"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৬ই পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 22nd December, 1961.
40 Naya Paise.

ভারতের মুক্তি-স্নান

শুধু গোয়ার মুক্তি নয়, দীর্ঘ অবসাদ ও হতাশা থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ যেন আজ মুক্তি লাভ করেছে। যেমন একদা লবণ সত্যাগ্রহের সময় আমরা দাণ্ডি-তট অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম এবং সেই যাত্রার মধ্যে ছিল গোটা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রতীক, তেমনি আজ আরব্য সাগরের তীরে গোয়ার সমুদ্রতটে আমরা মুক্তি-স্নান করেছি।

গত ১৪ বৎসরে ভারতবর্ষের অহিংস শান্তিনীতি বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্যাদা ও শক্তিবৃদ্ধিতে বিপুলভাবে সহায়ক হয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তার প্রতিফল হিসাবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে অবসাদ এবং ক্লৈব্য পুঞ্জীভূত হয়েছিল, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ, প্রধানত এই শান্তিবাদী নীতির জন্য, অথবা শান্তিবাদী নীতির জন্য নয়, তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য ভারত সরকার বিগত ১৪ বৎসর বহু ক্ষেত্রে আপোষমুখী এবং পৌরুষহীন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কাশ্মীরের অমীমাংসিত প্রশ্ন, পূর্ব-পাকিস্থানের উপদ্রবে বার বার নতিস্বীকার, বেরুবাড়ির হস্তান্তর, চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্নে পর্যাপ্ত দৃঢ়তার অভাব—এই ঘটনাগুলি জনসাধারণের মনে অনিবার্যভাবে দুর্বলতা ও নির্বীর্যতার অবসাদ সৃষ্টি করেছে।

আমরা একান্তভাবে এই ক্লৈব্য এবং অবসাদ থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। আমরা মুক্তি চেয়েছিলাম—শুধু গোয়ার পরাধীনতা থেকে নয়, ভারত সরকারের শান্তিবাদী নীতির সেই প্রতিফল থেকে, যা পরাভববাদী, যা জনসাধারণকে বীর্যহীন হতাশায় নিক্ষেপ করেছে। কাজেই গত সপ্তাহে আমাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা লিখেছিলাম যে, ভারতের জনমানসকে মুক্তি দিতে হবে। এবং যদি আমরা মর্যাদা সহকারে আমাদের উত্তর সীমান্তের অধিকারকে রক্ষা করতে চাই তাহলে তারও প্রথম পদক্ষেপ দক্ষিণের গোয়া থেকেই শুরু করা বাঞ্ছনীয়। (লক্ষণীয় যে আমরা নিশ্চিতভাবেই বলেছিলাম যে, শেষ মুহূর্তের দীর্ঘ দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও গোয়া সীমান্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরম্ভ হতে বাধ্য।) কোনো দেশের পক্ষেই আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেই দেশের সমস্ত জনমানস মাতৃভূমির সূচ্যগ্র অংশকে রক্ষা করার জন্য উদ্দীপ্ত এবং প্রাণোৎসর্গের জন্য আরব্ধ না হচ্ছে। কিন্তু এই উদ্দীপ্ত তেজ, এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম কিসের উপর আশ্রয় করে দাঁড়াবে?—যেখানে হাজার হাজার বর্গমাইল-ব্যাপী ভারতভূমি সম্বন্ধে আমাদের গভর্ণমেন্ট আপোষবাদী এবং সর্বংসহ? সুতরাং মাতৃভূমির প্রতি ধূলিকণা সম্বন্ধে এই মর্যাদাবোধ ও পবিত্রতার মনোভাব তৈরী হওয়া দরকার। স্বাজাত্যাভিমান ছাড়া কোনো জাতি বীরের জাতি হতে পারে না। এবং বীর ছাড়া অহিংসা সম্ভব নয়। কিন্তু বীরের তেজ কিভাবে জাতির ধমনীতে সঞ্চারিত হবে, যদি আমরা না দেখি সেই পদক্ষেপ, না শুনি সেই তূর্যধ্বনি, যা সমস্ত জাতিকে আহ্বান করেছে মাতৃভূমিকে পাশমুক্ত করার জন্য? আজ মাতৃভূমির প্রতি সেই বাঞ্ছিত সম্মাননার সূচনা ঘটেছে। আমরা নির্বীর্যতা থেকে মুক্তি স্নান করছি।

গোয়া ভারতবর্ষের শান্তি বিঘ্নিত করেনি। পর্তুগীজ গোয়া ভারতকে আক্রমণ করবে, এমন আশঙ্কাও কেউ করেনি। কিন্তু ভারতবাসীর কাছে এই শপথ আজ সজোরে এবং নূতন করে উচ্চারণ করা দরকার যে, মাতৃভূমির পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয়। এই শপথ আমাদের গোয়া অভিযানে নিয়ে গেছে, এই শপথই আমাদের উত্তর সীমান্তকেও দস্যুতার কবল থেকে মুক্ত করবে। এই মুক্তির, উদ্দীপনার ও আত্মোপলব্ধির দিন দীর্ঘজীবী হোক। এই মুক্তি দীর্ঘজীবী হোক, ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরে। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বিজয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জয় হিন্দ।

কবিতা

অকাল আষাঢ়ে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তব দক্ষিণ বায়ুর প্রবল মৌসুমী টানে
টেনেছো আমায়, মেঘমাশ্লিষ্ট নবনীপছায়!
সজল পাথরে সিক্ত সোপানে বক্ষে...বাগানে,
ডাকিলে জলের জলকীর্তনে ভিজা নৌকায়।

শিকড়ে শাখায় মাথুরে গাথায় ফোটা মল্লারে
দুলেছো হাওয়ায় দূর নীলিমায় ছায়ালি পিয়াল।

তব অলকের অলৌকিকের ঋতুনির্মাণে
কম্র কবরী মেলে দিলে অই স্ফুরিত ধারায়,
লাজে অম্বরে ডম্বরুগুলি আর্দ্র উজানে
বাজে গান্ধারে প্রিয়উন্ধারে অমল মায়ায়।

নর্তনিঃস্বনে গন্ধবীজনে বিধুর আঁধারে
মর্মরে, বনে, বারিবর্ষণে উতলা তমাল।

* * *
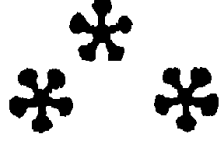
বৃক্ষ

সুশীলকুমার গুপ্ত

সময়ের অনুর্বর প্রতিকূল প্রান্তরের কোলে
তুমি আজ দেখা দিলে অত্যাশ্চর্য বৃক্ষের মতন;
তোমার বিস্বস্ত দেহে সবুজ আকাশ ঢেউ তোলে,
বল্কলের বস্ত্রে ঢাকা প্রাণের পবিত্র গুপ্তধন।

কখনো হাওয়ার তালে জাগাও ধ্রুপদ কথাকলি,
কখনো নীলিমাপ্রেমে হও মুগ্ধ, ঝড়ের গ্রাহক
পত্রমুদ্রা বিনিময়ে, কখনো কুসুমে দীপাবলী
জ্বালো বসন্তের নামে, ডালে ডালে পাখির নাটক।

ফিরিয়ে দিও না আজ; ক্ষমা করো পূর্ব ব্যবহার,
মুখ তোলো, চেয়ে দেখো—স্নিগ্ধশ্যাম তোমার হৃদয়ে
পেতেছি বিছানা, ভেঙে কামনার কঠিন কুঠার
গড়েছি প্রাণের শিল্প; তবু কেন কাঁপো দ্বিধাভয়ে?

সময়ের জ্বরে ভুগে রুগ্ন আমি তোমার নিকটে
এসেছি দরিদ্র মনে, দীপ্ত প্রেমে করো মনোনীত;
রক্ত ধোঁয়া কলঙ্কের হিজিবিজি মুছে প্রাণপটে
হও ছবি, ঢালো স্বপ্ন, দাও ছায়া সবুজ অমৃত।

স্বাক্ষরিত স্মৃতি

অনন্ত দাশ

দূরের সমুদ্রে যাবো দ্রুতমেঘ ঝড়ের পাখীরা
তটরেখা মুছে দিয়ে আকাশের বাদামী নেশায়
নদীর দর্পণে জ্বলে দুঃখ প্রেম স্মৃতির ত্রিশিরা
জলতলে শিশুকাল স্থিরমুখে ফিরে ফিরে চায়:
আমার স্মৃতির বহ্নি অই দেখ দূরে দূরে জ্বলে
শিহরিত দেওদারে মাঠ বৃক্ষ জলার আঁধারে
নৈঋতে নিঃসঙ্গ তারা প্রিয়গান হাওয়ার আঁচলে
রাত্রিশেষে পথহারা দিকশূন্য নদীর কিনারে।

এ কোন শহরে জন্ম উঁচুনীচু খিলানের পথ
কোলাহলে তীব্র স্রোত ভেসে যায় দূরে নিরবধি,
শ্বেতপদ্মে মৃদুহাসি কিছু দুঃখে মিলন শপথ
সব স্রোত মিশে যায় স্মৃতি এক বলয়িত নদী।
স্মৃতিজলে স্মৃতিরেখা চলে যাবো দূরের সাগর
এ নদীর পারাপারে ছুঁয়ে থাকি শূন্যতার ঘর॥

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেক ভালো কথাও শেষ পর্যন্ত ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়ায়। জাতীয় সংহতি ব্যাপারটাও ক্রমে যেন সেই রকম গোল-মেলে হ'য়ে উঠছে। মুখে 'সংহতি'র মন্ত্র জপ করে কার্যত সংহারের দিকেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা, সেও এখন তর্কের বিষয়।

সত্যি বলতে কি, জাতি হিসাবে আমাদের যে সংহত হওয়া দরকার এতে কারো দ্বিমত নেই। আজকের জগতে অসংহত জাতির যে কী নিদারুণ সর্বনাশ ঘটতে পারে কঙ্গোই তো তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু সবকিছু সমস্যার উপর দিয়ে স্টীম রোলার চালিয়ে ঐক্যের একটা বাঁধাপথ তৈরী করলেই যে জন-জগন্নাথের রথ গড় গড় করে এগিয়ে চলবে এমন মনে করলেও সে চিন্তা হবে যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট।

সংহতির প্রশ্নটাও যেন তেমনি যান্ত্রিক হ'য়ে উঠছে সম্প্রতি।

শোনা যাচ্ছে, জাতীয় সংহতির জন্যে সরকার নাকি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করতে উৎসুক। শিক্ষার মূলসূত্র কী হবে এ বিষয়ে সরকারী উদ্বেগ অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু মূলনীতি স্থির করা এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এক কথা নয়। শিক্ষাব্রতীদের একটা বিরাট অংশই সরকারী নিয়ন্ত্রণে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে এগিয়ে আসবেন না। অতএব উপস্থিত যাঁরা সরকারী কর্মে নিযুক্ত আছেন তাঁদেরই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের যোগ্য কিনা সন্দেহের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে একটি পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ ক'রে সরকার গত কয়েক বছর ধরে খুব একটা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এমন বলা যায় না। সংকলনটি এমন নিচু স্ট্যান্ডার্ডে লিখিত যে কেবলমাত্র ঐ পুস্তকের ভিত্তিতেই যদি কোনো শিশুকে বাংলা ও অংক শিক্ষা দেওয়া হয় তবে কোনোক্রমে সে লিখতে বা পড়তে শিখবে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ গ্রহণ করার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ফলত, কোনো ভালো ইস্কুলেই একমাত্র ঐ সংকলনটি দিয়ে শিশুদের পাঠাভ্যাস সাঙ্গ করা হয় না। এবং হয় না বলেই রক্ষা।

কিন্তু এসব হল খুঁটিনাটি কথা। এর চেয়েও জরুরী বিষয় আছে এবং

সেইটিই বর্তমান আলোচনায় আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখার ইচ্ছা।

সংহতির প্রশ্নে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এত মাথাঘামানোর তাৎপর্য কী? আমরা বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ যেখানকারই মানুষ হই না কেন, মূলত আমরা ভারতবাসী. এই গভীর স্বাজাত্যবোধকে অত্যন্ত শিশু বয়সেই যাতে ভারতীয় নাগরিকদের মনে দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই সরকার পাঠ্যপুস্তকের রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে চাইছেন। স্বাজাত্যবোধের স্ফুরণ হোক, এতে কারো

আপত্তি হ'তে পারে না। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ 'এক জাতি' হ'য়ে উঠুক, এ প্রস্তাবে সায় দেওয়া কঠিন। কারণ অনিবার্যভাবেই এর ফলে মনে পড়ে কিছুকাল আগে শোনা সেই অদ্ভুত শ্লোগান—এক জাতি, এক ভাষা (এবং আরো অনেক কিছু)! স্পষ্ট করেই বলা দরকার এর মধ্যে একটা অশুভ যোগাযোগ আছে, আর তার উদ্দেশ্যও বিশেষ মহৎ নয়। ভারতেতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ। ইউরোপীয় অর্থে এ দেশ একটা 'নেশান' নয়, মাল্টি-ন্যাশনাল কান্ট্রি। কিন্তু নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধানের মধ্যেও এখানে একটা 'মিলন' বা ঐক্যের ভাব আছে। তাকে বলা হয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই বিচিত্র এবং এক—দুটি দিকের প্রতি সমান জোর দিলেই তবে ভারতাত্মাকে আবিষ্কার করা সম্ভব। কোনো একটি দিকের প্রতি বেশী ঝোঁক দিলে সেটা হবে মারাত্মক।

পাঠ্যপুস্তককে কুক্ষিগত করে সরকার যদি ঐক্যের নামে কেবল সর্বভারতীয় বুলি কপচাতে শেখান তবে তার ফল হবে কী? প্রথম ফল হ'তে পারে এই যে, বইয়ে যা শিখবে আর জীবনে যা দেখবে তার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে না পেলে ছাত্রেরা একটু বড় হলেই গোটা দ্বিতীয় ফল হবে, তারা জোর করে চাপানো এই ঐক্যের প্রতি হবে বিদ্বেষপরায়ণ।

ঠিক যেমন হ'য়েছে জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীকে চালানোর মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের ফলে। বলা বাহুল্য, দৃষ্টান্তটা আকস্মিক নয়। দুটি প্রবণতার মধ্যেই কোথাও যেন একটা মিল রয়ে গেছে। এবং কেউ যদি সন্দেহ করে, পাঠ্যপুস্তকের মারফৎ জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও আসলে আ ধি প ত্য কা মী হিন্দীওয়ালাদেরই আরেকটা অপকৌশল, তাহলে সদুত্তর দেওয়া কঠিন হবে।

আমাদের আপত্তিটাও ঠিক এইখানেই।

অবশ্য এটা ঠিক যে, বর্তমানে যেভাবে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় তাকে আদর্শ ব্যবস্থা বলা যায় না। অযোগ্য লোকের লেখা অজস্র বাজে বই নিছক 'উচ্চ কমিশনের' উৎকোচে সরলমতি বালক-বালিকাদের মস্তক চর্বণ করছে। মলাটের উপর খেতাবধারী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নাম মুদ্রিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বইটির এক বর্ণও নিজে লেখেন না, সম্পাদনাও করেন না, সামান্য কিছু দক্ষিণা পকেটস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকেন। এই দায়িত্বহীন দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটুক, এটা আমরা অবশ্যই চাই। কিন্তু তার জন্যে সরকারী অনুপ্রবেশের দরকার নেই। সরকারী এবং বেসরকারী সহযোগিতায় একটি পরামর্শদাতা সমিতি স্থাপন করে তার উপর পাঠ্যপুস্তক রচনার মূলনীতি স্থির করার দায়িত্ব দিলেই যোগ্যতর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সমিতি অবশ্যই এমন পাঠক্রম অনুমোদন করবেন না, যা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং গোষ্ঠিগত অন্ধতা প্রশ্রয় দেয়। এবং সেইভাবেই স্থাপিত হবে জাতীয় সংহতির স্বেচ্ছামূলক প্রীতির বন্ধন।

• • •

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই আমাদের জাতীয় মানসের ভগীরথ। তিনি তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার দ্বারা কেবল যে আমাদের এই ঊষর দেশে রূপলোকের রসধারা প্রবাহিত করেছেন তাই নয়, তাঁরই প্রসাদে শতবর্ষ-উৎসব পালনও যেন এ-বছর বন্যার মতো দুর্বার হ'য়ে উঠেছে। এমনটা যে ঘটবে তা লোকোত্তর কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বোধকরি রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পারেন নি। নয়তো তিনি অবশ্যই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে বারণ করে যেতেন—যেমন বারণ করে গেছেন মর্মরমূর্তি স্থাপন করার বিষয়ে।

বাস্তবিক এই '৬১ সালে যেন চোখের উপর দিয়ে। অতীতকে কে না ভালবাসে? অতীতের ভিতর দিয়েই তো আমরা বর্তমানে এসেছি! কিন্তু

একটা গঠনশীল নতুন-স্বাধীনতা-পাওয়া দেশ হঠাৎ এমন পিছন ফিরে অতীতের মধ্যে মগ্ন হ'তে চাইছে, এ বড় তাজ্জব ব্যাপার।

যাঁদের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করা হ'য়েছে, সকলেই তাঁরা মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু মহত্ত্বেরও নিশ্চয়ই স্তরভেদ আছে এবং আমাদের সেই স্তরভেদের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। নয়তো প্রকৃতই যিনি অতুলনীয় মহৎ, তাঁর তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি না হলেও অন্যান্য যাঁদের একই সঙ্গে তুলে ধরা হয়, তাঁদের হীনজ্যোতি মনে হওয়া স্বাভাবিক। শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা এইভাবে আমাদের প্রিয় পূর্বপুরুষদের নিয়ে এত বেশী টানাটানি না করলেই বোধহয় ভাল করতাম।

আগামী '৬২ সালেও এই শতবর্ষের হিড়িক চলতে থাকবে ভাবলে শরীরটা আনচান করে ওঠে। তার চেয়ে যদি আমরা চিন্তায় কর্মে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐসব দিকপাল ব্যক্তির কিছুটাও যোগ্যতা নিজেদের জীবনে অর্জন করতে পারি তো সেইটেই কি আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা-নিবেদন হবে না? 'শতবর্ষ' তো স্যাচুরেশান পয়েন্টে এসে গেছে। আসুন না এবার আমরা প্রতিদিনের কথা ভাবি, মুখ ঘুরিয়ে তাকাই ভবিষ্যতের দিকে। তবে তো হব আমরা গৌরবপূর্ণ অতীতের যোগ্য উত্তরাধিকারী। আত্মবঞ্চনায় কতকাল আর যা-হোক একটা ছুতো নিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ভুলে

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের শতবর্ষ

সুধীরচন্দ্র সরকার

ভারতে সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা স্থাপনের শতবর্ষ উৎসব ১৪ই ডিসেম্বর হতে ২১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হোল। জেমস প্রিন্সেপের অধীনে সর্বপ্রথম ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্বের সূচনা হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে প্রিন্সেপের নাম নানা কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনিই সর্বপ্রথমে ভারতে প্রাচীনতম ব্রাহ্মী ভাষা লেখনের পাঠ উদ্ধার করেন। এই হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। তাঁকেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পথিকৃত বলা হয়। সমসাময়িক ইতিহাসের মালমশলা হতে তিনিই প্রথমে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কাহিনী উদ্ধার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভাল ভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই এই প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ভিত্তি স্থাপন হয় ১৭৮৩ সালে, যখন মনস্বী স্যার উইলিয়াম জোনস Asiatic Society of Bengal স্থাপন করেন এবং Asiatic Researches নামে পত্রিকা ও অন্যান্য বই প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৭ সালে এই সোসাইটির সেক্রেটারী জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লেখন পাঠোদ্ধার করে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করলেন। এর কয়েক বৎসর পরেই 'খরোষ্টি' ভাষা, যে ভাষা প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তার পাঠোদ্ধার হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ও খনন কার্য আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে।

১৮৬১ সালে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের অধীনে সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়। ২০ বৎসর ধরে কানিংহাম•উত্তর ভারতের স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দিরের প্রাচীনত্বের গবেষণা করেন। সে সময়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও প্রত্নতত্ত্বের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৮৮৫ সাল থেকে প্রত্নতত্ত্বের কাজ নানা কারণে ক্ষীণতর হয়ে আসে। এই বিভাগকে অনেকটা অনাবশ্যকীয় মনে হওয়ায় অনেক কর্মচারীর কর্মচ্যুতি ঘটে এবং এই বিভাগকে সংকুচিত করা হয়। এর ফলে এই বিভাগ কয়েক বৎসর অর্ধমৃত অবস্থায় থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম অবসর গ্রহণ করলে ডাক্তার বার্জেস প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হন। তাঁর অধীনে আবার নূতন কাজের সূচনা দেখা দিল। গবেষণার জন্য ব্রিটিশ ভারতকে পাঁচটি circle-এ ভাগ করা হোল—বোম্বাই, মাদ্রাজ, সিন্ধু ও রাজপুতনা সহ পাঞ্জাব, মধ্যভারত সহ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও আসাম, মধ্যপ্রদেশ সহ বাংলা। বার্জেস সাহেবের প্রধান কীর্তি হচ্ছে ৩২ খণ্ডে ৩০ বৎসর New Imperial Series প্রকাশ করা। এই খণ্ডগুলিতে ভারতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দিরের সঠিক বিস্তৃত বিবরণ আছে—যা আজকের নানা ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও নূতন আবিষ্কারের পরেও অমূল্য হয়ে আছে। কানিংহামের কাজ ছিল অন্য ক্ষেত্রে—তিনি প্রাচীন ভূগোলের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ মন্দির ও তাদের অনুসন্ধান এবং চীন পরিব্রাজক-দৃষ্ট স্থানগুলির প্রাথমিক বর্ণনা গবেষণা করে পুস্তক প্রণয়ন করতেন।

লর্ড কার্জন যখন ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন, তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সত্যকার শুভদিন আরম্ভ হোল। লর্ড কার্জনের উৎসাহে ও তাঁর প্রাচীনতত্ত্বের প্রতি অনুরাগের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নূতন রূপ ধারণ করলো। এই সময় থেকে ভারতের প্রত্ন-সম্পদের প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁর আদেশে এই বিভাগে অর্থের সচ্ছলতা ও দক্ষ শাসন দেখা দিল। প্রথমেই তিনি ঠিক করে ফেললেন যে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলি রক্ষা করাই এই বিভাগের সর্বপ্রথম কাজ হবে। এই
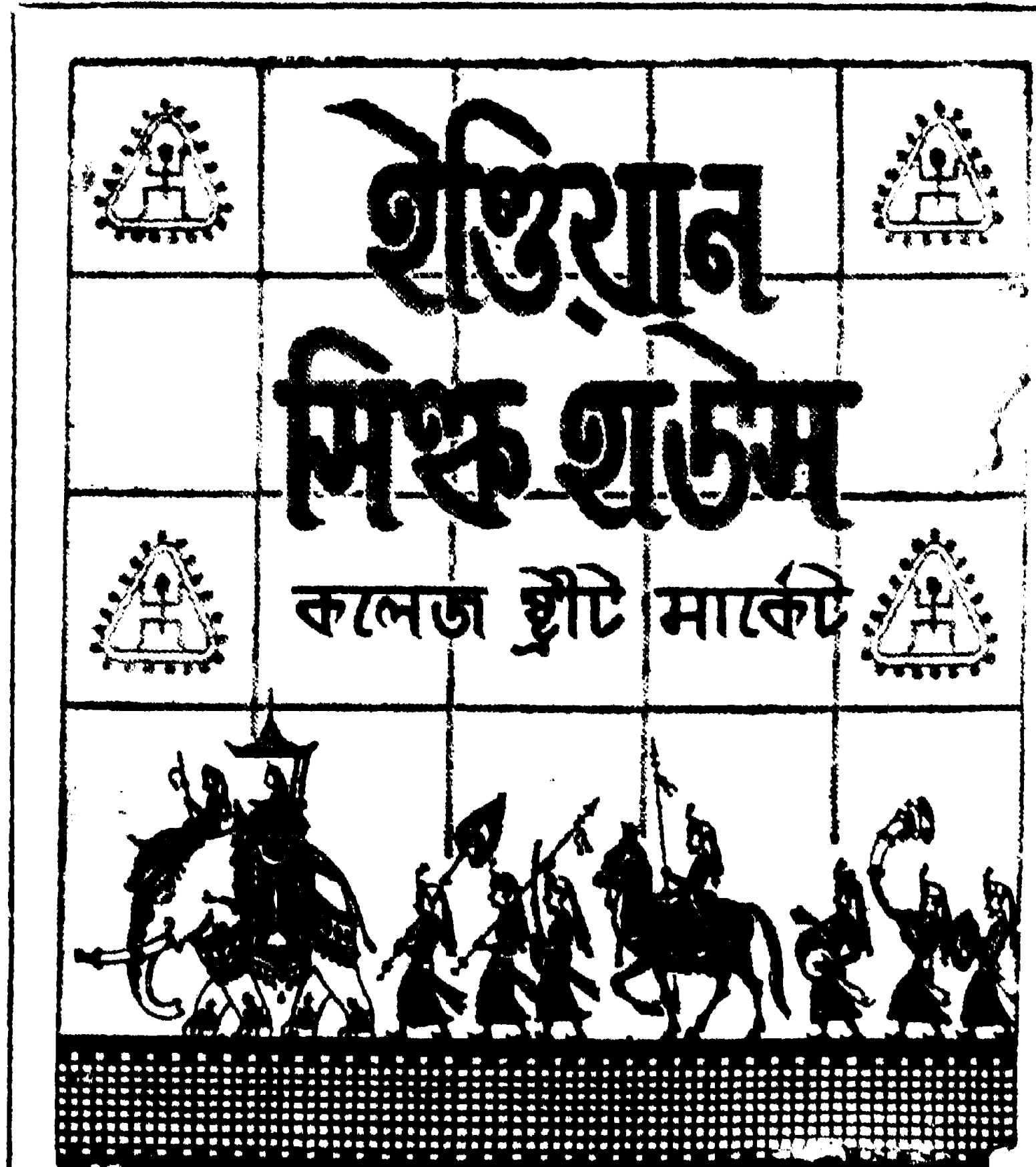
পশ্চিম বাংলার বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া জেলা) জোড়াবাংলা মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নৌকা চালনার দৃশ্য।

বিভাগে কি কি কাজ করতে হবে তা তিনি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিলেন— It is in my judgment. equally our duty to dig and discover, to classify, reproduce and describe, to copy and decipher and to cherish and conserve. লর্ড কার্জন রাজনৈতিক বিষয়ে ভারত-বিদ্বেষী হলেও এই সব সংস্কৃতি ব্যাপারে তিনি খুব প্রগতিশীল ছিলেন।

লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে স্যার জন মার্শালকে ডিরেক্টার জেনারেল পদে নিয়োজিত করলেন। সেই হতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হোল। সমস্ত জিনিষটাকে ভালভাবে করায়ত্ত করতে মার্শালের প্রথম দশ বৎসর কেটে গেল। তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগঠন, ক্রমোন্নতি ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। সেই সময় স্মৃতিস্তম্ভগুলির সংরক্ষণ হোত P. W. D-র সাহায্যে এবং আর্থিক সাহায্য আসতো প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের হাত হতে।

১৯০৪ সালে ভারতীয় আইন সভা Ancient Monuments Preservation Act পাশ করাতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এক নূতন যুগ এল। এই আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) সমস্ত প্রাচীন অট্টালিকা এমন কি বেসরকারী অট্টালিকাগুলিরও সংরক্ষণ ও মেরামত। অবশ্য পূজাঅর্চনার প্রাচীন মন্দির ছাড়া. (২) অজ্ঞ এবং অননুমোদিত লোক দ্বারা ঐতিহাসিক স্থানগুলির খনন বন্ধ করা এবং (৩) প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের জিনিষগুলি বিদেশে বা অন্যস্থানে অপসারণ নিবারণ করা। ক্যানিংহাম যেসব কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, যেমন বৌদ্ধস্মৃতিসম্বলিত স্থানগুলির খনন কার্য, তা পুনরায় রাজগীরে, কাশিয়াতে, সারনাথে, মীরপুর খাসে, পেশোয়ারে ও ভিটাতে আরম্ভ হয়।

এই সময়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রারম্ভের তারিখ ধরে নেওয়া হয়েছিল, বুদ্ধের জন্ম তারিখ হতে। এবং এই বিষয়ে ভারতীয় গবেষণা এর পূর্বে প্রবেশ লাভ করতে চেষ্টা করে না বা সন্ধান পায় নাই। এই স্থিতাবস্থা চলেছিল ১৯২৪ পর্যন্ত; কিন্তু সিন্ধুপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পা সহর আবিষ্কার হওয়ায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সিংহদ্বার হঠাৎ খুলে গেল। এই দুই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার জন্ম তারিখ খৃষ্ট জন্মের হাজার হাজার বৎসর আগে প্রমাণিত হোল। মহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পার আবিষ্কার বর্ণনা করতে গিয়ে মার্শাল লিখলেন, ভারতবর্ষে কিছু কিছু প্রাগৈতিহাসিক জিনিষ আবিষ্কার হলেও অন্যান্য প্রাচীন জাতির তুলনায় আমরা ভারতবর্ষকে আধুনিক জাতি বলে মনে করতাম; এর অতি প্রাচীন ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি কিছুই ছিল না, এই ধারণা নিয়ে এতদিন আমরা কাজ করেছিলাম। বুদ্ধ জন্ম থেকে যে দেশে প্রত্নতত্ত্বের সূত্রপাত বলে গ্রহণ করা হয়েছিল, সে দেশ সভ্যতা ও কৃষ্টিতে অন্যান্য অতি প্রাচীন দেশের তুলনায় অনেক নিম্নে। তাই এই আবিষ্কারের ফলে ভারত সভ্যতার যুগ আরও তিন হাজার বৎসর প্রাচীনতার সম্মান লাভ করলো। ভারতে সেই সময়ে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বেশী কোন স্মৃতিস্তম্ভ ছিল না। কিন্তু এখন প্রমাণিত হোল খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে, এমন কি তার পূর্বেও পাঞ্জাবে ও সিন্ধু দেশের অধিবাসীরা সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে বাস কোরত এবং সভ্যতা ও কৃষ্টিতে তারা বেশ উন্নত ছিল। ১৯২৫ হতে ১৯৩১ পর্যন্ত ভারত-প্রত্নতত্ত্বের মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার যুগ বলা যেতে পারে। দেশে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার ও প্রাচীনতার কীর্তিকাহিনী ছড়িয়ে পড়লো

এবং ভারতবর্ষ প্রবীণ সভ্য জগতের মধ্যে একটি শীর্ষস্থান অধিকার করলো। সেই থেকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এইখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এর পরে এই কাজে জড়িত ছিলেন স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার।
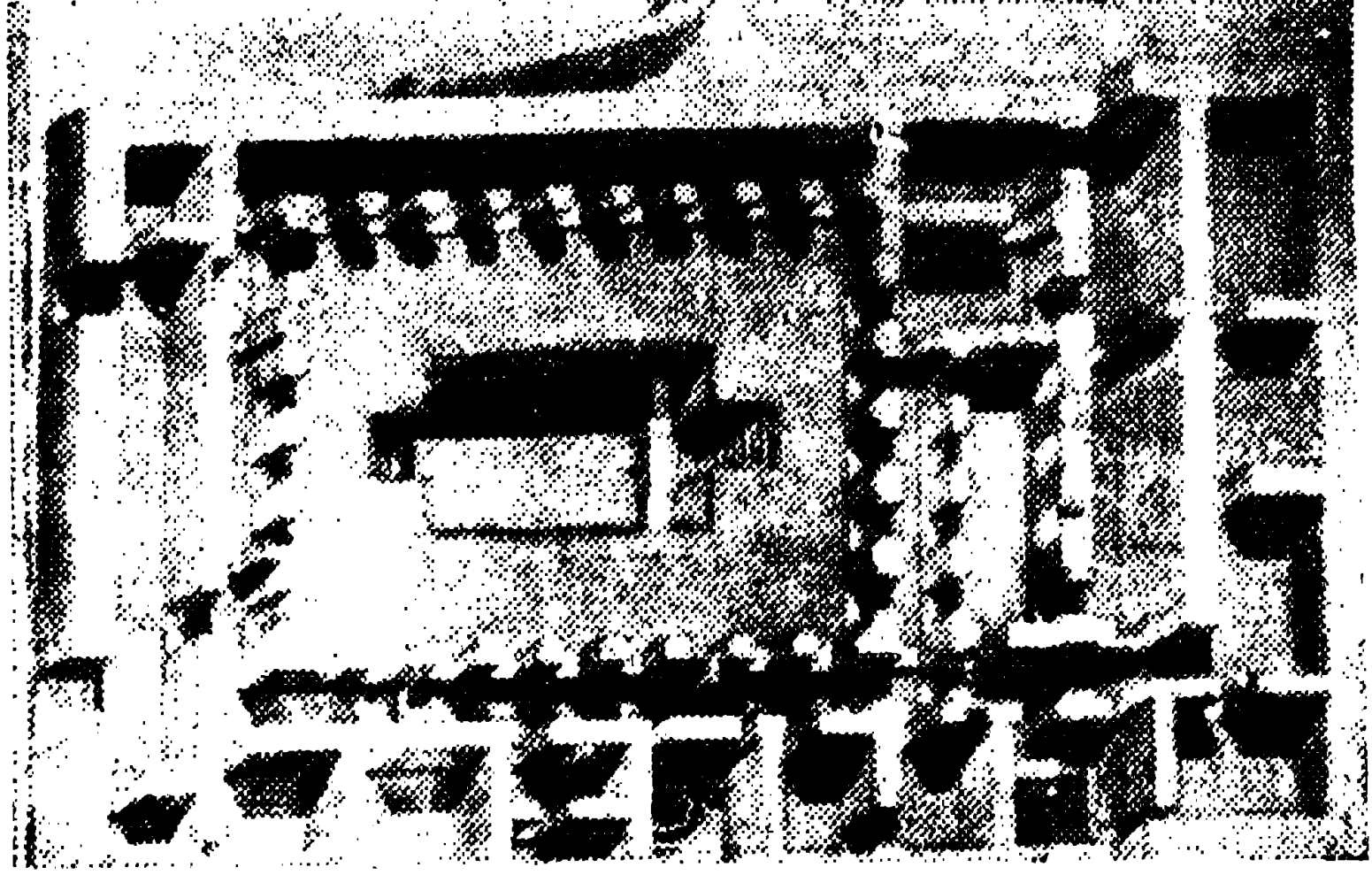
মহেঞ্জোদারোর পুরাকীর্তি—সুবৃহৎ স্নানাগারের বিচিত্র নক্সা

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মার্শাল তক্ষশীলা খনন করে একটি প্রকান্ড প্রাচীন সহর আবিষ্কার করলেন। এই সহর মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতের যোগসূত্রে ছিল এবং এই স্থানেই গ্রীক, পারস্য, সিথিয়ান, পারথিয়ান ও ভারতীয় জাতির সংমিশ্রণ হয়। মার্শল এই স্থানে প্রায় ২০ বৎসর খনন কার্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৯২৪ হতে ১৯৩৪ পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর যে অতি প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার হয়েছিল তা আবিষ্কারের সংগে সংগেই শেষ হয় নাই। পরে এই খনন কার্য পুনরায় আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে এই সিন্ধু-সভ্যতা আরো নীচের দিকে অগ্রসর হয়েছিল—যেমন ক্যাম্বেতে, কচ্ছে, গুজরাটে, লোহালে এবং শারাবতী উপত্যকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই সিন্ধু সভ্যতার সময় হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ হতে ২৭০০ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত। এইস্থানে মাটির নিচে সহর আবিষ্কৃত হয়েছে, নানা প্রাচীন জিনিষপত্র পাওয়া গিয়েছে, যেমন সীলমোহর, গহনা ইত্যাদি। তাছাড়া রাস্তা, ঘাট, গৃহ, স্নানের স্থান সবই আবিষ্কার হয়েছে।

এই আবিষ্কারের পর সমস্ত ভারতে রীতিমত খনন ও সংরক্ষণকার্য আরম্ভ হোল। যেমন সিন্ধুর প্রাগৈতিহাসিক স্থানে, বাংলার পাহাড়পুরে, মহাস্থান-গড়ে, নালন্দায়, রাজগীরে, পাটলিপুত্রে, দক্ষিণে নাগরজুনাকণ্ডায়। মার্শাল সাহেব সংরক্ষণ নীতির দিকেও বেশ নজর দিয়েছিলেন; এই সংরক্ষণ নীতির ফলে সমস্ত দেশে অনেক লুপ্ত, ভগ্ন জিনিষ, নদী বা মাটির গর্ভে নিহিত দ্রব্য আবিষ্কার হতে লাগলো।
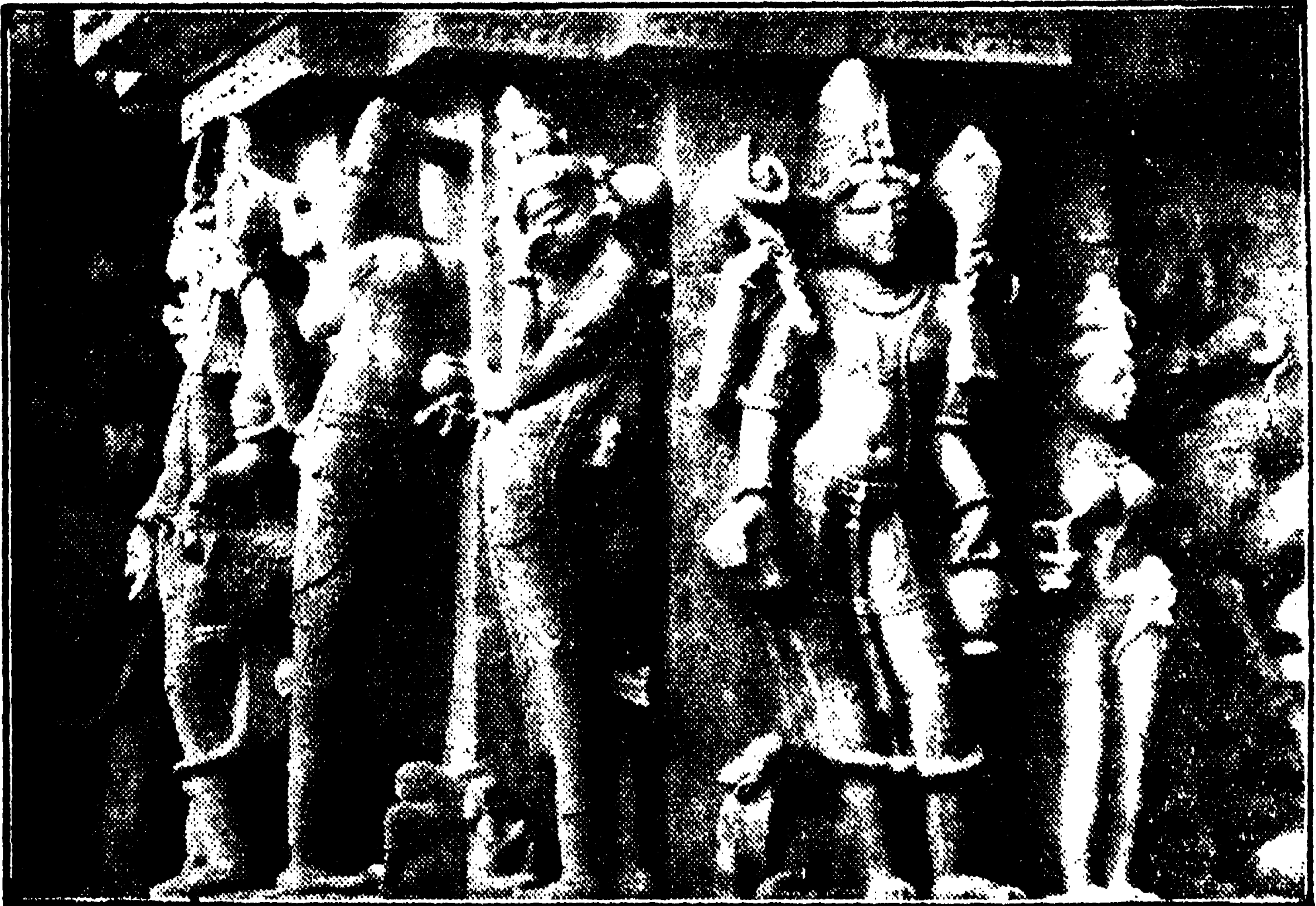
মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরের গায়ে ভারতের ভাস্কর্যকলার অপরূপ নিদর্শন—সুর ও সুরাঙ্গনাদের স্থান-বিভ্রমময় মূর্তি

মহেঞ্জোদারোর পুরাকীর্তি—কূপ

কেবলমাত্র সংরক্ষণ নয়, পুরাতন স্মৃতি-স্তম্ভ বা মন্দিরের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর বাগানের সৃষ্টি হোল এবং আবশ্যকমত নানা স্থানে এবং এই সব স্মৃতিক্ষেত্রে মিউজিয়াম স্থাপিত হতে লাগল। এই সব মিউজিয়ামে খনন করা যে সমস্ত ঐতিহাসিক জিনিষ পাওয়া গিয়েছে তা সংরক্ষিত হয়েছে। সারনাথ, তক্ষশীলা, সাঁচি, অমরাবতী, নাগরজুনাকণ্ডা, নালন্দা, খাজুরাহো, হাম্পী ইত্যাদিতে মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে।

এরপরে ডিরেক্টার জেনারেল স্যার মর্টিমার হুইলারের অধীনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে নানা রকম উন্নতি দেখা দিল। তিনি প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে এনে দিলেন। খননকার্যগুলির জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এত দিন দুইটি circle ছাড়া অন্যান্য circle-এর সংরক্ষণ-কার্য করতো P. W. Department এই দ্বৈতনীতির ফলে নানা দিক থেকে কাজের ব্যাঘাত ঘটতো। সেই সমস্ত কাজ এখন এক হাতেই এসে গেল। হুইলারের প্রচেষ্টায় এই সময়ে Central Advisory Board of Archeology স্থাপিত হোল। এই বোর্ড উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে থাকে। পরে দেশ স্বাধীন হবার পর ডাক্তার চক্রবর্তী, এ, ঘোষ ইত্যাদি কয়েকজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডিরেক্টার জেনারেল হয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রত্নতত্ত্বের কাজ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। সংরক্ষণ, খনন, মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠান, গবেষণা, পুস্তক প্রকাশ, আবিষ্কার ইত্যাদি সব কাজই এখন পূর্ণ মাত্রায় চলছে। প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রকাশ এখন নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন আইন Ancient Manuments and Archeological Sites and Remains Act পাশ হোল। এই আইনের বলে অর্থলোভী লোকরা যাতে ভারতের অমূল্য সম্পদ ভারতের বাইরে বিক্রয় না করতে পারে তা সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা হোল। বেসরকারী হাত হতে অমূল্য সম্পদগুলি যাতে আবশ্যক হলে সরকারী হাতে আসতে পারে তারও ব্যবস্থা হোল। সরকারের অনুমতি না নিয়ে পুরাতন মন্দির বা স্মৃতি স্থানগুলি ভেঙ্গে ফেলা, নষ্ট করা, স্থানান্তরিত করা নিষেধ হোল।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষা দানের জন্য দিল্লীতে School of Archeology স্থাপিত হয়েছে। এখানে ছাত্রদের খনন, রক্ষণ, সার্ভে, অঙ্কন, ফটোগ্রাফী, রাসায়নিক উপায়ে স্মৃতিসৌধের সংরক্ষণ—ইত্যাদি নানা প্রকার শিক্ষাদান করা হয়। দেশে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা আরম্ভের এক শত বৎসর পরে আলোচনা করে বেশ বুঝতে পারা যায়, প্রত্নতত্ত্ব এখন আমাদের দেশে পূর্ণতা লাভ করেছে। এর কর্মপ্রণালী শিক্ষার সমস্ত অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শতবার্ষিকী উৎসবের সময় যে সব মনীষীরা এই বিরাট কর্মের পথিকৃত ছিলেন, তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সকলে স্মরণ করি।

বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি সাতটি Circle-এ বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগের চারটি শাখা আছে—Excavation Branch, Epigraphical Branch, Chemical Branch and Museum Branch। এই বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ করা। Epigraphica Indica, Inscriptionum Indicanum Guide book, Ancient India বিষয়ক নানা ধরণের বহুমূল্য গ্রন্থ এই বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে ইতিহাসের অজ্ঞাত পৃষ্ঠা দেশবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।
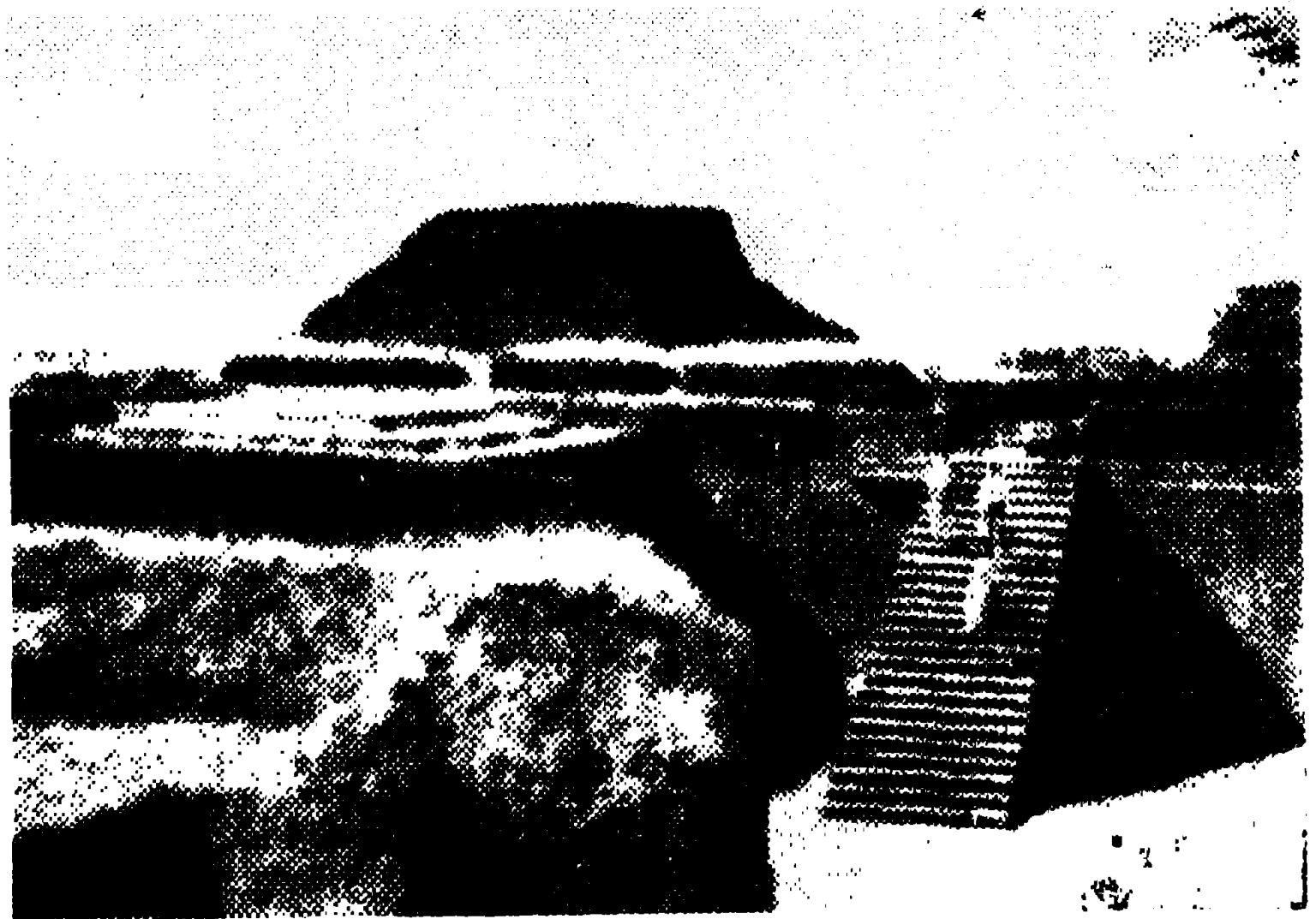
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নস্তূপ

এক আধুনিক চোরের গল্প

পরিমল গোস্বামী

সে দিন চায়ের দোকানের আড্ডায় চুরির গল্প আরম্ভ হয়েছিল।

গিরিশ দত্ত, গোবর্ধন রায়, আর তারাপদ সেন। পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও চায়ের দোকানে অনেক দিনের আলাপ। তিনজনেই সন্ধ্যার পর চার পাঁচ পেয়ালা চা খান এক আসরে বসে। ঘণ্টা দুই সময় বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায়। নিরাপদেও বটে, কারণ বাড়িতে ঘন ঘন চা খেলে কিছু অশান্তির কারণ ঘটে সবারই।

সে দিন প্রথম পেয়ালায় চুমুক দিতেই দোকানের বাইরে হঠাৎ "চোর চোর" চিৎকার উঠে দূরে মিলিয়ে গেল। শহরের পথে এ রকম প্রায়ই ঘটে।

এঁরা তিনজন সচকিত হলেন। অনেকে বাইরে বেরিয়ে গেল মজা দেখতে। কিন্তু খুব যে একটা মজা দেখা গেল এমন মনে হল না। হয়তো ছোট ছেলেরা খেলাচ্ছলে ঐ রকম চেঁচিয়ে থাকবে।

কিন্তু সে দিন এই উপলক্ষে এঁদের তিনজনের মধ্যে চোরের প্রসঙ্গটা বড় হয়ে দেখা দিল। পাড়ায় চুরি বেড়ে গেছে—সবাই ছিঁচকে চোর। জানালা দিয়ে কাপড়টা জামাটা নিয়ে পালায়, দূরে সরিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।

তারাপদবাবু ভিন্ন অপর দুজনেই এক তলার বাসিন্দা। একমাত্র তারাপদ-বাবুই চোরের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ, কারণ তিনি তিনতলায় থাকেন।

গিরিশবাবু বললেন, "সপ্তাহ তিনেক আগে তাঁর ঘরে লম্বা এক বাঁশ ঢুকিয়ে দুখানা ধুতি নিয়ে গেছে। আর জানেন, রাত তখন মাত্র ১১টা!"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "সপ্তাহ তিনেক আগে? মানে পুজোর দু'তিন দিন আগে। তা তো হবেই। ঐ সময়টা চোরের মরশুম। পুজোর নতুন জামা-কাপড় জোগাড়ের ব্যাপার আর কি। আহা, বেচারাদের ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, আরও অনেককে হয়তো পালন করতে হয়।"

গিরিশবাবু মনে মনে ভাবলেন ভদ্র-লোক কমিউনিস্ট। বললেন, "সে তো মশায় সবারই আছে। তাই বলে চুরি করতে হবে?"

"ঠিক তা বলিনি। আমি বলছি কি ওদেরও তো শখ আছে, অথচ কিনতে পারে না। এই তো সেদিন আমার বাড়িতে জানালায় কাঠি ঢুকিয়ে বেছে বেছে নতুন জামা আর শাড়ি নিয়ে গেছে। আরও নিত, কিন্তু মশারিতে আটকে গিয়ে এমন টান লেগেছিল যে মশারিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল আমার ঘাড়ে, একেবারে ফ্রেমসুদ্ধ!"

"কিন্তু আপনার কি তাতে খুব আনন্দ হয়েছে?"—একটু বাঁকা সুরে বললেন গিরিশবাবু।

"আদৌ না। থানায় খবর দিয়েছি।"

গিরিশবাবু নিশ্চিন্ত হলেন, তা হলে ভদ্রলোক কমিউনিস্ট নন।

গোবর্ধনবাবু আরও বললেন, "থানায় খবর দিয়েছি বটে কিন্তু চুরি আদৌ করে কেন তাও মাঝে মাঝে ভাবি।"

এ কথায় গিরিশবাবুর আবার ভ্রূ-কুঞ্চন ঘটল। বললেন, "আমরা মশায় অতটা ভাবি না, চুরি চুরিই—মানে চুরি ইজ নাথিং বাট চুরি—ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি চুরি করা পাপ"—

তারাপদবাবু এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে চা খাচ্ছিলেন, কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

তিনি বললেন, "চুরির নীতি নিয়ে তর্ক আরম্ভ করলে ওর শেষ পাবেন না। চুরি লোকে কেন করে তার উত্তর দিতে গেলে মানুষের আবির্ভাব কাল থেকে তার সমাজের বিবর্তন পর্যন্ত কথা তুলতে হয়। তার জন্য দু'চার মিনিট সময় যথেষ্ট নয়, দু'চার মাস লাগতে পারে। অতএব ও প্রসঙ্গ থাক। তার চেয়ে কয়েক দিন আগে আমার বাড়িতে যে একটি ইন্টা-রেস্টিং চুরি হয়ে গেছে, তার কথা শুনুন। সে এক কাহিনী। আর সে চুরির কথায় আপনাদের অনেক কথার উত্তরও পেয়ে যাবেন হয়তো।"

"বলেন কি, আপনার বাড়িতে চুরি? আপনি তো আমাদের মতো একতলায় থাকেন না, তিনতলায় থাকেন!"—বললেন গোবর্ধনবাবু।

"তা হলে বোধ হয় চাকরের কীর্তি" বললেন গিরিশবাবু। "দু-চার ঘা না দিলে স্বীকার করবে না।"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "চোর ধরেও তাকে আমরা মারি এবং মনে করি তাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলাম। কিন্তু চোরকে আমরা কি শিক্ষা দেব। হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষা দিচ্ছি।"

"কিছুই ফল হয় না ওতে"—বললেন তারাপদবাবু। আমার কাহিনীটি

শুনুন। অবশ্য আপনাদের ধৈর্যের উপর খানিকটা জুলুম হবে"—

"না না, কিছু না, চুরির মতো মনোহর প্রসঙ্গে বিরক্ত হব না, সময় নষ্ট হচ্ছে বলেও মনে করব না, আপনি বলুন।"—বললেন গিরিশবাবু।

তারাপদবাবু গল্প আরম্ভ করলেন।

"শুনুন, লক্ষ্মীপুজো গেল আপনার কবে—২৩শে অক্টোবর—না?"

"বলে যান, ও সব তারিখ কি আর মনে থাকে?"—বললেন গোবর্ধনবাবু।

"যাই হোক, লক্ষ্মীপুজোর ঠিক দুদিন পরের ঘটনা। রাত তখন হবে প্রায় একটা। বাইরে চাঁদের আলোর রহস্য।

"আমার বাড়ি হয়তো দেখে থাকবেন, নতুন স্টাইলের বাড়ি, ঝকঝকে নতুন। তেতলার ফ্লাটে থাকি। কি ভীষণ ভাড়া। কিন্তু ভাড়া প্রসঙ্গ এখানে একেবারেই অবান্তর—অথচ বাড়ির কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে খোঁচা দিয়ে ওঠে কথাটা।

"তিনতলায় থাকি, ফ্লাটে প্রবেশের প্রধান দরজাটি বন্ধ ক'রে শুই—ঘরের দরজা বন্ধ করার দরকার হয় না। সে দিন আমরা—স্ত্রী আর ছোট ছেলেমেয়ে—সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময় কি একটা শব্দে হঠাৎ জেগে উঠেই দেখি এক চোর আমাদের বড় ট্রাংকটি ঘরের বাইরে সরু বারান্দার উপর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"দেখতে ভদ্রলোকের মতো, মানে, চোর বলতে আমরা সাধারণত যেমন বুঝি ঠিক তেমন নয়। কিন্তু এসব চিন্তা ক'রে স্থির করতে হয়নি, বিদ্যুৎ চমকালে যেমন মনে আপনা থেকেই তার ছাপ পড়ে তেমনি আর কি। এবং চোর দেখামাত্র "কে?" বলে যে মর্মভেদী চিৎকারটি মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেও ভেবেচিন্তে নয়।

"আমার চিৎকার শোনামাত্র চোর পকেট থেকে পিস্তল বা'র করে আমার নাক বরাবর লক্ষ্য করল। বলল, 'ট্রাংক নিয়েছি, ওতে হয়তো কাপড়-চোপড় আছে, এখন নগদ টাকা কিছু চাই'।

"খেলনা পিস্তল হয়তো, কিন্তু সে কথা কি আর তখন ভাববার সময় ছিল?"

"হ্যাঁ তা হতে পারে" বললেন গিরিশবাবু। "তারপর কি হল?"

তারাপদবাবু বলতে লাগলেন, "আমার স্ত্রী চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠেই সব ব্যাপারটা চকিতে বুঝতে পেরে"—

"অজ্ঞান হলেন বুঝি?—স্ত্রীলোকের ঐ একটি ব্যাধি।" বললেন গোবর্ধনবাবু।

"না, অজ্ঞান হয়নি সে। তার মাথা অনেকটা ঠান্ডা, সে ছুটে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় অথচ চোর যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে বলল, 'ওগো, ও লোকটা মাসের শেষে এসেছে কেন, ওকে মাসের গোড়ায় আসতে বল।'—বুঝলেন মশায়, এমন বিপদেও স্ত্রীর হিসাব ঠিক আছে, আর জলজ্যান্ত একটা চোর সামনে নিয়ে মাথা ঠিক রাখা কি সোজা কথা? তার উপর আবার তার হাতে এক পিস্তল। কিন্তু সে কথা যাক। পিস্তল দেখে আমিই যে বেশি ভয় পেয়েছিলাম সে কথা বলা বাহুল্য। প্রাণের মায়াটাই তখন বড় হয়ে উঠেছিল, তাই চোরকে কোনো রকমে কাঁপা গলায় বললাম, 'একটু দাঁড়াও, দেখি ক টাকা আছে।' মশায়, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, চোর আমার কথা বিশ্বাস করল। তার প্রমাণ দেখা গেল সে হাত থেকে পিস্তলটা পকেটে রাখল।

"আমি বললাম তৎক্ষণে আমার ভয়টা কেটে গেছে—বললাম 'একটু দেরি হবে টাকা খুঁজতে, তুমি ততক্ষণ যে ট্রাংকটা টেনে বা'র করেছ তারই উপরে বস।"

"এই সব বললেন একটা চোরকে!" —অবাক হলেন গিরিশবাবু।

তারাপদবাবু বললেন, "মশায় প্রাণের ভয়ে কি যে না করা যায়, তাই ভাবি। যাই হোক টাকা খোঁজার নামে কিছু টাকা সরিয়ে রেখে কিছু টাকা বা'র করলাম। চারটে টাকা মাত্র। মানে ঐ টাকাটাই তাকে দেব ঠিক করলাম। কিন্তু তার হাতে দিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে গেল। তাই টাকাটা হাতে না দিয়ে ট্রাংকের উপর রাখলাম, এবং যথেষ্ট সাহসের ভান ক'রে তাকে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বললাম 'এতখানি ঝুঁকি নিয়ে চুরি করতে এসে কি লাভ? কি মেহনতই না হয়েছে তোমার এতদূরে উঠে আসায়।'

"চোর আমাকে, মশায়, অবাক ক'রে বলল, 'কিছু না, মেহনত হত আগে, যখন পাইপ বেয়ে উঠতে হত। এখন সব হাল ফ্যাশানের বাড়ি, সব জানালার উপরে সিঁড়ি লাগানো আছে—সান্-শেড না রেন-শেড বলে ওকে। ও সব তো আমাদের সুবিধার জন্যই তৈরি, সিঁড়ি বেয়ে ওঠায় আবার মেহনত কোথায়? ঝুঁকিই বা কোথায়?'

"আমি মশায় স্তম্ভিত চোরের মুখে এমন ভাষা শুনে। বললাম 'তোমাকে তো বেশ শিক্ষিত ভদ্রলোক ব'লে মনে হচ্ছে।' চোর বলল, 'কলেজে পড়েছিলুম বটে, পাসও করেছি, কিন্তু বলুন তো এ বাজারে এর কি দাম আছে?' বলে চুপ করল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ব'লে মনে হল। আলোচনা এ পথে চালালে অনেক কথা উঠবে, অনেক দেরি হবে, তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আগের কথায় ফিরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কাজে অন্য ঝুঁকি নেই?'

"চোর বলল 'মনে তো হয় না। পুরনো পাইপ-বাওয়া রীতির সঙ্গে তুলনা করুন না? তখন ধরা পড়ার ভয় বেশি ছিল। কিন্তু এখন সে ভয় অনেক কমে গেছে। তা ছাড়া আপনি আমার অসতর্কতার জন্য শব্দ হওয়ায় জেগেছেন। নইলে একটু সাবধানে মাল পত্তর সরালে কজন জাগে? ওঃ! আগের, মানে সেই ওল্ড্ মেথডে, বুক ছড়ে যেত, গা ঘেমে উঠত, হাঁফাতে হত। এখন আপনাদের ইঞ্জিনিয়াররা সে অসুবিধা দূরে করেছেন।'

"আমি বললাম, 'শুধু উপরে ওঠার ঝুঁকির কথা বলিনি। ধরা পড়লে কি হবে সেই কথাই বলেছি।' চোর বলল 'এর উত্তরে মাত্র একটা কথাই বলতে চাই এই বৃত্তিকে আমি ব্যবসা হিসাবে নিয়েছি। বাঙালী ব্যবসা করতে ভয় পায়, বাঙালীর সেই কলঙ্ক আমি ঘোচাচ্ছি এইভাবে।'

"ব্যবসা!—আমি চমকে উঠলাম এ কথা শুনে। এমন একটা যুক্তিহীন কথা শুনে মনটা দমে গেল। মনে হল এতক্ষণের আলোচনাটা মাঠে মারা গেল, একটা বাজে লোকের সঙ্গে বাজে তর্কে মেতেছি। বললাম 'ব্যবসা তো এক পক্ষে হয় না, দুটি পক্ষ দরকার। একজন বেচে একজন কেনে। যে কেনে সে দরকার বলেই কেনে। যে বেচে, বেচাটা তারও দরকার, কারণ তাতে সে মুনাফা করে। কিন্তু চুরিতে শুধু এক পক্ষের সবটাই

লাভ, অন্যপক্ষের সবটাই ক্ষতি। যার জিনিস চুরি করা হয়, চুরি তার দরকার নেই, সে চায় না চুরি, কাজেই ব্যবসার সঙ্গে তুলনা চলে না।'

"বিশ্বাস করবেন না মশায়, চোর আমাকেই বাজে লোক বানিয়ে ছাড়ল। আমার কথায় সে একটুখানি হেসে বলে কি না 'আপনি ভুল করছেন মশায়। চুরিতে একজন লোক বা একটি পরিবার বা যে কোনো এক পক্ষ তখন-তখন কিছু হারায় এ কথা ঠিক, কিন্তু সমস্ত সমাজ এতে অনেক লাভ করে।'"

গিরিশবাবু স্বগতোক্তি করলেন, "সে আবার কেমন কথা!"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "না হে, কিছুই বলা ঠিক নয়, চোর হয়তো ঠিক কথাই বলেছে।"

গোপালবাবু বললেন, "আমি তো মশায়, প্রতিবাদ ক'রে বলে উঠলাম 'সে আবার কি! নতুন কথা বলছ যে!' চোর একটা হাই তুলে বলল, 'মোটেই না, নতুন ঠেকছে আপনার কাছে, কিন্তু এটা নতুন নয়। প্রথমেই দেখুন না, হাজার হাজার পুলিস পালিত হচ্ছে শুধু আমাদের জন্য। সংসার থেকে চোর উচ্ছেদ ক'রে দেখুন না, হাজার হাজার পুলিস বেকার হবে, বহু পরিবার না খেয়ে মরবে।'

"আমি তো মশায় স্তম্ভিত। এমন কথা আগে ভাবিনি। কিন্তু আমার সংকীর্ণ কল্পনাশক্তিকে ভেঙে বিস্তার ক'রে দেওয়ার জন্যই যেন তার আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিন। সে বলতে লাগল, 'আর শুধু পুলিস কেন, ধরুন দেশে যদি একটি চোরও না থাকে, ছিঁচকে, সিঁদেল, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ, জালিয়াত, কেপমারি-ওয়ালা, ছিনতাইওয়ালা, বোমাবন্দুক-ওয়ালা—কেউ যদি না থাকে, তা হলে বাড়িকে নিরাপদ করার জন্য যে-সব দরজা জানালা গরাদ, কলাপসিপবল গেট, উঁচু প্রাচীর তৈরি হয় সব উচ্ছেদ হয়ে যাবে, এ সব যারা তৈরি করে তারা বেকার হবে, বাড়ির ডিজাইন বদলে যাবে, সিন্দুক বাক্স তৈরির কাজ ফুরিয়ে যাবে, ব্যাঙ্কের কাজ বারো আনা কমে যাবে, সেফ ডিপজিট ভল্ট, লকার, ইত্যাদি কিছুই দরকার হবে না। তবু এ আর কি? এর চেয়ে বড় এবং সমস্ত নারী-জাতিকে হাতে রাখার প্রধান উপায় অলঙ্কার-শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'অলঙ্কার-শিল্পও কি চোরের জন্য টিকে আছে?' চোর বলল, 'অবশ্যই। চোর না থাকলে কোনো মেয়ে গয়না পরতে রাজি হবে কি না সন্দেহ।'

"তার মানে?"

"আমার এই প্রশ্নের উত্তরে চোর বলল, 'যে গয়নার চুরি-মূল্য নেই তা পরে কোনো সুখও নেই। চুরি-মূল্য নেই কাচের চুড়ির। যেখানে সেখানে ফেলে রাখুন কেউ সে দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু শুধু সোনার গয়না বা পাথর-বসানো সোনার গয়না, পথে পড়ে থাকা দূরে থাক, চোরেরা নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে অন্যের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে। কিন্তু যদি ঐ সব গয়না যেখানে-সেখানে প'ড়ে থাকলেও কেউ তার দিকে ফিরেও চাইত না, চোরেরা পথ চলতে পায়ে বিঁধবে ব'লে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিত, তা হলে সে গয়না কোনো মেয়ে পরত কি? পরত না। তা হলে বুঝে দেখুন গয়নার যা কিছু আকর্ষণ তা শুধু চোরের জন্য।'

"আমি মশায় রণে পরাজিত এবং অবসন্ন বোধ করছিলাম চোরের কাছে। নিজেকে বড্ড ছোট বোধ হচ্ছিল। এমন সময় চোরকে সমর্থন ক'রে আমার স্ত্রীও দরজার আড়াল থেকে বলে উঠল 'ওগো, ও ঠিক কথাই বলেছে। খুব ঠিক কথা।'

"স্ত্রীর সমর্থন পেয়ে চোর একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমি বললাম, 'খুব ইনটারেস্টিং লাগছে ভাই তোমার কথা। তুমি ভিতরে এসে ব'স, আলোয় তোমার মুখ দেখে কথা শুনি, আরও ভাল লাগবে।' স্ত্রীকে বললাম হীটারে চা কর, রাত এখন দুটো, ভালই লাগবে।'

"পাশের ঘরেই ব্যবস্থা ছিল। আমরা ভিতরে এসে বসলাম। চোরকে ভাল করে দেখলাম এবারে। লম্বা মুখ, ঠোঁট পাতলা, দাড়ি গোঁফ কামানো, চোখ দুটি ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি। দু'তিন

'একটু দাঁড়াও, দেখি কটা আছে'

দিন মুখে ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি। ভদ্রলোকের ছেলেই বটে।

"পাশের ঘরে চা তৈরি হচ্ছিল, স্ত্রী আমাকে ডাকল। আমি যেতেই মশায় এক অদ্ভুত প্রস্তাব। স্ত্রী চাপা সুরে বলল, 'আমি চোরকে ভাল করে দেখেছি, ওর নাম ঠিকানা জেনে নাও।' 'কেন?' জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রী কোমল সুরে বলল, 'আছে দরকার। ছেলেটিকে আমার ভারী পছন্দ, এখন তো জাত বিচার উঠেই গেছে; আমার বোনের সঙ্গে বেশ মানাবে।'

"আমি এই অদ্ভুত প্রস্তাবকে নিরুৎসাহ ক'রে এ ঘরে চলে এলাম। মেয়েদের বুদ্ধিসুদ্ধি কবে যে হবে।"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "মেয়েরা খুব প্র্যাকটিক্যাল। দেখলেন না প্রথমেই চোর দেখে বলেছেন মাসের শেষে এসেছে কেন?"

তারাপদবাবু বললেন, "প্র্যাকটিক্যাল না হাতী। চোরের সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিতে চায়—এর নাম প্র্যাকটিক্যাল? কিন্তু শুনুন। স্ত্রী চা এনে দিল। একটুখানি খেয়েই চোর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল 'খুব খুশি হয়েছি আপনাদের বোঝাতে পেরে। কৃতজ্ঞও হয়েছি। এবং প্রতিদান স্বরূপে, আমি এ ট্রাঙ্কটি আর নেব না।'

"আমি বললাম, 'না না ওটা তো নাকে নিতেই হবে, তুমি এত ঝুঁকি নিয়ে ওটাকে টেনে বা'র করেছ।'

"চোর একটু উত্তেজিত সুরে বলে উঠল, 'বার বার ঝুঁকির কথা বলছেন কেন? কোন্ ব্যবসায় ঝুঁকি নেই? ঝুঁকি আছে বলেই কত রাজা ফকির হচ্ছে, কত ফকির রাজা হচ্ছে। ব্যবসায় ঝুঁকি থাকবে না, বলেন কি? ঝুঁকি না থাকলে কি ব্যবসা বলে?—ভেবেছিলাম আমি আমার কথা সব বোঝাতে পেরেছি, কিন্তু এখনও অনেকখানি বাকি আছে দেখছি।'

"স্ত্রী বলে উঠল 'না না তুমি ঠিকই বলেছ, ভাই। আমরা বুঝতে পেরেছি। তুমি বাক্সটি নিয়ে যাও।'

"কিন্তু চোর কিছুতে রাজি হল না। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কি ক'রে এত বড় ট্রাঙ্ক নিচে নামাবে, ভাই?' চোর হেসে বলল, 'এ সব বিদ্যা সবাইকে শেখাতে নেই। খুবই সোজা ব্যাপার। সঙ্গে দড়ি আছে, বেঁধে নিচে নামিয়ে দিতাম। তা হলে আসি আজ?'

"'আচ্ছা এসো' বললাম আমরা। দুজনেই। তারপর চোর রেলিঙের উপরে উঠে যেমন ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই নামতে উদ্যত হয়ে বলল, 'চুরি করতে এসে একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়া আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ। আপনারা টের পাননি, ইতিমধ্যে আপনারা দুজনেই যখন পাশের ঘরে গিয়েছিলেন তখন আপনার রাখা চারটে টাকা থেকে একটি সরিয়েছি, সেজন্য কিছু মনে করবেন না।'

"'না না, বেশ করেছ, বাকিগুলোও নিলে ভাল করতে।' কিন্তু শোন, একটু এদিকে এসো তো ভাই।' চোর দু পা এগিয়ে আসতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে বিজয়ার কোলাকুলিটা সেরে নিলাম। বিজয়ার পরেই এসেছে কিনা, তাই ওটা আর বাদ থাকে কেন। চোর খুশি হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, আমার স্ত্রীকেও প্রণাম করল। তার পর চকিতে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

গিরিশবাবু শেষ পেয়ালার শেষ চুমুক দিয়েই বললেন "এ যে একেবারে রূপকথা শোনালেন, মশায়।"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "তার চেয়েও অসম্ভব। শিক্ষিত, অথচ সিঁদেল চোর?

তারাপদবাবু বললেন, "আগে বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি। মানে শিক্ষিতেরা তো এখন দলে দলে ব্যবসায় নেমে পড়েছে। আপনি আমি চাকরি করি বলেই খেয়াল রাখি না। তা ছাড়া চুরি এখন সব জায়গাতেই বড় ব্যবসা হিসবে চলছে। চোর ঠিকই বলেছে 'আর সব ব্যবসায়ে যেমন ঝুঁকি আছে, এতেও তেমনি ঝুঁকি আছে। তবে এতে এমন একটি সুবিধাও আছে যা অন্য কোনো ব্যবসায়ে নেই।"

"কি সেটা?"—দুজনে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

"এতে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না।"

গিরিশবাবু বললেন "তা মানছি, অনেক শিক্ষিত লোক তো চুরিকে ব্যবসা বানায়নি।"

গোবর্ধনবাবু বললেন, "ব্যবসার নামে চুরি করছে ঐ একই কথা। তবে আপনার বাড়িতে যে চোর ঢুকেছিল তার কথায় যুক্তি থাকলেও কলেজ-পড়া সিঁদেল চোর এই প্রথম।"

গিরিশবাবু বললেন, "আমার তো মশায়, অবিশ্বাস হচ্ছে। আপনি সম্ভবত স্বপ্ন দেখে থাকবেন।"

চায়ের দোকানে অনেকেই চা খাচ্ছিল। একটি যুবক এঁদের পিছনেই বসে এঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সে এই সময় তাড়াতাড়ি একখণ্ড কাগজে কি যেন লিখল এবং সেটি ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় করে এগিয়ে এসে গিরিশবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "মাপ করবেন আমি একটি কথা বলতে চাই।"

"তা বলুন।"

"তারাপদবাবুর বাড়িতে যে চুরি হয়েছে সেটি সত্য ঘটনা। আমি আপনাদের সমস্ত কথাই শুনেছি। অবিশ্বাস করবেন না, কারণ আমিই সেই চোর।"

ব'লেই চোর হাতের মুঠোয় ভাঁজকরা কাগজখানা তারাপদবাবুর হাতে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবাই স্তম্ভিত। মিনিটখানেক কারও মুখে কথা নেই।

একটু আত্মস্থ হয়ে তারাপদবাবু বললেন, "এখন মনে হচ্ছে বটে, রাত্রে সেদিন এই লোকটার সঙ্গেই আলাপ করেছি। দাড়ি গোঁফ ভাল করে কামানো থাকাতে হঠাৎ চিনতে পারিনি।"

তারপর হাতের কাগজখানা খুলে প'ড়ে দেখেন তাতে লেখা আছে "আমার নাম নরেন্দ্ররঞ্জন মজুমদার (বৈদ্য) এম-এ ঠিকানা ০০০ বৌবাজার স্ট্রীট।

তারাপদবাবু ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝলেন। ছেলেটি বিয়ে করতে চায় তাঁর শালীকেই।

কিছুক্ষণ চোখবুজে কি ভাবলেন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

চিড়িয়াখানার অতিথি হাঁস

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল
বনহংসীর প্রেমে
আকাশ পথের কোন সীমান্তে নেমে।'

কিম্বদন্তী আছে কাব্যে বর্ণিত এই হংসবলাকা নীলপদ্মশোভিত মানস-সরোবর থেকে শীতের প্রারম্ভে উড়ে উড়ে উষ্ণতর অঞ্চলে চলে আসে। শুভ্র তুষারাবৃত কৈলাস পেরিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এরা নিম্ন অঞ্চলে নেমে এসে সারা শীত যাপন করবার জন্য ক্ষণিকের বাসা বাঁধে। আবার বসন্তের প্রারম্ভে সূর্যের উত্তাপে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার গলতে আরম্ভ করলে দলবেঁধে গাঁথা-মালার মত উড়ে উড়ে পরিচিত নীড়ে ফিরে যায়।

শীতের উজ্জ্বল মধুর রোদ যত শীতরাগত অতিথিদের আমন্ত্রণ করে আনে তাদের মধ্যে পাখিদের স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট। শুধু মানস-সরোবর নয়, লাধাক, তিব্বত, সাইবেরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের মত বহু দূর শীতের দেশ থেকে বহুবর্ণরঞ্জিত পালকের রঙিন ছটায় আকাশ আলো করে বিষুবীয় সূর্যের কাছাকাছি উড়ে উড়ে এসে তারা ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন বিচিত্র তাদের বর্ণালীশোভা তেমনি বিচিত্র তাদের নাম-ধাম। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো যাযাবর পক্ষি-সমাজের প্রচলিত রীতি—যা নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে।

পক্ষিতত্ত্ববিশারদদের মধ্যে হুইসলার, জে. বি. এস. হলডেন, জুলিয়ান হাক্সলি ও ডক্টর সেলিম আলির নাম বিশিষ্ট। দেশান্তর থেকে যাযাবর পাখির ঝাঁক এসে পৌঁছানোর সময় অনুসারে রেড্ ইণ্ডিয়ান সমাজে ক্যালেণ্ডারে মাসের নামকরণ করার রীতি প্রচলিত আছে।

সাধারণত উষ্ণ আবহাওয়া এবং খাদ্যের প্রাচুর্যসম্পন্ন অঞ্চলে পাখিরা শীতকালে এসে বাসা বাঁধে। অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের চেয়ে পাখিদের শীত ও গ্রীষ্ম দুই সহ্য করার শক্তি অধিকতর হলেও উত্তর গোলার্ধের শীতার্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে ও শীতে বরফের মত জমে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে পাখিরা নিজেদের উড়বার সীমার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অঞ্চলেই ডিম পাড়বার সময়ে ফিরে গিয়ে বাসা বাঁধে। তাই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের পাখিদের বাসা আর্কটিক অঞ্চলে এবং শীতকালে তারা বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে উড়ে আসে। দক্ষিণ গোলার্ধের পাখিরা ঠিক এর বিপরীত আচরণ করে। পূর্বাঞ্চল থেকে পাখিরা পশ্চিমাঞ্চলে উড়ে গেলেও সাধারণ উত্তর থেকে দক্ষিণেই পাখিদের গতায়াতের দিক্‌সীমা হিসেবে চিহ্নিত। আর্কটিক অঞ্চল থেকে এন্টার্টিক অঞ্চলে শীতকালে পাখিরা ১১,০০০ মাইল অবধি অনায়াসেই ভ্রমণ করতে পারে। আবার ফিরবার সময়ও ১১,০০০ মাইল পাড়ি দেয় অক্লেশে।

পাখিদের দেশ পরিবর্তনের কারণাবলী মোটামুটি তিন প্রকার :—

(১) শীতল ঝঞ্ঝাবাত্যা ও শীতার্ত আবহাওয়া
(২) স্বল্পস্থায়ী দিবাভাগের ফলে খাদ্যান্বেষণে অসুবিধা
(৩) শীতার্ত অঞ্চলে বরফ জমে যাওয়ার ফলে তাদের খাদ্যবস্তু সব্জী, ফল-মূলের অজন্মা।

আবার বসন্তকালে পরিত্যক্ত পূর্ব-নীড়ে ফিরে যাওয়ার কারণগুলি এই রকম :—

(১) নীড় বাঁধবার ও ডিম পাড়বার মত প্রচুর জনবিরল স্থান
(২) দীর্ঘস্থায়ী দিবালোকে, নতুন বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে খাদ্যান্বেষণ ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা
(৩) নতুন গজানো সব্জী ইত্যাদির প্রাচুর্য।

ভারতবর্ষের বাইরে দূর-দূরান্তর বিদেশ থেকে যেমন পাখিরা আসে, তেমনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পাখিরাও স্থান পরিবর্তন করে। হিমালয়ের হিম-অঞ্চল থেকে পাখিরা যেমন নেমে আসে, তেমনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও পাখিরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাংলাদেশে চলে আসে।

বর্তমান প্রবন্ধে যাযাবর পাখিদের মধ্যে বাংলাদেশ তথা কলকাতার আশে-পাশে শীতের অতিথি মানস-সরোবরের হংসবলাকার কথা আলোচনা করবো। তিব্বত, লাধাক এমন কি সুদূর সাইবেরিয়ার সীমান্ত থেকেও এই বিচিত্র পাখি কলকাতার আতিথ্য গ্রহণ করে।

সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার আকাশে ইংরাজি ভি-এর আকারে পরিচিত ক্যাক্-ক্যাক শব্দে দূর-দূরান্তর থেকে এই বালিহাঁসদের উড়তে দেখা যায়। এই বালিহাঁস বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে যে যে শ্রেণীর বালিহাঁস আসে তাদের কথা পরে বলছি।

এই বালিহাঁসেরা কোথাও বসবার আগে চক্রাকারে অনেকক্ষণ আকাশে পরিক্রমা করে। তারপর ঝিলে-বিলে, জলা জায়গায় ঝোপে-ঝাড়ে, কলকাতার সীমান্তে অবস্থিত নোনা-জলাভূমিতে নিরাপদ অঞ্চলে গাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কলকাতার আশে-পাশে জলাভূমিতে বালিহাঁস শিকারীর আনাগোনার কাহিনী কারোরই অবিদিত নয় যার ফলে প্রকৃত নিরাপত্তাবোধের অভাবে বালিহাঁস ও অন্যান্য নয়নানন্দকর পাখির মেলা ক্রমেই অদৃশ্য হতে বসেছে। ঘন গাছ-পালা সম্বলিত জলাভূমি এদের প্রিয় আবাসভূমি। তাই আলিপুর চিড়িয়াখানার ছোট ও বড় ঝিলে শীতকালে হাজার হাজার বালিহাঁসের মেলা অতি সহজেই চোখে পড়ে। চিড়িয়াখানার ঘন সবুজ গাছ-পালার আবেষ্টনী এদের সহজেই আকর্ষণ করে। বড় ঝিলের জলে এবং ঝিলের কেন্দ্রে অবস্থিত দ্বীপের গাছের ডালের নিরাপদ আশ্রয়ে বালিহাঁসের ঝাঁক পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করে। শিকারীর গুলির আঘাত এখানে এড়ানো যাবে একথা তাদের জানা।

ভোর চারটে থেকে উড়ে উড়ে তারা আলিপুর চিড়িয়াখানার ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে আরম্ভ করে। আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই কলকাতার সীমানায় নোনা-জলাভূমিতে ফিরে যায়। কিন্তু চাঁদের আলোয় পূর্ণিমা রাত্রে তারা চিড়িয়াখানাতেই থেকে যায়।

বালিহাঁসের পালকে বিভিন্ন বর্ণের সমারোহ এবং বিভিন্ন আকৃতি ও

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের গোত্র ও নামকরণ বিভিন্ন।

ম্যালার্ড (নীলশির), স্পটেড্ বিল (গোগরাল), গ্যাড্ওয়াল (পিঙহংস), পিনটেল্ (দিকহংস বা ত্রিশূলে), শভেলার (পান্তামুখী), কমনটিল্ (তুলসিয়া বিগরি), গ্রেটার ও লেসার হুইস্লিংটিল্ (সরাল), গার্গেনি (গিরিয়া), রাডি শেলড্রেক (চখা-চখী), উইজেন (পাতারি), পচার্ড (ভূতি) এবং কোম্ব ডাক (নাক্তা) প্রভৃতি বহু ধরণের বালিহাঁস আছে।

ম্যালার্ড সাধারণতঃ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য ধরণের হাঁস বাংলার ঝিলে-বিলে উড়ে আসে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় লেসার হুইসলিংটিল (সরাল), গার্গেনি (গিরিয়া), পিনটেল (দিকহংস), কোম্ব ডাক (নাক্তা) এবং রাডি শেলড্রেক (চখা-চখী) দেখতে পাওয়া যাবে। বালিহাঁসের ঝাঁকের মধ্যে সরালই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারপরে কিছু পরিমাণ গিরিয়ার সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য।

১৯৪১ সাল থেকে স্ট্যাটিস্টিকস্ নিয়ে দেখা গেছে যে সরাল ও গিরিয়াই আলিপুরের আতিথ্য স্বীকার করে এসেছে। এদের সংখ্যাই প্রতি বৎসর ক্রমবর্ধমান। এদের আগমনের কাহিনীও বিচিত্র। প্রথমে একদিন একঝাঁক উড়ে এসে ঝিলের জলে বসে। পরদিন হয়তো একজনও ফিরে আসে না। তারপর মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মালে দলে দলে আসে, শীতঋতু যাপন করে বসন্তকালে ফিরে যায়। ফেরার সময়ও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ধীরে ধীরে ফেরে। নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তাদের আগমনের কৌশল জানা যাবে।

তারিখ — আগন্তুক সংখ্যা

২২-৯-৬১—৪টি সরাল
২৩-৯-৬১—১০টি সরাল
২৪-৯-৬১—একটিও ফেরেনি
২৫-৯-৬১—১৯টি সরাল ও ২টি নাক্তা
২৬-৯-৬১—৩০টি সরাল, ৬টি গিরিয়া
২৮-৯-৬১—১০০টি সরাল
৩০-১১-৬১—৬,৫০০ (অধিকাংশ সরাল, ১৭টি নাক্তা, ২০০ গিরিয়া, ২টি দিকহংস)

উপরোক্ত স্ট্যাটিস্টিকস্ ৩০-১১-৬১ তারিখ অবধি পক্ষিতত্ত্ববিশারদ ডঃ সেলিম আলি ও চিড়িয়াখানার সুপারিনটেন্ডেন্ট আর. কে. লাহিড়ীর পর্যবেক্ষণ অনুসারে সংকলিত।

চিড়িয়াখানার অতিথি হাঁস — উৎপল

গত বৎসর ১৯৬০ সালে আলিপুরে আনুমানিক ৫,৫০০ বালিহাঁসের আগমন হয়েছিল। সে তুলনায় এ বছরের সংখ্যা ৬,৫০০ অর্থাৎ এক হাজার বেশি। গার্গানি (গিরিয়া) সচরাচর সরালের পরে আসে। সে হিসাবে ক্রীস্টমাসের পরে আরো গিরিয়া এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। চিড়িয়াখানায় প্রাপ্তব্য বালিহাঁসের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় নীচে দেওয়া হলো।

লেসার হুইসলিংটিল (সরাল)— পাতিহাঁসের চেয়ে সরালের আকার ক্ষুদ্রতর। তীক্ষ্ম শব্দে এরা বিদ্যুৎগতিতে উড়ে চলে। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সর্বত্র এদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই পাখি চোখে পড়ে না। মালয় পেনিনসুলা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, কোচিন-চীন, দক্ষিণ-চীন, জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও সর্বত্র এরা ছড়িয়ে আছে। বাংলার ঝিলের ধারে শরবনের ফাঁকে কিম্বা জল-ভরা ধানের ক্ষেতে এদের দেখা মেলে। খোলামেলা জায়গায় এরা থাকে না। এরা গাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে পছন্দ করে বলে 'গেছো পাখি' বলা হয়। শামুক, পোকা-মাকড়, ব্যাঙ, মাছ, ধান, গম খেয়ে এরা বাঁচে। গাছের কোটরে বা কাক ও চিলের পরিত্যক্ত নীড়ে এরা থাকে ও ডিম পাড়ে। সরাল হাঁস সাদা। কিন্তু গর্ভবতী মাদী সরাল হাঁসের বর্ণ বাদামী হয়ে যায়। এরা ঠিক প্রকৃত অর্থে

যাযাবর নয়। এদের গতিবিধি আঞ্চলিক সীমার মধ্যে সীমিত।

গার্গানি (গিরিয়া)—গিরিয়াকে নীল ডানাওয়ালা পাখি বলা যায়। এদের ডানায় সবুজ-নীল রঙের ছোপ এবং ডানার অভ্যন্তর ভাগ কোমল ধূসর বর্ণের। এদের চোখের ভুরু শুভ্র বলে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাইবেরিয়ার সীমান্ত থেকে শীতকালে আফ্রিকা, সোমালিল্যান্ড, দক্ষিণ এশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, বোর্ণিও সর্বত্র এদের গতিবিধি। কাশ্মীর থেকে সিংহল অবধি ভারতের সর্বত্র এদের দেখা যায়। ধান, গম ও সব্জী খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। জলা জায়গায়, ঝোপে-জংগলের আড়ালে আবডালে এরা নীড় বেঁধে থাকে।

পিনটেল (দিক্‌হংস)—সাদা ও ধূসর রঙের দিকহংসের মাথায় বাদামী রঙের ত্রিশূল-চিহ্নের জন্য ত্রিশূল নামেও অভিহিত করা হয়। এই হাঁসের লেজ সরু ও লম্বা—যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সাইবেরিয়ার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে এরা উড়ে আসে। বাংলাদেশে কম সংখ্যক দেখা যায়। ২০ থেকে ২০০টি হাঁস ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অক্টোবর মাসেই এরা দৃষ্টিগোচর হয়। পদ্মফোটা বিস্তৃত জলাভূমিতে এরা নামে। পদ্মের বীজ এদের প্রিয় খাদ্য।

কোম্ব ডাক্ (নাক্তা)—সাদা ও খয়েরি রঙের 'নাক্তা' হাঁসের বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরুষ-হাঁসের ঠোঁটের উপরিভাগে মাংসের একটি থলি থাকে। সুন্দরবন, যশোর, খুলনা, আসামের কাছাড় জেলা, সিলেট ও লুসাই পার্বত্য অঞ্চলে এই হাঁস প্রচুর দেখা যায়। এরাও অন্যান্য হাঁসের মত জলা জায়গা পছন্দ করে। জলাভূমি, ঝিল, হ্রদ, খালে ও নদীতে এই হাঁসের ঝাঁক নির্ভয়ে চরে বেড়ায়। কচিপাতা, শস্য, ব্যাঙ, পোকা, ছোট ছোট মাছ খেয়ে এরা জীবনধারণ করে।

রাডি শেলড্রেক (চখা-চখী)—এই জাতের হাঁস চখা-চখী নামে সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। কিম্বদন্তী আছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলায় বিড়ম্বিত ব্যর্থ প্রেমিক-যুগল চখা-চখী হয়ে পরস্পরকে আজও ডেকে ডেকে ফেরে। কমলা রঙের এই হাঁসের ডানায় সাদা, কালো ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের সমারোহ। দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, লাদাক ও তিব্বত অঞ্চলে এরা থাকে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত ছাড়া সর্বত্রই এদের গতিবিধি। নদীর চরে কাদায় ও বালুচরে এরা চরে বেড়ায়। জলজ পোকা-মাকড়, মাছ, ছোট সরীসৃপ এই মাংসাশী হাঁসের প্রিয় খাদ্য।

শীতের মরশুমের প্রারম্ভে বালিহাঁস অন্যান্য বিচিত্র পাখির ঝাঁক আমাদের একঘেয়ে শহুরে জীবনে মুক্ত-বনজ অরণ্যের স্বাদ এনে দেয়। কলকাতার আশে-পাশে নোনা-জলভূমির ধারে ধারে এবং শহরের বুকেও এদের বাসোপযোগী নতুন গাছ-পালার চাষ করলে এবং শহরের গাছ-পালা ধ্বংস না করলে এদের আকর্ষণ ও আমন্ত্রণ করা সহজ হবে। জলাভূমি এলাকায় বন্দুকধারী শৌখিন শিকারীরা এদের নিরাপত্তাবোধ অযথা যদি নষ্ট না করেন তাহলে আগন্তুক পাখিদের সংখ্যা বাড়ে। নিছক পক্ষি-প্রেমিক ছাড়াও বিবর্ণ শহরের বুকে নানান পাখির ডানার বিচিত্র রঙ-বাহারে যে কোনো শহুরে লোকের ক্লান্ত মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ক্লান্ত নাগরিকের মন এই পাখিদের শোভা-সৌন্দর্য দেখে অতি সহজেই মাধুর্যমন্ডিত হয়ে ওঠে—শৌখিন শিকারীরা এই নিরীহ বালিহাঁসের ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার আগে সেকথা একবার ভেবে দেখবেন কি?

চিড়িয়াখানার অতিথি হাঁস — ঝিলে

মতামত

'অমৃত' সম্পাদক

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

হয়ত আপনি আমার চিঠি প্রকাশিত করবেন না। আমি হিন্দির শিক্ষক, শুধু বইগুলো পড়ে বাংলা শিখেছি। এখন আমি 'অন্তর্ভারতী' নামে একটি সংস্থানের পরিচালনা করি। আমাদের প্রায় একশ ছাত্র বাংলা শিখছে। কিছুদিন আগে আমরা রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকী মহা উৎসাহে আয়োজিত করেছি। আমি অনেক বাংলা পত্র-পত্রিকা পাঠ করি। হিন্দির প্রতি আপনাদের ধারণা পড়ে আমাদের মনে আঘাত লাগে। আমরা হিন্দি-ভাষী আকুলভাবে বাংলাকে হিন্দির সহোদরা বোনের মতই সম্মান দিচ্ছি, আর আপনারা আঘাতের উপরে আঘাত করে চলে যাচ্ছেন।

কলকাতার বাঙ্গালীরা অশিক্ষিত চাকরদের মুখে শুনে অশুদ্ধ হিন্দি (খড়ী বোলী) শিখছেন। তাই ওরা যখন হিন্দিতে কিছুই বলেন ওটা হিন্দি নয়, যেমন বাংলার বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি ব্রজভাষা নয়। উদাহরণ দিচ্ছি—'বহ লড়কা উস মকান কে ভীতর ঘুস গয়া হৈ'।—হিন্দির এই বাক্যকে বাঙ্গালী এমন বলবে—'ও লেড়কা উশ মোকান কা ভীতোর মেং ঘুশ গিয়া হায়।'

'অমৃত' প্রথম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশান্তি রায় মহাশয়ের মতামত পড়ে আমি খুশী হয়েছি। উনি অরুণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা উল্লিখিত 'আমার মাথা নত করে দাও' কবিতার হিন্দির অনুবাদের বিষয়ে ঠিক লিখেছেন—'কিন্তু যতদূর জানি এ ধরণের অনুবাদ আজ পর্যন্ত হয়নি।' রায় মহাশয় ঠিক কথা লিখেছেন। অরুণবাবু মিছামিছি হিন্দির দুর্নাম করছেন। 'লুটৈঁদে মেরা শির তেরো চৈংরিকা গর্দা পর'—অরুণবাবু নাকি স্বপ্নে এমন অনুবাদ পড়েছেন? হিন্দি-ভাষীরা এ রকম ভাষা শুনে হাসবে আর বলবে এ হল বাঙ্গালী বাবুদের কলকাত্তিয়া হিন্দি।

দুঃখের বিষয় শান্তি রায় মহাশয় অত্যন্ত শুদ্ধ হৃদয়ে লেখাটা লিখেও হিন্দির যে অনুবাদ দিয়েছেন ওটা আরো অশুদ্ধ। ওটাও কলকাত্তিয়া হিন্দি। আমি উচ্চকোটির বাঙ্গালী লেখকদেরও রচনার মাঝখানে যত হিন্দির উদ্ধরণ দেখেছি সবই কলকাত্তিয়া হিন্দিতে লেখা হয়েছে।

আমি নিজেই রবীন্দ্রনাথের ঐ পংক্তি দুটির স্বরচিত হিন্দি অনুবাদ দিচ্ছি। বাংলা উচ্চারণে নয় সংস্কৃতের উচ্চারণে পড়ে দেখুন, কবির ভাষা, ভাব, ছন্দ, লয়াদির কতদূর রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এটা হিন্দি—

মেরা মাথা নত করদো হে,
আপনী চরণধূলি কে তল মেং।
মেরা অহংকার সব ধো দো,
মেরে নয়ন অশ্রু কে জল মেং॥

আমি বাল্যকালে যখন বনাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখনই কোন বাঙ্গালীর মুখ পর্যন্ত না দেখে বাংলা লেখাপড়া শিখেছি, এমনি করে আমি অসমিয়া, উড়িয়া, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা শিখেছি। আমি বাংলাভাষীদের challenge করি তাঁরা যেন সবার আগে শুদ্ধ হিন্দি শেখেন তারপরে হিন্দির নিন্দা করেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে ভারতীয় ঐক্যের উপরে প্রহার করে সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে হিন্দির অসম্মাননা করা আর রোমক-লিপির প্রচারের আগ্রহ করা সর্বথা অনুচিত।

বাংলা ভাষা আর সাহিত্যকে আমি কত ভালবাসি আমিই জানি। কিন্তু এটাও জানি রাষ্ট্রলিপি হিসাবে বাংলা অপূর্ণ এবং তার উচ্চারণ অশুদ্ধ। আপনারা নিজেও জানেন, তাই রোমক-লিপির ব্যবহারের জন্যে এত আগ্রহ ব্যক্ত করছেন।

রমানাথ ত্রিপাঠী (ডঃ)
হিন্দি বিভাগ
ভি. এম. এস. ই. [illegible] কলেজ
[illegible]পুর (উঃ প্রঃ)

[পত্রলেখক তাঁর পত্র প্রকাশিত হবে না বলে যে আশংকা করেছেন সেটা অমূলক। 'অমৃতে' আমরা কারো মত-প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না। একই বিষয়ে নানা পরস্পর-বিরোধী মতামতও সেজন্যে এখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। পাঠকগণ নিজেরা স্বাধীনভাবে বিচার করে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, প্রয়োজন মনে করলে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। কিন্তু প্রকাশিত মতামতগুলির জন্যে অবশ্যই কোনো সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না—সম্পাদক, 'অমৃত']

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চার ॥

পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটক ভারতে আসুক, তার স্বাধীনতা অবারিত এবং অনাহৃত। সে যথেচ্ছ ভ্রমণ করুক, একা যেখানে খুশি যাক, যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করুক—কেউ কিছু গ্রাহ্যও করবে না। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা,—তার পথ সকল দিকে খোলা। কেউ বিশেষ প্রশ্ন করবে না তুমি কে, কোথাকার, উদ্দেশ্য কি তোমার। পুলিশ বা গোয়েন্দা তার পিছু নেবে না, তাকে হয়রান করবে না কেউ, তাকে সন্দেহভাজন মনে ক'রে কেউ কোথাও থেকে কলকাঠি টিপবে না,—তার পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক। পর্যটক যদি মনে করে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কানাকানি ক'রে যাবে, ভারত গভর্ণমেণ্টকে দুটো সমালোচনা করতেও ছাড়বে না, অথবা যাবার আগে দুটো নিন্দে করে বাহাদুরি নেবে,—সেখানেও সে স্বাধীন। বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও,—ইংলণ্ড ও আমেরিকা ধরেও,—ভারতের মতো এই উদারতা নেই। যদি কেউ একটু ইংরেজি জানে, কিংবা সামান্য একটু হিন্দি,—তবে ভারত পর্যটনকালে কোথাও তার "গাইড" দরকার হয় না।

"নিয়ন্ত্রিত পরিভ্রমণ" কথাটার ইংরেজি বোধ হয় "কনডাকটেড টুর।" বিদেশীর পক্ষে পরিভ্রমণ "কনডাকটেড" ছাড়া হয় না। আমেরিকান পর্যটক যখন ভারতে আসে, সে তখন 'কাঁচা মাল'। বুদ্ধি থাকতেও সে বোকা, বিদ্যে থাকতেও অর্বাচিন, চক্ষু থাকতেও দৃষ্টিহীন, এবং পকেটে টাকা থাকতেও দুর্ভাগা! একজন সোভিয়েট নাগরিক যখন ভারতে আসে তখন সে যুথভ্রষ্ট হয় না, গণ্ডীর বাইরে যায় না সাধারণ লোকসমাজে মেশে না, পাঁচজনের সঙ্গে গল্পগুজবে মাতে না, ভারত প্রকৃতিকে জানতে চায় না। পৃথিবীর সব দেশের পর্যটক প্রাণের তাড়ায় ভারতবর্ষ দেখে যায়, কিন্তু সোভিয়েট নাগরিক সরকারি কাজ ছাড়া ভারতে আসে না এবং কাজের বাইরে আর কিছু জানবার ঔৎসুক্যও তার নেই। সেই কারণে সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের কাছে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

আমাদের জানবার বাসনা প্রবল। চল্লিশ বৎসর কালের প্রবল ঔৎসুক্য সঙ্গে নিয়ে গেছি, মন আমাদের সজাগ, অনুসন্ধানী এবং উৎকর্ণ। ইংরেজ আমলে রাশিয়ার ভিতরের কোনও খবর পাইনি। ওদের ভাষা শিখিনি, প্রকৃতি জানিনে, জনজীবনের মনের চেহারা বুঝিনে। ফলে, আমরাও এখানে দৃষ্টিহীন, এবং অপরের সাহায্য ছাড়া এক পাও চলতে পারিনে। যা দেখাচ্ছে তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, এবং যেখানে নিয়ে যাচ্ছে তার গণ্ডীর বাইরে এক পাও আমাদের যাবার উপায় নেই। সুতরাং আমাদের এই পর্যটন যে, 'কনডাকটেড টুর'-এরই অঙ্গ এতে সন্দেহ কি?

সে যাই হোক, তাসকন্দের সরকারি প্রতিষ্ঠান একটির পর একটি দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলুম। আমার উৎসুক মন খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি সাধারণ পরিবার, একটি গৃহস্থের জীবনযাত্রা,—যার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা স্নেহ প্রীতির সঙ্গে আমার মনকে মিলিয়ে দেখতে পারি।

হঠাৎ মিলে গেল সেই সুযোগ।

লক্ষ্ণৌর বিপ্লবী লেখক যশপাল সম্বন্ধে আমাদের দোভাষিণী শ্রীমতী সোয়েৎলানার প্রচুর কৌতূহল। এটি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি লানার হিন্দিজ্ঞান আমার চেয়ে অন্তত শতগুণে ভাল। হিন্দি ভাষায় যশপালের লেখা সে অনেক পড়েছে এবং কমিউনিস্টপন্থী যশপালের সমাদর সোভিয়েট ইউনিয়নে যথেষ্টই। লানা আমাকে ধ'রে বসল, যশপাল যদি এসে থাকেন, আমার সঙ্গে কিন্তু পরিচয় করিয়ে দিতে হবে!

আমি বললুম, আমারও যে একটা সর্ত আছে, লানা?

পরদেশিনী তরুণী তা'র শান্ত নম্র দুটি চোখ তুলে তাকালো,—কি?

বললুম, কথা রাখবে বল?

হ্যাঁ, নিশ্চয় রাখব।

বললুম, প্রতিদিন প্রায় বারো-চোদ্দ ঘণ্টা তোমার সঙ্গে রয়েছি। কিন্তু তুমি কে, কোথায় তোমার ঘরবাড়ি, কি তোমার পরিচয়, কে-কে আছেন তোমার, কেমন ক'রে তোমাদের চলে,—এসব কথা যদি আমার মনে আসে, সে কি অন্যায়?

লানা হাসিমুখে জবাব দিল, না, অন্যায় কেন?

সোৎসাহে বললুম, তা হলে যশপালকে নিয়ে যাই তোমাদের বাড়িতে, রাজি হও?

লানা খুশী হয়ে বলল, বেশ, তবে আজই চলুন?

তখনই যশপালকে ডেকে লানার কাছে হাজির করলুম। অনুরক্তা তরুণী তৎক্ষণাৎ ইংরেজি ছেড়ে হিন্দিতে যশপালের সঙ্গে হাসিখুশি মুখে আলাপ আরম্ভ করে দিল। লানা একজন অনুবাদিকা, এবং যশপালের কয়েকটি গল্প সে রুশ ভাষায় ইতিমধ্যেই অনুবাদ করেছে। সাহিত্য-কর্মে লানার যোগ্যতা কম নয়। পড়াশুনো নিয়ে তার দিন কাটে। হিন্দি, ইংরেজি ও উজবেক ভাষায় সে পারদর্শিনী।

গল্প করতে করতে তিনজনে আমরা চারিদিকের বিপুল জনস্রোতের ভিতর দিয়ে কোনও মতে পাশ কাটিয়ে এরাস্তা ওরাস্তা পেরিয়ে লানার বাড়ির দিকে চললুম। আমার বড় সাধ, রুশ গৃহস্থদের অন্দর মহল দেখব। তখন অপরাহ্ণ।

নিরিবিলি ছায়াঢাকা একটা অপরিচিত জগতের সুন্দর পথ যেন দূর-দূরান্তর থেকে বাহু মেলে রয়েছে। পথ কোথাও আঁকাবাঁকা নয়, সোজা,—দৃষ্টি কোথাও ধাক্কা খায় না। গাছপালায় ছাওয়া চিক্কন পরিচ্ছন্ন পথ কোথাও পাঁচঢালা,

কোথাও পাথরের খাদ্‌রিকরা, কোথাও বা ঢাল্‌,—কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন।

মিনিট দশেকের মধ্যে লানাদের বাড়ির সামনে এলুম। এই পথটির নাম "অলেক্সি টলষ্টয় ষ্ট্রীট",—আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক,—বিগত বিশ্বযুদ্ধে তিনি আত্মদান করেন। তাঁরই নামে এই রাস্তাটি উৎসর্গ করা। লানাদের বাড়ির নম্বর আট। সামনেই গাছপালার নীচে তাদের বাড়ির মস্ত ফটক। ওদের দেশে আগে রাস্তার নাম, পরে বাড়ীর নম্বর।

ফটকের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলুম। লানা বোধ করি এরই মধ্যে কখন্ তার বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে থাকবে, সেই জন্য এক বর্ষীয়সী মহিলা ডানদিকের নীচের ফ্ল্যাট থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সহাস্যে আমাদের দুজনকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এলেন এক বৃদ্ধ, এবং পিছনে পিছনে এলেন দুটি যুবক। এবং অন্য একটি তরুণী পিছন দিকে এসে দাঁড়াল। লানা সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল, এবং এই ক'দিন পর আমরা প্রথম জানলুম, লানা বিবাহিতা! ইনি শাশুড়ী, উনি শ্বশুর, এটি তার স্বামী, ওইটি দেবর এবং তার পাশে ছোট ননদ। আমি হাসিমুখে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললুম, তুমি অবাক করলে লানা, তোমার স্বামী এই ক'দিন দিনরাত আমাদের পরিচর্যা করছেন,—অথচ জানতে পারিনি, তোমাদের সম্পর্ক! তিনজনে মিলে এত গল্প করেছি, কিন্তু বুঝিনি—তোমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী!

স্বামী স্ত্রী উভয়ে হেসেই অস্থির। যুবকটির নাম ভাদিম রুডানিকভ। সে এই অল্পবয়সেই পররাষ্ট্র বিভাগে ভাল চাকরি করে। আন্দাজে পেলুম বিদেশী-সংযোগ রক্ষার কোনও একটা সেকশনে তার কাজ। বেতন আন্দাজ তিন হাজার রুবল। এমন অমায়িক এবং হাসিখুশী-স্বভাব যুবক আমাদের হোটেলের আপিসে খুব কমই চোখে পড়ে। লানার দেবর সম্প্রতি নতুন চাকরি পেয়েছে। ননদ পড়াশুনা করছে। শ্বশুর মহাশয় পেন্সন পান, শাশুড়ী ঘরকন্না দেখেন। লানা ছাড়া অপর কেউ রুশ ভিন্ন বিদেশী ভাষা জানেন না,—স্বামীও না।

এদিকটি একতলা বাড়ী। কিন্তু একই ফটক দিয়ে একাধিক গৃহস্থের প্রবেশ-পথ। সামনে কাঁচা উঠোন, ওদিকে অন্যান্য বাড়ীর আনাগোনার পথ। কা'রো কা'রো বাড়ীর মেয়ে-পুরুষেরা আড়াল-আবডাল থেকে প্রসন্ন চক্ষে আমাদের লক্ষ্য করছিল। এই ফ্ল্যাটে মোট বোধ করি তিনটি মাঝারি ঘর আমাদের চোখে পড়ছে। সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ। পর্দার ফাঁক দিয়ে কোন কোনও ঘরের ভিতরে চোখ পড়ছিল। যেমন থাকে। প্লেন খাট, কাঠের আলমারি, যেমন-তেমন ঘরকন্নার তৈজস-পত্র, জুতোগুলি রাখার জায়গা, একপাশে ছাদের দিকে ওঠবার সিঁড়ি, এদিকে ছোট রান্নাঘর, ওপাশে বাথ রুম। বাঙলা দেশের মতোই একটি ছোটখাট সাধারণ পরিবার। ওরা কোট-প্যান্ট গাউন পরে, আমরা পরি ধুতি,—তফাৎ এইটুকু। এই ধরণের পরিবার কলকাতায় হাজার-হাজার। এমনি আধ-পুরোনো পাকা বাড়ীর একতলা, এমনি ছোটখাটোর মধ্যে ঘরকন্নার সব ব্যবস্থা,—এবং জীবনযাত্রার এই ধরণ-ধারণ—এ সবই যেন আমার অতি পরিচিত!

প্রশ্ন করলুম, আপনারা কি ভাত খান্, না রুটি?

হাসিমুখে শাশুড়ী বললেন, মাঝে মাঝে সখ ক'রে ভাত রাঁধি বৈকি।

একটি মধ্যবিত্ত রুশ পরিবারের বাড়ীতে ঢুকে আমি যেন অভিনব কিছুর সন্ধান করছিলুম! লক্ষ্য করছি সবাই একটু লাজুক,—সাধারণ বাঙালী পরিবারের মতো মুখচোরা। টেবল-ক্লথটি পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা, কাপড় জামাগুলি গুছিয়ে রাখবার ব্যবস্থা, ধোবার বাড়ীর ফর্সা পাটভাঙ্গা চাদরখানি তাড়াতাড়িতে বিছানায় পেতে দেবার আয়োজন। অতিথির চোখে যেন সুশ্রী ও শোভন দেখায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক হল, কোনটাই গোপন করার জন্য হুড়োহুড়ি নেই।

আপনারা কেউ নিরামিষ খান না? তরি-তরকারি কী পান্ এখানে?

শ্বশুর বললেন, মাংস ঠিকই আসে, ওটা নইলে দুবেলাই কা'রো চলে না। তবে তরিতরকারির মধ্যে ওই,—আলু, পেঁয়াজ, দুরকম কপি, মাঝে মাঝে বেগুন, ওলকপি, মুলো, বিট্-গাজর, শশা, টমাটো—এইসব। মাছ এদিকে কম। না, চুনো মাছ নেই। কাটা বড় মাছ আনে সখ ক'রে। তবে এই সময়টা এদেশের অবস্থা মোটামুটি ভাল। এখন তুলো উঠেছে মাঠে মাঠে। লক্ষ লক্ষ টন তুলো। ফসল উঠেছে মাঠ থেকে। জিনিসপত্রের দাম ক'মে গেছে। দুধ, মাখন, ফলপাকড়, লেবু,—এখন অঢেল।

ওরই মধ্যে এবাড়ির ওবাড়ির সর্বত্র আমার অবাধ্য দুটো চোখ প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য বস্তু ঠিক যেন লেহন ক'রে ফিরছিল। এবার প্রশ্ন করলুম, দামদস্তুর কেমন কমেছে, একটু বলুন!

বৃদ্ধ বললেন, সে আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাবো ঠিক বুঝতে পারিনে। তবে কি জানেন, লোকে যেটা বেশি খায়, সেইটির দাম কম! যেমন মাংস, মাখন, চীজ, ফল, রুটি, সব্জি, আলু, পেঁয়াজ, চিনি—এদের দাম অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু চাউল, মাছ, এবং আর দুচারটি সামগ্রীর দাম বেশি। যেমন ধরুন এক "কিলো" চাল ৮।৯ রুবলের কম নয়,—কেননা এটার চাহিদা কম। আমাদের দেশে চাহিদার মাপে সব জিনিস উৎপন্ন হয়।

এই চাহিদার চেহারা কা'রা বিচার করে?

কেন, আমাদের পার্টি! তাঁরা যে প্রত্যেক মানুষের হাঁড়ির খবর রাখেন। প্রত্যেক পাড়ায় আমাদের প্রতিনিধি আছেন, তাঁর দপ্তর আছে।

প্রশ্ন করলুম, তিনি যদি তাঁর কাজে গাফিলতি করেন?

ভাদিম এবার হাসল। বলল, তা'র কোনও উপায় নেই। তাঁর এইটিই কাজ, এই কাজেই তাঁর উপার্জন। যদি একাজে তিনি অযোগ্য প্রমাণিত হন্, তাঁকে সরিয়ে অন্য কাজ দেওয়া হয়।

আপনাদের দেশে পার্টির স্বেচ্ছাসেবক কর্মী আছেন?

আছেন বৈকি।—ভাদিম জবাব দিল, কিন্তু মজুরি না দিয়ে কা'রো কাজ নেওয়া হয় না। এই ত, নানা রিপাব্লিক থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল মাঠের তুলা তুলতে। তারা হাজার হাজার। তিরিশ লক্ষ টনেরও বেশি তুলো বৃষ্টির আগে তুলতে হবে। এই ত' সবে সেসব কাজ শেষ হল।

এ ছেলেমেয়েরা কা'রা?

তারা ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, কারখানা,—সব শ্রেণীর ছেলেমেয়ে! তাদের খাওয়া, থাকা, বেড়ানো—সব বিনা-মূল্যে। তাছাড়া দৈনিক মাইনে,—ধরুন, মাথা পিছু কুড়ি বাইশ রুবল। একমাসের মধ্যে সব কাজ সেরে তা'রা চলে যায়।

এই আসা যাওয়ায় দেশের মাটি ও তার জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয়ও ঘটে। কিন্তু এদিকে আসে বলে ওদিকেও তাদের মাইনে কাটা যায় না! এই কাজের জন্য ওরা ছুটি পায়।

দেশের উন্নতি এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনার গৌরবে সকলের মুখে চোখে এক প্রকার উজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছিল।

প্রশ্ন করলুম, আপনাদের এখানে বেশ মাছি দেখছি, মশাও কি আছে?

মশা!—হ্যাঁ, গ্রীষ্মে দেখা দিলে মশা এক আধটা দেখা যায় বটে। তবে মশারি খাটাতে হয় না। কেন বলুন ত?

বললুম, আমার হোটেলের ঘরে মাঝে মাঝে মশা কামড়ায়!

সামনের টেবলে আমাদের জলযোগের আয়োজন করা হল। কেক, বিস্কুট, ক্রীম বিস্কুট, চা, কফি, আঙুরের তৈরি লাল রংয়ের মেয়েলি মিষ্ট মদ, বাদাম, আপেল, আঙুর, তরমুজ—ইত্যাদি। শাশুড়ী এবং ছোট ননদটি বিশেষ আগ্রহে এগুলি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। তবে ননদটি কুমারী, —তার স্বাভাবিক কুণ্ঠা ও আড়ষ্টতা এখনও কাটেনি। বাইরের লোকের সামনে তার হাত পা আসছে না!

রুশ পরিবার বটে, তবে রৌদ্রের দেশে রং একটু মেটে। ওদের গায়ের রং এবং চেহারা একটু যেন স্থূলে হাতের ছাঁচে ঢালা। এক সময় হাসিমুখে বললুম, আপনাদের এমন সুন্দরী বৌমাটিকে কোথা থেকে খুঁজে নিয়ে এলেন, বলুন ত?

লানা সোল্লাসে হেসে উঠে বলল, আমি সুন্দরী! না, মোটেই না, ভাদিম বিশ্বাস করে না!

শাশুড়ী হাসিমুখে বললেন, খুঁজতে হয়নি! ছেলের সঙ্গে একদিন নিজেই এসে দাঁড়াল!

বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁর চীনা-চশমার ভিতর দিয়ে সহাস্যে চোখ তুলে বললেন, আশীর্বাদ করুন, ওরা যেন সুখে থাকে!

আহারাদির পর লানা তার শোবার ঘরে আমাদের নিয়ে এল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর। আলমারিতে বই, অন্যটিতে পুতুল সাজানো, দেওয়ালে একটি আয়না ঝোলানো, এ পাশে টিপয়, রাস্তার দিকে জানলা, একটি টেবলে পড়াশুনোর ব্যবস্থা, লানার জন্য একটি টেলিভিশন্ সেট, একটি টেলিফোন, জামা কাপড় রাখার আলনা, ওপাশে বিছানা। বিছানার ওপর একটি সুন্দর খোকা-পুতুল পড়ে রয়েছে!

পুতুলটি নাড়াচাড়া করে বললুম, এটি যেন জ্যান্ত হয়ে তোমার কোলে ফিরে আসে, লানা!

লানা নতমুখে হেসে শুধু বলল, আপনাকে ধন্যবাদ!

ভাদিম কৌতুক করে কি যেন বলল। কিন্তু লানা রাগ করে স্বামীর কথাটির অনুবাদ করে আমাকে শুনিয়ে দিল,—শুনলেন ত? আমি নাকি আপনার শুভেচ্ছাটি ভাল করে শুনতে পাইনি!

যশপাল সকৌতুকে হেসে উঠলেন। বেচারী পক্ককেশ যশপাল!

এই দিনটির প্রায় ছয় মাস পরে আমার কলকাতার ঠিকানায় এক চিঠি পাই, শ্রীমান্ ভাদিম ও লানা একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছে!

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আমরা ছিলাম, এবং বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এই পরিবারটি আমাদের আনন্দ দেবার চেষ্টা পেল। লানা বোধ করি জানত, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার মনোভাবের সংবাদ। সেইজন্য সে তার আলমারি থেকে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের একখানা ছোট গল্পের সংকলন-গ্রন্থ বার করে আনল, এবং বইটি আমাকে উপহার দেবার সময় ভিতরে লিখে দিল: "To dear mister Sanyal, from the open heart of a little thing in Tashkent. I'll remember you for the whole life. Lana"

স্ত্রীর একখানি ফটো আমাকে উপহার দিতে ভাদিম ভুলল না। কিন্তু তার পিছনেও লানা এই শব্দ কয়েকটি বসিয়ে দিল: "From Svetlana with great respect."

পথে আসতে আসতে এক সময় প্রশ্ন করলুম, এই যে ধরো তোমাদের বাড়িতে এসেছিলুম, আমরা ত পরদেশী,—তোমরা অনুমতি নিয়েছিলে?

অনুমতি? কার?—লানা চোখ তুলল।

বললুম, বাঃ, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সবাই জানে এটা তোমাদের পুলিশ স্টেট! তাদের অনুমতি নেবে না?

লানা বলল, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাদের সম্বন্ধে যা বলে, আমাদের সঙ্গে তার অনেক কিছুই মেলে না। কিন্তু আমি ভাবছি কী সন্দেহ-বাতিক আপনার! আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন, আর আমরা তার জন্যে অনুমতি চাইতে যাব? কার কাছে অনুমতি নিতে হয়, তাও ত' জানিনে!

খানিক একবার প্রশ্ন করলুম, লানা, এটা কি তোমার স্থায়ী চাকরি?

লানা জবাব দিল, না, চাকরি আমি করিনে! তবে এই সম্মেলন উপলক্ষে অনেককে কাজে নেওয়া হয়েছে, তাই আমিও নিয়েছি। সম্মেলন শেষ হলেই আমাদের ছুটি। আমি সাহিত্যের কাজ করি ঘরে বসে। যে-বইটি আপনাকে দিলুম, ওর মধ্যে দুটি গল্প আমার হাতের অনুবাদ করা। রবীন্দ্রনাথের হিন্দী গল্প থেকে করেছি। যশপালজির কয়েকটি গল্প আমারই অনুবাদ।

সম্মেলনের এই দোভাষীর কাজে কত পাবে তুমি?

তা হাজারখানেক রুবল পেতে পারি। লানা হাসল।

হোটেলে ফিরে দেখলুম, তারাশঙ্করের একটু জ্বর হয়েছে। বস্তুতঃ ওঁকে কোন সময়েই সুস্থ দেখছিনে। সহসা কোথাও উনি বেরোতে চান না। স্নানাহার যথারীতি চলে, জ্বর চলে তার সঙ্গে, এবং ঔষধপত্রও চলে। ছোটাছুটি, হৈ-চৈ, হুজুগ, অনাবশ্যক পথে পথে বেড়ানো, অহেতুক কতকগুলো মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, অর্থহীন কৌতূহল নিয়ে পাড়াকে চারপাশে জড়ো করা,—এগুলো ওঁর আসে না। উনি একটু ওর মধ্যে [illegible] শান্তি-কাতরে। আমি ফিরতেই উনি [illegible] হাতালেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

আমি সারাক্ষণ [illegible] সঙ্গে কাটালাম। তারাশঙ্কর [illegible], একেলা আবার একটু [illegible] শরীরটা একদম ভাল [illegible] চাইনি, তুমি [illegible] আসতেও চাইনি [illegible] বিশ্বাস কর তুমি! আমাকে [illegible] পাঠালে [illegible]

[illegible] সকল। আমি চুপ করে শুনছি।

উনি [illegible] আমার [illegible] আমি হঠাৎ [illegible]

কিন্তু ঠেলে পাঠান! এখানে এসে দেখছি, সম্মেলনের আবহাওয়া আমার পছন্দসই নয়। যা ভাবিনি তাই ঘটছে। যারা এসেছে ভারত থেকে,—তাদের মধ্যে মিল নেই। ফিরে যেতে পারলে আমি বাঁচি!

একটি ছোট ইংরেজি অভিভাষণ তারাশংকর কলকাতা থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। সেটি টাইপ করা। ইংরেজি ভাষায় রচনা প্রস্তুত করা তারাশংকরের অভ্যাস নেই, এবং তাঁর জামাতা এটি টাইপ ক'রে দেবার পর সম্ভবতঃ তারাশংকরও লক্ষ্য করেননি, এর মধ্যে ভাষা ও ব্যাকরণ যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ রইল কিনা। আমি নিজে ইংরেজিতে কাঁচা, কিন্তু লেখাটি পাঠ ক'রে আমার মন পীড়িত হয়ে উঠল। এটি এভাবে সম্মেলনের সামনে পড়া চলে না, কারণ এর বিষয়বস্তু এবং প্রতিপাদ্য এতই অকিঞ্চিৎকর যে, এটি ভারতের মুখপাত্রের মুখ দিয়ে শুনলে সকল জাতির প্রত্যাশাই মার খেয়ে যাবে। আমি ভয় পেলুম।

এর ব্যবস্থা তারাশংকর করেছিলেন। তিনি নিজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে শ্রীধরণী এবং মুল্কেরাজকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দুজনে মিলে এই রচনাটির ওপর কিছু কাজ ক'রে মোটামুটি অবশ্য একটা কিছু দাঁড় করালেন বটে। কিন্তু একটি রচনায় তিনটি মনোভাব দাঁড়িয়ে রইল! আমার ইচ্ছা ছিল, তারাশংকর তাঁর সুন্দর বাংলা ভাষায় এমন একটি রচনা প্রস্তুত ক'রে দিন যাতে সমগ্র সম্মেলনের মন আনন্দে, রোমাঞ্চে ও শ্রদ্ধায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে, এবং ভারতের হৃদয় প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু তেমন সময় আর হাতে ছিল না। বাংলা প্রবন্ধটি প্রস্তুত থাকলে সেটি রুশ ভাষায় অনুবাদ ক'রে নেবার জন্য শ্রীমতী নিনোভা আমাদের হাতের কাছেই ছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে কেবলই ভাবছিলুম, আমরা সবাই যে রবীন্দ্রনাথের ভারত থেকে এসেছি।

আমাদের হোটেলের নিচের তলায় গিজগিজ করছে নানা জাতি এবং নব পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণপ্রাচ্য যেন ভেঙে পড়েছে। বর্মা ভিড়েছে সিংহলের সঙ্গে, ভিয়েটনামের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়ার সঙ্গে চীন, তুরস্কের সঙ্গে মিশর। আমার সঙ্গে একজনের একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাঁর নাম মিঃ চেলিশেভ। বয়স তাঁর চল্লিশের মধ্যে। তিনি মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা নিকেতনের একজন কর্তা। কৌতুকের বিষয় হল এই, তিনি সুন্দর হিন্দিভাষায় আলাপ করতে চান, কিন্তু আমি চাই ইংরেজিতে। কারণ সুস্পষ্ট। চেলিশেভের সুদর্শন চেহারাটির সঙ্গে তাঁর মধুর আচরণও মিলে যায়। এই গুণবান ব্যক্তিটির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় আগ্রায়, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে। সেখানে অপর একটি রুশ-বন্ধুকেও পাওয়া গিয়েছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বাংলা রচনা পাঠ করেছিলেন। তাঁর নাম অধ্যাপক গুনাচিউক দানিলৎচুক আলেকজান্দার। তিনি সোভিয়েট আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য-সম্পর্ক বিভাগে ভারতীয় অংশটির অধিনায়ক। এঁর সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

অনেকের মধ্যে যে-ব্যক্তিকে ক্ষুরধার বুদ্ধি ব'লে মনে হয়েছিল তিনি হলেন মস্কোর ফরেন্ লিটারেচার ম্যাগাজিনের সম্পাদক মিঃ চেকভস্কি। মানুষটি পাৎলা, ঈষৎ লম্বা, এবং প্রায় প্রত্যেকটি ইংরেজি শব্দের ওপর জোর দিয়ে কথা বলেন। তারাশংকরের প্রতি তিনি আগ্রহশীল। এঁরই সাময়িকপত্রে তারাশংকরের একটি প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে। তারাশংকর উক্ত প্রবন্ধে কয়েকজন বাঙালী গল্পলেখককে নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং এই প্রবন্ধে তাঁর সমকালীন এবং সতীর্থ কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের নামোল্লেখ নেই দেখে একটু অবাক হলুম, এবং তাঁর পছন্দসই এমন দু'একজনের আলোচনা রয়েছে যাঁরা কালের ধোপে টিকবেন কিনা সে-প্রশ্ন আছে। বৈদেশিক কাগজে এ-ধরনের আলোচনা আমার কাছে সুষ্ঠু মনে হয়নি। মস্কোর কাগজে ছাপা হবে বলেই বোধহয় এক-আধজন বামপন্থী লেখকের উল্লেখ ছিল।

একদিন টেবিলে খেতে ব'সে চেকভস্কি তারাশংকরের সামনে কয়েকজন বাঙালী লেখকের একটি তালিকা পেশ করলেন। এঁদের গল্প এবং উপন্যাস রুশ ভাষায় ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকার অধিকাংশ নামই আমাদের কাছে তথা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত। তাঁদের অনেকের নামে কোনও বই প্রকাশিত হওয়া দূরের কথা, বাংলার সুদূর পল্লীগ্রামের কোনও অখ্যাত সাপ্তাহিকেও হয়ত তাঁদের কারও লেখা আজও ছাপা হয়নি! কিন্তু তাঁদের গল্প কেমন ক'রে রুশ-ভাষায় ছাপা হল, কে সুপারিশ করল, কে বা কোন্ পথে সেসব লেখা পাঠাল,—এসম্বন্ধে কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু চেকভস্কির সঙ্গে আলোচনা করে এটুকু জানা গেল, সেদিন অবধি তারাশংকরের একটি গল্পও রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়নি। শুধু তাই নয়, বাঙালী লেখক বলতে যে পূর্ববঙ্গের বহু শক্তিমান মুসলমান লেখক-লেখিকাকেও বুঝায়, এঁদের সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত নন। মাঝে মাঝে রুশ এবং অন্যান্য সোভিয়েট বন্ধুজনের সৌজন্য, সহৃদয়তা এবং অনুরাগ দেখে ভুলে যেতুম যে, এটি কমিউনিস্ট সমাজ, এ সমাজ একটি নির্দিষ্ট নীতি এবং আদর্শের দ্বারা পরিচালিত,—জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ একটি বিশেষ ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারই সঙ্গে মন মিলিয়ে যদি কোনও এক অখ্যাত 'ক্ষুদিরাম পাঁড়ে' ও ভারতবর্ষ থেকে হ-য-ব-র-ল কিছু লিখে পাঠায়, তবে তার খাতির বোরিং প্রণালী থেকে বার্লিন পর্যন্ত হয়ত ছোটাছুটি করবে! বছর চারেক আগে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সাহিত্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন। কলিকাতায় সর্বভারতীয় লেখক-সভায় ব'সে তিনি বলেছিলেন, "পাঠক যা চায় আমি তা লিখব না, আমি যা লিখব তাই যেন পাঠক চায়।" সোভিয়েট প্রকাশকরা যা দেন তাই যেন তাঁদের পাঠকরা চান!

"অগানিয়োক" নামক একখানি অতি প্রসিদ্ধ সচিত্র সাপ্তাহিক কাগজ মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। মোটা আর্ট পেপারে ছাপা, পাতায় পাতায় অতি সুন্দর ছবি, এবং ভাষাটি রুশ। এই কাগজটি কত লক্ষ কপি যে ছাপা হয়, সেটি শুনলে গা রোমাঞ্চ হ'তে পারে। এই কাগজের যিনি সম্পাদক,—তাঁর ন্যায় বিশালকায় এবং রূপবান প্রৌঢ় ব্যক্তি অল্পই চোখে পড়ে। তাঁর নাম মিঃ সফ্রোনভ। ভদ্র, অমায়িক, সংগীত নৃত্য এবং পরিহাসপ্রিয়। তিনি একখানি মাত্র বাংলা মাসিকপত্রের নাম শুনেছেন এবং সেই মাসিকপত্র থেকে কিছু কিছু লেখা রুশভাষাতেও সংকলন করেছেন। সেই মাসিকপত্রটির যিনি সম্পাদক সেই শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের সঙ্গেই যে তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসি-খুশী আলাপ করছিলেন, সেটি তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর মুখেই শুনলাম, "অগানিয়োক্" শব্দটির বঙ্গার্থ হল,

"আগুন বা অগ্নিশিখা।" অনেকগুলি রুশ শব্দের সঙ্গে আমাদের কোথায় যেন নাড়ির যোগ আছে। যেমন, "গারিয়াচি চায়", মানে গরম চা। "মালাকো," মানে মিল্ক,—দুধ। "মিয়াসো," মানে মাংস।

আগেই বলেছি "শাখ্খার"—মানে শাক্কার, চিনি। "পিলাও" মানে পোলাও. দো. ত্রি. চিতির্থ্, পিয়াৎ, শেস্ঠ্ – দুই. তিন. চার. পাঁচ. ছয়—ইত্যাদি।

আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মতৎপর ছিলেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। গত এক মাসে গুণী, জ্ঞানী ও মনীষী সমাজে তাঁর সমাদর ও প্রতিপত্তি অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। তাঁর ডাক সর্বত্র এবং প্রত্যেকটিই পণ্ডিত-সমাজে। তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায় লক্ষ্য ক'রে অবাক হতুম, এবং তাঁর ঘরে স্তূপাকার বই ও বহুবিধ সৌখীন দ্রব্য-সামগ্রীর সমাবেশ দেখে আমন্দ পেতুম। তাঁর ছুটোছুটি এবং আনাগোনা অনেকটা আমাদের জানাশোনার বাইরে ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পণ্ডিত-সমাজে তাঁর খ্যাতির সীমা রইল না।

তারাশংকর অসুস্থ শরীরে ঘরেই রইলেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যার পর একটি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মোটর ছেড়ে দিয়ে হাঁটাপথে বেরিয়ে পড়লুম। সমগ্র তাসকন্দ নগরীর বিরাট আলোকসজ্জা সেদিন সমস্ত পৃথিবীবাসীকে অভিভূত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এর মধ্যে আনন্দ এবং অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাস যেমন ছিল, তেমনি রেষারেষি এবং জিদও কিছু ছিল বৈকি। হাল আমলের ধনীর ঘরে ছেলের বৌভাত,—পাঁচদিকের পাঁচটা লোক জেনে যাক্ না কেন, আমরা সেদিনের সেই "ঘুটেকুড়োনি" এখন আর নেই। সুতরাং এই বিপুল আড়ম্বরে আমন্দও ছিল, আত্মাভিমানও ছিল।

রাস্তায় একপা এগোতেই জনসাধারণ আমাদেরকে ঘিরল ঠিক বেড়াজালে। ওদের ভাষা বুঝিনে, হৃদয়টাকে বুঝি। আগ্রহের সেই আশ্চর্য অধীরতা আমাদেরকে যেন মাথায় তুলে নাচতে চায়! কেন? শুধুই কি আনন্দ? বেদনা কি নেই কিছু? এমন করে আমাদের গা ছোঁয় কেন? ওরা কি এই প্রথম বৃহত্তর জীবনটাকে স্পর্শ করছে? আধিভৌতিক প্রয়োজনু গত চল্লিশ বছরে ওদের মিটেছে,—ভাত, কাপড়, কাজ, আশ্রয়, আমোদ,—একে একে সব পেয়েছে! তবে কি এটা ওদের আরেকটা কোনও আত্মিক ক্ষুধা,—যেটা ভাত-কাপড়ের বাইরে? এটা কি ঐহিক সুখ-সম্ভোগের মধ্যে থেকেও কোনও একটা মহৎ অতৃপ্তি? কিন্তু এই বিশাল জনতার বুকের তলায় কান পেতে সেই নিগূঢ় রহস্যকথা শুনব, এমন আমাদের সময় কোথা?—থাক্, এসব আমার অনুমান মাত্র! এদেশের মাটির ওপরে আমি যে বহুকালের সংশয় নিয়ে পদার্পণ করেছি, সেই সংশয়যোগে আমি জর্জরিত, আমার এটি চিত্তবিকারও হতে পারে!

মিনিট দশেকের পথ, তারপরে পাওয়া গেল এক আলোকমালাসজ্জিত অট্টালিকা। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একান্ত সমাদরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। চারিদিকের সব মুখগুলি আমাদের পরিচিত। এই সমাবেশটি হল "উজবেক লেখক সঙ্ঘের।" প্রথমেই চোখ পড়ল আফ্রিকার সেই শীর্ণকায়া ঘনকৃষ্ণাঙ্গিনীকে। ঠিক মনে পড়ছে না, মেয়েটি বোধ করি ঘানা থেকে এসেছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে।

মেয়েটি খৃষ্টান, এবং আপন মাতৃভাষার মতোই সাবলীল ইংরেজি বলে। সেদিন কে যেন ওর সঙ্গে তারাশংকরের পরিচয় করিয়ে দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ মেয়েটি জেট বিমানের মতো দ্রুতগতিতে এবং হাত পা নেড়ে এমন বাকাচ্ছটা বিস্তার করল যে, ভদ্রচিত্ত তারাশংকর একটু আড়ষ্ট হলেন। কিন্তু তবু স্বভাবসৌজন্যবশত তারাশংকর একবার বলতে গেলেন, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'আফ্রিকার' উপর একটি চমৎকার কবিতা লিখে গেছেন! তারাশংকরের প্রত্যাশা ছিল, মেয়েটি তুষ্ট হবে!

তুষ্ট! কৃষ্ণসর্পিণী ফোঁস ক'রে উঠল,—থাক্, সে-কবিতা আমরা পড়েছি! কতটুকু জানতেন তিনি আফ্রিকাকে? কবে গিয়েছেন তিনি আমাদের মাঝখানে? কী দেখেছেন তিনি আফ্রিকার? তাঁর ওই কবিতায় আমরা অপমানিত বোধ করেছি। এ ধরণের সহানুভূতি আমরা চাইনে! আমরা জাগ্রত জাতি, সহানুভূতির তোয়াক্কা রাখিনে! আচ্ছা, নমস্কার—

তারাশংকর তার এবম্বিধ আচরণে একটু লজ্জিত হলেন বটে, কিন্তু ছোট হলেন না! মেয়েটি তার নিজের জন্য শুধু
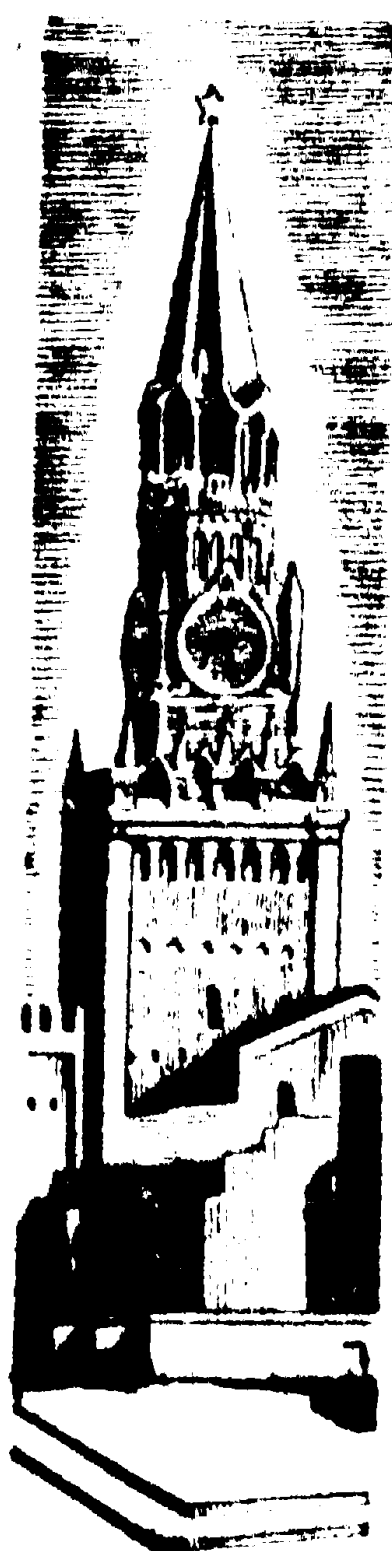
রেখে গেল ধিক্কার এবং অশ্রদ্ধা। যে-দেশ থেকে সে এসেছে সেই দেশকেই সে আমাদের চোখে ছোট করে দিল।

'উজবেক লেখক সংঘের' মহিলা-সভা শ্রীমতী জুলফিয়া ইসরাইলোভা একটি লেখক-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। মহিলা সুশ্রী, বয়স আন্দাজ ৪২।৪৪। কবি হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ, এবং ইংরেজিতে তাঁর যে কয়টি কবিতার তর্জমা হয়েছে তার কয়েকটিতে সত্যকার রোমাঞ্চ-আবেশ আছে। কিছুদিন আগে তিনি ভারত ভ্রমণ করে গিয়ে ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে কয়েকটি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেন। প্রত্যেক উজবেকের কল্পনায় ভারত সম্বন্ধে যে স্বপ্নচ্ছায়াটি ভেসে বেড়ায়, জুলফিয়ার গুটি কয়েক কবিতায় সেই ছায়াটি রঙে ও রসে উচ্ছ্বসিত। তাঁর সেই কবিতার ছোট বইটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

লেখক বৈঠকের সেই অধিবেশনে কিছুক্ষণ থাকার পর আমার মনে ছিলনা যে, আমি বিদেশী এবং এদের কাছে অপরিচিত! একটা সময় হয়ত আসে যখন ভাষাটাও আর অবরোধের সৃষ্টি করে না। আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি একটা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এসে পড়েছি,—যার প্রকৃত হাল এবং চাল আমার কিছুমাত্র জানা নেই। কিন্তু অভিনবত্বের মোহ আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, আমার দিন এবং রাত্রিগুলি যেন কেমন একটা নিবিড় মাদকরসাবেশের আড়ালে ধীরে ধীরে ছায়ার মতো মিলিয়ে যেতে লাগল। এদেশ ভাল কি মন্দ, সে আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, প্রতি মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ বিচার করার কোন দায়িত্ব নিয়েও আমি আসিনি, কমিউনিজম সম্বন্ধে শেষ ফতোয়া দিয়ে সরে যাব—এমন অর্বাচীনও আমি নই। কিন্তু এমন একটা নতুন জাতির বিচিত্র জীবনের তলায় তলিয়ে না গেলে নিজের কাছে আমি মুখ দেখাবই বা কেমন করে? সম্মেলনের অধিবেশনকাল শেষ হলে ছুটি আমাকে নিতে হবে সন্দেহ কি, কিন্তু মানুষের সমস্ত বাইরের খোসা ও খোলসের ভিতর থেকে একে একে যারা পরমাত্মীয়ের মতো উঠে আসছে — তাদের কাছে শুধু কি দুটো শুকনো মুখের কথা বলে এজন্মের মতো বিদায় নিয়ে চলে যাব?

নিজের দুর্বলতা অনুভব করে ভয় পেলুম। না, এত মাখামাখি ভাল নয়। পিছনের পায়ের চিহ্ন মুছে দিয়ে যথাসময়ে আমাকে বিদায় নিতে হবে বৈকি। কেবলমাত্র মুখের মিষ্টিকথার বেচাকেনাই ভাল। হৃদয়ের কথা থাক্।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা নিয়ে বসে গেলুম। সুনীতিবাবু, শ্রীধরণী ও তারাশঙ্কর ছাড়া তখন আর কেউ ছিলেন না। সাহিত্য নয়, লেখক নয়, আন্তর্জাতিক ভালবাসার কথাও নয়,—চীন এবং আফ্রিকার রাজনীতিক মনোভাব এবং কূটনীতিক আচরণ নিয়ে আলোচনা! সর্বাপেক্ষা স্বস্তির কারণ ছিল এই, সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ থেকে এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা। এ যাত্রায় তাঁরা হলেন 'হোস্ট'-অতিথিসেবক,—কোনও নিজস্ব অভিমত তাঁরা এই সম্মেলনের উপর আরোপ করতে চান না। চার পাঁচ শ' বাইরাগত অতিথির মনস্তুষ্টিসাধন করতে পারলেই তাঁরা খুশী। তবু আমাদের অনেকের মনে এই প্রকার একটা সংশয় বাসা বেঁধে রয়েছে যে, উগ্রনীতিপরায়ণ চীন প্রতিনিধিরা হয়ত বা রুশগণের সঙ্গে অপ্রকাশ্যে এই সম্মেলনের নীতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু তার কোনও সংবাদ বা প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না।

ওঁরা একে একে চলে যাবার পর আমিও বিদায় নিলুম। লালা ও মিশ্র আগেই বিদায় নিয়েছে। গত কয়েকদিন চণ্ডালের মতো আহার চলছে,— আজ প্রতিজ্ঞা করলুম, যকৃতের প্রতি আর অনাচার করব না। অতএব বারান্দার ছোট্ট আপিস থেকে ঘরের চাবিটি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম এবং প্রতিদিনের মতো আজও চোখে পড়ল, টিপাইয়ের ওপর পুনরায় সের দুই আঙ্গুর, গোটা আষ্টেক লাল আপেল এবং গোটা চার-পাঁচ পিয়ারা আবার নতুন করে রেখে যাওয়া হয়েছে। সমস্ত ঘরখানা মধুর চাটুকা আঙ্গুরের গন্ধে যেন ভরোভরো। আমাদের ঘরের চাবিগুলি 'ফ্লোর মেড'-এর আপিসে জমা রাখতে হয়, এবং আমাদের অনুপস্থিতি-কালে ঝিয়েরা ঘরে ঢোকে এবং ঝাড়-মোছা করে। এইটেই সব হোটেলের নিয়ম।

রাত কম হয়নি। বিছানায় শুতে যাব, এমন সময় টক্‌টক্ করে দরজায় টোকা পড়ল। হয় সুনীতিবাবু, নয় তারাশঙ্কর, নয়ত বা শ্রীধরণী। বিছানা ছেড়ে উঠে এলোমেলোভাবে দরজা খুললুম। না, এ যে মেয়ে! সন্ধ্যার সময় এই দীর্ঘাঙ্গী অগ্নিশিখার মতো মেয়েটাকে 'ফ্লোর আপিসে' প্রথম বসতে দেখে তারাশঙ্কর এবং তাঁর পিছনে আমি থমকে গিয়েছিলুম। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় তারাশঙ্কর ফিসফিস করে আমাকে বলেছিলেন, দেখতে পাচ্ছ 'ব্লণ্ড' কাকে বলে? ভাল করে দেখে নাও, 'ব্লণ্ড্ ভেনাস্!'

কিন্তু ভাল করে এই প্রথম মেয়েটিকে দেখলুম। রঙবেরঙীন ঘাগরা তার পরণে, স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে, পালিশকরা সোনার বর্ণের রাশি-রাশি চুল বব-করা, পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলি ঈষৎ হাস্যে বিকশিত। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স হবে। মেয়েটা যেন দপদপ করে জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে এক পা বাড়িয়ে নিজের একখানা হাত বারদুই নিজেরই মুখের কাছে তুলে মেয়েটা আমাকে প্রশ্ন করল, ঈট্, ঈট্,—নো-?

মেয়েটা ইংরাজি তেমন জানে না। কিন্তু তার প্রশ্নটা বুঝলুম, অর্থাৎ আমি খেয়েছি কিনা। সুতরাং বললুম, নো, আই ডোন্ট......থ্যাঙ্ক য়ু......

পুনরায় প্রশ্ন ঃ হোয়াই? হোয়াই? নো ঈট্? আই কাম্ ইয়োর রুম্?

মেয়েটি ঘরে এসে কিছুক্ষণ আলাপ করে যেতে চায়! কিন্তু আমার ভারতীয় মন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় বারোটা। তবু অভ্যর্থনা করতে হয়। মেয়েটি হাসিমুখে ঘরে ঢুকে দরজাটা সযত্নে ভেজিয়ে দিল।

ভারতীয় লেখককে দেখে সেদিন-কার মহারাণীর ইতিহাসটি মনে পড়ছে, —মেয়েটি স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এসে আমার মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বসল। মেয়েটি জাতে রুশ, এবং হঠাৎ মনে হয় পুরাকালের জার-আমলের কোনও রাজ-পরিবারের বংশে এর জন্ম। আমাদের হোটেলে শত শত প্রতিনিধি পুরুষ আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সোভিয়েট মেয়েও কাজকর্মে ঘোরাফেরা করে শত শত। যতগুলি আপিস আছে নীচের-তলায়,—প্রায় আগাগোড়া মেয়ে! ব্যাংক, পোষ্ট অফিস, প্যাসেঞ্জার অফিস, পাসপোর্ট কাউন্টার—সব মেয়ে। চাকর নেই, সব ঝি। এ-বাড়ীর প্রত্যেক তলার প্রত্যেকটি আপিস,—মেয়ে! লিফ্ট-ম্যান, অর্থাৎ মেয়ে। এক্সচেঞ্জ আপিস,

—মানে মেয়ে। দোভাষীর মধ্যে নব্বই-জনেরও বেশি হল মেয়ে। চতুর্দিকে মেয়ের সান্নিধ্য এত সহজলভ্য বলেই পুরুষের চোখে সহসা রং ধরতে চায় না। তা ছাড়া উপার্জনের সমকক্ষতা থাকার জন্য সহজে মেয়ের পক্ষে বশ্যতা স্বীকারের কথা ওঠে না। আমাদের দেশে কথায়-কথায় মেয়েরা পায়ে পড়ে কাঁদে বলেই ত খুশী হয়ে তাদের নিয়ে পদ্য লিখি!

এ মেয়েটা নিজের রূপে এবং রঙিন পরিচ্ছদে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বলল, নট ঈট্? হোয়াই?—জবাব দিলুম, নো!

ও বোঝে না ইংরেজি, আমি বুঝিনে রুশ। ফলে, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে একটা কৌতুক-নাট্য চলতে লাগল। কিন্তু ও যতটুকু ইংরেজি জানে, তারই সাহায্যে বুঝলুম, মেয়েটি রুশ বটে, তবে পৈতৃক বাস কিরঘিস্তানে, যেটাকে ওরা বলে কিরঘিজিয়া। মেয়েটার নাম, নেলী মিখাইলোনা কনস্টানটিনোভা। দেশে মা বাপ কেউ নেই। এখানে থাকে মাসির কাছে, এবং পাঠশালায় গিয়ে ইংরেজির পাঠ নেয়। 'বুক নম্বর টু' পড়ে। ইংরেজি একটু না জানলে তার চলছে না। বলতে বলতে সে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং মিনিট দুই পরে ফিরে এল কাগজের মলাট দেওয়া এক-খানা ইংরেজি ও রুশ ভাষা মেলানো বই নিয়ে। অন্য হাতে এনেছে ছোট ছোট দু'তিনটি সেই 'ভিনিগারে' ভিজানো শশা, এবং একটি লাল গোলাপ ফুল। ফুলটি আমি না নিলে কিন্তু সে ভীষণ রাগ করবে। বুঝলুম, এসব আমার মজুরী।

নেলী তার কটা দুটো চোখ পাকিয়ে তুলল, এবং আমার হাতে গুঁজে দিল দুটি শশা এবং ওই ফুলটি। শশা দুটি আমাকে খেতেই হবে, কিন্তু ফুল ইত্যাদি উপহার পাওয়ার অভ্যাস আমার কম! তা ছাড়া এসব ব্যাপারে আমি ভীতু। ফুল থেকেই ফল, এবং ফল থেকেই ফলাফল,—সুতরাং এসবে কাজ নেই! আড়ষ্ট হাতে ফুলটি নাকের কাছে একবার নেড়ে টেবলের উপর রেখে দিলুম।

"টীচ্, টীচ্, ইংলিশ, টীচ্ বুক্? মী! আই টক্ ইউ গুড!"

অর্থাৎ আমাকে একটু ইংরেজি শিখিয়ে দিন্ তা হলে আমি একটু ভাল করে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি! আমার ধারণা এইটিই নেলী বলতে চাইল। হাতঘড়িতে তখন রাত একটা বাজে। পুনরায় সে আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল, আজ থেকে কয়েকদিন সমস্ত রাত তাকে এই চার-তলার 'ফ্লোরে' কাজ করতে হবে। রাত নটায় আসবে সকাল সাতটার পর চলে যাবে এবং এরমধ্যে অবসর সময়টুকু সে নষ্ট করতে চায় না!

এক সময় সে তার ভাঙা ইংরেজি থামিয়ে উঠল এবং যাবার সময় হাত নেড়ে জানিয়ে গেল দরজাটা যেন বন্ধ না করি,—সে আবার আসবে!

দরজাটা ভেজিয়ে আলো জ্বেলে ব'সে রইলুম। দূরে কোথায় যেন মসমস করে এক একজনের জুতোর আওয়াজ কার্পেটের উপর দিয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমার মন সংশয়াচ্ছন্ন। এরমধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র নেই ত? কিংবা পরদেশীয় পক্ষে কোনও মায়াজাল? কেউ কি অদৃশ্যলোক থেকে পরীক্ষা করছে আমাকে? ঘরের মধ্যে কোথাও এমন কোনও যন্ত্র লুকোনো আছে যেটা টেলিভিশন হয়ে বাইরে কোথাও চলে যাচ্ছে? যারা কথায়-কথায় মহাকাশের মধ্যে কুকুর-বিড়াল পাঠিয়ে 'বীপ্ বীপ্' শোনে, চাঁদের উপরে নানা সামগ্রী রেখে আসে, যে-দেশে গ্যাগারিন ও টিটভ জন্মায়, তারা যন্ত্রের সাহায্যে না পারে কি? আমার চেতনা ধারাল হয়ে উঠল!

মিনিট পনের পরে ফিরে এসে নেলী একটু অবাক হয়ে দেখল, আমি ঘরময় হাসিখুশী মুখে পায়চারি করছি। কিন্তু এবার দেখি তার হাতে সেই জর্মান সিল্ভারের খাপে বসান এক গেলাস গরম চা, এবং এক প্লেট কাটা-টমাটো। সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এইরাত্রে চা এনেছে। আমিও বেশ সহাস্য কৃতজ্ঞতায় তার হাত থেকে চা নিলুম।

এবার সে আর বসল না। কিন্তু আমার চা-পানকরাটুকু সে তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল। তারপর বিদায় নেবার সময় চোখ তুলে বলল, "মী টেল্ স্টোরি ইউ......', বাকিটুকু হাত নেড়ে উপর দিকে দেখিয়ে বলল, আসছে কাল আপনার সঙ্গে আবার গল্প করব।—ইয়েস?

বললুম, আচ্ছা।

দরজাটি সযত্নে ধীরে বন্ধ ক'রে নেলী চ'লে গেল।

লণ্ডনবাসী একজন গ্রীক ভদ্রলোক এসেছেন এই সম্মেলনে। বয়সে প্রবীণ, নিরীহ এবং শান্ত। মৃদুভাষী, নিরভিমান ও খর্বকায়। তিনি বেছে নিয়েছিলেন আমাকে তাঁর বিশ্বাসভাজন দোসর হিসাবে। তিনটি প্রশ্ন প্রায়ই তিনি করতেন: রাত্রে ঠিক ঘুমটি হচ্ছে কিনা, দুপুরে আজ কোন্ সুপটি খাব, এবং হালচাল কেমন এখানে দেখছেন?

আমার যথাযথ জবাবগুলি শোনবার পর এক সময় তিনি বলেন, লণ্ডনে আছি চল্লিশ বছর। তা হলে এতকাল ধরে যা শুনে এলুম,—কই, তার সঙ্গে এখানে কিছু মিলছে না ত? যা দেখছি সবই ত বেশ লাগছে!

হাসিমুখে বললুম, সকালের দিকে এল্‌কোহল্ আপনার কেমন লাগে?

ও, মুখে গন্ধ পেয়েছেন মনে হচ্ছে। শুনুন, দাঁড়ান—। এদেশের ছেলেমেয়েরা তা হলে বিয়েও করে, ঘরকন্নাও করে—কেমন? তা হলে ত' আমার স্ত্রীকে সঙ্গে আনলেই পারতুম!

আনলেন না কেন?

ভয়ে!—ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন, যদি তাঁর মাথা বিগড়ে যায়? এখন দেখছি এরা ত সবাই গেরস্থ। কই, কোথাও অসভ্যতা দেখছিনে ত? কী বলেন আপনি?

আমি হেসে উঠে বললুম, খুঁজে বেড়ালে দু'একটা উদাহরণ হয়ত পাওয়া যায়!

কিন্তু লণ্ডনে ত' খুঁজতে হয় না! সত্যি বলতে কি, আমার স্ত্রীকে সেখানে আমি বাজার করতেও দিইনে!

কেন? তাঁর বয়স কত?

বৃদ্ধ বললেন, বয়স আর কত, সবে ষাট পেরিয়েছে! But she looks quite young!

নমস্কার জানিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, ভদ্রলোক আবার বললেন, What's in age, it's desire which counts!

আমাদের পাড়ার অবিনাশবাবুর সঙ্গে এ ব্যক্তির তফাৎ সামান্যই!

চারতলার বারান্দার ঠিক মাঝখানে, —সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই ডানহাতি কোনটিতে 'ফ্লোর-মেডদের' অফিস। দুটি স্ত্রীলোক প্রায়ই সেখানে থাকে। মাঝে এক বৃদ্ধার সঙ্গে এক প্রবীণা ছিলেন। এরা গরীব উজবেক, বংশটা

পাঁচমিশালী,—গায়ের রং মেটে। একটি দরিদ্র মিস্টিমুখী মেয়েকে দেখলুম,—মুখখানা শান্ত এবং অকিঞ্চন। মেয়েটি উজবেক মুসলমান, কিন্তু এমন স্বল্পভাষী এবং ভদ্র—সহসা চোখে পড়ে না। স্পষ্টত, এরা নতুন লোক,—সম্মেলন উপলক্ষ্যে কাজের চুক্তি পেয়েছে। আমরা যেমন বিয়ে বাড়ীর কাজে 'ঠিকে' লোক রাখতে বাধ্য হই! এই ভদ্র মেয়েটির ঘরে যে প্রকৃতই অন্নবস্ত্রের অভাব আছে, সেটি ওর দরিদ্র পোষাক, ওর রুক্ষ মলিন চেহারা, ওর জুতো মোজা এবং আচরণ থেকেই বোঝা যায়। সম্ভবতঃ বছর পঁচিশ বয়স হবে। সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকত সকলের পায়ের তলায়, এবং তার সহকর্মিণীদেরও সন্তোষ বিধানের জন্য সে হাতজোড় করে থাকত। ঝিয়েদের মহলেও সে মুখ বুজে ঝিয়ের কাজ করত। কতবার দুজনে মুখোমুখি এসেছি, ঘরের চাবি নিয়েছি তার হাত থেকে কতবার, ইঙ্গিতে কতবার গরম চায়ের জন্য তাকে ফরমাস করেছি এবং উভয়ের ভাষা উভয়ে না জানার জন্য কতবার যেন আমাদের দম ফেটে বেরবার চেষ্টা হয়েছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে বসবাসকালীন আর কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য আমার মন এমনভাবে সমবেদনাবোধে নাড়া খায়নি!

আমার ঘরে দিনের পর দিন পচ ধরেছে রাশিকৃত আঙ্গুর আর আপেলে, পরিত্যক্ত ভোজ্যবস্তু খাবরুমের সেই লোহার টুকরির মধ্যে ফেলে দিয়েছি অনেকবার। কিন্তু আমি জানি এ মেয়েটির ক্ষুধা ছিল, অভাব ছিল, দারিদ্র্য ছিল,—এবং ওই চারতলার অফিসে যারা কাজ করত, তাদের মধ্যে অনেকেরই জীবনযাত্রা বিড়ম্বিত ছিল। ওকে কিছু খাওয়াবার সাহস অবশ্য আমার হয়নি।

অফিসের ওই ছোটখাটো আড্ডায় একটি যুবক এবং আরেকটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরা দুজনেই ইংরেজি জানে। তরুণ বয়সের কোনও ছেলেকে সহসা এখানে আমরা দেখতে পাইনে। সর্বত্রই মেয়ে, কিন্তু পনেরো থেকে তিরিশ বছরের যুবকদের দল কোথায়,—তারা কেউ ত আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না? কোথায় সেই অচেনা অজানা অনামা কৌতূহলী হাসামুখ তরুণ যুবকের দল,—যারা সামনে এসে দাঁড়ালে সোভিয়েট ইউনিয়নের যৌবনশক্তির নবতম স্পর্শলাভ করব! সন্দেহ নেই, জলবহুল পথে,—সিনেমা, অপেরা, সার্কাস, জমায়েৎ, থিয়েটার,—একে একে সব ঠাঁই গিয়েছি। জনকয়েক যুবক দোভাষীও আশেপাশে ঘোরে,—কিন্তু অভাবটা থেকে যাচ্ছে মনে, এলোমেলো যুবক সমাজের মাঝখানে ব'সে নিরর্থক এবং অহেতুক বিশৃঙ্খলালাপে মশগুল হতে পারছিনে! কোথাও যেন অদৃশ্য কিছু একটা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছিল!

এই যুবকটিকে কাছে পেয়ে ভারি খুশী হয়েছিলুম। যেমন চটপটে, তেমন 'আড্ডাধারী', কিন্তু ভারি ভদ্র। ছেলেটি পড়াশুনো করে। ওর কেউ এখানে কাজ পেয়েছে তাই আসে মাঝে মাঝে। ছেলেটির নাম আরোনভ আরোন। বাড়ী এই ত' কাছেই, —হিজ্‌মাচ ষ্ট্রীট, ১৩ নম্বর। আসুন না একদিন গরীবের ঘরে! হৈ চৈ করে সব চলে যাবেন,—আমাদের ঘরকন্না দেখে যান! চলুন না হয় মাঠে নিয়ে যাই। চাষীদের এখানে ওখানে দেখবেন তুলোর গাঁটের এক একটা পাহাড়। এটা যে তুলোর দেশ! আর নয়ত চলুন উজবেক গ্রামের হাটতলায়! বড় বড় মেওয়ার কারবার, এই বড় বড় দাড়ি আর পাগড়ি বেঁধে ব'সে গেছে সব কারবারীরা। ভুঁড়ি নিয়ে ভারি ভারি মুসলমান কর্তারা ব'সে ব'সে গড়গড়ায় তামাক টানছে! মস্ত মস্ত হাট। ইরানী, তুরানী, আফগানি, তুর্কোমেন, রুশ, কাজাখ, আজেরবইজানি,—গেলে একেবারে দিশেহারা হবেন। দেখবেন একটার পর একটা 'চায়খানায়' কী ভিড়। সব রিপাবলিক ওখানে হাটবাজারে গিয়ে একদম একাকার! হৈ চৈ দিনরাত। ওখানে আপনাদের পেলে লুফে নেবে!

লাউড স্পীকার আছে?

আছে।

প্রশ্ন করলুম, হাটতলায় মারামারি গালমন্দ রাহাজানি—এসব আছে?

আরোন একটু অবাক হয়ে তাকাল, —এসব কি বলছেন?

পাশে সেই ঠোঁট-কাটা ছাত্রী মেয়েটি বসেছিল। নাম শারদোবা। সে হঠাৎ হেসে উঠল,—আপনাদের দেশে বুঝি আছে এসব? মনে রাখবেন এটা সোভিয়েট দেশ, এখানে বন্ধুত্ব আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই! যত সব আজগুবী প্রশ্ন আপনার!

আরোন বলল, আমার সেই অনুরোধ কিন্তু ভুলবেন না। দেশে ফিরেই কিন্তু ভারতের ইংরেজি খবরের কাগজ আর সাময়িকপত্র আমাকে পাঠাবেন। ভারতবর্ষকে ভাল ক'রে জানতেই হবে। ভারত আমাদের স্বপ্নের দেশ!

দেশে ফিরে কিন্তু আরোনকে কোনও কাগজ পাঠাতে আমার সাহস হয়নি। ছেলেটা স্বচ্ছন্দ এবং সহজ। কিন্তু পাপ আমারই মনে।

ঘরে এসে ঢুকছি, শারদোবা এল পিছু পিছু। জানলার ধারে তাকে বসতে দিয়ে বললুম, সকালবেলা কী খেয়ে বেরিয়েছ?

যা খুশি খেয়েছি, আপনার শুনে কি হবে?

বললুম, মেজাজ তোমার খারাপ দেখছি। হয় না খেয়ে এসেছ, আর নয়ত স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বেরিয়েছ!

এবার শারদোবা হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, আমি যে বিয়েই করিনি এখনো। এখনো যে পড়াশুনো করি! হ্যাঁ, অনেক মেয়ে আছে, ষোল-সতেরো-আঠারোয় বিয়ে করে!

তোমার ত' তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয়েছে, এখনো আইবুড়ো কেন?

আবার শারদোবা হেসে উঠল,—ছি ছি, আপনার একটুও জ্ঞানগম্যি হয়নি। আমার বয়স সবে যে তেইশ, এখনো ইউনিভার্সিটি ছাড়িনি। আপনি কিনা এমনি অপমান করলেন আমার বয়স বাড়িয়ে? মেয়েদের বয়েস কমিয়ে বললে তবে না তারা খুশী হয়!

শারদোবার সঙ্গে গল্প করতে বসলুম। বার বার এ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ সালাপ করেছি, কিন্তু একান্তভাবে পাইনি। মেয়েটি উজবেক মুসলমান। রুশ মেয়ের মতো ফর্সা নয়,—এবং রৌদ্রময় দেশের গুণে দুই চোখে কালো কাজলের আভা আছে। আমার ধারণা, সাধারণ রুশ মেয়ে অপেক্ষা মধ্য এশিয়ার মেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী। এদিককার বহু সুন্দরী এবং বেণী-ঝোলানো সুললনাকে লীলায়িত লাবণ্যে চলে যেতে দেখলে চট ক'রে 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরকে মনে পড়ে যায়। শারদোবার বাবা মারা গেছেন গত বছর। ওরা পাঁচটি বোন, একটি ভাই। শারদোবা সেজ মেয়ে। দুটি বড় বোন এখন শ্বশুরবাড়ীতে। চতুর্থ ভগিনীটি ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরে ভাল চাকরি করে, এবং ১৬০০ শত রুবল মাইনে পায়। শারদোবা

মাইনেটা একটু বাড়িয়ে বলল কিনা জানিনে। বোধ হয় বলেনি। বড় ভাইটি বড় একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং তিনি ১৯০০ রুবল মাইনে পান। এ'রা কেউ আপিসে গোপনে উপরি রোজগার করেন কিনা জানতে চাইলুম, এবং তৎক্ষণাৎ শারদোরা আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল, আমি নাকি সোভিয়েট নাগরিকদের অসম্মান করবার জন্য এসেছি। সে যাই হোক, তাসকন্দে শারদোরাদের নিজেদের ভাল বাড়ী আছে, বাবার আমলে কেনা। মাকে নিয়ে তারা মোট নজন। মা আর বৌদিদি বাড়ীতেই থাকেন, এবং রান্নাবান্না করেন। বাড়ীতে ঝি-চাকর নেই। দাদার কিন্তু অনেক টাকা জমেছে ব্যাংকে, আমরা সবাই জানি!—শারদোরা হাসতে লাগল।

শারদোরার গায়ের সুন্দর ওভারকোটটির দিকে তাকিয়ে বললুম, তোমার খরচপত্র কে চালায়?

বাঃ আমি যে ছাত্রী! ইউনিভারসিটি থেকে যে ৩০০শ' রুবল মাইনে পাই!—শারদোরা বলল, শুধু আমি কেন, ইউনিভারসিটির সব ছেলেমেয়েই পায়। এ বছর আমার কিছু বাড়বে। বই কিনতে ত' আমাদের টাকা লাগে না! ওর থেকে কিছু ক্লাস-ফি কেটে নেয়, এই যা। চলুন না একদিন আমাদের বাড়ীতে। কেমন ছোট্ট বাগান আমি করেছি, দেখে আসবেন। 'পিলাও' খাওয়াব আপনাকে।

বললুম, তা যাব না। হঠাৎ একদিন তোমাদের খাবার সময় গিয়ে হাজির হব। দেখব, কেমন তোমরা শুকনো রুটি মসলার জলে ভিজিয়ে চিবোও!

শারদোরা বলল, কী যে বলেন আপনি,—যা মুখে আসে তাই। আপনার সন্দেহ জানি, মশাই। অত গরীব আমরা নই। বেশত', যেদিন যখন খুশি যাবেন, ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। আপনার বড্ড সন্দিগ্ধ মন!

হাসিমুখে বললুম, তোমাদের দৈনন্দিন বাজার হাট কে করেন?

কেন, মা-বৌদিদি, এ'রা আছেন ত? তবে বৌদিদির ঝক্কি আছে তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে। মা যান বাজারে, মাঝে মাঝে আমিও যাই। তাছাড়া দাদাও বাজার ক'রে আনেন মাঝে মাঝে। তবে তাঁর বাজার করার মানে বাড়ীতে মোচ্ছব! মা-বৌদি রাগারাগি করেন!

নাছোড়বান্দার মতো আবার প্রশ্ন করলুম, ভালো জিনিস না খেয়ে বুঝি তোমরা টাকা জমাও, শারদোরা?

মোটেই না।—শারদোরা চেঁচিয়ে উঠল, টাকা জমাবার কিছু দরকার নেই আমাদের। জমানোটা সখ। সখের জিনিসের জন্যে টাকা। কিন্তু ওই আপনার আবার সেই সন্দেহ! ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখে আসবেন বাড়ীতে! দুধ মাখন তরিতরকারি ফল পাকড় মাছ মাংস ডিম,—রোজ আমাদের আসে। কে না খায় এসব? ও, তাহলে এই সন্দেহের জন্যেই বুঝি আপনি আমাদের বাড়ী হঠাৎ গিয়ে পড়তে চান? আমার মুখ দেখে আপনার কি মনে হয় চিঁ চিঁ করছি,—স্বাস্থ্য খারাপ?

হাসিমুখে বললুম, শুধু মুখখানা দেখলে স্বাস্থ্যটা সঠিক বোঝা যায় না, শারদোরা?

চোখ পাকিয়ে হেসে রাগ ক'রে শারদোরা তখনকার মতো বিদায় নিল। ভয় দেখিয়ে গেল, উপযুক্ত জবাব সে পরে দেবে! কিন্তু দেয়নি, বরং যখনই সে এসে গল্প করেছে, কুশল প্রশ্ন করেছে সর্বাগ্রে।

ভোজন মানেই অতিভোজন। অনেকেই আমরা এর হাত এড়াতে পারিনি। প্রাতরাশের প্রথম খাদ্য হল এক গ্লাস শাদা দই,—সেটায় না চিনি, না নুন। নামে "কেফির"। তারপর আসে এক কাঁসি পোচ,—স্বাস্থ্যবতী মুরগীর ডিম তিনটি 'মাখন-তেল' অর্থাৎ ঘিয়ে ডোবানো। মাংসের চপ নিলে তিনটি। ছোট এক গামলা মটরশুঁটি ঘিয়ে ডোবানো। মাথা গুণতি আটখানা শাদা অথবা কালো পাঁউরুটির টোস্ট। তদুপযুক্ত মাখন ও চীজ। পেঁয়াজ, টমাটো, কাঁচা শশা বিচিত্রিতভাবে কাটা। কাঁকড়ার শাঁস কাঁচের পাত্রে মন্দিরের মত উঁচু করা, তার ওপর ক্রীম ঢালা। আরও অন্ততঃ চার পাঁচ দফা। ব্রেকফাস্টে কফি থাকে, চা'ও নিতে পার। আঙ্গুর আপেল ইত্যাদির কথা আর নাই বা তুললুম।

আমাদের দেশে আমরা খাই কম, ঘন ঘন খাওয়ার অভ্যাস কম, এবং খেতেও পাই কম। সুতরাং সোভিয়েট দেশের কোথাও তিনটে এবং কোথাও চারটে ভূরিভোজন আমাদের কাছে অতিভোজনের সামিল। এর মধ্যে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের আসর বসল আমাদের সেই 'দাচায়' অর্থাৎ বাগানবাড়ীতে। সোভিয়েট ইউনিয়নের তিন চারজন ব্যক্তি, চীনের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং ভারতীয়রা নীচের তলার সেই টেবলে খেতে বসলেন। সেখানে দেশী মদ, গরু, ভেড়া, মোরগ, হাঁস, মাছ, যাবতীয় ফলফলাদি এবং নানাবিধ রুচিকর সামগ্রীর অভাব ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে তারাশঙ্কর ছিলেন মধ্যমণি। আহারাদির মাঝখানে পরস্পরকে ধন্যবাদ এবং সৌজন্যপূর্ণ বক্তৃতাদি দেবার একটা রীতি চালু আছে। সুতরাং এক সময় তারাশঙ্করকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হল। ভোজসভায় বা এখানে-ওখানে-সেখানে তাঁকে যে যখন-তখন বক্তৃতা করতে হবে এবং রীতিনীতি আদব কায়দা ও লৌকিকতা রক্ষার দায়ে মাঝে মাঝে কিছু বলা দরকার,—এটি তাঁর পক্ষে কিছু কষ্টকর। তিনি স্পষ্টই বললেন, এসব তাঁর অভ্যাসও নেই। মাতৃভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষায় কিছু বলতে তিনি অসুবিধা বোধ করেন। সুতরাং এসব ব্যাপারে "আমার বন্ধু ডঃ মুলকরাজ আনন্দকেই অনুরোধ করছি, আমার হয়ে তিনি এখানে দু' একটি কথা বলুন। এ বিষয়ে তিনি আমার অপেক্ষা যোগ্যতর।"

তারাশংকর ব'সে পড়ে স্বস্তি এবং নিষ্কৃতি লাভ করলেন, এবং মুলকরাজ তৎক্ষণাৎ উঠে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন! একজনের অসামর্থ্যের পরিপূরকস্বরূপ ঘণ্টাখানেকের জন্য আরেকজন কাজ করলেন মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে শুনেছিলুম, মুলকরাজ নাকি ভারতীয় গ্রুপের ডেপুটি-লীডার ছিলেন! এটি সত্য নয়। ভারতীয়দের মুখপাত্র ছিলেন তারাশংকর, এবং তারাশংকরের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন মুলকরাজ! চৌহান এবং যশপাল এ নিয়ে কৌতুক আরম্ভ করেছিলেন। রাণী লক্ষ্মীকুমারীর মতো শান্তস্বভাব মহিলা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমি 'কিন্তু তারাশংকরের কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি। অথচ দেখতুম তাঁর স্বাভাবিক শালীনতা, সত্যবোধ এবং অকপট স্বীকারোক্তি নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে বক্রোক্তি করতেন। বিদেশে গিয়ে ভারতীয় দলের আগাগোড়া এই ব্যাপারটা ঠিক স্বাস্থ্যকর মনে হয়নি। দলপতির প্রতি যথাযোগ্য আনুগত্য ও অনুরাগ না থাকলে সে-দলের সঙ্গে যাওয়াই সঙ্গত নয়। সে যাই হোক, এর পর থেকে ডেপুটি-লীডারের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের যুগ এল! তিনি করিৎকর্মা লোক। তিনি জানতেন কোন্ কোন্ মহলে আনাগোনা ক'রে তথাকথিত 'অসুস্থ অতএব অপটু' তারাশংকরকে পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়! ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ এগারোবার সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সোসালিস্ট দেশে বিচরণ করেছেন। ভারতবর্ষের লোক আজও জানল না, তিনি কি লেখেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত উপার্জনাদি সবই সোসালিস্ট দেশে! আমার প্রতি তিনি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, এবং আমি নিঃশব্দে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতুম।

(ক্রমশঃ)

শিশু গ্রন্থাগার

বিমল রায়চৌধুরী

ছাত্রদুর্নীতি আমাদের দেশের একটা পোষাকী সমস্যা। শিক্ষাজগতে কোথাও একটা গোলমাল হলেই এই পুরোনো পোষাকটিকে ঝেড়ে-ঝুড়ে বের করে জনসমক্ষে মেলে ধরা হয়। আভ্যন্তরীণ গোলযোগকে ধামা চাপা দেয়ার জন্যে এটা বোধহয় শিক্ষাব্রতীদের রঙের টেক্কা। ছেলেরা লেখাপড়া করে না—এই আপ্তবাক্যটি বলার আগে বক্তা যদি ভেবে দেখতেন বই-পড়ার স্বভাব ছেলেদের মধ্যে প্রথিত করার জন্যে কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন শিশুপোষক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, এ যাবৎ কাল, তাহলে বক্তাকে মন্তব্যটি বদলে ফেলে ভাবতে হত—ছেলেরা লেখাপড়া কেন করবে। বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপে আজকের পৃথিবী যখন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে তখন স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, আমাদের ছেলেরা পৃথিবীর নৈকট্যকে ছুঁতে পারবে। কারণ কাগজ যখন আবিষ্কৃত হয়েছে, মুদ্রণ-প্রক্রিয়াও যখন আমাদের অজানা নয়, তখন পুস্তক প্রকাশিত হতে কোনো বাধা নেই। এই বইয়ের জানালায় চোখ রাখলেই পৃথিবীর অচেনা মুখ আলোয় পরিষ্কার হয়ে আসে শিশুদের চোখে। কিন্তু শিশুরা বই পাবে কোত্থেকে? মধ্যবিত্ত সংসারের শিশুরা পাঠ্যপুস্তকের বিবর্ণ কুয়াশা কাটিয়ে ঝলমলে বইয়ের আলো খুব কম দ্যাখে। সুতরাং অচেনাকে চেনাবার জানালা আমরা আজো ছেলেমেয়েদের সামনে বন্ধ রেখেছি এবং বাংলাদেশে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত শিশু গ্রন্থাগারটি বাদে আরেকটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু গ্রন্থাগার খুলিনি। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারটিও খোলা হয়েছে এই সেদিন মাত্র। অবশ্য আমাদের দেশে যেখানে বয়স্কদের জন্যেই সাধারণ মানের গ্রন্থাগারের স্বল্পতা একটা বিরাট লজ্জার কারণ সেখানে শিশু গ্রন্থাগারের প্রস্তাবে কিছু কৌতুক জমতে পারে মনে হয়। তবু এ তথ্যটা ভাবতে আরো খারাপ লাগে যে সমগ্র ভারতবর্ষেই, মাদ্রাজে, বোম্বেতে এবং মহীশূরে, এই তিনটে শহরেই কেবলমাত্র শিশুদের জন্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার আছে। এবং সরকারী পাঠাগার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশু গ্রন্থাগার আছে মাত্র চারটি। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর সঙ্গে, বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সঙ্গে, আমেদাবাদ সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সঙ্গে এবং কলকাতায় আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শিশু গ্রন্থাগারের সভাসংখ্যা সাতশ মাত্র। অথচ সারা পশ্চিমবঙ্গের কথা ছেড়েই দিন, এই কলকাতাতেই শিশুর সংখ্যা কম নেই নিতান্ত। ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে ছোট ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ অসীম। বেবী ট্যাক্সী, স্মল কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ, বেবী কার, হাউজ লোন ফর স্মল ইনকাম গ্রুপ ইত্যাদি নানা সরকারী বেসরকারী পরিকল্পনায় আপনি 'স্মল' অথবা 'বেবী' কথাটির সন্ধান পাবেন কিন্তু 'লাইব্রেরী ফর দি স্মলস' অর্থাৎ চিলড্রেনস্ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় আলসাটা লক্ষ্য করার মতন। লাইব্রেরী এ্যাডভাইজরী কমিটির রিপোর্ট লাল ফিতের দোলনায় ঘুমোচ্ছে আজো। একটি বলিষ্ঠ শিশু গ্রন্থাগার আন্দোলন আমাদের দেশে আরম্ভ যে কবে হবে তা ভগবানও বলতে পারেন কিনা সন্দেহ।

'শিশু গ্রন্থাগার' কথাটা শুনলেই মনে হতে পারে যে কয়েকটি আলমারীয়ালা ঘর, কিছু বইয়ের জঙ্গল এবং চাকরীগত-প্রাণ জনৈক গ্রন্থাগারিক। কিন্তু আধুনিক অর্থে শিশু গ্রন্থাগার শুধুমাত্র পুস্তক আদান প্রদানের কেন্দ্র নয়। শিশু মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করার সমস্ত রকম উপকরণ ও পরিবেশ থাকা চাই তার। সুতরাং কিছু শিশুপাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করে, পাড়ার অনিচ্ছুক কাউন্সিলারকে প্রেসিডেন্ট করে তারপর চাঁদার খাতা বাড়িয়ে ঠিক শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মহীশূরের শিশু গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠায় রোটারীয়ানদের কর্মপ্রচেষ্টা একটি বে-সরকারী প্রচেষ্টা হিসেবে অনুকরণীয়। শিশুদের জন্যে যে গ্রন্থাগারটি হবে তার মূল পরিকল্পনা, গ্রন্থাগার-গৃহ, কক্ষসজ্জা এবং গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা স্বভাবতঃই বয়স্কদের পাঠাগারের থেকে ভিন্ন হবে। গ্রন্থাগারটি একটি গম্ভীর পাঠশালা না হয়ে হবে কলহাস্যের আনন্দনিকেতন। শিশুদের মানসিক প্রবণতাই হবে পুস্তক নির্বাচন, পরিবেশ গঠনের একমাত্র মাপকাঠি। শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম খুঁটিনাটিও গভীর মনোযোগের বিষয়। কিছু উদাহরণ দিলেই বক্তব্যটি বিশদ হতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক গ্রন্থাগার-গৃহটির কথা। যেখানে সেখানে একটি বাড়ি সহজলভ্য হলেই শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। শিশুরা সাধারণতঃ বাড়ি থেকে বেশী দূরে যেতে পারে না। শহরের কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হলে ও গাড়ি ঘোড়া ডিঙিয়ে শিশুদের পক্ষে সব সময়ে গ্রন্থাগারে যাওয়া সম্ভব না। সুতরাং গ্রন্থাগারটি আঞ্চলিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন শহরের প্রতি আধ মাইল ব্যাসার্ধে একটি করে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে শহরের অধিকাংশ শিশুর পক্ষেই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করা সম্ভব। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শিশু গ্রন্থাগারটি দূরধিগম্যতার দরুণ কলকাতার অধিকাংশ শিশুরই নাগালের বাইরে। গ্রন্থাগার-গৃহটিও হবে বিশেষ ধরণের। সাধারণ পাঠাগারের একটি অবহেলিত কোণে কিংবা বিরাট সরকারী গ্রন্থাগারের 'সবার নীচে সবার পিছে' (ন্যাশনাল লাইব্রেরীর একতলার কোণের শিশু-গ্রন্থাগারটি আগে সম্ভবতঃ স্ট্যাক রুম ছিল) আলো হাওয়ার অভাব উপেক্ষা করে শিশু গ্রন্থাগারের কল্পনা উচিত নয় মোটেই। আলো হাওয়া হবে অবারিত। কক্ষটিতে যাবার বা আসবার পথে খুব বেশী সিঁড়ি থাকবে না কোথাও যাতে পড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি শিশু গ্রন্থাগারেই একটি ছোট হলঘর থাকবে যেখানে মধ্যে মধ্যে গল্পের আসর, চিত্রকলা প্রদর্শনী অথবা শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শন চলতে পারে। কক্ষসজ্জা হবে ঝলমলে। গ্রন্থাগারটি যদি শহরে হয় তবে গ্রাম্য দৃশ্যাদির ছবি দিয়ে সাজানো যেতে পারে ঘরটি। গ্রামে হলে, শহরের দৃশ্যগুলি শিশুদের আকৃষ্ট করবে। নানা রকম জীবজন্তুর মডেল দিয়েও সাজানো যায় গ্রন্থাগার। শিশু গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র স্বভাবতঃই আকারে ছোট হবে (উচ্চতায় ২৫½ ইঞ্চি) এবং তাতে কোনো কোণ বেরিয়ে থাকবে না যাতে আঘাতের সম্ভাবনা থাকে। শিশুরা বয়স্কদের মত গম্ভীর হয়ে এক জায়গায় বসে পড়ে না। মত একটি বইও তারা একত্রে কল্লোলে পড়তে ভালবাসে। কোণের ছেলেটি যেই পাতা উল্টে একটি মজার ছবি দেখল, অমনি সে ছুটবে অপর কোণায়, তার বন্ধুকে তার আবিষ্কারের ' গোপন, বার্তাটি পৌঁছে দিতে—ফলে কিছু চেয়ার হয়ত উল্টোবে, কিন্তু আসবাবপত্র হাল্কা

বেতের হলে আঘাত লাগবে না। গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন হবে সহজ এবং সাধারণ। গ্রন্থাগারটি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়েসের ছেলে-মেয়েদের জন্যে, অতএব নিয়মের বাঁধন কঠিন হলে পাঠাগারটিকে তারা ভয়ই করতে শিখবে। গ্রন্থাগারটি খোলার এবং বন্ধ হওয়ার সময়টিও সুনির্ধারিত হওয়া উচিত। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শিশু শাখাটি খোলে তিনটার সময়, বন্ধ হয় সাতটায়। ফলে স্কুলগামী ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছে থাকলেও এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার বেশী গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পারে না। খেলাধুলো করার সময়, স্কুলের সময়, ছুটির দিন ইত্যাদি হিসেবের মধ্যে এনেই শিশু গ্রন্থাগারের কার্যনির্ঘণ্ট স্থির করতে হবে।

শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতার ওপরেই পাঠাগারের সাফল্য নির্ভর করে। বয়স্কদের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অতটা প্রধান নয়। আমেরিকায় সাধারণতঃ শিশু গ্রন্থাগারিকের বেতন অপেক্ষাকৃত বেশী হয়ে থাকে। এবং মেয়েরাই ওখানে ছোটদের গ্রন্থাগারিকের পদে বিবেচিত হন বেশীর ভাগ। আমাদের দেশেও কিণ্ডারগার্টেনগুলি চালিত হয় মেয়েদের দ্বারা, কারণ সহজাতভাবে মহিলারাই শিশু সংস্কারে অধিক অভ্যস্ত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা থাকা চাই গ্রন্থাগারিকের। প্রায়ই তাঁকে গল্প বলতে হতে পারে, ছবি এঁকে কিছু বোঝাতে হতে পারে, এমনকি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গানও গাইতে হতে পারে। অতএব এই ধরণের কিছু কিছু যোগ্যতা শিশুদের গ্রন্থাগারিকের থাকা একান্তই আবশ্যক। তাঁকে লাইব্রেরী-বিশেষজ্ঞ ত হতেই হবে, উপরন্তু শিশু-মনস্তত্ত্বে কিছু আসক্তি থাকা চাই তাঁর। কাজেই মনে হয়, মণ্টেসারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত মহিলারা যদি লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়েন তবে শিশুদের আদর্শ গ্রন্থাগারিক হতে পারেন।

গ্রন্থাগারের মূল উপকরণ অবশ্যই গ্রন্থ। উপযুক্ত পরিমাণে ছেলেমেয়েদের বই আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় না। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শিশু-বিভাগে গ্রন্থ-সংখ্যা মাত্র ৮০০০। তার মধ্যে বাংলা বই মাত্র ১০০০। সরকারী উদ্যোগ ছাড়া শিশু-সাহিত্যের প্রকাশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের ব্যাপারে যেমন সম্প্রতি "ওয়েস্ট বেঙ্গল চিলড্রেন্স্ ফিল্ম সোসাইটি" গঠিত হয়েছে তেমনি সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় "চিলড্রেন্স্ বুক সোসাইটি" গঠন করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়লে আমাদের দেশের প্রকাশকরাও ছোটদের বই প্রকাশে উৎসাহী হবেন। শিশু-সাহিত্য প্রকাশে উৎসাহ দানের জন্যে লাইব্রেরী এ্যাডভাইজরী কমিটি সুপারিশ করেছেন প্রকাশকদের বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের জন্যে। সম্প্রতি 'মৌচাক' পত্রিকার তরফ থেকে বাংলাদেশে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে। তাতে উপকারও হবে মনে হয়। কিন্তু সে পুরস্কার পান শিশু-সাহিত্য রচয়িতা, প্রকাশকরা আজও অপুরস্কৃত রয়ে গেছেন।

কলিকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' ভবনে প্রতিষ্ঠিত শিশু পাঠাগার

শিশুদের জন্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের (Book mobile) প্রচলন পশ্চিমবঙ্গে অচেনা হলেও বম্বেতে চার বছর আগেই শুরু হয়েছে। বম্বের "স্টেট উওম্যান কাউন্সেলের" উদ্যোগে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সাল থেকে একটি চলমান শিশু গ্রন্থাগার চালু করা হয়। বম্বে সরকার প্রদত্ত একটা মোটর-সাইকেল-ভ্যানে একজন গ্রন্থাগারিক ২০০০ বই নিয়ে প্রাথমিকভাবে দশটি গ্রামে মাসে তিনদিন করে যান। ভ্যান আসার তিনটে দিনের জন্যে শিশুদের উত্তেজিত আগ্রহ পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের মধ্যেও অনায়াসে সঞ্চারিত হতে পারত যদি ঐ ধরণের কোনো পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিতে পারতেন। শিশু গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাংলা দেশের অনগ্রসরতা বাস্তবিকই একটা বিস্ময়ের বিষয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত এ্যাডভাইজরী কমিটির রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মোট ৮৫টি শিশু গ্রন্থাগার ছিল ভারতবর্ষে। তার মধ্যে মহিশূরে ছিল ৫৩টি, বিহারে ১৭টি, মাদ্রাজে এবং রাজস্থানে ৬টি করে এবং পশ্চিমবঙ্গে একটিও নয়! কিন্তু কলকাতায় অন্তত শিশু গ্রন্থাগারের অভাব হত না, যদি করপোরেশনের পৌর-পিতারা প্রকৃত 'পিতৃত্বের' দায়িত্বে উপনীত হতে পারতেন। কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়। এই সমস্ত স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছন্দেই একেকটি শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায়। গ্রন্থাগার-গৃহের কোনো সমস্যাই ছিল না তাতে এবং স্কুলগুলো সারা কলকাতাময় ছড়িয়ে থাকতে শহরের প্রতিটি অঞ্চলের শিশুরাই গ্রন্থাগার-গুলো অনায়াসে ব্যবহার করতে পারত। অবশ্য পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিজেদেরই যখন কোনো লাইব্রেরী নেই সেখানে পরহিতার্থে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব প্রগল্ভতার নামান্তর মাত্র একথা সবিনয়ে স্বীকার করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিভাগীয় দপ্তরের নাম "ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন", সংক্ষেপে D. P. I. অর্থাৎ জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দপ্তর। এঁদের প্রমথ চৌধুরী স্মরণ করতে অনুরোধ করি :

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত।...আমি লাইব্রেরীকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে......।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি দেওয়ার কারণ এই না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার D. P. I'র দপ্তর বন্ধ করে "ডাইরেক্টরেট অফ সেল্ফ ইনস্ট্রাকশন" খুলুন। আমার প্রস্তাব "ডাইরেক্টরেট অফ লাইব্রেরী সারভিস" খোলা হোক।

‘মন্দিরে মন্দিরে’

তীর্থঙ্কর

॥ জটেশ্বরনাথ ॥

পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে পায়ে-হাঁটা পথ। বেশ কয়েক মাইল পথ। তারপর মহানাদ। গ্রামের লোক বলে মানাদ। অতি প্রাচীন স্থান। এই নাথ-ধর্মের মহা-কেন্দ্র মহানাদ।

লোকের বিশ্বাস এখনো মাঝ রাতে শুনতে পাওয়া যায় মহাশঙ্খনাদ। নাথ-যোগীরা যাকে বলেন, নাদ-ব্রহ্ম। মানুষের সাধনা হল ওই নাদ-ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়া। নাদের ওপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। নাদের জ্ঞান না হলে জগৎ জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা হয় না। নাথ-যোগীরা জোর দিয়েছেন মন্ত্র-সাধনার ওপর। চিত্তকে মন্ত্রের সাহায্যে নাদ-ব্রহ্মে লীন করতে হয়। সাধনার প্রথম স্তরে প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে আসে। প্রাণবায়ু সুস্থির হলে ঘন্টা বাঁশি বীণা শোনা যায়। তারপর আসে সমাধি।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একদিন নাথ-ধর্মের আন্দোলন। রাজা চন্দ্রকেতু নির্মাণ করে-ছিলেন এই মন্দির।

রাজা চন্দ্রকেতু কে ছিলেন এবং কবে রাজত্ব করেছেন তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আজ থেকে প্রায় ন'শ বছর আগে তিনি রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জটেশ্বরনাথের মন্দির। কিন্তু চন্দ্রকেতুর কীর্তি আর নেই। মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সব। মুসলমান আক্রমণ হয় প্রায় তিন শ' বছর আগে। দিল্লীর বাদশা তখন ফিরোজ শা'।

পাণ্ডুয়া তখন ছিল হিন্দু-প্রধান। হিন্দু-প্রাধান্য থাক বা না থাক গোহত্যা ছিল নিষিদ্ধ। একটি মুসলমান পরিবারে এক বালকের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছিল। উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে গোহত্যা করতে হয়েছিল। হিন্দুরা হত্যা করেছিল সেই বালককে। প্রতিকার চাইতে মুসলমানেরা গিয়েছিল দিল্লীর দরবারে। ফিরোজ শা তার ভাইপো শাহ সুফীকে পাঠিয়েছিল পাণ্ডুয়ায়। যুদ্ধ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানে পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে কিছু দূরে। কিন্তু পেরে ওঠেনি শাহ সুফী। মহানাদের জীয়ৎকুম্ভের অলৌকিক প্রভাবে মৃত হিন্দুরা আবার জীয়ন্ত হয়ে উঠত। দৈবশক্তির কথা কানে গিয়ে-ছিল শাহ সুফীর। গোমাংস ফেলে নষ্ট করা হয়েছিল দৈব প্রভাব। তারপর সম্পন্ন হয়েছিল মুসলমান বিজয়। অবশ্য এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা তর্কাতীত নয়। অনেকে এই ধারণাও পোষণ করেন যে, সে সময় পাণ্ডুয়ার রাজা আর মহানাদের রাজা ছিলেন একই ব্যক্তি। সেই আক্রোশে মুসলমানেরা ধ্বংস করেছে মহানাদের হিন্দু-কীর্তি। কিন্তু জটেশ্বরনাথের দানপত্র থেকে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় তেরো কিংবা চৌদ্দ শতকের দিকে।

মন্দিরের চারপাশে নাথ-যোগীরা বাস করতেন এককালে। এখন মন্দিরের মোহন্তরা যোগীরাজ বলে খ্যাত। এরা কানফা নাথপন্থী ও হঠযোগী। বাংলার শৈব ও তান্ত্রিকদের অন্যতম প্রধান সাধন-ক্ষেত্র মহানাদের নাম হয়েছে নাথ-যোগীদের নাদতত্ত্ব থেকে।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের অধীনে আরও দুটি নাথপন্থী মঠ ছিল। একটা ২৪ পরগণার রাজারহাট থানার অধীন গোরক্ষনাথের মঠ অন্যটি পাঁশকুড়ার সিদ্ধিনাথ শিবঠাকুরের মন্দির। এখন আর তারা মহানাদের জটেশ্বরনাথের অধীন নয়। এই নিয়ে মামলা হয়ে গেছে। মোহন্ত নির্বাচন সমস্যাও অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। এখন বারোপন্থী নাথগণ মোহন্ত নির্বাচন করে থাকেন।

নাথপন্থীরা বারো ভাগে বিভক্ত। তাদের নাম হচ্ছে, কপালানী পন্থী, সত্যনাথ পন্থী, রাওকে পন্থী, ধ্বজ পন্থী, দরিয়ানাথি পন্থী, বৈরাগ পন্থী, নটেশ্বরী পন্থী, আই পন্থী, গঙ্গা পন্থী, রাম পন্থী, ধরমনাথি পন্থী ও কান্থাড় পন্থী। অবশ্য এই বারো পন্থীর যুক্ত আবেদনের সময় দেখা গেল যে তারা এগারো পন্থী। একটি শাখার কোন অস্তিত্ব নেই। এরাই হলেন বারো-পন্থী নাথ।

মোহন্ত-নিযুক্তি-পত্রে লেখা আছেঃ "মহানাদে আমাদের বারোপন্থীগণের যে মঠ আছে উক্ত মঠ ও সম্পত্তি পরিচালনার জন্য আমরা তোমাকে মোহন্ত পদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি দেবতার পূজা ও নিয়মিত সাধুসেবা করিয়া হঠযোগ করিতে থাকিবে। তুমি অন্যায় বা অনাচার করিলে আমরা তোমাকে গদি-চ্যুত করিয়া অন্য মোহন্ত নিযুক্ত করিতে পারিব।" মহানাদের মোহন্ত সেবানাথ ও তাঁর শিষ্য মনোহরনাথ মোহন্ত-পদের জন্য কোর্টের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর থেকে নাথদের সই-সম্বলিত এই নিযুক্তি-পত্রের প্রচলন হয়। এই নিযুক্তি-পত্রে খুসিনাথ ও সমরনাথের সই দেখতে পাওয়া যায়।

এই আইনের পথ ছাড়া আছে লোকাচারের পথ। জটেশ্বরনাথের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য প্রমাণ হয় তাতে। এই পথটিও খুব প্রাচীন। শিব চতুর্দশীর দিন স্থানীয় রাজা বা জমিদারের নামে ভৈরবনাথের পূজা হয়। মহাধুমধাম হয় সেই পূজায়। পূজার পর পূজক মোহন্তের গলায় ফুলের মালা ও কপালে চন্দন লেপে দেন। পূজার সময় ছাগল বলি হয়। বলির রক্ত দিয়ে ফোঁটা দিয়ে "রাজটিকা" এঁকে দেওয়া হয় মোহন্তের কপালে। পরে তাঁকে সাতবার ভৈরবনাথের বেদী প্রদক্ষিণ করিয়ে রাজা নিজে কিংবা তাঁর প্রতিনিধি "যোগীরাজের" হাত ধরে নিয়ে যান জটেশ্বরনাথের মন্দিরে। তাঁকে বসানো হয় উঁচু বেদীতে। এই হচ্ছে লৌকিক প্রথা।

যতদূর বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, হরকনাথই প্রথম যোগী-রাজ। আগে যোগীরাজ হবার দিন মাথায় রেশমী সুতোর কালো রাজোচিত উষ্ণীষ পরতে হত। কিন্তু সেবানাথ মারা যাবার পর থেকে সেই উষ্ণীষ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী যোগী-

রাজরা গেরুয়া পাগড়ি পরেন। মোহন্তরা কৌপিনধারী। মাথা ন্যাড়া। দাড়ি-গোঁফ রাখতে নেই। কানে তাঁদের কুন্ডল, কপালে ভস্ম-ত্রিপুন্ড্র, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা।

বিরাট মন্দির জটেশ্বরনাথের। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। সামনে নাট-বাংলা। চারদিক প্রদক্ষিণের পর ছাদ। মাঝখানে খুব উঁচু একটি চূড়া। মন্দিরের সামনের জায়গার নাম জাত-তলা। প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকে বেদীর মধ্যে আছে চারকোনা লোহদন্ড। ইনি মহাকাল বা কালভৈরব। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের মধ্যে মহাকাল পূজিত দেবতা। একাধিক মহাকালের ধ্যান আছে সাধনমালায়। তাঁর পূজো হয় তান্ত্রিক মারণ পদ্ধতিতে। তিনি শত্রু দমন করেন। মহানাদে এই কালভৈরব লোহদণ্ডে বিরাজিত।

এর উত্তরে নিমগাছ। তলায় বেদী। সেখানে আছে বটুক ভৈরবের মূর্তি। শিবপুরাণে ভৈরবকে শঙ্করের পূর্ণরূপে বলে কল্পনা করা হয়েছে। ভৈরবের মূর্তি ভীষণ। হাতে তার খট্টাঙ্গ, পাশ, শূল, ডমরু ও সাপ। এই ভীষণ মূর্তিকে সাধনায় ধারণ করতে হয়। মায়ায় আচ্ছন্ন তারা সহ্য করতে পারে না শিবের এই প্রলয়ংকর রূপ। মহানাদে আছেন একাধিক ভৈরব। এই বেদীর দক্ষিণ দিকে মকর মূর্তি। মূর্তিটি প্রায় তিন ফিট লম্বা। শুঁড়ের দিকটা ভেঙে গেছে। তার পাশে একপাদ ভৈরব মূর্তি। তার পিছনে বটগাছ। তার তলায় দুখণ্ড পাথর। একটার ওপর আছে চারটি পদচিহ্ন। এখানে কালী পূজো হয়। ভৈরবনাথের উত্তরদিকে বেদীর ওপর খিলান। সেখানে হর-গৌরী মূর্তি। নাথ-সিদ্ধেরা শিবের সঙ্গে শক্তিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। শিবকে পেতে হলে শক্তির প্রয়োজন। শিবের শক্তি মানবদেহে কুলকুন্ডলিনীরূপে বিরাজমান। মহানাদে তাই হয় শিব ও শক্তির আরাধনা। তার উত্তরে বেলগাছের তলায় বিষ্ণু, শীতলা ও মনসার মূর্তি। বিষ্ণুর হাতে গদা-পদ্ম। মূর্তির নাকের দিকটা ভাঙা। মনসা মূর্তিও অক্ষত নয়। জটেশ্বর-নাথের মন্দিরের পূব দিকে উত্তরদ্বারী অন্নপূর্ণা মন্দির। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বশিষ্টদেবের অন্নপূর্ণা মন্দির ছিল জীয়ৎকুন্ডের পূব দিকে। মুসলমানেরা সেই মন্দির ভেঙে দেয়। অন্নপূর্ণা মন্দিরের উত্তর দিকে শিব-লিঙ্গ। ডান দিকে শিবমন্দির। জটেশ্বর-নাথের মন্দিরের মধ্যে বহু শালগ্রাম শিলা। জটেশ্বরনাথের মন্দিরের মূর্তি-গুলি খুব প্রাচীন বলে মূল্যবান নয়। **এই সব মূর্তি তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যা** কিংবা অষ্টাদশ মহাবিদ্যার কোন না কোন একটির অন্তর্গত। সচরাচর এই সব মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না বলেই এর মূল্য অনেক বেশী।

অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে মন্দিরের প্রাচীনত্ব বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ বহু সংস্কার হয়ে গেছে। তাই স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিলীয়মান। যোগীরাজ নাথুনাথের সময় মন্দিরটি পুনর্গঠিত হয়। যোগীরাজ খুসিনাথের সময় মন্দিরের প্রদক্ষিণ পুনর্নির্মিত হয় এবং মন্দিরটিও সংস্কার করা হয়। পূব দিকের মন্দিরের গায় খুসিনাথের নাম লেখা আছে। এই সময় লোহার কড়ি এবং বিলাতী টালি ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এই সব সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে জটেশ্বরনাথ ধরে আছে বাংলার অধুনালুপ্ত নাথধর্মের নীরব স্বাক্ষর।

সঙ্গীত বীক্ষণ

আনন্দভৈরব

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর কানাডা সফর

কানাডা আর্ট কাউন্সিলের আমন্ত্রণে লব্ধযশা স্বরোদ-শিল্পী আলি আকবর খাঁ গত আগস্ট মাসে কানাডায় যান। তিনি মন্টরিয়েল, লিনক্স, শারব্রুক ও ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত উৎসবে এবং অন্যান্য স্থানে স্বরোদে ভারতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। সংগীতজ্ঞ, সংগীত-অধ্যাপক, সংগীত-শিক্ষার্থী সকলেই তাঁর বাজনা বিশেষ-ভাবে সমাদর ও উপভোগ করেছেন।

সুর, ছন্দ, লয় সংগীতের এই মৌলিক তত্ত্ব বা উপাদানগুলি সর্বদেশের সর্বকালের সংগীতে উপস্থিত থাকলেও প্রয়োগ-পদ্ধতির ভিন্নতার জন্য এই উপাদানগুলি দ্বারা গঠিত সুরের নক্সা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রয়োগ-পদ্ধতির তত্ত্ব গ্রহণ-যোগ্য ভাবে জানা না থাকলে এক দেশের সংগীত আর এক দেশবাসীর নিকটে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। এক সময়ে ভারতীয় সংগীতের রস পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের অনাস্বাদিত ছিল। সুখের বিষয় বর্তমান কালে আমাদের দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পীর পাশ্চাত্য দেশে সংগীত পরিবেশনের ফলে তার বাধা কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। সেদিক থেকে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর কানাডা সফর, বিশেষ করে মন্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তিন সপ্তাহাধিক কাল অবস্থিতি, বক্তৃতা ও শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে। গত ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসম্বন্ধে বিস্তারিত জানা গেল।

মন্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের 'সামার স্কুলে' ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, ডক্টর রসেটি বেনশ'র সহ-যোগিতায় তিন সপ্তাহব্যাপী প্রাত্যহিক 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ললিত-কলা' পর্যায়ের আলোচনায় ও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি স্বরোদ-বাদনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য সংগীত পিপাসু শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন — তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র। ভারতীয় সংগীতের দ্বাবিংশ শ্রুতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ পাশ্চাত্যের সংগীত-রসিকদের নিকটে সাধারণতঃ দুর্বোধ্য প্রতীয়মান হয়। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লিখিত ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা বিবরণও এই দুর্বোধ্যতার কারণ। ওস্তাদ আলি আকবর প্রথমে বিলাবল রাগের সা রে গা মা পা ধা নি —শুদ্ধ স্বরসপ্তকের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ডো, রে, মি, ফা সল, লা, সি—মেজর স্কেলের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তারপর আরোহ, অবরোহ, বাদী, সম্বাদী ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতায় বিলা-বলের শুদ্ধ স্বরসমষ্টি নিয়ে যে বহু রাগের সৃষ্টি হয়, তার দৃষ্টান্ত দেন। ক্রমশঃ তিনি মাইনর স্কেলের তুলনায় আসাবরী রাগ এবং বিভিন্ন রাগে বিশেষ বিশেষ শ্রুতির প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য স্বরোদ-বাদনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ায় শিক্ষার্থি-গণের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য ও স্মরণ-যোগ্য হয় এবং ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিদেশে এরূপ গঠনমূলক কাজের বিশেষ তাৎপর্য ও উপযোগিতা আছে। তাতে ললিতকলার ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠবে। আমরা আশা করব ওস্তাদ খাঁ এবং ভারতের অন্যান্য কৃতী শিল্পিগণ ভবিষ্যতেও এরূপ শিক্ষামূলক সংগীত-কার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেইদিনগুলো নির্মলার চোখের উপর ভাসছে। কী পরিশ্রমটাই না করতে হত নরেনকে! ভোরে উঠেই মাঠে বেরিয়ে যাওয়া, তেতে-পুড়ে ফিরে এসেই স্নান সেরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে দু মাইল পথ ভেঙে ইস্কুলে ছোটা, বিকাল বেলা নামমাত্র বিশ্রাম করে বই নিয়ে বসা। ঘুমকাতুরে মানুষ, রাত জাগতে পারত না, তবু এগারটার আগে কোনোদিন পড়া ছেড়ে উঠত না। পল্লী-গ্রামে তখন নিশুতি রাত।

নির্মলাও জেগে বসে থাকত স্বামীর সঙ্গে। কোনো কোনোদিন নরেন বলত, তুমি শুয়ে পড়গে। মিছিমিছি রাত জেগে কী লাভ?

—যাচ্ছি, তুমি যা করছিলে করনা?

নরেন হেসে বলত, ভয় নেই, আমি ঘুমবো না।

—বিশ্বাস কি? যা ফাঁকিবাজ।

ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে একটি চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠত নির্মলার চোখে মুখে। নরেন তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সে চোখের ভাষা নির্মলার কাছে অস্পষ্ট ছিল না। মাত্র কয়েক হাত দূরে ঐ যে বলিষ্ঠ হাতখানা একটা পেন্সিল নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে এই মুহূর্তে সে কী চায়, কোন্ বিশেষ বাসনার দুর্দম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে তার প্রতিটি শিরায়, তাও সে তীব্রভাবে অনুভব করত। তারও কি ইচ্ছা হত না, ছুটে গিয়ে ঐ উন্মুখ বাহুর নিবিড় বেষ্টনে ধরা দেয়? ধরা দেবারই তো বয়স তখন। কিন্তু কঠোর সংযমের দৃঢ় বন্ধন সে কিছুতেই শিথিল হতে দিত না। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস চেপে উঠে চলে যেত। নিঃসঙ্গ শয্যায় ছটফট করে কেটে যেত দীর্ঘ প্রহর। তারপর কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই কোনো কোনো দিন দেখত বিছানার আর একটা ধার যেমন ছিল তেমনি নিটোল রয়ে গেছে, বালিশে কারো মাথার চিহ্ন পড়েনি। ছুটে যেত পাশের ঘরে। পড়ার মাদুরে হাতের উপর মাথা রেখে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন স্বামী। পাশে বসে কাঁধের উপর হাত রাখতেই চমকে উঠে অতৃপ্ত নিদ্রাকাতর রক্তাভ চক্ষু মেলে বলতেন, সকাল হয়ে গেছে?

ছেলের এই নতুন করে ছাত্র-জীবন শুরু করা মা প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেননি। দেখবার কথাও নয়। বৌ-এর তাড়নাই যে এর মূলে কাজ করছে, তাও তিনি জানতেন। মাঝে মাঝে ছেলেকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সে হাঁ না বলে এড়িয়ে গেছে। তখন বৌকে ডেকে বলতে শুরু করলেন, এসব কী পাগলামো হচ্ছে, বৌমা? ছেলেটার দিকে যে তাকানো যায় না। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, চোখ বসে গেছে। একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসলে, তখন?

নির্মলা মাথা নিচু করে শুনত, জবাব দিত না। আরও কড়া নজর দিত স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার দিকে। ঘরের গোরুর দুধ। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল গাভিন হয়েছে গাইটা। একবেলা করে দুইতে হয়। যা পাওয়া যায় সকলের পাতে দেওয়া চলে না। নিজে সে দুধ খেত না। শ্বাশুড়ী বিধবা মানুষ, তার উপরে অসুস্থ। তাঁর বরাদ্দটুকু বজায় রাখতে হবে। ও পাড়ায় একটি বাউরী-দের মেয়ে দুধ বিক্রি করত। কিনতে গেলে ওঁরা বাধা দেবেন আর দুধ কিনবার মত বাড়তি পয়সাও নেই। মেয়েটিকে গোপনে ডাকিয়ে এনে বাবার দেওয়া এক জোড়া কাপড় খয়রাত দিয়ে তার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হল যে, এখন সে রোজ এক পোয়া করে দুধ যুগিয়ে যাবে এবং এদের গোরু যখন বাচ্চা দেবে তখন ঠিক ঐ ভাবেই সেটা শোধ করা হবে। ঐ দুধটুকু থেকে কখনো দই কখনো ছানা করে সে স্বামীর বিকালের জলখাবারের সঙ্গে ধরে দিত। নরেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো প্রশ্ন করত না। লাভ নেই বলেই বোধহয় করত না। নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।

পাড়াগাঁয়ে এক বাড়ির খবর দশ বাড়ি ছড়িয়ে পড়তে দশ মিনিটও লাগে না। নরেন যে অনেক রাত পর্যন্ত দরজায় খিল এঁটে বৌ-এর কাছে বসে পড়ে, এই অত্যন্ত রুচিকর সংবাদটি নানা রসে পুষ্ট হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঠাট্টার সম্পর্কী যাঁরা অর্থাৎ দিদিমা, দাদামশাই, ননদ ভগ্নী-পতির দল দুজনকে লক্ষ্য করে এমন সব স্থূল রসিকতার বাণ ছুঁড়তে শুরু করলেন যা কানে গেলে শুধু কান নয় মাথাও গরম হয়ে ওঠে।

নরেন স্বভাব-বৈষ্ণব, তার ধৈর্যের বাঁধ শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি, কোনো অবস্থাতেই ভাঙে না। এইসব মন্তব্য গায়ে লাগলেও গায়ে মাখত না। কখনো হেসে, কখনো হাসবার মত মুখ করে নিজের কাজে চলে যেত।

নির্মলাও প্রাণপণে চেষ্টা করত এই উৎপাতগুলো বিনা উত্তরে এড়িয়ে যেতে। 'কিন্তু বোবার শত্রু নেই', এই প্রচলিত প্রবাদটি আর যেখানেই চলুক, পল্লীগ্রামে অচল। বোবা সেখানে অভি-মন্যু, সপ্তরথীর হাত থেকে পালাবার

পথ নেই। এখানে যারা বৌ হয়ে আসে তাদের অবস্থা করাতের সামনে শাঁখের মত। এদিকেও চিরবে, ওদিকেও চিরবে। জবাব দিলে বলবে 'মুখরা', না দিলে বলবে 'দেমাক!' নির্মলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুপ করে সয়ে নিলেও মাঝে মাঝে দু'একটা জবাব দিয়ে বসত। বলাবাহুল্য সেটা জবাব এবং তার জের চলত অনেকদিন।

'রাঙাঠানদি' বলে একজন প্রতিবেশিনী কিছুদিন থেকে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিলেন। পঞ্চাশোর্ধা বালবিধবা। সাধারণতঃ এই জাতীয়া পল্লীকন্যাদের কথায়বার্তায় আদিরসের কিঞ্চিৎ প্রাবল্য থাকে। দেহে ও মনে স্বাভাবিকভাবে ঐ রসের আস্বাদন সম্ভব হয়নি বলে বোধহয় ঐ একটিমাত্র পথ ধরে অর্থাৎ বাক্যের ভিতর দিয়েই তার প্রবাহটা একটু অতিরিক্ত এসে পড়ে। রাঙাঠানদি এদিক দিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নির্মলার কাছে কাছে মুখ নিয়ে ওদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে নানা কৌতূহল যে ভাষায় তিনি প্রকাশ করতেন, কোনো দুঃসাহসিক অভিধানেও তার উল্লেখ নেই। কৌতুকের সুরে বললেও তার মধ্যে কেমন একটা জ্বালা ফুটে উঠত। দূর সম্পর্কীয়া এই মহিলাটির উপর নির্মলার গোড়া থেকেই একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।

সম্প্রতি বিষয় পরিবর্তন করে তিনি নরেনের লেখাপড়ার ব্যাপারটা নিয়ে পড়েছিলেন। একদিন একটা কঞ্চির ছড়ি হাতে করে নির্মলার ঘরে গিয়ে বললেন, তোর জন্যে নিয়ে এলাম নাতবৌ। নে, তুলে রাখ।

নির্মলা ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাতেই যোগ করলেন, কী দেখছিস! তোর পিঠে পড়বে বলে আনিনি। সে সব ছিল আমাদের কালে। কথায় কথায় বৌ-এর পিঠের চামড়া তুলে নিত সোয়ামীরা। তেমন তেমন মরদ যারা, তারা এখনো নেয়। তোর ঐ ভ্যাদাকান্ত বরটি তো সোয়ামী নয়, তোর ছাত্তর। পড়া না পারলেই বসিয়ে দিবি দুঘা।...... বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়লেন। নির্মলা কোনো জবাব দিল না। ছড়িখানা তুলে নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। রাঙাঠানদি মিনিটখানেক গুম হয়ে বসে থেকে বললেন, অত তেজ ভাল নয়, বুঝলি? যা রয় সয় তাই করিস।

নির্মলা সে কথারও উত্তর দিল না। উনি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এসে শ্বাশুড়ীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কী বললেন, নির্মলার শোনবার প্রবৃত্তি ছিল না। কিছুক্ষণ যাবৎ বেশ খানিকটা তর্জন-গর্জন কানে এল। আরও কিছুক্ষণ পরে শ্বাশুড়ীর ঘরে যখন গেল, তিনি একা একা নির্জীবের মত শুয়ে ছিলেন। বৌ-এর সাড়া পেয়ে চোখ মেলে বললেন, সম্পর্কে উনি তোমার গুরুজন, বৌমা, কথাবার্তাগুলো সেই রকমই বলা উচিত।

নির্মলা বিস্ময়ের সুরে বলল, আমি তো ও'কে কিছুই বলিনি।

—মুখে না বলে হাব ভাবে বললে সেটা আরো বেশী লাগে।

নির্মলা যা করছিল, করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কথাটা পাঁচ কান ঘুরে যথাসময়ে নরেনের কানে গিয়েও পৌঁছল। ততক্ষণে রটনা ঘটনাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। নরেন মুখে কিছু না বললেও, ভিতরকার বিরক্তিটা মুখের ভাবেই বোঝা গেল। নির্মলা মনে মনে আহত হল। রাগে ও অভিমানে প্রথমটা মনে হল স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া দরকার। অনেক ভেবে নিজেকে নিরস্ত করল। কথা জিনিসটা বাড়ালেই বাড়ে। তার সঙ্গে বাড়ে তিক্ততা ও অশান্তি। কী দরকার? যে ব্রত সে হাতে নিয়েছে, তার দিকে চেয়ে এসব ছোটখাট মান অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। স্বামী যদি তার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ ধারণা করে থাকেন, সেটা সাময়িক। তাদের ভিতরকার সম্পর্কটা তো এত ঠুনকো নয় যে এই সামান্য মনোমালিন্যের ভার সইবে না।

একটা বিষয়ে নির্মলা মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করেছিল,—এত কাণ্ডের পর রাঙাঠানদি নিশ্চয়ই আর আসবেন না। কিন্তু মহিলাটিকে তখনো সে চিনতে পারেনি। দুষ্টক্ষতের মত এদের বিষাক্ত সংস্রব থেকে কোনো অবস্থাতেই মুক্তি নেই। ক'দিন না যেতেই তিনি আবার দেখা দিলেন। আঁচলের আড়াল থেকে একটা মোটা দড়ি বের করে বললেন, অমন সুন্দর ছড়িটা তোর পছন্দ হল না। টান মেরে ফেলে দিলি। এবার দ্যাখ, কী রকম কাজের জিনিস এনেছি। দামটা দিয়ে দিস।

খাটের উপর চেপে বসলেন ঠানদি। নির্মলা তার রসিকতার গতিটা তখনো ধরতে পারেনি। তার জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তিনিই সেটা পরিষ্কার করে দিলেন—আগে একটু মাঠের দিকে যেত মানুষটা। এখন তো দেখছি তাও বন্ধ করে দিয়েছিস। এবার ইস্কুলের চাকরিটাও ছাড়িয়ে দে। দিয়ে একেবারে রাতদিনের মত ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখ। অতবড় ভ্যাড়াটা; আঁচলে কুলোবে কেন? তাই বেশ মোটা দেখে—

—ওটা আপনিই রেখে দিন।

—আমার তো আর কেউ নেই। আমি এটা দিয়ে কী করবো?

—দরকার মত গলায় দিয়ে ঝুলতে পারবেন।

—কী বললি? সিংহীর মত গর্জে উঠলেন রাঙাঠানদি।

নির্মলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল। ঠানদি লাফিয়ে উঠলেন। বাড়ি কাঁপিয়ে বললেন, আমি গলায় দড়ি দেবো কোন দুঃখে। তুই দে। দিয়ে মর।

নির্মলা হাসতে হাসতেই বলল, আমি যদি দিই, দড়িটাও যোগাড় করে নেবো। আপনার কাছে ধার চাইতে যাবো না।

রাঙাঠানদি নাতবৌ-এর মুণ্ডপাত করতে করতে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

এবারকার ঘটনাটা অন্য আকার নিল। যাঁরা একটু বিজ্ঞ গোছের তাঁরা অবশ্য বলাবলি করতে লাগলেন, নরেনের বৌ-এর ও-কথাটা বলা ঠিক হয়নি। শত হলেও, বুড়ো মানুষ, গুরুজন। কিন্তু অন্যান্য মহলে এর ভিতরকার কৌতুকরসটাই উপভোগ করল বেশী।

চারিদিকের এই বিরূপ আবহাওয়া ও প্রতিকূল অবস্থার চাপে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠত নির্মলা। এগুলোকে তবু ঠেলে সরিয়ে পথ করা চলে, কিন্তু অভাবের চাপটাই দুর্জয় হয়ে দাঁড়াল। ঠানদি ঠিকই বলেছিলেন। সকালে বেরিয়ে চাষবাসের তদারকটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল মাত্র রাত্রির ঐ কটি ঘণ্টার উপর নির্ভর করলে চলে না। সকালের তিন-চার ঘণ্টাও ঐ সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়েছিল। ক্ষেতখামারের ব্যাপারে একমাত্র নির্ভর অনেকদিনের পুরনো চাকর—

প্রসন্ন। তার তখন বয়েস হয়েছে, ঐ সঙ্গে নিজের ছিটেফোঁটা দু-এক বিঘা যা ছিল, তাও করতে হয়। সব দিক ঠিক সামাল দিয়ে উঠতে পারছিল না। জমির ফলন কমে যাচ্ছে; অভাব-অনটনের ছায়া আরো গাঢ় হয়ে উঠল। সংসারের তিনটি প্রাণীর মুখেই তার ছায়া পড়ল। কিন্তু একজন আরেকজনকে জানতে দিল না। শ্বাশুড়ী কিছুদিন থেকে সংসারের সব কিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এতগুলো বছর শক্ত হাতে হাল ধরে এসে ভাঙ্গনের মুখে হঠাৎ ছেড়ে দেবার মধ্যে যে দুর্জয় অভিমান ছিল, ছেলে-বৌকে তা স্পর্শ করলেও নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। যে-পথে তারা চলেছিল, তার থেকে ফিরবার আর তখন উপায় নেই।

এই দুঃসময়ে একটি মাত্র মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, শুধু দাঁড়ানো নয়, বাধা-সংকুল পথে এগিয়েও দিয়েছিলেন অনেকখানি। নরেনের স্কুলের প্রবীণ হেডমাস্টার হরিশংকরবাবু। এই বয়সে, পড়া-শুনোর জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবার এতদিন পরে, তাঁর থার্ডমাস্টারের মধ্যে নতুন করে যাত্রা শুরু করবার উদ্যম দেখে তিনি রীতিমত চমৎকৃত হয়েছিলেন। নিজে অগ্রণী হয়ে তাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবার ভার নিয়েছিলেন। প্রথমে সেটা ছিল অনিয়মিত। পরে, রোজ ছুটির পর নিজের বাসায় ডেকে নিয়ে নিয়মিতভাবে পড়াতে শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে কথায় কথায় নরেনই একদিন বলে ফেলেছিল নির্মলার কথা। শুনে নিজে থেকেই যেচে দেখা করতে এসেছিলেন। ঐ রকম গাঁয়ে, তখনকার দিনে, তাদের ঘিরে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে করে একজন নব-বিবাহিতা গৃহস্থ-বধূর পক্ষে তার স্বামীর প্রবীণ উপরওয়ালার সামনে বেরোনো মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু নির্মলা এতটুকু দ্বিধা করেনি। পরিচিত আপনজনের মতই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে তিনি বাধা দিয়েছিলেন, না, মা। তোমরা ব্রাহ্মণ: বর্ণ-শ্রেষ্ঠ।

নরেন বলেছিল, তাতে দোষ নেই, মাস্টারমশাই। আপনি আমাদের মহর্ষি, অভিভাবক, সুতরাং গুরুজন।

—তা হোক, নরেন। তাই বলে ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণাম নিতে পারবো না। অতটা আধুনিক হতে পারিনি। তাছাড়া, এতো যে-সে মেয়ে নয়। ওকে আমি রীতিমত শ্রদ্ধা করি।

নির্মলা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল অতবড় একজন প্রবীণ বিদ্বানলোকের মুখে এই প্রশস্তি শুনে। হরিশংকরবাবু তার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মা। সত্যিই তুমি কেবল আমার নও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন। ছেলেমানুষ হলেও তুমি আদর্শ-গৃহিণী, কালিদাস যেমন বলেছেন, স্বামীর সখী বা সহচরী শুধু নও, সচিব', নরেনের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'ইংরেজিতে বলব friend, philosopher and guide' বলেই হেসে উঠেছিলেন। সরল সাদা হাসি। আরো অনেক কথা বলেছিলেন হরিশংকরবাবু। নরেনের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমরা মনে করি, স্ত্রী শুধু ভার। সে যে কতবড় ভুল, বৌমার মত দুটি-একটি মেয়ে যখন দেখি, তখন বোঝা যায়। স্ত্রী ভার নয়, শক্তি, পুরুষের জীবনের প্রেরণা, an inspiring force।

এর পরের বার যেদিন এলেন, খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নির্মলা বলল, আপনি পালাবেন না, কাকাবাবু, আমি এখনি আসছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শ্বেত-পাথরের ডিশে কয়েকটি নিজের হাতে তৈরী নারকেলের সন্দেশ এবং সেই সঙ্গে এক কাপ চা এনে ধরে দিল ওঁর সামনে। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই ধূমায়িত পাত্রটির দিকে চেয়ে হরিশংকর বললেন, এই পরম বস্তুটির ওপর আমার আসক্তি আছে, তুমি কেমন করে জানলে, মা?

নির্মলা উত্তর দিল না, মৃদু হেসে তাকাল নরেনের দিকে। উনিও তার

স্ত্রী ভার নয়, শক্তি, পুরুষের জীবনের প্রেরণা...।

দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, ও, তুমি বুঝি গোয়েন্দাগিরি করেছ?

চা-এর পাত্রে একটা চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আঃ! এ যে অমৃত! এই স্বাদটুকু যে কতকাল পাইনি। ভুলেই গিয়েছিলাম চা কাকে বলে। চা তো সবাই করে, কিন্তু কোলকাতার বাইরে এই বিশেষ 'তার'-টুকু কেউ আনতে পারে বলে তো জানা ছিল না। এ তুমি কোথায় শিখলে, বৌমা?

—আমার বাবা বড্ড চা ভালবাসেন, কিন্তু ঠিকমত না হলে খান না। আমিই বরাবর তাঁর চা করে দিয়েছি। ....

বলতে বলতে শেষের কথাগুলোয় একটা করুণ সুর বেজে উঠল। তারই রেশ যেন শোনা গেল হরিশঙ্করের কণ্ঠে। বললেন, তোমার বাবা ভাগ্যবান।

মাস্টারমশাই বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

দু'বছরে হল না, তিন বছরের মাথায় নরেন আই-এ পাশ করল। অল্পের জন্যে প্রথম বিভাগটা ফসকে গেল। ততদিনে নির্মলার শ্বশুর ও বাপের বাড়িতে অনেক ওলট-পালট ঘটে গেছে। শ্বাশুড়ী ও বাবা দুজনেই গেছেন। জগদীশের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শেষের ক'মাস কোর্টেই যেতে পারেননি। ধার-দেনা করেই চলছিল এক রকম। সুদে-আসলে তার পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছিল, কাটোয়ায় বাড়ি বিক্রি করেও শোধ হয়নি। 'দেশে' ভাগের ভাগ যে ক'বিঘা জমি অবশিষ্ট ছিল তাতেও টান পড়েছিল। সর্বস্বান্ত হবার পর মেজে মেয়ে এসে মাকে তার নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাকী জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে গেছেন। বাবার শ্রাদ্ধের সময় সেই যে গিয়েছিল নির্মলা, মায়ের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। সব কিছু মিটে যাবার পর যেদিন চিরকালের তরে কাটোয়া ছেড়ে চলে যান, তখন আর যেতে পারেনি। শ্বাশুড়ীর সে সময়ে একেবারে এখন-তখন অবস্থা।

আজ এতকাল পরে শেষবারের মত দেখা মায়ের সেই সাদা থানপরা নিরাভরণ মলিন রূপটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার আগের চেহারা যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। ....

বাবার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই শ্বাশুড়ীও মারা যান। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন শেষ দিকটায়। দেহের যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক কষ্টটাই বোধ হয় বেশী। জন্ম থেকেই ছেলে ছিল তাঁর ছায়া। বৌ আসবার পর সে যেন কায়া থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। এই ফাঁকটা সহ্য করতে পারেননি। ছোট্ট সংসারটিকে যে পথে তিনি চালিয়ে এনেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চালাতে চেয়েছিলেন, ওরা যে তার থেকে একটা নতুন পথ কেটে বার করে নিল, তার সঙ্গে রফা করা সম্ভব হয়নি। জীবনের শেষ কটা বছর তিনিও তাই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে এনে রোগশয্যার সঙ্কীর্ণ পরিসরটুকুর মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন। তার বাইরে কোনো কিছুর সংযোগ রাখেননি।

মায়ের ওষুধ-পথ্য, পড়াশুনোর খরচ, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি দায়গুলো মেটাতে নির্মলার দুখানা গয়না ছাড়াও খান দুই ধানের জমি মহাজনের গদিতে বাঁধা পড়েছিল। তার উপরে অনেক দিন উপযুক্ত দেখাশুনোর অভাবে বাকী জমিগুলোও ঠিকমত ফল দেয়নি। একমাত্র ঐ পরীক্ষার ফল, তার মধ্যে সাফল্যের চমক এবং আনন্দ যতই থাক, সংসারের এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। নরেন যখন ভাবছে, যে নৌকা ডুবতে বসেছে তাকে টেনে তুলবার কাজটা কোনখান থেকে কিভাবে শুরু করা যায়। নির্মলা এসে সোজাসুজি রায় দিয়ে বসল, বি-এ-টা কিন্তু গোড়া থেকেই খেটে পড়তে হবে। সোজা ব্যাপার তো নয়।

নরেন স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝল, সাংসারিক অভাব, ধার-দেনা, চাষবাসের শৈথিল্য, নির্মলার নিজের কষ্ট অসুবিধা—কোনো যুক্তিই চলবে না। তার সামনে ঐ একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং তার মাঝখানে থামবার উপায় নেই। আরম্ভের পর শেষ অনিবার্য। অবশিষ্ট জমিতে আর হাত দেওয়া যায় না। হাত পড়ল নির্মলার স্বল্পাবশেষ সোনার টুকরো দু-একখানা যা পড়েছিল, তারই গায়ে। তার থেকেই বই এল। শুরু হল বি-এ পরীক্ষার প্রস্তুতি। হরিশঙ্করবাবু উৎসাহ দিলেন। পড়াশুনোয় সাহায্য করা সম্ভব হল না। তিনি নিজেও এর বেশী এগোননি। তার বদলে আর একটা জিনিস দিলেন, এই দুঃসময়ে অভাব-ক্লিষ্ট দম্পতির কাছে যার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বড়। 'হায়ার কোয়ালিফিকেশন'-এর যুক্তি দেখিয়ে নরেনের মাইনের অংকটা আরও একটু উপরে তুলবার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্কুল-কমিটি অতি কঠিন ঠাঁই। সেখানে যুক্তির জোর পাত্তা পায় না, হেডমাস্টার তা ভালো করেই জানেন। বলতে গেলে, এক রকম গলার জোরেই প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নিলেন।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীর শিল্পমেলা

বরুণকুমার মজুমদার

দিল্লীতে শিল্পমেলার আয়োজন এই প্রথম নয়। এই রকমেরই আর একটি মেলা দিল্লীতে বসেছিল ছ' বছর আগে, পঞ্চান্ন সালে। তবে প্রদর্শিত সামগ্রীর পার্থক্যে ও আড়ম্বরের বিপুলতায় এই দুই মেলায় প্রায় আকাশ-মাটির পার্থক্য।

পঞ্চান্ন সালের শিল্পমেলা বসেছিল ৭২ একর জমিতে, আর এবারের মেলা বসেছে ১৪০ একর জায়গা জুড়ে। সেবারে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল ৩,৬০০ কিলোওয়াট, এবার সরবরাহ হচ্ছে ৭,২০০ কিলোওয়াট। সমগ্র মেলাটি ঘুরে দেখতে হলে একজনকে প্রায় ৩৫ মাইল পথ হাঁটতে হবে। মেলার কেন্দ্রস্থলে আছে এক হাজার ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া একটি হ্রদ যাতে নৌ-বিহারের ব্যবস্থা আছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবী থেকে যত শিল্প-সামগ্রী এসেছে তার মোট দাম প্রায় ২৫ কোটি টাকা। প্রায় এক হাজার রেল ওয়াগন ১৬ হাজার টন মাল বহন করে এনেছে শিল্পমেলায়। যাঁরা মেলা দেখেননি তাঁরা এই থেকেই হয়ত বর্তমান মেলার বৈচিত্র্য ও বিশালতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

শিল্পমেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ভারতের শিল্প-প্রয়াস ও সাফল্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করা, এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যাঁরা মেলা দেখবেন তাঁরা স্বাধীন ভারতের গত চৌদ্দ বছরের শিল্প-উদ্যোগ সম্বন্ধে অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবেন। সারা ভারতের সব রাজ্য থেকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন এ মেলায় নিয়ে আসা হয়েছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত বহু পণ্যেরও স্থান হয়েছে এই মেলায়। কিন্তু যাদের সহযোগিতা, নির্দেশনা ও আর্থিক আনুকূল্যে ভারতের বর্তমান শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে তাদের সেই ঋণটুকু স্বীকারের একটা আন্তরিক প্রয়াসও শিল্পমেলার উদ্যোগীরা করেছেন। একারণে ভারতের শিল্প-পণ্যের বর্ণাঢ্য সমাবেশের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পঃ জার্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, বুলগারিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, উত্তর ভিয়েৎনাম ও রুমানিয়ার প্রদর্শনী মণ্ডপ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ লেনদেন চলে যে দেশগুলির সংগে। প্রায় সমস্ত বিদেশী শিল্প-মণ্ডপগুলিতেই দেখানো হচ্ছে ভারতের শিল্প-উদ্যম ও কারিগরী জ্ঞানার্জনে কিভাবে তারা এতদিন সহযোগিতা করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা কতখানি সাহায্য করতে আগ্রহী।

বিদেশী মণ্ডপগুলির মধ্যে বৃহত্তম বৃটেনের মণ্ডপ। সেইটাই স্বাভাবিক। ঐ দেশটির সংগে আমাদের সম্পর্ক দুইশত বছরেরও বেশী পুরাতন, সেকারণে তাদের সংগেই আমাদের লেনদেন সবচেয়ে বেশী। ১৯৫৭ সালে ভারত থেকে ২৪০ কোটি টাকার পণ্য গেছে বৃটেনে। ভারতের তৃতীয় যোজনাতেও বৃটেনের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ১১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদেশী মণ্ডপটি হল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্র এপর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যতগুলি প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে এইটিই তার বৃহত্তম আয়োজন। চল্লিশটিরও অধিক মণ্ডপে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ করেছে, সেগুলিকে নিয়মিত কর্মরত রেখে তারা দর্শনার্থীদের আগ্রহ সজীব করে তুলছে। মার্কিণ মণ্ডপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হ'ল উড়ন্ত মোটরগাড়ী, যা চাকা ছাড়াই চলছে। এখনও এই নব-উদ্ভাবিত যানটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়নি। যেদিন হবে, বলা বাহুল্য, সেদিন যন্ত্রজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের সহায়ক হয়েছে তারও কিছু কিছু নিদর্শন প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন দেখানো হচ্ছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে সেখানে ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে। মহাকাশ পরিক্রমার বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশও দর্শনার্থীদের কাছে কম আগ্রহের সৃষ্টি করেনি।

তৃতীয় উল্লেখ্য মণ্ডপটি সোভিয়েট ইউনিয়নের, তার জাঁকজমকও চিত্তাকর্ষক। গত আট বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতের পণ্য রপ্তানি আট গুণ বেড়ে ৩০ কোটি টাকা হয়েছে। যত দিন যাবে এই দুই দেশের মধ্যে পণ্যের লেনদেন ততই বাড়বে বলে উভয় দেশেরই দৃঢ় আশা। সোভিয়েট মণ্ডপে গেলে চোখে পড়বে, ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বৈত উদ্যোগে দক্ষিণ ভারতে নেভেলি কারখানা, রাঁচীতে ভারি যন্ত্র নির্মাণ কারখানা প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মডেল। একটি মডেলে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কার্যপ্রণালী দেখানো হচ্ছে। তিন নম্বর স্পুটনিকের মডেলটির আকর্ষণও সাধারণের কাছে কম নয়।

বৃটেনের মণ্ডপে নাইলন যুবতী লীলা ও পূর্ব জার্মানীর কাঁচের নারীও বিশেষ আকর্ষণীয়। ভারতের শিল্প-মণ্ডপগুলিতে প্রদর্শিত হচ্ছে, কি কি পণ্য ভারত বিদেশে পাঠায় এবং দুটি পঞ্চবার্ষিক যোজনায় কতখানি সফল হয়েছে তার শিল্প-উদ্যোগ। ষ্টলগুলির অংগসজ্জাও বিশেষ রমণীয়। প্রাচীন ও নবীন স্থাপত্য-শিল্পের অতি সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে সেখানে। কোনটি নির্মিত হয়েছে সাঁচি স্তূপের অনুকরণে, কোনটি কুতবমিনারের ধাঁচে, কোনটি বা প্রাচীন মিশরের অনুকৃতি।

দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রদর্শনীতে। হ্রদে নৌ-বিহারের কথা ত পূর্বেই বলা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়নের নিদর্শন উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এ মেলার আয়োজন হয়নি। এমনকি দেশে বিদেশে বাণিজ্যিক বিস্তৃতির বৈষয়িক চিন্তাও এই মেলার উদ্যোক্তাদের মূল অনুপ্রেরণা নয়। এই মেলার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হ'ল আদান-প্রদান ও জানাশোনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সখ্য ও সৌভ্রাত্রের সম্পর্ককে নিবিড় করে তোলা। কারণ আজকের পৃথিবীতে স্বাধিকারের চেয়েও বড় কথা হল সহযোগিতা। বিশেষ করে ভারতের মত সদ্য স্বাধীন উন্নয়নকামী দেশগুলির কাছে এই সহযোগিতার মূল্য সীমাহীন। তাই দিল্লীর বর্তমান বর্ণাঢ্য আলোকোজ্জ্বল শিল্প-প্রদর্শনীকে শিল্পমেলা না বলে বিশ্বমেলা বলাই বোধহয় ঠিক হবে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

(কাশ্মীরী গল্প)

॥ ভূমিকা ॥

ভূস্বর্গ কাশ্মীর জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু কাশ্মীরী ভাষায় সাহিত্য রচিত হচ্ছে মাত্র পনের বছর আগে থেকে। কাশ্মীরের সামাজিক বিন্যাস এবং নির্দিষ্ট অক্ষরলিপির অভাবে কাশ্মীরী ভাষা থাকা সত্ত্বেও তা সাহিত্যে রূপ পায়নি। শত শত বছর ধরে কাশ্মীরবাসীকে চরম দারিদ্র্য আর অশিক্ষার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। আজও এই ভূ-স্বর্গের মানুষ-গুলির ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

হিন্দু মুসলমান ছাড়াও কাশ্মীর রাজ্যে অনেক উপজাতি রয়েছে। এবং মূলতঃ এদের মধ্যে কাশ্মীরী, ডোগরী, বালতী, দরদী, পাঞ্জাবী, হিন্দী ও উর্দু ভাষা প্রচলিত। তবে অধিক সংখ্যক মানুষ কাশ্মীরী ভাষাতেই কথা বলে। ভারতে ইরাণী প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কাশ্মীরী প্রধান। প্রাচীনতম কাশ্মীরী সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা হল শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লার লেখা কয়েকটি কবিতা। শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লা চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। তাঁর আগেও কাশ্মীরীতে সাহিত্য রচিত হত, কিন্তু তার নমুনা দুষ্প্রাপ্য।

বিখ্যাত কবি দীননাথ নাদিমের 'জবাবী কার্ড' প্রথম সার্থক কাশ্মীরী গল্প। নাদিমের এই গল্পের সাফল্য লক্ষ্য করে অন্যান্য সাহিত্যিকরাও ছোটগল্পের আঙিনায় পদচারণ শুরু করলেন। ছোট-গল্পরচয়িতাদের মধ্যে নূর মহম্মদ 'রোশন', সোমনাথ জুৎসী, আবদুল আজীজ হারান, শঙ্কর রেণা, অর্জুন দেব 'মজবুর', আলী মুহম্মদ লোন, আখ্তার মুহীউদ্দীন, উমেশ কৌল, তাজ বেগম, পুষ্করনাথ ভান প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এ-ছাড়া রহমান 'রাহী' প্রমুখ অন্যান্য সাহিত্যিক গোর্কী, কৃষণচন্দর, চেখভ প্রমুখের গল্প অনুবাদ করে কাশ্মীরী ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করার পথ সুগম করেছেন।—অনুবাদক।)

স্রোতের টানে

মূলরচনা : আলী মুহম্মদ লোন

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

খালের ঢেউগুলো মরে গেছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। খালে এক ফোঁটা জল নেই। ঘন অন্ধ কালো বনের গাছগুলো নড়ছে না, পাতাও না। কঠিন এক নিস্তব্ধ নীরব ভাব ছেয়ে রয়েছে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। টিলার উপর লাঠিতে ভর করে ঠায় দাঁড়িয়ে করমদীন ভাবছে, এখনও যদি বৃষ্টি না হয় খুব ক্ষতি হবে। পন্ডিতমশাই বউয়ের সংগে ঝগড়া করবেন। ছেলেমেয়েদের কাউকে পড়তে বসেনি বলে, কাউকে তামাক সেজে দেয়নি বলে বকবেন আর মারবেন। আর হয়ত আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবেনও না। আচ্ছা, আকাশে যদি মেঘ না জমে, বৃষ্টি যদি না পড়ে তাতে কার কি দোষ! খালে যদি জল না ঢোকে, ঢেউগুলো যদি জেগে না ওঠে তো অপরাধ কার! কিন্তু পন্ডিতমশায়ের কাছে এসব কথা বলেও কোন লাভ নেই। আজও যদি পন্ডিত-মশাই আমার উপর চটে যান তাহলে আমিও চটে যাব জেনুর উপর। শত অনুরোধ করলেও আমি গান গাইব না। দূর থেকে জেনুর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকব। আর একটি কথা ছুঁড়ে দেব তার দিকে, জেনু তুমি ঐ ঘরের ভেতর আর কতদিন পাহাড়ী ছাগলের মত বাঁধা থাকবে! জেনুও ইটটি খেয়ে পাটকেলটি আমার দিকে ছুঁড়ে দেবে, খুব হয়েছে থাক আর বক্‌বক্ করতে হবে না। মুরদ তো নেই কিছু করার। ওর কথা শুনে আমি আর একটি কথাও বলতে পারব না। মাথা নিচু করে ফিরে আসা ছাড়া উপায় থাকবে না। সত্যিই তো তাকে পাওয়ার জন্য যা করা উচিত তাতো আজও করে উঠতে পারিনি। কিছুক্ষণ ভেবে করমদীন কানের কাছে হাত রেখে টেনে একটা গান ধরল। প্রথম কলিটি গেয়েই থেমে গেল। তার গান পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন অট্টহাস্য করছে। মেজাজ বিগড়ে গেল। শালা একটা গান গাইতেও দেবে না এই পাহাড়গুলো। আকাশের দিকে তাকাল। কোথাও এক চিল্‌তে মেঘ দেখা যাচ্ছে না!

টিলা থেকে নিচে নেবে লুঙিটাকে কষে বেঁধে দুই কাঁধে লাঠি রেখে খালের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর কাঁধের লাঠিটি নাবিয়ে খালে যে গুঁড়িগুলো পড়ে রয়েছে সেগুলোর উপর ঠকঠক করে টোকা দিতে লাগল। ওগুলোও যেন পাথর বনে গেছে। জেনুর বাবার হৃদয়ের মতই কঠিন হয়ে গেছে। একবার মুষলধারায় বৃষ্টি নাবলে পন্ডিত-মশায়ের মন ভরে যেত, তখন জেনুর বাবার বাধাকে এই গুঁড়িগুলোর মতই স্রোতের বুকে ভাসিয়ে দেওয়া যেত। পন্ডিতমশায় নিজে আমাকে কথা দিয়েছেন। বৃষ্টি পড়লে খালে ঢেউগুলো জেগে উঠলে পন্ডিতমশাই জেনুর বাবার সংগে দেখা করবেন, জেনুর বিয়ের কথা পাড়বেন। করমদীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করবেন। তাঁর প্রস্তাবে গররাজী হওয়ার মত বুকের পাটা এ-তল্লাটে কারো নেই। করমদীন ভাবছে, শালা আমার মত অভাগা আর নেই। মুষলধারে একবার বৃষ্টি পড়লে হয়। ঢেউগুলো জেগে উঠবে, খালের গুঁড়ি-গুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নদীতে। একটার সঙ্গে আর একটা গুঁড়িকে দড়ি অথবা তার দিয়ে বাঁধা হবে। সেগুলো নদীর বুকে ভাসবে, আর আমি এক গুঁড়ি থেকে আর এক গুঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে যাব। তারপর পন্ডিতমশাই তাঁর কথা রাখবেন। ...

করমদীন আবার আকাশের দিকে তাকায়। কী নির্দয় আকাশ। এতবড় আকাশের কোন কোণে মেঘ নেই। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত আগুন ঝরে পড়ছে, খালে একবিন্দু জল নেই।

আর আকাশের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল করমদীন। পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করল। ঐ ছোট্ট কৌটোর উপরেই ছোট আরশির টুকরো বসানো রয়েছে। মুখটা তাতে একবার দেখল। মুখটা মন্দ নয় দেখতে। সবকিছুই

সুন্দর দেখাচ্ছে—নাক, চোখ, কান, গোঁফ —তবু জেনুর বাবা কেন যে...

এক কাঁড়ি নস্যি দিয়ে দাঁতগুলো ঘষল। পরক্ষণেই জেনুর কথা কানে বাজল, দেখ তুমি যদি ঐ নস্যি দিয়ে দাঁতমাজা না ছাড় তা হলে কিন্তু... কী বিশ্রী অভ্যেস। তৎক্ষণাৎ সে ধারে-কাছে জল না পেয়ে জামার এক কোণ দিয়ে দাঁতগুলো মুছে পরিষ্কার করে ফেলল। আর পিচ কেটে দুবার থুথু ফেলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থ বনে গেল। আশ্চর্য তারই মাথার উপর এক টুকরো মেঘ। সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামে চিৎকার করে সবাইকে জানাতে লাগল, মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হবে! করমদীন ছুটেছে তো ছুটেছেই। ঝোপ-ঝাড় টপকে তীরবেঁধা হরিণের মত ছুটেছে। কে যেন তার দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, কিরে জেনুকে পেয়েছিস? সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকজন হেসে বলল, আর পেয়েছে। ওর ভাগ্যে আছে শুধু জেনুর বাবার জুতো। জেনুকে আর পাবে কোত্থেকে। করমদীন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার বলছি ওর সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছো কি কুড়ুল দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো। ওর মুখের উপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করেনি। করমদীন ভাবছে মানুষ কত নির্দয়; এমন সব কথা খোঁটা দিয়ে বলে যে মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় অথচ এই লোকগুলি সেদিন জেনুর বাবার হাত থেকে, বলা চলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তাকে।...অন্যান্য দিনের মত সেদিনও করমদীন শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জেনুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অন্ধকার রাত্রের বুক চিরে। টের পায়নি যে জেনুর বাবা আড়াল থেকে সব দেখেছে। হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁক-ডাক করে লোক জমা করেছিল। ভীষণ চটে গিয়েছিল সেদিন। জেনুর বাবার জুতোও তার মাথায় পড়তে বাকী থাকেনি।

উদাস দৃষ্টি মেলে করমদীন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল, বৃষ্টি হবে!! আমি যে দেখছি নীল আকাশের বুকে টুকরো টুকরো কাজলকালো মেঘ জমছে। পণ্ডিতমশাই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে করমদীনের দু-হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাগ্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, মেঘ দেখেছো? বৃষ্টি হবে তাহলে!

—হবে বৈকি, নিশ্চয়ই হবে। ঐতো মেঘ! ঐ যে কত মেঘ!!

তারপর পণ্ডিতমশায়ের নির্দেশে করমদীন বেরিয়ে পড়ল কয়েকটি দিন-মজুর ডাকতে। তার ফিরে আসতে না আসতে শোনা গেল মেঘের গর্জন, দেখা গেল বিদ্যুতের চমক; বৃষ্টি চুম্বন করল মাটির বুক। মজুররা বেরিয়ে পড়ল লাঠি কুড়ুল নিয়ে। পণ্ডিতমশায়ের নির্দেশে কাজ শুরু হল। মজুররা দূরে দূরে খালের পাড়ে আর করমদীন গুঁড়িগুলোর ওপর দাঁড়াল। সবাই ভিজছে। সেখান থেকে জেনুর ঘর দেখা যাচ্ছে। খালের এই গুঁড়িগুলোতে ঢেউ লাগলেই হোল, তারপর তার জীবনে দেখা দেবে নতুন দিন। পণ্ডিতমশায় তাকে পাইয়ে দেবে জেনুকে। আশপাশের জল আর পাহাড়ের বুক চিরেও জল খালে জমা হতে লাগল। পণ্ডিতমশাই চিৎকার করে বললেন, করমদীন প্রথম গুঁড়িটা ঠেলে দিবি। তার পরেরগুলো পর-পর ঠেলা হবে। করমদীন গুঁড়িটা ঠেলতে গিয়ে দেখে কোথায় আটকাচ্ছে। গুঁড়ির নিচের দিকটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল করমদীন। খালে স্রোত এসেছে। প্রচণ্ড স্রোত। তাকে মাঝে মাঝে ঠেলে ফেলতে চাইছে। সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে গুঁড়িটাকে ঠেলছে। চোখ ফেটে জল আসতে চায় যেন। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। গুঁড়িটা নড়ে গেল। আর কোন ভয় নেই। স্রোতের টানে গুঁড়িটা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। তারপর বাকী গুঁড়িগুলোকে তার সঙ্গে বেঁধে দিলে সেগুলোও স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে এগোতে লাগল। চারদিক হৈ-চৈ পড়ে গেল। আনন্দে পণ্ডিতমশায় আর তার বন্ধুরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। পণ্ডিতমশায় চিৎকার করে সব মজুরদের হুকুম দিল, খালের অত ধারে থেকোনা। সরে এসো। কিন্তু তার কথা সকলের কানে গেলেও করমদীনের কানে যায়নি। করমদীন এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সেই স্রোতের দিকে। যে গুঁড়িটা একটু আটকাচ্ছে সেটাকে ঠেলে দিচ্ছে। একটি গুঁড়িও যাতে না আটকায় সেদিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পৃথিবীর অন্য কোন শব্দ তার কানে যাচ্ছে না। একমাত্র স্রোতের শব্দ তার কানে বাজছে। চোখ তার নিবদ্ধ গুঁড়িগুলোর উপর। কখন সে জলে নাবছে, কখন সে ডাঙায় দাঁড়াচ্ছে তা সে নিজেই জানে না। পণ্ডিতমশায় ঘাবড়ে গিয়ে করমদীনকে বলল, স্রোতের টান বেড়েছে, সাবধানে দূরে দাঁড়া। কাছে যাসনি, দূরে সরে থাক—জলে নাবিসনি।

—আপনি অত ভাববেন না। আমার কপালের জোর আছে [illegible]

—ঐ দেখ, দেখ গাছগুলো ভেসে যাচ্ছে। জলে দাঁড়াসনি, দূরে সরে আয়।

হঠাৎ করমদীন চমকে উঠল। আবার একটা গুঁড়ি আটকে গেছে। একটা আটকানো মানেই পিছনের সবগুলোর আটকে যাওয়া। করমদীন চিৎকার করে ডাকল সবাইকে। কিন্তু কেউ জলে নাবতে সাহস করল না। পণ্ডিতমশাই চিৎকার করে হাঁকলেন, এ-কি করছিস, উঠে আয় বলছি!

কিন্তু করমদীনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রচণ্ড জোরে ঠেলতে লাগল সেই গুঁড়িটাকে। নড়ে উঠল গুঁড়িটা। সেটি নড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানও বেড়ে গেল!

—উঠে আয়...কোনদিন স্রোতের টানেই দেখছি তুই চলে যাবি!

একগলা জলে দাঁড়িয়ে করমদীন হি-হি করে হাসল। তীরের লোকগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

গুঁড়িটা সরাতে গিয়ে করমদীনকে খালের এপার থেকে ওপারে যেতে হয়েছিল। এখন সে ওপারের একগলা জলে দাঁড়িয়ে পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে!

করমদীন ভাবছে, সবকটা গুঁড়ি চলে যাওয়ার পর পণ্ডিতমশাই জেনুর বাবার কাছে যাবে। তারপর জেনুর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ঐ গুঁড়িগুলোর দিকে, স্রোতের দিকে। ওসবের সঙ্গে যে তার ভাগ্য জড়িত! সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল খালের পাড়ে। সারারাত কেটে গেল। পরের দিন সন্ধ্যা—মাত্র কটা গুঁড়ি বাকী আছে। তারপরইতো পণ্ডিত-মশাই জেনুর বাবার কাছে যাবেন। বিয়ের কথা পাড়বেন...

হঠাৎ করমদীনের কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিল। জেনুর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের আওয়াজ। তার বুকে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা গেঁথে দিচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠছে করমদীনের মন!

উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশ, মাটি আর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল করমদীন। ভাবছে, কালকেই যদি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম—তাহলে বেশ হতো। নদীতে পড়তাম। তারপর মোহনায়। তারপর...

জেনুর বাড়ি থেকে সানাইয়ের আওয়াজ আসছে। আর করমদীনের মনে হচ্ছে কে যেন তার বুকে হাতুড়ী পিটছে। তার বুকে আগুনের স্রোত বইছে।

বিজ্ঞানের কথা
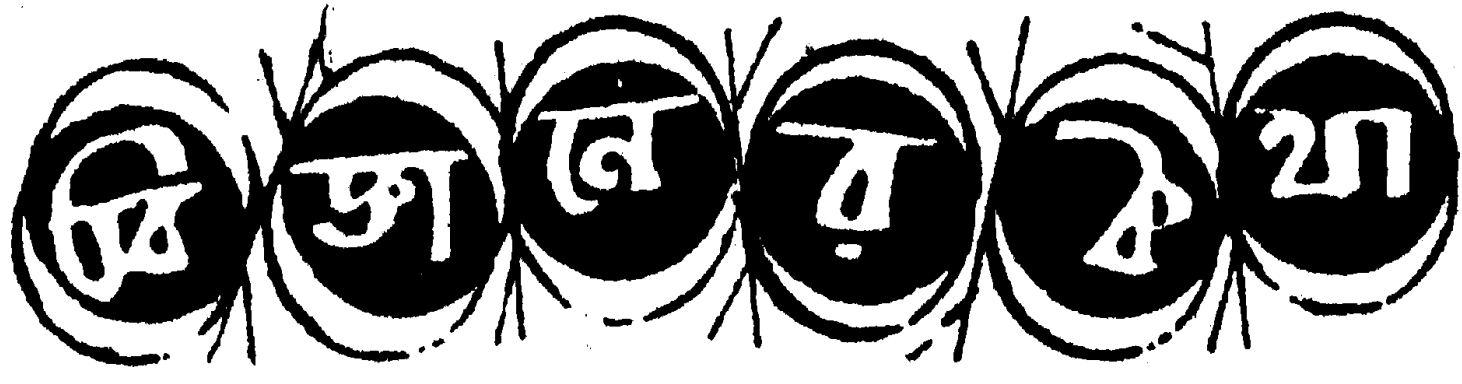
॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ ভারতীয় প্রত্ন-সমীক্ষার একশো বছর ॥

দিল্লীতে ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্ন-সমীক্ষা সংস্থার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভারতে গত একশো বছরের প্রত্নচর্চার ইতিহাস নানা দিক থেকে গৌরবমণ্ডিত। যদি দৃষ্টান্ত দিতে হয় তাহলে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে হরপ্পার ও মহেনজোদাড়োর। কিন্তু এই দুটিতেই শেষ নয়। সারা ভারতবর্ষ এই সংস্থার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। এবং এই ক্ষেত্রটি খুবই ব্যাপক। শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিশ্চয়ই এই একশো বছরের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস সাধারণের কাছে উপস্থিত করা হবে। খবরের কাগজের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় ইতিমধ্যেই একটি-দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা চলে, এই উপলক্ষে প্রত্ন-সমীক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ পুস্তিকাও প্রচারিত হবে। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞরা সাধারণত বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সাধারণের জন্যে মুখ খোলেন না। শতবার্ষিকী এমনি একটি উপলক্ষ যখন প্রত্নবিদরা নিজেরাই একশো বছরের প্রত্নচর্চার ইতিহাস শোনাতে চাইবেন। কাজেই আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের কাছে এ এক দুর্লভ সুযোগ। এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার আমরা নিশ্চয়ই করব। আর প্রত্নবিদ্যা এমনই একটি বিষয় যাকে বাদ দিয়ে চলতে হলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না। কারণ প্রত্নবিদ্যাই হচ্ছে সেই ভিত্তিভূমি যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতে হয়, নিজের দেশকেও।

১৮৬১ থেকে ১৯৬১—এই একশো বছরের প্রত্নচর্চা ভারতের ইতিহাসকে যে কতখানি সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই বিবরণ নিশ্চয়ই যোগ্য ব্যক্তিদের মুখ থেকেই শোনা যাবে। আমি এখানে এই আলোচনা তুলব না। কিন্তু এই একশো বছরের প্রত্নচর্চারও একটি প্রারম্ভিক কাল আছে, যখন প্রত্নচর্চার আনুষ্ঠানিক জন্মের ক্ষণটির জন্যে প্রস্তুতি-পর্ব চলছিল। এই প্রারম্ভিক-কাল সম্পর্কেই কিছু বিবরণ আমি এখানে উপস্থিত করতে চাই।

॥ সূত্রপাত ॥

ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন ও গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল কোনো উচ্চকিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে নয়, নিতান্তই পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম স্যার উইলিয়ম জোনস্। ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে তাঁরই পরিচালনায় একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়েছিল যার নাম এশিয়াটিক সোসাইটি এবং যার উদ্দেশ্য ছিল "এশিয়ার ইতিহাস...পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য" সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। ভারতে ১৭৮৪ সালের আগেও যে এ-ধরনের খোঁজ-খবর নেবার ব্যক্তির অভাব ছিল তা নয়। কিন্তু তা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করার ব্যাপার, বা বলা চলে, কিউরিও সংগ্রহ করবার বাতিক। স্যার উইলিয়ম জোনস্-ই সর্বপ্রথম বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলোকে একটা সংহত রূপ দিয়েছিলেন, যার ফলে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও একটা সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পেয়েছিল। ১৭৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' আর ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোসাইটির যাদুঘর। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন ও গবেষণা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সারা দেশে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। আর বাংলাদেশকে অনুসরণ করে অনতিকালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

তবে স্বীকার করা দরকার যে গোড়ার বছরগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বা সমীক্ষার কাজ একেবারেই হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কি-ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করতে হয়, কি-ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণকে ব্যাখ্যা করতে হয়—এসব বিষয়ে তখনো কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। ফলে, সমস্ত মনোযোগটা গিয়ে পড়েছিল প্রাচীন সাহিত্যের ওপরে। এমন কি মনে করা হত যে প্রাচীন সাহিত্য থেকেই ভারতীয় ইতিহাসের সমস্ত উপকরণকে আবিষ্কার করা যাবে। এই কারণেই তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র প্রসারিত ছিল নানা বিচিত্র দিগন্তে। জাতিতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ গণিত পর্যন্ত কোনো বিষয়কেই তাঁরা অবান্তর মনে করতেন না। ফলে, প্রাচীন সাহিত্য ও লিপিকে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার মধ্যেই তাঁদের সমস্ত প্রয়াস নিবদ্ধ ছিল। এলোরা বা কুতুবমিনার বা তাজমহল বা এ-ধরনের আরো যে-সমস্ত নিদর্শন সারা দেশে ছড়ানো ছিটানো ছিল তাদের সম্পর্কে প্রশস্তিবচন ছাড়া বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তখনো পর্যন্ত জাগ্রত হয়নি।

তবু তাঁরাই ছিলেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পথিকৃৎ। ভারতে প্রত্নচর্চার সূত্রপাত তাঁরাই করে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের এই অবদান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অবশ্যই এ-প্রসঙ্গে উজ্জ্বলতম নাম স্যার উইলিয়ম জোনস্। তিনিই সর্বপ্রথম সপ্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, গ্রীক ইতিহাসে কথিত সান্ড্রোকোটোস এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একই ব্যক্তি এবং তাঁর এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলেই ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাল-তারিখের সুস্পষ্ট চিহ্ন পড়েছিল। তাছাড়া তিনি প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত কয়েকটি স্থানকে ভৌগোলিকভাবে সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই কীর্তির থেকেই প্রাচীন ভারতের ভূগোল সম্পর্কে গবেষণার সূত্রপাত।

স্যার উইলিয়ম জোনস্-এর কয়েকজন সহকর্মীর অবদানও এই প্রসঙ্গে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। একজন হচ্ছেন চার্লস্ উইলকিনসন। তিনি গুপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। ভারতে লিপি-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা চলে। এই প্রসঙ্গে আরো দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজনেই ছিলেন স্যার উইলিয়ম জোনস্-এর পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। একজন হচ্ছে এইচ. টি. কোলব্রুক ও অপরজন হচ্ছেন এইচ. এইচ. উইলসন।

একই সময়ে, পশ্চিম ভারতেও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় কয়েকটি বিশিষ্ট নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৯৫ সালে

প্রকাশিত হয়েছিল স্যার চার্লস্ ম্যালেট-এর এলোরা গুহা সংক্রান্ত নিবন্ধ। ১৮০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সল্ট-এর লেখা আরো দুটি গুহার বিবরণ। ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল উইলিয়ম এর্সকিনের লেখা এলিফান্টা গুহার বিশদ ব্যাখ্যা।

তৎকালে মাদ্রাজের সবচেয়ে অগ্রণী পুরাতাত্ত্বিক ছিলেন কোলিন ম্যাকেঞ্জি। তিনি আট হাজারেরও বেশি প্রাচীন লিপি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহও ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে একটি কথা কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। একেবারে গোড়ার দিকে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সরকারী সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা সেই উদ্যোগকে পুষ্ট করেনি। সরকারী উদ্যোগের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে ১৮০০ সালে। এই বছরে মহীশূরের সার্ভে করার জন্য সরকারীভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন ফ্রান্সিস বুকানন। এই সার্ভে রিপোর্টে মহীশূরের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কেও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে পুরাতাত্ত্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। পরে ১৮০৭ সালে তিনি আবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের কর্তৃত্বাধীন এলাকা সার্ভে করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আট বছর ধরে এই সার্ভে চলেছিল। দিনাজপুর, রংপুর, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, বিহার, শাহাবাদ ও গোরখপুরের বিবরণ তিনি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বিবরণের মধ্যে উল্লিখিত এলাকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং চিত্র ও নক্শা সমেত প্রত্যেকটি নিদর্শনের নিখুঁত মাপজোখ উপস্থিত করা হয়েছিল।

কিন্তু তারপরে দীর্ঘকাল ধরে সরকারী উদ্যোগের আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। মাঝে মাঝে বড়ো জোর তাজমহল বা কুতুবমিনার বা এ-ধরনের কোনো প্রাচীন অট্টালিকা মেরামতীর জন্যে কমিটি খাড়া করা হত মাত্র। তা সত্ত্বেও প্রাচীন অট্টালিকাগুলি যে পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়েছিল তা বলা চলে না। কাগজে-কলমে আইন থাকা সত্ত্বেও দেশের শাসকরাই অনেক ক্ষেত্রে পুরাকীর্তির মর্যাদা দিয়ে চলেননি এবং অনেক পুরাকীর্তি বিনষ্ট হওয়ার জন্যে তাঁরাই দায়ী।

॥ পুরাতত্ত্ব থেকে প্রত্নতত্ত্ব ॥

১৮৩৩ সালে জেমস্ প্রিন্সেপ কলকাতা টাঁকশালের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন। একই সময় থেকে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। তাঁরই পরিচালনায় ভারতে পুরাতাত্ত্বিক অনুশীলন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা চলে। শিক্ষা ও চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন পুরোপুরি একজন বিজ্ঞানী। ফলে, তাঁর কর্মপদ্ধতিতে ছিল বিজ্ঞানীসুলভ শৃঙ্খলা ও সংহতি এবং খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে তিনি পর-পর এমন কতকগুলি আবিষ্কার করেছিলেন যার ফল ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির রহস্য ব্যাখ্যা করার কৃতিত্ব তাঁরই। পিয়াদাসী লিপির পাঠোদ্ধার করে তিনিই সর্বপ্রথম সপ্রমাণ করেছিলেন যে সম্রাট অশোকই এই লিপিতে উল্লিখিত শাসনকর্তা। এমনি আরো অনেক কৃতিত্বের মধ্যে তাঁর বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে তিনিই প্রথম সাল-তারিখের পটভূমিতে সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

তবে শুধু নিজস্ব আবিষ্কারের জন্যেই নয়, আরো একটি কারণে তিনি স্মরণীয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা তাঁর মধ্যেই আমরা প্রথম দেখতে পাই। এই উদ্দেশ্যে এক-দল কর্মীও গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের প্রত্নচর্চা তাঁরই হাত ধরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল।

তবে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতটিও সে-সময়ে আয়ত্ত ছিল। তখনো পর্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল এই যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য এমন সব নিদর্শন হাজির করবে যা যাদুঘরে রাখার যোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সাহায্যে যে প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিহাস রচনা করা চলে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের উদ্দেশ্য তাই হওয়া উচিত—এ চিন্তা পরবর্তীকালের।

১৮৪০ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এই অকালমৃত্যু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে এমন একজন উদ্যোগী পুরুষকে অপসৃত করেছিল যাঁর অবর্তমানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকেনি।

তবে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পরবর্তীকালে সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা। ভারতীয় প্রত্নচর্চার ইতিহাসে এই যুগটি অজস্র অবদান সমৃদ্ধ। কয়েকটি স্মরণীয় নামও এই যুগে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর ভারতে মারখাম কিট্টো, এডওয়ার্ড টমাস ও কানিংহাম, দক্ষিণ ভারতে স্যার ওয়াল্টার এলিয়ট, পশ্চিম ভারতে কর্ণেল টেলর, ডঃ স্টিভেনসন ও ডঃ ভাউ দাজী ইত্যাদি।

১৮৪৪ সালের মে মাসে ব্রিটেনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের কাছে দুটি অনুরোধ জানান। একটি অনুরোধে ভারতের বিভিন্ন গুহাচিত্রের প্রতিলিপি চেয়ে পাঠানো হয় এবং অন্য অনুরোধে এমন একটি ব্যবস্থা করার কথা বলা হয় যাতে এই গুহাগুলি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। ফলে ভারতের বিভিন্ন এলাকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে সরকারী আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করার প্রস্তাবও ওঠে।

প্রস্তাবটি কাগজে-কলমে গৃহীতও হয়েছিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশের রাজনীতি এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, ১৮৬১ সালের আগে এই প্রস্তাবটিকে সংগঠনগত রূপ দেওয়া যায়নি। এবং সকলেই জানেন যে ১৮৬১ সালে যে যোগ্য ব্যক্তিটির ওপরে এই সংগঠনের পরিচালনা-ভার অর্পিত হয়েছিল তিনি হচ্ছেন স্বনামখ্যাত স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম।

সংবাদ বিচিত্রা

।। নারী ও পুরুষ ।।

বর্তমানে জার্মানী দু' ভাগে বিভক্ত হলেও একটি সমস্যা উভয় অংশে বর্তমান। উভয় জার্মানীতেই বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর তুলনায় কম। ২০ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ব জার্মানীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশী। এই বয়সের মধ্যে নারীর সংখ্যা পশ্চিম জার্মানীতে পুরুষের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশী। ফলে বিবাহ-সমস্যা বর্তমানে জার্মানীতে প্রবল। কারণ নারী ও পুরুষের এই সংখ্যায় কোনরূপ ভারসাম্য নেই। কিন্তু ফ্রান্সে নারী ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ১১,৫৭১,০০০ ও ১১,৬৩৯,০০০। তাই ফ্রান্সে নারী ও পুরুষের এই সংখ্যায় ভারসাম্য পুরো মাত্রায় বজায় থাকায় মেয়েদের বিবাহ সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা দিতে পারেনি। ফ্রান্স ছাড়া পৃথিবীতে একমাত্র ডেনমার্ক, সুইডেন ও ব্রাজিলেই নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ১৫ লক্ষ বেশী। এ ছাড়া নারী-প্রাধান্য দেশ—মেক্সিকো, কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রিয়া বেলজিয়াম, বৃটেন, স্পেন, ফিনল্যাণ্ড, ইতালী, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়া।

সমস্যা সর্বত্র একরকম নয়। কোনো কোনো দেশে আবার বিপরীত অবস্থা। ভারত ও ব্রহ্মে পুরুষের সংখ্যা নারীর অপেক্ষা ৪০ লক্ষ বেশী। পুরুষ-প্রাধান্য দেশ—কানাডা, ইস্রায়েল, আয়র্ল্যাণ্ড, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ফরমোসা।

বিবাহবিচ্ছেদে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম। প্রতি এক হাজার অধিবাসীতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৪-৪৪টি ক্ষেত্রে। ইতালীতে বিবাহবিচ্ছেদ আইনতঃ গ্রাহ্য নয়। ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী ও ডেনমার্কে হাজারে বিচ্ছেদের হার যথাক্রমে ১-৩০, ২-৩৮ ও ২-৮৬। আর ভারতে ১৯৬০ সালে ৫৯৯৪টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়।

।। ঘুমের খেসারৎ ।।

রাত্রিতে ঘুম না হলে আমাদের অবস্থা যে কি নিদারুণ কষ্টকর হয়ে ওঠে তার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। যারা রাত্রিতে প্রয়োজনীয় কাজ করে তাদের পক্ষে অবশ্য ঘুম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কাজের মাঝে ঘুমিয়ে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা। এমনি এক বিপদে পড়েছিল বাগদাদের হোসেন কাদির নামক জনৈক ব্যক্তি। তার প্রয়োজনীয় কাজ অপরের দ্রব্য না বলে নিয়ে যাওয়া।

এক বাড়ীতে চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে পাঁচিল টপকে ঢুকল হোসেন। কিন্তু বাড়ীর লোকজন তখনও জেগে রয়েছে। আত্মগোপন না করলে বিপদের সম্ভাবনা। তাই সে গিয়ে আশ্রয় নিল এক ডুমুর গাছের নীচে। সেখানে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে। বাড়ীর লোক ঘুমোবার আগে কাদির ঘুমিয়ে পড়ল। আর সাত-সকালে ঘুম ভাঙলো পুলিশের ডাকে।

কাদিরের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। এ ঘটনার দিন চারেক আগে আর এক বাড়ীতে সে চুরি করতে যায়। কিন্তু সেখানেও এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে যখন ঘুম ভাঙল তখন চুরির সময় নেই। সকাল হয়ে গেছে। সে যাত্রা রক্ষা পেলেও এ যাত্রায় সে রক্ষা পেল না। ঘুমের খেসারৎ দিতে হল প্রয়োজনীয় কাজের সময়ে ঘুমোতে গিয়ে।
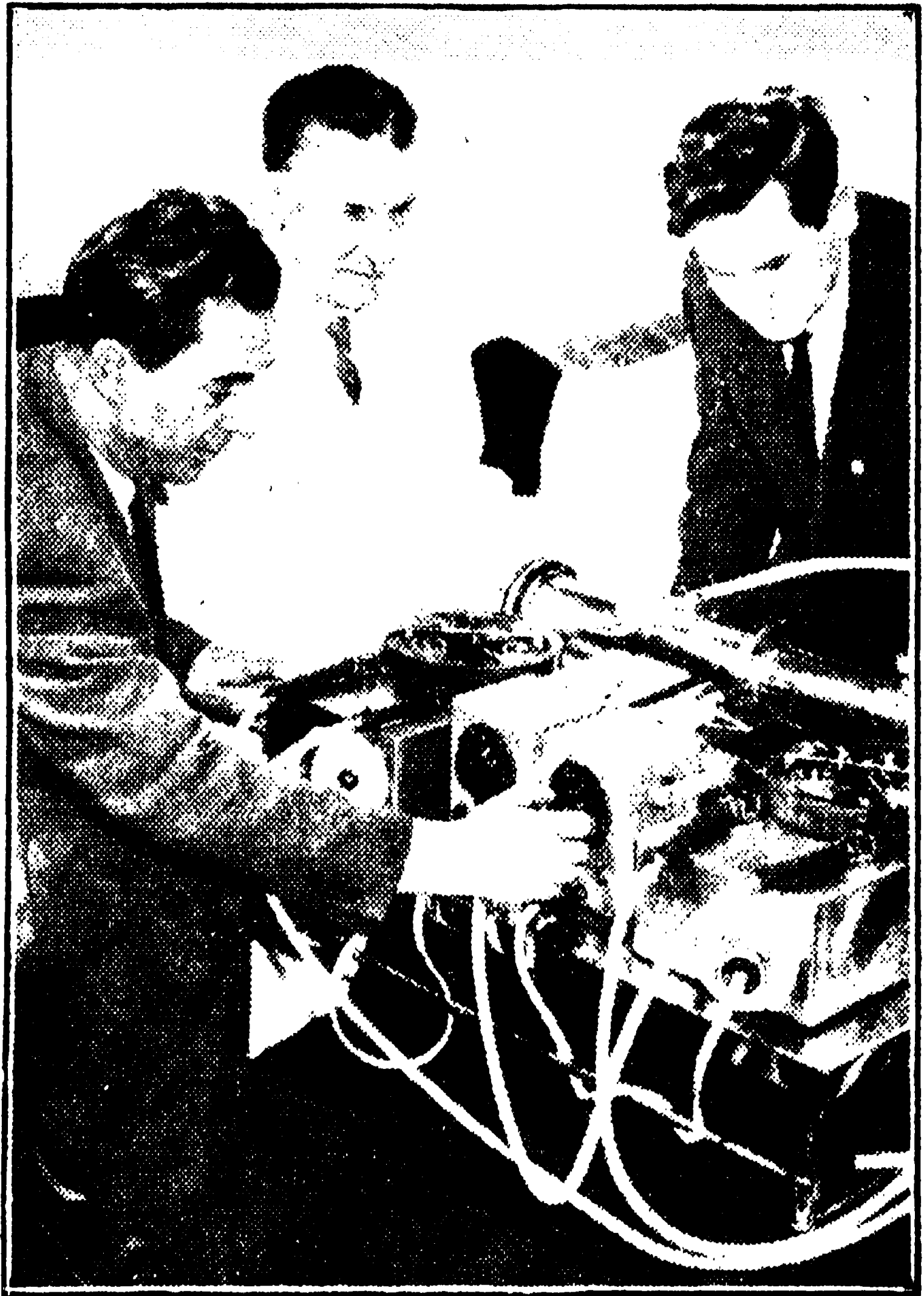
।। কৃত্রিম হৃদযন্ত্র ।।

ওপরের চিত্রটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের। পোল্যাণ্ডের পোজান শহরের কার্ডিওলজিক্যাল সেণ্টারের অধ্যাপক ডঃ জন মল (মধ্যে) এটির আবিষ্কারক। এফ, ক্রুজাক (বামে) এবং ডব্লু, এস জ্যামকোইক (দক্ষিণে) যন্ত্রটি তৈরী করেছেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যন্ত্রটির নির্ভুলতা প্রমাণিত হওয়ায় এখন পোজান ওসাজে বহু গুরুতর হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচার কাজে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ডঃ মল সর্বশেষ যে অস্ত্রোপচার করেছেন সেটি ছিল আট বৎসরের একটি বালিকার ওপর। অস্ত্রোপচারটি সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়। এই আবিষ্কারটি বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচায়ক তো বটেই তাছাড়া বহু মানুষের বেঁচে থাকবার পথে অন্যতম সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এই যন্ত্রের সহায়তায় বহু গুরুতর রোগীর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হবে সহজেই।

দিগন্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পথচারিদের অসুবিধে ঘটানো থেকে বিরত হয়ে দুজনে দুপাশে চলে গেল।

কথা ভাবতে ভাবতে গেল ও প্রশ্নটা না তুললেই হতো। যতই হোক ওর মা।

আর ইন্দ্রনীল ভাবতে ভাবতে চলল গম্ভীর হয়ে মাওয়াটা আমার পক্ষে লজ্জাকর হলো। যতই হোক আমরা আধুনিক। অথচ কেন যে কিছুতেই মনকে মুক্ত করতে পারা যায় না।

মা! কিন্তু নীতারও তো বাবা।

নীতা কত সহজ।

নীতা কত মুক্তমন। কত স্বচ্ছন্দ চিত্ত।

বাপের সম্পর্কে ওর কী মমতা, কী উদার স্নেহ।

ইন্দ্রনীল এত চেষ্টা করছে, তবু কিছুতেই কেন পারছে না মনকে সহজ করে নিতে। পারছে না সারাজীবন বঞ্চিত দুটি মানুষকে ওর মত উদার স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে। না পারে না।

রাগ না আসুক বিরাগ আসে।

চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওদিক থেকে, মন ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে ও চিন্তা থেকে।

আচারে আচরণে আধুনিক হওয়া যত সহজ, মনে আধুনিক হওয়া তত সহজ নয়।

আচ্ছা যদি ইন্দ্রনীলের বাবা বেঁচে থাকতেন, আর ইন্দ্রনীল এ ধরনের ব্যাপার তাঁর জীবনে দেখতে পেত! ভাল করে ভেবে দেখলো ইন্দ্রনীল। সম্ভব হতো। খুব সম্ভব হতো। মেনে নেওয়া যেত বাবার সেই দুর্বলতা।

জগতে সকলের দুর্বলতা ক্ষমা করা যায়, যায় না বোধ হয় শুধু মার।

নীতাও মায়ের ক্ষেত্রে পারতো না।

ইন্দ্রনীলের দৃঢ় বিশ্বাস এটা।

কিন্তু কেন?

সে কথা ইন্দ্রনীল জানে না।

হয়তো মানুষ মাকে সকলের চাইতে শ্রদ্ধা করতে চায় বলে।

হয়তো মাকে পৃথিবীর ধূলি-মাটির ঊর্ধ্বে দেখতে চায় বলে।

কিন্তু জগতে তো বাংলা দেশ ছাড়া আরও দেশ আছে।

হিন্দু সমাজ ছাড়া আরও সমাজ আছে। প্রথা-পদ্ধতির প্রকারভেদ আছে। সেখানে কি মাতৃভক্তি নেই?

প্রশ্নটা করে ইন্দ্রনীল আপন মনের কাছে, উত্তর পায় না।

নীতাও আপন মনের কাছে প্রশ্ন করছে, উত্তর পাচ্ছে না।

ভাবছে জ্যোতির্ময়ের প্রস্তাবেই সায় দেওয়া উচিত ছিল কি না তার!

মায়ালতা বলেছিলেন, 'বেশ তো গারদে দেবার মত পাগল যদি না হয়, আর পাঁচটার বাড়ীতে গোলমাল যদি অসুবিধে হয়, আমাদের কাছাকাছি ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে তোমরাই বাপ-মেয়ে থাক আমরা দেখাশোনা করি। এটা কি হচ্ছে?'

নীতা জুতসই উত্তর না পেয়ে বলে-ছিল 'ফ্ল্যাট তো আজকাল পাওয়া শক্ত।'

মায়ালতা মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'আহা, তোমার এই সুচিন্তা পিসির বাড়ী ছাড়া কলকাতা শহরে আর বাড়ী নেই।'

অগত্যাই তখন বলতে হয়েছিল নীতাকে, 'আচ্ছা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখি। যদি রাজি হন—'

তখন সে প্রতিশ্রুতিটা নিতান্তই স্তোকবাক্য ছিল। কিন্তু এখন নীতা গভীরভাবেই ভাবছে। ভাবছে সুচিন্তার দুরূহ যন্ত্রণাময় অবস্থা দেখে।

হ্যাঁ দুহাতে সবলে আঁকড়ে ধরে-ছিলেন সুশোভন সুচিন্তাকে। যখন মায়ালতা বীরদর্পে বলে উঠেছিল 'একা ফিরে আমি যাচ্ছি না। নিয়ে তোমাকে যাবোই!'

সভয় আর্তনাদ করে সুচিন্তাকে আশ্রয় করতে গিয়েছিলেন সুশোভন মায়ালতার সামনে, সুমোহনের সামনে, নীতা আর নিরঞ্জনের সামনে।

সুচিন্তা অবিচলিত ছিলেন।

স্থির হয়ে গিয়েছিলেন।

সহসা পাথর হয়ে গেলে যেমন স্থির থাকে মানুষ। আর পাথরের সেই পুতুল যেমন অবিচলিত থাকে তেমনি।

কিন্তু ভিতরে যে যন্ত্রণার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তা কি ধরা পড়েনি সুচিন্তার চোখের মধ্যে?

চোখের নীল শিরাগুলো না হলে অমন টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল কেন। কেন সেই লাল শিরাগুলো ফেটে যেতে চাইছিল।

ভয়ঙ্কর একটা দুঃসহ যন্ত্রণার চীৎকার যেন সুচিন্তার মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সুচিন্তার সর্বাঙ্গ থেকে, প্রতিটি লোমকূপ থেকে। সেই চীৎকারকে সংহত রেখেছিলেন সুচিন্তা ওই দুটি চোখের মধ্যে।

সেই চোখ দেখেছে নীতা।

তাই ভাবছে।

ভাবছে আরও বেশী সুযোগ নিতে চাইলে কী দশা হবে সুচিন্তার। আরও সুযোগ নেবার কী অধিকার আছে নীতার।

সুচিন্তা তো সমাজবন্ধ জীব। সেই সমাজবন্ধ, যে সমাজে মায়ালতারা থাকেন।

সুচিন্তা চোখের সামনে একখানা বই খুলে ধরে বসেছিলেন, নীতা কাছে এসে বলল, 'পিসিমা, বইটা কি খুব ইন্টারেস্টিং ?'

সুচিন্তা সচকিতে বলেন, 'কই না তো ? কেন ?'

'দু-একটা কথা বলছিলাম।'

'বল।'

'বলছিলাম, আপনার ওপর তো অনেক অত্যাচার করা গেল, এবার বোধ হয় বাবাকে নিয়ে আমার চলে গেলেই ভাল হয়।'

সুচিন্তা মুখ তুলে বলেন, 'ভালটা কার দিক থেকে বলছ ?'

'সব দিক থেকেই বোধ হয়।'

সুচিন্তা মৃদু তীক্ষ্ণ স্বরে বলেন, হ্যাঁ, তোমার বাবাকে কাছে নিয়ে যেতে পেলে তোমার জ্যেঠিমার সংসারের বিছুটা ভাল হতে পারে।'

নীতা সুচিন্তার ঠিক এ ধরনের মনোভাব আশা করেনি। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, 'আমি তা জানি। কিন্তু আপনার যন্ত্রণাটাও তো চোখে দেখলাম। জ্যেঠিমারা যখন সন্ধান পেয়েছেন, তখন তো বারেবারেই এসে এরকম হানা দেবেন।'

সুচিন্তা স্থির স্বরে বলেন, 'দিক না। প্রকৃত অবস্থাটা তাতে স্পষ্ট হবে।'

নীতা কাতরভাবে বলে, 'এ আপনি রাগ করে বলছেন পিসিমা।'

'রাগ ?' সুচিন্তা হাসেন! হ্যাঁ, হেসেই বলেন, 'না রাগটাগ কিছু করিনি আমি।'

'সে আপনার মহত্ত্ব। তাছাড়া ভেবেছিলাম—কিন্তু সে কথা থাক। বুঝতে পারছি এত লোকলজ্জার ভার বওয়াও কম শক্ত নয়। বাবাকে নিয়ে আমি ফের দিল্লীতেই চলে যাব। আর আট মাস পরেই তো সাগর বিলেত থেকে আসবে, তখন আমি ভরসা পাবো, সাহায্য পাবো।'

সাগরময় সম্পর্কে সব তথ্য সুশোভন সুচিন্তাকে জ্ঞাত করিয়েছেন। একদা সুচিন্তা নীতার বিয়ের কথা তুলতেই উত্তেজিত আনন্দে বলে উঠেছিলেন, 'তুমি কি মনে করেছ সুচিন্তা, আমি নীতার বর যোগাড় করিনি? রাজপুত্তুরের মত বর। সত্যি কি না বল নীতা, তুই তো দেখেছিস? রাজপুত্তুরের মতন নয় ?'

'কি যে বল বাবা। কালো তো।'

হেসে বলেছিল নীতা।

সঙ্গে সঙ্গে চটে উঠেছিলেন সুশোভন।

'কালো তার কি? কালোরা মানুষ নয়? সুচিন্তার ওই ফর্সা ছেলেগুলোর থেকে অনেক ভাল সে।'

'আঃ বাবা, এর মধ্যে আবার সুচিন্তা পিসিমার ছেলেদের কথা উঠছে কেন?' বিরক্তি দেখিয়েছিল নীতা। সুশোভন নিভে গিয়ে বলেছিলেন 'উঠতে নেই বুঝি?'

'না।'

'আচ্ছা থাক। কিন্তু সেই ছেলেটার নাম কি বলতো নীতা?'

'ভাবো না বাবা।'

বলেছিল নীতা কৌতুকহাস্যে।

সুশোভন মাথা নেড়েছিলেন, 'হচ্ছে না।'

তারপর সুচিন্তা নীতাকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিলেন সব তথ্য। আর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল নীতা, শুনে কী এক আশ্চর্যসুন্দর প্রসন্নতায় জ্বলজ্বলিয়ে উঠেছিল সুচিন্তার মুখ।

সেই মুখ দেখে নীতা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বুঝতে পারেনি সুচিন্তার এতটা খুশী হবার কী কারণ থাকতে পারে। সুশোভনের মেয়ের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের বার্তায় এতবেশী নিশ্চিন্ত হলেন সুচিন্তা?

কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

সুচিন্তা নিজেও বুঝতে পারলেন না নীতার বর ঠিক করা আছে জেনে তাঁর বুক থেকে এমন পাষাণভার নেমে গেল কেন? সুচিন্তার ছেলেরা মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা পাবে ভেবেই কি বুক থেকে পাথর নামল সুচিন্তার? তিনিও কি সেই 'মিত্র' আর 'মুখার্জী'র দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছিলেন ?

নাকি পাছে আজীবন সঞ্চিত জীবনপাত্র-ভরা সুধাকে সংসারের গুড়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হয়, এই ভেবে কণ্টকিত হয়েছিলেন? ভেবেছিলেন, ভেবে সারা হচ্ছিলেন অলৌকিককে লৌকিক বন্ধনের মধ্যে বন্দী করে ফেলার মত স্থূলতা আর কি আছে? সুশোভন সুচিন্তার বেয়াই হবেন, এর চাইতে কুৎসিত আর কি আছে?

তাই নীতার জীবনের এই খবর তাঁকে মুক্তি এনে দিল?

কি জানি কি হল সুচিন্তাও জানেন না, নীতাও জানে না। শুধু সেদিন থেকে যেন সুচিন্তা আগের থেকেও শান্ত হয়েছেন স্থির হয়েছেন। সহজও হয়েছেন। হয়েছেন সাগরময় সম্পর্কে সচেতন।

সাগরময় সম্পর্কে সুচিন্তা অবহিত বলেই নীতা বলতে পারলো, 'সাগর এলে ভরসা পাবো, সাহায্য পাবো।'

কিন্তু আজ সুচিন্তা সে ভরসাকে আমল দিলেন না।

নীতাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, 'আট মাস পরে কি হবে তা ভেবে তো আর এখনকার কাজ ঠিক করে ফেলা যায় না। এখন কার ভরসায় সুশোভন দিল্লী যাবে?'

নীতা অবাক বিস্ময়ে বলে, 'কিন্তু আট মাস আগে তো বাবা দিল্লীতেই ছিলেন। কার ভরসায় ছিলেন? তখন তো অবস্থা আরও কঠিন ছিল।'

সুচিন্তা দৃঢ়স্বরে বল্লেন, 'সেই অবস্থাটাকে আবার ডেকে এনে লাভ

ধূমকেতুর মত এসে উদয় হলাম, সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।'

'নিজেকে নিমিত্ত ভেবে অশান্তি পেয়ে লাভ নেই নীতা। যা হবার তা হয়। ভাগ্য তার খাতার হিসেবে চলে।'

'ঘুম থেকে উঠে বাবা কি খাবেন?' বলল নীতা।

আজকাল সুশোভনের সেবা যত্নের সব কিছুই প্রায় সুচিন্তার হাতে চলে গেছে। কেমন করে গেছে কে জানে। আস্তে আস্তে একটা একটা করেই গেছে। তাই সুশোভনের খাওয়ার কথা সে প্রশ্ন করে জানতে পারে।

'ফল তো খেতে চাইছে না আজ, তাই আজ একটা দিশী খাবার করে রেখেছি।'

'দিশী খাবার!'

'হ্যাঁ, সরুচাকলি আর চাঁদের পায়েস!'

'ওমা সে কী, এসব আপনি জানেন?' নীতা উচ্ছ্বসিত হয়, 'আগে আগে বাবা যখন ভাল ছিলেন এইসব পিঠেপুলি সরুচাকলির গল্প করতেন। বলতেন ওঁর পিসিমা সেই সব নাকি বানাতেন একেবারে অপূর্ব। শ্যাম-পুকুরের বাড়ীতে এসেছি একবার পুজোর সময়, বাবা বললেন, পিসিমার মতন সেই সব পিঠে সরুচাকলি বানাও বৌদি, তা জ্যেঠিমা একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'ও সব মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো পাড়াগেঁয়ে ছেলের ভাল লাগত, কেক্ পুডিং খাওয়া সাহেবের মুখে রুচবে না।'

'বাবার ছেলেমানুষী জানেন তো? তবু বললেন, 'তুমি করই না। রোচে কি না দেখ। কি কি লাগবে বলে দাও আনিয়ে দিচ্ছি। জ্যেঠিমা বললেন, দেশ ছেড়ে পর্যন্ত ওসবের পাট তুলে দিয়েছি, ভুলে গেছি।' আমার ইচ্ছে হয়েছিল আমি শিখে নিয়ে বাবাকে খাওয়াই, কিন্তু কার কাছেই বা শিখি বলুন? আজ আপনি নিজে থেকেই—আপনার কাছে আমি শিখে নেব পিসিমা।'

'দেখ আগে তোর বাবার মুখে রোচে কি না।' সুচিন্তা ঈষৎ হাসলেন, 'আসলে তো অনেক জিনিসকেই আমরা একটা ভাবরূপ দিয়ে মনের মধ্যে লালন করে থাকি, একদার ভাললাগাটাকে স্মৃতির কৌটোয় তুলে রাখি সুখের রসে জারিয়ে। মনে ভাবি এমন আর হয় না। যতক্ষণ সে সেই কৌটোর মধ্যে বন্দী থাকে ততক্ষণ অবিকৃত থাকে, রোমাঞ্চময় হয়ে থাকে, তাকে টেনে বার করে যদি নতুন করে উপভোগ করতে চাই সবটাই ভেঙে যায়, বিকৃত হয়ে যায়। ছেলেবেলার স্মৃতি এমনি একটা জিনিস। অবিশ্যি সব ক্ষেত্রে সমান নয়, উপভোগ করতে জানাও একটা আর্ট, সে আর্ট যাদের জানা থাকে তারা সব কিছুই সুন্দর করে তুলতে পারে।'

কথা চলছিল, হঠাৎ কথা বন্ধ করতে হল, ঘরের মধ্যে থেকে একটা ভয়ার্ত স্বর ভেসে এল, 'নীতা নীতা!'

নীতা সুচিন্তা দুজনেই উঠে গেলেন তাড়াতাড়ি।

দেখা গেল সুশোভন বিছানার ওপর উঠে বসে আছেন একটা চাদর গলা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে জড়িয়ে। চোখে সেই প্রথম দিককার মত একটা ব্যাকুল অসহায় দৃষ্টি। যে দৃষ্টি ইদানীং আর আদৌ দেখা যেত না।

'কি হল?'

সহজভাবে প্রশ্ন করলেন সুচিন্তা কাছে গিয়ে।

'ওরা চলে গেছে?' ফিস্‌ফিস্ করে বলেন সুশোভন।

'কারা? কারা চলে গেছে?'

'ওই যে যারা আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

নীতা বোধকরি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুচিন্তা ঝরঝরিয়ে হেসে ওঠেন, 'ধরতে আবার কে এসেছিল! কী আশ্চর্য সুশোভন, এতখানি বয়েস হল তোমার এখনো ঠাট্টা বুঝতে শিখলে না?'

'ঠাট্টা!' যেন অবাক হয়ে তাকান সুশোভন।

'নিশ্চয়। ও তোমার বৌদি হয় না? বৌদিরা ঠাট্টা করে না? জিগ্যেস কর নীতাকে। এতটুকু মেয়ে ও পর্যন্ত জানে।'

সুশোভন আস্তে গায়ের চাদরটা নামিয়ে দেন, বলেন, 'নীতা, সুচিন্তা তো ঠিক কথাই বলে—তাই না?'

'হ্যাঁ বাবা, পিসিমা সব সময় ঠিক কথা বলেন।'

'তাহলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে না?'

'মোটেই না।'

'চলে গেছে ওরা?'

'সেই কখন।'

'রাগ করে চলে যায়নি তো?' আবার একটা ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে সুশোভনের চোখে।

'কী আশ্চর্য, রাগ করবে কেন?' সুচিন্তা বলেন, 'দেখলে না কত গল্প করছিল আমার সঙ্গে!'

'না! তোমাকে বকছিল ওদের বড় বৌ।'

'কি যে বল সুশোভন। ওদের বড় বৌয়ের তো ওই রকমই কথা। মনে নেই তোমার? সকলের সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। মোহন কি বকেছে আমায়?'

'মোহন! মোহন! আমার সেই ভাইটা?' চেঁচিয়ে ওঠেন সুশোভন, 'ও ভাল ছেলে।'

'তাই তো বলছি। সবাই তো ভাল ওরা।'

'না। বড়বৌ ভাল নয়। ও আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

সুচিন্তা এবার গম্ভীর হয়ে যান, গম্ভীর আর গভীর স্বরে বলেন, 'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না কেন সুশোভন? আমি বলছি আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'পারবে না? কেউ পারবে না?'

'না কেউ পারবে না—বিশ্বাস কর আমার কথা।' আস্তে সুশোভনের পিঠের ওপর একটা হাত রাখেন সুচিন্তা, আরও গভীর স্বরে বলেন, 'শুধু যদি তুমি নিজে—'

কিন্তু সেই মৃদু কথা উদভ্রান্ত পাগলের কানে ঢোকে না।

তিনি সহসা উৎফুল্ল স্বরে বলেন, 'নীতা শুনেছিস তো?'

'শুনলাম বৈকি বাবা।'

'উঃ। শুধু শুধু কী ভয়টাই পেয়েছিলাম। আমি কি জানি সব ঠাট্টা, সব ঠাট্টা। জানি কি সুচিন্তার গায়ের জোরের সঙ্গে কেউ পারবে না। আমায় খেতে দাও তো সুচিন্তা। কখন থেকে খিদে পেয়েছে, ভয়ে তোমাদের ডাকতে পাচ্ছি না। চাদরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছি।'

(ক্রমশঃ)

চায়ের ধোঁয়া

(ছয়)

॥ সংগীত ॥

পরিচালক : বাংলা নাট্যশালায় সংগীতের ব্যবহারও অভিনেতা মহোদয়ের একাধিপত্যে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ আবহ-সংগীত জিনিসটাই সৃষ্টি হয়নি। সংগীত তার নিজস্ব রূপে নাট্যশালায় বিকশিত হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই মানবেন। নাট্যশালার সংগীত ভিন্ন জিনিস। এই নাট্যসংগীত সৃষ্টি হয়নি।

দার্শনিক : নাট্যশালার সংগীত স্বাধীন নয়, এটা মানছি। সংগীত শ্রেষ্ঠ কলা। নিকৃষ্ট কোনো কলার পরিসরে সে নিজেকে মেলে ধরবে কি করে?

পরিচালক : শুধু শ্রেষ্ঠ কলা বললে ভুল হবে। সংগীত এবস্ট্রাক্ট কলা; সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ, বিমূর্ত। অথচ নাট্যশালার সংগীতকে কোনো একটা বিশেষ পরিবেশ, বা বিশেষ আবেগকে রূপ দিতে হয়। ওরকম সুনির্দিষ্ট কাজে সংগীতকে নিয়োজিত করা অসম্ভব।

ভাষাবিদ : এটা কি ঠিক বলছেন? পাশ্চাত্য সংগীতে যাকে ডিস্ক্রিপটিভ মিউজিক বলে তাতে তো যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবতার ধ্যান দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধরুন চাইকোভ্স্কির-র "১৮১২ ওভার্চার"; নেপোলিয়নের মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণ অবলম্বনে রচিত। স্পষ্টই এর মধ্যে তুষার-ঝড়, সৈন্যদের ক্লান্ত পদক্ষেপ এবং অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শোনা যায়। এক্ষেত্রে সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ না হয়ে একান্তভাবেই বাস্তব-ভিত্তিক।

নাট্যকার : আবার দেখুন রসিনি-র "বার্বার অফ সেভিল্" ওভার্চার; যেখানে একটি অতীব আমুদে চরিত্রের মনোবিকলন করা হয়েছে। ফিগারো-চরিত্র হাসছে, গাইছে আর খাটছে প্রভুর মনোরঞ্জনার্থে। এই ফিগারো-র চরিত্র হচ্ছে ঐ ওভার্চারটির বিষয়বস্তু। এখানেও সংগীত বিমূর্ত নয়।

পরিচালক : আপনারা যে উদাহরণ দুটি দিলেন, দুটিই ওভার্চার। আর ওভার্চার মানেই অপেরা-র সংগীত। অপেরা তো নাট্যশালার ব্যাপার। অপেরায় গল্প আছে, অভিনয় আছে, ঘটনা আছে, চরিত্রবিশ্লেষণ আছে। অপেরা হোলো নাটকেরই আরেক রূপ। সেই অপেরার জন্যে লেখা সংগীতকে খাঁটি মার্গ সংগীত বলছেন কি করে?

উৎপল দত্ত

উপরন্তু ঐ ওভার্চারগুলোর ভিত্তিতেই আধুনিক থিয়েটারের সংগীত রচিত হবে। খাঁটি মার্গ সংগীতে বাস্তবের আঁচ যা একটু পেয়েছি তা হচ্ছে বেঠোফেন-এর "ষষ্ঠ সিম্ফনি"তে। প্রথম চারটে খণ্ডই প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগীতকারের উচ্ছ্বাস নিয়ে রচিত। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পাখীর ডাক এবং চতুর্থ খণ্ডে ঝড়ের গর্জন একেবারেই বাস্তব-ভিত্তিক। কিন্তু দেখুন শেষ খণ্ডে সমস্ত বাস্তবকে অতিক্রম করে 'মেষপালকদের স্তব-সংগীত' এক বাস্তবোত্তর জগতে পৌঁছে গেছে। বেঠোফেন-এর এই সিম্ফনিটি ছাড়া পাশ্চাত্য মার্গ সংগীতে তথাকথিত বাস্তবতা কোথাও আমার কানে বাজে নি। শুবের্ট দেখুন, ব্রাহ্‌মস্ দেখুন, দেখুন বেটোফেন-এর বিখ্যাত পঞ্চম বা নবম সিম্ফনি।

ভাষাবিদ : আধুনিক সংগীতকারের সংগীতে যে মেশিন-এর ঝংকার শোনা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কি বলবেন? যেমন স্ট্রাভিন্স্কি।

পরিচালক : পাশ্চাত্য সংগীত যুগে যুগে রচিত হয়ে চলেছে। মেশিনের ঝংকার যা শুনছেন তা সংগীতকারের আধুনিক মনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন। মেশিন-যুগের সংগীতকারের মধ্যে সংগীতের নিটোল মিঠে সুর যদি না বাজে তাকে কি আপনি বাস্তবভিত্তিক বলবেন? এঁদের সংগীত যদি পুরোনো হার্মনির তত্ত্বকে ভেঙে গুঁড়িয়ে,

আরপেজিও আর মেজর-মাইনরের বন্ধন ভেঙে জাজ আর মার্গ সংগীতের তফাত ঘটিয়ে নতুন রঙ্গে, "অমার্জিত" সুর সৃষ্টি করে, তবে তা যুগের দাবীতেই করছে। তাকে বাস্তব-ভিত্তিক বলা ভুল। কোনো বিশেষ আবেগ, বা বিশেষ চরিত্র, বা বিশেষ ঘটনাকে তো এ'রা রূপ দিচ্ছেন না। এ'রা নবযুগের সামগ্রিক আবেগকে তুলে ধরছেন। জর্জ মাহ্লের-এর "সং অফ দি আর্থ" শুনুন; আমার কথা পরিষ্কার হবে।

ভাবাবিদ : প্রোকোফিয়েফ-এর "লাভ অফ দি থ্রি অরেঞ্জেস"?

পরিচালক : সে তো বাস্তবভিত্তিক হবেই; আবার অপেরার কথা তুলছেন? হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভারতীয় মার্গ সংগীতে তো বাস্তবের কোনো রেশই নেই। খাঁটি এব্স্ট্র্যাক্ট সংগীত হোলো ভারতের মার্গ সংগীত, আমাদের রাগরাগিণী।

নাট্যকার : বাস্তবের রেশই নেই—একথা মানতে পারলাম না। ঋতু-সংগীত দেখুন—বসন্ত বা বাহারে একটি বিশেষ ঋতুর ছায়া আসছে কিনা! মল্হারে বর্ষার রূপ ধরা পড়ছে না? আবার দেখুন প্রাতগেয় এবং রাত্রিগেয় রাগের পার্থক্য নেই? ভৈরোঁ রাগে ভোরের চেহারা স্পষ্ট। কেদারে চাঁদনি রাতের আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

পরিচালক : দেখুন, যে কোনো অভিব্যক্তির জন্যে সিম্বলিজম্ চাই, একটা আত্মলব্ধ সংকেত চাই। সংগীত-বিশারদ রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ভাষায় "আত্মার প্রয়োজনে" এই সংকেতের সৃষ্টি, "আত্মার প্রয়োজনে তার জন্ম, আত্মার একত্বে তার পরিণতি"। ভারতীয় রাগসংগীতের কলাকৌশলের পুরোটাই এই সিম্বলিজম্। গানের ঋতু বা সময় এই ধরণের সিম্বলিজম্-এর প্রকাশ। একটা ভিত্তি ঠিক করে নিয়ে গায়কের আত্মার প্রকাশের ব্যবস্থা। ঐ ভিত্তিটুকুকে প্রধান করার কথাই উঠতে পারে না। ভৈরোঁ-র কোমল রেখাব এবং কোমল ধৈবতে ভোরের ছোঁয়া থাকতে পারে। কিন্তু ভৈরোঁ-র দ্রুত তাল যখন শুরু হয় তখনো কি বলতে চান ভোরের আভাস পান? বাহার-এর তান দিতে গেলে বক্রভাবে দিতে হয়; সরল তান দিলে হুড়মুড় করে অড়ানা, বাগেশ্রী প্রভৃতি ঢুকে পড়বে; সেই বক্রতানেও কি বসন্ত ঋতুর চেহারা পান? আর বড় ওস্তাদের কাছে প্রাতর্গেয়-রাত্রিগেয় প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে গেছে। "বসন্ত" রাগের কথা বললেন; বসন্ত শেষরাত্রে গাওয়ার কথা। আমি মাঝরাত্রে বসন্ত শুনেছি উস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে; সকালে রোদ ওঠার পর শুনেছি নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে দুটোই সংগত মনে হয়েছে; আমার কিস্যু অসুবিধে হয় নি। ভৈরবী গাওয়া হবে কখন? ভর-সন্ধ্যের ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গলায় শুনেছি: মনে হয়েছে—হ্যাঁ, এ রাগ সন্ধ্যেকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। সেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ভোরবেলার শুনেছি—বাজু বন্দ খুলে খুলে যাউ—মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এ তো ভোরেরই রাগ। আবার এই সেদিন ওস্তাদ লতাফৎ খাঁ সাহেব ভৈরবী গাইলেন মাঝরাত্রে—মনে হোলো, এ তো রাত্রেরই রাগ। মলহারে বর্ষার রূপ ফোটে, ঠিক কথা। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপও ফোটে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ধ্রুপদ শুনেছেন—"বরসাত ঘন শ্যাম"? বিলায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের খেয়াল শুনেছেন—"মহম্মদ শা রংগীলে? "করিম নাম" খেয়ালটিতে তো বর্ষার রূপ নেই, যদিও মিয়া কি মল্হার রাগে রচিত। এই রাগে 'বরসন লাগীরে বদরিয়া" গানও যেমন আছে; "বোলি রে পপৈয়া" গানও লেখা হয়েছে। না, আমার মনে হয় ঋতু বা সময় রাগসংগীতের একটা কাঠামো মাত্র। ভেতরের রক্তমাংসটা একেবারে এব্স্ট্র্যাক্ট। মল্হারের ধমার শুনেছিলাম উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে; আমার কানে মেঘগর্জন বা বাতাস ধ্বনিত হয়নি; হয়েছিল "খেলন আয়ে", অতীব চটুল চপল একটি নারীর মূর্তি। আবার সেই খাঁ সাহেবের ছায়ানটে খেয়াল শুনেছি, যেখানে ঝড়-বাতাসের নামগন্ধ থাকার কথা নয়; অথচ দমকা ভিজে বাতাসে বারবার মনে দোলা লেগেছিল। কেদারে চাঁদনি রাতের ছায়া আমি কোনো উস্তাদের কণ্ঠে পাইনি; ও শুধু বইয়েই পড়েছি। অথচ সংগীত-রসিকশ্রেষ্ঠ অমিয় সান্যাল মহাশয় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কেদারে ভিন্ন রূপ পেয়েছেন; উনি দেখেছেন—পঞ্চম যেন মহাবীর; বারবার সে পৃথিবী সেঁচে নানা উপঢৌকন এনে লাস্যময়ী মধ্যমার পায়ে নিবেদন করছে; কিন্তু মানিনীর মান ভাঙছে না। না, মশায়রা, রাগসংগীতে নিছক বাস্তবকে খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।

নাট্যকার : সেইখানেই তো গণ্ডগোল! বাস্তবের সঙ্গে আমাদের রাগ-সংগীতকে যদি একেবারেই জুড়তে না পারা যায়, তবে তো নাট্যশালায় রাগ-সংগীতকে ব্যবহার করা অসম্ভব।

পরিচালক : এব্স্ট্র্যাক্ট্ নি? রাগ-সংগীতকে নিজস্ব রূপে ব্যবহার করা অসম্ভব। আরো দেখুন, শুধু যে সময়-ঋতু-ঝড়বৃষ্টি-চাঁদ এ সংগীতে নেই তা নয়; আবেগকেও প্রাধান্য দেয়া এ সংগীতে চলে না। আবেগের বাড়াবাড়িতে ঠুমরি সৃষ্টি হয়, খেয়াল হয় না; ধ্রুপদ-ধমার তো নয়ই। আবেগের কাতরতা

নিকৃষ্ট কলার অংগ। মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আবেগকে অতিক্রম ক'রে মহৎ-ভাবের সঞ্চার করে। মশাই, চোখে জল আসে "অরক্ষণীয়া" পড়ে; কিন্তু "হ্যামলেট্" পড়ে চোখ সিক্ত হয় না, বুক ভরে যায়। ভারতীয় রাগসংগীতের বেলায়ও তাই। রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলছেন, "মনের দিক দিয়েও রাগের গোড়ার কথা প্রশান্তি; আবেগ অথবা উদ্বেগহীনতা......গান করতে বসে সুর যদি নিতান্ত করুণ হয় তাতে আবেগের যাথার্থ্য প্রমাণ হয়, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না।" এই সম্রাটোপম প্রশান্ত রাগ-সংগীতকে থিয়েটারের গোয়ালে আটকাবে কে?

ভাষাবিদ ঃ তবে এতকাল ধরে বাংলা নাট্যশালা কি সংগীত চালিয়েছেন? নবনাট্য আন্দোলনই বা সংগীতকে কি করতে চাইছেন?

পরিচালক ঃ এতকাল বাংলা নাট্য-শালা সমস্যাটার সম্মুখীনই হয়নি। সমস্যাটাকে এড়িয়ে গেছে। যাত্রার হার্মোনিয়াম, কর্নেট, বাঁশি, ক্ল্যারিনেট, বেহালার সংগে জুড়েছে অর্গ্যান; এই বিচিত্র অর্কেস্ট্রা দিয়ে যাত্রার সুর বাজিয়েছে। অর্থাৎ দেশ, বাগেশ্রী বা খাম্বাজ রাগকে ভিত্তি ক'রে একটু কনসার্ট বাজিয়েছে। তাও ড্রপ ওঠার আগে বা ড্রপ পড়লে পরে। নাটকের মধ্যে বেজেছে শুধু একটু যুদ্ধের বাজনা। এ ছাড়া নাটকের মধ্যে রাগ-ভিত্তিক গান দেয়া হয়েছে পাঁচ-সাতখানা ক'রে; দু-একটি গান ছাড়া এরা নাটকের বিষয়বস্তু বা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন; সুতরাং এরা নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে। মোটকথা সংগীতকে আমলই দেয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম গানকে সত্যিকারের ব্যবহার করে দেখালেন কিভাবে গানের কথার সংগে, সুরের সংগে নাটকের সাযুজ্য ঘটাতে হয়। "রক্তকরবীতে" "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"টা ভাবুন। বা "অচলায়তনে" "কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন"। অথবা "তপতীতে" "তোমার আসন শূন্য আজি"। একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে যখন আর কথায় কুলোয় না, তখনই যেন নাটকটি গানের সুরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এও আবহ-সংগীত নয়। এ-ও গান। আবহ-সংগীত অন্য জিনিস। সে ভাষাহীন। সে স্বাতন্ত্র্যহীন। সে একান্তভাবেই নাটকের অংগ। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে এগোননি।

হাসতে মানা

"নিজের মাথার কথাই তো খালি খালি বলছেন, আর এদিকে আমার একখানা সিওর বাউন্ডারি যে নষ্ট হল সেটা বুঝি কিছু নয়—এ্যাঁ?"

নাট্যকার ঃ গণনাট্য সংঘ কিছু করেছেন?

পরিচালক ঃ চেষ্টা করেছেন, পারেননি। আগেই বলেছি গণনাট্য সংঘ পুরোনো নাট্যশালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সেই নাট্যশালারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; অভিনেতাকে একেবারে একমাত্র অধিপতি করে তুলেছেন। তাই সংগীতকে তাঁরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারবেন না—এ আর আশ্চর্য কি? না, গণনাট্য সংঘও আবহ-সংগীতকে রচনা করে নিতে পারেননি। তারপর পেশাদার এবং অপেশাদার অভিনয়ে এল আর এক দৌরাত্ম্য; ঐ কনসার্টের নূতন রূপ—ইলেকট্রিক গিটার আর ঝাঁজ। এ'রা কনসার্ট ছাড়াও আবহ-সংগীতের খোকামি শুরু করলেন। এখনও তাই চালাচ্ছেন। এই আবহ-সংগীত কিরকম জানেন? ধরুন নায়ক বললেন, মীরা, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর আমাদের দেখা হবে না। মীরা বললেন, ওগো কেন? সংগে শুনবেন বেড়ালের ডাক। মানে গোড়ায় মনে হবে বেড়ালের ডাক, তারপর বুঝবেন ওটা গিটার আর বাঁশি; ওঁরা করুণ-রস সৃষ্টি করছেন। ধরুন খল-নায়ক বললেন, কোথায় যাচ্ছ মীরা? অসীমকে আমার গুন্ডারা খুন করেছে! এই কথাগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝাবার জন্যে সংগে সংগে বিষম হট্টগোল করে ঝাঁজটাঁজ বেজে উঠবে। এগুলো বাঁধা ফর্মুলো। আর একর্ডিয়ন, গিটার প্রভৃতি সংযোগে যে কনসার্টটা বাজে সেটাতে রাগের ভিত্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশঃ মার্কিন ফক্স্-ট্রটের সুর ধ্বনিত হতে শুরু হয়েছে। খুবই দুঃখের বিষয় প্রান্তিক-এর "বিশে জুন"-এর মতন নাটকে মার্কিন সংগীতের নাম ক'রে "টাকিশ পোলের" মতন জঘন্য শস্তা সংগীত বাজিয়ে নাটকের আবহাওয়ার বারোটা বাজানো হয়েছে। নাটকের সংগীতকার বোধহয় জানেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ল্যাসি-ক্যাল সংগীত আছে!

নাট্যকার ঃ মধু বসু-র ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর সংগে তিমিরবরণ

চেষ্টা করেছিলেন তো সত্যিকারের আবহ-সংগীত সৃষ্টি করতে।

পরিচালক ঃ করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা ব্যর্থ হোলো কেন জানেন? তিমিরবরণ বুঝেছিলেন—খাঁটি রাগ-সংগীতকে থিয়েটারে আনা অসম্ভব। অথচ একটা নাটকের সংঘাত-আবেগ প্রভৃতিকে রূপ দিতে গেলে কনসার্ট বাজালে চলবে না, আবার গিটার-ঝাঁজের গাধামিও চলবে না। উনি বুঝেছিলেন নূতন ধরণের অর্কেষ্ট্রা প্রয়োজন। অর্কেষ্ট্রাই পারে নানাধরণের শব্দসমষ্টি সৃষ্টি করতে। শব্দ; সংগীত নয়। শব্দ কখনো এলোমেলো হবে, কখনো ধীর-মধুর হবে, কখনো বা আবার গর্জন করে উঠবে। কিন্তু রাগসংগীতের প্রশান্ত গভীর সুরে সে রকম বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম; সে বৈচিত্র্য আনলে সেটা আর রাগ-সংগীত থাকতো না। অতএব তিমিরবরণ স্বরোদ-সেতারের সংগে আরো বহু যন্ত্র জুড়ে সুরসৃষ্টি করতে বসলেন। কিন্তু রাগসংগীতের বন্ধন কাটাতে পারলেন না। পিলু বা বাহার রাগের নির্দিষ্ট সরগমকে অতিক্রম করতে পারলেন না। ফলে তাঁর সংগীত এদিকেও গেল না, ওদিকেও গেল না। অর্কেষ্ট্রা ব্যবহার করব, অথচ মেলোডিকে ভাঙতে পারবো না—এরকম দ্বিধায় পড়লে সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্কেষ্ট্রাকে মানলেই পাশ্চাত্য সংগীতের ডায়াটোনিক স্কেলকে মানতে হবে, থিয়োরি অফ হার্মনিকে মানতে হবে। তিমিরবরণ পারেননি হার্মোনি সৃষ্টি করতে।

ভাষাবিদ ঃ আপনারা কি তাই চাইছেন? আপনারা কি ভারতীয় নাট্য-শালায় হার্মোনি চালাবেন? রাগ-সংগীত বিসর্জন দেবেন?

পরিচালক ঃ রাগসংগীতকে বিসর্জন তো দেবই, কারণ সংগীতকেই যে বিসর্জন দেব। আমরা চাইছি নাট্যশালার আবহ-সংগীত। কোনো সংগীতকেই সেখানে স্বকীয়তা নিয়ে আসতে দেব না; আবহ-সংগীত মানেই পরাধীন সংগীত। সমগ্র নাটকের মধ্যে সে লুপ্ত। রাগসংগীত সেখানে বিদ্রোহ করে বসবে। অন্যপক্ষে বেঠো-ফেনও সেখানে বিদ্রোহ করে বসবেন। নাট্যশালা চাইছে রাগসংগীত-বেঠোফেন সর্বকিছুকে জড়িয়ে একটা নতুন সংগীত। আর আমার মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য হার্মোনি-র থিয়োরি এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ হার্মোনি-র ব্যবহারে শব্দ-সমষ্টির নানা বৈচিত্র্য আনা যায়; মিঠে-মধুরের মায়া কাটানো যায়; প্রয়োজনমত সংগীতকে নানা পর্দায় নানা কম্বিনেশনে দৌড় করানো যায়। আসল কথা হচ্ছে, রাগসংগীতের কঠোর নিয়ম আমরা গানের আসরে মানবো, থিয়েটারে নয়। আসরে কোনো ওস্তাদ যদি দরবারি-তে কোমল-গান্ধার ঠিকমতো না লাগাতে পারেন তবে রেগে যাবো। কিন্তু থিয়েটারের ওস্তাদ যদি গান্ধার-বর্জিত এক দরবারি রচনা করে বসেন আর সেটা যদি আমার নাটকের রূপকে প্রতিফলিত করে তবে আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করবো। "কেরানী ফৌজ"-এর আবহসংগীতে যোগ নায়কি কানাড়া প্রভৃতি ব্যবহার হয়েছে; অথচ বারবার সব নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউণ্টার পয়েণ্ট গর্জন করে উঠেছে, "যোগ" রাগ হঠাৎ মালকোশের দিকে ছুটে দিয়েছে, নানা যন্ত্রের নির্ঘোষ হঠাৎ মূল সুরটিকে চেপে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে "কেরানী ফৌজের" উদ্দাম বিপ্লবীদের জীবন ঐ রকমই হয়। সেই বাঁধনছেঁড়া জীবনকে প্রকৃত রূপই দিয়েছেন রবিশংকর। "অংগারে" জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্যে পুরো অর্কেষ্ট্রার স্থান দখল করেছে একটি সেতারের ঝালা—সেটিকে তখন যথার্থ জলের তোড় মনে হয়েছে বলেই তা সার্থক। আবার প্রথম দৃশ্যের শেষে সনাতনের 'জান বাঁচাও" চীৎকার থেকে ধরে নিয়ে যে সংগীতাংশটি, তা খাঁটি য়ুরোপীয় রীতিতে সৃষ্ট; কিন্তু নাটকের ঐ মুহূর্তটিকে অকস্মাৎ বিরাট বৃহৎ করে তুলেছে বলে ওটিও সার্থক।

নাট্যকার ঃ উঃ, থামুন দিকি মশায়! আর এক রাউণ্ড চা হোক!

পিতামহ

শক্তিব্রত ঘোষ

হঠাৎ দাদুর কথা মনে পড়ল বাসনার। একবার কাঁদতে ইচ্ছে হলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শরতের দিন একটু আগেও প্রখর ছিল আলোয় আর রোদে, এরই মধ্যে নিভে এলো সব। সূর্য হারিয়ে গেছে আম আর জারুল গাছের আড়ালে ঠাকুরপাড়ার ওধারে, ছায়া এতক্ষণে নিস্তব্ধ হিমে করুণ হয়ে নেমেছে যে-পথে সে বাড়ি ফিরে যাবে।

বাড়ি আর কতটুকু পথ? এক মাইল, খুব বেশি হলে। কিন্তু এ পথে যেতে যেতে বাসনা বার বার সময়ের কথা ভুলে যায়। ছায়ার রঙে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। মাটি আর উদ্ভিদের গন্ধে নিজের দেহের রক্তের প্রসাধন খুঁজে পায়। মেঘনার ধার থেকে ধুলোয় মাখামাখি যে সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সে ফিরে আসতো ছেলেবেলায়, চালতে আর গাব-বনের ঠাণ্ডা নিশান্ত ছায়ার পথে, তাদের কথা মনে পড়ে।

ছেলেবেলাই বলে তাকে বাসনা। মাত্র দুটো বছর আগে হলেও সেটা তার ছেলেবেলা, এই দু-বছরের ব্যবধানে সে বড় হয়ে উঠেছে। পথে হাটিতে হাটতে কোনো সখনো আগের সে বাসনাকে খুঁজে পেলে তাকে সে অনুকম্পা করে; এখন নিঃসাড় দৃষ্টি মেলে তার দিকে একবার স্তব্ধ হয়ে তাকায়।

সেই রোগাটে, ছিপছিপে, শ্যামবর্ণা মেয়েটি আজ আরো কৃশ হয়েছে, কিন্তু দেহে তার আসংগা মাংস লেগেছে। শরীরের কোথাও কোথাও টনটন ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। বাসনা জানে তের বছরের মেয়ের দায় অনেক। কিন্তু বাবা কি জানেন সে-কথা? জানলে কি কখনো সেই সাতভোরে নিজে কারখানায় যাবার আগে তাকে পথে বার করে দিতেন যা-হোক একটা কারণ দিয়ে? মা কি জানেন না রাজপুরের বাজারটা খারাপ, এখানকার দোকানদারগুলো ও রিক্শাওয়ালারা কি চোখে দৃষ্টি নিয়ে যে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাসনা বুঝতে শিখেছে, সৎ-মা সব জেনেই সৎ-মেয়েকে রাজপুরের বাজারে পাঠায়।

—হু-ই-শ্-শ্

একটা বিদঘুটে শব্দে বাসনা ফিরে তাকায়। তাকিয়ে দেখে সেই চোয়াল-উঁচু ছেলেটা, রাস্তার ওপাশ থেকে আসতে আসতে তাকে ইশারা করে ডাকছে।

বাসনা জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছ?'

ছেলেটা ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বাসনার গা ঘেঁসেঘেঁসে। বাসনা একটু সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ ওর হাত ধরে ফেলল।

'তুই না কাজ খুঁজছিলি? কাজ করবি?'

খুশী হতে যাচ্ছিল বাসনা। কিন্তু কোথায় যেন একটা টান পড়ল ভিতরে। তবু বলল, 'হাঁ, খুজছিলাম তো। করব কাজ। কোথায়?'

বাসনা দেখল ছেলেটির দাঁতগুলো পানের ছোপে কুৎসিৎ।

'আয়' বাসনার হাত ধরে টানলো ছেলেটা, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

বাসনা হাতটা ছাড়িয়ে নিলো একটু জোর করে।

'এখন কোথায় যাবো? রাতে আবার কাজ কি?'

ছেলেটার দাঁতগুলো চামড়ার আড়ালে লুকলো। ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিলো একবার। একটু সরে এসে বাসনার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

'চেহারা দেখে তো মনে হয় না বয়েস কম হয়েছে', ছেলেটির মুখের দুর্গন্ধে বাসনার গা শিউরে উঠলো, 'রাতের কাজ অর্থ জানো না?'

আবছায়া-ঘেরা সায়াহ্ন-পথে অনেক দূর থেকে যেন দাদুর ডাক শুনতে পেল বাসনা। 'সোনা, সন্ধ্যা হয়ে গেল যে, এলিনে এখনো? শাঁখ বাজাবি না? আয় তাড়াতাড়ি। দীপ দেওয়ার কাজ শেষ করে নে। গল্প শুনবি না তারপর?'

গল্প শোনার সময়। সন্ধ্যা-প্রদীপের লগন। তার মৃদু আলোয় বৃদ্ধের কোলে মাথা রেখে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রামায়ণের গল্প শোনার সময়।

হঠাৎ দাদুর কথা মনে পড়লো বাসনার। একবার কাঁদতে ইচ্ছে করলো।

বাবা এতক্ষণে ফিরে এসেছেন হয়তো। বরানগরের তেলের কারখানায় সারাদিনের ক্লান্তির পর ফিরে এসেছেন

ঘরে। মা রুটি আর গুড় দিয়ে একটা কলাই-করা প্লেট এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাবা কি এসে জিজ্ঞাসা করেছেন একবার, 'বাসনাকে দেখছি না?' মা উত্তরে কি বলেছেন? 'এখনো ফেরেনি?' শুধু এইটুকু? 'ও-মেয়েই দেখো মুখ পোড়াবে তোমার; রাত তো কম হ'লো না, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে দেখো।' এ নয় তো! হয়তো। কিন্তু এক মিনিট। কি আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর নানা কথা আর হাসির স্রোতে ভরে উঠবেন তারা। কলাই-করা প্লেট শূন্য করে, হাতল-ভাঙা চায়ের কাপটা নিয়ে বসে। নানান কথার স্রোতে।

বাবা ভুলে গেলে, তারপরেও আরো কিছু থাকে বাসনার। অভুক্ত দিন কাটিয়ে ভারি জিভ নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে। কোথাও কোন কাজ পায়নি সারাদিন। যেমন বেরিয়েছিল, তেমনি, শূন্য হাতে। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সে দেখবে একটা হাতল-ভাঙা কাপ আর কলাই-করা প্লেট একটা কোণে পড়ে আছে। আর অন্ধকারের সঙ্গে মিশে-যাওয়া একটা কৃশ ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করছেন: 'এত রাত হ'লো যে বড়? কোন লাট সাহেবের বাড়িতে কত মজুরিতে দিন খেটেছিস শুনি?'

ছায়ামূর্তি নিশ্চল।

'অমন চুপ করে থাকলে তো চলবে না।' বাবার গলা (বাবার গলা?) রুক্ষতর হয়ে উঠলো, 'কত পেলি সারাদিনে?'

ছায়ার শরীর থেকে একটা মৃদু স্বর ভেসে এলো, 'পাইনি বাবা।'

'কি বললি, পাসনি?' বাবা মাদুরের ওপর উঠে বসলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না, অতবড় মেয়ে কোন কাজ পায় না। কাজ না পেলে হবে না বলে রাখছি। অমনি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারি অত পয়সা আমার হয়নি।'

মা হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন।

'নাও থামো, খুব হয়েছে' মা বললেন, 'তোমার চিৎকার করাটা এক স্বভাব। ওতে কাজ হয় না কোন। একদিন কাজ দেখাতে পারতে, বুঝতাম; আর তাতে কাজও হতো।'

'আজ শেষবারের মতো বলছি', বাবার গলা, 'কাল থেকে কিছু যদি আনতে না পারো, এ বাড়িতে ভাত জুটবে না আর।'

মানুষের মন কখনো কখনো আকাশ হয়, তাতে মেঘ জমে, বৃষ্টিও পড়ে। সেই ছায়া-শরীর থেকে পৃথিবী নীরবে কয়েকফোঁটা জল পেল। নিজের মধ্যে নিঃশেষে গ্রহণ করল মুহূর্তে।

রাতে একা বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম এলো না বাসনার। অন্ধকার রাত, বেড়ার ওপাশে বাবার নাক ডাকার শব্দ আসছে। বাবা। বাসনার একটা দিনের কথা এখনো কত স্পষ্ট মনে পড়ে। বাবা কলকাতা আসবেন, ঠাকুর দালানে তাঁকে ডাকলেন দাদু। নানা কথা বললেন। মা'র কথাও বলেছিলেন। মাকে কলকাতা পাঠাননি দাদু, বাসনাও তাঁর কাছেই থাকলো; বাবা মাঝে মাঝে আসবেন। দাদু নির্দেশের মতো কথাগুলো বলেছিলেন। ঠাকুর দালান, ঠাকুর, ভোগ, পুজো সব ছেড়ে ঘরের বৌ যেতে পারে না। বাবা বুঝলেন। বাবা দাদুকে প্রণাম করে সমস্ত মেনে নিলেন। আসবার আগে প্রণাম করলেন ঠাকুর, বাসনাকে আদর করলেন, মাকে আড়ালে ডাকলেন একসময়। 'আমি খুব তাড়াতাড়ি আবার আসবো। পুজো তো এসেই গেল, আর মাস দেড়েক মাত্র। তোরা খুব ভালো থাকিস। তোর জন্যে খেলনা আনবো অনেক।' বাবা বলেছিলেন, বাসনাকে, যাবার আগে; যতক্ষণ না সমসেরাবাদের বাঁকে আড়াল হয়, বাবা বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন গোরুর গাড়ির ছৈয়ের ভেতর। দাদু বললেন 'দুর্গা'। মা সেদিন রাতে তুলসীতলায় হরিলুট দিলেন।

পাশের ঘরে মা যেন কি বলছেন। মার গলা। মা, সৎ-মা বাসনার। বাসনার মা নেই।

ঠাকুর দালান, বিগ্রহ, দাদু, মা, তুলসীতলা কিছু নেই। বাইরে অন্ধকার রাত; ঝিঁঝি ডাকছে; একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, শেয়াল যাচ্ছে বোধ হয়। পাশের ঘরে বাবার নাক ডাকা শুরু হয়েছে আবার। মা'র হাতের চুড়ির শব্দ ভেসে এলো। বাসনা শুয়ে শুয়ে কাঁদলো। কই, দাদু তো কোলে নিয়ে গল্প শোনালো না, অবাক করলো না; বাসনার কান্না ফুরলো না ত!

'বাবা, তুমি আমাকে কোলে নাও। আমাকে আদর করো। আমাকে অবাক করে দাও।' বাসনার একবার বলতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু বাবা এখন ঘুমোচ্ছেন; মার জাগ্রত চুড়িগুলো তাঁকে পাহারা দিচ্ছে।

বাবা শুনতে পাবেন না।

বাসনাও ঘুমোবে না। ভোর হবে। মা একবাটি মুড়ি ছুড়ে দেবেন। বাসনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তারপর বাবা কাজে বেরোবার আগে তাকে বেরতে হবে। রাজপুরের বাজার। সেই চোয়াল উঁচু ছেলেটা। রিক্সওয়ালাগুলো।

এমনি করে সারাটা দিন। বাবা কি একবারও বাসনাকে মনে করবে? বাবা?

রাজপুরে বাজারে ঘুরতে ঘুরতে, অন্যমনস্কভাবে কথাটা একবার ভাবলো বাসনা। মনে মনে সে হাসলো না, বাবাকে তিরস্কার করলো না। বাবার জন্যে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কান্না জমে উঠেছে। চোয়াল-উঁচু সেই কদাকার ছেলেটাকে আসবার পথে শীতলা মন্দিরের কাছে দেখে এসেছে সে। দ্রুত পথটুকু পেরিয়ে এসে প্রথমেই বাবার কথা মনে হলো। ছেলেটার সঙ্গে সর্বত্র যেন আশ্চর্য মিল। দুয়ের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। ছেলেটাকে বাসনা ঘৃণা করে। বাপকেও করা উচিত। কিন্তু বাসনার মনে হলো, সে ভালোবাসে বাবাকে। বাবা ভালো। কিন্তু বাবা পাপ করেছেন। বাবা কেন পাপ করেন? বাবা কেন বাসনাকে রাজপুরের বাজারে পাঠান? মা মরে গেলেও বাবা কেন দেশের বাড়ি যাননি। দাদু মরে গেলেও বাবা বাসনার খবর নেননি কেন।

সামান্য জ্বরে মা মারা গেলেন, দাদু বাসনাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। চোখের জল মুছে দিয়েছিলেন। বাসনা
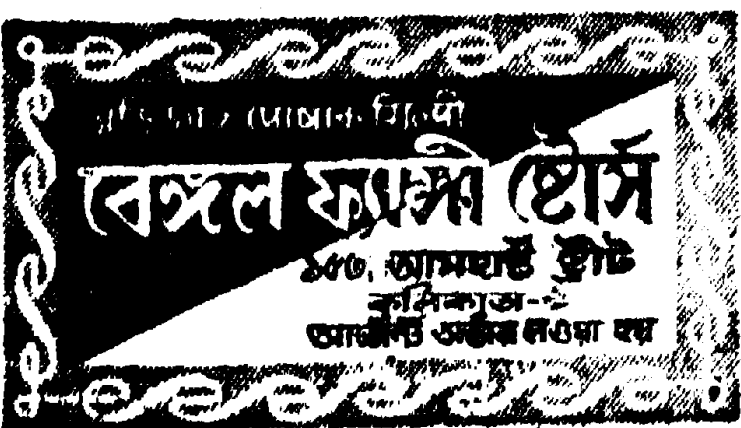
দাদুর কাঁধে মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা; বাবা কবে আসবে?'

দাদু জবাব দিলেন। মণ্ডপের দাওয়ায় বসে সন্ধ্যায় সেদিন আর রূপ-কথার গল্প বললেন না। সীতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন রামচন্দ্র : রামচন্দ্রের পাপের গল্প শোনালেন।

'রাম সীতাকে তাড়িয়ে দিলে, দাদু?' একদিন বাসনা সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলো।

'ভুল করেছিল।' দাদু যেন অন্য-মনস্কভাবে কথাটার জবাব দিল।

দাদুর কোলে মাথা রেখে তাঁর বুড়ো মুখের দিকে তাকিয়েছিল বাসনা। একটা শক্ত পেয়ারা গাছ থেকে খসে পড়লো চালে, শব্দ উঠলো তার। বাদাম-তলায় অন্ধকারে জোনাকিগুলো আগুন নিয়ে খেলা করছে। আকাশ মেঘহীন প্রশান্ত, মণ্ডপের [illegible] প্রদীপ জ্বলছে।

'জানিস দিদি, রামচন্দ্রই হোক আর যুধিষ্ঠিরই হোক, পাপ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবেই। তোর বাবা দেবীর কলঙ্কে পুড়ে মরবে।'

'বাবা কবে আসবে, দাদু?'

'জানি না। তুই তার কাছে যাস না।'

'আর ক'দিন থাকবো?'

দাদু সহসা জবাব দিলেন না। চার-দিকে ঘন অন্ধকার যেন একটা গোপন আয়োজনে ব্যস্ত। এই বাড়ি, এই মণ্ডপ, বাৎসরিক পুজো, আর এই গৌরবর্ণ বৃদ্ধের পুণ্য জীবন : সমস্তের বিরুদ্ধে যেন বিষাক্ত একটা নিঃশ্বাস আসন্ন হয়ে উঠছে।

কিন্তু, সে বছরও পুজো হলো।

নানা আভরণে সেজে উঠলেন দেবী দশভুজা। পঞ্চমীর সারা রাত কুমোরদের রঙ করা দেখলো বাসনা। প্রায় শেষ রাতে স্বল্পালোক স্তব্ধতার মধ্যে নিতাই রঙের বাটি হাতে তুললো।

সবচেয়ে ভালো আঁকিয়ে কুমোর নিতাই। দেবীর মুখোমুখি হয়ে এসে দাঁড়ালো। আরেকটা ছেলে একটা প্রদীপ উঁচু করে ধরলো।

প্রতিবার মা এসেছেন মাঝে মাঝে।

'এবার ঘুমোবি বাসনা, চল্।'

'দৃষ্টিদানটা না-দেখে আমি যাবো না। তুমি শোও গে।'

বাসনার জীবন থেকে সেই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের অংশটি খসে পড়েছে। বড় চোখ নিয়ে এবারও দেবীর দৃষ্টিদান দেখলো বাসনা। নিতাই বিশ্রামের জন্য নেমে একটা বিড়ি ধরালো।

বললো : 'যাও, এবার ঘুমোতে যাও, বাসনা।'

'দ্যাখো, দ্যাখো,' বাসনা নিতাইকে জড়িয়ে ধরলো : 'দুচোখে মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

নিতাই বাসনার পিঠে হাত রাখলো।

'ওই চোখ সবার দিকে অমনভাবে তাকায়।'

দাদু একদিন বলেছিলেন, 'জানিস দিদি, আকাশে ওই যে অত তারা দেখছিস, ওগুলোর মধ্যে তোর মা আছে। মানুষ মরে গেলে, যারা ভালো, তারা হয়ে জেগে থাকে তারা। তোর মা তোকে ওখান থেকে দেখছে।'

মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে, উঠোনে নেমেই আকাশের দিকে তাকালো বাসনা। শেষ-রাতের ক্লান্ত আর শিথিল নক্ষত্রপুঞ্জ। পৃথিবীর কত কাছে নেমে এসেছে দ্যুলোক। তার আশীর্বাদের উত্তাপ যেন স্পর্শ করছে পৃথিবীকে। মা। মা কই? কোন তারা? ঠাকুরের মতো অমন করে তাকিয়ে আছ তুমি? নবপত্রিকা স্নান হলো। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো দেবীর। সূত্রধার চণ্ডী পাঠ করলেন। মণ্ডপের এককোণে একটা জলচৌকিতে বসে দাদু নিশ্চিন্ত।

বাসনা কাছে এসে দাঁড়ালো।

'বাবা এলো না দাদু?'

'না।'

বাসনা দেখলো, সমস্ত পুজোয় যেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন দাদু। চার দিন রাতে ঘরেও যাননি শুতে। মণ্ডপেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকবার, ইচ্ছে হলেও, বাসনা দাদুর কাছে যেতে পারে নি। হাতে জপমালা, নিবদ্ধ দৃষ্টি দেবীর মুখে। দাদুকে এমন করে তার কখনো দেখেনি বাসনা।

বাসনার মনে হলো, দাদু অনেক-দূরের মানুষ। আর কখনো অমন করে দাদুর বুকে মুখ লুকোতে পারবে না সে। দাদুর কোলে মাথা রেখে রামায়ণের গল্প শোনা হবে না।

দাদু অনেক দূরের হয়ে গেল যেন: —ওই তারাদের মতো অনেক দূরের আলো।

নবমীর দিন রাতে, শান্তিজলের পাট চুকে গেছে, রঙের কৌটা নিয়েছে বাসনা, প্রতিবেশিরা ফিরে গেছে আরতির শেষে, দাদুর কাছে ডাক এলো বাসনার। দাওয়ায় ঠাকুরমশাই তামাক খাচ্ছেন, ভীষণ ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাঁর মুখ। দাদুর রূপোলী মুখে একরাশ জড়তা কিসের।

'আয়।'

বাসনাকে দাদু কোলের ওপর বসালেন।

'পুজোর শেষ রাত আজ। আমার কাছে বোস্।'

বাসনার কান্না পেল।

'দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। কিছু দেখছিস্?'

'আমার দিকে তাকিয়ে আছে, দ্যাখো দাদু।' বাসনা হঠাৎ বলে উঠল।

'মার জন্যে মন কেমন করে?'

বাসনা চুপ।

'মা দেবীর কাছে আছে। সবাই তার কাছে থাকে।'

'আমিও থাকবো।'

'তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে।'

'তুমিও।'

বাসনা দাদুকে গলা জড়িয়ে ধরলো।

'ঠাকুরমশাই, আপনি তো কলকাতা যাবেন, বাসনাকে ওর বাপের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

ঠাকুরমশাই উত্তর দিলেন না।

'এবার ঘুমোতে যাও দিদি তুমি।' বাসনাকে তুলে দিলেন দাদু।

বাসনা ঘরে ফিরে এলো। অন্ধকার ঘর। একটা লন্ঠন নিভু নিভু জ্বলছে দরজার গায়। খাটে জানালার ধারে এসে বসলো। এখান থেকে মণ্ডপ চোখে পড়ে।

কাঁদলো না বাসনা। আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকালো না। দেবীর প্রসারিত চোখও দেখলো না।

যতক্ষণ সেদিন না ঘুমিয়েছিল বাসনা জানালা দিয়ে দাদুর দিকে তাকিয়েছিল। বুড়ো রূপোলী মুখটি বাসনার এত চেনা মনে হয়। ঠিক বাবার মুখের মতো। বাসনার রক্ত।

দশমীর রাতে দাদুর জ্বর এলো। কার্তিকের হিমসন্ধ্যা; বয়েসকে না মেনে নিরঞ্জনের সময় জলে নামলেন দাদু। জ্বর এলো।

রাজপুরের বাজারের হাল্কা ভিড়ে দাঁড়িয়ে, বাসনার মনে হলো, সারাটা পুজো দাদু নিজেকে যে অমন করে অস্বাভাবিক দূরে আড়াল করেছিলেন, তার কারণ ছিল। সারাটা জীবনের শেষতম পুজো। হয়তো ভিতর-স্নায়ুতে সেই বোধটা ধরা পড়েছিল; হয়তো ইচ্ছাকে মানা করতেই সমস্তটা এত দ্রুত, এতটা নির্বিরোধ নেমে এসেছিল।

উজ্জ্বল রোদ রাজপুরের আকাশে। দুপুরে নেমে আসছে তার মূর্চ্ছা নিয়ে। দুধারে ছায়া-ছায়া পথগুলো সর্বময় দৃষ্টির মতো। বাসনার দিকে তাকিয়ে আছে ঃ বাসনার সমস্তটা মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ডানহাতের পথটা বাসনার ভালো লাগে। ওই পথ ধরে এগিয়ে গেলে সেই বিরাট ইঁট-কাটার মাঠ; তাকে পেরিয়ে সেই বড় অতলস্পর্শ দীঘি। ও-পথে বাসনা অনেকদিন গেছে। অনেক রাতে একা একা ফিরেছে। সমস্তটা পথ তার সঙ্গে এসেছে একটা ছায়া। রাতের টোলের গুরুমশাইর মুখটা।

দেশের বাড়ি থেকে অগত্যা একদিন চলে এসেছিল বাসনা। দাদু মারা গেলেন, বাবা খোঁজ নিলেন না। বাবা আসবে, এই কথাটা ভেবে ভেবে বাসনার অনেকদিন কেটে গেল। ঠাকুরমশাইর কলকাতা যাওয়া বাতিল হয়েছিল আগেই; এবার বাসনার জন্যে তাকে বেরোতে হলো। বাসনা দেশ ছেড়ে বাবার কাছে এলো।

তারপর ঠাকুরমশাই বিদায় নিয়েছেন। ছোট্ট, অপ্রসর জীবন থেকে শেষ আলোক-বিন্দু খসে পড়লো। দাদু, মণ্ডপ, তুলসীমঞ্চ, দশভুজা, চণ্ডীপাঠ, ঠাকুর-মশাই, শান্তিজল, রামায়ণের গল্প। মা। প্রবল অন্ধকার মনে হলো বাসনার; সব হারিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকবে বলে তাকে দিনমান সাঁতার কাটতে হবে এই সমুদ্রে। নিজের জগৎ থেকে কত দূরে; নিঃসীম ভয় যেন এই অপরিচিতকে ঘিরে।

কাজে বেরিয়ে, শূন্য অবসন্ন যখন ঘরে ফিরছে বাসনা, একদিন সেই আলোকবিন্দু দেখল।

দিঘীর দক্ষিণ ধারে একটা চালা ঘরে আলো জ্বলছে। একটা ন্যাড়া ঝাউয়ের নীচে সে দাঁড়ালো ঃ দীঘির জলে আলোরা অজানা কি একটা খেলায় মেতেছে ঃ দু'মিনিট ভাবলো, তারপর সেই আলোঘরের দিকে পা বাড়ালো।

পঁচিশজন তো হবেই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা জড়ো হয়ে বসেছে; সারা ঘরে লন্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে একটা। আবছায়া মিশে আছে দরমার বেড়ায়। এককোণে সে বসে। গৌরকান্তি মুখ; উজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি চোখে।

গুটিসুটি সবার পিছনে, দরজার কাছাকাছি একটা জায়গা করে বসে পড়লো বাসনা। বেড়ায় একটা বোর্ড টাঙানো, তাতে অ আ ক খ লেখা; কিন্তু সুগৌর দৃষ্টির দিকেই সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে, তার কাছ থেকে শুনছে সবাই। বাসনার মনে হলো, অনেকদিন পর, তার কাছে যেন সেই পরিচিত জগৎটা আবার ফিরে আসছে। মণ্ডপ, দাদু, পুজো, রামায়ণের গল্প। মানুষ পুজো করে কেন? বাসনা মনে মনে কে কে পুজো করে। দাদু ভালোবাসতো বাসনাকে, অপাপস্নেহে অবাক করে দিতো তাকে। আজ এখানে বসে, এই অপরিচিত, হঠাৎ পেয়ে-যাওয়া শৈশব-কৈশোরে, বাসনা আবার অবাক হয়ে খুশী হয়ে উঠলো। মানুষ খুশী হয় কত সহজে, কত সামান্য পেলে, শুধু মনের স্বাভাবিককে পেলেই।

সেই আবছায়া অন্ধকারে, স্বল্পালোকে নির্জনতার মধ্যে বসে, সবাই মিলে রামায়ণের গল্প শুনছে।

দাদুও বলতো।

বাবা হয়তো এখন কারখানা থেকে ফিরেছে। বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে, মা তার চুড়ির শব্দে শাসন আর সুখ ঘোষণা করছে। হাসি উঠেছে সেই ছোট্ট বাড়িতে। বাসনা ফিরে গেলে একটা বাধা পাবে; আবার উপেক্ষা আর কৌতুকের সিঁড়ি ভেঙে সময়কে ভরে তুলবে কথায় আর হাসিতে। বাবা কথা বলতে বড় ভালোবাসে। বাবা একা একা চুপ করে থাকে না কখনো। বাবা আকাশের দিকে তাকায় না।

বাবা যদি গল্প বলতো, রামায়ণের গল্প, বাসনা ভাবে।

বাবা কি রামায়ণের গল্প জানে? জানে। 'জানিস দিদি, তোর মতো, তোর বাবা যখন এমনি ছোট, এমনি করে কোলে নিয়ে তাকেও রামায়ণের গল্প বলেছি।' দাদু বলেছিলেন।

বাবা তবে বাসনাকে রাজপুরের বাজারে পাঠায় কেন?

এখন অনেক রাত। কলকাতার দিকে শেষ লোকালটা চলে গেছে। পৃথিবীর কাছে অনেকখানি নেমে এসেছে আকাশ।

হাওয়া নেই। স্তব্ধ নিশ্চল কালো স্তূপ যেন গাছের ছায়াগুলি।

বাসনা বাড়ি এলো।

'কে ?'

'আমি বাসনা।'

'কিছু হলো আজ ?'

বাসনা উত্তর দিল না।

'এত রাত হলো কেন ?'

'ইস্কুলে গিয়েছিলাম।'

'ইস্কুল ?'

বাসনার বাবা একটা চিৎকার করে উঠলো। ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। 'তোকে ইস্কুলে যেতে বলেছে কে ? এই রাত পর্যন্ত হচ্ছে সারাদিন ধরে ?

অফুরন্ত ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যেও কখন ঘুমিয়ে পড়লো বাসনা

হেডমাস্টার দেখে বুঝি আর তর সইলো না ওখানে যাবার ? যা, বেরো তুই এ বাড়ি থেকে। বেরো।'

মা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

'আহা, অমন করে বললেই কি আর তাড়ানো যায় ! তাড়াতে তুমি পারবে না, সে হয় না। কিন্তু তোমার গুণধরীকে একবার জিজ্ঞেস করো না, এত রাত পর্যন্ত অমন করে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে আমাদের মুখ কালো করা কেন ?'

রাতে ঘরে ঢুকতে পেলো না বাসনা। বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে শুলো। ঘুম এলো না। বাবার নাক ডাকার শব্দ। মার হাতে চুড়িগুলো শব্দ তুলছে। বারান্দার পশ্চিম কোণে কুকুরটা লেজগুটিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। থমথমে অন্ধকারে চারদিকের নির্জনতা ভয়াবহ। বাসনার ভয় করলো। মাকে ভাবতে চেষ্টা করলো একবার। 'মা' অনেকবার উচ্চারণ করলো মনে মনে। আর, এই প্রথম, একটা তীব্র অনুভূতি বোধ করলো বাসনা। গুরুমশাই। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের আড়ষ্টতা মিলিয়ে গেল, আকাশকে প্রকাণ্ড বলে মনে হলো।

সন্ধ্যা নেমে এলে, দীঘির ধারে সেই ন্যাড়া ঝাউগাছটার নীচে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সে। ওধারে চালা-ঘরে ছেলে মেয়েরা একে একে গিয়ে বসছে। স্বপ্নের মতো লাগে। বাবা নেই, মা নেই, অপমান নেই। কী গভীর আশ্বাস।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?'

বাসনা চমকে ফিরে তাকালো। গুরুমশাই।

'কি করছ ?'

'ইস্কুলটা দেখছি।' বাসনা পরিষ্কার গলায় বলল।

'যাবে না ?' গুরুমশাই হাসলেন, 'চলো আমার সঙ্গে।'

'বাড়ি ফিরতে রাত হবে। বকা বকবে।' উত্তেজিত হয়ে বাসনা বলল।

'তুমি তো মাঝে মাঝে আসো। বাড়িতে বলে আস না ?'

বাসনা মাথা নাড়লো।

'বাড়িতে বকুনি খাবে, তবু আসো কেন ?'

বাসনা কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকালো গুরুমশাইর মুখে।

'ভালো লাগে।'

সমস্ত আকাশ জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছিল। বাসনা দেখলো, অকপট স্নিগ্ধতায় তার দিকে তাকিয়ে আছেন গুরুমশাই। এবং শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর একটা হাত বাসনার দিকে এগিয়ে এলো।

'আমার হাত ধরো।' গুরুমশাই বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

সমস্ত সত্তা, সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একটা রোমাঞ্চের আস্বাদে মন ভরে গিয়েছিল। আজ এই রাতে, এই গাঢ় পরিপূর্ণ অন্ধকারে বারান্দার মাদুরে শুয়ে শুয়ে সেই রোমাঞ্চ আরেকবার অনুভব করলো বাসনা। আকাশ বড় নীচে নেমে এসেছে। ঐ গ্রহলোক থেকে মা তাকিয়ে আছেন বাসনার দিকে, বাবু বলেছিলেন। অতল দীঘির জলে নিজেকে মেলেছিলেন মা, ডুবে গিয়ে উঠে এলেন, আর বাঁচলেন না।

এ-জগতে কেউ বাঁচে না। বাসনা বাঁচে না, সহজ বাঁচে না, অনাচারি বাঁচে না। কিন্তু বাবা চিরদিন নাক ডেকে ঘুমোবে। মার চুড়ি অনন্ত বাসনা ঘোষণা করবে। আর বাসনা ঘুমোবে না।

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্যে পরলোক থেকে দেবদূতেরা নেমে আসে, বাসনা শুনেছিল। আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে নেমে-আসার একটা দৃশ্য যেন অনুভব করলো বাসনা। দেবলোকের দূত এই বাসনার মৃত্যুর মধ্যেও নেমে এসে গেছে।

'আমার হাত ধরো। এসো আমার সঙ্গে।'

সেদিন, সেই বারান্দায় শুয়ে, অফুরন্ত ভয়ের কুণ্ডলীর মধ্যেও কখন ঘুমিয়ে পড়লো বাসনা।

দেশে বিদেশে

॥ দণ্ডকের ডাক ॥

কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পাঠানোর শেষ দিন ছিল ১৫ই ডিসেম্বর। কিন্তু ভারত সরকার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে সেই সর্বশেষ তারিখ ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পেছিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভারত সরকার জানিয়েছেন, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সন্তোষজনক অগ্রগতি সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের মধ্যে দণ্ডকারণ্য যাওয়ার মত যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়নি। ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এগার মাসে মাত্র ১৩ শত উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকে গেছে। অথচ বছরের প্রারম্ভে বিভিন্ন শিবিরে কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবার ছিল প্রায় ১৭ হাজার। স্বভাবতই এ-অবস্থায় আরও একবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ভিন্ন সরকারের গত্যন্তর ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকে যে জমি উদ্ধার করা হয়েছে তাকে আবার জঙ্গলগ্রস্ত হতে দেওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে না। তবুও যদি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়া যায় তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে শেষপর্যন্ত হয়ত নিরুপায় হয়েই জাতীয় অপচয় প্রতিরোধকল্পে পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের দণ্ডকে পুনর্বাসনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে।

॥ সরকারী প্রতিশ্রুতি ॥

গত সেপ্টেম্বর মাসে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্মবিরতি আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতনদানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। মূলত সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করেই পশ্চিমবঙ্গের পাঁচিশ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক তাঁদের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তারপর তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এসম্পর্কে সরকার আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বিভিন্ন শিক্ষাদপ্তর থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি, এবিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন বলেও তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় না। স্বভাবতই শিক্ষকদের মধ্যে আবার বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। এদের এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে, সাধারণ নির্বাচনের আগেই যদি এ-ব্যাপারে একটা ফয়সালা না করে ফেলা যায় তবে বর্ধিত হারের টাকাটা আর পাঁচ বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

শিক্ষকদের আন্দোলন নতুন করে শুরু হলেও সরকার পক্ষ এখনও নীরব, তবে দপ্তর পরম্পরায় যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় একেবারে নিরাশ হওয়ার কারণ না ঘটলেও আপাতত বর্ধিত হারে শিক্ষকদের বেতন লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এজন্যে রাজ্য সরকারের যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হবে তা তৃতীয় যোজনার কর্তাব্যক্তিদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁরা যতদিন না সদয় হচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশের শিক্ষিত স্নাতকদের সত্তর টাকা বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। রাজ্য সরকার কোন ভরসায় অবিলম্বে শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি যদি তাঁরা রক্ষা না করেন তবে তার চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কথা আর কিছুই হবে না। শিক্ষক-সমাজ নিরুপায় হয়ে আবার হয়ত আন্দোলনের পথে নামবেন এবং এবার আর শুধু সরকারী প্রতিশ্রুতিতেই তাঁরা নিরস্ত হবেন না। ওদিকে কলেজের অধ্যাপকরাও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

॥ গোয়া ॥

'আর সহ্য করা হইবে না', 'ধৈর্যের সীমা শেষ হইয়াছে', 'গোয়ার মুক্তি আসন্ন' ইত্যাদি বক্তৃতার বারংবার পুনরাবৃত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালকবৃন্দ করে চললেও গোয়ার মুক্তি সত্যিই আসন্ন একথা ভাবার মত কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। বরঞ্চ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করে পর্তুগীজ শাসকটিকে বিতাড়িত করে গোয়ার সাড়ে ছ'লক্ষ মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে বলে সপ্তাহ দুয়েক আগে যে ক্ষীণ আশা ভারতবাসীদের মনে জেগেছিল তা প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীমেনন প্রায় স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গোয়ায় প্রবেশের কোনই সম্ভাবনা নেই। ভারত সরকারের প্রথম তর্জনগর্জনে পর্তুগীজ সরকার বোধহয় সত্যিই একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল, তাই বৃটেনের কাছে তারা ধর্ণা দিয়েছিল মধ্যস্থতার অনুরোধ জানাতে। কিন্তু এখন ভারত সরকারের প্রকৃত মনোভাবটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে কোন দ্বিধা না করেই তারা বন্দুকবাজী শুরু করে দিয়েছে। সামরিক আদালতে বিচার, অমানুষিক প্রহার, বেপরোয়া গুলীবর্ষণ এখন গোয়ায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত সরকার যদি এখন পেছিয়ে পড়েন তবে তার বিশ্বাসঘাতকতা অপবাদ ভাগ্য একটু বাড়া ছাড়া কোন ক্ষতি হবে না। চরম সর্বনাশ হবে শুধু গোয়ার সেই মানুষগুলির, যারা ভারত সরকারের এবারের বাগাড়ম্বর ও পাঁয়তারাকে সত্যি ভেবে বর্বর পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে আর একবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

॥ স্বাধিকারের প্রহসন ॥

দলমতনির্বিশেষে নেপালের স্বাধীনচেতা মানুষগুলি আজও বন্দী অথবা নির্বাসিত। সংসদ এখনও বাতিল, সংবিধান এখনও পঙ্গু। স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র কণ্ঠরোধ করে রেখেছে নেপালের পঁচাশী লক্ষ মানুষের। কিন্তু নেপালের দুর্ভাগ্য সেইখানেই শেষ হয়নি। কদিন আগে নেপালরাজ চীনে গিয়ে উপঢৌকন দিয়ে এসেছেন নেপালের শ্রেষ্ঠ গৌরব এভারেষ্টশৃঙ্গকে, স্বাক্ষর দিয়ে এসেছেন লাসা-কাঠমণ্ডু পথ নির্মাণের চুক্তিপত্রে। ফলে নেপালের কমিউনিষ্টরা এখন সেখানকার রাজতন্ত্রের স্বতঃ সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যেটা নেপালের ভবিষ্যৎ সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে আদৌ শুভ নয় কথা।

এই অবস্থায় নেপালরাজ সম্প্রতি এক ঘোষণাবলে নেপালের নাগরিকদের মৌল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেছেন। নাগরিকের মৌল অধিকার বলতে যাঁরা বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা,

রাষ্ট্রশাসনে অংশ গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি বুঝে থাকেন, তাঁদের এই রাজঘোষণা পাঠ করে অবশ্যই নিরাশ হতে হবে। কারণ যেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে, নেপালের নেতৃবৃন্দ এখনও বন্দী এবং রাজা মহেন্দ্রের স্বৈরতন্ত্রের যাঁরা এতটুকু সমালোচনা করবেন তাঁদেরই গ্রেপ্তার করা হবে। রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং বাতিল সংসদ পুনঃস্থাপিত করার কোন প্রস্তাবও রাজঘোষণায় নেই। যাবতীয় মুখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার-বর্জিত এই তথাকথিত স্বাধিকারের ঘোষণাপত্র যে নেপালবাসীদের ধাপ্পা দেওয়ার জন্যেই প্রচার করা হয়েছে এটুকু বোঝার মত বুদ্ধির অভাব নেপালবাসীদের নিশ্চয়ই হবে না।

॥ অদ্ভুত শয্যাসংগী ॥

চীন ও পাকিস্থান, বলতে গেলে দুই দেশের গঠন ও রাষ্ট্রাদর্শে কোনই মিল নেই। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে, চীনের রাষ্ট্রাদর্শের মূলকথা নিরীশ্বরবাদ। পাকিস্থান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, চীন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পয়লা নম্বর শত্রু। চীনের বিচারে পাকিস্থান দুর্নীতিদুষ্ট বুর্জোয়াতন্ত্র, পাকিস্থানের বিচারে চীন সে অনৈশী একনায়কতন্ত্র, তবুও এই দুটি দেশের মধ্যে হঠাৎ খুব দস্তি গড়ে উঠেছে, কারণ একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ঘটেছে অদ্ভুত মিল। সে বিষয়টি হল ভারতভূমির উপর অন্যায় জবরদখল। পাকিস্থান ও চীন উভয়েই গায়ের জোরে ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে নিয়েছে এবং সেই দখল কোন যুক্তিতেই তারা ছাড়তে রাজী নয়। দস্যুস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ চীন ও পাকিস্থান আজ পরস্পরের বন্ধু এবং আত্মরক্ষার্থে দুই রাষ্ট্রই ভারতের বিরুদ্ধে শুরু করেছে জঘন্য মিথ্যা প্রচার। রাশিয়া থেকে শুরু করে সব কমিউনিস্ট রাষ্ট্রই একবাক্যে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করেছে এবং বারবার করে সম্পূর্ণ কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তির দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। চীনের ধূর্ত নেতারা এপর্যন্ত কাশ্মীর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য না করলেও কাশ্মীর যে ভারতের নয় এমন কথা তাঁরা কখনও বলেননি। এইবার তাঁরা তাঁদের এতদিনের নীরবতার সুযোগ নিচ্ছেন। কদিন আগে পাকিস্থানে অবস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, রাশিয়ার মত চীন কোনদিনই কাশ্মীরের ওপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করেনি। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের ওপরেও চীন পাকিস্থানের আইনসংগত অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তার সংগে ঐ সীমান্তে তথাকথিত পাক-চীন সীমান্ত স্থির করে নিতে প্রয়াসী হয়েছে। এতে অবশ্য ভারতের নতুন করে কোন ক্ষতি হবে না। তবে চীন যে মনে করেছে পাকিস্থানকে তারা ভারতের বিরুদ্ধে বেশ খানিকটা কাজে লাগিয়ে নিতে পারে, সে ভুল ভাঙতে তাদের খুব বেশী সময় লাগবে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্থানের এক পাও চলার সামর্থ্য নেই।

॥ বিচ্ছেদ ॥

কমিউনিস্ট দুনিয়ার নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে ক্ষুদ্র আলবেনিয়ার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে সংগে ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিও আলবেনিয়ার সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। ইউরোপ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলবেনিয়া এখন এক-ঘরে, কিন্তু তাই বলে সে নিঃসংগ নয়। তার সংগে আছে তার চেয়ে আকারেতে ৪৩০ গুণ ও জনসংখ্যায় ৪০০ গুণ বড় কমিউনিস্ট চীন, যার প্ররোচনাতেই সে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিরোধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয়েছে। রাশিয়া-আলবেনিয়া বিরোধ প্রকৃতপক্ষে চীন-রাশিয়া বিরোধেরই প্রচ্ছন্নরূপ। চীনের রাজনীতি সর্বত্রই এক। ভারতের বিরুদ্ধে সে যেভাবে পাকিস্থানকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে, আলবেনিয়াকেও সে ঠিক সেই রকমই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। নইলে আলবেনিয়ার কল্যাণকামী সে নয়, আর কল্যাণ করার কোন সামর্থ্যও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট চীনের নেই। এ অবস্থায় আলবেনিয়াকে যদি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিজোটের হাতে গিয়ে পড়তে হয় তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। চীনকেই আজ তার উন্নতির জন্যে বহু পরিমাণে বৃটেনের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং রাশিয়ার সংগে বিরোধ আরও বাড়লে তার বৃটেনের ওপর নির্ভরতা আরও বাড়বে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম শিরোমণি বৃটেনের ওপর এই নিরুপায় নির্ভরতা শেষ পর্যন্ত যে চীনের রাষ্ট্রীয় গঠন ও সমাজ ব্যবস্থার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং অতিবিপ্লবী চীনের বর্তমান কার্যকলাপ হয়তো প্রতিবিপ্লবের পথেই তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মনে করা যেতে পারে।

॥ স্বাগতম ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ আসছেন ভারতে, রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণে। ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় আসবেন তিনি। ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়নের মহান মৈত্রীর কথা স্মরণ করে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রাষ্ট্রীয় অতিথিকে। ব্রেজনেভের উপস্থিতিতে আরও নিবিড় হয়ে উঠুক এই দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন।

॥ পূর্ব সীমান্তে ॥

ভারতের পূর্ব সীমান্তের উপদ্রবকারীরা ভারতীয়, এবং সংখ্যায় তারা এক লক্ষও নয়। তবুও আশ্চর্যের বিষয় যে, গত এক যুগ ধরে চেষ্টা করেও ভারত সরকারের পক্ষে তাদের সংযত বা নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। বৈরী নাগাদের কথা বলছি—স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ভারত সরকার তাদের হার মানাতে পারেনি বা তাদের দখল-করা ঘাঁটিগুলির একটিও কেড়ে নিতে পারেনি। প্রায় পনেরো মাস আগে 'হেকমা' বৈরী নাগারা একটি ভারতীয় বিমানকে অবতরণে বাধ্য করে এবং তার চারজন বৈমানিককে তারা ধরে নিয়ে যায়। নিরস্ত্র অসভ্য নাগাদের পক্ষে মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি উড়ন্ত বিমানকে কি করে টেনে নামানো সম্ভব হল এ প্রশ্নের কোন উত্তর আজ পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। এমন কি চারজন বৈমানিককে নাগারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের পরিণতি সম্বন্ধেও কোন সদুত্তর তাঁরা এখনও পর্যন্ত দেননি। কদিন আগে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীমেনন বলেন, ধৃত বৈমানিকরা নিহত হয়েছেন একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁরা যে জীবিত এ কথাই বা এই পনেরো মাস পরে কোন্ প্রমাণের জোরে তিনি বলছেন তাও তিনি জানাননি। জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে তিনি প্রমাণের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

কতকগুলি উলঙ্গ অসভ্য নাগা যে সরকারের শাসনকে এত সহজে উপেক্ষা করতে পারে, তাকে যে পর্তুগাল, পাকিস্থান, চীন সকলেই উপেক্ষা করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৭ই ডিসেম্বর—২১শে অগ্রহায়ণ ঃ 'পর্তুগীজদের সহিত মোকাবিলার জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) স্পষ্ট ঘোষণা—গোয়ার বর্তমান অবস্থা অসহনীয় বলিয়া মন্তব্য।

গোয়ায় সামরিক প্রস্তুতি ও গণ-পীড়ন অব্যাহত—জাতীয়তাবাদীদের তৎপরতা বৃদ্ধি ; কয়েক স্থানে তীব্র খণ্ড-যুদ্ধের অনুষ্ঠান।

৮ই ডিসেম্বর—২২শে অগ্রহায়ণ ঃ গোয়া সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিকা ডাঃ শ্রীমতী লরা ডিসুজার গোয়া প্রবেশ—মুক্তি অভিযান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী অরুণা আসফ আলিরও সীমান্ত (গোয়া) অভিমুখে যাত্রা।

'ভারতে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ'—সমস্যা সম্পর্কে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত ক্যান্সার সম্মেলনে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবনের উদ্বোধনী ভাষণ।

৯ই ডিসেম্বর—২৩শে অগ্রহায়ণ ঃ নির্ভুলভাবে এশিয়ার ইতিহাস প্রণয়নে ঐতিহাসিকদের প্রতি আহ্বান—দিল্লীতে প্রথম এশীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

সীমান্ত (ভারত) অতিক্রমকারী পর্তুগীজ সৈন্যদের সহিত ভারতীয় টহলদার বাহিনীর সংঘর্ষ ও গুলী বিনিময়—গোয়ার অভ্যন্তরে ব্যাপক ধর-পাকড় ঃ ডাঃ শ্রীমতী লরা ডিসুজা গ্রেপ্তার।

১০ই ডিসেম্বর—২৪শে অগ্রহায়ণ ঃ 'গোয়ার ভারতভুক্তি সুনিশ্চিত ঃ পর্তু-গীজ শাসনাধীনে গোয়ার অবস্থান অসম্ভব'—নাগপুরের জনসভায় প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

দশজন কিষাণ স্বেচ্ছাসেবক সহ-কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন গ্রেপ্তার—কেরলে কৃষক সংঘের আন্দোলন দমনে সরকারী কার্যব্যবস্থা।

১১ই ডিসেম্বর—২৫শে অগ্রহায়ণ ঃ 'ভারতীয় বিমান কর্তৃক চীনের আকাশ-সীমা লংঘনের অভিযোগ ভিত্তিহীন'—চীনা প্রতিবাদ লিপির উত্তরে ভারতের সর্বশেষ নোট।

সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতীয় গ্রামে আবার পর্তুগীজ সৈন্যদের হানা ও গুলীবর্ষণ—ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদ।

১২ই ডিসেম্বর—২৬শে অগ্রহায়ণ ঃ গোয়ার অভ্যন্তরে মুক্তিফৌজ ও পর্তু-গীজ সৈন্যদের তুমুল সংঘর্ষ—দক্ষিণ গোয়ার দুইটি গ্রামে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন।

'কম্যুনিস্ট পার্টি আলোচনা দ্বারা চীন-ভারত সীমানা বিরোধের মীমাংসা চায়'—পাটনায় সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীঅজয় ঘোষের (পার্টির সাধারণ সম্পাদক) বিবৃতি।

১৩ই ডিসেম্বর—২৭শে অগ্রহায়ণ ঃ গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টির দৃঢ় প্রতিবাদ—রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সভা-পতির নিকট ভারতের জরুরী পত্র।

ভারতীয় জেনারেলদের গোয়া সীমান্তে উপস্থিতি।

পাঞ্জাবী সুবা গঠনের জন্য অকালী-দের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ দাবী—দিল্লীতে সর্বভারতীয় অকালী সম্মেলনের প্রস্তাব—দাশ কমিশন (শিখদের অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত) বয়কটের সিদ্ধান্ত।

॥ বাইরে ॥

৭ই ডিসেম্বর—২১শে অগ্রহায়ণ ঃ কাতাংগায় ভারতীয় ও সুইডিশ বিমান বহরের অভিযান—বিমানঘাঁটি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ।

পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর বরাবর চীন-পাকিস্থান সীমানা নির্ধারণের প্রচেষ্টা—করাচীতে চীনা রাষ্ট্রদূত ও পাক্-পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক।

৮ই ডিসেম্বর—২২শে অগ্রহায়ণ ঃ কাতাংগার উপর রাষ্ট্রসংঘের বিমান অভিযান অব্যাহত—কংগোতে বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের কাজে বাধাদান।

'কাশ্মীর সমস্যা বর্তমান থাকিতে ভারতের সহিত যৌথ-প্রতিরক্ষা সম্ভব নহে'—সাংবাদিকদের নিকট পাক্ প্রেসি-ডেন্ট আয়ুব খাঁর বিবৃতি।

স্বস্তি পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) সভা-পতির নিকট পর্তুগালের জরুরী পত্র—ভারতের বিরুদ্ধে বলপূর্বক গোয়া অধি-কারের চেষ্টার ভিত্তিহীন অভিযোগ।

৯ই ডিসেম্বর—২৩শে অগ্রহায়ণ ঃ রাশিয়ার হাতে ১০০ মেগাটনেরও অধিক শক্তিসম্পন্ন বোমা আছে—যুদ্ধবাজদের প্রতি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

কাতাংগায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সফল অভিযান—বিমান আক্রমণের চাপে কাতাংগা সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ার সংবাদ।

১০ই ডিসেম্বর—২৪শে অগ্রহায়ণ ঃ রুশ আলবেনিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন—মস্কো ও টিরানা দূতাবাস হইতে উভয় রাষ্ট্রেরই কর্মচারী অপ-সারণের নির্দেশ।

নেপালে জনগণের মৌলিক অধি-কার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত—নেপালের রাজা মহেন্দ্রের বেতার ঘোষণা।

১১ই ডিসেম্বর—২৫শে অগ্রহায়ণ ঃ প্রাক্তন জার্মাণ নাৎসী [illegible] বাহিনীর কর্ণেল এডল্ফ আইখম্যান (৫৫) ইহুদী জাতি ও মানব সমাজের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত—দীর্ঘ বিচারের পর জেরুজালেম আদালতের রায়।

কংগোর ব্যাপারে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতদ্বৈধতা—কাতাংগায় রাষ্ট্রসংঘের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে প্যারিসে পশ্চিমী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

১২ই ডিসেম্বর—২৬শে অগ্রহায়ণ ঃ এলিজাবেথভিলে (কাতাংগা) রাষ্ট্রসংঘের ঘাঁটিতে অজ্ঞাত পরিচয় বিমানের হানা।

জাপানে সামরিক অভিযানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ—১৩ জন প্রাক্তন সামরিক অফিসার গ্রেপ্তার।

১৩ই ডিসেম্বর—২৭শে অগ্রহায়ণ ঃ কাতাংগায় যুদ্ধবিরতির জন্য রাষ্ট্রসংঘে এককভাবে বৃটেনের প্রস্তাব—প্যারিস বৈঠকের পরও কাতাংগা প্রশ্নে ইংগ-মার্কিণ-ফরাসী মতানৈক্য।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ পাকিস্তানের পথে ॥

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এসেছে কিভাবে সে কথা প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের অনেকখানি জানা, এবং বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে এই স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেকখানি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের তথ্যানুগ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইতিহাস কোনোদিন লিখিত হবে কিনা কে জানে, কারণ ইতিমধ্যে ডাঃ তারাচাঁদের গ্রন্থে যে-নমুনা পাওয়া গেছে তা ইতিহাস-প্রেমিকদের হতাশ করেছে। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁদের সংযোগ ছিল, তাঁদের কেউ কেউ আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি থাকলেও কিছু কিছু সার বস্তুও পাওয়া যায়। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে বড়, ছোট, মাঝারি ধরনের যাঁরা—তাঁরা অনেকেই স্মৃতিচারণ রচনা করেছেন এবং এখনো অনেক স্মৃতিকথা প্রকাশিতব্য। সাধারণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাই সমসাময়িক কালের কথা অনেকেই ভুলে যান, সেগুলি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এমনই একখানি স্মৃতিগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তবে লেখক পাকিস্তানী এবং এক হিসাবে পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্মৃতিকথা প্রকাশ করলেন। আমাদের শের-এ-বঙ্গাল এ. কে. ফজলুল হক যদি স্মৃতিকথা লিখতেন সেই গ্রন্থও চমকপ্রদ হত সন্দেহ নেই। এই স্মৃতিকথার লেখক চৌধুরী খালিকুজ্জমান, যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী, দেশ-বিভাগের পর দু দিনের জন্য পাকিস্তানে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। কেন আসেননি সেই কৈফিয়ত তাঁর সদ্য-প্রকাশিত স্মৃতিচারণে আছে এবং যথাকালে সে বিষয় উল্লেখ করা যাবে।

চৌধুরী খালিকুজ্জমান আরো অনেক মুস্লিম লীগ নেতার মতো অনেকদিন কংগ্রেসী রাজনীতি করে অবশেষে লীগের মাতব্বরি করতে ব্রতী হন। সমকালীন ইতিহাসের অনেক কথা এই গ্রন্থে আছে, সেই হিসাবে 'ডকুমেণ্টারি' তথ্যসমৃদ্ধ বইখানি সুখপাঠ্য। এই গ্রন্থে দেশ-বিভাগের পর ভারতীয় মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হাসান সুরাবর্দী সাহেবের একখানি পত্র আছে, মুস্লিম লীগকে আবার জাগ্রত করার জন্য ভারতে যাঁরা ইদানীং কোমর বেঁধেছেন এই চিঠিখানি তাঁদের কিঞ্চিৎ উপকার করতে পারে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করতে পারে। তবে অযথা যথেচ্ছ ডকুমেণ্ট ব্যবহার বর্জন করলে চৌধুরী সাহেব ভালো করতেন, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য আকরগত তথ্য সরবরাহ করা। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দিকে চোখ রেখেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভারতীয় মহানাটকের পাত্র-পাত্রীরা স্বমুখে স্ব স্ব ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু স্বীকারোক্তি করলে তা ইতিহাস-রচয়িতার পক্ষে সুবিধাজনক সন্দেহ নেই। অন্তরঙ্গ এবং সমসাময়িকদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের বিচার, এবং কয়েকটি ছোট-খাটো ঘরোয়া উক্তি ইতিহাসের ফাঁককে ভরাট করার কাজে লাগে। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের India Wins Freedom নামক গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে চৌধুরী সাহেব তাঁর আত্মকথা রচনায় উদ্বুদ্ধ বা প্রলুব্ধ হয়েছেন। মৌলানা আজাদ বলেছেন যে, তাঁর পরামর্শে কর্ণপাত করলে দেশ-বিভাগের জ্বালা হয়ত সইতে হত না, আর চৌধুরী সাহেব বলেছেন যে তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ হলে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্ত হত না, এবং পাকিস্তানের ভাগে আরো কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণে জমি পাওয়া যেত, এমন কি কাশ্মীর সমস্যা বা সিন্ধু নদের জল সংক্রান্ত সমস্যারও ঝামেলা থাকতো না।

আজাদ সাহেব বলেছেন যে 'ক্যাবিনেট মিশনের 'গ্রুপিং' ব্যবস্থায় কথা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে, চৌধুরী খালিকুজ্জমান বলেছেন, আমিই বৃটিশকে দেশ-বিভাগের পরামর্শ দান করেছি। তিনি বারবার বলেছেন যে আমি জিন্নার চাইতে এক কাটি বেশীই করতে পারতাম। দেশ-বিভাগ করে হয়ে গেছে, চৌধুরী সাহেব পাকিস্তানের বাঁধা বাসিন্দা হয়েছেন, তবু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তিক্ততা তাঁর মন থেকে যায়নি, কংগ্রেস আজো তাঁর কাছে 'Hindu Junta', তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা সবাই ক্ষুদ্র, গান্ধীজী সম্পর্কে অবশ্য অশ্রদ্ধাকর উক্তি নেই।

মৌলানা আজাদ বলেছেন যে, নেহরুর জন্যই যুক্তপ্রদেশের লীগ নেতারা আজাদীয় সমাধান-সূত্র মেনে নিতে পারেননি, নইলে সব ঠিক হয়ে যেত। আজাদ সাহেবের স্মৃতিকথা প্রকাশের পর নেহরুজী এ কথার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, লীগ কোনোদিন আজাদীয় সমাধান-সূত্র গ্রহণ করার জন্য অভিমুখী হয়নি। চৌধুরী খালিকুজ্জমান কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যাদির দ্বারা নেহরুজীর উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি কংগ্রেসপ্রেমী লীগ নেতারাও (তাঁদের মধ্যে চৌধুরী সাহেব অন্যতম) এই সমাধানসূত্র সম্পর্কে তাঁদের গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। যুক্তপ্রদেশে নির্বাচন কালে কংগ্রেস এবং লীগের নির্বাচনী কার্যসূচীতে তেমন পার্থক্য ছিল না। কংগ্রেস যখন বিজয়ী হল তখন সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দিকেই আগ্রহশীল হল, তখন আর কোনোরকম কোয়ালিশন করার কথাই উঠল না, লীগকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়া বা বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু করার রইল না। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থায় লীগ রাজী হয়নি, এবং দুই দলে আর কোনো দিন মিলন হয়নি।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটেছিল, তবে ঠিক এমনটি নয়। ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে রাজী ছিল, কয়েকদিন অপেক্ষাও করেছিল, কিন্তু কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড সেদিন শরৎচন্দ্র বসুর আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। যদি শরৎচন্দ্র বসুর আবেদন সেদিন কংগ্রেসী ওপর মহল গ্রহণ করতেন, তাহলে ইতিহাসের আকৃতি অন্য রকম হয়ে যেত, অন্ততঃ বাংলা দেশে।

কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রফেসার রেজিনালড্ কুপল্যাণ্ডের উক্তি স্মরণীয়, তিনি বলেছিলেন :—

"To come to terms with the Moslem League, in the first place, was a negation of the totalitarian

doctrine which had now taken so firm a hold on Congress minds. The Congress regarded no Indian as a patriot whose opinion differed from the Congress creed. India could only be freed by the Congress and only in the Congress way."

১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশনের প্লান অনুসারে সংযুক্ত ভারতের সম্ভাবনাই ছিল, কংগ্রেস সেই প্লান গ্রহণ করতে রাজী হয়েও প্রাদেশিক গ্রুপিং ফর্মুলা প্রভৃতি মেনে নিতে পারেনি। স্যার চিমনলাল শীতলবাদ সেদিন বলেছিলেন :

"Cabinet Mission Plan was killed by the wobbing and vacillating attitude of the Congress."

চৌধুরী সাহেবের এই আত্মকথায় যে আত্মম্ভরিতার পরিচয় আছে তার প্রতি অবশ্য কঠোর মনোভঙ্গী পোষণ না করাই উচিত। একটা বয়সে পৌঁছে মানুষের এই রকম অবস্থা ঘটে, সেকথা তাঁর নিজেরও স্মরণ হয়েছে, জিন্নার পাদপদ্মে নেতৃত্বের সুবর্ণ মুকুট সমর্পণ করে তিনি এখন তাই, "a phantom of what I had once been in Indian politics" পাকিস্তান সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলী বা দেশ-বিভাগজনিত হানাহানির ব্যাপারে তাঁর অন্তরে তাই এতটুকু ব্যথা নেই। তিনি যা করেছেন তাই উপযুক্ত এবং একমাত্র পথ হিসাবেই তা গহীত হয়েছে এই ভঙ্গী তাঁর অনেক বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। মুসলমানরা ভারতে সংখ্যালঘু সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সংখ্যালঘুদের সংখ্যা আরো হ্রাস করে তিনি কি ভারতীয় মুসলমানদের শক্তিহীন করেন নি? যাঁরা ভারতে বাস করছেন তাঁদের মনে একটা বিচ্ছেদসূচক মনোভাব সৃষ্টি করার মধ্যে সততা নেই, রাজনীতি আছে।

এই গ্রন্থ আধা-আত্মকথা, আধা-ইতিহাস, অথচ এই গ্রন্থে ভারতীয় কনস্টুয়েন্ট এসেম্বলীর মুসলীম লীগ-দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি সহসা কেন পাকিস্তানে চলে গেলেন এবং সেইখানেই চিরতরে রয়ে গেলেন, তার কোনো কৈফিয়ত নেই। তিনি দু দিনের জন্য করাচী গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন দেখলেন যে তাঁর একটি বিবৃতি সম্পর্কে জিন্না অত্যন্ত কঠোর মনোভঙ্গী পোষণ করেন, তখন তিনি স্থির করলেন ভারতে ফিরে অপর কাউকে জিন্নার বিশ্বাসভাজন হওয়ার সুযোগ দান করা উচিত মনে করেননি, তাই তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ভারতীয় মুসলীম লীগের নেতা পাকিস্তানের মুসলীম লীগ-নেতার আস্থাভাজন হওয়া প্রয়োজন, ভারতবর্ষীয় লীগদল পাকিস্তানী লীগের ব্রাঞ্চ অফিস। তিনি প্যাটেল সম্পর্কে কটূক্তি করলেও একথা বিস্মৃত হয়েছেন যে, সর্দার প্যাটেল তাঁর বা তাঁদের সম্পর্কে এই অভিযোগই করতেন।

চৌধুরী খালিকুজ্জমানের মনে এক-বিন্দু অনুশোচনা নেই। দেশ-বিভাগ পাক-ভারত মহাদেশের দু'দিকের মানুষের যে ক্ষতি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার একটা হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং তিনি প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে জিন্নার অনেক পূর্বেই তিনি দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ লীগ কেন আর্ধেক পাঞ্জাব আর আর্ধেক বাংলা নিয়েই শান্ত হল, তিনি হলে বা তাঁর মতানুসারে যদি সবাই চলত, তামাম পাঞ্জাব আর বাংলা কবজা করা যেত। এই সব উক্তির পরেও চৌধুরী সাহেব তাঁর অ-সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বড়াই করেছেন। তিনি ১৯৩৭-এর কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব যদি যুক্তপ্রদেশে গঠিত হত, তাহলে সব ভালো হয়ে যেত, এই কথাটি বারবার বলেছেন। এই কথাটির মধ্যে অবশ্য কিছু সার বস্তু আছে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের হাল অনেকেরই স্মরণ আছে নিশ্চয়। তিনি নবাব মসিনুল মুলুককে প্রশংসা করেছেন। মিনটো-মরলী সংস্কারের কালে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়ে মুলুক সাহেব মুসলমান সম্প্রদায়ের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। অথচ তদানীন্তন লাটসাহেবের সেক্রেটারি কর্তৃক লিখিত চিঠিখানিও ফাঁস করে দিয়েছেন। এই পত্রে সেই শ্বেতাঙ্গ সেক্রেটারি উপদেশ দান করেছেন যে, পৃথক নির্বাচনী প্রথা এবং মনোনয়ন প্রথার জন্য আবদার করবে।

ব্রিটিশ ভারতের পঞ্চাশ বছরব্যাপী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর একটি রঙীন ওড়না চাপানোর চেষ্টা করেছেন চৌধুরী সাহেব, তবে সেই ওড়নার স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে আসল প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কবিতা মানুষের হৃদয়ের গভীর অনুভূতির ফল, আত্মজীবনী আজকাল যেন জরাগ্রস্ত মনের বিষবাষ্পাচ্ছন্ন অভিব্যক্তি। ইতিহাস অনেক অপ্রিয় কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সেই ইতিহাস নিশ্চয়ই গ্রাহ্য নয় যা তথ্য এবং তত্ত্ব উভয় দিক থেকেই বিকৃত রুচি এবং বিভ্রান্ত দৃষ্টির দ্বারা রচিত। চৌধুরী খালিকুজ্জমানের আত্মকথা পাঠ করলে সাময়িক ইতিহাসের এক অতি কদর্য এবং বীভৎস আকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে, তার কিছুটা সত্য, কিছু কষ্ট-কল্পিত আর কিছুটা উদ্ভট। *

*Pathway To Pakistan: By Choudhuri Khaliquozzaman II Longmans: Rs. 26/- only

নতুন বই

সুখ— (উপন্যাস)—অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বক্তব্যবান লেখক। কিন্তু কাহিনী রচনা এবং চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর এমনই দক্ষতা যে বক্তব্যের কথা কারো মাথায় না ঢুকলেও অনায়াসে তাঁর গল্প-উপন্যাস প'ড়ে রস গ্রহণ করা যায়। সেইজন্যে তিনি সাধারণ এবং বিদগ্ধ, এই উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ লেখক।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে অন্নদাশঙ্কর একটি রূপকথার প্রতীক ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থের নায়িকা মালা হল সেই রূপকথা রাজ্যের কিরণমালা। লেখক তার চরিত্রের মূল সূত্রের হদিস দিয়ে জানিয়েছেন—'রূপকথার রাজপুত্র কবে আসবে তারই জন্যে সে অপেক্ষা করবে। আর কারো গলায় মালা দেবে না। না, বিয়ের জন্য সে ভাবিত নয়। তার ভাবনা মুক্তা ঝরা জলের জন্যে। সোনার শুক-পাখীর জন্যে। অরূণ বরূণ তো নেই। কে যাবে ওসব আনতে? অগত্যা কিরণ-মালাকেই যেতে হয়।' ওদিকে কাহিনীর নায়ক বিলাত প্রত্যাগত শিল্পী দেব-প্রিয়ের জবানীতে প্রথমেই এইভাবে বই শুরু হয়েছে—'একটি মানুষকে সুখী

করা কি সোজা কাজ! আমি তো মনে করি এর চেয়ে একটা সাম্রাজ্য জয় করা সহজ।'

উপন্যাসের ঘটনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল পর পর্যন্ত। জাতীয় আন্দোলন, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, দাঙ্গা এবং আততায়ীর হাতে মহাত্মাজির প্রাণদান ইত্যাদি সমস্তই অত্যন্ত বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনীর টানা-পোড়েনে দেখা গেল মালা রূপকথার মনোলোকে বাস করলেও নোয়াখালিতে গান্ধীজীর অনুগমন করে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েই সে খুঁজেছে তার প্রকৃত প্রশ্নের সদুত্তর। তারপর গান্ধীজীর রক্তাক্ত আত্মদানের পর সে বলেছে—'......পথিকদের একজন এতদিনে মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তা ঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।' একথার উত্তরে নায়ক দেবপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে—'বাকী থাকে সোনার শুকপাখী। সেটি আনতে যাচ্ছে কে?' মালা মধুরভাবে তাকিয়ে জবাব দেয়—'সেটি আনতে যেতে হবে মায়া পাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।' তারপর সে অন্যান্য কথার পর আবার বলে—'সৌন্দর্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছো বলে তুমি কি রাজপুত্র নও? রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধবেই। তুমি না চাইলেও আমিই তোমাকে দ্বন্দ্বে নামাব। আমি যে তোমার শক্তি।'

আশাকার এইসব উদ্ধৃতির কল্যাণে এটুকু বোঝা গেছে যে, এ উপন্যাসের মূলসুর কোন পর্দায় বাঁধা। অথচ কাহিনীতে কোথাও ছেদ নেই, অবাস্তবতা নেই। প্রত্যক্ষ এবং প্রতীক এখানে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে পরস্পরের সঙ্গে যে একে কেবল অসাধারণ নয়, অনন্যসাধারণ বলতেও দ্বিধা হয় না। সুখে নিজেই যেন একটি 'শুকপাখী'। আমাদের নতুন কালের বাগানে সে তার চিরন্তন আশার গান শোনাতে এসেছে।

দূরবীন—(ছোটগল্প)—বনফুল। বাকসাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম চার টাকা।

বনফুলের গল্প-গ্রন্থ সমালোচনা করা অতিশয় সহজ। কারণ পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা চলে—বনফুলের গল্প, আর কি বলার আছে ইত্যাদি। সত্যই বনফুল বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ভঙ্গী ও বিশেষ শ্রেণীর গল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাহিনীর বর্ণনা-ভঙ্গী সরল হৃদয়গ্রাহ্য, বক্তব্য সুস্পষ্ট, অথচ অতি অল্প কথায় পাঠকচিত্ত জয় করার এক নিজস্ব আঙ্গিক তিনি সৃষ্টি করেছেন যার অনুকরণ করাও কঠিন। বনফুলের ছোটগল্প তাই বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখনীয় অবদান। 'দূরবীন' নামক গল্প-সংকলনে বনফুলের কয়েকটি বিখ্যাত গল্প সংগৃহীত হয়েছে, তিরিশটি গল্পের মধ্যে বনফুলের শিল্পি-মানসের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিবালা, আত্মহত্যা, ক্ষীর, মড়াটা, ভোরের স্বপ্ন প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে অপূর্ব সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে সাধারণ জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে গল্প রচনার কৃতিত্ব বনফুলের অসীম।

'দূরবীনে' তাঁর সেই শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদভূষণ এঁকেছেন কানাই পাল। মুদ্রণ সুন্দর।

ডম্বরু ডাক্তার (নাটিকা)—**মনোজ বসু। গ্রন্থ প্রকাশ—৬৪, বিপিনবিহারী গাংগুলী স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।**

মনোজ বসু নাট্যকার হিসাবেও খ্যাতিমান। সাধারণ রংগমঞ্চে তাঁর 'ডাক-বাংলো', 'নূতন প্রভাত', 'প্লাবন' প্রভৃতি অভিনীত হয়ে খ্যাতিলাভ করেছে। এর মধ্যে 'ডাক-বাংলো' নাটকটিকে উপন্যাস থেকে নাটকায়িত করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। ডম্বরু ডাক্তার নাটকটি হাসির নাটক। অনেকগুলি টাইপ চরিত্র আছে। অভিনেত্রী জোটানো কষ্টকর বলে নাটকীয় পাত্রীর সংখ্যা কম। দৃশ্যপট একটি, অভিনয়ের সময় ঘণ্টাখানেক। 'রায় রায়ান' নামক বেতারখ্যাত নাটিকা-টিও এই গ্রন্থে সংযোজিত। 'রায় রায়ান' বহুবার বেতারে অভিনীত হয়েছে। উত্তম নাটকীয় উপাদান রায়-রায়ানের মধ্যে আছে। নাট্যকার রায়-রায়ান নাটিকাটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রশংসা লাভ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ—শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন—সম্পাদক : গোপাল হালদার। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। দাম পাঁচ টাকা।

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করেছেন ন্যাশানাল বুক এজেন্সী। এর সম্পাদক একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। তিনি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ প্রভৃতি লেখকদের সহযোগিতায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন তা নানাদিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ। হীরেনবাবু বাংলা সাহিত্যে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের 'সার্বভৌমত্ব' স্বীকার করেও অত্যন্ত সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, তিনি 'অখণ্ড মণ্ডলাকার', সর্বচরাচরে তাঁর ব্যাপ্তি, এমন বিশ্বরূপদর্শনের শক্তি কোথায় আমাদের মিলবে?' কিন্তু ব্যাপ্তিই তো কাব্যের সবচেয়ে বড় গুণ নয়। 'অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা বিনা তো কাব্যের কৈলাসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।......এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাঁদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই সমীচীন।' তারপর আমাদের এবং ইতালী ও ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন পরিস্থিতি বিচার করে গভীরতা ও তীব্রতার চরম দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে দান্তে ও শেকস্‌পিয়ারের নামোল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের এই পরিস্থিতিতে একদিকে দান্তে এবং অপরদিকে শেকস্‌পিয়ারের প্রত্যাশা কখনোই সঙ্গত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে যে এই স্তরের মহাকবিকে স্মরণ করতে হয়, এটাই তাঁর অবিসংবাদী মহত্ত্বের এক প্রমাণ...।' কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভাববার মতো।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে সঙ্কুচিত। কিন্তু ওর মধ্যেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীকের' উপর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণের' শিরোনামায় সুশোভন সরকারের উদ্ধৃতিবহুল প্রবন্ধটি।

সংকলনের মধ্যে একটা সুন্দর পরিকল্পনার আভাস আছে। লেখকগণও বিভিন্ন বিষয়ে চর্বিতচর্বণ না করে নিজেদের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এ জন্যে শতবার্ষিকী ভিড়ের মধ্যে সংকলনটি চট করে হারিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। বইখানির ছাপা-বাঁধাই চমৎকার।

গুরুদর্শন— (আলোচনা) **সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২॥ দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

লেখক বাল্যকালে শান্তিনিকেতনে 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয় দেখে মনে মনে গুরুকে পছন্দ করেন। মনে হয়েছিল গুরু তাঁর আপন জন। তারপর পরিণত বয়সে 'অচলায়তন' পাঠ করে লেখকের মনোভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে, তিনি নতুন ব্যাখ্যা লাভ করেছেন। দর্শন নয়, তত্ত্ব নয়, নতুন দৃষ্টিকোণে 'অচলায়তনে'র বিচার করার চেষ্টা করেছেন। সুযোগ্য লেখক। বালকদের নেই ভক্তি, না বোঝে গুরু, না দিতে পারে ধর্মসঙ্গ। তারা জানে শুধু খেলতে, স্পষ্ট কথা তারা বোঝে। গুরু এদের কাছে চরম নির্দেশদাতা। এদের নিত্যখেলার সঙ্গী, কারণ তিনি তাদের মধ্যে পেয়েছেন পরম সম্ভাবনা। এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটিতে লেখক অপরূপ লিপিকুশলতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের কাছে 'গুরুদর্শন' তাই এক মূল্যবান আকর্ষণ।

জাতিস্মর কথা —(অলৌকিক কাহিনী)—সুশীলচন্দ্র বসু। প্রকাশক—দি ঘাটশীলা কোম্পানী। ৩নং ম্যাঙ্গো লেন। কলিকাতা—১। দাম চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

দার্শনিক অঁরি বের্গস যাকে বলেছেন Elan Vital, বার্নাড শ যাকে বলেন Life-force, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন জীবন-দেবতা, আসলে তর্কাতীত ভাবে সবই এক। সমগ্র প্রাণী-জগতের নব-নব সৃষ্টি, রূপান্তর, জন্মান্তর এক ঈক্ষণা বা সংকল্পের ব্যাপার, ঈক্ষণা ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। কর্মবাদ এবং জন্মান্তর রহস্য অনেকে স্বীকার করেন না, অনেকে আবার তা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলেছেন—"বহূনি মে ব্যতীতাণি জন্মানি-তব চার্জুন। তানাহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ॥"—হে অর্জুন, আমাদের বহু জন্ম অতীত হয়েছে, সে সব আমার জানা, তোমার জানা নেই। ভগবান বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়েছিল—তার ফলে জাতকের কাহিনী রচিত হয়েছে। 'জাতিস্মর কথা' নামক গ্রন্থে লেখক ইদানীংকালের কয়েকটি পরিচিত জাতিস্মর কাহিনী একত্রে সংকলন করে পরিবেশন করেছেন। কাহিনীগুলি চমকপ্রদ, রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। লেখকের ভূমিকাটি সুলিখিত, তবে মাঝে মাঝে ভক্তিরসের অকারণ ছড়াছড়ি থাকায় বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থ এক হিসাবে প্রথম সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

স্বপ্ন (নাটিকা)—কালীপদ দে। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন। ১৭৩-৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম এক টাকা।

সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ নাটিকা। বর্তমান সামাজিক জীবনের পট-ভূমিকায় রচিত নাটিকাটিতে, বিজয়ের অসুখ, স্ত্রী রমা প্রকাশ ভাণ্ডারীর অর্থসাহায্য গ্রহণ করে, রেবা বিজয়ের বোন সব বোঝে। শেষ দৃশ্যে বিজয় মারা যায়, কাশতে কাশতে মৃত্যু। রমা দুখানি নতুন শাড়ি হাতে করে যখন বাড়িতে প্রবেশ করে—রেবাকে শাড়ি দেখাতে যায়, তখন রেবা বলে ওঠে—থান কাপড় পাসনি একটাও?—এইখানেই যবনিকা। অর্থনৈতিক চাপে সমাজ কোথায় চলেছে তার সুন্দর চিত্র এই নাটকে রূপায়িত।

তদন্ত (নাটিকা)—প্রণবেশ চক্রবর্তী। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন। ১৭৩-৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম—আট আনা মাত্র।

বিষয় তলাপাত্র সহসা নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁর পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত আত্মীয় বন্ধুরা তদন্ত শুরু করলেন, তারপর তিনি শেষ দৃশ্যে এসে হাজির। আটত্রিশ পাতার নাটিকা। তবে এই ক্ষুদ্র নাটকে বিচিত্রের মুদ্রাদোষ 'আপনার রাগের কথা' এবং হৃদয়ের মুদ্রাদোষ "বোনটা যদি আজ বেঁচে থাকত"—বড্ড কানে লাগে। কয়েকটি সুন্দর রেখাচিত্র আছে।

ব্যবসায়ীর কথা —(ব্যবসা-বাণিজ্য)— মদনমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: ভারতীয় সাহিত্য-পরিষদ। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বই পড়ে ব্যবসা শেখা যায় না, তবে হাতে-কলমে কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়। লেখক স্বয়ং ব্যবসা-জীবনে সিদ্ধি-লাভ করেছেন, এবং মোটামুটি একটা পথ-নির্দেশ করেছেন এই গ্রন্থে। বিদেশে এই জাতীয় প্রচুর গ্রন্থ আছে, বাংলায় আর আছে কিনা জানি না। কর্মহীন বেকার যুবকদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে পথ-নির্দেশ করবে। সৎ ভাবে জীবন-ধারণে উপযোগী জীবিকা অর্জনে অল্প মূলধনেও কিভাবে ব্যবসা করা যায় এবং ব্যবসায়ীর কি করণীয় তার নির্দেশ এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজন।

মন্দিরময় ভারত (দ্বিতীয় ভাগ)— অপূর্বরতন ভাদুড়ী। প্রকাশক: এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম ছ' টাকা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থের লেখক অপূর্বরতন ভাদুড়ী তারই বিবরণী দান করেছেন। প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী দ্রাবিড়, বেসর ও কাশ্মীর পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করেছেন ভারতের সমস্ত গুহা-মন্দিরের। নাগর পদ্ধতিতে নির্মিত প্রায় সমস্ত মন্দিরের বিবরণ দিয়ে তিনি তৃতীয় ভাগ রচনা করবেন। লেখক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশে মন্দিরের গঠন আর তার নির্মাণ-পদ্ধতি এবং তার ক্রমোন্নতি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে সমকালীন ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী ও গুহামন্দির নির্মাণের ধারাবাহিক বিবরণী দান করেছেন। সব যে লেখক স্বচক্ষে দেখে-ছেন তা নয়, যা দেখেছেন এবং যা দেখেননি সব নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গুহামন্দির—দাক্ষিণাত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গুহামন্দির—কলিঙ্গ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গুহা-মন্দির—মালব নিয়ে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায়। এই গ্রন্থে কয়েকটি ছবি আছে বটে তবে চিত্রের পরিমাণ আরো কিছু বেশী থাকা উচিত ছিল। এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অধিক সংখ্যায় নেই। অথচ এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই লেখককে অভিনন্দন জানাই। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

কাজের কথা— আবুল হাসানত সম্পাদিত। ইনস্টিটিউট অফ আর্টস সায়েন্সেস এ্যান্ড হিউম্যানিটিস-এর উদ্যোগে ৩১নং তোপখানা রোড, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। সভ্যতার উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে আধুনিক অনুপরমাণু, কৃষি, খেলাধুলো প্রভৃতি নিয়ে এ বইটি লেখা। বাঙলা শব্দের মধ্যে উর্দু শব্দের আধিক্য গ্রহণীয় নয় বলেই মনে হয়। কারণ তার ফলে ভাষা হয় শ্রুতিকটু। এ ব্যাপারে সম্পা-দক মশায়কে অবহিত হতে বলি। শ্রদ্ধেয় আবুল হাসানত লিখিত অধ্যায়-গুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষা যেমন সুন্দর তেমনি রয়েছে কঠিন বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আলো-চনা কালে সত্যের বিকৃতি সাধনের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল তা নিন্দনীয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে লক্ষ্য করা হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥ আজকের কথা ॥

॥ অথ অভিনয়সাফল্য কথা ॥

"সেতু"-নাটকের পাঁচশততম স্মারক উৎসব উপলক্ষে বিশ্বরূপার পক্ষে শ্রীরাসবিহারী সরকার যে-ভাষণ দেন, তা প'ড়ে যে-কোনও পাঠকের মনে হ'তে পারে যে, অভিনয়সাফল্য-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের চাবিকাঠিটির সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তাঁর মতে "বাংলার মাটির মমত্ববোধ সঞ্জাত বাংগালী মেয়ের যে মন, —সেই মন কোন নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো—বাঙালী দর্শকের তা' প্রিয় হয়।" অর্থাৎ নাটকের প্রধান চরিত্রকে হ'তে হবে একটি মেয়ে এবং সেই মেয়ের যে-কোন কারণে দুঃখের অবধি থাকবে না, যাতে দর্শক-অন্তঃকরণ তার দুঃখে অভিভূত হয়ে বেদনার্ত হয়ে ওঠে এবং সময় সময় সেই বেদনা, গভীর থেকে গভীরতর হয়ে দর্শকচক্ষুকে অশ্রুসজল ক'রে তুলতে সমর্থ হয়।

লাঞ্ছিতা, ব্যথিতা, বঞ্চিতা নারীর কাহিনী—অবশ্য নাটকীয়-কাহিনী সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহকে দর্শক-সমাগমে সরগরম ক'রে তুলেছে বারে বারে, এ-কথা অনস্বীকার্য। সরলা, শাস্তি-কি-শান্তি, বলিদান, বঙ্গনারী, বাঙলার মেয়ে, পরপারে, ভ্রমর, মন্ত্রশক্তি, মা, ব্রতচারিণী, শ্যামলী প্রভৃতি বহু নাটক বা উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ দর্শকের চক্ষু থেকে যেমন ধারা বইয়েছে দর দর বেগে, ঠিক তেমনই ভরিয়েছে রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষের সিন্ধুক কড়কড়ে কাঁচা টাকায়। কিন্তু বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আজ পর্যন্ত যত নাটক অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে, তাদের সবগুলিরই প্রতিপাদ্য বিষয় কি "বাংগালী মেয়ের মন"? এখানে আমরা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথা বাদ দিয়ে আমাদের আলোচনাকে মাত্র সামাজিক তথা গার্হস্থ্য নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি। গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকের নাম যদিও অন্যতম স্ত্রী-চরিত্রের নামে, তবু সমস্ত নাটকখানি জুড়ে কি যোগেশের বিপর্যয় বড়ো হয়ে নেই? শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"তে জীবানন্দের হাহাকার কি অলকার (ষোড়শীর) মর্মবেদনাকে অকিঞ্চিৎকর করে দেয়নি? অনুরূপার "পোষ্যপুত্র"-এ শ্যামাকান্তর আর্তনাদ কি অন্য সকলের দুঃখকে ম্লান ক'রে তোলেনি? কাজেই বাঙালী মেয়েকে ঘিরে নাটক লিখলেই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনা, যদি না তার মধ্যে সার্বজনীনতার আবেদন থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, এই যে 'সেতু' নাটক, যার পাঁচশততম স্মারক উৎসব উপলক্ষে সকলে সমবেত হয়েছেন, তার প্রধান নারী-চরিত্রের যে-বেদনা—সন্তানহীনতার বেদনা, সে কি মাত্র বাঙালী নারীই অনুভব করে? জগতের সমস্ত সন্তানহীনা বিবাহিতা নারীই এই বেদনায় কাতর এবং সেই কারণেই "সেতু" নাটকের মধ্যে সার্বজনীন আবেদন আছে এবং তা আছে ব'লেই "সেতু" জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে। এর পরেই তিনি বলেছেন, মাত্র নাটক ভালো হ'লেই

সিটিজেন ফিল্মসের নিবেদন "গংগা-যমুনা" চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

প্রিয়তা লাভ করবে, নইলে করবেনা, এমন ধারণা অভ্রান্ত নয়।

এবং মাত্র নাটক সার্থক হ'লেই তার অভিনয়ও যে সার্থকতা লাভ করবে, এমন মতবাদ যে অযৌক্তিক, তা ঐ স্মারক উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই বলেছেন, বাঙালী মেয়ের মন চিত্রিত করলেই নাটক সার্থক হয়ে হ'লনা, সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে তার চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে মঞ্চের ওপর ফুটে ওঠা দরকার। এখানেই এসে পড়ে শিল্পীদের কৃতিত্বের কথা। (বিবেকানন্দবাবু এই সম্পর্কে নামোল্লেখ না করেও অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অপরূপ অভিনয়চাতুর্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেন।) বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা যদি একযোগে একটি ছন্দ বজায় রেখে রসোত্তীর্ণ অভিনয় করতে পারেন, অর্থাৎ তাঁদের টীমওয়ার্ক যদি

ভালো হয়, তাহ'লে সে জিনিষটাও অভিনয়কে সার্থক ক'রে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর পরেই আসে মঞ্চোপ-স্থাপনা বা প্রয়োগনৈপুণ্যের কথা। উপ-যোগী দৃশ্যপট, বেশভূষা, আসবাবপত্র, আলোক-সম্পাত, আবহ-সঙ্গীত এবং বিশেষ কলাকৌশল ("সেতু"র ক্ষেত্রে রেল-সাঁকো সংলগ্ন নির্জন স্থানে তাপস সেন প্রযুক্ত ট্রেন-দৃশ্য)—যাকে আজ সমস্ত মিলিয়ে "আঙ্গিক" আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেইটিও কোনো নাটককে সাফল্য-পূর্ণভাবে অভিনয় করবার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ নাটক, অভিনয় ও আঙ্গিক—এই তিনের সম্পূর্ণ একাত্ম-তার ভিতর দিয়েই অভিনয় সার্থকতা লাভ করে এবং এই একাত্মতা আনয়নের কাজকেই গর্ডন ক্রেগ "আর্ট অব থিয়েটার" আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

কিন্তু এসব তথ্য জানা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাটক, অভিনয় ও আঙ্গিক—একাত্ম হবার পরেও নাট্যাভি-নয় জনপ্রিয়তা লাভ করলনা; কিংবা কোনো একটি বিশেষ নাট্যাভিনয় যতটা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, আর একটি ততখানি হ'লনা। রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে 'হিমি'র যে মর্মব্যথা, তার আবেদন নিশ্চয়ই সার্বজনীন। এবং আর্ট থিয়ে-টার্সের আমলে স্টার থিয়েটারে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' অভিনীত হতে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, কি অভিনয়, কি আঙ্গিক—সব দিক দিয়েই এই মঞ্চাভিনয়টি অসামান্য শিল্প-সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হয়েছিল। তবু, তবু নাট্যরসিক দর্শক-সাধারণ তাকে সাদর সম্বর্ধনা জানায়নি। মুষ্টিমেয় সমালোচক এবং সাহিত্যিক-শিল্পীর প্রশংসাধন্য হ'লেও "গৃহপ্রবেশ" আর্থিক সাফল্য লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়েছিল। অতএব, বুঝতে নিশ্চয়ই কারুর অসু-বিধা হচ্ছেনা, মঞ্চনাটকের জনপ্রিয়তা-লাভের কোনো বাঁধাধরা রাজপথ আজও কেউ আবিষ্কার করতে পারেননি এবং কোনোদিন পারবেন বলে অনুমান কর-বার কোনো সঙ্গত কারণও হাতের কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ সদা-পিচ্ছিল দর্শকমনের, যে ভালো লাগলে বলে ভালো লেগেছে এবং ভালো না লাগলে বলে ভালো লাগেনি, অথচ কখনই বলতে পারেনা, কেন ভালো লেগেছে বা কেন ভালো লাগেনি এবং আগে থাকতে কিছুতেই নিজের হদিশ দেয় না,—সেই দর্শকমনের সন্ধান নাট্য-জগতের বহু রথীরথী বহু পরিশ্রমেও

ক'রে উঠতে পারেননি। তাই বলি, যখন চলে, তখন চলে; আর যখন চলেনা, তখন সে-জগদ্দল পাথরকে নড়ায় কার সাধ্য।

যুদ্ধোত্তর ইটালীতে চলচ্চিত্রশিল্প :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীর অবস্থা হয়েছিল হাড়-পাঁজর বার-করা যক্ষ্মা রোগীর মত। আহার নেই, বাসস্থান নেই, জীবিকাঅর্জনের কোনও পথ খোলা নেই—দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোককে দিন কাটাতে হচ্ছিল। যুদ্ধের কশাঘাতে মানুষ জর্জরিত; সমাজ-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত: মনুষ্যত্ব হয়েছে অন্তর্হিত। এই অবস্থার মধ্যে জনকয়েক চলচ্চিত্র-পাগল ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছবি করবার জন্যে—সরীসৃপের অবস্থাপ্রাপ্ত মানুষের দুঃখের দেওয়ালীকে তারা অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু কোথায় স্টুডিও, কোথায় ক্যামেরা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, আর কোথায় বা ফিল্ম এবং অপরাপর সরঞ্জাম? তা' হ'লে কি হবে? ভগ্নোদ্যম হবার পাত্র নয় তারা। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে—ডিস্‌-পোজ্যালে অনেক জিনিস বিক্রী হচ্ছে। তার ভিতর কি ভাঙাচোরা ক্যামেরা দু'-একটা পাওয়া যাবে না? এবং কিছু কাঁচা ফিল্ম? এদিকে এই অবস্থা: অন্য দিকে দেশ আমেরিকান ছবিতে ছেয়ে গেছে। তার ওপর যুদ্ধের আগেকার দিনের মত কোনো সরকারী রক্ষাকবচ নেই। আবার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অবস্থা এমনি যে, ছবি তৈরী ক'রে রপ্তানী দ্বারা যে কিছু আয়ের পথ প্রশস্ত করা যাবে, তারও কোনো উপায় নেই। অথচ ছবি তৈরী করতেই হবে, যা

সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম চিত্র "লায়লা মজনু"র একটি দৃশ্য।

হবে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের জীবনা-লেখ্য। তৈরীও হ'ল ছবি—ভাঙা ক্যামেরা এবং এখান-ওখান থেকে জোগাড়-করা কাঁচা ফিল্ম দিয়ে তৈরী হ'ল—ওপেন সিটি (Open City)। কিন্তু যারা তৈরী করল, তাদের ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। ছবিখানি তাই শুধু নিজেই একটি অসামান্য শিল্পসৃষ্টি ব'লে অভিনন্দিত হ'ল না, চলচ্চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করল—তাদের প্রাণে জাগাল নতুন আশা, অন্তরে দিল নবতম প্রেরণা। প্রমাণ করল যে, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার ভিতর দিয়েও ভাল ছবি তৈরী করা অসম্ভব নয়। রোবার্টো রোসে-লিনির "ওপেন সিটি" দেখবার পর ইটালী সরকারও আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না—এগিয়ে এলেন দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করতে। প্রথমেই আমেরিকান ছবির আমদানীকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দেশীয় চিত্রের মুক্তিলাভের পথকে প্রসারিত করলেন। এবং A, N, I, C, A, (ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান অব দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি) ও A, G, I, S, (দি জেনারেল অ্যাসোসিয়েশান অব এন্টার-টেনমেন্ট)-এর মারফত দেশীয় চিত্র-প্রযোজনার বাধাবিপত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারিত করবার জন্যে সচেষ্ট হলেন।

যুদ্ধোত্তর ইতালীয় চলচ্চিত্র সারা ইওরোপের চিত্রজগতে আনল বিপ্লব। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এল নব-বাস্তবতা (neo-realism)। সমসাময়িক ইটালীর প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার মর্মমূলকে উদ্ঘাটিত করে দেখাতে শুরু করল এই ছবিগুলি। রোসেলিনির "পয়সা" বা ভিত্তোরিও ডে সিকার "সুসাইন" ছবিকে ত পূর্ণাঙ্গ দলিল-চিত্র আখ্যা দেওয়া যায়। এদেরই মধ্যে দিয়ে লোকে যেমন ইটালীর শিল্পী-সত্তাকে প্রত্যক্ষ করল, তেমনই এই বাস্তবধর্মী ছবিগুলি লোকের চোখের সামনে সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন দিগন্তকে তুলে ধরল। ডে সিকার "বাইসিক্ল

থিভ্‌স্‌" জগতের চিত্রামোদীদের রীতি-মত বিভ্রান্ত ক'রে তুলল। ছবির মাধ্যমে এতখানি মানবিক আবেদনকে অভিব্যক্ত করা যায়, এ যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বৈদেশিক ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে হলিউড থেকে ছবিখানিকে বিশেষ পুরস্কার দ্বারা অভিনন্দিত করা হ'ল। ঐ ১৯৪৮ সালেই রোসেলিনির "জার্মানী, জিরো ইয়ার" ছবিখানিও অসাধারণ চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় আমেরিকার ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ কমিটি দ্বারা বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রাত্যহিক জীবন থেকেই এই সব ছবির বিষয়বস্তু সংগৃহীত। সামাজিক বিপর্যয়, কালোবাজার, শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, মানুষের কর্মহীনতা প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে ছবিগুলি গ'ড়ে উঠেছিল। চার বছর বয়েসের ছেলেকে নায়ক ক'রে ডে সিকা তৈরী করলেন "দি চিল্ড্রেন ওয়াচ আস" ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৫-এ তিনি তৈরী করলেন "সু সাইন"—রাস্তার ধারে ব'সে যে-ছেলে-গুলি জুতো বুরুশ করে, তারা কিভাবে কালোবাজারীদের দ্বারা চালিত হয় এবং ক্রমে পাকা চোর হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত শিশু-অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়ে জেলে যায়, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী বিধৃত হয়েছে এই ছবিতে। যুদ্ধোত্তর রোমের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জেলের যে নিখুঁত চিত্র এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা অবিস্মরণীয়।

ডে সিকার "বাইসিক্ল থিভ্‌স্‌"-এ বাপ এবং ছেলের চুরি-যাওয়া সাইকেল উদ্ধারের প্রাণান্তকর চেষ্টার দৃশ্য-গুলিকে কি সহজে ভুলতে পারা যায়? যথার্থ মানবিক স্পর্শসমৃদ্ধ ছবিখানি ইটালীর সাধারণ লোকের দারিদ্র্যের যে সর্বনাশা রূপ প্রকাশ করেছে, তার তুল্য বাস্তব আলেখ্য পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে আর দ্বিতীয় নেই। এই বাস্তব রূপকে ছবির মধ্যে তুলে ধরবার জন্যে ডে সিকাকে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা বুঝতে হ'লে পল রোথা এই ছবিখানির সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা পড়া দরকার। অনেক প্রশংসাবাণীর মধ্যে তিনি বলেছেন: "ছবিটির নায়ক অ্যান্টোনিওর ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনো বড় অভিনেতা নন, আসলে একজন কারখানার শ্রমিক; দু' মাসের ছুটি নিয়ে ছবিতে কাজ করে-ছিল। আর ঐ ব্রুনো ব'লে ছেলেটি, তার আসল নাম হচ্ছে এঞ্জো স্টিয়োলা, একটি উদ্বাস্তু বালক। এমনি ধারা ছবির আর সব চরিত্রে সাধারণ লোকেরাই অভিনয় করেছে—মাত্র একটি ভূমিকায় ছাড়া। এবং সমস্ত ছবিটি তোলা হয়েছে কর্মমুখর রোমের রাস্তায়, বাজারে, অলি-গলিতে, ক্ষুদে ক্ষুদে ঘরে, কংক্রীটের তৈরী ফ্ল্যাটে।...লোকে বলে ছবিখানি খুব সোজা, সাদাসিধে। সত্যিই কি তাই? গোটাকয়েক চরিত্র এবং কয়েকটি ঘটনা নিয়ে তৈরী ছবিখানির মধ্যে মানবজীবন সম্বন্ধে কি গভীর অভিজ্ঞতা ও চলচ্চিত্রশিল্প বিষয়ে কি অসামান্য দক্ষতারই না পরিচয় পাওয়া যায়! বাস্তব জীবন নিয়ে সংবাদচিত্র তোলা খুবই সহজ; কিন্তু কাহিনী-চিত্রের ঘটনাকে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে তুলতে হ'লে পরিচালককে নিজের শিল্প সম্বন্ধেই যে শুধু সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়, তা নয়; সেই বিশেষ পরি-বেশের উপর তাঁর এমন কর্তৃত্ব থাকা দরকার যে, সাধারণ লোক এবং যান-বাহনও তাঁর আদেশমত চলাচল করে। ছবিটির একটি দৃশ্য তোলা হয়েছে দুরন্ত বৃষ্টির মধ্যে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও দৃশ্যটির পথ ও ফুটপাথকে ভিজে রাখা কি অসম্ভব শ্রমসাধ্য, তা সাধারণ দর্শক অনুমানও করতে পারবেন না।...আর কোনও ছবি এমন বিচিত্রভাবে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাকে নিয়ে এমন সংবেদনশীল গভীরতার পরিচয় দিতে পারেনি। লেবার এক্স-চেঞ্জের ধাপ থেকে শুরু ক'রে শেষ দৃশ্যে ক্রন্দনরত সন্তানের হাত ধ'রে নায়ক অ্যান্টোনিওর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে দূরে চ'লে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্যই তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ছবির সমগ্র শিল্পকার্যটিকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।"

আর ডি বনসাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রের একটি ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইটালীর বাস্তবধর্মী ছবিগুলির মধ্যে নাম করবার মত অপরাপর ছবি হচ্ছে—ডে সান্তিজের "দি ট্র্যাজিক চেজ", কোমেন্সিনির "স্টিলিং ফরবিড্‌ন্‌" লুচিনো ভিস্কন্টির "অব্‌সেশান", অ্যালবার্টো লাত্তুয়াদার "উইদাউট পিটি", অ্যাল্ডো ভার্গানোর "দি সান অলওয়েজ রাইজেস", ফ্রান্সেস্কো ডি রবার্টিজের "দি সিম্পল লাইফ" প্রভৃতি।

বিবিধ সংবাদ

॥ সোভিয়েট চলচ্চিত্রোৎসব ॥

গেল ১৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার থেকে এক হপ্তা ধ'রে জ্যোতি সিনেমায় সোভিয়েত চলচ্চিত্রোৎসব হয়ে গেল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফিল্মালয়ের শশধর মুখোপাধ্যায় মেয়র রাজেন্দ্রনাথ মজুম-দারকে উদ্বোধন কার্য সমাধা করবার জন্যে অনুরোধ করবার সময়ে বলেন—"কোনোও দেশের চলচ্চিত্র সেই দেশের চলচ্চিত্রশিল্পরীতি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করার সঙ্গে সঙ্গে সেই

অপেশাদারী নাটক

নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে বেশীরভাগ সময়ই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় নাটকই। নারী-চরিত্রে কাকে পাওয়া যাবে। পট-পরিবর্তন ক'বার। সেট তৈরী করতে খরচ হবে কত। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে-কোন অপেশাদারী নাট্যসংস্থাকে। এইসব প্রশ্নের সহজ সমাধান পাওয়া গিয়েছিল জোছন দস্তি-দারের দুই-মহল নাটকে। তাঁর লেখা নতুন নাটক "বিংশোত্তরী" তেমনিই অপেশাদারী সংস্থাগুলির জন্যেই রচিত। নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ। বাস্তব, জীবন্ত চরিত্রগুলি স্বাভাবিক। দাম—আড়াই টাকা। প্রকাশ করেছেন—"ধারাবাহিক", ২৯।১, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। নিকটস্থ বইয়ের দোকানে কিনতে না পেলে, "ধারাবাহিক"-কে চিঠি লিখুন।

'যাত্রিক' পরিচালিত চিত্রযুগের 'কাঁচের স্বর্গ'-র একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

দেশের সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান জন্মাতে সাহায্য করে।" মেয়র শ্রীমজুমদারও উদ্বোধন প্রসঙ্গে এই ধরণের চলচ্চিত্র উৎসবের সার্থকতা সম্পর্কে বলেন—"বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর ক'রে মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করবার জন্যে চলচ্চিত্র যেভাবে সহায়তা করতে পারে, তেমন আর অন্য কিছুই নয়।" সোভিয়েত-কন্সাল মিঃ চেরকাশভের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর নিমন্ত্রিত অতিথিদের টিটভের মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত "এগেন টু স্টার্স" ও "দি ফেট অব এ ম্যান" নামে দু'খানি ছবি দেখানো হয়। দ্বিতীয় চিত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি লোক সৈন্য দলে ভর্তি হবার ফলে কেমন ক'রে নিজের প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে বাধ্য হয় এবং গ্রামে ফিরে নিজের আপন বলতে যা-কিছুকে ধ্বংস হ'তে দেখে মনের মধ্যে দারুণ রিক্ততা অনুভব করে এবং শেষে একটি অনাথ বালককে পেয়ে তার মানসিক পরিবর্তন হয়, তাই দেখানো হয়েছে। মানবিক আবেদনে পূর্ণ এই ছবিখানি সোভিয়েত সামাজিক বাস্তব আর্টের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

॥ দশরূপক প্রযোজিত "কালপুরী" ॥

গেল ১১ই ডিসেম্বর, সোমবার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে দশরূপক সম্প্রদায় পরেশ ধর লিখিত নতুন নাটক "কালপুরী"কে মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'কালপুরী'কে নাটক বলতে পারলে আমরা খুশীই হতুম। কিন্তু নাটকের ভিতর দ্বন্দ্ব তো দূরের কথা, একটি কাহিনীও যদি না থাকে, তাহলে তাকে 'নাটক' নামে অভিহিত করতে আমাদের মন সায় দেয়না। 'কালপুরী'তে যমরাজের সভায় কয়েকজন মর্তবাসী মৃত্যুর পর এবং একজন না-ম'রেই এসে হাজির হয়েছে এবং দেখানো হচ্ছে, যারা যত বেশী অধার্মিক, তারা যমরাজের কাছ থেকে তত বেশী বাহবা পেয়ে অনন্ত স্বর্গবাসের ছাড়পত্র পাচ্ছে এবং যে-ধার্মিক, তার প্রতি নরকবাসের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ স্বয়ং যমরাজ পর্যন্ত ঘুষখোর ইত্যাদি। সবশেষে বিধাতাপুরুষ এসে প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় বিচার করেন—ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় হয়। 'কালপুরী'কে রূপক বা শ্লেষাত্মক রচনা বলা যায়, কিন্তু নাটকের ধর্ম এই রচনা পালন করেছে ব'লে মনে করতে পারছি না।

কিন্তু প্রযোজনা বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে "কালপুরী" অত্যন্ত সার্থক। মঞ্চ-পরিকল্পনা ও পরিচালনা—উভয় ব্যাপারেই সুন্দর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। "কালপুরী"র নির্ঘণ্ট পত্রিকায় দশরূপকের কর্তৃপক্ষ বলেছেন—"বর্তমান যুগে প্রথম শ্রেণীর নাট্য-প্রয়োগের একমাত্র নিরিখ হলো মঞ্চকলার সমস্ত বিভাগের এক রসোত্তীর্ণ সমন্বয় সাধন। এই সমন্বয় সাধনের অবি-সংবাদী সম্রাট (হচ্ছেন) নির্দেশক—গর্ডন ক্রেগ যাকে বলেছেন আর্টিস্ট অব দি থিয়েটার। তিনি তাঁর দলের শিল্পীদের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে তোলেন। তাঁর সৃজন-শীল কল্পনায় নাটকের যে সমগ্র রস-রূপটি প্রতিবিম্বিত হয়, অভিনয়-শিল্পী ও বিভাগীয় কর্মিদের সহায়তায় তিনি মঞ্চের ওপর সেই রসরূপটি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন।" ও'দের এই বক্তব্য যে মাত্র কথাতেই পর্যবসিত হয়নি, বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রেও তাঁরা যে একে যথাযথভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। তাই দেখি, 'কালপুরী'র সমগ্র অভিনয় যেন একটি বিশেষ সুরে বাঁধা, যাকে খন্ডভাবে দেখা যায়না। বিধাতা পুরুষ (শিবনাথ ধর), যমরাজ (তারকনাথ ধর), ভবনাথ (পান্না চট্টোপাধ্যায়), ঠান্ডামল (তপন দাস), সুশাসন (সৌমেন চট্টোপাধ্যায়), গ্যাঁড়াচন্দ্র (সুধীর শেঠ), ভংগীধর (শৈবাল গুপ্ত), বনবীর (কিরণ দত্ত), হরসুন্দরী (বাণী দাশগুপ্ত) প্রভৃতি সকলেই সু-অভিনয় করেছেন। বিশেষ ক'রে দুটি নাম উল্লেখ করব দুটি ভিন্ন কারণে। প্রথম, হিয়াহতকারিণীর ভূমিকায় হিমানী গঙ্গোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দ, চটুল এবং চরিত্রোপযোগী দেহসৌষ্ঠব অকৃপণ প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু বুর্কনিরাম-রূপে রবীন ভড় সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে একটু বেসুরো—তাঁর অঙ্গভঙ্গী ঢের সংযত হ'তে পারত।

আমরা 'দশরূপক'-এর ভবিষ্যৎ গতি-পথের দিকে আশান্বিতভাবে চেয়ে থাকব।

ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের "বাল্মিকী প্রতিভা"

জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ "বাল্মিকী-প্রতিভা"

লিখেছিলেন মাত্র একুশ বৎসর বয়সে। এবং গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারভুক্ত যাঁদের নিয়ে তিনি এই গীতিনাট্যকে মঞ্চস্থ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন কিশোর এবং এক-আধজনকে মাত্র যুবক বলা যেতে পারে। পারিবারিক পরিবেশে বসে যাঁরা অভিনয় দেখেন, তাঁরা নাটক বা অভিনয়ের চুলচেরা বিচার করেন না, বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের রং-চং মেখে একটু গাইতে বা নাচতে কিংবা চেঁচিয়ে দুটো কথা বলতে দেখলেই খুশীতে ডগমগ হয়ে পড়েন। অনুমান করতে পারি, এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ "বাল্মিকী-প্রতিভার" সূচনায় বলেছেন, "একটা সময় এসেছিল, যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মিকী-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।" কবির এই কথা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি যখন "বাল্মিকী-প্রতিভা" লিখেছিলেন, তখন তাঁর মনের মত কলমও ছিল কাঁচা, তাতে পাক ধরতে তখনো দেরী ছিল।

তাই কবির প্রথম যৌবনের রচনাকে ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের মত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান যখন সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করবার কথা ঘোষণা করলেন, তখন মনে স্বভাবতঃই কিছু কৌতুক অনুভব করেছিলুম। এবং তাঁর ১৮৮২ সালের এই রচনাকে তাঁরা যে-নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন, তাতে কবিমানসের অন্তর্নিহিত রসধারায় অবগাহন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। অরূপ গুহ-ঠাকুরতার নির্দেশনায়, বিমল চক্রবর্তীর পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জায় অসিত চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতার নৃত্য-পরিচালনায়, প্রভাতকমলের সঙ্গীত-পরিচালনায়, রুমা গুহঠাকুরতা পরিকল্পিত বেশভূষায় এবং তাপস সেনের

প্রশান্ত চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে অর্দ্ধেন্দু মুখার্জি পরিচালিত "বন্ধন" চিত্রে সন্ধ্যা রায়।

পরিবর্তনশীল আলোকধারায় সজ্জিত হয়ে ইউথ কয়ারের "বাল্মিকী-প্রতিভা" বালক-কিশোর-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সকলকেই খুশীর জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যাঁরা মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে বাল্মিকীর ভূমিকায় শ্রীগুহঠাকুরতা, দস্যু দলের মধ্যে "আঃ বেঁচেছি এখন"-বলা বিশেষ দস্যুটি এবং বালিকা-বেশে মধুশ্রী বর্ধন, লক্ষ্মী-রূপিণী রুমা গুহঠাকুরতা এবং নৃত্যরতা বনদেবীরা বিশেষ করে দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ক্যালকাটা ইউথ কয়ার তাঁদের এই কবি-আরতির জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

কাঁচড়াপাড়া "আর্ট থিয়েটার"

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এই "আর্ট থিয়েটার"-এর জন্ম। মাত্র ২৫ জন সভ্য নিয়ে এঁরা যাত্রা সুরু করেন এবং আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে অন্ততঃ শ'তিনেক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সগৌরবে টিঁকে আছেন। যে-কোনও নাট্য-গীত সংস্থার পক্ষে এই টিঁকে থাকাটাই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু আরও বেশী অবাক হবার কাজ এঁরা সুরু করেছেন এই বছরের ৬ই জানুয়ারী থেকে। এঁরা ঐ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার কাঁচড়াপাড়া স্পিনিং ইনস্টিটিউটে নিয়মিতভাবে অভিনয় করে আসছেন এবং অল্পমূল্যের টিকিটের বিনিময়ে স্থানীয় দর্শকেরা সেই অভিনয় দেখে পর্যাপ্ত পরিমাণে খুশীও হচ্ছেন। কয়েকজন প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মুখে শুনেছি, এঁদের 'ছেঁড়া তার', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'কৃষ্ণকলি' প্রভৃতি অভিনয় অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়ে থাকে এবং যে-কোনও

খ্‌্‌তে নাট্যরসিকদর্শকও সে-অভিনয় সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করতে বাধ্য। আমরা "আর্ট থিয়েটার"-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নাট্য-সাহিত্য শাখা:

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে সর্বপ্রথম নাট্য-সাহিত্য শাখার সৃষ্টি করে উদ্যোক্তারা অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ করেছেন। পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলেই দেখা যায়, নাটকই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যসৃষ্টি। সেই সাহিত্যের সম্যক আলোচনার জন্যে নাট্য-সাহিত্যকে একটু পৃথক ক'রেই দেখা উচিত। মনে পড়ে, আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে নৈহাটীতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। তিনি রঙ্গজগতের লোকের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তখনকার উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ দিয়েছিলেন। এবারের নবসৃষ্ট নাট্য-সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। সভাপতিরূপে শ্রীরায় যে ভাষণ দিয়েছেন, তা যেমনই সুচিন্তিত, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষণের শেষাংশ সকলেরই প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় আমরা এখানে তা তুলে দিচ্ছিঃ "প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের দেশে নাকি নাটক নেই। দেশের নাটক অবহেলা ক'রে পাশ্চাত্য নাটকের গুণপনায় অনেকে শতমুখ।
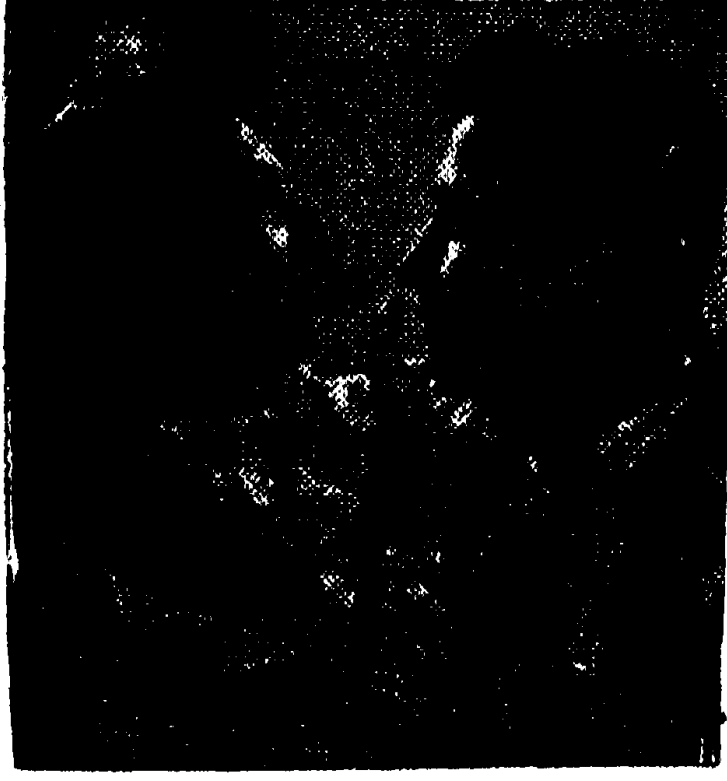
হিন্দী চিত্র 'মুরাদ'-এ চিত্রা ও তরুণ শিল্পী শাগা

কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক মান আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের মানের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে ক'রবার কোন কারণ নেই, একথা নির্ভয়ে ঘোষণা ক'রে আমি বিদায় নিচ্ছি।" শ্রীরায়ের উক্তি নিয়ে তার্কিকেরা তর্কযুদ্ধে নামুন এবং মস্তিষ্কপীড়ন করুন।

মল্লারের রবীন্দ্র-স্মরণোৎসব:

গেল ১৯-এ এবং ২০-এ ডিসেম্বর 'মল্লার' সম্প্রদায় মহাজাতি সদনে "ভুল স্বর্গ" নামে একটি নৃত্য-নাটিকা ও "এক যে ছিল রাজা" নামে একটি শিশু নাট্যসহ গান, নাচ, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে রবীন্দ্র শত বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করেন।

॥ নাটকাভিনয় ॥

বিগত ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীরবি সেনগুপ্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় উত্তরায়নের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক পরলোকগত নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকটি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়ের প্রাক্কালে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কুমার বিশ্বনাথ রায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়-প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, প্রধান ও অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

* * *

বিশ্বরূপা থিয়েটার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দকে ও বাংলার সাহিত্যিক প্রতিনিধিবৃন্দকে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬৷৷টায় বিশ্বরূপা প্রেক্ষাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবেন।

সোভিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম চিত্র 'দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেন্ট'-এর একটি দৃশ্য।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষ হতেও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হবে। অনুষ্ঠান অন্তে 'সেতু' নাটকটি বিনা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত (৫০১ তম অভিনয়) হবে।

বাংলার নাট্যশালার প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাসে এইরূপ প্রতিনিধি সম্মেলন এই প্রথম।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড ॥

ভারতবর্ষ : ৪৬৬ রাণ (ভি এল মঞ্জরেকার ১৮৯ নট আউট, এম এল জয়সীমা ১২৭, সি জি বোরদে ৪৫ রাণ। ডেভিড এ্যালেন ৮৭রাণে ৪, বি নাইট ৭২ রাণে ২, ডেভিড স্মিথ ৬৬ রাণে ১, আর বারবার ১০৩ রাণে ১ এবং টনি লক ৮৩ রাণে ১ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৫৬ রাণ (৩ উইকেটে। পুলার ৮৯, কেন ব্যারিংটন ১১৩ নট আউট এবং টেড ডেক্সটার ৪৫ নট আউট)

১ম দিন (১৩ই ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ ২৫৩ রাণ (৩ উইকেটে)। মঞ্জরেকার ৬১ এবং উমরীগড় ৮ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১৪ই ডিসেম্বর) : ৪৬৬ রাণে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যান্ড ২১ রাণ (১ উইকেটে। পুলার ৭ এবং ব্যারিংটন ১৩ রাণ করে নট আউট থাকেন)

৩য় দিন (১৬ই ডিসেম্বর) : ইংল্যাণ্ডের ২৫৬ রান (৩ উইকেটে)। কেন ব্যারিংটন ১১৩ রান এবং টেড ডেক্সটার ৪৫ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

নয়াদিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলা নির্দিষ্ট দিনে আরম্ভ হয়ে মাঝপথে বৃষ্টির জন্য ভন্ডুল হয়ে গেছে। তিনদিন খেলার পর চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে পুনরায় খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। সরকারীভাবে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে তৃতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল ড্র। এই নিয়ে ভারতবর্ষের উপর্যুপরি ৯টা টেস্ট খেলা ড্র গেল। ১৯৫৯-৬০ সালের অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ম টেস্ট, ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে পাকিস্থানের বিপক্ষে ৫টি টেস্ট এবং ১৯৬১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩টি টেস্ট। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলার এই শোচনীয় পরিণতির মধ্যে মানুষের কোন হাতই ছিল না। স্বয়ং বরুণদেবের হস্তক্ষেপে খেলা পণ্ড হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৩ উইকেট খুইয়ে ২৫৩ রাণ করে।

লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৮৩ রাণ (জয়সীমা ৫৪ এবং কণ্ট্রাক্টর ২৮)। কণ্ট্রাক্টর দলের ১২১ রাণের মাথায় লকের ৭ম ওভারের দ্বিতীয় বল ঠিকমত মারতে না পেরে পুলারের হাতে সোজা 'ক্যাচ' তুলে আউট হন। মঞ্জরেকার ২য় উইকেটে জয়সীমার সঙ্গে খেলতে নামেন। তখন জয়সীমার রাণ ছিল ৮১।

লকের বলে জয়সীমা একটা ওভার বাউণ্ডারী মারেন। এর পর ব্যারিংটনের দ্বিতীয় ওভারে ২ বার বাউণ্ডারী মেরে জয়সীমা তাঁর ৯৯ রাণে পৌঁছে যান। এই ৯৯ রাণের মাথায় জয়সীমা সাত মিনিট চুপচাপ থেকে ব্যারিংটনের বলেই টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম শতরাণ পূর্ণ করেন। এই শতরাণ করতে তাঁর ১৯৬ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী করেন ১২টা এবং ওভার বাউণ্ডারী ১টা।

ভারতীয় দলের মধ্যে খুব কম খেলোয়াড়ই ২০০ মিনিটের খেলায় টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন। গত বছর পাকিস্থানের বিপক্ষে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে জয়সীমা মাত্র ১ রাণের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি, ৯৯ রাণের মাথায় আউট হয়ে যান।

চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের রাণ ছিল ১৯৩ (১ উইকেটে), জয়সীমার রাণ তখন ছিল ১২৬ এবং মঞ্জরেকারের ২৪ রাণ।

দলের ১৯৯ রাণের মাথায় জয়সীমা নিজস্ব ১২৭ রাণ করে ডেভিড স্মিথের বলে তাঁরই হাতে ধরা পড়েন। জয়সীমা মোটমাট ২৬৯ মিনিট খেলেছিলেন, বাউণ্ডারী করেন ১৪টা এবং ওভার বাউণ্ডারী ২টো। ৩য় উইকেটে খেলতে নামলেন পতৌদির নবাব 'টাইগার' তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। মাঠের ৩০,০০০ হাজার দর্শক এই তরুণ খেলোয়াড়কে আনন্দধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। টাইগার ২০ মিনিট খেলে নিজের ১৩ রাণ করলেন। এবং এই অশুভ ১৩ রাণের মাথায় এ্যালেনের বলে দোমনা হয়ে পুল করলেন। বলটা সোজাসুজি রিচার্ডসনের হাতে ধরা পড়ল। দলের ২৪৪ রাণের মাথায় দলের ৩য় উইকেট পড়ে গেল। ৪র্থ উইকেটে খেলতে নামলেন উমরীগড়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষের ২৫৩ রাণ দাঁড়িয়েছে ৩টে উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৪ উইকেট পড়ে ৩৩৭ রাণ। উমরীগড় এ্যালেনের বলে এল বি ডবলিউ হয়ে আউট হন। লাঞ্চের সময় উইকেটে ছিলেন মঞ্জরেকার (১২০ রাণ) এবং বোরদে (১১)। দলের ২৯৮ রাণের মাথায় লকের বলে মঞ্জরেকার ২ রাণ করলে ভারতবর্ষের ৩০০ রাণ পূর্ণ হয় ৪১৫ মিনিটের খেলায়। মঞ্জরেকারের রাণ দাঁড়ায় ৯৮। পরের ওভারে এ্যালেনের বলে মঞ্জরেকার ২ রাণ করে তখন নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন। এই শতরাণ করতে তাঁর ২০৮ মিনিট সময় লাগে, বাউণ্ডারী করেন ১৫টা। ইংলণ্ডের বিপক্ষে মঞ্জরেকারের এই দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী।

চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে ৪৪৩ রাণ ছিল।

টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ ভারতবর্ষ পুরোপুরি কাজে লাগায়। কিন্তু চা-পানের বিরতির পরের ৪০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২৩ রানে। অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিণতি! এই অনিশ্চিত পরিণতির জন্যেই ক্রিকেট খেলা রোমাঞ্চকর—অন্য পাঁচটা খেলার থেকে ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। দলের ৪০৪ রানের মাথায় বোরদে নিজস্ব ৪৫ রান ক'রে বারবারের বলে পুল করতে গিয়ে বলটা ফস্কে যান। বল তাঁর প্যাডে লেগে তাঁর উইকেট ভেঙ্গে দেয়। ৫ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং মঞ্জরেকার দলের ১৩২ রান তুলে দেন। দলের ৪৬২ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (দেশাই) পড়ে। ১০ম অর্থাৎ শেষ উইকেটে খেলতে নামেন সুভাষ গুপ্তে। দলের ৪৬৬ রানের মাথায় কোন রান না করেই গুপ্তে নাইটের বলে বোল্ড আউট হন।
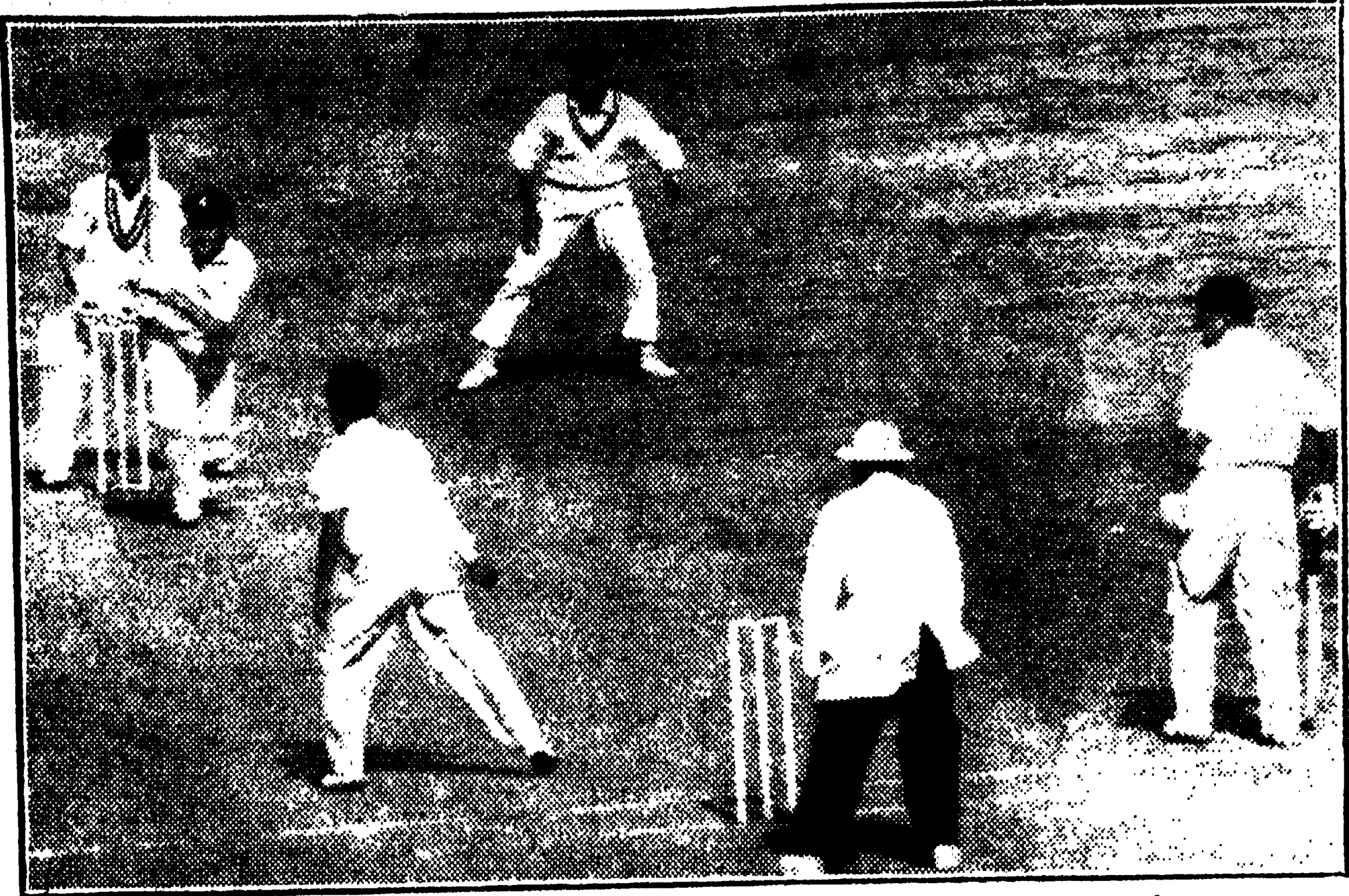
নিউদিল্লীর ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলার (তৃতীয় দিনের) দৃশ্য : ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড় জিওফ পুলার গুপ্তের বল মেরেছেন।

মঞ্জরেকার নিজস্ব ১৮৯ রান করে নট আউট থেকে যান। জুটির অভাবে মাত্র ১১ রানের জন্যে তিনি শেষ পর্যন্ত ২০০ রান পূর্ণ করতে পারলেন না। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় মঞ্জরেকারের এই ১৮৯ নট আউট রানই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড ছিল ১৮৪ (ভি মানকড়, লর্ডস, ১৯৫২)।

মঞ্জরেকার তাঁর এই ১৮৯ রান তুলে নেন ৪৮৭ মিনিটের খেলায়। বাউণ্ডারী করেন ২৯টা। মাত্র একবার নিজস্ব ১০১ রানের মাথায় তিনি আউট হওয়ার হাত থেকে ছাড়ান পান। নতুবা তাঁর খেলায় কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না। প্রথম দিনের খেলায় তিনি জয়সীমার সঙ্গে ২য় উইকেটে খেলতে নামেন এবং ৬১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

ইংল্যাণ্ড ৪০ মিনিটের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ২১ রাণ করে। পুলার (৭) এবং ব্যারিংটন (১৩) নট-আউট থাকেন।

শুক্রবার (১৫ই ডিসেম্বর) বিশ্রামের দিন ছিল। শনিবার (১৬ই ডিসেম্বর) ইংল্যাণ্ডের ২য় দিনের নট-আউট খেলোয়াড় ব্যারিংটন এবং পুলার পুনরায় প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দু'জনেই খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৩৭ রান উঠে। লাঞ্চের বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের ৯৭ রান দাঁড়ায়, ১ উইকেটে। পুলার এবং ব্যারিংটন দু'জনেই ৪৮ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন। দলের ১৬৬ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে, পুলার নিজস্ব ৮৯ রান ক'রে কৃপাল সিংয়ের বলে মঞ্জরেকারের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। পুলার ২৫০ মিনিট খেলে ১৩টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। পুলার এবং ব্যারিংটনের ২য় উইকেটের জুটিতে ১৬৪ রান ওঠে। এই ১৬৪ রান ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ২য় উইকেটের জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ১৫৮ (লেন হাটন এবং পিটার মে, লর্ডস, ১৯৫২)

ব্যারিংটনের সঙ্গে মাইক স্মিথ ৩য় উইকেটে খেলতে নামেন। কিন্তু বেশীক্ষণ খেলতে পারেননি। মাত্র ২ রান ক'রে দলের ১৭৭ রানের মাথায় গুপ্তের বলে বোল্ড আউট হ'ন। মাইক স্মিথ উপর্যুপরি তিনটে টেস্ট ইনিংসে 'গোল্লা' করেছিলেন। এবার দু' রান ক'রে তবু মান রক্ষা করলেন। ব্যারিংটনের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধলেন অধিনায়ক টেড ডেক্সটার। এই ৪র্থ উইকেটের জুটি এই দিন ৭৯ রান তুলে নট-আউট থেকে যান।

ইংল্যাণ্ড এই দিন শম্বুক গতিতে রান করে। লাঞ্চের বিরতির আগের ২ ঘণ্টায় ৬৬ রান এবং চা-পানের বিরতির আগের ২ ঘণ্টায় ৭৭ রান অর্থাৎ চার ঘণ্টার খেলায় মোট ১৪৩ রান ওঠে। খেলায় যা কিছু দ্রুতগতিতে রান উঠেছিল তা চা-পানের পরের এক ঘণ্টার খেলায়, ৬৭ রান। ৫½ ঘণ্টার খেলায় এই দিন ইংল্যাণ্ডের ২৩৫ রান ওঠে। চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার অনুকূলে এই রান মোটেই যথেষ্ট নয়। এই দিন ২য় উইকেটের জুটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের রেকর্ড রান এবং কেন ব্যারিংটনের সেঞ্চুরী যা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্যারিংটন এ মরসুমের পাকিস্তান ও ভারত সফরে এ পর্যন্ত ৪টি টেস্ট খেলায় যোগদান ক'রে উপর্যুপরি চারটি টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন। তাঁর ২০টি টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত টেস্ট সেঞ্চুরীর সংখ্যা দাঁড়াল ৬টি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ব্যারিংটন তাঁর নট-আউট ১১৩ রান করেন ৩১৬ মিনিটের খেলায়।

লাঞ্চের বিরতির কয়েক মিনিট আগে আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখা দেয়, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে। সে বৃষ্টি যে চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের খেলা ভণ্ডুল করবে তা কেউ কামনা করেননি।

তৃতীয় দিনের খেলা প্রসঙ্গে আর এক কথা, একঘেঁয়েমী খেলায় দর্শকরা

অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে খোল-কীর্তন সহযোগে মাঠ মুখরিত ক'রে তুলেছিলেন। ভারতীয় টেস্ট খেলায় আর এক বিশেষ দ্রষ্টব্য, খেলার মাঠের মধ্যে কুকুরের হঠাৎ উপস্থিতি। নয়াদিল্লীর ফিরোজ শাহ্ কোটলা মাঠে তার ব্যতিক্রম হয়নি; তৃতীয় দিনের খেলায় একজোড়া কুকুর মাঠে নেমেছিল অত্যন্ত প্রয়োজন সময়ে—দর্শকরা তবু কিছুক্ষণ হাঁফ ছেড়ে হাসিমুখ করেছিলেন।

এম সি সি বনাম উত্তরাঞ্চল দল

উত্তরাঞ্চল : ১৫২ রান (বিজয় মেহেরা ৫৬। লক ১৭ রানে ৪, ব্যারিংটন ১৮ রানে ২, ডেভিড স্মিথ ১৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১৪৫ রান (বিজয় মেহেরা ৫৩। বারবার ৬৬ রানে ৪, লক ৩১ রানে ৩, ব্যারিংটন ১৩ রানে ১ এবং ব্রাউন ৩ রানে ১ উইকেট)

এম সি সি : ২৫৬ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডেক্সটার ৭২, প্যারফিট ৪৬। মুদিয়া ৭১ রানে ৬ এবং প্রেম ভাটিয়া ৩২ রানে ২ উইকেট) ও ৪২ রান (১ উইকেট। রাসেল নট আউট ২৫)

১ম দিন (৮ই ডিসেম্বর) : ১৫২ রানে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। এম সি সি : ৫৯ রান (১ উইকেট)।

২য় দিন (৯ই ডিসেম্বর) : ২৫৬ রানে এম সি সি দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। উত্তরাঞ্চল : ৭৯ রান (২ উইকেট)

৩য় দিন (১০ই ডিসেম্বর) : ১৪৫ রানে উত্তরাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি। এম সি সি ৪২ রান (১ উইকেট)

জলন্ধরে এম সি সি বনাম উত্তরাঞ্চল দলের তিন দিনের খেলায় এম সি সি ৯ উইকেটে জয়লাভ করে। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরের ৭৫ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

॥ রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ॥

বাংলা : ৩৮৯ রাণ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পঙ্কজ রায় ৯৮, আর বি কেশরী ১৩৬। রাজবংশী ১০২ রাণে ৩ এবং এস ভট্টাচার্য ৯৮ রাণে ২ উইকেট)

ও ৮১ রাণ (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পঙ্কজ রায় ৪৯)

আসাম : ২৭০ রাণ (এ গুহরায় ৪৭, এম পি বড়ুয়া ৪২, অবনী হাজারিকা ৪০। আর বি কেশরী ৭১ রাণে ২, সৌমেন কুণ্ডু ৪৭ রাণে ২, কে মিত্র ৪১ রাণে ২, এস কাপুর ৬০ রাণে ২ এবং কে কিষাণ ২৭ রাণে ১ উইকেট পান)

ও ৯৫ রাণ (১ উইকেটে। এম পি বড়ুয়া ৫১, এ গুহরায় ৩৭)।

ইডেন উদ্যানে বাংলা বনাম আসাম দলের পূর্বাঞ্চলের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। বাংলা দল প্রথম ইনিংসে ১১৯ রাণে অগ্রগামী থাকায় ৫ পয়েন্ট এবং দ্রুতগতিতে রাণ তোলার জন্যে অতিরিক্ত ১ পয়েন্ট, মোট ৬ পয়েন্ট লাভ করেছে। অন্যদিকে আসাম দল পেয়েছে ৩ পয়েন্ট। পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা দল ইতিপূর্বে ৯ পয়েন্ট পেয়েছে উড়িষ্যা দলকে হারিয়ে। উপস্থিত বাংলা দলের পক্ষে ১৫ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে।

॥ জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ॥

অমৃতসরে অনুষ্ঠিত ষড়্বিংশতিতম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) পুরুষদের সিঙ্গলস, পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ ক'রে 'ত্রিমুকুট' আখ্যা লাভ করেছেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : গত বছরের বিজয়ী নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৫-৩ ও ১৫-৮ পয়েন্টে নানাকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নান্দু নাটেকার এবং দেওরেস (মহারাষ্ট্র) ১৫-০ ও ১৫-৫ পয়েন্টে তুতাং এবং জাহাজকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস মীনা সা (রেলওয়ে) ১১-১ ও ১১-৬ পয়েন্টে যশবীর কাউরকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নান্দু নাটেকার এবং মিস নন্দ কেলকার (মহারাষ্ট্র) ৭-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েন্টে মিস অচলা কার্ণিক এবং এ আই শেখকে পরাজিত করেন।

নৌচালনা প্রতিযোগিতা

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এবং এ্যামেচার রোয়িং এসোসিয়েসন অব দি ইস্ট রেগেটা পরিচালিত নৌ-চালনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফলাফল :

উইলিংডন ট্রফি : বিজয়ী ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব 'এ'। রানার্স-আপ—লেক ক্লাব।

ভেনাবেলস বাউল : বিজয়ী ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব 'এ'। রানার্স-আপ—লেক ক্লাব 'এ'।

হুগলী কাপ (চ্যাম্পিয়ানসীপ ট্রফি) : ১ম—ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব (২২ পয়েন্ট); ২য়—লেক ক্লাব (২০ পয়েন্ট)

ম্যাকলীন স্কালস : বিজয়ী এস, এন, মেদোরা।

॥ রাজ্য টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল : দীপক ঘোষ ২১-৯, ২১-৯, ২১-১৬ পয়েন্টে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান হ্যারী অ-কে পরাজিত করেন। দীপক ঘোষ ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের ফাইনালে জয়ী হয়েছিলেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল : দীপক ঘোষ এবং জে এম ব্যানার্জি ১৭-২১, ২০-২১, ২১-১৩, ২২-২০ পয়েন্টে হ্যারী অ এবং দীপককুমার ঘোষকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল : কুমারী উষা আয়েঙ্গার ২১-১৪, ২১-১০, ২১-১৬ পয়েন্টে ডাঃ তপতী মিত্রকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৬ বার খেতাব লাভ করেন।

॥ আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স ॥

ক'লকাতায় ভারত বনাম রাশিয়ার তৃতীয় আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ২৭৮—২৫২·৪ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়লাভ করে।

রাশিয়ার আজনাওরিয়ান ব্যক্তিগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান আজারিয়ান (রাশিয়া) ব্যক্তিগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পান।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফলাফল

আজনাওরিয়ান	(রাশিয়া)	৫৬·৮ পয়েন্ট
আজারিয়ান	(")	৫৬·৩ পয়েন্ট
জ্যাকারিয়ান	(")	৫৬·১ পয়েন্ট
আকোপিয়ান	(")	৫৫·৩ পয়েন্ট
অনন্তরাম	(ভারত)	৫২·০ পয়েন্ট
শ্যামলাল	(")	৫০·৭ পয়েন্ট
ডি মণ্ডল	(")	৪৮·৬ পয়েন্ট
এভাকিয়ান	(রাশিয়া)	৪৫·২ পয়েন্ট
ত্রিলোক সিং	(ভারত)	৪৩·৭ পয়েন্ট
নারসেসিয়ান	(রাশিয়া)	৪২·৭ পয়েন্ট
সুরজীৎ সিং	(ভারত)	৪০·৬ পয়েন্ট
দলীপ সিং	(")	৩৭·৪ পয়েন্ট
সত্যনারায়ণ	(")	২২·৮ পয়েন্ট

॥ পুস্তক পরিচয় ॥

রমণীয় ক্রিকেট : শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী, ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ৫৲ টাকা।

ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা। ইংরেজি সাহিত্যে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন কালে বহু রসরচনা এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় বিরাট 'ক্রিকেট-সাহিত্য'ও গড়ে উঠেছে। বর্ণনার পারিপাট্যে এবং ভাষার মাধুর্যে ক্রিকেট খেলা এমনই রমণীয় রূপ ধারণ করেছে যে, যাঁরা কখনও ক্রিকেট খেলার মাঠে উপস্থিত হননি বা ক্রিকেট খেলার অনুরাগী নন তাঁরাও এই 'ক্রিকেট-সাহিত্য' থেকে নিঃসন্দেহে প্রচুর রসোপলব্ধি করবেন।

বাংলা দেশে ক্রিকেট খেলার রসজ্ঞ লোকের সংখ্যা কম নয়। বাংলা দেশে ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলার মর্যাদা লাভ ক'রলেও বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় 'ক্রিকেট-সাহিত্য' রচনায় হাত দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থেরই রচয়িতা শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে তাঁরই প্রথম বই 'ইডেনে শীতের দুপুরে' এবং নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ক্রিকেট খেলার সরস রচনা ইতিমধ্যে সুধী ও ক্রিকেট খেলার অনুরাগী মহলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে। ক্রিকেট সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় বই এই 'রমণীয় ক্রিকেট'। ক্রিকেট খেলা দেখার মতই বইটি উপভোগ্য হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য রচনা, ১৯৬০-৬১ সালের ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট খেলা এবং ব্রিসবেন মাঠের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ 'টাই' ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট)।

ক্রিকেট খেলার বহু স্মরণীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও কাহিনী বইখানির অন্যান্য রচনাগুলি সমৃদ্ধ ক'রে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। লেখক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, 'ক্রিকেটের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস ব্যাট থেকে উৎসারিত হয়নি, তা হয়েছে কলম থেকে'। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই এবং খেলোয়াড়দের আলোক-চিত্রগুলি পুস্তকখানির আর এক বিশেষ আকর্ষণ।

M. C. C. IN INDIA: Published by Illustrated News (Sports), 203/2B, Cornwallis Street, Calcutta-6. Price Re. 1/-.

ইংরেজীতে প্রকাশিত এই স্মারক পুস্তিকাটি এম সি সি দলের ভারত সফর উপলক্ষে রচিত। এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের আলোক-চিত্র ও জীবনী, ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের আলোক-চিত্র, ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডের টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড এবং অসংখ্য মূল্যবান পরিসংখ্যান পুস্তিকাটির প্রধান আকর্ষণ। সুদৃশ্য আর্ট কাগজে সুমুদ্রিত এই পুস্তিকাটি ক্রিকেট খেলার অনুরাগী-মহলে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করবে।
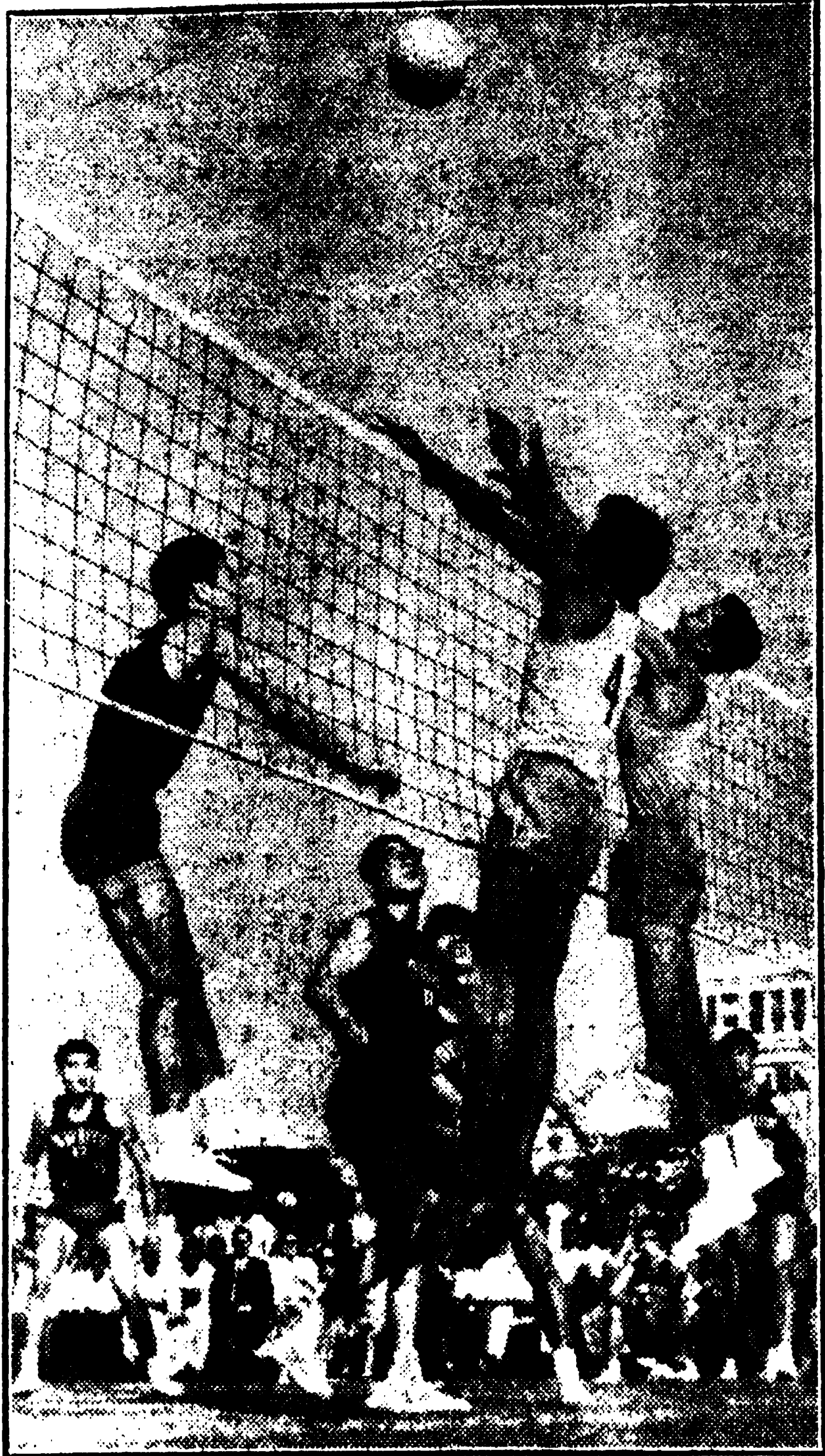
প্রদর্শনী ভলিবল খেলা : জাপানের কুরিন কাই ভলিবল দলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দলের খেলার দৃশ্য।

জাপানী ভলিবল দল

জাপানের কুরিন কাই ভলিবল দল ক'লকাতায় তাদের প্রথম প্রদর্শনী খেলায় পশ্চিমবাংলা দলকে ৩—১ খেলায় পরাজিত করে। দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় জাপানী দল ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতির একাদশ দলের বিপক্ষে ৩—২ খেলায় জয়লাভ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

॥ ক্রীড়া ও রঙ্গজগৎ বিশেষ সংখ্যা ॥

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৩ই পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 29th December, 1961.
40 Naya Paise.

যে খেলা গ্রীক নাটকের মতো পঞ্চমাঙ্কে বিভক্ত তার আসর কলকাতায় আরম্ভ-প্রায়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইডেন উদ্যানের শীতের দ্বিপ্রহর সেই নাটকের আশ্চর্য কৌতুকময় ছলনায় পূর্ণ হবে। সহস্র সহস্র দর্শকের বৃত্তাকার বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ মণ্ডপটে এই নাটকের পাঁচ দিনের পাঁচ অঙ্কে আছে জমানো আনন্দ উচ্ছ্বসিত সূর্যকিরণের মতো, অথবা অবসাদ ক্লান্তিকর, কিংবা আছে শীতার্ত উত্তরের হাওয়ার মতো নির্মম সুতীক্ষ্ণ বিষাদ। কি আছে তা কেউ জানি না। প্রথম জয়ের আনন্দ? ড্র-এর বহু-পুরাতন পুনরাবৃত্তি, অথবা নির্মম পরাজয়?

উত্তর জানা নেই। কারণ যে সময় ক্রীড়া-ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় ক্রিকেটের নূতন সূর্যোদয় ঘটেছে বলে ঘোষণা করেছিলেন, তার পর থেকে প্রহর গণনা করলে ইতিমধ্যে শুধু প্রভাত নয়, ভারতীয় ক্রিকেটে দ্বিপ্রহরের প্রথম সূচনা ঘটার কথা। এই সূর্যোদয়ের ঘোষণা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাবার কারণ হয়েছিল। কেননা অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত পর্বে নাটকের উত্তেজনা ছিল প্রচণ্ড, কয়েকবার পাঞ্জায় পাঞ্জায় আবদ্ধ তীব্র লড়াইয়ের আস্বাদ ছিল এবং তাছাড়া ছিল কানপুর গ্রীন পার্কের অভূতপূর্ব বিজয়-কাহিনী। তখন বেগ এবং জয়সীমার আবির্ভাব ছিল উচ্চাশাজনক। সর্বোপরি নরী কণ্ট্রাক্টর, মঞ্জরেকার এবং বোর্দের হস্তে যেমন ব্যাটিং-এর একটি পাকা গাঁথুনী তৈরী হচ্ছিল, তেমনি বোলিংয়েও আক্রমণের ফণা উদ্যত হতে পারে, এই আশা দেখা গিয়েছিল। কাজেই অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত পর্বের শেষেও আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হইনি।

কিন্তু ভারত বনাম পাকিস্থান পর্বে প্রভাতী সূর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অথচ শোনা যায় ইতিমধ্যে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের উৎপাত কতকাংশে প্রশমিত হয়েছিল এবং নরী কণ্ট্রাক্টরের ক্যাপ্টেনসিতে ভারতীয় দলের অন্তঃকরণ মালিন্য-মুক্ত হওয়ারও অবকাশ ঘটেছিল। বিষণ্ণ ক্রিকেট অনুরাগীদের একথা স্মরণ করানো নিষ্প্রয়োজন যে, উপরোক্ত সুলক্ষণগুলি সত্ত্বেও ভারত বনাম পাকিস্থান পর্বে ক্রিকেট নিস্তেজ, হতবীর্য এবং সৎসাহসহীন হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল যে, প্রভাতী সূর্য হয়ত আপাতত শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন। সুতরাং সমস্ত আশা মুলতুবী ছিল বর্তমান পর্বের জন্য—এইবার স্থির হবে সূর্য সত্যই উঠেছে, কি ওঠেনি।

কিন্তু বর্তমান পর্বে কি সেই নূতন প্রাণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যে প্রাণ দুরন্ত, যৌবনলব্ধ এবং অসমসাহসিক? অথবা যে ব্যাট বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসিত এবং বোলিং দুরন্ত বায়ুবাণের মতো দুর্গভেদী? বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের পাহাড়প্রমাণ রান উঠল ৮ উইকেটে ৫০০। সেই অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে এই পর্বের শুরু। গ্রীন পার্কে প্রথম ইনিংসে অবশ্য একবার মনে হয়েছিল সুভাষ গুপ্তের দ্বারা এই অশুভ বুঝি তিরস্কৃত হল। অন্তত গ্রীন পার্কের খেলায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে তীব্র উত্তেজনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। এবং দিল্লীতে প্রথম ইনিংসে ভারতের ৪৬৬ রানে ব্যাটিং-এর আশ্বাসও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এ আশ্বাস ক্ষণস্থায়ী। কারণ গ্রীন পার্কেই দ্বিতীয় ইনিংসে সুভাষ গুপ্তে এবং ভারতীয় বোলারগণের সকলের সারাদিনের ক্লান্তি দিয়েও ইংলণ্ড দলকে দ্বিতীয় ইনিংসের দুর্জয় দুর্গ থেকে হঠানো যায়নি এবং দিল্লীতে প্রথম ইনিংসেই ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে ২৫৬ রানের জবাব দেখে আশ্বাস মুখ লুকালো (প্রকৃতি এই নিশ্চিত ড্র-এর উপরে অসময়ে তাঁর যবনিকা নিক্ষেপ করলেন)।

এবে আরম্ভ চতুর্থ টেস্ট ইডেন উদ্যানে। ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি রৌদ্রের, আশার কিংবা বীর্যবত্তার। ইংলণ্ড বনাম ভারত পর্বে খেলায় হারজিতের মধ্যে কোনো রাজনীতির রঙ লাগবে না, একথা ভারতীয় খেলোয়াড়েরা জানতেন। তবু তাঁদের ঝুঁকি নিতে দেখা যায়নি। সুতরাং নাটকের তৃতীয় অঙ্কের পরেই ক্লান্তিকর অবসাদ কি প্রায় নিশ্চিত? কিন্তু 'প্রায় নিশ্চিতের' পরেও ক্রিকেটের ছলনা দেখা দিতে পারে। অন্তত ইডেনই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র। কেননা শীত এখানে প্রবল, রৌদ্র উজ্জ্বল এবং টার্ফ সুমসৃণ। এইখানে আমরা আহ্বান করছি উভয় দলকে—তারা ড্র-এর পুনরাবৃত্তি ভঙ্গ করুন। কারণ যে খেলা গ্রীক নাটকের মতো পঞ্চমাঙ্কে সাজানো, তার মধ্যে এই হতবীর্য ড্র-এর ট্র্যাজি-কমিডি দুঃসহ।

M.C.C.

এই তিনটী অক্ষর
তিন কাঠির খেলা -- খেলেছে ভারতের
তিনটী নগরে !
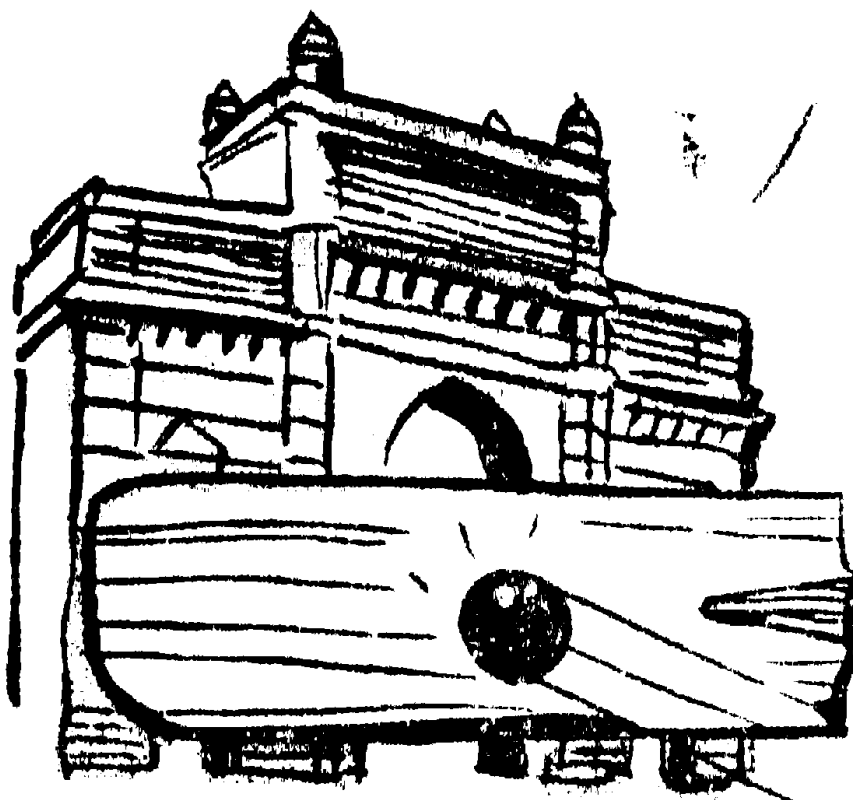
তাই, বোম্বাইয়ের
বেঁচেছে প্রাণ !
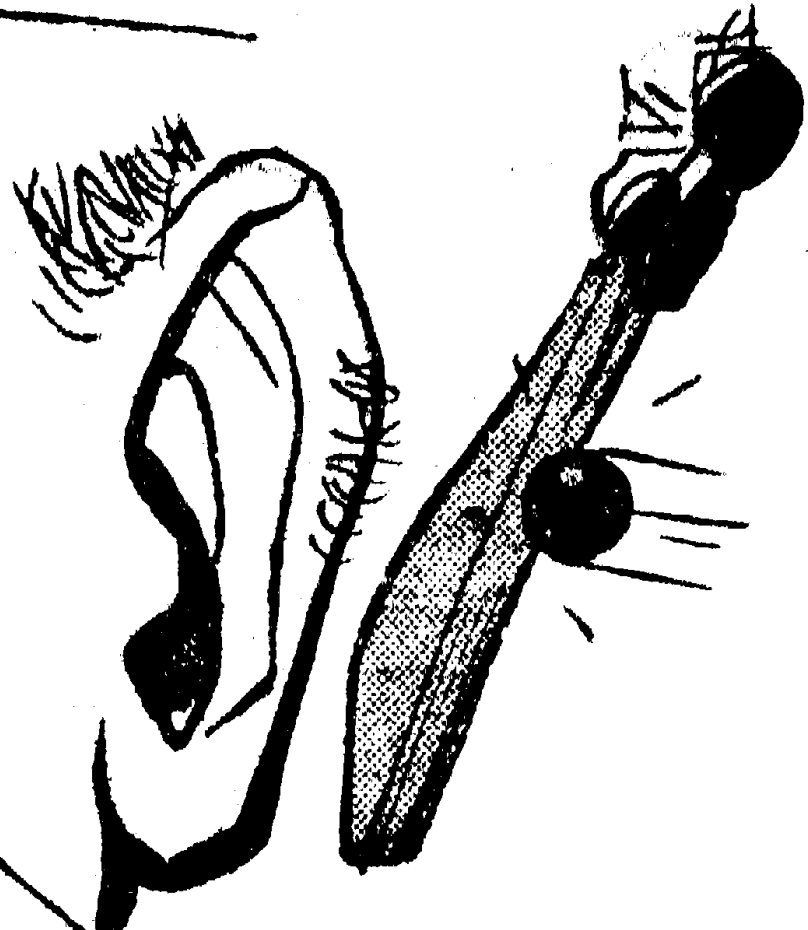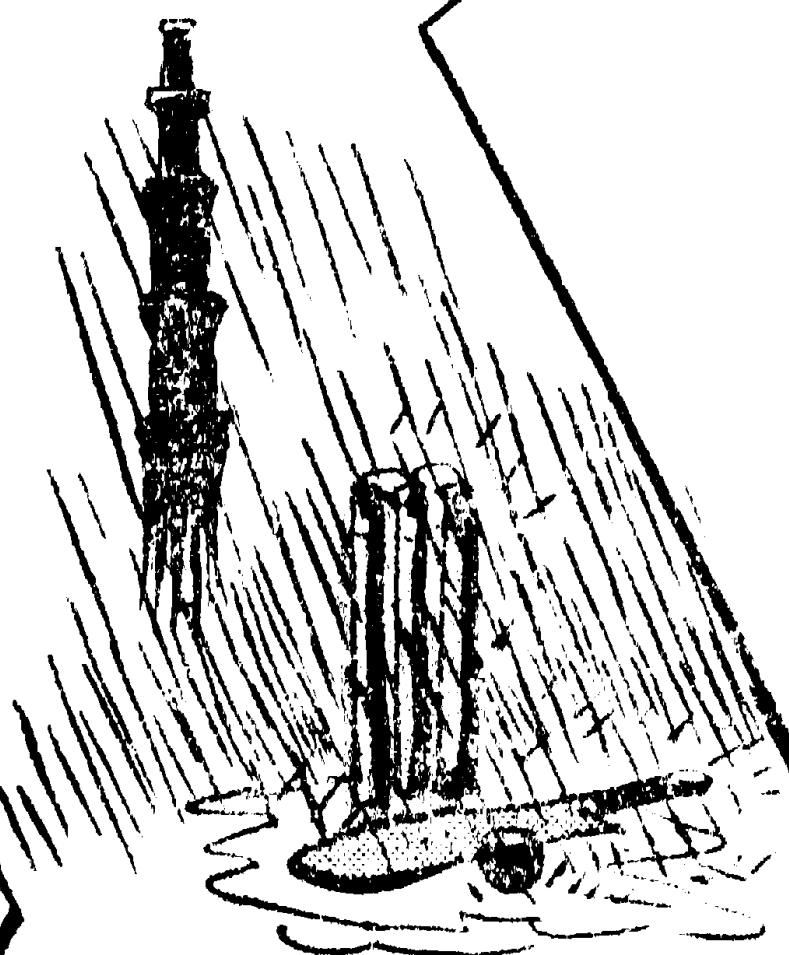
আর কানপুরের
কান !

কলকাতাকে
বাঁচাও মা!

দিল্লীকে বাঁচিয়েছে
দিল্লীর লাড্ডু -- তার বৃষ্টি !

কিন্তু চতুর্থ নগরী, কলকাতা ?
কিসে বাঁচবে তার প্রাণ
না, বৃদ্ধি পাবে মান ?

পূর্বপক্ষ
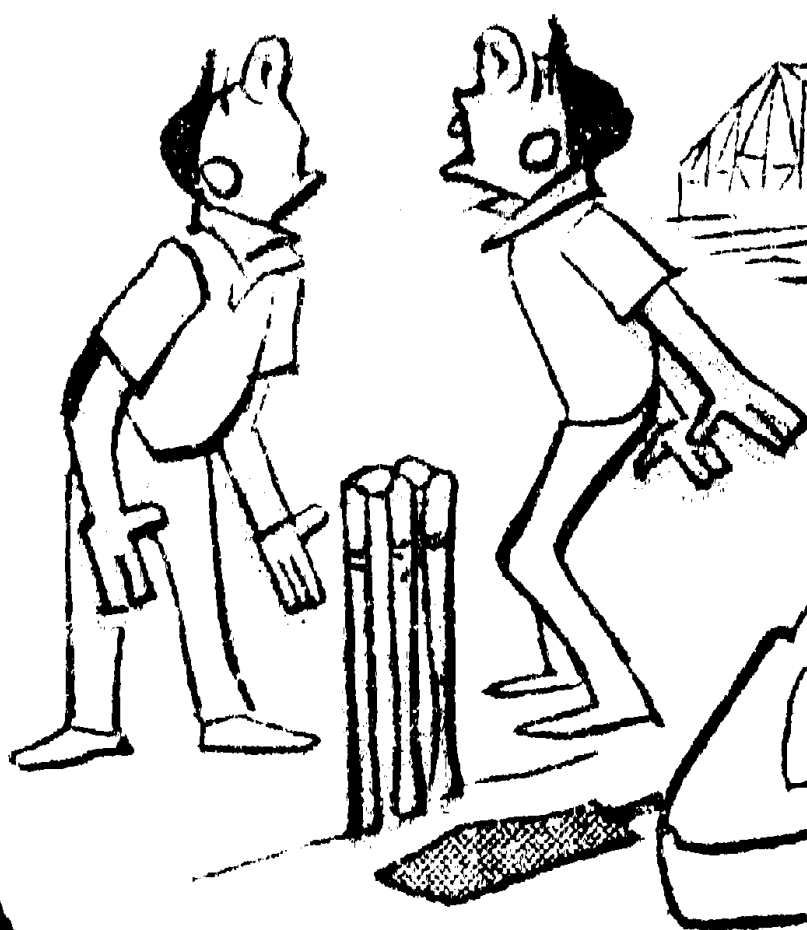
জৈমিনি

বোধকরি স্বপ্ন দেখছিলাম।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি আমি ক্রিকেটের মাঠে। বিশ্বাস করুন, টিকিটের জন্যে আমি চেষ্টা করিনি। আমি কোনো আড্ডায় যাইনে। ক্রিকেটের কথা আলোচনা করতে না পারলে আমার 'পাঁচ আইনে' ধরা পড়ে কলকাতা শহর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু কী করে টিকিট পেলাম আর মাঠে এসে হাজির হলাম সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এই সব কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার যোগভঙ্গ হল। কে যেন ওপাশ থেকে মন্তব্য করল, লোকটা উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই তিন দিক থেকে কোরাসে অনুরোধ এল, ও দাদা, ও দাদু, 'বসে' পড়ুন! (স-এর উচ্চারণ ইংরেজী এস্-এর মতো)!

তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম। তারপর শীতের সকালে হঠাৎ ঘেমে উঠে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম। —অপরিচিত লোকের মুখে দাদা, বিশেষত দাদু শুনলে আমার গা কেমন করতে থাকে।

ওদিকে খেলা শুরু হ'য়ে গেল। লোক আসার কিন্তু বিরাম নেই। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, প্যাসেজের মধ্যে তখনো গিজ গিজ করছে মানুষ। কোথায় ঢুকবে, কে জানে।

টেস্ট ম্যাচ। সকালের শিশির ভেজা মাঠে সাবধানে ব্যাটিং চলছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি পাশের এক গলাবন্ধ কোট আর খয়েরী টুপি পরা মোটা ভদ্রলোক ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে পান করতে লাগলেন।

লাল শাড়ী আর নীল সান-গ্লাস পরা এক ভদ্রমহিলা আমার সামনে দিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেলেন।

ব্যাটসম্যান আউট হ'য়ে গেল। কেমন ক'রে তা দেখতে পেলাম না। আমার সামনে ছিল তখন লাল শাড়ীর ব্যাফল ওয়াল। বিফল মনে নিজের মান রাখতে আশ-পাশের লোকের দেখাদেখি চাঁচামেচি শুরু করলাম।

শেষ চ্যাঁচানোটা ছিল আমার। ওপাশ থেকে আবার মন্তব্য হল, উজবুক!

বিপদে ফেললে দেখছি। এবার থেকে বেশ স্মার্ট হ'য়ে খেলা দেখব স্থির করলাম। কিন্তু লাঞ্চের রিসেস হওয়ার সম্ভাবনায় পিলপিল করে লোক বেরিয়ে যেতে লাগল সামনে দিয়ে। কিছুই দেখতে পেলাম না।

পাশের খয়েরী টুপি তখন প্যাড়া আর লাড্ডুর মতো কী যেন সব বার ক'রে খেতে লাগলেন। তারপর আবার চা।

লাল শাড়ী ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেলেন।

ওদিকে খেলা শুরু হ'য়ে গিয়েছে। সূর্য মধ্যগগনে। রানের গতি ঢিলে। সারা মাঠ কেমন যেন ঝিমিয়ে এল। কোথা থেকে এক টুকরো কমলালেবুর খোসা এসে পড়ল খয়েরী টুপির গায়ে। তিনি সেটাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন পিছনে। ব্যস, এদিকেও একটা মিনিয়েচার ক্রিকেট আরম্ভ হ'য়ে গেল। এবং সময়োচিত প্রীতি সম্ভাষণ। বেশ উপভোগ করছিলাম। ওদিকে কে যেন আউট হ'য়ে গেল। প্রচণ্ড হৈচৈ, চিৎকার। আমি খেলা দেখতে এসেছি, কাজেই চিৎকারে গলা মেলালাম। নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নামবার পর আড়চোখে চেয়ে দেখি খয়েরী টুপি এবার কমলালেবু খাচ্ছেন। আমারও চা-তেষ্টা পেয়ে গেল।

ইতিমধ্যে লাল শাড়ী আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেলেন।

হঠাৎ একটা হৈ-চৈ। প্যাসেজের মধ্যে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদেরই কারো মাথায় ওপর থেকে একটা খালি চায়ের ভাঁড় পড়েছে। দুপক্ষের চাপান-উতোরে ও'দের ঐ কবির লড়াইটা যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় চায়ের ছুটি হ'য়ে গেল। খয়েরী টুপি এবার আবার একটা টিফিনক্যারিয়ার খুলে বসলেন। ইতস্তত লোক চলাচল হ'তে শুরু করল। একজন পদস্থ ব্যক্তি ভারী গলায় কাকে যেন বললেন, না আর ফিরছিনে।

অন্য গলায় উত্তর এল, সে কি, এর পরই তো জমবে!

জমুক। আমার একটা ককটেল পার্টি আছে। নেহাৎ ব্যানার্জি বলল, তাই এলুম।

ব্যানার্জি কে? ও, তোমার সেই জুনিয়ার?

হুঁ, বেশ কিছু খসেছে। ফু—ল্! আই'ম এ টাফ নাট।

ডোণ্ট বি ক্রুয়েল। হেঃ, হেঃ।

হাঃ, হাঃ।

আর শোনা গেল না। বেচারা ব্যানার্জি! কতো আশা নিয়েই না বসে আছে বাড়ীতে, অথচ এদিকে এই ব্যাপার।

চায়ের সময়টা শেষ হ'য়ে গেল। লোকেরা যে যার জায়গায় ফিরছে।

খয়েরী টুপি দ্রুত হাত চালাচ্ছেন!

লাল শাড়ী ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেলেন। এবার সঙ্গে আরেকজন তরুণী, নীলবসনা। কানে এল—

লাল বলছেন নীলকে, নীলের সঙ্গে নীল জামা পড়েছিস কেন ভাই! প্যারট ইয়লো পরবি। বেশ কনট্রাস্ট হবে।

নীলের জবাব, আমি ভাবলাম রোদের সময় খোলা মাঠে এইটেই স্ট্রাইকিং হবে। তুই কিন্তু কপালে টিপটা না দিলেই পারতিস।

হোয়াই?

দে মে থিংক, ইউ আর ম্যারেড!

হিঃ হিঃ হিঃ

হিঃ হিঃ

খেলা শুরু হ'য়ে গেছে ওদিকে। সবাই আসন পরিগ্রহ করেছে। মাঠে কেমন একটা স্তব্ধতার ভাব। মচমচ আওয়াজে চেয়ে দেখি পাশের খয়েরী টুপি খাওয়া দাওয়ার শেষে এবার দ্রুত গতিতে চকোলেটের প্যাকেট খুলছেন। আকণ্ঠ ভোজনের ফলে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে। হাত দুটি কিন্তু তখনো তাঁর মুখ-বিবরে মাল চালান করে যাচ্ছে। কেমন গা গুলিয়ে উঠল আমার। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

মনে মনে ভাবতে লাগলাম, রিনিকে বেশ ফলাও করে বলতে হবে। ক্রিকেট খেলা দেখি না বলে সে বছর যা অপমান করেছিল তার শোধ তুলতে হবে। ভুটু চৌধুরীটা খুব ডিঙ নিয়ে গেছে সেবার। আরে বাবা, ভগবান আছেন। আমার সামনে দিয়ে দুজনে, খেলা দেখে এসে ডিসকাস করতে শুরু করবি আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাব, এ তো চিরকাল চলতে পারে না। রিনি এবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, ভুটু টিকিট পায়নি। (ভগবান আছেন)! আমি খেলা দেখছি। আর এর বিশদ বিবরণ আমিই জানাব রিনিকে। তারপর (ভগবান আছেন) ভুটুকে যদি ডাউন দিতে না পারি তো......!

...মা গায়ে নাড়া দিয়ে বললেন, কী বলছিস যা তা।

অ্যাঁ!

অবেলায় এমন করে কেউ ঘুমোয়? চা হ'য়ে গেছে, ওঠ এবার।—মা চলে গেলেন। আমিও উঠে বসলাম। তারপর আবার বোকার মতো শুয়ে পড়লাম।

সবই স্বপ্ন!

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

আজ ৭ই অক্টোবর। কিন্তু সকালের দিকে নয়, বিকাল চারটের সময়ে এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। নাভয় অপেরা হাউসের ললাটে চল্লিশটিরও বেশি বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে। ভারতেরটি প্রায় মাঝখানে। ওদের মধ্যে দু'-একটি পতাকায় এই প্রথম আরবী লিপি চোখে পড়ল। দেখছি পতাকা সাজাবার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজেরা কোথাও প্রাধান্য নেননি! কোথাও তাঁরা গায়ের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, তাঁদের অহংকারের ছাপ দেখাচ্ছেন কোথাও। তাঁদের এই সৌজন্য ও শালীনতাবোধকে রাজনীতিক একটা কৌশল বলে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ বিদ্রূপ করেছেন। তার জন্য আমি দুঃখও বোধ করেছি। যা সুন্দর, শোভন ও সুরুচিসম্মত—তা যদি স্বল্পকালীনও হয়, তবুও শ্রদ্ধেয়। আমি মনে মনে কর্তৃপক্ষকে অভিবাদন করেছিলুম।

নাভয় অপেরা হাউসের বিশাল বারান্দায় উঠে একবার থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আগে একটি সিগারেট ধরালুম। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ধূমপান চলবে না। হ্যাঁ, সর্বশরীরে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চহর্ষ ছিল বৈকি! জানি পৃথিবীব্যাপী ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে এই সম্মেলন সম্পর্কে। কিন্তু নগদ বিদায় পাবার লোভে আধুনিক কাল চিরদিনই যে অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে! ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সেই "এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স" অথবা আজকের এই "এশিয়া-আফ্রিকা—" এর কোনটাই ত' নতুন নয়!

এই ধরণের প্রথম সম্মেলনটিতে আমি যে একদা উপস্থিত ছিলুম!

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের চতুর্থ সপ্তাহের দিল্লী! নগরের বহু স্থলে তখন আগুন, লুট, এবং অতর্কিত হত্যাকাণ্ড চলছে! রাত্রের অন্ধকারে বন্দুকের গুলী চালানো হচ্ছে। সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি অবিরাম গতিতে চলছে। বিলাতে শ্রমিক দলের পক্ষে মিঃ এটলী তখন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ভারতের শাসক গোষ্ঠির মধ্যে তখনও চার্চিল দলের লোক ভরা, এবং সেই কারণে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন "তথাকথিত জাতীয় গভর্ণমেন্টের" অধিনায়ক এবং তিনি পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে দিবারাত্র শত্রুতা সাধনে লিপ্ত! সেই নাটকীয় কালের সর্বপ্রকার যন্ত্রণা ও অবমাননার মধ্যেও আধুনিক ভারতের নবযুগস্রষ্টা নেহরু একথা ভোলেননি যে, একদা এই ভারতের কোন সুপ্রাচীন যুগে রাজা যুধিষ্ঠির এই ইন্দ্রপ্রস্থে ব'সেই তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন! সেইজন্য সেদিন সামান্য ক্ষমতা লাভ ক'রেই "ইন্টার এশিয়ান রিলেশনস্ কনফারেন্স" মারফৎ ডাক দিয়েছিলেন মহাপ্রাচ্যের দিগ্দিগন্তে! তেত্রিশটি জাতি তাঁর সেই ডাক শুনে ছুটে এসেছিল নিউ দিল্লীর সেই পুরনো কেল্লায়,—যার পুরনো নাম 'পাণ্ডব দুর্গ'। তাদের মধ্যে ছিল যুদ্ধ-জর্জরিত সোভিয়েট ইউনিয়ন, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত চীন, কোরিয়া, যুদ্ধপরাজিত জাপান, ফিলিপাইন, সিয়াম, ইন্দো-চীন, সংগ্রামরত ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, তিব্বত, ইরাক, ইরাণ, নেপাল, ভুটান—কে নয়? সেদিনও পর্যবেক্ষক ছিল আমেরিকা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স—ইত্যাদি। সেই দশ-দিনব্যাপী বিরাট সম্মেলনে সমগ্র প্রাচ্যলোকের ভাষার সঙ্গে আপন-আপন কণ্ঠস্বর মিলিয়েছিলেন গান্ধীজী রাধা-কৃষ্ণণ, নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী, সাটান শারিয়ার, এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের বড় বড় দিকপাল। সেদিনকার সেই যুগসন্ধিকালে নব-ভারতের জন্মলগ্নে আমিও যে ওই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্মেলনের একান্তে একাকী বাঙ্গালী লেখক ব'সে ব'সে সেই রাজসূয় যজ্ঞস্থলের পবিত্র ধূলি ললাটে তুলে নিয়েছিলুম! পৃথিবীর সর্ব-মানবের মিলন-তীর্থস্বরূপ নবভারতের মহৎ কল্পনা ছিল যে রবীন্দ্রনাথের! নেহরু যে সেটিকে প্রথম বাস্তবে রূপায়িত করেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, একথা ভুললে আজ কেমন ক'রে চলবে? বলা বাহুল্য, নিজের মধ্যে আমি জোর পেয়ে গেলুম!

সিগারেটটি ফেলে বারান্দার মস্ত দরজা পেরিয়ে লবীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। এখানে ওখানে ব'সে গেছে বইয়ের ষ্টল—সর্বত্র রুশ ভাষার গ্রন্থই বেশি। বিগত দু'শো বছরে ইংরেজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীর বইয়ের বাজারগুলি দখল করে ইংরেজি বই বেচে এসেছে, এবং এমন ভাবে অন্যান্য দেশের সাহিত্যের অনুবাদ করেছে যে, অপর কোনও ভাষাকে তেমন মাথা তুলতে দেয়নি। এখানে এসে দেখলুম, মাত্র গত এক বছরে রুশ ভাষায় মোট ৬,৭৮,০০০ হাজারখানা বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে! এর মধ্যে অনুবাদ এবং মৌলিক রচনা দুই আছে। লবীতে অগণিত নরনারীর জটলা ও আলাপ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে একটি হেড-ফোন্ সংগ্রহ ক'রে শ্রীমতী লানাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রবেশ করলুম। তারাশংকর বসবেন মঞ্চের উপর, সুতরাং তিনি আগেই ভিতরে গেছেন। তাঁর পরণে গরম শাদা লং কোট, শাদা প্যান্ট, শাদা গান্ধী টুপি, কালো মোজা এবং নস্যবর্ণের ঘুন্টিবাঁধা চপ্পল,—পায়ে ফোস্কার ভয়ে!

ভিতরটায় গিয়ে নির্দিষ্ট সীটে না বসা পর্যন্ত পা দুখানা ছমছম করে! ধনী মারোয়াড়ীর প্রাসাদে বিবাহ উপলক্ষ্যে গিয়ে ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো দরবারকক্ষে ঢুকে চেনামুখ না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি থাকে না। তারাশংকরের

অবস্থাও প্রায় তাই দাঁড়িয়েছিল। চতুর্দিকব্যাপী সম্পূর্ণ অচেনা ও অজানা সাহেব-মেমদের জগতের সামনে মঞ্চের উপরে ব'সে বীরভূ'য়ের এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অবস্থাটা হয়ে উঠেছিল, যেন জলের মাছ ডাঙগায় গিয়ে উঠেছে! যে-টুপিটা ও'র মাথায় ছিল সেটি গান্ধীক্যাপ বটে, কিন্তু কন্‌গ্রেস যেদিন থেকে ওই টুপি মাথায় তুলল, সেই দিন থেকে গান্ধীজী নিজের মাথায় ওটি আর তোলেননি। তা ছাড়া ওটুপি মানায় চুড়িদার এবং শেরওয়ানীর সঙ্গে —প্যান্টের সঙ্গে নয়। নেহর‍ু বিদেশে গিয়ে চুড়িদার-শেরওয়ানী ছাড়া কখনও গান্ধীটুপি পরেননি! পোষাক সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান ছিলেন সিংহলের 'ভিক্ষ‍ু' প্রতিনিধি। তাঁর সেই মুণ্ডিত মস্তক এবং বৌদ্ধ বর্ণের দশ-টুকরো সেলাই-করা দেহাবরণ সমগ্র সম্মেলনের সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য জাগিয়ে রেখেছিল!

প্রেক্ষাগৃহে তিন সারি চেয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পাকিস্তান এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি, সুতরাং তাঁদের জন্য কোনও আসন ছিল না। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, একটি নাটকীয় মুহূর্তে পাকিস্তানের দু'জন সুযোগ্য প্রতিনিধি,—তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নিত্যউৎপীড়িত প্রসিদ্ধ কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এবং অন্যজন প্রসিদ্ধ কবি ও গায়ক হাফিজ জলন্ধরী কিভাবে যেন পিছনে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা যথাসময়ে যখন এসে পৌঁছলেন, ভারতীয়রা পরম সমাদরে তাঁদের দু'জনকে নিজেদের মধ্যে ডেকে নিলেন। এ'রা দুজনেই পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী, এবং সাজ্জাদ জহীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই দুই ব্যক্তির মতো এমন অমায়িক, ভদ্র, মিষ্টপ্রকৃতি এবং শক্তিমান লেখক পশ্চিম পাকিস্তানে আর ক'জন আছেন জানতে ইচ্ছা করে। এ'রা দুজনেই কমিউনিস্ট, এবং পরবর্তীকালে ফয়েজ আহমেদ ফিরে গিয়ে মাতৃভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে নূতন আয়ুব-গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। দ্বিতীয় বন্ধুটির খবর আর পাওয়া যায়নি।

বিরাট সেই মঞ্চের সাজসজ্জা অপরূপ। মঞ্চের পটভূমিতে মস্ত একটি চক্রাকার প্রতীক্ চিহ্ন। চক্রের নীচে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রতীক্। চক্রের ভিতরে একখানা হাত আরেকখানা হাতকে করমর্দনস্বরূপ ধারণ ক'রে রয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্য ক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে এশিয়া এবং আফ্রিকা—এই দুই মহাদেশ আজ মিলিত হোক। মঞ্চের উপর টেবলের দীর্ঘ কয়েকটি শ্রেণী, তাদের উপরে প্রত্যেকটি দেশের এক একটি জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। পতাকার ঠিক পিছনে সেই-সেই জাতির মুখপাত্র আসন গ্রহণ করেছেন। ঠিক মাঝখানের টেবলটিতে রয়েছে সোভিয়েট জাতির পরিচিত পতাকা, কেননা অতিথিসেবক দেশ হিসাবে উজবেক রিপাবলিকের সর্বোচ্চ অধিনায়ক শ্রীযুক্ত শারফ রশিদভ এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই সভাপতিকে কেন্দ্র ক'রে পাশাপাশি বসেছেন অন্যান্য সকল দেশের মুখপাত্রগণ। সামগ্রিকভাবে এটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রিসিডিয়ম্। এর পর এক এক পালায় এক একজন সাময়িক সভাপতি হবেন,—কারণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান!

আমাদের সামনে মঞ্চের উপর ডানহাতি প্রায় শেষ দিকে তারাশংকরকে আসন দেওয়া হয়েছিল,—প্রথম দিন হিসাবে আরেকটু মাঝামাঝি তাঁর আসনের ব্যবস্থা করলে শোভন হত। কেননা এদেশে প্রথম পদার্পণ-কাল থেকেই লক্ষ্য করছি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, এবং ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধ যেন সর্বত্রই স্বতঃ-উৎসারিত। একদিকে ভারত এবং অন্যদিকে আর সব দেশ, এই যেন ভাব। ভারত যদি ভ্রুকুটি করে, যদি রুষ্ট হয়, যদি আনন্দিত হয়, যদি সমালোচনা করে, ভারতের মুখে যদি সুখ্যাতি শোনা যায়, ভারত যদি তুষ্ট থাকে—তবে একটা সাংবাদিক কানাকানি রটে যায়। এই সম্মেলনে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ছদ্মবেশী পুলিশ এবং গোয়েন্দার দল এর মধ্যে ছড়িয়ে ছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সোভিয়েট পুলিশ এবং "মিলিচ্-মেনদের" প্রতিনিধিরা ছিলেন, এটি পরে তাঁদের মুখ থেকেই শুনেছি। এ আলোচনা পরে করব।

মঞ্চের আসনে সেদিন তারাশংকরকে দেখে আমি গৌরব ও গর্ববোধ করে-

ছিলুম। কেননা তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের কাহিনী এবং তাঁর পরবর্তী অবস্থার দুঃখ-দুর্যোগ এবং দুর্দশার ইতিহাস আমার চেয়ে বেশি হয়ত অনেকেই জানে না। তাঁর প্রথম গল্পটি ছাপা হবার কালে অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' মাসিক পত্রের গণতান্ত্রিক সম্পাদনার কাজে আমি লিপ্ত ছিলুম। কিন্তু সেদিনকার সেই অপরিচিত 'ব্যক্তি'টির লেখা গল্পটি প'ড়ে আমার মতো অনেকেই আনন্দ পেয়েছিলেন। এর পর তারাশঙ্কর উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন দ্বিতীয় যুদ্ধের কালে, এবং দুর্ভিক্ষের বছরে 'মন্বন্তর' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে বাঙলার কমিউনিস্টপন্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর বাম-পন্থীগণের প্রচারকার্যের ফলে তিনি 'গণ-ঔপন্যাসিক' এই আখ্যা পান। বছর পাঁচেক পরে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পরে তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্ট আদর্শের মতবিরোধ ঘটে, এবং পূর্বের মতো তিনি কন্‌গ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যান্‌। কিন্তু সাহিত্যকর্মে তাঁর নিষ্ঠা, অনুরাগ, অধ্যবসায় এবং শক্তিমত্তা তাঁকে গত কয়েক বছরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ক'রে তোলে। আজ ভারতের সকল লেখকের ভীড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এক-জন বাঙালী লেখক এই আসনে এসে বসলেন,—তারাশঙ্করের এই অনন্য-সাধারণ কৃতিত্বের দিকে চেয়ে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করছিলুম।

দর্শক সাধারণের সঙ্গে আমারও দৃষ্টি প্রিসিডিয়মের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বভাবতই নিবদ্ধ হচ্ছিল। পরীক্ষা ক'রে দেখতে পাচ্ছি, শাদা পোষাকের আবরণে তারাশঙ্করকে একটু বেশি কালো মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁর ঠিক পাশেই বসানো হয়েছিল আফ্রিকার অন্তর্গত ঘানা দেশের সেই 'কৃষ্ণসর্পিনী' মেয়েটিকে,—যে-মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি নিয়ে তারাশঙ্করকে কড়া কথা শুনিয়েছিল! সুতরাং দূরে ব'সে বন্ধুবরের মানসিক অবস্থাটি অনুধাবন করছিলুম। আজ মেয়েটিকে 'সর্পিনী' বলতে বাধল। যেহেতু উনি 'শূদ্রা' নন্‌, সেইজন্য নাম দেওয়া গেল "কৃষ্ণরাধা"।

লতাপুষ্পশষ্পাচ্ছাদিত সমগ্র মণ্ডটিকে গোলাপ-ডালিয়া-সূর্যমুখীর পুষ্পো-দ্যানে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু সভাপর্বের প্রথম দিনটি বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী আলাপ পরিচয়াদি এবং অনু-ষ্ঠানসূচী ও কর্ম-তালিকার আলোচনা নিয়ে কাটল। শারফ রাসিদভের অমায়িক, শান্ত ও মিষ্টকথার জন্য সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রায় চার ঘণ্টা লাগল সভার কাজ শেষ করতে। মোট পাঁচদিনে দশটি অধিবেশন বসবে। ষষ্ঠ দিবসে সর্বসম্মতিক্রমে এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ে জগতের সর্বত্র প্রচারিত হবে। মাঝখানে পড়বে একটি রবিবার, সেদিন ছুটি। কেন ছুটি, আমি জানিনে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব কম, এবং প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রচলনের প্রতি ওদেশে স্বাভাবিক বিরক্তিই প্রকাশ পায়। কিন্তু খৃষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রে খৃষ্টাব্দ গণনার যুক্তি কোথায় এটি যেমন জানিনে, তেমনি বিপ্লব-পূজারীর দেশে স্যাবাথ্‌-ডে'র প্রাচীন রীতি মেনে চলবার কারণও বুঝিনে। ও'রা যদি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বিপ্লবাব্দ—১',—এইভাবে গণনা কর-তেন এবং সেইভাবে ও'দের বর্ষপঞ্জী চালু হত—তাহলে হয়ত যুক্তি খুঁজে পেতুম। সোভিয়েট ইউনিয়নে ভ্রমণ করে আমার মনে হয়েছিল, খৃষ্টের মৃত্যুবর্ষ বাদ দিয়ে লেনিনের জন্মবর্ষ নিয়ে পঞ্জিকা প্রচলন করলে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নীতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা, সমাদর এবং ভালবাসার কথা আমাদের মধ্যে কে না জানে, কিন্তু কুড়ি বাইশ কোটি লোক প্রতিদিনের প্রতি কর্মে লেনিনের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন না ক'রে জলগ্রহণ করে না, সোভিয়েট ইউ-নিয়নে গিয়ে এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করতুম না!

আমাদের প্রত্যেকের দুই কানে একটি ক'রে হেড-ফোন্‌ আট্‌কানো ছিল, এবং তারই সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোট একটি রেডিয়ো বাক্স,—সেটি আমাদের গলার নীচে লকেটের মতো ঝুলছে! ছয়টি ভাষাযুক্ত সেই যন্ত্রের একটি ক'রে কাঁটা ঘোরালেই একটি ক'রে ভাষা শোনা যাবে। অর্থাৎ একজন বক্তৃতা করছেন, এবং অন্তরাল থেকে ছয়জন ব্যক্তি তাঁর প্রতি ছত্রটি পলকে-পলকে ছয়টি ভাষায় অনুবাদ ক'রে বেতারযোগে প্রচার কর-ছিলেন, এবং আমরা প্রত্যেকে আমাদের দরকারমতো ভাষাটি ধরে নিচ্ছিলুম! বক্তা বলছেন আরবী ভাষায়, কিন্তু আমি শুনছি ইংরেজিতে। আমার এই নূতন অভিজ্ঞতাটির জন্য সেদিন বিজ্ঞান জগৎকে যেমন ধন্যবাদ দিয়েছি, তেমনি অন্তরালবর্তী সেই ছয় ব্যক্তির কৃতিত্ব-কেও তারিফ করেছি!

হেড-ফোনের টিপুনিতে মাঝে মাঝে কান দুটো ব্যথা ক'রে ওঠে, ওটা মাঝে মাঝে খুলতে হয়। পাশে বসে আছেন
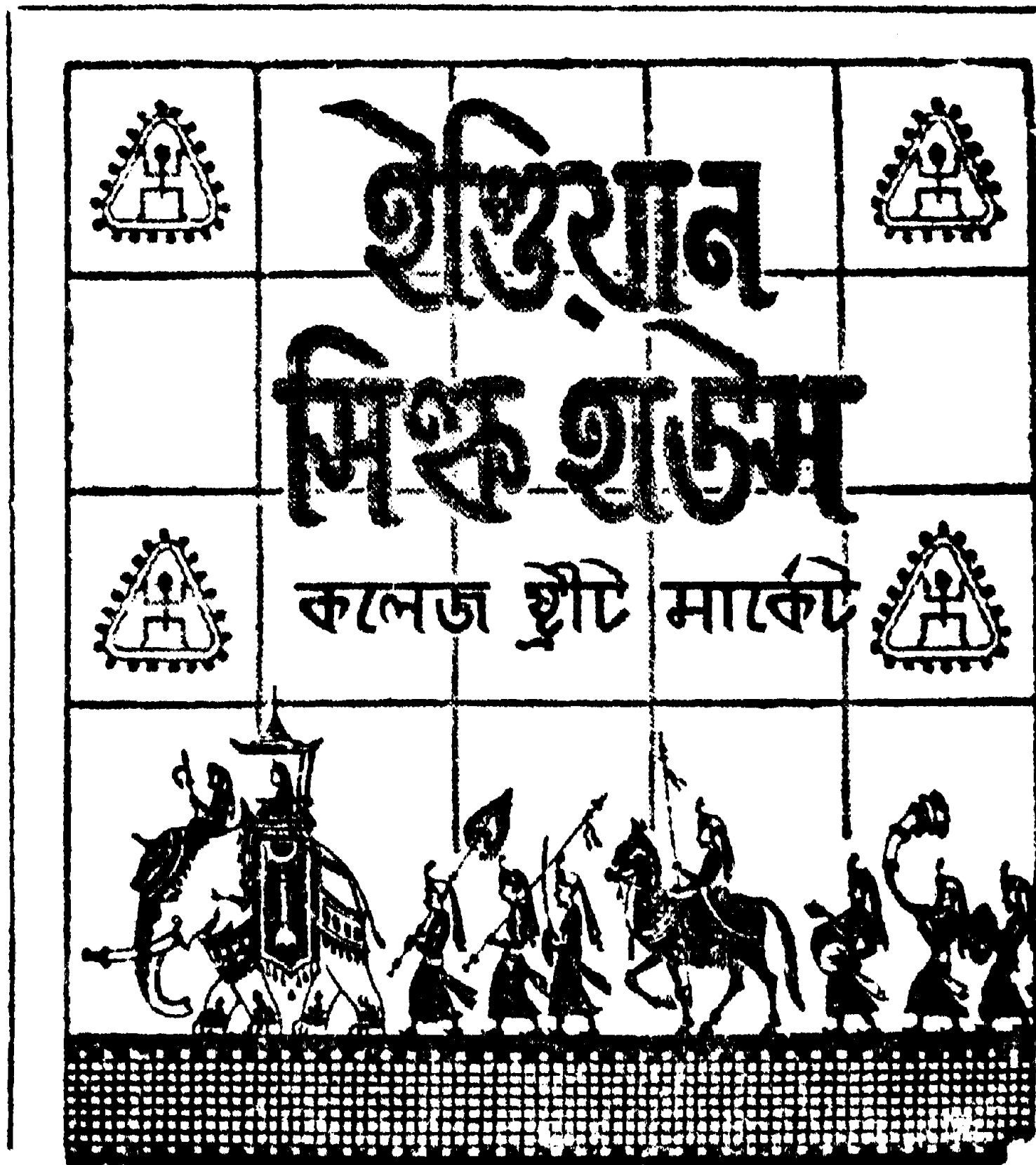
সুনীতি চাটুজ্জ্যে, এপাশে শ্রীধরণী। তাঁর কাছাকাছি বসেছেন নিত্যানন্দ গোপাল হালদার এবং এদিকে যশপাল চেয়ে রয়েছেন কপিশচক্ষে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো! ওধারে পাঞ্জাব, পিছনে লণ্ডন, এধারে মারাঠা, নাকের ওপর কেরালার দামোদরন্, তাঁর গায়ে কবি সুভাষ। ডানদিকের প্রথম কয়েকটি চেয়ারের সারি জুড়ে বসেছেন চীন, মঙ্গোলিয়া, লাওস, সিয়াম, ভিয়েৎমিন, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা,—এবং সিংহল ও বর্মা। মধ্য-প্রাচ্য পিছনে, কিন্তু মিশর ও আফগানিস্তান এবং নববিপ্লবকিসিদ্ধ ইরাক—সামনে! 'কারিডরগুলির' এখানে ওখানে রয়েছেন পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা। তারপর আমার চোখে বাকি সব ধোঁয়া,—শুধু সাহেব আর মেম। ও'দের মধ্যে ইংরেজ একজন ভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, তিনি লণ্ডন এবং বোম্বাইয়ের যথাক্রমে 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' ও 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার' প্রতিনিধি মিঃ পার্কার।

সাড়ে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি পরে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হল। সম্মেলন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথম সোভিয়েট প্রতিনিধিগণের অমায়িক ও ভদ্রব্যবহার এবং শত শত অতিথিগণের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমাদর। তাঁরা কোনও সময়ে আপন আপন অভিমত অথবা প্রতিপত্তি কারও প্রতি আরোপ করার চেষ্টা পাননি। প্রাচীন রুশ কাল্‌চারের ঐতিহ্য এবং আভিজাত্য তাঁরা ধারণ ক'রে ছিলেন।

লেখক সম্মেলন উপলক্ষে এসে চীন প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য যেন একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে না এলে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ঘটত না। কালক্রমে তাঁদের স্তাবকস্বরূপে কয়েকটি জাতির প্রতিনিধিরাও জুটে গেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু আছেন দক্ষিণ-প্রাচ্য, কিছু বা আফ্রিকা। স্পষ্টত দুটি কারণে চীনারা এসেছেন তাসকন্দে। লেখক সমাজের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে মিলিয়ে দেওয়া, এবং সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে রাখা। তাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। তাঁদের উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছিলুম।

প্রথম থেকেই চীন প্রতিনিধিগণের সামাজিক সৌজন্য এবং ভদ্রব্যবহার কতকটা যেন ওজনকরা মনে হচ্ছিল। সেটি জাত্যভিমান কিংবা আভিজাত্যবোধ, এ হিসেব আমরা করিনি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁদের প্রতিপত্তি প্রচুর। প্রাচীন চীনাদের ঔরসজাত জাতি ও জনতা সোভিয়েট ইউনিয়নে কম নেই। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব সোভিয়েট ইউনিয়নে চীন ও মঙ্গোলের রক্তধারা আজও সমানে বইছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই নাকি "চীনা উপনিবেশ" আছে কোনও কোনও অঞ্চলে,—যেমন আছে আমাদের কলকাতায়,—সেখানে শত সহস্র চীনা গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে বহুকাল থেকে বাস করে। এ খবরটি পেয়েছিলুম উক্রাইনের এক সুলেখিকা শ্রীমতী অলেসিয়া ক্রাভেঙ্কের কাছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশবিপ্লবের কালে বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে চীনাদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠি সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে লড়াই করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যবসাবাণিজ্যের উপর চীনাদের প্রতিপত্তি কম নয়, কেননা চৈনিক সামগ্রীসম্ভারে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাজার ছাওয়া। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছি, চীন এবং জর্মন ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চ মূল্যে নিয়ে নিম্নশ্রেণীর সামগ্রী সোভিয়েট বাজারে বিক্রি করেন। আমি নিজে ঠকেছি! চীনাদের শিল্প, চারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজকের নয়। রুশ সাম্রাজ্যের পাশেই চীন সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল এতকাল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের যে পূর্বাপর সম্পর্ক, সেটি যেন বন্ধুত্ব অপেক্ষা আত্মীয়তার মধ্যেই পর্যবসিত। সেখানে উভয়ের মধ্যে বিবাদ যদি কোনও দিন বাধে, সেটি যেন হবে আত্মীয়-কুটুম্ব মণ্ডলের মধ্যে বিবাদ! চীনারা যখন সোভিয়েট ইউনিয়নে আসে, তখন তাদের আচার-ব্যবহারে একবারও মনে হয় না যে, তারা এসেছে ভিন্ন রাষ্ট্রে,—তারা যেন এসেছে কুটুমবাড়ী বেড়িয়ে যেতে! সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে সকল জাতিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে সমাদর সহকারে ঘরে তুলেছেন,—কিন্তু চীনারা এসেছেন ঘরের লোক হিসাবে! তাঁরা সমাদর এবং অভ্যর্থনার অপেক্ষা রাখেননি!

চীন প্রতিনিধিগণের মুখপাত্র ছিলেন বর্তমান চীনের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁরা সেদিন ভারতীয়গণকে একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ করলেন। কিছুকাল আগে তারাশঙ্কর গিয়েছিলেন চীনদেশে, এবং সেই সূত্রে এ'দের কারো কারো সঙ্গে আগেই তাঁর আলাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন বন্ধুত্বের অনুরাগে এবং প্রীতির বিনিময় ক্ষেত্রটিকে যথেষ্ট সুপরিসর মনে হচ্ছে না! কারণ চীন-প্রতিনিধিরা একটি বিশেষ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছেন তাসকন্দে—সেটি দিনে দিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে চৈনিক রাজনীতির বয়স প্রায় দুই হাজার বছর হতে চলল। সে যুগে ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিরাট প্রাচ্য ছিল কোথায়? শুধু ভারতবর্ষ তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে আপন সনাতন সংস্কৃতির উপরে বৌদ্ধ-সভ্যতাকে ধারণ ক'রে। সে যাই হোক, সে সব তলিয়ে থাক্ ইতিহাসের পুরনো পৃষ্ঠাতে। কিন্তু আজ যে-চীনকে দেখছি তাসকন্দে, এ সেই একই চীন! বছর দশেক হতে চলল ওরা পোষাক বদলেছে, কিন্তু বোধ করি প্রকৃতি বদলায়নি! ওদের চিরকালীন রক্তের ধারায় যে-রাজনীতি ভেসে বেড়িয়েছে, সেটির থেকে ওরা মুক্ত থাকবে—এ প্রত্যাশাও সংগত নয়। ওরা সেই প্রাচীন রাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা এখন খুঁজে পেয়েছে প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী অভিযানে। এটি ওদের অপরাধ নয়, এটি ওদের প্রকৃতিগত। ওরা শান্তি অবশ্যই চায়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক'রে চায় আত্মপ্রসারের সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বব্যাপী অধিকার। এই শতাব্দীতে ওরা খুঁজে পেয়েছে মার্কসিজমের নতুন হাতিয়ার, তাই নিয়েই ওরা আবার জয় করতে বেরিয়েছে ওদের প্রাচীনকালের লুপ্ত গৌরব! সেই একই প্রকৃতির তাড়নায় ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দূর-প্রাচ্য থেকে দক্ষিণ পূর্ব প্রাচ্য, মধ্য-প্রাচ্য, নিকট-প্রাচ্য,—এবং এখন ওরা চলেছে আফ্রিকার অন্ধকার অন্ধ্রেরন্ধ্রে। সুতরাং আজ যদি আমাদের মতো সামান্য মানুষ নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে যে, চীন প্রতিনিধিরা এসেছেন শুধু আন্তঃমহাদেশীয় লেখকদের ভালবাসার জন্য, তাহলে মস্ত ভুল হবে। চীনারা এসেছেন প্রতীচ্য জগৎকে এই সুযোগে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে যাবার জন্য। সর্বাপেক্ষা বিপদ এই, ভদ্র লেখক-সম্প্রদায় যদি তাঁদের সঙ্গে সমস্বরে এমনতরো কটূক্তি করতে বিরত থাকেন, তবে তাঁদের কপালে এই কলঙ্কের টিকা দেওয়া হবে যে, তাঁরা "সাম্রাজ্যবাদীর গুপ্তচর"।

তাসকন্দের চাপা কানাকানিতে ভারতবর্ষকে এই "কলঙ্ক" গ্রহণ করতে হয়েছিল বৈকি!

এর কারণ যেটি ছিল সেটি আগেই বলেছি। তারাশঙ্কর এই লেখক সম্মেলনকে সাহিত্য সম্মেলন ভেবে এসেছিলেন! এখানে লেখক সম্প্রদায়ের রাজনীতিক আদর্শের বিচার হচ্ছে,--কে কেমন লিখছে তার বিচার নয়। লেখকের মন এখন পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ সুখ-দুঃখ ও কল্যাণ-অকল্যাণে জড়ানো। আধুনিক মানব সভ্যতার নিত্য দ্বন্দ্বের দোলায় লেখকের জীবনও দোলায়িত। তারই সাংঘাতিক দোলন লেখকের জীবনাদর্শ ও সাহিত্য-চেতনা তথা রসোপলব্ধির ধারাকে নিত্যই নিয়ন্ত্রিত করছে। সুতরাং জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে লেখকের ভাবনা, বেদনা, আনন্দ, সুখ ইত্যাদি। সেদিন আর নেই যে, একদিকে "রোম নগরী" পুড়ে ছারখার হচ্ছে, অন্যদিকে 'নীরো' শুধু তাঁর বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন! আজ এখনও যখন কোটি কোটি নরনারী নানা দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির পায়ের তলায় দলিত হচ্ছে, জগতের লেখকরা তখন কেমন করে নীরব থাকবেন? তাঁরা ত' ভাব-নায়ক, পথ-প্রদর্শক! মানুষের শৃঙ্খল-মোচনকর্মে লেখকরা যদি সহায়তা না করেন ত' করবে কে?

সুতরাং তারাশঙ্কর যখন বললেন, আমরা উপনিবেশবাদকে গালমন্দ দেবার জন্য এখানে জড়ো হইনি, তখন এই অপযশ রটল যে, তিনি ওটার সমর্থক! শুধু তিনিই নন, এই মনোবৃত্তি নাকি ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যেও চালু রয়েছে, যেহেতু তাঁরা আজও ইংরেজের কমনওয়েল্থ্ ত্যাগ করেননি।

রাজনীতির এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে ভারতবর্ষের যথার্থ মনোভাবটিকে একদিকে যেমন প্রকাশ করা গেল না, তেমনি এই এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলন আপাত ভাবে সাহিত্যিক সম্মেলন হলেও এর ভিত্তিমূলের রাজনীতিক স্বভাবটির হাত থেকে কোনও জাতিরই নিষ্কৃতি ছিল না! সম্মেলনকালীন দিনমানগুলি যেমন পরস্পর প্রীতি ও সৌহার্দ্যে ভরা থাকত, তেমনি প্রায় প্রতিরাত্রে তাসকন্দ হোটেলের নীচের তলায় একটি কক্ষে প্রেসিডিয়মের অপ্রকাশ্য বৈঠকে রাজনীতিক কচকচি ও মূল প্রস্তাবটির সম্বন্ধে পারস্পরিক বিসম্বাদে ভরে উঠত! সেই বৈঠক থেকে তারাশঙ্কর একদিনও খুশী হয়ে ফেরেননি এবং একদিনও 'লাল চীনের' আচরণে তিনি সন্তুষ্ট হননি! কেবলই তাঁকে এই কথা বলতে শুনেছি, এ ধরণের আলোচনায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে জানলে আমি আসতুম না! আমাকে যেন তলিয়ে দেওয়া হচ্ছে,—এদের কথাবার্তার কোনও নাগাল আমি পাইনে! মুল্‌করাজ এসব ব্যাপার নিয়ে রয়েছে। তার ওপর আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন এসব শেষ ক'রে পালাতে পারলে আমি বাঁচি। আমার আর ভাল লাগছে না!

বলা বাহুল্য, মুল্‌করাজ তখন একই কালে সাপ এবং ব্যাঙের গালে একই সঙ্গে চুমা দিচ্ছিলেন! এদিকে তারাশঙ্করের ক্লান্তি, বিরক্তি এবং অসুস্থতা --নিরুৎসাহজনক মনে হচ্ছিল। সম্মেলনের তৃতীয় দিন থেকেই তিনি ভারতে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলেন। সম্মেলনে এবার আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাওয়া বইছে!

কোন কোন জাতির প্রতিনিধিরা সোভিয়েট এবং চীনের চাটুকারে পরিণত হয়েছিলেন। ভালবাসা, তোষামোদ এবং তুষ্টিবিধান—এ তিনটি এক বস্তু নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ ভারতীয়গণকে ভালবাসবার এবং তাঁদের তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চাটুবাক্য বলেননি! তাঁদের স্বভাব-সংযম এবং সৌজন্য আমাদের পক্ষে আনন্দের কারণ ছিল। ভারতীয়গণের মধ্যে আট দশজন ব্যক্তি সোভিয়েট এবং চীনের চাটুকার শ্রেণীতে

পরিণত হয়েছিলেন। ভারতীয়গণের মধ্যে দু'চারজন মদ্যপান করতেন বেশি, ফলে টলটলে হয়ে উঠতেন, এবং ভোজনের আসরে ব'সেই উচ্চ প্রলাপোক্তি করতেন! ও'দের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা উচ্চকণ্ঠে ভারতের ঘরোয়া রাজনীতিক বিতণ্ডা নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে দিতেন, এবং নেহরু গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করতেন। অনেক সময় কেবল এই কথাই মনে হত, এ'দের অনেকেরই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার এখনও জন্মায়নি, এবং যথাযোগ্য তদন্ত না ক'রে এ'দেরকে ছাড়-পত্র দিয়ে এদেশে আসতে দেওয়াটাও ভাল হয়নি। বিদেশে গিয়ে স্বদেশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার মধ্যে যে হীনবৃত্তি প্রকাশ পায়, সেটি পৃথিবীতে একমাত্র গণতন্ত্রী ভারতই বোধ হয় বরদাস্ত করে! এই কারণেই দেখতে পেয়েছিলুম, ভারতীয় গোষ্ঠিটি একদিনের জন্যও "ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলে" পরিণত হতে পারল না!

এর পরের দিন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভারতীয়গণের মুখপাত্রস্বরূপ তারাশঙ্কর তাঁর সেই ক্ষুদ্র রচনাটি পাঠ করেন। সকলের প্রত্যাশা ছিল, ভারতবর্ষের হৃদয় এবার উদ্‌ঘাটিত হবে,—সেজন্য হাততালি পড়েছিল প্রচুর। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনাটি অভিভাষণ হয়ে ওঠেনি, হয়েছিল অভিমত। এই রচনায় মুলকরাজের হাত এবং শ্রীধরণীর আরোপিত বক্তব্য থাকার জন্য এর স্বকীয়তা ছিল কম। সুতরাং তারাশঙ্করের উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে এবং রচনা পাঠের পরে প্রচুর পরিমাণে আন্তর্জাতিক করতালি এবং অভিনন্দনের পরেও এই কথাটা সকলের মনে রয়ে গেল, প্রত্যাশাটা ছিল কি প্রকার এবং পাওয়া গেল কী বস্তু। কিন্তু ওই রচনাটির মধ্যে শ্রীধরণী-মুলকরাজ মিশ্রিত একটি রাজনীতিক ব্যাখ্যাংশ লাল চীনের একটি মাসিক পত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। (Chinese Literature, January, 1959)।

তবু একটি মূল্যবান কথা উক্ত টাইপকরা রচনাটার মধ্যে ছিল। তিনি ভারতীয় দলকে এবং নিজকে এই সম্মেলনের অন্তর্নিহিত রাজনীতিক প্রকৃতির থেকে সরিয়ে রাখতে চান। আমরা এখানে এসেছি সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য। উপনিবেশবাসী এবং পরপদদলিত জাতিগণের সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা বর্তমান, কিন্তু এই সম্মেলন কেবলমাত্র লেখক ও সাহিত্যকর্মীদের জন্য, এটি মূলত রাজনীতিক নয়!—তাঁর এই বক্তব্যটি উগ্রনীতিপরায়ণ চীন এবং কোন কোন আফ্রিকান দলের পক্ষে মনঃপূত হয়নি।

যাবার আগে তারাশঙ্কর বুঝতে পারেননি, এই সম্মেলনের বাইরেটা সাহিত্যের খোসায় ঢাকা ছিল, ভিতরের শাঁস ছিল রাজনীতিক। তাসকন্দ পৌঁছবার কিছুকাল পূর্বে তিনি পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। অতঃপর তাসকন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি নেহরুর কাছে অবশ্যই এক বিস্তারিত বিবৃতি দিয়ে থাকবেন। কিন্তু সে-বিবৃতিটি কি প্রকার আমার জানা নেই! সেটি যদি আগাগোড়া নির্ভুল এবং প্রকৃত তথ্যপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে নেহরুর পক্ষে বিশেষ দুঃখদায়কই হবে। ভারতীয় লেখকদের সম্বন্ধে তিনি আস্থা হারাবেন।

সে যাই হোক, লেখক সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্য ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, আগেই একথা বলেছি। ভারতের মন খুশী থাকে, এর আয়োজন ছিল। ভারতের সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক যেন অকৃত্রিম হয়, এটি ছিল অনেকের পরিকল্পনা। রুশ প্রতিনিধিরা এটিকে নীতিস্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার জাতিগণের প্রতিনিধিরা এটিকে আপন-আপন হৃদয়ের দ্বারা লাভ করেছিল। আর্যদের আদিভূমি মধ্য-এশিয়া, অস্বীকার কেউ করেনি। একই রক্ত বয়ে গিয়েছে মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে কাশ্যপ আর কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে হাঙ্গারী-রুমানিয়ার দিকে, এবং সেই রক্তেরই প্রবাহ হিন্দুকুশ, পামীর, কারাকোরম, কাশ্মীর ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নেমে এসে প্রথম রাজনীতিক শ্লোগান্ আমাদের কানে-কানে শুনিয়েছিল, "গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরি—" ইত্যাদি। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিচ্ছেদ, অব্যয়। যার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সেকালের বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ ক'রে একালের গান্ধী পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং দুইজনেই আত্মবলি দিয়েছেন! মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ, এবং সেই যোগ আবার মোগল পাঠানের যুগে আত্মীয়তায় পরিণত। ভারত সম্রাট আলাউদ্দিন মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু তুর্কীর এক গোষ্ঠিকে আমরা রেখে দিয়েছি! মধ্য-এশিয়ায় অন্নজল কম—আচ্ছা, থাক তোমরা ভারতে! মাটি খুঁড়ে ফসল বানাও, মাঠে মাঠে ঘর বানাও, এবং সুখে থাকো। সম্রাট অশোক থেকে ললিতাদিত্য—সবাই ওদেরকে জায়গা দিয়েছে। অতঃপর পাঠান-মোগল যারাই এসেছে, তারা শুধু ভারতে ঠাঁই পেয়েছে তাই নয়, তাদের অনেককে 'জামাই' ক'রে ঘরেও এনে বসিয়েছি। বাবর এসে সম্রাট হয়েছে, কিন্তু তার দলবল ফিরে যায়নি। সমগ্র মধ্য-এশিয়ার চিত্তবৃত্তি ভারতের মনের সঙ্গে জড়ানো। তাদের নাচ, গান, আলাপ, আপ্যায়ন, আতিথেয়তা—যেমন আমরা মোগল দরবারে দেখে এসেছি, এবং যেমনটি দেখেছি বাঙলার প্রাক্তন জমিদারদের বৈঠকখানায়—ভারতের রুচির সঙ্গে তাদের মন মেলানো!

সুতরাং ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের জন্য তাসকন্দের শিক্ষিত মহল যে একটি 'রবীন্দ্র-দিবস' পালন করবেন, এতে বিস্মিত হইনি।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় তাসকন্দের লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যর্থনা সভায় যখন আমরা গিয়ে পৌঁছলুম, দেখা গেল সেটি একটি ক্ষুদ্রাকার "শান্তিনিকেতন"! শুধু একজন কবিকে উপলক্ষ ক'রে দুটো ফুলের মালা কিংবা গোটা দুই বক্তৃতা দিয়ে কাজ সারলে চলবে কেমন ক'রে? রবীন্দ্রনাথ মানে ভারত, তার সংস্কৃতি, তার মহিমা, তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য! শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়,—তাঁর পরিবেশটিও চাই! আকাশ-পথের পথিক পাখীর চূর্ণ কণ্ঠের ডাকে যে অন্তরের ইশারা মহাকবির বুকের মধ্যে কাঁপন ধরাত, লতাবিতানের ছায়া-পথে অন্তরালবর্তী যে রক্তমুখী গোলাপ মহাকবির পদচারণক্ষেত্রকে সুগন্ধে মুখরিত করত, এবং পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে জনপদনন্দিনীর দল যেমন ক'রে তাঁকে মঙ্গলশঙ্খে এবং হুলুধ্বনিতে বরণ করত,—সেগুলিকে বাদ দিয়ে 'রবীন্দ্র-সন্ধ্যা' উৎযাপনের অর্থ দাঁড়ায় কতটুকু? সুতরাং একটি পুষ্পশষ্পাচ্ছন্ন ছায়াবীথির দুই পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি সুশ্রী এবং শাড়িপরিহিতা "আশ্রম-বালিকা" শঙ্খধ্বনি ও অভিবাদনের দ্বারা ভারতীয়গণকে আনন্দহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। রুশ, তাতার, উজবেক, মঙ্গোল প্রভৃতি বহু শ্রেণীর তরুণীদের পরণে সুন্দর ভারতীয় রেশমী শাড়ি,

মাথায় টায়রা এবং ওড়না ও সর্বাঙ্গে ফুলের আভরণ-অলঙ্কার—এগুলি যেমন ছিল বিচিত্র, তেমনি সৌন্দর্য ও রসবোধের পরিচায়ক। ওদের মধ্যে কোন কোনও আনন্দিনীর রসোচ্ছল চক্ষু-তারকায় এবং শরমজড়িত শিথিল বসনে জড়িয়ে ছিল "কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপায় মেশা"!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর প্রমুখ সমগ্র অধ্যাপক সমাজ এবং ছাত্রবৃন্দ সেই জনপূর্ণ কক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং পিছনের দেওয়ালে একখানি সুবৃহৎ রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ঝোলানো ছিল। বিস্তৃত মঞ্চের উপর প্রথম কয়েক সারিতে ভারতীয়গণের জায়গা হয়েছিল। বাঙালী লেখকরা বসেছিলেন পাদ-প্রদীপের কাছে। তারাশঙ্কর তাঁর ভাষণ দিচ্ছিলেন বাঙলায়, এবং বাঙলা-জানা শ্রীমতী বিকোভা সেটি রুশ ভাষায় সকলের সামনে অনুবাদ ক'রে দিচ্ছিলেন। ওরই মধ্যে শ্রীমতী বিকোভা দোভাষিণী হিসাবে দুই-একটি চুপি চুপি প্রশ্ন করার ফলে তারাশঙ্কর সহসা একটু বিরক্ত হলেন, এবং শ্রীমতী বিকোভাকে সরিয়ে দিয়ে শেষের কয়েকটি ছত্র ইংরেজিতেই প্রকাশ করলেন। এই সামান্য ঘটনাটিতে উপস্থিত অনেকেই আড়ষ্ট হয়েছিলেন। পরে সুনীতিবাবু তাঁর সুন্দর ও মনোজ্ঞ ইংরেজিতে একটি ভাষণ দিলেন, এবং তাঁর হঠাৎ কি যেন দুর্মতি হল,—লোকসমক্ষে আমাকে একজন মস্ত রবীন্দ্র-আবৃত্তিকার ব'লে পরিচিত করলেন! ফলে, আমাকে এগিয়ে গিয়ে মহাকবির একটি গীতি-কবিতা আবৃত্তি করতে হল! বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অংশটি হল প্রাচ্য-বিদ্যার কেন্দ্র, এবং শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক বাঙলা জানতেন! নচেৎ আমার আবৃত্তির পর করতালির শব্দ শুনে এই কথাই মনে হত, এটা দলে প'ড়ে হাততালি ছাড়া আর কিছু নয়!

ভারতীয়গণের সকলকে একটি ক'রে সুন্দর উজবেক টুপি উপহার দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁদের মুখপাত্রস্বরূপ তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন টুপির সঙ্গে একটি তুলানির্মিত নীলাভ জোব্বা। এই ধরণের জোব্বা অর্থাৎ উজবেকি ঢলঢলে লম্বা জামা মধ্য-এশিয়ার দেহাতি 'সর্দাররা' প'রে থাকেন।

ঘণ্টা দেড়েকের সেই অবিস্মরণীয় আনন্দোৎসবের পর উজবেক রাজভবনের দিকে সবাই মিলে যাত্রা করতে হয়েছিল। আলোকমালা তাসকন্দ নগরীকে নন্দন-কাননে পরিণত করেছিল। সেই অবর্ণনীয় শোভা-সমৃদ্ধির ভিতর দিয়ে সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রতিনিধিগণ রাজ-দরবারে এসে পৌঁছলেন। রাত্রি তখন আটটা।

কলকাতার রাজভবনের কথা মনে প'ড়ে গেল। ইংরেজের আমলে তৈরি হলেও কলকাতা নেহাৎ গরীব নয়। কিন্তু এখানে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার রাজভবন যখন নির্মাণ করা হয়েছিল, তখন সিমেণ্টের চলন হয়নি এবং ইস্পাতের কড়ি তখন কেউ ব্যবহার করেনি! কল-কব্জা এবং বিভিন্ন প্রকার লৌহ, ইস্পাত, পিতল প্রভৃতির বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম তখনও এতটা তৈরি হয়নি। খিলান তৈরির মসলা ছিল অন্যরূপ,—যেমন আগ্রার তাজমহল, দৌলতাবাদের দুর্গ, আমেদাবাদের মসজিদ, জগন্নাথের মন্দির, মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ, মীনাক্ষীর গোপুরম্‌ অথবা চিতোরের ভগ্নাবশেষ। কলকাতার মিস্ত্রিরা সেকালে ইংরেজকে এই সব মশলাই জুগিয়েছিল। কিন্তু যে-রাজদরবার কক্ষে আমরা এসে প্রবেশ করলুম সেটি ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে, সম্পদে এবং পুষ্পাভরণে কিছুক্ষণ অবধি সবাইকে হতবুদ্ধি ক'রে রেখেছিল। এর ভিতরকার যে বিশাল বিস্তৃতি এবং সমারোহ, সেটি মোগল-রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কালকে স্মরণ করিয়ে দেয়! সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্বেল পাথর এবং শ্রেষ্ঠ শেগুন কাঠের জন্য পৃথিবী-প্রসিদ্ধ, এবং শীতপ্রধান দেশ বলেই কাঠের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশি। এক একখানা দরজা দশ থেকে পনেরো ফুট উঁচুও আছে। তার ফ্রেম চওড়ায় দশ বাই আট ইঞ্চি, এবং তার পাল্লা তিন ইঞ্চিরও বেশি মোটা! নিষ্কলঙ্ক শেগুন কাঠের উপর বিচিত্র কারুকার্যের চেহারা দেখলে মন ঈর্ষান্বিত হয়। মধ্য-এশিয়ার এই মরুলোকে এমন শত সহস্র প্রাসাদ যারা একপ্রকার 'রাতারাতি' এক-একটি প্রতিষ্ঠানের নামে নির্মাণ ক'রে তুলেছে তাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটা যাদু জানে কৈ। সেই কারণে মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর লেনিনের প্রতিকৃতি এই দরবার-কক্ষের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। তাঁর অমোঘ মন্ত্রপাঠ মধ্য-এশিয়ার প্রতিটি মৃত বালুকণাকে এক একটি প্রাণীতে পরিণত করেছে।

জনসংখ্যা এক হাজারের কম বোধ হয় নয়। এখানে এসে মিলেছে প্রাচ্যলোক এবং সেদিনকার অন্ধকার ও ছায়াবৃত আফ্রিকা মহাদেশ, প্রতীচ্যের বহু অতিথি এসেছেন, এবং আমেরিকার কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন।

যে-বিবাদ আমরা দেখি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংবাদপত্রাদিতে, যে-বিসম্বাদ আমরা দেখি উভয় মহাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে পদার্পণ করার পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাচ্ছিনে। এই বিশ্বাসটি ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হচ্ছে, এক দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অপর কোনও দেশের জনসাধারণের মূলতঃ অমিল নেই। শুধু জীবনযাত্রার মানরূপ কোথাও কম এবং কোথাও বেশি। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা চলে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে যেমন কয়জন প্রশংসমান আমেরিকান, স্কচ এবং অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এতকাল কলকাতায় বাস করেও তেমন হয়নি। সে আলোচনা পরে করব।

একদিকে বিরাট মঞ্চ। নীচের দিকে উজবেক গভর্ণমেন্টের সর্বাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শারফ রশিদভকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন জাতির মুখপাত্ররা আসন গ্রহণ করেছেন। আমরা ছিলুম একান্তে। তারাশঙ্কর আমার পাশে ছিলেন এতক্ষণ, এক সময় তিনি উঠে অগ্রসর হলেন এবং পাদ-প্রদীপের কাছাকাছি গিয়ে কর্তৃসমাজে আসন নিলেন। মঞ্চের উপরে নাচগানের পালা চলছে। নানাবিধ শ্রেষ্ঠ ভোজ্য-সামগ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কোমল ও উগ্র মদের অবারিত এবং অজস্র সরবরাহ চলছিল এবং মদ্যপিপাসীর সংখ্যা সেই আন্তর্জাতিক ভোজের আসরে যে সর্বব্যাপী, সেটি লক্ষ্য করার মতো। সেই মদরসরঞ্জিত আবিল দৃষ্টিতে সকলেই দেখতে পাচ্ছিলেন, মঞ্চের উপরে মধ্য-এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীরা একে একে এসে অপ্সরানৃত্যের দ্বারা ইন্দ্রসভার নর্তকীদের অবাস্তব কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, এবং এই দরবার কক্ষের বিরাট আসরে বসে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাঁদের মোহমদির দৃষ্টি তুলে মনে মনে কী কামনা করছিলেন, সে আমি জানিনে— কিন্তু মঞ্চ এবং পাদপ্রদীপের কাছাকাছি যে সকল প্রবীণ এবং পক্বকেশীরা বসেছিলেন, তাঁরা যে অপর সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, এর প্রমাণ পাচ্ছিলুম

আশে পাশে। আমার কাছেই বসেছিলেন অতি নিরীহ এবং ভদ্রচেতা কমিউনিস্ট কবি সুভাস মুখোপাধ্যায়। তিনি মাঝে মাঝে চোখ তুলে এই ধনীশ্রেষ্ঠ সোভিয়েট জাতির সর্বব্যাপী সম্পদের সমারোহের দিকে লক্ষ্য করছিলেন!

রুশ, চাইনীজ, আফ্রিকান প্রভৃতি নাচের পর ভারতবর্ষ ভাবল, আমিই বা কম কিসে? সুতরাং রূপোভিমানিনী এবং পাঞ্জাবিনী শ্রীমতী প্রদ্যোৎ কাউর মঞ্চের উপরে উঠলেন চারিদিকের মদমত্ত বিপুল করতালির মধ্যে এবং তাঁর বসন-শৈথিল্যের মধ্যে মাথার বেণী দুলিয়ে যখন নাচতে লাগলেন তখন আমরা সে দৃশ্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে রুচিকর আহার্য সামগ্রীর প্রতিই মনঃসংযোগ করলুম।

মধ্যরাত্রির পর কখন্ সভা ভাঙ্গল, কাদের সঙ্গে ফিরলুম, ঘরে ঢুকে কখন বা ঘুমোলুম,—পরদিন প্রভাতে উঠে মনে মনে এগুলো তোলাপাড়া করেছিলুম!

সকালে শীতার্ত মেঘলা আকাশ থেকে সপসপ ক'রে বৃষ্টি নেমেছিল! আজ ঠাণ্ডা দিন। কিন্তু হোটেলের প্রত্যেকটি ঘরকে আরামদায়ক করার জন্য উঁচু জানালার ঠিক নীচের দেওয়ালে একটি রেলিং ঘেরা অন্ধকার গুহালোক থেকে গরম হাওয়া ঘরে উঠে আসে! আমরা বড় আরামে আছি।

রাজনীতি কিছু ঘুলিয়ে উঠেছে। চীন, রুশ এবং আরও দুই চারটি জাতির মনে ভারতের অভিমত সম্পর্কে কিছু দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে মনে হচ্ছে। এদিকে দুদিন সম্মেলনের পর বহু প্রতি-নিধির কৌতূহল গেছে কমে এবং নানা লোক নানাস্থলে ঘুরছেন। এর পর তাসকন্দ থেকে কে কোন্ দিকে যাবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে! চীন প্রতিনিধিরা আজ ভারতকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করেছেন। এদিকে সকালের অধিবেশনে সভাপতির আসনে বসলেন তারাশঙ্কর এবং ভারতীয় গোষ্ঠীর সকলেই এতে গৌরব বোধ করলেন।

গতকাল থেকেই লক্ষ্য করছি আমাদের দুজনের আশেপাশে শ্রীমতী লানা অথবা নিকা দুজনের একজনও নেই। মনে পড়ছে পরশু সন্ধ্যা থেকেই লানা বই আর কাছে আসছে না এবং গতকাল বিকালে দেখেছি সিংহলের প্রতিনিধিদের মাঝখানে সে বসে রয়েছে! খুব আশ্চর্য ঠেকল। সকালে প্রাতরাশের উদ্দেশ্যে নীচের তলায় লাউঞ্জের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, লানা তার সিংহলীদের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আমাকে দেখে উঠে এল। হাসিমুখে বললুম, হঠাৎ যে গা ঢাকা দিলে? বিদেশ বিভূঁয়ে তোমরা দোভাষীরা কাছাকাছি না থাকলে কে দেখবে আমাদের?

এদিকে আসুন,—ব'লে লানা আপিস মহলের দিকে আমাকে নিয়ে গেল। পরে বলল, আপনাকে আমি খুঁজছিলুম!

কেন? কি হয়েছে?

আপনাদের কাজ ক'রে খুব আনন্দ পাচ্ছিলুম।—লানা বলল, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জি আমার ওপর রাগ করেছেন মনে হল!

প্রতিবাদ ক'রে বললুম, কে বললে? এ তোমার ভুল, লানা। তারাশঙ্কর বরাবর তোমার সুখ্যাতি ক'রে এসেছেন! তোমার কথা সত্য নয়।

লানা চোখ তুলল আমার দিকে। মেয়েটার মুখে চোখে কোথায় যেন আমার বড় মেয়ের ছবিটি ভেসে বেড়াত! লানা বলল, ব্যানার্জির কথামতোই কর্তৃপক্ষ আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন! কি দোষ করলুম আমি বুঝতে পারিনি। তবে যশপালজি আর আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার সময় তাঁকে নিয়ে গেলেই ভাল করতুম। হ্যাঁ, আমার দোষ হয়েছে বৈকি!

আমি আর কি বলব, চুপ ক'রে গেলুম। লানা বলল, আপনার যখন যা দরকার আমাকে বলবেন, তক্ষুণি আসব।

এর পরে তারাশঙ্করকে প্রশ্ন ক'রে জেনেছিলুম লানাকে দিয়ে তাঁর কাজ চলছিল না, সেইজন্যই তিনি লানাকে ছুটি দিয়েছেন! আমার ব্যক্তিগত অসু-বিধার কথাটা সম্ভবত তাঁর মাথায় আসেনি। আমি হাসছিলুম। তাঁর কৈফিয়ৎটি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়নি।

তারাশঙ্করের কাজে নতুন যিনি এলেন, সেই মহিলার বয়স চল্লিশ বছর হবে বৈকি। অতি নম্রভাষিণী এবং সুশ্রী। দেখলেই বুঝতে পারা যায়, জারের আমলের কোনও বিশেষ অভিজাত বংশের কন্যা, এবং দোভাষীর কাজ সম্ভবত তাঁর পেশা নয়। তাঁর নাম "ভেরা", কিন্তু উচ্চারণটি একটু গড়িয়ে হয়ে ওঠে "ভিয়ারা"। ভেরা, নাটাশা, শাশা, লোলা, তামারা,—প্রভৃতি নামগুলি সোভিয়েট দেশে খুব চলতি। ভেরা এক সময় আমাকে ডেকে বললেন, আপনার যখন যা দরকার বলবেন। আপনাদের দুজনের কাজই আমি করব। আমি ভেরাকে সসম্মানে ধন্যবাদ জানালুম।

কৌতুকের বিষয় এই, তারাশঙ্করের কাজকর্ম একেবারেই কম। কারণ ঘর থেকে তিনি প্রায়ই বেরোন না। দিনে রাত্রে তিনবার শুধু তাঁর খেতে যাওয়া,—কিন্তু তখন ভারতীয়রাই সঙ্গে থাকেন। সামাজিক বাধ্য-বাধকতার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন মুল্‌করাজ,—এবং ভোজের আসরে দোভাষীর বিশেষ দরকার হচ্ছে না! তবে ঘরে ব'সে রুশ এবং উজবেক-দের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অবশ্যই দোভাষীর প্রয়োজন।

সে যাই হোক, বেসরকারীভাবে লানা আমার কাজে রয়েই গেল। পোস্ট আপিসের কাজ, টাকা ভাঙ্গানোর কাজ, খোঁজ-খবর নেবার কাজ,—সব কাজেই সে রইল। মনোহারী এবং বইয়ের দোকানের সামনে এলে লানা ছুটে এসে দাঁড়ায় এবং কেনা বেচায় সাহায্য করে। রাস্তায় লোক-জনের মাঝখানে গিয়ে অপরিচিত ভাষা-ভাষীদের মধ্যে নিরুপায় বোধ করলে লানাই এসে পাশে দাঁড়ায়। মেয়েটার প্রতি আমার কেমন যেন বাৎসল্য ও কৃতজ্ঞতা-বোধ জন্মেছে।

চীন-ভারত মধ্যাহ্ন ভোজসভায় পরস্পরের মন জানাজানি এবং সৌহার্দ্য-সম্পর্ক রক্ষার কথাটা ছিল। চীনের মুখ-পাত্র হলেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু চীন, রুশ, উজবেক, আফ্রিকান, মিশরী, দক্ষিণ প্রাচ্য প্রভৃতি যখন ধরে নিচ্ছেন যে, ভারতীয় দলের মুখপাত্রের অভিমতই হল ভারতের অভিমত—তখন দেখা যাচ্ছে ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যেই অন্তত আট-দশটি অভিমত বর্তমান! এর প্রমাণ পাওয়া গেল শেষের দিকে একদিন। ভারতীয় গোষ্ঠির মধ্যে একটি অস্বস্তি দেখা গিয়েছিল। ফলে, কুড়ি বাইশটি স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দরখাস্ত হাতে নিয়ে শ্রীযুক্ত গোবিন্দসিং মালসুখানি এবং হরচরণ সিং এঁরা দুজনে এসে একদিন তারাশঙ্করের ঘরে ঢুকলেন। সেই দরখাস্তর মূল কথাটা ছিল এই, আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ না ক'রে ভারতীয় লেখকদের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার কোনও অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি! এই দরখাস্তটিতে সুনীতিবাবু, শ্রীধরণী প্রভৃতি সাত আটজনের সই ছিল না। দরখাস্তকারীদের ইচ্ছা ছিল, এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনের একটি স্থায়ী আপিস ভারতে প্রতিষ্ঠা করা। এই ইচ্ছার মূলে উৎস কোথায় এবং এটি কাদের দ্বারা প্ররোচিত, সেটির সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ ক'রে তারাশঙ্কর জবাব দিয়ে-ছিলেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কথা-বার্তা না ব'লে তিনি এই আপিস খোলার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে প্রস্তুত নন্!

এবার আমাকে কথা বলতেই হল। একটি সর্বভারতীয় বেসরকারী সাহিত্য

প্রতিষ্ঠানের সুখস্বপ্নিল প্রস্তাবের কথা তুলে আমি যখন উভয়পক্ষে মিটমাটের চেষ্টা করলুম,—এবং চেয়ারম্যানের পদে তারাশঙ্করের নামটি প্রস্তাব ক'রে তারাশঙ্করকে উৎসাহিত ক'রে তুললুম,—তখন সহসা হরচরণ সিং খুশী হয়ে আমাদের দুজনের পদধূলি নিলেন, এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন! কিন্তু শৃগালের চুক্তি ওখানেই ধামাচাপা পড়ল! সে যাই হোক, এই দরখাস্তখানি পাঠ ক'রে আমার তখন মনে হয়েছিল, তাসকন্দের এই হোটেলেরই কোথাও ভারতীয়দের মধ্যে একটি পৃথক গোষ্ঠি কোনও একটা পরামর্শসভায় নিয়মিতভাবে একত্র মিলিত হন এবং সেখানে একটি নীতি নির্দিষ্ট হয়! সেদিন আরেকবার আমার মনে হয়েছিল, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যথেষ্ট গৌরব নিয়ে ভারতীয়রা ফিরতে পারবেন না!

মূল প্রস্তাবটির সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট-পন্থী প্রতিনিধিমণ্ডলীর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সকলেই চান্ প্রস্তাবটি সর্বজাতিসম্মত হয়ে বিঘোষিত হোক,—নচেৎ পাশ্চাত্য জাতিগণের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহ্য করতে হবে! কিন্তু একা ভারতবর্ষ যদি স'রে দাঁড়ায় ত সর্বনাশ! ওরা জানে ভারত মানে আমরা এই কয়জন। আমি জানি আমরা ভারত নই,—এবং ওও জানি আমরা কয়েকজন হুজুগে লেখক মাত্র,—নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা নই, এবং ভারত গভর্ণমেন্ট আমাদেরকে পাঠাননি। কেবল সুপারিশক্রমে তাঁরা আমাদেরকে ছাড়পত্র দিয়েছেন মাত্র! আমরা এসেছি নিজেদের খরচে এবং নিজেদের গরজে। স্বয়ং যিনি মুখপাত্র, তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও নির্বাচিত মুখপাত্র নন! ভারতবর্ষ তাঁকে পাঠায়নি, পাঠিয়েছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র! সেই কারণে সন্ধ্যার দিকে যখন তারাশঙ্করের ঘরে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্বয়ং মিঃ শারফ রশিদভ সোভিয়েটপ্রসিদ্ধ ধনীশ্রেষ্ঠ লেখক মিঃ সিমানভ ও ফরেন লিটারেচার ম্যাগাজিনের বিখ্যাত সম্পাদক মিঃ চেকভস্কি প্রমুখ অন্য দু'-একজন লেখক এসে ঢুকলেন, তখন আমি একটু আড়ষ্ট হয়েছিলুম। ভেরার পরিবর্তে একজন পুরুষ দোভাষী ও'দের সঙ্গে এলেন। চেকভস্কি ছাড়া ও'দের আর কেউ ইংরেজি জানেন না!

তারাশঙ্কর অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর মুখ চোখের চেহারা বিশেষ স্বাভাবিক ছিল না। যাঁরা এলেন তাঁরা চিন্তান্বিত, গম্ভীর, কিন্তু বিনীত। কিন্তু আমার মনে হল এ'রাই ত বাঘাভল্লুক! এ'রাই ত' সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের এক একটি টুকরো! তারাশঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন।

চেকভস্কি তাঁর জোরবান ধারালো পরিচ্ছন্নতায় তাঁদের কথা বলতে লাগলেন। ভারতীয় মুখপাত্রের সহযোগিতা এবং সম্মতি সকলেই কামনা করেন। সাহিত্য ত' জীবনের বাইরে নয়! ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের শোষণ ও অনাচার সম্বন্ধে ভারতের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। মূল প্রস্তাবে যদি এর উল্লেখ থাকেই, ভারতের আপত্তিটা ঠিক কোন্‌খানে!

তারাশঙ্কর তাঁর অভিমতের পুনরুক্তি ক'রে সহসা ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে "পঞ্চশীলার" কথা ঘোষণা করলেন! কিন্তু এ ধরণের আলোচনায় ঠিক পঞ্চশীলের কথাটা আসে কিনা, সেটা ও'রা বুঝতে না পেরে পরস্পর একবার মুখচাওয়াচায়ি করলেন। তারাশঙ্করের মনের কথাটা ব্যাখ্যা করা হয়ত সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু মুখপাত্রের মুখের উপর দিয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা এদেশের রীতির দিক থেকে নিয়মতান্ত্রিক হবে কিনা, এই ভেবে চুপ ক'রে থাকতে হল। দেখতে পেলুম ও'দের প্রকৃত প্রশ্নটি তারাশঙ্করের পক্ষে যথেষ্ট বোধগম্য হয়নি। উনি কেমন একটা চাঞ্চল্য বোধ করছিলেন।

ও'রা চলে যাবার পর এক সময় বললুম, সম্মেলনের সামনে আমি যদি একটা লেখা পড়ি, তোমার আপত্তি আছে, তারাশঙ্কর?

তারাশঙ্কর বললেন, না, কিসের আপত্তি? বাঙ্গলায় লিখবে?

বললুম,—অনুবাদ করিয়ে নেবার সময় পাব না!

এক সময়ে নিজের ঘরে উঠে এলুম। নানা কারণে আমার মন ভাল ছিল না। অতঃপর রাত্রির আহারাদি সেরে যখন ঘরে এসে ঢুকলুম, শ্রীমতী নেলী এল তার ইংরেজি দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে, যেমন সে 'ফ্লোরের' ফাই-ফরমাস সেরে প্রত্যহ রাত্রে আসে। আজ অন্তত পঁচিশ ত্রিশটি ইংরেজি শব্দ তাকে শেখানো চাই! মাঝখানে একবার তারাশঙ্কর এলেন গোটা-দুই সিগারেটের জন্য, এবং এই তরুণীর অধ্যবসায়কে তারিফ ক'রে গেলেন। বিনা বেতনে এমন মাষ্টারী বহুকাল করিনি। নেলী যখন খুশী হয়ে বিদায় নিল রাত তখন দুটো বাজে! কলকাতার ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা!

পরদিন প্রতিজ্ঞা করলুম ঘর থেকে আজ বেরোব না, এবং লেখাটা লিখে শেষ করব। আহারাদি আজ বন্ধ থাক। কিন্তু ওরই মধ্যে একবার তারাশঙ্কর আমার ঘরে, আমি সুনীতিবাবুর ঘরে, সুনীতিবাবু তারাশঙ্করের ঘরে, এবং শ্রীধরণী এ-ঘরে ও-ঘরে—এই করতে করতেই বেলা বেড়ে গেল! অবশেষে অনেক বেলায় অবসর পেয়ে স্নানাদি সেরে এসে বসলুম। ইংরেজিতে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নাম দিয়ে কাগজ-কলম টেনে লেখাটা ধরলুম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে পছন্দসই রকমের লেখার কাগজ, চিঠির কাগজ, সুন্দর খাম, উৎকৃষ্ট কালি অথবা সুক্ষ্মধার কলম,—এগুলি দুষ্প্রাপ্য। নিজের কাগজের প্যাড সঙ্গে ছিল তাই রক্ষে। এগুলি সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশ এবং ভারত অনেক বেশি অগ্রসর। কাগজকলম নিয়ে নাড়াচাড়ার মধ্যে এক সময় তারাশঙ্কর এসে তামাসা করলেন, রাত জেগে মেয়েটাকে আর কত ইংরেজি শেখাবে বল ত? শিখল কিছু?

হৈ চৈ ক'রে আমরা দুজনেই হাসাহাসি ক'রে নিলুম কতক্ষণ। কিন্তু সময় আমার কম,—আগামীকাল সকালে আমার রচনা পাঠ! গত কয়েক দিনের মধ্যে অবশ্য নানা জায়গার তাগাদায় চার-পাঁচটি প্রবন্ধ লিখে দিয়েছি। তবে তার মধ্যে দু'-একটি লিখে দিতে হয়েছে তারাশঙ্করের জবানীতে,—তার একটি তাসকন্দ বেতারের জন্য, আরেকটি মস্কোর এক কাগজে। সুতরাং হাত একটু সড়োগড়োই ছিল। একটা সুবিধে এই, এটা বিলেত নয়,—এখানে আমার ইংরেজি খুঁটিয়ে কেউ বিচার করছে না। আসল কথাটা গুছিয়ে বলতে পারলেই হল। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, বিলেত হলে আমার লেখা চলত কিনা! সোভিয়েট অধ্যাপক দানিলচুক ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় বাঙ্গলা সাহিত্য সম্মেলনে বাঙ্গলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, আমি সেটি অবশ্যই সংশোধন ক'রে দিতে পারতুম! কিন্তু এখানে দুঃসাহসের কথা এই, সর্বজাতিসম্মিলিত এখানকার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আমি লেখাটা পড়ব! সন্দেহ নেই, আমার মানসিক বিরক্তিই আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। উপনিবেশবাদ সম্বন্ধে ভারতের পক্ষের কথাটা আমাকে বলতেই হবে।

দরজা বন্ধ ক'রে বসেছিলুম টেবলে। বেলা প্রায় এগারোটা। হঠাৎ টক টক ক'রে দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে খুলে দেখি, নেলী! কেউ কা'রো ভাষা জানিনে, মাত্র গুটিকয়েক ইংরেজি শব্দের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে উভয়ে চলাফেরা করি এবং তার জন্য এক এক সময় হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে যাই। নেলীর হাতে সেই জর্মন-সিলভারের খাপসমেত এক গেলাস "গরিয়াচি চায়" এবং দুটি 'সোসিসকি'। অর্থাৎ চা এবং মাংসের খাবার। ভিতরে এসে দুটি বস্তু সে টেবলের ওপর যখন রাখল, তখন আমার নিজের ভাঁড়ার থেকে তাকে একটি আপেল দিলুম। এই নিঃসংকোচ স্বাচ্ছন্দ্য ভারতে নেই। চেয়ে দেখলুম আরেকবার। মাথায় রাশিকৃত সোনালি চুল গোলাপে-জবায়-পদ্মে মিলিয়ে এ-মেয়ের যৌবনসম্ভার

সৃষ্টি! সমগ্র দেহলতায় যেমন কাঠিন্য, তেমনি শক্তিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমার জন্য এবম্বিধ জলযোগ আনবার কথা তা'র নয়। বুঝতে পারা গেল, আমি প্রাতরাশে যাইনি—এটি লক্ষ্য ক'রে সে এ সব আনিয়েছে। আজ তার হাতে দেখলুম একটি নতুন আংটি। এবং সে ওই আপেলটি চিবোতে চিবোতে হাত পা এবং মুখ নেড়ে ইংরেজি শব্দ যুগিয়ে আমাকে বোঝালো, আজ আপনাকে সেই সব ছবি দেখাব,— সেই যে কাল রাত্রে বলেছিলুম—সেই যে মাসিবরের বাড়িতে— !

মেয়েটার দাঁত আর ঠোঁটের চাপে কেমন করে রস ছিটকে পড়ে এটি দেখার জন্য টিপাইয়ের উপর থেকে কয়েকটা বড় বড় আঙ্গুর ওর হাতে দিলুম। হাসি-মুখে সেগুলি একে একে সে খেল, এবং আমি খুশী হলুম। অতঃপর সহাস্যে বিদায় নিয়ে গেলে নিজের কাজে আবার মন দিলুম।

লেখাটার ওপর সবেমাত্র মনঃসংযোগ ক'রে অগ্রসর হচ্ছিলুম, ঠিক এমনি সময় হঠাৎ দরজা ঠেলে তিনজন মেয়ে-ছেলে ভিতরে এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোকটির ঘন কালো কোঁকড়া চুল এবং যার কালো চোখে কাজলের ছায়া,—সে এগিয়ে এসে পুরনো আঙ্গুরের থালাটা সরিয়ে নিয়ে সের দেড়েক তাজা আঙ্গুর এবং গোটা দশেক টাটকা আপেল গুছিয়ে রেখে চলে গেল। বাকি দুজনের হাতে বড় বড় তোয়ালে আর বুরুশ। তারা মেথরানি কি রাজরানি—সেটা ঠাউরে দেখবার আগেই একজন গেল বাথরুমে, অন্য জন বুরুশ-ঝাঁটাসহ গৃহকর্তার দিকে এগিয়ে এল। অতএব টেবল ছেড়ে উঠে সবিনয়ে বাইরে যেতে হল।

অদূরে 'ফ্লোর-আপিসে' নেলী বসে-ছিল, এবং তা'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুজন মীসরীয় প্রতিনিধি এবং আর কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ জটলা করছিল। ওদের মধ্যে আমাদের ঘরের লোক রয়েছে একজন, তিনি উড়িষ্যা কন্‌-গ্রেসের তরুণ এম-এল-এ সত্যানন্দ চম্পতরায়। ছেলেটি অতি ভদ্র এবং মিষ্টপ্রকৃতি। সে এগিয়ে এসে আমার কাছে সোৎসাহে নেলীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে লাগল, এবং পিছন থেকে একত্র রানী লক্ষ্মীকুমারী এবং আমার পাতানো-ভগ্নি শ্রীমতী দুর্গা ভাগবৎ এসে বললেন, সত্যি বাপু, ছুঁড়ির চেহারাটা একবার দেখেছেন? কী রং, কী চুল! কী খায় বলুন ত?—সবাই মিলে কতক্ষণ আমরা হাসাহাসি করলুম। ও'রা যাচ্ছিলেন সম্মেলনের অধিবেশনে। আমি যাচ্ছিনে,—কাজে ব্যস্ত।

স্ত্রীলোকগুলি চ'লে যাবার পর লেখাটার প্রতি মন দিয়েছিলুম—লিখে যাচ্ছি নিজের মনে! হঠাৎ দরজাটা খুলে নেলী এসে ঢুকল,—চেয়ে দেখি তার হাতে মাঝারি এক গেলাস গরম দুধ। মনে পড়ছে কাল রাত্রে অনুযোগ করেছিলুম, শুধু মাংস, মাখন রুটি, চীজ আর ফল,—খেয়ে অরুচি! না পাই ভাল চা, না পাই দুধ! এই সব খাদ্য রাত দিন খাও তাই তোমাদের এমন কড়া মেজাজ আর গোঁয়ার্তুমি। তোমরা শান্তি চাও, কিন্তু একটুও শান্ত নও!

গেলাসটা টেবলে রেখে নেলী বলল, "ঈৎ, ঈৎ,—গারিয়াচি মালাকো।" অর্থাৎ গরম দুধ খেয়ে নিন। আমি শুধু হেসে বললুম, "স্পাসিভা!" (ধন্যবাদ)।

হুমড়ি খেয়ে আমার লেখাটার উপর প'ড়ে সে দেখতে লাগল, কেমন ক'রে আমি ইংরেজি অক্ষরগুলো সাজাচ্ছিলুম। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে একবার জানলার বাইরে দূরে সুসজ্জিত নাভয় অপেরা হাউসের দিকে সে তাকাল। বলল, বিউটিফুল!—তারপর যাবার আগে কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ইউ গুড......ভেরি গুড......আই ব্রিং ফতো......গুড ফতো টু-নাইট!—অর্থাৎ আপনি মানুষটি বেশ ভাল, এবং ফটোগুলি এনে আপনাকে দেখাব!

সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই, গত চার-পাঁচ দিন ধ'রে নেলীর অবিরত আনাগোনায় তার বক্তব্যগুলি আমি প্রায় সম্পূর্ণই বুঝে নিতে পারতুম, এবং সে যখন পুনরায় ঘন্টা দুই পরে এক প্লেট খাবার হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল,—আমি সেই ভোজ্য সামগ্রী-গুলির দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, আমার রুচি-অরুচিও এখন সে বোঝে! প্লেটের উপরে রয়েছে, ভিনিগারে ভিজানো শশা, টমাটো, গোটা কয়েক মটর শুঁটি, একটি 'সোসিসকি', এবং দুখানা টোস্ট-মাখন।

কাঁচা লঙ্কা নেই গোটা দুই?

নীয়েৎ!—অর্থাৎ, না।

প্রশ্ন করলুম, তোমার খাওয়া হয়েছে, নেলী?

জবাব দিল, "দা!"—অর্থাৎ হ্যাঁ!

"খারাসো"—ব'লে আমি খেতে ব'সে গেলুম। "খারাসো" মানে, বেশ!

মেয়েটার সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের চিহ্নও নেই; বোধ হয় তার প্রয়োজনও কম। কিন্তু ওর বাঁ হাতের অনামিকায় দুদিকে দুটি কালো মীনাকরা কাজের ঠিক মাঝখানে বসানো একটি হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছিল,—সেটির প্রতি আমার দৃষ্টি বারম্বার ছুটে যাচ্ছিল। নেলী বলল, এটি আপনি দেখুন, পরে আমি নেবো। আমি কিন্তু ওটি দেবো না আপনাকে!

উচ্চ হাস্যে ঘর ভরিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

লেখাটা কোনমতে শেষ ক'রে একটি কাপি ক'রে দিতে বিকাল সাড়ে চারটে বাজল। এর মধ্যে নেলী বার বার দেখে গেছে কাজ আমার শেষ হয়েছে কিনা। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে না নিলেই হত! এর জন্য অন্তত দিন তিনেক নিরিবিলি সময় আমার পাবার দরকার ছিল।

লেখাটা নিয়ে বাইরে এসে শ্রীমতী ভেরাকে পাওয়া গেল। উনি ওটা নিয়ে গেলেন টাইপ করিয়ে দিতে, এবং মূল রচনাটা যে আমি হাতছাড়া করতে চাইনে, সেটি তাঁকে জানিয়ে দিলুম। এই লেখাটি পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের রুশ কাগজে সম্ভবত ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তার "পারিশ্রমিক" আমি পাইনি।

ভেরাকে লেখাটি দিয়ে আমি আরেক-বার স্নান করতে নামলুম।

এখানে আমার সেদিনকার ডায়েরী থেকে তারাশঙ্কর-কথিত কয়েকটি ছত্র তুলে দিই: "প্রতি রাত্রে নীচের তলার একটি গোপন কক্ষে প্রিসিডিয়মের সভা বসছে। রুশ, চীন, ভারত, মীসর ও অন্যান্য আফ্রিকান মুখপাত্ররা ওখানে প্রধান। চীন ও আফ্রিকানদের জিদ ও জবরদস্তি ওখানে খুব বেশি,—তারা-শঙ্কর ও'দের প্রতি তুষ্ট হননি। তাঁর ওপর চাপ প্রচুর। রুশরা শান্ত এবং আপাত নিরপেক্ষ। কিন্তু তারাশঙ্করের বিশ্বাস তাঁরাও আছেন অলক্ষ্যে। মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে আগে ভোট দেবার কথা ছিল না, এখন সেকথা উঠেছে। আগে পৃথকভাবে মোট তিনটি প্রস্তাব তিন দল মিলে লিখেছিল, কিন্তু ভারতীয় প্রস্তাবটি গ্রাহ্য না হবার জন্য তারাশঙ্কর পিছিয়ে আসেন! এদিকে আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারীর আশঙ্কা, ওদিকে তাঁর উপর চীন, আরব ও আফ্রিকার চাপ,—ফলে, তিনি একা সংগ্রাম করতে থাকেন! মুল্‌করাজ আনন্দ্‌ ও সাজ্জাদ জহীর একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। এই সব প্রাত্যহিক কচকচির মধ্যে তারাশঙ্কর ক্লান্ত, অবসন্ন ও অসুস্থ হন। অবশেষে ভোটদানের কথা ওঠে, এবং তিনি নিরুপায়ভাবে ও সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মূল প্রস্তাবের খসড়ায় অতঃপর স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। রাত্রে মিটিং শেষ ক'রে ফিরে এসে তারাশঙ্কর আমাকে বলেন, ওদের কাছে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এবং আমি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি! মুল্‌করাজদের খসড়ার ভাষা কিছু নরম ছিল এই মাত্র। সম্মেলন শেষ হবামাত্রই তিনি দিল্লী ফিরে যেতে চান। তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে আমার মন সমবেদনায় ভরে উঠল।"

সেদিনের ডায়েরী ওখানেই শেষ করেছিলুম। (ক্রমশঃ)

মতি নন্দী

শূন্যে অন্তরীন

খেঁকুরে চেহারার লোকদুটো এতক্ষণ গুজগুজ করছিল আর তাকাচ্ছিল। শেষে তাদের একজনকে এগিয়ে আসতে দেখে ঘাসের শীষটা থু-থু করে ফেলে, নিমাই তৈরী হয়ে বসল।

"আপনার কি এই মাঠেই খেলা আছে?"

বিনীত, প্রায় বিগলিত প্রশ্ন। আড়মোড়া ভাঙার মত কসরত করে নিমাই বলল, "ননাঃ, ইউনিভার্সিটি মাঠে ছিল, গিয়ে দেখি প্রফেসর মারা গেছে বলে খেলাটা বন্ধ। ফেরার পথে ভাবলুম কোথাও বসে খেলা দেখি, তাই।"

"আপনি কোন্ ক্লাবে খেলেন?"

"কোথাও না। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করার মানে?"

নিমাই অল্পবিস্তর মেজাজ দেখাতে চাইল। লোকটা প্রায় গলে যাবার যোগাড়।

"তাহলে তো ভালই হল। একটা অনুরোধ করব যদি রাখেন।"

নিমাইয়ের হাত চেপে ধরল লোকটা, "আমাদের আজ একজন কম হয়ে গেছে, লীগের খেলা, ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাচ, আপনি যদি দয়া করে আমাদের সাহায্য করেন।"

"বারে, তা কি করে সম্ভব!"

"খুব সম্ভব, সে ভার আমাদের। আপনাকে তো আর অপোনেন্ট টিম চেনে না, ওরা আসছে নৈহাটি থেকে; আমাদের টিমে যে আসেনি তার নামেই আপনি খেলুন। খেলতে এসেছিলেন খেলেই ফিরুন।"

হেঁ হেঁ করে লোকটা হেসে উঠল। অন্য লোকটা ব্যস্ত হয়ে মালির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিল, তাকে ডাকল। যেন অপেক্ষাতেই রয়েছে, ছুটে এল।

"কি হল হাবলো, উনি খেলবেন তো।"

"নিশ্চয়।" হাবলো হেঁ হেঁ করে হাসল। "খেলা পোস্টপন হয়ে গেছে তাই ফিরছিলেন, কলেজ টিমের প্লেয়ার।"

"কোন্ কলেজ?"

"সিটি"। ঘাসের শীষ ফেলার মত করে নিমাই উচ্চারণ করল।

"কাল সন্ধ্যায় এত জল ঢেলেছে পীচে যে এখনো জবজবে হয়ে রয়েছে। মালীটাকে দিয়ে বারকতক টানিয়েনি।"

লোকটা চলে গেল। হাবলো ঘড়ি দেখল।

"এখনো সময় আছে, অপোনেন্ট টিমও পৌঁছয়নি, চলুন টেন্টে যাওয়া যাক।" যেতে যেতে হাবলো বিশেষ গোপনীয় কথা বলার সুরে বলল, "যার খেলার কথা ছিল আজ সকালেই ফোন করে বলেছে, পিকনিকে যাচ্ছি; বড়লোক মানুষ, বাপের পয়সা আছে, নিজেও ব্যবসা করে।"

তাঁবুতে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। হাবলো তাকে পরিচয় করিয়ে দিল পাল-মশায়ের সঙ্গে। আজকের খেলার অধিনায়ক পালমশাই। ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। হেসে কথা বলেন।

"বল করতে পারেন তো?"

"না, ব্যাটসম্যান, ফোর ডাউন।" বেঞ্চে বসে নিমাই চারধারে তাকাল। পোষাক বদলে তৈরী হচ্ছে কয়েকজন। খেলার পোষাক তার পরাই আছে। সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। ক্যাম্বিসের ছোট্ট ব্যাগ থেকে বুট বার করে পরতে শুরু করল।

"ঘড়ি কিম্বা টাকাকড়ি সাবধানে রাখবেন কিন্তু।" মুখ তুলল নিমাই। পালমশাই বলছেন, "খেলার সময় তাঁবুতে বিশেষ কেউ তো থাকে না, কিছুদিন আগেই একজনের শেফার্স চুরি গেছে। তার কিছুদিন আগে একটা নতুন লেন হাটন ব্যাট।"

"চুরি যাবার মত কিছুই আমার নেই।"

"ভালো" হেসে, কাগজে তামাক ঢেলে পালমশাই পাকাতে শুরু করলেন।

তাঁবুর মধ্যে গুমট, নিমাই বেরিয়ে এল। মাঠের পাশে [illegible] টিনের [illegible] নীচে খানচারেক বেঞ্চ, একটা টেবিল, জলের ড্রাম আর স্কোর জানাবার বোর্ড।

রোদ্দুরে এসে নিমাইয়ের হাত পা-আলগা [illegible] ছায়ায় বেঞ্চটাকে টেনে নিল। হাওয়া দিচ্ছে, মাঠের ধারে ছোট ফ্ল্যাগগুলো টান হয়ে কাঠি কাঁপাচ্ছে। [illegible] নীচে [illegible] নিমাই কুঁকড়ে বসল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। পাউরুটি, মাংস কিম্বা ডিম দিয়ে জব্বর করে [illegible] মারতে হবে। চোখ বুজল নিমাই। পাউরুটি, মাংস, ডিম আর, আর পাল-মশায়ের কথাটা মনে পড়ল ঘাড় 'কাবা টাকাকড়ি সাবধানে রাখবেন কিন্তু। সাবধান। নিশ্চয় সাবধান। আর শেফার্স, লেন হাটন। আর,

আম্পায়াররা এসেছে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা পৌঁছে [illegible] গেছে। টশ হল। পালমশাই ফিল্ডিং করবেন ঠিক করলেন। গা ঝাড়া দিয়ে নিমাই উঠল। ছুটে এল হাবলো।

"আপনি কিন্তু রাজেন চক্রবর্তী নামে খেলছেন।"

তাতে কিছু এসে যায় না। না খেললেও কিছু এসে যায় না। আসলে নিমাই অথবা রাজেন নামটা যাই হোক, তাতে তার মাথাব্যথা নেই।

নিমাইকে দাঁড়াতে হল থার্ডম্যানে। উইকেট কীপারের প্রায় পিছনে মাঠের সীমানা ঘেঁষে। সূর্য সামনে, হঠাৎ চোখ তুললেই আকাশটা অন্ধকার হয়ে যায়। হাওয়া আসছে পিছন থেকে, শির-দাঁড়ায় কনকনে ভাব। চলতে অসুবিধা, বুটটা যথেষ্ট বড়। ঠাণ্ডা বাতাসে চোখের পাতা আঠালো হয়ে আসছে।

প্রথম বলটাই যে উইকেটকীপার ফস্কে যাবে নিমাই তা আশা করেনি। জমিটা এবড়োখেবড়ো। ইঁটে ঠোক্কর খেয়ে নিমাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সামলে উঠতে উঠতে বল বাউন্ডারীর সীমানা পার হয়ে গেল। বলটা ধরা উচিত ছিল। অপ্রস্তুত লজ্জায় নিমাই মাঠের লোকেদের দিকে তাকাল। ওরাও যেন অবাক হয়েছে। মাঠের বাইরে থেকে কে চীৎকার করল, "দেখে কী হবে আর, বলটা কুড়িয়ে আনো।"

মাথা নামিয়ে নিমাই ছুটল। অনেক দূর গড়াতে গড়াতে চলে গেছে বলটা। হাতে নিয়ে ভাবল এখান থেকেই ছুঁড়ি, তারপর ভাবল যদি ঠিক উইকেট-কীপারের হাতে না পড়ে।

"আবার হাতে করে আসছেন, ছুঁড়তে পার না?"

মাঠের বাইরের সেই গলাটা। নিমাই তাড়াতাড়ি বলটা ছুঁড়ল। পড়ল উইকেটকীপারের মাথা টপকে। নিমাইয়ের মনে হল মাঠের কয়েকজন যেন মুচকি হাসল। মুখ ঘুরিয়ে নিল নিমাই। কানে রাবণের চিতার শব্দ। চোখ তুলল, অন্ধকার। পিছন ফিরল, শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া।

এ রকম মনে হয়েছিল সেই দিনটায়। বাবা বাড়ি ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, নিমাই পাশ করেছে? মা কি যেন বললেন, বাবা আর একটিও কথা বলেননি। পাশের ঘরে নিমাই মাথা নিচু করে বসেছিল। নিজেকে পাশের বাড়ির ছেলের মত মনে হচ্ছিল।

বলটা কেন ধরা গেল না? নিমাই খুঁটিয়ে জমি দেখল, গর্ত, ইঁটের ডগা, ধুলো, শুকনো গোবর, শালপাতা। অনায়াসে বল ধরা অসম্ভব। তার থেকে জায়গা বদল করে যদি শ্লিপে দাঁড়ান যায়। [illegible] ক্যাচ [illegible] ধরতে না পারলে চট করে দোষ দিতে পারবে না।

ওভার শেষ হতেই পালমশাই নিমাইকে খোঁড়াতে দেখে ডাকলেন, "কি ব্যাপার, তখন লাগল নাকি?

"হ্যাঁ মচকে গেছে। দৌড়তে পারব না, বরং শ্লিপে দাঁড়াই।"

পালমশাই রাজি হলেন।

পা ফাঁক করে ঝুঁকে দাঁড়াল নিমাই। বাদামী রংয়ের পোক্ত বাট! চোখ দুটো ছুঁচোলো করে লোকটা অপেক্ষা করছে ঘা দেবার জন্য। নিমাই চোখের কোণের ভাঁজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। বল ছোঁড়া হয়েছে। ভাঁজগুলো সমান হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিমাই ব্যাটের দিকে তাকাল। অপেক্ষায় থাকতে হবে যদি বলটা ব্যাটের কাণা ছুঁয়ে দিক বদল করে।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাটসম্যান। বিদ্যুৎগতি থাবার মত ব্যাটটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশ্চর্য বলটা ব্যাট ছুঁল না। মুচড়ে পাশ কাটিয়ে উইকেটকীপারের দিকে এগিয়ে এল। উত্তেজনায় হাত-তুলে নিমাই লাফিয়ে উঠল।

অদ্ভুত চোখে উইকেটকীপার তাকাল সকলের দিকে। বল ফস্কেছে। স্টাম্প আউট করতে পারল না। একটা সুযোগ চলে গেল। নিমাই চোখ সরিয়ে নিল। বাবা মারা যাওয়ার পর এইভাবে তাদের সংসারটা [illegible]-চাকা খেয়ে গেছল। মাঠের বাইরে [illegible] [illegible] করে উঠেছিল যারা এখন [illegible] করছে নিজেদের মধ্যে। ব্যাটসম্যান একবার হাসল। আলগা দস্তানা দাঁতে দিয়ে টেনে ঠিক করে নিল। বোলার ঘাম মুছল। বলটা প্যান্টে ঘষতে ঘষতে আবার বল করার জন্য তৈরী হল। উইকেটকীপার হাঁটুভেঙে বসল গলা উঁচিয়ে। নিমাই ঠিক করল চোখ আকাশে তুলবে না, বাতাসে পিঠ লাগাবে না, এখনো একজনও আউট হয়নি, ব্যাটের দিকে তাকাবার আগে টাঙানো স্কোর বোর্ডটা শুধু দেখে নিল।

জীবন ফিরে পেয়ে লোকটা বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। ঝড়ের মত তছনছ করছে বোলিং। ছোটাছুটি করে ক্লান্ত ফিল্ডাররা হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর শ্লিপে লোক থাকার অর্থ হয় না। নিমাইকে পাঠান হয়েছে বাউন্ডারীর ধারে। রাণ উঠেছে দ্রুত। এতে তার উদ্বেগ নেই, কেননা এদলের সে কেউ নয়।

পাশেই আর এক মাঠেও খেলা হচ্ছে। হঠাৎ অনেকগুলো গলায় চীৎকার উঠল। নিশ্চয় আউট হল কেউ। ঘাড় ফেরাল নিমাই। ব্যাট হাতে ফিরে যাচ্ছে একজন। মাঠের লোকগুলো ছুটে গিয়ে বোলারকে জড়িয়ে ধরেছে।

নিজেদের খেলায় নিমাই চোখ ফেরাল। বোলার ছুটে যাচ্ছে বল করতে। লোকটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। ঝিম-ঝিম করে উঠল নিমাইয়ের চুলের গোড়া। আবার সেই রকম হবে নাকি। বল লক্ষ্য করে ব্যাট থাবা মারল। উইকেটকীপার ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠল। ফিল্ডাররা গুঁড়ি মেরে পা-পা এগিয়েছিল। থেমে গেল।

বলটা ছুটে যাচ্ছে বাউন্ডারীর দিকে। নিমাই পিছু নিল। ইচ্ছে নেই

কিন্তু না ছুটলেও ভাল দেখায় না। দেরী করে ফেলেছে। পাশের মাঠ থেকে সেই সময় আবার চীৎকার উঠল। ঝাঁকে হাত দিয়ে ধরার সময় নেই। পা দিয়ে বলটাকে আটকাল। হাত দিয়ে তুলেই ছুঁড়ল।

ব্যাটসম্যান একবারও রাণ করার জন্য ছোটেনি। কেননা তার ধারণা বলটা বাউণ্ডারী হবেই। আম্পায়ার বাউণ্ডারীর ইসারা জানাবার আগে তাকাল নিমাইয়ের দিকে, অর্থাৎ বাউণ্ডারী হয়েছে কিনা জানাও।

নিমাই বাউণ্ডারী চিহ্নটা খুঁজল। মাঠের চারধারে ফ্ল্যাগবাঁধা কয়েকটা কাঠি পোঁতা আছে মাত্র। দাগ দেওয়া নেই। আন্দাজে নিমাই বুঝল, অদৃশ্য বাউণ্ডারী পার হবার পরেই সে বলটা ধরেছে।

মাঠের বাইরে থেকে বিষণ্ণ গলায় কে চীৎকার করল, "আর একটু জোরে দৌড়তে হয়, রাণ যে দুশোয় উঠে গেল।" মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে হাত তুলে ইসারা করল নিমাই, বাউণ্ডারী হয়নি।

পালমশাই ওভারের শেষে নিমাইয়ের কাঁধ চাপড়ে গেলেন। ব্যাপারটায় গর্ব নেই। কিন্তু খারাপ কিছু করেছে বলেও নিমাইয়ের বোধ হচ্ছে না। একটু লজ্জা করল মাত্র। রাণ বাঁচানোর জন্য এই মিথ্যা বলতে হলে সে নিশ্চয় বলত না। আসলে নিজের ব্যর্থতা চাপার জন্যই বলল। এ রকম হয়েছিল প্রথমবার যখন ব্যাট হাতে বাড়ি ফেরে। দাদা জিজ্ঞাসা করেছিল "রাখতে দিয়েছে তোর কাছে?" তখন লজ্জা করেছিল।

মাঠের সবাই ফিরে এল তাঁবুতে। এবার লাঞ্চ। তারপর নিমাইদের দল ব্যাট করবে।

মাংসের ঝোলে পাউরুটি চুবিয়ে নিমাই গোগ্রাসে গিলছিল। পাশের লোকটি আলাপ জমাল।

"আপনি নতুন এসেছেন?"

দলেরই লোক, সুতরাং সত্যি কথা বলা যায়, ঘাড় নাড়ল নিমাই, "না, শুধু আজকেই খেলছি।"

"যা বোলিং, তাতে ফিল্ডিং দেওয়া অসম্ভব। ষ্টাম্পটা মিস না করলে দেড়শোর মধ্যে ওরা নেমে যায়।"

নিমাই ঘাড় নাড়ল। দেড়শোই হোক আর পঞ্চাশই হোক তাতে তার কিছু এসে যায় না।

নিমাই হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে আরো দু টুকরো রুটি তুলে নিল। লোকটা বকবক করে যাক, তাতে কিছুই আসে যায় না। দুটো সহজ ক্যাচ ফস্কেছে, তাই বোধহয় অন্যের খুঁত দেখাতে চায়। নিমাইয়েরও গলদ ছিল কিন্তু, খুঁত ধরাতে সে ব্যস্ত নয়। কেননা আর কয়েকঘণ্টা পরে খেলা শেষ হলেই সে চলে যাবে। আর এ-মুখোই হবে না।

"আপনাকে আর একটু দি"

ঘাড় নাড়ল নিমাই, হাবলো দু হাতা মাংস নিমাইয়ের প্লেটে দিল। "অন্ততঃ পঁচিশটা রাণ আপনি আজ বাঁচিয়েছেন" মাংস দিয়েও হাবলো দাঁড়িয়ে থাকল, "ব্যাটিংটাও যদি একটু এই রকম হয় তাহলে গেম শিওর ড্র। আপনাকে কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবেই। ব্যাট করার মত আজ একজনও টিমে নেই।"

হাবলোর দিকে নিমাই তাকাল। মনে মনে সে অবাক হয়ে গেছে। অদ্ভুত আবদার তো! আমি কেউ নই, বলতে গেলে রাস্তার লোক অথচ পুরো টিমটা-কেই ঘাড়ে ফেলে দিতে চায়। এই রকমই যখন অবস্থা তখন টিম করাই বা কেন, লীগে নাম দেওয়াই বা কেন! মরুকগে। এদের টিম থাকুক না-থাকুক তাতে আমার কি?

"আপনাকে চাটনি দোব?"

নিমাই ঘাড় নাড়ল। হাবলো চাটনি আনতে গেল।

"আপনাকে এখন খুব খাতির করবে। যদি খারাপ খেলতেন তাহলে পুঁছতোও না।" পাশের লোকটা আবার বকবক শুরু করেছে!

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠে টেবিলের অন্যধারে বসা একজনকে বলল, "অধিকারীদা, এটি মেজো না সেজো?"

বছর আটেকের একটি ছেলেকে আঙুলে করে চাটনি খাওয়াচ্ছিল লোকটি, কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল কথা শুনে। তবু হাসতে হাসতে বলল, "সেজো। আসতে চাইছিল না জোর করে আনলুম। বললুম চ আগে মাঠের ঘাস চিনবি নইলে ক্রিকেট শিখবি কি করে?"

ছেলেটা ক্যাবলামুখে বাপের হাত চাটছে। ওর সুবিধের জন্য অধিকারী শালপাতাগুলো দাদিকে বিলিয়ে দিতে লাগল। চাটা শেষ করে ছেলেটি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"আর খাবি?"

লজ্জা পেল ছেলে, বাপের পিঠের আড়ালে মাথা লুকোল।

"হাবলো আর একটু চাটনি দাওতো এদিকে।"

চাটা শেষ করে ছেলেটি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অধিকারী চেঁচাল। নিমাইয়ের পাশেই হাবলো দাঁড়িয়ে কিন্তু নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অধিকারী আবার চেঁচাল।

"এই এক জ্বালা, নিজেও খাবে

গন্ডের খানেক ছেলেকেও এনে খাওয়াবে।" বিড়বিড় করে হাবলো চাটনি দিতে গেল।

পেটপুরে খাওয়া হয়েছে, খেলা শুরু হতে দেরী আছে। তা'ছাড়া ফোর-ডাউন ব্যাটসম্যান, তার মানে চারজন আউট হলে খেলতে নামা। তার অনেক দেরী। তাঁবু থেকে নিমাই বেরিয়ে এল। পাশের তাঁবু থেকেও একদল বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাল। নিমাইকে একজন জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের খেলার রেজাল্ট কি দাদা?" জবাব পেয়ে আর একজন বলল, "তার মানে আপনাদের সবাইকেই ব্যাট করতে হবে?"

কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, গা-জ্বালা করে। সুরটাকে বেঁকিয়ে নিমাই বলল, "আপনাদের বুঝি করতে হবে না।"

"প'চানব্বুই অল-ডাউন, আমাদের বায়াত্তর এক উইকেটে। জিততে আর চব্বিশটা রাণ বাকি, ব্যাট আর পাওয়া সম্ভব নয়।"

নিমাই বিরক্ত বোধ করল। আচ্ছা এক টিমের হয়ে খেলছি বটে। বুড়ো-হাবড়া, নয়তো চালিয়াৎ, দৌড়তে পারে না, বল করতে পারে না, তবু খেলতে নামা চাই। বিরক্তিটা রাগে উঠল অধিকারীকে দেখে। ছেলেটাকে বেড়ার ধারে মোতাচ্ছে। নিমাইকে দেখে কাছে এল, বলল, "এ ক্লাবে নতুন এলেন?"

"শুধু আজকের জন্য।" গম্ভীর সুর দিয়ে নিমাই ব্যক্তিত্ব ফোটাতে চাইল।

"এভাবে আর ফিল্ডিং দেবেন না। এবড়ো-খেবড়ো জমি, ওভাবে বল ধরলে যে জখম হবেন। আগে শরীর তারপর খেলা।"

নিমাই হাসল। সকলেই তার সুখ্যাতি করছে কিন্তু আসলে সে কিছুই করেনি। ছুটেছে জোরে, বল ধরেছে মরি-বাঁচি করে। খাটবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, তবু খেটেছে। স্রেফ লজ্জায়। ব্যাপারটা নিমাইয়ের কাছে গোলমেলে ঠেকছে। মাঠে নেমে না-খেলতে পারলেই তার লজ্জা। লজ্জা না পেলেও চলে। তবে এইটুকু মনে হয়েছে যে, আসলে সকলে তাকে যা ভেবেছে সে তাই নয় বলেই এমনটা হচ্ছে আর প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তাই কাটাতে। এতে ক্ষতির কিছু নেই লাভও কিছু হবে না। এ ধরণের অহেতুক লজ্জা যে কেন হয় তার কাছে সেই জিনিসটাই গোলমেলে ঠেকে।

ঘাসের উপর আধশোয়া হয়েছিল নিমাই, পিঠে বল লাগলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অধিকারীর বাচ্চা ছেলেটা ছুটে আসছে বল কুড়োতে। অধিকারী ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে। বল নিয়ে ছেলেটা ছুটে গেল।

খেলতে নামার আগে কসরত হচ্ছে। ছেলেকে ঘাস চেনাচ্ছে। নিমাইয়ের হাসি পেল। এখন প্র্যাকটিশ করে কতটুকু উন্নতি হবে খেলার? বলটা আবার এল। নিমাই উঠে কুড়োল। ছুঁড়ে দিল। খেয়ে উঠে বাচ্চাটার ছুটতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। কাগজে তামাক পাকাতে পাকাতে পালমশাই একবার ঘুরে গেলেন।

"কোন পজিশনে নামবেন, ছ নম্বর?"

নিমাই ঘাড় নাড়ল। সেই বকবকিয়ে লোকটা আড়চোখে তাকাতে তাকাতে পাশ দিয়ে চলে গেল। শীতের দুপুরে ভরাপেটের সঙ্গে রোদ্দুরের একটা আঁতাত আছে। মিলে গেলেই দুটো জিনিস এক হয়ে ঝিমুনি এবং তাই থেকে ঘুমে দাঁড়ায়। চোখের পাতা ভারি হয়ে বুজে গেছল, ধড়ফড় করে উঠে বসল নিমাই।

অধিকারী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

"ঘুম পাচ্ছে বুঝি?"

নিমাই পরিষ্কার বুঝল যে বোকার মত হল তার হাসিটা, কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি।

"ব্যাট করা মানে আপনাকে একা লড়তে হবে এগারটা শত্রুর সঙ্গে। কোন দিক থেকে যে খতম করে দেবে জানেন না, চোখ, কান, হাত, পা-কে সজাগ করে রাখতে হবে, ঢিলে দিলেই নির্ঘাত মৃত্যু।"

অধিকারী নিমাইয়ের পাশে বসল। মাথায় পাকা চুলের ঝামর, কপালে কাটা দাগ, আঙ্গুলগুলো সরু, লম্বা, শিরওঠা। কণ্ঠনলী সর্বদাই যেন কাঁপছে।

নিমাই জিজ্ঞাসা করল, আপনি বেঙ্গলের ট্রায়াল খেলেছিলেন?"

"কে বলল" হাসল অধিকারী।

"শুনেলুম।"

হ্যাঁ বলেই চীৎকার করল, "রান রান।"

অধিকারীর ছেলে পড়িমরি ছুটল বল কুড়োতে। চোখ বসাবার জন্য কে একজন বেড়ার ধারে ব্যাট করছে। হাবলো মালীদের দিয়ে হাঁড়ি, প্লেট পরিষ্কার করাচ্ছে, অন্যান্যরা চাঁদোয়ার ছায়ায় গল্পে ব্যস্ত। বিপক্ষ দল তোড়জোড় করছে ফিল্ডিংয়ে নামবার জন্য।

এইভাবে বল কুড়োতুম ছাব্বিশ বছর আগে, তখন ক্লাশ টেনে পড়ি। সেই থেকে আজও খেলে যাচ্ছি।"

"বেঙ্গলের হয়ে খেলেননি?"

"চান্স পেলুম কই। খেলা খেলা করেই তো ভবিষ্যৎ নষ্ট করলুম। আমার থেকেও ভালো ব্যাট করত অবনী মিত্তির, সে এখন কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। ছেলেটাকে দিয়েছে ফ্রেম পালিশের দোকানে, দেখা হল, সেদিন, পুরনো গপ্পো হল, বললুম, মাঠে আসতে। হাতজোড় করে বলল, 'আর কেন ভাই আখের খুইয়েছি তো এবার কি বুড়োবয়সে চাকরীটাও খোয়াব। ছেলেটা দিনকতক মাঠে ঘোরাঘুরি করছিল। একদিন হাত-পা বেঁধে চাবকালুম তারপর কাজে লাগিয়ে দিলুম।"

ছুটে এল হাবলো।

"বুঝলেন আমাদের প্যাড আছে চার জোড়া আপনিতো ফোর ডাউন, সেকেন্ড উইকেট পড়লেই প্যাড পরে তৈরী হয়ে নেবেন। অধিকারী তোমার কি হল বলতো, প্যাড-ফ্যাড পরবে না না কি? আজ তোমায় ওয়ান ডাউন দেওয়া হয়েছে, অবস্থা খুব খারাপ, জেতাতো যাবেই না যদি সময় নষ্ট করে ড্র করা যায়। এস এস।"

হাবলো ছুটে চলে গেল, আম্পায়ার মাঠে নামছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনজন আউট হয়ে ফিরে এল, প্যাড পরে বেঞ্চে বসে নিমাই খেলা দেখছে। গল্প করতে করতে পাশের মাঠের সেই ছেলেকটা হাজির হল, জেতা হয়ে গেছে তবে হাতে সময় আছে তাই খেলা বন্ধ হয়নি।

তিনজন খুব তাড়াতাড়ি আউট হওয়ায় নিমাই হাল্কাবোধ করছে। তার আউটে কেউ দোষ দিতে পারবে না। আউট হয়ে এসে দুজন কারণ দিয়েছে, মাঠের অবস্থা। বল গড়িয়ে এসেছিল। নিমাই ভাবল প্রথম বলটাই যদি সিধে

গড়িয়ে আসে তাহলে বাঁচা যায়, হাবলোকে আসতে দেখে ব্যাজারবোধ করল সে, কি বলবে মোটামুটি বলে দেওয়া যায়। জবাবে তাকেও কি বলতে হবে জানা আছে—নিশ্চয়, চেষ্টা করবো তো বটেই, আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে ড্র হয়।

মুখ ফিরিয়ে মাঠের খেলা দেখতে লাগল নিমাই, অধিকারী ব্যাট করছে। ময়লা, পুরানো প্যাণ্ট, মাথায় আদ্যি-কালের এক টুপি, গোড়ালির কাছে রঙীন মোজা দেখা যাচ্ছে, বুটের বদলে কেডস, রুগ্ন-লম্বা দেহ, বলটা এগিয়ে খেলতে গিয়ে ফস্কাল, প্যাডে লেগেছে, বোলার চীৎকার করে উঠল, আম্পায়ার মাথা নাড়ল।

"আর চোখে দেখতে পায় না।"

চাঁদোয়ার নীচে বলাবলি শুরু হল।

"বয়স কম হল নাতো, প্রায় চুয়াল্লিশ-বিয়াল্লিশ, এ্যাদ্দিন খেলছে এই ঢের।"

"এবার কিন্তু ছাড়া উচিত।"

"তাহলে ও মরে যাবে, খেলাই ওর প্রাণ।"

নিমাই শুনতে শুনতে দেখল অধিকারী অস্থির হয়ে পড়ল যেন, অবধারিত রাণ-আউটের ফাঁড়া কাটিয়ে অন্য ব্যাটসম্যান অধিকারীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে অথচ সে চীৎকার করছে, ধমকাচ্ছে। দেখে বিশ্রী লাগল নিমাইয়ের। এতখানি গুরুত্ব দিয়ে খেলাকে নেওয়া কেন? ভুল হয়েছে তো হয়েছে, ভুলের মাশুল দিয়ে ফিরে আসবে মাঠ ছেড়ে। তাই বলে কুৎসিত চেঁচামিচি কেন?

মাঠের ওধারে রাস্তায় একটা মোটর এসে দাঁড়াল। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একজন নেমে চাঁদোয়ার দিকেই আসছে, হাবলো ছুটে গেল লোকটির দিকে। কে একজন বলল, "মিস্টার চক্রবর্তী।" একটু কাছাকাছি লোকটি এসে পড়তেই নিমাইয়ের বুকের হাড় এবং মাংসগুলো উবে গিয়ে শূন্যতার সৃষ্টি করল, রাশি রাশি বাতাস সেখানে ভারী হয়ে জমা হল। নিমাইয়ের নড়াচড়ার উপায় রইল না। লোকটি আরো এগিয়ে এল। সঙ্গে হাবলো বকবক করছে, লোকটি সব-কিছুর দিকে। তাকাতে তাকাতে নিমাইয়ের দিকেও তাকাল। বুকের বাতাস খানিকটা যেন কমে গেল। না

চিনতে পারেনি। কিংবা হতে পারে, এ সেই লোক নয়, তবু সন্দেহ গেল না নিমাইয়ের।

পিছু ফিরে স্কোরবুকটা দেখছে। নিজের নাম দেখে লোকটা নিশ্চয় জানতে চাইবে তার নামে কে খেলছে। হাবলো ছুটে এসে নিমাইকে দেখাবে। দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে লোকটা বলবে, "গত বছর কি আপনি টালা মাঠে খেলতে গেছলেন?" তারপর হয়তো শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, "ঠিক আপনার মতই দেখতে একজন, ওখানকার এক ক্লাবে নেট প্র্যাকটিশের সময় এসে বল-টল করত; এমনিই একজন, ক্লাবের কেউ নয়; দিন-দুই পরেই একটা ব্যাট চুরি যায়, তাকেই সন্দেহ করা হয়।
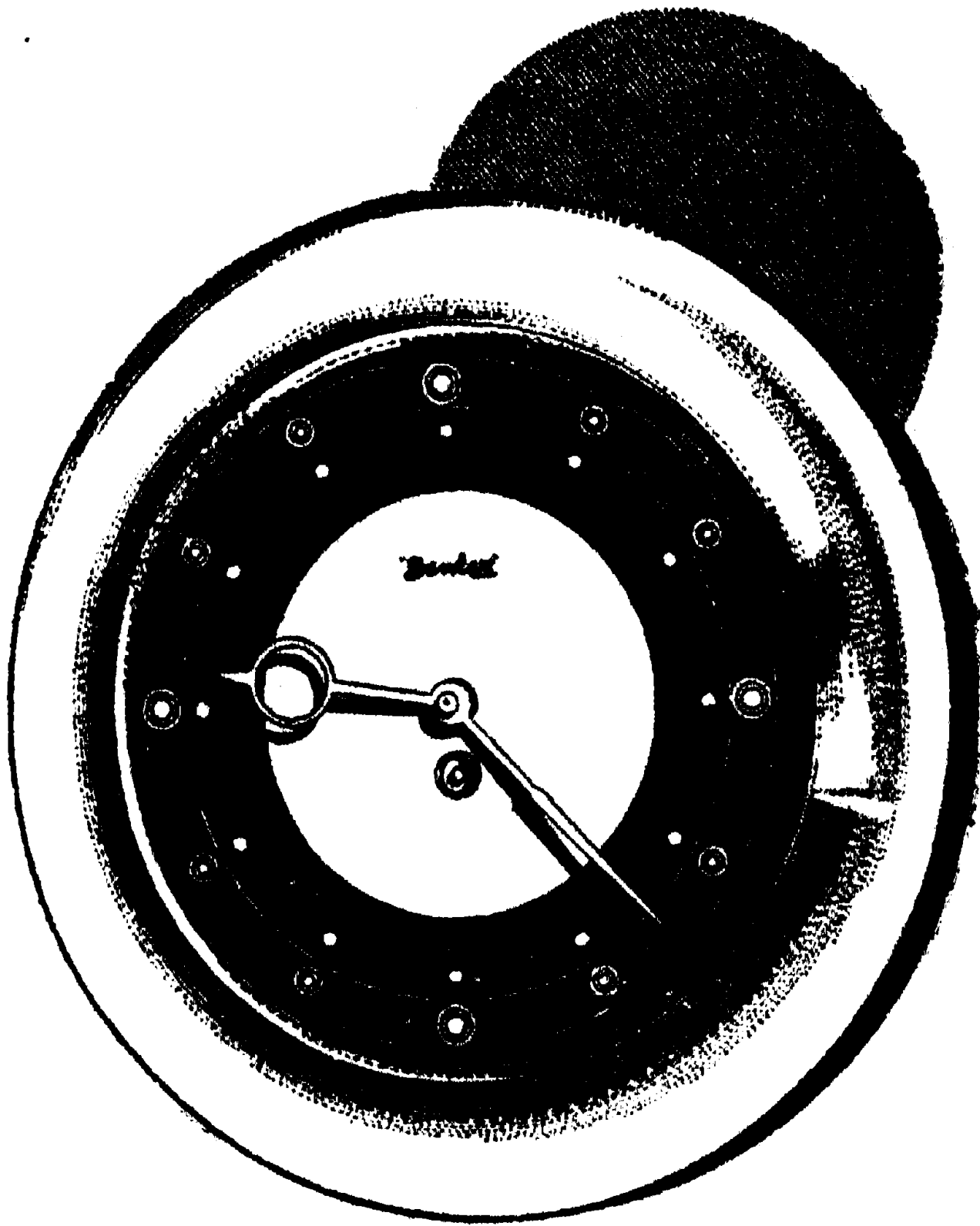
কিন্তু সেকথাতো আর মুখফুটে বলা যায় না।" এই বলে লোকটা হয়তো আবার ভুরু কোঁচকাবে।

মাঠের মাঝে চীৎকার উঠল, নিমাইয়ের পাশের লোকটি 'আঃ' বলে সিধে হয়ে বসল। আউট হয়ে ফিরে আসছে অধিকারীর সঙ্গী ব্যাটসম্যান।

যে করেই হোক পালাতে হবে। নিমাই উঠে দাঁড়াল, হাতে ব্যাট, মাঠের মাঝখানে ছাড়া আর পালাবার উপায় নেই। হাবলো কিছু একটা বলবার জন্য আসছে, মুখ নামিয়ে হনহন করে নিমাই উইকেটের দিকে রওনা দিল।

পা ফাঁক করে সাত-আট হাত দূরেই লোকটা দাঁড়িয়ে। ব্যাট নিয়ে তৈরী হল নিমাই। বোলার ছুটে আসছে। সামনের লোকটা কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ল। নিমেষের জন্য নিমাই তার মুখের দিকে তাকাল। বুভুক্ষের মত তার দিকে তাকিয়ে আছে একজোড়া লোভী চোখ, শিউরে উঠল নিমাই। বলটা অনেক বাইরে দিয়ে আসছে। ছেড়ে দিল।

ওভার শেষ হতেই অধিকারী এগিয়ে এল, "তড়বড় করবে না, ডাকলেই ছুটবে।"

ব্যাট হাতে অধিকারী দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে বিপক্ষ দল, ছুটে আসছে বোলার, পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ল ওরা। অধিকারী একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে, যেন এ পৃথিবীতে দৃশ্যবস্তু কিছু নেই, এতগুলি ভয় যে তাকে ঘিরে রয়েছে, তা যেন সে গ্রাহ্যই করে না। তাকে মাঠ থেকে বিদায় করে দেবার জন্য ওদের চেষ্টাকে যেন সে দেখেও দেখছে না।

যেন জানতো বলটা ওইখানেই পড়বে। নিঃশব্দে হাওয়ায় ভাসিয়ে বাঁ পা-টাকে এগিয়ে দিল। গর্বিত ভঙ্গিতে শরীরটা ঝুঁকে পড়ল। সিধে ব্যাটের প্রতিরোধকে এগিয়ে ধরল আক্রমণের সামনে। বাধা পেয়ে বলটা এক ইঞ্চিও লাফাতে পারল না। ঘেরাও করা লোকগুলি হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার সেই পদধ্বনি, মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র, যেন অপমান করার জন্যই সামনের লোকটাকে আরো এগিয়ে দেওয়া হলো। ভয় পাওয়াবার জন্য অধিকারীর বাঁ-ধারে আর একজোড়া সতর্ক হাত রাখা হল। ডানদিকে সামনের দিকের লোক সরিয়ে মাঠ খুলে দেওয়া হল প্রলুব্ধ করার জন্য। অথচ সেই সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। পৃথিবীর দৃশ্যবস্তু যেন নিশ্চিহ্ন। পদধ্বনি, এগিয়ে আসছে।

যেন জানা ছিল। ডান-পাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে পিছিয়ে দিল, শরীর-টাকে একটু নুইয়ে বাঁ-পা টেনে আনল পিছনে। সিধে ব্যাট বুকের কাছে ধরল। হারমেনে বলটা পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

অধিকারী মাথার টুপি খুলে আবার পরল, পাতলা হয়ে গেছে ঠিক মাঝখানের চুল, পাকা চুলের তেড়ি মাথা ঘিরে হাসল, বাহুতে নাক ঘষল, এক-বার নিমাইয়ের দিকে তাকাল ও।

আবার সেই একই দৃশ্য। লোকটা যেন সব জানে। জানবেই, ছাব্বিশ বছর মাঠে রয়েছে।

ঠিক একইভাবে নিমাইও সামনে তাকাল। সামনে অধিকারী, স্টাম্প, উইকেট, বোলার মাঠের সীমানায় সাদা পরদা, আর পরদার পাশে কে লোকটা? সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে হাড় এবং মাংস উবে গেল, রাশি রাশি বাতাস সেখানে জমা হল।

ছুটে আসছে বোলার, সেই পদ-ধ্বনি নিশ্চয় উঠেছে। লোভ, ভয়, অপমান, ঘিরে ধরে ষড়যন্ত্র করছে অথচ নিমাই চেষ্টা করেও পারছে না ব্যাটটাকে তুলতে, অসহায়ভাবে সে চারধারে তাকাল।

ঠিক হাঁটুর নিচেই শব্দটা হল, চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ল চারপাশের ওরা। থর থর করে কেঁপে নিমাইয়ের ব্যাটধরা হাতটা ঝুলে পড়ল। আম্পায়ার মাথা নাড়ল, নট আউট।

গ্লোভসের মধ্যে চিটচিটে ঘাম। পায়ের মোজা ঘামে ভিজে, কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে ভুরুর উপর দিয়ে চোখে নেমেছে। জ্বালা করছে চোখ। কি রকম ভাবে যেন অধিকারী তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মাঠের বাইরে থেকে কে চীৎকার করল, "স্টেডী, ডোন্ট নার্ভাস।" নিমাই শক্ত করে ব্যাটের হাতল চেপে ধরল। লজ্জা করছে তার, প্রাণপণে ফিল্ডিং দিয়েছিল যে লজ্জায়, সেই জিনিস।

হাতল ধরে সামনে তাকাল সে। অধিকারী, স্টাম্প, আম্পায়ার, বোলার, সাদা পরদা আর কোথায় সেই লোকটা? নেইতো। ওই যে পর্দার বাঁদিকে বসে চিনেবাদাম খাচ্ছে। খেতে খেতে তাকেই লক্ষ্য করছে। লক্ষ্য করতে করতে ভাবছে, নিশ্চয় ভাবছে—

মাথায় হাত চেপে সামনের লোকটা হায় হায়-এর ভঙ্গিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। সব-কিছুই হয়ে গেছে শুধু বলটারই উইকেট ছোঁয়া হয়নি। চীৎকার করতে ইচ্ছে হল নিমাইয়ের 'ও লোকটা কি সরে যাবে না?" পর্দার সামনে থাকলে সরে যাবার জন্য বলা যেত, কিন্তু তাতো নেই।

হেরে গেছি, নিমাই ঠিক করল সে মাঠ থেকে চলে যাবে। ইচ্ছে করে আউট হয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় চলে যাওয়াই ভালো। পারব না। এভাবে পারা যায় না। তাছাড়া আমিতো এদের কেউ নই। খেলতেও আমি আসিনি, আউট হয়ে গেলে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

নিমাই সামনে তাকাল। অধিকারী, স্টাম্প, আম্পায়ার...চোখ বন্ধ করে বেপরোয়া ব্যাট চালাল। চোখ খুলল আশ্চর্য হয়ে সামনের লোকটা মাথায় হাত আড়াল করে বসে, বলটা গড়িয়ে যাচ্ছে সিমেন্টের উপর সর্প-দানার মত, অধিকারীর উত্তেজিত মুখ দশ হাতের মধ্যে।

মাঠের বাইরে হাততালি দিচ্ছে কয়েকজন। অধিকারী এগিয়ে এসে বলল, "ঘাবড়ে গেছ?"

মাথা নেড়ে স্বীকার করার জোরটুকুও নিমাইয়ের নেই। "আগে মাঠ বোঝ, বোলারকে বোঝ, তারপর হাত খুলো। আগে টিকে থাকা তারপর মার।"

অধিকারী ফিরে গেল, নিমাই আবার তৈরী হল। সামনে তাকাল, চোখে পড়ল চক্রবর্তী এখনও পর্দার পাশে বসে। নিমাই দাঁতে দাঁত ঘষে বল আসামাত্রই লাফ দিয়ে বেরোল, সারা মাঠ টপকে পর্দার ওপারে গিয়ে বল পড়ল। হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল চক্রবর্তী।

ওভার বাউণ্ডারী। নিমাই বিশ্বাস করতে পারছে না, একটা পুরু রক্ত-

মাথা ঘটনার মত লোকটা চোখের সামনে বসে। ওকে যদি বলের ঘা মেরে ওখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায়। অন্য কোথাও বসুক। অন্তত যেখানে বসলে চোখে পড়বে না। ওভার শেষ হতেই নিমাই বলল, অধিকারীদা আপনি এইদিকে আসুন. এদিকের পিচটা বড় অসুবিধে করছে।"

"বেশ, তৈরী থাক, রাণ নিয়ে এদিকে আসছি।"

প্রথম বলেই অধিকারী রাণ নেবার চেষ্টা করল। বেড়াজাল ভেঙে বল গলাতে পারল না। অধিকারী ছুটতে গিয়ে পিছিয়ে এল। বড়দা তার জন্য কারখানায় একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছিল। সুপারিশ পেতে ফোরম্যানকে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিতে হবে। মেজদির কানপাশা বিক্রী করার জন্য চেয়েছিল, মেজদি দেয়নি। বিয়ের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। বড়দা মেরেছিল মেজদিকে। মেজদি ছুটে পাশের বাড়ী পালিয়েছিল।

নিমাইও পড়িমড়ি ছুটে গেল ওধারের উইকেটে। রাণ নেবার জন্য অধিকারী ছুটেছে। মাঝামাঝি ধাক্কা লাগল দুজনের। ছিটকে পড়ল অধিকারী। নিমাই মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করে নিজের উইকেট বাঁচাতে ফিরে এল। প্রবল উল্লাসে ওরা চীৎকার করল। অধিকারীর উইকেট মাটি থেকে উপড়ে দিয়েছে, রাণআউট অধিকারী মাথা নিচু করে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল।

নিমাই ভাবল দোষটা কার। চোখ পড়ল সেই লোকটার উপর। পর্দার পাশে বসে চিনেবাদাম ভাঙছে। আশ্চর্য সব সময়ই ও সামনে রয়েছে, চেষ্টা করেও ওধারের উইকেটে সে যেতে পারছে না, লোকটাকে পিছনে ফেলে চোখের আড়ালে রাখতে পারছে না। নিশ্চয় ও তাকে নজরে রাখছে। নিশ্চয় ও তাকে চিনে ফেলেছে, নিশ্চয় কথাটা সবাইকে বলে দিয়েছে। ওরা সবাই মাঠের বাইরে অপেক্ষা করছে, মাঠ থেকে বেরোলেই তাকে ঘিরে ধরবে, ঘন হয়ে কাছে এগিয়ে আসবে। যতই এগোবে ততই ওদের চোখমুখ কঠিন হতে থাকবে।

নিমাই সতর্ক হবার চেষ্টা করল। হয়তো ওরা বুঝেছে সে ঘাবড়ে গেছে। চোখাচোখি হল একজনের সঙ্গে, ধূর্তের মত সে হাসল। আর একজন হাত ঘষছে। ঠিক পিছনেই গলা খাঁকারির শব্দ হল। ওরা ঘিরে ধরেছে।

চোখের মণি ছুঁয়ে হাওয়া চলে যাচ্ছে। জ্বালা করছে, পাতা নামিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ব্যাটের হ্যাণ্ডেলের রবারে আলতো হাত বোলাল, ডুমো ডুমো ফোস্কার মত। মর্গে মেজদিকে দেখে মা কেঁদেছিল। কাপড় সরে গেছল। সেমিজটা ফুলে উঠেছিল ভারী বুকের জন্য। পর্দার খুঁটি কাঁপছে সম্ভবতঃ হাওয়াতেই কিংবা লোকটা ঠেস দিয়ে বসেছে বলে; নিমাই বুঝল সে ফাঁদে পড়েছে। এখন মাঠ ছেড়ে বাইরে গেলেই ও লোকটা তাকে ধরবে অভিযুক্ত করবে ব্যাট ছুঁয়ে দায়ে।

আর এই লোকগুলো, যারা তাকে ঘিরে ধরেছে, সামান্য ভুলের অপেক্ষায় রয়েছে. বলটা ব্যাট ছুঁয়ে একটু বেপথে যাক, প্যাটা একটুর জন্য দাগের বাইরে বেরোক, ঝোড়ো বলে ভয় পাক, কিংবা ঘূর্ণী-বলে ধাঁধায় পড়ুক। ওরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠবে। একটা আঙ্গুলে আকাশমুখো হবে তাকে মাঠের বাইরে যাবার নির্দেশ জানিয়ে।

নিমাই তৈরী হল লড়াইয়ের জন্য। মাঠে তাকে থাকতেই হবে, যতক্ষণ পারা যায় ওই লোকটার হাতে ধরা না দিয়ে সে থাকবে। মাঠের বাইরের ওরা অপেক্ষা করুক। মাঠের মধ্যের এরা অপেক্ষা করুক। সে লড়বে, বীরের মত লড়বে।

অত্যন্ত শিথিল ভঙ্গিতে সময় চলেছে। দীর্ঘ শীতের রাত্রের মত খেলা আর ফুরোয় না। জেতা হবে না জেনেই নেমেছে, এতক্ষণে প্রায় নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে যে হারও হবে না।

ক্লান্তি, বিরক্তি, হতাশা ধীরে ধীরে উৎসাহী বিপক্ষকে কালো করে আনছে। ওরা অলস হয়ে পড়ছে, সুযোগ পেলেই গল্প করছে নিজেদের মধ্যে, অন্যমনস্ক হয়ে অন্য মাঠের খেলার দিকে তাকাচ্ছে।

পর্দার পাশে বসে রাজেন চক্রবর্তী সিগারেট ধরাচ্ছিল। স্তূপ হয়ে আছে চিনেবাদামের খোসা আর ঠোঙ্গা। একটা লোক ছুটে এসে তাকে কি বলল। ব্যস্ত হয়ে রাজেন চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি রওনা হল রাস্তামুখো। ওখানে তার মোটর রাখা আছে।

নিমাই দেখল সে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী ছেড়ে দিল। আর পরের বলেই তার একটি ষ্ট্যাম্প নিখুঁতভাবে ঢলে পড়ল।

মাঠের এগারজন একবুক শ্বাস টেনে চীৎকার করে ছেড়ে দিল। হাসল নিমাই। আমি নই রাজেন চক্রবর্তী আউট হয়ে গেল। মাঠের বাইরে যাবার জন্য রওনা হয়ে সে ভাবল, এতে আমার কিছুই এসে যায় না, কারণ এ ক্লাবের আমি কেউ নই।

মাঠের ধারে, বাইরের ওরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। নতুন ব্যাটসম্যান মাথা নামিয়ে তার গা ঘেঁসে মাঠে রওনা হল। কাউকেই এখন গ্রাহ্য করি না— এমন একটা কথা ভেবে সে হাল্কা বোধ করল। পাংশু মুখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে ওরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। হেসে নিমাই তাবুর দিকে এগোতে ওরা সরে দাঁড়াল।

ময়লা প্যাণ্ট যত্ন করে ভাঁজ করছে অধিকারী। ছেলেটা চুপ করে বেঞ্চে বসে। নিমাই বুট খোলার জন্য বসল। তাঁবুতে আর কেউ নেই। মাঠের ধারে এখন সকলে থমথমে উদ্বেগ ভোগ করতে গেছে।

"যে যাই বলুক, কান দিও না" অধিকারী বলছে তাকেই। নিমাই ঘাড় ফেরাল। "এতদিন ধরে খেলছি, বুঝতে পারি।"

"কি বুঝেছেন?" শ্বাসরোধ হল নিমাইয়ের।

"ভাল না বাসলে তো এমন খেলা যায় না। ছাব্বিশ বছর ধরে আমি তো এই চেষ্টাই করছি।"

একটা ছেঁড়া তোয়ালে অধিকারী এগিয়ে দিল, "মুছে নাও, ভীষণ ঘেমে গেছ।"

যন্ত্রের মত মুখ মুছল নিমাই। নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে অনুভব করল তার বুক খালি। হাড় এবং মাংস গুলো উবে গিয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। বুকের মধ্যে এক বায়ুহীন কক্ষ। তাকে ঘিরে অনেকগুলো ছায়া একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। টেনেটেনে হেসে উঠল নিমাই। "এ খেলার কৃতিত্ব আমার নয় কিন্তু, স্কোরবুকে দেখবেন অন্য-লোকের নাম লেখা আছে।"
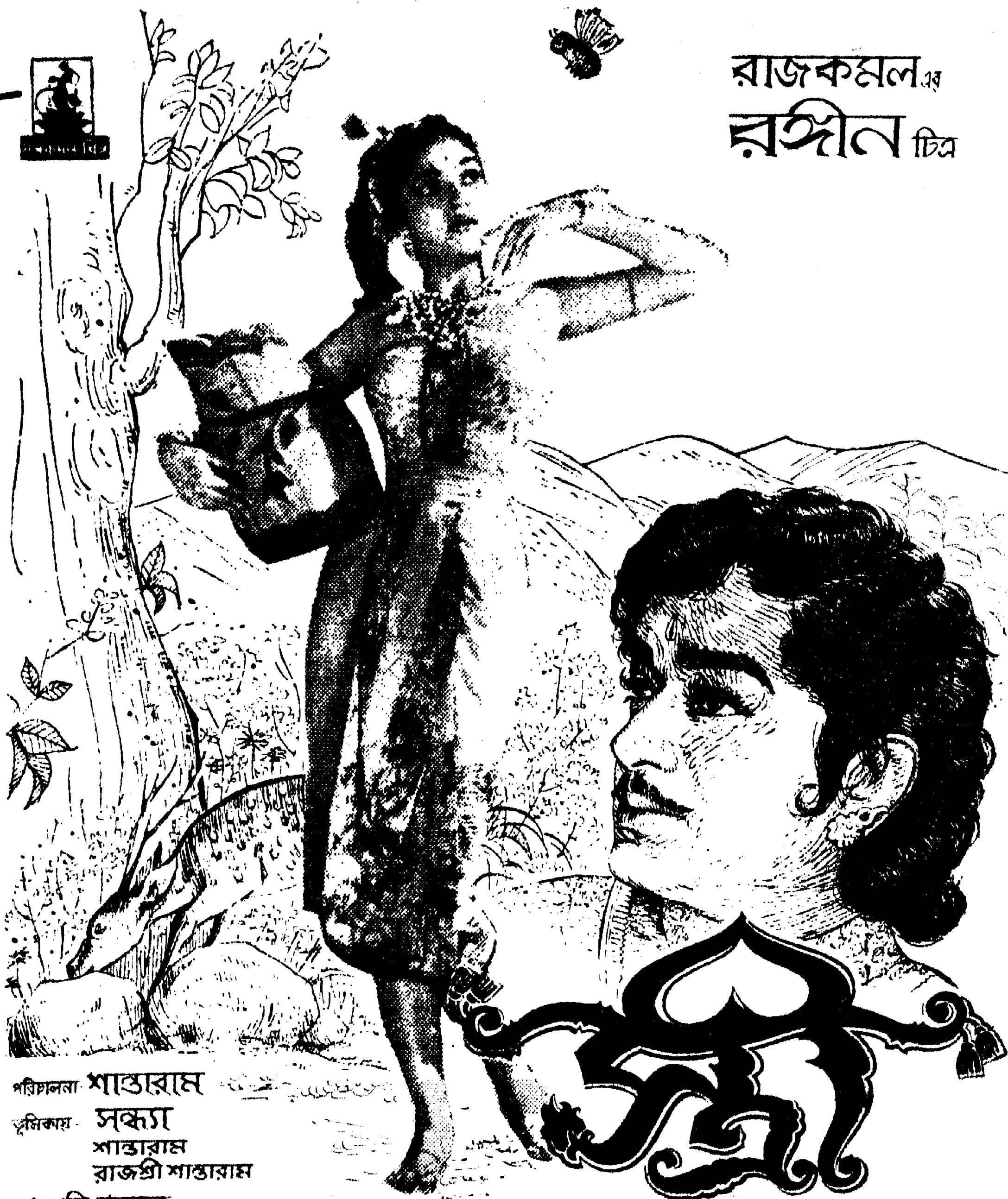
দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আতঙ্কের বিকলতা দূরে সরে যেতেই বড়বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সুশোভন। আর তার মাত্রা ছাড়াল খাবারের আয়োজন দেখে। চীৎকার করে টেবিল চাপড়ে হৈ-চৈ তুলে দিলেন একেবারে। 'নীতা দেখে যা, দেখে যা। আর সুচিন্তার সেই ছেলের? তারা কোথায় গেল? তারা কোনদিন দেখেছে এসব? এ হচ্ছে আমাদের দিনাজপুরের জিনিস। এ শুধু আমি জানি আর সুচিন্তা জানে। আচ্ছা সুচিন্তা, আর কারা কারা যেন জানতো?'

'কেন, তোমার পিসিমা জ্যেঠিমা, আমার ঠাকুমা।'

'ঠিক। ঠিক। ইউ আর রাইট!!' মহোৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েন সুশোভন, 'সুচিন্তা সব জানে। তাইতো সুচিন্তাকে এত ভালবাসি।'

'আর আমায় বুঝি ভালবাসনা বাবা', নীতা কৌতুকে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সুশোভন ত্রস্ত ব্যস্তে বলেন, 'সেকি সে কি! কী যে তুই বলিস নীতা! আসলে বুঝতে পারছিস না, তুইতো—মানে'.........

'আচ্ছা বাবা বুঝতে পেরেছি। এবার খাও। এই যে বলছিলে খিদে পেয়েছে।'

'পেয়েছেই তো। দেখনা কত খাই।' বসে পড়ে আস্ত একখানা সরুচাকলি মুখে ভরে ফেলে গোল-গোল মুখে জড়িত স্বরে বলেন সুশোভন, 'এক্সজাকটলি! অবিকল! হুবহু একেবারে সেই রকম! সুচিন্তা, দেখ আমি আর কিছু ভুলে যাচ্ছি না—সব মনে করতে পারছি। সেই ঠাকুমা, যিনি আমাকে—যিনি আমাকে কি নামে যেন—'

'ভানু' বলে ডাকতেন তোমার ঠাকুমা!'

'আঃ তুমি বলে দিলে কেন সুচিন্তা? আমি তো বলতামই। চুপ করে থাক দেখ আমি সব ঠিক বলি কিনা। ঠাকুমা ঠাকুমা যিনি আমায়—যিনি আমায় 'ভানু' বলে ডাকতেন, তিনি চালের আলশেয় মুখ রেখে ডাকতেন 'ভানু ভানু মোহনকে সঙ্গে নিয়ে একবার চলে আয়, পিঠে পুলি বানিয়েছি।' শুনেই লাফাতে লাফাতে চলে আসতাম আমি, মোহনকে ডাকতে দেরী সইত না। কিন্তু মোহন কে নীতা?'

'বাঃ ছোট কাকা না? তোমার ছোট ভাই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সুচিন্তার যেমন অনেকগুলো ছেলে, তেমনি অনেকগুলো ছেলে ছিল আমাদের দিনাজপুরের বাড়ীতে।'

'বাবা আবার তুমি সুচিন্তা পিসিমার অনেকগুলো ছেলে বলছ?'

'ওঃ ইস! ভারী ভুল হয়ে গেছে। সুচিন্তা রাগ করছে। কি হবে নীতা।'

'আচ্ছা আজ আর রাগ করলেন না পিসিমা, আর কিন্তু বোল না।'

'না না। আর বলব না। কিন্তু কিসের যেন কথা হচ্ছিল?'

সুচিন্তা একটু জোর দিয়ে বলেন, 'ভাবোনা কিসের কথা হচ্ছিল। এই তো বললে সব মনে পড়ছে।'

'পড়ছে তো কিন্তু ওই কোন খানটায় যেন নীতা—'

নীতা হেসে ফেলে বলে, 'ওই যেখানটায় তুমি ছোটভাইকে না ডেকেই না ভেবেই পেটুকের মত ছুটে ছুটে পিঠে খেতে আসছিলে।'

'ও হো হো।' প্রবল স্বরে হেসে ওঠেন সুশোভন, হাসি আর থামতে চায় না। অনেকক্ষণ পরে চোখমুখ লাল করে বলেন, 'ও পেটুক আমি একটু ছিলাম। ভাত খেতাম না ভাল করে, খালি পিসিমাকে বলতম নাড়ু দাও চিঁড়ে তক্তি দাও, ইয়ে আরও সেই কি সব যেন দাও দাও করতাম, আর পিসিমা বলতেন, 'ভ্যালা এক ছেলে হয়েছে বাবা।'

'ভ্যালা! ভ্যালা কি বাবা?'

হেসে লুটোপুটি খায় নীতা।

'আহা, ওর নাম গিয়ে ভালো! ভালো। তা পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা অমন বলে। বাড়ীতে ওই অত খেতাম আমি, আবার সেই ঠাকুমা যিনি আমায় ভানু বলতেন, তাঁর কাছে গিয়ে কি যে উৎপাত করতাম।'

নীতা বলে, 'বাঃ তুমি তো বেশ সুন্দর করে গল্প বলতে পারছ বাবা।'

'পারবোই তো। আর তো কিছু ভুলে যাই না—আমি।'

'আর কোনদিন ভুলে যেতে পাবেও না, এই বলে রাখছি।'

'আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু সুচিন্তা তুমি কথা বলছ না কেন?'

'কথা বলব কেন, কথা শুনছি।'

'কিন্তু তখন তো তুমি কেবল কথা বলতে সুচিন্তা। যখন সেই ঠাকুমার কাছে যেতাম। ঠাকুমা বলতেন, 'ওই একটু থামতো চিন্তে, কথায় একটু ক্ষামা দে।' বলতেন না সুচিন্তা? বলতেন না,

মেয়ে তো নয়, যেন কলের গানের বাক্স। দম দেওয়াই আছে।'

'বলতেন বৈ কি। আশ্চর্য, তোমার তো কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে না।'

'দেখ সুচিন্তা, কখন যেন তুমি আমার পিঠে হাত রাখলে!' চিন্তিত-মুখে বলেন সুশোভন।

সুচিন্তা আরক্ত মুখটা ফিরিয়ে বলেন, 'পিঠে খাওয়ার গল্পই তো হচ্ছিল,—'

'তা' তো হচ্ছিল। কিন্তু সেই যখন তুমি আমার পিঠে হাত রাখলে? মনে হল কোথাকার যেন একটা দরজা খুলে গেল, কী যেন একটা জট পাকানো ডেলা সহজ হয়ে গেল, সোজা হয়ে গেল। এরকম কেন হল, বল তো?'

সুচিন্তা শান্ত সুরে বলেন, 'ও রকম হয়। ওটা আমার ইচ্ছাশক্তির জোর।'

'তবে এতদিন কেন সে শক্তি খাটাওনি সুচিন্তা? কেন পিঠে হাত রাখনি? তুমি তো জানতে, আমি যে ওই ঠাকুমার ডাকে ছুটে যেতাম, সে কেবল নাড়ু পিঠে খাবার জন্যে নয়। যেতাম তোমার জন্যে। তোমায় না দেখে থাকতে পারতাম না, না দেখলে মরে যেতাম তাই। এ সবই তো তুমি জানো।'

সুচিন্তা বললেন, 'ভুলে গিয়েছিলাম সুশোভন। ভুলে গিয়ে ভুল করেছিলাম, এবার মনে রাখবো, এবার যা ঠিক তাই করবো।'

আস্তে সুশোভনের পিঠে একটা হাত রাখলেন সুচিন্তা।

যৌবনের উত্তাপ নেই বলে সে স্পর্শ কি ব্যর্থ?

মায়ের হাতের ছোঁয়া অনুভূতির গভীরতর স্তরে গিয়ে পৌঁছয় না? প্রিয়ার মধ্যে থাকে না, মাতৃ-হৃদয়?

দিন চারেক পরে সুবিমল এলেন। সঙ্গে এল অশোকা।

এঁরা প্রমাদ গণেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য রকম শান্তভাবে দেখালেন সুশোভন। সেভাবে শুধু ওদেরই অবাক করে দেওয়া নয়, সুচিন্তাকেও অবাক করে দেওয়া, অবাক করে দেওয়া নীতাকে।

সুবিমল এসে বসতেই সুশোভন একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'ওরা যাকে দাদা বলে, সে না?'

সুবিমল হেসে বললেন, 'শুধু ওরা বলবে কেন, তুইও তো বলিস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও তো বলি, তাই না নীতা?'

'হ্যাঁ বাবা!'

'দাদা রোগা হয়ে গেছে।'

বললেন সুশোভন।

সুবিমল বললেন, 'রোগাতো হবোই। বুড়ো হচ্ছি না?'

'বুড়ো হতে যাবে কেন?' অসন্তুষ্ট হন সুশোভন, 'বুড়ো হওয়ার দরকার কি! সুচিন্তাও কেবল ওই কথা বলে। খুব ধমকে দিলাম একদিন, সেই থেকে ভয় পেয়ে গেছে, জব্দ হয়ে গেছে। আর বলে না।'

সুচিন্তা আজ আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াননা, অপ্রতিভ হন না, সহজভাবে বলেন, 'তা' দাদাকেও কসে ধমকে দাও। জব্দ হয়ে যাবেন।'

'না না দাদাকে বকে না। বকতে নেই।' মাথা নাড়লেন সুশোভন। তারপর হঠাৎ বলেন 'ও চুপ করে বসে আছে কেন?'

লক্ষ্য অশোকার দিকে।

নীতা সহাস্যে বলে, 'ও কে?'

সুশোভন সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেন, 'তুই কি—আমায় পাগল পেয়েছিস নীতা? ও কে আমি তা' জানি না? ওতো ছোট-বৌমা! খুব ভাল মেয়ে, খুব ভাল মেয়ে। বুঝলে সুচিন্তা ওদের বাড়ীর বড়বৌয়ের মত নয়।'

শুনে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে অশোকার, সুচিন্তার, নীতার, শুধু সুবিমল নির্বিকার। বোধ করি বা মুখের একটু হাসির রেখাই ফোটে তাঁর।

সুচিন্তাও মৃদু হেসে বলেন, 'কথাবার্তা একেবারে বেপরোয়া।'

সুবিমল বলেন, 'তা তো হবেই। তবে সংসারে এক-আধজন বেপরোয়া পাগল-টাগল থাকলে বোধ হয় সংসারের অন্য লোকগুলোর খাঁটি চেহারাটা ধরা পড়ে।'

'কি বল সু-সুচিন্তা! আচ্ছা তোমার আর একটা ডাক নাম ছিল না?'

সুচিন্তা হাসেন, 'শুধু 'চিন্তা' বলে ডাকতেন সবাই—'সু'টা বাদ দিতেন, বোধকরি মেয়ের স্বভাবগুণে। আপনার পিসিমা তো আবার ডাকতেন 'দুশ্চিন্তা'।'

'ঠিক ঠিক।' সুবিমল হাসেন, 'ওই রকমই কি যেন একটা মনে পড়ছিল।'

'পিসিমা বলতেন, 'মেয়ে তো নয়

"তবে এতদিন কেন সে শক্তি খাটাওনি সুচিন্তা? কেন পিঠে হাত রাখনি?..."

ডাকাত। ওকে দেখলেই আমার দুশ্চিন্তা হয়।'

নীতা হেসে বলে 'সত্যি পিসিমা, এই রকম ছিলেন আপনি?'

'এই তো সামনেই সব সাক্ষী হাজির, জিগ্যেস কর।'

'আপনাকে দেখলে কিন্তু সেকথা বিশ্বাস হয় না।'

'তা' এই আমির সঙ্গে সেই 'আমির' সম্পর্ক কি বল? সে সুচিন্তা তো কবে মরে গেছে। জন্মান্তরবাদ তোরা মানিস না, আমরা মানি। কত জন্ম আর কত মৃত্যু পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি, হয়তো আরও কতবার মরবো আর জন্মাবো। শুধু লোকে কাজের সুবিধের জন্যে বলবে 'এ সেই সুচিন্তা।'

সুশোভন অস্বস্তি আর বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন, 'মরার কথা কেন সুচিন্তা, মরার কথা কেন? ওই তোমার একটা বড় দোষ। কই এরা তো ওসব বলে না।'

'ওরা ভাল।' হেসে ফেলেন সুচিন্তা।

'আর তুমি বুঝি খারাপ? কই কে বলে বলুক তো।'

'তুমিই তো বলছ।'

'কী আশ্চর্য! খারাপ কেন বলব? এই তো ছোট বৌমা রয়েছে, ও তো মিছে কথা বলবেনা, ও বলুক আমি তোমায় খারাপ বলেছি?'

হঠাৎ অশোকা বলে ওঠে, 'আমি মিছে কথা বলবনা এ কথা আপনাকে কে বলল মেজদা?'

'কে আবার বলবে,' উত্তেজিত দেখায় —সুশোভনকে, 'আমি চিনিনা তোমায়? কিন্তু......কিন্তু মেজদা কে ছোটবৌমা?'

'বাঃ আপনিই তো মেজদা!'

'আমি মেজদা! আমি মেজদা! এবার তুমি বড্ড ভুল কথা বলছ ছোটবৌমা। মেজদা তো ওদের বাড়ীতে, সেই বড়-বৌদের বাড়ীতে থাকে।'

সুবিমল ঈষৎ কৌতুকভরে বলেন, 'ও বাড়ীর সে মেজদা কী করে?'

'কী করে! কী করে!' হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যান হতাশ হয়ে যান সুশোভন। বলেন, 'কী করে বলতো নীতা?'

নীতা গম্ভীরভাবে বলে, 'বলব কেন! বলে দিলে তো রাগ হয় তোমার। নিজেই ভাব তুমি।'

'তবে আমি চলে যাই, একলা একলা ভাবি গে?'

'উঁহু'। চলে যেতে পাবেনা। আমরা কি চলে গিয়ে ভাবি? এখানেই ভাব তুমি।'

সুবিমল নীচু গলায় বলেন, 'থাক দরকার কি অকারণ ব্রেণের ওপর চাপ দিয়ে—'

নীতাও নীচু গলায় বলে 'না জেঠা-মশাই। ডাক্তার বলেছেন চেষ্টা করাতে। বলেছেন পুকুরে যেমন পানা পড়ে, তেমনি এ ধরনের অসুখে ব্রেণে একটা বিস্মৃতির স্তর পড়ে, তাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করা দরকার! তাছাড়া অনেক দিন ধরে অলসতার সুখ উপ-ভোগ করে করে মাথার একটা পলায়নী মনোবৃত্তি আসে, খাটতে নারাজ হয়, তাই তাকে খাটাবার জন্যে কিছুটে জোর দিতে হয়। অবশ্য ইদানীংই বলছেন এটা।'

'আগের থেকে ইমপ্রুভ করেছে?'

'অনেক অনেক! আকাশ পাতাল। এমন কি এই সেদিনও, যে দিন জ্যেঠিমা এলেন—'

সুশোভন বিরক্তভাবে বলেন, 'তোমরা অমন আস্তে আস্তে কথা বলছো কেন বলতো? আমার ভয় করে না?'

'ভয়? কেন ভয় করবে কেন?'

'বাঃ ভয় করবে না! তোমরা আস্তে আস্তে কথা কইবে—'

সুচিন্তা বলে ওঠেন, 'তা তুমি ওদের কথা শুনেছনা,—ওদের মেজদা কি করে বলছনা—'

'কেন বলবনা? এই তো বলছি—সেই অনেকগুলো দুষ্টু দুষ্টু ছেলে নিয়ে গাড়ী চড়ে বেড়াতে যায় মেজদা, আর আর—'

অশোকা থেমে থেমে বলে, 'আর চকোলেট কিনে দেন তাদের, পুতুল কিনে দেন, সার্কাস দেখান।'

'ঠিক ঠিক। ইউ আর রাইট! আরও বলে যাও তো ছোট বৌমা, মেজদাকে আমার খুব ভাল লাগছে।'

'কিন্তু আপনিই তো তখন মেজদা হন।'

'আমি মেজদা হই?'

'হন বৈ কি। সেই গাড়ী থেকে নেমে বলেন, 'ছোট বৌমা তোমার ছেলেগুলো ডাকাত ডাকাত, স্রেফ ডাকাত!'

হঠাৎ সুশোভন টেবিলে একটা ঘুসি মেরে উচ্ছ্বসিত ভাবে চীৎকার করে ওঠেন, 'আমি যাবো।'

'যাবে? কোথায় যাবে বাবা?'

'কোথায় আবার? ওদের বাড়ী! সেই ছেলেগুলোকে আমি ভালবাসি। নীতা আমার ফর্সা জামা কই? দাও তাড়াতাড়ি দাও। ছোট বৌমা চল চল—' হঠাৎ অশোকার খুব কাছে সরে এসে চুপি চুপি বলেন সুশোভন, 'পালাই চল। নইলে এরা যেতে দেবে না!'

'আচ্ছা যাবে—' সুচিন্তা বলেন, 'আগে এরা চা খাক। বসুক গল্প করুক!'

'না না' সুশোভন সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন 'তোমার মতলব খারাপ সুচিন্তা, তুমি আমায় ওদের কাছে যেতে দেবে না। কিন্তু আমি শুনেছিনা, আমি যাবো। নীতা গাড়ী আনাও, শীগগির গাড়ী আনাও, দেরী করলে বিপদ হবে।' টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসান।

সুবিমল তাড়াতাড়ি বলেন, 'কিন্তু ও বাড়ীতে যে বড় বৌ রয়েছে শোভন। তোমায় ধরে নিতে আসবে!'

'না না।' আরও জোরের সঙ্গে বলে ওঠেন সুশোভন, 'সে তো ঠাট্টা! ঠাট্টা বোঝ না কেন?'

সহসা চটি দুটো পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন সুশোভন।

'বাবা, আজ এখন তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে—' নীতা কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখে, 'আজ থাক। কাল আমরা সবাই যাবো।'

'না না! তোমাদের কথা আমি শুনতে চাই না—' মেয়ের হাতটা ঠেলে দেন সুশোভন, 'কই কোনদিন আমায় নিয়ে গিয়েছ? তুমি জানতেনা ওই ছেলে-গুলোকে আমি ভালবাসি।'

ধুপ ধুপ করে নামতে থাকেন সুশোভন।

'বিপদ করলে!' সুবিমল বলেন, 'প্রথমটা দেখে মনে হল—'

নীতা বলে 'কোন কথায় যে কি হয়ে যায় হঠাৎ। কিন্তু বাবা যে নেমেই পড়লেন পিসিমা, কি হবে?'

সুচিন্তা উঠে গেলেন।

কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তুমি এখানেই থাকবে। আর কোথাও যাবে না।'

থেমে গেলেন সুশোভন।

বললেন, 'আমি এখানেই থাকব? আর কোথাও যাব না?'

'হ্যাঁ আমার তাই ইচ্ছে।'

'তোমার তাই ইচ্ছে! তবে আর কি হবে। নীতা গাড়ীটাকে চলে যেতে বল।' বলে আবার ধুপ্ ধুপ্ করে উঠে এলেন সুশোভন, বসে পড়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি গাড়ীটা তোমায় কে আনতে বলল নীতা? দেখছ সুচিন্তার ইচ্ছে নেই।'

মায়ালতা প্রায় রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে-ছিলেন, সুবিমলরা ফিরতেই বলে

উঠলেন, 'কি গো ছোট গিন্নী হ'লতো? মিটল তো আশা?'

'মিটল বৈ-কি দিদি।'

বলল অশোকা।

'তা অনেকক্ষণ তো কাটিয়ে এলে, সুচিন্তাবালা খুব খাওয়ানো মাখানো করলেন বোধ হয়?'

'করলেন।'

'তারপর—।' 'আমায় ধরতে আসছে' বলে চেঁচামেচি করলেন না তোমার 'মেজদা'।'

ভাসুরদের অশোকা 'দাদা' ডাকে বলে, সুবিধে পেলেই মায়ালতা সেই শব্দটার প্রতি কটাক্ষপাত করেন।

'বড়দা তো ছিলেন দিদি, কি কি কথা হল শুনেন। আমার আবার এখন ওই ডাকাতদের দেখতে হবে বলে' দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় অশোকা।

'দেখলে?'

বললেন মায়ালতা ক্রোধ ক্ষোভ সংমিশ্রিত সেই তাঁর নিজস্ব সুরটিতে।

'দেখলাম বৈকি।'

সুবিমল হাই তোলেন।

'সব সময় ওই রকম অগ্রাহ্য।'

'গ্রাহ্য করাবার মন্ত্রটা আর শিখতে পারলে কই বড়বৌ।'

'মন্তর-তন্তর তুকতাক শিখে আর দরকার নেই আমার। শিখুকগে তোমাদের সুচিন্তারা। যাদের তুক করে পরপুরুষকে আঁচলে বেঁধে রাখবার প্রবৃত্তি এখনো বজায় আছে।'

সুবিমল সূক্ষ্ম হাসির সঙ্গে বলেন, 'তা পরপুরুষে প্রবৃত্তি না থাক, ঘরেওতো একটা—'

'হ্যাঁ তেমনি পুরুষ যে সে! আঁচলে বাঁধা পড়ারই মানুষ!'

'কে যে কী মানুষ সে হিসেব কি আর চট করে হয় বড়বৌ? হয়তো সারা-জীবনেও টের পাওয়া যায় না। তেমন আঁচলের সন্ধান পেলে, কী হতো না হতো বলা বড় শক্ত।'

'হ'ল আরম্ভ সেই প্যাঁচালো কথা। ইস কী আর বলব। এর থেকে একটা গণ্ডমূর্খ চাষাভুষোর হাতে পড়লেও দুটো কথা কয়ে সুখ ছিল আমার!' ঠিকরে ওঠেন মায়ালতা, 'গিয়ে তো তিন ঘণ্টা কাটিয়ে এলো'। ভাইকে দেখলে কেমন তাই শুনি।'

'চমৎকার! দেখে, সত্যি বলব বড় হিংসে হল।'

'হিংসে হল?'

'তাইতো হ'ল।'

'পাগল হতে ইচ্ছে হ'চ্ছে?'

তিক্ত হাসি হাসেন মায়ালতা।

'তাই বা মন্দ কি।' সুবিমলও হাসেন, ব্যঙ্গ হাসি।

'তা' যে সে পাগল হলে তো চলবে না, প্রেমে পাগল হ'ল, তবে না সুখ।'

'পেছে ঠিক। বৃথাই তোমাকে বোকা ভাবি।'

'তা' ভাববে বৈকি। বলি বাজে কথা রেখে কাজের কথা কইবে?'

'বল।'

'ব্যাপারটা কী বুঝলে? টাকা কড়ি সব ওই সুচিন্তার খর্পরে গিয়ে পড়ছে না—'

'ইস ওই কথাটা তো জিগ্যেস করা হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে তো।'

'আচ্ছা এখন যত পারো ব্যঙ্গ করে নাও আমাকে। পরে বুঝবে। সুচিন্তার অত আদরের মানে তোমরা না বোঝ আমি বুঝেছি। মেজ ঠাকুরপোর একটা মাত্তর মেয়ে, তাকে যদি পটিয়ে পাটিয়ে ঘরে তুলতে পারে, তা'হলে মেজ ঠাকুরপোর যথা সর্বস্বই ঘরে তোলা হবে। আর তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমাদের ঘরের মেয়ে কায়েত শ্বাশুড়ীর পদসেবা করছে।

'ওইটা ভুল বললে বড়বৌ। ওটা এযুগে কেউ করে না। না শ্বাশুড়ীর, না শ্বাশুড়ী পুত্রের। ওটা অচল।'

'তা পদসেবা না হয় নাই করল' রেগে ওঠেন মায়ালতা, 'কায়েত জামাই হলে খুব মুখোজ্জ্বল হবে তো তোমাদের!'

মুখ উজ্জ্বল হচ্ছে, এমন ঘটনা সব সময় জোটে কই বল?'

'তা হোক! কত গয়না ছিল মেজ বৌয়ের,—কত টাকা মেজঠাকুরপোর—সবই বিনশ্বতি হচ্ছে জানছি, কিন্তু জাতটা কি বলে খোয়াবে তাই ভাবছি। তা সুচিন্তা কোনটিকে দিয়ে গাঁথলেন নীতাকে? বড়, মেজ না ছোট? মেয়েটিতো শুনেলাম তিনটিকে নিয়েই ডাংগুলি খেলছেন।'

'তাই নাকি? এত শুনলে কোথা থেকে?'

'হুঁঃ!' বুদ্ধি থাকলে আর বেচে খেতে হয় না। ঝি মাগীটাকে একটা টাকা দিলাম 'মিষ্টি খেও' বলে তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলাম।'

'চমৎকার! তুমি যে কেন উকিল হলে না তাই ভাবি। কিন্তু এত অবকাশ তুমি পেলে কখন?'

'সে যদি বললে—' মায়ালতা হাসেন, 'ভাগ্যবানে'র বোঝা' ভগবানে বয়। আমিও ঠিকরে বেরিয়ে এসেছি, আর দেখি ঝি মাগীটাও কাজ করে বেরোচ্ছে, ডাকলাম হাতছানি দিয়ে গাড়ীর কাছে।'

সুবিমল গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'তা' এতই যদি জেনে নিলে, বড়, মেজ, ছোট কোন ছেলেটিকে দিয়ে গেঁথেছে, সেটা জেনে নিলে না কেন?'

'সময় ছিল? ওদিকে তো তোমার ছোট ভাই তাড়া লাগাচ্ছেন। স্বাধীনতার সুখ পেলাম জীবনে?'

'ভাগ্যিস পাওনি। কিন্তু সে যাক—একটা খবর দিয়ে তোমার হৃদয় স্বচ্ছটা একটু ঘুচিয়ে রাখি। সুচিন্তার বড়শি কাজে লাগেনি। নীতার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে, এবং অনেকদিন থেকেই আছে।'

'নীতার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে! অনেকদিন থেকেই আছে!'

যন্ত্র চালিতের মত উচ্চারণ করেন মায়ালতা।

'হ্যাঁ।'

'কতদিন শুনি?'

'তা' জানি না। শুনেলাম ঠিক হয়ে আছে বাস এই পর্যন্ত। হতে পারে চার-পাঁচ বছর! শুধু শোভনের অসুখের জন্যেই—'

'বলি তুমি ও কি—পাগলের বাড়ীর হাওয়ায় পাগল হয়ে গেলে? চার-পাঁচ বছর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে নীতার, আর আমরা জানলাম না?'

'আমাদের জানানোটা হয়তো খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়নি ও'দের!'

'হুঁ! তা কোথায় শুনি?'

তা জানি না। ঠিক হয়ে আছে তাই জানতে পেলাম।'

মায়ালতা প্রশ্ন করলেন, 'সব ঠিক?'

সুবিমল বললেন 'সব ঠিক।'

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে মুখ টিপে হেসে বললেন, 'ও, তাই বুঝি? সব ঠিক?'

হায়, ভাগ্যবিধাতা কি কোনদিন তাকিয়ে দেখেন তাঁর সেই হাসিটুকু মানুষের কাছে কী বেশে আসে। আসে বজ্রের বেশে, রুদ্রের বেশে, আগুনের বেশে। দিশেহারা মানুষ ভয়ে ভয়ে স্তবের মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে, 'প্রভু তুমি যা কর সবই মঙ্গলের জন্য।' কিন্তু মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠে, মঙ্গলময়ের ভণ্ডামীর খোলস খুলে ফেলে তীব্র চীৎকারে বলে উঠতে চায়, ভুল ভুল সব মিথ্যে।

'আকাশকে চিরে চিরে বলতে ইচ্ছে করে তার 'কেন, কেন কেন!'

দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে, নীতা আজ সেই প্রশ্নে আকাশকে বিদীর্ণ করে ফেলতে চাইছে,—'কেন কেন কেন!' কেন আমার ওপর ভাগ্যবিধাতার এই এই নিষ্ঠুরতা! কেন সে এমন হিংস্র, এমন কুটিল। কী করেছি আমি তার!'

এ প্রশ্ন কোটি কোটি মানুষের।

এ প্রশ্ন অনন্তকালের।

এ প্রশ্ন নিরুত্তর।

আকাশের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে আশ্রয় চায় মানুষ, আকাশের কাছে চায় মাথাকোটা প্রশ্নের উত্তর! যে আকাশ শুধু সীমাহীন শূন্যতায় গড়া—!

ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর দণ্ড নিয়ে এসে দাঁড়াল একখানি তারবার্তা।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীর বাহুমূলে হাত দিয়ে একটু আকর্ষণ করতেই নির্মলা দূপা পিছিয়ে গেল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, কী হচ্ছে? চারদিকে লোক রয়েছে না?..... শোন; ইস্কুল থেকে আসবার সময় মাস্টার-মশাইকে নিয়ে এসো। রাত্রে দুটো খাবেন এখানে।

—আজই খাওয়াতে চাও? কিন্তু এত বেলায় আয়োজন করা—

—ওঁকে দুটো খেতে দেবো, তার জন্যে আবার আয়োজন কিসের? সেটুকু আমি করে নেবো।

—বেশ।

সেরাত্রে নির্মলার চোখে এক ফোঁটা ঘুম এল না। স্বামী পাশ ফিরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। এতদিন পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মনে মনে যে-আশঙ্কা ছিল, সেটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব দুর্ভাবনার অবসান হয়ে গেছে। কিন্তু নির্মলার আবার নতুন ভাবনা শুরু হল। পাশ করলেই তো হবে না। তারপর? যে-জীবনের স্বপ্ন তার দুচোখ ভরে আছে, এই পাশটা তার প্রবেশ দ্বার, কিংবা সেখানে পৌঁছবার প্রথম ধাপ। এখনো অনেক ধাপ উঠতে হবে, অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বলতে গেলে, এখন থেকেই শুরু হবে আসল সংগ্রাম। এই কয়েক বিঘা ধানজমি, যাতে সারাবছর ভাল ভাবে পেট চলা ভার, তার সঙ্গে কটা টাকার মাস্টারি—দুএ মিলে দুটি প্রাণীর কোনো রকমে হয়তো চলে যায়, কিন্তু এই কি জীবন? এখন না হয় দুজন, এর পর কথাটা মনে আসতেই এক ঝলক রঙিন লজ্জা বুকের কোণটা ছুঁয়ে গেল দুটি একটি অতিথি যখন আসবে, কী দিয়ে তাদের মানুষ করবে? সমাজের দশজনের কাছে কী পরিচয় পাবে তারা? ঠিক বলেছিল মেজদি। পরিচয়টাই সব চেয়ে বড় কথা। নরেনকে এবার সেই পরিচয়ের সাধনায় নামতে হবে।

হেডমাস্টারমশাই ভরসা দিয়েছেন, বছর খানেক পরে আর কয়েকটা টাকা মাইনে বাড়াবার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তবু তো সেই গ্রাম্য ইস্কুলের মাস্টার। কজন তাকে চেনে? যারা চেনে তারাই বা কী চোখে দেখে? অবজ্ঞা মেশানো করুণা। না; এখানে আর নয়। নরেনকে এবার বেরোতে হবে। প্রথম কাজ কলকাতায় গিয়ে একটি ভদ্রগোছের চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা।

গ্রাজুয়েট হবার পর এই স্কুলে পড়ে থাকবার ইচ্ছা নরেনেরও ছিল না। কাটোয়া কিংবা কাছাকাছি কোনো জায়গায় আর একটু বেশী মাইনের মাস্টারি—এর বেশী সে উঠতে পারেনি। দূরে যাওয়া চলবে না। সংসারে পুরুষ বলতে সে একা। একটি ভাইও নেই যে তার অবর্তমানে পৈত্রিক ভিটে, বাগান, পুকুর এবং তার সঙ্গে ঐ জমি কখানা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবে। এগুলোর উপর তার একটা নাড়ির টান ছিল। এই নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনের ছায়াঢাকা কোণটিতে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই সে চাইত না। এর থেকে নিজেকে উপড়ে নিয়ে শহরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার উচ্চাকাঙ্খা তার মনে কোনদিন স্থান পায়নি।

নির্মলার প্রস্তাব শুনে বিরস মুখে বলল, কোলকাতায় আমাদের কেউ নেই। গিয়ে উঠবো কোথায়?

—কেন, মেসে।

—তার তো খরচ আছে। চাকরী কদ্দিনে পাওয়া যাবে, কে জানে?

—চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটবেই। যদ্দিন যা খরচ লাগে আমি দেবো।

—তুমি আর দেবে কোত্থেকে? গয়না কটাও তো প্রায় শেষ। ওতে আর হাত দেওয়া চলবে না।

নির্মলার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ অভিমান ফুটে উঠল, দরকারের সময়েই যদি কাজে না এল, এই সোনার পিণ্ড দিয়ে কী হবে আমার?

নরেন আর ওদিক দিয়ে যেতে সাহস করল না, অন্য যুক্তি পাড়ল, তুমি থাকবে কোথায়?

—কোথায় আবার? বাড়িতে?

—একা?

—একা কেন? প্রসন্ন রয়েছে অতদিনের লোক। তাছাড়া বাগদী বুড়ির

সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। রোজ রাত্রে এসে শোবে এই ঘরে। নিমাই আছে, মনি ঠাকুরপো আছে, গোপী কাকা আছেন, দেখাশুনা করবেন।

কাছে সরে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, ভয় নেই, পালিয়ে যাবো না। কদিন আর? চাকরি পেয়ে যখন বাসা করবে—কথাটা শেষ করেনি নির্মলা, বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার সুন্দর চোখদুটো এবং তার উপরে ফুটে ওঠা একটি অর্থপূর্ণ চাপা হাসি।

লেখাপড়া থেকেই চাকরি এবং চাকরি থেকে আসে স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার যা কিছু উপকরণ—সাধারণ মানুষের এই সহজ কথাটাই জানত নির্মলা। বিয়ের আগে তাদের সেই ছোট মহকুমা শহরে যতদিন ছিল এবং বিয়ের পর এই পাড়াগাঁয়ে এসে যা কিছু দেখেছে এবং শুনেছে, সব এই কথারই সমর্থন। নিজের গ্রাম বা শহর ছেড়ে বিদেশে গেলেই তার মূল্য বেড়ে যায়। দুচারদিনের জন্যে যখন আসে, ছোটবড় সবাই তার দিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। একদিন যাদের কাছে সে তাচ্ছিল্য ও বিরূপ মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই পায়নি, তারাই তাকে সমাদর করে বসায়, খুশী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার চালচলন, বেশবাস, বলন কথন—সব ওখানকে সাক্ষ্য দেয়, সে একটি উচ্চ-স্তরের জীব। অর্থাৎ সে চাকরি করে।

কিন্তু চাকরি পাবার দুঃখ যে কত বড় এবং যারা পেয়েছে তাদের দুঃখও যে কম নয়, তার কোনো খবরই নির্মলার জানা ছিল না। নরেনও কি জানত? জানল প্রথম কলকাতায় যাবার পর এবং তার কাছ থেকেই আরও পরে জেনেছিল নির্মলা।

বাংলার পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত জীবনে তখন ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। স্কুল-কলেজের দ্রুত প্রসার চলছে; তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে বিদেশী সভ্যতার চমক। মোটা ভাত কাপড়ের সাদামাটা জীবনযাত্রা কাউকে খুশী করতে পারছে না। ছোট-খাট জোতদার তালুকদার, তার চেয়েও যারা নিচের স্তরে, পুকুর-বাগানওয়ালা সাধারণ গৃহস্থ, হাট বাজারের দোকানদার, চালকলা বাঁধা পুরোহিত, চাদর ও চটি-ধারী সামান্য বেতনের স্কুল মাস্টার—সকলের মুখে এক কথা, ছেলেকে ইংরেজি পড়াও। শহরের হাওয়া যাদের গায়ে লেগেছে,—টিনের চালের নীচে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় ঘেরা 'বাসায়' বসে যারা মক্কেল চরান, অর্থাৎ দিন গেলে দুটি টাকা আয়ের উকিল মোক্তার, তাদের উপর নির্ভরশীল মুহুরি টাউট; জমিদারী সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা তহশিলদার;—এদের তো কথাই নেই। সকলের বাড়ি থেকেই দলে দলে ছেলে বেরিয়ে বেলা দশটায় স্কুল-কলেজের পথ ধরে। 'প্যাশ'-এর মান ইচ্ছা করেই নামিয়ে রাখা হয়েছে। ইংরেজ বলেছে, 'তোমাদের শিক্ষার হার এত 'লো', স্বরাজ চাইছ কোন মুখে?' তাই শিক্ষাবিদরা উঠে পড়ে লেগেছেন, 'পারসেনটেজ অব লিটারেসি' বাড়াতে হবে। শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে সকল স্তরের সব ঘরে।

পাশ করে যারা বেরোচ্ছে, তারা কেউ গ্রামে ফিরছে না, মহকুমা শহরেও থাকছে না, ধাওয়া করেছে কলকাতার দিকে। চাকরি চাই। কোথায় এত চাকরি? বিশ্ব-বিদ্যালয় তার কারখানা বাড়িয়ে চলেছেন। মাল যত বেরোচ্ছে, তার সিকিভাগও কাটছে না। 'সাপলাই' প্রচুর 'ডিমান্ড' নেই। কোত্থেকে আসবে 'ডিমান্ড'? সেই তো গুটি কয়েক সরকারী অফিসের নড়-বড়ে চেয়ার, নয়তো সওদাগরী আফিসের বনাত-ছেঁড়া টেবিল। দুজায়গাতেই মালিক ইংরেজ। গুপ্ত-ব্যানার্জি-ঘোষ-বাগচি দেখলেই দরজা দেখিয়ে বলে 'নো ভেকান্সি'. কেউ কেউ আবার জুড়ে দেয়—এখানে এসেছ কেন? তোমাদের যে-সব জাতভাই বোমা ছুঁড়েছে, তাদের কাছে যাও।

আফিসে আফিসে ধাক্কা খেয়ে গ্র্যাজুয়েটের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ভিড় করছে ল কলেজের দরজায়। গাউনের বাজার ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু মক্কেলের বাজারে মন্দা। সতের বছর ধরে ঝুড়ি ঝুড়ি ইংরেজি কেতাব গলাধঃকরণ করে বটতলায় বসে দুপয়সার চা-এ গলা ভেজানো। কোনো কোনো নেতা তাই দেখে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ভেঙে ফেল দারভাঙ্গা বিল্ডিং। উকিল আর চাই না। কী লাভ হচ্ছে বি-এ, এম্-এর ভিড় বাড়িয়ে, কলেজে না ঢুকে, ঢুকে পড় বড়বাজারের গলিতে। দরজায় দরজায় ফেরি কর কাপড়ের গাঁইট। কিন্তু সেখানে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিপুলকায় মাড়বার।

চাকরিজগতের এই চিত্রটি নরেনের চোখে পড়েছিল বেলেঘাটার মেস-এ গিয়ে উঠবার কয়েকদিন পরেই, কিন্তু স্ত্রীকে জানতে দেয়নি। দিয়েছিল অনেকদিন বাদে। তখন নির্মলাও নিজের চোখে দেখতে শিখেছে এবং 'দুঃখ' নামক মানুষের যে পরম শিক্ষক তার কাছেও অনেক পাঠ নেওয়া হয়ে গেছে।

হরিশংকরের এক বন্ধু বেলেঘাটা অঞ্চলে ঐ শস্তা মেসটিতে থেকে কোন এক সওদাগরি আফিসে চাকরি করতেন। মাস্টারমশাইয়ের চিঠি নিয়ে নরেন যেদিন সেখানে গিয়ে উঠল, তিনি হেসে বললেন, হরিটা চিরদিনই পাগলা। আপনি না জানেন, সে তো জানে চাকরি কী চীজ। ভালো করেননি, ভাই। ভাবছি, এই সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে আপনার একূল ওকূল দুটোই না যায়।

সরকারী চাকরির বয়স চলে গেছে। একমাত্র গম্যস্থল ঐ 'মার্চেন্ট আফিস' নামক মহাতীর্থ; সে পথ আরো বেশী দুর্গম। মাস্টারমশাইয়ের বন্ধুটি অনেক আগেই একটু জায়গা পেয়েছিলেন। তখন তার অবস্থা ঠিক মাঝখানের কোনো জংশন স্টেশন থেকে ওঠা রেলওয়ে যাত্রীর মত। ভিতরে ভীষণ ভিড়, বাইরেও অনেক লোক। ঠেলেঠুলে অনুনয় বিনয় করে নিজে কোনোরকমে উঠে পড়লাম। তার

পরেই ঝাঁঝিয়ে উঠলাম বাইরের দিকে চেয়ে, আর জায়গা নেই।

একজোড়া দুল বিক্রির সামান্য কটা টাকা নির্মলা স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিল। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। এদিকে সমস্তদিন ঘোরাঘুরিই সার। কারো কাছ থেকে ভরসার লেশমাত্র নেই। মেস-এর পাওনা বাড়ছে। ম্যানেজার অ্যাডভান্স চেয়েছিলেন, না পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছেন। নরেনের লজ্জা করে ভাতের পাতে গিয়ে বসতে। মাঝে মাঝে দু-এক বেলা গা-ঢাকা দেয়। তাতে বিশেষ সুবিধা নেই। 'মিল' না নিলে বাদ পাওয়া যায় সামান্যই। ঠাকুর চাকরেরা অবজ্ঞা দেখাতে শুরু করেছে। অন্যান্য মেম্বরদের চোখে কখনো উপহাস কখনো বিরক্তির ভ্রূকুটি।

তবু কোন মুখে টাকা চাইবে নির্মলার কাছে? সে দেবেই বা কোত্থেকে? এদিকে ক্রমাগতঃ চিঠি আসছে—কোনো সুবিধে হল? শেষ চিঠিখানার উত্তর দেওয়া হয়নি। একই কথা কতবার লেখা যায়? শেষ পর্যন্ত টাকার উল্লেখ না করে পারে না? গয়না আর নেই। সামান্য দু-এক কুচি যা আছে, একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া গৃহস্থের অকল্যাণ। আর একখানা জমি বিক্রী করে টাকা পাঠাতে হল। প্রসন্ন অনেক আপত্তি করল, গোপী কাকাও মত দিতে চাইলেন না। কিন্তু নির্মলা কারো কথা শুনল না। টাকা না হলে বিদেশ বিভুঁয়ে কী করে চলে? একটা কিছু জুটলেই, জমি উদ্ধার করতে কতক্ষণ? নাই বা যদি করা যায়, তাতেও ক্ষতি নেই। তখন তো আর ঐ জমির উপর নির্ভর করে তারা এই গাঁয়ের বাড়িতে বসে থাকবে না।

কয়েক মাস কাটবার পর সামান্য একটা টিউশানি জুটিয়ে নিয়ে একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলল নরেন। তাতেও পুরো খরচ চলে না। তবু স্থির করে ফেলল, স্ত্রীর কাছে আর টাকা চাইবে না। তার আগেই পর পর আরো দুখানা জমি চলে গেছে। যা আছে তাতে নির্মলার একারই চলা ভার। ওরই মধ্যে একটা মস্ত বড় সুরাহার কথা—জমিগুলো ব্রহ্মোত্তর, খাজনা দিতে হয় না। এ দুর্দিনে এটুকুও কম নয়।

একদিন নরেন তার নিজের কষ্ট কিংবা চাকরি সন্ধানের দুঃখের ইতিহাস স্ত্রীকে কিছুই জানায়নি, ভরসাই বরং দিয়ে এসেছে বরাবর। নির্মলা যে আশা ও আগ্রহ নিয়ে একটি একটি করে দিন গুনেছে, তার চিঠিগুলোর প্রতি ছত্রেই তার পরিচয়। তার উত্তরে নৈরাশ্যের সুর ওষ্ঠপ্রান্তে এসেও আটকে যায় লেখনীর মুখ বাধে। কিন্তু বছর কাটতে চলল; আর তাকে অন্ধকারে ফেলে রাখা যায় না। এও এক ধরনের প্রতারণা। উদ্দেশ্য যাই হোক মিথ্যা দিয়ে স্ত্রীকে অনির্দিষ্টকাল ভুলিয়ে রাখা অন্যায়। তাছাড়া নির্মলা তো ভেঙে পড়বার মত মেয়ে নয়। যা সত্য, তাই সে জানুক, যতই না তা কঠোর হোক।

পরের চিঠিতে সব কিছু খুলে লিখল নরেন। তার সঙ্গে জানাল, চাকরির কোনো আশা নেই, তার পেছনে আলেয়ার মত ছুটে বেড়ানো নিরর্থক। সোনা এবং

চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটবেই

জমি বিক্রী করে সেই টাকা কলকাতায় মেস ম্যানেজারের হাতে তুলে দেওয়াও মূর্খতা। গৃহস্থের সামান্য সম্বল ঐ সোনাটুকু ও জমিগুলো খুইয়ে যে ক্ষতি আগেই হয়ে গেছে, তাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। নির্মলার সম্মতি পেলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে বলে স্থির করেছে। তারপর দেশের মধ্যেই একটা কোনো স্কুলের চাকরির সন্ধান করা। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেজন্যে কিছু দেরি হলেও ক্ষতি হবে না। ঘরের ভাত খেয়ে চেষ্টা করা চলবে।

চিঠি পড়ে নির্মলার চোখের সামনেটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে পাবার চেষ্টা করল। একটি মর্মান্তিক হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। 'ঘরের ভাত'ও যে নিঃশেষ হয়ে এসেছে, স্বামী এখনো জানতে পারেননি। জানিয়ে লাভও নেই। যে পথে তারা এতটা এগিয়ে গেছে, তার থেকে আর পিছু ফিরে আসা যায় না। এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র উপায়। শেষ-প্রান্তে যাই থাক, কূলে বা অকূলে, সে ভাবনার অবসর নেই।

হরিশঙ্কর এলেন দেখা করতে। কিছুদিন থেকে সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না। অনেকদিন আসতে পারেননি। নির্মলাকে দেখে যেন আঁৎকে উঠলেন, তোমাকে যে চেনা যায় না, বৌমা। অসুখ করেছিল, আমাকে জানাওনি কেন?

—অসুখ কোথায়? আমি তো ভালই আছি, কাকাবাবু।

—না, না, ভালো নেই, মোটেই ভালো নেই, বলে বারবার মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, অবিশ্যি ভালো না থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে তা জানি। কিন্তু তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও যে অযথা চিন্তা করে শরীর মন নষ্ট করবে।

—না, কাকাবাবু, চিন্তাও আমি করি না। আমার এখনো আশা আছে, এ-দিন কেটে যাবে। সেই কথাই তাঁকে বরাবর লিখে থাকি।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তাইতো লিখবে। একেই তো বলে সহধর্মিণী। দুঃসময়ে যে পাশে এসে দাঁড়ায়, সাহস দেয়, ভরসা দেয়।

নির্মলার শরীর খারাপের কারণ যে শুধু দুর্ভাবনা নয়, শুধু মানসিক নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী শারীরিক, সেকথা কাউকে বলা যায় না। মাস্টারমশাইয়ের কাছেও সে চেপে গেল। কিছুদিন থেকে ভাতের থালার সামনে বসলেই তার স্বামীর কথা মনে পড়ে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও একটু ভালো খাওয়া, দুটি একটি ভালো রান্নার দিকে মানশুষটির যে বিশেষ ঝোঁক আছে, নির্মলা ক'দিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল। শাশুড়ীও তাকে বলেছেন সেকথা। অসুখে পড়বার পর এইটাই ছিল তাঁর বড় ভাবনা। কী রান্না করেছ? কী দিয়ে খেল নরেন? ও কিন্তু এখনো চেয়ে খেতে জানে না। 'না' বললেও দুটো ভাত ওকে বেশী দিও, বৌমা। জেলেপাড়া থেকে মাঝে মাঝে কইমাছ আনিয়ে 'ঝালদে' করে দিও। বড্ড ভালবাসে ও। একগংগা ঝোল দিও না যেন। ও খেতে পারে না—এমনি অনেক কথা তিনি বলতেন শুয়ে শুয়ে। নির্মলা নিজেও দেখেছে, জিজ্ঞাসা না করেও বুঝে নিয়েছে এই মুখচোরা মানুষটির কোন্ কোন্ জিনিসের উপর বিশেষ লোভ। সেইগুলোই বেছে বেছে রান্না করে দিয়েছে। নরেন একটি কথাও বলেনি। সেটা তার স্বভাব নয়। কিন্তু চোখে-মুখে উপচে পড়েছে খুশী। শুধু আনন্দ নয়, কৃতজ্ঞতা। নির্মলার মন তৃপ্তিতে ভরে গেছে।

রান্না করতে গিয়ে, বিশেষ করে নিজে যখন ভাত নিয়ে বসে, তখনই সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যায়। হাত মুখে উঠতে চায় না। খাবারগুলো নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে। কোনোদিন আধপেটা, কোনোদিন অনাহার। কত কী তুচ্ছ জিনিস রাঁধতে গিয়ে আর হাত সরে না—স্বামী বড় ভালবাসেন। রান্না পড়ে থাকে। দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেয়, কিংবা উনুনে জল ঢেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

মায়ের একটি ছেলে, অভাবের সংসার হলেও আদরে মানুষ হয়েছে নরেন। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন মনটাকে মানিয়ে নিতে পারেনি নির্মলা। তারপর সেও কোনোদিন স্বামীকে অনাদর করেনি। আজ কোথায় কী দিয়ে খাচ্ছেন, মেস-এর ঠাকুরের রান্না হয়তো মুখে তুলতেও পাচ্ছেন না—এই সব কথাই থেকে থেকে মনটাকে তোলপাড় করে তোলে।

দু'চারটে অন্যান্য কথার পর হরিশঙ্কর বললেন, নরেন ফিরে আসতে চায়। ওখানে কোনো সুবিধে হচ্ছে না। তোমাকেও বোধহয় সেই কথাই লিখেছে।

নির্মলা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

—ইস্কুলের চাকরিটা খালি আছে কিনা জানাতে লিখেছে। মাস ছয়েক খালিই রেখেছিলাম, তারপর আর ওরা শুনল না। নিজেদের লোকজন আছে তো। তারই একটিকে এনে বসিয়েছে। নরেনের কাছে সে কিছুই নয়। কিন্তু খুঁটোর জোর যখন আছে, তাকে আর হঠায় কে? তাই, ভাবছি কী লিখি। অবিশ্যি কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয়তো—

—আপনি লিখে দিন আসবার দরকার নেই। এলে চাকরি পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে ওখানেই চেষ্টা চলতে থাক। এতদিনই যখন গেছে দেখা যাক্ আরো কিছুদিন।

—কিন্তু বছর ঘুরে গেল। কোলকাতার শহরে খরচপত্তরও কম হচ্ছে না।

—সে সব যেমন করে চলছিল তেমনি চলবে।

—কী করে যে তুমি চালাচ্ছ, আমি তো ভেবেই পাই না।

—ভগবান চালাচ্ছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন, কাকাবাবু, এ-সব যেন সার্থক হয়।

বলতে বলতে নির্মলার গলা ধরে এল। হরিশঙ্কর বললেন, সার্থক হবে বৈকি, মা? তোমার এতবড় ত্যাগ বৃথা যাবে, এ কখনো হতে পারে না।

উঠতে উঠতে বললেন, আমি তাহলে সেই কথাই লিখে দিই।　　(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

॥ অভিনন্দন ॥

অনেক আলোচনা হয়েছে গোয়ার মুক্তি নিয়ে, সমালোচনাও হয়েছে অনেক অবাঞ্ছিত বিলম্বের জন্যে। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। তাই পূর্বের সব সমালোচনা ভুলে প্রাণভরে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা ভারত সরকারের সফল গোয়া অভিযানকে। ভারতের মুক্তি অভিযান এতদিনে সম্পূর্ণ হল—সার্থক হ'ল ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি থেকে শুরু করে নিত্যানন্দ সাহাদের অকৃপণ জীবন দান।

ভারতের উত্তর সীমান্তে যে নূতন বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে, এই ঝড়ো হাওয়ার দাপটে তা হাল্কা মেঘের মতই শূন্যে মিলিয়ে যাবে অতি দৃঢ়তার সংগে এ আশা পোষণ করার অবশ্যই কারণ ঘটেছে। ভারতের শান্তিনীতি মানে যে নিরুপায়ের আত্মসমর্পণ নয় তা আশা করি ভারতের প্রতিবেশী শত্রুরা এবার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে।

॥ প্রকৃত বন্ধু ॥

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সিংহল। ক্ষুদ্র গোয়ায় বারো হাজার সৈন্য পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে পর্তুগাল জাহাজ বোঝাই করে আরও সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল গোয়া অভিমুখে। বৃটেনের সহযোগিতায় সেই সৈন্য বোঝাই যুদ্ধ জাহাজ জিব্রাল্টার অতিক্রম করে এগিয়েও এসেছিল লোহিত সাগরের মুখে পর্যন্ত। কিন্তু সেইখানে অপ্রত্যাশিতভাবে বাদ সাধল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি নাসের কড়া হুকুম দিলেন, পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ সুয়েজ দিয়ে যেতে পারবে না। একমুহূর্তেই পর্তুগালের গোয়া রক্ষার শেষ স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেল। লিসবনের মূল ঘাঁটির সংগে সংযোগহারা গোয়ার পর্তুগীজ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সম্মুখে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথই খোলা রইল না।

গোয়ায় হার মেনে পর্তুগাল ও তার সাম্রাজ্যবাদী দোসররা ভারতকে জব্দ করতে চাইল রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে। কিন্তু সেখানেও তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সোভিয়েট ইউনিয়নের 'ভেটো'র খড়্গাঘাতে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধিতার সংগে হাত মিলালো সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া ও সিংহল। সিংহলের প্রতিনিধি সাম্রাজ্যবাদীদের নিন্দাবাদের দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, গোয়ায় নেহরুর নীতি শান্তিনীতির পরিপন্থী নয়। যে উপনিবেশিকতা আজও স্থায়ী বিশ্বশান্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে, সেই বাধাকেই কিছুটা অপসারিত করে প্রকৃতপক্ষে শান্তির পথই সুগম করেছেন শ্রীনেহরু। গোয়ার মুক্তি সংগ্রামকে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্যায় বলেও বর্ণনা করেছেন।

॥ উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা ॥

গোয়ার মুক্তি অভিযানে পশ্চিমী শক্তিজোটের, বিশেষ করে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার কারণ খুবই সহজবোধ্য। সারা পৃথিবী জুড়ে এমনি টুকরো টুকরো বহু সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আজও তাদের অধিকারে রয়েছে যার কোনটই তারা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে রাজী নয়। অথচ তারা জানে যে গোয়ায় পর্তুগীজ বিতাড়ন সম্পূর্ণ হলে তাদেরও ঐসব অঞ্চলগুলি থেকে একে একে পাট গোটাতে হবে। ফ্রান্সের হাত থেকে তিউনিসিয়া কেড়ে নেবে বিজের্তা, সোমালিয়া কেড়ে নেবে জিবুতি, বৃটেনের হাত থেকে স্পেন কেড়ে নেবে জিব্রাল্টার, আরব কেড়ে নেবে এডেন, চীন কেড়ে নেবে হংকং, সিঙ্গাপুরে নিশ্চিহ্ন হবে সামরিক কর্তৃত্ব। সুয়েজ ত অনেকদিন আগেই ঠিক এমনিভাবে তার হাতছাড়া হয়েছে। পর্তুগালকে আর হয়ত তাড়াবার দরকার হবে না, সে নিজেই এবার ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে চীনের মাকাও দ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ার টাইমর দ্বীপাংশ। ইন্দোনেশিয়া ত ইতিমধ্যেই ধনুকভাঙা পণ করে বসেছে, পশ্চিম ইরিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে সে অবশ্যই ডাচ-কবলমুক্ত করবে। ওদিকে এঙ্গোলাতেও নতুন করে শুরু হয়েছে পর্তুগালের বিরুদ্ধে এঙ্গোলাবাসীদের অভিযান প্রস্তুতি। সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী মহলে নতুন করে ত্রাসের সঞ্চার করেছে ভারতের গোয়া মুক্তি অভিযান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের মূল ভূখণ্ডের মুক্তি যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল সারা পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির মনে, এবং যার ফলে এপর্যন্ত উনষাটটি রাষ্ট্রের শৃংখল-মুক্তি ঘটেছে এশিয়া ও আফ্রিকায়, সেই অনুপ্রেরণাই আবার নতুন করে জেগে উঠেছে সারা পৃথিবীর অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের মনে। সাম্রাজ্যবাদের যে ছিটেফোঁটা এখনও অবশিষ্ট আছে পৃথিবীতে তাও এবার শেষ হবে পর্তুগীজ ছিটতালুকগুলির মুক্তির অনুপ্রেরণায়।

॥ কাতাংগা ॥

কাতাংগা সমস্যারও বোধহয় এইবার সমাধান হতে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘের দুর্বার অগ্রগতির সম্মুখে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ-ব্যবস্থা। কাতাংগার রাজধানী এলিজাবেথভিলের অর্ধেক এখন রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন। নিরুপায় শোম্বে আবার তাই রাষ্ট্রসংঘের শরণ নিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগেই কিটোনায় শুরু হয়েছে কাতাংগার প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও কংগোর প্রধানমন্ত্রী এডুলার সাক্ষাৎকার। নিরুপায় শোম্বে নিজের গরজেই এগিয়ে এসেছেন মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে। সুতরাং মনে হয় বিচ্ছিন্ন কাতাংগা এবার কংগোর অংগীভূত হওয়ার প্রস্তাব স্বীকার করে নেবে।

॥ লোকান্তর ॥

আর এক শিক্ষাব্রতী ও কর্মসাধকের অকস্মাৎ লোকান্তর হল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়ে এসেছিলেন ভুবনেশ্বরে, সেখান থেকে বিমানযোগে দিল্লীতে ফিরে গেল তাঁর প্রাণহীন দেহ। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যরূপে ও দিল্লীর শিক্ষা দপ্তরের অন্যতম প্রধানরূপে ডঃ সিদ্ধান্ত শুধু সুপরিচিতই ছিলেন না, নিষ্ঠা কর্মদক্ষতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার গুণে তিনি ছিলেন সবার আস্থাভাজন। সুবক্তা ও সুলেখকরূপেও পরলোকগত শিক্ষাব্রতীর খ্যাতি কিছু কম ছিল না। মাত্র ৬৭ বছর বয়সে এমন একজন মানুষের জীবনাবসান হ'ল, সেটা বাঙলা দেশেরই দুর্ভাগ্য।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৪ই ডিসেম্বর—২৮শে অগ্রহায়ণ ঃ গোয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রস্তুতি—বেলগাঁও-এ জেনারেল থাপার, এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার ও জেনারেল চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

'যুগের দাবী সত্ত্বেও পুরাতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম'—দিল্লীতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) উদ্বোধনী ভাষণ।

১৫ই ডিসেম্বর—২৯শে অগ্রহায়ণ ঃ ভারতে পক্ষকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফর উদ্দেশ্যে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেফের সদলে নয়াদিল্লী উপস্থিতি—সর্বত্র রুশ সম্মানিত অতিথির বিপুল সম্বর্ধনা।

দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ গ্যালব্রেথের সাক্ষাৎকার—গোয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে মত বিনিময়।

ত্রিবান্দ্রমে ক্ষিপ্ত জনতার উপর পুলিশের লাঠি চার্জ—কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে শ্রীনাম্বিয়ার প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতাগণ গ্রেপ্তার।

১৬ই ডিসেম্বর—৩০শে অগ্রহায়ণ ঃ দিল্লীতে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেফ ও শ্রীনেহরুর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক—নিরস্ত্রীকরণ, বার্লিন সমস্যা, ঔপনিবেশিকতা প্রভৃতি প্রধান আন্তর্জাতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা।

গোয়ায় পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতার অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট গোয়া রাজনৈতিক সম্মেলন নেতা জর্জ ভাজের তার।

'ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করিলে চীনাদের প্রতিরোধে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত সরকারকেই সমর্থন করিবে'—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠক কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীঅজয় ঘোষের ঘোষণা।

১৭ই ডিসেম্বর—১লা পৌষ ঃ শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজের গোয়ায় প্রবেশ—মধ্যরাত্রিতে সৈন্য ও বিমান বাহিনীর ত্রিমুখী অভিযান সুরু—সর্বাধিনায়ক পদে লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরী।

গোয়া হইতে সদলে গভর্ণর জেনারেল ও পর্তুগীজ অফিসারদের পলায়ন।

পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মুক্তি অর্জনে ভারতের কার্য-ব্যবস্থায় রাশিয়ার পূর্ণ-সমর্থন—বোম্বাই-এ রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেফের ঘোষণা।

১৮ই ডিসেম্বর—২রা পৌষ ঃ গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিমের পতন আসন্ন—ভারতীয় ফৌজ কর্তৃক দমন, দিউ ও অঞ্জাদেব দ্বীপ অধিকার—যুদ্ধে পর্তুগীজ রণতরী 'আলবুকার্ক' নিমজ্জিত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ভারতের গোয়া অভিযান কর্মসূচী সমর্থন—বল প্রয়োগের জন্য ঔপনিবেশবাদী বৃটিশ সরকারের খেদ—নয়াদিল্লীতে সংবাদের ভীড়।

১৯শে ডিসেম্বর—৩রা পৌষ ঃ গোয়া মুক্তি অভিযানের সফল সমাপ্তি—২৬ ঘন্টা মধ্যেই পর্তুগীজ সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণে বাধ্য—গোয়া, দমন ও দিউ-এ ভারতীয় পতাকা উত্তোলন—মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথ গোয়ার সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত—পাঞ্জিমের রাজপথে জেঃ চৌধুরীর (সর্বাধিনায়ক) বিপুল সম্বর্ধনা।

গোয়ার মুক্তিতে ভারতের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-উল্লাস—কলিকাতার জনসভায় গোয়ার সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

ভুবনেশ্বরে হৃদরোগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের (৬৭) জীবনাবসান।

২০শে ডিসেম্বর—৪ঠা পৌষ ঃ মহানগরীতে (কলিকাতা) সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেফের বিপুল সম্বর্ধনা—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সর্বাগ্রে রুশ রাষ্ট্রনায়কের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

॥ বাইরে ॥

১৪ই ডিসেম্বর—২৮শে অগ্রহায়ণ ঃ রাষ্ট্রসংঘে টাঙ্গানিকার (নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র) অন্তর্ভুক্তি—বিশ্ব সংস্থায় ১০৪-তম সদস্যরূপে স্বীকৃতিলাভ।

এলিজাবেথভিলেতে কাতাঙ্গী সৈন্য ও রাষ্ট্রসংঘবাহিনীর মধ্যে অব্যাহত সংঘর্ষ—সহরের সন্নিহিত স্থানে যুদ্ধের সংবাদ।

১৫ই ডিসেম্বর—২৯শে অগ্রহায়ণ ঃ লক্ষ লক্ষ ইহুদী হত্যার অভিযোগে অ্যাডলফ আইখম্যানের মৃত্যুদণ্ড—দীর্ঘ বিচারের পর ইস্রায়েলী আদালতের (জেরুজালেম) রায়।

১৬ই ডিসেম্বর—৩০শে অগ্রহায়ণ ঃ রাষ্ট্রসংঘে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসনদানের দাবী নাকচ—সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট প্রস্তাব ৪৮—৩৬ ভোটে অগ্রাহ্য।

গোয়ার প্রশ্নে উ থান্ট (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল) ও শ্রীনেহরুর মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান।

রাষ্ট্রসংঘবাহিনী কর্তৃক এলিজাবেথভিলের উত্তরাধ দখল—প্রেসিডেন্ট শোম্বের রাজধানী হইতে পলায়ন।

১৭ই ডিসেম্বর—১লা পৌষ ঃ কাতাঙ্গায় অবিলম্বে যুদ্ধাবসানের জন্য শোম্বের ব্যাকুলতা—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্টের জরুরী তার।

১৮ই ডিসেম্বর—২রা পৌষ ঃ এলিজাবেথভিল উপকণ্ঠে সাময়িক যুদ্ধবিরতির নির্দেশ—কাতাঙ্গীঘাঁটি হইতে অসামরিক লোকদের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ কমান্ডের ব্যবস্থা।

১৯শে ডিসেম্বর—৩রা পৌষ ঃ রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি-পরিষদে গোয়া প্রসঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী প্রস্তাবে রাশিয়ার ভেটো—পশ্চিমী গোষ্ঠীর ভারত বিরোধী চক্রান্ত চূর্ণ।

'পর্তুগালকে অবিলম্বে গোয়া, দমন ও দিউ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হউক'—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তিপরিষদের নিকট ভারতীয় প্রতিনিধি সি এস ঝার দৃপ্ত দাবী।

নিউগিনির (ওলন্দাজ কবলিত) মুক্তির জন্য সমস্ত শক্তি সমাবেশের নির্দেশ—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের ঘোষণা।

২০শে ডিসেম্বর—৪ঠা পৌষ ঃ কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী সিরিল এডুলার মধ্যে সাক্ষাৎকার—কিটোনায় (রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অধিকারভুক্ত) রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে আলোচনা সুরু।

পশ্চিম নিউগিনির সীমান্তে ইন্দোনেশীয় নৌবহরের মহড়া—সশস্ত্রবাহিনীকে প্রস্তুত থাকিবার জন্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের নির্দেশ।

গোয়ার প্রশ্ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে (নিউইয়র্ক) যাওয়ার পথে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের লণ্ডনে উপস্থিতি।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ সমস্যা ও সম্মেলন ॥

একদা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অতিশয় আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। তখন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের যাঁরা দিকপাল তাঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি শাখার সভাপতিত্ব গ্রহণ করতেন। এবং তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত, লেখকদের চিত্রসহ সেই সব প্রবন্ধ পাঠ করে পাঠকরা আনন্দলাভ করত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের বহু স্মরণীয় সাহিত্যসেবী এই সব সম্মেলনে যোগদান করে অনুষ্ঠানের সার্থকতা বৃদ্ধি করেছেন। বাঙালীর প্রবাস-জীবনের কয়েকটি শীতকালীন দিন সাহিত্য-আলোচনায় মুখর ও মধুর হয়ে উঠত।

তখনও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী এতটা পিছে হটে আসেনি। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেনি। সরকারী কর্মে, অধ্যাপনায়, আইন-ব্যবসায়ে বা চিকিৎসক হিসাবে বাংলার বাইরে বহু প্রতিষ্ঠাবান বাঙালী বাস করতেন। পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হলেও সেদিনের বিত্তশালী বাঙালীদের অতুলনীয় সাহিত্য-নিষ্ঠাই এই সব সম্মেলনকে সার্থক করে তুলত।

এমনই একটি স্মরণীয় প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৬-এ দিল্লী শহরে। দিল্লীর প্রবাসী বাঙালীরা সেবার মূল সভাপতি নির্বাচন করেছিলেন 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে। বাংলা সাহিত্যের এই চিরস্মরণীয় সাহিত্যিক সেই অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়।

এই সভাতেই কাশী থেকে যোগদান করেছিলেন সদ্য সরকারি চাকরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে এক রকম ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন 'উত্তরা'র প্রখ্যাত সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী। কেদারনাথ অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে সেদিন পড়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত রস-রচনা 'পেনসনের পর'। এই রচনাটি শুনে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কেদারনাথকে অভিনন্দন জানালেন, আর বাংলা সাহিত্য লাভ করল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একজন প্রথম শ্রেণীর লেখককে। দিল্লীর সভায় যিনি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করেছিলেন, উত্তরকালে তিনি সমগ্র বাঙালী পাঠক সমাজকে চমকিত করে গেছেন।

এই সভাতেই অমল হোম মহাশয় পাঠ করেন "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য"। সেই প্রবন্ধটিতে কল্লোল-কালিকলমের দলের নবীন সাহিত্যিক-দের প্রতি বক্রোক্তি ছিল। অমল হোমের সেই প্রবন্ধ বিচিত্র আলোড়ন শুরু করল। তখনকার কালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নবশক্তি'তে প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়ে প্রতিবাদ প্রকাশিত হত। সম্পাদক স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন প্রগতিবাদী তরুণ লেখকদের সমর্থক।

এই প্রবন্ধের ফলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "সাহিত্য ধর্ম"। যা নিয়ে পরে জোড়া-সাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে কয়েকদিনব্যাপী সাহিত্য সভায় কবি নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সম-কালীন সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সেই সব ঘটনা আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তখন বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি স্নেহ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে সাহিত্য-সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সকলের মধ্যেই প্রবাহিত ছিল। বাংলার নব-জাগৃতির কাল তখনও শেষ হয়নি। বাংলার সাহিত্যিক চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রে সেদিন দৈন্য ঘটেনি। বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা ও জীবনদর্শন একই সূত্রে গাঁথা ছিল। কনিষ্ঠ সাহিত্যিকরা সেদিন সাহিত্যাগ্রজ-দের সম্মান করতেন, মতান্তর মনান্তরে পরিণত হতে দেখা যায়নি কখনও।

কাল ভেদে রুচি ভেদ, এখন আর সেদিন নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থা যেমন ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে যেতে বসেছে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনও তেমনই আবিলতায় পরিপূর্ণ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট সংকট দেখা দিয়েছে। যতই কেন আমরা বলি না যে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে বসে আছি। মনন-শীলতায় আমরা একমেবাদ্বিতীয়ং একথা আর বলা যায় না। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আজ আর সর্বাধিনায়ক বসে নেই, এখন সবাই রাজা। যা খুশী করা যায়, যা খুশী বলা যায়। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙালীর সমাজ-জীবনে আজ

যে ব্যাধি প্রকট হয়ে উঠেছে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে, যাঁরা জাতীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করেন, তাঁদের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্প-সম্মত রস-সমৃদ্ধ সাহিত্য সর্বকালের আনন্দ বস্তু। কিন্তু জনপ্রিয়তার লোভে রচিত নিম্ন রুচির বীভৎস রসের পরিবেশন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। একথা সাহিত্য-পাঠক, সাহিত্য-লেখক এবং সাহিত্য-সমালোচক সকলেই জানেন, কিন্তু সতর্ক করার মত ক্ষমতায় আজ আর কেউ অধিরূঢ় নেই। সমাজের কল্যাণ কিভাবে সম্ভব সে আজ কে বলবে?

সাহিত্য-রাষ্ট্রে যখন সবাই রাজা, তখন সেই গণতান্ত্রিক সাহিত্য-রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের জন্য সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। সাহিত্য-সম্মেলন এমনই এক ক্ষেত্র, সেখানে সকল দলের, সকল মতের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। পারস্পারিক ভাব-বিনিময়ের ফলে সাহিত্যের পথ-নির্দেশ করবেন যাঁরা অগ্রজ চিন্তানায়ক যাঁরা নবীন তাঁরাও এগিয়ে এসে পেশ করবেন তাঁদের যুক্তি, প্রবীণকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করাই নবীনের ধর্ম।

সাহিত্য সম্মেলনে কিন্তু এই জাতীয় কোন কাজ কি সম্ভব? বাংলা সাহিত্যের আজ কি সমস্যা সর্বপ্রধান? বাঙালী লেখকের সামনে আজ কি প্রশ্ন সর্বাধিক প্রবল? সর্বভারতীয় এবং বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্পদের কি পরিচয়? রাষ্ট্রানুকূল্যের ফলে সাহিত্যিকদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে? রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?—এই সব প্রশ্ন নিয়ে কি এতটুকু আলোচনা হবে?

হয়ত হবে না। কারণ সাহিত্য-সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদের মধ্যে লিখনরত সাহিত্যিকরা সংখ্যায় মাইনরিটি। কলিকাতায় যে সাহিত্য-সম্মেলন হবে তার আবেদকদের মধ্যে মাত্র চার পাঁচজন ব্যক্তি সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত। বাকী অনেকের কোনো পরিচয়ই কারো জানা নেই।

এই সব কারণেই, সাহিত্য-সম্মেলন জমে না। একটিও প্রস্তাব, একটিও প্রবন্ধ, একটিও অভিভাষণ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ, দূরাগত প্রতিনিধি বা উৎসাহী সাহিত্যরসিকের মর্মমূলে প্রবেশ করে না। নৃত্য-গীত, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে আসল বক্তব্য চাপা পড়ে। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন শুধু হাসি খেলা আর প্রমোদের মেলা হয়ে শেষ হয়। বাৎসরিক সাহিত্য-সভা আনন্দ-সভা তথা হোক, তবে সেই সাহিত্য-সম্মেলনের এই বিরাট আয়োজনে সাহিত্যিক সমস্যাবলী যদি আলোচিত হয় তবেই সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের কল্যাণ সাধিত হবে, নতুবা তার সার্থকতা কোথায়?

নতুন বই

অগ্নিমিতা— (উপন্যাস) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক বাক-সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। অকস্মাৎ বাঙালী পাঠক আবিষ্কার করেছে তাঁর আবির্ভাব। দল-নিরপেক্ষ এই নবীন সাহিত্যিক মূর্তিকর যেমন কঠিন পাথরে কেটে প্রতিমার সঞ্চার করেন, তেমনই শিল্প-শক্তিতে সমৃদ্ধ। তাঁর এই আলোচ্য উপন্যাসটি শারদীয় দৈনিক বসুমতীর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশকালে বিশেষ সমাদর লাভ করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সতীনাশার থান—স্থানমাহাত্ম্যে স্মরণীয়। এই সতীনাশার থানকে ঘিরে আগুনের রঙে রাঙা স্বাহার মত মেয়ে, তার বোন বাসনা, বলাই দাস আর নন্দকে ঘিরে গল্প জমে উঠেছে। শেষ দৃশ্যে স্বাহার জীবনের ধূমকেতু নন্দের প্রত্যাবর্তন। তখন আর তার বেশী বাকী নেই জীবনের। স্বাহা চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। সে সেই নন্দর চিকিৎসা করল। বাসনার বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও সে আপন প্রাণ মন ঢেলে সেবা করল। তারপর কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে পরাণ চাটুজ্জের ভিটের দিকে মহোৎসবের আসর থেকে দেখা গেল আগুন জ্বলছে, সব জ্বলছে দাউ দাউ করে। সেই আগুনে স্বাহাও পুড়ে মরেছে। তাই স্বাহার আত্মাহুতির ফলেই সতীনাশার থান, স্থানমাহাত্ম্য লাভ করেছে। 'অগ্নিমিতা' উপন্যাসটির বক্তব্য বলিষ্ঠ এবং বিচিত্র, সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা—(আলোচনা)— অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শান্তি লাইব্রেরী। ১০বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বঙ্গসাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের বলাকা' নামক গ্রন্থে। 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনে হল এ পাখার বাণী দিল আনি শুধু পলকের তরে, পুলকিত

নিশ্চলের অন্তহীন অন্তরে বেগের আবেগ।"—সেই গতিবেগ বলাকা কাব্যগ্রন্থে। বলাকা কাব্যের সেই তত্ত্ব ও কাব্য সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন অভিজ্ঞ অধ্যাপক। নবীন, যৌবন গীত, গান, প্রেম, ছন্দ ও ছবি এই কয়টি ভাগে সমগ্র কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন দিক, বক্তব্য এবং মর্মবাণীর পরিচয় দান করেছেন লেখক। যে-নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং উপলব্ধির ফলে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব বর্তমান লেখকের মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে থাকায়, গ্রন্থটি নীরস বিশ্লেষণী গদ্যগ্রন্থে পর্যবসিত হয়নি। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ আলোচনার ফলে এই গ্রন্থটি মূল্যবান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু তুলনামূলক উক্তির উধৃতি ও ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, 'বলাকা' কাব্যের বাণী—নবীন হও। মৃত্যুর অন্তরে পশি জীবনের সীমানায় অমৃতের সন্ধান আনা। মৃত্যুঞ্জয় মহাকালের কাছে যা আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছে—সে চিরনবীন। চির-যৌবন জয়গান। বলাকা কাব্যের সেই গভীর মর্মবাণী অতিশয় সরল ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন লেখক এই আলোচনা-গ্রন্থে।

ফক্কড়তন্ত্রম—(কাহিনী) প্রথম পর্ব। অবধূত রচিত। প্রকাশকঃ গ্রন্থ প্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯। দাম—দু টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'অবধূতে'র বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অসীম। তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'বশীকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর সংগে সকল পাঠকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। তাঁর রচনায় এক অনাবিষ্কৃত জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে আছে এই নূতন জগতের রহস্য। অলৌকিক, আধিভৌতিক জগতে লেখকের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। আধুনিককাল বড় বিচিত্র। মন্ত্র, তন্ত্র, বশীকরণ, উচাটন, মারণ প্রভৃতি সে তেমন শ্রদ্ধা রাখে না। আবার তার প্রয়োজনের মুহূর্তে সে সব কিছুতেই বিশ্বাসী। সে অলৌকিকত্বের প্রতি আস্থাবান না হয়েও কৌতূহলী। "ফক্কড়তন্ত্রম"—মানব-মনের এক আঁধার গহনের ইতিহাস। বলাবাহুল্য সেই অন্ধকার পথে বিচরণ করা অতিশয় কঠিন কর্ম। 'ফক্কড়তন্ত্রমে'র মধ্যে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তার বিষয়বস্তুর যথেষ্ট শালীনতা নেই,—থাকার কথাও নয়, তবু যদি কিঞ্চিৎ সংযম এবং বিচারের সঙ্গে এই কাহিনীটি পরিবেশিত হত তাহলে রচনাটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হত। সেনসেসালিজম সাময়িকভাবে মানব মনকে আলোড়িত করে বটে, কিন্তু সেই ক্ষণমুহূর্তের অবসানে তার আর কোনও মূল্য থাকে না। অবধূত শক্তিমান লেখক, কিঞ্চিৎ সতর্কতা আর সংযমের সাহায্যে তিনি সহজেই এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

সাগর আকাশ—(কবিতা) অনিলকুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—দু টাকা।

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের কবিখ্যাতি অনেক দিনের। অনিলকুমারের কবিতা পাঠে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—'আধুনিককালের যে কলরোল অনেককে উদ্‌ভ্রান্ত করে অনিলকুমার ভট্টাচার্য তার ভেতর থেকেই মহৎ সংগীতের উপাদান খুঁজে যে বার করেছেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।' অনিলকুমার ভট্টাচার্যের এই কবিতাগুলি ১৩৬১ থেকে ৬৭-র ভিতর রচিত এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এবং কয়েকটি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতির প্রেম বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। কবি প্রকৃতির পূজারী, নিসর্গের শোভা আর পাখির গান তাঁকে আলোড়িত করলেও বাস্তবের বিচিত্র আকর্ষণ তাঁর আধুনিক মনকে আন্দোলিত করেছে। অনিলকুমারের এই সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহে তাঁকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

Rabindranath Tagore in Germany — Published by Max Mueller Bhavan, German Cultural Institute, New Delhi.

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী বৎসরে ম্যাক্সমূলার ভবনের এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থ। ১৯২১, ১৯২৬ এবং ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ জার্মানী ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সে সময়ে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির চোখে রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছিলেন তাঁদেরই আলোচনা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বিষয়ক মন্তব্যের একটি অজ্ঞাত জগতের উদ্ঘাটন হবে আশা করি এ আলোচনাগুলি থেকে। রবীন্দ্রনাথ ও রুডলফ একইনের পত্রালোচনা রয়েছে। তা-ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ "The Child" নামক বিখ্যাত কবিতাটি। আলোচ্য বৎসরে এ রকমের একটি গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ম্যাক্সমূলার ভবনের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

The Wayfaring Poet — Published by The Dunlop Rubber Co. (India) Ltd. 57B, Free School St. Calcutta-16.

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডানলপ কোম্পানীর এটি শতবার্ষিকী উৎসর্গ। রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। চির-অজ্ঞাতকে জানার যে প্রেরণায় তিনি পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার পরিচয়কে সার্থক রূপদানের চেষ্টা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার উধৃতি দ্বারা গ্রন্থটি যেমন সমৃদ্ধ—তেমনি সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর জীবনের পরিচয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এ অসামান্য প্রচেষ্টার সার্থক রূপদানের জন্য শ্রীচিন্মোহন সেনানবীশ ধন্যবাদার্হ। তা-ছাড়া অনুবাদ কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রী জি পি গাঙ্গুলী, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীপ্রভাত গুহ, শ্রীসমর সেন, শ্রীসুরেত ব্যানার্জি, শ্রীটগর হক এবং শ্রীক্ষিতীশ রায় প্রভৃতি। নানা কাজে সহায়তা করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। অনেকগুলি সুদৃশ্য আলোকচিত্রও রয়েছে। ডানলপ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ বিচিত্রা

।। চিত্র তারকার বিপদ ।।

"সিঙ্গাপুর এবং মালয়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ব্যাপার নিয়ে আমি অসংখ্য গালমন্দভরা চিঠি পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না তাদের এই উগ্র মনোভাবের কারণ কি।"—এ অভিযোগ জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরের একুশ বছরের চিত্র তারকা— সারা আবদুল্লা।

সারা সিঙ্গাপুরের বিমান বন্দরে ব্রিটিশ সংগীত-শিল্পী ক্লিফ্ রিচার্ডসকে প্রকাশ্যে চুম্বন করে। ফটোগ্রাফারগণ যেকোন মুহূর্তকে ধরে রাখার জন্য সব সময়েই তৈরী হয়ে থাকে। তাদের তৎপর ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই চুম্বনদৃশ্য। সারা আবদুল্লা আর ক্লিফ্ রিচার্ডসের চুম্বনদৃশ্যের এই যুগল ছবি ছাপা হল মালয়ী এবং ব্রিটিশ সংবাদ-পত্রগুলিতে। রিচার্ডসের কিছু না হলেও সারার বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে খুব সমালোচনা হচ্ছে। সারা-রিচার্ডদের এই ছবি ছাপার পর থেকে সারা কেবলমাত্র সমালোচিতই হচ্ছে না অপমানিতও হচ্ছে। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। চিত্র তারকার চুম্বন এখন অশ্রুজলে পরিণতি লাভ করেছে। সারা অ্যাংলো-এশীয় নিউজ-সার্ভিসের সংবাদদাতার কাছে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অভিযোগ জানিয়েছে।

ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে। সিংগাপুরের অ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীইনচে আহ্মদ বিন মহম্মদ ইব্রাহিম যদিও বলছেন যে সারার প্রকাশ্য স্থানে চুম্বনের বিরুদ্ধে সিংগাপুরের মুসলিম ধর্মীয় আদালতের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু সারা মালয়ী মুসলিম মিশনারী সমিতি বলছেন যে মুসলিম ধর্মীয় আদালত থেকে সারার কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। যাইহোক সারার অবস্থা বিপজ্জনক হলেও সে কিন্তু অন্য কথা বলছে। তার মতে চুম্বন করার মধ্যে কোনরূপ অস্বাভাবিক বা অমানবিক বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না।

॥ অভিনয়ের অভিনয় ॥

যা একদিন অভিনয়ের অংগ ছিল তা আজ বাস্তবে সম্ভব হল। অর্থাৎ দু'বৎসর আগে পশ্চিম জার্মাণীর ডুসেলডর্ফ সহরে একটি মূল্যবান হীরা-জহরতের দোকানে টেলিভেসনের জন্য একটি ডাকাতির চিত্র গৃহীত হয়। দোকানে ঢুকে ডাকাতের দল দশ লক্ষ ডলার মূল্যের অলংকার হস্তগত করে। তাদের এই দ্রুত কার্য সমাপ্তিতে জনতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই বিস্মিত জনতার দিকে গুলী চালাতে চালাতে ডাকাত দল পলায়ন করে। ছবিটি তোলবার পর সমগ্র পশ্চিম জার্মানীতে দেখান হয়। তখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে এই ঘটনা একদিন সত্য হয়ে দেখা দেবে। দোকানের মালিক এখবর জানতে পারলে হয়ত এপথে যেতেন না।

কিছুদিন আগে এক ডাকাত দল এই চিত্রটি পুরোপুরি অনুকরণ করেছে। ডাকাতি করবার জন্য ডাকাত দল ঘরে ঢুকল, কিভাবে সিন্দুক ভাঙ্গল, অলংকারসমূহ হস্তগত করল, কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল, কিভাবে গুলি চালাল তা টেলিভেসন চিত্রটির সংগে হুবহু মিলে গেছে। অর্থাৎ টেলিভেসন চিত্রটি এদের ডাকাতি করতে শুধু প্ররোচনাই দেয়নি পদ্ধতিটিও শিখিয়ে দিয়েছে। বিগত অভিনয়ের এ পুনরাভিনয়টি আশ্চর্য নয়কি!

॥ শততম রজনীর অভিনয় ॥

পাঁচশততম রজনীর অভিনয় দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। খুব বেশী হলে এক সহস্র রজনীর অভিনয়ের বেশী আমাদের দেশে কল্পনা করা যায় না। তাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে থাকে।

কিন্তু বিদেশের কথা শুনলে আশ্চর্য হওয়ার কথা। বিদেশে যেটি এখনও রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে সেটি লসএঞ্জেলস থিয়েটার মার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যে বইটি এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে তার নাম "দি ড্রানকার্ড"। ১৯৩৩ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পুনরাভিনয়ের মধ্য দিয়ে বইটির ৯,৪৭৭টি অভিনয় হয়। এখনও পর্যন্ত এটি বিশ্বে রেকর্ড হিসাবে গণ্য। কিছুদিন আগে আগাথা ক্রিস্টির "দি মাউস ট্র্যাপে"র অভিনয় দশ বৎসরে পদার্পণ করল লন্ডনের অ্যামবাসেডার্স থিয়েটারে।

ব্রিটিশ থিয়েটারের ইতিহাসে "মাউসট্র্যাপ"ই হচ্ছে সব থেকে দীর্ঘদিন অভিনীত। ১৯১৬ সালে লন্ডনে অভিনীত অস্কার এস্কির "চু-চিন-চাও"-এর রেকর্ড ছিল ২,২৩৮টি অভিনয়। "মাউসট্র্যাপ" পাঁচ বছর আগেই এরেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল।

"মাউসট্র্যাপে"র এ অভিনয় দেখে যেমন আমাদের বিস্ময় জাগে তেমনি "দি ড্রানকার্ডে"র অভিনয়ের কথা শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কথা। যেদেশে একটি রঙ্গমঞ্চের আয়ু একশত বৎসর নয় সেখানে এরূপ দীর্ঘ-দিন অভিনয়ের কল্পনা করা যায় না। তাই পাঁচশত রজনীর অভিনয় দেখেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

॥ পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র ॥

বর্তমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে পোল্যাণ্ডের স্থান খুবই উচ্চে। পোল্যাণ্ডের "ক্যানাল", "এ্যাসেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ড", "ইভ ওয়ান্টস্ টু স্লিপ" এবং সম্প্রতিককালের "মাদার জোয়ান অব্ দি এঞ্জেলস্" আমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত। ঐ সমস্ত চিত্র উৎপাদন করে পোল্যাণ্ড কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং বাজার লাভ করেনি, উপরন্তু একটি বিরাট দেশীয় শিল্প গড়ে তুলেছে। বিরাট বিরাট স্টুডিও গড়ে তুলেছে চিত্রের সামগ্রিক উৎপাদন হারও বেড়ে গেছে ভীষণভাবে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৪২টি পূর্ণ কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩টি চিত্রে গিয়ে দাঁড়ায়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বৎসরে ৩৫টি করে কাহিনী-চিত্র নির্মিত হবে। বিশ্বের চলচ্চিত্ররসিক মাত্রেরই নিকট এটি সুখবর।

কিন্তু কাহিনী চিত্রই আধুনিক চলচ্চিত্রের সব কিছুই নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের সাহায্যে নানাবিধ তথ্য প্রদান ও আনন্দ করা হয়ে থাকে। এরকম তথ্য-চিত্র বা শিক্ষামূলক চিত্র বা নীতিমূলক চিত্র পোল্যাণ্ডে বৎসরে ৪০০-এর বেশী নির্মিত হচ্ছে।

পোল্যাণ্ডে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্র-গুলিও দেখান হয়ে থাকে। দেশের অধিকাংশ চিত্রগৃহে চিত্রগুলি দেখানর ফলে জনসাধারণ সমভাবে দেশী ও বিদেশী চিত্রগুলি দেখতে পারে। ১৯৫৯ সালে চিত্রগৃহে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০২,৫০০,০০০, এর মধ্যে ৩১,৭০০,০০০ জন পোলিশ চিত্র দেখতে পায়।

একটি পূর্ণ-দীর্ঘের পোলিশ চিত্র নির্মাণে সাধারণত যা খরচ হয় তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। সব থেকে বেশী খরচায় নির্মিত চিত্রটি হচ্ছে "দি নাইটস্ অব দি ক্রস"। এটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল ৩২ লক্ষ জলোটিস্। এ সমস্ত চিত্রগুলি যে অর্থ-ব্যয়ে নির্মিত হয় তার পরিমাণ যাই হোক না কেন অন্ততঃ বেশ কিছু অর্থ আয় হয় এর থেকে। নানাভাবে চিত্রের উন্নতি সাধন করে পোল্যাণ্ড কেবলমাত্র বিশ্বের বাজার দখল করছে না—একটি বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলে জাতি ও সভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়তা করছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রজীবনীর চিত্রনাট্যরূপ লেখার উদ্দেশে গত বছর জুন মাসের তিন সপ্তাহ কাটে আমার দার্জিলিং শহরে। সেই সময়ে সকাল-বিকাল কাজের ফাঁকে Mall-এ গিয়ে বসা বা Mall-এরই আশেপাশে জলাপাহাড় রোড, অবজারভেটরি হিল বা বার্চ হিল রোডে ইতস্তত ভ্রমণ—এ ছিল দৈনিক রুটিনের অন্তর্গত।

ছেলেবেলায় একাধিকবার দার্জিলিং গিয়েছি। কিন্তু Mall এর যে একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে সেটা এবারই প্রথম লক্ষ্য করলাম। এক বর্গমাইলেরও কম এই একটি জায়গায় যে গল্পের কত খোরাক লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, বছরে দু'বার মাসাধিককাল-ধরে ধনী-দরিদ্র, নব্য-প্রাচীন, দেশী-বিদেশীর এমন চিত্রবৈচিত্র্যময় সমাবেশ বাংলা দেশে আর কোথাও ঘটে বলে আমি ত জানি না।

সাধারণ মানুষের চরিত্রও (হয়ত বা বিশেষ করে সাধারণ মানুষেরই) দার্জিলিং-এর কুয়াশাবৃত রূপকথা-সদৃশ মহিমাময় পরিবেশে অন্তত সাময়িকভাবে একটি বিশেষ রূপ নিতে বাধ্য।

এই পরিবেশ ও চারিত্রিক উপাদান থেকে একটা বিশেষ ধরনের চিত্রনাট্য গড়ে উঠতে পারে এ-ধারণা আমার গতবারই হয়েছিল। গত আশ্বিনে দার্জিলিং-এর সঙ্গে দ্বিতীয় পরিচয়ের কালে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়। কাহিনী রচিত হয় এর কিছু পরেই।

ছেলেবেলায় একাধিকবার সমাগত একটি ধনী বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী। রায়-বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী হলেন এই পরিবারের হর্তাকর্তাবিধাতা। ইন্দ্র-নাথের সঙ্গে সাহেবী হোটেল উইণ্ডারমিয়ারে এসে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা, শ্যালক জগদীশ, বড় মেয়ে অনিমা ও তার স্বামী শংকর, ছেলে অনিল ও ছোট মেয়ে মনীষা।

অলকানন্দা রায় ও এন বিশ্বনাথন্

এদের কোন-না-কোনটির সঙ্গে ঘটনাচক্রে সংশ্লিষ্ট আরো চারটি চরিত্র হল, সদ্যবিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়ার প্রণব, মধ্যবিত্ত বেকার যুবক অশোক ও অতি-আধুনিকা ইঙ্গ-বঙ্গ তরুণীদ্বয় শীলা ও মিলি।

এ ছাড়া আছে ইংরাজ, নেপালি, তিব্বতী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় মানুষের পার্শ্বচরিত্র। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সব পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করার জন্য দার্জিলিং-এর স্থায়ী বাসিন্দাদের রাজি করাতে কোন অসুবিধা হয়নি।

এক কথায় বলতে গেলে, একই শহরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে একটি পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের, একটি দিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার নাটকীয় বিবরণ হল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'।

স্থান কাল পাত্রের দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য ত বটেই, এমন কি পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও, রঙের ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে বলে আমি মনে করি।

রঙের নানান সমস্যার ইঙ্গিত ও আলোচনা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা রইল।

কাঞ্চনজঙ্ঘা চিত্রে অনুভা গুপ্তা ও সুব্রত সেন

'ডকুমেণ্টারী' ছবির ভবিষ্যৎ

নির্মলকুমার ঘোষ (এন-কেজি)

ডকুমেণ্টারী ফিল্ম বা প্রামাণিক চিত্র চলচ্চিত্রেরই একটি প্রলম্বিত প্রশাখা। তবু এর ধর্ম চলচ্চিত্রের থেকে ভিন্ন। চলচ্চিত্রের প্রধান লক্ষ্য আনন্দ দান আর তার মূল উপাদান প্রাত্যহিক জীবনের নাটকীয় অংশগুলির বিশেষত্ব সাধন। ডকুমেণ্টারীর ধর্ম সম্পর্কে জন গ্রিয়ারসনের অভিমত এই যে, এর তথ্য কখনো পরিচালকের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে না, ক্যামেরার সাহায্যে নাটকীয়তার মানসরসে ভিজিয়ে জীবনের যথাযথ প্রতিফলন করাবে। এই জাতীয় চিত্রের ভিত্তি রচিত হয়েছে সেই বহুবিদিত "দৃষ্টিই বিশ্বাস" বা "Seeing is believing নীতির ওপরে: তার এরা জনসাধারণের গোচরে আনে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথে সরকারী বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের মতন প্রস্ফুটোন্মুখ গণতন্ত্রে জনসাধারণকে তাদের নিজেদের ও তাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন করার কাজে ডকুমেণ্টারী চিত্রের জুড়ি মেলা ভার।

ভারতীয় নাগরিকের উন্নততর জীবনযাত্রার পথে প্রামাণিক চিত্রের অমিত সম্ভাবনা উপলব্ধি করে ভারত গভর্ণমেণ্টের তথ্য ও বেতার সরবরাহ দপ্তর Ministry of Information & Broadcasting ১৯৪৮ সনে ফিল্মস ডিভিসন নামে একটি দপ্তরের প্রবর্তন করেন। আজ গৌরবের সঙ্গে বলা যায় যে, পৃথিবীর দলিলচিত্র প্রযোজক গোষ্ঠীর মধ্যে ভারতের ফিল্মস ডিভিসন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে এই ডিভিসন বছরে প্রায় ১০০টি চিত্র প্রযোজনা করে· তার মধ্যে কয়েকটি টেলিভিসনে প্রদর্শনের নিমিত্ত পুনঃপ্রযোজিত হয়েছে: কুড়িটি Production Unit ছাড়া ডিভিসন বেসরকারী প্রযোজকদের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হন সরকারী চলমান সংস্থা সেগুলিকে সহস্রাধিক গ্রামের অন্ধকার কোণে বহন করে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে: যেমন— The Green Heritage, Spring comes to Kashmir, রাধাকৃষ্ণ, খাজুরাহো প্রভৃতি।

চিন্তাধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার প্রতি সাধারণের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। তারই ফলে প্রামাণ্যচিত্রের লক্ষণীয় অগ্রগতি। গ্রিয়ারসনের সংজ্ঞা এ জাতীয় চিত্র সম্পর্কে এখনও প্রযোজ্য, তথাপি বাড়তি কিছু এদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে যার ফলে প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে জগৎব্যাপী একটি নূতনত্বের আমদানী হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র আজ তথ্য উপেক্ষা করে নাটকীয়তার দিকে ঝুঁকেছে যদিও সেই সঙ্গে documentary ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সীমারেখা প্রায় বিলীন হবার উপক্রম হয়েছে। এর প্রধান কারণ ডকুমেণ্টারীর কল্পনা সুন্দর কলাকৌশলের অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ চিত্রের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে কতকগুলি ডকুমেণ্টারী চিত্রে বিলীয়মান সীমারেখাটিকে অতিক্রম করা হয়নি, Target for to-night বা Listen to Britain পূর্ণাঙ্গ চিত্রের অবয়ব অনুসরণে পরিপুষ্ট ও অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে কিন্তু তথ্যচিত্র গৌরব অর্জন করতে গিয়ে আজ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। এখানকার প্রামাণিক চিত্র চিত্র যতটা ততটা প্রমাণ বলিষ্ঠ নয়। এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বরেণ্য মনীষীদের রূপে আবির্ভূত হন সাবধানী "make-up man"-এর প্রসাদধন্য কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী। তথ্যচিত্র বাস্তবতার দাবী রাখে বলেই আজ হতে বহু বছর পরে যদি এই ছবিগুলির নেগেটিভ ব্যবহার করা হয় তবে প্রকৃত মনীষী তলিয়ে যাবেন পেশাদারের সুষ্ঠু রূপসজ্জার আড়ালে। অভিনেতার কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গীসমূহ আসলের পূর্ণমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। এর আইনগত দুর্বলতা ছাড়াও নীতিগত ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ impersonation, আইনের চোখে একটি

অপরাধ, documentary ছবিতে document বা তথ্য বিরোধী কাজকে সে আইনের আওতায় ফেলা যায়। দ্বিতীয়তঃ দেশের জ্ঞানবৃদ্ধগণ সম্মিলিতভাবে যে ফাঁকি শুধু সয়ে আসছেন তাই নয় অভিনন্দিত করে আসছেন ও দেশের গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের সুখ, সমৃদ্ধি এবং ঐতিহ্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে যা অনুমোদন করে আসছেন ভবিষ্যৎ পুরুষ মহা আড়ম্বরে তাকে Truth and whole truth বলে গ্রহণ করবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই কিন্তু সত্যের প্রতি এই চরম ঔদাসীন্যে দুঃখ আছে।

চিত্র বিশেষকে হৃদয়গ্রাহীকরে তুলতে হলে সত্যের সীমা লঙ্ঘন করতে হয় এ কথা অনস্বীকার্য। তবু মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তাকে এড়িয়ে গেলে কিছু কায়িক শ্রমের সাশ্রয় হলেও সত্যের অপলাপ ঘটে। যেখানে মানুষী ক্ষমতার অবসান শুধুমাত্র সেখানেই নাট্যরসের খাতিরে কৃত্রিমের আনয়ন সমর্থন করা যায়। Walt Disney'র Living Desert একটি সার্থকনামা ডকুমেন্টারী চিত্র। প্রাণতুচ্ছ করে সেখানে ফটোগ্রাফার এগিয়ে গিয়েছেন সাপ ও বাঘের সংঘর্ষ তুলতে, যথাযথ একটি দৃশ্য
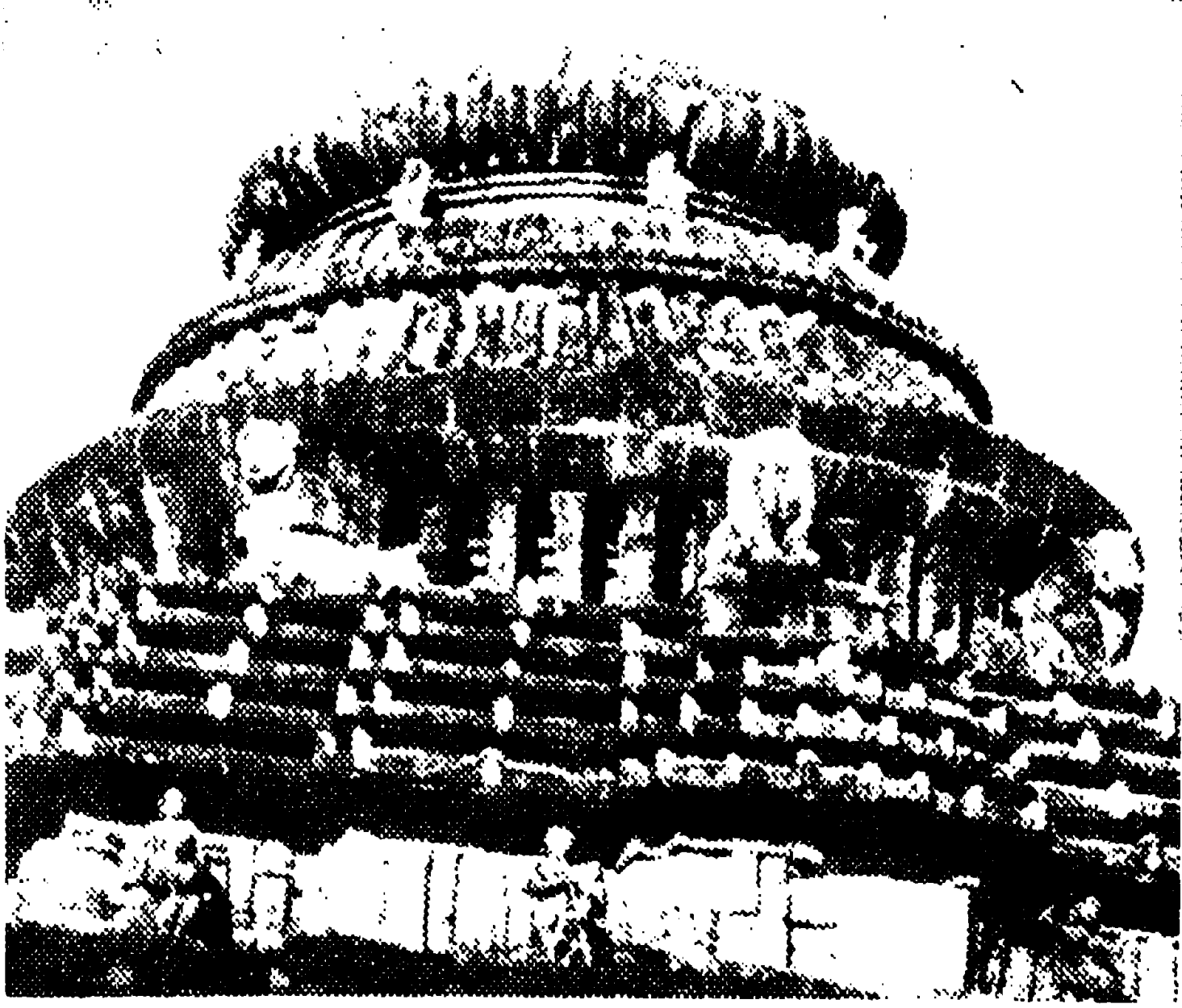
কণারক —ফিল্ম ডিভিসন

নাটকীয়ভাবে গ্রহণ করার জন্য দিনের পর দিন ফেটোগ্রাফার অপেক্ষা করেছেন জন-বিরল অরণ্যে—ক্যামেরার খেলায় সমস্ত মরুভূমি প্রাণমন্থনে সজীব হয়ে উঠেছে। তথ্যচিত্রের বৃহৎ ধর্ম এই যে তা জগৎ সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্র নীরব ভাষায় মুখর করে তোলে; কাহিনীহীন, সংলাপহীন নাটকীয়তায় দৃশ্যপট আচ্ছন্ন রাখে। নাটকীয় উপাদানের রসোপলব্ধিতে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই শুধু Living Desert এর দৃশ্যবিশেষে দেখি কিছুটা নকলের আমদানী; বিষধর সর্প বিবরে প্রবেশ করার পরের দৃশ্য প্রামাণ্য নয় কারণ সে দৃশ্যের রূপাংকণ মানুষের গোচর ক্ষমতার অতীত। এ ক্ষুদ্র কৃত্রিমতা ও কল্পনাও সত্যাশ্রয়ের নামান্তর কারণ অনুবর্তী অংশে যা প্রস্ফুট করা হয়েছে তা নিছক কল্পনার বস্তু নয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে সত্যের অনুধাবন যে সত্যাশ্রয়িতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না "রবীন্দ্রনাথ" চিত্রে তারা চ্যাটার্জি অঙ্কিত বালক রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে বা তপন সিংহ প্রযোজিত দিলীপ রায় অভিনীত আচার্য জগদীশচন্দ্র চরিত্রে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে আশা করা যায় যে প্রকৃতির ওপরে মানুষের ক্ষমতা দৃঢ়তর ও সেই সংগে ডকুমেন্টারীর ভবিষ্যৎ উন্নততর হবে।

লিটল এ্যামবাসেডরস্ —ফিল্ম ডিভিসন

বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে ডকুমেন্টারীর জন্যে উজ্জ্বল স্বর্ণময় এক ভবিষ্যৎ পথ চেয়ে রয়েছে। এর আয়ু নাটক বা উপন্যাসের ওপরে নির্ভরশীল নয়। জীবন নিয়ে এর কারবার। একদিকে রয়েছে রূপে-রসে গড়া প্রকৃতি অপরদিকে দৈনন্দিন ও রাজনৈতিক জীবনের প্রাত্যহিক মালিন্য ও অফুরন্ত জীবনরসের ভাণ্ডার। আখ্যান

বস্তুর এই প্রসার দলিলচিত্রের সামনে অনন্ত গৌরবময় ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিয়েছে, মানুষের জীবনদর্শন যত ব্যাপ্ত ও গভীর হবে ডকুমেন্টারীর কৌশল তত উন্নততর হয়ে উঠবে। এই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন রবার্ট ফ্লাহার্টি Walt Disney প্রমুখ কৃতি ও চিন্তা-শীল ডকুমেন্টারী প্রযোজকেরা। এ'দের

স্বাস্থ্যের জন্য যৌগিক ব্যায়াম

চিত্র অনিন্দ্য তথ্যচিত্র. ভারতীয় ডকুমেন্টারী নামধারী চিত্রগুলির ন্যায় পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ নয়। Short film ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা feature film উভয়েরই চরিত্র প্রামাণ্যচিত্র হতে বিশিষ্ট। তথ্যের প্রতি আনুগত্য ও সূক্ষ্ম নাট্যরসের অতুল সংমিশ্রণ ডিজনী বা ফ্লাহার্টি বা পল রোথার চিত্রে লক্ষ্যণীয়। , সত্যের প্রতি অটুট আনুগত্য পূর্ণাঙ্গ নাটকচিত্রে বিরল এবং আশা করবারই নয়। তাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণের আনন্দবর্ধন ও তাদের নীতি অবাস্তব পরিবেশ রচনা করা—যে পরিবেশ দর্শক বাস্তব জীবনে পায় না কিন্তু যে পরিবেশ সে তার স্বপ্নিল অলস মুহূর্তগুলোতে কামনা করে। তাই নাটকচিত্র মালিন্য ও কলুষতা ঢেকে দেয় উজ্জ্বল আলোয়, কৃত্রিম সৌন্দর্যে। হয়তো কিছুদিন আগে চিত্র প্রযোজকদের এ ধারণা অভ্রান্ত ছিল এবং কিন্তু আজ শিক্ষাদানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, বিজ্ঞানের যুগের নাগরিককে আনন্দের দোহাই দিয়ে অবাস্তবের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষ্ফল প্রচেষ্টা। এরই মধ্যে নিহিত আছে ডকুমেন্টারীর সাধারণের মাঝে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, কারণ নাটক চিত্রের চেয়েও অধিক কলা-কৌশল ও প্রয়োগ-বিজ্ঞান প্রয়োজন এক উৎকৃষ্ট প্রামাণ্যচিত্রে। তার প্রতিটি মুহূর্তে ঘটনার সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা দরকার, কিন্তু সেই অবলীলায় কিছুতেই যেন না থাকে নাটকীয় কাহিনী হতে আমদানী করা উত্তেজনা। প্রকৃষ্ট তথ্যচিত্রের জন্য প্রয়োজন চিত্রের স্বচ্ছন্দগতি, ভারসাম্য, রম্য ও উপযোগী ভাষা, যা দুর্বহ হয়ে উঠছে না অতি উত্তেজিত ও প্রকাশোন্মুখ সঙ্গীতের প্রাবল্যে—কারণ আভরণের প্রয়োজন সত্তাকে উপযোগী পারি-পার্শ্বিকে প্রকাশ করার জন্য চিত্রের বাহ্যিক প্রয়োগশিল্পে তার গন্ডী টানা আছে, সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তার নেই। একথা ভারতীয় প্রমাণচিত্র প্রযোজকরা প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছেন। ডিজনীর কার্টুন চিত্রে প্রয়োগশিল্পের যে নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তা পূর্ণাঙ্গ নাটকচিত্রের পক্ষেও শিক্ষণীয়।

নাটকের আছে কল্পনায় রঙ্গীণ নিজস্ব এক মোহিনী শক্তি যার মূলধন হোলো মানব মনের নিহিত কামনা-বাসনা হাসি-কান্না নিয়ে যাদুকরী খেলা। সে খেলার মায়াদণ্ড হোলো মানুষের মনের অলিগলির সুলুক-সন্ধান! কিন্তু তবু বলবো নাটক নাটকই। বিশেষ একটি বা কয়েকটি চরিত্রের আবেগ নিয়ে সে যে বস্তু গড়ে তোলে তা সত্যের বর্ণাঢ্য অতি অঙ্কনমাত্র; সত্যের প্রতিফলন নয়। এক, দুই, তিনের মধ্যে যে বিশ্বমানব বিরাজ করে তাই নিয়ে কারবার পূর্ণাঙ্গ নাটকচিত্রের। কিন্তু ডকুমেন্টারীর পরিধি ও প্রকার হোলো বহু মানবের মধ্য থেকে এই মানবাত্মার আবিষ্কার। সেই জীবন ছড়িয়ে আছে সাধারণের জীবনের প্রতি-দিনের আবর্তে। এবং অবশ্যই প্রকৃতির উদার আহ্বানের মধ্যে। তাই বলি ডকু-মেন্টারীর নির্মাতাকে ভাড়া করা ষ্টুডিও সেট ও পেশাদারের নিপুণ অভিনয় ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে উপাদানের সন্ধানে নেমে আসতে হবে প্রতিদিনের পথের ধুলোয় মানুষের চলমান জীবন-স্রোতের মধ্যে—যে জীবনের সঙ্গে মুহু-মুহু আলিঙ্গন ঘটে প্রকৃতির অনন্ত-লীলায়। সেখানে ডাকহরকরাকে দেখাতে হলে যেতে হবে ডাকহরকরারই কাছে

বলায়-কথনে-চলনে, আচরণে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অপরূপ হয়ে ফুটে উঠবে।

এই মহৎ দায়িত্বের কথা বোধ করি আজ বিস্মৃত হতে বসেছেন আমাদের সরকার আশ্রয়ী ফিল্ম ডিভিসন। যাঁরা তাঁদের নানা গুণে সুন্দর ক্ষুদ্র তথ্যচিত্রগুলিকে কলঙ্কিত করতে বসেছেন এই সত্যানুগত্য হারিয়ে। তাঁরা আজ যা করছেন তা সত্যের বিকৃতি করেন, কৃত্রিমকে সত্যের অবগুণ্ঠনে মুড়ে মুড়ে তাঁরা বাজারে মাল সরবরাহ করছেন। তাঁদের সামাজিক উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধ অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নয় কিন্তু সে দায়িত্ব কখনোই সম্পূর্ণভাবে পালিত হতে পারে না ভাড়া করা একই অভিনেতা-অভিনেত্রীগোষ্ঠী নিয়ে বা ষ্টুডিওর সেটে বহির্জীবনের অনুকৃতি দিয়ে। ডকুমেণ্টারীর শিল্পীর আবিষ্কার ঘটবে আমাদের অযুত নর-নারীর সাধারণ জীবনের মধ্যে, তাকে কোনো কৃত্রিম নাট্যশিক্ষা দেওয়া হবে না, Director এর নির্দেশ মাফিক চলনে, বলনে বা কণ্ঠ নিক্ষেপণে তাকে ওয়াকিবহাল করে তোলবার চেষ্টা হবে না। যথাসম্ভব তাদের সহজ হতে দিতে হবে, ভুলতে দিতে হবে Camera ও Sound-কে। এখানে পরিচালকের উদ্দেশ্য হবে Camera'র সামনে জীবন ফুটিয়ে তোলা নয়; চলমান জীবন স্রোতের অংশ বিশেষ Camera-য় ধরে রাখা। এই প্রসংগে মনে পড়ে এক বিখ্যাত পাশ্চাত্য ডকুমেণ্টারী নির্মাতার কথা যিনি রণ-প্রাঙ্গণের এক নিখুঁত প্রামাণিক চিত্র তুলতে গিয়েও ট্যাঙ্কের আওয়াজকে এমন এক কৃত্রিম উপায়ে শব্দবন্ধ করতে চেয়েছিলেন যা নাকি পরে সেনাবাহিনীর লোকেরা বলেছিলেন, মোটে ট্যাঙ্কের সত্য শব্দানুলেখন নয়। চিত্র নির্মাতার উঁচু মাথা—এই মন্তব্যে হেঁট হয়ে গিয়েছিলো।

তাই বলি ডকুমেণ্টারী নির্মাতাকে বেরিয়ে আসতে হবে নতুন কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাট্যচিত্রের কঠিন নির্মোক থেকে। আরও ভালো হয় যদি সে পরিচালক আমরা আবিষ্কার করে নিই শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে থেকে নাট্যচিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যাঁদের obsession ঘটেনি। এই চিত্র নির্মাতারাই নতুন করে খুঁজে পাবেন নতুনতর কল্পনায় সমৃদ্ধ ও সত্যে বলিষ্ঠ নতুন শিল্পী—যারা শিল্পী নয়, শুধু ক্যামেরার সাহায্যে বিশেষ জীবনকে একবারই মাত্র ফুটিয়ে তুলবেন একটি বিশেষ জীবনের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে।

হয়তো এতে অযুত সত্যজিৎ-তপনানুরাগীরা (যে গোষ্ঠীর একজন বলে আমিও গৌরব বোধ করি) ক্ষুব্ধ হয়ে বলবেন: "তবে কি—রবীন্দ্রনাথ বা 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' প্রামাণিক ছবি রংগে, রূপে ও রসে ফুটিয়ে তোলার মহৎ প্রয়াস হবে না, শুদ্ধমাত্র নির্বাচিত শিল্পী দিয়ে ঐ মহামানবদের মিথ্যা চরিত্রাঙ্কনের কলঙ্ক এড়াতে উত্তরে বলবো, নিশ্চয়ই সে ছবি হবে, কিন্তু তাতে যেন থাকে আপোষহীন সত্যেরই জিৎ সত্যেরই তপন-কিরণ যেন তাতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কি হবে তার প্রয়োগপদ্ধতি, কেমন করে দেখাবো বালক রবিকে, দেখাবো আচার্য জগদীশচন্দ্র বা নেতাজীকে উত্তরে বলব, যেমন গভীর সত্য সুন্দর করে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছেন শ্রীশান্তি চৌধুরী তার অপরূপ "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" ছবিতে, দেখিয়েছেন নন্দলালকে শ্রীমান আশীষ মুখোপাধ্যায় তার "রূপকার নন্দলাল" ছবিতে, ছন্দ ও চিন্তা গভীর কল্পনার সাহায্যে, শুধু প্রতিকৃতি দিয়ে ছবি দিয়ে, অঙ্কন দিয়ে। তার মধ্য দিয়ে যে কালাতীত রবীন্দ্রনাথ ও যে নন্দলাল ধরা দিয়েছেন আমাদের মনের গভীরে তার বুঝি তুলনা নেই। জয় হোক এই এই নতুন যুগের পথিকৃৎদের।

আজকের থিয়েটারে পরিচালক

ধনঞ্জয় বৈরাগী

দর্শক হিসাবে যখন আমরা নাটক দেখতে যাই, তখন দেখি, মঞ্চের উপর অভিনেতাকে, দেখি তাদের সাজ-পোষাক দেখি আঙ্গিক, শুনি সংলাপ, আবহ-সংগীত। কিন্তু যার কথা শুনতে পাই না, যাকে চোখেও দেখতে পাই না অথচ যার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে নাটকের সাফল্য, তার-ই নাম পরিচালক।

পরিচালক শব্দটি আমি ব্যবহার করছি, অনেকে অবশ্য সেকেলে বলে আজকাল ঐ শব্দটিকে বর্জন করেছেন, যার বদলে তাঁরা হয়ত লিখবেন—নির্দেশক বা প্রযোজক। কারণ, ইংরাজী প্রতিশব্দ ছবির রাজত্বে Director, কিন্তু মঞ্চ-রাজ্যে Producer। আমি অবশ্য বেশী বাক্-বিতন্ডার মধ্যে প্রবেশ না করে বলব—নামে কি আসে যায়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক, সে যেমন গোলাপই থাকে, সেই রকম নির্দেশক, প্রযোজক, পরিচালক যে ভাবেই উল্লেখ করি না কেন, সেই একজন ব্যক্তিকেই বোঝায়। নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে যিনি একচ্ছত্র সম্রাট। ক্রিকেট খেলার মাঠে যেমন ক্যাপ্টেন, বিলাতী অর্কেষ্ট্রার ক্ষেত্রে যেমন কন্ডাক্টার, পুতুলনাচের বেলায় যে রকম সূত্রধার, ঠিক সেই রকম নাটকের ক্ষেত্রে পরি-চালক। আমরা কত সময় দেখেছি, অনেক-গুলি ভাল ব্যাটস্‌ম্যান বেশ কয়েকটি ভাল বোলার-সম্বলিত ক্রিকেট টিম খেলতে নেমে হেরে গেল তুলনায় দুর্বল বিপক্ষের কাছে শুধু অধিনায়কত্বের দোষে। যখন যাকে দিয়ে যে কাজটি করাবার, ক্যাপ্টেন করাতে পারেননি বলে ভাল ভাল খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও দলটি হেরে গেল। ঠিক সেই রকম আমরা কত সময় দেখেছি, ভাল নাটক, শক্তিমান নট-নটীরা অভিনয় করছেন, সুন্দর আঙ্গিক, কিন্তু তবু যেন কিছুতেই নাটক জমছে না। এই যে কেন জমছে না, যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, দেখব নাটকটি সুপরিচালিত নয়। যেমন ধরুন, মাছের ঝোল রাঁধা হয়েছে, তাতে ভাল মাছ পড়েছে, টাট্‌কা আলু-পেঁয়াজ, সুগন্ধি সবই পড়েছে, তবু স্বাদ হয়নি। কেননা তাতে পারে হয়ত বা মশলা দিতে গিয়ে রাঁধুনি পরিমাণের সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। আবার এমনও দেখা যায়, নুনটা দিতেই সে ভুলে গেছে। এরকম আলুনি নাটক কত মঞ্চেই তো আমরা প্রতিনিয়ত দেখেছি। এর জন্যে হয়ত দোষ পড়ে অভিনেতাদের উপর, বেচারী নাট্যকাররাও অকারণে নিন্দার ভাগী হন। কিন্তু যে প্রকৃত অপরাধী, সেই অপটু পরিচালক অলক্ষ্যেই থেকে যান।

আবার পক্ষান্তরে এও দেখা যায় সুর উঁচু জাতের সংগীত নয়, যন্ত্রীরাও সাধারণ কিন্তু কন্ডাক্টারের অসামান্য পরিচালনায় শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে রইল। এখানে বাহাদুরি কন্ডাক্টারের। ঠিক তেমনি অত্যন্ত মামুলী নাটকও পরি-চালনার গুণে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সে-ক্ষেত্রেও প্রাপ্য স্বীকৃতি-টুকু পরিচালক পান না, তিনি অলক্ষ্যেই থেকে যান। দর্শকরা বলে, চমৎকার নাটক, কি সাবলীল অভিনয়, ইত্যাদি।

পরিচালক ছাড়া কোন নাটকের অভিনয় হয় না। যে-সব সৌখিন দল আছে, যারা সখের জন্যে মাত্র এক রাত্রি অভিনয় করে তাদের দলেও পাড়ার হারুদা বা সেক্রেটারীর কাকা কেউ থাকেন, যিনি আগে অভিনয় করেছেন, তিনি এই দলের পরিচালক। পেশাদার মঞ্চে অবশ্য পরিচালকের একটি নির্দিষ্ট আসন আছে যার জন্যে টাকা দিয়ে লোক রাখা হয়। তবে দুঃখের কথা, এই পরি-চালনার কাজ শেখার জন্যে, পরিচালকের দায়িত্ব কি, তা জানবার জন্যে শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না। যাঁরা শিখতে আসেন, শতকরা নব্বুই জন অভিনেতা হতে চান, আর বাকি দশজন শিখতে চান—আলো বা সেটের কাজ। অবশ্য আমাদের দেশে পরিচালনা শেখবার ছাত্রের যেরকম অভাব ঠিক সেই রকমই অভাব ওই বিদ্যা শেখবার জায়গার। তাই এ-দেশের পরি-চালকরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের স্পর্ধাতে, নিজেদের ভুল-ত্রুটির মধ্যে দিয়েই কাজ শিখেছেন, এখনও শিখছেন। হয়ত ভবিষ্যতেও শিখবেন।

সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকে মনে করেন, পরিচালকের দায়িত্ব অভিনয় শেখানো, আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। পরিচালক অভিনয় শেখাবেন না। পরি-চালক যেরকম তাঁর পছন্দমত নাটক বেছে দেবেন, ঠিক তেমনি বেছে দেবেন উপযুক্ত অভিনয় করবার শিল্পী। ধরুন, যদি বিজয়া নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়, পরিচালক যোগ্যতা অনুযায়ী শিল্পীদের মধ্যে থেকে বিজয়া, রাসবিহারী, নরেন বেছে নেবেন। কিন্তু এমন যদি মেয়ে হয় ভাল অভিনয় করতে পারে না, তাকে দিয়ে বিজয়ার চরিত্রে রূপ দেওয়ানো মানে অ, আ, ক, খ থেকে তাকে অভিনয় শেখাতে হবে। এ-দায়িত্ব পরিচালকের নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, দলে ভাল অভিনেত্রী না থাকলে আমরা কি করব, তার উত্তরে বলব, বিজয়া নাটক বাছাই সে-দলের উচিত হয়নি। নাটকের চরিত্র অনুযায়ী শিল্পীর যোগান দেওয়া দলের কাজ। তারপর তাদের একত্রিত করে নাটকের মঞ্চরূপ দেওয়ার দায়িত্ব পরিচালকের।

অনেকে প্রশ্ন করেন, কি কি গুণ থাকলে ভাল পরিচালক হওয়া যায়। আমি মনে করি, নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবকিছু পরি-

চালককে জানতে হবে। নাটক বোঝবার তাঁর ক্ষমতা থাকা চাই, কোন্ শিল্পীকে দিয়ে কতখানি কাজ পাওয়া সম্ভব, চাই তা জানবার অন্তর্দৃষ্টি, কোন্ দৃশ্যে কিভাবে ভাবসৃষ্টির জন্যে আলোক-সম্পাত করা প্রয়োজন, নাটক অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা, সব বিষয়েই পরিচালকের সর্বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সংগীতের উপর যদি তাঁর অধিকার না থাকে, যদি তিনি নৃত্যের তাল-লয় না বোঝেন, তাহলে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী মঞ্চের উপর নাটকের যথাযথ রূপ দেওয়া একরকম অসম্ভব।
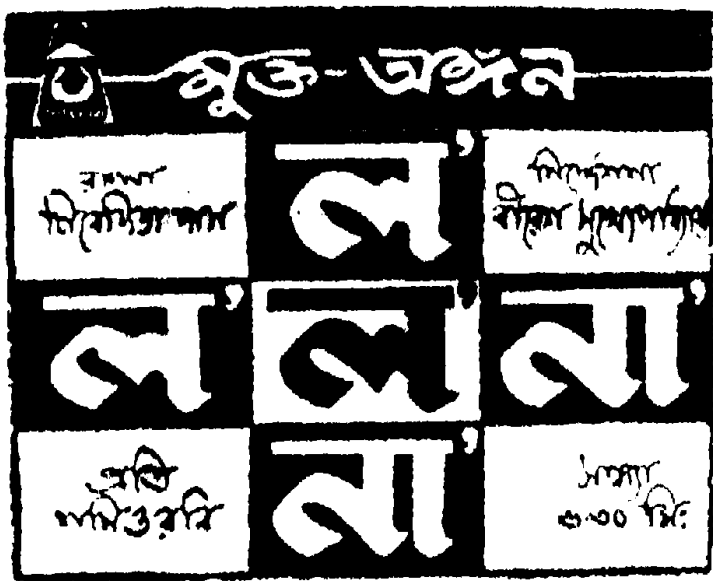
এই সবের জন্যে অনেকের ধারণা— প্রযোজনার ক্ষেত্র ক্রমশঃ জটিলতর হচ্ছে বলেই পরিচালকের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ আগেকার দিনে পরিচালক বলে কেউ ছিলেন না। আমি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কারণ, পুরোন আমলের গ্রীক্ থিয়েটারের কথা যখন পড়ি, দেখি তাদের মঞ্চোৎপাদনে অভিনয় পরিচালনা করত মঞ্চ-ব্যবস্থাপক (stage manager)। এই বিশেষ ব্যক্তিটির উল্লেখ গ্রীক্ থিয়েটারে বরাবরই পাওয়া যায়। সংস্কৃত যুগে নট-নটীরা যে 'শৈলূষ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁরাই নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন।

এমন কি Commedia dell' Arte নামে যে অভিনেতৃবর্গ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-ভাবে কোন রকম লিখিত নাটক সঙ্গে না রেখে নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে, আমাদের কবির লড়াই-এর মত নাটকের সৃষ্টি করত, তাদের দলেও একজন বিশেষ ব্যক্তি থাকত, যার নাম capo comico। তারও কাজ ছিল পরিচালকের মতই সব-কিছুর তত্ত্বাবধান করা।

পরবর্তী যুগে অভিনেতা-প্রধান নাট্যশালার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই 'ট্রি' বা 'আরভিং'-এর মত স্বনামধন্য অভিনেতা, যাঁরা শুধু অভিনেতা নন, পরিচালকও বটে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে নাট্যশালার ইতিহাস খুঁজলে আমরা পাবো বহু খ্যাতিমান অভিনেতাকে, যাঁরা বরাবর যুগ্ম-দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। আজকের দিনে লরেন্স অলিভার বা জন গিলগুড ঐ একই ঐতিহ্যের বাহক। আমাদের দেশে গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার প্রমুখ অনেকেই একাধারে অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন, তবে আধুনিক সমালোচকরা অনেক সময় ইঙ্গিত করেন অভিনেতা-পরিচালক হবার একটা বিপদ আছে। অভিনেতা নিজের উপর দুর্বলতাবশতঃ নিজের চরিত্রটিকে ভাল করে ফুটিয়ে তুলে বাকি সব ছেঁটে-কেটে বাদ দিয়ে দেন। ফলে নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনা হওয়া সম্ভব হয় না। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। অনেক ক্ষেত্রে যে এ-ধরণের ঘটনা ঘটেছে, ইতিহাসে তার যথেষ্ট নজির আছে। কিন্তু তাই বলে অভিনেতা যে পরিচালক হতে পারবেন না বা তাঁর হওয়া উচিত নয়, তা মানতে আমি রাজী নই। যদি কোন অভিনেতার মধ্যে দ্বৈত সত্তা থাকে, তাহলে একাধারে অভিনেতা ও পরিচালকের দায়িত্ব নিতে পারেন। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁর পরিচালক-সত্তা তাঁর অভিনয়-সত্তাকে অন্য অভিনেতাদের মত সংযমের মধ্যে রাখবে।

অনেক নাট্যকার যাঁরা মনে করেন, অভিনেতা-পরিচালক নিজের প্রাধান্যের জন্য নাটকের অঙ্গহানি করেন, তাঁদের বিশ্বাস, নাট্যকাররাই যোগ্য পরিচালক। কারণ, সব শিল্পীকে তাঁরা সমান চোখে দেখবেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিপদ নাট্যকারের দুর্বলতা থাকে নাটকের উপর: সুষ্ঠু প্রযোজনার খাতিরে যেখানে নির্মমভাবে সংলাপ কেটে দেওয়া দরকার নাট্যকার-পরিচালক প্রাণ থাকতে কিছুতেই তা করতে পারেন না।

এই সব কারণেই আর একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাঁদের পরিচয় শুধু পরিচালক। এঁরা নাটকও লেখেন না, অভিনয়ও করেন না, কিন্তু নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডী-পাঠ সব কিছু জানেন, অতএব তাঁদের প্রযোজনায় নাটক বা শিল্পীর প্রতি কোনরকম পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

যে পরিচালক কোন একটি লিখিত নাটককে নাট্যকারের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে মঞ্চস্থ করেন, তাঁকে কিন্তু আমরা বাহাদুরী দিই না। কারণ, পরিচালককে লিখিত নাটকের উপরও আর একটু বেশী কিছু দিতে হয়। এই 'বেশী কিছু' কথাটার তাৎপর্য পরিষ্কার করে বোঝান শক্ত। কেননা, নাট্যকার যে চিন্তা-ধারায় নাটকটি লিখেছেন বা অভিনেতা যেভাবে চরিত্রের রূপ দিতে চান কিংবা পাঠক নাটকটি পড়ে যেভাবে তা গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনেকখানি পার্থক্য থাকে। কারণ, পরিচালক শুধু লিখিত নাটকটির কথাই তো ভাবেন না, তাঁকে ভাবতে হয়, যেভাবে নাটকটি মঞ্চের উপর অভিনীত হবে, তার কথা। নাটকটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখেন, যে-সব শিল্পীরা অভিনয় করে তাঁদের, দেখেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব, দেখেন কিভাবে মঞ্চের উপর তাঁদের দাঁড় করাতে হবে, দেখেন তাঁদের রূপসজ্জা, সাজ-পোষাক, দেখেন পিছনের দৃশ্যপট। এই থেকেই বোঝা যায়, শুধু নাটকের কথা ভাবলে পরিচালকের চলে না, নাটকের মত সবকটি অঙ্গের কথা ভাবতে হয়। সবকটি অঙ্গ মেলালে যার রূপ ফুটে ওঠে, তার নাম থিয়েটার, যা পরিচালকের সৃষ্টি। আমরা যখন কথায় বলি, 'থিয়েটার দেখতে যাব', তখন আমরা শুধু নাট্যশালা দেখতে যাই না, শুধু নাটকও দেখতে চাই না বা শুধু অভিনেতাদেরও দেখতে চাই না, আমরা যাই নাটকের মঞ্চস্থ রূপ দেখতে, তারই নাম থিয়েটার, তারই সৃষ্টিকর্তা পরিচালক।

অতএব আজকের দিনে থিয়েটারের কথা উঠলে দেখতে হয়, কে পরিচালক, তাঁর পরিচালনা করার ক্ষমতা কতখানি; কারণ, তাঁরই যোগ্যতার উপর নাটকের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। নিঃসন্দেহে বলা চলে আজকের দিনের থিয়েটার হল পরিচালক-প্রধান।

[illegible]

অভিনয়

উৎপল দত্ত

(শান্ত)

অভিনয় সম্বন্ধে যেদিন আলোচনা হবার কথা ছিল, সেদিন নাট্যকার প্রায় এক সংকট উপস্থিত করে ছাড়লেন। তিনি বাংলার এক জবরদস্ত অভিনেতাকে চা-কেকের লোভ দেখিয়ে আড্ডায় উপস্থিত করলেন। পরিচালক তাঁকে দেখেই আঁৎকে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা টেনে বসালাম। বললাম—মশাই, প্রতিপক্ষ জোরদার না হলে কখনো বিতর্ক হয়? সন্ধি হোলো, রামমোহন-সন্তোনিয়াম তর্ক সুরু হোলো, আমরা জমিয়ে বসলাম।

পরিচালক সুরু করলেন—এতকাল বাংলা নাট্যশালা অভিনেতাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, অভিনেতাদের আস্ফালনের আখড়া ছিল। এই অভিনয় কি ধরনের ছিল আগে বুঝতে হবে।

অভিনেতা বললেন—আমি বলছি। এতদিন, মানে আপনারা নটচ্যাংড়ারা আসার আগে পর্যন্ত, অভিনেতা আবেগের গভীরে ডুবতে জানতেন। অভিনয় করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে জানতেন। অহীনবাবুর সাজাহান দেখেছেন? কয়েকটি দৃশ্যের পর থেকে যে প্রচণ্ড আবেগ অনুভূত হোতো তাঁর অভিনয়ে, আপনাদের শম্ভু মিত্রের বাঁধাধরা গলার খেলায় তা কস্মিনকালেও ফোটেনি। ছবিবাবুর নাট্য দেখেছেন? হলপ করে বলতে পারি, ছবিবাবু, আশেপাশের সব ভুলে গিয়ে সে পার্টে ডুবে যেতেন। আর তাকেই বলে আর্ট। অভিনয়ের মুকুটমণি ডেভিড গ্যারিক বলতেন,

"the greatest strokes of genius have been unknown to the actor himself, till circumstances, and the warmth of the scene, has sprung the mine, as it were, as much to his own surprise, as that of the audience."

অন্যের লেখা কথা মুখস্থ বলতে বলতে, অন্যের সৃষ্ট দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে অভিনেতার নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ এমন আশ্চর্য এক আবহাওয়া গড়ে ওঠে, এমন নতুন রূপে হেসে ওঠে চরিত্রটি যে সেই মুহূর্তে অভিনেতা হয়ে ওঠেন স্রষ্টা। তিনি আর তখন নাট্যকারের দাস থাকেন না, তিনিও সৃষ্টি করেন।

ভাষাবিদ বললেন—গ্যারিকের যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম হিপোলাৎ ক্লেরোঁ সম্বন্ধে তাঁর এক রচনা থেকে। ক্লেরোঁ-র কণ্ঠস্বর, অংগ-সঞ্চালন সবই নিখুঁৎ ছিল, তবু প্রাণ যেন তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। কারণ তাঁর মধ্যে প্রতিভার "electrical fire" ছিল না। ঐ electrical fire কথা দুটিও গ্যারিকের। সে fire যাঁর আছে তিনি তাঁর পার্টকে অতিক্রম করে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে উঠে, হোরেস-এর ভাষায়

পেকাতুস্ ইনানিতের আন্‌জিৎ,
ইরিতাৎ, মুলকেৎ, ফালসিস,
এেরিবুস, ইমপোৎ উং মাজুস।

যাদুকরের মতন অভিনেতা অজানা-অচেনা রূপকথার সব ভয়-ভাবনা আর সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলেন, আগুন ধরে যায় তাঁর নিজের হৃদয়ে।

পরিচালক নাট্যকারের চুরুটের স্তূপ থেকে বিনা অনুমতিতে একটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে পুরোনো অভিনেতারা আবেগাশ্রয়ী অভিনয় করতে করতে ডুবে যেতেন পার্টে। তাই সেটা আর্ট?

অভিনেতা বললেন—হ্যাঁ। সব আর্টেরই মূল কথা হোলো আবেগ।

পরিচালক বললেন—ঠিক, সব আর্ট সৃষ্টি করার সময়ে আবেগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে তার আর নড়চড় নেই। একটা ছবি আঁকবার সময়ে শিল্পীর মনে বেশ খানিকটা উচ্ছ্বাস আসতে বাধ্য। কিন্তু সে উচ্ছ্বাসকে যখন তিনি রং আর ক্যানভাসে বেঁধে ফেললেন তখন সেটা চিরকালের মতন স্থির হয়ে রইল। রোজ সে ছবি বদলে বদলে যেতে পারে না। কারণ রং বা ক্যানভাস প্রাণহীন পদার্থ। ঔপন্যাসিক যখন লেখেন তখন তাঁর প্রাণে আবেগের বন্যা বইতে পারে; কিন্তু সে আবেগের ফলাফল অনড় কাগজ-কালির সীমায় বন্দী হয়ে থাকে। কিন্তু অভিনেতা নিজেই স্রষ্টা, আবার নিজেই সৃষ্টির উপাদান। তিনিই শিল্পী, আবার তিনিই শিল্পের কাগজ-কলম-রং-ক্যানভাস। অথচ তিনি জীবন্ত মানুষ। এবং জীবন্ত বলেই তিনি অনড় নন, সচল। তাঁর হাত-পা, তাঁর কণ্ঠস্বর সচল। এবং তিনি মানুষ, মেশিন নন। আর মানুষ বলেই প্রতিদিন তিনি হুবহু একই জিনিষ সৃষ্টি করতে পারেন না। কক্ষনো পারেন না। মার্জিন অফ হিউম্যান এরর তাঁকে ছাড়তেই হবে। আর ঠিক সেই কারণে তিনি শিল্পী নন, তাঁর আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ও শিল্প নয়। আবেগের উপর যার ভিত্তি তার বিচিত্র গতি। আবেগ যেদিন সপ্তমে উঠলো সেদিন অভিনয় উঁচু পর্দায় বাঁধা; আবেগ যেদিন ঢলো-ঢলো চলছে, সেদিন অভিনয়ও মন্দ্র সপ্তকে নেমে আসতে বাধ্য। আবেগে যে অভিনেতা কম্পিত তিনি কি সুরে বলবেন, কি ঢং-এ হাঁটবেন কেউ বলে দিতে পারে? তিনি চাইছেন এটা, হচ্ছে ওটা। চাইছেন বসে পড়তে, হচ্ছে ভেঙে পড়া। আবেগ তাঁকে কানে ধরে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। আবেগভিত্তিক শিল্প আকস্মিক জিনিষ। একেক দিন হোলো, একেক দিন হোলো না। গ্যারিক নিজেই বলছেন যা স্রষ্টার কাছে অজ্ঞাত, অজানিত, তা শিল্প কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এদিকে গর্ডন ক্রেগ স্পষ্টই বলেছেন,

"Art.......can admit of no accidents. That then which the actor gives us, is not a work of art; it

is a series of accidental confessions. আমাদের প্রবীণ অভিনেতাদের ভাষায় "মুড না হলে অভিনয় হয় না।" কিন্তু মুড তো আমাদের চাকর নয়; সে রোজ 'বান্দা হাজির' বলে নাও হাজির হতে পারে।

অভিনেতা বলে উঠলেন—তা মুড চিত্রশিল্পীরও এক আধদিন না আসতে পারে। সেদিন তাঁর ছবি খারাপ হয়। যেদিন মুড থাকে সেদিন ভাল ছবি আঁকেন।

এবার দার্শনিক বললেন—আপনি প্রশ্নটা অন্যখানে নিয়ে গেলেন। চিন্তার মুড সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি না। চিত্রশিল্পী যদি খারাপ আঁকেন, ছবিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু যা ভাবছেন ঠিক তাই আঁকতে তিনি সক্ষম। তাঁর আঁকার উপকরণের কোনো নিজস্ব মুড নেই যে তারা হঠাৎ ভিন্ন পথে লম্বা দেবে। তিনি যদি একটা সরল রেখা আঁকতে চান, তো তুলি বা রং-এর এমন ক্ষমতা নেই যে, তারা সেটাকে বৃত্তে পরিণত করতে পারে। কিন্তু অভিনেতা স্রষ্টা হিসেবে যা ভাবছেন, সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে সেটাকে নাও রূপ দিতে পারেন, কারণ তাঁর হয়তো আজ মুড নেই। অনেক ভেবেচিন্তে অভিনয়ের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, অসংযত আবেগে বা আবেগের অভাবে, অর্থাৎ মুড-এ থাকলে বা মুড-এ না থাকলে তিনি সে পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারেন। এবং গিয়ে থাকেন এটা আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ যেটাকে সরল রেখার মতন এঁচেছিলেন, সেটা বৃত্ত হয়ে দাঁড়ালো। এখানেই আসছে আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের মূলগত বিরোধ। একদিন এক মস্ত অভিনেতাকে দেখেছিলাম বহুদিন আগে ষ্টারে; সেদিন তাঁর মুড এসেছিল নিশ্চয়ই কারণ সহ-অভিনেতাকে হত্যা করার সময়ে তলোয়ার দিয়ে জখম করেছিলেন। আর মুড না থাকলে যে কি হোতো তা কয়েক বছর আগেও রবিবার দুপুরের অভিনয় দেখলে বোঝা যেত। 'নন্দকুমার' দেখেছিলাম, মশাই, ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং নন্দকুমার প্রতি সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে অনুচ্চস্বরে খিস্তি করছিলেন, আঠারো শতকের ভাষায় নয়, খাঁটি বিশ শতকের কলকাতার রকবাজদের ভাষায়।

সবাই একটু ভদ্রতার হাসি হাসলেন। তারপরই অভিনেতা সদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন—শিল্পে আকস্মিকতার স্থান নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বেনেদেত্তো ক্রোচে থেকে আঁদ্রে জিদ পর্যন্ত সকলের মতামত দেখলে ক্রমশই প্রতীত হয় সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টিতে আকস্মিকতার স্থান ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতীত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে আকস্মিকতা বিরাট স্থান জুড়ে আছে। সেটাকে ওড়াবেন কোন যুক্তিতে? আমি বলছি রাগ-সংগীতের কথা, বিশেষ করে খেয়ালের কথা। এখানেও গায়ক নিজেই স্রষ্টা, নিজেই উপকরণ। কিন্তু ইওরোপের অপেরা-গায়ক অন্যের স্বরলিপি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, প্রতিটি আরিয়া-র প্রতিটি স্বর পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু ভারতীয় গায়ক? রাগের লক্ষণ বা সরগম-আদি ছাড়াও তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এবং এই স্বাধীনতার জন্যেই আকস্মিকভাবে এক একটা প্যাটার্ণ সৃষ্টি হতে বাধ্য। গায়ক নিজেই কি মাঝে মাঝে অবাক
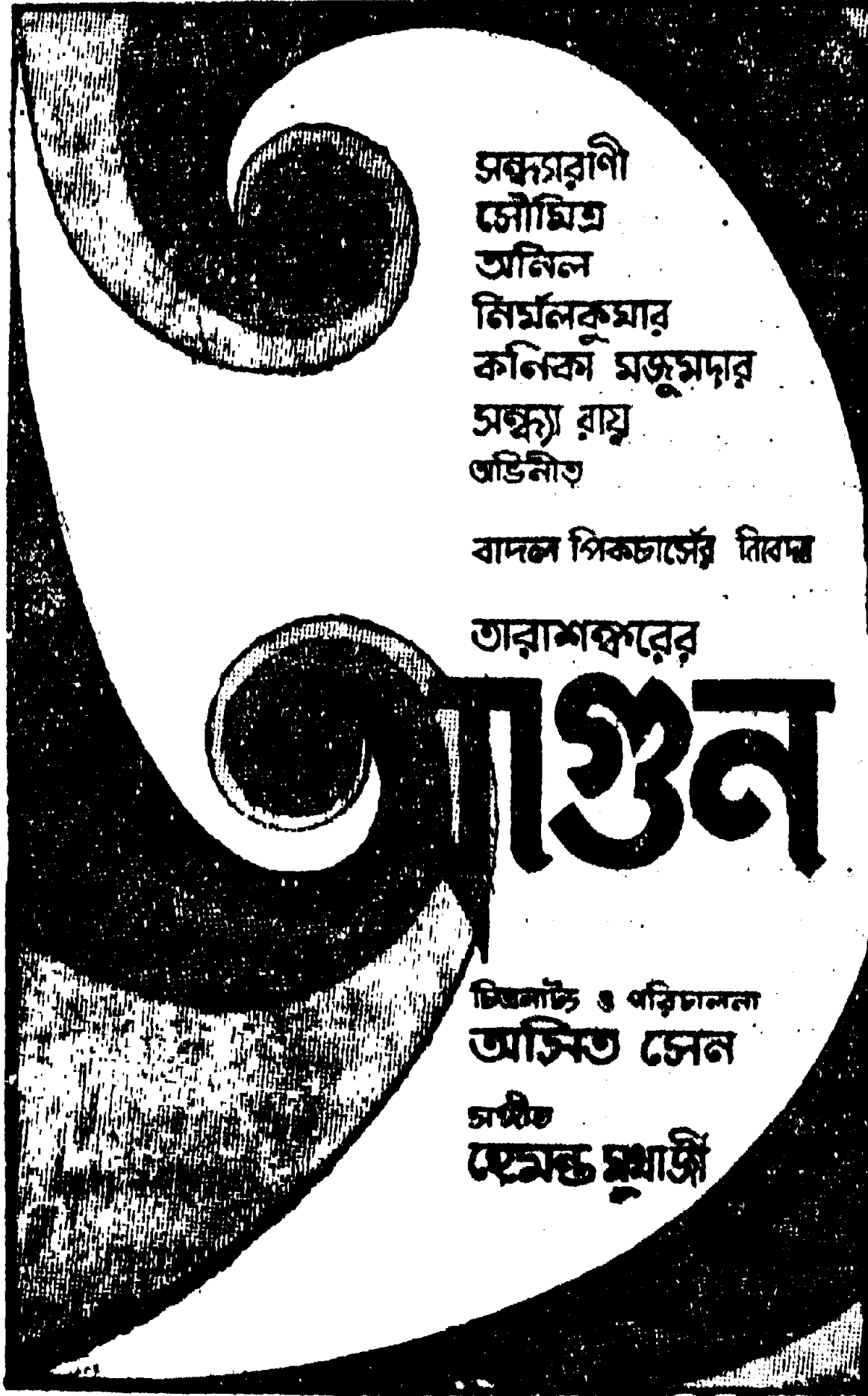
হয়ে যান না নতুন প্যাটার্ণ সৃষ্টিতে? গায়ক মুডের মধ্যে না থাকলে এ ধরণের গান গাওয়া কি সম্ভব? পদে পদে নতুন প্যাটার্ণ সৃষ্টি করা সম্ভব? "মেজাজ" বলে যে কথাটি চালু আছে সংগীত-জগতে তার তাৎপর্য ভেবে দেখেছেন আপনারা?

ভাষাবিদ বললেন— শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি আলোচনা করলে আপনার কথা আপেক্ষিক অর্থে সত্য। কিন্তু আপেক্ষিকই, তার বেশি নয়। সব শিল্পেই কিছুটা আকস্মিকতা অনস্বীকার্য। তার মধ্যে ভারতীয় রাগ-সংগীতে আকস্মিকের পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু সেইজন্যেই সেটাকে লুপ্ত করে আনার কি প্রয়াস গায়কদের! সেইজন্যেই প্রতিটি তানকে হাজারবার রেয়াজ করার ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছে। সেইজন্যেই ভারতীয় রাগ-সংগীতের জন্যে যে সাধনা প্রয়োজন তা আর কোনো শিল্পে আছে বলে আমার জানা নেই। এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হোলো আকস্মিককে ক্ষুদ্রতম পরিসরে বন্দী করে রাখা। বলছেন, পদে পদে ও'রা নতুন প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেন। বাজে কথা। আপনার তা মনে হয়। আসলে ওসব প্যাটার্ণ কয়েক হাজার বার অভ্যেস করে তবে তাঁরা আসরে বসেন; আকস্মিক এখানে কিচ্ছু নেই। তবে কলাকৌশলকে এমনভাবে তাঁরা আয়ত্ত করেন যে, আপনার মনে হয় সহজ সাবলীলভাবে বুঝি তাঁরা তক্ষুণি সুর-সৃষ্টি করছেন। আর আবেগ তাঁদের যতই থাক, রাগ-সংগীত আবেগ-ভিত্তিক নয়। অসংখ্য নিয়মে খেয়াল-গান বাঁধা। খেয়াল-এ খামখেয়াল নেই, এটা মনে রাখবেন।

পরিচালক বললেন—তা ছাড়া অভিনেতার চেয়ে গায়ক আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গায়কও শিল্পের উপকরণ বটেন, কিন্তু গায়কের হাতের অস্ত্রটি অসাধারণ। তিনি কথা কন না, গলায় সুর তোলেন; আর রেয়াজি গলায় সুর একটা বিশেষ ঢং, বিশেষ ষ্টাইল নিয়ে বসে যায়। গায়কের মানসিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর গলাটা একই থাকে। যাঁর সি-শার্প, তাঁর সি-শার্পেই সা থাকে। আবেগে অস্থির হয়ে স্কেল নামিয়ে আনা সম্ভব না। এদিক থেকে গায়কের গলাকে একটি সংগীতের যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ এর নিজস্ব কোনো মুড নেই বা গায়কের মুড দ্বারা এ প্রভাবান্বিত নয়। এর প্রায় আলাদা সত্তা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অভিনেতার গলা, তাঁর মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য। কারণ তিনি মঞ্চে কথা বলেন স্বাভাবিক নিজস্ব গলায় এবং ভঙ্গীতে। সেইজন্যেই অভিনেতার গলা ভাঙে; সেইজন্যেই খুব বড় অভিনেতাকেও হঠাৎ শুনতে হয় "লাউডার প্লীজ!" জীবন থেকে সরে গিয়ে নকল একটা জোয়ারি এনে ফেলে গায়ক তাঁর গলাকে স্বাধীন দৃঢ় স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন; আর জীবনানুগ কথাবার্তা বলতে হয় বলে অভিনেতার গলা আপনার-আমার গলার মতনই আবেগের দাস —অভিমানের গলা, দুঃখের গলা, ক্রোধের গলা, স্বাভাবিক গলা প্রভৃতি নানা স্তরে অভিনেতাকে ছুটে বেড়াতে হয়। গায়ক আর অভিনেতাকে এক পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় সেতার আর অভিনেতাকে এক শ্রেণীতে ফেলা।

অভিনেতা পরাভব স্বীকার করেন না; বলেন—এইসব না হয় মানলাম; তাতে কি হোলো? আকস্মিকতাকে একেবারে অস্বীকার তো আপনারা করতে পারছেন না। অভিনয়-শিল্পে না হয় আকস্মিকতার স্থান কতকটা বেশি; অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে অভিনেতার পরিশ্রমই বা কম কিসে? রিহার্সালের উদ্দেশ্যই তো তাই।

পরিচালক বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠিক! রিহার্সালের উদ্দেশ্যই হোলো অভিনেতার চলাফেরা কথা-বার্তাকে সুদৃঢ় ছকের মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে আবেগ-বশবর্তী হয়ে আকস্মিকের উপর তিনি নির্ভর না করেন। কিন্তু এতকাল বাংলা নাট্যশালায় আমরা কি দেখেছি? রিহার্সাল বস্তুটির কি হাল তাঁরা করেছেন?

অভিনেতা চেঁচামেচিতে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বললেন—কারা?

পরিচালক উন্মত্ত স্বরে বললেন—অভিনেতা মহারাজরা! উচ্ছৃংখলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তাঁরা! কজন ঠিক সময়ে রিহার্সালে এসেছেন? কজন রিহার্সালে আদৌ এসেছেন? রিহার্সাল বলতে এতকাল কি বুঝিয়েছে? জনাকয়েক লোক পরিচালককে ঘিরে বসেছেন; বসে বসেই বলে নিয়েছেন পার্টটা। উঠে দাঁড়াবারও দরকার হয়নি; চলাফেরা বসা-ওঠা, প্রবেশ-প্রস্থান কিছুই মহড়া দিতে হয়নি। সীন এঁকেছেন যিনি ড্রেস-রিহার্সালের পূর্বে তিনি অভিনেতাদের কখনো জানাননি কি রকম পরিকল্পনা তিনি করছেন। পরিচালক—পরিচালক তাঁকে বলবো না, বলবো কথা-নির্দেশক—কি ধরণের নির্দেশ দিতেন জানেন? অভিনেতাদের কথা ঠিক করে দিতে তাঁর পরিশ্রমের শেষ নেই, কিন্তু দৃশ্যসজ্জা-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কি হোতো? ওহে, একটা বনপথ লাগবে প্রথম অংকে! দ্বিতীয় অংকে দরবারে দুটো থাম দিও তো হে! আর তৃতীয় দৃশ্যে অন্তঃপুরে একটা তক্তপোষ লাগবে। ব্যস! বাদবাকি সব দৃশ্যসজ্জাকরের স্বাধীন কল্পনা-প্রসূত। অভিনেতা হয়তো দরজা কল্পনা করেছেন ডানদিকে, দরজা এল বাঁদিকে। অভিনেতা ভেবেছেন অমুক সংলাপটা বসে বসে দেব, কার্যক্ষেত্রে দেখলেন ভোঁ ভাঁ, বসার কোনো আসনই দৃশ্যসজ্জায় নেই। অতএব, অভিনেতা বাহাদুররা যে যেমন দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছেন! রিহার্সাল মানে শৃংখলা!! আমাদের বড় বড় অভিনেতা-দের কাছে রিহার্সাল ছিল চা-সিঙ্গাড়ার আসর আর প্রক্সি দিয়ে কাজ চালাবার মেলা! তারপর দুই বড় অভিনেতা এক দৃশ্যে এলেই আমরা কি দেখেছি? প্যাঁচের লড়াই! হাততালি কুড়োবার পায়তারা! পরস্পরকে দাবিয়ে দেয়ার আণবিক যুদ্ধ! আর কম্বিনেশন নাইটে এক দঙ্গল বড় অভিনেতা জড়ো হওয়ার ফলে যে গৃহযুদ্ধ ঘটতে দেখেছি তাতে দর্শক হিসেবে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে। নাটক চুলোয় গেল, দৃশ্যের পরিবেশ জাহান্নমে গেল—চলছে শুধু শাজাহান-আওরংগজেব-যশোবন্ত-দিলদারের খেয়োখেয়ি! এরকম ব্যাভিচার করতে করতে তাঁরা দর্শকদের পর্যন্ত এত নীচে টেনে নামিয়েছিলেন যে অভিনেতাদের পারস্পরিক তুলনাই হয়ে উঠেছিল দর্শকদের কাজ! এঁর শাজাহান ভাল, না ওঁর! এঁর আওরংগ-জেব ওঁর দিলদারকে কেমন চেপে দিল, ওঁর যোগেশ এঁর রমেশকে কেমন জুতিয়ে দিল, ঐসবই ছিল মূল আলোচনার বিষয়! ছ্যা, ছ্যা! স্বর্গ থেকে যে গিরিশ আর দ্বিজেন্দ্রলাল চোখের জলে বান ডাকাচ্ছিলেন একথা এইসব অভিনেতাদের স্ফীত মস্তিষ্কে ঢোকেনি! আর বলিহারি সেইসব পক্ককেশ পণ্ডিত-দের যাঁরা এতকাল এই কুৎসিত নির্লজ্জ

মারামারির মধ্যে নাট্যশালার সর্বনাশ দেখেননি, দেখছেন আজকে যখন নবনাট্য আন্দোলন অভিনেতার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে সামগ্রিকভাবে মঞ্চটাকে ঐক্যবন্ধ শিল্পরূপ হিসেবে গড়বার চেষ্টা করছে!

দার্শনিক বললেন —আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের মূল বিরোধটা তখনই স্পষ্ট হয় যখন দুই বা ততোধিক আবেগময় অভিনেতা এক দৃশ্যে অভিনয় করেন। এ'র আবেগ আর ও'র আবেগ দুই ভিন্ন পথে ছুটতে থাকে; তার মধ্যে মিল ঘটাবে কে এমন দূরদৃষ্ট! আর অভিনয় একক শিল্প নয়, বহুর সমন্বয়। তাই আবেগ-ভিত্তিক অভিনয় সব সময়েই অশৈল্পিক!

অভিনেতা দেখলাম কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তবু বললেন—আপনারা কি বলতে চান প্রাচীনরা রিহার্সালে কিছুই করতেন না?

পরিচালক ধমকে বললেন—হ্যাঁ, তাই বলছি; কিস্যু করতেন না! করলে যে আবেগ খানিকটা সংযত হয়ে পড়বে! সে কি হতে দেয়া যায়? আরে মশাই পার্টটা পর্যন্ত মুখস্থ করতেন না তাঁরা! আর অংগভংগীরই বা কি বাহার! রিহার্সালে গতর তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অভিনয়ের দিন? পুরো নাটকটা চলছে ঢিমে তেতালায়। হঠাং-হঠাৎ মুড এসে পড়তেই গলা সপ্তমে এবং হাত শূন্যে উঠলো! কতকগুলো ফর্মুলা-বাঁধা জেসচার-এরই রকমফের, বেগে প্রস্থান বা বেগে প্রবেশের মুখে একখানা কোমর-দোলানো অংগুলি-নির্দেশ! সে যে কি কদর্য ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! এ ছাড়া আর যে কতকগুলো ভুরু-তোলা বা চোখ-পাকানো বা ক্রুর-হাসির রেওয়াজ আছে সেগুলির অর্থও এখনো আমি বুঝি নি। শেরিডান-এর "ক্রিটিক" পড়েছেন তো? তাতে রিহার্সালের দৃশ্যে এক অভিনেতাকে বিনা সংলাপে শুধু একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিতে দেখে সমালোচক ড্যাংগল্ বলছেন:

"What does he mean by shaking his head in that manner?"

তাতে পাফ্ বলছেন:

"Don't you know? Why, by that shake of the head he gave you to understand that even though they had more justice in their cause and more wisdom in their measures, yet, if there was not a greater spirit shown on the part of the people, the country would at last fall a sacrifice to the hostile ambition of the Spanish monarchy."

ড্যাংগল্ হতভম্ব হয়ে বলছেন:

"Did he mean all that by shaking his head?"

এই ছিল আমাদের আবেগাশ্রয়ী অভিনেতাদেরও চেহারা! আবেগ চিরকালই ভাসা-ভাসা ঘোলাটে আবছা-আবছা বস্তু। তাকে রূপ দিতে গেলে ঐ পাফ্-সাহেবের অভিনেতাদের মতনই আবছা অস্পষ্ট অংগভংগী ছাড়া উপায় কি?

এবার নাট্যকারও দেখলাম তাঁর ডেকে-আনা উকিলের কথাবার্তায় আস্থা হারাচ্ছেন। কারণ তিনি নিজেই জিগ্যেস করে বসলেন—আচ্ছা, আবেগকে মুক্ত বিচরণের অধিকার দিলে আরো একটা সমস্যার উদ্ভব হয় না কি? অভিনেতা নিজে মানুষ; তাই নানা স্বাভাবিক মানবিক আবেগে তিনি নিজেই বিপর্যস্ত। কিন্তু মঞ্চের উপর তাঁর নিজের আবেগের কোনো স্থান নেই; সেখানে আর একটি চরিত্রের আবেগে তাঁকে ডুবতে হবে। কিন্তু আবেগের ছিপি খুলে দিলে আমার তো মনে হয় নিজের আবেগের স্রোতটাই ছুটবে আগে। সব মিলে একটা জগাখিচুড়ি হবার সম্ভাবনা থাকে না? কারণ মানুষ নানা জটিল আবেগের আবর্ত-মাত্র; কিন্তু নাটকের চরিত্র মোটামুটি সরলীকৃত; সিম্প্লিফাইড।

ভাষাবিদ বললেন—পাউল কর্নফেল্ট ঠিক তাই বলেছেন শুনুন:

"Concern for many things prevents the real-life person from externalising himself completely: the memory of many things is rooted in him and the rays of a thousand events criss-cross within him. So at any given moment he can only be a changing complex of behaviour." কিন্তু অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর হতে হবে "not complex, but one!" অতএব আবেগকে দমন না করে উপায় নেই!

পরিচালক বলে চললেন—তা ছাড়া কার আবেগ? অভিনেতা আপনি বলছেন তাঁর পার্টের মধ্যে ডুবে যেতেন! কি করে? কি উপায়ে? যতক্ষণ কোনো গেরস্ত-গেরস্ত চরিত্র করছি ততক্ষণ বলতে পারি সে চরিত্রের আবেগ হয়তো আমি খানিকটা বুঝতে পারি। ছেলের আমাশা, বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়নি, গোয়ালা জল মেশায়, গিন্নী আবার আঁতুর-ঘরে, এসব সমস্যায় জর্জরিত চরিত্রের যা আবেগ তার সংগে আমার নিজের আবেগকে হয়তো মিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ধরুন সাজাহান, ভারত-সম্রাট সাজাহান, নিজ প্রাসাদে প্রাণপ্রিয় পুত্র কর্তৃক বন্দী সাজাহান, প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ পিতাশ্রেষ্ঠ সম্রাট সাজাহান! কে বলতে পারে, হ্যাঁ, আমার আবেগের সংগে সাজাহানের আবেগ মিলতে পারে? কোথায় সে বস্তুবীজ? তবে কি সাজাহানের বিপুল হৃদয়াবেগকে খর্ব করে, বাঁধ বেঁধে পূতিগন্ধময় জলাশয়ে পরিণত করে টেনে তাকে নিম্নমধ্যবিত্ত অভিনেতার পর্যায়ে নামাতে হবে? ছা-পোষা অর্ধশিক্ষিত অভিনেতা শ্রীযুত গোলোকচন্দ্রবাবু সাজাহানের পর্যায়ে উঠতে পারছেন না; ঠিক আছে, সাজাহানকেই টেনে গোলোকচন্দ্রের পর্যায়ে নামানো যাক!

অভিনেতা অপমানিত আরক্ত মুখে প্রতিবাদ করে উঠলেন—কেন? গোলোকচন্দ্র যদি ভাল অভিনেতা হোন তবে তাঁর কল্পনাশক্তি থাকা উচিত। সাজাহানকে কল্পনা করে নিতে পারেন!

পরিচালক দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন—আরে থামুন না মশাই! কল্পনাশক্তির একটা সীমা আছে তো! নাকি! বাহ্যতঃ একটা সাজাহান খাড়া করা কঠিন নয়; পোষাক-টোষাক পরে, মুখে দাড়ি-টাড়ি এঁটে বাদশাহকে নকল করা সম্ভব, এমন কি, ভাল দৃশ্যসজ্জা পেলে দরবারের জাঁকজমকও খানিকটা এনে ফেলা যায়; অনবরত ইতিহাসের বই পড়ে আর দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুনে সম্রাট সাজাহানের মনের দিকটাও অংশতঃ হয়তো মক্সো করা যায়। আর আগ্রা গিয়ে চাঁদনি রাতে তাজমহল দেখে বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েও খানিকটা বাদশাহি মেজাজ না হয় আনা গেল। চলনবলনে বেশ একটু রাজসিক ভাব না হয় রপ্ত করা গেল। কিন্তু সে তো আর আবেগের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সম্রাটের আবেগ কেমন ছিল সে-অবস্থায়, সেটা যিনি কল্পনা করতে পারবেন তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ হয়ে পড়বেন! শেক্স্পিয়ারের ওথেলো যখন অজ্ঞান হয়ে মঞ্চে পড়ে যায়, তারপর উঠে ভুল বকে, বা হ্যামলেট যখন পোলোনিয়াসকে হত্যা করে, তখনকার আবেগ কেমন যদি জানতে পারতাম তবে আমিই শেক্স্পিয়ার হয়ে বসতাম।

অভিনেতা বললেন—কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল আর শেক্স্পিয়ার-এর লেখায় সে

আবেগ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। পড়লেই বোঝা যায়।

পরিচালক বললেন—ও'দের লেখায় যে আঁচটুকু পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে সে চরিত্রের বৃহত্তর আবেগে প্রবেশ করতে পারেন? ঐটুকু পরিবেশে গোটা মানুষটাকে ধরতে পারেন?

নাট্যকার আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন—অসম্ভব! বড় বড় পন্ডিতরা সম্যক বুঝতে পারেন না ঐসব মহাশক্তিধর চরিত্রদের, আর অভিনেতা বুঝবেন কি করে? নাট্যকার ঠিক কি ভেবে লিখেছিলেন তা যথাযথ বোঝা অসম্ভব। একটা ছবি দেখে পিকাসো-র আবেগকে সম্যক বুঝতে যাওয়া মূর্খতা। দরবারি আলাপ শুনে তানসেনের আবেগকে চিনতে ভগবানও পারেন না। কেন বাজে কথা বলছেন?

অভিনেতা দমেন না; বলে চলেন—প্রশ্নটা গুলিয়ে ফেলছেন। সম্যক আবেগ ধরতে পেরেছি কিনা সেটা বড় কথা নয়; কথা হোলো দর্শক আমাকে দেখে সাজাহান বলে মেনে নিচ্ছে কিনা। অভিনয়-শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হোলো দর্শকের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি।

চেঁচিয়ে উঠলেন পরিচালক—এক্স্যাক্টলি! দর্শককে ধোঁকা দিতে পারলেই হোলো। তবে আবেগের কথা কেন তুলছেন? দর্শকের অবিশ্বাসকে স্তম্ভিত করে নাকচ করে দিতে পারলেই হোলো। সেখানে আবেগের স্থান কোথায়? বিন্দুমাত্র আবেগ আমার মধ্যে না জাগলেও আমি ঠান্ডা মাথায় আমার চলাফেরা, কথা-বার্তা, পোষাক-রূপসজ্জা সব দিয়ে দর্শককে বুঝিয়ে ছাড়তে পারি যে, আমি সাজাহান?

অভিনেতা আমতা-আমতা করছিলেন। তাই পরিচালক উন্মত্ত রিহার্সালি কণ্ঠে ধমক দিলেন—বলুন, পারি?

অভিনেতা বললেন, শুষ্ককণ্ঠে,—হ্যাঁ।

পরিচালক জেরা করে চললেন—এবং এই ধোঁকাবাজিই যেখানে অভিনয়-শিল্পের ভিত্তি, সেখানে ঠান্ডা মাথাই বেশি কার্যকরী এটা মানেন? আবেগে অস্থির হলে ধোঁকাবাজি করা যায় না এটা স্বীকার করেন? আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের অর্থই হোলো নিজের ধোঁকায় নিজেই পর্যুদস্ত হওয়া, এটা মানেন?

অভিনেতা মৃদু মাথা নাড়লেন। পরিচালক সদর্পে বলে চললেন—দর্শককে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে নিজেরই আবেগে বিচলিত হওয়া হোলো মূর্খতার রেকর্ড! সেইজন্যেই দেখেছি এক একজন নায়ক নিজে কেঁদেকেটে চোখের জলের বাণ ডাকাচ্ছেন, অথচ দর্শক নির্বিকার! আর ওদিকে শিশিরবাবুর জীবানন্দ নিরুত্তাপ উদাসীন ভাবলেশহীন কণ্ঠে দুটি কথা কইলো, আর মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের চোখ জ্বালা করে উঠলো! বলুন, অভিনয়ের উদ্দেশ্য কে সত্যি সাধিত করলেন! আপনি ছবিবাবু, অহীনবাবুর নাম করেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর নাম সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কেন গেছেন জানি। বাংলার নাট্যশালার মরুভূমিতে শিশির-বাবু একমাত্র ওয়েসিস। আবেগে অস্থির হয়ে তাঁকে কোনোদিন চেঁচাতেও দেখিনি, ডুকরে কাঁদতেও দেখিনি, লম্ফঝম্পও করতে দেখিনি, ফোকাশ নিতেও দেখিনি। ধীর স্থির মানুষটি মঞ্চের কোণে বসে মৃদু হেসে চলে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে নিজের ওপর রেখেছেন সতর্ক পাহারা। সেই সংগে রেখেছেন দর্শকের উপর সজাগ দৃষ্টি। অথচ দর্শককে কাঁদিয়েছেন আর হাসিয়েছেন বছরের পর বছর। মশাই, শিশিরবাবুর কাছ থেকে শিখুন, কাকে বলে বুদ্ধি-আশ্রিত অভিনয়, কাকে বলে অভিনয়। নিজে তিনি আবেগে ভেসে যাননি, দর্শককে আবেগে ভাসিয়েছেন। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজে কাঁদা নয়, দর্শককে কাঁদানো। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজেই হেসে ফেলা নয়, দর্শককে হাসানো। আবেগাশ্রিত অভিনয় কক্ষনো এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না।

অভিনেতা কিয়ৎকাল মাথা ঝুঁকিয়ে ভগ্ন দেবদাসের মতন বসে রইলেন। তারপর একখানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—কিন্তু নটগুরু স্তানিসলাভস্কি পর্যন্ত অভিনয়ে মুহূর্তের আকস্মিক প্রেরণাকে স্বীকার করেন। তাঁর যে ঠান্ডা-মাথায় পুংখানুপুংখ অভিনয়-পরি-কল্পনা তার উদ্দেশ্য আবেগকে বাদ দেয়া নয়, আবেগকে নিয়মিত জাগাবার একটা রাস্তা বার করা। তিনি বলছেন তাঁর সিস্টেম আবিষ্কারের মূলে ছিল এই প্রশ্নটি :

"Are there no technical means for the creation of the mood, so that inspiration may appear oftener than is its wont?"

অর্থাৎ আবেগ বা প্রেরণাকে বাদ দেয়ার কথাই উঠছে না। বরং সেই আবেগকে ইচ্ছেমত জাগানো যায় কি না।

পরিচালক বললেন—তা স্তানিস্-লাভস্কিকেই বা চরম বিচারকের আসনে বসাবো কেন? স্তানিসলাভস্কি কোনো সিস্টেম আবিষ্কার করেননি। আবিষ্কার বলতে যা বোঝায় তা করেননি। তাঁর পূর্বসূরীদের ধ্যানধারনাগুলোকে তিনি একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীরা এবং তিনি নিজেও আবেগাশ্রিত অভিনয়ে বিশ্বাসী। তাঁর মতকে আমরা মানতে যাব কেন? বিশেষ যখন তাঁর সিস্টেম একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অভিনেতা চমকে উঠলেন—কি! ব্যর্থতায়! মানে?

পরিচালক বললেন—ব্যর্থ না হলে তাঁর সিস্টেম অনুসরণ করলেই প্রেরণা জাগবার কথা! অথচ মস্কো আর্ট থিয়েটারের বর্তমান পরিচালকদের এবং অভিনেতাদের মন্তব্য পড়ুন; বুঝবেন অমন সুইচ-টেপা প্রেরণার উৎস তাঁদের হাতে নেই। স্তানিস্লাভস্কিরই আখড়া থেকে আবেগের চরম শত্রু মেয়ার-হোল্ডের আবির্ভাবেই বোঝা গিয়েছিল সিস্টেমটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

অভিনেতা চেঁচিয়ে উঠলেন—কেন একথা বলছেন? কি সাহসে? কি স্পর্ধায়?

পরিচালক বললেন—বলছি, বলছি। সিস্টেমটির মূল কথা কি? না, ওসব ইনার সার্কল বা সাইকোটেক্নীক-এর কচকচি বাদ দিয়ে মোদ্দা কথায় আসুন!

অভিনেতা বললেন উদ্দীপ্ত হয়ে—স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির মূল কথা হোলো—দি ম্যাজিক ইফ্। অভিনেতা জানেন তাঁর আশেপাশের দৃশ্যপটগুলো সত্যিই ইঁটের দেয়াল নয়; তিনি জানেন তিনি সত্যিই গোর্কি-সৃষ্ট মাতাল স্যাটিন নন; তিনি জানেন আশেপাশের চরিত্ররা সত্যিই চোর-গুন্ডা-মাতাল নয়; তিনি জানেন পুরো ব্যাপারটা অলীক। তবু তাঁকে ভাবতে হবে : "যদি এসব সত্যি হোতো তবে আমি কি করতাম?" ঐ যদিটাকে প্রাণপণে ধ্যান করতে পারলেই মুড আসবে, আবেগ জাগবে।

পরিচালক শ্লেষাত্মক হাসি হাসলেন; বললেন—যদি এসব সত্যি হোতো!! কি করে সত্যি হবে? আমি কি মাতাল, না পাগল! অভিনেতার মাথা খারাপ না হলে ঐ যদিটাকে বিশ্বাস করবেন কি করে? আমি তো জানি এসব

মিথ্যে। সেখানে ওসব যদি-টদি আমদানীর অর্থই হোলো—সত্যের ভান! ভান কখনো শিল্প হতে পারে না! দর্শককে ধোঁকা দেয়ার জন্যে যদি নিজের কাছেও ভান করতে হয়, তবে মশাই শিল্পকে জলাঞ্জলি দিন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! মঞ্চের পুরো জিনিষটাই অবাস্তব। দেয়াল অবাস্তব, চরিত্ররা অবাস্তব, গল্পটা অবাস্তব। ঘরের তিনটে দেয়াল, চতুর্থটা নেই; থাকলে দর্শকরা কিস্যু দেখতেই পেতেন না। মাথার উপর ছাদ নেই, আছে কাপড়ের বর্ডার। দেয়ালের পাশেই আছে কালো কালো উইংস্। মাঝে মাঝে যবনিকা এসে পড়ছে। আমি জানি এসব মিথ্যা। এগুলোকে সত্যি ভেবে এগুলোর মানে হোলো শিল্প নিজেকেই নিজে ধাপ্পা দিচ্ছে। আরো শুনুন মশাই, বাধা দেবেন না! স্তানিস্লাভস্কি থেকে শুরু করে এদেশের একক অভিনেতারা পর্যন্ত সকলেই শত মত সত্ত্বেও কতকগুলো মৌলিক নিয়ম মানছেন, যে নিয়মগুলো প্রতি মুহূর্তে তাঁদের চলাফেরা কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এক অভিনেতা আরেকজনকে ঢেকে দাঁড়াবেন না; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বলবেন না; গলা তুলে অভিনয় করতে হবে, নিভৃত প্রেমের দৃশ্যেও ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে হবে, প্রেমাবেগে গাঢ় গলা করলে চলবে না; ইচ্ছেমত লাইন জুড়ে দেবেন না, তাহলে সহ-অভিনেতাকে আর সংলাপ বলতে হবে না, উনি মূর্ছা যাবেন!! এরকম বহু নিয়ম তাঁরা মানছেন। এই নিয়মগুলোকে স্বীকার করেও আবেগকে কি করে মুক্ত করেন তাই আমার কাছে এক বিস্ময়! আসলে হয়তো এদ্দিন যাকে আবেগ বলে তাঁরা চালিয়ে এসেছেন তা নিছক তাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতার অপব্যাখ্যা, এপোলোজি! নইলে এঁরা মৃত্যু দৃশ্যে মরার আবেগ আনতে গিয়ে তারস্বরে চারপাতা সংলাপ বলেন কি করে? এক টাকার সীটকে প্রেমালাপ শোনান কি করে? শত্রু শিবিরে ঢুকে ফিসফিস ষড়যন্ত্রকেও অমন উচ্চগ্রামে জানান কি করে? তলোয়ারের রাম-খোঁচা খেয়েও অমন ভরত-নাট্যমের ভংগীতে পতন-ও-মৃত্যু দেখিয়ে হাততালি জোগান কি করে? আবেগই যদি এদের প্রধান সম্বল হোতো তবে 'দর্শক চুলোয় যাক' বলে এঁরা নিজের মনে নিজের স্বর্গ রচনা করতেন। না! ঐ "আবেগ" কথাটিও বাংলা নাট্যশালার উচ্ছৃংখল অভিনেতাদের একটা ধাপ্পা! আপনি

ডেভিড গ্যারিকের উধৃতি দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন; প্রায় দুশো বছর আগেকার এক অতি-অভিনয়ের প্রবক্তাকে সাক্ষী মেনেছেন। আমি অসংখ্য নজীর দিতে পারি পরবর্তী প্রতিভাবান অভিনেতাদের মধ্যে থেকে। এঁরা কেউই আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-টত্ত্ব জানতেন না; এঁরা প্রত্যেকেই একক অভিনয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন এবং এঁদের অভিনয় দেখে সমালোচকরা এঁদের আবেগাশ্রয়ী আখ্যাই দিয়ে গেছেন। অথচ এঁরা প্রত্যেকে বলছেন এঁদের অভিনয়ে আবেগ বা প্রেরণার চেয়ে সচেতন পরিকল্পনার প্রভাব অনেক বেশি। গ্যারিক-এরও আগে যিনি ইংলণ্ডের নটগুরু বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই বেটারটন বলছেন :

"Art must be consulted in the study of the larger share of the professors of this art."

তারপর তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে ভেবে ভেবে তিনি চরিত্রের বাহ্য চেহারাটা গড়ে তোলেন; আবেগ-আদির উল্লেখমাত্র বেটারটন করেননি। মহাপণ্ডিত দার্শনিক দিদেরো তৎকালীন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ক্লেরোঁ-র অভিনয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

"When by dint of hard work she has got as near as she can to her idea of the part, the thing is done; to preserve the same nearness is a mere matter of memory and practice....She repeats her efforts without emotion."

আর মাদাম ক্লেরোঁ স্বয়ং তো সদর্পে বলে গেছেন—হ্যাঁ, আমি কলাকৌশল দিয়েই গড়ে তুলি আমার পার্ট; ঐ ভাবেই আমি রোক্সান বা অ্যামেনেইড-এর মতন পার্ট করে আপনাদের কাঁদিয়েছি! গ্যারিক-বেটারটনের সংগে আর যে লোকটি এককালে ইংলণ্ডের মঞ্চ কাঁপিয়েছিলেন সেই এডমণ্ড কীন সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে; তিনি নাকি এমন প্রচণ্ড আবেগময় অভিনয় করতেন যে ভয়ে সহাভিনেত্রীর মূর্ছা যাওয়াটা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কীন বলছেন :

"I have bestowed the utmost care and attention....There is no such thing as impulsive acting; all is premeditated and studied beforehand."

ঊনিশ শতকের দিকপাল ইংরেজ অভিনেতা ম্যাক্রেডি বলছেন আবেগকে দমন

না করলে পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া হবে; অথচ :

"As there must be one form of expression which he finds nearest to the exact truth, in once attaining this, every deviation or declension from it must be more or less a deterioration."

তাই তিনি নবীন অভিনেতাদের আসনে একটি ল্যাটিন আপ্তবাক্য রেখেছেন : হিকলাবর, হক ওপুস এস্ট" যার অর্থ মোটামুটি দাঁড়ায় "কাজ করে যাও!" কাজ অর্থে মাথার ঘাম ফেলা। আবেগ বা প্রেরণার মুখ চেয়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। গত শতকের শ্রেষ্ঠ সমালোচক জর্জ হেনরি লুইস বলছেন :

"What is called inspiration is the mere haphazard of carelessness or incompetence."

হেনরি আর্ভিং-এর চেয়ে বড় অভিনেতা পুরাতনদের মধ্যে বোধ হয় কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয়কেও আবেগ-কম্পিত বলে সবাই বর্ণনা করতেন। আর্ভিং জবাব দিচ্ছেন :

"It is often supposed that great actors trust to the inspiration of the moment. **Nothing can be more erroneous**......The great actor's surprises are generally well weighed, studied and balanced."

নাট্যশালার সংগ্রামী বিপ্লবী গর্ডন ক্রেগ্ আবেগকে একেবারে বহিষ্কার করার পক্ষপাতী; তিনি বলছেন :

"As the mind becomes the slave of the emotion it follows that accident upon accident must be continually occurring......Emotion is the cause which first of all creates, and secondly destroys. Art can admit of no accidents."

এবার দেখা যাক সেই সব আধুনিক অভিনেতাদের যাঁরা "আবেগবান" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁরা নিজেদের কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি বলছেন? জন্ গীল-গুড তাঁর বিখ্যাত হ্যামলেট সম্বন্ধে কি বলেছেন পড়েছেন? গভীর মনোযোগ দিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত ছক অনুসরণ করে যাওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ; আর এক-আধদিন যখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন—ধরুন দর্শকদের গণ্ডগোলের ফলে বা নেপথ্যে কুশলীদের খটাখটির ফলে—তখন নিজের অজ্ঞান্তেই তাঁর দেহ এবং কণ্ঠ নিজ নিজ কর্তব্য করে গেছে; দর্শকরা কেউ জানতেই পারেনি যে, হ্যামলেট আজ অমুক দৃশ্যে ভাবছিল শো-এর শেষে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না। আবেগের নিকুচি করেছে! গীলগুড-এর চেয়ে বড় অভিনেতা তো মশাই এ শতাব্দীতে দুর্লভ। আমেরিকার নতুন থিয়েটারের জনক ডেভিড বেলাস্কো অভিনয়কে শিল্প বলেও মানতে রাজী নন; তিনি বলছেন অভিনয় একটা বিজ্ঞান। জন ব্যারিমুর বলছেন অভিনয়ে টেকনিকটাই বড় কথা, আবেগ-টাবেগ বাজে কথা। স্টেলা আডলের বলছেন আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটারের ভিত্তিই ছিল দলগত অভিনয়; আর দলগত মানেই ঠান্ডা-মাথায় চিন্তা করে অভিনয়। চ্যাপলিন বলছেন, কৌতুকাভিনেতার প্রতি মুহূর্তে দর্শক-সচেতন থাকা চাই; কৌতুকাভিনয়ের ইতিহাস পড়া থাকা চাই; এক একটা ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশকে পঞ্চাশবার রিহর্সেলে দেয়া চাই। আর ব্রেশট্ তো তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অভিনেতাকে একেবারে আবেগশূন্য করতে চেয়েছিলেন; তাঁর এই পদ্ধতির নাম "ফেরফ্রেমডুং"। তাঁর এপিক থিয়েটারের পরীক্ষা সাফল্যের পথে এ কথাও আজ সর্বজনবিদিত। তিনি চাইছেন "এলিয়েনেশন"; ঘটনা এবং পরিবেশ থেকে অভিনেতার দূরত্ব বজায় রেখে অভিনয় করা। অভিনেতার কাছ থেকে তিনি চাইছেন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের নিরুত্তাপ দৃষ্টিভঙ্গী। তার জন্যে প্রথমেই আবেগ-আদিকে ছাঁটাই করতে হবে :

If the A-effect (এলিয়েনেশন বা ফেরফ্রেমডুং) is to achieve its aim, **the stage and the auditorium must be cleared of 'magic'......The actor is not to warm the audience up by unlossing a flood of temperament."**

এরভিন পিস্‌কাটর সোজাসুজি এই এপিক অভিনয়ের নাম দিয়েছেন 'অবজেকটিভ একটিং", অভিনেতা যেখানে সূত্রধার মাত্র, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মতন। অভিনেতার "আবেগ" বা "পার্টে ডুবে যাওয়া" ইত্যাদি শিকেয় তুলে রাখার প্রস্তাব করেছেন পিসকাটর। তাই মশাই, যদ্দুর মনে হচ্ছে স্তানিস্‌লাভস্কির থিয়োরিটা নেহাৎই ফাঁকা বুলির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর যে অভিনেতা বলেন, "আজকে পার্ট করতে করতে জগৎ ভুলে গিয়েছিলাম", হয় তিনি মিথ্যাবাদী, আর না হয় ভুলেছিলেন তিনি ঠিকই, তবে সেটা মদ্যপ্রসাদাৎ!

কিছুক্ষণ চারদিক থমথম করছিল। একটু পরে ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, আর্ভিং-বেটারটন-ম্যাকরেডি-কীন, তারপর গীলগুড-ব্যারিমুর-চ্যাপলিনদের মতামত শুনে আমারো মনে হচ্ছে আবেগের স্থান অভিনয়ে নামমাত্র বা নেই!

পরিচালক মাথার ঘাম মুছে বললেন—আর নেই বলেই নবনাট্য আন্দোলন অভিনয় নিয়ে নূতন পরীক্ষার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেছে। নূতন অভিনয় দলগত অভিনয়। ঠান্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে মঞ্চে না নামলে দলের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে যেখানে সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রশ্ন, প্রতি মুহূর্তে যেখানে বৃহত্তর কম্পোজিশনে নিজের স্থান নেয়ার প্রশ্ন সেখানে ঐ আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বার ওয়ান! নবনাট্য আন্দোলনে তাই মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অভিনেতা বাহাদুরের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে; পরিচালকই এখানে সম্রাট। তাঁর প্রজা হচ্ছে অভিনেতা। অভিনয় চারটি আঙ্গিকের একটি মাত্র। অভিনেতাকে তাই সম্পূর্ণ নূতন চেতনা নিয়ে পরিচালকের বিশাল নকসায় নিজের স্থান নিতে হবে। তার জন্যে রিহার্সাল নূতন ধরণের হচ্ছে, অভিনয়ও—থাক, সে আর একদিন হবে। পরিচালনা সম্বন্ধে যেদিন আলোচনা হবে সেদিন বলবো।

এই সময়ে কেষ্ট প্রচুর জলখাবার নিয়ে প্রবেশ করাতে আলোচনায় ছেদ পড়লো। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বোম্বাইয়ের চিত্রজগৎ

বিমল দত্ত

স্বনামধন্য এই জগৎ। বিশেষণ-যোগে তার রূপগুণ বর্ণনা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনের আর ভাড়াটে পত্রিকার জয়ধ্বনির সোরগোলে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকার জৌলুস-সজ্জায়-এ জগৎ একটা জনচিত্তে চমকজাগানো চেহারা আয়ত্ত করে ফেলেছে। অবশ্য এটা তার দোষ নয়। এমন ক্লাউন সে সেজেছে প্রাণের দায়েই। এখন টিকে থাকতে গেলে ওকে গায়ের জৌলুস টিকিয়ে রাখতেই হবে। কিন্তু প্রাণের দায় শুধু চিত্রলোকেরই নয়, আমাদেরও আছে। আজ তাই, ভাবতে বসার সময় এসেছে।

কোনো প্রমোদ বা শিল্প-মাধ্যম এমন সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা নিয়ে আজও আবির্ভূত হয়নি। চলচ্চিত্র আমাদের দেশেও তার এই ত্রিবিশ বছরের সাবালক জীবনেই রীতিমত একটা উপসর্গ হিসেবে উপস্থিত। একে আর উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু হঠাৎ দিবানিদ্রা ভেঙে গুরুমশায়ের মত ধড়-ফড় করে সেন্সারের লগুড়-হাতে উঠে পড়ে এলোপাতাড়ি সুশিক্ষা দানের চেষ্টা করলে লাভ হবে না। কারণ, বখাটে ছেলে অনেক থাকলেও, কিছু ভাল ছেলে আছে, তাদেরও পড়া বন্ধ করিয়ে নিল-ডাউন করালে সুকাজ হবে না; তাছাড়া, বড়ো কথা, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি গুরুমশাই, ঘুমোচ্ছিলেন এতোকাল। ওরা যেটুকু শিখেছে,—করেছে, নিজের চেষ্টাতেই করেছে, আর যে বদনামী আজ অনেকে করছে, তা-ও সুপথের প্রেরণা বা সুযোগ না পাওয়ার জন্যেই। বা, কখনো কেউ বাধা দেয়নি বলেই। আজ যদি আপনি-আমি চিত্রজগতের বেলাল্লা-পণায় ক্ষুব্ধ হয়ে থাকি, তার জন্যে কিছুটা দায় আমাদের স্বীকার করতেই হবে। দেখুন না, সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনা হয়ে থাকে; ভাল-মন্দ বিচারের একটা চেষ্টা আছে সকলের মধ্যেই; এ নিয়ে সমালোচনাও কম নেই; কিন্তু চলচ্চিত্রকে আমরা কিছুকাল সমালোচনার অযোগ্য করে রেখে, আজ হঠাৎ দেখ্‌ছি যে এ সমালোচনার অতীত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মত সুসংস্কৃত রুচিবাগীশের দেশেই যদি সিনেমা-পত্রিকার ঘুলিয়ে তোলা পাঁকের তলে সিনেমার সৎ-প্রবাহ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাহলে, অবাক হবার কারণ নেই যে, শেকড়বিহীন পাঁচমিশেলী বোম্বাই সংস্কৃতি তার চিত্রলোকের দিগম্বর পংক-সজ্জা দেখে বিচলিত হবে না।

বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র এক রোগ-বিকার পীড়িত বিকলাঙ্গ কিশোর। শুনতে যতই খারাপ লাগুক, এ রোগকে চেপে, লুকিয়ে, অস্বীকার করে কিছু-তেই মুখরক্ষা হবার নয়। বিকার আছে, কিন্তু তবু এখনো ও কিশোর। চোখে আশা আর উদাম চমক দেয় মাঝে মাঝে। সেটাই প্রাণলক্ষণ। তার কথা এবার আলোচনা ক'রবো। তবে, তার আগে জেনে রাখা দরকার যে, এই বিকৃত চেহারার জন্যে দায়ী তার চরিত্রহীন বণিক বাপ। তাই জন্মাবধি তার রক্তে বিষের বীজ রয়েছে। অর্থলিপ্সা তার পূর্বপুরুষের দান। ওদিকে মায়ের স্নেহ-সৌরভ সে কম পায়নি। বরং শিশুকালে রোগের চেয়ে স্নেহের ছায়াই বেশী দেখা যেত মুখে।

১৯১৩ সালে দাদাসাহেব ফাল্‌কের প্রযোজনায় প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' জনসমাদরে অভিষিক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের জগতের মতই এক্ষেত্রেও আমাদের প্রিয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও লোকগাথার চরিত্রগুলি রূপালী পর্দায় আবির্ভাব করতে শুরু করল। আর তখনো মুখে কথা না ফুটলেও ১৯২৮ সালেই ইম্পিরিয়াল

গুরু দত্ত পরিচালিত 'সাহেব বিবি গোলাম'-এ জবা ও ভূতনাথের চরিত্রে ওয়াহিদা ও গুরু দত্ত

ফিল্ম কোম্পানীর 'দি বম্' বলে একটি রাজনৈতিক ছবিতে সে প্রথম ইন্-কেলাবী ভাষণ তুলল। তৎকালীন সেন্সর তৎপরতার সঙ্গে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

অনতিকাল পরেই যখন তার মুখ খুলল, সত্যি সত্যিই, অর্থাৎ ছায়াছবির সঙ্গে যখন শব্দসম্ভারও এসে যোগ দিল—তখন ১৯৩১ সালে—সে উপহার দিল 'আলম্ আরা'। সেই স্বরলাভের আশীর্বাদ অভিশাপ হয়েই দেখা দিল। চলচ্চিত্র মুখর হ'ল কথায়, গানে...নাচে ও বক্তৃতায়। যা মুখ্যত দর্শনীয় হওয়ার কথা, সেই চলচ্চিত্র আজও আর কিছুতেই তার বাচালতা আর গানের মওকা ছাড়তে পারল না। 'শিরিণ ফরহাদ', 'হুর্নি কা লেড়কি', 'লায়লা মজনু' ইত্যাদি আসর জমিয়ে রইল কিছুকাল। তারপর কলকাতার নিউ থিয়েটার্স থেকে ১৯৩৩ সালে 'পূরান ভকত' তৈরী হয়েছে আর ১৯৩৪-এ যখন কলকাতা থেকেই 'চণ্ডিদাস' আর 'সীতা' তোলা হ'ল তখন এখানে পুণা থেকে প্রভাত ফিল্মস্-এর 'অমৃত মন্থন'।

এই সময় থেকেই কিন্তু আসল রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। ধর্মকথা, পুরাণ, আর ইতিহাস নিয়ে এই সময়ে যে কাড়াকাড়ি চেঁচামেচি হ'ল—তার অন্তরের প্রেরণা খুব আধিভৌতিক ছিল না। সাধারণের ধর্মপ্রবণতা বা অন্ধ আকর্ষণ, ও লাস্যময়ীদের নাচের

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বিপাশা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

অজুহাতে যৌন আবেদনের মোহ...টাকা রোজগারের চমৎকার উপায় হিসেবে দেখা দিল তখনই। আর, তাবৎ শিকারী হা-হা রবে ছুটে এলো। কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ, পুণা সর্বত্রই সের দরে সিনেমা তোলা হ'তে লাগল।

এই অবস্থার মধ্যে দেখা দিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। 'দেবদাস' নিয়ে শিল্পের সাহসে উজ্জ্বল উদার এক সাধারণ মানুষের গল্প নিয়ে হাজির হলেন। সেটা ১৯৩৫ সাল। পুণা থেকে তোলা হয়েছে 'ধর্মাত্মা'। (বোম্বাই-এর চিত্রলোকের কথা বলতে গিয়ে কলকাতা ও পুণার উল্লেখ করছি। হিন্দি ছবির রাজধানী বোম্বাইতে বদল হয়ে কেমন ক্রমেই হাওয়ার গুণ আয়ত্ব করছে, সেটাও লক্ষ্য করবেন, এই সুযোগে। পুণা মহারাষ্ট্রের এক সংস্কৃতির কেন্দ্র। তার সাক্ষর সে রেখে গেছে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে)। বম্বে টকীজ-এ সেই বছরেই তোলা হয়েছে 'জওয়ানী-কী-হাওয়া'।

প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বোস ও শান্তারাম তখনকার চরিত্রহীন বাজার-মুখী লোভী ভিড়ের মুখ ঘোরাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৫-এ 'দেবদাসে'র মুক্তির পর থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত বেশ লক্ষণীয় কতগুলি ভাল ছবি হ'ল। পুণা থেকে পরপর দেখা দিল, 'অমর জ্যোতি', 'দুনিয়া না মানে', 'আদমী'। কলকাতা থেকে এলো, 'বাঘী সিপাহী', 'মঞ্জিল', 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি', 'অধিকার', 'ধরতি মাতা', 'দুশমন', 'সাপেরা'...আর বোম্বাই থেকে তৈরী হ'ল 'অচ্ছুৎকন্যা', 'জেলর', 'পুকার'।

তখনকার সেই নীতিহীন, রুচি-হীন, অর্থকরী চিত্রলোকের পরি-প্রেক্ষিতে না দেখলে এই ছবিগুলির গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, ধারণা করা—যে কি অপরিসীম ক্ষমতা ও সাহস নিয়েই না প্রমথেশ বড়ুয়া এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আজকের অবস্থা যদিও কম শোচনীয় নয়, তবু তখন সর্ব-সাধারণের বিশেষত দেশের বিদগ্ধ সমাজের অবহেলা ও উদাসীনতা এক-দিকে ও নীতিরহিত অর্থলোলুপতার অবাধ আক্রমণ অন্যদিকে—যেমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, এখনকার তবু কিছুটা সচেতন জনসাধারণ ও কিছু সংখ্যক শিক্ষিত শিল্পানুরাগীর দৃষ্টির প্রশ্রয়ে অবস্থা ততটা সঙ্গীন নয়। শান্তারাম, দেবকী বোস ও প্রমথেশ বড়ুয়া হয়তো কিছুটা রোগমুক্তির সঞ্জীবনী তখনই রক্তে চালান করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ওঁরা সময় পেলেন না। যুদ্ধ এসে পড়ল।

ফিল্ম পাওয়া দুষ্কর হ'ল। লাইসেন্স প্রবর্তিত হ'ল। ছবি তোলার খরচ অনেক বেড়ে গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার

উপায় রইল না। ছবিতে টাকা ঢালতে উৎসুক হয়ে যারা এলো, উসুল করতে তারা জিরাফ-উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। ছবি বেশী হয় না। যা হয়—তাই একেবারে ছুটে চলে। তাই, কিছু একটা করে ফেলা নিয়েই কথা। তার ওপর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অনটন, অব্যবস্থার কবলে আনুসঙ্গিক উত্তেজনা নিয়ে দেশের নীতি-রীতি সবই তখন বদলে যাচ্ছে। আমোদ করা আর আনন্দ করার তফাৎ ঘুচে গেছে। তাই বহু চেষ্টায় প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ কয়েকজন চলচ্চিত্র জগতে যে সুবাতাসের স্নিগ্ধতা এনেছিলেন, মাদক উল্লাসের চিৎকারে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বম্বে থেকে 'আওরৎ' (৪০), 'রোটি' (৪২), 'জমীন' (৪৩), পুণা থেকে 'পড়োশী' (৪২), 'রামশাস্ত্রি' (৪৪), কলকাতা থেকে 'জীন্দগী' (৪০), 'লগন' (৪১), 'জবাব' (৪২) মুক্তিলাভ করল। কিন্তু অজস্র বিকৃত ছবির সামনে তারা জনমনে আর তেমন রেখাপাত করতে পারল না।

আর তখন থেকেই অধুনাতম উগ্রতম ব্যাধির উপসর্গটা দেখা দিয়েছে। ভাল ছবির, সুস্থ ছবির আকর্ষণকে ডুবিয়ে দিয়ে মাথা তুলছে সবেগে মোহ-গ্রস্থ হবার কামনা। আর সাপের ঝাঁপি হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে তো ছিলই যুদ্ধস্ফিত নতুন লক্ষপতির দল।

কিন্তু যুদ্ধের সময়ে নৈতিক মান যেমন চুরমার হয়ে ভেঙেছে তেমনি তখনই দেশাত্মবোধের একটা সার্বজনীন আবেগও মাথা তুলতে শুরু করেছে। অল্প সংখ্যক চেতন মনের ভাবমাত্র যা ছিল এতোদিন এবার বহুতর জনমনে তার স্পষ্টতর একটা রূপ দেখা দিতে, ও অঙ্গিকার ভাষা নিতে উদ্যত হয়েছে। নিউ থিয়েটার্স থেকে উদ্‌গত হ'ল 'হামরাহী' ১৯৪৫ সালে। আর এক পর্যায়ের শুভারম্ভ হ'ল। তখন সমস্ত দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা এগিয়ে এসেছেন; তখন অনেক বলার কথা। লোকেরাও শুনতে উদ্‌গ্রীব। নাটকে উপন্যাসে, কবিতায় গানে ছবিতে—সাড়া পড়ে গেছে। চলচ্চিত্রেও আই পি টি এ বম্বেতে তৈরী করলেন 'ধরতি কে লাল।' সেটা ১৯৪৬ সাল। 'ধরতি কে লাল'-এর সঙ্গেই মুক্তি পেল 'ডক্টর কুটনীশ কী অমর কাহানী', 'নীচানগর', 'মিলন'।

আগে যা বলেছি, এখন সে কথাই প্রমাণ করছি। বিকারগ্রস্থ কিশোরের চোখে আশা আর স্বপ্ন ঝিলিক দিয়ে গেলেও বিকৃতিটা ক্রমেই আরো প্রখর হ'য়ে দেখা দিতে শুরু হ'ল এইবার। স্বাধীনতার উদ্দীপনা যেমন সঙ্গীতে-সাহিত্যে, চিত্রকলায়, কোথাওই স্থায়ী কোনো সৃষ্টির কারণ হয়নি, তেমনি চলচ্চিত্রেও হয়নি। পক্ষান্তরে, এক ধরণের আলস্যবিলাসে আবহাওয়া আবিল হয়ে উঠল।

বাঙলাদেশে 'ভুলি নাই' যখন আত্মস্থ রাখার চেষ্টা করছে, উদয়শঙ্কর মাদ্রাজ থেকে এক আনন্দ-স্বাদের সন্ধান দিচ্ছেন 'কল্পনা'য়, এখানেও প্রচুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাজকাপুর এনে দিয়েছেন 'আগ'......এসবই ১৯৪৮-এ... তখন বিপরীত পক্ষের প্রবল দল মাদ্রাজের স্টুডিও থেকে 'চন্দ্রলেখা' নিয়ে ধেয়ে এলো। আর তারই তালে বোম্বাই চলচ্চিত্রজগৎ দুলে উঠল। 'চন্দ্রলেখা' নেচে নেচে বহুকাল ধরে চলল, এবং ঈর্ষা-কাতর বহু বুকে যে ঝনৎকারের বাণ বিঁধে গেল—তারই ফলে সৃষ্টি হ'ল 'নিশান', 'মঙ্গলা', 'শবনম', 'আন'... আরো অজস্র। আবার একবার ঘুরেফিরে সেই নাচগানের আদিপর্ব শুরু হ'ল। তবে এবার হরপার্বতীর নাচটা রক্-এন্ড রোল্-এর তালও আয়ত্ত করে নিল। এক জারজ সিনেমা-সঙ্গীতে, আগলহীন কথায়, প্রগল্‌ভ প্রলাপে চলচ্চিত্র কবির লড়াই-এর আখড়া হয়ে গেল...আর

নাইলনের দৌলতে সঙ্গীতমুখরা নৃত্য-পটিয়সী নায়িকার সর্বাঙ্গে আয়েস-খোঁজা দর্শকের দৃষ্টির পাঁচান্তর নয়া পয়সার আমন্ত্রণ সাজানো হ'ল। চমৎকার জমল। তা সত্বেও 'যোগন', 'অমর ভূপালী', 'আওয়ারা' (৫০-৫১) হয়েছে।

দুর্দিন বেশ ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ ১৯৫৩ সালে বিমল রায় নিবেদন করলেন 'দো বিঘা জমীন'। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এতোদিন একটা ভাবরূপ আশ্রয় করে দেখা দেবার চেষ্টা করছিল এবার সে দেহধারণ করেই দেখা দিল। সেই থেকে 'পথের পাঁচালী' পর্যন্ত (৫৫) শুধু বক্তব্যের দিক দিয়েই নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও চলচ্চিত্র একটা স্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'দো বিঘা জমীন' বা 'পথের পাঁচালী' শুধু একালের ঘটনা নয়, বড়ুয়া সাহেব, শান্তারাম, দেবকীবাবু যে পতাকা সৃষ্টি করেছিলেন, এতোদিন যে পতাকা অনেক ধুলোয় বেরঙ হয়ে লুটিয়ে ছিল, এবার তা সগৌরবে নির্মল হয়ে আকাশে উড়ল।

৫৩ সালে কলকাতায় নির্মিত হয়েছে বাবলা। দো বিঘা জমীন ছাড়াও বোম্বাইতে ঝাঁসি কি রাণী, পরিণীতা, ইত্যাদি হয়েছে। পরের বছর 'আওলাদ', 'মুন্না', 'বিরাজ বহু', 'বুট পালিশ'।

আর 'পথের পাঁচালী' দেখা দিল ৫৫তে, তখন রাজকাপুর তৈরী করে-ছেন 'জাগতে রহো'।
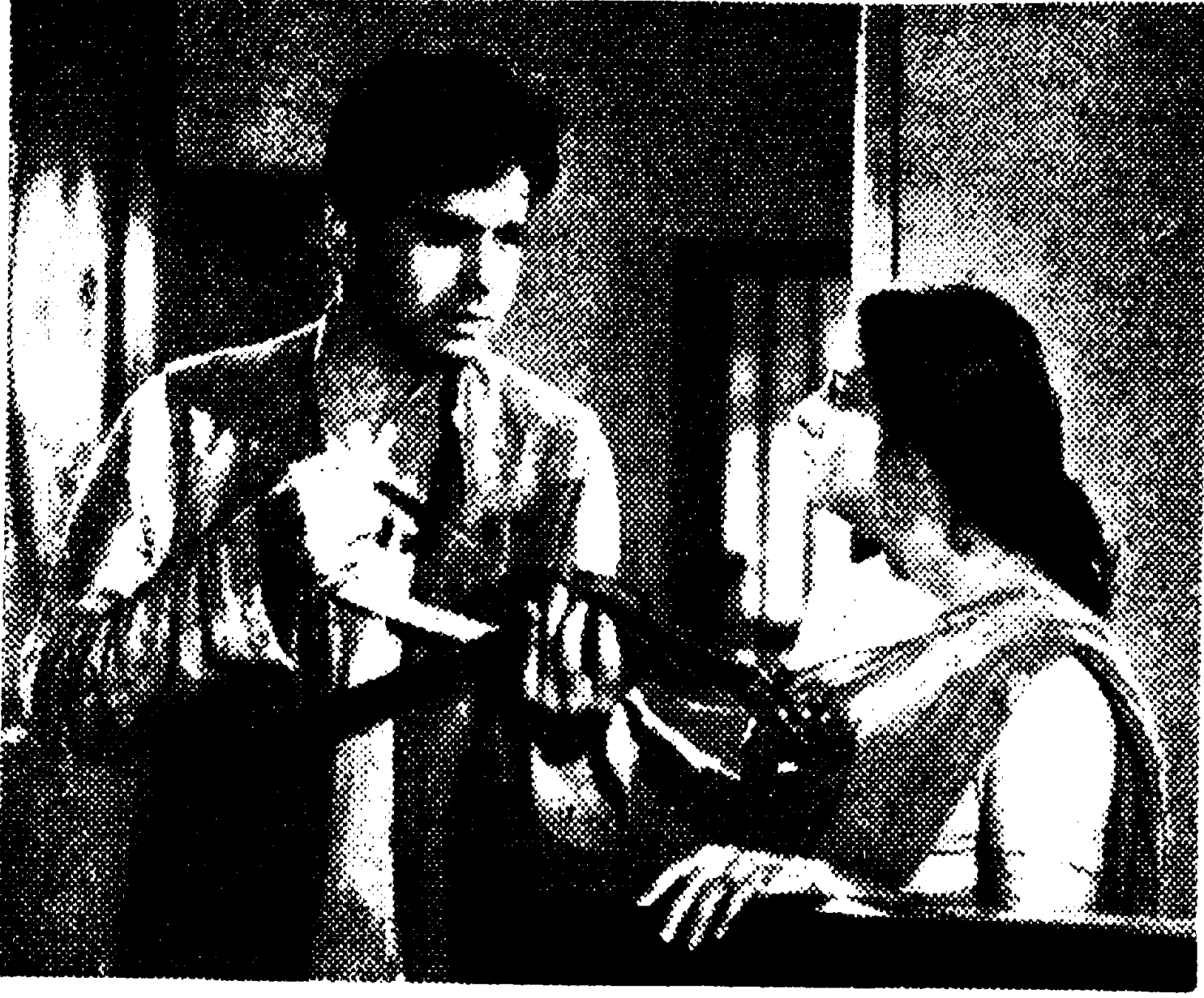
হৃষিকেশ মুখার্জির "মুসাফির" চিত্রে দিলীপকুমার ও নিরূপা রায়

৫৭তে 'দো আঁখে বারা হাত', 'মাদার ইণ্ডিয়া', 'পিয়াসা' তৈরী হ'ল— কিন্তু ইতিমধ্যে বাতাস বেশ বিষিয়ে গেছে। ওই ছবিগুলোতেও তা প্রকট। বক্তব্যের বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও অর্থহীন, সংগতিহীন আবর্জনায় অবিশ্বাস্য। সমাজসত্য বা জীবনসত্যকে চলচ্চিত্রে স্থান দেওয়ার জন্যে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও অতিপ্রাকৃত পরিবেশে সস্তায় মনহরণের কাজে লাগলেন। ভূরি ভূরি বাজে ছবি তো হচ্ছিলই, এমনকি বিমল রায় 'দো বিঘা জমীনে'র পথ ছেড়ে 'মধুমতী' আশ্রয় করলেন। যেন-তেন-প্রকারে ছবি চালানোর গরজে চিত্র-নির্মাতারা বহুকাল থেকে নায়ক-নায়িকা-জুটিকে প্রচুর রঙে সাজিয়ে মাথার ওপর তুলে জনসাধারণকে ভোলাতে আর ডাকতে চেষ্টা করে আসছেন। তার ফলে ছবির পরিচালক, কাহিনীকার ইত্যাদিরা গৌণ হয়ে গেলেন ...ও দেখা দিল, ষ্টার সিস্টেম। হু হু ক'রে তারকাদের বাজারদর চড়তে লাগল। শুধু টাকা নয়, কালো টাকাও। বাঙলাদেশে একটা ছবি তোলার জন্যে যা খরচ হয়, বিজ্ঞাপনে তার চেয়ে বেশী খরচ হ'তে লাগল। নায়ক-নায়িকা চাই—আর চাই মিউজিক ডিরেক্টর (সংগীত পরিচালক ব'লে ও'দের অপমান করা উচিৎ নয়)। লোকে অদ্ভুত সব পোষাক পরা, আজব পরিবেশে এমন অপূর্ব সব গান শুনতে ও দেখতে লাগল, যে ভূভারতে কস্মিন-কালেও কেউ তা ভাবতে পারেনি। লোকেদের মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। প্রযোজকের ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়। হিসেব টেঁকে না। রাজকাপুর-নূতনের বিধুর আলিংগনের পোষ্টার দেখেও লোক আসে না...দেবানন্দ-মালা সিনহাও না। অথচ এদিকে ছ'লাখ সাত লাখ ছু'য়েছেন এক একজন নায়ক, অন্ততঃ দাবী করছেন। সেই তাড়ায় পড়ে কিছু পরিচালক নতুন নায়ক-নায়িকা আমদানীর চেষ্টা করলেন। তার ফল এমনিতেই ভালই দেখা গেল। কিন্তু অভিনয়ে যখন হচ্ছে না, তখন অন্য-কিছু দিয়ে জমাতে হবে...আর অন্য-কিছুর সংজ্ঞাটা তো আপনারা জানেনই। এমন কদর্য রুচির পরিচয় দিতে শুরু করল শতকরা অন্ততঃ আশীজন, এবং বাকি শতকরা কুড়িও—প্রচ্ছন্নভাবে আদিরসাত্মক আগ্রহ সৃষ্টির এমন চেষ্টায় লাগলেন যে, জনসাধারণের তরফ থেকেও প্রতিবাদ উঠতে লাগল। লগুড় হাতে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সেন্সার। চলচ্চিত্র ব্যবসায় থেকে বাড়তি টাকা শুষে নেওয়ার জন্যে স্থাপিত হ'ল লেভী ব্যবস্থা। চলচ্চিত্র জগতের দুর্ব্যবহারই সরকারকে প্রধানত লেভী ও সেন্সারের ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করলেও, ব্যবস্থাটা এমনই বেহিসেবী, আচমকা আর এলোপাতাড়ি হ'ল যে কার্যতঃ তা ক্লাশশুদ্ধকে 'নীল-ডাউন' করানোরই সামিল হ'ল। এখনো এরই জের চলেছে।

রাজকাপুর 'জাগতে রহো'তে যার দোরগোড়ায় হুঁসিয়ারী শুনিয়ে গিয়েছিলেন, নিজেই 'জিস্ দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়'-এর সিঁদকাটি নিয়ে তারই ভিত আক্রমণ করেছেন। 'মুসাফির' ও 'হীরামোতি' নিয়ে হৃষিকেশ মুখার্জি ও কৃষণ চোপরা দেখা দিলেন—অনেকেই অনেক আশা করল। কিন্তু বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের কপালে তা টিকল না। হৃষিকেশ মুখার্জি করলেন 'আনাড়ি' আর কিষণ চোপরা 'চারদিওয়ারী'। শিল্প আর তার বিশেষ রীতির বৈশিষ্ট্যের খাতিরে চলতি ভিড়ের সংগ ছেড়ে নিজের পথ ধরা এক কথা, আর 'যা কেউ করেনি তা করতে হবে' এ প্রতিজ্ঞা আরেক কথা। 'অনুরোধা', 'মেমদিদি', 'পরখ', 'চারদেওয়ারী' সবই

"শাদী" চিত্রে বলরাজ সাহানী ও সুলোচনা

বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে কিছুকাল আগেকার 'হামলোগ', 'ফুটপাত', 'হাম সফর', 'গরম কোট', 'সনসার', 'লালবাত্তি' ইত্যাদির মতই সুস্থ ছবির ভঙ্গী ধরে না-পারল সুস্থ পথ সৃষ্টি করতে, না পারল জনমনে ভাল জিনিসের আগ্রহ জন্মাতে।

'এবার দেখিয়ে দেবো' বলে উল্টো পথে চলা, বাঙলাদেশের মজ্জায় আছে। তার ঝড়-ঝাপটা আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। কিন্তু একথা মনে না করে উপায় নেই যে, এই আন্দোলনের মধ্যেই কোথায় যেন আশাটুকু লুকিয়ে আছে।

বিমল রায় 'প্রেমপত্র', হৃষি মুখার্জি 'ছায়া' 'আশিক' 'আসলি-নকলি' সম্প্রতি অবলম্বন করলেও বোম্বাইতে এখানেই আমাদের আশা করা ছাড়া গতি নেই। যখন মাথার ওপর 'মোগলে আজমে'র খাঁড়া ঝুলছে, 'মধুমতী' তৈরী করছেন বিমল রায়, গুরু দত্ত করছেন 'কাগজ কা ফুল', শশধর মুখার্জি নিয়ে এসেছেন 'লাভ ইন সিমলা', 'দিল দেকে দেখো'র হাওয়া, 'দিল্লীকা ঠগ' লোকের হাড় কাঁপিয়ে যাচ্ছে, তখন থেকে ব্যক্তিগত-ভাবে ওঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলে বুঝেছি, মজ্জায় মজ্জায় কোথায় একটা হার মেনে নেওয়ার কাঁপন শুরু হয়ে গেছে ওঁদেরও।

'বাঙলাদেশেই বা পথের পাঁচালী কতো চলেছে?' এই বিভীষণ প্রশ্নের সামনে মুখ কিছুটা বিরস করলেও বলতে হয়েছে, 'গোয়ালাকে চিরকালই দোরে দোরে দুধ ফেরী করে বেড়াতে হয়: শুঁড়ি নিজের ঘরে বসেই মদ বেচে যেতে পারে।'

সার্থক ও মংগলাত্মক সৃষ্টি মণ দরে গজায় না। তা সহজ নয়; তার সর্টকাটও নেই। সবায়ের দ্বারা তা হবার নয়। সব সময়েও তা হয় না। তাই যাঁরা তা হয়তো পারেন, অন্ততঃ নিজেরাই এক-দিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কতগুলো খোলাখুলি বোঝাপড়া হওয়া দরকার। মেমদিদি, পরখ বা অনুরাধা না চলার দোষ পুরোপুরি জনসাধারণের ঘাড়ে তুলে দেওয়া কি সত্যভাষণ হবে? ভালো কথা বলাই কি যথেষ্ট? বরং তাকে কি খেলো কথার চেয়ে আরো বেশী যত্ন ক'রে, আরো মনোগ্রাহী করে পরিবেশন করার দায়িত্ব নেই? সে দায়িত্ব কি প্রতিপালিত হয়েছে? এসব ছবি না-চলার কুফল শুধু প্রযোজকদের পকেটের ওপর দিয়েই যায় না—সুস্থ ছবির আন্দোলনকেও দমিয়ে দেয়।

অথচ এদিকে দক্ষিণ ভারতের বিকট চিৎকারে এবং তাঁদের অনুসরণকারীদের সোরগোলে শিল্প বলুন, মানবিকবোধ বলুন, যুক্তিসংগত চিন্তা বলুন, সবই কর্দম-শয়নে সুবর্ণ-জয়ন্তীর শতদল

ফুটিয়ে চলেছে। গার্হস্থ্য চিত্রের নাম ক'রে শাশুড়ি বউকে ঠেঙাচ্ছে, ছোট ভাই বড়ো ভাইকে, মেয়ে বাপকে—এমন কি চাকর এসে চাকরাণীকেও দু'ঘা দিয়ে যাচ্ছে—এবং অনেক রুমাল ভিজিয়ে শেষে আবার সবাই কোলাকুলি ক'রে নায়ক-নায়িকার ভুল বা মান ভাঙিয়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন করে দিচ্ছে। সেইসব ছবি যদি কষ্ট করে একবার দেখেন তা'হলে বুঝবেন, সাধারণ মানুষ স্থূলে জিনিস গ্রহণ করতে পারে বলে সেখানে ভীড় করে যায়, সেকথা পুরো সত্যি নয়। কতগুলো মোদ্দা ভালো কথা খুব চিৎকার করে বলা হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মন ভোলানো হচ্ছে নাচে-গানে। কিন্তু শুধু নাচ-গান দিয়ে এ চেষ্টা বার বার বিফল হয়েছে। সঙ্গে একটা মনে-লাগে এমন বড়ো কথার আবরণও থাকলে—তবেই কারসাজীটা টেঁকে। প্রখ্যাত এক মাদ্রাজী চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে ছবির গল্প সম্পর্কে একবার এক সূত্রে কথা হয়েছে। তাঁর লেখকের কাছে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।........ Don't go in for logic. Logic is a slow process of thinking. Make some 'CONVINCING NONSENSE!' আশাকরি, আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না।

এইCONVINCING NONSENSE তৈরীর বছরে যে শ'তিনেক নজীর আপনারা দেখে থাকেন তাদের নাম দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের ফতোয়া সারা বছরেই জারী থাকে। এগুলো যদি শুধুই nonsense হতো তাহলে কিছুই করতে পারতো না। কিন্তু ওরা convincing! মেমদিদি, পরখ, বা অনুরাধা—অবশ্যই sensible কিন্তু convincing হতে না পারাতেই হার মেনেছে। এ সমস্যা যে কত দুরূহ তা যে আমি বুঝতে পারছি না, তা নয়। মেনে নিতে ইচ্ছে করছে না।

মাত্র কয়েক বছর আগে, আমরা অতি উৎসাহের দাপটে এক পণ্ডিত চিন্তাশীল সু-অভিনেতাকে নিয়ে মারাত্মক এক এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলাম। টিপু সুলতানের ব্যাখ্যা করতে করতে এই সময়ে তিনি বলেছিলেন, অতো বড়ো যুদ্ধবিশারদ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ টিপু সুলতান সেই সময়েই অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। যুক্তি দিয়ে বুঝলেও হৃদয় দিয়ে তা স্বীকার করেননি। আবেগে দেশপ্রেমে নিষ্ঠায় নিজের যুক্তির সঙ্গেও সংগ্রাম করে চলেছেন। তাঁকে আমরা রাজী করালাম এক পেশাদারী দলের সঙ্গে টিপুর ভূমিকায় অভিনয় করতে। তিনি সত রিহার্সাল দিলেন তার চেয়েও বেশী তৎকালীন ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করলেন। কিন্তু অভিনয় রজনীতে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ছাপিয়ে হায়দারআলী ও মাসয়ে লালীর সঘন চিৎকার যখন বার বার করতালি আদায় করে নিচ্ছিল তখন আমাদের অধোমুখে ঠিক ততগুলোই চপেটাঘাত পড়ছিল। কিন্তু উনি অতোটা দমে যাননি। ধড়াচুড়ো খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'আসলে কি জানো, এক স্টেজে দু-রকম টেকনিক চলে না।'

এখানে আমার প্রায়ই তাই মনে হয়, একই পর্দায় হয়তো ঘুঁঘট আর 'অনুরাধা' চলে না। কিন্তু অনুরাধাকে যদি নিজেরাই হেলাফেলা করে স্টেজে তুলে দিই, তাহলে তারও চরিত্র যায়, শিল্পেরও মান থাকে না। এবার আর একটা নতুন উপসর্গের কথা বলে এপর্ব শেষ করা যাক। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে এখন আর প্রায় কেউ শুধু পরিচালক শুধু প্রযোজক, শুধু অভিনেতা থাকতে রাজী হচ্ছেন না। একাই সব হয়ে উঠতে চাইছেন। নজীর আছেই চার্লি চেপলিন। কিন্তু...থাক্। সে কথা নয়। ক্ষমতার কথা নাই বা তুললাম। প্রযোজক পরিচালক অভিনেতা মায় কাহিনীকার, সঙ্গীত পরিচালক—সবই। কারো ক্ষমতাকেই সন্দেহ করা আমার অভিপ্রায় নয়। তবে একথা বার বারই মনে হয়, যে, এই ডামাডোলের বাজারে সর্বশক্তি সংহত সংঘবদ্ধ চেষ্টার যখন এমন দরকার, তখন নিজে একা নিঃসঙ্গ চেষ্টায় শক্তিক্ষয়-বা-ব্যয় না করে সমধর্মী শিল্পী খুঁজে বার করতেই হবে। ভারতে লেখকের অকাল এখনো পড়েনি। স্বীকার করি যে, চলচ্চিত্রের চাহিদা উপন্যাসিকের ভাঁড়ার হয়তো সরাসরি মেটাতে পারবে না। কিন্তু পরিচালকের visualisation এর যতটা ক্ষমতা, অস্বীকার করা অন্যায় হবে যে, ভারতের প্রমুখ সাহিত্যিকদের ততটা কল্পনা করার সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। ও'রা জোট বাঁধলে অদ্ভূত হতে পারে। এবং দুই মহারথীর ঐক্যবাদনেই সেই সুর জাগতে পারে অনেক সহজে যা একার পক্ষে দুষ্কর। চিত্রকর একা বসে ছবি আঁকেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ এক সমবেত শিল্প। একাই একবার পিয়ানো, একবার বেহালা একবার বাঁশী বাজিয়ে লোককে তাক লাগাতে পার যায়, কিন্তু তা কিছুতেই ঘর্মাক্তকলেবরে হাততালি পেলেও কোনমতেই চারজন গুণী বাদকের সমান মর্যাদার সৃষ্টি করতেই পারে না। অহমিকা বিসর্জন দিয়ে, সাধারণ মানুষকে আর অন্য শিল্পীদেরও কিছুটা বিশ্বাস করে—এখন, এই মুহূর্তেই না এসে দাঁড়ালেই নয়। স্রোতের মুখে দর্শকের দল ভেসেই চলেছে [illegible] কিছু শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা একটা কাজ চলা গোছ ডিঙ্গি নৌকোয় তাদের তুলে নেবেন। ছ

আঙ্গিকের কথা আলোচনা করিনি। এখন তা বিশদ আলোচনার সময়ও নয়। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আঙ্গিকের নাম করে উন্নাসিক বীতরাগে সাধারণ মানুষকে অবহেলা করে যত বড়ো দুর্লভ রত্নই না তৈরী হোক, কিছুকাল এমনি গেলে, সেই রত্নের গড়া হার পরাবার জন্যে এক কঙ্কাল ছাড়া আর কাউকেই পাওয়া যাবে না।

অপুর্বর মা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনস্থির করে ফেল্লেন—ছেলেকে চাকর হতে দেবেন না। ও'কে মানুষ করতে হবে। হঠাৎ তার চাউনী, গাড়ীর জানলায় তার মুখ, আর চাকার শব্দ একটা কাব্য রচনা করে বুকে ঘা দিতে লাগল। চলচ্চিত্রে ওই বিশুদ্ধ আঙ্গিক সর্বজনগ্রাহ্য হয়তো কখনো হবে না। তবু তা অতি মূল্যোবান বস্তু। এসত্ত্বেও আমি তর্ক জারী রাখতে চাই। হিন্দী ছবিতে অপুকে নিয়ে ওই দৃশ্যে হয়তো, অপুর মা আর কর্তামশায়ে টানা-হেঁচড়া চলতো, হয়তো অপুকে দু'চার ঘা দুপক্ষ থেকেই খেতে হতো—পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে হয়তো রাত্তিরে চুপি চুপি মা-বেটায় পালাতে হতো—লোকের মনে দাগকাটার তাগিদে হয়তো অসম্ভব কাণ্ডও করতে হতো, তবু অপুকে মানুষ করার জন্যে মা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন একথাটা থাকতো। ভাল জিনিস বোধ্য-গ্রাহ্য-হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করতে হবে। কারণ চলচ্চিত্র আগামী কালের জন্যে তুলে রাখা চলে না। এ উপন্যাস নয়। একে আজকের দর্শককে স্বীকার করতেই হবে।

অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদি বলি মধ্যপন্থা নিতে হবে। শিল্পেরই খাতিরে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধরুন, বি আর চোপরার ছবিগুলো। ছবি হিসেবে হয়তো খুব ভাল নয়। অনেকটা স্থূল। ভালই চলে। আর মোটকথাটায় ভদ্রনীতি, আর ঔদার্যের সুর আছে। অসঙ্গত ব্যাপারও আছে। কিন্তু বিকার নেই। দর্শকের প্রতিক্রিয়া সুস্থ হয়। এক হী রাস্তা, ধুল কা ফুল, কানুন... ইত্যাদি চলেছে সগৌরবে, আর জনপ্রিয়তার সম্মানলাভ করায় অন্ততঃ আমি লজ্জিত হবার কারণ দেখিনি।

আঙ্গিকগত ত্রুটি ভাবগত সুস্থতার জন্যে অসহনীয় মনে হয় না। আমরা বিশ্বাস করি, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, লেখক—এ'রা সবিনয়ে প্রত্যেকে যথাযথ সম্মান ও দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে নিজেদের কাজ করে গেলে আর সাধারণ মানুষকে বিকৃতরুচির দৈত্য মনে না করলে—এখনো, এই ফাইনান্সিয়ার শাসিত চলচ্চিত্রজগৎ থেকে ভাল অথচ চলার মত ছবি তৈরী হতে পারবে।

অভিনয়ে আঙ্গিক

তাপস সেন

গেল দশ বছর ধ'রে লিট্‌ল্‌ থিয়েটার, বহুরূপী প্রভৃতি নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বুঝেছি, মঞ্চাভিনয়ে আজকে আলোকসম্পাত, শব্দ বা ধ্বনি সৃষ্টি এবং অপরাপর যান্ত্রিক কৌশল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অভিনয়কে যতদূর সম্ভব বাস্তব করবার জন্যে আজ যেমন পর্দায় আঁকা চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানলা, রাজপথ-অলিন্দ দেখানো চলে না, তেমনি চলে না পাদ-প্রদীপ বা ফুট-লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করা এবং বিশেষ একটা ক্লাইম্যাক্সের মাথায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখের ওপর ফোকাশ (জোর আলো) ফেলা। সিনেমাতে যেমন ক্যামেরার সাহায্য ছাড়া ছবি তোলা যায় না এবং পর্দা ও প্রক্ষেপণ-যন্ত্র বা প্রোজেক্টার ছাড়া সেই ছবির পজিটিভ প্রিন্ট (সমপত্রী) দেখতে পাবার উপায় নেই, ঠিক তেমনি যান্ত্রিক কৌশল ছাড়া আজ মঞ্চাভিনয় অসম্ভব।

'সেতু' এবং 'অঙ্গারের' পরে অভিযোগ উঠেছে, যান্ত্রিক কৌশল আজ বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের জাত মেরে দিচ্ছে, রঙ্গমঞ্চকে একটা ম্যাজিকের কারখানা ক'রে তুলেছে। ঠিক কি তাই? 'সেতু'-নাটকে চরম অপমানের পর অসীমার আত্মহত্যা করার চেষ্টাকে যদি দর্শক অমোঘ পরিণতি ব'লে মেনে নেন এবং স্বামী তাপস দ্বারা তাকে এই মর্মান্তিক কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাকেও নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহ'লে এই নাটকীয় ঘটনাকে মঞ্চের উপর থেকে যতদূর বাস্তব রূপে দেখানো সম্ভব, তা দেখানোকে অন্যায় বলা যায় কি ক'রে? বরং বলা উচিত নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে এমন অপূর্বভাবে সহায়তা করবার জন্যে যন্ত্রদেবতাকে শত ধন্যবাদ। ঠিক সমান কথাই বলা যায়, 'অঙ্গার' নাট্যাভিনয় সম্পর্কে কয়লাখাদের মধ্যে যখন জ্ঞাত-ভাবে কিছু কর্মী আবদ্ধ হয়ে আছে, তখন মালিক চাইলেন, তাঁর সম্পত্তি বিনষ্ট হবার ভয়ে খাদগুলিকে জলপূর্ণ ক'রে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিতে—তাঁর কাছে মানুষের প্রাণের চেয়ে সম্পত্তির দাম ঢের বেশী। এই বর্বর অমানুষিকতার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে কয়েকজন সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও খাদের মধ্যে নেমে গেলেন সহকর্মীদের জীবন রক্ষা করবার সংকল্প নিয়ে। এদিকে মালিক খাদের ভিতর জল ঢালবার সমস্ত তোড়জোড় প্রস্তুত করছেন।—এইখানে যদি দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটানো হয়, যা 'অঙ্গার' নাটকে হয়েছে, তাহ'লে দর্শক-মনে যে-প্রত্যাশা জাগে যে উৎকণ্ঠা (Suspense) জাগে, পরবর্তী দৃশ্যে কি দেখতে পেলে তা নিবারিত হবে? লোকগুলি যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে খাদের মধ্যে নেমে গেল, মালিকের অনমনীয় মনোবৃত্তির অনিবার্য ফলস্বরূপ খাদের মধ্যে জল ঢালার সম্মুখীন হয়ে তাদের অবস্থা কি হ'ল, তাই চাক্ষুষ দেখবার জন্যে দর্শক-মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে না কি? দর্শক-মনে কি ক্রমাগত একই প্রশ্ন জাগে না যে, খাদের মধ্যে জলঢালা দৃশ্য মঞ্চ থেকে দেখানো সম্ভব হবে কি? এবং যান্ত্রিক-কৌশলে যখন তা সত্যই সম্ভব হয়, তখন দর্শকের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। 'সেতু'র বেলা রেলগাড়ী যাওয়ার দৃশ্য এবং 'অঙ্গার'-এ খাদে জল বোঝাই হওয়ার দৃশ্য—দুটিই দর্শকের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে একেবারে রোমহর্ষকের (Sensational) পর্যায়ে উঠে যায় এবং এইখানেই যত আপত্তি। যা আমরা দেখব ব'লে আশা করি না, তা তোমরা দেখাবে কেন?—দেখাতে পারার বাহাদুরী কে তোমাদের নিতে বলেছে?—কেন দেখালে না যে, ট্রেনের আসার আওয়াজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে অপেক্ষমানা অসীমা নেপথ্যে ছুটে গেল এবং পরক্ষণেই তাপস চিৎকার করতে করতে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে হঠাৎ অসীমার গমনপথের পানে তাকিয়ে আর্তনাদ ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং অসীমাকে টানতে টানতে মঞ্চে নিয়ে এসে বললে, 'এ তুমি কি সর্বনাশ করছিলে, অসীমা?' এবং 'অঙ্গার'-এ জলকল্লোলের শব্দ অল্প থেকে প্রচণ্ড-তম ক'রে তুলে লোক ক'টিকে কাল্পনিক জলের মধ্যে অসহায়ভাবে ডুবে যাবার অভিনয় দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে বাহবা আদায় করতে?

অর্থাৎ অভিযোগকারীরা বলতে চান, তোমরা এগিওনা, যেখানে আমাদের থিয়েটার ছিল, সেইখানেই তাকে থাকতে দাও। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, এগুনো মানেই বেঁচে থাকা, স্থানু হয়ে থাকা তো মৃত্যুর সামিল। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন
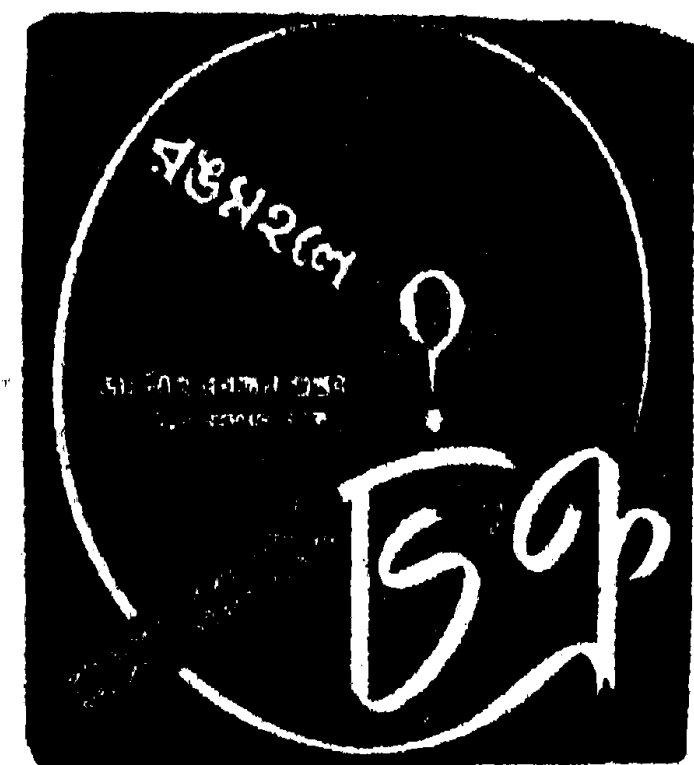
যে, আমাদের অভিনয়কলা যুগে যুগেই এগিয়েছে; তা না এগুলে সে ত' আজও যাত্রার যুগেই থাকত। প্রেক্ষাগৃহই বা কেন, রঙ্গমঞ্চই বা কেন? জোড়াসাঁকোর সান্যাল-বাড়ীতে আমরা যে-মঞ্চ দেখেছিলুম, গ্রেট ন্যাশনাল, ষ্টার বা ক্লাসিক নিশ্চয়ই তার থেকে ভিন্নতর। মনোমোহনে যে-পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে 'বঙ্গেবর্গী', 'দেবলাদেবী' অভিনীত হ'ত, আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন' অবশ্যই সেই পুরাতন পরিবেশের মধ্যে অভিনীত হয়নি; তার সাজ-পোশাক, দৃশ্যসজ্জা, এমনকি নূতনতর অভিনয়-ধারা দর্শকমহলে সে-যুগে অবিসংবাদী-রূপে বিস্ময়-বিমোহনের সঞ্চার করেছিল। আবার শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে' "সীতার" উদ্বোধন করলেন শানাই-শাঁক-ঘন্টা-ধূপ-ধুনার পবিত্র পরিবেশের মধ্যে এবং পাদপ্রদীপকে ((foot light-কে) চিরতরে নির্বাসিত ক'রে Spot light-এর সাহায্যে আলোছায়ার সৃষ্টি ক'রে অভিনয় চালালেন, মঞ্চের মূকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের প্রবর্তনা করলেন, তখন দর্শকমহলে কি নতুন ক'রে আর একবার বিস্ময়ের সঞ্চার হয়নি? এবং এরও পরে শেষ কথা হচ্ছে, আমাদের অভিযোগকারীরা যদি বিদেশী নাট্যশালার বর্তমান ধারাকরণ সম্পর্কে কিছু খোঁজ রাখবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তাঁরা নিজেরাই সুর পাল্টে বলতে সুরু করবেন, তোমরা কি যান্ত্রিক কৌশল দেখাচ্ছ? দারুণ গুরুগম্ভীর (Serious) অভিনয়ের সঙ্গে ভোজবাজীর কি বিচিত্র সমাবেশ ঘটতে পারে, তা দেখে তোমাদের চোখ কপালে উঠে যেত।

ভুলে গেলে চলবে না যে, নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য—শ্রাব্যকাব্য নয়। এবং যেখানে আঙ্গিক একটা বাইরের জিনিষ নয়। নাটক যদি বীজ বা অঙ্কুর হয়, অভিনয় হচ্ছে মহীরুহ—ডালপালা, শেকড়, পাতা, ফুল, ফল—সব জড়িয়ে তার রূপ এবং প্রকাশ। নাট্যকলা যে-যুগে যেমন হাতিয়ার পেয়েছে, তাকেই অভিনয়-সৌকর্যের জন্যে ব্যবহার কোনো দিনই দ্বিধা করেনি। 'অঙ্গার'-নাটকের শেষের দৃশ্য দর্শকদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে বলেই

বাদল পিকচার্সের 'আগুন' চিত্রে কণিকা মজুমদার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আপত্তি; কিন্তু কৈ? তার আগের দৃশ্য—যেখানে যান্ত্রিক-কৌশল প্রয়োগের ফলে নিদারুণ ট্রাজেডীর জন্যে আলো-ছায়ার মাঝে কোলিয়ারীর বাইরের রূপটাকে জীবন্ত অথচ শঙ্ককরণ ক'রে তোলা হয়, সেটি তো পরম উপভোগ্য বলেই মনে হয়! আসল কথা, খুব আর্টিষ্টিক হ'লেও যেখানে বিস্ময় নেই, সেখানটা সহজ ব'লে মেনে নিতে বাধা থাকেনা যেমন, 'চার অধ্যায়', 'পুতুল খেলা' বা 'ফেরারী ফৌজ'-এর দৃশ্যগুলি নানা যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিত কৌশলের ফলে যথেষ্ট বাস্তব মঞ্চমায়ার সৃষ্টি ক'রলেও দর্শকের আপত্তির কিছু কারণ ঘটেনি। অবশ্য 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী' অভিনয়ে পশ্চাদপটে মেঘের খেলা প্রথম প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু সমগ্র অভিনয় যাঁর দ্বারা নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত, তিনি বুননের টানাপোড়েনের নিয়মানুসারেই যে কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও ম্লান, কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার, কোথাও উচ্ছল হাসা, কোথাও মর্মন্তুদ কান্নার মতোই কোনোও দৃশ্যে আলোছায়ার খেলা, আবার কোনোও দৃশ্যে তার সঙ্গে ধ্বনিমায়া এবং অন্য কোনও দৃশ্যে চমকের প্রবর্তনা চান, এ তথ্য সকলের জানা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তিনি সত্যিই যখন বলেন, এইখানটায় একটা খুব বড়ো রকম চমক না দিলে আমি নাটককে ধরে রেখে দিতে পারব না, তখন আমাদের মাথায় হাতুড়ী মেরে চমকের বস্তু আবিষ্কার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। লেখকের যেমন কালি কলমের সঙ্গে মনও কাজ করে, একই বিষয়বস্তুকে যেমন গদ্যে, পদ্যে এবং শেষাশেষি গানেও বলা যায়, তেমনই একই নাটকের অভিনয় যাত্রা রীতিতেও করা যায়, আবার মধ্যযুগীয় রঙ্গমঞ্চের মতো ফেলা দৃশ্যপটের সামনেও করা যায়, এবং অত্যন্ত আধুনিক আঙ্গিকে সাজিয়ে বাস্তবভাবেও অভিনয় করা যায়। আর নিশ্চয়ই সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন, আজকের এই স্পুটনিক-স্পেসম্যানের যুগে আধুনিক নীতির অভিনয়ই সকলের দেখতে ভালো লাগে।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা রঙ্গালয়ের যেমন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বৈদেশিক হেরোসিম লেবেডেফ, তেমনই বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পেরও প্রথম সূচনা করেন মিস্টার স্টিফেন্স নামে জনৈক বৈদেশিক ভদ্রলোক। সেযুগের স্টার থিয়েটারে ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি নাট্যাভিনয়ের শেষে 'ফাউ' হিসেবে ছোট ছোট চলচ্চিত্র দেখাতেন। অবশ্য মিঃ স্টিফেন্স যে মাত্র স্টার থিয়েটারেই ছবি দেখাতেন, তা নয়; তাঁর কর্মক্ষেত্র সারা ভারতবর্ষেই বিস্তৃত ছিল। মিঃ স্টিফেন্সের সমসাময়িককালে এই কলকাতায় যিনি প্রথম চলচ্চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহিত হন, তিনি হচ্ছেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাদ্রী অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ। তিনি বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র ক্যামেরা আনিয়ে নানা রকম ছোট ছোট ছবি তৈরী করেন এবং সেগুলিকে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে প্রোজেক্টারের সাহায্যে প্রদর্শিত করেন। দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৫ সালে লুমিয়ার ব্রাদার্সের দ্বারা প্রথম চলচ্চিত্র জন্মগ্রহণ করার এক বছরের মধ্যেই কলকাতা তথা বাঙলা দেশে এই নবজাত শিল্পের আমদানী হয়।

মিঃ স্টিফেন্সের দেখানো চলচ্চিত্র দেখে এই নতুন শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে-বাঙালী ভদ্রলোক শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীই নয়, সারা ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, তাঁর নাম হীরালাল সেন। ইনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী চন্দ্রমোহন সেনের পুত্র। প্রথমে স্থিরচিত্রগ্রহণে হাত পাকিয়ে তিনি চলচ্চিত্রগ্রহণের কৌশল জানবার জন্যে মিস্টার স্টিফেন্সের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁকে সোজা এড়িয়ে যান। হীরালালবাবু এতে হতাশ না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর অনুসন্ধানে ব্রতী হন এবং লোকপরম্পরায় ফাদার লাফোঁর নাম শুনে তাঁর কাছে গিয়ে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁর অসাধারণ আগ্রহ দেখে ফাদার তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করেন এবং চিত্রশিল্প বিষয়ে বহু উপদেশ দেন। হীরালালবাবু প্রথমে অবশ্য বিদেশ থেকে ছবি ও প্রোজেক্টার আনিয়ে ছবি দেখানোর কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রয়াল বায়োস্কোপ"-এর নাম জানেনা, এমন লোক আমাদের চলচ্চিত্র-জগতে বিরল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি এই কাজ সুরু করেন। এ ব্যাপারে প্রথমে তাঁর সহকারী ছিলেন তাঁর ভাই দেবকীলাল। কিন্তু তিনি যখন মুন্সেফের চাকরী নেন তখন হীরালালবাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁর অপর ভাই মতিলাল। ক্লাসিক থিয়েটারের অমর অভিনেতা অমর দত্ত মশাইও এঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। অধুনালুপ্ত নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটারীর রসায়নাধ্যক্ষ সুবোধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাবা প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর কাছ থেকেও হীরালালবাবু প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৯০০ সালে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের সঙ্গে নূতন আকর্ষণ হিসেবে চলচ্চিত্র দেখানো সুরু করেন হীরালালবাবু। এর তিন বছর বাদে বিদেশ থেকে মুভি-ক্যামেরা আনিয়ে হীরালালবাবু এদেশেই ছোট ছোট ছবি নির্মাণের কাজে ব্রতী হন এবং ঐ বছরই—১৯০৩ সালে তাঁর তৈরী ছবি ক্লাসিকে দেখানো সুরু হয়। আলিবাবা, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল, সরলা, হরিরাজ প্রভৃতি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী এই চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়। এতে অভিনয় করেন অমরেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, কুসুমকুমারী প্রভৃতি ক্লাসিক থিয়েটারের শিল্পীরা। হীরালালবাবু এ ছাড়া বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর 'এডওয়ার্ডস্ টনিক', সি কে সেনের 'জবাকুসুম তৈল', ডবলিউ মেজর কোম্পানীর 'সালসা প্যারিলা' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-চিত্রও তোলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে যেকটি প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাদের মধ্যে রয়াল বায়োস্কোপ ছাড়া লণ্ডন বায়োস্কোপ, ইম্পিরিয়াল বায়োস্কোপ, মনার্ক বায়োস্কোপ, ওয়েলিংটন বায়োস্কোপ, ক্যাপিটাল বায়োস্কোপ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই সময়েই প্যাথে ফ্রেরীজ নামে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান কলকাতায় বিদেশ থেকে ছোট ছোট ছবি আনা থেকে সুরু করে প্রোজেক্টার, মুভি-ক্যামেরা প্রভৃতি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত দ্রব্যাদি আমদানী সুরু করেন। কিন্তু হীরালালবাবু প্রতিষ্ঠিত

"দেশের মাটি" চিত্রে ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও উমাশশী

রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে এঁরা প্রথমে হীরালালবাবুর কাছেই এঁদের মালপত্রসমেত কোম্পানীটি বিক্রী করবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ-সঙ্গতির অভাবে হীরালালবাবুর পক্ষে তা আর সম্ভব হয়না। তখন প্যাথে ফ্রেরীজের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেন বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জে এফ ম্যাডান।

চিত্র প্রদর্শনীর কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রথমে ম্যাডান সাহেব কলকাতার ময়দানে—যাকে লোকে বলত 'গড়ের মাঠ'—তাঁবু ফেলে 'এলফিনিস্টোন বায়োস্কোপ' নাম দিয়ে ছবি দেখাতে সুরু করেন। এই তাঁবুতে আমরা সে-যুগের বিখ্যাত ছবি 'প্রোটিয়া' ও 'ক্যাবিরিয়া' দেখি। ম্যাডান সাহেবের প্রথম প্রতিষ্ঠিত চিত্রগৃহের নাম হচ্ছে 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস'। অধুনা 'মিনার্ভা' নামে বিখ্যাত হগ মার্কেটের লাগোয়া কর্পোরেশন প্লেসের চিত্রগৃহটিই ম্যাডান সাহেবের প্রথম প্রতিষ্ঠিত ছবিঘর। এটা সম্ভবতঃ ১৯১২ সালের ঘটনা।

কিন্তু কলকাতার প্রথম স্থায়ী চিত্রগৃহ স্থাপনের গৌরব হচ্ছে 'দি এশিয়াটিক সিনেমেটোগ্রাফ কোম্পানী'র। তাঁরাই হগ মার্কেটের দক্ষিণে বর্তমান লিন্ডসে স্ট্রীটের ওপর 'বিজু থিয়েটার' এবং টেরিটি বাজারের সামনে চীৎপুর রোডের ওপর 'ফিনিক্স থিয়েটার' স্থাপন করেন। প্রথমোক্ত বিজু থিয়েটারেই ডুদ্যামী সাহেব চলচ্চিত্র দেখাতে থাকেন 'পিকচার হাউস' নাম দিয়ে। পরে তিনি চৌরঙ্গী রোড ও লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে 'পিকচার হাউস' খোলেন। এই পিকচার হাউসও পরে ম্যাডান সাহেবের কুক্ষিগত হয় এবং তিনি এর নাম দেন 'এলফিনস্টোন পিকচার হাউস'। এই চিত্রগৃহটিই পরে 'প্লাজা' এবং বর্তমানে 'টাইগার' নামে পরিচিত।

জে এফ ম্যাডান টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর কাছে তাঁর "ম্যাডান স্টুডিও" স্থাপিত করেন ১৯২০ সালে। এবং এর পরেই তিনি নির্বাকচিত্র নির্মাণে যত্নবান হন। অবশ্য ও'র আগেই দু'টি প্রতিষ্ঠান পূর্ণদৈর্ঘ বাঙলা ছবি তৈরী করতে সুরু করে দিয়েছিলেন এবং এঁদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের ছবি শেষও করেছিলেন। রোটারী ক্লাব-খ্যাত ও কর্ণাম্বিয়া ফিল্মসের অধুনালুপ্ত কলকাতা শাখার কর্ণধার নীতীশ লাহিড়ী ও তদানীন্তন গ্লোব গ্র্যান্ড অপেরা হাউসের (বীজু থিয়েটারের পরবর্তী নাম) ম্যানেজার শ্রীমুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে ইন্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের (চিত্রজগতে ডি জি নামে খ্যাত) পরিচালনায় "ইংল্যান্ড রিটার্ণড্‌ বা বিলাত-ফেরত" ছবিখানি ১৯১৯ সালের মধ্যে শেষ হলেও ম্যাডান কোম্পানীর অসহযোগিতার দরুণ কোনো চিত্রগৃহ না পাওয়ায় যথাসময়ে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। বাঙলা চিত্র-জগতের অন্যতম পথিকৃৎ, অরোরা সিনেমা কোম্পানী এবং অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা অনাদিনাথ বসু ও চিত্রশিল্পী দেবী ঘোষের সহযোগিতায় ১৯১৭ সালে রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মিকীর জীবনী অবলম্বনে 'রত্নাকর' ছবি তুলতে সুরু করেন ; কিন্তু নানা কারণে ছবিটি সম্পূর্ণ হয় প্রায় তিন বচ্ছর পরে ১৯২০ সালে। ইতিমধ্যে ম্যাডানের উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারস্থ চিত্রগৃহ "কর্ণওয়ালিস থিয়েটার" খোলা হয়ে গেছে এবং সেখানে দর্শকের ভীড়ও অসম্ভব হচ্ছে। ম্যাডান স্টুডিও-তে ১৯১৯ সালে তোলা হল তাঁদের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ নির্বাক ছবি "শিবরাত্রি" এবং তা মুক্তি পেল ঐ সালেরই ৮ই নভেম্বর কর্ণওয়ালিস চিত্রগৃহে। ছবিখানি কে পরিচালনা করেছিলেন, তা মনে নেই বটে, কিন্তু তার প্রধান দুটি ভূমিকায় ব্যাধ ও ব্যাধিনীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দু'জন ইতালীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এরপর ম্যাডান কোম্পানী পর পর বহু নির্বাক ছবি নির্মাণ করেন জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধু বসু প্রভৃতির পরিচালনায়। এবং এঁদের বিখ্যাত ছবির মধ্যে শকুন্তলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, জয়দেব, কাল-পরিণয়, মানভঞ্জন, দালিয়া, গিরিবালা, নৌকাডুবি প্রভৃতির নাম করা যায়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কার্তিক রায় প্রভৃতি অভিনেতা এবং সীতা দেবী (রেণী স্মিথ), পেসান্স কুপার, এফি হিপোলেট, শান্তি গুপ্তা, কাননবালা, শশীমুখী প্রভৃতি অভিনেত্রী ম্যাডান কোম্পানীর ছবিতে অভিনয় ক'রে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

নির্বাক বাঙলা ছবি তুলে ম্যাডানের আর্থিক সাফল্য বহু লোককে প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে বাঙলা ছবি তুলতে উৎসাহিত করে। কিন্তু সে-কথা বলার আগে "ইংল্যান্ড রিটার্ণড" ও "রত্নাকর"-এর মুক্তিলাভের ব্যাপারটা ব'লে নেওয়া দরকার। প্রথম ছবিখানি শেষ হবার পরেও যখন দেখা গেল, প্রায় সমস্ত চিত্রগৃহই ম্যাডানের অধিকারে থাকায় সুবিধাজনক শর্তে ছবিখানির মুক্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন নীতীশ লাহিড়ী মশাই বর্তমান ক্যালকাটা কেমিক্যালের প্রধান পরিচালক বীরেন মৈত্র মহাশয়ের পিতাঠাকুরের সহায়তায় দক্ষিণ কলিকাতায় রসা থিয়েটার (বর্তমান পূর্ণ থিয়েটার) নামে চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই "ইংলণ্ড রিটার্ণড্‌ বা বিলাত ফেরত"

মুক্তি পায় ১৯২১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী। "রত্নাকর" ছবিখানিও ঐ সালেই মুক্তিলাভ করে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে।

১৯২৬-২৭-২৮ সালে নির্বাক চিত্র নির্মাণের বহু প্রতিষ্ঠান এই কল্‌কাতা শহরের বুকের ওপর গড়ে ওঠে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মত। এর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠান ছিল ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্স ফিল্ম কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস। এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই কর্মব্যস্ত যুগে এ'দের স্টুডিও পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। ৪০, দমদম রোডে প্রথমোক্ত কোম্পানীর যে স্টুডিও ছিল, তার কর্ণধার ছিলেন ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়। এই স্টুডিওতেই বাঙলাদেশের প্রথম যুগের দু'জন ভারতখ্যাত পরিচালকের হাতেখড়ি। এ'রা হচ্ছেন দেবকীকুমার বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়া। এছাড়া বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী কৃষ্ণগোপালেরও প্রথম শিক্ষা এখানেই। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্সের বিরাট ছবি "ফ্লেমস্ অব ফ্লেশ" পদ্মিনীর জীবনকাহিনী নিয়ে তোলা। এতে আলাউদ্দীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কল্লোল-সম্পাদক ও চিত্রপরিচালক দীনেশ দাশ এবং পদ্মিনীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সবিতা দেবী (আইরিশ গ্যাসপার—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তদানীন্তন কিউরেটারের কন্যা); রোমাণ্টিক দেশভক্ত নায়ক দেববর্মণের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন দেবকীকুমার বসু এবং তাঁর বিপরীতে ছিলেন ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী প্রেমলতিকা গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিখানি দেখানো হয় ধর্মতলা স্ট্রীটের "রওনাক মহল"-এ (বর্তমান নাম জ্যোতি সিনেমা)। কিন্তু এই ছবিখানি প্রস্তুত করতে যে অর্থব্যয় হয়, তার সামান্যমাত্র অংশও ফিরে আসেনি ছবিটি দেখানোর পর। এবং এই কারণে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্স "পঞ্চশর" এবং "মনি মেকস হোয়াট নট" নামে আরও দু'খানি ছবি করলেও শেষ পর্যন্ত টি'কে থাকতে পারেনি। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে এর থেকে দীর্ঘতর জীবন লাভ করেছিল নারকেলডাঙা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, ঘনশ্যাম দাশ চোকানীর "ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস্"। কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত, এই প্রতিষ্ঠানের দু'খানি ছবি "শঙ্করাচার্য" ও "নিষিদ্ধ ফল" ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) বহুদিন ধ'রে চলেছিল এবং ফলে ছবি দু'খানি থেকে প্রচুর অর্থাগমও হয়েছিল। এই কিনেমা আর্টস-এরই আর একখানি কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত ছবি "ভাগ্যলক্ষ্মী"-তে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

এই দু'টি বিশেষ নামকরা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরও যে-সব উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান সে-সময় দেখা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নরেশচন্দ্র মিত্রের যুগ্ম চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত "তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী"র। এ'দের "আঁধারে আলো" (ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গারাণী প্রভৃতি) ও "চন্দ্রনাথ" (ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। গ্র্যাফিক আর্টস-এর "বঙ্গবালা" (ফণী বর্মা ও উমাশশী) ও "বিগ্রহ" (জীবন গঙ্গোপাধ্যায় ও রেণুকা ঘোষ), ইস্টার্ণ আর্টস-এর "দেবদাস" (ফণী বর্মা অভিনীত;—এর চিত্রগ্রহণ করেন নীতীন
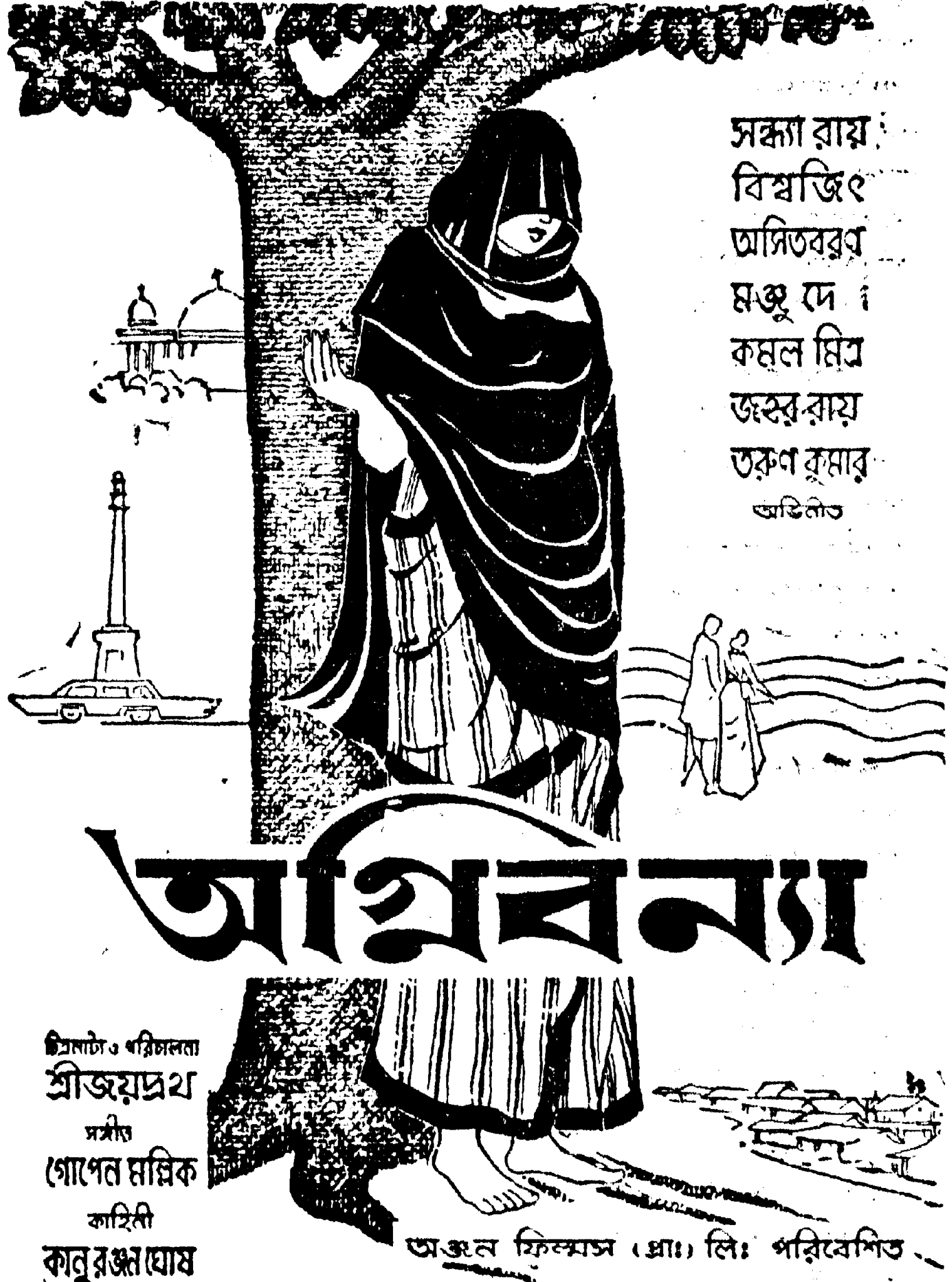
যোগেশ চৌধুরী পরিচালিত "নিয়তি" চিত্রে শিশুবালা, কান্তি চৌধুরী ও অজিত ভট্টাচার্য

বসু), আর্য ফিল্মস-এর "বুকের বোঝা" (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীণা দত্ত অভিনীত), বড়ুয়া পিকচার্স-এর "অপরাধী" (দেবকীকুমার বসু পরিচালিত এবং প্রমথেশ বড়ুয়া ও সবিতা দেবী অভিনীত) প্রভৃতি ছবির নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনীত "সোল অব্ এ স্লেভ" এবং প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত বিরাট চিত্র "হাতেমতাই"-এর নামও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়।

১৯২৭-২৮ সালে বোম্বে টকীজ-খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-প্রযোজক চিত্র-শিল্পী ফ্রাঞ্জ অস্টেন প্রভৃতি কয়েকজন বিদেশীর সহায়তায় "লাইট অব এশিয়া" (বুদ্ধ-কাহিনী), "সিরাজ" (তাজমহলের কল্পিত জন্মকথা) এবং "থ্রো অব এ ডাইস" নামে তিনখানি নির্বাক ছবি প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে শেষের দু'খানি ছবিতে প্রসিদ্ধ শিল্পী, শিল্প-নির্দেশক ও চিত্র-পরিচালক চারু রায় ও সীতা দেবী অভিনয় করেন।

ঠিক সময়েই বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে প্রযোজকরূপে প্রবেশ করেন তদানীন্তন বড়লাটের আইনসচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যম পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সরকার। কণ্ট্রাক্টারী ব্যবসা করতে করতে এ'র দৃষ্টি চিত্রব্যবসায়ের দিকে প্রসারিত হয় এবং তারই ফলে প্রথমে জন্ম নেয় "চিত্রা"-চিত্রগৃহ ও পরে প্রতিষ্ঠিত হয় "ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফ্ট" নামে চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চোরকাঁটা" ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "চাষার মেয়ে"-কে এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে চিত্ররূপায়িত করেন পরিচালক চারু রায় ও পরিচালক প্রফুল্ল রায়। প্রথম ছবিটিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন অমর মল্লিক, রাজীব রায় ও জ্যোৎস্না গুপ্তা। 'চিত্রা'র উদ্বোধন হয় রাধা ফিল্মস প্রতিষ্ঠিত নির্বাক চিত্র "শ্রীকান্ত" দিয়ে। ছবিটি দর্শকসাধারণকে এমনই নিরাশ করে যে, তাঁরা চিত্রগৃহটিরও ক্ষতিসাধন করতে মারমুখী হয়ে ওঠেন। "চোরকাঁটা", "চাষার মেয়ে"-ও মুক্তিলাভ করে এই "চিত্রা"-তেই।

কিন্তু নির্বাক চিত্রের দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। "এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে" মুক্তিলাভ করেছে গীতি-বহুল সবাক চিত্র "শো বোট"। "চিত্রা"-তেও মুক্তি পেল ভারতের প্রথম সবাক চিত্র, ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর "আলম্আরা"। ম্যাডান কোম্পানীও পেছিয়ে থাকলেন না। তাঁরাও তৎপর হয়ে যন্ত্রপাতি আনিয়ে প্রথমে ছোট ছোট খণ্ডচিত্র নির্মাণ করতে লাগলেন। বিভিন্ন নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্যাবলী, কোনো একজন গায়কের গান, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের মেয়েদের সমবেত সঙ্গীত প্রভৃতি পর পর জুড়ে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করতে সুরু করলেন। পরে হাত দিলেন বড়ো ছবিতে। বাঙলাদেশের প্রথম সবাক চিত্র, অমর চৌধুরীর পরিচালনায় তোলা "জামাই ষষ্ঠী" (৬ রীলে সম্পূর্ণ) ও "বিষ্যুৎবারের বারবেলায়" (৩ রীলে সম্পূর্ণ) মুক্তি পেল ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে ক্রাউন সিনেমায়।

'হুক্কা পাঞ্জা' চিত্রে ছবি বিশ্বাস

ঠিক এই সময়েই "রাধাকা"-শব্দযন্ত্র নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ সরকার খুললেন তাঁর ভারতবিখ্যাত "নিউ থিয়েটার্স"। এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননীকে যথাক্রমে জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভূমিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রী রূপে নিয়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় তোলা হ'ল শরৎচন্দ্রের "দেনাপাওনা"—বাঙলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র। এই ছবিতে গাজনের দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উমাশশী। শিশিরকুমার অভিনয়-প্রদীপ্ত, অভাবনীয় মঞ্চসাফল্যমণ্ডিত "ষোড়শী"র কাছে নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন "দেনাপাওনা"কে অত্যন্ত নিষ্প্রভ বোধ হ'ল। এর পর এল নিউ থিয়েটার্সের "পুনর্জন্ম", "কপালকুণ্ডলা", "চিরকুমার সভা" এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রীবৃন্দ অভিনীত "নটীর পূজা"। ম্যাডান থিয়েটার তৈরী করলেন "জোর বরাত", "কেলোর কীর্তি" প্রভৃতি ছবি। কিন্তু সবাক চিত্র নির্মাণের যে একটি বিশেষ শিল্পরীতি বা প্রযুক্তি (technique) আছে, যার ফলে চলচ্চিত্র গতিশীল হ'তে পারে, সে-বিদ্যা যে এইসব ছবির পরিচালকেরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তা প্রমাণিত হ'ল না। এমন সময়, সম্ভবতঃ ১৯৩২ সালে "চিত্রা"-তে মুক্তি পেল নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন, দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "চণ্ডীদাস"। চিত্ররসিক জনসাধারণ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলে যথার্থ সবাক চলচ্চিত্র কাকে বলে। অমর মল্লিকের "ভজা, ভজা", উমাশশীর "ক ঠাকুর, বঁড়শীও কাটা গেল, মাছও পালিয়ে গেল" এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান "ছুঁওনা, ছুঁওনা বধূ, ঐখানে থাক" "ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে" প্রভৃতি লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। একদিনে বাঙলাদেশের লোক সিনেমা-পাগল হয়ে উঠল। জনৈক দর্শক ছবিখানিকে পর পর বাহাত্তর দিন ধ'রে দেখেছিলেন, এ নজীরও আছে। এর পরে নিউ থিয়েটার্সের "পূরাণ ভকত" করল ভারত জয় এবং "মীরাবাঈ" "দেবদাস" "ভাগ্যচক্র" "দিদি" "জীবন-মরণ" "হিন্দী চণ্ডীদাস" "ধূপছাওন" "প্রেসিডেণ্ট" প্রভৃতি ছবি শুধু বাঙলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করল—জোড়া নীল হাতীর প্রশংসায় লোকে শতমুখ হয়ে পড়ল। "ভাগ্যচক্র"এ নীতীন বসু প্রথম প্রবর্তন করলেন "প্লে-ব্যাক" প্রথায় গানের দৃশ্য তোলা।

কিন্তু সংসারের চাকা ঘুরেই চলেছে। নিউ থিয়েটার্স, কালী ফিল্মস, রাধা ফিল্মস, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী, ফিল্ম কর্পোরেশন, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, অরোরা ফিল্মস, ইস্টার্ণ টকীজ প্রভৃতি সব স্টুডিও এবং চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানকেই এই উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। নিউ থিয়েটার্স তার দরজাও বন্ধ করে দিয়েছে; কালী ফিল্মস হাত বদল করেছে। সে-যুগের প্রথিতযশা অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, চিত্রশিল্পী প্রভৃতিদের মধ্যে কেউ বা মৃত, কেউ বা জীবন্মৃত, আবার কেউ বা বাঙলাদেশকে ছেড়ে বোম্বাইকে নিজের ঘর করেছেন এবং অন্য কেউ বা চিত্রলোকের মায়া কাটিয়ে অন্য কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন। পুরাতন গিয়ে নূতনের অভিযান সুরু হয়েছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান চ'লে গিয়ে এসেছেন একক প্রযোজকের দল। এবং প্রযোজকদের নিয়ন্ত্রিত করছেন পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি। নব দিগন্তের সূচনা ক'রে এসেছেন সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর অনুবর্তী পরিচালকেরা।

বহু রকম বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাঙলার চলচ্চিত্রজগৎ ভারতের চলচ্চিত্রকে জগৎসভায় ঠাঁই করে দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে নাভিশ্বাস ওঠা সত্ত্বেও আজও টি'কে আছে এবং যতদিন সিনেমাশিল্প আছে, ততদিনই থাকবে।*

---

*এই প্রবন্ধের জন্যে লেখক "রূপমঞ্চ"-সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। তাঁর প্রণীত সুবিস্তৃত পুস্তক "বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাস" অতি শিগ্‌গির প্রকাশিত হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

গঙ্গা-যমুনা (হিন্দী) ঃ সিটিজেন্স ফিল্মসের নিবেদন; নাসির খাঁ প্রোডাকসান; ১৫৬৬১ ফুট দীর্ঘ ও ১৯ রীলে সম্পূর্ণ; রচনা ও প্রযোজনা ঃ দিলীপকুমার; পরিচালনা ঃ নীতীন বসু; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা ঃ ভি, বাবাসাহেব; শব্দধারণ ঃ এম, আই, ধরমসে; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ নৌসাদ; গীত-রচনা ঃ শকীল; শিল্পনির্দেশনা ঃ সুধেন্দু রায়; নৃত্য-পরিচালনা ঃ বি, হীরালাল; সম্পাদনা ঃ হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ও দাস ধয়মদে; রূপায়ন ঃ দিলীপকুমার, নাসির খান, আনওয়ার হোসেন, নাজির হোসেন, এস, মাজির, কানহাইয়ালাল, বৈজয়ন্তীমালা, আজরা, লীলা চিটনীস প্রভৃতি। কল্পনা মুভিজ-এর পরিবেশনায় গেল ২২-এ ডিসেম্বর থেকে ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী, বীণা, খান্না, ইন্টালী টকীজ প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধ'রে টেকনিকলারে তোলা "গঙ্গা-যমুনা" সব দিক দিয়েই একখানি বিরাট ছবি। নাচে, গানে, রঙে, রসে, ঘটনাপ্রবাহে, লোমহর্ষক দৃশ্যাবলীতে, নয়নসুখকর মনোহর নৈসর্গিক দৃশ্যে এবং সকলের ওপর মাটির মানুষের সুখ দুঃখ-হাসি-কান্নায় ভরপুর এই সুদীর্ঘ ছবিটির প্রতিটি ফ্রেম এর বিরাটত্বের পরিচয় বহন করছে। এমন একখানি ছবি হিন্দী চিত্রজগতকে উপহার দেবার জন্যে আমরা প্রযোজক দিলীপকুমার ও পরিচালক নীতীন বসুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গ্রামের গরীব বিধবার দুটি নাবালক ছেলে—গঙ্গা ও যমুনা। মিথ্যা চুরির অপবাদে হাজতবাসের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে মা যখন হঠাৎ মারা গেল, তখন পড়ুয়া ছোটভাইয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্যে সরলবুদ্ধি নিরক্ষর গঙ্গা হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে রোজগার করতে সুরু করল। অবসর সময়ে গঙ্গা নাচে, গায়, খেলাধূলো করে—গাঁয়ে এ-সব বিষয়ে তার জুড়ী মেলা ভার। অস্পৃশ্য মেয়ে ধন্নো কিন্তু তার কাছে হার মানতে রাজী নয় এবং প্রায়ই ওদের মধ্যে রেষারেষি, কথাকাটাকাটি, ঠোকাঠুকি চলে। কিন্তু যেদিন গ্রামের জমিদারের দুর্বৃত্ত শ্যালক হরিরাম এই ধন্নোকে নিজের লালসার বলি করতে উদ্যত হ'ল, সেদিন সকল বিপদকে অগ্রাহ ক'রে গঙ্গাই তাকে উদ্ধার করল। দুর্বৃত্তের ছলের অভাব হয় না; তাই জঘন্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে হরিরাম গঙ্গাকে জেলে দিয়ে তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করল। ইতিমধ্যে যমুনা গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে শহরে গেছে পড়তে। গঙ্গা জেলে যাওয়ায় তার পড়াশুনো হ'ল বন্ধ—তাকে টাকা পাঠাবে কে? বেচারা বুঝতেই পারল না হঠাৎ হ'ল কি; গ্রামে ফেরবারও পয়সা নেই তার হাতে। এই অবস্থায় যখন সে শহরের পথে পথে ঘুরছে, তখন নিজের সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দেওয়ার ফলে সে আশ্রয় পেল একজন পদস্থ পুলিস কর্মচারীর কাছে। ভদ্রলোক তাকে শেষ পর্যন্ত পুলিশের ইন্সপেক্টারের কাজও পাইয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন কর্তব্যপরায়ণতার সম্বন্ধে।

এদিকে জেল থেকে বেরিয়ে গঙ্গা গেল হরিরামকে উচিত শিক্ষা দিতে এবং তার কাছ থেকে বেশ মোটা রকম টাকা কেড়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল জঙ্গলে বাস করতে—তার সরল, গ্রাম্য মন কেমন ক'রে যেন বুঝে নিল, বড়লোকের সমাজে সাধুতার স্থান নেই। তাই সে হয়ে উঠল—দেশী 'রবিনহুড'। এবং তার দলে এসে যোগ দিল ধন্নো। গঙ্গার দল ঘোড়া ছুটিয়ে লুঠতরাজ করে, চলন্ত ট্রেণ থামায়—সে হয়ে পড়ল সমাজের বিভীষিকা।

একদিকে সমাজদ্রোহী, শান্তিভঙ্গকারী, আইন অমান্যকারী গঙ্গা; অন্যদিকে সমাজ-শৃঙ্খলা শান্তিরক্ষক, আইন-প্রতিপালক—যমুনা। রক্তের টান, স্নেহের বন্ধন ভাইকে ভাইয়ের সান্নিধ্যে আনতে

জয়দ্রথ পরিচালিত "অগ্নিবন্যা" চিত্রের একটি দৃশ্য

চায়; আবার আদর্শের বিরোধ, কর্তব্যের অনুরোধ দুজনকে ভিন্ন পথে চালিত করে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণের রক্তাক্ত পরিণতি মর্মস্পর্শীভাবে ছবিটির শেষাংশে বিধৃত।

কিছুদিন আগে তরুণকুমার ভাদুড়ী রচিত "অভিশপ্ত চম্বল" নামে একখানি বই প'ড়ে চমৎকৃত হয়েছিলুম। দিলীপকুমার লিখিত "গঙ্গা-যমুনা"-তে তার কিছুটা ছায়াপাত লক্ষ্য করলুম। খুবই সম্ভব, দুজনেই একই ঐতিহাসিক কাহিনী বা পুলিস রিপোর্ট থেকে নিজেদের গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই গঙ্গার ভূমিকায় দিলীপকুমারের কথা বলতে হয়। একদা দিলীপকুমার দুঃখ করে বলেছিলেন, জীবনে তিনি বহু ভূমিকাতেই অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে এমন ভূমিকা জোটেনি, যা অভিনয় করতে পেয়ে তিনি ধন্য মনে করবেন। মনে হয়, এতদিনে তাঁর অভিনয়ের উপযোগী ক'রে তিনি নিজেই একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সাদাসিধে, লেখাপড়া-না-জানা গোঁয়ার, গেঁয়ো ছেলে—যে সোজা কথার সোজা জবাব দিতে ভালোবাসে, কারুর কাছ থেকে ঢিল খেলে মুখ বুজে সহ্য না ক'রে তার দিকে পাটকেল ছুঁড়ে শোধ নিতে যায়, ভালো লোককে ভালো এবং মন্দ লোককে মন্দ বলার মধ্যে কি অপরাধ থাকতে পারে, তা বুঝতে পারে না, খেলায়, ধুলোয়, নাচে, গানে, মারামারিতে, ঘোড়া চড়ায়, সাঁতারে, গুলি ছোঁড়ায় সমান দক্ষতা যার আছে, এমন একটি ভালোবাসার মতো, মন কেড়ে নেবার মতো চরিত্রকে তিনি পর্দার বুকে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর সহজ, সাবলীল অভিনয়ের মারফত। তাঁর মুখের একান্ত ঘরোয়া কথাগুলিকে দর্শকেরা যেন লুফে নেয়।

তাঁর পরেই নাম করতে হয় প্রাণ-চঞ্চলা, অচ্ছুৎকন্যা ধন্নোর ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালার অনবদ্য অভিনয় ও চিত্তহারী নৃত্যগীতের। ধন্নোর হাসি, দুষ্টুমি, অভিমান, অনুরাগ, ব্যথাবেদনা —সমস্তকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অবলীলাক্রমে। অসামান্য নৃত্যপটীয়সী ব'লে বৈজয়ন্তীমালার খ্যাতি আছে। কিন্তু "গঙ্গা-যমুনা" ছবিতে প্রকৃতির দুলালীর মতো বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে তিনি যেভাবে একক এবং বহুর সঙ্গে নেচেছেন ও গেয়েছেন, তা তাঁর অতীত খ্যাতিকে ম্লান ক'রে দিয়ে তাঁকে এক নতুন গৌরবের অধিকারী করল।

গঙ্গা এবং ধন্নো—এই দুটি চরিত্রই ছবিখানির অন্ততঃ তিন ভাগ জুড়ে আছে। বাকী ভাগে যাঁরা চরিত্রানুযায়ী যথাযথ অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে লীলা চিটনীস (মা), কানাহাইয়ালাল (মুন্সী), নাসির খান (যমুনা), আজরা (কমলা), নাজির হোসেন (পুলিস-কর্মচারী), এস, নাজির (শিক্ষক) এবং আনওয়ার হোসেন (হরিরাম) প্রভৃতির নাম প্রশংসার সহিত উল্লেখযোগ্য।

পরিচালক নীতীন বসু বহুদিন বাদে আবার যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছেন। ছবির কাহিনীকে তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে—কোথাও তার গতি স্তব্ধ হয়নি। ছবি যত এগিয়ে গেছে, দর্শক ততই উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ছবির শেষাংশ ঘটনাবৈচিত্রে, নাটকীয়তায় এবং ভাবাবেগে সুসমৃদ্ধ। ছবির গোড়ার দিকে গঙ্গা-যমুনার বাল্যকালের কাহিনী এবং সমগ্রভাবে ছবিটির দৈর্ঘ কিছু কম করতে পারলে ছবিটি নিখুঁত হয়ে উঠত।

আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এই বিরাট ছবিতে ক্যামেরা কি অদ্ভুত কাজই

না করেছে! কি বিরাট পটভূমিকাকেই না নয়নানন্দকররূপে পরিবেশন করেছে! কোথাও স্থির এবং কোথাও সচল হয়ে কোথাও ছোট্ট এতটুকু স্থান, আবার কোথাও গগনচুম্বী বিরাট প্রাকৃতিক শোভা—সমস্তই সার্থকভাবে সেল্যুলয়েডে প্রতিফলিত করেছে বাবাসাহেবের ক্যামেরা। টেকনিকলারের কাজে কিন্তু সব জায়গায় সমতা রক্ষিত হয়নি।

ছবিতে নাচ গান আছে প্রচুর—দুঃখের গানও আছে বোম্বাই ছবির বৈশিষ্ট্য হিসেব। সুরযোজনায় এবং আবহসংগীত রচনায় নৌসাদ তাঁর খ্যাতিকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। সুধীন রায়ের শিল্পনির্দেশ ছবির বিরাটত্বকে বর্ধিত করেছে। এ-ছবির সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং এ-কাজে যুগ্ম-সম্পাদক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ও দাস ধরমেদ কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নৃত্যরচনায় বি. হীরালাল চলচ্চিত্রের মঙ্গে চাহিদাকে বিস্মৃত না হয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বিশেষ ক'রে সমবেত নৃত্যগুলিকে যে গতিশীলতা দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ছবিতে জনতার প্রচুর কাজ আছে। এদের ঠিকমত পরিচালনা করার কঠিন কাজে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শামসুন্দীন। অপরাপর বিভাগীয় কর্মীরাও তাঁদের কাজ যথাযোগ্যভাবে করতে পেরেছেন বলেই এত বড় ছবিটি প্রায় নিখুঁতরূপে দর্শকদের সামনে দেখা দিতে পেরেছে। অবশ্য সকলকে এক ছন্দে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই প্রযোজক দিলীপকুমার ও পরিচালক নীতীন বসুর।

"গংগা-যমুনা" হিন্দী চলচ্চিত্র-জগতে একটি সার্থক যোজনা।

দে প্রোডাকসন্সের "সঞ্চারিণী" চিত্রে কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী

বিবিধ সংবাদ

।। গংগা-যমুনার উদ্বোধন ।।

২১-এ ডিসেম্বর ওরিয়েণ্ট সিনেমায় একটি বিশেষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে "গংগা-যমুনা"র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবিটির প্রযোজক দিলীপকুমার এবং পরিচালক নীতীন বসু। দু'জনেই উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন—"এই ছবির মাধ্যমে ভারতবর্ষের নরনারীকে উপস্থিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের সুখ-দুঃখ হাসিকান্না, আশাআকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে চেয়েছি—কতটুকু পেরেছি বা না পেরেছি, সেটা দর্শক বলবেন। তবে কাজের মধ্যে আমাদের নিষ্ঠার অভাব ছিল না। এইটুকু বলতে

প্যারি।" নীতীন বসু আরো বলেন, "বি, এন, সরকারের পর যথার্থ প্রযোজক রূপে পেয়েছি দিলীপকুমারকে—ছবির প্রয়োজন, ছবির মর্ম ইনি বোঝেন।" পরদিন ২২-এ ডিসেম্বর ফারপোতে মধ্যাহ্নভোজে এ'রা দু'জনেই সাংবাদিকদের সংগে মিলিত হয়েছিলেন।

।। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে "কানাল" ছবির প্রদর্শনী ।।

বিখ্যাত পোলিশ ছবি আন্দ্রে ওয়াজ্‌দা পরিচালিত "কানাল" ছবিটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্যে কণ্টিনেণ্টাল মুভী অ্যান্ড টি ভি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। গেল ২২-এ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ কলকাতার "প্রিয়া" সিনেমায় ছবিটি এক হপ্তা ধ'রে দেখানো হ'ল। এর আগে মূলে রুশীয়, জাপানী বা ফরাসী ভাষার বদলে ইংরেজী সংলাপ জুড়ে কয়েকখানি রুশীয় ও ফরাসী চিত্র জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত হলেও ইংরেজী সাব-টাইটেল জুড়ে মূল (পোলিশ) সংলাপকে বজায় রেখে কোনো ছবির সাধারণ প্রদর্শনী কলকাতায় এই প্রথম। এ দিক দিয়ে "কানাল' ছবির প্রদর্শনী একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

।। সুন্দরমের "ফিঙ্গার প্রিণ্ট ।।

সুন্দরম নাট্যসম্প্রদায় প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার বেলা ১০টায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পার্থপ্রতিম চৌধুরী লিখিত ও পরিচালিত রহস্যঘন নাটক "ফিঙ্গার প্রিণ্ট"-এর অভিনয় নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছেন। অভিনয়ে এবং উপস্থাপনায় এই সম্প্রদায়ের দলগত নিষ্ঠা যথার্থই প্রশংসনীয়। একটিমাত্র সুপরিকল্পিত দৃশ্য এবং বেশীর ভাগ সময়েই মৃদু-ক্ষীণ আলোক-সম্পাতে যথেষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু টেপ-রেকর্ডিং মারফত ভি. বালসারা সৃষ্ট আবহসংগীত বহু জায়গাতেই পাত্রপাত্রী কথিত সংলাপকে শ্রুতিগোচর হ'তে দেয় না। অভিনয়ে শাশ্বতীর ভূমিকায় মিতা চট্টোপাধ্যায় ও গোয়েন্দা মিঃ সেনের ভূমিকায় পার্থপ্রতিম যথেষ্ট নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইন্সিওরেন্স এজেণ্ট ও ভৃত্য মহেশও অত্যন্ত সু-অভিনয় করেছেন এবং অপরাপর ভূমিকায় অভিনয় চলনসৈ। কিন্তু আর যাঁদেরই যাই অভিমত হোক না কেন, "ফিঙ্গার প্রিণ্ট"কে আমরা এ যুগের শ্রেষ্ঠতম রহস্য নাটক বলতে পারছি না। প্রথম তিনটি দৃশ্যে নাটক একটি ইঞ্চিও এগোয় না, যেখানে আরম্ভ হয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে; চতুর্থ দৃশ্যে ইন্সপেক্টরের মহেশকে চার্জ করায় দর্শকের মনে যে কৌতূহল জাগানো হয় তাকে আর এগোতে দেওয়া হয় না; 'ফিঙ্গার প্রিণ্ট' সম্পর্কীয় ব্যাপারে আবার একটু কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং শেষে শাশ্বতীর স্বীকারোক্তি দর্শক মনে একটি হঠাৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। —এই যদি রহস্য-নাটকের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হয়, তা হ'লে নবনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে সন্দিহান হ'তে হবে।

।। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির "ডে সিকো" চিত্র প্রদর্শনী ।।

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে চলচ্চিত্রে "নিও রিয়ালিজম"-এর অন্যতম প্রবর্তক, বিখ্যাত ইটালীয় পরিচালক ভিত্তোরিও ডে-সিকার চারখানি নাম-করা ছবি—"মিরাকল অব মিলান", "হ্যালো এলিফ্যাণ্ট", "দি গোল্ড অব নেপলস্" এবং "দি বাই-সিকল্ থিভস" দেখানো হয় প্রধানতঃ এ'দের সভ্যবৃন্দকে। চলচ্চিত্রের স্বরূপ নির্ণয় এবং প্রকৃত রসাস্বাদন ক্ষমতা সৃষ্টির পথে সোসাইটির বহু প্রচেষ্টার মধ্যে এটিও একটি।

।।মৌসুমীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব ।।

গেল ২৩-এ ডিসেম্বর, শনিবার রবীন্দ্র-সরোবর-ভবনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে মৌসুমীর সভ্যবৃন্দ কবির "দুই বোন"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছিলেন।
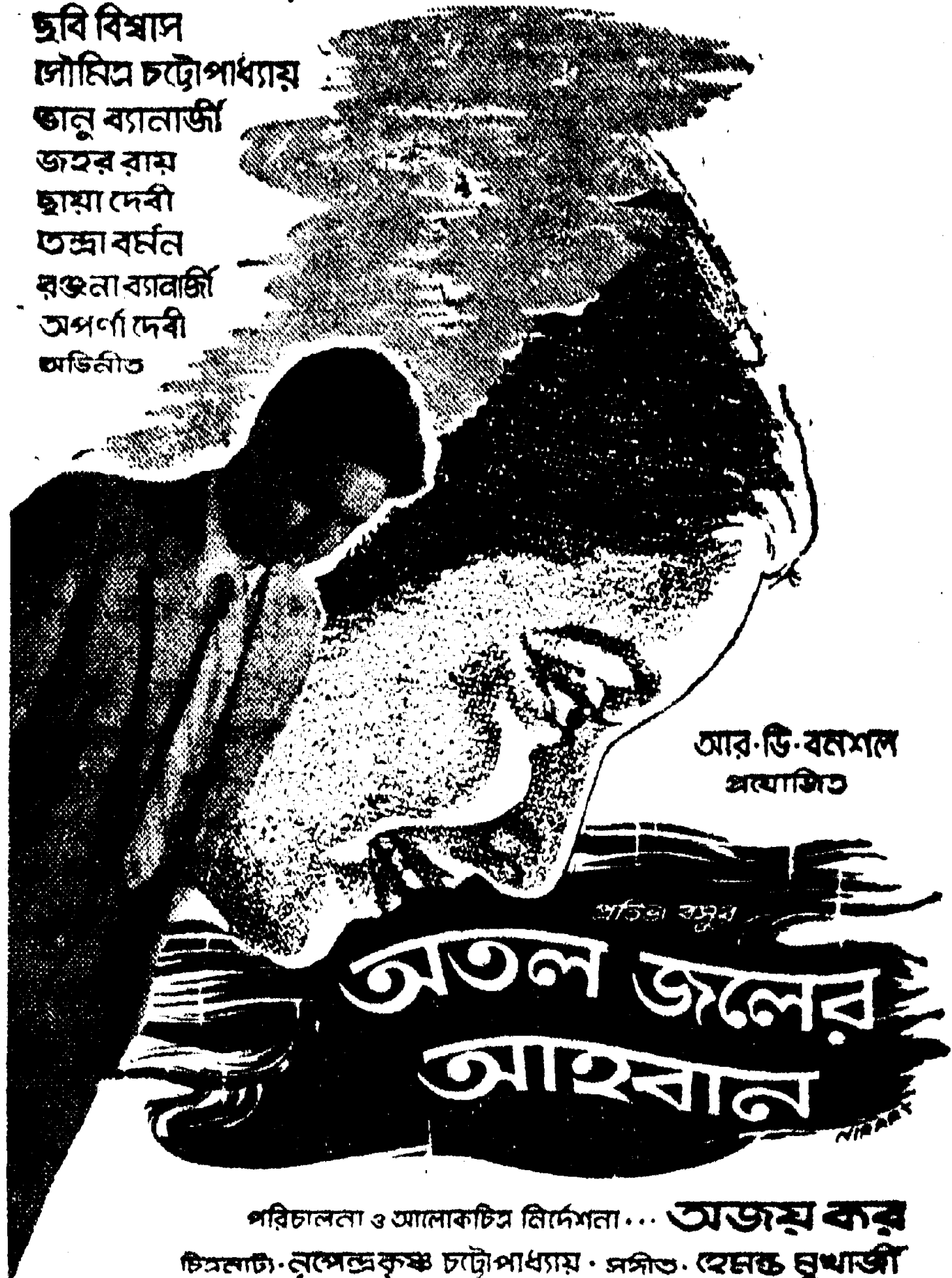
অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহ্বান" চিত্রে তন্দ্রা বর্মন

॥ **সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার বিশেষ প্রদর্শনী** ॥

গেল ২৫-এ ডিসেম্বর, বড়দিনের দিন জনতা চিত্রগৃহে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা বিখ্যাত রুশ-চিত্র, ১৯৫৮ সালে ক্যান্‌স্ চলচ্চিত্রোৎসবে গ্র্যান্ড প্রিক্স-প্রাপ্ত, মিখাইল কালাটোজভ-পরিচালিত "ক্রেন্‌স্ আর ফ্লাইং"-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে সভ্যবৃন্দের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

॥ **"সায়ম"-এর বার্ষিক উৎসব** ॥

গেল ২৬-এ ডিসেম্বর, দক্ষিণ কল্‌কাতার "মুক্ত অংগণে" 'সায়ম্'-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে কবিগুরুর 'মুক্তধারা মঞ্চস্থ হয়।

॥ **গুজরাটী সাহিত্য পরিষদের ২১-তম অধিবেশন** ॥

গুজরাটী সাহিত্য পরিষদের চার-দিনব্যাপী অধিবেশন উপলক্ষে ২৮এ ডিসেম্বর গুজরাটী সাহিত্য মণ্ডল কর্তৃক ভবানীপুর গুজরাটী বিদ্যালয়ে শিবকুমার যোশী প্রণীত নাটক 'সুবর্ণ-রেখা' অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকটি গুজরাটীতে লেখা হলে নাটকের ঘটনাস্থল বাঙলা দেশ এবং বিভিন্ন চরিত্রও বাঙালী। ১৯৪২-৪৩-এর পটভূমিকায় লেখা এই নাটকটিকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকালীন বাঙলার, তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে। ৩১-এ ডিসেম্বর অভিনীত হবে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' এবং ১লা জানুয়ারী হবে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'-র বাঙলা নাট্যরূপ।

॥ **নীলদর্পণ অভিনয় ও বার্ষিক অনুষ্ঠান** ॥

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্মচারী সমিতির হেড অফিস শাখার সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি কর্তৃক গত ৫ই ডিসেম্বর 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে তাদের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে দীনবন্ধু মিত্রের **নীলদর্পণ** নাটক অভিনীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযতীন ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নাট্যশাস্ত্র বিশারদ শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য। অফিস ক্লাবে এ ধরণের উচ্চস্তরের নাটক অভিনয় প্রশংসার যোগ্য বলে তিনি বলেন। আর সত্যিই তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য। অফিস ক্লাবে এত সুন্দর টিমওয়ার্ক হতে পারে তা আশাতীত। সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছেন, তবে বিশেষ করে গোপী দেওয়ান, তোরাপ এবং সাবিত্রীর অভিনয় পেশাদার মঞ্চাভিনেতাকেও হার মানিয়েছে অন্তত কোন কোন জায়গায়। সর্বশ্রী রণজিত রায়, বিশু সেন এবং ঝর্ণা দেবী তাঁদের ক্লাবের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পরিচালক শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

প্রভাত ষ্টুডিওর "সৈরিন্ধ্রী"। ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৩১ সালে কিন্তু চিত্রটি রঙীন করিয়ে আনা হয় জার্মানী থেকে।

* ভারতীয় চিত্রে প্রথম আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার হয় বাংলা ছবি চণ্ডীদাসে। নির্মাণকাল ১৯৩২।

* ভারতীয় চিত্রে প্রথম প্লে-ব্যাক প্রথার প্রচলন হয় বাংলা ছবি "ভাগ্য-চক্র" মারফৎ। নির্মাণকাল ১৯৩৪।

* ভারতবর্ষে প্রথম নির্মিত ইংরেজী ছবি "কোর্ট-ডান্সার"। চিত্রটি নির্মিত হয় সম্পূর্ণ ভারতীয় তত্ত্বাবধানে ১৯৪০ সালে।

* ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদ-চিত্র প্রতিষ্ঠান "ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক।

* ভারতবর্ষে প্রথম চলচ্চিত্রের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের প্রচলন হয় ১৯৫৪ সাল থেকে।

* ভারতবর্ষে প্রথম রঙীন কার্টুন চিত্র "ব্যানিয়ন ট্রি" নির্মাণ করেন ফিল্ম ডিভিশন ১৯৬০ সালে।

"কাজল" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী, নর্মদা চিত্রের পরিবেশনায় শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম

* ভারতবর্ষে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করেন লুমিয়ের ব্রাদার্স, ৭ই জুলাই, ১৮৯৬ সালে।

* কলকাতায় প্রথম চিত্রগৃহ স্থাপন করেন জে এফ ম্যাডান ১৯০৭ সালে।

* ভারতবর্ষে প্রথম নির্মিত ছবির নাম "হরিশচন্দ্র"। দাদাভাই ফালকের প্রযোজনায় চিত্রটি নির্মিত হয় বম্বেতে ১৯১৩ সালে এবং ঐ বছরের এপ্রিল মাসে বম্বেতে মুক্তি-লাভ করে।

* বাংলা দেশে প্রথম নির্মিত ছবির নাম "নলদময়ন্তী"। নির্মাতা জে এফ ম্যাডাম। নির্মাণ কাল ১৯১৭।

* ভারতবর্ষে ছবির সেন্সার আরম্ভ হয় কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজে ১৯২০ সালে।

* দক্ষিণ ভারতের প্রথম নির্মিত ছবি হল "ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা"। নির্মাণকাল ১৯২১।

* ভারতবর্ষে প্রথম সবাক চিত্র প্রদর্শনী হয় কলকাতার এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে ১৯২৯ সালে। ছবিটি ছিল ইউনিভার্সালের 'মেলোডি অফ লাভ'।

* ভারতবর্ষে প্রথম নির্মিত ছবি "আলম আরা" নির্মিত হয় বম্বের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম ষ্টুডিও কর্তৃক ১৯৩১ সালে। দ্বিতীয় সবাক চিত্র "শিরীফরহাদ" নির্মিত হয় কলকাতায়। নির্মাতা ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ।

* ভারতবর্ষে প্রথম রঙীন ছবি হল

পুরনো দিনের ক্রিকেট

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাটু)

(১৭৯২ — ১৯৩৬)

বল খেলা বলতে আমরা এখন **যা বুঝি, ইংরেজের** এদেশে আগমনের **পূর্বে সে রকম** কোন খেলা প্রচলিত **ছিল মনে হয় না।** মহাভারতে বর্ণিত **শুষ্ক কূপ থেকে** তীরের পিছনে তীর **গেঁথে অর্জুন যে** হারানো গোলকটি **উদ্ধার করেছিলেন** সে গোলক বা **বলটিকে নিয়ে কি** ধরণের খেলা হত? **প্রাচীন সাহিত্যে** উল্লিখিত 'কন্দুক' **ক্রীড়াই বা কি?** এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর **আমরা এখনও** উদ্ধার করতে **পারিনি।**

কয়েক রকমের বল খেলার সঙ্গে **ক্রিকেট খেলাও** ইংরেজদের দ্বারা ভারত-**বর্ষে** প্রবর্তিত হয়। কলকাতার মাঠে **প্রথম ক্রিকেট** খেলার বিবরণ আমরা **সংবাদপত্র** মারফত পেয়েছি। ১৭৯২ **খৃষ্টাব্দে** বর্তমান রাজভবনের সামনের **মাঠে ইষ্ট** ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার্স **সাহেবদের** দলের সঙ্গে একটি নাবিক **দলের ম্যাচ** হয়। তারপর থেকে এ-খেলা **সাহেবদের** নিজেদের মধ্যেই **সীমাবদ্ধ** ছিল। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত, নানা **আদব-কায়দায়** বিগলিত, নিজ নিজ **তাঁবুর সামনে** বেয়ারা-বরকন্দাজ পরি-**বেষ্টিত সুখাসনে** উপবিষ্টা তাদের **মেমসাহেবদের** সামনে মাঠে মন্থর-**গতিতে** ছোটাছুটি করছেন, **এমন সাহেব** খেলোয়াড়দের ঝিমানো **ক্রিকেট** খেলা বাঙালী দর্শক আরও কিছুকাল **পর্যন্ত হয়ত** দেখে থাকবেন, **কিন্তু কিছুটা** কৌতূহল উদ্রিক্ত হলেও এ খেলার আকর্ষণ বাঙালী দর্শক অনেক-দিন পর্যন্ত অনুভব করেননি।

দুর্গাপূজায়, ছেলে-মেয়ের বিয়েতে নিজেদের বাড়ীতে সাহেবদের **নিমন্ত্রণ** করে নানা রকমে আপ্যায়িত করলেও সে-যুগে ইংরেজের সঙ্গে সহজ-ভাবে মেলা-মেশায় বাঙালীর নানা ধরণের অন্তরায় ছিল—ইংরেজের উগ্র জাত্যাভিমান আর বাঙালীর নিজের সামাজিক বিধি-নিষেধ। ইংরেজি শিক্ষা, সামাজিক ব্যাপারে তাদের উদারতা, বাঙালীর মনকে আকৃষ্ট করলেও তাদের প্রবর্তিত খেলা-ধূলার মাধ্যমে মেলা-মেশার কথা তখনও বাঙালীর মনে জাগেনি।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনে ইংরেজ-প্রবর্তিত বল খেলার প্রতি আগ্রহ হয়েছে দেখা যায়। তার পূর্বে অবশ্য "নব বাবুরা" ঘোড়দৌড়ের মাঠ তৈরী করিয়েছেন, সে মাঠে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছেনও, সাহেব-দের প্রবর্তিত অন্য দু'এক রকমের আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থাও করেছেন নিজেদের জন্য, কিন্তু কোন রকমের বল খেলার রেওয়াজ বাঙলাদেশে গড়ে উঠতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষ দুই দশকের দিকে "ব্যাট-বল" নাম নিয়ে ক্রিকেট স্কুল কলেজের ছেলেদের খেলার অঙ্গ-রূপে দেখা দেয়।

ইংরেজ প্রবর্তিত সব রকমের বল-খেলা ব্যয়-সাপেক্ষ। নানা উপকরণ, বিভিন্ন ধরণের সাজ-পোশাক, হরেক রকমের ব্যবস্থার জন্য অর্থের প্রয়োজন—ধনী ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে দল-বেঁধে এসব খেলার আয়োজন করা সম্ভবপর নয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "ক্লাব" গঠন করা তখনও পর্যন্ত বাঙালীর মনে আসেনি—বিশেষ করে খেলাধূলোর জন্য। আখড়ার অস্তিত্ব পূর্ব থেকে ছিল বটে, আখড়াধারীর নিজের চেষ্টায় আখড়াগুলি চলত। বিলাতি অনুকরণে ক্লাব গঠন করে চালাতে ধনী ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হল। ধনী বাঙালী পিছিয়ে রইলেন না, তাঁদের সাহায্যে নব্যশিক্ষিত উৎসাহী ছেলেদের চেষ্টায় খেলাধুলোর জন্য "ক্লাব" গড়ে উঠল। বিলাতের মত বিশেষ বিশেষ খেলার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্লাব নয়, কয়েক রকমের খেলার জন্য এক একটি ক্লাব। অবশ্য কোনো কোনো ক্লাবে কোন একটি বিশেষ খেলার জন্য পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন। ক্রিকেট খেলা এমনি করে ধীরে ধীরে বাঙালীর প্রিয় হয়ে দাঁড়াল।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাই সম্ভবতঃ বাঙালীর পূর্বে এ-খেলা এদেশে আরম্ভ করেছিলেন। নিজেদের অল্প কয়েকটি ক্লাবের মধ্যে প্রথম দিকে তাঁদের খেলা সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তাঁরা "খাস" সাহেব দলের সঙ্গে খেলতেন। বাঙালী ক্লাব-গুলি প্রথমে নিজেদের মধ্যে ও কিছু পরে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ক্লাবগুলির সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করেন, খাস বিলাতি সাহেবদের সঙ্গে ফিকসচার পেতে তাঁদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়ে-ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বে এ সৌভাগ্য লাভ করতে তাঁরা পারেননি। টাউন ক্লাব তখন কয়েকটি ধনী জমিদার পরিবারের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হয়ে ক্রিকেট খেলায় কিছু খ্যাতি-লাভ করেছে। তাঁরাই তখনকার বড়-সাহেবদের আভিজাতিক ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে প্রথম ক্রিকেট খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ইডেন গার্ডেন তখন এদেশীয়দের কাছে সত্যিই মায়া-কানন। ইংরাজি নব-বর্ষে সে মাঠ নানা রঙের পতাকায় সজ্জিত হয়ে রমণীয় হয়ে উঠত। এর মাঠের ধারে বসে সাহেবদের ক্রিকেট খেলা দেখা তখনকার দিনের আকর্ষণ ছিল। এমন সুসজ্জিত প্যাভিলিয়নে প্রবেশের অধিকার, এমন সুন্দর মাঠে এমন সুন্দর পরি-বেশে খেলতে পারার সুযোগ লাভ, সৌভাগ্য নয়ত কি? টাউন ক্লাব মাঠে খেলতে পাবার সুযোগ পেলেন বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে প্যাভিলিয়নের ধারে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র সামিয়ানা খাটানো হল, কচুরী-সিঙ্গাড়া প্রভৃতি খাবারের ব্যবস্থা করে তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল, ক্রিকেট-ক্লাব দলের অধিনায়ক তাঁদের সামিয়ানায় এসে আদর-আপ্যায়নও করে গেলেন, সাহেবরা কিন্তু নিজেদের প্যাভিলিয়নের অন্দরে বসে তাঁদের লাঞ্চ খেলেন, এক টেবিলে বাঙালীদের সঙ্গে বসলেন না। এ প্রথা অবশ্য বেশী দিন চালু ছিল না, দু-তিন বৎসর পরে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। এই প্রথম ম্যাচের ফিকসচার

পেতে টাউন ক্লাব ও পরবর্তী দু-এক বৎসরের মধ্যে এরিয়ান-ক্লাব প্রমুখ যাঁরা ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সংগে খেলতে পাবার সৌভাগ্য অর্জন করে-করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই নিজ নিজ পুরাতন স্কোর বই-এর রেকর্ড দেখাতে হয়েছিল।

কলকাতায় ও মফঃস্বলের কয়েকটি শহরে ও কলেজে ক্রিকেট তখন কিছু কিছু চলছে। প্রিন্সিপাল সারদারঞ্জন রায় মশায়ই এ সময়ে কলেজের ছেলে-দের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ সংক্রামিত করেন। যুব-শক্তির শারীরিক, মানসিক তৎপরতা ও উপস্থিত বুদ্ধির বিকাশে এ খেলার উপযোগিতা বোধ করি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ও তজ্জন্য যুবজনের মধ্যে এর প্রসারে তিনি বহুবিধ চেষ্টা করে গেছেন। বিভিন্ন কলেজের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার ব্যবস্থা তাঁর চেষ্টাতেই ফলবতী হয়।

এরিয়ান ক্লাবের দুখিরামবাবুর কাছেও বাংলার ক্রিকেট বহুল পরিমাণে ঋণী। কত ছেলেকে কি পরিমাণ পরি-শ্রমে দিনের-পর-দিন নেটের আড়ালে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের বাড়ীতে গিয়ে, উপদেশ দিয়ে তৈরী করে গেছেন তা বলা যায় না। শুধু নিজের ক্লাবের ছেলেদের শিক্ষা দিতেন না, যে-কোনো ক্লাবের যে-কোনো ছেলের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উন্নত সম্ভাবনা দেখতে পেতেন, উপযাচক হয়ে উপদেশ দিয়ে, হাতে-কলমে শিখিয়ে তাদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করে গেছেন। ক্রিকেটের উন্নতি-কল্পে তিনি ও সারদাবাবু যে পরিমাণ পরিশ্রম ও "ছেলে মানুষী" করে গেছেন, আজকের দিনে তা মনে করলে বিস্ময় লাগে ও হাসি পায়। এ বিষয়ে তাঁদের সম্বন্ধে গল্পগুলি সংগ্রহ করে কেউ যদি প্রকাশ করেন তা নিছক গল্প বলেই অনেকের আজ মনে হবে।

ভারতের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও ক্রিকেট কলকাতায় ততটা প্রসার লাভ করতে পারেনি যতটা পেরেছিল বোম্বাই-এ। বোম্বাই প্রদেশের ক্রিকেট-অনুরাগী গভর্ণর লর্ড হ্যারিসের উৎসাহে ঐ প্রদেশের কয়েকটি বড় বড় শহরে, এমনকি ছোট ছোট করদ-রাজ্যে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিকেটের চর্চা তখন ব্যাপক হয়েছিল, ফলে বোম্বাই প্রদেশবাসীরা অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এখানকার বিদেশী পরিচালকদের উৎসাহের অভাবে বাঙগালীর ক্রিকেট অনেক পিছিয়ে ছিল। অবশ্য তাঁদের নিজেদের চরিতার্থ-তার জন্য দেশের দুএকটি ক্রিকেট দল এদেশে তাঁরা আনিয়েছিলেন। এই রকমের একটি দল, (Oxford Authenitics, কে, জে, কী'র (K. J. Key) নেতৃত্বাধীনে এদেশে এসেছিলেন, তখনকার বিখ্যাত পিটিয়ে ব্যাটসম্যান লর্ড হক (Lord Hawke) এ দলের সঙ্গে আসেন। ইডেন গার্ডেনের ঝাউ-গাছ-পার-করা তাঁর "ছয়ের বাড়ী'র কয়েকটি ওভার-বাউন্ডারী মার বাঙালী দর্শকের অনেক দিনের আলোচনার খোরাক হয়েছিল। এই দলে আরও কয়েকজন নামকরা ক্রিকেটার ছিলেন। এই সব বিদেশী ভাল খেলোয়াড়দের খেলা দেখে এখানকার খেলোয়াড়রা বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। লর্ড হক আরো একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

আমাদের রণজিৎসিংজী এ সময়ে

বাংলার ক্রিকেট খেলার 'জনক' অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়

"কালা-প্রিন্স" নামাঙ্কিত হয়ে বিলাতে আতসবাজী ফোটাচ্ছেন। ওখানকার লোক এমন সাবলীল অথচ আয়াস-হীন ব্যাটিং ইতিপূর্বে দেখেননি। যে কোনো ধরণের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখে সেদেশের লোক অবাক—এমন কি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে জয়লাভের আশায় স্বাজাত্যাভিমান বিসর্জন দিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড-দলভুক্ত করতে হয়েছে। এ খবর দেশে পৌঁছেছে, আমাদের বুক দশহাত হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট খেলার উৎসাহ সুতরাং আমাদের বেড়েই চলল।

বোম্বাই প্রদেশে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ পূর্ব হতেই ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেখানে ট্রায়াঙ্গুলার (Triangular) ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হল— প্রথমে হিন্দু, পার্শী ও ইউরোপীয় দলে প্রতিযোগিতা চলত—পরে মুসলমান দল যোগদান করায় এই প্রতিযোগিতার নাম হয় Quadrangular.

বাংলাও পিছিয়ে রইল না। এখানেও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল, বাঙালী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে—তার নাম হল Schools Cricket. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষী এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

এইকালে মধ্যে মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা, জামনগরের মহারাজা তাঁদের দল নিয়ে কলকাতায় আসতেন, সে সব দলে কয়েকজন ভাল ভাল সাহেব ক্রিকেটার থাকতেন। রেঙ্গুণ ও কলম্বো থেকেও ইউরোপীয় দল আসত। এখানকার নাটোরের ও কুচবিহারের দল এবং ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে তাঁদের খেলা হত। সে এক সমারোহের ব্যাপার। এখানকার দর্শকমণ্ডলী উঁচুদরের ক্রিকেট দেখে পরিতৃপ্ত হত। ফ্রাঙ্ক ট্যারান্ট এ সময়ে কয়েক বৎসর কলকাতায় ছিলেন। তাঁর বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলবার সুযোগ পেয়ে তখনকার উঠতি খেলোয়াড়রা বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। ক্যালকাটা, বালিগঞ্জ প্রমুখ ইউরোপীয় ক্লাবগুলিতে এ সময়ে হোসি, ল্যাগডেন ও ক্যাম্বেলের মত উঁচু দরের খেলোয়াড় থাকায় আমাদের ছেলেদের ক্রিকেট খেলায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

আমাদের এখানকার ক্রিকেটের আদি যুগে "লপ্পা" বল দেওয়ার রেওয়াজ যেমন ছিল তেমনি জোরে আন্ডারহ্যান্ড (Fast underhand Bowling) বোলিংও অনেকে করতে পারতেন। তখনকার কালে এ রকম বলে ব্যাটসম্যানদের অনেকের হৃৎকম্প হত। আন্ডারহ্যান্ড বল যে অত দ্রুতগতিতে দেওয়া যায় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। কয়েকজন ইউরোপীয়কেও আন্ডারহ্যান্ড বল ১৯০৪—১৯০৫ পর্যন্ত দিতে দেখা গিয়েছে।

এই শতকের প্রারম্ভ থেকে ওভার-আর্ম (Over arm) বোলিং (কেউ কেউ তখন এই ধরণের বোলিংকে রাউন্ড-আর্ম (Round arm) বোলিংও বলতেন) আক্রমণের বিশিষ্ট উপায় হিসাবে গৃহীত হয় ও তার চর্চা সুরু হয়। পাতিয়ালা দলের বিখ্যাত জে, টি, হার্ণ (J. T. Hearne) সাহেবের ওভার-আর্ম বোলিং-এর চাতুর্য ও কার্যকারিতা দেখে খুব সম্ভব এই বোলিং পদ্ধতি এখানে স্থায়ীরূপে গৃহীত হয়।

বিংশ-শতাব্দীর শুরু থেকে ক্রিকেট বাঙালীর প্রিয় খেলা হয়ে উঠে। কুচবিহারের মহারাজা এ সময়ে একটি দল গঠন করেন। বিলাত থেকে দু-তিনজন পেশাদার ক্রিকেটার আনিয়ে তিনি তাঁর দলে খেলাতেন এবং কলকাতার দেশী ও ইউরোপীয় দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত করতেন। স্থানীয় প্রখ্যাত খেলোয়াড়দেরও তিনি দলভুক্ত করতেন ও তাঁর উডল্যান্ডস (Woodlands)-এর মাঠে গুণসম্পন্ন উঠতি ছেলেদের নেট-প্র্যাকটিস করবার সুযোগ দিতেন। নেটে পেশাদার খেলোয়াড়রা এই সব ছেলেদের ব্যাটিং, বোলিংয়ের কায়দা-কৌশল সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। নেট-প্র্যাকটিস-এর পর ফিল্ডিংও অনেকক্ষণ ধরে চর্চা করা হত। সে সময়কার প্রখ্যাত খেলোয়াড় বিধু মুখুজ্যে, কুলদারঞ্জন রায়, মণি দাস কুচবিহারের পুরো টীমে খেলতেন; উঠতি ছেলেদেরও এই সব কৃতী খেলোয়াড়দের সঙ্গে ম্যাচ খেলার সুযোগ দিয়ে তাদের পাকা খেলোয়াড় হতে সাহায্য করা হত।

নাটোরের মহারাজাও এ সময়ে একটি দল গঠন করেছিলেন—তাঁর দলে অবশ্য বিলিতি পেশাদার কেউ ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নিয়ে তিনি দল গঠন করতেন—বস্তুতঃ ১৯১১ সালে ভারতবর্ষ থেকে যে দল ইংলণ্ডে পাঠানো হয়, সেই ইংলণ্ড সফরকারী দলের মধ্যে নাটোর দলের সাত-আটজন ছিলেন। নাটোরের মহারাজার আরও একটি গুণ ছিল যে, তিনি বিভিন্ন কলেজ-দলকেও তাঁর দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দিতেন।

এই সমস্ত যোগাযোগের ফলে বাংলার ক্রিকেটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাঙালী দলগুলির ইতিপূর্বেকার দশ বছরের খেলার সঙ্গে এই সময়কার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় যে, অ-বাঙালী দলের বিরুদ্ধে খেলে

বাঙালী দল পূর্বে কখনই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি যেমন পেয়েছিলেন পরবর্তী দশ বছরে। হাওড়া স্পোর্টিং, টাউন ক্লাব, এরিয়ান্স, কুমারটুলি ইনস্টিটিউট, মোহামেডান স্পোর্টিং, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহনবাগান প্রমুখ বাঙালী দল শক্তিশালী অ-বাঙালী দলসমূহের বিরুদ্ধে প্রায়ই সমানে-সমানে লড়তেন—গ্লানিকর পরাজয় ক্বচিৎ কখন ঘটত। আরও একটি সুলক্ষণ দেখা দিয়েছিল যে, স্কুল-কলেজ থেকে অনেক নূতন ছেলে এই সব ক্লাবে যোগ দিয়ে খেলার মান উন্নত রাখতে সাহায্য করতেন। এতদিন দর্শকের ভূমিকা প্রবল ছিল, এখন থেকে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়তে লাগল।

অধিকাংশ খেলোয়াড়ই তখন মধ্যবিত্ত ঘরের। ক্রিকেটের সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-আসাক ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয় সংগ্রহ করা তাদের পরিবারের সাধ্যের অতীত। সেজন্য ক্রিকেটের প্রতি তাদের অনুরাগ অবশ্য একটুও শিথিল ছিল না। খুব কম ছেলেরই নিজের ব্যাট ছিল। পেন্টুলুন (সেকালের পরিভাষা), বুট-জুতা, সার্ট, টুপি ইত্যাদি যোগাড় করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে খেলায় অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড় ধুতি ব্যবহার করতেন, পায়ে বুটজুতা, মাথায় হ্যাট। অ-বাঙালীদের বেলায় নিজের না থাকলে ধার-ধোর করে যোগাড় করতে হত। ফলে অনেক সময় ভালো খেলোয়াড় অপরের প্যান্টুলুন পরে নড়তে চড়তে পারতেন না। এই রকম অবস্থায় পড়া একজনকে বলতে শুনেছি—"খেলব কি! সারাক্ষণ মনে হয়েছে আমার অঙ্গে কোন আবরণ নেই।" এই প্রসঙ্গে আর একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। উডল্যান্ডস-এর মাঠে কুচবিহারের সঙ্গে আমাদের দলের ম্যাচ চলছে। আমাদের একজন ধার-করা পেন্টুলুন পরে কুচবিহারের বিরুদ্ধে দারুন ব্যাট করছেন। খেলা খুব জমে উঠেছে, আমরা মাঠের ধারে বসে তাঁর খেলার খুব তারিফ করছি। এমন সময় ফট করে বেশ জোরে একটা আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম খেলোয়াড়টি পেন্টুলুনের ভিতর থেকে সার্টের তলাটি টেনে বার করে ইজেরের উপর ঝুলিয়ে দিলেন তারপর আবার ব্যাট করার জন্য প্রস্তুত হলেন। পরের বল কিন্তু আর খেলতে হল না, আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। ঠিক কি ঘটেছে অনুমান করতে পারিনি। আমাদের কাছে আসতেই আমাদের অনুরাগী যে বন্ধুটি আমাদের সব খেলায় দর্শক হিসাবে আমাদের সঙ্গে যেতেন তিনি একখানি ধুতি খেলোয়াড় বন্ধুটির হাতে এগিয়ে দিলেন এবং খেলোয়াড় বন্ধুটি সেই ধুতিখানি পরে পুনরায় মাঠে খেলতে নামলেন। আমরা তো অবাক। গর্ব বোধ হল। এমন অনুরাগী বন্ধু কেউ কখনও পায়? কখন কার দরকার পড়বে মনে করে বাড়তি ধুতি সঙ্গে নিয়ে যে বেড়ায় সে বন্ধুর তুলনা কোথায়? পরক্ষণেই টের পেলাম যে, নিজের অঙ্গের একমাত্র বসনটি খুলে দিয়ে শুধু আলোয়ানটি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে নির্বিকারচিত্তে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুটি খেলা দেখছেন। এমন সর্বত্যাগী "ফড়ে" আজকালকার যুগে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের দ্বিজেন সেন মশায়ের চেষ্টায় ও কুচবিহারের রাজা ও রাজকুমারদের আনুকূল্যে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে বেঙ্গল জিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য খেলার চর্চা এর অঙ্গীভূত হলেও ক্রিকেটের উন্নতিবিধান ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় একমুখিত্ব ছিল না—কতকটা এলোমেলো। তথাপি সে সময়কার বেঙ্গল জিমখানার কৃতিত্ব সামান্য নয়। বোম্বাই থেকে একজন 'ক্রিকেট কোচ" আনিয়ে নেট-প্র্যাকটিশের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বছর দু-এক প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন করে ক্রিকেটকে লোকপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। কুচবিহারের রাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর আরও ছয়-সাত বৎসর কোনো রকমে এর অস্তিত্ব বজায় ছিল।

বাঙালীর ক্রিকেট যে বিশেষভাবে উন্নতির দিকে মোড় নিয়েছে এই সময়কার কাগজপত্র দেখলে তা পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহও অনেক বেড়েছে। বাঙ্গালী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের মিলিত একটি বাংলা দল এই সময়ে মধ্যপ্রদেশে প্রেরিত হয়। সেখানকার সব খেলাগুলিতেই বাংলা দল বিশেষ উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়। রাওয়ালপিণ্ডি ও মাদ্রাজ থেকে

বাছাই দলের আগমন সম-সাময়িক কালেই ঘটে এবং এই দুই শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়ে আমাদের ছেলেরা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে। গিলিগান সাহেবের নেতৃত্বে এম, সি, সি, দলের এ সময়ে কলকাতায় আগমন, ব্রিটিশ ক্রিকেটের এই সর্বপ্রথম ভারত অভিযান, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

গিলিগান দলের বাংলা সফরের ব্যয়-নির্বাহের মোটা অংশ বাঙালী দর্শকের অর্থে সাধিত হলেও স্বতন্ত্র একটি বাঙালী দল এম, সি, সি'র বিরুদ্ধে খেলবার অনুমতি পায়নি। এম, সি, সি'র বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবে লড়নে-ওয়ালা একটি বাঙালী টিম সে সময়ে গঠন করা শক্ত ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ পরিচালকদের বিরুদ্ধ মনোভাবের দরুণ শেষ পর্যন্ত বাঙালী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমন্বিত একটি মিলিত দল তাদের বিরুদ্ধে খেলতে পায়। এই উপেক্ষা বাঙালী খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে পীড়িত করে এবং পরবর্তীকালের অনেক অপ্রিয় ব্যাপার এই উপেক্ষার ফল বলে মনে হয়।

ব্রিটিশ পরিচালকদের এই উপেক্ষার ফল ফলতে বেশী দেরী হল না। মোহনবাগান ক্লাবের 'গাইজবাবু' (ডি, এন, গুহ) ও অন্যান্য উৎসাহীদের চেষ্টায় বেঙ্গল জিমখানা পুনর্জীবিত হল। উঠতি (colts) খেলোয়াড়দের বিভিন্ন শক্তিশালী ক্লাবদের বিরুদ্ধে খেলবার সুযোগ করে দিয়ে এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে কলকাতা থেকে অভিজ্ঞ ও উঠতি খেলোয়াড় সমন্বিত দল পাঠিয়ে বেঙ্গল জিমখানা বাংলার ক্রিকেটে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। বেঙ্গল জিমখানার এই সব প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে জার্ডিন সাহেবের নেতৃত্বাধীনে এম, সি, সি'র কলকাতায় আগমন গোড়ার দিকে অনিশ্চিত ছিল। ব্রিটিশ পরিচালকরা ধুয়া তুলেছিলেন যে, এই সফরের বিরাট ব্যয় "ফুটবল-পাগল" বাঙালী দর্শকদের অর্থে সংকুলান হবে না। বেঙ্গল জিমখানা কলকাতার সফর কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসেন ও সফরের যথোচিত ব্যয়-বহনের অঙ্গীকার করায় ব্রিটিশ পরিচালকরা বাধ্য হয়ে শেষে চুক্তি-বদ্ধ হন। ফলে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পায় ও নূতন নূতন ক্রিকেটারের অভ্যুদয় হতে থাকে।

এই সময়ের কাছাকাছি ক্রিকেটের "পোকা" বেরী সর্বাধীকারীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে "ইউনিভার্সিটি অকেশনালস" দলটির পত্তন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা এই দলের সভ্য হলেও বাংলার ছেলেরাই এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে উপকৃত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশে সফরের ফলে বাংলার ছেলেরা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে বিখ্যাত খেলোয়াড় রাইডার তাঁর প্রবীণ ও চৌকস খেলোয়াড়দের নিয়ে এর পরেই কলকাতায় আসেন। বিশ্ববিখ্যাত চৌকস খেলোয়াড় ম্যাকার্টনে (Macartney) এই দলে ছিলেন। তাঁর ও এই দলের অন্যান্যদের খেলা দেখে ও তাঁদের বিরুদ্ধে খেলবার সুযোগ পেয়ে আমাদের ছেলেরা অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করেন। এতাবৎ ব্রিটিশ ক্রিকেটাররাই আমাদের আদর্শ ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ানদের খেলার পদ্ধতি আমাদের নূতন শিক্ষা দান করে এবং নূতন নূতন পরীক্ষা গ্রহণে আমাদের উৎসাহী করে তোলে।

১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফরের দল-গঠন উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক যে সব খেলার (Trial games) আয়োজন হয় তাতে বাঙলা থেকে তিনজন আমন্ত্রিত হন, স্পোর্টিং ইউনিয়নের গণেশ ও কার্তিক বসু এবং এরিয়ান্সের সুঁটে ব্যানার্জি। শেষ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে কেউই ইংলণ্ড সফরের জন্য নির্বাচিত না হলেও বাঙালীর ক্রিকেট যে এগিয়ে চলেছে তা পরিস্ফুট হয়। এর পূর্বে ১৯১১ সালের ইংলণ্ড সফরের দল-নির্বাচনের জন্য এরিয়ান্সের বিধু মুখুজ্যে মশায় ও ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের "গ্রাউণ্ড-বয়" ফাগুরাম ট্রায়ালের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জাত-হারাবার ভয়ে বিধুবাবু ইংলণ্ডে যেতে নারাজ থাকায় ট্রায়াল খেলায় যোগদান করেননি। "ছোট জাত" বলে শেষ পর্যন্ত ফাগুরামেরও ট্রায়াল-খেলায় যোগদান করা সম্ভবপর হয়নি।

পরবর্তী ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ড সফরে বাংলার সুঁটে ব্যানার্জি নির্বাচিত হলেন। বাঙালীর দীর্ঘকালের চেষ্টা এতদিনে সফল হল। খুব ছোট হরফের হলেও ভারতের ক্রিকেট মানচিত্রে বাংলার নাম উঠল।

লঘু মেজাজে

অজয় বসু

সবুজ মখমল-বিছানো সাজানো বাগান ঘিরে বৃত্তাকারে পাতা দর্শক-আসন। আসনের মাথায় চাঁদোয়া। তাতে রং-বেরং-এর প্রাচীরপত্র ঝুলছে। গ্যালারিতে লোকজন থৈ-থৈ করছে। দর্শকদের আঙ্গিক-সজ্জা বিচিত্র বর্ণের। মনেও তাঁদের অনাবিল রংয়ের অফুরন্ত ছোপ। ঘাসের রং, পরিবেশের রং, মানুষের মনের রং, সব মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তারই মাঝে রংদার খেলা ক্রিকেটের সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠা।

খেলা চলছে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার-পরা আর পুলওভার-আঁটা জনকয়েক তরুণকে কেন্দ্র করে। তাঁদের মধ্যমণি যে দুজন তাঁদের হাতে বিলিতি 'উইলো'তে-গড়া চাঁচাছোলা পরিচ্ছন্ন দুখানি ব্যাট। আর সেই ব্যাটের জীবন্ত ভূমিকা ঘিরেই যতো নাটক।

ব্যাট তো নয়, যেন হাতিয়ার বিশেষ। বোলারদের বাগ মানাতে ব্যাটসম্যান হাতিয়ার শানাচ্ছেন। ব্যাটে-বলে হতেই বল ছুটছে দিগ্বিদিকে। বলের গতি কখনো ঊর্ধ্বগামী কখনো বা নিম্নগামী। ব্যাটকে হার মানাতে ওদিকে বলেরও ছলচাতুরীর অন্ত নেই। মাটিতে পড়ে হুংকার তুলে বল কখনো সরোষে লাফিয়ে উঠছে। আবার কখনো সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে ব্যাটের নাগাল এড়াবার আনন্দে উড়ছে যেতে।

মুস্তাক আলী

ব্যাট আর বলের দ্বন্দ্ব যতোই বাড়ে, ক্রিকেট-মাঠের নাটকও জমে ততো।

সবচেয়ে জমে টেস্ট ক্রিকেটের অনুষ্ঠান। টেস্টই ক্রিকেট খেলার বড় আসর। সে আসরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হলো দুটি দেশ। টেস্ট ক্রিকেট মানেই দু'দেশের মর্যাদার অগ্নিপরীক্ষা। দু'দেশের সেরা খেলোয়াড়েরা টেস্টে অংশ নেন। তাঁদের দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটান সাধারণ ক্রীড়ানুরাগীরা। আর অসাধারণ যাঁরা, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা সেই খেলোয়াড়দেরই ভূমিকা উপলক্ষে প্রথা-প্রকরণ, কারুকীর্তির চুলচেরা বিশ্লেষণে নিজেদের চুল পাকিয়ে ফেলেন।

ব্যাটসম্যানের দক্ষতায় কোথায় কমতি পড়লো, উইকেটের হেঁয়ালীপনা কোন্ মুহূর্তে বাড়লো, নব প্রতিষ্ঠিত কোন্ নজীরে অতীতের কোন্ পরিসংখ্যান একেবারে গুঁড়িয়ে গেল—তারই সোচ্চার আলোচনায় বিশেষজ্ঞের দল মসগুল। আর তারই অজস্র নজীর প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ধরা। হাততালি দেওয়ার চেয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্যেই যেন পক্ষ-বিশেষের আগ্রহ বেশী।

কেমন যেন গুরুগম্ভীর ভাব। লর্ডস থেকে ওভাল, মেলবোর্ণ থেকে সিডনী, ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়াম থেকে ইডেন উদ্যান, যে কোনো টেস্ট খেলার মাঠেই চোখ ফেরাই না কেন, নজরে পড়বে এই একই দৃশ্য। চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমার ফাঁকে কেমন যেন রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া। যেন খানদানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে দিকপাল ওস্তাদের বন্দেজী তানকর্তব শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যাকরণের বিশুদ্ধ প্রভাবে মণ্ডপে থমথমে ভাব। হালকা মেজাজের রাশ আলগা করব অবকাশ কোথায়?

একালের টেস্ট খেলার মাঠেও হালকা মেজাজকে আলগা করে রাখার উপায় নেই। লঘু মেজাজের দর্শক মাঠে হাজিরা দিলে পণ্ডিতেরা রুষ্ট হন। বোদ্ধার দল মনে করেন, এই বুঝি পবিত্র ভূমি কলুষিত হয়ে উঠলো। তবু মেজাজ সব সময়ে কড়া শাসন মানে

জ্যাক হবস

না। মেজাজের লঘু দিকও আছে। সেই দিকের চাহিদা মেটাতে যাঁরা টেস্ট ক্রিকেটের বাহ্যিক কাঠামো ভেদ করে অন্দরমহলে নেপথ্য দৃষ্টি হানতে পেরেছেন তাঁরা কিন্তু সব সময়ে ফাঁকিতে পড়েননি।

হারজিত, মর্যাদা-গৌরব, পরিসংখ্যান-টেকনিকের বাইরে ক্রিকেটের আর একটি লুকোনো মহল আছে। সে মহলেও অনেক মজা। নিছক মজা-লোটায় আগ্রহ যদি থাকে তাহলে চলুন একবার সেই জগতে গিয়ে উঁকি মারি।

১৯২৬ সালের ইংলণ্ডের মাঠে খেলা চলছে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার। পঞ্চম বা সর্বশেষ টেস্ট খেলা। আগের চার-চারটি খেলা অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। সুতরাং চূড়ান্ত সাফল্যে লক্ষ্য স্থির রেখে পঞ্চম অঙ্কে বাজীমাত করার সংকল্পে দু'পক্ষই কোমর এঁটেছে কষে।

দু'দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো যখন তখন অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে গিয়েছে বাইশ রাণে। এমন সময় নামলো বৃষ্টি। বৃষ্টি তো নয়, যেন ভাগ্য-দেবীর নিদারুণ পরিহাস! বৃষ্টিতে মাঠ ভিজলো, সংগে সংগে সমর্থক মহলের উৎসাহ, আশা ভিজে একেবারে চুপসে গেল। তাঁরা ধরেই নিলেন যে, বর্ষণসিক্ত মাঠে ইংলণ্ডের পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো রাস্তাই আর খোলা নেই। বিশেষজ্ঞরাও সায় দিয়ে মাথা হেলালেন।

এই অবস্থায় ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন স্বনামধন্য জ্যাক হবস আর তাঁরই অবিচ্ছেদ্য সংগী হার্বার্ট সাটক্লিফ। ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আরম্ভ

করলেন কোনো ফার্স্ট-বোলার নন, একেবারে নির্ভেজাল স্লো-স্পিন-বোলার আর্থার মেইলি। ভিজে কাদামাটির উইকেট তো স্পিন-বোলারদের কাছে হাতে-পাওয়া 'স্বর্গ' বিশেষ।

মেইলি বল ছাড়লেন। প্রথমটি লেগ-ব্রেক। পিচ পড়ে উলটো মুখে ঘুরে বল বেরিয়ে গেল অফ-স্টাম্পের বাইরে। বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান জ্যাক হবসের হাতের ব্যাট হাতেই রয়ে গেল, ব্যাটে-বলে হলো না। বিশ্বাসঘাতক উইকেটের প্রকৃতির নমুনা দেখে হাবার্ট সাটক্লিফ্ অনুচ্চারিত কণ্ঠে বল্লেন, 'এই উইকেটে আমরা সবাই মিলে সত্তর রাণ তুলতে পারি কিনা সন্দেহ!'

মেইলি দ্বিতীয় বল দিলেন—'গুগলী'। দেখতে লেগ-ব্রেকের মতো কিন্তু কাজের পরিচয়ে অবিমিশ্র অফ-ব্রেক। হবস বুঝতেই পারেননি। এবারেও বল ব্যাটে না লেগে লাগলো গিয়ে তাঁর প্যাডে। প্যাডসমেত হবসের পা তখন স্টাম্পের ভেতরে এবং বলটিও পিচে পড়েছে স্টাম্পের মধ্যে। আইন অনুযায়ী এক্ষেত্রে হবসের আউট (এল্ বি ডবলিউ) হওয়ার কথা। কিন্তু ভুল বুঝে মেইলি কোনো আবেদন করলেন না। আসলে মেইলি কেন, অস্ট্রেলিয়ার কোনো খেলোয়াড়ই আবেদন করেননি।

আম্পায়ার ছিলেন বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার। মেইলি ও তাঁর সতীর্থদের মৌনতার ফাঁকে তিনি যেন হাবার্ট সাটক্লিফের কানে কানে কি বল্লেন। আরও পরে চেস্টারের সঙ্গে দু এক কথা বিনিময়ের পর স্বয়ং জ্যাক হবসও যেন আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

কানাকানি আর হাসাহাসির সূত্রে শেষপর্যন্ত যখন জানাজানি হয়ে গেল যে, মেইলির দ্বিতীয় বলে হবস আউট হয়ে গিয়েছিলেন তখন মেইলি ও তাঁর সতীর্থদের অবস্থা দেখে কে! সবাই যেন মাথার চুল ছিঁড়ে নিজেদের হাত কামড়াতে চাইছেন। ইস্! এমন ভুলও মানুষ করে? হাতে পেয়েও তাঁরা হবসের মূল্যবান উইকেটটিকে বেহাত করে দিলেন! নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অস্ট্রেলিয়া দলের সবাই তখন একেবারে হায় হায় করছেন!

ওদিকে 'নতুন জীবন' পেয়ে জ্যাক হবস কিন্তু গুটিগুটি করে নিজের একশ রাণ বানিয়ে ফেল্লেন। দেখতে দেখতে সময়ে উইকেট শুখালো আর অনুকূল উইকেটে ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ করলো ৪৩৬টি রাণ এবং শেষ অঙ্কে জয়লক্ষ্মী বরণ করে নিলেন ইংলণ্ডকেই।

সে খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, ইংলণ্ড জিতেছে একমাত্র জ্যাক হবসের ক্রীড়ানৈপুণ্যে। ফ্র্যাঙ্ক চেস্টারের মতে 'হবস যদি কোনো রাণ না করে ফিরে যেতেন তাহলে সেই মুহূর্তে স্যাঁতসেঁতে ওভাল উইকেটে ইংলণ্ডের আর কোনো খেলোয়াড় দাঁড়াতেই পারতেন না।'

আর্থার মেইলি ও অস্ট্রেলিয়া দলের ভাগ্যে সেদিন নির্বাকের প্রাপ্য পুরস্কারই জুটেছিল। একটি মাত্র ভুলের খেসারতে অস্ট্রেলিয়াকে যে কতো বড় বঞ্চনা সইতে হলো তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। পাওনা আদায় করতে ভোলেন যাঁরা ফাঁকিতে পড়ে তাঁরা কেমন মজাদার নেপথ্য কাহিনীর মালমশলায় রেখে যান—এই ঘটনাই তার বড় সমর্থন।

ভুল বোঝাবুঝির সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট উপলক্ষে নেপথ্যে আরও অনেক মজার কাহিনী গড়ে উঠেছে। এমনি একটিতে জড়িয়ে আছেন লোকপ্রিয় ভারতীয় মুস্তাক আলি।

১৯৩৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের কোণঠাসা অবস্থা! ৩৬৮ রাণের ব্যবধানে থেকে চা-পানের পর ভারতের প্রথম উইকেটে খেলতে এলেন মুস্তাক আলি। সঙ্গে বিজয় মার্চেন্ট। মুস্তাক এসেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অননুকরণীয় ভঙ্গীতে মার মারতে লাগলেন।

দলের অবস্থা বিপর্যস্ত। সবাই আশা করেছিলেন, এবার অন্ততঃ মুস্তাক আলি কিছুটা সংযমের পরিচয় রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি একেবারেই উলটো মূর্তি ধরে বসলেন। দেখে ভারতীয় দলপতি স্বয়ং 'ভিজি' কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে তাঁবু থেকে দূতের হাতে পত্র পাঠালেন মুস্তাকের উদ্দেশ্যে 'সহজভাবে নাও'—অর্থাৎ বিপক্ষের আক্রমণকে বেপরোয়া মনে উপেক্ষার চেষ্টা না করে দেখে-শুনে খেলো।

কিন্তু তাতে হলো হিতে বিপরীত। সহজ হওয়ার নির্দেশ পেয়ে মুস্তাক পেলেন বাড়তী স্ফূর্তি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতের ব্যাট ঘুরতে লাগলো চকিত ভঙ্গীতে, রাণ ওঠার গতিও বেড়ে চললো দ্রুত তালে। গুনে গুনে চোদ্দটি বাউণ্ডারী মেরে এইভাবে মুস্তাক আলি যখন তাঁর ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী পূর্ণ করে ফেল্লেন তখন ঘড়ির কাঁটা সবে ১৩৯ মিনিট অতিক্রান্তের সঙ্কেত জানিয়েছে। দিনের শেষে ভারতের রাণ উঠলো বিনা উইকেটে ১৯০, মুস্তাক ১০৯ রাণে অপরাজিত। দলের বিপদ তখন অনেকটা কেটে গিয়েছে।

মুস্তাক আলি সেদিন যতোক্ষণ উইকেটে জীবন্ত ছিলেন ততোক্ষণ ভিজি মনে শান্তি পাননি। যদিও মুস্তাক রাণ তুলেছিলেন অকৃপণ মেজাজে। সেদিনের মুস্তাক অপরাজিত থাকায় ভিজি'র বুক-ধড়ফড়ানি কমলো। ফিরে আসতে মুস্তাককে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, অতো ব্যস্ততা কিসের? মুস্তাক বল্লেন কেন? সহজভাবেই তো খেলার নির্দেশ ছিল!

এই কাহিনীর হদিশ অবশ্য ম্যাঞ্চেস্টার মাঠের দর্শকেরা পাননি।

পেয়েছেন বিল ফার্গুসন রচিত 'মিঃ ক্রিকেট' পুস্তকের পাঠকবর্গ।

অস্ট্রেলীয় বিল ফার্গুসন ছিলেন সেবার ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের স্কোরার ও ব্যাগেজ-মাস্টার। তাঁর লেখনীতে ভারতীয় দলপতি 'ভিজি'ও এক মজার মানুষ বলে চিত্রিত হয়ে আছেন :

'ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার ক্রিকেট জগতের এক বিচিত্র চরিত্র, আরবোপন্যাসের নায়কদেরই মতো। দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে ইংলণ্ডে আসার সময় ব্যক্তিগত সাজপোষাক ও আনুষঙ্গিক সম্পদে বোঝাই ছত্রিশটি সুটকেশ এবং দু-দুটি ভৃত্য সঙ্গে নিতে ভোলেননি।

'ভৃত্য দুটির অবস্থা ছিল চব্বিশ ঘন্টাই জো হুকুম। মায় রাত্রেও তাদের মনিবকে পাহারা দিতে হতো তাঁরই শয়নকক্ষের মেঝেতে শুয়ে থেকে। ধনীর দুলাল মহারাজকুমার খেলার মধ্যে সুযোগ পেলেই ড্রেসিংরুমে ঢুকে সার্ট পালটে নতুন জামা গায়ে চড়িয়ে নিতেন। ভৃত্যদের কাজ ছিল ড্রেসিংরুমেই ইস্ত্রি করে সার্টগুলিকে মনিবের পরনের উপযোগী করে রাখা। মহারাজকুমার সময় সময় আমাকেও তাঁর পোষ্য কর্মচারী মনে করে তাঁর কোট বওয়ার ও অঙ্গাবোলার তদারকে নির্দেশ দিতেন।

'সফরের মাঝখানে মহারাজকুমার তাঁর জনকয়েক ধনী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিস বিহারে চলে যান। দলপতির এই অনুপস্থিতির জন্যে সফরকারী ভারতীয় দলকে ইংলণ্ডে অবশ্য কোন অসুবিধে বোধ করতে হয়নি। কারণ খেলোয়াড় হিসেবে ভিজির তেমন প্রতিষ্ঠাই ছিল না। তবে তাঁর গুণ ছিল বড় খেলোয়াড়দের পৃষ্ঠপোষকতা করা।'

সব শেষে টেস্ট ক্রিকেটের প্রাচীনতম মজাদার নেপথ্য কাহিনীর উল্লেখ রাখি। এই কাহিনীর উদ্ভব একেবারে শুরুতে অর্থাৎ সেই ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে যেদিন অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ণ মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের অনুষ্ঠান হয়।

সেই খেলায় অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ৪৫ রাণে। আর ইংলণ্ড হেরেছিল বিবিধ কারণে। প্রথম কারণ যাত্রাপথের ক্লান্তি, দ্বিতীয় কারণ খেলার দিনে নিয়মিত উইকেটরক্ষক এড্ পুলের অনুপস্থিতি।

অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছবার পথে লিলিহোয়াইট পরিচালিত সেই ইংলণ্ড দলের প্রতিনিধিদের পুরানো আমলের যানবাহনের অসুবিধে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের অকৃপণ আপ্যায়ন সহ্য করতে হয়। পথিমধ্যে পার্বত্য নদীর টানে তাঁদের অশ্বযান ভেসে যাওয়ায় যান উদ্ধারে ও নদী উত্তরণে জলে গা ভাসানো ছাড়া ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের গত্যন্তর ছিল না।

জলে ভিজে, জ্বর গায়ে ইংলণ্ডের জনকয়েক খেলোয়াড় যখন প্রথম টেস্ট উপলক্ষ্যে মেলবোর্ণ মাঠে নামেন তখন আবার নিয়মিত উইকেটরক্ষক এড্ পুলে অনুপস্থিত!

পুলে কোথায়? সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন ক্রাইস্টচার্চের এক কয়েদখানায়। আগের রাত্রে এক পানশালায় এম সি সি'র খেলা সম্পর্কে 'টেবল বন্ধুর' সঙ্গে বাজী ধরে তিনি এমন এক গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন যে, শেষপর্যন্ত শান্তিরক্ষকেরা এসে তাঁকে সবান্ধব উদ্ধার করে নিয়ে যায় নিজেদের আতিথিশালায়।

দীর্ঘমেয়াদী বিচার-অন্তে করকরে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা গুনে এড্ পুলে যখন মুক্তি পান তখন অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের মধ্যে দুটি টেস্ট ম্যাচই হয়ে গিয়েছে। সে বছরে আর কোন টেস্ট খেলার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং সে যাত্রায় পুলের পক্ষে ম্যাচে যোগ দেওয়া ঘটে ওঠেনি।

বেচারী এড্ পুলের ভাগ্যবিপর্যয়ে কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের ক্রীড়ানুরাগীরা সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা সংগ্রহ করে তাঁরা পরে পুলেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড উপহার দেন এবং শোভাযাত্রার মাধ্যমে পুলের উদ্দেশ্যে এক দিনের 'বীর পুজোর' আয়োজন করেন।

বিচিত্র কাহিনী! কিন্তু গল্প-কথা নয়। এ সবই বাস্তব ঘটনা। টেস্ট ক্রিকেটের গুরুগম্ভীর আয়োজনের ফাঁকিকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা ঘটেছে এবং সেই সূত্রেই টেস্ট ক্রিকেটের মেজাজ নেমেছে লঘু পর্দায়।

জাতীয় চেতনা ও ফুটবল

আরবি

আজকে যখন তরুণ-প্রবীণ এমনকি বৃদ্ধদেরও 'আমার মোহনবাগান' বলে ভাবে গদ্গদ হতে, দেখি মোহনবাগানের জেতা-হারায় আনন্দ-বেদনায় হাবুডুবু খেতে, বিস্ময় লাগে, বিরক্তিও বোধ করি। এ-দল আমার ও-দল তোমার, একমাত্র ক্লাবসদস্য ছাড়া অন্য কারো মুখে একথা কেমন ন্যাকামি বলে মনে হয়। অথচ মোহনবাগানের সঙ্গে সংস্রববিহীন লোকই শুধু নয়, অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলির সদস্যারাও কেউ কেউ মোহনবাগান সম্পর্কে ভাবালুতা দেখান। তাদের মানসিক নাবালকত্বে মনে মনে হাসি।

কিন্তু নিজের কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, মোহনবাগান জিততে পারেনি বলে আমারই মেরুদণ্ড নিঃসাড় মনে হয়েছে, বেশ খানিকক্ষণ গ্যালারির কাঠে কি ক্যালকাটা মাঠের মখমলি ঘাসে শুয়ে না থেকে পথ চলতে পারিনি। অথচ আমিও ছিলাম চার আনার গ্যালারিতে লাইন-দেওয়া দর্শক। মোহনবাগানের তাঁবুর ধারে পর্যন্ত ঘেঁষবার কোন অধিকার ছিল না আমার।

তবু আমার সেদিনকার আচরণ স্মরণ করে এতটুকু হাসি আসে না আর। নিজের বলে নয়। সেদিনের মোহনবাগান আর আজকের মোহনবাগানে আকাশ-পাতাল ফারাক বলে। মোহনবাগান আজ কলকাতার অজস্র স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে একটি মাত্র, প্রথম বিভাগ লীগের ষোলটি দলের অন্যতম। আই-এফ-এ শীল্ডের ফিক্সচারে কখনও ফাস্ট-সীডেড, কখনও সেকেণ্ড-সীডেড, সারা ভারতের ফুটবলে মস্তবড় সোরগোল। দিল্লীর ডুরান্ড কাপে ও বোম্বাই-এর রোভার্স কাপে জনতা আকর্ষণের অন্যতম সওদা। ওই সব বৈশিষ্টই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য, কিছুটা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সম্বন্ধেও। তাছাড়া শক্তিশালী ফুটবল দল হিসেবে আজকের দিনে হায়দ্রাবাদের অন্ধ্র পুলিশ, মাদ্রাজ এঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ, ই-এম-ই সেন্টার প্রভৃতি আর বেশ কয়েকটি নাম প্রায়ই শোনা যায়। তাহলে মোহনবাগানের মোহিনী শক্তি কোথায়! ওইটি নেহাতই মনগড়া বালসুলভ ভাবালুতা নয়।

আমাদের যুগে মোহনবাগান ছিল এক ও অদ্বিতীয়, নিছক একটি ফুটবল দল নয়, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকামী চেতনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মোহনবাগান ছিল জাতীয় সংগ্রামের অন্যতম মন্ত্র, অপর মন্ত্র ছিল বন্দে মাতরম্।

১৯৩৫ সালেই যে সীমারেখা টানছি, তার কারণ ওইবারেই বোঝা গেল, কলকাতা ফুটবলে ইয়োরোপীয়ান প্রাধান্য শেষ হয়ে গেছে। অনেকগুলি শক্তিশালী সামরিক ও বে-সরকারী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয়দের মুখরক্ষার দায়িত্ব এককভাবে মোহন-বাগানকেই আর বহন করতে হবে না। মোহনবাগানের জাতীয় ভূমিকা শেষ হয়েছে। রাজশক্তি তখনো ইংরেজ হলেও, তদানীন্তন বাঙলার নতুন রাষ্ট্রশক্তি মুসলিম লীগের অভ্যুদয়েরই করোলারি মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। মহামেডান স্পোর্টিং সেদিন যে উন্নতমানের ক্রীড়াকৌশলে দিগ্বিজয় করেছিল, তাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করবার আমার ইচ্ছা নেই। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতে বৃটিশ ফুটবলের মান পড়ে যাওয়ার সুযোগেই মহামেডান স্পোর্টিং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

কলকাতা ফুটবলে ভেঙেপড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শূন্য সিংহাসন দখল করে মহামেডান স্পোর্টিং যতই আত্মপ্রসাদ বোধ করে থাকুক, আমরা জানতাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত শক্তির দিনগুলিতে তাদের বিরুদ্ধে অজস্র অসুবিধা সত্ত্বেও যে তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছে মোহনবাগান, তাতেই মোহনবাগান সার্থক। মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে মহারাণা অমর সিংহের বিলাসজীবন নয়, রাজ্যহীন রাজধানীবিহীন, ঘাসের রুটি খেয়ে পর্বতের কন্দরে কন্দরে ঘুরেই মুঘল-শক্তিতাড়িত প্রতাপসিংহের বীরসত্তা সার্থক হয়েছিল।

মোহনবাগানের এই গৌরবের দিনগুলিতে তারা একবারও লীগ বা শীল্ড জেতেনি। তবু বৃটিশ ফুটবলার-দের জন্য সুরক্ষিত রোভার্স কাপ ও একান্তভাবে বৃটিশ ফৌজীদলগুলির জন্য অনুষ্ঠিত সিমলার ডুরান্ড কাপে সাদরে ডেকে নিয়ে যেতে হয়েছিল মোহনবাগানকে, যার ফলে ভারতের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয়-বিরোধী অ্যাপার্থিয়েডের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছিল চিরদিনের জন্য।

ইংরেজদের বুটপায়ে ফুটবলের বিরুদ্ধে ভিজেমাঠে মোহনবাগানের নাঙ্গাপায়া-ফুটবল নাকাল হয়েছে; বৃটিশ-কবলিত আই-এফ-এর পরিচালনায় শ্বেতাঙ্গ রেফারি লাইনসম্যান ম্যাচ খেলিয়েছে, ক্যালকাটা টেন্টের ধারে নেটিভরা ঘেঁষতে পারেনি। তবু শুকনো মাঠ পেলে প্রবলতম বৃটিশ প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত হেরেছেই বেশি বার, কিন্তু সামান্যতম গোলের ব্যবধানে, আর সে গোলও সব সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না; তার সমর্থনে একমাত্র যুক্তি ছিল 'রেফারিজ ডিসীশান ইজ ফাইনাল'। এবং ফাইনাল বলেই তো মোহনবাগানের গোল দেওয়ার প্রচেষ্টাগুলিকে নির্লজ্জের মত ব্যর্থ করে দিতে বাধতো না রেফারির।

দর্শক হিসেবে আমাদের কি-ই বা করণীয় ছিল! শুকনো মাঠে মোহন-বাগানের সঙ্গে খেলায় ক্যালকাটার ভীতির জন্য যেদিন রেফারি সি আর ক্লেটন বেশি ভিড়ের অজুহাতে খেলা শুরুই করাল না, সেদিন গ্যালারিতে আগুন ধরিয়েছিলাম আমরা। ড্যাল-হৌসির বিরুদ্ধে খেলায় রেফারিং-এর প্রতিবাদে মাঠে নেমে পড়ে খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। স্বয়ং গোষ্ঠ পালের নেতৃত্বে মোহনবাগান মাঠের মধ্যে বল স্পর্শ না করেও বিপক্ষদল ক্যালকাটাকে

শিবদাস ভাদুড়ী

নিরুপদ্রবে খেলতে দিয়ে সত্যাগ্রহ করেছিল।

কিন্তু যেদিন বৃটিশরাজের শক্তির দম্ভে গান্ধীজী কারারুদ্ধ, তরুণ বীরের দল জেলে পচছে, কি ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, সেদিন আমাদেরও দমননীতির রোলার চালিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়েছে। গোষ্ঠ পালকে তীব্র তিরস্কার করার ধৃষ্টতাও আমাদের নির্বিবাদে মেনে নিতে হয়েছে।

একান্ত নির্বিবাদে অবশ্য কোনদিনই মানিনি। বলাইদা যেদিন ক্যালকাটার ডেনয়-এর টেংরিটা কটাশ করে ভেঙে দিলে, সেই মুহূর্তে আমরা পাশবিক উল্লাস করেছি, শুধু ক্যালকাটা বা আই-এফ-এ'র বিরুদ্ধে আক্রোশ তৃপ্তিরই কথা নয়, ক্ষুদিরাম থেকে যত বাঙালীর ছেলেকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে ইংরেজ সবার যেন প্রতিশোধ নিয়েছে বলাইদা। তারপর সামাদ যখন মাঠে নাগর নাচ নাচিয়েছে এগারটা শাদা চামড়াকে, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমরা নেটিভ কেরাণীর জাত গ্যালারিতে বসে গলা ফাটিয়ে বাপান্ত ও শাপান্ত করেছি রাজার জাত, গোরার জাত ও বড়সাহেবের জাতভাইকে, কে জানে খেলোয়াড় দলে গ্যালারিতে-বসা কতজন দর্শকের বড়সাহেবও ছিল কিনা।

আর গোষ্ঠ পালকে কে না চেনে? বাঙলাভাষাভাষী একজনও সেদিন সারা দুনিয়ায় ছিল না, যে কিনা এককথায় পাল বলতে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেনি। আর কলকাতার ইংরেজরা তো রীতিমত ভয় করেছে ওই নামটিকে। ভারতীয় ফুটবলে বুট প্রবর্তনের সময় কর্তৃপক্ষ যখন সাফাই গাইলেন, শুধু পায়ের ব্যাক বুটপরা ফরোয়ার্ডদের আক্রমণের মুখে স্বভাবতই ভয় পেয়ে থাকে, গোষ্ঠবাবু হেসে বলেছিলেন, কি জানি ভাই, আমি তো কখনো ভয় পাইনি, বরং ওরাই চিরদিন আমাকে ভয় করেছে। ওরা বলতো চাইনীজওয়াল্, গুরু দুখীরাম বলতেন মত্ত সিংহ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

বুটবলের সমর্থনে নন্দপদ সেণ্টার-ফরোয়ার্ডের শুটিং-এর দুর্বলতাও উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, শুধু পায়ের শটে বার ভেঙেছিলেন অভিলাষ ঘোষ, গোল ও গোলকীপার কাঁপতো শরৎ সিংহ, মোনা দত্তর শটে। এতটুকু বেঁটে রবি গাঙ্গুলীর মশার কামড়ে বিরাট বুনো মোষ ম্যাগননির বিব্রত হওয়ার কথা আজও স্মৃতিপটে জ্বল-জ্বল করে। কুমার দি উইজার্ড আজ স্বপ্নকথা, হেড না দিয়ে, গায়ে গা না ঠেকিয়ে কোন ফরোয়ার্ড বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ নয়ছয় করে দিচ্ছে শুনলে ওরা আজ বলে রূপকথা।

ইদানীং মোহনবাগানের ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত ২৯শে জুলাই তারিখটিকে 'জাতীয় ফুটবল দিবস' বলে পালিত হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এই দিনটিতে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ে আমাদের ফুটবলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল। চারদিকে বিধিনিষেধের হাজারো লোহ-বেষ্টনীতে হাফিয়ে-ওঠা পরাজিত ক্ষুব্ধজীবনে একমাত্র ফুটবল মাঠেই তো ইংরেজদের একহাত নেওয়ার সুযোগ ছিল আমাদের। মোহনবাগান একহাত নিত খেলার মাঠে সমানে সমানে লড়াই করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেরে গেলেও কখনও-সখনও হারিয়ে দিয়ে। আর গ্যালারিতে বসে গরীব নেটিভের দল আমরাও একহাত নিতাম গলাবাজি করে, সেখানে আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ওই সময়টুকুতে আমাদের গলা ও ভাষার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা চলতো না।

ক্রমে মোহনবাগানের আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে নামটিই মন্ত্র হয়ে উঠলো দেশময়, ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যে সংগ্রামে আমরা অংশ গ্রহণ করতে পারতাম না, সেই সংগ্রামেরই একমাত্র বিকল্প ও প্রতীক ফুটবলে ইংরেজদের সঙ্গে সমানে সমানে সংগ্রাম করায় আমাদের একমাত্র বাহিনী ছিল মোহনবাগান।

শুধু তাই নয়। ওরা যতই চেষ্টা করুক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আমাদের হীনতা প্রতিষ্ঠা করতে, ব্যাপকভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ করার প্রয়াস আমরা করতে পারতাম শুধু ফুটবল মাঠে। মোহনবাগানকে দিয়েই আমরা প্রতিনিয়ত বছরের পর বছর প্রমাণ করেছি, জীবনের অন্তত একটি ক্ষেত্রে এবং সে ক্ষেত্র একান্তভাবে তোমাদেরই নিজস্ব—সেখানে আমরা তোমাদের সমান না হলেও ছোট নই।

নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে শুকনো মাঠের খেলাকে তোমরা বর্ষা ঋতুতে চালু করে ভিজে মাঠে পেয়ে যতই হারাও আমাদের নগ্নপদবিহারী খেলোয়াড়দের, শুকনো মাঠ পেলে আমরা ছেড়ে কথা কই না।

বিজয়দাস ভাদুড়ী

প্রথম বছর প্রথম বিভাগে উঠেই সেরা টিম মিডলসেক্স-এর বিরুদ্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল দিয়েছিল মোহনবাগান। তারপর প্রবল বর্ষণ নেমে এল, তারই মধ্যে গোল শোধ করে পরে জবজবে মাঠে আরো তিনটি দিয়ে দিল মিডলসেক্স এবং শেষপর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়নও হল ওরাই। যে ক্যালকাটা ছিল কলকাতার ফুটবল ব্রজে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, সেই ক্যালকাটাকে প্রথম সাক্ষাতে গিন্টোফিল্ট প্রতিযোগিতায় (১৯০৭) হারিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান। অথচ তখন লীগে শীল্ডে ক্যালকাটার অতুলনীয় রেকর্ড। ১৯১২ সালের শীল্ড খেলায় দু'দলের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, রেফারির বাঁশি বেসুরো বাজায় ৩—২ গোলে জেতা খেলা ১—২ গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। ১৯১৪ সালে সরকারী চ্যারিটির জন্য বিশেষ খেলায় নির্গোল ড্র করলে ক্যালকাটা-মোহনবাগান। পরের বছর প্রথম বিভাগ লীগে ওঠা থেকে প্রতি বছরই বড়সাহেবদের লাল-শাদা জামার সঙ্গে দুবার করে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

প্রথম লীগ খেলায় সেণ্টার হাফ রাজেন সেন এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাস ঘোষ ও শরৎ সিংহের অনুপস্থিতিতে গোর ঘোষকে সেণ্টার-হাফ নিয়ে শিবদাস ভাদুড়ীকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলিয়ে অপরাজিত রইল মোহনবাগান। ফিরতি খেলায় সেই যে ক্যালকাটার এক গোলের জয়, তাই কায়েম হয়ে থাকলেও, ১৯২৩ সালে লীগ-শীল্ডের জোড়ামুকুট মাথায় তুলেও মোহনবাগানের কাছে হারতে হয়েছিল ক্যালকাটাকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে। তিন বছর বাদে ১৯২৬ সালে সারা লীগে ক্যালকাটার একটিমাত্র পরাজয় মোহনবাগানের হাতে। যে নর্থ স্টাফোর্ড তৃতীয় দশকে কলকাতার লীগের সবচেয়ে শক্তিশালী গোরা দল, প্লে-অফে ক্যালকাটাকে হারিয়ে যারা লীগ চ্যাম্পি-

ম্লান হল তাদেরও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল যোগ্যতর দল মোহনবাগানের কাছে। প্রসঙ্গত বলছি, সেই খেলার রিপোর্টে স্টেটসম্যান কলকাতায় অবিলম্বে ফুটবল স্টেডিয়াম হওয়ার দাবি জানিয়েছিল. আজও সে দাবি অপূর্ণ। তবে আজ আর কেউ দাবি করে না, সবাই চূড়ান্ত নৈরাশ্যে ধরে নিয়েছে, ও হবার নয়।

ড্যালহৌসী ছিল চিরকাল মোহনবাগানের বগি টিম, তবু শীল্ড-বিজয়ী ড্যালহৌসীর পুরো দলকে ৬—১ গোলে হারিয়ে চুঁচুড়ায় গ্ল্যাডস্টোন কাপ জিতেছিল মোহনবাগান ১৯০৫ সালে। অথচ খেলতে যাবার সময় ট্রেণে ড্যালহৌসীর সাতজন খেলোয়াড়কে দেখে যখন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারি শৈলেন বসু বাকি খেলোয়াড়দের খবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন সহজ ভদ্রতার বশে, দম্ভভরে ওরা উত্তর করেছিল, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে সাতজনই যথেষ্ট। ১৯২৫ সালে প্রবল বর্ষণের মধ্যে ২—১ গোলে ড্যালহৌসীকে হারিয়েছিল মোহনবাগান একেবারে প্রথম দিকের খেলায়; অথচ ড্যালহৌসী আগের বছর গোল অ্যাভারেজে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও রাণার্সআপ হারিয়েছিল ক্যামেরনস ও সাউথ ওয়েলস বর্ডারার্স-এর কাছে।

পঁচিশ সালে লীগ তো এসেই গিয়েছিল হাতের মুঠোয়। অথচ ভাঙা দল। গোষ্ঠবাবু নিয়মিত খেলতে পারছেন না; আর দাস আর জাফর আলি ব্যাক, ফরোয়ার্ডে শ্যাম পার্কেকেলা ক্লাব কর্ণোয়ালিস-এর খোকা মুখার্জি, বুড়ো হাবুল সরকার, অজ্ঞাতনামা করালী পাঠক, কুমারবাবু ও ক্ষেত্র বোস। সেই দল নিয়েই প্রায় অসাধ্যসাধন, দশ বছরের স্বপ্ন বুঝি সফল হয়! ক্যালকাটা ১৬টা খেলায় ২২ পয়েন্ট করে লীগ টেবল-এর মাথায়, মোহনবাগানের ১৫টা খেলে ২১ পয়েন্ট। একটা মাত্র খেলা বাকী, রেঞ্জার্স-এর সঙ্গে। আরে ছোঃ রেঞ্জার্স; বছরের পর বছর শুধু রেলিগেশান ঠেকিয়ে চলেছে, আগের ম্যাচে সাত গোল খেয়েছে, তাকে আবার ভয়। লীগের কাপ তো ঘরে উঠে গেছে।

তবু ঠোঁটে-ঠেকানো কাপ পড়ে গেল পানীয় মুখে ঢালবার আগের মুহূর্তে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গোরাদল ডারহামস যে শীল্ড খেলতে এসেছে, তাদের তিনজন নক্ষত্রমার্কা ফরোয়ার্ড খেললে রেঞ্জার্স-এর পক্ষে। সে যুগের আইনে কোন বাধা হল না। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি, দু গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। অথচ সাতাশ সালে প্রবল শক্তিশালী চ্যাম্পিয়ান দল নর্থ স্টাফোর্ডসকে চারদিনের একটানা বৃষ্টি-ভেজা মাঠে ২-২ ড্র করালে।

প্রথম বছর রোভার্স-এ আমন্ত্রিত হয়ে রাণার্স-আপ, প্রথম বছর ডুরান্ড খেলার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে সেমি-ফাইনালে শেরউড ফরেস্টার্স-এর কাছে রেফারির বিরূপতায় ১-২ গোলে বিদায়। দারুণ খ্যাতি নিয়ে পর পর তিন বারের ডুরান্ড বিজয়ী ইয়র্কস অ্যান্ড ল্যাঙ্কস এল শীল্ড খেলাতে, প্রথম রাউন্ডেই বিদায়, শুকনো মাঠে ছ গোল দিয়ে দিল মোহনবাগান।

এমনি কত গৌরবের দিন! বুক আমাদের গর্বে ফুলে উঠেছে। শুধু জিতেছে বলে নয়, ভালো খেলেছে বলে মোহনবাগান। জয়লাভের পথে সেদিন হাজার অন্তরায় ছিল, তাই জেতাকে বড় করে দেখিনি আমরা, কিন্তু ভালো খেলতে না পারলে মরমে মরে যেতাম, আর মানুষ তো যন্ত্র নয় যে নিত্য একই খেলা খেলবে। মোহনবাগানের বীরত্ব সেদিন ছিল পরাধীন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রয়াস।

১৯১১ সালে শীল্ডে বিজয়ের পর ১৯৩৯ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ। তারপর লীগ, শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স সব মিলে মিশে ছয়লাপ। কিন্তু আজকের জয় তো জোলো, রামা আর শ্যামা, একজন তো পাবেই জয়মুকুট। হোম থেকে আসা নতুন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত প্রতি বছরই অজ্ঞাতশক্তি ক্যালকাটা ড্যালহৌসি, আর দুবছর অন্তর দুটি করে নতুন ফৌজী দল এই নিয়ে যে লীগ খেলা তা শেষ হয়ে গেছে ১৯৩৯-এর আগেই। কোথায় কায়রো, কোথায় কোয়েটা, কোথায় থার্টুম থেকে মিলিটারী দল আসে না আজ শীল্ড খেলতে। লীগ আজ বালি-হাওড়া মার্কাস স্কোয়ার দলের সঙ্গে পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়ার লুকোচুরি খেলা। শীল্ডের চ্যালেঞ্জার পাটনা, দিল্লী, কটক, বড়জোর মাটিতে পা-রাখতে-অস্বস্তি-বোধ-করা ভারতীয় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। বাঘ শিকারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও হার-না-মানা মোহনবাগান আজ শেয়াল, খরগোশ শিকারে থলেভরে সার্থকতায় মশগুল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের শীল্ড বিজয় একবারই হয়েছিল, সেই ১৯১১ সালে। ম্যারাথনের যুদ্ধে বিজয়ী এথেনীয়ানদের যেমন তাদের ভাগ্যদেবতা সেদিন ললাটে অদৃশ্য তিলক এঁকে দিয়ে বলেছিলেন—যাও, তোমাদের সমৃদ্ধি হোক। ১৯১১ সালের ২৯এ জুলাই জনতার ভিড় থেকে এগিয়ে-আসা এক ব্রাহ্মণ সুধীর চ্যাটার্জিকে বলেছিলেন কেল্লায় পতপত করে ওড়া ইউনিয়ন জ্যাক-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, ওটা জিতবে কবে? সেটা যে আজ আমরা পেয়ে গেছি ১৯১১-র শীল্ডবিজয়-সৃষ্ট জাতীয় আত্মবিশ্বাস তাতে অনেকখানি কাজ করেছিল। তারপর যতবারই যে শীল্ড পাক, তা হল শীল্ড পাওয়া, জয় একবারই হয়। হিলারি-তেনজিং কর্তৃক মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ের পর কতলোকেই তো উঠবে সে চূড়ায়!

১৯১১ সাল মোহনবাগানের সার্থকতার মাউন্ট এভারেস্ট; শতাব্দীর মোড় ঘোরা থেকে এক পা এক পা করে যেভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে মোহনবাগান ফুটবলের ক্ষেত্রে, অর্জন করেছে আত্মপ্রত্যয়, তারই সার্থক পরিণতি। কিন্তু সারাদেশ জুড়ে ফুটবলের প্লাবন, মোহনবাগানের ভিতর দিয়ে জাতীয় চেতনার পাষাণকারা ভেঙে অগ্রসর হওয়া আপামর সাধারণে, ১৯১১তে তার শুরু।

তবু ১৯০৮ সালে আই-এফ-এ শীল্ড খেলতে প্রথম আমন্ত্রিত হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে যখন গর্ডন হাইল্যান্ডার্স-এর কাছে হেরেছিল মোহনবাগান, "বামন হয়ে চাঁদে হাত" বলে শ্লেষাত্মক রসের ছড়া ছেপে বিলোন হয়েছিল।

আত্মগ্লানির পঙ্কে ডুবে আমরা যে বৃটিশদের তুলনায় নিজেদের বামন ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, সেই মনোভাবকে এক ধাক্কায় গুঁড়ো করে মাত্র তিন বছর বাদে মোহনবাগান জাতীয় ইতিহাসে যে অধ্যায় রচনা করেছিল, তার গুরুত্ব আজও কেউ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। স্বাধীন ভারত, বিশ্বের দরবারে সম্মানিত ভারত, লিঙ্কন-রুজভেল্ট-এর সমান মনীষী নেহরুর নেতৃত্বে চালিত ভারত, রুশ-আমেরিকা যার সঙ্গে মিতালি রক্ষা করতে ব্যগ্র সেই ভারতের নাগরিক কেমন করে উপলব্ধি করবে, ক্ষুদিরাম থেকে মাতঙ্গিনী হাজরার যুগ পর্যন্ত তরুণ মনের তীব্রতা? আজ বছরের পর বছর লীগ-শীল্ডের যুগ্ম-মুকুটে অভ্যস্ত মোহনবাগানের সমর্থকরাই বা কেমন করে বুঝবে, ক্যালকাটাকে হারানোর থ্রিল। সে থ্রিল আসতো জাতীয় চেতনার গভীর থেকে। ইষ্ট বেঙ্গলকে হারানোর মত নকল বিভেদ জাগিয়ে রেখে আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না তার। সেদিনের তারুণ্য আজ চূড়ান্ত ঈর্ষার বস্তু।

ক্রিকেট ও এম সি সি

ক্ষেত্রনাথ রায়

ক্রিকেট খেলায় ইংরেজদের জাত্যাভিমান ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ কাল ধরে ইংরেজ জাতি মাতৃস্নেহে ক্রিকেট খেলাকে লালন-পালন ক'রে মানুষ করেছে। ক্রিকেট খেলার সেই আদিম বর্বর রূপ আর নেই। রূপে-গুণে সমৃদ্ধ ক্রিকেট খেলার আজ যে চেহারা আমরা দেখি, আদিম চেহারার সঙ্গে তার প্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ বলা যায়। ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা এবং তাদেরই চেষ্টায় ক্রিকেট আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছে—শুধু এই থেকেই ক্রিকেট খেলার সার্থক জীবনের বড় পরিচয় নয়। ক্রিকেট খেলার আসন আরও উঁচুতে এবং ক্রিকেট নিছক খেলার পর্যায়ে পড়ে না। ইংরেজ জাতির শিক্ষা, জাতীয় চরিত্র এবং কৃষ্টি-সভ্যতা সার্থক রূপ ধারন করেছে এই ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে। ইংরেজি সাহিত্যে ক্রিকেট খেলা অবলম্বন ক'রে বহু সরস রচনা এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে 'ক্রিকেট-সাহিত্য' একটি সার্থক অবদান। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে অত্যন্ত বেরসিকও এই সাহিত্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রচুর রসোপলব্ধি করবেন।

বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশগুলিতে ক্রিকেট খেলার প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশী। কিন্তু শুনে আশ্চর্য লাগে, ক্রিকেট খেলার জন্মস্থান এই দেশগুলিতে নয়, এমন কি যে ক্রিকেট খেলা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের এত মাতামাতি এবং জাত্যাভিমান সেখানেও নয়। প্রাচীন ইংরেজি অভিধানে 'ক্রিকেট'এর যে ব্যাখ্যা আছে তার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার কোন সম্পর্ক নেই। ইংল্যাণ্ডের 'bowl' খেলায় দাগ দেওয়ার জন্যে ছড়ির (stick) প্রয়োজন হ'ত। এই ছড়িকেই (stick) বলা হ'ত 'ক্রিকেট'। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী ভাষার অভিধানে 'criquet' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এবং এই শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে খেলার বর্ণনা ছিল। ফরাসী ভাষায় এই শব্দের উচ্চারণ ছিল 'krick-Kay'। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের G. Florio রচিত 'ইটালিয়ান-ইংলিস' অভিধানে 'ক্রিকেট' শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে খেলার উল্লেখ করা হয়। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ম্যাথিউ রচিত একটি ল্যাটিন কবিতায় ক্রিকেট খেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রায় ২৫০ বছর আগে সাসেক্সের (ইংলণ্ড) ইস্ট হোয়াথলীর জনৈক মিসেস মেরী টার্নার তাঁর পুত্রকে যে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর স্বামীর ক্রিকেট খেলার গুণ বর্ণনা দিয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে ইংল্যাণ্ডে 'ক্যাট এ্যাণ্ড ডগ্' এবং 'হ্যাণ্ড ইন্ এ্যাণ্ড হ্যাণ্ড আউট' নামে একই খেলা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে এই ভিন্ন নামের খেলাগুলি 'ক্রিকেট' নাম ধারণ করে। ১৫৫০

ডবলউ. জি. গ্রেস
আধুনিক কালের ইংলিস ক্রিকেট খেলার 'জনক'!

খৃষ্টাব্দে রাসেল রচিত 'হিসট্রি অব্ গিলফোর্ড' গ্রন্থে সর্বপ্রথম খেলা হিসাবে ক্রিকেটের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রিকেট খেলার সমগোত্রস্থানীয় খেলার উল্লেখ ভিন্ন নামে ভিন্ন দেশেও পাওয়া যায়। যেমন পারস্যের প্রাচীন 'Chowgan-Guin' খেলা। এই খেলার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনকালের ক্রিকেট খেলার অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। পারস্য দেশে যে সময়ে এই খেলাটি সুপ্রচলিত ছিল, ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট বা তার স্বগোত্র-স্থানীয় কোন খেলার প্রচলন তখনও হয়নি। অনেক ঐতিহাসিকের মতে পারস্যের এই খেলাটিই ইংল্যাণ্ডের আধুনিককালের ক্রিকেট খেলার পূর্ব-পুরুষ। ইংল্যাণ্ডের জল-বায়ুতে এবং ইংল্যাণ্ডের লোকের রুচিতে সংশোধিত হয়ে 'ক্রিকেট' নামে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের 'গুলি-ডাং' খেলার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার রক্তের নিকট সম্পর্ক কল্পনা করা একেবারে অবাস্তব হবে না। দুটি খেলার উদ্দেশ্য একই—নিক্ষিপ্ত বস্তুকে আঘাত ক'রে দূরে পাঠানো। গুলি-ডাং খেলায় ডাং দিয়ে গুলিকে মারা হয়, ক্রিকেট খেলার ব্যাট দিয়ে বলকে। একসময়ে ক্রিকেট খেলায় উইকেটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। গুলি-ডাং খেলার মতই মাটিতে
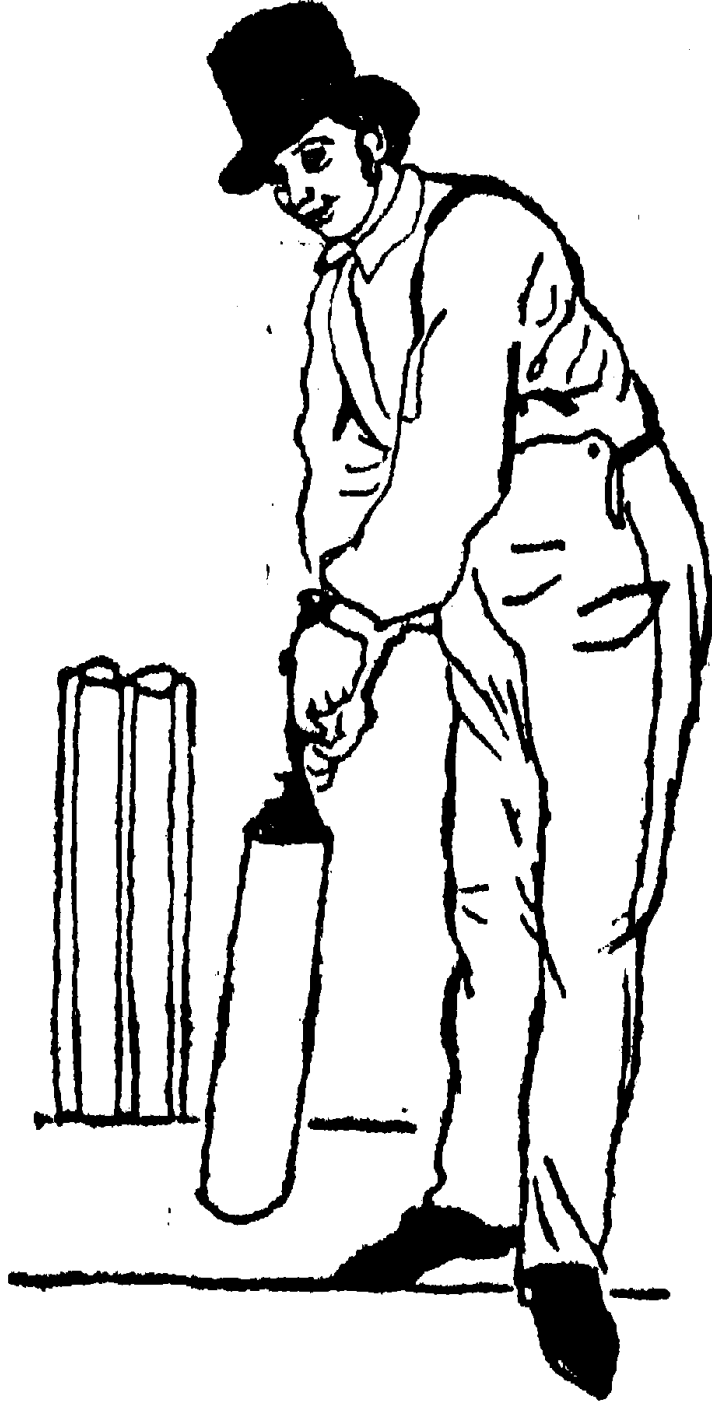
সেকালের ব্যাটসম্যান

গাব্বুর (গর্ত্ত) প্রচলন ছিল। ক্রিকেট খেলায় শূন্যের বল লুফে যে ফল, গুলি-ডাং খেলাতেও গুলি লুফে একই ফল—খেলোয়াড়কে খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। এক সময়ে ক্রিকেট ব্যাট ডাং-এর থেকে খুব সুপুরুষ ছিল না। এমনি ধরণের এক তুলনামূলক আলোচনা পড়েছিলাম কোন বিশিষ্ট ইংরেজি সংবাদপত্রে ইংরেজ লেখকের কলমে। ইংরেজ-লেখক আলোচনায় গুলি-ডাং খেলাকে অপাঙক্তেয় করেননি। এই খেলায় উন্নত-মানের ক্রীড়া-চাতুর্য প্রকাশের যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তার উল্লেখ করেছিলেন।

এই রকম সম্ভাবনার কথা ভেবেই ভারতবর্ষে অবস্থানকারী বৃটিশ রেজিমেণ্ট দলের জনৈক বড়কর্তা ছুটি উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন 'পুণা' খেলার সাজসরঞ্জাম ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দীর্ঘদিনের ছুটি এই খেলার মধ্যে ডুবে কাটিয়ে দেবেন। তাঁর বাসভবন 'ব্যাডমিণ্টন কোর্টে' একদিন চা-পানের নিমন্ত্রণে তিনি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান জানান এবং তাঁদের উপস্থিতিতে সপরিবারে 'পুণা' খেলার কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সকলেরই চোখে প্রাচীন ভারতীয় খেলাটি প্রশংসালাভ করে। 'ব্যাডমিণ্টন কোর্ট' বাসভবনে খেলাটি সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুণ উপস্থিত সকলেই সেই দিনই খেলাটির নতুন নাম দিলেন 'ব্যাডমিণ্টন'। ভারতীয় 'পুণা' খেলা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলো এবং ধর্মীয় নাম নিল 'ব্যাডমিণ্টন'—যে খেলা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে গরীয়ান।

ঠিক এইভাবেই ক্রিকেট খেলার পূর্বপুরুষ একদিন ইংল্যাণ্ডে এসে-ছিল এরকম অনুমান করা অবাস্তব হবে না। কয়েকটি ঘটনা থেকে এ অনুমান সমর্থন লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের যে খেলা পরবর্তী-কালে ক্রিকেট নাম ধারণ করে সেই খেলাই একদিন ইংল্যাণ্ডের রাজ-রোষানলে ভস্মীভূত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ক্রিকেট খেলার সেই আদি-পুরুষের জনপ্রিয়তায় ইংল্যাণ্ডের নৃপতিকুল দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। দেশের যুব-সম্প্রদায় ধনুর্বিদ্যা এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় বিমুখ—সৈন্য বিভাগে নতুন লোক পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। দেশের যুব-সম্প্রদায় ক্রিকেট খেলার সেই আদি পুরুষের মোহে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা বর্জন করেছে। সেই যুগে রাজকীয় বাহিনীতে দেশরক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল তীর-ন্দাজ বাহিনী।

১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড খেলা অবৈধ ঘোষণা না ক'রে শুধু দেশের লোককে সতর্ক ক'রে দেন। এই ঘোষণার ফলে অনেক খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে দিয়ে ভাল মানুষ সেজে গেল, কিন্তু খেলার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পেল না। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড ১৪৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কঠোর হস্তে এই খেলা উচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি এই খেলা অবৈধ ঘোষণা করলেন এবং রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, খেলো-য়াড়দের পক্ষে দু' বছর কারাদণ্ড এবং ৫০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড। জমির মালিকরাও ছাড়ান পেলেন না। জমির উপর খেলবার অনুমতি দেওয়ার জন্যে তিন বছর জেল এবং ১০০ পাউণ্ড অর্থদণ্ডের বিধান দেওয়া হ'ল। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে এই খেলাটি প্রায় নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাঁর পরবর্তীকালের রাজাদের আমলেও এই খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল কিন্তু তাঁরা এই খেলা সম্পর্কে অনেক উদার ছিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই খেলাটির উপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

রাজ-আদালত ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিলেন,—

"It (cricket) is a very manly game, not bad in itself, but only bad in the ill use made of it by wagering more than ten pounds on it, wagering being bad and against the law."

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্যান বিজয়ের অনেক অনেক বছর আগেও ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট

সেকালের ক্রিকেট ব্যাট

খেলার প্রচলন ছিল। তাঁদের যুক্তি, কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রিকেট খেলার চেহারা কত রকমে বদলে গেছে কিন্তু পীচের দৈর্ঘ্য আগের সেই ২২ গজই (yards) থেকে গেছে। সাক্সনরা জমির মাপের জন্যে যে 'চেন' ব্যবহার করতো তারই মাপ ছিল ২২ গজ ক'রে।

আজ আমরা যে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে পরিচিত তারই একটা আদিম রূপ ছিল মধ্যযুগের ক্রিকেট খেলায়। খেলায় কোন স্টাম্পের বালাই ছিল না। তার পরিবর্তে পীচের দু'দিকের শেষ প্রান্তে গর্ত থাকতো। খেলায় 'ক্যাচ' এবং 'রান-আউট' ছিল। ব্যাটসম্যান প্রয়োজনমত বলের পিছনে দৌড় দিয়ে বল মারতো। ক্রিকেট ব্যাটের আকার ছিল অনেকটা হকি স্টিকের মত। ব্যাটের বাঁকা অংশটা চ্যাপটা এবং ভারী ক'রে তৈরী করা হ'ত। এই ভারী অংশ দিয়েই বল মারার প্রচলন ছিল। বোলাররা 'আন্ডার আর্ম' বল দিত। অনেক বছর পর পীচের শেষ প্রান্তে একটা ক'রে স্টাম্প প্রথম দেখা দেয়। তারপর দু'টো ক'রে এবং তাদের মাথায় দু'টো বেল ৪½ ইঞ্চি ক'রে। মধ্যে ফাঁক থাকতো দু' ফিট। এই বিরাট ফাঁক দিয়ে বল কতবার ছুটে গেছে, ব্যাটসম্যান নির্ভয়ে খেলে গেছে, আউট হওয়ার দুর্ভাবনা কমই ছিল। বর্তমানে আমরা দেখছি তিনটে স্টাম্প, উচ্চতা ২৮ ইঞ্চি, উইকেটের প্রস্থ ৯ ইঞ্চি এবং মাথায় দু'টো বেল ৪½ ইঞ্চি ক'রে।

ব্যাটের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সম্বন্ধে আগে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাটের প্রস্থ ৪½ ইঞ্চি বেঁধে দেওয়া হয় এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৮ ইঞ্চিতে। আগের দিনে ভারী ওজনের ব্যাট খেলোয়াড়রা পছন্দ করতেন; ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ৪ পাউন্ড ২ আউন্স ওজনের ব্যাট দিয়ে এক ইনিংসে ২৭৮ রান তুলেছিলেন। এখন প্রমাণ সাইজ ব্যাটের ওজন প্রাধারণতঃ ২ পাউন্ড ৩ আউন্স।

আগের দিনের ক্রিকেট খেলায় প্যাডের ব্যবহার ছিল না। বল লেগে হাত-পা খুবই জখম হ'ত কিন্তু সে দিকে খেলোয়াড়দের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আনুমানিক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রবিনসন নামে একজন খেলোয়াড় সর্বপ্রথম পায়ে মোটা কাগজের বোর্ড লাগিয়ে মাঠে খেলতে নামেন। তাঁর এই অঙ্গসজ্জা দেখে সারা মাঠের লোক হেসে গড়াগড়ি খায়। ক্রিকেট খেলার 'এল-বি-ডবলউ' আইন সম্পর্কে আম্পায়ারের মতের সঙ্গে খেলোয়াড়রা বা দর্শকরা খুব কম সময়েই একমত হ'তে পারেন। 'How's that' সিংহনাদে দলের ক্যাপটেন সমেত এগারজন খেলোয়াড়ই মাঠ কাঁপিয়েছে কিন্তু আম্পায়ার 'আউট' হওয়ার সংকেত দেন নি। ক্রিকেট খেলার এই এল-বি-ডবলউ আইনটি খুবই জটিল ব্যাপার: সব লোকের মাথায় ঢুকে না। মনে হয় যেন জ্যামিতির উপসর্গ। এই আইনের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের খেলায়। পরবর্তী-

...রে এই আইনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ক্রিকেট খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন ছিল না। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে লন্ডন ক্লাবই সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলার আইন রচনা করে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে ক্রিকেট খেলার এই আইন এম সি সি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করে। এরপরও আইনের কিছু কিছু সংশোধন হয়েছে।

ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এম সি সি'র আবির্ভাব একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের সভ্যরা লর্ড টমাস প্রতিষ্ঠিত ৩য় লর্ড'স মাঠে মেরীলিবোণ ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের সংক্ষিপ্ত নামই এম সি সি। প্রায় দু'শত বছরের বেশী আগে ইংল্যান্ডের আর্টি-লারী গ্রাউন্ডে আর্টিলারী গ্রাউন্ড ক্লাব নামে একটি ছোট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই ক্লাবটি ঐ মাঠ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মাঠ পরিবর্তনের সংগে ক্লাবের নামেরও পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ হয় হোয়াইট কনডুইট ক্লাব। এই হোয়াইট কনডুইট ক্লাব থেকেই

১৮১১ খৃষ্টাব্দের ক্রিকেট খেলায় মেয়েদের যোগদান

মেরীলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের জন্ম। এম সি সি'র সংগে লর্ড'স মাঠের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লর্ড টমাস নামে ক্রিকেট খেলার একজন অনুরাগী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ডর্সেট স্কোয়ারে ক্রিকেট খেলার একটি মাঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারেই মাঠের নাম রাখা হয় লর্ড'স গ্রাউন্ড। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড টমাস নর্থ ব্যাংকে তাঁর মাঠ সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু এ অঞ্চলেও তাঁর মাঠটি তিনি চিরস্থায়ী রাখতে পারলেন না। রিজেন্ট ক্যানেল খননের ফলে তাঁকে মাঠ সরিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল বর্তমান স্থানে। এই অঞ্চলে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় লর্ড'স মাঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মাঠ পরিবর্তনের প্রতি ক্ষেত্রেই লর্ড টমাস প্রথম লর্ড'স মাঠের তৃণাচ্ছাদিত জমিও স্থানান্তরিত ক'রেছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম সি সি তৃতীয় লর্ড'স মাঠের মালিকানা লাভ করে।

সেকালের ক্রিকেট খেলার দৃশ্য

ক্রিকেট খেলার সংগে এম সি সি'র অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ব্যাট-বল বাদ দিয়ে যেমন ক্রিকেট খেলার কল্পনা করা যায় না তেমনি এম সি সি'কে বাদ দিয়ে ক্রিকেট প্রসংগ আলোচনা করা অসম্ভব ব্যাপার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় এম-সি-সি-র মর্যাদা একচ্ছত্র সম্রাটের সমান। ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনে কোন পরিবর্তন অথবা কোন কিছু সংযোজনা করার একমাত্র ক্ষমতা এই এম-সি-সি কর্তৃপক্ষের। এক কথায় আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে এম-সি-সি প্রতিষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে সুপ্রীম কোর্ট বলা যায়। এই এম-সি-সিই ইংল্যান্ডের প্রতিভূ; বিদেশের ক্রিকেট সফরে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'ইংল্যান্ড' নাম নিয়ে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। আর এম-সি-সি'র এই লর্ড'স মাঠ—শুধু ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্রিকেট খেলো-য়াড়দের কাছে একবাক্যে তীর্থস্থানের মতই পবিত্র। ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের সব থেকে বড় কাম্য লর্ড'স মাঠের টেস্ট খেলায় দলে স্থান পাওয়া।

টেস্ট ক্রিকেট রেকর্ড

(১৯৬১-৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯৬১ সালের ১১ই নভেম্বর। এই তারিখের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ৭২টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যোগদান করে। এই ৭২টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি সংকলিত হয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ এখনও অসম্পূর্ণ—পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে তিনটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অসম্পূর্ণ সিরিজের অনুষ্ঠিত তিনটি টেস্ট খেলার ফলাফল রেকর্ড তালিকায় সেই কারণে গ্রহণ করা হয়নি)।

॥ টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র
" ব, ইংল্যান্ড	২৪	১	১৫	৮
" ব, অস্ট্রেলিয়া	১৩	১	৮	৪
" ব, ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৫	০	৫	১০
" ব, নিউজিল্যান্ড	৫	২	০	৩
" ব, পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট:	৭২	৬	২৯	৩৭

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

ভারতবর্ষ	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	সিরিজ ড্র
" ব, ইংল্যান্ড	৭	০	৬	১
" ব, অস্ট্রেলিয়া	৩	০	৩	০
" ব, ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩	০	৩	০
" ব, নিউজিল্যান্ড	১	১	০	০
" ব, পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট:	১৭	২	১২	৩

ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান: ৫৩৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), বিপক্ষে পাকিস্তান, মাদ্রাজ (৪র্থ টেস্ট), ১৯৬০-৬১)

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান: ৭৮ রান বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ৩য় টেস্ট), ১৯৫২)

৫৮ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন (১ম টেস্ট), ১৯৪৭-৪৮)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান: ২৩১ রান ভি মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ (৫ম টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান:

৫৬০ রান (১০ ইনিংস, এভারেজ ৫৬·০০)—আর এস মোদী (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৪৮-৪৯)।

৫৬০ রান (১০ ইনিংসে, এভারেজ ৬২·২২)—পলী উমরীগড় (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৩)

প্রথম ডবল সেঞ্চুরী: ২২৩ রান পলী উমরিগড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, হায়দরাবাদ (১ম টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)

ডবল সেঞ্চুরী (৩): ২২৩ রান পলী উমরীগড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, হায়দ্রাবাদ (১ম টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)

২২৩ রান ভি, মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, বোম্বাই (২য় টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)

২৩১ রান ভি, মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ (৫ম টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)

একটি ম্যাচের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী: ১১৬ ও ১৪৫ রান—বিজয় হাজারে (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডলেড (৪র্থ টেস্ট), ১৯৪৭-৪৮)

॥ বোলিং রেকর্ড ॥

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট:

৯ উইকেট (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯)

৯ উইকেট (৬৯ রানে)—জাসু প্যাটেল (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০)

একটি ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট:

১৪ উইকেট (১২৪ রানে—৬৯ রানে ৯ ও ৫৫ রানে ৫) —জাসু প্যাটেল (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০)

১৩ উইকেট (১৩১ রানে—৭৯ রানে ৫ ও ৫২ রানে ৮) —ভি মানকড় (বিপক্ষে পাকিস্তান, নিউদিল্লী, ১৯৫২-৫৩)

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট:

৩৪ উইকেট (৫৭১ রানে। এভারেজ ১৬·৭৯)—ভি মানকড় (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫১-৫২)

৩৪ উইকেট (৬৬৯ রানে। এভারেজ ১৯·৬৭)—সুভাষ গুপ্তে (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৫৫-৫৬

সেঞ্চুরী: ৭২টি খেলায় ৫০টি সেঞ্চুরী

সেঞ্চুরী সংখ্যা	বিপক্ষে	মোট খেলা
১৫	ইংল্যান্ড	২৪
১১	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৫
৯	নিউজিল্যান্ড	৫
৮	পাকিস্তান	১৫
৭	অস্ট্রেলিয়া	১৩

যে-কোন উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রান: ৪১৩ রান (১ম উইকেটে)—পংকজ রায় এবং ভিনু মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ (৫ম টেস্ট), ১৯৫৫-৫৬)—এই ৪১৩ রান ১ম উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলার প্রতিটিতে ৪০০ রানের ইনিংস: ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ এই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান: ৬৭৪ রান—অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান: ১০৫ রান—অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান—২৫৬ রান—রোহন কানহাই (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান: ৭৭৯ রান (৭ ইনিংসে: এভারেজ

১১১·২৮)—এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৪৮-৪৯

প্রথম ডবল সেঞ্চুরী: ২১৭—ওয়াল্টার হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড), ওভাল, ১৯৩৬

ডবল সেঞ্চুরী (৭): ২৫৬ **রান**—আর কানহাই (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯; ২৩৭ রান ফ্রাঙ্ক ওরেল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিংস্টোন, ১৯৫৩; ২৩০* রান বি সাটক্লিফ (নিউজিল্যান্ড), নিউ দিল্লী, ১৯৫৫-৫৬; ২১৭ রান ডবলিউ হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড), ওভাল, ১৯৩৬; ২০৭ রান এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), পোর্ট অব স্পেন, ১৯৫৩; ২০৫* রান জে হার্ডস্টাফ (ইংল্যান্ড), লর্ডস, ১৯৪৬ এবং ২০১ রান ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), এডলেড, ১৯৪৭-৪৮

একটি ম্যাচের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী: ১৩২ ও ১২৭*—ডন্ ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮ ১৬২ ও ১০১ এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯

১৯৬১-৬২ সালের ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ সমাপ্তির পর ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিবিধ রেকর্ড 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সেঞ্চুরী (৭২): ২৮ ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৫টা টেস্ট); ১৬ ইংল্যান্ড; ১৫ অস্ট্রেলিয়া; ৮ পাকিস্থান এবং ৫ নিউজিল্যান্ড।

সেঞ্চুরী (৭২):	**টেস্ট খেলা**	**সেঞ্চুরী**
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৫	২৮
ইংল্যান্ড	২৪	১৬
অস্ট্রেলিয়া	১৩	১৫
পাকিস্থান	১৫	৮
নিউজিল্যান্ড	৫	৫

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট: ৮ উইকেট (৩১ রানে)—ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট: ১২ উইকেট (৯৪ রানে)—ফজল মামুদ (পাকিস্থান), লক্ষ্মৌ, ১৯৫২-৫৩।

১২ উইকেট—এ কে ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া), কানপুর, ১৯৫৯-৬০

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট: ৩০ উইকেট (এভারেজ ১৭·৬৬)—ডবলউ হল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৫৮-৫৯

খেলাধুলো দশক
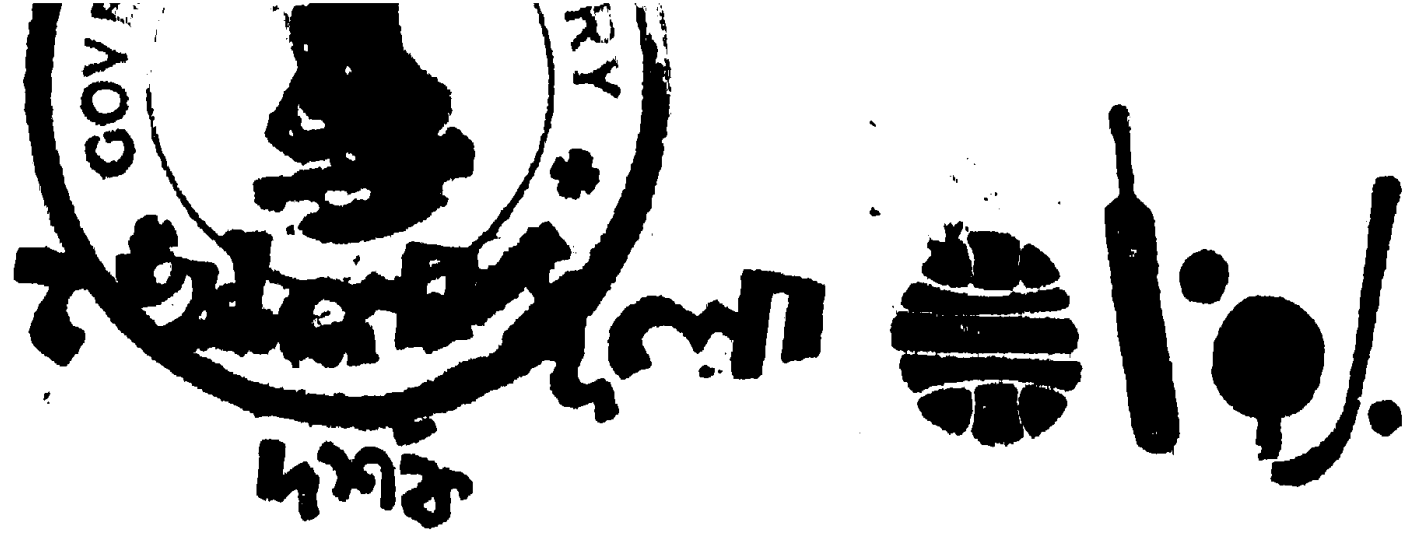
এম সি সি দল: ২৬১ **রান** (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন ৮০ নট-আউট, জে কে স্মিথ ৪০ নট-আউট এবং রিচার্ডসন ৫৯)

ও ২৭৭ (৫ উইকেটে। রিচার্ডসন ১৪৭, রাসেল ৪৭। কাপুর ৮১ রানে ৩ এবং শতপতি ৭৫ রানে ২ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল দল: ২৬৩ **রান** (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আর বি কেনী ৭০, এম পি বড়ুয়া ৬৬, পঙ্কজ রায় ৪৬। হোয়াইট ৪৫ রানে ২ এবং ব্যারিংটন ৬৩ রানে ২ উইকেট।

কটকে এম সি সি বনাম পূর্বাঞ্চল দলের তিন দিনের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

প্রথম দিনের খেলায় এম সি সি দল ২৬১ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের সর্বোচ্চ ৮০ রান ক'রে ব্যারিংটন নট-আউট থেকে যান। শতপতি, কুণ্ডু এবং কেনী ১টা ক'রে উইকেট পান।

লাঞ্চের সময় এম সি সি দলের স্কোর ছিল ১২৬, ২ উইকেটে। উইকেটে নট-আউট ছিলেন পারফিট (৯ রান) এবং ব্যারিংটন ২১ রান)।

চা-পানের বিরতির সময় এম সি সি দলের রান দাঁড়ায় ২৬১, ৪ উইকেটে। ব্যারিংটন (৮০ রান) এবং মাইক স্মিথ (৪০) নট-আউট থাকেন। চা-পানের সময়ের ২৬১ রানের ওপরই এম সি সি দলের অধিনায়ক মাইক স্মিথ প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই দিন এক ঘণ্টার খেলায় পূর্বাঞ্চল দল কোন উইকেট না খুইয়ে ৩৭ রান তুলে দেয়।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দল সারাদিন ব্যাট ক'রে দলের ২৩৭ রান দাঁড় করায় ৫ উইকেটে। অর্থাৎ ৫ উইকেট খুইয়ে ২০০ রান তুলে। এম পি বড়ুয়ার ৬৬ রান এবং আর বি কেনীর নট-আউট ৬৪ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দল এক ঘণ্টার খেলায় আরও তিনটে উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ২৩৭ রানের সঙ্গে ২৬ রান যোগ করে। মোট রান দাঁড়ায় ২৬৩, ৮ উইকেটে।

দলের এই ২৬৩ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তখন খেলার সময় পড়েছিল ২৪৫ মিনিট। খেলা নির্ঘাত অমীমাংসিত যাবে এই বিবেচনায় এম সি সি দলের অধিনায়ক দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং প্র্যাক্টিসের জন্য ছেড়ে দেন। এম সি সি দল ২৪৫ মিনিটের খেলায় ৫ উইকেট খুইয়ে ২৭৭ রান তুলে দেয়। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ১৪৭ রান করেন রিচার্ডসন। তিনি প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫৯ রান করেছিলেন। রিচার্ডসন ২য় ইনিংসে তাঁর ১৪৭ রান তুলেন ২১৫ মিনিটের খেলায়। বাউন্ডারী মারেন ১৪টা। তাঁর ১০২ রান তুলতে ১৩৮ মিনিট সময় লাগে। প্রথম উইকেটের জুটিতে রিচার্ডসন এবং রাসেল দলের ১২৯ রান তুলে দেন।

॥ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ॥

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দল উপর্যুপরি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের কৃতিত্ব লাভ করেছে। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বাংলা দল।

ফাইনালের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ: স্যার্ভিসেস দল ৭৬-৫১ পয়েণ্টে মহীশূর দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ: বাংলা দল ৫৭-৫৩ পয়েণ্টে মহীশূর দলকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ: মহারাষ্ট্র অন্ধ্রকে পরাজিত করে।

॥ জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ॥

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল মোট ১১টি বিভাগের মধ্যে ১০টি বিভাগের ফাইনালে জয়লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। রানার্স-আপ হয়েছে রেলওয়ে দল।

চূড়ান্ত ফলাফল:

সার্ভিসেস—৪৮ পয়েণ্ট; রেলওয়ে দল—২৫ পয়েণ্ট; মহীশূর—৯ পয়েণ্ট; মধ্যপ্রদেশ—৫ পয়েণ্ট; পাঞ্জাব—৩ পয়েণ্ট; বিহার—২ পয়েণ্ট; মহারাষ্ট্র—২ পয়েণ্ট; অন্ধ্র প্রদেশ—১ পয়েণ্ট; বাংলা—১ পয়েণ্ট; গুজরাট—০ পয়েণ্ট।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের

বহু চিত্র সম্বলিত প্রথম ও একমাত্র বিশদ-বর্ণিত কাহিনী

গোয়া মুক্তি সত্যাগ্রহ
আন্দোলনের নেতা
ত্রিদিব চৌধুরীর

সালাজারের জেলে উনিশ মাস ১০·০০

"পুস্তকটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, কারণ গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের এটি যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শুধু তাহাই নহে, সে বিবরণ রসোত্তীর্ণ এবং উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক।" —**যুগান্তর**, ৬।৮।৬০

এগারখানি আসল আর্ট পেপারে ছাপা ফটোগ্রাফ ও একখানি ম্যাপ এই বই-এর ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। পুস্তকের শেষে গোয়ার তিনটি প্রধান জনপ্রিয় জাতীয় সংগীত এবং তাহাদের বাঙলা অনুবাদ দেওয়া আছে।

কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের	**কবি-চিত্ত**	৫·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের	**স্বনির্বাচিত কবিতা**	৪·০০
বনফুল-এর	**নূতন বাঁকে**	২·৫০
দেবেশ দাশের	**সুদূর বাঁশরী**	২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

কখনো মেঘ ৪·০০ ঃ **সম্রাট** ২·০০
সাগর থেকে ফেরা (নবম মুদ্রণ) ৩·০০

স্মরণীয় অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

বিবিধ গ্রন্থ

ডঃ উমা দেবীর
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬·০০

বিনয় ঘোষের
বাদশাহী আমল ৬·০০

সুবোধ ঘোষের
অমৃতপথযাত্রী ৩·৭৫

নলিনীকান্ত সরকারের
হাসির অন্তরালে ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
ফানুস ফাটাই ২·৫০

কয়েকখানি বিশিষ্ট উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

উপন্যাস ॥ বনফুল-এর **ভীমপলশ্রী** ৫·০০ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দেবকন্যা** ৪·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **তুমি আর আমি** ২·০০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সর্সেমিরা** ৩·০০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরীর **স্বগতোক্তি** ৩·২৫ ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্তের **নীল আলো** ২·৭৫ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** ৫·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **রিকশার গান** ৫·০০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **পরাশর** ২·৭৫ ॥ কণাদ গুপ্তের **পূর্ব মীমাংসা** ২·৫০ ॥ বিমল মিত্রের **নিশিপালন** ৪·৭৫ ॥ দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বসতি** ৩·৫০ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **নীল রাত্রি** ৩·৫০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাঝির ছেলে** ২·৫০ ॥ প্রতিভা বসুর **মালতীদির গল্প** ২·৫০ ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **কান্নাহাসির দোলা** ৩·৭৫ ॥ লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** ২·৫০ প্রবোধকুমার সান্যালের **ইস্পাতের ফলা** ৩·৫০ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের **ফুটলো কুসুম** ২·০০ ॥ চিত্রিতা দেবীর **দুই নদীর তীরে** ৬·৭৫ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **অঘটন আজো ঘটে** ৫·০০ ॥ নিরুপমা দেবীর **অন্নপূর্ণার মন্দির** ৩·২৫ ॥ বিক্রমাদিত্যের **অনোখীলাল পথোটিয়া** ২·৫০ ॥ বাণী রায়ের **আরও কথা বলো** ২·৭৫ ॥ **গল্পগ্রন্থ** ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** ২·৫০ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সিন্ধুর টিপ** ২·৫০ ॥ রঞ্জন-এর **সংকরী** ৩·০০ ॥ অনুরূপা দেবীর **ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মিলন-সেতু** ২·৫০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ২·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জন্ম ও মৃত্যু** ৩·০০ ॥ দ্বারেশ শর্মাচার্যের **জ্যোতিষীর ডায়েরী** ২·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কায়কল্প** ৩·৫০ ॥

আমাদের বই
পেয়ে ও দিয়ে
সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন [illegible] গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

● রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৫শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২০শে পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 5th January, 1962.
40 Naya Paise.

যে সময় আমরা এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছি, ঠিক সেই সময় ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেটে একটি অপূর্ব মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। অপূর্ব শুধু এই জন্যে নয় যে, ইংলণ্ড দল ইডেন উদ্যানে তাঁদের প্রথম ইনিংসে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। শুধু ইংলণ্ড দলের বিপর্যয়ের দিক থেকে দেখলে কানপুরের গ্রীন পার্কে এর চেয়েও বড় বিপর্যয়ের সম্মুখে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন এবং ফলো-অনে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে ২২ রানে তাঁরা ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে মুহূর্তটি অপূর্ব এইজন্য যে, প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের নবীনতর খেলোয়াড়দের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাওয়া গেছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বোর্দে, সেলিম দুরানী এবং রঞ্জানের বোলিং সাফল্যের পরিচয়। সর্বোপরি ভারত ২৭৪ রানে অগ্রগামী। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম ভাগে কণ্ট্রাক্টর ও জয়সীমার ক্ষণিক ঝলকানিতে উচ্চাশা যদিও উত্তুঙ্গ হয়েছিল, তথাপি তৃতীয় দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে আশা খর্বিত হয়েছে বহুলাংশে মঞ্জরেকর এবং পতৌদির নিশ্চল ব্যাটিংয়ের ফলে। তবু আমরা বলছি, ভারতীয় ক্রিকেট এখনও সুযোগ হারায়নি, এখনও তার সম্মুখে অপূর্ব সম্ভাবনার দরজা খোলা আছে।

এই সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা আছে উম্রিগড়ের বলিষ্ঠ ব্যাটে এবং বোরদের নিশ্চিত নির্ভরতায়। চতুর্থ দিন ভাগ্য যদি উম্রিগড় ও বোর্দেকে এই সুযোগ দেয় এবং তাঁরা যদি নিজস্ব দক্ষতা ও শক্তির উচ্চতম প্রমাণ ইডেন উদ্যানে দিতে পারেন—অর্থাৎ সবগুলি "যদি" বাস্তবে সত্য হয়ে দেখা দেয় যদি, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট একটি অনাস্বাদিত গৌরব লাভ করতে পারে। সে গৌরব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জয়ের গৌরব।

সম্পূর্ণ আশা যদি চরিতার্থ নাও হয়, অথচ অন্যদিকে উম্রিগড় ও বোর্দে যদি তাঁদের যথার্থ শক্তির পরিচয় দিতে পারেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটে আর একটি সম্ভাবনা জন্মলাভ করবে। সেই সম্ভাবনা হচ্ছে কণ্ট্রাক্টর ও মঞ্জরেকরকে বাদ দিয়ে নবীনতর খেলোয়াড় এবং তৎসহ অতীতের দুইজন মাত্র অভিজ্ঞ খেলোয়াড়—উম্রিগড় ও বোর্দেকে সঙ্গে নিয়ে একটি নূতন প্রাণবন্ত পরিচ্ছন্ন দল গঠনের সম্ভাবনা। কণ্ট্রাক্টর সম্বন্ধে আমরা কঠোর সমালোচনায় প্রবেশ না করেও একথা বলতে পারি যে, দুর্ভাগ্য তাঁর টেষ্ট জীবনের উপরে ছায়াপাত করেছে। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের ভারতীয় দলকে আর জড়িত রাখা চলে না, বিশেষত এই জন্য যে, অধিনায়কত্বের পূর্ণ দাবীদার আর একজন খেলোয়াড় এই দলেই আছেন এবং এই দলে আছেন তাঁকে বাদ দিয়েও দুই-জন ওপেনিং ব্যাটসম্যান।

সুতরাং এই খেলার যাই পরিণতি হোক, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য নূতন অধিনায়ক প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের দল থেকে দুইজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের বিদায়ও প্রয়োজন। ভারতীয় ক্রিকেট সাম্প্রতিককালে নিঃসন্দেহে কণ্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকরের কাছে অসাধারণভাবে ঋণী। বহু উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন ইনিংস তাঁরা দিয়েছেন এবং বলা প্রয়োজন যে, বিগত টেষ্ট সিরিজে কণ্ট্রাক্টরের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মালিন্য বহুলাংশে দূর করেছিল।

তাছাড়া, আরও একটি বক্তব্য আমাদের আছে। গত কয়েকদিন ইডেন উদ্যানে অন্তত ৩০ হাজার দর্শক ষ্টেডিয়াম ও গ্যালারি পূর্ণ করেছিলেন। মোট ২১ হাজার সিজন টিকিট বিতরণ করা হয়েছিল, বাদ বাকি দৈনিক টিকিট। এই দৈনিক টিকিট সংগ্রহের নিগ্রহ আজকের নয়, অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত টেষ্ট সিরিজের সময় থেকেই কলকাতার নাগরিকদের উপর দুঃসহ অত্যাচাররূপে দেখা দিয়েছে। এই অত্যাচার আরও দুঃসহ এইজন্য যে, কলকাতা নগরীর যেটুকু সমৃদ্ধি এবং ক্রীড়ানুরাগ আছে, তাতে কলকাতায় একটি ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম অর্ধনির্মিত হয়ে পড়ে থাকার কোনো কথা নয়। ষ্টেডিয়াম অর্ধনির্মিত, ছেলেরা চাল-চুলো ছেড়ে দিয়ে রাত্রিদিন অবিচ্ছিন্ন লাইনে দাঁড়িয়ে, আহারনিদ্রা ত্যাগ করে মাঠে যাওয়ার দুর্বহ ক্লেশ বহন করছে; কারণ, সরকার উদাসীন, অথবা ক্রীড়াজগতের চক্রান্তের দ্বারা বশীভূত। ইডেন উদ্যানের গত কয়েকদিনের দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এর জন্য অবশ্যই সরকারকে দায়ী করবেন। যদি একথা সত্য হয় যে, তাঁরা কোনো চক্রান্তের দ্বারা বশীভূত নন—এবং আমরাও একথাই বিশ্বাস করতে চাই, তাহলে সরকারকে এই কলঙ্ক ও যন্ত্রণা অবিলম্বে দূর করতে হবে। মোট কথা এই যে, আমরা যদি তরুণদের শান্তি না দিই তাহলে তরুণেরাও আমাদের অশান্তি থেকে নিস্তার দেবে না।

কবিতা

রক্তকরবীর প্রতি

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ও কিশোরী, ফোটা কাম-রাঙা ফুল
নিলাজ রে তোর যৌবন,
গূঢ় বাসনার মৌমাছি কার
তোকে ঘিরে তোলে গুঞ্জন।

নির্জন ছাদে আলসেয় এসে
কী সাহসে হাত বাড়ালি?
কোন হঠকারী পান্থে সহসা
বিলোল চাহনি বিলালি।

নেই, নেই কোনো অভিসার রাত
জ্যোৎস্নার মায়া-মাধুরী,
প্রখর দিনের আলোকে আবার
একী নাগরালি চাতুরী!

যত অশান্ত রক্ত-কণার
ঋণশোধ করে তবে,
ভস্ম কি হবি নিজ হাতে জ্বালা
এই বহ্নুৎসবে।

কাল ভোরে তোকে ভুলবে প্রেমিক—
যাকে আজ দিলি মিতালি;
স্খলিত আঁচলে হৃদয়ে কি দোলে
ঢেউয়ের আথালি-পাথালি?

আশ্রয়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

একাকি থাকতে বাধা তাছাড়া যা কিছু
বলো সব মেনে নেব।

কেবল যে প্রেম চাই তাই নয়—ইচ্ছা মতো যে কোন বন্ধন
সঙ্গে দিতে পারো আমি থেকে যাবো,
তার সাথে, তার বক্ষোযুগে।

শেফালি তলার ছায়া, পুকুরের গায়ে হাওয়া কিংবা হৃদয়ের
গভীরে ঘূর্ণায়মান রঙিন বিমান—তুমি যা দেবে সকলি
হাতে নেব। সঙ্গীহীন হ'লে বড়
সাংঘাতিক স্তব্ধতা ছড়ায়—
তুষার উন্মাদ স্রোতে ভেঙে পড়ে পাঁজরের জীর্ণ সমতলে,
এত ধ্বংস, এত হিংসা কেহ বক্ষে ঠাঁই দিলে বাঁচি।

বারবার মনে হয় পৃথিবীতে নানাবিধ আক্রমণ আছে।
যারা অস্ত্রহীন, কোন কালেও জানে না ক্রোধ তারাও হঠাৎ
দণ্ড তুলে ছুটে আসে। যেমন,
বাদল কণা—অত ঠাণ্ডা, ম্লান,
তোমাকে একাকি পেলে ভয়ংকর ত্রিশূলের ঘায়ে
শেষ করে দিতে পারে। তখন বিপন্ন ত্রাসে সমাকুল ছুটে
কারো কাছে যাওয়া চাই,
হোক প্রেম কিংবা মেঘ, শিশির, কবিতা।

*

অন্য ডাকে

শান্তি লাহিড়ী

কে আমাকে ডেকে গেছে,
আমি বুঝি অন্য কোন নির্জন সীমায়
হাত ভরে অন্যকারো ভালোবাসা খুঁটে খুঁটে তুলি।

কে আমাকে ডেকে গেছে।
স্মরণীয় কেউ নয়, ব্যস্ততায় ভুলে আছি তাকে,
ভুলে গেছি দূরে থেকে দৃষ্টির উত্তর বিনিময়।
সকালে জলের কলে অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা ভাঙে।

সে আমাকে ডেকে গেছে। আমি অন্য আকাশে উধাও,
আমি অন্য আকাশের শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেছি,
আমি তার ডাক
শুনিনি, শুনিনি।

সকালে কলের জলে অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা ভাঙে.
হাত ভরে অন্যকারো ভালোবাসা খুঁটে খুঁটে তুলি।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল এবার কলকাতায়। এই অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যের নানাবিভাগে যে-সব কৃতী কবি-সাহিত্যিক ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যে চিন্তা করার বিষয় ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অভ্যস্ত ভাবনার সদর রাস্তায় না গিয়ে শিশু-সাহিত্য বিভাগের উদ্বোধক শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) একটি মৌলিক চিন্তার চোরাপথ আবিষ্কার করে যেভাবে সোরগোল তুলেছেন, তাতে সকলেই ম্রিয়মাণ হবেন।

উক্ত উদ্বোধকের শিশু-বোধ্য বা শিশু-বধ্য বক্তৃতার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্য এখন জাহান্নমে যেতে বসেছে। কয়েকটি শিশু-সাহিত্য প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে যড় করে সাহিত্যের নামে বাজারে বাজে মাল ছাড়ছেন এবং পরস্পরকে পুরস্কৃত ক'রে সেই ভুষিমালের বাজারদর বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাই শ্রীমৌমাছি তাঁদের নাম দিয়েছেন, 'পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতি'।

তা-ছাড়া তিনি আরো বলেছেন, সোভিয়েট রাশিয়া থেকে কতকগুলি শিশুপাঠ্য বই বাজারে এসে এদেশের শিশুদের ক্ষতিসাধন করছে। কাজেই ভারত সরকারের উচিত ঐ সব দূষিত পুস্তকের আমদানী বন্ধ করে দেওয়া।

শ্রীমৌমাছির শেষোক্ত বক্তব্যটির কোনো সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যে প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, তেমন একটি উচ্চস্তরের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে হটকারিতা মাত্র। এ বিষয়ে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ করবেন ভারত সরকার, এবং ভারত সরকারের সদবুদ্ধির প্রতি আমার আস্থা আছে। শ্রীমৌমাছির যদি তা না থাকে তো তা নিয়ে আমি বিতণ্ডা করতে যাব না। সে বোঝাপড়ার দায়িত্ব ভারত সরকারের।

ইত্যবসরে আমরা ঘরোয়া ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। একথা খুবই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়ের মতো দিকপাল শিশু-সাহিত্যিক আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সেকথা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বেলাতেও তো সমানই প্রযোজ্য! বড়দের সাহিত্যেই কি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্রের মতো লেখক আছেন? •গদ্য, কবিতা, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি

বিভাগেই আজ যুগসন্ধির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এর একটা সমাজতাত্ত্বিক কারণ নিশ্চয়ই আছে, এবং গবেষকগণ অবশ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারেন। কিন্তু তা না করে নিছক গলাবাজি করে বাংলার শিশু-সাহিত্য নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে বলে ধুয়ো ধরলে সে গুরুমশাইগিরি কেউই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

বাস্তবিক 'মধু'র কারবারী মৌমাছির হুলের যতো বিষ আছে, সবই যে এই একটি অধিবেশনে এমন করে উজাড় করবেন তা বোধহয় কেউই ভাবতে পারেননি। নয়তো তাঁকে উদ্বোধনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর আগে উদ্যোক্তাগণ দুবার করে ভাবতেন।

কিন্তু মঞ্চে আরোহণ করলেই কি কেউ অন্য সকলের ঊর্ধ্বে চলে যান? যিনি বক্তৃতা দেবেন তিনিই একমাত্র জ্ঞানী এবং অন্য যাঁরা শুনবেন তাঁরা সকলেই মূর্খ এটা মনে করাই বা কী ধরণের আত্মম্ভরিতা?

শ্রীমৌমাছি যখন নির্বিচারে বাংলার সমস্ত শিশু-সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে ধিক্কৃত করছিলেন তখন তাঁর নিজের কথা মনে ছিল কি? তিনিও তো গত কয়েক দশক ধরে সানন্দচিত্তে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্যে মেলা বসিয়ে রয়েছেন। তাঁর মধুচক্রও তো কম শক্তিমান নয়! প্রকৃতই যদি তিনি শিশুদের জন্যে এতটা ভাবিত হ'তেন তবে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলাদেশের শিশু-জগতে একটা অবদান রেখে যেতে পারতেন। তা তিনি পেরেছেন কি? পারেননি, এবং পারেননি বলেই আজ তিনি অন্যদের প্রতি এত ঈর্ষাপরায়ণ।

শ্রীমৌমাছি কাকে ঠিক 'পিঠ চুলকানী' বলেছেন তা জানিনে। প্রকৃত গুণগ্রাহিতা চিরকালই সাহিত্যের পক্ষে উপকারী হ'য়েছে। বড়কে সম্মান জানিয়ে মানুষ তার নিজের মনুষ্যত্বকেই সম্মানিত করে। শ্রীমৌমাছি যদি বাংলার শিশু-সাহিত্যের জন্যে সত্যিই কিছু করতেন, অর্থাৎ তাঁর পিঠখানিও যদি চুলকানোর মত প্রশস্ত হতো, অবশ্যই তাহলে অনুরাগীর হাত সেদিকে এগিয়ে যেত। কিন্তু হুলের বিষ মর্মে মর্মে (কিংবা চর্মে চর্মে) অনুভব করিয়ে তো সে ভালোবাসা আদায় করা যায় না! তখন ভালোবাসার হাতই যে প্রহরণধারী হ'য়ে ওঠে। আর হ'য়েছেও ঠিক তাই। শ্রীমৌমাছি তাঁর বিষোদ্গারের পালা শেষ করা মাত্রই চারিদিক থেকে বাংলার প্রতিনিধিস্থমূলক শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহিত্যিক ও সম্পাদকগণ একযোগে ধিক্কার জানিয়েছেন এই পশ্চাদ্‌দংশনের রুচিবিগর্হিত স্পর্ধাকে। তাঁদের বিবৃতিটিকে হুবহু তুলে দিচ্ছি এখানে।

সাহিত্য সম্মেলনে 'মৌমাছি' ধিক্কৃত

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শিশু-সাহিত্য শাখার উদ্বোধনী বক্তৃতায় আনন্দমেলার 'মৌমাছি' দেশের অন্যান্য শিশু ও কিশোর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও পরিষদগুলিকে অত্যন্ত শালীনতাহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং 'পরস্পর পৃষ্ঠ-চুলকানি সমিতি' আখ্যা দিয়াছেন।

আমরা বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যিকগণ এবং বিভিন্ন সংগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ 'মৌমাছি'র এই দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তির জন্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করি এবং তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার-ধ্বনিত করি।

আমরা বিশ্বাস করি—দেশের যে যেখানে যতটুকু কিশোর-কল্যাণ কাজে ব্রতী আছেন, সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে নব-ভারত গড়ে তুলছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (রামধনু)
রত্নাকর (ডানপিটেদের আসর)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
(কিশোর জগৎ, ভারতবর্ষ)
শ্রীসুকোমল দাশগুপ্ত
(শিশু-সাহিত্য পরিষদ)
স্বপনবুড়ো (সব-পেয়েছির আসর)
আশা দেবী (মহিলা)
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ....
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সন্দেশ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল
(শিশু-সাহিত্য পরিষদ)
শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
(দৈনিক বসুমতী ও মৌচাক)
ইন্দিরা দেবী ....
ধীরেন বল (শিল্পী)

হায়, কালের গতি কি কুটিল! কী করতে শেষে কী হ'য়ে গেল। বাংলার শিশু-সাহিত্যের মসনদে আবুহোসেনী করতে গিয়ে রজনী প্রভাত হ'তেই আজ তিনি পথের ধূলায়—সর্ব-পরিত্যক্ত, একা!

নীতি : সাহিত্য-প্রতিভার কল্যাণ-স্পর্শ না পেলে পঙ্গু-লেখকের পক্ষে গিরি-লঙ্ঘন করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

* * *

'যুগান্তর' পত্রিকার একটি সংবাদে চমৎকৃত হলাম। সংবাদটির শিরোনামা হল 'বিষেও ভেজাল'। এতে জানা যাচ্ছে, ভারতীয় মান সংস্থার ষষ্ঠ সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসি বি গুপ্ত মন্তব্য করেন, ভারতে প্রস্তুত ঔষধে ভেজালের পরিমাণ এত বেশী যে, কোনো ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করলেও বিফল হবে; কারণ বাজারে বিক্রয়যোগ্য বিষেও ভেজাল দেওয়া হচ্ছে।...... উক্তির অনুকূলে তিনি একটি অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করেন।
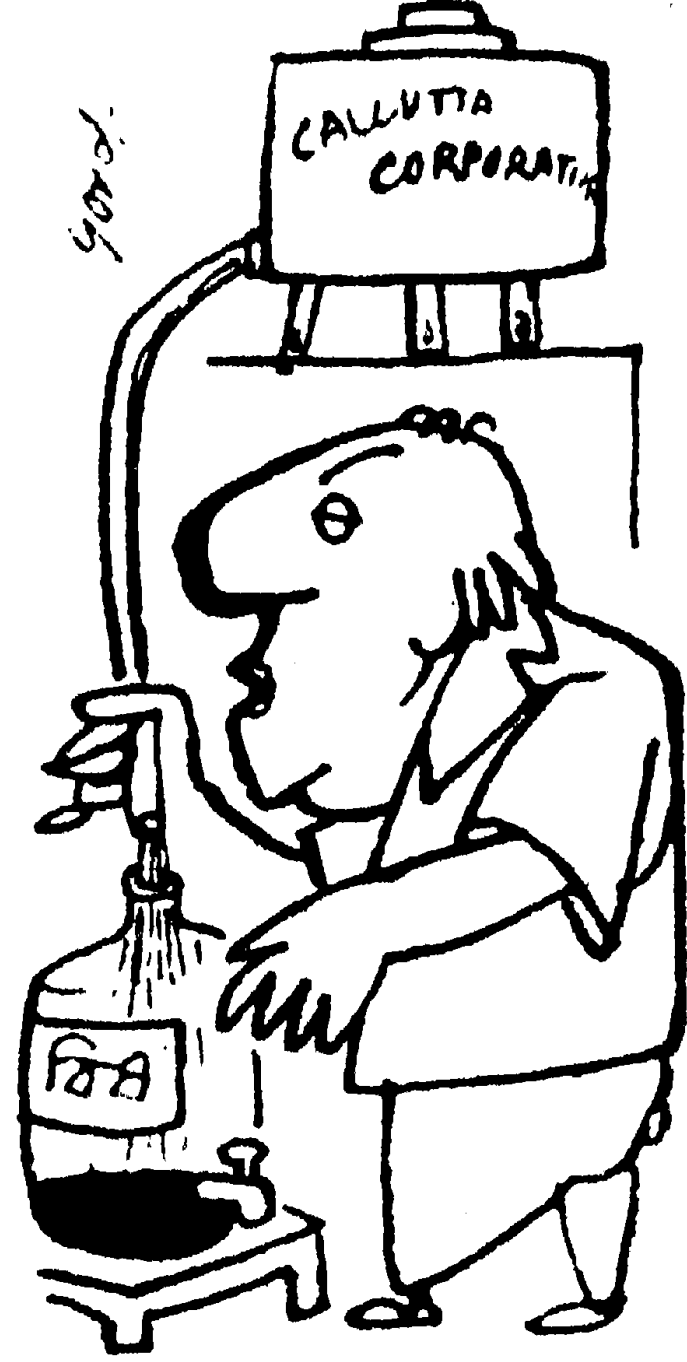
এর থেকে শিক্ষণীয় হল :

(১) বিষ খেয়ে মরতে যাওয়া আহাম্মকী—কারণ তাতে মৃত্যুর কোনো গ্যারাণ্টি নেই।

(২) যা বিষ নয় তা খেয়ে বরং মরা যেতে পারে—কারণ তাতে ভেজাল আছে। অতএব খাদ্যদ্রব্য সাবধানের সঙ্গে গ্রহণীয়।

(৩) মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে খাদ্যদ্রব্যে কম এবং বিষে আরো বেশী ভেজাল দেওয়া উচিত।

(৪) তা'ছাড়া, কেবল বিষ নয়, বারুদ, গোলা-গুলী, আর বিশেষ ক'রে এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমাতেও প্রচুর পরিমাণে ভেজাল মেশানো কর্তব্য।

(৫) এবং যাঁরা পরস্পরের প্রতি অনর্থক বিষোদ্গার করে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া মৃত্যুমুখী করে তুলছেন তাঁদের বাক্যের মধ্যেও কিছু মিষ্টি কথার ভেজাল মিশ্রিত হোক।

নব-বর্ষের সূচনায় এই হল আমার নতুন পঞ্চশীল। যাঁরা অকালে পঞ্চত্ব পেতে চান না, তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য

বুদ্ধদেব বসু

ব্যাকরণগত অশুদ্ধির ভয়ে যাঁরা গদ্যকবিতার নাম মুখে আনেন না, গদ্য-গানের উল্লেখ শুনে তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত বেশি কাতর হ'য়ে পড়া স্বাভাবিক। গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা যদি বা প্রকাশিত হ'তে পারে, গান কি তার চিরাচরিত ছন্দ-মিলের বাঁধন ছেড়ে বেরোতে পারে কখনো? কিন্তু প্রতিভা বস্তুটির একটি লক্ষণ এই যে তা নিয়ম মেনে চলে না, কারো অনুমতির অপেক্ষা না-রেখে কখনো-কখনো সৃষ্টি করে সেই অপূর্বকে, শাস্ত্রমতে যার সত্তাই অসিদ্ধ। কত ভিন্ন-ভিন্ন শৈলীতে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, তা চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে সম্ভবপরতার সম্প্রসারণেই প্রতিভাবান সার্থক হ'য়ে থাকেন। যা নিয়মিত ছন্দে-মিলে বিন্যস্ত, যা ছন্দোবদ্ধ কিন্তু মিলের কোনো বাঁধা নিয়ম মানেনি, যাতে ছন্দ মিল দুয়েরই ব্যবহার আংশিক ও অস্পষ্ট, যাতে মিল নেই আর ছন্দের আছে আভাসমাত্র—এই সব রকম উদাহরণই রবীন্দ্রনাথে প্রচুর, আর সর্বশেষে এমন গানও তিনি রচনা করলেন যার ভাষা গদ্য, আর যা শুনে আমাদের আনন্দিত হবার বাধা হচ্ছে না। গদ্য-গান হ'তে পারে কি পারে না তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে তর্ক হ'তে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাটা যে গানই তা আমাদের অশাস্ত্রীয় হৃদয়-স্পন্দনেই অনুভব করা যায়, প্রমাণের জন্য পাঁজিপুঁথির দ্বারস্থ হ'তে হয় না।

বাংলা গান রচনার অনেকগুলো প্রচল রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করেছেন, এই কথাটা কারোরই অবশ্য অজানা নেই। প্রথম মিলটির অনুলাপ বাংলা গানের একটি বড়ো নিয়ম, কিন্তু এর বিরুদ্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন তিনটি গান যা আমাদের সকলেরই চেনা : 'দুঃখের বরষায়', 'এ শুধু অলস মায়া' ও 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু'। উপরন্তু, প্রথমোক্ত গান দুটির আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো অংশই ফিরে-ফিরে গাওয়া হয় না। ছন্দ ও মিলের দিক থেকে 'আঁধার অম্বরে' মনোযোগের যোগ্য : তার যুক্তবর্ণের ঢাউ-তোলা কল্লোল, 'মদির' ও 'ঝটিকা'র স্বরানুপ্রাস, চতুর্থ ও অষ্টম পংক্তির মিলহীনতা—এই সবের মিলিত প্রভাব, শুধু শ্রোতার নয়, পাঠকের মনেও মোহসঞ্চার করে; যে-ভাবে, একটু টেনে-টেনে, আমরা কবিতাটি পড়ি, সুর যেন তারই উন্নত ও সম্প্রসারিত প্রকরণ। এর ঠিক উল্টো ধরনের বিস্ময় আনে 'এ শুধু অলস মায়া' : ছাপার অক্ষরে এটি একটি পরিচ্ছন্ন চতুর্দশপদী, প্রতি পংক্তির মাত্রাসংখ্যা ষোলো, মিলের বিন্যাস চতুর ও অপ্রত্যাশিত (কখকখ কগঘগঘগঘঙঘঙ) *। কিন্তু ছাপার অক্ষরে দেখে কল্পনা করাও যায় না এর সুর কী রকম হবে, গানটি শুনতে-শুনতে যেন অন্য এক জগৎ খুলে যায় আমাদের সামনে। মিলের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম মানেননি, তেমনি ছন্দ ব্যবহারেও তিনি সাহসিকভাবে অভিনব। সুর থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়েও পদবিন্যাস ছন্দোবদ্ধ হবে, এই হ'লো বাংলা আধুনিক গানের সর্বস্বীকৃত রূপ, এর ব্যত্যয় দেখলে আমাদের উৎসাহ কেমন ম্লান হ'য়ে আসে। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের সব গানে, আর অতুলপ্রসাদের অধিকাংশে, কবিতার ছন্দ অনাহতভাবে বিরাজমান। বলা বাহুল্য, গানের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বরিকভাবে পূরণ করেছেন। ক্বচিৎ কোনো ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকতে পারে, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত, আমার অনুমান 'মায়ার খেলা' থেকে 'প্রবাহিণী' পর্যন্ত, তাঁর গানগুলিতে কাব্যের ছন্দোবন্ধন শুধু যে অক্ষুণ্ণ তা নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর। বিস্ময়কর এইজন্যে যে গানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছন্দ লেখেননি, ছন্দ সৃষ্টিও করেছেন; স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের অনেক নতুন ভঙ্গি, মিলের অনেক সূক্ষ্ম কৌশল, অনুপ্রাসের অন্তর্লীন চাতুরী—বাংলা কবিতায় এই সব কারুকর্মের উত্তম উদাহরণ খুঁজতে হ'লে আমাদের 'গীতবিতানে'র—আর বিশেষভাবে 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায়ের— শরণাপন্ন হ'তেই হবে। কিন্তু তাঁর উত্তরজীবনের সবগুলি গানকে আমরা এইশ্রেণীতে ফেলতে পারি না; কেননা তাদের মধ্যে ব্রাত্য অনেক, ছন্দ-মিলের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা; যেমন কবিতায় তিনি এই সময়ে স্বীকার করলেন গদ্যকে, তেমনি গানকেও ছন্দ থেকে ছুটি দিলেন। হয়তো এমনও বলা যায় যে তাঁর পূর্ব ও মধ্য-জীবনের অধিকাংশ গান নির্ভুলভাবে কবিতা, এবং কবিতা ব'লেও (বা এমনকি কবিতা ব'লেই) আদরণীয়, কিন্তু উত্তরজীবনে তাঁর গান অনেক বেশি গান হ'য়ে উঠলো, আর সেইজন্যেই তাতে ছন্দোরক্ষার আর প্রয়োজন হ'লো না।

'গীতবিতান' সর্বশেষ (১৯৬০) সংস্করণের ১০১৮ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কৈশোরক গানের উল্লেখ আছে যা 'অল্পাধিক অমিত্রাক্ষরে' রচিত। শুধু মিলের নয়, ছন্দোবন্ধন বা এমনকি ধ্বনিস্পন্দেরও অভাব দেখা যায় এই রচনাগুলিতে, হয়তো অনভিজ্ঞতাই তার কারণ; সাহিত্যের দিক থেকে এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা আলোচ্য হ'তে পারে না। পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর না হোক, গানে মিলবর্জন ও ছন্দোমুক্তির প্রথম উল্লেখ্য উদাহরণ 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'। গানটির রচনাকাল ১৩০২; সমকালীন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা ও গানের প্রতিবেশে দেখলে এটিকে আকস্মিক ব'লে মানতে হয়। কিন্তু 'নীলাঞ্জন ছায়া'র সূক্ষ্ম ও সচেতন শিল্পকর্মের সঙ্গে সমকালীন অন্য অনেক গানের আত্মীয়তা নিবিড় :

নীলাঞ্জন ছায়া
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ—
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্তাবিরহ কান্তারে॥

এই ক্ষুদ্র রচনাটিকে পরীক্ষা করলে অনেক বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত,

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ষোলো মাত্রার পয়ারের ব্যবহার বাংলা কবিতায় বিরল, তার কারণ এই যে ষোলো মাত্রায় কবিতার পংক্তি ঠিকমতো শেষ হ'তে পারে না, কেমন টলমল করে। হয়তো এইজন্যেই 'এ শুধু অলস মায়া'র সুর এমন চঞ্চল ও রুদ্ধশ্বাস, একটি বাক্যাংশ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই পরেরটিকে ধ'রে ফেলা হচ্ছে। গানটি গান হিশেবে এত বিখ্যাত যে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিলে ধৃষ্টতা হয় না যে এটি 'গান রচনা' নামে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত; এবং ঐ পুস্তকেই অন্য কয়েকটি চতুর্দশপদীতে মিলের ব্যবস্থায় তুলনীয় কৌশল দেখা যায়। যেমন, 'যৌবন-স্বপ্ন'—কখককখকখগঘগঘঙঙঘ, 'ক্ষণিক মিলন'—কখকখগঘগঘঘঙঙচচ।

এটি প্রায় অমিত্রাক্ষর, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষর ('বনান্ত-সুগন্ধ-দিগন্ত'কে মিল না-ব'লে বরং অর্ধ-মিল বা স্বরানুপ্রাস বলা ভালো), আট পংক্তির মধ্যে একটিও ক্রিয়াপদ নেই, 'মোর' ছাড়া সবগুলো শব্দই তৎসম, আর কবিতার বিচারে ছন্দোবন্ধ একে বলা চলে না। ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ আছে, কিন্তু তাল নেই, পুঞ্জিত যুক্তবর্ণের অনুপ্রাস কানে শোনাচ্ছে ভালো, দীর্ঘ স্বরগুলি যেন দীর্ঘায়িত উচ্চারণ দাবি করছে, 'কান্তারে' শব্দের 'এ' স্বর যেন একটি অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রচনাটিকে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে দিলে।

কিন্তু, এত রকম কারুকার্য সত্ত্বেও, আমাদের মানতেই হবে যে বাংলা ভাষার একটি কবিতা হিশেবে রচনাটিকে পাঠ করা দুঃসাধ্য। এই একই ধরনের রচনা 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো', 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও তা-ই। শেষেরটিতে একটিও মিল নেই, প্রথমটিতে আছে একটিমাত্র ('হরষে-বরষে-বাতাসে-আকাশে-সুবাসে'), ছন্দ উভয়েরই শিথিল; হয়তো এরা মুক্ত ছন্দ বা ফ্রী ভর্সের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারে, এবং এই স্বাধীনতা কবির উত্তরপর্যায়ের অনেক গানেরই চরিত্র-লক্ষণ। এগুলোকে কবিতার মতো আবৃত্তি করে সুখ হয় না, যেমন হয় 'গীতাঞ্জলি'র গান আবৃত্তি ক'রে; এরা গীত ও শ্রুত হবার জন্যই রচিত, নিতান্ত পাঠক এদের স্বাভাবিক ভোক্তা নয়; মনে-মনে পড়লেও মনে-মনে সুরটাকে টেনে নিয়ে চলতে হয়, আর সুর যদি শোনা না থাকে তাহ'লে পাঠক অবলম্বনহীন।

ছন্দ ভেঙে দিয়ে, মিল বর্জন ক'রে গান রচনার এই যে নতুন রীতি, এই যে রবীন্দ্রনাথের শেষ গীতিগুচ্ছ বাণীবাহিত থেকেও সম্পূর্ণ সুরনির্ভর হ'য়ে উঠলো, তাঁর তিনটি নৃত্যনাট্যে এই রীতিরই বিবর্তন ঘটেছে। নাটকত্রয়ের প্রথম প্রকাশের কাল বঙ্গাব্দ ১৩৪২ থেকে ১৩৪৬ পর্যন্ত; প্রায় একই সময়ে লেখা হচ্ছিলো তাঁর প্রধান গদ্যকবিতার গ্রন্থগুলি; 'পুনশ্চ'র ঈষৎ পরবর্তী এরা, এবং 'বীথিকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র সমকালীন। বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তির প্রসঙ্গে এই তিনটি নৃত্যনাট্য ঐতিহাসিকের আলোচ্য হবে, কেননা এদের সংলাপের অংশও সুরে বাঁধা, অথচ তাতে পদ্যের বাঁধুনি নেই। অন্তত 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'য় সংলাপ রচিত হয়েছে শুধু ধ্বনিস্পন্দন ও মিলের সাহায্যে; পদ্য নয়, গদ্যও তাকে বলা যাবে না (কেননা 'সাধু' ক্রিয়াপদ ও পদ্যোচিত ব্যুৎক্রমের অবিরল ব্যবহার হচ্ছে), মনে-মনে কিছু-একটা সুর বানিয়ে না-নিলে ছাপার অক্ষর মূক হ'য়ে থাকে। আসলে যা শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য তাকে নিস্তাপ অক্ষরের পথে 'পাঠকের অভিসারে' পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি। 'চিত্রাঙ্গদা'র 'বিজ্ঞপ্তি'তে তাঁকে বলতে হ'লো:

> এ-কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হ'য়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

'নৃত্যনাট্য শ্যামা'র প্রথম লেখন 'পরিশোধে'র মুখবন্ধে আবার লিখছেন:

> কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাটীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

'অপরিহার্য'?—আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—তিনি কি পারতেন না ছন্দ অটুট রেখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে বসাতে? অনেক আগে কি 'মায়ার খেলা'তে তা করেননি? আর-এক প্রশ্ন: সত্যি কি কথাগুলিতে শুধু এক 'শ্রীহীন বৈধব্য' অনুভব করছি আমরা? কই, না তো, মনে হচ্ছে এরাও কবিত্বরসে সিঞ্চিত, ছাপার অক্ষরে প'ড়েও কিছুটা বিচলিত হচ্ছি না তা নয়।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবন-কুঞ্জবনে॥
এল হৃদয়-শিকারে,
এল গোপন পদ-সঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণ-বিজড়িত অন্ধকারে॥
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য পরীক্ষা
হানে সাধুর সাধন দীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে॥

হ্যাঁ, বিচলিত হচ্ছি, যাকে বলে মনে একটা 'ভাব' জাগছে, কিন্তু তার কারণ কি এই শব্দবিন্যাস, না কি আমাদের বহুশ্রুত সংলগ্ন সুরের স্মৃতি, সে-বিষয়ে মনস্থির করা সহজ হচ্ছে না। এই অংশটিকে নিতান্ত কবিতা হিশেবে গ্রহণ করলে সপ্তম ও অষ্টম পংক্তি স্বরবৃত্ত ব'লে স্বীকার্য হ'তে পারে, নবম ও দশম পংক্তির দীর্ঘস্বর দীর্ঘায়িত ক'রে পড়লে সেখানেও ছন্দ পাওয়া সম্ভব, অন্ত্যানুপ্রাস প্রচুর তা তো স্পষ্ট দেখছি, তৎসম শব্দের ভিড়ের মধ্যে 'শিকার' ও 'বেড়াজাল'-এর মতো দৈশিক শব্দের অভিঘাতও লক্ষণীয়—অথচ মোটের উপর স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই যে এই স্তবক পঠিত হবার জন্য লেখা হয়নি, সুরের সংযোগে গান

হ'য়ে ওঠাতেই এর সার্থকতা। অর্থাৎ, রচনাটি গদ্য-পদ্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় দোলায়িত হ'য়ে আছে, সাহিত্যবিচারে এর সংজ্ঞার্থ অস্পষ্ট।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'ও এই একই পদ্ধতিতে রচিত, কিন্তু তার কোনো-কোনো অংশে গদ্য পেয়েছে স্পষ্ট রূপ, আর সেই কারণে আমি একে সহচর নাটক দুটি থেকে একটু আলাদা ক'রে নিতে চাই। এর প্রথম লেখন একটি গদ্য নাটিকা, অন্য দুটি কাব্য থেকে রূপান্তরিত, এই পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। উপরন্তু, 'চণ্ডালিকা'র বিষয়বস্তুটিও এক বিশেষ অর্থে মানবিক, এবং তার রচনাশৈলী বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় এতে আভরণ বিরল, পদে-পদে মিলের ঝংকার নেই, স্থানে-স্থানে পদ্য ছন্দের আভাস পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে গদ্যের সরলতাকে বরণ ক'রে নিয়েছে। কাব্য-নাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ভুলতে পারেনি, 'পরিশোধ' কবিতার স্মৃতি 'শ্যামা'কে জড়িয়ে আছে, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ কোনো কালে পদ্যরূপ দেননি, নৃত্য-নাট্যটি তার অগ্রজ এক গদ্য নাটিকার অনুলেখন; আর সেইজন্যই গদ্য এখানে কোথাও-কোথাও সাবলীল ও স্বাবলম্বী। পদ্য ভেঙে অপদ্য রচনা করা দুরূহ, কিন্তু টানা গদ্য ও গদ্যকবিতায়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচনাগুলিতে ব্যবধান এতটা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছিলো যে একটি পত্রকে নতুন ক'রে সাজিয়ে তিনি 'পুনশ্চ'র 'বাসা' কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। অনুরূপ উপায়ে 'চণ্ডালিকা'ও লাভবান হয়েছে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণ উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ('চণ্ডালিকা' গদ্যনাটিকা)

এই অংশটিকে অসমপংক্তিক রূপে সাজিয়ে দেখা যাক:

সেদিন রাজবাড়িতে
বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর।
মা-মরা বাছুরটাকে
নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে।
কখন সামনে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু,
পীত বসন তাঁর।
বললেন, 'জল দাও।'
প্রাণ উঠল চমকে,
শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে।

গদ্য-কবিতা হ'লো কি? নিশ্চয়ই—কিন্তু সুরে বসাবার উপযোগী হয়তো হ'লো না, অন্তত কোনো করুণ রসের সুরের পক্ষে 'নাওয়াচ্ছিলুম' কথাটার বেড়া টপকানো শক্ত হবে। সুরের গরজে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু মাত্র পরিবর্তন ক'রে রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় লিখলেন:

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।

মিল নেই, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন '[illegible]র বোল' তাও শোনা যাচ্ছে না; এর মনোমুগ্ধকর সুরের সঙ্গে যদিও আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত, তবু সেই সুরের স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে—'করাতে-ছিলেম' ক্রিয়াপদে মৌখিকতার অভাব সত্ত্বেও এই অংশটিকে গদ্য-কবিতা হিশেবেই পাঠ করা সম্ভব। তাহ'লে বলা যেতে পারে যে এই হচ্ছে সত্যিকার গদ্য-গান। বাইরের চেহারা একেবারেই গানের মতো নয়, বিষয়বস্তুও নিতান্ত আট-পৌরে, মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের মুখের কথাই গান হ'য়ে উঠলো। সুর-মন্দিরে যে-সব প্রসঙ্গের প্রবেশের অধিকার ছিলো না, একটি অস্পৃশ্যার সঙ্গে সেই অস্পৃশ্যদেরও মুক্তি দিলেন আমাদের কবি। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়গুলি বাংলা গানে ইতিপূর্বে স্বীকৃত হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলির অবলম্বন ছিলো কৌতুক, আর পিছনে ছিলো বিলেতি মিউজিক-হল-এর উদাহরণ। প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল, আর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় দস্যুদের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ, সেই সাংগীতিক হাস্যরসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' উন্নত ও
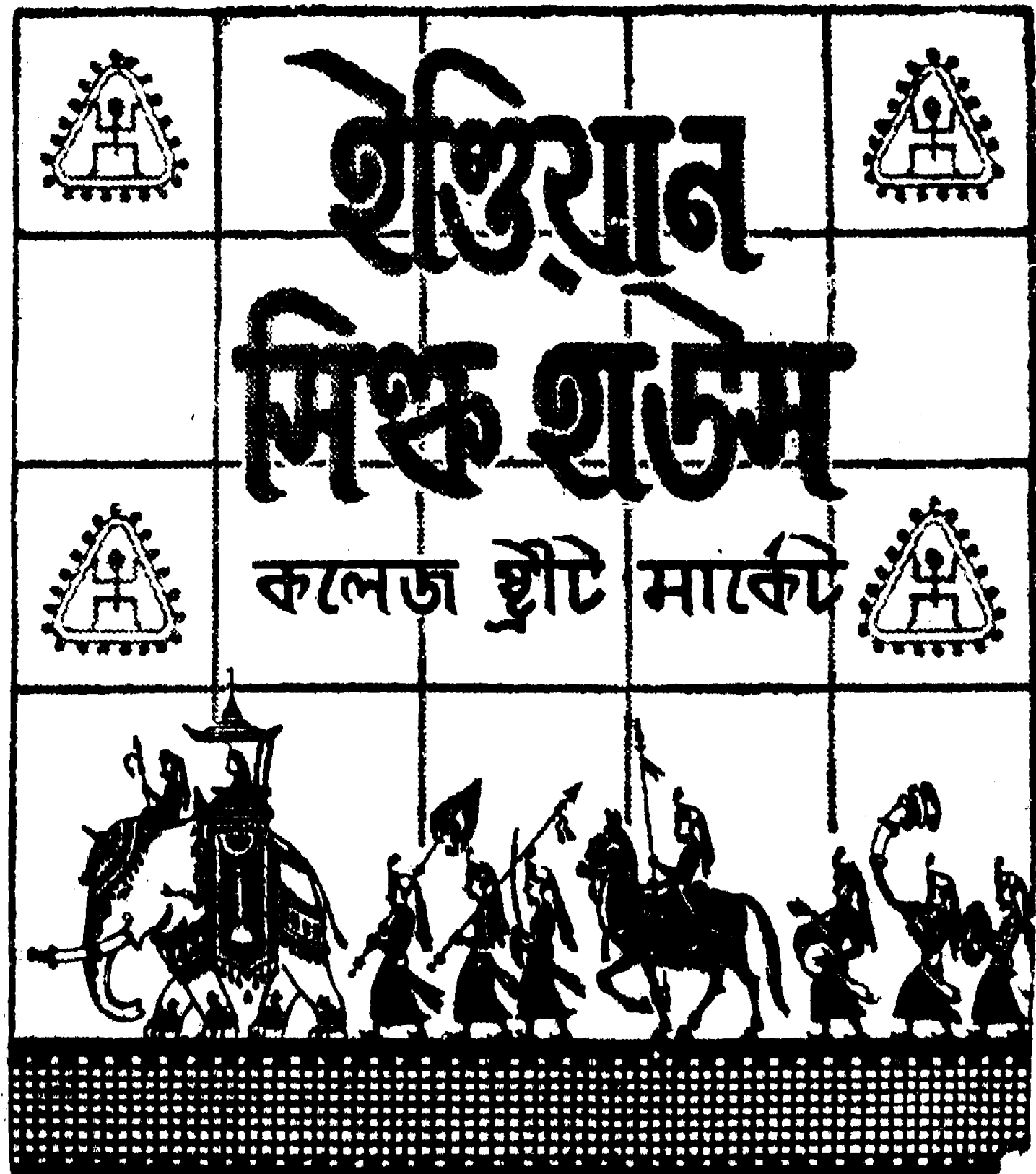
গম্ভীর ভাবের রচনা, কৌতুকের সম্ভাবনা-মাত্র নেই এখানে (যা 'শ্যামার' প্রহরীর দৃশ্যে আছে); উদ্ধৃত অংশের বেদনা ছাপার অক্ষরেও ধরা পড়ে; 'স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়। মা-মরা বাছুরটিকে'—এই অত্যন্ত শাদাশিধে কথাটিও যখন কারুণ্যে গ'লে সুরের মধ্যে মিশে যায়, তার অভিভাবে সংক্রমিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না।

অবশ্য 'চণ্ডালিকায়' 'সাধু' ক্রিয়া-পদের ব্যবহার অবিরল: 'মোর', 'হেন', 'উথলি', 'উন্ধারিতে' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দেরও অভাব নেই; এবং পূর্বোক্ত অংশটি সমগ্র রচনার মধ্যে ব্যতিক্রম ব'লেই উল্লেখযোগ্য। অন্য কোথাও এই ধরনটা নেই তা নয়, কিন্তু পুরোপুরি গদ্যের ভাষা বেশিক্ষণ বজায় থাকেনি। যেমন—

কেউ যে কথা বলতে পারেনি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও।
ঐ একটু বাণী—
তার দীপ্ত কত;
আলো ক'রে দিল আমার সারাজন্ম:
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা।

'উথলি উঠল' গদ্যে অসম্ভব, পদ্যেও অশোভন, ব্যাপারটা গান না-হ'লে রবীন্দ্রনাথ এটা লিখতেই পারতেন না। কোনোক্রমে 'উথলে উঠল' লেখা সম্ভব হ'লে এই অংশটিকেও গদ্য ব'লে আমরা মানতে পারতুম। মোটের উপর বলা যাবে না যে 'চণ্ডালিকা' গদ্য রীতি অবলম্বন করেছে, তবে তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে এটি যে সবচেয়ে বেশি গদ্য-ঘেঁষা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'গীতবিতানে'র সর্বশেষ সংস্করণের ৯৭১ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে—'চণ্ডালিকা'র বহু গান সম্পূর্ণই গদ্য ছন্দে লেখা,' এটাকে আমি সর্দভ-প্রায়প্রসূত অতিবাদ হিশেবে গ্রহণ করছি, কেননা রবীন্দ্রনাথের গদ্য ছন্দের কবিতা'র সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র গরমিলগুলো এত স্পষ্ট যে এই উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নেয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব।

এখানে স্মর্তব্য যে 'পুনশ্চ'র 'শাপমোচন' কবিতার একটি অংশে কবি সুরযোজনা করেছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে সেটি একটি গদ্য-গান হিশেবে স্বীকার্য। দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতানে'র 'প্রেম' বিভাগের চারটি গানে* আমি পদ্যছন্দ খুঁজে পাইনি, পুরোপুরি গদ্য না হোক, গদ্যের দিকে এদের উন্মুখতা স্পষ্ট, যদিও 'সাধু'ভাষা ও মাঝে-মাঝে মিলের ব্যবহারের ফলে অমনস্ক বা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এদের পদ্য ব'লে কল্পনা করা আশ্চর্য নয়।

বলা দরকার যে গদ্যকবিতা বা ছন্দোমুক্ত কবিতাও সমিল হ'তে পারে, মাঝে-মাঝে মিল বা মিলের আভাস থাকলেই প্রমাণ হয় না যে, রচনাটি পদ্যজাতীয়। যেমন, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়' গানটিতে আমরা একটি মিল অথবা অর্ধ-মিল পাচ্ছি (সন্ধ্যায়-চায়-সাধনায়-বেদনায়), 'এসো গো জেবলে দিয়ে যাও প্রদীপখানিতে' মিল আরো স্পষ্ট, কিন্তু এই গান দুটিতে কোনো বাঁধা-ধরা ছন্দ স্বীকৃত হয়নি, 'কাব্য আবৃত্তির আদর্শে' এদেরও বিচার চলবে না। আর যে-সব গান অংশত ছন্দোবন্ধ, বা যাতে একাধিক প্রকার ছন্দের ব্যবহার আছে, বা পাশাপাশি আছে ছন্দ ও ভাঙা ছন্দ, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে-প্রসঙ্গ ধরানো অসম্ভব। শুধু কয়েকটি বিখ্যাত গান উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করি। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ নেই, 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে'র আট পংক্তির মধ্যে মাত্র চারটিতে তা খুঁজে পাওয়া যায়; 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' আগাগোড়া স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান; 'আজি বারিষণমুখরিত শ্রাবণ রাতি' বা 'সঘন গহন রাত্রি'র নিয়মিত পর্ববিভাগের চেষ্টা করলে যে-কোনো ছান্দসিক পরাস্ত হবেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরই এমন গান একটি অন্তত আছে, যা রীতিমতো ছন্দোবন্ধ অথচ যাতে একটিও মিল নেই; সম্পূর্ণভাবে অমিত্রাক্ষরে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি গানের যদি নাম করতে হয় তা—'বিশ্ববীণারবে' নয়, 'নীলাঞ্জন ছায়া' নয়, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও নয়, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে যেমন আসে স্বপ্ন'—এই গানটি ঠিক তা-ই। প্রথমোক্ত রচনা দুটিতে মিল একেবারেই নেই তা নয়, দ্বিতীয়টিতে তার আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, আর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বিধিবন্ধ ছন্দে রচিত নয় ব'লে অমিত্রাক্ষরের প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। মিল আছে কি নেই, এই কথাটা শুধু সেখানেই ওঠে যেখানে কাব্যছন্দ অব্যাহত; গদ্যে বা মুক্তছন্দে মিল থাকতে পারে কিন্তু মিলের জন্য পাঠকের কোনো প্রত্যাশা থাকে না। ছন্দোবন্ধ রচনা, যাতে আমরা মিল আশা করি, অথচ শিল্পিতার গুণে মিলের অভাব অনুভব করি না, 'অমিত্রাক্ষর' কথাটা শুধু সেখানেই প্রয়োজ্য। আর তারই সার্থক উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের সুরাশ্রিত কবিতার মধ্যে—হয়তো বা একমাত্র এই 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে' গানটি। এবং এটি আন্তরিক মূল্যেও গরীয়ান।

কাব্যরচনার দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্র-সংগীতে বৈচিত্র্য যে কত বিপুল তা আমরা গীতমুগ্ধ হ'য়ে সব সময় মনে রাখতে পারি না; তবু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা অসম্ভব যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় তাঁর গান যেমন একটি বড়ো অংশের অধিকারী, তেমনি—শুধু সুর নয়—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির কারু-শিল্পেও তাঁর কৃতি এখানে অপর্যাপ্ত। আমার বিশ্বাস, শেষ জীবনে নিরন্তর রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না-হ'লে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-গানের আরো স্পষ্ট ও সপ্রতিভ কোনো আকৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, ব্যাপারটা এ-রকম পদ্য-গদ্যের মধ্যবর্তী অনিশ্চয়তায় সমাপ্ত হ'তো না। কিন্তু এই রাস্তাটি তিনি খুলেছিলেন মাত্র, মৃত্যু তাঁকে অগ্রসর হ'তে দেয়নি, এবং এই বিশেষ পথে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো যাত্রী নেই। *

* ২০৫, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮ নম্বর গান, প্রথম পংক্তি যথাক্রমে, 'ওগো পড়োশিনী,' 'ওগো স্বপ্নরূপিণী,' 'ওরে জাগায়ো না' ও 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল'। শেষোক্তটি প্রায় মিলবর্জিত। হয়তো অনুরূপ উদাহরণ আরো আছে, যা আমি লক্ষ করিনি, বা এ-মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

* আমার পূর্বপ্রকাশিত একটি লেখার কোনো-কোনো অংশ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

ভাগ্য

লীলা মজুমদার

তক্তাঘাট থেকে আউটরাম ঘাট পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়ে পায়ে হাঁটবার যে সরু পথটা গেছে, সেইটি হোল এ অঞ্চলে মন খারাপ করবার সব চাইতে উৎকৃষ্ট জায়গা। ইলিশমাছের সময়টুকু বাদ দিয়ে একটু দেরি করে ওখানে যেতে হয়, যখন সন্ধ্যা বেলায় হাওয়া-খাওয়ার দল বাড়ি চলে গেছে, অথচ নিশাচরদের বেরুবার ঠিক সময় হয়নি। এখন ঐখানে আধ অন্ধকারে একলা একটি বেঞ্চিতে বসতে হয়। শহরের কোলাহল কানে আসে না, আলোগুলো স্তিমিত, গঙ্গা থেকে কেমন একটা কুয়াশা ওঠে, নৌকো নিঃশব্দ ছায়ার মতো, মানুষেরা অন্য কোনো লোকের জীব, জাহাজের বাঁশি ব্যর্থতায় ভরা। হতাশার পক্ষে এর চাইতে ভালো জায়গা আর কি হোতে পারে। তবে ওখানে কপালও জোর।

এই যে এখন আমাকে দেখছেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ পরিজন কেমন আমাকে ঘিরে রয়েছে, ঘরভরা প্রেম আর শান্তি নিয়ে জীবনের সায়ংকালটাকে কাটাচ্ছি, দেখে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের চোখ টাটাচ্ছে, এক দিন এসবের কিছুই আমার ছিল না। এমন একটা দীনহীন বিফল হতভাগা ছিলাম যে কেউ আমাকে হিংসে করার সম্ভ্রমটুকুও দিত না। তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হোতে পারে বলুন। সারা জীবনে এতটুকু রঙের ছোপ লাগেনি। সখও ছিল, লোভও ছিল যথেষ্ট, অথচ সদুপায়ে কিছু লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, অসৎপথে যাবার সাহস ছিল না। তার ওপরে প্রেমে পড়লাম আমাদেরি প্রতিবেশীর কন্যা মনোরমার সঙ্গে, আমি বলে যে একটা মানুষ আছি সে তা লক্ষ্যও করত না। বলা বাহুল্য কর্মস্থলে মানসম্মান মাইনে আমার ছিল সবার চেয়ে কম। এমনিতেই কম অপ্রিয় ছিলাম না আমি।

এই সময় গঙ্গার ধারের ঐ জায়গাটাকে আবিষ্কার করেছিলাম। ক্রমে নিজের হতাশা নিজের কাছে একটা বিলাসের মতো হয়ে দাঁড়াল, কি যে ভালো লাগত বিষণ্ন বিমর্ষ সন্ধ্যাবেলাকার ঐ নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য উপভোগ। এর পরিণাম কি হোত বলতে পারি না, যদি না এক দিন সেই লোকের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হোয়ে যেত, যার কাছে আমি আমার সমস্ত সাফল্যের জন্য ঋণী।

একটা নৌকো থেকে নামল লোকটা ঠিক যেখানে গাছের ছায়া সব চাইতে গাঢ়। পাড়ি বেয়ে উঠে এসে আমারি পাশে বসল, একটু লম্বা গড়ন, কোঁকড়া চুল, পাৎলা ছিমছাম চেহারা, কালো মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, কড়ে আঙুলে কালো পাথর বসানো আংটি তাতে সোনা দিয়ে উলটো হরফে কি যেন লেখা, তাকে ঘিরে রয়েছে একটা মিষ্টি সুগন্ধ তামাকের না আতরের না কিসের যেন। আর সারা গায়ে ভারি একটা সাফল্যের ছাপ। আমি ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে উঠলাম। হাতের ক্যামেরা নামিয়ে রেখে সে বললে,

"মাথা তুলে বুক চিতিয়ে বোস। ঐরকম একটা নুয়ে পড়া মিইয়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে কেউ কখনো সাফল্য লাভ করে?"

বললাম,

"আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।"

সে বললে,

"তাতেও খুব সফল হবে বলে মনে হয় না। গলায় কম্ফর্টার বেঁধেছ কেন? ওটা খুলে ফেলে দিয়ে খালি গায়ে এই শীতে ঐ লিকলিকে চেহারা নিয়ে খানিক বসলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। নয়তো এ সময় কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই, জলে ঝুপ করে নেমে পড় না কেন? আমি কিছু বলব না কথা দিচ্ছি, পা ভেজালে আমার সর্দি লাগে। সে কষ্টের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কষ্টের তুলনা হয় না। নাও, ওঠ, ঝাঁপ দাও। সাঁতার জানো না নিশ্চয়ই? আর জানলেও, কুমীর আসে মাঝে মাঝে, নিমোনিয়া আছে, কিছুতে যদি পা জড়িয়ে যায় তবেই তো হোয়ে গেল। নেমে পড়।"

বললাম,

"ভয় করে যে, যদি ডুবে যাই।"

লোকটা কাষ্ঠ হেসে বললে,

"তবেই তোমার মরা হোয়েছে? কিন্তু মরবার ইচ্ছেটা হোল কেন শুনি।"

আমার সারা জীবনের ব্যর্থতার কথা বুঝিয়ে বললাম, মনোরমার প্রতি আমার ভালোবাসার বিফলতার কথা বললাম।

সে লোকটা সহানুভূতি জানিয়ে বললে,

"কিন্তু তাই বলে তো হতাশায় গা ঢেলে দিলে চলবে না। আমাকে দেখ, একদিন আমার জীবনও তোমারি মতন বিফলতায় ঠাসা ছিল। সেসব দিনের কথা আর কি বলব তোমায়। ভাবতে পারো জীবনে কোনো পরীক্ষায় পাশ করিনি, কোনো চাকরি রাখতে পারিনি, একটা লটারি জিতিনি, একটি ভালো বন্ধু পাইনি, কোনো ভালো শিক্ষাও পাইনি। জানো, যে রাত্রে আমি বাড়ি ফিরতাম না হয়তো আমার কোনো দুর্ঘটনা হোয়েছে মনে করে আমার বাড়ির লোকরা মোড়ের দোকান থেকে চপ কাটলেট এনে খাওয়া-দাওয়া করত; পাড়ার লোকে এসে তাদের অভিনন্দন করত।

অথচ এখন আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছ, তার দাম কত জানো? হিসেবের সংখ্যা পাবে না। সাধারণ জিনিস নয় এসব, প্রত্যেকটির একটা করে বিরাট ইতিহাস আছে, জিনিসের যা দাম, তার দাম তার চাইতে শতগুণ বেশী। এই দেখছ মার্কিনী সোনার সীলমোহর-করা হাতঘড়ি, এক মাস জলে চুবিয়ে রাখলেও এতটুকু টসকাবে না। এর ইতিহাস শুনলে তুমি শিউরে উঠবে, প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হোয়ে যাবে। জানো এক মাস সমুদ্রের তলায় পড়ে থাকার পর, মরা জলদস্যুর হাতের কব্জি থেকে ডুবুরি নামিয়ে একে তোলা হোয়েছে। টাকা দিয়ে এর দাম হয় না।

কামিজের হাতার বোতাম দুটোকে একটু নজর করে দেখ, এগুলো হোল সত্যিকার বৈদূর্যমণি, এরকম লাল বৈদূর্যমণি পৃথিবীতে দুচারটের বেশি পাওয়া যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি প্রবাল দ্বীপের দেবতার চোখ ছিল এদুটো, প্রাণ হাতে করে ইংরেজ নাবিকরা এগুলো খুবলে এনেছে। পরে আর রাখতে পারেনি। সেই আমার কাছেই এসেছে। অত দাম দেবে কে?

এই দেখ আমার সিগারেট কেস, হয়তো ভাবছ নিকেলের তৈরী? শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, কারণ ওটা হোল খাঁটি

প্লাটিনাম, ওজন মতো হীরের সমান দামী। কোণায় হীরে দিয়ে, নীলা দিয়ে এস্ এস্ লেখা দেখেছ? ঠিক যেন দুটো সাপ জড়াজড়ি করে রয়েছে, ঐ হোল গিয়ে আমার নাম, শম্ভু সামন্ত। ওটা আমাকে কে দিয়েছে জানো? খোল, ভয় কিসের, খুললেই দেখ না?"

একটু চাপ দিতেই কেস্‌টি গেল খুলে, আর সেই সামান্য আলোতেও আমার চোখ গেল ঝলসে। অমন রূপসী মেয়ে যে হোতে পারে এ আমি ভাবতেও পারিনি। ঢাকনির ভেতরে রঙিগন মীনেকরা মুখ, কি বা তার ডোল, কি বা তার বর্ণ, চোখদুটো যেন পদ্ম-ফুল, চুলগুলো কালো আঙুরের থোপা। দেখে দেখে চোখ ফেরাতে পারি না। এর কাছে মনোরমা যেন স্বর্গের পাখির পাশে দাঁড়কাক। বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

আস্তে আস্তে আমার হাত থেকে কেসটা নিয়ে, বন্ধ করতে করতে লোকটা বললে,

"ও আর কি দেখছ, ঐ রকম বিশ পঁচিশ জনকে এনে এখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই তেমন শক্ত কাজ নয়। আরে, এ আর এমন কি, আমার জলপায়রাকে যদি একবার দেখতে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত। পাঁচটি মহাদেশে পাঁচটি বিয়ে-করা বৌ রয়েছে, কিন্তু ওর কাছে দাঁড়াতে পারে এমন একজনও নয়।"

অনেকক্ষণ চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল শম্ভু সামন্ত, পকেটে দেখলাম দু দুটো সোনার কলম। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল,

"আমার পায়ের জুতোটা লক্ষ্য করেছ কি? নরম যেন মখমল। এই দেখ, খুলে কেমন দুমড়ে ভাঁজ করে ফেলছি, পায়ে দিলে মনে হয় যেন পায়ে পাখা গজিয়েছে। এ জুতো পরলে আর গলায় কম্ফর্টার বেঁধে কলকাতা শহরের একটা বেঞ্চিতে বসে মৃত্যু কামনা করতে না। সত্যি কথা বলতে কি অ্যামেরিকা না গেলে এ জুতো পেতেও না কোথাও। এর প্রত্যেকটি ফোঁড় হাতে তোলা তা জানো, কোথাও একটা কাঁটা কি পেরেকের ব্যবহার নেই। জাহাজের ডেকে এই সবচেয়ে ভালো। তবে তোমাকে বেচলেও এর দাম উঠবে না।"

পকেট থেকে একটা সবুজ রঙের চোঙা বের করে তাতে একটা সিগারেট ভরে বলল,

"এটা কাঁচের নয়, সত্যিকার জেডের। মধ্য এশিয়াতে তৈরী, নরুন দিয়ে হাতে কেটে নক্সা করা। ঐ যে আগুনের হল্কার ওপর দুটি পাখির ডানা দেখছ, ওর মানে এর নকল হয় না। এর দাম বলব না, লজ্জা পাবে।"

মনে মনে মরে গিয়ে ওর পাশে বসে থাকলাম। একটা ভালো আংটি কিনে যে মনোরমাকে দেব সে সঙ্গতিও আমার নেই। আর আমার মতো একটা নিঃস্ব লোকের কাছ থেকে আংটি নেবেই বা কেন মনোরমা। ঐ লোকটার কাছ থেকে ঐসব বহুমূল্য জিনিসের একটা দুটো হাতাবার এমন সব বে-আইনী ও অব্যর্থ উপায় মনের মধ্যে দিয়ে খেলে গেল যে নিজেই নিজের অজান্তে শিউরে উঠলাম।

লোকটাও যেন আমারি চিন্তার খেই ধরে, সবুজ জেডের চোঙায় পরানো সিগারেটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে নিচু গলায় বললে,

"অথচ কত সহজে এ সমস্তই তোমার হোতে পারে?—আচ্ছা, অত রোগা কেন তুমি? কি খাও? মাখন দিয়ে রান্না করা হাঁস খেয়েছ কখনো, এতটুকু জল দিতে হয় না, স্রেফ নোনতা মাখনে কাঠ-কয়লার ওপর অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ। খেলে তোমার শিরায় জলের বদলে রক্ত ছুটতে আরম্ভ করে দেবে।"

ছোট কি একটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে বললে, "ওটা কি ফেললাম জানো? একটু মৃগনাভি। বাসি হোয়ে গেছে কিনা, গন্ধটা আর ভালো লাগছে না।" পকেট থেকে একটা রেশমি রুমাল বের করে হাওয়ায় একটু নেড়ে দিলে, ভুর ভুর করে উঠল কি একটা গন্ধ, যা নাকে গেলে মনে হয় এখুনি বাড়িঘর কাজকর্ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। রুমালটাকে আবার পকেটে গুঁজে বললে,

"যেটা ফেললাম, সেটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশিই হবে।"

গলায় আমার ব্যথা করতে লাগল। ভগবানের এ কি দারুণ অন্যায়? ভাঙা গলায় বললাম,

"কি করে আপনার কপাল ফিরল।"

সে হেসে উঠল,

"কি করে ফিরল? ঠিক এমনি করে, এমনি একটা বিষণ্ণ বিমর্ষ সন্ধ্যাবেলায়, তোমারি মতন এমনি হতাশ ভাবে ঠিক এইখানেই বসেছিলাম। এমন সময় আমারি মতন একটি লোক অন্ধকারে নৌকো থেকে নেমে এমনি করেই আমার পাশে বসল, তার হাতেও ঠিক এই রকমই একটি ক্যামেরা। সে আমাকে বললে, কি হোয়েছে কি তোমার? খেতে পাও না? আমি তোমাকে পৃথিবীর সেরা খাবার খাওয়াব। শীতের কাপড় নেই? আমি তোমাকে মিঙ্কের লাইনিং দেওয়া কোট করে দেব। ঘরবাড়ি নেই? আমি তোমার ওয়াল্ডর্ফ-এস্টোরিয়ার মতো বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেব।"

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শম্ভু সামন্ত বলল,

"দিয়েছিলও সব। রাজা করে দিয়েছিল আমাকে। এখন সে ব্যাটা সন্ন্যাসী হোয়ে যাওয়াতেই হোয়েছে যত মুস্কিল।"

তারপর সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে,

"হবে বড়লোক? মনোরমার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী বৌ হবে—"

সারা গা আমার ঐ শীতে ঘেমে নেয়ে উঠল। বললাম,

"তার আগে কি করতে হবে আমাকে?"

সে অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,

"কি করতে হবে? স্রেফ কিচ্ছু না।"

"কিচ্ছু করতে হবে না? এমনি এমনি বড়লোক করে দেবে?"

"তা নয় তো কি; নইলে আর বলছি কি। কিছুই করতে হবে না, শুধু মাঝে মাঝে যখন যেখান থেকে বলব ঐ রকম একটা ক্যামেরা নিয়ে, যেখানে বলব সেখানে পৌঁছে দিতে হবে।। আমি নিজে বলব না, আমার লোক এসে তোমাকে বলে যাবে। খুব সাবধানে কাজ করতে হবে, আমার লোক ছাড়া কাকেও দেবে না।"

"কি করে চিনব তোমার লোককে? যদি ভুল করি।"

লোকটা বিরক্ত হোয়ে বলল,

"ভুল করা যেমনি সাংঘাতিক, তেমনি অসম্ভব। চিহ্ন দেখে আমার লোক চিনবে, আবার কি করে চিনবে। আগুনের হল্কার ওপরে দুটি পাখির ডানা।"

রেশমি কামিজের বোতাম খুলে যেই সেই চিহ্ন দেখাসে, আমি আমার সিটি দিলাম। দেখতে দেখতে ঝোপ-ঝাড় থেকে, অন্ধকার নৌকো থেকে পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেলল। আমি ওদের গোয়েন্দা দলের সবচাইতে কম মাইনের লোক। বে-আইনী হীরের ব্যবসার তদন্ত করছিলাম, সন্দেহ করি কিন্তু প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। তার নাম সত্যিই শম্ভু সামন্ত, বে-আইনী হীরের কারবারিদের পাণ্ডা। তাকে ধরবার জন্য এক বছর ধরে কতই না চেষ্টা হোয়েছে। শেষে আমার হাতেই ধরা দিল, সঙ্গে ক্যামেরা ঠাসা হীরে! আমার নাম-ডাক হোল, উন্নতি হোল, ওসব একবার হোলে আর কেউ রুখতে পারে না। সত্যিই আমাকে রাজা করে দিয়েছিল সে। মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে, আবার ঝেড়ে ফেলে দিই। এই আমাদের কাজ। দেখবেন গিয়ে, একবার জায়গাটি, সন্ধেবেলায়, হাওয়া-খাওয়ারা গেলে পর, নিশাচরেরা বেরুবার আগে। ঐখানে নৌকো থেকে নামত সে।

॥পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়॥

তুষারকান্তি ঘোষ

মালব দেশে ছিল মালবীয়দের আদিপুরুষদের বাস। আর মালব থেকেই মালবীয় নামের জন্ম। যে পরিবারে মদনমোহন মালবীয় জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি ছিল। পিতামহ প্রেমধর, আর পিতা ব্রজনাথ, দুজনেই পণ্ডিত হিসেবে এলাহাবাদে সুপরিচিত ছিলেন। ব্রজনাথ গীতার যে সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন, তা প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল।

এমন বংশে জন্মগ্রহণ করে বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষা প্রচারই যে মদনমোহনের জীবনের অন্যতম কর্তব্য হয়ে উঠবে, এটাই বোধ করি স্বাভাবিক।

১৮৬১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, এলাহাবাদে মালবীয়জীর জন্ম। কিছুদিন বাড়িতেই হিন্দি ও সংস্কৃত শেখার পর তিনি জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ক্রমে প্রবেশিকা, এবং পরে এলাহাবাদ মিয়র কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু এখানেই শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। পরে দেশসেবার আহ্বান ও আইন ব্যবসায়ের সাফল্য সত্ত্বেও, শিক্ষার প্রসারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অটুটই ছিল। তিনি যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, তখন মহামতি গোখলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব সভায় পেশ করেন। মালবীয়জী শুধু প্রস্তাবটি সমর্থনই করেন নি, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করার জন্যে তিনি যে জোরালো বক্তৃতা করেছিলেন, তা আজো স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে মালবীয়জীর প্রধান কীর্তি—বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মোটেই সহজ কাজ নয়;—এর জন্যে তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অর্থ-সংগ্রহের জন্যে তাঁকে সারা ভারত পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল; আর ব্যবস্থাপক সভায় আইন রচনার জন্যেও তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। নিজের আদর্শ অনুযায়ী, শিক্ষা প্রচারের জন্যে তিনি যে বৃদ্ধ বয়সেও কতদূর পর্যন্ত শ্রম স্বীকার করতে রাজী ছিলেন, বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয় তারই উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে আছে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

কিন্তু তবু শুধু শিক্ষা প্রচারের কাজেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। দেশসেবার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন—অতি অল্প বয়সেই। তিনি যখন মাত্র ২৫ বছরের তরুণ, তখন থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের শুরু। আর একেবারে শেষ বয়সের আগে, সেই সম্পর্ক ছিন্নও হয়নি।

কংগ্রেস নেতাদের প্রথম সারির একজন হয়ে ওঠেন মদনমোহন, ১৯০৯ সালে,—যখন তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসেও তিনি সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন।

মালবীয়জীর কর্মজীবনের একটা বৃহৎ অংশ ব্যবস্থাপক সভার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ১৯০২ সালে ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্রপাত। ঐ সময়ে তিনি যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। শাসন-ব্যবস্থার যখন সংস্কার হ'ল, তার পরেও তিনি আবার সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তবে মালবীয়জীর খ্যাতি যথার্থ প্রচারিত হয় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের পর। এই সভায় তাঁর মুদ্রাযন্ত্র নিয়ামক আর রাজদ্রোহ সংক্রান্ত আইনের বিরোধিতা, স্মরণীয় হয়ে আছে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে তিনি এই সভা থেকে পদত্যাগ করেন।

বৈধ আন্দোলনের সাহায্যে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা ছিল মালবীয়জীর উদ্দেশ্য। ১৯০৮ সালে, বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময়েও তিনি এই মতই প্রকাশ করেছিলেন।

জাতীয় স্বার্থে যতোটা সম্ভব সুবিধা আদায়ই, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তবু অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি কখনোই পশ্চাদপদ হননি। আর এ-প্রসঙ্গে অন্ততঃ দু'টি ঘটনা বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো। তার একটি হল ভারতের বাইরে, চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। প্রধানতঃ মালবীয়জীর যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ফলেই লর্ড হার্ডিঞ্জ এই ব্যবস্থা রহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর দ্বিতীয়টি হল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে

মদনমোহন মালবীয়

রিপোর্ট রচনার উদ্যোগ। ১৯১৭-১৯১৮ সালে, দিল্লী কংগ্রেসের পর, পাঞ্জাবের সামরিক শাসন সম্পর্কে তদন্তের জন্য মালবীয়জী একটি সাব্-কমিটি গঠন করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এম আর জয়াকর আর স্বয়ং গান্ধীজী তাঁকে এই রিপোর্ট রচনায় সহায়তা করেন। আর এই রিপোর্টের ফলেই পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসকদের বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে সত্য তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এর পরে, মালবীয়জীকে আমরা সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখতে পাই, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে, ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় দু'বার কারাবরণে, ১৯৩২ ও '৩৩ সালে কংগ্রেসের নিষিদ্ধ অধিবেশনে সভাপতিরূপে, আর সর্বোপরি ১৯৩১ সালে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে।

সেই সময়ে, আরো অনেক খ্যাতিমান দেশনেতার মতো, মালবীয়জীও অমৃত-বাজার পত্রিকার ঘোষ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। (আমার কাকামশাই) স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কলিকাতায় এলেই তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন।

মালবীয়জীকে শেষ জীবনে দেখতে পাই, হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে প'ড়েছেন। তিনি দু'বার মহাসভার সভাপতি পদেও বৃত হন।

কিন্তু শুধু রাজনৈতিক কারণেই তিনি হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হননি, হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃই হয়েছিলেন। কৈশোরেই তিনি "হিন্দু সমাজ" নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ও শ্রেণীর হিন্দুদের একতাবদ্ধ করাই ছিল এই সমাজের উদ্দেশ্য। পরবর্তী জীবনেও মালবীয়জী হিন্দুধর্মের পোষকতার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

অবশ্য, ধর্ম বলতে ধর্মের গোঁড়ামি কখনোই তাঁর সমর্থন লাভ করেনি। তাই পরবর্তীকালে শুদ্ধি-সংগঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, আর সর্ব শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মিলনসাধন, তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ যে মানবধর্ম, তারই প্রকাশ দেখতে পাই মালবীয়জীর এই সকল কর্মের মধ্যে।

আজ মালবীয়জীর জন্মের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে তাঁর দেশবাসী এই দেশনেতা, সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সদাপ্রস্তুত, মানবপ্রেমিককে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে। (কলিকাতা আকাশবাণীর সৌজন্যে)

মতামত

মহাশয়,

গত কয়েক সংখ্যা 'অমৃতে' পত্রিকায় হিন্দি ভাষায় বাংলা অনুবাদ নিয়ে যে সব আলোচনা চ'লছে, তা উৎসাহের সঙ্গেই পড়লাম। এর একটা কারণ অবশ্য আমার এই প'য়তাল্লিশ/ছে'চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর উত্তর-প্রদেশেই কেটেছে। আমার জন্ম এলাহাবাদে। এখনো দেশ ব'লতে সেইটেই বুঝি।

গত ২২এ ডিসেম্বরের অমৃত পত্রিকায় ডাঃ রমানাথ ত্রিপাঠীর পত্রখানা প'ড়ে ভাল লাগলেও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারলাম না। সত্যিকারের সাহিত্যিক বাঙালীরা হিন্দির দুর্নাম করেন বলে আমার জানা নেই। বরং বহু বাঙালীকে জানি যাঁরা হিন্দি ভাষায় বিস্তর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যে সব বাঙালী অন্য কোনো ভাষাকে ছোট জ্ঞান করেন, তাঁরা প্রকৃত সাহিত্যিকদের কখনোই সমর্থন পান না। অমন দু'চারজন বে-হিসেবি লোক সব ভাষাভাষীদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

আমার মতে হিন্দি অত্যন্ত সুললিত ভাষা। বাংলার 'মদন' কথাটিকে যদি হিন্দিতে "ম্যাদন" বলি তাহলে মিষ্টি শোনায়। কিন্তু বাংলার যে নিজস্ব উচ্চারণ আছে তাকে ঠিক অশুদ্ধ বলি কি ক'রে। আবার কতগুলি শব্দে বাংলার মিষ্টতা অননুকরণীয়—সব ভারতবাসীরাই তা স্বীকার ক'রেছেন। ছেলেমেয়েদের নামকরণ তাই বাংলা নামের মতন করেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

হিন্দি সাহিত্যের কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ, 'নিরালা' মহাদেবী ভার্মা—পৃথিবীর যে কোনো ভালো সাহিত্যিকদের সমতুল্য। বর্তমানে নাট্য-সাহিত্যেও হিন্দি খুব উন্নতি সাধন ক'রেছে। অনুবাদ সাহিত্য হিন্দির অমূল্য সম্পদ। হিন্দির অতীত-সাহিত্য ভারতের এক মহা গৌরবের অধ্যায়। তুলসীদাস, মীরাবাই, কবীর, দাদু—এঁদের গান ও কবিতা বহু বাঙালীর মুখে বহুবার ক'রে শুনি।

পরবর্তী যুগে উর্দু ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুর কিছু উন্নতি সাধন হ'য়েছে কিন্তু হিন্দি ভাষা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার কারণ উর্দুই ছিল তখন শিক্ষিতদের ভাষা। খুব প্রতিভাশালী হিন্দি লেখকেরাও তাঁদের অনেক ভাল লেখা উর্দুতে লিখেছেন। প্রেমচাঁদ তাঁর কিছু বহুমূল্য গ্রন্থ উর্দুতে লিখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর হিন্দি ভাষার ভেতর উর্দুর প্রচুর প্রভাব আছে। এসব ছাড়া হিন্দি-পাঠক সম্প্রদায়ও হিন্দি ভাষার মূল্য তেমন দেননি। আমার যুক্ত-প্রদেশীয় অনেক বন্ধুকে ব'লতে শুনেছি "হিন্দি গল্পতো মেয়েরা পড়ে।" অর্থাৎ যারা কম শিক্ষিত তারাই পড়ে। মেয়েদের প্রতি ও মাতৃভাষার প্রতি এই অবজ্ঞাই হিন্দিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কোথায় কোন্ অর্ধশিক্ষিত বাঙালী তার নিন্দা ক'রেছে তার জন্য হিন্দির কোনো ক্ষতি হয়নি। এবং তাতে দুঃখ পাবারও কিছু নেই।

"ক'লকাতার হিন্দি" বলে ডাঃ ত্রিপাঠী যে অবজ্ঞা ক'রেছেন সেটা তাঁর মত লোকের কাছে ঠিক শোভা পায় না। তথাকথিত ইংরাজী-পন্ডিতেরা এক সময় আমাদের ইংরিজীকে ঠাট্টা ক'রে Babu English ব'লতেন। এও যেন অনেকটা সেই ধরনের হ'লো। হিন্দি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা বা বলা অ-হিন্দি প্রদেশের লোকদের কাছে হয়তো কিছুটা শক্ত। যেমন ইংরেজের মত ক'রে আমরা ইংরিজি ব'লতে পারি না। (অনেকে হয়তো পারেন)। সেই অক্ষমতাটুকু ক্ষমার চোখেই দেখা উচিত। ভিন্ন ভাষাভাষীরা ভুল হিন্দি বললেও আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে হিন্দি সাহিত্যেরই উন্নতি হবে। যেমন হ'য়েছে বাঙলার। কত বিদেশী কথা এর মধ্যে অজানিত ভাবেই ঢুকে গেছে। আজ তার অনেক কথাই ভাষার সম্পদ হ'য়ে উঠেছে।

ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাও যেমন প্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত গোঁড়ামী থাকাও তেমনি বিপজ্জনক। কয়েক বছর আগে এ বিষয় লখনউতে ডাঃ রঘুনাথের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের ধারে কাছেও আমি যাই না। তবু তিনি এ-বিষয়ে আমার কথা স্বীকার ক'রেছিলেন। হিন্দিকে বিকৃত ক'রলে ডাঃ ত্রিপাঠীর যতটা খারাপ লাগবে, আমার তার চেয়ে কম লাগবে না। কিন্তু কেউ একটু ভুল বললে তা সহ্য করা যাবে না সেটাও ঠিক নয়।

রাষ্ট্র-লিপির জন্য দেবনাগরী ও বাংলা দুটো লিপিই সমান অ-পূর্ণ। ভারতের পক্ষে রোমান-লিপিই সবচেয়ে সুবিধা-জনক হবে ব'লে মনে হয় এবং তাতে বিশ্বের দরবারেও ভারতীয় মূল-সাহিত্য সহজেই স্থান অর্জন ক'রবে।

"মাথা নত ক'রে" গানটির সুন্দর অনুবাদটির জন্য ডাঃ ত্রিপাঠীকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হিন্দির গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত বোধ করি।

ইতি—ভবদীয় শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত, কলিকাতা—৩১।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

॥ ছয় ॥

তাসকন্দের সম্মেলন শেষ হচ্ছে আগামী ১৩ই অক্টোবর। আজ ১০ই। আগামী পরশু হল রবিবার, বাঙ্গলার মহালয়া, সেদিন ছুটি। একই গাছে নানা দেশের নানা বর্ণের পাখি বসেছে, যথা-সময়ে তারা যে যার আকাশপথে উড্ডীন হবে। আমাদের মহলে ডাঃ সুনীতি-কুমার তাঁর সহকারী গোপাল হালদার মহাশয়কে নিয়ে শীঘ্রই পেকিং রওনা হবেন। ডাক্তার কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী বোধ হয় দিল্লী যাবেন ১৫ই। তারাশঙ্কর যাবেন তাঁদের গাঁয়ের দুর্গাপুজোয়। যাঁরা আমাদের মধ্যে 'রেড ইন্ডিয়ান', তাঁদের গতিবিধি ও লক্ষ্য অস্পষ্ট।

আমার নিজের অদূর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এখানকার গাঁয়ের পুরনো হাটতলায় গিয়ে সর্দার মহলের সঙ্গে মিলে যদি তাদের 'চায়-খানার' আশেপাশে একটু জায়গা পেতুম, তবে দু'চার মাস গড়গড়ার তামাক এবং 'মাটন-পিলাও' খেয়ে কাটিয়ে যাওয়া যেত! আঙ্গুর আর আপেলের মরশুম না গেলে বাড়ি ফিরতুম না। আমি যেন দিল্লী-লাহোর আর মুলতান-মিয়ানওয়ালির পথে-ঘাটে ঘুরছিলুম।

ভারতীয় গোষ্ঠির আর কে কোন্ দিকে যাবেন বলা কঠিন। তবে অনেকের মতো আমারও ইচ্ছে, মস্কো! রাত্রের বিপুল ভোজসভার একধারে পাশাপাশি কয়েকটি টেবলে ব'সে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। প্রায় দেড়শ' লোক খাচ্ছে একসঙ্গে। ওদের মধ্যে মঙ্গোলদের গায়ের রং কিছু মলিন, উজবেকরা অনেকটা গৌর, এবং টুপির পশম দেখে চিনতে হয় ওদের মধ্যে কা'রা তাতার। কিন্তু ওদের সৌজন্য ও গ্রাম্য সরলতায় আমি মুগ্ধ ছিলুম। আহারাদির মাঝ-খানেই যথারীতি শ্রীধরণী ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিলেন নিরীহ সুভাষকে,— আরে সুভাষ, তুমি শ্বশুরবাড়ী এলে, কিন্তু কিছু দেখলে না—!

কমিউনিস্ট সুভাষের শ্বশুরবাড়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন যে নয়, এটি আমরা বুঝি। কিন্তু এই পরিহাস সুভাষের মতো আমরা সবাই উপভোগ করতুম। রাজনীতিক মতবাদের দিক থেকে শ্রীধরণী ও সুভাষের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কিন্তু শ্রীধরণী সুভাষের অমায়িক সৌজন্য এবং ভদ্র ব্যবহারের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে-ছিলেন!

কে কি খাচ্ছে, আমরা দেখছিনে। কিন্তু মদ্যপান করছেন না—এমন লোক খুবই কম। কেউ খাচ্ছেন লাল, কেউ হরিদ্রাভ, কেউ বা জলবর্ণ! লাল মানে ওয়াইন্, হলুদে মানে কোনিয়াক্, জল-বর্ণ মানে ভোদ্‌কা! শেষের নামটি কানে ভাল শোনায় না,—যেন স্থূল-বর্তুল চর্বিপ্রধান মাংসপিন্ড! সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নরনারীর অতিশয় স্বাস্থ্য এবং মেয়েদের চর্বিপ্রধান দেহপিন্ডগুলির দিকে তাকালে 'ভোদ্‌কা' শব্দটি বেমানান লাগে না! সম্প্রতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কোনও টেবিলেই বিনামূল্যে মদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না! দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে ভারতবর্ষ এবং আর কয়েকটি দেশে মদ্য বস্তুটি আহার্য সামগ্রীর মধ্যে অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কিন্তু এখানে অধিকাংশ ভারতীয়ই রাত্রির আহার এবং মধ্যাহ্নভোজের কালে তিন প্রকার মদ্যই ব্যবহার করছিলেন! মদ অখাদ্য নয় এবং কুকুর-বিড়ালের জন্য মদ্য প্রস্তুত হয় না! আমেরিকার হ্যানিম্যান সাহেব শিখিয়ে গেছেন, প্রতি খোরা হোমিওপ্যাথী ওষুধের সঙ্গে অন্তত এক ফোঁটা মদ খাওয়া শরীর-তন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজন! ভারতবর্ষের নিষ্ঠাবতী ব্রহ্ম-চারিণী বিধবা, মদ্যনিবারণী সমিতির সমাজপতিগণ, ভাটপাড়ার পন্ডিতসমাজ অথবা ধর্মমন্দিরের আচার্যগণ—এ'রা কোন না কোন সময় হোমিওপ্যাথী ওষুধ অবশ্যই খেয়েছেন! কিন্তু প্রশ্ন হ'ল মাত্রায়! মাত্রাবোধ যার নেই, সেই হল মদখোর, মাতাল! সম্প্রতি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ খুশ্চভ সমগ্র দেশে মদ্যপান কনট্রোল করতে বলেছেন, এটি অতি সুখের কথা। যে দেশে মদ্যপানের সঙ্গে সামাজিক অপযশ নেই এবং যেখানে পথে-ঘাটে সর্বত্রই যে কোনও সময়ে মদ কিনতে পাওয়া যায়, অথবা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে খেলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না,—সেই দেশের পথে-ঘাটে সকাল-সন্ধ্যা ঘুরেও একটি টলটলে লোক অথবা 'মাতাল' দেখতে পেলুম না এটি আশ্চর্য। কথা বলবার সময় অনেক সোভিয়েট নাগরিকের মুখে মদের গন্ধ পেয়েছি, কিন্তু একজনকেও ঈষৎ মাত্র অস্বাভাবিক বা অসামাজিক আচরণ করতে দেখিনি। আমার বিশ্বাস, এই সংযম পৃথিবীর অপর কোনও দেশে নেই। সুতরাং হোটেলের মধ্যে যদি অবারিত ভাবে এবং বিনামূল্যে মদ্য বিতরণ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, সেটি নিন্দার কথা নয়!

কোন কোনও ভারতীয় প্রতিনিধির পক্ষে অসুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় তারাশঙ্কর নিজেই একদিন তাঁর স্বোপার্জিত রুবল খরচ ক'রে তাঁদের টেবলে মদ্য বিতরণ করেছিলেন!

উপরে উঠে আসতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজল। আমাদের চাবির নম্বর নেলীর মুখস্থ। তারাশঙ্করের ৬৪, আমার ৬৬ এবং সুনীতিবাবুর ৬৮। নেলী আজ অত্যন্ত ব্যস্ত, কাগজ-পত্র থেকে মাথা তুলবার তার সময় নেই। সুতরাং ঈষৎ মৌখিক হাসি হেসে সে একে একে চাবিগুলি আংটা থেকে খুলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। আমি নিজে বিশেষ ক্লান্ত ছিলুম।

ঘরে এসে কোটটা খুলে রেখে কয়েকটা আঙ্গুর মুখে তুলেছি, এমন সময় নেলী এল। তার সাঙ্কেতিক ইংরেজিতে বলল, কাল নটা পর্যন্ত আমার ডিউটি। আপনি কিন্তু ঘুমোবেন

না। আজ আমার কাজ খুব বেশি, ঘণ্টা দেড়েক পরে আমি আসব।

ভাগ্যবিধাতা মেয়েটাকে সব দিয়েছে, দেয়নি শুধু দ্বিধা, সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা। আমি ভয় পেলুম, কারণ এটা বিদেশ বিভূঁই,—চারিদিকে অজানা মানুষের দল। কা'র মনে কি আছে জানিনে, মুখের উপর মেয়েটাকে আঘাত দিতেও পারিনে। মধ্যরাত্রে মেয়েছেলের পক্ষে বিদেশীর ঘরে আসা-যাওয়া এদেশে রীতি আছে কিনা আমার জানা নেই। তা যদি না থাকে তবে নেলীর এই আচরণ রহস্যজনক কিনা সেটি বিবেচ্য। তা' ছাড়া আমাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের বহু পার্থক্য,—তার সঙ্গে পরিহাস করাও আমার নীতিতে বাধে! সে যদি অবুঝ হয়, ছেলেমানুষী করে,—সেক্ষেত্রে আমারই সজাগ থাকা প্রয়োজন। আমার সঙ্গে রয়েছে ভারতের সম্মান, সেখানে আমার নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনীতিক দায়িত্ব বর্তমান।

আমি হাত নেড়ে শান্তকণ্ঠে বললুম, কাল সকালে চা দেবার সময় গল্প ক'রে যেও,—আজ তুমি ক্লান্তও বটে, কাজের চাপও তোমার বেশি।

নেলী চুপ ক'রে দাঁড়াল, এবং আমি শুভরাত্রি জানিয়ে আবার ঘরে ঢুকলুম। ভিতরে এসে দরজাটায় যথারীতি চাবি লাগিয়ে দিলুম। হোটেল তখন প্রায় নিশুতি হয়ে এসেছে।

দেশে ছেলেমেয়েদের কাছে চিঠি দিতে হবে। কাল একটা টেলিগ্রাম করব। তারাশঙ্কর কিছু রুবল দেবেন, ভেরার সাহায্যে কতগুলো বই দেশে পাঠিয়ে দেব। কাল সকালের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আমার প্রবন্ধ পাঠ,—সুতরাং সময় কম। আমি তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র লিখতে ব'সে গেলুম। দিনমানে পত্রাদি লেখার সময় একেবারেই পাওয়া যায় না।

খানতিনেক দীর্ঘপত্র লিখে যখন শেষ করলুম, রাত তখন প্রায় দুটো বাজে। কাঁচের কুঁজোয় জল গড়িয়ে খেয়ে যখন প্রায় বিছানায় ঢুকব মনে করছি তখন দরজায় সহসা বার তিনেক মৃদু টোকা পড়ল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, এটি বাইরে থেকে চাবির গর্তের ভিতর চোখ রাখলেই দেখা যায়। সুতরাং ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ ক'রে নীরব থাকা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুললুম। নেলী সহাস্যে ভিতরে এক

মেয়ের নিজস্ব মন আছে, তার জগৎ আছে, তার স্বাভাবিক দায়িত্ব-চিন্তা আছে! আমি কোন্ দেশের কাপুরুষ যে, আমার বিচারবোধের দ্বারা এবং আপন আত্মাভিমানের দ্বারা মেয়েদের নিজস্ব জীবনবোধকে শৃঙ্খলিত করব? নেলী যে আজ সারাদিনের প্রতিক্ষণটি জপমালার মতো গুণেছে, কেননা সে তার নিশ্চিন্ত অবসরকালে এক অজানা পরদেশীর কাছে তা'র সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথাটি বলবে! এ জীবনে যাকে আর কোনও দিন দেখব না, আর কোনও দিন যার খোঁজ-খবর নেব না, তার একটি একান্ত মিনতির যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে যাব না,—ভারতের সংস্কৃতি একথা ত' বলেনি!

ভিতরে ঢুকে নেলী এটা ওটা নাড়াচাড়া করল, এবং এক সময় টেবলের সামনে এসে বসল। এ ঘর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য তার প্রচুর,—কেননা এটি ভারতীয় মনের বাসা,—এবং এ ঘরে আশঙ্কা নেই! মেয়েটা অক্লান্ত পরিশ্রমে অভ্যস্ত, এবং লানার মতোই এটি তার চুক্তিবদ্ধ কাজ। পরিশ্রমে সোভিয়েট মেয়ে পুরুষ অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নয়। দেশের অর্ধাংশের সমগ্র দায়িত্ব মেয়ে বহন করছে। একই প্রবল শক্তি, কিন্তু ছেলে আর মেয়ে—এই দুইয়ের মধ্যে সেই শক্তির দ্বিধাবিভক্ত প্রকাশ!

আলমারির ভিতর থেকে নেলীর আংটিটা বার করলুম; সে কেবল তার বাঁ হাতের আঙ্গুলটি বাড়িয়ে দিল। পরে সে প্রশ্ন করল, আপনার কাছে জানতে এলুম, দু' বছর পরে 'কায়রোতে' আবার নাকি এই সম্মেলন হবে?

বললুম, শুনেছি বটে সে কথা। কেন, যাবে তুমি সেখানে?

আমার কলমটি নিয়ে সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। পরে বলল, কে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, কেই বা যেতে দিচ্ছে! আপনি যাবেন?

ডাকলে যাব বৈকি।

একটি সম্পূর্ণ ইংরেজি বাক্যরচনায় দু'মিনিটেরও বেশি তাকে সময় নিতে হচ্ছে। তার মনের কথাটি ভিতরে ভিতরে যেন একটি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো ঝটাপটি করছিল,—সে-যন্ত্রণা থেকে সে-পাখির মুক্তি পাওয়া দরকার। আমি এসে তার মুখোমুখি বসলুম। বললুম, নেলী, তোমার গল্পটি বল!

ছোট্ট একটি কাহিনী সেই চিরন্তন কালের—কিন্তু বেদনা তার চিরনূতন! সেখানে রাশিয়া-আমেরিকার পার্থক্য নেই, সমাজব্যবস্থার বিভিন্নতা সেখানে স্বতোৎসারণের পথে অবরোধ নয়। মেয়ের চোখে যদি অশ্রু ঝরে, তবে সেই অশ্রু ভাগ ক'রে নেয় পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের মেয়ে! সেখানে তাসকন্দ থেকে ত্রিচিনোপল্লী এবং তেহরাণ থেকে টেনেসি ভ্যালি—এদের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। ভারতবর্ষের নারীর হৃদয়ে এই নিত্যকালীন বেদনার কাহিনীকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছিলেন মহাকবি কালিদাস তাঁর শকুন্তলায়। এই কাহিনীটি প'ড়ে কেঁদে উঠেছে ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকা,—এবং দেড়শ' বছর আগেকার এই স্লাভ-তাতার দেশের অধিবাসীরাও! মানব ইতিহাসের সেই অনাদ্যন্ত কালের করুণ গল্পটি আরেকবার বাসা বেঁধেছে নেলীর অশ্রুজলের মধ্যে! তরুণ রাজকুমার দুষ্মন্ত এসেছিল মৃগয়ার অন্বেষণে, অরণ্যের উপান্তে কণ্বমুনির আশ্রম-কুটীরে যে-মেয়েটিকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল তারই বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে সামান্য নেলীও মুক্তি পায়নি! ছোট্ট কাহিনী হল এই :

প্রেসিডেণ্ট নাসের এসেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নে কিছুকাল আগে। তাঁর সঙ্গে যে দেহরক্ষী দলটি এসেছিল, তাদেরই মধ্যে প্রাক্তন মীশরীয় রাজবংশের একটি তরুণ কুমার নেলীর প্রতি আসক্ত হয়, এবং সেই ছেলেটি বুঝি তার দলের কাছে ছুটি নিয়ে তিন সপ্তাহকাল তাসকন্দে বাস করে! ছেলেটি রুশভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিল। নেলীর মাসিমা তাকে সন্তানস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন। তিন সপ্তাহকাল পরে ছেলেটিকে চলে যেতে হয়,—তার ছাড়পত্রে এই প্রকার নির্দেশ ছিল। যাবার সময় 'শকুন্তলার' হাতের আঙ্গুলে রয়ে গেল দুষ্মন্তের হীরকাঙ্গুরীয়,—ওইটি রইল নেলীর পরম পরিচয়স্বরূপ! হীরকের টুকরোর মতোই নেলীর অশ্রু টলটল ক'রে উঠল।

নেলী একবার পিছন ফিরে তার গাউনের ভিতর থেকে পাৎলা একটি প্যাকেট বার করল। ভিতরে প্রায় খান তিরিশেক মাসিমার তোলা ফটো। ছবি দুজনের, এবং নানা অবস্থায় তোলা। নেলী নিজেই সেগুলি দেখিয়ে আমাকে সোৎসাহে তাদের প্রতিদিনের কাহিনী বোঝাবার চেষ্টা পাচ্ছিল, কিন্তু এক সময় তার অবাধ্য চোখের জল তাকে বিরত ক'রে তুলল। ছেলেটির বয়স আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, গোঁফ আছে, এবং

দেখতে ভারি সুশ্রী। ওর মধ্যে চার পাঁচ-খানা ছবি নেলী প্রথমটায় দেখাতে চায়নি, কিন্তু পরে সে নিজেই উঠে আমার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে ছবিগুলি একে একে আমার চোখের সামনে ধরল। এ ছবিগুলি ওর সাঁতারের পোষাকে তোলা, ছেলেটি নিজেই এ ছবিগুলি তুলেছে!

কিন্তু নেলীর আবেগপ্রবণ প্রশ্নটি আজও আমার কাছে রয়ে গেছে। সে এইটি বলতে চাইছিল, তার কাজের জীবন নয়—কিন্তু আনন্দের জীবনটি তার নষ্ট হয়ে গেছে! সে আত্মদান করেছে যার কাছে, তাকে বিবাহ করবার পথ কি তার খোলা আছে? সে-ছেলেটাও যে চোখের জল ফেলে চলে গেছে! তার দেখা কি পাবে কোনদিন? এই হীরের আংটিটি আঙ্গুলে প'রে মধ্য-এশিয়ার মরুলোক পেরিয়ে মীশরের দিকে একাকিনী যাত্রা করবার পরম ব্যক্তি-স্বাধীনতা কি তার আছে? নেলী ত' রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন জানে না! আপন হৃদয়ের বাইরে আর কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তার কাছে কতটুকু? সে ত' কেবলমাত্র কর্মযন্ত্র নয়? তার বিবেকের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, তার সত্তার অনন্ত মুক্তিপিপাসা, তার ভালবাসার নিষ্কণ্টক অভিব্যক্তি, বন্ধন-বিহীন তার মানবাত্মা,—এর মূল্য কি নেই কোথাও?—

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল, ভোর হতে আর বিলম্ব নেই। মেয়েটা এক-এক সময় কাঁদছিল ঝরঝরিয়ে, এবং তাকে নানা-ভাবে শান্ত করতে হচ্ছিল। অবশেষে তার যাবার সময় আমার ভাঁড়ার থেকে বার ক'রে দিলুম একখানা মহীশূরের চন্দনগন্ধী সাবান,—সেটির সুগন্ধে যেন সহসা নেলীর ঘুম ভাঙ্গলো, এবং এই উপহারটি পরম যত্নে মুঠোর মধ্যে নিয়ে চোখ দুটো ভাল ক'রে মুছে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলোটা নিবিয়ে এসে ঘুমোবার চেষ্টা পেলুম, কিন্তু সম্ভব হল না। তারাশঙ্করের সেই ফ্লাস্কে গরম চা আছে, সেই লোভে এক সময় উঠে পড়লুম। অন্ধকারেই প্রায় ছটা বাজে। দরজা খুলে বেরিয়ে তারাশঙ্করের দরজায় টোকা দিতে যাব—দেখি লাউঞ্জের সেই কালো গদি-আঁটা বেঞ্চে নেলী অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোবার সময় কম্বলখানা গায়ে নিয়েছিল, কিন্তু সেখানা খসে পড়েছে। মেয়েটার শোওয়া বড় দুরন্ত। ওখানে থমকিয়ে আমার কর্তব্যটি চিন্তা করলুম। তারপর এগিয়ে এসে কম্বল-খানা তুলে নিদ্রাচ্ছন্ন মেয়েটার গায়ে ঢাকা দিয়ে তারাশঙ্করের দরজায় এসে টোকা দিলুম।

তারাশঙ্কর জেগে ছিলেন। উঠে এসে দরজা খুলে হাসলেন,—আজও কি সারা-রাত জেগে ইংরেজি শেখাচ্ছিলে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শিগগির চা দাও—পরে তোমার তামাসা শুনব! ব'লে ঘরে ঢুকে সোফার উপরে বসলুম। তারাশঙ্কর বাইরে এসে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে গেলেন, নেলী কম্বলচাপা দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

আজ ১১ই অক্টোবর। আমার অগ্নি-পরীক্ষা!

রৌদ্রে মেঘে নীলাভ আকাশে এবং বর্ণিটবিন্দুতে তাসকন্দ নগরী যদিও কিছু শীতার্ত, তবুও বাঙ্গলার প্রথম হেমন্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আজ সকালে সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। আজ আমার পরিচ্ছদে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। পরণে শান্তিপুরী কাঁচি ধুতী, গায়ে চাঁপাবর্ণ মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং তার উপর গরম জ্যাকেট, কাশ্মীরি আলোয়ানখানা তার উপর জড়ানো, পায়ে লক্ষ্ণৌই নাগরা। এ ধরণের পোষাক সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং আমি শত শত ব্যক্তির আকর্ষণের কেন্দ্র! কেবলমাত্র পোষাকটির জন্যই বার বার ছবি তোলা হচ্ছিল। লানা আমার সঙ্গে চলল!

ভয় পেলে আমার চলবে না, কেননা এখন পর্যন্ত নানা লোকের মনে নানা জটিল বিতর্ক থেকে গেছে। আমার ইচ্ছা আমাদের মনের কথাটা আর একটু স্পষ্ট হোক। স্পষ্ট কথাটার অভাবে আমাদের প্রকৃত মনোভাবটি অস্পষ্ট থেকে না যায়, এইটি আমার বাসনা। আমার নিজের পেশা রাজনীতি নয়, দল আমি পাকাইনে এবং দলে ভিড়িনে।

কিন্তু তবু আমার একটি দায়িত্ব পালনের তাগিদ ছিল।

আজকের সভাপতি ছিলেন মীশরী প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র সুপণ্ডিত প্রফেসর মহম্মদ খালাফাল্লা,—তাঁর কাছাকাছি রয়েছেন প্রসন্নচিত্ত শারফ মুশিদভ। সম্ভবত আজ শনিবার বলেই ভিতরের জনতা কিছু বেশি। আমি প্রথম দিন থেকে সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলুম সেই কারণেই হয়ত আমার সম্বন্ধে নানা লোকের মনে কিছু বেশি ঔৎসুক্য ছিল। ভারত থেকে আমি গোয়েন্দা অথবা পর্যবেক্ষক—কোনটা হয়ে এসেছি সেটি সুস্পষ্টভাবে জানার দরকার তাঁদের আছে বৈকি। "সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের" কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। যে কারণেই হোক "ফরেন লিটারেচারের" মিঃ চেকভস্কিকে আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন ব'লে মনে হয়নি,—যদিচ আমার রচনাদি তাঁর কাগজে বারম্বার ছাপা হয়েছে!

এক সময় আমার ডাক পড়ল, এবং আমি প্রেক্ষাগৃহের অনেকটা অংশ পেরিয়ে কোমল মখমলের জাজিমের উপর দিয়ে গিয়ে মঞ্চের উপর সেই 'কাঠগড়াটার' কাছে দাঁড়ালুম। আমার বুকের কাছাকাছি উঁচু একটি ছোট টেবলের উপর চার-পাঁচটি লাউড-স্পীকারের যন্ত্র বসানো, এবং তাদের ঠিক মাঝখানে একটি টেবল-ল্যাম্প। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি, এশিয়া-আফ্রিকার যে কোনও দেশের একটি ছাগলও এসে যদি এখানে দাঁড়ায় তবে চারিদিক থেকে হাততালি পড়ে, এবং পাঁচ-সাতটা লোক টপাটপ তাদের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে! সুতরাং আমার বেলা যদি এগুলোর পুনরুক্তি ঘটে তবে তার জন্য আমার ফুলে-ফেঁপে ওঠার কোনও কারণ নেই! অতএব হাততালি থামবার পর আমি আমার রচনা পাঠ আরম্ভ করলুম।

ঠিক প্রবন্ধ এটি নয়, এটিকে ভাষণ বলা যেতে পারে। কেননা প্রথমেই আমি সভাপতি এবং সতীর্থদিগকে সম্বোধন করেছিলুম। আমি ছিলুম পর্যবেক্ষক এবং পর্যটক,—এখানে প্রবন্ধ পাঠের ফরমাস নিয়ে আসিনি। সুতরাং সেই ভাষণের অন্তর্গত দু-একটি বক্তব্য এখানে বলা দরকার। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মহৎ সংস্কৃতির থেকে যে হৃদয় জাগ্রত এবং বিবেক উদ্বুদ্ধ হয়—তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এখানে একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলেছি! রাজনীতিক অথবা সামরিক চুক্তির জন্য এখানে আসিনি, এসেছি বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের জন্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মতভেদ থাকতে পারে, যেমন আছে রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে,—কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পকর্মের উপর আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্যে মিলিত হই। উৎকৃষ্ট সাহিত্য দেশ এবং মহাদেশের সকল রাজনীতিক অবরোধ চূর্ণ ক'রে দেয়, কেননা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সেই সাহিত্য আমাদের ঘরে এসে ঢোকে! লেখকদের কলমই হ'ল তাদের তরবারি,—কিন্তু এই তাসকন্দের সম্মেলনে আমরা এই প্রবাদটি পরিবর্তন করে সর্বসম্মতভাবে যেন ঘোষণা ক'রে যেতে পারি, পৃথিবীর সকল সামরিক তরবারি যেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম সম্পাদনের কলমে রূপান্তরিত হয়! (করতালি)। পূর্ব-যুগে বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় যখন ছিল না, তখন আমরা সকল জাতিরই মানসিক সান্নিধ্য লাভ করেছি শেক্সপীয়র, টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে। পাশ্চাত্য জাতিরা তাদের জড়বস্তুর সন্ধানে কয়েক শতাব্দি আগে এশিয়া এবং আফ্রিকায় এসেছিল। কিন্তু সেই প্রতিভা তাদের ছিল না যার সাহায্যে তারা দেখতে পায়, অন্ধকার মহাদেশে কোথায় কোথায় জ্বলছে জ্ঞানপ্রদীপ! সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে আপন আপন শোষণ-কার্যের পথ সুগম করার জন্য তারা যে অগ্নিকুণ্ড রচনা করেছিল, সেই আগুনের শিখায় আজ তারা নিজেরাই অবশেষে দগ্ধ হতে বসেছে। বিজ্ঞান ও বিদ্যার গৌরব তাদের থাকা সত্ত্বেও দুই মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের গুরুভার তারা বইতে পারেনি। তারা কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে পৌঁছয়নি! অন্ধকার দুই মহাদেশের মধ্যে তারা যখন শোষণ ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত, তখন একবারও তারা সন্দেহ করেনি, তাদের ওই লালস-লুব্ধ হস্তের হীনবৃত্তির প্রতি দুই মহাদেশের গণ-দৃষ্টি কিছুকালের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়েছিল! ওদের বিদ্যার সঙ্গে ছিল লোভ, এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়েছিল স্বার্থচক্রান্ত,—অথচ ওরাই দুই মহাদেশের বহু শতাব্দীব্যাপী নিদ্রার অবসান ঘটিয়েছে!

উপনিবেশবাদ আজ পুরনো হতে চলেছে; বিদ্যা এবং জ্ঞানের সঙ্গে উপনিবেশবাদ খাপ খাচ্ছে না। ভারতবর্ষ লড়াই করেছে ইংরেজের সঙ্গে দীর্ঘকাল, এবং স্বাধীনতা লাভ করেছে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে! কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে তার হৃদ্যতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অব্যাহত রয়ে গেছে। ফ্রান্সের সঙ্গেও তাই। ইতিহাসে এককালে যারা ভারতের উপর প্রভুত্ব এবং রাজত্ব করেছে, ভারতের মনে তাদের সম্বন্ধে কোনও ঘৃণা নেই! পাশ্চাত্য সভ্যতা তার সঙ্গে এনেছে জাতীয় চেতনা, ঐক্যবোধ এবং নিয়মতান্ত্রিকতা। তাদের শিক্ষা, জ্ঞান, চিন্তাধারা, আদর্শ এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারা, তাদের সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি—এ সব আমরা গ্রহণ করেছি বৈকি! উপনিবেশবাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মুছে যাবার দিন সমাগত, এবং এমন দিন আসন্ন, যখন সকল মহাদেশ একই সৌহার্দ্য-ক্ষেত্রে এক সঙ্গে একই সভায় বসবে! মানব সভ্যতায় সংহতি অনিবার্য!

প্রায়ই শুনি স্বাধীন দেশ ভিন্ন বড় প্রতিভা এবং মনীষীর জন্ম সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে এ বিশ্বাস সত্য হয়নি! পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা দুর্গতির কাল গত দেড়শ বছরের মধ্যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণের জন্ম-লাভ ঘটেছে, যেমন ঘটেছে রাশিয়ার জারের আমলে পুশকিন, টলস্টয়, দস্টয়েভস্কি, লেনিন, গোর্কি, চেকভ প্রভৃতিদের। এঁরা সবাই সারা জগৎকে আলোকিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনীতিক উৎপীড়ন এবং নিগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিশেষ নীতির ফলে যদি ভয় বা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিবেক সাময়িক কালের জন্য হয়ত মরে। কিন্তু মহৎ শিল্প ও সাহিত্য নিবিড় বেদনাবোধ থেকেই আপন সিদ্ধির মন্ত্রলাভ করে। ভারতের উপর ইংরেজ প্রভুত্বের যুগ অন্ধকারের যুগ একথা বলতে পারব না!

আজ দুই মহাদেশ কথা বলছে এক-সঙ্গে মিলে এই তাসকন্দে। এটি নতুন। কিন্তু শুধু লেখকরাই আনতে পারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ইতোমধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মিলে আনন্দ ও রোমাঞ্চের সঙ্গে চেয়ে দেখুক, দুই মহাদেশের পাখীরা কেমন একই ডালে ব'সে পরিপূর্ণ কণ্ঠে নবযুগের

সঙ্গীত ঘোষণা করতে থাকে! (মূল রচনার আংশিক অনুবাদ)

নিজের জায়গায় যখন ফিরে এসে বসেছি, ভারতের মুখপাত্র তারাশঙ্কর সোজা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন এবং আমাকে প্রথম আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন লণ্ডনের "নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশনের" মিঃ পার্কার। তিনি খুব খুশী হয়ে করমর্দন করলেন। ক্রোর-পতি সোভিয়েট লেখক মিঃ সিমানভ শ্রীমতী অকসানার মারফৎ আমার ভাষণের সুখ্যাতি করেন। আমার ডায়েরীতে লেখা রয়েছে আরও কয়েক-জন প্রশংসাকারীর কথা,—যেমন গোপাল হালদার, আত্রে, দেশপাণ্ডে, চৌহান, প্রীতম সিং, সত্যানন্দ, যশপাল প্রভৃতি। বাইরের লোকের মধ্যে সেই লণ্ডনবাসী বৃদ্ধ গ্রীক ভদ্রলোক,—এবং সাইপ্রাস, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া। শ্রীধরণী শুধু আমার কানে কানে বললেন, চীন প্রতি-নিধিরা চুপ ক'রে ছিলেন, ওঁরা বোধ হয় খুশী হননি! অতঃপর ভারতে ফিরে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলুম, নানা কাগজে আমার ভাষণটি উদ্ধৃত করা হয়, এবং শ্রীধরণী "অমৃতবাজারে" লেখাটি নিয়ে আলোচন করেন। কিন্তু আমি সর্বাপেক্ষা খুশী হয়েছিলুম তারাশঙ্করের কথায়, যখন তিনি বল-লেন, তুমি ঠিক কথাটি বলেছ। এইটিই আমরা বলতে চাই!

শ্রীধরণীর পর্যবেক্ষণটি অনেকটা সত্য। তারাশঙ্করের প্রতি চীন প্রতি-নিধিগণের মনোভাব সম্বন্ধে আমার মনে কিছু ক্ষোভ ছিল। সেটি আমার ভাষণের উৎপত্তির মূলে।

শ্রীমতী লানা আমার সঙ্গে প্রায় থাকে সর্বক্ষণ। কিন্তু সে জাত-দোভাষী নয় বলেই হোটেলের ভিতর গিয়ে টেবলে বসতে তার কুণ্ঠা আছে। তার স্বভাবে এবং অভ্যাসে রয়ে গেছে একটি শান্ত আভিজাত্য, এবং একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যার সলাজ নম্রভাব। তাকে মানায় রান্নাঘরে, পরিবার পরিচর্যায় এবং সন্তান-পালনে। একদিন বললুম, কি আশ্চর্য, এলোমেলো আদম-বাউড়ো চুল তোমার, মাথাটা আঁচড়াতেও পারনি? কি ছিরি হয়েছে দেখেছ?

লানা মুখ তুলে বলল, চুল বাঁধবো, সাজগোছ ক'রে হোটেলে আসব, বলবে কি সবাই? উনি আবার ওসব তেমন পছন্দও করেন না!

সে কি! বললুম, রুব্‌নিকভ ত' আধুনিক ছেলে! তুমি একটু রং পাউডার মাখলে সে কি রাগ করবে? অমন হাসিখুশী তোমার স্বামী!

জানেন না আপনি,—লানা বলল, ও ভীষণ চাপা! ওর মুখে তামাসা শুনলেই আমার গায়ে লাগে।—তা ছাড়া শুনুন, আমাদের দেশে ওসব সামগ্রী বিশেষ কেউ পছন্দও করে না! রাস্তা-ঘাটে ত' দেখতেই পাচ্ছেন, সাজসজ্জা প্রসাধনের রেওয়াজ কম। দেশের কাজ এখন অনেক বাকি। ছেলেমেয়েদের সেই সময় কই? আমার নিজেরও ওসব ভাল লাগে না!

পথে চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। লানা আমাকে মনোহারী দোকানে নিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় প্রশ্ন করলুম, তোমার স্বামীর মাইনের টাকা কে হাতে নেয়?

লানা হাসিমুখে বলল, উনিও খরচ করেন, আমিও নিই। শ্বশুরের পেন্সন আছে, দেওর ননদের পড়ার খরচ নেই। আমিও ত' রোজগার করি! আমার স্বামী কিন্তু সকলের প্রিয়, মাইনেও ভাল পায়।

ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমালে পার?

জমাই ত'!—লানা বলল, তবে ভবিষ্যতের ভাবনা কিসের? এখানে যে ইচ্ছে করলে যখন তখন রোজগার! বুড়ো মানুষ কেউ যদি ফুলের বাগান করতে বসে, তাতেই তার রোজগার! যদি তার বিধবা বুড়ি থাকে সেও যে পেন্সন পায়! এদেশে উপোস ক'রে মরবার কোনও উপায় নেই।

মনোহারীর দোকানে সামগ্রীর প্রাচুর্য দেখতে ভাল লাগে। রান্না-ভাঁড়ারের বিবিধ বাসনপত্রের চাহিদা অনেক। ইলেকট্রিকের নানা জিনিসপত্র। ক্রেতার ভিড়ে অনেক সময় দোকানে ঢোকা যায় না। পানীয় বস্তু বহু দোকানের একটা অঙ্গ। সব কাজকর্মের মধ্যে আহার্য কিছু একটা পাওয়াই চাই।

একখানি পাৎলা দাড়ি-কামাবার আয়না কিনলুম চার রুবল খরচ ক'রে। প্রসাধন সামগ্রী সর্বত্রই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রায় সবগুলিই নিম্নস্তরের। ভাল একখানা তোয়ালে দুর্লভ। ভাল একটি ফুলহাতা পশমের সোয়েটার—যেমন লানার গায়ে দেখছি—তার দাম প্রায় চারশ' রুবল পড়ে। একটি যেমন-তেমন গরম কোট পাঁচশ' থেকে ছ'শ রুবল। অথচ সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই, তাসকন্দের কোনও ব্যক্তিকে —সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরেও,—এমন দেখিনি যার গায়ে শীতের জামা নেই! ছেঁড়া দেখেছি, তালি-মারা দেখেছি, ধূলিমলিন দেখেছি,—কিন্তু বিনাবস্ত্রে কষ্ট পাচ্ছে এটি চোখে পড়েনি! ভিখারী এদেশে নেই বলেই এতদিন জানতুম। কিন্তু সেটি সত্য নয়। ভিড়ের মধ্যে এক আধবার হঠাৎ ভিখারীও দেখেছি ভিক্ষে করছে। পা-খোঁড়া লোক দেখেছি এদিক ওদিক তাকিয়ে হাত পাতছে,—যারা অধিকাংশই বুড়ো অথবা কর্মশক্তি-হীন,—কিন্তু গায়ে তাদের গরম জামা এবং পায়ে মোজা-জুতো ঠিকই আছে! আমাদের দেশেও এই। পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হিমাচলে, নেপালে, দার্জি-লিংয়ে,—যত দরিদ্রই হোক, শীতবস্ত্র এবং জুতো ঠিকই আছে। কর্মশক্তি-সম্পন্ন কোনও মানুষ পৃথিবীর কোথাও আজ বসে খেতে চায় না। কিন্তু সোভিয়েট দেশের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই যে, সব চেয়ে নীচের তলাকার সমাজের মধ্যেও কেউ বেকার, উপার্জন-হীন, এবং অন্নবস্ত্রহীন নেই। আমার পক্ষে বিস্ময় হল, ওদের ক্রয়শক্তি এবং দ্রব্যমূল্যের উচ্চমান। ওদের অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ালে হক-চকিয়ে যেতে হয়। ওদের আর আমাদের একই জগৎ, একই আকাশ, একই জল মাটি,—কিন্তু প্রথম গিয়ে পদার্পণ করলে মনে হতে থাকে, ধীরে ধীরে আমার পা দুটো উঠে যাচ্ছে শূন্যের দিকে, এবং মাথাটা যাচ্ছে নীচের দিকে! মাথা দিয়ে হাঁটছি, এবং চোখে যা দেখছি,—সেটা একই জগৎ বটে, তবে সবটাই ডিগবাজির চোখ! এক একবার মনে হয় যেটা ওদের কাছে জলের মতন স্বচ্ছ সহজ, সেইটিই আমার কাছে জটিল গোলকধাঁধা! পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভবত আমার মতন সামান্য অর্থনীতিক বিদ্যে নিয়েও যাওয়া যায়, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে যাবার আগে কমিউনিষ্টপন্থী সর্বাধুনিক অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বই মুখস্থ ক'রে যাওয়াই ভাল! এ যারা বোঝে না, অথবা মাথা ঘামাবার ভয়ে বুঝতে চায় না,—যারা পূর্ব-সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে ওদের দিকে তাকায়,—তারাই নির্বোধের মতো চট ক'রে গালি দিয়ে বসে! প্রথমত, ওদের দেশের মাটিতে পা রেখে প্রথম

দাঁড়ালেই বুঝতে পারা যায়, তথাকথিত 'পলিটিক্স' ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ত্রিসীমানাতেও নেই। ওদের মরণ-বাঁচনের কথা হ'ল কমিউনিজম, অর্থাৎ একটা বিশেষ অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা,—যেটা আগাগোড়া বীজগণিতের ওপর দাঁড়িয়ে, যেটা জটিল একটা অঙ্ক, —একটা বিরাট অর্থনীতির নক্সা,—যে-অরণ্যে প্রবেশ করলে বেরোবার পথ পাওয়া যায় না, এবং যে-ফাঁদে পা বাড়ালে এ জীবনে উদ্ধার নেই! মানব-ইতিহাসের কোনও পর্বে পৃথিবীর একটা বিশাল ভূখণ্ড পরিব্যাপ্ত ক'রে এতবড় একটা ঊর্ণনাভের অঙ্কজাল সৃষ্টি মানবভাগ্যবিধাতা ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না! এই অঙ্ক নির্ভুলভাবে কষতে গিয়ে যে-ব্যক্তি ভুল করে, সে প্রধানমন্ত্রী হলেও মরে,—এবং যে-ব্যক্তি ভুল ধরে সে নগণ্য হলেও উচ্চ আসন পায়! এই অঙ্কে যে-ব্যক্তি ফাঁকি দিয়ে গোঁজামিল চালায়, তার শাস্তি পিছন থেকে বন্দুকের গুলী! এই অঙ্কের জন্যই পাশ্চাত্য পৃথিবীতে ওরা একটা বিভীষিকার প্রতীক, ওদের দিকে তাকালে হৃৎকম্প হয়! ওদের ওই অভিনব সমাজব্যবস্থার প্রধান উপাদান হ'ল সর্বহারা মানুষ,—যাদের কিছু নেই! চাল-চুলো নেই, শিক্ষাদীক্ষা নেই, ঘরবাড়ী নেই, ধনদৌলত নেই,—এমন কি যাদের জন্ম-পরিচয়ও দরকার করে না! ওরা জীবন্ত মানুষ পেলেই খুশী,—যেটা হবে ওদের কর্ম-যন্ত্র, যেটা একটা বিশেষ শক্তির আধার, যেটার জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের অবস্থাটার নাম হবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনের সামগ্রী, —যেটা শুধু কীর্তির কাজে লাগে! ওদের কাছে একটা জীবন্ত মাংস-পিণ্ড দাও, ওরা খুশী হবে। সেটাকে ঢালবে ওরা বিশেষ একটা ছাঁচে, সেটাকে নিয়ে যাবে গবেষণাগারে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে নানা জারক রস, নানা ধাতুর নির্যাস, বিশেষ বায়ুতে তাকে নিঃশ্বাস নেওয়াবে, বিশেষ চিন্তায় তাকে ভাবিত করবে, বিশেষ স্বপ্নে তার মোহ-মদিরতা ঘটাবে! তার পর সেই মাংসপিণ্ড যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসবে তখন সে দাঁড়াবে একা বিরুদ্ধ বৃহৎ পৃথিবীর সামনে! সে দেখবে জরাজীর্ণ কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও পাণ্ডুর একটা অর্থশূন্য পৃথিবী —যেটা ভূত-প্রেত-পিশাচ-দৈত্য-দানবময় কতগুলি বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন 'ক্যাপিটা-লিস্টদের' দ্বারা আবর্তিত! ওরা দুই পুরুষ ধ'রে মনের মতন পুতুল বানিয়ে চলেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাধিক সমাদৃত এবং পূজ্য হল তারাই যাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তা, আদর্শ, কল্পনা, বিচারবোধ,—এখনও অপরিণত—অর্থাৎ শিশুপাল। অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থের শিশুকেও দেখেছি অন্তত এক থেকে দুই হাজার রুবল মূল্যের শীত-বস্ত্র পরে খেলাধূলা করছে। কোনও এক পল্লীগ্রামের কাদামাটির পথে একদল কিশোর কিশোরীর পোষাক দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওরা রাজবাড়ীর ছেলেমেয়ে —কিন্তু তাদের বাপখুড়ো চাষ-বাস করে "কলেকটিভ ফার্মে"। শিশু এবং কিশোর-সমাজে ওরা একটি নতুন জাতি ওরফে শ্রেণী সৃষ্টি করেছে—যাদের নাম 'পায়োনীয়ার্স'! তারা হল অনন্য, তারা ঠিক সাধারণ নয়। তারাই হবে ভবিষ্যৎ কালের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, অর্থাৎ পার্টি! তারাই তখন রাজপুরুষ। তারাই দাঁড়াবে একচ্ছত্র নির্বাচনে।

মধ্যএশিয়ার যাযাবর জাতির সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বহুকালের। ঠিক জানিনে, তবে এরা অনেকটা মানবজাতির আদি সম্প্রদায়ের একটি শাখা হতে পারে। এরা ঘর, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা এবং নির্দিষ্ট জীবনব্যবস্থা—এদের কোনটাই এখনও খুঁজে পায়নি। শুধু মধ্যএশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ও মধ্য-প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ ইউরোপেও এদের সংখ্যা কম নয়। এদের একটা অংশের নাম জিপ্‌সি এবং এদের একটা বড় রকমের দল ভারতের মধ্যে বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র যাযাবর সম্প্রদায়কে উপ-জাতি বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। এদের নির্দিষ্ট আস্তানা নেই এবং নিত্যই গতিশীল। জন্মমৃত্যুর বিবর্তন সঙ্গে নিয়ে এরা পথে পথে চলে। পশুপালন এদের পেশা। জাতিধর্মের কোনও পরিচয় এদের মধ্যে স্বীকৃত নয়।

মধ্যএশিয়ার সেই বিশ্ববিশ্রুত যাযাবর উপজাতির এক প্রতিনিধিকে হঠাৎ পাওয়া গেল তাসকন্দে। যে-উপ-জাতির গোষ্ঠিতে এ ব্যক্তির জন্ম হয়, সেটির নাম হল, "তোবিকতি",—এরা কাজাখস্তানের মরুচারী সম্প্রদায়। এরা বংশপরম্পরায় মধ্যএশিয়ার মধ্যেই চরে বেড়ায়, এবং এই যাযাবর দলেরই একটি শাখার অধিনায়ক "ওমর খান আউয়ে-জভের" পরিবারে এই ব্যক্তির জন্ম হয়। এ'র নাম "মখ্‌তার আউয়েজভ"। এঁর অমায়িক সৌজন্য ও মিষ্টভাষণে আন্তরিক তৃপ্তিবোধ করেছিলুম। শ্রীমতী লানা ছিল আমাদের উভয়ের আলাপের সেতু।

যাযাবর জাতি সম্বন্ধে আমার প্রাচীন ধারণা কিছু পরিবর্তন করতে হল বৈকি। কারণ মখ্‌তার আউয়েজভ একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং কাজাখ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। কাজাখ বিজ্ঞান ভবনে তিনি বর্তমানে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং কাজাখ রিপাবলিকের রাজধানী "আল্‌মো-আতার" বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত পনেরো বৎসরকাল যাবৎ তিনি বিবিধ-প্রকার গবেষণার কাজে লিপ্ত।

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অক্লান্ত গবেষণার একটি পরিণত ফল হল, তাঁর রচিত অতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক একটি মানুষের জীবন-কাহিনী,—এটি উপন্যাসের আকারে লেখা। নাম "আবাই"। আবাই ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিগত শতাব্দিতে কাজাখ জাতির সর্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি আজীবন দারিদ্র্য অশিক্ষা দুর্গতি কুসংস্কার ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এই কবির সম্পূর্ণ নাম ছিল "আবাই কুনানবায়েভ",—এবং জাতিতে তিনি মুসলমান ছিলেন। এই লোক-কবির সম্বন্ধে বহুপ্রকার প্রচলিত শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে "আবাই" গ্রন্থটি রচিত হয় এবং এর জন্য মিঃ মখ্‌তার সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

মখ্‌তার আউয়েজভ জন্মগ্রহণ করেন এক দরিদ্র যাযাবর বংশে, এবং অতি প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লাগোষ্ঠির মধ্যে মানুষ হন। তাঁকে বাল্যজীবনে আরবী ভাষা ও অক্ষরে লিখিত কোরাণ থেকে প্রথম পাঠ নিতে হয়, এবং পরবর্তীকালে তিনি আবাই রচিত কাব্য ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন। মিঃ মখ্‌তার এবং আবাই একই "তোবিকতি" গোষ্ঠির বংশধর। ভদ্রলোক যেমন স্বল্পভাষী, তেমনি মিষ্টপ্রকৃতি। মাথায় তাঁর মস্ত টাক, মুখের ছাঁচ কতকটা মঙ্গোলীয় ধরণের, হাসিটি অতি মিষ্ট এবং প্রসন্ন। তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধেয় বলে আমার মনে হয়েছিল।

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও কাজাখ-

সন্তানের মরুচারী উপজাতির বিভিন্ন দলের মধ্যে শোচনীয় বর্বরতা পাওয়া যেত। হত্যা, লুণ্ঠন, বহুবিবাহ, নারী-হরণ, দস্যুতা, বিবাদ ও কলহ,—এবং তার সঙ্গে দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অজ্ঞান কুসংস্কার মিলিয়ে থাকত। সেই ভয়াবহ দুর্গতির মধ্যে যে-জীবনের ধারাটা প্রায় নরককুণ্ডের মধ্যে কিলবিল করত, তার সেই অবস্থাটা মখতার সাহেবের আজও মনে আছে।

এককালে কাজাখস্তানের ভূমিজ সম্পদ ছিল জারের অনুগ্রহপুষ্ট জনৈক ইংরেজ মিঃ উরকুহার্টের হাতে। মিঃ উরকুহার্ট এখানকার কয়লা এবং তেলের খনিগুলির মালিক ছিলেন এবং তাঁরই সঙ্গে মন মিলিয়ে রুশ ব্যবসায়ীরা কাজাখস্তানের ধনসম্পদের উপর প্রভুত্ব করতেন। কাজাখরা ছিল শুধু কুলিমজুর দারোয়ান চাকর ও বরকন্দাজদের পর্যায়-ভুক্ত। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য ছিল এই যে, রুশ ব্যবসায়ী এবং ধনপতিগণের দ্বারা কাজাখরা সর্বাপেক্ষা নিগৃহিত হত। রুশদের সেই অমানুষিক উৎপীড়ন দরিদ্র ও হতভাগ্য কাজাখদের পক্ষে মুখ বুজে বরদাস্ত করা ছাড়া উপায় ছিল না। কবি আবাই তাঁর জীবনের মধ্যে এর ইতিবৃত্ত রেখে গেছেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এবং মিঃ মখতার আউয়ে-জভ সেগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন।

রুশবিপ্লব এবং তার পরবর্তী অবস্থা আশীর্বাদের মতো কাজাখস্তানে এসে পৌঁছয়। মিঃ উরকুহার্ট এবং রুশ ধনপতির দল তাঁদের সেই সকল কয়লা ও তেলের খনির মধ্যে জল ঢেলে দিয়ে পালিয়ে যান দিগ্‌বিদিকে। মিঃ উরকু-হার্ট বিলেতে গিয়ে পৌঁছন। অতঃপর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস একই সঙ্গে কলঙ্কে মসীকৃষ্ণ এবং গৌরবে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। নবজাত সোভিয়েট ইউনিয়ন, বল-শেভিক পার্টি, নিরীহ দরিদ্র এবং ক্ষুধার্ত জনতা একদিকে, এবং অন্যদিকে আমেরিকান, ইংরেজ, জার্মানি, ফরাসী, বেলজিয়ম প্রভৃতি চৌদ্দটি জাতির সশস্ত্র সৈন্যদলসহ জার আমলের গৃহশত্রু-গোষ্ঠিরা,—সমগ্র রাশিয়ায়, মধ্যএশিয়ায়, ইউরোপীয় দেশে, কৃষ্ণসাগরের চতুঃপ্রান্তে, উরাল ও ককেশাস • পাহাড় পর্বতের আশেপাশে—সর্বব্যাপী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে তোলে। সেই সময়ে শত্রুদলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হোয়াইট গার্ড' এবং জাতিয়তা-বাদী দলের নাম ছিল "রেড গার্ড"। সর্বহারা মধ্যএশিয়ার নানা অঞ্চলে যে-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বেধে ওঠে সেটি 'হোয়াইট গার্ডদেরই" বিরুদ্ধে—যাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ রুশ ছিল অগণিত, সোভিয়েট-বিরোধী সংরক্ষণশীল মুসল-মানের দল ছিল প্রচুর সংখ্যক, ছিল কায়েমী স্বার্থকেন্দ্রিক বহু ধনবান গৃহ-শত্রু,—কিন্তু অন্যদিকে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের নবজাগ্রত বিপ্লবী যৌবন। সংগ্রাম চলে দশ বৎসর, কিন্তু এরই মধ্যে সাত বৎসর যেতে না যেতেই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে লেনিনের মৃত্যু ঘটে!

রুশধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েট ব্যবস্থার সহায়তায় কাজাখ-স্তান বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'স্বাধীন' রিপাবলিকে পরিণত হয়।

পুরনো তাসকন্দে ঘুরেছি দিন দুই। এ যেন আমার চেনা জগৎ। লাহোর কিংবা লক্ষ্ণৌ জেলার মফঃস্বল শহর। পাশে হাটতলা, ওদিকে একখানা বড় বাড়ি, এদিকে বস্তিপাড়ার ভিতর ধুলোমাখা কাঁচাপাকা ঘর-দোরের সারি আঁকাবাঁকা সরু পথের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পাথরের ডেলা-ডুমরি বিছানো পথ চলে গেছে যেন কোথায় বিবাগী হয়ে। হাট-তলার রৌদ্রে বসে গেছে বিকিকিনির জটলা। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ ফড়েরা এসেছে—কেউ এনেছে রাঙ্গা রাঙ্গা দেশী আলু আর পেঁয়াজ, কেউ বেগুন আর গাজর, কেউ বা বীট আদা রসুন টমাটো, কেউ বা বাঁধাকপি, রান্না-বাটনার মসলা কিংবা লাল লঙ্কার গুঁড়ো ইত্যাদি। দর বাড়াবার উপায় নেই, পাশেই 'ষ্টেট ফার্মে' একই সামগ্রী বাঁধা-দরে বিক্রি হচ্ছে। এপাশে মনোহারী, ওপাশে সোনালী সুতোয় আর জরিতে কাজ নিয়ে বড় মিঞা দর্জির দোকানে বসা, তার পাশে জাঁদরেল মিঞামাতব্বর বসেছেন গড়গড়া নিয়ে, অদূরে পথ দিয়ে মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছে কালো বোরখা-পরা মহিলা, এগিয়ে গেলে মস্ত বাজার। সেই বাজারের ছোট ছোট কাঁচের আলমারীর মধ্যে মোটা চর্বি-ওলা তাজা গরু ও ভেড়ার মাংস নিয়ে বসে গেছে ফড়েরা। বসেছে আঙুর আপেল রোজবেরি আর পীয়ারা নিয়ে। আছে মুদি, মাখন, মুরগী আর অন্যান্য পক্ষী-মাংসের সারিবাঁধা দোকান। প্রতি বাজারে একটি অফিস। সেখানে ডাক্তার, কেরানি, খাদ্যপরীক্ষক, ইনস্পেক্টর। বাজারে বসবার পোষাক ভিন্ন, সে-পোষাক হাস-পাতালের অস্ত্রোপচারকারীদের মতো শাদা একটা জোব্বা। এখানে ওখানে জলের বিশেষ ব্যবস্থা। মাছি আছে তাসকন্দে প্রচুর, কিন্তু কোনও ফলে, মাংসে, মাছে—মাছি বসলে চলবে না, তার জন্য তদন্ত-কারী দাঁড়িয়ে। তিন জায়গা থেকে হাটে মাল আসে, 'কলেকটিভ ফার্ম', 'ষ্টেট ফার্ম', এবং ব্যক্তিগত। প্রত্যেক চাষী পরিবারের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ প্রায় সওয়া চার বিঘা, অর্থাৎ আধ 'হেক্টর'—হয়ত ভুল আছে আমার হিসাবে। এই

জমিতে সে গরু, মুরগী, হাঁস পোষে, ফলের বাগান করে, ঘর বাঁধে, সব্জিও ফলায়,—এবং বাজারে বেচে যায়। দর সর্বত্র এক। মাঝে মাঝে তরমুজের পাহাড়,—তরমুজ বড় প্রিয় মধ্যএশিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরছে আশেপাশে। কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছে মাল বহনের জন্য ঘোড়ার গাড়ি,—ঘোড়া দেখলে ভয় করে! কুলি কিংবা মুটে একটিও নেই,—যদি কেউ বেশি কিছু কেনে, হাতে ক'রেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে! গ্রাম থেকে চাষীরা মালপত্র নিয়ে আসে গাড়িতে—দল বেঁধে আসে। বাজারে সর্বত্র লাভ করার চেষ্টা আছে, কিন্তু লোভের প্রকাশ নেই। দর-দস্তুরের কথাই ওঠে না। বিতর্কের চিহ্নও নেই। কেনো কিংবা ফিরে যাও—কিন্তু মূল্যটা এক। শ্রেণীভেদ আছে। এ আঙ্গুর যদি একসের (কিলোগ্রাম) কেনো, এটার এই দাম, ওটার দাম ওই। নিঃসংশয়ে মাছ-মাংস কেনো,—টিপে দেখো না, গন্ধ শুঁকো না, দর করো না! ফড়েরা খদ্দের ডাকছে বৈকি। সামনে দিয়ে গেলেই মেয়ে কিংবা পুরুষ বিক্রেতারা ডাক দেয়,—এটা নাও, বেশ ভাল, তাজা,—হ্যাঁ, এই দাম। মুরগী এবং অন্যান্য পাখীর দাম খুব বেশি, কিন্তু বিক্রিও খুব। গরু ভেড়া বেশি, শূকরের মাংস নেই। ওটা মধ্যএশিয়ার ধর্মমতে আটকায়,—সংখ্যায় তারা দু'কোটিরও বেশি। তাসকন্দে শূকর পালনের কেন্দ্র সংখ্যায় কম।

গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকলাম। ধুলো আছে। চারিদিকের রুক্ষতা, পথঘাটের সঙ্কীর্ণতা আছে, কিন্তু নোংরা নেই, জঞ্জাল জড়ো করা নেই, সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা নেই। একে জলহাওয়া ভাল, তার উপর আহারাদির সুনির্বাচন, ওরা বেশ ভালই আছে। এদিকের জনসাধারণের নিজস্ব বাড়ী ও সম্পত্তি আছে, ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং দোকানপত্রও কম নয়। লাভ লোকসান তাদের নিজেদের। কেউ দর্জি, কেউ মনোহারি, কারো তামাক সিগারেট, কারো ফলের কারবার, কারো চাল ডাল মসলা,—সবাই নিজে নিজে চালায়! লোক যদি রাখো তবে ঘরের লোক নাও। দোকানে মাইনে করা চাকর রাখতে পাবে না,—সেটা হবে অপরের পরিশ্রম ভাঙিয়ে তোমার পুঁজি! ছেলে-মেয়েকে কাজে নাও, বউকে নাও,—কিন্তু শালা, ভাগ্নে, ভাইপো,—এদেরকে চেয়ো না, বৃহৎ দেশকর্মের দিকে তাদের ডাক আছে! তুমি সুখে এবং সচ্ছল অবস্থায় থাকো,—কিন্তু অনর্থক সম্পত্তি বাড়াতে যেয়ো না, মানুষের পরিশ্রমকে তোমার লোভের উপকরণ ক'রো না। মানুষের অনেক দাম,—সে তোমার ব্যক্তিগত লালসার ক্রীতদাস নয়!

পুরাতন কালের মুসলমান সমাজপতিরা রয়েছেন। আধুনিক কালের ধাক্কা তাঁদের এখনও সম্পূর্ণ সয়নি। প্রাচীন তাসকন্দে এলেই দেখতে পাই, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, সিয়ানওয়ালি, পেশোয়ার কিংবা পুরনো দিল্লীর কোনও পল্লীতে এলুম। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ সুসজ্জিত, পাকা দাড়ি, মাথায় সাচ্চা জরির কাজকরা উজবেক ক্যাপ, পরণে চুক্তিদার, পায়ে মোজা জুতো! বহু মুসলমান মহিলা আজও বোরখা পরে রাস্তায় ঘুরছেন। পায়ে মাঝে মাঝে দেখি সেই মেহেদি পাতার রং এবং সরু জুতো। মুখের উপরকার ঢাকা প্রায়ই খুলে যায়, এবং হঠাৎ চোখে পড়ে যায় কালো সুর্মার রেখারঞ্জিত রবীন্দ্রনাথের দুটি গীতি-কবিতার টুকরো! ওদের দেখেছি কতবার কাশ্মীরে, কোহাট-বান্নুতে, দেখেছি কো-মারীতে আর শিমলায়, দেখেছি দিল্লী আর মুলতানে। তুর্কিস্তানের প্রতি সুন্দরীকে ডেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, সুখে আছ ত?—কিন্তু ভাষা যে জানিনে। তাই দূরের থেকে ওদের বোরখা-খোলা মুখের প্রসন্নস্মিত হাস্যটুকু দেখে চলে যেতে হয়। কি যেন এক অদৃশ্য নৈকট্যের টানে হৃৎপিণ্ডে কাঁপন ধরে যায়।

বিশাল এক মসজিদে প্রবেশ করলুম। এটির নাম 'বড়া খাঁন্' মসজিদ। এর সঙ্গে জোড়া রয়েছে মাদ্রাসা বিদ্যালয়। চারিদিক পরিচ্ছন্ন এবং সুনিয়ন্ত্রিত। প্রতি শুক্রবারে উৎসব। এক একটি মসজিদ ইসলাম চর্চার কেন্দ্র। স্টেট থেকে প্রত্যেক মৌলবী মাসোহারা পান, প্রতি মসজিদের যাবতীয় খরচ স্টেটের—প্রত্যেক কর্মী বেতনভোগী এবং পোষাক পরিচ্ছদ দেখলেই বুঝতে পারা যায়, অবস্থা প্রত্যেকেরই সচ্ছল। তাঁদের শান্ত প্রসন্ন ভাব এবং অমায়িক মিষ্ট ব্যবহার প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই, এবং জাতির কর্মজীবনকে ইসলাম নিয়ন্ত্রিত করে না। ধর্মাচরণ এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার। একটির বেশি বিবাহ সোভিয়েট ইউনিয়নে নিষিদ্ধ অর্থাৎ এক স্ত্রী জীবিত থাকতে অথবা এক বিবাহের বিচ্ছেদ না ঘটলে ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ চলে না। নরনারীর এখানে সম্পূর্ণ সমান অধিকার। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে লেখা-পড়া শিখতে হবে, গত্যন্তর নেই। ইসলামের শিক্ষার উপর কোথাও জোর নেই, মৌলবীরা ইসলাম প্রচারের জন্য দল বেঁধে এদেশে-ওদেশে সভাসমিতি করে বেড়ান না। কিন্তু প্রতিটি মসজিদ এখন এক একটি ইসলামের গবেষণা কেন্দ্র। বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হবার ফলে ওদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন সুখী, সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যদায়ক হয়ে উঠেছে। মেয়েদের জীবনে এসেছে শান্তি ও সম্মান, পুরুষেরা খুঁজে পেয়েছে সংযম। খবর নিয়ে জানা গেল, প্রত্যেক বছরে সোভিয়েট মধ্যএশিয়ার একটি মস্ত মুসলমান দল হজ করতে যান। স্টেট থেকে তাঁরা সর্ব-প্রকার সহযোগিতা পান।

শ্রীমতী লানা ছিল সঙ্গে—সে জাতিতে খৃষ্টান এবং আমি ভারতীয় হিন্দু। দুইজন প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয় মৌলবী ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে প্রত্যেকটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে দ্রষ্টব্য সামগ্রীগুলির ইতিহাস এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমরা একটি সুন্দর ছোট সুসজ্জিত ঘরে ঢুকে কয়েকখানি সুদৃশ্য ও স্বর্ণাক্ষররঞ্জিত কোরাণগ্রন্থ দেখলুম। এগুলির মধ্যে দুই তিনখানি প্রায় ছয়শ' বছর আগে বোম্বাই থেকে গিয়েছিল। এটি দেখে মনে পড়ে গেল দিল্লী দুর্গের কোরাণ মিউজিয়ম এবং আজমের শহরে অবস্থিত জগৎপ্রসিদ্ধ খাজা দরগা শেরিফের কথা।

বিশেষ বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করার আগে পায়ের জুতো খুলছিলুম দেখে মৌলবী হাসিমুখে বললেন, না খুললেও চলত, ওটা এখানে আপত্তিজনক নয়।

পালপার্বন উপলক্ষে এখানে মেলার মতো বহু লোক জমায়েৎ হয়। ঈদের দিনটিতে দেশব্যাপী সাড়া পড়ে যায়। রমজানের মাসে তেমনি উপবাস এবং নানা দেশ থেকে মৌলানারা এসে আরবী ভাষায় কথকতা ও ভাষণ দেন। আজানের ডাকে তেমনি নমাজ পড়তে বসে জনসাধারণ।

আমার মনে নানা সংশয় এবং অস্বস্তি ছিল। ধর্মাচরণ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোথাও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, এটি আমার জানা ছিল না। মৌলবী সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিন খুশী হয়ে বিদায় নিলুম। যা শুনে এসেছি এতকাল ধরে তার অনেক-গুলির সঙ্গে এখানে মিলিয়ে নিতে পার-ছিলুম না,—এজন্য কেমন যেন যন্ত্রণা বোধ করছিলুম! বুঝতে পারা যাচ্ছে একাধিক সংবাদপ্রতিষ্ঠান কোন কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের কানে মিছে কথা শুনিয়ে এসেছে।

(ক্রমশঃ)

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সংসারে কোনো কিছুই অবিচ্ছিন্ন নয়। একটানা সুখ যেমন মানুষের ভাগ্যে নেই, একটানা দুঃখও তাকে চিরকাল সইতে হয় না। আদিগন্ত বর্ষার আকাশেও মাঝে মাঝে সূর্যরশ্মির দেখা মেলে। নরেনের দীর্ঘ পর্যটন একদিন শেষ হল। কোন রকমে একটা চাকরি জুটল জুট কোম্পানীর আফিসে। মাইনে ত্রিশ টাকা। সেটা কম কি বেশী, সেকথা আর তখন মনে হয়নি। একটা কিছু তো পেলাম, একটু দাঁড়াবার ঠাঁই—এই চিন্তাই মন জুড়ে রইল। খবরটা তখনই জানিয়ে দিল নির্মলাকে। তারপর নিজের অবস্থাটা মনে মনে হিসাব করতে বসল। এই ত্রিশের সঙ্গে টুইশানির পনর যোগ করলে যা দাঁড়াবে, তার থেকে কষ্টে-সৃষ্টে মেসের খরচ চালিয়ে বাকীটা মাসে মাসে বাড়ি পাঠানো চলবে। স্ত্রীর গয়না এবং পৈতৃক জমিজমা, যা হাত-ছাড়া হয়ে গেছে তার তো কোনো উপায় নেই, যেগুলো এখনো বন্ধকের কোঠায় আছে, আস্তে আস্তে উদ্ধার করতে হবে। তার আগে নির্মলাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে, নিজেরও দুটো দিন বিশ্রাম দরকার। চাকরিতে যোগ দেবার প্রস্তুতি হিসাবে সাতদিন সময় দিল কোম্পানী।

মুখোমুখী দেখা যখন হল, দুজনে শুধু তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। দুজনের চোখেই নীরব অনুযোগ—এই হাল হয়েছে শরীরের, আর আমাকে একটা খবরও কি দিতে নেই? মুখে ও-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলল না। প্রতি-বেশীরা প্রথমে উদ্বেগ পরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

এবারেও হার হল নরেনের। এই শরীরে মেসে কাটাবার প্রস্তাব বলা মাত্র নাকচ করে দিল নির্মলা। স্থির হল, একটা ছোটখাট বাসা ঠিক করে নরেন নিজে আসতে পারে ভাল, নয়তো চিঠি লিখলেই মনি ঠাকুরপোকে সঙ্গে করে ও চলে যাবে। এখানে থাকবেই বা কিসের ভরসায়? হাতে দুগাছা চুড়ি ছাড়া দেহে বা বাক্সে সোনা বলতে কিছু আর তখন পড়ে নেই। দু-একখানা জমি যা আছে, তাতে একজনেরও পেট চলে না। সেগুলোও ছাড়তে হবে। নতুন বাসা করবার আয়োজন তো আছে একটা। সে খরচ নেহাত ছোট নয়।

বেলেঘাটা অঞ্চলেই বেশ ভালো বাসা পাওয়া গেল। দুখানা ঘর, রান্নাঘর, তার কোলে একটু উঠোন। ভাড়া দশ টাকা। এর চেয়ে কম ভাড়াতেও একখানা ঘর পাওয়া যেত কোনো গলির মধ্যে। কিন্তু চিরকাল পাড়াগাঁয়ে খোলামেলায় মানুষ, শহরের এই ছটাক মাপা ঘিঞ্জির মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। নির্মলাও সেখানে টিঁকতে পারবে না। যে স্ত্রী এত করেছে, তাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্যও যদি না দিতে পারে, তবে কিসের পুরুষ সে? এই কথাটাই মনে হল নরেনের। দরকার হলে আর একটা ছাত্র না হয় জুটিয়ে নেবে কোনোখানে। তাছাড়া মাইনে তো ওখানেই আটকে থাকবে না। ক্রমশঃ বাড়বে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে অন্য চাকরি পাবার সম্ভাবনাও রইল।

বাসা দেখে নির্মলার খুশী আর ধরে না। বলল, এই উঠোনটুকু আমাদের কত কাজে লাগে দেখো। দুটো কুমড়ো গাছ পুঁতবো ঐখানে, বড় হলে ছাদে উঠে যাবে। ওপাশটায় দেবো ঝিঙে আর এদিকে থাকবে লঙ্কা আর ঢ্যাঁড়শ। তর-কারী আমাদের কিনতে হবে না। এক-খানা কোদাল শুধু এনে দিও আমাকে।

নরেনের মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। বলল, দেবো। কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট্ট সংসারটুকু গুছিয়ে ফেলল নির্মলা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিল কাটোয়ার বাড়িতে ফেলে আসা কতগুলো ছাড়া ছাড়া দৃশ্য। একজনের মুখে শোনা টুকরো টুকরো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ। ছাদের অন্ধকারে সেই শেষদিনের কটুকথা এখনো কানে বাজছে, —'আমারই ভুল হয়েছিল। যে যা তাকে সেই ভাবেই দেখা উচিত।' চোখ দুটো আবার দপ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হল সেই দাম্ভিক লোকটাকে ডেকে এনে দেখায় তার আজকের এই জীবনযাত্রা। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করল, না; এখনো সে সময় আসেনি। আর একটু উঠতে হবে। তারপর।

সেইদিনই স্বামী আফিস থেকে ফিরলে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁগো, তোমার মাইনে বলছিল ত্রিশ টাকা। তাই না?

—হ্যাঁ।

—আর?

—আর কী?

—উপরি?

নরেন জলখাবার খেতে খেতে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্ত্রীর মুখের দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, উপরি মানে?

—বাঃ, চাকরিতে উপরি থাকে না?

—ঘুসের কথা বলছ?

—ঘুস কেন হবে? উপরি। আমার মেজোজামাইবাবু মাইনে যা পায় তার

চেয়ে অনেক বেশী পায় উপরি। তারপর, আমার সই শোভনার বর—

——না, আমার কোনো উপরি নেই—কথার মাঝখানেই কেমন গম্ভীর দৃঢ়-স্বরে বলে উঠল নরেন।

স্বামীর এই কণ্ঠস্বর নির্মলা এর আগে কোনোদিন শোনেনি।

বহু বছর পরে সেই দিনগুলো স্মরণ করে নির্মলার দুচোখ জলে ভরে উঠছে। ঐ একটি জায়গায় মানুষটি ছিল অনমনীয়। কিন্তু যে লোক এত কোমল, এত দুর্বল, স্ত্রীর ইচ্ছাকে যে চিরদিন নিঃশব্দে মেনে এসেছে, ঐ একটি মাত্র ক্ষেত্রে তার এই দৃঢ়তা যেন একটা অন্যায় জিদ বলে মনে হয়েছিল সেদিন। কী দুর্মতি হয়েছিল নির্মলার! ওটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

পাটের আফিসে 'উপরি'র প্রচলন কম ছিল না। নরেনের সহকর্মীরা তার পুরো সুযোগ নিতে ছাড়ত না। তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসত ওদের বাড়িতে। বেশীরভাগই নরেনের চেয়ে বয়সে ছোট। নির্মলাকে বৌদি বলে ডাকত। কথায় কথায় উপরি আয়ের প্রসঙ্গও কোনো কোনোদিন এসে পড়ত, এবং নরেন যে এ বিষয়ে সব রকম ছোঁয়াচ সযত্নে এড়িয়ে চলে, তা নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করত নির্মলার সামনেই। সকলের কাছেই যেটা সহজ ও স্বাভাবিক তার সম্বন্ধে একজন লোকের এই এক-গুঁয়েমি নিতান্ত অদ্ভুত ছাড়া আর কি? মাঝে মাঝে মনে হত এটা একটা ভীরুতা মাত্র। নরেনের কথার মধ্যেই যেন তার স্বীকৃতি ছিল, ও আমি পারবো না, ওটা আমাকে দিয়ে হবে না—পীড়াপীড়ি করলে এই ছিল তার উত্তর।

বছর দুয়েক পরে নির্মলার কোলে এল খোকা। তার আগে ও পরে কত-গুলো বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হল, এই সামান্য আয়ে যা কুলায় না। সেই টানাটানিই বাড়তে লাগল দিনদিন। নির্মলা যদি বুঝত, এই মাইনেটুকুই সম্বল, এরই মধ্যে তাকে সবকিছু কুলিয়ে নিতে হবে, তাহলে হয়তো ততটা অসন্তোষের কারণ ঘটত না। কিন্তু অভাব দূর করবার উপায় যেখানে হাতের মধ্যে, সেখানে শুধু একটা গোঁ কিংবা বোকামির বশে হাত গুটিয়ে বসে থাকা কে সহ্য করতে পারে? এই মনোভাব থেকেই শুরু হল বিরোধ। খোকা পেটে আসবার পর থেকে উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে নির্মলার স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে পড়েছিল। মেজাজ বশে রাখতে পারত না। যখন তখন রূঢ় কথা বেরিয়ে আসত, দু'বছর আগেও যা সে মুখে আনা দূরে থাক, মনে মনেও ভাবতে পারত না। প্রথম প্রথম নরেন কোনো জবাব করত না। কিন্তু মানুষের মাথায় যখন রক্ত চড়ে এবং তার থেকে বেরিয়ে আসে কটূক্তি, উত্তর না দিয়ে তাকে ঠান্ডা করা যায় না। রসনার ধর্মই হল, সে যখন বিষ-উদ্গিরণ শুরু করে, সে বিষ মাথা পেতে নিলেই তার স্রোত বন্ধ হয় না। বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নেওয়াও সহজ নয়। নরেনেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছিল।

সেই দিনটা অক্ষয় হয়ে আছে নির্মলার জীবনে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই এমনি থেকে যাবে।

মাস শেষ হতে পুরো এক সপ্তাহ বাকী। নির্মলার হাতে একটি পয়সা নেই। বাজার হয়নি। ঘরে দুটো আলু ছিল। তাই সেদ্ধ করে, শুধু একটু নুন মেখে ভাতের সঙ্গে ধরে দিয়েছিল স্বামীর সামনে। নরেন চোখ তুললে দেখতে পেত থালাটা রাখতে গিয়ে দুচোখ তার জলে ভরে উঠেছিল। স্বামী যদি আধপেটা খেয়ে কিংবা না খেয়ে রাগ করে চলে যেতেন, কিংবা দুটো রূঢ় কথা শুনিয়ে দিতেন তাকে, নির্মলা বোধহয় মনে মনে খুশী হত। মনে করত, এটা তার পাওনা। কিন্তু নরেন কোনো-দিকে ফিরে চায়নি, নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে যা পেয়েছে তাই দিয়েই সব ভাত কটি খেয়ে নিয়েছিল। সেই দিকে চেয়ে নির্মলার চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে দেখা দিল জ্বালা। স্বামী যখন উঠতে যাবেন তিক্ত-কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল, খুব ভালো লাগছে; না?

নরেন চকিতে একবার চোখ তুলে তাকাল, জবাব দিল না। মুখ ধুয়ে ঘটিটা এনে রাখল বারান্দার কোণে।

—কথা বলছ না যে?

—ছাতাটা দাও।

নির্মলা ছাতা আনতে গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। এই উত্তর না দেওয়ার মধ্যে যেন একটা সদম্ভ অবজ্ঞা লুকিয়ে আছে। কেন? কিসের এত তাচ্ছিল্য? কিজন্যে এত অহঙ্কার? স্বামী যখন যাবার জন্য পা বাড়াল, মনে হল সে শুধু যাওয়া নয়, তাকে দুপায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। নির্মলা সুর চড়িয়ে বলল, চলে যাচ্ছ; খোকার দুধের টাকাটা দিয়ে গেলে না?

—আমার কাছে তো টাকা নেই।

—দুধ আনবো কী দিয়ে?

—দেখি, যদি আসছে মাসের টুইশানের টাকা থেকে কিছুটা আগাম পাওয়া যায়।

—আগামের নাম করে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করবে না?—প্রশ্ন নয়, প্রশ্নচ্ছলে আরো খানিকটা শ্লেষ-উদ্গিরণ।

নরেন চলে যাচ্ছিল, একবার ফিরে তাকাল। প্রতিবাদের সুরে বলল, ভিক্ষে মানে? নিজের পাওনা চেয়ে নেবো তার মধ্যে লজ্জারই বা কী আছে?

—ও: আর যে পাওনা চাইতে হয় না, দুনিয়াসুদ্ধ সব লোকে ন্যায্য বলে আদায় করে নেয়, লজ্জা বুঝি শুধু তার বেলায়?

আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গ, যা নিয়ে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে। কিন্তু নরেনকে টলানো যায়নি। কিন্তু নির্মলা তো ভুলে থাকতে পারে না। লোকেও ভুলতে দেয় না। কালই ওর এক আফিস-ঠাকুরপো এসে বলে গেছে, নরেন এখন যে জায়গায় গিয়ে পড়েছে, দুহাতে পয়সা লুঠবার অমন ঘাঁটি আর নেই। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, একটু চোখ বুজে থাকলেই পকেট আপনা হতেই ভারী হয়ে ওঠে। ঐ পোস্টে এর আগে যে ছিল, এরই মধ্যে যাদবপুরে বাড়ি করে ফেলেছে। 'কিন্তু নরেনদা আমাদের গোঁসাই মানুষ, একেবারে ঠাকুর

রামকেণ্ট!' বলে হেসে উঠেছিল ভদ্রলোক। হাসি নয়, যেন একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই অনুপস্থিত অকর্মণ্য লোকটার মুখের উপর। তখন থেকেই সেই কথাগুলো ঝাঁ ঝাঁ করছিল নির্মলার কানের ভিতর। তার উপরে চারদিকের এই হাজ। প্রতিমুহূর্তে বুকটা তার জ্বলে যাচ্ছিল। তারই তীব্র ঝাঁজ বেরিয়ে এল, ওর ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

নরেন পা বাড়িয়েছিল; থমকে দাঁড়াল। এদিকে না ফিরেই বলল, সব লোকে কি করে না করে তা দিয়ে আমার দরকার নেই। আমি পারবো না। সেকথা তোমাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছি।

—তা জানি। পারবার সাহস নেই, সে বুকের পাটা নেই তোমার।

—সাহসের কথা নয়। ওটা অন্যায়; আমার বিবেকে বাধে।

—বিবেক! ঘরে যার হাঁড়ি চড়ে না কচি বাচ্চার মুখে একফোঁটা দুধ যে যোগাতে পারে না তার আবার বিবেক! ওসব ভড়ং রেখে দাও। আসলে তুমি—

(ফণিনীর মত গর্জে উঠেছিল নির্মলা। মুহূর্তের তরে নরেনও ফিরে তাকিয়েছিল প্রদীপ্ত চক্ষু মেলে।)

—আসলে তুমি ভীরু, অক্ষম, অপদার্থ! জন্ম জন্ম ধরে কত পাপ করেছি, তাই তোমার মত একটা কাপুরুষের হাতে পড়েছিলাম!

বলতে বলতে রুদ্ধকণ্ঠে দুচোখে আঁচল চেপে ধরে সেইখানেই বসে পড়েছিল। নরেন আর দাঁড়ায়নি।

সেইদিনই ঘটে গেল চরম সর্বনাশ।

খানিকটা আগুন বেরিয়ে যাবার পর বুকের ভিতরটা যখন স্বভাবের নিয়মে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে এল, নিজের আচরণের কথা ভেবে নির্মলার লজ্জা যত হল, তার চেয়ে বেশী হল বিস্ময়। মনে মনে বলল, এ কী করলাম! সত্যিই তো। এতবড় রূঢ়কথা স্বামীকে সে কোনোদিন বলেনি। মাথাটা কি তার একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল? অথচ, তার চেয়ে কে বেশী জানে, এর কোনোটাই তার মনের কথা নয়। কিন্তু স্বামী কি তা বুঝবেন? এই শিশুসম সরল মানুষটি যে তারই উপরে একান্তনির্ভর। তাঁর সেই অখণ্ড বিশ্বাসের মূলে নিজে হাতেই সে চরম আঘাত করে বসল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। অন্যদিন অফিস থেকে বেরিয়ে টুইশান সেরে এর কিছু আগেই নরেন এসে পড়ে। আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? দারুণ দুর্ভাবনায় নির্মলা ক্রমাগত ঘর-বার করতে লাগল।

পাশের বাড়ির বৌটি খোকাকে বড় ভালবাসে। বিকাল হলেই রোজ এসে নিয়ে যায়। অনেকদিন খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কোলে করে পেণছে দেয়। আজও তাই দিতে এল। নির্মলা তখনো ঘরে যায়নি, আলো জ্বালেনি। বৌটি আসতেই উদ্বেগের সুরে বলে উঠল, কী করি বলতো ভাই, এখনো তো উনি এলেন না।

—কোথাও আটকা-টাটকা পড়েছেন হয়তো। এসে পড়বেন এখখুনি।

সেই সময়ে একটা রিক্সা নিয়ে অফিসের একজন বাবু ঝড়ের মত ঢুকল ওদের গলিতে। ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শীগ্‌গির আসুন, বৌদি।

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে! কেন? উনি কোথায়?

—আসুন, বলছি সব। তাড়াতাড়ি উঠুন।

নির্মলার মুখে আর কথা সরল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল বৌটির মুখের দিকে। সে বলল, তুমি ঘুরে এসো দিদি,

খোকাকে আমি রাখছি। ওর জন্যে কিছু ভেবো না।

হাসপাতালে গিয়ে যখন পৌঁছল, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ: হাঁটুর ঠিক নিচে থেকে ডান পাটা কাটা। ঢাকা তুলে মুখের দিকে তাকাল নির্মলা। সবখানি জুড়ে মনে হল যেন অপরিসীম ক্লান্তি। সেই ক্লান্তির বোঝা টেনে টেনেই এই কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষটা। নেই, একথা যে বিশ্বাস করাই যায় না।

যারা সেখানে ছিল তাদের কাছেই শোনা গেল, ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ নাকি পড়ে যায়। ডান পাটা চলে গিয়েছিল গাড়ির তলায় এবং তারই উপর দিয়ে ট্রামটা বেরিয়ে গেছে। রাস্তার লোকেরাই ছুটে এসে টেনে তুলেছিল। সুবিধামত যানবাহন পাওয়া যায়নি। অ্যাম্বুলেন্স আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণ সমানে চলেছে হেমারেজ। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে যখন নিয়ে যাওয়া হল, সারা দেহে আর তখন রক্ত বলতে কিছু নেই। কেমন করে থাকবে? মনে মনে বলল নির্মলা। সব রক্ত যে তিনি তারই জন্যে জল করে গেছেন। স্ত্রী হয়ে নিজের স্বামীকে সে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে।

জন্ম জন্ম ধরে কত পাপ করেছি; তাই তোমার মত একটা কাপুরুষের হাতে পড়েছিলাম।

অ্যাম্বুলেন্স করে যারা পৌঁছে দিয়েছিল তার মধ্যে একজন বলল, এমনিতেই শরীরটা বোধহয় খুব দুর্বল ছিল। অ্যাক্সিডেন্টের পর কথাবার্তা বিশেষ বলতে পারেননি। নিজের নাম আর আফিসের ঠিকানাটা শুধু কোনোরকমে বুঝতে পেরেছিলাম। খবর দিতেই ও'রা সব এসে পড়লেন।

আফিসের কজন সহকর্মী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তখন নয়, কদিন পরে তারা এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিল নির্মলাকে। নরেন ভট্টাচার্যির প্রথম এবং শেষ অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কয়েকমাস ধরে সে বিলক্লার্কের কাজ করছিল। ধীর, স্থির এবং খাঁটি লোক বলেই বোধহয় কর্তৃপক্ষ অনেককে বাদ দিয়ে এ-দায়িত্ব তার হাতে দিয়েছিলেন। এখানে যারা বসে, বড় বড় বিল প্রতি তাদের একটা বাঁধা পাওনা আফিসের শুরু থেকেই প্রায় 'নিয়ম'এ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নরেন সে টাকা স্পর্শ করত না। ঐদিন আফিসে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল; কোনো কাজে হাত দেয়নি, কারো সঙ্গে কথাও বলেনি। তারপর, একটা পার্টি এসেছিল বিল পাশ করাতে। নতুন লোক। কাজ হয়ে গেলেই একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল ফাইলের তলায়। নরেন প্রথমে চমকে উঠলেও, খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে টাকাটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছিল। পাশের টেবিলে যে কেরাণীটি বসে, পার্টির লোক চলে যেতেই কাছে এসে একগাল হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, এতদিনে সুবুদ্ধি হল, দাদা? এবার বুঝতে পারলেন তো কী ভুল করেছেন এ্যাদ্দিন ধরে।

নরেন কোনো সাড়া দেয়নি। শুকনমুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ চঞ্চলভাবে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিল। —কোথায় চললেন? পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওর সহকর্মী। জবাব দেয়নি। আফিসেও আর ফিরে আসেনি। ছুটির একটু আগে খবর এল, সে হাসপাতালে।

দিন সাতেক পরে নির্মলার নামে একটা চিঠি এসেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে—"মৃত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে যখন আউট-ডোরএ আনা হয়, তাহার পকেটে দশটা টাকা পাওয়া গিয়াছিল। উহা রোগীদের প্রাইভেট ফাণ্ডে জমা আছে। আপনি নিজে অথবা লিখিত অধিকারসহ অন্য কোনো লোক পাঠাইয়া টাকাটা ফেরত লইবার ব্যবস্থা করিবেন।" •

চিঠিটা সে তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। (ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলার প্রচলন খুব বেশী দিনের নয়, ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে। বর্তমানে আমরা যে ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি এবং সাজ-সরঞ্জামের সংগে পরিচিত তার প্রায় সবগুলিরই উদ্ভাবক এবং সংস্কারক ইংরেজ জাতি। ইংরেজরাই আদিম যুগের ক্রিকেট খেলার ধারাকে মার্জিত ক'রে এবং খেলায় নতুন নতুন কলা-কৌশল আবিষ্কার ক'রে, নতুন সাজ-সজ্জায় ভদ্রস্থ করেছে ক্রিকেট খেলাকে। এ প্রায় হুকোর খোল-নলচে বদল করার সামিল। ইংরেজদেরই আন্তরিক আগ্রহে এবং চেষ্টায় ক্রিকেট খেলা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র নিয়ে নানা রকমের গাল-গল্প এবং প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইংরেজ জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ,—বাইবেল, ক্রিকেট এবং ফুটবল—এই তিনের সমন্বয়ে ইংরাজ জাতি। এই তিনটির সংগছাড়া ইংরেজ বিদেশের মাটিতে কখনও পা ফেলেনি। বাইবেল ইংরেজ জাতির পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ এবং ক্রিকেট ও ফুটবল তাদের অতি জনপ্রিয় জাতীয় খেলা। শুধু তাই নয়, এই খেলা দুটি ইংরেজ জাতির শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতার অন্যতম বাহক এবং ধারক। ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার আর এক নাম 'Kings' game'. প্রথম দিকে আমাদের দেশের লোক ক্রিকেট খেলাকে বলতো 'ব্যাট-বল' খেলা। ক্রিকেট খেলার কৌলিন্য বিচার ক'রে শিক্ষিত সমাজ নামকরণ করলেন 'Princes' game'।

যে সব ইংরেজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁরা ইংল্যাণ্ডের মাটির মায়া ছেড়ে এলেও ক্রিকেট খেলার সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে আসতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডের আকাশ-বাতাস ও মাটির সংগে ভারতবর্ষের বিস্তর প্রভেদ লক্ষ্য করেও তাঁরা ভারতবর্ষের পরিচ্ছন্ন নীল আকাশের তলায়, সোনালী রোদে উদ্ভাসিত সবুজ ঘাসের আঙিনায় এক দিন ক্রিকেট খেলার বীজ বপণ করেন। সেই শুভ দিনটি আজও খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলার যে সব বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'Madras Courier' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সেই সময়ের দুটি খেলার বিবরণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই খেলা দুটি—ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সংগে দমদম এবং ব্যারাকপুর দলের। সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে আমরা এই দুটি খেলাকে আপাততঃ সব থেকে পুরানো দিনের খেলা বলতে পারি। তবে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের অনেক আগে যে ক্রিকেট খেলা ভারতবর্ষের মাটিতে রীতিমত চালু ছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের কোন সন্দেহ নেই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের অনেক আগে বেঙ্গলী গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, বেঙ্গল জার্ণাল এবং মাদ্রাজ কিউরিয়র পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্বের এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ক্রিকেট খেলার কোন উল্লেখ আছে কিনা তার কোন অনুসন্ধান আজও হয়নি। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভের সময় থেকে যদি আমরা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে যাই তাহলে দেখতে পাব ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের অনেক বছর আগেই ভারত-বর্ষে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানীগুলি প্রবল শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু ইংরেজ এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া করেছেন; এমনকি বহুজন ভারতবর্ষে দীর্ঘ-কাল বসবাসও ক'রে স্বদেশে ফিরেছেন। এই দীর্ঘকালের প্রবাস-জীবনে ক্রিকেট-অনুরাগী ইংরেজ জাতির পক্ষে ক্রিকেট না-খেলা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

১৯১১ সালে পাতিয়ালা মহারাজার নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড সফরকারী প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতবর্ষের ক্রিকেট ক্লাবগুলির মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ক্লাব—ইউরোপীয়দের ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার উন্নতিকল্পে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব সক্রিয়ভাবে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেনি। তবে আমরা পরোক্ষভাবে লাভবান হয়েছি। তাছাড়া ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ক্রিকেট খেলার বিখ্যাত 'Wisden' প্রামাণ্য পুস্তকে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে শুধু ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে; সেই সংগে কোন নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া নেই। কিন্তু অনেকের মতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের অনেক আগে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের অস্তিত্ব কল্পনা করা অবাস্তব হবে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারাই ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের অনেক বছর আগেই কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাধুলায় এবং আমোদ-প্রমোদে ইংরেজদের অনুরাগ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সুতরাং কলকাতার ইংরেজদের পক্ষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রিকেট না খেলা বা ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করা ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের পক্ষে এক অস্বাভাবিক ঘটনা নয় কি? ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকাল যদি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ বলেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, তাহলে ঐতিহাসিকদের মতে, গ্রেট-ব্রটেনের বহির্জগতে এই ক্লাবই প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব। এমন কি, ইংল্যান্ডের মাটিতে আজও পর্যন্ত যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় সুপ্রাচীন ক্রিকেট ক্লাব নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব তাদের মধ্যেও অন্যতম। আরও এক বিষয়ে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ঐতিহ্য আছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইডেন গার্ডেনে অবস্থান ক'রে একই স্থানে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করার দ্বিতীয় বিশ্ব রেকর্ড করেছে এই ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। এ বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড আছে, কেন্টের ভাইন ক্রিকেট মাঠের বাসিন্দা সেভেনওকস ক্রিকেট ক্লাবের। যদিও বোম্বাই ভারতীয় ক্রিকেট খেলার পীঠস্থান, ভারতবর্ষের মাটিতে ক্রিকেট খেলার পথিকৃৎ কলকাতা। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মানউন্নয়নে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও তাদের অস্তিত্বে আমরা লাভবান হয়েছি। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবেরই আমন্ত্রণে এবং ব্যবস্থাপনায় ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে জি এফ ভার্ণোনের নেতৃত্বে প্রথম ইংলিস ক্রিকেট দল, ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে কে জি কে'র নেতৃত্বে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি অথেনটিক্স নামে তৃতীয় ইংলিস ক্রিকেট দল এবং ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে সরকারীভাবে এম সি সি দল ভারত সফরে আসে। এই সফরগুলি থেকে আমরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছি, উন্নত মানের ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি! ইংল্যান্ডের অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের খেলার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় হয় এবং তাদের খেলা দেখে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের চোখ খুলে যায়—খেলা সম্বন্ধে তাদের ধারণা বদলে যায়।

দিলীপ সিংজী

কে এস রঞ্জিৎ সিংজী

জি এফ ভার্ণোনের ভারত সফরের পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হক দ্বিতীয় ইংলিস ক্রিকেট দল নিয়ে ভারত সফরে আসেন। তাঁর দলে আমরা খেলতে দেখলাম স্যর এফ স্টানলি জ্যাকসনকে, যিনি পরবর্তীকালে বাংলার গভর্ণর হয়ে এসেছিলেন, ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের পক্ষে ৩৩টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন এবং একাধিকবার দক্ষতার সঙ্গে ইংলন্ডের টেস্ট ক্রিকেট দল পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম দিকের (১৮৯৩—১৯২৬-২৭) চারটি ইংলিস ক্রিকেট দলের ভারত সফরের মধ্যে প্রথম তিনটি ছিল বেসরকারী সফর। ইংলিস ক্রিকেট দলের মধ্যে সরকারীভাবে প্রথম ভারত সফরে আসে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে প্রথম এম সি সি দল। সরকারী সফর হলেও ভারতবর্ষের বিপক্ষে সরকারীভাবে টেস্ট ম্যাচ খেলবার অধিকার এম সি সি দলের ছিল না। এম সি সি দলের এই প্রথম সরকারী সফর ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় অধ্যায়। এই দলে ছিলেন ইংল্যান্ডের কয়েকজন নামজাদা টেস্ট খেলোয়াড়। টেস্ট খেলার দুর্ধর্ষ বোলার মরিস টেটের নামই এতদিন আমরা শুনেছিলাম; এবার তাঁর খেলা চোখে দেখলাম। টেট এবং গিয়ারীর বোলিং দেখে বিস্মিত হলাম। দেখলাম ব্রাউনের উইকেট কিপিং; আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম স্যান্ডহাম, ওয়াট এবং টেটের একাধিক সেঞ্চুরী রান। মরিস টেট এই ভারত সফরে ১২৪৯ রান করলেন এবং ১২৮টা উইকেট পেলেন।

কিন্তু আমরা তার থেকে বিস্মিত হলাম এবং সেই সঙ্গে গর্ব অনুভব করলাম বোম্বাইয়ের হিন্দু বনাম এম সি সি দলের খেলায় এম সি সি'র দুর্ধর্ষ বোলারদের আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে যখন সি কে নাইডু সেঞ্চুরী রান (১৫৩) করলেন। নাইডু ঝড়ের গতিতে প্রায় ১০০ মিনিটের খেলায় তাঁর ১৫৩ রান তুলে দেন। বাউন্ডারী এবং ওভার-বাউন্ডারীর ফুলঝুরি ছুটিয়ে দেন তাঁর এই ১৫৩ রানে—১৩টা বাউন্ডারী এবং ওভার-বাউন্ডারী ১১টা—বাউন্ডারী এবং

পতৌদির নবাব

ওভার-বাউন্ডারীর ছড়াছড়ি। এম সি সি দল এই সফরে সরকারী টেস্ট ম্যাচ না খেললেও বোম্বাই, ক'লকাতা এবং মাদ্রাজে সম্মিলিত ভারতীয় একাদশ দলের সংগে তিনটে ম্যাচ খেলেছিল। এই তিনটে খেলাকে বেসরকারী টেস্ট খেলার পর্যায়ে খেলা যায়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের খেলা ড্র যায়; ক'লকাতায় এম সি সি দল জয়লাভ করে। বোম্বাইয়ের খেলাটিই বিশেষ স্মরণীয়। এম সি সি দলের অধিনায়ক আর্থার গিলিগন নিজেও স্বীকার করেছেন, সফরের এই খেলায় তাঁর অজেয় দলটি ভারতীয় দলের কাছে পরাজয়ের হাত থেকে খুব জোর বেঁচে যায়। এই খেলায় এম সি সি দল প্রথম ইনিংসে ৩৬২ রান ক'রে সব আউট হয়ে যায়। দলের সর্বোচ্চ ৮৩ রান করেন ওয়াট। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৪৩৭ রানে শেষ হ'লে তারা ৭৫ রানে এগিয়ে যায়। আমরা দেখে অবাক হলাম নিরীহ প্রকৃতির চেহারা নিয়ে প্রফেসর দেওধর ২৫৫ মিনিট খেলে সেঞ্চুরী (১৪৮ রান) করলেন। বাউন্ডারী মারলেন ১২টা। এম সি সি দলের ২য় ইনিংসে ভেল্কির খেলা দেখালেন ভারতীয় বোলার রামজি, ৩২ রানে ৪ জনকে আউট ক'রে। দুটো ইনিংসে রামজি ৭টা উইকেট পেলেন ৭৪ রানে। দুই দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই এক ইনিংসে ৪টে উইকেট পান। এদিকে আবার দেওধরের ১৪৮ রান, দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান হ'ল। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা দয়াপরবশ হয়ে এম সি সি দলকে সে যাত্রা পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আমরা জিততে পারলুম না, তবুও আমাদের বুক গর্বে দশ হাত বেড়ে গেল। ক্রিকেট খেলায় আমাদের প্রকৃত আত্মচেতনা এই সফর থেকেই। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রিকেট খেলার গুরুত্বও আমরা প্রথম অনুভব করলাম।

ভারতবর্ষের মাটিতে ক্রিকেট খেলার প্রথম ভিত্তিস্থাপন হয় ক'লকাতায়; কিন্তু বোম্বাই ভারতীয় ক্রিকেট খেলার প্রাণকেন্দ্র। বোম্বাইয়ের সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা—১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের মিলিটারী দল বনাম বোম্বাই আইল্যান্ড দলের খেলা। বোম্বাই খুবই ভাগ্যবান যে, লর্ড হ্যারিসের মত একজন সুদক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট খেলার একজন ভক্তকে গভর্ণররূপে পেয়েছিল। লর্ড হ্যারিসেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় বোম্বাই মহাপীঠস্থানের মাহাত্ম্য লাভ করে।

সি কে নাইডু

ভারতীয়দের মধ্যে বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে। পারস্য দেশের 'Chowgan-Gui' খেলা সম্বন্ধে পার্শীদের যথেষ্ট ধারণা ছিল। প্রাচীন ক্রিকেট খেলার সংগে পারস্য দেশের এই 'Chowgan-Gui' খেলার আবার অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য ছিল। ইংল্যান্ড যে যুগে ক্রিকেট খেলার নাম-গন্ধও জানতো না, সেই সময়ে পারস্য দেশে 'Chowgan-Gui' খেলার জনপ্রিয়তা সারা দেশ জুড়ে ছিল এবং ভারতবর্ষের পার্শীদেরও এ খেলা অজানা ছিল না। তাই ইংরেজদের ক্রিকেট খেলাও খুব স্বাভাবিকভাবে পার্শীদের আকৃষ্ট করে। পার্শীদের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব (ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব) স্থাপিত হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকে পার্শী ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সর্বপ্রথম 'রাউন্ড-আর্ম' বল দিতে আরম্ভ করে। সারে ক্রিকেট দলের রবার্ট হেন্ডারসন কয়েক বছর বোম্বাইয়ে ছিলেন। তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষার গুণে পার্শীরা ক্রিকেট খেলায় প্রভূত উন্নতি করে। পার্শীরা ক্রিকেট খেলায় অত্যুগ্র আগ্রহ এবং অসম-সাহসিকতার পরিচয় দেয় ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে। বোম্বাইয়ের ক্রিকেটিং গভর্ণর লর্ড হ্যারিস পার্শীদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় পার্শীরা এই দুঃসাহসিক অভিযানে নামতে সাহস পায়। ইংল্যান্ডের মাটিতে পার্শী দলের এই দুটি সফরই ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রিকেট অভিযান। প্রথম পার্শী দলটি খুব শক্তিশালী ক'রে গঠন করা সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ড সফরের খরচপত্র খেলোয়াড়দেরই বহন করতে হয়েছিল, ফলে অনেক নামকরা খেলোয়াড় সফরে যেতে পারেননি। প্রথম ইংল্যান্ড সফরে পার্শীদলের খেলার ফলাফল দাঁড়ায়: মোট খেলা ২৮, জয় ১, হার ১৯, ড্র ৮। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় পার্শীদল ৩১টা খেলায় যোগদান করে। প্রথম দলের তুলনায় জয়লাভের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলাফল দাঁড়ায়: জয় ৮, হার ১১, ড্র ১২।

পার্শীদের ইংল্যান্ড সফরের পর ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে জি এফ ভার্ণোন-এর নেতৃত্বে প্রথম ইংলিস ক্রিকেট দল এবং লর্ড হকের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইংলিস ক্রিকেট দল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত সফরে আসে। পার্শীরাই এই দুটি ইংলিস ক্রিকেট দলকে শেষ পর্যন্ত অজেয় আখ্যা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেয়নি। পার্শীরা ভার্ণোনের দলকে ৪ উইকেটে এবং হকের দলকে ১০৯ রাণে হারিয়ে দেয়।

বোম্বাই-এ প্রথম হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব (বোম্বাই ইউনিয়ন হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম মুসলীম ক্রিকেট ক্লাব (মহমেডান ক্রিকেট ক্লাব) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় প্রথম হাতে-খড়ি নিয়েছিলেন রামচন্দ্র বিশ্রাম নাভেলকার, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বোম্বাইয়ের পেন্টাঙ্গুলার এবং কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার যুগকে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা এই প্রতিযোগিতা থেকেই। প্রেসিডেন্সি ম্যাচই কালক্রমে ট্রাঙ্গুলার, কোয়াড্রাঙ্গুলার এবং শেষে পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় এবং পার্শীদলের মধ্যে বাৎসরিক ক্রিকেট খেলার প্রথম ব্যবস্থা হয়। এই বাৎসরিক খেলার নাম ছিল প্রেসিডেন্সি ম্যাচ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদলের অনুরোধে প্রেসিডেন্সিদল (ইউরোপীয় দল) হিন্দু দলের সংগে একটা ম্যাচ খেলে। হিন্দুরা ১০৬ রানে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত

মহম্মদ নিসার

করে। দ্বিতীয় বছরেও হিন্দুদলের কাছে ইউরোপীয় দলের হার হয় এবং সেই থেকেই বাৎসরিক খেলার নাম দাঁড়ায় ট্রাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলা। এই নাম ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসলীম দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় কোয়াড্রাঙ্গুলার নাম হয়। ১৯৩৭ সালে 'রেষ্ট' দলকে প্রতি-যোগিতায় স্থান দেওয়া হয়; এবার নাম হ'ল পেন্টাঙ্গুলার অর্থাৎ পাঁচ দলের খেলা— ইউরোপীয়, পার্শী, হিন্দু, মুসলীম এবং রেষ্ট দল। আসলে প্রতি-যোগিতাটি দলগত প্রতিযোগিতা ছিল না, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ছিল। প্রত্যেকটি দল নিজ নিজ সম্প্রদায় বা জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। ফলে প্রতিযোগিতায়

মুস্তাক আলী

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উত্তেজনার ভাব দেখা দিত। এই উত্তেজনা শুধু খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা স্থানীয় ব্যাপার ছিল না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জাতির লোকের মনে প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ এবং উত্তেজনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরাট আকার ধারণ করতো। ভারত-বর্ষের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কগণ খেলার এই উত্তেজনাকে সুনজরে দেখেননি। তাঁদের দৃঢ় ধারণা জন্মায়, দেশের মধ্যে সাম্প্র-দায়িক বিষ বিস্তারের পক্ষে খেলার এই উত্তেজনা খুবই সহায়ক এবং তা দেশের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। দেশের রাজ-নৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই বিরুদ্ধ মনোভাবই শেষ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা স্থগিত হওয়ার কারণ। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডু পেন্টাঙ্গুলার এবং কোয়া-ড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার যুগকে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার 'স্বর্ণ যুগ' হিসাবে চিহ্নিত করে বলছেন, 'আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পেন্টাঙ্গুলার এবং কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতি-যোগিতা স্থগিত রাখার ফলেই ভারতীয় ক্রিকেট খেলার আজ এই গরীব হাল দাঁড়িয়েছে'। এই সঙ্গেই তিনি বলেছেন, 'আমি ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেই একথা বলছি, রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে নয়।' ইউ-রোপীয় দলকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রধানতঃ ইংল্যান্ড থেকে খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা প্রতি বছর ভারত-বর্ষে আসতেন। পেন্টাঙ্গুলার এবং কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কল্যাণেই ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেন্ট, সি বি ফ্রাই, উইলফ্রেড রোডস, জর্জ হার্স্ট প্রভৃতির মত প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা আমরা দেখেছি এবং ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের সঙ্গে খেলে ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

ইংল্যান্ড এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম সর্ব-প্রথম উৎকীর্ণ করেন জামনগরের রাজ-কুমার রঞ্জিৎ সিংজী। ইংল্যান্ডের পক্ষে তিনি ১৫টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, সবগুলিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। তিনি ছাড়া আরও দু'জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় সে যুগে ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন—রঞ্জিৎ সিংজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দিলীপ সিংজী এবং পতৌদির নবাব ইফতিকার আলী। দিলীপ সিংজী খেলেন ১২টা টেস্ট এবং ইফতিকার আলী তিনটে। প্রকৃতপক্ষে

অমর সিং

এই তিনজন ভারতীয় ক্রিকেট খেলো-য়াড়ের সাফল্যে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলিস ক্রিকেট মহলের অনুদার দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনেকটা পরিবর্তন হয়। এই তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে রঞ্জিৎ সিংজী ছিলেন নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। প্রধানতঃ তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য, তাঁর খেলোয়াড়সুলভ শিষ্টাচার এবং বিনম্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের জন-সাধারণ ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্তার পরি-চয় পায়। রঞ্জিৎ সিংজী সহজেই বৃটিশ জনসাধারণের হৃদয় জয় করেন। দুই দেশের কৃষ্টি সভ্যতার আদান-প্রদান এবং দুই দেশের মধ্যে সখ্যভাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খেলাধুলার প্রভাব যে অপরিমিত এবং খেলাধুলা যে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদূতের সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, রঞ্জিৎ সিংজী তাঁর খেলার মাধ্যমে আর একবার তা প্রমাণ করে দিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ইংলিস ক্রিকেট মহলের

লালা অমরনাথ

সুদীর্ঘকালের সযত্ন-রক্ষিত উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে দেখা দিল।

রঞ্জিৎ সিংজীর সাফল্য ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষকে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা মহারাজার নেতৃত্বে সর্বদল সম্মিলিত প্রথম ভারতীয় দল ইংল্যান্ড সফরে যায় এবং ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এম সি সি দল সরকারীভাবে ভারত সফরে আসে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ লর্ডসে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম সরকারী টেস্ট খেলা সুরু হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ইংল্যান্ড সফরে ভারতবর্ষ মাত্র একটা টেস্ট খেলেছিল এবং ইংল্যান্ড সে খেলায় ১৫৮ রানে জয়ী হয়েছিল। প্রথম সরকারী টেস্ট খেলতে নেমে ভারতবর্ষের এ পরাজয় খুব বেশী অগৌরবের হয়নি। ইংল্যান্ডের জলবায়ুতে সপ্তাহে ছ'দিন ক্রিকেট খেলার মত অভ্যাস এবং শরীরের তাগদ ভারতীয় খেলোয়াড়দের ছিল না। টেস্ট খেলাতে নাজির আলি, পালিয়া এবং অমর সিং আহত পা নিয়ে খেলেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে মহম্মদ নিসার ৫টা উইকেট পান, ৯৩ রানে; দ্বিতীয় ইনিংসে জাহাংগীর খাঁ পান ৪টে উইকেট, ৬০ রানে। নিসারের প্রচন্ড বোলিং দেখে ইংল্যান্ড চমৎকৃত হ'ল। ভারতবর্ষ-ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম খেলাতে একমাত্র মহম্মদ নিসারই এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পাওয়ার প্রথম গৌরব লাভ করেন।

ভি মানকড়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স, হেড কোয়াটার্স ইংল্যাণ্ডে। ভারতবর্ষ প্রথম যোগদানের অধিকার লাভ করে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের এস রবার্টসন এবং স্যার উইলিয়ম কুরী। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের ভারত সফরকারী এম সি সি দলের অধিনায়ক আর্থার গিলিগান ভারত সফরকালে ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের বড়লাট এবং পাতিয়ালা মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংস্থা দিল্লীতে গঠিত হয়। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন আর ই গ্র্যান্ট গোভান এবং প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এন্টনি ডি মেলো। দুজনই আজ স্বর্গগত। এই সংস্থাই আজ ভারতীয় ক্রিকেট খেলার সর্বময় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এই সংস্থার উদ্যোগে সর্বপ্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল ভারতবর্ষের বাইরে ক্রিকেট সফরে যায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে এই ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ক্রিকেট দল সরকারীভাবে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েণ্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্থান সফরে গেছে এবং অন্যদিকে সরকারীভাবে ভারত সফরে এসেছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েণ্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্থান ক্রিকেট দল।

১৯৬১-৬২ খৃষ্টাব্দের ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের টেস্ট খেলার ফলাফল বাদ দিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ পাঁচটি দেশের বিপক্ষে ৭২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। ভারতবর্ষের জয় ৬, হার ২৯ এবং খেলা ড্র ৩৭। ভারতবর্ষ এপর্যন্ত টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছে নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটো ক'রে এবং ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১টা ক'রে টেস্ট খেলা। এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কোন টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ভারতবর্ষ ১৭টা টেস্ট সিরিজ খেলে মাত্র দুটো টেস্ট সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে— নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। সিরিজ ড্র গেছে ৩টে—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে এবং পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে।

পলি উমরীগড়

ভারতবর্ষের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। এই জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলের পুরস্কার 'রঞ্জি ট্রফি'। কালবিজয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গগত রঞ্জিৎ সিংজীর স্মৃতি-স্মরণার্থে পাতিয়ালার স্বর্গগত মহারাজা এই পুরস্কারটি দান করেন। বোম্বাই প্রদেশ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরেই 'রঞ্জি ট্রফি' জয়লাভের গৌরব লাভ করে। শুধু তাই নয়, বোম্বাই ১২ বার 'রঞ্জি ট্রফি' জয়ী হয়ে সর্বাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের রেকর্ড করেছে।

গত তিন বছর (১৯৫৯-৬১) বোম্বাই ক্রিকেট দলই রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে। বাংলা দল এ পর্যন্ত মাত্র একবার রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে; রানার্স-আপ হয়েছে পাঁচবার —১৯৩৭, ১৯৪৪, ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছাড়াও ভারতবর্ষের মানচিত্রে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হিসাবে এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (বিজয়ীদলের পুরস্কার রোহিন্টন—বেরিয়া ট্রফি, সূচনা ১৯৩৬), আঞ্চলিক লীগ প্রতিযোগিতা (বিজয়ীদলের পুরস্কার দিলীপ ট্রফি, সূচনা ১৯৬১) এবং নিখিল-ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (বিজয়ীদলের পুরস্কার—কুচবিহার কাপ)।

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মান-উন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তৎকালীন দেশীয় রাজ্যগুলির—বিশেষ ক'রে পাতিয়ালা, নওনগর, পোরবন্দর, ভিজিয়ানাগ্রাম, ভূপাল এবং বাংলা দেশের কুচবিহার এবং নাটোর রাজ্যের দান এবং

পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকায় নামেন প্যাতিয়ালা রাজপরিবার। প্যাতিয়ালার স্বর্গীয় মহারাজা ভূপিন্দর সিং মাহীন্দর বাহাদুর একজন কৃতী ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে প্রথম 'সর্ব-ভারতীয় ক্রিকেট দল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড সফরে যায়। ক্রিকেট খেলার প্রতি মহারাজার অনুরাগের আর এক পরিচয়, তাঁর রাজদরবারে বহু ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় চাকুরী লাভ করেন। নিজের ক্রিকেট দলকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মহারাজা নিজ ব্যয়ে উইলফ্রেড রোড্স, জর্জ হার্স্ট, ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট, লারউড প্রভৃতি প্রখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করেন। এইসব প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের সাহচর্য লাভে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। ১৯৩০-৩১ সালের ক্রিকেট মরসুমে আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে দেখতে পেলাম ইংল্যাণ্ডের দুজন প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—জ্যাক হবস্ এবং হার্বার্ট সার্টক্লিফকে। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ কুমার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই খেলোয়াড় সংগ্রহ করে যে দল গঠন করেন সেই দলেরই শক্তি বৃদ্ধি করেন হবস্ এবং সার্টক্লিফ। মহারাজ কুমার এই দল নিয়ে সারা দেশে ক্রিকেট খেলার একটা ঝড় বইয়ে দেন।

সেই যুগটির কথা ভাবছি। যে যুগে ইংরেজ জাতির চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং আহার-বিহার যেমন ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর যুব-সমাজকে আকৃষ্ট ক'রেছিল তেমনি করেছিল তাদের এই ক্রিকেট খেলা। নিছক অনুকরণের আবেগেই দেশের তৎকালীন যুবসমাজ ইংরেজদের ক্রিকেট খেলায় আকৃষ্ট হয়নি। এই বিদেশী খেলায় দর্শকদের চিত্ত জয় করার মত যথেষ্ট উপাদান ছিল। ইংরেজদেরই খেলা রপ্ত ক'রে ভারতবাসীও যে সে খেলায় শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিতে পারে—এমনি একটা মনের দৃঢ়তা দেশের যুবকদের উদ্দাম ক'রে তুলেছিল। প্রথম দিকে তারা এদেশের উপাদান থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে। খেলার নিয়মকানুন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারনা ছিল না। চোখে দেখা খেলার যতটুকু বুঝেছিল তাই মূলধন করে তারা ক্রিকেট খেলার চর্চা আরম্ভ করে দেয়। এইভাবেই ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের হাতে খড়ি।

সুদীর্ঘকালের ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ কতখানি সাফল্য লাভ করেছে—এ প্রশ্ন আজ স্বভাবতই মনে জাগে। ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ প্রথম সরকারী টেস্ট-ক্রিকেট খেলার যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব নিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ এখনও ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় একটাও 'রাবার' লাভ করতে পারেনি। ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যে একাধিক ভারতীয় খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন সত্য, কিন্তু সেই তুলনায় দলগত সাফল্য খুবই নগণ্য। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সাফল্যের পক্ষে যে দলগত সংহতি এবং খেলোয়াড়দের মানসিক শক্তি প্রয়োজন, ভারতবর্ষের তার খুবই অভাব।

পাঁচজন বাঙালী টেস্ট খেলোয়াড়

এন চৌধুরী

সুটে ব্যানার্জি

পি সেন

পংকজ রায়

এস ব্যানার্জি

টেস্ট ক্রিকেট রেকর্ড

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড

১৯৬১—৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজ এখনও অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ টেস্ট সিরিজের অনুষ্ঠিত চারটি টেস্ট খেলার ফলাফল রেকর্ড তালিকায় সেই কারণে গ্রহণ করা হয়নি।

প্রথম টেস্ট খেলা : ২৫শে জুন, লর্ডস, ১৯৩২

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা	রাবার জয় অথবা ড্র
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	০	১	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৩৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	৫	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	০	৩	১	৪	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	০	৫	০	৫	ইংল্যাণ্ড
	মোট	১	১৫	৮	২৪	

প্রতি সফরে ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের রাণ

ইংল্যাণ্ডের রাণ: সাল	রাণ	উইকেটে	ভারতবর্ষের রাণ: সাল	রাণ	উইকেটে
১৯৩২	৫৩৪	১৮	১৯৩২	৩৭৬	২০
১৯৩৩-৩৪	১৪৮৪	৪০	১৯৩৩-৩৪	১৩৫৫	৬০
১৯৩৬	১৩৪৮	২৮	১৯৩৬	১৩৬৭	৫৫
১৯৪৬	১০১৮	২৮	১৯৪৬	১১২৮	৪৯
১৯৫১-৫২	২৪০৪	৭৫	১৯৫১-৫২	২২৯৩	৬৪
১৯৫২	১৭৫১	৪০	১৯৫২	১৩০৯	৭০
১৯৫৯	২৩৫৫	৫৮	১৯৫৯	১৯২৪	১০০
মোট :	১০৮৯৪	২৮৭		৯৭৫২	৪১৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন রাণ

ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ এবং পুরো এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড :

সর্বোচ্চ রাণ: দল	রাণ	সাল	সর্বনিম্ন রাণ: দল	রাণ	সাল
লর্ডস্			**লর্ডস্**		
ইংল্যাণ্ড	৫৩৭	১৯৫২	ভারতবর্ষ	৯৩	১৯৩৬
ভারতবর্ষ	৩৭৮	১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	১৩৪	১৯৩৬
ম্যাঞ্চেস্টার			**ম্যাঞ্চেস্টার**		
ইংল্যাণ্ড	৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৩৬	ভারতবর্ষ	৫৮	১৯৫২
ভারতবর্ষ	৩৯০ (৫ উইঃ)	১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	২৯৪	১৯৪৬
ওভাল			**ওভাল**		
ইংল্যাণ্ড	৪৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৩৬	ভারতবর্ষ	৯৮	১৯৫২
ভারতবর্ষ	৩৩১	১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	৩৬১	১৯৫৯
লিডস্			**লিডস্**		
ইংল্যাণ্ড	৪৮৩ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫৯	ভারতবর্ষ	১৪৯	১৯৫৯
ভারতবর্ষ	২৯৩	১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	৩৩৪	১৯৫২
নটিংহাম			**নটিংহাম**		
ইংল্যাণ্ড	৪২২	১৯৫৯	ভারতবর্ষ	১৫৭	১৯৫৯
ভারতবর্ষ	২০৬	১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	৪২২	১৯৫৯

বিভিন্ন মাঠে টেস্ট খেলার ফলাফল

ইংল্যাণ্ডে

মাঠ	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
লর্ডস	৫	৫	০	০
ম্যাঞ্চেস্টার	৪	২	০	২
ওভাল	৪	২	০	২
লিডস	২	২	০	০
নটিংহ্যাম	১	১	০	০
মোট	১৬	১২	০	৪

ভারতবর্ষে

মাঠ	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
বোম্বাই	২	১	০	১
কলিকাতা	২	০	০	২
মাদ্রাজ	২	১	১	০
দিল্লী	১	০	০	১
কানপুর	১	১	০	০
মোট	৮	৩	১	৪

	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ডে	১৬	১২	০	৪
ভারতবর্ষে	৮	৩	১	৪
মোট :	২৪	১৫	১	৮
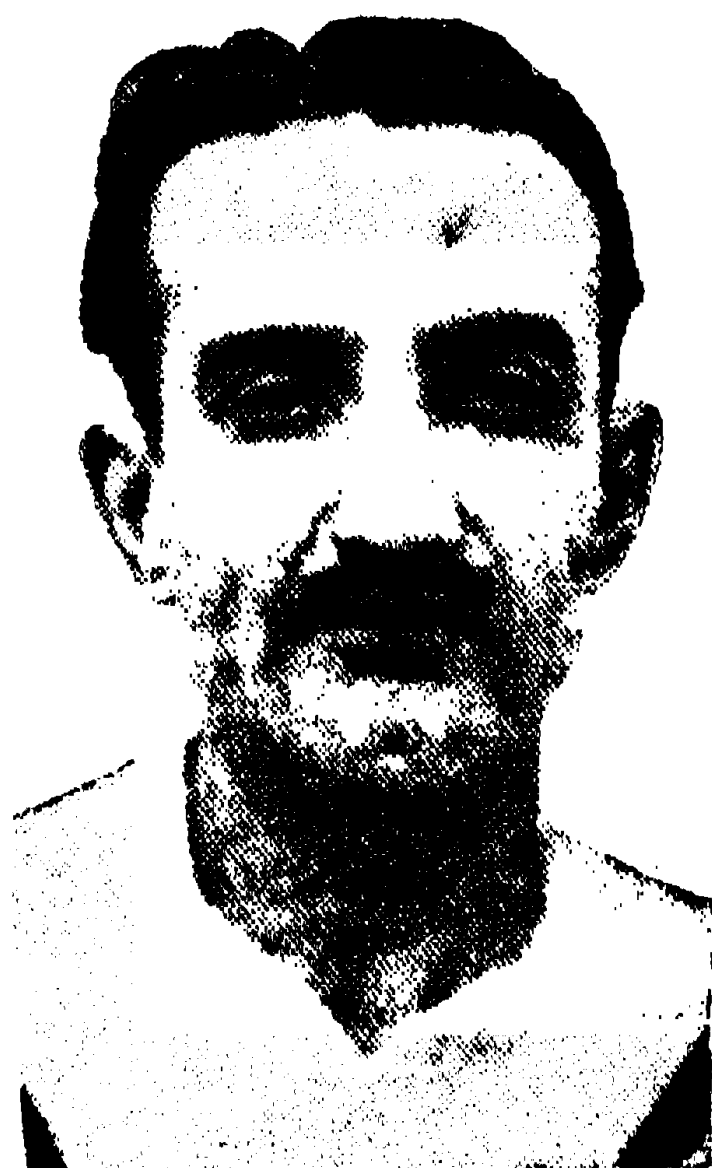
বিজয় মার্চেন্ট

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন রাণ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ এবং পুরো এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বনিম্ন রাণের রেকর্ড :

সর্বোচ্চ রাণ			সর্বনিম্ন রাণ		
বোম্বাই			**বোম্বাই**		
দল	রাণ	সাল	দল	রাণ	সাল
ভারতবর্ষ	৪৮৫ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	২০৮	১৯৫১-৫২
ইংল্যাণ্ড	৪৫৬	১৯৫১-৫২	ইংল্যাণ্ড	৪০৮	১৯৩৩-৩৪
কলিকাতা			**কলিকাতা**		
দল	রাণ	সাল	দল	রাণ	সাল
ইংল্যাণ্ড	৪০৩	১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	২৩৭	১৯৩৩-৩৪
ভারতবর্ষ	৩৪৪	১৯৫১-৫২	ইংল্যাণ্ড	৩৪২	১৯৫১-৫২
মাদ্রাজ			**মাদ্রাজ**		
দল	রাণ	সাল	দল	রাণ	সাল
ভারতবর্ষ	৪৫৭ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১৪৫	১৯৩৩-৩৪
ইংল্যাণ্ড	৩৩৫	১৯৩৩-৩৪	ইংল্যাণ্ড	১৮৩	১৯৫১-৫২
দিল্লী			**দিল্লী**		
দল	রাণ	সাল	দল	রাণ	সাল
ভারতবর্ষ	৪১৮ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	৪১৮ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫১-৫২
ইংল্যাণ্ড	৩৬৮ (৬ উইঃ)	১৯৫১-৫২	ইংল্যাণ্ড	২০৩	১৯৫১-৫২
কানপুর			**কানপুর**		
দল	রাণ	সাল	দল	রাণ	সাল
ইংল্যাণ্ড	২০৩	১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১২১	১৯৫১-৫২
ভারতবর্ষ	১৫৭	১৯৫১-৫২	ইংল্যাণ্ড	২০৩	১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মোট রাণ : ১০৮৯৪ রাণ, ২৮৭ উইকেটে (ইংল্যাণ্ডে ৭০০৬ রাণ, ১৭২ উইকেটে এবং ভারতবর্ষে ৩৮৮৮, ১১৫ উইকেটে)

ভারতবর্ষের পক্ষে মোট রাণঃ ৯৭৫২ রাণ, ৪১৮ উইকেটে (ইংল্যাণ্ডে ৬১০৪ রাণ, ২৯৪ উইকেটে এবং ভারতবর্ষে ৩৬৪৮ রাণ, ১২৪ উইকেটে)।

অতিরিক্ত রাণ

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৫০৫ রাণ।

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৪৬২ রাণ।

সেঞ্চুরী সংখ্যা

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৬টি (ইংল্যাণ্ডের মাঠে ১২: ভারতবর্ষের মাঠে ৪)।

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১৫টি (ইংল্যাণ্ডের মাঠে ৭ : ভারতবর্ষের মাঠে ৮)।

মাঠ	প্রথম টেস্ট খেলার তারিখ	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ডে		
লর্ডস	২৫শে জুন, ১৯৩২	৫
ম্যাঞ্চেস্টার	২৫শে জুলাই, ১৯৩৬	৪
ওভাল	১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬	৪
লিডস	৫ই জুন, ১৯৫২	২
নটিংহ্যাম	৪ঠা জুন, ১৯৫৯	১

ভারতবর্ষে

মাঠ	প্রথম টেস্ট খেলার তারিখ	মোট খেলা
বোম্বাই	১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩	২
কলিকাতা	৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪	২
মাদ্রাজ	১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪	২
দিল্লী	২রা নভেম্বর, ১৯৫১	১
কানপুর	১২ই জানুয়ারী, ১৯৫২	১

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

(ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন মাঠে ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

মাঠ	রাণ	খেলোয়াড়	সাল
ওভাল	২১৭	ডবলউ আর হ্যামণ্ড	১৯৩৬
লর্ডস	২০৫ *	জে হার্ডস্টাফ (জুনিয়র)	১৯৪৬
ম্যাঞ্চেস্টার	১৬৭	ডবলউ আর হ্যামণ্ড	১৯৩৬
লিডস	১৬০	এম সি কাউড্রে	১৯৫৯
নটিংহ্যাম	১০৬	পিটার মে	১৯৫৯

ভারতবর্ষের পক্ষে

মাঠ	রাণ	খেলোয়াড়	সাল
লর্ডস	১৮৪	ভিনু মানকড়	১৯৫২
ওভাল	১২৮	বিজয় মার্চেন্ট	১৯৪৬
লিডস	১৩৩	ভি এল মঞ্জরেকার	১৯৫২
ম্যাঞ্চেস্টার	১১৮	পলি উমরীগড়	১৯৫৯
নটিংহ্যাম	৫৪	পঙ্কজ রায়	১৯৫৯

(ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাঠে ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

মাঠ	রাণ	খেলোয়াড়	সাল
বোম্বাই	১৭৫	টম গ্রেভনী	১৯৫১-৫২
দিল্লী	১৩৮ *	এ জে ওয়াটকিন্স	১৯৫১-৫২
মাদ্রাজ	১০২	সি এফ ওয়াল্টার্স	১৯৩৩-৩৪
কলিকাতা	৯২	আর টি স্পুনার	১৯৫১-৫২
কানপুর	৬৬	এ জে ওয়াটকিন্স	১৯৫১-৫২

ভারতবর্ষের পক্ষে

মাঠ	রাণ	খেলোয়াড়	সাল
দিল্লী	১৬৪ *	বিজয় হাজারে	১৯৫১-৫২
বোম্বাই	১৫৫	বিজয় হাজারে	১৯৫১-৫২
মাদ্রাজ	১৩০ *	পলি উমরীগড়	১৯৫১-৫২
কলিকাতা	১১৫	দত্তু ফাদকার	১৯৫১-৫২
কানপুর	৬০	এইচ আর অধিকারী	১৯৫১-৫২

* নট আউট

প্রতি সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান

	ইংল্যাণ্ডের পক্ষে		ভারতবর্ষের পক্ষে	
১৯৩২	১৬৪	ডি আর জার্ডিন	৭০	এস ওয়াজির আলী
১৯৩৩-৩৪	২৮৪ (৭১·০০)	সি এফ ওয়ালটার্স	২০৩ (৪০·৬০)	লালা আমরনাথ
১৯৩৬	৩৮৯ (১৯৪·৫০)	ডবলউ আর হ্যামন্ড	২৮২ (৪৭·০০)	বিজয় মার্চেন্ট
১৯৪৬	২১০ (১০৫·০০)	জে হার্ডস্টাফ	২৪৫ (৪৯·০০)	বিজয় মার্চেন্ট
১৯৫১-৫২	৪৫১ (৬৪·৪২)	এ ওয়ার্টাকিন্স	৩৮৭ (৫৫·২৮)	পংকজ রায়
১৯৫২	৩৯৯ (৭৯·৮০)	লেন হ্যাটন	৩৩৩ (৫৫·৫০)	বিজয় হাজারে
১৯৫৯	৩৫৭ (৫৯·৫০)	কে এফ ব্যারিংটন	২৩৩ (৩৩·২৮)	নরী কণ্ট্রাক্টর

১৯৩২ সালে মাত্র ১টি টেস্ট খেলা: ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ৪টি করে টেস্ট খেলা এবং ১৯৫১ থেকে ৫টি করে।

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রাণের রেকর্ড: ইংল্যাণ্ডের পক্ষে—৪৫১ রাণ (৬৪·৪২) এ জে ওয়ার্টাকিন্স, ১৯৫১-৫২ ভারতবর্ষের পক্ষে ৩৮৭ রাণ (৫৫·২৮)—পংকজ রায়, ১৯৫১-৫২।

বোলিং

সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড

এক ইনিংসে : ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৮ (৩১ রানে)—এফ ট্রুম্যান, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২
ভারতবর্ষের পক্ষে: ৮ (৫৫ রানে)—ভি মানকড়, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

একটি খেলায় : ভারতবর্ষের পক্ষে: ১২ (১০৮)—ভি মানকড়, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২
ইংল্যাণ্ডের পক্ষে: ১১ (৯৩ রানে)—এ ভি বেডসার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৪৬ ১১ (১৪৫ রানে)—এ ভি বেডসার, লর্ডস, ১৯৪৬ এবং ১১ (১৫৩ রানে)—এইচ ভেরিটি, মাদ্রাজ, ১৯৩৩-৩৪

একটি সিরিজে : ভারতবর্ষের পক্ষে: ৩৪ (গড় ১৬·৭৯)—ভিনু মানকড়, ১৯৫১-৫২
ইংল্যাণ্ডের পক্ষে: ২৯ (গড় ১৩·৩১)—ফ্রেডী ট্রুম্যান, ১৯৫২

এক ইনিংসে সর্বাধিক ওভার বল

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৭৬ ওভার—ভি মানকড়, নিউদিল্লী, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৫৩ ওভার—আর ট্যাটারসাল, নিউদিল্লী, ১৯৫১-৫২

বিজয় হাজারে

এ জে ওয়ার্টাকিন্স

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৮৫ (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ৩৯০ (৫ উইকেটে), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৫৭১ (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

ভারতবর্ষে : ৪৫৬, বোম্বাই ১৯৫১-৫২

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১২১, কানপুর, ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ৫৮, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১৪৩, মাদ্রাজ ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডে : ১৩৪, লর্ডস, ১৯৩৬

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৩৩৩ রান—বিজয় হাজারে (৭ ইনিংস খেলা, ১ বার নট আউট, গড় ৫৫·৫০), ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ৩৮৭ রান—পংকজ রায় (৮ ইনিংস খেলা, ১ বার নট আউট, গড় ৫৫·২৮), ১৯৫১-৫২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৩৯৯ রান—লেন হ্যাটন (৬ ইনিংস খেলা, ১ বার নট আউট, গড় ৭৯·৮০), ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ৪৫১ রান—এ. জে. ওয়ার্টাকিন্স (৮ ইনিংস খেলা, ১ বার নট আউট, গড় ৬৪·৪২), ১৯৫১-৫২

উইকেটের জুটিতে রেকর্ড রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

উইকেট	রান	জুটির নাম	মাঠ	সাল
১ম	২০৩	বিজয় মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলী	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
২য়	১০৯	নরী কণ্টাক্টর ও আব্বাস আলী বেগ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
৩য়	২১১	বিজয় মার্চেণ্ট এবং বিজয় হাজারে	নিউদিল্লী	১৯৫১-৫২
		ভিনু মানকড় এবং বিজয় হাজারে	লর্ডস	১৯৫২
৪র্থ	২২২	বিজয় হাজারে এবং মঞ্জরেকার	লিডস	১৯৫২
৫ম	৮৯	মঞ্জরেকার এবং কৃপাল সিং	লর্ডস	১৯৫৯
৬ষ্ঠ	১০৫	বিজয় হাজারে এবং দাত্তু ফাদকার	লিডস	১৯৫২
৭ম	৯৩	পলি উম্রিগড় এবং গোপীনাথ	মাদ্রাজ	১৯৫১-৫২
৮ম	৭৪	লাল সিং এবং অমর সিং	লর্ডস	১৯৩২
৯ম	৫৪	জি রামচাঁদ এবং এস জি সিন্ধে	লর্ডস	১৯৫২
১০ম	৪৩	আর এস মোদী এবং এস জি সিন্ধে	লর্ডস	১৯৪৬

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

উইকেট	রান	জুটির নাম	মাঠ	সাল
১ম	১৪৬	ডব্লিউ জি এ পার্কহাউস এবং জি পুলার	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
২য়	১৫৮	লেন হ্যাটন এবং পিটার মে	লর্ডস	১৯৫২
৩য়	১৬৯	রমণ সুব্বারাও এবং মাইক স্মিথ	ওভাল	১৯৫৯
৪র্থ	২৬৬	ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড এবং টি এস ওয়ার্দিংটন	ওভাল	১৯৩৬
৫ম	১৮২	জে হার্ডস্টাফ এবং পি এ গিব	লর্ডস	১৯৪৬
৬ষ্ঠ	১৫৯	টম গ্রেভনী এবং টি জি ইভান্স	লর্ডস	১৯৫২
৭ম	১০২	আর ইলিংওয়ার্থ এবং আর সুইটম্যান	ওভাল	১৯৫৯
৮ম	১৩৮	আর রোবিন্স এবং এইচ ভেরিটি	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
৯ম	৭০	এল এফ টাউনসেণ্ড এবং এইচ ভেরিটি	কলিকাতা	১৯৩৩-৩৪
১০ম	৩২	এইচ ভেরিটি এবং ই ডব্লিউ ক্লার্ক	কলিকাতা	১৯৩৩-৩৪

ফ্রেডী ট্রুম্যান

সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ (১৫)

রান	খেলোয়াড়	মাঠ	বৎসর
১৮৪	ভি মানকড়	লর্ডস	১৯৫২
১৬৪*	ভি এস হাজারে	নিউদিল্লী	১৯৫১-২
১৫৫	ভি এস হাজারে	বোম্বাই	১৯৫১-২
১৫৪	ভি এম মার্চেণ্ট	নিউদিল্লী	১৯৫১-২
১৪০	পংকজ রায়	বোম্বাই	১৯৫১-২
১৩৩	ভি মঞ্জরেকার	লিডস	১৯৫২
১৩০*	পি আর উম্রিগড়	মাদ্রাজ	১৯৫১-২
১২৮	ভি এম মার্চেণ্ট	ওভাল	১৯৪৬
১১৮	লালা অমরনাথ	বোম্বাই	১৯৩৩-৪
১১৮	পি আর উম্রিগড়	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১১৫	ডি জি ফাদকার	কলকাতা	১৯৫১-২
১১৪	ভি এম মার্চেণ্ট	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
১১২	মুস্তাক আলী	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
১১২	আব্বাস আলী বেগ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১১১	পংকজ রায়	মাদ্রাজ	১৯৫১-২
	ইংল্যাণ্ড (১৬)		
২১৭	ওয়াল্টার হ্যামণ্ড	ওভাল	১৯৩৬
২০৫*	জে হার্ডস্টাফ (জুনি)	লর্ডস	১৯৪৬
১৭৫	টম গ্রেভনী	বোম্বাই	১৯৫১-২
১৬৭	ওয়াল্টার হ্যামণ্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
১৬০	কলিন কাউড্রে	লিডস	১৯৫৯
১৫০	লেন হাটন	লর্ডস	১৯৫২
১৩৮*	এ জে ওয়াটকিন্স	নিউদিল্লী	১৯৫১-২
১৩৬	বি ভ্যালেনটাইন	বোম্বাই	১৯৩৩-৪
১৩১	জি পুলার	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯
১২৮	টি এস ওয়ার্দিংটন	ওভাল	১৯৩৬
১১৯	ডি এস শেফার্ড	ওভাল	১৯৫২
১০৬	পিটার মে	নটিংহাম	১৯৫৯
১০৪	টি জি ইভেন্স	লর্ডস	১৯৫২
১০৪	লেন হাটন	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫২
১০২	সি এফ ওয়াল্টার্স	মাদ্রাজ	১৯৩৩-৪
১০০	মাইক স্মিথ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫৯

* নট আউট।

এ ভি বেডসার

সঙ্গীত বীক্ষণ

আনন্দভৈরব

॥ পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন ॥

'নবমিলনে'র পরিচালনায় বেলেঘাটায় গত ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারটি অধিবেশনে ষষ্ঠ বার্ষিক পূর্ব-কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানসূচীতে একদিকে ক্ল্যাসিকাল কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্য, অন্যদিকে বিশিষ্ট ধারার বাংলা গান ও একটি নাটক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া, পৃথকভাবে শিশু-দিবস ও যাত্রা-দিবস নামাঙ্কিত দুটি বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। অনুষ্ঠানসূচীতে এরূপ বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ প্রশংসাজনক সন্দেহ নেই; কেননা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধারণ সংগীত অপেক্ষা কিছু ভিন্নতর।—সেজন্য মৌলিক আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলছি।

ক্ল্যাসিকাল কণ্ঠসংগীত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্মেলনে খেয়াল গানই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাতে অবশ্য আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু তৎসঙ্গে ধ্রুপদের অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হলে সমীচীন হত। প্রথম অধিবেশনে খেয়াল গান পরিবেশন করেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তীর খেয়াল গানের বিশেষ একটি মান আছে যেজন্য তাঁর গান উপভোগ্য হয়। কাবুলের ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন সারহাং তৃতীয় অধিবেশনে কেদার রাগে ও চতুর্থ অধিবেশনে দরবারী কানাড়া রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। কেদার রাগে তাঁর শুদ্ধ গান্ধার থেকে তীব্র মধ্যমে আরোহণ 'অভিনব' মনে হল। চতুর্থ অধিবেশনে ছায়ানট রাগে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের খেয়াল গান চমৎকার হয়েছে। তাঁর সঙ্গে মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁর সারেঙ্গী ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর তবলা সহযোগিতা প্রশংসনীয়। এই অধিবেশনের শেষ কণ্ঠসংগীত-শিল্পী পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। তিনি সুন্দর মেজাজে ললিত রাগের রূপায়ণ করলেন। খেয়ালের পর তিনি পরিবেশন করেন যোগিয়া রাগে ঠুংরি। যোগিয়া ভক্তিরসের রাগ। ঠুংরি গানে এই রাগের প্রয়োগ লক্ষ্য করার বিষয়।

যন্ত্রসংগীত ।। তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার-বাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জয়জয়ন্তী রাগে আলাপাদি ও গৎ এবং পরে খাম্বাজ রাগে ঠুংরি পরিবেশন করেন। সারারাত্রিব্যাপী চতুর্থ অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠান—স্বরোদে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর ও সেতারে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈত-বাদন। ভোরবেলাকার রাগগুলির এমন একটি প্রভাব আছে যা মনে বিশেষ রেখাপাত করে। শিল্পীদ্বয়ের অহীর-ভৈরব রাগে আলাপ জোড় ও ঝালা মনোগ্রাহী হয়েছে। গান-বাজনা শুনতে শুনতে শ্রোতার মনে দু রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়—একটি তন্ময়তা, অপরটি উত্তেজনা। সমঝদার শ্রোতা তন্ময়তার ভাব পছন্দ করেন, সাধারণ শ্রোতা উত্তেজনার দিকে ঝোঁকেন বেশি। অহীর-ভৈরব রাগের পর ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় টোড়ি রাগের সামান্য মুখবন্ধ করে যেই বিলম্বিত ত্রিতালের গৎ ধরলেন এবং পণ্ডিত কিষণ মহারাজ যেই তবলায় একটি অতি দীর্ঘ পড়ন, একটি দীর্ঘ তেহাই দিয়ে শেষ করে সমে এসে পড়লেন, অমনি অধিকাংশ শ্রোতা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও বাহবা দিতে লাগলেন। শিল্পীগণ (সম্ভবত মুখের হাসি মনে চেপে) তাল-লয়ের কৌশল প্রদর্শন করতে লাগলেন ও তৎসঙ্গে বাহবা পেতে থাকলেন। কিন্তু এতে যে পূর্বেকার সাবলীল ও সুন্দর সুর-সৃষ্টির রেশ কেটে যায়। সংশ্লিষ্ট শ্রোতাগণকে এ বিষয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সবিনয়ে অনুরোধ জানাই। শিল্পীদ্বয় সিন্ধু-ভৈরবী রাগে ঠুংরি বাজিয়ে চতুর্থ অধিবেশনের সু-সমাপ্তি করলেন।

নৃত্য ।। তৃতীয় অধিবেশনে কথক নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী রুবি দত্ত। চতুর্থ অধিবেশনে ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেন শ্রীমতী এল বিজয়লক্ষ্মী। লালিত্যপূর্ণ নৃত্যের জন্য নৃত্য-শৈলীর অধিকার ও সাবলীল দেহসুষমার আবশ্যক হয়। এই শিল্পীর উভয় গুণই আছে। তবে অবশ্য নৃত্যে একই শিল্পীর কাছে সব ক'টি রসের সমান অভিব্যক্তি আশা করা যায় না। শ্রীমতী এল, বিজয়লক্ষ্মীর নাগ-নৃত্যটি বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছে। তাঁর আঙ্গিক অভিব্যক্তিও ভালো।

বাংলা গান ।। এই সম্মেলনে লোকসংগীত, রামমোহন রায়ের গান, রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুল-গীতি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলা গান ও নাটকই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল চতুর্থ অধিবেশনের আরম্ভে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানসূচীতে এই সব গান অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধু। কিন্তু পরিবেশিত অধিকাংশ বাংলা গানের ক্ষেত্রে যে অভাবটি অনুভব করা গেছে, বিশেষ করে একই সম্মেলনে পরিবেশিত রাগসংগীতের অনুষ্ঠানগুলির তুলনায় যে অভাবটি বোধ হয়েছে, সেটি হল আনুষঙ্গিক যন্ত্রসংগীতের অভাব। সেজন্য সুরের পরিবেশ সৃষ্টিতে দৈন্যতা থেকে গেছে। সমঝদার ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সংগীতে সুরের আবহাওয়া (atmosphere) কত প্রয়োজন। Standing tune তো অত্যাবশ্যকই। তাছাড়া এরূপ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বাংলা গানের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক যন্ত্রনির্বাচনও সংস্কৃতির দিক ভেবে ভারতীয় প্রথাতে করাই বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে কিছু ধ্রুপদাঙ্গ গানও (রবীন্দ্রসংগীত) অন্তর্ভুক্ত হলে ভালো হত।

নাটক ।। দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখা কর্তৃক 'নৌকাডুবি' অভিনীত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যীকৃত রূপ। এ নাটকটি যতটা ভালোভাবে অভিনীত হয়েছে, প্রযুক্ত যান্ত্রিক অংশ কিছু কম করলেও ক্ষতি ছিল না। যেমন গোড়াকার ঝড়ের দৃশ্য। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঝড়ের যে লীলা দেখানো হল, তাতে আলোকপাতের কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত যে অভিনয়-কলা নাটকের মুখ্য বিষয় তা খুব এগোয় বলে মনে হয় না।—বরঞ্চ কিছুটা চাপা পড়ে যায়।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মঞ্চসজ্জাও কম প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। বাংলা তথা ভারতীয় প্রথায় কত সুন্দরভাবে মঞ্চসজ্জা করা যায়! যথাস্থানে কিছু ফুল ও মাঙ্গলিক সামগ্রীর সমাবেশে পরিবেশের চমৎকারিত্ব কত বেড়ে যায়।

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা গেল। পূর্ব-কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ পরিকল্পনা করে যে অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করেছেন, পরিশ্রম স্বীকার করে যে অনুষ্ঠান কার্যকর করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।
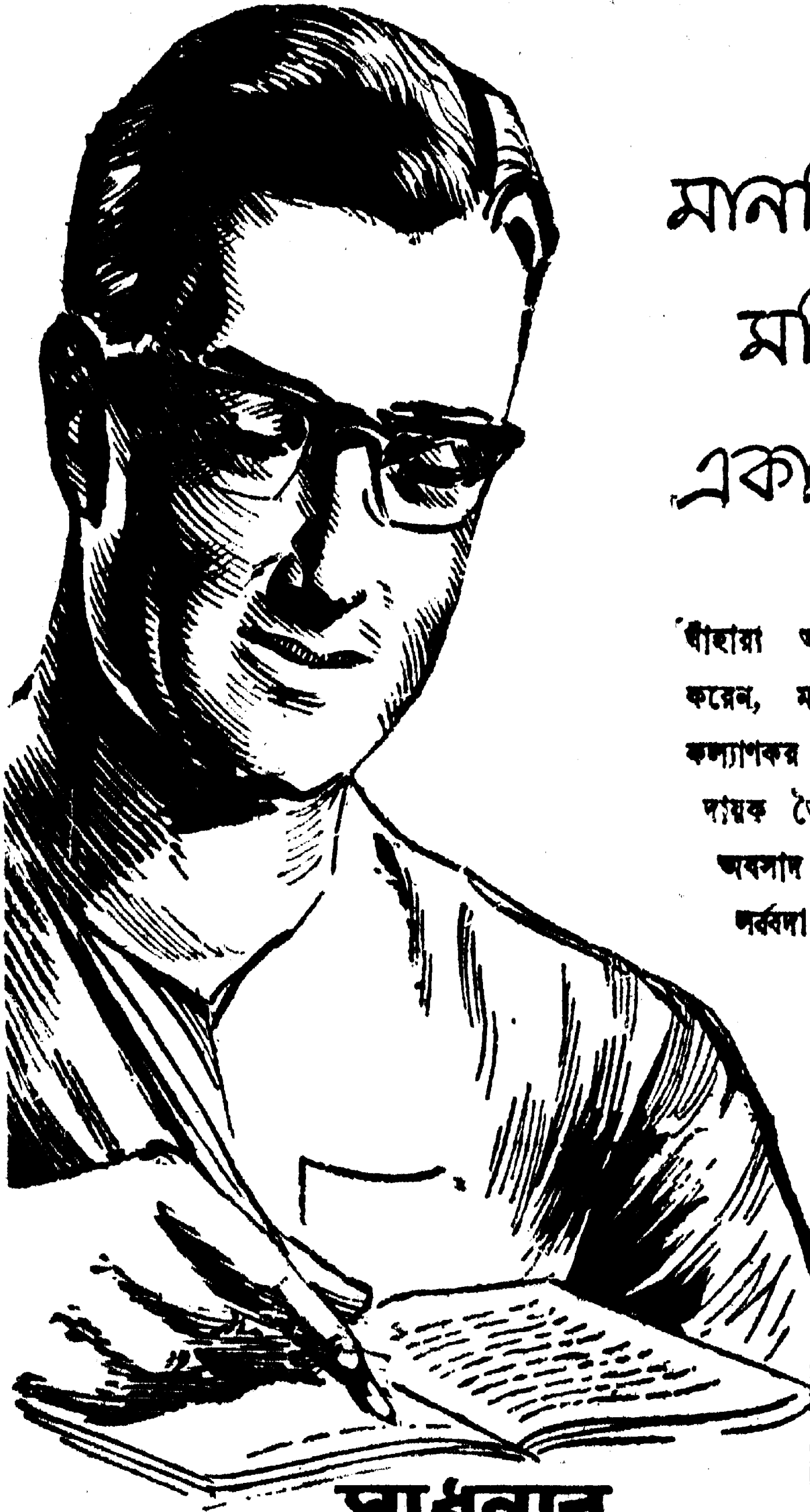
বিজ্ঞানের কথা

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ মানুষের বয়স ॥

মানুষ কতদিন ধরে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে? এতদিন পর্যন্ত বলা হত, প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের একটি আবিষ্কার ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, মানুষের বয়স প্রায় সাড়ে-সতেরো লক্ষ বছর।

বছর দুয়েক আগে ডঃ এল, এস, বি, লীকে নামে একজন প্রত্নবিদ টাঙ্গানিকায় মাটি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন। মাটির যে বিশেষ স্তর থেকে ফসিলটি পাওয়া গিয়েছিল সেই স্তরের পাথরকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এই বয়স নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রাচীনতম ফসিলটির নাম জিন্‌যান্‌থ্রপাস্ (Zinjanthropus)।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের এই প্রাচীনতম নিদর্শনটিকে মানুষ বলা হচ্ছে এই কারণে যে এই জীবটি দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে চলাফেরা করত এবং হাত দিয়ে পাথরের হাতিয়ার বানাত। মানুষের সংজ্ঞা যদি এই হয় যে মানুষ হচ্ছে এমন একটি জীব যে হাতিয়ার বানাতে পারে তাহলে জিন্‌যান্‌থ্রপাসও নিশ্চয়ই মানুষ, যদিও চেহারার দিক থেকে এই জীবটির সঙ্গে নির্ভেজাল বানরের বিশেষ কোনো তফাত ছিল না।

যাই হোক, মানুষের বয়স এই যে আরো খানিকটা বাড়ানো গেল তার ফলে অন্য কোনো দিক থেকে না হোক, মানুষ আরো খানিকটা প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারবে নিশ্চয়ই। তবে তার বেশি কিছু নয়। কারণ, এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মানুষের লিখিত ইতিহাস মাত্র পাঁচ হাজার বছরের। তারও হাজার দুয়েক বছর আগে থেকে মানুষ চাষবাস করতে শিখেছে ও নগর-সভ্যতার পত্তন করতে পেরেছে। শেষের দিকে এই সাত হাজার বছর হিসেব থেকে বাদ দিলে মানুষের পুরো বয়সকালটাই কেটেছে পুরনো পাথর-যুগে বা যাকে বলা হয়, প্রত্নপ্রস্তর যুগে, যখন মানুষ শিকার ও সংগ্রহ করে খাদ্যের সংস্থান করত ও হাতিয়ার বলতে ব্যবহার করত পাথরের টুকরো। কাজেই পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষ নামক জীবের বাস যদি দশ লক্ষ না হয়ে সাড়ে-সতেরো লক্ষ বছর হয়েই থাকে তাতে পুরনো পাথর-যুগটাই আরো খানিকটা ব্যাপ্তি পায় মাত্র, মানুষের কৃতিত্বকে নতুন করে যাচাই করতে বসবার কোনো প্রয়োজন ঘটে না।

॥ পুরনো থেকে নতুন ॥

তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই একই সময়ে পুরনো পাথর-যুগের শেষ আর নতুন পাথর-যুগের শুরু। এক-এক অঞ্চলে এক-এক সময়ে পুরনো থেকে নতুন যুগে উত্তরণ ঘটেছে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, ইউরোপে নতুন পাথর-যুগ শুরু হবার অনেক আগেই পশ্চিম এশিয়ায় তা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই উত্তরণের ব্যাপারটিকে বুঝতে হলে এই দুই পৃথক যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পাথরের হাতিয়ার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

মানুষ আজ পর্যন্ত যতো রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে সেগুলোকে উৎকর্ষের বিচারে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা চলে। আবার এই হাতিয়ার দেখেই বলা চলে কোন্ সময়ের মানুষ কী ভাবে জীবন কাটিয়েছে। যদি দেখা যায় সে টুকরো-পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করছে তাহলে বুঝতে হবে সে বেঁচে আছে জন্তুজানোয়ার শিকার করে আর ফলমূল ব্যবহার করে। এই যুগটিকেই বলা হয় পুরনো পাথর-যুগ। ইংরেজিতে প্যালিওলিথিক (Palaeolithic) যুগ। হাতিয়ার পরখ করতে করতে এর পরের যে যুগটির সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানে মানুষ তার খাদ্যের জন্যে পুরোপুরি শিকার ও সংগ্রহের ওপরে নির্ভর করছে না, চাষ ও পশুপালন করতে শিখেছে। এই যুগটিই হচ্ছে নতুন পাথর-যুগ বা ইংরেজিতে নিওলিথিক (Neolithic)। এই যুগে এসে দেখা যাবে পাথরের হাতিয়ারকে ঘষেমেজে ছুঁচলো করে নেওয়া হচ্ছে। এই যুগের বৈশিষ্ট্য তিনটি : চাষ, পশুপালন ও মাটির পাত্র তৈরি করা।

মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় নতুন পাথর-যুগ শুরু হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে। পশ্চিম ভারতবর্ষেও প্রায় একই সময়ে। কিন্তু ইউরোপের কোনো জায়গা থেকে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি যা থেকে মনে হতে পারে সাড়ে-চার হাজার বছর আগে ইউরোপের কোথাও নতুন পাথর-যুগ শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় আজো এমন মানুষ আছে যারা পুরনো পাথর-যুগে বাস করছে। আবার ইংলণ্ডে যখন নতুন পাথর-যুগের শুরু, মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় ব্রোঞ্জ-যুগটি তার আগেই হাজার হাজার বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে। তেমনি ইংলণ্ডে যখন শিল্প-বিপ্লব হচ্ছে, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা তখনো নতুন পাথর-যুগে, অস্ট্রেলিয়ায় তখনো পুরনো পাথর-যুগ।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে মানুষের অগ্রগতি সব জায়গায় একই মাত্রায় নয়। কিন্তু অসমান অগ্রগতিও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। পুরনো পাথর-যুগ পেরিয়েই তবে পৌঁছতে হবে নতুন পাথর-যুগে। নতুন পাথর-যুগ পেরিয়ে ব্রোঞ্জ-যুগে। ব্রোঞ্জ-যুগ পেরিয়ে লৌহ-যুগে। যদি দেখা যায় এশিয়ার একদল মানুষ ও আফ্রিকার একদল মানুষ একই ধরণের হাতিয়ার ব্যবহার করছে তাহলে এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা চলে যে, এই দু-দল মানুষ একই যুগে বাস করছে। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না যে, এই দু-দল মানুষ একই সময়ে বাস করছে। অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে শুধু ধারণা হতে পারে কোন্ সমাজ কোন্ বিশেষ যুগে রয়েছে। কিন্তু কোন্ সমাজ সময়ের দিক থেকে কতখানি

মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রাচীন—সে খবর প্রত্নবিদের কাছ থেকে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

বয়সের হিসেব জানতে হলে আমাদের যেতে হবে ভূ-বিজ্ঞানীর কাছে। পৃথিবীর শিলাস্তরে নির্ভুলভাবে বয়সের খবর লেখা রয়েছে। কাজেই কোন্ শিলাস্তরে কোন্ হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই সেই হাতিয়ারের বয়স সম্পর্কে ধারণা হতে পারে।

এই শিলাস্তর বা স্ট্র্যাটিফিকেশন নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু যতোই দুরূহ হোক, যে-কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পক্ষে এটি অপরিহার্য। যেমন ধরা যাক, বাংলা দেশের কোনো এক জায়গার মাটি খুঁড়ে হরপ্পা সংস্কৃতির পরিচয়-জ্ঞাপক কোনো একটি মাটির পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল। সংগে সংগে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে আজ থেকে পাঁচ-সাত হাজার বছর আগে বাংলা দেশের মাটিতে হরপ্পা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল তাহলে হয়তো ভুল করা হবে। সেজন্যে দরকার, যে-বিশেষ স্তরে মাটির পাত্রটি পাওয়া গিয়েছে সেই স্তরের শিলাকে বিশ্লেষণ করে তার বয়স নির্ধারণ করা।

সম্প্রতি মেদিনীপুরে ও বর্ধমানে মাটি খুঁড়ে কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসংগেও শিলাস্তর বা স্ট্র্যাটিফিকেশনের প্রশ্নটি সংগতভাবেই ওঠে। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এ-সম্পর্কে যতোটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই বিশেষ দিকে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লীর প্রত্ন-সমীক্ষা সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চয়ই আলোচিত হবে এবং অনতিকালের মধ্যেই হয়তো এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত জানা যাবে। বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন থাকতে অনুরোধ করছি, কারণ বিষয়টির গুরুত্ব অসাধারণ। যদি সত্যিই প্রমাণিত হয় যে মেদিনীপুরের ও বর্ধমানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সময়ের দিক থেকেও প্রাচীনতা দাবি করতে পারে তাহলে বাংলা দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে নতুন ধারণা সৃষ্টি হবে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে : "সর্বপ্রথম কোন সময়ে বাংলা দেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তর নির্মিত যে সমুদয় অস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাই তাহাদের অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সর্বপ্রাচীন মানুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অস্ত্র ব্যবহার করিত তাহার গঠনে বিশেষ কোন কৌশল বা পারিপাট্য ছিল না, পরবর্তী যুগে এই সকল অস্ত্র পালিস ও সুগঠিত হয়। এই দুই যুগকে সাধারণত প্রত্নপ্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগ বলা যায়।......বাংলা দেশেও আদিম মানব সভ্যতার এইরূপ বিবর্তন হইয়াছিল। কারণ এখানেও—প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও তাম্র যুগে সম্ভবত বাংলার পার্বত্য সীমান্ত প্রদেশেই মানুষ বসবাস করিত—ক্রমে তাহারা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

বাংলা দেশের মধ্যভাগ সম্পর্কে এই ছিল এতকালের ধারণা। এবং এখনো পর্যন্ত এই বিশেষ অঞ্চল থেকে পুরনো পাথর-যুগের কোনো হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি, পূর্ব-ভারতে পুরনো পাথর-যুগের হাতিয়ারের আবিষ্কারের কেন্দ্র এখনো পর্যন্ত সিংভুম ও মানভুম।

॥ মেদিনীপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ॥

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-গবেষক শ্রীঅশোক ঘোষের। মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে তিনি সম্প্রতি পুরনো ও নতুন পাথর-যুগের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন।

স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়—"প্রধানত ঠাকুরাণ-পাহাড়ী গ্রামটি কেন্দ্র করিয়াই শ্রীঘোষ তাঁহার এক অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের জন্য যে-সকল পার্বত্য গুহা তিনি সরেজমিন পরিদর্শন করেন সেগুলি হইতেছে—শিমূলপাল, লাবনী, ভে দা কু ই, শিমুলিয়াখাগ্রা, বামনাডিহা, নয়নাগড়, আম্তাজুড়ি, জামরুই, ধুলিয়াপুর এবং পুটুডুংগি। সমগ্র এলাকাটাই সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত অরণ্যাঞ্চলের অভ্যন্তরে এবং শ্বাপদসঙ্কুল।...গুহাগুলির প্রবেশ-পথ দশ ফুট হইতে পনেরো ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত। উচ্চতা বর্তমানে চার ফুট। তবে গুহার মেঝেতে নতুন মাটি জমিয়া আছে। শ্রীঘোষ একটি গুহার মেঝে দুই ফুট পর্যন্ত খুঁড়িয়া সেখান হইতেও প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই দুই ফুটের নীচে আরও অন্তত পাঁচ ফুট নরম মাটি রহিয়াছে। খননকার্য শেষ পর্যন্ত চালাইলে বিভিন্ন স্তরে এমন সকল নিদর্শনও পাওয়া যাইতে পারে যাহার দ্বারা হয়তো প্রমাণ করা সম্ভব হইবে যে, মানুষ একই ভূখণ্ডে বাস করিয়া প্রত্ন-প্রস্তর যুগ হইতে নব্য-প্রস্তর যুগে উত্তরণ লাভ করিয়াছিল।"

শ্রীঘোষ যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে এনেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে পাথরের হাতিয়ার। কতকগুলো পুরনো পাথর-যুগের, কতকগুলো নতুন পাথর-যুগের। বাংলা দেশের এই বিশেষ অঞ্চল থেকে ইতিপূর্বে এ-ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়নি। এই বিচারে শ্রীঘোষ নিশ্চয়ই পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারেন।

॥ বর্ধমানে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ॥

বর্ধমানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আরো চমকপ্রদ। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করেন শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

"সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-অধিকার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাজারঢিবি নামক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে পুনরায় খননকার্য চালান এবং ইহার ফলে আরও বহু সংখ্যক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি প্রাগৈতিহাসিক তাম্র-প্রস্তর যুগের হরপ্পা গোত্রীয় সভ্যতার পরিচয় বহন করে। এই পুরাবস্তুগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই অতীতযুগের ভগ্ন-মৃৎপাত্র। এইগুলি সাধারণত উজ্জ্বল লাল রঙের এবং মসৃণ গাত্রবিশিষ্ট এবং এইগুলির উপর কালো অথবা সাদাটে রঙের নানা চিহ্ন ও চিত্র দেখা যায়।...এইগুলি ছাড়া তাম্রপ্রস্তর যুগের সিন্ধু সভ্যতার আর এক ধরনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি শত ছিদ্র বিশিষ্ট লোহিতাভ মৃৎপাত্র। বর্তমানে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের নিদর্শন-গুলিও একই স্থানে ও নিকটবর্তী গোস্বামীখণ্ডে পাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের অস্ত্রগুলি ও অপরাপর কয়েকটি নিদর্শন আমাদের সিন্ধু সভ্যতার সহিত সাদৃশ্যমূলক এক তাম্রপ্রস্তর যুগের বিলুপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিয়া তোলে।"

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগে হরপ্পা সংস্কৃতির সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। যে-কথা আগেই বলা হয়েছে, হরপ্পা সংস্কৃতির সংগে সাদৃশ্য থাকার অর্থ সব সময়ে এই নয় যে সময়ের দিক থেকেও এই নিদর্শন হরপ্পা সংস্কৃতির সমকালীন। আশা করা চলে, দিল্লীর সম্মেলনে এ-বিষয়ে আলোচনা হবে এবং এই অঞ্চলে বিস্তৃততর ও ব্যাপকতর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা-কার্য পরিচালনা করার কর্মসূচী গৃহীত হবে।

বড়দিনের টুকরো খবর

অজিত সেন

বেথলেহেমের গোয়ালঘরে যে অপূর্ব দেবশিশু জন্মেছিল, দুর্গম পার্বত্য পথের চড়াই উৎরাই ভেঙে প্রচন্ড শীতে তিনজন জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্বদেশ থেকে ঘুরে এসে যীশুর জন্মের সেই পুণ্যকাহিনী সারা পৃথিবীকে শুনিয়েছিলেন। ক্রিসমাস পর্বে সেই পুণ্যাত্মার জন্ম-তারিখে পৃথিবীর দেশে দেশে তাই উৎসব সুরু হয়ে যায়।

একটি শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বলেই বোধহয় ক্রিসমাস যেন শিশুদের বিশেষ উৎসব। অন্যান্য জাতির পালা-পার্বণে শিশুদের ভূমিকা নগণ্য না হলেও ক্রিসমাসের সময় শিশুদের পোয়া-বারো। ক্রিসমাসের যত উপহার—সব যেন তাদের জন্যেই। তাই যত শিশু রাত্রে খোলা বারান্দায়, ছাদের আলসায় মোজা টাঙিয়ে রেখে দেয়—কখন চুপিসাড়ে হাল্কা পায়ে ক্রিসমাসের খোশমেজাজী খুড়ো সান্টা ক্লজ এসে সেই শূন্য মোজা-গুলি নতুন নতুন উপহারে ভরে দেবে; সকালে উঠে তারা সেই সব উপহার দেখে আনন্দে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

নানা দেশে ক্রিসমাসের নানা রকম চেহারা কল্পনা করা হয়ে থাকে। বরফের দেশ সুদূর ল্যাপল্যান্ড এ বিষয়ে অগ্রণী। ল্যাপল্যান্ডেই প্রথমে ক্রিসমাসের চেহারা বর্ণনা করা হয় যেন, একমুখ ধব্‌ধবে দাড়ি-গোঁফওয়ালা মাথায় লাল-টুপিপরা এক হাসিখুশি বুড়ো—হরিণে-টানা স্লেজগাড়ী ছুটিয়ে—আর পথের দুধারে বাড়ির দরজায় মাঝে মাঝে থেমে বাচ্চাদের জন্যে খেলনা দিয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ব্রাজিল সব দেশেই ফাদার ক্রিসমাস এই হাস্যোজ্জ্বল বৃদ্ধের মূর্তিতে পরিচিত। দেশ হিসেবে নাম অবশ্য একটু আলাদা আলাদা হয়েছে। কখনো সান্টা ক্লজ, কখনো সেন্ট নিকোলাস, আবার কখনো শোনা যাবে সেন্ট নিক; কিন্তু আর যাই হোক, সকলেরই পেশা এক—বাচ্চাদের জন্যে মনভোলানো উপহার জোগানো। ক্রিসমাস তার তুষার-ধবল দাড়ি নেড়ে হরিণ-টানা স্লেজেই আসুক কিম্বা মনোরথেই আসুক—বহু পূর্বে জানা যায় সে আসছে। আকাশে-বাতাসে তার আসার খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়া যায় উত্তুরে হাওয়ার হাড়-কাঁপানো ঠান্ডায়। কুয়াশার চাদর সরিয়ে আড়-মোড়া ভেঙে সূর্য হাই তুলতে না তুলতে আপিস-ইস্কুলের যে-বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়—এবার ভরসা হয় সে একটু বাড়বে; একটু থেমে হাঁফ ফেলবার সময় পাওয়া যাবে।

তার আগমনের পূর্বেই রাস্তার তোরণ, দোকান-পসরা, চৌরঙ্গীর স্টলের ঝক্‌ঝকে শো-কেস আলোকমালায় সুসজ্জিত সুশোভিত হয়ে প্রতীক্ষা করে। তাপাঙ্ক যেমন কয়েক ডিগ্রী নীচে নামে, জিনিসপত্রের দাম কয়েক ডিগ্রী চড়ে যায়। কিন্তু এহ বাহ্য। দাম যতই হোক নিউমার্কেট থেকে রকমারি গ্রিটিংস কার্ড কিনে বিদেশী বন্ধুকে বৎসরান্তে শুভেচ্ছা পাঠাতে ভারতীয় বন্ধু কার্পণ্য করবেন না। দর্জির দোকানে নয়নলোভন গরম পোষাকেরও অর্ডার দেওয়া চলবে—বৎসরান্তে অন্তত একটি নতুন স্যুট না হলে চলবে কেন? মার্কেটের স্টলে স্টলে সাজানো যত-রাজ্যের আপেল, আঙুর, বড়ো সাইজের কমলালেবু থরে থরে সাজানো। হাতছানি দেয়—তাদেরও উপেক্ষা করা চলে না। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার পথে বাজারটাও ঘুরে দেখে যেতে হয় একবার। লোভনীয় ভেটকী, গলদা চিংড়ী অন্যপক্ষে গ্রাম-ফেড মাটন কি মুরগীর আমন্ত্রণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপথে এসে পৌঁছায়। ছোট-দের জন্যে উপহার—হরেকরকম খেলনা, ছবিওলা মজাদার গল্পের বই, সে তো আছেই। আর তাছাড়া ভালো রেস্তোঁরা থেকে মাখন-ভর্তি কেক না নিলে ক্রিস-মাস পর্বের অঙ্গহানি। অবস্থা তত স্বচ্ছল না হলেও দরিদ্রতম খ্রীষ্টানও বৎসারান্তের এই একটি দিনে গৃহের পরিবার-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চায় বইকি!

দার্জিলিং থেকে আনানো পাইন গাছের চারা কিম্বা সবুজ কাগজের ক্রিসমাস স্যাপ্লিংটিকে মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে তোলে। সপরিবারে ডিনার-টেবিলে বসে মোমবাতি জেলে ক্রিসমাস-কেক কাটার সঙ্গে উৎসব সুরু হয়ে যায়। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় ডিকেন্সের ক্রিসমাস স্টোরির সেই গরীব কেরাণী-টিকে—ব দ মে জা জী কৃপণ ধনীর আপিসের চাকরী করতে করতে যে মাইনে কাটা যাবে বলে দেশে যাবার জন্যে ছুটি নিতে ভয় পেতো। কিন্তু অবশেষে এক ক্রিসমাসের সময়ে সেই বদমেজাজী বুড়োর হার্দ্য পরিবর্তন ঘটলো। গরীব কেরাণীটিকে অর্থসমেত কয়েকদিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাড়ি পাঠিয়ে কৃপণ বুড়ো নিজেও ক্রিসমাস করতে সেই সর্বপ্রথম বন্ধুর বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে হঠাৎ অবাক করে দিল—ক্রিসমাসের মেজাজই এমনি।

ক্রিসমাসের আনন্দ থেকে অখৃষ্টানরাও বঞ্চিত নয়। আমরা নিজেদের ভাষায় ক্রিসমাসকে তর্জমা করে বড়দিন করে নিয়েছি। উৎসবের ছোঁয়াচ সকলকেই

লাগে। বড়দিনের মৌতাত সকলের মনেই নেশা ধরায়। ছুটির দিনে বাঙালীর বাড়িতেও বড়দিনের কেক এসে জোটে। বাঙালী গিন্নির রান্নাঘর থেকেও ফুলকপি আর গলদা চিংড়ীর ব্যঞ্জনের গন্ধ কিম্বা মাংসের সৌরভ সমস্ত পাড়া মাত করে দেয়। তারপর আছে হোটেল রেস্তোঁরায় লাঞ্চ-ডিনার। ইংরেজ গেছে, যাক্। কিন্তু রেখে গেছে ইংরেজী খানা-পিনা। না হ'লে সমূহ ক্ষতি হতো। খানায় হয়তো ফরাসী কি অন্য জাত ইংরেজকে টেক্কা দেয়। কিন্তু পিনা অর্থাৎ পানীয়? খাঁটি স্কচ হুইস্কি জনি ওয়াকারের ছত্রিশ ইঞ্চি স্টেপ ফেলে আজও 'স্টিল গোয়িং স্ট্রং'। অবশ্য এর মাত্রাতিরিক্ত অপব্যয় কোথাও কোথাও হচ্ছে কিন্তু সম্বৎসরের এমন দিনে এর কথা শুনে বেরসিকের মত ভ্রূকুঞ্চন করলে চলবে কেন?

বড়দিনের আসর সর্বত্র জম-জমাট। সার্কাসের তাঁবুর নীচে, চিড়িয়াখানায় খুশি-ঝলমল, হাতীর পিঠে-চড়া শিশুদের ভিড়ে—বড়দিন। মাঠের ধারে কমলা-রঙা রোদ্দুরে পিকনিকরত ছেলেদের ভিড়ে—বড়দিন। কোলাহলহীন আপিস-পাড়ায় পাড়ায়, মনুমেন্টের তলায় পা ছড়িয়ে বসে জিরোচ্ছে বড়দিনের বেলা।

দোকানের উজ্জ্বল শো-রুমে বিচিত্র মনোহারী দ্রব্যসামগ্রীতে, প্লাষ্টিকের ফুল-পাতা, কাগজের তৈরী সবুজ গাছ, রঙীন বেলুনে, ফুলের স্টলে থরে থরে সাজানো প্যানসি, ক্রিসান্থিমাম্, জেইজি, গোলাপ, ডালিয়ায় সর্বত্রই বড়দিনের স্পর্শগন্ধ। মোটকথা কলকাতা বড়-দিনকে দু'হাত তুলে অভ্যর্থনা জানিয়েছে —কার্পণ্য করেনি এতটুকু।

গির্জায় ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটায় প্রার্থনার ঘন্টা বেজে উঠেছে। ক্রিসমাসের বুড়ো গড়ের মাঠের ধার দিয়ে হরিণ-টানা শ্লেজে চড়ে দাড়ি থেকে তুষারের কণা ঝাড়তে ঝাড়তে চৌরঙ্গী অঞ্চলে খুশি মনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে লেগেছে পার্ক স্ট্রীটের আলোর ঝলক। ছোট ছোট বাল্বের আলোর মালার মধ্য-মণি—কাঁচের বিশাল বলের মত বাল্ব। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে উৎসবের কোলাহলে সেও যোগ দিয়েছে। লোয়ার সার্কুলার রোড আর থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে ছেলেদের তৈরী ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে সাজানো অতিকায় ক্রিসমাস ট্রি-র নীচে স্নো-ম্যানের মূর্তি দেখে সে প্রাণখুলে হেসেছে। এই শিশুদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও প্রার্থনা করেছে, এই প্রজ্জ্বলিত মোমের শিখার মত সূর্য দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হোক—শীত পালিয়ে যাক। বসন্তের পৃথিবী এই ক্রিসমাস স্যাপলিং-এর মতো শ্যামল হয়ে উঠুক। উৎসবমত্ত গৃহের দরজায় দরজায় গিয়ে সে আশীর্বাদ রেখে গেছে সকলের জন্যে।

আগে ক্রিসমাসকে শিশুদের উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু না, বড়রাও নেহাৎ বাদ পড়েনি এই উৎসব থেকে। বড়দের উৎসবের আসন পাতা বড় বড় হোটেল-রেস্তোঁরায়; ফেণি-লোচ্ছল পাণীয়, খাদ্য এবং কনসার্ট-বন্দিত কাবারেতে, নাচের আসরে। মনোমোহিনী স্বল্প-বসনা সুন্দরীর বিলোল কটাক্ষে এই শীতের রাত্রেও সেখানে বসন্তের হাওয়ার উষ্ণতা। পরস্পরের ভরা পেয়ালার টুং টাং শব্দে, হ্যাপি ক্রিসমাসের সম্ভাষণ—প্রতি-সম্ভাষণে।

চেলো, ডবল বাস্, হাওয়াইয়ান গীটার ও ড্রামে বিচিত্র সুর-তরঙ্গে দেশ-দেশান্তর একাকার হয়ে যায়; কলকাতার মধ্যরাত্রিতে যেন কুহকময় হাওয়াই কি তাহিতি দ্বীপের কুঞ্জবনের স্বপ্নজাল রচিত হয়—যার আড়ালে শুধু অপ্সরীর হাতছানি।

নৈশ ক্লাবে-ক্লাবেও জমে ওঠে বাহুবন্ধ যুগলের লীলায়িত নাচ; শ্যাম্পেনের মদির গন্ধে উচ্চকিত হয়ে ওঠে রাত্রির নৈঃশব্দ্য। আগেই বলেছি কলকাতার অখৃষ্টান সমাজও বাদ পড়েনি। উৎসবের আনন্দে সকলেই নিজ অধিকার নিয়ে অবসর বিনোদনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। ইয়ার-বক্সি সমভিব্যাহারে সকলেই বেরিয়েছেন বড়দিন করতে। বড়দিনে সকলেরই বড়মেজাজ। নিঃস্রোত একঘেয়ে জীবনের এই সজীব ক্ষণিক তরঙ্গ-চঞ্চলতা ক্রিসমাসের বুড়ো স্মিত-মুখে সবই দেখেছে। সে জানে এ তারই সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর ফল। সস্নেহ হাসি হেসে সকলের অগোচরে একফাঁকে সে সরে পড়েছে। শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে প্রতি বৎসর এই অবারিত আনন্দের জোয়ার যেন আমাদের জীবনে আসে। তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় থ্রি চিয়ার্স দিয়ে আমরা বড়দিনের পূর্ণপাত্র আর একবার তুলে ধরে এক চুমুকে নিঃশেষ করি।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীতার নামে এসেছে সেই টেলিগ্রাম সাগর-পার থেকে সাগরময়ের বার্তা বয়ে। এক ছুটির দুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে মোটর এ্যাকসিডেন্টে গুরুতর আহত হয়েছে—সাগরময়! বাঁচার আশা আছে কি নেই। এখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থা, জ্ঞান ফিরবে কিনা কে জানে। খবরটা নীতাকে জানানো কর্তব্য বোধে জানানো হল। তাছাড়া—এই দীর্ঘ টেলিগ্রাম যে করেছে, সাগরের সেই বন্ধু শিশির রায়, সে কেবলমাত্র নীতার ঠিকানাটাই জানে। এখানে অনেক চিঠি লিখতে দেখেছে সাগরকে। সাগরময়ের বাড়ীর ঠিকানা তার জানা নেই।

কিন্তু বাড়ীতেই বা আছে কে সাগরের?

ত্রিপুরার ছেলে সাগরময়, মানুষ হয়েছে কলকাতায় বোর্ডিংয়ে। সেটাও হয়েছে নেহাৎই বাপের কিছু টাকা ছিল বলে। দেশের বাড়ীতে আছেন সতাতো কাকা আর সৎঠাকুমা, সাগরের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁরা সৎ এবং সততার পরিচয় কখনোই দেননি।

তবু নিজের জোরে কেটে বেরিয়ে গেছে সাগর।

ডাক্তারী পাশ করেছে, মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছে, উপযুক্ত চাকরী জোগাড় করেছে, এবং সংগ্রহ করেছে একটি মনোরমা প্রিয়া। একদা আলাপ হয়েছিল কলকাতায়, নীতারই অনুপ্রেরণায় আর আকর্ষণে দিল্লীতে চলে গিয়েছে ভাগ্যান্বেষণে। সেখানে ভাগ্য প্রসন্ন দৃষ্টি মেলেই তাকিয়েছিল।

তারপর সব যখন ঠিক বিয়ের দিন স্থির হয় হয়, সহসা সুশোভনের মধ্যে দেখা দিল বিভ্রান্তি, ওলোট পালট হয়ে গেল সব কিছু, চোখে অন্ধকার দেখল নীতা। আর অহরহর জন্যে সাহায্যের হাত প্রসারিত রেখেও সাগর যখন দেখল সুশোভনের শূন্যতা কোথায়, তখন পরামর্শ দিল নীতাকে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে সেইখানে, যেখানে সুশোভন হৃদয়ের আশ্রয় পাবেন।

এই নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করল সাগর। কিন্তু ইতিপূর্বে আর একটি ঘটনা ঘটানো ছিল, যেটা নীতার জীবনে তার এক অসুবিধে বয়ে আনল। কিছু-দিন আগে থেকেই অবশ্য ঠিক ছিল, কিন্তু তখন তো সুশোভন সুস্থ মানুষ। উচ্চতর গবেষণার জন্য বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যাবার ব্যবস্থা ঠিক করা ছিল সাগরময়ের, এবং এটাও মনে মনে ঠিক করা ছিল বিয়েটা সেরে একেবারে নীতাকে নিয়েই পাড়ি দেবে, কিন্তু ওই ঠিকটা বেঠিক হয়ে গেল। সব কিছু ভেস্তে যাওয়ায় একাই চলে যেতে হ'ল তাকে। আর সেখানে গিয়ে জানাল নির্দিষ্ট সময়ের থেকে ফিরতে আরও একটু দেরী হবে তার, কারণ ঠিক সুশোভনের ধরণের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সম্পর্কে নতুন কিছু চিকিৎসার পদ্ধতি সে আয়ত্ত করতে উৎসুক। তা' গিয়ে পর্যন্ত প্রেসক্রুপশন আর পরামর্শ তো পাঠাচ্ছিলই সাগর, কিন্তু সুশোভনের জন্যে যে স্নেহনীড়, যে 'হৃদয়ের আশ্রয়ের' ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিল সে, সেটা কার্যকরী করা সম্ভবপর হচ্ছিল না নীতার পক্ষে।

একটা অসম্ভব অস্বাভাবিক অসামাজিক কাজ করতে, অনেকটা সাহসের দরকার যে। তাই সে ঠান্ডার দেশে উপকার হবে আশায় বাবাকে নিয়ে গেল দার্জিলিং। কিন্তু সেখানে সুশোভনের ভয়ার্তভাব আরও বেড়ে গেল। প্রতিমুহূর্তেই নীতাকে আটকাতে সুরু করলেন তিনি 'পড়ে যাবি' বলে। নিজে চোখ ঢেকে থাকতে লাগলেন পাহাড় দেখবার ভয়ে।

ওদিকে সাগর অনুযোগ জানাচ্ছে, অনুরোধ জানাচ্ছে। বার বার বলছে 'ভদ্রমহিলা যখন বিধবা, অর্থাৎ নিজেই বাড়ীর মালিক, তখন অতই বা ভয় পাচ্ছ কেন? গিয়েই দেখ না।' বলছে, 'আমার তো মনে হয় না এই প্রবল আবেগ, কেবলমাত্র এক পক্ষের ভালবাসার ফল।'

আরও অনেক কথাই বলেছে সাগর দীর্ঘ পত্রে।

শেষ পর্যন্ত তো মনস্থির করে ফেলেছিল নীতা, আর সেই একদিন ভোরে ওদের গাড়ী এসে থেমেছিল অনুপম কুটিরের দরজায়।

কিন্তু নীতার জীবনের রথখানাও কি থেমে যাবে, এই অনুপম কুটিরের অন্তরালে?

এই তো ভাবতে সুরু করেছিল নীতা তার জীবনের অন্ধকার বাঁধ

ফিকে হয়ে আসছে, সুশোভনের অবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে তা' যেন মাঝে মাঝেই ধরা পড়ছে।

এ খবর পেয়ে উৎসাহিত সাগর উত্তর দিয়েছিল, 'আশা করছি আমি যতদিনে ফিরবো, ততদিনে তোমার বাবা কন্যা সম্প্রদানের তোড়জোড় করতে শুরু করেছেন। ডাক্তার পালিতের পরামর্শ মতই চলবে। মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করতে নিষেধ করে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। যে রোগী অন্যের পক্ষে অনিষ্টকারী নয়, তাকে হসপিটালে দেওয়ার পক্ষপাতী এখানেও অনেক ডাক্তারই নয়।'

এ চিঠি পড়ে নীতা অবশ্য সেদিন ভেবেছিল, 'অন্যের পক্ষে অনিষ্টকারী' মানে কি? মার-কাট পাগল? কিন্তু নিতান্ত মৃদু প্রকৃতিও কি অন্যের পক্ষে অনিষ্টকর হতে পারে না?

ভেবেছে সে দিন নীতা, অনেকবার ভেবেছে 'সুচিন্তা পিসিমার অনেক ক্ষতি হবেই। করছি আমিই!' আবার ভেবেছে আর তো কটা দিন! তারপর তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক হল না। আবার সব বেঠিক।

সেই বেঠিকের বার্তা রয়েছে নিরঞ্জনের হাতে।

টেলিগ্রাম!

একটু যেন কেঁপে উঠল নীতা।

তবু হাত বাড়িয়ে নেবার সময় ভাবল ভয়ের কি আছে। হয়তো সাগর মানসিক চিকিৎসার নতুন কোন পদ্ধতির সন্ধান পেয়ে অথবা নতুন কোন ওষুধের সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি জানিয়েছে। ভাবল কি জানি, হয়তো বা সাগর হঠাৎ ফিরেই আসছে। হয়তো ওর ওখানের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মিটে গেছে, কিন্তু সে সব ভাবনা তো মাত্র দু' এক মুহূর্তে। খামটা ছিঁড়ে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরা পর্যন্ত।

তারপর, কপালে ঘাম ফুটে ওঠে নীতার। হঠাৎ সে যেন ইংরিজি অক্ষরগুলো ভুলে যায়। তাই সেই ভাষাটা দুর্বোধ্য লাগে তার। নিরক্ষরের মত একটা অবোধ অসহায়ের ভাবে ঝাপসা হয়ে আসে দুই চোখের দৃষ্টি।

নীতার নামের বিদেশী ছাপমারা যে পত্র-টত্র অবিরত আসে যায়, নিরঞ্জনের চোখে যে কোনদিন পড়েনি। নীতা লেটার বক্সের চাবিটা নিজের কাছে রেখেছিল সেই প্রথম থেকে। আর নিজের চিঠি? সে তো নিজে ছাড়া পোষ্ট করতে কাউকে কোনদিন দেয়নি। তাই সহসা বিদেশের টেলিগ্রাম দেখে ভুরু কুঁচকেছিল নিরঞ্জন, ভেবেছিল এটা আবার কি।

তারপর ভাবল বোধকরি বিদেশী কোন ঔষধ-কোম্পানীর টেলিগ্রাম। হয়তো সুশোভনের জন্য এদেশে দুষ্প্রাপ্য নতুন কোন ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়েছে ডাক্তার, তাই নীতা দ্রুত সংবাদ চেয়ে জানিয়েছে মিলবে কিনা।

অতএব টেলিগ্রামটা নীতার হাতে দিয়েই গম্ভীরভাবে সরে আসছিল সে, কিন্তু পারল না। পারা শক্ত। টেলিগ্রামটা বাঙালী মনে আজও উদ্বেগের বাহক। তাই নিরঞ্জন চলে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল নীতার মুখের দিকে তাকিয়ে। যে মুখের দিকে এমনি অলক্ষ্যে শত শত মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জন, কখনও মুগ্ধ কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও হতাশ কখনও বুভুক্ষু দৃষ্টিতে।

মাঝে মাঝে বুঝি সে দৃষ্টি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দুঃসাহসিক কিছু একটা করতে চায়। কিন্তু অনুপম কুটিরের শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ হয়না। তাই নিরঞ্জনের সেই দৃষ্টি নীতার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

আজও পড়ল না। নীতা তাকিয়ে দেখল না—ব্যগ্র উন্মুখ দৃষ্টি মেলে একজন তার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখছে; আর অবাক হচ্ছে।

হ্যাঁ অবাকই হচ্ছে নিরঞ্জন, যখন দেখছে—টেলিগ্রামটা পড়তে কপালে ঘাম জমে উঠেছে নীতার। যখন দেখছে —আঙুলের আগাকটা থর-থর করে কাঁপছে তার।

নিরঞ্জন অবাক হ'ল উদগ্রীব হ'ল বোধ করি কিছু একটা প্রশ্ন করতেও উদ্যত হ'ল, কিন্তু প্রশ্ন করল না।

অনুপম কুটিরের অনেক গেছে, তবু এটুকু যায়নি। এখনো অপরের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে মর্যাদায় বাধে তার। কিন্তু নীতা ততক্ষণে মান-মর্যাদার প্রশ্ন ভুলে বলে উঠেছে—'দেখুন তো এখানটায় কি লিখেছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

অথচ না বোঝবার কথা নয়।

দীর্ঘ টেলিগ্রামে ভাষা স্পষ্ট প্রাঞ্জল। হরফগুলো টাইপ করা পরিষ্কার।

তবু বুঝতে পারছে না নীতা।

বলছে 'দেখুন তো এখানটায় কী লিখেছে'।

বুঝতে পারছেনা!

তার মানে বিশ্বাস করতে পারছেনা। কি করে করবে বিশ্বাস? অনেক কষ্ট পাচ্ছে নীতা, তবুও সে এখনও ছেলেমানুষ। জানেনা তৃষ্ণার্তের মুখের কাছেই তুলে ধরা জলপাত্রটা সহসা হিঁচড়ে টেনে ধুলোয় ফেলে দেওয়ার খেলাটাই ভাগ্যবিধাতার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

নিরঞ্জন টেলিগ্রামখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'সাগর কে?'

'সে একজন!' অধীর গলায় বলে ওঠে নীতা, 'তার সম্পর্কে কি লিখেছে তাই বলুন।'

নিরঞ্জন তীক্ষ্ণচোখে নীতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি যা পড়েছেন তাই-ই। মোটর এ্যাকসিডেণ্টে গুরুতর আহত হয়ে—'

'এখানটায় কী লিখেছে—' একটা জান্তব আর্তনাদ ওঠে চিরহাস্যময়ী নীতার কমনীয় কণ্ঠ থেকে, 'সেন্স আর কোনদিন ফিরবেনা?'

নিরঞ্জন স্থিরভাবে বলে, 'একেবারে ফিরবেনা একথা বলেনি। বলেছে সন্দেহের মধ্যে। কিন্তু সাগর কে? শিশির রায় কে? আপনার বান্ধবী আর তার স্বামী?'

'কী বকছেন পাগলের মত!' নীতা টেলিগ্রামখানা ওর হাত থেকে ফের টেনে নিয়ে বলে ওঠে, 'সাগরের নাম কখনও শোনেননি আপনি? জানেন না সাগর কে?' নিরঞ্জন আস্তে মাথা নাড়ে।

'সাগর আমার বান্ধবী নয়, বন্ধু। আমি ওর সঙ্গে এনগেজ্ড্!'

সাপের সামনে বিষ-পাথর ধরলে না কি সাপ একেবারে পাথরের মত স্থির হয়ে যায়, কিন্তু কথা কি বিষ-পাথরের থেকে কম শক্তিশালী? মানুষকে কি পাথর করে দিতে পারেনা সে?

পারে বৈ কি! তেমন কথা হলেই পারে। অন্তত নীতার এখনকার এই কথাটা নিরঞ্জনকে পাথর করে দিল।

নিরঞ্জন শুধু অতি কষ্টে উচ্চারণ করল 'এনগেজ্ড্!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না কেন?'

অধীর হয়ে উঠেছে শান্ত সভ্য মেয়েটা। ভাগ্যের হিংস্রতায় নিজেও হিংস্র হচ্ছে।

'স্পষ্ট করে বলবার আর কি আছে বলুন?' নিরঞ্জন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, 'যা লেখা আছে তার বেশী কিছু বলবো কি করে? মোটর এ্যাকসিডেণ্টে আহত হয়েছেন, বন্ধু শিশির রায় আপনার ঠিকানা ছাড়া, আহতের অন্য কোন আত্মীয়ের ঠিকানা জানেননা, তাই আপনাকে জানিয়েছেন। ক্রাইসিস চলছে—'

'ও কি আমাকে যেতে বলেছে—'

আরও অধীর কণ্ঠে বলে উঠে টেলিগ্রামখানা ফের চোখের সামনে ধরে নীতা। সুশোভনের মেয়ের রক্তে কি সুশোভনের অধীরতা জেগে উঠল? জেগে উঠল সুশোভনের পাগলামি! অন্তত নিরঞ্জনের তাই মনে হল। অবাক হয়ে বললো, 'যেতে বলেছে! যেতে বলবে! কোথায় যেতে বলবে!'

'কেন যেখানে সে রয়েছে!'

'যেখানে! মানে বিলেতে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ অত অবাক হচ্ছেন কেন? বিলেতে যায় না মানুষ? চলুন এই টেলিগ্রাম নিয়ে আমার সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসে, চলুন এয়ার অফিসে—'

'পাগলামি করছেন কেন, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন কথাটা যৌক্তিক কি না।'

নীতা বসে পড়ে বলে, 'যৌক্তিক নয়? আমার প্রস্তাবটা অযৌক্তিক। আর ও মরে যাবে, আমি দেখতে পাবোনা, এটাই যৌক্তিক?'

'এর আর আমি কি বলব বলুন?'

'আপনি আমাকে ওই সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন কিনা—তাই বলুন!'

হঠাৎ নিরঞ্জনের চোখে সাপের চোখের মত একটা ভয়ংকর স্থিরতা দেখা দেয়, সেই স্থির দৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা গলায় সে বলে, 'কিন্তু তাই বা আমি পারতে যাবো কেন? তাতে আমার লাভ?'

'লাভ? লাভের কথা, আপনার নিজের লাভের কথা এখন ভাবছেন আপনি?'

'ভাবছি বৈ কি! লাভ লোকসান ভাববার এমন ভয়ানক সময় তো আগে আর আসেনি। অবিরত নিজের মনে কেবল লাভের হিসেবই করে গিয়েছি, এখন যদি হঠাৎ দেখি, 'লাভ' বলে কোন শব্দই নেই, আগাগোড়াই শুধু লোকসান—'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, তা' বোঝবার ক্ষমতা আমার এখন নেই। না পারেন, আমি একাই যাচ্ছি।' বলে দ্রুত কম্পিত পায়ে চলে যায় নীতা। কিন্তু নিরঞ্জন তা'র সঙ্গ ছাড়েনা, চলতে চলতে বলে, 'আপনার বাবার মত মিছে পাগলামি করবেন না, বরং একটা ট্রাংক-কল করে—'

'আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।'

বলে সুচিন্তার কাছে এসে দাঁড়ায় নীতা।

কিন্তু একা নিরঞ্জনই নয়, সকলে একই কথা বলে। সুচিন্তা, নিরুপম, ইন্দ্রনীল, 'যাবে? যাবে কি বল? পাগলি হলে না কি?'

তা' পাগলের মেয়ে পাগল হবে, এ আর আশ্চর্য কি! হয়তো সহসা ক্ষেপেই উঠেছে নীতা, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায়, আর মানুষের লাভ-লোকসানের হিসেব কষায়।

'আমি যাবোই যাবো।'

বলল নীতা।

'যাবেই, যাবে?' সুশোভনও অবাক হয়ে বলেন, 'কোথায় যাবে?'

'সাগরের কাছে!'

'সাগর! সাগরের কাছে?' সুশোভন হতাশ মুখে বলেন, 'কে সে?'

'বাবা, বাবা! তুমি তো জানো সাগর কে।

—তুমি তাকে কত ভালবাসতে! কত গল্প করতে। গল্প করতে করতে আর তর্ক করতে করতে বেলা হয়ে যেত, তুমি বলতে 'সাগর খেয়ে যাও।' এত কথা আজকাল মনে করতে

'...লাভ লোকসান ভাববার এমন ভয়ানক সময় তো আগে আর আসেনি।...'

পারছ তুমি, আর সাগরকে মনে করতে পারছনা? ভাব ভাব খুব করে ভাব।'

সুশোভন হতাশভাবে বলেন 'আমি ঘরে চলে যাই নীতা, একলা একলা ভাবিগে—।

সুচিন্তা কাছে এসে বললেন 'আমি তোমায় বলে দিচ্ছি সুশোভন। সাগর সেই ছেলেটি যার সঙ্গে—'

সুশোভন হাত তুলে থামান বলেন 'থামো সুচিন্তা বড্ড তুমি বলে দাও। আমার মনে পড়ছে, নীতার সঙ্গে সঙ্গে দোকানে যায়। সুটকেস কেনে অনেক জিনিস কেনে, সেই ছেলেটা সাগর।'

'হ্যাঁ বাবা। তার অসুখ করেছে—'

সুশোভন বিহ্বলভাবে বলেন, 'কিন্তু সে তো কোথায় যেন চলে গেছে নীতা! সে তো আর আসবে না।'

'আসবে আসবে। আমি তাকে নিয়ে আসবো বাবা, তাই তো যেতে চাইছি।'

সুশোভন তেমনিভাবে বলেন, 'আমি তো অতদূরে যেতে পারবনা নীতা!'

'তুমি। তুমি তো যাবে না। তুমি কি করে যাবে? তুমি এখানে থাকবে।'

'কী আশ্চর্য। কি যে তুই বলিস নীতা। কার কাছে থাকবো আমি?'

নীতা স্থির স্বরে বলে, 'কেন, সুচিন্তা পিসিমার কাছে।'

'সুচিন্তার কাছে। ঠিক ঠিক সুচিন্তা-ই তো আছে। কিন্তু নীতা, সুচিন্তা, একলা পারবে কেন?

সুচিন্তা বলেন, 'পারবো সুশোভন। একলাই পারবো। কিন্তু নীতা—'

'আর কিন্তু নয় পিসিমা। আমি যাবোই যাবো।'

একটু চুপ করে থেকে সুচিন্তা বলেন, 'যদিও তোমার এই যাওয়ার সংকল্প আমার কাছে একটা অদ্ভুত অসম্ভব পাগলামী বলে মনে হচ্ছে নীতা, মিথ্যে বলব না খুব একটা বাড়াবাড়ি জেদ বলেই মনে হচ্ছে, তবু এওতো দেখেছি তোমরা এ যুগের মেয়েরা প্রতিনিয়তই অসম্ভবকে সম্ভব করছ। আর তোমাদের এই গতির বেগে, এগিয়ে যাবার টানে পাবনো রথগুলোও তাদের কাদায় বসা চাকাগুলোকে টেনে তোলবার সাধনা করছে।'

পিসিমা, শুধু এযুগে কেন সাবিত্রী, যমলোক পর্যন্ত দৌড়েছিলেন, এতো আপনাদেরই কথা।'

'সাবিত্রী।'

সুচিন্তা বলেন, 'কিন্তু নীতা, সমাজ যে সাবিত্রীকে সত্যবানের জন্যে লড়বার অধিকার দিয়েছিল।'

নীতা দৃঢ়স্বরে বলে 'সব ক্ষেত্রেই কি সমাজের হাততোলার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলে পিসিমা, কিছু অধিকার ভগবানের কাছ থেকে অর্জন করতে হয়।'

'ভগবানের কাছে অর্জন করতে হয়।' একথা এতদিন পরে শুনতে পেলেন সুচিন্তা।

কিন্তু নাই বা কোনদিন শুনলেন, একথা বুঝতে কে মানা করেছিল সুচিন্তাকে? সুচিন্তা নিজে কেন ভাবতে পারেননি 'কিছু অধিকার ভগবানের কাছে অর্জন করতে হয়।' কেন ভাবেননি একটা অসহায় মানুষকে ধরে আর একটা মানুষের কাছে উৎসর্গ করার মত হাস্যকর প্রহসনটাকে পরম মূল্য দিয়ে মন বুদ্ধি আত্মা চৈতন্য সব কিছুকে পিটিয়ে পিটিয়ে বাধ্য রাখবার আপ্রাণ চেষ্টাটা আরও হাস্যকর।

সমস্ত জীবনটা সুচিন্তার এক দুঃসহ অপরাধবোধের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েই কেটে গেল। সেই প্রহারজর্জরিত আত্মাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আজও সমস্ত প্রাণ হাহাকার করে উঠতে চায় সুচিন্তার।

হঠাৎ নীতার উপর অদ্ভুত একটা ঈর্ষা অনুভব করলেন সুচিন্তা।

সেই ঈর্ষাতিক্ত মনে ভাবলেন, বাপের অনেক টাকা থাকলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ু অনেক 'লোকে'ই যাওয়া যায়।

ব্যাঙ্কে অনেক হাজার টাকা মজুদ না থাকলে, এত সাহস আসতো কোথা থেকে। অসম্ভবকে সম্ভব করতো কিসের জোরে।

তারপর এক সময় অবাক হয়ে দেখলেন, কী আশ্চর্য; নীতাকে ঈর্ষা করছেন তিনি।

সুশোভনের মেয়ে নীতাকে।

সংসারকে বড় কম দেখেছেন সুচিন্তা, তাই অবাক হচ্ছেন। সংসারকে অনেক দেখলে দেখতে পেতেন, ঈর্ষার বিচরণক্ষেত্র সুরু হয় আপন ঘরের অন্তঃপুর থেকে। সুশোভনের মেয়ে না হয়ে ও যদি সুচিন্তার মেয়েই হত, ঈর্ষা কি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত?

নীতা আকাশে উড়ে তার প্রেমাস্পদের রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সুচিন্তা তাকে একটু ঈর্ষাও করবেন না, এ কি হয়।

হ্যাঁ নীতা অসম্ভবকেই সম্ভব করে।

কিন্তু তার জন্যে কাঠ-খড়ও অনেক পোড়াতে হয় বৈকি। গোটা তিনটে দিন তো সে শুধু রাস্তাতেই ঘোরে, নিরঞ্জনের সঙ্গে নয়, নিরুপমের সঙ্গে, আর টাকার বৃষ্টি করে।

ঈর্ষার কথা হলেও কথাটা সত্যি বৈ কি। টাকা না থাকলে কেবলমাত্র বাড়াবাড়ি জিদটা, আর কোন ফসল ফলাতে পারে? টাকা থাকা চাই। চেয়ে নেওয়া টাকা নয়, ভিক্ষের টাকা নয়, অধিকারের টাকা।

অর্থনৈতিক মুক্তি না থাকলে হৃদয়-নৈতিক মুক্তিটা অর্থহীন।

নীতা যাত্রার আয়োজনে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে, আর নিরঞ্জন ট্রাঙ্ককলের পর ট্রাঙ্ককল করছে 'রোগীর অবস্থা জানাও। জানাও কেউ যদি ছুটে উড়ে যে করে হোক দেখতে যেতে চায়, সে কি গিয়ে দেখতে পাবে?'

কিন্তু নিরঞ্জনের এত উদ্বেগ কেন?

সে কি প্রার্থনা করছে খবর আসুক 'আর কারো দেখতে আসার প্রয়োজন নেই। সব প্রয়োজন চুকে গেছে।'

না কি নীতার কাতরতায় ব্যাকুল হয়ে—মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছে, আর অনেক ধর্ণা দিয়ে খবর আনাচ্ছে সে।

(ক্রমশঃ)

ক্রিকেট-অধ্যায়ের করুণতম নায়ক

রেখা ও লেখা: শ্রীলেখা ঘোষ

সোনালী হেমন্তের অবসানে শীত এসেছে কলকাতায় তার কুয়াশা-জড়ানো হিমেল হাওয়ার স্পর্শ নিয়ে। পারদ রেখার নিম্নগতি আশঙ্কার সঞ্চার করেছে নগরবাসীদের মনে. শীতার্ত দুর্ভাগাদের দুরবস্থা বর্ণনায় সংবাদপত্র-গুলি পঞ্চমুখ। কিন্তু শীত ঋতুর এমন প্রবল প্রতাপও ক্রিকেট-ক্রীড়ামোদীদের উত্তপ্ত উত্তেজনায় শীতল জল নিক্ষেপ করতে পারেনি। গোয়া. কাতাঙ্গা, কুয়ায়েত. চীন সবকিছু আড়াল করে প্রতি বছরের মতন এবারেও কলিকাতার আকাশ বাতাস শুধু একটি জল্পনায় সরগরম হয়ে আছে—ক্রিকেট।

মহিলারা ব্যস্ত হয়েছেন শাড়ীর রঙের সঙ্গে ব্লাউসের রঙ. এবং ব্লাউসের রঙের সঙ্গে লিপস্টিকের রঙের আধুনিকতম কম্বিনেশান করতে। পুরুষেরা ব্যস্ত মহিলাদের এই সজ্জা বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিস্তার করতে। কিন্তু লক্ষ্য (বা উপলক্ষ্য) দুই পক্ষেরই এক—রণজি স্টেডিয়াম। কিন্তু আলোর সঙ্গে যেমন ছায়া, তেমনি এই উদ্বেলিত শিহরণ-কম্পিত ক্রিকেট মরসুমের করুণ চিত্রও আছে বৈকি। জানেন কি এই অধ্যায়ের করুণতম নায়ক কে বা কারা? না, এর নায়ক তাঁরা নন যাঁরা দিবারাত্রির রৌদ্রে-জলে লাইন দিয়ে ক্রিকেট সংগ্রহে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ইডেন গার্ডেনের 'ওয়েসিস' ছেড়ে মরুভূমি সদৃশ নীরস বিবর্ণ গৃহ অভিমুখে প্রত্যাগত হন। না, এর নায়ক তাঁরাও নন, যাঁরা উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্যে দীপ্ত চক্ষে ব্যাট করতে নেমে, রান-সংখ্যা দশের কোটায় পৌঁছবার আগেই উত্তেজিত ধিক্কারধ্বনির মাঝে ক্ষিপ্ত মনে বিদায় নেন। আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন, ক্রিকেট-অধ্যায়ের করুণতম নায়ক সেই মুষ্টিমেয় কয়েক-জন যাঁরা ভাগ্যচক্রে কোনো না কোনো ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

হ্যাঁ তাঁরাই। যাঁদের উপরে টিকিট না-পাওয়ার সমস্ত আক্রোশ অনেকে অসঙ্কোচে ঢেলে দেন, যাঁদের বহু লোকে মনে করেন, ক্রিকেট সীজনের সমগ্র আনন্দের একমাত্র ভোক্তা। এঁরা হয়তো ভেবে দেখেন না যে, এই কর্মকর্তাদেরও আইন-কানুন মেনে চলতে হয়, তাঁদেরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টকে জানি। ঘরে ও বাহিরে বিব্রত এই ব্যক্তিটিকে দেখেই ক্রিকেটের মরসুমে তাঁর সমস্থানীয় অন্যদের অবস্থাও অনুমান করতে পারি। এই প্রেসিডেন্ট মহোদয় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার টিকিট পান। কিন্তু ঘরে ও বাহিরে অসংখ্য ক্রীড়ানুরাগীদের তুলনায় সে সংখ্যা অতি নগণ্য। আত্মীয়রা আসেন সাম্যের দাবী নিয়ে, বন্ধুরা আসেন মৈত্রীর বাণী নিয়ে আর ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে প্রেসিডেন্টকে তিরস্কারে জর্জরিত করবার স্বাধীনতা তো সকলেরই আছে। ঘরে বা বাহিরে, পত্র-যোগে বা ফোনযোগে, অনুনয়ে বা তাড়নায় সকলেরই একটি মাত্র প্রার্থনা—শুধু একটি ক্রিকেট টিকিট! কেউ আবার নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, তাঁদের লক্ষ্য কেবলমাত্র পরোপকার।

যেমন ধরুন প্রেসিডেন্টের গৃহিণী স্বয়ং। পুজোর আসন থেকে উঠে এসে ডেকে বলেন, "শোনো একটা কথা আছে।" তারপর জুৎ করে বসে আঁচল থেকে সুদীর্ঘ একটি লিস্ট উন্মোচিত করে প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে বলেন, "মাত্র এই ক'জন! আমাকে বড্ডো ধরেছে: এদের টিকিট জোগাড় করে দিতেই হবে।" প্রেসিডেন্ট নিরুপায়. এবং সে কথা গৃহিণীকে বোঝাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? প্রথমে গর্জন পরে বর্ষণ। গৃহিণী বাষ্পাকুল নেত্রে বলেন, "বরাবরই জানি আমার কোনো কথাই থাকে না, তার ওপরে লিস্টে আবার আমার বাপের বাড়ীর ক'জনের নাম আছে......"

প্রেসিডেন্টের পুত্রবধূটি ভালো। শ্বশুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তদুপরি এই সীজন পড়ে পর্যন্ত শ্বশুরের যত্নের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ দেখলেও আনন্দ হয়। লক্ষ্মীঠাকরুণের মত মূর্তি নিয়ে যখন বৌমাটি শ্বশুরের খাওয়ার কাছে এসে বসেন তখন শ্বশুরের মন-প্রাণ জুড়িয়ে যাবার কথা, কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কণ্টকিত হয়ে থাকেন কখন বধূমাতা মধুর হেসে মধুরতর স্বরে বলবেন, "বাবা,—র জন্যে একটা ক্রিকেট টিকিট।"

কলেজে পড়ুয়া প্রবাসী কন্যা সানু-নাসিক স্বরে বলেন, "না বাবা না। ক্রিসমাসে কলকাতায় এসে ক্রিকেট দেখবো না তা হতেই পারে না। কলেজে আর তা হ'লে মুখ দেখাতে পারবো না, ইট্‌'স্ অলমোস্ট এ কোয়েশ্চন অব প্রেস্টিজ!"

মাত্র এই ক'জন!...

কন্যার দোষ নেই, কলেজের কমনরুমে এক বান্ধবীর সঙ্গে তার কথোপকথন শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। বান্ধবীটি কিয়ৎক্ষণ প্রেসিডেন্ট-কন্যার

দিকে বিহ্বল নেত্রে চেয়ে থেকে ভাবাকুল স্বরে বলে, "সত্যি, তুই কি ফরচুনেট!"

"কেন?"

"তুই তো কলকাতায় যাবি?"

"হ্যাঁ।"

"খেলা দেখবি?"

"হয়তো।"

আকুল প্রশ্ন বান্ধবীর, "জয়সীমাকে দেখবি?"

"বোধহয়।"

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবারও উচ্চারিত হয়, "সত্যি, তুই-ই ফরচুনেট!"

প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের লোরেটো হাউসে পড়া আদুরে নাত্‌নী ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে এসে তর্জন করে বলে, "দাদু! শুনেছি নাকি তুমি আমায় খেলা দেখতে নিয়ে যাবে না? হাউ ডেয়ার ইউ!"

নাতিটির চেহারাটি লম্বা-চওড়া, চাল-চলনও গুরুগম্ভীর। মৃদুমন্থর গতিতে এসে বোনের সঙ্গে যোগ দেয়, "আমরা নাকি খেলা দেখতে পাবো না?"

দাদু উত্তর দেন, "একটি মাত্র উপায় আছে। আমার প্রেসিডেন্টের ব্যাজটি খুলে দিচ্ছি—কোটে আট্‌কে সোজা মাঠে চলে যাও, কেউ বাধা দেবে না।"

* * *

এতো গেলো ঘরের কথা—বাইরেও প্রেসিডেন্টের অবস্থা কম শোচনীয় নয়। কোনো একটি বাল্যবন্ধু বাল্যস্মৃতির মধুর আবেদনে ভরা একটি হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখলেন, অবশ্য বাল্যবন্ধুর কাছে সামান্য একটি টিকিটের অনুরোধটাও জানিয়ে রাখলেন সেই সঙ্গে। অক্ষমতা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর এলো, "এতো বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট যে এরকম অপদার্থ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিলো না।" প্রেসিডেন্ট জবাবে লিখলেন, "এখন ধারণা হয়েছে তো? ভবিষ্যতে এই ধারণাটি বজায় রাখলে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

অপর এক বন্ধু, সজ্জন এবং উপকারী, তাঁর নাত্‌নীকে প্রেসিডেন্ট আদর ক'রে 'দিদিমণি' বলে ডাকেন। বন্ধুটি প্রেসিডেন্টকে এসে বললেন, "ওহে তোমার দিদিমণি যে কাঁদছে।"

প্রেসিডেন্ট শশব্যস্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, কেন?"

"আর কেন? তার একটা ক্রিকেট টিকিট চাই।" (দিদিমণির বয়স সাড়ে চার বছর)।

কোনো এক ধনী বন্ধু সহসা প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে দর্শন দিলেন। পত্র-পুষ্পশোভিত বাগানের সৌন্দর্যের অকুন্ঠ প্রশংসা করে বললেন, "কি সুন্দর বাগান! এই ধার দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখে যাই।"

"সত্যি, তুই-ই ফরচুনেট!"

এর উত্তরে প্রেসিডেন্ট বললেন, "একখানার বেশী টিকিট দেওয়া কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"ওতেই হবে, যথেষ্ট হবে।"

কোনো এক রাজ্যের কন্‌-সাল জেনারেল ফোনে ডাকছেন। প্রেসিডেন্ট রিসীভার কানে তুলেই বললেন, "ক'খানা আশা করছেন? একখানা দেওয়াও যে প্রায় অসম্ভব!"

সম্পর্কে এক বৈবাহিক করুণ মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন, মুখে একই বুলি—একটা টিকিট। প্রেসিডেন্ট যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় নিজের অক্ষমতা ব্যাখ্যা করলেন। বৈবাহিক মহাশয় অতঃপর অনুনয় ছেড়ে তর্জন ধরলেন। ঘূর্ণমান লোচনে কম্পিত অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "একটা টিকিট দিতে পারেন না. এমন ঘরে মেয়ে দিয়েছি কেন?

প্রেসিডেন্ট উষ্ণ হয়ে বললেন, "ক্রিকেট টিকিটের আশায় দিয়েছেন নাকি?"

"নিশ্চয়ই! লোকে পাঁচ রকম দেখেই দেয়। তা এখন দেখছি..." ইত্যাদি।

ইলেকসনে ব্যস্ত কোনো কোনো বন্ধু এসে বলেন, "ভাই, কিছু টিকিট না দিলে তো বাঁচি না।" প্রেসিডেন্ট বললেন, "তোমাদের এখন ম্যাচ দেখবার সময় কোথা হে?" তাঁরা বিমর্ষ বদনে বললেন, "কি করবো বলো? ক্যান-ভাসাররা এত পরিশ্রম ক'রছেন—তাঁরা আর কিছুই চান না। তাঁরা সজোরে চীৎকার ক'রে বলেন, 'ভোট ফর—' তার-পরেই হাত বাড়িয়ে দাবী জানান—'এক-খানা টিকিট যোগাড় ক'রে দিতেই হবে—যেমন করে হোক।' —তাই......।"

প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের ধর্মকর্মে মন আছে। এক প্রভাতে একটি টিকিটের বিনীত আবেদনের সঙ্গে আঁটা একটি একশো টাকার চেক দেখে 'হুজুগ এবং জাতির ভবিষ্যৎ' শীর্ষক একটি দার্শনিক ভাবধারায় নিমজ্জিত হয়েছেন এমন সময়ে প্রশান্ত বদনে এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী দেখা দিলেন। প্রেসিডেন্ট শশব্যস্তে আসন দিলেন। স্বামীজী জানালেন "—স্টেটের রাণীর একটি অনু-রোধ নিয়ে আসছি।"

"বলুন। রাসলীলা উৎসবের কোনো আয়োজনে বা কেদারবদরী যাত্রার......"

"আরে না—না, ও-সব কিছু নয়। রাণীমার অনুরোধ অতি সামান্য। কেবল একটি ক্রিকেট টিকিট।"

কোনো এক আত্মীয় চিঠি লিখেছেন। প্রথমে প্রচুর প্রশস্তি, "আপনার সদাশয়তার কথা কে না জানে। শ্রীচরণ সেবাই অধমের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। আপনারা কোনোদিন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না, তাই সাহসে ভর করিয়া দ্বারে আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। যদি কোনোক্রমে (ছেলের চাকুরী, মেয়ের বিবাহ, স্ত্রীর রোগভোগ নয়) শুধু একটি—!"

এ'রা কেউই মানতে রাজি নন যে, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মনে করেন মাত্র একখানি টিকিট তাও দিতে পারেন না, এ কি সত্যিই সম্ভব! তাঁদের হতাশ হৃদয়ের দুঃখ রাগ বা বেদনা সহজেই অনুভব করতে পারি। কিন্তু হায়রে প্রেসিডেন্ট মহাশয়, ক্রিকেটের মরসুমে তাঁর মর্মব্যথা অনুভব করার জন্য কেউ নেই। গৃহযুদ্ধের অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা তাঁকে একাই বহন করতে হয়।

* * *

শেষ যখন আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দেখা হলো তখন তাঁর ক্লান্ত করুণ কণ্ঠ শুনলুম, "মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এমন আকাংখিত পদ থেকেও রেসিগনেশান দিয়ে দিই।"

আমি চকিত হয়ে বললুম, "সেকি! কেন? আপনার খেলার ওপরে এমন আকর্ষণ, তার ওপরে প্রতিষ্ঠানটির সভ্যদের সঙ্গে আপনি এমন প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা। আপনি রেসিগনেশান দেবেন! কি কারণে?"

"একটি মাত্র কারণে। মিসারেবল্! লাইফ আমার মিসারেবল্ হয়ে উঠেছে। ফোনের আওয়াজ শুনলে মনে হয় বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটোচ্ছে, চিঠি খুলতে হাত কাঁপে। সীজনের এক মাস আগে থেকে যেন তেন প্রকারেণ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাই, তবু রক্ষে নেই? ক্রিকেটের টিকিট আমায় তাড়া করেছে!"

আমি আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বললুম "সবই বুঝি, হুজুগ এমনই জিনিস। আপনি রেসিগনেশান দিলে অনেকেরই অনেক ক্ষতি হবে। যাক্, যে জন্যে এসেছিলুম, একটা কথা—"

"কি?"

"একটা ক্রিকেট টিকিট!"

চায়ের ধোঁয়া

উৎপল দত্ত

(আট)

॥ অভিনেতার শিক্ষা ॥

অভিনেতা : আপনারা অভিনেতাকে আবেগশূন্য করে যন্ত্রে পরিণত করতে চাইছেন।

পরিচালক : যন্ত্রে পরিণত করতে পারলে ভালই হোতো। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে অভিনেতাকে যতটা যন্ত্র-সদৃশ করে তোলা যায় ততটা করা। আগেই বলেছি সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে জ্যান্ত মানুষ ব্যর্থ, কারণ সে নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই জ্যান্ত মানুষকে যতটা সম্ভব প্রাণহীন করতে পারলে তবেই কতকটা শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব।

ভাষাবিদ : কারণ শিল্পের উপকরণ কখনই আত্মপ্রকাশ করে না, নিজের অস্তিত্ব জাহির করে না। পিকাসোর ছবি দেখতে দেখতে ওটা কত ইঞ্চি পুরু চটে আঁকা হয়েছে, বা কি পরিমাণ প্যাস্টেল খরচ হোলো এসব মাথায় আসে না। চট-রং এরা নিজেকে জাহির করে না। একান্ত নিরপেক্ষভাবে এরা শুধু শিল্পীর আইডিয়াকে তুলে ধরেই খালাস। কিন্তু অভিনেতা জ্যান্ত মানুষ হওয়ার ফলে সর্বসময়ে নিজেকে ব্যক্ত করতে উদগ্রীব। শিল্পীর অর্থাৎ পরিচালকের বক্তব্যকে ছাপিয়ে অভিনেতা নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিল্পের চিরন্তন বিধি অনুযায়ী অভিনেতারও নিজেকে লুকিয়ে রাখা উচিত। অথচ জীবনের চিরন্তন বিধি অনুযায়ী অভিনেতা নিজেকে প্রকাশ করতে চান। এই বিরোধটাই অভিনয়-শিল্পের কাল হয়েছে।

অভিনেতা : এ বিরোধের যে সমাধান নবনাট্য-আন্দোলন করতে চাইছে তাতে অভিনেতা যন্ত্রের মতন পরিচালকের তাঁবেদারি করে যাবে, এই তো?

পরিচালক : হ্যাঁ, বিনাবাক্যব্যয়ে, টুঁ শব্দ না করে! একটা সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতন কাজ করবে টীম, কথায় এবং চলাফেরায়। দ্রুত কথা আদানপ্রদানে, নিখুঁত স্থান-পরিবর্তনে অভিনেতারা ক্রমশঃ সেই যন্ত্রের স্ক্রুতে পরিণত হবেন।

অভিনেতা : এবং অচিরে যে প্রতিভা তাঁদের আছে সব লুপ্ত হবে।

পুরোনো নাট্যশালা অভিনেতাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু আপনাদের নাট্যশালা অভিনেতাকে হত্যা করতে চাইছে। এক প্রান্ত থেকে আপনারা বিক্ষুব্ধ পেন্ডুলামের মতন অন্য প্রান্তে দোল খাচ্ছেন।

পরিচালক : যন্ত্রের স্ক্রু হলে অভিনেতার প্রতিভা লুপ্ত হয় এ কথা আপনাকে কে বলেছে?

অভিনেতা : বাঃ! স্ক্রু-এর আবার প্রতিভার দরকার হয় নাকি?

পরিচালক : সত্যিকারের স্ক্রু-এর প্রতিভা লাগে না। কিন্তু একটা আস্ত জলজ্যান্ত মানুষের স্ক্রু-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে গেলে চরম প্রতিভার প্রয়োজন হয়। আপনি তো বড় অভিনেতা, আপনাকে শাজাহানের পাট দিলে আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে করেও দিতে পারেন; কিন্তু আপনাকে যদি বলি একটা লাঠির ভূমিকায় নামুন, বা একটা টেবিলের ভূমিকা নিন দিকি! আপনি পারবেন? সবচেয়ে কঠিন পার্ট হোলো যন্ত্রের স্ক্রু হওয়া। নিজেকে বিলীন করে একটা মেশিনের ক্ষুদ্রতম অংশ হওয়া সবচেয়ে দুরূহ কাজ।

ভাষাবিদ : সেই যে কবিতা আছে, জাঁ মোরেয়া-র :

"জ্য ম্য কঁপেয়ার ও মোর—".

অভিনেতাদের বেলায় কবিতাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য। মৃতের সঙ্গে নিজেকে সমতুল্য করে দেখলে তবেই জীবন-ঘটিত আবেগ-দম্ভ-গর্ব ধূলিসাৎ করে অভিনেতা সৃষ্টির মালমশলা হিসেবে নিজেকে মূল্যবান করতে পারেন। নচেৎ তিনি ব্যর্থ।

পরিচালক : যা বলেছেন। অভিনেতার দম্ভকে চুরমার করাই বর্তমানে আমাদের কাজ। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত রিহার্সাল নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। অভিনেতাকে মেশিনের অংশ করে তোলা ভবিষ্যতের কাজ। বর্তমানে অত বড় পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিনেতা যে পরিচালকের হাতে মোমের পুতুল হবেন, সেটাই যে অভিনেতার পবিত্র কর্তব্য, এটা জানিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে। এবং এই কর্তব্য পালন করার জন্যে অভিনেতার নিজেকে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অভিনেতা : কি ভাবে? কি রকম পদ্ধতিতে এটা করা সম্ভব?

পরিচালক : পদ্ধতি একটা সহজেই বলা যায়। সেটা কজনের নাগালের মধ্যে তা অবশ্য এ সমাজ-ব্যবস্থায় বিবেচনা-সাপেক্ষ। তবু পদ্ধতিটা বলছি। তা থেকে হয়তো ভবিষ্যতের যে থিয়েটারের স্বপ্ন আমরা দেখছি তাকে বুঝতে পারা যাবে। প্রথমেই অভিনেতার দেহকে তৈরী করতে হবে। আমাদের দেশের অভিনেতারা হয় অনাহারগ্রস্ত, ক্ষীণজীবী; নয় স্থূলোদর। অথচ দরকার পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যবর্জিত সুগঠিত দেহ। মাংসপেশীর স্থূলত্ব নয়, মাংসপেশীর নমনীয়তা; কায়িক শক্তি নয়, কায়িক ক্ষিপ্রতা। প্রতিটি পেশীকে মগজের দাস করে আনতে হবে। এই জন্যেই চীনের ক্লাসিক্যাল নাট্যশালার অভিনেতারা

এক্রোব্যাট্‌ও বটেন। এই ক্ষিপ্রতা আনবার উপায় হোলো তালোয়ার-খেলা। আধুনিক ফেন্‌সিং। আমি চাই সেই দিনটি যখন দুই অভিনেতা একসঙ্গে হলে তলোয়ার-খেলার নানা প্যাঁচ নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করবেন। প্রিমো-কার্নো-পনুতো রেভেসো-র আলোচনায় মুখর হবেন। সেই সঙ্গে যাবতীয় খেলাধুলোতেই তাঁরা জড়িয়ে পড়বেন। ক্রিকেটকে বাদ দিয়ে আমি অভিনয় ভাবতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না কেন রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে বাইশটি তরুণের বুদ্ধি-শক্তি-হিম্মতের লড়াইয়ে অভিনেতা শামিল হবেন না। বুঝতে পারি না কেন নেভিল কার্ডাস-এর ব্র্যাডম্যান-হ্যামন্ড তুলনামূলক নিবন্ধে তাঁরা রস পাবেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে নাটকীয় খেলা ক্রিকেট। সে নাটককে উপভোগ করতে সবচেয়ে সক্ষম অভিনেতারা। বর্তমানে অভিনেতাদের কাছ থেকে শুনতে চাই ক্রিকেটের কৌশলগত টেকনিকাল্ আলোচনা; শুনতে চাই তাঁরা স্ল্যাশার ম্যাক্‌কে আর ইয়ান মেকিফ-কে সমালোচনা করছেন; শুনতে চাই তাঁরা ওরেল-বেনড্ লড়াইয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ; শুনতে চাই কম্পটন-সুইপ বা গ্রেভ্‌নি অফ-ড্রাইভের মৃত্যুতে তাঁরা শোক করছেন। বলছি পড়াশোনার অস্বাস্থ্যকর স্যাঁৎসেঁতে কারাগার থেকে অভিনেতা নিজেকে মুক্ত করুন। বেরিয়ে আসুন রোদের মধ্যে; খেলার জগতে। স্বীকার করুন ওভালে বা লর্ডস্‌-এ যে নাটক হয়, ষ্টার-বিশ্বরূপার নাটকের চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়।

অভিনেতা : পড়াশোনা দরকার নেই বলছেন?

পরিচালক : নিশ্চয়ই দরকার। প্রচুর পড়াশোনার দরকার। কিন্তু বলছিলাম গ্রন্থকীট হয়ে সত্যিকারের বলিষ্ঠ অভিনেতা হওয়া অসম্ভব। আউটডোরের প্রতি অভিনেতার থাকবে দুর্নিবার আকর্ষণ। দেহ গঠিত হলে মনকে গঠিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। মনকে প্রস্তুত করবো কি ধাঁচে? চাই একটি সজীব সচেতন মন। চাই এমন একটি অভিনেতা যিনি বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন নন। যুগান্তকারী যেসব ঘটনা রোজ ঘটছে সে সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জানবার ঔৎসুক্য যদি না জাগে প্রাণে তবে বুঝবো শিল্প হিসেবেও এ ব্যর্থ। সাধারণ মানুষকে জানবার-বুঝবার আগ্রহ যেদিন মরে যাবে, সেদিন বুঝবো, অভিনেতাও মরে গেছেন। আমি শুনতে চাই, অভিনেতারা সকালে চা খেতে খেতে তর্ক করছেন মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে অটো কুসিনেন যা বলেছেন, তা সঠিক, না, ভুল। আমি চাই না যে, অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড্ বা অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন্‌-এর নাম করলে অভিনেতা আকাশ থেকে পড়েন। ডক্টর পাউলিং বা হালডর লাক্স-নেস-এর নাম শোনেননি এমন লোককে দরকার নেই নাট্যশালায়। বলছি না যে, ইতিহাস-দর্শন-সমাজ-বিজ্ঞান সব গুলে খেতে হবে। কিন্তু একটি সভ্য মানুষের পক্ষে আজকের যুগান্তকারী ধ্যান-ধারণাগুলি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকাও অসম্ভব। আর অভিনেতাকেও সভ্য মানুষ হতে হবে। আর অন্যান্য শিল্পগুলি সম্বন্ধে তো কথাই নেই। যামিনী রায়ের ছবি দেখে প্রাণে একটা না একটা অনুভূতি জাগা প্রয়োজন। অসংখ্য ছবি দেখতে হবে, এ-দেশি ও-দেশি। সেজান্, মাতিস্, পিকাসো সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই। কানওয়াল কিসন্ বা রামকিংকর বেজ সম্বন্ধেও। তেমনি গান—রাগসংগীত। সত্যিকারের যাঁরা শিল্পী, তাঁদের গান ভাল লাগা চাই। সলামৎ আলিকে ভাল অনেকেরই লাগে। কিন্তু একটা শিল্পীসুলভ মনের পরিচয় পাই তখন, যখন সোহন সিং বা লতাফৎ হোসেনের গানে কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল ভাল লাগে কি আপনার? দেশ রাগের চেয়ে মুলতান বেশি প্রিয় কি? যদি না লাগে, তবে বুঝবেন আপনার মনের শিক্ষায় গলদ আছে। সাধারণ মানুষ তিলং রাগে ঠুংরি শুনে (বড়ে গোলাম আলি সাহেবের কণ্ঠে) কেঁদে ফেলতে পারেন। কিন্তু শিল্পীর কান তৈরী হবে অন্য ধাঁচে। জীবনের বা জীবনোত্তর বৃহৎ সত্যের দিকে ধাবিত হবে তাঁর অন্তর, তখন তিনি চাইবেন বিলায়েৎ হোসেন খাঁ-সাহেবের কণ্ঠে কানাড়ায় ধ্রুপদ। পাশ্চাত্য সংগীতকেও তখন আপনা থেকেই মনে ধরবে। বেঠোফেনকে বা ভের্দিকে যিনি হেসে ওড়ান, তাঁরও কান তৈরী হয়নি—এতো ধরেই নিতে হবে। আর সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্যে যাঁর আগ্রহ নেই, তিনি অভিনেতা হতে পারবেন না—এ ধ্রুব সত্য। সব পড়তে হবে : মাইকেল থেকে বিজন ভট্টাচার্য, শেক্সপীয়ার থেকে ক্রিস্টো ফা র ফ্রাই। উপন্যাস পড়তে হবে; কবিতা ভাল লাগতে হবে। যা কিছু নাটকীয়, তাকেই রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হবে। আবার হঠাৎ হয়তো বট-ভিনিক-এর বাষট্টি চালে টাল্‌কে মাৎ করার ইতিবৃত্ত পড়ে পুলকিত হওয়ার অবকাশ থাকবে। বুঝতেই পারছেন, আদর্শ অভিনেতার আদর্শ শিক্ষার প্রায় সবটাই নাট্যশালার বাইরের জগৎটাকে জড়িয়ে। যিনি বলেন, "গত ত্রিশ বছর আমি থিয়েটার নিয়েই পড়ে আছি", তিনি আসলে অভিনেতা হিসেবে আত্মহত্যা করেছেন। কেন সেটা পরে বলবো।

সংবাদ বিচিত্রা

।। বরবাহৃত সৌভাগ্য ।।

লোকটির নাম বরগ্রেস। মণিহারী দোকানের ম্যানেজার। চল্লিশ বছরের চাকুরীতে ইস্তফা দিতে হল। বরগ্রেসের ইচ্ছা ছিল না। তবুও সে বিদায় নিল। বিদায়ের আগে মালিক তাকে এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। সংগে দক্ষিণা দেন একটি ফাউন্টেন পেন।

কেন এমন হোল! কারণ, মানুষটির ভাগ্য ফিরেছে। ফুটবলের লটারীতে। ৫৪ হাজার পাউন্ড অর্থ লাভের পর এই সামান্য চাকুরীতে কি মন ভরবে! মালিক বললেন, বিদায় নাও। বরের বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তবুও নিতে হল।

।। কোষ্ঠী বিচার ।।

প্যারিসের টেলিফোন ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশীয় ব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে। প্যারিস টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে সংবাদ, আবহাওয়া, দু-মিনিটের ধর্মোপদেশ, পর্যটন-তথ্য ও রাস্তার অবস্থার খবর সরবরাহ করা হয়। শুনলে অবশ্য আমরা একটু আশ্চর্য হব। কিন্তু টেলিফোনে কোষ্ঠী বিচারের কথা সত্যিই আশ্চর্যজনক ঘটনা।

এম জাঁ পীয়ের ড্রিন ছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি তিনি প্যারিসে টেলিফোন মারফৎ জিজ্ঞাসুদের কোষ্ঠীর ফলাফল জানাতে শুরু করেছেন। ফোনের ডায়ালে এলিখি ৭৯-৬৯ ডাকলেই শোনা যাবে ওপার থেকে বলছে "আপনার রাশি বৃশ্চিক ঃ আপনার কাজের সঙ্গে যদি একটু ভাবাবেগের যোগ থাকে তাহলে ভাল হয়; কন্যা হলে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। মিথুন ঃ তাহলে আপনার জীবনের অতীত কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।"

।। বিচিত্র গুণশালী সিলিকোন ।।

কোয়ার্টজ পাথর আর মাটি অর্থাৎ বালির দর প্রায় একই রকম ছিল এত দিন। বালি কোয়ার্টজেরই রূপান্তর। কিন্তু গত বিশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই তুচ্ছ বস্তুটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সিলিকোন নামে যে নতুন জিনিষটির ব্যবহার সুরু হয় সেটি আজ ঘরের নানা কাজে, শিল্প-কারখানায়, মোটরগাড়ীতে, এরোপ্লেনে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাসায়নিক পরিভাষায় কোয়ার্টজের অপর নাম হলো সিলিকা। সিলিকোন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে হয় সিলিকার সৃষ্টি। এই কোয়ার্টজ চূর্ণ অর্থাৎ বালি এবং পাথরকে বৈদ্যুতিক কটাহের (ফার্ণেস) প্রচণ্ড উত্তাপে বিগলিত করে একাকার করে ফেলা হয়। এই মিশ্র পদার্থটিকে বলা হয় সিলিকোন। সিলিকোনের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে তার অসংখ্য রূপান্তর ঘটানো হয়। যেমন, মিথিল, ফেনিল এবং ভিনিল পর্যায়ের বিভিন্ন রাসায়নিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করা হয় সিলিকোন-রবার, সিলিকোন-রেজিন, তরল-সিলিকোন ইত্যাদি।

ওষুধপত্র, অস্ত্রোপচার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সিলিকোনের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে আজকাল। সিলিকোনের গুণাবলীর কিছু কিছু নমুনার উল্লেখ এখানে করা যাচ্ছে। এর স্বাদ নেই, বর্ণ নেই, কোনও অনিষ্টকারিতা নেই। কাচ, রবার, ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি পদার্থকে যে কোনও রকম ছাঁচের তৈরি করতে, খাদ্যবস্তু, কেক, পুডিং ইত্যাদিকেও ইচ্ছামত আকার দান করতে সিলিকোনের সাহায্য আজকাল নেওয়া হচ্ছে। তৈরি জিনিষগুলির গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ে না। মসৃণ, সুন্দর হয় দেখতে।

কাগজ বা বোর্ডের গায় সিলিকোন কোটিং মাখিয়ে দিলে কোনও বস্তু সে সবের গায়ে সেঁটে থাকবে না। শক্ত আঠাকেও অতি অল্প সময়ে, খুব সহজেই পরিষ্কার করে তুলে দিতে পারে এই বস্তুটি। হাতে মাখবার ক্রীম, চুলে মাখবার তেল, দুর্গন্ধনাশক পাউডার এবং ফুস্কুড়ি-নিবারক মলম ইত্যাদিতে আজকাল সিলিকোন ব্যবহার করা হচ্ছে। রংয়ের পালিশের ঔজ্জ্বল্য অল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমেই বাড়িয়ে তোলে এই সিলিকোন। মোটরগাড়ীতে, আসবাবপত্রে এর ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রে খুবই বেড়ে গিয়েছে। কোনও কিছুতে জল জমতে না দেওয়া হচ্ছে সিলিকোনের একটি গুণ। শ্রমশিল্পের নানা ক্ষেত্রে এই হেতু এর বিশেষ সমাদর। তা ছাড়া, বিদ্যুৎ-প্রবাহ-নিরোধক হিসেবেও এর সমধিক মূল্য রয়েছে। চিকিৎসা ও প্লাস্টিক সার্জারিতে সিলিকোনের বহুল ব্যবহার ক্রমশঃই বিস্তৃতিলাভ করছে। সিলিকোনের তৈরি কৃত্রিম নাক, কান ইত্যাদি অকৃত্রিম বলেই মনে হয়।

।। চিন্তাশীল উষ্ণগৃহ ।।

পশ্চিম জার্মানীর হামবর্গে একটি উদ্যানময়ী নগরী। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম—সুন্দর সুন্দর বহু পার্ক রয়েছে ওখানে। আর রয়েছে ছবির মত দুটি কৃত্রিম হ্রদ। সব মিলিয়ে হামবুর্গকে সারা ইউরোপের সুন্দরতম সহরগুলির মধ্যে একটি বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৬৩ সালে এই হামবুর্গেই বিশ্ব উদ্যান প্রদর্শনী হবে।

হামবুর্গের অতি জনপ্রিয় পার্ক প্লানটেনে অনেক গাছ ও ফুলের বাগান আছে। আর আছে "পাম হাউস" নামে একটি উদ্ভিদ গৃহ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যতো রাজ্যের গাছ-গাছড়া রয়েছে এই উদ্ভিদ গৃহটিতে। এবং এটির পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত জার্মান স্থপতি, বার্লিনের কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণহার্ড হার্মকেস্।

অধ্যাপক হার্মকেস-এর আর একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী উপরোক্ত পার্কটিতে এখন একটি অভিনব জিনিষ তৈরী হচ্ছে—সেটি হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় চিন্তাশীল উষ্ণগৃহ এবং এই জাতীয় জিনিসের এটিই হবে প্রথম। ১৯৬৩ সালে হামবুর্গের আন্তর্জাতিক উদ্যান প্রদর্শনীতে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ দর্শকমহলে এটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। উষ্ণগৃহটিকে স্বয়ংক্রিয় করা হবে ইলেকট্রিক কৌশলের দ্বারা। সূর্যের আলো এর উপর যতটা পড়বে তার পরিমাণ ও প্রাখর্য সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য গৃহটির ছাদ আবরণ ও রৌদ্র-ঢাকনি প্রয়োজন অনুযায়ী আপনা-আপনিই খুলবে বা বন্ধ হবে। বাইরের আবহাওয়া যাই হোক না কেন উষ্ণগৃহটি হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং এটির তাপমাত্রা সব সময়েই সমান থাকবে। এমনকি গৃহমধ্যের গাছগুলির উপর জল দেওয়ার কাজ পর্যন্ত পরিচালিত হবে স্বয়ংক্রিয় হাইড্রোমিটার যন্ত্রের দ্বারা।

উপরোক্ত নির্মীয়মাণ স্বয়ংক্রিয় উষ্ণগৃহের কাছেই পশ্চিম জার্মানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯টি জাতীয় উদ্যানের প্রথমটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এই উদ্যানটির পরিকল্পক হচ্ছেন বিখ্যাত জুরিখ স্থপতি অধ্যাপক ক্রেমার। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক উদ্যান প্রদর্শনী দেখতে যাঁরা হামবুর্গে আসবেন তাঁরা এই বাগানটি দেখে অবাক হয়ে যাবেন। কেননা, এটি হবে একটি তরুবিহীন সুদৃশ্য উদ্যান যার ভেতরে থাকবে ত্রিকোণ আকার একটি সাঁতারের পুকুর, বেশ বড় সূর্য-স্নানের জায়গা, খেলার মাঠ, গল্প-গুজব করার জায়গা আরও অনেক কিছু।

কলঙ্কিনী রাই

সুনীলকুমার ঘোষ

তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এরা আমার চারপাশে প্রহরী বসিয়েছে। তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি।

পারব কেমন করে? তুমি তো আমার কাছে সংস্কারের রাজপথ বেয়ে আসনি। আমার মনের অন্তরতম স্থানে ছিল তোমার অপরূপ রূপের স্পর্শবিহীন ছোঁয়া। তোমাকে আমি কোনদিনই আমার তর্কজিজ্ঞাসার মীমাংসা হিসাবে পাইনি; পাইনি ধরা-ছোঁয়ার নিবিড়তার মধ্যে। পেয়েছি অকস্মাৎ, মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের শিহরণে, আর মুহূর্তে হারিয়ে-যাওয়া কল্পনার বিলাসে। আমার হৃদয়-স্পন্দনের আড়ালে আড়ালে তোমার নিত্য যাওয়া-আসা।

ওরা বলে, আমি ব্যর্থ, আকাশ-চারিণী। প্রভাত-সূর্যের রঙিন আলোকে আমি স্বর্ণরেণু বলে ভুল করেছি। যেমন স্বর্ণমৃগকে সীতা একদিন জীবন্ত মৃগ বলে ভুল করেছিল। স্বর্ণমৃগ মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। আর স্বর্ণআলো সোনা নয়, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীকে ভস্ম করার দাহ। ভুল আমি করিনি তো করল কে?

আমি হাসি। মুঠো-মুঠো সোনা-হীরে-জহরত দিয়েই বুঝি ওরা সার্থকতার ইমারত তৈরি করে। যা-কিছু স্থূল, যা-কিছু মানুষকে তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, যা-কিছু জৈবিক ভোগ-লালসার ক্লেদপঙ্কে মানুষকে ডুবিয়ে মারে, তাই ওদের অভিধানে সার্থকতা। বিলাস-ব্যসনের ক্রম-প্রক্ষিপ্ত, ক্রম-প্রসারিত দিগ্‌বলয় হিংসার কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন করেই ওরা সার্থকতার রাজপথে দৈত্য-দীঘল বিপর্যয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়ায়। জীবন-যুদ্ধের তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় অহমের বিস্ফোরণই ওদের সার্থকতার শেষ পরিচয়। দুর্বাশার সেই উদ্ধত ব্যক্তিত্ববোধ আজ ওদের সংস্কৃতির প্রতি লোমকূপে দুরারোগ্য ক্যানসারের সৃষ্টি করেছে। স্নেহই বল, প্রেমই বল, ভালবাসাই বল, সবই সেই দুষ্ট ব্যাধির শিকারমাত্র। তাই জীবনের ভস্মস্তূপের ওপর ওদের সার্থকতার স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে।

আমি জানি, ওদের বিচারে আমার দণ্ড ভয়ঙ্কর। যে নারী স্বৈরচারিণী তাকে সমাজ ক্ষমা করবে না। দণ্ড দেওয়ার অধিকার ওদের রয়েছে। শাস্ত্র, প্রথা, লোকধর্ম, আর অনুশাসন, সবই ওদের কণ্ঠস্থ। সংসারে নারীর কর্তব্য নিয়ে ওরা বহু প্রবন্ধ লিখেছে, বহু পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে। সে সমস্ত আমি জানিও না, বুঝিও না। এইটুকু জানি যে, নারীর হৃদয় নিয়ে ওরা চিরকালই ফাটকা বাজারের খেল দেখিয়েছে। সেখানে নারী যদি বা থাকে, নারীত্ব নেই।

কথাটি আমিও যেমন জানি, ওরাও ঠিক তেমনি জানে। আর জানে বলেই ওরা আমার নারীত্বকে রেফ্রিজারেটরের হিমগর্ভে বন্দী করে রেখেছে, সংস্কারের দম্ভে আমার মনুষ্যত্বকে বলি দিয়েছে।

কিন্তু আমার কাছে ঐ দুটোই যে বড়। নারীত্ব আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, মনুষ্যত্ব শিখিয়েছে ভাল-বাসাকে আবিষ্কার করতে। অথচ যারা আমার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করল না, নারীত্বের অধিকার তাদের কেমন করে বোঝাব? ওরা না বোঝে, না বুঝুক, আমি তোমাকে অস্বীকার করতে পারিনি।

কী করে অস্বীকার করি বল? সংসার যার সঙ্গে আমাকে সাতপাকে জড়িয়ে দিল সেই হ'ল আমার আসল মানুষ, আর যার সঙ্গে শত-সহস্র পাকের বাঁধন,যাকে লাখ-লাখ যুগ বুকের মধ্যে রাখলেও তৃপ্তি নেই, সেই হল বাহুত, অবান্তর, অর্থহীন। তাই যদি হবে, তাহলে সেই সমাজ-স্বীকৃত মানুষটির

সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কেন? সে তো আমার যৌবন-বনে মদমত্ত হাতির মত ঘুরে বেড়িয়েছে, আমার সমস্ত শত-দলকে ছিন্নভিন্ন করেছে, তছনছ করেছে আমার সাজানো বাগানকে। আমার নন্দনতাকে বুভুক্ষুর মত গো-গ্রাসে গ্রাস করেছে। তবু তার ক্ষুধা মেটেনি, তবু তার তৃষ্ণা বহমান।

কিন্তু তুমি? তুমি শুধু দিয়েছ। নাওনি কিছু। সমস্ত উজাড় করে দিতে গিয়েছি তোমাকে; তুমি কেবল একটু হেসেছ। তোমার দিকে চেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি বারবার। অতুল তোমার বিভব, রাজ-রাজেশ্বর তুমি। আমি দীনা। তোমার অকৃপণ প্রাচুর্যের দ্বারে আমার সমস্ত সত্তা দীন ভিখারীর মত লজ্জায় মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে থাকে। তোমাকে আমি কী দেব? তোমাকে কিছু দেওয়ার স্পর্ধা কেন আমার!

শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তখন আমার চোখে উষার রক্তমদিরা। প্রভাত সূর্যের রঙিন আবেশে মাতোয়ারা; আমার মনের আনাচে-কানাচে অজানা শিহরণের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। শৈশবের অনু-সন্ধিৎসায় যার দিকে প্রথম তাকালাম তাকে আমি কোনমতেই আপনার জন বলে ভাবতে পারিনি। বরং কিছুটা সংশয়, কিছু বিস্ময়, আর কিছু ভয় সেদিন আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল।

পুজোর ছুটিতে গ্রামে এসেছিলাম বেড়াতে। বাড়ীর পাশেই রূপনারায়ণ। ভরা নদীর কূলভরা জল অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে। একপাশে তার অবারিত মাঠ ধানের অরণ্যে ডুবে গিয়েছে। আর এক পাশে শ্যামলতার রঙে ছোপান দিক-চক্রবাল। অপরূপ সে দৃশ্য। নৌকো চলেছে তর-তর করে। জাল ফেলে অজস্র জেলে-ডিঙ্গি মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে। নদীর বুকে অজস্র পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিল, বক, কাদাখোঁচা, মাছরাঙা, চক্রবাক, আর পানকৌড়ির দল।

রূপনারায়ণই ছিল আমার শৈশবের বিভীষিকা, কৈশোরের স্বপ্ন। এরই কূলে কূলে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কোন রকম আড়ম্বর ছিল না তোমার, ছিল না কোন চটক। তোমার চোখের দৃষ্টিতে ত্র্যম্বকের তৃতীয় নয়নের কোন দাহ ছিল না, ছিল পূর্ণিমার রক্তবিভা। একটি অতি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের লীলায় রূপনারায়ণের কূলে কূলে রাখালের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে তুমি।

তোমার দিকেই চেয়েছিলাম। হঠাৎ কখন অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে গেল। ওপরের দিগ্বলয় অতিক্রম করে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ছুটে এল বিভীষিকার জোয়ার। রাশি রাশি, কালো-কালো সীমান্তহারা হাজার-হাজার অন্ধকারের ঢেউ। তাল-গোল পাকিয়ে, তারা যেন আমাকে গ্রাস করার জন্যে দৌড়ে এল।

চারপাশে চেয়ে দেখলাম। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, ওপর-নীচে, চার-পাশ থেকেই লাখ-লাখ দৈত্য-শিশুরা আমাকে নিঃশব্দে গ্রাস করার অদম্য উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছে। আমার চোখের আলোও কখন নিভে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। কেবল রূপনারায়ণের বোটের ওপর একটা লাল আলো সেই অতলন্ত অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ এক ক্ষতের মত দগদগ করছে যেন।

হঠাৎ ভয়ের একটি তীব্র শিহরণ আমাকে কাঁপিয়ে দিলে। না, পৃথিবীতে আলো নেই, বাতাস নেই, দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় মাটিও বুঝি নেই। কান পেতে রইলাম। কোনদিকে কোন শব্দ পর্যন্ত নেই।

হ্যাঁ, রয়েছে। সেই অন্ধকারের নিতল গহ্বর থেকে রূপনারায়ণেরই বোবা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—পালাও, পালাও।

সেদিন আর কিছু চিন্তা করার মত শক্তি ছিল না বলেই, এক ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম বাড়ীতে। সামনে দিদিকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর; ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে আমি তখন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন : কী হয়েছে তোর?

আমি নির্বাক। কেবল দিদিকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিদি বললে : নদীর ধারে বেড়াতে গেছল; ভয় পেয়েছে বোধ হয়।

বাবা আমাকে ধমকে বললেন : কত-বার তোকে বারণ করেছি, নদীর ধারে যাবি নে একলা। একদিন সাপে-খোপে কাটলে তখন বুঝবে; আর নয়ত শেয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে। কী হয়েছে বল!

ভীরু দুটি চোখ তুলে বললাম : ওরা তাড়া করেছে, বাবা।

কারা?

ঐ ওরা।

আবার ধমক এল বাবার কাছ থেকে : তুই পাগল না কি রে? কারা বলবি তো?

চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন : আজকাল এদিকটায় বড় চোর-বদমাইসের বাড়াবাড়ি হয়েছে। মুন্সী, বন্দুক নিয়ে আয়।

রাগলে বাবার খেয়াল থাকে না। তাই তাড়াতাড়ি বললাম : চোর নয় বাবা, অন্ধকার।

খিল খিল করে হেসে উঠল দিদি। বাবার প্রতাপ নরম হয়ে গেল। তিনি আমার দিকে একটু চেয়ে বললেন : তোর মাথা যে খারাপ তা আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। আর কখনও ওপাশে একলা যাবি নে, বুঝেছিস!

আমার জীবনে সেই প্রথম সংশয়। তারপর বেশ কটা বছরের ব্যবধান। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ চষে বেড়িয়েছি, হোটেল-রেস্তোরাঁ-পিকনিকে দাপাদাপি করেছি। অনেক আলো, অন্ধকার দেখেছি। কিন্তু সেদিন রূপনারায়ণের কূলে যে অন্ধকার দেখেছিলাম তাকে কোনদিন ভুলতে পারিনি। আমার স্পর্শকাতর মনটিকে সে যেমন করে সেদিন নাড়া দিয়েছিল তেমনটি আর কেউ দেয়নি। আর তারই পটভূমিতে যে কিশোরটিকে দেখেছিলাম, তাকেই বা ভুলতে পারলাম কই? আমার শয়নে-স্বপনে, বিলাসে-ব্যসনে, আমার উদ্দাম কর্মমুখর দিনরাত্রির মাঝে হঠাৎ কখন-কখন সে হাতছানি দিয়ে চলে যায়। তাকে ধরতে পারিনে; অথচ তাকে একেবারে অস্বীকার করারই বা সাধ্য কোথায় আমার?

সেবার আবার সেই গ্রামে হাজির হলাম। আমি, দিদি, বাবা। সেই রূপ-নারায়ণ, আর তার জলের আবর্ত। সেই দূরের বৃদ্ধ বট, আর যুবতী বনঝাউ। সেই অসংখ্য গেঁয়ো পাখি-পাখালির অশ্রান্ত কোলাহল। আর বিপুল মাঠের বুকে দিগন্ত-প্রসারি শূন্যতার আর্তনাদ।

এবারে আর শিশু নয়, কিশোরী। এবারে আর অনুভূতি নয়, বুদ্ধি আর

বিচারের মাপকাঠি দিয়ে সব কিছু যাচাই করার প্রবৃত্তি। অনাগত যৌবনের দুঃসাহস আমার রক্তের প্রতিটি কণিকায়।

সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই আলো, সেই অন্ধকার। এরা কেউ অপরিচিত নয় আমার কাছে, কেউ পরদেশী আগন্তুক নয়। এদের ভিতর দিয়েই ঘুরে বেড়াই, কাশ আর বেনা-বনের ধারে ধারে, অশথ, বট, আর পিপুল গাছের ছায়ায় ছায়ায়। সবই রয়েছে সেই আগের মত। শুধু তুমি নেই। সেই পাঁচ বছর আগেকার তরুণ কিশোরটিকে যে তখনও ঠিক তেমনি করেই মনে ছিল এ কথা সত্য নয়; তবু যে কিছু একটা ছিল, আজ তা নেই, এই অভাববোধটিই মাঝে-মাঝে আমাকে বিমনা করে তুলত।

অথচ বিশ্বাস কর, সে আমার সখের অভাব। ছেলেবেলায় যেমন সখের শিবঠাকুর গড়তাম, পুতুলকে ছেলে-মেয়ে সাজিয়ে ঘুম পাড়াতাম, এ-ও অনেকটা তেমনি। কিন্তু কেমন করে জানব যে সেই সখই আমার জীবনে এমন চরম সত্য হয়ে দাঁড়াবে?

সেদিন হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আমার ঘুমে-জড়ানো চোখ দুটি চেয়ে রইল বাইরের বিপুল পৃথিবীর দিকে। সে এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। আকাশ ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। আলোতে তার ভরে গিয়েছে চারপাশ। নদীর জলের ওপর চিকন রূপালি ঢেউ। ওপাশের বনঝাউ আর দেওদারের মাথায় হাল্কা হাওয়ার আলোড়ন।

সজাগ হয়ে উঠলাম। মনে হল এই নিদ্রিত সুখসুপ্ত পৃথিবীতে, দ্যুতিমান আকাশের নীচে বিস্তৃত কোন এলাকা জুড়ে যেন একটি সংগীতের আসর জমে উঠেছে। একটি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বান দিগ্‌দিগন্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনন্ত বিরহের সৃষ্টি করেছে। স্থির হয়ে রইলাম। কিন্তু কই, কানের তন্ত্রীতে তো তার ঝঙ্কার নেই। তবু হৃদয়ের গভীরতম তারে তারই আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছে কেন?

সেই আবেদনটিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার জন্যেই বোধ হয় জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল তোমার ওপর। প্রথমে তোমাকে বুঝতে পারিনি। মনে হল পাঁচ বছর আগেকার কোন একটি কিশোরের শিল্যেট যেন দীর্ঘ অন্ধকার ভেদ করে ধীরে ধীরে আলোর রাজ্যে মূর্তিমান হয়ে উঠছে।

বিশ্বাস কর, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। আর আমার সেই বিস্মিত অনুভূতির সামনে তুমি ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করলে। শিউরে উঠলাম। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, এতদিন ধরে যেন তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়?

এই অভিযোগ যেন আমার দৃষ্টির ভিতরেই লুকিয়েছিল, আর তুমিও তা বুঝতে পারলে। পেরেই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

কি লজ্জা? তোমারও কি এতটুকু সংকোচ নেই? কিশোরীর এই নিশীথ অভিসার কেউ বরদাস্ত করবে নাকি? আর যদিও বা করে, নিজের দিক থেকেও তো একটা বাধা থাকা উচিত। না, নিজেরও কোন মর্যাদাবোধ থাকবে না? তুমি ডাকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে? আমি কি একটা খেলনা?

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। পাশে আমার দিদি ঘুমোচ্ছে। ও-পাশের ঘরে বাবা। নিচের ঘরে চাকরের দল। সদর দরজা বন্ধ। ইচ্ছা হলেই কি এই কারাগার থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব? তুমি তো হাতছানি দিয়েই খালাস। আমি যাই কেমন করে?

ভীরু চোখে তোমার দিকে চেয়ে দেখলাম। তোমার চোখের তারায় হাসির বিদ্যুৎ। ভীষণ রাগ হ'ল তোমার ওপর। তুমিই না রাধাকে এইভাবে পাগল করে দিয়েছিলে? নিজেকে সব সময় দূরে সরিয়ে রেখে কিশোরীর হৃদয় নিয়ে এ কী খেলা খেলে চলেছ তুমি?

তারপর? কেমন করে, আর কখন যে আমার তরুণী-হৃদয়ের সমস্ত কিছু লোকলজ্জা, ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার কাছে হাজির হলাম তা একদিন হয়ত মনে ছিল, আজ আর কিছু নেই। তোমার বিরুদ্ধে আমার সহস্র অনুযোগে যারা এতক্ষণ সংগীণ উঁচিয়ে আমার চারপাশে পাহারা দিয়েছিল তারাও তোমার সান্নিধ্যে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। তুমি যেন সেই রাজার দুলাল। কতদিন যে তুমি আমার আঙিনার ওপর দিয়ে তোমার মুরলী বাজিয়ে চলে গিয়েছ, আমি বুঝতে পারিনি। অথচ তোমারই পায়ে আমার তরুণী-হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় উৎসর্গ করার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম আমি। কত দিন, কত যুগ!

আমার সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত তুমি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে যেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। জ্যোৎস্না রাতের সেই নিভৃত নদীতটে, বনতুলসী শালুকের বনে বনে, কেয়া-কদমের ছায়ায় ছায়ায়, কেতকী-হাসনাহানার গন্ধে, চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহ কূজনের অন্তরালে আমার প্রথম ভীরু অভিসার। একটি পরিপূর্ণ আনন্দের ভারে মিলনের উচ্ছ্বাস দুকূলহারা হয়ে আপনার তটরেখা অতিক্রম করে গেল।

কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছিল জানি নে, হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। সেই শান্ত সমাহিত নিশীথের স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে তাল-গোল পাকিয়ে উঠল কোলাহল। চোখ মেলে দেখি, তখনও পূবের শুকতারাটি আমার প্রথম বাসরের শেষ দীপ হয়ে জ্বলছে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। দিদি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বাবা বললেন ঃ ইস; এই সাপের রাজ্যে শ্মশানের পাশে পড়ে রয়েছিস তুই? লোকগুলো কোথায় গেল?

চারপাশে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম। প্রথম বাসর যাপনের ক্লান্তি তখনও নিটোল হয়ে বসেছিল আমার চোখের পাতায়। প্রিয় দয়িতের সঙ্গে একটি সুখরাত্রি যাপনের শিহরণ তখনও আমার শিরায় শিরায় প্রতি লোমকূপে সঞ্চরমাণ। তরুণী জীবনের সেই প্রথম প্রিয় অভিসার, আমার চির-জীবনের একটি অমূল্য সঞ্চয়।

গলার হার, হাতের চুড়ি, কিছুই খোয়া যায়নি। যতই তাদের বোঝাতে চাই, ওগো, চোর আসেনি, আমিই চুরি করে পালিয়ে এসেছি, ততই তারা দাপাদাপি করে। যতই বলি, ওগো, আমার এক মন ছাড়া কিছুই খোয়া যায়নি, ততই তারা হুংকার ছাড়ে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওরা আসল চোরটিকে খুঁজে পেল না। তাই ধাওয়া করল নকল চোরের পিছনে। থানা থেকে দারোগা এল। আজকাল যে একদল অসামাজিক প্রাণী কিশোর-কিশোরীদের মোহাচ্ছন্ন করে অজানা দেশে পাচার করে নিচ্ছে তার একটি লম্বা ফিরিস্তি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সকলের সামনে পেশ

করে দিলে, আর তার ঘ্রাণ আর দৃষ্টি-শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় মিত্র-বাড়ীর বাউন্ডুলে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল।

কিছু একটা করতে পেরেছেন এই ভেবে, আর সোনার গহনা কিছু খোয়া যায়নি দেখে, বাবা কিছুটা হাঁফ ছাড়লেন। তবে সাবধানের মার নেই। অতএব পাহারা বসল আমার চারপাশে।

দোতলার জানালার পাশে আমি সন্ধ্যে থেকে চুপটি করে বসে থাকতাম। আমার সমস্ত শরীর জুড়েই যেন একটি পরিবর্তনের ঢল নেমেছে। নিজেও বুঝি নে, অথচ দারুণ একটি অশান্তিতে যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলাম।

গভীর রাত্রে তোমার বাঁশী বেজে উঠত। ঘুমোতে-ঘুমোতে চমকে উঠতাম। বেরিয়ে আসতে চাইতাম ঘর থেকে। কিন্তু বেরোবার পথ নেই। চারিদিকে কড়া পাহারা। আবার ফিরে আসতাম জানালার ধারে। তুমি তখন দাঁড়িয়ে থাকতে, আর হাতছানি দিয়ে ডাকতে। আমি নিরুপায়ের আশাভঙ্গে সেইখানেই ফুঁপিয়ে উঠতাম।

ডাক্তার এলেন। বদ্যি এলেন। নাড়ী টিপলেন, পিঠ ঠুকলেন, চোখ দেখলেন। না, কোথায় রোগ! ও রোগ দেহের নয়, মনের।

শেষ পর্যন্ত ওঝার ডাক পড়ল। অনেক ভেবে-চিন্তে ওঝা তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করলেন: নিশিতে পেয়েছে। ঐ বটগাছের ডালে বিশ বছর আগে একটি তরুণী আত্ম-হত্যা করেছিল। জ্যোৎস্না রাতে তারই প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় এ-অঞ্চলে। অতএব ও দিকের ক-টা জানালা বন্ধ করে দাও।

ঝপ ঝপ করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। তোমাকে দেখার শেষ সুযোগটিও হারালাম আমি।

আবার আকাশ জুড়ে ঘন রাত নেমে এল। সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তুমিও এলে। আমি তোমার নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতে পেলাম। কিন্তু তোমাকে দেখার কোন উপায় ছিল না আমার।

দিন আর রাত্রির কণ্টক শয্যায় রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল আমার প্রাণ। মনে মনে তোমারই বিরুদ্ধে তোমার কাছেই নালিশ জানালাম। বললাম, হে নিষ্ঠুর, তুমি এই কারাপ্রাচীর ভেঙে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছ না কেন? তুমি কি কেবল কাঁদাতেই জান?

সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ তোমার ডাক এল। বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল। আকাশের তারায় তারায় প্রতিধ্বনি জাগল তার। ওঠ, জাগ; আর কতদিন প্রতীক্ষা করে থাকব তোমার?

ব্যাকুল সেই ডাক। তোমার এই ব্যাকুলতা আর কোনদিন কানে আসেনি আমার।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম: দিদি, দিদি!

কি রে মীনু?

শুনতে পাচ্ছ?

কী?

ঐ, ঐ শোন। আমাকে ডাকছে ও।

দিদির চোখে-মুখে আতঙ্ক: কে ডাকছে? এত রাত্রে আবার কে ডাকবে তোকে?

আমি আকুল হয়ে বললাম: সে কি? শুনতে পাচ্ছ না? তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও। মাত্র একটিবার দেখা দিয়েই চলে আসব।

বিছানা থেকে উঠে পড়তেই দিদি আমাকে ঝাপটে ধরে ফেলে বললে: ছিঃ মীনু, লক্ষ্মীটি। ও ঝড়ো বাতাস। কিছু নয়। তুই শুয়ে পড়।

বললাম: না গো না। ও রোজই আসে আর ফিরে যায়। তুমিও তো ভাল-বেসেছ দিদি। আমাকে তুমি একটিবার ছেড়ে দাও।

দিদিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে কপাটের গায়ে ধাক্কা মারলাম। খুলল না দরজা। তারপর একটার পর একটা ধাক্কা। বাবা উঠলেন, চাকররা দৌড়ে এল।

আমি তখন মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে পাগলের মত কাঁদছি। লজ্জা, শরম, ভয়, কিছু নেই। থাকবে কেমন করে? মানুষ যখন শেষ পরিখায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে তখন তার জীবনবোধই বুঝি অপরের জীবন নিতে এগিয়ে দেয়।

পরের দিনই আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর আর তোমাকে খুঁজে পাইনি। কলকাতার বিরাট জনারণ্য আর ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে তুমি নিজেকে বুঝি চির-নির্বাসন দিয়েছিলে।

তুমি তো নির্বাসন দিলে নিজেকে। কিন্তু আমি? আমার সেই রুদ্ধ-কারার দিনগুলি কী অসহনীয় ব্যথায় গুটি গুটি এগিয়ে চলেছিল জানতে কি? এখানে বান ডাকে না রূপনারায়ণের, আকাশ জুড়ে অন্ধকার নামে না। এখানে জ্যোৎস্নার বুকে চিতা জ্বালিয়েছে কর্পোরেশনের আলো। এখানে বন-তুলসী-কেয়াকদমের বালাই নেই, নেই চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহ-কূজন।

তবু যেদিন সন্ধ্যায় উতরোল বৃষ্টির গন্ধে আকাশের বুকে জলভরা মেঘেরা উদ্দাম হয়ে উঠত, তখন যেন মনে হত আমি একা। এই বিপুল বিশ্বে আমার অন্তর শূন্য। তখনই মনে হত, তুমি যেন কুবেরের অভিশাপে নির্বাসিত যক্ষ, বেদনার অগ্নিগর্ভে সুদূর রামগিরি পাহাড়ে বর্ষযাপন করছ। আর তোমারই দূত হয়ে আকাশের ঘন মেঘ বহু জন-পদ অতিক্রম করে আমার দ্বারে উপ-স্থিত। আমি আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকতাম তার দিকে।

এই ভাবে চলত কতদিন কে জানে, হঠাৎ একটি ব্যতিক্রম ঘটল। দিদি ভাল-বাসার টানে ঘর ছাড়লে। অথবা, বাবা তাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করলেন। এর স্বপক্ষে বাবার যুক্তি নাকি অকাট্য। দিদির ওপর বাবার অনেকটা আশা ছিল। স্নেহ বল, সুযোগ বল, স্বাধীনতা বল, কোন দিক থেকেই দিদিকে বঞ্চিত করেননি তিনি। বাবা প্রায়ই গর্ব কর-তেন, তাঁর মত নিস্বার্থ স্নেহ এযুগে দুর্লভ। তাঁর স্নেহের ভাণ্ডারে ক্ষুদ্রতার মূষিক ঢুকতে পারবে না কোনদিন।

কিন্তু দিদি হঠাৎ বুঝতে পেরে-ছিল, এবং আমিও আজ পেরেছি, যে বাবার পর্বত-স্নেহ সেদিন মূষিককে ধরাশস্ত না করলেও, তার মূষিক প্রসব করতে দ্বিধা হয়নি। তাই যদি না হবে তাহলে দিদিকে তিনি পরিত্যাগ করলেন কেন? দিদি ভালবেসে বিয়ে করেছিল। যাকে বিয়ে করেছিল তার পয়সা ছিল না। আর লোহার ব্যবসায়ী বাবার কাছে মানুষের চেয়ে লোহার দামটাই ছিল বেশী। অতএব বাবার পিতৃস্নেহের রাজ-সিংহাসন থেকে দিদি নির্বাসিতা হল। তবু এতদিন যে-স্নেহকে তিনি সুদুর্লভ বলে প্রচার করে এসেছিলেন সেই স্নেহের লিপ্সা দেখে তাঁর পিতৃত্বের দম্ভ লজ্জা পেয়েছিল কি না জানিনে, তবে মনুষ্যত্ব যে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে

স্বকীয় মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল এতেই আমি খুশী।

দিদির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের যূপ-কাষ্ঠে আমার বলি হল।

মস্তবড় ব্যাঙ্কার সমীরণ দত্ত। তাঁর হাতিও ছিল না, ঘোড়াও ছিল না। ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা, আর গাদা গাদা চাকর। তাঁরই ছেলে নবারুণকে বাবার প্রথম জামাই করার ইচ্ছা বহুদিনের। দিদির বদখেয়ালে বাবার মাথা হেঁট হল, আর তাই তিনি পুষিয়ে নিলেন আমার সংগে নবারুণের বিয়ে দিয়ে।

নবারুণের জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারীর কোন দোষ নেই। যে-কোন মেয়েকেই বিয়ে করে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর বাঁধতে পারত। তার অর্থ ছিল, প্রাণ ছিল, স্বাচ্ছল্য ছিল, পরিচয় ছিল। তবু সে আমাকে বুঝল না।

প্রথম রাত্রে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আজকের এই আনন্দের দিনে তোমার চোখে জল কেন মীনু?

বললাম ঃ ও তুমি বুঝবে না।

প্রথম মিলনের রাত্রে কোন স্বামীই স্ত্রীর কাছে এ-উত্তর আশা করে না। নবারুণও হয়ত তা আশা করেনি। কিন্তু আমি কেন তাকে সব কথা খুলে বলতে পারলাম না? কেন তাকে বলতে পারলাম না, আমি প্রোষিতভর্তৃকা। আমাকে তুমি ভালবেস না। প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিতে আমি অক্ষম।

কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাই লক্ষ্য করলে আমি কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি। আবার ডাক্তার, বদ্যি, হাতুড়ে।

বাবা বললেন ঃ ডাক্তার-বদ্যি থাক, নবারুণ, একটু হাওয়া পরিবর্তন করে এস।

হয়ত হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল আমার। সত্যিই বড় হাঁপিয়ে উঠে-ছিলাম।

ঘাটশীলায় এলাম হাওয়া পরিবর্তন করতে। সংগে এল আমার দেওর রণেন। আমারই সমবয়সী। সকলের মধ্যে সেই হয়ত একটু বুঝত আমাকে।

রণেন বললে ঃ বৌদি, এবার তোমার মুক্তি।

হেসে বললাম ঃ তাই যদি হয়।

নবারুণ আমাদের বাধা দেয়নি; বরং রণেনের ওপর ঢালোয়া আদেশ দিয়েছিল আমাকে নিয়ে ঘুরতে।

আমিই অভিযোগ করেছিলাম ঃ তুমিও চল।

নবারুণ হেসে বলেছিল ঃ মাপ কর। তোমার ঐ পাহাড়-পর্বত-নদী-নালা আমার ধাতে সইবে না। রণেনকেই সংগে নাও। ও আজকাল কবিতা লিখছে, খোরাক পাবে ভাল।

রণেনও সায় দিয়ে বললে ঃ থাক বৌদি। যে লোকটা ব্যালান্স শীট ছাড়া জীবনে আর কিছুই বুঝল না, তাকে পাহাড়ের ভাষা কী শোনাবে! ও মেহ-নতে কাজ নেই। তার চেয়ে চল, আমরাই বেরিয়ে পড়ি।

যাবার সময় অবশ্য নবারুণ সংগী হল। ঘাটশিলায় এলাম।

তারপর কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল। হঠাৎ একদিন তোমার ডাক এল আবার। শিউরে উঠলাম। যে-ডাক এত-দিন প্রায় ভুলেই গেছলাম, সেই ডাক। যেন যুগ যুগ প্রতীক্ষার পর হৃদয়ের বেদনানির্যাসে মাখানো এই ডাক।

লজ্জায় মরে গেলাম। ছিঃ ছিঃ, এত-দিন তোমাকে ভুলে ছিলাম কেমন করে?

গভীর নিশুতি রাত্রে আবার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার পাশে দিকচক্রবাল পর্যন্ত জ্যোৎস্না তার রুপোলি আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে। তারই মাঝখানে তুমি। তিন বছর আগে রূপ-নারায়ণের কূলে যাকে প্রথম পেয়ে হারিয়েছিলাম।

তোমার শরীরে ক্লান্তি, চোখে-মুখে পথ চলার অবসাদ। অনেক পথ অতিক্রম করে, অনেক প্রতীক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে আবার তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাকে আমি ফেরাব কেমন করে?

আমার পাশে নবারুণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তুমি আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলে আমাকে। আমার বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হওনি তুমি। আমি যে তোমাকে ভুলে ছিলাম তার সব দায় আর দায়িত্ব যেন তোমার।

কাঁধে কার শীতল স্পর্শ। ফিরে চেয়ে দেখি নবারুণ।

তুমি?

নবারুণ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে—তুমি যে আমাকে প্রত্যাশা করনি জানি। কিন্তু স্ত্রী যার নিশীথ-বিহারিণী তাকে একটু সজাগ থাকতেই হয়। বাড়ী চল।

তার স্পর্শ রূঢ়, স্বর রূঢ়তর।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

তোমার ঐ বন্ধুটি কে?

চিনবে না তুমি?

না চেনাটাই উভয়ত ভাল।

তার পর নবারুণের সংগে আর কোন কথা হয়নি।

পরের দিন আবার বেরিয়ে এলাম। দরজার কাছে আসতেই রণেনের সংগে দেখা।

বললে ঃ চল বৌদি।

তুমি যাবে?

তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

না, না। এস।

দুজনেই বেরিয়ে গেলাম।

কিছু দূর যাওয়ার পর রণেন জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যাবে বলত?

ও যেখানে নিয়ে যাবে।

কে?

ঐ যে দাঁড়িয়ে।

চারপাশে চেয়ে রইল রণেন ঃ কেউ তো নেই।

বিরক্ত হয়ে বললাম ঃ নেই? ঐ যে দাঁড়িয়ে। আমাকে ডাকছে। তুমি যাও, যাও।

তুমি তখন ঐ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। মাথায় তোমার চাঁদের মুকুট। তোমার দেহের রূপালি দ্যুতিতে চার-পাশ ঝলসে উঠছে। তুমি দাঁড়িয়েছিলে তোমার সোনার রথে। কেবল আমার প্রতীক্ষায়, আমারই প্রতীক্ষায়।

আর কিছু মনে নেই। মনে হল দুপাশের পৃথিবীর সবকিছু সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। সামনের সহস্র বাধা প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে আমাকে। পিছনে রণেনের ব্যাকুল আর্তনাদ আমার গতিকে শ্লথ করতে পারেনি। প্রতি মুহূর্তে তোমার আমার দূরত্ব কমছে। অথবা তুমি তোমার হাত দুটি বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলে। তার-পর, কখন তুমি আমাকে রথে তুলে নিলে মনে নেই আমার। শুধু শুনলাম, তোমার জয়রথের চক্রনির্ঘোষ মেঘলোকে পাড়ি জমিয়েছে। কেবল তুমি, আর আমি। তোমার বুকে মাথা রেখে আমার প্রসুপ্তি।

* * *

আমাকে এরা আজ গারদে পুরেছে। আমি নাকি উন্মাদ! আমি হাসি। অথবা, এরাই ঠিক! উন্মাদ না হলে তোমাকে পাওয়ার যোগ্যতা আমার থাকত না।

আর কোন দুঃখ নেই। না তোমার, না আমার।

প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ দুটি প্রদর্শনী : কারু ও চারুশিল্প ॥

ডিসেম্বরের **প্রথম সপ্তাহে** ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে ও পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল কলকাতাবাসীর। অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের প্রদর্শনীটি ছিল কারুশিল্পের। পৃথিবী-বিখ্যাত মৃৎশিল্পী, মার্কিণী মহিলা শ্রীমতী বিয়াট্রিস উড কুড়ি বছরব্যাপী অক্লান্ত সাধনায় উজ্জ্বল মৃৎশিল্পের যে বিস্ময়কর সৃষ্টিতে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছেন, নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার আমন্ত্রণে সেই উজ্জ্বল মৃৎশিল্পের ৭৬টি মনোরম নিদর্শন নিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন হস্তশিল্প সংস্থার কলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় নক্সা কেন্দ্র। আর, আর্টিস্ট্রি হাউসের প্রদর্শনীটি ছিল চারুশিল্পের। তরুণ শিল্পী রামনারায়ণ চক্রবর্তীর এই **প্রথম একক** প্রদর্শনীতে আমরা দেখেছি ২৫টি জল-রঙ ও ৩০টি তেল-রঙে অঙ্কিত সুন্দর চিত্র। স্টুডিও গ্রুপের এই তরুণতম শিল্পী নিজে পেশা হিসেবে ফলিতশিল্পের কাজ গ্রহণ করলেও চারু-চিত্র অঙ্কনে যে শক্তি ও শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠেছি। এবারে একে একে এই দুই শিল্পের শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থিত করছি।

॥ শ্রীমতী উডের উজ্জ্বল মৃৎশিল্প ॥

শ্রীমতী বিয়াট্রিস উড এই প্রদর্শনীতে উজ্জ্বল মৃৎশিল্পের যে নমুনা উপস্থিত করেছেন সেগুলি উপকরণমূল্যের দিক থেকে হয়তো খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না, কিন্তু শিল্পমূল্যের বিচারে তা যে কোনো রস-পিপাসু মনকে আনন্দ দেবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত মৃৎশিল্পের সুনিপুণ ঐতিহ্যের সঙ্গে শ্রীমতী উডের গভীর একাত্মতার ফসল যেন এগুলি। প্রদর্শিত মৃৎপাত্রগুলির সর্বাঙ্গে এমন এক কারুকৃতিত্ব ফুটে উঠেছে যা না দেখলে সত্যি বিশ্বাস করা যায় না। এর কোনটির গঠনে আদিম শিল্প-চেতনার স্পষ্ট চিহ্ন, আবার কোনটির আকৃতিতে আধুনিক বিমূর্ত শিল্প-চেতনার আভাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই আকৃতি সৃষ্টি করার জন্য শ্রীমতী উড কোনো ছাঁচের সাহায্য গ্রহণ করেননি। আবহমানকাল ধরে কুম্ভকারেরা যে চাকায় মৃৎপাত্র সৃষ্টি করেছে শ্রীমতী উড-ও সেই চাকাতেই রূপ দিয়েছেন এইসব আকৃতি। পাত্রগুলিকে উজ্জ্বলতা দান করার জন্য তিনি এমন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন যা তাঁর একান্ত নিজস্ব উদ্ভাবন ক্ষমতার পরিচায়ক। আর অধিকাংশ পাত্র নিম্ন তাপে পোড়ানো, ফলে উজ্জ্বল রঙগুলি থেকে বুদ্বুদ উঠে পাত্রগুলির অঙ্গ জুড়ে মূর্ত হয়েছে অমসৃণ অথচ সুন্দর এক শিল্পরূপ। মনে হবে, এগুলি যেন কোনো মূল্যবান প্রস্তরের বুকে অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন শিল্পী। শ্রীমতী উডের এই সৃষ্টি তাই দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে ধ্রুপদী শিল্পের সম্মান অর্জন

সবুজবন (৫) রামনারায়ণ চক্রবর্তী
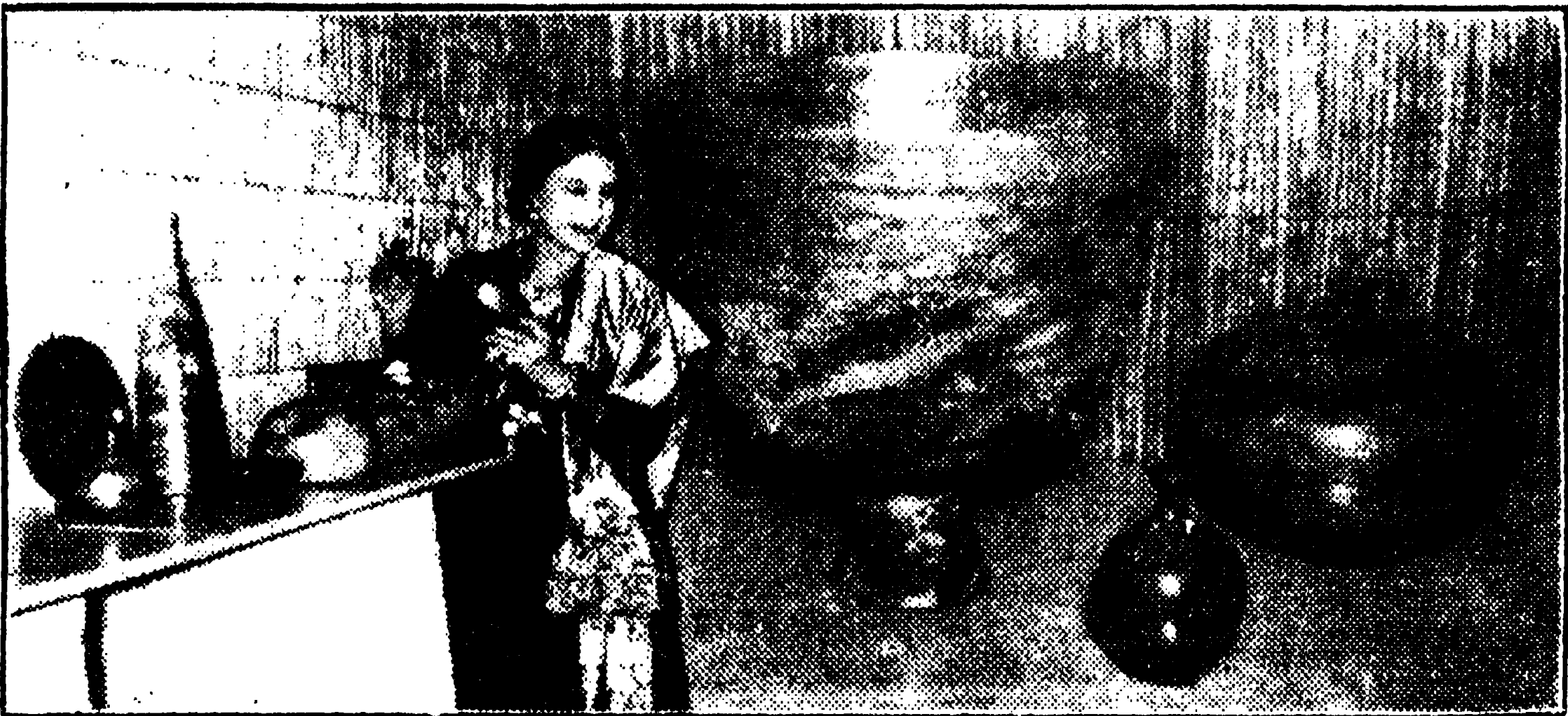
আকাদেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে উজ্জ্বল মৃৎশিল্পের প্রদর্শনীতে মার্কিন শিল্পী শ্রীমতী বিয়েট্রিস উড।

করেছে। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ একবাক্যে স্বীকার করেছেন শিল্পীর এই কৃতিত্ব। আমরাও শ্রীমতী উডকে উজ্জ্বল মৃৎশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুনেছি, শ্রীমতী উড কুড়ি বছর-ব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ৪০০ শত ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন। এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে মৃৎপাত্রে নাকি উজ্জ্বলতার শত সহস্র এফেক্ট সৃষ্টি করা সম্ভব। এই প্রদর্শনীর নিদর্শনগুলি দেখে কথাটা আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা উজ্জ্বল মৃৎপাত্র পুনরুজ্জীবনের জন্য শ্রীমতী উডের নিকট থেকে যদি তাঁর ফর্মুলার অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ করে এ দেশের কাজে লাগাতে পারেন তবেই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সফল হবে। না হলে, এক শহর থেকে অন্য শহরে শ্রীমতী উডের প্রদর্শনী চালান করায় সাধারণ দর্শকেরা খুশী হতে পারে, আসল মৃৎ-শিল্পীর তাতে খুব লাভ হবে কি কিছু? কথাটা কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করে আমরা শ্রীমতী উডকে আবার অভিনন্দিত করছি।

॥ শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্তীর চিত্রকলা ॥

তরুণ শিল্পী রামনারায়ণ চক্রবর্তীর চিত্র-প্রদর্শনী আমাদের মুগ্ধ করেছে। এই প্রথম একক প্রদর্শনীতে তিনি যে শিল্প-সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। স্টুডিও গ্রুপের অন্যান্য শিল্পীর মত শ্রীচক্রবর্তীও তথাকথিত আধুনিক শিল্পকলার নামে শিল্প-বিকৃতিকে চরম সত্য বলে গ্রহণ করেননি। বরং আমাদের চেনা-জানার জগতকে, সাধারণ মানুষ আর প্রকৃতিকে তিনি তাঁর তরুণ শিল্প-দৃষ্টির সাহায্যে শিল্প-নৈপুণ্যে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আর, শিল্প সৃষ্টিতে তাঁর সততা ও আন্তরিকতার চিহ্ন এখানে প্রদর্শিত প্রায় প্রতিটি চিত্রেই পরিস্ফুট। একজন তরুণ শিল্পীর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

খচ্চর (৫২) রামনারায়ণ চক্রবর্তী

জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলি থেকে তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে শিল্পী অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য স্বীকার্য কিন্তু রং প্রয়োগে সর্বত্র একঘেঁয়েমী প্রাধান্য পেয়েছে। একই ম্লান বর্ণে প্রতিটি চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় দর্শক-মন খুব স্বাভাবিক কারণে খুশী হতে পারে না। বরং সেদিক থেকে তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয়ানুযায়ী বর্ণ-প্রলেপন খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

তবু জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে 'টেণ্টস' (১নং), 'গ্রীন উডস' (৫নং) 'আপ দি স্লোপ' (১৩নং), 'সানলিট অ্যাসে' (১৫নং) ও 'হামিদ' (১৭নং) আমার ভাল লেগেছে। এই চিত্রগুলির কম্পোজিশনে শিল্পীর দক্ষতা সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত।

তেল-রঙে অঙ্কিত প্রায় প্রতিটি চিত্রই শিল্পীর পরিমিতিবোধ, রঙ প্রয়োগের দক্ষতা ও আশ্চর্য সংস্থাপনের গুণে আমাদের মনোহরণে সক্ষম। 'রিলাক্সিং'চিত্রে (২৬নং) অবসর-বিনোদনে রত মানুষগুলোর এলোমেলো ভাব চমৎকার ফুটেছে। 'আণ্ডার দি ব্রিজ' (২৭নং) চিত্রের সংস্থাপন, অনুচ্চ ও উচ্চ রঙের বৈপরীত্য—উপরের সেতু, নীচের গোরু ও সেতুর ফাঁক দিয়ে দূরের বাড়ীঘরগুলিকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে। 'গার্ল রিডিং' (২৮নং), 'এজ' (২৯নং) ও 'মেমোরিজ' (৩০নং) প্রতিকৃতি চিত্রগুলি শিল্পীর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। নিঃসর্গচিত্রের মধ্যে কুলু ও পার্বত্য দৃশ্যের চিত্র দুটি নিঃসন্দেহে সুন্দর। 'শিয়ালদা ষ্টেশন' (৩৭নং) চিত্রটিতে রাত্রির আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ, লাল আর ঈষৎ হলদে উদ্ভাসিত প্লাটফর্ম, মানুষজন—লাল, কালো, হলদে ও রৌদ্র-রঙে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চিত্রখানির কম্পোজিশানও হয়েছে সুন্দর। 'নাইট ওভার ক্যালকাটা' চিত্রখানিতে কালো রঙের প্রাধান্য আর একটু কম থাকলে সুন্দর চিত্র হতে পারতো। এই প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে 'রেলওয়ে সাইডিং' (৪৩নং) বোধ হয় সকলকে আনন্দ দিয়েছে। রেললাইন, রক্তচক্ষু ইঞ্জিন, গুমটি, বৈদ্যুতিক থাম, আলো—সব মিলে এই চিত্রে যে-রূপ উদ্ভাসিত তা যে কোনো দক্ষ শিল্পীর চিত্রকলার সংগেই তুলনীয়। অথচ তরুণ শিল্পী আশ্চর্য দক্ষতায় তাকে বিধৃত করেছেন।

আমরা এই প্রদর্শনী দেখে সত্যি খুশী হয়েছি। এই তরুণ শিল্পী বিপথ-গামী না হলে এঁর থেকে বাঙলা দেশ আরো সুন্দরতর চিত্র-সম্পদ উপহার পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে এঁর চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম।

দেশে বিদেশে

॥ মহান সংগ্রাম ॥

জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ একদিন **মহান সংগ্রাম** বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যে শিশুকে উপযুক্তভাবে পালনের শক্তি আমাদের নেই, শুধু স্বার্থপরতাবশে সেরূপ কয়টি শিশুর জন্মদান করা এক নিষ্ঠুর অপরাধ। তাতে সমগ্র পরিবারটির অবনতি ত ঘটেই শিশুদেরও অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়......যুগে যুগে অসংখ্য নির্দোষ শিশু অভাব ও অকাল মৃত্যুর হাতে পড়বে এ এক অসহনীয় অবিচার।' কিন্তু এই **'অবিচারই'** আজ সারা পৃথিবীতে বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৮৫০ থেকে ১৯৫০ এই একশ বছরে পৃথিবীর লোক ১১৭ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ২৪০ কোটি, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। তার সাত বছর বাদে, ১৯৫৭ সালে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাবমতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা আরও প্রায় চল্লিশ কোটি বেড়ে হয়েছে ২৭৯·৫ কোটি। অর্থাৎ এখন প্রতি বছরে পৃথিবীর লোক বাড়ছে প্রায় ছ' কোটি করে এবং কয়েক বছর বাদে এই জ্যামিতিক বৃদ্ধির হার আরও দ্রুত হবে। সুতরাং এই প্রবল জনোচ্ছাসের সম্মুখে ইতোমধ্যেই যদি কোন সর্বাত্মক বাধা না তোলা যায় তবে আগামী একশ বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা পাঁচশ' কোটি পেরিয়ে যাবে। ভারতে এখন লোকসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে ৩১২, যা চীনের চেয়েও প্রায় তিন গুণ বেশী। স্বভাবতই ভারতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এ সম্পর্কে প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ পালিত হল সারা দেশ জুড়ে।

কিন্তু পরিবার পরিকল্পনাকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সমস্যা বলে মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার, জীবনধারণের উন্নত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও পারিবারিক জীবনের স্থিতি ব্যতিরেকে পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য অবাস্তব চিন্তা। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারগুলির সন্তানস্বল্পতা এই যুক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ এ দেশের অধিকাংশ লোক আজও অশিক্ষিত এবং উন্নত জীবনমান সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের নেই। আর পারিবারিক জীবনে স্থিতির অভাব ত আমাদের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার নিতান্তই নিষ্ফল বলে মনে হয়।

॥ কর্তব্যের নির্দেশ ॥

মহীশূরের রাজ্যসরকার সরকারী কর্মচারীদের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো কর্মচারী তাঁর উপর নির্ভরশীল বাবা মার অযত্ন করেন তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পূর্বে অনুরূপ আরও একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে মহীশূর রাজ্যসরকার তার কর্মচারীদের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মাদ্রাজ রাজ্যসরকার ঘোষণা করেছেন, পঁয়ষট্টি বছরের বেশী বয়সের অবলম্বনহীন বৃদ্ধদের কুড়ি টাকা করে আমৃত্যু পেনশন দেওয়া হবে। অঙ্কের পরিমাণ বেশী না হলেও মাদ্রাজ রাজ্য-সরকারের এই সহানুভূতিশীলতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

॥ অবাঞ্ছিত বহিরাগত ॥

এতদিন পর্যন্ত কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির নাগরিকদের বৃটেনে যাওয়ার জন্যে কোন 'ভিসা'র প্রয়োজন হ'ত না। নিজের দেশের ছাড়পত্র পেলেই বৃটেনে প্রবেশ ও বসবাস করা যেত। কিন্তু বৃটিশ সরকার স্থির করেছেন, বাইরের লোকেদের এভাবে তাঁরা আর অবাধে বৃটেনে প্রবেশের অনুমতি দেবেন না। ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে আনীত বিল কমন হাউসে দুবার পাশ হয়ে লর্ডস হাউসে চলে গেছে, সেখানে অনুমোদিত হলেই বিল আইনে পরিণত হবে।

কিন্তু বহিরাগতদের উপর বৃটেন কতখানি নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ লর্ডস সভায় পেশ করেছেন প্রাক্তন চিকিৎসক লর্ড ইভান্স। তিনি বলেছেন, বহিরাগত ৩৬ শত চিকিৎসকের সেবা থেকে বৃটেনের হাসপাতালগুলি বঞ্চিত হলে এখনই বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ভেঙে পড়বে। হাসপাতালগুলির চতুর্থাংশ চিকিৎসক বহিরাগত, এবং জরুরী শল্য চিকিৎসার অর্ধেক করানো হয় তাদের দিয়ে। লর্ড ইভান্স বলেন, এই থেকেই বোঝা যাবে, বহিরাগতদের উপর বৃটেন কতখানি নির্ভরশীল। তিনি বলেছেন, সর্বাধিক সংখ্যক চিকিৎসক আসেন ভারত ও পাকিস্থান থেকে। এছাড়াও আসেন ইজিপ্ট, ইস্রায়েল, আফ্রিকা, মাল্টা, পর্তুগাল, তুরস্ক, চীন, গ্রীস ও সিংহল থেকে।

॥ অতিবৃদ্ধি ॥

ভারতের গোয়ামুক্তি অভিযানের প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদে যারা প্রস্তাব এনেছিল বৃটেন ছিল তাদের অন্যতম। নিজে এত বড় ভারত ছেড়ে চলে গেলেও পর্তুগীজ ছিটতালুকক'টির জন্যে তাকে চোখের জল ফেলতেই হয়েছিল, কারণ পর্তুগাল তার 'নাটো' জোটের সাঙাত। তাছাড়া এ প্রতিবাদ যদি বৃটেন না জানাত তবে জিব্রাল্টারের ওপর স্পেনের, এডেনের ওপর আরবের বা হংকঙের ওপর চীনের দাবী ন্যায়সঙ্গত একথা তাকে মেনে নিতে হত। তাই নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে বৃটেনকে গোয়া অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হয়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘে। কিন্তু পর্তুগালের মন তাতে ভোলেনি, ধূর্ত বৃটেনের চোখের জল যে লোক-দেখানো তা সে বুঝেছে। তাই লিসবনের পথে পথে আজ ভারতের চেয়েও বেশী বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে কপট মিত্র বৃটেনের বিরুদ্ধে। ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে, 'নাটো'র মুণ্ডপাত করে পর্তুগালের বিক্ষোভকারীরা দাবী তুলেছে বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের।

এইটাই স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কূট রাজনীতি বিংশ শতাব্দীর সজাগ পৃথিবীতে যে সম্পূর্ণ অচল, অতিবৃদ্ধি বৃটেনের এ উপলব্ধি যতদিন না হবে ততদিন এই রকম অপদস্থ তাকে বারবার হতে হ'বে।

॥ রেকর্ড ব্রেক ॥

একটানা ১০৮১ দিন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী থেকে মঃ দেব্রে ফ্রান্সের রাষ্ট্রজীবনে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। ইতিপূর্বে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মঃ ওয়াল্ডেক রুশোর প্রধানমন্ত্রিত্বই দীর্ঘতম ছিল। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের শাসন দায়িত্ব জেনারেল দ্য গলের হস্তে অর্পিত হওয়ার আগে তৃতীয় রিপাবলিকের সমাপ্তি পর্যন্ত প'চাত্তর বছরে ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়েছিল ১১০ বার এবং সেই মন্ত্রিসভাগুলির গড়পরতা আয়ু ছিল দশ মাস। দ্য গল ক্ষণভঙ্গুর তৃতীয় রিপাবলিকের সংবিধান বাতিল করে চতুর্থ রিপাবলিক কায়েম করেন প্রায় তিন বছর আগে। মঃ দেব্রে এই চতুর্থ রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী এবং এখনও পর্যন্ত তিনি স্বপদে বহাল আছেন। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক জীবনে এ ঘটনা অভিনব। ফরাসী শাসনযন্ত্রের এই অপরিবর্তন স্থায়িত্বই বোধহয় দ্য গল শাসনের শ্রেষ্ঠ অবদান।

ঘটনাপ্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২১শে ডিসেম্বর—৫ই পৌষ : 'পৃথিবী হইতে উপনিবেশবাদ নির্মূল হওয়ার দিন সমাগত'—কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভের ভাষণ।

মুক্ত গোয়ায় আবার স্বাভাবিক প্রাণ-চাঞ্চল্য—দমন ও দিউতেও নিয়মিত প্রশাসন কার্য সুরু।

দিল্লীতে প্রবল শৈত্য ও ঘন কুয়াসা—বিমান, ট্রেন ও মোটর চলাচল ব্যাহত—কলিকাতা মহানগরীতেও প্রচন্ড শীত।

২২শে ডিসেম্বর—৬ই পৌষ : যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের সহিত গোয়া, দমন, দিউ'র অন্তর্ভুক্তির উদ্যম— ভারত সরকার কর্তৃক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘোষণা।

'বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন'—কলিকাতায় প্রাদেশিক মধ্যবিত্ত সম্মেলনে প্রাক্তন বিচারপতি ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ।

২৩শে ডিসেম্বর—৭ই পৌষ : জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনে (কলিকাতা) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তত্রিংশতিম অধিবেশনের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। মূল সভাপতি : কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

গোয়ার প্রশ্নে ইঙ্গ-মার্কিণ মনোভাবে শ্রীনেহরুর ক্ষোভ প্রকাশ—বোলপুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য।

২৪শে ডিসেম্বর—৮ই পৌষ : 'দেশবাসীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলাই শিক্ষার সার্থকতা'—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সমাবর্তন ভাষণ। সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) দাবী—নূতন ও পুরাতনের সমন্বয়ে মহিমাময় ভারত গড়িয়া উঠুক।

'ভাষা সমস্যার সমাধান না হইলে কাছাড়ে পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে'—কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৫শে ডিসেম্বর—৯ই পৌষ : প্রবীণ বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (৮২) জীবনদীপ নির্বাণ।

উত্তর প্রদেশ ও বিহারে শৈত্য-প্রবাহে এ যাবত প্রায় দুই শত লোকের মৃত্যু।

২৬শে ডিসেম্বর—১০ই পৌষ : মহাভারতের অনুবাদক প্রখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশের (৮৬) জীবনাবসান।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রদের তিনটি ভাষা শিক্ষার সুপারিশ—জাতীয় ভাবগত ঐক্য কমিটির (ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের নেতৃত্বে গঠিত) রিপোর্ট পেশ।

২৭শে ডিসেম্বর—১১ই পৌষ : 'গোয়া অভিযানে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন হয় নাই'—লালকেল্লায় রুশ রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান—ভারত সভা হলের (কলিকাতা) সমাবেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

॥ বাইরে ॥

২১শে ডিসেম্বর—৫ই পৌষ : গোয়ার মুক্তি অর্জনে ভারতের কর্মনীতি ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক সমর্থন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট প্রেরিত বাণীতে ভারতীয় জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

কাতাঙ্গার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপে শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) সম্মতি —কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ আদোলার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর।

পশ্চিম ইরিয়ানের (নিউগিনি) সীমান্ত বরাবর ইন্দোনেশীয় সৈন্য-সমাবেশ।

২২শে ডিসেম্বর—৬ই পৌষ : শোম্বে-আদোলা চুক্তি সম্পর্কে কাতাঙ্গা মন্ত্রিসভার উল্টা সুর—প্রেসিডেন্ট শোম্বে কোন স্বাক্ষর দেন নাই বলিয়া ঘোষণা।

বারমুডায় কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ ম্যাকমিলান) দুই দিবসব্যাপী গোপনে বৈঠকের অনুষ্ঠান—গোয়া প্রশ্ন সমেত বার্লিণ, কঙ্গো ও আণবিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা।

২৩শে ডিসেম্বর—৭ই পৌষ : ইন্দোনেশীয় ফৌজের প্রতি অভিযানার্থ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ—পশ্চিম নিউগিনিকে ওলন্দাজ কবলমুক্ত করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার তোড়জোড়।

রোডেশিয়া হইতে কাতাঙ্গায় শ্বেতাঙ্গ সৈন্য আমদানী— বৃটেনের নিকট রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের (উ থান্ট) তীব্র প্রতিবাদ।

পশ্চিম ইরিয়ানের প্রশ্নে ইন্দোনেশিয়ার সহিত মীমাংসা আলোচনায় ডাচ সরকারের আগ্রহ—উ থান্টের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল) নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ।

২৪শে ডিসেম্বর—৮ই পৌষ : আলজিয়ার্সে মুক্তি সংগ্রামী (বিদ্রোহী) ও ফরাসী চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ—বহু লোক হতাহত হওয়ার সংবাদ।

২৫শে ডিসেম্বর—৯ই পৌষ : 'লিওপোল্ডভিলে কাতাঙ্গার পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইবে'—সরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও জাতীয় পরিষদ সভাপতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৬শে ডিসেম্বর—১০ই পৌষ : পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া) কর্তৃক সামরিক অভিযান কমিটি গঠিত।

মিশরে বিদেশীদের জমিজমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের জন্য সর্বরকম প্রস্তুতি—প্রেসিডেন্ট নাসেরের আদেশ অনুযায়ী কাজ।

কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও শ্যামের ষড়যন্ত্র—প্রিন্স নরোদমের (কাম্বোদিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান) অভিযোগ।

২৭শে ডিসেম্বর—১১ই পৌষ : কুয়ায়েত রক্ষায় বৃটিশ নৌ ও বিমান-বাহিনীর এডেন অভিমুখে যাত্রা—ইরাক কর্তৃক বৃটেনের বিরুদ্ধে নূতন প্ররোচনা সৃষ্টির অভিযোগ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ এই যুগের মন ॥

লিসেস্টার য়ুনিভার্সিটির খ্যাতনামা সাহিত্য অধ্যাপক জি. এস. ফ্রেজার বিগত পঁচাত্তর বছরের ইংরাজী সাহিত্যের যে-ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থটির সম্প্রতি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। The Modern Writer And His World গ্রন্থটি, ছাত্র, অধ্যাপক, সাহিত্য-সাধক, সাহিত্য-পাঠক সকলের কাছেই সমান আদরণীয়। পশ্চিম জগতের সাহিত্যাকাশে হাওয়া-বদলের ইতিহাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থ। কত মত, কত পথ, কত রুচির অভ্যুদয় আবার পতন এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে দেখা গিয়েছে, ফ্রেজার সাহেব তার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন।

প্রধানতঃ এই গ্রন্থটি ইংরাজী সাহিত্যের জাপানী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কারণ সেই জাপানীরা "had been cut off from contact with us (অর্থাৎ বৃটিশ) during the war with fairly clear guide-book to modern tendencies" —অন্য দেশের ছাত্রদের কাছেও গ্রন্থটি সমান মূল্যবান, ইংরাজী সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে যাদের গভীর জ্ঞানের অভাব তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করে লাভবান হবেন। লেখক অতিশয় নম্রভঙ্গীতে আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে এই শ্রমসাধ্য কর্মে হাত দিয়েছেন, এবং নাটক, কবিতা ও কথা-সাহিত্যের ত্রিধারা সম্পর্কে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হ'ননি, সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে একটি আলাদা পরিচ্ছেদও সন্নিবেশিত করেছেন।

এই গ্রন্থে লেখকের মনে যে-সব নিত্য-নূতন ভঙ্গীর উদয় হয়েছে, বিগত বৎসরের বিভিন্ন ভঙ্গী ও রুচি, ঘরে এবং বাইরে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, তা সবই লেখকের এই রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেন পত্র-পুষ্পে একটি সুন্দর বৃক্ষ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সে গাছে কখনো লেগেছে প্রবল ঝঞ্ঝার দোলা কখনো বা সুমধুর দখিন সমীরণ। কখনো করুণ, কখনো মধুর।

লেখক এক কথায় বলেছেন যে, তাঁর "the preliminary task of getting a literary scene into perspective" এবং "depicting the relation of the writer to his age."

যুদ্ধোত্তর এবং প্রতীকধর্মী আধুনিক কবিতা তাঁর কাছে 'notably complex', এই জটিলতার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন : এর মূল কারণ—"the growing complication in the organisation of our world. Society has ceased to be local and organic; many customs. habits and traditions have decayed, and the poet has become a much more isolated person than he was even in the elegant and urban Eighteenth Century...."

এই গহন সলিলে ঝাঁপ দেওয়ার কারণ স্বয়ং কবিও বলতে অক্ষম, সেই নিমজ্জমান অবস্থা সম্পর্কে একজন ডুবন্ত মানুষের মতই তিনিও সেই একই কৈফিয়ৎ দান করবেন। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা বা নূতন রীতি সম্পর্কে যদি বলা যায় "the decay of past standards in present day life" তাহলে কৈফিয়ৎ-টুকু অনেক স্পষ্ট হয়।

নাট্যকার কিন্তু এতখানি একচ্ছত্রের দাবী করতে পারেন না, তাঁর প্রতিক্রিয়া অন্য রকম, তাই তাঁকে সংরক্ষণশীল রুচির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হয়। বড় থিয়েটারের দর্শক, প্রযোজক, অভিনেতা প্রভৃতি সকলের রক্ষণশীলতার সঙ্গে তাঁর আপোষ করতে হয়। ফ্রেজার বলেছেন— "The history of the Drama has made a rather thin show compared to the history of Poetry or the Novel. Our age is one of good plays rather than great plays."

তাই লেখকের মনে কি চিন্তা দহন করছে তার বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রেজার সাহেব, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি বা সমালোচক যেই হোন না কেন তাঁর মন আলোড়িত হবেই, যখন "the foundations of the world he walks on are dangerously shifting"— তখন আর তিনি কি করতে পারেন?

সাহিত্যের ভঙ্গী, রূপকল্প প্রভৃতির সম্পর্কে আলোচনাকালে মিঃ ফ্রেজার পাঠকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর আলোচনার সীমানাভুক্ত, তিনি অধিকাংশ লেখকের উল্লেখ করেছেন ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের বিবরণ দান করেছেন। বিশেষ কষ্ট না করেই ফ্রেজার সাহেবের মন্তব্য-বিচারে তাই পাঠকের সুবিধা হবে। শ্রীমতী রোসামন লেমানের উপন্যাসই হোক, কি টি. এস. এলিয়টের নাটক হোক, কিংবা এজরা পাউণ্ডের কবিতা হোক, বা জর্জ ওরওয়েলের সমালোচনাই হোক ফ্রেজার পাঠকের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন সেই সব লেখকের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে। এর ফলে এই সব লেখকদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি গ্রন্থকারের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া তা বোঝার সুবিধা হবে।

সাম্প্রতিক কালের সমালোচনা-সম্ভার সম্পর্কে লেখক আশা না ছাড়লেও তেমন খুশী নন। তাঁর ধারণা কবিতার মান-নির্ধারণে তাপমান যন্ত্রের ঘন ঘন উত্থান-পতন, গোষ্ঠীগত ভঙ্গী এবং গোষ্ঠী-মনোভাব, শ্রান্তি, অনিশ্চয়তা আধুনিক কবিতার বর্তমান অবস্থার জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। তাই আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যপাঠের ভূমিকা হিসাবে, এবং সেই সাহিত্যের স্রষ্টাদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করতে ফ্রেজার সাহেব কৃত The Modern Writer And His World- গ্রন্থটি অতিশয় মূল্যবান পথনির্দেশক। এই গ্রন্থ পাঠে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন, আর যাঁরা নবীন, একেবারে শিক্ষানবীশ তাঁরা নতুন বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ পাবেন, নতুন করে পড়া এবং বার বার পড়ার আগ্রহ লাভ করবেন। কৌতূহল বুদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটবে। মানবিকতার দিগন্ত সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠবে।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা উৎসাহী, তার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল থাকতে চান তাঁরা এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি পাঠ করলে শুধুমাত্র যে আলোচিত গ্রন্থটি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন, তা নয়, তাঁরা এ যুগের লেখকের মনের গহনে ডুব দিতে পারবেন। আজকের লেখকদের মন কি ভাবে পরিচালিত হয়, কে সেই মনকে

নিয়ন্ত্রিত করে, কি তার অসুবিধা এবং কোথায় সুবিধা তা বোঝার সুবিধা হবে।

যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর সর্বত্র সামাজিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে, ইংলণ্ডের মানুষের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটেনা, তার সাহিত্য তাই সর্বদা যে স্পষ্ট এবং সোচ্চার তা নয়। ইংলণ্ড আজো বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রস্থল। ইংরাজী সাহিত্যের বুদ্ধিদীপ্ত ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে আছে পরিচ্ছন্ন মননশীলতা আর অম্লান নবীনতা। আধুনিক মনের প্রতিচ্ছবি সেই সাহিত্যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে, বহুধা বিচিত্র সাহিত্যভাণ্ডারে আজও ভাবৈশ্বর্যের কি আশ্চর্য সমাবেশ তার পরিচয় ফ্রেজার সাহেবের এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

THE MODERN WRITER & HIS WORLD: By G. S. Fraser—p.p. 326—Price—Rs. 8/- only. Rupa & Co: Bombay and Calcutta.

নতুন বই

কাব্য পরিক্রমা—(সমালোচনা গ্রন্থ)—অজিতকুমার চক্রবর্তী। বিশ্ব-ভারতী। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা—৭। দাম দু'টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্য-পরিক্রমা' বাংলা সাহিত্যে একটি সুপরিচিত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এইটিই সর্ব-প্রথম তাঁর কাব্য-সমালোচনা গ্রন্থ। বার্নার্ড শ'র জীবদ্দশায় যেমন চেষ্টারটন সর্বপ্রথম তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। অজিতকুমারও তাই করেছিলেন এবং তৎকালে সাহিত্য-সমাজে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গ্রন্থকার সেদিন লিখেছিলেন "যে সব রসতৃষ্ণার্ত পথিক রবীন্দ্র কাব্য-তীর্থে আমার পূর্বে পরিক্রমণ করিয়াছেন আমার সঙ্গে বর্তমানে করিতেছেন এবং আমার পরে অনাগত কালে করিবেন তাঁহাদের হাতে একজন পথিকের এই বৃত্তান্ত সাদরে উপস্থিত হইল।" ১৩২২ সালে কাব্য-পরিক্রমা প্রথম প্রকাশিত হয়। আজ ১৩৬৮তেও তার গৌরব অম্লান।

মাহাদিগন্ত— (কবিতা) — জগন্নাথ চক্রবর্তী। মহাদিগন্ত প্রকাশন। দাম—তিন টাকা। ২৯।১এ, গোপী-মোহন দত্ত লেন, কলকাতা-৩।

জগন্নাথ চক্রবর্তী একজন সৎ কবি। 'মহাদিগন্ত' তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।

'আদিম পিপাসা থেকে
কামনা তৃপ্তির এক অতৃপ্ত কামনা
বুকে বয়ে
স্বপ্ন থেকে জাগরণ।'

আবহমান কালের স্রোতে ভেসে যে মানুষ বর্তমানের মহাদিগন্তে চোখ মেলে জেগে উঠেছে—তারই বিস্তৃত চৈতন্য-প্রবাহের মহাকাব্য এই 'মহাদিগন্ত'।

সম্প্রতিকালে ফরাসী দেশের কবি সাঁ ঝন্ পার্স মহাকাব্য রচনা করেছেন। জগন্নাথবাবুর কাব্যগ্রন্থের গতিপ্রকৃতি ও মেজাজ তা থেকে ভিন্ন। খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতা হিসেবেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ আমায় বিশেষ আনন্দ দিয়েছে এবং মনে হয়েছে গীতি-কবিতাতেই তাঁর প্রকৃত চারিত্র্য ধরা পড়ে। 'বৈদেহি! আমার সেতু', 'মাধবীলতা', 'রহস্যময়ী', 'ইঞ্জেল ও বুনো পারাবত', 'কোকিল স্লোগান গায়' প্রভৃতি বহু কাব্যাংশ কবিতা-পাঠকের মনে প্রকৃত কবিতার স্বাদ এনে দিতে সক্ষম।

জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কাব্যবোধের কোনো বিরোধ নেই। বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি এমন কি বিজ্ঞানের সূত্র $mc^2=E$ ও তাঁর চিত্রকল্পের জগতে অবহেলিত নয়। অবশ্য জানিনা, বিজ্ঞানের এই বিহঙ্গ-শিশুর জন্য ভবিষ্যতে তিনি কোন নীড় নির্মাণ করবেন! বিজ্ঞানের আপাত উল্লেখেই ক্ষান্ত হবেন কিংবা কাব্যবস্তুর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞান তাঁকে প্রেরণা জোগাবে কিনা?

এ ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও বিদেশী বহু কাব্যাংশ থেকে স্মরণীয় পংক্তি চয়ন করে তাঁর নিজস্ব কাজে লাগিয়েছেন। সম্প্রতিকালের কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অতীতকালের তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হলে এই কৌশলের জুড়ি নেই, এবং এও আমরা জানি যে, এর ফলে কাব্যের ব্যঞ্জনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু জগন্নাথবাবুর কাব্যাংশের সঙ্গে উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের অবি-চ্ছেদ্য মিলন সর্বক্ষেত্রে ঘটেনি যার ফলে সেগুলিতে নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি বলে মনে হয়।

এ রকম কিছু কিছু বাহিক ত্রুটি সত্ত্বেও 'মহাদিগন্ত' কাব্য-পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কাব্যগ্রন্থপাঠে সেই প্রসাদগুণে পাঠককে তৃপ্তি দেবে যা ক্রমশঃই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

বাতাবরণ— (কবিতা) অসিতকুমার ভট্টাচার্য। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ। দাম—আড়াই টাকা।

অসিতকুমার ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'বাতাবরণ'। তিনি সাময়িক পত্রিকায় নামস্বাক্ষরে অসিতকুমার নামেই সমধিক পরিচিত। কাব্যগ্রন্থখানি চারিটি অংশে, যথাক্রমে প্রচ্ছদপট, ক্রান্তিকাল, অলাত-চক্র ও উত্তরপথ—প্রভৃতি শীর্ষনামে বিভক্ত। সুমুদ্রিত এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই পাঠযোগ্য। অযথা চিন্তাসাপেক্ষ কালহরণকারী অধ্যবসায়ে পাঠককে নিযুক্ত হতে হয় না। কবিতা-গুলির সবচেয়ে বড় গুণ, সেগুলি স্বতোৎসারিত। ছন্দ, শব্দচয়ন প্রভৃতিতে নিপুণতা এবং সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে সচেতন মনস্ক দৃষ্টি কবির বিষয়ে শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কবিতাগুলির রচনকাল এবং কবির অগ্রগমনের স্বাক্ষরও সে প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সচেতন কবি 'জোহরে'র ল্যাণ্ডস্কেপ রচনায় যেমন 'আকাশের বুক চিরে, থম থমে মেঘ ঢেকেছে পূর্বকোণ' রচনা করেন, তেমনই ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ উপ-লক্ষে সময়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখেন। অসিতকুমার ভট্টাচার্য আরও বেশি চিত্রকল্প ও ছন্দের পরীক্ষা সেখানে পাঠকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে রাখবেন বলে মনে করি। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও অঙ্গসজ্জা যে কোনও গ্রন্থকার ও প্রকাশকের ঈর্ষার কারণ হবে।

ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি—(কবিতা) সমীর রায়চৌধুরী, কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দাম—দেড় টাকা।

সন্নিবিষ্ট পঞ্চাশটি কবিতায় সমীর রায়চৌধুরী যে পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তার পটভূমি জীবনানন্দীয় নিসর্গ-চেতনা। প্রভূত শক্তিমান জীবনানন্দের কাছে বর্তমান কবির ঋণ নিসর্গ-চেতনায় মাত্র নয়, প্রকরণগতও বটে। তবে কোথাও কোথাও স্বাধীনভাবে পদচারণা করবার চেষ্টা যে দেখা যায়নি, তা নয় এবং বলাই বাহুল্য যে, যে সকল কবিতায় স্বচেষ্টভাবে প্রভাবমুক্ত হতে চেয়েছেন সেখানেই কবি সমীর রায়চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য। শব্দব্যবহারে এবং বাক্য-গঠনে কবির নৈপুণ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সচেতন

কষ্টকর প্রয়াস মাত্রে পর্যবসিত। তথাপি একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে আলোচ্য কবি যে কাব্যরসিকদের নিকট সমাদৃত হতে পারবেন, বর্তমান গ্রন্থ তার সাক্ষ্য হয়ে রইলো।

সরণী— (কবিতা)—ভাস বিরচিত। প্রকাশক—বাণীতীর্থ। ২৬বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। দাম—আড়াই টাকা।

'ভাস' এই ছদ্মনামের আড়ালে যে কবিটি লুকিয়ে আছেন, তাঁর কবিতা রচনার শুরু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। বিভিন্ন-কালে রচিত কবিতাবলীকে তিনি বিভিন্ন পর্বে সাজিয়েছেন। এই প্রবীণ কবির কবিতাগুলিতে বলাবাহুল্য আধুনিক কবিতার ছাপ নেই, কবিতাগুলি মূলতঃ প্রাচীন আঙ্গিকে রচিত। ছন্দ সর্বত্র সুষমামণ্ডিত না হলেও মনোহর। কবিতা বাঙালী লেখকদের কাছে অতি সহজেই এসেছে সুদীর্ঘকাল থেকে, কাব্য-সাহিত্য তাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। প্রবীণ কবি 'ভাস'—পুরাতন রীতিতে যে কবিতা-গুলি রচনা করেছেন তার বক্তব্য, আঙ্গিক এবং কাব্য-মাধুরী প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

ভালবাসা ও বিবাহ—যজ্ঞেশ্বর রায়ঃ এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ৫এ।১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

ভালবাসা ও বিবাহ সমাজ-জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানব-সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর জোরেই সৃষ্টিরক্ষা হয়ে আসছে। অনেকে হয়ত বলবেন, এ রকম একটা জৈবিক ব্যাপার নিয়ে বই লেখার কি প্রয়োজন আছে? জিনিসটা তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার; কোন বাঁধা-ধরা নীতি-নিয়মের বিষয় নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এই নিতান্ত জৈবিক ব্যাপারটির প্রকৃত তাৎপর্য অনেকে জানেন না বা তার প্রকৃত মর্যাদা রাখতে পারেন না। আর সেইজন্যই সংসারে নিত্যনিয়ত বিরোধ, ভুল বোঝা-বাঝি এবং বিভিন্ন নোংরামির প্রকাশ। লেখককে ধন্যবাদ যে তিনি সংসারের এই সমস্ত ত্রুটি লাঘবের সাধু উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বইটি রচনা করেছেন। লেখক বিশ্বাস করেন যে, ভালবাসা জিনিসটা অলৌকিক হলেও তার সঙ্গে লৌকিক বিবাহের একটা সামঞ্জস্য সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। আর এ সমন্বয় সম্ভব হতে পারে মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক ও উন্নততর প্রজনন সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার ভিত্তিতে। আমার মনে হয় আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি বিভাগে প্রণয় প্রসঙ্গ, বিবাহ প্রসঙ্গ ও সন্তান প্রসঙ্গ নিয়ে যে সরস আলোচনা করা হয়েছে তা এই সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলায় বিশেষ সাহায্য করবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

অম্বিষ্ট—সম্পাদক : শ্রীবীরেন্দ্র নিয়োগী ও শ্রীস্বদেশ রায়। 'অম্বিষ্টে'র আলোচ্য সংখ্যাটি রবীন্দ্র-স্মারক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন ভবানী সেন, নরহরি কবিরাজ, চিন্মোহন সেহানবীশ, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাশ, চিত্ত ঘোষ প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলি তথ্যসম্পন্ন যুক্তিগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ। পুরনো ও নতুন লেখকদের দ্বারা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি অনেকেরই ভাল লাগবে আশা করি।

জাগরী—সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা। "জাগরী"র এটি ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। এই সংখ্যায় কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কবিতা, গল্প, রম্য-রচনা, মঞ্চচিত্রকথা, নিবন্ধ প্রভৃতিতে কাগজটি সমৃদ্ধ।

পরিষদ বার্ষিকী—সম্পাদনা : বঙ্গীয় পরিষদ, নতুন দিল্লী-৩।

পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত আলোচ্য সংখ্যাটি রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত। বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন হুমায়ুন কবির, অশোক মিত্র, মনোজ বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বটকৃষ্ণ দে প্রভৃতির কবিতা সংকলিত হয়েছে। ইংরিজি বিভাগে লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী, সি, ডি, দেশমুখ, সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রভৃতি। সংকলনটি থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

Tagore And Man — Tagore Centenary Peace Festival; All India Committee: Calcutta. Rs. 2.50.

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি সম্মেলনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী পাঠকের সামনে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়কে তুলে ধরবার যে প্রচেষ্টা রয়েছে এর পেছনে তা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের যোগ্য। জাতীয় মুক্তিকামনা, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, মানবিকতা, শান্তি প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। ১৮৭৮-১৯৪১ সালের মধ্যে কবির যে সমস্ত বিষয়ে যে চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল তারই সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা হিসাবে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ-কার্যে অংশ গ্রহণ করেছেন সরোজ আচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, সমর সেন প্রভৃতি। শান্তি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থটির সুপ্রচার কামনা করি।

In Homage To Tagore — Tagore Centenary Peace Festival; All India Committee: Calcutta Rs. 3.50 nP.

আঠারো জন বিদেশীর রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘের সংকলন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ। জে, ডি, বার্ণল (বৃটিশ), জ্যাকুইস ম্যাডুলে (ফরাসী), আর্থার লার্টভিস্ট (সুইডেন), হাণ্ডর লাক্সনেস (আইসল্যাণ্ড), ওয়াল্টর রুবেন্স (বার্লিন), ডঃ দুশেন জাভেতিল (চেকোশ্লভাকিয়া), আরভিন বাকুতে (হাঙ্গেরী), ইভা ঘোষ (হাঙ্গেরীয়—বাঙ্গালী কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের পত্নী), রিউ এ্যালে (নিউজিল্যাণ্ড), দ্যু বয়েস (যুক্তরাষ্ট্র), জেমস জি এন্ডিকোট (কানাডা), ওয়াল্ডো আতিয়াস (চিলি), মি-লান-ফঙ (পিকিং), জর্জ কেৎ (সিংহল), হিউলেট জনসন (ডিন অব ক্যান্টারবেরী), ইউজিন কটন (ফরাসী), ইলিয়া এরেনবুর্গ (সোবিয়েৎ), জন লুইস (বৃটিশ)—এর লেখায় সংকলনটির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা—রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা। এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কাজী আবদুল ওদুদ, সন্তোষ-কুমার ঘোষ প্রভৃতি। কয়েকটি বিদেশী লেখকের রচনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও লিখেছেন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

।। বাঙলা ছবির সালতামামি ।।

আমরা আর কোন্ কোন্ বিষয়ে ইংরেজ হয়েছি, তা' জানি না; তবে তারিখ-মাস-বছর গণনার কাজ যে ইংরেজীতেই ক'রে থাকি, এ-কথা অনস্বীকার্য। এটা বাঙলা কোন্ সাল এবং আজ পৌষ মাসের কোন্ তারিখ, এ সঠিক বলতে হ'লে আমাদের পঞ্জিকা, বাঙলা দেওয়ালপঞ্জী বা ইংরেজী-বাঙলা তারিখ-দেওয়া ডায়েরীর শরণাপন্ন হওয়া-ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আজ যে ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬২, এ-কথা জানবার জন্যে আমাদের কারুর মুখের দিকে তাকাতেও হবে না, বা কোনো পুঁথিপত্তর হন্যে হয়ে হাতড়াতে হবে না। কাজেই, আশা করতে পারি, বাঙলা ছবির সালতামামি অর্থাৎ বাৎসরিক হিসাব ইংরাজী ১৯৬১ সাল ধ'রে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

এ বছর সব সমেত ৩৪খানি বাঙলা কাহিনী-চিত্র মুক্তিলাভ করেছে। এর সঙ্গে ফিল্মস ডিভিসনের হয়ে তোলা সত্যজিৎ রায়ের দলিল-চিত্র "রবীন্দ্রনাথ" এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তোলা দেবকী বসুর "অর্ঘ" (রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতার চিত্ররূপ) যোগ দিলে বাঙলা ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। অথচ সে তুলনায় হিন্দী ছবি মুক্তি পেয়েছে অন্ততঃ ৮৪টি অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে বাঙলা ছবির প্রায় আড়াই গুণ। বাঙলাদেশের শহর কলকাতায় বাঙলা ছবির মুক্তির সুযোগ যে কত কম, তা এথেকেই সহজে অনুমান করা যেতে পারে।

তারিখ অনুসারে প্রযোজক-প্রতিষ্ঠানের নামসমেত ছবিগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ৩৪খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির মধ্যে ২৪টিই সামাজিক বা গার্হস্থ্য চিত্র। ৫ খানি হাল্কা হাসির ছবি বা কৌতুক চিত্র; ২ খানি ভক্তিমূলক চিত্র; ১ খানি জীবনী চিত্র; ১ খানি রহস্যঘন চিত্র এবং ১ খানি কাল্পনিক পটভূমিকায় গ্রথিত চিত্র। সামাজিক ছবিগুলির মধ্যে ১ খানি ছবি পরীক্ষামূলকভাবে কথাহীন ক'রে রচিত; ২ খানি প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত (অলিভার টুইস্ট ও নেকলেস); ৫ খানি হচ্ছে উপন্যাসের চিত্ররূপ: জীবনী চিত্রখানিও প্রসিদ্ধ বইয়ের চিত্ররূপ; ১ খানি রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের চিত্ররূপ; ২ খানি কৌতুকচিত্রও ২টি বইয়ের চিত্র-

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	ছবির নাম	প্রতিষ্ঠান
১।	১২ই জানুয়ারী	মানিক	চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা
২।	২৩শে "	কেরীসাহেবের মুন্সী	বিকাশ রায় প্রোডাকসান
৩।	৩রা ফেব্রুয়ারী	রায়বাহাদুর (বোম্বাইয়ে তোলা)	পি, কে, ফিল্মস্
৪।	১০ই "	সাধক কমলাকান্ত	অরুণিমা পিকচার্স
৫।	২রা মার্চ	সাথীহারা	বাদল পিকচার্স
৬।	১৭ই "	লক্ষ্মী-নারায়ণ	প্রবালিকা পিকচার্স
৭।	২৪এ "	মিঃ ও মিসেস চৌধুরী	সুলতা পিকচার্স
৮।	৩১এ "	কোমল-গান্ধার	চিত্রকল্প
৯।	" "	বিষকন্যা	হিমালয় পিকচার্স
১০।	১৪ই এপ্রিল	অগ্নিসংস্কার	শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স
১১।	" "	স্বরলিপি	জনতা পিকচার্স এ্যান্ড থিয়েটার্স
১২।	২১এ "	মধ্যরাতের তারা	এম, এম প্রোডাকসান্স
১৩।	৫ই মে	তিন কন্যা	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসান্স
১৪।	১৯এ "	স্বয়ংবরা	ইউনাইটেড ফিল্মস্
১৫।	২৬এ "	মেঘ	পটমঞ্জরী
১৬।	৯ই জুন	ঝিন্দের বন্দী	বি, এন, রায় প্রোডাকসান্স
১৭।	১৬ই "	পঙ্কতিলক	বিশ্বভারতী চিত্রমন্দির
১৮।	৭ই জুলাই	দিল্লী থেকে কলকাতা	কথাচিত্র
১৯।	" "	নেকলেস	ভি, এম্, এন, প্রোডাকসান
২০।	১৪ই "	কাঞ্চন মূল্য	রূপভারতী ফিল্মস্
২১।	২৭এ "	কঠিন মায়া	সুশীল মজুমদার প্রোডাকসান্স
২২।	২৮এ "	আজ কাল পরশু	চলচ্চিত্রালয় প্রোডাকসান্স
২৩।	১৮ই আগষ্ট	ডাইনী	দেবী প্রোডাকসান
২৪।	২৫এ "	আশায় বাঁধিনু ঘর	কনক প্রোডাকসান
২৫।	১লা সেপ্টেম্বর	মধুরেণ	শ্রীমান পিকচার্স
২৬।	১৪ই "	মিথুন লগ্ন	অখিল চিত্র প্রোডাকসান
২৭।	১৫ই "	পুনশ্চ	মৃণাল সেন প্রোডাকসান
২৮।	১৭ই অক্টোবর	ইঙ্গিত	তারু মুখার্জি প্রোডাকসান
২৯।	২০এ "	দুই ভাই	ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্স
৩০।	" "	সপ্তপদী	আলোছায়া প্রোডাকসান্স
৩১।	১০ই নভেম্বর	আহ্বান	একতা প্রোডাকসান
৩২।	১৭ই "	সন্ধ্যারাগ	জাওলা প্রোডাকসান্স
৩৩।	" "	মা	এম-কে-জি প্রোডাকসান্স
৩৪।	৮ই ডিসেম্বর	কাণামাছি	টাস ফিল্মস্
		এবং	
৩৫।	৫ই মে	রবীন্দ্রনাথ	ফিল্মস ডিভিসন
৩৬।	৮ই "	অর্ঘ	পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রচার বিভাগ

বি আর 'সি সিনে প্রোডাকশনের 'সরি ম্যাডাম' চিত্রে বিশ্বজিৎ

রূপ; কাল্পনিক পটভূমিকায় রচিত চিত্রখানিও বিখ্যাত কাহিনীর চিত্ররূপ; বাকীগুলি বিশেষভাবে ছবির জন্যেই লিখিত গল্প অবলম্বনে গঠিত।

৩৪ খানি ছবির মধ্যে ১২ খানি অর্থাৎ ⅓ অংশ আর্থিক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে; ৮ খানি আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করেছে এবং ১৪ খানি অল্পবিস্তর অসাফল্যই লাভ করেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাঙলা ছবি নির্মিত হওয়া সম্বন্ধে কর্মকর্তাদের সুপরিকল্পিত উপায় অবলম্বন করবার সময় এসেছে। বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পকে যদি মাত্র কোনোক্রমে টিঁকে না থেকে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে বাঙলা ছবিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তার বিক্রীর বাজারকে বাড়াতে হবে, তার অধিকতর মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে হবে, মাত্র সারা ভারতে নয়, সারা বিশ্বে যাতে তার চাহিদা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হয়, সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। বাঙলা চলচ্চিত্র-জগতের প্রযোজক ও স্টুডিও-মালিক থেকে সুরু ক'রে বিশিষ্ট কলাকুশলী এবং শিল্পীবৃন্দ এক টেবিলে ব'সে একটি সুষ্ঠু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেই পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্য করতে আহ্বান করুন। অ-বাঙলা ছবির অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যদি বাঙলা ছবির অনিবার্য ধ্বংস দেখতে না চান, তাহলে সকলে সময় থাকতে সচেতন হোন।

একটি স্মরণীয় রুশ চিত্র:

জ্যোতি সিনেমায় গেল দু'হপ্তা ধ'রে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত চলচ্চিত্রোৎসবে যে-ক'খানি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি দেখানো হ'ল, তার মধ্যে একখানি হচ্ছে: "দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেণ্ট"। আট হাজার ফুটের কিছু বেশী এই কাহিনী-চিত্রটি দেখে মনে হ'ল, ছবির মত ছবি তৈরী করতে গেলে কি অসাধারণ নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন, তারই একটি চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে "দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেণ্ট"। চারটি মাত্র চরিত্র—তিনটি পুরুষ ও একজন সুন্দরী নারী-অভিনীত এই ছবিখানি তার বিচিত্র পরিবেশে, বহির্দৃশ্যের দুর্গম ভয়াবহতায়, অপরূপ নাটকীয়তায়, চরিত্রচিত্রণের সুষ্ঠু প্রকাশে এবং অসামান্য চিত্রধর্মিতায় আমাদের মনের গভীরে যে অবর্ণনীয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা নেই।

এশিয়ার শীতলতম স্থান, সাই-বেরিয়ার অন্তর্গত ইয়াকুশিয়া নামে একটি জনহীন, দুর্গম বনভূমি চিত্র-কাহিনীটির অকুস্থল। তিনজন পুরুষ ও একজন নারীসমন্বিত একটি ভূবিজ্ঞানী অভিযাত্রী দলকে সেখানে পাঠানো হয়েছে হীরকের সন্ধানে। ক্লান্তিহীন দলটি সর্বক্ষণই অনুসন্ধানে ব্যস্ত। দলনেতা কন্সট্যাণ্টিন স্যাবিনিন অবসর মুহূর্তে চিঠি লেখে তার স্ত্রীকে; সে-চিঠি ডাকের যোগাযোগের অভাবে প্রায়ই ফেলা হয় না—তাই দিনের পর দিন চিঠির আকার বেড়েই চলে। দলের কনিষ্ঠতম দু'জন—আঁদ্রেই ও তানিয়া পাঠ্যাবস্থা থেকেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু সে-অনুরক্তির বহিঃ-প্রকাশ সামান্যই। দলের পথ-প্রদর্শক সার্গেই সবথেকে বয়েসে বড়ো—বয়েস পঁয়ত্রিশ; অসম সাহসী ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। কিন্তু সকলে মিলে হীরকানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকবার মাঝেই কোন্ অশুভক্ষণে সার্গেই-এর দৃষ্টি পড়ে তানিয়ার কমনীয় তনুশোভার উপর। কামনা-লালসায় উদগ্র হয়ে উঠে সে তানিয়াকে আকর্ষণ করে; তানিয়া কোনোক্রমে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে চলে যায় আঁদ্রেই-এর কাছে। সার্গেই তখনকার মত নিজেকে শান্ত করে; কিন্তু সুযোগ বুঝে আঁদ্রেইকে এক সময় করে আক্রমণ। ওরা দু'জনে পরস্পরের প্রতি বহুদিন ধরে অনুরক্ত জেনে সার্গেই-এর চেতনা জাগে; সে ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে সংযত করে। ছবির মধ্যে এই প্রেম এবং ঈর্ষার ঘটনা অত্যন্ত সহজভাবেই এসেছে—একটুও মনে হয় না যে, এটা অবান্তর এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। অনুসন্ধানের কাজ একটুও থামেনি।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "সূর্যস্নান" চিত্রে লিলি চক্রবর্তী

এবং একদিন অদম্য উৎসাহী, স্থির-সংকল্প তানিয়ার হাতেই উঠে এল একটি টুকরো হীরে—ফিকে নীল মাটীর কিম্বার্লাইট পাইপ থেকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তানিয়াকে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিল আঁদ্রেই; তারা পরস্পরকে আবেগে জড়িয়ে ধ'রে উদ্দাম নৃত্য করতে লাগল। দলটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল—হীরার সন্ধান পাওয়া গেছে। রেডিও-যোগে মস্কোয় খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এবার তারা ফিরবে। কিন্তু হঠাৎ বিপর্যয় সুরু হয়ে গেল। বনের মধ্যে রাত্রিবেলা সুরু হয়ে গেল দাবানল। দলের প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্তু এবং অপরাপর জিনিষ নিরাপদ জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর সার্গেই প্রাণ দিল জ্বলন্ত গাছ চাপা প'ড়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বাকী তিনজন ছুটল উত্তরমুখে—তারা চলেছে তো চলেইছে—শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন তাদের খাদ্য যাচ্ছে ফুরিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে শতছিন্ন। অবশেষে অকস্মাৎ মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়ে আগুনকে নেভাল বটে, কিন্তু তাদের পথকে করল বিপদসংকুল, দুরধিগম্য। কখনো রবারের ভেলায়, কখনো বুক-ডোবানো জলের মধ্যে দিয়ে তারা চলতে লাগল অচিন পথে। তাদের দুঃখের মাত্রাকে চরমতম করবার জন্যে এল শীত তার সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে প্রকাশ ক'রে। তাদের রেডিও যোগাযোগ হয়েছে ছিন্ন, বিপর্যস্ত; তারা কোথায়, সভ্যজগত থেকে কত দূরে—তা' জানবার তাদের কোনো উপায় নেই। এরই মাঝে বিদ্রুপের মতো ওদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছে মস্কো থেকে বেতারযোগে প্রেরিত ওদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন বাণী। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আঁদ্রেই হ'ল পীড়িত। স্যাবিনিন ও তানিয়া তার অসুস্থ দেহটাকে বহন ক'রে নিয়ে চলল শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও। অসুস্থ আঁদ্রেই ভাবে, তার জন্যে এদের কত কষ্ট; বলে সে-কথা তানিয়াকে। পরে সকলেই যখন নিদ্রা-মগ্ন, আঁদ্রেই নিঃশব্দে ঝাঁপ দেয় অন্ধকারের বুকে নিজেকে শেষ করবার জন্যে। জেগে উঠে আঁদ্রেইকে দেখতে না পেয়ে তানিয়ার সে কি বিলাপ, সে কি মর্মভেদী প্রেমের প্রকাশ! তারপর ঐ নিদারুণ তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে একদিন তানিয়াও ঢলে পড়ল মৃত্যুর মুখে। শুধু দলনেতা স্যাবিনিন তার ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন নিয়ে এসে পৌঁছল এক উন্মুক্ত নদীতীরে; সেখানে একটি কাষ্ঠনির্মিত ভেলায় শুয়ে নিজেকে ছেড়ে দিল দৈবের হাতে। অবশেষে একটি হেলিকপ্টার এসে মুমূর্ষু স্যাবিনিনকে করল উদ্ধার। প্রকৃতির নির্দয়তাকে পরাস্ত ক'রে মানুষ বাঁচল।

রাজেন তরফদার পরিচালিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের 'অগ্নিশিখা' চিত্রে নবাগতা শর্মিষ্ঠা ও কণিকা মজুমদার।

ছবিটির প্রথম দৃশ্য—যেখানে অদৃশ্য এরোপ্লেন বিদায় সম্বর্ধনায় আগত লোকগুলি থেকে ক্রমেই দূরে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেইখান থেকে সুরু ক'রে একেবারে শেষের দৃশ্য—যেখানে হেলি-কপ্টার মুমূর্ষু স্যাবিনিনকে উদ্ধার

বাদল পিকচার্সের 'আগুন' চিত্রে নির্মলকুমার ও সৌমিত্র। কাহিনী : তারাশঙ্কর। পরিচালনা : অসিত সেন।

নরেন্দ্র মিত্রের 'ভুবন ডাক্তার' অবলম্বনে রূপায়িত 'শাস্তি' চিত্রের একটি মধুর মুহূর্তে সন্ধ্যা রায়

করবার জন্যে নেমে আসছে, সেই পর্যন্ত এমন একটি দৃশ্য এবং সট দেখলুম না, যা পরিচালক এবং তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে একাত্ম চিত্রশিল্পীর চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি প্রবল অনুরাগের নিদর্শন নয়। সমস্ত ছবিটিই তোলা হয়েছে স্টুডিওর বাইরে প্রকৃতির বাস্তব পরি-বেশে। প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে তোলা ছবি—কিন্তু কি আশ্চর্য সুন্দর, সহস্র ভয়াবহতা সত্ত্বেও সুন্দর শিল্প-কর্মের জ্বলন্ত নিদর্শন! ক্যামেরা কি অসম্ভব গতিশীল, শব্দযন্ত্র কি দুরন্ত শব্দধর! ছবির এক একটি ফ্রেম যেন শত সাধনার বস্তু। বহি-প্রকৃতির ভয়ঙ্করতাকে যে এমন অপরূপ-ভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে—বিশেষ ক'রে কাহিনী-চিত্রের মাধ্যমে ধরা সম্ভব, এ যেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

"দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং"-এর সৃষ্টিকর্তা মিখাইল কালাটোজভ্-কে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাই "দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেণ্ট" ছবির জন্যে।

বিবিধ সংবাদ

চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটারের বার্ষিক উৎসব :

'সি-এল-টি' নামটি আজ সর্বজন-বিদিত। শুধু কল্‌কাতাতেই নয়, ভারতের প্রসিদ্ধ নগরীগুলিতেও 'সি-এল্-টি'কে সমাদর জানাবার লোকের অভাব নেই। এই কিছুদিন আগেই এ'রা বোম্বাই, আমেদাবাদ থেকে শুরু ক'রে ভারতের পাঁচটি প্রদেশ পরিক্রমা ক'রে জনসম্বর্ধনার মুকুট মাথায় ক'রে কল্‌কাতায় ফিরে এসেছেন। ২৩-এ ডিসেম্বর থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব এ'রা পালন করছেন নিজাম প্যালেসের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে। প্রতিদিন বিশেষ বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে চলছে এ'দের শিশু-মেলা। এই মেলাতে গিয়ে শিশুদের সঙ্গে বুড়োরাও যে আনন্দের রসদ সংগ্রহ করতে পারবেন, তা নির্ভয়েই বলতে পারা যায়। এ'রা এ বছর এ'দের বহু বিখ্যাত পালাগুলি ছাড়াও 'ছন্দ' নামে একটি নতুন পালা পরিবেশন করছেন।

'সায়ম'-এর বার্ষিক উৎসব :

'সায়ম্' সম্প্রদায়টি নতুন, কেননা এ'দের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল গেল ২৬-এ ডিসেম্বর। এই সংস্থার সভাপতি, শ্রীরামকুমার ভাওয়ালকাও বলেছেন, "এই সাংস্কৃতিক সংঘ এখনো কৈশোর অতিক্রম কোরতে পারেনি।" তাই

দেখা গেল, উৎসব অনুষ্ঠানের সময় ৬টায় ঘোষিত হ'লেও জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইলেন ৬টা ৪৫ মিনিটে এবং 'মুক্তধারা' অভিনয় শুরু হ'ল তারও অর্ধঘণ্টা পরে ৭টা ১৫ মিনিটে। 'মুক্তধারা'র দৃশ্যটি অনাড়ম্বর ভাবে সুপরিকল্পিত হ'লেও আলোক-সম্পাতের নিদারুণ ত্রুটির জন্যে তার সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে প্রতিনিয়তই। অভিনয়ের দিক দিয়ে কিন্তু 'মুক্তধারা' বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলতে পারা যায়; বিশেষ ক'রে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠনিঃসৃত গানগুলি এবং অম্বার ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয় আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। আমরা এই নবজাত সংস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। তাঁদের সংকল্পিত নিজস্ব মুখপত্রটি প্রকাশের অপেক্ষায় আমরা আগ্রহান্বিত।

"ঝুমরু" চিত্রে মধুবালা ও কিশোরকুমার

গুজরাটী নাটক 'সুবর্ণরেখা' :

গুজরাটী সাহিত্য পরিষদের এক-বিংশতিতম অধিবেশন উপলক্ষে গুজরাটী সাহিত্য মন্ডল গেল ২৮-এ ডিসেম্বর শিবকুমার যোশী প্রণীত চার অঙ্কে সমাপ্ত নাটক 'সুবর্ণরেখা'র অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে শেষাদ্রি, সুবর্ণরেখা, মায়া দেবী ও অভিজিতের ভূমিকায় যথাক্রমে শিবকুমার যোশী, যোগিনী প্যাটেল, জ্যোতি ভালারিয়া ও শারদ বাসানীর নাম করতে হয়। অপরাপর ভূমিকায় বালকৃষ্ণ মেহতা, নরেন্দ্র পুজোরা, জয়ন্তীলাল মেহতা উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

দেবর ফিল্মসের (মাদ্রাজ) 'মাহুত' ছবিতে বি সরোজা ও উদয়কুমার

থিয়েটার ইউনিটের 'কৃষ্ণচূড়া' :

দক্ষিণ কলকাতার 'থিয়েটার ইউনিট' সম্প্রদায় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥টায় তাদের নতুন নাটক 'কৃষ্ণচূড়া' মঞ্চস্থ করছেন মহারাষ্ট্র নিবাস প্রেক্ষাগৃহে। পরিচালনা, আলোকসম্পাত ও মঞ্চ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে শেখর চট্টোপাধ্যায়, তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরী।

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "অভিযান" :

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবি 'অভিযান'-এর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এই নামের উপন্যাসটির নায়ক একটি গ্রাম্য ট্যাক্সি ড্রাইভার, এ-কথা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা আছে। এই

রাজেন তরফদার পরিচালিত "অগ্নিশিখা" চিত্রে সীতা মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার ও জনৈক শিল্পী

ছবিতে যাঁরা অভিনয় করছেন, তাঁদের মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা দেবী ও লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রাক্তন অভিনেতা রবি ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরায় সম্প্রতি বর্ধমান অঞ্চলে ছবিটির বহির্দৃশ্য তোলবার জন্যে গিয়েছেন।

চলচ্চিত্র-প্রয়াস-সংস্থার নতুন ছবি "সূর্যস্নান" :

একটি মৌলিক ও বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে গঠিত, চলচ্চিত্র-প্রয়াস-সংস্থার নতুন ছবি 'সূর্যস্নান' মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত এই ছবির দুই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র।

ভক্তিমূলক ছবি 'রূপ-সনাতন' :

ভক্ত রূপ ও সনাতনের জীবনকাহিনী অবলম্বনে একটি ছায়াছবি গ'ড়ে উঠছে ইস্টার্ন টকীজ স্টুডিওতে সুনীলবরণের পরিচালনায়। কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ এর সুরকার এবং এতে অভিনয় করছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সমীরকুমার, নবকুমার, জহর রায় প্রভৃতি।

টেক্সটাইল ডিরেক্টরেটের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব :

খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সভাপতিত্বে এবং খাদ্য-ত্রাণ-সচিব বি, আর, গুপ্তের প্রধান অতিথিত্বে টেক্সটাইল ডিরেক্টরেটের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আজ, ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদন প্রেক্ষাগৃহে। এই উপলক্ষ্যে এ'দের নাট্য-সমিতি ধনঞ্জয় বৈরাগী লিখিত 'রুপোলী চাঁদ' মঞ্চস্থ করবেন।

পরলোকে সাহিত্যিক-পরিচালক সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় :

গেল মঙ্গলবার, ২৬-এ ডিসেম্বর, সাহিত্যিক-পরিচালক সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। লেখকরূপে স্বীকৃতি লাভের পর সুধীরবন্ধু চিত্র-পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 'বন্দে মাতরম্' থেকে শুরু ক'রে 'দখনে বাঘ', 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র', 'মাথুর', 'বৃন্দাবন-লীলা', 'নুপুরেই তালে তালে' প্রভৃতি ছবির পরিচালনা করেন। সম্প্রতি তিনি 'লবকুশ'-এর চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

'আমরা' গোষ্ঠীর মৌ-চোর :

দক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত নাট্য-সংস্থা 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক গত ২৩শে ডিসেম্বর মুখার্জিপাড়া লেনস্থ ময়দানে (দক্ষিণ কলিকাতা) সলিল সেন রচিত 'মৌ-চোর' নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

নাটক পরিচালনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন যথাক্রমে শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশ বিশ্বাস। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—কানন দে, মালতী চৌধুরী, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, বিরাজ চক্রবর্তী, তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিন ভট্টাচার্য, অসীম ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

রতনের ভূমিকায় তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, সনাতনের ভূমিকায় দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফড়িংগের ভূমিকায় রবিন ভট্টাচার্য এবং ময়নার ভূমিকায় কানন দে বিশেষভাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। অন্যান্য ভূমিকায় সকলে সু-অভিনয় করেন।

নাটকের আলোক-সম্পাত মাঝে-মাঝে নাট্যরসিকদের ক্ষুণ্ণ করে।

মিনার্ভায় 'ছায়াপথ' :

আসছে ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় ক্যালকাটা থিয়েটার শ্রীবিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত ছায়াপথ নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটার-এ দ্বিতীয়বার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিতভাবে মঞ্চস্থ করবেন। ইতিপূর্বে প্রয়োগ-শৈলী ও অভিনয় আঙ্গিকের দিক থেকে নাটকটি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। ক্যালকাটা থিয়েটার এবারও তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন, আমরা আশা করি। বিভিন্ন চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতি মৈত্র, বাণী দাশগুপ্তা,, আলপনা গুপ্তা, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও বিধু মুখোপাধ্যায় রূপদান করবেন।

॥ দশরূপকের "ডানা ভাঙা পাখি" ॥

দশরূপক প্রযোজিত জনপ্রিয় নাটক "ডানা ভাঙা পাখি" আগামী ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬২, সন্ধ্যা ৭টায় মিনার্ভা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এই নাটকের বিস্তর মঞ্চ স্থাপত্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। নাটকখানি রচনা করেছেন পরেশ ধর। নির্দেশনায়, সঙ্গীতে ও আলোক-সম্পাতে আছেন যথাক্রমে মণীন্দ্র মজুমদার, জগন্নাথ ধর ও রবীন দাস।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড—৪র্থ টেস্ট ॥

ভারতবর্ষ : ৩৮০ রান (চান্দু বোরদে ৬৮, পতৌদির নবাব ৬৪, বিজয় মেহেরা ৬২, সেলিম দুরানী ৪৩ এবং পলি উমরীগড় ৩৬। ডেভিড এ্যালেন ৬৭ রানে ৫, টনি লক্ ৬৩ রানে ২ এবং ডেভিড স্মিথ ৬০ রানে ২ উইকেট)

ও ১০৬ রান (৩ উইকেটে। জয়সীমা ৩৬ এবং মঞ্জরেকার ২৭। পতৌদির নবাব ২৪ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৪ রান ক'রে ৩য় দিনের খেলার শেষ পর্যন্ত নট-আউট আছেন)

ইংল্যান্ড : ২১২ রান (পিটার রিচার্ডসন ৬২ এবং টেড ডেক্সটার ৫৭ রান। সেলিম দুরানী ৪৭ রানে ৫, চান্দু বোরদে ৬৫ রানে ৪ এবং রঞ্জানে ৫৯ রানে ১ উইকেট)

১ম দিন (৩০শে ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ—২২১ রান (৫ উইকেটে)। জয়সীমা ১২ রান এবং বোরদে ১৫ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

২য় দিন (৩১শে ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৮০ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ১০৭ রান। পিটার পারফিট ১০ রান এবং টেড্ ডেক্সটার ১১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিনের খেলা (১লা জানুয়ারী, ১৯৬২) : ২১২ রানে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট পড়ে ১০৬ রান। পতৌদির নবাব (২৪ রান) এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (৪ রান) নট-আউট আছেন।

ক'লকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলা গত ৩০শে ডিসেম্বর আরম্ভ হয়েছে। পাঁচদিনের খেলার তিনদিন গত হয়েছে। ২রা জানুয়ারী বিশ্রামের দিন। খেলা পুনরায় আরম্ভ হবে ৩রা জানুয়ারী এবং শেষ হবে ৪ঠা জানুয়ারী।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক টসে জয়লাভ করেন। কিন্তু এই জয়লাভের পুরো সুযোগ প্রথমদিন ভারতবর্ষ নিতে পারেনি। প্রথমদিনের খেলায় ৫ উইকেট পড়ে মাত্র ২২১ রাণ ওঠে। খেলার দোষে এবং ইংল্যান্ডের কড়া ফিল্ডিংয়ের দরুণ ভারতবর্ষের রাণ সংখ্যা কম ওঠে। দ্বিতীয় দিনের ১৬০ মিনিটের খেলায় বাকি ৫ উইকেটে ১৫৯ রান উঠে প্রথম ইনিংস ৩৮০ রাণে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট পড়ে ১০৭ রাণ দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং কোন সময়েই উন্নত পর্যায়ে ওঠেনি। খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২১২ রাণে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ১৬৮ রাণে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে বেলা ১টা ২৫ মিনিটে।

১৬৮ রাণে এগিয়ে থেকেও ভারতবর্ষ সমীহ ক'রে খেলেছে। ভারতবর্ষের ১০২ রাণ পূর্ণ হয় ১৬০ মিনিটের খেলায়। তৃতীয় দিন খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ে ভারতবর্ষের রাণ দাঁড়ায় ১০৬ (৩ উইকেটে)।

খেলা শেষ হ'তে পুরো দু'দিন বাকি। উপস্থিত ভারতবর্ষ ২৭৪ রাণে এগিয়ে আছে। হাতে জমা আছে ৭টা উইকেট। অপরদিকে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের পুরো খেলা বাকি। তৃতীয় দিনের শেষে খেলার যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা একেবারে অসম্ভব নয়।

প্রথম দিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার কিছু কম সময়ের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ২২১ রান ওঠে, ৫টা উইকেট পড়ে। দলের ৬ রানের মাথায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরি কণ্ট্রাক্টর মাত্র ৪

চতুর্থ টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে টনি লক মাটিতে পড়ে চমৎকারভাবে পতৌদির নবাবের ক্যাচ লুফেছেন

রান ক'রে বোল্ড-আউট হ'ন। মেহেরার সঙ্গে ২য় উইকেটে জুটি বাঁধেন মঞ্জরেকার। দলের ৫০ রানের মাথায় আউট হ'ন মঞ্জরেকার, নিজস্ব ২৪ রান ক'রে। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৭৪, ২টো উইকেট পড়ে। তখন উইকেটে ছিলেন মেহেরা (৩২) এবং পতৌদির নবাব (১২ রান)। দলের ১৪৫ রানের মাথায় মেহেরা ৬২ রান ক'রে লকের বলে পারফিটের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হ'ন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৬২, ৩টে উইকেট পড়ে। এই সময় পতৌদির নবাব ৫৭ রান এবং উমরীগড় ১১ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন। দলের ১৮৫ রানের মাথায় পতৌদির নবাব এ্যালেনের বল মেরে মাটি থেকে সামান্য উ'চুতে একটা ক্যাচ তুলেন। কেউ ভাবতেই পারেননি, সেই বল কেউ ধরবেন। কিন্তু লক চোখের পলকে অতি তৎপরতার সঙ্গে মাটিতে বলটা পড়বার আগেই ধরে ফেলেন। তার ঠেলা সামলাতে লককে মাটিতে পড়ে ঘুরপাক খেতে হয়েছে কয়েকবার। পতৌদির নবাবকে হারানোর দুঃখ ভুলে গিয়ে সারা মাঠের লোক লকের বাহাদুরির তারিফ করলেন। পতৌদির নবাব তাঁর ৬৪ রানে ১১টা বাউন্ডারী মেরেছিলেন। উমরীগড়ের সঙ্গে জয়সীমা খেলতে নামেন। এই জুটি বেশী রান তুলতে পারেনি। ৯ রান যোগ হওয়ার পর দলের ১৯৪ রানের মাথায় উমরীগড় এ্যালেনের শেষ বলে স্কোয়ার লেগে ক্যাচ তুলেন। ডেভিড স্মিথ সেই ক্যাচ ধরে ফেলেন। উমরীগড় ৭২ মিনিট খেলে তাঁর ৩৬ রানে ৮টা বাউন্ডারী মারেন। তাঁর শূন্য-স্থানে খেলতে নামেন বোরদে। লকের বলে বোরদে বাউন্ডারী মারলে ভারতবর্ষের ২০১ রান পূর্ণ হয়, ২৮৩ মিনিটের খেলায়। দলের ২২১ রানের মাথায় জয়সীমা উইকেটের ওপর ছায়া পড়ায় খেলা বন্ধের জন্যে আবেদন জানান। ইংল্যান্ডের অধিনায়কের সম্মতি-ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের ৬ মিনিট আগেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। জয়সীমা (১২ রান) এবং বোরদে (১৫ রান) নট-আউট থাকেন। ভারতবর্ষের এই দিনের ২২১ রানের মধ্যে বিজয় মেহেরা (৬২) এবং পতৌদির নবাব (৬৪) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১২৬ রান করেন। টসে জয়লাভ করেও ভারতবর্ষ তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারেনি। রান খুবই ধীর পদক্ষেপে উঠেছে এবং খেলায় জয়লাভের পক্ষে এই ধরনের রানের হার মোটেই যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষ তার বাকি ৫টা উইকেটে ১৫৯ রান করে ১৬০ মিনিটের খেলায়—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এক রান হিসাবে রান তুলে। শেষ উইকেটের জুটি রঞ্জনে এবং দেশাইয়ের খেলায় দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পায়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৩১০, ৬টা উইকেট পড়ে। দলের ২৫৯ রানের মাথায় পূর্ব দিনের নট-আউট খেলোয়াড় জয়সীমা ৩৭ রান ক'রে বিদায় নেন। লাঞ্চের সময় উইকেটে ছিলেন বোরদে (৬৫) এবং দুরানী (১৪ রান)। বসন্ত রঞ্জনে এবং রামকান্ত দেশাই ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের ২৩ রান তুলে দেন। ইংল্যান্ড দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পান ডেভিড এ্যালেন, ৬৭ রানে ৫টা।

এই দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, দলের ৩১৪ রানের মাথায় বোরদের রান-আউট। দুরানী এবং বোরদে একই দিকের উইকেটে দাঁড়িয়ে, লক বোলিং সাইডের উইকেট ভেঙে বোরদেকে রান-আউট করেন।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলা : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে পতৌদির নবাব ইংল্যান্ডের বেরী নাইটের বলে 'হুক' করতে গিয়ে বিফল হন এবং ব্যাটের হাতল দিয়ে বলটা উইকেট থেকে অনেক দূরে উ'চুতে তুলেছেন। ইংল্যান্ডের উইকেট-কীপার মিলমান ঝাঁপিয়ে পড়ে দূরের বলটা ধরতে চেষ্টা করছেন। বলটা নিরাপদেই মাটিতে আশ্রয় পায়।

ইংল্যান্ড এই দিন ১৬০ মিনিটের খেলায় ৩টে উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০৭ রান করে। এই দিন দলের সর্বোচ্চ ৬২ রান করার কৃতিত্ব পিটার রিচার্ডসনের। উইকেটে নট-আউট থাকেন পিটার পারফিট (১০ রান) এবং টেড ডেক্সটার (১১ রান)। অসুস্থ থাকার দরুণ দলের খ্যাতনামা নির্ভরশীল ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার দলভুক্ত হননি। তাঁর অভাবে দলের শক্তি হ্রাসই শুধু হয়নি, দর্শকরা তাঁর খেলা দেখতে না

সেলিম দুরাণী

পেয়ে হতাশ হয়েছেন। যে ব্যারিংটন আলোচ্য টেস্ট সিরিজের প্রতি টেস্টে সেঞ্চুরী ক'রেছেন তিনি এই দিনে মাত্র ১৪ রান ক'রে বিদায় নেন। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং ভাল হ'লে এইদিন কয়েকজনকে আরও কম রান নিয়ে বিদায় নিতে হ'ত।

তৃতীয় দিন লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান গিয়ে দাঁড়ায় ২০৩, ৬টা উইকেট পড়ে। টেড ডেক্সটার (৫৬ রান) এবং ডেভিড এ্যালেন (১১ রান) নট-আউট থাকেন।

লাঞ্চের পরের ২৬ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ডের বাকি চারজন খেলোয়াড় আউট হয়ে যান মাত্র ৯ রান যোগ ক'রে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ২১২ রান ওঠে, মোট ২৭৭ মিনিটের খেলায়। এই দিন সেলিম দুরানী ৪টে উইকেট পান। লাঞ্চের পরবর্তী খেলায় দুরানী মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের ৩ জনকে আউট করেন ৪·২ ওভার বলে মাত্র ৭ রান দিয়ে। এই ৪·২ ওভারের মধ্যে তাঁর ২টো মেডেন ওভার ছিল। তৃতীয় দিনের খেলায় চান্দু বোরদে ৩টে উইকেট পান। দুরানী এবং বোরদের মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস এত অল্প রানে শেষ হয়।

ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রান করেন পিটার রিচার্ডসন (৬২) এবং অধিনায়ক টেড ডেক্সটার (৫৭ রান)। তৃতীয় দিনের খেলায় দলের ২০৮ রানের মাথায় ডেক্সটার বোরদের বলে বোল্ড-আউট হ'ন। ডেক্সটার ১৪৫ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী মারেন।

বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয় ১টা ২৫ মিনিটে।

ভারতবর্ষ ১৬৮ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই অবস্থায় খেলার গতি ভারতবর্ষের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের খেলার দোষে চতুর্থ টেস্ট খেলার মোড় আজ ঘুরে গিয়ে বিগত তিনটি টেস্ট খেলার পথ ধরেছে। অর্থাৎ অমীমাংসিত ফলাফলের পথ। অনেকের এই রকমই ধারণা। ক্রিকেট খেলায় নিশ্চয় ক'রে কিছু বলার মত মুর্খতা আর নেই।

চান্দু বোরদে

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের খেলায় ৩৯ রানে প্রথম আউট হ'ন কণ্ট্রাক্টর, মাত্র ১১ রান ক'রে। জয়সীমা ৩৬ রান ক'রে দলের ৫৫ রানের মাথায় বোল্ড-আউট হ'ন। ৩য় উইকেটে জুটি বাঁধেন মঞ্জরেকারের সঙ্গে পতৌদির নবাব। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৫৫, ২ উইকেটে। মঞ্জরেকারের রান তখন ৪ এবং পতৌদির নবাব তখনও রান করেননি। দলের ১০২ রানের মাথায় মঞ্জরেকার তাঁর ২৭ রান ক'রে লকের বলে ষ্টাম্পড হ'ন। তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষের ৩টে উইকেট পড়ে রান দাঁড়িয়েছে ১০৬। পতৌদির নবাব (২৪ রান) এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (৪ রান) নট-আউট আছেন।

ভারত বনাম ইংলণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে সেলিম দুরাণীর বলে পারফিট ক্যাচ তুললে ভারতের অধিনায়ক নরি কন্ট্রাক্টর সেই বল ফেলে দিয়েছেন। এই সময় পারফিট ১০ রাণ করেছিলেন। ছবির বামদিকে নরি কন্ট্রাক্টর।

॥ ডেভিড কাপ ॥

১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় ইটালীকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া এই নিয়ে ১৮ বার ডেভিস কাপ জয়ী হ'ল—নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুগ্মভাবে অস্ট্রেলেসিয়া নামে ৭ বার এবং একক অস্ট্রেলিয়া নামে ১১ বার। ১৯৪৬ সাল থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী কালের প্রতি-যোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার জয় ১০ বার এবং আমেরিকার জয় ৬ বার। গত ১৬ বছরের (১৯৪৬-১৯৬১) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রে-লিয়া এবং আমেরিকা খেলেছে ১৪ বার। এবং অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালী ২ বার। এই হিসাব থেকে দেখা যায় লন্ টেনিস খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসীপের সমতুল্য ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এক-টানা খেলেছিল ১৪ বার এবং অস্ট্রেলিয়া এই সময়ের মধ্যে ডেভিস কাপ পেয়েছে ৮ বার এবং আমেরিকা ৬ বার।

অস্ট্রেলিয়া যেমন আধুনিক কালের ক্রিকেট খেলার বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান তেমনি লন্ টেনিস খেলাতেও।

১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ প্রতি-যোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় ইটালীকে পরাজিত ক'রে যুদ্ধ-পরবর্তী কালের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এই নিয়ে ৩ বার ৫—০ খেলায় জয়ী হ'ল—১৯৫৫-৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকে এই সময়ের মধ্যে আমেরিকা ৫—০ খেলায় জয়ী হয়ে ডেভিস কাপ পেয়েছে ২ বার —১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০ সালের ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় জয়ী হয়ে ডেভিস কাপ জয় করেছিল এবং এ বছর অস্ট্রেলিয়া একটা সেটেও পরাজিত না হয়ে ৫—০ খেলায় জয়ী হয়েছে।

॥ এম সি সি বনাম সার্ভিসেস ॥

এম সি সি : ৩৩৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পারফিট ১১২, বারবার ৫৮ এবং ডেক্সটার ৫৮ রান। রমেশ ৫৪ রানে ৪ এবং দানি ৫১ রানে ২ উইকেট)।

সার্ভিসেস : ১৭২ রান (দাণ্ডেকার ৬৯। হোয়াইট ৪২ রানে ৫ এবং নাইট ৫২ রানে ২ উইকেট)। ও ১৩০ রান (দেওয়ান ৩৭ এবং দানি ৪০ নট আউট। হোয়াইট ৩২ রানে ২ এবং নাইট ৭ রানে ৪ উইকেট)।

ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে এম সি সি বনাম সার্ভিসেস দলের তিনদিনের খেলায় এম সি সি দল এক ইনিংস ও ৩৭ রানে জয়লাভ করে। এবারের ভারত সফরে এম সি সি দলের এই তৃতীয় জয়। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—১২টা খেলা, জয় ৩, খেলা ড্র ৯, হার ০।

প্রথম দিনের খেলায় এম সি সি দলের ৯টা উইকেট পড়ে ৩৩৯ রান ওঠে। সার্ভিসেস দলের বোলিংয়ে বিশেষ কোন ধার ছিল না। দলের ৩২ রানের মধ্যে রিচার্ডসন এবং পুলার আউট হয়ে যান। তখন অনেকেরই ধারণা হয় সার্ভিসেস দলের বোলিংয়ে বুঝি অনেক কিছু সারবস্তু আছে; কিন্তু খেলার দৌড় ঐ পর্যন্তই। এম সি সি দলের ন্যাটা খেলোয়াড় পিটার পারফিট সেঞ্চুরী (১১২ রান) করেন। ডেক্সটার ৫৮ রান ক'রে আউট হলেও তাঁর ব্যাটিং দর্শনীয় হয়েছিল। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৯৫, ২ উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন খেল-ছিলেন বারবার (৩০ রান) এবং পারফিট (৩৫)। চা-পানের সময় দেখা গেল, আরও ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে রান দাঁড়িয়েছে ২৭৩ রান (৫ উইকেটে)। চা-পানের বিরতির পর তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে দলের উইকেটও পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় দলের রান ৩৩৯ (৯ উইকেটে)। পাঁচ ঘন্টার খেলায় ভাল রানই দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় এম সি সি আর ব্যাট করেনি, পূর্বদিনের ৩৩৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। যে অনিশ্চিত ফলাফলের জন্যে ক্রিকেট খেলার বিশেষত্ব তার দৃষ্টান্ত এইদিন পাওয়া গেল। আড়াই ঘন্টার খেলায় সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৭২ রানে শেষ হয়ে যায়। দলের ১৪৫ রানের মাথায় চারজন আউট হয়—দানি (৫ উইকেট), সুরেন্দ্রনাথ (৬ষ্ঠ উইকেট), মুদিয়া (৭ম উইকেট) এবং রমেশ (৮ম উইকেট)। লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ১৪৫ (৪ উইকেটে)। লাঞ্চের পরে প্রথম ওভারে হোয়াইটের ৫টা বলে চারটে উইকেট পড়ে। এই হোয়াইটের ও... খেলার প্রথম দিকে সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়রা মেরে ছাতু করেছিল হোয়াইটের এক ওভার বলে দণ্ডেকার ১৯ রান এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন।

ঠিক যে সময়ে দেখা গেল, সার্ভিসেস দল অমীমাংসিত ফলাফলের দিকে খেলার মোড় ঘুরিয়েছে তখনই দলে দারুণ ভাঙ্গন হ'ল। লাঞ্চের সময় দলের যে স্কোর ছিল ১৪৫ (৪ উইকেটে), সে রান গিয়ে দাঁড়াল ১৪৬, ৮টা উইকেট পড়ে। এই যে এক রান যোগ হ'ল তাও বল মেরে নয়, হোয়াইটের নো-বল থেকে।

হোয়াইটের দুর্ভাগ্য যে, তিনি দু'বার অল্পের জন্যে 'হ্যাট-ট্রিক'-এর কৃতিত্ব লাভ করতে পারেননি। দলের এই দারুণ ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়াল ৯ম উইকেটের জুটি ওয়াস্তি এবং ওয়ালসন। এ'দের এই জুটিতে দলের ২৭ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিনের সকাল দিকের খেলায় হোয়াইট ৩৩ রান দিয়ে কোন উইকেটই পাননি। সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংসের খেলার শেষে দেখা গেল, হোয়াইট ৪২ রানে ৫টা উইকেট পেয়ে-ছেন। ৪·২ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে হোয়াইট ৫টা উইকেট পান।

সার্ভিসেস দলকে ১৬৭ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে হয়। এই দিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও সার্ভিসেস দল খুব খারাপ খেলার পরি-চয় দেয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, ৫টা উইকেট পড়ে দলের মাত্র ৯৪ রান উঠেছে।

তৃতীয় দিনে মাত্র এক ঘণ্টার খেলায় সার্ভিসেস দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৩০ রানে শেষ হয়ে যায়। নাইট মাত্র ৭ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হওয়াতে দর্শকরা মনে সোয়াস্তি পায়।

অমীমাংসিত ফলাফলের ওপর লোকের অরুচি ধরে গেছে। সার্ভিসেস দলের পক্ষে খেলায় এ পরাজয় অগৌরবের হয়নি। যেভাবে ক্রিকেট খেলা উচিত সার্ভিসেস দল তারই স্থাপন করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনায় সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১ গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২ ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৬শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 12th January, 1962.
40 Naya Paise.

যখন আমরা একমাত্র ইডেন উদ্যানের দিকেই উত্তেজিত প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছি, ততক্ষণে বাঙলাদেশের দৃষ্টির প্রায় অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণপুরীর বিশৃঙ্খলা এবং বিহারের 'হিরো ওয়ারশিপ' পর্ব সমাধা হয়ে গেছে। নেহরুজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠির দ্বারা প্রতিহত হয়েছেন এবং জনতার আলিঙ্গনাকাঙ্ক্ষী নেহরু তাঁর কন্যার নির্বন্ধাতিশয্যে (প্রাণ-বিসর্জন থেকে) নিবৃত্ত হয়েছেন!

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দর্শনাকাঙ্ক্ষার এই আতিশয্যের দ্বারা কংগ্রেসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বিপন্ন এবং জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে অবলুপ্ত হয়েছিল। বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জন্য যে, সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সম্মুখে ছিল গোয়া-মুক্তির ফলাফল, পশ্চিমী শক্তির উষ্মা এবং পাঁচ বৎসরের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলির কোনোটিই যথাযথভাবে পালিত হয়নি।

তথাপি এই সম্মেলন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করেছে। একথা অনেকেই জানেন যে, বিহারে সম্প্রতি স্বতন্ত্র দলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছিল। প্রচ্ছন্ন এই জন্য যে, সরাসরিভাবে স্বতন্ত্র দল বিহার অঞ্চলে কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা অর্জন করেননি। কিন্তু স্বতন্ত্র দলের বক্তব্য এবং রক্ষণশীল নীতি কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক কর্মীকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করছিল। এই প্রভাব বিস্তারের পিছনে, বলাই বাহুল্য অতীতের জমিদারতন্ত্র এবং গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে।

কাজেই স্বতন্ত্র দলের রক্ষণশীল প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে নেহরুজী এখানে একটি জোরালো বক্তৃতা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র দলের লোকেরা নন, তাঁদের দ্বারা বশীভূত কংগ্রেস কর্মীরা। নেহরুজী এ'দের উদ্দেশে জোরালো ভাষায় বলেছেন যে, কংগ্রেস যে সমাজতন্ত্রের পথ অবলম্বন করেছে তা থেকে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আজিকার বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পথ ছাড়া অগ্রগতির আর কোনো পথ নেই। ভিন্ন মতাবলম্বীদের সতর্ক করে দিয়ে পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে, তাঁরা তল্পি-তল্পা গুটিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার কোনো পরিবর্তন ঘটানো হবে না। সুদীর্ঘকাল পরে—প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৫ সালে আবাদী প্রস্তাবের পরে, পণ্ডিত নেহরু কখনো কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে এমন দৃপ্ত ভাষায় নিজের চিন্তাধারা প্রকাশ করেননি।

এই ঘোষণা জনসাধারণের পক্ষে যেমন আশাব্যঞ্জক, নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষেও এই ঘোষণা প্রতিষেধকরূপে কাজ করবে। গত ১০ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিমাণ (মোট নিয়োজিত মূলধনের) শতকরা দেড় ভাগ থেকে শতকরা প্রায় সাড়ে আট ভাগে উন্নীত করেছেন; মূল এবং ভারী শিল্পগুলি এবং বিশেষভাবে বিদ্যুৎ, ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে; অধিকাংশ রাজ্যে জমিদারীর বিলোপ সাধন করা হয়েছে এবং ভূসম্পত্তির উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য হয়েছে; এবং ভবিষ্যতে এই সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি আরও অগ্রসর করা হবে, যাতে জাতীয় মূলধন মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে বেরিয়ে এসে বহুর মধ্যে বিস্তৃত হয়—এর ইঙ্গিত নির্বাচনী ইস্তাহারে যেমন আছে, তেমনি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রেড্ডির বক্তৃতায়ও আছে।

একথা সহজেই অনুমেয় যে, এই গতিবেগ রোধ করার জন্য পুরাতন এবং কায়েমী স্বার্থগুলি বর্তমানে সংঘবদ্ধ হতে চাইছেন। যেহেতু তাঁদের ইচ্ছা এবং স্বার্থকে কার্যকর করার দ্বিতীয় কোনো উপায়ান্তর, অর্থাৎ কোনো দ্বিতীয় শক্তিশালী দল ভারতবর্ষে নেই, সেইজন্য তাঁরা (স্বতন্ত্র দলের সাইনবোর্ড বা প্রচার মহিমা বজায় রাখলেও) আসলে কংগ্রেসের লবী মহলকেই প্রভাবিত করতে চাইবেন। ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথে কংগ্রেস ছাড়া আপাতত অন্য কোনো পথ নেই, রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো লোক একথা স্বীকার করবেন। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অংশগুলিকে নির্বিঘ্ন রাখা এবং শক্তিশালী করে তোলা প্রধানত পণ্ডিত নেহরুরই দায়িত্ব। এই ভূমিকায় তিনি যত বেশী দৃপ্তভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন, জনতার প্রগতিবাদী অংশ তাঁকে তত সমর্থন করবে।

কবিতা
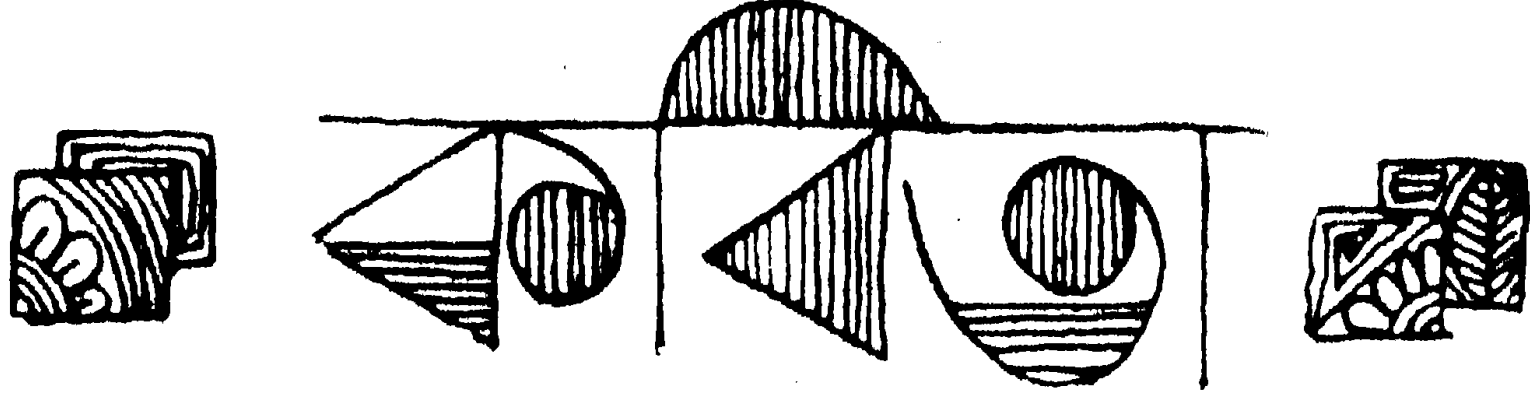
চূর্ণ পদাবলী

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ

রাত্রি, দিন, আকাশ, নদী, বাগান, মাঠ বন,
সাগর গিরি দেখেছি সব ; সবের চেয়ে যা অভিনব
মানুষ দেখে পাইনি সীমা, সত্যি অতুলন।

প্রথম প্রেম

একটি আশ্চর্য কথা হঠাৎ কী ক'রে যাই পেয়ে
জীবনের কোনো বাঁকে, আপ্তবাক্য যেন এক করি আবিষ্কার
সব চেয়ে প্রথমা যে সব চেয়ে শেষ সেই মেয়ে।

ট্রেনের জানলায়

দ্রুত মাঠ। ধুম্র হাওয়া। মুহুর্মুহু
দৌড়ের টেলিগ্রাফ-পোস্ট।
ঝাপসার পাহাড় দূরে। শ্যাম বনরেখা-ঘেরা
পাখি-ওড়া দিগন্ত বলয়।
সকাল ভাঙছে পূবে, এঞ্জিনগন্ধী
হাওয়া মাথে শুয়ে চিল্কার কোস্ট।

কথাবিলাস

সিলিঙে ঘুরছে পাখা, টেবিলে
সম্বৃত আলো নীল শেডে ঘেরা—
কবির কলমে নদী, ঝিরিঝিরি হাওয়া,
মাঠ, সীমাহীন আকাশের কথা ;
ত্রিসীমায় মাঠ নেই, কাব্যে তবু
প্রেম করে মেঠো মানুষেরা।

দুই পথ

সৌধের অরণ্যে ঘুরে নগরীর ক্লান্ত
পথ শেষ করে পাড়ি
বিশীর্ণ গলির প্রান্তে ; দেয়ালে দরন্ত বাধা।
অথচ প্রত্যুতপক্ষে
কতো অল্পে গ্রাম্য পথ হয়ে যায় দিগন্তসঞ্চারী।

রেলিঙে রুলির হাত

ময়লা হয়েছে আলো—ভরসন্ধ্যা—
ছায়ার রচনা দিকে দিকে—
নির্জন বারান্দা। বাজে উৎপলার গান—
আলো জ্বলে ওঠে তেতলা বাড়িতে ;
সব ছবি মুছে গিয়ে রেলিঙে
রুলির হাত আছে দেখি টি'কে!

অসময়ে

প্রেম খুঁজে প'য়ত্রিশে লিলি পরে
আজো তার শাড়ি কামরাঙা।
এরা ওরা আসে যায় 'নেতি নেতি'
বাতলায় দেখা যায় শেষে একদিন
জীবনের জানলায় প্রেম এলো
পারাবত এক ডানা ভাঙা।

বৃষ্টির পরে

বৃষ্টি গেছে। জল জমেছে। পোথো ছেলের ফূর্তি।
জাগলো ডাঙা পথের বাঁকে রিক্সওয়ালা দ্বিগুণ হাঁকে
মেঘের আড়ে সূর্য আসে মুণ্ডহীন মূর্তি।

লিরিক

প্রাণের প্রাণের তুমি, গানের
গানের তুমি পূরবী পরজ।
প্রেমের কবিতা গড়ি, প্রেমের কবিতা ভাঙি,
একরাশ শব্দ থেকে দেখি
বেরিয়ে এসেছে কে ও অর্থ হয়ে
প্রাণপূর্ণ উত্তাপে সহজ।

সতী

কন্যা ডাকে—সাধ্বী মাগো। পুত্র ডাকে—লক্ষ্মী।
স্বামী ডাকেন—প্রতিপ্রাণা। লোপাট
করেও ইতিহাসের পাতা
গিনি বয়ে বেড়ান মনে
গত দিনের অ্যাডাল্টারির ঝক্কি।

দূর্বদণ্ড

জৈমিনি

জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার শিশুরা। কারণ এরাই বড় হ'য়ে উঠে তাদের মাতৃভূমিকে নতুন গৌরবের অধিকারী করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রথম থেকেই যে-রকম অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয় তাতে আশঙ্কা জাগে যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির সমস্ত ইমারতটাই হয়তো একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, শিক্ষাই হল জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু একটি শিশুকে শিক্ষিত করে তোলার পথে কী প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক! কলকাতার মতো শহরে যেখানে কেবল বাংলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত, সেখানে নতুন শিক্ষার্থী এইসব শিশুদের নিয়ে ইস্কুল সীজনের শুরুতে প্রায় প্রত্যেক অভিভাবককেই কী ভাবে নাজেহাল হ'তে হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

প্রত্যেক ইস্কুলেই নতুন ছাত্রকে ভর্তি করার জন্যে অ্যাডমিশন টেস্টের ব্যবস্থা আছে। একেবারে প্রাথমিক শ্রেণীর এই ধরনের টেস্টে মা এবং বাবার হাত ধরে পাঁচ ছ' বছর বয়সের বিস্মিত, হতবাক মানবশিশুরা ইস্কুল নামক নতুন একটি জায়গায় গিয়ে যে-রকম কঠিন অভিজ্ঞতা-লাভ করে তাতে শিক্ষার নামে তাদের মনে যদি আতঙ্ক ও আক্রোশ জন্মে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

অ্যাডমিশন টেস্টের বিষয়ে কয়েকটি কথোপকথন শোনার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আমার হ'য়েছিল। তা থেকে অবস্থাটির মর্মচিত্র উদ্ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা।

এক নম্বর দৃশ্যের ঘটনাস্থল কোনো বহুল বিজ্ঞাপিত ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের আফিস সংলগ্ন বারান্দা।

অপেক্ষমান নারী-পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা শ দুয়েক।

একজন মহিলা। (পার্শ্ববর্তিনীকে) আপনার হ'য়ে যাবে। মিস্টার সেন যখন বলে দিয়েছেন—।

দ্বিতীয় মহিলা। (উদ্বেগের সঙ্গে) না ভাই, মিস্টার সেন শুনলাম সেক্রেটারীর অপোনেণ্ট পার্টির লোক। কী যে হয়!

১ম মহিলা। হ'য়ে যাবে। আপনার ছেলে তো বুদ্ধিমান। আমার আবার হ'য়েছে কি জানেন, পরীক্ষার ঠিক আগেই ওর আবার জ্বর হল কিনা!

২য় মহিলা। (কাষ্ঠ হাসি হেসে, ঈষৎ অবিশ্বাসের সুরে) বাচ্চারা এক-আধটু গা গরম হলে কেয়ার করে না। কিন্তু আমার যা অবস্থা হ'য়েছিল! টেস্টের এক মাস আগে থেকে বাড়ীতে এক গাদা গেস্ট এল। ছেলেটাকে পড়াতেই বসাতে পারলুম না।

১ম মহিলা। (কাষ্ঠ হাসি হেসে, সমান অবিশ্বাসের সুরে) আগে যা পড়েছে তাতেই হবে! ঐ বোধহয় রেজাল্ট বেরোল......! (সবেগে ধাবিত)

দ্বিতীয় দৃশ্য মোটর গাড়ীতে। স্বামী ড্রাইভ করছেন, ছেলে কোলে করে স্ত্রী পাশে বসে।

স্বামী। মিছিমিছি অফিস নষ্ট হল। (ক্ষণিক বিরতি) আমার মনে হয় খোকনের বদলে তোমারই আবার ভর্তি হওয়া উচিত।

স্ত্রী। (অনামনস্ক ভাবে) অ্যাঁ—

স্বামী। তা নয়তো কি। এক বছর ধরে তো পড়াচ্ছো। শিখলটা কী?

স্ত্রী। (অপমান হজম ক'রে, কৈফিয়তের সুরে) একশ সাতাশী জনের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটা নিল। আমি কি করব?

স্বামী। (নাক দিয়ে হুঃ করে শব্দ-সহ) তোমার ছেলেটির উনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশ হ'তে বাধা ছিল কোথায়? যতো সব লেম এক্সকিউজ! (সজোরে গাড়ীর গীয়ার পরিবর্তন) আগেই জানতাম।

স্ত্রী। (তিক্ত বিদ্রূপে) জানতেই যদি তো বসে ছিলে কেন? নিজে পড়ালেই পারতে। কার কতদূর দৌড় আমার জানা আছে।

স্বামী। বাজে ব'কো না বোকার মতো। (ক্ষণেক বিরতি) বালীগঞ্জের ইস্কুলটার রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে?

স্ত্রী। পরশু।

স্বামী। খিদিরপুরের?

স্ত্রী। পনেরই।

স্বামী। কাল কি পার্ক স্ট্রীটের ইস্কুলটায় টেস্ট দেওয়াতে যাবে?

স্ত্রী। উপায় কি? এগুলো যদি না হয়?

স্বামী। (নিশ্বাস ফেলে) আর পারা যায় না বাপু। নিজের চাকরীর জন্যে এতো উমেদারী করিনি।

স্ত্রী। (তিক্ত হাসির সঙ্গে) তুমি তো আই এ এস পরীক্ষা দাওনি। খোকনের পরীক্ষা তার চেয়েও কঠিন!

খোকন। (নীরবতা ভঙ্গ করে) আমি আর পরীক্ষা দেব না মা।

স্বামী স্ত্রী (সমস্বরে) ছিঃ ও কথা বলে না বাবা।

খোকন। রোজ রোজ পরীক্ষা দিতে ভালো লাগে না।

স্বামী স্ত্রী (সমস্বরে) এইবারই ঠিক হ'য়ে যাবে।

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় "চায়ের ধোঁয়া" প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

সম্পাদক, অমৃত

খোকন। কিচ্ছু হবে না, আমি জানি সব ইস্কুল বাজে!

তৃতীয় দৃশ্য উন্মোচিত হয় একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইস্কুলের রেক্টারের ঘরে। বাংলার একজন যশস্বী সাহিত্যিক সামনের চেয়ারে বসে আছেন।

সাহিত্যিক। (ইংরাজীতে) মহাশয়, আমার ছেলের ব্যাপারটা একটু পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন?

রেক্টার। (বাংলাতে) আমার অন্তরে খুব দুঃখ হয় একথা বলিতে মিস্টার দস্তিদার, কিন্তু আমি অপারগ। আপনার পুত্র হতাশভাবে অকৃতকার্য হইয়াছে।

সাহিত্যিক। আচ্ছা, ক্লাস টু-তে না হোক, ক্লাস ওয়ানে তো নিতে পারেন।

রেক্টার। খুবই সন্দেহজনক। সে তো ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই!

সাহিত্যিক। কিন্তু ক্লাস টুয়ের পরীক্ষায় যে কিছু নম্বরও পেয়েছে সে কি ক্লাস ওয়ানে পারবে না মনে করেন?

রেক্টার। (সহাস্যে) কে বলিতে পারে? কোনো পরীক্ষাতেই তো পশ্চাৎ দিকের ফল ঘোষণা করে না। আপনি বারান্তরে চেষ্টা করিবেন।

সাহিত্যিক। (উঠে দাঁড়িয়ে) একটা বছর নষ্ট হ'ল আর কি!

রেক্টার। খুবই দুঃখের কথা। (বেয়ারাকে) মিসেস তফাদার—!

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। একই নাটকের পুনরাবৃত্তি প্রায় সর্বত্র। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ফলে তার ট্র্যাজিক পরিণতিটা কিছু তীব্রতর হ'য়ে ওঠে, এই যা পার্থক্য। কোনো কোনো অভিভাবিকা ইস্কুলে-ইস্কুলে ঘুরে শেষে চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে নিজের মরণ কামনা করেন। কোনো কোনো অভিভাবক ইস্কুলের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষকে জোচ্চোর ঘুষখোর বলে গালাগাল দিয়ে মামলা করবেন বলে শাসিয়ে যান।

কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত ঘটে না। দিন যেমন কাটছিল তেমনি কাটে। ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে। ইস্কুলের সংখ্যা যেন ছিল প্রায় তেমনি থাকে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে। ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে পরের বছর আবার অভিভাবক আর ইস্কুল-কর্তৃপক্ষের মধ্যে দড়ি-টানাটানি খেলা।

জাতি গঠনের জন্যে চারিদিকে অনেক কিছুই হচ্ছে আজকাল। কিন্তু যাদের নিয়ে একটা জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তাদেরই যে কীভাবে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা ভাবলে সব-কিছুই কেমন বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে।

এর কি কোনো প্রতিবিধান হ'তে পারে না?

প্রাচীন ভারতের অপরাধবিজ্ঞান

সুকুমার বসু ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি-শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি হইতে প্রাচীন ভারতের অপরাধ, অপরাধী, এবং দণ্ডনীতি সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে স্মার্ত পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ এবং টীকাকারগণের ভাষ্য ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সামাজিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং জীবনযাত্রাকে আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত মনীষী বিভিন্ন নীতি এবং বিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক, অস্তম্ভ, গৌতম, শুক্রাচার্য, কৌটিল্য, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ন, বিষ্ণু, বর্ধমান, বাৎস্যায়ন, চণ্ডেশ্বর, নারদ, মেধাতিথি, মিতাক্ষরা প্রমুখ পণ্ডিতগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত মনীষীগণের রচিত গ্রন্থগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়াব্দের সুরু হইতে চারিশত খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই রচনাগুলি ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটক, বিভিন্ন সংহিতা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি এবং বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয় যে, প্রাক্-বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নীতি এবং দণ্ড বিধানের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাক্-বৈদিক যুগের অবসান এবং বৈদিক যুগের সূচনার অন্তর্কালীন ইতিহাস আজ পর্যন্ত আলোচনা-সমালোচনার বিষয়বস্তু। বৈদিক সভ্যতার প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋক্‌বেদ। তৎকালীন দণ্ডনীতি সম্পর্কীয় নির্দিষ্ট কোন পুস্তকের সন্ধান না মিলিলেও বৈদিক স্তোত্রগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগের নৃপতিগণ অপরাধীর এবং অপরাধের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন এবং অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সচেতন ও তৎপর ছিলেন। গুপ্তচরগণের সহায়তায় সংবাদসংগ্রহের পদ্ধতি বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই যুগের রাজতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রজাকল্যাণ। স্বীয় রাজত্বকে ক্ষমতাশীল করিবার মানসে এবং রাজত্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার প্রয়াসে সেই যুগের নৃপতিগণ রাজসভার সদস্যবর্গের সহায়তায় এবং পরামর্শে নানা প্রকার নীতি ও বিধান প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার মুহূর্ত হইতে রাজ্যের অধীশ্বর ন্যায়দণ্ডের অধিকারী হইতেন। ন্যায়দণ্ড অর্থে পরমপুরুষ সৃষ্ট একটি বিশিষ্ট রক্ষাকারী ক্ষমতা বুঝায়। এই ক্ষমতা প্রজাদিগকে এবং প্রজাপালককে ধর্মপথে সংযুক্ত থাকিবার দিব্যদৃষ্টি দান করিত। ফলে রাজা ধর্মপথে থাকিয়া রাজত্ব পরিচালনা করিতেন এবং প্রজাগণ অন্যায় এবং অবিচার হইতে রক্ষা পাইতেন। রাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ এবং বিন্যাস ক্রমশঃ শাসনযন্ত্র ও শাসনতন্ত্রকে উন্নত করিয়াছিল। ফলে রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার পুরোহিত এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের কবলমুক্ত হইয়া একদল বিশেষজ্ঞ রাজনীতিবিদ্‌দের আয়ত্তে আসিল। ইঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করিলেন। এই সময় হইতে সকল পর্যায়ের অপরাধকেই রাজতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে ঘোষণা করা হইল। অপরাধের গুরুত্বভেদে বিভিন্ন পদ্ধতির দণ্ডের প্রবর্তন হইল। ক্রমশঃ সুসংবদ্ধ ও সুলিখিত দণ্ডনীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।

দণ্ডনীতি :

ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পরমপুরুষের অংশভূত দণ্ড বিভিন্ন রূপ (নীতি, স্বরস্বতী, দণ্ডনীতি প্রভৃতি) পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকে ধারণ করিতেছে। অসংযত, অবিবেচক এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের দমন করিবার উদ্দেশ্যেই দণ্ডের সৃষ্টি। মনুর মত-অনুযায়ী জাগ্রত এবং নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই প্রাণীকে রক্ষা করিবার এবং শাসন করিবার দায়িত্ব দণ্ডের। শুক্রাচার্যের মতে অসংযত মানুষকে সংযত করা দণ্ডদানের মূল উদ্দেশ্য। কৌটিল্যের মতে সম্পদ অর্জনে, সংরক্ষণে, বর্ধনে এবং যথাযথ ব্যবহারে দণ্ড মানুষকে সাহায্য করে। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণের দৃষ্টিভঙ্গীগুলি বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমাজের নিরাপত্তা রক্ষাই ছিল দণ্ডের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন—এই চারিটি প্রধান সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি রূপায়িত হইয়াছিল। সেই যুগে প্রতিশোধমূলক শাস্তির প্রচলন থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঐ শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ ছিল না। সাধারণভাবে অপরাধমূলক প্রবৃত্তিগুলির নিবৃত্তিই ছিল শাস্তিদানের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিরোধমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে কারাগার নির্মাণ এবং বিচারের ফলাফল জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার সুস্পষ্ট নির্দেশ মনু দিয়াছিলেন। ধর্মসূত্রেও আমরা এই নির্দেশের সমর্থন পাই। মনুর নির্দেশ-অনুযায়ী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ জনসাধারণকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে অপরাধীকে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের উপর দিয়া বিচারস্থলে আনয়ন করা উচিত এবং জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবেই বিচার ও দণ্ডের নির্দেশ ঘোষণা করা বিধিসঙ্গত ছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্তকে এই ভাবে দণ্ডদানের কাহিনী সেই যুগের প্রচলিত বিচারপদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। গুরু অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীর দৈহিক নির্যাতন প্রকাশ্যে করাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে অপরাধের পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন করা। স্বভাব-অপরাধীদের সমাজের দুষ্ট-ক্ষত বিবেচনায় মনু বিভিন্ন পদ্ধতির প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদনের (প্রতিশোধমূলক শাস্তি) নির্দেশ দিয়াছিলেন। শুক্রনীতিতেও এই মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

অপরাধীর চরিত্র পথ এবং স্বভাব সংশোধন করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিতে প্রায়শ্চিত্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। গৌতমের ধর্মসূত্রে উল্লিখিত আছে যে, গুরুর উপদেশ এবং প্রায়শ্চিত্ত এই দুইয়ের উদ্দেশ্য চিত্তের অনুশাসন। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, ব্যক্তি, পরিবার

ও জাতি বিশেষে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া নৃপতি এমন দণ্ড বিধান করিবেন যাহাতে ঐ ব্যক্তি দণ্ডাদেশ পালনের পর পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ধর্মপালন করিতে সমর্থ হয়। শুক্রনীতি অনুযায়ী দণ্ডের মাধ্যমে অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সৎ জীবনযাপন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই দণ্ডদাতার কর্তব্য। সেই যুগের মনীষীগণের মতে দণ্ডভোগের মাধ্যমে অপরাধী অপরাধোত্তর অনুশোচনা হইতে মুক্তি পায়। মনুর মতে যথোপযুক্ত দণ্ডভোগ করিবার পর অপরাধজনিত সমস্ত পাপ দূর হয় এবং পরবর্তী কর্মধারার সুকৃতির ফলে ঐ ব্যক্তি স্বর্গারোহণেরও যোগ্য হইতে পারে। রাজদণ্ড কোন অপরাধীকে অব্যাহতি দিলে দডভোগ না করিয়াই অপরাধজনিত পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব—মনুস্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতিতে এই মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে দণ্ডবিধান বা প্রয়োগ সম্পর্কীয় অনধিকার চর্চা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। অপরাধী সম্পর্কীয় যাবতীয় মীমাংসার একমাত্র অধিকারী ছিলেন রাজা এবং তাঁহার রাজদণ্ড। রাজাকে দণ্ডের অধিপতি বলা হইত। দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা এবং প্রয়োজনবোধে অপরাধীকে ক্ষমা করিবার অধিকার রাজা ব্যতীত আর কাহারো ছিল না। বিচারকের কর্তব্য ছিল শুধুমাত্র দণ্ড বিধান করা। শুক্রনীতিতে কেবল মাত্র ধিক্‌দণ্ড এবং বাক্‌দণ্ডের সম্পূর্ণ অধিকার বিচারকের উপর ন্যস্ত করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে রাজা দণ্ডাধীন অপরাধীগণের মুক্তি দিবার অধিকারী ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৬১৮ অব্দে লিখিত ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে এবং পরবর্তী যুগে বৃহৎ সংহিতায় এই নির্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহার ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে পঁচিশবার অপরাধীদের মুক্তি দিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের অভিষেক দিবসটি তাঁহার রাজত্বে প্রতি বৎসর আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইত। বাণভট্টের হর্ষচরিতে সম্রাট হর্ষবর্ধন সম্পর্কে অনুরূপ কাহিনী লিখিত আছে। মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রে অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ আছে। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের উপর প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা পালনের পূর্বে জনৈক ঘাতকের বিবৃতি ঐ রীতির প্রচলন সমর্থন করে।

মনু এবং বিষ্ণুর নির্দেশ অনুযায়ী দুই শ্রেণীর অপরাধীদের কোন উপলক্ষেই মুক্তি দিবার অধিকার রাজার ছিল না। প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থায় এই নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হইত। এই দুইজন স্মার্তের মতে এই দুই শ্রেণীর অপরাধীকে ক্ষমা করিলে অপরাধজনিত পাপ রাজার উপর বর্তিত হইবে। মনুর মতে লুণ্ঠন, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা, প্রভৃতি বলপ্রয়োগজনিত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধী ক্ষমার অযোগ্য। ইহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে রাজা নিজেই অপরাধী হইবেন। বিষ্ণুর মতে স্বভাব অপরাধীও ক্ষমার অযোগ্য। অপরাধীর ক্ষমা প্রসঙ্গে এই বিধানটির সেই যুগে প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ কালিদাস, শূদ্রক প্রমুখ লেখকগণের লিখিত বিভিন্ন নাটকে এবং অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দণ্ডের মান নিরূপণ করিতেন। গৌতমের মতে দণ্ডাদেশের পূর্বে রাজা অপরাধীর কুলমর্যাদা, সামর্থ্য, উদ্দেশ্য এবং অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হইবেন এবং এই সমস্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতে বিচার করিয়া দণ্ডাদেশ দিবেন। বশিষ্ঠ-স্মৃতিতেও অনুরূপ নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব, ঘটনাচক্র এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার পরিস্থিতির উপর বিচারপদ্ধতি এবং দণ্ডাদেশ নির্ভরশীল। কৌটিল্যের মতে একই অপরাধের জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে একই শাস্তি প্রযুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। মনুস্মৃতির বিখ্যাত টীকাকার মেধাতিথির মতে মনু দণ্ডদানকালে রাজাকে অনুবন্ধ বিষয়ে সচেতন থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অনুবন্ধের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, আদিম প্রবৃত্তির স্থূলে ও অসামাজিক চরিতার্থতা, পানোন্মত্ততা, প্ররোচনা, ঘটনার বিকৃতি এবং অপরাধীর মানসিক বিন্যাস সম্পর্কে সেই যুগের নীতি-প্রণেতাগণ বিজ্ঞাত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতির টীকাকার মিতাক্ষরার মতে কেবলমাত্র উপযুক্ত বিষয়গুলির উপর দণ্ডবিধাতার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা সমীচীন নহে। ঐগুলি বিচারপদ্ধতির বিশেষ সহায়ক হইলেও দণ্ডবিধাতার দিব্যদৃষ্টিই দণ্ডের যথার্থ মান নির্ধারক। রাজা যেমন রাজদণ্ডের অধিপতি তাঁহার দিব্যদৃষ্টি অনুরূপভাবে তাঁহার বুদ্ধির অধিপতি। সুতরাং দিব্যদৃষ্টির সহায়তা ব্যতীত নির্ভুল দণ্ডাদেশ সম্ভব নয়। বর্ধমান প্রণীত 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থে তথ্য-সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। বর্ধমানের মতে তথ্য-সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় :

(১) জাতি—অপরাধীর কুলপরিচয়।

(২) দ্রব্য—অপরাধের বস্তু।

(৩) পরিমাণ—ক্ষতির, আঘাতের, হানির পরিমাণ।

(৪) বিনিয়োগ—পরিমাণের (৩) আনুমানিক বা যথার্থ মূল্য নির্ধারণ।

(৫) পরিগ্রহ—অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কে হইয়াছে ?

(৬) বয়ঃক্রম—অপরাধীর বয়স।

(৭) শক্তি—অপরাধীর সামর্থ্য (শারীরিক, মানসিক অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এবং আর্থিক)।

(৮) গুণ—অপরাধীর কর্ম বা পেশা।

(৯) দোষ—অপরাধ কোন্ শ্রেণীর এবং স্বভাব-অপরাধী কিনা ?

প্রাচীন ভারতের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির কোন স্থানেই অপরাধীর নির্জ্ঞাত নোদনাশক্তির কথা আলোচিত হয় নাই। অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই যুগের মনোবিজ্ঞানীগণ অপরাধ সম্পর্কীয় নীতি প্রণয়নে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির মধ্যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও সেই যুগের উন্নত মনোবিদ্যার বিশেষ কোনো অবদান স্বীকৃতি পায় না। কয়েকটি ক্ষেত্রে যে আভাষ পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নীতিপ্রণেতার দিব্যদৃষ্টির প্রকাশ মাত্র।

অপরাধ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ

অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে

প্রাচীন ভারতের নীতিপ্রণেতাগণ নির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের দেশব্যাপী বিন্যাসের নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই সংস্থা এবং ইহার অধীনস্থ কর্মীদের মাধ্যমে রাজার শাসনাধীন অঞ্চলগুলির আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা পাইত বলিয়া এই কর্মীগণের নামকরণ হইয়াছিল রক্ষী এবং ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মীদের বলা হইত আরক্ষক। বিভিন্ন গ্রন্থে চৌরদ্ধারনিক, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক, প্রমুখ কর্মচারীদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহারা সবাই ঐ রক্ষী-সংস্থাভুক্ত কর্মচারী। মনুস্মৃতিতে গ্রামীন রক্ষী-সংস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংস্থার কর্মীগণ গুল্ম নামে অভিহিত হইতেন। যাজ্ঞবল্কস্মৃতিতে আরক্ষকগণকে গ্রাহক নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই সূত্রে স্থানপাল ও স্থানিক নামকরণ বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানপাল বা স্থানিক প্রতিটি আঞ্চলিক রক্ষীকেন্দ্রের বা "স্থানের" (বর্তমানে থানা) দপ্তর পরিচালনা করিতেন।

অপরাধ প্রতিরোধকল্পে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি বিশেষের উপর আরক্ষকগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। প্রয়োজনবোধে এই সমস্ত প্রকৃতির ব্যক্তিদের অবরুদ্ধ করা হইত। (১) বৃত্তি বা উপজীবিকাহীন ব্যক্তি, (২) অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি, (৩) পতনোন্মুখ ধনী, (৪) বিপথগামী পুরুষ অথবা রমণী, (৫) সন্দেহজনক গতিবিধিযুক্ত পুরুষ অথবা রমণী, (৬) নিশাচর, মদাপ, লালসাযুক্ত পুরুষ, (৭) কাল্পনিক ভয়ে ভীত ব্যক্তি, (৮) গোপনে পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতা, (৯) স্বর্ণ বা অনুরূপ মূল্যবান দ্রব্যের গুপ্ত ব্যবসায়ী এবং (১০) স্বভাব-অপরাধী।

ব্যবসায় এবং গৃহস্থ ব্যক্তির সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধকল্পে রাজকর্মচারীর অনুমতি ব্যতীত এবং অপ্রকাশ্যে যে কোন মূল্যবান বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইত। রাত্রিকালে নগরে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার জন্য কৌটিল্য সান্ধ্য আইনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রতি রাত্রে আঞ্চলিক রাজকর্মচারীর দপ্তর হইতে বিশেষ ভেরীসংকেত ঘোষিত হইবার পর বিনা অনুমতিতে রাজপথে বিচরণ দণ্ডনীয় ছিল। প্রতি রাত্রে প্রত্যেক গৃহস্বামীর গৃহে অবস্থিতি অবশ্য কর্তব্য ছিল। অনুপস্থিতির কারণ ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক আরক্ষকের নিকট সন্তোষজনক না হইলে অথবা অনুমোদিত না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন। যাজ্ঞবল্কের মতে আরক্ষক ও রক্ষীগণের সংবাদ-সংগ্রহ নির্ভুল হইলে তাঁহারা পুরস্কৃত হইবেন নচেৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধেও যথোপযুক্ত দণ্ডাদেশ দান করা হইবে। কর্তব্য পালনে অক্ষমতা দণ্ডনীয় হওয়ায় সেই যুগে রাজকর্মচারীগণ স্বভাবতঃ কর্তব্যনিষ্ঠ হইতেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের আরক্ষ বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণ অনুযায়ী রাজধানী এবং শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল "প্রদেষ্টা"র উপর। প্রদেষ্টার অধীনে বহুসংখ্যক গোপ নিযুক্ত থাকিতেন। এই গোপ বা নগররক্ষীগণ রাজধানী এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের "স্থানে" স্থানিক বা স্থানপালগণের নির্দেশে আঞ্চলিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। গ্রামাঞ্চলে প্রতি দশটি গ্রামের জন্য একটি রক্ষীকেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল। এই কেন্দ্রগুলিকে সংগ্রাহণ বলা হইত। সংগ্রাহণের আরক্ষককে সংগ্রাহক নামে অভিহিত করা হইত। বিশটি সংগ্রাহণের পর্যবেক্ষণের ভার একজন খার্ভাতিকের উপর ন্যস্ত ছিল। দুইটি খার্ভাতিকের দপ্তর একজন দ্রোণমুখের তত্ত্বাবধানে থাকিত। গ্রামাঞ্চলে প্রতি স্থানপালকে দুইজন দ্রোণমুখের দপ্তর পরিচালনা করিতে হইত। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে একজন স্থানপালের উপর আট শত গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত ছিল।

আরক্ষ বিভাগ
শহর
গ্রাম
প্রদেষ্টা প্রদেষ্টা প্রদেষ্টা প্রদেষ্টা
স্থানপাল স্থানপাল স্থানপাল স্থানপাল স্থানপাল (আটশত গ্রাম) স্থানপাল
গোপ গোপ গোপ গোপ গোপ
দ্রোনমুখ (চারশত গ্রাম) দ্রোনমুখ
খার্ভাতিক (দুইশত গ্রাম) খার্ভাতিক
সংগ্রাহক (দশটি গ্রাম) ———→ মোট সংখ্যা বিশজন ←———

কর্মদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির ব্যাপ্তি অনুযায়ী আরক্ষকগণের অধীনে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিতেন। ইঁহাদের প্রধান অনুসন্ধান ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করা। অপরাধ অনুসন্ধান এবং অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য গুপ্তচরদিগের সাহায্যে সংগৃহীত হইত। আরক্ষকগণ গুপ্তচরের সাহায্যে অপরাধীর অবস্থান অপরাধমূলক কার্যগুলির প্ররোচকদের সন্ধান, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের গতিবিধি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। কাত্যায়ন-সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজার নিজস্ব গুপ্তচরগণকে সূচক নামে অভিহিত করা হইত। কাত্যায়নের সূত্রে এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের উল্লেখ পাওয়া যায়—এই স্বেচ্ছাসেবকগণ বিনা পারিশ্রমিকে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক সংবাদগুলি গোপনে রাজা অথবা রাজকর্মচারীকে সরবরাহ করিত। এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবকগণের নাম ছিল স্তোভক। কৌটিল্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংবাদ গোপনে সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন উপজীবিকাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই যুগে একদিকে যেমন পণ্ডিত, চিকিৎসক, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, গৃহী, ভিক্ষু, শিক্ষিতা বর্ষীয়সী বিধবা, ইত্যাদির গুপ্তচর হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় অনুরূপভাবেই কুব্জ, খঞ্জ, মূক, এবং যবন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর রূপোপজীবিনীদের গুপ্ত সংবাদ সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত করা হইত। প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরগণের সংবাদ সরবরাহের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। প্রয়োজনবোধে শিক্ষিত কবুতরের সাহায্যেও বার্তা প্রেরণ করা হইত। গবেষকগণের মতে

কৌটিল্যের গুপ্তচর সম্পর্কীয় রীতি-নীতিগুলি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী প্রশংসনীয়ভাবে উন্নত না হইলেও ঐ সময়ের সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী যুগোপযোগী ছিল। সেই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঐ সময়ের বিশেষজ্ঞগণ হত্যা অপরাধের জন্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিকে ঘটনার কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) নারীঘটিত বিসম্বাদ, (২) সম্পত্তিজনিত মতদ্বৈধতা, (৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোমালিন্য, (৪) শত্রুতামূলক মনোভাব, (৫) প্রতারণা, প্ররোচনা, ইত্যাদি বিষয়ক। উক্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি মনোমত না হওয়ায় ক্রোধের উৎপত্তি এবং ঐ ক্রোধের নিবৃত্তির পরিণতি হত্যা অথবা সমপর্যায়ের কোন অপরাধের মূল কারণ বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিতেন। রহস্যজনকভাবে কাহারো মৃত্যু ঘটিলে সেই যুগে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হইত :

(১) মৃত্যু সাধারণভাবে ঘটিয়াছে কি না?

(২) উহা আত্মহত্যা কি না?

(৩) উহা হত্যা কি না?

(৪) হত্যাকারী দস্যু-তস্করাদি না অন্য কোন প্রকারের শত্রু?

(৫) স্থানীয় অনুসন্ধান :

(ক) নিহত ব্যক্তির সহিত কাহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

(খ) নিহত ব্যক্তি হত্যার পূর্বে কোথায় ছিল?

(গ) হত্যার জন্য কাহাকে সন্দেহ করা যায়?

অর্থশাস্ত্রে শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকাকারগণ তাঁহাদের ভাষ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপরাধ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশে হত্যা-অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য নারীঘটিত, বৃত্তি ও সম্পত্তিজনিত ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষভাবে অনুসন্ধানের উল্লেখ আছে।

কৌটিল্যের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির গতিবিধি, অস্ত্রশস্ত্র, বন্ধুবান্ধব, প্ররোচক, আয়ত্তাধীন সম্পত্তি, বৃত্তি, প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য সংগ্রহকারীকে ছল, বল এবং কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্নের সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তির পদচিহ্নের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন সুগন্ধি বস্ত্রখণ্ড অনুসন্ধানের কার্যে বিশেষ সহায়ক। বিভিন্ন যৌন-অপরাধের অনুসন্ধান সম্পর্কেও সেই যুগের নীতি-গ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। নাবালিকা অথবা সাবালিকা, বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, এমন কি পতিতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসংগম সেই যুগে অপরাধ হিসাবে গণ্য হইত।

ছদ্মবেশে বসবাসকারী ব্যক্তি, সন্দেহজনক গতিবিধিযুক্ত ব্যক্তি এবং অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, অপব্যয়, বিলাসিতা ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির আর্থিক সংগতি সন্দেহ প্রমুক্ত হইলে ঐ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার নির্দেশ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কৌটিল্য বিশেষ শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনায় প্রাচীন ভারতের অপরাধ-বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ মূল্যবান তথ্যের সন্ধান। সেই যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণের প্রণীত নীতিগুলি বর্তমানের চিন্তাধারায় বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সেই যুগের নীতিগুলির প্রয়োগ-মূল্যের মান নির্ধারণ করিবার জন্য বিষদভাবে আলোচনা প্রয়োজন। সেই সময়ের মনীষীগণের প্রণীত অমূল্য গ্রন্থগুলির উপর অধুনা গবেষকগণের ধ্যান আনয়ন বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের অপরাধ ও অপরাধী বিষয়ক চিন্তাধারার রূপ-রেখায় লিখিত এই প্রবন্ধটি অতীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিবেশনের প্রয়াস মাত্র।*

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও রচনাগুলি হইতে বর্তমান প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে :

মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, শুক্রনীতি, মহাভারত (শান্তিপর্ব), রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরবসন্ত), দণ্ডবিবেক, ধর্মসূত্র, বশিষ্ঠস্মৃতি, মৃচ্ছকটিক, Hindu Judicial System (Varadachariar), Hindu Jurisprudence (Sen), Enclycopeadia of Religion and Ethics (Jolly), About theft in ancient India, (Sircar), Cal. Pol. Journal. Vol. I, Early Indian Concept of State, in relation to Justice and Espionage, (Sen), Cal. Pol. Journal Vol. I.

চাচী

বনফুল

অশোক দেব

আজকাল সহৃদয় মানুষের বড় অভাব। সকলেই আমরা নিজেদের অতি-সংকীর্ণ গন্ডীর ভিতর পশুর মতো বাস করিতেছি। হৃদ্যতা বজায় রাখিবার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। প্রথম উপকরণ অবশ্য মন। দিলদরিয়া মন চাই। কিন্তু অভাবের তাড়নায়, পরশ্রীকাতরতার উত্তাপে, স্বার্থ-কলুষিত রাজনীতির বিষে আমাদের দিলদরিয়া মন মরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় উপকরণ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য; অতিথিকে, বন্ধুকে, আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে আপ্যায়িত করিবার সামর্থ কই? এখন আমরা নিজেরাই খাইতে পাই না, নিজেরাই পরিতে পাই না। দিলদরিয়া হইতে হইলে তৃতীয় উপকরণ, স্থান। ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাস করিয়া দিলদরিয়া হওয়া যায় না। ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র খোপে বেশী দিন বাস করিলে মনটাও ছোট হইয়া যায়। এই সব কারনেই আজকাল বোধহয় সহৃদয় ব্যক্তির দেখা বড় একটা পাই না। সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটি অচেনা ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমার আত্মীয় তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমাকে ভাই রাত্রে থাকতে বলতাম, কিন্তু দেখছই তো দুটি মাত্র ঘর। খেতেও বলতে পারলাম না আমাদের রাত্রে রান্নাই হয় না, আমরা পাঁউরুটি খেয়ে থাকি।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কি। আমি কোনও হোটেলে গিয়ে উঠেছি। কাল যদি থাকি বিকেলে আসব।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার আত্মীয়ের স্ত্রী বলিলেন, "আমরা কণ্ট করে বিছানা খাট সরিয়ে ওঁকে থাকতে বলতে পারতাম। স্টোভে খানকয়েক লুচি আর ডিমের ডালনা করে দেওয়াও অসম্ভব হ'ত না, কিন্তু লোকটা মুসলমান, তাই আর প্রবৃত্তি হ'ল না।"

ভদ্রমহিলা পাকিস্তানের মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল কি করে?"

"ইসমাইলের বাবা ওঁর বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তাই উনি যখনই কলকাতায় আসেন একবার দেখা করে' যান। কিন্তু যখনই আসেন আমার কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে, মনে হয় গেলে বাঁচি।"

আমার আত্মীয় হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা ভুলো না; ওর দৌলতেই আমার চাকরি। ইসমাইল চেণ্টা না করলে এ চাকরি পেতাম না।"

"তা হোক, ওরা আমাদের যে ক্ষতি করেছে তারপর আর ওদের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের ত্রিসীমানায় থাকতে চাই না।"

ভদ্র মহিলার চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম মাউণ্টব্যাটেন ইহাই চাহিয়াছিলেন এবং আমাদের নেতৃ-দের সহযোগিতায় তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চাচীর কথা মনে পড়িল।

আমার বাবা ছিলেন মনিহারী গ্রামের ডাক্তার। শুধু মনিহারীতেই নয় আশ-পাশের অনেকগুলি গ্রামে তাঁহার বেশ পশার ছিল। চাচীর সঙ্গে আমাদের কবে যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা মনে নাই। শুনিয়াছি আমাদের জন্মের পূর্বে তিনি একবার আমাদের বাড়িতে আসিয়া মাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহার স্বামী রহমতুল্লা সাহেব বাবাকে 'বড় ভাই' পদে বরণ করিয়া বাবার হাতে একটি রঙীন রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে বাল্যকাল হইতেই চাচীর দেওয়া নানা উপহার পাইয়াছি। আমার খুব ছেলেবেলায় তিনি আমাকে একটি জরির টুপি দিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিজের হাতের সেলাই করা প্রকান্ড একটি 'সুজনি' আমাদের বিছানায় পাতা থাকিত মনে পড়িতেছে। দোলের সময় আমাকে তিনি একটি লাল রঙের ছাতা লাল রেশমের পাঞ্জাবি ও পায়জামা উপহার দিয়াছিলেন। যখনই যেখানে যাইতেন আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। চাচী যে মুসলমান তাহা অনেকদিন জানিতামই না। ধারণা ছিল তিনি আমাদেরই কোন দূর-

সম্পর্কীয় আত্মীয় বৈরিয়া গ্রামে বাস করেন। চমৎকার বাংলা বলিতেন। সেইজন্য আরও বুঝিতে পারিতাম না যে তিনি পর। তাঁহার ছেলে-মেয়ে ছিল না। ডাক্তারি, কবিরাজী, হেকিমি চিকিৎসায় তাঁহার বন্ধ্যাত্ব মোচন হয় নাই, তাই তিনি নানা তীর্থে নানা পীরের দরগায় গিয়া সন্তান কামনা করিতেন। ভারতবর্ষের নানা তীর্থে তো গিয়াছিলেনই, মক্কা-মদিনাও গিয়াছিলেন। যেখানেই যাইতেন, আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। তাঁহার দুইটি উপহারের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। একটি ছোট্ট রূপার কৌটা, ঠিক আঙুলের মতো দেখিতে। তাহার ভিতর ভালো আতর-মাখানো তুলা ছিল। দ্বিতীয় জিনিসটি 'কৌনি'র চাল। 'কৌনি' বলিয়া একরকম ক্ষুদ্রকায় শস্য এদেশে হয়। খুব ছোট দানার চাল হয় তাহা হইতে। সেই চালের পায়েস অতি উপাদেয়।

চাচী আমাদের বাড়িতে যখন আসিতেন তখন দূর হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার গরুর গাড়ির গরু দুইটির গলায় অনেক ঘণ্টা ছিল, গরু দুইটির চেহারাও ছিল চমৎকার। অমন ধপধপে শাদা বলিষ্ঠ প্রশান্ত-মূর্তি গরু বড় একটা চোখে পড়ে না। ছোট ছোট কালো শিং দুইটি যেন কষ্টিপাথরের। মুখের ভাব এত শান্ত, এত ভদ্র, যেন মনে হইত দুইটি অভিজাত বংশের সুসন্তান। চাচী তাহাদের কপালে পানের-আকারে দুইটি কাঁসার টিকলি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের আরও সুন্দর দেখাইত। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হইতে যে সৌম্য স্নিগ্ধ শান্ত ভদ্রতা বিকীর্ণ হইত তাহা তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিতেও বড় একটা দেখা যায় না। চাচীর গাড়িটি ছিল আরও সুন্দর। গাড়ির অমন টপ্পর (ছই) এ অঞ্চলে অন্তত আমি আর দেখি নাই। সেটি ছিল একটি চতুষ্কোণ ঘরের মতো। বাঁশের ও রঙীন দড়ির কারুকার্যে মনোরম। তাহাতে জানলা ছিল। আয়না ছিল। তাহার ভিতর কয়েকটি ছবিও টাঙানো থাকিত। এই গাড়ি আসার শব্দ শুনিলেই আমরা উল্লসিত হইয়া উঠিতাম। মা গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন। তবু চাচী আসিয়া যখন বিছানায় বা চেয়ারে বসিতেন মা কোনও আপত্তি করিতেন না। চাচী চলিয়া গেলে তিনি চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া সব আবার শুদ্ধ করিয়া লইতেন। চাচীর অকৃত্রিম স্নেহ মায়ের গোঁড়ামিকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। চাচী যখনই আসিতেন আমাদের জন্য খাবার করিয়া আনিতেন। চিঁড়ে-ভাজা, মুড়ির মোয়া, নানারকম সন্দেশ, হালুয়া এইসবই সাধারণতঃ আনিতেন তিনি। মা নিজে যদিও খাইতেন না, কিন্তু আমাদের খাইতে দিতে তিনি কখনও আপত্তি করেন নাই। অবশ্য খাইতে দিবার পূর্বে খাবারগুলিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া লইতেন।

একবার মা মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। সেবার আমার উপনয়ন হইয়াছে। তখনও আমার মাথা ন্যাড়া, সাড়ম্বরে ত্রিসন্ধ্যা করি এবং খাওয়ার সময় কথা বলি না। চাচী তাঁহার গরুর গাড়ি লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মাকে বলিলেন, আমি আমার ছেলেকে নিজের বাড়ি লইয়া যাইব। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। মা প্রমাদ গণিলেন। চাচীর সহিত এমন একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত। অথচ মাথা-ন্যাড়া একটা সদ্য-ব্রহ্মচারীকে মুসলমানের বাড়ি গিয়া অন্ন-গ্রহণ করিবার অনুমতিই বা দেন কি করিয়া! মা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাবা বলিলেন, ওখানে তোমাদের রান্না খাবার খাওয়া অবশ্য চলিবে না। এক বছর আমাদের নিয়মে থাকিতে হয়। তবে এমনি গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে। চাচী বলিলেন, ছেলে আমাদের বাড়ি যাইবে আর না খাইয়া ফিরিয়া আসিবে তা কি সম্ভব। ওখানে যাইতে হইবে, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, উঁহার জাত আমি মারিব না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, শরৎ দাদাকেও আমাদের সঙ্গে দিন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পাহারাদার হইয়া আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনারাও যদি যাইতে চান, আর একটা গাড়ি পাঠাইয়া দিতেছি।

শেষ পর্যন্ত যাইতে হইল। মামাবাবু অশ্বারোহণে গাড়ির পিছু পিছু গেলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। চাচীর বাড়ির প্রকাণ্ড হাতা। দেখিলাম, চাচী সেই হাতার এক প্রান্তে দুইটি বেশ বড় বড় খড়ের ঘর করাইয়াছেন। তাহার একটিতে নূতন খাট, নূতন বিছানা এবং এমন কি নূতন একটি চেয়ার পর্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্য ঘরটিতে রান্না হইতেছে। মৈথিল ঠাকুর রান্না করিতেছে। ভাল ঘিয়ের লুচি, আলুর দম, পটল ভাজা, বুটের ডাল, সন্দেশ, পায়েস— সবই সেই ঠাকুর করিতেছে। তাহার দুইজন সহকারীও মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া যে দুইটি চাকর রহিয়াছে, তাহারা গোয়ালা। আমাদের আশেপাশে মুসলমানের ছায়া পর্যন্ত নাই। আমাদের খাইবার জন্য চাচী বাসনপত্র আনাইয়াছেন স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার গৌরবাবুর বাড়ি হইতে। রূপার বাসন।

আমাদের খাইবার সময় চাচী একটি মোড়া আনিয়া একটু দূরে উপবেশন করিলেন এবং মামাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিদিকে বলিয়া দিবেন তাঁহার ছেলের জাত আমি মারি নাই।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তিনি আমাকে একটি গেরুয়া রঙের রেশমের পাঞ্জাবি কাপড় এবং চাদর দিলেন।

চাচীর কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মনিহারী গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলাম, আত্মীয়ের স্ত্রীর কথায় আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম।

"আপনি চা খাবেন কি, যদি খান তো স্টোভ জেবলে জল চড়িয়ে দি।"

"না এত রাত্রে আর চা খাব না।"

উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। আজকাল বেশীক্ষণ কোথাও বসা যায় না।
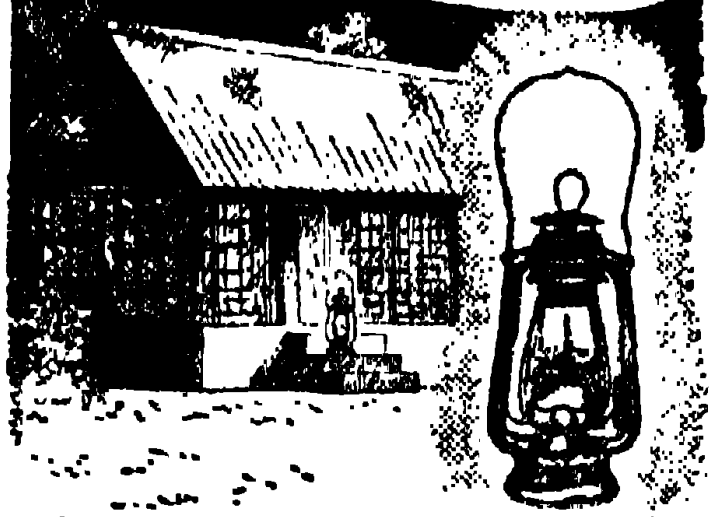
রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সাত ।।

প্রসাধন-বিলাসের একটি প্রধান উপকরণ—সাবান! সভ্যতা যত এগিয়েছে, সাবানের চলন তত বেড়েছে। সাবানের সুগন্ধ নানাশ্রেণীর, তার আকৃতিও নানাবিধ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাবান হল যেমন-তেমন, গন্ধবোধের অভাব। সেটায় কোনমতে কাজ চ'লে যায়, কিন্তু মন খুশী হয় না। ওদের সাবানে কেমন একপ্রকার জনগণের গন্ধ,—কিছু তার মধ্যে ক্ষারের আভাস, কিছু বা বন্য রুশীয়। দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়িয়েছি, সুগন্ধ মাথার তেল কোথাও নেই। দাঁতের মাজন মুখে দিলে মুখগহ্বর বিরক্তির ফেনায় ভ'রে ওঠে। ওদের 'সুগন্ধী' এসেন্স আগাগোড়া ফাঁকি। আতর - গোলাপ - চামেলি - চুয়াচন্দনের নাম ওরা শোনেনি। চারিদিকে ফুলের অজস্র শোভা,—কিন্তু গন্ধ বাতাস নেই বললেই হয়। গ্লিসারিন কাকে বলে বোঝে না। ওদেশে গেলে সৌখীন সামগ্রীর অভাব ঘটে পদে পদে। স্নানের ঘরে ঢুকলেই একথা মনে আসত।

কমিউনিষ্ট দেশের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু হল, 'কলেকটিভ ফার্ম'। বাঙলার অনুবাদকরা এটাকে বলছেন, 'যৌথ খামার'। কিন্তু খামারের অর্থ শস্যপ্রান্তর বোধ হয় নয়—ওটা হল বহিরাঙ্গন, যেটা চাষীর বাস্তুভিটার সঙ্গে যুক্ত, যেটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির এলাকা। আমাদের দেশে বলা হয় ক্ষেত-খামার। ক্ষেত এবং খামার।

তাসকন্দ ছাড়িয়ে মাইল ছয়েক সুন্দর একটি পথ ধ'রে গেলে বন-বাগানভরা একটি 'কলেকটিভ ফার্ম' পাওয়া যায়। ষ্টালিন আমলের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কালিনিনের নামে এই অঞ্চলটি যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কলেকটিভ ফার্মটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কার্ল মার্কস'। রুশীয় ভাষায় কলেকটিভ ফার্মকে বলা হয়, 'কল্খোজ্'! বহুসংখ্যক গ্রাম এবং তৎসংলগ্ন শস্যপ্রান্তর একত্র ক'রে যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে, তাকেই 'কল্খোজ্' বলা হয়। আমাদের দেশে এ ধরণটি নেহাৎ অপরিচিত নয়। আমাদেরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি লোক্যাল্ বোর্ড, কয়েকটি লোক্যাল্ বোর্ড নিয়ে একটি ইউনিয়ন বোর্ড, এবং কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। অতএব এটি সেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং তার হেড আপিস। এর মধ্যে জগৎজোড়া বিস্ময় যদি কিছু থাকে ত' থাক্, আমাদের কাছে এর চমক নেই। চমক হল এর গণস্বত্ব, এবং পরিচালন-ব্যবস্থার অভিনবত্ব। প্রত্যেক চাষী ভাবছে, এ সম্পদ সকলের, কিন্তু প্রত্যেকেই জানছে, এ তার নিজের নয়। চাষী এখানে কর্তা নয়,—কর্ম।

আমাদের দলটি ছিল মস্ত। প্রায় জনষাটেক মেয়েপুরুষ। যখন গিয়ে পৌঁছলুম, বেলা তখন এগারোটা। 'কালিনিন' জেলায় এলুম অথবা ফরিদপুর জেলার একটি গ্রামের উপান্তে এসে দাঁড়ালুম, ঠিক ঠাহর করা যায় না। চারিদিকের তৃণপ্রান্তর এবং বনময় শ্যামলতা যেন আভাস দিচ্ছে পৌষ মাসের শেষ, ধান উঠেছে ঘরে ঘরে, স্তূপাকার ধান,—দেবী এবার এসেছেন হস্তীপৃষ্ঠে, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা! মাঠের কোথাও কোথাও যেন সাঁওতাল পরগণার রাঙামাটির ছোপ লেগেছে ; এখানে ওখানে বিশাল শাল্মলীর ছায়াবীথিকা। প্রান্তরের শেষপ্রান্তে অরণ্যের রেখা। ভুলে যেতে হয় মধ্যএশিয়ার 'ওয়েসিসে' দাঁড়িয়ে আছি।

তারাশঙ্কর আমাদের সঙ্গে আসেননি। প্রথমত তাঁর শরীর জুৎসই নয়, দ্বিতীয়ত সোভিয়েট দেশের জীবনধারা ও দ্রষ্টব্যবস্তুর সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্যও কম। আপাতত তিনি গৃহগত-

প্রাণ। দুর্গোপূজোর আর সপ্তাহখানেক মাত্র বাকি, তিনি ফিরতে পারলে বাঁচেন! সুনীতিবাবু, শ্রীধরণী,গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এঁরা সঙ্গে আছেন। ভ্রমণ, সামাজিকতা, কৌতূহল, জ্ঞানপিপাসা, পরিহাসবোধ— এসব ব্যাপারে ডাঃ সুনীতিকুমারের মতো ৭০ বৎসরের নিত্যোৎসাহী 'তরুণকে' আমার দেখতে বাকি ছিল। তাঁর পরিশ্রমের সঙ্গে অনেক সময় আমরা পেরে উঠিনি। এটিও সযত্নে লক্ষ্য করেছি, আহারাদির পরিমাণ সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের চেয়ে তিনি কম যান না! ভারতীয় দলটি মেয়েপুরুষ মিলিয়ে প্রায় যেমন সবাই এসেছেন, তেমনি এসেছেন রুশ, উজবেক, কাজাখ, মঙ্গোল, মীসরী, গ্রীক, সাইপ্রিয়ট, সিংহলী, কোরীয় এবং দক্ষিণ প্রাচ্যের নানা প্রতিনিধি। অবশ্যম্ভাবী শিখ বন্ধু শ্রীসন্ত সিং শেখোন সঙ্গে আছেন। মিঃ আত্রে এবং শেখোন সঙ্গে থাকলে একটু আড়ষ্ট হই,—ওঁরা একটু বেশি মাতামাতি ক'রে ফেলেন! মেয়েরা শেখোনকে নিয়ে পরিহাস করেন। তিনি বিপত্নীক। তাঁর বিশ্বাস তিনি কমিউনিষ্ট। সে যাই হোক, বহুর খানেক পরে পাঞ্জাবের মহিলা কবি শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম আমাকে বলেন, মিঃ শেখোনের স্ত্রী আজও বর্তমান!
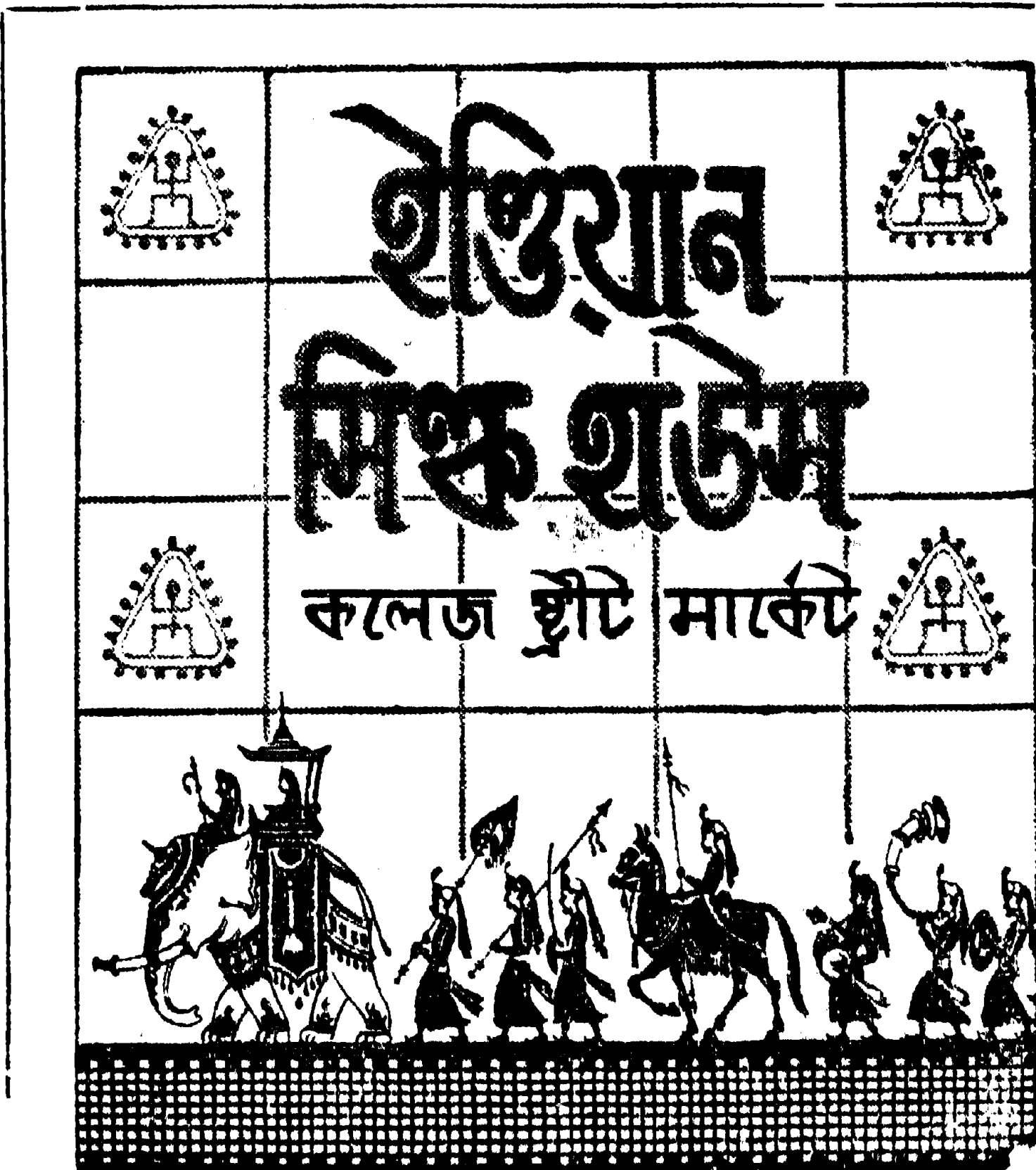
কলেকটিভ ফার্ম-এর আপিস ঘরে আমরা গিয়ে ঢুকলুম। এগুলি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এর সভা আছে, নির্বাচন এবং ভোট আছে, স্বাধীনভাবে জনকল্যাণের কাজ করার ক্ষেত্র আছে, এবং পারিবারিক সমৃদ্ধিসৃষ্টির উদার সুযোগ আছে। ঈষৎ শ্যামবর্ণ যে-উজবেক ডাইরেকটর মহাশয় আমাদের সামনে চেয়ারম্যান হয়ে বসে সকল প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে যাচ্ছেন,—এতগুলি বিদেশাগত ব্যক্তির সামনে ব'সে কতকটা অকিঞ্চনের মতো তাঁর মুখে আড়ষ্টতার ছায়া দেখা যাচ্ছিল। তাঁর বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে যেন একটু মুখস্থভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং তাঁর কর্মসম্পাদনে ভুলত্রুটি ঘটলে তাঁর কর্মচ্যুতি হবে কিনা এই ভাবনাটি আমাকে পেয়ে বসেছিল! আমার মনে হল আমরা হঠাৎ এখানে এসে পড়িনি, পূর্বাহ্নে এখানে আয়োজন করা ছিল! কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার ভারতীয় মনের শঙ্কা সঙ্গেই এনেছি। সুতরাং এই নির্বাচন, মনোনয়ন, ভোট ইত্যাদির তলায় তলায় স্বজন-পোষণের চক্রান্ত এবং পক্ষপাতিত্বের 'সুতোটানা' ব্যাপারগুলি আছে কিনা সেটি ভাবছিলুম। মানুষের দুজ্ঞেয় মনঃপ্রকৃতির জটিল অভিব্যক্তি এই সুবৃহৎ চাষী প্রতিষ্ঠানের কোথায় কোন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জটিলতর সমস্যার উদ্ভাবন করছে,—এটি নবাগত বিদেশীগণের পক্ষে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুষ্ঠভাবে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেদিন আমরা আমাদের প্রত্যেকটি উৎসুক প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়ে খুশী হয়েছিলুম। বাইরের কাঠামোয় কোথাও ভুল নেই!

ছোট এবং বড় মিলিয়ে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে ৭০ থেকে ৮০ হাজার "কলেকটিভ ফার্ম" সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং প্রতি বছরেই এর সংখ্যা বাড়ছে। সাইবেরিয়ার লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি আয়ত্তের মধ্যে আনা হচ্ছে,—সেসব অঞ্চলে ময়দানবের নূতন [illegible]বসৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। নগরের পর নগর বসে যাচ্ছে রাতারাতি, বিপুল পরিমাণ লৌহযন্ত্রের ঘর্ঘর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে সেখানকার দিগ্দিগন্তব্যাপী তুষারক্ষেত্রের আশেপাশে। কৃত্রিম তাপ সৃষ্টি ক'রে নগরগুলিকে গরম রাখার চেষ্টা চলছে, বিগলিত তুষার থেকে কৃত্রিম নদী সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সাইবেরিয়ার উত্তর প্রবাহিনী নদী 'অবি, এনেসি' প্রভৃতির প্রবাহকে পশ্চিম-দক্ষিণের দিকচিহ্নহীন কাজাখস্তান ও 'কারাকুম' মরুভূমির ভিতর দিয়ে প্রবহমান করবার আয়োজন হচ্ছে। অতএব "কলেকটিভ ফার্ম"গুলি সোভিয়েট-শক্তির শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই! চাষী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে খাদ্য এবং সম্পদ-সৃষ্টির নির্ভুল হিসাব মিলিয়ে রেখে সেই শক্তি এখন ভিন্ন কাজে অবতীর্ণ হয়েছে। আগাগোড়া জেনে গেলুম বৈকি।

এই 'কলেকটিভ ফার্ম' এবং এর কর্ম-প্রণালী বহির্জগতের কোটি কোটি নরনারীর মনে বিগত চল্লিশ বৎসরকাল যাবৎ এনেছে প্রবল ঔৎসুক্য, সন্দেহ, ভয়, বিভীষিকা এবং বহুবিধ নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক প্রশ্ন। পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রে অথবা এক-নায়কতন্ত্রে গভর্ণমেন্ট হল সেই দেশের জল মাটির "অছি" মাত্র, সেই অছি হল শাসন-প্রশাসনের সর্বোচ্চ অধিনায়ক অর্থাৎ রুজভেল্ট বা চার্চিল গভর্ণমেন্টের অধিকার 'অছি'র (trustee) অধিকার ছাড়া আর কিছু ছিল না! কিন্তু তাঁদের প্রশাসিত সেই ভৌগোলিক রাষ্ট্রসীমানার মধ্যে যে মাটি, ভূমি ও জল—সেগুলির উপর স্বত্বস্বত্বের মালিকানা হল দেশবাসীর। তারাই ভূম্যধিকারী। ভারতের ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীন ভারতের আমলেও তাই! রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হল গভর্ণমেন্ট, ভূমির মালিক দেশবাসী। তাদেরই মাটি, তাদেরই সম্পত্তি। অশোক, আলাউদ্দিন, আকবর, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ—একে একে সবাই গেছে, কিন্তু জল মাটির মালিক থেকে গিয়েছে ভারতের সেই নিত্যকালীন জনসাধারণ। জমিদার, তালুকদার, জোতদার,—এরা চিরকাল ছিল ভিন্ন ভিন্ন নামে। রাশিয়াতেও ছিল, এবং তাদের নাম ছিল 'কুলাক'। মহামতি টলস্টয়ের বইতে প্রথম পড়েছিলুম, 'কুলাক' কি বস্তু! ওদের দেশের 'কুলাক' আর আমাদের ভারতীয় 'কুলাক' এক বস্তু নয়। বাঙালী জমিদারগণের অগণ্য অনাচারের কাহিনী আবাল্য শুনে এসেছি। কিন্তু তাদের অন্য একটা দিক ছিল। ভারতের 'কুলাক'রা সেকালের 'স্লাভ' ও তাতারদের ব্যাধিগ্রস্ত বদরক্ত নিয়ে জন্মায়নি!—বাঙালী জাতির আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা, জগৎসভায় তাদের গৌরবের পরিচয়, বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙালীর জয়যাত্রা,—এ সমস্তই জমিদার আমলের সৃষ্টি। আধুনিক ভারতের সর্বপ্রধান সংস্কৃতির কেন্দ্র, কলিকাতা মহানগরী,—এর আদিঅন্ত জমিদার বাঙালীর সৃষ্টি! আমাদের সভ্যতা বিপ্লবে তৈরি হয়নি,—চিত্তের উৎকর্ষ এবং আত্মিক সাধনা ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি! জমিদাররা তার সহায় ছিল। বাঙালীর দেড়শ' বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জমিদার গোষ্ঠির সঙ্গে জড়ানো। রাজা রামমোহনে যার আরম্ভ, এবং রবীন্দ্রনাথে যার শেষ!

যা বলছিলুম।—সোভিয়েট গণতন্ত্র "অছি"-র দেশ নয়, মালিকের দেশ। এই বিরাট ভূভাগের প্রতি ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি ও জলের মালিক হল সোভিয়েট রাষ্ট্র! তা হলে জনগণ কা'রা?—জবাব পাবে, তারাই ত রাষ্ট্র! ভূমির এক-তিলাংশ কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়। যে-জমিতে তুমি বাস ক'রে আসছ বংশ-পরম্পরায়, সে তোমার নয়, তা'র কোনও দলিল আজ তোমার হাতে নেই, তুমি তার মালিক নও! কিন্তু ওখান থেকে কেউ কোনও দিন তোমাকে উচ্ছেদ করবে না, কোনওকালে কেউ খাজনা আদায়

তুমি থাকবে ওই জমিটুকুর চিরকালীন উপস্বত্বভোগী। অর্থাৎ জমি রইল তোমার জিম্মায়, শুধু মালিকানাটা কেড়ে নেওয়া হল! আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও নাগরিক তার দেশের যেকোনও অঞ্চলে যে কোনও সময় গিয়ে বসবাস করতে চাইলে তাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চার বিঘা বসবাসের জমি দেওয়া হবে, এবং একটি জীবিকা সে পাবে। সেই জীবিকার জন্য দরখাস্ত করা কিংবা হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন নেই। তুমি একটি উপযুক্ত কাজ চাও, একথা কাকমুখে জানা গেলে সেই কাজ আসবে তোমার কাছে! প্রকাশ থাকে, মস্কো-লেনিনগ্রাড প্রভৃতি বড় বড় শহরের মিউনিসিপাল এলাকায় তুমি ওই চার বিঘে নিজস্ব জায়গা পেতে পার না,—এ ব্যবস্থা শুধু গ্রামাঞ্চলের জন্য! গ্রামের চাষী শহরে গিয়ে বাড়ি বানিয়ে বসবে, তা চলবে না। শহর মানে যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। সেখানে থাকবে শিল্পকর্মী,—চাষীর জায়গা কোথায়? যুক্তিহীন খেয়াল-খুশির প্রশ্রয় চেয়ো না।

"কার্ল মার্কস কলেকটিভ ফার্মটি" ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পত্তন হয়,—বিপ্লবের ১৩ বছর পরে। তখন ওখানে মোট ৬০টি টুকরো চাষের ক্ষেত ছিল, এবং মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল লাঙগল টানার জন্য। দরিদ্র চাষীদের জীবন ছিল দুঃখ-দৈন্যে পরিপূর্ণ। এখন এখানে ৫৬৫টি পরিবার বাস করে ফসলের ক্ষেতে এক হাজার লোক খাটে, এবং ৩০০০ নরনারী ও শিশু প্রতিপালিত হয়। প্রতি পরিবারের নিজস্ব চার বিঘা জমি। এখানে আপেলের বাগান হল প্রায় ৯০০ বিঘা, আঙ্গুরের দরুণ প্রায় ১২০০ বিঘা। ৪১০ গাভী,—তার মধ্যে ১৬০টি দুধ দেয়,—প্রতি গরুর দুধ আধমণের কম নয়। ৩০০০ ভেড়া এবং ২৫০টি শূকর, ৩৫০০টি মুরগী ও হাঁস,—এগুলি রয়েছে। এই চাষী-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উপার্জন হল ১,১৫,০০,০০০ লক্ষ রুবল। ভারত সরকারের বিনিময় ব্যবস্থানুসারে প্রতি ছয় টাকায় প্রতি পাঁচ রুবল। এই ফার্মে একটি মেয়ে অথবা একটি পুরুষ সারাদিনে মোট ৮ ঘন্টা যদি ক্ষেত-খামারে কাজ করে, তবে সে দৈনিক উপার্জন করবে ১ কিলোগ্রাম পরিমাণ গম অথবা চাউল, ৫ কিলো করতে আসবে না, মিউনিসিপ্যাল কিংবা ইউনিয়ন বোর্ড কখনও ট্যাক্স চাইবে না,—তরীতরকারী, ১০ কিলো আলু এবং নগদ ২১ রুবল। যে-যত খাটবে তার ততই উপার্জন। প্রতি বছরে ওরা মোট ৭৫০ "ওয়ার্ক-ডে ইউনিট" গণনা করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রতিদিন যদি মোট আট ঘন্টা ক্ষেত-খামারে কাজ করে, তবে উৎপাদিত সামগ্রী এবং নগদ মজুরি মিলিয়ে সে বৎসরে ২০ থেকে ২৫ হাজার রুবল পরিমাণ রোজগার করবে। সম্প্রতি ইশাপোভা নামক একটি গয়লানি এক বছরে মোট ৮০০ ইউনিট পরিশ্রম ক'রে টাকা ও সামগ্রী মিলিয়ে ৪০,০০০ রুবল উপার্জন করেছে! এইসব কর্মীরা স্টেট থেকে বিশেষ পুরস্কার পায়, এদের ছবি টাঙ্গানো হয় নানা জায়গায়, এবং এরা উপাধি পায় "Hero of the Socialist labour". সোভিয়েট ইউনিয়নের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান-দপ্তরে এইসব 'হিরো'র ছবি তাদের কাজের পরিচয় দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কাগজে-কাগজে এদের নাম ও ছবি বেরোয়।

প্রতি চাষী পরিবারের নিজস্ব জমি চার বিঘার মতো, বোধ হয় একটু বেশি। তাদের আছে ঘরোয়া আঙ্গুরে আর আপেলের গাছ, খামারে শাকশব্জী,—আলু, লাউ, কুমড়ো, বেগুন, পেঁয়াজ, আদা, টমাটো, বেরী, গাজর, বীট, কপি, —যে যেমন লাগাতে পারে। ঘরে আছে গরু, কিংবা ঘোড়া, হাঁস বা মুরগি, যদি কারও আপত্তি না থাকে ত' শূকর,—শূকর পালনে লভ্যাংশ প্রচুর! তবে মুসলমানরা প্রায়ই শূকর রাখে না। কা'রো কা'রো বাড়ীতে দুই তিনটি গরু। বাড়ীর বড় ছেলে যদি বউ আর বাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে যায় ত' থাক না। সে হয়ে গেল একটা ফ্যামিলি, পেয়ে গেল চার বিঘা জায়গা! ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, অসুখ-বিসুক,—এসবের খরচ নেই। বুড়ো হ'লে যথারীতি পেন্‌সন্।

কথায় নির্ভর করার মতো মন আমার নিঃসংশয় নয়। অথচ মাত্র সাত ঘন্টার মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরব এমন ফরমাস নিয়েও আসিনি। কিন্তু ওরই মধ্যে প্রতি চাষী পরিবারের ঘরকন্নায় যা দেখলুম, তা আমাদের দেশের চার পাঁচশ' টাকা মাইনে-পাওয়া, কর্মচারীদের অবস্থার

মতোই। প্রতি বাড়ীতে ইলেকট্রিক, রেডিয়ো,—অনেক বাড়ীতে টেলিভিশন। বাড়ীর প্রতি কাঁচের জানলা ভেলভেট পোশাক বিছানাপত্র ভাল, টেবিল চেয়ারের সজ্জা, আলমারি, পাউরুটি প্রস্তুতের উনুন অনেক ক্ষেত্রে মেঝের উপর শতরঞ্চি— এবং সকলের চেহারা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। উঠোনে আর বাগানে গোলাপ ডালিয়ার সমারোহ; লতায় লতায় তখনও আঙ্গুর ঝুলছে। শিশুদের সুন্দর এবং ঘনা-স্বাস্থ্য দেখলে চুপ ক'রে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। গ্রামে গ্রামে রুশ মঙ্গোল, তাতার, তুর্কি, উজবেক—সবাই একত্র ছড়িয়ে আছে।

এইসব কেন্দ্রে আছে ক্লাব এবং কনসার্ট, আছে সিনেমা এবং মঞ্চ। শীত গ্রীষ্মে বাইরের শিল্পীরা আসে। একটি মাধ্যমিক ও দুটি প্রাইমারি স্কুল, একটি বড় হাসপাতাল, তিনটি চিকিৎসা কেন্দ্র। এদের আছে আঠারো খানা লরী আঠারো খানা খোলা ট্রাক, দুখানা ফার্মের মোটর। কুড়িটি পরিবারের বাড়ীর মোটর আছে, পনেরো খানা মোটর-সাইকেল। মাখন ও চীজ এখানেই তৈরি হয়। তেল নামক কোনও খাদ্যবস্তু ওরা জানে না,—এটি পাঞ্জাব-কাশ্মীরের মতো।

শতকরা ২২ ভাগ খাদ্যসামগ্রী বেচতে হয় গভর্ণমেণ্টকে, এবং চাষী-প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উপার্জন থেকে শতকরা ৮ ভাগ রাজস্ব দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট এই ফার্মকে প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ রুবল দেন, পেনসনভোগীদের মাসোহারাস্বরূপ এবং ফার্ম দেয় প্রতি মাসে রাজস্বস্বরূপ ১০,০০০ হাজার রুবল। এই ফার্মের দুটি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র আছে তাসখন্দে এবং অন্যত্র আছে সাতটি। আমরা এখানকার বিরাট গোশালা, তাদের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি এবং বিচরণ ক্ষেত্র দেখে ঈর্ষান্বিত হলুম, এবং তিব্বতী চাঁওরী গাইয়ের অপেক্ষা বৃহৎ আকৃতিসম্পন্ন গাভী ও তাদের পালান-গুলি দেখে বিস্ময়াহত হলুম। এই ফার্মের নানাবিধ উপকরণ, কলকব্জা ঝাড়াই-বাছাইয়ের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম একদিনে বা দুদিনে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম-দিকে যেমন আমার মন ছিল সংশয়াচ্ছন্ন, এখন তার চেহারা হয়ে গেল পরশ্রী-কাতর। যে-দেশে গরু, শিশু ও স্ত্রীলোকের চেহারা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সে-দেশের ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনও প্রকার সংশয় রইল না!

মাঠে-মাঠে জলের ব্যবস্থা এবং নালিপথগুলি দেখার জন্য ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লুম। এ যেন বর্ধমান জেলার গ্রামের ধারে। কিন্তু আশেপাশে একটির পর একটি আঙ্গুরের লতাবীথিকা দেখে আমাদের ছোটখাটো দলটি হয়ে উঠল 'পাগলপারা'। ডাঃ সুনীতিকুমার—যিনি চিরনবীন—তিনি হলেন 'ডাকাত দলের' সর্দার। ফলে, নীতি, ধর্ম, সংযম ও শঙ্কা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে শ্রীধরনী, সুভাষ গোপাল হালদার, দামোদরন্—ইত্যাদি আমরা সেই বেওয়ারিশ আঙ্গুরের বনে প্রবেশ করলুম, এবং ঘণ্টাখানেক পরে পেট মোটা ক'রে সে-অঞ্চল থেকে টলতে টলতে যখন সভাসমাজে এসে দাঁড়ালুম,— আমাদের অবস্থাটা তখন মনে হল,— জ্যোৎস্না রাত্রে মহুয়া বন থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটি রসগদগদ ভালুকে ভায়া!

এর পরে সবাই এসে জুটলুম এক বাগানবাড়ীতে,—চারিদিকে তার কাঁচা পথ, গ্রামের বিয়েবাড়ীতে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার মধ্যে এসে পৌঁছলুম মনে হচ্ছে! বাড়ীটি পুরনো এবং আশপাশের কয়েকটি কাঁচাপাকা একতলা বাড়ী থেকে গ্রামের বৌরা এবং ছেলেমেয়েরা তাদের সুন্দর মুখগুলি বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চালার তলায় বড় বড় লোহার কড়াই এবং ডেকচিতে মোগলাই পোলাও মাংস চড়েছে, এবং এদিকে ছোট ছোট কাঠ কয়লার উনুনে উৎকৃষ্ট 'দুম্বার' মাংসে ঘৃতপক্ক শিককাবাব এক একটি টিনের কাঠির দ্বারা প্রস্তুত হচ্ছে। এত লোকের সমাগম,—প্রকৃতির তাড়না আছে বৈকি! সুতরাং তার জন্যও বেড়াঘর উঠে গেছে রাতারাতি। আগাগোড়া চেহারাটা শুধু ভারতীয়ই নয়, বঙ্গ-দেশীয়! কেউ কারো ভাষা জানিনে, কিন্তু সবাই মিলে গলাগলি ও হাসি-হুল্লোড় করতে এতটুকু বাধছে না। কাঁচা উঠোনের উপর নাচগান বাজনা বাঁশি ম্যাজিক ঢোল-ঢাক,—সবগুলো চলছে একে একে। সেই ঘূর্ণিবাতার মধ্যে নামলেন আচার্য আত্রে, শেখোন, শ্রীমতী প্রদোৎ কাউর এবং ভারতীয়দের মধ্যে অন্যান্য অনেকেই। সেটাকে এক কথায় বলে আনন্দ উৎসবের কাণ্ড-কারখানা। গ্রামের প্রবীণ মোড়লরা পর্যন্ত ছুটে এসে তাদের প্রাচীনকালের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য হুজুগে মেতে উঠল, এবং এই ডামাডোলের মধ্যে বারান্দার উপর টেবিলে পাত পেতে ব'সে ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-বোষ্টমরা কোন্ কোন্ নিষিদ্ধ মাংসাদি এবং কি কি প্রকার পানীয় বেশ রুচিসহকারে একে একে আত্মসাৎ করতে লাগলেন, তার হিসাব আমার ডায়েরীতে নেই ব'টে তবে আমাদের তদানীন্তন সুহৃদ এবং অভিভাবক, বলবান, কঠিন, ও পরিহাস-প্রিয় জনাব রুস্তম ইসমাইলভ সম্ভবত আজও স্মরণে রেখেছেন। যখন সবাই ফিরলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিপুল উৎসুক জনতা হোটেলের সামনে, এবং অপেরা ব্যালে থিয়েটার চা-পার্টি সম্মেলন নৈশভোজ,—প্রভৃতির অগণিত আমন্ত্রণ সকলের জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

* * *

১৩ই অকটোবর তারিখে লেখক সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের শেষ দিন। ভিতরে প্রেক্ষাগৃহ জনপরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি জাতি, অর্থাৎ প্রায় ৪৫টি জাতির সকল প্রতিনিধি উপস্থিত। সবাই উদ্গ্রীব, তাসকন্দ উৎসুক, পৃথিবী কৌতূহলী।—এশিয়া আফ্রিকা লেখক-সম্মেলন থেকে মহাপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার মর্মবাণী একটি চরম প্রস্তাবের দ্বারা ঘোষণা করা হবে। কোন্ ব্যক্তি সেটা ঘোষণা করবেন, সেটি এখনও জানিনে।

প্রথম দিকটায় আরম্ভ হয়ে গেল "বিজয়া সম্মেলনের" কোলাকুলি এবং ভালবাসা। যে সকল বিদেশী রাশিয়ান্-'ভোদকা'র লোভে হুজুগ করে এসে-ছিলেন, এবং আজ সকালেও যাদের অনেককে প্রাতরাশের টেবিলে ব'সে মদ্য-পান করতে দেখেছি, তাঁদের কেউ কেউ বিশেষ আবেগপ্রবণ হয়ে ওই কোলাকুলি এবং ভালবাসার মধ্যে হু হু ক'রে খানিকটা কাঁদলেন। 'বিজয়া সম্মেলনের' অন্তরালে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের বাতাস ছিল রাজনীতিক শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরা। ভারতবর্ষের প্রতি অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আজ প্রয়োজন ছিল ডাঃ রাধা-কৃষ্ণণ, অথবা হুমায়ুন কবীর, কিম্বা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতির। আজ যেন এই জগৎসভায় নিজেদেরকে বড় সামান্য মনে হচ্ছিল।

সহসা তারাশঙ্কর মঞ্চের উপর থেকে নেমে সোজা এলেন আমার কাছে।

কানে কানে বললেন, শিগগির বাইরে চল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

তৎক্ষণাৎ সীট ছেড়ে উঠে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হনহন ক'রে বাইরে এলুম। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললুম, ডাক্তার ডাকব? কেমন মনে হচ্ছে?

তাঁর দাঁড়াবার অবস্থা ছিল না। বললেন, না, ডাক্তারের দরকার নেই। আগে ঘরে নিয়ে চল। শিগগির এস—

দ্রুতপদে তাঁর সঙ্গে কিয়দ্দূরবর্তী তাসকন্দ হোটেলে পৌঁছে লিফ্‌ট্‌ বেয়ে উঠে তাঁকে তাঁর ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেই তিনি বাথরুমে ঢুকে সর্বাগ্রে হড় হড় ক'রে বমি করতে আরম্ভ করলেন,—ইত্যাদি। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে এই বিদেশ বিভূঁয়ে ওলাওঠা রোগের আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, স্বজন-পরিজনের কথা স্মরণ ক'রে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলুম! এর আগে একদিন নীচের হোটেলে খাবার সময় তিনি ঠাহর না ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে 'শাদা মাষ্টার্ড' গিলতে গিয়েছিলেন,—সেদিন ভয়ানক 'বিশম' লেগে তাঁর যে 'ফাঁড়া' গিয়েছিল, সেটি আমি ভুলিনি। কিন্তু আজ আমি কোন্‌ ভাষায় তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাব—সেইটি আকুল হয়ে ভাবছিলুম! কেন মরতে আমি তাঁর সঙ্গে এসেছিলুম! কী বলব সবাইকে? কেমন ক'রে পোড়ামুখ দেখাব?

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারাশঙ্কর দরজা খুলে তাঁর চাঁদমুখখানি নিয়ে বেরোলেন! তারপর সহাস্যে বললেন, ভুল গেছ বুঝি? কাল রাত্রে তুমি যে সেই ইংরেজি জোলাপের ট্যাবলেটটি খাইয়েছিলে,—মনে নেই? তার ওপর আজ সকালে আবার কতগুলো গিলে একটু ভুল করেছি! এখন একটু ভাল আছি। বিশ্রাম দরকার।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন হাঁচ্‌কা পেলেই তীরবেগে দৌড়য়, তেমনি ক'রে আবার ছুটলুম সম্মেলনের দিকে। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ঢুকে আবার নিজের জায়গাটিতে একটু সুস্থির হয়ে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু আমোদ পাচ্ছি, এমন সময় ফিরে দেখি—তারাশঙ্কর গুটি গুটি আবার মঞ্চের উপরে উঠছেন! বাঁচলুম। চুলোয় যাক্‌ ভারতবর্ষ, আমার নিত্যসঙ্গী বীরভূম অতঃপর সুস্থ থাকলেই আমি স্বস্তিবোধ করি।

পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের সামনে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্করের 'পাতানো' ডেপুটি ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দ সকল জাতির পক্ষ থেকে সেই তথাকথিত 'সর্বসম্মত' মূল প্রস্তাবটি পাঠ এবং ঘোষণা করলেন। ডাঃ আনন্দ এই প্রাধান্য চেয়েছিলেন, যেমন অনেকেই চায়,—এবং এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি আরেকটু চিন্তা করলেই বুঝতেন, 'পরাজিত' ভারতবর্ষকে তাঁর মুখ দিয়ে উপযুক্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করানো হচ্ছিল, এবং কন্‌গ্রেসী তারাশঙ্কর ভারতের মুখপাত্র হয়েও কেমন একটা বিচিন্তিত আশঙ্কায় একটু গা-বাঁচিয়ে সরে রইলেন। সম্ভবত শ্রীনেহরুর নিকট একটি জবাবদিহির প্রশ্ন ছিল তাঁর মনে মনে। কিন্তু যে সকল বাক্য এবং শব্দের প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন তারাশঙ্কর ভারতীয় গোষ্ঠীর মুখপাত্র পদ ত্যাগ করতে গিয়েও মোহগ্রস্ত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেইগুলি যথাযথভাবে মূল প্রস্তাবটিতে সুসজ্জিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মুখপাত্র তারাশঙ্করও নয় এবং হাসিখুশী ডেপুটি মুল্‌করাজও নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেদিন নিরুপায়ভাবে চীনের বাঁকা স্বভাবের জিদ, আফ্রিকার কৃষ্ণরক্তিম চক্ষু, আরবদের বিদ্রূপ এবং নাশেরের ব্যক্তিত্ব—এইগুলির কাছে নাক খৎ দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল! পরবর্তীকালে বাস্তববাদী এবং দূরদর্শী শ্রীনেহরুর কাছে এই সব দৃশ্যের নির্ভুল চিত্র পেশ করা হয়েছিল কিনা, আমার সন্দেহ আছে।

তারাশঙ্কর বিদায় নিচ্ছেন আজই শেষ রাত্রে। সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমাকে বললেন, তুমি এখানে কিছুদিন থেকে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেবো না, আমি তোমার বাড়ির নিয়মিত খোঁজখবর নেবো। নিজেই আমি যাব তোমার ওখানে।

সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করেছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ। পুনরুক্তি বাহুল্য, তাঁর আগ্রহ এবং আকিঞ্চনেই এদেশে আমার আসা। আমার দ্বারা তাঁর সহায়তা হোক এবং এবং তিনি গৃহস্বাচ্ছন্দ্য পান, এই ছিল আমার কাম্য। তিনি আমার সতীর্থ, বহুকালের বন্ধু এবং অনেক দুর্যোগ-বিপর্যয়ের সঙ্গী। আমি তাঁর গৌরবের আনন্দভোগী। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আপন অধ্যবসায়ের দ্বারা যে খ্যাতি ও

প্রতিষ্ঠা নির্মাণ করেছেন, সেটি অনন্য। আমি তাঁর গল্পের বিশেষ অনুরাগী। একদা রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরের গঙ্গার ঘাটে তাঁর নৌকায় ব'সে আমাকে বলেছিলেন, নতুন লেখক একজন এসেছে, দেখেছ? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়! ভাল গল্প লেখে! প'ড়ে আনন্দ পাই!

আমি তখন একটি কাগজের সম্পাদক। তারাশঙ্কর সে-কাগজে লেখেন। কবির মুখে সুখ্যাতি শুনে খুশী হয়েছিলুম।

রাত্রে এক সময় তারাশঙ্করকে ডেকে বললুম, শোনো, এবার থেকে একটি কথা বিবেচনা ক'রে দেখো, ভাই। আমার বিশ্বাস, ভারতের বাইরে আর কোথাও তোমার পক্ষে না যাওয়াই সংগত। বিদেশের জল হাওয়া, খাদ্য, বসবাস এবং বিদেশী সমাজ—এদের কোনটাই তোমার ধাতে সইবে না। কথাটা মনে রেখ।

এর কিছুকাল আগে তারাশঙ্করের আমেরিকা যাবার কথা উঠেছিল, সেটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। তাঁর মতো সরল, নিরীহ এবং পল্লীধর্মী ব্যক্তির পক্ষে বৃহত্তর পৃথিবীর লোকযাত্রার মধ্যে গিয়ে না পড়াই স্বস্তিদায়ক। তাঁর স্ত্রী-পুত্র তাঁকে অতঃপর অকূলে না ভাসালেই আমি সুখী হই।

শেষ রাত্রে তারাশঙ্কর আমাকে তুললেন। তাঁকে বিদায় দিতে এলুম সিঁড়ি পর্যন্ত। শ্রীমতী ভেরা তাঁকে নিয়ে চললেন তাসকন্দ বিমানঘাঁটিতে। যাবার সময় তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "দেখো ভাই, ভারতবর্ষের সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়!" আমি হাসিমুখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

আন্দাজ বেলা দশটার সময় কানে এল, বিমানঘাঁটিতে তাঁর পাসপোর্ট নিয়ে কি যেন গণ্ডগোল বেধেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক বিমানঘাঁটি পেরোবার সময় একটি অনুমতির ছাপ প্রতি-পাসপোর্টে দেওয়া হয়। শ্রীমতী ভেরার সেটি হুঁস ছিল না। এক সময় এই স্বল্পভাষিণী মহিলা যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন হাসিমুখে প্রশ্ন করলুম, কপালে পুরস্কার কিছু জুটল?

নম্রহাস্যে ভেরা জবাব দিলেন, যাবার মুখে বাধা পড়লে সকলেরই অমন মেজাজ খারাপ হয়! অপরাধ আমারই। তবে উনি অসুস্থ মানুষ কিনা,—চট ক'রে রাগ এসে পড়ে! আমারই দোষ—!

লাউঞ্জে ব'সে আমরা কয়েকজন ভারতীয় শ্রীমতী ভেরার অবস্থাটা অনুমান করতে পারছিলুম বৈকি। কিন্তু তারাশঙ্কর ততক্ষণে দিল্লী পৌঁছে গেছেন!—

ভারতবর্ষে ত্যাগের প্রাক্কালে এটি শুনেছিলুম, সম্মেলন শেষ হবার পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েকজনকে দিন পনেরো ধ'রে তাঁদের শহর-বাজার দেখাবেন। মস্কোয় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে কিনা, সেকথা কেউ বলছে না। পরিস্থিতি উৎসাহজনক নয়।

আমাদেরকে জর্জিয়ায় নিয়ে যাবার আয়োজন চলছিল। তাই সই।

ইতিমধ্যে আমাদের অনেকে অর্থোপার্জনে মন দিয়েছিলেন। হিজিবিজি লিখে একটা খাড়া করলেই টাকা! আমি লিখেছি তিন চারটি। কিন্তু টাকার টিকিও দেখছিনে। বোধহয় 'গোকুলে' বাড়ছে। লেখাগুলো যারা নিয়ে গেছে, তাদের নামধাম কিছুই জানিনে। সে যাই হোক, এবম্প্রকার 'সাহিত্য' রচনার ফলে ভারতীয় তিনটি মহিলার আর্থিক অবস্থা দেখতে দেখতে বেশ সচ্ছল হয়ে উঠল।

বন্ধুবর চৌহান, সত্যানন্দ, পট্টনায়ক, দুর্গা ভাগবৎ, হরচরণ সিং, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি সকলেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মেজাজ-মর্জি নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা করছেন তখন নেলী মাঝে মাঝে এসে তার দুই একটি ইংরেজিজ্ঞান জানিয়ে সকলের মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি করছিল। ওরই মধ্যে এক আধবার আসা যাওয়া করছেন সহবাসী দুই অভিন্নহৃদয় কমিউনিষ্ট বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং কেরালার অধ্যাপক দামোদরন। নেলী আমাদেরকে মধ্যে মধ্যে চা খাওয়াচ্ছে। মেয়েটার চারদিকে পতঙ্গগুঞ্জন কম হয়নি। দুইটি কালো-মণির মাঝখানে তার হীরের আংটিটা জ্বলজ্বল করছে।

এমন সময় শ্রীমতী সোয়েৎলানা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে এদিক ওদিক তাকাল। রুদ্ধশ্বাসসহ উঠেছে সিঁড়ি দিয়ে,—মুখখানি বড় ক্লান্ত। আজ আর সেয়েটার নয়,—পরেছে একটি ধূসর কোমল ফ্লানেল্ কোট। কেন জানিনে, সে যেন নেলী অপেক্ষা আমার অনেক নিকটতর! পাশ থেকে কে যেন বলল, ওই নিন্, আপনার 'মেয়ে' এসে হাজির!

লানা আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে কাছে বসল। বুঝতে পারিনে মেয়েটার সরল নিষ্কলুষ ও মিষ্ট চাহনি দেখলে কেন আমার ভিতরে একটা বাৎসল্য ঘুলিয়ে ওঠে। ছোট রুমালটি দিয়ে কপাল মুছে চুলগুলি সরিয়ে সে নিজের পোর্টফোলিওটি খুলল। পরে বলল, আপনার এই আয়নাটি আমার কাছে ছিল। সেই যে সেদিন কিনেছিলেন—?

হাসিমুখে বললুম, আমার সঙ্গে এমন ক'রে সম্পর্ক ঘোচাতে তুমি উৎসাহ পাচ্ছ?

লানার আঙ্গুলগুলি একবার তার ব্যাগের মধ্যে থেমে গেল, এবং সে মাথা নীচু ক'রেই একটি রঙ্গীন পুষ্পচিত্রিত এবং লাল ফিতা লাগানো কাগজের তিনকোনা বাক্স বার করল। ঈষৎ মৃদুস্বরে বলল, আপনার বড় মেয়ে আমারও বোন, তাকে এই পাউডারের কৌটোটি দেবেন!—এই ব'লে সে বাক্সটি আমার হাতে দিল।

বিদেশে ভাবের কোনও আবেগ প্রকাশ করতে নেই, সেজন্য আমি সতর্ক হয়ে থাকি। অতঃপর এক সময় তার দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললুম, আমার বড় মেয়ের চেয়েও আমার যে-মেয়েটি বয়সে একটু বড়,—কই, তাকে ত' কিছু দিয়ে যেতে পারলুম না?

সংযত মৃদুকণ্ঠে মাথা হেঁট ক'রেই লানা বলল, তার স্বামী এবং তাঁকে আপনি আশীর্বাদ ক'রে যান্—!

আমি শুধু বললুম, একটি অনুরোধ ক'রে যাই। কিছুকাল এ ধরণের কাজ তুমি আর নিয়ো না। তোমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় এসব ছুটোছুটির কাজ তোমার পক্ষে ভাল নয়, লানা!

লানা একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু জড়োসড়ো হয়ে বলল, আপনার কথা আমি ঠিক মনে রাখব! কিন্তু আমার কাজে যদি ত্রুটি হয়ে থ'কে, তবে আমাকে ক্ষমা করবেন! কলকাতায় ফিরে মিঃ ব্যানার্জিকে আমার নমস্কার জানাবেন। অনুমতি দিন, এবার আমি যাই—

লানার বিদায় নেবার পর আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। এমন কাছাকাছি তখন কেউ ছিল না যাকে বলতে পারতুম, এমন

সংপ্রকৃতি, মিষ্টভাষিণী এবং ভদ্র মেয়ে তাসকন্দে আমি কমই দেখেছি!

উৎসবের কোলাহল কলরবের পর কেমন একটি অবসাদ এবং শূন্যতা যখন চারিদিকে ছায়াবিস্তার করেছিল, এমনি সময় দুটি যুবক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকদিন থেকে জনতার ভিড়ের মধ্যে অনেকবার এদের দুজনকে দেখেছি, আজ তারা একান্ত হয়ে কাছে এল। একজন রুশ, চোখে মোটা চশমা, বিশেষ শান্ত প্রকৃতি,—কোথাকার যেন শিক্ষক। নাম জর্জ। অন্য যুবকটির সঙ্গে ইতঃপূর্বে বহুবার আলাপ করেছি এবং মুখচেনা,—চেহারাটি অতিশয় সুশ্রী এবং সুগৌর। সে উজবেক, নাম মামুদভ। এঁরা দুজন এবার এলেন আমাদের পরিচালক এবং দোভাষীরূপে। মামুদভ সামান্য হিন্দি ও ইংরেজি জানে। এঁরা দুজন আজ সকাল থেকে আমাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমরা সবাই অতি দ্রুত অতরঙ্গ হয়ে উঠলুম।

অক্টোবরের মাঝামাঝি। স্বল্পস্বল্প বৃষ্টি বাদলও হয়ে গেছে। শেষরাত্রে জর্জ এসে আমার দরজা ঠেলে ঘুম ভাঙালেন, এবং দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যখন বাইরে এলুম তখন রাত থমথম করছে। দেখতে পাওয়া গেল সকলেই প্রায় প্রস্তুত। সদ্যস্নাতা রাণী লক্ষ্মীকুমারী, ভগিনী দুর্গা ভাগবৎ, শ্রীমতী প্রদ্যোৎ কাউর, শ্রীধরণী, সুভাষ, মাল সুখানী, দামোদরন, হরচরণ সিং, আত্রে, দেশপাণ্ডে সবাই। অবশ্যম্ভাবী শ্রীযুক্ত শেখোনও আছেন বৈকি।

বাস ছাড়ল পাঁচটায়, তখনও রাত্রি শাঁ শাঁ করছে। উৎসব শেষ হয়েছে দুদিন আগে, কিন্তু তখনও তাসকন্দ নগরী আলোকমালায় অলংকৃত। আমরা যখন বিমানঘাঁটিতে এলুম, বহু যাত্রী তখনও বেঞ্চি ও চেয়ারগুলি দখল ক'রে নিদ্রিত। উপরের হোটেলে জর্জ আমাদের নিয়ে গিয়ে প্রাতরাশের টেবলে বসালেন। গরম গরম চা অথবা কফির প্রয়োজন ছিল বৈকি। অতঃপর শ্রীমান সুভাষের সঙ্গে ব'সে গেলুম দাবা খেলায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু বিমানঘাঁটিতে দাবা খেলার ব্যবস্থা আছে।

সাড়ে ছটার সময় যখন বিমানটি ছাড়ল তখন যেমনই শীত, তেমনই অন্ধকার। ভিতরটা শীতার্ত, সুতরাং জবুথবু হয়েই ব'সেছিলুম। ভারতীয়রা মোট প্রায় কুড়িজন,—তাদের দায়িত্ব নেওয়া কম কথা নয়। জর্জ এক একবার উঠে কেবলই মাথা গুণছে, কেউ হারিয়ে গেল অথবা অন্ধকারে পিছিয়ে পড়ল কিনা। এক একজনের নাম ধ'রে সে ডাকছে, এবং চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে তার কাগজপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে। এক একবার নাম এবং কাগজের সঙ্গে মানুষটাকে মিলিয়ে সবিনয়ে সে-ব্যক্তিকে সে প্রশ্ন করছে, প্রাতরাশ ঠিকমতো খাওয়া হয়েছে কিনা। তিনটি মহিলা যাঁরা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁদের নামের পাশে জর্জ লাল চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছে। কারণ নামটি ভারতীয় বটে, কিন্তু কোনটি পুরুষ এবং কোনটিই বা মেয়ে? জর্জের মুখে চোখে উদ্বেগ অশান্তি আর দুর্ভাবনা লেগে রয়েছে। জীবনে এত বড় দায়িত্ব আর কবে সে পালন করেছে? সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব আর কবে এমনভাবে তার মুঠোর মধ্যে এসেছে — এই কাজটির মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার কথা, সোভিয়েট আতিথেয়তার কথা, ভারতীয়গণের মর্যাদার কথা, এবং সম্ভবত তার নিজ জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার কথা,—সুতরাং জর্জ মুহুর্মুহু আমাদের সকলের তদ্বির তদারকের জটিল সমস্যা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে কাগজপত্র ওলটাচ্ছিল।

এপাশে ফিরে দেখি নিদ্রানিমীলিত চক্ষে মামুদভ সিগারেট টানছে। মুখে মৃদু সুন্দর মিষ্ট হাসি। এ জীবনে কোনও উদ্বেগের ধার সে ধারেনি। পরম নিশ্চিন্ত সে। আমরা কে কে প্রাতরাশ খাইনি, সে-খবর সে রাখেনি। কিন্তু নিজে সে ওই ভোর রাত্রে গিলেছে প্রচুর। গল্পগুজবে আনন্দে আড্ডায় সে মশগুল। সে দোভাষী বটে কিন্তু গলায়-গলায় বন্ধু! কাল আমার কানে কানে সে বলেছে, ভাগ্যি আপনারা এসেছিলেন! সরকারি খরচে ভ্রমণে যাচ্ছি পনেরোশ' মাইল দূরদেশে। আরে, "বিলিসি"তে আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি যে! ভাগ্নে ভাগ্নিদের দেখিনি কতদিন। আমি ঠিক আছি, বুঝলেন সার, কিচ্ছু ভাবতে হবে না। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে! আমি একাই একশ'! আর তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তি—ব্যস।

মামুদভ আমারই পাশে ব'সে সিগারেট টানছিল। যুবকটি আপন মধুর এবং প্রসন্ন প্রকৃতির জন্য আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

জেট বিমানটি আমাদের নিয়ে দূর শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। উপরে মহাকাশ, এবং নীচেকার অনন্ত অতলের দিকে মহাসমুদ্রবৎ মেঘস্তর,—পৃথিবীর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। এটিও সেই টি-ইউ-১০৪ প্লেন,—সোভিয়েটের গর্ব! এই বিমান যিনি প্রথম নির্মাণ করেন তাঁর নাম মিঃ টপোলেভ,—সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বজনপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। আন্দাজে পাওয়া যাচ্ছিল, আমরা পশ্চিম দিকে ভেসে যাচ্ছিলুম। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ফুট উপরে শূন্যলোকে যাবার পথে একবারও আমরা জানতে পারলুম না যে, আমরা শিরদরিয়া নদী পেরিয়ে কিজিল-উর্দা এবং কারাকুমের অন্তহীন মরুলোক অতিক্রম ক'রে এবার আরল হ্রদ পার হচ্ছিলুম। তাসকন্দ টাইমে সকাল আটটা যখন বাজল, তখনই মাত্র দেখা গেল দূরে পূর্বআকাশে রক্তিম বর্ণের সমারোহ ঝিলমিল ক'রে উঠেছে।

মামুদভ আমার গায়ে একটা ঠেলা দিল,—আঃ, চেয়ে দেখুন না পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে! সাক্ষাৎ পরী!

ফিরে দেখি একটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী তরুণী হাসি-হাসিমুখে প্রাতরাশের ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে। মামুদভের দুটি সুন্দর চক্ষু ওই মেয়েটির কালো দুটি আয়ত চক্ষুকে যেন চিরকাল ধ'রে চেনে! মেয়েটি প্রাতরাশ দিয়ে চলে যাবার পর একটা মাংসের চপে কামড় দিয়ে মামুদভ আমার কানে কানে বলল, 'আরমেনিয়ার মেয়ে,—ওর নাম হ'ল 'রোজা'!

তুমি কেমন ক'রে জানলে?

আমি!—মামুদভ হা হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, সব জেনে নিয়েছি প্লেনে ওঠবার আগে! দেখবেন একবার কি ক'রে ভাব করতে হয়? দাঁড়ান—

এই ব'লে মামুদভ গোগ্রাসে প্রত্যেকটি সামগ্রী চিবিয়ে গিলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বললুম, তুমি বিয়ে করেছ, মামুদভ?

বিয়ে! তবেই হয়েছে! এখন বিয়ে করলে বাবা ধ'রে ঠ্যাঙাবে না?

প্রশ্ন করলুম, কেন? তুমি রোজগার করছ, বিয়ের বয়সও হয়েছে,—দেখেশুনে একটি বিয়ে ক'রে ফেলো না কেন?

মামুদভ বলল, দেখেশুনে? কেন, আমার প্রাণে ভয় নেই? বাবা বেঁচে থাকতে এসব চলবে না। তাহলে কান ধ'রে একেবারে অর্ধচন্দ্র! তিনি ভীষণ সেকেলে লোক!

প্রাতরাশ শেষ হবার পর একটা বিশেষ সময়ে বিমানটি যেন নীচে নামছিল, এবং নামতে নামতে এক সময় মেঘসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিল। যেন নীরেট বিবর্ণ একটা বোবা ধূসরতার গূঢ়রন্ধ্রে কতক্ষণের জন্য আমরা হারিয়ে গেলুম সাবমেরিনের মতো। তারপর এক সময় লক্ষ্য করলুম, পৃথিবীর কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বিশাল এক মরুভূমির প্রান্তে রয়েছে যেন এক সুনীলাভ সমুদ্র, এবং তারই দূরে সীমানায় অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী এবং রূপালী রেখার মতো সর্পিলগতি দু' একটি নদী। রেলগাড়িতে না চড়লে কতটুকুই বা দেখতে পাই? কিন্তু আমার নিজের ধারণা, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বিদেশী পর্যটকদের জন্য সচরাচর রেলগাড়িতে ভ্রমণ পছন্দ করেন না! পর্যটকেরা দেশ, গ্রাম, জনপদ, লোকালয়, এবং জনগণের

আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখতে-দেখতে যান; এটি বোধকরি তাঁদের অভিপ্রেত নয়। একথা সত্য, অল্প সময়ের মধ্যে পর্যটক-দের জন্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে গেলে বিরাট সোভিয়েট ভূভাগে বিমান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু যে সকল পর্যটকের হাতে প্রচুর সময় আছে, এবং যাঁরা নিজেদের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত,—তাঁদের যেখানে খুশি রেলভ্রমণ করবার সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এমন সংবাদ আমরা শুনিনি। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। পৃথিবীর বহু জাতি বহু-কাল ধ'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিবিধ প্রকার শত্রুতাসাধনে লিপ্ত, এবং অর্ধসত্য এবং অর্ধমিথ্যার জাল বুনে বহু জাতি তাঁদের বিপক্ষে শত্রুজনোচিত প্রচারকার্য ক'রে আসছেন! এর ফলে কোনও ব্যক্তি অথবা জাতিকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে ভয় পান। সেই সঙ্গে একথাও সত্য নয় যে, অন্যান্য দেশের জাত-কমিউনিষ্টকে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন! কারণ কার মনে কি আছে, দেবা ন জানন্তি—! যারা বন্ধু-সজ্জন, তারা প্রকৃত বন্ধু কিনা এটি তলিয়ে জানতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেক দিন লাগে। কোনও ভারতীয় কমিউনিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে যত্রতত্র অবাধ ভ্রমণ ক'রে বেড়াবার সুবিধা অদ্যাবধি পেয়েছেন, এটি আমার জানা নেই। চীনাদের সুযোগ সুবিধা সামান্য কিছু বেশি। নচেৎ কোনও কমিউনিষ্টের পক্ষে কোনও বিশেষ সুবিধা সোভিয়েট ইউনিয়নে আছে, এটি আমার চোখে পড়েনি। এককালের কমিউনিষ্ট অন্য-কালে এসে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে বৈরিতা করেছে, এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেই জন্য সর্বাপেক্ষা নিকট বন্ধুদেরকে তাঁরা যদি বা বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসান, অন্দরমহলে একেবারেই ঠাঁই দেবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত নন্।

ককেসাস পর্বতমালার শীর্ষদেশ-গুলি তুষারে আবৃত। কিন্তু তার নীচে গম্ভীর অরণ্যে ও নদী-নির্ঝরিণীতে প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর। আমাদের বিমানটি জর্জিয়ান রিপাবলিকের একটি বিমানঘাটিতে অবতরণ করছিল। দেখতে পাচ্ছিলুম পূর্বে পশ্চিমে দুটি বিশাল সমুদ্র,—একদিকে কাশ্যপ উপসাগর, অন্যদিকে কৃষ্ণসাগর। এই দুই সাগরের মধ্য ভূভাগে কয়েকটি দেশ যেন গায়ে-গায়ে জড়িয়ে রয়েছে—যেমন আজারবাই-জান, ইরান, আর্মেনিয়া, তুরস্ক, জর্জিয়া এবং ট্রান্স-কর্কেশিয়া। এদের মধ্যে ইরান ও তুরস্ক হল পররাষ্ট্র।

আমাদের বিমানটি দেখতে দেখতে নেমে এল "টিফ্লিশ" শহরের বিমান-ঘাটিতে। এখানকার স্থানীয় নাম হল 'টিবিলিসি'। কিন্তু আদর ক'রে সবাই একে ডাকে, "বিলিসি"। সোভিয়েট ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশে এই আমরা প্রথম পদার্পণ করলুম। তা যদি হয় তবে এটি ইউরোপের সর্বশেষ দক্ষিণ-পূর্ব কোণ। আমরা হঠাৎ একটি নতুন জগতের যেন স্পর্শ পেলুম।

অপরিচিত দেশ, এবং যাঁরা অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের কারও কোনও পরিচয় জানিনে। দোভাষী জর্জ সকলের সঙ্গে সকলের হাত মিলিয়ে দিলেন। ওঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা এই প্রথম ভারতীয়কে দেখলেন, এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁদের দীর্ঘকালের সশ্রদ্ধ কৌতূহলের কথাও জানালেন। আশেপাশে পুষ্পোদ্যান এবং সর্বত্র শ্রীমণ্ডিত। আজ সকালের কাগজ-গুলিতে ভারতীয়গণের আগমনবার্তা বোধকরি ছাপা হয়েছিল, সেইজন্য কয়েকজনের হাতে একটু ছোট সাইজের কয়েকটি সংবাদপত্র ঘোরাফেরা করছিল। ওঁরা সকলের ছবি তুললেন, এবং এই ছবিযুক্ত সংবাদপত্রাদি পরদিন ভারতীয়-গণের হাতে দেওয়া হয়েছিল। কাগজ-গুলির ছাপা, ছবি এবং প্রসাধন—ভারতবর্ষের সংবাদপত্রাদি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এইখানে দাঁড়িয়েই আমাদের দলটি দ্বিধা বিভক্ত হল। বড় দলটি চললেন আর্মেনিয়ার রাজধানী 'এরিভানের' দিকে। তাঁদের জন্য একখানি ভাল সরকারি বাস অপেক্ষা করছিল। এটি লক্ষ্য করেছি, অতিথিদের পক্ষে অসুবিধা না হয়, সেদিকে ওঁদের সতর্ক লক্ষ্য থাকে। এদিকে শ্রীধরণী, সুভাষ ও দামোদরনকে নিয়ে আমরা চারজন, এবং আমাদেরকে শহরে নিয়ে যাবার জন্য দুখানা মোটর প্রস্তুত ছিল। ওঁরা সঙ্গে নিলেন জর্জকে, এবং আমাদের সঙ্গে রইল মামুদভ। মামুদভ ভারি হাসি-খুশী।

প্রাচীন "টিফ্লিস" শহর পার্বত্য,—ছোটবেলাকার ভূগোলের বইতে এটি পড়া ছিল। দূরদূরান্তে ককেশাসের চূড়াগুলি দেখা যাচ্ছে, এবং এই শহরটি উপত্যকার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বন বাগান, বড় বড় গাছপালা ও সুদীর্ঘ সুন্দর মসৃণ পথ এবং আশেপাশে পাহাড়তলী—দৃশ্য হিসাবে এগুলি মনোরম। পথে ট্রাম, ট্রলিবাস, বাস, মোটর, ট্যাক্সি—ইত্যাদি যানবাহন প্রচুর। মালপত্র বহনের জন্য ট্রাক এবং ঘোড়ার গাড়ি—দুই-ই আছে। মাঝে মাঝে খোলা ও বদ্ধ ট্রাকে দলের পর দল পুরুষ ও মেয়ে মজুর যাচ্ছে। ওদের নাম "ওয়ার্কার"—অর্থাৎ কর্মী। কর্মী ছাড়া অপর কোনও সংজ্ঞা সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই! জনগণকে বলা হয় "নরোদ"।

লেনিন এবং ষ্টালিনের বিভিন্ন ভঙ্গীর প্রতিমূর্তি প্রায় বহু চৌমাথায় প্রতিষ্ঠিত। লেনিনের মূর্তিগুলির মধ্যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের কাঠিন্যকে সর্বত্রই প্রকাশ করা হয়েছে। ষ্টালিনের মূর্তিতে নাটকীয় ভঙ্গী কম, তবে প্রাধান্য প্রচুর। এই জর্জিয়া হল ষ্টালিনের জন্মভূমি। কৃষ্ণসাগরের এপারে জর্জিয়া এবং ওপারে ক্রাইমিয়া,—এই দুই দেশে মানুষের পরমায়ু নাকি পৃথিবীর মধ্যে গড়পড়তায় সর্বাধিক। এই জর্জিয়াই নাকি সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে সর্বশ্রেষ্ঠ আহার্য তালিকা যুগিয়েছে শুনতে পাই। সেই আহার্য তালিকার প্রথম দফাই হল, "দই"! সোভিয়েট দেশে প্রাতরাশের সময় দই হল প্রথম খাদ্য! নুন অথবা চিনি যোগ না ক'রে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতরাশ খাবার ভূমিকাস্বরূপ এক গ্লাস ঘন পাৎলা দই খায় সকলের আগে। দইটি টক, এবং এর সাধারণ নাম হল, "কেফির"। এটি সাধারণভাবে সকলেরই প্রিয়।

মেঘলা দিনটি বেশ ঠাণ্ডা। এগারো মাইল পথ পেরিয়ে লেনিনের একটি বিশাল ও সুউচ্চ স্কোয়ার ঘুরে নগরের সর্বাপেক্ষা জনবহুল একটি রাজপথের উপরে এক স্থলে এসে আমরা নামলুম। সামনেই "ইনটুরিষ্ট হোটেলের" মস্ত বড় বাড়ি, এবং আমাদের সঙ্গে যে তিন-জন কবি ও সাহিত্যকর্মী "লেখক সঙ্ঘের" পক্ষ থেকে এতক্ষণ ছিলেন, তাঁরা আমাদের আহার বিহার বসবাস এবং দৃশ্যাদি পরিদর্শন করানোর দায়িত্ব-ভার নিয়েছিলেন। কৌতুকের বিষয় ছিল এই যে, আমাদের চারজনের মতো মামুদভও এদেশে নতুন এবং সেও সমান কৌতূহলী। শুধু তাই নয়, আমাদের কোনওমতে এক জায়গায় বসিয়ে সে তার আত্মীয় পরিজন মহলে যাবার জন্য ব্যস্ত, এবং লেখক সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের হাতে আমাদের দায়িত্ব তুলে দিয়ে সে একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াবারই পক্ষপাতী। তার ভাব এবং ভঙ্গীর মধ্যে কতকটা যেন স্বাভাবিক যৌবন চাঞ্চল্যও ছিল, এবং বন্ধুবর শ্রীধরণী তার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাকে মাঝে মাঝে ছুটি দিচ্ছিলেন। মামুদভ চেষ্টা করছিল তার কর্তব্যপালনে যথাসম্ভব যেন ত্রুটি না থাকে।

হোটেলে দুটি ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল দোতলায়। এ বাড়িটি প্রাচীন আমলের, এবং বনেদী। এই সম্পত্তির মালিক কে ছিল, তার কাহিনী স্পষ্টত মুছে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু সেকালের "বনেদী" ব্যবস্থা এ বাড়িতেও থেকে গেছে। অর্থাৎ বাথরুম অনেক দূরে! তোয়ালে গামছা দাঁতমাজন সাবান ইত্যাদিসহ লোটা হাতে নিয়ে ইউরোপীয় সমাজের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে বাথরুম খুঁজে বার করার মধ্যে যে

আড়ষ্টতা আছে, সেটি চট ক'রে মামুদভকেও বোঝানো যায় না। কাছা-কাছি মেমসাহেব যারা তত্ত্বাবধানে রয়েছে তারা একটু বেশি ফর্সা এবং একটু বেশী সুসজ্জিতা,—আমাদের সঠিক অসুবিধাগুলি তাদেরকে বোঝাতে যাব, এমন ভাষাও হাতের কাছে নেই। আমাদের একমাত্র উপায় ছিল ধর্মঘট! কিন্তু সেটি আপাততঃ থাক্। আরও বিপদ, সোভিয়েট স্নানাগার এবং শৌচাগারগুলি প্রাচ্যজাতিগণের কতকগুলি সুপ্রাচীন বদ অভ্যাস বহন ক'রে থাকে,—সোভিয়েট ইউনিয়নের পনেরোটি রিপাবলিক সেই পুরনো এবং নোংরা অভ্যাস থেকে আজও পরিত্রাণ পায়নি! জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ আরও কিছু প্রচার করা কর্তব্য! এ সম্বন্ধে আমার নিজের দেশের কথা ভুলিনি। পাঞ্জাব এবং বিহার প্রদেশ দুটিতে যাঁরা তন্ন তন্ন ক'রে ঘুরেছেন, তাঁরাই জানেন জনসাধারণের একটা বৃহৎ শ্রেণী জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি প্রকার অজ্ঞ!

সুভাষের সঙ্গে হাঁটাপথে একটু বেরিয়ে পড়েছিলুম। পায়ে না হাঁটলে জনচিত্তের সঙ্গে কোনও সংযোগ করা যায় না। একটি দোকানের সামনে যদি দাঁড়াই, একটি জঞ্জালের পাত্রের প্রতি যদি তাকাই, একটি শিশুর হাসির কারণ যদি বুঝি, যদি হাট-বাজারের মধ্যে দেখে বেড়াই, সরু গলিটির মধ্যে মাথা গলাই, বাগানের রেলিংয়ের ধারে যে-মুচিটি জুতো শেলাই নিয়ে রয়েছে যদি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই,—তারই মধ্যে পাওয়া যায় দেশের প্রকৃত ছবি! জাতিচরিত্রের প্রকৃত পরিচয় যেমন আছে তার সাহিত্যে নাট্যে চিত্রে এবং বিভিন্ন কীর্তিতে, তেমনি আছে বস্তিতে বাজারে নোংরা গলিতে এবং নালা-নর্দমায়। যারা দল-বল মিলে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্ত জনজটলার মধ্যে গল্পগুজবের আসর বসায়, তারা ত' পোষাকী শ্রেণী! তারা ত' মনোনীত ব্যক্তি, তাদের আলাপ ত' ওজন করা, তাদের ভালবাসা ত' রাজনৈতিক, তাদের অভ্যর্থনা নৈর্ব্যক্তিক! তাদের মধ্যে প্রকৃত দেশ আছে কি? আছে কি প্রকৃত জনসাধারণের চিত্তলোক?

'বিলিসি' নগর তাসখন্দ অপেক্ষা ধনী। চোখ দুটো ঘোরালেই দেখতে পাওয়া যায় জনসাধারণের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল; দুরবস্থা এবং দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র নেই তাদের পোষাকে এবং স্বাস্থ্যে। প্রতি বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল দোকান জনতায় পরিপূর্ণ, এবং সাধারণের ক্রয়-শক্তি বিপুল পরিমাণ! ছোট ছেলেমেয়ে-দের সাজসজ্জা অতি মূল্যবান পশম এবং ফ্লানেলে ঢাকা। পথে বেরোলেই শিশুর হাতে তাদের মা বাপ খেলনা কিনে দেয়। মেয়েদের হাতেই অধিকাংশ বাজারের থলে। তাসখন্দ ছেড়ে এসে আঙ্গুরের হাত থেকে কতকটা নিষ্কৃতি পেয়েছি! প্রায় সব মেয়ের থলের মধ্যে দেখছি আপেল-আনার - টমাটো-মাংস - পাঁউরুটি পেঁয়াজ-শশা, ছোট ছোট মুলো, বিট গাজর এবং তার সঙ্গে দু'একটি বোতল কিংবা টিনের অথবা কাচের কৌটা। সোভিয়েট ইউনিয়নে গ্যাস অথবা ইলেক-ট্রিকে রান্না হয়। প্রতি গৃহস্থ-ঘরে গরম জলের সুব্যবস্থা আছে। কিন্তু শীত-প্রধান দেশে প্রতি বাড়িতে কেন্দ্রীয় উত্তাপ-সৃষ্টির ব্যবস্থা আছে কিনা খোঁজ পাইনি। 'বিলিসি' শহরের ধনসম্পদের চেহারা দেখে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম।

আমরা যে-অঞ্চলে আছি সেটি "চৌরঙ্গী পাড়া", এপাশে "ধর্মতলার" মোড়, ওদিকটায় "ক্যামাক ষ্ট্রীট" ও "রডন ষ্ট্রীটের" পরিবেশ। পথ কোথাও নেমেছে গড়িয়ে, কোথাও উঠেছে ঢালু হয়ে। একটি মস্ত বাগান দেখছি, তার উত্তরে একটি গির্জা,—গির্জার মাথায় একটি ঘড়ি। বাগানের একটি বেঞ্চে নিরিবিলি গাছের ছায়ার নীচে বসে রয়েছে একটি তরুণ দম্পতি। কিন্তু দিনের বেলায় উভয়কে একটু যেন বেশি ঘনসান্নিবিষ্ট হয়ে বসতে দেখে মনে হ'ল, বিবাহিত দম্পতি নাও হতে পারে। দুই সপ্তাহকাল হতে চলল, সোভিয়েট ইউ-নিয়নে এসেছি। নানা পথে এবং নানা অঞ্চলে কম ঘুরিনি। কিন্তু চকিতে এমন দৃশ্য কোথাও চোখে পড়েনি, যেটিতে শালীনতার অভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ্য পথে ঘাটে পার্কে নিরিবিলিতে ঝোপঝাপের আড়ালে বিজনে বাগানে—এমন উদাহরণ দিনে ও রাত্রে দেখতে পাইনি যেটিকে বয়সোচিত লীলা-চাপল্যের দৃশ্য বলতে পারা যায়। শুধু একদিন সন্ধ্যায় তাসকন্দ হোটেলের পাঁচতলার সিঁড়ির বাঁকে দুটি রুশ তরুণ তরুণী নামবার পথে ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেটি খুঁটিয়ে আমি বলব না! তরুণ সত্যানন্দ পাশ থেকে বলেছিল, দেখলেন একবার কাণ্ডটা?—উত্তরে আমি বলেছিলুম, না, দেখিনি। চুপ কর!

দুখানা মোটর আমাদের চারজনের জন্য সর্বদা মোতায়েন ছিল। কিন্তু সঙ্গে তিন চারজন যাঁরা আশেপাশে ঘুরছেন তাঁরা আমাদের "এক পালকেরই পাখী" অর্থাৎ কবি ও লেখক। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়সে প্রবীণ তিনি জর্জিয়ান লেখক সঙ্ঘের চেয়ারম্যান ও কবি, আরেকজন সেক্রেটারী। লেখক সঙ্ঘ এখানে প্রচুর প্রতিপত্তিশালী। তাঁদের মস্ত আপিস, ক্লাব, কাছারি, নাট্যমঞ্চ এবং বিবিধ বিনোদনী প্রতিষ্ঠান। তাঁরা এদেশে নমস্য এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। সরকারী রাজনীতি ও পার্টির নিয়মকানুনের সঙ্গে লেখক সমাজ সংযুক্ত। একজন বড় লেখক এবং একজন মন্ত্রী—উভয়ের মধ্যে প্রধান কে, বলা কঠিন। একজন বিশিষ্ট লেখক যদি কোনও কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তবে রাষ্ট্রকর্তাদের টনক নড়ে ওঠে। লেখকদের 'ঘরোয়া' স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করার সাহস নাকি রাষ্ট্রের নেই! কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্তা যে কমিউ-নিষ্ট পার্টি,—লেখক সমাজের সঙ্গে সেই পার্টি যে একাকার! সংঘর্ষ বেধে ওঠবার পথ নেই, কেননা একজন বিশিষ্ট লেখক মানেই ত' একজন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্মী! সোভিয়েট সাহিত্যের সর্বশেষ লক্ষ্যটি ই হল আদর্শ কমিউনিষ্ট সমাজের ভিত্তিমূলকে দৃঢ়তর করা! বিগত চল্লিশ বৎসরকাল যাবৎ একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ভিন্নরূপ সমাজ-ব্যবস্থার চিন্তা আর কারও কল্পনাতেও আসে না! সাহিত্যের যে-অংশটায় রস-কল্পনার উদার এবং প্রশস্ত ক্ষেত্র, যেটি সর্বপ্রকার শাসন এবং বাঁধনের বাইরে আপন রসোপলব্ধির পথকে শুধু স্বীকার করে, রুশ সাহিত্যের সেই চিরকালীন প্রাণধারা অচিরকালের মধ্যে শুকিয়ে আসবে কিনা এ প্রশ্ন আমার নিজের মনেই থেকে গেছে!

শহরের ভিতর দিয়েই বনময় উপত্যকা পথ পেরিয়ে চার পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে উঠে এলুম। চারিদিকের এমন বিস্তৃত মনোরম ছবি আগে দেখিনি। দীর্ঘ পাহাড়ের সমান্তরাল রেখা যেন 'বিলিসি' নগরীর প্রাচীরের কাজ করছে। পাহাড়ের এক-দিকের ঢালুতে বিলিসি শহর, অন্য-দিকে অরণ্যের দূর দূরান্তরব্যাপী দৃশ্য। নিকটে দূরে ওক, পাইন, বার্চ ইত্যাদি ঘন বৃক্ষজটলার সমারোহ। ছুটির দিনে আশেপাশে নগরের অনেকে এখানকার নিরিবিলি নিকুঞ্জলোকে চড়ুইভাতি করতে আসে। নগরের ঠিক মধ্যপথ ধ'রে যে-নদীটি বয়ে চলেছে, তার নাম 'কোরা'। কোরার দুই পারে বসেছে জনবসতি। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে জর্জিয়ার মতো এমন উর্বর, শস্যশালিনী, খনিজ-সম্পদপ্রধান, স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যের লীলাভূমি নাকি কমই আছে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়েছিল জলাপাহাড় থেকে দার্জিলিং নগরীর দৃশ্য, মুসৌরীর উপরে দাঁড়িয়ে নীচেকার দেরাদুন, টিফিন-টপে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে নৈনিতাল, এবং পাইন-পীকে দাঁড়িয়ে সুন্দর শীলং নগরী! কিন্তু যে-চারটি ভারতীয় দৃশ্যের নাম করলুম তার একটিতেও প্রবহমানা নদী নেই, শুধু নৈনীতালে আছে সুবিস্তৃত সরোবর!

(ক্রমশঃ)

মতামত

॥ হিন্দী অনুবাদ প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

প্রথম বর্ষ ২৫-তম সংখ্যায় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের **রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য** প্রকাশের পর কয়েকটি আলোচনা লক্ষ্য করলাম। এ সম্বন্ধে কিছু অনুপূরক বক্তব্য রাখার ইচ্ছা করি, প্রয়োজন বোধে প্রকাশ করতে পারেন।

এ বছর (১৯৬১)-এর প্রারম্ভে বোম্বাইয়ের রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় পাশ্চাত্য জন-মানসে বিশ্বকবির পরিমিত প্রভাব আমরা আর একবার লক্ষ্য করেছিলাম। বলাবাহুল্য, উপযুক্ত অনুবাদের অভাবই এর মূলে কারণ। ফাদার ফালো এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপে রবীন্দ্র-রচনার এ পর্যন্ত যা অনুবাদ হয়েছে তা পরিমাণে যেমন সামান্য যোগ্যতা-বিচারে তেমনি কয়েকটি মাত্র সার্থক। রবীন্দ্র-কবিতার হিন্দী অনুবাদ নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্ক উঠলো তার মূলে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির ন্যায় (ব্যতিক্রম যথা গুজরাতি) সরকারী পোষকতা-পুষ্ট হিন্দী ভাষাও এই অনুবাদ কর্মে সফল হয়নি। দুর্বল ভাষা-পদ্ধতির কথা বলছি না, যা তথ্য তাকে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই মাত্র। হিন্দী প্রায়শ ব্যর্থ হলেন কিন্তু চেষ্টা যে করছেন এ কথা নিশ্চয়ই ভুলবো না। আশা করি অনুশীলন পরিণামে সার্থক হবে। এ প্রসঙ্গে স্বনামধন্য শিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। বাংলার সঙ্গে যখন পূর্ব ও উত্তর ভারতের অনেক ভাষাগোষ্ঠীর পার্থক্য দুরধিগম্য নয়, তখন শুধু লিপির পরিবর্তন করে রবীন্দ্র-রচনার মৌলিক রস অন্যান্য ভাষায় সহজেই প্রবাহিত করা চলে। হিন্দী, মারাঠি, পাঞ্জাবি ভাষাগুলির একই লিখন পদ্ধতি, সুতরাং এক দেবনাগরি হরফে ছাপা হলেই এ সব ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে রচনার প্রসার ঘটবে। পাদটিকায় দুরূহ কথাগুলির অর্থ বিভিন্ন ভাষায় (সঙ্গে ইংরেজিও থাকতে পারে) বোঝান থাকলেই যথেষ্ট। পরিকল্পনাটি ভারত সরকার মূলত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কাজ বেশি দূর এগুলো না কেন জানি না। শ্রুতি-নির্ভর পদাবলীতে লিপির সমস্যা নেই। গান কাব্যপাঠ, নাট্যাভিনয় ভারতের অনেকগুলি অঞ্চলেই মূল ভাষায় প্রচার করা চলতো, বিশেষত গান—যেখানে সুরাশ্রয়ী কথাগুলির ধ্বনিরম্যতাই প্রধান অংশ। কিন্তু এই পরিচয় সাধনের দিকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত আকাশবাণীর কার্যক্রম কখনই নির্দেশিত হয়নি; উপরন্তু দেখি স্থানীয় কলকাতা কেন্দ্রটি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হিন্দীর আক্রমণে বিপর্যস্ত। সরকারি উচ্চতম মহলে 'গুরুদেব' বলে বন্দিত কবির মূলে রচনার প্রসারে কেন এই অনাসক্তি? রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছিলেন এই কি তাঁর অপরাধ? শতবার্ষিকী বর্ষে সরকারি দপ্তর থেকে রবীন্দ্র-প্রবন্ধের একটি ইংরেজি সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল—সংকলিত রচনাগুলি যে বাংলা থেকেই অনূদিত তা কোথায়ও উল্লেখ নেই। স্বীকৃতিদানে হিন্দী অনুরাগী কর্তৃপক্ষ লজ্জা বোধ করেন নাকি। ঘটনা যেভাবে আবর্ত তুলছে, বলা যায় না, রবীন্দ্রনাথ হিন্দী কবি ছিলেন—এমন কথা না বিদেশীর মুখে শুনতে হয়।
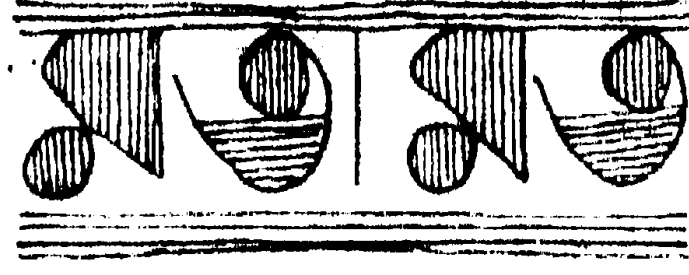
ডঃ ত্রিপাঠী বাংলা লিপির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কোন লিপিই বা আদর্শ। আর যা হোক বাংলা দেবনাগরি লিপির মত অতো জটিল হয় না। রোমক লিপি ব্যবহারে বাংলায় ক'জন অনুরাগী জানি না, তবে প্রচলিত লিপির অনুকূলে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এই সেদিনও শারদীয় "যুগান্তরে" তাঁর বক্তব্য রেখে গেছেন, বাংলা লিপিকে রাষ্ট্র লিপি করার দুরাশা বা অভিসন্ধি তাতে ছিল না। বাংলা উচ্চারণ অশুদ্ধির কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু সে হিসাবে হিন্দীও কি অশুদ্ধ বা বিকৃত ভাষা নয়। আসল কথা, বাংলা এবং হিন্দী সংস্কৃত থেকে দুভাবে বেরিয়ে এসেছে। সময়ের গুণে অনেক বিবর্তন ঘটেছে। যা পরিবর্তন তাকে পরিবর্তন বলাই ভাল।

বাংলা ভাষার গর্ব শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই নয়। অধিক থাক, ভারত সীমানার বাইরে তা এখন রাষ্ট্রমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ওড়িয়া অসমিয়া মৈথিলী ভোজপুরি ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে বাংলার যতটা মিল বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপে বিভক্ত তথাকথিত হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাগুলির অন্তর্বর্তী মিল তার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি নয়।

কথাগুলি পূর্ণ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, তবু ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। সমস্তই তাই জটিল হয়ে উঠেছে। আমরা একে অপরকে আঘাত করছি, ফলে সবারই মন তিক্ত হয়ে উঠছে—জাতির একতার বাঁধনে ফাটল ধরছে। ডঃ ত্রিপাঠীর মানসিকতা আমরা বুঝি, কিন্তু সেই সঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায় বা অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষোভই বা অস্বীকার করি কি করে। প্রত্যেক ভাষাই তার স্বাভাবিক বিকাশ চায়, কিন্তু হিন্দী যেন তার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। আসল কথা, ভাষার কথা আজ আর ভাষার মধ্যেই বাঁধা পড়ে নেই, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে সমস্ত সমস্যাটাই অন্য রূপ নিয়েছে। হিন্দীকে তাই এর প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হচ্ছে। রাষ্ট্র মানে নাকি জাতীয় (হিন্দীতে), হিন্দী এই জাতীয় ভাষার সিংহাসন দখল করতে বসেছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই আসন গেড়েছে। কি তার গুণ? এ কথা কে জিজ্ঞাসা করবে? ইতি,

অশোককুমার দত্ত।
(বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)

* * *

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু,

বেশ কিছুকাল পূর্বে অমৃতে প্রকাশিত শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংস্কৃত অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষার প্রতি অজ্ঞতাপ্রসূত অহেতুক মন্তব্য নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ। শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দুবাবুর প্রস্তাবটির প্রতি ডাঃ ত্রিপাঠী মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীটি কিন্তু সমর্থনযোগ্য নয়। ডাঃ ত্রিপাঠী মহাশয় নিজেকে বাংলা ভাষাজ্ঞ ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁর কৃত অনুবাদটিকে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন, তাঁর অনুবাদ যতই সুন্দর হ'ক না কেন, মূলের মিনতির সুর ওতে নেই। এটা তাঁর অক্ষমতা নয়। আসলে, ভাষান্তরিত হ'লে মূলের মাধুর্য আর থাকে না। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অনুবাদে তা নষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি যে-সব ভাষার মূল সংস্কৃতে নিহিত, একটু আয়াস করলে যারা পরস্পরের ভাষার রস উপলব্ধি করতে পারে, কেন তারা অনুবাদের কারা-প্রাচীর তুলে মূল রসগ্রহণে বঞ্চিত হবে? রেডিওতে যখন রবীন্দ্র-সংগীতের হিন্দী অনুবাদ কিংবা মীরার ভজনের বঙ্গানুবাদ শুনি, তখন কান্না পায়। যুগবাহিত সনাতন সংস্কৃতি কি জাতীয় দুর্দিনে সংহতির সেতু হ'তে পারে না? ভাষা সমস্যার সমাধানে অরুণবাবু বা ত্রিপাঠী মহাশয়দের কি কিছুই করণীয় নেই? আমার মনে হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্ধেন্দুবাবুর প্রস্তাবটি নস্যাৎ করা তো যায়ই না, অপিচ, বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। নমস্কারান্তে—

বীরেন ভট্টাচার্য
কলিকাতা—৩।

মহাত্মা শিশিরকুমার

আনন্দকুমার সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত চেতনা বাঙালীর জীবন-প্রবাহে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সে চিন্তাচেতনায় সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কয়েকজন লোকোত্তর পুরুষ একালেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের অক্লান্ত শক্তিমত্তায় বাঙালী নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাদের অন্যতম।

সেদিনের কথা বাঙালী কোনদিন ভুলবে না। শক্তিমত্ত ব্রিটিশ শাসক এদেশের মানুষের ওপর শোষণ চালিয়েছে নির্দয়ভাবে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেই সময়েই শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এই দুঃসাহসী মানুষ ইংরেজের সর্বপ্রকার শাসন-দণ্ড উপেক্ষা করে অত্যাচারিত সহায়-সম্বলহীন চাষীদের মর্মন্তুদ জীবনকে তুলে ধরলেন সমস্ত মানুষের সামনে। সে সময়কার বিভিন্ন লেখকের রচনায় এবং পত্র-পত্রিকায় তাঁর শ্রান্তিহীন কর্মযজ্ঞের কাহিনী অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইংরেজ সরকার প্রেস অ্যাক্টের সাহায্যে কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনাতে শিশির-কুমার রাতারাতি ইংরেজিতে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করে এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেন। এই ঘটনা সারা বিশ্বের বিপ্লব আর জাতি-মুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিশিরকুমারের এ প্রচেষ্টা তৎকালীন মুক্তিপ্রয়াসী জাতির চেতনামূলে যেমন শক্তি সঞ্চার করেছিল তেমনি বিদেশীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিল ইংরেজের অত্যাচারের স্বরূপকে।

ভুলে গেলে চলবে না এ শক্তির উৎস এসেছিল কোথা থেকে? নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের সন্তান শিশিরকুমার ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। নিজেকে গড়ে তোলার মূলে তাঁর পিতৃদেবের প্রচেষ্টাও কম ছিল না। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ শিশিরকুমারকে উপযুক্তভাবে মানুষ করবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি।

শিশিরকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল তাঁর প্রকৃতিপ্রেম আর সঙ্গীতপ্রিয়তা। প্রকৃতির নির্মল, মুক্ত স্বচ্ছ পরিবেশের মধ্যে তিনি জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন জীবনের চরম সত্য ও পরম প্রেয়কে সঙ্গীতের অনিন্দ্যসুন্দর আবেদনের মধ্যে।
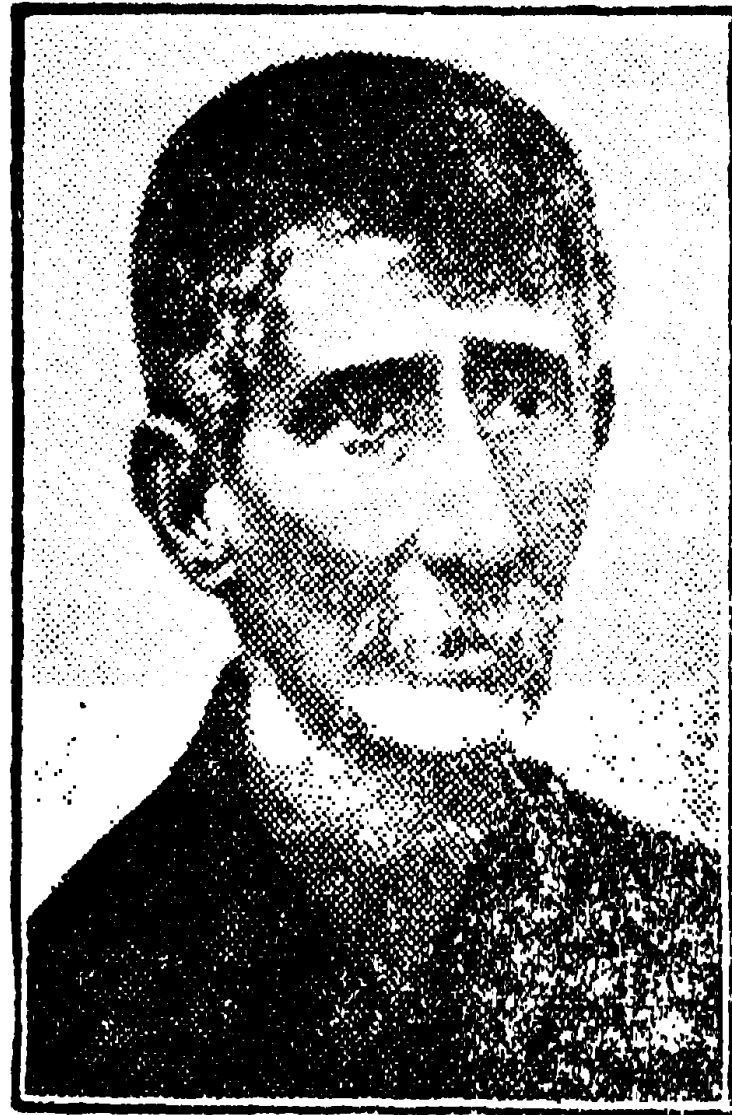
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে জীবনের ভিত্তিমূলে স্থান দিয়ে তিনি কর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ধর্মের মহৎ সত্য আর কর্মের মহত্তম উদ্দেশ্যকে। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, সতত বিনয়াবনতঃ দয়াদাক্ষিণ্যের উন্মুখতা এসেছিল বৈষ্ণব ভক্তিবাদ থেকে। মানব জীবনের সার্বিক অভিপ্রায়ের অন্তরালে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভগবৎ প্রেম। যে প্রেম-বন্যায় "রাজনীতিবিদ শিশিরকুমার সমাজ-সংস্কারক শিশিরকুমার, তত্ত্ববিদ্যা-অনুশীলনকারী শিশিরকুমার, সংবাদিক শিশিরকুমার" ভেসে গিয়েছিলেন। পরম এই ভগবৎচিন্তার পূর্ণতালাভের জন্য তিনি প্রতিটি ধর্মক্ষেত্র পরম আকুলতার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ সময়ে তাঁর এই চঞ্চলতা আর অস্থিরতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নিঃসীম নীলিমায় মিলিয়ে গিয়ে ভগবানকে উপলব্ধির প্রয়াসের মিল দেখা গিয়েছিল।

শিশিরকুমার কোন নতুন ধর্ম প্রচার করেননি। সেরকম অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম সে সময়ে হীনতেজ অবস্থায় ছিল। শিশিরকুমারের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ধর্ম রক্ষা পায় বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৮৯৯ সালে যে গৌরাঙ্গ সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় তার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের কাজ চলতে থাকে। শক্তিশালী খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিশিরকুমারকে কাজ করতে হয়েছে। এ কাজে তাঁর সহযাত্রীদের সহযোগিতার মাঝখানে অবশ্য কোন দুর্বলতা ছিলনা। সত্য ও সুন্দরকে তাঁর উপলব্ধির প্রয়াস একালেই বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করে। শিশিরকুমার এই ধর্মরক্ষার কাজে অগ্রসর হয়ে বলেন যে, "কর্ম আমাদের রথ, ভগবদকৃপা তার কাছে রথী। কৃপাভিক্ষা সবার জন্য। কৃপালাভ করে পরের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নাম প্রেম। কর্ম সেও মানুষের জন্যে, ধর্ম তাও মানুষের...... কল্যাণের জন্যে, কর্মের সাধনার মধ্যেই ধর্মের আরাধনা। ব্যবহারিক জীবনের ঊর্ধ্বে পরম ভাগবতকে ধারণ করে রাখতে হবে। এই ধারণ করাই ধর্ম। এই ধর্মই আমার সকল কাজের প্রেরণা।" এর মধ্য দিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করা যায় তা কেবলমাত্র ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষেই অনুকরণীয় নয়, সর্বসাধারণের পক্ষেও মঙ্গলকারী। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর সত্যদৃষ্টির জন্য বাঙালীর কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। সে যুগে তাঁর প্রেরণা আর উৎসাহে বহু বাঙালী সন্তান প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের শাসনদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে জাতির ভাগ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

লোকসঙ্গীত ও শিল্পীসমাজ

(আলোচনা)

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লোক-সংগীত নিয়ে আজকাল একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে লোক-সংগীত সম্বন্ধে প্রচার করা হয়। ছেলে-বুড়ো সবাই লোক-সংগীতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আলোকিত মণ্ডপের মধ্যে সহস্র লোচনের সামনে শিল্পীরা গেয়ে আনন্দ পান পারিশ্রমিকও মন্দ মেলে না। যেই আলো নিভে যায়, লোক চলে যায়, চারিদিক অন্ধকার হয় তখন গায়কদের কথা সবাই ভুলে যান। যে যার বাড়ী চলে যান ক্ষণিক সৌভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে। তারপর ব্যাস সব অন্ধকার; সারা বছর আর কেউ ডাকে না, খোঁজ করে না, বাঁচলো কি মরলো সেকথা কেউ ভাবেও না।

যদি একবার এই লোক-সংগীত-শিল্পীদের কথা ভাবা যেত তবে চোখের সামনে ভেসে উঠতো ঐ সব শিল্পীদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও দুঃখময় জীবনের একটি নিখুঁত ছবি। আমাদের দেশের শিল্পীরা চিরকাল দুঃখের মধ্যে কাটিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। মনের গভীরতম স্থল থেকে উৎসারিত সুরকে যাঁরা সাধনার দ্বারা ও অনুশীলনের দ্বারা প্রকাশ করেন তাঁদের এই চিরদারিদ্র্য কেন বরণ করতে হবে, কেন তাঁরা আর দশটা মানুষের মত সকল রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিজেদের বিকশিত করে তুলতে পারবেন না সেটা এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পী জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলতে হলে তাঁদের সমাজ ও সংসারের যে প্রাত্যহিক দাবী-দাওয়া আছে তা মেটানোর চেষ্টা করা দরকার একথা আমরা ভাবি না। একান্ত নিভৃতে যে ফুলটি আগাছার জংগলে ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ছিল তারা একদিন সংসার সমুদ্রের প্রবল ঝড়ে কোনরকম অবলম্বন না পেয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

লোক-সংগীত মনোরম পরিবেশের মধ্যে খাপ খায় ভালো। মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, জন ও জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা নিয়ে প্রেমবিরহ সুখ ও দুঃখ নিয়ে রচিত সাধারণ মানুষের মনের কথার ছন্দোবদ্ধ সুরে গাঁথা সংগীতের নাম লোক-সংগীত। লোক-গীতির মধ্যে আমরা পাই পল্লীর বাস্তব চিত্র, জীবনের প্রকৃত রূপ।

পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগ যেদিন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে সেদিন থেকেই পদ্মা মেঘনা পাড়ের ও অজয় কাঁসাই তীরের সরল মানুষদের দুঃখ আরম্ভ হয়ে গেছে। মরা গাঙে জোয়ার আসে বটে থাকে না বেশীক্ষণ। বেসুরো ফাটা বাঁশীর শব্দ একরকমের আর ভাল বাঁশীর শব্দ অন্য ধরনের। দুটো বাঁশী একসঙ্গে যদি ফুঁ দেওয়া যায় তাহলে সুরের চেয়ে হাওয়াই বেরোয় বেশী। গান গাইতে হলে কণ্ঠ দরকার, কণ্ঠ কি আর শিল্পীদের আছে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফেটে গেছে... কেউ সাড়া দেয়নি, অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়েছে:.....গলা আর বাজে না ......ঝিমিয়ে গেছে। সংগীতের ক্ষেত্রেই যে এটা হয়েছে তা বলছি না—অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে।

বাঁশীতে জোরে ফুঁ মারে বাঁশী আর বাজে না। চোখের সামনে রাখাল ছেলে শ্যামলী ধবলীকে দেখতে পাচ্ছে না, তারা পালিয়ে গেল কি হারিয়ে গেল মনে করে তার মনে আনন্দ নেই—মন-মরা হয়ে বসে থাকে। বাংলা দেশের গ্রাম্য শিল্পীদের আজ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, তবু তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। নিজেদের কথা তারা কাউকে বলতে চায় না—একান্তে সকলের কাছ থেকে সরে থাকে। মুখে মুখে গান রচনা করে যারা একসময় পল্লীর আকাশ-বাতাসে অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা তুলেছিল তারা আজ মূক হয়ে গেছে। প্রকৃতির মাঝে তারা যে সুন্দরকে একদিন দেখেছিল তাদের সেই চিরসুন্দর আজ হারিয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে একজন শিল্পীর সঙ্গে লোক-সংগীতের বিষয়ে আলোচনা করেছিলুম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা গান গাই অন্যোজনে প্রেরণায় নয়, আনন্দে নয় দুঃখে, কি করবো ছোটবেলা থেকে এই বিষয়ে চর্চা করে আসছি অন্য আর কিছু জানি না, তা না হলে এসব ছেড়ে দিতুম। কেউ আমাদের দেখে না বা ডাকে না অথচ পেট তো ভরাতে হবে। যদি উপযুক্ত আনুকূল্য পেতুম ও সাধনায় প্রতিবন্ধকতা না থাকতো তাহলে দেখিয়ে দিতুম যে বাংলার লোক-সংগীতের মধ্যে কি অমূল্য জিনিস আছে।' কথাটা খুবই সত্যি। বাংলার মাটি, বাংলার পরিবেশের মধ্যে এমন মাদকতা আছে যা মানুষকে শিল্পী হবার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু সমস্যা-জর্জরিত এই দেশে উপযুক্ত চর্চার সুবিধা না থাকায় অনেক ইচ্ছাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

রস বিতরণে, চিত্তবিনোদনে আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে লোক-সংগীত অন্যতম বাহন বলা যেতে পারে। বাংলার কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, আউলিয়া, সারি, জারি গান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার।

সাহিত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা-রাজড়ারা। আজ হয়েছেন জনসাধারণ। স্বর্ণসিংহাসন থেকে হৃদয় সিংহাসনে কলালক্ষ্মীর আসন পাতা হয়েছে। এই আসন চিরস্থায়ী করতে হলে কলালক্ষ্মীর সেবকদের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। উৎসাহ এসেছে বটে, এই উৎসাহের জোয়ার যেদিন সকলের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে বাংলার গ্রামে গ্রামে, যেদিন শিল্পীদের খোঁজ নেওয়া হবে এবং তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হবে সেই দিন শিল্পীদের দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় তেরো বছর কেটে গেছে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম লোক-সংগীতের উন্নতির জন্য সরকারী কিংবা বে-সরকারী তরফ থেকে উল্লেখ-যোগ্য কোন প্রচেষ্টা হয়নি। অথচ এদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য ছিল। দেশের সর্বাংগীণ উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষের মনের খোরাক ও রসের খোরাক ঠিকমত পাওয়া যাবে।

বাংলার পরিচয় তার সংস্কৃতিতে, অতএব সাংস্কৃতিক কাজে যারা নিমগ্ন রয়েছেন—তাঁদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের ওপর নির্ভর করবে জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন। সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ অবিলম্বে জাতির স্বার্থে করা দরকার। তাহলে শিল্পীরা মরবেন না তাঁদের সাধনা অব্যাহত থাকবে ও দেশকে নিত্য-নূতন রস পরিবেশন করে সুস্থ রাখবেন। এর ফলে বাঙালী বাঁচবে, লোক-সংগীতের সুরে মানুষের মন জাগবে...হৃদয় ভরে যাবে।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের ইতিহাসটুকু আরও সংক্ষিপ্ত। আফিসের বাবুরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সামান্য কিছু টাকা এনে দিয়েছিল ওর হাতে। তার থেকে বাকী বাড়ি-ভাড়া এবং অন্যান্য খুচরো দেনা যা ছিল, শোধ দিয়ে, সামান্য কয়েকখানা নোট সম্বল করে এই বস্তির ঘরে উঠে এসেছিল। খোকা তখন দুবছরের। কটি ভদ্রলোক যা করেছিলেন, তার তুলনা নেই। কিন্তু সবাই ছাপোষা গরিব কেরানী। নির্মলা তাদের বোঝা বাড়াতে চায়নি। পাছে ওকে নিয়ে তারা আরও বিব্রত হয়ে পড়েন, তাই তাদের না জানিয়েই চলে এসেছিল।

সমস্ত রাত বারান্দার সেই খুঁটিটায় ঠেসান দিয়ে বসে, কখনো জাগ্রত চিন্তা, কখনো অর্ধ-চেতন জড়তার ভিতর দিয়ে নির্মলা তার পিছনে ফেলে আসা দিন-গুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল. অনেকদিন আগে পড়া পুরনো বই-এর পাতা যেমন করে লোকে উলটে দেখে। ইচ্ছে করে হয়তো নয়, দুঃসহ ভারে নুইয়ে-পড়া মনের উপর আপনা হতেই সে ছবিগুলো ভেসে ভেসে উঠছিল। তারপর এক সময়ে আর ভাববার শক্তি রইল না। সূক্ষ্ম স্নায়ুজালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নেমে এল গভীর ক্লান্তি। চোখ-দুটো বুজে এল। অবসন্ন দেহখানা লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। কতক্ষণ তেমন করে পড়েছিল, সে জানতে পারেনি। হঠাৎ যেন মনে হল খোকা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকছে, মা, ওঠো। তন্দ্রা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। দূরে আকাশের কোলে অন্ধকারের আবরণ অনেকখানি পাতলা হয়ে গেছে। বস্তির এখানে সেখানে জেগে উঠেছে আরব্ধ জীবন-যাত্রার আভাস।

দেহে মনে এতবড় গভীর অবসাদ নির্মলার জীবনে বোধহয় আর কখনো আসেনি। স্বামী যেদিন গেলেন, সেই নিদারুণ দুর্দিনেও চারদিকটা এমন শূন্য হয়ে যায়নি। তখন তার বুক জুড়ে ছিল খোকা। ঐ একফোঁটা শিশুই যেন তার সব শূন্যতা ভরে দিয়েছিল। আজ সেও চলে গেল। সামনে পিছনে কেউ কোথাও নেই। এই চরম বিপদের কথা কার কাছে গিয়ে জানাবে সে? কে তার খোকার সন্ধান এনে দেবে? এতদিন পরে মনে হল, আজ যদি মা থাকত। মা নেই, সে খবরটা এখানেই পেয়েছিল, মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে। বস্তির স্কুলের মাস্টারমশাই বলেছিলেন খোকাকে। কোত্থেকে যেন জানতে পেরে-ছিলেন। শুনে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নির্মলা। খোকার দিকে চেয়ে দাঁত মুখ চেপে কোনরকমে কান্না রোধ করেছিল। কিন্তু নিঃশ্বাস চাপতে পারেনি। সে নিঃশ্বাসে সেদিন শোকের চেয়ে স্বস্তিই বোধহয় ছিল বেশী। মনে মনে বলেছিল, এ ভালই হল। জামাই-এর আশ্রয় ও অন্ন বেশীদিন ভোগ করতে হল না, ছোট মেয়ের এই রাজৈশ্বর্যও দেখে যেতে হল না। আজ কিন্তু মায়ের অভাবটাই মনে পড়ল সকলের আগে। এমন দিনে বোধহয় সকলেরই পড়ে। জীবনের আকাশে যখন রিক্ততার পূর্ণগ্রাস দেখা দেয়, সেই নিঃসীম অন্ধকারে একটি মাত্র আলোর রেখা তখনো বেঁচে থাকে, সেটি, মায়ের মুখ। সারাজীবনে যে মাকে ডাকেনি, মায়ের কথা ভাবেনি, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার মুখ থেকেও একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে—মা।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দিদিদের কথাও মনে হল নির্মলার। দুজনের কেউ কোলকাতায় নেই। বড়দিরা বদলি হয়ে গেছে সেই কোথায়, কুমিল্লায় না নোয়াখালি। মেজদিও কিছুদিন আগে বেড়াতে বেরিয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে। রেলের লোক, অনেকদিন ধরে অনেক দেশ ঘুরবে। এ-দুটো খবরও জানিয়ে-ছিলেন মাস্টারমশাই। খোকাকে ডেকে বলেছিলেন একদিন। খোকা ঠিক বুঝতে পারেনি। মাসিদের কথা সে জানত না। ভাসাভাসা যা বলেছিল, তার থেকেই বুঝে নিয়েছিল নির্মলা।

মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে হতেই একটু যেন ভরসা এল নির্মলার প্রাণে। ওঁর কানে গেলে উনি নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না। বেলা হলেই কাকে দিয়ে হোক খবর দিয়ে রাখতে হবে, ইস্কুলে আসামাত্র যেন দয়া করে একবার আসেন। ওঁর সামনে আগে কোনোদিন বেরোয়নি। উনিও এদিকে কখনো আসেন না। খোকার মুখেই যা কিছু শোনা। কিন্তু আজতো আর তার লজ্জা করবার দিন নয়। আজ তাকে বেরোতেই হবে।

বসে থাকবার শক্তি ছিল না। ঐখানে শুয়েই, কখন সকাল হবে, তারই দিকে অধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তখনো দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলছে। হঠাৎ কতগুলো ভারী ভারী গাড়ীর শব্দ কানে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তিটা যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। পুরুষদের চাপা আওয়াজ, মেয়েদের কান্না ও শিশুকণ্ঠের আর্ত চীৎকারে চারদিক

ভরে গেল। নির্মলা বুঝল—পুলিশ। কিন্তু কোথায় কীভাবে কার উপর দিয়ে আজকের উৎপাত শুরু হবে সেই অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করতে লাগল। হঠাৎ তিন-চারজন ইউনিফর্ম-পরা লোক ঢুকে পড়ল সব বাড়ির মধ্যে। একজন অফিসার জাতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কে থাকে?

কোনোরকমে উঠে বসে নির্মলা বলল, আমি।

—আর?

—আমার ছেলে।

—কত বড় ছেলে?

—ন' বছরে পড়েছে।

—কোথায় সে?

—কাল দুপুর থেকে বাড়ি নেই।

—কেন?

—রাগ করে চলে গেছে, আর ফেরেনি।

বলতে বলতে নির্মলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। এতগুলো অচেনা অজানা পুরুষ মানুষের সামনেও চোখের জল আটকে রাখতে পারল না।

অফিসারটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করলেন বারান্দায় উঠে ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিলেন, এদিক ওদিক তাকালেন, তাপর গট-গট করে বেরিয়ে চলে গেলেন। বাকী যারা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও তার অনুসরণ করল। নির্মলা ভাবছিল, ওঁরা তো পুলিশের লোক. ওঁদের কাছে বললে কি ছেলেটাকে খুঁজে এনে দিতে পারেন না? সে সুযোগ আর হল না। বলবার আগেই ওঁরা চলে গেলেন।

ঘন্টা চারেক ধরে গোটা বস্তিটার মাথার উপর দিয়ে যেন এক খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেল। যেখানেই সন্দেহ হল, কাঁথা-কম্বল উলটে পালটে থালা-ঘটি-বাটি তছনছ করে মহা আড়ম্বরে ছুটে চলল তল্লাশীর ঝড়। তারপর এক সময়ে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কার ভাগ্যে কী ঘটল জানবার জন্যে নির্মলা যখন উদ্বেগ বোধ করছে, দুটি ছেলে এসে খবর দিল মাস্টারমশাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

—কোন মাস্টারমশাই?

—বড় মাস্টারমশাই: সাইকেল থেকে নামতেই অ্যারেস্ট করেছে।

নির্মলার বুকের ভিতরটা যেন ওলট পালট হয়ে গেল। কোন রকমে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলতে পারল, কেন?

পুলিশ বলছে, উনি নাকি "স্বদেশী পার্টির" লোক; নাম ভাঁড়িয়ে বস্তির স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে আরো তিনটি ছেলেকে নিয়ে গেছে।

ছেলে কটির নামও জানালো তারা। নির্মলার কানে সে কথা ঢুকল না। তখন তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বসে আছে একটি মাত্র কথা—মাস্টারমশাইও চলে গেলেন। মনে হল, এও যেন তারই ভাগ্যের খেলা। সংসারের পথে তাকে সকল রকমে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেওয়াই বোধহয় বিধাতার অভিপ্রায়। তাই তার এই শেষ ভরসাটুকুও কেড়ে নিয়ে গেলেন।

— চার —

থানার গারদ থেকে কোর্ট বা জেল হাজতে যখন আসামীকে চালান করা হয় তার কোমরে দড়ি এবং হাতে হাতকড়া লাগাবার ব্যবস্থা আছে। ছাগলচুরি মামলার আসামী দিলীপ ভট্চাযের বেলায় দ্বিতীয় দফাটা প্রয়োগ করা হল না। তার কারণ এ নয় যে বয়স কম বলে সিপাইরা তার উপর দয়া পরবশ হয়ে উঠলেন কিংবা থানার কর্তারা বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করলেন। তার কারণ, অত ছোট মাপের হাতকড়া থানার মালখানায় পাওয়া গেল না। হয়তো ঐ বস্তুটি যারা তৈরি করে তাদেরই বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব। নজর ছিল শুধু বড় বড় ক্রিমিন্যালের মোটা কবজির উপর, এই জাতীয় খুদে ক্রিমিন্যালের ভেবে দেখেনি। তবু জোড়া কয়েক হাতকড়া পরখ করে দেখা হল। তার ঐ অত-বড় ফাঁদালো বেড়-এর ভিতর দিয়ে খোকার গোটা হাতটা গলিয়ে দিয়ে উচ্চহাসি করে উঠলেন পুলিশের কনস্টেবল। তারপর সেই বেঢপ বস্তুটি সম্বন্ধে এমন একটি রুচিপূর্ণ দেহাতী গালি উচ্চারণ করলেন যা শুনলে লোহার হাতকড়ারও কান লাল হয়ে ওঠে। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অগত্যা ভারী দড়িটাকেই শক্ত করে বাঁধলেন। খোকার কোমরটা নুয়ে পড়ল। ধমকের সাহায্যে তাকে যথাসম্ভব সোজা রাখবার ব্যবস্থা করে দড়ির একটা ধার ধরে বীরদর্পে বেরিয়ে পড়লেন কোর্টের দিকে।

দৃশ্যটা থানা অফিসারের নজরে পড়ল। বোধ হয় বলতে গেলেন অতটুকু ছেলে, একটা হাত চেপে ধরে নিয়ে গেলেই চলে। কী দরকার ছিল ঐ ভারী মোটা দড়িটা ওর কোমরে জড়াবার? বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হুকুমটা বেআইনী; কনস্টেবল হয়তো শুনবে না। শোনেও যদি এবং তারপর ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসে রিপোর্ট দেয়, আসামী পালিয়ে গেছে. দারোগাবাবুর চাকরি নিয়ে টানাটানি। সাধ করে ওসব ঝক্কি ঘাড়ে নেবার কী দরকার? পুলিশের চাকরিতে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই।

খোকাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, চলতি ভাষায় তার নাম ছোকরা-জেল। আসলে সেটা জেল নয়, হাজত; বিচারের আগে কমবয়সী আসামীদের আটক করে রাখবার খোঁয়াড়। ওর মত, এবং বেশীর ভাগ ওর চেয়ে বড়, বিশ বাইশটা ছেলে একটা ঘরের মধ্যে জটলা করছিল। এক-দিকে বসেছে 'বাঘবন্দী'র আসর। খেলছে বোধ হয় দুজন আর তাদের ঘিরে হল্লা করছে জন দশেক। আর একদিকে দুজনে মিলে লড়াই শুরু হয়েছে। চড়, কীল, ঘুসি চলছে বেপরোয়া। দুতরফেই উৎসাহ দেবার প্রচুর আয়োজন। হঠাৎ সব থেমে গেল। 'বাঘবন্দীর' দল বাঘকে খোলা রেখেই উঠে দাঁড়াল। পুরো লড়াই-এর মাঝখানে সহসা দুপক্ষে বিনাসর্তে সন্ধি হয়ে গেল। এত কাণ্ডের মধ্যেও ঘরের একটা কোণ ঘেঁসে যে দুটো ছেলে শুয়ে শুয়ে কী করছিল, তারাও ধড়মড় করে উঠে বসল। সকলেরই দৃষ্টি দরজার দিকে। নতুন আমদানীর গন্ধ পেয়েছে, সব আগ্রহ গিয়ে পড়েছে তারই উপর। এই একখানা ঘরের চার দেয়ালে ঘেরা যে জগৎ, তার মধ্যে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে আসে এক একখানা নতুন মুখ। ঐটুকুই ওদের বৈচিত্র্যের স্বাদ। আপাততঃ সব ফেলে তাকে নিয়েই মেতে উঠবার পালা।

কোমরে জড়ানো ভারী বোঝা; তার উপর রোদের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। লোহার ফটক খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই, খোকা ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়ল। সমস্ত মুখটা লাল, তার উপর ঘামের সঙ্গে মিশে গেছে চোখের জল। ভয়ে ভয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিয়েই মাথা নিচু করল। ব্যঙ্গ ও কৌতুকে ভরা একদল নিষ্ঠুর মুখ। স্নেহ, সখ্য বা মমতার কোনো আভাস সেখানে চোখে পড়ল না।

ফটক বন্ধ করে সিপাই সরে যেতেই কতগুলো ছেলে এগিয়ে এসে খোকাকে

ঘিরে ফেলল। ঢ্যাংঙা মতন একজন ওর গা ঘেঁসে বসে ছদ্ম সহানুভূতির সুরে বলল, 'আহাহা! ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ। আচ্ছা, আমি বাতাস করছি।' বলেই একটা ময়লা রুমাল বের করে মুখের কাছে নাড়তে শুরু করে দিল। চারদিকে হাসির ধুম পড়ে গেল। আর একটা ছেলে ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে মুখখানা ছুঁচলো করে বলে উঠল—খোকার পুতুল টুকটুক, দুধ খায় চুকচুক।' সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা হাসির রোল। এর পরে যে এল সেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী রসিক। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে খোকার মুখে গুঁজে দিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, খিদে পেয়েছে? খাও, খাও, একটা বিড়ি খাও।

বিড়ির গন্ধ খোকা একেবারেই সইতে পারত না। একে সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, তার উপরে ঐ গন্ধটা নাকে যেতেই গা পাক দিয়ে উঠল। ওয়াক তুলতেই ছেলের দল নানারকম কলরব করে ছিটকে পিছিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটা কোণ থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি বড় গোছের ছেলে। ধমকের সুরে বলল, 'এই, আবার তোরা নতুন ছেলের পেছনে লেগেছিস? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' বলেই, মজাটা শুধু মুখে নয়, হাতে-কলমেও দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ হাতের কাছে যারা পড়ল, তাদের কারো কান, কারো চুল টেনে, কারো গালে বেশ ভারী ওজনের চড় কসিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যে জায়গাটা ফাঁকা করে ফেলল।

খোকা তখন আর বসে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়েছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেটি বলল, এই, কী নাম তোর?

খোকা ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল, দিলীপ?

—কী করেছিস?

—কিছু করিনি।

—কিছু করিসনি, তবে পুলিশে ধরল কেন?

দিলীপ কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। প্রশ্নকর্তা ধমকে উঠল, কথা কসনা কেন? হাবা নাকি?

খোকা ভয়ে ভয়ে বলল, একজনে একটা ছাগল ধরে আনতে বলেছিল—

—ও, আর বলতে হবে না। তুই একটা গাধা। সকালে কিছু খেয়েছিস?

খোকা মাথা নাড়ল।

'শালারা!' বলে সে দাঁতে দাঁত ঘষে ঘষে চিৎকার করে ডাকল, ও সিপাইজী।

গেটের ওধারে অদৃশ্য স্থান থেকে সাড়া এল, কেয়া হুয়া?

ছেলেটা আপন মনে বিড় বিড় করে বলল, 'কেয়া হুয়া! ব্যাটা লাটসায়েব।' প্রকাশ্যে বলল, এবার আইয়ে না থোড়া মেহেরবানি করকে।

গেটরক্ষী ফটকের ওপাশে দেখা দিয়ে বিরক্তির সুরে বলল, ক্যা বোলতা হায়?

—বোলতা হায় যে ছোট ছোট লেড়কা লোগ্‌কা ভুখ লাগ গিয়া। খানা কব দেগা?

—দেগা সব্ টাইম হোগা?

—টাইম তো হয়ে গ্যাছে।

—হোয়ে গেছে তো মিল্ যায়গা। চুপচাপ রহো। চিল্লানেসে রিপোর্ট্ হো যায়গা।

—রিপোর্ট ফিপোর্ট এর পরোয়া আমি করি না। আমার নাম রতন সিকদার। অনেকবার এসেছি, এখানে। জমাদারকে ডেকে দিন।

—জমাদার তোমারা নোকর হায়?

—আচ্ছা, এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, নোকর হায় না কী হায়। সবাই মিলে এমন চেল্লানো শুরু করবো, যে সায়েব পর্যন্ত ছুটে আসবে।

'এই', বলে, দলবলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সেই মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করবার বন্দোবস্তই বোধ হয় করতে যাচ্ছিল, এমন সময় জমাদার সাহেবের সাড়া পাওয়া গেল, 'কী হোল রে রতন'?

—আজ্ঞে কিছু না, একটু যেন লজ্জিত ভাবে বলল রতন, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

—'শালা বাটি লেকে চলা আও।' সিপাইএর দিকে ফিরে বলল, 'খোলো'।

মুহূর্তে মধ্যে যেন ডাকাত পড়ল ঘরের ভিতর। একপাল অনাহারী ছেলের হল্লা ছুটোছুটি এবং তার সঙ্গে অ্যালু-

ব্যঙ্গ ও কৌতুকে ভরা একদল নিষ্ঠুর মুখ

মিনিয়াম থালা বাটির তুমুল শব্দ। গেট খুলতে তর সয় না। কে কার আগে বেরোবে, তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি। জমাদার এগিয়ে এল বেটন উঁচিয়ে। দু এক ঘা পড়লও কারো কারো পিঠে। তার জন্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই জটলার মধ্যে হাতে একটা হেঁচকা টান পড়তেই উঠে বসল দিলীপ। রতন চেঁচিয়ে উঠল, এই ছোঁড়া, এখনো শুয়ে আছিস? চল, খাবিনে?

খাবার ব্যবস্থা বারান্দায়। মেঝের উপর লাইন করে উঁচু হয়ে বসেছে ছেলে-গুলো। সামনে থালা, তার পাশে বাটিতে খাবার জল। থালার উপর ঝনঝন আওয়াজ করে, পড়ল এসে এক 'কাঠা' ভাত, তার একটার গায়ে আর একটা মিলছেনা, সব আলাদা আলাদা বসে একে অন্যের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। আর একজন এসে হড়হড় করে ঢেলে দিল এক 'ডাবু' ডাল, তারও দানার সঙ্গে জলের অসহযোগ। তৃতীয় এবং শেষ দফায় এল হরেক রকম আনাজ ঘেঁটে একটি কালচে রংএর আধা তরল রাসায়নিক পদার্থ, যার নাম তরকারী।

পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ চলছে, 'কম দিচ্ছ কেন?' 'ডাবু ভরেনি আর একটু দাও' 'হামকো আলু নেহি দিয়া', 'খালি ঝোল দিচ্ছ যে, তরকারী কই?' কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও তার সমুচিত জবাব দেওয়া হচ্ছে, 'চোপরাও,' 'ঈস! লাটসায়েব? আলু চাই', 'না খাবি তো উঠে যা'— ইত্যাদি। কেউ কেউ থালা হাতে লাইন ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে, বরাদ্দ পাওনা পায়নি বলে। পরিবেশনকারীর দল (তারাও ওদেরই মত ছোকরা-জেলের বাসিন্দা) 'ডাবু'র ডান্ডা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে, কিংবা সিপাই এসে বসিয়ে দিচ্ছে ঘাড় ধরে।

এই হট্টগোলের একধারে মাথা নিচু করে বসে দিলীপ তার ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। দু'এক গ্রাস মুখে দিয়েছিল, আর পারেনি। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, তবু এ-খাবার তার গলা দিয়ে নামবে না। এত শক্ত মোটা মোটা ভাত, এরকম ডাল, তরকারী সে কোনো-দিন চোখেও দেখেনি, বিশেষ ক'রে এই রান্না! বাড়িতে যা সে খায়, সেও সামান্য ডাল-ভাত, তার সঙ্গে একটা দুটো সাধারণ তরকারী, কখনো-সখনো এক টুকরা মাছ। কিন্তু তার সবটুকুই অমৃত। সেই স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে। জেলের অন্ন না হয়ে পরমান্ন হলেও এটা আজ তার মুখে উঠত না।

চারদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল, সকলেই গোগ্রাসে গিলছে। ওদিকে যাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তারা শূন্য থালার উপর প্রাণপণে আঙুল ঘষছে এবং একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই আঙুলগুলো চুষে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার থালাটা তুলে ধরে লম্বা জিব বের করে চাটছে। খোকার ঠিক ডানপাশে যে বসেছিল, লোলুপদৃষ্টিতে কয়েকবার ওর থালার দিকে তাকিয়ে দেখে ফিসফিস করে বলল, তুই খাবিনে?

খোকা মাথা নাড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা আর কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে খপ করে ওর থালা থেকে খানিকটা ভাত তরকারী তুলে নিল। বাঁপাশে যে ছিল, তারও লক্ষ্য ছিল এইদিকে। সে-ই বা ছাড়বে কেন? কিন্তু হাত-বাড়াতেই বাধা এল ডান পাশের দাবিদারের কাছ থেকে। তার গায়ের জোর বেশী। বাঁ ধারওয়ালা তখন চেঁচিয়ে উঠল। শুরু হল কাড়াকাড়ি এবং পলকের মধ্যে সেটা মারামারিতে গিয়ে দাঁড়াল। দুজন সিপাই বেটন উঁচিয়ে ছুটে এল এবং কয়েক ঘা না বসিয়ে দুজনের কাউকে ছাড়াতে পারল না।

খোকার উপরেও ওদের দু-চারটা কিল ঘুষি এসে পড়েছিল। সেই সঙ্গে কিছু ডাল মাখা ভাত। একপাশে দাঁড়িয়ে সেগুলো যখন ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে, রতন কোত্থেকে এসে বলল, বাঁদর দুটো তোকে খেতে দিল না। চল, জমাদারকে বলে তোকে নতুন ভাত-ডাল আনিয়ে দিচ্ছি।

দিলীপ মাথা নেড়ে বলল, আমি খাবো না।

—খাবি না! কেন?

দিলীপ কোনো উত্তর দিল না। রতন হেসে ফেলে বলল, দূর বোকা! না খেয়ে সারাদিন থাকবি কেমন করে?

খোকার হাত ধরে টানতেও সে যখন নড়তে চাইল না, স্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠ যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলল, জেলে এসে পেরথম পেরথম ঐরকম লাগে। তারপর দেখবি, সব সয়ে যাবে। চল।

মাসখানেকের মধ্যেই দিলীপ ভট্টা-চার্যের মামলা তৈরি হয়ে গেল। সোজা কেস্। চোরাই মাল সমেত হাতে-নাতে ধরা পড়েছে আসামী। তদন্তের জটিলতা নেই। সাক্ষী-সাবুদের বাহুল্য নেই। তবু থানা-অফিসার কিছুদিন সময় নিলেন, কসাই দুটোকে ধরা যায় কিনা। সে চেষ্টা যথারীতি ব্যর্থ হল। দিলীপই একমাত্র আসামী। তার বিরুদ্ধে ৩৭৯ ধারার সঙ্গে ৪১১ ধারা যোগ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট একজন মহিলা। বিভিন্ন ধরণের সোস্যাল ওয়ার্ক অর্থাৎ সমাজ-সেবায় নেতৃত্ব করে থাকেন। প্রশ্ন উঠবে, তার উপরে বিচারের ভার কেন? অন্য কোনো বিচারমঞ্চে তো নারীর আবির্ভাব ঘটেনি। 'বার'এ কেউ কেউ ঢুকেছেন, 'বেঞ্চ' পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। এখানে যে এ ব্যবস্থা হল, তার কারণ বোধহয় আসামীদের বয়স। এখানে যাদের বিচার হয় সব "ছোকরা," —শিশু ও কিশোর। মাতৃজাতির হাতে তারা সন্তানসুলভ ব্যবহার পাবে, এই রকম কোনো উদ্দেশ্য হয় তো উদয় হয়ে থাকবে কর্তৃপক্ষের মনে। কিন্তু আইন প্রণয়ন বিচারকের হাতে নেই, আছে শুধু তার প্রয়োগ। শুধু সেইটুকুতে তাঁর 'মাতৃত্ব' প্রকাশের অবকাশ কতখানি? স্ত্রী-ডাক্তার নিজের হাতে ব্যবস্থাপত্র লিখলেই কি কুইনাইনের তিক্ততা চলে যায় না কমে যায়? নারী-হস্তের স্পর্শে আইনের কঠোর ধারাগুলো মোলায়েম হয়ে উঠবে, সে-ও তেমনি দুরাশা মাত্র।

ধরুন, যদি হয়, সেইটাই কি বাঞ্ছনীয়? অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে পুরুষ-সার্জন যেভাবে ছুরি চালান, মহিলা-সার্জনকেও সেই একই ভাবে চালাতে হবে! সেখানে যদি তীক্ষ্ণতার অভাব দেখা দেয়, দ্বিধা জাগে, করুণা বা মমতার আবির্ভাব ঘটে, বুঝতে হবে তিনি অক্ষম চিকিৎসক। নারীত্বের দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে তিনি চিকিৎসার বিধি লঙ্ঘন করেছেন। যেখানে কঠোর-তার প্রয়োজন, কোমলতার প্রয়োগ সেখানে অপপ্রয়োগ। আইনের বেলাতেও তাই। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নারী

ও পুরুষে কোনো তফাত নেই। আইনের বিধানকে যদি যথাযথ প্রয়োগ করতে হয়, উভয়কেই সমান কঠোর বা সমান কোমল হতে হবে। একজন মহিলাকে বিচারাসনে বসাবার মূলে যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে থাকে, সেটা মহৎ হলেও ন্যায়ানুগ নয়।

আরো প্রশ্ন আছে। এ ধারণা কোথা থেকে এল যে, শিশু-অপরাধীর উপর নারীর দৃষ্টি পুরুষের চেয়ে কোমলতর? কে বললে পুরুষ জাতির চেয়ে নারী-জাতি কম নিষ্ঠুর? ইতিহাস কি বহু-ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য দেয়নি? প্রতি-দিনের সংসার-যাত্রা কি প্রায়শঃ অন্য কথা বলে না? একটি দৃষ্টান্তই বোধহয় যথেষ্ট। বালক-ভৃত্যের উপর গৃহস্থের যে অবহেলা, উৎপীড়ন কিংবা নির্মম অবিবেচনা প্রায় সর্ব দেশ এবং সর্ব কালের সাধারণ ঘটনা, খুঁজলে দেখা যাবে, তার মধ্যে গৃহকর্তার হাত যদি বা থাকে, প্রেরণা গৃহিণীর।

কিন্তু বহুদিনের বদ্ধমূল সংস্কার যে নারীর প্রাণ কোমল। এক্ষেত্রেও, তাই কোর্টবাবু একটু বেশী সতর্ক। বিদুষী বা বুদ্ধিমতী যতই হোন, তবু তো 'মেয়ে-মানুষ'। কি জানি কী বিভ্রাট বাধিয়ে বসেন! দেখিয়ে বসেন কোথায় কী দুর্বলতা! পুরুষ হাকিম হলে সে ভাবনা ছিল না। এঁর বেলায় শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়। যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে কঠোরতর মনোভাব নিয়ে এগোতে হয়। দিলীপের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কোর্টবাবু বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠলেন, এর আগে কবার চুরি করেছিস?

জবাব দিতে গিয়ে দিলীপের গলা কেঁপে গেল, কথাগুলোও ঠিক বোঝা গেল না।

কী বললি? হুঙ্কার দিলেন কোর্ট-বাবু। ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর এল, আমি চুরি করিনি।

—চুরি করিনি! ন্যাকা!—মুখ ভেংচে এইটুকু বলেই তিনি হাকিমের দিকে ফিরলেন এবং হাত পা নেড়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এখন থেকে সাবধান না হলে এই সব খুদে অপরাধী ভবিষ্যতে বিপজ্জনক সমাজ-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হবে। ছাগল ছেড়ে কাপড়-চোপড়, থালা-বাটি এবং ক্রমশঃ হাত পাকিয়ে পাকিয়ে টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটিতে গিয়ে পোঁছবে। ভদ্রঘরে জন্ম হলেও বর্তমানে এরা যে-স্তরে নেমে গেছে, সেখান থেকে এখনই এদের কঠোর হস্তে উৎপাটন করা প্রয়োজন। তা যদি না হয়, এই দিলীপ ভট্চাজ আরো অনেক দিলীপকে সংক্রামিত করবে। সে-রোগের বীজ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে সমাজের উচ্চস্তরে। সুতরাং—

বক্তৃতার মাঝখানেই খোকা হাকিমের দিকে ফিরে বলে উঠল, আমি চুরি করিনি। আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দিন। আর কখ্খনো বাইরে যাবো না।

বলতে বলতে দু-চোখ জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে আবার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাকিম কোর্টবাবুর দিকে মুখ তুলে বললেন, ওর মায়ের কোনো খোঁজ করা হয়েছিল?

—চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, ইওর অনার। কিন্তু ঠিকানা বলতে না পারলে কোল-কাতার শহরে একটা মেয়েছেলেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

—কোন্ বস্তিতে থাকে তাও বলতে পাচ্ছে না?

—কোন্ দিকে তাও ঠিকমত দেখাতে পারে না। ও-সি অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো হদিস করতে পারেনি। তার রিপোর্টেই রয়েছে সে কথা। ইওর অনার মে হ্যাভ এ লুক্।

ম্যাজিস্ট্রেট আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, সামনে-রাখা নথিপত্রের দিকে চোখ ফেরালেন।

কোর্টবাবু তার অসমাপ্ত বক্তৃতায় ফিরে বললেন, তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এই আসামীর একমাত্র মা ছাড়া অন্য অভি-ভাবক নেই। কোনো বস্তিতে একখানা ঘর নিয়ে থাকে এবং সম্ভবতঃ ঝি বা ঐ জাতীয় কোনো কাজকর্ম করে স্ত্রীলোক-টিকে নিজের ও ছেলের ভরণপোষণ চালাতে হয়। ছেলেকে বস্তি-জীবনের অসৎসঙ্গ থেকে বাঁচাবার তার সময় নেই, সামর্থ্যও নেই। তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং মাকে খুঁজে পেলেও সেখানে ফিরে যাওয়া আসামীর পক্ষে কল্যাণকর নয়, সমাজের পক্ষেও অবাঞ্ছনীয়। বেঙ্গল চিলড্রেন-অ্যাক্ট প্রয়োগ করবার এ রকম উপযুক্ত ক্ষেত্র আর হতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অভিজ্ঞ কোর্ট-অফিসারের সঙ্গে একমত না হবার কারণ দেখতে পেলেন না। সেই দিনই 'রায়' দিলেন, এবং তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন,— আপাত-দৃষ্টিতে চুরিটা সামান্য বলে মনে হলেও, একে উপেক্ষা করা যায় না। কালক্রমে এর মধ্যেই বৃহত্তর অপরাধের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, আসামীর নিজের মঙ্গল, এবং সমাজ-স্বার্থের প্রয়োজন বিবেচনা করে, তাকে তার ষোল বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে আবদ্ধ রাখবার আদেশ দেওয়া হল।

ডাক্তারের সাক্ষ্য অনুসারে আসামীর বয়স তখন দশ। তাকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হল, জেল নয়, ছ বছর তাকে কোন্ একটা ইস্কুলে রেখে লেখাপড়া, কাজকর্ম শেখানো হবে, দিলীপ কিছু-ক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি সে ইস্কুলে পড়বো না। আমাদের বস্তিতে ইস্কুল আছে। মাস্টারমশাই খুব ভালো পড়ান, খুব ভালোবাসেন আমাকে।

কোর্টে যারা ছিল, সকলের চোখে-মুখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। হাকিম গম্ভীরভাবে পেশকারকে অন্য কেস্ পেশ করবার নির্দেশ দিলেন।

একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে যখন তাকে ডক্ থেকে নেমে আসতে ইঙ্গিত করল, খোকার অসহায়, ভয়ার্ত চোখ দুটো নানা মুখ ঘুরে হাকিমের উপর গিয়ে পড়ল; এবং যে-আবেদন সে জনে-জনের কাছে করেছে, কিন্তু সাড়া পায়নি, আরেকবার তারই পুনরুক্তি শোনা গেল তার করুণ কণ্ঠে—'আমি মার কাছে যাবো।'

নারী-ম্যাজিস্ট্রেট তখন অন্য ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। কথাটা কানে গেলেও বোধহয় মন দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ নুনমাটির কালোসোনা ॥

ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে নুনমাটির কালোসোনার হাসি ফুটেছে। কিছুকাল আগেও নুনমাটি ছিল গৌহাটির এক জনবসতিহীন জলা জায়গা। এখন সেখানেই গড়ে উঠেছে ভারতের প্রথম জাতীয় তৈল শোধনাগার।

খনিজ তেলের অন্যতম নাম কালোসোনা। আধুনিক জগতে এই কালোসোনার কদর এত বেশি যে, এই কালোসোনার মাপকাঠিতেই বিচার করা হয় কোন্ দেশ কতখানি সমৃদ্ধ। ভারত এতদিনে এই গৌরবান্বিত সমৃদ্ধির পথে পা বাড়াতে পারল।

অবশ্য এক্ষেত্রে বিদেশী একটি রাষ্ট্রের উদার সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল। রাষ্ট্রটি হচ্ছে রুমানিয়া। প্রায় আঠারো কোটি টাকা খরচ হয়েছে শোধনাগারের নির্মাণকার্যে। তার মধ্যে প্রায় ছ' কোটি টাকা এসেছে রুমানিয়া থেকে। নামমাত্র সুদে অতি সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য এই ঋণ নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ। আর শুধু টাকার পরিমাপেই এই ঋণের বিচার হওয়া উচিত নয়। শোধনাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি টাকার বিনিময়ে অন্যত্রও পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু যন্ত্রপাতির সঙ্গে যে পঞ্চাশজন রুমানীয় বিশেষজ্ঞ ভারতে এসেছেন এবং যে পঞ্চাশজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে রুমানিয়ায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের মূল্য নিরূপণ ব্যবসায়গত লেনদেনের আঁকজোকে হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতের প্রথম জাতীয় তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে ডাকতার বিভাগ বিশেষ একটি ডাক-টিকিট প্রবর্তন করেছেন। এই ডাকটিকিটের যে-ছবি কাগজে বেরিয়েছে তাতে দেখা যায়, নুনমাটির তৈল শোধনাগারের যন্ত্রপাতির পাশে রয়েছে একটি একশৃঙ্গ গণ্ডার। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। আসামকে বলা হয় জঙ্গলের দেশ, হাতি গণ্ডার ও অন্য নানা বন্য জন্তুর বিচরণস্থল। এবং সকলেই জানেন যে আসামের সবচেয়ে বিখ্যাত জন্তু হচ্ছে একশৃঙ্গ গণ্ডার। এই কারণেই একটি সর্বাধুনিক ধরনের শিল্প-কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রচারিত ডাকটিকিটেও একটি বন্য জন্তুর ছবি অনায়াসেই একটি দেশের প্রতীক হয়ে বসতে পেরেছে। তবে ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে আসামের ইতিহাসে এমন একটি বিপুল সম্ভাবনার উদ্বোধন হল যে, ভবিষ্যতের আসাম হয়তো এই নুনমাটির কালোসোনাকেই প্রতীকচিহ্ন হিসেবে ধারণ করবে।

উদ্বোধনের দিন শোধনাগারটি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হয়েছে মাত্র। পুরোপুরি চালু হতে এখনো কিছু সময় লাগবে। এই শোধনাগারে খনিজ তেল আসবে নাহারকাটিয়া ও মোরাণ থেকে—যার দূরত্ব প্রায় ২৭০ মাইল। নদী ও জঙ্গলের বাধা রয়েছে পাইপলাইন বসানোর পথে। কাজটি সময়সাপেক্ষ। আপাতত রেলপথে দৈনিক ২৫ ট্যাঙ্ক-ওয়াগন তেল শোধনাগারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এই হচ্ছে আরম্ভ। এবং ভবিষ্যৎ যে শুভ তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

পুরোপুরি চালু হয়ে যাবার পরে এই শোধনাগারে বছরে মোট তেল পরিশোধিত হবে ৭,৫০,০০০ টন। অবশ্য ভারতে তেলের চাহিদা এ থেকে মেটানো যাবে না। কিন্তু পৃথকভাবে বিচার করলে এই সংখ্যাটিও বিপুল। শুধু তাই নয়, শোধনাগারটি এমনভাবে তৈরী যে বাড়তি খরচ না করেই এর উৎপাদন শতকরা দশ ভাগ বাড়ানো চলবে। বর্তমানে খরচের শতকরা দশ ভাগ খরচ করে উৎপাদন বাড়ানো চলবে শতকরা ত্রিশ ভাগেরও বেশি। আর বর্তমান খরচের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খরচ করতে পারলে উৎপাদন বাড়বে শতকরা একশো ভাগ, অর্থাৎ বর্তমান উৎপাদনের দ্বিগুণ। এই সংখ্যাগুলোকে যদি শুধুই সংখ্যা হিসেবে ধরা না হয়, তাহলে এ-থেকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রটি সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া অসম্ভব নয়।

॥ নাহারকাটিয়ার ভবিষ্যৎ ॥

নাহারকাটিয়াকে কেন্দ্র করে পনেরো মাইল ব্যাসার্ধের এলাকাটি ১৯৬৫ সালের মধ্যেই হয়ে উঠবে পূর্ব-ভারতের গ্যাস-ভিত্তিক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল। প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। তাছাড়া নাহারকাটিয়া থেকে দশ মাইল দূরে নামরূপে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ৫০,৪০০ কিলোওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পাওয়ার-স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হবে ৪১৬ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত। আশা করা যাচ্ছে, সমগ্র উত্তর আসামের বিদ্যুতের চাহিদা এই একটি পাওয়ার-স্টেশন থেকেই পূরণ করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়াও আরো একটি পাওয়ার-স্টেশনের নির্মাণ কার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এটি হবে গ্যাস-টারবাইন পাওয়ার-স্টেশন—ভারতে প্রথম। বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ৫,৩৭০ কিলোওয়াট।

গ্যাস-ভিত্তিক শিল্পের এলাকায় একটি সার উৎপাদনের কারখানাও যে স্থাপিত হবে তা বলাই বাহুল্য। এই সার উৎপাদনের কারখানা থেকে ইউরিয়া পাওয়া যাবে বছরে ৫০,০০০ টন ও অ্যামোনিয়াম সালফেট বছরে ৫০,০০০ টন। এর ফলে আশেপাশের চা-বাগানগুলির সারের চাহিদা তো মিটবেই, অন্যান্য এলাকাতেও কিছু কিছু যোগান দেওয়া যাবে। কারখানাটির নির্মাণকার্যের ব্যয় প্রায় বারো কোটি টাকা।

বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের সংখ্যাও নিতান্ত কম হবে না। পনেরো কোটি
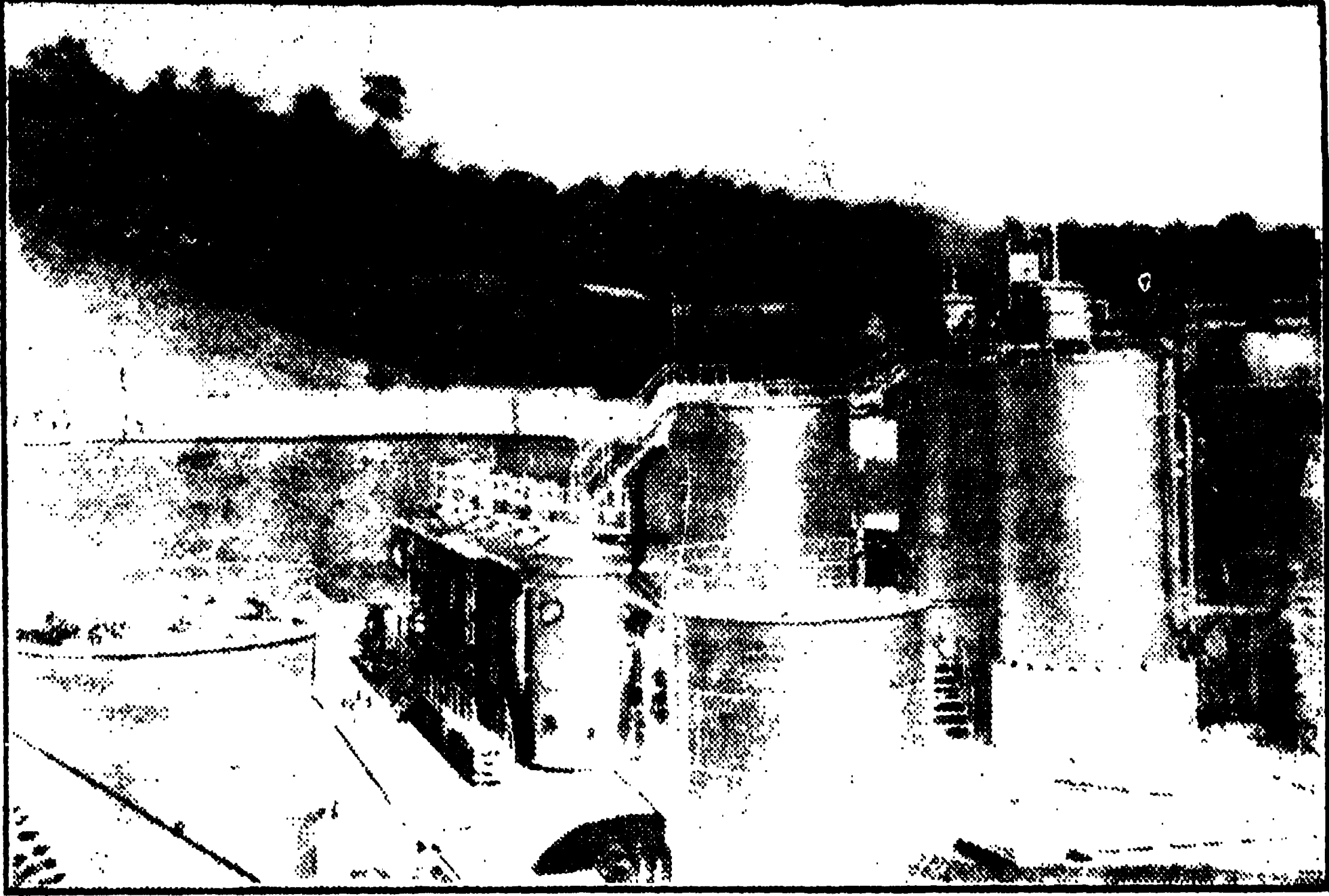
নুনমাটি তৈল শোধনাগার

টাকা ব্যয়ে একটি কৃত্রিম রবার তৈরির কারখানা নির্মাণ করার কথা হচ্ছে, বছরে ২০,০০০ টন কৃত্রিম রবার তৈরি হবে।

চার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে একটি ফাইবার ও প্ল্যাস্টিক কারখানা। বছরে ৪,০০০ টন পলিথীলিন ও অন্যান্য প্ল্যাস্টিক পাওয়া যাবে এই কারখানা থেকে এবং আশা করা চলে, এই প্ল্যাস্টিক তৈরীর কারখানার আশে-পাশে অজস্র প্ল্যাস্টিক-ভিত্তিক শিল্পও কালক্রমে গড়ে উঠবে।

এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে একটি ফার্নেস ব্ল্যাক প্ল্যাণ্ট। উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১০,০০০ টন।

আরো একটি কারখানার নির্মাণ-কার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এই কারখানায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দিনে ৪০,০০০ ইট তৈরি হতে পারবে।

ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। যেটুকু বলা হল তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতেই নাহারকাটিয়া হয়ে উঠবে ভারতের অন্যতম শিল্প-সমৃদ্ধ এলাকা। একটি তথ্যের উল্লেখ করলেই এই সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে। তিনসুকিয়া - নামরূপ - ডিব্রুগড় এলাকায় যে-পরিমাণ গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা দৈনিক যাট লক্ষ থেকে এক কোটি ঘনফুট। শিল্প ও জনবসতি কী বিপুল হলে পরে এই বিপুল পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন হতে পারে তা অনুমানসাপেক্ষ।

আশা করা চলে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের ডাক-তার বিভাগকে আরো কয়েকবার একশৃঙ্গ গণ্ডারের ছবি সম্বলিত ডাকটিকিট প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু ততো দিনে আসাম হয়ে উঠবে সত্যিকারের অর্থে কালোসোনার দেশ। আর কালোসোনা মানেই সমৃদ্ধি। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আসামে এই শুভ ভবিষ্যতেরই সূচনা হয়েছে।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ॥

এই লেখাটি যখন ছাপার হরফে প্রকাশিত হবে ততোদিনে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের খবর পুরোনো হয়ে গিয়েছে। এবং বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্পর্কে মোটামুটি যেটুকু জানার তা সবাই জেনে ফেলেছেন। এত আগে থেকে আমার পক্ষে বিজ্ঞান কংগ্রেসের খবর লেখা সম্ভব নয়। তবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি সম্পর্কে দু-একটি খবর জানাতে পারি।

আজ থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সূত্রপাত। তার আগে পর্যন্ত গবেষক পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীদের মিলনের স্থান ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। এই সোসাইটির ভবনেই উনপঞ্চাশ বছর আগে একটি সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, ভারতের বিজ্ঞান-প্রসারের জন্যে একটি সমিতি গঠন করতে হবে। প্রস্তাবটি কার্যকর হয় ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির প্রথম অধিবেশন। এই প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সারা ভারত থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৫ জন আর নিবন্ধের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫টি।

আর উনপঞ্চাশ বছর পরে কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির যে ৪৯তম অধিবেশন বসেছে সেখানে প্রতিনিধির সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি আর নিবন্ধের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। গত কয়েক বছরের অধিবেশনে বিদেশ থেকে যাঁরা যোগ দিতে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই দিকপাল বিজ্ঞানী। যাঁরা সভাপতিত্ব করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্ববরেণ্য।

তবে মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি আকাদেমি-ধরনের প্রতিষ্ঠান নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পরিচালনা করা নয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অন্য ভাষায়, প্রতিষ্ঠান চায় যে দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা বাড়ুক ও আরো অধিক সংখ্যক বিজ্ঞানী তৈরি হোক।

॥ বিজ্ঞানীর সাধনা ॥

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবরণ যখন দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তখন বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো নিজেদের অতীত জীবনের স্বপ্নের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তাঁদের মনে পড়েছে, একসময়ে তাঁরাও বিজ্ঞানের সাধনায় জীবনকে উৎসর্গ করার কথা ভাবতেন। এখন আর নিজেদের সম্পর্কে এসব চিন্তা নেই। এমনকি ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এই আশা পোষণ করেন না। তবে অল্পবয়স্কদের কথা আলাদা। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবরণ অন্তত কয়েকজন তরুণকে উদ্দীপিত করবেই। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে তরুণ মাত্রই বিজ্ঞানী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদর্শ-বাদী তরুণদের কাছেই আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার সুযোগ অবাধ নয়। সহায়-সামর্থ্যহীন পরিবারের ছেলের পক্ষে ধরাবাঁধা অ্যাকাডেমিক পথে উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া খুবই দুরূহ। আবার ধরাবাঁধা পথে অগ্রসর না হলে পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান-সাধনার সুযোগ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু দেশের এই অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে। তখন হয়তো ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অধ্যবসায়কে সম্বল করেই বিজ্ঞানী হবার দুরূহ সাধনায় অগ্রসর হওয়া চলবে। যে দুরূহ সাধনায় বিদেশের বহু বিজ্ঞানী সফল হয়েছেন। দৃষ্টান্ত অজস্র। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন শিল্পী। প্রিস্টলে পাদরি। এডিসন টেলিগ্রাফ অপারেটর। আইন্স্টাইন পেটেন্ট অফিসের কেরানী। ফ্যারাডে বই বাঁধাই করার দপ্তরী। ফিরিস্তিকে আরো অনেক বাড়ানো চলে, তার দরকার নেই। এঁরা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী, অথচ দেখা যাচ্ছে ধরাবাঁধা অ্যাকাডেমিক পথে অগ্রসর হয়ে এঁরা কেউ-ই বিজ্ঞানী হননি।

তাহলে নিশ্চয়ই এঁরা এমন কিছু কিছু মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন যা এঁদের বিজ্ঞানী হতে সাহায্য করেছে। যা না থাকলে এঁরা ভিন্নপথের যাত্রী হয়েই থাকতেন। এই গুণগুলি কী? পুরোপুরি একটা ফিরিস্তি করা যাক।

১। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একটানা কাজ করে যাওয়া,

২। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ করা,

৩। যে-কোনো অবস্থায় অবিচলিত থাকা এবং কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়া,

৪। অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করা, অন্যদের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত থাকা,

৫। মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া,

৬। গবেষণায় ও পরীক্ষাকার্যে অনলস হওয়া এবং প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা,

৭। স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকা এবং নিজের গবেষণার পথ নির্ধারণ করা,

৮। প্রত্যেকটি ব্যাপারকে খুঁটিয়া বিচার করা এবং সমগ্রভাবে বিচার করা,

৯। পুরস্কার বা খ্যাতির প্রত্যাশা না করে কাজ করে যাওয়া এবং নিজের কাজ সম্পর্কে ও বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ না করা,

১০। লেখক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞের মতো প্রখর কল্পনাশক্তি থাকা।

বিজ্ঞানীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকের মধ্যেই এই দশটি গুণ কম-বেশি পরিমাণে আছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই দশটি গুণের কোনোটিই জন্মগত নয়। অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা প্রত্যেকটি গুণই অর্জন করা চলে। অবশ্যই মাত্রার কম-বেশি থাকবে। প্রত্যেকটি গুণই উচ্চতম মাত্রায় অর্জন করতে হবে এমন কথা বলা হচ্ছে না। তা সম্ভবও নয়। এমনকি নিউটনের মতো বিজ্ঞানীও অন্যদের সম্পর্কে কিছুটা অসহিষ্ণু ছিলেন।

আরো একটি কথা। বিজ্ঞানী হতে হলে সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করা চাই। বই পড়ে এবং হাতেকলমে কাজ করে এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ভাণ্ডারটি নানাভাবে পুষ্ট করেছেন। এই ভাণ্ডারটিকে সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এজন্যে ধরাবাঁধা অ্যাকাডেমিক পথেই অগ্রসর হতে হবে সেকথা বলা হচ্ছে না। তবে অ্যাকাডেমিক পথটিই প্রশস্ত পথ। একলব্য প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত হয়তো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন না করেই বিজ্ঞানী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই। না অতীতে, না বর্তমানে। হওয়া সম্ভব নয়।
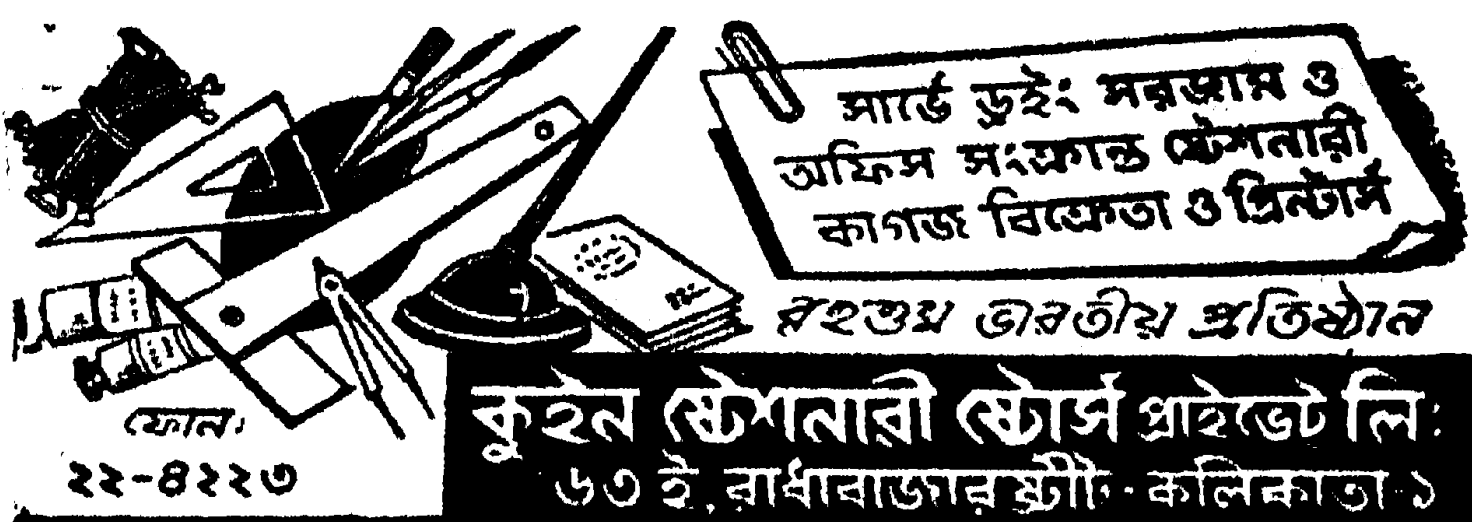
ব্যালে নৃত্য প্রসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্যালে হচ্ছে নৃত্য, সংগীত ও মূকাভিনয়ের সমন্বয়। ইতালীতে এর সূত্রপাত। ফ্রান্সে এর উৎকর্ষতা এবং রাশিয়াতে অমরতা লাভ করে।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে ক্যাথারিণ ডি মেডিসির বিবাহে প্রথম নাটকীয় ব্যালে মঞ্চস্থ হয়। ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরী ও ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই উৎসাহী ব্যালে নর্তক হয়ে ওঠেন।

সম্রাট লুই অ্যাকাডেমী রয়েল ডি লা ডান্স প্রতিষ্ঠা করে ফ্রান্সে ব্যালেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে পিটার দি গ্রেটের পৃষ্ঠপোষকতায় রাশিয়াতে ব্যালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রারম্ভে শতাব্দীকাল ব্যালে অনুষ্ঠান ছিল রাজদরবারে সীমাবদ্ধ। তাতে অংশ গ্রহণ করতো শুধু পুরুষেরা। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে শ্রীমতী লাফন্টেন সর্বপ্রথম ব্যালে নর্তকী হিসাবে প্রখ্যাতিলাভ করেন।

১৭২৬ শতাব্দীতে শ্রীমতী কামারগো নৃত্যের ঘাঘরা হাঁটু পর্যন্ত খাটো করবার আগে পর্যন্ত তার ঝুল ছিল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। ফরাসী বিপ্লবের পর প্যারিস অপেরার সজ্জাকর শ্রীমাইও সাঁট পোষাক চালু করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীর কার্লো ব্লাসিস ব্যালে আঙ্গিকের একটি নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন। আজ পর্যন্ত তা প্রায় অপরিবর্তিতই আছে।

আখ্যায়িকা অনুযায়ী একজন ক্যারিওগ্রাফার ব্যালের নৃত্য পরিকল্পনা করেন। তারপর একজন সংগীত-পারচালক অভিব্যক্তি ও ভঙ্গী অনুযায়ী আবহ-সংগীত রচনা করেন।

মার্গট ফনটেন

তিনটি প্রধান ধারা

ইউরোপীয় ব্যালের আজ প্রধান তিনটি ধারা—রাশিয়ান, ইতালীয়ান ও ইংরাজি। ধ্রুপদী সংযম ও মহিমান্বিত ভঙ্গী প্রথম ধারার, স্বাচ্ছন্দ্য ও গীতধর্মী হচ্ছে দ্বিতীয় এবং ক্ষুদ্রতর বৃত্তে নমনীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিব্যক্তি হচ্ছে তৃতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য।

ব্যালে শিল্পীদের চারটি শ্রেণীভেদ। শীর্ষস্থানীয়ারা হচ্ছেন প্রাইমা ব্যালেরীনা। পৃথিবীতে মাত্র ৫ জন শিল্পীকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। তাঁদের মধ্যে প্রথমা হচ্ছেন মস্কোর বলসই নৃত্যশালার উলানভা। বৃটেনের মার্গট ফন্টেন সম্ভবত খ্যাতি ও কীর্তিতে দ্বিতীয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম 'ব্যালেরীনা'। এ'রা প্রধানা ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন 'সোলইস্ট'। এ'রা একা নাচেন, কিন্ত প্রধান ভূমিকায় নয়। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছেন 'কুপস দি ব্যালে'। এই তরুণী নর্তকীরা একটি দলের মধ্যে নাচেন।

বৃটেনে মার্গট ফন্টেন একটি অনুষ্ঠানের জন্যে ৭০০ পাউন্ড পেতে পারেন আর কুপসরা সাধারণত পান ১৪ পাউন্ড।

একজন ব্যালে শিল্পীর পক্ষে দেহ-লাবণ্যই যথেষ্ট নয়, তাঁর চাই প্রবল প্রাণ-চাতুর্য ও নিঃসীম শিল্প-নিষ্ঠা।

ব্যালের তীর্থ-নগরী মস্কো

যেমনভাবে ইতালীতে চিত্র-শিল্প, জার্মাণীতে গান ও ইংল্যাণ্ডে নাট্যকলা এক-এক সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে তেমনি আজ রাশিয়া হয়ে উঠেছে ব্যালে নৃত্যের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র।

এক হিসেবে দেখতে গেলে রাশিয়ান ব্যালের বর্তমান অত্যুগ্র উৎকর্ষতার অনেকখানি কৃতিত্ব স্মরণীয়া বৃটিশ ব্যালে নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে নূতন আঙ্গিকে স্বাভাবিক নৃত্য বিখ্যাত রুশ ব্যালে শিল্পী সেরগি ডায়াঘিলেভ এবং কারিওগ্রাফার মাইকেল ফকনিলকে আকৃষ্ট করে। ফকলিনকে বর্তমান রুশ ব্যালের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত 'দি সোয়ান'কে প্রখ্যাতা ব্যালে শিল্পী পাভলভা (১৮৮৫-১৯৩১ খৃঃ) কিংবদন্তীতে পরিণত করেছেন।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় সেরগি ডায়াঘিলেভ প্যারিসে প্রস্থান করেন। সেখানে তিনি ব্যালেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান। কিন্তু একথা মনে করবার কারণ নেই বিপ্লবের উত্তাল অনিশ্চয়তায় রাশিয়ান ব্যালে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরং মহানায়ক লেনিনের অভয় হস্তের আশ্রয়ে রাশিয়ার ব্যালের বিপ্লবান্তে নবজাগরণ হলো। মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও কিরভ প্রভৃতি নগরীতে ব্যালে চর্চার জোয়ার এলো। দুনিয়ার প্রথম মজুর রাষ্ট্রে ব্যালে শিল্পীদের পারিশ্রমিক ক্রমে ক্রমে যা দাঁড়ালো তা বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির শিল্পীদের কাছে প্রায় কল্পনার বিষয় হয়ে উঠলো।

আনা পাভলোভা
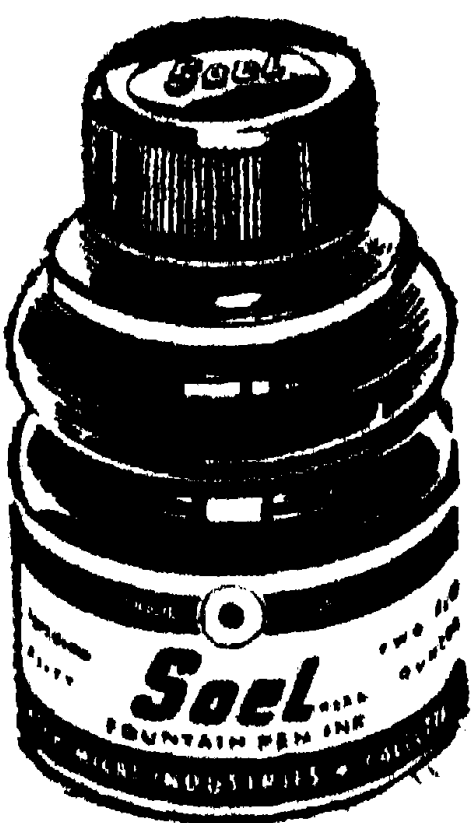
রাশিয়ার ব্যালের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে মস্কোর বলসই নৃত্যশালা। পৃথিবীর দেশে-দেশে ব্যালেরীনাদের স্বপ্ন হচ্ছে জীবনে অন্তত একবার বলসইতে আবির্ভূত হওয়া। কয়েক বছর আগে বৃটেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ব্যালেরীনা শ্রীমতী বেরিল গ্রের সেই স্বপ্ন সার্থক হয়। রাশিয়া সফরের শেষে 'রেড কার্টেন আপ্' নামক একটি বইতে তাঁর অভিজ্ঞতা চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি বলসই-নৃত্যশালা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি দিয়েছেন ঃ

'বলসই কথাটার অর্থ 'মহান'। এর চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কোন নাম তার হতে পারতো না।

এখানে প্রায় ২৮০০ লোক,—একটি ছোট শহরের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যা কাজ করে। এখানে ২২০০ দর্শকের আসন আর পার্শ্ববর্তী 'বলসই-ফিলিয়ালি' নামক সংলগ্ন নাট্যশালায় আছে ১৯০০ দর্শকের আসন।

বলসই ব্যালে সম্প্রদায়ে আছেন ২০০ জন শিল্পী এবং ৩০০ জন শিক্ষার্থী। মঞ্চটি ৮৫ ফিট প্রশস্ত, ১৮৫ ফিট গভীর এবং সেই গভীরতার ৭৭ ফিট অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্র ও সংগীত-শিল্পীর সংখ্যা ২০০ জন, সাধারণত যার অর্ধেক সংখ্যক শিল্পী অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন।'

বিদেশী শিল্পীদের রাশিয়ায় কিভাবে সম্মানিত করা হয় তার বর্ণনায় শ্রীমতী গ্রে লিখেছেন, "আমরা চাবাওকিয়ানির (Chaboukiani) নৃত্যগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। বিরামের সময় আমাদের বক্সে আসা-যাওয়ার সময় বারান্দার দুধারে জনতা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতো। নিজেকে যেন কোন রাজ-নন্দিনীর মত মনে হতো।"

দিগন্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

না, ভাইয়ে ভাইয়ে কোন মনান্তরও নেই মতান্তরও নেই। আসলে 'অন্তর' জিনিসটার সঙ্গেই কোন যোগসূত্র নেই। এক বাড়ীতে থেকেও সুচিন্তার ছেলেরা পরস্পরের কাছে প্রতিবেশীর চাইতে নিকটতম নয়।

সারা জীবন নিজের মনাকে বেঁধে রাখতে রাখতেই সমস্ত চেষ্টার শক্তি খরচ হয়ে গেছে সুচিন্তার, সংসারকে বাঁধতে পারেননি। যে একাত্মবোধে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে, তর্ক করে, শাসন করে, সে 'বোধ' ওদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বোধকরি জন্মাবারই অবকাশ পায়নি।

ইন্দ্রনীল উল্লাসে ডগমগ করতে করতে তার বান্ধবীর সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথে যেতে আসতে চোখে পড়লে নিরুপম মাথা নীচু করে ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে ওঠে, নিরঞ্জন ভুরু কুঁচকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চলে যায়। বাড়ী এসে কেউ কোনদিন ছোট ভাইকে প্রশ্ন করে না, 'মেয়েটা কে?' তিরস্কার করে না, 'ওভাবে ঘুরিস কেন?'

ভাইয়ে ভাইয়ে দরকার হলে মেপে-জুপে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে ওরা।

তবু আজ বড়ভাইকে ডেকে কথা কইল নিরঞ্জন। 'দাদা' বলার অভ্যাস নেই, বিনা সম্বোধনেই বলল, 'মিথ্যে পাগলামী করে বেড়াচ্ছ কেন? নীতাকে বিলেতে পাঠিয়ে লাভ আছে কিছু?'

নিরুপম এমন কোনও প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবু শান্তভাবেই বলল, 'কার লাভের কথা বলছ?'

'প্রত্যেকের দিক থেকেই বলছি। ধর তোমার—'

'আমার কথা থাক।'

'ঠিক আছে। কিন্তু নীতারই বা কি লাভ হচ্ছে? ও গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে তো ওর লাভার মরেই যাবে।'

'অসভ্যের মত কথা না বললেই খুশী হবো।'

'আচ্ছা সুসভ্য ভাষাতেই বলছি— তোমার বিশ্বাস ও গিয়ে ওর—ইয়ে বন্ধুকে দেখতে পাবে?'

'সেই বিশ্বাসেই তো ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

'আমি বলছি, কোন লাভ হবে না।'

'না হবার কথাই বা ভাবা হবে কেন? দেশটা এদেশ নয়, চিকিৎসা-পদ্ধতি উন্নত, তা-ছাড়া সকালে ট্রাঙ্ককল করে খবর পাওয়া গেছে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে।'

অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সে খবর নিরঞ্জনও টের পেয়েছে যে, গতকাল সন্ধ্যাতেই পেয়েছে। আর তাই না এত জ্বালা তার!

আশ্চর্য! গল্পের নায়কের মত শোকে বলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও মরল না হতভাগা লোকটা। সাগরময়ের উপস্থিতিটা নিরঞ্জনের কাছে একেবারে আকস্মিক, তাই এত অসহ্য লাগছে তার। এ যেন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ জানলা খুলে দেখতে পেল জানলার সামনে আলো আড়াল করে বিরাট এক পাহাড়!

ইন্দ্রনীলের মত অমন সস্তা হয়ে 'প্রেমে পড়তে' পারার ক্ষমতা নেই নিরঞ্জনের, কিন্তু সেই প্রথম থেকেই নীতার প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ তাকে পীড়িত করেছে। বিশেষ একটা যন্ত্রণা দিয়েছে।

অথচ সহজভাবে সেটা ব্যক্ত করতেও মর্যাদায় বেধেছে তার। তাই সে উত্তরোত্তর সারা পৃথিবীর ওপর, এমন কি নীতার ওপরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঈর্ষা বোধ করেছে ইন্দ্রনীলের প্রতি। ঈর্ষার কালো দৃষ্টিতে তাকিয়েছে সুচিন্তার দিকে। আর প্রতিনিয়ত ভেবেছে কি করে নীতার কাছে সহজ হওয়া যায়।

কিন্তু অকস্মাৎ এ কী ওলট-পালট।

নিরঞ্জনের সমস্ত বাসনার উপর, সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাবনার উপর একেবারে যবনিকা পাত!

নীতা বাক্‌দত্তা!

প্রথম আঘাতের ধাক্কাটা কেটে যেতেই, মনে মনে আর এক হিংস্র আশা বহন করতে লাগল নিরঞ্জন। যাক লোকটা মরে লাইন ক্লীয়ার করে দিয়ে যাচ্ছে। তাই বারে বারে ট্রাঙ্ককল করে জানতে চাইছিল, 'খবর কি, খবর কি'! অর্থাৎ মরল কিনা, মরল কিনা। কাল সকাল পর্যন্তও আশা হচ্ছিল নিরঞ্জনের ভাগাই সব ভার হাতে তুলে নিয়ে ঘটনাকে

নিরঞ্জনের অনুকূলে চালাচ্ছেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাতাস উল্টোমুখে বইল।

খবর এল অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

সে খবর যে নীতার কাছেও এসেছে বা আসতে পারে, আত্মকেন্দ্রিক মানুষটার বাসনান্ধ দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েনি। ভাবছিল নিরুপমকে প্ররোচিত করে এখনো যদি নীতার যাওয়াটা বন্ধ করা যায়।

'ও উন্নতি কোন কাজের নয়।' বলল নিরঞ্জন।

'কোন্‌টা কাজের, আর কোন্‌টা কাজের নয়, তার বিচারকর্তাও আমরা নই!' বলল নিরুপম।

'নীতার কতগুলো টাকা বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেটা ভাবছ?'

'টাকাটা নীতার, কাজেই ভাবা না ভাবার প্রশ্নটা অবান্তর।'

'তোমার এত সাহায্য না পেলে ওর এভাবে যাওয়া সম্ভব হ'ত না।'

'ও ধারণা ভুল। যে কোন ভাবে সম্ভব ও করিয়ে নিতই।'

'কিন্তু ধর, ও যাওয়ার পর ওর '...'

'বন্ধু'।

'ঠিক আছে বন্ধুই। ওর যাওয়ার পর যদি ওর বন্ধু মারা যায়? তখন ওর অবস্থা কি হবে কল্পনা করতে পার? তুমি তো খুব হিতৈষী সেজে—'

'তোমার আর কিছু বলবার আছে?'

'না!' বলে চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলে নিরঞ্জন, 'এই হিতৈষীগিরিটা বোধকরি ভবিষ্যতের আশায় জমি প্রস্তুত করে রাখা হচ্ছে?'

নিরুপম আরক্তমুখে বলে, 'তোমাকে আর একবার সভ্যভাবে কথা বলবার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'

'তা' দিতে পারো। তবু এ কথা জেনো, তোমার মনের কথা বুঝতে আমার বাকী নেই।'

'শুনে সুখী হ'লাম।'

বলে নিরুপম নিজেই নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

নিরঞ্জন তীব্র দৃষ্টিতে মিনিট দুই সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, ধাক্কা লাগল পর্দার ওদিক থেকে।

'বড়দা আপনি ডাক্তার পালিতের সঙ্গে—' অসমাপ্ত কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে নীতা বলে উঠল 'আপনি এখানে? বড়দা কোথায়?'

'জানি না।'

'আপনি একাই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন?'

'যদি থাকি, তাতে আপনার আপত্তি আছে?' ধরুন যদি বলি আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'সেটা ভুল বলা হবে। কারণ আমি ঠিক এখন এখানে আসব এটা আপনার জানবার কথা নয়।'

'জানবার কথা নয়, তবে জানা কথা!' নিরঞ্জন কুটিল চোখে তাকিয়ে বলে, 'সন্দেহ নেই আপনি বুদ্ধিমতী।'

'শুনে খুশি হলাম' বলে নীতা দরজার দিকে দু'পা যেতেই নিরঞ্জন সহসা পিছন থেকে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে চাপা গর্জনের মত বলে, 'দাঁড়ান!'

'এর মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'মানে বোঝবার বুদ্ধি অবশ্যই আছে তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের। একটা নির্বোধ লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছ, আর এটুকু বুঝতে পারলো না, কী বলতে চাই।'

আজ এই ক'দিন নীতার মুখে হাসি বলে জিনিসটা ছিল না। সে মুখ রোগা শুকনো কালো হয়ে উঠেছে, এই ক'দিনেই। কিন্তু এখন সহসা ওর মুখে অদ্ভুত একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। রাগ নয়, বিরক্তি নয়, চীৎকার নয়,

'এর মানে? কী বলতে চান আপনি?'

সেই অদ্ভুত হাসি-মাখানো মুখে শান্ত সুরে বলল নীতা, 'আপনি কি আমাকে প্রেম নিবেদন করতে চাইছেন?'

গালে চড় খাওয়ার মত কালচে মুখে বলে নিরঞ্জন, 'যদি তাই-ই করি?'

'আপনি তো সব-কিছুই লাভ-লোকসানের হিসেব কসে করেন, তাই সেই হিসেব দিয়েই বলি, 'তা'তে লাভ?'

নিরঞ্জন তেমনি চাপা গর্জনে বলে, 'আপনাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, আমার পথের বাধা দূরে হোক। লাভটা আসুক হাতের মুঠোয়।'

'আমাদের ভগবান খুব সম্ভব আপনার কথায় কান দেবেন না। সরুন আমায় যেতে দিন!'

'না, আমার কথাটা শুনতে হবে। কথা নয়, প্রশ্ন! যদি তোমার সেই ভাবী স্বামীর মৃত্যু হয়, পরবর্তী চান্সটা আমার, এ আশা করতে পারি?'

'আপনি এত শয়তান জানতাম না। সরুন—'

'না নীতা দেবী—সরতে পারবো না। উত্তর না নিয়ে উপায় নেই আমার। উত্তর চাই।'

সেই হাসিটা আবার ফুটে ওঠে নীতার মুখে।

'চাই' বললেই কি পাওয়া যায়?'

'যায়। এই আমার বিশ্বাস।'

'ভাল। বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকা ভাল। কিন্তু ভাবছি,—আপনার এতখানি নিরুপায় অবস্থা হ'ল কবে থেকে?'

সহসা নিরঞ্জনের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়, তীব্রতা সরে গিয়ে ফুটে ওঠে একটা আবেদনের দীনতা।

'কখন ঘটল, সে কথা কি তুমি সত্যিই টের পাওনি নীতা। যেদিন প্রথম এসে দাঁড়ালে, সেদিন থেকেই আমি—কিন্তু কেন তুমি বাজে মেয়েদের মত আমাকে নিয়ে মজা দেখলে? কেন আগে জানালে না তুমি এনগেজড্।'

'বাজে মেয়ে' শব্দটা নীতার কান লাল করে তোলে, তবু সে সংযত ভাবেই বলে, 'খবরটা যে উচ্চরবে ঘোষণা করে বেড়ানো উচিত, তা' বুঝতে পারিনি।'

'বুঝতে পারোনি নয়, ইচ্ছে করেই বুঝতে চাওনি। সেই অঘোষিত খবরটা হঠাৎ যেদিন ঘোষিত হয়ে পড়বে, সেটা কারো পক্ষে হয়তো মর্মান্তিক হবে, এ বোধ তোমার ছিল না বলতে চাও?'

নীতা গম্ভীরভাবে বলে, 'চাই বইকি। জগতের সমস্ত মর্মস্থল যে আমারই জন্যে আনকোরা মজুত রয়েছে, এতটা ধারণা ছিল না।'

'কথার মার-প্যাঁচে অনেক সত্যকেই অন্য মূর্তি দেওয়া যায়, আমি বলবো তুমি ইচ্ছে করে খবরটা গোপন করেছিলে।'

'সেটা বোধকরি খুব একটা দুরভিসন্ধির বশেই?'

'সৎ অভিসন্ধিও বলতে পারব না।' বিদ্রূপে আর তিক্ততায় কুৎসিত হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের মুখ। 'আসল কথা বিরহী-চিত্তের অবসর বিনোদনের বাসনায় কিছু প্রেমের খেলা খেলবার সুবিধের জন্যেই এই গোপনতা। তা' তা'তে সফল হয়েছ সন্দেহ নেই। কারণ মজা তুমি একজনকে নিয়েই করনি, করেছ অনেককে নিয়ে। নিরুপম মিস্তিরকে তো পুতুলনাচের পুতুলের মত ইচ্ছাসূত্রে ধরে ওঠ-বোস করাচ্ছ, ইন্দ্রনীলবাবু বোধকরি হতাশ হয়েই অন্যত্র আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন, আর—'

'আর আপনি বোধ হয় ঠিক করেছেন, গায়ের জোরে প্রেম আদায় করে নেবেন? তা' ভাল। বলং বলং বাহু বলং। কিন্তু আমার আর বসবার সময় নেই। আশা করি আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?'

'বক্তব্য শেষ হয়েছে, উত্তর পাইনি।'

'উত্তর! ওহো হো হো। বলছিলেন বটে শয়তান আপনার সহায় হয়ে যদি অবস্থাকে আপনার অনুকূলে আনে তা'হলে আমার ব্যাপারে আপনার অগ্রাধিকার, এই চুক্তিপত্রে সই করে রাখি। কেমন, এই না?'

'ব্যঙ্গ করো। কিন্তু একটু ভেবো, আমার পোষা কোনও শয়তানকে তোমার সাগরের কাছে পাঠিয়ে দিইনি মোটর এ্যাকসিডেণ্ট ঘটাতে।'

'আপনার যা যা বলবার, বলা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ গেছে! তবে খেলা একটা দেখালে বটে নীতা দেবী।'

নীতা ভিতরের সমস্ত উত্তেজনাকে সংযত রেখে শান্তসুরে বলে, 'ব্যাপার কি জানেন? দোষ আমারও নয়, আপনারও নয়, দোষ আমাদের দেশের মানসিকতার। কোনও মেয়ে কোনও ছেলের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই, ধরে নিতে হবে সেটা প্রেমের খেলা, আর সে খেলায় জেনে বুঝেও হতভাগ্য ছেলেরা প্রেমের পাথারে প'ড়ে হাবুডুবু করবেই, এই নিয়ম। এ হচ্ছে একেবারে অনিবার্য অমোঘ।

'তাই আপনি নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন আপনার দাদা আর ছোট ভাই দু'জনেই একই দেবীকে ভজনা করছেন। আপনার কথাতো বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন বলুন তো? মেয়েদেরকে কি কিছুতেই বন্ধুভাবে নেওয়া যায় না? সহজ মেলা-মেশার পথে সহজ হয়ে চলা যায় না তাদের সঙ্গে?'

'না যায় না!' প্রায় বাঘের মত গর্জন করে ওঠে নিরঞ্জন। 'ওসব আদর্শবাদের কাব্যিক বুলি রাখ। ও বুলি রক্তমাংসের মানুষের জন্যে নয়। প্রকৃতি নিজের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে নাকি?'

'উত্তর দেবার অনেক কথা আছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে এখন প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করবার সময় আমার নেই। তবে আপনার জন্যে আমি দুঃখিত। বড়দার মত সহজভাবে যদি ছোট বোনের মত নিতে পারতেন আমাকে, হয়তো—'

'সহজভাবে?' তীব্র স্বরে হেসে ওঠে নিরঞ্জন, 'ছোট বোনের মত! ওসব ভাল

ভাল বুদ্ধি তুলে রাখ নীতা তোমার ওই বড়দার জন্যে। লোকটা ভীতু, লোকটা কাপুরুষ, তাই মনে করছে এই দাদাগিরির ছলনাটুকু যদি ভেঙে যায়, তো হয়তো সবই যাবে। তার চাইতে এই সান্নিধ্যটুকুই বা মন্দ কি। এ ধরনের লোককে চিনতে আমার বাকী নেই।'

'মেয়ে-পুরুষের মধ্যে একটি মাত্রই সম্পর্ক সম্ভব, এই তা হলে আপনার ধারণা?'

'শুধু আমার ধারণা নয়, বিশ্বসুদ্ধ বুদ্ধিমান লোকেরই তাই ধারণা। সেই যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা না কি একটা কথা আছে, সেটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। 'দাদা' বলে ডাকলেই যদি ভগ্নীস্নেহ বিকশিত হয়ে উঠত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। শ্রীমতী সুচিন্তা দেবীও তো শুনেছি একদা সুশোভন মুখুয্যেকে 'দাদা' সম্বোধন করতেন।'

নিরঞ্জনের প্রত্যেকটি কথা দিয়ে যেন তিক্ততা ঝরে পড়ে।

এবার নীতা আর দাঁড়ায় না। 'আর একবার বলছি আপনার জন্যে দুঃখ হয়—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নীতার বিদেশযাত্রার খবর শ্যামপুকুর লেনের মধ্যেও পৌঁছয় বৈকি। খবর আর আগুন যে বাতাসের পাখায় ভর করে ছোটে।

মায়ালতা সুমোহনের কাছে ছুটে এসে বলেন, 'হ্যাঁ ছোটঠাকুরপো, নীতার যেতে আসতে নাকি দশ বারো হাজার টাকা খরচ হবে?'

'তাই সম্ভব। বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'একটা কথা জিগ্যেস করি, ওর বাপই না হয় পাগল, কিন্তু মেয়েও কি পাগল হয়ে গেছে?'

'সেটাও অসম্ভব নয়।' পা নাচাতে নাচাতে নির্লিপ্ত উত্তর দেয় সুমোহন।

'আর তোমরা? জেঠা-কাকা-দাদারা? তোমাদেরও কি মাথার দোষ ঘটেছে, তাই মেয়েটাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছ না?'

'তা' এসেছিল তো তোমাদের কাছে বাবার কথা জানাতে। চেষ্টাটা তুমি করলে না কেন?'

মায়ালতা নিজের পয়েন্ট ভুলে গিয়ে বলেন ওঠেন, 'আমি সে পরামর্শের অপেক্ষায় বসেছিলাম বুঝি? ভাবছ চেষ্টা করিনি?'

'বাস! বাস! তুমি যেখানে ব্যর্থ আমরা সেখানে কীটস্য কীট বৈ তো নয়।'

'কীটস্য কীট তোমরা কেন হবে আমিই। নইলে আর সকলের বড় হয়েও সকলের হেয় আমি? নইলে নীতা নির্লজ্জের মত মুখের ওপর বললো, 'আমার বিয়ে দিতে হলেও তো বাবার অনেক টাকা খরচ হতো।' আর তোমার দাদা সেই কথায় সমর্থন করলেন।'

'তোমার বিরুদ্ধ পক্ষে রায় দেওয়াটা তো দাদার চিরাচরিত নিয়মের অঙ্গ।'

'তা বলে ঘরের মেয়ের যা খুশি বেহায়াপণা, যা খুশি বেপরোয়াপণার প্রতিবাদ হবে না? বিয়ে কোথায় তার ঠিক নেই, বর নয়, কিছুই নয়, কবে কি একটু ভাবভালবাসা হয়েছিল বলে তার অসুখ দেখতে বিলেত ছুটতে হবে—এমন কথা ভূ ভারতে কেউ কখনো শুনেছে? টাকাই নয় আছে বাপের, তাই বলে লোকলজ্জা থাকবে না?'

'নো, নো,! ও দুটোর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে রোদের সঙ্গে বৃষ্টির মত। একটা থাকলে, আর একটা থাকে না। টাকা থাকলে চক্ষুলজ্জা নেই, চক্ষুলজ্জা থাকলে, টাকা নেই।'

'তা' তুমি যতই বল ছোটঠাকুরপো, এমন ধিঙ্গীপণা সাতজন্মেও দেখিনি। বিয়ে-করা বর হলেই কি অসুখ দেখতে কেউ কখনো বিলেতে ছুটেছে শুনেছ?'

'ধুত্তোর নিকুচি করেছে বিয়ে—' সুমোহন খাটের বাজু চাপড়ে বলে, 'বিয়েটাই কি প্রেমের মাপকাঠি না কি?'

মায়ালতা বেজার মুখে বলেন, 'চিরকাল তো তাই জেনে আসছি।'

'চিরকাল যা জেনে আসছ বৌদি সব ভুল। এই যে তোমাদের 'ছোটবৌ'! তার সঙ্গে তো আমার—'

সহসা বাক্য সংবরণ করে 'হুঁ হুঁ' করে সুর ভাঁজতে শুরু করে সুমোহন।

মায়ালতা কিন্তু 'কি হ'ল' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন না, কারণ তাঁর বুঝতে দেরী হয় না কি হল। এমন হামেসাই ঘটে। আর কিছু নয় নির্ঘাৎ ছোটবৌয়ের অঞ্চলের আভাস দেখা গিয়েছে।

হ্যাঁ, অশোকা আসছে।

জলখাবারের রেকাবীটা টেবিলে নামিয়ে রেখে, ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিয়ে আসে অশোকা, কারণ এ জল সুমোহনের স্পেশাল জল, পাড়ার কোনখানের টিউবওয়েল থেকে আনানো থাকে।

'কী ওসব?'

মুখ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে সুমোহন।

অশোকা উত্তর দেয় না, উত্তর দেন মায়ালতা। ওই মুখ বাঁকানোর ঝালটা নিজের গায়ে তুলে নিয়ে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছ না নাকি?'

'পাচ্ছি বৈকি।' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গী করে সুমোহন, 'আহা, কী অপূর্ব! কী অভূতপূর্ব! কী নতুন! হালুয়া আর পাঁপর ভাজা! মরি মরি!'

মায়ালতা ছিটকে ওঠেন, 'তা গেরস্থ ঘরে রোজ রোজ নতুনের আমদানী হবে কোথা থেকে শুনি? বাজার দেখতে পাও না?'

'বাজার।' সুমোহন দার্শনিকের সুরে বলে, 'এই পৃথিবীর মানুষের বাজার দেখতে দেখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, তোমার ওই তেল নুন লকড়ির বাজার দেখবার অবকাশ কোথা?'

'তা' অবকাশ হবে কেন! অবকাশ হয় শুধু টিপ্পনি কাটতে। রাজ্যসই চালের আমদানী করতে তো কেউ বাধা দেয়নি তোমাকে ছোটঠাকুরপো! তোমার ওই মেজদার মত কেষ্ট বিষ্টু হলেই পারতে!'

'তা পারতাম! কিন্তু হ'লাম না!' সুমোহন বলে, 'কিছু না হয়েও চালিয়ে যেতে পারা যায় কিনা, সেটাই হচ্ছে আমার গবেষণার বিষয়! ওই নিয়েই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'হুঁ, অমন আত্মভোলা দাদাটি পেয়েছ তাই—' মায়ালতা মুখ বাঁকান, 'নইলে গবেষণা করা বেরিয়ে যেত!'

'আহা, সেটা তো পাবোই। ওটা স্বতঃসিদ্ধ! জগতে যেমন শীত আছে,

তেমনি ভেড়ার লোমও আছে, ওটা বিধি-নির্দিষ্ট।'

মায়ালতা রেগে উঠে বলেন, 'হচ্ছিল এক কথা, পেড়ে আনলে আর এক কথা। বলি এই তো ছোটবৌ, খুব তো বিদুষী বুদ্ধিমতী, ও বলুক না নীতার এই টাকার বৃষ্টি করে ধেই ধেই করে বিলেত যাওয়াটা বেশ শোভন হচ্ছে?'

অশোকা ওদিকে ঘরের এটা ওটা গোছ করছিল, মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমায় উত্তর দিতে বলছেন?'

'বলছিই তো। বলব না কেন? তোমার ভাসুর তো উঠতে বসতে তোমার বুদ্ধির ব্যাখ্যান করেন—বল না, এটা বেশ ভাল হচ্ছে? লোকে ধন্যি ধন্যি করবে?'

'লোকের কথা বলা বড় শক্ত দিদি! আমার তো মনে হয়েছিল সেটা ওর প্রাপ্য!'

'প্রাপ্য! ধন্যি ধন্যিটা প্রাপ্য! আর ওই ছেলেটা, ভগবান না করুন, যদি না বাঁচে, তখন ওর অবস্থা কি হবে? বিদেশ বিভূঁই!'

'বিদেশ বিভূঁইয়ে তো স্বামীও মারা যায় লোকের দিদি!'

'স্বামী আর ওই একটা ভালবাসার লোক সমান হল?' ঝাঁজিয়ে ওঠেন মায়ালতা।

'না, সমান নয় বটে!' মৃদু হেসে চলে যায় অশোকা।

মায়ালতা মুখটা বেজার করেন।

'বুঝলে?' সুমোহন পাঁপরে কামড় দিতে দিতে বলে, 'ও তোমার গিয়ে 'স্বামী' আর 'ভালবাসা', এ দুইয়ের মধ্যেও সম্পর্ক রোদ বৃষ্টির মত! বুঝলে তো?'

'নিকুচি করেছে তোমার ন্যাকরার! আমি শুধু ভাবছি টাকাটার কথা! দশ বারো হাজার টাকা! উঃ!'

মায়ালতার ছেলেরাও বলে, 'উঃ! নীতাটা ড্যাং ড্যাং করে আকাশে উড়ে চলল বিলেতে! ভাবা যায় না। ওসব ছুতো টুতো রেখে দাও বাবা, যা বুঝছি সার কথা, ওসব হচ্ছে ষড়যন্ত্রের ব্যাপার! কাঁহাতক আর ওই পাগল বাপের পাগলামী সয়ে সয়ে দিন কাটায়। এই একটা কারণ সৃষ্টি করে কেটে পড়ল।'

মায়ালতা সায় দিয়ে বলেন, 'আশ্চর্য কি। জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সেই যে বন্ধু ছোঁড়াটা সেটাই বা কেমন কে জানে।'

তপোধন বলে, 'দাও মা বাবা আমায় কিছু টাকা, একবার ঘুরে আসি, ব্যাপারটা দেখেও আসি। পাসপোর্ট পাওয়ার অসুবিধে হবে না, কারণ দেখানো যাবে ছোটবোনের এস্কর্ট হয়ে যাচ্ছি!'

'হ্যাঁ, বড় চারটিখানি টাকার কথা কি না!'

বলেন মায়ালতা।

তপোধন তার ছোটকাকার মত মুখ-ভঙ্গী করে বলে, 'বিলেত, আমেরিকা, জাপান, জার্মাণী যাওয়া আজকাল ডাল-ভাতের সামিল হয়ে গেছে বুঝলে মা? আমার বন্ধুরা সবাই একবার করে কোথাও না কোথাও ঘুরে আসছে। আমাদের মত হতভাগা এ যুগে বেশী নেই। সবাই তো আশ্চর্য হয়ে যায় বলে, 'তোর বাবার তো যথেষ্ট প্র্যাকটিস, তুই তো—'

মায়ালতা বাধা দিয়ে বলেন, 'তবে যে উনি বলেন, 'এখনকার ছেলেরা যে এত বিদেশ যায়, সে সব নিজের নিজের চেষ্টায়। স্কলারশিপ জোগাড় করে—'

'রেখে দাও না ওসব কথা!' তপোধন আরও বেজার মুখে বলে, 'বাপের টাকা না থাকলে, সব ফক্কিকার।'

মায়ালতা এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলেন, 'কী বলবো বল! তোদের যেমন কপাল! সংসারে যদি এতসব আপদ-বালাই না থাকতো, তা'হলে কি আর আমি তোদের বিলেত আমেরিকা না পাঠাতাম? মেজঠাকুরপোও যে হয়ে রইল ভূতাবতার। নইলে সমানেই আমি মনে মনে আঁচ করে রেখেছিলাম তোরা পাশটাশ করে বেরোলে, একজনের জন্যে অন্ততঃ চেপে ধরবো তোর মেজ-কাকাকে। বলব ছেলে আর ভাইপো সমান, তোমার তো ছেলে নেই ওদের মানুষ করে তুলতে পারলে তোমারই লাভ। তা কপালক্রমে তোরা দু'তিনবার করে ফেল মারতে থাকলি, ওদিকে মেজ-ঠাকুরপোও—'

'আচ্ছা মা, এই যে নীতা চলে যাচ্ছে, মেজকার টাকাকড়ির ব্যবস্থা কি হবে?'

'ওই সুচিন্তাকেই সর্বস্বের অধি-কারিণী করে রেখেছেন বোধহয়!'

তপোধন বিরক্ত স্বরে বলে, 'কি বলবো, কাকা গুরুজন। কিন্তু খুব এক-খানা দেখালেন বটে!'

'শুনলি তো সব? বড়ভাইকে চিনতে পেরেছে, ছোটবৌকে চিনতে পেরেছে—শুধু আমাদের বেলাতেই—'

'শুনেছি সব! বুঝেছিও সব আমি শুধু ভাবছি, নীতা চলে যাচ্ছে এই ছুতোয় মেজকাকাকে যদি একবার এখানে এনে ফেলা যেত, তা'হলে আমি ও'কে ম্যানেজ করে নিয়ে ঠিক কিছু টাকা বাগিয়ে ফেলতে পারতাম!'

'সে আর হচ্ছে না। সুচিন্তাটি শক্ত ঘাঁটি।'

'ওঁর ছেলেরা যে কেমন তাই ভাবি। সহ্য করে কি করে?'

'ছেলেরা!' মায়ালতা বিদ্রূপহাস্য বলেন, 'ছেলেরা খুসিসে আছে। সংসারের সুরাহা হচ্ছে, এ আর বুঝছিস না।'

মায়ের এই নিভৃত আলোচনায় তপোধনই বিশেষ বিশ্বস্ত। সাধন ঠিক এভাবে মার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয় না,—সে শুধু মা-বাপের চেতনার অভাবেই যে তার কিছু হচ্ছে না, সেটাই বড় গলায় বলে বেড়ায়। বলে 'পয়সা খরচ না করলে ছেলে তৈরী করা হয় না, হয় গরু গাধা পালন করা। শুধু খেতে পরতে দিলেই মা বাপের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, সে যুগ আর নেই।'

যুগ যে বদলেছে, এ চেতনা বোধকরি নীতার এই ঘটনার আগে তাদের এমন-ভাবে আলোড়িত করেনি। যখনি ওরা ভাবছে নীতার বাবা তাদেরই বাবার সহোদর ভাই, রাগে হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে তাদের! অন্যপরে যে যা করে করুক, আমারই কাছের লোক আমার চাইতে ছাড়িয়ে উঠছে, এর চাইতে অসহ্য আর কি আছে?

সুবিমল যে তাঁর ছেলেদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য করেননি, এটা যেন নীতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা
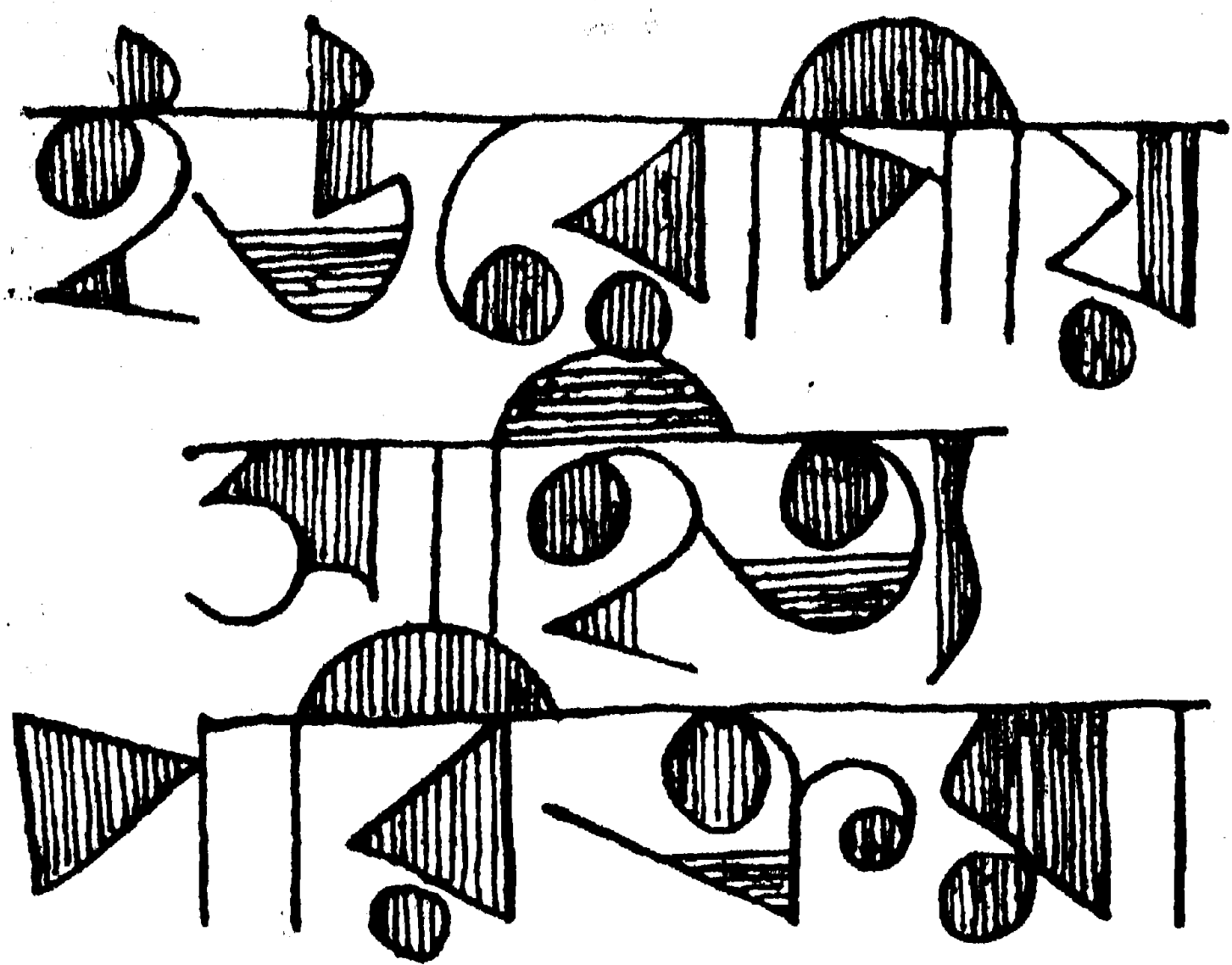
সার্থবাহ

॥ ইতালীয় চিন্তালোক : রাজনীতি ও কান্তিবিদ্যা ॥

দান্তে জেনেছিলেন যে জীব দিয়েছেন যিনি, তা'র মুখে ভাষা দেবার দায়িত্বও ছিল তাঁরই। খৃষ্টানদের পূর্বেও স্বীকৃত ঈশ্বর-সৃষ্ট জীব যখন ইহুদীরা, দান্তের মতে "প্রথম বক্তার ওষ্ঠ যা নির্মাণ করেছিল তা, অতএব হিব্রু ভাষা"। * মধ্যযুগের মানুষ স্বর্গকামী দান্তে যদিও তাঁর 'দে ভলগারি এলোকয়েন্তিয়া'য় ভাষার মুক্তি ও বাচন সম্বন্ধে একজন আধুনিকের মতোই সতর্ক, তবু তাঁর মরমী চিত্তে বচনের বিধাতাও যে সামাজিক মানুষ না হয়ে ঈশ্বরই হবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দান্তে বলেছিলেন যে মানুষের অহমিকাই ঈশ্বরদত্ত সেই প্রথম প্রকাশ-পদ্ধতিকে নানান মাতৃভাষার বিভিন্নতায় ভেঙেছে।

দান্তে নিশ্চয়ই অবাক হতেন ঈশ্বরের হস্ত-নিঃসৃত জীবদের অহমিকার গুরুতর বিকাশগুলি দেখলে। স্রষ্টার নির্মল সেই দান ভাষা কতো বিকট অপব্যবহারে আজ কলুষিত। আত্মপ্রকাশের যে-মোহন উপায়রূপে সৃষ্টির সৌন্দর্য বিলাসী মানুষের কাছে ভাষার আত্মিক উত্থান তার কী [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের মধ্যে [illegible]। এই অপলাপের নিদর্শন [illegible] দান্তেকে দেখাতে [illegible] যেতে হ'ত না-[illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] ফরাসী [illegible] বা [illegible] [illegible] কিংবা আদলফ হিটলরের জাতীয় প্রাণায়ামের মন্ত্রগুলি; প্রলয়ের নিখুঁত বার্তা বহন ক'রে ভাষা তা'র সংহারক মূর্তি প্রকাশ করেছিল দান্তেরই প্রিয় 'ভলগার', প্রচলিত ইতালীয়ানে।

মুসোলিনীর বক্তৃতাগুলির কথা বলি না, সেগুলি একজন বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ। (আর, বেনেদেত্তো ক্রোচের কথা সত্য হ'লে, মুসোলিনীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই স্বরচিত নয়)। কিন্তু কী অতল বিস্ময় ও উৎত্রাস জাগত দান্তের, যদি তিনি শুনতেন জিওভান্নি জেন্তিলের সেই শক্ত, যুক্তিময় বচনগুলি যা'তে ফাশিবাদের দার্শনিক বনিয়াদ সেজেছিল. যদি পড়তেন দান্তে সেই 'ফাশিবাদী বুদ্ধিজীবিদের ফতোয়া' যা'র উদ্যোক্তা ছিলেন জেন্তিলে! নরকের কোন মহলে পাঠাতেন দান্তে জেন্তিলেকে? বিপথগামী কবি মারিনেত্তির 'আফ্রিকীয় কবিতা'য় ইতালীয় ভাষার বিদঘুটে ক্রিয়াকলাপ চাক্ষুস করলেই বা কী হ'ত দান্তের ধারণা? আন্নুন্তসিওর দোর্দণ্ডপ্রতাপ অহমিকার ভাষা ও তা'র সাধিতবোর পরিচয় পেলে ঐ বিলাসী আত্মার আবাস-সন্ধানে দান্তেকে ঘুরতে হ'ত নরক বা পুরগাতোরিওর কোন চত্বরে চত্বরে? মধ্যযুগীয় কবি যদি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর স্বদেশের মাটিতে এসে দাঁড়িয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রাখতেন তাহলে তাঁর মনে হ'ত যে ঈশ্বর নয়, শয়তানই মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিল প্রকাশের ঐ অস্ত্র ভাষাকে।

* "Fuit ergo hebraticum idioma illud quod primi loquentis labia fabricarunt" De Vulgari Eloquentia, I.vi.

পরিপক্ক শয়তানির জন্য অবিমিশ্র নরকযন্ত্রণা দান্তের বিচারে নিঃসন্দেহে যাঁর প্রাপ্য হত, তিনি অবশ্য উপরোক্তদের একজন নন। তিনি ইতালীয় অর্থনীতিবিদ ভিলফ্রেদো পারেতো। দস্তুরমতো দার্শনিক না-হলেও, এবং তাঁর রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞানের চর্চায় গণিত-নিষ্ঠ বিজ্ঞানীর দাঢ়্য সপ্রমাণ করলেও, পারেতোর শ্রেষ্ঠ রচনা, 'মন ও সমাজ' দার্শনিকত্বের ভাণ-বিবর্জিত নয়। পারেতো মন ও সমাজের যে অমানবিক সমীক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন কুটিলতায় তার দোসর মেলা ভার। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে-ভয়ানক পথনির্দেশ পারেতো দিয়েছিলেন, তা'র হদিস পাওয়াও মাকিয়াভেল্লির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যে মৌলিক তত্ত্বকে নির্ভর ক'রে ফাশিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তা'র প্রত্যক্ষ জনক ছিলেন পারেতো। এবং একমাত্র সেই কারণেই তিনি আমাদের আলোচ্য। কারণ, প্রকাশিত ফাশিবাদের নির্মমতার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না পারেতোর মস্তিষ্কপ্রসূত সেই ভয়ানক চিন্তার নির্মমতা, যা ফাশিবাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় ছুঁয়ে ছিল। বরং, প্রকাশিত ফাশিবাদের কিয়দংশও যদি বা উত্তেজনার প্রাবল্যে মানসিক অত্যাচারের নিদর্শন হয়ে থাকে, সুস্থ (?) মস্তিষ্কের যে চিন্তা ঐ বর্বরতার প্রজনন ও বৃদ্ধি সম্ভাবিত করেছিল তার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কলুষিত।

ফাশিবাদের বীজমন্ত্র প্রথম কোন গুরুর থেকে লব্ধ, এ নিয়ে বিতন্ডার সুযোগ থাকতে পারে। সে-গুরুর সন্ধানে দূর অতীতের মাকিয়াভেল্লি আর অদূরের নীতশে, কিংবা ফরাসী সোরেলের নামোল্লেখ সহনীয় নিশ্চয়ই। ঔপন্যাসিক হেনরি জেমস যিনি মন্তব্য করেছিলেন যে 'যা চালু থাকে তা-ই ঠিক', অজান্তে ফাশিবাদের অভিসন্ধি সমঝেছিলেন কি-না কে বলতে পারে? কিন্তু সচেতনভাবে, বুদ্ধিবিবেকের সমস্ত দাপট নিয়ে ফাশিবাদী দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভিলফ্রেদো পারেতোই।

মার্শালের অর্থনীতিতে গাণিতিক স্বচ্ছতার অভাব যে পারেতোকে পীড়া দিয়েছিল, সেই পারেতো পরিশেষে অর্থনীতি ও গণিত পরিহার করে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের [illegible] বুঝি তাঁর আত্ম-নির্ণয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন যে রাষ্ট্রের অগণিত বাসিন্দা, সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উন্মুখ করতে হলে তাদের সামনে যুক্তিসংগত পন্থার নির্দেশ না রেখে, কোনও অযৌক্তিক, উচ্ছৃঙ্খল, 'মিথ'-রূপ প্রলোভন নাচাতে হবে। কারণ, জনগণমনের সবচেয়ে কার্যকরী উদ্দীপনার বাস তার অচেতন মনে এবং সেই অচেতনকে কোনও রামরাজ্যের প্রলোভন এমন উপযুক্ত কশাঘাত করতে পারে যে জনগণমনকে নিয়ে যথেচ্ছ উন্মার্গ-বিহার সম্ভব হয়। নেতার কবলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তখন সাধারণ মানুষ। আর পারেতো জানতেন যে অভিজাতগোষ্ঠীর প্রতিভূ, নেতা নির্বিচারে কাজে লাগাতে পারেন সাধারণ মানুষকে। ছলে বা কৌশলে নয়, একমাত্র বলেই—ঐভাবে দুর্নিরীক্ষ্য এক তাড়নায় ক্ষেপিয়ে-তোলা লক্ষ লক্ষ মানুষের শক্তি আহরণ ক'রে,—রাষ্ট্রনেতাকে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ করতে হবে। শক্তির পথকে রাষ্ট্রোন্নতির পরম বলে নির্ধারিত করেছিলেন অবশ্য পারেতোর ওস্তাদ, ফরাসী জেয়র্জ সোরেল, কিন্তু ঐ শক্তির যে উৎসের সন্ধান ফাশিবাদ পেয়েছিল তা বিদগ্ধতর পারেতোরই অবদান। সুনিপুণ মনোবিজ্ঞানী ও হীনতম চক্রান্তকারীর মিলন ঘটেছিল পারেতোর বিষাক্ত চিন্তায়। মানুষের অপ্রস্তুত অচেতন মনকে এই রকম ষড়যন্ত্রে কবলিত করে মানুষকে নিরঙ্কুশ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের ফাশিবাদী কৌশল পারেতোর পূর্বে অতো স্বচ্ছভাবে আর কোনও কূটনীতিজ্ঞ শেখেননি।

উক্ত অবতরণিকার উদ্দেশ্য পাঠক-চিত্তে এরূপ ধারণা জাগান নয় যে বিশ-শতকী ইতালীয় চিন্তালোক জুড়ে এক-মাত্র ঐ পারেতো-কথিত ও মুসোলিনী-সাধিত ফাশিবাদ নামক ভয়ঙ্করী প্রহেলিকারই অধিষ্ঠান। পারেতো-জেন্তিলে বা মারিনেত্তি-আন্নুন্তসিওদের চিত্ত-মন্থনের গরল ছাড়া ইতালীয় চিন্তার অন্য কোনও প্রাপ্তিযোগ ঘটেনি এমন নয়। সত্য, যে এ যুগের ইতালীয় চিন্তার অনেকখানিই একটি রাজনৈতিক অর্কেস্ট্রা। (যা'তে মুসোলিনী যদি নির্দেশক হ'ন, প্রথম-বেহালা বাজিয়েছিলেন পারেতো; হার্প ধরেছিলেন জেন্তিলে। আর কেটলড্রামে বা এস্বোনে রব তুলেছিলেন আন্নুন্তসিও, মারিনেত্তিরা)। কিন্তু উক্ত সলীল পশ্বাচারের মধ্যেও অপ্রমত্ত থেকে, জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে পূর্ণ চৈতন্যে শিল্প-সাহিত্য রূপ মহা-সত্যের অনুধাবন করেছিলেন এক প্রবীণ ইতালীয়। তিনি বেনেদেত্তো ক্রোচে।

ফাশিবাদের ভূমিকম্পে ভয়ে আত্মহারা হয়ে ছোটাছুটি করেননি ক্রোচে; কিংবা, তাঁর পায়ের নীচেকার মাটি বিদারিত হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নেয়নি। উদ্ধারের একটি সবল আশা ক্রোচেকে কখনও দুর্যোগের কাছে আত্মসমর্পণ করায়নি। ছোটবেলায় একটা আসল ভূমিকম্প—ইস্কিয়া দ্বীপের সেই ভয়াবহ ভূপিকম্প—বারো ঘন্টা ক্রোচেকে ভগ্ন-স্তূপের ভিতর লুকিয়ে রেখেও তাঁর প্রাণহরণ করতে পারেনি। এমনই এক প্রতিরোধী মননের সাক্ষ্য ছিল ক্রোচের রচনায় যে স্বয়ং মুসোলিনী পর্যন্ত একসময় ঐ অসামরিক চিন্তানায়ককে মসীযুদ্ধের সুযোগ দিয়ে আপন অহমিকা তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। অনেক পরে ভাতিকানের 'পবিত্র দপ্তর' মারফত ক্রোচের রচনাবলী 'পরিবর্জন সূচী'র অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে মুসোলিনী ক্রোচেকে ফাশিবিরোধী লেখা লিখতে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে ক্রোচের প্রতিরোধ এতো প্রবল যে তা চাপা দেওয়া দুঃসাধ্য, বরং প্রকাশ্যে ফাশিবাদের অকাট্য যুক্তি দিয়ে ক্রোচেকে খণ্ডন করবেন একজন জেন্তিলে বা পারেতো।

ফাশিবাদের উগ্রতাও যেমন, যুদ্ধোত্তর ইতালীর বামপন্থী তীব্রতাও তেমন, ক্রোচেকে যতশীঘ্র এক মানবিক মধ্যপথের প্রত্যয়েই ফেরায়। দার্শনিক জীবনের সূরুতে মার্কসবাদ ক্রোচের প্রণিধান দাবী করেছিল অনিবার্যভাবে; এবং ফাশিদর্শনের প্রধান ভাষ্যকার জেন্তিলে ছিলেন এককালে ক্রোচের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু মার্কসবাদ আলোচনায় ক্রোচে যেমন গোড়া থেকেই অপকারী 'আদর্শ-বাদী' সোরেলের সাহচর্য ধাতস্থ করেন, তেমন জেন্তিলেকে বিসর্জন দিতেও ক্রোচের সময় লাগেনি।

নানাভাবে রাজনৈতিক ছোপ লেগেছিল দার্শনিক ক্রোচের ব্যক্তিত্বে। জেন্তিলের প্রত্যুত্তর, "ফাশিবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের ফতোয়া" রচনা করেন ক্রোচে। তাঁর সম্পাদিত 'লা ক্রিতিকা'র অনেক সংখ্যাই সাহিত্য-দর্শনের পরিবর্তে রাজনীতির মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিওলিত্তির নিরপেক্ষ সরকার ক্রোচেকে শিক্ষামন্ত্রীর পদ দিয়েছিল। সরবে দাবী করেছিলেন ক্রোচে ভিকতর এম্মানুয়েলের সিংহাসন ত্যাগ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ক্রোচের প্রকৃত উৎসাহ ছিল দর্শন চর্চায়, এবং সেই চর্চায় তাঁর জীবনসাধনার মহত্তর সার্থকতা। এই দর্শন চর্চাও আবার ক্রোচের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল কান্তিতত্ত্বে। —কিংবা আরো স্পষ্টভাবে সাহিত্য মীমাংসায়। কাব্যাদর্শ, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে ইতালীয়দের যে প্রবণতা অষ্টাদশ-শতকের মুরাতোরিকে নিখুঁত কবিতায় মর্মে নীতিসংগত প্রসাদগুণ খোঁজায়, ভিকোকে 'নব্য জ্ঞানের' দিশায় এক আদিম সার্বজনীন ভাষার উৎপত্তি দেখায় ছন্দোময় কবিতার উচ্চারণে (প্রসঙ্গতঃ, জর্জ টমসন প্রমুখ মার্কসবাদী সমালোচকরা কবিতার জন্ম বিষয়ে যে আলোকপাত করেছেন তা মনে হয় ভিকোর 'নব্য জ্ঞানে' পূর্বদৃষ্ট): যথেষ্ট গুরুভার এক দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে 'ইতালীয় সাহিত্যের উপাখ্যান' লেখায় উনবিংশ শতকের ফ্রানচেস্কো দে সাঙ্কতিসকে,— সেই প্রবণতা ক্রোচেকে তাঁর দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করায় 'এস্তেতিকা' (কান্তিবিদ্যা) দিয়ে।

কান্তিবিদ্যার প্রতি অনেকে একটা নিরসক্তি পোষণ করেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে উক্ত বিদ্যা অনন্তপার দর্শন শাস্ত্রের নেহাতই এক আঞ্চলিক পাঠ। সে-হিসাবেও আলগা, অগভীর, এমনকি অপ্রয়োজনীয়, এবং তার আবেদন কেবল মানবসমাজের নিশ্চিন্ততর এক গোষ্ঠীর কাছে অশোভন নয়। কোনও ভাবনাকে বা ভাবুককে 'কান্ত' (এস্থেটিক) বলে অভিহিত করা অনেকাংশেই এক বাস্তববাদী শিকায়ৎ। কিন্তু এই কান্তিবিদ্যার পরিধি যে যথেষ্ট বিস্তৃত —এতো বিস্তৃত যে দর্শন বিষয়ের প্রায় সবখানিই এর মুখ্য বা গৌণ আওতায় বর্ধিষ্ণু,—এ রকম উপদেশ ক্রোচের চেয়েও স্পষ্টভাবে আমাদের দিয়েছেন এযুগের এক মহাপণ্ডিত, (যদি বা স্বল্পখ্যাত) ইংরাজ দর্শন-বেত্তা, এডয়ার্ড বুলো। অন্ততঃ ক্রোচের উপস্থাপিত কান্তিবিদ্যার সমপর্যায়ে পৌঁছলে উক্ত বিদ্যার জ্ঞান গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে নিমিত্তমাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে যে বিশ্ব-

বীক্ষার দায়িত্ব নিতে সক্ষম, তা'তে সন্দেহ নেই।

ক্রোচের সাহিত্যদর্শনের একটি মৌল বক্তব্য আলোচনা করলেই উপরোক্ত দাবীর যাথার্থ পরিস্ফুট হবে। ক্রোচে বলেন যে শিল্পে ব্যক্ত-বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্ব, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বা সু-কুর পরিমাপ শিল্পের মূল্যায়নে অনাবশ্যক: ধর্তব্যই নয়। কারণ শিল্প হল শুধুই ব্যক্তি (অভিব্যক্তি)। ব্যক্ত হয়েছে যা' তার বিষয়গতের কোনও প্রকার যাচাই শিল্প-সমালোচনার স্বাধিকারে নেই, যা আছে তা একমাত্র তা'র রূপগতের, অর্থাৎ শিল্প ব্যক্তের বস্তুতে নয়, ব্যক্তির রূপে। ক্রোচে যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে কী প্রকাশ করছি এ নিয়ে শিল্পীর দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে কম, কীভাবে প্রকাশ করছি এই তাঁর একমাত্র প্রণিধানযোগ্য। কারণ কী-প্রকাশ-করছি ক্রোচের কাছে এক প্রায়-জৈব নির্ঘণ্টে পূর্বানুমোদিত।

ক্রোচের কাছে ফর্ম ও কন্টেন্টের দ্বন্দ্ব এক নিশ্চিত ও দ্রুত সমাধান লাভ করে। কারণ তিনি শিল্পে ক্রিয়াশীল জ্ঞানকে ইনটুইশনলব্ধ বলে নির্ধারিত করেন। জানার দ্বিবিধ পন্থা : যৌক্তিক জ্ঞান ও ইনটুইশন বা স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞাই শিল্প-প্রক্রিয়ায় কল্পনা-নিয়ন্ত্রা সেই বুদ্ধি যার আহরণ বা বিনাশ কোনওটাই শিল্পীর করায়ত্ত নয়। ক্রোচের ভাষায় শিল্পকে যদি একটি কান্ত ঘটনা (এস্থেটিক ফ্যাক্ট) বলে গ্রহণ করি, তবে তার সংঘটনে আছে কেবল স্বজ্ঞাতবোধ বা ইমপ্রেসনগুলিরই খেলা, অন্বয় পরিণতি। উক্ত স্বজ্ঞাত বোধকে নিঃসন্দেহে পাওয়াই—এমন কি মনে মনে পাওয়াও,—তার অনূদিত শিল্পরূপ দাবী করে। যেমন সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে শব্দে যে বোধের প্রকাশ, তা প্রায় বোধের সঙ্গেই একাত্ম। কারণ চিন্তা বলতে আমরা যা বুঝি তা মনের ভিতরও প্রকাশিত শব্দের মারফত ছাড়া সম্ভব নয়। (যতদূর মনে পড়ে এক জায়গায় টি এস এলিয়টও এবম্বিধ শব্দমাত্রিক চিন্তার কথা বলেছেন।)

ক্রোচের চিন্তা স্পষ্টতঃ আর্টের তন্মাত্র সার্থকতার পৃষ্ঠপোষকতা করে। কিন্তু 'আর্টের জন্য আর্ট' এবং ক্রোচের দর্শনে নির্ধারিত ব্যক্তিসর্বস্ব শিল্পের তত্ত্ব ওজনে বা উদ্দেশ্যে সমান নয়। প্রথমতঃ শিল্পীর পক্ষ থেকে ঘোষিত ঐ 'আর্ট' জোর দিয়েছিল তাঁর প্রকাশ্য বস্তুকে নিয়ে শিল্পীর যথেচ্ছ হবার অধিকারের ওপর। ক্রোচে দেখিয়েছিলেন যে স্বজ্ঞাতবোধের ব্যক্তিত্বে শিল্পী এমনই কুলীন যে তাঁর প্রকাশিত বস্তুর বিচার নিরর্থক। শিল্পীর যথেচ্ছ হবার ছাড়পত্র অবশ্যই ক্রোচে লিখে দেননি। বরং তাঁর স্বজ্ঞা-বিধানে শিল্পীর কর্তব্য অনেকখানিই স্বয়ংক্রিয়। আর যে তাত্ত্বিক ভার শিল্প-সত্তার ক্রোচীয় ব্যাখ্যায়, তার অনুপাতে শিল্পীদের ঐ বিক্ষোভ, শোভনভাবেই, লঘিমা-প্রাপ্ত।

আপাতদৃষ্টিতে অনতিসাধারণ ক্রোচের এই বক্তব্য—'যদি প্রকাশগুলি সত্যই নিখুঁত হয়, করার আর কিছুই নেই, কেবল সমালোচককে উপদেশ দেব যে শিল্পীকে তবে রেহাই দিন'—আসলে কিন্তু যথেষ্ট অসাধারণ একটি মন্তব্য। ক্রোচে ব্যক্তের নির্দোষিতা বিবেচ্য না করে ব্যক্তির, প্রকাশিতের বস্তুতান্ত্রিক পরিমাপ অগ্রাহ্য করে প্রকাশের যে নান্দনিক মাপজোখের ওপর আস্থা রাখেন তার অবশ্যই ক্ষমতা নেই শিল্পের নৈতিক, সামাজিক, এমনকি মানবিক বন্ধনগুলি সম্বন্ধে শিল্পীকে সচেতন করে রাখার। শুধু যে নেই তা নয়, উক্ত বন্ধনগুলির অস্তিত্ব নস্যাৎ করার অধিকারও ঐ নান্দনিক জেদের কাছে প্রত্যাশিত। স্বজ্ঞাত বোধ মানুষকে যদি কেবল সাধু প্রকাশক করে তোলে তাহলে মানুষের চিন্তা ভাবনার সর্ববিধ উক্তিকেই বাধ্যকর এক আত্মনির্ণয় বলা চলে এবং শুধু শিল্পীকে কেন আলাপচারী সামাজিক মানুষকে বাক্-সংযম অভ্যাস করতে হয় না কখনই। কান্তিবিদ্যার এই ক্রোচীয় সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে উৎকটতম ধ্যানধারণার বহিঃপ্রকাশ—জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রেই ঐ অনির্ণেয় স্বজ্ঞারই অবদান! স্পষ্টতঃ ক্রোচীয় অবধানে নিপুণ শিল্পীর হাতে গরল ও সুধা তুল্যমূল্য। কতোখানি ব্যাপক ও বৈনাশিক এই স্বজ্ঞা-চালিত শিল্প-যন্ত্রের উৎপাদন হ'তে পারে তা'র প্রমাণ 'সোনার যুগ' নামক সুররেয়ালিস্ত চলচ্চিত্র থেকে প্যারিসের ওবেলিস্ক ও ওলিম্পিয়া প্রেসের বইগুলি, কবি গিয়োম আপলিনেররের ('আরাগ' লিখিত ভূমিকাসহ) 'একজন অল্পদারের প্রেস' থেকে হেনরি মিলরের নিষিদ্ধ উপন্যাস-গুলি পর্যন্ত। ক্রোচীয় শিল্প-সংজ্ঞায় 'ললিতা'র নাবোকভ বিনাবাক্যব্যয়ে সমালোচনা থেকে রেহাই পান।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত হলেও 'এস্তেতিকা' ক্রোচের যৌবনের রচনা। উপরের মন্তব্যানুগ নন্দন-সর্বস্ব শিল্পের প্রশস্তি ঠিক না-গাইলেও, 'এস্তেতিকা'র ক্রোচে যে নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতি কিছুটা উদাসীন, একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কান্তিবিদ্যায় ক্রোচে যদি বা এমতো একদেশদর্শী, তাঁর পরিণত দর্শন এক সর্বাঙ্গীন জীবনচর্যাকে আয়ত্ত করেছিল এবং নৈতিকের ঐ প্রাথমিক, আপাত-অসতর্কতার ক্ষতিপূরণ করেছিল সদসতের দীর্ঘতর এক অধ্যয়নে! কীভাবে শিল্পের নান্দনিক সত্যকে পরম বলে বিশ্বাস করেও ক্রোচের জীবনদর্শনে নৈতিক আদর্শের মহত্ত্ব পরিশেষে ইতিহাস-বিধৃত জীবনসংগ্রামের এক শ্রেয়তর স্থিরস্বরূপে প্রমাণিত হয়, সে আলোচনার স্থান বর্তমান প্রবন্ধে নেই। পারেতো-জেন্তিলের ইতালীতে চিন্তার যে নিঃশঙ্ক বিকার মারণ ও উচ্চাটনের মন্ত্রপাঠে ভাষার সনাতন পবিত্রতায় পর্যন্ত কলঙ্কলেপন করেছিল, সেই বিকারের অভিশাপ থেকে ইতালীয় ভাষা ও মানবিকতার পূর্ণাবয়ব মুক্তি, সভ্যতার এক সংকটকালে ধ্বনিত হয়েছিল প্রবীণ ক্রোচেরই ভাষণে : "রাজনৈতিক আদর্শ-বাদগুলির, স্লোগানের পাল্টা শ্লোগানের উপযোগিতা অবশ্যই আছে; ওরা অস্ত্রধারণে আহ্বান করে, যোদ্ধাদের মিলিত করে আক্রমণে ও প্রতিরোধে এবং তাদের মাতিয়ে তোলে জয়ের আনন্দে বা আশায়। তবু আপন সরল ও মৌলিক মানবিকত্ব নিয়ে মানুষের যে হৃদয় তা পড়ে থাকে শূন্যে। মনে হয় যেন দু'টি ইতিহাস, ইতিহাস ব্যক্ত করার দু'টি পথ—চলেছে খুব লাগোয়া সমান্তরাল, কিন্তু কখনও মেলে না। রাজনৈতিক ও নৈতিক। কিন্তু আসলে, একটি ইতিহাসের, যে ইতিহাসে জীবনের নিরন্তর সৃজন, ও বিশ্বজনীনে উৎসর্গীকৃত জীবনের বিরতিহীন উন্নয়ন ও মুক্তি,—সেই ইতিহাসের দুইটি রূপ বা 'দ্বন্দ্ব-মূলক মুহূর্ত'। উক্ত স্বধর্মে আশ্রিত যে মানুষের মন, সে সানন্দে রাজনৈতিক ইতিহাসের উদ্বেগ ন্যস্ত করবে রাজ-নীতিবিদের, সেনাদলের ও অর্থনীতিজ্ঞের হাতে। নৈতিক ইতিহাসের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি তার, যে-ইতিহাসে উন্মোচিত হচ্ছে, সেই নাটক, যা চলেছে তার নিজেরও ভিতর আর যাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সাক্ষাৎলাভ ঘটছে সেই পিতৃপুরুষ ও ভাইদের সঙ্গে যাঁরা তারই মতো মুক্তিকে চেয়েছিলেন তারই মতো জেনেছিলেন কীভাবে কাজ করতে হয় ও দুঃখ বরণ করতে হয় সে মুক্তির জন্য।"

চিন্তা,—আর, চিন্তা অর্থেই ক্রোচীয় সংজ্ঞায়, ভাষা : দুইই দুষ্কৃতিকারিদের কবলে প'ড়ে যে অপঘাতের আরতিতে ইতালীয় চৈতন্য দখল করেছিল তা'র সমর্থন ক্রোচের প্রস্তাবিত স্বজ্ঞার কোনও বিশেষ সাধনা অবশ্যই নয়। মানুষ ক্রোচে তাঁর জীবনে সপ্রমাণ করেছেন যে স্বজ্ঞা যদিও পরবশ নয়, তবু তার প্রতিপালন সম্ভব মানুষিক চিত্তের ঋজুতা নিয়ে। শিল্পের স্বরূপ নির্ণয়ে ক্রোচের প্রাথমিক মতবাদ যেহেতু কোনও উন্নাসিকতা থেকে জন্মায়নি,—ক্রোচে গোঁড়ামিতে ভুগেছিলেন কম। মানবিকতার ধর্মে পরিণতি তিনি পেয়েছিলেন, আর তা' ছিল মহৎ এক চিত্তস্থৈর্যের ফল। কারণ অস্বীকার্য নয় যে উন্মার্গগামী হওয়ার প্ররোচনা চিক্কণ কোনও সরীসৃপের মতো ক্রোচের কান্তিবিদ্যার পরিচ্ছন্ন কুঞ্জবন থেকে বেরোতেই পারতো।

।। ভূগর্ভে টেলিভিশন কেন্দ্র ।।

দক্ষিণ জার্মাণ রেডিও ষ্টেশনের আধুনিক টেলিভিশন ষ্টুডিও এবার সবুজ ঘাসের নীচে আত্মগোপন করবে অর্থাৎ ভূগর্ভে আশ্রয় নেবে। ওপরে থাকবে কেবল প্রশাসনিক দপ্তর ও সম্পাদকীয় কর্মচারীদের অফিস বাড়ী।

বিশ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট চারিটি ষ্টুডিও সমেত একটি সমন্বয় ষ্টুডিও, একটি বিশেষ বার্তা ষ্টুডিও, দুটি ঘোষণাকারীর ষ্টুডিও, দুটি মহড়া-দানের ষ্টুডিও, একটি নৃত্য মহড়াদানের ষ্টুডিও, একটি বৃহৎ আধুনিক সাজ সরঞ্জামপূর্ণ কারিগরি কারখানা, একটি দৃশ্যপট নির্মাণের কারখানা ভূগর্ভে নির্মিত হবে। এছাড়া সেখানে থাকবে প্রযোজকের দপ্তর ও ষ্টুডিও, কাজকরার ঘর, ডাকঘর, তার অফিস, গবেষণাগার, কাটিং ঘর, ট্রিক ষ্টুডিও, কাঁচা ও তোলা ফিল্ম রাখার ঘর, ইঞ্জিন ঘর ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, টেলিভিশন গাড়ী ও চলন্ত ট্রান্সমিশনবাহী গাড়ী-রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য নানা ব্যবস্থা। এই টেলিভিশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে ভূগর্ভে বেশ একটি ছোটখাট যান্ত্রিকসহর গড়ে উঠবে।

বর্তমানে বিরাট জায়গা জুড়ে মাটি খুড়ে তিনটি ষ্টুডিওর বাইরের দেওয়াল তৈরী হয়েছে। ছাদহীন এই সব দেওয়ালের মাঝখানের পথগুলি ঠিক যেন গোলকধাঁধা। মনে হয় এর মধ্যে ঢুকলে আর বেরুনো যাবে না। প্রতিটি ট্রান্সমিশন ও রেকর্ডিং কক্ষের দুটি দেয়াল থাকবে—একটি বাইরের ও একটি ভেতরের দেয়াল—এই দুয়ের মাঝখানে থাকবে দশ ইঞ্চি বায়ুর স্তর যাতে এইগুলি সম্পূর্ণ শব্দ-নিরোধক হয়। গভীরভাবে প্রোথিত এইসব ষ্টুডিওর চারদিকে ছয় ফুট দূরত্বে ৫১ ফুট উঁচু বিভাজক দেওয়াল উঠবে যাতে ষ্টুডিওর আসল দেওয়াল নোনা লেগে নষ্ট না হয়। দেওয়ালের মাঝখানে তাজা বাতাস চলাচলের পথ থাকবে এবং তলায় নালী থাকবে যাতে কোন রকমে ওপর থেকে জল পড়লে বেরিয়ে যেতে পারে।

সাজসরঞ্জাম ছাড়া ষ্টুডিও, অফিস ইত্যাদি তৈরী করতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য খরচ পড়বে পৌনে মিলিয়ন ডলারের মত। এরপর অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম বসাবার খরচ তো আছেই। তৈরী সম্পূর্ণ হলে এটি হবে স্টুটগার্ট সহরের আর একটি দর্শনীয় বস্তু। ওপরে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মাঠে ফুল ও গাছের নয়নাভিরাম শোভা, আর তারই নীচে ২৫০ জন মানুষে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলবে যাতে উপরের মানুষ কিছুক্ষণ স্ফূর্তিতে কাটাতে পারে।
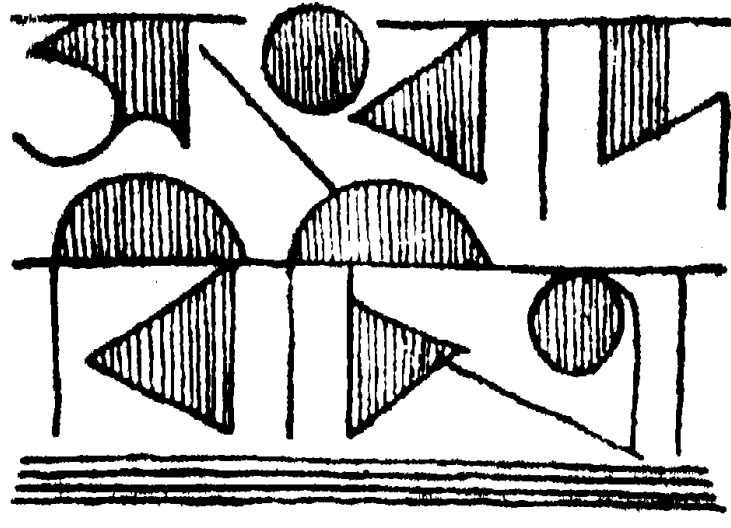
।। বিশ্বের আধুনিকতম হাসপাতাল ।।

ভারতের রাজধানী দিল্লী এবং দেশের বৃহত্তম সহর কলিকাতার বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না এবং এগুলিতেও যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-গুলি যথাযথ পালিত হয় না সে দিকে দৃষ্টি করে কিছু দিন আগে ভারতের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে আলোচনা করা হয়।

অতি আধুনিক নক্সায় বাড়ী তৈরী করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবার্লিন ইতিমধ্যেই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে এখন আধুনিক যুগের মানুষের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী বাড়ী তৈরী হচ্ছে। এই পশ্চিম বার্লিনেই এখন তৈরী হবে, সমগ্র ইউরোপের মধ্যে আধুনিকতম হাসপাতাল। যে স্থপতিদল এই হাস-পাতালের নক্সা তৈরী করার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন আমেরিকান এবং একজন জার্মাণ।

এই নতুন চিকিৎসাগারের বিভিন্ন বিভাগকে এর চিকিৎসা পদ্ধতি ও সরঞ্জামকে, আমেরিকার হাসপাতাল নির্মাণ সম্পর্কিত আধুনিকতম অভিজ্ঞতা এবং জার্মাণীর চিকিৎসা ও কারিগরী সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের চরমতম সংযোজন বলা যায়। জার্মাণ বিজ্ঞান পরিষদ এবং পশ্চিম বার্লিনের ফ্রী-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিকিৎসা পরিষদ এই হাস-পাতালের সাধারণ পরিকল্পনা ও নক্সা তৈরী করেন। চিকিৎসা, চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণা ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাদানের এই নতুন কেন্দ্রটির জন্য আনুমানিক চার কোটি ডলার ব্যয় হবে।

বর্তমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী এতে ১৪০০ জন রোগীর শয্যা থাকবে। হাসপাতালটির আয়তন হবে পুনরুদ্ধার করা ৯৬০,০০০ বর্গ ফিটসহ প্রায় ২,০৭০,০০০ বর্গফিট। আয়তন অনুসারে হাসপাতালটিতে শয্যার সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। তবে প্রধান কথা হল এখানে ধরতে গেলে "একই ছাদের নীচে" থাকবে বহু বিশেষ বিভাগ, একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণীর গবেষণা কেন্দ্র।

এই বিপুল হাসপাতালগুলিতে থাকবে অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম যার ফলে বিশ্বের সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানী গবেষকগণ পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে থাকতে পারবেন। প্রায় ৮০০ জন নার্স, অন্যান্য কর্মী ও সহকারী সহ এই হাসপাতালের কর্মী সংখ্যা হবে ২৫০০ জন। অস্ত্র চিকিৎসার ২২টি কক্ষ এবং ১৯টি গবেষণাগার ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করে সেগুলি অত্যা-ধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে সুসজ্জিত করা হবে। এতে থাকবে তিনটি কোব্যাল্ট বা কেসিসিয়াম রেডিয়ে-শন যন্ত্রপাতি এবং একটি ইলেকট্রোন বিটাট্রন। চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী ছাত্র গণের জন্য তৈরী হবে ১১টি লেকচার হল ও আলোচনা কক্ষ এবং এগুলিতে কম পক্ষে ১৬০০ জন ছাত্রের বসবার জায়গা থাকবে। ১ লক্ষ পুস্তক নিয়ে তৈরী করা হবে এর নিজস্ব গ্রন্থাগার। হাসপাতালটির সাধারণ বিভাগে থাকবে একটি ডিস্পেন্সারী, ঔষধ প্রস্তুত কক্ষ, অত্যন্ত ঠান্ডা একটি গবেষণাগার, ষ্টোর, প্রশাসন কক্ষসমূহ, পরিশোধন কক্ষ, সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রাখার কক্ষ, বিভিন্ন ধরণের ওয়ার্কশপ বিছানা ও ডিস ধোয়ার কক্ষ, খাওয়ার ঘর, ক্যান্টিন এবং হাস-পাতাল কর্মীগণের বিশ্রাম কক্ষ, এবং এগুলি সবই থাকবে একটি বাড়ীতে। ফলে এটিকে মনে হবে একটি ছোট সহর।

এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হবে যে সমগ্র ইউরোপের কোথাও তেমনটি থাকবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, সমস্ত লেকচার হল থেকেই ছাত্রগণ ক্লোজ সার্কিট রঙ্গীন টেলিভিশনের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার দেখতে পাবেন; একটি ঘরে তিনটির বেশি রোগী-শয্যা থাকবে না এবং সেখানেও নার্স বা অন্যান্য কর্মীদের যাতে কোন রকম কায়িক পরিশ্রম না করতে হয় সেজন্য যথাসম্ভব যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে।

দৃশ্যের আড়ালে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য
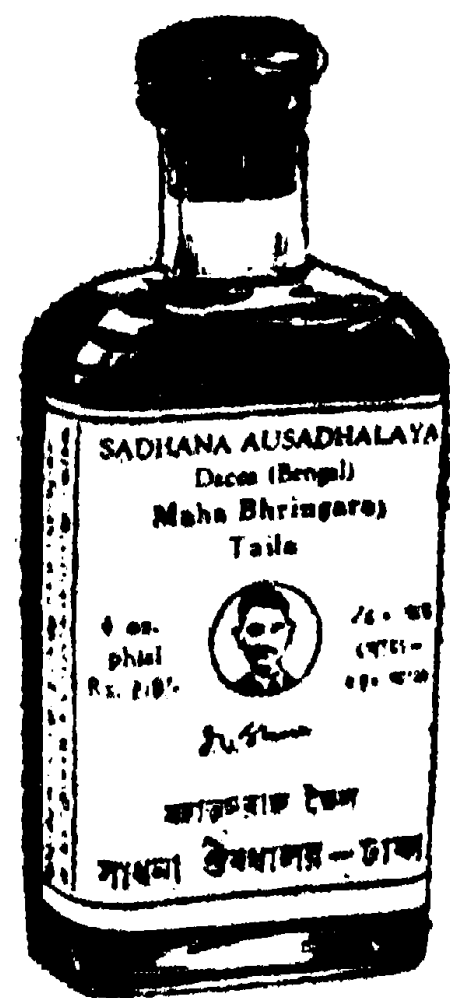
বিয়োগান্ত নাটক। সমাপ্তি বিচ্ছেদে। সিঁথির সিঁদুর মুছে একজন অন্যজনকে ছেড়ে চলে যাবে। মিথ্যে হয়ে যাবে সংসার, জীবন, স্বপ্ন, সাধ—সব সব! এ জীবনে কিছুই থাকে না, থাকবে না। অথচ চোখের পাতা বুঁজিয়ে এখনো স্পষ্ট দেখা যায় সাজানো-গুছানো ঘর, আসবাব; অনুভবে প্রত্যক্ষ করা যায় অন্তত করতে কষ্ট হয় না আদৌ দুটি মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ, হাসি, গান, কথা বলা। তবু মিথ্যে হয়ে যাবে, অনর্থক মনে হবে এত আয়োজনের এই সমারোহ। শুধু একটা চিঠি, কয়েকটি কালির আঁচর একজনের হাতের মুঠোয় পৌঁছুবার অপেক্ষা। তারপরেই প্রয়োজনের পৃথিবী থেকে নির্দয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে অন্যজন। টিকে থাকার যুক্তি-তর্ক সেখানে অচল। এ ওর কাছে হয়ে যাবে চিরকালের মত পর। ভালোবাসার মানেটা যাবে পাল্টে। অভ্যাস এবং সংস্কার ছাড়া দ্বিতীয় কোন সংজ্ঞা দেয়া যাবে না প্রেমের। সে বড় করুণ দৃশ্য। ভাবতে গেলে বুকে ব্যথা বাজে। শিথিল হয়ে আসে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মাথাধরার মতই মন কেমন করে।

•

মনে-মনে তাই প্রস্তুত হচ্ছিল শেখর। দৃশ্যটা উপভোগের জন্য যথার্থভাবেই তৈরী করছিল নিজেকে, যেমন নির্দিষ্ট গৎ বাজাবার আগে শিল্পী বেহালার কান মুচড়ে টান-টান করে নেয় প্রতিটি তার। যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে ছড়ের সামান্যতম আঘাতেই যার ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা। অথচ যা নইলে বেহালার বুকে-ও ব্যথার মূর্চ্ছনা জাগে না। তেমন করে সুরের ব্যথা বাজে না। সব জেনেশুনেই শেখর তাই নিঃশব্দে ফুটতে থাকে। সেই সম্ভাবিত নিষ্ঠুর মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে থাকে। আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপি-চুপি সময়ের বয়স গুণে চলে। কখন যে অন্ধকার হবে সব। এই ঘর, ঘরের প্রতিটি মুখ নিবে যাবে পলকে। শুধু চোখের সামনে জেগে থাকবে একটি আলোকিত দৃশ্য! সমস্ত ঘর এখন তারই করুণতম প্রতীক্ষা। সুতরাং যতখানি নিঃসঙ্গ, একা এবং অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে, শেখর ঠিক ততখানি নয়। কথাটা একবার অস্পষ্টভাবে অনুভব করল। করে সান্ত্বনার মত আরো অস্পষ্ট এক বোধের নাগাল পেল যেন। পেয়ে অপেক্ষকৃত শান্ত হতে চেষ্টা করল, কারণ চোখ চেয়ে না দেখেও কান পেতে অন্যমনস্কের মত শুনতে পেল আসে-পাশে বাসা-ভাঙ্গা মৌমাছির ওড়া-উড়ির শব্দ পাখনার কলগুঞ্জন! সবাই বলা-বলি করছে কথাটা। একই ব্যথার ভারে আনত প্রতিটি মন। মানুষ তো! সভ্যতার মার্জনা যত কঠোর করেই তুলুক না, শিক্ষার দামী পোশাকে থাক না সারা গা ঢাকা! দেহের আড়ালে বসে মন তবু সময় না বুঝে কাঁদে। দুঃখ, তা যারই হোক, পরিমাণে কিংবা আকারে যত তুচ্ছই হোক না কেন, দুঃখ তো! আর এইটুকু আছে বলেই হয়তো পৃথিবী টিকে আছে এখনো। চারপাশে বোমা-বারুদের শব্দ আর গন্ধের ভেতরে ভয়াবহভাবেও মানুষ মানুষ হয়ে বেঁচে আছে। এইসব বিচিত্র ভাবনা শেখরের মনে আশ্চর্য সব শক্তি যোগায়। এবং তাই একই সঙ্গে অজস্র প্রাণ এবং হৃদয় ছুঁয়ে নির্বিকারচিত্তে বসে থাকতে একটুও দ্বিধা কিংবা কষ্ট অথবা অসঙ্গতি বোধ করে না।

শেষবারের মত ওয়ার্ণিং বেল্ বেজে উঠল। পর্দার আড়ালে কনসার্ট থেমে গেলে যে-যার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। গুঞ্জন মন্থর হয়ে এলে একটি-দুটি করে আলো নিবতে থাকে ঘরের। দেখতে-দেখতে আবছা, অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। মুখগুলি ছায়ার প্রলেপ মাত্র মনে হয়। চোখের সামনে পর্দাটা তবু অবিচল। শেখর টের পায়, তার মতই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সবাই। এইবার চিঠির বাক্সটা খোলা হবে! আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়ে ফেলবে একজন! তারপর? তারপর সেই অতি সম্ভাব্য নির্দয়তম মুহূর্ত! নিষ্ঠুর বিচ্ছেদে নাটকের অশ্রু-সিক্ত অসহ্য সমাপ্তি! ভাবা যায় না, ভাবতে পারে না শেখর, কেন এমন হয়!

ভাবনার সামনে পর্দাটা দুলতে শুরু করেছিল সবে। যবনিকার ওপারে

নিষ্প্রভ আলোর রেখাটা কাঁপছিল। শোবার ঘর এবং ঘরের আসবাবের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল ক্রমশ। ঠিক তখন অশরীরি ছায়ামূর্তির মত চোখের সামনে দাঁড়াল ওরা দুটিতে। দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়াল। দেখে চমকে উঠল শেখর। কারণ এই অবস্থা, অন্ধকার ঘরেও চিনতে কষ্ট হল না আদৌ। দিনেশ আর রাত্রি। অন্ধকার কেঁপে উঠল যেন। ভয় পেয়েছে? এ ওর মুখ দেখল। কী বলতে চেয়ে থেমে গেল!

সামনের সারিতে পাশাপাশি বসে পড়ল ওরা। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। রাত্রির কানের কাছে মুখ এনে কী বলল দিনেশ। তার কথাই কী? দেখতে পেয়েছে? চিনতে? অথচ কী আশ্চর্য, আগে-পিছে এত কাছাকাছি বসে থেকেও টের পায়নি শেখর। আলো জ্বলে উঠলে দেখতে পায়নি। অন্ধ তো না। দিনেশের মত এখনো নাকের ডগায় চশমা তোলার কথাও ভাবেনি! তবে? রাত্রি কি আগের মত চেঁচিয়ে হাসতে ভুলে গেছে? হাসতে কিংবা কথা বলতে? নাকি ইচ্ছে করেই জীবন থেকে বাতিল করে দিয়েছে ওসব? বাহুল্য ভেবে বর্জন করেছে? অবশ্য হাসবার সুযোগ এখানে কোথায়? নাটকটাই যে করুণ রসের। কিছুক্ষণ পরেই বিচ্ছেদ এসে যার সমাপ্তি ঘোষণা করবে সেখানে হাসতে গেলে লোকে পাগল ছাড়া আর কীই বা ভাববে রাত্রিকে? কিন্তু কথা বলা? না, সে বোধটুকু আছে। নিজেরা অনর্গল কথা বলে অপরের উপভোগে বাধা দেবার মত দীনতা অথবা বোকামি দিনেশের পাশে বসিয়ে অন্তত এই মুহূর্তে রাত্রির কাছে প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। ...

ওদিকে নাটক শুরু হয়ে গেছে। মঞ্চের ওপরে স্পষ্টতর আলোয় কথা বলছে দুটি মুখ। যেন মেঘ-রোদ্রের লীলা চলেছে ভেতরে-বাইরে সর্বত্র। এবং তা সঞ্চারিত হচ্ছে মঞ্চের অদূরে উৎকণ্ঠিত দর্শকের চেতনায়। বোবা হয়ে বসে আছে সবাই। একটুখানি খাশীর হাওয়া বয়ে গেল। অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখাল ওদের। কিন্তু সাধ্য কার অনন্তকাল এ আনন্দ ধরে রাখে? কোথা থেকে মেঘ এসে আলোর টুঁটি চেপে ধরে। অন্ধকার, বিষন্ন হয়ে আসে চারদিক। মৃত বিবর্ণ মনে হয় দৃশ্যের সমস্ত সম্ভার। চাবি হাতে একজন উঠে দাঁড়ায়। নিরুপায় দুটি চোখ মেলে চেয়ে থাকে অনাজন। বাধা দেবার সাহস কিংবা শক্তিও যেন নেই আর।......

দেখতে দেখতে গলা শুকিয়ে আসে। তেষ্টা পেয়েছে কিনা বোঝা ভার। অথচ এই মুহূর্তে হাতের কাছে এক গ্লাশ জল পেলে মন্দ হত না, শেখর তা টের পায়। নির্দ্বিধায় সবটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত, সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হত নিজেকে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই।

নিজের অজান্তে হাত তুলতে যাচ্ছিল। রাত্রির কাঁধে হাত রেখে প্রায় বলতে যাচ্ছিল কথাটা। যে-কথাটা প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ মনে মনে মহড়া দিয়ে বলেছে সেই কথাটাই যথা সময়ে বলতে না পেরে কষ্টের সীমা থাকে না। দ্বিধা সংকোচের হাত ধরে বাড়তি কিছু অভিমান এসে আদুরে মেয়ের মত গলা জড়িয়ে ধরে শেখরের। কী এক জাতের বিস্ময় এবং অপরিচিত অভিভূতি তাকে নিজের আসনে বসিয়ে রাখে, উপরন্তু হাতখানা কোলের ওপর গুটিয়ে নিতে যথাসাধ্য সাহায্য করে। শরীরের এমন সময়োপযোগী আচরণে প্রথমে মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ হতে-হতে অবশেষে বিরক্ত না হয়ে পারে না।

কী ভাবছে রাত্রি? এই আলোকিত শা তাকে অন্য কোন ছবি দেখাচ্ছে না তো? জিগগেস করতে ইচ্ছে করে, যে-সুখের আশায় একদিন ঘর ছেড়েছিলে, এতদিনে তাকে পেলে? সুখের মুখ আমি দেখিনি। আমার মনে তবু দুঃখ নেই! রাত্রি, তোমার?

ঘড়ি-বাঁধা বাঁ হাতখানা আলতোভাবে রাত্রির কাঁধে তুলে দিলে দিনেশ। কেঁপে উঠল শেখর। বুক আর বাহুর পেশী-গুলিই অতি সংগোপনে কঠিন হয়ে ওঠে। শেখর টের পায় না, অযাচিত বেদনা এবং অপমানের জ্বালাটাই এই মুহূর্তে ঠিক কতখানি কাবু করে তোলে তাকে। প্রতিহিংসার সহজাত ইচ্ছেটাই বুঝি দীর্ঘকাল পরে চোখ মেলে তাকায়। বুকের ভেতরে কিসের অস্পষ্ট কলরব। তবু নিজেকে পঙ্গু বানিয়ে বসিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। চুপ-চাপ বসে-বসে তাই ভাবে, সভ্যতা নামক এই সুন্দর খেলনাটা যদি হাতের মুঠোয় না পেতাম! আফসোসের অন্ত থাকে না শেখরের। দিনেশের ঘড়ি-বাঁধা কব্জিটাই মুচড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। রাত্রির কোলের ওপরেই যদি ছুঁড়ে ফেলি? অমানুষিক উল্লাস বুকের ভেতরে নাচানাচি শুরু করে শেখরের। মঞ্চের দিকে চোখ আর নেই। এবার নিজের দিকে॥

* * *

—'রাত্রি, রাত্রি! ঐ দ্যাখো, খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকে এক রাশ রাস্তার ধুলো-ময়লা ছড়িয়ে দিলে ঘরময়।'

আমি প্রাণ-পণ চেঁচাচ্ছিলুম। তোমাকেই ডাকছিলুম। উপায় থাকলে নিজে উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে আসতুম। কিন্তু তুমি জানো, আমি কত অসহায়? কতদিন একইভাবে বিছানায় পড়ে আছি? এই পড়ে থাকা আমার কাছে কী যে লজ্জাকর!

তুমি বিশ্বাস করোনি। কারণ বিশ্বাস করার মত শক্তি কিংবা সাহস তখন হারিয়ে ফেলেছো। কারণ, পরে জেনেছি একদিনের জন্যেও আমাকে ভালোবাসতে পারোনি। এক দণ্ড আমার কাঁধে একটু হাত বুলিয়ে দেবার কথাও ভাবোনি।

ছোড়দি না থাকলে আমি মরে যেতুম। না খেয়ে, বিনি চিকিৎসায়। এ জীবনে এমন সুন্দর নাটকটাই হয়তো দেখা হত না।

ছোড়দি তোমার দুচক্ষের শূল। আমার মা-ও। যার এক পা তখন ঘরের বাইরে।

অনেক রাত্রে শ্যামের ঘরে আড্ডা দিয়ে ফিরলে। মুখ তোমার থম-থমে।

যেন অপরাধ আমাদের। দোষের মধ্যে দিদি তোমার সঙ্গে কথা বলেনি। কারণ বলে-বলে সে তখন হয়রাণ। কৈফিয়ত চেয়েছিল মা। তাইত সে রাত্রে ভাত কেমন ছ্ঁয়ে দেখলে না। উপরন্তু কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করলে আমাদের তিনজনকেই। ইতিপূর্বে যে-ভাষার জল-অচল ছিল আমাদের ঘরে।

শুধু নিজেকেই ছোট করে দিলে তাই নয়। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথা-ও নিচু হয়ে গেল মা-দিদির সামনে। তোমাকে নিয়ে বড়াই ছিল আমার। তা আর টিকতে দিলে কোথায়।

তুমি জানো, আমাদের বিয়েতে মা-দিদির আপত্তি ছিল ঘোর। শুনে দমে যাওনি। বরং একাই সব সামলে নেবে কথা দিয়েছিলে।

পরদিন ছোড়দির চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা শোনালে। মাকে একটা খারাপ স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলে না। তবুও সাধ মিটল না। অঞ্জলিদির অমন সুন্দর সংসারে আগুন লাগাতে গেলে। ছোড়দির সঙ্গে দেবী-দার অমন মেলা-মেশার কী জঘন্য মানেই না তৈরী করলে।

ছোড়দি তবু চুপ। মা-ও। তোমার ওপর আর কোন হুকুম নেই। কোন দাবি নেই কারো। আমিই কি কোনদিন এই নিয়ে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেছি তোমার?

করিনি। কেউই না। না মা, না দিদি, না আমি। কারন, আশা তখনো মরেনি। একদিন মা হবে তুমি-ও! তখন এই সংসারে-ও ঋতুবদল হবে।

• • •

অমরবাবুর স্ত্রী পার্বতী। আমারই সুবাদে তোমার সঙ্গে আলাপ। কিন্তু ভাব জমাতে তোমার জুড়ি নেই। পরকে আপন করার চাবিকাঠি যে তোমারই নিঃশব্দ করুণ মুখশ্রী। সবাই জানে, আমার অত্যাচার তোমার কাছে অসহ্য।

পার্বতী বলেছিলেন, 'কাউকে কেয়ার করার দরকার নেই তোর। বলবি, দিন-কাল পালটে গেছে। এখন আর কুনো-ব্যাং হয়ে বসে থাকার দিন নেই মেয়েদের।'

পার্বতীর তখন রেডিও থেকে গানের অডিশনে ষষ্ঠবার ফেলের খবর এসেছে। কিন্তু তুমি কে? নামু সইটা সবে শিখেছো। তা-ও বাংলায়। আমারই দৌলতে। দিন-কাল যারা পাল্টায়, মানুষ হিসেবে সত্যি তাদের জাত আলাদা। দুনিয়ার হাল-চাল তো কম দেখা হল না। এতদিনে এই সহজ সত্যটুকু মেনে নেবার ধৈর্য নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছো।

কাল যারা পাল্টায় তাদের দলে তুমি নেই। পার্বতী-ও না।

পাল্টানো কালের স্রোতে একদল গা ভাসিয়ে ডোবে। অন্যদল ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যায়। তাদের আছে শক্তি। আছে সাহস। ধৈর্য। তুমি কি আজো, অন্তত এই শেষের দলে নিজের নাম লেখাতে পেরেছো? আমি বিশ্বাস করিনে। একটি মেয়ের মেধা কিংবা স্বভাবের খবর নিতে ক'বছর

চাই রাত্রি? চার বছর কি কোন অভিজ্ঞতার বয়স হতে পারে না?

অমরবাবুর স্ত্রীই তোমাকে খেলে। কথাটা বিশ্বাস করার দিন আজ এসেছে।

আমার নামে যে সব কথা রটিয়েছিলে একটা মানুষকে পাগল করে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। বন্ধুদের কাছে একটা জল-জ্যান্ত পরিহাস হয়ে দাঁড়ালুম।

পরে বুঝলুম, দশরথকে কেন ছেড়েছিলে। তার কী দোষ!

কথাটা গোপন রেখেছিলে। তোমার বাবা-মা পর্যন্ত চেপে যেতে দ্বিধাবোধ করেননি। আমার তাতে ক্ষোভ নেই। নেই কোন অভিযোগ। কিন্তু পার্বতী কিংবা অমর মাথা যাদের বুদ্ধির উকুনে ঠাসা, কেমন করে মনে-মনে ছকে নিলে সব ভেবে অবাক হই। সত্যিই কি আমার দুর্ব্যবহার তোমাকে অজিতের ঘরে পাঠিয়েছে, রাত্রি?

মানতুম, যদি পুরো চারটি বছর-ও ঘর করতে এক সঙ্গে।

ওখান থেকে কোথায় গেলে তারপর?

কী যে খাওয়ালে! পাগল হয়ে ছ' মাসের বেশী টিকল না অজিত!

এ সব খবর নিশ্চয়ই জানো! অমর কিংবা পার্বতীকে শোনাওনি। সেই দিন থেকেই ও'দের সঙ্গে আমার কথা বলা-বলি বন্ধ। ভালো লাগে না। বন্ধুতায় আমি বিশ্বাস হারিয়েছি, রাত্রি।

* * *

আমার মা আর বেঁচে নেই।

অনেকদূরে চলে গেছে ছোড়দি। কতকাল যে আমরা আমাদের দেখিনে। তুমিই আমাদের দূর করে দিলে। পর!

বিয়ে করিনি। করবো না। ঘেন্না ধরে গেছে। ভিখিরি দেখলে এখন মুখ ফিরিয়ে নিই। কারো কান্না দেখেই আর কষ্ট পাইনে। একটুও বিচলিত বোধ করিনে, রাত্রি। ইচ্ছে করেই দয়া-মায়া ভুলেছি। ভালোবাসাকে ভাবতে শিখেছি, সভ্য মানুষের মার্জিত-ন্যাকামি। বলতে পারো, এতদিনে সাবালক হয়েছি। চল্লিশ বছর বয়সে।

আমি পয়সা নিয়ে হাটে-হাটে ঘুরেছি। সুখের খোঁজ তবু পাইনি।

তুমি তো রূপের ক্ষতি যৌবন দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছো। এই পুঁজি নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছো ঘর থেকে ঘরে। সুখ কি আঁচলে বাঁধা পড়ল?

* * *

[মঞ্চের আড়ালে থালা-বাসন ভাঙার শব্দ। যেন একই সঙ্গে মাটিতে আছড়ে ফেললে কেউ। ঝম-ঝমিয়ে উঠল চার-দিক। অসংখ্য বাদ্য-যন্ত্রের মিলিত ঝংকার বুঝি চরম মুহূর্তকেই ঘোষণা করে।

চমকে উঠে চোখ তোলে শেখর। মঞ্চের উজ্জ্বল আলোয় বসে একজন এখনো চিঠি পড়ছে। নতুন কোন অর্থ আবিষ্কার করছে মনে হয়। অমাজন বেরিয়ে আসবে এখুনি। তারপর? ভাবতে-ভাবতে একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলে। শ্বাস রুদ্ধ করে দেখছে সবাই। কাছে-পিঠে শব্দ করে কিছুই বাজে না। কেবল কোন দূরে বেহালার

প্রায় নিঃশব্দ, করুণ গোঙানি! পাশের ভদ্রলোক বুঝি সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর নিঃশ্বাসের উত্তাপ ঘাড়ে জ্বালতো আঙ্গুলে ছোঁয়ালো শেখরের। অস্বস্তি লাগে। বিরক্তি বোধ না করে পারে না।

কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা বেশ দামী। এখনো রাত্রির কাঁধে হাত তুলেই রেখেছে দিনেশ। ভয় পেয়েছে! যদি হারিয়ে যায়! কেড়ে নেয় কেউ! কাপুরুষ! দাঁতে দাঁত ঘষল শেখর।

দুটো ডায়ালের মাঝখানে দামি পাথর। সাপের চোখের মণির মত জ্বলছে। হিংস্র, নিষ্ঠুর দৃষ্টি। যেন শেখরকেই দেখছে। ওরই দিকে অপলক চেয়ে!

দেখতে-দেখতে দিনেশের চেহারাটা মিলিয়ে যেতে থাকে। একটা নির্বিষ সাপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না শেখরের। শরীর-মনের সমস্ত জ্বালা এবং হিংস্রতা শুধু মাত্র একটি চোখের রক্তাভ মণিতে জমা করে চেয়ে আছে সাপটা। ছোবল দেবার শক্তি না থাকায় ও যে কী নিরুপায়! অসহায় সমস্ত শরীরে অন্তহীন অসাড়তা! তাকে না, ও এখন পাহারা দিচ্ছে রাত্রিকেই।]

* * *

এই মুহূর্তে শ্যাম কাছে থাকলে কী হত? অজিত?

দেখতে পেতো। ঠিক আমার মতই। একটা মন-গড়া নাটকের পাশে আরেকটা!

তোমার সবটুকুই অভিনয়। আমি ছাড়া সে কথা জীবন দিয়ে আরেকজন জেনেছে, অজিত।

মাঝে-মাঝে মিথ্যে সত্যির চেয়ে মধুর, নির্মম এবং নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তুমিই তার জ্বলন্ত উদাহরণ, রাত্রি। শ্যাম কিংবা রাণু কাছে থাকলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতুম। তারা তোমাকে ভালোবেসেছিল। আমাকে দিয়েছিল ঘৃণা। অবশ্য তুমিই তার উপকরণ জুগিয়েছিলে। রাণু তোমার কানে দিয়েছিল ঘরছাড়ার মন্ত্র। ঐ বয়সে পাঁচটি সন্তানের মা হয়ে যা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই, তোমাকে দিয়েই মিটিয়ে নিয়েছিল অপূর্ণ বাসনা। পরে ওর জন্মের ইতিহাস জেনে বুঝেছিলুম, রাণুরা এই হয়!

* * *

[সিঁথির সিঁদুর মুছে বেরিয়ে এল একজন। খাটের ওপরে বসেছিল অন্যজন। কী ভেবে চিঠিটা দলা পাকিয়ে মঞ্চের এক কোনে ছুঁড়ে ফেললো নির্দ্বিধায়। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আবার উঠে বসে। সামনে তাকায়। হাসে। বুঝি একটা আপোসের আশায় হাতখানা মুঠোর ভেতরে টেনে নিতে চায়। অন্যজন দুই চোখে অপরিসীম ঘৃণা, অপমান, বেদনা এবং লজ্জা ফুটিয়ে দু'পা পেছনে সরে যায়।

একজন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রার্থনার ভঙ্গীতে সম্মুখে প্রসারিত দুই হাত। কণ্ঠে অকপট করুণ আহ্বান। আপন-করা কাছে-টানা ডাক। অতর্কিতে এক রাশ বিস্ময় এবং বেদনার মেঘ এসে তাকে কালো করে দেয়। অনুনয়ের সুরে সে তখনো ডাকে। সমস্ত অপরাধ মাথা পেতে নিতে চায়।

কিন্তু না। অন্যজন তখন মরিয়া। খোলা দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে চিরকালের মতই বাইরে চলে যায়। পেছনে পড়ে রইল স্বামী এবং সন্তানে গড়া এত যত্নের সংসার। মিথ্যে, মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল সব।]

* * *

আমার কাছে এ নাটক তবু অর্থহীন। রাত্রি, তোমার কাছে? এই কি ছিলুম আমরা? জীবনটাকে ফুলের বাগান করবো বলেছিলুম! শীত এসে তাকে বিবর্ণ করে দিলে। বসন্তের শুরুতে উঠল ঝড়! হায়রে দুরাশা!

* * *

[পর্দা পড়ে গেলে আলোয় ভেসে গেল চারদিক। একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই। খোলা দরজা দিয়ে জলস্রোতের মতই বেরিয়ে যেতে থাকে। শেখর তবু নড়ে না। বসেই থাকে। কিন্তু কোথায় সেই সাপ! দিনেশ রাত্রি! কেমন করে পালিয়ে গেল! আলো জ্বেলেও দেখা গেল না যে কাউকে! তবে কি অন্ধকারের মতই ওদের অস্তিত্ব! নাকি আসেনি কেউ!]

স্বামী এবং সন্তানে গড়া এত যত্নের সংসার। মিথ্যে মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল সব!

চিরন্তন চ্যাপলিন

প্রভাতকুমার দত্ত

চার্লস চ্যাপলিন যিনি চার্লি চ্যাপলিন নামে পরিচিত তাঁর সম্পর্কে এপর্যন্ত পৃথিবীতে যত আলোচনা হয়েছে তা বোধ হয় আর কোন চিত্র-পরিচালক সম্পর্কে হয়নি। হবারই কথা কারণ ফিল্ম জগতে চার্লির মত প্রতিভাও তো আর এপর্যন্ত দেখা যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য হোল চার্লিকে যে যেভাবে পারেন বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে নিয়ে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য পরিচালক ও অভিনেতা চার্লিকে সবাই ভালোবেসেছেন। কিন্তু ফিল্ম তত্ত্ববাগীশদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানে কোন বিতর্কমূলক মতবাদের অবতারণা করতে চাই না। এখানে শুধু মানুষ ও শিল্পী চার্লির কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হবে। অনেক সময় আমরা বাহ্যিক জীবনের ঘটনা স্রোতের মাঝে আসল মানুষটিকে বুঝতে পারি না। চার্লির ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাই হয়েছে। চার্লির জীবনের নানা ঘটনা অতি পরিচিত। কিন্তু তাঁর শিল্পমানসের যথার্থ তাৎপর্য বোধ হয় অতটা পরিচিত নয়।

Charlie the Kid—নিজ নাম আর তাঁর তোলা একটি বিখ্যাত ছবির নামের পাশাপাশি সংস্থাপনের মধ্যেই চার্লির প্রকৃত পরিচয় নিহিত। যেমন আমরা অনেক সময় বলি না William the Conqueror অথবা Tsar Ivan the Terrible এও ঠিক তাই Charlie the kid। চার্লি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে সব সময়ই মনে হয় তিনি কি করে জগতকে এমন বিচিত্রভাবে দেখেন এবং এমন বিচিত্র চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সেই দেখাকে প্রকাশ করেন। কোন একটা বিষয় মূর্ত রূপ নেবার আগে চার্লির মানস-জগতে যে প্রক্রিয়া চলে সেটা জানতে সকলেরই ইচ্ছা করে। সাদা চোখের দৃষ্টির কথা বলছি না, চার্লির যে মানসিক চোখ তা কি দেখে এবং কিভাবে দেখে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রহস্য। চ্যাপলিনের জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হোল এই যে পাকা চুল সত্ত্বেও তিনি কখনও জীবন সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টিকে হারাননি এবং জাগতিক ঘটনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গ্রহণ করেছেন। একজন বয়স্কের মধ্যে এই ধরণের গুণের প্রকাশকে সাধারণতঃ Infantilism বলা হয়ে থাকে। চ্যাপলিনের যা কিছু কমিক সৃষ্টি তা এই শিশুসুলভ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই নির্মিত। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে চার্লি ছবি তোলার এই একটি পদ্ধতিই ব্যবহার করেননি বা Infantilism-এর তিনিই প্রথম প্রবক্তা নন।

এখন প্রশ্ন হোল ফিল্মে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে চ্যাপলিন কেন এই পদ্ধতিকেই গ্রহণ করলেন। Infantilism বলতে সাধারণত বোঝায় বাস্তবতা থেকে পলায়ন। এটা অনেকটা সত্য কথা বৈকি। আজকালকার দিনে ভৌগোলিক অর্থে পলায়ন এক প্রকার অসম্ভব। নিউ-ইয়র্ক বা প্যারিস থেকে পালিয়ে পৃথিবীর কোন দূরতম স্থানে আশ্রয় নিলেই যে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ বাঁচানো যাবে তা মোটেই নয়। আজকাল পৃথিবীর দূরত্ব অনেক কমে গেছে। সভ্যতার যা কিছু নতুন কলকব্জা তা আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং বর্তমানে র‍্যাঁবোর (Rimbaud) প্যারিস থেকে আবিসিনিয়া এবং গঁগ্যার তাহিতি দ্বীপে পলায়নের আর কোন গুরুত্ব নেই। এখন যে ধরনের পলায়ন সম্ভব তাকে আমরা evolutionary আখ্যা দিতে পারি। এর অর্থ হোল ক্রমাবনতির পথে চলা, পিছিয়ে যাওয়া, শিশুমনের স্বর্ণোজ্জ্বল চিন্তা ও কল্পনার জগতে ফিরে যাওয়া, শিশুসুলভ মনোবৃত্তি-গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া। নিয়মে বাঁধা সমাজে যেখানে জীবন শুধুমাত্র ছকে ফেলা সেখানে এই শাসন-অনুশাসনের বাঁধন থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সবচেয়ে বেশী করে অনুভূত হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি জিনিসটা সভ্য মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েই পশু থেকে মানুষকে আমরা পৃথক করে বিচার করে থাকি। এতদিন মানুষের যা কিছু জাগতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে তা শুধু এই বুদ্ধিবৃত্তির জোরেই। কিন্তু এখন যন্ত্র—বিংশ শতাব্দীতে যার সর্বত্র জয়জয়কার—তা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মানুষের মস্তিষ্ক একটা কারখানা বিশেষ। বর্তমানে শিল্প-কারখানায় অধিকতর যন্ত্রের প্রবর্তন করা হচ্ছে মানুষের কায়িক পরিশ্রম কমিয়ে অল্প সময়ে বেশী জিনিস উৎপাদনের জন্য। ঠিক তেমনি মানুষ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তার চিন্তার বোঝাকে লাঘব করতে চাইছে। আধুনিক মানুষ 'electronic brain' 'robot man' ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। এ সমস্ত জিনিস আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হোল চিন্তার ভারটা ক্রমশ যন্ত্রের ওপর অর্পণ করা। বস্তুপুঞ্জের জালে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে দীর্ঘ চিন্তার বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশের সময় তার হাতে থাকছে না। একেই আমরা Intellectual Machi-nism বা বুদ্ধিবৃত্তির যান্ত্রিকতা বলে গণ্য করতে পারি। চার্লি চ্যাপলিন

এই ধরণের যান্ত্রিকতাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। তাঁর Infantilism-এর উদ্দেশ্য হোল বুদ্ধিবৃত্তির এই যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি।

চ্যাপলিনের Infantilism-এর আরেকটি দিক রয়েছে। সে জিনিসটার আলোচনা প্রয়োজন। কোন মানুষকে যদি বলা হয় যে সে বদমেজাজী, খামখেয়ালী বা অদ্ভুত স্বভাবের তাহলে এই আক্রমণ সে সহ্য করে নেবে। কিন্তু যদি বলা হয় যে তাঁর কোনরকম 'হিউমার' জ্ঞান নেই তাহলে সে গুরুতর আঘাত পাবে। 'হিউমার' জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে মানুষ কেন এমন নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করে? এর উত্তরে বলা যায় হিউমার জ্ঞান থাকা বলতে বোঝায় কতকগুলি বিশেষ অভ্যাসের উপস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম অভ্যাস হোল আবেগশীলতা অর্থাৎ স্ফূর্তিপ্রিয়তা। স্ফূর্তিপ্রিয় হওয়ার জন্য মানুষ কেন এত গর্ববোধ করে? দুটো কারণে। প্রথমত, স্ফূর্তিপ্রিয়তা বলতে বোঝায় শৈশব ও যৌবন। স্ফূর্তিপ্রিয়তা বজায় থাকলে মানুষ মনে করে তার দেহে যৌবনসুলভ আনন্দ ও শক্তি তখনও বজায় আছে। স্ফূর্তিপ্রিয়তা লোপ হওয়া মানেই হচ্ছে বার্ধক্য ও জরা। কে আর সহজে স্বীকার করতে চায় যে তার মন ও শক্তি বার্ধক্যগ্রস্ত। বৃদ্ধেরা তাই আমোদ-রসিকতার মধ্যে দিয়ে এটুকু সান্ত্বনা পেতে চায় যে তারা এখনও ক্রীড়াশীল যুবা। কিন্তু এছাড়া স্ফূর্তিপ্রিয়তার আর একটি অর্থ আছে। যখন কোন মানুষ স্ফূর্তিপ্রিয় হয় তখন তার অর্থ হোল যে সে চারিদিকের যাবতীয় নীতিবন্ধন থেকে মুক্ত। মুক্ত হওয়ার চেয়ে মানুষের আর কোন বড় ইচ্ছা নেই। মানুষের সব সময়েই ইচ্ছা করে তার নিজের একটা জগত সৃষ্টি করে নিতে। এই ইচ্ছার কণামাত্র পূর্ণ হলেই আমরা আনন্দ বোধ করি। স্ফূর্তির মধ্যে আমরা আমাদের নিজের জগতকে সৃষ্টি করি। সুতরাং একটি মানুষের সূক্ষ্ম হিউমার জ্ঞান আছে বলতে বোঝায় যে তার স্ফূর্তিবোধ বজায় রয়েছে। অর্থাৎ তার মনোজগত মুক্ত ও সৃষ্টি-ধর্মী।

হিউমারের উপরিউক্ত তাৎপর্যকে অনেক চিত্রনির্মাতা কমেডিয়ান স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্বীকারোক্তি সবচেয়ে সার্থকভাবে লক্ষ্য করা যায় চ্যাপলিনের মধ্যে। চ্যাপলিন তাঁর ছবিতে এমন শিশুসুলভ পরিস্থিতি উপস্থিত করেন যে তার প্রভাব দর্শকদের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হয়ে যায় মনের দিক থেকে চ্যাপলিন দর্শকদের ছোটবয়সের শিশুসুলভ স্বর্ণময় রাজ্যে টেনে নিয়ে যান। চ্যাপলিনের কাছে Infantilism হচ্ছে মানসিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে পলায়ন। অনেকে হয়ত বলতে পারেন এটা শুধু রোগ উপশমের জন্য একটা দাওয়াই-এর উল্লেখ মাত্র। কিন্তু এমনিভাবে কজন চিত্রপরিচালকই বা সফলকাম হতে পেরেছেন? চ্যাপলিন দেখলেন তিনি যে মুক্তি কামনা করছেন তার সফল চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব একমাত্র জীবন্ত কার্টুন মারফত। কারণ শিল্পের এই মাধ্যমে শিল্পী নিজেকে সবচেয়ে মুক্ত বোধ করেন এবং তাঁর কল্পনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রসারিত করার সুযোগ পান।

'মডার্ণ টাইমস' বইটিতে আমরা সর্বপ্রথম চ্যাপলিনের চোখের দৃষ্টির রহস্যকে উপলব্ধি করতে পারি। এর আগে তোলা তাঁর যে সমস্ত Short Comedy তাতে শুধু ভালো ও মন্দ লোকের মধ্যে বিরোধটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই সমস্ত ভালো ও মন্দ লোকেরা কখনও কখনও আবার ধনী ও দরিদ্ররূপে পরিচিত। এদেরই লক্ষ্য করে চ্যাপলিনের দৃষ্টিতে হাসি বা কান্নার ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'মডার্ণ টাইমস' বইটিতে আমরা দেখি চ্যাপলিন এই ভালো ও মন্দ লোকগুলিকে সামাজিক শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছবির ষ্টাইলকে অসম করে তুলল, বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করল, যার ফলে চ্যাপলিনের চোখের দৃষ্টির রহস্যকে বোঝা অনেকটা সহজসাধ্য হোল। চ্যাপলিনের চোখের দৃষ্টির রহস্যের আসল রূপটি কি? তা হচ্ছে মনের দিক থেকে হাস্যময় শিশুর দৃষ্টি নিয়ে ভীষণ, দুঃখময় ও করুণ জিনিসকে দেখা। এই সমস্ত জিনিসের ইমেজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং দ্রুত উপলব্ধি করা (শুধু উপলব্ধি ঘটনার নীতিগত ব্যাখ্যা নয়) চ্যাপলিনের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখতে পার এ জিনিসই তাঁকে অদ্ভুতের প্রতি আকর্ষণ করেছে যার ফলে তাঁর নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। চ্যাপলিনের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার ন্যায়নীতিগত বিচার না করে শিশুর দৃষ্টিতে দেখা। ছবির নির্মাণ-কৌশলের যত কিছু কায়দাকানুনই ধরা হোক না কেন তীক্ষ্ণ চ্যাপলিন-দৃষ্টি সর্বত্রই ধরা পড়ে। তাঁর একটি ছোট্ট 'এ নাইট এ্যাট দি শো' থেকে আরম্ভ করে আধুনিককালের ট্র্যাজেডি যা 'মডার্ণ টাইমসে' পরিস্ফুট তাতে আমরা ঐ একই দৃষ্টিরই উপস্থিতি লক্ষ্য করি।

চ্যাপলিনের সবকিছু সৃষ্টিকার্যের একজনই মাত্র সহযোগী এবং তা হচ্ছে 'রিয়ালিটি'। এই সহযোগীকে নিয়ে চ্যাপলিন তার যা কিছু সার্কাসের মজার খেলা দেখান। 'রিয়ালিটি' হচ্ছে কঠিন দৃষ্টি 'সাদা-মুখো ভাঁড়' আপাতদৃষ্টিতে সৎ, যুক্তিশীল, বিবেচক ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেই বোকা বানানো হয়—ব্যঙ্গ করা হয়। রিয়ালিটির অকপট ও শিশুসুলভ সহযোগী চ্যাপলিনই এখানে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন। তিনি খোলামনেই হাসেন এবং সে হাসি হচ্ছে বাস্তবের বিচারনিষ্পত্তি। চ্যাপলিন উদ্ভটের যে শিশুসুলভ ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির জগত সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সকলেরই প্রত্যাশার জিনিস আছে। চ্যাপলিন উদ্ভটের মধ্য দিয়ে 'ক্লাউনে'র ছদ্মবেশে এমন কথা বলতে চেয়েছেন যা ঠিক উদ্ভট পর্যায়ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, চ্যাপলিনের একমাত্র প্রধান সহযোগী হোল 'রিয়ালিটি'। ব্যঙ্গলেখক যে জিনিসটা দুটি স্তরে উপস্থিত করেন চ্যাপলিন কমেডিয়ান হিসাবে সেটা একটি মাত্র স্তরেই উপস্থিত করতে পারেন। পর্দায় যখন চ্যাপলিনের বিশেষ মুখভঙ্গী করা হাসির ছবি পরিস্ফুট হয় তখনই ব্যঙ্গের সূত্রপাত।

চ্যাপলিনের ছবির ঘটনাগুলি অনেকটা সেইরকম যা শিশুরা 'পরীর গল্পে' পড়তে ভালবাসে। শিশুদের এই ধরণের দু-একটি আজগুবি গল্পের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। একটির নাম "দশটি ছোট কালো বালক"। এটি ছড়ার আকারে লিখিত। ছড়াটির শেষের অংশের বিষয়বস্তু হচ্ছে এইরূপ : পাঁচটি কালো ছেলে একটি একটি করে সংখ্যায় কমছে। একটি গেল সর্বোচ্চ বিচারালয়ে, একটিকে গিলল সমুদ্রের হেরিং মাছ, তৃতীয়টি ভালুকের পেটে, চতুর্থটি রোদ্দুরের তাপে পুড়ে মারা গেল। বাকি যেটি রইল সেটি

বিবাহ করল। আর কেউ রইল না। কারণ শেষের কালো বালকটি বিবাহ করায় আর বালক রইল না বয়স্ক মানুষে পরিণত হোল। ছোটদের প্রিয় আর একটি গল্প : একজন লোক ঘরে দাড়ি কামাচ্ছিল। হঠাৎ দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দে চমকে ওঠায় ক্ষুরে তার নাকটি কাটা যায়। উত্তেজনার বশে ক্ষুরটি হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় তার পায়ের একটি আঙুলও কাটা পড়ে। ডাক্তার এসে ক্ষত-স্থানগুলি বেঁধে দেয়। কয়েকদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলতে দেখা গেল যে নাকটি পায়ে লাগানো হয়েছে এবং আঙুলটি মুখে। মানুষটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু কেমন যেন দেখতে লাগল। কারণ প্রত্যেকবার নাক ঝাড়ার সময় তাকে পায়ের জুতো খুলতে হোত। শিশুজগতের এই ধরনের কমিক ঘটনা চ্যাপলিনের ছবিতে বহুস্থানেই চোখে পড়ে। শিশুদের অবুঝ মনের যে জগত তার সামনে সব সময়ই অবশ্য বড়দের নিষেধ বাধার তর্জনী উঁচিয়ে থাকে। তাই অত্যন্ত অসময়েই শিশুদের আনন্দের জগতের পরিসমাপ্তি ঘটে। যে মানুষ বয়েস গেলেও মানসিকভাবে শিশু থেকে যায় সে জীবনের অনুপযুক্ত বলেই গণ্য, তাকে নানা কুৎসিত ও অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়। চ্যাপলিন যখন তাঁর ছবিতে শিশুর দৃষ্টি নিয়ে কোন বিষয়বস্তু ও তার রূপায়ণের কথা চিন্তা করেছেন তখন শিশুদের জীবন সম্পর্কে সরল দৃষ্টি ও বড়দের নিষেধ তর্জনীর সংঘাতনির্ভর যে কমিক পরিস্থিতি সেটাই রূপালী পর্দায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

চ্যাপলিনের 'দি পিলগ্রিম' ছবি থেকে একটি দৃশ্যের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। ঘটনাটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তের। পলাতক এক আসামীর কোন এক ভালো ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে শেরিফ তার প্রত্যুপকার করতে চান। তাই যেখানে গেলে আসামী মুক্তি খুঁজে পাবে সেই মেক্সিকো সীমানার দিকে চ্যাপলিনকে সংগে নিয়ে যেতে যেতে শেরিফ বোঝাতে চাইছেন যে ফেরারী হিসাবে চ্যাপলিনের এ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু চ্যাপলিন কিছুতেই বুঝতে পারেন না তাকে কি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে শেরিফ চ্যাপলিনকে সীমানার অপর পার থেকে একটি ফুল তুলে আনতে বলেন। চ্যাপলিন অনুগত-ভাবে পরিখা পেরিয়ে মুক্তির রাজ্যে পা দেন। শেরিফ খুশী মনে ফেরার পথ ধরেন। কিন্তু চ্যাপলিন তাঁর শিশুসুলভ মমতার বসে ফুল নিয়ে ফিরে এসে শেরিফকে আবার পাকড়াও করে। এর পর মুহূর্তেই শেরিফ চ্যাপলিনের প্যান্টের পেছনে লাথি মারেন। ধাক্কা খেয়ে চ্যাপলিন ক্যামেরার মুখ থেকে সীমানারেখা বরাবর সরে যাচ্ছেন, তার একটি পা যুক্তরাষ্ট্র ও অপর পা মেক্সিকোর সীমানার মধ্যে স্থাপিত। এখানেই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি। এই দৃশ্যটিতে আমরা কি শিশুর মন ও বয়স্ক মানুষের মনের সংঘাতজনিত অপূর্ব এক শিল্পরস অনুভব করি না? বয়স্ক মানুষ যে দৃষ্টিকে চিরকালের মত হারিয়েছে তার স্মৃতি কি এখানে আমরা অনুভব করি না? শিল্পী ও সৃজনীশীল প্রতিভা হিসাবে এই ধরনের দৃশ্যেই চ্যাপলিনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

'মডার্ণ টাইমস' ছবির পর চ্যাপলিন তোলেন 'দি ডিকটেটার'। এই ছবিতেই চ্যাপলিনের শিল্পগত বক্তব্যে আমরা বিরাট এক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এর আগে পর্যন্ত চ্যাপলিন প্রতিটি ছবিতে Suffering man বা উৎপীড়িত মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 'দি ডগস লাইফ' চিত্রে একজন পুলিস, 'দি গোল্ড' চিত্রে বিরাট সঙ্গী যিনি চ্যাপলিনকে মুরগীভ্রমে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং 'মডার্ণ টাইমস' ছবিতে এসেমব্লি-লাইন অর্থাৎ বিরাট যন্ত্রসমষ্টি—এগুলিই হচ্ছে উৎপীড়ন-কারী। এ পর্যন্ত চিত্র-সৃষ্টিতে চ্যাপলিন তাঁর দেখার যে বিশেষ পদ্ধতি তারই দাসত্ব করেছেন। কিন্তু 'দি ডিকটেটার' ছবিতে সর্বপ্রথম তিনি তাঁর বিশেষ পদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মন নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছেন। এই ছবিতে একজন সত্যিকারের বয়স্ক মানুষের পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ ও জোরালো কণ্ঠ আমরা শুনতে পেলাম। ছবিটি দেখে আমাদের বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে এতদিনকার পরিচিত 'চার্লি দি কিড্'-এর মৃত্যু হয়েছে এবং তার জায়গায় আমরা পাচ্ছি 'চার্লি দি গ্রোন আপ' অর্থাৎ বয়স্ক চার্লিকে। 'দি ডিকটেটার' ছবির সমাপ্তি দৃশ্যকে চ্যাপলিন বক্তৃতামঞ্চরূপে ব্যবহার করে-ছেন। 'দি ডিকটেটারে'র লেখক এখানে বিচারকর্তা অবশ্য জনগণের পক্ষ থেকে। এখানে তিনি ফ্যাসি-বিরোধী সভায় বক্তৃতারত।

বয়স্ক চার্লির পরিচয় আমরা আরো ভালো করে পাই তাঁর 'মঁসিয়ে ভেদু' ছবিতে। চার্লিকে অর্থ আত্মসাৎ ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারালয়ের মঞ্চ থেকে চার্লি অভিযোগ করছেন মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে যে রাষ্ট্রকর্ণধাররা বড় হত্যার আয়োজন করেছে তাদের বিচার কে করবে? ব্যক্তিকে যে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কি শুধু চার্লি দায়ী? ব্যক্তির বিচারই কি সমস্ত বিচারের সমাপ্তি? এগুলিই বয়স্ক চার্লির প্রশ্ন। পরবর্তী ছবি 'লাইম লাইট' অবশ্য ঠিক 'দি ডিকটেটার' বা মঁসিয়ে ভেদু'র পর্যায়ভুক্ত নয়। তবে এটিরও বিষয়বস্তু ও আবেদন সামাজিক। এই ছবিতে সামাজিক প্রশ্নটা অবশ্য প্রধানত ব্যক্তিকে নিয়ে, সমগ্র সমাজ ও দেশকে নিয়ে নয়। সমস্যাটা হচ্ছে সমাজে শিল্পীর স্থান। 'লাইম লাইট'-এ চার্লি দি কিড' বা শিশু চার্লির কমিক পরি-স্থিতির প্রয়োগ নানা স্থানে রয়েছে। কিন্তু 'চার্লি দি গ্রোন আপ' বা বয়স্ক চার্লির বক্তব্যই আলোচ্য ছবির মর্মকথা। শিল্পী হিসাবে চ্যাপলিনের বয়েস গেছে, তিনি আর তেমন লোকের মনোরঞ্জন করতে পারেন না। এ সত্ত্বেও একজন উঠতি শিল্পী-প্রতিভার হতাশাময় পরি-স্থিতি দেখে তিনি নীরব থাকতে পারেন না। তাঁকে নিজের অভিজ্ঞতার সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বড় শিল্পী হওয়ার পথ সুগম করে দেন। এই যে বয়স্ক মনের মানবিক সহানুভূতিবোধ এটাই লাইম লাইটের মূল কথা।

তবে কি 'চার্লি দি কিড' আর 'চার্লি দি গ্রোন আপ' সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ? নির্বাক যুগের ছোট কমেডি-গুলি আর পরবর্তীকালের দি ডিকটে-টার, মঁসিয়ে ভেদু, লাইম লাইটের যুগ কি সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন? তা মোটেই নয়। এখানে একটার পরিণতি হচ্ছে আর একটায়। আগেকার ছোট কমেডিগুলিতে চ্যাপলিনের প্রতিবাদ ছিল পৃথিবীর মানুষকে নির্বিচারে 'ভালো' আর 'মন্দ'রূপে ভাগ করার বিরুদ্ধে। দি ডিকটেটার, মঁসিয়ে ভেদু ছবিতে সেই চেতনাই সামাজিক ও দেশগত রূপ লাভ করেছে। যে চার্লি সেই চার্লিই আছেন। শুধু শিশুর দেখার জগতটা বয়স্কের দেখার জগতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই কমিক পরিস্থিতির ব্যবহার বজায় আছে।

---

*(প্রবন্ধটি রচনায় আইজেনস্টাইনের আলোচনা থেকে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।)

একটি মন্দিরের ইতিহাস

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই কাহিনীটি ঐতিহাসিক—এর মূলে দলিল ও দস্তাবেজগুলির সারাংশ আমি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মুখে, দিল্লীর জাতীয় 'আর্কাইভস' এর দপ্তরে, আকাশবাণীর বক্তৃতায়, ও কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকায় উপস্থাপিত করেছি—সেই জন্য তর্কবিচারে বা প্রমাণ বিশ্লেষণে না গিয়ে এই কাহিনীটিকে গল্প হিসাবে পুনরায় পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম, পুনরাবৃত্তির ত্রুটি সত্ত্বেও, শুধু একটি কারণে যে আজও কলকাতা থেকে দু মাইল দূরে গঙ্গাতীরে এই প্রতিষ্ঠানটি "ঐতিহাসিক" হয়ে যায়নি, ভগ্নমন্দির বিদ্যমান এবং আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত।]

কথা কও, কথা কও—মুনি অতীত কালভেঙে কথকতায় বসেছেন সন্ধেবেলায়—নিভু নিভু প্রদীপের ছায়ায় আবছা আলো অন্ধকারে ভেসে উঠেছে টুকরো মায়ামন্দির রেখাগুলি। কবে সেই নদী পেরিয়ে শালিখার ধারে ঘুসুড়ির বাঁকে গৈরিক কষায় বস্ত্র পরিহিত এক তেজোকান্তি সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন উত্তরের দিকে চেয়ে—চোখে স্বপ্ন ভাসচে হিমকুন্দতুষারশীর্ষ নগেশের চেহারা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ—তিব্বত, কৈলাস, মানস। জ্ঞানপিপাসু তরুণ পরিব্রাজক, ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিব্বতে গিয়ে পৌঁচেছিলেন। পরিচয় হয়েছিল প্রধান লামার সঙ্গে—তাসীলাম্পোর তাসী বা পাঞ্চেন লামা—তিনি মঞ্জুশ্রীর অবতার, চীন সম্রাটের মন্ত্রদাতা গুরু, বুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত প্রতীক, যাঁর অমিত আভা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে—বজ্রগর্ভ মহাবোধিসত্ত্ব, যিনি অক্ষোভ্য ক্ষোভ নেই যাঁর। লামা বলেছিলেন দুঃখময় এ সংসার, তানা রাক্ষসী রূপ ও নামের মধ্য দিয়ে সংস্কার ও পুদ্গলের মাধ্যমে আনছে দুঃখ, আসছে বেদনা, আসছে কামনা। চিত্ত কুশলশীল নয়, চিন্তা সদ্ভাবনাযুক্ত নয়, বাক্য সুভাষিত নয়—দুঃখময় এ সংসার—সম্যগ্ দৃষ্টি নেই, সম্যগ্ সংকল্পের অভাব, বহুকল্পদুর্লভা বোধি নেই। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা মহাগুরুর নির্দেশ। ইহাসনে শুষ্যতু শরীরং বলে ত্বক্ অস্থি, মেদ মাংসের উৎসর্গ নয়, শরণ নিতে হবে সেই বোধির, সেই জীবনবেদের, সেই সংঘশক্তির তবেই আসবে অনাসক্তি, অপ্রমাদ—এই তো শাস্তার শেষ বচন—পচ্ছিমা বাচা। তিনি শুধু লোকোত্তর নন, লোকনাথও। তাই তিব্বতে আমরা তাঁকে খুঁজেচি মানুষের বিভূতির মধ্য দিয়ে, শক্তির পথে, ভুক্তির মন্ত্রে, তন্ত্রের আশ্রয়ে, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযানের তত্ত্ব দিয়ে—বাংলাদেশের কাছেই আমাদের এই শিক্ষা—এই গুহ্যসাধনার পীঠস্থান ঐখানে। তিনি আরো বলেছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে—দেখো ফিরে যাও তুমি বাংলাদেশে—বড় ভালোবাসি আমি ঐ নদী মেখলা শস্যশ্যামলা মাটিকে—ঐখানেই আমি দুবার জন্মগ্রহণ করে কায়া পরিবর্তন করে নিয়েছি—আমার বড় ইচ্ছা গঙ্গার তীরে একটি মঠ, একটি মন্দির স্থাপিত করি—ভারতের জ্ঞান ও তিব্বতের বিজ্ঞান মিলিত হয়ে একটি নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তুলুক। জগদপকৃতিই তাঁর পূজা "তদপকৃতি স্তব লোকনাথ পীড়া" জগতের অপকার করাই তাঁকে পীড়া দেওয়া।

এ কাহিনী ইতিহাস ডিঙিয়ে বেড়া ভেঙে সুদূর যুগান্তরের গল্প নয়—এ হচ্ছে প্রায় আজ-কাল-পরশুর কথা—দুশো বছরও হয়নি। ইংরেজ সবে জব চার্নকের চৌকীতে বসে বাদশার দেওয়া দেওয়ানী নিয়ে রঙের তুরুফ খেলছে, বৈঠকখানার বটযক্ষিনীদের ডেকে বলছে—রসবন্ধং দদস্ব মে। তারা জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে সওদা, পকেট ভর্তি করে পণ্যবাহী সভ্যতার পুণ্য মুনাফা—মারি ত গন্ডার, লুটি ত ভান্ডার। তারই কলরোলে সাগরপারে উঠছে ভারতফেরতা নবাবদের প্রাসাদ, আর শিল্পবিপ্লবের আমন্ত্রণ আর এপারে তাদেরই প্রসাদপুষ্ট তাঁবেদার সাকরেদ বেনিয়ান দালাল

মুৎসুদ্দি নায়েব গোমস্তার হুঙ্কার। ততদিনে ফিকে হয়ে এসেছে বোম্বেটে হার্মাদের হল্লার খবর, আর্মেনিয়ান রূপসীদের জেল্লার কাহিনী, হাবসী ক্রীতদাসীদের হাহুতাশ, নিমকীর চৌকীর গল্প, ভোররাতে বাগানবাড়ী ফেরত নতুন বাবুদের পাল্কীর হুমহাম আর ঘোড়ার খুরের কদম কদম শব্দ। দেখতে দেখতে বজ্রবাহী বাদাবনে বেতের জঙ্গল চিরে দক্ষিণ রায়ের রাজত্ব ছোট থেকে ছোট হতে থাকে—গোবিন্দপুর সুতোনুটী ডুবু ডুবু, কালিঘাট ভেসে যায়, কলকলিতা হয়ে ওঠে কলিকাতা। সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাদের আগমন তারা ভোগবতীর ভৃঙ্গার ভরে নিতে জানে ভাগীরথীর জলে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার শিহরণ লাগে, দিল্লীশ্বরের সিংহাসনে তার কাঁপন জাগে, ভিত নড়ে ফাটল ধরে। দিল্লীর রঙ্গশালার রং মহলের শীশমহলের কক্ষে কক্ষে বাতি নেভে, চাঘতাই মুঘলবংশের ইমারত জহরৎ মাটিতে লুটোয়। মকরধ্বজ, মৃগনাভিতেও নাভিশ্বাস বন্ধ হয় না। কানে শোনানো হয় তারকব্রহ্ম নাম নয় হরহর মহাদেও, গুরুজী কি ওয়া। আবদালী দুরাণী রোহিল্লাদের চীৎকারে দূত আস্ফালন। ভোর হলো যেই শ্রাবণ শর্বরী, দেখা গেলো বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগ্বলয়ে।

আর আমরা

> বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা—
> জোয়ার এলে উজিয়ে যাব—
> ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা

এমনি দিনে (১৭৭৪ খৃঃ অব্দে) কলিকাতার সুরম্য লাটপ্রাসাদে দামামা বেজে উঠলো—প্রবলপরাক্রান্ত মহামান্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর তিব্বতের দূতদের সাদরে অভ্যর্থনা করছেন—তাঁরা আসছেন তাসী লামার পত্র নিয়ে গিরিদরী বেয়ে আমাদের কল্পনার অভেদ্য হরগৌরীর হিমমণ্ডিত আবাস থেকে। মহাকবি মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক লিখছেন—আমরা কল্পনা করতে পারি বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণা কক্ষে দণ্ড-কমণ্ডলধারী অজিন-স্কন্ধে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই প্রবন্ধ হয়েছিল লেখা।

তিব্বত থেকে এই যে 'মিশন' এলো তার কারণ যে হিমালয় থেকে দলে দলে ভোটেরা এসে কুচবিহার আক্রমণ করে। মহারাজা কোম্পানীর শরণাপন্ন হন এবং তাদের সৈন্যসামন্ত এসে হানাদারদের তাড়িয়ে দেয়। খবর গেল তেসু লামার কাছে তিব্বতে। জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত অনেক ভেবে চিন্তে পত্র দিলেন হেষ্টিংসের কাছে, এক সম্মানজনক সন্ধির প্রস্তাব করে—লামার দূত হয়ে যিনি এলেন তাঁর নাম আচার্য পুরাণগির গোঁসাই বা পূর্ণ গিরি গোস্বামী।

লামা লিখলেন—ভুটানের দেবরাজা আমার অনুগত—তাকে আমি ভৎসনা করেছি যে এরূপ অত্যাচার আর সে না করে, আপনিও আর তাকে কোনরূপে উৎপীড়ন করবেন না আপনি প্রবল পরাক্রান্ত, আমি ভগবান তথাগতের একজন দীন সেবক—ধরিত্রীর প্রত্যেক জীবেরই কল্যাণ কামনা করাই একমাত্র কাম্য—মালা জপ করতে করতে আমি প্রার্থনা করি—ওঁ মণিপদ্মে হুম—শান্তি, শান্তি।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দেখলেন যে এই সুযোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধা করে লওয়া যায় কিনা। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তিনি জর্জ বগোল (Bogle) নামে এক ইংরাজের নেতৃত্বে একটি 'মিশন' পাঠালেন—সঙ্গে রইলেন আচার্য পূর্ণ গিরি। কাউন্সিলের মিনিটে পাড়ি—ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখছেন যে, তিব্বতের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তার অনুসন্ধান করতে হবে এমন কি flora, fauna এবং সামাজিক তথ্যও যেমন বহুপতিপ্রথা। আর এই সময়েই লামা তাঁর প্রিয় শিষ্য পূর্ণগিরিকে গঙ্গার তীরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার দিলেন। হেষ্টিংসকে সে বিষয়ে চিঠিও লিখলেন— Persian Records-এর ইতিহাসে এই লাখেরাজী বন্দোবস্তের হিসাব নিকাশ পাওয়া যায়—প্রায় দেড়শো বিঘে জমি। চীন থেকে সংগৃহীত তারা মূর্তি এলো—প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতীক হিসাবে। ভিত্তি হলো ভোটবাগানে মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠার। সঙ্গে রইলেন সম্ভবচক্র, সমাজগুহ্য, পদ্মপাণি, বজ্রভৃকুটি। তার পরে দেখি রয়েছে শালগ্রাম শিলা, বিন্ধ্যবাসিনী, শিব-শিবানী, আলিঙ্গিত শক্তি দেবতা, আনন্দলক্ষণ ভেদনের রূপে।

তখনকার দিনে এই ধরনের পরিব্রাজকের দলের কয়েকটির ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায়। তারা ব্যবসার-বাণিজ্যের সঙ্গে লিপ্ত থাকতেন। তৃতীয় তাসী লামার আত্মজীবনীতে তিব্বতীয়। এরূপ গোস্বামী কৃষ্ণপুরী, লালা কাশ্মীরীমল, শোভারাম প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয়ের নাম পাওয়া যায়। কাশীরাজ চৈৎ সিং-এর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল—তিনি সারনাথে, গয়ায় দূতসহ পূজো পাঠিয়েছিলেন এও ঐতিহাসিক তথ্য। তিব্বত গমনের পথগুলি ঐ পরিব্রাজকদেরই জানা ছিল।

চার বৎসর পরে হেষ্টিংস আবার একটি 'মিশন' পাঠান চীন সম্রাটের সঙ্গে যাতে কোম্পানীর সৌহৃদ্য পাকাপাকি হয় লামার মধ্যস্থতায়। ঐ সময়ে লামার আমন্ত্রণ এসেছিল মহাচীন যাত্রার। স্বয়ং সম্রাট তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী। আচার্য পূর্ণগিরি হলেন সঙ্গী। লামা কিন্তু বলেছিলেন যে, এই তাঁর শেষ যাত্রা। সত্যিই তিনি দেহরক্ষা করেন এক নিদারুণ রোগ মারী গুটিকায়। তার পূর্বেই তিনি সম্রাটকে মন্ত্র দান করেন এবং পূর্ণগিরির বিবরণীতে (যা তিনি হেষ্টিংসকে দিয়েছিলেন ১৭৯১ সালে এবং ১৮০৮ সালে প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছিল—সে অপূর্ব গল্প আর একদিন বলবো) তার সম্পূর্ণ ছবি পাই। তিব্বতীয়দের ধারণা যে, লামারা অজর অমর, তাঁরা মরেন না—মৃত্যু মানে "দেহ-দেহান্তর প্রাপ্তি নব এব মহোৎসব"। তারা শুধু কায়াটা বদলে নেন—কোন সদ্যজাত শিশুর দেহে তাঁদের আত্মা সঞ্চারিত হয়—তিনি হন নবকলেবর প্রাপ্ত—উত্তাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ। শিশু লামার প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে হেষ্টিংস আবার পূর্ণ গিরিকে পাঠান ক্যাপ্টেন টার্নারের সঙ্গে। টার্নারের কাহিনীও অনেক অদ্ভুত কথা শোনায়। কলিকাতা থেকে চতুর্থ 'মিশন' যায় ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে। এবারে আচার্য পূর্ণ গিরিই নেতা—ভারতের আধুনিক কালে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা তাঁরই। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন হেষ্টিংস বিলাতে চলে গেছেন—ম্যাকফারসন্ অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল। তাঁরই হাতে রিপোর্ট পেশ করা হয়। তারপর থেকেই পূর্ণগিরি ঐ ভোটবাগানের মঠেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর খ্যাতি, তাঁর নিরলস সাধনা দেশ-বিদেশের প্রণাম কুড়িয়ে আনে—স্থানটি তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলও মঠাধীশের সঙ্গে এসে আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর ১৭১৭ শকাব্দে (ইং ১৭৯৫) ২৩শে বৈশাখ গভীর রাত্রে দস্যুদল মঠ আক্রমণ করে এবং আচার্য পূর্ণগিরি নিহত হোন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে এ খবর প্রেরিত হয়। বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের আধার হেবজ্রের বজ্র তাঁরই উপর পড়ে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

(অসমীয়া গল্প)

॥ ভূমিকা ॥

বাংলার সাহিত্যের কাছে অসমীয়া সাহিত্য যে কত বেশী ঋণী তা অনুধাবন করতে পারি ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম-সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করলে। জনৈক অসমীয়া সমালোচক বলেছেন, 'সব গল্পেরই ঘটনা যেন বাংলাদেশের; অসমীয়া বিশেষত্বের ছাপ পড়ে না'।

পশ্চিমী দেশের ও বাংলাদেশের গল্পের অনুবাদের মাধ্যমে অসমীয়া ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। প্রথম মৌলিক ছোটগল্প-রচয়িতা হিসেবে লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়ার নাম উল্লেখ্য। তাঁর সুনিপুণ সম্পাদনায় বহু ছোটগল্প প্রকাশিত হয় রসোত্তীর্ণ হয়ে। মধ্যবিত্তদের জীবন-যন্ত্রণাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী। মহী বড়া এবং লক্ষ্মীনাথ ফুকনের হাসির গল্প জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রাধান্য দেখি হলিরাম ডেকার গল্পে। সর্বাধিক সার্থক গল্পরচয়িতা হিসেবে লক্ষ্মীনাথ শর্মার নাম করতে পারি। বীণা বড়ুয়ার গল্প-গুলোতে কলেজের বিভিন্ন চরিত্র ধরা দিয়েছে। সুনিপুণ গল্পরচনায় রমা দাসের খ্যাতি আছে। দীননাথ শর্মারও বলিষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক হিসেবে নাম আছে। চিত্রলতা ফুকনের লেখনীতে প্রেমের গল্প চমৎকার ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে উচ্চ মধ্য-বিত্ত থেকে সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পটভূমিকায় বহু সার্থক জীবনধর্মী ছোটগল্প-রচয়িতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন আবদুল মালিক, যোগেশ দাস, কেশব মহান্ত, মানেক দাস, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, হেমেন বোরগোহাইন, ভবেন্দ্র-নাথ সাইকিয়া এবং সৌরভ চালিহা প্রমুখ।

সাধারণভাবে বলা চলে যে, আধুনিক অসমীয়া কথা-সাহিত্যিকরা নতুন নতুন বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুকে সুচারুসম্মিত ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে আরও রসগ্রাহী গল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

—(অনুবাদক)

আবিষ্কার

মূল রচনা ঃ **চিত্রলতা ফুকন**

অনুবাদ ঃ **বোম্মানা বিশ্বনাথম্**

ডায়েরীটা পড়ে অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপক।

মালবিকাই সেদিন সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দীপককে। দীপক রাজীও হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার সেবা করতে আর ডাক্তার ডাকতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হল দীপকের। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর দীপক এসে শোনে মালবিকা অগত্যা তার বান্ধবী সাগরিকাকে নিয়ে ছবি দেখতে চলে গেছে। ঘরে একটু অন্য-মনস্কভাবে কিছুক্ষণ বসার পর হঠাৎ তার নজরে পড়ল মালবিকার বিছানার ওপর একটি ডায়েরী খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এক নিশ্বাসে ডায়েরীটা পড়ে ফিরে গেল দীপক।

রাত যেন আর কাটতে চায় না। দীপক অবাক্ত এক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকায়। তার মস্তিষ্কে তোলপাড় করতে থাকে ডায়েরীর কথাগুলো। তারাগুলো মুক্তোর মত জ্বলছে। সে যে মালবিকাকে বলেছিল ছক-বাঁধা জীবন তার পছন্দ নয়। সমস্ত বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সাহস তার আছে।

মালবিকার সঙ্গে দীপকের কি করে পরিচয় হল তা একটু বলা দরকার। শরৎকালের কোন একদিন। পূব আকাশে গোলাপের পাপড়ির রঙ ধরেছে। পশ্চিম আকাশে তখনো অন্ধকার মিলিয়ে যায়নি। দীপক প্রাতর্ভ্রমণ করছিল। মালবিকা এবং সাগরিকা অনেকক্ষণ নৌকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। নৌকার খোঁজ না পেয়ে তারা একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল। ধারে-কাছে দীপককে দেখে নিঃসংকোচে মালবিকা বলল,—এই যে শুনুন, একটু সাহায্য করবেন?

—বলুন কি সাহায্য করতে পারি?

—একটা ডিঙি ডেকে দিন না?

দীপক সাগ্রহে তা করে দিল। মালবিকা ধন্যবাদ জানিয়ে নৌকায় উঠল।

এর পরের দুমাস দীপকের মনে সেই অচেনা মেয়ে সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগল। তাকে দেখার ইচ্ছাও হয়েছিল প্রবল। দুমাস পর দীপক ঠিক আগের জায়গা-তেই মালবিকার দেখা পেল। এবার দীপকই কথা শুরু করল।

—ঠাকুরের কাছে মনের কথা নিবেদন করার জন্যই তো আপনি মন্দিরে যান?

—আপনার ধারণা ভুল। মানুষের কল্যাণসাধনের জন্যই আমি ঠাকুরকে ডাকি।

—কথাটা অন্তঃসারশূন্য মনে হচ্ছে না কি? অবশ্য আমি নিরুপায়, হয়ত বুঝতে পারছি না।

—আমি সত্যি কথাই বলেছি। বিশ্বাস করা আর না-করা আপনার উপর।

এ-ধরনের দুচার কথার পর ওরা পরস্পরের পরিচয় জানল। ততক্ষণে ডিঙি এসে গেল। দুই বান্ধবী হাসতে-হাসতে ডিঙিতে উঠল।

মালবিকার কথা দীপকের মনে গেঁথেছে। বাড়ি ফেরার পথে তার প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে লাগল। মালবিকা সত্যিই স্পষ্টবাদী। লজ্জার ভান নেই। সংকোচের অভিনয় করতে পারে না। কথা বলার ভঙ্গী সুন্দর। আর চোখদুটো যেন শ্রাবণের ঘনকালো মেঘ। ভোরের বাতাসে রেশমী কালো চুল সাপের মত দুলে-দুলে উড়ছে। সামগ্রিকভাবে মুখটা খুব সুন্দর না হলেও তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সারাদিন দীপকের চোখের সামনে থেকে মালবিকার চেহারা যেন সরতে চায়নি।

মালবিকাও দীপকের কথা যে একটুও ভাবেনি তা নয়। ধীরে ধীরে ওরা পরস্পরকে বেশী করে জানলে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল মালবিকা যেন প্রাণখুলে কথা বলতে পারছে না। কোথায় যেন তার

বাধছে। তার কথার মধ্যে নিরাশার ভাবটাই বেশী। তার কথা শুনে দীপকের মনেও একটা আশাহত উদাসভাব জেগেছিল। কিন্তু পরস্পরকে দেখলেই তাদের উভয়ের মনে একটা ঢেউ জাগত একটা দোলাও তারা পেত। মাঝে মাঝে ওদের মুখ লজ্জার আরক্তিমতায় ভরে যেত। দীপকের চোখ দেখে মালবিকাও বুঝত সে কি বলতে চায়। মালবিকা আপ্রাণ চেষ্টা করতো নির্বিকার ভাষাহীন চোখে তার দিকে তাকাতে। কিন্তু সবসময় তা পারত না। একদিন হঠাৎ দীপক প্রশ্ন করেছিল তাকে।

—মালু?

—উঁ।

—খোলামনে সব কথা বলার অধিকার আজও হয়ত আমার নেই। আমি সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

—করতে পারেন।

—আমার দাবী অন্য ধরনের। আমার ভিতরে যে শিল্পীমন রয়েছে তার পূর্ণ-বিকাশ যদি ঘটাতে হয় তা হলে নিশ্চয়ই একটি প্রেরণার উৎস চাই। যার ফলে আমার লুপ্ত সেই শিল্পী-মন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে।

—নিষ্প্রাণ পাথরে প্রাণের উৎস খুঁজছেন?

—নিষ্প্রাণ হতে যাবে কেন?

—আপনার ধারণা ভুল। আমার সম্পর্কে আপনার অনুমান মিথ্যা। শত-চেষ্টা করেও অন্তরের গভীর থেকে ভালবেসেও যখন প্রতিপক্ষের ভালবাসা পাইনি, একবার যখন আমার ভালবাসা পদদলিত হয়েছে আর আমি কোন্ ভরসায় কাউকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি দীপকদা?

—মানুষের মন অত ক্ষুদ্র হতে পারে না। সেটা যে সাগরের মত বিশাল, অসীম।

তারপর মাথা নিচু করে দুজনেই কি যেন ভাবতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে দীপক আস্তে আস্তে চলে গেল।

নির্দোষী দীপকের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করে মালবিকার মনে একটুও অনুশোচনা জাগেনি। তার জীবনে ভালবাসাবাসি শেষ হয়ে গেছে। আর নয়। ভালবাসার কথা উঠলেই আজো তার মনে পড়ে যায় অক্ষয় চলিহার কথা। নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু বছর চলা-ফেরার পর অক্ষয় বিয়ে করল অন্যকে। অক্ষয়ের কথা আজো তার কানে বাজছে, তোমাকে না পেলে আমার এ-জীবন শূন্য হবে মালবিকা। আমার বাঁচা নিরর্থক হবে। আরো কত কথা, কত প্রতিশ্রুতি মনে পড়ছে একে একে। এটা সত্য যে উভয় পরিবারের আর্থিক দিক অসমান ছিল। ডিগ্রীর দিক দিয়েও মালবিকা পিছিয়ে ছিল। তবে তার সেই ষোল বছর বয়সেই একটি জ্ঞানপিপাসু মন ছিল; তার ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন তাদের এই গভীর ভালবাসার শোচনীয় পরিণতি ঘটল। দারিদ্র্যকে অক্ষয় স্থান দিতে চায়নি নিজের জীবনে। তার অর্থগৃধ্নুতো সম্পদের কাছে আভিজাত্যের কাছে বলি দিল তার গভীর প্রেমকে। মালবিকা ভাবছে: একজন পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব অপরের পক্ষেও তো তা অসম্ভব নয়। আর কোন্ ভরসায় দীপকের ভাল-বাসায় স্বীকৃতি দিতে পারি। মুখের ওপর স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চার-দিনের দিন আবার দীপক এসে মালবিকার পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ ঐভাবে নির্জীব হয়ে যেন পড়ে রইল। মালবিকার মন নাড়া পেল। হাজার হোক মেয়েমানুষের মন তো।

—আপনি আমার কথায় খুব ব্যথা পেয়েছেন, না—দীপকদা?

—না।

—পাননি কেন?—পাওয়ার তো কথা।

—তোমার অবস্থা বোঝার মত শক্তি আমার আছে বলে।

তারপর মাথা তুলে মালবিকার দিকে তাকিয়ে দেখে তার চোখে যেন প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার ঊর্মিমালা খেলছে। মালবিকা বুঝল তার চোখ জলে ভরে পড়ে তাই সে তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে গেল।

এবার সেই আগের কথায় ফিরে যাচ্ছি। দীপকের জীবনের সেই বিনিদ্র রাত্রিকে পেছনে ফেলে একটি লালটুক-টুকে ভোর এল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল দীপক। সে ঠিক করল আজ যে-কোনভাবে মালবিকার মনের কথা জানতেই হবে। সরাসরি আজ কথা বলবে। ডায়েরী পড়ার পর থেকে একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দ তার মনকে আন্দোলিত করে তুলেছে। কিন্তু আজ মালবিকা কি উত্তর দেবে জানে না। এই অনিশ্চয়তার ফলে আশংকাও তার মনে দানা বাঁধছে।

অন্যান্য দিনের মত আজকেও দীপক মালবিকার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মনে মনে ঠিক করল ডায়েরীর একটি কথাও যাতে বেফাঁস বেরিয়ে না পড়ে তার জন্য সচেষ্ট থাকবে। মালবিকাকে কিছুতেই বুঝতে দেবে না যে সে ডায়েরী পড়েছে।

মালবিকা গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে। দীপক স্বগতোক্তির মত বলল, যে মেয়ের মন শিশুর মত এত সরল এবং পবিত্র—যার চোখেমুখে এমন বুদ্ধির ছাপ, অক্ষয় চলিহা কি করে পারল তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে! নিশ্চয়ই লোকটার মনে বিন্দুমাত্র কোমলতা ছিল না।

মালবিকার এলোমেলো চুল বাতাসে একটু একটু উড়ছে। বিছানায় রাণীর মত হেলান দিয়ে কী সুন্দরভাবে শুয়ে রয়েছে। কী ভাবছে এত তন্ময় হয়ে! ওর মনের পদ্মপাতায় কি বাইরের হাওয়া লেগেছে! সে কি কালকের ছবি সম্পর্কে ভাবছে। দীপক আস্তে আস্তে ডাকল, মালু?

—উঁ। মুখ তুলে চাইল মালবিকা। আশ্চর্য! দীপককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে

মালবিকার চোখেমুখে অদ্ভুত এক আনন্দের ছাপ পড়ল। এর আগে কোনদিন দীপক তার এতটা খুশী-খুশী ভাব দেখেনি।

কথা বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে টেবিলের সামনের চেয়ারে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মালবিকা একটি পান সেজে এনে দিল।

—কি ব্যাপার মালু—আজকে যে তোমাকে এত খুশী-খুশী দেখাচ্ছে।

—নতুন আবিষ্কারের আনন্দে। আমার এতদিনকার ভুলের সমাধি হয়েছে।

—ভুলের সমাধি?

—হ্যাঁ, ভুলের সমাধি

—আমাকে জানাবে না?

—নিশ্চয়ই জানাবো। একদিন আমার মধ্যে যে একটি অন্ধ বিশ্বাস ছিল, যে ভুল ধারণা পোষণ করে আসছিলাম তা আজ ধুয়ে-মুছে গেছে।

—কাল সিনেমা দেখার ফলে?

—হ্যাঁ, কাল আমি নতুন পথ পেয়েছি। পর্দায় যা ঘটল তার সঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতার মিল রয়েছে। একটা গল্প—বলি শুনুন : ছোট্ট একটি পরিবার। ঘরে মাত্র দুজন। একটি তন্বী, নাম গৌরী বই দেও। তার বুড়ো বাবা ক্যান্সার রুগী। গৌরী তার মাকে হারিয়েছে অল্পবয়সেই। ডাক্তারী পাশ করে নীলাচল বড়ুয়া নিজের শহরে প্র্যাকটিস শুরু করল। সৌভাগ্যেই হোক আর দুর্ভাগ্যের ফলেই হোক গৌরীর বাবার চিকিৎসা শুরু হোল তার হাতেই। গৌরীর বাবা লোকাল বোর্ডের কেরানী। ওদের সংসার ততটা স্বচ্ছল নয়। নীলাচল ডাক্তারের যাতায়াত বেড়ে গেল ওদের বাড়িতে। আস্তে আস্তে গৌরীর সঙ্গে তার প্রণয় হোল। ডাক্তারটির নামে বাজারে নানা রকম রটনা থাকা সত্ত্বেও গৌরীর মত মার্জিত রুচিসম্পন্ন মেয়েকেও নীলাচলের ভালবাসার অভিনয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হোল। বাবার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা দেখে গৌরী নিজেই একদিন মুখ ফুটে নীলাচলকে বিয়ে করার কথা বলল। তারপর থেকে নীলাচল আর ও-বাড়ির ছায়া মাড়ায়নি। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই গৌরীর বাবা মারা গেল। তার জীবনের এই ধরনের এক চরম সংকট মুহূর্তে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল শংকর। শংকরের কাছেই প্রেরণা পেয়ে ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হল গৌরী। গৌরী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝল যে অবিবাহিত হয়ে থাকার জ্বালা আছে। লোকে নানা কথা রটায়। তারপর ওর জীবনের এক শুভক্ষণে বিয়ে হল শংকরের সঙ্গে।

গল্প বলে একটু থেমে মালবিকা বলল এ-গল্প খুব বেশী সেকেলে নয়, এটা আমার স্বপ্নে-দেখা গল্প নয়, রূপকথাও নয়—একটি জীবন্ত বাস্তব কাহিনী। কাল সিনেমায় এই গল্পই দেখেছি। বারবার ভেবেছি। অক্ষয় চলিহা এবং নীলাচলের মত মানুষ আর কতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে। ওদের কি অধিকার আছে নিষ্পাপ মেয়েদের এভাবে আগুনে ঠেলে দেওয়ার!

—যাক, তবু এতদিনে বুঝেছ।

—আশ্চর্য! আজও অক্ষয় চলিহাকে ভুলতে পারছিলাম না, কবর দিতে পারছিলাম না তার স্মৃতিকে।

—অক্ষয় চলিহা আবার কে?

—ও, সেকথা তো আপনাকে বলাই হয়নি। অক্ষয় চলিহার বাড়ি ডিগবয়ে। জীবনে প্রথম তাকেই আমি ভালবেসেছিলাম। তাকে দিয়েই নিজের জীবনের রামধনু সাতরঙে রাঙিয়ে ছিলাম মনে মনে। কত কল্পনার আল্পনা এঁকেছি মনের আঙিনায়। কিন্তু কার মনে কোন কালসাপ আছে বুঝব কি করে!

মালবিকার চোখ নিবদ্ধ হোল দীপকের চোখে। দীপক তার চোখের ভাষা অনুধাবন করার চেষ্টা করল।

—তাহলে অক্ষয় চলিহাই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

—হ্যাঁ, আমি এতদিন মনে মনে এই বিশ্বাসঘাতককেই পুজো করে এসেছি। কিন্তু কাল আমার সে-ভুল ভেঙেছে।

—শোনো মালু, অক্ষয় চলিহার বাড়ি কিন্তু এখন ডিগবয়ে নয়, ওরা আজকাল ডিব্রুগড়ে থাকে।

—আপনি অক্ষয় চলিহাকে চেনেন?

—তুমি কি অক্ষয় চলিহার পরিবারের সবাইকে চেন?

—না। শুনেছি ওর আরো দুটো ভাই আছে। ওদের আমি কোনদিন দেখিনি। ওরা নাকি দূরে থাকে।

—ভয়ের বা আশঙ্কার কিছু নেই মালু। আমাকে অক্ষয় চলিহার মত লোক বলে মনে করো না। অক্ষয় চলিহার সঙ্গে আমার সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তোমার অতীত জীবনের যে ইতিহাস এতদিন জানতাম না তা মাত্র কাল আমি জেনেছি। তোমার জীবন-উপন্যাসের কয়েকটি পাতা কাল পড়েছি।

—কি বলছেন দীপকদা!

—ঠিকই বলছি। কাল সুযোগ পেয়েছিলাম তোমার গোপন ডায়েরীটা পড়ার। বিছানার ওপর পড়েছিল, একটু পড়ে নিলাম।

—আজ না হোক কাল আমি নিজেই সব কিছু জানাতাম। আপনার কাছে সব না জানিয়ে আমার উপায় নেই।

—তুমিও আজ একটা নতুন বিষয় জেনে নাও মালু। ভয় নেই। ভয়ের কোন কারণ নেই। শোন মালু, আমি সেই-অক্ষয় চলিহারই ভাই—দীপক।

থ বনে গেল মালবিকা। নির্বাক তার ঠোঁট।

অনশনের অশনি

কণাদ রায়

> Down on your knees,
> And thank heaven, fasting, for good man's love.
>
> **— Shakespear**

ভালোমানুষের ভালোবাসা অর্জন করবার জন্যে অনশন—একটি সেক্সপীরিয় উপদেশ। কিন্তু ইদানীংকালে অনশনকে 'খারাপ মানুষদের' হৃদয়-পরিবর্তনের জন্যেই বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে। পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে মাস্টার তারা সিং-এর ৪৭ দিনের অনশন ধর্মঘট কয়েকদিন আগের খবর। অনশনকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার শুরু করেন সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগের জাপানীরা। শত্রুপক্ষের কোনো লোককে অপদস্থ করার জন্যে সে যুগের জাপানে তার দরজার গোড়ায় প্রায়োপবেশন করা হত।

কিন্তু অনশনের উৎস-সন্ধানে এগোলে বিক্ষোভের বদলে ধর্মকেই পাওয়া যাবে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রায়োপবেশনের প্রথাটি প্রচলিত। মন্দিরে না খেয়ে ধর্ণা দেয়া, শিবরাত্রির উপোস করা ইত্যাদি নানা ভঙ্গীতেই অনশন প্রথা আজো লিপ্ত। তবে না খাওয়ার মনস্তত্ত্বটি বিচার করলে দেখা যাবে সাধারণতঃ ইচ্ছাপূরণের প্রেরণাতেই অনশন করা হয়। সন্তান-কামনা, রোগমুক্তি, ঈপ্সিত ফললাভ ইত্যাদি নানা কারণেই আজো তারকেশ্বরে না খেয়ে 'হত্যে' দেয়া হয়।

অনশনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অশনি রূপে ব্যবহার আরম্ভ করেন প্রথমে মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল অনশন। এবং আজকে শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গেও অনশনের সংযুক্তি ঘটেছে। খবরের কাগজের পাতায় 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' শব্দটি নিশ্চয়ই অপরিচিত নয় আজকে। অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত গান্ধীজি মোট ১৪বার অনশন করেন। তার মধ্যে একটি অনশন বিশেষ বিখ্যাত। মৌলানা মহম্মদ আলির বাড়ীতে ১৯২৪ সালে ২১ দিনব্যাপী অনশন আরম্ভ করেন গান্ধীজি। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। ১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে যারবেদা কারাগারে আমরণ অনশন আরম্ভ করেন গান্ধীজি আবার। যারবেদা কারাগারে গান্ধীজি আরেকটি অনশন করেন ১৯৩৩ সালে। 'হরিজন' পত্রিকা মারফত যারবেদা কারাগার থেকেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন গান্ধীজি। কিন্তু বৃটিশ সরকার বাদ সেধেছিলেন। ফলে অনশনকেই বেছে নিয়েছিলেন গান্ধীজি প্রতিবাদের অঙ্গিক হিসেবে। জীবন সায়াহ্নে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অনুকূলে আরো দুটি অনশন করেন গান্ধীজি। প্রথমটি দিল্লীতে, দ্বিতীয়টি কলকাতায়। কিন্তু নিজে অনশনে আগ্রহী হলেও যথেচ্ছ অনশনের পক্ষপাতী কখনই ছিলেন না গান্ধীজি। একদা জেনারেল আভেরীর অনশন প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছিলেন :

If a man however popular and great he may be, takes up an improper cause and fasts in defence of the impropriety, it is the duty of his friends, fellow workers and relatives to let him die rather than that an improper cause should triumph so that he may live. Fairest means cease to be fair when the end sought is unfair. (Harijan, 17. 3. 46)

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীরা তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার-কল্পে অনেকবার অনশন করেছেন। এই পর্যায়ের বিভিন্ন অনশনগুলির মধ্যে শহীদ যতীন দাসের অনশন বিশেষ উল্লেখ্য। লাহোর জেলে যতীন দাসের ৬৪ দিনের প্রায়োপবেশন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল ঘটনা। এই অনশনেই যতীন দাসের পরলোকগমন ঘটে। He that lives upon hope will die fasting —বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের এই বিখ্যাত উক্তিকেই সত্য প্রমাণ করেছিলেন শহীদ যতীন দাস মরে গিয়ে।

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও অদম্য অনশন-সংগ্রামী কম নেই। ১৯৫১ সালে ফ্রান্সের লিজ্ চেলস্ নাম্নী ৩৫ বছরের এক মহিলা কাঁচের শবাধারে শুয়ে ৬০ দিন অনশন করেন। তাঁর অনশনের উদ্দেশ্য ছিল যৌগিক ধ্যানের সাহায্যে বিশ্ব সমস্যার সমাধান। জার্মাণীর উইলি স্মিটজ্ নিজেকে "অনশন শিল্পী" বলতেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পশুশালার একটি কাঁচের খাঁচায় এই 'অনশন শিল্পী' ১৯৫০ সালে ৫৩ দিনের অনশন করেন। শুধু সোডার জল আর সিগেরেট ছাড়া আর কিছুই খেতেন না উইলী। পৃথিবীর অপরাজিত অনশনকারী, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক। ইংলণ্ডের জ্যাক ওয়াকার ১৯৫২ সালে ৭২ দিন, ৩ ঘণ্টা ৪ মিনিট অনশন করেন নেহাতই একটা বাজী জেতবার জন্যে। ইংলণ্ডের সাড়ে চার মাস কৈকোস পার্সি কপলন স্থির করেছিলেন ১০০ দিনের অনশন করে ভবে অতুল কীর্তি রাখবেন। কিন্তু ভদ্রলোক ৯৩ দিনের মাথায় অনশনের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকও ত্যাগ করেন।

অনশন প্রসঙ্গে একটি সাধারণ প্রশ্ন জাগতে পারে মনে, যে না খেয়ে কদিন একটা মানুষ বাঁচতে পারে। শরীর-বিজ্ঞানীরা বলেন অনশনের ক্ষমতা নির্ভর করে শারীরিক সঞ্চয়ের ওপর। তবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে বয়স যত বেশী হয় অনশন-যুদ্ধে যোঝবার ক্ষমতাও তত বাড়ে। সাধারণভাবে বলা যায় হৃষ্টপুষ্ট যে-কোনো লোক পঞ্চাশ থেকে ষাট দিন পর্যন্ত অনশন করে থাকতে পারে। তবে তাকে জল কিংবা অনাধরণের কোনো পানীয় গ্রহণ করতেই হবে। গান্ধীজি অনশনকালে নুন-জল এবং বাইকারবোনেট অফ সোডা পান করতেন।

প্রদর্শনী

কলারসিক

দুই শিল্প মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের হাড়-কাঁপানো শীতকে হার মানিয়ে চৌরঙ্গীর সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের এবং ধর্মতলার ভারতীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তরুণ মনের নতুন স্বপ্নে উত্তপ্ত বার্ষিক চিত্রকলার দুটি প্রদর্শনীই যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই দুটি প্রদর্শনীর জন্য যেমন তরুণ শিল্পীরা উন্মুখ হয়ে থাকেন তেমনি কলকাতার শিল্পরসিক ব্যক্তিরাও থাকেন সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। কারণ এই তরুণ শিল্পীরাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিল্পের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে অনেকেই বিশ্বাস পোষণ করেন। সুতরাং দুটি প্রদর্শনীর তুলনামূলক বিচার করাই আমাদের পক্ষে বোধহয় সঙ্গত কাজ হবে।

চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী প্রদর্শনী দুটিতে স্থান পেয়েছে চারু চিত্র, ফলিত শিল্প, ভাস্কর্য ও কারুকলার নিদর্শনসমূহ। সব মিলিয়ে চৌরঙ্গীর সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং ধর্মতলার ভারতীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছেন। প্রথমটিতে প্রদর্শিত হয়েছে সাড়ে সাতশতটি নিদর্শন, দ্বিতীয়টিতে আছে প্রায় দুইশতটি শিল্পকর্মের নমুনা। এই বিপুল সংখ্যক নিদর্শন ভাল করে দেখা বোধহয় কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা তবু দেখতে চেষ্টা করেছি। এবং এই দেখার ফলে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার মনে। বিষয়টি বলাই ভাল। এবারকার চিত্র-প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় (যদি একে সুস্থমনে প্রতিযোগিতা বলে স্বীকার করা হয়) সরকারী মহাবিদ্যালয় কিন্তু বে-সরকারী ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ের কাছে প্রায় সর্ববিষয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন। তুলনামূলক সামগ্রিক বিচারে তৈল-রঙ ও জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রকলায় ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই উন্নততর মান প্রদর্শন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। ফলিত শিল্প ও ভাস্কর্যের কাজ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য বলে মনে হয়েছে।

এবার প্রশ্ন : কেন এমনটি হল? সরকারী মহাবিদ্যালয় এবং বে-সরকারী মহাবিদ্যালয় উভয়েরই আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের একটুও অজানা নয়। তবু যে-সরকারী শিক্ষায়তনে বহু খ্যাতনামা শিল্পী শিক্ষকরূপে কর্মরত তাঁদের কাছেই তো আমাদের প্রত্যাশা বেশি। আভ্যন্তরীণ গলদ যদি এমন স্তরে উপনীত হয়ে থাকে যেখানে আর শিক্ষাদানও সম্ভব না, তবে কেন তাঁরা নীরব রয়েছেন এখনো? আভ্যন্তরীণ গলদ সত্ত্বেও বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষেই বা কি করে সম্ভব হচ্ছে তুলনামূলকভাবে ভাল কাজ করার দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে আনা? প্রশ্নটি ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকদেরই বেশি করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। আর, ছাত্রদের নিকট আমার বক্তব্য : প্রতিযোগীর সুস্থ মনোভাব নিয়ে তাঁরা যেন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। শিল্পের জগতে বাঙলার মহান ঐতিহ্যের তাঁরাই তো উত্তর-সাধক—এ-কথাটা যেন সর্বসময়ে মনে রাখেন ছাত্র-শিল্পীরা।

চাষি বউ —শচীন পাল

এই বিচারের পর এবার দুই মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী সম্বন্ধে অন্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। দুটি প্রদর্শনী দেখে আমার মনে হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথাগত চিত্রাঙ্কন থেকে বিমূর্ত চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝোঁকটা যেন ক্রমান্বয়ে প্রবলতর হচ্ছে। কিন্তু বিমূর্ত শিল্পের জগতে বিচরণ করতে হলে যে আঙ্গিক-নৈপুণ্য ও কল্পনা-প্রতিভার অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন সেটা মোটেই সহজলভ্য নয়। ভারতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝোঁকটাই এদিকে একটু বেশি বলে এ-ব্যাপারে তাঁদের অধিকতর সচেতন হতে অনুরোধ করি।

টুওয়ার্ডস দি সি—প্রবীরকুমার শিকদার।

সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শিত নিদর্শনগুলির মধ্যে তেল-রঙের চিত্রকলা বিভাগটি সবচেয়ে ভাল হয়েছে। জল-রঙের মাধ্যমে অংকিত চিত্রকলার বিভাগটি এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে দুর্বলতম সংযোজন। ফলিত শিল্প, ভাস্কর্য ও কারুকলার বিভাগগুলি মোটামুটি মন্দ না বলা যায়।

তেলরঙে অংকিত চিত্রগুলির মধ্যে রামকুমার গুপ্তের 'হুজ ফিউচার' (১৪১), 'স্টাডি' (১৪০), মিলি পালের 'প্রেয়ার' (১২৬), 'স্ট্রীট সিংগার' (১২৮), কৌশিক চক্রবর্তীর 'ফ্লাওয়ার স্টাডি' (২৯), প্রদীপ-কুমার বসুর 'সাফারার্স' (৫২), অজয় দেবের 'হাটের পথে' (৭১), অমিতাভ সেনগুপ্তের 'হর্স এন্ড দি গ্রুম' (৯২), সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অ্যাবসর্বড' (৪৩), শম্ভু দাশের 'লেন', পংকজকুমার মাইতির 'বিসাইড দি গ্যাঞ্জেস' (১১৮), কুমকুম নন্দীর 'ভিজিটরস' (১২১), আশীষ-কুমার প্রধানের 'ল্যান্ডস্কেপ' (১৩০), প্রবীরকুমার শিকদারের 'টুওয়ার্ডস দি সি' (১৩৮) ও মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'ফেয়ারওয়েল টু কালার্স' (১৭৩) এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

পূর্বেই বলেছি জল-রঙের কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে নেই। তবু এর মধ্যে বিশ্বনাথ ঘোষের 'দি কাপল' (১৯৯), কানাইলাল চক্রবর্তীর 'রিফ্লেকশান' (৫৮), হরভূষণ মালের 'বস্তি' (১৬৫) ও হীরেনকুমার মিত্রের 'ইন এ ভিলেজ মার্কেট' (৩) অনেকের ভাল লাগতে পারে।
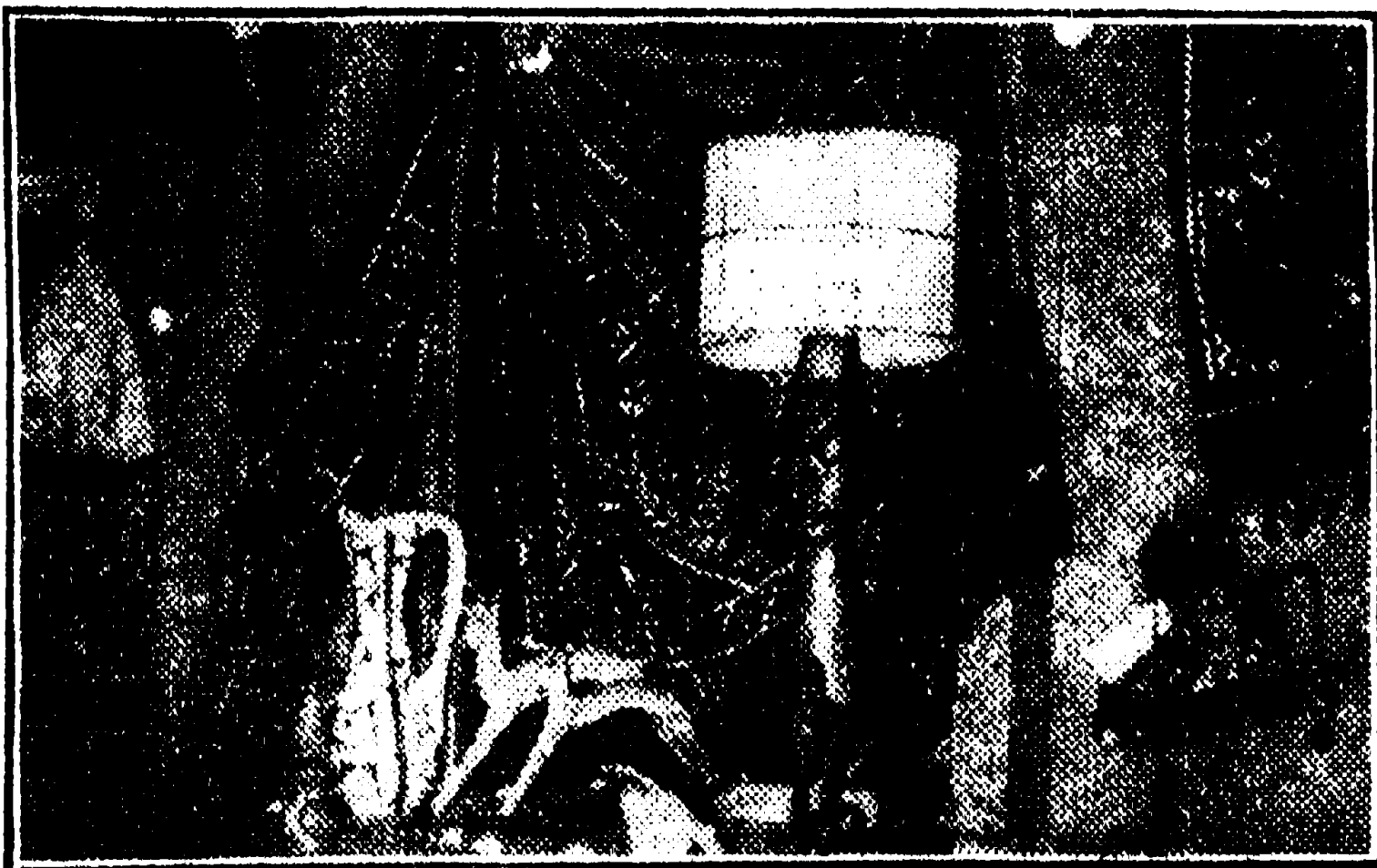
ফোল্ডার —শিখা পাল

গ্রাফিক চিত্রকলায় শিখা পালের লিনোকাট 'জেলেনী' (৪০৭), তপনকুমার সেনগুপ্তের লিথো 'দার্জিলিং' (৪১০), দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফরেস্ট' (৪২৬) ও প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঠখোদাই 'ওয়ে টু দি মার্কেট' (৪১৬) দর্শকমনকে আকর্ষণ করবে।

ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ দেবনাথ, ভোলানাথ কর্মকার, সান্ত্বনা গোস্বামী, শচীন্দ্র পাল ও অসিত দাশগুপ্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কারু শিল্পের কাজের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বাতিকের কাজ ও সিরামিকের নিদর্শনগুলি। আশা করি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভবিষ্যতে আরো উন্নততর নিদর্শন দিয়ে বর্তমান ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে নেবেন।

ভারতীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিমূর্ত শিল্পের দিকে ঝোঁকের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই ঝোঁক সত্ত্বেও বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের শিল্প-কর্মে। এদের মধ্যে তেল-রঙে অংকিত বিকাশ ভট্টাচার্যের 'হর্স এন্ড ক্যারেজ' (২১), পাঁচুনারায়ণ গুপ্তের 'লাইট এন্ড রোলিং' (৯৮), সন্তোষ গুপ্তের 'সুইচবোর্ড' (১০৪), মায়া মুখার্জির 'সান কিসড্ বিচ' (১১৪), মৃণালকান্তি দত্তের 'প্রসেশান' (৬৭), শ্রীকৃষ্ণ সেনের 'পেভমেণ্ট ফ্যামিলি' (১৪৮), কেতায়ুন সাখলাতের 'এজ অফ হেলপলেসনেস' (১৫১), 'ডার্টি ওয়ালস' (১৫৩), 'বিফোর অফিস আওয়ার্স' (১৫৫), ইকবালউদ্দিন আহম্মদের 'কাউ ইন দি ফিল্ড' (১) ও লক্ষ্মী ধরের 'এ বেঙ্গলী লেডী' (৪৮) নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

সরকারী মহাবিদ্যালয়ে জল-রঙের চিত্র-কর্ম দেখে যে হতাশ হয়েছিলাম এখানকার ছাত্রদের জল-রঙের সুন্দর চিত্রগুলি দেখে তেমনি আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হয়, মানস ভট্টাচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য, সন্তোষ চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র দাশ, শ্যামল নন্দী প্রমুখ ছাত্র-শিল্পীরা ভবিষ্যতে জল রঙের মাধ্যমে আমাদের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম উপহার দিতে পারবেন। ভাস্কর্যের কাজে মধুসূদন চক্রবর্তী, নিতাই দাশ ও সরোজ মুখার্জি সত্যি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলিত শিল্প বিভাগটিও প্রশংসার যোগ্য।

মোটকথা : কলকাতার এই দুই শিল্প মহাবিদ্যালয় আরো যোগ্যতাসহকারে তাঁদের কর্ম পরিচালনা করুন, আগামী বছরে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো ভাল চিত্র-সম্পদ আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরুন, এই আশা নিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

কারুশিল্পের কয়েকটি নিদর্শন

॥ পশ্চিম ইরিয়ান ॥

গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে অনুপ্রাণিত ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইন্দোনেশিয়ার যাবতীয় রাষ্ট্রনির্দেশ পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিম ইরিয়ানের অধিবাসীরাও তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং ডাচ সরকারের উপস্থিতিতেই ঘরে ঘরে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পতাকা উড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের বাসভূমি ইন্দোনেশিয়ারই অংশ এবং ডাচ সরকারের বে-আইনী উপস্থিতিকে তারা স্বীকার করে না।

৩ লক্ষ ১২ হাজার ৩২৯ বর্গমাইল আয়তনের নিউগিনি দ্বীপটি আকৃতিতে সিংহলের চেয়ে প্রায় বার গুণ বড়। তবে লোকসংখ্যা মাত্র ১৪ লক্ষ। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা দ্বীপটি আবিস্কার করেছিল এবং তারাই ওর নাম দেয় নিউগিনি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ও নাম মানে না, অনেক আগে থেকেই তার কাছে ঐ দ্বীপটির পরিচয় ইরিয়ান নামে। দ্বীপের পূর্ব অংশ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণাধীন, নাম পপুয়া। পশ্চিম অংশ ডাচ অধিকারে— ঐ টুকুই ইন্দোনেশিয়ার দাবী। ডাচ নিউগিনি, অর্থাৎ পশ্চিম ইরিয়ানের আয়তন ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৮৯ বর্গ মাইল, সমগ্র নিউগিনির প্রায় অর্ধেক। লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। ১৯৪৯ সালে হল্যান্ডের সংগে ইন্দোনেশিয়ার যে চুক্তির ফলে ১৯৫০ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয় সেই চুক্তিতেই লেখা ছিল, এক বছরের মধ্যে ডাচ সরকার পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে ফেলবে। কিন্তু তারপর থেকে এ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার শত দাবী সত্ত্বেও হল্যান্ড চুক্তির সর্ত রক্ষায় কোন আগ্রহ দেখায়নি। অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিগুলিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব, কারণ পশ্চিম ইরিয়ানের পশ্চিম অঞ্চলে তৈল খনিগুলির অন্যতম সোরং খনিটির ৮০ শতাংশ ভাগের মালিক মার্কিন পুঁজিপতিরা। দ্বিতীয়ত পশ্চিম উপকূলের হল্যান্ডিয়া নামক বন্দরটির সামরিক গুরুত্ব সীমাহীন। আর শেষ কথা, হল্যান্ডও ন্যাটোর সরিক। অতএব পশ্চিমী শক্তিজোটের মুখ হাত দুই বন্ধ। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার দাবী ক্রমে ক্রমে যেভাবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে তাতে এভাবে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা যে খুব বেশীদিন সম্ভব হবে না এটা তারা বুঝতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে গোয়ার ঘটনার পর পশ্চিমী শক্তিজোটের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি আজ আর সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষুকে ভয় করেনা। সে কারণে হল্যান্ড ইতিমধ্যে অনেকখানি সুর নরম করেছে। পর্তুগালের মত গলাধাক্কা খাওয়ার আগেই সে হয়ত পশ্চিম ইরিয়ান থেকে পাট গুটিয়ে চলে আসবে। ২রা জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, ডাচ প্রধানমন্ত্রী ডিকুয়ে হল্যান্ডের সংসদে ঘোষণা করেছেন, পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সংগে আলোচনা শুরু করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। তবে হল্যান্ডের এই মনোভাবের পরিবর্তনে ইন্দোনেশিয়ার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিন জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে পারে অন্য কোন বিষয় নিয়ে নয়। ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম প্রদেশ বলে ঘোষণা করে তার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিক ভূগোলে পশ্চিম ইরিয়ান বরাট এবং তার রাজধানীর নাম "কোষ্ট বেরাম," অর্থাৎ নূতন নগরী।
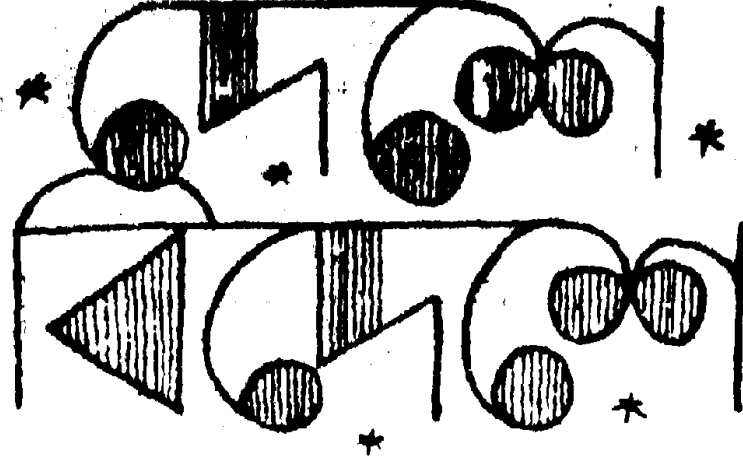
॥ মালয়েশিয়া ॥

মালয়, সিংগাপুর, বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও, ব্রুনেই ও সারোয়াক এই ক'টি রাজ্য, রাষ্ট্র ও উপনিবেশের সমন্বয়ে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব কার্যকর হতে চলেছে। কতকগুলি দ্বীপ উপদ্বীপ ও দ্বীপাংশের এই সংযুক্তি নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে মালয় এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে খুব বেশী উৎসাহী ছিল না, কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে তার আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। তার কারণ মালয়ের স্বারপ্রান্তে সিংগাপুরে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনাদের প্রভাব বর্তমানে মালয়ের নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিংগাপুরের ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৭৫ জন চীনা, এবং মালয়ীদের সংখ্যা মাত্র ১৪ শতাংশ। এই চীনাদের অধিকাংশই কমিউনিষ্ট চীনের সমর্থক এবং তাদের চাপে সিংগাপুরের লি কুয়ান ইউ-র সরকারের অবস্থা খুবই সংকটজনক। মালয়ের প্রায় ৬৯ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যেও চীনাদের সংখ্যা প্রায় ৩৭ শতাংশ। এই অবস্থায় মালয় ও সিংগাপুরের সংযুক্তি ঘটলে চীনাদের সংগে মালয়ীদের সংখ্যার একটা ভারসাম্য আনা সম্ভব হবে। তবে অবস্থা আরও নিরাপদ ও সুনিশ্চিত রাখার দরকার বিবেচনা করে মালয় সরকার বর্তমানে বৃটিশ অধিকৃত উত্তর বোর্ণিও, সারাওয়াক ও ব্রুনেই অঞ্চলকেও প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। স্কটল্যান্ডের আয়তনবিশিষ্ট উত্তর বোর্ণিওর জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ এবং তার ২২ শতাংশ চীনা। দেশটিতে তেলের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সারোয়াকের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ, যার ৩১ শতাংশ চীনা। সারোয়াকে সোনা রবার ও বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সরিক ব্রুনেই আয়তনে ক্ষুদ্রতম হলেও সবচেয়ে সমৃদ্ধ, প্রচুর খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে। জনসংখ্যা ৮০ হাজার, তারমধ্যে চীনার সংখ্যা ১৯ শতাংশ। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে বৃটেন যে তার উপনিবেশগুলিকে সংযুক্ত হতে দিচ্ছে সেটা অবশ্যই নিঃস্বার্থে নয়। তার বাণিজ্যিক স্বার্থ ঐ সকল অঞ্চলে অটুট ত থাকবেই, পরন্তু এই আদানপ্রদানের ফলে সিংগাপুর বন্দরের উপরেও তার বর্তমান অধিকার আরও স্থায়ী ও সর্বাত্মক হবে। মালয়কে নিজের স্বার্থেই সিংগাপুরের উপর বৃটিশ কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সম্প্রসারণ নীতি আজ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে চীনা অধিবাসীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও একটি বিরাট শক্তিরূপে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় বৃটেন বা অন্য যে কোন একটি, শক্তিশালী রাষ্ট্রের সংগে মালয়ের মৈত্রী অনিবার্য প্রয়োজন। তাই সম্প্রতি লন্ডন সফরকালে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান বলেছেন, 'সিয়াটো' জাতীয় কোন বন্ধজোটে

মালয় যোগ না দিলেও কমনওয়েলথ সে কোনদিনই ত্যাগ করবে না। আর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে যুগ্ম-বিবৃতিতে তিনি স্বাক্ষর দিয়েছেন তাতে সিঙ্গাপুরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কথারই উল্লেখ করা হয়নি। বলাবাহুল্য, প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মালয় পৃথিবীর বৃহত্তম রবার ও টিন উৎপাদক দেশ। তারসঙ্গে যুক্ত হবে নতুন এলাকাগুলির খনিজ তেল, বক্সাইট, সোনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। জনসংখ্যাও হবে প্রায় এক কোটি।

॥ পর্তুগালে খন্ডবিদ্রোহ ॥

গোয়া হারানোর দুঃখে পর্তুগাল এবার খৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন বড়দিনকে শোকদিবসরূপে পালন করেছিল এবং নববর্ষেও কোন উৎসবের আয়োজন তারা করেনি। কিন্তু আরও দুঃখ যে পর্তুগালের ভাগ্যনিয়ন্তাদের জন্যে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে তার ইঙ্গিত ঐ নববর্ষের দিনেই পর্তুগালে প্রকাশ পেয়েছে। চরম নিষ্ঠুর একনায়ক সালাজারের লৌহশাসনের নিষ্পেশনে খোদ পর্তুগালেই আজ গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সালাজারের ফ্যাসী শাসনের বিন্দুমাত্র বিরোধিতাও সেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করতে হয়। তবুও পয়লা জানুয়ারী সে রাজ্যে বিদ্রোহ হয়েছে এবং বিদ্রোহ করেছে সৈনিকরা, যাদের জোরে সালাজার প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পর্তুগাল ও তার উপনিবেশগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের কন্ঠ রুদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিদ্রোহ হয়েছিল লিসবনের ১০৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মুর সৈন্যদের বেজা ঘাঁটিতে। বেজা দক্ষিণ পর্তুগালের বাইক্সো-আলেন্তেজো প্রদেশের রাজধানী। মূলে পর্তুগালে বিদ্রোহ এই প্রথম। সালাজার অবশ্য এইবারের বিদ্রোহ আরও বেশী সৈন্য নিয়ে গিয়ে ও বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে দমন করতে পেরেছেন, কিন্তু এ অভ্যুত্থান যে সালাজারী স্বেচ্ছাচারেরই অবসানের সূচনা তা স্বয়ং সালাজারেরও বুঝতে ভুল হয়নি। তাই তিনি পর্তুগালের সৈন্যবাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড ও জন-নিরাপত্তা পুলিশ বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আর এক সংবাদে প্রকাশ, গোয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ কিছু না করার জন্য পর্তুগাল রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করার কথা চিন্তা করছে। অবশ্য উপনিবেশগুলির ব্যাপারে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনোভাব প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে তার ওপর ক্রমেই যেভাবে চাপ বাড়ছে তাতেও পর্তুগালের পক্ষে আর বিশ্ব-জনমতের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

॥ লেবাননে অভ্যুত্থান ॥

বছরের শেষদিনে লেবাননেও একটি অভ্যুত্থান হয়েছিল তবে মধ্যপ্রাচ্যের এই আরব রাজ্যের অভ্যুত্থানটি ছিল দক্ষিণপন্থী নাশনালিস্ট সোস্যাল পার্টির নেতৃত্বাধীন। এই দলের অন্যতম দাবী হল সিরিয়া ও লেবাননের সংযুক্তি। যথাসময়ে হস্তক্ষেপের ফলে বিদ্রোহ বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি এবং বিদ্রোহের নেতারাও সকলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এখন লেবাননের অবস্থা স্বাভাবিক। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কায়রো লেবাননস্থ বৃটিশ দূতাবাসের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ এনেছে যে, সিরিয়ার পিপলস পার্টির সঙ্গে যোগসাজস করে বেইরুতস্থ বৃটিশ দূতাবাসই এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে।

॥ কোরিয়ার বয়স স্থির ॥

এ বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় কোন লোকের বয়স বাড়ল না। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এতদিন কোরিয়ায় শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই জঠরে অবস্থানকাল ধরে' তার বয়স এক বছর ধরা হ'ত। কিন্তু এই বছর থেকে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার স্থির করেছেন, তাঁরা ইউরোপীয় হিসাব মতে বয়সের হিসাব করবেন। অতএব এই একটা বছর কারও বয়স বাড়ল না কোরিয়ায়। জঠরের অন্ধকারে অতিবাহিত একটি বছর এবার কোরিয়াবাসীরা জগতের আলোয় উপভোগের সুযোগ পেলেন।

॥ প্রচন্ড হিমপ্রবাহ ॥

অভূতপূর্ব হিমপ্রবাহ নেমে এসেছে সারা উত্তর-ভারতে। আবহতত্ত্বের পরিসংখ্যানমতে এমন হাড় কাঁপানো শীত গত বারো বছরের মধ্যে কলকাতায় নামেনি। কিন্তু বিহার, উত্তর-প্রদেশ, দিল্লী ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে যে ভয়ংকর শীতের খবর এসেছে তা বঙ্গবাসীদের কল্পনাতীত। কানপুরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও নীচে নেমেছে এবং সেখানে কলের পাইপের জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে পাইপ ফেটে গেছে। দেরাদুনে ১৮" তুষারপাত হয়েছে। এলাহাবাদে হিমের আক্রমণে এক সপ্তাহে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের, আগ্রায় ৭০ জনের। গোয়ালিয়রের তাপমাত্রা হিমাঙ্ক রেখারও নীচে নেমে গেছে, সেখানে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। তবে বিহারের ক্ষতিই সর্বাধিক। ভারতের উষ্ণতম স্থান গয়ায় বাহাত্তর ঘণ্টার হিমপ্রবাহে মারা গেছে ৫২ জন, পাটনায় ৬০ জন। সারা বিহারে এ পর্যন্ত ২১৮ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। বাঙলাদেশে হিমের আক্রমণে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে।—বন্যার প্রবল আক্রমণে এই সেদিন সারা দেশ একবার বিপর্যস্ত হল, এবার এল হিমের আক্রমণ। সত্যিই অবাক হতে হয় আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে। ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র নেই, তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্যের কথা, শুধুমাত্র জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তাপটুকুর অভাবে এদেশের শত শত মানুষকে শীতে কুঁকড়ে পশুপাখীর মত রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে হয়। এ দারিদ্র্য ও দুর্দশার অভিশাপ থেকে কবে আমরা মুক্তি পাব, কবে এ দেশের মানুষ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবে?

॥ স্মরণে ॥

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ, শিক্ষাব্রতী অনাথনাথ বসু—এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনজন মহান সন্তানকে হারাল বাঙলাদেশ। মহাজীবনের পতন যেন অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে আমাদের জীবনে।

মহান স্বামী বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের আর এক যোগ্য ভ্রাতা, তেজস্বী, দেশকর্মী, নির্ভীক চিন্তানায়ক ভূপেন্দ্রনাথের কর্মজীবন শুরু হয় সেদিনের বৈপ্লবিক কর্মধারার মুখপত্র 'যুগান্তরের' সম্পাদকরূপে। ঐ পত্রিকার সম্পাদকরূপেই তিনি প্রথম কারাবরণ করেন এবং এক বছর বাদে মুক্তি পেয়ে গোপনে দেশ ত্যাগ করে যান আমেরিকায়। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে আসেন জার্মানীতে এবং ঐ স্থানের ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে আবার শুরু হয় তাঁর বৈপ্লবিক কার্যক্রম। কিন্তু জ্ঞান সাধনাও তাঁর অব্যাহত থাকে এবং জার্মানীতেই তিনি অর্জন করেন তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৯২৫ সালে ভূপেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তখন থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন জ্ঞান ও কর্মের একনিষ্ঠ সাধক।

সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস ভট্টাচার্যের নিরলস সাহিত্যসাধনার সাক্ষ্য বহন করবে তাঁর রচিত বারোখানি মৌল গ্রন্থ ও চৌদ্দটি টীকা গ্রন্থ। কিন্তু সবার উপরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মূল সংস্কৃত হতে অনূদিত ১৫৯ খন্ডে বিভক্ত এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারত।

গান্ধীদর্শনের অন্যতম চিন্তানায়ক, নয়াদিল্লী সেন্ট্রাল এডুকেশন ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষণ (এম-এড) বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ও বিশ্বভারতী শিক্ষণ বিভাগে ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীঅনাথনাথ বসুর জীবনাবসান বাঙলার শিক্ষাব্রতী মহলের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৮শে ডিসেম্বর—১২ই পৌষ: 'গোয়ায় সালাজারী শাসনের (পর্তুগাল) পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিশ্বে আগুন জ্বলিবে'—সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা।

শৈত্যপ্রবাহে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এযাবত প্রায় আট শত নর-নারীর জীবনান্ত—এগারো দিন পর পাটনা ও গয়ায় সূর্যোদয়।

২৯শে ডিসেম্বর—১৩ই পৌষ: এক সপ্তাহব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরের পর ব্রেজনেফের (সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট) ভারত ত্যাগ।

'গোয়ার জনগণ ইচ্ছানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা স্থির করিবে'—মাদ্রাজের সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর গোয়া ত্যাগ আরম্ভ—পুলিশ (ভারতীয় ও গোয়ান) কর্তৃক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ।

৩০শে ডিসেম্বর—১৪ই পৌষ: 'গোয়া অভিযানের ফলে ভারতের শান্তি-নীতি পরিত্যক্ত হয় নাই'—বারাণসীর জনসভায় শ্রীনেহরুর উক্তি—নিরপেক্ষতার আদর্শে ভারত এখনও অবিচল বলিয়া ঘোষণা।

গোয়ার কারেন্সী ও বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা সম্পর্কে বিধিনিষেধ—সামরিক গভর্ণর মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথের নির্দেশনামা জারী।

৩১শে ডিসেম্বর—১৫ই পৌষ: 'নূণমাটি (গৌহাটি) শোধনাগার ভারতীয় তৈলশিল্পে নূতন যুগের সূচনা করিবে'—গৌহাটির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

'তৃতীয় পরিকল্পনাকাল মধ্যে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইবে'—কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের আশা প্রকাশ।

১লা জানুয়ারী, '৬২—১৬ই পৌষ: শুভ নববর্ষে শ্রীনেহরু (প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক গৌহাটিস্থ নূনমাটি তৈল শোধনাগারের (প্রথম রাষ্ট্রীয় শোধনাগার) উদ্বোধন—ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা।

'আসামে পৃথক পার্বত্য-রাজ্য গঠন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে'—শিলং-এ শ্রীনেহরুর বক্তৃতা—স্কটিশ ধরণের স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবেদন।

২রা জানুয়ারী—১৭ই পৌষ: পে-কমিটির মূল সুপারিশ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) সিদ্ধান্ত—কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ—মার্চ মাস (১৯৬২) মধ্যেই নূতন বর্ধিত বেতন দেওয়ার বিধি-ব্যবস্থা।

আসানসোলে দামোদরের তীরে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর ছয়জন ডাকাত নিহত।

পাঞ্জিমে ষ্টেট-ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন—সমুদ্রপথে রপ্তানী-বাণিজ্য সুরু।

ইন্দোনেশিয়ার পথে মেজর জার্মাণ টিটভের (দ্বিতীয় সোভিয়েট মহাকাশ-চারী) দিল্লী উপস্থিতি।

৩রা জানুয়ারী—১৮ই পৌষ: 'একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই মূল সমস্যা-সমূহের সমাধান সম্ভবপর'—কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশনে শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণ! অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ বি, মুখার্জি!

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সরকারী কর্মসূচী প্রণয়ন—১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা।

॥ বাইরে ॥

২৮শে ডিসেম্বর ১২ই পৌষ: মোজাম্বিকে ভারতীয়দের উপর পর্তুগীজ দলন অব্যাহত—প্রায় এক সহস্র ভারতীয়কে আটক ও যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংবাদ।

কঙ্গোলী পার্লামেন্টের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত কাতাঙ্গার একদল প্রতিনিধির যোগদান।

২৯শে ডিসেম্বর—১৩ই পৌষ: লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সংক্রান্ত আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থ—তিনজন প্রিন্সের (লাওস নেতৃত্রয়) মধ্যে গোড়াতেই মতবিরোধ।

কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও কাতাঙ্গী সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় লড়াই।

বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার বিশেষ সংস্থা গঠন—মার্কিণ দেশরক্ষা দপ্তরের ঘোষণা।

৩০শে ডিসেম্বর—১৪ই পৌষ: অসুস্থতা হেতু মিসেস জ্যাকেলিন কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্নী) প্রস্তাবিত ভারত সফর স্থগিত।

গোয়া হাতছাড়া হওয়ায় পর্তুগালের শোক—নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠান বাতিল।

৩১শে ডিসেম্বর—১৫ই পৌষ: ১৮ই মার্চ (১৯৬২) রাশিয়ার সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য—সর্বোচ্চ সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর নামে প্রচারিত ইস্তাহারে ঘোষণা।

বেইরুতে ব্যাপক ধরপাকড়—লেবাননে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টার জের।

১লা জানুয়ারী, '৬২—১৬ই পৌষ: 'সোভিয়েট-মার্কিণ সম্পর্কের উপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল'—মঃ ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধানমন্ত্রী) ও মিঃ কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) মধ্যে নববর্ষের বাণী বিনিময়।

খাস পর্তুগালে পেজা সহরে বিদ্রোহ—বিদ্রোহী দল কর্তৃক সেনানিবাস দখলের সংবাদ—শেষ অবধি বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত।

২রা জানুয়ারী—১৭ই পৌষ: হল্যান্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়ার ডাক ও তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

৩রা জানুয়ারী—১৮ই পৌষ: পর্তুগালের রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগের হুমকী: গোয়ায় ভারতের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতিদানে আপত্তি—পর্তুগীজ জাতীয় পরিষদে ডাঃ সালাজারের (প্রধানমন্ত্রী) ভাষণ।

ওলন্দাজ-কবলিত পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশীয় প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা—রাজধানী ও নূতন প্রদেশের যথাক্রমে 'কোস্ট বেরাম' ও 'ইরিয়ান বয়াট' নামকরণ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য ॥

১৯৬১-র মে মাসে নয়াদিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, দেশের মধ্যে যে বিদ্বেষ এবং বিভেদ দেখা যাচ্ছে তার ভাবগত সংহতি প্রয়োজন, এবং সেই সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দকে নায়ক করে বারোজন সদস্য সম্বলিত এক কমিটি গঠিত হল। সেই ভাবগত ঐক্য কমিটি বা Emotional Integration Committee তাঁদের প্রাথমিক পর্যায়ের রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং এই রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি ভাষা গ্রহণের সুপারিশ অনুমোদন করেছেন।

ভাবগত সংহতি কমিটির মূল বক্তব্য : "education properly oriented can prove the greatest cohesive force in the country"—কথাটি ঠিক, কিন্তু সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, পুঁথি অনুসারে এখনও সবাই জানে যে, ভারত আমার দেশ, আমি ভারতীয়, তবু এত বিভেদ কেন, এত বিদ্বেষ কেন?

অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে জাতীয় সংহতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড, ন্যাশান্যাল ক্যাডেট কোর প্রভৃতি এই কর্মে এক সুমহান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের শিক্ষা প্রতিটি শিশুর আঁতুড় ঘরেই হওয়া উচিত। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যদি কলুষিত থাকে, শৈশব থেকেই সে এক বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে, ভাষাগত, বর্ণগত বিভেদ সংস্কারের মত চিত্তে বদ্ধমূল হয়ে যায়, অনেক চেষ্টার পর তাকে আর মন থেকে উৎপাটন করা যায় না। একাত্মতার আদর্শ আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা যথেষ্ট পরিমাণে দেখিয়েছেন, বাংলা দেশের বীর বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন শুধু বাংলার স্বাধীনতার জন্য নয়, সারা ভারতের মুক্তিই তাঁদের লক্ষ্য ছিল, খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ভারত নয়, এক অবিভাজ্য বৃহৎ ভারত ছিল তাঁদের স্বপ্নের দেশ। ১৯৪৭ পর্যন্ত দেশে সেই মনোভাব ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর রাতারাতি যেন সব পরিবর্তিত হল। স্বাধীনতার যেন হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফের মত 'তোমার-আমার' আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কালে তাই কোন্ প্রদেশের ভাগে কতখানি বেশী এবং কতখানি কম লেখা যায় তার চেষ্টা হয়। সরকারী আনুকূল্যে যে এই সব ঘটনা ঘটে সে কথা বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার আগেও বলেছেন, আবার সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন। আসামের ভাষাগত সংগ্রামে ধামাচাপা নীতি কি ভাবে গৃহীত হয়েছে সে কথাও সকলে জানেন, সুতরাং এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে স্কুলের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়ে, একই ধরণের পোষাক পরিয়ে, জাতীয় সংগীত গান করিয়ে কি ভাবগত সংহতি রক্ষা করা সম্ভব? মানসিক ঔদার্যবৃদ্ধির জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন তার জন্য কি আমরা সচেষ্ট হয়েছি?

এখনও বিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস, ভূগোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হয়, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাধিকার এই তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে 'সমাজবিজ্ঞান' নামে পড়িয়ে থাকেন। ছাত্র তার পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বুঝতে পারে তার ক্ষুদ্র গ্রাম বা শহরটি এক বৃহত্তর রাষ্ট্রের সামান্যতম অংশ মাত্র। জাতীয় ভৌগলিক সীমানা সুদূরে বিস্তৃত এবং সেই সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র মানবজাতির নাম—'ভারতীয়', তারা সবাই এক সূত্রে বাঁধা, সহস্র জীবনের মন এক সূত্রে বাঁধা, তারই নাম ঐক্য বা সংহতি। এই সুবিশাল দেশমাতৃকার কাছে আনুগত্যের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ।

জাতীয় গৌরব নিয়ে অতিমাত্রায় গর্ববোধ করাও আবার ভালো নয়, তার ফলে হিটলারী বা মুসোলিনির জাতীয়তাবাদের মনোভাব মনে জাগতে পারে, তাই তার বিপদ আছে। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, তার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, বহু বিচিত্র ভাষার মালা আর আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে দেশের জাতিগত বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে, তাই এদেশে আতিশয্যজনিত সংকটের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ভারতের যোগসূত্র ছিল সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থা। ইংরাজী শাসনের ফলে সেই ভাবগত সংহতির মূলে প্রথম কুঠারাঘাত হয়েছে। সবাই ইংরাজী ভাষা কায়দা-কানুন রপ্ত করে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চোখা চোখা বাক্য নিক্ষেপ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম করলেন। ভারতের অধিকাংশ নেতাই ইংরাজীনবীশ, ইংরাজী ভাষায় রচিত সংবাদপত্রে আমরা অতিশয় কড়া প্রবন্ধ রচনা করে ইংরাজকে বলেছি—'কুইট্ ইণ্ডিয়া', আর দেশ যখন স্বাধীন হল, সেই স্বাধীনতার জন্মলগ্নে যে বাক্য আমাদের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হ'ল তা পবিত্র হিন্দিতে "আংরেজী হঠাও"।

অপেক্ষাকৃত ধনী সন্তানের মিশনারী স্কুলে, কিংবা পাবলিক স্কুলের ধরণে গঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে বাধা নেই, ধনীগৃহে ইংরাজী কায়দা-কানুন, বেশভূষা পরিধানে আপত্তি নেই, ডিনার, লাঞ্চ, ককটেল পার্টিতে আপত্তি নেই, সাহেবী ধরণে ককটেল-গ্লাসে টমাটোর রস পান করতেও আপত্তি নেই, কিন্তু "আংরেজী—হঠাও"—

দেব-নাগরী অক্ষরে দেশ ছেয়ে গেল, সরকারি ভবন, সরকারি পোস্টকার্ড, কারেন্সী নোট প্রভৃতি দেব-নাগরী চালু হল। সরকারি বেতার প্রতিদিন হিন্দি ভাষার প্রচারে সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয় করতে লাগল এমন কি ফিল্ম ডিভিসনের ছবিও প্রচারপত্র হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ভাবগত সংহতির ফাটল দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এখন প্রতিদিন যদি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বলে—"আমার পিতামাতা, শিক্ষক, দেশ—সকলকে ভালোবাসিব"—তাহলে সেই বাক্যের দ্বারাই কি ভাবগত সংহতি সম্ভব হবে?

যে মানুষগুলি একদিন দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ করেছিলেন, আজ আর তাঁরা নেই, এখন সেই আকারে কি "আমার দেশকে সমৃদ্ধ করব, গড়ে তুলব" এই মনোভাবসম্পন্ন মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারেন না?

ভাষাগত বিভেদ, সাংস্কৃতিক বিভেদ আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তাকে আরো বিস্তৃত করার জন্য একমাত্র ঔষধ হিসাবে হিন্দী ভাষার বোঝা সমগ্র ভারতের বুকে চাপিয়ে দিলেই কি ভাবগত সংহতি বৃদ্ধি পাবে?

ভাষা নয়, বর্ণবিভেদ নয় নতুন দেশের নতুন মানুষের যদি সর্বত্র সমান সুযোগ ও সুবিধালাভ ঘটে তবেই মিলনের সেতু রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। কমিটির সুপারিশে রাতারাতি দেশে শুভেচ্ছা এবং সহৃদয়তার বন্যা নিশ্চয়ই প্রবাহিত হবে না।

ইংরাজী বিদায় করে সর্বত্র সকল কর্মে হিন্দি চালানোর ফলে দেশে ভাবগত সংহতি বৃদ্ধি পাবে—একথা নিশ্চয়ই কেউ মনে করেন না, কিন্তু যা ছলে করা সম্ভব নয় তা বলের দ্বারা করা যায়, তাই আবশ্যিক ভাবে হিন্দি চাপাও। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় কাজাগাম-পন্থীরা প্রবল হয়ে উঠছে সুতরাং কনশেসান স্বরূপে হিন্দিভাষীরা দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা শিখবে এই প্রস্তাব আছে।

যার পিছনে যুক্তি আছে তা সর্বজন-গ্রাহ্য, ডঃ সম্পূর্ণানন্দের কমিটির বক্তব্যের মধ্যে যেটুকু গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে কারো আপত্তি থাকবে না, শিশুদের মনে জাতীয় ভাবধারা প্রসারের জন্য চেষ্টা করা সর্বদা কর্তব্য, সংস্কার-মুক্ত মন নিয়েই তা করা সম্ভব।

আজ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে শুধুমাত্র আঞ্চলিক তুষ্টি-সাধনের উদ্দেশ্যে, সেইসব স্থানে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের সমানাধিকার নেই। ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রতি সমান শ্রদ্ধা সব অঞ্চলে নেই, শুধু "আংরেজী হঠাও" নয় সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলিকেও বধ করার জন্য প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে। ভাবগত সংহতি-বিনাশের সেই সর্বনাশা অস্ত্রটিকে সংহত করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। হিন্দির সমৃদ্ধি হোক, হিন্দি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক এ সকলেরই কাম্য, কিন্তু অন্য কোন ভাষাকে বধ করে নয়। তার পিছনে যে কোনও শক্তিমান প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য থাকুক, এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি দেশে আরো অশান্তি বৃদ্ধি করবে। ঐক্য নিশ্চয়ই সকলের কাম্য, কিন্তু শুধু বাক্যে নয়, এর পিছনেই আছে মাণিক্যের মোহ। সেই মাণিকাটুকুর দিকেই সর্বাধিক আগ্রহ থাকায় সংহতির এই দুর্গতি ঘটেছে। অতঃপর জয়পুরে কি ঘটে তার দিকেই সশঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকতে হবে।

নতুন বই

জাগর দীপ—(উপন্যাস)—অঞ্জলি বসু। মেরিট পাবলিশার্স, ৫১নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা।

সাধারণ প্রেমের উপাখ্যান হলেও অধিকাংশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। জীবন-চক্রের পথ-পরিক্রমায় মানুষের মনোভূমি বিচিত্র মানসিক চিন্তা-চেতনায় পূর্ণ। আর তারই অন্তরালে চলেছে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের দ্বন্দ্ব। শেষকালে জয় হল সত্যের। সত্যের পূর্ণতায় মাঝখানে গিয়ে যখন অপর্ণা সার্থক স্থান খুঁজে পেল তখনই জীবন সুন্দর হয়ে উঠল।

লেখিকার রচনাশৈলী স্বচ্ছ সাবলীল ও স্বাভাবিক। তাই ঘটনার গতি তরতর করে এগিয়ে গেছে পরিণতি সাধনের পথে। কোথাও জটিলতার সৃষ্টি করে পাঠক ঠকানোর প্রয়াস নেই। লেখিকা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করবেন—তাঁর

এই প্রথম উপন্যাসে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চৌধুরী বাড়ি— (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ রায়। গ্রন্থালয়, ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি সাধারণ ধরণের প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে। বিস্তৃত আকারের উপন্যাসটির কাহিনী সংস্থাপনায় ঘটনার জটিলতা সৃষ্টিতে এবং চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশসাধনে উপন্যাসকার মোটামুটিভাবে সার্থক হয়েছেন। এ-ধরণের বৃহৎ উপন্যাস রচনায় আরও দক্ষ শিল্পী-স্বভাবের প্রয়োজন। কাহিনী যাতে অযথা বড় হয়ে না ওঠে সেদিকে দৃষ্টিদানের প্রয়োজন পড়ে। রজত চরিত্রটি আরও সংক্ষিপ্ত স্থান জুড়ে থাকলে হয়ত উপন্যাসটি আরও সার্থক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠত বলে মনে হয়।

আলোক লগন— (উপন্যাস)—উত্তম-পুরুষ। তুলিকলম, ১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

গ্রামের ছেলে সহরে এল বাপ-মাকে হারিয়ে। রেখে এল বিধবা দিদিকে। তারপরের ইতিহাস দীর্ঘ। কঠোর জীবন-সংগ্রাম। ধনী কন্যাকে বিবাহ করে যখন সে বিলেত থেকে ফিরে এল তখন সাংসারিক জীবনে অশান্তি। দিদিকে হারাতে হল। কঠোর আঘাত পেয়ে পালিয়ে গেল দূরপল্লীতে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। উদ্দেশ্যহীন পথ-পরিক্রমা সুরু হল।

এ-উপন্যাসটিতে একটি আদর্শ প্রচার করবার চেষ্টা করা হলেও তার ধারা কাহিনীর গতিপ্রবাহের স্বাভাবিক ধারা বিশেষ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং জটিলতা পাওয়া যায়। ঘটনার নাটকীয়তা সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক মোটামুটিভাবে দক্ষ বোঝা যায়। তাঁর পূর্বরচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি এ-দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে এ-উপন্যাসে সমীরের দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তের মনোবিশ্লেষণে তিনি সার্থক হয়েছেন। সমীরের শেষ পরিণতি আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যাই হোক তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের প্রতীক্ষায় রইলাম। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই মনোরম।

তিথিপর্ণা— (উপন্যাস)—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সাহিত্য-জগতে কবি হিসাবে পরিচিত। তাঁর রচিত গল্প বা উপন্যাস কখনো দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটিতেই কথা-সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি। বিনায়ক সেনের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জমীদার। ভাগ্যচক্রে সে মলঙ্গা লেনের সরু গলির বাসিন্দা। দারিদ্র্য আর সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করে মধ্যবিত্ত বিনায়ক তার সাহিত্য-সাধনা অব্যাহত রাখে, সে কবি। বিনায়কের স্ত্রী তার সকল কর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করে। বিনায়ক কিন্তু একদিন তহবিল তছরূপের দায়ে ধরা পড়ে। বিনায়ককে সহায়তা করে স্বপ্নার বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রণয়ী সুকুমার। বিনায়ক অবশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। লেখক বিশেষ কৌশলে আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা— (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক সন্তোষ দত্ত। প্রকাশক এস ব্যানার্জি কোং, কলিকাতা: ৯। দাম—১·৫০।

পর পর দুটি জাতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এই বছর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের কাজে হাত লাগিয়েছেন। স্বভাবতই জাতীয় পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে দেশের লোকের জানার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জিজ্ঞাসা অধ্যাপক সন্তোষ দত্তের লেখা বইটি পড়ে অনেকখানি পরিতৃপ্ত হতে পারে বলে আশা করি। জটিল অর্থ-নৈতিক তত্ত্বের বাইরেও পরিকল্পনা-গুলির যে একটা সহজ ও সর্বজনীন রূপ আছে তা অধ্যাপক দত্তের লেখা বইটিতে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচনাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক দত্ত বহু স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন। সেকারণে বইটি পড়লে তিনটি পরিকল্পনা সম্পর্কেই একটা ধারণা করা যায় এবং প্রথম দুটি পরিকল্পনার সাফল্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

প্রবন্ধ সাহিত্যে অধ্যাপক দত্ত এখন সুপরিচিত। অতি কঠিন বিষয়কেও সহজে পরিবেশন করার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। বইখানি তাই শুধু অর্থনীতির ছাত্রদেরই নয় সাধারণ চিন্তাশীল পাঠকদের কাছেও সমাদর পাবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

বন্ধুর প্রান্তর (উপন্যাস)—শ্রীস্পুটনিক। মাতৃ প্রকাশনী, ৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম ২·৫০ ন, প।

আলোর পরিধি (কবিতা)—শ্রীসলিল মিত্র। কারেন্ট বুক সপ্, ৫৭ কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম ১·৫০ ন, প।

আগুন হতে গিয়ে (কবিতা)—নিমাই-কুমার ঘোষ। প্রকাশনী কমলা, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

কৃষ্ণকলি (কবিতা)—শ্রীসুকুমার সেন-গুপ্ত। প্রতিমা পুস্তকালয়, ডি১ আনন্দ পালিত রোড। কলি-১৪। দাম ১·৭৫ ন, প।

প্রণয় গোস্বামীর গল্প—শ্রীপ্রণয় গোস্বামী। পুস্তক, ৮।১বি **শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-১২। দাম** ২·৫০ ন, প।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙলাদেশ (আলোচনা)—শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, বি সরকার এণ্ড কোং; ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলি—১২। দাম দুই টাকা।

রবি কাহিনী (জীবনী)—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। আলোক-ভারতী। ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি—১৩। দাম ১·৫০ ন, প।

রবিতর্পণ (কবিতা)—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ জানা। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। দাম ৩·০০

জাহাজ ঘাটা (কবিতা)—শ্রীশোভাময়। বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা—১২। দাম ৭৫ ন, প।

সরল গীতা (গীতা ভাষ্য)—শ্রীপ্রীতি-কুমার ঘোষ। পি, কে, ঘোষ এণ্ড কোং; ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলি-কাতা—৪। দাম ১·৫০ ন, প।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

মঞ্চশিল্পীদের অবস্থান ধর্মঘট :

বর্তমান রঙমহলের কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ৩১এ ডিসেম্বর থেকে দ্বার রুদ্ধ করেছেন, এ খবরও যেমন পাঠকের অজানা নেই, তেমনি তার পরবর্তী সংবাদও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, রঙমহল শিল্পী-গোষ্ঠী ঐ থিয়েটারে অবস্থান ধর্মঘট করছেন। মঞ্চশিল্পীদের অবস্থান ধর্মঘট বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নিশ্চয়ই একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার। আগে কখনও এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। দিল্লী শহরে কোনও হিন্দী রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা নাকি কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান ধর্মঘট করে তাঁদের অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। রঙমহল শিল্পীদের দাবী, একটি সমবায়সংস্থা হিসেবে তাঁদের ঐ রঙ্গমঞ্চ চালাবার অধিকার দেওয়া হোক। এবং এই সম্পর্কে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উভয়-পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি ন্যায়সঙ্গত সর্তে আবদ্ধ হতে চান। শিল্পীগোষ্ঠী এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মধ্যস্থতা কামনা করেছিলেন। শোনা যাচ্ছে, গেল শুক্রবার ৫ই জানুয়ারী ডাঃ রায়ের সঙ্গে উভয়পক্ষই মিলিত হয়েছিলেন, কিন্তু অনেক আলোচনার পরেও কোনো আশু মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং সময় চাওয়া হয়েছে। তিনি নাকি দু'দলকেই যতশীঘ্র সম্ভব ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমরাও চাই, গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি হয়ে রঙমহলের পাদপ্রদীপ শীঘ্রই আবার আলোকিত হয়ে উঠুক।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের "বধূ" চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

রঙমহলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রান্তরে প্রকাশিত একটি চিঠির লেখক বলছেন "আমাদের ধারণা রঙমহলেরই একাধিক নাটক—যেমন, 'উল্কা', 'মায়ামৃগ', 'এক মুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি' প্রভৃতি—বহুল জন-প্রিয়তা অর্থাৎ ব্যবসায়ীক সাফল্য অর্জন করেছে। এই সব নাটক কর্তৃপক্ষকে কম টাকা দেয়নি। দু-একটি নাটকে যদি আর্থিক লাভ নাও হয়, তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা থিয়েটার বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন কেন, বুঝলাম না। এতই কি দুরবস্থা হয়েছে তাঁদের? তা ছাড়া সংস্কৃতির দিকটাও কি তাঁরা ভেবে দেখবেন না?" ইত্যাদি।

প্রথমেই বলি, দেশের সংস্কৃতি নিয়ে মাথাব্যথা আর যার করবার করুক, সাধারণ রঙ্গালয়ের ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষ ওর ধার ধারেন না একটি কড়াও। তাঁরা যে তাঁদের টাকাকে ব্যাঙ্কে না রেখে বা তা দিয়ে সরকারী কাগজ না কিনে থিয়েটারের কারবারে লগ্নী করেছেন তার একমাত্র কারণ, সরকারী কাগজ বা ব্যাঙ্কের সুদ অত্যন্ত কম, আর এই কারবারে মুনাফা অনেক বেশী। কিন্তু যেখানেই বেশী লাভের লোভ, সেখানেই কিছু ঝুঁকিও (risk) নিতে হয়, এই সহজ সত্য কথাটা তাঁরা বেশীর ভাগ সময়েই মনে রাখেন না। তাঁরা মনে করেন যে নাটকই খোলা হবে তাতেই প্রেক্ষাগৃহ গমগম্ করার সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যে ঝনৎকার শুনতে পাওয়া যাবে পুরো দমে। দু'একখানি নাটক আশা অনুযায়ী টাকা আমদানী করতে না পারলেই তাঁদের চোখ ওঠে কপালে, মাথা যায় ঘুরে—মনে ভাবেন, তাইতো একি হোলো? এ লোকশান সই কি করে? কিন্তু কিছুদিন আগেই আর পাঁচখানি নাটকের অভিনয়কালে টাকা যে সিন্দুক ছাপিয়ে উঠছিল, একখানির

জায়গায় তিনখানি মোটরকার খরিদ করা হয়েছিল, এসব কথা তাঁদের মনে পড়ে না। বর্তমানের ঘাটতি পূরণ করতে যে টাকা বার করতে হচ্ছে, তা যে কিছুদিন আগেকার লাভেরই টাকা, একথা তাঁদের মন কিছুতেই স্বীকার করতে চায়না, তাঁদের মন ক্রমাগত বলে, ঘর থেকে টাকা বার করে লোকসানের ধাক্কা সামলানো কি বুদ্ধিমানের কাজ? ও তো মূর্খতার নামান্তর মাত্র। অতএব দিনকাল যখন খারাপ, তখন দাও ঝাঁপ বন্ধ করে—যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি।'

অবশ্য এর পরেও কথা থাকে। বর্তমানে উত্তর কলকাতায় যে চারটি সাধারণ রংগালয় আছে, দেশে নাট্যকে হুজুগের বান বইতে থাকায় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর কল্যাণে এদের প্রত্যেকটির বার্ষিক আয় কত হচ্ছে, তার একটা হিসেব দরকার হয়ে পড়েছে। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে সাধারণ রংগালয়ের অভিনয় হয়ে থাকে গড়পড়তা একশো পঁচিশ। বাকী একশো আশি দিন এবং রবিবার সমেত প্রায় প্রত্যেকটি ছুটির দিন সকালে মঞ্চগুলি ভাড়া খাটে। রংগালয়গুলির প্রাইভেট বুকিংয়ের খাতা খুললে দেখা যাবে বছরে কমবেশী দুশো থেকে আড়াইশো দিন বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চগুলি দখল করে অভিনয়ের জন্যে। প্রতিটি অভিনয়ের জন্য দেয় ভাড়ার পরিমাণ ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত। কাজেই একথা নিশ্চয়ই কাউকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না যে, সাধারণ রংগালয়গুলি তাঁদের অভিনয় চালাবার জন্যে যে খরচ করে থাকেন, তার বেশ একটা মোটা অংক উসুল হয়ে আসে এই ভাড়ার টাকা থেকে। এর পরেও যদি কোনো রংগালয়ের কর্তৃপক্ষকে লোকসান বাঁচাবার জন্যে সাধারণ অভিনয় বন্ধ বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলে গোলো-যোগটা কোথায় সেটা যথার্থই অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

সুশীল মজুমদার পরিচালিত "সন্ধ্যারাণী" চিত্রে কণিকা মজুমদার

থিয়েটার ইউনিট-এর "কৃষ্ণচূড়া":

দক্ষিণ কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে প্রতি বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷টায় 'থিয়েটার ইউনিট"-নামে নাট্যগোষ্ঠী (অবশ্য নামের মধ্যেই সে-পরিচয় আছে) নিয়মিতভাবে "কৃষ্ণচূড়া" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করছেন। শুনে খুসী হলুম, এঁদের অভিনয় ওই অঞ্চলের নাট্যরসিক জনসাধারণের মধ্যে একটি সুস্থ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং "কৃষ্ণচূড়া"র অভিনয় দেখবার জন্যে উৎসাহী দর্শকরা মহারাষ্ট্র নিবাসের প্রেক্ষাগৃহে পদধূলি দিতে কার্পণ্য করছেন না।

একদা এই দক্ষিণ কলকাতাতেই 'কালিকা" থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল প্রচুর আড়ম্বরের সংগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী শ্রীরাম চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে "কালিকা" থিয়েটার দীর্ঘ দিন—অন্ততঃ দশ বছর দক্ষিণ কলকাতার নাট্যরসিক দর্শক-সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করেছিল। পরে রংগালয়টি চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয় মালিকের খেয়ালখুশীমত। গেল শুক্রবার, ৫ই জানুয়ারী থিয়েটার ইউনিটের "কৃষ্ণচূড়া" নাট্যাভিনয় (এটি ছিল বিশেষ অভিনয়) দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, থিয়েটার ইউনিট এবং থিয়েটার সেণ্টারের "মুখোস"-সম্প্রদায়ের নিয়মিত অভিনয় দক্ষিণ কলকাতার দর্শক সাধারণের নাট্যরসপিপাসা কিছু পরিমাণে মেটাবার সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করলেও যতদিন পর্যন্ত না ঐ অঞ্চলে একটি আধুনিক রুচি ও বিজ্ঞানসম্মত যথার্থ থিয়েটারগৃহ (legitimate theatre) গড়ে উঠছে, ততদিন পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ধান ভানতে শিবের গীতের মত শোনালেও আমরা দক্ষিণ কলকাতার নাট্যোৎসাহী সুধীবৃন্দকে

এই ব্যাপারে একযোগে একটি সার্থক আন্দোলন গড়ে তুলতে পরামর্শ দেব, যাতে অনতিকালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে একটি অভিজাত সাধারণ রঙ্গালয় স্থায়ীভাবে গড়ে উঠতে পারে।

"কৃষ্ণচূড়া"—বসন্তে রক্তরাঙা ফুলে যার শাখা-প্রশাখা ঢেকে গিয়ে পথিকের মনকে যৌবনোন্মাদ করে তোলে। সমরসেট মম-এর Sheppy গল্প অবলম্বনে শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কৃষ্ণচূড়া'-নাটকের নায়ক, জয় হিন্দ হেয়ার কাটিং সেলুনের অন্যতম কারিগর নিতাই-এর জীবনও একদিন বিচিত্র বর্ণে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, যেদিন তার স্ত্রী, মেয়ে, জামাই থেকে সেলুনের মালিক, সহকর্মীরা এবং তার চেনা-জানা সকলেই জানত, সে রেঞ্জার্স লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ বাবদ ৪২,০০০্ হাজার টাকার মালিক হতে চলেছে। অন্য সকলের মাথা খারাপ হলেও নিতাইয়ের কিন্তু কোনও রকম মতিবিভ্রম ঘটেনি, যদিও সকলের মতে মাথা খারাপ না হওয়াটাই তার মাথা খারাপের লক্ষণ। টাকাটা হাতে পেলে সকলেই যা করবে বলে ভাবে, যেমন—বাড়ী, গাড়ী, বড় ব্যবসা, ভালো খাওয়া-দাওয়া-থাকা ইত্যাদি, নিতাই তা আদৌ ভাবল না: সে বললে, তার আগে থাকতেই ঠিক করা আছে, সে কি করবে। জানা গেল, সে টাকা হাতে পেলে দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করবে, অভাবে পড়ে লোকে যাতে চুরি না করে, সেই ব্যবস্থা করবে, খাওয়া-পরার সমস্যা মেটাবার জন্যে কোনো গৃহস্থ বধূ যাতে নিজের দেহ বিক্রয়ে বাধ্য না হয়, সে তা দেখবে, দারিদ্র্যের অভিশাপকে সে ঘোচাতে চেষ্টা করবে। এবং লটারীর টাকা হাতে পাবার আগেই সে কাজ সুরু করে দিলে। পণ্টু নামে একটি ছি'চকে চোর এবং কমলা নামে এক পতিতাকে সে নিজের বাড়ীতেই আশ্রয় দিল তাদের অর্থাভাবজনিত স্খলিত চরিত্রকে সংশোধনের আশায়। মেয়ে, সবি এবং জামাই গোবিন্দ তার এই অদ্ভুত আচরণে ক্ষেপে উঠলেও তার প্রেমময়ী স্ত্রী বিভা তার কাজকে সমর্থনই করল। কিন্তু রক্তচাপের রোগী নিতাই তার এই সামাজিক দায়িত্বকে বেশীদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারল না। যখনই সে আবিষ্কার করল, তার চেষ্টায় সে বিফল হয়েছে, বাঁচবার মত আশ্রয় পেয়েও পণ্টুর চৌর্যবৃত্তি গেল না, কমলা আবার পতিতার জীবনেই ফিরে গেল, তখন আশাহত নিতাই নিজের অন্তর বেদনাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না, মুহূর্তে তার অন্তরবেদনা তাঁর শারীরিক রোগের বিস্তার ঘটাল, যার ফলে সে ঢলে পড়ল মৃত্যুর হিমশীতল কোলে।

সন্তোষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মন দিল না বঁধু' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সবিতা বসু

বুঝতে কষ্ট হয় না যে, "কৃষ্ণচূড়া" নাটকটি মনস্তত্ত্বমূলক। তাই ঘটনার ভীড় নেই। একটি মাত্র লটারীর টাকা পাওয়ার সংবাদ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং নাটকের কেন্দ্রবিন্দু সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে কিভাবে স্থানচ্যুত হয়েও নিজের ভারসাম্যকে ফিরিয়ে পাবার চেষ্টা করছে, তাই হয়েছে নাটকের উপজীব্য। কিন্তু প্রচুর সামাজিক জিজ্ঞাসাসূচক সংলাপ নাটককে অযথা ভারাক্রান্ত করেছে এবং অবচেতন মনের কথোপকথন থেকে সমাজসংস্কারের আদর্শকে মিথ্যা জানবার পর মুহূর্তেই নিতাইয়ের মৃত্যু অনিবার্য হলেও বড্ড বেশী আকস্মিক বলেই মনে হয়।

কিন্তু "কৃষ্ণচূড়া" নাটকের দুর্বলতাকে চমৎকারভাবে ঢেকে দিয়েছেন থিয়েটার ইউনিটের শিল্পিবৃন্দ তাঁদের নাট্যনৈপুণ্যের দ্বারা। স্বাভাবিক অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখালেন নিতাই-এর চরিত্রে শেখর চট্টোপাধ্যায়। তিনি কোনও একটি জায়গাতেও মনে করতে দেননি যে, তিনি অভিনয় করছেন। নিতাই-এর স্ত্রী, বিভার ভূমিকায় দীপিকা ভট্টাচার্য ও গৃহস্থ বধূর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, এবং স্বামীর কার্য সম্পর্কে আন্তরিক সমর্থনাকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। ভ্রষ্টাদর্শ ছি'চকে চোরকে মূর্তিমান দেখলুম প্রণয় সোমের অভিনয়ের

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশংকরের 'উত্তরায়ণ' চিত্রের একটি বেদনা-করুণ দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও আশা দেবী

ভিতর। বারবিলাসিনী কমলার ভূমিকায় সাধনা রায় চৌধরী তার মানসিক পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সু-অভিনীত হয়েছে পরিচালনার গুণে।

মহারাষ্ট্র নিবাসে অভিনয়মঞ্চ এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানের সংকীর্ণতার কথা বিবেচনা করলে "কৃষ্ণচূড়া"র মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত প্রভৃতি আঙ্গিকের কাজ যথেষ্টই প্রশংসা পাবার যোগ্যতা রাখে। বিশেষ করে অবচেতন মনের মূর্তিময়ী আবির্ভাবকে যেভাবে মঞ্চের উপর তুলে ধরা হয়েছে, তা তাপস সেনের জাদুস্পর্শ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। আবহ-সঙ্গীতের প্রক্ষেপে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলেও আবহ-সঙ্গীত এবং ধ্বনি নাটকীয় রসকে গাঢ় করতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

"কৃষ্ণচূড়া" নাট্যরসিকদের নবতম আনন্দের সন্ধান দেবে।

বিবিধ সংবাদ

: একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা :

ইংরাজি বর্ষশেষের শেষ সন্ধ্যা একটি চমৎকার আনন্দোজ্জ্বল স্নিগ্ধসুন্দর রমণীয়তার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে আমার। একটি সন্ধ্যাকে রসেরূপে উপভোগ্য করে তোলার জন্যে প্রশংসার দাবী করতে পারেন উত্তর কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সংগীতসংস্থা 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র পরিচালক এবং কর্মীবৃন্দেরা। উপলক্ষ্য ছিল সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাসের অষ্টাদশ বার্ষিক স্মৃতি-পূজা এবং সংঘের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন। স্থান : ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট—সময় ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছটা।

সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল কলিকাতা আকাশ বাণীর প্রখ্যাত : অধুনা-বিস্মৃত সুরস্রষ্টা ও সংগীত পরিচালক। বহু বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করে গেছেন এই সংগীতপাগল আত্মভোলা মানুষটি। বিশেষ করে যন্ত্র-সংগীতের রাজত্বে তাঁর দান অতুলনীয়।

এই স্মৃতিপূজা উপলক্ষে সংগীতাচার্যের শিষ্য-শিষ্যারা তাঁর উদ্ভাবিত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সঙ্গে সংগীত-রসিকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হলেন।

এই স্মৃতি-উৎসবে কন্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সংগীতের বিপুল আয়োজনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে 'সেতার বিচিত্রা', 'পুরাতনী' গান, 'পল্লী-গীতি', প্রভৃতি। হিমাংশু দত্ত সুর-সাগরের 'ঝরানো পাতার পথে' ও 'বন্ধন-হারা এই বন্ধুর পথ' সমবেতভাবে গীটারে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই স্মরণীয় সন্ধ্যাকে আনন্দ মুখরিত করে তুললেন সুগায়ক সারদা গুপ্ত শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাঠাকুর) রচিত 'ভোটামৃত' হাসির গান গেয়ে। স্থানাভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব হল না। তবে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই স্মরণীয় সন্ধ্যাকে রমণীয় করে তুলতে যথাসাধ্য করেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

* * *

কমলা থ্রিরীং সার্কাস :

পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, কমলা থ্রিরীং সার্কাসের মত বড় দেশী সার্কাস এপর্যন্ত কলকাতায় আসেনি। এঁদের ট্রাপিজের খেলা এক কথায় রোমহর্ষক; প্রায় পঞ্চাশ জন সুগঠিতদেহী যুবক-যুবতী এতে অংশ গ্রহণ করেন এবং একসঙ্গে দুটি রীংয়ে খেলা দেখাতে থাকেন। দর্শকরা রুদ্ধ নিশ্বাসে এই খেলা দেখে খেলার শেষে অজস্র বাহবা না দিয়ে পারেন না। এ ছাড়া তারের উপর সাইকেল খেলা, জমিতে এক চাকার সাইকেলের খেলা, প্লাস্টিক স্কেচ, একই রীংয়ে এক সঙ্গে বাঘ-সিংহের খেলা, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে নানা রকমের কসরৎ প্রভৃতি বহু বিচিত্র ব্যাপার দেখে যে-কোনও দর্শকের মন আনন্দে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে পড়ে। এঁদের হাসির খেলাগুলিও খুব নূতনস্বপূর্ণ; সাইকেলে চড়ে ফুটবল খেলা এবং জরাজীর্ণ মোটর অভিযান যথার্থই অভিনব।

* * *

দশরূপকের "ডানা ভাঙা পাখী" :

গেল সোমবার, ৮ই জানুয়ারী মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে দশরূপক নাট্য-সম্প্রদায় পরেশ ধর বিরচিত "ডানা ভাঙা পাখী"-কে মঞ্চস্থ করেন। নব নব আঙ্গিকে নাট্যাভিনয় করার ব্যাপারে দশরূপকের যে-খ্যাতি আছে, এই

"বাগদাদ" চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্যে বৈজয়ন্তীমালা।

নাটকের উপস্থাপনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

* * *

এস-সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় প্রয়াস :

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনী ও মণি বর্মার চিত্রনাট্য অবলম্বনে এস-সি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় প্রয়াস "কাঁটা ও কেয়া"র কাজ চিত্ত বসুর পরিচালনায় ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সুরু হয়েছে। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* *

বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের "কাজল" :

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরযোজনায় বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের নবতম নিবেদন "কাজল"-এর চিত্র গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন সবিপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি।

* * *

পরলোকে শেঠ মোহনলাল জেলোকা :

পরিবেশক সংস্থা প্রভা পিকচার্সের কর্ণধার শেঠ মোহনলাল জেলোকা অল্পদিন রোগভোগের পর গেল ২৯-এ ডিসেম্বর অকালে পরলোকগমন করেছেন। পরিবেশন ছাড়া বাঙলা ছবির প্রযোজনাতেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। মধু বসু পরিচালিত "শেষের কবিতা" ছবিটি তাঁরই প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠী :

হাওড়ার অন্যতম খ্যাতনামা সংস্থা বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ ১৪ই জানুয়ারী রবিবার রামরাজাতলায় স্থানীয় দুই প্রবীণ নাট্যশিল্পী শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীগণপতি মৈত্র বিদ্যাবিনোদকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন এবং ঐ সঙ্গে সুধাময় লাহিড়ীর 'মেঘলা আকাশ' ও রমেন লাহিড়ীর 'তমসার তীরে' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি পরিচালনা করবেন রমেন লাহিড়ী।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য :

১লা জানুয়ারী, সন্ধ্যা ছয়টায় নবগ্রাম (হুগলী) মহাদেশ পরিষদের রবীন্দ্র ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। উৎসবে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—বাবুলাল নেওয়ার। উক্ত উৎসব অনুষ্ঠানে নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন সমর মিত্র ও তাঁর সম্প্রদায়। আবহ-

সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন স্বপনা সেন-গুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, শঙ্কর পাল, গোপাল মিত্র প্রভৃতি।

কমিণ্ট ক্লাবের 'বাংলার মেয়ে' ঃ

গত ২২শে ডিসেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান দপ্তরের কর্মিগণের অবসরিক 'কমিণ্ট ক্লাব' দ্বারা 'যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বাঙলার মেয়ে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ভবানী, দেবী, বীথি, উপেন্দ্রনাথ, ক্যাপ্টেন চৌধুরী এবং সুরেশের ভূমিকায় যথাক্রমে সর্বশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরীপতি ভট্টাচার্য, সরিৎবিন্দু ঘোষ ও কৌশিকীব্রত দত্তের অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, আলোকসম্পাত ও সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী দীপেন্দু ঘোষ, বিমলকুমার বসু ও অনিল ওঝা। শ্রীআনন্দকুমার রায়ের নাট্য-পরিচালনা উপস্থিত সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে।

অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করেন ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত।

।। রাজিয়া সুলতানা ।।

হিন্দী চিত্র মুভি ইণ্ডিয়া চিত্রের 'রাজিয়া সুলতানা' চিত্রটি পরিচালনা করেছেন ঃ দেবেন্দ্র; সংগীত ঃ লচ্ছিরাম, রূপদান করেছেন—নিরুপা রায় জয়রাজ, কামরাণ, আগা প্রভৃতি।

হলিউডের অস্কার প্রতিযোগিতায় শান্তারাম প্রযোজিত "স্ত্রী"

প্রযোজক পরিচালক ভি শান্তারামের টেকনিকালার চিত্র "স্ত্রী" এ বছর অস্কার প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হবে। ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া সম্প্রতি এই ছবিটি মনোনীত করেছেন। শ্রীশান্তারাম অস্কার প্রতিযোগিতার সময় হলিউডে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। আগামী ১৯শে জানুয়ারী থেকে কলিকাতায় চিত্রটি মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

* * *

।। সরি ম্যাডাম ও মন দিল না বঁধু ।।

পুরো পাঁচ হপ্তা বাদে আজ ১২ই জানুয়ারী দুখানি বাঙলা ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে। এক, বি-আর-সি সিনে প্রোডাকসন্স-এর নবতম নিবেদন, দিলীপ বসু পরিচালিত "সরি ম্যাডাম" বিশ্বভারতী পিকচার্সের পরিবেশনায় শ্রী, ইন্দিরা,প্রাচী ও অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা, বিশ্বজিৎ, ছবি বিশ্বাস, দিলীপ রায়, জহর রায় প্রভৃতি। দুই, এস-কে-প্রোডাকসান্স নিবেদিত ছবি "মন দিল না বঁধু" মুক্তি পাচ্ছে দর্পণা, ছায়া, লোটাস, আলেয়া ও অন্যান্য ছবিঘরে। ছবিটির পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায় এবং এর রূপায়নে আছেন সবিতা বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও অধুনা-পরলোকগত তুলসী চক্রবর্তী। এস্-কে পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

।। "রূপান্তরী"র একাঙ্ক নাটক ।।

আগামী ১৫ই জানুয়ারী '৬২ সন্ধ্যা ৭টায় "রূপান্তরী"র শিল্পীগোষ্ঠী দুইটি একাঙ্কিকা দক্ষিণ কলিকাতার "থিয়েটার সেন্টার" হলে মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছেন। পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিবেশনায় "রূপান্তরী"র যে মৌলিকত্ব আছে তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু একাঙ্কিকা পরিবেশনায় "রূপান্তরী"র এই প্রথম প্রচেষ্টা। দুইটি একাঙ্কিকা হচ্ছে, যথাক্রমে "ডাক্তার হালদার"—এর রচয়িতা শ্রীজগদীশ চক্রবর্তী এবং "পাঁচটা থেকে সাতটা"র রচয়িতা জোছন দস্তিদার। দুটি নাটকই হাসির। দুইটি একাঙ্ক নাটকেরই পরিচালনা করছেন জোছন দস্তিদার।

সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে ছবি বিশ্বাস ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

টুকিটাকি
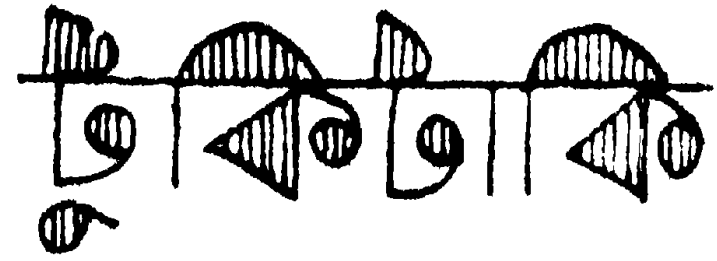
লণ্ডনের পটভূমিকায় তোলা হচ্ছে আরেকটি অদ্ভুত ছবি। ছবিটির নাম "গর্গো"। ২৫০ ফিটের একটি অতিকায় জলদানবের ৮০ ফিট দীর্ঘ শিশু (!)কে আইরিশ কোস্টে ধরা হয়। কিন্তু মা হারানো শিশুকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজেই টেমস নদী দিয়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হল। সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে সন্তানকে উদ্ধার করে আবার সে অদৃশ্য হল সমুদ্রের কল্লোলে। রূপকথার আঙ্গিকে তোলা এই চিত্রে মাতৃহৃদয়ের আকুতির ভূমিকাই প্রধান।

* * *

সাম্প্রতিক মেগাটন বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত 'দি ডে দি আর্থ কট্ ফায়ার' চিত্রটি অনেকদিক দিয়েই একটি নতুন ধরনের ছবি। চিত্রটির পটভূমি হল লণ্ডন শহর। ক্রমাগত পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্থানচ্যুত হবার পরের অবস্থাটি নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে ছবিটিতে। ভূমিকম্প, বন্যা এবং তীব্র উত্তাপে বিপর্যস্ত লণ্ডনের দৃশ্যগুলি যেন আগামী দিনের বিপদ-সংকেত। এডোয়ার্ড জাড্ বিষাদগ্রস্ত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নায়িকা জেনেট মুনরো। ছবিটি তুলছেন ভ্যাল্ গেস্ট প্রোডাকসন্স।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড—৪র্থ টেস্ট

ভারতবর্ষ : ৩৮০ রান (চান্দু বোরদে ৬৮, পতৌদির নবাব ৬৪, বিজয় মেহেরা ৬২, সেলিম দুরানী ৪৩, জয়সীমা ৩৭ এবং পলি উমরীগড় ৩৬। ডেভিড এ্যালেন ৬৭ রানে ৫, টনি লক্ ৬৩ রানে ২ এবং ডেভিড স্মিথ ৬০ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫২ রান (চান্দু বোরদে ৬১, জয়সীমা ৩৬, উমরীগড় ৩৬ এবং পতৌদির নবাব ৩২ রান। টনি লক্ ১১১ রানে ৪, এ্যালেন ৯৫ রানে ৪ এবং নাইট ১৮ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২১২ রান (পিটার রিচার্ডসন ৬২ এবং টেড ডেক্সটার ৫৭ রান। সেলিম দুরানী ৪৭ রানে ৫, চান্দু বোরদে ৬৫ রানে ৪ এবং রঞ্জানে ৫৯ রানে ১ উইকেট)

ও ২৩৩ রান (টেড ডেক্সটার ৬২, পারফিট ৪৬, রিচার্ডসন ৪২ এবং নাইট নট-আউট ৩৯। দুরানী ৬৬ রানে ৩, দেশাই ৩২ রানে ২, রঞ্জনে ৩১ রানে ২ এবং উমরীগড় ৪৬ রানে ২ উইকেট)

১ম দিন (৩০শে ডিসেম্বর) **:** ভারতবর্ষ ২২১ রান (৫ উইকেটে)। জয়সীমা ১২ রান এবং বোরদে ১৫ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

২য় দিন (৩১শে ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৮০ রানে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ১০৭ রান। পিটার পারফিট ১০ রান এবং টেড ডেক্সটার ১১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিন (১লা জানুয়ারী, ১৯৬২) : ২১২ রানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট পড়ে ১০৬ রান। পতৌদির নবাব (২৪ রান) এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (৪ রান) নট-আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (৩রা জানুয়ারী) : ২৫২ রানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট পড়ে ১২৫ রান। টেড ডেক্সটার (৬১ রান) এবং পিটার পারফিট (৩ রান) নট-আউট থাকেন।

৫ম দিন (৪ঠা জানুয়ারী) : খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ২ ঘঃ ২৩ মিঃ আগে ২৩৩ রানে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হয়।

ক'লকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১৮৭ রানে জয়লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বিগত ২৮টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার মধ্যে ভারতবর্ষের এই দ্বিতীয় জয়। ভারতবর্ষ প্রথম জয়লাভ করে মাদ্রাজে, ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্ট খেলায় এক ইনিংস এবং ৮ রানে। ১৯৬১-৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজের খেলায় এই প্রথম জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল। প্রথম তিনটি টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। মাদ্রাজের ৫ম বা শেষ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের জয়লাভ হলে অথবা খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও ভারতবর্ষ ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের 'রাবার' সম্মান লাভ করবে। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের জয় হ'লে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজের মতই 'রাবার' ড্র যাবে। ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের বিগত চারটি খেলা ধরে ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ২৮, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫, ভারতবর্ষের জয় ২ এবং খেলা ড্র ১১। ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজ বাদে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে; ফলাফল—ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৬ এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত ১।

সার্থক অধিনায়ক পলি উমরীগড়

১৯৫১-৫২ সালের অমীমাংসিত টেস্ট সিরিজের পর ভারতবর্ষ ১৯৫২ এবং ১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে দুটি টেস্ট সিরিজ খেলেছিল এবং মোট ৯টি খেলার মধ্যে ৮টি খেলায় হার স্বীকার করেছিল—১৯৫২ সালের ৪টি টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১ এবং ১৯৫৯ সালের ৫টি খেলাতেই ইংল্যাণ্ডের জয়। উপর্যুপরি

রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের জয়লাভে দর্শকদের অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস

দ্বটি টেস্ট সিরিজে শোচনীয় ব্যর্থতার পর আজ ভারতবর্ষ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কানপ্বরের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য করেছিল। কানপ্বরে ইংল্যাণ্ডকে হারানোর স্বযোগ ভারতবর্ষ হেলায় হারিয়েছে।

ভারতবর্ষের জয়লাভের পথে বড় বাধা—দল পরিচালনায় দক্ষতার এবং সাহসের অভাব। চতুর্থ টেস্ট খেলাতেও ভারতবর্ষের এই অভাব ছিল। তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ২১২ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ১৬৮ রানে এগিয়ে যায়। প্রথম উইকেটে জয়সীমা এবং কন্ট্রাক্টর ৩০ মিনিটের খেলায় ৩৭ রান তুলে দেন। কিন্তু তৃতীয় উইকেটের খেলায় মঞ্জরেকার এবং পতৌদির নবাব খেলার লাগাম জোর টেনে ধরেন। মঞ্জরেকার ১২৭ মিনিট খেলে ২৭ রান ক'রে আউট হ'ন এবং পতৌদির নবাব ৯৭ মিনিটের খেলায় তাঁর ২৪ রান করেন। মঞ্জরেকারের সঙ্গে খেলতে নেমে পতৌদির নবাব তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি। অভিজ্ঞ টেস্ট খেলোয়াড় মঞ্জরেকারের এই আত্মরক্ষাম্বলক খেলায় দর্শকরা অতি-মাত্রায় বিরক্ত হয়ে শেষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। খেলা ভাঙ্গার পাঁচ মিনিট আগে মঞ্জরেকার লকের বলে স্টাম্পড-আউট হন। তাঁর বিদায়ে দর্শকদের গ্যালারী আনন্দে ম্বখরিত হয়ে উঠে। মঞ্জরেকার এবং পতৌদির নবাবের এই আত্মরক্ষা-ম্বলক খেলা দেশে-বিদেশের সমালোচক-দের কলমে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছে। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পরও ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন য্বক্তি দর্শকরা তো খ্বঁজে পাননি, এমন কি ক্রিকেট খেলার বিজ্ঞ সমালোচকরাও না। লাঞ্চের সময় ভারত-বর্ষ ৪০১ রানে অগ্রগামী ছিল। লাঞ্চের পর ৪০ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। এই ৪০ মিনিট সময়ে মাত্র ১৯ রান যোগ হয়। অধিনায়কের সাহসের অভাবেই খেলায় এই মারাত্মক আত্মরক্ষাম্বলক নীতি। ভারতবর্ষের জয়লাভের ম্বলে ছিল চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে কন্ট্রাক্টরের অন্বপস্থিতিতে পলি উমরীগড়ের দক্ষতার সঙ্গে দল পরি-চালনা, সেলিম দ্বরানী এবং বোরদের বোলিং এবং বোরদের ব্যাটিং সাফল্য। বোরদে উভয় ইনিংসেই ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন। বোরদের প্রথম ইনিংসের ৬৮ রান উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এই চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের জয়লাভে ব্রটেন ভারতবর্ষকে 'জয়তু ভারত' আখ্যায় অভিনন্দন জানিয়েছে।

লণ্ডনের 'ডেইলি মেল'-এর প্রখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক এলেক্স ব্যানিস্টার বলেছেন, পরাজয়ের কোন ছ্বতো দেখা-বার অবকাশ নেই। ভারতবর্ষ খেলার সর্ববিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষ প্রতিটি খেলায় শক্তি সঞ্চয় ক'রে চলেছে; অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়েছে। ব্যানিস্টার আরও বলেছেন, ভারতবর্ষের ফিল্ডিং ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অনেক উন্নত। কিন্তু তারা সময়ে সময়ে ভুল করে থাকে। এই বিভাগে ইংল্যাণ্ডের অনেক ত্রুটি চোখে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ড যতদ্বর সম্ভব শক্তি-শালী দল ভারতবর্ষে পাঠাবে—জোড়া-তালিদেওয়া দ্বিতীয় দল নয়।

'ডেইলি এক্সপ্রেস' লিখেছেন, পরি-তাপের বিষয় যে, ইংল্যাণ্ডের তর্বণ খেলোয়াড়রা খেলায় আশান্বর্প পার-দর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে দলের ম্বষ্টিমেয় প্রবীণ খেলোয়াড়দের উপর বেশী পরিমাণ চাপ পড়ে। ফিল্ডিংয়ের ত্রুটির জন্যে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষকে ১০০ রান 'বোনাস পয়েন্ট' হিসাবে দিয়েছে।

'ইভনিং নিউজ'-এর মন্তব্য, ভারত-বর্ষ যোগ্য দল হিসাবে জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয়ের স্বযোগ দেখা দিয়েছে।

'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড'-এর মন্তব্য, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সফরের অপরাজিত রেকর্ড ধ্বলিসাৎ হয়েছে এবং ইংল্যাণ্ড অমর্যাদার গ্লানি বহন করেছে। মাদ্রাজের স্বদৃঢ় উইকেটে খেলার ফলাফল 'অমীমাংসিত' ছাড়া অন্য কোন কিছ্ব আশা করা যায় না।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার বলেছেন, ভারতীয় দল যের্প শক্তি-শালী, এই দলকে একটি খেলায় দ্ব'বার আউট করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই দল খেলার সর্ববিভাগে শক্তিমান হয়ে উঠেছে।

'ভারতবর্ষের টেস্ট জয়, ইংল্যাণ্ড পরাজিত এবং মর্যাদাচ্যুত'—এই ধরনের শিরোনামায় লণ্ডনের ৫ই জান্বয়ারী তারিখের সংবাদপত্রগ্বলি ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলার বিবরণ পরিবেশন করেছিল।

খেলার তৃতীয় দিন বেলা ১টা ১৪ মিনিট সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মোট ২৭৭ মিনিট খেলার পর শেষ হয়। রান দাঁড়ায় মাত্র ২১২, ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ৩৮০ রানের থেকে ১৬৮ রান কম। ভারতবর্ষ বেলা ১টা ২৫ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১০৬ রান তুলে দেয়, ৩টে উইকেট হারিয়ে। ৪র্থ উইকেটের জ্বটি পতৌদির নবাব ২৪ এবং ফার্বক ইঞ্জিনিয়ার ৪ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

২রা জান্বয়ারী, মঙ্গলবার বিশ্রামের দিন ছিল। ৩রা জান্বয়ারী ভারতবর্ষ তাদের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর আহত থাকায় এই দিন থেকে খেলতে নামেন নি। তাঁর জায়গায় পলি উমরীগড় দল পরিচালনা করেন। তৃতীয় দিনের ১০৬ রানের সঙ্গে ১৩ রান যোগ হওয়ার পরই ভারতীয় দলে ভাঙ্গন দেখা গেল। দলের ১১৯ রানের মাথায় ইঞ্জিনিয়ার (৯ রান), পতৌদির নবাব (৩২ রান) এবং দ্বরানী (শ্বন্য রান)—এই তিনজন আউট হয়ে যান। লকের বলে বিদায় নেন পতৌদির নবাব এবং দ্বরানী; ইঞ্জিনিয়ারের উইকেট পান এ্যালেন। ইঞ্জিনিয়ারের শ্বন্যস্থানে উমরীগড় খেলতে নামেন; অপর দিকের উইকেটে ছিলেন পতৌদির নবাব। দলের ১১৯ রানের সঙ্গে কোন রান যোগ হ'ল না, পতৌদির নবাব এবং দ্বরানী বিদায় নিলেন। উমরীগড় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দলের ভাঙ্গন দেখলেন। দ্বরানী এই ইনিংসে গোল্লা করলেন। দ্বরানীর অভিশপ্ত উইকেটে খেলতে নামেন বোরদে। ৭ম উইকেটের জ্বটিতে উমরী-গড় এবং বোরদে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে যান, দলের রান দাঁড়ায় ১৯২। ৭ম উই-কেটে ৭৩ রান ওঠে। উমরীগড় নিজস্ব ৩৬ রান ক'রে দলের এই ১৯২ রানের মাথায় এ্যালেনের বলে বোল্ড হ'লেন। প্রথম ইনিংসেও উমরীগড় ৩৬ রান করে-ছিলেন।

বোরদের সঙ্গে খেলতে নামেন রামকান্ত দেশাই। এই জ্বটির খেলায় কিছ্ব সময়ের জন্যে আমরা আনন্দ উপ-ভোগ করল্বম। লকের এক ওভারে ১৩ রান উঠলো। দেশাই করলেন ২টো বাউ-ণ্ডারী, ২ ও ১ রান। বোরদে করলেন ২ রান। লক সে সময়ে ব্যাটসম্যানদের 'জ্বজ্ব'—৪টে উইকেট নিয়েছেন। তাই লকের এক ওভারে ১৩ রান উঠতে দেখে সারা মাঠ আনন্দে ভেঙ্গে যায়, সেই সঙ্গে মনের ভয়ও দ্বর হয়। লকের ঠিক পরের ওভারে দেশাই এ্যালেনের বলে একটা ওভার-বাউণ্ডারী করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে দর্শকদের আনন্দ কানায় কানায় ভরে উঠলো। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়ায় ২৩৩ রান, ৭ উইকেট পড়ে। বোরদে ৪১ রান এবং দেশাই ২৯ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরবর্তী ৪০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে ১৯ রান যোগ হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর খেলা আরম্ভ করলেন নাইট। বোলার বদলী ক'রে

ডেক্সটার হাতে-নাতে সুফল পেলেন। নাইট প্রথম ওভারেই ২টো উইকেট পেলেন কোন রান না দিয়েই। নাইটের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বল 'কাট' করতে গিয়ে স্লিপে পারফিটের হাতে ক্যাচ দিয়ে দেশাই আউট হ'ন। দেশাই ২০ মিনিট খেলে ২৯ রান করেন, ৫টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী মারেন। দেশাইয়ের শূন্য স্থানে রঞ্জনে খেলতে নামেন এবং নাইটের ঐ ওভারেই শেষ বল মেরে লকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন সর্ট-লেগে। রঞ্জনে কোন রান না করেই বিদায় নেন। শেষ উইকেটে বোরদের সঙ্গে খেলতে নামেন ভাঙ্গা হাত নিয়ে ওপেনিং ব্যাটসম্যান মেহেরা। মেহেরা আহত থাকায় ইনিংসের সূচনায় নামেননি এবং ফিল্ডিং করেন নি।

সারা মাঠ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। লাঞ্চের পরও ভারতবর্ষকে ব্যাট ধরতে দেখে। দর্শকরা আশা করেছিলেন ভারতবর্ষের অধিনায়ক ২৩৩ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং লাঞ্চের পর খেলতে না নেমে ইংল্যাণ্ডকে ২য় ইনিংস খেলতে দান ছাড়বেন। ক্রিকেট খেলার বিশেষজ্ঞরাও ভারতবর্ষের অধিনায়কের এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারেননি। যাই হোক বোরদে দর্শকদের মনের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করলেন। দলের ২৫২ রানের মাথায় এ্যালেনের দ্বিতীয় বলটা বোরদে এমনভাবে মারলেন যেন মনে হ'ল তিনিও আর ব্যাট ধরে রাখতে খুশী নন্, তাই তাঁর এই 'ইচ্ছা-মৃত্যু'। বোরদের ব্যাট থেকে বলটা যেন ধরা দিতেই সোজা ছুটে গেল মিড-অনে। ব্যারিংটনের হাতে বলটা সহজেই ধরা পড়লো। বোরদেকে দুটো কারণে দর্শকরা অভিনন্দন জানালেন, বোরদে ভারতবর্ষের উভয় ইনিংসেই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান (৬৮ ও ৬১ রান) করেন আর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা খতম করার জন্যেও। ক্রিকেট খেলার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনে লাঞ্চের পরও ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করার কোন সংগত কারণ ছিল না। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৪০ মিনিট স্থায়ী ছিল, রান উঠেছিল মাত্র ১৯। এই ১৯ রান জয়লাভের পক্ষে খুব কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ৪০ মিনিট সময়টা ভারতবর্ষ বৃথা নষ্ট করেছে এবং জয়লাভের পথে দাঁড়িয়ে এইভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট করা খুবই ঝুঁকির কাজ হয়েছে।

বেলা ১টা ২৫ মিনিটে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ২৫২ রাণে শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২১২ রাণের থেকে ভারতবর্ষ ৪২০ রাণে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৩৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ইংল্যাণ্ড বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তখন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন হয় ৪২১ রাণের, খেলার সময় ছিল ৪৯০ মিনিট।
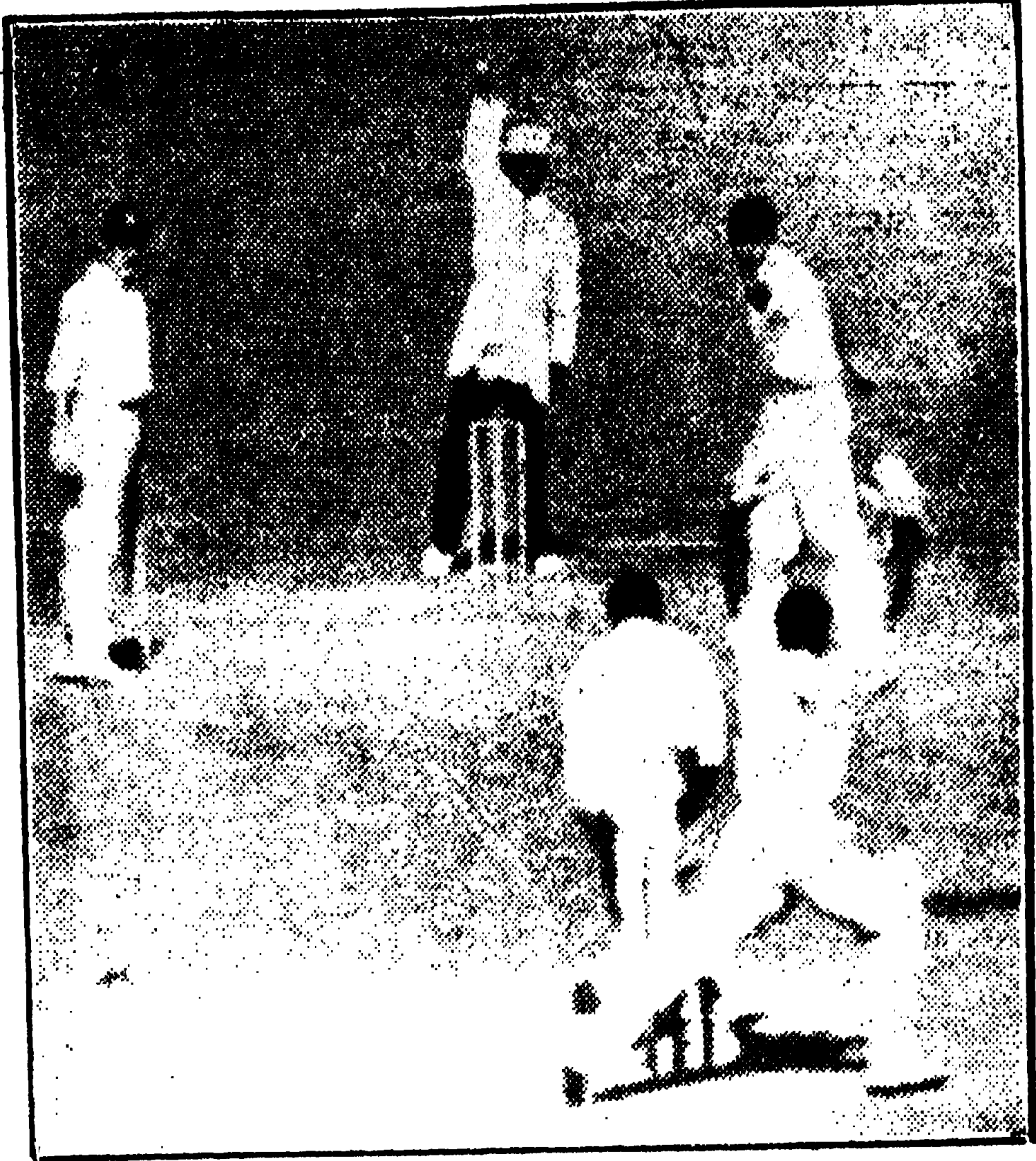
চতুর্থ টেস্ট খেলার শেষ দিনে সেলিম দুরাণীর বলে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার এল-বি-ডব্লিউ হয়ে আউট হয়েছেন। দুরাণীর আবেদনে আম্পায়ার রঘুনাথ রাও হাত তুলে উইকেটের পতন ঘোষণা করেছেন।

চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ৫৭, ২ উইকেট পড়ে। রিচার্ডসন ২৪ রাণ এবং ডেক্সটার ২১ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

ইংল্যাণ্ড দলের ২০ রাণের মাথায় রাসেল ৯ রাণ ক'রে রঞ্জনের বলে বোল্ড আউট হন। ব্যারিংটন এবারও দর্শকদের হতাশ করলেন। দলের ২৭ রাণের মাথায় মাত্র ৩ রাণ ক'রে দেশাইয়ের বলে দুরাণীর হাতে কট হন। এত অল্প রাণে ব্যারিংটনের উইকেট পড়বে কেউ আশা করেন নি। ব্যারিংটন পর পর তিনটে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন। চতুর্থ টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে তাঁর মাত্র ১৪ রাণ ছিল। তাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ব্যারিংটনকে নিয়ে দর্শকদের দুশ্চিন্তা কম ছিল না—সেঞ্চুরী না ক'রে কি সহজে ব্যারিংটন হাতের ব্যাট ছাড়বেন? ব্যারিংটনের বিদায়ে অনেকখানা উৎকণ্ঠা মন থেকে নেমে যায়। অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা-পান করেও দর্শকরা মুখ বিকৃত করতে ভুলে যান।

চতুর্থ দিনে খেলা ভাঙ্গার পর স্কোর বোর্ড দেখে দর্শকরা জয়লাভের আশা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন—ইংল্যাণ্ডের ৪ উইকেট পড়ে ১২৫ রাণ। রিচার্ডসন, রাসেল, ব্যারিংটন এবং বার্বার—চারজন নামকরা ব্যাটসম্যান বিদায় নিয়েছেন। উইকেটে নট আউট আছেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটার (৬১ রাণ) এবং পারফিট (৩ রাণ)। ইংল্যাণ্ডের ভাঙ্গনের মুখে তৃতীয় উইকেটের জুটি রিচার্ডসন এবং ডেক্সটার ৬২ মিনিটের খেলায় ৬৫ রাণ তুলে দেন। ডেক্সটার তাঁর ৬১ রাণে ১১টা বাউণ্ডারী মারেন।

ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেংগল আয়োজিত এক নৈশ ভোজসভায় এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এম সি সি'র ম্যানেজার টম পিয়ার্স'কে সি এ বি'র পক্ষ থেকে স্মারকচিহ্ন উপহার দিচ্ছেন।

দলের বিপর্যয়ের মুখে অধিনায়ক ডেক্সটার অসীম ধৈর্য এবং অটুট দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, ইংল্যান্ড তখনও ২৯৫ রাণের পিছনে, তাদের হাতে জমা ৬টা উইকেট।

পঞ্চম দিন খেলার ১৬ মিনিটে মহাগুরু পতন হ'ল। দলের ১২৯ রাণের মাথায় দুরাণীর বলে ডেক্সটার এল-বি-ডব্লিউ হয়ে আউট হলেন। তখন সবেমাত্র পূর্ব দিনের ১২৫ রাণের সংগে মাত্র চার রাণ যোগ হয়েছে (ডেক্সটার ১ এবং পারফিট ৩ রাণ)। ডেক্সটার ১২৭ মিনিট খেলে তাঁর ৬২ রাণ করেন। পারফিটের সংগে খেলতে নামেন নাইট। এই ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি যেন আর ভাঙ্গতে চায় না। লাঞ্চের সময় ঘনিয়ে এলো। শেষ ওভারে বল করছেন উমরিগড়। উমরিগড়ের ৫ম বলে পারফিট এল-বি-ডব্লিউ হয়ে আউট হ'লেন। উমরিগড়কে শেষ ওভারের শেষ বলটা দিতে হ'ল না, লাঞ্চের জন্যে খেলা বন্ধ হ'ল। পারফিট ১৫০ মিনিট ব্যাট ক'রে ৪৬ রাণ করেন, বাউন্ডারী মারেন ৬টা। পারফিট এবং নাইটের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ৬৬ রাণ ওঠে। এই রাণটাই বড় কথা নয়। সময়টা ছিল বেশী মূল্যবান। পারফিট এবং নাইট ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৪ মিনিট উইকেট পাহারা দিয়েছিলেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের স্কোর ১৯৫, ৬ উইকেট পড়ে। নাইট ২৪ রাণ ক'রে নট-আউট। পারফিটের শূন্যস্থানে তখনও কেউ নামেন নি। এই সময় ইংল্যান্ড ভারতবর্ষের থেকে ২২৫ রাণের পিছনে ছিল। লাঞ্চের পর নাইটের সংগে খেলতে নামেন এ্যালেন। দলের ২০৮ রাণে এ্যালেন (৭ম উইকেট) এবং ২১৭ রাণে মিলম্যান (৮ম উইকেট) আউট হয়ে যান। এর পর আমরা দেখলাম ৯ম উইকেটে বেরী নাইটের সংগে খেলতে নামলেন টনি লক।

দুরাণীর প্রথম বলে লক তাঁর প্রথম ১ রাণ করলেন। চতুর্থ বলে তিনি বোরদের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। সংগে সংগে আউটের জন্যে আবেদন ধ্বনিত হয়ে উঠে। কিন্তু এই আবেদনে আম্পায়ার রাও সাড়া দেন নি। এর ঠিক পরের বল মেরে লক রাণ-আউট হয়ে যান। দেশাই সরাসরি উইকেট তাক ক'রে বল মেরে লকের উইকেট ভেংগে দেন। তখন দলের রাণ ২২৪। দশম উইকেটে খেলতে নামেন ডেভিড স্মিথ। দলের ২৩৩ রাণের মাথায় স্মিথ নিজস্ব ২ রাণ ক'রে দুরাণীর বলে লং লেগে বল তুলে দেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্জরেকার। মঞ্জরেকারকে দেখে অনেকেই ভয়ে চোখ বন্ধ করেন। যাঁরা মনের সাহসে চোখ খুলে ছিলেন তাঁরা দেখলেন মঞ্জরেকার সহজভাবেই বলটা ধরে জয়লাভের আনন্দে লম্বা দৌড় দিয়েছেন। ভারতবর্ষের ১৮৭ রাণে জয়—অংক কষে ফলাফল বের করতে হ'ল না। ইংল্যান্ডের শেষ উইকেট পতনের সংগে সংগেই লোকের মুখ থেকেই উত্তরটা নিঃসৃত হ'ল।

এই শুভক্ষণটি লোকে ঘড়ির কাঁটায় দেখে নিল—২টো বেজে ১২ মিনিট। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৫ মিনিট খেলেছে। বেরী নাইটকে দেখলাম ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সংগে প্যা ভে লি য় নে ফিরছেন। তিনিই ইংল্যান্ডের অপরাজিত যোদ্ধা—১১৪ মিনিট খেলে নাইট ৩১ রাণ করেন, বাউন্ডারী করেন ৪টে। ডেক্সটারের শূন্যস্থানে তিনি খেলতে নামেন, পারফিটের সংগে ৬ষ্ঠ উইকেটে।

আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক্স

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (পুরুষ বিভাগ) : ১ম পাঞ্জাব ৪৩ পয়েন্ট, ২য় বিক্রম ৪১, ৩য় মাদ্রাজ ১৮।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (মহিলা বিভাগ) : ১ম মহীশূর ৪৮ পয়েন্ট, ২য় বোম্বাই এবং পুণা প্রত্যেকে ১০ পয়েন্ট, ৩য় বিক্রম ৭ পয়েন্ট।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (পুরুষ বিভাগ) : ১ম রাজশেখরন (মাদ্রাজ)—১০ পয়েন্ট।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (মহিলা বিভাগ) : ১ম কৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দম (মহীশূরে)—১৩ পয়েন্ট। ৯।১।৬২

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-র পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচী পত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৭শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৫ই মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 19th January 1962
40 Naya Paise.

প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, বিগত দুইটি সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় এবার গণ-উদ্দীপনার একান্ত অভাব। কিন্তু কেন? গতবারও পঞ্চবামপন্থী ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে বিকল্প সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এবারও সেই দাবী আছে, বরং এবার সংখ্যার দিক থেকে বামপন্থীরা বৃহত্তর। এবার তাঁরা ষড়বাম। তথাপি বিকল্প সরকার গঠনের দাবীর পশ্চাতে গতবার যে পরিমাণ উদ্দীপনা ছিল, এবার তার অভাব কেন?

এর দুইটি কারণ এই হতে পারে যে, সাধারণ নির্বাচন ও বয়স্ক ভোটাধিকারের যে অভিনবত্ব ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে ছিল, তা ক্রমশঃ কমে আসছে। নির্বাচনের ব্যাপারে অভিনবত্বের উত্তেজনা বা হুজুগ ক্রমশঃ অস্তমিত হচ্ছে; এবং আশা করা যায়, ঠিক সেই অনুপাতে নির্বাচকমণ্ডলীও স্থৈর্য লাভ করছেন। কিন্তু উদ্দীপনা কমা সত্ত্বেও একথা লক্ষ্য করা গেছে যে, ১৯৫২ বা ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে শতকরা যত ভাগ লোক ভোট দিয়েছেন, সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচনগুলিতে তার তুলনায় কম লোক ভোট দেননি। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে, অসীমকৃষ্ণ দত্ত বনাম বীরেন রায়ের লোকসভা দ্বন্দ্বে ১৯৫৭ সালে যত সংখ্যক ভোট পড়েছিল, ১৯৫৮ সালে ভোটের সংখ্যা তার চেয়ে অনুপাতে বিশেষ কম হয়নি। কিংবা বিধানসভার ক্যানিং উপ-নির্বাচনেও সাম্প্রতিক ভোটসংখ্যা সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় কম ছিল না। অর্থাৎ ভোটদানে জনসাধারণের আগ্রহ বা দায়িত্ববোধ কমেনি, কিন্তু বাহ্যিক উত্তাপ ও সোরগোল কমেছে। আমরা মনে করি, এই ঘটনাটি নির্বাচকমণ্ডলীর সাবালকত্বই প্রমাণ করে।

কিন্তু উদ্দীপনা বলতে যা বোঝায়, তা হ্রাস পাওয়ার আরও একটি কারণ থাকতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এবার পাড়ায় পাড়ায় পার্টি সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত কম, স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা স্বল্পতর, প্রাচীরপত্রে এখনও শহরের সমস্ত দেওয়াল মসীলিপ্ত হয়নি। আমরা একথা বোঝাতে চাইছি না যে, পার্টির ছাপমারা সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ কমেছে, কিংবা সম্প্রতি তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় প্রত্যেক পার্টি বা প্রার্থীর চারপাশে যে বিপুলসংখ্যক সাময়িক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের সমাবেশ ঘটে, তা এবার নিশ্চিতভাবেই স্বল্পতর এবং তাঁদের উৎসাহও প্রমত্ত নয়। কেন নয়?

কেউ কেউ একথা মনে করেন যে, নির্বাচনে কোনো পার্টির পক্ষেই এমন কোনো বক্তব্য উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি, যাতে জনমন বা যুবমন প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। এমন কোনো মহৎ বিশ্বাস, প্রেরণা বা আদর্শের চিত্র স্থাপিত হয়নি, যাতে সমস্ত সমাজ-মনের ভিতরে আলোড়ন দেখা দেবে, যাতে নির্বাচনকে সাধারণ মানুষ একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করবে। ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, তার মধ্যে কোনো বিশ্বাসের ছবি না থাকুক, অবিশ্বাসের ছবি ছিল। অসহিষ্ণু জনসাধারণ অন্য কোনো দায়িত্বশীল পার্টির সন্ধান চেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে সেই প্রতিবাদ বা অবিশ্বাস হয়ত আর তত তীব্র ছিল না—কারণ কংগ্রেস ততদিনে বিশেষ করে গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে তার প্রভাব গভীরতর করতে পেরেছিল এবং আস্থাও হয়ত ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালে বিকল্প সরকারের উচ্চাশা অনেকের মনকে স্পর্শ করেছিল; অনেকে ভেবেছিলেন গণতন্ত্রের সুস্থতা এবং সুপুষ্টির জন্যও ক্ষমতার অদল-বদল দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পঞ্চবামপন্থী ফ্রণ্টকে দৃঢ় করা কর্তব্য।

কিন্তু ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে বিরোধী দল সেই উচ্চাশাকে নিঃসন্দেহে বহুবার প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছেন। প্রথমত, তাঁদের পারস্পরিক অনৈক্য, নির্বাচনের পূর্বে সাময়িক ইলেকশনী-চুক্তি এবং নির্বাচনের পরেই আত্মকলহ বিরোধী দল সম্বন্ধে আস্থাকে দুর্বলতর করেছে। দ্বিতীয়ত, ক্ষয়িষ্ণু পি-এস-পি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যেমন স্থির ধারণা সৃষ্টি হতে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে চীনা আক্রমণের ঘটনা এবং ষ্ট্যালিন আমলের কমিউনিষ্ট শাসন সম্বন্ধে কতকগুলি ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হওয়ার ফলে কমিউনিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধেও জনসাধারণ গভীরভাবে সন্দিগ্ধ হতে আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টিও একটি দ্বিধাগ্রস্ত মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দল এবং বামপন্থীদের সম্বন্ধে গত তিন বছরে যে পরিমাণ অনাস্থা বা সংশয় স্বাভাবিকভাবে পুঞ্জীভূত হয়েছে, অতীতে কংগ্রেসের বহু প্রচার বা অপপ্রচার সত্ত্বেও তা কোনোদিন হয়নি। ১৯৪২ সালের পর কমিউনিষ্টদের উপরে কোনোদিন এতবড় ছায়াপাত আর ঘটেনি। সুতরাং নির্বাচনের দ্বারা কোনো মহৎ বিপ্লব বা সংস্কার সাধিত হবে, সে ধারণা আজ মৃত। ভোটের সংখ্যা হয়ত কমবে না, কিন্তু নির্বাচন সম্বন্ধে জেহাদী মনোভাব, কিংবা উদ্দীপনা নিশ্চয়ই তিরোহিত হয়েছে।

কবিতা
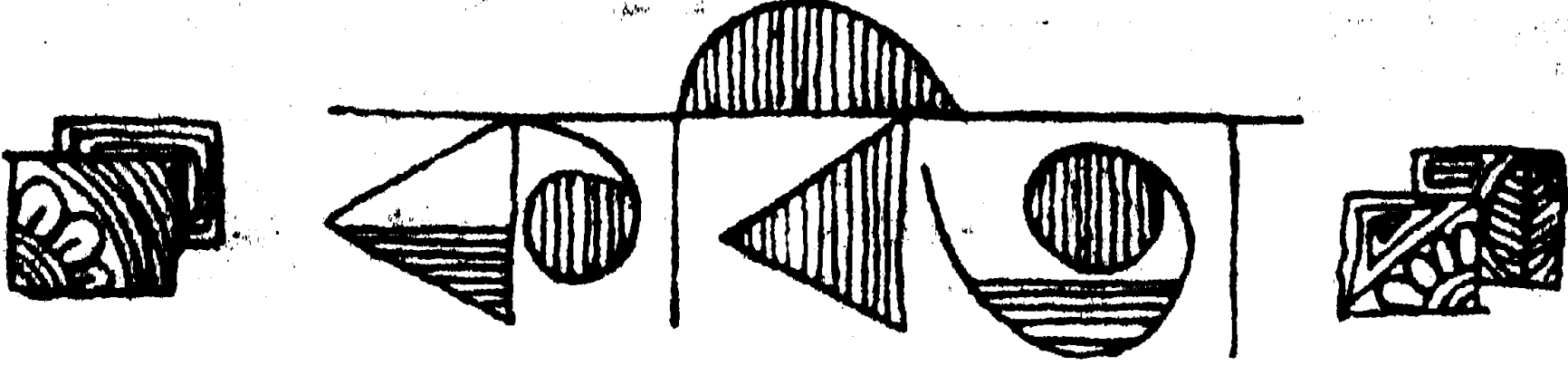
স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের কোথায় শেষ? স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর
চোখ ফেরাবো না, আমি কোনোদিনও চোখ ফেরাবো না।
হাতের অনর্থ হাতই ভেঙ্গে দিয়ে করে সমাহার,
জীবনই জীবন ভাঙ্গে, মৃত্যু তারে কখনো ভাঙ্গে না।

তোমরা আমার দোষই দাও বারেবার, আমি দোষী।
ও ভালোবাসার মর্ম বুঝতে পারগ না হলেও
ক্ষতি কি আমার? তোমরা ওকে দেখো, ব'লো না রাক্ষসী,
প্রেতিনী, খলের সেরা। ওর কাছে ঋণী তা সত্ত্বেও!

ঋণ কিছু কম নাকি একবার মিলিত দৃষ্টিতে?
ঋণ কিছু কম নাকি বুকের শুষ্কতা ভিজে গেলে?
উৎসন্ন ক্ষেতের শস্য যদি ঘাস; বিচারে, বৃষ্টিতে
দুষ্য; কী-যথেষ্ট তবে, এই বুকে ভালোবাসা পেলে?
স্বপ্নের কোথায় শেষ? স্বপ্ন, তোমাদের প্রতি আর
চোখ ফেরাবো না, আমি কোনোদিনও চোখ ফেরাবো না।

তরল, সূর্যাস্তহীন নগরীকে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ঐ কি সূর্যাস্তহীন নগরীর ধ্বংস-অবশেষ?

বিচিত্র হে, ডুবে যেতে সাধ, কিন্তু বিশাল নির্জন
দাঁড় বেয়ে আসে, বুঝি তার শিরস্ত্রাণ দেখা যায়।
এখনি সে দুই হাত দুই দিগন্তের দিকে রেখে
স্থির হবে; আমাদের রুধিরে প্রতাপ
আছে আজো,—এই অনুভব
বড়োই শোভন, তবু একে অপরের প্রতীক্ষায়
নতমুখ; অন্তরাল হয়ে এলো, অন্তরালে
অবগাহনের স্বাদ—মসৃণ, সুদূর, লাল,—বিস্মরণের।
নৌকার উজান ওঠে ফুলে, তীরে আমার উজ্জ্বল!
তটরেখা ছুঁতে পারি, অন্তিমে যা আছে, তার সব;
বাতাস কি প্রতিকূল বিরুদ্ধাচরণে
ভাসাবে আবক্ষ; তবে আর
কী রইবে রাত্রিময়, দিনের তুফানে, যুগ্মতায়।

প্রতিকারহীন, এই কোমল গভীরে এসো নামি;
জানিনা কেমন দূরে বলে তাকে, কতোটা যোজন
তাকে ঘিরে প'ড়ে আছে দাঁড়ির অথর্ব দুই হাত,
তরল, সূর্যাস্তহীন নগরীকে, আমাদের নিমজ্জনের
কোন্ কথা ব'লে আজ আমরা নিঃশেষ?
সে কি কোনো কথা না সৌরভ......
তটরেখা ছুঁতে গিয়ে—বালুকায়, জলের ভিতর
আমাদের পতনের, অভ্যুত্থানের আলোড়ন;
ফুল ফল পল্লবিত বৃক্ষের বিপ্লব
নিস্তেজ বিষয়হীন রৌদ্রে যায় ঝ'রে :
আমাদের প্রেম আজ অপ্রেমের দুঃস্থ অহংকার!

দূরে দাঁড়িয়ে

জৈমিনি

শিক্ষার পরে স্বাস্থ্য। গত সপ্তাহে আমাদের শিক্ষায়তনগুলির বিষয়ে যা বলেছি, হাসপাতালগুলির অবস্থাও দেখা যাচ্ছে সেই একই প্রকার। 'যুগান্তর' পত্রিকার এক বিবরণে জানা গেল, কলকাতার হাসপাতালগুলিতেও "ঠাঁই নাই' 'ঠাঁই নাই' রব উঠেছে। একটি রোগী নিয়ে তার আত্মীয়স্বজনকে সারাদিন যদি হাসপাতালের পর হাসপাতালে জায়গা খুঁজে বেড়াতে হয় তবে রোগীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রোগীর শুভানুধ্যায়ীদের অবস্থাও প্রায় একই রকম কাহিল হ'য়ে ওঠে। কাজেই বাড়ীতে কেউ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে সমস্ত বাড়ীটার উপরই যদি শোকের ছায়া নেমে আসে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কলকাতা বিরাট শহর। প্রতি বছরই এখানে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু সে অনুপাতে হাসপাতাল বাড়েনি; হাসপাতালগুলির বেড্-সংখ্যাও সে অনুপাতে বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় কেবল কলকাতাবাসী নয়, কলকাতার চারপাশ থেকেও যদি মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগী কলকাতায় চিকিৎসিত হওয়ার জন্যে আসে, (এবং আসে বলেই আমাদের বিশ্বাস) তাহলে হাসপাতালগুলির বাহিরে এবং ভিতরে কী রকম গঙ্গাসাগর মেলা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা তা কাউকে বলে বোঝাতে হয় না।

বস্তুত হয়ও ঠিক এই রকমই। খাটগুলি প্রায় সব সময়ই ভর্তি। ঘরের মেঝেয় এবং বারান্দায় গদী পেতেও যে কতো রোগীকে আশ্রয় পেতে হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে নেহাৎ চলে-বেড়ানোর ক্ষমতা থাকে না বলেই হয়ত রোগীরা পড়ে থাকেন, কিন্তু রোগীর আত্মীয়-বন্ধু যাঁরা মাত্র দু ঘণ্টার জন্যেও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁরা যে কী রকম নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। সত্যি বলতে কি, আমি নিজে অনেকবার হাসপাতালে কাউকে দেখতে গিয়ে মনে মনে এই ভেবে বিস্মিত হয়েছি যে,

কী করে আমারই এক প্রিয়জন এই অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে ২৪টি ঘণ্টার মাপে এক-একটি পুরো দিন অতিবাহিত করছেন, এবং আমি তাঁর জন্যে 'সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত' থাকা সত্ত্বেও মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যেই অন্ততঃ পাঁচবার ঘড়ির দিকে গোপনে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। পরে বুঝেছি, এর জন্যে আমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এটা হল বাঁধা-মার। কেবলমাত্র যিনি এখানে রোগী হ'য়ে আসেন তিনিই এ 'মার' হজম করার ক্ষমতা অর্জন করেন, অন্যেরা সে সহনশীলতা থেকে বঞ্চিত। আমি যদি কখনো রোগী হ'য়ে এখানে আসি, আর তিনি আসেন দেখতে তো তিনিও আমারই মতো চোরা-চোখে ঘড়ির দিকে চাইবেন।

এখন, এই পটভূমিতে বিচার করুন হাসপাতালের অব্যবস্থাগুলিকে। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা, দুদিকেই অব্যবস্থা আছে নিদারুণ রকমের। ঔদাসীন্য এবং অবহেলায় কত রোগী অকালে প্রাণ হারায় তার কিছু কিছু কাহিনী সকলেরই জানা আছে। এগুলি অমার্জনীয়, ঠিকই। কিন্তু কেবল কর্তব্য আর মানবিকতার দোহাই দিয়ে এগুলির প্রতিবিধান হবে এমন মনে করা অসংগত। হাসপাতালে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও মানুষ। যেখানে মাত্র দু' ঘণ্টার জন্যে রোগীর সংগে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আমাদের প্রাণ ছটফট করে ওঠে সেখানে দিনের পর দিন একদল চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী দেবদুর্লভ ধৈর্যের সংগে কর্তব্য সম্পাদন করে যাবেন এমন প্রত্যাশা করা চরম আশাবাদীর পক্ষেও বোধহয় সম্ভব নয়। আসল কথা, এই ক্লান্তিকর বিশৃংখলার মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করলে কোনো মানুষের পক্ষে দেবতা তো কা কথা, মানুষ থাকাই আর সম্ভব নয়--সে যন্ত্র হ'য়ে যায়। হাসপাতালের নামে এত হৃদয়হীনতার অভিযোগ ওঠে সেইজন্যেই।

কাজেই প্রতিকার করতে হবে গোড়া থেকে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ আর কর্মীদের সচেতন হ'তে হবে তাঁদের গুরুতর মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু সেই সংগেই এই কলকাতা শহরে দরকার অন্তত গোটা দুয়েক বড় আকারের হাসপাতাল। তা যতোদিন না হচ্ছে ততোদিন খবরের কাগজে এ নিয়ে মাঝে মাঝে সোরগোল উঠবে, আমরা 'হায় হায়' 'ছি ছি' করব, এবং প্রয়োজনের সময় আবার উপচে-পড়া হাসপাতালগুলির দরজায় দরজায় ঘুরে করুণা ভিক্ষা করব। অবস্থা যেমন ছিল তেমনি থাকবে। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনে, যখন অধিকাংশ ব্যাধিই সুচিকিৎস্য, তখন যে কোনো সামান্য অসুখেই প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যাব—এই কথা ধ্রুব জেনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বেঁচে থাকব ততোদিন, যতোদিন না সেই ভয়ংকর শেষের দিন শিয়রে এসে দাঁড়ায়!

* * *

আতিশয্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জনপ্রিয় লেখককে আমরা বলি সাহিত্য সম্রাট, লোকরঞ্জনী অভিনেত্রীকে বলি নাট্যসম্রাজ্ঞী, গলির মোড়ের মিষ্টির দোকান খুলে সাইনবোর্ডে লিখি 'ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। আজকাল আবার নতুন উপদ্রব দেখতে পাচ্ছি। অ্যাফিলিয়েটেড ইস্কুলে ছাত্র ভর্তি করানো কঠিন হ'য়ে ওঠায় 'কোচিং ক্লাস' গজিয়ে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। শহরে নতুনআসা সার্কাস এবং হাতুড়ে ওষুধের বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে এসব প্রতিষ্ঠানেরও রকমারী বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে। এই রকম একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে 'গ্যারাণ্টি দিয়া পাশ করাই। ইংরাজীতে কাঁচা ছাত্রের সুবর্ণ সুযোগ।'......মানে বুঝতে মাথা গুলিয়ে যায়। মনে হ'তে পারে, ইংরাজীতে পাকা হলে সে সুযোগ বুঝি বা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে!

আসলে বাড়িয়ে বলার বিপদই এই। কোনো মাত্রা থাকে না। ফলে অপূর্ব, অভূতপূর্ব, অসাধারণ, অনন্যসাধারণ প্রভৃতি বিশেষণ শেষ পর্যন্ত কথার কথা হ'য়ে দাঁড়ায়, কেউই আর তাতে আকৃষ্ট হয় না। যাকে ভালোবাসি তার বিষয়ে বাড়িয়ে বলতে ইচ্ছা হয় বইকি। কিন্তু পরিমিতি বোধের অভাবে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন হাস্যকর অবস্থায় এসে দাঁড়ায় তার উদাহরণ যে কোনো ইলেকশান মিটিং-এ গেলেই স্বকর্ণে শুনতে পাবেন। এ ধরণের মিটিং-এ ঢালাওভাবে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা যদি সত্যিই মানুষের আয়ত্তাধীন হত, তবে সশরীরেই আমরা স্বর্গভোগ করতাম, এবং তা এই মাটির পৃথিবীতেই, স্বর্গলাভ করার দরকার হত না।
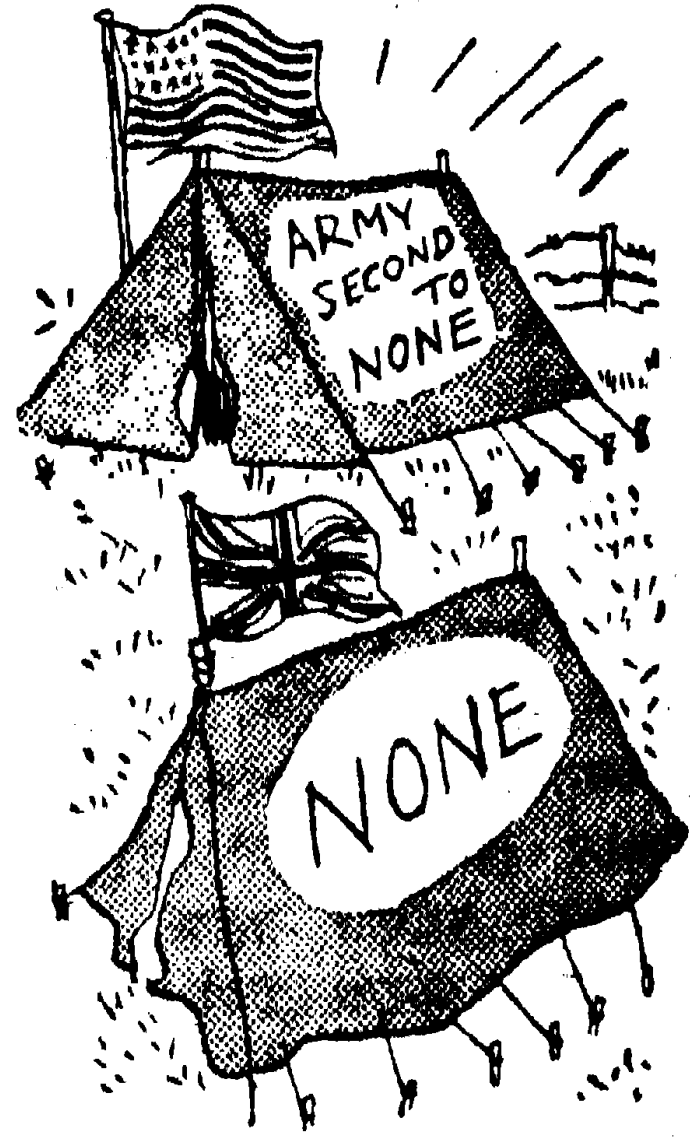
এসব দেখে মনে পড়ল এক গল্প। কোরীয়ার যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী আমেরিকান আর ব্রিটিশ সৈন্যদলের ছাউনি পড়েছে পাশাপাশি। আত্মগরিমা প্রচারের নেশায় আমেরিকান সেনানী ছাউনীর গায়ে লেখালেন, **'Army second to none!'** ব্রিটেনের বাক্‌সংযম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ সেনানী নিজের ছাউনির গায়ে লেখালেন শুধু **'None'!** ব্যস, ঐ ছোট্ট একটি কথাতেই কাজ হল—প্রমাণিত হল তাঁরাই হলেন 'ফার্স্ট' আমেরিকানরা তাঁদেরই 'সেকেণ্ড' মাত্র!

গল্প চিরকালই গল্প। কিন্তু এর মধ্যে শাঁস যা তা হল এই যে, শব্দকে যতো কমানো যায়, ততোই বাক্যের ব্যঞ্জনা বেড়ে যায়। শব্দ বাড়ালে বাক্য হয় ভোঁতা। রসিকজন ভেবে দেখবেন!

বাংলা শোক কাব্য প্রসঙ্গে

মিনু মিত্র
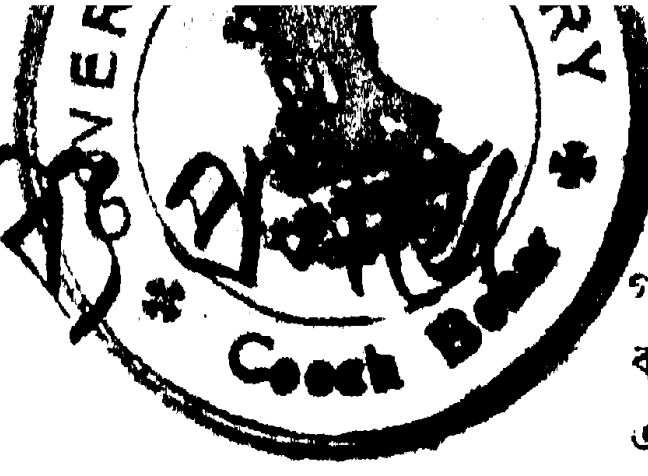
শোক-কাব্য রচিত হয় তখনই, যখন শোক কবির ব্যক্তি-সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন হবার উপযোগিতা লাভ করে। শোক-কাব্য, শোকের উচ্ছ্বাস মাত্র, এমন বলা অন্যায়। এইজন্যই ক্রন্দন হাহাকার কাব্য নামের উপযোগী নয়। ব্যক্তিগত শোক প্রকাশের রূপটিকে কোন প্রকারেই শোক-কাব্য বলা চলে না। তবে এ-কথা সত্য যে, শোক-কাব্যে যেটুকু শোকের ভূমিকা, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কবি অবশ্যই শোক লাভ করবেন এবং শোকের অনুভূতি তাঁর জীবনে অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠবে। কিন্তু সেই তীব্র অনুভূতিকে কবি যখন বহিঃপ্রকাশ দান করবেন কাব্যে, তা বহুজনের অন্তরে আবেদন জাগাবে। আর তখন কবির অনুভূতি ঠিক শোকের ব্যক্তি-সীমায় বিধৃত থাকবে না, কবির দৃষ্টিও আপনার হতে সরে গিয়ে বহুজনের অন্তরের প্রতি নিবদ্ধ হবে। ব্যক্তি-সীমা অতিক্রান্ত হলেই ভাব রসের পথে যাত্রা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ব্যক্তিগত ভাবই বহুজন-হৃদয়বেদ্য হ'লে রস-সীমায় উপস্থিত হয়। তাই কবি যখন আপনার শোককে আপনার হ'তে দূরে সংস্থাপিত করতে পারেন, তখনই তাকে আশ্রয় করে কাব্যের জন্ম।

শোক-কাব্য বলতে আমরা দু'টি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমত, শোক ব্যক্তির সীমাকে উত্তরণ করবে আর দ্বিতীয়ত, তা সর্বজনের অন্তরে আবেদন জাগাবে। কাব্য পাঠের আনন্দও পাঠক পাবেন আবার কবির বেদনাটিও তাকে নাড়া দেবে অর্থাৎ পাঠক যখন বেদনাক্রান্ত আনন্দলাভ করবেন, তখনই শোক-কাব্য সার্থক। কিন্তু এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, শোকের ব্যক্তিক প্রকাশের স্পর্শ যদি সামান্যতমও লাগে কাব্যে, তবে কাব্যের মাঝে আসবে ভাবের অতিরেক।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যে শোক-কাব্যের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এক নজরে লক্ষ্য করলে দু'টি কাব্যই প্রধান হয়ে ওঠে। একটি অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা, অন্যটি রবীন্দ্রনাথের স্মরণ। দু'টি কাব্যের শুরু একই উৎস হ'তে, কিন্তু গতি ও প্রকৃতিতে তারা একে অন্যের চাইতে পৃথক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শোক-কাব্যের কথা। Milton রচনা করেছেন Lycidas, Shelley-র শোক-কাব্য Adonais এবং Tennyson-এর শোক-কাব্য In memorium এগুলি প্রধানত pastoral elegy নামেই চলিত। তবে সত্যকারের pastoral elegy বলতে যা বোঝায়, তা কেবলমাত্র Milton-এর Lycidas-এর মধ্যে বর্তমান। বর্তমান আলোচ্য বাংলা শোক-কাব্য গ্রন্থ দু'টির সহিত Shelley এবং Tennyson-এর কাব্য দু'টির একটা মিল আছে। অক্ষয়কুমার তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে রচনা করেছেন "এষা" কাব্য। তাঁর পত্নীর মৃত্যুর প্রায় ৪।৫ বৎসর পর কাব্যখানি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পত্নীর মৃত্যুর কিছু পরেই এ-কাব্য রচনা করেন। Shelley-র কাব্য Adonais রচিত হয় Keats-এর মৃত্যুতে Shelley-র শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে। আর Tennyson-এর In memorium কাব্যখানিও বন্ধুর মৃত্যুতে কবির বেদনাগাথা। শোক-কাব্যের উৎসের দিক হ'তে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' এবং অক্ষয় বড়ালের 'এষা' সমগোত্রীয়। কিন্তু Shelley ও Tennyson-এর কাব্য-উৎস সমপর্যায়ের নয়। কারণ Keats-এর মৃত্যুতে Shelley ব্যথিত হ'লেও Keats-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না বললেই হয়।

"এষা" কাব্যে অক্ষয়কুমারের কবির শোকের চাইতে ব্যক্তির শোকই প্রভাবিত হয়েছে বেশী। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া তার যথাযথ রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর বহুদিন পরে এ-কাব্য রচিত হয়েছে, তাই শোকের উচ্ছ্বাস তখন প্রাধান্য পেতে পারেনি। এ-কাব্যে কবির রোমান্টিক ভাববিলাসী মনটা গৃহের সীমার বাঁধা পড়েছে। অবাস্তব বেদনা-বিলাস কবির অন্তরকে মুগ্ধ করে রচনা করেছিল এক স্বপ্নলোক, সেখানে তার প্রিয়া ছিল কিন্তু তার বস্তুগত সত্তা ছিল না। আর গৃহে যদিও ছিলেন কল্যাণী তাঁর মাঝে কবি মানসীকে খুঁজে পাননি। এমনি এক সময় এলো মৃত্যুর আঘাত। কবিকে আঘাত করেই স্বপ্নলোক হ'তে বস্তু-লোকে ফিরিয়ে আনলো। কবির ভুল ভাঙলো। কবি এতদিন যাকে অস্বীকার করেছিলেন, আজ তাঁকে পাবার জন্যই তিনি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অথচ তখন সকল কিছু সমাপ্ত হয়ে গেছে। "এষা" কাব্যে কবির কথা হ'ল "মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা"। বেদনার চরমক্ষণে কবির মনে এলো সংশয়। শোকের আবেগ তখন কবির ব্যক্তিত্বেই আবদ্ধ, তাই বেদনার্ত কবি জীবনের অস্তিত্বের পিছনে কোন কল্যাণের কথা, কোন মহত্ত্বের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারলেন না।

কিন্তু এ সংশয়ের অবসান ঘটলো কবির দর্শন ভাবনায়। কবি দার্শনিক হ'য়ে উঠলেন। একদা কবি যে মানসীকে আপনার বাসনা দিয়ে, কামনা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন, আজ তারই রূপে আপনার স্ত্রীর ভাবনাকে মিলিয়ে দিলেন। আজ সেই প্রিয়া সর্বভূতে লীন হয়ে গেছে। তাই এই জগৎ, এই দেবতা একেবারে মিথ্যা নয়। জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে তীব্র সংশয় জেগেছিল কবির অন্তরে, কবি তাকে ধীরে ধীরে সান্ত্বনার পথে নিয়ে গেছেন সাবেক দর্শন-চেতনার স্পর্শে। তবু সান্ত্বনা আসে না অন্তরে। বহুদিনের গড়ে তোলা আত্মকৃত ভুলের অনুশোচনায় আর মৃত্যুর বেদনায় কবির অন্তরে জেগে থাকে একটানা ক্রন্দন। কবির কাব্যে দর্শনের সাহায্যে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস আছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ক্রন্দন। শোকের রাজ্যে যে অনাবিল প্রশান্তি ও শান্ত গাম্ভীর্য তা কবি শেষ পর্যন্ত লাভ করেননি। আর এই জন্যই ব্যক্তির শোককে আশ্রয় করেই সত্যিকারের শোক গাথার মর্যাদা লাভ করেছে এ কাব্য। শোকের ফলশ্রুতি এখানে কবির সজল চোখে স্মৃতি-তর্পণ।

"স্মরণ" কাব্যগ্রন্থে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকার্ত। শোকের প্রাথমিক অবস্থায় এ কাব্যের জন্ম। তাই ব্যক্তি-শোকের স্পর্শ এখানে স্বাভাবিক। কবির অন্তরে এই শোকের আঘাত অত্যন্ত তীব্র। গৃহের সকল দিকেই পত্নীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করছেন। আর এই অনুভূতি কবির বেদনাকে আরও তীব্র ও সচেতন

করে তুলেছে। কবি পত্নীর অস্তিত্বকে সর্বত্রই অনুভব করছেন। আর অত্যন্ত তুচ্ছ নানা ব্যাপারে তাঁর পত্নীর নানা স্মৃতি কবিকে চঞ্চল করে তুলেছে।

"দেখিলাম খান কয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।"

আজকের বিরহীচিত্ত অনুভব করছে বহু কর্ম কীর্তি খ্যাতি আয়োজন রাজি শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে সব হয় মিছে যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে না থাকে একটি হাসি;

তাই কবির চিত্ত আজ একটি কল্যাণ হস্তের প্রদীপালোক আর একটি ক্লান্ত প্রতীক্ষার জন্য উৎসুক। শোকের আঘাতে কবির মন অসীমের দূরত্ব হ'তে সরে এসে সীমার দিকে ঝুঁকেছে। কবির অন্তর বস্তুজগতের ছোটবড় হাসি-কান্নায় ব্যথা-বেদনায় আন্দোলিত। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি প্রকৃতিকেও ঠিক গ্রহণ করতে পারছেন না। গ্রহণ করতে পারছেন না তার সৌন্দর্যকে। কবির মনে হল প্রকৃতির চাইতে পত্নীর স্নেহ-বাহুডোর বেশী কাম্য।

প্রভাত জগৎ হ'তে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহু ডোর।

পরম বেদনায় কবির চোখে বসন্তের উচ্ছলতাও ম্লান হয়েছে। কবি ক্লান্ত ব্যথিত সুরে বসন্তকে আহ্বান করেন—

আমার বক্ষের বেদনার মাঝে করো তব
উৎসব
আনো তব হাসি আনো তব বাঁশী
ফুলপল্লব আনো রাশি রাশি
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক
যত পাখি আছে সব।
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
করো তব উৎসব।

কিন্তু কবির এই ব্যক্তি-স্পর্শ—কাতর শোক স্থায়ী নয়। কবির মনটি চির-দিনই ভূমার সুরে বাঁধা। তাই ব্যক্তি-গত বেদনায় অভিভূত হলেও বেশীক্ষণ তাতে বদ্ধ থাকেন না। পূর্ণতার পূজারী কবি শান্ত রূপকে গ্রহণ করতে চান। তাই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনাও ক্ষণিক। তারই পরে কবি তাঁর সুরকে ভূমার সুরে বেঁধে দেন। ফলে ব্যক্তি-শোকের তীব্রতা দূর হয়ে আসে প্রশান্তি। পত্নীর মৃত্যুতে উচ্চগ্রামে বাঁধা কবির মন ক্ষণিকের জন্য সরে এসেছিল। কিন্তু আবার পরম শান্ত শুদ্ধতায় স্থায়ী হল তাঁর সুর। কবি বুঝলেন তাঁর প্রিয়া আজ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে অসীমের মাঝে ঠাঁই নিয়েছে।

সে আজি বিশ্বের মাঝে মিলিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে।

আজ বিশ্বের প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে কবি তাঁর পত্নীর সত্তাকে অনুভব করছেন। এতদিন তাঁর সঙ্গে ছিল কবির বিচ্ছেদ দেহের সীমায়। আজ সেই দেহের বন্ধন আর নেই। কবি-পত্নী আজ সকল প্রকার বন্ধনের অতীতে কবির একান্ত নিকটে উপস্থিত হয়েছেন।

মিলন সম্পূর্ণ হ'ল আজি তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে
এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল,
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।

মৃত্যুর আলোকে কবি পত্নী নূতন-রূপে কবির নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। "মৃত্যু" কবির মতে পরম প্রকাশ। মৃত্যু নূতনের পূজারী, পুরাতনের বেড়া-দেওয়া জীবন হতে মৃত্যু মুক্তিদান করে, উত্তরিত করে নূতনের দেশে। আজ কবি-পত্নীও মৃত্যুর পরশে নবায়মানা। তিনি নিজে কবির কাছে যেমন নূতন-রূপে উদ্ভাসিতা তেমনি কবির অন্তরে মৃত্যুকেও তার নবরূপে বিকশিত করে তুলেছেন। ক্লান্ত-জীবনের গ্লানি ঘুচেছে মরণ-স্নানে। বিশ্বদেবতার অনন্তের দ্বারপথও হয়েছে উন্মুক্ত। কবি মৃত্যুর পথরেখা ধরে উপস্থিত হয়েছেন ত্রিভুবন দেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে। মৃত্যুর আলোকে কবির চোখে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হল। দুই বৈপরীত্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক সম্পূর্ণতা। পরম পূর্ণের অর্ঘ্য রচনায় আছে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সংঘাত। এমনি করে পরম দার্শনিক ভাবনায় কবির মন বেদনা হতে মুক্তি লাভ করেছে।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্য প্রকৃত-পক্ষে স্মৃতিপূজা হয়েছে এমন বলা চলে না। কবি পত্নীর স্মৃতি-তর্পণ করেছেন সত্যি কিন্তু কবির গতিচঞ্চল মন একটি বেদনার বিন্দুতে স্থির থাকেনি। জগতে যত ব্যথা-বেদনা তা শুধুমাত্র সীমিতজীবনের ছোট ছোট পদক্ষেপ। ভারতীয় দর্শনের আনন্দ-বাদে কবির মন অভিষিক্ত। তাই ব্যথা-বেদনাকে কবি বেশীক্ষণ স্থায়ী রাখতে পারেন না। ব্যথা পান দুঃখ পান কিন্তু কবি তারও আগে হতে জানেন এ সত্য নয়; ব্যথা সীমিত দৃষ্টির ফল-প্রসূত। উপনিষদের চেতনায় যার অন্তর পূর্ণ তিনি এই সীমা, এই অন্তকে কিছুতেই চরম বলে মানতে পারেন না। তিনি বলেন এও সত্য, কিন্তু একে অতিক্রম করে অন্যতর বৃহত্তর সত্যের পথে অগ্রসর হতে হবে। কাজেই পত্নীর মৃত্যুতে ব্যথিত কবিও মৃত্যুর বেদনায় আবদ্ধ থাকেননি, বেদনার অতীতে আনন্দলোকের সন্ধানে ফিরেছেন। এবং তাঁর বেদনাকে তিনি বিশ্বের অনুতে-পরমাণুতে বিস্তৃত করে ভূমাতে প্রতি-ষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

এই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Shelley-র মিল। Keats-এর মৃত্যুতে Shelley যে কাব্য রচনা করে-ছিলেন সেখানে কবি ঠিক ব্যক্তি-সীমায় আবদ্ধ রইলেন না। Keats-এর ব্যক্তি-গত ভাবনা ও কবিকৃতিকে খানিকটা প্রাধান্য দিয়ে Shelley একেবারে সৃষ্টির মূলে উপস্থিত হয়েছেন। যেখানে সকল আত্মার উৎস একটি। একটি উৎস হতে জন্ম লাভ করে বিশ্বের সকল কিছু প্রকাশ পায় আলোকে, আবার লীন হয়ে যায় সেই পরম সত্তার বুকে। তখন সকল কিছুই একাকার হয়ে যায়। এ হ'ল "সাগরলহরী সমানা", আর সেখানেই ত একে অন্যের পরম আত্মীয়। তাই Shelley Keats-এর মৃত্যুকে মুক্তির পথরূপে দেখলেন। দেহ-বিমুক্ত আত্মা আজ পরম সত্তার স্থান লাভ করলো, যেখানে দেশ, কাল, বুদ্ধি ও সংস্কারের কোন বেড়া দেওয়া নেই। Keats এখানেই সর্বব্যাপ্তি লাভ করলেন।

He is made one with nature;
there is heard
His voice in all her music,
from the moon
Of thunder to the
song of night's sweet bird,
He is a presence to be
felt and known,
In darkness and in light,
from herb and stone.

রবীন্দ্রনাথও সেই পরম আনন্দময় সত্তার কথাই বলেছেন। আত্মা আনন্দ-ময় রূপ হতে এসেছে আবার ফিরেও গেছে সেই পরম আনন্দময় সত্তায়, যে সত্তা দ্যুলোক ভূলোক বেষ্টন করে আপনাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে।

চিত্তের সৌন্দর্য তব বাধা নাহি পায়
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে
পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে।

Shelley'র মতে এই যে দৈহিক মৃত্যু তা মৃত্যু না, শুধু স্বপ্ন হতে জেগে ওঠা। পরম সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন আত্মা বন্দী ছিল এতদিন, সীমার বাঁধনে

আজ পরম সত্তায় লীন হয়ে সে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মুক্তি লাভ করলো। সকল প্রকার তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার বন্ধন হতে আত্মা পেলো মুক্তি মৃত্যুর দ্বারপথে।

We decay
Like corpses in a charnel;
fear and grief
Convulse us and
consume us day by day.

রবীন্দ্র ভাবনাতেও এমনতর মুক্তির কথা বলা হ'ল। মৃত্যুর স্নানে আত্মা আপনার সকল বন্ধন দূরে করে মহিয়সী হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথের আরও একটি শোক-গাথার কথা বলা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোক-গাথা বিশেষ। রচনার উৎস বিচারে কবিতাটি Shelley-র Adonais কবিতাটি'র সমগোত্রীয়, এবং ভাবনার বিচারেও আছে আশ্চর্য মিল। Shelley প্রকৃতিকে Keats-এর মৃত্যুতে বিষাদ প্রতিমারূপে দেখলেন। কবিতা দেবী শোকাশ্রু পাত করেছেন কবির সৌন্দর্য-ভাবনাগুলি যেন শোকে মূহ্যমান। চাঁদের আলো কবির শোকে পাণ্ডুর, শিশিরকণা অশ্রু হয়ে ঝরছে আর ফুলেদের মধ্যেও বেদনায় ঝরে যাবার পালা এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবিগুরু ঠিক এমনতরই প্রকৃতির পরিবেশ রচনা করেছেন।

আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে
পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল
তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে
কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায়
ধূলি পরে?

রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের আত্মার একটা মুক্তির রূপ দেখলেন। কবি অনুভব করলেন কবির আত্মার পরম আনন্দের দেশে উত্তরণ। সীমার ক্ষুদ্রতা হতে মুক্তিলাভ করেছে আত্মা। সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির আনন্দের মধ্যে তার এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার বেদনাও তুচ্ছ।

ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হ'তে গেল খসি সর্ব আবরণ
করি লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি মর্ত্য কবি
মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে,
যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীত
ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে
তারায় তারায়।

জীবনই বন্দীশালা। পরম আনন্দময় সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন করেই জীবনের প্রকাশ। জীবন তাই আনন্দ হতে বিচ্ছিন্নতার রূপান্তর। কাজেই জীবনের প্রচণ্ডগতিশীলতায় কোন রূপেই স্থায়ী নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি স্থায়ী চেতনায় মানুষ আসতে পারে। Shelley বললেন :

Life like a dome of many
coloured glass,
Stains the white Radiance
of Eternity,
Until Death tramples it
to Fragments.

তা হ'লে বলা যেতে পারে যে কবিগুরু ও Shelly-র শোকগাথা রচনায় একটা সমাত্মবোধ আছে। আর এই আত্মবোধ হল তাদের দর্শন ভাবনায়।

॥ ৪ ॥

শোকের প্রকাশ ধারায় ব্যক্তিগত বেদনা ও তার প্রতিক্রিয়া এবং পরিশেষে তা হতে উত্তরণ দেখা যায়। আর শোকের রসপরিণতির পথে এই ধারাটিই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের শোকগাথায় ব্যক্তিগত স্পর্শ আছে, তবে কবি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েননি যদিও শোকের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ স্মরণ কাব্যে দেখা যায়। প্রকৃতি-ভাবনার ক্ষেত্রে কবি খানিকটা ধূসর বর্ণ ব্যবহার করেছেন, কোথাও বা একেবারেই নিরঙ শোকের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। বসন্ত এসেছে কবি তাকে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রঙ্গিম করে ভাবতে পারেননি। ক্লান্তসুরে তার ব্যথিত চিত্তের দ্বারে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানেই তাঁর কাব্য অক্ষয় বড়ালের "এষা" কাব্য হতে পৃথক। এষা কাব্যে কবি "প্রকৃতির" বিস্তৃতির দিকে তাকানর অবকাশ পাননি। সংসারের চারিদিকে নানা ছোটখাট কাজে বিশৃঙ্খলা, মাতৃহারা শিশুদের মূর্তি বারে বারে তাকে পত্নীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। একদা কবি পত্নীকে যোগ্যতর মর্যাদা দেননি এই অনুশোচনায় আর বেদনায় তার অন্তর হাহাকার করে উঠেছে। আর এই শোকের প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে কবিচিত্তে। কবি জগতের কোনকিছুর পরেই আর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। এ জগতে যে শোকের অস্তিত্ব সত্য একথা কবি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না। কবি রোমান্সের জগৎ হতে ফিরে এসেছেন গৃহতীর্থে। রোমান্সের রাজ্যে আত্মতুষ্টি ছিল কিন্তু শান্তি ছিল না। আজ গৃহজীবনের শান্তিকে হারিয়ে কবি গৃহের মাঝেই আপনাকে ডুবিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী চিত্তের প্রশান্তিতে মৃত্যু ক্ষণিকের বেদনার বুদবুদ তুলেছে মাত্র। পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছে সেই বেদনার বুদবুদ। আর কবিও অত্যন্ত সমাহিত হয়ে চিন্তা করেছেন দর্শন, বেদনার রেশ থাকলেও তা এখানে অপ্রধান।

বড়াল কবির বেদনার আর্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী সজীব ও মানবিক। কথাটায় হয়ত ভুল করার
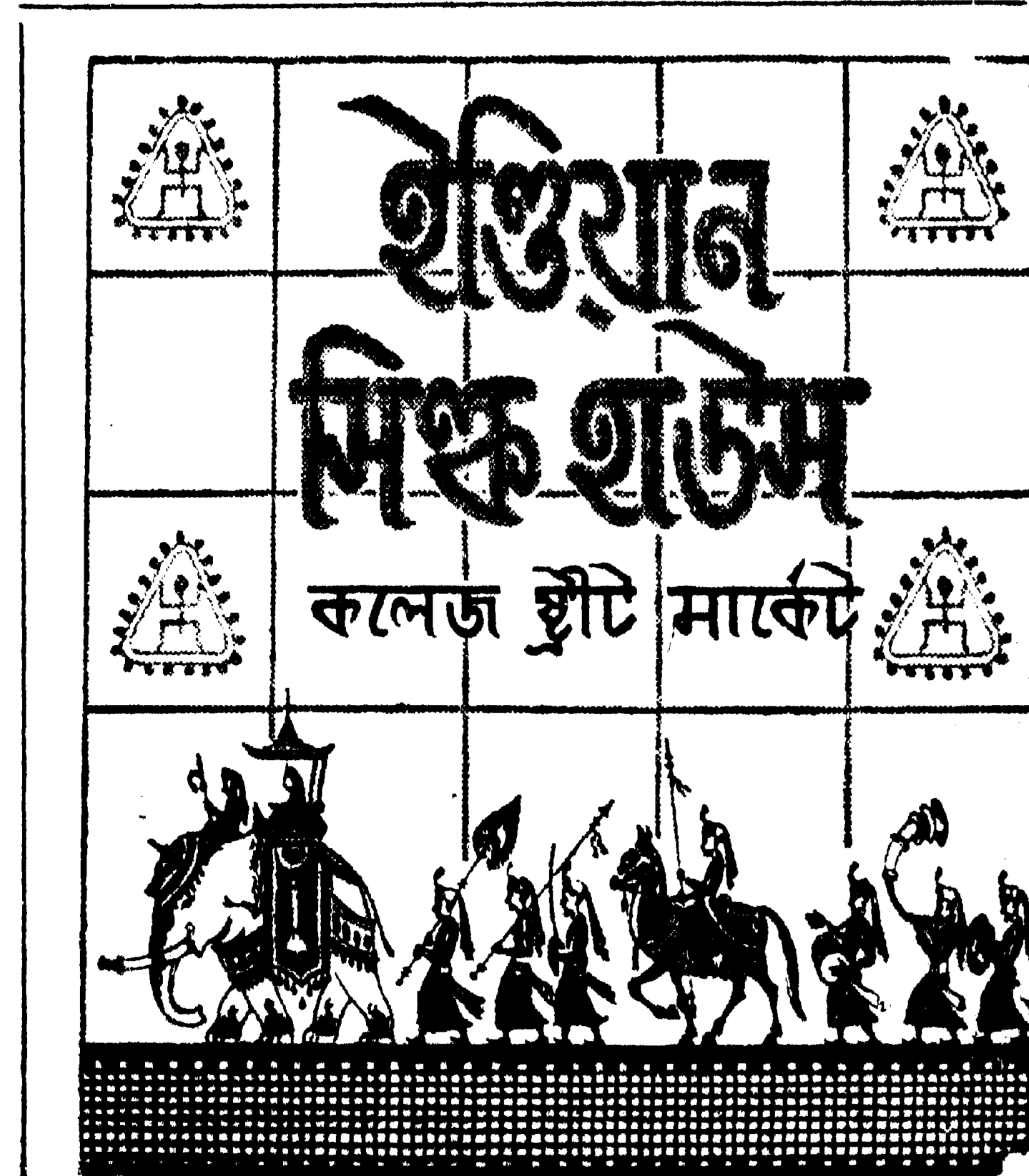
অবকাশ থেকে গেল। রবীন্দ্রনাথের শোক-গাথা স্বতস্ফূর্তনয় এমন নয় তবে সাধারণ জীবনের মত নয়। মানবীয় আবেদন তাঁর কাব্যের নেই, একথা সত্যের অপলাপ। কিন্তু বড়াল কবির জীবনে শোকের মানবীয় প্রকাশটাই প্রধান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কোন সংশয় ছিল না, ছিল না কোন দ্বন্দ্ব। তিনি যাকে গ্রহণ করতেন অত্যন্ত স্থিরভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। তাই প্রশান্তিতে কোন সংশয় বা দ্বিধারই অবকাশ ছিল না। যদিও কোন বিপরীত ভাবনা আসত কবি তাকে সহজেই শান্ত স্তব্ধতায় পরিণত করতে পারতেন। এইজন্য মৃত্যুর বেদনা যত তীব্রই হোক না কেন, কবির অন্তরে তা যত বড় আলোড়নই তুলুক না কেন কবি আপনার সংযম দিয়েই তাকে গ্রহণ করতে পারতেন। এবং এইজন্যই তাঁর কাব্যে একটা নির্বেদ ভাবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। শোকাহত কবির শোকের কোন উচ্ছ্বাসই প্রকাশলাভ করেনি। ফলে সাধারণ পাঠক আমরা খুশী হতে পারি না। বড়াল কবির কাব্যে যে পরম আর্তি, বেদনা ও হাহাকার প্রকাশলাভ করেছে তা সাধারণ মানবের হাসিকান্না আনন্দবেদনা সুখ দুঃখ জড়িত অনুভূতির সহজ প্রকাশ। "এষা"র কবি তার স্বতস্ফূর্ত আবেগকে যথাযথ রূপদান করেছেন। তাই তত্ত্বের প্রাচুর্য ঘটেনি সেখানে। স্মরণ কাব্যে কবির 'পরে পত্নীর মৃত্যুর যে প্রতিক্রিয়া, তা কেবলমাত্র ক্লান্তবিষণ্ণতায় প্রকাশলাভ করেছে।

প্রকৃতির দিকে চোখ মেলেও রবীন্দ্রনাথ পরম আনন্দে তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না। বড়াল কবি সোজাসুজি অস্বীকার করেছেন এই জগতের অস্তিত্ব ভগবানের অস্তিত্ব। তীব্রবেদনায় আকুল কবির অন্তরে সকল কল্যাণ আনন্দের বিরুদ্ধে জেগেছে সংশয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তা আসেনি কারণ তাঁর মন প্রথম হতেই আনন্দের ও পূর্ণতার সুরে বাঁধা হয়েছে উচ্চ গ্রামে। কাজেই ব্যথা বেদনায় বিচলিত হলেও আকুল হয়ে ওঠেন না। ফলে তাঁর শোকের প্রতিক্রিয়া শুধু বিষন্নতায় প্রকাশিত। কিন্তু "এষা"র কবির বেদনা সাধারণ বোধসম্পন্ন দৈনন্দিন জীবনের আর্তিসঞ্জাত রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বেদনা হতে শান্তিলাভ করতে গিয়ে খুব বেশী আয়াস করেননি। কারণ তিনি পূর্ণের যাত্রী খণ্ডজগতের সীমাকে স্বীকার করলেও জানেন এর চেয়ে বৃহত্তর সত্যের দিকেই মানুষের গতি।

১৯ শতকের সংশয়-বাদী মন বড়াল কবির, তাই সংশয়ী মানসে তাঁর বেদনা তীব্রতর। সাধারণ মানুষের মন অস্থির ও চঞ্চল। তাই বড়াল কবির কাব্যের ভাবনা ও শান্তি এষণা সাধারণ মানবের অন্তরে আবেদন করে বেশী আর অক্ষয়কুমারের কাব্যে শোকের পরিণতি এসেছে অত্যন্ত ধীরে একটি বিশিষ্ট ধারাপথে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ধারা লক্ষ্য করা যায় না। গৃহের মাঝে কল্যাণরূপিণীর হস্তস্পর্শের শূন্যতা কবিকে চঞ্চল করে তুলেছে। কবি আর্তকণ্ঠে প্রার্থনা করছেন একটি দীপজ্বলা গৃহে একটি ক্লান্ত আঁখির প্রতীক্ষা। আর এই আর্তির মাঝেও কবি বুঝতে পারছেন এই স্বাভাবিক। জীবনের চলার পথে এও একটি ঘটনা। জীবনকে রূপে রূপে সত্য করে, নূতন করে তোলাই মৃত্যুর কাজ। তাই মৃত্যুর স্নানে জীবনের সকল গ্লানি হয় মুক্ত। কবি ব্যথিত অথচ সান্ধ্য আকাশের মত শান্ত। কিন্তু কবির বুদ্ধি ও অনুভূতি এতটুকু ম্লান হয়নি শোকের আঘাতে। অক্ষয়কুমারের জীবনে অপর পক্ষে কোন সচেতন বুদ্ধি বা সার্বিক অনুভূতি ক্রিয়াশীল নয়। মৃত্যুর আঘাতে কবির যে আর্তি তা কিছুতেই দূর হবার নয়। শোকের প্রথম আবেগ কমে এলে কবির বুদ্ধি যখন সচেতন হ'ল তখন কবি সান্ত্বনা লাভ করলেন। তবু শান্তি আসে না অন্তরে, মনটা ক্ষণে ক্ষণেই হাহাকার করে ওঠে। বুদ্ধির চাইতে এখানে ব্যাকুলতাই বড়। তাই শান্তি পেয়েও অশ্রুভরা চোখে বলেন, "মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা।" রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'মানবী'কে বেশীক্ষণ 'মানবী' রাখতে পারেন না, তাকে অসীমে মিলিয়ে দেন।

"স্মরণ" কাব্যে বুদ্ধি ও ভাবনার প্রাধান্য আবেগ ও ভাবের উপরে। "এষা" কাব্যে বুদ্ধির ওপর আবেগ ও ভাবনার জয়। তাই এষা কাব্যের মানবিক আবেদন বেশী। বুদ্ধি ও ভাবনার মূল্য যতই থাক আবেগ ও অনুভূতির প্রাধান্যই এ জগতে বেশী। আর "স্মরণ" কাব্য সম্বন্ধে এই কারণেই একটা বিপরীত ভাবনা গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। আন্তরিকতার অভাব এ কাব্যে আছে, একথা অসত্য। কবি যখন বলেন—

দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে
একবার
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম
অধিকার।

তখন পত্নীর প্রেমে কবির আন্তরিকতা নেই একথা বলা চলে না। তবে প্রকাশের গাম্ভীর্য আবেগকে সংহত করে দিয়েছে। সেখানে কবিধর্মের মূলে আছে অসাধারণ সংযম ও শান্তির সুর।

॥ ৫ ॥

সংযত আবেগ ও অনুভূতির প্রসারে Shelley এবং রবীন্দ্রনাথের একটা মিল দেখা গেলেও এ-দুয়ের মাঝে একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। Shelley-র জীবনে এই অস্তিত্ববাদী পরমানন্দ প্রাধান্য পায়নি কারণ বৈজ্ঞানিক Shelley-র ভগবানের অস্তিত্বেই ছিল সন্দেহ। তবে Shelley বিশ্বাস করতেন জগতের সকল চলমানতার আড়ালে এক পরমসত্তার অস্তিত্ব, যার বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, নেই কোন পরিবর্তন। জগতের সকল কিছু মিথ্যা কারণ তাহারা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সকল পরিবর্তনশীল জীবনের পিছনে আছে একটি পরম সত্য যাহাতে এই জগতের অনুপরমাণু বিধৃত। Shelley-র এই ভাবনার পিছনে লজিক্যাল যুক্তি এবং বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই পরমানন্দ অনুভূতিসঞ্জাত অভিজ্ঞতা। Shelley-র জীবনগত অভিজ্ঞতা ছিল না যা রবীন্দ্রনাথের পরমৈশ্বর্য। তাই Shelley-র Adonois এর মাঝে ব্যক্তিগত শোকানুভূতি যা কিছু তা একান্তই আপনার সম্পর্কীয়, Keats-এর সঙ্গে কবির আত্মবোধ জাত নয়। কারণ Keats-এর সঙ্গে Shelley-র সম্পর্ক ছিল খুবই কম। আর সান্ত্বনা অংশটিও এইজন্যে একটি ধারাপথে আসেনি। Adonois কবিতাটিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—শোকোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনা। দুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দুটি কাব্য রচনা করা অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু যদিও রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্যে লক্ষ্য স্থির এবং কবি অনিবার্যভাবে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তথাপি একটি প্রবাহ রক্ষা করে এই শোক সান্ত্বনায় পরিণত হয়েছে।

"এষা" কাব্যে কবির জীবনের কেন্দ্রেই হাহাকারের প্রকাশ। সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস আছে, আছে সান্ত্বনা, আছে শোক হ'তে উত্তরণের প্রয়াস, অধ্যাত্ম রাজ্যে দার্শনিকতায় যাবার চেষ্টাও প্রধান তবু সকল কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে ব্যথার করুণ রাগিনী। কাজেই বলা যেতে পারে, একাব্যে মানবিক আবেদন প্রধান।

হারানর বেদনা ক্রমশ আপন ধারায় শান্তি ও দার্শনিকতার পথে অগ্রসর হচ্ছে পরিশেষে শান্তি লাভ করেছে দার্শনিক ভাবনায়। তবু তাঁর রচনায় দার্শনিকতার উচ্চাদর্শ নেই, মনকে সম্পূর্ণরূপে দর্শনরাজ্যে স্থিত করে দিতে পারেননি কবি। আর তা যদি পারতেন তা হলে এর মানবীয় আবেদনটুকু হারিয়ে যেত। আর এই ব্যাপারটিই রবীন্দ্রনাথের স্মরণ কাব্যে ঘটেছে। কবি অত্যন্ত শান্তচিত্তে মৃত্যুর রূপটিকে গ্রহণ করেছেন। তার জীবনে মৃত্যুর দান কতখানি তাও তিনি অনুভব করেছেন। বড়াল কবিও মৃত্যুর মধ্যে আপনার প্রিয়াকে খুঁজে পেয়েছেন তবু তার এই মৃত্যু অভিজ্ঞতায় দার্শনিক চেতনা কম। কাজেই শোকের পূর্ণ চিত্র কবির কাব্যে

পাওয়া যাবে না। শোকের পরের স্তরই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই প্রসংগে Tennyson-এর In Memorium-এর কথা উল্লেখযোগ্য সেখানে বন্ধুবিয়োগে বেদনাবিধুর কবির অশ্রুতর্পণ ঘটেছে। In Memorium-এও ব্যক্তি-শোকের তীব্রতা ছিল প্রথম দিকে। পরে সেখানে স্থানলাভ করেছে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, কিছু বা ধর্মচেতনার নিয়ন্ত্রণ।

মনের এই ধূসর রঙটিকে কবি প্রকৃতির পরেও প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। প্রকৃতির বিস্তৃতির পরে আপনার শোককে আনার সংগে সংগেই তার দৃষ্টি হল উন্মুক্ত। বন্ধুকে তিনি চিরন্তন করে ফিরে পেলেন। কবি প্রকৃতির সর্বত্র, বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে বন্ধুর সত্তাকে প্রকাশিত হতে দেখলেন। কবি বললেন :

My regret
Becomes an April Violet
And buds and blossoms
like the Rest.

রবীন্দ্রনাথের মনোভংগীতে ঠিক এমনতর না হলেও একটি খুশীর স্পর্শ পাওয়া যায়। বিশ্ব প্রকৃতির রূপের আড়ালে কবি পত্নীর রূপটিকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

কবির শান্ত করুণ মনে আনন্দের ছোঁয়া—
এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া আলোকের আকুল কম্পনে
এই শীত মধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।

শেলীও ঠিক এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বললেন, Keatsও মৃত নন। তিনি নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন বিশ্বের সত্তায় সত্তায়। আজ হতে বিশ্বের সকল প্রকাশে পাওয়া যাবে তার প্রকাশ। বলা যেতে পারে এখানে কবিত্রয়ীর ভাবনাগত মিল আছে।

এরও পরের স্তরে সান্ত্বনা। সান্ত্বনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও Tennyson-এর একটা ভাবনাগত মিল রয়ে গেছে। তবে Tennyson পুরোপুরি দর্শন ও অধ্যাত্মরাজ্যে চলে গেছেন। সেখানে বন্ধুর বিরহ বেদনা বা তার আত্মা গৌণ। কবি আত্মার একটা সার্বিক রূপ নিয়ে চিন্তা করেছেন। কবির ধর্মচেতনা বিজ্ঞান ভাবনা ও দার্শনিকতাই এখানে মিশ্ররূপে একক ভাবনা হয়ে উঠেছে। Shelleyর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছে। Shelley যখন Keats-এর মৃত্যুর শোকে সান্ত্বনার এষণায় বেরিয়েছেন তিনিও দর্শনের রাজ্যে চলে গেছেন ব্যক্তি-সম্পর্কহীন হয়ে। জগতের সংগে তাঁর ভাবনার আর কোন বিশিষ্ট সম্পর্কই রইল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংহতচিত্ত হলেও তাঁর সান্ত্বনা কাব্য হয়ে উঠেছে তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত হয়নি ব্যক্তি-সম্পর্কহীন হয়নি বলেই। মৃত্যুদানকে পরম বলে গ্রহণ করলেও কবি যখন বলেন—

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তি দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি
আজিকে তারে সকল তার কর্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।

তখনই তা কাব্যত্ব লাভ করে। তত্ত্বের সংগে ব্যক্তি ভাবনার সুসমন্বয়েই রচিত হয় প্রকৃত কাব্য।

সব শেষে বলা যেতে পারে যে Shelley এবং Tennyson উভয়ের সংগেই শোককাব্য প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের মিল প্রচুর। তবু একথা সত্য যে রবীন্দ্রদর্শনে প্রবহমান ধারা আছে, আছে একটি দেশের চিন্তা ভাবনার ঐতিহ্য-ধারা, Shelley বা Tennysonএর কাব্যের দর্শনে তা নেই। তাই তাঁদের দার্শনিকতার শুরুতেই কাব্যত্ব হারিয়ে গেছে।

উপরে উল্লেখ করা কাব্য তিনখানির সংগে "স্মরণ"র যে মিল তা শোক-কাব্য বলে এবং পুরোপুরি বহিরাঙ্গিক। তবে অন্তর দিক হতে মিল একেবারে নেই এমন বলা চলে না। তবু তাঁদের যাত্রা-পথেই একটা পার্থক্য এসে গেছে। "স্মরণ" কাব্যে সান্ত্বনায় শান্তস্তব্ধতা আসেনি। রবীন্দ্রনাথ, Shelley এবং Tennyson-এর কাব্যে যে শান্ত স্তব্ধতা তা স্মরণ কাব্যে আসেনি শেষ পর্যন্ত। কবির সান্ত্বনার কথাতেই অশ্রুভেজা ভারি সুরই রূপ পায়।

স্মরণ কাব্যের স্বাতন্ত্র্যের কারণ হিসেবে অন্যতর একটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। বড়াল কবি গৃহজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন প্রথম হতেই। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুতে কবি গৃহের সীমায় ফিরে এলেন। কিন্তু সেখানে কবি আর সুন্দরকে পেলেন না। নূতন যা কিছু তার 'পরে প্রত্যাশা থাকে অনেক। অক্ষয়-কুমার যখন গৃহের দিকে ফিরলেন তখন, তার এই নূতন অভিজ্ঞতা হলেও এর সকল মাধুর্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। কবির জীবনে এই অপ্রাপ্তির বেদনাই তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এরই জন্য কবি শান্তিকে কিছুতেই পাচ্ছেন না। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য কবিদ্বয়কে নূতনকে গ্রহণের আনন্দ হারানর তীব্র বেদনা সহ্য করতে হয়নি। কারণ রবীন্দ্র-নাথ পত্নীর মৃত্যুকে আলোকের দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন। Shelleyর সংগে Keats-এর বন্ধুত্ব খুব নিবিড় ছিল না আত্মবোধ ছিল কমই। আর Tennyson-এর বন্ধু তার অত্যন্ত প্রিয় ও আপনজন কাজেই অপরিচয়ের ব্যবধান রচিত হয়নি। কিন্তু "স্মরণ"র কবি আপন হতে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই তার কাছে গৃহের শান্তি নূতন আর তাকে যখন কবি আস্বাদন করতে এলেন, তখন বস্তুজগতের মাধুর্যের আস্বাদন পেলেন। তখন তার বিলীয়মান রেশটুকু লাভ করলেন। নিজেই যে নিজেকে এ মাধুর্য হতে বঞ্চিত করেছেন একথা অনুভব করেই তাঁর বেদনা এত তীব্র। অপর পক্ষে অন্য কবিদের জীবনে বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদন অথবা একেবারেই অপরিচয়, তার হতে বিচ্যুতি তাঁদের বেদনাকে এত তীব্রতর করে তোলেনি।

মতামত
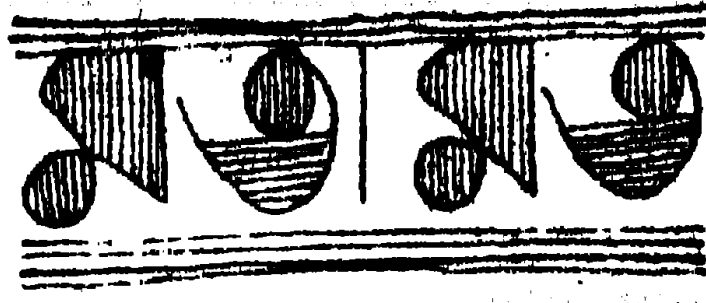
পরিচালকের গগনস্পর্শী দম্ভের কাছে দর্শকের বক্তব্য

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

নাট্যকার-পরিচালক উৎপলবাবু এক চায়ের আসর ফেঁদে ভাষাবিদ ও দার্শনিককে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর নব আবিষ্কৃত আঙ্গিক-কীর্তনের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে। এই আঙ্গিকের ম্যালেরিয়া জ্বরে তিনি বহুদিন থেকেই ভুগছেন মনে হয়, শেষ দশায় তাঁকে বিকারে পেয়েছে। এক আঙ্গিকের বিচারে তিনি অভিনেতা, আঁকা-সীন, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ-র আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন। ব্যাপার কি? নব-নাট্য আন্দোলন সুরু হয়েছে দেশে, নতুন নতুন ধারা বেয়ে সে-নাটক এগিয়ে যাবে এটা মানি, কিন্তু যাকেই তাঁবে পাবো না, সেই হবে 'পদনীপিসি', আর তার গায়েই কুৎসা ছিটিয়ে মারবো, এ-কোন্ দেশীয় বস্তু?

যে আঙ্গিককে সর্বস্ব করে তিনি আসরে নেমেছেন, তার প্রকৃত আকৃতি' টেনে বাড়িয়ে ঘোঁট বাড়ানোর সার্থকতা যে কি, তাও বোঝা যাচ্ছে না। তিনি এত কথা বুঝলেন আর এই ছোট্ট সত্য কথাটা বুঝতে চাচ্ছেন না কেন যে, আঙ্গিকের অঙ্গ যখন নাটক (আত্মা) ছাড়া আর সর্বত্রই বিস্তৃত, তখন তিনি যা নিয়ে গদা ঘুরোচ্ছেন, সেটা উৎকট দৃশ্যসজ্জার প্রয়োগকৌশল ছাড়া আর কিছু মাত্র নয়। এই দৃশ্যসজ্জাও অপাচ্য নয়, দুষ্পাচ্যতেই বিরক্তি। ছেলের চেয়ে ঘুনসী, পায়ের চেয়ে পা-জামার ব'ড়া-বাড়িতে চোখ টাটায়।

দর্শক-মন বলে আর এক শিব কৈলাসে বাস করে, তার যজ্ঞভাগকে অগ্রাহ্য করা যায়নি কোন দিন। তার কাছে রোমান্সের ভেল্কিবাজি আর রিয়ালিজমের এঁদো পাঁক কোনটাই যখন প্রশ্রয় পায়নি, তখন 'অভিনেতার দৌরাত্ম্য' মুক্ত হতে গিয়ে পরিচালকের বীর ঝম্পের খপ্পরে পড়তে যে সে রাজি হবে না—এটাই সহজ সত্য। ১৮৫৭ সালের অভিনয়কে আজ যদি "নীরেট ধরনের আড়ম্বর" বলে মনে হয়, তবে ১০০ বছর পরে 'অঙ্গারের' দৃশ্যসজ্জাকেই জ্যাঠাদের দাপাদাপী না বলার পক্ষে যুক্তি আছে কি? সেদিনকার 'ন্যাকড়ায় আঁকা বনপথে' নিমচাঁদদের নিয়ে যারা 'অবান্তর আলোচনায় মত্ত' হয়েছিল, তারাই আজকে আবার 'অঙ্গারের', 'সেতুর' দৃশ্যসজ্জা নিয়ে মত্ত হচ্ছে এবং তাদের জন্য 'সত্যিকারের থিয়েটারে বাস্তবতার স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলা রংগমঞ্চে ঐ বাস্তবতাই প্রয়োজন।' —বলে যত বড় অপবাদই ছুড়ে মারুন, তাদেরই কল্পনার দুয়ারে ঐ তথাকথিত বাস্তবতার মুখোসধারী দাম্ভিক পরিচালকদেরও হাতজোড় করে দাঁড়ানো ছাড়া কোন অন্য উপায় নেই। 'ঘরবাড়ি, নদীর বাঁধ সব আস্ত ত্রি-মাত্রিকরূপে' তুলে ধরলেই কি আস্ত বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পারবেন। না, তা হয় না—কারণ, চোখের দেখা ও মনের অনুভূতি দুয়ে মিলেই নাট্য-রসকে গ্রহণীয় করে তোলে। পরি-চালকের কারসাজি শুধু চোখের পর্দাতেই আটকে থাকলে মনের দুয়ারে ঘা পড়ে না। আর যত বড় শক্তিমান শিল্পীই হোন না কেন, দর্শকের বিচারালয়ে মাথা পেতে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, সুস্থ শিল্প-প্রতিভার সহায় হতে পারে না।

উৎপলবাবু থিয়েটার ও রেডিমেড দর্শক পেলে কি করবেন, তার অবান্তর কাদা না ঘেঁটে, এটুকু অন্ততঃ বলা চলে, তিনি যা করেছেন (অঙ্গার ও ফেরারী ফৌজে), দৃশ্য প্রয়োগকৌশলের পক্ষে তা বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমি উৎপলবাবুর কথাতেই বলছি, অঙ্গারের দৃশ্য-পরিকল্পনায় এক অযথা 'স্থূল' বাস্তবকে রেখে মনকে পীড়িত করা হয়েছে। 'গোটা ট্রেনকেই তুলে ধরলে' যদি 'স্থূল' হয়, তবে একটা আস্ত 'ক্রেন ও তার কর্ণবিদারী শব্দ রেখে তিনি কোন্ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতে চেয়েছেন? আর অনুভূতি? পৃথিবীর উপরকার মানুষদের কাছে খনির নীচেকার মানুষের যে আর্ত appeal—তাকে 'হল' থেকে বাইরে আনার অবকাশ পেলুম না। এক ভেল্কির বন্যায় তার অপমৃত্যু ঘটল। আসলে নবযুগের সংগে নব আঙ্গিককে দর্শক-মন আপনিই মেনে নিয়েছে—'ডন কুইক্সটো'দের অসির ভয়ে নয়—এমনিই। যুগের প্রভাবে।

গণনাট্য সহজভাবে বক্তব্য হাজির করার জন্য যা করেছে, তার মধ্যে অভি-নয় ও আবৃত্তির তফাত যদি উৎপলবাবু না খুঁজে পান, তবে যাত্রাতে ত' অভিনয় পাবেন-ই না। আমরা অপেক্ষায় রইলুম উৎপলবাবুর থিয়েটার factory থেকে ('অন্য শিল্প থেকে ধার করবেন না।') যে অ-'অভিনেতাকেন্দ্রিক' নাটকের production হবে তাতে 'দম্ভ'-মুক্ত 'আমরা সবাই নায়ক'দের দেখব বলে। বলাই বাহুল্য ইতিমধ্যে 'দৌরাত্ম্য'-মুক্ত হতে গিয়ে যে 'পিটনবাজ' ও 'ভাঁড়' অভিনেতা উৎপল দত্তের দেখা পেলাম, তিনি ভরসা দিতে পারেননি মোটেই। আমি আবার বলছি, নব আঙ্গিকের ধারাকে দর্শক-মন স্বীকার করে নিয়েছে এবং উৎপলবাবুর মধ্যেও যদি কিছু আসল বস্তু পায়, তা সাদরেই গ্রহণ করবে। অযথা খোঁচা মেরে 'সতীনী কোন্দল' করার অসাহিত্যিক যুগ পার হয়ে এসেছি—অভিনন্দনযোগ্য আন্দো-লনকে অশিল্পীসুলভ আক্রমণে নোংরা না করতে আমি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

—উপেক্ষিত দর্শক
শ্রীদেবেন সাউ
(কলিকাতা-৯)

শতাব্দীর শব

মিহির আচার্য

রেডিয়োতে একটি বিলিতি বাজনা বাজছিল। কোনো শিল্পী যদি সেই গানটির ছবি আঁকতেন তা হলে দেখা যেত একটি উত্তালতরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র আর তার তলায় ধাবমান মুমূর্ষু সিন্ধু-সারসের কাকলী। নিঃশব্দ কক্ষে ওই গানটি আবহ-সংগীতের কাজ করছিল। ছোট্ট গোল টেবিল, তিনটি চেয়ারে তিনটি স্তব্ধ মূর্তি। গৃহস্বামী অরুণোদয় চ্যাটার্জি, তাঁর স্ত্রী তপতী এবং পরিবারের বন্ধু গৌতমী রায়। ইলেকট্রিকের দুধ-শাদা বাল্বের আলোয় সমস্ত ঘরে জ্যোৎস্নার ভিজে স্নিগ্ধতা। মাথার ওপর মাঝারী সাইজের নতুন ফ্যানটা অজস্র হাওয়ার খুশি ছড়াচ্ছিল। টেবিলে উষ্ণ কফির পাত্র গন্ধ এবং ধোঁয়ার অস্তিত্ব তুলে গ্রহণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। সময় সন্ধ্যা। বাইরে এক পশলা বর্ষণের পর আবার গুমোটের বাষ্পে ছেয়ে গেছে। পাখার হাওয়া গুমোটের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছে। চেয়ারের তিনটি প্রাণী কেউ নড়ছে না, নড়ছে না অনেকক্ষণ থেকে। যেন কোন্ চিত্রকরের আদেশে স্থানুর মতো তারা বসে রয়েছে। বোধকরি নিশ্বাসও পড়ছে না। নাঃ প্রাণের কোনো লক্ষণও নয়। কারণ তাহলে অস্তিত্ব মুখর হবে। এবং সেটা কারুর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

তপতীর মস্তিষ্ক ঃ (বয়েস ত্রিশ, ভারি গড়ন, কোমল শ্যাম, বিদুষী, কোনো কলেজের দর্শনের অধ্যাপিকা।) আমি জানতাম এমন হবে। জানতাম! অনেক দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু মনকে পীড়িত করতে পারিনি। কারণ তাতে মন ছোটো হয়। আমি ছোটো হতে পারিনি, পারি না। আমি শিক্ষিত, ভদ্র সংস্কৃত আমার মন, গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মতো সেখানে এক ফালি সন্দেহের ছায়া আমি ফেলতে পারিনি। কারণ সেটা আমার হার, আমার অহংকারের পতন। অরুণোদয়কে আমি বিশ্বাস করেছি, এখনও করি। এই দশ বছরেও যদি তাকে না চিনতে পেরে থাকি, সে-লজ্জা আমার। তাকে আমি পরিপূর্ণ করে ভরে রেখেছি কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যে বাইরের জলো হাওয়া ঢুকে তার মনের স্বাস্থ্যকে হরণ করবে। ও আমাকে যখন যেভাবে চেয়েছে পেয়েছে। আমি নিজের সত্তাকে গলিয়ে দিতে পেরেছি ওর প্রয়োজনের তাগিদে। ওকে আমি পরিচ্ছন্ন ঘর দিয়েছি, নিরাপত্তা দিয়েছি, ওর কাছে আমি কখনো ভার হইনি। অরুণোদয়ের সন্তানকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, ওর সন্তানের আমি মা, স্ত্রীর গৌরব আমার সর্বশরীরে, শোণিতে, স্পন্দনে। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার নির্ভুল, নিখুঁত। আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী সে ঠিকই মনে রাখে, এমনকি আমার জন্মের তারিখটি পর্যন্ত। প্রতিদিনের চলাফেরার ভেতরে অরুণোদয় কখনো বেহিসেবী হয়নি। বাড়ির প্রতি ওর টান প্রবল, আপিসের কালটুকু ছাড়া সে বাড়িতেই আত্মগোপন করে থাকতে ভালোবাসে। ওর বন্ধু বলতে কেউ নেই। হ্যাঁ আমিই ওর বন্ধু, সারা দিনের জমানো আবেগ সে আমার কাছেই মুক্ত করে। ওকে আমি ছাড়া আর কে এত বেশি বোঝে! এতদিন হয়েছে তবু ও আড়ষ্ট, মুখচোরা। স্বামীর চেয়ে ওকে প্রেমিকরূপে বেশি মানায়। এমন ছেলেমানুষি করে! আমার কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হলে কিংবা রাত্রের পাট চুকিয়ে শোবার ঘরে আসতে! আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রণয়ীর মতো, আমি শ্রাবণে জন্মেছি বলে শ্রাবণী বলে ডাকে। ওর কাছে দাম্পত্যজীবন একখণ্ড লিরিক কবিতার মতো। আমাকেও কেমন আবিষ্ট করে রাখে। ওর কাব্য, আমাকে কাঁপায়, আমাকে চঞ্চল করে, শিহর জাগায় রক্তের প্রবাহে। ওর এই ছেলে-মানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিয়েছি, ওকে শিশুর মতো লেগেছে। তবু কেমন নেশা আছে ওর মধ্যে। নতুন নতুন করে জীবনকে আস্বাদ করা।

তবু বলব ওর এই আবেগের মধ্যে ভয় ছিল না এতদিন। কারণ ওর দেয়া স্পর্শানুভূতির গভীরে আমি অতল মনের নাগাল পেতাম না। মনে হত এই ভালো। এই স্পর্শ, এই স্পন্দন, এই রঙ, এই উত্তেজনা। কিন্তু, এক-এক সময় মনে হত এটা স্বাভাবিক নয়,

ঘোরঘোর অবস্থা। যেন জীবনের ব্যাকরণ নেই এর মধ্যে। ওটা শুধু স্পর্শ-স্পন্দন-রঙ-উত্তেজনা জড়ানো একটা অন্য কিছু বস্তু। এবং সে বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করলে কিছু পাওয়া যাবে না। অবাস্তব, একটি খেয়াল মাত্র। আমার ভয় হত। ভয় হত একটা দুর্বোধ্য জিনিসের সঙ্গে ঘর-করার মতো। অরুণোদয়কে ঘিরে আমার একটা ভয়ের জাল গড়ে উঠল। সে-জালকে ভেদ করি সে-সাধ্য আমার ছিল না।

সে-ভয়টিই কি আজ সত্য হল। এবং তার রূপটি এত প্রচণ্ড, বিহ্বল-করা। আমি ভাবতে পারছিনে, কিশোরী-বেলায় শাড়িকে কায়দা করবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে ওঠার মতো একটা ভাব আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। আমি ভাবনাগুলিকে গুটোতে পারছিনে, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমি কি ভাবব, কেমন করে ভাবব। আমি সাংঘাতিক ধরনের কিছু ভাবতে যাচ্ছি—কিন্তু পারছিনে। আমি তো জানতাম, অনেক-দিন থেকেই আঁচ করছিলাম : একটা কিছু হতে যাচ্ছে। নিশ্চিত ধারণা করেছিলাম একটা কিছু হতে যাচ্ছে—আমার মন চাইছিল একটা কিছু হোক। পুরনো বিপজ্জনক স্টোভটা একদিন বিস্ফোরিত হয়ে পড়ুক, আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বিস্ফোরিত হল এবং আমারই চোখের সামনে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আমার এতদিনকার উদ্‌বেগ শান্ত হল। একটা পীড়ার হাত থেকে আমি বাঁচলাম। কিন্তু, এখন আমি কি করব। আমি এখন থেমে থাকতে পারিনে, কারণ আর চিন্তার অবকাশ নেই, চিন্তা দূর হয়েছে। এখন আমাকে কিছু করতে হবে।

আমি নতুন মুন্সেফ হয়ে এসেছি এজলাসে, আমার সামনে নতুন মামলা। আমি বিচারক। রায় দিতে হবে। অরুণোদয় গৌতমী—ওরা দাঁড়িয়ে আছে আসামীর কাঠগড়ায়। কিন্তু আমার বিচার করে কে। বিচারকেরও বিচার আছে। আমি, আমার অন্য-সত্তাকে কোনো-দিন সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরিনি। আমি আত্মনাশকেই আত্মসম্মান ভেবেছিলাম। কোনোদিন ওকে জানতে দিইনি আমিও একটি ব্যক্তিত্ব, যার বিচার-বিবেচনা আছে। যে চোখ খুলে সবকিছু পর্য-বেক্ষণ করতে ভালোবাসে। আমি চোখ খোলা রাখিনি, অন্যের চোখ দিয়ে আমি সংসারযাত্রা নির্বাহ করে চলেছিলাম। আমি দশ বছরের জীবনে কোনোদিন রাগিনি, বিরক্ত হইনি। অরুণোদয় আমাকে নিরুপদ্রব নির্জীব মেয়েমানুষ ভেবেছিল। আমি শীতের দিনের লেপের মতো স্বাভাবিকভাবে জড়িয়েছিলাম ওর দেহে। আমি নিজেকে দামী করতে পারিনি, তাই দাম পেলাম না, অল্পমূল্যে বিকিয়ে গেলাম সংসারের হাটে।

কিন্তু ওদের বিচার আমাকে আজ করতেই হবে। ওরা আমাকে ঠকিয়েছে, আমার বিশ্বাসকে অপহরণ করেছে। আমি শক্ত-কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে চাইলাম ওদের দিকে। কিন্তু ওদের মুখ আমি দেখতে পেলাম না। আমার চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা আর ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আমি চোখের সামনে শাদা দেয়াল ছাড়া কিছু দেখতে পারলাম না। আমি কি বলব ওদের, কী বলতে পারি। ওদের অপরাধ তো আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ওরা অপরাধী। এখন আমার রায় কি হবে? অরুণোদয় তুমি প্রস্তুত হও। তুমি জানো : আমার বাড়ির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কেবল ভালোবাসার জোরেই আমি তোমার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। তোমাকে আমি নিরা-পত্তা দিয়েছি, আর্থিক সহায়তা। এখন আমার বাড়ির লোক কি বলবে, ওদের কাছে আমাকে কি হাস্যকর করুণ অব-স্থায় ফেললে। তুমি জানো আমার কলেজের কলিগরা আমাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, আমার এ-দশা দেখলে তারা আমাকে কৃপাকটাক্ষ করবে। আমার সামাজিক সম্মান আমার কাছে বড়। কারণ আমি সামাজিক জীব। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে এইভাবে ধূলিসাৎ করে দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই। তাছাড়া—আমাদের সন্তান তার কাছে তোমার কি পরিচয় আমি দেবো। সে জানবে তার বাবাকে, জানবে তার পরিবারকে, এবং সে মুহূর্তে সামাজিক বন্ধনের পবিত্রতাকে সে সন্দেহের চোখে দেখবে, তার সুস্থ সুন্দর বিশ্বস্ত জগৎ এক লহমায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

আমি এখন আর নিজের কথা ভাবছিনে। নিজের কথা ভাববার এ-সময় নয়। আমার চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎটা দুলে উঠছে। আমি কোনো ব্যক্তি নই, আমি প্রফেসার চ্যাটার্জি, মিসেস চ্যাটার্জি, আমি মা, আমি সংসারী মেয়ে। এগুলিকে আমি সবসময় বড় করে দেখেছি। এগুলিই আমার আচরণ, আমার সম্পদ। এর একটিও গেলে আমি সর্বস্বান্ত হব, রিক্ত হব।

আমি আজ বুঝতে পারছি জীবন ছন্দ নয়, স্পন্দন নয়, রঙ নয়, উত্তেজনা নয়, জলের মতোই জীবনের কোনো রঙ নেই, সে স্বাভাবিক, সহজ। অরুণোদয়, তুমি কি বুঝতে পারছ কী ক্ষতির কালিমা তুমি আমার—আমাদের জীবনে টেনে আনলে। তোমার চুরি-করা আবেগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তুমি কি একবারও ভাবোনি ভবিষ্যতের চেহারাটা? সংসারটা একটা সুগ্রথিত মালার মতো, তার একটি ফুল ছিঁড়ে গেলে, সমস্ত মালাটাই খুঁতগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

অরুণোদয়, আমি তোমাকে শাস্তি দেবো। কিন্তু তার আগে আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই। দ্যাখো আমি একটুও উত্তেজিত হইনি, আমি ঠাণ্ডা মাথায় তোমার কথা শুনব। বলো, বলো তুমি অরুণোদয়।

অরুণোদয়ের মস্তিষ্ক : (বছর পঁয়ত্রিশ, স্বাস্থ্যবান যুবক, গৌরবর্ণ, উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে।) এই জীবনকে আমি কোনোদিন বুঝিনি। জীবনটা আমার কাছে চিরকালই দুরূহ অঙ্কের মতো দুর্বোধ্য লেগেছে। ফলে আমি নিজস্ব একটি ভঙ্গি সৃষ্টি করে-ছিলাম। কলেজ জীবনের অমানুষিক দারিদ্র্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাকে একটি ধার-করা বর্ম পরতে হয়েছিল। সিনিসিজমের আড়ালে আমি পলায়ন করতে চেয়েছিলাম। এটা একটা নকল বীরপণা! আমার জীবনস্রোত এগিয়ে গেল হোঁচট খেতে-খেতে। মনে হল জীবনটা একটা আকস্মিকতার মালা-গাঁথা ছাড়া কিছু নয়। আমি নিজের চেষ্টায় কিছু করিনি। তপতীর সঙ্গে যোগাযোগ আমার কলেজ জীবনের শেষ পর্বে। আমি ওকে ভালোবাসি কিনা বোঝবার আগেই আমি ওকে প্রেম নিবেদন করে বসলাম। আর তপতী আমাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন ক্ষিপ্র এবং হঠাৎ ঘটে গেল যে আমি বাধা দিতে পারলাম না, আমার জীবনভঙ্গির সঙ্গে কেমন খাপ খেয়ে গেল।

আমি ঘর পেলাম, নিরাপত্তা পেলাম। কিন্তু কোনোদিনও মনে হয়নি এর জন্যে আমি দাম দিয়েছি এবং দাম দেয়ার অব-কাশও আছে। এ যেন আমার স্বাভাবিক পাওনা। একেক দিন আমার এ-সন্দেহও

হয় এ ঘর আমার কিনা, আমি এ-সংসারের সত্যিই প্রভু কিনা, নাকি অতিথিমাত্র। আগেই স্বীকার করেছি আমার জীবন-বোধের পায়ের তলায় কোনোদিন মাটি ছিল না। কাজেই দাম্পত্য জীবনের আদল আমার কাছে কিছু রঙ কিছু উষ্ণতা কিছু স্পন্দন আর উত্তেজনার বাষ্পে হারিয়ে গেল। তপতী, আমার স্ত্রী, বিয়ের পর থেকে মা হওয়া পর্যন্ত কোনোদিন একটা শরীরী মূর্তিতে ফুটে উঠেছে কিনা আমার সন্দেহ। তপতী আমার কাছে রঙ-উষ্ণতা-স্পন্দন-উত্তেজনায় তালপাকানো একটা পদার্থ ছাড়া কোনোদিনই কিছু হতে পারেনি। সে যে একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা, তারও অন্দর ও বাহির জীবনে অনেক সমস্যা আছে—সে-চিন্তা কোনোদিন আমার মনে উদয় হয়নি। সেজন্যে আমাদের সম্পর্কটা বিশেষ এক জায়গায় থেমে গিয়েছিল, আর এগোয়নি। আমার এখন ভাবতে অবাক লাগছে তপতীর জীবনের অনেক ঘটনাই আমি স্মরণ করতে পারিনে। কোন্ ইয়ারে সে এম এ পাশ করেছে, ফার্স্ট ক্লাশে কত পজিশন, কলেজে সে কত মাইনে পায়, ইউ জি সি'র টাকা পাচ্ছে কিনা, ওর জীবনের এমন ধরনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমার অজ্ঞানতা অগাধ পরিমাণ। এমনকি এসব ব্যাপারে আমার অনাগ্রহ বিস্ময়কর।

তা সত্ত্বেও আমাদের দাম্পত্য জীবন-প্রবাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। একজন পুরুষ স্ত্রীর কাছে যা আশা করে তার বেশিই আমি পেয়েছি। তপতী আদর্শ স্ত্রী, রত্নবিশেষ, যে কোনো পুরুষ তাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে গর্ব অনুভব করবে। আমিও যে স্ত্রীগর্বে গর্বিত নই, এমন নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এক-একজন মানুষ আছে যারা ভালো কিছু সহ্য করতে পারে না। ভালো জিনিস গ্রহণ করবার ক্ষমতাও অনেকের থাকে না। ভালো জিনিস বলেই হয়তো তার চোখ-বাঁধানো মনোহারিতা নেই।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি তপতীর মতো ভালো নই। হয়তো যাকে ভালো বলে তা হবার মতো ঐশ্বর্য নেই আমার চরিত্রে। আমি ভালো হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখলাম ভালো জিনিসটা বড় আঁটসাঁটো, ইচ্ছেমতো নড়াচড়ার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তপতীর ভালোত্ব আমার স্বাধীনতাকে খর্ব করে, যেন অন্তঃশীল টানে আমাকে ওর চারপাশে ঘোরায়। অথচ, ট্রাজিডি এই : ওর এই ভালোত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কেমন এক নেশা আছে এর আস্বাদে। আমার স্বার্থপরতা তা চুমুকে চুমুকে লেহন করে। আর, তখনই মনে হয় তপতীকে না-ভালোবেসে পারা যায় না। এই দোটানায় আমার জীবনটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, আমার সত্তা আধখানা হয়ে গেছে। আমি একই সময়ে আমার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ এবং বিরক্তি বোধ করি।

সেদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটল। আমার এক কলিগ্ মিঃ বোস ললাট দেখে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আমার সম্বন্ধে সেদিন আশ্চর্য মন্তব্য করলেন : 'আপনি পুলিসের চাকরিতে জয়েন করলে প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন।' বললেন : 'আপনার মধ্যে দুটো মানুষ আছে ডকটর জেকিল এন্ড মিসটার হাইড—দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব আপনার মধ্যে কাজ করছে।' কথাটা শুনে রাগ হয়েছিল। কিন্তু মিঃ বোস যখন হেসে বললেন : 'ভয় নেই। আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরও আপনি এই দুমুখো অস্ত্রে ঠকাতে পারবেন। কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আজ সে-মন্তব্য হঠাৎ আমার মনে পড়ল। দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব! মনে হল একটা নিষ্ঠুর অদৃষ্টবাদ আমার অজ্ঞাতেই আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সেবার শিমুলতলায় যখন গোতমীর সঙ্গে আলাপ হল তখন আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে অদৃষ্টবাদ আর দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব। সাধারণ গেরস্থঘরের মেয়ে, বিদ্যার চেয়ে বয়েস বেশি বেড়েছে। শরীরের ভাঁজ থেকে আরম্ভ করে চোখ-মুখের হাসি আর লাবণ্যগুলি একেবারে নতুন, সতেজ। আবেগ অনুভূতিগুলি কিশোরের মতো অপরিশীলিত এবং স্ফূর্ত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সজাগ নয়। শহরের যান্ত্রিক জীবন-ধারণের বাইরে এখানে এই শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে আমার সংস্কার প্রবৃত্তিগুলি কেমন আদিম রূপ গ্রহণ করছিল। আমার এতদিনে মনে হল আমার স্ত্রীর সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের সঙ্গে আমার আন্তরিক যোগাযোগ নেই। আমার মনের কাঠামো ওর চেয়ে নিচুস্তরে বাঁধা। মনে হল ওর পরিশীলিত বুদ্ধির তলায় আমার স্বাভাবিক মনটা বন্দী হয়ে ছট-ফট করছিল। অর্থাৎ গোতমীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পক্ষে আমি সুবিধে মতো দর্শন গড়ে তুলছিলাম। বয়েসের ব্যবধানের পাঁচিল আমি সহজেই ডিঙিয়ে পার হলাম। গোতমী কায়দাটা বুঝেছিল, বুঝে সে হেসেছিল। হেসে ভ্রূভঙ্গি করে তর্জনী তুলেছিল : 'আমি দিদিকে বলে দেবো।' দিদিকে বলেনি গোতমী। দিদিকে আড়াল করেই সে আমার সান্নিধ্যে এসেছিল। অথচ আশ্চর্য, সে জানত আমি বিবাহিত, আমি পিতা, তা সত্ত্বেও আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করবার জোর যে সে কোথায় পেয়েছিল, জানি না। আমার মতোই তপতীর সঙ্গে সে ভালোমানুষের অভিনয় করত।

শিমুলতলার ঘনিষ্ঠতা কলকাতায় এসে অন্তরঙ্গ রূপ নিল। সপ্তাহে তিন-দিন গোতমী আমার সঙ্গে দেখা করত। সমস্ত দেখার ব্যাপারটাই ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত, আমার স্ত্রী তা জানত না। কোনোদিন আপিসে যাওয়ার আগে আমার মাথা ধরত, আপিসে ছুটি নিতাম। তপতী চলে যেত কলেজে। আর দুপুরবেলায় হঠাৎ এসে পড়ত গোতমী। এই সমস্ত মধুর মিথ্যাগুলি আমাদের উপভোগকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে

ভুলত। চুরি করার থ্রিল ছিল আমাদের রক্তে।

বছর দুয়েক এইভাবেই গড়িয়ে গেল। গোতমীর সংগে আমার সম্পর্কের বিন্দুমাত্র টোল পড়েনি।

আজ ভাবি : আমার স্ত্রী কি আমাদের এই ডাকাতি, এই সিঁধকাটা সম্পর্কে কোনোদিন সন্দেহ করেনি; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়নি? কেন? তপতী কি সত্যিই এত উদার, এত সংস্কার-বিমুক্ত? ওর মুখের কথায় আমাদের এই নিভৃত রহস্য ভেঙে যেতে পারত। সে ভেঙে দেয়নি। হয়তো তপতী ছোটো হতে চায়নি, পারেনি।

কিন্তু আজ স্বচক্ষেই সে দেখল আমাদের প্রেমলীলার একটি স্থূল মুদ্রা। তা দেখেও তো সে ফেটে পড়ল না, অপমানিত বাঘের মতো গর্জে উঠল না। এমন সর্বংসহা হয়ে উঠল সে কি করে! নাকি, ভাবছে সে কী বলবে আমাকে, গোতমীকে। কিংবা এই মুহূর্তে আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যদি গোতমীর সামনে আমি নিজের সম্মান বাঁচাতে ওকে আঘাত করে বসি। তাই কি? কিন্তু আমি সত্যিই ওকে কি ভাবে আঘাত করতে পারি? ওকে বলব তোমাকে আর ভালোবাসি না, তোমার সংগ আমার কাছে অসহ্য! একথা বলা যায় না। কারণ একথা সত্য নয়। আমি স্ত্রীকে ভালোবাসি কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু তপতীকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না, একথা সন্দেহাতীত। তপতী নেই অথচ গোতমী আমার জীবনে আছে, আমি ভাবতেই পারিনে। তপতী না-থাকলে গোতমীও থাকবে না আমার জীবনে। কেন? আমি জানিনে। তপতী যদি এই মুহূর্তে দাবি করে গোতমীকে তোমায় ছাড়তে হবে, আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা না-করে হেঁটমুখে গোতমীকে চলে যেতে দেবো। কারণ গোতমীর সম্মানরক্ষার প্রশ্ন আমার নয়। তার আর আমার সম্পর্ক কোনো সম্মানজনক শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়—গোতমী সেটা বোঝে এবং স্বীকারও করে। সে এবং আমি দুজনেই চোর, ওইখানেই শুধু আমরা পরস্পরের সাকরেদ। এমন অনিশ্চিত সত্ত্বেও গোতমী কেন আমার সংগে এই খেলায় মাতল। নাকি তারও কোনো নিশ্চিতি কোথাও ছিল না! গোতমীকে সত্যি এক-একসময় আশ্চর্য লগে আমার নিজেরই। আমার প্রয়োজনের আগুনে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠতে ও কখনো কোনোদিন আপত্তি করেনি। ও কোনোদিন বাধা দিয়েছে, শরীর খারাপ বলে কোনোদিন আমাকে প্রতিহত করেছে বলে আমার মনে হয় না। ওর চরিত্রে বাধাবন্ধহীন এই দুর্দমতা আমাকে বিস্মিত করেছে, ক্লান্ত করেছে, কিন্তু ও কোনোদিন ক্লান্ত হয়নি। যেন ও বলতে চায় : আমার অজস্র আছে, তাই খরচের ভয় নেই। আর ও যখন আরো অনেক দিতে পারবে তখন, তখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। ও আমাকে দিতে পারার প্রতিযোগিতায় হারাবে বলে ঠিক করেছে।

এখন গোতমী কি করবে? সে চলে যাবে। কারণ থাকবার অধিকার তার নেই। সে-অধিকার সে চায়ওনি আমার কাছে। এমনকি, আমার স্ত্রীকেও সে ঈর্ষা করে না। হয়তো স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা করবার কোনো ঐশ্বর্য পায়নি সে। না : সামাজিক মর্যাদাকেও সে ঈর্ষা করে না বলে মনে হয়। সে তো বলতে পারত : আমাকে পেতে হলে ঘর ভাঙো, বলতে পারত আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই! কিন্তু কিছুই সে বলেনি। বলেনি। এখন আমার মনে হল : গোতমী মনে মনে আমাকে কাপুরুষই ভাবে। সে আমার বীরত্ব জানে। কাজেই এর বেশি আশা করে না। কিন্তু একথা ভেবে তো আমি শান্তি পাইনে। আমাকে যে সে কাপুরুষ ভাববে তাতে আমার পৌরুষ ধিকৃত হয়।

না। আমি আর ভাবতে পারছিনে। এরা কিছু করুক। তপতী ফেটে পড়ুক। ক্লাইম্যাক্সের চূড়ায় ঘটনা ছত্রখান হয়ে পড়ুক। আমি এই বোবা গুমোট সহ্য করতে পারছিনে।

গোতমীর মস্তিষ্ক : (বছর বাইশ, যৌবন উদ্ধত, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন চেহারা, দীঘল আঁখিপল্লব, কাজলে গভীর, একটু ক্লান্ত, চিন্তাচ্ছন্ন।) শিমুলতলায় আমাদের পাশের বাড়িতে এক গোধূলির আলোয় এই পরিবারকে দেখলাম, আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী এবং একটি সন্তান। পোশাক-আশাক চেহারার মতোই এ'দের সংসারের ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রূপে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। আমাদের সংসারে পরিচ্ছন্নতা কোথাও নেই, আমার বাবা উন্মাদ, মা শুচিবায়গ্রস্ত। মন ওখানে নিয়ত মাথা খুঁড়ে মরত। আমার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তের ওপর এ'রা যেন এক উদার স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের বাড়ির জানালা থেকে ও'দের সংসারের ঘরোয়া খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি জলতরংগের মতো আমার কানে বাজত। এই আকর্ষণই একদিন আমাকে ওই বাড়ির সংগে যুক্ত করল। হঠাৎ-ই আলাপ অন্তরংগতার পর্যায়ে উঠে এল। ও বাড়ির প্রয়োজনীয় অতিথি হয়ে পড়লাম, যখন-তখন ও বাড়িতে আমার হাজিরা, একদিন না-গেলে ডাক পড়ত। আমরা একসংগে বেড়াতে যেতাম। যেদিন দিদির সময় হত না সেদিন অরুণোদয়বাবুর সংগে একাই বেরোতাম। অরুণোদয়বাবু না থেমে অনর্গল কথা বলতে পারতেন, অথচ বাড়িতে দিদির সামনে তাঁকে খুব কম কথা বলতে দেখেছি। আমিই যে তার কথার উৎসকে খুলে দিয়েছি, ভেবে আমার গর্ব হত।

আমার সংগে বেড়াতে-যাওয়া অরুণোদয়বাবুর চেহারা একেবারে অন্যরকম। বাইরের কোনো লোক দেখলে আমাদের সম্পর্ককে ভুল করতে পারত। অরুণোদয়বাবু প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমাকে স্পর্শ করতে ভালোবাসতেন, কখনো হাত, কখনো বাহু। মাঝে মাঝে বুনো ফুল তুলে আমার খোঁপায় গুঁজে দিতে এক আমোদ অনুভব করতেন। কী আশ্চর্য, ও'র দেয়া এই স্পর্শসুখকে আমি উপেক্ষা করতে পারতাম না। মনে মনে বিরক্ত হলেও না। পরে বুঝতে পেরেছি এই দুর্বলতাই আমার কাল হল।

কিন্তু সেদিন যখন আমার ডান হাত ও'র হাতে তুলে নিয়ে অরুণোদয়বাবু একটি প্রস্তাব করলেন। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম ঃ 'আমি আপনাকে ওইভাবে ভাবিনি।' অরুণোদয়-বাবু জোর করেননি। কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন সারা রাত এক বিশ্রী চিন্তায় কেটেছে। দিদির জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে। এই যদি অরুণো-দয়বাবুর চেহারা হয়, সেটা খুবই দুঃখের। কিন্তু, আশ্চর্য লাগে, অরুণোদয়বাবুর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ আমাকে প্রেতের মতো তাড়া করত। আমার ব্যবহারে তিনি কষ্ট পেয়েছেন ভেবে আমার খারাপ লাগত।

পরে একদিন ও'কে বলেছিলাম ঃ 'আপনি আমাকে ভালোবাসেন সেটা অন্যায় নয়। হয়তো আমিও আপনাকে বাসি। কিন্তু একে শরীরের সম্পর্কে আনবেন না। কারণ সে-সম্পর্ক আপনার একমাত্র দিদির সঙ্গেই হতে পারে।'

অরুণোদয়বাবু জোর করেননি।

ও'রা কলকাতায় চলে গেলেন। আমি বাঁচলাম। কিছুদিন পরে আমরাও কলকাতায় ফিরে এলাম। অরুণোদয়-বাবুকে এড়াতে ও'কে ভুলতে চেষ্টা করে যখন সফল হয়েছি মনে হল এমন সময় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। রাস্তায় দাঁড়িয়েই তিনি হঠাৎ ঝগড়া শুরু করলেন আমার সঙ্গে। পরের দিন দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর আমি কোনো রকমে পালিয়ে আসতে পারলাম।

বাড়িতে পৌঁছে আমি খুব ভাবলাম। যাব না বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু বিকেল হতেই আমি নেশাগ্রস্তের মতো বেরিয়ে পড়লাম। অরুণোদয়বাবু আমাকে রেস্টুরেন্টের পর্দাটানা ক্যাবিনে টেনে নিয়ে গেলেন। দু প্লেট পুডিঙ সামনে রেখে অতর্কিতে তিনি আমাকে আবেগের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলেন। আমি কাঁদলাম, কেঁদে হারলাম।

ওঁর দেওয়া এই স্পর্শসুখকে আমি উপেক্ষা করতে পারতাম না।

আমি অরুণোদয়বাবুকে ঘৃণা করি, আমার ঘৃণার যদি দাহাশক্তি থাকত তাহলে ও'কে আমি নিঃশেষে পুড়িয়ে মারতাম। কিন্তু ভালোবাসার মতো ঘৃণারও যে আকর্ষণ আছে, তা আমি জানতাম না। অরুণোদয়বাবুর সমস্ত চালচলন আচার-ব্যবহার ঠানদিদির রামায়ণ পড়ার মতো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাকে খাদ্যবস্তুর চেয়ে বেশি সম্মান তিনি কোনোদিন দেননি। ও'র এই বাড়াবাড়ি দেখে এক-এক সময় মনে হত অরুণোদয়বাবু এখনো অবিবাহিত, অন্তত তাঁর জেদ দেখে তাই মনে হত। এখন বুঝতে পারি অরুণোদয়বাবুর নিপুণ অভিজ্ঞতাই ইচ্ছের বাইরে আমার দেহে ঝড় ডেকে আনত। সে-ঝড়ের প্রমত্ত উল্লাসকে অস্বীকার করি সে শক্তি আমার ছিল না।

আমি এ-সংসারে অভিশাপ ডেকে আনছি, দিদিকে প্রতারণা করছি, আমার সর্বদা মনে হত। ধরা পড়লে কি হবে, তাও আমি ভাবতে পেরেছিলাম। অরুণোদয়বাবু যে আমাকে কোনোদিন সামাজিক সম্মানের আসন দেবেন না সে কথাও আমি ভালো করে জানতাম। কিন্তু, আমার ফেরার পথ ছিল না। বরং এই সমস্ত দুর্ভাবনাকে জয় করতে আমি আরো বেশি ও'র আবেগের প্রশ্রয় দিতাম। অস্বাভাবিক মাতাল হয়ে থাকতে চাইতাম।

আমার আজকাল ক্লান্ত লাগে। আমার জীবন অন্ধকার। ভবিষ্যতের কোনো পথ আমি খুঁজে পাইনে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব সে-উদ্যমও আর খুঁজে পাইনে। আমি বাজে, অকেজো মেয়ে। আমার শরীর ছাড়া কিছু নেই, আর সে-শরীরও বহু ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে। আমার কাছে বেঁচে-থাকা টিঁকে-থাকার একটা গতানুগতিক রুটিন ছাড়া কিছু নয়।

আমি চলে যাব, আমাকে ধরে-থাকার কেউ নেই। দিদি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন একদিন, বিশ্রী স্বপ্নের মতো আমাকে ভুলতে পারবেন। হয়তো আমাকে একদিন বুঝতে তাঁর অসুবিধে হবে না। আমি তাঁদের সংসারকে বাঁচিয়েছি। ও'র স্বামীকে আমি নামতে দিইনি। সমস্ত বিষ আমার অঙ্গে ধারণ করে ও'কে আমি আটকেছি। অন্য মেয়েকে তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে দেইনি। অনেক

ক্ষতি হতে পারত. অনেক ক্ষত নিয়ে সে-ক্ষতিকে আমি রুখেছি।

আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের কাহিনী কেউই জানে না। সে কাহিনী আমার একার। অরুণোদয়বাবু আমার মনকে কোনোদিন জানতে চাননি, তাঁর কাছে আমার হৃদয়ের অস্তিত্ব নেই। আমার ছোটোখাটো সুখদুঃখ শোনবার ধৈর্য তাঁর নেই, আর আমিও হৃদয়-জ্বালা বলতে না-পেরে বেঁচে গেছি।

রাত বাড়ছে। এবার আমাকে উঠতে হয়। কিন্তু, এঁরা কেউ কিছু বলছেন না কেন! দিদি কেন বের করে দিচ্ছেন না আমাকে। আমার অপরাধ তো প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তপতী প্রথম কথা বলল : 'শান্তনুর আজকেও আবার জ্বর বেড়েছে। তুমি ডাক্তারের কাছে একবার যাও।'

'জ্বর বেড়েছে।' অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল অরুণোদয় : 'কই এতক্ষণ আমাকে বলোনি তো।'

অরুণোদয় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

নির্জন ঘরে এখন দুই নারী।

তপতী বলল, 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

গৌতমী বলল, 'থাক। আপনাকে আবার কফি করতে যেতে হবে না। আমি এবার যাব।'

'একটু বোসো।' তপতী বলল।

উঠে গিয়ে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল তপতী। ফিরে এসে চেয়ারে বসল। তারপর একটু থেমে কোনো দিকে না-তাকিয়ে প্রশ্ন করল : 'এখন তোমরা কি করতে চাও?'

গৌতমী বলল, 'আমি জানি না।'

তপতী ওর মুখে চোখ রাখল। 'না-জেনে এতদূর এগিয়েছ।'

গৌতমী মুখ নিচু করল।

'তুমি অরুণোদয়কে ভালোবাসো?'

'আমি বুঝতে পারিনে।'

'ভালোবাসো কিনা তাও বোঝো না! আশ্চর্য তো!' তপতী বলল।

'তোমার কি মনে হয় অরুণোদয় তোমাকে ভালোবাসে?'

'সে কথা তিনি অনেকবার বলেছেন আমার কাছে।'

'তুমি বিশ্বাস করেছ?'

গৌতমী শীর্ণ হাসল। 'বিশ্বাস না-করলে কাছে আসব কি করে?'

'কিন্তু তুমি জানতে ওঁর স্ত্রী আছে, ছেলে আছে...'

'জানতাম বৈকি। তিনি তো কোনো কিছুই গোপন করেননি আমার কাছে।'

গৌতমী হাই তুলল : 'এমনকি তিনি তাঁদের খুব ভালোবাসেন এ কথাও বলেছেন অনেকবার।'

'ও।' তপতী বলল। 'এত জেনেও...?'

'হ্যাঁ।' গৌতমী বলল : 'উনি আমাকে বলেছিলেন বিবাহিত লোকদের ভালো-বাসবার অধিকার নেই, একথা বিশ্বাস করেন না।'

'তার মানে—' তপতী উষ্ণ হল : ভালোবাসা ক'বার আসে জীবনে?'

'একথা ওঁকে জিগ্যেস করবেন।'

'করব। কিন্তু তোমার কাছে আমি কিছু রুচি সংস্কৃতির প্রমাণ আশা করেছিলাম।'

গৌতমী বলল, 'আমি তো শিক্ষিত নই। আমার কাছে অতটা আশা করে-ছিলেন কি করে? তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

'মেয়ে হয়ে আরেকটি মেয়ের সর্বনাশ করতে আটকাল না তোমার?'

গৌতমী বলল, 'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত আপনি আমাকে এই অভিযোগই
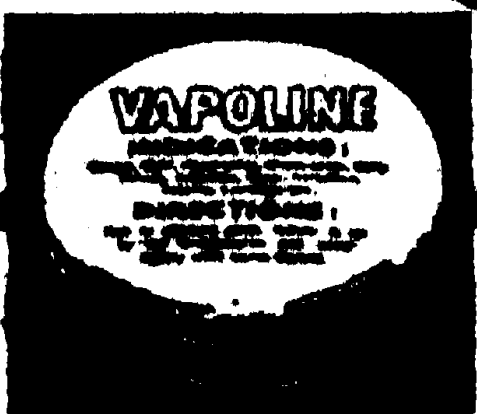
দেবেন।' ওর মুখের চেহারা আশ্চর্য শান্ত অথচ কঠিন; 'আপনি আমার শক্তিতে খুব বিশ্বাস রেখেছেন দেখছি। মাত্র দু'বছরের ঘনিষ্ঠতায় আপনাদের এতদিনকার সংসারে সর্বনাশ ডেকে আনব, একথা বিশ্বাস করি কি করে!'

তপতী ওকে বাধা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, গোতমী থামাল ওকে : 'আমাকে শেষ করতে দিন। এই দীর্ঘ দশ বছরেও যে স্বামীকে আপনি চিনতে পারেননি সেইটেই আমার কাছে আশ্চর্য লাগে।'

তপতী রেগে উঠল : 'আমার স্বামী সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করবার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

গোতমী ধীর গলায় বলল, 'আপনার স্বামী আমার কাছে একজন পুরুষমানুষ ছাড়া কিছু নন। এবং সে-পুরুষটি সম্বন্ধে মন্তব্য করবার অধিকার আমার আছে।'

তপতী বলল, 'ওটা ওর একধরনের অসুস্থতা...'

গোতমী বলল 'তবে শুশ্রূষা করে আরাম করেননি কেন সে-অসুখের। জানেন অসুস্থ লোক তার অসুখ সমাজের আরো দশজনের ওপর ছড়িয়ে দেয়।'

'বারে! আমি কী করব, কী করতে পারি...'

'পারতেন। যদি আপনার শিক্ষার অহংকার থেকে নেমে আসতে পারতেন। যদি অতটা নিঃস্বার্থ উদার হবার অভিনয় না করতেন। যদি ওঁকে প্রশ্রয় না দিতেন...'

'আমি, আমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছি!' বিবর্ণ ফ্যাকাসে গলায় আর্তনাদ করে উঠল তপতী।

'দিয়েছেন।' কঠিন গলায় বলল গোতমী : 'আপনার মতো আপনার স্বামীকে চেনে কে! রোজকার ব্যবহারে আপনি কি পেয়েছেন ওঁর কাছে? মেয়েদের কোনো সম্মান দিতে তিনি জানেন, মেয়েদের মন আছে সেকথা তিনি বিশ্বাস করেন?'

'গোতমী!'

'হ্যাঁ। এর পরেও আপনি কি করে এতোদিন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন আমাদের সম্পর্ক খুব পবিত্র। মেয়ে বলে আমাকে উনি সম্মান দেন?'

তপতী অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এত বুঝেও তুমি এই আবর্তের মধ্যে এলে কেন?'

গোতমী প্রথমে বলল, 'জানিনে।' তারপর একটু চিন্তা করে : 'হয়তো প্রথমটায় মেয়েলি লোভ, কৌতূহল, দেখি-না-কি-হয়! তারপর একদিন নিজেকে-হারিয়ে ফেললাম। দেখলাম আমাকে উনি তৈরি করে ফেলেছেন, আমার অনুভূতি-ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি এক ভালো-লাগা স্বাদে ভরে তুলেছেন। আমি সুখ পেলাম। তখন ভাবলাম যে-সুখ আমাকে আনন্দ দেয় তা মিথ্যে নয়, অন্যায় নয়। মিথ্যা বা অন্যায় হলে, আমি সুখ পাব কেন!'

তপতী মূক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গোতমীর দিকে। মনে হল মেয়েটির ব্যক্তিত্বে একটা নির্দয় নিষ্ঠুরতা আছে যা তাকে আহত করছে। তারপর যেন যুক্তি পেয়েছে এমন গলায় বলল, 'কিন্তু তোমার সামনের জীবনটা, তোমার ভবিষ্যৎ...'

গোতমী রুক্ষ হাসল। 'আমার বাবা উন্মাদ মা অসুস্থ। আমার লেখাপড়া হল না। আমার যে ওঁরা বিয়ে দেবেন সে-আশাও আমি রাখিনে। তাই হাতের কাছে যা পেলাম তাকে ফিরিয়ে দিতে ভরসা পেলাম না।'

'আশ্চর্য।' তপতী বলল : 'কিন্তু একবারও ভাবলে না একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের মানেটা কি হয়?'

গোতমী বলল, 'ভেবেছি। কিন্তু তাতো সত্যি নয়। তিনি তো আমাকে বাঁধেননি, আমার আসা-যাওয়ার পথ খোলা আছে। তিনি আমাকে টাকা দেন না, আমার সুখ-সুবিধের কোনো ব্যবস্থাই তিনি করেন না।'

তপতী পঙ্গু নিস্তব্ধতায় বসে রইল। দেহের সমস্ত রক্ত জমে যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তার গায়ে যদি কেউ ছুঁচ বসিয়ে দেয় কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না তার। এই মেয়েটির থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাতন্ত্র্য সে এতদিন অনুভব করত। কিন্তু আজ মনে হল বইয়ের জগতের চেয়েও সে এই রক্ত-মাংসের জগৎটাকে বেশি চিনেছে। হোক তার জীবন-বোধ অসংস্কৃত অশ্লীল, তবু জোর আছে তার ভাবনায়। এ মেয়েকে ঝুঝতে পারবে না তপতী। এ মেয়ের কাছে হার-জিতের কোনো দাম নেই। ওর কাছে তার

শিক্ষার পলেস্তারা খসে গেছে, নগ্ন হয়ে গেছে দাম্পত্য জীবন। যে স্বামীকে সে চিনতে পারেনি, তার স্বরূপকে সে অল্প দিনেই ধরেছে। 'এই আমার সংসার'—তপতী কান্নাগলা গলায় বলল। 'এর কোন্‌খানে আমার গৌরবের আসন আছে। আমি মা, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। যদি-না থাকে পিতৃত্বের অলংকার।'

গৌতমী উঠে দাঁড়াল। 'আমি এবার যাই—'

'না। ও আসুক।' তপতী বলল।

'রাত হয়ে যাচ্ছে যে।'

'হোক।'

অরুণোদয় ঘরে পা দিয়ে বলল, 'ডাক্তার এলেন না। এই ওষুধ দিয়েছেন।'

তপতী বলল, 'বোসো।'

অরুণোদয় বসল।

'গৌতমীকে বসিয়ে রেখেছি। ও আজ এখানেই খেয়ে যাবে।' তপতী বলল।

তপতী ওষুধ হাতে বেরিয়ে গেল।

দুজনে নিঃশব্দ। যেন একটা মৃত শবকে স্পর্শ করে দুজনে বসে রয়েছে। তারপর অরুণোদয়ই প্রথম কথা বলল, 'তুমি এখনো বাড়ি গেলে না কেন?'

গৌতমীর ঠোঁট জোড়া বিস্ফারিত হল। 'আপনি এগিয়ে না দিলে যাব কি করে?'

'তার মানে?'

'বারে। রাস্তায় একলা পেয়ে বলবেন না কখন আবার আসতে হবে?'

'আর আসতে হবে না।' অরুণোদয় বলল কঠিন গলায়।

'কেন? আমার অপরাধ?'

'এর পর আর তোমার এখানে আসা চলে না। সেটা ভালো দেখায় না।'

'বেশ তো।' গৌতমী বলল: 'বাইরে কোথায় দেখা করব বলুন? হোটেলে রেস্তোরাঁয়?'

'না। তার দরকার হবে না।'

'বেশ। তাহলে আমি চলি।' গৌতমী এবার উঠে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও।' অরুণোদয় বলল: 'কী কথা হচ্ছিল এতক্ষণ তোমাদের? কি, কি বললে তপতীকে?'

একটা সুতীব্র ঘৃণায় সমস্ত শরীর শিখার মতো জ্বলছিল গৌতমীর। চেয়ারের হাতল ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। একটু একটু কাঁপছিল, চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। বিষাক্ত বিস্বাদ গলায় গৌতমী বলল: 'মনে পড়ে এক গ্রীষ্মের প্রচন্ড দুপুরের কথা আপনার? দিদি ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন কলেজের স্টিমার-পার্টিতে। আপনার আদেশ মতো সেই সকালে দিদির চলে যাওয়ার সময়টুকু অপেক্ষা করে আসতে হল আমাকে। আমি চান করলাম, ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে রান্না করলাম আপনার জন্যে, যত্ন করে খাওয়ালাম আপনাকে। মনে পড়ে সেদিন আপনি আমাকে দিয়ে দিদির সমস্ত পার্টই করিয়ে নিয়েছিলেন। একদিন, শুধু একদিন আমি আপনার নকল স্ত্রী সেজেছিলাম। এবং সেদিনের সেই মিথ্যে সাধকে আমাকে এই ক'মাস লালন করতে হয়েছে, রক্তে মাংসে সে-একটা মানুষের আদল নিচ্ছে...'

ভয়ে বিবর্ণ কেঁপে-ওঠা গলায় অরুণোদয় বলল, 'মিথ্যে কথা, সব তোমার বানানো।'

'চুপ করুন।' তীব্র গলায় ধমকে দিল গৌতমী। 'মিথ্যে কি সত্য তা আপনার চেয়ে ভালো করে কে জানে। আমি কোনো দিন কোনো কারণে আর আপনার কাছে আসব না। আমি চাই ওর পিতৃত্বকে আপনি স্বীকার করবেন।'

'না। কিছুতেই না। আমি এর কিছুই স্বীকার করিনে।' অরুণোদয় চিৎকার করে উঠল।

গৌতমী বলল, 'দরকার হলে আমাকে পুলিশের আশ্রয় নিতে হবে।' ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল সে।

অনেক রাত পর্যন্ত ছেলের রোগ-শয্যার পাশে স্থির বসে ছিল তপতী। অরুণোদয় বারান্দায় পায়চারি করছিল। মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল ঘরে, ঢোকেনি। তপতীও ডাকেনি। তারপর শেষ রাত্রে ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তপতী।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। শান্তনু তখনো ঘুমিয়ে। আলনা থেকে তোয়ালে-কাঁধে তপতী বাথরুমে পা দিল। পা আটকে গেল ওর, ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করতে গিয়ে স্বর বেরুল না। বিবর্ণ ধূসর দৃষ্টিতে সে কেবল তাকিয়েই রইল।

বাথরুমের চৌবাচ্চার গায়ে হেলান দিয়ে অরুণোদয়ের দেহটা শক্ত কাঠের মতো আটকে রয়েছে, লম্বা ঘাড়টা ভেঙে পড়েছে বুকের ওপর, রক্তের তাজা ধারাটা গলা বেয়ে কোমর বেয়ে পা স্পর্শ করে চৌবাচ্চার উপচে-পড়া জলের সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত রঙ ধারণ করেছে। ধারালো রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে মেজেতে।

দর্শনের ছাত্রী তপতীর মনে হল: ওটা একটা মানুষের কাঠামো নয়,' একটা শতাব্দী, অস্থির অশক্ত ভগ্ন খর্ব, রুধির ঢেলে তার ঋণ শোধ করছে।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আট ।।

জর্জিয়ার আকাশ মেঘমলিন। মধ্যাহ্ন-কালেও প্রচুর ঠান্ডা। শুনতে পাচ্ছি নবেম্বরের শেষ দিকে এখানে তুষারপাত হয়।

"কোরা" নদীটির দুই পারে পাহাড়ের সানুদেশে 'টিফলিস' তথা 'বিলিসি' শহর। বিলিসির মূল শব্দার্থ হল 'উষ্ণ প্রস্রবন।' পূর্বপাহাড়ের উচ্চ মালভূমিতে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে-ছিলুম তারই কাছাকাছি দেখা গেল, একদল ছুতোরমিস্ত্রি একটি বিশাল কাষ্ঠআয়তনের উপরে কী যেন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। ঠাহর করে দেখলুম, একটি অতিকায় নারীর দারুমূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছে! আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করলেন আমাদের সহচারী জর্জিয়ার এক প্রবীণ কবি,—যিনি এখানকার লেখক সংঘের সভাপতি। তাঁর মুখে শুনলুম, আগামী দুই দিনের মধ্যে জর্জিয়ার সাংবাৎসরিক জাতিয় উৎসব আসন্ন। বিলিসি নগরীর পূর্ণ ১৫০০ শত প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী পরশু দিনে অর্থৎ ১৭ই অক্টোবর তারিখে বিশেষ সমারোহসহকারে পালন করা হবে। সেই সর্বব্যাপী উৎসবের প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপা হলেন এই দারুমূর্তি জননী জর্জিয়া। ইনি জর্জিয়ান জাতির জীবনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী! এঁর প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের জন্য সবাই পূজা নিবেদন করে।

ভদ্রলোকের ভক্তি-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে একটু বিস্মিত হয়েছিলুম। এই জর্জিয়া সোভিয়েট 'কালাপাহাড়' ষ্টালিনের জন্ম-ভূমি। এখানে দেবীমূর্তি-পূজার এমন সর্বব্যাপী সাড়া প'ড়ে যায়, এটি অভিনব সংবাদ বৈ কি। আমাদেরও এ বছর দুর্গা-পূজার আর মাত্র চারদিন বাকি,—মনে পড়ে গেল।

পাহাড়ের এই শীর্ষদেশটির নাম হল 'থাসবিন্দা।' আমাদের দেখান হল, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে অদূরবর্তী তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্যের সীমানা! জর্জিয়ার অন্তর্গত 'বাটুমি' নামক কৃষ্ণসাগরের একটি বন্দর নগরের প্রান্তে তুরস্কের উত্তর সীমানা। অতি নিকটবর্তী সোভিয়েট আরমেনিয়া এবং আজেরবাইজানের দক্ষিণে অবস্থিত পারস্যের উত্তরপ্রান্ত। ১৫০০ শত বৎসর পূর্বে জর্জিয়া ছিল এক আমীরের দখলে, এবং তিনিই এই বিলিসি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের দেশেও একটি মেয়ে একটি বৃহৎ নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল,—সেই নগরী আজও তার আপন গৌরবে সমুজ্জ্বল! নগরীর নাম ইন্দোর এবং মেয়েটির নাম রাণী অহল্যাবাঈ! যাই হোক, এরপর বিলিসি নগরে আসে ঐতিহাসিক কালের ধাক্কা। রাজনীতিক সংঘর্ষ, ধর্মান্ধদলের সংগ্রাম, রাষ্ট্র-বিপ্লব, হত্যা হানাহানি এবং আমাদের অতি পরিচিত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এরই মধ্যে এসে ঢোকে আরব, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়। অতঃপর এসে পৌঁছয় মুসল-মান। মুসলমানদের মসজিদ, দুর্গ ও সভ্যতার সঙ্গে ধ্বংস হতে থাকে খৃষ্টানদের গির্জা এবং জনপদ। আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে ইতিহাসের পর্বে পর্বে সংগ্রাম বেধে ওঠে। এখনও রয়ে গেছে কোথাও কোথাও খৃষ্টান এবং ইহুদীদের কীর্তিচিহ্ন; রয়ে গেছে আরব এবং মুসলমানদের দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ।

"থাসবিন্দা"র সর্বোচ্চ অঞ্চলের এক প্রান্তে কিছুকাল আগে একটি দুশো ফুট উঁচু টেলিভিশন্ টাওয়ার বসানো হয়েছে। বস্তুতঃ টেলিভিশন্ টাওয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নে বহুসংখ্যক। টেলি-ভিশন্ এখানে আপাতত খুবই জনপ্রিয়। তাসকন্দে নাভয় অপেরা হাউসে যখন রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি" বইখানি **Daughter of the Ganges** এই নামে রুশ নাট্যাকারে মঞ্চের উপরে অভিনীত হচ্ছিল, এবং ধুতি-পাঞ্জাবি, রাঙ্গাপাড় শাড়ি, ও সিঁদুরপরা অভি-নেত ও অভিনেত্রী যখন প্রথম শ্রেণীর চমকপ্রদ অভিনয় করছিল,—আমি সেই মঞ্চের উপর বাঙ্গলা দেশের পটভূমি দেখে তন্ময় ও অভিভূত হয়েছিলুম এবং ডাঃ সুনীতিকুমারের মুখে অজস্র সুখ্যাতি শুনেছিলুম। সেদিন তাস-কন্দের অধিবাসীরা টেলিভিশনে "নৌকা-ডুবি" অভিনয় দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছিল এবং শ্রীমতী নেলী তাঁর সমস্ত কর্তব্য ফেলে রেখে লাউঞ্জের কোনে বসে টেলিভিশনটি দখল করে রেখেছিল!

"থাসবিন্দা"র চারিদিকে একটি সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান রচনা করা হয়েছে এবং এই নিরিবিলি পাহাড়ের উপরে যে সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত একতলা প্রাসাদটি বিশিষ্ট অতিথিগণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে সেখানে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী নেহরুকে আনা হয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, ছবি তুলেছিলেন, অটোগ্রাফে সই করে-ছিলেন, কা'র পিঠ চাপড়েছিলেন, কোন্ ড্রাইভারের গাড়ি চালানর সুখ্যাতি করেছিলেন, কার গায়ে ফুলের মালা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তির কাছে তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা প্রকাশ পেয়েছিল,—এগুলি অনেকবার অনেক জায়গায়,—যেহেতু আমি ভারতীয় সেই হেতু,—শুনতে হয়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে নেহরু বিশেষ জনপ্রিয় এবং শান্তির অগ্রদূত হিসাবে অভিনন্দিত।

একজন অধ্যাপকের খোঁজ পাওয়া গেল, যিনি রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করার জন্য সাত বছর ধরে বাঙ্গলা ভাষা শিখেছেন! তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রসিদ্ধ 'কর্মী'।

পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নগরের দিকে একটি বৈদ্যুতিক রজ্জুপথ এবং একটি রেলপথ নেমে গিয়েছে। এই

অভাবনীয় রেলপথটি শুধু বিস্ময়ই আনে না, মনকে যেন অনেকটা শঙ্কিত করে তোলে! পাহাড়ের শীর্ষদেশ একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, এবং তার নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে 'কোরা' নদী। আলমোড়া অঞ্চলে পিথোরাগড়ের 'সোর' উপত্যকায় দাঁড়িয়ে এই প্রকার দৃশ্য আমার দেখা ছিল। 'কোরা' নদীর দুই পারে অন্তহীন হরিৎ ক্ষেত্র,— শস্যশ্যামল এবং বনময় ভূভাগ দিগন্তের দিকে মিলিয়ে রয়েছে। এখান থেকে দূরে উত্তরে ককেশাস পর্বতের তুষারচূড়া 'এলব্রুজ' দৃষ্টি-গোচর হয়।

টিফ্‌লিস, টিবিলিসি অথবা বিলিসি —এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল, "উষ্ণ প্রস্রবন।" এই শহরের আশে-পাশে বহু স্থলে নাকি গরম জলের ঝরণা আছে। এককালে মুসলমানের সংখ্যা জর্জিয়ায় এবং এই শহরে ছিল প্রচুর। তারা আজও জর্জিয়ায় রয়েছে বংশ পরম্পরায়, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার তলায় এমনভাবে তলিয়ে গেছে যে, আজ তাদের আর বৈশিষ্ট্য নেই। গ্রামাঞ্চলে, ক্ষেতখামারে, কারখানায় এবং নূতনতর জীবনব্যবস্থায় তাদের অনেকেই নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে বটে,—এবং মাঝে মাঝে তাদের মাথার চাঁদিটুপি দেখে চিনতেও পারা যায়। তবু সংখ্যা তাদের কম। অনেকের মাথা ন্যাড়া, অনেকের আছে সামান্য পাকা দাড়ি,—কিন্তু তাদের বর্ণ, চাহনি, চেহারা, পোষাক, খাদ্য, আচার-আচরণ,— সমস্তই ইউরোপীয়। এক কালের প্রত্যেকটি পৃথক সম্প্রদায় একালে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে একাকার হয়ে গেছে। এ দৃশ্যটি দেখে একটু বিস্ময় লাগে, 'নিরীশ্বরবাদী' ষ্টালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ার সর্বত্র যেখানে যত মসজিদ, সিনাগগ, গির্জা, মন্দির বা উপাসনা স্থান আছে, সবগুলি রয়েছে সযত্ন সংরক্ষিত এবং রাষ্ট্র তাদের পরিচালনা করে! কোনও ধর্মমতের উপর কোথাও জোর নেই, ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র ও জীবনের যোগ নেই, এবং তা নিয়ে কারও মাথাব্যথাও নেই! আদমসুমারীর হিসাবে তাদের একমাত্র পরিচয়, তারা শুধু সোভিয়েট নাগরিক! তার জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ বা সম্প্রদায় নেই, গোষ্ঠি বা গোত্র নেই,—সে কেবলমাত্র সোভিয়েট নাগরিক। সে কর্মী, সে আদর্শ কম্যুনিষ্ট সমাজের মানুষ, যে নাকি সাধু, সজ্জন, সত্যবাদী, সাহসী এবং পরিশ্রমী,—এই নাকি তার শেষ পরিচয়।

এ-শহর যে অনেককালের পুরনো তার একটি পরিচয় পথেঘাটে স্পষ্ট। ফুটপাথের ধারে ধারে বড় বড় বাড়ি, কিন্তু নীচের তলাটা রাস্তার অনেক নীচে। ফুটপাথে উবু হয়ে কিংবা হেঁট-হয়ে ফিরে দেখলে গৃহস্থের শোবার ঘরের ভিতরটা অনায়াসে দেখা যায়। ডবল পাটের কাচের জানলায় লেশযুক্ত পর্দার আবরণ, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফুটপাথ ধরে হাঁটলে পায়ের জুতোর ওপর নিচেকার গৃহস্থঘরের আলোটা এসে পড়ে। জর্জিয়ায় মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা ততটা এসে পৌঁছয়নি, যতটা এসেছে তুর্ক ইরানী তাতার ও ইহুদির রক্ত। এর উপরে যোগ হয়েছে আবহ-প্রকৃতি। সুতরাং রৌদ্র ও মরুভূমির দেশ তুর্কিস্তান থেকে আমরা এসেছি শীত-প্রধান এবং হরিৎপ্রধান দেশে। এখানে জনসাধারণের দেহবর্ণ হয়েছে শাদা এবং তাসকন্দ অপেক্ষা মার্জিত, উন্নত ও বুদ্ধিবান। মেয়ে পুরুষের আচরণ সংযত, নিরুচ্ছ্বাস, ওজনকরা এবং অনেকটা যেন আত্মকেন্দ্রিক। কথায় কথায় গলাগলি করে না, জড়িয়ে ধরে না, গায়ে দুধ তেলে না, আহ্লাদে গদগদ হয় না, রুস্তম ইসমাইলভের মতো জড়িয়ে ধ'রে খেতে বসায় না, এবং আনন্দে দিশাহারা হ'তে চায় না! পরদেশীর সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, থমকে এক আধবার দাঁড়ানও হয়ত আছে, কিন্তু জনতা ছুটে আসে না আলিঙ্গন করতে,—এরা কৌতূহলকে দমন করতে জানে! কানাকানি করে, পাশ দিয়ে ফিসফিস ক'রে যায়, পথ ছেড়ে সরেও দাঁড়ায়, কিন্তু অহেতুক ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রে আত্মাভিমান নষ্ট করতে চায় না। ওদের মুখে চোখে আচারে-আচরণে ইউরোপের আত্মাভিমান ও গাম্ভীর্য বেশ স্পষ্ট। ওরা জানে কাশ্যপ সমুদ্রের পূর্ব পারে রয়ে গেছে প্রাচীন প্রাচ্য,—কিন্তু এটি প্রতীচ্য, কাশ্যপের পশ্চিম পার! আমরা এখন এশিয়া ছেড়ে ইউরোপে!

হোটেলের কাছাকাছি যাদুঘরটি দেখতে গেলুম। বিভিন্ন প্রাচীন তৈল-চিত্রগুলির অভিব্যক্তিগুলি দেখে অভি-ভূত হতে হয়। তার রং, রূপ-প্রাণময়তা, সৌষ্ঠব,—সমস্তগুলি যেন মোহমুগ্ধ করে! চারিদিকে অগণিত সভ্যতার ইতিহাসের টুকরো যেন ছড়ানো। শিল্পীদের বিচিত্র প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন-কালের শিল্পকলা এবং বিভিন্ন যুগের অতীত কাহিনীতে যেন যাদুঘরটি পরিপূর্ণ। যীশুখৃষ্টের তৈলচিত্র এবং মূর্তিগুলি সুরক্ষিত রাখার মধ্যে কম্যুনিষ্ট স্বভাব প্রকৃতির মিল নেই বটে, তবে এটি স্পষ্ট যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে খৃষ্টানদের জয়জয়কার ঘটেছে! বর্তমান জর্জিয়ার অধিকাংশ হল নানা জাতির সংমিশ্রণ। সকল সম্প্রদায়েরই জাতিবৈশিষ্ট্য এই মিশ্রণের ফলে মিলিয়ে গেছে। সোভিয়েট অর্থ-নীতির কঠোর কাঠামোর মধ্যে জর্জিয়ার প্রকৃতি এখন নিয়ন্ত্রিত।

তাসকন্দে যেমন, এখানেও তাই। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবাদপত্রাদি এবং ম্যাগাজিনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া তেমন আর কিছু নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সামগ্রিক জীবনকে জানবার ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়,—এমন সংবাদ বিশেষ কোথাও ছাপা হয় না। নিজের দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং ভালমন্দর কথা নিয়ে থাক অথবা পৃথিবীর কোন কোন্ দেশে 'সর্বত্যাগী এবং লোকপূজ্য' কমিউনিষ্টরা কোন্ কোন্ 'প্রতিক্রিয়াশীল' গভর্ণমেণ্টের হাতে 'সাংঘাতিকভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে তার সংবাদ জেনে রাখ!'

প্রকৃত সংবাদ না জানার ফলাফল আমি দেখেছিলুম। পরবর্তীকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনৈক বন্ধু আমাকে হাসিমুখে বলেছিলেন, আপনি বোধ হয় নিজেও জানেন না, ভারতবর্ষের অনেকগুলি কারাগার ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্মীতে পরিপূর্ণ! ভারতবর্ষ যে ষ্টালিনের দেশ নয়, একথাটি তাঁকে বোঝাতে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। বোধ হয় 'লৌহ-যবনিকার' দুর্নাম এইজন্যই!

ইতিহাসের ব্যাখ্যা যেমন বদলায় এককাল থেকে অন্যকালে, প্রাকৃতিক ভূগোলও তেমনি বদলায় এক এক কল্পে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এককালের সমুদ্র অন্যকালের মরুভূমি, এবং তাঁরা নাম করেন শাহারা, থর, গোবি এবং মধ্য এশিয়া। উত্তর ভারত আর তিব্বত-মঙ্গোলিয়া পরিব্যাপ্ত ক'রে ছিল নাকি মহাসমুদ্র, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের তলদেশ থেকে আগ্নেয় অবস্থার আকস্মিক চাপে হিমালয়-হিন্দু-কুশ-ককেশাস কতকটা মাথা তুলল! ফলে, সেই বৃহত্তর সমুদ্র ছত্রখান' হয়ে গেল। কতক জল এল আরব ও বঙ্গসাগরে, কতক গেল গোবি পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে, এবং কতকটা জল পশ্চিম পথে যেতে যেতে কয়েকটি বিস্তৃত গহ্বর রচনা

করল—যেমন আরল হ্রদ, কাশ্যপ উপসাগর, কৃষ্ণসাগর, মর্মর ও ভূমধ্যসাগর! সর্বশেষ জলের ধাক্কা সয়েছিল জিব্রালটর,—ওখানকার পাহাড় ভেঙে সেই জল গিয়ে পড়েছে বিস্‌কে উপসাগরে!

এসব কথা ভূতত্ত্ববিদের এবং বিশেষজ্ঞগণের। এই সব বিশেষজ্ঞ এবং ভূতত্ত্ববিদ্ আজকের নয়। এঁরা দুই-চারশ' বছর ধ'রে এই ধরণের কথা ব'লে আসছেন। তিব্বতের বালু লবণাক্ত, হ্রদগুলি লবণে ভরা, সমুদ্রের ফসিল সেখানে ছড়ানো। মধ্যএশিয়ায়, ইরাকে, ভূমধ্যসাগরের আনাচে কানাচে এবং থর ও শাহারায়,—কাহিনী একই। যে-কারণে পাঞ্জাবের সরস্বতী আর দৃষদ্বতী যশলমের মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেছে, যে-কারণে আমাদের আদিগঙ্গা, ত্রিবেণীর সরস্বতী এবং প্রতিবেশিনী বিদ্যাধরী নিরুদ্দেশ হতে চলেছে, ঠিক সেই কারণে মধ্যএশিয়ার আমুদরিয়া নদী কাশ্যপ সমুদ্রপথ ছেড়ে আরল হ্রদে এসে ঝাঁপ দিল। প্রকৃতির বিকার ঘটে যুগে যুগে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, উপমহাদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশীলা এবং কাবুলের পথ ধ'রে বাঙলাদেশ থেকে রেশম বস্ত্রাদির বিপুল বাণিজ্য এককালে আমুদরিয়ার উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে যেত কাশ্যপসাগরে এবং সেখান থেকে ভল্‌গা নদীর সাহায্যে দক্ষিণ রাশিয়ায়। মিঃ ইউলিসিস ইয়ং এই প্রাচীন রেশম-পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতবিশেষজ্ঞ রুশ অধ্যাপক হেরাশিম লেভাদভের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে লেভাদভ কলকাতায় বাস করেছিলেন অনেককাল। ইয়ং সাহেবের আলোচনায় বুঝতে পারা যায়, ভারত তথা বাঙলাদেশের সঙ্গে রেশম বাণিজ্যসূত্রে সাংস্কৃতিক সম্পর্কটা খৃষ্টীয় শতাব্দর প্রথম থেকেই। অস্ত্রাখান এবং আধুনিক ষ্টালিনগ্রাডের মাঝামাঝি ভল্‌গা অঞ্চলে এমন অনেক সুপ্রাচীন সমাধি স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে ভারতীয় তথা বাঙলার রেশম বর্তমান! সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় শুধু যে ভারতের রেশমব্যবসায় একচেটিয়া ছিল তাই নয়, কাশ্যপসাগরের উত্তর এবং পশ্চিম পারে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল নাকি প্রচুর, এবং এখনও বিভিন্ন নামে সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাকীর্তির অবশেষ বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে বাঙলাদেশ থেকে স্থলপথে ইংল্যান্ড যাবার পথে জনৈক ইংরেজ জর্জ ফস্টার এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "অস্ত্রাখানে দেখে এলুম ভারতীয়দেরকে। টাকাকড়ি-ধনসম্পত্তি নিয়ে ওরা বেশ আছে ভল্‌গার ধারে। পকেট ভারি ক'রে একদল ফিরে যায় ভারতে, আবার আসে এক নতুন দল।"

জর্জিয়ার প্রতিবেশী আজারবাইজানে ভারতীয়গণের প্রভাব ছিল প্রচুর। সম্পর্কটা কতকালের প্রাচীন সেটি বলতে পারিনে, কিন্তু পাঁচশ' বছরের একটা মোটামুটি হিসেব সহজেই মেলে। চেঙ্গিস খাঁর কালে এবং তাঁর পরবর্তী তৈমুরলঙের কালেও "ভারতের উপকথা" নামক গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দিতে রাশিয়ায় জনপ্রিয় ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দিতে রুশ পরিব্রাজক নিকিতিন সাহেব তাঁর ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য রেখে গিয়েছেন। আজারবাইজান অঞ্চলে প্রথম অগ্নিপূজার পত্তন করেন ভারতীয় এক-দল সাধু অষ্টম শতাব্দিতে। কথিত আছে তাঁরা বাকু নগর থেকে দক্ষিণ রাশিয়ার অস্ত্রাখানে যান্। কশ্যপ মুনির সঙ্গে কাশ্যপ উপসাগর এবং কাশ্যপ-মীর অর্থাৎ কাশ্মীরের পৌরাণিক যোগাযোগের কিংবদন্তী নিয়ে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ওখানে দেখতে পাওয়া যায়।

লেভাদভের কাহিনী ওখানেই শেষ হয়নি। লেভাদভ ছিলেন লন্ডনের রুশ দূতাবাসে। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে ইনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, এবং সেকালের সেই সুদীর্ঘ জল এবং স্থলপথ পেরিয়ে তিনি কলকাতায় এসে বারো বৎসরকাল বাস করেন। তাঁর চাকরি ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে। কলকাতায় তিনি একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন, নিজে বাঙলাভাষা শেখেন, বাঙলায় অভিনয় করেন, বাঙলা নাটক লেখেন এবং ইংরেজি লিখিত নাটকের বাঙলা অনুবাদ করেন। এই অপরাজেয় অধ্যবসায়ী রুশ মনীষীর প্রতি বাঙলার তদানীন্তন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেননি, কিন্তু পরলোকগত লেভাদভের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেছিলেন রুশ পন্ডিত ও মনস্বীরা। তাঁরা তখন থেকেই ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের রুশীয় অনুবাদ প্রকাশ ক'রে আসছেন। রাশিয়ার সেই প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই আজ রবীন্দ্রনাথকে সর্বান্তকরণে বরণ ক'রে নিচ্ছে!

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গত শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে এক দুঃসাহসী বাঙালী যুবক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে রাশিয়া অভিযানে সহায়তা করেছিলেন। এই যুবকটি বিলাতে পড়াশুনো করতে যায় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে রাশিয়া যাত্রা করে। সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধে রুশগণের প্রচুর আগ্রহ থাকার জন্য নিশিকান্ত সেখানে ভারতীয় হিসাবে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং বাঙলাদেশের যাত্রা ও কথকতা বিষয়ে তার থেসীস সেখানে সমাদৃত হয়। অতঃপর নিশিকান্ত রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে অধিষ্ঠিত হন। বলা বাহুল্য, এটি
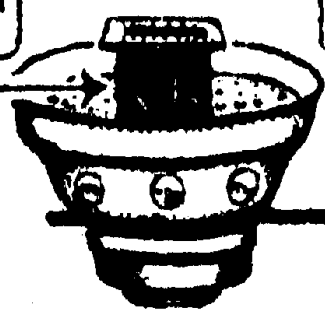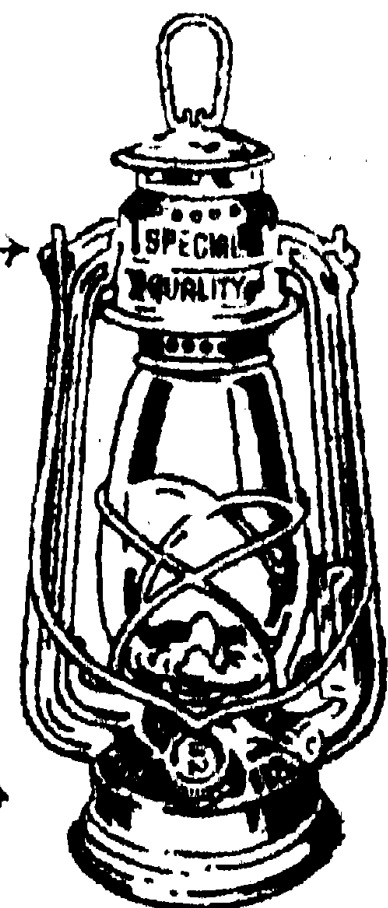
প্রায় নব্বই বছর আগেকার কথা এবং রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কাজে এই বাঙালী যুবকের উপচার সামান্য নয়। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের উপরে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে অধিকতর দৃঢ় করে তুলতে চান।

দক্ষিণ রাশিয়ার সঙ্গে সুপ্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ আর কোথায় কি ভাবে হয়েছিল আমার জানা নেই। ভারতীয় বেদে উল্লিখিত সপ্তাশ্বরথবাহী সূর্যের প্রতীক-মূর্তিটি দক্ষিণ রাশিয়ার কিউবান অঞ্চলে বহু-কাল পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল এটি শুনেছি। এছাড়া ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যের নানা প্রভাব মধ্যএশিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার নানা অঞ্চলেই খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু এইগুলি সব একত্র করে যিনি এর মূলে তাৎপর্য বিচার ও ব্যাখ্যা করবেন, তিনি আগামীকালের ঐতিহাসিক।

'বিলিসি' থেকে বেরিয়ে পড়ে-ছিলুম সকালে। শীতের হাওয়া দিয়েছে বেশ, কিন্তু আরামদায়ক মধুর রৌদ্রও আজ দেখা দিয়েছে। শহর থেকে বেরিয়ে গেছে যে পথ সেটি উপত্যকা,—'কোরা' নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে অনেক-খানি। নদীতে স্নান করে না কেউ, নদীকে কেউ বলে না জননী, পরিস্রুত কলের জল ছাড়া কেউ মুখ ধোয় না এবং নদীর জন্য নৈবেদ্যও কেউ সাজায় না! নদী এখানে শুধু স্থূলে প্রয়োজনের সামগ্রী। কিন্তু নদীর প্রবাহকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য এবং নির্মল করে তোলার জন্য রাষ্ট্রের খরদৃষ্টি সর্বদা ওর ওপর নিবদ্ধ।

আমরা উপত্যকার পথ ধরে চলেছি। মাঝখানে সুন্দর চিক্কণ পথ। একধারে পাহাড়ের সানুদেশ, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ মসৃণ প্রান্তর। প্রান্তরে কোথাও আল নেই, ঝোপঝাপড়া নেই,—ট্রাকটর চাষ করে গেছে যেন কবে। এখন দ্বিতীয়বার ফসলের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে। সেই প্রান্তরের নীলাভ বর্ণের উপর চোখ ছাড়া পেয়ে বহুদূরে অবাধ চলে যায়। আমরা চারজন ছাড়া আরও জনদশেক সঙ্গে ছিলেন। ওঁদের মধ্যে লণ্ডনবাসী সেই বৃদ্ধ গ্রীক ভদ্রলোকও রয়েছেন। তাঁর মুখে দুটি তিনটি প্রশ্ন আজও ঘোরে; রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা, যকৃতের কাজ কেমন চলছে এবং কেমন দেখছেন সব?

মাইল পনেরো পথ পেরিয়ে আমরা একটি মফঃস্বল শহরে এসে পৌঁছলুম। শহরটি প্রাচীন,—আধুনিক চেহারা বিশেষ কিছু নেই। বাড়ীঘর প্রায় সবই পুরনোকালের, তবে পথঘাটের কিছু সংস্কার চোখে পড়ে। এমন শহর আমার অপরিচিত নয়। হাতের কাছে রাণীগঞ্জ রয়েছে, এটি তার চেয়ে বেশি কি? স্বঃপরিবৃত্ত পরিবাররা রয়েছে গায়ে গায়ে —কারও অবস্থা কিছু শাঁসে-জলে, কিছু বা যেমন তেমন। শুকনো পথ-ঘাটে, কোথাকার দুটো ন্যাড়ামাথা ছেলে পথে খেলা করতে বেরিয়ে এল, এ বাড়ীর দুটো লোক ও বাড়ীর রোয়াকে বসে রোদ পোয়াচ্ছে, ওপাড়ার একটি যুবক এপাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করছে সাইকেলখানার ওপর ভর দিয়ে, একটি বাড়ির বউ গলা বাড়িয়ে ওরই মধ্যে আমাদেরকে দেখে গেল, ও-বাড়ির ছাদের রৌদ্রে বিছানা শুকোতে দিচ্ছে এক বৃদ্ধ এবং ওই ছাদেরই উপর কাঠের ঘরটির সামনে একটি ফিটফাট যুবক তার ফুলগাছগুলির তদারক করছে! আমরা যেন শিবপুরের এক পাড়াপল্লীর কাছাকাছি এসেছি,—শুধু তার নোংরা নালানর্দমা এবং কদর্য পৌর ব্যবস্থা বাদ দিয়ে। এই শহরটি নাকি কোনও এককালে জর্জিয়ার রাজ-ধানী ছিল। এর নাম 'মাজখেতা'। ধূলি ও রুক্ষতা প্রচুর আছে চারদিকে এবং বিশেষ কোথাও নূতনত্বের চিহ্ন নেই। জনসাধারণ ঠিক 'সাহেব মেম' নয়—কিছু ইহুদী-আর্মানী-আরবী মেলানো। তুর্ক-ইরানীর একটা অংশও আছে বৈকি। কিন্তু এরা মিলে গেছে এখন সবাই, সকলেই সমস্বার্থে বাঁধা। দারিদ্র্যের এবং অশিক্ষার সঙ্গে ধর্মান্ধতা যে বাঁধা থাকে, এটি একালে আমাদের চেয়ে আর বেশি কে জেনেছে? এও ত দেখে নিলুম, জীবনধারণের সুব্যবস্থা এবং সচ্ছলতা ঘটলেই ধর্মান্ধতা যায় ঘুচে!

আমাদের গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল, তার সামনে দ্বাদশ শতাব্দির একটি বিশাল দুর্গপ্রাকার এবং এই প্রাচীন প্রাকারের চেহারাটা প্রয়াগদুর্গের প্রাচীরের মতই। কিন্তু সেকালের সেই প্রাচীর একালে তার অর্থ হারিয়েছে, এখন কেবল প্রাচীনযুগের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। এই প্রাকারের ভিতরে রয়েছে বিরাট এক উপাসনা ক্ষেত্র। কিন্তু এটি খৃষ্টানদের অথবা ইহুদীদের, সেটি ঠিক অনুমান করা যায় না। আমরা সকলেই ভিতরে প্রবেশ করলুম এবং দীর্ঘক্ষণ পরিদর্শন করে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্মিত হলুম। বিস্ময়ের প্রথম কারণ এই, সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং ষ্টালিনের জন্মভূমি এই জর্জিয়ায় পূজা-অর্চনার এমন অবাধ স্বাধীনতা! আমার ধারণা, এটি খৃষ্টানদের গীর্জা নয়, এটি ইহুদীদের সিনাগগ্। বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ, আমরা যেন একটি প্রাচীনকালের প্রখ্যাত শিবমন্দিরে এসে ঢুকলুম! মেয়ে এবং পুরুষ মিলে সেই একই পুষ্পপাত্র সাজাচ্ছে, তেমনি আরতি করছে। এক একজন মোমবাতি সঙ্গে এনে ছোট ছোট গুহা ও গর্ভ-মন্দিরের সামনে রেখে আভূমি প্রণাম করছে, এবং সেই যেমন দেখে এলুম চিরকাল,—মাথা ঠুকছে এ-দেয়ালে আর ও-দেয়ালে! সেই ছবির একাজবিশন, সেই কড়িকাঠ পর্যন্ত নানা চিত্রালংকারে সাজানো, সেই চোখ বুজে হাত জোড় করা বা নাকখৎ দেওয়া!—আমরা যেন ভারতবর্ষেরই এক তীর্থমন্দিরে এসে হাজির হলুম। ভিতরটা খুবই প্রাচীন, মেঝেটা পুরনো পাথরের, মাঝে মাঝে ফাটল ধরা। এধারে ওধারে ছোট ছোট গুহামন্দির কাশীর অলিগলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়! হিন্দুরা এবং ইহুদীরা যেমন আচমনের সময় দুখানা হাত নানা-ভাবে ঘুরিয়ে কপালে, কাঁধে, পিঠে, নাভিতে, কণ্ঠে স্পর্শ করে, এও তেমনি কসরৎ! বুড়ি আর বুড়োর সংখ্যাই বেশি,—এখনকার ছেলে-মেয়েরা আর আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে তেমন বিশ্বাস করে না।

খৃষ্টের কোন কোন তৈলচিত্র প্রায় এক হাজার বছর আগে আঁকা এবং কোন ছবিতে করুণা-বিষণ্ণ রূপটি দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে রাখে! এই উপাসনার ক্ষেত্রটিকে আমরা যেন একটি নতুন আবিষ্কার বলে ধরে নিলুম। এখানে ওখানে সর্বত্রই খৃষ্টের জীবনী দেওয়ালে চিত্রিত করা, যেমন আমাদের সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের দেওয়ালগুলি,—এবং প্রবেশপথের মাথার উপরে একটি জননীর কোলে আলোকাভ শিশুখৃষ্ট উপবিষ্ট—এইটি খোদিত রয়েছে! ভিতরে ধূপ ও পুষ্পের গন্ধ,

এক একস্থলে স্থাপত্যের মনোরম নিদর্শন, মূর্তির সম্মুখে নৈবেদ্য ও পূজার বিবিধ উপচার। একজন বন্ধু বললেন, দূরদূরান্তর থেকে এখানে অনেকে 'মানৎ' করতেও আসে! তোরণ-দ্বারটি দেখবার মতো, এবং একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, একদা ধর্ম-মন্দিরকে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য এই বৃহৎ দৃঢ় লৌহবন্ধ বিশাল তোরণের প্রয়োজন ছিল। তাতার, তুর্কি এবং হয়ত বা আরবদের কঠিন ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আক্রোশ এক এককালে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে তুলত !

এই মন্দিরের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করেন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। শুধু এটি নয়। গির্জা, মসজিদ এবং এদের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মমন্দিরগুলির যা কিছু আনুষঙ্গিক খরচপত্র, সমস্তই স্টেটের। পুরোহিত, যাজক, মৌলবী এবং তাদের পরিবারগণ মাসোহারা পান, —সে মাসোহারা নামমাত্র নয়। এই মন্দিরের পুরোহিত পান মাসে এক হাজার রুবল। তাঁর সন্তানাদির লেখা-পড়ার দায়িত্ব সরকারের,—বিনামূল্যে ঔষধপত্র এবং চিকিৎসা। পুরোহিত মহাশয়ের বাসস্থান স্টেট থেকে দেওয়া, এবং এই মন্দিরের সর্ববিধ কাজকর্মাদির জন্য যে কয়জন মেয়ে-পুরুষ পরি-চারণের কাজ করে, তারা স্টেট থেকে বেতন পায়। সকল ধর্মমন্দিরের পক্ষে এই একই ব্যবস্থা। কমিউনিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার কালে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোথাও একটি ধর্মমন্দিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এটি সত্য। কিন্তু বহু ধর্ম-মন্দিরকে যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে এ খবরটি পরে পেয়েছিলুম। তবে কমিউনিষ্ট আমলে ধর্মমন্দির নির্মাণের সংখ্যা বেড়েছে কিনা এ খবর আমি পাইনি। কিন্তু প্রকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র কাকে বলে, জর্জিয়াতে এসে তার প্রথম সন্ধান পেলুম বটে। এখানে নানা সম্প্রদায় নানা ধর্মমত নিয়ে গায়ে গায়ে বাস করে, এবং পাড়ায় পাড়ায় ধর্মধ্বজা নিয়ে রেষারেষি নেই। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে টেক্কা দিয়ে রাতারাতি পথে ঘাটে, আঁস্তাকুড়ে, বাজারে—একটা ক'রে মন্দির কি মসজিদ গ'ড়ে তোলে না,—কেননা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এখানে ঠিক অহিংসাবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এখানে রাষ্ট্রের সাংঘাতিক চণ্ডমূর্তি একথা জানে, হুজুগে জন-সাধারণের খেয়ালখুশির সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাটা রাষ্ট্রের আত্মিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং এই সর্বনাশা প্রশ্রয়ের পথ ধ'রেই আসে ভবিষ্যৎ কালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক পরিণাম, এটিও বোধ করি তারা জানে। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে ধর্মাচরণের ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। তাঁরা মনে করেন, রাতারাতি গির্জা কিংবা মসজিদ কিংবা সিনাগগ্ গ'ড়ে তোলাটার মধ্যে আছে ধর্মান্ধতা, এবং সেই কারণেই সেটি রাজনীতির খেলা! এক্প্রকার খেলায় সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎসাহ বড়ই কম। তারা জাত সম্প্রদায় ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠি—কোনটা বিচার করে না, বিচার করে শুধু যুক্তির। মানুষের বর্ণ ও জাতি-বিচার হয় নানা দেশে, কিন্তু বজ্জাতির বিচার হয় রাশিয়ায়!

ওখান থেকে বেরিয়ে আবার আমরা একটি পার্বত্য সানুদেশের সুন্দর পথ ধরলুম। পাহাড়ের ধারে ঘন অরণ্যের জটলা কোথাও কোথাও ছায়াচ্ছন্ন মায়া-লোক সৃজন করেছে। দক্ষিণের পথ চলে গিয়েছে আর্মেনিয়ার ভিতর দিয়ে তার রাজধানী এরিভানের দিকে, সেখান থেকে সোজাপথ প্রবেশ করেছে ইরাণের তাব্রিজ এবং তেহরাণ পর্যন্ত। এরিভান থেকে পশ্চিম পথটি তুরস্কে প্রবেশ করেছে। এখান থেকে অদূরবর্তী কৃষ্ণ-সাগরের দিকে গেছে দুটি পথ,—সুখুমি এবং বাটুমির দিকে। আমরা চলেছি অনেকটা উত্তর-পশ্চিমে।

মামুদভের তল্পি খালি নেই। খাদ্য কিছু-না-কিছু তার সঙ্গেই থাকে। চিকেন-স্যাণ্ডুইচ, বাদাম, আপেল, আঙ্গুর—তার ঝুলিতে এসব ঠিকই আছে। সে যেমন খায়, তেমনি খাওয়ায়! সুভাষ মুখুজ্যে দামোদরন্, শ্রীধরণী—সঙ্গেই আছেন। গাড়ি চালাচ্ছে একজন জর্জিয়ান। পাশে বসেছেন লেখক সঙ্ঘের সভাপতি। দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল।

পথের মাঝখানে একস্থলে গাড়ি থামল একটি পাহাড়ের বাঁকে। পাহাড়ের ধারে কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ও মজুর কাজ করছিল। এরা সবাই জর্জিয়ার গ্রামীয় লোক। ওদের মধ্যে স্ত্রীলোক রয়েছে জনতিনেক,—তাদের পরণে ধুলোবালি-মাখা কালো প্যাণ্ট, গায়ে মোটা জ্যাকেট, মাথায় ওড়না—তার পাশ দিয়ে বেণী ঝুলেছে, পায়ে ময়লা জুতো। রাজমিস্ত্রি ও মজুরের পোষাক এবং চেহারা বোধ করি পৃথিবীর সর্বত্রই এক।

গাড়ি থেকে নেমে এবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। এখানেও জর্জিয়ার ১৫০০ শত বার্ষিক উৎসবকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য ছোট্ট পাহাড়ের চূড়াটিতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে। সিমেণ্ট ও পাথর দিয়ে কাজ চলছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি একজন মজুরের কাছে দাঁড়ালুম। মামুদভের মারফৎ প্রশ্ন করলুম, কাজ করছ, শীত করছে না?

লোকটার বয়স বেশি নয়। কিন্তু সে যখন আমার প্রশ্ন শুনে হাসল, তার

ইস্পাতে বাঁধানো একটা দাঁত দেখলুম। সে হাসিমুখে বলল, কই, না?

কতক্ষণ কাজ করবে?

মোট আট ঘণ্টা!—অকপটে সে জবাব দিল।

ওই মেয়েরাও তাই?

হ্যাঁ—

আড়ষ্টতা সত্ত্বেও প্রশ্ন ক'রে বসলুম, কত মাইনে পাও?

লোকটা বলল, দেড়শ' থেকে দুশ' রুবল সপ্তাহে। যেমন-যেমন কাজ।

আরও যেন কি বলল, এবং মামুদেভ আমাকে বুঝিয়ে দিল, দেড়শ'র কম নয়, দুশোর বেশি নয়!

দূরে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টপরা যে আঁটসাঁট মেয়েটা সকৌতুকে হাসছিল সে হ'ল এর বউ। বৌটার উপার্জন একই। আমার আরও দু'একটা প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়ে দিল, তাদের ঘরসংসার আছে বৈকি। সন্ধ্যার পর ওরা ক্লাব কিংবা সিনেমায় যায়। রোজ ওরা মাংস খায়। খেতে ব'সে ওরা মাখন অপেক্ষা ক্রীম পছন্দ করে। মামুদেভ এ সুযোগ ছাড়ল না! হাসিমুখে বলল, ওর বৌটার 'হেল্‌থ' কেমন চমৎকার, দেখেছেন? এই পাড়া...খায়-দায় ভাল!

আমরা আবার গাড়িতে উঠে এলুম। শ্রীধরণী যথারীতি নিরীহ সুভাষকে ক্ষেপাতে ক্ষেপাতে চললেন। উভয়ের সম্পর্কটি বড় মধুর। একজন হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যজন অনেকটা আমেরিকা! এই দুইয়ের মাঝামাঝি আমার অবস্থাটা ভারতের মতো! কিন্তু দামোদরন্ হলেন স্বয়ং কেরালা, এবং তখন কেরালায় কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে আমরা দামোদরনের চোখে কতকটা কৃপার পাত্র! তিনি অগ্রগামী, ভারত পশ্চাৎপদ্!

বিলিসি থেকে কম বেশি পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে এসে পাওয়া গেল একটি অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর। শহরের নাম 'গোরি'। এই শহরেরই একস্থলে যোসেফ ষ্টালিন জন্মগ্রহণ করেন, এবং বড় বড় অট্টালিকা ও বিভিন্ন বিস্তৃত রাজপথ পেরিয়ে আমাদের গাড়ি ষ্টালিনের সঠিক জন্মস্থলটির সামনে অতি বৃহৎ এক প্রাসাদের কাছে এসে দাঁড়াল। এই প্রাসাদ হল 'ষ্টালিন-মিউজিয়ম'! এটি আনকোরা নতুন, এবং এরই ঠিক পাশে ষ্টালিনের শৈশবকালের বাস্তুভিটা।

সেই ষ্টালিন! যে-নামটি বিগত ত্রিশ বৎসর কাল ধ'রে পৃথিবীর প্রায় সকল মানবসমাজে উত্তেজনা, আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, উল্লাস, বেদনা, বিস্ময় এবং অপার রহস্য সৃজন ক'রে এসেছে! সভ্যতার ইতিহাসে একটি মানুষ কুড়ি কোটি সদাজাগ্রত বলবান নরনারীর উপরে ত্রিশ বছর ধ'রে একচ্ছত্র প্রভুত্ব ক'রে এসেছে এমন উদাহরণ বিরল। বলা বাহুল্য, বিদ্যুতের স্পর্শ লাগল সর্বশরীরে।

ষ্টালিনের মৃত্যুর সাড়ে পাঁচ বছর পরে তাঁর জন্মস্থলে এসে দাঁড়াতে পারব এটি স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কেননা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও ষ্টালিনের জীবন-কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের দরজা তার কাছে অবারিত হয়নি! ছাড়পত্র সম্বন্ধে ভারতীয় উদারতা কতকটা থাকলেও প্রবেশপত্র সম্বন্ধে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ছিলেন অতিশয় কঠোর! বাহিরের প্রত্যেক ব্যক্তি ষ্টালিনের কাছে অল্পবিস্তর অবাঞ্ছনীয় ছিল, এবং "বাঞ্ছনীয়" হয়ে ওঠবার পথেও বাধা-বিপত্তি ছিল প্রচুর। সোভিয়েট কমিউনিষ্ট সমাজের বাইরে কোনও জাতি বা দেশ ষ্টালিনের চোখে শ্রদ্ধেয় ছিল কিনা এ প্রশ্ন থেকে গিয়েছে! পৃথিবীর ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ তাঁকে কেমন চক্ষে দেখত, সম্ভবত সেই খোঁজও তিনি রাখতেন না। সে যাই হোক, তিনি আপন 'সত্যে' ছিলেন কঠোর এবং অবিচল। স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও রিপাবলিক ভারত ধনতন্ত্রী জাতিগণের বন্ধুত্ব হারায়নি, এবং পাশ্চাত্য জাতিগণের সহিত তা'র সৌহার্দ্য রয়ে গেল,—এই প্রশ্নটি হয়ত ষ্টালিনকে পীড়া দিত! ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে তদানীন্তন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের চাপা সংঘর্ষের সংবাদ আমাদের কানে শোনা ছিল। সেই ষ্টালিন! সমগ্র ইউরোপের উপর বর্তমান শতাব্দির দানবদলপতি হিটলারের একচ্ছত্র সর্বাধিনায়কত্ব যাঁর আমলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়! সেই ষ্টালিন—যিনি ঘরের বাইরে যাননি, পৃথিবীর কোনও জাতির সঙ্গে কথা বলেননি, বাইরের কোনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকাশ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি, সোভিয়েট নাগরিককে বাইরের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে দেননি; যিনি তাঁর সমকক্ষ কোনও সোভিয়েট জননেতাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখেননি! সেই ষ্টালিনের সূতিকাগারের সামনে এসে কয়েকজন আমরা দাঁড়ালুম, এবং বিগত চল্লিশ বৎসরকাল ধ'রে পৃথিবীব্যাপী যে বিদ্বেষ, সংশয়, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, অবিশ্বাস, উদ্দীপনা, আশ্বাসবাদ, আদর্শসংঘাত, এবং নূতন ও পুরাতন সভ্যতার মধ্যে যে নিত্য সংগ্রাম সমগ্র জগতকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে,—এই অতি দরিদ্র, দুঃস্থ ও অকিঞ্চন ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে সেই মূল প্রশ্নটির কথা আরেকবার ভাবতে লাগলুম!

ষ্টালিন এখানে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, এবং ১৮৮৩ পর্যন্ত মোট চার বছর এই ঘরটিতে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। এই মফঃস্বল শহরের একটি কোনে ব'সে ষ্টালিনের পিতা জুতা শেলাই এবং মুচির কাজ করতেন। এই শহরে যে মুচিগোষ্ঠি ছিল, ষ্টালিনরা ছিলেন তাঁদেরই এক পরিবার, এবং আমরা কলকাতা শহরে যে মুচিকে দেখি পিঠে ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে এবং তিন পায়া লোহাটা এ কাঁধে ফেলে এবং দড়িবাঁধা টিনের কৌটোটি বাঁ হাতে ঝুলিয়ে এক প্রকার দুর্বোধ্য অথচ সুপরিচিত আওয়াজে হেঁকে যায়, ষ্টালিনরা তা'র থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন ছিলেন না! সামনে একটিমাত্র বাসযোগ্য ছোটঘর, একখানা তক্তা এবং তার ওপর দরিদ্র বিছানা, কয়েকটি অতি পুরাতন এবং অতি সামান্য ও বিবর্ণ আসবাবপত্র,—ব্যস, ওই পর্যন্তই, ঘরের সামনে একটি কাঠের বারান্দা। এই ঘরটির তলায় মাটির নীচে এই সাইজের আরেকটি ঘর রয়েছে রাস্তার নীচে ভূগর্ভে,—সম্ভবত সেটিতে ছিল রান্না-ভাঁড়ার—এবং মাটির তলাকার ওই "শূকরের খোঁয়াড়"-সদৃশ ঘরটিতে থাকতে হত ষ্টালিন পরিবারটিকে মিলিয়ে মিশিয়ে! এই বীভৎস দৈন্য ও দারিদ্র্যের ধিক্কার পরবর্তীকালের ক্রেমলীন-অধিনায়ক ষ্টালিনের চরিত্রকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল কিনা, সে সংবাদ আমার জানা নেই। শুনেছি তাঁর শেষ জীবনে অপরাপর ব্যক্তিকে দিয়ে তিনি এমন একখানি জীবনী তথা ইতিহাস রচনা করিয়েছিলেন যেটি আধুনিক সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি! ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে ষ্টালিন মারা যান্। সংবাদ রটেছিল এই যে, কয়েকজন চিকিৎসকের ষড়যন্ত্রই তাঁর মৃত্যুর কারণ,—এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক-

দিনের মধ্যেই ষ্টালিনের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মিঃ বেরিয়ার হুকুমে সেই চিকিৎসকের দলকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু অতঃপর একটি নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। চিকিৎসকরা ছাড়া পান্, এবং বেরিয়া পলায়ন ক'রে আত্মগোপন করেন। কিন্তু বর্তমান সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বেরিয়ার সুদীর্ঘকালব্যাপী অনাচার অধিকতর বরদাস্ত না ক'রে তাঁকে কৌশলে আটক করেন। অতঃপর বেরিয়াকে গুলীবিদ্ধ ক'রে হত্যা করা হয়। কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতির ঘাত-সংঘাত পরবর্তী চার বৎসরকাল অবধি চলে। সম্ভবত কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্যলাভের জন্য পরস্পরের ভিতরে মস্ত লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু বহির্জগতের কাছে এই গৃহবিরোধের ইতিহাস ফলাও ক'রে প্রচারিত হয়নি। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য মালেনকভ প্রধানমন্ত্রী হন্। তারপর আসেন মার্শাল বুলগানিন। কিন্তু তাঁকেও চ'লে যেতে হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর মিঃ ক্রুশ্চভ প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হন। বলা বাহুল্য, এর আগে থেকেই মিঃ ক্রুশ্চভ সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে যাই হোক, এই সময় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জার্মান ডিক্টেটর হিটলারের অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী অনিশ্চয়তা ও রহস্যাচ্ছন্নতার অবসান করেন,—যেটি ষ্টালিন চেপে রেখেছিলেন দ্বাদশ বৎসরকাল। হিটলারের সর্বপ্রধান পারিবারিক ভৃত্য হেনজ্ লিংগে রুশ-কারাগার থেকে ছাড়া পান্ এবং তিনি প্রথম প্রকাশ করেন যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে হিটলার ও তাঁর 'একদিনের-পত্নী' শ্রীমতী ইভা ব্রণ—উভয়ে বার্লিন চান্সারীর অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করেন! হিটলার নিজকে গুলীবিদ্ধ করেন এবং ইভা বিষ খান্। অতঃপর পেট্রলের দ্বারা তাঁদের দেহ দুটিকে ভস্মীভূত করেন হেন্জ্ হিংগে ও জেনারল হানস্ বয়ার।

ষ্টালিনের মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট পার্টি সম্ভবত নূতনভাবে সংঘটিত হয়, এবং সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এতকাল ধরে বৃহত্তর পৃথিবীর চক্ষে "সমাজচ্যুত" জীবন যাপন ক'রে এসেছে, এই অপমানজনক অবস্থা থেকে তাকে বাহিরে আনবার চেষ্টা হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী নেহরুকে তাঁরা আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান্ এবং শ্রীনেহরু সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। এর চার-মাস পরে নবেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও সোভিয়েট কমিউ-নিষ্ট পার্টির সর্বাধিনায়ক মিঃ ক্রুশ্চভ ভারত পরিদর্শনে আসেন। ভারতবর্ষ এই প্রথম দেখল, রুশ নেতার চেহারা ও চরিত্র, এবং দেখল তাঁরা কী বিচিত্র বস্তু! সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতাগণের সঙ্গে ভারতের এই প্রথম কায়িক সংযোগ!

এখানকার এই বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং তৎসংলগ্ন মনোরম উদ্যানটি বিপ্লববাদী ষ্টালিনের বহু বিচিত্র কীর্তিকলাপের পরিচয়ে পরি-পূর্ণ। অগণিত তৈলচিত্রের মধ্যে কেবল দুটি মানুষকেই চিনে বার করা যায়। একজন লেনিন, অন্যজন ষ্টালিন। ছবি-গুলিতে একথা বলা হয়েছে লেনিনের একমাত্র বিশ্বস্ত ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন ষ্টালিন। ষ্টালিন অনুপ্রাণিত, ষ্টালিন উল্লসিত, ষ্টালিন উৎসাহিত এবং ষ্টালিন সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য! জন-পূর্ণ সম্মেলনের ছবি, কর্মীপরিবৃত লেনিনের ছবি—কিন্তু সকল ছবিতেই লেনিনের পাশে ষ্টালিনের প্রাধান্য দেখা যায়। এগুলি তৈলচিত্র,—ষ্টালিনের আমলেই প্রস্তুত।

তাসকন্দ এবং জর্জিয়ায় ভ্রমণকালে পৌত্তলিক সোভিয়েট ইউনিয়নের পথে ঘাটে পার্কে বাজারে ইস্কুল-আপিসে রাস্তার মোড়েমোড়ে বনপথে নদীতীরে—লেনিন যেমন আছেন, ষ্টালিনও আছেন তেমনি। ভারতবর্ষও পুতুলের দেশ,—কিন্তু তা'রা প্রতিমা! গান্ধীজির কয়েকটি মূর্তি ভারতে ছড়িয়ে আছে,—যিনি কেবল ভারতেরই স্বাধীনতা আনেননি, বৃটিশ সাম্রাজ্যই যাঁর আঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে,—তাঁর মূর্তিগুলি আঙ্গুলে গোণা যায়। আজ সমগ্র পৃথিবী যাঁর রাজনীতি-জ্ঞানের শুচিতায় অনুপ্রাণিত, যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একমাত্র মিলন-সেতু, সেই জওয়াহরলাল নেহরুর একটি মূর্তিও বোধ হয় ভারত-বর্ষে নেই! আমার বিশ্বাস,—ষ্ট্যালিনের এই আঁতুড় ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই আমার এই বিশ্বাসটি হচ্ছে, তাঁর নিজের সবন্ধে বিশ্বাসের জোর ছিল কম। হয়ত এই সকল চিত্র এবং মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি ভাবতেন, তাঁর মৃত্যুর পরে যারা দেশের শাসনভার নেবে তারা তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা না দিতেও পারে!

সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকাকালীন এটি দেখতুম, ষ্টালিন সম্বন্ধে কেউ আলোচনা তুলতে চায় না! যাঁর আমলে সোভিয়েট দেশের সকল প্রকার উন্নতি ঘটেছে, তাঁকে যেন ভুলতে চায় সবাই! তিনি নাকি ক্রেমলিনের বাইরে আসতেন না, সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন না, পার্টির জন্য মাথা ঘামাতেন না, অধস্তন নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না। দেশের জনজীবনের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন নাকি অতি বিশ্বস্ত
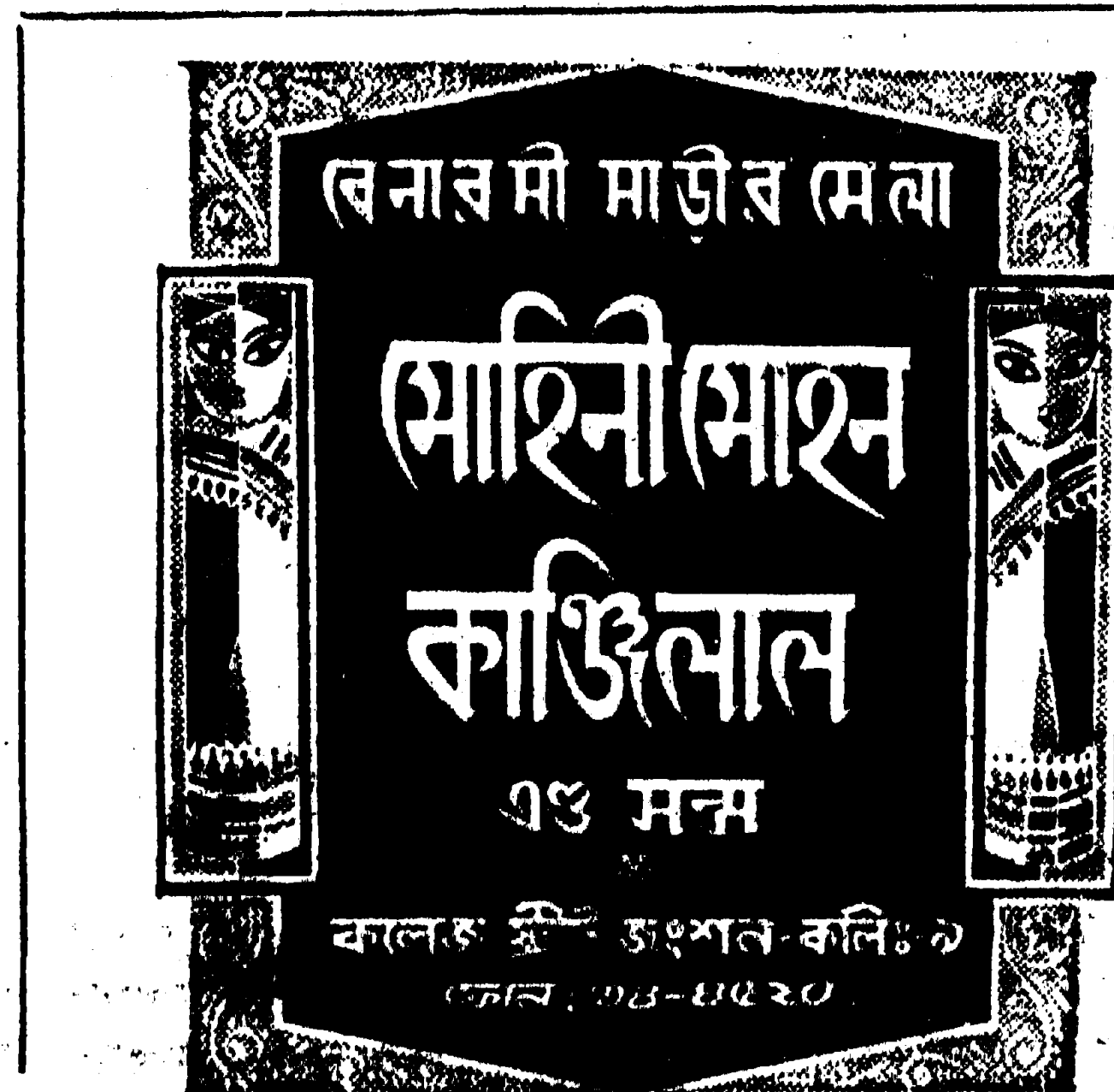
চার-পাঁচটি লোক মারফৎ। বেরিয়া নাকি ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ—এই দশ বৎসরকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের থেকে সর্বাপেক্ষা কম সংবাদ আসত ভারতে। ষ্টালিন এই সময়ে আপন একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর দেশে। কিন্তু কানাকানিতে শুনেতুম, অগণিত সহস্র হত্যাকান্ড ঘটছে রাশিয়ায়, লক্ষ লক্ষ নরনারী বিনা দোষে কায়িক উৎপীড়ন সহ্য করছে। বহু নিরপরাধ জাতিয় নেতা—যাঁরা ষ্টালিনের এককালের সহকর্মী,—তাঁদেরকে নানা অছিলায় হত্যা, উৎপীড়ন, এবং সাইবেরিয়ার তুষারলোকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ষ্টালিন নাকি তাঁর সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সহকর্মীকে সুস্থ বা জীবিত রাখতে চান না! সেই যুগটি নাকি ছিল প্রকৃত 'লৌহ যবনিকার' যুগ—কারণ এই সকল বীভৎস সংবাদ ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে আমাদের কানে এসে পৌছত। এর ফল ফলেছে এই, লেনিন যেমন সমগ্র ভারতের আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন, ষ্টালিন আমলের কমিউনিষ্ট রাশিয়া তেমনি অশ্রদ্ধা, ভয় ও ঘৃণা উদ্রেক করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ষ্টালিন 'জেনারালিসিমো' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে শুনেছি, তিনি কোনদিন কোনও রণক্ষেত্রে বা ফ্রন্টে উপস্থিত হননি, কোনওদিন কোনও সৈন্যদলকে উদ্দীপিত করেননি। বরং তিনি নাকি তাঁর এবং পরিবারের উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী, আসবাবসজ্জা, যানবাহন ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে মস্কো থেকে দূরে সরে যান। একথাটি আজও আমার বিশ্বাস করতে বাধে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ মস্কোয় গিয়ে উপস্থিত হন এবং রাশিয়ার সম্পর্কে কয়েকখানি মনোজ্ঞ চিঠি লিখে পাঠান। কিন্তু ষ্টালিন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোথাও সমাদর করেছেন অথবা শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়েছেন—এর কোনও পরিচয় 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থে নেই।

গোরি শহরের এই অঞ্চল অতিশয় নিরিবিলি, এবং এমন শান্ত ও শব্দলেশহীন পাড়াপল্লী ইতিমধ্যে অল্পই দেখেছি। পৃথিবীর অপর কোনও অঞ্চলে এত স্বল্পসংখ্যক মানুষের জন্য এমন বৃহৎ ভূভাগ আর একটিও নেই, এবং বোধ করি অপর কোনও দেশে এত অল্পসংখ্যক নরনারীর জন্য এমন অপরিমেয় প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদও কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে নেই। সেই কারণে মানবজাতির ইতিহাসে যে জনসাধারণ অগণ্য এবং যারা সর্বাপেক্ষা নগণ্য, তারা মাত্র কয়েকটি বিশেষ নিয়মনীতি পালন করে এত অল্পকালের মধ্যে যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছে, ইতিহাসে তার দ্বিতীয় উদাহরণই বা কোথায়?

গোরির পশ্চিমদিকে একটি ছোটখাটো পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ পাহাড়টি যেন খাপছাড়া, হঠাৎ যেন উঠেছে ভুঁইফোড় হয়ে,—তার জাতিগোত্রের পরিচয় কিছু নেই। শুনতে পাওয়া গেল, রাশিয়ার বহু বিপ্লবী কর্মী এবং ষ্টালিনেরও বহু গোপন রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এই পাহাড়টির যোগ আছে। আত্মগোপনের সুযোগ, গোপনীয় গতিবিধি এবং গুপ্ত অস্ত্রশালা রক্ষার কাজে সেদিন এই পাহাড়টির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

আমাদের চতুর্দিকে অতি বিস্তৃত এবং নবনির্মিত পুষ্পকানন। সেখানে গোলাপ, ডালিয়া, সূর্যমুখী এবং নানাবর্ণের পুষ্পলতা ও বিচিত্র গুল্মগুচ্ছ সমগ্র কাননকে মনোরম করে রেখেছে। উত্তর অংশটা হল, বিশাল সুরম্য প্রাসাদ, সেটি যাদুঘর এবং তার সম্মুখভাগে দীর্ঘলম্বিত সোপানশ্রেণী। এটি প্রস্তর প্রাসাদ, এবং এর নির্মাণনীতি বিশেষ যোগ্যতার সাক্ষ্য দেয়। ভিতরে নীচে ও উপরতলায় মহলের পর মহল ষ্টালিনের সমস্ত জীবনকাহিনী সংখ্যাতীত তৈলচিত্রে, ফটোয় এবং নানাপ্রকার মডেলে প্রকাশ করা হয়েছে। মহামতি লেনিনের কর্মজীবনের সঙ্গে ষ্টালিনের যোগাযোগ কি প্রকার নিবিড়, একজনকে বাদ দিলে আরেকজনের কর্মধারা যে গতিহীন হয়ে পড়ত, সেটি নানাপ্রকারে বোঝানো হয়েছে। ট্রট্স্কি এবং অন্যান্য জননেতার সঙ্গে লেনিনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল কিনা, তার পরিচয় নেই। বলা বাহুল্য, ষ্টালিনের আমলে ট্রট্স্কি সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, সকল ব্যক্তি অপেক্ষা কলঙ্কিত এবং সর্বনিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতক—এইভাবেই তিনি চিত্রিত হয়ে এসেছেন। ট্রট্স্কির সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করাই সোভিয়েট নীতি এবং তাঁর সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলে সে ব্যক্তির পরিণাম ষ্টালিনের আমলে কি প্রকার হত, সে খবর আমি নেবার চেষ্টা করিনি। আমার কৌতূহল ছিল লেনিন ও ট্রট্স্কির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং তাঁর সম্বন্ধে লেনিন কি প্রকার ধারণা ও মনোভাব পোষণ করতেন—সেটি নির্ভুলভাবে জানা। আমার সেই কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে গেছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে ট্রট্স্কি আপন প্রাণরক্ষার জন্য রাশিয়া ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু এক মেক্সিকো ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও তিনি আশ্রয় পান নি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এক গুপ্তঘাতক তাঁকে হত্যা করে। বহু লোকের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি ষ্টালিন।

ষ্টালিন সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। সেইজন্য তাঁর এই মিউজিয়মটি বিশেষ একটি ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল। ভূগর্ভের অনেক নীচে কি প্রকারে বিপ্লবীরা হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা ছাপবার জন্য একটি ছাপাখানা পরিচালনা করত, দেওয়ালের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে কেমন বিচিত্র কৌশলে তারা ভূগর্ভে প্রবেশ করত, ষড়যন্ত্র করত, আত্মগোপন করে থাকত দিনের পর দিন,—এম্বপ্রকার কাহিনীগুলি মিলিয়ে একটি অতি সুন্দর শিল্পকর্মান্বিত মডেল কাঁচের একটি বাক্সয় সুরক্ষিত রয়েছে। আগাগোড়া যাদুঘরটিতে এমন একটি আবেগপ্রবণতা এবং বৈপ্লবিক চেতনাকে শানিত করে রাখার সর্বাঙ্গীণ শিল্পসম্মত যোগ্যতার চেহারা প্রকাশ করা হয়েছে যেটি সকলের মনে উদ্দীপনা আনে। যাদুঘর সাধারণত মৃত, অনড় এবং জড়বস্তুর রক্ষাগৃহে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকটি যাদুঘরের বৈশিষ্ট্য হল তাদের প্রাণময়তা, তেজঃব্যঞ্জনা এবং উপলব্ধির গভীরতা। এগুলি যেমন-তেমন সাজান ছবি আর পুতুলের ভাঁড়ারঘর নয়। প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্যের মধ্যে পাওয়া যায় একটি চরিত্রসত্তা, একটি বিশেষ ভাবনার আশ্রয়, এবং একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তির ইতিহাস।

পুষ্পোদ্যানের ঠিক মাঝখানে ষ্টালিনের প্রাচীন সূতিকাগারটিকে শিকড়সুদ্ধ তুলে এনে সুরক্ষিত করা হয়েছে,—এ দৃশ্যটি বিচিত্র এবং উপভোগ করার মতো। এর মধ্যে একটি অসাধ্যসাধনের কৌশল বর্তমান।

পুরাতন গোরি শহরের এই অঞ্চলটি নানাপ্রকারে প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাক-বিপ্লবের কাল এবং বর্তমান যুগের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। নূতন যুগে কোথাও সরু ও সংকীর্ণ পথঘাট নির্মাণ করা হয় না। অট্টালিকা কোথাও ক্ষুদ্র হয়নি নূতন যুগে, কেননা বাঁচি ব্যাপক হয়েছে একালে জনগণের মধ্যে। এক হয়েছে বহু। কোথাও থেকে যেন ডাক দেওয়া হয়েছে সকলকে। সেই কারণে সকলের পথকে সুগম করা হয়েছে

পথটাকে প্রসারিত করে—এই পথে সবাই ছুটে আসুক। দুটো 'চৌরঙ্গী' পাশাপাশি থাকলে যেন এক একটি পথের হিসেব পাওয়া যায়। অগণিত মর্মর-মূর্তি পথে পথে ছড়ান। আদর্শ জননী, আদর্শ কর্মী, আদর্শ জননায়ক ও যোদ্ধা, আদর্শ কবি ও শিল্পী, আদর্শ চাষী ও মজুর এদের অগণিত প্রতীক-মূর্তি পথের নানাস্থান শোভা এনেছে। নূতন নগর পরিদর্শনের পর এখানে ওখানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল গ্রামাঞ্চলের দিকে। দূরে দূরান্তর সমতল প্রান্তরের কোনও কোনও অংশে ছোট ছোট পাহাড় দেখতে পাচ্ছি। সেখানে প্রধানতঃ যে ফসলটি দেখছি সেটি শালগমের মতো,— এগুলির নাম বীট, স্বাদ মিষ্ট, এবং এর থেকে চিনি হয়। পরে শুনেছিলুম সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও আখের চাষ হয় না এবং আখ জন্মায় না। এই 'সুগারবীট' থেকেই দেশের চিনি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

আঙ্গুরের একটি বৃহৎ ক্ষেতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। এখানে মাচানে বাঁধা আঙ্গুরের লতা ঝুলছে না, ছোট ছোট বেগুনগাছের মতো ছোট গাছগুলিতে কালো কালো বৃহৎ আকারের আঙ্গুরের থোকা এমনভাবে ফলেছে যে, শ্রীধরণী প্রমুখ আমরা কেউ লোভ সংবরণ করতে পারলুম না, এবং লুটতরাজের ব্যাপারে মামুদেভ এবং সোভিয়েট মালিকরাও কেউ পিছিয়ে রইলেন না! সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, তথাকথিত মালিক কেউ নেই যে, ডান্ডা নিয়ে তেড়ে আসবে, এবং অভাব কোথাও নেই যে, গা ঢাকা দিয়ে চুরি ক'রে খেয়ে পালাবে। কেউ এখানে কালো হাঁড়ি, পতাকা, অথবা খড়ের-আঁটি-দিয়ে-তৈরি নকল মনুষ্যমূর্তি মাঠের উপর দাঁড় করিয়ে রাখে না, রাত্রের দিকে কেউ হাঁক পাড়ে না এবং জন্তু-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র এই সর্বভুক দেশে নেই। গ্রামে বা শহরে ঘুরলে একটা কথা শুধু মনকে পেয়ে বসবে, যেটি সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বত্র প্রযোজ্য—মানুষ এখানে আহার করে পর্যাপ্ত পরিমাণে, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য সর্বব্যাপী,—এবং এদের ত্রিসীমানায় অন্নের অভাব লেশমাত্র নেই! ওরা ওদের চির-বুভুক্ষু ও চিরদরিদ্র দেশকে সর্বাগ্রে অন্ন, বস্ত্র ও 'চাকুরি' দিয়ে পরিতুষ্ট করেছে, তার পরে হাত দিয়েছে দেশ-জোড়া সংগঠনের কাজে। হয়ত বহু ক্ষেত্রে জনসাধারণের গলা টিপে গায়ের জোরে কাজ আদায় ক'রে নিয়েছে, নির্মম রূঢ় হস্তে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করেছে, দয়াহীন কঠিন নির্দেশের দ্বারা এক শ্রেণীর জনগণকে অসাধ্যসাধনের দিকে ঠেলে দিয়েছে,—শুনেছি এমন অনেক কথা ও কাহিনী! এগুলির মধ্যে অতিশয়োক্তির অংশ কতটা জানিনে। তবু এগুলি সত্য বলেই ধ'রে নিচ্ছি। গভর্ণমেন্ট মাত্রই জানে, চিরকালের মূঢ়, মূক, হতভাগ্য, রুগ্ন ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে দিয়ে দেশগঠনের কাজ কি প্রকার! মোট ১৪টি পর-রাষ্ট্রের শত্রুতা, এবং ১৯টি সীমান্তের অপর পার থেকে বহিঃশত্রুর বিবিধ প্রকার বৈরিতা,—এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধভয়ভীত জাতির পক্ষে জরুরী ব্যবস্থা পত্তন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল কি? জনকল্যাণের পরম আদর্শটা সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সোভিয়েট রাষ্ট্র তার ধারাল এবং ভয়াল শাসনব্যবস্থাকে প্রকাশ করেছে, এবং সেই নির্মম কঠোরতার হাত এড়াতে পারেনি প্রধান-মন্ত্রী থেকে নগণ্য মজুরটির একজনও কেউ! সময় ছিল না ওদের হাতে! ইউরোপ, এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্য জুড়ে ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত ওদেরকে একটি দিনের জন্যও সুখ শান্তি এবং নিরাপদে থাকতে দেয়নি। সেই কারণেই ওরা একটির পর একটি পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান চালু ক'রে ঘরের লোককে চোখ রাঙিয়ে, ধমকে, চাবুকে—ফর্দমতো কাজ আদায় করেছে দ্রুতগতিতে। সোভিয়েট আমলে মার খেয়ে মরেছে অনেকে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ যুগ বাদ দিলে না খেয়ে মরেনি কেউ! ওরা যুক্তি বোঝে, কিন্তু অহেতুক দয়া বোঝে না! ওরা কাজ বোঝে ব'লেই কথা বলেনি তিরিশ বছর! ওরা লোহালক্কড়ের কারখানা গড়েছে যেমন সংখ্যাতীত, তেমনি মানুষ তৈরির কারখানাও গড়েছে প্রতিটি রিপাব্লিকে,—এবং সেই কারিগরী কৌশল কি প্রকার সেটি দেখার জন্য ইউরোপীয় ও এশিয়া থেকে যারা গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাদের হিংসাতুর চক্ষুকে আড়াল করার জন্যই সম্ভবত ওরা 'লোহার পর্দা' ঝুলিয়ে রেখেছিল,—যাতে হাওয়াতেও না ওড়ে! আনন্দের কথা এই, বিগত তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষের একটি জনপ্রাণীও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যেমন শত্রুতাও করেনি, তেমন গোয়েন্দাগিরিতেও প্রশ্রয় দেয়নি! ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রাশিয়ার 'পঞ্চবার্ষিকী' আদর্শের সার্থক অনুকরণ।

মাঠ ময়দান থেকে ঘরে ফিরে এসে আমরা অপরাহ্নকালে স্থানীয় 'ইনটুরিস্ট' হোটেলের জনবিরল একটি পুরনো বাড়ীর নীচের তলার ডিনার খেতে বসলুম। এটি 'মধ্যাহ্ন'-ভোজন, অতএব 'ডিনার'! স্থানীয় জর্জিয়ান লেখকরা এলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন জাপানী, মিশরী, সীরিয়,—এবং আমাদের সেই পুরনো বন্ধু বৃদ্ধ গ্রীক ভদ্রলোক। আমরা মোট চারজন ভারতীয়। আহার্য এবং পানীয়র প্রাচুর্যের ফলে মোট জনকুড়ি পুরুষ ও মহিলা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন। এই হোটেলের সুশ্রী ও যুবতী মেয়েরা বিশেষভাবে আমাদের জন্য পোলাও, মাংস, চপ, মাছ এবং দু'একটি নিষিদ্ধ মাংসাদি বিশেষ যত্নে মসলাসহ রান্না করেছেন। ওর মধ্যে মাটির ভাঁড়ে 'বেগুন' সহযোগে ভেড়ার মাংসর মোগলাই রান্নাটি স্মরণীয় বটে! বেগুন বড়ই দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী,—'নবাব সুবোরাই' খায়! বলা বাহুল্য, রীতি অনুযায়ী আহারাদির মাঝখানে দু'চার কথা বলার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এল, এবং আমার ভাষণের পর প্রবীণ কবি মহাশয় এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন।

ঘন্টা দুই ধ'রে আহারাদির পর সকলে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বিদায় নেবার আগে এখানকার রীতি হচ্ছে, নরনারীর মধ্যে আলিঙ্গন ও চুম্বন বিনিময় করা! হোটেলের মেয়েরাও দেখা গেল, সলজ্জ হাস্যে এগিয়ে এলেন! এ ব্যাপারে ভারতবর্ষ পিছিয়েই রইল, কিন্তু ভিড়ের ভিতর দিয়ে 'কেরালা' অগ্রসর হলেন কিনা এখন আর মনে পড়ে না। মামুদেভ কি করল আমি দেখিনি!

আসবার পথে এক সময় মামুদেভের সাহায্যে প্রবীণ জর্জিয়ান কবি মহাশয় আমাকে বললেন, আপনি শুনে সুখী হবেন জর্জিয়ান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে!

সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল অস্পষ্ট, কিন্তু মধুর ছিল স্নিগ্ধ উপত্যকা পথ। মাঝে মাঝে রেল লাইন পার হচ্ছিলুম, এবং দূরদূরান্তর প্রান্তরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন প্রতিটি গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল। চারিদিকে দ্বার খুলে রয়েছে নূতন জগৎ!

অনেক পথ পেরিয়ে হোটেলে ফিরে একটু অবাক হলুম। যাবার সময় যথারীতি চাবি রেখে গিয়েছিলুম। এখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলুম শ্রীধরণী এবং আমার জন্য বড় একখানি আসবাব-সজ্জিত ও কার্পেটমোড়া সুন্দর ঘর দেওয়া হয়েছে, এবং ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন আধুনিক ফ্যাশানের একটি বাথরুম! শুধু তাই নয়, কাপড় চোপড় যেগুলি ছাড়া ছিল সেগুলি যেন মন্ত্রবলে ধোবদস্ত এবং ইস্তিরিযুক্ত হয়ে সযত্নে একটি টিপাইয়ের উপর রাখা। কাঁচের কুঁজোয় জল, দুটি গেলাস, একটি ফুলের তোড়া, ফলের পাত্রে আঙ্গুর ও পীয়ার, জানালায় লেসযুক্ত পর্দা, নরম বিছানায় পরিচ্ছন্ন শয্যা-সম্ভার।

আমরা যে এখন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অতিথি, একথা গতকাল বোধ করি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কানে ওঠেনি! শুয়ে পড়লুম বিছানায়!

(ক্রমশঃ)

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(চার)

স্বর্গীয় রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করার জন্য সকল প্রচেষ্টার তিনিই আদি প্রেরণাদাতা। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর অবদান অসামান্য, একথা অনস্বীকার্য। তবে রাজা সৌরিন্দ্রমোহনই বিজ্ঞানসম্মত ও ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বোধগম্য উচ্চাঙ্গ-সংগীত শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে কলিকাতায় বেঙ্গল মিউজিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর অধিকাংশ সংগীত গ্রন্থই এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে কলিকাতায় উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থলরূপে ভারত সংগীত সমাজের উদ্ভব হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মৃত্যুর পর বেঙ্গল মিউজিক স্কুলেরও বিলুপ্তি ঘটে। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কলিকাতার গণ্য-মান্য অভিজাতগণ মিলিতভাবে ভারত সংগীত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানেও উচ্চাঙ্গ, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের শিল্পিগণ নিয়মিতরূপে সংগীত পরিবেশন ও সংগীত শিক্ষা বিতরণ ক'রতেন।

ভারত সংগীত সমাজের পক্ষ হ'তেই 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামক মাসিক পত্রিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'তো। আমার পূর্ব নিবন্ধে আমি লিখেছি যে, পিতৃদেবের সহিত সংগীত সমাজের সম্বন্ধ বরাবরই ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি সংগীত সমাজের কর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন। এখানে নিয়মিত অভিনয়ে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ক'রতেন ও সংগীতের আসরে মৃদঙ্গ বাজাতেন। সংগীত সমাজের সূত্রেই রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত তাঁর গভীর স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা হ'তে বিদায় নিয়ে যখন রাঁচীতে শান্তিপূর্ণ অবসর জীবন গ্রহণ ক'রলেন, তখন "সংগীত প্রকাশিকা" পত্রিকাও সম্পাদকের অভাবে প্রকাশপথ হারাল। রাজা সৌরিন্দ্রমোহনও তখন সত্তর বৎসর অতিক্রম ক'রেছেন, তাঁর কর্মময় জীবনও অবসানের পথে চ'লেছে। এ'রা উভয়েই কর্ম হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রলেও কলিকাতার উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনান্ত পর্যন্ত কখনও কার্পণ্য করেননি।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই পরিস্থিতির সময়ে বাংলায় সংগীতের দীপ্তশিখা তুলে ধ'রে দাঁড়ালেন ঠাকুরবাড়ীর পরমাসুন্দরী বিদুষী কন্যা—সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপা প্রতিভা দেবী। ইনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং বঙ্গপ্রতিভার বরপুত্র স্বর্গীয় জাষ্টিস্ আশুতোষ চৌধুরীর সহধর্মিণী। এ'দের উৎসাহে ও পরিচালনায় প্রথমত পার্ক স্ট্রীটে ইন্ডিয়ান কন্‌সারভেটর্ অব মিউজিক' স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন স্বর্গীয় প্রফেসর কৌকভ খাঁ। আমরা পূর্ব নিবন্ধে উল্লেখ ক'রেছি যে, তানসেন বংশীয় সংগীত-নায়ক বাসৎ খাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ, স্বরোদী। প্রোফেসর কৌকভ খাঁ নিয়ামতুল্লারই দ্বিতীয় পুত্র। মৃত্যুকালে পিতা পুত্রদের জন্য লক্ষাধিক অর্থ সঞ্চিত ক'রে গিয়েছিলেন। তাই কৌকভ খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেরামতুল্লা খাঁ সরোদ যন্ত্রে অসামান্য অধিকার সত্ত্বেও পিতার মৃত্যুর পর ছয়-সাত বৎসরকাল পেশাদার সংগীতকারের জীবন অবলম্বন করেননি। এ'রা এলাহাবাদে শাল ও আতরের ব্যবসা ক'রতেন। দেশনেতা ব্যারিষ্টার সমাজের শিরোমণি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের স্বর্গত পিতা মতিলাল নেহরু এই সরোদী ভ্রাতৃদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতা সর্বতোভাবে করতেন। পণ্ডিত মতিলাল প্যারিসে কোন বৃহৎ প্রদর্শনীতে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-সংগীতের পরিবেশনের জন্য কৌকভ খাঁ ও কেরামতুল্লা খাঁকে ইউরোপে নিজ ব্যয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এনায়েত্ হোসেন সরোদী যন্ত্র-সংগীতের কৃতিত্বে ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, কৌকভ খাঁর সরোদ-বাদনও প্যারিস এবং লণ্ডনের গুণীসমাজে সেইরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা উৎপাদন করেছিল। ইউরোপীয় গুণীগণ ভারতীয় কণ্ঠ-সংগীতের বিশেষ সাড়া দেন না। কেননা, ভারতীয় উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ ইউরোপে কখনও পরিবেশন করা হয়নি এবং খেয়ালের নানাবিধ তান ও অলংকারের সৌন্দর্য তাঁরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। পক্ষান্তরে মধ্য ও দ্রুত লয়ের সুরেলা যন্ত্র-সংগীত সহজেই তাঁদের হৃদয় আকর্ষণ ক'রতে পারে। বিদ্যার গুণে ও রাগের উপর অধিকারে সম্ভবতঃ কেরামতুল্লা খাঁ কৌকভ খাঁ অপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু সরোদ বাদনের ক্রিয়াঙ্গে বিশেষতঃ মধ্য ও দ্রুত লয়ে বিংশ শতাব্দীতে কৌকভ খাঁর সমকক্ষ কেহ হ'য়েছেন একথা আমরা সহজে স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। যাঁরা লঘু ভাষায় তাঁর সমালোচনা ক'রে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কারোরই কৌকভ খাঁ'র সঙ্গে কোন জলসায় প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটেনি। ইনি শুধু সরোদে যে ক্রিয়াশুদ্ধ ছিলেন তাই নয়, সংগীতশাস্ত্রেও এ'র যথেষ্ট অধিকার ছিল। তা-ছাড়া হিন্দী, উর্দু, ইংরাজী ও পার্শী ভাষায় কৌকভ খাঁ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শা ও নেপালের মহারাজার সংগীত-দরবারে প্রধান ধ্রুপদ গায়ক ওস্তাদ তাজ খাঁর দুহিতার সহিত এ'র বিবাহ হয়। পিতার নিকট কণ্ঠ-

সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত শিক্ষার পর তাজ খাঁর নিকট হতে ইনি বহু ধ্রুপদ গানও সংগ্রহ করেছিলেন। সরোদে আলাপের মধ্য ও দ্রুত অংগে, অর্থাৎ জোড়, ঠোক্ ঝালা, লাড়, লড়্‌গুথাও, লড়্‌লপেট প্রভৃতি বিভাগে এ'র কৃতিত্বের তুলনা হয় না। কেননা, রবাবের বাদ্য-পদ্ধতি অনুসরণ করে নিয়ামতুল্লা খাঁ সরোদে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তার নিখুঁত পরিবেশন কোকভ খাঁ করে গেছেন। জোড় বা বোল বাজাবার সময় অতি দ্রুত লয়ের মধ্যেও তাঁর স্বরলহরী কখনো জড়িয়ে যেত না। প্রত্যেকটি স্বর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশের সংগে সংগে চতুর্দিকে সুরের এক ইন্দ্রজাল বিরচিত হতো। বলাবাহুল্য কলাকারসুলভ দিল্‌-দরিয়া মেজাজের সংগে ব্যবসায় বুদ্ধির বনিবনা হ'তে পারে না। ফলে উক্ত সরোদী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের সঞ্চিত সব অর্থ নষ্ট ক'রে ফেললেন বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণে শাল ও আতরের অজস্র উপহার ও উপঢৌকনের প্রাচুর্যের ফলে। জ্যেষ্ঠ কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব এলাহাবাদ শহরেই যন্ত্র-সংগীত শিক্ষকতা ও সংগীত পরিবেশনের দ্বারা প্রচুর আয়ের পথ খুঁজে পান। কনিষ্ঠ কোকভ খাঁ সাহেবকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর নিজ দরবারে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন। মহারাজার বাড়ীতে খাঁ সাহেব প্রাতঃকালে ভৈরবীর জলসার দ্বারা কলিকাতায় তাঁর সাংগীতিক জীবনের প্রথম উদ্বোধন ক'রেছিলেন। যাঁরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। তাঁদের কাছে শুনেছি যে, মহারাজা সেদিন সংগীতানুরাগী বহু অভিজাত বংশীয় ও বিদ্বান ও গুণীদের তাঁর সভায় নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। তাঁরা সকলেই কোকভ খাঁর বাজনায় অভিভূত হয়ে যান ও ঘোষণা করেন যে, রবাবী কাসেম আলি খাঁর পর অতি দ্রুত লয়ের বোলে ঐরূপ সুরেলা সুস্পষ্ট বাজনা তাঁরা কখনো শোনেননি। তাঁরা বলেছিলেন যে, খাঁ সাহেবের বাজনায় সুরের এক অলৌকিক দীপ্তি ছিল। এর পর একে একে সংগীতানুরাগী বহু ধনী তাঁর শিষ্য হন। মহারাজার দরবারে নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা ছাড়াও বহু গুণী তাঁকে সংগীত শিক্ষকতার জন্য বহু অর্থ নিয়মিতভাবে দিয়ে এসেছেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্নবাবু সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরের শিক্ষার ফলে সে সময়ে সুরবাহারের আলাপে কলিকাতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু সেতারের দ্রুত গতের জন্য তিনিও কোকভ খাঁর শিষ্য হন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহারাজা পরিবারের সহিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক যোগাযোগ চিরদিনই ছিল অতি সুনিবিড়। যদিও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার পর মহারাজার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক বিষয়ে মতানৈক্য লক্ষিত হতো, তথাপি সংগীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠাকুর বংশের এই দুই শাখার সহযোগিতার কখনো অভাব হয়নি। মহারাজার দরবারের ওস্তাদদের কাছে মহর্ষির পরিবারের মহিলাগণ সর্বদাই সংগীত শিক্ষা ক'রতেন। অশেষ প্রতিভাশালিনী প্রতিভা দেবী কোকভ খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও ক্রিয়াগুণে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীলা হন। তিনি ও তাঁহার বরেণ্য পতি বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী কোকভ খাঁকে কেন্দ্রস্থানীয় করেই শিক্ষিত সমাজে সংগীতের বিশিষ্ট কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হন। মহারাজার ভ্রাতা (ছোট রাজা) সৌরীন্দ্রমোহন তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টার সর্বতোভাবে সাহায্যদানে ব্রতী হন।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

— পাঁচ —
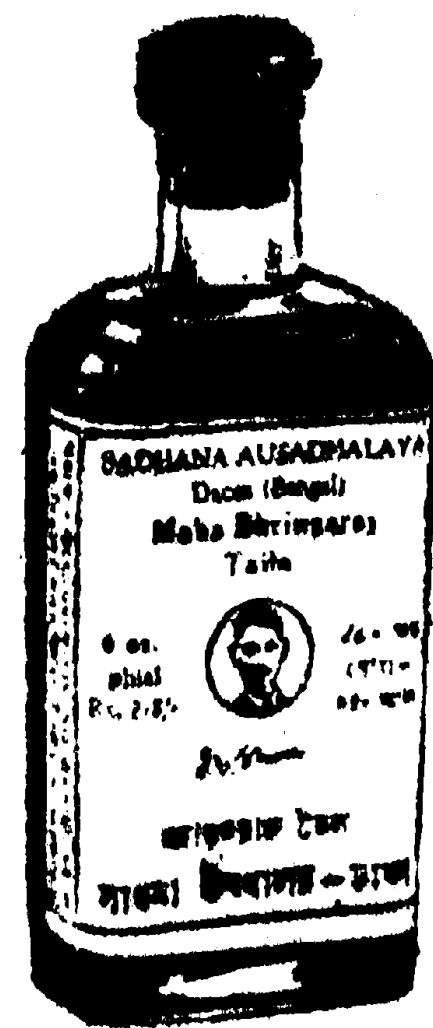
বর্ষ্টাল স্কুল। কিছুদিন আগেও ছিল ফার্স্ট ক্লাশ ডিষ্ট্রিক্ট জেল। চারদিক ঘিরে চৌদ্দ ফুট উঁচু পাঁচিল, মাঝখানে মোটা মোটা লোহার গরাদ-দেওয়া বড় বড় ব্যারাক, তার পাশে সেল্, ওয়ার্কশপ, কিচেন, গুদামের লম্বা সারি। চার পাঁচশ বিভিন্ন-মেয়াদী কয়েদীর আস্তানা। শুধু 'ক্রিমিন্যাল প্রিজনার' নয়, চোর, ডাকাত, খুনী, জালিয়াৎ এক পাশে সরিয়ে বাকী ব্যারাকগুলোর মাঝে মাঝে জড়ো করা হত 'স্বদেশী' বন্দীর দল। এক সময়ে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র, দোতলার পশ্চিম প্রান্তে ছোট ঘরখানিতে কাটিয়েছিলেন কয়েক মাস। ঘর থেকে বেরিয়েই খানিকটা ছাদ। সকালে বিকেলে তার উপরে পায়চারি করতেন। কখনো স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেন নদী এবং তার পরপারে গাছ-পালার দিকে। জেল ছাড়িয়ে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তার পরেই গঙ্গা। সেখান দিয়ে নৌকো করে যারা যেত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সেই সৌম্য মূর্তি। তার উপরে অস্তমান সূর্যের স্বর্ণালোক। অবাক হয়ে ভাবত, এ কোন্ জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব হল জেলখানায়!

'গেট্' পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেই মাঠ। তার পূব দিকে এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো বট আর অশত্থ গাছ। বিরাট গুঁড়ির চারদিকটা মাটি কিংবা ইঁট দিয়ে কষে বাঁধিয়ে দিয়েছিল সিপাইরা। তারই কোনোটার উপর বসে কাজী নজরুল ইসলাম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন তাঁর সদ্যোরচিত বিদ্রোহ-গাথা—

> কারার এই লৌহকপাট
> ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট,

বিদ্রোহের শাস্তিও পেয়েছিলেন নিশ্চয়। এ কাহিনী সত্য না কিংবদন্তী, যদি সত্য হয়, কোথায় কোন্ গাছটির বেদি-মূলে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল সেই ওজস্বী কণ্ঠের গম্ভীর মাধুর্য, আজ আর জানবার উপায় নেই। কবি শুধু স্তব্ধ নন, আচ্ছন্ন-চেতনা।

সেই ডিষ্ট্রিক্ট জেল হঠাৎ একদিন জেল-জন্ম ঘুচিয়ে দিয়ে হয়ে গেল স্কুল—বর্ষ্টাল স্কুল। বাইরের চেহারা একই রয়ে গেল। সেই কালো পাঁচিল, ব্যারাক, সেল, সেই আউটার ও ইনার গেট। শুধু অষ্টপ্রহর বন্ধ না রেখে, তাদের পাল্লা-গুলো খুলে দেওয়া হল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত; আর গেটের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল মস্তবড় সাইনবোর্ড BE MEN—মানুষ হও।

> মসিরেখা উপন্যাস মাত্র। স্থান কাল পাত্র কাল্পনিক। কোনো অংশে কোনো বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের যদি কিছুমাত্র প্রতিফলন ঘটে থাকে, বুঝতে হবে সেটা আকস্মিক। —লেখক

শোনা যায়, বার্ণার্ড শ' নাকি কোন্ জেল কিংবা ঐ জাতীয় কোনো প্রতি-ষ্ঠানের গেটের মাথায় এই ধরনের সাইন-বোর্ড দেখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছিলেন, উপদেশটা বোধ হয় আমার মত ভিজিটারদের জন্যে। ভেতরে যারা থাকে, তারা তো এটা দেখতে পায় না।

বর্ষ্টালের কর্তৃপক্ষ সে প্রশ্নের অব-কাশ রাখেননি, আরেকখানা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন ভিতরে, মেইন ব্যারাকের গায়ে। নবাগত আবাসিক ইনার গেট পার হলেই দেখতে পাবে BE MEN; দেখে অনুপ্রাণিত হবে, অবশ্য যদি তার ইংরেজি অক্ষর পরিচয় থাকে।

গেট দুটো খুলে দিয়ে এবং তার মাথার উপর বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে কারা-বিভাগের কর্তারা বুঝিয়ে দিলেন, এটা জেল নয়, স্কুল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা-দের ভুল ভাঙল না। তাদের চোখের উপর এখনো যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই উদ্ধত প্রাচীর। তাই ইস্কুল কেউ বলে না, বলে, 'বোরোস্টাল জেল।' এই কটমট কথাটার মানে তাদের জানবার কথা নয়। ইংলণ্ডের কোনখানে ঐ নামে নাকি একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কে কবে সেখানে কতগুলো খুদে অপরাধী জড়ো করে তৈরি করেছিল নতুন ধরনের কয়েদখানা, কোন্ আদর্শে কী উপায়ে তাদের মানুষ করা হত, এ সব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। শুধু এইটুকু জেনেই তারা নিশ্চিত, এক সময়ে ছিল এটা বড়দের জেল, এখন ছোটদের।

আসল পরিবর্তন সেইখানেই। শ পাঁচেক প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদী অন্যত্র চালান দিয়ে, এতবড় বাড়িটায় যাদের জায়গা হল, তাদের সংখ্যা আশী-বিরাশী, বয়স আট থেকে একুশ। তার মধ্যে দুটো গ্রুপ্ বা শ্রেণী—'ইনডাসট্রিয়াল বয়েজ', ষোল পুরলেই যারা বেরিয়ে যাবে, আর 'বর্ষ্টাল্ বয়েজ', ষোল না হলে যারা এখানে ঢুকতে পাবে না। আইনের ভাষায় এবং সরকারী পরিচয়ে এরাও 'কন-ভিক্ট্' অর্থাৎ কয়েদী। কোনো স্পেসিফিক্ বা সুনির্দিষ্ট অপরাধে ফৌজদারী আইনে কোনো ধারায় উপযুক্ত কোর্ট্ যাকে দণ্ড দিয়েছেন, সে-ই শুধু এই 'স্কুলের' 'ছাত্র' হবার যোগ্য। তার বাইরে আর কারো এ অধিকার নেই।

অনেকের ধারণা, এটা দুষ্টু এবং বেয়াড়া ছেলেদের শায়েস্তা করবার জায়গা, এবং তাদের কাছ থেকে প্রায়

প্রতিদিন নানা ধরনের আবেদন আসে। বিপন্ন ধনী অভিভাবক তার বয়ে-যাওয়া ছেলে বা নিকট আত্মীয়কে কড়া শাসনে রেখে একটু ঠাণ্ডা করে দেবার অনুরোধ নিয়ে অধ্যক্ষের স্বারস্থ হন। কেউ প্রস্‌পেকটাস্ চেয়ে পাঠান, কত বছরের কোর্স, কী কী শেখানো হয় এই সব নানা তথ্যের ফিরিস্তি সমেত। এখানে ঢুকতে হলে কতটা বিদ্যা চাই এবং বেরিয়ে চাকরি-বাকরি সুলভ হবে কিনা, সে খবরও জানতে চান কোনো কোনো অল্প-বয়সে-বিগড়ে-যাওয়া বেকার ছেলের গরিব বাপ।

আলাদা ভাবে এত চিঠির জবাব কে দেয়? তাই এখানকারই প্রেস্ থেকে একটি সাধারণ উত্তর ছাপিয়ে রেখেছেন অধ্যক্ষের দপ্তর—"এতদ্দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, উপযুক্ত কোর্টের ওয়ারেণ্ট্ বিনা কোন বালককে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না।" অর্থাৎ ছেলেকে আগে পুলিশে দিন, আর পুলিশ-কেসে পড়বার মত বিদ্যা যদি এখনো সে আয়ত্ত করে না থাকে, ততদিন অপেক্ষা করুন।

এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেছেন কোনো কোনো অভিভাবক, সে দৃষ্টান্তও আছে। ঘর থেকে বাসন চুরি করেছে বলে বাপ ছেলের নামে থানায় এজাহার দিয়েছেন, সেখান থেকে ছুটেছেন কোর্টে, ডকে দাঁড়িয়ে হলপ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তদ্বির করেছেন যাতে তার সাজা হয়। ছেলে বর্স্টালে আসবার পর ফল আর মিষ্টির ঝুড়ি হাতে করে এসেছেন দেখা করতে।

মামলা শেষ হবার দুদিন পরেই দিলীপ ছোকরা গারদ থেকে বর্স্টালে এসে পৌঁছল। জীবনে সেই প্রথম তার রেলগাড়ি-চড়া। তার আগে রেলের বাঁশী শুনেছে, শব্দ শুনেছে, এবং এই আশ্চর্য দৈত্যটির নানা কীর্তিকলাপের চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছে হারু ও অন্য বন্ধুদের কাছে। মনে মনে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল, একদিন রেলে চড়বে। মার কাছে সেটা প্রকাশ করতে সাহস করেনি। মা কি করে সংসার চালায় জানত বলেই করেনি। সেই সুপ্ত আশার যে এমন করে পূরণ হবে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল কোনোদিন?

দুজন জোয়ান পুলিশ যখন তার কোমরে দড়ি বেঁধে এবং তার একটা ধার হাতে ধরে থার্ড ক্লাশ কামরার ভিড়ের মধ্যে নিয়ে তুলল, রেলগাড়ি এবং তাকে ঘিরে যে জগৎ, খোকার কল্পনা-রঙীন মনে কোনো বিস্ময় বা আনন্দ জাগিয়ে তুলতে পারল না। অথচ এই বস্তুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার আজন্ম-লালিত সাধ ও স্বপ্ন। চারদিকে একবার মাত্র চোখ তুলেই বুঝল, এই মুহূর্তে সে-ই এতগুলো লোকের একমাত্র দৃষ্টি-স্থল। সে দৃষ্টিতে ভরা শুধু ঘৃণা ও কৌতুক। কে একজন বলে উঠল পাশ থেকে, "কতটুকু ছোকরা চুরি করেছে, দ্যাখ। জেলে নিয়ে যাচ্ছে, বোধ হয়।" "জেলে না দিয়ে চাবুকে মেরে হাড় ভেঙে দিতে হয়।" উত্তর দিল আরেকজন।

দিলীপের মাথাটা নুইয়ে পড়ল মাটির দিকে। সে চোর, সেইটাই তার একমাত্র পরিচয়; কোমরের ঐ দড়িটা আর ঐ পুলিশ দুটো সেই কথাই তারস্বরে জানিয়ে দিচ্ছে সকলের কাছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর একজন ভদ্রলোক একটু সরে গিয়ে পুলিশের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ছেলেটাকে? বসিয়ে দাও না?

কনস্টেবল দুজন অবশ্য আগেই বসে পড়েছিল। একজন ওর দিকে চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল, 'কেয়া দেখতা হায়। বৈঠ্ যাও।'

যেন এতক্ষণ না বসাটাই ওর অপরাধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক একটু শ্লেষের সুরে বললেন, ঐ টুকুন একটা বাচ্চা, তার পেছনে দুটো পুলিশ, তার ওপরে আবার একটা জাহাজের কাছি বেঁধেছ কোমরে। এর চেয়ে লোহার বাক্সে প্যাক্ করে আনলেই পারতে।

আশে-পাশে দু-একজন হেসে উঠল। একজন পুলিশ উষ্মার সুরে বলল, ভাগনেছে কোন্ দায়ী হোগা? তোম-লোগ?

—বল কি! চলন্ত গাড়ি থেকে ভাগবে! তোমরা আছ কী করতে?

অনাবশ্যক মনে করে পুলিশের লোকেরা এ-কথার কোন জবাব দিল না।

নতুন আমদানী ছেলেদের আসবার পরদিনই অধ্যক্ষ অর্থাৎ সুপারসাহেবের কাছে হাজির করা হয়। দিলীপ এসেছিল সন্ধ্যার পর। পরদিন সকালবেলা লপসি খাইয়ে তাকে দু গেটের মাঝখানে এনে বসান হল। একদিকে সুপারের অফিস, আর একদিকে অন্য সব বাবুদের। বেলা আটটার কাছাকাছি আশে-পাশে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গেটের বাইরে যে পেটা ঘণ্টাটা ঝোলানো আছে, কে গিয়ে তার উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিলিটারী খাকী-পরা একজন বিপুলকায় ভদ্রলোক তার চেহারার সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান একটি বেঁটে সরু বেতের ছড়ি বগলে চেপে ঝড়ের মত ঢুকে পড়লেন এবং 'লেফ্‌ট-টার্ন'-এর ভঙ্গিতে, বাঁ-পাশের দেয়াল ঘেঁষে যে লম্বা পা-ওয়ালা টেবিল রয়েছে, তার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে যে সিপাইটি দাঁড়িয়ে ছিল বুটে বুট ঠুকে স্যালুট করল এবং শশব্যস্তে বাড়িয়ে ধরল একটি মোটা কলম! সাধারণ কলমের চেয়ে অন্ততঃ তিনগুণ তার বেড়।

কলমটা যেন কেড়ে নিলেন ভদ্রলোক এবং টেবিলের উপরে-রাখা মোটা খাতার পাতা জুড়ে খস্‌খস্ করে কী একটা লিখে তেমনি ঝড়ের বেগে অফিসে গিয়ে

ঢুকলেন। গেট পেরিয়ে সকলকেই ঐ গেট-বুকে সই করতে হয়।

দিলীপের পাশে আর একটি ছেলে বসেছিল, ওর চেয়ে অনেকটা বড় এবং বছর কয়েক আগে থেকে আছে বর্ষ্টালে। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'বড়সায়েব'। এবং কি মনে করে ফিক্ করে হেসে ফেলল। দিলীপের চোখের উপর তখনো ভাসছে ক্ষণ-পূর্বে দেখা সেই বিশাল মূর্তি, যাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে আতঙ্কে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মানুষের আকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল থাকবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। কারণ, প্রথমটির উপর তার হাত নেই, দ্বিতীয়টি বহু পরিমাণে তার করায়ত্ত। তবু এ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে বের করাই সাধারণ মানুষের স্বভাব। কারো বাইরেটা দেখেই তার ভিতরটা সম্বন্ধে আমরা মনে মনে একটা ধারণা গড়ে তুলি। সে মন যদি শিশু-মন হয়, এই ধারণা যেমন সহজে জন্মায়, তেমনি গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে।

রোগীদের বেলাতেও তাই। ডাক্তারের চেহারা তার ওষুধের চেয়ে বেশী কাজ করে। ভাল পশার গড়ে তুলতে হলে যে সব গুণের প্রয়োজন, বিদ্যা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তার মধ্যে একটা প্রধান দফা হল আকর্ষণীয় মুখশ্রী। কুরূপা নার্স যতই করুণাময়ী হোক, রোগীর মন জয় করতে পারে না। পারলেও, সময় লাগে। ফ্লোরেন্স্ নাইটেঙ্গল যখন গভীর রাত্রে ওয়ার্ড-পরিক্রমায় বেরোতেন, মোমবাতির মৃদু রশ্মিতে আলোকিত তার সেই আনত দেহ এবং শান্ত মধুর মুখের দিকে চেয়েই রোগীরা তাদের অর্ধেক যন্ত্রণা ভুলে যেত। তাদের অর্ধসুপ্ত চেতনার মধ্যে বিচরণ করত একটি নিঃশব্দচারিণী 'লেডি উইথ্ দি ল্যাম্প্', নারীদেহে মিনিস্টারিং এঞ্জেল।

দিলীপ যে প্রথম দৃষ্টিতেই বর্ষ্টালের উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিল, অনেকদিন মন বসাতে পারেনি, তার মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল তার অধ্যক্ষের আকৃতি, যার সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিল অতি সামান্য। এ অভিজ্ঞতা দিলীপের একার নয়, তার মত আরো অনেকের। শিশু ও কিশোরকে মানুষ করবার প্রাথমিক প্রয়োজন—যেখানে সে থাকবে, এবং বেড়ে উঠবে, সেই গৃহ ও পরিবেশের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ। মানুষ করবার গুরুদায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের সব আয়োজন ব্যর্থ হবে যদি প্রথম থেকেই ওর প্রিয় হতে না পারেন। কিন্তু প্রিয়দর্শন না হলে প্রিয় হওয়া বড় কঠিন, বিশেষ করে ছোটদের কাছে।

দিলীপের পাশে যে-ছেলেটি বসে ছিল, বছর ষোল সতর বয়স, দেখতে আরো ছোট দেখায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়ল। কাঁদো কাঁদো মুখ করে দাঁড়াল গিয়ে বড় সাহেবের টেবিলের উল্টো দিকে। তার বিরুদ্ধে গুরুতর রিপোর্ট। আগেরদিন দুপুর বেলা এক ডেক ভাত অতিরিক্ত গলে গিয়ে তলায় লেগে গিয়েছিল, পোড়া গন্ধে অনেকে পেট ভরে খায়নি, তারা নালিশ করেছে ডেপুটি সুপারের কাছে। এজন্যে দায়ী ঐ ছেলেটি। ওদিন 'গ্রীণ-হাউস'-এর রান্নার পালা। ঐ তাদের সর্দার অর্থাৎ 'ষ্টার বয়'। কিছুদিন হল, কাজকর্মে এবং স্বভাব-চরিত্রে খুশী হয়ে সাহেব ওকে 'ষ্টার' বানিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ ছেলে-দের চাইতে ওর পদ বেড়ে গেছে, এবং তার সঙ্গে কতগুলো সুবিধা সুযোগ। একটি সাধারণ ছেলের দৈনিক বরাদ্দ যেখানে আধ ছটাক মাছ বা মাংস, 'ষ্টার'-এর প্রাপ্য আড়াই ছটাক অথবা তার বদলে দুটো ডিম। তার উপরে মাসে একটাকা করে মাইনে। তা দিয়ে সে পুজো-পার্বণে মিঠাই মণ্ডা কিনতে পারে। সবচেয়ে বড় সুবিধা, অন্য ছেলে-দের মত তার ঘোরাফেরায় কোনো বাধা নেই। দরকার হলে বাইরেও সে যেতে পারে। এই বাড়তি পাওনার বদলে খানিকটা বাড়তি দায়িত্বও চেপেছে তার ঘাড়ে। গ্রীণ্-হাউসের সে ক্যাপ্টেন এবং সেখানকার ছেলেদের দলবদ্ধভাবে যখন যে কাজে লাগানো হয়, সেটা ঠিকমত হল কিনা, দেখবার ভার তার। কোথাও কোনো ত্রুটি হলে শাস্তিটা তার প্রাপ্য। দু'সপ্তাহ করে এক একটা 'হাউস'-এর উপর রান্নাঘরের ডিউটি পড়ে। 'হাউস' বিভাগ হয় বয়স হিসাবে। বর্ষ্টাল স্কুলে সবচেয়ে যারা ছোট তারা পড়েছে গ্রীণ-হাউসে। এই কাঁচ এবং কাঁচাদের উপর

যখন রান্না-বান্না পরিবেশন ইত্যাদি কাজ চাপে, স্কুল কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। অনেকখানি অতিরিক্ত ঝক্কিও পোহাতে হয় সেই সঙ্গে। কিন্তু এর থেকে এদের অব্যাহতি দেবার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। আইনের অনুশাসন। তার ভিতরকার কথাটা বোধহয় এই—বাঁশকে ইচ্ছামত আকার দিতে হলে কাঁচা থেকেই ধরতে হয়। একবার ডাঁটো হয়ে গেলে আর সহজে নোয়ানো যায় না।

ছোটদের দিয়ে শক্ত কাজ করাতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবেই। তার জন্যে সুপারসাহেব তৈরী ছিলেন। ছেলেটিকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভাত নামাতে দেরি করেছিলে কেন? 'বাঘবন্দী' খেলা হচ্ছিল, না?

—না, স্যার। জিজ্ঞেস করুন সিপাই-বাবুকে।

সিপাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কৈফিয়তের সুরে বলে উঠল, ছোট ছাট ছেলে—

—'চোপ রাও', গর্জে উঠলেন সুপার, 'হাঁড়ির দুধারে বাঁশ বাঁধা রয়েছে কী করতে। চারজনে না পারে ছজন কেন লাগাওনি?'

'সিপাইবাবুর' অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আর মুখ খুলতে সাহস করল না। সুপার নিজের মনে গজ-গজ করতে লাগলেন, 'রোজ ঐ এক কথা! ছোট ছেলে, ছোট ছেলে। আমি যেন সখ করে ধরে এনেছি এগুলো, সব আমার খাস তালুকের প্রজা!'

দোয়াত-দানি থেকে একটা মোটা কলম তুলে নিয়ে, সামনে যে ছোট্ট বাঁধানো খাতাটা ছিল—ঐ ছেলেটির টিকেট—তার উপর সজোরে চালাতে চালাতে বললেন, ডিগ্রেডেড্ ফর ওয়ান মানথ্। চীফ্ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল পাশের দিকে। আসামীর দিকে চেয়ে ঘোষণার সুরে বলল, 'এক মাসের জন্যে ডিগ্রেড্। সেলাম কর।'... বলে এগিয়ে এসে, ওর কাঁধে যে স্টার-মার্কা পেতলের ব্যাজ লাগানো ছিল, খুলে নিয়ে মিলিটারী কায়দায় সেলুট্ করে ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সিপাইটিও তার অনুসরণ করল। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে চীফ্ অফিসার ধমকে উঠল সিপাইকে, তোমাকে ফোঁপর দালালি করতে কে বলেছিল? খালি খালি সাজা বাড়িয়ে দিলে ছেলেটার।

সিপাই মাথা নীচু করে রইল। অনুযোগটা অস্বীকার করতে পারল না। তারা জানে না, এই ছোট ছেলেগুলোর সম্পর্কে কোথায় কারো উপরে যেন একটা গোপন অভিমান আছে সুপার-সাহেবের। এদের ভালো-মন্দের ভার তাঁর হাতে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যে কত

সুনীল গুহ

'চোপ রাও'

অক্ষম ও অসহায় এই সব ক্ষেত্রে সেইটাই যেন ধরা পড়ে যায়, তাঁর অধস্তন কর্মীরাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেই ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে ছেলেগুলোর ওপর। অজ্ঞাতসারে অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে ওঠেন। ঐ দুর্বল স্থানে আঘাত না দিলে ছেলেটাকে হয়তো শুধু সাবধান করেই ছেড়ে দিতেন।

ছেলেটি তখন গেটের এককোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চীফ্ অফিসার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, কাঁদছিস কেন? মোটে তো একটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।...... আচ্ছা, তোর খাবারটাবারগুলো যাতে ঠিক থাকে, সেটা আমি দেখবো।

শেষদিকের আশ্বাসটুকু গোপনে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে জানিয়ে দিল চীফ্ অফিসার। ছেলেটি এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। ঐ তুচ্ছ দুটো ডিম আর দুটুকরো মাংসের সে পরোয়া করে না। তার ক্ষোভ এবং বেদনা অন্যখানে, অনেক গভীরে। প্রৌঢ় চীফ্ অফিসার তা বুঝবে কেমন করে। এই বয়স যে সে অনেক দূরে ফেলে এসেছে। কৈশোর সব আঘাত সইতে পারে, পারে না শুধু একটি—তার মান ও মর্যাদার উপরে যে আঘাত। এ দুটি সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। যাদের উপর সে এতদিন নেতৃত্ব করে

এসেছে আজ কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে তাদের কাছে! মুখ ফুটে তারা হয়তো কিছুই বলবে না, তবু তাদের চোখের দিকে তাকাবে কেমন করে? তা ছাড়াও আর একটা জিনিস ছিল। কিশোর মনের অত্যুগ্র অভিমান। চীফ্ অফিসার যখন শাস্তিটা ঘোষণা করল, তখনো তার তীব্রতা ঠিক বুঝতে পারেনি ছেলেটি। কিন্তু তারপরেই যখন দুটো উদ্ধত হাত এগিয়ে এল বুকের উপর থেকে ব্যাজটা কেড়ে নেবার জন্যে, তার মাথার ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হল, এই পেতলের চাকতিটা সে নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরক্ষণেই বুক ভরে গেল দুর্জয় অভিমানে। সুপারের আনত মুখের পানে চেয়ে তার ক্ষুব্ধ মন অনুচ্চারিত কণ্ঠে বারংবার বলতে লাগল, একদিন যে গৌরব তুমি নিজেই দিয়েছিলে, আজ নিজে হাতেই তা ছিনিয়ে নিলে, সায়েব! বেশ!

কৃতিত্বের জন্যে প্রাপ্ত যে পদ বা সম্মান, অপরাধ করলে তার থেকে নেমে আসতে হবে, তার মধ্যে বেদনা যতই থাক, ক্ষোভের কারণ নেই। মানুষ ক্ষুব্ধ হয় তখন, যখন ক্ষমতার দম্ভ অনুষ্ঠানের ঘটা দিয়ে একে বিচারের ক্ষেত্র থেকে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। যে-পদ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে তুমি বিচ্যুত হলে—এই আদেশটাই কি যথেষ্ট নয়? বিগত পদোন্নতির সেই বিশেষ চিহ্নটিকে সকলের সামনে হরণ করে তাকে অপদস্থ করবার কী প্রয়োজন? সম্মান যে হারাল সে নিজেই তার চিহ্ন ধরে রাখতে লজ্জা বোধ করবে, ব্যস্ত হয়ে উঠবে সেটা নিজে হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে সুযোগ তাকে দেওয়া হল না। যদি হত, সে সম্মান হারাত এই পর্যন্ত, কিন্তু অসম্মানিত হত না। এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত, বিশেষ করে ছোটদের কাছে, যারা স্বভাবতঃ অবুঝ, ন্যায় বিচারের ন্যায্যতাকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শেখেনি।

আরো দুটি ছেলের নামে 'রিপোর্ট' ছিল। একজন কাজ করে বুক্ বাইন্ডিং সেকশনে। বাইন্ডিং-এর কাগজ চুরি করে ঘুড়ি বানিয়েছে। 'একজিবিট্' হিসাবে ঘুড়িটাও হাজির করা হল। সাহেব হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, কাগজ, সুতো আর লেই, এই তিনটে না হয় ওখান থেকেই পেয়েছে, কিন্তু বাঁশের শলাগুলো এলো কোত্থেকে?

উত্তরের আশায় ডেপুটি সুপারের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি তাকালেন চীফ্ অফিসারের দিকে। চীফ্ অফিসার আসামীকেই প্রশ্ন করল, 'কাঠি কোথায় পেয়েছিস?' সে উত্তর না দিয়ে তার 'মাস্টার' অর্থাৎ বাইন্ডিং ইনস্ট্রাক্টরের মুখের পানে চেয়ে মুচকে হেসে ফেলল। সকলেই বুঝল এর মধ্যে কিঞ্চিৎ রহস্য আছে। সাহেব ধমকে উঠলেন, বল্, কোথায় পেয়েছিস।

—উনি দিয়েছেন স্যর, মাস্টারকে ইঙ্গিত করে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল আসামী।

ইন্‌স্ট্রাক্টর ভোলানাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লেন, আমি! আমি দিয়েছি তোকে!

সাহেব হাত তুলে থামবার নির্দেশ দিতেই, স্থান কাল ভুলে আরো জোরে চিৎকার করে উঠলেন, মিছে কথা বলছে স্যর। এক নম্বর বদমাস ছোকরা। এ-ই সেদিন গুড় চুরি করেছিল গুদাম থেকে।

—তা করতে পারে, সহজ শান্তভাবে বললেন সুপার, গুড় গুদামে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঁশের কাঠি তো বর্স্টাল স্কুলে গজায় না।

হঠাৎ সুর বদলে ধমক দিলেন ছেলেটাকে: 'কান ধর।' সে যেন এই জন্যই তৈরী হয়ে ছিল এমনিভাবে তৎক্ষণাৎ দুহাতে দুটো কান চেপে ধরল। সাহেব বললেন, 'পঁচিশ বার ওঠ বস।'

এবারেও কিছুমাত্র দ্বিধা, সংকোচ বা ইতস্ততঃ ভাব দেখা গেল না। কালবিলম্ব না করে ওঠ-বস শুরু করে দিল। চীফ্ অফিসার জোরে জোরে গুণে চলল, এক, দুই, তিন, চার..............।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ সুড়ঙ্গ কাটার গল্প ॥

রেললাইন বসাবার জন্যে পাহাড় ফুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে আমরা আর তেমন অবাক হই না। আসামের দিকে বা বোম্বাইয়ের দিকে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বড়ো বড়ো সুড়ঙ্গ দেখে অভ্যস্ত। এমন কি কলকাতা শহরের রাস্তার নিচেও ময়লা জল নিকাশের জন্যে জটিল একটি সুড়ঙ্গ-পথের অস্তিত্ব আছে তাও আমাদের জানা। অল্প কয়েক দিন আগে কলকাতায় 'কানাল' নামে একটি পোলিশ ছবি এসেছিল। এই ছবিতে একটি শহরের নিচেকার ময়লা জল নিকাশের জটিল সুড়ঙ্গ-পথ দেখানো হয়েছে। ছবিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ধরেই নিয়েছেন যে কলকাতা শহরের মাটির নিচেও অমনি একটি সুড়ঙ্গ-পথ আছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে নাকি সুড়ঙ্গ তৈরি হবে আর সেই সুড়ঙ্গ-পথে ট্রেন যাতায়াত করবে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। খজাপুর স্টেশনে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন এই স্টেশনে রেললাইন পারাপারের জন্যে ওভারব্রিজ নেই, আছে একটি টানেল। এই টানেল বা সুড়ঙ্গটি তৈরি করা হয়েছে রেললাইনের তলা দিয়ে। মাইথন ড্যামের গোটা পাওয়ার-হাউসটি একটি পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে বসানো। এমনি দৃষ্টান্ত আরো অজস্র আছে। আধুনিক কালে টানেল বা সুড়ঙ্গ আমাদের কাছে কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

কিন্তু এই সুড়ঙ্গ-তৈরিরও একটি ইতিহাস আছে, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আছে, বা এক কথায় একটি বিজ্ঞান আছে। বিজ্ঞানের অন্য যে-কোনো শাখার মতো এই শাখাটিও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এসেছে। একেবারে গোড়ার দিকে তাগিদটা ছিল নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার। মাথা গুঁজবার ঠাঁইকে বড়ো করবার জন্যেই সে-সময় প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে গুহা খুঁজতে হয়েছিল এবং সেই গুহাকে খুঁড়ে খুঁড়ে বড়ো করতে হয়েছিল। তাছাড়া অনেক সময়ে হাতিয়ারের পাথর খুঁজবার তাগিদেও মানুষ গুহা খুঁড়েছে। তবে একেবারে গোড়ার দিকে চুনাপাথর ছাড়া অন্য কোনো পাথর খোঁড়ার মতো হাতিয়ার মানুষের ছিল না। প্রাচীন মিশর সভ্যতার যুগে এসেই প্রথম দেখা যাচ্ছে, শক্ত পাথর কেটে-খুঁড়ে মাটির নিচের কবর ও মন্দির তৈরি হয়েছে। ভারতেও গুহা-মন্দিরের নিদর্শন বড়ো কম নয়।

তবে সুড়ঙ্গ-খোঁড়ার ব্যাপারে রোমানদের কৃতিত্বই বেশি। ৫২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম ক্লডিয়াসের রাজত্বের সময়ে তৈরি হয়েছিল সাড়ে-তিন মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গ-পথ, যার সাহায্যে একটি হ্রদের জলকে নিকেশ করা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গ-পথটি ছিল ছ' ফুট চওড়া ও দশ ফুট উঁচু আর ভূপৃষ্ঠ থেকে এই সুড়ঙ্গ-পথের গভীরতা কোথাও কোথাও ছিল চারশো ফুট। রোমানরা এমনি ধরনের সুড়ঙ্গ আরো অনেকগুলো তৈরি করেছিল।

আধুনিক কালে আবার সুড়ঙ্গ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পরে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রেলের লাইন পাততে গিয়ে মানুষকে আবার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজে হাত দিতে হল। তবে উনিশ শতকের মানুষকেও সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্যে সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতোই অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তখনো হাতিয়ারের সম্বল বলতে ছিল শাবল, গাঁইতি আর হস্তচালিত ড্রিল। আলো জ্বালাতে ছিল মোমবাতি। বিষাক্ত বাতাস বা এ ধরনের অন্যান্য বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষার সম্বল ছিল না-থাকার মতো। কাজেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে প্রচুর সংখ্যক মানুষকে অসহায় ভাবে রোগে ও দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছিল।

॥ আল্‌প্‌স পর্বতমালার সুড়ঙ্গ ॥

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে রেলপথের যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালাকে ফুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হয়েছিল। কাজটি শুরু হয় ১৮৫৭ সালে আর শেষ হয় ১৮৭১ সালে। ততোদিন পর্যন্ত প্যারিস থেকে রোমে যেতে হলে মাঝখানের ষোল মাইল পার্বত্য রাস্তা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে পার হতে হত।

১৮৫৭ সালে ফ্রান্স ও ইতালি দু-দিক থেকেই সুড়ঙ্গ কাটার কাজ শুরু হয়। কিন্তু দেখা গেল প্রাণপণ পরিশ্রম করেও সারা দিনে পাথর কাটার কাজ এগোয় মাত্র ন' ইঞ্চি। ইঞ্জিনিয়াররা হতাশ হয়ে পড়লেন। একদিকে ন' ইঞ্চি হলে দু' দিকে মোট আঠারো ইঞ্চি। এমনি শম্বুকগতিতে অগ্রসর হলে ষোল মাইল লম্বা সুড়ঙ্গটি কাটতে কয়েক জন্ম লেগে যাবার কথা! কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিল না। হস্তচালিত ড্রিলের সাহায্যে প্রায় পঁচিশ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গটি তেমনি আস্তে আস্তে কাটা হতে লাগল।

১৮৬১ সালে প্রবর্তন হল কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার ড্রিলের। সঙ্গে সঙ্গে চলল বারুদের ব্যবহার। এবারে দেখা গেল দিনে এক-একদিকে প্রায় চার ফুট করে সুড়ঙ্গ কাটা যাচ্ছে। এমনি ভাবে কাজটি শেষ হয়েছিল ১৮৭১ সালে। খরচ পড়েছিল দেড় কোটি ডলার। পঁচিশ ফুট ব্যাসের এই টানেলটি তৈরি করার সময়ে প্রথমে তিনটি ছোট ছোট টানেল পাশাপাশি কাটা হয়েছিল। তারপরে এই তিনটি টানেলের মাঝখানকার দেওয়ালকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এমনি ভাবে প্রায় প্রত্যেকটি পর্বে অসম্ভবকে সম্ভব করার পরে তৈরি হয়েছিল এই বিখ্যাত টানেলটি।

আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটি তৈরি হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে। এটি লম্বায় ৯·৩ মাইল। এই টানেলটি তৈরি করার সময়ে পূর্বেকার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল, ফলে তৈরি হয়েছিল উন্নততর যন্ত্রপাতি ও উদ্ভাবিত হয়েছিল উন্নততর প্রক্রিয়া। তাছাড়া বারুদের বদলে এবার ব্যবহার করা হয়েছিল ডিনামাইট। এই সমস্ত কারণে এই টানেলটি কাটার সময়ে এক-একদিকে প্রতিদিনে আঠারো ফুট করে

সুড়ঙ্গ কাটা গিয়েছিল। ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাজটি শেষ হয়।

পরের টানেলটি অস্ট্রিয়ায়। এবারের কাজের গতি আরো দ্রুত—এক-একদিকে দিনে ২৭·২ ফুট। অন্যান্য ব্যবস্থাও আরো অনেক নিখুঁত। টানেলটি লম্বায় ৬·২৫ মাইল; শুরু ১৮৮০ সালে, শেষ ১৮৮৪ সালে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য টানেলের নাম সিম্‌প্লোন। ১২·৩ মাইল লম্বা এই টানেলটি সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে ইতালিকে যুক্ত করেছে। কাজটি শুরু হয় ১৮৯৮ সালে; প্রথম পর্ব শেষ হয় ১৯০৫ সালে, দ্বিতীয় পর্ব ১৯২০ সালে। এই টানেলটির বিশেষত্ব এই যে, এক্ষেত্রে দুটি টানেল পাশাপাশি কাটা হয়েছে—প্রত্যেকটি টানেলে একজোড়া করে লাইন।

আর এই সমস্ত টানেল তৈরি করার সময়ে কত রকমের বিপদ-আপদ ও অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যে যেতে হয়েছে তা লিখে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে ও বিপদ হচ্ছে অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হওয়া। কারণ, প্রত্যেকটি টানেল কাটতে গিয়েই দেখা গিয়েছে যে ভূতাত্ত্বিকদের সমস্ত অনুমান মিথ্যে প্রমাণিত করে ভূস্তর-সংস্থান কল্পনাতীত রকমের প্রতিকূলে হয়ে ওঠে। আল্‌প্‌সে পর্বতমালার প্রত্যেকটি সুড়ঙ্গ এমনি সব প্রতিকূলতার সাক্ষ্য। এমনও হয়েছে যে, সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়ে উত্তরদিকে পাওয়া গিয়েছে শুধুই কঠিন পাথর, কিন্তু দক্ষিণদিকে অন্তঃস্রোতা জলের প্রবল প্লাবন। দৃশ্যটি কল্পনা করা যেতে পারে। প্রতি মিনিটে ৪০০০ গ্যালন জল তোড়ে বেরিয়ে আসছে আর তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে হস্তচালিত ড্রিলের সাহায্যে পাথর কেটে চলেছে একদল মানুষ। ড্রিলের ফলা পাথরের গা কেটে খানিকটা বসতে না বসতেই হয়তো বিপুলতর তোড়ে নতুন আরেকটা জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। আর শুধু তো অন্তঃস্রোতা জলই একমাত্র বিপদ নয়। কোথাও কোথাও উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে, মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব। তখন সেই উত্তাপকে শীতল করার ব্যবস্থা করতে হয়। আর অবস্থা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে ওঠে যখন এ-দুটি ব্যাপার ঘটে একসঙ্গে, অর্থাৎ যদি উত্তপ্ত জল তোড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সিম্‌প্লোন টানেলের একটি বড়ো অংশ কাটতে হয়েছিল প্রতি মিনিটে ৪৩৩০ গ্যালনের তোড়ে বেরিয়ে আসা ১১৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তপ্ত জল-কে যেন নিরন্তর লড়াই করে। অন্যদিকে এই একই টানেলে পাওয়া গিয়েছিল ঠাণ্ডা জলের স্রোত, যার বেগ ছিল প্রতি মিনিটে ১০,৫৬৪ গ্যালন আর তাপমাত্রা ৫৫·৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

এই সমস্ত কারণেই প্রত্যেকটি টানেলের নির্মাণকার্যের সঙ্গেই জড়িত আছে কিছু লোকের প্রাণদান। বড়ো বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটে গেছে একাধিক। এখনো ঘটে। পুরোপুরি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় বলেই শত সাবধানতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ও আপদ-বিপদকে এড়ানো যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। কয়েক মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরি করার চেয়ে মাইথনের মতো একটি বাঁধ তৈরি করা নিশ্চয়ই অনেক সরল কাজ। কিন্তু আমাদের দেশে এই বাঁধটি তৈরি করতে গিয়েও বেশ কিছু সংখ্যক লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। উনিশ শতকে নির্মাণকার্যের সাজ-সরঞ্জাম আরো অনেক অনুন্নত ছিল, যন্ত্রবিদ্যা ছিল আরো অপরিণত। কাজেই, সে-অবস্থায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যে আরো কত বেশি ছিল তা অনুমান-সাপেক্ষ।

আজকের দিনে টানেল তৈরি হবার কথা শুনলে আমরা আর অবাক হই না। ইউরোপের একাধিক শহরে মাটির তলা দিয়ে রেলগাড়ি চলাচলের জন্যে সুবিস্তৃত সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি করা হয়েছে। এমন কি আমাদের এই কলকাতাতেও তা হবার কথা হচ্ছে। তারপরে হয়তো টেম্‌স্‌ নদীর তলা দিয়ে যেমন সুড়ঙ্গ-পথ আছে, তেমনি আমাদের এই কলকাতার গঙ্গার তলা দিয়েও সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি হবে। কিন্তু কোনো টানেলের গায়েই লেখা নেই বা থাকবে না যে কী অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের ইতিহাস পার হয়ে তবে আজকের টানেল-বিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ॥

কটকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৯তম অধিবেশন শেষ হল। আগামী অধিবেশনটি হবে ৫০তম, অর্থাৎ সুবর্ণ-জয়ন্তী। অধ্যাপক কোঠারীর সভাপতিত্বে আগামী বছর দিল্লীতে এই সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে।

বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ইতিহাসে এমন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে যখন অভাব, অজ্ঞতা ও রোগকে সারা পৃথিবী থেকে নির্মূল করে ফেলা চলে। এমন সুযোগ আগে আর কখনো আসেনি। প্রস্তাবে বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যে, তাঁরা যেন এই মহৎ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হন। প্রস্তাবে এই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ-প্রস্তুতি সমানে চালানো হচ্ছে এবং এমনভাবে চালানো হচ্ছে যে সর্বাত্মক ধ্বংসসাধনে সক্ষম অস্ত্রাদি এবং বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা। প্রস্তাবে বিজ্ঞানীদের সক্রিয় হতে বলা হয়েছে এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছে—বিজ্ঞান যে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করেছে তা মানুষের আত্মবিলোপের জন্যে ব্যবহৃত না হয়ে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্যেই যেন একান্ত-ভাবে প্রযুক্ত হয়।

এই প্রস্তাবকে আমরাও নিশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে সমর্থন করব। বিজ্ঞানের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা সক্রিয় হয়ে উঠুন, আমরাও তাই চাই। তাঁদের কাছ থেকে আমরা যেমন জ্ঞানলাভ করতে চাই, তেমনি পেতে চাই পথের নির্দেশ। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যদি এই প্রস্তাবটি শুধুই একটি প্রস্তাবে পর্যবসিত না হয়।
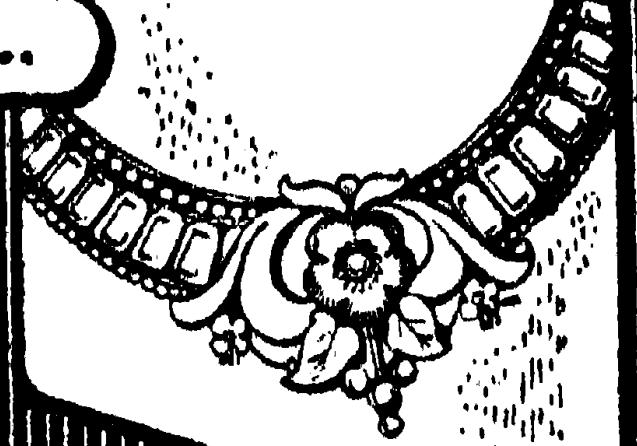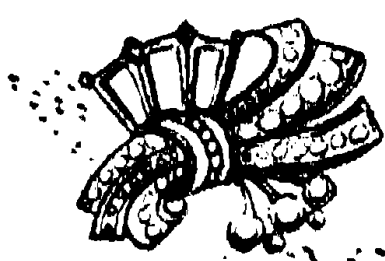
জয়দেবের মেলা

বারীন মৈত্র

দু'ধারে দুই মহাতীর্থ..

মধ্যে তার মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান। খানিকটা পিচ-ঢালা লম্বা এক-টানা রাস্তা। এক তীর্থ একালের আলপনায় নানা রঙে আঁকা: আর এক তীর্থ রাঙা মাটির ধুলোয় ধূসর;—দীনহীন-অখ্যাত-অবজ্ঞাত। শতছিন্ন একখানা নক্সী কাঁথায় আপাদমস্তক জড়িয়ে সে সুদূর অতীতের দিকে ধূসর দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

নিরবধি কাল—বিপুলা এ পৃথিবী। শতাব্দীর স্রোতের অব্যাহত গতি ম্লান পাণ্ডুর করে দিয়ে গেছে সুদীর্ঘ অতীতের সেই পাণ্ডুলিপি লেখা।...

চলেছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে কবি জয়দেবের স্মারক মেলা জয়দেব-কেঁদুলিতে। কারুকার্য করা বর্তমান থেকে যেন অতীতের অন্ধকারে। পৌষ মেলা সেরেছি শান্তিনিকেতনে; এবার মকর সংক্রান্তির স্নানে চলেছি জয়দেবের কদম্বখণ্ডির ঘাটে। এ দু'য়ের মাঝে কয়েকটা শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসের কত না লক্ষ চড়াই-উৎরাই! কিন্তু জয়-দেবকে ধন্যবাদ। বোলপুরের অতি বিনীত, অবনত বাসখানি বেশ সমতল পথ বেয়ে এসে দাঁড়াল জয়দেবের দ্বারে; এমন কি শান্তিনিকেতনের রিক্সাওয়ালা বেশ সদম্ভে যখন পৌষালীর ঘরের জানলা ধাক্কা দিয়ে শেষ রাতে তুলে দিল আমাদের, তখন সত্যিই ভাবিনি বোলপুর স্টেশনে জয়দেবগামী বাসে চাপিয়ে দিব্য আরামের নিঃশ্বাস ছাড়বে ও। চলন্ত রিক্সার বিরুদ্ধে ভুবন-ডাঙ্গার মাঠের শেষ রাতের ভুতুড়ে হাওয়ার সমস্ত প্রতিবাদ নিষ্ফল করে দেবে সে!—

যাক্ সে-কথা...

কিন্তু ফলাও করে বলা যায়, পৌষ-মেলায় শান্তিনিকেতন গিছলুম। সেখানে নিশ্চিন্ত শয্যাতল থেকে সদর্পে বেরিয়ে এসে দামী ওভারকোটের তলায় বহুমূল্য শীতবস্ত্রের অন্তরালে সঞ্চিত বক্ষবাসে পুষ্ট সংস্কৃতি বেশ সজীবতা লাভও করে; কিন্তু জয়দেবে? ও-আখড়ার প্রবেশপত্রই ধুলোয় তৈরী; (উপনিষদ যে বলেছেন, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—জয়দেবে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এ-কথা ঘোষণা করতে হয়।) অতএব এই প্যালিওলিথিক ধূলিসাগরে নিমজ্জিত হয়ে কেবলমাত্র অন্নসত্রের ওপর নির্ভর করে ওঁদের মাঠের ওপর উন্মুক্ত আকাশের তলে উন্মত্ত বাউলের আখড়ায় নিশিজাগরণের ইতিহাস বোধ হয় অতটা ফলাও করে বলা যাবে না।...

ইলামবাজার পেরিয়ে বাস তখন পিচের রাস্তা ফেলে সশব্দে সবেগে ধূলি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে অকস্মাৎ বাঁদিকে বাঁক নিয়ে। তারপর সেই তরঙ্গায়িত মাঠের রাস্তা ধরে চলতে চলতে তীর্থযাত্রীদের ধূলিসহযোগে প্রাতঃরাশ করিয়ে বেশ খানিক গিয়ে এক ধানকাটা মাঠের ওপর নোঙর করল বাস। আকাশের গায়ে, খাঁ-খাঁ-করা মাঠের প্রান্তে তখন এক একঘরে তালগাছের মাথায় রোদের ছিটে লেগেছে। রাখাল তখন গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে! দ্বিতীয় চরণ (কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে) কেউ কেউ ঘটি-হাতে চলিয়াছে ঘাটে।... দু'-একবার বাসের পাদানীতে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর তখন প্রমাদ গণছেন। সহযাত্রী বাঁড়ুয্যেমশাই সুর করে ধরলেন, জলে নামিব, সাঁতার কাটিব—তবু আমি বেণী ভেজাবো না! এবার দেখান সে কসরৎ-খানা। বন্ধুবর নাইলনের বিচিত্রিত মোজা সমেত এ্যাম্বাসাডর নিয়ে নেমে এলেন! সে-সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ধুলোর মধ্যে।...বাঁড়ুয্যেমশাই সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন।

* * *

নেহাত-ই ছোট্ট তরী জয়দেব-কেঁদুলি; সেখানে কোথাও একবিন্দু স্থান নেই। লক্ষ দুর্যোগ উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক এসে জমে বসেছে মেলায়; সামনের মাঠখানা জুড়ে গরুর গাড়ীই জমেছে কয়েক শ'। সেখানে দূর পথের যাত্রী নিয়মিত সংসার রচনা করে ফেলেছে ছই-এর মধ্যে! কোথাও তিল-ধারণের স্থান নেই!

জয়দেবকে এরা সকলে মনে রেখেছে। গ্রামে গাঁথা বাংলার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের কাছে দ্বাদশ শতকের কবি আজও বেঁচে আছেন। বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করে, মাইক মারফত পাব্লিসিটি অন্তে কোন সাংস্কৃতিক বৈঠকের দ্বারোদ্ঘাটন দিবস হয়নি! অথচ সহজ, শান্ত নিরালা এক কোণে অচেনা এক প্রান্তরের ধূলি-শয্যায় এরা চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছে। এসেছে এই সীমন্তে মেটে-সিঁদুর-পরা ঘরণীর দল—কাঁধে ঝোলাঝুলি আনন্দ-লহরী-হাতে। অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাস বাবাজীরা। কে জানে কে খবর দিয়েছে এদের। দূর দূর গ্রাম থেকে এত মানুষ এসে ঠেকেছে জয়দেবের ঘাটে। অজয়ের শুকনো বুকের বেলাভূমি ধরে আসছে

সার সার নিঃস্ব রিক্ত সাধারণ মানুষের দল। কেউ কি বলেছে এদের—

একদিন যদি খেলা থেমে যায়
মধুরাতে
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে
শারদপ্রাতে
তবু মনে রেখো—।

কেউ বলেনি। তবু মনে আছে। গোটা দেশের হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন কবি জয়দেব। তাদের ধমনীতে তরঙ্গিত হচ্ছে যে ধর্মকেন্দ্রিক জীবনের সুর—এ স্মৃতি জেগে উঠেছে সেখান থেকে। তাদের কাছে পুরাণের পাতায় কবি জয়দেব কেবল মধুর কোমল-কান্ত পদাবলীর স্রষ্টা নন—তাদের আরাধ্য রাধামাধবের সঙ্গে তিনি যে একাত্ম! এই পৌষলক্ষ্মী অঙ্গনে এলেই নবান্নের গন্ধে তাদের মনে পড়ে যায়—এই শুভদিনের কথা। অজয়ের ঘাটে মকর সংক্রান্তির স্নানের কথা। আর ওরা ঘরে থাকতে চায় না; ঘরে থাকতে পারও না।

বীরভূমের এক অতি নগণ্য পল্লী এই জয়দেব-কেঁদুলী; হৃতশ্রী, হৃতগৌরব; হৃতশ্রী হৃতবৈভব। কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস। তবু এই পৌষ মাসের লক্ষ্মীঠাকরুণ আপন পদ্মহস্তে সাজিয়ে দেন বন-বনান্ত—উদার মাঠঘাট আর গ্রামবধূর আঙিনা। আজ জয়দেবের হাটে-মাঠে ঘুরে চোখ দুটো মেললেই তথ্যের সন্ধান করছে। আধুনিক কলকাতার উন্নাসিক পথিক আমরা। চোখের সামনে মেলা রয়েছে হৃতশ্রী গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ। অজয়ের বিরাট বুকে জুড়ে শীতশুষ্ক নদীপথে উষর ধূসর বালির শয্যা পাতা। ঘাটে এসে এক ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি শত শত যাত্রী সেই জলই অঞ্জলি ভরে মাথায় দিয়ে অবগাহন স্নানের তৃপ্তি পাচ্ছে। সূর্যপূজো করছে কেউ। ভোরের শীতে কাঁপতে কাঁপতে বৈষ্ণবী ভিজে চুল পিঠে মেলে নাকে রসকলি আঁকছে আর হাসতে হাসতে গান ধরছে—

চন্দনচর্চিত নীল-কলেবর পীত-বসন
বনমালী।
কেলি চলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড-
যুগস্মিত শালী।।

আর কোনদিকে কিছু নেই, যা দ্বাদশ শতকের কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। আছে অজয়ের তীরে সিংহাসন মন্দির। কুশেশ্বর শিবলিঙ্গ আর অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত যন্ত্রসহ সমস্ত মন্দির। আছে, জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধবের বিগ্রহ। এই মূর্তি কবি অজয়ের ঘাটে পেয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; অবশ্য তাঁর সমকালীন মন্দিরটি আর নেই। সে মূর্তিও জয়দেব বৃন্দাবন যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। তারপর শূন্য মন্দিরে শ্যামরূপার গড়ের রাধাবিনোদকে বর্ধমানের মহারাজা এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ যে মন্দিরটি তার সামান্যতম টেরাকোটা-শিল্প নিয়ে যাত্রীকে তৃপ্তি দেয়—কিন্তু সে মন্দিরও নির্মাণ করেছেন বর্ধমান মহারাণী নৈরানী দেবী ১৬১৪ শকাব্দে।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌতূহল পরিতৃপ্তির কোন উপাদানই সারা জয়দেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিকে তার জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না—মহাকবির এই উপদেশবাণী সমর্থন করে গীতগোবিন্দের মধ্যেই কবিকে খুঁজে পেতে হবে। আপাততঃ আমার গবেষণা তা' নিয়ে নয়।

অথচ, সংক্রান্তিকেন্দ্রিক কেঁদুলীর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রী জড়ো হয়েছে। জড়ো হয়েছে শীতের বন্ধু 'গরম চা' মার্কা চায়ের দোকান, প্লাস্টিকের খেলনা পুতুল থেকে এক পয়সার তালপাতার এক বাঁশী পর্যন্ত। জুটেছে, সিউড়ি বাজারের অন্নদানী বামুনের খাবারের দোকান থেকে—বোম্বাই চলচ্চিত্রের সুগম সংগীত-লহরী পর্যন্ত। ওপরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুচোর কেত্তন আমাদের মত বাবু থেকে—চুড়ো-বাঁধা চুল বাবাবর বাউল দীন দরবেশের দল! সকলেই এরা হঠাৎ-ই এসেছে আজকের দিনে। তারপর শীতান্তে সাইবেরিয়ার বালিহাঁসের দলের মত সরে পড়বে যে যার ঘরে; হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। পড়ে থাকবে কোটি কোটি শালপাতা, শ'কয়েক উনুন ধুলো-মাখা, কালি-মাখা ভাঙ্গা হাঁড়ি সেই জনহীন ধূলিসাগরের মধ্যে। তুলোট কম্বলের ব্যাপারী ফিরে যাবে ভিন্ন মেলার সন্ধানে। জয়দেব গোস্বামীর পদরজধন্য কেঁদুলীর মাটি নির্নিমেষ

বাউলের গান

চেয়ে থাকবে নির্বাক আকাশের দিকে—আবার সারাটা বছর।

জয়দেব-কেঁদুলী যদিও বৈষ্ণবদের তীর্থ, তবুও অ-বৈষ্ণবদের ভিড়ও কম নয়। জাত-ধর্ম সব খুইয়ে এখানে এসে সসম্মানে সবাই ঠাঁই পায়। এক পংক্তিতে বসে একই অন্নসত্রে সবাই খেয়ে-দেয়ে যায়; প্রাচীনতার প্রতীক মহাবৃদ্ধ বট-বৃক্ষ ঘিরে হোগলা-চটের সাময়িক হেসেলে সার সার উনুনে পর পর হাঁড়ির পর হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না চলে বিরাম বিশ্রামহীন। কাঠের ইন্ধনের যেমন অভাব নেই—তেমনি অভাব নেই অন্নের! যাত্রী সমাগমের যেমন বিরাম নেই, বিরাম নেই আহারের বিরাম নেই অন্ন প্রস্তুতের এ'কদিন।

রাধামাধবের মন্দির

সেদিন সারাদিন কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত দুজনে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার ঝোঁকে বসে পড়েছিলাম এক বৈষ্ণবীর আস্তানার পাশে! শীতের দেশ। রুক্ষ কঠিন সে শীত। সারা রাতের মত আশ্রয়ের খোঁজে সকলে তখন দিশেহারা। শতরঞ্চীটা কোনরকমে বিছোতেই তার-স্বরে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বৈষ্ণবী! অন্ধকার, কেরোসিনের কুপির আবছা আলো। ভয় পেলাম; হয়ত অন্ধকারে হাত-পা মাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র দেরী হল না। ঘোরদ্যমানা বৈষ্ণবী ঘোষণা করল; ওখানে তার পানের সরঞ্জাম ছিল—আমরা কি আর কোথাও জায়গা পেলাম না। হায় জয়দেব গোঁসাই! সারা পৃথিবী যখন স্থান নাই স্থান নাই করে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে অক্লান্ত স্বার্থপরের মতন হাহাকার করে ফিরছে—তখন কোন এক নবদ্বীপের মাঝবয়সী বৈষ্ণবী গোপালের মা পানটুকটুকে ঠোঁট নেড়ে ওই একই কথা বলে চলেছে!—তা' যাননা বাবুরা—মনোহর বাবার ওখানে!

অতঃপর স্থান হল; গোপালের মার চোখে হাসি ফুটল। বিচিত্র পানের আসবাব-পত্র—একখানা শতছিন্ন গামছার কোণায় কোণায় বাঁধা পুঁটুলির অন্তর থেকে পান সুপুরি খয়ের সহযোগে সে আমাদের আতিথ্য দান করেছিল।...

তারপর গান।...আসরে ঠাকুরদাস-বাবাজী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দাঁড়াল; ঘনিষ্ঠ সহজ সুরে ধরল

—(তুমি) একাদশী করলে যদি
ডুব দিয়ে জল খেয়ো না।
(ওমন) ভাবের ঘরে চুরি করো না।।

কথাগুলো যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে বুকের মধ্যে পুরে দিল বুড়ো ঠাকুরদাস। কি জানি, হয়ত আমাদের পেয়েই সোজা কথাটার অঙ্কুশ এমন নির্দয়ভাবে বিঁধিয়ে দিল ও।...

দীর্ঘ রাত বাউলের গানের সুরে কখন শেষ হয়ে এল। শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না—বিশুর ঠেলা খেয়ে যখন জেগে উঠলাম—তখন বীরভূমের এ প্রান্তে ভোর হয়ে গেছে... বাউল তখনও গাইছে! চেয়ে দেখি গোপালের মার গায়ে মাথা পেতে রাত কখন কেটে গেছে। বৈষ্ণবী কোমল কণ্ঠে বলল, বাবুদের কি এখেনে ঘুম হয়। উঠুন। ধড়মড় করে উঠে বসলাম!

বেশবাস ঠিক করে একতারাটা ছেলের হাত থেকে নিয়ে গোপালের মা এবার গান জুড়ল। আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে ধরল,

(ও মন) ঘুমিয়ে রইলি ঘণ্টা হল
টিকিট কৈ নিলি।
(যখন) পড়বে পাখা হবি ভাকা
মনরে বোকা তোরে বলি।।

আমায় নয়। গোপালের মা সমস্ত মানুষের কথা বলছে দেহতত্ত্বের গানে। বলছে,

গাড়ীর গার্ড ওই গোলকপতি
নামটি দয়াময়!
চরণ ইঞ্জিন চালিয়ে বাঁচান
জীবকে সমুদয়।।

এরপর আর কথা চলে না! আস্তে আস্তে উঠতে হল। এবার ফিরে যেতে হবে; বোলপুরে দুপুরের গাড়ী ধরে কলকাতা। উঠতে গিয়ে দেখি শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথা ধরেছে; অজয়ের ঘাটে এসে দাঁড়ালাম রোদে পিঠ দিয়ে; শরীর যেন আর চলছে না।

ঘরে ফেরার পথে ভাবছি, বিশ্বনাথ বাউল সেই যে বলে গেল,

হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না!

ওই যে, নড়ে চড়ে হাতের কাছে, গুজলে জনম-ভর মেলে না—সেই মনটিকে পেতে হলে এবার ঘরের নিশ্চিন্ত অবসর একান্তই প্রয়োজন।

অতএব আর দেরী নয়!...

দিগন্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই পরিবেশ সুশোভনের।

এই তাঁর বাড়ী, এরাই তাঁর একান্ত আপনার লোক। এরা, যারা অবস্থাপন্ন সুশোভনকে 'পরমাত্মীয়' বলে কাছে কোনদিন টানেনি কিন্তু সুশোভন হাত-ছাড়া হয়ে গেলেন ভেবে হাত পা কামড়াচ্ছে।

মায়ালতা বোকা, মায়ালতার ছেলেরা বোকা, কিন্তু সুবিমলই কি ভাবছেন না, গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁর একবার দিল্লী যাওয়া উচিত ছিল। অনুতাপের জ্বালায় নয়, মনের জ্বালায়। 'বাবার শরীর ভাল নয়' নীতার এই পত্র বারবার পেয়েও অত নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা ঠিক হয়নি। যাওয়া আসা করলে সুশোভনের মেয়ে তাঁদের থেকে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারত না।

আর সুবিমলদেরও এভাবে পাঁচ-জনের প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হত না। এই সেদিন পিসতুতো ভাইয়েরা বাড়ী বয়ে এসে কত কথা জিগ্যেস করে গেল। ছোটপিসি ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন সুবিমল যাননি তাই। গেলে হয়তো এই প্রশ্নই করতেন, 'সুচিন্তা কেন?' সুচিন্তা কি জন্যে?'

এসবের কিছুই হয়তো হতে পারত না, যদি সুবিমল আগে বুঝতেন। কিন্তু যে কোন জিনিসই যতক্ষণ আয়ত্তে থাকে, কে তার মূল্য বোঝে? অনায়ত্ত হয়ে গেলে, হাতছাড়া হয়ে গেলে, তখন 'মনে হয় 'ইস, আগে কেন!' মানুষ সম্পর্কেও ওই একই কথা।

সুমোহন সবকিছুই ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখার ভঙ্গী করে, তবু মনে মনে সেও ভাবছে জীবনের গোড়ার দিকে নেহাৎ বোকামী হয়ে গেছে। দেশ-ভাগের পর বড়দার সংসারেই মাথা গুঁজে না থেকে বিপত্নীক মেজদার আশ্রয়ে চলে গেলেই হত! নীতা মেয়েটা তখন ছোট ছিল, অশোকার মত কর্মিষ্ঠা খুড়ি পেলে বর্তে যেত।

কিন্তু অশোকাই যে যত নষ্টের মূল।

স্বামীর সঙ্গে কখনও কোনও পরা-মর্শ নেই। অথচ যেন দিব্যি বাধ্য। এর চাইতে সে যদি রাতদিন ঝগড়া করত, সেও ভাল ছিল।

আচ্ছা সুচিন্তা কিভাবে স্বামীর ঘর করেছে চিরকাল। দেখাই তো যাচ্ছে মন-প্রাণ বাঁধা দেওয়া ছিল অন্যখানে।

হঠাৎ মনের গতি অন্যখাতে বইতে থাকে—সুমোহনের। ভাবতে শুরু করে কে জানে অশোকার মধ্যেও কোন গোপন ইতিহাস আছে কি না! ছেলেপুলের মা? তা'তে কি! মেয়েদের মনকে বিশ্বাস নেই। সুচিন্তা যা দৃষ্টান্ত দেখাল।

আশ্চর্য! বয়েস হয়ে গেলেও প্রেম ভালবাসা এসব জীইয়ে থাকে মনের মধ্যে? প্রত্যক্ষই তো দেখা যাচ্ছে থাকে। মেজদাকেই তাদের ভাইবোনের মধ্যে সব থেকে বোকা বলে জানতো সুমোহন, কিন্তু এখন তার মেজদার ওপর রীতি-মত একটা ঈর্ষা আসে। পাগল হয়ে গেছে মানুষটা তবুও আসে। বোকারাই প্রেমিক হয় একথা ভেবে যতই মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, সান্ত্বনা পায় না।

জীবনে ব্যর্থরা বোধ করি এমনিই হয়।

জগতকে ব্যঙ্গ করে মনের ঝাল মেটাতে চায়, 'আমি ওদের মত নির্বোধ নই' ভেবে আত্মপ্রসাদের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে, কিন্তু ঈর্ষার হাত এড়াতে পারে না।

তবু সবই চলছিল একরকম, নীতা যেন সহসা একখানা থান ইঁট বসিয়েছে এই নিস্তরঙ্গ সংসারের মাথায়।

তা' ইঁট পড়েছে অনেকেরই মাথায়।

নীতার যাওয়ার কারণটা গৌণ হয়ে গেছে, যাওয়াটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। মানসিকতায় মায়ালতার সঙ্গে খুব বেশী আর তফাৎ কোথায় অতি আধুনিকা কৃষ্ণা শিপ্রা মাধুরীর। যারা এ পাড়ার মেয়েরা।

নীতা যদি বিবাহিতা হত, আর তার স্বামীর সম্পর্কে এ রকম দুর্ঘটনার খবর আসত, তা' হলে এরা অবশ্যই সহানুভূতির চোখে দেখত ব্যাপারটাকে। কিন্তু ভাবীস্বামী? আশ্চর্য! 'যাই বল বাবা, বেশ মজা করে চলল।'

ইন্দ্রনীল কৃষ্ণার এই মন্তব্যে ভুরু কুঁচকে বলে, 'মজা করে?'

'না তো কি!'

'ভালবাসার পাত্র সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী তো বেশ মোহমুক্ত।'

'মোহমুক্ত কেন হবে। দেশটা কী তা তো দেখতে হবে? যেখানে হাত পা উড়ে গেলে বেমালুম কাঠের হাত পা জুড়ে হাঁটায় চলায়, লাংস উপে গেলে প্লাস্টিকের লাংস বসিয়ে দিব্যি বাঁচিয়ে তোলে, মাথার খুলি উড়ে গেলে অন্যের খুলি খুলে এনে খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে আস্ত করে দেয়, সেখানে আবার ভাবনা!'

'তা বটে!'

'চল না দেখা করে আসি।'

'কি দরকার! সে এখন ভীষণ ব্যস্ত।'

'বাবার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করছে নীতাদি?'

'কী আর।'

'কোন নার্স টার্স—'

'নাঃ!'

'তোমার মাকেই সমস্ত করতে হবে?'

'তা' ছাড়া আর কি! তবে—' ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে বলে, 'তবে যদি স্বেচ্ছায় কেউ—মানে আর কি, এই ছুতো করে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ঘটনাটাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হও!'

'চমৎকার!'

'খারাপটা কি?'

'দু দুটো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে নাকি?'

'যতদূর দেখছি তাই করতে হবে। বেশীদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারা যাবে বলে মনে হয় না।'

'এত অধৈর্য!'

ধৈর্যটা অপ্রয়োজনীয় বলেই অধৈর্য। ভিতরে ক্ষুধা প্রবল, সামনে সুখাদ্য মজুদ, ধৈর্য ধরাটা অর্থহীন ছাড়া আর কি?'

'তুলনাটা কিন্তু অত্যন্ত আপত্তিকর। ক্ষুধা, খাদ্য, ছিঃ!'

'ছি টি বুঝি না, যা সত্য, তা সত্য!'

'ভাবছি তোমার কত পরিবর্তন! কি ছিলে আগে।'

'রিয়্যাকশান! প্রতিক্রিয়া। এখন বুঝতে পারি আমার বাবার প্রকৃতি আমার মধ্যে কাজ করছে। বাবা ছিলেন ভোগবাদী।'

'তোমার মাকে কিন্তু আমার একটু ভয় ভয় করে, কেমন করে যেন তাকান!'

'তোমার মাকেও আমার কম ভয় করে না, তিনি যা করে তাকান! মনে হয় পারলে ভস্ম করতেন।'

কৃষ্ণা হেসে উঠে বলে, 'তবু আমরা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাতে ছাড়ি না। আশ্চর্য!'

'পরমাশ্চর্য!'

ওরা অনেকেই দমদমে গেল, নীতাকে তুলে দিতে। নিরুপম, ইন্দ্রনীল, কৃষ্ণা, এবাড়ী ওবাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা। একটা উপলক্ষে হৈ হৈ করে ... আর কি। বিশেষ একটি বয়সের মেয়ে-ছেলেরা একত্রিত হবার সুযোগটা কখনও ত্যাগ করে না। দলবেঁধে সিনেমা দেখতে, আর দলবেঁধে গুরুদর্শনে যেতে ওদের সমানই আগ্রহ। খুশীর মাত্রাটাতেও তারতম্য নেই।

ইন্দ্রনীল নীতার একটা হাতের ওপর হাতের চাপ দিয়ে বলে, 'কবে আসছ বল! তুমি না এলে বিয়ে টিয়ে হবে না।'

'আসাটা তো আমার ইচ্ছাধীন নয়।'

'গিয়ে থাকবে কোথায়?'

'সে ব্যবস্থা শিশির রায় করে রাখবে। কিন্তু আমার ফেরার অপেক্ষায় তুমি বসে থাকবে কেন?'

ইন্দ্রনীল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'চাঁদকে হাতে না পেলেও চাঁদের দিকের জানলাটা খুলতে ইচ্ছে করে,—এই হচ্ছে তোমার কেন'র উত্তর!'

'বড়দা বাবা রইলেন।'

ঝরঝর করে এক ঝলক জল ঝরে পড়ে গালের ওপর গাল থেকে হাতের ওপর। হ্যাঁ নিরুপমের হাতের ওপর। যে হাতটা নীতা আগ্রহে আর আকুলতায় ধরেছে চেপে।

'বড়দা আমি যেন বাবার খবর পাই।'

'পাবে না, এমন আশঙ্কা করছ কেন?'

না, আশঙ্কা নয়। ভাবছি আপনাদের ওপর— থাক ওকথা বলব না, শুধু বলছি পিসিমার ওপর খুব চাপ দেওয়া হ'ল, ওঁকেও একটু দেখবেন।'

'পিসিমা' সম্পর্কে খুব একটা সহানুভূতি নেই নিরুপমের, তাই শান্ত-ভাবে বলে, 'বেশী ভাবনা কোর না।'

'ডাক্তার পালিত তো কাল খুব ভরসা দিলেন!'

'দিলেন তো!'

'এমন হয় না ফিরে এসে দেখলাম বাবা ভাল হয়ে গেছেন।'

'অসম্ভব নয়।'

সময় নিকটবর্তী হয়, চাঞ্চল্য জাগে যাত্রীদের মধ্যে, কান্নাকাটির পালা পড়ে যায় চারিদিকে। দেশের মাটি, প্রিয়জনের সান্নিধ্য, ছাড়বার মুহূর্তে কে পারে চোখের জল না ফেলে থাকতে।

আর নীতা?

তার তো সামনে পিছনে দু'দিকেই অশ্রুর সমুদ্র।

গিয়ে কেমন দেখবে সাগরকে? সাগর কি তাকে চিনতে পারবে? সাগর কি আবার আগের মত হবে? সাগরকে কি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে নীতা?

ফিরে এসে বাবাকে দেখতে পাবে তো?

হঠাৎ নীতাকে দেখতে না পেয়ে, ভয়ানক একটা কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে না তো আবার!

বাবা কি ভাল হবেন? সাগর কি বাঁচবে?

আকাশ আর মাটি, দু'জনে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ব্যাথাতুর দৃষ্টি মেলে।

নীতা তুমি কার জন্যে ভাববে?

আস্তে আস্তে মাটি ছাড়িয়ে আকাশের পথে রথ যাচ্ছে উঠে। মাটি পড়ে থাকছে অনেক নীচে, অনেক দূরত্বের ব্যবধানে। আকাশ সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাপসা হয়ে আসছে সুশোভনের চিন্তা......'ওরা তো রইল, সুচিন্তা পিসিমা তো রইলেন, আমি আর আজকাল কীই বা করতাম।'......আত্মসান্ত্বনার এই মন্ত্রটাও ক্রমশঃ থেমে যাচ্ছে!

উত্তাল হয়ে উঠছে আকাশ।

সাগর, সাগর, কতদিন তোমায় দেখিনি।

সাগর, সাগর, তোমায় কি গিয়ে দেখতে পাবো? সাগর, তুমি কি আমায় বকবে? তুমি কি বলবে আমি অন্যায় দুঃসাহস করেছি?

সাগর, তুমি আমায় চিনতে পারবে তো?

তুমি না জানি কী রকম হয়ে গেছ, সাগর?

দুঃসাহসিক নিঃসঙ্গ পথের সঙ্গী শুধু এই ব্যাকুল প্রশ্ন।

পিতা আর স্বামী, জীবনের এই দুই প্রিয় দেবতা, দুই পরম আকর্ষণ, এদের মধ্যে একজনকে না ছাড়লে আর একজনের সান্নিধ্য পাবার উপায় নেই। মেয়েদের জীবনের এই এক মস্ত ট্র্যাজেডি। ছাড়তে হবে।

অনেক ছাড়তে হবে।

ছাড়তে হবে আশৈশবের প্রিয় পরিচিত স্নেহ নীড়টিকে, ছাড়তে হবে জন্মসূত্রে পাওয়া বংশপরিচয়কে, ছাড়তে হবে আজন্মের রুচি পদ্ধতি সংস্কারকে।

ছাড়তে পারাই সুন্দর, ছাড়তে পারাই শোভন।

'ছাড়বো না' বলতে গেলেই ভেঙ্গে যাবে জীবন।

এ কী শুধুই এ দেশে? দেশে দেশে মেয়েদের জীবনের পরীক্ষাই তো ত্যাগের পরীক্ষা। কিছু না ছাড়লে, কিছু পাবার উপায় নেই তাদের।

সাগর যদি বেঁচে উঠেও জীবন্মৃত হয়ে থাকে? যদি চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যায়? নীতা কাকে ছাড়বে? অসহায় পাগল বাপকে, না পঙ্গু অসহায় প্রেমাস্পদকে?

দু'জনকে বহন করবে এমন সাধ্য কি হবে তার?

সাগর তুমি বেঁচে ওঠ, সেরে ওঠ, আগের মত হয়ে ঝলসে ওঠো আমার জীবনের মধ্যে। তুমি আমায় ভেঙে ফেলো না সাগর, গুঁড়িয়ে ফেলো না আমায়।

মানুষের দেহটা কী আশ্চর্য জিনিস দিয়ে তৈরি! ভিতরের উত্তাল তরঙ্গ বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়ে না। নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে দেহ সেই তরঙ্গকে সংহত করে।

নইলে নিরুপমকেই বা এত শান্ত এত স্তিমিত দেখতে লাগে কি করে?

বড়দা!

বড়দা! বহন করতে হবে এই ডাকের ভার।

নিরুপম কী নিরুপায়।

হাতের চামড়াটা সেই তখন থেকে জ্বালা করছে। চোখের জলের কি কোনো দাহিকা শক্তি আছে? চামড়াটা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে? তাই রুমাল দিয়ে মুছে কিছু হলো না। কলের মুখ খুলে জলের ধারার নীচে হাতখানা ধরল নিরুপম।

নীতা বলেছিল সে জানত না 'জগতের সমস্ত মর্মস্থল তার জন্যেই মজুত ছিল।' কিন্তু এমনিই হয়। যার মধ্যে আকর্ষণীয় শক্তি আছে সে কী শুধু একজনকে আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকে? উজ্জ্বল আলোক-শিখায় কাছে লক্ষ পতঙ্গ প্রাণ দেয় কেন?

'হাত ধরে ধরে অতক্ষণ ধরে অত কি কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে?'

বলল কৃষ্ণা বেজার মুখে।

'যদি বলি ওর বাবার জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিল, তাই সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।'

'বিশ্বাস করব না।'

'তা'হলে সে কথা বলবও না।'

'আমার কিন্তু রাগ হচ্ছিল।'

'একটু রাগ হওয়া ভাল।' বলল ইন্দ্রনীল, 'তাতে অনুরাগ বাড়ে।'

'পুরোনো কথা, পচা কথা। নীতাদির সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল তাই শুনি।'

'তা বলব না।'

'বলবে না।'

'মাঃ জীবনে যার সঙ্গে যা কিছু কথা বলব, সব তোমার কাছে পেশ করতে হবে, এমন কনডিশানের মধ্যে আমি নেই।'

'যার সঙ্গে যত কথা নয়। যত মেয়ের সঙ্গে যা যা কথা—'

'তাও না। বুঝলে কৃষ্ণা, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই নিজস্ব নির্জন একখানা ঘর থাকে, সে ঘরের জানলায় উঁকি দিতে নেই।'

'ওটা আমার ভাল লাগে না।' কৃষ্ণা বলে বিরস মুখে।

ইন্দ্রনীল হাসে, 'আমার সব কিছুই যদি তোমার ভাল লাগার মত হয়, আমাকে আর বেশী দিন ভাল লাগবে না তোমার।'

'তার মানে?'

'মানে কিছু শক্ত নয়। বাড়ী গিয়ে ভাবোগে। বুঝতে পারবে।'

কৃষ্ণা সতেজে বলে 'ওসব কথা জানি না, আমার দিকে ছাড়া কারুর দিকে তাকাবে না, আমার সঙ্গে ছাড়া কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, আমার কথা ছাড়া কারুর কথা ভাববে না, এই হচ্ছে আমার শর্ত।

'বলেছি তো কোন শর্তের মধ্যে আমি নেই।'

কৃষ্ণা ছলছল চোখে বলে, 'বুঝতে পারছ কিনা তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে—তাই এত অহঙ্কার তোমার।'

ইন্দ্রনীল বলে 'একটু অহঙ্কারই যদি না থাকে, তো রইল কি মানুষের? অহঙ্কারই তো মানুষটা।'

'কল্যাণীয়াসু নীতা'। নীচে দস্তখৎ করে 'ইতি শুভার্থী বড়দা।'

না এ চিঠি পাঠাচ্ছে না। আজই চিঠি পাঠাবে এমন পাগল নিরুপম নয়।

নিরুপম রাত জেগে বসে শুধু চিঠির খসড়া করছে। চিঠি লেখার তো

আবার নতুন কাগজে নতুন করে ফাঁদছে 'কল্যাণীয়াসু নীতা—'

কিন্তু চিঠির ভাষা মনের মত হবে কি করে?

লেখবার কথা কোথায়?

মাত্র আজই তো গেছে নীতা।

......প্রত্যেকের মনের মধ্যেই নিজস্ব নির্জন একখানা ঘর থাকে......

সেই তো কথা।

অহঙ্কারই তো মানুষটা।

সভ্যতার অহঙ্কার, সংযমের অহঙ্কার, রুচির অহঙ্কার, উদাসীনতার অহঙ্কার, এই দিয়েই তো নিজেকে নিজে খাড়া করে রেখেছে মানুষ।

এই অহঙ্কারকে ঘোচাতে পারবে না বলেই নিরুপম রাত জেগে চিঠি লেখে

অভ্যাস নেই। আসলে বাংলা চিঠি লেখার অভ্যাস আদৌ নেই। অথচ নীতা বলে গেছে 'আপনার চিঠির আশায় হাঁ করে বসে থাকবো বড়দা, বাবার খবর বিশদ জানাবেন। আপনার ওপরই ভার। বাংলায় লিখবেন কিন্তু।'

সুশোভনের কথা বিশদ লেখবারই চেষ্টা করছে নিরুপম, কিন্তু ভাষা মনের মত হচ্ছে না।

কী আশ্চর্য!

মনে হচ্ছে যেন কতদিন।

'মনে হচ্ছে—কতদিন যেন কোথায় ছিলাম। আবার এসেছি। এ রকম কেন মনে হচ্ছে বলতো সুচিন্তা?' সুশোভন বলেন, 'কোথাও কি আমি গিয়েছিলাম?'

সুচিন্তা মাথা নেড়ে বলেন 'না তো।'

'আচ্ছা তবে কেন মনে হচ্ছে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত লোক যেন কত কী বলেছিল, কত গোলমাল করছিল। তারা সব কারা বল তো?'

সুচিন্তা ম্লানভাবে বলেন, 'কই। কেউ তো না। কোথাও তো যাওনি তুমি।'

'যাইনি? কোথাও যাইনি?' সুশোভন উত্তেজিত হন, 'যাওনি বললেই শুনবো? নিশ্চয় তুমি আমায় কোথাও নিয়ে গিয়েছিলে সুচিন্তা।'

সুচিন্তা ম্লান ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলে, 'আমার তো মনে পড়ছে না। তুমি বল তো কে কী বলেছে তোমায়?'

সুশোভন বিরক্তভাবে বলেন, 'সেই কথাই তো জিগ্যেস করছি। মাথার মধ্যে কত কথা। অথচ সব যেন কি রকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওরা কোথায় গেল বল তো?'

সুচিন্তার মনে অথই সমুদ্র, সুচিন্তার মনে দুর্ভাবনার পাহাড়।

এরপর কি? এরপর কি হবে।

নীতা ছিল, যেন পায়ের তলার মাটি ছিল।

কিন্তু পায়ের তলায় মাটি থাকলে কি সত্যের পরীক্ষা হয়? সাহসের পরীক্ষা হয়?

সুশোভন বিরক্ত হলেন, 'কী এত ভাবছ সুচিন্তা? ওরা কোথায় গেল বলছ না কেন?'

সুচিন্তা ক্লান্তভাবে বলেন, 'কারা?'

'কী আশ্চর্য! কারা আবার? যারা সব এখানে থাকে। ওরা সব কোথায় যেন চলে গেল।'

'কোথায় গেল তোমায় তো বলে গেল সুশোভন!'

সুচিন্তা আরো ক্লান্তি অনুভব করেন, 'নীতা বিলেত চলে গেল, আমার বড়ছেলে আর ছোটছেলে তাকে তুলে দিতে গেল।'

'নীতা চলে গেল।' সুশোভন ব্যাকুলভাবে বলেন, 'কেন বল তো সুচিন্তা? ও কি রাগ করে চলে গেল?'

'রাগ করবে কেন।' সুচিন্তা আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলেন, 'সব কথাই তো বলল তোমায়। সেই ছেলেটি, যার সঙ্গে নীতার বিয়ে হবে, তার যে অসুখ করেছে, তাই তাকে দেখতে গেল নীতা।'

সুশোভন একটু চুপ করে থেকে বলেন 'ওঃ। বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝতে পারছ?'

'নীতা আমার ওপর রাগ করে চলে গেছে।'

বিষণ্ণ কাতর মুখে বসে থাকেন সুশোভন।

সুচিন্তা আস্তে সুশোভনের পুরু পুরু হাতের ভারী একখানা থাবার উপর নিজের একখানি হাত রাখেন, শান্তভাবে বলেন, 'কিন্তু নীতা শুধু শুধু রাগ করবে কেন? কী করেছ তুমি?'

সুশোভন আজ আর সেই স্পর্শের প্রভাবে তেমন বিচলিত হ'ন না, অন্যমনস্কের মত বলেন, 'কি জানি। মনে হচ্ছে কত কী যেন দোষ করেছি। জোরে জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার সুচিন্তা।'

'ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।' সুচিন্তা বলেন, 'এই তো ক'দিন পরেই এসে যাবে নীতা।'

সুশোভন আস্তে মাথা নাড়েন, 'না, ও আর আসবে না।'

'আমি বলছি আসবে।'

জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন সুচিন্তা।

সুশোভন অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি বলছো আসবে? সব কথা তুমি কী করে বুঝতে পারো সুচিন্তা?'

'পারি! সব বুঝতে পারি আমি।' সুচিন্তা লঘু হন, 'এই তো বুঝতে পারছি তোমার এখন খিদে পেয়েছে।'

'কই না তো?'

'বাঃ, তুমি বুঝি নিজে নিজে বুঝতে পারো?'

সুশোভন মাথা নেড়ে বলেন, 'আমি পারি না, নীতা পারে। এখন আমিও পারছি। আমার খিদে পায়নি।'

'বই পড়বো সুশোভন?'

'না'।

'না কেন? পড়ি না?'

'আঃ সুচিন্তা, বড্ড তুমি জোর করো।'

'বেশ আর জোর করব না।'

'সুচিন্তা তুমি রাগ করছ?'

'করছি তো! তুমি কেন আমার কথা শুনছ না?'

সুশোভন ঈষৎ বিচলিতভাবে বলেন, 'শুনবো না কেন? শুনবো তো! কিন্তু সুচিন্তা—'

'কী? কী বলবে বল?'

'বলছি তোমার কথা আমি শুনবো কেন?'

বিচলিত হচ্ছেন সুচিন্তাও।

সুশোভন কি বদলে যাচ্ছেন?

নীতার কাছে কি হার হবে সুচিন্তার?

কিন্তু সুচিন্তা যে প্রতিজ্ঞা করেছেন হারবেন না, হার মানবেন না।

'কাল থেকে তোমাতে আর আমাতে বেড়াতে যাবো সুশোভন।'

'বেড়াতে!'

সহসা উৎফুল্ল হন সুশোভন। 'এখনই চল না সুচিন্তা। দেখে আসি সেই যাদের বাড়ীগুলো ভেঙে দিল, কোথায় গেল তারা। ওঠ ওঠ চল।'

'বাড়ী আবার কাদের ভাঙল? কই ভাঙেনি তো।'

'ভাঙেনি? বললেই হবে? শাবল দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভাঙল না? নীতা বলল ওদের আবার ঘর হবে। বাজে কথা। আমি বলছি হবে না। ঘর ভেঙে গেলে আর কখনো ঘর হয়?'

সুচিন্তা সহসা সুশোভনের কাঁধের ওপর একটা হাতের চাপ দেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'কেন হয় না বল তো সুশোভন?'

হঠাৎ পাগল সুশোভন একটা বেয়াড়া কাজ করে বসেন, হাতের কাছে টেবলে একটা কাঁচের গ্লাস ছিল, সেটা তুলে নিয়ে সবলে মাটিতে আছাড় দিলেন। ঝনঝন শব্দটা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'কেন হয় না তুমি বল এবার?' সুশোভন অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, 'পারলে? পারবে কেন? যত সব পাগলের কথা। তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো সুচিন্তা, আস্তে আস্তে তুমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছ।'

'এই কথা মনে হয় তোমার?' সুচিন্তা বলেন।

'হয়ই তো—' সুশোভন জোর দিয়ে বলেন, 'মাঝে মাঝে এমন আজেবাজে কথা বল। নীতা বিলেত গেল, আর তুমি বলছ নীতা আমার ওপর রাগ করে চলে গেছে।'

নিজের কথারই নিজে উত্তর দেন সুশোভন।

(ক্রমশঃ)

।। প্রকৃতই বন্ধু ।।

বন্ধু সেই যে বিপদের সময় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়ায়। অবশ্য সব সময় এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এ ধরণের একটি লোক নিউজীল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে পাওয়া গেছে। ব্যক্তিটি বিকেল বেলায় একটি টেলিফোন পেল। আর সেই টেলিফোনে তার এক বন্ধু জানিয়েছে যে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে ফেরানো যাচ্ছে না। সে ওয়েলিংটন বিমানঘাঁটি হয়ে সিডনিতে যাবে। এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে তার এই বন্ধুটি। বন্ধুটির কাতর অনুরোধে তার পক্ষে স্থির থাকা মুস্কিল হোল। তার পক্ষে আর কোন উপায়ও অবশ্য ছিল না। সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রাণপণে গাড়ী চালাল বিমানঘাঁটির দিকে। স্পীডের দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। যখন সে বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছুল, তখন তার বন্ধুপত্নীটি বিমানে উঠছেন। সে দেখল বিপদ অনেকটা এগিয়ে গেছে। অনেক বোঝাবার পর বন্ধুপত্নীটি আবার ঘরে ফিরে এল। তারই প্রচেষ্টায় একটি সংসারের ভাঙ্গন রোধ হল। তাদের মধ্যে আবার মিল হয়েছে। তারা এখন সুখেই আছে।

বিপদতারণকারী এই বন্ধুটিকে কিন্তু কম বিপদে পড়তে হয় নি। অতিরিক্ত বেগে গাড়ী চালাবার জন্য তাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সে উপরোক্ত বিবৃতিটি প্রচার করে। এখন তার সেই সুখী বন্ধুটি কি করছে তা জানতে ইচ্ছা হয় বইকি।

।। অন্ধের কর্মক্ষমতা লাভ ।।

যারা অন্ধ তারা কারখানায় কাজ করবে—কথাটা একদিন অবিশ্বাস্য ছিল সত্য—কিন্তু আজ আর নয়। বৃটেনে প্রতি বছর পাঁচ শতাধিক অন্ধ রয়েল ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দি ব্লাইণ্ড ও শ্রমমন্ত্রী দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা লাভ করছে। এ ব্যাপারে বৃটেন অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে গেছে। অন্ধ ব্যক্তিদের এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ কথাই প্রমাণ করছে যে তারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করলে চক্ষুষ্মান শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানায় পাশাপাশি সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।
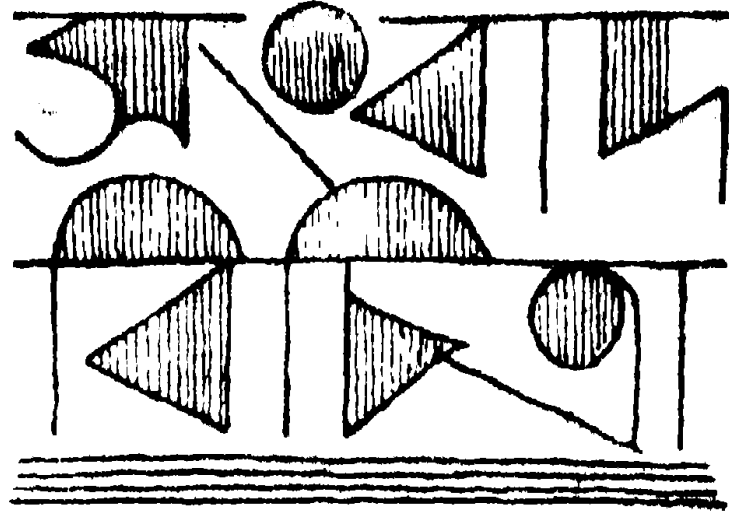
ইন্সটিটিউটটি একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের সহায়তায় এক প্রকার সূক্ষ্ম যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তন করেছেন। যার দ্বারা অন্ধ ও অর্ধ-নিপুণ কর্মিগণ সহজেই ইঞ্জিনীয়ারিং অংশগুলির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করতে পারে। ফলে সহজেই কর্মিগণ যন্ত্রটির কাজে হাত লাগাতে পারে। যন্ত্রটির নাম 'অডিবল কমপেরেটর'। এটি অতি সহজেই তিন রকমের আওয়াজের দ্বারা পরীক্ষাধীন অংশ বিশেষের স্থূলত্ব সম্পর্কিত সঠিক খবরটি জানিয়ে দেয়। সমাজের অপ্রয়োজনীয় লোকগুলির প্রয়োজনে লাগবার দিনের দেরী নেই বলে মনে হয়।

।। আত্মহত্যাকারী মাছ ।।

মাছও যে আত্মহত্যা করতে পারে এমন একটা খবর পাওয়া গেছে সিডনি থেকে। প্রত্যক্ষদর্শী মানুষেরা এখনও নিউ সাউথ ওয়েলসের উত্তর উপকূলে ইভান্স নদীর তীরে বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখছে শত শত মাছ মাথা উঁচু করে ছুটে আসছে উপকূলে। সেখানে আছড়ে পড়ে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিচ্ছে। সমগ্র উপকূল ভাগ লক্ষ লক্ষ মৃত মৎসে ভরে গেছে। প্রাণিতত্ত্ববিদরা একটা কিছু গবেষণার বিষয় খুঁজে পেয়েছেন!

সিডনি থেকে ৫১২ মাইল উত্তরে ইভান্স হেডে অর্থাৎ যেখানে ইভান্স নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এবং সমুদ্রের ১৮০ মাইলব্যাপী স্থান জুড়ে এই অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ব্যাপারটি এখনও ঘটে চলেছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, "আমি দেখলাম সমুদ্রের উপকূলে ভাগ মরা মাছে ভরা। জানিনা কি কারণে মাছগুলো কোন ত্রাসে সাঁতরাতে সাঁতরাতে উপকূলে ভাগে এসে আছড়ে পড়ে আত্মহত্যা করছে। মাছদের এই সাঁতার দেওয়ার দৃশ্য বিস্ময়কর। আমি একটি মাছ ছুঁড়ে দিলাম। তারপর সেই মাছটা মাথাটা জলের ওপরে রেখে লেজের সাহায্যে সাঁতরে এসে মৃত্যুবরণ করে নিচ্ছে। মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া আর না ছুঁড়ে দেওয়া মাছ একভাবেই মরছে। দৃশ্যটি অভূতপূর্ব।"

প্রাণিতত্ত্ববিদ বলছেন যে, হয় নদীর জল দূষিত হয়েছে না হয় মাছের মধ্যে কোন মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

।। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কৃত্রিম জ্ঞানবুদ্ধি ।।

ভবিষ্যতে হয়ত মানুষের জায়গায় কৃত্রিম জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা অনেক কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভব হবে। পশ্চিম জার্মানীর কার্লস্রুহের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দল গবেষক কৃত্রিম বুদ্ধির কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির বিষয়ে গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এটুকু বেশ বোঝা গেছে যে, স্বয়ংক্রিয় অথবা ইলেকট্রনিক যন্ত্রকে শিক্ষা গ্রহণ করার মত শক্তিযুক্ত করা চলে। এই সব যন্ত্রে কৃত্রিম বোধশক্তির কারিগরি বর্তমান এবং মানুষের ব্যবহার অনুকরণ করবার শক্তিও এদের প্রচণ্ড। চেতনাশক্তি না থাকলেও চিন্তাশক্তির অনেকগুলি সাধারণ ধারা এরা সহজেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে। একটি ইলেকট্রনিক মগজের শক্তি মানুষের মনের চেয়েও বেশী, কেন-না এর মধ্যে কত অজস্র খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখা যায়, এবং কত রকমারী সব যন্ত্রের সমন্বয়ই না এর মধ্যে রয়েছে, যেমন সংখ্যা পরিগণক যন্ত্র, পঠন-যন্ত্র পত্যাদি।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি শিক্ষা গ্রহণ করে আলোক রেখার সাহায্যে। কার্লস্রুহের একটি পরীক্ষার কথা শুনুন। প্রথমে বড় একটি কাঁচের পরদায় একটি গোলক ধাঁধার ছায়া দেখা গেল। তারপর আলোর রেখা সেই গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে পথ বের করে বাইরের দিকে যেতে চেষ্টা করল—যেখানে বাধা পায় অমনি অন্য রাস্তা খোঁজে। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রন যন্ত্রটির লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে ভাল এবং কম দূরত্বের রাস্তাটি খুঁজে বের করা। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরীক্ষাটি যদি আবার করা হত তাহলে দেখা যেত যে এবারে যন্ত্রটির লক্ষ্য ভুল হয়নি। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এদের ঘটনা মনে করে রাখবার ক্ষমতা থাকে।

উপরোক্ত যন্ত্রের মানুষের মত পঞ্চেন্দ্রিয় আছে কিনা সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, তবে উপরোক্ত গবেষক মণ্ডলী এ বিষয়ে একমত যে, মানুষের মত এরাও ঠেকে শেখে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

বোধশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের মহিমায় ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে অনেক কিছুই অদল-বদল হতে পারে। সামাজিক জীবন, আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি সব কিছুই পাল্টে যেতে পারে। যন্ত্রোজ্জয়ে মানুষের প্রচেষ্টা কত বিচিত্র পথের সন্ধানই না দেবে তা ভাবতে পারা যায় না।

জলে শুধু জলে

অতীন্দ্র মজুমদার

কিছুদিন আগে দিল্লীতে মহামারী আকারে কামলা রোগ হ'য়ে গেল। তা নিয়ে সারা দেশে কত উদ্বেগ আলোচনা, বিধানসভা বিধান পরিষদ এমন কি লোকসভায় পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর চলল। রীতিমত একটি অনুসন্ধান কমিটি বসল, রোগের কারণ নির্ধারণ করবার জন্যে। এই সম্প্রতি জানা গিয়েছে যমুনার জল দূষিত হওয়ার জন্যেই কামলা রোগ এত ব্যাপক আকারে দিল্লীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। জানা গেল, কামলা রোগটি জলবাহিত রোগ।

শুধু কামলা রোগই নয়, মারাত্মক কলেরা রোগও জলবাহিত প্রধান রোগ-গুলির অন্যতম। কলকাতায় এখনই কলেরার বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব চলেছে। পাইকারী হারে টিকা দেওয়া, খোলা-খাবার সম্বন্ধে হুঁসিয়ারি করা থেকে, প্রতিষেধক যত রকম উপায় আছে, তা এখনই চালু করার কাজ চলছে। জল সম্বন্ধেও সাবধান হ'তে লোককে বলা হচ্ছে। দূষিত জল, অপর্যাপ্ত পানীয় জল, জল-সরবরাহের নানা অসুবিধা-এ সবই এখন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জল এমনিভাবেই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। জলের আরেক নাম সেজন্যেই জীবন।

পৃথিবীর এই পরিণত বয়সেই যে আমরা জল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তা নয়। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরাও এই জল নিয়ে নানা গবেষণা ক'রে গিয়েছেন। জল সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা কেমন ছিল, আধুনিক যুগের লোকদের তা শুনতে হয়ত আগ্রহ হ'তে পারে—সে ভেবেই এ আলোচনার অবতারণা।

প্রাচীন যুগের ঋষিরা জলকে মোটা-মুটি দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। চরক মুনি তাঁর একটি শ্লোকে বলছেন, "পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমং ইতি দ্বিধা।" পানীয় জলের দুটি ভাগ— 'দিব্য' এবং 'ভৌম'। দিব্য জল অর্থ যা আকাশ থেকে পতিত হয়—যেমন বৃষ্টির জল, শিলার জল, হিমানী-জল (বরফ জল), শিশির-জল। এই চার রকম দিব্য জলের আবার বিভিন্ন রকমের গুণ বা দোষ আছে। অনার্তবে, অর্থাৎ পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র,—এই চার মাসে বৃষ্টির জল উপকার না ক'রে বরং ক্ষতিই করে। অনার্তবের সময় ছাড়া অন্য সময় আবার বৃষ্টির জলে বায়ু-পিত্ত-কফ নাশ হয়। শিলা বা করকার জল রুক্ষ, পরিপাকে গুরু, অতি শীতল এবং কফ ও বায়ু বৃদ্ধিকারক। কিন্তু বরফের জলে আবার শ্লেষ্মা ও উরু-স্তম্ভ রোগ সেরে যায়। শিশিরের জল শীতল ও রুক্ষ হ'লেও বায়ু পিত্তরোগের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। এমনি নানা দোষ-গুণ দিব্য জলের আছে। আবার এ দিব্য জল সংগ্রহ করবার পদ্ধতিও আলাদা আলাদা। যেমন-তেমন করে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা চলবে না। বৃষ্টির প্রথম জলটা বাদ দিয়ে খোলা জায়গায় বস্ত্রাবৃত পাত্রে সেই জল সংগ্রহ করতে হবে। আর, মাঝে মাঝে লোহার ডান্ডা আগুনে পুড়িয়ে সেই জলে ডুবিয়ে নিতে হবে। এতে জলজ কীট নষ্ট হয়ে যাবে।

ভৌম জল অর্থ পার্থিব জল। পার্থিব জলেরও মোটামুটি তিনটি ভাগ মুনিরা করেছেন। জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। "অল্পোদকোঽল্পবৃক্ষশ্চ পিত্ত-রক্তাময়ান্বিতঃ। জ্ঞাতব্যো জাঙ্গলো দেশ-স্তত্রত্যং জাঙ্গলং জলং॥" যেখানে গাছ-পালা কম, জল কম, আর রক্ত-পিত্ত সম্বন্ধীয় রোগের আধিক্য—সেখানকার জল জাঙ্গল জল। আবার "বহ্বম্বু বহু-বৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ"—গাছ বেশী, জল বেশী ও বাত শ্লেষ্মা রোগের প্রকোপও বেশী, সেখানকার জল আনূপ জল। আর সাধারণ জল হচ্ছে সেই জায়-গা'র, যেখানে গাছ বেশী জল কম, কিম্বা জল বেশী গাছ কম, আবার পূর্বোক্ত দু রকমের রোগই আছে। জলের গুণ—

জাঙ্গল জল রুক্ষ, লবণরসাবিশিষ্ট, লঘু; আনূপ জল স্নিগ্ধ, অভিষ্যন্দি, মুখপ্রিয়, কিন্তু গুরুপাক; আর সাধারণ জল মধুর, শীতল, পাকে লঘু এবং বলাই বাহুল্য তৃপ্তিজনক।

পার্থিব জল আবার স্থান এবং অবস্থা ভেদে নানা ভাগে বিভক্ত। যেমন নাদেয়, ঔদ্ভিদ, নৈর্ঝর, সারস, তাড়াগ, বাপ্য, কৌপ, চৌণ্ড, পাল্বল, চৈকির, কৈদার। বাণভট্ট বলছেন—"নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতং"—নদ বা নদীর জলই হচ্ছে নাদেয় জল এবং "রুক্ষং, বাতলং, লঘু, দীপনং, কটুকং ইত্যাদি হচ্ছে তার গুণ। চরক বলেন—ঔদ্ভিদ জল (অর্থাৎ প্রস্রবণের জল, ফোয়ারার জল) পিত্তঘ্ন, শীতলং প্রীননং (প্রীতিদায়ক) এবং লঘু। নৈর্ঝর জল বা

ঝরণার জল সম্বন্ধে বাগ্‌ভট্টের মত "কফঘ্নং দীপনং লঘু," মধুরং কিন্তু কটুপাক আবার বায়ুপিত্তবর্ধক। সারস জল মানে পর্বত দ্বারা রুদ্ধ নদীর জল। শুশ্রুত বলেছেন—সারস জল বলকারী রুচিকর কিন্তু কষা (constipative)। তড়াগ বা হ্রদের জল কিন্তু সুস্বাদু হ'লেও কষায় রসবিশিষ্ট এবং এ জলও constipative। কৌপ জল মানে কূপের জল। শুশ্রুত বলেন, কূপের জল যদি সুস্বাদু হয় তবে তা ত্রিদোষনাশক। কিন্তু ক্ষারযুক্ত হ'লে পিত্ত বৃদ্ধিকর হবে। চৌঞ্জের জল কূয়োর জলের মতই অযত্নসম্ভূত। পল্বলের জল, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক, কিন্তু বর্ষাকালে পরিপূর্ণ এমন জায়গার জল, শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ভাবপ্রকাশের মতে—স্বাদু হলেও তা 'ত্রিদোষকৃৎ' (বায়ু-পিত্ত-কফবর্ধক)। চিকির জল নদীতীরবর্তী জায়গার বালি খুঁড়ে পাওয়া যায়। কৈদার জল হচ্ছে "কেদার ক্ষেত্র" অর্থাৎ ধান্যক্ষেত্রের জল। চিকির বা কৈদার জলের উপকার কর'র চেয়ে ক্ষতি করার ক্ষমতাই বেশী।

এখন কোন্ সময়ে কোন্ জল খাওয়া উচিত? হেমন্তকালে সারস বা তড়াগের জল, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূয়োর জল, পুকুরের জল, ঝরনার জল খাবে কিন্তু নদীর জল খাবে না, কারণ এ সময়ে নদীতে বৃক্ষপত্র পতিত হ'য়ে জল দূষিত হয় (চরক)। বর্ষাকালে ফোয়ারার জল, বৃষ্টির জল খেতে পারা যাবে—আর শরৎকালে অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণ এবং চন্দ্রকিরণ নদীর জলে পতিত হয় ব'লে শরৎকালে নদীর জল অমৃত সমান। শুশ্রুত সেজন্যেই বলেছেন, "শস্তং শরদি নাদেয়ং" কারণ "দিবারবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ॥" চরক এবং শুশ্রুতের মত ছাড়া আরো একটি মত আরেক ঋষি দিয়েছেন—তিনি বলেন পৌষ মাসে সরোবরের জল, মাঘ মাসে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূয়োর জল, চৈত্রে চৌঞ্জের জল, বৈশাখে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠে ঔদ্ভিদ জল, আষাঢ়ে কূয়োর জল, শ্রাবণে বৃষ্টির জল, ভাদ্রে কূয়োর জল, আশ্বিনে চৌঞ্জের জল আর কার্তিক অঘ্রাণে যে-কোন জল ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সব জলই খুব প্রত্যূষে সংগ্রহ করতে হবে।

পানীয় জল কেমন হওয়া উচিত, তা শাস্ত্রে বলে দেওয়া আছে। তা গন্ধহীন হবে, ছয় রসের কোন রসের স্বাদ তাতে থাকবে না, খুব ঠাণ্ডা, তৃষ্ণানাশক, নির্মল ও সর্বোপরি মনের আনন্দজনক হতে হবে (ভাবপ্রকাশ)। এর বিপরীত গুণবিশিষ্ট সমস্ত জল যেমন পিচ্ছিল, কীটবহুল, পত্র-শৈবালসমাকীর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধযুক্ত, চন্দ্র-সূর্যকিরণরহিত সমস্ত জল অপেয়। আধুনিক ডাক্তারী শাস্ত্রেও তাই বলে। ডাক্তারী শাস্ত্রে যেমন জলকে শুদ্ধ করার উপায় দেওয়া আছে, ভাবপ্রকাশও তেমনি জল শোধিত করার নানা নির্দেশ দিয়েছেন—প্রথম এবং প্রধান হল, জল গরম করে নেওয়া (অগ্নি বা সূর্যের উত্তাপে)। দ্বিতীয় উপায়,—সোনা, রূপো, লোহা, পাথর কিম্বা বালি গরম ক'রে সাতবার জলে ডুবিয়ে নিতে হবে, তাহ'লেই সেই জল "স্বচ্ছং কণক মুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাৎ দোষবর্জিতং" হবে।

এ সব মত বা জলশুদ্ধির বিভিন্ন নির্দেশ আজকাল আয়ুর্বেদের পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ। এখন এসব মত হয়ত অনেকের কাছেই খুব গ্রহণীয় বলে মনে হবে না। আমিও ঋষিদের নির্দেশিত মতানুযায়ী জল সংগ্রহ করতে বলছি না বা শরতে নদীর জল, বর্ষায় বৃষ্টির জল পান করতে বলছি না। আগেকার যুগের লোকের সময় ছিল প্রচুর, জীবনে জটিলতাও বর্তমান যুগের মত আসেনি। তাই তাঁরা যখন যেমন নির্দেশ আয়ুর্বেদে দেওয়া আছে, তেমন জল পান করতেন। এখন উদয়াস্ত রুজি-রোজগারের চিন্তা করব, না চৌঞ্জের জল, ঔদ্ভিদ জল খুঁজে খুঁজে বেড়াব! কিন্তু একটা কথা ভাবতে ইচ্ছে হয়, আমরা যেমন কাতারে কাতারে কলেরায় মরছি, মহামারী আকারে কামলা রোগের ভয় নিয়ে বাস করছি—প্রাচীন যুগে সেরকম মহামারী আকারে কলেরা, টাইফয়েড কি দেখা দিত? বোধ হয় বর্তমানের মত এত মারাত্মক আকারে দেখা দিত না। সেটা কি, জল সম্বন্ধে তাঁরা অতিরিক্ত সাবধান ছিলেন বলে? তা যদি হয়, তবে ত প্রাচীন যুগের কাছে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানগর্বিত এই যুগের মানুষ আমরা হেরে গিয়েছি!!

ক্রীতদাসী

মানবেন্দ্র পাল
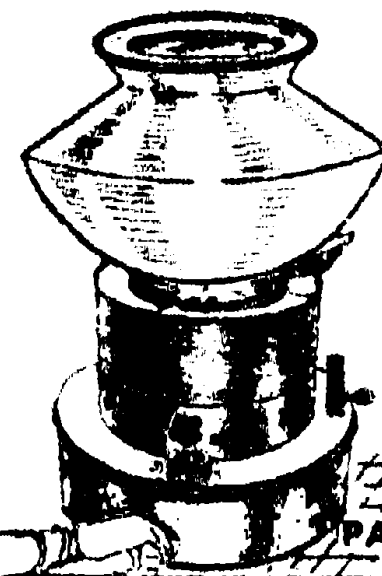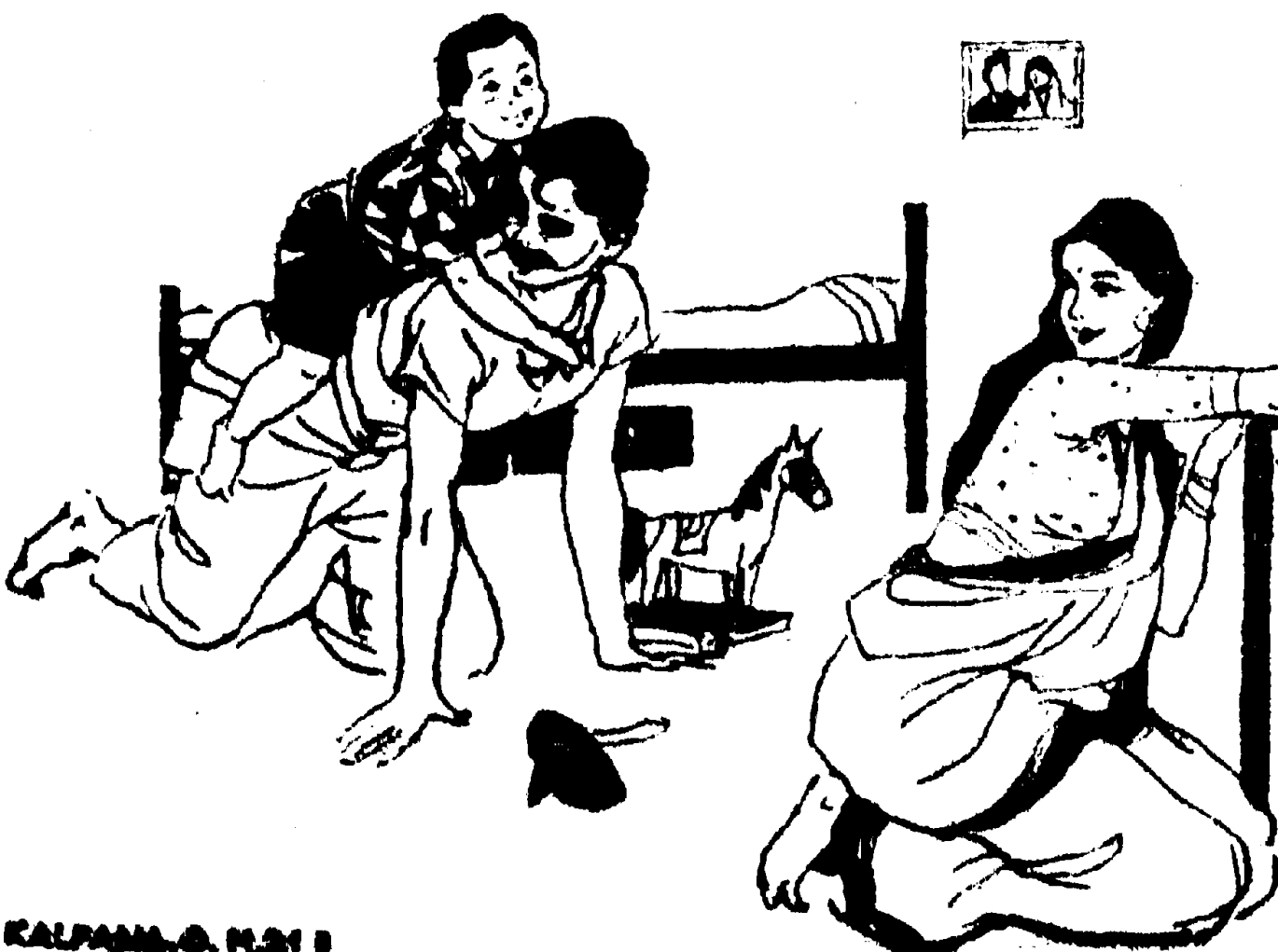
আশ্চর্য, সেকালের মানুষ হয়েও এ যুগের প্রতি রাধারাণীর এতটুকু বিরূপ মনোভাব নেই। তিনি বলেন, যে কালো অন্ধকার যুগ থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বারো বছর বয়েসেই বধূ সেজে পরের সংসারে দাসীবৃত্তি করা, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে ভুল বানানে কোনো রকমে নামটুকু লিখতে পারা, হাজার রকমের বিধিনিষেধ, সংস্কার! শুধু কি তাই? নিজের ঘরটুকুর মধ্যে বন্দীজীবন কাটানো, দুনিয়ার খবর জানবার উপায় নেই, একটু আলোর মুখ দেখবার উপায় নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই, পুরুষ ডাক্তারের কাছে নাড়ী দেখাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া যে কী লজ্জার তা আজকের মেয়েরা কল্পনা করতে পারে না। তার চেয়ে এ যুগ ঢের ঢের গুণে ভালো বাপু। সোনার যুগ! না হয় জিনিসপত্রর দর বেড়েছে, খেয়ে পরে সুখ নেই, তা হোক, তবু মানুষ আলো দেখতে পায়, মানুষের মতো নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে। এই যে মেয়েরা আজকের দিনে বি এ এম এ পাস করছে, চাকরি করছে এও তিনি সমর্থন করেন। এমন কি বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করতে চলে যাচ্ছে, পাড়াপড়শী কেউ সে বিষয়ে কটাক্ষ করলে রাধারাণী হেসে বলেন, তাতে কী, মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে তো স্বাবলম্বী হবার জন্যেই।

•

প্রতিবেশিনী হয়তো বলেন, লেখাপড়া শেখে শিখুক কিন্তু স্বামী থাকতে স্বাবলম্বী হবার দরকারটাই বা কী? দুদিনে না হয়—।

রাধারাণী বলেন, দুর্দিনের কি বাকি কিছু আছে? দেড়শো দুশো টাকা মাইনেতে কি আজ আর সংসার চলে! তা স্বামী-স্ত্রী খাটবে না? ও কি শখ করে কেউ খাটে? খাটে প্রাণের দায়ে।

রাধারাণীর বয়েসের বাঙালি ঘরের অল্পশিক্ষিতা কোনো গৃহিণীর কাছে ঠিক এতখানি উদারতা আশা করা যায় না।

তাঁর নিজের সংসারটি বৃহৎ। ছেলেমেয়েতে আটটি। তার মধ্যে পাঁচটি মেয়ে তিনটি ছেলে। পাঁচটি মেয়ের মধ্যে দুটিকে পার করেছেন কোনো রকমে, এখনো তিনটি বাকি। সবচেয়ে কনিষ্ঠ যে মেয়েটি তারও শাড়ি পরার বয়েস হয়ে গিয়েছে তবু ফ্রক পরেই থাকে। ছেলে তিনটির মধ্যে দুটি চাকরি করে। ছোট ছেলেটি পড়ছে। স্বামীর বয়েস প্রায় ষাট। কিন্তু এখনো শরীরে ক্ষমতা আছে। তাঁরই পরিশ্রমে এত বড়ো সংসারটা এখনো মাথা তুলে আছে।

সুখে দুঃখে, অভাবে অনটনে একরকম করে সংসার চলে যায়। ধার হয়, দেনা হয়, আবার তা একটু একটু করে শোধও হয়। দায়ে বিপদে এক-আধখানা গহনা যে বাঁধা না পড়ে তা নয়। আবার একদিন তা উদ্ধার করে আনা হয়। এমনিভাবেই জোড়াতালি দিয়ে সংসার চলছিল।

হঠাৎ একটু ছন্দপতন ঘটল।

একদিন রাধারাণী নিজের ঘরের চৌকির নীচ থেকে কতকগুলো কাঁসার বাসন বার করছিলেন, লক্ষ্য করলেন বড় ছেলে জয়ন্ত বারে বারে তাঁর ঘরের সামনে ঘোরাফেরা করছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। রাধারাণী ছেলেকে চেনেন। বেশি কথা বলে না—হৈ চৈ করে না—চেঁচামেচি করে না। তবে মন যখন বিক্ষিপ্ত হয় তখন অমনি করে পায়চারি করে বেড়ায়। আজকের লক্ষণ যদিও অনেকটা সেই রকম তবু ঠিক পায়চারি করছিল না, করছিল ঘোরাঘুরি।

একটু পরেই রাধারাণীকে একলা পেয়ে জয়ন্ত চাপা স্বরে বললে, মা, একটু শোনো।

কণ্ঠস্বর শুনে রাধারাণী একটু অবাক হলেন। একটু ভয়ও পেলেন। বিস্ময় এবং কৌতূহল দমন করে রাধারাণী এগিয়ে গেলেন। কিন্তু জয়ন্ত তবু কিছু বলতে পারে না, মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে।

রাধারাণী ভ্রূকুটি করে বললেন, কী হয়েছে?

না, কিছু হয়নি।

তবে?

জয়ন্ত আবার নিরুত্তর হয়ে রইল।

কী বলবি বাপু, খোলোসা করে বল।

জয়ন্ত এবারে যেন একান্ত বেপরোয়াভাবেই বলে ফেলল, আমি বিয়ে করব।

বিয়ে! রাধারাণী চমকে উঠলেন। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, বেশ।

এরপর আরও একটু ভেবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, পাত্রী কি তুমি ঠিক করেছ?

জয়ন্ত তেমনি মাথা নিচু করেই বললে, হ্যাঁ।

সে কি কলকাতায় থাকে?

জয়ন্ত যেন ঈষৎ প্রশ্রয় পেল। তৎক্ষণাৎ বললে, হ্যাঁ, আমাদের আপিসেই টেম্পোরারি কাজ করত। এখন তার কাজ গিয়েছে।

রাধারাণীর ললাটে নিঃশব্দে একটি ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। রাধারাণীর সেই ভ্রূকুটির অর্থ জয়ন্ত সঠিক বুঝতে পারল কিনা বলা যায় না, সে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বললে, আমি তাকে কথা দিয়েছি মা।

রাধারাণী প্রশান্ত গাম্ভীর্যে একটি একটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, অবশ্যই কথা রাখতে হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম তোমার তো ঐ আয় আর আমাদের সংসারের অবস্থাও তো দেখছ। এ অবস্থায় সে কি মানিয়ে নিতে পারবে?

জয়ন্ত সোৎসাহে তখনই বলে উঠল, খুব পারবে। আমি বলছি, পারবে।

রাধারাণী সে কথায় কর্ণপাত না করে যেন স্বগতই বললেন, আমার ঘরে এখনো তিনটে আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, ওরা যদিও খুব শান্ত বুদ্ধিমতী তবু মা হয়ে তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝি। এ সত্ত্বেও এই অভাবের সংসারে তোর বৌ আসবে এমন অসম্ভব কল্পনাও মাঝে মাঝে যে না করেছি তা নয়। আমার নিজেরও কি সাধ যায় না বৌ নিয়ে ঘর করি? কিন্তু—

রাধারাণী আবার থামলেন। যেন অনেক কষ্টে দমন করলেন নিজেকে।

মা আর ছেলে। নির্জন নিস্তব্ধ ঘর। দুজনেই মুখোমুখি নির্বাক দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে নীচ থেকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কলকোলাহল কানে আসছে। মেজো ছেলেটা ছোটো বোনকে ধমকাচ্ছে—এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে আলনাটা একটু গোছাতে পার না?

মেয়েও তেমনি; মুখের ওপর উত্তর দিচ্ছে—কত গোছাব! তোমরা একটা কাপড় আলনা থেকে টেনে নেবে আর সেই সঙ্গে পাঁচটা ফেলবে। পারব না আমি বারে বারে গোছাতে।

পারবি না! বড় মুখ হয়েছে না?

এই ঝগড়া বিবাদের মাঝেও শোনা যাচ্ছে থার্ড ইয়ারে পড়া ছেলেটার গিটার। হিন্দী সিনেমার একটা চলতি গান তোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেকেন্ড হ্যান্ড গিটারটা কিনেছে পাড়ার একটি ছেলের কাছ থেকে ইনস্টলমেন্টে দাম পরিশোধ করার শর্তে।

ছোটো মেয়ের ঠিক ওপরের মেয়েটি রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলছে, মা, কচুর ডালনায় কি নুন দিয়েছ?

রাধারাণী শান্ত সংযত স্বরে বললেন, বেশ তাই হবে। কবে তুমি বিয়ে করতে চাও?

জয়ন্ত নিচু গলায় বললে, ওদের ইচ্ছে কাজটা যত তাড়াতাড়ি সারা হয়।

বৌ এল। সুন্দর বৌ। যেমন রূপে তেমনি গুণে। রাধারাণী সন্তুষ্ট হলেন। বুকে টেনে নিলেন বৌকে। আহা, এমনি একটি মেয়ে নইলে যেন বুক জুড়োয় না।

নতুন বৌ, তাতে আবার ছেলে থাকে কলকাতায়। শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসে, রবিবার দিনটি থাকে আবার সোমবার ভোরে চলে যায়। রাধারাণী সব সময়ে চেষ্টা করেন অন্তত সপ্তাহের এই দুটো দিন যেন বৌ কোনোরকমে সংসারের কাজে জড়িয়ে না পড়ে। তাই জয়ন্ত বাড়ি থাকলেই তিনি বৌকে পাঠিয়ে দেন। —যাও, যাও বৌমা, জয়ন্ত বোধ হয় তোমায় ডাকছে।

জয়ন্তর মনের খবর কী তা পরিষ্কার না জানতে পারলেও বধূ বুঝতে পারত প্রকৃতপক্ষে জয়ন্ত তখনই তাকে তলব করেনি। এটা শাশুড়ির ছলমাত্র। বধূ লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় এবং চাপা পুলকে মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে ওপরে চলে যেত। আর রাধারাণী অন্তরালে থেকে এই দৃশ্য চুপি চুপি উপভোগ করতেন। আহা এ সৌভাগ্য ক'জনের হয়? সেই এতটুকু ছেলে জয়ন্ত। সেই আজ এত বড় হয়েছে, কলকাতায় চাকরি করছে, তারই আবার বৌ!

কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন একটা অভিমান জাগত। এ ধরণের অভিমান আগে কখনো জাগেনি। এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তাঁর যেন কেমন মনে হয়, এই যে জয়ন্ত হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একটি মেয়ে স্থির করে বসল—একটি বারও কাউকে এমন কি এই মাকে পর্যন্ত হাবে ভাবে জানালো না,—একেবারে কাজ পাকা করে শুধুমাত্র অনুমতি প্রার্থনা করল—তাও এমনভাবে যেন যদি অনুমতি মেলে ভালোই নইলে আলাদা হয়েও আমাকে ওকেই বিয়ে করতে হবে—এটা যেন কেমন। 'তাকে কথা দিয়েছি যে!' বেশ তো, কিন্তু এই পাকা কথা দেবার আগে কি একটি বার সামান্য আভাসে ইঙ্গিতেও মাকে জানাতে পারত না? মা কি তাতে বাদ সাধত? মায়ের চেয়ে বড়ো আর কে আছে রে ত্রিভুবনে?

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সামলে নিয়েছেন। তা হোক। ছেলেমানুষ। অমন একটু ভুল ত্রুটি হয়েই থাকে। তা ছাড়া এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা অমনি বেপরোয়াই হয়। অত খেয়াল থাকে না। মানুষের গোটা জীবনের মধ্যে এই অল্প একটু অবসর বিধাতা দিয়েছেন যে সময়টা, ভুল করবার, আত্মহারা হবার, নেশাগ্রস্ত হবার। অথচ যে ত্রুটিগুলির জন্যে পূর্ণ ক্ষমা মঞ্জুর।

বৌটিও সত্যিই ভালো। গুণের বৌ। কিন্তু একটু যেন কথায় বার্তায়
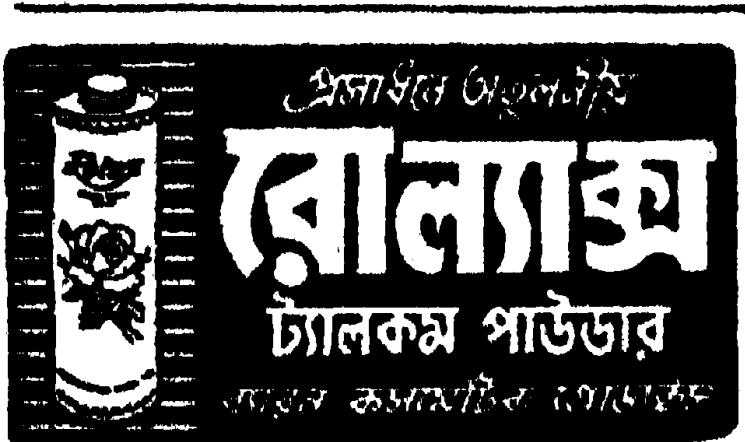
ছিলে। এক এক সময় এমন এক একটা কথা বলে ফেলে যেটা কেবলমাত্র সমবয়সী বন্ধুদের কাছেই বলা চলে, গুরুজনদের কাছে নয়। তাঁর মেয়েরাও এ ধরণের কথা বলা তো দূরের কথা শোনাতেও অভ্যস্ত নয়। তাদের বৌদি যখন বেপরোয়াভাবে সেই সমস্ত কথাবার্তা বলে তখন তারা লজ্জায় পালিয়ে যাসে। তবু কি বৌয়ের লজ্জা আছে! চেঁচিয়েই বলবে—এ কি, তোমরা উঠে যাচ্ছ কেন? এ সব তোমাদেরও জেনে রাখা উচিত।

জেনে রাখা উচিত!

পাশের ঘরে রাধারাণী ঘুমোবার ভান করে শুয়ে থেকে শোনেন আর লজ্জায় মরে যান। কী বিবেচনা! এইসব ছাইভস্ম কথা কুমারী মেয়েদের শোনা উচিত!

কিন্তু বৌ বোঝে না মোটে। কোথা থেকে খবরের কাগজ একটা টেনে নিয়ে তার বিশেষ এক জায়গায় দাগ দিয়ে বলে, এই দেখো, কাগজেও লিখছে, আজ আর বহু সন্তানের জননী হওয়া কোনো মায়েরই কাম্য নয়। এর জন্য—আরে, পালাচ্ছ কেন? এ বক্তৃতা তো আর আমি দিইনি। কাগজে ছাপার অক্ষরে—রাধারাণী মনেমনে গজ্ গজ্ করেন,—না, না, এ বাপু ভালো নয়। কুমারী মেয়েদের সামনে ওসব কথা বললে মন চঞ্চল হয় যে। তার চেয়ে মেয়ে দুটোর জন্যে দুটো ভালো পাত্র দেখে দাও দিকি!

এমনিভাবে পাঁচ বছর কেটে গেল।

এই পাঁচ বছরে রাধারাণীর সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি হল না। না হল মেয়েদের বিয়ে, না বাড়ল সংসারের আয়। বাড়ল শুধু জয়ন্তর সংসার। তিন তিনটে সন্তান হয়ে গেল। ওদিকে কর্তার শরীরে ভাঙ্গন ধরেছে। সে শক্তি আর নেই। এখন একটুতেই হাঁপ ধরে, একটুতেই ভেঙে পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য, বৌয়ের কোনো পরিবর্তন নেই। তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গতি যত কমছে, স্বামীর সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে তার সন্তান-সন্ততির সযত্নপালন যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে ততই সে যেন আরও শক্ত করে সংসারকে আগলে ধরছে। প্রাণপাত পরিশ্রম করছে সংসারের কাজে—একটি জিনিসও অপচয় হবার উপায় নেই। অথচ সেই সঙ্গে মুখে হাসি ফুটে উঠছে দ্বিগুণ। তার অঙ্গে নতুন গহনা উঠছে না বটে কিন্তু আপন দেহটিকে বড়ো অপরূপ করে তুলছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—পরণের শাড়িটি পর্যন্ত নিজে হাতে কাচা—নিজে হাতে ইস্ত্রি করা। তার বিছানার চাদরটি দেখলে কেমন যেন প্রলোভন হয়। মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান নেই, কিন্তু মাথার কাছে হাত পাখাটিতে যে লাল ঝালরের কাজটি করেছে তাতে তার সুস্থ সুকুমার মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তার শুভ্র ললাটের গোল সিঁদুর টিপটি খাঁটি সিঁদুরেরই টিপ—মাদ্রাজী কুমকুম জাতীয় লাল প্রসাধনের প্রয়োজন তার নেই।

রাধারাণী যতই দেখেন ততই অবাক হন। বাড়িতে যখন সকলেরই মেজাজ অভাবে নৈরাশ্যে খিট্‌খিটে তখন এ মেয়ে কেমন করে পেল এত আনন্দের সংবাদ, কোথা থেকে পেল এত আলো, এত আশা? তবে কি জয়ন্তর মাইনে বেড়েছে? সে কথা কি ওরা গোপন করেছে তাঁর কাছে? তাই কি জয়ন্ত বাড়ি এলেই দুজনের গোপন কথা বেড়ে ওঠে!

মন যখন এমনি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখনই আবার রাধারাণী তা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন প্রাণপণে।

—না, না, এমন আর কি। সপ্তাহান্তে ছেলে আসে, একটু ওরা মেলামেশা করবে না? আর যদি সত্যিই জয়ন্তর মাইনে বেড়ে থাকে তাহলে—তাহলে তো তা আনন্দেরই কথা। সে তো ভগবানের আশীর্বাদ। তাঁদের দিন তো ফুরিয়ে আসছে, এখন তো ওদেরই শুরু।

পরক্ষণেই মনে হল,—হ্যাঁ, দিন তো ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু এখনো তিনটি আইবুড়ো মেয়ে ঘরে ঠাসা। একটি বেকার ছেলে, আর একটি এখনো টেম্পোরারির দড়িতে ঝুলছে। স্বামীর স্বাস্থ্যের তো ঐ অবস্থা! সংসার তো তাঁকে এখনো মুক্তি দেয়নি। মৃত্যুর আগে কি মুক্তি নেই?

এমনি সময় হঠাৎ আবার একদিন জয়ন্ত ডাকল—মা!

রাধারাণী সে কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। ঠিক এমনি স্বরেই ও তাঁকে ডেকেছিল বিয়ের কথা বলার সময়। ছেলে এমনিতে কম তাঁর সঙ্গে কথা বলে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছেন, যখন ডেকে কিছু বলে তখন প্রায়ই সে কথা কিছু গুরুতর না হয়ে যায় না। আজও তাই তিনি ছেলের ডাকে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তেমনিভাবেই ছেলে মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময়ে বললে, মা, আমি ভাবছি রাণুকে কিছু-দিনের জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাব।

রাধারাণী চমকে উঠলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে হল, বুঝি এইটুকুই বাকি ছিল। এতদিনে ছেলে পর হতে চলল। তবু কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

জয়ন্ত আবার মাথা নিচু করে রইল।

এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে? জয়ন্ত মাথা নাড়ল, না।

তবে?

ওকে একবার ডাক্তার দেখাব।

ডাক্তার দেখাবে! কেন? কী হয়েছে বৌমার?

জয়ন্ত ইতস্তত করে বললে—না—ইয়ে—তেমন কিছু নয়; তবু ভাবছিলাম একবার—মানে—ছেলেমেয়ে তো অনেক-গুলি হয়ে গেল।

রাধারাণী তবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। আশ্চর্য হয়ে বললেন, ছেলেমেয়ে হয়েছে তো ডাক্তার কী করবে? বৌমার শরীর তো খারাপ নয়। বরং ভালোই আছে।

জয়ন্ত এবার একটু পরিষ্কার করেই বললে, শরীর এখনো ওর খারাপ হয়নি, কিন্তু হবেই আরও ছেলেমেয়ে হলে। তাছাড়া অতগুলি ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, সেও সাধ্যের বাইরে। তাই ভাবছিলাম, যদি ডাক্তার কিছু পাকা-পাকি ব্যবস্থা করে দেয়—।

রাধারাণী শিউরে উঠলেন। জয়ন্ত আবার মাথা নিচু করল। ক্ষণকাল দুজনেই কোনো কথা বললে না। তারপর এক সময়ে রাধারাণী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—তাতে বৌমা রাজি হবে?

জয়ন্ত মাথা দুলিয়ে সায় দিল। —রাজি হয়েছে।

মুহূর্তে রাধরাণীর কাছে সব ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এ পরামর্শ তাহলে বৌ-ই দিয়েছে। নইলে তাঁর ছেলের মাথায় এসব অনাসৃষ্টি কল্পনা আসতই না।

রাধারাণী কোনো উত্তর না দিয়েই চলে এলেন। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় তাঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—এ আবার কী! একি বাড়াবাড়ি নয়? বাড়ির বৌ হয়ে ঐসব কথা তুলতে পারল। চক্রবর্তী-বাড়ির বৌ যাবে কলকাতার হাসপাতালে ছেলে হওয়া বন্ধ করতে! এর চেয়ে বড়ো পাপ কী আছে—এর চেয়ে নির্লজ্জতা আর কী হতে পারে! কুৎসিত প্রচেষ্টার পিছনে কী জঘন্য লালসা আর মত্ততার ইঙ্গিত রয়েছে সেকি কেউ বোঝে না?

কিন্তু রাধারাণীর স্বভাবের বৈশিষ্টই এই যে, তিনি কিছুতেই হার মানবেন না। যখন বোঝেন, নিজে দুর্বল হয়ে পড়ছেন, কিছুতেই যখন বিপক্ষকে সমর্থন করতে পারছেন না, মমতা এবং স্নেহের বন্ধন শ্লথ হয়ে আসছে—অন্যপক্ষ দূরে সরে যাবেই তখন সেই মুহূর্তেই তিনি প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছেন তাদেরই অনুকূলে আপন যুক্তিকে, আপন চিন্তাধারাকে বইয়ে নিয়ে যেতে। এমন এক-আধবার নয়, বার বার। আজও তাই যখন জয়ন্তর মুখে ঐ ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনলেন তখন তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন নতুন যুক্তি খোঁজবার। কী করে ওদের সমর্থন করা যায়। তখন তাঁর মনে হল, বৌমা তো জয়ন্তকে নতুন কোনো পরামর্শ দেয়নি—আজকাল আকছাড় তো এমনি হচ্ছে। এই তো সেদিন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির সব এসেছিল তারাও তো দিব্যি ফলাও করে গল্প করে গেল তাদের ছেলে নাকি বৌকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অপারেশান করিয়ে এনেছে। শুনে রাধারাণীর প্রথমটা খুব লজ্জা হয়েছিল, তারপর মনে পড়ে গেল এ ধরণের কথা বা আলোচনা তো আজ নতুন নয়; যে কথা আজ অন্যের বাড়ির বৌদের গিন্নিদের মুখে শুনছেন, সেই কথাই তাঁর বাড়িতে বলেছিল তাঁরই পুত্রবধূ পাঁচ বছর আগে। কাজেই আজ সেই বৌমাই যদি সত্যি তেমন কিছু করতে চায় তাহলে সেটা কি খুব নতুন কিছু, লজ্জার বিষয় হবে?

রাধারাণী যেন কতকটা সামলে উঠলেন।

সত্যি সত্যিই বৌ অপারেশন করে মাস-খানেক পর ফিরে এল। এই এক মাস ধরে রাধরাণী নাতিনাতনীগুলিকে আগলে ছিলেন। সেই সঙ্গে দুর্ভাবনাও কম হয়নি। অপারেশান, হাসপাতাল এসবের নাম শুনলেও ভয় করে—তা সে যত সামান্য অপারেশনাই হোক না কেন। কিন্তু ওরা যখন ফিরে এল তখন বৌয়ের সেই অকুণ্ঠিত চলাফেরায়, নিঃসংকোচ কথাবার্তায় কেমন যেন নিজেই লজ্জা পেলেন। এই যে এত বড় কান্ডটা করে এল এর জন্যে কেনো সংকোচ নেই! বরঞ্চ কেমন যেন একটা চাপা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এ আনন্দ কি গরিবের সংসারের একটি সমস্যা সমাধানের আনন্দ, না অন্য কিছু?

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন বৌমার যেন কেমন পরিবর্তন হয়েছে। সর্বদাই যেন কেমন উঠতি বয়েসের মেয়েদের মতো ঝঙ্কার তুলে হাসি। একটুতেই রঙ-তামাশা, লজ্জা-সরম যাওবা একটু ছিল এখন যেন আর সেটুকুও নেই। শাশুড়ীর সামনেই স্বামীর দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে হাসা—মাথার কাপড় খসে পড়ছে—কথায় কথায় ছেলেমানুষদের মতো বুকের কাপড় টানছে। শুধু তাই নয়, কোথাও কিছু নেই তার ঘরের জানলায় জানলায় পর্দা ঝুলল—শনিবারে শনিবারে পাউডার মাথার ধুম পড়ল। বড় ছেলে দুটোর ও ঘরে আর ঠাঁই হল না, তাদের শোবার ব্যবস্থা হল অন্য ঘরে।

রাধারাণী ভাবেন—এ আবার কি! এদের কি নতুন করে ফুলশয্যে শুরু হল নাকি!

রাধারাণীর এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের চোখেও ঠেকল। তারাও হাসাহাসি করে বললে—একালের হাওয়া তো এই জানি, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই সব পুরনো হয়ে যায়। কিন্তু জয়ন্তর ব্যাপারই আলাদা। তা ভালোই, বৌয়ের ক্ষ্যামতা আছে।

হ্যাঁ, তা এখন রবিবার দিনটা ওদের দুটিকে কাছছাড়া হতে দেখা যায় না। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বৌ একখিলি পান নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকবে আর বেরোবে বিকেল গড়িয়ে গেলে। যতই দেখেন রাধারাণী—যতই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না ততই রাগে ঘেন্নায় গা জ্বলে যায়।

সেদিন অমনি বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেছে। উনুনে আঁচ কামাই যাচ্ছে অথচ এখনো পর্যন্ত বৌমা নামল না চা করতে। দু-একবার বুঝি নীচ থেকে বৌমা বৌমা করে ডেকেও ছিলেন। কিন্তু সাড়া পাননি। অবাক হলেন। জয়ন্ত তো বেরিয়ে গেল যেন একটু আগে, একা ঘরে বসে কি করছে বৌ? তখন নিজেই ওপরে উঠে গেলেন।

—বৌমা—বলে পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতেই তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করে পালিয়ে এলেন। জয়ন্ত যে আবার কখন ঘরে ফিরে এসেছে অথবা মোটেই বেরোয়নি তা বুঝতে পারেননি। তাহলে কি আর ও ঘরের ত্রিসীমানা মাড়াতেন? ছি ছি এত বয়েস হল তবু ছেলেমানুষী গেল না। লাজ-লজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়ে বসেছে ওরা? এই দিনের বেলায় ঢলাঢলি আর হাত নিয়ে টানাটানি!

রাগে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল রাধারাণীর। সে সন্ধ্যায় তিনি আর রান্নাঘরে গেলেনই না। বৌ অবশ্য তখনই নেমে এসেছিল, কিন্তু বৌয়ের মুখ দেখতে তাঁর আর ইচ্ছে হচ্ছিল না।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বাললেন না। অন্য সময় মাঝে মাঝে শরীর একটু আধটু অসুস্থ হলে—একটু আধটু মাথা ধরলে রাধারাণী এমনি চুপচাপ এসে অন্ধকারে তাঁর এই ছোট্ট ঘরে শুয়ে থাকেন। সেই সময় ঐ বৌমাই আসে, কাছে বসে। তপ্ত ললাটে হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে ডাকে—মা! সে কণ্ঠস্বরে রাধারাণীর সব সন্তাপ দূর হয়ে যায়।

কিন্তু আজ তেমন কেউ এল না। আসবে না তা রাধারাণী জানেন। বৌ লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু এ লজ্জা কি মনের? না, চক্ষুলজ্জা মাত্র? চক্ষুলজ্জাই সম্ভবতঃ। কারণ এ যুগটাই হচ্ছে নির্লজ্জের যুগ—বেহায়াপনার যুগ। শুধু তাঁর পুত্রবধূ কেন, প্রায় সব ঘরেই আজ লজ্জার ঠাঁই নেই। তাদের কথাবার্তা, তাদের কাপড় পরার ভঙ্গী সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আজ লজ্জাহীনতাই বড়ো সভ্যতা,—উঁচু আদর্শ হয়ে উঠেছে।

আধুনিকতার নাম করে তারা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। তা না হলে মাথার ওপর শ্বশুরে শাশুড়ী থাকতেই ছেলেমেয়েগুলোকে ফেলে বৌ দিব্যি সেজেগুজে সবার সামনে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে এমন একটা কাজ সেরে আসতে পারল! নিষ্কণ্টক ভোগবিলাসের ওপর এত নেশা?

লাজলজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়ে বসেছে ওরা?

অথচ—অথচ তাঁদের সময় কি ছিল? ধীরে ধীরে রাধারাণীর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। ফিরে গেলেন তাঁর বধূজীবনে। স্বামীর সোহাগ তিনিও বড় কম পাননি। কিন্তু সোহাগের যা কিছু ভার তা তাঁকেই বহন করতে হয়েছে বেশি। একটির পর একটি সন্তান এসেছে—তাদের অনেকগুলিই অবাঞ্ছিত। যখনই সন্তানসম্ভাবনা বোঝেছেন তখনই শিউরে উঠেছেন। এমনিতেই ছেলেমেয়েগুলি বড় হয়নি, তার ওপর আবার একটা আসছে। নিজের কষ্ট—রাত জাগা—অসুখ বিসুখে চিন্তা ছাড়াও এতগুলিকে মানুষ করতে হবে সে চিন্তাও তাঁর ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না কিছু। তাই স্বামীর সোহাগকে তিনি সোহাগ বলে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেননি। ও যেন আদিম বর্বর পুরুষের দণ্ড নিরীহ অসহায় ক্রীতদাসী স্ত্রীর ওপর।

ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠলেন রাধারাণী। উঃ, সে একদিন গিয়েছে—কালো অন্ধকারের যুগ।

ছেলেমেয়েতে তাঁর মোট এগারোটি হতে পারত। সব কটিকে মানুষ করে তোলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল—যদিও তাদের বাপ ছিল সেদিক দিয়ে উদাসীন। কিন্তু বোধহয় একটাকেও মানুষের মতো মানুষ করা হয়নি—। অযত্নে অশ্রদ্ধায় অবহেলায় অসময়ে কতকগুলো গেল নষ্ট হয়ে, কতকগুলো গেল মরে। তাদের জন্যে কেবল ভগবানের ওপর দোষ দিলে মনকে ভোলানো হয় কিন্তু সত্যকে সম্মান দেওয়া যায় না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এই অন্ধকার নির্জন কক্ষে তাঁর চোখের সামনে সহসা একটি শিশুমুখ ভেসে উঠল। চার বছর বয়েস। মিষ্টি মুখখানি। মায়ের কোল ছেড়ে এক পা দূরে থাকত না। ঘুমোবার সময় পাছে তার মা চলে যায় তাই মায়ের কাপড়টি শক্ত করে ধরে থাকত। সে কঠিন মুষ্ঠি কখন যে শিথিল হয়ে যেত শিশু তা টের পেত না।

হঠাৎ সেবার শীতের মুখে ছেলেটা ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। জ্বরও হয়েছে যেন। মুখ থেকে লালা ঝরতে লাগল। বার বার মায়ের কাছে এসে ঘুরতে লাগল—বার বার গলায় হাত দিয়ে দেখাতে লাগল ব্যথা। কিন্তু মায়ের তখন সেদিকে মনোযোগ দেবার উপায় নেই। তাঁর নিজের শরীরই খারাপ। আসন্নপ্রসবা। আজ কালের মধ্যেই হবে। ছেলেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেই যে তাকে দূরে সরিয়ে নিল আর সে কাছে আসেনি—সরে গেল সেই রাত্রে যে রাত্রে হল তাঁর ঐ ছোটো মেয়ে বুলা।

সে তো আজ অনেক দিন আগের ঘটনা। আজ আবার সেই মমতায় মাখা অভিমানী ছেলের মুখখানি মনে পড়তেই তাঁর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কেউ একবার সেদিন ছেলেটাকে ভালো করে লক্ষ্যও করল না—একবার ডাক্তারও দেখালো না। এই যে মৃত্যু এর জন্যে কি কেবল ভগবানকেই দায়ী করা চলে?

না, না, ব্যর্থ হয়েছে তাঁর নারী-জীবন—এই ক্রীতদাসীর জীবনও জীবনকে তিনি শুধু বহন করেই এসেছেন—আজকের এদের মতোন সুন্দর করে উপভোগ করতে পারেননি। সুখী একালের মেয়েরাই—সুখী ঐ রাণুর মতো বুদ্ধিমতী জীবনরসিক নির্লজ্জ মেয়েরাই। ওরাই যৌবনকে জীবনের মধ্যে বন্দী করে বরণ করে ভোগ করে যাচ্ছে। ওদের কাছে আজ তাঁর সব দিক দিয়ে পরাজয়—সব দিক দিয়ে।

সেই অন্ধকার ছোট ঘরখানিতে একা শুয়ে নিজের বিগত জীবনের জন্যে এই প্রথম শোক পেলেন রাধারাণী। চোখে তাঁর একফোঁটা জলও দেখা দিল না।

ডিসেম্বর মাসে অনেকগুলি সম্মিলিত ও একক চিত্র-প্রদর্শনীর ভিড়ে কলকাতার প্রদর্শনী-কক্ষগুলির প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছিল। আমরা এই প্রদর্শনীগুলির সঙ্গে তাল রেখে চলার মত স্থান সংকুলান করতে পারিনি। ফলে, 'অমৃতের' পৃষ্ঠায় অনেক চিত্র-প্রদর্শনীই এখনো অনালোচিত রয়ে গেছে। এবার তারি কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। আশা করছি আগামী দু' একটি সংখ্যার মধ্যেই আমরা বাকী অন্যান্য চিত্র-প্রদর্শনীর আলোচনা শেষ করে চলতি প্রদর্শনীর কথা 'অমৃত' পাঠকদের কাছে পরিবেশন করতে পারবো।

২৩ নং চিত্র—শিল্পী: হেরমানস্কা

প্রদর্শনী

কলারসিক
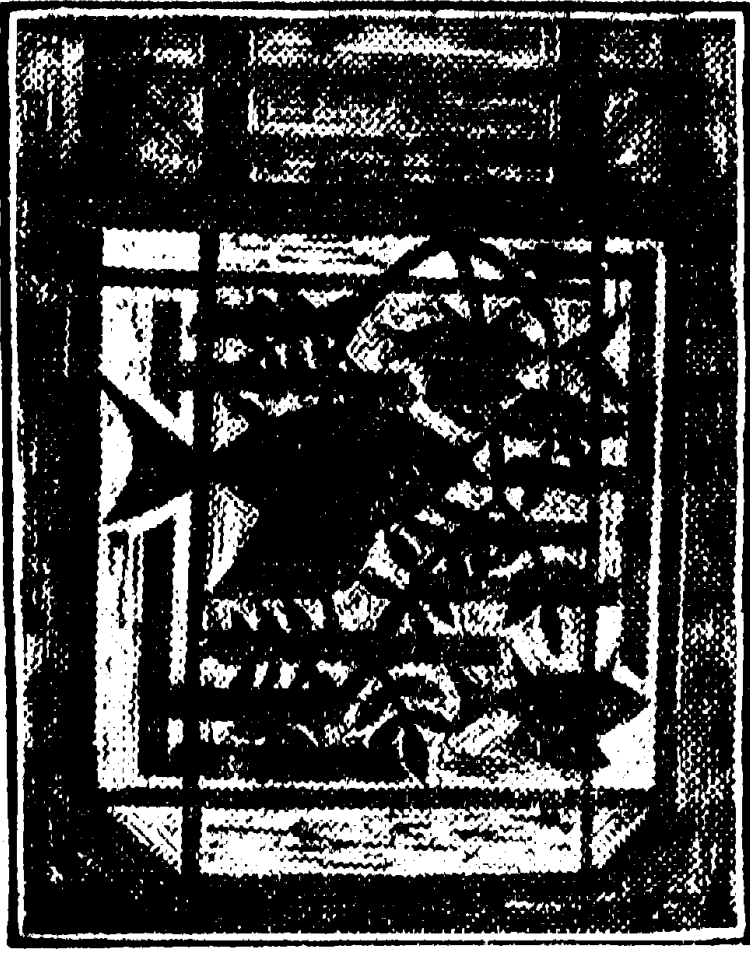
॥ চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাফিক শিল্প প্রদর্শনী ॥

গত ২রা জানুয়ারী থেকে আর্টিস্ট্রি হাউসে 'সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্ট'-এর উদ্যোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাফিক শিল্পের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়ায় গ্রাফিক শিল্পের যে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে ৮০টি প্রিন্ট-সম্বলিত এই প্রদর্শনীতে তার একটি বিশেষ ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সোসাইটির সভ্য শ্রীঅজিত চক্রবর্তী চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে এই প্রিন্টগুলি সংগ্রহ করেন। প্রদর্শনীতে উডকাট, উড-এনগ্রেভিং, লিনোকাট, লিথোগ্রাফ, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট ইত্যাদি গ্রাফিক আর্টের প্রায় সব কটি মাধ্যমের নিদর্শনই রাখা হয়েছে। যাঁদের ছবি প্রদর্শনীতে দেখা গেল তাঁরা প্রায় সকলেই পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পরীতি অনুসৃত হয় তা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের কাজে আধুনিক ফরাসী এবং অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশের শিল্প-রীতির প্রভাবই সুস্পষ্ট। এঁদের অধিকাংশই শিক্ষালাভ করেছেন প্রবীণ শিল্পী ভ্ল্যাদিমির পুকুল্ এবং কারেল্ স্ভোলিন্স্কির কাছে।
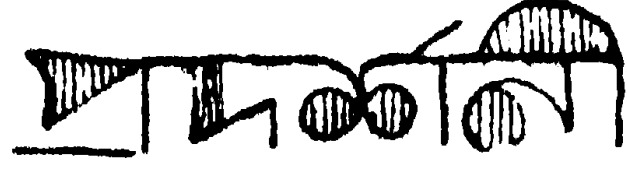
প্রথমেই প্রফেসর পুকুল্-এর কাজগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁর উড এনগ্রেভিংগুলি (৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯) অনবদ্য সৃষ্টি। দুটি ধর্মমূলক ছবির ফিগার ড্রইং তাকিয়ে দেখার মত। আর (৪৬) নম্বরের ছবির মত টোন উড-এনগ্রেভিং-এ, সচরাচর দেখা যায় না। এঁর (৪৪) নম্বরের মেজোটিন্টটিও ফিগার ড্রইং-এর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী ড্রাফটস্ম্যানদের কথা মনে পাড়িয়ে দেয়। প্রদর্শনীতে মেজোটিন্টের কাজ এই একটিই আছে। এছাড়া প্রফেসর পুকুল্-এর চারটি এচিং (৪০, ৪১, ৪২, ৪৩) এবং একটি ধাতুর ওপর এনগ্রেভিং (৪৫) প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক কারণে এঁকে প্রাহার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট-এর শিক্ষকতা ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অক্লান্তভাবে শিল্প-সৃষ্টির কাজে লেগে আছেন।
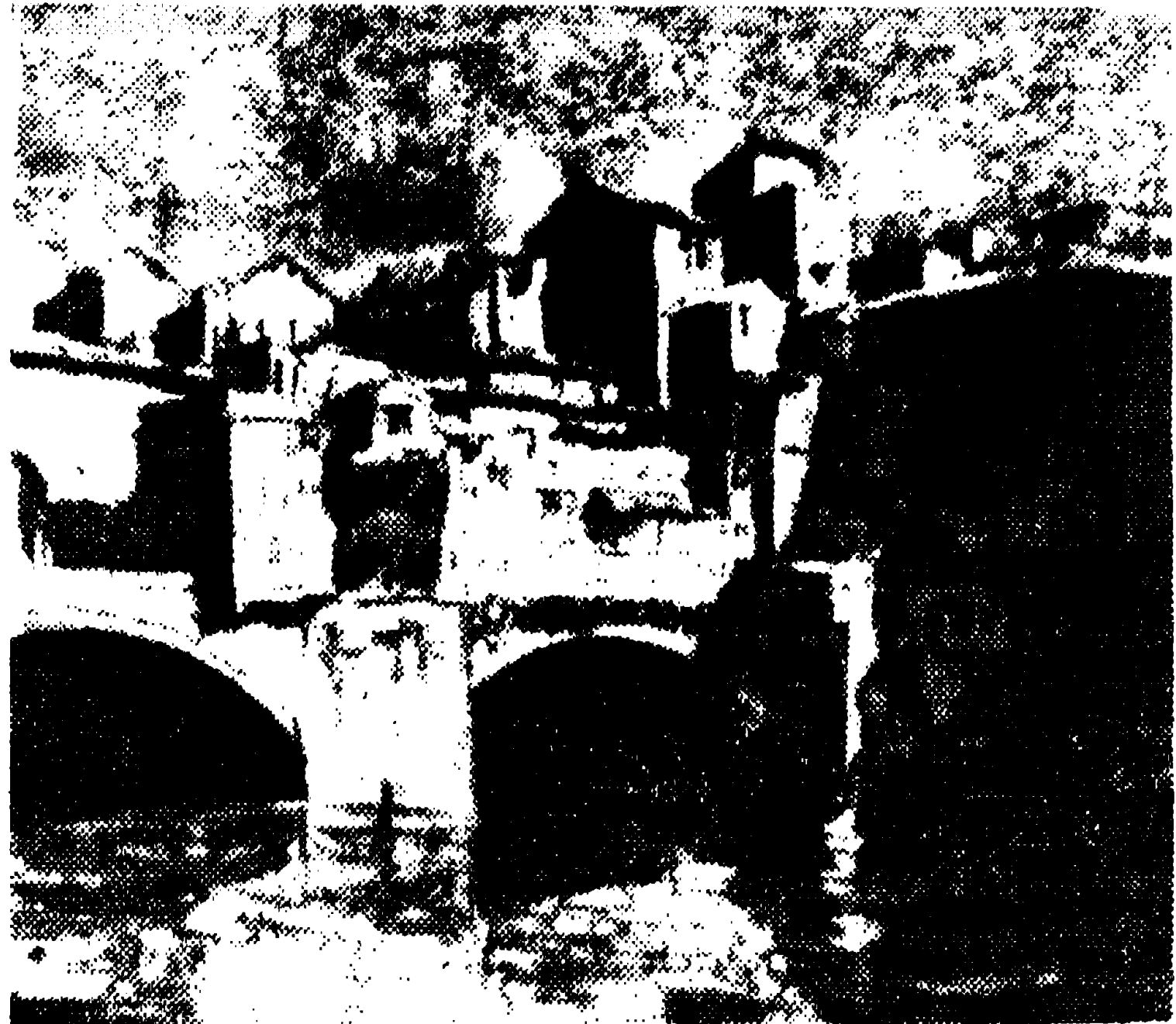
প্রফেসর পুকুল্-এর সমবয়সী হলেন কারেল স্ভোলিনস্কি। প্রাহার হাইস্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর ইনি শিক্ষক; এনগ্রেভিং-এ সুদক্ষ। চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকশিল্পের প্রভাব এঁর ওপর বেশী। এঁর একটি চমৎকার স্টোন এনগ্রেভিং (৬৩), একটি লিথো-গ্রাফ (৬৪) এবং কয়েকটি উডকাট প্রদর্শিত হয়েছে। আধুনিক শিল্পরীতির আভাস এঁর ছবিতে পাওয়া যায়।

এঁদের পর আর যে সব শিল্পীদের কাজ দেখানো হয়েছে তাঁদের সকলকেই প্রায় তরুণ বলা চলে। ১৯২০-এর পূর্বে এঁদের কারো জন্ম হয়নি। এঁদের সকলের ওপরই আধুনিক ফরাসী-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। হানা উরবানোভার পোর্ট্রেটটি (৭০) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁর দুখানি ড্রাই-পয়েন্টে (৭৪, ৭৫) এক বিচিত্র মাধুর্যের সন্ধান মেলে। লুবোমির প্রিবিল্-এর এচিংগুলি (৩৭, ৩৮, ৩৯) বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা। এঁর কাজেও চেকো-শ্লোভাকিয়ার লোক-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। জোসেফ দুখন-এর দুটি উড-কাট (২২, ২৯) রবীন্দ্রনাথের আঁকা মুখোসগুলির কথা মনে পাড়িয়ে দেয়। বেশ বলিষ্ঠ লাগল এঁর কাজ। ফ্রান্টিসেক পেটেরকার উডকাটগুলির সৌন্দর্য দেখা গেল নকশার বাহুল্য বর্জনে। এঁর এবং আরো দু-একজনের কাজে গোগাঁর উড-কাটের কিছুটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ভেরা হেরমানস্কার রঙীন লিনোকাট-গুলির প্যাটার্ণ এবং বর্ণসমাবেশ (২৩

৪৬ নং চিত্র—শিল্পী: ভ্ল্যাদিমির পুকুল্

২৪, ২৫) নয়নতৃপ্তিকর। মিণ্টি হাতের কাজ। এনগ্রেভিং-এর যন্ত্রে খোদাই করার ফলে অনেক পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম রেখা আনা হয়েছে। ফ্রান্টিসেক বুরান্টের ড্রাইপয়েন্টগুলির মধ্যে (১৫) এবং (১৯) নম্বরের কাজ বেশ জোরাল। এচিংয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কয়েকজন কাজ করেছেন। তার মধ্যে (৪, ৫৪, ৫৫) সংখ্যক ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। অনেকের কাজে আবার কেবলমাত্র আঙ্গিকের প্রাধান্যই লক্ষ্য করা গেল। প্রদর্শনী সাজানটি সুন্দর। এর আয়োজনের জন্যে সোসাইটি ধন্যবাদার্হ। আশাকরি আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীরা চেকোশ্লোভাকিয়ার থেকে পিছিয়ে থাকবেন না।

।। শ্রীগোষ্ঠ কুমারের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

শ্রীগোষ্ঠ কুমার তরুণ শিল্পী। আঠারোখানি তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ও বারোটি ভাস্কর্যের নিদর্শন নিয়ে এই শিল্পী তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে। শ্রীগোষ্ঠ কুমারকে আমরা এককালে ভাস্কর্য-শিল্পীরূপেই চিনতাম কিন্তু এই প্রদর্শনী তাঁর অন্য পরিচয়ও তুলে ধরেছে আমাদের কাছে। এবার আমরা বলতে পারি : শ্রীগোষ্ঠ কুমার চিত্র-শিল্পীরূপেও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। তবে একটা কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীগোষ্ঠ কুমার ড্রয়িং সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন কিন্তু যেহেতু তিনি ড্রয়িং আয়ত্তে এনেছেন সেই হেতু কি শুধু দৈহিক অবয়বকে ভেঙে জ্যামিতিক প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেই 'আধুনিক' শিল্পীরূপে নিজের পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হবেন, না শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে এ-যুগের জীবন-যন্ত্রণাকে চিত্রায়িত করতে অগ্রসর হবেন? সোজা কথায় গোষ্ঠ কুমারের মতো প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীর কাছে আমরা শুধু আঙ্গিক-সর্বস্বতা আশা করিনে। আমরা এমন বক্তব্য বা বিষয়কে চাই যার চিত্ররূপ দেখে আমাদের হৃদয়-মন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আলোড়িত হয়। আমরা যেন বলতে পারি : দ্যাখো, দ্যাখো, এই শিল্পী আমাদের সীমিত কল্পনাকে কেমন স্বচ্ছন্দে দূর থেকে দূরে প্রসারিত করে বাস্তবের বিমূর্ত চেতনায় বিধৃত করেছেন।

মূলতঃ এই প্রদর্শনীতে গোষ্ঠ কুমার আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জগতে নিয়ে যেতে

ভাস্কর্য (১)—শিল্পী : গোষ্ঠকুমার

পারেননি। তবু তাঁর অনেকগুলি চিত্রের সংস্থাপন, বলিষ্ঠ বিন্যাস-কৌশল, রঙ প্রয়োগের দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। ১নং চিত্রটির বেহালাবাদনরতা নারীমূর্তির চমৎকার অবয়ব বিভাজন, উজ্জ্বল রঙের বিলেপন, ৬নং চিত্রের চারটি খণ্ডিত মূর্তির সাহায্যে একটি পরিবারের কম্পোজিশান কিংবা ১৫নং চিত্রের সাদা, কালো লাল ও হলুদ রঙে চিত্রিত মুখোমুখী বসা, দুটি নারী-মূর্তির রচনা-কৌশল লক্ষ্য করলে গোষ্ঠ কুমারের ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান হওয়া যায়। এই আস্থার ভাব তাঁর ভাস্কর্যমূর্তিগুলি দেখলে আরো দৃঢ় হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাস্কর হিসাবে গোষ্ঠ কুমার অনেক বেশি পরিণত। এখানে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে বিমূর্ত শিল্প-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তা' তাঁর চিত্রকলা অপেক্ষা অনেক বেশি সুন্দর। ভাস্কর্যের নিদর্শনরূপে মা'র বুকে সন্তান (২নং), পাঠরতা দুটি নারী (৯নং), কিংবা উজ্জ্বল মাটির ১নং ভাস্কর্যের নিদর্শনটি প্রতিটি দর্শকের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা এই তরুণ শিল্পীর কাছে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত শিল্পের জগৎ প্রত্যাশা করি। শ্রীগোষ্ঠ কুমার আমাদের আশা পূর্ণ করুন—এই কামনা নিয়েই তাঁকে আজ অভিনন্দন জানাই।

।। শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

আর্টিস্ট্রি হাউসের এক পাশে যখন শ্রীগোষ্ঠ কুমারের প্রদর্শনী চলছিল ঠিক সেই সময় অন্য পাশের তিনটি কক্ষ জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী। শ্রীমতী রায়েরও এটি প্রথম একক প্রদর্শনী।

শ্রীমতী রায় কোনো অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নন। অল্প কিছুকাল

হিমালয়—শিল্পী : সুচন্দ্রা রায়

তিনি শিল্পী মাখন দত্তগুপ্তের ছাত্রী ছিলেন। পরে একক প্রচেষ্টায় তিনি শিল্প-সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। তাঁর সেই সাধনার ধন ৫০খানি চিত্র নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতার কলারসিকদের সম্মুখে। আধুনিক রীতি-নীতির কোনো চিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখিনি। তিনি প্রথাগত শিল্পী। সহজ-সরলভাবে আমাদের চেনা-জানা মানুষ ও জগৎকে তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। আর এই চেষ্টায় যে তিনি অনেকখানি সফল হয়েছেন এ-কথাও স্বীকার্য।

শ্রীমতী রায়ের কয়েকখানি প্রতিকৃতি ও নিঃসর্গ চিত্র আমার ভাল লেগেছে। এর মধ্যে 'রেড কার্ডিগান' (১৭নং) ও একটি ন্যুড স্টাডি (২নং) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'রেড কার্ডিগান'-এ যে সুন্দর প্রতিকৃতি চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন অন্যান্য প্রতিকৃতি চিত্রগুলি সেই তুলনায় নিষ্প্রভ। এত অসম শিল্পমান এক শিল্পীর হাতে কি করে সম্ভব হলো তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার এইজন্যই বোধহয় প্রয়োজন রয়েছে। যা হোক, শ্রীমতী রায়ের 'পিসফুল কান্ট্রিসাইড (১নং), 'ভিলেজ রিক্রিয়েশান' (২৯নং) ও 'আফটার দি স্নো ফল' (৪২নং) নিঃসর্গ চিত্র হিসাবে মন্দ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রঙের ঔজ্জ্বল্য একটু কম হলে বোধহয় আরো ভাল এফেক্ট সৃষ্টি করা সম্ভব হত।

একক প্রচেষ্টায় শ্রীমতী রায় যেটুকু করেছেন তার জন্য তাঁকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো। পরবর্তীকালে তিনি আরো ভাল চিত্র আমাদের উপহার দিন, আজ শুধু এইটুকুই তাঁর কাছে প্রত্যাশা করছি।

।। শ্রীচিন্ময় চৌধুরীর চিত্র-প্রদর্শনী ।।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আর্টিস্ট্রি হাউসে যে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেটি ছিল শিল্পী চিন্ময় চৌধুরীর চিত্র-প্রদর্শনী। এটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে। এই প্রদর্শনীটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ একজন শিল্পী কোনো অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে অত বড় ক্যানভাসে তৈল-রঙের মতো কঠিন মাধ্যমে প্রায় নির্ভুলভাবে চিত্রের আকারকে প্রয়োগ করার দক্ষতা দেখিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই আলোচনার প্রথমে শিল্পী গোষ্ঠ কুমারের কাছে আমরা যে যন্ত্রণা-জর্জর জীবনকে আধুনিক শিল্পীর বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছি, শিল্পী চিন্ময় চৌধুরী চিত্রের বিষয়বস্তুর নির্বাচনে সেই চেতনার অনেকখানি পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, ব্যথা-বেদনা আর আনন্দ শিল্পীর তুলির টানে, বলিষ্ঠ রচনায়, রঙ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্ততঃ তাঁর 'গ্যাম্বল' চিত্রে (২নং) জীবনের জুয়া-খেলায় মত্ত নর-নারী কিংবা 'সিকনেস' (১৫নং) চিত্রে উলঙ্গ-সভ্যতার প্রচণ্ড রূপায়ণ দেখে এই শিল্পীর কল্পনা-প্রতিভাকে স্বীকার করে নিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। এই কল্পনা-প্রতিভার দৈন্যই ইদানীং কালের আধুনিক শিল্পীদের সব চেয়ে বড় দৈন্য। এরি অভাবে অনেক দক্ষ শিল্পীও দর্শক-মনে সাড়া জাগাতে পারেন না। শ্রীচৌধুরীকে এই দুর্লভ বস্তুটির অধিকারী দেখে আমরা আনন্দিত।

শ্রীচৌধুরীর সর্বমোট ১৬ খানি চিত্র ছিল এই প্রদর্শনীতে। কয়েকটি শুধু conflicting রঙের কম্পোজিশান।
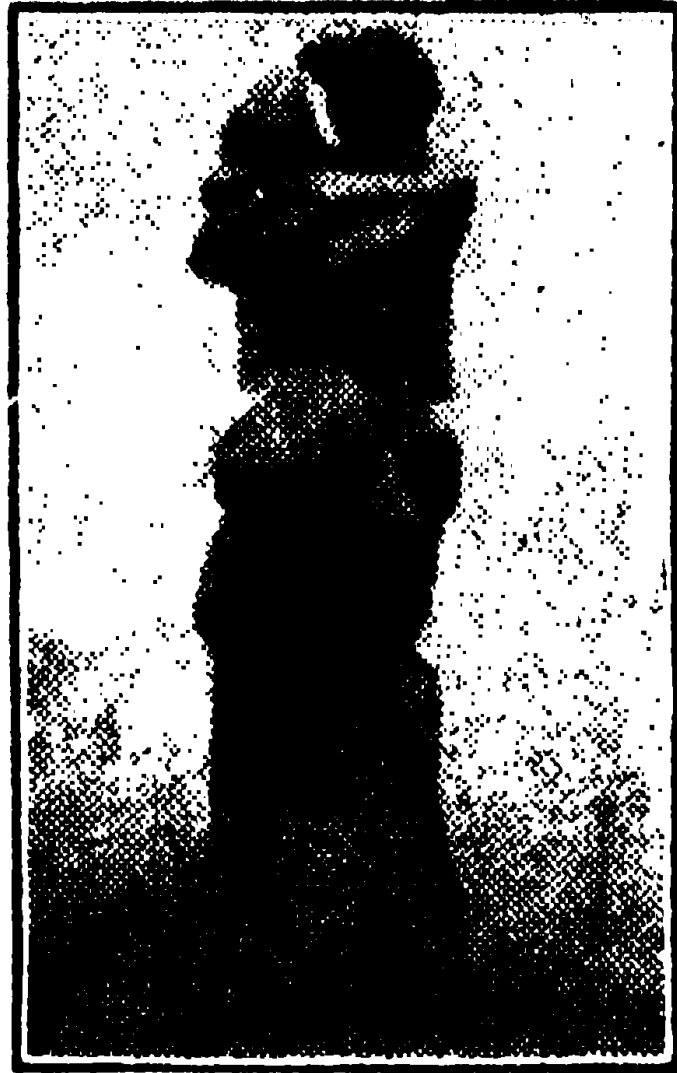
আলিঙ্গন (ভাস্কর্য)—শিল্পী : চিত্ত সিংহ

এগুলির চিত্রধর্মীতা অস্বীকার করিনে কিন্তু ঐ রঙের প্লাবন কিংবা বৈপরীত্য দর্শন করে নয়ন তৃপ্ত হয়, মন কিন্তু ভরে না। এ-সব সত্ত্বেও শ্রীচৌধুরী আমাদের যা দিয়েছেন তার মূল্য কম নয়। তাঁর 'ওল্ড স্কীম' (৫নং) চিত্রের মুখোমুখী বসা দুটি নর-নারীর প্রেমময় রূপের চমৎকার কম্পোজিশান কিংবা 'লাইফ ইন ব্লীক' (১নং) চিত্রের আনন্দিত চিত্র-সৌন্দর্যও আমাদের ভাল লেগেছে। শিল্পী চৌধুরীর এই যে সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টি তা আরো বিকশিত হোক। এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনী দেখার জন্য আমাদের অসীম আগ্রহ রইলো।

।। শ্রীচিত্ত সিংহের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

শ্রীচিত্ত সিংহের শিল্প-কর্ম সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। ১৯৬১ সালের ২৩শে জুন তাঁর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী দেখে আমরা তাঁকে বলেছিলাম 'রবীন্দ্র-চিত্রকলার উত্তরসাধক'। তাঁর অশিক্ষিত পটুত্বের সেই চিত্রাবলী কলকাতার কলারসিকেরা সেদিন নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

এবার শ্রীসিংহ তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন যথাক্রমে চৌরঙ্গী টেরাসে ও মহাবোধি সোসাইটি হলে। এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল শিল্পীর ৪২টি নতুন চিত্র-নিদর্শনসহ মোট ৭৫ খানি চিত্র ও ৫টি ভাস্কর্যের সুন্দর নমুনা। শিল্পী তাঁর জগৎকে ভাস্কর্য-কলার মধ্যেও যে বিস্তৃত করেছেন এই নতুনতর পরিচয় পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি।

শিল্পীর নতুন চিত্রকলা তাঁর পূর্ব-প্রদর্শিত চিত্রেরই স্মৃতিবহ। এবার তৈল-রঙের মাধ্যমকেও শিল্পী প্রয়োগ করতে সাহসী হয়েছেন। এবং এই মাধ্যমে রচিত তাঁর গোলাপ ফুলের স্টীল চিত্রটি (১নং), বিষণ্ণ-বদনা (৫নং) তানপুরা হাতে নারী (৩৬নং) বলিষ্ঠ রেখায় ও চমৎকার বর্ণ-লেপনে খুবই ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। জল-রঙ ও প্যাস্টেলের মাধ্যমে অঙ্কিত তাঁর অনেকগুলি চিত্রও আমাদের ভাল লেগেছে। শ্রীসিংহের বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনা এই সব চিত্রের সর্বাঙ্গে বিদ্যমান। কিন্তু এই একই পথে বারংবার পরিক্রমা আমি অন্ততঃ সমর্থযোগ্য মনে করছি না। যে-অর্থে আমরা তাঁকে 'রবীন্দ্র-চিত্রকলার উত্তরসাধক' রূপে চিহ্নিত করেছিলাম আশা করি, তিনি তাঁর স্বরূপে যথার্থ উপলব্ধি করে আরো নতুন পথে নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী হবেন। তাঁর যখন শিল্পী হিসাবে দৃঢ়প্রত্যয়, দক্ষতা আর কল্পনা করার ক্ষমতা আছে তখন তিনি শুধু একই বৃত্তে ঘুরপাক খাবেন কেন?

অবশ্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ এই বৃত্ত ভাঙ্গারই সূচনা। এখানে তিনি আলিঙ্গনরত প্রণয়ী-যুগলের (১নং) যে বিমূর্ত ভাস্কর্য-সৌন্দর্য আমাদের উপহার দিয়েছেন কিংবা বাবা দাঁড়িয়ে আছে আর মা ছেলেকে টানছে (২নং) তার যে চমৎকার গতিশীল ভাস্কর্য মূর্তি সৃষ্টি করেছেন তা দেখে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হয়েছে, শ্রীসিংহ একেবারে মরশুমী ফুল নন, অথবা তাঁর প্রথম প্রদর্শনী দেখে, আমরা ভ্রান্তিবশে প্রলাপ বাণীও উচ্চারণ করিনি। তাই এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রীসিংহ সম্বন্ধে আমরা এখনো অনেকখানি আশা পোষণ করছি। শ্রীসিংহ কি আমাদের সেই আশা পূর্ণ করবেন না?

॥ চীনের দাবী ॥

পিকিং বেতারকেন্দ্র থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট এলাকার এক হাজার বর্গমাইল ভূখন্ডের ওপর দাবী জানানো হয়েছে। দাবীর সমর্থনে কমিউনিস্ট চীনের বক্তব্য হ'ল, ঐ এলাকা তার রাষ্ট্রসীমানার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতার সমস্বার্থে কমিউনিস্ট চীন ও পাকিস্থান আজ পরস্পরের বন্ধু এবং এই বন্ধুত্বকে দৃঢ়তর করে তোলার প্রয়াস উভয়পক্ষ থেকেই রয়েছে। এ অবস্থায় পাকিস্থান সত্যিই যদি চীনের দাবীমত কিছুটা কাশ্মীরের অংশ ছেড়ে দেয় তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না। কারণ পাকিস্থানের তাতে লাভই হবে। পরের জমি বিলিয়ে দিয়ে সে একটি শক্তিশালী ভারত-শত্রুর সখ্য লাভ করবে। তাছাড়া কাশ্মীরের ওপর একজন ভাগীদার এইভাবে দাঁড় করাতে পারলে পূর্ণ কাশ্মীরের পুনর্মুক্তি ভারতের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পাকিস্থানের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভারতের পক্ষে এই ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের দাবী তাই এই ভাগ-বাঁটোয়ারার কাজ বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই জোরালো করে তোলা দরকার।

॥ চরম-পত্র ॥

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডঃ সুকর্ণ ৯ই জানুয়ারী ওলন্দাজ সরকারকে এক চরম পত্র দিয়ে জানিয়েছেন, আর দশদিন মাত্র তিনি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে অপেক্ষা করবেন। যদি কোন মীমাংসা তার মধ্যে না হয় তবে নিরুপায় হয়েই ইন্দোনেশিয়াকে পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির জন্য অস্ত্রধারণ করতে হবে। অর্থাৎ আগামী ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে ওলন্দাজ সরকার, যদি স্বেচ্ছায় পশ্চিম ইরিয়ান ত্যাগ না করে তবে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে তাকে পশ্চিম ইরিয়ান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

দেশে বিদেশে
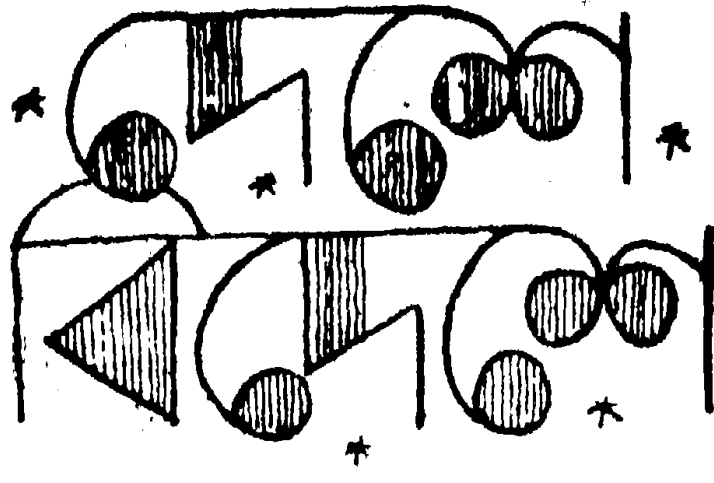
ঐ চরমপত্র যে নিছক ফাঁকা কথা নয় তাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে ডঃ সুকর্ণ ত্রুটি করেননি। পরের দিনই পনের হাজার ছাত্রের এক বিরাট সমাবেশে তিনি পরবর্তী পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বলেছেন, প্রথমে ইরিয়ানের নিকটতম দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ সেলিবিসের মাকাসারে পশ্চিম ইরিয়ানের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে। তারপর ইন্দোনেশিয় বিমানবাহিনীতে ছয়টি আঞ্চলিক কমান্ড গঠন করা হবে। ডঃ সুকর্ণ বলেছেন, পশ্চিম ইরিয়ান দখলের জন্যে ঐ শক্তিই যথেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রবীণ অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ এমনকি ডঃ সুকর্ণের ব্যক্তিগত দপ্তরের কর্মচারীরাও সামরিক শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেছেন। ঐ সভাতেই তিনি আবেগময়ী ভাষায় বলেছেন, ১৯৬২ সালের মধ্যে পশ্চিম ইরিয়ান অবশ্যই ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, আর আমরা আলোচনা চাই না। পরিশেষে ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন—আসুন আমরা পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করি।

আজীবন মুক্তিযোদ্ধা ডঃ সুকর্ণের এই বলিষ্ঠ কন্ঠের দাবী ও আবেগভরা আহ্বান যে ফাঁকা কথা নয় তা ওলন্দাজ সরকার বা তার পশ্চিমী দোস্তরা না বুঝলেও একদা-পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে আমরা বুঝি। সুতরাং পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির আসন্নতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। তবে দুঃখ এই যে, গোয়ার ব্যাপারেও পশ্চিমী শক্তিদের কোন শিক্ষা হল না। দস্যুস্বার্থে অন্ধ উপনিবেশী শক্তিগুলি আজও বুঝল না যে, তাদের রক্তচক্ষুকে মিথ্যা ভয় করার দিন শেষ হয়েছে। এই-ভাবে অন্যায়ের প্রতিকার করতে আজ যে ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হচ্ছে, নিঃসন্দেহে তার ফলে রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিই ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক অশুভ শক্তিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ যদি তার কর্তব্য পালন না করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থে অন্য দেশগুলিকে এইভাবে উপেক্ষা করে তবে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের পরিণতি জাতিসংঘের পরিণতিরই অনুরূপ হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর তার জন্যে ভবিষ্যতের ইতিহাস নিশ্চয়ই মুক্তিকামী দেশগুলিকে দায়ী করবে না।

॥ নেপালে অভ্যুত্থান ॥

নেপালে গণবিক্ষোভ ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য ও দুর্নিবার হয়ে উঠছে। বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ দমনের ব্যাপারে রাজা মহেন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা নেই, প্রয়োজন হলে, শত সহস্র নেপালবাসীকে বন্দী বা হত্যা করতেও তাঁর স্বৈরশাসন দ্বিধাবোধ করবে না। তবুও বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে, এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে যেটা সবচেয়ে বড় সুখবর, নেপালের পুলিশ এবং বহুক্ষেত্রে নেপালের সৈন্যরাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। নামমাত্র বাধা দিয়েই পূর্ব নেপালের ছয়টি পুলিশ-চৌকির প্রহরীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়েছে। এ অবস্থায় জনসমর্থনশূন্য নেপালের স্বৈরশাসনের

পক্ষে দিশাহারা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে তারা ইতোমধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছে যে এই বিদ্রোহ ভারতের সমর্থনপুষ্ট। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য এ কথার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নেপালের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই ভারত হস্তক্ষেপ করবে না। ভারত এপর্যন্ত শুধু কিছু আত্মগোপনকারী নেপালী বিদ্রোহীকে ভারতে অবস্থানের সুযোগ দিয়েছে, যে সুযোগ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত দিতে বাধ্য।

নেপালের ব্যাপারে ভারতের নীতি আরও স্পষ্ট হওয়াতে কোন বাধা নেই। ভারত আজ স্পষ্ট ভাষায় একথা বলতে পারে যে, গণসমর্থনহীন নেপালী শাসন আজ সম্পূর্ণরূপে সম্প্রসারণবাদী কমিউনিস্ট চীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই চীন ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূমি জোর করে দখল করেছে এবং আরও কয়েক হাজার বর্গমাইল জমির উপর তার লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। এ অবস্থায় ভারত কোনমতেই তার প্রতিবেশী ক্ষুদ্ররাষ্ট্র নেপালে চীনের প্রভাব বিস্তৃত করার সুযোগ দিয়ে নিজের বিপদ বাড়াতে পারে না। সুতরাং নেপালের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে রাজ্যের সাধারণ মানুষের দাবী সমর্থনের পূর্ণ অধিকার ভারতের আছে। পূর্বেও ভারত নেপালের গণ-অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছে, এবং করেছে বলেই রাজা মহেন্দ্রের পক্ষে আজ নেপালের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়া সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আজ ভারতের সমর্থন বা সহযোগিতাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে নিন্দা করা অন্ততঃ রাজা মহেন্দ্রের পক্ষে শোভা পায় না।

॥ ঔদ্ধত্য ॥

গোয়া মুক্ত হয়েছে এবং ঐ ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশটির সাত লক্ষ মানুষ সাড়ে চারশ বছরের নিষ্ঠুর শাসন থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য ভারতের মুক্তিফৌজকে প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছে। গোয়ার অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীও ইতিমধ্যে ভারতীয় সংবিধান ও ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়েছেন। কিন্তু পর্তুগীজ আমলের প্রধান বিচারপতি মিঃ ইসমাইল গ্রেশান, এটর্ণি জেনারেল মিঃ জোস কুষাদ্রাস ও অন্য একজন বিচারপতি রাষ্ট্রপতি ও সংবিধানের নামে নতুন করে শপথ জানাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, গোয়ার উপর ভারত সরকারের অধিকার আইনস্বীকৃত নয়, ভারতের সংবিধান এখনও পর্যন্ত গোয়ায় প্রবর্তিত হয়নি। গোয়া এখনও ভারতের সৈন্য শাসনাধীন, অতএব ভারতের রাষ্ট্রপতি বা সংবিধানের প্রতি আইনসম্মতভাবে তাঁরা আনুগত্য জানাতে পারেন না। এই অজুহাতের উত্তরে বলা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করেছে এবং প্রতি মুহূর্তেই তারা ভারত সরকারের আজ্ঞাবহ। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হলে আজই ঐ সৈন্যবাহিনী গোয়া ত্যাগ করে চলে আসবে। সুতরাং গোয়ার শাসনদায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে না থেকে সৈন্যবাহিনীর হাতে আছে একথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। গোয়ায় যে আজ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা চালু আছে তাকে অস্বীকার করার অর্থ ঐ শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থারই বিরোধিতা করা। বলা বাহুল্য, আইনের প্যাঁচ তুলে যারা আজ গোয়ার ভারতের শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ঐ। গোয়ায় নতুন করে অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে প্রাক্তন উপনিবেশী শাসকদের ঐ সকল অনুগৃহীতরা পুরাতন প্রভুদেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে এবং সেইটাই হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পুঁজি। স্বাধীন গোয়ায় যে তাদের পক্ষে বসবাস করা চলবে না এটা তারা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভারত সরকারের পক্ষে এই ঔদ্ধত্যকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না।

॥ পরলোকে অজয় ঘোষ ॥

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ গত ১৩ই জানুয়ারী দিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। এই সর্বভারতীয় নেতার আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমায় বৈরামপুর গ্রামে। এর পিতা ছিলেন ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ ঘোষ। অজয় বাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নশাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এস-সি পাশ করেন। এই সময়েই রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা আকৃষ্ট হন। এবং নানাবিধ রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩১ সালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকে মৃত্যুর কিছুকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫১ সাল থেকে চার বার পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে পরিভ্রমণ করেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকেই তাঁর শরীর খুব খারাপ ছিল। তাসত্ত্বেও মস্কো ও পিকিংয়ের নানা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি 'নিউ এজে'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পার্টি বিষয়ক বই ছাড়া নানা বিষয়ে তিনি বই লিখেছেন।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৪ঠা জানুয়ারী—১৯শে পৌষ : শ্রীকৃষ্ণপুরী (পাটনা) অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার সংক্রান্ত আলোচনা অসমাপ্ত—উচ্ছৃঙ্খল জনতার চাপে অর্ধপথে বৈঠক স্থগিত।

ইডেন উদ্যানে (কলিকাতা) চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে (ক্রিকেট) ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভ—১৮৭ রাণে ইংল্যান্ড দলের পরাজয় বরণ।

'সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থাগুলির সহিত কোন আপোষ চলিতে পারে না'—কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে (শ্রীকৃষ্ণপুরী) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

৫ই জানুয়ারী—২০শে পৌষ : জনতার উচ্ছৃংখলতাজনিত তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনও (শ্রীকৃষ্ণপুরী) পণ্ড—হুড়োহুড়িতে ২৯ জন আহত ও অনেকে অচৈতন্য—শ্রীনেহরু কর্তৃক শেষ পর্যন্ত সভা মুলতুবী রাখার ঘোষণা।

'জাতীয় সংহতি বিরোধী শক্তিগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে'—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৭তম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীর ভাষণ।

৬ই জানুয়ারী—২১শে পৌষ : 'ভারত কাশ্মীরকে কিছুতেই পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবে না'—শ্রীকৃষ্ণপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে শ্রীনেহরু কর্তৃক ভারতের সুদৃঢ় নীতি ব্যক্ত—ভারতভূমিতে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্তে বিশ্বে চরম বিপর্যয় দেখা দিবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর হুঁসিয়ারী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের (৮২ হাজার) প্রতিবাদ দিবস পালন—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট দাবী-দাওয়াসম্বলিত স্মারকলিপি পেশ।

৭ই জানুয়ারী—২২শে পৌষ : 'চীন-ভারত বিরোধ শান্তিপূর্ণ আলোচনায় মীমাংসিত হইতে পারে'—দমদম বিমানঘাটিতে ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু'র উক্তি।

কেরল কর্ষক সংঘমের ৪১ দিনব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার।

'বিজ্ঞানের বিপুল শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে'—বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (কটক অধিবেশন) আহ্বান।

৮ই জানুয়ারী—২৩শে পৌষ : চীন কর্তৃক গিলগিট এলাকার (পাক্ অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলভুক্ত) চার হাজার বর্গমাইল স্থান দাবী—শ্রীনগরে প্রাপ্ত সংবাদে নূতন চীনা অভিসন্ধির তথ্য ফাঁস।

'রাজা মহেন্দ্রের অত্যাচারের ফলে নেপালে গণ-অভ্যুত্থান'— কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে নেপালী কংগ্রেসের সভাপতি জেনারেল সুবর্ণ সমসেরের ঘোষণা।

৯ই জানুয়ারী—২৪শে পৌষ : পূর্ব নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ জারীর সংবাদ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দার্জিলিং-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ি।

১০ই জানুয়ারী—২৫শে পৌষ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত।

'সরকার ও করদাতাদের মধ্যে বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে'—দিল্লীতে প্রত্যক্ষ কর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র ভাষণ।

॥ বাইরে ॥

৪ঠা জানুয়ারী—১৯শে পৌষ : জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় পুনরারম্ভের জন্য ১৪ই মার্চ (১৯৬২) তারিখ নির্ধারিত—সোভিয়েট ও পশ্চিমী মহলের মতৈক্য হওয়ার ঘোষণা।

ব্রহ্মের কারেণ বিদ্রোহীদের সহিত সৈন্যবাহিনীর ছয় ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ—উভয় পক্ষে ১৪ জন নিহত ও ৪০ জন আহত।

৫ই জানুয়ারী—২০শে পৌষ : 'বর্তমান যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার ভিত্তিতে কাশ্মীর সম্পর্কে চুক্তি অনুষ্ঠানে পাকিস্তান রাজী নহে'—শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) প্রস্তাবের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

'সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বার্লিন সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর'—পশ্চিম জার্মান সরকারের নিকট সোভিয়েট ইউনিয়নের স্মারকলিপি।

পশ্চিম নিউগিনি উদ্ধারে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতির আদেশ জারী।

৬ই জানুয়ারী—২১শে পৌষ : 'বর্তমান বৎসরেই (১৯৬২) পশ্চিম নিউগিনি (ওলন্দাজ অধিকৃত) ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে,—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের ঘোষণা

নিউগিনির (পশ্চিম ইরিয়ান) উপর ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌম অধিকার মানিয়া লওয়ার দাবী—রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের নিকট সুকর্ণের বক্তব্য পেশ।

৭ই জানুয়ারী—২২শে পৌষ : পশ্চিম ইরিয়ানের চতুর্দিকে ইন্দোনেশীয় ফৌজের উপস্থিতি—অঞ্চল পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে ইন্দোনেশিয়ার অভিযান চালনার সংকল্প।

নেপালে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি অব্যাহত—সৈন্যদের সহিত ইতস্ততঃ সংগ্রামে বহু ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ।

৮ই জানুয়ারী—২৩শে পৌষ : ম্যাকাসারে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে (ইন্দোনেশিয়া) হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা—অজ্ঞাত আততায়ীর হাতবোমায় ৩৪ জন হতাহত—এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

রুশ জঙ্গী বিমান কর্তৃক বেলজিয়াম যাত্রীবাহী বিমান আটক—সোভিয়েট আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ।

৯ই জানুয়ারী—২৪শে পৌষ : পশ্চিম ইরিয়ান সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ইন্দোনেশিয়ার শেষ চেষ্টা—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কর্তৃক নেদারল্যান্ডকে দশ দিন সময় দান।

বৃটেন হইতে পশ্চিম জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি—পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলার আদেনুয়েরের সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

১০ই জানুয়ারী—২৫শে পৌষ : পাখতুনিস্থানের জনসাধারণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী— সাংবাদিকদের নিকট রাষ্ট্রসংঘে আফগানিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ আব্দুর রহমান পেজওয়কের বক্তৃতা।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ জীবনযুদ্ধের রূপকথা ॥

শ্রীযুক্ত ভি এস নাইপাল একজন ভারতীয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাঁদের পরিবারবর্গের বসবাস। বিগত দশ বছর ধরে তিনি ইংলন্ডে বাস করছেন। এই শ্রীযুক্ত নাইপাল ১৯৬১তে একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিককালে কোনো বিদেশী রচিত গ্রন্থ সমালোচকদের এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেনি। নাইপালের গ্রন্থটির নাম 'A House For Mr. Biswas'—সমালোচকদের মতে এই উপন্যাসটি কমনওয়েলথের ইতিহাসে এক অপূর্ব গ্রন্থ।

কিছুকাল আগে বিখ্যাত সমালোচক কার্ল মিলার লিখেছিলেন—
"I am half inclined to believe that the Commonwealth really exists outside the reproachful cries of English leading articles — if only because there really is a School or Coalition of Commonwealth writers". —
—কার্ল মিলার কমনওয়েলথের লেখক বলতে বোঝেন—
'Whose education has been English, whose learning is in English literature and history, and who are anxious to address English audience as well as a domestic one" কার্ল মিলার বৃটেনের মানুষ, তাই মনে করেন যে অতীতের বৃটেনের প্রভুত্বের ফলে এই সম্পর্ক তেমন মধুর হয়ত হবে না, ঔপনিবেশিক সম্পর্ক যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল সেই আঘাত হয়ত এখনও মোছেনি, কিন্তু তাঁর মতে কমনওয়েলথের লেখক দল এর কিন্তু মুখের মত জবাব দিয়েছেন— — have retaliated with some formidable books.

কার্ল মিলারের এই উক্তি বিভিন্ন কমনওয়েলথ অঞ্চল সম্পর্কে অতি চমৎকারভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। নাইপাল লিখিত A House For Mr. Biswas—সমালোচকদের মতে এমনই এক 'Formidable' গ্রন্থ। ১৯৬১-তে ইংলন্ডে এমন গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি, গ্রন্থটি সুলিখিত, কৌতূহলোদ্দীপক, এবং চমকপ্রদ। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বহুল-আলোচিত হবে। কমনওয়েলথ-সংস্কৃতির যাঁরা অন্তর্ভুক্ত তাঁদের সমস্যাও এই উপন্যাসে রূপায়িত। উপন্যাসটির নাটকীয় পরিণতির মধ্যে যে গতিবৈচিত্র্য এবং শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর।

মনে হতে পারে যে এই উপন্যাসের সমস্যাটি পরিপূর্ণভাবে 'সাহিত্যিক' সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্র ক্ষীণ, এমনকি নাইপালের গ্রন্থের নায়ক মোহন বিশ্বাসের সঙ্গেও হয়ত সম্পর্কবিহীন। মোহন বিশ্বাস জাতিতে হিন্দু, তার বাবা ছিলেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, আরো অনেক মজুরের সঙ্গে ত্রিনিদাদে এসেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় ভারতীয় মজুর প্রচুর আছে। এদের আনা হয়েছিল আখের মাঠে কাজ করার জন্য। উপন্যাসটির আঙ্গিক প্রচলিত ভঙ্গীমাফিক এবং বর্ণনামূলক, এক হিসাবে মোহন বিশ্বাসেরই জীবনকথা। ইক্ষু-কাটিয়ে মজুরের কুঁড়ে ঘরে তার জন্ম থেকে স্পেনের বন্দরে একটি জীর্ণ বন্ধকী বাড়িতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীটি বিস্তৃত।

মোহন বিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের জন্য অনেক কাজই করেছে, সাইনবোর্ড এঁকেছে, আখের বাগানে শ্রমিকদের সর্দারি করেছে, দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার, সরকারী কর্মচারী; অনেকগুলি সন্তানের জনক, এবং অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পিতা। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বেচারীকে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে অনেকখানি সময় সংগ্রাম করতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে মৃত্যু। সমগ্র উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্তসার। কিন্তু ত্রিনিদাদীয় হিন্দুসন্তান নাইপালের লেখনীতে এই মহাজীবনকথা কিভাবে ফুটে উঠেছে তা ঠিক এমনই সংক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলা যায় না।

'সংস্কৃতি' কথাটি এইখানে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত। মিঃ বিশ্বাস সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কে অজ্ঞ নন। শিক্ষায়তন, মর্যাদামন্ডিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদমালা, কিংবা ইতিহাসে বা গ্রন্থাদিতে যেসব শহরের কথা আছে, সেইসবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি। সংহত, সর্বজনীন সমাজের সঙ্গে সংযোগ ঘটেনি। এবং আড়কাঠির প্রচেষ্টায় আমদানীকৃত সব রকমের মজুরের দল এই ছোট্ট দ্বীপটিতে আমদানি করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত নায়পাল যে প্রশ্ন করেছেন সে প্রশ্নটি অতিশয় গভীর অর্থপূর্ণ। এমন এক অসংলগ্ন সমাজে যে-সব মানুষ বাস করে, তারা কি তাদের জানতে পারে, চিনতে পারে। সেই সমাজের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেও পারে না। তাই যদি না পারল তবে আর সে কি করে আপনাকে জানবে চিনবে?

মোহন বিশ্বাস জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে দীর্ঘসময় ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ, (যা বাংলা দেশের ত্রিশ বছর আগেকার ছাত্ররা সকলেই পড়েছেন), সামুয়েল স্মাইলসের—'Self-Help' গ্রন্থটি পাঠ করতেন। স্মাইলস লিখেছেন, নিষ্ঠা, সৎকর্ম, কৃচ্ছ্রসাধন এবং কঠোর কর্মের দ্বারা কিভাবে পরিণামে অবশ্যম্ভাবী জয়মাল্য লাভ করা যায়, এই ধরনের বহু গ্রন্থের মধ্যে তাঁর 'Self-Help' গ্রন্থটি বহু-বিখ্যাত এবং বহুপঠিত।

মোহন বিশ্বাস তার দুঃসময়ে এই 'Self-Help' পড়ছে, লেখক বলেছেনঃ—

"He stayed in the back trace and read Samuel Smiles. He has bought one of his books in the belief that it was a novel, and had become an addict. Samuel Smiles was as romantic and satisfying as any novelist, and Mr. Biswas saw himself in many Samuel Smiles heroes; he was young, he was poor, and he fancied he was struggling. But there always came a point when resemblance ceased. The heroes had rigid ambitions and lived in countries where ambitions could be pursued and had meaning. He had no ambition, and in this hot land, apart from opening a shop or buying a motor-bus, what could he do? What could he invent?"

মোহন বিশ্বাস স্মাইলসের গ্রন্থটি উপন্যাস ভ্রমে কিনেছিল। ভালোই লেগেছিল গ্রন্থটি, সব নায়কগুলিই তার মত, তারাও দরিদ্র, অল্পবয়সী এবং হয়ত সেও তাদের মত সংগ্রামী। কিন্তু তাদের ছিল উচ্চ আশা, সুন্দর পরিবেশ। এই গরমের দেশে তার আবার আশা কি! একটা দোকান দেওয়া কিংবা মোটরবাস

কেনো ভিন্ন কি আর করতে পারে? কি সে আবিষ্কার করবে? সুতরাং মোহন বিশ্বাস কোনোদিনই কোনো কিছু উদ্ভাবন করতে পারেননি। তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর আছে। স্বদেশ স্বজন থেকে ছিন্নমূল হয়ে এই মানুষগুলি একদিন তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এই উত্তপ্ত দ্বীপে এসেছিল, সঙ্গে আর কিছুই আনতে পারেনি। শুধু এনেছিল তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং স্বদেশের মধুর স্মৃতি। মোহন বিশ্বাস স্বয়ং একজন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু নয়, তবু তার পরিবারে ধর্মগ্রন্থ পড়া হয়, অনেক পাল-পার্বন অনুষ্ঠিত হয়, একাল-সেকালের চিন্তায় অনেক সময় কাটে, এইভাবে বংশানুক্রমে একটা ধারাবাহিকত্ব থেকে যায়, একটা চিরস্থায়ী আদর্শ এবং ঐতিহ্য পুরুষ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে এই আজব দ্বীপের বিভ্রান্তিকর অগভীর জীবনের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে।

এই উপন্যাসের অনেকখানি অংশ মোহন বিশ্বাস ও তার সন্তানদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তার বর্ণনায় ব্যয় করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় মোহন বিশ্বাসের বড় ছেলে আনন্দ যদিচ বুদ্ধিমান ও চতুর, তবু তার কাছে এই জগৎ তার পিতৃদেব মোহন বিশ্বাসের মতই বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছে, তবু আনন্দ শিক্ষালাভ করেছিল এবং আরো উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েছিল।

আনন্দ যখন ইংলণ্ডে তখনই মোহন বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে। পিতার সর্বশেষ চিঠিখানি পুত্র আনন্দের কাছে "strange, maudlin, useless" মনে হয়েছে। পৃথিবী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নাইপালের দৃষ্টিভঙ্গী অতিশয় জটিল—যে কোনো ভাবে, যে কোনো কালে যে মানবিক শান্তি এবং পরিপূর্তি লাভের সম্ভাবনা আছে পাঠককে এতটুকুও কল্পনার অবকাশ তিনি দেননি।

মোহন বিশ্বাস তার নিজস্ব বিদগ্ধ মনোভঙ্গী এবং আবেগময় প্রাণোচ্ছ্বল-তার দ্বারা আপনার সংজ্ঞা শেষ পর্যন্ত জানিয়ে যায়। সমগ্র উপন্যাসে তার ভূমিকা অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত মানুষের ভূমিকা। আপনার অক্ষমতা এবং সীমিত শক্তির সম্পর্কে সে সচেতন। নিজের জন্য যা সে করতলগত করতে পারেনি সেই না-পাওয়ার প্রতিই তার আগ্রহ। যদিচ যে ভূমিতে সে প্রতিষ্ঠিত তার সম্পর্কে সন্দিহান তবু গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠকের সে বিষয় আর কোনো সংশয় মনে থাকে না। মোহন বিশ্বাস 'ষোড়শী'র জীবানন্দের মত মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে চায়, পরিপূর্ণ মানুষ। সে দুর্বল, অক্ষম, জীবনে সে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, এমন এক জায়গায় সে থাকে যে স্থানটির ম্যাপে কোনো চিহ্ন নেই— "a place that was no where, a dot in the map of the Island, that was a dot on the Map of the World.)"—

পাঠক কিন্তু এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ যে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষের মতই তারও বাঁচার অধিকার আছে, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচা, পৃথিবীর যা কিছু ভালো তার সে অংশীদার, শুধু দুঃখের নয়, দুর্দশার নয়, তার সম্পদ ও ঐশ্বর্যেরও সে অধিকারী। তার অশান্তি এবং অস্বস্তি তাকে অনেক পীড়ন করেছে, জীবনে অনেক হীন এবং নগণ্য কর্ম করতে বাধ্য করেছে—কিন্তু তার সেই হতাশা, সেই বঞ্চিত মনোভঙ্গীই তার জীবনে এনেছে পৌরুষ এবং বীর্যবত্তা।

'A House For Mr. Biswas' একটি সুদীর্ঘ উপন্যাস। বিবরণমূলক উপন্যাসের গতি শ্রীযুক্ত নাইপাল বরাবর অব্যাহত রেখেছেন। গ্রন্থের মধ্যে যে সরসত্ব এবং শ্লেষ আছে তা তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং তিক্ত। শ্রীযুক্ত নাইপাল এই উপন্যাস রচনার দ্বারা যে কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করেছেন, সংগ্রামশীল সাহিত্যিকের জীবনে তা সর্বশ্রেষ্ঠ জয়মাল্য। তাঁর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পৃথিবীর সকল প্রান্তের সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করবে। আর সর্বশেষে একটি কথা নেহাত সংকীর্ণ মনোভাব নিয়েই বলি—গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয় লেখকের পূর্বপুরুষ হয়ত একদিন এই বাংলা দেশ থেকেই অন্নসন্ধানে ত্রিনিদাদের আখের মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমগ্র ঘটনালবীতে যেন বাংলা দেশের গন্ধ পাওয়া যায়। *

* A House For Mr. Biswas by Mr. V. S. Nayapal

নতুন বই

বন কেটে বসত— (উপন্যাস)—মনোজ বসু। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম নয় টাকা।

মনোজ বসু একদা 'বনমর্মর' নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, মনোজ বসুর গল্প উপন্যাস নাটক ও ভ্রমণ-সাহিত্য বাঙালী পাঠকের সুপরিচিত। পাঠক-চিত্ত সহজেই জয় করার শক্তি মনোজ বসুর আছে তাই তিনি জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাঁর সব-চেয়ে বড় কৃতিত্ব যে তিনি বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের খাঁটি এবং নির্ভেজাল ছবি আঁকতে সুদক্ষ। তাঁর গল্প-কথনের ভঙ্গীতে যে পল্লী-কথকের সুর আছে নিঃসন্দেহে সেটি তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ। বেশী প্যাঁচ বা জটিলতা নেই তাঁর রচনায়, সহজ সরল এবং সরস ভঙ্গীতে তিনি অতি-পরিচিত মানুষ-গুলিকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে পাঠকের সামনে এনে হাজির করতে পারেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। মনোজ বসুর হাত পুরোপুরি রোমান্টিক, রোমান্টিক গল্প রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে অনেকবার, প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার উপন্যাসে আছে সেই রোমান্টিক আবেগের সঙ্গে রিয়ালিজমের চমৎকার সংমিশ্রণ। বাস্তব ও রোমান্সের এই গাঁটছড়ার ফলে 'বন কেটে বসত' এক সুখপাঠ্য উপন্যাস হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে। মনোজ বসু ইতিপূর্বে 'জলে জঙ্গলে' নামক একখানি উপন্যাসে এই জাতীয় পরীক্ষা করেছিলেন, 'বন কেটে বসতের' বৃহত্তর পটভূমিকায় তাঁর সেই পরীক্ষার সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা গেল। চব্বিশ পরগণার ভূমিহীন চাষী-দের জীবন-কাহিনী 'বন কেটে বসত', বন-জঙ্গল সাফ করে তারা নীড় বাঁধে আর নানা কারণে তাদের ক্রমে দূরে সরে যেতে হয়, শেষে একেবারে সাগরের নীল গহনের মুখে পৌঁছায়। অর্থনীতির নিদারুণ তাড়নায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গগন দাসকে একদিন অজানার আহ্বানে পাড়ি দিতে হয়েছে। গগন বেরিয়েছে সেন জীবনটাকে দেখবে বলে, সে দাঁড়িয়েছে একেবারে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি। গগন দাস তাই পর্যায়ক্রমে কখনো

সেজেছে ডাক্তার, কখনো পাঠশালার পণ্ডিত আবার শেষপর্যন্ত মাছের ভেড়ীর মালিক। জাতে সে কিন্তু জেলে নয়, পেটের দায়ে মধ্যবিত্ত গগনকে অনেক দূরে চলে আসতে হয়েছে। সংগে আছে স্ত্রী, বিধবা বোন চারুবালা যাকে একদিন নগেনশশী লালসালোলুপ দৃষ্টিতে কাছে টানতে চেষ্টা করেছিল, আর আছে জগন্নাথ, বলাই, রাধেশ্যামের দল, তারাও মানুষ। সকলকে নিয়েই ত' সংসার। চারুবালা এক নৌকায় জগন্নাথের সঙ্গিনী হয়েছিল কিসের টানে তা সহজেই বোঝা যায়—তারপর মহেশঠাকুর। সব ঘটনা অতি দ্রুতগতিতে ঘটে চলেছে—সেই মাছমারা জেলে, মেছো ভেড়ীর তদারককার দালালগোষ্ঠী, আড়তদার, হোটেলওয়ালা প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রগুলি চমৎকার ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে জল এবং জেলে নিয়ে উপন্যাস লিখিত হয়েছে 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'গঙ্গা', মনোজ বসুর 'বন কেটে বসত' সেই বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সমগোত্রীয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নিদারুণ অর্থনীতি, আর মাটির আকর্ষণ 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে লেখক অসামান্য লিপিকুশলতায় এঁকেছেন। গ্রন্থশেষে লেখক বলছেন : 'অথৈ কালাপানি সামনে, একবেলার পথও নয়। জগা ভাবে—এখান থেকে তাড়া খেয়ে আর তো ডাঙ্গাজমি নেই, তখনকার উপায়?" এই উপন্যাসে মনোজ বসু আপনাকে অতিক্রম করে এক কালজয়ী সাহিত্য রচনার গৌরব অর্জন করেছেন। নিঃসহায় মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকথার বিচিত্র রূপায়ণ 'বন কেটে বসত'।

কহেন কবি কালিদাস— (রহস্য কাহিনী) **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশিং প্রাঃ লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।**

বাঙলা রহস্য কাহিনী-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর রচিত এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। গোয়েন্দা কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ঘটনার বিদ্যুৎগতি আর সূক্ষ্ম রহস্যজাল উন্মোচন-কৌশল ব্যোমকেশের কাহিনীগুলির পরম বৈশিষ্ট্য। হত্যাকারী কে? হত্যার পর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই ছদ্মবেশী মানুষটিকে ধরে ফেলতে ব্যোমকেশের কোন অসুবিধা হয় না। ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধানের সামনে সবই উদ্ঘাটিত হয় যথাসময়ে।

আলোচ্য উপন্যাসও ব্যোমকেশের পূর্ববর্তী কাহিনীগুলির মতো কৌতূহলোদ্দীপক। এ কাহিনী 'অমৃতে'র প্রথম সংখ্যা থেকে যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে তখনই অগণিত পাঠকের সাদর অভিনন্দন লাভ করে। চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতায়, ঘটনা-সংস্থাপনের কৌশলে এবং ভাষার সুস্নিগ্ধ প্রসাদগুণে বইখানি চিরদিনই পাঠকসমাজের অনুরূপ সমাদর লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প— (গল্প সংকলন) : প্রকাশক : বাক-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

সৈয়দ মুজতবা আলী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তার পিছনে আছে তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রচুর অভিজ্ঞতা, সরসতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা। আলী সাহেব তাই যা কিছু লেখেন তার মধ্যেই চিন্তার খোরাক থাকে, আবার সেইসংগে চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী মালমশলারও অভাব থাকে না। তাঁর 'দেশে বিদেশে' যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন ভ্রমণ-সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা, আবার যাঁরা 'চাচা কাহিনী' পাঠ করেছেন তাঁরা আলী সাহেবের গল্প-কথনের বিচিত্র ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছেন। এই মানুষটির অন্তরে যে একজন দার্শনিক বৈরাগী আছে তা সহজেই ধরা পড়ে। বাংলার সাহিত্য জগতে আজ তাই তিনি প্রথম সারিতে স্থানলাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বারোটি বিখ্যাত গল্প সংযোজিত হয়েছে। গল্পগুলি সাময়িক-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। গল্পগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তার নির্মল সরসতা। নোনাজল, পাদটীকা, বেঁচে থাক সর্দি-কাশী, নোনামিঠা, গাঁজা, স্নব, কর্ণেল, নবাব-জাদী, বিষের বিষ প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট সংযোজন। গ্রন্থারম্ভে প্রকাশক একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়েছেন, কিন্তু মনে হয় এই জাতীয় লেখক কিংবা কোনো অধিকারী সাহিত্য-সমালোচক যদি মুজতবা আলী সাহেবের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে কিছু আলোকসম্পাত করতেন তাহলে পাঠকজনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হত।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি মনোরম।

রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়— (প্রবন্ধ) ক্ষুদিরাম দাস। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে কাব্যেরই অধিকার বেশি। সমগ্র জীবনব্যাপী যে সোনার ফসল তিনি দিয়ে গেছেন, তা এখনও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তাই নিয়ত নতুন নতুন সমালোচনা-গ্রন্থের প্রকাশ ঘটছে। একদিকে তা রবীন্দ্র-বিচারের পথকে যেমন সুগম করে তুলছে তেমনি বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসকেও বলিষ্ঠ করে তুলছে। এ পথে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাসের আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহুকাল পূর্বে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে সাধারণ ও অসাধারণ পাঠক নির্বিশেষে প্রতিটি গুণগ্রাহী মানুষের কাছে গ্রন্থটি সমাদর লাভ করে।

তার কিছু কারণও বর্তমান। শ্রীযুক্ত দাস রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় দান করতে গিয়ে কেবলমাত্র কাব্যকেই তুলে না ধরে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আলোকে কবির কাব্য-সত্তাকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'বনফুল', 'কড়ি ও কোমলে'র কাল থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি দানের জন্য সততা ও নিষ্ঠার সংগে অগ্রসর হয়েছেন। এবং তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ প্রবণতা ও বিকাশশীল শিল্পী-স্বভাবের পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ' চেতনার অন্তরালে বিবিধ কার্য-কারণ সূত্র তুলে ধরে গ্রন্থখানিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলবার চেষ্টা করেননি। রবীন্দ্র-কাব্য সাধনার শেষ পর্যায় সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার বলছেন, বিষয়-বৈচিত্র্যে, নিজ মানসের নিপুণ বিশ্লেষণে এবং প্রকাশরীতির অভিনবত্বে সায়াহ্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির ঐক্যমূলক সমগ্র পরিচয়ের জন্যেও এই পর্যায়ের অধ্যয়ন অপরিহার্য—এ সত্য সর্বাংশে স্বীকার্য। তা প্রমাণ করবার জন্য গ্রন্থকার উপযুক্ত যুক্তিসহ আলোচনা করেছেন পরিপূর্ণ রবীন্দ্র-মানস উপলব্ধির জন্য

আলোচ্য গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য। "প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয়" অধ্যায়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বলাকা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন তা হয়ত সব সময়ে মেনে নেওয়া যায় না, কিন্তু কোন বিষয়কে পরিপূর্ণ রূপে বোঝবার আগে যে সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন তা কেবলমাত্র এ অধ্যায়টি থেকে নয়, গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়েই ছড়িয়ে আছে বলে নিজের মত সুস্পষ্ট করা সহজ হয়ে ওঠে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—(প্রবন্ধ)—শংকরীপ্রসাদ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম ১২-৫০ টাকা।

কেবল প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেই নয় সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেই বৈষ্ণব পদরত্নাবলীতে অতুলনীয়। আর সেই পদাবলীতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অবদান অনন্যসাধারণ। তাঁদের কবিকৃতির বিচার-বিশ্লেষণ চলেছে বহুদিন ধরে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তার মধ্যে অন্যতম।

পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির স্থান কত বড় তাই নির্ণয় করতে চেয়েছেন গ্রন্থকার। বাঙালীর মনভূমিতে চিরজাগ্রত ভাবসাধনার যে দীপশিখা চণ্ডীদাস তুলে ধরেছিলেন, প্রেম-সৌন্দর্যের সুনিপুণ বর্ণনা-মাধুর্যে বিদ্যাপতি মানবিক ভাবধারাকে যে কতদূর সমৃদ্ধ করে রেখেছেন তা শ্রীযুক্ত বসুর সাবলীল বর্ণনাগুণে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। আলোচনায় চিন্তা, যুক্তি ও সংযমের অভাব ঘটেনি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দুটি পরিচয় তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমজন পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক কবি এবং দ্বিতীয়জন প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক কাব্যচিন্তার অন্তরাল থেকে যে কাব্যিক রূপসুষমা বিকশিত আর বিদ্যাপতির প্রেমভাবনার অন্তরাল থেকে যে আধ্যাত্মিক-ভাবনা ফুটে উঠেছে তা গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেছেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যজগৎকে অবলম্বন করে—সমালোচকের বক্তব্যকে উপজীব্য করে নয়। তাই সমগ্র গ্রন্থখানি রচনায় গ্রন্থকার যে দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হয়। লেখকের এই বিশেষ দৃষ্টির জন্য গ্রন্থখানি মৌলিক চিন্তাধারা পুষ্ট গবেষণা-ধর্মী হয়ে উঠেছে। যে নির্মল দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বিচার করেছেন, তাঁদের কাব্যভাবনা ও চিত্রকল্পের জগৎকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন তা বাঙলা সাহিত্যে নতুন। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের নব মূল্যায়ন তাঁর কাছ থেকে আশা করা অন্যায় হবে বলে মনে করি না।

॥ সংকলন ও পত্র পত্রিকা ॥

একতা—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮। সম্পাদক—তুষার চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা সংকলন। প্রতি বৎসরই এ'রা একটি করে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বিশেষ বৃহদাকারের সংকলনটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যে সমস্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে তার মূল্য কেবলমাত্র ছাত্রদের কাছেই নয়; সমস্ত শ্রেণীর সহৃদয় পাঠকের জন্য।

শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীদেবেশ রায় শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী, শ্রীসূর্য সেন, শ্রীবিজন পুরকায়স্থ, শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তীর আলোচনা যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু তা আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার দাস, শ্রীঅরুণ সেন, শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবেদুইন চক্রবর্তী, শ্রীভাস্কর বসু, শ্রীনির্মাল্য আচার্য, শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবার্ণিক রায়ের আলোচনা সংকলনটি মূল্যবৃদ্ধি করেছে। শ্রীকেশব চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" নামক আলোচনাটি যথেষ্ট মূল্যবান। তা ছাড়া আরও অনেকগুলি রচনা রয়েছে।

একটি হিন্দী ও উর্দু বিভাগও আছে। এদের পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

উচ্চারণ—সম্পাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য। দাম ১্ টাকা।

মনোরম প্রচ্ছদসম্পন্ন সাহিত্যপত্র। বিশেষ করে কবিতাই বেশি স্থান পেয়েছে। কবিতা লিখেছেন, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, পরিমল চক্রবর্তী প্রভৃতি। অরুণ ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

দলিল-চিত্র :

কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলায়তন। এর মধ্যে একটি মানুষের জীবন সিন্ধুতে বিন্দু সদৃশ। তবু সেই মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত আছে কি?—প্রথম চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেমন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে তাকাতে থাকে, তেমনই কথা বলতে শেখবার পর মুহূর্ত থেকেই সে 'এটা কি?' 'ওটা কি?' 'এটা কেন?' 'ওটাতে কি হয়?' ইত্যাদি বহু প্রশ্নবাণে তার চারপাশের লোকেদের বিব্রত করতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ পায়নি তার জীবনে, সেও নিজের সংসারের গন্ডীর বাইরের জগৎটা সম্পর্কে উদাসীন নয় আজকের দিনে। গরুর গাড়ীর যুগকে বহু পিছনে ফেলে রেখে আজ গোটা পৃথিবীটাই এগিয়ে এসেছে স্পুটনিক-স্পেস-এর যুগে। এবং সেই সঙ্গে মানুষের মনও চাইছে ব্যাপ্তি: জগতের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র পৃথিবীর ও তার মানুষের খুঁটি-নাটি পরিচয় প্রভৃতি জানবার জন্যে মানুষের মন আজ উদ্‌গ্রীব।

এই জ্ঞানেচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্যে বিজ্ঞান যত রকমের জ্ঞানসঞ্চারণের পন্থা (means of communication) আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সার্থকতম হচ্ছে দলিল ও সংবাদ চিত্র। বিশেষ করে আমাদের দেশে,—যেখানে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা এখনও শতকরা কুড়ির বেশী নয়, সেখানে—দলিল-চিত্র মানুষের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার পক্ষে কত যে উপযোগী, তা ব'লে বোঝাবার নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বইয়ে পড়া বিদ্যের থেকে চোখে দেখে এবং কানে শুনে যে বিদ্যে লাভ করা যায়, তার মূল্য ও পরিমাণ অনেক বেশী! বই বা খবরের কাগজের সাদা পাতার ওপর জড়ো করা কালো কালো অক্ষর দেখে যাদের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, রূপালী পর্দার ওপর তারাই ছবি ও কথার মাধ্যমে মুদ্রণযন্ত্রের জন্মেতিহাস, ইতালীর গুহাচিত্র, রাজা অশোক বা রবীন্দ্রনাথের জীবনীচিত্র প্রভৃতি সবই দেখে আনন্দ এবং শিক্ষা—দুই-ই লাভ করে। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, তা যেমন সংবাদ-চিত্র মারফত পরিবেশন করা হয়, তেমনই ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, জীবনী, শিল্পরীতি প্রভৃতি সম্পর্কে সত্য তথ্য পরিবেশন করা হয় দলিল-চিত্রের সাহায্যে। দলিল বা document কথার অর্থই হচ্ছে যথার্থ প্রামাণ্য সাক্ষ্য-সামগ্রী। কাজেই দলিল-চিত্রের মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যাকে যথার্থ সাক্ষ্য-সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।
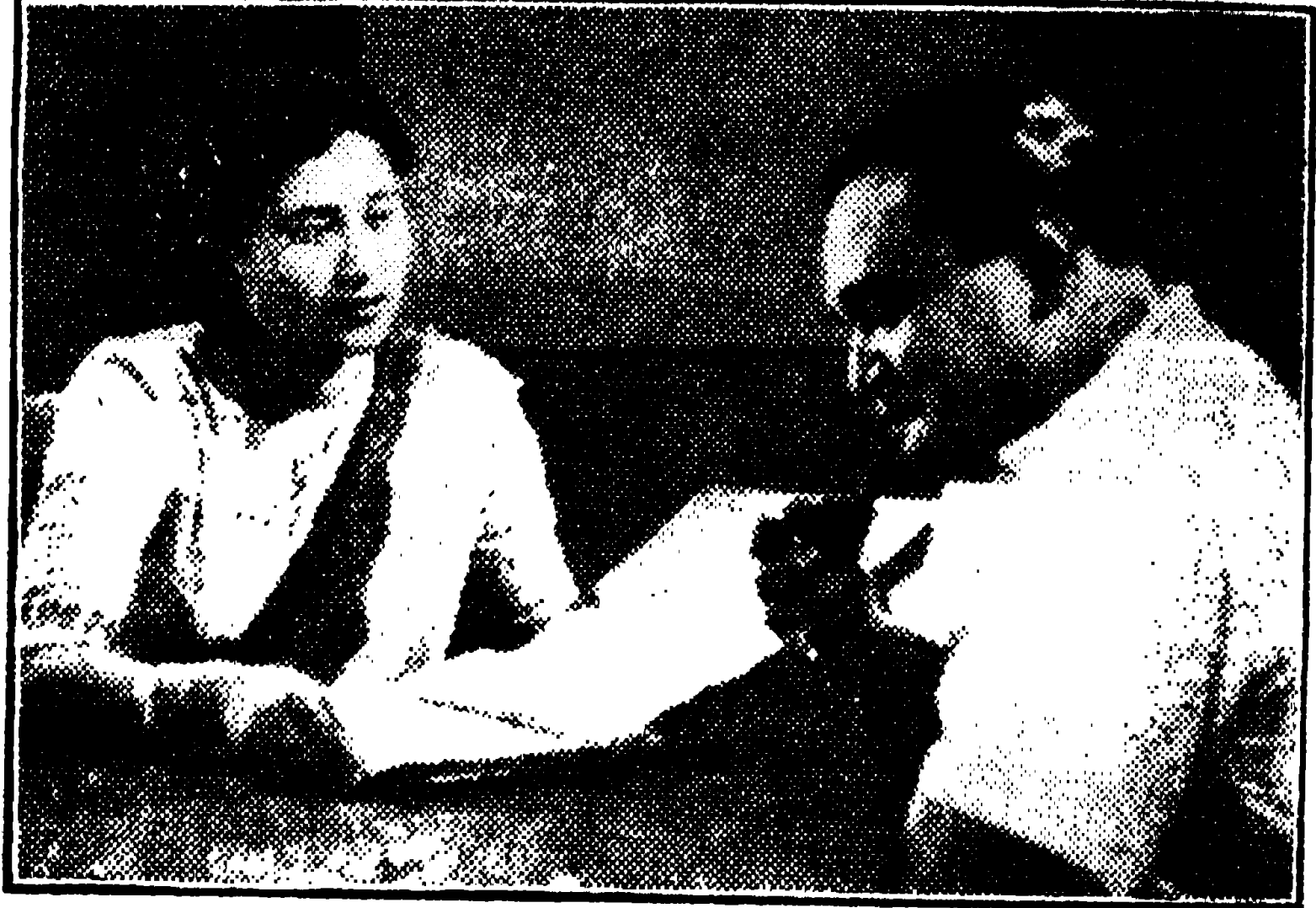
দলিল-চিত্রকে সম্পূর্ণভাবে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। তাই সত্যজিৎ রায়-কৃত "রবীন্দ্রনাথ" দলিল-চিত্রের দাবিকে পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম হয়নি। তিনি বালক-রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে গিয়ে কাহিনীচিত্রের ধারা অনুযায়ী একটি কিশোরকে দিয়ে বালক-রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অভিনয় করিয়েছেন। তেমনি "মায়ার খেলা"-র দৃশ্যাংশও সাজানো কৃত্রিম জিনিষ—রবীন্দ্র-জীবনীর দলিল নয়—। বাস্তবজীবনে দলিল জাল করলে যে-অপরাধ হয়, দলিল-চিত্রে এই ধরণের কৃত্রিম জিনিষের অনুপ্রবেশ ঘটানো তার থেকে কম গুরুতর অপরাধ নয়। দলিল-চিত্রকে হ'তে হবে সম্পূর্ণভাবে সত্যাশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রের চিত্রকে যেমন কোনোক্রমেই খাজুরাহোর মন্দিরের অংশবিশেষ ব'লে চালানো চলবে না, ঠিক তেমনই চলবে না রাজা অশোক বা জগদীশ বসুর দলিল-চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে কোনো একটি অংশে নাটকীয়তা আমদানী করবার জন্যে

সন্তোষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মন দিল না বঁধু' চিত্রে মুকুল ধর ও জনৈকা শিল্পী

কাউকে দিয়ে ও'দের চরিত্র অভিনয় করানো। ৩৪-সংখ্যার "অমৃত"-এ নির্মলকুমার ঘোষ (এন্-কে-জি) ঠিকই বলেছেন, "ডকুমেন্টারী নির্মাতাকে বেরিয়ে আসতে হবে নতুন কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাট্যচিত্রের কঠিন নির্মোক থেকে।...(ডকুমেন্টারীর) পরিচালকের উদ্দেশ্য হবে camera-র সামনে জীবন ফুটিয়ে তোলা নয়; চলমান জীবনস্রোতের অংশ-বিশেষ camera-য় ধরে রাখা।"

দলিল-চিত্র কিন্তু রসহীন নয়। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলিল-চিত্র পরিচালক এবং সম্পাদকের ছবি সাজানো, বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক শব্দ এবং নেপথ্য ভাষণের গুণে যথেষ্টই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ দলিল-চিত্র ১,০০০ থেকে ৩,০০০ ফুট দীর্ঘ হলেও ৭ বা ৮ হাজার ফুটের দলিল-চিত্রও যে মানুষের মনকে ধরে রাখতে পারে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ওয়াল্ট ডিজনীর "দি লিভিং ডেজার্ট" বা সোভিয়েট ফিল্ম "লাইফ ইন দি আর্টিক" থেকে। এই দুটি ছবিতেই এমন নিপুণভাবে বিষয়বস্তুকে দর্শকের চোখের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসার পরিবর্তে দর্শক সম্মোহিত হয়ে যান; একটি বিচিত্র নূতন অভিজ্ঞতায় দর্শকের মন কানায় কানায় ভরে ওঠে।

বর্তমানে কাহিনী-চিত্রের জগতে নিও-রিয়ালিজ্‌মের জোয়ার আসায় বহু কাহিনী-চিত্রও অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ হয়ে দেখা দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'তে পারে, দলিল-চিত্র এবং কাহিনী-চিত্রের মাঝের সীমারেখা বুঝি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হয়না, হতে পারেনা। দলিল-চিত্রের দলিলত্ব বা প্রামাণিকত্ব কাহিনী-চিত্রের make-belief-এর অর্থাৎ সত্য-ব'লে-প্রতীয়মান হওয়ার জগতে কোনোও দিনই আসবে না।

চিত্র সমালোচনা

সরি ম্যাডাম: বি, আর, সি, সিনে প্রোডাক্‌সন্স-এর নিবেদন; ১১,৬২০ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা: দিলীপকুমার বসু; সংগীত পরিচালনা: ভেদ পাল; চিত্রগ্রহণ: বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দধারণ: জে, ডি, ইরাণী; গীত-রচনা: তেজোময় গুহ ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীতগ্রহণ: বি, এন, শর্মা ও কৌশিক; শিল্পনির্দেশ: সুনীল সরকার; সম্পাদনা: অমিয় মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ: ছবি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, দিলীপ রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা, সন্ধ্যা রায়, কেতকী প্রভৃতি। বিশ্বভারতী পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১২ই জানুয়ারী থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

প্রথমেই স্বাগত জানাই ছবির পরিচালক দিলীপকুমার বসু এবং সংগীত পরিচালক ভেদ পালকে এমন একখানি নিছক গীতিবহুল হাল্কা প্রেমের ছবি বাঙলার দর্শককে উপহার দেবার জন্যে। ছবির একশো ভাগের ভিতর প্রথম আশি ভাগই হাসি, হুল্লোড়, গান এবং প্রেম নিবেদনের টানাপোড়েন প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শককে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; শেষের কুড়ি ভাগ অবশ্য গল্পকে কিছু গুরুগম্ভীর, নাটকীয় মোচড় দেওয়া এবং অবাধ মিলন থেকে গুরুজনের সম্মতিক্রমে মিলনান্তক করবার ফলে সেই বন্যা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু বলতে বাধা নেই, এমন হাল্কা (সস্তা বললে অন্যায় হবে!) আদি রসাত্মক আজকের দিনের যুবক-যুবতীর রোমান্সের ছবি বাঙলাদেশে আর হয়েছে ব'লে মনে করতে পারছি না। সিচুয়েশান, সংলাপ ও সংগীতের এমন অপূর্ব মিলন ক্বচিৎ দেখা গেছে। বাঙলাদেশের গতানুগতিক ছবি থেকে

"সরি ম্যাডাম" একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং যে-প্রাণোচ্ছলতার গুণে বোম্বাই দেশের হিন্দী ছবি সাধারণ বাঙালী দর্শককে ক্রমেই হিন্দী ছবির দিকে আকৃষ্ট করছিল, সেই প্রাণোচ্ছলতার পরাকাষ্ঠা দর্শক দেখতে পাবেন এই 'সরি ম্যাডাম' ছবিতে। এবং ছবিটির আর একটি গুণ এর বহির্দৃশ্য। বাঙলা-দেশের বহু ছবিই রাঁচীর দৃশ্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু 'সরি ম্যাডাম'-এর মত এমন সার্থকভাবে রাঁচীর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরতে অতি অল্প ছবিই পেরেছে।

কলকাতা শহরে গাড়ী চালিয়ে পথ-চারীর গায়ে কাদার ফুল ফোটানোর ঘটনা হামেশাই হয়ে থাকে; কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে দুঃখিত হয় ক'জন? কারণ পরমানন্দে মোটর হাঁকাতে হাঁকাতে চালকের খেয়ালই থাকে না, কার ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় তাঁর মোটরের চাকার লীলাখেলায় মলিনতাপ্রাপ্ত হ'ল। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, নিগৃহীত পথচারী মোটরটিকে ধ'রে ফেললেন? তখন নিশ্চয়ই আপনি-আমি আশা করি, মোটরবিহারী তাঁর পাউডারলিপ্ত মুখ-খানিকে যথাসম্ভব কাঁচুমাচু ক'রে 'Sorry-দুঃখিত' ব'লেই অব্যাহতি পেয়ে

'সরি ম্যাডাম' চিত্রের নায়িকারূপে সন্ধ্যা রায়

থাকেন। কিন্তু কলেজ গার্ল রমা-চালিত মোটর যখন এম্‌-এ-পড়া ধনী যুবক রজতের প্যাণ্টলুনটিকে কর্দমশোভিত করল, তখন কিন্তু কুমারী রমা কুমার রজতের হাত থেকে অত সহজে নিষ্কৃতি পেল না। এমন কি, রমা যখন একখানি দশ টাকার নোট রজতের দিকে এগিয়ে ধ'রে বলল, 'লণ্ড্রী থেকে আপনার প্যাণ্টটা কাচিয়ে নেবেন', তখন তার জবাবে রজত দশ টাকার নোটটি পকেটস্থ ক'রে রমার গাড়ীর একটি টায়ারকে ফুটো ক'রে দেয় ছুরির আঘাতে এবং একখানি একশো টাকার নোট রমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'টায়ারটি সারিয়ে নেবেন।'

এই ভাবে হ'ল শুরু উভয়ের মধ্যে। রজত এবং রমা—দুজনেই ভালো গাইয়ে, বলিয়ে-কইয়ে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—দুজনেই সুরূপ ও যৌবনোচ্ছল। কলেজ ফাংশানে 'রাধা চলেছে মুখটি ঘুরায়ে কাঁদে শ্যামের বাঁশরী' থেকে আরম্ভ ক'রে দুজনেরই রাঁচী যাওয়া এবং সেখানে রাগ-অনুরাগের টানাপোড়েনের চরম পরিণতি হিসেবে রজতের শিভ্যালরির পরিচয় পেয়ে সকল দ্বন্দ্বের যখন অবসান, তখন রমার বাপের উভয়ের বিবাহবন্ধনে আপত্তির পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত ছবিটাই রজত-রমা সর্বস্ব; বাকী যে-দু'পাঁচজন ছবিতে আসে, এমন কি জহর রায় অভিনীত শিবশংকর মহলানবীস ও দিলীপ রায় অভিনীত সনৎ গাঙ্গুলী পর্যন্ত সবই পাদপূরণের জন্যে। ছবির শেষাংশে দর্শকদের চমক দিয়ে আবিষ্কৃত হয় রজতই হচ্ছে ধনী রাজীব চট্টো-পাধ্যায়ের ছেলে এবং রমা হচ্ছে রাজীবের পালিতা কন্যা। অতএব তার পর 'যা পদ্য মিলে যা'।

অভিনয়ে মাৎ করেছেন রজতের ভূমিকায় বিশ্বজিৎ। মনে হয়, এইটিই
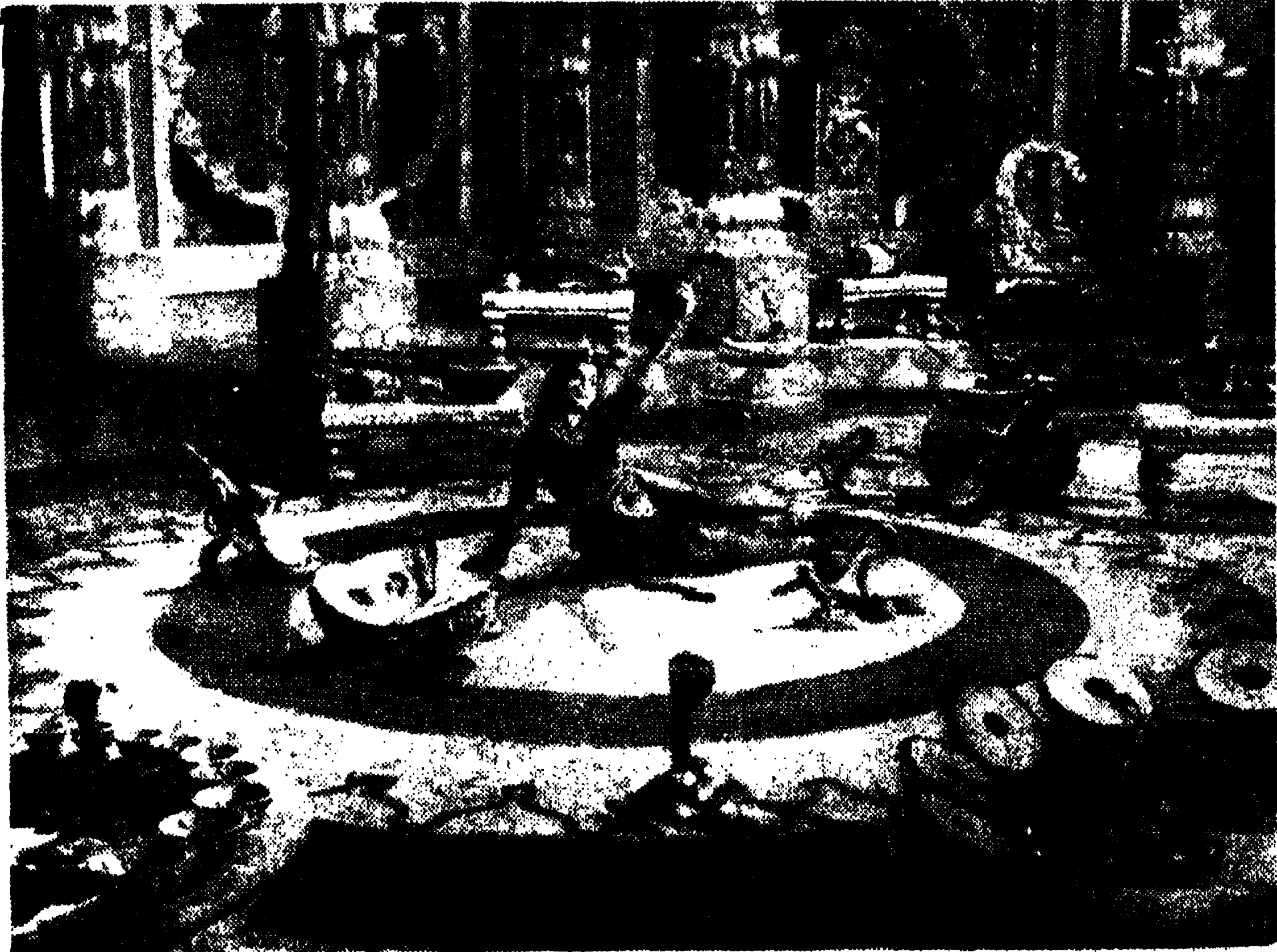
বিনোদ ফিল্মের চিত্রার্ঘ্য 'নাগ দেবতা'র একটি দৃশ্য

হচ্ছে আজ পর্যন্ত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। তিনি স্বচ্ছন্দে পাদচারণা করেছেন, রক-এন-রোলের স্টাইলে নাচবার চেষ্টা করেছেন, গেয়েছেন (সত্যি এবং ঠোঁটনাড়া—দুই) এবং অনুরূপ ভংগীসহকারে অভিনয় করেছেন। এক কথায়, তিনি রজতের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন। তাঁর সংগে প্রায় সমান তালে চলেছেন সন্ধ্যা রায় রুমার ভূমিকায়। তাঁর যৌবনোচ্ছলতাকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করেছেন পরিচালক দিলীপ বসু এবং চিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী। শিবশংকরের ভূমিকায় জহর রায় দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন তাঁর বাচনে ও অংগভংগীতে। এ ছাড়া রাজীবের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সনতের ভূমিকায় দিলীপ রায় এবং অপরাপর ভূমিকায় অজিত চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন।

চিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তীর কাজ সর্বত্র সমান না হ'লেও মোটের ওপর ভালোর পর্যায়ে। বিশেষ ক'রে বহির্দৃশ্য ও রাত্রির দৃশ্যগুলির প্রতি তিনি সুবিচার করেছেন। ভেদ পালের সংগীত-রচনা বাঙলা ছবিতে একটি নূতনত্বের আস্বাদ দিয়েছে এবং সুরযোজনা ও আবহসংগীত—উভয় বিভাগেই অত্যন্ত উপভোগ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে 'হায় নিয়তি একি খেলা'—নামক দুঃখের গানটি বাদ দিলেই ভালো হ'ত। সংগীত-গ্রহণ অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের।

সমগ্রভাবে 'সরি ম্যাডাম' একটি চমৎকার উপভোগ্য চিত্র।

অগ্রদূত পরিচালিত ও তারাশংকর রচিত 'বিপাশা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার।

মন দিল না বঁধু ঃ এস্, কে, প্রোডাকসন্স-এর চিত্র; ১২,৩২০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত-পরিচালনা ও পরিচালনা ঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়; চিত্র-গ্রহণ ঃ সন্তোষ গুহরায়; শব্দধারণ ঃ গৌর দাস ও পরিতোষ বসু; সম্পাদনা ঃ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা ঃ গৌর পোদ্দার; গীতিকার ঃ মোহিনী চৌধুরী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়; রূপায়ণ ঃ সবিতা বসু, সুমনা ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, বুলু ধর, রবীন ঘোষ প্রভৃতি। এস, কে পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১২ই জানুয়ারী থেকে দর্পণা, ছায়া, লোটাস, আলেয়া ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

সুবোধ মুখার্জি পরিচালিত হিন্দী চিত্র 'জংগলী'-তে শাম্মীকাপুর ও সাহিরা বানু

গ্রাম্য পিতা পুত্র ভজহরিকে পাঠিয়েছেন শহরে মানুষ হবার জন্যে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বড়ো হবার জন্যে। পুত্র ভজহরি মানুষ হয়েছেন, বড়োও হয়েছেন, কিন্তু বিদ্যায় নয়, আর্ট কালটিভেসনের ফলে— বাঙলাদেশের বড়ো সিনেমা স্টার হয়ে।—এখন আর তিনি ভজহরি নন, তাঁর নাম হয়েছে সুবিমলকুমার। এবং তিনি যথারীতি প্রেমে পড়েছেন তাঁর বিপরীতে যিনি নিয়মিতভাবে নায়িকা সাজেন, সেই শিখা দেবীর। গ্রাম্য পিতা পুত্রের বহুদিন কোনো খোঁজ পান না, নিজে বাতে, সর্দিতে এবং আরও অপরাপর রোগের আক্রমণে অসুস্থ। কাজেই তিনি ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পাঠালেন তার মামা আত্মারামকে। শহরে এসে আত্মারামের চক্ষু চড়কগাছ; ভাগ্নে ভজা মস্ত বড়ো অ্যাক্টর সুবিমল এবং শিখারূপিনী শিখার প্রেমে ডগমগ। দু'জনে ছবির

"রাজিয়া সুলতানা" চিত্রে নাম-ভূমিকায় নিরূপা রায়

স্যাটিং করে এবং স্যাটিংয়ের ফাঁকে দু'জনে মিলে ঘরবাঁধবার স্বপন দেখে। আত্মারাম এই স্বপন ভেঙে ধূলিস্যাৎ করবার চেষ্টা করে। সুযোগ বুঝে শিখাকেই পাকড়াও করে তাঁর ভাগ্নের ভজার পরিত্রাণের জন্যে। শিখা রাজীও হয়; দু'জনের মাঝে হয় ভুল বোঝা-বুঝি। পরে অনেক দীর্ঘশ্বাস ব্যয়িত করবার পর আবার হয় উভয়ের মিলন অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে, যখন শিখা সকল দুঃখের অবসান কামনায় বিষপানে হতচেতন।

এই মামুলি গল্পই হচ্ছে 'মন দিল না বঁধু'র উপজীব্য। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন ছবিখানির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংগীত-পরিচালক এবং পরিচালক। অনেকগুলি কঠিন কাজের ভার তিনি একক বহন করেছেন এবং তার উপর এই ছবিতেই তাঁর পরিচালকরূপে প্রথম হাতেখড়ি। কাজেই তিনি তাঁর নূতন ভূমিকায় প্রশংসার সংগে উত্তীর্ণ হতে পারেননি এবং সংগে সংগে সংগীত-পরিচালকরূপেও তিনি তাঁর ক্ষমতার সম্যক পরিচয় দিতে অসমর্থ হয়েছেন। তার ওপর সম্পাদনার ত্রুটির জন্যে ছবির দৃশ্যগুলি বহু জায়গাতেই যেন হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে শেষ হয়েছে।

কাজেই বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, 'তুলসী চক্রবর্তী, সবিতা বসু, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির যথাসাধ্য সুঅভিনয় সত্ত্বেও ছবিখানি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারেনি।

বিবিধ সংবাদ

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অবস্থান ধর্মঘট :

একদা বহু কর্মী অধ্যুষিত ইন্দ্রপুরী স্টুডিও আজ পূর্বের গৌরব হারিয়েছে অবস্থাবৈগুণ্যে। এখন এই বিশাল স্টুডিওর কর্মিসংখ্যা মাত্র প'য়তাল্লিশ। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, নিয়মিত পারিশ্রমিক না পাওয়ার অভিযোগে এ'রা গেল শুক্রবার থেকে অবস্থান ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছেন। স্টুডিওতে কাজ থাকুক বা না থাকুক, স্টুডিও ভাড়া নিয়ে যাঁরা ছবি তৈরী করেন, তাঁরা স্টুডিও-মালিককে নিয়মিত তাঁর প্রাপ্য দিন বা নাই দিন, যে-কর্মিরা মাস-মাহিনাতে ওখানে কাজ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রতি মাসের শেষে নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের প্রাপ্য মাহিনা পাবার অধিকারী। এ'দের সকলের গৃহ আছে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে এবং সেই কারণেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এ'দের অর্থব্যয় করতে হয়। এই স্টুডিওর বহু কর্মী তাঁদের জীবনের মূল্যবান বৎসরগুলি এইখানেই কাটিয়েছেন। কাজেই নিয়মিত মাস-মাহিনা থেকে যদি তাঁরা সত্যিই কয়েক মাস ধ'রে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তা'হলে তাঁদের শোচনীয় অবস্থা সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করবে। এ-ব্যাপারে যত শীঘ্র মীমাংসা হয়, ততই মঙ্গল।

রঙমহলের শিল্পী ও মালিক বিরোধ :

পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিরোধে মধ্যস্থতা করেছেন, এ-কথা পাঠকদের নিশ্চয়ই জানা আছে। শোনা যাচ্ছে, মীমাংসার একটি খসড়া উভয় পক্ষের বিবেচনার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাই নিয়ে দুই পক্ষই এখন আলোচনা ও পর্যালোচনা চালাচ্ছেন। এও আশা করা যাচ্ছে, শিগ্‌গিরই বিরোধ মিটে গিয়ে রঙমহলের পাদপ্রদীপ আবার জ্বলে উঠবে।

বিমল রায়ের "কাবুলীওয়ালা" :

বহু প্রতীক্ষিত হিন্দী ছবি "কাবুলীওয়ালা"র শহর কলকাতায় শুভ প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার, ১৯-এ জানুয়ারী থেকে স্থানীয় মিনার্ভা, রাধা, পূর্ণ প্রভৃতি চিত্রগৃহে। ছবিখানির নামভূমিকায় নেমেছেন বলরাজ সাহনি এবং মিনির চরিত্রে দেখা যাবে নবাগতা বেবি সোনুকে। হেমেন গুপ্ত ছবিখানির পরিচালনা করেছেন এবং প্রযোজনা করেছেন বিমল রায়। ছবিখানির সর্বসাধারণের মধ্যে অসামান্য আবেদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহারাষ্ট্র, পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী সরকার ছবিখানির ওপর থেকে প্রমোদকর রহিত করেছেন। শোনা যাচ্ছে, যেখানেই মুক্তিলাভ করেছে, সেখানেই ছবিখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

শান্তারাম পরিচালিত ও প্রযোজিত 'টেকনিকলারে' নির্মিত 'স্ত্রী' :

শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বন করে শান্তারাম নতুন যে রঙীন ছবি তৈরী করেছেন, তার নাম দিয়েছেন "স্ত্রী"। রাজকমল কলামন্দিরের ছবিখানি স্থানীয় জ্যোতি, দর্পণা, প্রিয়া, গ্রেস, গণেশ এবং শহরতলীর অপরাপর ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে আজ, ১৯-এ জানুয়ারী থেকে।

কাঁচড়াপাড়া 'আর্ট থিয়েটার' :

কাঁচড়াপাড়ার রেল কলোনীস্থ স্পল্ডিং ইনস্টিটিউটে 'আর্ট থিয়েটার'

নামে একটি নাট্যসম্প্রদায় যে গেল ১৯৬১ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে প্রতি সপ্তাহের শনিবার দিনটিতে নিয়মিতভাবে অভিনয় চালিয়ে মফস্বলের অভিনয় জগতে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, এ-সংবাদ 'প্রেক্ষাগৃহ'-এর পাঠকেরা আগেই পেয়েছেন। আমরা গেল শনিবার, ১৩ই জানুয়ারী এ'দের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। এদিন এ'দের অভিনয়ে নাটক ছিল তুলসী লাহিড়ীর অমর নাটক 'ছে'ড়া তার'। অভিনয় দেখে মনে হ'ল, এই নাট্যগোষ্ঠীটি যে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেন, তা সচরাচর দুর্লভ। সুনীল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমগ্র দলটি যেন অভিনয়োৎকর্ষের জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। রহিম, ফুলজান, শ্রীমন্ত, মামুদ ইত্যাদি সকল ভূমিকাই মঞ্চের উপর জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়টি গেল এক বছরের মধ্যে 'ছে'ড়া তার', 'দুঃখীর ইমান', 'বিসর্জন', 'মুক্তি', 'কঙ্ককাল' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ ক'রে স্থানীয় নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। আমরা সম্প্রদায়টির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দশরূপকের "ডানা ভাঙ্গা পাখী" :

গেল ৮ই জানুয়ারী, সোমবার দশরূপক সম্প্রদায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পরেশ ধর রচিত "ডানা ভাঙ্গা পাখী" অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। সমাজের ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তিনটি পরিবারের মধ্যে মূর্ত ক'রে নাট্যকার তাদের স্থান দিয়েছেন একটি ত্রিতল বাড়ীর তিনটি তলে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মাধবী ধনী ঘরের ছেলে মোহনের দিকে হাত বাড়ায় তার ভাইয়ের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি নিরাশ হয়ে পদস্খলিত হয়ে পড়ে নীচের তলায়, যেখানে মিস্ত্রী হীরেন ছিল তাকে আশ্রয়ের হাত বাড়িয়ে ঘরে তোলবার জন্যে। অভিনয়ে হিমানী গঙ্গোপাধ্যায় (মাধবী), পান্না চট্টোপাধ্যায় (হীরেন), তারকনাথ ধর (প্রবীণ), শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (টুটুল), শিবনাথ ধর (গগন), তপন দাস (মোহন) প্রভৃতি সকলেই সুঅভিনয় করেন। মাত্র রিনার ভূমিকায় রুবি মিত্রের কর্কশ কণ্ঠ আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র দপ্তরের "রূপোলী চাঁদ" :

গেল ৫ই জানুয়ারী মহাজাতি সদনে সন্ধ্যা ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র দপ্তরের কর্মিবৃন্দ ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপোলী চাঁদ' অভিনয় করেন। প্রগতিমূলক এই নাটকটির রূপায়ণে অভিনেতারা অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন— শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ, শঙ্করনারায়ণ, সুশীল রঞ্জন সিংহ ও রাণী ব্যানার্জি।

নাটকটি আরম্ভ হওয়ার আগে শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাবে সামাজিক প্রগতিমূলক নাটক করার পেছনের যুক্তির বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে কর্মিবৃন্দের পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। স্মরণিকাটি বেশ সুন্দর ও শোভন হয়েছে।

রূপকৃৎ-এর 'বিপ্রদাস' :

গত বুধবার দশই জানুয়ারী '৬২ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রূপকৃৎ-এর সদস্যরা দিলীপ নাগের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' অভিনয় করলেন। মোটামুটিভাবে সমগ্র নাটকটিই সুঅভিনীত হয়েছিল বলা চলে। বিপ্রদাস, দ্বিজদাস ও রায়বাহাদুরের চরিত্রে যথাক্রমে পরিচালক স্বয়ং, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী চরিত্রানুগ সাবলীল অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। বন্দনার চরিত্রে শিপ্রা সাহা ও সতীর ভূমিকায় শাশ্বতী রায়ও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। নাটকটির গ্রন্থনায় প্রতুল দে'র মুন্সীয়ানা লক্ষ্যণীয়।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ-ইংল্যান্ড ৫ম টেস্ট ॥

ভারতবর্ষ : ৪২৮ **রাণ :** (পতৌদির নবাব ১০৩, নরী কন্ট্রাক্টর ৮৬, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৬৫, নাদকার্ণী ৬৩। ডেভিড এ্যালেন ১১৬ রাণে ৩, ব্যারী নাইট ৬২ রাণে ২, বব বারবার ৭০ রাণে ২, টনি লক ১০৬ রাণে ১, পিটার পারফিট ২২ রাণে ১ এবং টেড ডেক্সটার ২২ রাণে ১ উইকেট)।

ও ১৯০ রাণ (মঞ্জরেকার ৮৫, প্রসন্ন ১৭, ইঞ্জিনীয়ার ১৫ নট আউট। লক ৬৫ রাণে ৬, এ্যালেন ৬৪ রাণে ১, পারফিট ২৪ রাণে ১, ডেভিড স্মিথ ১৫ রাণে ১)।

ইংল্যান্ড : ২৮১ রাণ (মাইক স্মিথ ৭৩, ডেভিড এ্যালেন ৩৪, জি মিলম্যান ৩২ নট আউট, ডেভিড স্মিথ ৩৪। সেলিম দুরাণী ১০৫ রাণে ৬, বোরদে ৫৮ রাণে ২, দেশাই ৫৬ রাণে ১, নাদকার্ণী ০ রাণে ১ উইকেট)।

ও ২০৯ রাণ (ব্যারিংটন ৪৮, পারফিট ৩৩, নাইট ৩৩, এ্যালেন ২১ এবং বারবার ২১। দুরাণী ৭২ রাণে ৪, বোরদে ৫৯ রাণে ৩, নাদকার্ণী ২৫ রাণে ১, প্রসন্ন ১৯ রাণে ১ এবং দেশাই ১৬ রাণে ১ উইকেট)।

১ম দিন (১০ই জানুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ২৯৬ রাণ (৭ উইকেটে)। নাদকার্ণী ১২রাণ এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৭ রাণ করে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১১ই জানুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৪২৮ রাণে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১০৮ রাণ (৪ উইকেটে)। মাইক স্মিথ ২৯ এবং পিটার পারফিট ১৬ রাণ করে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৩ জানুয়ারী) : ২৮১ রাণে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ভারতবর্ষ ৬৫ রাণ (৩ উইকেটে)। মঞ্জরেকার ৩১ রাণ এবং উমরিগড় ৭ রাণ করে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (১৪ জানুয়ারী) : ১৯০ রাণে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যান্ড ১২২ রাণ (৫ উইকেটে)। পারফিট ১৮ রাণ এবং নাইট ১৪ রাণ ক'রে নট আউট থাকনে।

৫ম দিন (১৫ই জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস লাঞ্চের পর ১০ মিনিট সময়ে সমাপ্ত।

মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১২৮ রানে জয়লাভ করে। ফলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ২—০ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পায়। এই সিরিজের প্রথম তিনটি টেস্ট খেলা ড্র যায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের এই প্রথম 'রাবার' জয়। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে ৮টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। 'রাবার' পেয়েছে ইংল্যান্ড ৬ বার, ভারতবর্ষ ১ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে ১ বার। ভারতবর্ষ টেস্ট সিরিজ খেলেছে এই পাঁচটি দেশের সঙ্গে—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান। ভারতবর্ষ এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করতে পারেনি। পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ১৮টা টেস্ট সিরিজ খেলে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ৩, হার ১২ এবং সিরিজ ড্র ৩।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই 'রাবার' লাভে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রাক্কালে এই সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়লাভের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের মর্যাদা বহুল পরিমাণে আজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৭ উইকেট খুইয়ে ২৯৬ রাণ করে। এই দিনের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে সাফল্যলাভ করেন তরুণ খেলোয়াড় পতৌদির নবাব (১০৩রাণ) এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর (৮৬ রাণ)। পতৌদির নবাব তাঁর ১০৩ রাণ করেন ১৬৮ মিনিটে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। সেঞ্চুরী রাণ তুলতে তাঁর ১৬৩ মিনিট সময় লাগে। ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট খেলায় তিনি সর্বাপেক্ষা কম সময়ে সেঞ্চুরী রাণ করার রেকর্ড করেন। তাঁর দর্শনীয় এবং নির্ভুল খেলাই ভারতবর্ষের প্রথম দিনের খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নরী কন্ট্রাক্টর ৫ম টেস্ট খেলায় শুধু টসে জয়ী হননি। তিনি যে আলোচ্য টেস্ট সিরিজের খেলায় একটানা অসাফল্যের জের টেনে চলেছিলেন তার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আবার কন্ট্রাক্টর ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছ থেকে নায়কোচিত সম্মানলাভ করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রাক্কালে তাঁর এই ব্যাটিং সাফল্য তাঁর খেলোয়াড় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ উপর্যুপরি চারটি টেস্ট খেলায় টসে জয়ী হয়েছে। উজ্জ্বল ক্রিকেট খেলা বলতে যা বুঝায় ভারতবর্ষ তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই দিনের খেলায়। অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর তাঁর অভ্যস্ত রক্ষণশীল নীতি পরিহার করে আক্রমণাত্মক নীতি

দুই অধিনায়ক—নরী কন্ট্রাক্টর এবং টেড ডেক্সটার।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

অবলম্বন করেন। কণ্ট্রাকটর এবং পতৌদির নবাব তৃতীয় উইকেটের [illegible] ৯৪ মিনিটের খেলায় দলের [illegible] রাণ তুলে দেন। মধ্যাহ্নভোজের পর থেকে চা-পানের বিরতি—এই দু ঘণ্টার সময়ে ভারতবর্ষের ১৩৫ রাণ [illegible] অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এক রাণের বেশী। এক সময়ে স্কোর বোর্ডের [illegible] হিমসিম খেয়ে যান ভারত-[illegible] রাণের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে [illegible] করতে—১৯৮ মিনিটের খেলায় ১৭৮ রাণ। দলের ৭৪ রাণের মধ্যে [illegible] আউট হন, জয়সীমা দলের [illegible] রাণে এবং মঞ্জরেকার দলের [illegible] রাণে। কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে পতৌদির [illegible] ৩য় উইকেটে খেলতে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ভারতবর্ষের রাণ দাঁড়ায় [illegible], ২ উইকেট পড়ে। কন্ট্রাক্টর [illegible] রাণ এবং পতৌদির নবাব ৬ রাণ করে নট আউট। দলের ১৭৮ রাণে কণ্ট্রাকটর ৮৬ রাণ করে বারবারের [illegible] বোল্ড আউট হন। কন্ট্রাক্টরের নির্ভুল ১৯৮ মিনিটের খেলায় ছিল ১১টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী। তাঁর এই ৮৬ রাণই আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে তাঁর পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ। এর আগে ছিল [illegible] রাণ (৩য় টেষ্ট নিউ দিল্লী)। কণ্ট্রাকটরের শূন্যস্থানে উমরীগড় [illegible] নামেন পতৌদির সঙ্গে। কিন্তু উমরীগড় মাত্র ২ রাণ করে দলের [illegible] রাণের মাথায় এ্যালেনের বলে উইকেট-কীপার মিলম্যানের হাতে ধরা [illegible]। এই সময়টায় ভারতীয় দলের সমর্থকদের মনে কালো মেঘ নেমে আসে, ১৯৩ রাণের মধ্যে চারজন [illegible] ব্যাটসম্যান আউট—জয়সীমা ([illegible]), মঞ্জরেকার (১৩ রাণ), কন্ট্রাক্টর ([illegible] রাণ) এবং উমরীগড় (২ রাণ)।

দলের এই সংকট অবস্থায় নির্ভীক-ভাবে খেলে গেলেন পতৌদির নবাব। দলের ১৯৮ রাণের মাথায় তিনি এ্যালেনের বলে তাঁর দ্বিতীয় ওভার-বাউণ্ডারী মারলেন। দলের রাণ দাঁড়াল ২০৪, ২২৩ মিনিটের খেলায়। তাঁর হল ৮২ রাণ।

চা-পানের বিরতির সময় ভারত-বর্ষের রাণ দাঁড়াল ২২১, ৪ উইকেটে। পতৌদির নবাব ৯০ রাণ এবং বোরদে ৯ রাণ। চা-পানের বিরতির পরের খেলায় লকের বলে পতৌদি ৭টা রাণ করলেন--এক এক করে তিন রাণ এবং একটা বাউণ্ডারী। তাঁর রাণ দাঁড়াল ৯৭। লকের হাত থেকে নাইট বল নিলেন। নাইটের প্রথম বলেই স্কোয়ার লেগে বল পাঠিয়ে পতৌদি বাউণ্ডারী করলেন--রাণ হল ১০১।

বাপু নাদকার্ণী

দলের ২৪৫ রাণের মাথায় নাইটের বল পুল করতে গিয়ে পতৌদি ঠিকমত বলটা মারতে পারেননি। লেগে লকের

টনি লক

মাইক স্মিথ

হাতে বলটা ধরা পড়ায় পতৌদি তাঁর ১০৩ রাণের মাথায় আউট হ'ন। এই ১০৩ রাণ করতে ১৬৮ মিনিট সময় লাগে। এই রাণের মধ্যে ছিল ১৬টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী। এইদিন ভারতবর্ষের আরও দুটো উইকেট পড়ে--দলের ২৭৩ রাণের মাথায় দুরাণী ২১ রাণ করে এবং ২৭৭ রাণের মাথায় বোরদে ৩১ রাণ করে আউট হন। প্রথম দিন খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতবর্ষের রাণ ২৯৬, ৭টা উইকেট পড়ে।

৮ম উইকেটের জুটি নাদকার্ণী এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার যথাক্রমে ১২ ও ৭ রাণ করে নট আউট থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম আধ ঘন্টার খেলায় ভারতবর্ষের ৩৮ রান ওঠে। এই রানের মধ্যে নাইটের প্রথম ওভারে ইঞ্জিনিয়ার একাই ১৬ রান করেন। নাইটের বলে ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে ড্রাইভ মেরে বাউন্ডারী করেন। তৃতীয় বলে হুক ক'রে বাউন্ডারী এবং চতুর্থ বলে ২ রান। পঞ্চম বলটা ছিল ফুল টস--সে বল ড্রাইভ মেরে বাউন্ডারী এবং ষষ্ঠ বলে ২ রান—এক ওভারে মোট ১৬ রান। ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ৩৩ রানের মাথায় খুব জোর আউট হওয়া থেকে বেঁচে যান। প্যারফিট সোজা ক্যাচ ধরতে পারেননি, বোলার ছিলেন বারবার। এর আগে বারবার একবার ইঞ্জিনিয়ারের ক্যাচ ফেলে দেন, এ্যালেনের বলে।

দ্বিতীয় দিনে খেলা জমিয়েছিলেন ৮ম উইকেটের জুটি ফারুক ইঞ্জি-নীয়ার এবং বাপু নাদকার্ণী। এই ৮ম উইকেটের জুটিতে ১১০ মিনিটের খেলায় তাঁরা দলের ১০১ রাণ তুলে দিয়ে যে কোন দেশের বিপক্ষে অষ্টম উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড করেন।

পূর্ব রেকর্ড ৮২ রাণ (জি এস রামচাঁদ এবং এম এস তামানে, পাকিস্থানের বিপক্ষে, ভাওয়ালপুরে ১৯৫৪-৫৫)।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেণ্ট খেলায় অষ্টম উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড ছিল ৭৪ রাণ (লাল সিং এবং অমর সিং, লর্ডস, ১৯৩২)। দলের ৩৭৮ রাণের মাথায় ইঞ্জিনীয়ার তাঁর ৬৫ রাণ করে আউট হন। এই রাণ করতে তিনি ১১০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন এবং বাউণ্ডারী করেছিলেন ১১টা। উপস্থিত এই ৬৫ রাণই তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের সর্বোচ্চ রাণ। ইঞ্জিনীয়ারের শূন্য উইকেটে দেশাই খেলতে নামেন। দেশাই ১৩ রাণ করে দলের ৩৯৮ রাণের মাথায় বারবারের বলে, এল-বি-ডব্লিউ হয়ে আউট হন। দলের ৪২৮ রাণে ১০ম উইকেট (নাদকাণী) পড়ে। নাদকাণী ১৬৩ মিনিট খেলে তাঁর ৬৩ রাণ করেন। বাউণ্ডারী
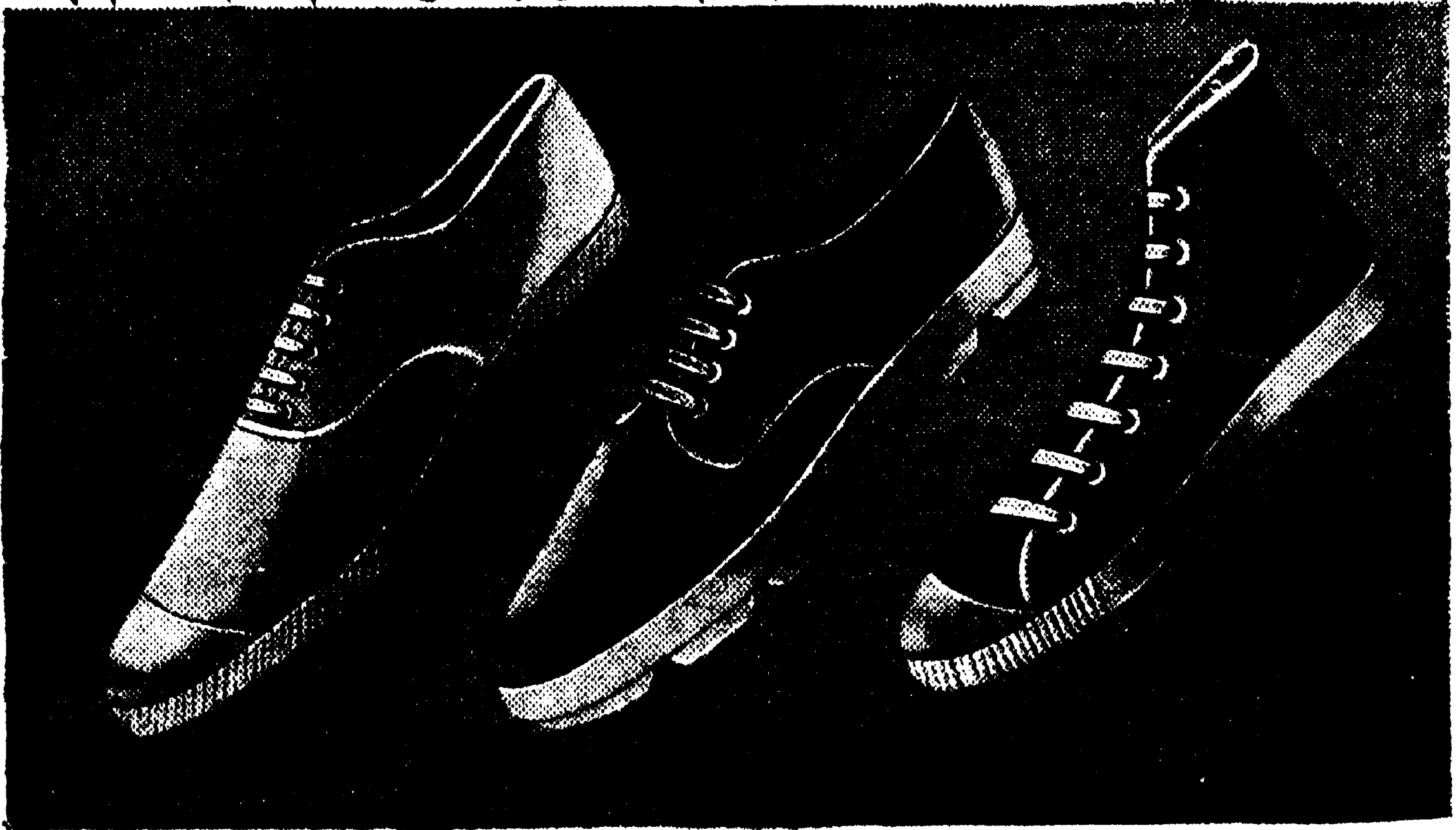
মারেন ১০টা। প্রসন্ন ১ রাণ করে নট আউট থেকে যান।

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ৪২৮ রাণে শেষ হয়। এই ৪২৮ রাণ তুলতে আট ঘণ্টা সময় লাগে। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস কুড়ি মিনিট স্থায়ী ছিল।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। ৫৪ রাণের মধ্যে চারজন নামকরা ব্যাটসম্যান বিদায় নেন--দলের ১৮ রাণে রিচার্ডসন, ৪১ রাণে ব্যারিংটন, ৪৫ রাণে ডেক্স-টার এবং ৫৪ রাণে বারবার। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে মাইকস্মিথ এবং পিটার পারফিট দলের এই দিনের ভাঙ্গন রোধ করেন। নির্দিষ্ট সময়ে ১০৮ রাণ ওঠে চার উইকেট পড়ে। মাইক স্মিথ ২৯ রাণ এবং পিটার পারফিট ১৬ রাণ করে নট আউট থাকেন।

১২ই জানুয়ারী বিশ্রামের দিন ছিল।

তৃতীয় দিনে খেলার পট পরিবর্তন হ'ল। ইংল্যান্ড দলের সহ-অধিনায়ক মাইক-স্মিথ, বোলার ডেভিড স্মিথ এবং ডেভিড এ্যালেন এবং উইকেট-কীপার মিলম্যানের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার পরিচয় পাওয়া গেল। ইংল্যান্ডের এই চারজন খেলোয়াড় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ১০৮, ৪ উইকেট পড়ে—রিচার্ডসন, ব্যারিংটন, ডেক্সটার এবং বারবার এই চারজন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান বিদায় নিয়েছেন। ইংল্যান্ড কোনঠাসা হয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের বাকি ৬টা উইকেটে ১৭৩ রান উঠে গিয়ে ২৮১ রানে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয়। ফলো-অনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার থেকে সম্মানের সঙ্গেই ইংল্যান্ড রেহাই পায়। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে মাইক স্মিথ এবং পারফিট দলের ৮০ রান, ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে মাইক স্মিথ এবং নাইট ৪৬ রান তুলে দেন। শেষ উইকেটে ডেভিড স্মিথ এবং উইকেট-কীপার মিলম্যান দলের মূল্যবান ৫৫ রান করেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় বল লুফতে না-পারায় ইংল্যান্ড দলের দু'জন এবং ভারতবর্ষের একজন খেলোয়াড় আউট থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। দেশাই এ্যালেনের 'ক্যাচ' নষ্ট করেন। মিলম্যানের ক্যাচ ধরতে পারেননি নাদকার্ণী। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে উমরী-গড়কে আউট করার সুযোগ নষ্ট করেন পারফিট। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৮১ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষ ১৪৭ রানে এগিয়ে যায়; কিন্তু ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি—দলের ১৫ রানে কন্ট্রাক্টর, ৩০ রানে জয়সীমা এবং ৫০ রানে পতৌদি আউট হ'ন। বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেন সেলিম দুরাণী, ১০৫ রানে ৬টি উইকেট নিয়ে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাঁকে নিয়ে এই চারজন বোলার এক ইনিংসের খেলায় ৬টি বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন—লালা অমর সিং (মাদ্রাজ, ১৯৩৩-৩৪)—৭টি, লালা অমর সিং (লর্ডস, ১৯৩৬)—৬টি, ভি মানকড় (মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২)—৮টি, এস জি সিন্ধে (নিউদিল্লী, ১৯৫১-৫২)—৬টি এবং সেলিম দুরাণী (মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২)—৬টি।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ৫ম উই-কেট (পারফিট) পড়ে যায় দলের ১৩৪ রানে। ৫ম উইকেটের জুটি ভাঙ্গায় দর্শকদের গ্যালারীও আনন্দধ্বনিতে ভেঙ্গে পড়ে। ৫ম উইকেটের জুটি পার-ফিট এবং মাইক স্মিথ দলের ৮০ রান যোগ করেন। পারফিটের ২৫ রানে ছিল ৪টে বাউন্ডারী। মাইক স্মিথের সঙ্গে খেলতে নামেন বেরী নাইট। দলের ১৮০ রানের মাথায় মাইক স্মিথ তাঁর ৭৩ রান ক'রে দুরাণীর বলে উমরীগড়ের হাতে কট হ'ন। মাইক স্মিথ ২০০ মিনিট খেলে তাঁর ৭৩ রান করেন—৮টি বাউন্ডারী এবং ১টি ওভার-বাউন্ডারী মারেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে এই ৭৩ রানই তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান এবং ৫ম টেস্ট খেলায় তিনিই দলের সর্বোচ্চ রান করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে মাইক স্মিথ এবং বেরী নাইট দলের ৪৬ রান তুলে দেন। খেলার সেই সময়ের পরি-স্থিতিতে এই রান খুবই মূল্যবান।

মাইক স্মিথের শূন্য উইকেটে এ্যালেন খেলতে নামেন, নাইটের সঙ্গে। এই সময় দলের রান ১৮০, ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ইংল্যাণ্ডের ৪৯ রানের প্রয়োজন ছিল। ৯ রান যোগ হওয়ার পর দলের ১৮৯ রানের মাথায় নাইট (১৯ রান) বিদায় নিলেন। এ্যালেনের সঙ্গে খেলতে নামেন উইকেট-কীপার মিলম্যান। ভারতীয় দলের অনেক সমর্থকই চোখের সামনে কল্পনা করছেন—ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু এরা দুজনে ২২ রান যোগ ক'রে লাঞ্চ খেতে গেলেন। লাঞ্চের সময়ের স্কোর—২১১ রান (৭ উইকেটে), এ্যালেন ২৬ রান এবং মিল-ম্যান ৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

লাঞ্চের পর, ইংল্যাণ্ডের ২২৬ রানের মাথায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুরানীর পর পর বলে এ্যালেন ৩৪ রান ক'রে এবং লক কোন রান না করেই আউট হলেন। ৯টা উইকেট পড়ে ইংল্যাণ্ডের ২২৬ রান—তখনও ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ৩ রানের প্রয়োজন। শেষ খেলোয়াড় ডেভিড স্মিথ খেলতে নামলেন। ডেভিড স্মিথ প্রথমেই দুরানীর হ্যাট-ট্রিক রোধ করলেন এবং তারপর দলকে ফলো-অন করার লজ্জা থেকে বাঁচালেন। এর পর তিনি বোলার-দের এমনভাবে পিটতে লাগলেন যে, ভারতীয় সমর্থকদের সমস্ত উৎসাহ ও উত্তেজনা মিইয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের এই শেষ উইকেটের জুটিতে ৪৮ মিনিটের খেলায় ৫৫ রান উঠে গেল, রান দাঁড়াল ২৮১। শেষ কালে নাদকার্নীর বলে ডেভিড স্মিথ বোল্ড হ'লেন। ডেভিড স্মিথ ৪৮ মিনিট খেলে ৩৪ রান করেন, ৩টে বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী মারেন। মিলম্যান ৩২ রান ক'রে নট-আউট থেকে যান। ২৮১ রানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে ভারতবর্ষ মাত্র ১৪৭ রানে অগ্রগামী হয়।

চা-পানের ৪৫ মিনিট আগে ভারত-বর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৩ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৫ রান করে। জয়সীমা (১০), কন্ট্রাক্টর (৩ রান) এবং পতৌদির নবাব (১০ রান) আউট হয়ে যান। বিজয় মঞ্জরেকার ৩১ এবং উমরীগড় ৭ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। ভারতবর্ষ ৭টা উইকেট হাতে জমা রেখে ২১২ রানে অগ্রগামী হয়। কিন্তু তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণ ছিল।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৭টা উইকেট পড়ে ১২৫ রাণ ওঠে, মোট রাণ দাঁড়ায় ১৯০। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষ ৪৫ মিনিট ব্যাট করে। লাঞ্চের সময় ছিল ১৪৮ রাণ, ৭টা উইকেট পড়ে। মঞ্জরেকার ৭৭ রাণ এবং নাদকার্ণী ১ রাণ করে নট আউট ছিলেন। দলের ১৫৮ রাণের মাথায় মঞ্জরেকার তাঁর ৮৫ রাণ ক'রে নিজের দোষে রাণ আউট হ'ন। মঞ্জরেকার ২৪৮ মিনিট খেলে ৮৫ রাণ করেন, বাউন্ডারী করেন ১০টা। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯০ রাণের মধ্যে মঞ্জরেকার একাই করেন ৮৫ রাণ। এই থেকেই তাঁর খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। দলের ভাঙ্গনের মুখে একমাত্র তিনিই দৃঢ়তার

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের ফলাফল ধরে কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্য :

ব্যাটিং

	মোট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী সংখ্যা
উমরীগড়	৫৪	৩১৮৬	২২৩	১১
মঞ্জরেকার	৪২	২৫১৬	১৮৯*	৫
কণ্ট্রাক্টর	২৯	১৫৮৫	১০৮	১
বোরদে	২৩	১২৩০	১৭৭*	২
জয়সীমা	৮	৭২৮	১২৭	১
নাদকার্নী	১৬	৫৫৮	৭৬	০

* নট আউট

বোলিং

	রান	উইকেট
বোরদে	১৫০৭	৩৫
নাদকার্নী	১০৫৫	৩২
দুরানী	৬৩১	২৩

সেলিম দুরাণী

সঙ্গে খেলে যান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য টেস্ট সিরিজে মঞ্জরেকার মোট ৫৮৬ রাণ ক'রে যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণ করার রেকর্ড করেছেন। পূর্বের রেকর্ড ৫৬০ রাণ রুসী মোদী (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৪৮-৪৯) এবং পলি উমরিগড় (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৫৩)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রাণের রেকর্ড—৭৭৯ রাণ ই ডি উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৪৮-৪৯)। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কেন ব্যারিংটন মোট ৫৯৪ রাণ ক'রে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রাণ করার নূতন রেকর্ড করেন। পূর্ব রেকর্ড ৪৫১ রাণ—এ জে ওয়াটকিন্স, ১৯৫১-৫২।

ভারতবর্ষের শেষ উইকেটের জুটি ইঞ্জিনীয়ার এবং প্রসন্ন মূল্যবান ৩২ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক ৬টি উইকেট পান টনি লক ৬৫ রাণে।

ভারতবর্ষের থেকে ৩৩৭ রাণের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। বাকি ৪৭০ মিনিটের খেলায় ৩৩৮ রাণ তুলতে পারলে ইংল্যাণ্ডের জয়—খেলার এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে নামে। প্রথম ইনিংসের খেলার মতই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় ইংল্যাণ্ড চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দলের পাঁচজন নামকরা ব্যাটসম্যান আউট হ'ন। এদিকে মাত্র ১২২ রাণ উঠে। আরও কম রাণ হ'ত, যদি উমরিগড় এবং দুরাণী ব্যারিংটনের ক্যাচ এবং প্রসন্ন ডেক্সটারের ক্যাচ নষ্ট না করতেন। ব্যারিংটন ৪৮ রাণ করেন।

পাতৌদির নবাব

ভি এল মঞ্জরেকার

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড তার বাকি ৫টা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১২২ রানের সঙ্গে ৮৭ রান যোগ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ২০৯ রান দাঁড়ায়। চতুর্থ দিনে দলের ৯০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। পঞ্চম দিনে দলের ১৫৫ রানের মাথায় নাইট (৬ষ্ঠ উইকেট) নিজস্ব ৩৩ রান ক'রে বিদায় নেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ব্যারি নাইট এবং পিটার পারফিট দলের মূল্যবান ৬৫ রান তুলে দেন। দলের ১৬৪ রানে পারফিট এবং ১৯৪ রানে মিলম্যান বিদায় নেন। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় স্কোর দাঁড়ায় ২০২, ৮টা উইকেট পড়ে। এ্যালেন ২১ এবং লক ৭ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন। লাঞ্চের পর মাত্র ১০ মিনিট ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস স্থায়ী ছিল।

লাঞ্চের পরের খেলায় কোন রান যোগ হ'ল না, এ্যালেন তাঁর ২১ রান ক'রে দলের ২০২ রানের মাথায় আউট হ'ন। দলের শেষ খেলোয়াড় ডেভিড স্মিথ খেলতে নামেন লকের সঙ্গে। দলের ২০৯ রানের মাথায় লক ১১ রান ক'রে বোরদের বলে নাদকার্ণীর হাতে বন্দী হ'ন। ফলে ভারতবর্ষ ১২৮ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

সেলিম দুরানী দুই ইনিংসের খেলায় ১৭৭ রানে ১০টা উইকেট (১০৫ রানে ৬ এবং ৭২ রানে ৪) পান।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাত্র দু'জন ভারতীয় খেলোয়াড়—ভিনু মানকড় (১০৮ রানে ১২টা, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২) এবং সেলিম দুরানী একটা টেস্ট খেলায় ১০টা উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে দুরানী মোট ২৩টা উইকেট পেয়ে উভয় দলের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার সম্মান পেয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বেশী সংখ্যক উইকেট পেয়েছেন লক ২২টা এবং এ্যালেন ২১টা।

এক নজরে—ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা	রাবার জয় অথবা ড্র
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	০	১	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	৫	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	০	৩	১	৪	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	০	৫	০	৫	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	২	০	৩	৫	ভারতবর্ষ
মোট		৩	১৫	১১	২৯	

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অপারেশন চক্র
৬॥০ ৩্

কালোভ্রমর
(৩য় ও ৪র্থ একত্রে) ৫॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযান ৫॥০
উত্তরায়ণ ৫॥০

প্রবোধকুমার সান্যালের

বিবাগী ভ্রমর ৭্
বেলোয়ারী ৭্

অবধূতের

দুর্গমপন্থা ৪্ **পিয়ারী** ৪্

মন্মথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৭্ **সর্বংসহা** ৫্

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহ্নিবন্যা ৮॥ **উপকণ্ঠে** ৯্
গল্পপঞ্চাশৎ ৯্

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ
১ম ৫্, ২য় ৫্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অলকা-তিলকা ৪॥০
সাত পাকে বাঁধা ৪॥০

চরণদাস ঘোষের

সহধর্মিণী ৪॥০ **দান** ৩॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তরঙ্গের পর ৫্

আশাপূর্ণা দেবীর

সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫্
গল্পপঞ্চাশৎ ৮্
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫্

হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

লীলাভূমি ৫্

শঙ্কাহীন চিত্তেই বলিতেছি শঙ্কু মহারাজ এই এক [illegible] বাজীমাৎ করিয়াছেন।......"বিগলিত-করুণা-জাহ্নবী-যমুনার সর্বত্র [illegible] পরিচয়। লেখকের রসবোধ আছে, শিল্পদৃষ্টি আছে এবং [illegible] দখল ও গল্প তৈরীর ক্ষমতা আছে। গ্রন্থটি বাংলার ভ্রমণ [illegible] সার্থক রচনা।

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগান্তর)।

তোমার মধ্যে এমন একজন প্রকৃত গুণী লেখক চাপা ছিল এটি আগে বুঝতে পারিনি।...পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাবছিলুম তোমার অভিজ্ঞতা ও লিপিকুশলতার কথা। তোমার চিত্র এবং চরিত্র বর্ণনা পাঠকের ঔৎসুক্যকে প্রতিনিয়তই জাগিয়ে রেখে চলেছে।...আমি তোমাকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

—প্রবোধকুমার সান্যাল।

তোমার ভ্রমণকাহিনী 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' সবটা পড়া হয়নি। যতটা পড়েছি তা ভাল লেগেছে।...

...—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বই পড়েছি, খুব ভাল লেগেছে। আপাততঃ সংক্ষেপে সেইটুকু জানিয়েই তৃপ্তি পাচ্ছি। পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

—সজনীকান্ত দাস।

'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' বাংলা ভাষার ভ্রমণ সাহিত্যে একটি রমনীয় সংযোজন...বইখানিতে শেষ দিকটার প্রতি thrillএ পূর্ণ। ভ্রমণের সঙ্গে কাহিনীও মিলেছে বড় সুন্দর।...কাহিনীর উপসংহার অনেকদিন পর্যন্ত পাঠকের হৃদয়কে বিচলিত করতে থাকে। প্রথম রচনাতেই শঙ্কু মহারাজ Bulls eye বিদ্ধ করেছেন।

—প্রমথনাথ বিশী।

চলার পথে নানা ঘটনার সহিত রোমান্স ও ট্রাজেডী জড়িয়ে থাকায় অনুসন্ধিৎসু মন এগিয়ে চলে লেখকের সঙ্গে আর কিছু জানার জন্য।

—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

সারারাত ধরে পড়লাম। এই বইখানি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই।...আমার খুব ভাল লেগেছে বইখানি, অকপটে তাই জানালাম।

—অবধূত।

শঙ্কু মহারাজের

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখী ভ্রমণের অত্যাশ্চর্য কাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

দুই মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

অসংখ্য চিত্র, মানচিত্র ও পথপঞ্জীসহ—

= মূল্য ছ টাকা =

মনোজ বসুর মহৎ উপন্যাস

বন কেটে বসত

"বন কেটে বসত" একটি সুবৃহৎ বাস্তবজীবনধর্মী উপন্যাস। রূপদক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রদ্ধেয় লেখক "বন কেটে বসত"এ যাদের রূপায়িত করেছেন, একালের পাঠকের কাছে তারা এক একটি জিজ্ঞাসা এবং মনোযোগ আকর্ষণের প্রাণবন্ত পুরুষ। তাই মনে হয়, মহৎ লেখক শুধু নিছক স্রষ্টাই নয়, ভূয়োদর্শী।

—দেশ

॥ নয় টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৮শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 26th January 1962.
40 Naya Paise.

এ সপ্তাহের অমৃত যখন প্রকাশিত হবে তখনও নেতাজী জন্মদিবসের উৎসব শেষ হয়নি এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব তখন আসন্নপ্রায়। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেদিন আমরা লিখছি সেদিন শীতের প্রায়ান্ধকার ঊষাকালে এই নগরীর পথে পথে কিশোর ও যুবকদের প্রভাতফেরীর সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। সেই সংগীত যেন একটি যুগের প্রতিধ্বনি—সহসা মনে হয়, অতীতের দ্বার যেন কে খুলে দিয়েছে। যে বৃহৎ, মহান, উজ্জ্বল সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বহু আত্মদানের দ্বারা ভারতবর্ষ নিজেকে উপলব্ধি করেছিল, তার সমস্ত উদ্দীপনা অকস্মাৎ রক্তের মধ্যে যেন অনুভব করা যায়। সকালের প্রায়ান্ধকারে যখন শুনি—'ওগো মা তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে"—তখন আমাদের দেশমাতৃকা, যিনি স্বর্ণপ্রসূ, তেজোময়ী—তাঁর মূর্তি পুনর্বার চকিতে মনশ্চক্ষুতে দেখা দেয়।

আজ রাজনীতির অনেকখানি শুধু ভোট, পার্লামেণ্ট এবং আমলাতান্ত্রিক আচরণের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু একদিন রাজনীতি এবং দেশপ্রেম সমার্থক ছিল। এবং সেদিন মাত্র ১৪ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন ত্যাগ এবং অন্তরের অগ্নিদাহন ছাড়া রাজনীতির আর কোনো প্রসাদ ছিল না। আজ নানা শ্রেণীর প্রসাদলোভ রাজনীতির ক্ষেত্রকে কলুষিত করেছে এবং এর মধ্যে ব্যবসায়িক তৎপরতাও দেখা দিয়েছে। কাজেই দেশপ্রেমের সেই প্রজ্বলন্ত ছবি ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের মন থেকেও বিলীয়মান, তরুণদের মধ্যে ত্যাগস্পৃহা আর প্রবলতম আবেগের বস্তু নয়। এবং দেশ বলতে একটি অখণ্ড, জীবন্ত মূর্তি আর যেন চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হতে চায় না।

বোধহয় ইতিহাসে এই উত্থানপতন অনিবার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষকে এক তেজোগর্ভ অধ্যায়ে রেখেছে। এর পরের মুহূর্তে আছে অনিবার্য অবসাদ, সংশয় ও নৈরাশ্য। এই সংশয়ের যুগে যেহেতু জাতির হৃদয়কেন্দ্র থেকে প্রধান আবেগের শিখাটি অপসারিত হয়েছে এবং সেখানে তাপ নিম্নগামী ও আত্মবিশ্বাস মৃতপ্রায়, সেইজন্য একথা অনিবার্য যে, জাতির সম্মিলিত প্রাণশক্তি আজ দুর্বলতর হয়ে দেখা দেবে। অনৈক্য, অবিশ্বাস ও স্বার্থ-বাঁটোয়ারার কলহও উপস্থিত হবে।

তাছাড়া, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ও আইন প্রবর্তনের প্রথম যুগে ৪০ কোটি মানুষকে নিয়ে যে বিরাট মুক্তির পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, তা থেকেও প্রথম মন্থনে অমৃতের পরিবর্তে গরল ওঠা স্বাভাবিক। নূতন মানুষেরা ক্ষমতার আস্বাদ ও সংবিধানের নূতন অধিকার লাভ করেছে; কোটি কোটি মানুষ জীবন সম্বন্ধে, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নূতন চাহিদার সম্মুখীন হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এই যুগে ১৯৪৭ থেকে বর্তমান চলতি সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ ঘটতে আরম্ভ করেছে। অতীতে জীবনের কাছে তাদের কোনো দাবি ছিল না। ভারতবর্ষের তৎকালীন ৩৩ কোটি নরনারীর মধ্যে অন্তত ২৫ কোটি ছিল সেই অবচেতন মনুষ্যত্বের মধ্যে। আজ বাস্তব জীবনে তাদের মানসিক জাগরণের, বৈষয়িক চাহিদার, অধিকার-প্রয়োগের এবং প্রতিনিধিত্বের প্রথম যুগসন্ধি।

এই যুগসন্ধি সেইজন্যই মহান এবং ভয়ংকর—৪০ কোটি নরনারীর প্রথম জাগরণের কোলাহলের দ্বারা এই সন্ধিক্ষণ পরিপূর্ণ। এবং এই ক্ষণে তাদের অপূর্ণ প্রত্যাশা, তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাদের ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব যেমন একদিকে সমস্ত দেশকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে থাকবে, তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনের সীমাবদ্ধ শক্তি, অতীতের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা এবং সম্মুখের দুঃসাধ্য কর্তব্যের আহ্বান এ্যাডমিনস্ট্রেশানকে বিচলিত এবং শ্রমজীর্ণ করিতে চাইবে।

কিন্তু এ সমস্তই আসন্ন নবজন্মের বেদনার সাক্ষ্য। আমরা একটি যুগ থেকে আর একটি যুগে প্রবেশোদ্যত। একটি অধ্যায় থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত হয়ে অন্য অধ্যায়ে চলেছে। এই পৃষ্ঠা পরিবর্তনের মুহূর্তে পুরোনো পাতার অক্ষরগুলি অস্পষ্ট মনে হচ্ছে, পৃষ্ঠাটি যেন ঘূর্ণমান, যেন আলো-আবছায়ায় আন্দোলিত। কি বলতে চাইছে যেন তা জানি না। তবু জানি এ শুধু এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়ে উত্তরণের সংশয়মাত্র। কেননা ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হবেই।

কবিতা
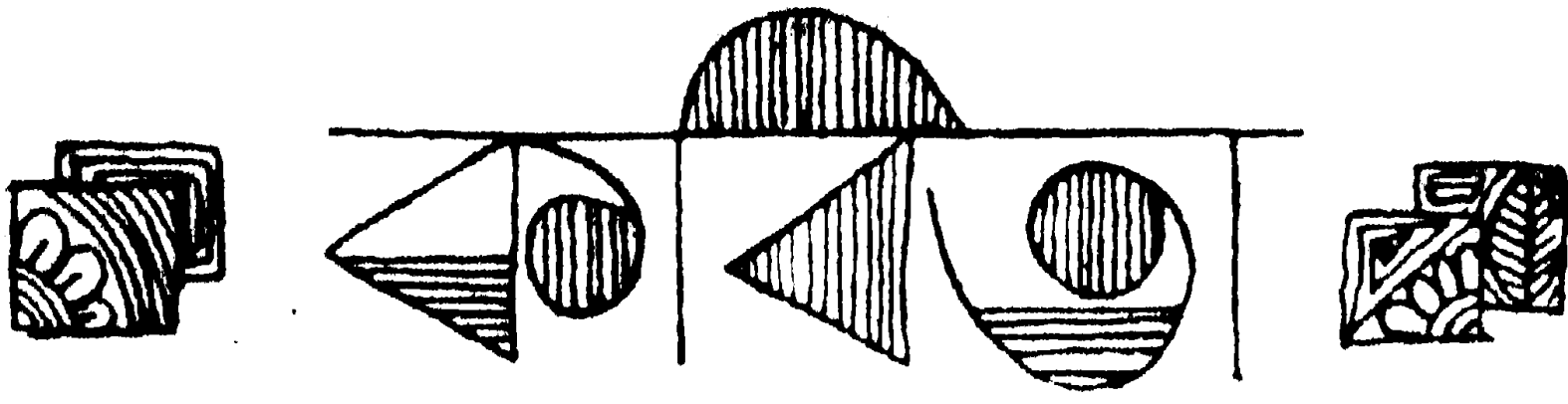
শিশিরকুমার তর্পণ
কালিদাস রায়, কবিশেখর

হে দেশপূজ্য জনগণগুরু
মহাভাগবত তুমি।
তোমারে অঙ্কে ধরিয়া ধন্য
একদা বঙ্গভূমি।
যতদিন যায় তোমার মহিমা
মহাসিন্ধুর পাইনাক সীমা।
ধন্য হয়েছে গত শতাব্দী
তোমার ললাট চুমি'।

নিমাই-এর প্রেম অমিয়ের ধারা
বহাইলে ধরাতলে।
আজো নরনারী সে ধারায় স্নান
করিতেছে কুতূহলে।
কত না কীর্তি রয়েছে উজলি,
কার কথা ছাড়ি কার কথা বলি।
জাতীয়তা বীজ রোপিলে বঙ্গে
তাহাতে অমৃত ফলে।।

শক্তি তোমার নূতন করিয়া
গড়িল দেশের হৃদি।
ভক্তিসাগর মন্থন করি
তুলিলে পরম নিধি।
ইহ পরত্রে ঘটালে মিলন
তব অবদান দেশে অতুলন
দেশের সেবার ব্রতে তুমি দিলে
নবীন বিধান বিধি।।

✲ ✲

বহুরূপে হেরি যে তোমায়
হরেন্দ্রনাথ সিংহ

তোমায় সর্বত্র হেরি ভবনে ভবনে—
নব নব রূপে কত বিচিত্র লীলায়,
বহুরূপে ধরা দাও ধরায় কায়ায়;
মধুর সম্পর্ক ধরি' আত্মীয় জীবনে।
দেখাও অজানা দৃশ্য প্রেমের বাঁধনে—
ভুলায়ে কত কী ছলে পূজায় খেলায়,
অসীম শকতি-দানে ভবের মেলায়;
দিতেছ যে কবিতার প্রেরণা গোপনে।

রূপে গুণে গন্ধে স্পর্শে প্রকৃতি মাঝারে,
নীরবে নীরবে হয় কত পরিচয়।
তুষার পার্বত্য পথে দিতেছ আমারে,
বারে বারে দেহ মনে শকতি দুর্জয়।

অসীম সৌন্দর্য মাঝে দেশে দেশে ঘুরি,
সর্বস্ব ভুলায় বিশ্ব রূপের মাধুরী।

দূরবীণ

জৈমিনি

হুজুগ বড় মজার জিনিস। আপন বেগেই আপনি বাড়ে।

অষ্টগ্রহের সমাবেশে মস্ত একটা তোলপাড় হবে, সকলেরই মুখে এই এক কথা। কাগজপত্রেও এই নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা চলছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের মানুষ। এসব অ-বৈজ্ঞানিক কথায় সায় দিতে লজ্জা পাই। তবু মনের মধ্যে যে গেঁয়ো মানুষটা রয়েছে তার কিন্তু পক্ষপাত রয়েছে ঐদিকেই। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে বেশ উচ্চাঙ্গ ধরনের একটা হাসি টেনে সকলেই আমরা আলোচনা করছি এ বিষয়ে। এবং আলোচনা যতো বাড়ছে, আর শেষের সেই দিনটি যতো কাছে এগিয়ে আসছে ততোই আলোচনার মধ্যে একটু একটু করে অস্বস্তি দেখা দিচ্ছে। সকলেরই ভাবখানা এই—কিছুই হবে না জানি, কিন্তু বলা তো যায় না! ভবিষ্যৎ চিরকালই ভবিষ্যৎ, অতএব—!

অতএব, গোপনে একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, এবং পরিচিত লোক দেখলে পাকে-প্রকারে, যেন নেহাত কথার কথা বলছি এমনি ঔদাসীন্যের সঙ্গে ঐ অষ্ট-গ্রহের কথা তোলা। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, অন্যের মনের ভাবখানা জেনে নেওয়া, এবং সেই সূত্রে যদি নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায়—এই আর কি!

হুজুগ এইভাবেই মানুষকে দুর্বল করে দেয়।

প্রায় একশ বছর আগে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ সাধারণ বাঙালীর সম্বন্ধে যা লিখে-ছিলেন সেটা এখনো দেখা যাচ্ছে আমাদের বিষয়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। তিনি লিখেছিলেন—

'সাধারণে কথায় বলেন, 'হুনরেচীন' ও 'হুজুতে বাঙ্গাল', কিন্তু হুতোম

বলেন, 'হুজুকে কলকেতা।' হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টি-ছাড়া ও আজগুবে! কোনো কাজকর্ম না থাকলে 'জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা' দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে...... নিষ্কর্মা লোকেরা যে আজগুবে হুজুকে তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যতদিন বাঙালীর বেটার অকুপেশান না হচ্ছে, যতদিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙালীর গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্মেশান না হচ্ছে, ততদিন এই মহান দোষের মুলোচ্ছেদের উপায় নাই।'...

এটা ঠিকই, আজ আমাদের হুঁকো হাতে করে সময় কাটানোর দিন নেই, প্রাণ রাখতেই আজ প্রাণান্ত, কিন্তু 'হুজুকে কলকেতা'র স্বভাবটা রয়েছে প্রায় একই রকম। এর কারণ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হয় না। আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে সেই কারণটা। আমরা অত্যন্ত বেশী আবেগ-প্রবণ, যুক্তির চেয়ে মেনে নেওয়ার দিকেই ঝোঁক আমাদের বেশী। ফলে, শুকনো খড়ে আগুনের মতো কোনো একটা ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে এসে পড়লেই আমরা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আমল থেকে যুক্তিবাদের দিকে বারে বারে আমাদের চরিত্রের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা তাই ব্যর্থ হ'য়েছে।

যাই হোক, আমাদের যেসব বন্ধুরা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পৃথিবী ধ্বংস হবে মনে করে উত্তেজনার সঙ্গে কালাতিপাত করছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে একটা কাহিনী উদ্ধৃত করছি ঐ 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' থেকেই। একশ বছর আগেও অনুরূপ একটা হুজুগের বান এসেছিল কলকাতায়, এবং বলাবাহুল্য তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কাহিনীটা এইরকম—

'প্রলয় গর্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বললে যে, 'আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে, ১৫ই কার্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে।'... আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক হ'য়ে রইলেম! এদিকে শহরেও ক্রমে রোল উঠলো—'১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে!' বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরোবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের গেরোটি যেমন আলগা হ'য়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে শহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থরমোমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হ'য়ে পড়লো।

'শহরের যেখানে যাই, সেইখানেই মড়া ফেরবার মিছে হুজুক। আশা, নির্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন; জোচ্চোর ও বদমাইশেরা সময় পেয়ে গোছালো গোছালো জায়গায় মড়া ফেরা সেজে যেতে লাগল; অনেক গেরোস্তোর ধর্ম নষ্ট হল—অনেকের টাকা ও গহনা গেল—বাজারে হত্তেল মাগ্গি হ'য়ে উঠলো! ক্রমে আষাঢ়াস্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ই কার্তিক নবাবী চালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধি-পুজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্যে পৌত্ত-লিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তারের জন্যে মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটির দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র-

মড়া ফেরা

ভ্রাতাহীন নির্বোধ পরিবারেরা সেইরকম ১৫ই কার্তিকের অপেক্ষা করে ছিলেন। ১৫ই কার্তিক দিল্লীর লাড্ডু হ'য়ে পড়লো—যাঁরা পূর্বে বিশ্বাস করেননি, ১৫ই কার্তিকের আড়ম্বর এবং অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন।......

'১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, রাত্তির দশটা বাজে, মড়া ফিরলো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হ'য়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গেল!'

...ঠিক এইভাবে একদিন ফেব্রুয়ারীর ৫ই আসবে, ৯ই-ও পার হবে। এবং জীবন যেমন চলছে তেমনি চলবে। তবে হ্যাঁ, উত্তেজনা চাই বইকি! অষ্টগ্রহের ঝাঁজ কমে গেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলা আছে, তারপর আছে ইলেকশান। তাছাড়া পশ্চিম ইরিয়ান, কঙ্গো—এসব তো স্টকে আছেই। একটা নিয়ে মেতে উঠলেই হল!

হুজুগের প্রতিভা নিত্য নব-নবোন্মেষশালিনী!

মধুসূদন : প্রথম মর্মী কবি

— কৃষ্ণ ধর

(জন্ম ২৫শে জানুয়ারী, ১৮২৪ :
মৃত্যু ২৬শে জুন, ১৮৭৩)

মধুসূদনের স্মরণীয় কীর্তি-কাব্য মেঘনাদ বধ যে বৎসরে রচিত হয়, বাংলাদেশের মহাভাগ কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-লগ্নে সেই বৎসরটি চিহ্নিত। একশো বছর আগে মাইকেল মধুসূদন তাঁর বীরোচিত ভঙ্গিতে যে অশ্রুগীতিময় মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, তা আজ, এই বিশ শতকের মধ্যভাগেও আমাদের উৎসুক, অনুসন্ধিৎসু মনে এক অফুরন্ত বিস্ময়। কবি হিসেবে মধুসূদনই বাংলা কবিতাকে যুগের লক্ষণে আক্রান্ত করে গিয়েছিলেন। আধুনিক মননের দর্পিত পদক্ষেপ, জিজ্ঞাসার আয়ত দৃষ্টি, যন্ত্রণার অশ্রু ও অভিমানের তরঙ্গ-দোলা ঊনিশ শতকে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা কবিতার শরীরে স্পর্শ করালেন। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের পর মাইকেল মধুসূদন এক সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশের আবিষ্কারক। বাংলা ভাষার যে মাধুর্য মধ্যযুগে বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, মধুসূদনের শিক্ষিত, মার্জিত ও বিদগ্ধ প্রতিভায় সেই কোমল ভাষা পেল নতুন তেজস্বিতা ও গতিবেগ।

পয়ারের অভ্যস্ত, ব্যবহৃত ধ্বনির যে একঘেঁয়েমি মধ্যযুগের বাংলা কবিতাকে বৈচিত্র্যহীন করেছিল, মধুসূদনের চিত্রশালায় তার নববেশ ধারণ। এবং এই নতুন রূপ, তার ব্যঞ্জনা, ধ্বনিসৌকর্য ও প্রবহমানতা নিয়ে বাংলা কবিতাকে যেন আকস্মিকভাবেই একেবারে আধুনিক জগতে এনে পৌঁছে দিল। পূর্বগামী যুগের গ্রাম্যতার চিহ্ন মাত্র রইল না। বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে এবং গতিময়তায় বাংলা কবিতা মধুসূদনের হাত ধরে যেন এক শতাব্দীর কয়েকটি ধীরগামী দশক এক লাফে পেরিয়ে অধীরভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব, পরিশ্রমী প্রতিভা এবং ইয়োরোপীয় বিদ্যাপারঙ্গমশানিত বুদ্ধি বাংলা সাহিত্যের স্থিরজলাধারে কী যে অস্থির চাঞ্চল্য এনেছিল, এক শতাব্দী পরে, রবীন্দ্রনাথের মতো বনস্পতির ছায়াতলে নিশ্চিন্তে বাস করে তা আমাদের সহজে অনুভবগম্য হবে না। তাই আজকের যুগে মধুসূদনের সাহিত্য নিয়ে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য শুনতে অভ্যস্ত হয়েছি। মধুসূদনের বীরত্ব শুধু পয়ার ভাঙ্গার স্পর্ধায় নয়, তাঁর অপরিসীম মমত্ব বোধে। ভারতবর্ষের চিরায়ত সাহিত্য ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসার কোনো অন্ত ছিল না।

মধুসূদনের কবিতা, নাটক ও পত্রগুচ্ছে দেশের জন্য, মাতৃভাষার জন্য এবং ইয়োরোপের যে অফুরন্ত [illegible]ভাণ্ডার তাঁর অধিগত হয়েছিল তার সঙ্গে বাংলাভাষীদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আকুলতা ছড়ানো। মধুসূদনের হাতেই বাংলা কবিতার আধুনিকতার শুরু: নতুন অলংকরণের এই সৌন্দর্য সে সময়ের পাঠকরা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তদৃষ্টি ব্যক্তিও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের দোলা প্রথমে অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু পরে মিলটনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স আবৃত্তি করে, তার পাশাপাশি মধুসূদনের কবিতা পাঠ করে মাইকেলকে নতুন যুগের কবি রূপে অভিনন্দিত করেছিলেন। মধুসূদনের ভাষা ব্যবহার নিয়ে এখনকার সমালোচকরা উদাসিন। সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য মধুসূদন দিয়েছেন, ক্রিয়াপদকেও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের কবিতার অন্তর-সৌন্দর্য তার ছন্দে ও ভাব-মাহাত্ম্যে, শুধুমাত্র শব্দচয়নে নয়। মধ্যযুগীয় গ্রাম্যতা, অমার্জিত রুচি, ধর্মাশ্রিত কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যানে বাংলা কবিতার তখন অনড় গতি। সে যুগে মধুসূদনের প্রতিভা, যা প্রমিথিউসের আগুন আনার মতোই অনন্যসার্থকতায় দীপ্ত, অচলায়তনের পাঁচিল ভেঙ্গে দিলেন তছনছ করে,

সেখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারকে চকিত আলোয় দিলেন ঝলমলিয়ে। মধুসূদনকে বিচার করতে গেলে, এই ঐতিহাসিক যুগধর্মকে জানতে হবে সবার আগে।

মধুসূদন একলব্যের মতো যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ইয়ং বেঙ্গলের পুরোধা ডিরোজিও। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার ও রিচার্ডসনের শিক্ষার প্রভাব সে যুগের তরুণ শিক্ষার্থীদের 'angry young men'এ রূপান্তরিত করেছিল। এবং ইয়োরোপীয় বুদ্ধিবাদ ও ফরাসি বিপ্লবের সাগর-উথলানো সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী কলকাতার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে পৌঁছুতে বেশি সময় নিল না। মধুসূদনের জীবনে, মননে ও সাহিত্য-কর্মে এই বিদ্রোহী মানবতারই জয়যাত্রা। কিন্তু বিদ্রোহই মধুসূদনের কবিতার একমাত্র ভাববস্তু নয়, বাংলা কাব্যের মূল আলম্বন বিভাব যে গীতিময়তা, এই বিরাট বিদ্রোহীর অন্তরের অন্তঃপুরে সেই অশ্রুভরা বেদনা অপূর্ব গীতি-কাব্যের সুরে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যকে নতুন যুগ-লক্ষণে ছন্দায়িত করেছিল। মধুসূদন নবযুগের প্রথম ও সার্থক কবিরূপেই আমাদের কাছে স্মরণীয়। মধুসূদনের কাব্যেই বাংলাদেশের একজন কবিকে পাঠক প্রথম হাত দিয়ে ছুঁতে পারলেন। এই কবিতা ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে তাকে মানবিক আবেদন ও ব্যক্তিগত আবেগের প্রবলতায় ঐহিক সৌন্দর্যের সমধর্মী করে তুলল।

লাতিন, গ্রীক, ফরাসি ও ইংরেজী—ইয়োরোপের এই চারটি ভাষার সমুদ্রে তিনি অবগাহন করেছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসা, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ধ্রুপদী চিন্তার প্রতি তাঁকে আরও বেশী আকৃষ্ট করে তুলেছিল। সাহিত্যের উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের মাটি থেকে, তাঁর অতুলনীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। কিন্তু এই চিরাচরিত উপকরণকে তিনি নতুন ভাব-বিপ্লবের সামগ্রী করে তুলতে পেরেছিলেন ইয়োরোপীয় রেণেসাঁসের আদর্শে ও প্রেরণায়। কলকাতায় বিশপস্ কলেজে পড়বার সময়েই মধুসূদনের মনে ইয়োরোপীয় ভাব-বিপ্লব ও নতুন চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছিল। বাংলা ভাষায় মধুসূদনের এই স্মরণীয় কীর্তি স্থাপনের মূলে ছিল ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও চিত্তের বন্ধনমুক্তি। এর ফলেই দারিদ্র্য, অমিতাচার ও অশেষ দুঃখ দুর্ভোগের সহযাত্রী হয়েও মধুসূদনের কবি-প্রতিভা আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়নি। ইয়োরোপীয় ভাষায় সুদক্ষ হয়েও তিনি মাতৃভাষার মধ্যেই নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। কারণ বাংলাভাষার মানবিক গরিমা, উদার আদর্শ ও মধুসূদনের সমকালীন ও পুরোগামী মনীষীদের সংস্কারমুক্তি আন্দোলন তাঁর জ্বলন্ত কবি-প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের পথ করে দিয়েছিল।

মধুসূদন কবিতা রচনাতে হাত দিয়ে প্রথমেই একটি দুরূহ বৈপ্লবিক কর্মসাধনা করলেন। দ্বিপদী পয়ারবদ্ধ বাংলা ছন্দের আড়ষ্টতা মধুসূদনের মনের অস্থিরতাকে ধরে রাখতে পারল না। বাংলা পয়ারের পর্বভঙ্গ ও অন্ত্যমিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তিনি এতে আমদানী করলেন ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের স্বাদ। খাঁচায় আবদ্ধ ছন্দ-সরস্বতী যেন মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মতো মনের আকাশে ডানা মেললেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। এবং একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে মধুসূদনের এই প্রবল পুরুষকার ব্যতিরেকে বাংলা কবিতার বন্ধনমুক্তি সম্ভব হতো না। ইয়োরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত কবির পক্ষেই এই দুরূহ কর্তব্য স্বকীয় প্রতিভার জাদুস্পর্শে সুষমামণ্ডিত করে তোলা সম্ভব ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা, তার দুর্দম শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে মধুসূদন এমন প্রত্যয়ী ছিলেন যে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের মঙ্গলাচরণে লিখেছিলেন: 'আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।'

মধুসূদন তাঁর এই বৈপ্লবিক কীর্তির সাফল্য নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্যের স্বীকৃতি সে যুগে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়। তিনি তখন বলেছিলেন:

"Even the stiff old Pundits are beginning to unbend themselves.. Blank verse is in the 'go' now...... I say 'sub Blank verse ho jaga".

মধুসূদনের পৌরুষ শুধুমাত্র ছন্দের গতিবেগ সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, অপরিসীম ভাষা-প্রীতি এবং তীক্ষ্ম প্রতিভা বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদকে বৃদ্ধি করেছিল। এ যুগের দৃষ্টিতে মেঘনাদ বধের অনেক শব্দ অপ্রচলিত ও সংস্কৃতের নিকট অচ্ছেদ্য ঋণ-বন্ধনে আবদ্ধ মনে হবে। 'যাদঃপতি', 'ইরম্মদ' কিংবা 'দম্ভোলি' নিশ্চয়ই এখন কাব্য-পাঠকদের কাছে বিস্মিত কৌতুকের বিষয়। কিন্তু মধুসূদন সংস্কৃত শব্দকোষ থেকে এই আশ্চর্য ধ্বনিতরঙ্গের শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে এক বিস্ময়কর গাম্ভীর্য আনয়ন করেছিলেন। মাইকেলের কবি-চরিত্রে ক্লাসিক নিষ্ঠাই এই শব্দানুরাগের উৎস। কিন্তু মধুসূদনের শব্দচয়ন পণ্ডিতদের মতো কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি দেশজ শব্দের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কেও ছিলেন অবহিত। মধুসূদনের কাব্যে সংস্কৃত ও দেশজ শব্দের সমান ব্যবহার এই কবির আশ্চর্য শক্তির পরিচায়ক। তাঁর কাব্য ও নাটকের ভাষার এই আধুনিকতা, সাধুভাষার গাম্ভীর্য ও কথ্য ভাষার গতিশীলতা বাংলা দেশের পাঠকদের মন কেড়ে নিয়েছিল। রেণেসাঁসের লক্ষণই এই। ইয়োরোপীয় রেণেসাঁসের যুগেও ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার এইরূপ বিস্ময়কর রূপান্তর মহৎ কবিদের রচনায় লক্ষণীয় ছিল। ৲

মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাব-কল্পনা, চরিত্র-চিত্রণ এবং সামগ্রিক বক্তব্যকে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের প্রতীকরূপে বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। ১৮৬১ সালে মেঘনাদ বধ

কাব্য প্রকাশিত হয়। শত বর্ষেও এই কাব্যের আকর্ষণ আমাদের কাছে কমেনি। তার কারণ মেঘনাদ বধ বাংলা কাব্যের নব-যুগের দর্পণ। ঐতিহ্যের পুনর্বিচার এবং নবযুগের জীবনবোধ এই মহাকাব্যের প্রকরণে মধুসূদন বাংলাদেশের সামনে উপস্থিত করেছিলেন বৈপ্লবিক স্পর্ধায়। এর কাব্যগুণ ও ঐতিহাসিক মূল্য বাংলার নবজাগ্রত চেতনায় চিরকালের মতো স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যপাঠের পর মধুসূদনের প্রতিভাকে যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তা আজকের যুগেও স্মর্তব্য। তিনি বলেছিলেন : "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদ-স্থল—নিশ্চয় হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।...... অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

মধুসূদনের কবিজীবনের সকরুণ পরিণতি আমাদের কলংককে দুরপনেয় বেদনায় বিদ্ধ করেছে। কিন্তু আজ সগৌরবে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, মেঘনাদ বধের কবিকে সেদিন বাংলাদেশ প্রকাশ্য জনসভায় সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁকে জাতীয় কবিরূপে বরণ করেছিল। ১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার এক সম্বর্ধনা সভায় কবিকে রৌপ্যময় পাত্র ও মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রে বলা হ'ল : '...আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুত্তম অলংকারে অলংকৃত করিলেন। আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি।...... পৃথিবী মণ্ডলে যতদিন বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবে তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক...।'

কোনো কবির জীবিতাবস্থায় এইরূপে স্বীকৃতি, ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আর হয়নি। তৎপরেও রবীন্দ্রনাথ একমাত্র ব্যতিক্রম। এপিক রচনার সুদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির। গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত কবির এই বাসনা সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি। কারণ এপিক রচনার উপকরণ ছিল না মেঘনাদের মৃত্যুর উপাখ্যানে। মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার পর তিনি কলকাতায় মহরমের মিছিল দেখে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : 'ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনো মহৎ কবির উদ্ভব হ'তো, হাসান ও তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুকে অবলম্বন করে কি চমৎকার এপিক লেখাই না তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। সমস্ত জাতির মনোবেদনাকে তিনি নিজের পক্ষে টানতে পারতেন। আমাদের এমন কোনো বিষয় নেই।' (ইংরেজী পত্রাংশ থেকে)।

মাইকেল জানতেন লংকাধিপতি রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি ঐতিহ্য বিরূপ। দেশবাসীর সমবেদনাই নেই তাদের পক্ষে। তিনি নিজেও কাব্যের মধ্যে রাবণকে সীতাহরণের জন্য বারবার তিরস্কৃত করেছেন। তবু তিনি এই কাহিনীকে আর্য কবির উপেক্ষার পংক থেকে উদ্ধার করে জাতির পরম্পরাগত অনুভূতির জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুললেন। একমাত্র কাহিনীর সূত্র ছাড়া বাল্মিকীর কাছে কবির ঋণ স্বল্প। গ্রীক মিথলজির ছাঁচে তিনি একে অনন্য ব্যঞ্জনায় লৌকিক ভাবনার জগতে নামিয়ে এনেছিলেন। তিনি গ্রীক কবিদের মতোই বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন, সংস্কৃত কবিদের মতো নয়। অথচ বীররসে ভাসি মহাগীত তিনি পরিবেশন করলেন না। বাঙালির হৃদয়ের অশ্রুর উৎসই পুনর্বার উন্মোচিত হ'ল কবি মধুসূদনের বীরদর্পী লেখনীতে। মননজগতে বীর রসের প্রতি আগ্রহ থাকলেও, করুণ রসের প্রতিই ছিল তাঁর হৃদয়ের অবারিত আনুগত্য। গ্রীক কবিদের মতোই তিনি নিহত মেঘনাদের জন্য শোকাকুল পিতা রাবণের সকরুণ চিত্র এঁকে যেন বললেন : Art is feebler far than Destiny. রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণ করে বলা যায় : '...তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।'

রাবণের সবংশে বিনাশ, লংকার অস্তমিত বিজয়-গৌরব, দেশপ্রেমিক মেঘনাদের অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ, এ সমস্তই যেন তৎকালীন ভারতবর্ষের পদাহত স্বাজাত্যাভিমান, পরাধীনতার বন্ধনশৃংখল ও বিড়ম্বিত দেশবাসীর ভাগ্যবিপর্যয়ের ইঙ্গিত। মধুসূদনের অবচেতন মনে পরাধীনতার মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ মেঘনাদ ও রাবণ চরিত্র।
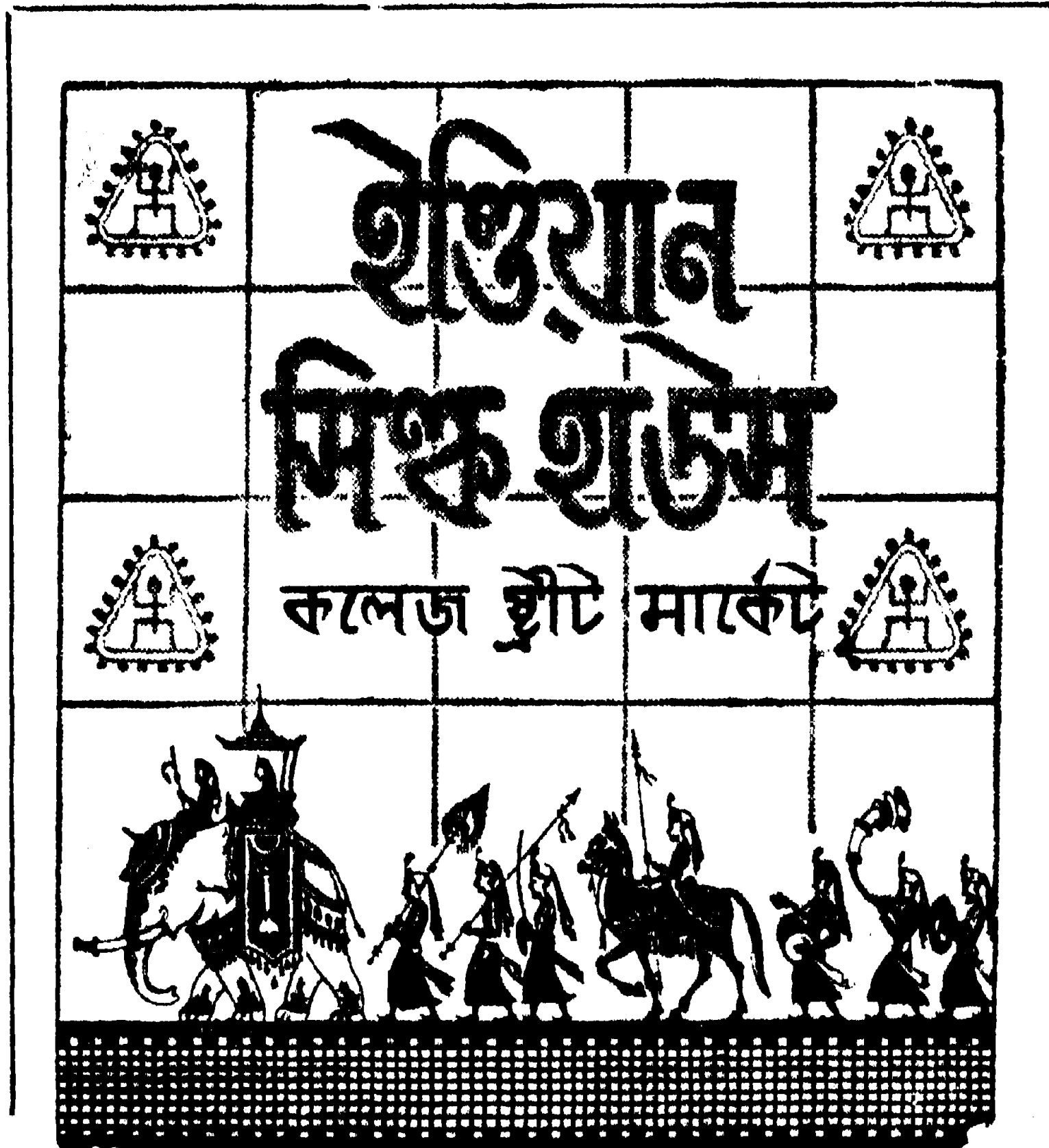
বীরাঙ্গনা প্রমীলাও ভারতের নবজাগ্রত নারীর প্রতীক। সামন্ত-যুগের স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক মধুসূদন কোনোদিন স্বীকার করেননি। এই প্রমীলা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-র সমধর্মিণী। তাই একথা না মনে হ'য়ে পারে না, মেঘনাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন-জাগা বাংলার অপূর্ণ বাসনা স্বাধীনতা লাভের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাকেই রূপায়িত করেছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার আগে তিনি লিখেছিলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', যদিও কাব্যটি মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশিত হবার পর আত্মপ্রকাশ করে। মেঘনাদের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার অন্তরধর্ম, ভাষা ও ছন্দ-বৈশিষ্ট্যে কী বিস্ময়কর পার্থক্য। ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের লিরিকধর্মিতার এক আশ্চর্য প্রকাশ। বাংলা ছন্দের অনাস্বাদিত সৌন্দর্য, গীতিময়তা এবং বৈচিত্র্য মধুসূদনের প্রতিভার গুণে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভাব-সম্পদের দিক থেকেও ব্রজাঙ্গনা রাধার চিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনন্য। রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীতের অস্পষ্ট ধ্বনি যেন মধুসূদনের লেখনীতে প্রথম শোনা গেল। ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব কবিতা হলেও, বৈষ্ণব কাব্যের ত্রিপদী ও পয়ার মধুসূদন গ্রহণ করেননি। ইতালীয় Ottava Rima-র মতো স্তবক বিন্যাস করলেন তিনি পয়ার ও লাচাড়ীর সুষ্ঠু সংমিশ্রণে। বাংলা কাব্যে এই ছন্দ যেন নির্ঝরের নৃত্যের মতো কানে বাজতে লাগল :

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?

কিংবা

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশ সম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে।
কত যে কাঁদে রাধিকা, কি কব সজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহরজনী।

মধুসূদনের ছন্দকুশলী প্রতিভা বৈষ্ণব কবিতার রাধাকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে দিল এই কাব্যে। শব্দচয়নেও তিনি এই কাব্যটিতে আধুনিক গীতি-কবিতার পূর্বসূরীরূপে নন্দিত হবার যোগ্য। মধুসূদন নিজেও এই কাব্যটিকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'My Brajangana is better than my Meghnad.'

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের কোনো গুরু ছিলেন না। তিনি একলব্যের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহাকবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা কবিতা ও নাটকে তাঁর নিজের প্রতিভার স্পর্শে নিত্য-নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সনেট রচনা তাঁর বৃহত্তর কীর্তির মধ্যে একটি। চতুর্দশ পদাবলীতে কবিচিত্তের স্পর্শ সর্বত্র ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের আগে মধুসূদনই একমাত্র কবি যিনি বাংলা কাব্যে কতকগুলি মৌলিক ধারার প্রবর্তক। মধুসূদনকে বিচার করতে হলে, তাঁর শতাধিক সনেট অবশ্যপাঠ্য। আত্মপ্রত্যয়ী কবি জানতেন যে, বাংলা কাব্যসাহিত্য নতুন অনুভবের জন্য তাঁরই অপেক্ষা করছে। সনেট রচনার পর মধুসূদন বাংলাভাষার এই নতুন শক্তি সম্পর্কে আরও সচেতন হন। তিনি বলেছিলেন, 'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian'.

মধুসূদনের আরও দুইটি কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি'। আত্মবিলাপ বাংলাভাষায় প্রথম রচিত কবির অন্তর্যন্ত্রণার কথা। ১৮৬১ সালে রচিত এই কবিতাটি কবির জবানীতে এক আশ্চর্য সংবেদনায় মথিত :

রে প্রমত্ত মন মম :
কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুমভাতি
কত দিন রবে?

এর ছন্দ ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের লগ্নকে যেন ত্বরান্বিত করেছে। মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাতেই সম্ভবতঃ দেশকে প্রথম চিন্ময়ী জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এবং মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও কবিমানসের বেদনার্ত বিষণ্ণ প্রতিফলনে এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে :

রেখো মা, দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো
তব মনঃকোকনদে।

মধুসূদন বাংলাদেশের কাছে শুধু ক্ষণকালের অশ্রুসজল স্মৃতিই প্রত্যাশা করে গেছেন তাঁর স্বরচিত সমাধি-লিপিতে। কিন্তু দীর্ঘ শতাব্দীর ব্যবধানেও মধুসূদন বাংলা কাব্যে এবং নাটকে, স্বধর্মী প্রথম শিল্পীরূপে, অবিস্মরণীয় স্রষ্টা পুরুষরূপে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন।

সমাধিস্থলে মধুসূদনের আবক্ষ মর্মর মূর্তি

সন্নকেতকী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কুকুরছানাটা বোধকরি অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়াই সেদিন রাস্তায় নামিয়াছিল।

সুবীর সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে লইয়া মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মাথা-খোলা জাগুয়ার গাড়িটা আস্তে চলিতে জানে না, সামনে সাদার্ন অ্যাভিনিউএর খোলা রাস্তা পাইয়া উল্কার বেগে ছুটিয়াছিল।

কুকুরছানা সময় বুঝিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় অবতরণ করিল। তারপর মন্থরপদে রাস্তা পার হইয়া চলিল। তাহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, গায়ের রঙ নোংরা হলুদবর্ণ। সুবীর প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই; যখন দেখিতে পাইল তখন কুকুরছানা ও মৃত্যুর মাঝখানে বিশ গজের ব্যবধান। সুবীর সবেগে ব্রেক কষিল।

স্বামীর পাশে বসিয়া অরুণা এই বেগ-সংহৃতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার কপাল ড্যাশ্-বোর্ডের গায়ে সজোরে ঠুকিয়া গেল। কপাল কাটিল না বটে, কিন্তু অরুণা একটি ক্ষীণ কাকুতি উচ্চারণ করিয়া সুবীরের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

কুকুরছানা চাপা পড়ে নাই, অক্ষত ছিল; সে গুটিগুটি ফিরিয়া গিয়া আবার ফুটপাথে উঠিল। সুবীর দেখিল অরুণা মূর্চ্ছা গিয়াছে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—'অরুণা! অরুণা—!'

অরুণা সাড়া দিল না। সুবীরের বুকের মধ্যে একবার ধক্ করিয়া উঠিল; তারপর সে মোটর ঘুরাইয়া তীরবেগে চলিল। মাইল খানেক দূরে একটা নার্সিং হোম আছে, সেখানকার ডাক্তার তাহার পরিচিত।—

সুবীর অবস্থাপন্ন বনেদী ঘরের ছেলে। শান্ত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার চরিত্রে একটি অচপল দৃঢ়তা আছে। মাত্র ছয় মাস হইল অরুণার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। অরুণা উজ্জ্বল রূপবতী। আধুনিক আদর্শে কৃশাঙ্গী তন্বী নয়। কিন্তু কালিদাস ও জয়দেবের চোখে বোধকরি ভাল লাগিত; তাহাকে দেখিলে গীতগোবিন্দ ও মেঘদূতের কথা মনে পড়িয়া যায়।

ছয় মাসের বিবাহিত জীবনে তাহারা মনের দিক দিয়া খানিকটা কাছাকাছি আসিয়াছে, কিন্তু একেবারে মিশিয়া গলিয়া একাকার হইয়া যায় নাই। সুবীর নিজের মন-প্রাণ অরুণার কোলে ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু অরুণার মনের আড়াল এখনও পুরাপুরি ঘুচিয়া যায় নাই। বিবাহ এমন একটি অনুষ্ঠান যাহার ফলে দুইটি যুবক-যুবতী অকস্মাৎ পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ঘটিলেই যে মনের ঘনিষ্ঠতা ঘটিবে এমন কোনও কথা নাই। কাহারও কাহারও মনের কবাট আস্তে আস্তে খোলে, খুলিতে বিলম্ব হয়।—

নার্সিং হোমের ডাক্তার অরুণাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—'ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কংকাশন হয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান হবে।'

অরুণার যখন জ্ঞান হইল সুবীর তখন তাহার শয্যাপাশে বসিয়া একাগ্র চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। অরুণার চোখে কিন্তু মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি, সে ক্ষণকাল শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—'কেয়ার গন্ধ!'

ডাক্তার বলিলেন, 'সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তিন চার দিন লাগবে।'

অরুণা নার্সিং হোমেই রহিল। তিন-দিন পরে সুবীর অরুণাকে গৃহে লইয়া আসিল। অরুণা এখন সারিয়া উঠিয়াছে, সেই আচ্ছন্ন ভাব আর নাই। তবু, তাহার মুখের হাসি চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হয় সে যেন অন্তরের কোন্ সুদূর-লোকে প্রবেশ করিয়াছে, বহির্লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক কমিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সান্নিধ্য নিবিড় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল তাহা আবার শিথিল হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া সুবীর নার্সিং হোমের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিল। ডাক্তার শুনিয়া বলিলেন,— 'ও কিছু নয়, দু'চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে। এক কাজ করুন না, ও'কে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। চেঞ্জ লাগলে শিগ্‌গির আরাম হয়ে যাবেন।'

সুবীর বলিল,—'কোথায় যাব? শীত এসে পড়ল, এখন তো পাহাড়ে যাওয়া চলবে না।'

ডাক্তার বলিলেন,—'নাই বা গেলেন পাহাড়ে। অত বড় রাজস্থানের মরুভূমি পড়ে রয়েছে, সেখানে যান।'

রাজস্থানের মরুভূমি! সুবীরের মনে পড়িয়া গেল, তাহার এক দূর-সম্পর্কের

ভগিনীপতি মস্তবড় প্রত্নতাত্ত্বিক, তিনি বর্তমানে রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে খননকার্য চালাইতেছেন। ভালই হইয়াছে, সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের মরুভূমিতেই যাইবে। নূতন দেশ, নূতন পরিবেশ; অরুণা অচিরাৎ সারিয়া উঠিবে।

সে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া অরুণার কাছে প্রস্তাব করিল। অরুণা বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইল না, কিন্তু রাজি হইয়া গেল।

তারপর দিন দশেকের মধ্যে রাজস্থানে ভগিনীপতিকে চিঠি লিখিয়া সব রকম ব্যবস্থা করিয়া সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কলিকাতা হইতে রাজস্থানের অপরান্ত সামান্য পথ নয়, দিল্লীতে ট্রেন বদল করিয়া যাইতে তিন দিন লাগে। মেল ট্রেনের একটি কুপে কামরায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে অরুণার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, চোখেমুখে উৎসুক আগ্রহ দেখা দিল। সে এ জানালা হইতে ও জানালায় ছুটাছুটি করিয়া, সুবীরকে নানা বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অরুণার এই পরিবর্তনে সুবীর পরম আহ্লাদিত হইল, তাহাকে কাছে টানিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল,—'ভাল লাগছে?'

অরুণা কাকলি কলিত স্বরে বলিল,—'খুব ভাল লাগছে। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে অনেক দিন বিদেশে থাকার পর নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।'

তারপর একদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে তাহারা রাজস্থানের একটি ছোট স্টেশনে অবতরণ করিল। তাহারা প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই স্টেশনের বাহিরের শুষ্ক প্রান্তর হইতে বালি-মাখা আতপ্ত বাতাসের একটা তরঙ্গ তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গেল। অরুণা চকিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—'গন্ধ পাচ্ছ? কেয়া ফুলের গন্ধ?'

অরুণা পূর্বেও একবার অর্ধচেতন অবস্থায় কেয়া ফুলের উল্লেখ করিয়াছিল, সুবীরের মনে পড়িল। সে দীর্ঘ ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল,—'কেয়া ফুলের গন্ধ? কৈ না। ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার গন্ধ পাচ্ছি।'

এই সময় কোট-প্যান্ট সোলা-হ্যাট্‌-পরা প্রবীণ বিরাজমোহনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রৌদ্রতাম্র শীর্ণাঙ্গ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বাংলা ইংরেজি হিন্দী সংস্কৃত মিশাইয়া কথা বলেন। সুবীর তাহাকে প্রণাম করিল, দেখাদেখি অরুণাও প্রণাম করিল। বিরাজমোহনবাবু ইতিপূর্বে অরুণাকে দেখেন নাই, সপ্রশংস হাসিয়া বলিলেন,—'বাঃ, খাসা শ্যালবধূ তো!'

সুবীর অবাক হইয়া বলিল,—'শ্যালবধূ!'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'শ্যালবধূ বুঝলে না? তুমি হলে আমার শ্যাল, মানে শ্যালক; ও হল গিয়ে তোমার বধূ, সুতরাং শ্যালবধূ।—এস, জীপ এনেছি, স্টেশন থেকে পনরো মাইল যেতে হবে।'

জীপে মালপত্র তুলিয়া তিনজনে গাড়িতে উঠিলেন, বিরাজবাবু গাড়ি চালাইলেন। স্টেশন হইতে আধ মাইল যাইবার পর আর লোকালয় দেখা যায় না; চারিদিকে ধু ধু বালি; দুই চারিটা কঙ্কালসার বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়, দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিপি, তাহার মধ্যে দিয়া অস্পষ্ট পাথুরে পথের চিহ্ন চলিয়াছে।

জীপ চালাইতে চালাইতে বিরাজবাবু কথা বলিতে লাগিলেন।—'এ দেশটা এখন প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু দু'হাজার বছর আগে এমন ছিল না, উর্বর দেশ ছিল। তখন এখানে একটি রাজা ছিল; মরুভূমির উপান্তে ছোট্ট

একটি রাজ্য। তারপর প্রকৃতি এবং মানুষ একসঙ্গে এই রাজ্যের পিছনে লাগিল। ইতিহাসে যাদের Parthian বলা হইয়াছে সেই পারদ জাতি এদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু বেশিদিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না। দুই শত বছরের মধ্যে মরুভূমি আসিয়া রাজ্যটিকে গ্রাস করিয়া লইল। এখন এদেশে মানুষের বসতি নাই বলিলেই চলে, পুরাতন ঘরবাড়িও ভূমিসাৎ হইয়াছে; কেবল প্রস্তরনির্মিত রাজ-প্রাসাদটি এখনও মরুভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বালুর মধ্যে অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় মাথা জাগাইয়া আছে।

'এই রাজপ্রাসাদ এখন আমাদের স্কন্ধাবার, মানে হেড্ কোয়াটার্স। তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

সুবীর বলিল,—'সেখানেই খোঁড়া-খুঁড়ি করছেন নাকি?'

বিরাজবাবু হাসিলেন,—'আরে না না, ও প্রাসাদ তো মাত্র দেড় হাজার কি দু'হাজার বছরের পুরনো। আমাদের দৃষ্টি আরো গভীর। রাজপ্রাসাদ থেকে মাইল তিনেক দূরে এক জায়গায় সিন্ধু সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে ওখানে ব্রোঞ্জ যুগের একটা সভ্যতা ছিল, এখন বালি চাপা পড়েছে। আমরা তাই খুঁড়ে বার করছি।'

বিরাজবাবু শুধু প্রত্নপণ্ডিত নয়, প্রত্নপাগল; তিনি উৎসাহভরে খননকার্য বিষয়ে আরও অনেক তথ্য বলিয়া চলিলেন। সুবীরের পুরাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, সে নীরবে শুনিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা চলিবার পর সম্মুখে মাইল দুয়েক দূরে একটা উঁচু পাথরের ঢিবি দৃশ্যমান হইল; যেন বালু ফুঁড়িয়া একটা ত্রিকোণ পাথরের চাঁঙড় মাথা তুলিয়াছে। বিরাজবাবু বলিলেন,—'ওই দেখ রাজপ্রাসাদ, যেখানে তোমরা থাকবে।'

অরুণা উৎসুক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সুবীর বলিল,—'আপনিও তো ওখানেই থাকেন।'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'ওখানে আমার অফিস আছে বটে কিন্তু আমি বেশীর-ভাগ তাঁবুতেই থাকি। যেখানে এক্সকা-ভেশন হচ্ছে সেখানে হরদম না থাকলে অসুবিধা হয়। আমার সহকারিরা এবং কুলিরাও সরজমিনে থাকে। রাজপ্রাসাদটা তোমাদের দু'জনের জন্যে রিজার্ভ থাকবে।'

সুবীর ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—'কেবল আমরা দু'জন একলা থাকব?'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'একেবারে একলা নয়, অফিসের একজন পাহারাদার আছে, সে প্রাসাদেই থাকে। তার বৌকেও আনিয়ে রেখেছি। ওরা স্থানীয় লোক। দু'জনে মিলে তোমাদের খবরদারি করবে।'

জীপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের সামনে থামিল। একজোড়া স্ত্রীপুরুষ প্রাসাদের ছায়ায় বালুর উপর মুখোমুখি বসিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। পুরুষের মাথায় ধামার মতন প্রকাণ্ড পাগড়ি, পাগড়ির নীচে গোঁফ ও দোপাট্টা দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। স্ত্রীলোকটির নাকে নথ, সীমন্তে রূপার ঘুন্টি।

বিরাজবাবু বলিলেন,—'গিরধর সিং, এঁরা এসেছেন, তোমরা এঁদের দেখভাল্ করবে। রুক্মিণী, রান্নার ব্যবস্থা করেছ তো? বেশ, আমি এখন খাদে যাচ্ছি, 'চিরাগ-বাত্তি'র সময় ফিরব। তোমরা এঁদের সামান্ ভিতরে নিয়ে যাও।' সুবীরকে বলিলেন,—'আজ রাত্তিরটা আমি এখানেই থাকব, তোমাদের ঘর-বসত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।—আচ্ছা।'

বিরাজবাবু জীপ্ চালাইয়া প্রস্থান করিলেন।

গিরধর সিং ও রুক্মিণী লটবহর লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুবীর ও অরুণা প্রাসাদের সম্মুখে বালুর উপর পায়চারি করিতে করিতে চারিদিক দেখিতে লাগিল। প্রাসাদের সদর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ চওড়া, আগাগোড়া গেরুয়া রঙের পাথর দিয়া তৈয়ারী। নীচের তলা বালুস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট দুইতল মিলিয়া এখনও প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ। তৃতীয়তল পিরা-মিডের ন্যায় কোণাকৃতি। স্থানে স্থানে পাথর খসিয়া গিয়া প্রাসাদের গায়ে ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর অটুট আছে।

সুবীর দেখিতে দেখিতে বলিল,—'এত পুরনো বাড়ি, দেখে কিন্তু মনে

হয় না। এই বাড়িতে দেড় হাজার দু'হাজার বছর আগে রাজা-রাণী থাকত, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত গম্‌গম্‌ করত, কল্পনা করা যায় না। তুমি কল্পনা করতে পার?'

স্বপ্নাতুরচক্ষে চাহিয়া অরুণা বলিল,—'পারি।'

গিরধর আসিয়া জানাইল, সামান যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে, এখন মালিক ও মালকিণী গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন। সুবীর ও অরুণা ঢালু বালির পাড় আরোহণ করিয়া একেবারে দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইল। বারান্দাটি প্রশস্ত, তাহার প্রান্ত হইতে ঘরের সারি আরম্ভ হইয়াছে; কক্ষের পর কক্ষ, অসংখ্য কক্ষ। কোনোটি আকারে আয়তনে সভাগৃহের ন্যায় বৃহৎ, কোনোটি কোটরাকৃতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সব মিলিয়া একটি বিশাল মধুচক্র বলিয়া ভ্রম হয়।

অট্টালিকার নিম্নতল হইতে পাথরের সিঁড়ি বিবর-নির্গত অজগরের মত দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়াছে। তারপর পাক খাইয়া ত্রিতলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গিরধর সিং বলিল,—'আপনাদের মহল তিনতলায়। আসুন।'

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমরা কোথায় থাকো?'

গিরধর সোপান-গহ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—'নীচে দু'টো ঘর পরিষ্কার করে নিয়েছি, সেখানে থাকি। রান্নাঘরও সেখানেই। ভারি চমৎকার জায়গা হুজুর। ঠাণ্ডা নেই, গরম নেই; একটু অন্ধকার, এই যা।'

সুবীর বলিল,— 'আর অফিস কোথায়?'

গিরধর বলিল,—'ঐ যে ওদিকের ঘরগুলো, ওখানে অফিস।'

সুবীর একটি বড় ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, অনেকগুলো টেবিল রহিয়াছে; টেবিলের উপর নানা আকৃতির পাথরের টুকরো। অফিসের স্বাভাবিক সরঞ্জাম, কাগজপত্র টাইপরাইটার, কিছুই নাই।

সুবীর বলিল,—'চল, এবার আমাদের মহল দেখি।'

ত্রিতলটি চন্দ্রশালা, অর্থাৎ চিলে-কোঠা। পাশাপাশি তিনটি ঘর; বাকি ছাদ উন্মুক্ত, মাঠ-ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত। ছাদ ঘিরিয়া পাথরের কারুকর্মখচিত আলিসা। মেঝের উপর বালুকার পুরু পলি পড়িয়াছে।

ঘর তিনটি কিন্তু পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, ধূলাবালির চিহ্ন নাই। মাঝের ঘরে একটি বড় খাট, এক পাশের ঘরে একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার দিয়া বৈঠকের আকারে সাজানো হইয়াছে; অন্য পাশের ঘরে স্নানাদির ব্যবস্থা। বিরাজবাবু প্রস্তু-লোকবাসী হইলেও বর্তমানকালের শ্যালক ও শ্যালবধূর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ভালই করিয়াছেন।

এই ঘরগুলির একটা অসুবিধা, দ্বারের কপাট নাই। পূর্বকালে নিশ্চয় কাঠের কবাট চৌকাঠ সবই ছিল, এখন ঘুন-চর্বিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যাহোক, বিরাজবাবু দ্বারে পর্দা টাঙাইয়া দিয়া যথাসম্ভব আব্রু রক্ষা করিয়াছেন।

গিরধর সিং বলিল,— 'হুজুর, আপনারা আরাম করুন, আমি চায় নিয়ে আসি।'

গিরধর সিং চলিয়া গেল। সুবীর ও অরুণা ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সুবীরের মুখে চোখে নূতনত্বের ঔৎসুক্য, অরুণার চোখে অবান্তরের কুহক। সুবীর বলিল,—'কেমন লাগছে?'

অরুণা অস্ফুট আত্মগত স্বরে বলিল,—'এ সব আসবাব এখানে কেন!'

সুবীর চকিত হইয়া বলিল,—'সেকালের বাড়িতে একালের আসবাব বেমানান ঠেকছে—না! কিন্তু উপায় কি? গজদন্ত পালঙ্ক অস্নেহদীপিকা সুবর্ণ-ভৃঙ্গার, এসব কোথায় পাওয়া যাবে!'

গিরধর সিং একটি বড় থালার উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া উপস্থিত হইল। দু'টি পাথরের বাটিতে মশলাদার চা; সঙ্গে ডালের ভাজিয়া, ঝাল মটর, পাঁপড় ভাজা ইত্যাদি টুকিটাকি খাবার। দু'জনেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহারা সাগ্রহে খাইতে বসিল।

চায়ের স্বাদ ঠিক স্বাভাবিক চায়ের মত নয়, তবু মন্দ লাগিল না। ভাজা-ভুজিতে ঝাল একটু বেশী, কিন্তু অত্যন্ত মুখরোচক। দু'জনে হাস্যপরিহাস করিতে করিতে সব খাইয়া ফেলিল। তারপর ঘরের বাহিরে ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল।

প্রাসাদের পিছন দিকে বালু-প্রান্তরের পরপারে সূর্য অস্ত যাইতেছে। আতপ্ত বাতাসের গায়ে একটু শৈত্যের

স্পর্শ লাগিয়াছে। দু'জনে আলিসার পাশ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চিম দিকে গিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা আয়ত চক্ষু মেলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। সুবীর নীচের দিকে উঁকি মারিল। বিশ হাত নীচে আলুথালু বালির ঢালু বাঁধ প্রাসাদের নিতম্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সে বলিল,—'চারিদিকে বালির সমুদ্র, মাঝখানে এই প্রাসাদ যেন একটি পাথরের দ্বীপ।'

অরুণা উত্তর দিল না, একাগ্র চক্ষে অস্তমান সূর্যের পানে চাহিয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গেল। নিম্নে বালুর উপর ঈষৎ আলোড়ন তুলিয়া শুষ্ক শীতল বায়ু তাহাদের মুখে আসিয়া লাগিল। অরুণা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। সুবীর কাছে আসিয়া তাহার স্কন্ধ জড়াইয়া লইল, বলিল,—'ঠাণ্ডা লাগছে। চল, ঘরে যাই। ভারি মজার দেশ রাজস্থান; দিনে গ্রীষ্মকাল, আবার সূর্যাস্ত হতে না হতেই শীতকাল।'

দু'জনে ঘরে ফিরিয়া গেল। সুবীর লক্ষ্য করিল না, অরুণার চোখে শংকা-ছোঁয়া উত্তেজনা। সে যে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল শীতল বায়ুর স্পর্শ নয়, তাহার মনেও যেন কোন্ অভাবনীয় ভবিতব্যতার স্পর্শ লাগিয়াছে।

ঘরে একটি অর্ধ-গোলাকৃতি গবাক্ষ আছে, বর্তমানে তাহার উপর পর্দা ঢাকা। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে সুবীর ও অরুণা দুইটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিল; সুবীর অরুণার একটা হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল,—'নতুন জায়গায় এসে তোমার বেশ ভাল লাগছে?'

অরুণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'ভাল লাগছে। আবার একটু ভয়-ভয় করছে।'

সুবীর অনুভব করিল অরুণার হাতের আঙুলগুলি ঠাণ্ডা, সে আঙুলের সহিত আঙুল জড়াইয়া লইয়া বলিল,—'ভয়ের কী আছে,' বাড়িটা মান্ধাতার আমলের, লোকজনও বেশী নেই, তাই একটু ভুতুড়ে-ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। দু'দিন থাকলেই ,ঠিক হয়ে যাবে।'

অরুণা দ্বিধাভরে বলিল,—'হ্যাঁ।'

দ্বারের কাছে আলো দেখা গেল। রুক্মিণী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি রেকাবির উপর কয়েকটি জ্বলন্ত মোমবাতি। এই দীপান্বিতা রমণীকে দেখিয়া সুবীরের চোখে একটা বিভ্রম জমিল; রুক্মিণী যেন বর্তমান কালের মেয়ে নয়, তাহার বেশভূষা স্বচ্ছন্দ গতি-ভঙ্গী সবই যেন সুদূর অতীতের স্পর্শবহ। রুক্মিণী সুন্দরী নয়, যুবতীও নয়। তাহার বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে, তামাটে গৌরবর্ণ দেহে কঠিন স্বাস্থ্য, নথ-পরা মুখখানিতে আভিজাত্যের দীপ্তি। প্রকৃতির বিচিত্র বিধানে রাজস্থানের উচ্চ নীচ সকল জাতির মেয়ের দেহে রাজকন্যাসুলভ মর্যাদা রহিয়া গিয়াছে।

রুক্মিণীর হাসিটি মিষ্ট, কণ্ঠস্বরও বিনয়। একটি মোমবাতি টেবিলের উপর রাখিয়া সে অরুণার পানে চোখ তুলিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিল,—'বাঈ, সব ঘরে বাতি দিয়ে আসি?'

অরুণা বলিল,—'এস।' অরুণার বাপের বাড়ি বিহার প্রদেশে, সেও অল্প-বিস্তর হিন্দী বলতে পারে।

রুক্মিণী চলিয়া গেল; অন্য ঘর দু'টোতে বাতি দিয়া আসিয়া অরুণার পাশে দাঁড়াইল,—'বাঈ, এবার তোমার চুল বেঁধে দিই?'

অরুণা তাহার পানে স্মিত মুখ ফিরাইল, নিজের চুলে একবার আঙুল বুলাইয়া বলিল,—'আজ থাক। আজ শুধু মুখ-হাত ধুয়ে নেব।'

'আচ্ছা। আমি তাহলে যাই, রসুই করতে হবে।'

'যাও।'

"ভাল লাগছে। আবার একটু ভয় ভয় করছে।"

রুক্মিণী অরুণার প্রতি একটি সুস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। সুবীর বলিল,—'রুক্মিণীর দেখছি তোমাকে ভাল লেগেছে।'

অরুণা একটু অন্যমনস্ক হাসিল।

দু'জনে মোমবাতির আলোয় নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণার দিকে চাহিয়া সুবীরের মনে হইল এই অস্পষ্ট আলোতে অরুণা যেন আরও অবাস্তব হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ও দুঃসাহসিক সম্পাদক

সুধীরচন্দ্র সরকার

ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে জেমস অগাস্টাস হিকির (James Augustus Hicky) নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশক ও সম্পাদক। হিকি ছিলেন আয়রলণ্ডের অধিবাসী এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। কলকাতায় এসে হিকি নানা রকম ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত হয়ে ঋণগ্রস্থ হন এবং এই জন্যে কয়েক বৎসর তাঁকে জেল খাটতে হয়। পরে একটি বন্ধুর সাহায্যে পুনর্বিচারের সুযোগ পেয়ে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর হিকি কলকাতায় একটি ছোট ছাপাখানা বসিয়ে বেশ দুই পয়সা রোজগার করেন। ফলে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে Bengal Gazette নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রই হোল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। প্রথম থেকেই নানা রকম সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনাকে 'কেচ্ছার' আকারে প্রকাশ করে হিকি তাঁর কাগজকে বেশ জনপ্রিয় করে ফেললেন। নানা রকম অশ্লীল গালাগালিপূর্ণ লেখায় তাঁর কাগজ ভরা থাকতো। সামান্য বিবাহের ঘটনাকেও তিনি সরস করে কাগজে প্রকাশ করতেন, যেমন—মাদ্রাজে নিউল্যাণ্ডের সঙ্গে মিস কাথবার্টের বিবাহ হোল। শ্বশুরের কাছ থেকে নিউল্যাণ্ড ৪০০০ স্বর্ণমুদ্রা ও চাল সরবরাহের একটা কনট্রাক্ট উপঢৌকন পেলেন।

এই সময়ে সেণ্ট হেলেনা থেকে সুন্দরী যুবতী মিস্ এমা ওয়ারিংহাম প্রথমে চুঁচুড়া পরে কলকাতায় এসে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে তোলপাড় করে দিলেন। এই মেয়েটির সৌন্দর্যের চমকে ও উচ্ছলতায় সমস্ত ইউরোপীয় সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। হিকি তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মিস এমাকে 'সেণ্ট হেলেনার বাচ্চা ঘোটকী' বা 'চুচড়ার প্রণয়িনী' আখ্যা দিয়ে এই কুমারীকে কষাঘাত করতে লাগলেন। এমার প্রণয়ী ৭।৮ জন পাণিপ্রার্থীর নামও কাগজে প্রকাশিত করে তাদের অপদস্থ করলেন। এই সুরে হিকি লিখলেন—

— The 'Chinsurah belle' has once again refused Iden George and a settlement of £29,000. There is, of course, a great disparity of age between them, but she would scarcely have declined such a fine offer on that account alone.

এর পরেই হিকি কাগজে লিখছেন— তাকে নিয়ে Paradise Lost (কল্পিত নাম) ও Feeble-এর (কল্পিত নাম) মধ্যে যে ঝগড়া সুরু হয়েছে, সেটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত 'সেণ্ট হেলেনার ঘোটকীকে' চুঁচুড়াতেই থাকতে বলা হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে তার চালচলন অনেকটা সভ্য-ভব্য হবে—আর লাফানো ঝাঁপানোটাও অনেকটা কমে যাবে।

এই ধরণের ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কবিতা যাঁরা এই কাগজে পাঠাতেন, তাঁদের লেখা

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR,
Calcutta General Advertiser.

হিকির বেঙ্গল গেজেট পত্রিকার শিরোনামাসহ প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

বেশী ছাপা হোত। এই সব 'কেচ্ছার' কবিতা যে কতদূর নিম্নস্তরের, তার একটা নমুনা এখানে উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে। এই রকম একটি কবিতার নাম 'আদিম ঈভ'। এই কবিতাটি এই 'চুঁচুড়ার প্রণয়িনী'কে নিয়ে লেখা। কবিতাটি এই রকম—

Pristine Eve in her innocence
could not be blamed
For disporting in nakedness
quite unashamed.
So the damsel decolletee who's
now in view,
If an innocent also, may
blameless be too.

হিকির কলমের খোঁচা থেকে দেশের সর্বশক্তিমান রাজকর্মচারীও বাদ পড়তেন না। প্রকাশ্যভাবে আঘাতের পর আঘাত করাই ছিল তাঁর সম্পাদকীয় কাজ। সেই সময়ের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে এবং তাঁর প্রিয়তমা মেরিয়ানকে তিনি কশাঘাতে জর্জরিত করতেন। এরপর হিকি তাঁর কাগজে লিখলেন— আমিও যদি মিসেস হেষ্টিংসের (গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী) পদলেহন করতে পারতাম, তবে তাঁর কাছ থেকে এমন সব দয়া-দাক্ষিণ্য লাভ করতে পারতাম যা গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে দান করা অশোভন বা অনুচিত হোত।

সরকার পক্ষ হতে এই রকম নানা প্রকার অপমানকর উচ্ছ্বাসের প্রতিবাদ আসতে দেরী হোল না। সরকারী কাগজে সেই শাস্তির আদেশ এইভাবে প্রকাশিত হোল—

Fort William, November 14th, 1780. "The Bengal Gazette' edited by J. A. Hicky, has lately contained highly improper vilifications tending to disturb the peace of the settlement. It will therefore be no longer accepted for transmission through the post.

অর্থাৎ তার শাস্তি হোল Bengal Gazette আর পোষ্টাপিসের মারফতে কোন স্থানে পাঠানো চলবে না। হিকিও দমবার পাত্র ছিলেন না। এর উত্তরে তিনি লিখলেন—আমার কাগজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও অত্যাচারীর পদলেহন আমি কিছুতেই কোরবো না। দরকার হোলে ব্রিটিশ সিংহাসনের কাছে আমি আর্জি পেশ করবো। আমার একমাত্র প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, এইসব অত্যাচারীর ও ষড়যন্ত্রকারীদের অভিসন্ধি সকলের সম্মুখে ফাঁস করে দেওয়া।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে হিকি সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিলেন। সরকারের মতলব হোল, আরো কিছুদিন এই ধরণের লেখা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে ঠিক সময়ে সম্পাদকের টুঁটি চেপে ধরা। এর ফলে, হিকি ক্রমাগত বিষ উদ্‌গীরণ করে যেতে লাগলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে হিকি কাগজে লিখলেন, —সরকার প্রকারান্তরে তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই সময় একদিন কলকাতার রাস্তায় দুইটি ইউরোপীয় ও একজন মুর কর্তৃক হিকি আক্রান্ত হয়ে কোন ক্রমে পরিত্রাণ পান। হিকি এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর কাগজে লিখলেন—এই কাঁটাটি উৎপাটিত হলে গভর্ণমেণ্ট আকাঙ্ক্ষিত নিষ্কৃতি লাভ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন।

আরও দুই মাস ধরে হিকিকে Great Moghal (অর্থাৎ ওয়ারেন হেষ্টিংস) ও তাঁর প্রিয়তমা 'Marian Alipore'-এর উপর এবং প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের উপর নানা রকম জঘন্য অপমানকর উক্তি বর্ষণ করতে দেওয়া হোল। প্রধান বিচারপতিকে বলা হোল, তাঁর সম্মুখে বিচারপ্রার্থী অপরাধীর মত তিনিও একজন অর্থলোভী। এর পর কাগজে প্রকাশিত হোল—মিঃ হিকি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, ভুঁইফোড়, বদমায়েস ও চোরাকারবারীরা, যারা ব্রিটিশের নামকে ও পতাকাকে কলঙ্কিত করছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করাবার জন্য নিয়তি তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন। ধ্বংস করবার প্রচেষ্টায় বা অত্যাচারীর ভ্রূকুটিতে ভীত না হয়ে তিনি তাঁর নির্ধারিত পথ অনুসরণ করবেন।

এরপর ওয়ারেন হেষ্টিংস আর নিশ্চেষ্ট থাকলেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর কুঠার হিকির স্কন্ধে পতিত হোল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্যার ইলাইজা ইম্পের এজলাসে হাজির করা হোল। ৪০,০০০ টাকার জামিন দিতে না পারায় তাঁকে হাজতে আটক করে রাখা হোল এবং বিচারে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিকির এক বৎসর জেল এবং ৭,০০০ টাকা জরিমানা হোল। জরিমানার টাকা অনাদায়ে অনিশ্চিত কালের জন্য জেল। হিকির কর্মচারীরা হিকির জেল হবার পরেও কিছুদিন কাগজ প্রকাশিত করেছিল। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় আক্রোশপূর্ণ লেখা কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় সরকার ছাপাখানাটি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। এইখানেই কাগজের অপমৃত্যু হোল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হিকির অগ্নিগর্ভ হৃদয়ের সঞ্চিত লাভা অবরুদ্ধ হোল। জরিমানা দিতে না পারায় সারা জীবন জেলে আবদ্ধ হয়ে থাকার ভীতি তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেললো। তিনি তাঁর মুক্তির জন্যে স্যার ইলাইজা ইম্পের দরবারে ক্রমাগত দরখাস্ত পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এই বিষয়ে তাঁর নিরাশা কি রকম নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল, তা তাঁর একটি দরখাস্ত হতে প্রতীয়মান হবে—

— Your Lordship's memorialist can now only pray to God for fortitude to withstand the shock of Your Lordship's rejection of his petitions. Every hope has fled, and the future only offers horror and confinement till death brings release.

এইবারে বন্ধুরা হিকিকে মুক্তি দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা টাকা সংগ্রহ করে জরিমানার টাকা শোধ করে হিকিকে তাঁর স্বদেশ আয়রল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন। কোন সময় হিকির মৃত্যু হয়েছিল, তার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে হিকির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি নিজেই তাঁর নাম এই ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় করে গিয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং প্রথম স্বাধীন সংবাদপত্র হিসাবে তাঁর দান যে অমূল্য তা কে অস্বীকার করবে? হিকির দুর্দমনীয় সাহসিকতা পরবর্তী যুগের সাংবাদিকদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরতে যে অনুপ্রাণিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মতামত

॥ চায়ের ধোঁয়া প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

শ্রীউৎপল দত্ত রচিত ধারাবাহিক রচনা 'চায়ের ধোঁয়া' সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বাংলা থিয়েটারে আঙ্গিকের ব্যবহার নিয়ে তাঁর আলোচনায় লক্ষ্য করছি—সেকালের অভিনেতাদের প্রতি তাঁর শ্রুতিকটু শ্লেষোক্তি যথা 'এই সেদিন পর্যন্ত, অভিনেতাই ছিলেন থিয়েটারের মূল গায়েন'—এই রকম আরো অনেক। আমার জিজ্ঞাস্য থিয়েটারে মূল গায়েন অভিনেতা থাকবে না তবে থাকবে কে? আলো, মঞ্চ-কৌশল, দৃশ্যপট, নাটক—যত উন্নতই হোক না কেন—অভিনেতাই যে অভিনয়ের মূল—অভিনয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার—make believe-art-এর শ্রেষ্ঠ বাহন একথা অনস্বীকার্য। সেকালে অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুই দুর্বল, স্থূল ছিল—কিন্তু অভিনীত চরিত্রের যথোপযুক্ত রূপায়ণে অভিনেতারা ছিলেন দক্ষ এবং সেই সার্থক অভিনয়ের জনাই অনা সব কিছু অবহেলা করেও দর্শক ছুটে আসতো থিয়েটারে, এটাও অত্যন্ত গর্বের কথা। আর আজ আঙ্গিকের নামে (নাটক ও অভিনয় বাদ দিয়ে) যা কিছু চলছে তা শুধুই আলোর খেলা—তাপস সেনকে ধন্যবাদ,—একমাত্র তাঁর গুণেই 'অঙ্গার' ও 'ফেরারী ফৌজে'র মত নাটক (?) চলেছে এবং চলছে এবং একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে যদি পরিচালক শ্রীদত্ত তাপস সেনের আলো ব্যতীত ঐ বই দুটী মঞ্চস্থ করেন।

অতীতের নাটকে থাকতো চরিত্র এবং তার বিকাশ এবং সেটা যে সুচারু সম্পন্ন হোত তা বোঝা যায় যখন চিন্তা করি স্থূল আঙ্গিক সত্ত্বেও দর্শক রাতের পর রাত থিয়েটারে ভিড় করতো। এখন ঠিক উল্টো—আলো, মঞ্চ-কৌশল সবই আছে—নেই শুধু নাটকে কোন চরিত্র বা তার কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিকাশ—তার বদলে টিম ওয়ার্ক—দু'-চারটি চরিত্রের Superb acting-এর বদলে mass-এর average acting! এর চাইতে আরো perfect team-work দেখা যাবে চৌরঙ্গীতে, কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, ডালহৌসীতে যে কোন সময় দাঁড়িয়ে সন্ধানী চোখ খোলা রাখলে। প্রশ্ন হোতে পারে তবে এখন থিয়েটারে দিনের পর দিন হাউসফুল হচ্ছে কেন? ভীড় হচ্ছে তাপস সেনের জন্য এবং সর্বোপরি সেই কারণে, যে কারণে ফুটবল মাঠে, টেস্ট ম্যাচ-এ, ফাংশান-এর নামে এবং লক্কড় হিন্দী সিনেমাতেও ভীড় হয়—এবং সেই কারণটি হল 'সূক্ষ্ম'(?) হুজুগ—আজ্ঞে হ্যাঁ—হুজুগটি সূক্ষ্ম না হলে মঞ্চ-কৌশল হুজুগেরা দেখবে কেন!

সে যুগের অভিনয়ের মূল গায়েন অভিনেতাদের অভিনীত বেশ কটি চরিত্র ক্লাসিক-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে—এটা কম গর্বের কথা নয়। কিন্তু এখনকার আঙ্গিক-সর্বস্ব নব-নাট্যান্দোলনকারীদের (তৃপ্তি মিত্র অভিনীত ক'টি চরিত্র ছাড়া) কোন চরিত্রই সে পর্যায়ে পৌঁছান দূরে থাক্—নাটকের আকর্ষণই থাকেনা তাপস সেনের আলো ব্যতীত।
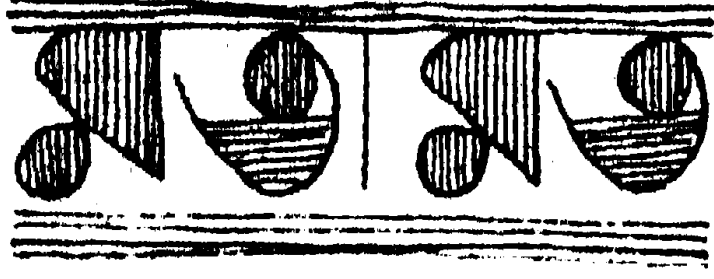
নাটক, অভিনয় ও আঙ্গিক—এই তিনের সম্পূর্ণ একাত্মতার ভিতর দিয়েই অভিনয় সার্থকতা লাভ করে। দেহ (নাটক ও অভিনয়) বাদ দিয়ে আলো-সর্বস্ব অঙ্গের উন্নতিতে যাদু সম্রাটের ম্যাজিক হয়, আলোর খেলাও হতে পারে কিন্তু তা নাটকাভিনয় হতে যাবে কেন? নাটক ও অভিনয়ের দুর্বলতা কি আলো দিয়ে ঢাকা যায়—না বরং আলো দিয়ে সে দুর্বলতা আরো প্রকট হয়ে দর্শকের চোখ ও মন কট্ কট্ করে। জানি শ্রীদত্তের তূণে অনেক বাণ আছে আমার লেখাকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে। কিন্তু তবু বলব তাঁর নিজের অভিনয় অত্যন্ত স্থূল—যা দিয়ে মঞ্চে হয়ত হুলুস্থূল করা যায় কিন্তু তার জোরে পূর্বসূরীদের প্রতি শ্লেষ করা শোভনও নয়, উচিতও নয়। নমস্কার। ইতি—

শ্রীসব্যসাচী মৈত্র।
চুঁচুড়া

॥ হিন্দি অনুবাদ ॥

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

প্রথম বর্ষ ৩৩-শ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমানাথ ত্রিপাঠী মহাশয়ের মতামত পাঠ করে আমি আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি। আশা করি আপনার পত্রিকা মারফৎ এটি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীর 'আমার মাথা নত করে দাও' কবিতাটির হিন্দি অনুবাদ পড়ে আমি সত্যি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এ ধরনের অনুবাদ-প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয় ও সম্মার্হ। তাঁর কাছ থেকে আমি অনুরূপ আরও অবদান আশা করছি। এটা সত্যি কথা আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা সাহিত্য নিয়ে বহু বাচালতা করেন। এরূপ সাহিত্য-বাচাল সর্বকালে নিন্দনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমি শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীর একটি বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি লিখেছেন—'ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে ভারতীয় ঐক্যের উপরে প্রহার করে সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে হিন্দির অবমাননা করা আর রোমক লিপির প্রচারের আগ্রহ করা সর্বথা অনুচিত।' এ প্রসঙ্গে বলা যায় স্বয়ং মহাত্মাজীও রোমক লিপির পক্ষপাতী ছিলেন, যার অর্থ নিশ্চয়ই হিন্দির বিরোধিতা করা ছিলনা। হিন্দি বা রোমক লিপির ব্যবহার সরকারী কাজ চালাবার উদ্দেশ্যেই। জাতীয় ঐক্য বা সংহতি শুধু একটা ভাষা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না। যদি তাই হয় তবে যে দেশে বহু ভাষা রাষ্ট্রভাষা ও লিপি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেখানে জাতীয় সংহতির একান্ত অভাব থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ, দেখা যায় ঐ সব দেশে আমাদের চেয়ে জাতীয় সংহতি বেশীই আছে। পক্ষান্তরে হিন্দি ভাষার মত শুধু ইংরাজী ভাষার ব্যবহারও জাতীয় ঐক্য বা সংহতির পরিপন্থী বলে গণ্য হতে পারে। আসলে জাতীয় ঐক্য ও ও সরকারী ভাষা—দুটোর ভিন্ন স্থান। এ বিষয়ে আমি এই সংখ্যার জৈমিনির লেখা 'পূর্বপক্ষ' পড়তে শ্রীত্রিপাঠীকে অনুরোধ করছি। আর এটাও স্বীকার্য যে, রাষ্ট্রলিপি হিসাবে বাংলা যেমন অপূর্ণ, হিন্দি ততোধিক অপূর্ণ। সব ভাষাকে ডিঙিয়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রলিপি হিসাবে যে স্বীকার করা হয়েছে সেটা ভাষা হিসাবে হিন্দি পুষ্ট বলে নয়। ভারতের সব প্রদেশের লোক অল্প-বিস্তর চলতি-হিন্দি বোঝে—এই সুযোগের বলেই। আসলে রাষ্ট্রলিপি হিসাবে হিন্দিকে পুষ্ট হতে হলে উদার হতে হবে, যে বিষয়ে হিন্দির কর্ণধারগণ নিতান্তই বিমুখ। আর একটি কথা। শুদ্ধ হিন্দি শিখতে হবে, হিন্দি নিন্দা করার আগে এটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু একথা সদর্পে বলা যায় যে, হিন্দি-ভাষীদের অনেকেই শুদ্ধ হিন্দি বলেন না আর 'কণ্ঠ-লেঙোটী' ইত্যাদি কথা নিয়ে তাঁরাও প্রচুর উপহাস করেন। এজন্য শ্রীত্রিপাঠী বাংলাভাষার পূর্ণতা ও বাঙালীকে challenge না করে বারোয়ারী challange করলেই ভাল করতেন।

যাই হোক, আমি শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীকে অনুরোধ করছি বাদানুবাদ বাদ দিয়ে আসুন আমরা পরস্পরের দোষত্রুটি মার্জনা করে মহত্তর চিন্তাকেই স্বাগত জানাই। ইতি—

বলাই ভট্টাচার্য
গোরক্ষপুর

[এ বিষয়ে আমরা আরো অনেক চিঠি পেয়েছি। কিন্তু আলোচনা যথেষ্ট হ'য়েছে বলে এ বিষয়ে আর কোনো চিঠি ছাপা বাহুল্য বিবেচনা করি।

সম্পাদক, অমৃত।]

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল
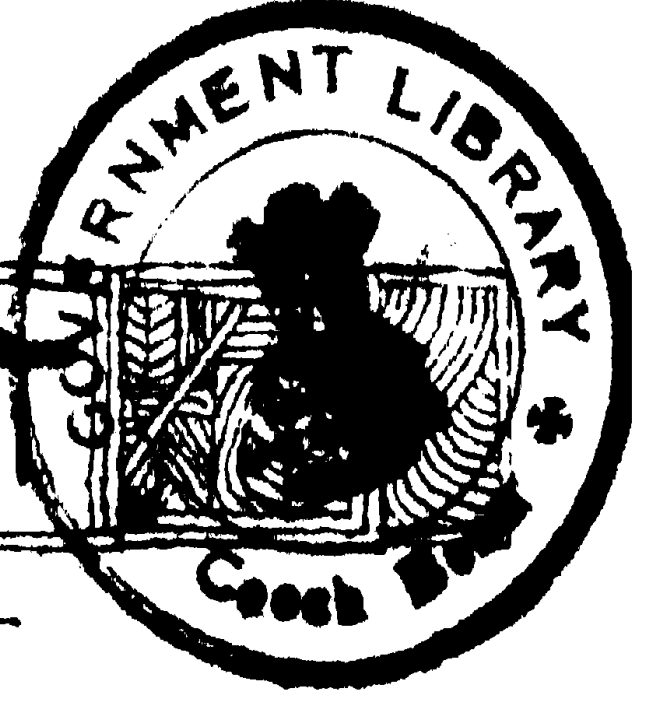
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। নয় ।।

আগেকার কালে শহর-নগর গ'ড়ে উঠতো সাধারণ মানুষের এলোমেলো এবং অগোছালো খেয়াল-খুশিতে। এখানে-ওখানে যেমন-তেমন বস্তির জটলা পাকিয়ে উঠত। নালা-নর্দমা দেখা দিত আশেপাশে। পথ-ঘাট এল তারপর। এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার যোগাযোগ ঘটল। অতঃপর চারটি সামগ্রীর বিশেষ দরকার হল ওই বস্তির পাঁচজনের। পানীয় জল, পাকা রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা এবং আলোর ব্যবস্থা। তখন ওই পাঁচজনেই বসালো পৌরসভা। এইটি কলকাতার ইতিহাস। কিন্তু নতুন দিল্লী, নতুন নগর চিত্তরঞ্জন বা কল্যাণী, নতুন ভুবনেশ্বর-চণ্ডীগড়ের ইতিহাস অন্যরূপ। এরা পরিকল্পিত নগর। মানুষ এসে পৌঁছবার আগে রাষ্ট্র এদের পত্তন করেছে। "চিত্তরঞ্জন" নগরী সুন্দর হয়েছে এই কারণে। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পর বিগত চৌদ্দ বছরে ভারতে যে পরিমাণ সংগঠনের কাজ এবং নতুন-নতুন ছোট-বড় নগর নির্মিত হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯১৭ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তা'র অর্ধেকও হয়নি! এর প্রধান কারণ, সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অশান্তির সঙ্গে অনিশ্চয়তা। স্বাধীনতা-লাভের পর পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত চালু করেছিল তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সোভিয়েট ইউনিয়ন সে-ক্ষেত্রে নিয়েছিল বারো বছর সময়। বলা বাহুল্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম শিক্ষক হল সোভিয়েট ইউনিয়ন।

জর্জিয়ার অন্তর্গত রুস্তভী নগরটি এমনি পরিকল্পিত। এই নগরের পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। নতুন বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে তাঁরা থাকেন স্বামী-স্ত্রী দুটি বাচ্চা নিয়ে। স্ত্রী একজন শিক্ষয়িত্রী। দুজনে মোট মাইনে পান্ ৩৫০০ রুবল। ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ে ৪০০০ হাজার টাকারও বেশি। কিন্তু আমাদের দেশের ওজনে প্রায় হাজার টাকা উপার্জনের গৃহস্থ! তবে কিনা এ'দের ফ্ল্যাটভাড়া মাত্র ৭০ রুবল। তিনখানা বড় শোবার ঘর; রান্নাভাঁড়ার, বাথরুম, বারান্দা ও লবি! এটি লক্ষ্য করেছি, বাসস্থান পাওয়াটাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু একবার পাওয়া গেলে আর ভাবনাও যেমন নেই, ভাড়াও তেমনি নামমাত্র। রান্নাঘরে ঘুঁটে-কয়লা, কাঠকয়লা বা জ্বালানি কাঠ-—এগুলি চিন্তার অতীত। হয় ইলেকট্রিক, নয়ত গ্যাস। মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে সর্বাপেক্ষা যেগুলি প্রাথমিক প্রয়োজনের বস্তু—সেগুলি সুলভ হচ্ছে দিনে দিনে। অন্যান্য রিপাবলিক-এ যেমন, এখানেও তাই। ইস্কুলের মাইনে নেই, এবং বই-খাতাপত্রের দাম যৎসামান্য—গায়ে লাগেনা। বাচ্চাদের টিফিন্ বিনামূল্যে। সেই টিফিন্ একটুকরো বাসি পাঁউরুটি আর ছোট ইঁটের ঢ্যালার মতো একটি দরবেশ নয়। তার মধ্যে মাখন, মাংস, দুধ ও ফলের ভাগ রয়েছে যথেষ্ট। প্রত্যেক শিশুকে স্বাস্থ্যময় ক'রে গ'ড়ে তোলবার দায়িত্ব নিচ্ছে রাষ্ট্র—কেননা ভবিষ্যতে সে একজন বলবীর্যদর্পী কমিউনিষ্ট হয়ে উঠবে!

লেনিনের সঙ্গে ষ্টালিন সর্বত্র। যেদিকে তাকাই,—প্রতি বাসগৃহে, পথের মোড়ে মোড়ে, যাদুঘরে, হোটেলে, বাগানে, দোকানে, ময়দানে, ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায়, রেলস্টেশনে, বিমানঘাঁটিতে—শুধু অগণিত পাথরের মূর্তি! পাছে লোকে ভুলে যায়—এই কারণে কি? পাছে কেউ ভিন্ন চিন্তা করে, ভিন্ন পথ ধরে—এই কি কারণ? আমাদের রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথের পাথরের মূর্তি সর্বদা চোখের সামনে নেই,—তাঁদের ভুলেছি কি? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কি হারিয়ে গেছে? করাচীতে গান্ধীর মূর্তি ভেঙে দিয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী কি প্রকাশ্যে গান্ধীজীকে ভালবাসেনা? "পাছে ভুলে যাই"—এই আশঙ্কায় কি এত মূর্তির ছড়াছড়ি? হৃদয়-মন্দির ব'লে কিছু কি এই সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই।

মাইল তিরিশেক পথ ঘুরে ফিরে তিবিলিসিতে ফিরে আমরা গেলুম জর্জিয়ান লেখক-সঙ্ঘের মস্ত আপিসে। বৃহদাকার অট্টালিকা। নানা লোক নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। টাইপ করছে কেউ, কোথাও হিসাব-নিকাশ চলছে, কোথাও দেখাশোনা ও মন জানাজানি হচ্ছে, কোথাও পরামর্শ-সভা বসেছে। মেয়েরা আসছে যাচ্ছে, যুবকরা ঘুরছে ফিরছে। এখানে নাকি লেখক-লেখিকা 'তৈরি' হয়। এখানে ভবিষ্যৎ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশপথের ছাড়-পত্র পাওয়া যায়।

বড় হল্‌টির দেওয়ালে রাষ্ট্রগুরু লেনিনের মস্ত একখানা তৈলচিত্র ঝুলছে। ষ্টালিনের ছবিটি ঠিক কোথায়, সেটি খুঁজছিলুম! কিন্তু মানিয়ে যেত টলষ্টয়-পুশকিনের ছবিও কাছাকাছি থাকলে!

আমরা দেখতে চাইলুম কয়েকজন নব্য লেখককে। একসময়ে তা'রা কয়েকজন একটু আড়ষ্টভাবে এসে দাঁড়াল। লেখক ব'লে ঠিক চিনতে পারা কঠিন। কোনও একটা কারখানায় যেন শিক্ষানবীশ

করছিল,—কাজ ফেলে এসে দাঁড়াল। কেউ কিছু শীর্ণ, কেউ দাড়ি কামানো, কেউ কিছু বিমর্ষ, কারো আধময়লা জামা কাপড়,—কারো মুখে চোখে ভারতীয়কে দেখবার জন্য চাপা ঔৎসুক্য, কেউ বা ভয়ভীরু। কেন জানিনে, আমার মনেও যেন এক প্রকার বিষণ্ণতা এসে গেল। ওদের ওই চেহারাগুলি যেন সমস্ত দিন আমার পিছু নিয়েছিল। ওদের জীবন্ত বলে মনে হয়নি।

হঠাৎ একদিন সকালে আমাদের খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন শাড়িপরিহিতা এক প্রাচীন বাঙ্গালী মহিলা! পিছনে পিছনে এলেন ঋজু দীর্ঘকায় একজন ভদ্রলোক, পরণে তাঁর আচকান এবং চুড়িদার। যেন কতকাল আগে কোন্ এক রহস্যাবৃত জগতের বিচিত্র জীবনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলুম, জেগে উঠে দেখি, "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!" পলকের মধ্যে ভুলে গেলুম আমার বিদেশী পোষাক, বিদেশী খাদ্য, বিদেশী বন্ধু, এবং এটি বিদেশ-বিভুঁই। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক ব্রাহ্মণ-সন্তান—যে-ব্যক্তি তেল-জলে আর শাক-ভাতে মানুষ! চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মহিলাকে প্রণাম করলুম। তিনি হলেন আশাদেবী আর্যনায়কম্, এবং পিছনে তাঁর স্বামী। ইনি সিংহলী বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় আলাপ করেন। ছোট-বেলা থেকেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ফণী অধিকারী মহাশয়ের নাম শুনে আসছি। তাঁর তিন কন্যা—ভক্তি, আশা এবং রাণু। শুধু রাণু কিছু অস্পষ্ট! লেডী রাণু মুখার্জি বললেই বোধ হয় সম্পূর্ণ হয়। আশাদেবী হলেন লেডী রাণুর দিদি। দিদি উনি সকলের। ও'র মুখে আমার দুই একখানি বইয়ের উল্লেখ শুনলুম।

দিল্লীর শিক্ষা-দপ্তরের তরফ থেকে প্রতিনিধিস্বরূপে আশাদেবীরা এসে-ছিলেন জার্মানীতে। সেখান থেকে সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণক্রমে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এখানে এসেছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিরামিষভোজী এবং দুজনেই আচার্য বিনোবা ভাবের অনু-পন্থী। এ'রা আচার্যের 'পদযাত্রার' নিত্য-সঙ্গী।

আশাদেবীর শান্ত মৃদু ও মিষ্ট আলাপে কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় হয়েছিলুম। তিনি বৃদ্ধা, এবং তাঁর মৃদু হাসের মধ্যে প্রসন্ন স্নেহটুকু দেখতে পেলুম। চেহারাটিতে যেন তাঁর প্রাচীন অশ্বত্থের জটার আভাস পাওয়া যায়। ভারতের সর্বক্ষমাশীল সাংস্কৃতিক প্রকৃতি যেন তিনি সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন! পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার কাছে আমার চারি-পাশের যা কিছু যেন অর্থহীন মনে হল! যেন হিমালয়ের কোথাও কোনও এক মহাদর্শী যাজ্ঞবল্ক্যের তপোবনপ্রান্তের হোমকুণ্ডের ধারে এসে বসেছি এবং বেদবতী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে অমৃতমন্ত্রের পাঠ শুনছি! তাঁর সঙ্গে আলাপ করছি বটে, কিন্তু আমার ভিতর থেকে অন্য এক 'আমি' যেন এই জর্জিয়ার মদ-মাংসের হোটেল থেকে ছুটে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ ভারতের গোদাবরী-বেত্রবতী গঙ্গা-কবরীর ঘাটে-ঘাটে এবং হৃষি-কেশের চন্দ্রভাগার তটে-তটে কিছু যেন অনুসন্ধান ক'রে ফিরছিল এবং কালদণ্ড পর্বতের নীচে শাকম্ভরীর গুহাগভের আনাচে কানাচে ঘুরছিল!

ভাষা বোঝেনা কেউ পথে ঘাটে, শুধু অবাক হয়ে জনসাধারণ আমাদের দিকে তাকায়। কেউ বোঝেনা কোন্ বিচিত্র দেশের মানুষ আমরা! পরস্পর জাতি পরিচয় জানার উপায় নেই। হাসিমুখে যদি কেউ নোংরা ভাষায় গালি দেয় সেটিকে সুমধুর শ্রদ্ধাবাক্য বলে ধ'রে নিতে আমরা প্রস্তুত। হাজার হাজার নরনারীর মধ্যে হয়ত একজন মাত্র জানে অশুদ্ধ ইংরেজি। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যেমন একজনও রুশ ভাষা জানে না। ভাষা না জানলে ভালবাসার প্রকাশ হয় কুণ্ঠিত। বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজ-ফরাসী-জর্মন মেয়ে বিয়ে ক'রে এনে বোধ হয় বাঙ্গলা শেখায় শুধু মধ্যরাত্রে রসগদগদ 'বাঙ্গলা' কণ্ঠ শোনবার জন্য!

মামুদভ মাঝে মাঝে তার সঙ্গসুধা থেকে মুক্তি দিয়ে স'রে পড়ছে তার কোন্ এক আত্মীয় মহলে। সুতরাং দোভাষী না নিয়েই বেরিয়ে পড়ছিলুম। হোটেল বাড়িখানার নানা নিশানা মুখস্থ করে যাই,—কেননা পথ হারালে একেবারে অগাধজলে! গরু হারালে লোকে থানায় জমা দেয়, কিন্তু সেখানেও সে গরু! অবশেষে মালিক এসে পৌঁছয় খুঁজতে খুঁজতে!

বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী চলেছে রাজপথের দুই ধারে,—কোথাও ফাঁক নেই। এমন সুদৃশ্য সালঙ্কৃত হর্ম্যরাজির পিছনবাগে কী আছে, কোনও পর্যটক দেখতে চায় কি? রাজপথ দিয়ে মোটর পেরিয়ে যায়, দুধারে দেখে যাই নগরের ঐশ্বর্য এবং সম্পদসম্ভার। কিন্তু গলি-ঘুঁজি, পাড়াপল্লী, আনাচ-কানাচ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যেখানে প'ড়ে থাকে "মাছের কান্‌কা, কাঁঠালের খোসা ও ভূতি, মরা বিড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরো কতো কি যে—!"

দু'একটি গলির মধ্যে একা ঢুকে খানিক দূরে অগ্রসর হয়েছিলুম। ভয় ছিল পাছে পথ হারাই। অদূরে পাশ দিয়ে আমাদের 'ঢাকুরিয়ার' কাঁচা নোংরা নর্দমা কোন্‌দিকে যেন বয়ে চলেছে! এক একখানা বাড়ির জরাজীর্ণ এক একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। কোন কোনও বাড়ির প্রবেশপথ গুহান্ধকারে আচ্ছন্ন,—যেমন কাশীর বাঙ্গালীটোলা! অত দীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলিতে একটি মাত্র আলোক-স্তম্ভ। একটি বউ কোনও এক পুরনো বাড়ির দরজায় বাজারের থলি হাতে নিয়ে ঢুকছে। অদূরে পুরনো এক দোতালার বারান্দায় রাজমিস্ত্রি মেরামতি কাজে লেগেছে। তাদের পাশে একটি ছেকরা কাঠি বাড়িয়ে পায়রা ওড়াচ্ছে। গলির ও-মুখে ঠুলি চশমাপরা এক মুণ্ডিত-মস্তক বৃদ্ধ একখানা ছোট জর্জিয়ান্ খবরের কাগজ পড়ছেন ছেঁড়া ও তালি-মারা ওভারকোট জড়িয়ে। বুঝতে পারা যায় এসব গলিতে মিত্তুয়া-মেথর প্রতিদিন ঢোকে না। এটি স্বল্পবিত্ত গৃহস্থপল্লী। বাঙ্গালীর চক্ষু এসব দৃশ্যের সঙ্গে অতি পরিচিত।

মাথা ন্যাড়া করা প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা বিলিসি শহরে অনেক বেশি। তার ওপর ছাঁটা ফ্রেঞ্চ দাড়ি। মাথায় কালো মখমলের চাঁদিটুপি। টুপির উপর একটা টোপ। বর্ণ শ্বেত। সম্ভবত এ'রা তাতার মুসলমান। তাসকন্দে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্যটা যেমন চোখে পড়ে, এখানে তা নয়। বিলিসি অতিশয় বিত্তশালী। প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ শহর।

এই বিত্ত-সম্পদের চেহারাটা আরেক-বার চোখে পড়ল এখানকার সর্বপ্রধান অপেরায়। অপেরার মধ্যে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র ছিল আমাদের কাছে। সেদিন 'জননী জর্জিয়ার' বাৎসরিক উৎসবের রাত্রি। অপেরায় এসেছেন জর্জিয়ান রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, পার্টির কর্তারা, সেনানায়করা এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ। প্রবেশপথটিতে পুলিশ বা মিলিচ-মেন্ গিজগিজ করছিল। একটু বিস্মিত হলুম, যখন আমাদের ভিতরে যাবার জন্য ওরা তাদাতাদি
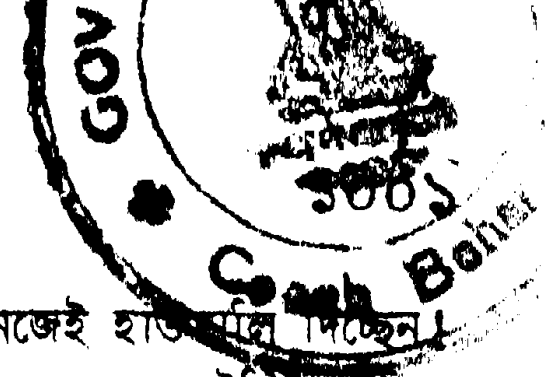
খুলতে লাগল! সমস্ত প্রবেশপথের দরজাগুলি এইভাবেই ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করা। এই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন কোথায় এবং কি জন্য—সেটি আমার জানার উপায় নেই। কিন্তু 'পীপ্‌ল্‌' নামক যে-জনসাধারণের প্রথম পূজো দেখি সোভিয়েট ইউনিয়নে,—এখানে সেই শ্রদ্ধা কই? কোথায় সেই উদার সর্বাগ্রহশীল আতিথেয়তা? কেন এই অবিশ্বাস? এর কারণটি কোথায়? জনতা নিয়ন্ত্রণ এক বস্তু, অবিশ্বাস ভিন্ন বস্তু! যেখানে ভয় সেখানেই অবিশ্বাস, এবং সেইখানেই পারস্পরিক অশ্রদ্ধার কথা ওঠে।

ভারতের কোনও একটি প্রজাতন্ত্র দিবসের কথা মনে পড়ে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীর পথে রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রাসহ বেরিয়েছেন! সেই দৃশ্যটি কেমন, এটি চাক্ষুস দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পথে বেরিয়েছে। একটি বাগানের রেলিংয়ের ধারে সেই বিরাট জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে হঠাৎ বিপর্যস্ত এক ব্যক্তিকে কে যেন পাশ থেকে চিনতে পারল, সেই ব্যক্তির নাম জওয়াহরলাল নেহেরু! তিনি প্রধান-মন্ত্রী!

জানি এটি নাটকীয়, জানি এটি জনসাধারণের ভালবাসার মনটিকে নিয়ে অপরিসীম কৌতুকের খেলা, আপন জনপ্রিয়তাকে ওই মুহূর্তে পরীক্ষা ক'রে নেওয়া! কিন্তু এই পরিহাস সরস ঘটনাটির মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং নেহরুর প্রতি জনসাধারণের যে আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে তেমন সৌভাগ্য ঘটেনি!

চাবি খুলে অপেরার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং আমাদের পিছন দিকে পুনরায় চাবি বন্ধ হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে পরিপূর্ণ জনতা, তারই মধ্যে সীট খুঁজে-পেতে আমাদের বসবার জায়গা করা হল। ভিতরটির দৃশ্য হিসাবে মনোরম। মঞ্চটি বৃহৎ এবং পুষ্পলতার শোভায় সুচিত্রিত। বৎসরের সর্বপ্রধান জাতিয় উৎসবটি এখানে পালন করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎকালে যারা রাষ্ট্রের সকল বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে সেই 'ইয়ং পাইয়োনীয়ার্স কোর'-এর অতি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান বালক-বালিকারা মঞ্চের উপরে এসে নানা কাজ, গান, কথা, বক্তৃতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা দেখাতে লাগল। প্রেক্ষাগৃহবর্তী ছেলেমেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা করল, এবং দেখতে দেখতে একটি ছোটখাটো সৈন্য-দল সামরিক পোষাকে ভিতরে ঢুকে এক বিশেষ ধরণের মার্চ আরম্ভ করল—যার সঙ্গে বাদ্য ও যন্ত্র এবং ঐকতান এক হয়ে মিলে গেল। এই মিলনের মধ্যে যে ব্যঞ্জনাটি পাওয়া গেল সেটি এই, গভর্ণমেণ্ট, পার্টি, পীপ্‌ল্‌, পুলিশ, মিলিটারি এবং অনাগতকালের রাষ্ট্রনায়ক দল—একই গানে, ঐকতানে, নীতি ও নিয়মানুগত্যে, শাসনে, বাঁধনে, কাঠিন্যে, শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্যে যেন সূত্রবদ্ধ থাকে! প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে যথারীতি অগণিত বেলুন উড়তে লাগল, উপর থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো রঙ্গীন বেলুন ছোড়া হল,—এবং এমন একটি সামগ্রিক বর্ণাঢ্যতা দেখা গেল যেটিকে ইন্দ্রলোক বা রূপলোক বললে মানায় ভাল। বলা বাহুল্য, আমরা মুগ্ধচক্ষে চেয়ে এই ইউরোপীয় উৎসবের আসরটি উপভোগ করছিলুম। অতঃপর জর্জিয়ান রিপাবলিকের যাঁরা সর্বোচ্চ অধিনায়ক তাঁরা মঞ্চের উপরে সারিবদ্ধ হয়ে একে একে তাঁদের যথাযোগ্য ভাষণ দিতে লাগলেন। আমরা কয়েকজন তাঁদের ভাষা বুঝিনে, কিন্তু হাততালি বুঝি। যিনি বক্তা তিনি বলতে বলতে নিজেই হাততালি দিচ্ছেন! সোভিয়েট ইউনিয়নের এইটিই রীতি। প্রত্যেক বক্তা নিজের কথা বলতে বলতে নিজেই হাততালি দেন! প্রধানমন্ত্রী মিঃ খুশ্চেভও তাঁর প্রায় প্রতি পূর্ণ বাক্যটির শেষে নিজেই হাততালি দিয়ে থাকেন! এটি আমাদের দেশে দেখা অভ্যাস নেই বলেই একটু যেন নতুন ঠেকে।

মামুদভ পাশে ব'সে ইংরেজিতে অল্পস্বল্প বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একজন বক্তার ভাষণে "নরোদ" শব্দটি বার বার শোনা যাচ্ছিল। জনগণের অপর নাম 'নরোদ'। কিন্তু এই প্রেক্ষাগৃহে সেই চিরকালীন 'নরোদরা' নেই,—যারা মুখ বুজে কাজ করে নগরে ও প্রান্তরে, যারা পাকা ফসল কাটে, নদী বাঁধে, পাহাড় কাটে, কারখানা বানায়, সেতু নির্মাণ করে, মানুষের সকল নোংরা কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়! মজুর, মেথর, কামার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, চাষী, ফড়ে, মুচি, গোয়ালা—তাদের পোষাক, রুচি, বসবাস, উপার্জন, চেহারা, চরিত্র—এসব অনেকটা ইতিমধ্যে দেখে বেড়িয়েছি বৈকি। কিন্তু তারা এই প্রেক্ষাগৃহে নেই।

এখানে যারা এসেছে তারা উচ্চশ্রেণী, উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চলোকের। এরা বোধ করি নিমন্ত্রিত, বিশিষ্ট, আলোকপ্রাপ্ত এবং অভিজাত সমাজের। এই চারিদেয়ালবন্ধ প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যারা রইল, পথের আশেপাশে ভিড় ক'রে যারা এই অপেরার উৎসবসজ্জার দিকে চেয়ে নির্বাকচক্ষে তারিফ করছে, বোধ করি তারাই 'নরোদ!'

"In the Soviet Union ...... a man's position is determined not by wealth or lineage but by the work he performs. There are no classes or social groups that enjoy privileges......"

—প্রেক্ষাগৃহে বসে এই কথাটি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলুম।

ট্রান্স-ককেশিয়ার সুরম্য পর্বত-শ্রেণীর তলায়-তলায় জর্জিয়ান রিপাবলিক-এ মোট ৪০ লক্ষ লোকের বাস। দুদিকে দুই উপত্যকা—'বাইওনি' এবং 'কোরা'। পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, পূর্বে কাস্পিয়ান সমুদ্র। পশ্চিম অংশে পাহাড়ের তলায় তলায় গহন অরণ্যানী, অগণিত বন্য নদী এবং জলধারা, অনধ্যুষিত হাজার হাজার বর্গমাইল-ব্যাপী জনবিরলতা। পাহাড়ি জ্বর, ম্যালেরিয়া, সাপ, হিংস্র জানোয়ার এবং বন্য সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক সেখানকার বনে-পাহাড়ে বসবাস করে। সেখানে তুষারবিগলিত জলের বন্যা নেমে এসে মাঝে মাঝে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—যেমন আমাদের আলিপুরদুয়ারকে ভাসায় ভুটানের নদী, যেমন কোশি আর সরযূর বন্যা সোমেশ্বর এবং কুমায়ুনের পাহাড়তলীর বস্তিকে ভাসায়—ঠিক তেমনি। পশ্চিম জর্জিয়ায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিত্য দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। কিন্তু ওরই মধ্যে আরণ্যক অধিবাসীরা কাঠের ফ্রেম বাঁধিয়ে বস্তি গ'ড়ে তুলেছে —যেমন আমরা দেখি আলিপুরদুয়ারে অথবা শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে মহানন্দার আশেপাশে। মাঝে মাঝে সেখানে নানা-বিধ ফলের বাগান আর আঙুরের ক্ষেত-খামার। সেখানে আজও বোধ করি যৌথ-চাষের ব্যবস্থা পত্তন হয়নি। জর্জিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত বড়ই রুক্ষ,—সেখানে আর্মেনিয়া, আজারবাইজানের প্রাকৃতিক কাঠিন্য বর্তমান। জর্জিয়া থেকে প্রচুর আহার্য সামগ্রী চলে যায় মস্কোর দিকে। আঙুর আপেল লেবু, চা তামাক তেল শাকসব্জি ভুট্টা আরও কত কি। বহির্বাণিজ্য করে বলেই জর্জিয়া ধনবান। তুলোর কারবার অনেক বেশি বলেই মধ্যএশিয়ার চারটি রিপাবলিক—যথা উজবেকিস্থান, তাজিকিস্তান, খিরগিজিয়া ও তুর্কমেনিস্তান—এদের এত নবাবী! এই জর্জিয়ার একটি নদী 'আলাজানির' দক্ষিণ পারে পাহাড়ি উপত্যকায় একটি আঙুরের ক্ষেত অবিচ্ছিন্নভাবে ৬০ মাইল অবধি বিস্তৃত! এই সমগ্র অঞ্চলটির নাম "কাখেটিয়া"।—এখানকার হাজার হাজার নরনারী এই দিকদিগন্তব্যাপী আঙুর-রাজ্যটিতে সারা বছর ধ'রে কঠোর পরিশ্রম করে। প্রতি বছর ভাদ্র-আশ্বিনে ফসল ওঠে। পাকা ফসলের কালে দেখা যায় প্রান্তরে-প্রান্তরে কোথাও মৃদু রক্তিম ছায়া, কোথাও ঘন রক্তনীল, কোথাও বা গাঢ় হরিৎ বর্ণাভা। সেই আঙুর চলে যায় ট্রেনে, ট্রাকে, জলযানে বা বিমানে নানান শহরে। তারই একটা বড় অংশ চলে যায় অগণিত মদের কারখানার দিকে। এই "কাখেটিয়া" উপত্যকার পূর্বদিকে তেমনি প্রায় ৭০ মাইল লম্বা চা-বাগান,—যেটি সোভিয়েট ইউনিয়নের অহঙ্কারের সামিল। এই দুই ফসলের ঠিক মাঝখান দিয়ে উত্তর পশ্চিমে একটি রেলপথ ও মোটরপথ চলে গেছে দুইশত মাইলেরও বেশি,—যে-পথের একদিকে উত্তুঙ্গ ককেশাস পর্বতমালা এবং অন্যদিকে কৃষ্ণ-সাগরের সুনীল জলধি। সোভিয়েট ইউনিয়নের ললাটে জর্জিয়া যেন কোহিনূরের মতো ঝলমল করছে!

সুপ্রাচীন টিফ্লিস তথা বিলিসি নগরী থেকে বিদায় নেবার আগে একবার পিছন ফিরে চেয়েছিলুম বৈকি। বিজ্ঞান ভবনটির বিশালতা দেখে গেলুম বটে, কিন্তু স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ হাজার ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল না। সুন্দর পাইনসমাকীর্ণ যে-পথটি ধ'রে চ'লে যাচ্ছি, এটির সঙ্গে জর্জিয়ার প্রাতঃস্মরণীয় এক কবির নাম জড়িত। তাঁর নাম 'সোতাহ রুস্তহাভেলী'। সেই পরলোকগত কবির নামে এখানকার সর্বজনপ্রিয় একটি রঙ্গালয় উৎসর্গীকৃত। সোভিয়েট ইউনিয়নে বহু রাজনীতিক নেতা ও সমর অধিনায়কের নামে বহু শহর যেমন গড়ে উঠেছে,—যথা লেনিনগ্রাড, ষ্টালিনগ্রাড, ষ্টালিনো, ষ্টালিনাবাদ, ষ্টালিনস্ক, ভরোশিলভগ্রাড, কুইবিশেভ কিরভ, মলোটভ, কালিনিন, কালিনিনগ্রাড, ফ্রুনজ, সোরের্দলভস্ক, আইভানভ, ভরোনেজ ইত্যাদি, তেমনি দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক, মনীষী ও কবিগণের নামেও অগণিত পথ ঘাট যাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় বন্দর নগর ইত্যাদি গ'ড়ে উঠেছে। পূর্বেকার নিজনি নভগোরড নগরটি গোর্কির নামে উৎসর্গ করা। উক্রাইনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবির নামে কাশ্যপ সাগরের একটি প্রধান বন্দর সংযুক্ত। পুশকিন, গোগল, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, গোর্কি, শেকভ, টুর্গেনিভ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সাহিত্যকর্মী ও কবির নামাঙ্কিত অগণিত রাজপথ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে ছড়াছড়ি। সম্রাট নেপোলিয়নের দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর জাতীয়তাবাদী তরুণ কবি পুশকিনের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর জারের দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হন। বস্তুত, রুশীয় ক্লাসিক সাহিত্য যাঁদের হাতে সৃষ্টি, তাঁরা কেউই জারের কঠোর শাসন থেকে নিষ্কৃতি পাননি। বলতে গেলে রুশ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের প্রথম মন্ত্রগুরু হলেন কবি পুশকিন।

একটা কথা কয়েকদিন থেকে পেয়ে বসেছে। মধ্যএশিয়া থেকে আরম্ভ করে কাশ্যপ সাগরের পশ্চিমবর্তী আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, নাখিচেভান ইত্যাদি দেশগুলির সম্বন্ধে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের কিছু জানা ছিল না। যে-দেশের উন্নতি ঘটে, সে-দেশের আলো বিকীর্ণ হতে থাকে দিকদিগন্তে। মধ্য-এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য চিরদিন ধুলোবালি মেখে আপন অজানা এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিরকাল ছেঁড়াকাঁথা আর কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকত। বাকু অঞ্চলের তেলের লোভে ইউরোপীয় জাতিরা যে আসেনি তা নয়, কিন্তু যতটুকু তেলের যতটুকু সীমানা ততটুকুই তার শিল্পাঞ্চলের উন্নতি। ইংরেজ আমলে আমাদের বাঙলার গ্রামাঞ্চলের উন্নতির কথা ওঠেনি, এমন কি, পূর্বে-কলিকাতায় যেখানে অধিবাসীদের জীবন দুর্গতি—সে-অঞ্চলটি সংস্কারের কথাও কারও মাথায় ঢোকেনি। ইংরেজদের শোষণ এবং বসবাসের জন্য যতটুকু দরকার ছিল, কলকাতার ঠিক ততটুকুই উন্নতি ঘটেছিল। সেই কালের ইংরেজদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাশিয়ার সম্রাট জার। তিনি তদানীন্তন বিরাট রুশ সাম্রাজ্যের অধিপতি। তখনকার দিনে আমরা ভূগোল পড়তুম: ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না! কথাটা মিথ্যে নয়। সিঙ্গাপুরে সূর্য অস্ত গেলে ট্রিনিডাডে সূর্যোদয় ঘটত! কিন্তু ভূভাগের পরিমাণ হিসাবে সম্ভবত

রুশ সাম্রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল! ইংরেজদের সেই সাম্রাজ্য ভেঙে আজ তচনচ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সেদিনকার সেই বিরাট ও বিপুল রুশ সাম্রাজ্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে! শুধু অক্ষুণ্ণ নয়, বরং ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর হয়েছে! কিন্তু সেই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের আজ নতুন নাম হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন!

রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রাশিয়ার অংশটা বাদ দিলে একদিন এই দাঁড়াত—সমগ্র দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত, নিষ্ঠুর, লুটেরা, দাঙ্গাবাজ, পরস্বাপহারী, বন্য, দরিদ্র এবং হতভাগ্য। এদেরই মধ্যে রুশ সম্রাট পাঠিয়ে দিতেন ভাইসরয় এবং গভর্ণর, পাঠিয়ে দিতেন সেনাদল এবং সমর-নায়ক, পাঠিয়ে দিতেন রাজস্ব আদায়কারী দল। তাদেরই সঙ্গে আসত ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান, বেল-জিয়ান, ইতালিয়ান প্রভৃতি ব্যবসায়ীর দল। তারা এসে ওই অসভ্য ও হতভাগ্য মধ্যএশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যকে কুলি মজুর এবং মুন্সীতে পরিণত করে আপন আপন ব্যবসায় ফলাও করে নিত। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছরে সে-চাকাটা ঘুরে গেছে। হোক না কেন সোভিয়েট 'সাম্রাজ্য', হোক না কেন কঠোর সমাজ-ব্যবস্থা, হোক না কেন উদ্যত শাসন-দণ্ডের ভয়াল বিভীষিকা,—মানুষের সেখানে নিরাপদ অন্ন জুটছে, নিশ্চিন্ত আশ্রয় জুটছে, শিক্ষা সমৃদ্ধি বিলাস বৈভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—এদের অফুরন্ত উপকরণ জুটছে। এটি দেখে খুশী হয়ে এলুম, একটি অতি দরিদ্র মুসলমান চাষীর ছেলে মহম্মদ ইস্কান্দার আজ ওই নিত্য-সমৃদ্ধিশালী আজারবাইজানের প্রধান-মন্ত্রী! একথা বিশ্বাস ক'রে এলুম, যদি কেউ কমিউনিজমের বিপক্ষে কথা না বলে, বিরোধী দল না পাকায়, ভিন্ন অভিমত পোষণ না করে, ভিন্নতর সমাজ-ব্যবস্থার কথা নিয়ে মাথা না ঘামায় এবং সকল প্রকার উন্নতিশীল কর্মের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, তবে তার ঐহিক এবং আধিভৌতিক দুর্ভাবনা আর কিছু থাকে না!

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ আজও সর্বাপেক্ষা সংযত এবং সৌজন্যশীল। শত উত্তেজনার মাঝখানেও সে আপন সংযম হারায় না। সুয়েজ খালের ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ একদিন সে হঠকারিতা করে-ছিল, তার ফলে ইডেনের প্রধানমন্ত্রীত্ব ঘুচে যায়। ইংরেজ তার আপন অপরাধকেও অনেক সময় ক্ষমা করে না। একালের ইংরেজ যেমন অনেকটা 'চরিত্রবান' হয়েছে, চার্চিল-বলডুইন আমলের ইংরেজ তেমন ছিল না। সমগ্র ইংরেজ সাম্রাজ্য নিয়ে তারা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে বার বার। একদা আমেরিকা হাতছাড়া হয়ে গিয়েও তাদের চোখ ফোটেনি। পরবর্তীকালে তারা আয়ার্ল্যাণ্ডে, প্যালেস্টাইন, এডেনে, মিসরে, ইমেনে, সিংহলে, বর্মায়, মালয়ে, জর্জটাউনে, এমন কি তিব্বতে এবং চীনেও,—কোনও ব্যাপারটায় তারা পরিষ্কার হতে পারেনি। উপমহাদেশ ভারতবর্ষকে তিন ভাগে ত্রিফলা ক'রে যে দুটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের জটিলতা তারা সৃষ্টি করে গেল, দুই পুরুষে সেই কলঙ্ক মোচন হলে বাঁচি! রাশিয়ার জারের 'মতিচ্ছন্নক্রমে' সোভিয়েট 'সাম্রাজ্যে' যখন দুধ আর মধু গড়াতে লাগল, চার্চিল দলের 'ভিমরতিক্রমে' ইংরেজ সাম্রাজ্য তখন ছারখার হয়ে এল! 'ভদ্রলোক' ইংরেজ যে-দেশ থেকেই পাততাড়ি গুটিয়েছে, সেই দেশই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে! ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্কালে পৃথিবীসুদ্ধ সবাই যখন জানল, ইংরেজ তার র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে ভারতকে 'দ্বিখণ্ডিত' করে পালাচ্ছে, তখন আমাদের দেশবাসী কেবল জানল, ওটা 'ত্রিখণ্ডিত'!

কিন্তু থাক্, আজ সবাই বলে ইংরেজ ভদ্রলোক!

আমাদের ছোটবেলায় কলকাতা শহরে আর্মানী মেয়েপুরুষকে দেখতুম। তখনকার দিনে আরব, ইহুদি, আর্মানী, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, তুর্কি, ইরানী, আফগানি, চীনা,—এরা ছড়িয়ে থাকত কলকাতায়। এদের পাওয়া যেত অধিকাংশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পাড়ায় পাড়ায়। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ইংরেজ আমলে পুষ্ট ছিল এবং রং একটু ফর্সা হলে ইংরেজ বলে চলে যেত! অনেকে বিশ্বাস করত তাদের পৈতৃক বাড়ি বিলাতে, এবং পরবর্তীকালে অনেকেরই ভুল ভাঙতো! ইংরেজ চলে যাবার সময় ওদেরকে বলে গেছে, তোমরা ভারতীয়—বিলেতে তোমাদের জায়গা নেই! ভারতের স্বাধীনতালাভের পর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা পথে বসেছিল! এখন পথ থেকে ঘরে উঠেছে!
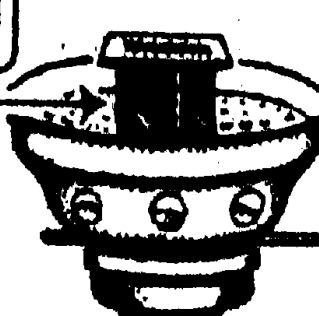
দু'হাজার বছর আগে ইহুদিরাও পথে বসেছিল। পৃথিবীময় তারা ঘুরেছে যাযাবরের মতো, কেননা নিজেদের দেশ তাদের ছিলনা। আজ 'ইসরায়েল' দেশটি সৃষ্টি হয়েছে শুধু তাদের জন্য। খৃষ্টকে হত্যা ক'রে তারা দু'হাজার বছর ধরে প্রায়শ্চিত্ত করল!

আর্মানীদের আপন দেশ রয়েছে আর্মেনিয়া, কিন্তু সেখানে তাদের অন্ন জুটতনা। আর্মানীদের বড় একটা অংশ শুধু অন্নসংস্থানের জন্য দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, তুরস্ক, এবং ভারতে এতকাল ছড়িয়ে ছিল। আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষুদ্রতম রিপাবলিক হল আর্মেনিয়া। বিস্ময়ের কথা এই, এশিয়া ও আফ্রিকা সব দেশ ছেড়ে আজ আর্মানীরা চলে যাচ্ছে আপন দেশে, কেননা তাদের আপন দেশে অন্নের

সংস্থান হয়েছে। কলকাতায় এখনও আছে আর্মেনীটোলা স্ট্রীট, কিন্তু সেখানে এখন আর্মেনীদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় কম। সুপ্রীম সোভিয়েটের একজন অতি প্রভাবশালী মন্ত্রী হলেন মিঃ মিকোয়ান, তিনি আর্মেনিয়। আমার সংগে যিনি প্রায় চার সপ্তাহকাল দোভাষিণী স্বরূপ ছিলেন তিনিও আর্মেনিয়ান মেয়ে। মধ্য-এশিয়ায়, ট্রান্স-ককেশাসে এবং এখানে ওখানে আর্মানিদেরকে চিনতে পারা যায় সহজে। সোভিয়েট ইউনিয়নে দাঁড়িয়ে একটু গলা নামিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, চারিদিকের বোঁচা ও ভোঁতাদের মাঝখানে একজন আর্মেনিয় পুরুষ অথবা মেয়ে এসে দাঁড়ালে চোখ দুটো স্বস্তিলাভ করে। ঘন কালো চোখ, কালো চোখের পাতা, উড্ডীন ঈগলের মতো আঁকা দীর্ঘ ভুরু, সুন্দর মুখের কাটুনি, দেহের অপরূপ লীলায়িত ভংগী, ঘন কৃষ্ণকেশ-দামের ঊর্মিমালা, আর্মেনিয়া ভিন্ন আর কোথায় পাব?

প্রাচীন আর্মেনিয়ার অধিবাসীকে প্রাচীনতম আসিরিয়ান বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে 'অসুর' শব্দটি বোধ করি আসিরিয় শব্দটির থেকে এসেছে! কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে বোধ করি দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পর্বতের প্রাচীরে ঘেরা। একটি আর্মেনিয়া এবং অন্যটি নেপাল। কিন্তু নেপালের কপাল ভাল। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে উত্তুংগ হিমালয়ের দ্বারা বেষ্টিত হলেও প্রত্যেকটি মৌশুমী বায়ুর সম্পদ্ সে লাভ করে। সেইজন্য নেপাল সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। কিন্তু আর্মেনিয়ার কপাল মন্দ। হাজার হাজার বর্গ-মাইলব্যাপী পাথর-জোড়া প্রান্তর, বাজ্‌ পাথরের চিরক্ষুধার্ত অসমতল উপ-ত্যকা, দিক্‌দিগন্তভরা কাঁটাঝোপ আর বন-স্যাওড়া। বৃষ্টি কোথাও পড়েনা সহজে। ঠাণ্ডা দেশ, কঠিন রুক্ষ বাতাস, চারিদিকে পর্বতপ্রাচীর, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় কিছু কিছু বনজংগল। নিচের দিকে এখানে ওখানে সামান্য সবুজের ছোপ, যেমন শাদা কাপড়ে কালির দাগ,—সেইখানে কিছু গম, কিছুবা যব। ফলের বাগান বানানো যায় যদি কোথাও খাল কেটে জল আনতে পার! পশ্চিমে তুরস্ক এবং ইরাণের সীমানা,—'আরক' নামক নদীটি সেই সীমানা নির্দেশ করছে। এই আরক নদীর পূর্বপারের একটি অঞ্চল হল নাবাল জমি,—অনেকটা নিচু। দেশের পক্ষে এ অঞ্চলটি একটি গহ্বর-স্বরূপ, সেইজন্য এটিকে বলা হয় "এরিভানে হলো।" এই গহ্বরের চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর। এখানে নরম মাটির উৎপত্তি ঘটেছে ভূগর্ভের আগ্নেয় অবস্থা থেকে। কিন্তু এখানেও নালীপথের জল ছাড়া চাষবাস হয়না।

আর্মেনিয়রা জনসংখ্যায় বোধকরি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির অন্য একটি। সম্ভবতঃ ষোল থেকে সতেরো লক্ষ। তবু এদের নিয়েই আজ নতুন আর্মেনিয়া তার ধূলোবালি, দারিদ্র্যদশা এবং চিরকালীন দুর্ভাগ্যকে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভেড়ার পাল চরানো যাদের কাজ, পশম বোনা যাদের পেশা, বিদেশ-বিভূঁয়ের মুখ চেয়ে যারা দিন গুণ্‌ত, তারা আজ মনের মতন ঘর খুঁজে পেয়েছে। মাটির তলাকার তামা, এলুমিনিয়ম, বিশেষ ধরণের পাথর, তুলো আর পশম, জন্তুর চামড়া আর পনীর,—এদের বড় বড় কারবার আজ ফলাও হয়ে উঠেছে। রান্নাবান্নার জন্য আর্মেনিয়ার প্রচুর খ্যাতি সোভিয়েট ইউনিয়নে। হোটেলে-হোটেলে দুটি 'সুপ' প্রসিদ্ধ। আর্মেনিয়ান এবং জর্জিয়ান। মাঝারি একটি আর্মেনিয়ান হোটেলে খেতে বসে 'বৌবাজারের পাইস-হোটেলের' মতো ভাতসহ কয়েকটি আমিষ রান্না পেয়েছিলুম। মাছ-ভাত পেলে আর্মানি মেয়ে বড় খুশী।

'সেভান' নামক বিরাট একটি পর্বত-স্থিত প্রাকৃতিক হ্রদ আর্মেনিয়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-যেন 'পাথরের তৈরি এক পেয়ালা জল।' আটাশটি ছোট বড় স্রোতস্বিনী চারিদিকের পর্বতপ্রাচীর থেকে সেভান্‌ হ্রদের মধ্যে এসে পড়ছে, কিন্তু একটি মাত্র নদী নেমে এসেছে সেভান্‌ থেকে। সেটির নাম 'রাজদান'। রাজদান গিয়ে মিলেছে আরক নদীতে।

বিস্ময়ের কথা এই, 'সেভান্‌'-এর বিপুল জলরাশি দেশজোড়া শুষ্ক বাতাসের দরুণ বাষ্প হয়ে উবে যায়! গতি তবু এতই দ্রুত যে, রাজদান দিয়ে নামবার মতো জল আর 'সেভানে' থাকেনা! ভাগ্যের এত বড় বিদ্রূপ এবং প্রকৃতির এতখানি নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া ভার। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের জয়যাত্রারকালে এই প্রাকৃতিক সমস্যার প্রতিকার হতে চলেছে।

মধ্যযুগীয় শ্মশান-শয্যা ছেড়ে রাজধানী 'এরিভান,' 'আলাভার্দ', লেনিনাকান, কিরভাকান প্রভৃতি নগর আজ এক একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যে-এরিভানের ধূলিধূসর পাথুরে পথে চিরকাল ধরে পশুপাল ঘাস খুঁজে বেড়াত, কেরোসিনের কুপি জ্বলত পাথুরে মাটির বস্তি-পল্লীতে,—কাঁচের চিমনিও যেখানে সহজে পাওয়া যেতনা,—সেই এরিভান এখন হর্ম্যরাজিতে ভরা। তার বিশাল রাজপথের পুষ্পোদ্যানের পাশ দিয়ে এখন মোটরকার ও ট্রাম চলে অবিশ্রান্ত।

মুমূর্ষু সমাজকে নবাবিষ্কৃত 'মৃত-সঞ্জীবনী গিলিয়ে' যারা তাকে দাঁড় করিয়েছে তাদের বাহাদুরি আছে বৈকি।

বিলিসির বিমানঘাঁটির হোটেলে একদল আজারবাইজানি মদের আসরে বসে কলরব করছিল। তখন অপরাহ্ন-কাল। তারা আমাদের কয়েকজন ভারতীয়কে দেখে উচ্ছ্বাসে অধীর এবং উল্লাসে উত্তরোল হয়ে উঠেছিল। অনেকের মুখে চোখে ঈষৎ মংগোলীয় ছাঁদ। অনেকে অত্যন্ত সুশ্রী, দেখলে দুর্ভাবনা হয়। কেউ কালো, কেউ হলদেটে কারো বা কেরোসিনের মতো বর্ণ। কণ্ঠস্বরে একপ্রকার দুর্ধর্ষতা এবং প্রকৃতিগত বন্যতা,—এ দুটি বস্তু যেন মদের প্রভাবে হাস্যোচ্ছ্বাসের সংগে বেরিয়ে আসছে। দোভাষীর পরোয়া তারা করলনা, এবং অনর্গলভাবে ভারতবর্ষকে ভালবাসার ফোয়ারায় ভাসিয়ে দিল! একটু বেশি সরল, যেন একটু পালিশের অভাব, একটু অস্থির, একটু বেশি আবেগপ্রবণ। অল্পকালের মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাটা আমাদের সংগে ঘটল, সেটা সামান্য নয়। মাদকবস্তুর প্রভাবটুকু বাদ দিলে এইটি দাঁড়ায়, দার্জিলিংয়ের এক আধময়লা হোটেলের মধ্যে একদল ভুটিয়ার সংগে কলকাতার বাংগালী আত্মীয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে! ওদের নিস্পর মনে হয়নি!

সেদিন সন্ধ্যাকালের মলিন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে জেট বিমানটি আবার উড়ে গিয়েছিল ককেসাস পর্বতমালা এবং কাস্পিয়ান সাগর পার হয়ে মধ্যএশিয়ার দিকে। দূর আকাশের রহস্য-চন্দ্রাভার ভিতর দিয়ে নিচের দিকে কিছু ঠাহর করার জো ছিলনা। শুধু জানলুম কাজাকস্তান পেরিয়ে তুর্কমেন ছাড়িয়ে আরল সাগর বাঁদিকে ফেলে উজবেকিস্তানের আকাশপথে আমরা আবার ভেসে আসছিলুম। ক্লান্ত তন্দ্রা ছিল দুই চক্ষে।

প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে তাসকন্দে নামলুম। রাত তখন প্রায় সওয়া আটটা।

একদল অচেনা লোক এসেছিল আমাদের নিয়ে যেতে। ওদের মধ্যে সোয়েৎলানার স্বামী ভাদিন্ হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এল। এই সুদর্শন যুবকটি ইতিমধ্যেই আমার 'জামাই' হয়ে উঠেছিল! দুঃখের বিষয়, দোভাষী ছাড়া এমন জামাইকে সম্ভাষণ করাও যায়না! মিঃ মুশচভ সম্প্রতি শুধু ওদেরকে শিখিয়েছেন, কেমন ক'রে ভারতীয় ভঙ্গীতে হাতযোড় ক'রে 'নমস্তে' বলতে হয়! দলের মধ্যে এক আধজন রসিক ব্যক্তি সহাস্যে আমাদেরকে 'নমস্তে' জানাল।

তাসকন্দ হোটেলের সেই জৌলুস চলে গেছে। নগরের সেই আলোকচ্ছটা ম্লান হয়ে এসেছে। নাভয় অপেরা হাউসের সেই উৎসবের সাজ খসে পড়েছে। সকল কৌতূহল মিটে যাবার পর সেদিনকার সেই বিপুল জনতা আবার অসীম বৈরাগ্যের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। হোটেলের ভিতরে আর বিশেষ কারোকে পাওয়া যাচ্ছেনা। পলেভয়, চেলিশেভ, রসিদভ, রুস্তম ইসমাইলভ, লুকোনিৎস্কি, বরোদিন—এ'রা কেউ নেই। এদিকে লানা, বিকোভা, নাটাশা, অকসানা, কালেরিয়া, নিকা, শারদোরা, নেলী, ভেরা—তারা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! ওরা সবাই অমনি ক'রে আত্মীয়ের মতো কাছে আসে, ক'দিনের ব্যবহারে মনে হয় ওদের মতো আপন আর বুঝি কেউ নেই! আপন আপন মধুর আচরণের দ্বারা মনে মনে রেখে যায় "মিষ্ট হাসি টুকরো কথার নানান্ জোড়াতাড়া।"— তারপর একসময় চলে যায় জলস্রোতের মতো! ওরা যাবার সময় নিঃশব্দ হাসির সৌজন্যে জানিয়ে যায়, ওরা দোভাষিনী,—ওদের চলমান জল-প্রবাহের উপর কোনও দাগ পড়ে না! ওরা চিরকালীন মেয়ে নয়,—হয়ত বা শুধু দোভাষিনীও নয়, ওরা বহুভাষিনী!

ওরই মধ্যে একদিন শ্রীধরণীর কাছে শুনলাম, নেলী তার মাসিকে সঙ্গে করে এর ভিতরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার নাকি কিছু 'কথা ও কাজ' ছিল, সেটি শ্রীধরণীকে বলতে চায়নি। সম্ভবত আমি দুবছর পরে কায়রো গেলে আমার মারফৎ সে তার মিসরীয় প্রণয়ীর কাছে সংবাদ পাঠাতে চেয়েছিল। আর নয়ত তাসকন্দ থেকে কায়রো যাবার যুক্তি পরামর্শ! নির্বোধ মেয়েটা আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ জানেনা।

এবার 'ফ্লোর আপিসে' যে 'মেড' এসে বসেছে সে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক। রং বেশ ফর্সা, ঘন কালো কোঁকড়ান চুল, কালো চোখ এবং কর্মযোগিনী। তরুণ কনগ্রেসী সত্যানন্দ উক্ত স্ত্রীলোকটির গাম্ভীর্য নিয়ে তামাসা করে। কিন্তু তামাসার মিনি পাত্রী তিনি যথারীতি আমাদের কারও ভাষা বোঝেন না। শুধু ঘরের চাবি রাখেন এবং ফিরে এলে হাতে তুলে দেন।"

আমরা মস্কো যাব কেমন ক'রে তাই সবাই মিলে ভাবছিলুম। শ্রীধরণীকে বাদ দিয়ে আমরা এখন মোট ষোল জন। শ্রীমান সুভাষ, সত্যানন্দ, দুর্গা, ভাগবৎ, প্রদ্যোৎ কাউর, লক্ষ্মীকুমারী, আত্রে, চৌহান, শেথোন, বেদী, যশপাল, হরচরণ সিং, গোবিন্দ সিং, প্রীতম সিং, প্রাগজি দোসা, পট্টনায়ক, দামোদরণ। আমাদের দায়িত্ব কে নেবে, বোঝা কে বইবে, অথবা আমরা স্বোপার্জিত রুবল খরচ ক'রে মস্কোয় গিয়ে কোনও বন্ধুর ওখানে উঠব কিনা, আমরা অনাদৃত এবং উপেক্ষিত বোধ করছি কিনা, আমরা এই কমিউনিস্ট 'শ্বশুরবাড়ীর' অবাঞ্ছিত 'ঘর-জামাই' কিনা—ইত্যাদি আলাপ-আলোচনা নিয়ে যখন ব্যাপৃত, সেই সময়ে দুটি ছোট ঘটনা ঘটল। মস্কোবাসী আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীমান কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তারযোগে সুভাষের নামে এক হাজার রুবল পাঠালেন—যাতে সুভাষ মস্কো যেতে পারে। অপর একটি ঘটনা হল, কেরালাবাসী কমিউনিষ্ট কর্মী এবং অধ্যাপক দামোদরন হঠাৎ একটি সরকারী আমন্ত্রণ পেলেন মস্কো যাবার জন্য! এটায় আমি একটু চমকে উঠেছিলুম। তবে কি সত্যিই 'এক-পালকের-পাখি' ছাড়া এদেশে অপর কারও খাতির নেই? কিন্তু আমাদের সুভাষ ত একজন 'দাগী' কমিউনিষ্ট,—তার প্রতি এই উপেক্ষা কেন?

আমরা তোমাদের দলের নই বটে, কিন্তু তোমার বাড়িতে যখন এসেছি, তুমি যদি অবহেলা করো,—সইব বটে, তবে এটি তোমার পক্ষেই অসম্মান! তুমিই আমাদের কঠিন পরীক্ষায় হেরে গেলে!—এই প্রকার একটা মনোভাব নিয়ে যখন আমরা কয়েকজন 'সোভিয়েট-সুহৃদ্' তোলাপাড়া করছি, তখন আমাদের নাকের উপর টেক্কা দিয়ে দামোদরন একদিন মস্কো উড়ে গেলেন! আমাদের প্রতি তাঁর একটা করুণা এবং উপেক্ষা ছিল, কারণ তিনি তদানীন্তন কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টভুক্ত কেরালার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু দ্রুতগতিতে যাবার আগে কারো সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করলেন বা বিদায় চেয়ে সৌজন্য-প্রকাশও করে গেলেন না, এটি আমাদের নিকট বিস্ময় হয়ে রইল। সুভাষের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিলেন দামোদরন,—কিন্তু 'বন্ধু'র কাছেই বা কিরূপ আচরণ কেন রেখে গেলেন, সেটি আর আমি সুভাষকে জিজ্ঞাসা করিনি!

সোভিয়েট ইউনিয়নে একথাটি চালু আছে, ভদ্রলোক মানে ঠিক কমিউনিষ্ট নয়, কিন্তু কমিউনিষ্ট মানেই ভদ্রলোক! আমি এই কথার কৌশল বুঝতে পারিনি। আমাদের দেশের কয়েকজন বামপন্থী এবং কমিউনিষ্টের সঙ্গে বাইশ বছর আগে আমার কিছু আলাপ হয়েছিল। তাঁরা হলেন ইউসুফ মেহেরালি, এম আর মাসানি, সাজ্জাদ জহীর, নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরও প্রায় বছর দশেক আগে কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মুজাফ্ফর আহমেদের—যিনি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী,—এবং যিনি "লাঙ্গল", 'গণবাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের তদানীন্তন সম্পাদক। এ'রা আজ কে-কে আপন মত এবং পথ বদলেছেন আমার জানা নেই! কিন্তু একথা জানি, এ'রা কেউ প্রথমকালের সোভিয়েট নেতাগণের মতো বিশেষ নিচের তলা থেকে ওঠেননি। এ'রা কেউ মুচি, ধোপা, জোলা, চাষী, নাপিত, ছুতোর, কামার, মিস্ত্রি প্রভৃতি পরিবারের সন্তান নন্। এ'রা প্রায় সকলেই ধনবান এবং অভিজাত পরিবারের থেকে এসেছেন। এ'দের শিক্ষা সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি—অতি উন্নত। দারিদ্র্যের প্রকৃত দুঃখদশা, জীবনের বিবিধ প্রকার উঞ্ছবৃত্তি, অন্নের এক একটি দানা খুঁটে খাবার অভ্যাস, মনিবের কাছ থেকে মজদুরির ধিক্কার, পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিত্য অপমান-সহিষ্ণুতা,—এসবের সঙ্গে এ'দের প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভবত ঘটেনি। এ'রা অনেকে অনেকবার কারাবরণ করেছেন সত্য, কিন্তু সেই কারাগার সাইবেরিয়ার অথবা কাজাখস্তানের 'লেবার-ক্যাম্প' নয়,—ইংরেজ আমল হলেও সে-কারাগার বা 'অন্তরীন' বহু সুবিধাযুক্ত ছিল। আমি নিজে বক্সা দুর্গ, মিয়ানওয়ালী, লাহোর, আলমোড়া ইত্যাদি কারাগারে ঘুরে-ঘুরে দেখেছি। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছিল, কারণ সেখানে জীবনের সর্বাঙ্গীণ যন্ত্রণা ছিল একান্তই সত্য। সেখানে 'রুটি' চাইতে গিয়ে যারা 'গুলী' খেয়েছিল, তারা সত্যিই রুটি চেয়েছিল! তারা শহরের প্রান্তে ব'সে পেট ভ'রে খিচুড়ি খেয়ে পান চিবোতে-চিবোতে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'-ধ্বনি তুলে সুবিধা আদায় করতে ছোটেনি। বহুকাল আগে একদা কঠিন শীতের মধ্যরাত্রে লেনিন যখন তুষারসমাকীর্ণ ফিনল্যান্ড উপসাগরের উপর দিয়ে অভুক্ত অবস্থায় পায়ে হেঁটে তুষারস্তূপ ঠেলতে ঠেলতে ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছন, সেই অঞ্চলটিতে আমি একদিন দাঁড়িয়ে এই কথাই ভেবে ছিলুম, জারের আমলে কমিউনিজম প্রচার করা এক জিনিস, আর ভারত গভর্ণমেণ্টের নিরাপদ ব্যবস্থার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে

'মৌলিক অধিকারস্বরূপে কমিউনিস্ট আন্দোলন অন্য বস্তু! ওদের দেশে যেটি নিত্যকার প্রাণধর্ম, আমাদের দেশে সেটি বিরোধের জন্যই বিরোধিতা'!

পৃথিবীর প্রায় সব গণতন্ত্রে যেমন প্রকাশ্যে বিরোধীদল আছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পার্টির মধ্যে তেমনি 'অপ্রকাশ্য' বিরোধীরা আছে। কিন্তু ওদের পার্টি এক, কেননা দেশের কর্মনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতি এক ও অভিন্ন। ওর মধ্যে বিবাদ-বিতর্ক আছে, আত্মমতের প্রাধান্য লাভের জন্য ভিতরে-ভিতরে দ্বন্দ্ব আছে, এবং মানবীয় আক্রোশ বিদ্বেষ হিংসা,—সমস্তই বর্তমান। কিন্তু এ সমস্তই 'পার্টি'র ঘরোয়া কাহিনী। বাইরে তার প্রকাশ নেই, সংবাদপত্রে সেসব ছাপা হয় না,—কঠিন গোপনতার বর্মে সেগুলি ঢাকা। হঠাৎ কখনো-কখনো পার্টির দেহে একেকটি বিষফোড়া দেখা দেয়, সেই ফোড়া গ'লে গিয়ে পুঁজ পড়ে, লাল হয় সেই ফোড়ার চারদিক, ব্যথায় টনটন করে সর্বশরীর, জ্বরভাব ও অবসাদে আচ্ছন্ন করে! তখন বুঝতে পারা যায় পার্টির দেহে বদরক্ত জমেছে, বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে! নৈলে অন্য দিকটা সহজ। কর্মনীতি নির্দিষ্ট হল ভোটের সংখ্যাধিক্যে, পার্টি-কংগ্রেসে তার উপর সর্বাঙ্গীন সম্মতি পাওয়া গেল এবং গভর্ণমেণ্ট সেটি নির্দিষ্টকালের মধ্যে পালন করার দায়িত্ব নিলেন। এক আদর্শে, অভিন্ন নীতিতে, একাগ্র চিন্তায়, আন্তরিক অধ্যবসায়ে সেই প্রতিশ্রুতি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমগ্র ইউনিয়নের কোটি কোটি 'রবোচি'-কে অর্থাৎ কর্মীকে ডাক দেওয়া হল! এই ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে গোপন বিরোধিতার নামই হচ্ছে, "dirty politics" বা নোংরা রাজনীতি! সেটি দেশদ্রোহিতা! সেই অপরাধের ক্ষমা নেই সোভিয়েট ইউনিয়নে!

শ্রীধরণীর কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। তিনি সাংবাদিক, সংবাদ-সমালোচক এবং রাজনীতিক পর্যবেক্ষক। আমেরিকায় তাঁর বই ছাপা হয়েছে, এবং তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, সেজন্য তাঁকে কথায়-কথায় ইউরোপ-আমেরিকা আসতে-যেতে হয়। কমিউনিস্ট জগতের হাঁচি-কাসির সঙ্গে তিনি নাকি পরিচিত। তিনি এ যাত্রায় পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপ ঘুরে মস্কো এবং তাসকন্দ হয়ে দিল্লী ফিরছিলেন। নূতন দিল্লীতে তাঁকে এমন একটি সুন্দর বাংলো দেওয়া হয়েছে যেটি আই-সি-এস অফিসারের ভাগ্যেও সচরাচর সুলভ নয়। তিনি খর্বকায়, সৌম্যদর্শন, কূটনীতিক, পরিহাসরসিক, এবং আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। পারিবারিক জীবনে তিনি পত্নীগতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু অতিশয় ক্ষতিজনক মনে হয়েছিল। তাসকন্দ লেখক সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন কিনা এটি এখনও আমাকে ভেবে বা'র করতে হয়। তাঁদের অনেকের ধারণা, শ্রীধরণীর কতকটা প্রভাব ছিল তারাশংকরের উপর!

তাসকন্দের শেষ দিনগুলিতে শ্রীধরণী মামুদভের সঙ্গে হাসি-পরিহাস নিয়ে অতিবাহিত করছিলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে একটু দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম। আহারাদির সম্বন্ধে তিনি যেন একটু অসতর্ক হচ্ছিলেন। আমার কাছে তিরস্কৃত হয়ে তিনি শুধু তামাশাই করতেন। কিন্তু তিনি তখন বিদায় নিলেই আমি বাঁচি!

কর্তৃপক্ষের শেষ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ভগ্নী দুর্গা ভাগবৎ প্রমুখ অনেকে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। সকলেই দিল্লী ফিরে যাবার তোড়জোড় করছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনার সমস্ত কলকাঠি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে। এ আর তোমার ভারতবর্ষ নয় যে, টেলিফোন ক'রে দিলেই 'এয়ার ইণ্ডিয়ার' বিমানে সীট রেডি। এখানে অদৃশ্যের সংকেতে চাকা ঘোরে, পাখা ওড়ে! গতকাল তুমি হয়ত বিপুল অভ্যর্থনা এবং বন্ধুজনের 'আন্তরিক' ভালবাসা পেয়ে বিপর্যস্ত বোধ করেছিলে,—আজ প্রভাতে উঠে তোমার সঙ্গে মতের অমিল ঘটুক,—চারিদিকের অসীম বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্য যেন তোমার সর্বশরীর ঠাণ্ডা ক'রে দেবে! কতক্ষণে তুমি এদেশ ত্যাগ ক'রে পালাবে, এইটি তোমাকে ভাবতে হবে সারাক্ষণ! আমাদেরকে এবার দিল্লীর প্লেনে চড়িয়ে দিলে সবচেয়ে বেশি খুশী হই। আমরা এখন যেন এক-একটি আধ-মরা কৈ-মাছ! অল্প জলের মধ্যে আমাদেরকে জীইয়ে রাখা হয়েছে! মাঝে মাঝে কেউ-কেউ আমার মতন ছট্‌কিয়ে এখানে ওখানে বেরিয়ে 'কানে' হাঁটছে এদিক-ওদিক,—এবং কেউ একজন গিয়ে কৈ-এর কাঁটা বাঁচিয়ে মাথাটা টিপে ধ'রে আবার এনে এই হোটেলের হাঁড়িতে ফেলে সরা চাপা দিচ্ছে! বস্তুত, আমাদের আত্মসম্মান বিপন্ন হচ্ছিল!

কমিউনিস্ট সুভাষ দেখেশুনে একেবারে চুপ। বুঝতে পারা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা আপাতত কেরালার খাতির কিছু যেন বেশি!

আমি নিজে কোনও এক সময় বোধ হয় কারও কাছে এমনি একটা পরিহাস ক'রে থাকব যে, মস্কো না যাওয়াটা যেন 'হ্যামলেট্' নাটকটি দেখতে এসে 'ডেনমার্কে'র রাজকুমারকে' না দেখে চলে যাওয়া!

সেদিন সকালে খবর এল, সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মিঃ সিমানভ আজ বেলা ঠিক দুটোর সময় আমাদের নিকট একটি ঘোষণাবাণী শোনাবেন! আমাদের কলকাতায় "সত্যনারায়ণ" পূজা ও ব্রতকথার পর পুরোহিত মহাশয় তামার কুশি হাতে নিয়ে 'শান্তিজল' ছিটোতে-ছিটোতে যখন বিজবিজ ক'রে মন্ত্রপাঠ করেন, আমরা তখন পা ঢেকে ব'সে মাথা হে'ট ক'রে সেই জলের ছিটে গ্রহণ করি। পুরোহিত শেষের দিকে এসে বলেন, "ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি!!"

মিঃ সিমানভ যখন ঠিক দুটোর সময় এসে আমাদের সামনে হেড-মাস্টারের মতন বসলেন, তখন আমার পূর্বোক্ত পরিহাসটি কে যেন তাঁকে শুনিয়ে দিল। পক্ককেশ ও ছাঁটা গোঁফযুক্ত ভদ্রলোক বেশ লম্বা, কিন্তু তিনি কত বড় লেখক, আমার জানা ছিলনা! পরিহাসটি শুনে তিনি মৃদু হাস্য করলেন কিনা ঠাহর করতে পারলুম না। তবে এক সময় একটু নাটকীয়ভাবেই তিনি ঘোষণা করলেন, আজ সকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের লেখক-সংঘ আমাদের সকলকে মস্কো যাবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন! আমরা মস্কো গেলে তাঁরা বড়ই প্রীত হবেন!

আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ এই ঘোষণাবাণীকে অধীর উল্লাসের সঙ্গে সৌভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভারতীয় কৈ-মাছের কাঁটা মিঃ সিমানভের গলায় ফুটেছিল! তিনি ওটা 'তর্জনী' আঙ্গুল দিয়ে বার করতে না পেরে অবশেষে গলা ঝেড়ে গিলে ফেললেন! খবরটি দিয়েই তিনি লবী ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন!

(ক্রমশঃ)

মুদ্রণ প্রমাদ

গত ৩৭শ সংখ্যা 'অমৃতে'র ৯২৮ পৃঃ তৃতীয় কলমের ৯—১২ লাইনের পাঠ এই রকম হ'বে—"কোথাও তিনি আশ্রয় পাননি। সেখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এক গুপ্তঘাতক তাঁকে হত্যা করে। বহু লোকের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি স্ট্যালিনেরই লোক।"

বিজ্ঞানের কথা
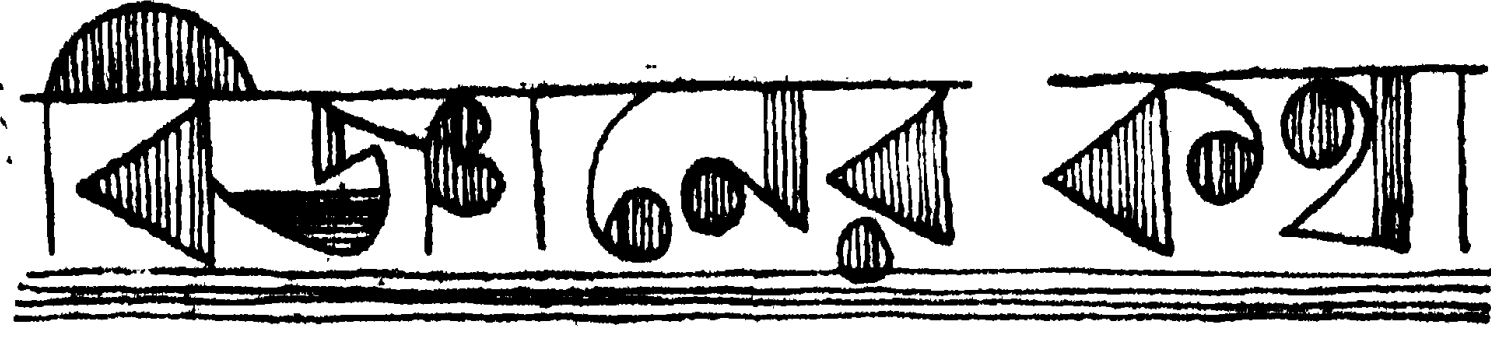
অয়স্কান্ত

॥ স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন ॥

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের গঠনতন্ত্র আনুষ্ঠানিক-ভাবে গৃহীত হয়েছে। বারোটি বছর বা পুরো একটি যুগ পার হয়েছে তার পরে। ভারতের ইতিহাসে এই যুগটি নানা দিক থেকে খুবই ঘটনাবহুল। অবশ্যই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হচ্ছে দু-দুটি পাঁচ-সালা পরিকল্পনা, যার ফলে কৃষিপ্রধান এই দেশটি দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর। মাত্র বারো বছরের মধ্যে ভারতের মতো বিপুল একটি দেশ যে বিপুল উন্নয়নমূলক আয়োজন করতে পেরেছে তা নিয়ে গর্ববোধ করা চলে। আমি এই উপলক্ষে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই।

॥ সরকারী নীতি ॥

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি যেমন একটি স্মরণীয় তারিখ, তেমনি ১৯৫৮ সালের ১৩ই মার্চ। এই তারিখে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাবে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ভারত সরকার সকল উপযুক্ত উপায়ে বিজ্ঞান-চর্চাকে উৎসাহ দেবেন এবং বিজ্ঞান-চর্চা যাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা করবেন। বলা বাহুল্য, এই কর্তব্য পালন এক ব্যাপক কর্মসূচীর রূপায়ণসাপেক্ষ। এজন্য একদিকে চাই উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চতম শিক্ষিত বিজ্ঞানী, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা। তাছাড়াও চাই এমন একটি পরিবেশ যাতে প্রতিভার বিকাশ হয় এবং বিকশিত প্রতিভা উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্র খুঁজে পায়। এবং সর্বশেষে চাই এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিজ্ঞানের ভূমিকাটি হবে কল্যাণকর। ভারত সর-কারের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত নীতিতে এই সমস্ত কথাই বলা হয়েছিল। তারপরে চার বছরও পার হয়নি। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কিত নীতি নিতান্তই একটা প্রস্তাবে পর্যবসিত হয়ে থাকেনি।

॥ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ॥

এই বিপুল দেশের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে কেন্দ্রীয় সংস্থাটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার নাম কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সংক্ষেপে সি-এস-আই-আর) বা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থার সভাপতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী উপ-সভাপতি। এই সংস্থার পরিচালনাধীনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সমিতি ও জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া পরিষদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্যও করে থাকে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুরো তালিকা তৈরি করাও পরিষদের অন্যতম কাজ। বলা বাহুল্য, পরিষদের অর্থসংস্থান প্রধানত সরকারী সাহায্যের ওপরে নির্ভরশীল। ১৯৬০-৬১ সালে পরিষদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত কোটি টাকা।

পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে পঁচিশটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। শুধু নামগুলো উল্লেখ করে গেলেই বোঝা যাবে যে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় এই গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত। যেমন, রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার জাতীয় গবেষণাগার (প্রথমটি পুণায়, দ্বিতীয়টি দিল্লীতে): নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণার জন্যে কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা—জ্বালানী (বিহারের জিয়লগোরায়), কাঁচ ও সেরামিক (যাদবপুরে), খাদ্য-বিজ্ঞান (মহীশূরে), রাস্তা (দিল্লীতে), বিদ্যুৎ-রসায়ন (মাদ্রাজে), চামড়া (মাদ্রাজে), গৃহ-নির্মাণ (রুরকিতে), ইলেকট্রনিক্স্ (রাজস্থানে), লবণ (ভবনগরে), খনি (ধানবাদে), মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং (দুর্গাপুরে), জনস্বাস্থ্য (নাগপুরে), ভেষজ গাছগাছড়া (দিল্লীতে), বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (দিল্লীতে) ইত্যাদি। আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে হাইদ্রাবাদে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবং জোড়হাটে। ধাতুবিজ্ঞান সম্পর্কিত জাতীয় গবেষণা-গার স্থাপিত হয়েছে জামশেদপুরে। তাছাড়া কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড এক্স্পেরিমেন্টাল মেডিসিন এবং বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেক্নো-লজিক্যাল মিউজিয়াম। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চর্চার আয়োজনটি যে কী বিপুল সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা এই ফিরিস্তি থেকে হতে পারে। পরিষদের পক্ষ থেকে 'জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় বিভিন্ন গবেষণার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে অর্থসাহায্য করা হয়ে থাকে। ১৯৬১ সালে ৯০টি গবেষণা কেন্দ্রের ৩৬৩টি গবেষণা এই সাহায্যের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে।

পরিষদের উদ্যোগে বর্তমানে জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে পরীক্ষা-মূলকভাবে যন্ত্রপাতিও তৈরি হচ্ছে। ১৯৫৭-৬০ সালে তৈরি হয়েছে ৪৬টি পরীক্ষামূলক যন্ত্র।

আর আছে বিজ্ঞান মন্দির, যার উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রচার। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে আছে পরীক্ষাগার ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগঠক। সারা দেশে আজ পর্যন্ত ৩৮টি বিজ্ঞান মন্দির স্থাপিত হয়েছে।

॥ নিউক্লিয়র গবেষণা ও পারমাণবিক তেজ ॥

বোম্বাইয়ের কাছে ট্রম্বেতে গড়ে উঠেছে বিপুল এক প্রতিষ্ঠান যার নাম পারমাণবিক তেজ প্রতিষ্ঠান (অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাব্লিশমেন্ট) উদ্দেশ্য, পার-মাণবিক তেজ সংক্রান্ত গবেষণা। দু' হাজারের বেশি বিজ্ঞানী ও কারিগর কাজ করছেন এই প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে ট্রেনিং স্কুল আছে সেখানে বছরে ১৫০ জন ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পনেরোটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মধারা পরিচালিত।

আমাদের দেশের প্রচুর পরিমাণ থোরিয়ামকে কাজে লাগাবার সবিশেষ চেষ্টা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যেই বোম্বাইয়ের কাছে তারা-পুরে ৩০০ মেগাওয়াটের একটি পার-

মাণবিক পাওয়ার স্টেশন নির্মিত হতে চলেছে।

আমাদের দেশের অন্যান্য যে সব সংস্থা নিউক্লিয়র গবেষণায় ব্যাপৃত আছে—যেমন, বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স, আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি—এই সব সংস্থার সংগেও প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

মহাজাগতিক রশ্মি ও এতদ্সংক্রান্ত নানা বিষয়ে গবেষণার সুবিধের জন্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কাশ্মীরের গুলমার্গে ৯০০০ ফুট উঁচুতে একটি পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে।

॥ অন্যান্য বিভাগীয় উদ্যোগ ॥

বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা অন্যান্য বিভাগীয় উদ্যোগেও হয়ে থাকে, যার কিছুটা উল্লেখ এখানে অপ্রাসংগিক হবে না।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ বোর্ডের পরিচালনাধীনে হাইড্রলিক রিসার্চ স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এগারোটি। এই এগারোটির মধ্যে পুণার কেন্দ্রীয় জল, বিদ্যুৎ ও সেচ গবেষণা কেন্দ্রটিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

অন্যান্য বিভাগীয় উদ্যোগের মধ্যে আছে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (কলকাতা), জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (কলকাতা), জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (কলকাতা), ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রপলজি (কলকাতা), ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (দেরাদুন), ইত্যাদি।

॥ অন্যান্য সংস্থা ॥

বিজ্ঞান-চর্চার যে বিস্তৃত কাঠামোটির উল্লেখ করা হল তার বাইরেও রয়েছে অন্যান্য অনেকগুলি সংস্থা। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এমন কয়েকটি সংস্থা : কলকাতার বোস ইনস্টিটিউট, লক্ষ্ণৌর বীরবল সাহানি ইনস্টিটিউট ফর প্যালিয়নটোলজি, কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স, আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ইত্যাদি।

বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের পক্ষ থেকেও গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। যেমন, টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, রবার রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, পেইন্ট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, ইত্যাদি।

॥ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা ॥

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যেও একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা রয়েছে, যার নাম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ। এই পরিষদ থেকে গবেষণার জন্যে বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় বিশেষ বিশেষ গবেষণার জন্যে সারা ভারতে অনেকগুলি সংস্থা আছে। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা চলে : সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কসৌলি; স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা; অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, কলকাতা; ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, দিল্লী; নিউট্রিশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কুন্নুর; পাস্তুর ইনস্টিটিউট, কসৌলি, শিলং ও কুন্নুর; সেন্ট্রাল লেপ্রোসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মাদ্রাজ; ইণ্ডিয়ান ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার, বোম্বাই; ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শ্রীনগর; সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ল্যাবরেটরি, কলকাতা; ইত্যাদি।

॥ কৃষি গবেষণা ॥

কৃষি গবেষণার কেন্দ্রীয় সংস্থা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ বা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ। এই পরিষদ সারা ভারতের প্রায় পঁচিশটি কৃষি গবেষণা সংস্থার কাজে সাহায্য করে, নির্দেশ দেয় ও যোগাযোগ বজায় রাখে। কলকাতার দুটি উল্লেখযোগ্য কৃষি গবেষণা সংস্থা হচ্ছে সেন্ট্রাল জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ও জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কটকে রয়েছে সেন্ট্রাল রাইস স্টেশন। দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এমনি অন্যান্য জায়গায়।

॥ কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ॥

বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের জন্যে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করা চলে : মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা ও এলাহাবাদের স্কুল অফ প্রিন্টিং, দিল্লী পলিটেকনিক ও ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস্ অ্যান্ড জিওলজি।

॥ কারিগরী শিক্ষা ॥

কারিগরী শিক্ষার আয়োজনও ভারতে গত কয়েক বছরে ব্যাপক রূপ নিয়েছে। কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯৫৪ সালে গড়ে তোলা হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যার নাম অল-ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন বা সারা-ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ। এই পরিষদ ভারত সরকারকে কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কারিগরী শিক্ষার জন্যে গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি স্থাপিত হয়েছে—খড়্গপুরে ১৯৫১ সালে, বোম্বাইতে ১৯৫৮ সালে, মাদ্রাজে ১৯৫৯ সালে এবং কানপুরে ১৯৬০ সালে। এই প্রসংগে দিল্লীর দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। একটি হচ্ছে দি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। অপরটি দি স্কুল অফ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং।

॥ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ॥

ভারত 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ সায়েন্টিফিক ইউনিয়নস'-এর সভ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে গঠিত বারোটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে ভারতের যোগাযোগ আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জিওডেসি অ্যান্ড জিওফিজিক্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ইত্যাদি।

॥ যাদুঘর ও সংগ্রহশালা ॥

সারা ভারতে যাদুঘর ও সংগ্রহশালা আছে মোট চুরাশিটি। তার মধ্যে কলকাতায় সাতটি—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, কমার্সিয়াল মিউজিয়ম, আশুতোষ মিউজিয়ম ও বিড়লা মিউজিয়ম। বিশেষ করে সব শেষে উল্লিখিত মিউজিয়মটি বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে খুবই শিক্ষাপ্রদ।

এই হচ্ছে খুব সংক্ষেপে, প্রায় একটা ফিরিস্তির আকারে, স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার বিবরণ। এই বিবরণ থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান-চর্চার আয়োজনটি বিপুল। যথোচিত ফললাভ হয়তো এখনো হয়নি। এখনো এদেশের বহু বিজ্ঞানী বিদেশে রয়েছেন; স্বদেশে ফিরে আসার কোনো সুযোগ তাঁদের নেই। এমন কি এখনো এদেশের বিজ্ঞানী উন্নতির রাস্তা না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞান-চর্চায় ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে হতাশ হবার কোনো কারণ ঘটেনি।

মসিরেখা

জরাসন্ধ
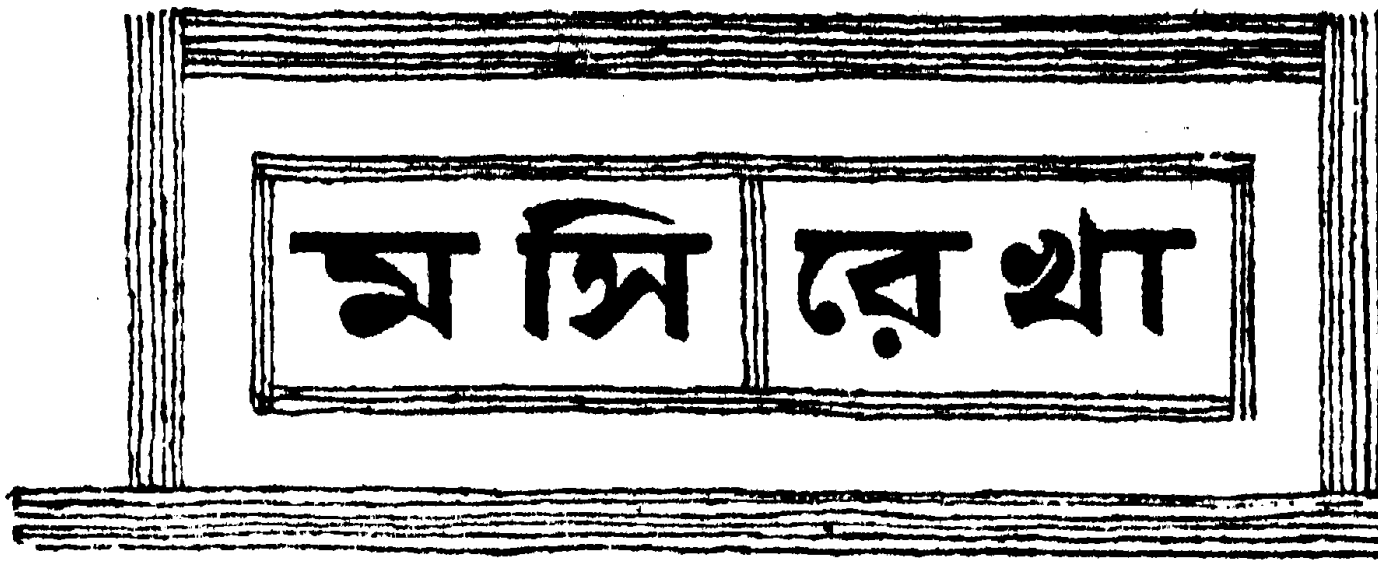
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছেলেটাকে বিদায় করে বাইন্ডিং মাষ্টারের দিকে ফিরে সাহেব ছদ্ম গম্ভীর সুরে বললেন, 'ওকে ঘাঁটিয়ে ভাল করনি, ভোলানাথ। চেপে যাওয়াই উচিত ছিল।

—আজ্ঞে, স্যর—

—যাক্; একটা মিথ্যাকে ঢাকতে হলে অনেক মিথ্যা বলতে হয়। সেই পুরনো কথা। এ কাজ ও আজ নতুন করছে না, আগেও করেছে। তোমার ছেলেরা যে-সব ঘুড়ি ওড়ায় তার কোনো-টাই বাজারে পাওয়া যায় না। গেলেও তুমি কিনে দিতে পার না, তা আমি জানি। নেক্সট্?

শেষ নির্দেশটির লক্ষ্যস্থল ডেপুটি সুপার। তিনি তৎক্ষণাৎ তিন নম্বর কেস্ পেশ করলেন। এবারকার আসামীর নাম কেশব মালাকার, ইন-ডাস্ট্রিয়াল বয়। কালো, নাদুসনুদুস, ভাঁটার মত গোলগাল। তিন বছর আছে এখানে। যখন এসেছিল, ঠিক একটুকরো পাঁকাটি। তারপর থেকে দৈর্ঘে আধ ইঞ্চিও বাড়েনি, তার দশগুণ পুষিয়ে নিচ্ছে প্রস্থের দিকে। ঠিক হেঁটে নয়, অনেকটা গড়িয়ে গড়িয়ে সাহেবের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একগাল হাসি।

—ও আবার কী করল! বিস্ময় প্রকাশ করল সুপার।

—'আজ্ঞে, স্যর; পুরো খাটনি দেয়নি', এগিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁতশালার ইন-চার্জ মধুসূদন-বাবু।

—সে কি! ও তো চমৎকার সোয়েটার বোনে, জানতাম।

ডেপুটি সুপার জানালেন, সুতার অভাবে সম্প্রতি সোয়েটার বোনা বন্ধ রাখতে হয়েছে এবং সেখানকার ছেলে-গুলোকে তাঁত 'কামানে' 'পাশ' করে দিয়েছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে? তাঁত ভালো লাগছে না?

কেশব মাথা নেড়ে জানাল, লাগছে।

—তাহলে কাজ করিসনি কেন?

—ফুটবল খেলে পা ব্যথা হয়েছে, স্যর।

সকলের মুখে চাপা হাসি খেলে গেল। সুপার বললেন, তাতে কী হয়েছে? তাঁত তো চালাবি হাত দিয়ে। পায়ের কাজ আর কতটুকু!

কেশব এ প্রশ্নের কোনো কৈফিয়ত না দিয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বোকার মত হাসতে লাগল। সাহেব ধমক দিলেন, কথা বলছিস না যে?

—দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়, স্যর।

সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেললেন মধুসূদনবাবুর মুখে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, বসে হাত পায় না। না দাঁড়ালে মাকুর দড়ি ধরতে পারে না।

এবার সাহেবও হেসে ফেললেন। টেবিলের ওপারে দাঁড়ানো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সচল তাকিয়াটির দিকে একবার তাকিয়ে তার টিকেটের উপর নতুন খাটনি লিখতে লিখতে বললেন, লিলিপুট থেকে ওর যোগ্য স্পেশাল তাঁত যদ্দিন এসে না পৌঁছায় ততদিন বরং রাঁদা চালাক। এবার থেকে কাঠ কামানে কাজ করবি, বুঝলি?

—ওখানে গেলে মারবে, স্যর।

—কে মারবে?

—দীনেশ।

—কেন?

কেশব উত্তর না দিয়ে ডেপুটি সুপারের দিকে তাকাল। তিনি ভরসা দিলেন, না, না; মারবে না। আমি ওকে বকে দেবো'খন। যা।

কেশব বিশেষ আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ডেপুটিবাবু তখন দীনেশ-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন। দীনেশ বর্স্টাল বয়, ষ্টার এবং ফুটবলের ক্যাপ-টেন। কেশবকে খেলায় নিতে তার ভয়া-নক আপত্তি এবং এই নিয়েই ঝগড়া। দীনেশের বক্তব্য হল, ফুটবল মনে করে খেলোয়াড়রা যদি ওকেই পিটতে শুরু করে, তার পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হবে না। তা সত্ত্বেও ও যখন জিদ করতে লাগল খেলবেই, তখন বলেছে, 'আমাদের বল যেদিন লিক্-টিক হয়, সেইদিন আসিস। তোকে দিয়েই খেলা যাবে।' বলা বাহুল্য প্রস্তাবটা কেশবের পছন্দ হয়নি। এ নিয়ে সবাই যখন হাসাহাসি করছিল, অপ-মানটা হজম করতে না পেরে তখনকার মত সরে এসে আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল। দীনেশ সঙ্গে সঙ্গে কিছু করেনি তবে বেশ ধীরভাবে শাসিয়ে রেখেছে সময় ও সুযোগ মত উপযুক্ত উত্তর দিতে ত্রুটি হবে না। ঢিলটা ছুঁড়লে পাটকেলটা খেতে হয়—এই সনাতন নিয়ম কেশবের জানা আছে। তাই তখন থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ডেপুটিবাবুর কাছে নালিশ দায়ের করেছে।

সে আশা করেছিল সাহেব অন্ততঃ তার দুঃখটা বুঝবেন, এবং আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হল। স্পষ্ট না বুঝলেও সন্দেহ হল, সকলের মত তিনিও যেন এতবড় ব্যাপারটাকে নেহাত হালকা করে দেখছেন। সাহেব কড়া মানুষ; দোষ করলে তাঁর কাছে কারো খাতির নেই, তা সে ছটরই হও আর ক্যাপটেনই হও। কিন্তু দীনেশের বিরুদ্ধে এই রকম গুরুতর অভিযোগ পেয়েও তিনি কিছুই করলেন না। একবার রেগেও উঠলেন না। লক্ষ্য করে কেশবের মনে জেগে উঠল শিশুমনের সেই চিরন্তন ক্ষোভ—বড়রা সব একদল। ছোটদের উপর কারো দয়া-মায়া নেই।

আর কোন রিপোর্ট ছিল না। এবার নতুন আমদানীর পালা। দিলীপকে যখন নিয়ে আসা হল, তার বুকের ভিতরে কে যেন তখনো হাতুড়ি পিটছে। ডেপুটিবাবু তার নাম, বাপের নাম এবং সঙ্গে জামা-কাপড় কি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। সুপারের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সে দেখল তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকেই লক্ষ্য করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মিনিট খানেক পরে তিনি প্রশ্ন করলেন, বাবা কবে মারা গেছেন?

—জানি না, আমি তখন খুব ছোট।

—মা আছেন?

দিলীপ মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বলতে চাইল, আছেন; স্বর ফুটল না। চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। সাহেব বললেন, আর কে কে আছেন তোমার? দিলীপ মাথা নেড়ে জানালে, কেউ নেই। এবার চোখের জল আর বাধা মানল না। দুটি বড় বড় ফোঁটা গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। হাতের উল্টো পিঠে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। সুপার বললেন, লিখতে জানো?

—জানি।

—ব্যস, তাহলে আর কি? মাকে একখানা বেশ বড় করে চিঠি লিখে দাও।

—আমার কাছে তো কাগজ নেই।

সকলের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। সাহেব ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, কাগজ নেই? তাহলে তো মুস্কিল। আচ্ছা সেটা না হয় আমরাই দেবো। বাড়ির ঠিকানা জান তো? ...... কোথায় থাকেন তোমার মা?

—বস্তিতে।

—কোন বস্তি? রাস্তার নাম কি?

—জানি না।

সুপার হাতের ভাঁজ করা ওয়ারেন্টখানা খুলে নিজের মনেই বললেন বাস্; এবার বোঝো ঠেলা। "অ্যাড্রেস আননোন।" তার মানে, ওটাও কর্তাদের খুঁজে নেবে। ও'রা আছেন শুধু 'ডাম্প' করতে।

ডেপুটিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, বেশ কড়া করে লিখে দিন তো, এক মাসের ওপর যে তোমরা আটকে রাখলে ছেলেটাকে, তার ঠিকানাটাও ট্রেস করতে পারনি? এ্যাদ্দিন কী করেছ তাহলে, জানতে চাই। চিঠির একটা কপি আই, জি, কে দিয়ে বলুন, এর পরে এই রকমের ইন্‌কম্‌প্লিট্‌ কেস আমরা রিফিউজ্‌ করবো।

—সেকথা আমরা আগেও কয়েকবার বলেছি স্যর। আই, জি, কোনো উত্তর দেননি।

—হুঁ; আচ্ছা!

'দেখে নেবো' গোছের একটা উত্তেজিত ভঙ্গি করে উঠে পড়লেন সুপারসাহেব। সেই ছোট্ট ছড়িখানা কুড়িয়ে নিয়ে বগলে চেপে এবার অনেকটা নরম সুরে বললেন, ঐ সঙ্গে কাছাকাছি পুলিশকেও লিখে দিন, ওরা কোনো খোঁজ দিতে পারে কিনা। সব দায় যেন আমাদেরই। যতো সব.........।

অস্পষ্ট ইংরেজিতে কার উদ্দেশ্যে কি সব বিড়বিড় করতে করতে কোনো দিকে না তাকিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন একদা-মিলিটারী, বর্তমানে ক্ষুদ্র একটি ছোকরা জেলের নির্বিঘ্ন অধিকর্তা—লেফ্‌টেনান্ট্‌ জি, কে, ঘোষ।

ভোরের ঘুম তখনো দুচোখে জড়িয়ে আছে। হঠাৎ ঘরের ঠিক বাইরে একটা জোড়ালো বাঁশীর অদ্ভুত ধরনের কিন্তু মিষ্টি আওয়াজ শুনে দিলীপ ধড়-মড় করে উঠে বসল। পাশেই কেশবের বিছানা। তার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কী বাজাচ্ছে?

কেশবও উঠে বসেছিল। বেশ মুরুব্বীর মত বলল, কখনো শোনিসনি বুঝি? ওকে বলে 'বিউগিল'। আমাদের উঠতে বলছে। উঠে পড়।

দিলীপ তাকিয়ে দেখল, ঘরে যেন ডাকাত পড়েছে। অতগুলো ছেলে, সব প্রায় তারই বয়সী কিংবা খানিকটা ছোটবড়, ভীষণ হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। বিচিত্র তাদের পোষাক। কারো পরনে ল্যাঙট, কারো হাফ-প্যান্ট্‌, কেউ চাদরটাকে লুঙির মত করে কোমরে জড়িয়ে আছে, গুটি তিনেক ছোট ছেলের সারা দেহে কিছু নেই। এক পাশে দাঁড়িয়ে একটি সর্দার গোছের ছেলে (সরকারী পদ—ক্যাপটেন) হাঁক-ডাক করে নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিল। ওদেরই একজনকে ধমকে উঠল, এই পটলা, তোকে একশ দিন বলেছি না, প্যান্ট পরে শুবি? বুড়ো ধাড়ী; নেংটো হতে লজ্জা করে না?

পটলা নাকীসুরে প্রতিবাদ জানাল, বা-রে, প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হয় না বুঝি?

ক্যাপটেন তখন অন্য একজনকে নিয়ে পড়েছে, জাঙিয়াটি কোত্থেকে জোটালে চাঁদ?

সেই ছেলেটা সাদা রং-এর আণ্ডারওয়ারের উপর তাড়াতাড়ি খাকী প্যান্ট্‌ চড়াতে চড়াতে বলল, কোথায় জাঙিয়া? ভুল দেখছ নাকি আজকাল?

—আচ্ছা, আসুক ডেপুটিবাবু। ভুল দেখছি কিনা, তালাসি নিলেই বেরিয়ে যাবে।

—না ভাই, তোর পায়ে পড়ি, বলে দিস না।

কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিতেই ক্যাপটেন হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটারও সুর বদলে গেল। তর্জনী তুলে বলল, বেশ, আমিও তাহলে বলে দেবো, তোমার পকেটে বিড়ি আছে।

—'আচ্ছা; যা করতে পারিস করিস।' বলে প্রতিপক্ষের তর্জনীর বদলে বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে দেখাল ক্যাপটেন।

'আণ্ডারওয়ার' তখন অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করল।—চাপা শাসানির ভঙ্গিতে বলল, দর্জী 'কামানে' যেতে হবে না কোনোদিন? গিয়ে দেখো।

ক্যাপটেনকে এবার আর মাথা তুলতে দেখা গেল না। ঢোলের মত প্যান্ট এবং পাশবালিসের খোলের মত সার্ট কেটে ছেঁটে চলনসই মত দাঁড় করাতে, এবং সেই সঙ্গে বাড়তি হিসাবে নিমাটা ফতুয়াটা কিংবা কমপক্ষে রুমালটা সংগ্রহ করতে ঐ স্থানটিতে প্রায় সকলেরই মাঝে মাঝে ধরণা দেবার প্রয়োজন ঘটে। তখন এই ছেলেটার এবং ওর মত আর যারা সেখানে কাজ করে, তাদের তোয়াজ না করে উপায় নেই।

বর্স্টাল স্কুলের ইউনিফর্ম খাকী—হাফ-প্যান্ট, হাফ-সার্ট, তার নীচে পরবার মত একটা গেঞ্জি জাতীয় খাটো জামা, সেও খাকী। এই রঙটির উপর এখানকার ছেলেদের (বোধহয় সব ছেলেরই) একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে। শিশু ও কিশোর মন চায় বৈচিত্র্য। শুধু খাদ্যে নয়, পোষাকেও। তাছাড়া বর্ণাঢ্য বস্তুর প্রতি তাদের চিরদিনের আকর্ষণ। ধুলো, বনভোজন, নববর্ষের রুট্-মার্চ, পুজো দেখা ইত্যাদি নানা উপলক্ষে এরা বাইরে বেরোতে পারে। সেখানে বহু লোকের ভিড়ের মধ্যেও এই পোষাকই এদের সকলের থেকে আলাদা করে রাখে। পুজো-মন্দিরে কিংবা রথের মেলায় এদেরই বয়সী ছেলের দল যখন রঙ্-বেরঙের জামা-কাপড় পরে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়ায়, খাকী-মার্কা বর্স্টালের

—"আচ্ছা; যা করতে পারিস করিস।"

ছেলেরা তৃষিত চক্ষে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। খবর নিলে জানা যাবে, সে দৃষ্টিতে স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা যতখানি, তার চেয়ে রঙ-এর তৃষ্ণা কম নয়।

বছরের পর বছর এই একঘেয়ে খাকীর কর্কশ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনটা ছটফট করে। জেলের কয়েদীর মত গোটা মেয়াদটা এদের পাঁচিলের আড়ালে কাটাতে হয় না। খেলা-

এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে খাকী-সজ্জার উদ্ভাবন কে করেছিলেন, সরকারী রেকর্ডে হয়তো তার উল্লেখ আছে। তিনি যে-ই হোন, এবং যে মনোভাব নিয়ে এই রঙটি নির্বাচন করে থাকুন, ছোটদের মনের দিকে তাকিয়ে করেননি। ছোটদের প্রতি স্নেহ বা মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, একথাও বলা চলে না। নিজের শিশু বা কিশোর পুত্রের পোষাক-নির্বাচনে খাকীকে হয়তো বর্জন করেই চলে থাকবেন। দু-চারটি মিলিটারী-ভাবাপন্ন পরিবার বাদ দিলে, এ দেশের সাধারণ গৃহস্থ খাকীকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে না। এই বর্ণটির প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত আরো বিরল।

বর্স্টাল এবং ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলের ছেলেগুলো পুলিশ বা মিলিটারী মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠুক, কর্তৃপক্ষের মনে এই জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলেও তো মনে হয় না। জীবিকা ক্ষেত্রে ওর কোনোটাতেই তাদের প্রবেশাধিকার নেই। যে-কোনো সরকারী চাকরির সব পথ তাদের কাছে চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে আছে। যে ধরনের অপরাধ, এবং যে-বয়সে সে অপরাধ তারা করেছিল, দুটোই এখানে অবান্তর। একটি মাত্র প্রাসঙ্গিক কথা—'দে ওয়ার কন্‌ভিক্‌টেড্ ইন্ এ কোর্ট অব ল'; আদালতে আইন-সংগত ভাবে তারা দণ্ডিত। সেদিক দিয়ে সাধারণ জেল কয়েদীর সমগোত্র।

এদের সামনে এই বাধা যদি না থাকত, তাহলেই বা কী লাভ হত জঙ্গী-আদর্শে এতগুলো ছেলেকে মানুষ করে? একটি ছোট ছেলের মধ্যে সত্যিই যদি সমাজ-বিরোধী-প্রবৃত্তি দেখা দিয়ে থাকে, তাকে সমাজমুখী করবার সুযোগ দেওয়াই হল আসল কাজ। শৈশব না পেরোতেই যে গৃহচ্যুত, তাকে যদি একদিন গৃহ-জীবনের ছায়ায় ফিরিয়ে আনা যায়, সংসারের সহজ পথ থেকে যে পিছলে পড়ে গেছে তাকে যদি তুলে এনে সেই পথের উপর দাঁড় করিয়ে হাতে যে-কোন ভদ্র অবলম্বন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই হল। তার চেয়ে বড় আর কী কাম্য থাকতে পারে? রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে এইটুকুই এদের প্রত্যাশা। সেখানে খাকী লাগবে কোন কাজে?

'ইউনিফর্ম'-এর প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় পোষাকের ঐক্য দিয়ে একটা গোষ্ঠী-মনোভাব গড়ে তোলা। সেটা গেল ভিতর-

কার সম্পর্কের কথা। বাইরের জগতে ঐ পরিচ্ছদটাই পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। কোন্ জাতের বা কী ধরনের পোষাক, তারই উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে গোটা গোষ্ঠীর মূল্যায়ণ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বর্স্টালের এই খাকী-মার্কা বিবর্ণ খোলস লোকচক্ষে তার মর্যাদা বৃদ্ধির সহায় হয়নি; বরং ঐ ছেলেগুলোকে যেন খানিকটা কৃপার পাত্র করে তুলেছে। বলা যেতে পারে, অস্থানে এবং অপাত্রে পরে খাকী তার জাত হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া ছোটদের পরিচ্ছদ হিসাবে ওটা শুধু অসুন্দর ও অনুজ্জ্বল নয়, অনেকটা যেন অনাথ ও অসহায়ের প্রতীক।

তর্ক উঠবে, কাপড়-চোপড়ের রং বদলালেই কি এদের সম্বন্ধে আপনার আমার দৃষ্টির রং বদলে যাবে? পুরো-পুরি যাবে না; তার সঙ্গে আরো অনেক জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে আছে; তবে অনেকটা যে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রং জিনিসটা ব্যক্তি বস্তু বা বৃত্তি নিরপেক্ষ নয়, এর একটা নিজস্ব অর্থ ও সংজ্ঞা আছে। যে কাউকে যে কোনো রং-এ মানায় না। সন্ন্যাসীকে সবুজ এবং বর্ষিয়সী হিন্দু বিধবাকে যদি গাঢ় রক্ত রং-এ সজ্জিত করে দেখানো হত, তারা যে মূল্য এবং মর্যাদা পাচ্ছেন, তা পেতেন না। প্রথমজনের গৈরিক এবং দ্বিতীয়ার শুভ্র বেশ অর্থহীন বহিরাবরণ নয়, ও'দের আদর্শ ও জীবন-ধারার বহিঃপ্রকাশ।

তার চেয়েও বড় কথা—শুধু অন্যের চোখে নয়, আমার চোখেও আমার একটা রূপ আছে, যা দেখে কখনো আমি লজ্জা পাই, কখনো গর্ববোধ করি। সে রূপের অনেকখানি জুড়ে আছে আমার পরিচ্ছদ ও তার রং। সেটি যদি আমার মনের মত হয়, আমার চোখে আমি শুধু যে সুন্দর হবো তা নয়, আমার কাছে আমার মর্যাদা বেড়ে যাবে। জীবনে বড় হবার প্রথম সোপান নিজের কাছে এই মর্যাদাবোধ।

বর্স্টালের ইউনিফর্ম তৈরি করে তার নিজস্ব দর্জীশালা। খাকী কাপড়ের থান আসে বাইরে থেকে। একজন দর্জী-মাষ্টার আছেন, যার মাইনে প্রথম জীবনে ছিল বোধহয় তিরিশ টাকা, ক বছর অন্তর একটাকা হারে বেড়ে জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে প'য়ত্রিশে। গুটি পাঁচেক ছেলে আছে তার 'কামানে'। দুজন সগর্বে কাঁচি চালায়, তারা 'কাটার'। মান্ধাতার আমল থেকে কয়েকখানা মোটা কাগজের ফর্মা বানিয়ে রেখেছেন মাষ্টারমশাই। তার উপরে কাপড় ফেলে দাগে দাগে কেটে ফেলে 'কাটার' ছেলেরা। একজন তার উপরে কল চালায়। তিনটি সাইজ আছে—এক, দুই, তিন অর্থাৎ বড়, মেজো, ছোট। তোমার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যাই হোক, এই তিনটির কোনোটাতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যদি ফিট্ না করে, অর্থাৎ হাফ্ সার্টের হাত কনুই ছাড়িয়ে ঝুলে পড়ে কবজির কাছাকাছি, কিংবা হাফ প্যান্ট্ ধাওয়া করে গোড়ালির পানে, সে দোষ তোমার বে-সাইজ গড়নের। তার জন্যে দর্জী-মাষ্টার বা তার কাটারদ্বয় দায়ী নয়। তোমার কোমরটা যদি বেটপ বেড়ে গিয়ে থাকে, যার ফলে প্যান্টের বোতাম আঁটতে গিয়ে প্রাণ-বেরিয়ে যায়, তার ফল তোমাকেই ভুগতে হবে। দর্জী-মাষ্টার তো বিশ্বকর্মা নন যে ঠিক ফরমাশ মত মাল যোগাবেন।

কিন্তু সংসারে কোনো কিছুই আট্‌কে থাকে না। সব সমস্যার সমাধান আছে। ঢ্যাঙা বা বেঁটে হয়েও তোমার মাপ মত পোষাক জুটে যাবে যদি দর্জী-'কামানের' দাক্ষিণ্য লাভ করতে পার। বিনিময়ে কিছু দিতে হবে। দাক্ষিণ্যের সঙ্গে দক্ষিণার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। দক্ষিণার নানা রূপ। কখনো দুটো বিড়ি, কখনো রন্ধনশালা থেকে সংগ্রহ করা এক টুকরো মাছ, কিংবা গুদাম থেকে হাত-সাফাই-এর উপার্জন একটুখানি ভেলি-গুড়। পয়সার আদান-প্রদানও একেবারে বিরল নয়। সেখানে আরেক দল লোকের আনুকূল্য চাই, অবশ্য মোটা বখরার বিনিময়ে। তাদের নাম পেটী অফিসার, ছেলেরা বলে 'মাষ্টার', কাঠ-মাষ্টার, লোহা-মাষ্টারের থেকে ভিন্নগোত্র। সরকারী কাজ—পাহারা ও খবরদারি।

আর একটা কারণে ছেলেমহলে দর্জীশালার প্রচুর প্রভাব। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইউনিফর্মের খাকী রং এবং তার উপরে ব্যাপক অরুচি।

দুপুরের দিকে সুপার এবং তার ডেপুটি যখন অনুপস্থিত, দর্জী কামান কিঞ্চিৎ বেসরকারী কারবার করে থাকে। বর্স্টালের বাসিন্দার সংখ্যা যতই নগণ্য হোক, ষ্টাফ অর্থাৎ কর্মিদলটি ছোট নয়। সাত আট জন ইন্‌স্ট্রাক্‌টর, হেড্ মাষ্টার ও তার সহকারী শিক্ষক জন-চারেক, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, কেরাণীকুল, তার উপরে চীফ ও তার উপচীফ সমেত একদল সিপাই বা পেটী অফিসার। বেতনের ব্যাপারে বেশীরভাগই দর্জী-মাষ্টারের নিকট প্রতিবেশী। সকলেরই সংসার আছে এবং সেখানে লক্ষ্মীর বদলে মা ষষ্ঠীর অতিরিক্ত অনুগ্রহ। সরকারও এদের উপর যথেষ্ট দয়াপরবশ। পেটী অফিসারের একাংশ সমেত প্রায় সকলকেই একটি করে বাসগৃহ দান করেছেন। তার ভাড়া লাগে না। সে কি কম অনুগ্রহ? 'বাসগৃহ' কথাটা আক্ষরিক অর্থে নয়, সরকারের সম্মানরক্ষার্থে ব্যবহার করা হল। আসলে সেগুলো 'গৃহ' নয়, 'বাস' করবার জন্যেও তৈরি হয়নি। ডিষ্ট্রিক্ট জেলের আমলে ছিল 'ডেড্‌ ষ্টক্ আর্টিকেলস্' অর্থাৎ লোহা-লক্কড়ের গুদাম, এখন একগাদা হাফ্-ডেড্ নরনারীর মাথা গুঁজবার গুহা। যাদের মাথা সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে গোঁজা আছে, তারা যে অচিরেই পুরো-ডেড্-এর দলে গিয়ে ভিড়বে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর সকলেই নিঃসন্দেহ।

গুদামগুলোর পেছনের দেয়াল জেলের প্রাচীর, নিশ্ছিদ্র, নিরেট। দুপাশের দেয়ালেও একটা ফোকর পর্যন্ত নেই। সামনে একটি মাত্র দরজা। ভর-দুপুরেও আলো না জেললে ভিতরটা দেখতে পাবে, এ রকম চোখের জোর বন্য জন্তুর থাকতে পারে, মানুষের নেই। সুতরাং দিনরাত বাতি জ্বলছে; এবং সেটা কেরোসিনের ডিবা কিংবা বর্ষ্ট্রালের বাতিলকরা ভাঙা হারিকেন। তার থেকে আলো বেরোচ্ছে যতটা তার দশগুণ উঠছে কালি। মারাত্মক ফলটা অনুমান করতে ডাক্তারী জ্ঞানের দরকার হবে না।

প্রতিটি বাড়ি অর্থাৎ কোয়ার্টার্সের সামনে একটু করে ঘেরা কম্পাউন্ড। কী দিয়ে ঘেরা জানতে চাইবেন পাঠক। কেরোসিন টিন কেটে কেটে পিটিয়ে সোজা করে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট পাত। তার উপর আলকাতরা লাগিয়ে পাশাপাশি বাঁশের বাখারিতে গেঁথে বেড়া বানিয়ে দিয়েছে বার্স্টালের ছেলেরা। সেইগুলো জুড়ে জুড়ে খাড়া হল কম্পাউন্ড ওয়াল। সরকার একটি পয়সা দেননি, এই রকম উদ্ভট স্কিমের স্যাংকশনও নেই। এসব ঘোষসাহেবের পাগলামি। পি, ডবলিউ, ডি'র ইঞ্জিনিয়র মাঝে মাঝে হুমকি দেন, আমাদের বিল্ডিং-এর গায়ে কতগুলো ডার্টি আন অথরাইজড্ ষ্ট্রাক্‌চার আমরা এ্যালাউ করবো না। পুল দেম ডাউন। সাহেব তার বেঁটে ছড়িটা বগলে চেপে ছুটে

আসেন, বেড়ার গায়ে চটেঘেরা শৌচাগারগুলো দেখিয়ে বলেন, ঐ আবশ্যক কর্মটির জন্যে হতভাগা মেয়েমানুষগুলোর এখানে যে একটু আড়াল দরকার। অবিশ্যি, বেশীদিন আর দরকার হবে না। যেভাবে আছে, শীগগিরই হয়তো গোরু ঘোড়ার দলে চলে যাবে। তখন আর পরদা লাগবে না। তখন আমি নিজেই এগুলো সব ভেঙে দেবো। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কটা দিন সবুর করুন।

একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র হেসে চলে যান। বন্ধু লোক; প্রশ্রয়ের সুরে বলেন, আপনার সঙ্গে আর পারা যায় না, মশাই। কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্ট কী করছে? ষ্টাফ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা না করে আপনারা এলেনই বা কেন? এগুলো তো আগেই দেখবার কথা।

—'দেখবেটা কে?' উত্তর করেন ঘোষ। আমি যখন বলতে গেলাম স্কুল তো খুলছ, এতগুলো স্টাফ, জায়গা দেবে কোথায়? মনিব তাকালেন তাঁর পাকামাথা পি-এর দিকে। তিনি বললেন, তার জন্যে ভাবনা নেই, সাহেব। দে ক্যান্ লিভ অ্যানিহোয়্যার।

বাস্; তারপর ফিরতে না ফিরতেই হুকুম পেলাম, 'ইউ আর দি ম্যান্ অন দি স্পট্; একটা কিছু বন্দোবস্ত কর।' করলাম। বিনি পয়সায় এরকম খাসা কেরোসিন ওয়াল বানাতে পারতেন আপনি?

ঐ কটা গুদামে সব লোকগুলোকে পুরে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যে গুলো বাকী রইল, তাদের জন্যে তৈরি হল সস্তাদামের কতগুলো কুড়ে। চটেই-এর বেড়া, সরু শাল গাছের খুঁটি, উপরে ধানের খড়ের ছাউনি। একটা বর্ষাতেই সেগুলো পচে গলে ঝাঁজরা। পরের বর্ষার অনেক আগেই মেরামতের এষ্টিমেট্ গিয়ে পড়ে থাকে ইনস্পেকটর জেনারেলের দপ্তরে। মঞ্জুরি আসতে আসতে শীত এসে পড়ে। তালপাতা মাথায় দিয়ে নির্বিবাদে বর্ষা কাটায় বর্ষ্টালের বাবুরা।

কিন্তু এদের প্রাণেও সাধ আহ্লাদ আছে। ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে না পারুক, গায়ে একটা করে ভদ্রবেশ না দিলে চলে কেমন করে? ঈশ্বরের আশীর্বাদে সব বাড়িতেই, বলতে নেই, তাদের দলটা বেশ পুষ্ট। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার পর আদি দম্পতিকে স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায় করবারকালে ঈশ্বর তাদের আদেশ করেছিলেন, গো এ্যান্ড মালটিপ্লাই। খৃষ্টান না হয়েও সে আদেশ এরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে। শুধু এরা কেন, এদের মত এদেশের অগণিত মানুষ; যাদের ঘরে খাবারের বদলে খাইয়েদের ভিড় অন্ততঃ দশগুণ। এইসব বাবুদের ছেলেপিলের জামা-কাপড়-সমস্যা আংশিকভাবে মিটিয়ে থাকেন বর্ষ্টালের দর্জী-মাষ্টার। কোনো রকমে কাপড়টুকু সংগ্রহ করতে পারলেই হল। তাকে কেটেকুটে কলে চড়িয়ে জামায় দাঁড় করাবার ভার তার হাতে। ব্যাপারটা খয়রাতী নয়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিলেই তিনি খুশী। তাকেও তো এই করেই চালাতে হয়। ছেলেদের লাভ হল—মাপ নেবার ফাঁক দিয়ে খানিকটা বাড়তি কাপড়। সেইগুলোই ফতুয়া, আন্ডারওয়ার রুমাল হাফ্সার্টের রূপ নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন খাকী-রাজ্যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের আমদানী করে থাকে। খাকীর উপর অরুচি তো সকলেরই। সুতরাং মুখ বদলাবার সুযোগ কেউ ছাড়ে না। তাই, দর্জীশালার চাঁইদের কেউ চটাতে চায় না। তাদের প্রভাব সর্বত্র।

প্রকাশ্য দিনের সাদা আলোয় দর্জী-মাষ্টারের এই কালো কারবারটি গোপন থাকবার কথা নয়। জানে সবাই, কিন্তু ফাঁস করে না কেউ। মোটামুটি সকলেরই স্বার্থ আছে। ডেপুটি সুপার নতুন মানুষ। তার কানে যখন খবরটা গেল, তিনি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। সাহেবের নজরে আনবার আগে দর্জী-মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন। মাষ্টার কিছুমাত্র না ঘাবড়ে সোজাসুজি সবকিছু কবুল করে বললেন, এতে করে সরকারী কাজের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না স্যার। বরং একদল গরিব লোকের উপকার হচ্ছে। তার মধ্যে আমিও আছি।

ডেপুটি তো অবাক। চোখ কপালে তুলে বললেন, তাই বলে এসব বে-আইনী কান্ড চলতে থাকবে!

উত্তর এল, চিরদিনই তো চলে আসছে।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত বীক্ষণ
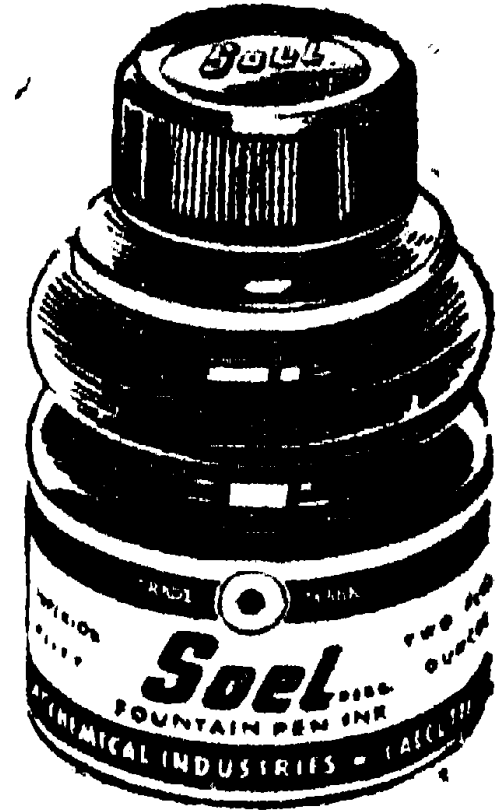
আনন্দভৈরব

॥ মধ্য কলিকাতা সংগীত সম্মেলন ॥

৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি এই আট দিনে নয়টি (৭ জানুয়ারির দুটি সহ) অধিবেশনে তরুণ সংগীত সম্মেলন কর্তৃক পরিচালিত মধ্য কলিকাতা সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শেষ অধিবেশন ছিল সারারাত্রিব্যাপী। স্থানীয় ও বহিরাগত বহু শিল্পী এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কয়েকজন নতুন শিল্পী অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এ প্রয়াস প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন অধিবেশনে কন্ঠসংগীত পরিবেশন করেন মহম্মদ দবীর খাঁ (পশ্চিমবঙ্গ), পণ্ডিত ভীমসেন যোশী (পুনা), শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ), শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ) ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ ও সালামত আলি খাঁ (পাকিস্তান), ওস্তাদ আমানত আলি খাঁ ও ফতে আলি খাঁ (লাহোর), শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক (কটক), শ্রীমতী প্রভা আত্রে (নাগপুর), শ্রীমতী মাণিক বর্মা (পুনা), শ্রীমতী নয়না দেবী (দিল্লি) ও অন্যান্য শিল্পীগণ; যন্ত্র সংগীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ (তৎসহ তাঁর পুত্র আমজেদ আলি খাঁ—দিল্লি); ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (পশ্চিমবঙ্গ), ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ ও ইমারৎ হোসেন খাঁ (বোম্বাই), শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বাই) শ্রীমতী শিশিরকণা ধর-চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ) কুনওয়ার রাজেন্দ্র সিং (উজ্জয়িনী), মহম্মদ নইয়ার হোসেন খাঁ (বারানসীর মিঞা বিসমিল্লা খাঁয়ের পুত্র) ও ইমদাদ হোসেন খাঁ এবং অন্যান্য শিল্পীগণ। এই সম্মেলনের সব অনুষ্ঠানের বিবরণ ও আলোচনা এস্থলে সম্ভব নয়। কন্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত ভেদে মাত্র কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করে নৃত্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করব।

প্রথম অধিবেশনে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন মহম্মদ দবীর খাঁ। এই সম্মেলনে একমাত্র এটিই ধ্রুপদের অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছে। তৃতীয় অধিবেশনে শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। তাঁর রাগ-রূপায়ণ ও 'বোলন লাগি' মধ্যলয়ের খেয়াল গানটি উপভোগ্য হয়েছে। আজকাল খেয়াল গানে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের প্রাধান্যই বেশি দেখা যায়। মধ্য লয়ের গানে একটা স্বতন্ত্র মজা ও মর্যাদা আছে। শুদ্ধকল্যাণ রাগের নাম সম্বন্ধে কোনো কোনো গুণী ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন 'শুদ্ধ' শব্দটি স্বগঠিত (একক) রাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে খেয়াল গান পরিবেশন করেন ওস্তাদ আমানত আলি খাঁ ও ফতে আলি খাঁ। তাঁদের গায়ন-ক্রিয়ায় পরস্পর সহযোগিতার ভাব আছে—যা দ্বৈত সংগীত পরিবেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠ অধিবেশনে মালগুঞ্জী রাগে খেয়াল ও তারানা এবং পরে ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক। মালগুঞ্জী রাগ রূপায়ণে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদের, বিশেষত দুই গান্ধারের প্রয়োগে কুশলতা আবশ্যক। শ্রীমতী পটনায়কের রাগ-রূপায়নে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। ষষ্ঠ অধিবেশনে মারু-বেহাগ রাগে খেয়াল ও ভজন এবং অষ্টম অধিবেশন বাগেশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। রাগ-বিস্তারের সময় এক একটি স্বর প্রয়োগ করার সময় পণ্ডিত যোশীর বিশেষ স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাগ-রূপায়ণে এক একটি স্বরকে গভীরভাবে প্রয়োগ করে সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁর অঙ্গ-ভঙ্গিতে আধিক্য এসে পড়ে।

এই সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়েরও বাংলা গান পরিবেশন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইদানীং সংগীত সম্মেলনে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের গান সচরাচর শোনা যায় না। সেদিক থেকে উদ্যোক্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। প্রায় দুই যুগ আগে এই শিল্পী যে কন্ঠ-সম্পদ-শিল্পী-মেজাজ ও সৃজনীশক্তি নিয়ে উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার ফলে সংগীতমার্গের যে অত্যুচ্চ স্থানে আজ তাঁর পৌঁছুবার কথা, ভবিতব্য তা ঘটতে দেয়নি। আলোচ্য অনুষ্ঠানে তিনি যে রাগ-রূপ ফুটিয়ে তুললেন, তাতে মতান্তরের অবকাশ থাকতে পারে, পূর্বের তুলনায় তাঁর কন্ঠ-সম্পদ সমালোচ্য হতে পারে, কিন্তু এখনও যে শিল্পী-মেজাজের তিনি অধিকারী, চমকপ্রদ স্বর-প্রয়োগে ও স্বরবিন্যাসসৃষ্টিতে তাঁর যে স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব বর্তমান, তার-সপ্তকে তাঁর কন্ঠস্বরের যে অনায়াস গতি ও মাধুর্য তার তুলনা কমই মেলে। বহুদিন আগের গাওয়া তাঁর 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা আমারে ভুলিয়ো প্রিয়' গানটি চমৎকারভাবে গাইলেন। এ গানের অর্থ শিল্পীর জীবনে আজ ভিন্ন রূপে প্রতিভাত। কিন্তু সংগীত-রস-পিয়াসীজন তাঁকে ভুলতে পারে না।

নবম অধিবেশনে মিঞাকী টৌড়ী রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি পরিবেশন করেন ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ ও সালামত আলি খাঁ। রাগ-রূপায়ণে (আলাপে) তাঁরা মন্দ্র-সপ্তকের কোমল ধৈবত থেকে মধ্য সপ্তকের অতিকোমল গান্ধার পর্যন্ত অংশ অনেকক্ষণ ধরে গেয়েছেন; কতকাংশ পুনরাবৃত্তির জন্য কিছুটা একঘেয়ে মনে হয়েছে। উক্ত অংশের সঙ্গে পরবর্তী বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের পরিবেশন-সময়ের আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। মাঝে মাঝে হাল্কা তানের প্রয়োগ না করলে টৌড়ী রাগের বৈশিষ্ট্য আরও ফুটে উঠত। তাঁদের ঠুংরি গান উপভোগ্য হয়েছে। দ্বৈত কন্ঠে সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা ও সহকারিতা প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানে তার অভাব অনুভূত হয়েছে।

যন্ত্রসংগীত।। প্রথম অধিবেশনে স্বরোদে শোভা-কানাড়া রাগ এবং অষ্টম অধিবেশনে বাগেশ্রী রাগ পরিবেশন করেন ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ। পূর্বোক্ত অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন তাঁর পুত্র আমজেদ আলি খাঁ এবং শেষোক্ত অধিবেশনেও আমজেদ আলি খাঁ ও রহমত আলি খাঁ। উভয় অধিবেশনেই বিলম্বিত ও দ্রুত গতের অংশ প্রধানতঃ আমজেদ আলি খাঁ

বাজিয়ে শোনান আমরা এই সুলক্ষণ-যুক্ত তরুণ শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তাঁর হাত বেশ তৈরি। বয়েস ও সাধনার পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে রস-সৃষ্টির দিকে আরো বেশি মনোযোগ দিলে তিনি একজন সফল স্বরোদ-শিল্পী হতে পারবেন ভরসা করা যায়। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর দিকপাল শিষ্যবৃন্দের গুণের পরিচয় আমরা বহুকাল পেয়ে আসছি। ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর এই পুত্র-শিষ্যের গুণের পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বরোদে চন্দ্রনন্দন রাগ পরিবেশন করেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। চন্দ্রনন্দন রাগে ক্ষণে ক্ষণে মালকোষ ও চন্দ্রকোষ রাগের আভাস পাওয়া গেলেও শুদ্ধ গান্ধার ও পঞ্চমের প্রয়োগে বিশেষতঃ শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ-প্রবলতায় এই মিশ্র রাগের রূপটি ফুটে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে তবলায় সঙ্গত করেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (হীরুবাবু)। নবম অধিবেশনে এই সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও প্রথমে বিলাসখানি টোড়ী রাগের আলাপ বাজিয়ে শোনান ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। তাঁর আলাপের মাধ্যমে এই রাগের শান্ত রসটি চমৎকাররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। বিলাসখানি টোড়ী রাগের আলাপ, জোড় ও ঝালার পর তিনি দরবারী টোড়ী রাগে গৎ পরিবেশন করেন। শৈলী, রস-সৃষ্টি ও পরিমিতির দিক থেকে বিচারে শিল্পীর এ অনুষ্ঠানটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-সঙ্গত পরিমিত ও সরেস লেগেছে।

সপ্তম অধিবেশনে দ্বৈতভাবে সেতারে শুদ্ধ মারু রাগ পরিবেশন করেন ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁ ও ইমরাত হোসেন খাঁ। এই দুই ভ্রাতার পরিবেশনে পরস্পর সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য আছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আলাপাংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত মনে হলেও, গৎ-বাদন ভালো লেগেছে। নবম অধিবেশনে সেতারে ললিত-রাগ পরিবেশন করেন শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাগ-রূপায়ণ মনোগ্রাহী হয়েছে। তাঁর সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে চমৎকারিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। চতুর্থ অধিবেশনে কিশোর-শিল্পী কুনওয়ার রাজেন্দ্র সিং জোগ রাগে সুর-মাধুরী বাজান। সুরমাধুরী যন্ত্রটি বেহালার প্রকারভেদ। এই যন্ত্র ভিন্নতর আকারে পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমিত হয়। আর একজন তরুণ শিল্পী এই সম্মেলনে সানাই-বাদনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হলেন বারাণসীর মিঞা বিসমিল্লা খাঁর পুত্র মহম্মদ নইয়ার হোসেন খাঁ। তিনি তাঁর পিতৃব্য মহম্মদ ইমদাদ হোসেন খাঁর সঙ্গে সানাই বাজিয়ে শোনান।

নৃত্য—এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে নৃত্য পরিবেশন করেন বোম্বাইয়ের শ্রীমতী রোশনকুমারী (কথক), দিল্লির শ্রীব্রিজমোহন মহারাজ (কথক), বোম্বাইয়ের ঝাবেরি ভগ্নীদ্বয় ও সম্প্রদায় (মণিপুরী), এল, বিজয়-লক্ষ্মী (ভারতনাট্যম্) দিল্লির কুমারী উমা শর্মা (কথক), বাংলার মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (কথক), ও অন্যান্য শিল্পীগণ। 'আনন্দভৈরবে'র নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত বসবার আসনটি এত পেছনে ছিল যে, সেখান থেকে নাচের আঙ্গিক, অভিব্যক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা দুঃসাধ্য। কাজেই অনুষ্ঠিত নাচের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া এস্থলে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে দু-একটি কথা বলব। বোম্বাইয়ের ঝাবেরী ভগ্নীদ্বয় ও সম্প্রদায় তাঁদের মণিপুরী নৃত্যমালায় আংশিক ভানুসিংহের পদাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সে ছদ্মনামে ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির সুরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আলোচ্য অনুষ্ঠানে চারটি গান গীত হয়েছিল—শুনলো শুনলো বালিকা, মরণের তুঁহুঁ মম, গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে ও আজু সখি মুহু মুহু। উচ্চারণ সর্বত্র নিখুঁত না হলেও গানগুলি যথাসম্ভব ঠিক-ঠিক সুরে গীত হয়েছিল, এজন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণকে প্রশংসা জানাই। নৃত্যে সাথ-সঙ্গতের যে ব্যবস্থা থাকে তার প্রধান উদ্দেশ্য হল নৃত্য-রূপায়ণে সাহায্য করা, নৃত্যের ছন্দ-সুষমার সামঞ্জস্য ও পুষ্টিসাধন করা। কিন্তু ষষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীব্রিজমোহন মহারাজের ও নবম অধিবেশনে শ্রীমতী রোশনকুমারীর কথক নৃত্যানুষ্ঠানের সময় তার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। সাথ-সঙ্গতকারী অনুগমন না করে প্রতিযোগিতার ভাব পোষণ করলে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। এই সম্মেলনে নৃত্যানুষ্ঠানের আধিক্য অনুভূত হয়েছে। বিশেষত শেষ অধিবেশনে মাঝখানে একটি মাত্র যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবধানে পর পর দুটি, ভালো হলেও দীর্ঘ কথক নৃত্যের ব্যবস্থা সমীচীন মনে হয়নি। ফলে সাধারণ শ্রোতা-দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। তৎসত্ত্বেও বলব সেজন্য মঞ্চে নৃত্যপ্রদর্শনকারী একজন গুণী শিল্পীকে অসাধুবাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় শালীনতার পরিচায়ক নয়।

এই সম্মেলনে শ্রোতার সংখ্যা নৈরাশ্যজনক। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে লেখকের বসবার আসনটি ছিল একেবারে পেছনের দিকে। আগাগোড়া সামনে শত শত আসন খালি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হয়েছিল থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলে। এ স্থানটি লম্বাটে ধরণের। একে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী মণ্ডপে গান-বাজনা জমে কম, তার উপর যদি মণ্ডপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অন্তর অধিক হয় এবং উপরন্তু লোক-সমাগম যথেষ্ট কম হয় তা হলে তো কথাই নেই। ১৩ জানুয়ারির সারা রাত্রি-ব্যাপী অধিবেশন যখন ১৪ জানুয়ারি বেলা সাড়ে দশটার পরে সমাপ্ত হল, তখন খুব অল্প সংখ্যক লোকই মণ্ডপে উপস্থিত ছিল। আমরা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিন্দা করছি মনে করলে ভুল হবে। উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করে ভবিষ্যতে আরো সুপরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠানের স্থান, সূচী ইত্যাদি নির্বাচন করার জন্য উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানাই।

পুতুল নাচ

কণাদ চৌধুরী

পুতুলনাচের ইতি-কথা লিখতে বসলে প্রথমে ভারতবর্ষের নাম না লিখে উপায় নেই। বাস্তবিক পুতুলনাচের জন্ম আমাদের দেশেই। রাজস্থানের পুতুল-নাচ অনেকদিন ধরেই লোকরঞ্জনের জনপ্রিয় উপকরণ। এমন কি আমাদের দেশে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পুতুলনাচের পুতুল তৈরীই এক-মাত্র জীবিকা। বাংলা-দেশেও কিছু পুতুলনাচ শিল্পী আছেন। এদেশের পুতুলনাচ প্রায়শঃই ধর্ম-নির্ভর। রামায়ণ, মহাভারত অথবা পৌরাণিক কাহিনীর সুতোতেই পুতুল-দের নাচানো হয় সাধারণতঃ। কিন্তু আধুনিক অর্থে 'পাপেট শো' বলতে যা বোঝায়, তার চারণভূমি হল সাগরপারের কয়েকটি দেশ। ইদানীং কালে অবশ্য কলকাতার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান 'পাপেট শো' মঞ্চস্থ করছেন। তবু একথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করা যায় যে, 'পাপেট শো'র মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হলেও, ধাত্রী-ভূমির গৌরবটি প্রতীচ্যের কয়েকটি বিশেষ দেশেরই প্রাপ্য। চেকোশ্লো-ভাকিয়া, রাশিয়া এবং আমেরিকা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম।

আমেরিকায় পুতুলনাচ প্রদর্শনীর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। টেলিভিশনে এবং চলচ্চিত্রেও আজকাল সেখানে পুতুলনাচের প্রদর্শনী হয়। ফলে পুতুল নাচিয়ে দলের সংখ্যাও আমেরিকায় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এখন সেখানে প্রায় ষোল শো পুতুল-নাচিয়ে দল আছে। সম্প্রতি এমনি একটি বিখ্যাত আমেরিকান পুতুলনাচের দল ভারত সফরে এসেছেন। সফরটি তিন মাসের। কলকাতায় এ'রা এসে পৌঁছবেন জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে। কল-কাতায় এ'দের মাত্র তিনটে প্রদর্শনী হবে। মাত্র তিন দিনের জন্যে হলেও আয়োজন কম নয়। দুজন পুতুলনাচ শিল্পী এবং চারজন সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে দেড়শো জন 'পুতুল-শিল্পী' আসছে মাত্র তিন দিনের নাটকে 'অভিনয়' করতে।

নাটকটিও কম জমাটি নয়। আমেরিকান উপ-কথার জলদস্যু 'ডেভি জোনস লকারে'র শৌর্য-বীর্যের গাথা এই পুতুলনাচ নাটকের মূল আখ্যায়িকা। এই নাটকের সঙ্গে একটি 'ওয়াটার ব্যালে'ও সংযোজিত হয়েছে। নাটকটি ছাড়াও একটি বিচিত্রানুষ্ঠানও মঞ্চস্থ করবেন

"ওয়ান্স আপ্‌ওন এ টাইম" নাটকে নায়ক ও প্রতিনায়ক

এই পুতুলনাচ দল। বিভিন্ন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'পুতুল অভিনেতারা' অংশ গ্রহণ করবে এই বিচিত্রানুষ্ঠানে।

এই দলের মধ্যমণি হলেন বেয়ার্ড দম্পতি—বিল এবং কোরা বেয়ার্ড। পুতুলনাচের প্রতি বিল বেয়ার্ড আসক্ত হন সাত বছর বয়েস থেকেই। বাবার কাছ থেকে একটা হাতে-তৈরী পুতুল উপহার পেয়ে খেলার পুতুলকে পুতুলনাচ খেলায় রূপান্তরিত করতে আগ্রহ জন্মেছিল বালক বেয়ার্ডের। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে এবং শিকাগো আকাডেমী অব ফাইন আর্টসে শিক্ষাকালীনও তাঁর এই আগ্রহ আদৌ কমেনি। স্বর্গগত টনি সার্গ পুতুলনাচ শিল্পের একজন দিক্‌পাল শিল্পী ছিলেন। তাঁর কাছে পাঁচ বছর বেয়ার্ড শিক্ষানবিশ ছিলেন। স্বদেশে পুতুলনাচ শিল্পী হিসেবে বেয়ার্ড দম্পতি ইতিমধ্যে যথেষ্ট নাম করেছেন। চলচ্চিত্রে এবং টেলিভিশনে তাঁদের অনুষ্ঠান মার্কিন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মিসেস বেয়ার্ড বলেছেন যে, তাঁদের প্রদর্শনীর জন্যে তাঁরা এখান থেকে নতুন ভাবধারা নিয়ে যাবেন বলে আশা রাখেন। বিশেষ করে এমন কিছু তাঁরা এই পুতুলনাচের অন্তর্ভুক্ত করতে চান যা থেকে আমেরিকান দর্শকেরা বর্তমান এশিয়ার জীবনধারা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। এইভাবে দুটি দেশের মধ্যে বোঝাপড়া ও মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলেও তিনি আশা করেন।

পুতুল নাচের প্রক্রিয়া

।। ছোট রেডিও ।।

কোলকাতা শহরে ছোট রেডিও দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে। এর মধ্যে অনেকগুলিই বড় রেডিওর কিঞ্চিৎ ছোট সংস্করণ। এগুলি ঘরে রাখলেই শোভা পায়। ছোট রেডিও খুবই ছোট হবে। সহজে বহন করা যায়। তাছাড়া পকেটে **অথবা হাতের মধ্যে** সহজে লুকিয়ে রাখা যায়। এ দৃশ্য বিশেষ করে জাপানেই **বেশী দেখা যায়।** অনেক সময় আপনি **চমকে উঠবেন, কারণ আপনি** আশেপাশের কোন জায়গা থেকে শব্দ আসছে দেখতে পাবেন না। জাপানে বর্তমানে **ছোট রেডিও তৈরীর প্রতিযোগিতা চলছে। আর** আপনি কোলকাতায় **সচরাচর ছোট ছোট** বাক্স দেখতে পাবেন অনেকের হাতে। তা যেমনি দৃষ্টিকটু তেমনি অশালীন বলে মনে হয়।

টোকিওতে এমন একটি রেডিও **তৈরী করা হয়েছে যাকে পৃথিবীর সব থেকে ছোট** আকারের রেডিও বলা যায়। **জাপানের রেডিও কারিগর আর বিশেষজ্ঞরা** এবিষয়ে অনেকদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন। এই ছোট আকারের রেডিওটির নাম দেওয়া হয়েছে "মাইক্রোনিক রুবি"। এর উচ্চতা ৪৮ মি. মি: ৪৩ মি. মি. চওড়া এবং ২০ মি. মি গভীর। মোট ওজন ৮৫ গ্রাম। রেডিওটির আকৃতি সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। যে কোন রেডিওর সঙ্গে এ সমানতালে চলতে পারে। যেমন স্বরের স্পষ্টতা রয়েছে তেমনি রয়েছে দীর্ঘদিন টিকে থাকবার ক্ষমতা। এই সমস্ত রেডিওর পাশে কলকাতার বাক্স-মার্কা রেডিও কেমন দেখায়!

।। যন্ত্র সাহায্যে অনুবাদ ।।

আমেরিকার ওয়াশিংটনস্থিত জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী উদ্যোগে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা রবোট ট্রানস্লাটারের সাহায্যে অনুবাদ করা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এই সকল যন্ত্র সাহায্যে সাহিত্যাদি বিষয়ের তুলনায় বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের অনুবাদ অনেকখানি সহজ।
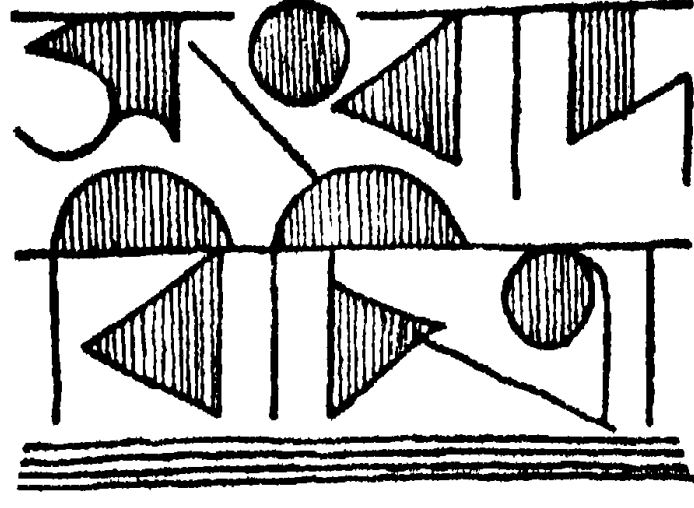
প্রকৃতপক্ষে এরা হচ্ছে একএকটি কম্প্যুটার। ভাষাতত্ত্ববিদগণ এতে প্রতিটি শব্দের জন্য প্রতিশব্দ জুগিয়ে থাকেন। অনুবাদ খুবই দ্রুত হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ৫০ হাজার শব্দসম্বলিত জৈব রসায়ন বা অর্গানিক কেমিস্ট্রির একখানা পুস্তকের অনুবাদ এই যন্ত্র সাহায্যে করা হয়েছে। এই অনুবাদকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক বলা না গেলেও অনেকটা সন্তোষজনক হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত কাঁচা, মার্জিত নয়। এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞদের অভিমত যন্ত্র সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের অনুবাদ সাহিত্যাদি বিষয়ের তুলনায় এই কারণেই অনেকখানি সহজ যে, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুবাদের শব্দসংখ্যা সাহিত্যাদি বিষয়ের তুলনায় কম হয়ে থাকে। এছাড়া লাতিন হতে উদ্ভত বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ বহু দেশে প্রচলিত এবং বাক্যগঠনে সাহিত্যের মত বিশেষ ইডিয়ম বা বাগধারার প্রয়োজন হয় না।

॥ শব্দের অনুরূপ গতিসম্পন্ন বিমান ॥

সম্প্রতি কনভেয়ার ৯৯০ নামে এক-প্রকার নতুন ধরনের শব্দের অনুরূপ গতিসম্পন্ন বিমান নির্মাণের পরিকল্পনাকে রূপদান করা হচ্ছে। ঘণ্টায় এর গতি হবে ৬৪০ মাইল এবং চারটি জেট ইঞ্জিন দিয়ে চালান হবে। প্রত্যেকটি ইঞ্জিন ১৬১০০ পাউণ্ড ধাক্কা সৃষ্টি করবে। কনভেয়ার ৮৮০ই বর্তমানে সর্বাধিক দ্রুতগামী বিমান। প্রতি ঘণ্টায় এর গতি হচ্ছে ৬১৫ মাইল।

।। টেলিফোন এ্যামপ্লিফায়ার ।।

নতুন নতুন ব্যবহারযোগ্য জিনিসের আবিষ্কার আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জটিলতাকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে। এক হাতে টেলিফোন ধরে অন্য হাতে কিছু লেখা বা কোন কাগজপত্র খুঁজে দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এভাবে কাজ করা খুব আরামদায়ক নয়। বর্তমানে এমন এক ধরনের টেলিফোন অ্যাম্পিফায়ার তৈরী হয়েছে, যাতে শ্রোতাকে সবসময়েই টেলিফোনটি কানের কাছে ধরে রাখতে হয় না। শ্রোতা ইচ্ছে করলে টেলিফোনটি রেখে দিয়ে কিছু লিখতে পারেন বা খুঁজতে পারেন। ব্যবহৃত টেলিফোনটি থেকে যে শব্দ বেরিয়ে আসবে তা থেকে অপরদিকের বক্তব্য শোনা যাবে। পশ্চিম জার্মানীর এসেনের একজন উৎপাদক দুটি আকারবিশিষ্ট নতুন এক ধরনের টেলিফোন এ্যামপ্লিফায়ার তৈরী করেছেন। এগুলির দাম হল ৯৮ এবং ১২৮ মার্ক (যথাক্রমে ২৫ ও ৩২ ডলার বা ৯ ও ১২ পাউণ্ড)। এই এ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে টেলিফোনের আলোচনা এতো বাড়ানো যায় যে, উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পারে।

।। কাগজ ও পারমাণবিক শক্তি ।।

যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল নিউক্লিয়নিক্স কর্পোরেশন এমন একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার সাহায্যে সামান্য একটু পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার দ্বারাই কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সাধন করা হবে। কাগজ তৈরী হবার সময় এই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাগজকে মোলায়েম করে দেয় এবং ওজনের সমতা রক্ষা করে।

পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যের জন্যে উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থায় পারমাণবিক রশ্মি বিচ্ছুরণ করা হয়। উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কাগজের কলে যখন লম্বা হয়ে কাগজ বেরিয়ে আসে তখন এই যন্ত্রটি কাগজের উপর-নীচ উভয় পার্শ্বেই আগু-পিছু করতে থাকে। এই সময় যন্ত্রটিতে স্ট্রনসিয়ামের যে পরমাণু কণিকাটি থাকে তা থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মিটি কাগজ ভেদ করে যাবার সময় কাগজ কতটা পুরু তা ধরা পড়ে। কাগজের ঘনত্ব কম-বেশী হলেই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালবগুলির সামঞ্জস্যবিধান করে কাগজের মণ্ডের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে কাগজের ঘনত্বে আর কোন তারতম্য থাকে না।

এ ছাড়া এই যন্ত্রের মাধ্যমে কাগজের গড়পড়তা ওজন পাওয়া যায় এবং এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি কাগজ প্রস্তুতের জন্য মোট কতটা মণ্ড কলে ঢুকবে তাও নিয়ন্ত্রণ করে। যন্ত্রটির নির্মাতা বলেছেন যে, এই নতুন ব্যবস্থার ফলে ইতিমধ্যেই আমেরিকার কাগজ প্রস্তুত শিল্পে প্রচুর সাশ্রয় হচ্ছে।

বিভ্রান্ত যৌবন

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ বা জাতির প্রধান ভরসাস্থল যুবশক্তি যখন সাংগঠনিকমূর্তি ত্যাগ করে সংহার মূর্তি পরিগ্রহ করে—তখনই বোধ হয় জাতির জীবনে ভয়াবহ দুর্দিন উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবী অপচয়িত যৌবনের সমস্যায় চিন্তাকুল। শুধু য়ুরোপের সমাজ-বিজ্ঞানীরাই এ সমস্যায় বিব্রত নয়, ভারতবর্ষেও আমরা এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। 'টেডি বয়' বা 'রকের ছেলেদের' সমস্যার স্বরূপ সন্ধান ও ব্যাধির প্রতিকারের চিন্তা আমাদের করতেই হবে।

প্রথমে য়ুরোপে সমস্যার ধরণটা আলোচনা করে দেখলে সুবিধা হবে। বিভিন্ন দেশে এদের বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। ইংলণ্ডে বলে টেডিবয় (Teddy boys), জার্মাণীতে হ্যাবস্টার্কেন (Halbstarken), ফ্রান্সে ব্লুসোঁনয়ার (Blousousnoirs), বা কালোকোর্তার দল, জাপানে তাই-য়োজকু, অস্ট্রেলিয়ায় Bodgies, সোভিয়েটে স্তাইলিয়াগি ব্যবহৃত হয় মার্কিণী কায়দায় ব্যসনপ্রিয় ও ইয়াঙ্কী সঙ্গীত-আসক্ত যুবকের প্রতি। নামে ভেদ থাকলেও প্রকৃতি ও কর্মপন্থায় অভিন্ন। এদের বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৪-২১র মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা লক্ষ্যহীন বিদ্রোহ এদের কৌল লক্ষণ। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন উন্নত পরিবর্তন তারা চায় না; তারা সব কিছুকে নষ্ট করেই উল্লাস বোধ করে; এক কথায় বলা যায় তাদের ধর্ম নেতিবাচক।

আমাদের দেশে এই বিপথগামীতার প্রধান কারণ যে দারিদ্র্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু মাত্র দারিদ্র্যই যে এর একমাত্র কারণ নয় এবং এই সমস্যা সমাধানে বোধ হয় আর্থিক উন্নতিই এক-মাত্র বিষহর নয়। য়ুরোপের 'টেডিবয়রা' আমাদের 'রকফেলারদের' মতো দারিদ্র্য-নিপীড়িত নয়। তবু কেন সেখানে এ সমস্যা দিন দিন বাড়তির মুখে! যদি বলা যায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের প্রভাবই এর জন্য দায়ী তবে প্রশ্ন উঠবে পুরো খবর পাওয়া না গেলেও, সোভিয়েট রাশিয়াও এ সমস্যা মুক্ত নয়।

প্রথম অবস্থায় মনে হয়েছিল এটা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল; সভ্যতার ছিন্নমস্তা-

রূপে যৌবনের সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছিল আর তার সমস্ত প্রাণপ্রবাহকে বিপরীতমুখী করে তুলেছিল। এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য, তথাপি পর্যালোচনা করে দেখা গেল যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন যার সর্বাঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণে প্রকট—সেই জার্মাণীতে যুদ্ধ শেষ হবার প্রথম পর্বে 'টেডিবয়' সমস্যা চিন্তার কারণ হয়নি বরং বলা চলে ভাঙ্গা জার্মাণীকে গড়বার কাজে যুবশক্তি আত্মনিয়োগ করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জার্মাণী যতই সমৃদ্ধ হতে আরম্ভ করল ততই এই সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিল। অথচ আপাতঃ-দৃষ্টিতে এটাকে আশ্চর্যই মনে হয়। ফ্রান্সে অবশ্য প্রথম যুগে এ সমস্যা যতখানি ভয়াবহ ছিল এখন তার চেয়ে অনেকটা সংযত। অথচ ইংলণ্ড ও আমেরিকা এই সমস্যায় দিশাহারা। সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকা অপচয়িত যৌবনের সমস্যায় চিন্তাকুল—এর কারণ কী? বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাটিকে দেখছেন।

প্রথম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে সভ্যতার অভিমান নিঃস্ব হয়ে গেল, ফলে দেখা দিল একটা তীব্র নৈরাশ্য। দ্বিতীয়তঃ আর একটা বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় বর্তমানকে প্রগাঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, তৃতীয়তঃ বর্তমান যুগে য়ুরোপের সাংস্কৃতিক শক্তি আমেরিকার আর্থিক সঙ্গতির কাছে বিক্রীত অর্থাৎ আজকের আমেরিকা শুধু আর অর্থ নয়, সংস্কৃতি দিয়ে য়ুরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমেরিকাই সেই আদর্শ জগৎ যেখানে যন্ত্রের প্রচণ্ড শক্তিকে অর্থ দিয়ে বশ করে ভোগলালসার চরম নিবৃত্তি ঘটান যায়। শুধু য়ুরোপই বা কেন, আজকের এশিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে আমেরিকাকেই

গুরু করতে চাইছে। তাই দেখতে পাচ্ছি জাপানেও অপচয়িত যৌবনের সমস্যার তীব্রতা আজ এত বেশি। এই যুব-সমস্যা আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছে। এখন ওদেশের সঙ্গে এদেশের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ওদেশের ছেলেমেয়েরা যুদ্ধের প্রচণ্ড রূপকে প্রত্যক্ষ করেছে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা তা করেনি বটে তবে দাঙ্গা এবং দেশ-বিভাগের ঘূর্ণিঝড়ে তারাও সব হারিয়েছে। প্রচলিত ভাবাদর্শগুলোর প্রতি নিষ্ঠা কাজে কাজেই দুপক্ষেই অনুপস্থিত। আমাদের ছেলেমেয়েরা অর্থের অভাবে, বেকারীর জ্বালায় যখন জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে, ওদেশে তখন দেখছি নাবালকদের হাতে অর্থের প্রাচুর্যই তাদের মত্ত করে তুলেছে। আমাদের দেশে নিরক্ষরতার অভিশাপ, অথচ ওরা সাক্ষর হয়েও অসংযত। আমরা যে সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি (এবং মূলতঃ ওদেরই দুর্বল ছাঁচে) সেই অবস্থার বাইরে গেলেই যে সব সমস্যা মিটবে তাত মনে হয় না। ওদেশের তুলনায় আমাদের পারিবারিক বন্ধন অবশ্য এখনও অনেক দৃঢ়। পরিবার থেকে বেশ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠলে মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ফূরণ হয় না। মানুষ স্বার্থপর এ কথাও যেমন সত্য, সে ভালবাসা পেতে চায় এবং দিতে চায় একথাও তেমনি মিথ্যা নয়। পারিবারিক ভিত্তির আর একদিক শাসনের ভয়। স্নেহের বন্ধন এবং শাসনের ভয় দুদিকেই নিরঙ্কুশ বেপরোয়া হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাই পরিণতি।

নানা রকমের সমাধানের কথা সমাজবিজ্ঞানীরা ভাবছেন। কেউ বলছেন পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় কর; কেউ বলছেন এত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী হতে না দিয়ে আরও কিছুকাল তাদের পাঠ্যজীবন চলুক, কেউ বলছেন ইয়াঙ্কী সিনেমা (আমাদের হিন্দী সিনেমা) ও ভাবধারার কুপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা হোক ইত্যাদি। এগুলি সবই সত্য, কিন্তু একটা প্রশ্ন বিশেষ করে ভেবে দেখতে হবে—আজকের যে যন্ত্রসভ্যতার আমরা গৌরব করছি, সেই যন্ত্রের সার্বিক দাসত্বই আমাদের অনেকখানি যন্ত্র করে তুলেছে কিনা। মানুষের উন্নতির জন্য যন্ত্রের ব্যবহার নয় এ যেন সমস্ত মানবসমাজকেই যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের প্রকৃতি-বিজয় সম্পূর্ণ করতে মানবপ্রকৃতিকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। বোমা বিস্ফোরণের বিভীষিকা আমাদের বিজয় গৌরব।

এই অবস্থায় আমাদের যারা দেশকে নতুন করে শিল্পোন্নত করতে চলেছে, তাদের চিন্তা করতে হবে কি করে যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও মানবিক গুণকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষকে মানুষ রাখার জন্য, তাকে অন্য কিছুতে পরিণত করার জন্য নয়। বর্তমান যুগে মার্কিণী সভ্যতাই প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত: তার কতকগুলো মৌল লক্ষণ ঐতিহ্যহীনতা, দেহগত ভোগের জন্য আদিগন্ত ছোটাছুটি দুর্বার গতি। এই গতির বেগ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; তাই মার্কিণী জীবনযাত্রার অনুশীলনই প্রগতিশীল হওয়ার উপায় (সোভিয়েট সমাজের উন্নতির লক্ষ্য ও মার্কিণী উৎপাদনের টার্গেট)। এই অবস্থার একটা সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কিনা সেইটাই ভারতীয় সভ্যতার নবরূপায়ণের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী
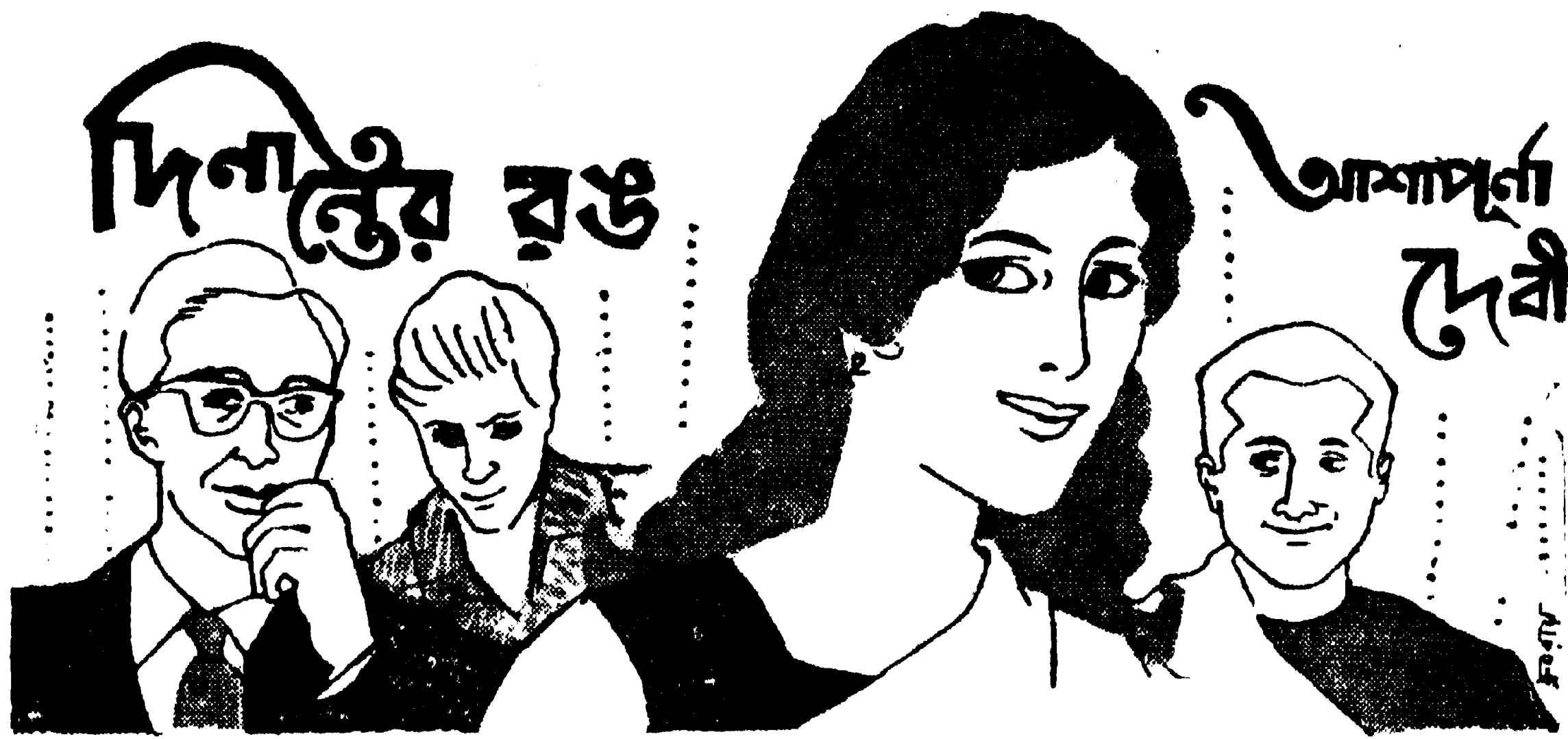
(উপন্যাস)

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

'বাইরে একটা কাজ পাচ্ছি আমি।'

নিরঞ্জন এসে অকারণ রূঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে তার নতুন খবরটা।

সুচিন্তা কুটনো কুটছিলেন থতমত খেয়ে বঁটিটা কাৎ করে উঠে এসে ছেলের কথারই পুনরাবৃত্তি করেন, 'বাইরে একটা কাজ পাচ্ছ!

'হ্যাঁ!'

'কোথায়!' প্রশ্ন নয়, শুধু উচ্চারণ।

'কোন এক জায়গায়!' টুকরো কথা। যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলা হয়ে না যায়। জায়গাটার নাম বলারই বা দরকার কি! কোন একটা জায়গায়, এই বললেই যথেষ্ঠ!

সুচিন্তা কী বলবেন! তিনি কি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করবেন ছেলেকে, 'কেন তুই হঠাৎ বাইরে চলে যাবি?' না কি প্রশ্ন করবেন, 'কেমন সেই কাজ, এখানের চাইতে ভাল? মাইনে বেশী? থাকবার ব্যবস্থা আছে তো?'

না এসব সহজ মাতৃহৃদয় সুলভ প্রশ্ন করবার উপায় নেই সুচিন্তার। কারণ সুচিন্তা তাঁর ছেলেদের সুলভ সাধারণ করে মানুষ করেননি। তাই, একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'একেবারে ঠিক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ!'

'নিরুকে বলেছ নাকি?'

'বলবার কোন দরকার আছে?'

'না দরকার আর কি!' সাবধানে একটা নিশ্বাস চেপে ফেলেন সুচিন্তা।

'অনুমতি নিতে বলছ?'

এক টুকরো বিদ্রূপের হাসি ঝলসে ওঠে নিরঞ্জনের মুখে।

'অনুমতি!'

একটু অবাক হন সুচিন্তা।

'কি জানি, বড় ভাই! গুরুজন!'

সুচিন্তা চুপ করে থাকেন।

'রাত্তির নটার গাড়ী!' বলে নিরঞ্জন উল্টোমুখো হয়, কিন্তু সুচিন্তা বোধ-করি অনুপম কুটিরের ধৈর্য আর বজায় রাখতে পারেন না, তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত বলে ওঠেন, 'আজকেই যাবে?'

'হ্যাঁ আজই তো। পর্শু জয়েন করতে হবে।'

মায়ের এই আর্তস্বরটা কি একটু নাড়া দেয় নিরঞ্জনকে? তাই সে একটু বেশী কথা বলে? 'পর্শু জয়েন করতে হবে' এটুকুও তো না বললে চলতো।

'বাইরে চলে যাবার কি খুব দরকার হয়েছিল?' সুচিন্তা বলেন আস্তে থেমে থেমে 'এখানকার কাজটা তো খারাপ ছিল না!'

নিরঞ্জন সহসা রূঢ় ব্যঙ্গের স্বরে বলে ওঠে 'না, এখানকার কাজটা হয়তো খারাপ ছিল না, কিন্তু সমস্ত 'এখানটা' অসহ্য হয়ে উঠেছে মা! এই অসহ্য জায়গাটার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আধা মাইনেয় অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে আমায়।'

নিরঞ্জন নিজের ঘরে চলে যায়।

সুচিন্তা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে। আকাশে মেঘ আনাগোনা করছে। বিচক্ষণ লোকেরা বলে থাকেন জীবনটা ওই আকাশের মত। সেখানে সুখদুঃখের মেঘ আসা-যাওয়া করে মাত্র স্থায়ী নয় কিছুই।

শাদা মেঘকে শাদা আর কালো মেঘকে কালো ভেবে উতলা হবার কিছু নেই, ওরা যে বাষ্পপিণ্ড সেটাই আসল কথা। ওরা আসবেই। আসবে আবার চলে যাবে।

আকাশকে বিক্ষত করবার সাধ্য ওদের নেই।

সুচিন্তা কি ওই আকাশের মত হবেন?

কখন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুশোভন, কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন চমক ভাঙল তাঁর কথায়। 'তোমার ছেলে তোমায় বকল কেন সুচিন্তা?'

সুচিন্তা তাড়াতাড়ি বললেন, 'কই বকেনি তো?'

'বকেনি? তবে তুমি মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'না মন খারাপ কেন? মন খারাপ তো করিনি।'

সুশোভন আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'বললে শুনবো কেন?

আমি দেখছি মন খারাপ! আমি জানি ওরা তোমায় বকে। চলো না সুচিন্তা আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

সুচিন্তা ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, 'চলে যাব? কোথায় চলে যাব?'

সুশোভন চুপিচুপি বলেন, 'এই যেখানে তোমার ওই ছেলেরা নেই। শুধু তোমাতে আর আমাতে গল্প করবো, ওরা আমাদের দিকে কটমট করে তাকাবে না!'

সুচিন্তা সুশোভনের চোখের দিকে অপলকে মুহূর্ত কয়েক চেয়ে থাকেন, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'ওরা আমাদের দিকে কী ভাবে তাকায়, তুমি বুঝতে পারো?'

'পারবো না!' সুশোভন অসহিষ্ণু-ভাবে বলেন, 'আমাকে কি কানা পেয়েছ সুচিন্তা? আমি সব দেখতে পাই।'

'সব দেখতে পাও তুমি? সব বুঝতে পারো?' সুচিন্তা সহসা বিচার-বিবেচনা ভুলে সুশোভনের বুকের ওপর মাথাটা রাখেন, আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'আমার কত যন্ত্রণা বুঝতে পারো? দেখতে পাও আমার কী কষ্ট?'

সুচিন্তা কি ভুলে গেলেন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছেছেন!

'আমার ট্রেনের খাবারের জন্যে কোনো হাঙ্গামার—'

হ্যাঙ্গামার দরকার নেই—এই কথাটাই হয়তো বলতে আসছিল নিরঞ্জন, থেমে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল, অস্ফুটে কী একটা শব্দ উচ্চারণ করে বিদ্যুৎবেগে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

কী বলল ও?

'অসহ্য!'

'রাবিশ!'

'কুৎসিত!'

শব্দ শুনতে পেয়েছেন সুচিন্তা, কথা বুঝতে পারেননি।

সুশোভন বুকের ওপর এসে-পড়া সুচিন্তার মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরলেন না, আস্তে আস্তে দু'হাতে ঠেলে দিলেন। সাবধানে বললেন, "দেখলে তো সুচিন্তা? আমি বলিনি? বলিনি তোমার ছেলেরা কেমন করে যেন তাকায়।'

'তাকাক। তাকাক! যে যেমন করে ইচ্ছে তাকাক!' সুচিন্তা তীব্র আবেগের স্বরে বলে ওঠেন, 'আমরা আর সেদিকে তাকাব না। আমরা আর ভাববো না—কে কী ভাবলে। চলো সত্যিই আমরা কোথাও চলে যাই।'

সুশোভনও তো এই ক্ষণকাল আগে বলছিলেন, 'চলো সুচিন্তা আমরা কোথাও চলে যাই।' কিন্তু এখন আর সায় দিলেন না, উৎফুল্ল হলেন না, কেমন একরকম স্বরে বললেন, 'রোসো সুচিন্তা, আগে ভাবি। মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার ছেলে রাগ করল! ভাবতে দাও আমাকে, ভাবতে দাও।'

ভাবতে দাও।

পাগলে কি ভাবতে পারে?

নাকি ভেবে ভেবেই পাগল হয়ে যায়?

সুচিন্তা কি তাই ক্রমশঃ পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

'লোকচক্ষু' নামক ভয়ঙ্কর বস্তুটাকে অগ্রাহ্য করবার সংকল্প গ্রহণ করছেন কেন, অমন দৃঢ়-কঠোর মুখে! পাগল না হলে তা' করে কেউ?

'ডাক্তার পালিত কাল একবার ও'কে নিয়ে যেতে বলেছেন!'

কাছাকাছি এসে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারণ করে নিরুপম। সম্বোধন করে না কাউকে। 'উনি'টা কে, সে সম্পর্কে নামোল্লেখ করে না।

তবু উত্তর সুচিন্তাকে দিতেই হয়।

না দিয়ে উপায় কোথা?

'বেশ তো নিয়ে যেও। কখন যেতে বলেছেন?'

'ওই যেমন যান এগারটার সময়।'

'কলেজ নেই তোমার কাল?' সুচিন্তা সাবধানে প্রশ্ন করেন।

'থাকলে আর কি করা যাবে?' নিরুপম উত্তর দেয়, 'যেতে তো হবেই।'

সুচিন্তা একটু থেমে বলেন, 'ঠিকানা বলে দিলে, সুবলকে সঙ্গে করে আমি নিয়ে যেতে পারবো না?'

'তুমি!'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?'

'তেমন দরকার পড়লে চেষ্টা কোরো', নিরুপম মৃদুস্বরে বলে, 'দাঁতা এ-ভারগুলো আমায় দিয়ে গিয়েছে। মানে আর কি অনুরোধ করে গেছে—'

'আচ্ছা! তাহলে শোনো, ডাক্তারকে বোলো, ও'র খিদে-টিদেগুলো বড্ড কমে গেছে।'

'বলব। তবে ওদিকে তো বিশেষ দৃষ্টি দিতে দেখি না ডাক্তারকে।'

'দৃষ্টি দিতে দেখ না?'

'না। শুনলেও গ্রাহ্য করেন না। বলেন, 'ওতে কিছু আসে যায় না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে আমার একবার দেখা করতে ইচ্ছে করে।'

নিঃশ্বাস ফেলে বলেন সুচিন্তা।

'দেখা করার আর অসুবিধে কি।' নিরুপম বলে। কিন্তু এ-কথা বলে না, 'বেশ তো মা, চল না, কালই চল না আমার সঙ্গে।'

সুচিন্তা আর একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'নিরঞ্জন তোমায় কিছু বলেছে?'

'নিরঞ্জন! আমায়!—কি বিষয়ে?'

'ও আজ চলে যাচ্ছে—'

'চলে যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ চলে যাচ্ছে। কোথায় যেন চাকরী নিয়ে।'

'আজ চলে যাচ্ছে! কোথায় যেন চাকরী নিয়ে।' অবাক না হয়ে পারে না নিরুপম।

সুচিন্তা কঠিনস্বরে বলেন, 'হ্যাঁ, এইমাত্র জানিয়ে গেল আমায়। এখানকার কাজ থেকে অর্ধেক মাইনেয় চলে যাচ্ছে এখানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে বলে।'

নিরুপম কথা বলে না। শুধু মার দিকে চেয়ে থাকে।

সুচিন্তা আবার বলেন, 'হয়তো তোমারও একদিন এখানটা অমনি অসহ্য হয়ে উঠবে, অসহ্য হয়ে উঠবে ইন্দ্রর—সেদিন তোমরাও এখানটাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাইবে!'

'নিরঞ্জনকে কি তুমি দোষ দিচ্ছ?'

নির্লিপ্ত প্রশ্ন করে নিরুপম।

'না, দোষ দেব কেন? দোষ দেবার কী আছে? অসহ্য হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু বলতে পারো—এ-অবস্থায় আমার আর কি করবার

ছিল? অন্য কেউ হলে, অন্য কী করতো?'

'আমি তো তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইনি মা।'

সহসা সুচিন্তা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন অনেক প্রশ্নে, 'কেন চাও না? চাওয়াই তো উচিত। তোমরা বড় হয়েছ তোমরা আমার অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চাইতে পারো না? আমার বোকামীতে পরামর্শ দিতে পারো না? আমার—'

'আমি কারুর কোন কিছুকেই অন্যায় ভাবি না। যে যার নিজের বিচারে চলবে, এইটাই তো স্বাভাবিক। আর বোকামী? তাই বা ভাববো কেন, সাঁতা যে বোকা নয়, তার ব্যাপারে।'

সুচিন্তা বিক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, 'নিরঞ্জন চলে যাবে, তোমরা কেউ ওকে আটকাবে না।'

'আটকাবার কি আছে? ছেলেরা কি বিদেশে চাকরী করতে যায় না?'

'এইভাবে যায়?'

নিরুপম একটু হাসে, 'যাওয়ার ভাবটায় আর কতটুকু কী এসে যায় মা? যাওয়াটাই সত্য।'

সুচিন্তা তেমনি উদ্বেল স্বরে বলেন, 'নীতা যা খুসি করল, নীতা দায়িত্বমুক্ত হয়ে শুধু নিজের কথা ভেবে চলে গেল। আমি এখন সুশোভনকে নিয়ে কী করবো তাই বল।'

'নতুন করে তো করবার আর কিছু নেই মা। আর তুমি কী করবে—এ-প্রশ্ন এখনকার নয়। এ-প্রশ্ন ছিল প্রথম দিনের।'

সুচিন্তা স্তিমিত হয়ে যান, ঠাণ্ডা হয়ে যান। নিস্তেজ স্বরে বলেন, 'আচ্ছা থাক ও-কথা। তবে এইটুকুই জানিয়ে রাখি, সুশোভন আজকাল একটু যেন বুঝতে পারছে। অবহেলা, অসম্মান, বিরূপতা—এগুলো ধরতে পারছে ও।'

নিরুপম একটু চুপ করে থেকে বলে, 'অবহেলা, অসম্মান! আমার দিক থেকে অন্ততঃ এ-প্রশ্ন ওঠেনি, উঠবেও না। তবে অন্যের কথা আমি কি বলব!'

সুচিন্তা কি আজ ছেলের সংগে ঝগড়া করবেন স্থির করেছেন? যেমন করেছিলেন একদিন শোবার ঘরের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে?

সব ছেলেদের সংগেই দূরত্ব আছে, তবু নিরুপমের সংগে দু'-একটা কথা কওয়া চলে। ওরা তো কথা কইতেই দেয় না। কিন্তু কথা চলে বলেই কি কলহ চালাতে চাইবেন সুচিন্তা? 'অবহেলা, অসম্মান হয়তো কর না, কিন্তু ওর প্রতি সন্তুষ্টও নও তোমরা।' তাই বলেন—প্রকাশ্যে।

অভিযোগের সুরেই কথাটা বলেন সুচিন্তা।

'সন্তুষ্ট!'

নিরূপম বলে, 'সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টের প্রশ্ন এতদিন পরে উঠছে কেন বুঝতে পারছি না। আমাদের সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টে কী এসে যায়? নিজের তোমার কি নতুন করে কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'আমার অসুবিধে? আমার অসুবিধের কথা বলছি আমি?' সুচিন্তা আরক্ত মুখে বলেন, 'আমার বক্তব্য হচ্ছে সুশোভনের যেন আজকাল এক-আধ সময় চেতনা ফিরছে, সেই সব সময় যদি ওর প্রতি অনাগ্রহ, অগ্রাহ্য দেখে, হয়তো আহত হয়ে আবার—'

'আমাকে কি করতে বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সুচিন্তা বলে ওঠেন, 'কঠিন কোন পরিশ্রমের কথা বলছি না, একটু সহৃদয়-ভাবে কথা, একটু নরমভাবে তাকানো, এইটুকুতেই—'

নিরুপম ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'চেষ্টা করব। যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। তবে খুব বেশী একটা কিছু যদি আশা কর, কথা দেওয়া শক্ত।'

'আশা করব? খুব বেশী আশা করব আমি তোমাদের কাছে? না নিরু, পৃথিবীর কোথাও কারো কাছে কোন আশা আমি করি না, শুধু একটা অসুস্থ মানুষের জন্যে—একটু করুণা ভিক্ষে করছি—'

নিরুপমের মুখে সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠল, 'অসুস্থ মানুষদের কথা ভেবে ভেবে সুস্থ মানুষেরা যদি অসুস্থ হয়ে ওঠে, কাকে আর করুণা করা যায় বলো? করুণা বস্তুটাই মন থেকে শুকিয়ে যায় শেষ অবধি।'

সুচিন্তা ওই সূক্ষ্ম হাসির জ্বালাটা কি পরিপাক করলেন? না, তা করলেন না। হয়তো করতে পারলেন না। তীক্ষ্ণ-স্বরে বলে উঠলেন, 'শুকিয়ে কি আর যায় নিরু? তা' যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে আবার পাত্র উপ্‌ছে পড়ে করুণার ধারা। শুধু গুরুজনকে অপদস্থ করতে পারাই তোমাদের এ-যুগের মস্ত বীরত্ব। তাই নিরঞ্জন 'কোথায় যাচ্ছি' এটুকু পর্যন্ত না বলে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়, ইন্দ্র... একটা মেয়ের সংগে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়, আর তুমি—'

'আমার কথা থাক মা! আমি যেমন ছিলাম, তেমনিই থাকবো।' বলে চলে যায় নিরুপম।

সুচিন্তা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কিন্তু কতক্ষণই বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পান সুচিন্তা। ঘড়ি জানিয়ে দিল সুশোভনের স্নানের সময় হয়েছে। সেকথা ভুলে বসে থাকবেন, এ বিদ্রোহের উপায় নেই সুচিন্তার।

মাকড়সার মত নিজেই যে সুচিন্তা নিজের মৃত্যুর ফাঁদ রচনা করেছেন।

নিরঞ্জন চলে যাচ্ছে, বাড়ী স্তব্ধ।

সুবল চাকরটা পর্যন্ত বেডিং সুটকেস নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। নিরঞ্জনের এই চলে যাওয়াটা সংসারের সহজ রীতিতে বিদেশে চাকরী করতে যাওয়া নয়, এটাই যেন ধরে ফেলেছে ওরা সবাই।

ইন্দ্রনীল কৃষ্ণাদের বাড়ীর সংগে কোথায় যেন পিক্‌নিকে গিয়েছিল সেই ভোরবেলা, এখন ফিরল। আর ফিরে অবাক হয়ে গেল নিরঞ্জনের যাত্রার আয়োজনে।

ইন্দ্রনীলের আজকাল কথা কয়ে কয়ে কথা বলার ভয়টা ঘুচে গেছে, ঘুচে গেছে আড়ষ্টতা। তাই দ্রুত ভংগীতে বলে, 'ব্যাপার কি মেজদা? এর মানে?'

নিরঞ্জন বলে, 'মানে ব্যাখ্যা করবার কি আছে? বাইরে একটা কাজ পেয়েছি, চলে যাচ্ছি।'

'বাইরে? কোথায়?'

'ব্যাংগালোরে।'

ঘরের মধ্যে থেকে শুনতে পান সুচিন্তা, এতক্ষণে জানতে পান কোথায় যাচ্ছে তাঁর ছেলে।

ইন্দ্রনীল বলে, 'তা' মন্দ নয়। বেশ কেটে পড়ছ বাবা। বেঁচে যাচ্ছ।'

সুচিন্তা শুনতে পাচ্ছেন তাঁর ছোট ছেলের কথা। বাড়ী ছাড়তে পেয়ে বেঁচে যাচ্ছে তার মেজদা, তাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এর উত্তরে নিরঞ্জন কি বলল সুচিন্তা শুনতে পেলেন না। নিরঞ্জনের স্বর ভারী খাদে। আবার ইন্দ্রনীলের তরতরে গলার কথা বেজে উঠছে, 'আমার জন্যেও একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখগেনা। আমিও তাহলে পথ দেখি।'

পথ দেখতে চাইছে সুচিন্তার ছেলেরা। বিদেশে যেমন তেমন একটা চাকরী পেলেই তাদের পথের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

'তুমি তো ভালই আছ।'

নিরঞ্জন বলছে ছোট ভাইকে।

'ভালই বটে! যতটা সম্ভব বাড়ীর বাইরে থাকা যায় তার সাধনায় যা হয় তাই করে বেড়াচ্ছি। নেহাৎ খাওয়া শোওয়ার বন্ধনটাই এখনো বেঁধে রেখেছে, ওবিষয়ে একটা সুরাহা হলে, আর এক ঘণ্টাও থাকি না।'

এবার নিরঞ্জনের বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠ ঝলসে ওঠে, 'কেন তোমার আর এত অসহ্য কিসের? তোমাকে তো খুব নীতিবাগীশ মনে হয় না।'

'নীতি দুর্নীতি বুঝি না মেজদা, যা ভাল লাগে না তা সয় না, এই হচ্ছে শাদা কথা। থাকগে মরুকগে। চল তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। খাওয়া হয়ে গেছে তোমার?'

'স্টেশনে খেয়ে নেব।'

'স্টেশনে খেয়ে নেবে। কেন এখন তো আটটা বাজে, অনায়াসেই—'

'নাঃ। সেটাই সুবিধে। সুবল, এগুলো নামাও।'

সুবল সবিনয়ে নিবেদন করে আগে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে ভাল হ'ত না।

নিরঞ্জন বলে, 'না না বেরিয়ে পড়ে ধরে নেওয়া যাবে। ইন্দ্র তুমি যাবে তো চলো। অবশ্য দরকার কিছু ছিল না।'

'দরকার তোমার নয়, আমারই। ঠিকানাপত্র জেনে নেওয়া দরকার। কে বলতে পারে কোনদিন কলকাতা ছেড়ে তোমার বাসাতেই গিয়ে হাজির হই কিনা। আমার তো রীতিমত হিংসে হচ্ছে তোমার ওপর।'

নিরঞ্জন কী চাকরী জোগাড় করেছে, কী তার ভবিষ্যৎ, এসব না জানলেও চলে ইন্দ্রনীলের, নিরঞ্জন বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারছে, এইটাই সার কথা। এর জন্যেই হিংসে করা চলে নিরঞ্জনকে।

'ট্রেনের সময় হয়ে গেছে আমার।'

এটুকু বলেছে নিরঞ্জন।

মায়ের দরজার কাছাকাছিই এসে দাঁড়িয়ে বলেছে।

তা' এইটুকুই যথেষ্ট বৈকি।

নিরপেক্ষ কেউ উপস্থিত থাকলে নিরঞ্জনকেই প্রশংসা করত। ছেলের

বিদেশযাত্রার সময় যে মা নিজের অহংকার নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকে, উতলা হয়ে এসে কাছে দাঁড়ায় না, সে মাকে সহানুভূতি করবে কে? দশে-ধর্মে ছি ছি-ই করবে তাকে।

শাস্ত্রে নেই, 'স্নেহনিম্নগামী!'

প্রবাদে বলছে না, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়—'

ঢের করেছে নিরঞ্জন, ওইটুকু বলে।

কিন্তু ছি ছি! সুচিন্তা কী করলেন!

তবু ঘরে বসে রইলেন!

বেরিয়ে এলেন না! যাত্রাকালে একবার আশীর্বাদ-বাণী উচ্চারণ করলেন না! ছোট্ট ওই ঘরটার মধ্যে বসে কী করছেন এখন তিনি!

বেরিয়ে যিনি এলেন, তিনি সুশোভন।

এদিককার বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভারী ভারী পায়ের শব্দ করে।

সমস্ত দৃশ্যটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ প্রায় ধমকের মত করে বলে উঠলেন, 'তোমরা সবাই ভেবেছ কি? সকলে মিলে চলে যাচ্ছ যে?'

ওঁর কথায় এরা উত্তর দিল না, শুধু অবহেলায় একবার চোখ ফেরাল। কিন্তু চিরনির্বাক সুবল সহসা একটা কথা বলে উঠল। শেলষের স্বর সন্দেহ নেই।

'আপনি তো রইলেন বাবু, ওতেই হবে।'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন সুশোভন, চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, 'তুমি চুপ করে থাক। তুমি চাকর! আমি এদের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছি।'

'সেয়ানা পাগল বোঁচকা আগল।' অস্ফুটে এইটুকু উচ্চারণ করে সুবল ছোট্ট বেডিংটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে ভারী চামড়ার সুটকেসটা বাগিয়ে ধরে নীচে নেমে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুশোভন।

বললেন, 'তোমরা তো নীতার কাছে যাচ্ছ না!'

ইন্দ্রনীল ঈষৎ কৌতুকের সুরে বলে, 'নীতার কাছে যেতে যাবো কেন? কী দরকার আমাদের?'

'দরকার নেই! দরকার নেই তোমাদের! তবে যাবারই বা দরকার কি তোমাদের?'

ইন্দ্রনীল গলাটা বেশ চড়িয়ে বলে, 'কেন গেলেই তো ভাল। বাড়ীতে এত-গুলো ছেলে, এতো আপনার ভাল লাগে না।'

সুশোভন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবার ভঙ্গীতে বলেন, 'তা' সত্যি। ঠিক বলেছ। কিন্তু সবাই চলে গেলে সুচিন্তা যে কাঁদবে।'

'নাঃ কাঁদবেন কেন!' পাগলকে সমীহ করার দরকার নেই, দরকার নেই

"তোমরা সবাই ভেবেছ কি?"

তার সামনে সভ্যতা বজায় রাখার, তাই ইন্দ্রনীল তীব্র স্বরে বলে, 'আপনি তো আছেন।'

'হ্যাঁ আমি তো আছি।' সুশোভন সহসা গম্ভীর হয়ে যান। গম্ভীর বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, 'তোমাদের কথাগুলো কিন্তু ভাল নয় বুঝলে? খুব বিশ্রী। এবার থেকে ভাল করে কথা বলতে শিখবে। নীতার কাছে শিখে নেবে। নীতা তো কই তোমাদের মত করে তাকায় না। তোমাদের মত করে কথা বলে না।'

ইন্দ্রনীল আর কিছু বলত কি না কে জানে, ঠিক এই মুহূর্তে এদিকের অন্ধকার ছোট ঘরটার দরজায় একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়, একটা অচেনা গলা বলে ওঠে, 'সুশোভন, তুমি ঘরে যাও। তোমার বাইরে আসার দরকার নেই।'

ছায়াটা আবার ঘরের অন্ধকারে মিশে যায়।

আর সুশোভন তাড়াতাড়ি ঘরে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় বসে পড়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, 'দরকার নেই! দরকার নেই মানে? ওরা সবাই চলে গেলে তুমি কাঁদবে, আমি জানি না ভাবছ? ওরা তোমায় ভালবাসে না, ওরা তোমায় বকে, তবু তুমি ওদের জন্যে কাঁদবে! তুমি এত বোকা কেন সুচিন্তা!'

নিঃশব্দ বাড়ীটা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় নিরঞ্জন আর ইন্দ্রনীল।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

বিংশশতকী জার্মান * উপন্যাস

।। টমাস মান : ব্যক্তি ও নির্জনতা ।।

সপ্তদশ শতকের ফরাসী দার্শনিক ব্লেজ পাস্কাল মর অস্তিত্বের সকল রোসনাই ভুলে যে অতল, অনন্ত শূন্যের গহ্বর দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তা'রও পরপারে তিনি দেখেছিলেন ঈশ্বরকে। তাই তাঁর চোখে মানুষের জীবন যদিবা অবিশ্বস্ততা, অবসাদ ও উদ্বেগে ভরা, তবু মানুষ একাকী নয়। মানুষের দুশ্চিকিৎস্য, সার্বিক একাকীত্ব উপলব্ধি করার বিক্রম পাস্কালের লাতিন হৃদয়ে হয়ত বা বেমানানও হ'ত। তা'র জন্য আরো কঠিন প্রস্তুতি ছিল টিউটনিক মনের। জীবন অর্থে অবিরাম বেদনা বুঝেছিলেন শোপেনহাউয়র; যে-বেদনা-বোধে মানুষের অংশীদার নেই। গুহাচর ভালুকের নৈঃসঙ্গ্য ও বিক্ষোভে আপন অস্তিত্বকে অন্বিত দেখেছিলেন নীতশে। মরমী রিলকের চোখেও মানুষকে বেয়ে চলতে হচ্ছে সেই 'প্রথম-বেদনার' গিরি-সোপান—একা। সত্তা ও শূন্যের বিচারে বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির প্রখরতা দেখান যদিও লাতিন মানসেরও আয়ত্তাধীন সমানে, তবু সে বিচারে উপযুক্ত আবেগ ও অনুভবের মর্যাদা যুক্ত করার, তা'কে এক নিবিড়, প্রায়-দৈহিক বোধে পুরো মানুষিক ক'রে তোলার দায়িত্ব যেন টিউ-টনিক চিত্তের এক বিশেষ অধিকার। আর সে বিচারের রায়ে মানুষকে নিঃসঙ্গ সাব্যস্ত করার নজির যে সে-চিত্ত বারে বারে হাতড়ে পেয়েছে, তা'র কাহিনী ৎসরাতুস্ত্রা ও ফাউস্ত, কিের্কেগোর্দ, হাইদেগর, কাফকা ও টমাস মান।

এই নৈঃসঙ্গ্য-বোধ যা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তারই এক পরিণতি, সামাজিক ও নৈতিক সাহচর্যের মাঝখানে মানুষকে দেখে সম্পর্কহীন তবু বিবেকবান্ এক সত্তা হিসাবে, যা'র ব্যক্তিগত বিশ্ব এক ভয়ানক অন্তর্বিমুখতার চাপে আড়ষ্ট। সাংসারিক জীব হয়েও মানুষকে সর্পিল কোন এক চেতনার পথে হেঁটে এসে এমন সব প্রাপ্তি বা ক্ষয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে হয় যে, সে-অভিশাপে তা'র অস্তিত্ব নির্বাসন লাভ ক'রে জীবনের সম্পন্ন, ঐতিহাসিক সেই উপনিবেশ থেকে যেখানে মানুষ তা'র বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসতে, সম্পর্ক পাতাতে, দেবত্বে-পামরত্বে বিশ্বাসী হতে শিখেছিল। ঐভাবে নির্বাসিত, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি মানুষ সমাজের কাছে যেমন অপ্রিয়, নিজের কাছে তেমনি অতৃপ্তিকর। নৈঃসঙ্গ্য-কবলিত বোদলেয়র বুঝেছিলেন যে 'তিনি পরের কাছে অপ্রয়োজনীয় আর নিজের কাছে ভয়ানক'। নীতশের নিঃসঙ্গ 'আমি' বুঝেছিল যে তা'র গতি কেবল এক ভয়াবহ 'কোনওখানে-নয়'-এ। কিন্তু তবু এই নৈঃসঙ্গ্যের বোধ সখ-ক'রে-বাধানো কোনও রোগ নয়, এবং এর সূত্রপাত ঘটলে রক্ষা পাবার জন্য কোনও প্রতিষেধকও সুলভ নয়। তাই আধুনিক জার্মান উপন্যাসে যে নিঃসঙ্গতার স্বাদ ও গন্ধ পাঠককে অভিভূত করে, সে নিঃসঙ্গতা কোনও উন্মাসিক ঢঙ নয়। এমন কি তা'কে এক রুগ্ন মানসিকতা ব'লে বাতিল করা যায় কি-না, তা'ও যথেষ্ট বিচার সাপেক্ষ, যদিও অল্পবয়সে ডি, এইচ, লরেন্স টমাস মান-প্রসঙ্গে অনুরূপ অসুস্থতার অভিযোগ করেছিলেন। বিশ শতকের এই সভ্য, জমজমাট, সামাজিক জীবনেও মানুষকে কী-ভাবে একাকী হ'তে হয়, কী সুষ্ঠু, যান্ত্রিক প্রসন্নতায় অপরেরা সেই একাকীত্বকে মেনে নেয়, তা'র এক চমকপ্রদ, প্রতীকী কাহিনী ফ্রান্তস কাফকার 'দের প্রৎসেস' (ইং 'দি ট্রায়াল') নামক উপন্যাসে। নায়ক ইহুদী য়োসেফ কা-কে আচমকা গ্রেফতার হ'তে হ'ল একদিন সকালে। তাঁকে জানান দিতে যে-দুই ব্যক্তি এলেন সে দুজন অবশ্য পুলিশের লোক ন'ন; তাঁরা যে কে বা কী সে পরিচয় মেলে না। য়োসেফ কা-র অপরাধ যে কী তাও সে কখনও জানতে পারে না। তবু তা'র বিচার হয়। উদ্ভট নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। বিচারক, বাড়ীউলি, ধোপানী, ঐ দুই আগন্তুক ও উকিল য়োসেফ কা'র নির্জন জীবনকে কোনওখানে স্পর্শ ক'রে না, কেবল তা'র রূপ-কথার মতো অপরাধের ইতিবৃত্তটির ফাঁকে ফাঁকে আসা-যাওয়া ক'রে তা'রা আরো বাড়িয়ে দেয় জীবন-নাট্যে এই রহস্যময় নিঃসঙ্গ নায়কের মৌন যন্ত্রণা। অবশেষে এক সন্ধ্যায় আগন্তুকদ্বয় য়োসেফ কা-কে ধরে এবং তা'কে ছুরিকাঘাতে নিহত ক'রে।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে গোয়তের কাছে এই মানুষিক নিঃসঙ্গতার প্রতিরোধে প্রেমকে দাঁড় করানর প্রয়োজন হয়েছিল। জার্মান সাহিত্যের 'স্তুর্ম্ উন্ত দ্রাঙ' (ঝড়-ঝাপটা) পর্যায়ের সার্থক প্রথম উপন্যাস গোয়তের 'দি লাইদেন দেস য়ুঙগেন ভের্তের' (ভের্তেরের দুঃখ) উপন্যাসে প্রেমকে গোয়তের মনে হয়েছিল, সেই আলো, যা'র অভাবে জীবনের ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যর্থ। কিন্তু এই প্রেমও যে কাল-ক্রমে স্বরূপ পাল্টে এমন বিশ্লিষ্ট, ধোঁয়াটে এক লীলা হতে পারে যা'তে প্রেমিককে কেবলি ফিরে পেতে হয় আলো বা উত্তাপের বদলে নৈঃসঙ্গ্যের নিস্তাপ অন্ধকার, তা টের পাওয়ার দুর্ভাগ্য ভের্তেরের হয়নি। সেরূপ প্রেমের দুস্তর ছলনায় সাঁতরে বেড়িয়ে কোনও কূলে উঠতে পারেনি যে, হান্স কাস্তরূপ, সে এ যুগের একটি মহত্তম উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। টমাস মানের 'দের ৎসাউবেরবার্ক' (ইং 'ম্যাজিক মাউন্টেন') হান্স কাস্তরূপের নিঃসঙ্গতা ও সেই নিঃসঙ্গতার আকাশে আন্তরিক এক আতসবাজির মতো উত্থিত প্রেমের ব্যর্থ গতিপথ অধ্যয়ন করে। অবশ্য এ ছাড়াও বহু বিষয় ও বহু চরিত্র মানের উপন্যাসটিতে অজস্র কথোপকথনের বস্তু ও পাত্র-পাত্রীরূপে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাস্তরূপ ও ক্লাভিদার নিষ্ফল প্রেমের কাহিনীকে ঐ যাদু পর্বতের বৃত্তাবদ্ধ

---

* বর্তমান লেখকের পূর্ব বিজ্ঞাপিত সিদ্ধান্ত (১৮শ 'অমৃত' দ্রষ্টব্য) অনুসারে এই প্রবন্ধমালায় ব্যবহৃত য়ুরোপীয় নামধামের উচ্চারণ যথাসম্ভব শুদ্ধ ও অপ্রবর্তিত রাখা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই য়ুরোপীয় নামগুলির যে-চালু বাঙ্গালা উচ্চারণ তা ইংরাজ জিহ্বার পছন্দসই প্রবর্তনায় সিদ্ধ এবং সে হিসাবে বাঙ্গালার পক্ষে স্বাভাবিক ও চরম অবশ্যই নয়। 'স্পানিশ' না বলে 'স্পেনীয়' এবং তারপর সশঙ্কভাবে, 'হিস্পানীতে' পৌঁছানো, কিম্বা 'এ্যারিস্টটেলীয়' না ব'লে 'আরিস্ততেলীসীয়' বলার প্রয়াস উক্ত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ মাত্র। এই মর্মে শিরোনামায় ব্যবহৃত 'জার্মান' স্পষ্টতঃ বেঠিক। কিন্তু 'গের্মনীয়' বা 'দয়ৎসীয়'—''জার্মানের'' সম্ভাব্য বাঙ্গালা সংস্করণ অত্যন্ত আকস্মিক বিবেচিত হতেই পারে,—এমনকি, অবোধ্যও। অনুরূপ কারণে 'তোমাস, মান' না-লিখে 'টমাস মান' বরদাস্ত করা হ'য়েছে।।

শৈত্য ও অপার্থিবতার মধ্যে মূল্যবান এক মানবিক মর্ম ব'লে গ্রহণ করা যায়।

কাস্তরূপের নিঃসঙ্গতা এতো স্থির ও সম্পূর্ণ যে সময়ের পরিমাপ তা'র কাছে নিরর্থক। একটানা, একরঙা অবস্থিতিতে এমন অভ্যস্ত সে যে তিন সপ্তাহের জন্য স্যানাটোরিয়ামে থাকতে এসে সেখানে কাটিয়ে গেল সাতটি বৎসর। ইতালীয়, রুস, ওলন্দাজ, জার্মান নারী ও পুরুষ বাসিন্দাদের আলোচনা, তর্কাতর্কি, চলাফেরায় যেন অলৌকিকভাবে জীবন্ত যক্ষ্মারোগীদের ঐ আরোগ্য-সদন, যেখানে মৃত্যুর গুরুত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। কী আকর্ষণে কাস্তরূপ সেখানে হাজির হয়ে আর নড়তে চাইল না, তা'র একমাত্র উত্তর বোধহয় এই যে কাস্তরূপের কাছে কোনও 'আকর্ষণ'ই জীবনে বাস করার প্ররোচনাকে বাড়াতে (বা কমাতে) পারত না। কারণ নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকূপে আত্মসচেতনতা নিয়ে সে যে বেঁচে থাকছিল তা'র কোনও 'উদ্দেশ্য' বোঝার তাগিদও সে হারিয়েছিল। সুস্থ ছিল সে, কিন্তু যখন সে জানল যে, সে যক্ষ্মাক্রান্ত তখনও সে আশ্চর্যভাবে সুস্থ! আসলে কাস্তরূপের নির্জনতা তাকে অমানবিক বানিয়েছিল তা'র অজ্ঞাতে। জৈব অভিলাষের কোনও কঠিন কণাও বুঝি লুকিয়ে ছিল না তা'র দেহের জীবকোষে। অথচ মৃত্যু-ইচ্ছাও পোষণ করে না সে। হয়ত এই নির্মম অস্তিত্ব, যা'র বুদ্ধিজনিত ক্লান্তি জিজীবিষা ও মুমূর্ষাকে তুল্যমূল্যে করেছে, কাস্তরূপকে দুর্বলভাবে প্রেমের সঙ্গ খোঁজায়, যদিও সে অন্বেষণও নেহাতই আপাতিক। রূপসী, রঙ্গময়ী ক্লাভিদা শোশা, স্যানাটোরিয়ামের বিবর্ণ উদ্যান যা'র উপস্থিতিতে গোপনে এক লীলাকানন, যা'র রক্তের রুস প্রচণ্ডতা ফরাসী চিন্তা-সম্ভোগের ছোঁয়াচে জটিল হয়েছে, —তা'কে প্রেম নিবেদন করে কাস্তরূপ। কিন্তু টমাস মান, পুরোপুরি শহুরে এবং নিস্পৃহ, সে প্রেমের চিত্রক, তা গোয়েতীয় প্রেম নয়। ত্রিস্তান ও ইসোল্‌দের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের স্বাভাবিকও বড়জোর কাস্তরূপদের আলোচনার বস্তু হতে পারে, তা'তে স্বাদ নেই। ক্লাভিদা নারী হয়েও স্নিগ্ধ হতে ভুলে গেছে। প্রহেলিকার মতো এক স্বাধীনতার সন্ধানে সংসারের মহানিকেতন ছেড়ে হবু-রোগিনী সেজে স্যানাটোরিয়াম-গুলিতে উড়ে-উড়ে বেড়ায় সে। কাস্তরূপ যে অপূর্ব ভাবায়,—উদারতম প্রশস্তির সুযোগ সে ভাষায়—ক্লাভিদাকে প্রেমের কথা বলে, সে ভাষাও তাই একটা গোপন শাঠ্যের মন্ত্রণায় অনিবার্যভাবে বিদেশী ফরাসী হয়। মানের উপন্যাসখানির অনেকগুলি পাতা ভ'রে যায় ক্লাভিদা-কাস্তরূপের তার্কিক প্রেমালাপের খানদানী ফরাসীতে। নৈঃসঙ্গ্যে প্রতিষ্ঠিত কাস্তরূপ লীলাময়ী ক্লাভিদার অযৌন মৌনের সমক্ষে এসেও অবাক হয় না। বিপন্ন হতে ভুলে গেছে সে। বরং সে নির্বিঘ্নে সমর্থন জানায় বৃদ্ধ ওলন্দাজ, পেপেরকরনের প্রতি ক্লাভিদার নিরবয়ব অনুরাগের। যাদুপর্বতের যে সোপান ক্লাভিদা, কাস্তরূপ বা বিদগ্ধ শ্রীযুক্ত সেত্তেমব্রিনির মতো মানের অন্যান্য চরিত্রগুলি বেয়েছিল, তা বুঝি বুদ্ধিতে অজেয় সেই প্রথম-বেদনারই! কারণ, বিশশতকী টমাস মান মানুষিক নির্জনতার দর্শনে দুর্মরভাবে সুপঠিত, এবং বিধির বিধানে তিনি সুনৃত পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেছেন।

নির্জনতার যে-উপপাদ্য ফ্রান্তস কাফকায় বা টমাস মানে, তা'র দার্শনিক ভিত্তি অবশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তা, এবং সে চিন্তার টিউটনিক ভাষ্য আরতুর শোপেনহাউয়র, ফ্রীদরিখ নীতশে, সোয়্রেন কির্কেগোর্দ, অসভালদ স্পেঙলর ও মারতিন হাইদেগেরের রচনাবলীতে নানাভাবে বিনাস্ত। তবু, গের্মনীয় ঔপন্যাসিকতায় যে আগাগোড়া মননশীলতার ও মনস্তাত্ত্বিকতার ঝোঁক অন্ততঃ দুশো বছরের ঐতিহ্যে সপ্রমাণ, একথা মানতে হয়। জার্মান উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভিলান্তের 'আগাথন' নামক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মারফত যে-ভিন্নমুখী শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পায়, তা কালক্রমে একটি নূতন আঙ্গিক ও বোধের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী করে। উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের পরিবেশন জার্মান ভূমিতে সহজ ও বিস্তর ফসল ফলায়। গোয়েতের 'ভের্তর' ও তার পরবর্তী 'ভিলহেলম মাইস্তরস' অনায়াসেই ঔপন্যাসিক রচনার কেন্দ্রত্ব আরোপ করে চরিত্র বিশ্লেষণে, যদিও সে বিশ্লেষণে কাহিনী পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে না। মনস্তত্ত্বাশ্রিত এই জাতীয় জার্মান উপন্যাসকে বলা হ'ত 'বিল্দুঙসরোমান'। বস্তুতঃ এই 'বিল্দুঙসরোমান' জার্মান উপন্যাসের এমন একটি ন্যায্য ধারা, যে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ জার্মান ঔপন্যাসিকই এই ধারাকে একটি উপযুক্ত দায়ভাগ ব'লে মেনে নিয়েছেন। ঘটনা থেকে মনোলোকে এই মতো যাত্রা জার্মান উপন্যাসকে যে বিশেষ চরিত্র দেয় তা, বলা বাহুল্য, বিংশ শতকে স্পষ্ট ও পরিণত হয়। কিন্তু এই চরিত্র উনবিংশ শতকী জার্মান উপন্যাসে ও ছোটগল্পেও লক্ষণীয় থাকে। এমনকি 'মেয়রখেন' বা 'রূপকথা'র শিল্পে পর্যন্ত একজন তেওদর স্তর্ম ('ইমেনসে'-রচয়িতা) চরিত্র-বিশ্লেষণের মেজাজ পরিস্ফুট করেন। 'বিল্দুঙসরোমানে'র স্বধর্ম অক্ষুন্ন থাকে বর্তমান শতাব্দীর হেরমান সুদেরমান, য়াকব ভাসেরমান, কবি হানস কারোসা ও রিলকের উপন্যাসে। টমাস মানের 'বুদেনব্রকস' থেকে 'য়োসেফ উন্ত জাইনে ব্রুয়্দের'—নামক চারখণ্ডে-সমাপ্ত উপন্যাসে এবং কাফকার 'দের প্রৎসেস' থেকে তাঁর 'ছোট গল্প ও স্বল্প গদ্যে' ('এর্তসেয়ালুঙেন উন্ত ক্লাইনে প্রোসা' ঃ ইঃ 'ইন দি পেনাল সেটলমেণ্ট') উক্ত স্বধর্মেরই তীব্র ও পর্যাপ্ত প্রকাশ।

ফ্রান্তস কাফকার রচনায় স্বীকার করতেই হয়, শিল্প সর্বত্র ঠিক স্বচ্ছন্দ কল্পনা ও বুদ্ধির তালে চলেনি। কোনও মরমীও ব্যক্তিগত অস্বচ্ছতার পর্দা ভেদ ক'রেই যেন কাফকার প্রতীকী কাহিনী-জগতে প্রবেশ সম্ভব। এবং প্রতীকের তাৎপর্য যেহেতু বহুধা ব্যক্ত, কাফকার উপন্যাসে মনোজগতের বিবরণও অনেকক্ষেত্রে রহস্যাবৃত থেকে যায়। ব্যক্তি হিসাবে কাফকা হয়ত কতকটা উৎকেন্দ্রিকতায়ও ভুগতেন। অন্ততঃ বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বপূর্ণ চিন্তাক্ষমতাকে এলোমেলো হবার সুযোগ দিতে তাঁর স্বভাব যে তাঁকে বাধা দিত না তা'র হরেক নজির তাঁর 'রোজনামচা'য়। তরুণ চেক কবি গুস্তাফ য়ানুখের 'কাফকার সহিত কথোপকথনে' কাফকা রবীন্দ্রনাথকে 'ছদ্মবেশী জার্মান' বলেই ক্ষান্ত হন না, রবীন্দ্রনাথকে 'স্যাক্সন' বাংলে তাঁকে রিখার্দ ভাগনরের আত্মীয় প্রমাণ করেন কাফকা! সন্দেহ নেই যে 'স্তুর্ম উন্ত দ্রাঙ' পর্যায়ের 'বিল্দুঙসরোমান' যা খুঁজেছিল তা মোদ্দা কথায় বুদ্ধিজীবী উপন্যাস এবং সে-হিসাবে তা'র মহত্তর ও একনিষ্ঠ অভিব্যক্তি টমাস মানের উপন্যাসে। আর টমাস মানেরই বোধহয় নিখাদ বুদ্ধিজীবী উপন্যাস রচনার সর্ববিধ সুযোগ ও ক্ষমতা ছিল। কারণ, গোয়েতের ক্ষেত্রে,—যেমন মান নিজেই দেখিয়েছেন,—শহুরে মানুষটির মিলন ঘটেছিল নিয়তিবাদীর সঙ্গে (eine Vereinigung des Urbanen und des Daemonischen) এবং তাই বলা যায় যে, বুদ্ধির পূর্ণাবয়ব শিশু ভের্তর বা ভিলহেলম মাইস্তরস হয়নি। কিন্তু ঔপন্যাসিক চিন্তায় মান প্রত্যক্ষ, অতন্দ্র শহুরে মানুষ, অরাফিয় বা অন্য কোনও তন্ত্রোদ্ভূত জীবন-মীমাংসায় যাঁর আস্থা খুবই ভঙ্গুর।

সেই কারণেই জার্মান উপন্যাসের অপর একটি ধারা মানের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়েছিল। সে-ধারাটিকে অবশ্য কোনও বিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা

নিরূপিত করা যায় না। আখ্যানমূলক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, 'রোমান্স', 'মোরখেন' বা রূপকথা ইত্যাদি পাঁচ-মিশালিতে পুষ্ট যে ঔপন্যাসিকতা 'বিলদুঙসরোমানের' পাশাপাশি অষ্টাদশ শতক থেকে জার্মানীতে পরিচিত ছিল, তা'তে মনস্তত্ত্বের প্রবেশ নিষিদ্ধ না-থাকলেও, চরিত্র-বিশ্লেষণের মৌলিক ধর্ম তা'র ছিল না। হয়েক প্রভাবের মধ্যে ওয়ল্টর স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস উক্ত ধারায় কার্যকরী হয়েছিল,— উদাহরণ-স্বরূপ, অষ্টাদশ শতকী ভিলহেলম হাউফের রচনায়। এই ধারায় পুষ্ট হয়েছে জার্মান উপন্যাসের একটি মূল্য-বান শাখা এবং বর্তমান কালের অনেক ক্ষমতাবান্ জার্মান ঔপন্যাসিক এ শাখাটির বৃদ্ধি সম্ভব করেন। 'বিলদুঙ্-সরোমানের' মানসিকতা থেকে অপেক্ষা-কৃত মুক্ত, চিরাচরিত ঔপন্যাসিক প্রেক্ষিতে, কল্পনাপ্রবণ অথবা বাস্তব-বাদী, লোমহর্ষক অথবা রূপকান্ত, ব্যঙ্গাত্মক অথবা রাজনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ উপন্যাস মান-কাফকার সমকালীন জার্মান উপন্যাস-সাহিত্যে পরিচিত। এ জাতীয় বৈচিত্র্য মানের মেজাজে যথেষ্ট পছন্দসই হয়নি, যদিও তাঁর প্রথম দিকের একটি রচনায় অনুরূপ বিচিত্র ভাবনার ছাপ স্পষ্ট।

তাই, আধুনিক জার্মান উপন্যাসের আলোচনায় যদিও টমাস মানেই আমাদের ফিরে-যেতে হয় বারবার, তবু মানের আশে পাশে যে সকল শিল্পী (এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁদের উল্লেখ এখানে অনিবার্য। টমাস মানের অগ্রজ, হাইনরিখ মান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পর-বর্তী জার্মান জীবনের আলেখ্যদানে তাঁর উপন্যাসের সারবত্তা সপ্রমাণ করেছেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি হাইনরিখ মানের প্রধান উপজীব্য, যদিও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও কামনার সপক্ষে যেন এক লাতিন বিহ্বলতা বিদ্যমান। হাইনরিখ মানের ঔপন্যাসিক আদর্শের সদাসত বিচারের পূর্বে অন্ততঃ এটুকু বলা যায়, সে আদর্শে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছিল স্বয়ং টমাস মানকে। অগ্রজের মতবাদ খণ্ডনের জন্য যে যথেষ্ট তৎপরতা দেখান মান তাঁর 'বেত্রাখতুঙেন আইনেস উনপলিতিশেন' ('জনৈক অরাজনৈতিক ব্যক্তির ভাবনা')-নামক গ্রন্থে, একথা আমরা জেনেছি সমালোচক এরিখ হেলর মারফৎ। 'নোবেল'-পুরস্কৃত হেরমান হেসের য়ুরোপীয় খ্যাতি তাঁর 'স্তেপেন-ভোলফ' ('স্টেপির নেকড়ে') নামক উপন্যাসটির জন্য, যদিও হেসের 'সিদ্ধার্থ' তাঁকে এদেশে সর্বাধিক পরি-চিত করেছে। শ্লেগেল, ম্যুলর ও অন্যবিধ প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের দেশ জার্মানী,— তাই, হেসের রচনায় বুদ্ধ হয়ত মোটেই আকস্মিক নয়। কিন্তু কবি ও চিত্রকর হেসে তাঁর ঔপন্যাসিকতায় বাস্তববোধ ও বুদ্ধির অনুশাসনে কাল্পনিকের লাগাম টেনে-ধরতে যে অনিচ্ছুক এবং তাঁর আপাতঃ সরল বাচনের ছলনায় কষ্টগ্রাহ্য কোনও বক্তব্যকে পাঠকের ধাঁধা-সমাধান-করা বুদ্ধির খোরাক ক'রে পাঠাতে যে তিনি সম্মত, তা তাঁর 'দি মরগেনলান্দ-ফাহর্ত' (ইঃ 'জার্নি টু দি ইস্ট') পড়লে মানতেই হয়। রূপক-কাহিনী হিসাবেও উক্ত উপন্যাসটি কল্পনার এমন সংযম প্রকাশ করে না যা চলনসই বুদ্ধির পাঠকদের (বর্তমান লেখক তাঁদের এক-জন) পাঠ-নীতিকে আশ্বস্ত রাখে। হেসের এই রহস্যময় যাত্রার ইতিহাসে 'তাও', 'কুণ্ডলিনি' থেকে পারসিফাল, সাঙ্কো পাঞ্জা, বাসুদেব, ক্লিঙসর ও ফাতিমা ইত্যাদি অসংখ্য আবির্ভাব তাঁর প্রাচ্য-প্রবজ্যাকে বহুবর্ণ ক'রে তোলে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এ সকল আবির্ভাবের সার্থকতা অনুধাবন করা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। এক স্থলে যদি বা জার্মান চিত্রকর পাউল ক্লে-র স্মৃতি-উদ্ধার ক'রে হেসে পাঠককে সুযোগ দে'ন কথঞ্চিৎ উৎফুল্ল হবার—'নীল যেন তুষার/হয় পোল সম ক্লে' চমৎকার কাব্য ক'রে বলেন হেসে, তবু পরমুহূর্তেই সন্দেহ জাগে ক্লে-কে এইভাবে এক যাত্রায় সঙ্গী-করা কেন হেসের? 'ক্লে'-কি শুধু 'শ্নে' (তুষার)-র মিলই! কাফকার উপন্যাসে রূপক জটিল হলেও, আবহাওয়া জাগ-তিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, কিন্তু হেসের 'দি মর্গেনলান্দফাহর্ত' যেন গুপ্তধন উদ্ধারের ফরমুলার মতো কোনও ধারা-বাহিক দুর্বোধ্যতারই সমাচার। বুদ্ধি-জীবীদের তথাকথিত উন্নাসিকতাও চেয়ে হেসের এই মরমিয়া ভাবণ, অন্ততঃ উপ-ন্যাসের ক্ষেত্রে, কম প্রেয়। বাহ্যিক জগত থেকে আন্তরিকে মর্মের সন্ধানে অবশ্য অন্যান্য জার্মান ঔপন্যাসিকরাও গেছেন কিন্তু সে গমনের ইতিবৃত্ত তাঁরা যথেষ্ট অজটিলভাবে বলতে পেরেছেন। যেমন, য়াকব ভাসেরমান ও কাফকার বন্ধু মাক্স ব্রং। এই মর্ম-সন্ধান ছাড়া, বস্তু-তান্ত্রিক অভিযানেও জার্মান ঔপ-ন্যাসিকরা সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'ইম ভেস্তেন নিখৎস নয়েস' (ইঃ 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট') বা নামতঃ কোন সামরিক বিজ্ঞপ্তির অনুরণন, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পটভূমিকায় জীবনের যে-প্রত্যক্ষ, বাস্তববাদী বিবরণ দেয়, কাসিমির এদ্শমিতেরদাস 'গুতে রেখত' (সং সঠিক) তা'রই আরো পূর্ণতর ভাষ্য। আর্নল্ৎ ৎস্ভাইকের 'স্ত্রাইত উস দেন জের্‌গেয়ান্তের গ্রিশা' (ইং কেস অফ সার্জেণ্ট গ্রিশা'), ভাসেরমানের 'ক্যাসপা'র হাউসর', লিয়ন ফয়খতভাঙেরের 'য়ুৎ সুয়েস' (ইঃ পাওয়ার'), রোবের্ট মুসিলের 'দের মান ওহনে আইগেন-শাফতেন' (বৈশিষ্ট্যবিহীন ব্যক্তি') জার্মান উপন্যাসে এক স্বচ্ছতর বাস্তবিক মর্মের অনুসন্ধান ব্যক্ত করে। এই বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিকতা ব্যাপ্তিতে বা ঘনত্বে যদিও বুদ্ধিবাদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ, এবং যদিও এই গের্মানীয় বাস্তবচর্চার আতিশয্যেই সম্ভব হয়েছিল য়ুলিউস বিরবাউমের অশ্লীল রচনা, 'প্রিনৎস্ কুককুক', তবু রূপক ও মরমী অন্ত-র্মুখিতার রহস্য থেকে উপন্যাসে অনেক মানানসই এই বাস্তব-সাধনার পার্থিবতা।

নিছক বাস্তব ও মরমিয়া অন্তর্লোকঃ এই দু'য়ের কোনওখানেই বোধহয় ব্যক্তির সেই পরম নিঃসঙ্গতার রাজ্য উপস্থিত নেই, যে রাজ্যের অধীশ্বর পূর্ণাঙ্গ চেতনার মুকুটটি ধারণ ক'রে নিয়ত অসুখী। উনবিংশ শতাব্দীতে এই অসুখে গোয়্তেকে পীড়িত ও বিচলিত দেখা যায়। কিন্তু বিধিদত্তের প্রতি গোয়্তীয় আস্থা যদি সে অসুখকে নিরাময়ের প্রলোভন দেখিয়ে থাকে, বিংশ শতকী টমাস মান তবে সে অসুখকে দুরারোগ্য বলে মেনে নিয়ে-ছিলেন, মনে হয়, বুদ্ধির ও অনু-ভূতির জটিলতর জীবাণু তাঁর রক্তে টের পেয়ে।

মানের পক্ষে এই নৈঃসঙ্গ্যবোধ, 'যাদু পর্বতে' যা'র বৃহত্তর প্রকাশ, কোনও উটকো প্ররোচনায় উৎপন্ন হয়নি। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ই মানকে ব্যক্তি-চরিত্রের গভীরতম অঞ্চলে অস্তিত্বের অর্থ খোঁজায়। প্রথম রচনা 'বুদেন ব্রকস'-এ মান ছিলেন অধিকাংশ সমাজ-সচেতনঃ ব্যক্তির বদলে একটি 'পরিবারে'র ভাঙন তখন তাঁর লক্ষ্য। মানের দ্বিতীয় রচনা 'ত্রিস্তান', অনা-য়াসেই তাঁকে ভিন্ন পন্থার নির্দেশ দিয়েছেঃ 'ত্রিস্তান' গল্পে 'স্থান' হিসাবে দেখা দিয়েছে 'আইনফ্রিদ' হাসপাতাল, প্রেমের পাত্রপাত্রীরূপে হাজির হয়েছে দুই নিঃসঙ্গ চরিত্র,—হের স্পিনেল ও হের ক্লয়্তেরয়ান-পত্নী গাব্রিয়েলে, আর প্রেমের স্বরূপ হয়েছে নিষেধ ও বিষাদের পাংশুতে ছোপান। এ গল্পে হের স্পিনেল পুরুষার্থের অভাবে যেমন সুদূর ও একা, তেমনি গাব্রিয়েলে, বিদেহী, রোগাতুরা, করুণাহীন। স্পিনেল-গাব্রিয়েলের আবছায়া, উৎকণ্ঠিত এবং অধারণীয় প্রেম নৈঃসঙ্গ্যের পীঠে যেন কেবল ব্যভিচারের অশরীরী ক্ষোভ, যা গাব্রিয়েলের আগুনে, এক আশ্চর্য বিভ্রমে, শপ্যার 'নকতুর্নে'র তমিস্রাকে টেনে নিয়ে যায় কামজ 'জেহ্নে সুখ-ৎসমোতিফে'র ব্যথার্ত প্রবলতায়। 'ত্রিস্তানে'র অপর গল্প, 'তোনিও ক্রয়গর'-এর নায়ক, তোনিও যেমন প্রেমের তেমন শিল্পের জগতে একজন অশোভন আগন্তুক; ঘরেও নহে পারেও নহে, তোনিও দাঁড়িয়ে সেই মাঝখানের দুঃসহ নৈঃসঙ্গ্যে।

'ত্রিস্তান' লেখার পর থেকেই মানসিক নৈঃসঙ্গে বিদগ্ধ টমাস মান। এমনকি চেষ্টা করলেও অন্যতর উজ্জ্বল জগতে গিয়ে চোখ-খোলার উপায় আর তাঁর ছিল না। এইরূপ কোনও অনন্যের কল্পনা, যে কারণেই হোক মানকে যে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'কোয়নিগলিখে হোহাইত' * রচনায় বাধ্য ক'রে তা স্পষ্ট। এই উপন্যাসখানির একমাত্র ভাষা ব্যতীত আর কিছুই যেন মানের বৈশিষ্ট্য ধরিয়ে দেয় না, এমনি ভিন্নরূপে পরিকল্পনা প্রকট এর কাহিনী, চরিত্র ও উপজীব্য বিষয়-বস্তুতে। এই নিছক প্রেম-কাহিনীর মেজাজ কতকটা ঐতিহাসিক-উপন্যাসের, চরিত্রগুলির গতিবিধি ও কথাবার্তা কাহিনীকারের সদ্বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে চমৎকারভাবে এবং বর্ণনাত্মক স্থিরত্বে এর যৎসামান্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগও যেন চাপা-পড়া। স্বল্পভাষী বিদ্রূপান্ত ঝোঁক, দীর্ঘাবয়ব একটি বাক্যের কোটরে অতীত ঘটনার অনেক নাড়ীভূঁড়ি গচ্ছিয়ে-দেওয়া, সুরক্ষিত অনুচ্ছেদ এবং নাতিদীর্ঘ ও নিরাবেগ সংলাপ—এই সকল ভাষিক ও আঙ্গিকগত লক্ষণ ছাড়া উক্ত উপন্যাসটিকে টমাস মানের ব'লে চিনে নেবার উপায় নেই। মনে হয় 'বিলদুঙস্-রোমানে'র বদলে মান এক্ষেত্রে সহজতর 'রোমান্স' রচনারই দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং একথা অনস্বীকার্য যে কাহিনী-কেন্দ্রীক ও বর্ণনাত্মক লেখার হাতও তাঁর চমৎকার। মাত্র একটি ছোট অনুচ্ছেদে মান রাজকুমারী কাতারিনার বৃত্তান্ত পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে দেন (পৃঃ ২৮); ব্যারোমীটর দেখার সামান্য ঘটনাটির উল্লেখ ক'রে নায়ক ক্লাউস হাইনরিখ ও ইমা স্পেপায়েল মানের চরিত্রের অনেকখানি পরিস্ফুট করেন (পৃঃ ১৭০-৭১)। কিন্তু এই মিলনান্ত প্রেমোপাখ্যানে মান সচেতনভাবেই তাঁর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বিশ্ব থেকে অপসৃত হ'য়ে প্রায় রূপকথা-সম্ভব দেশকালপাত্রের আমদানিতে সায় দিয়েছেন। আর এতৎ সত্ত্বেও বোধহয় মানতে হয় যে নায়ক ক্লাউস হাইনরিখও একজন অচপল নির্জন ব্যক্তি, যদিবা রাজপুত্র।

ব্যক্তি ও নির্জনতার অবধারিত বিশ্বে প্রত্যাবর্তন, সেই বিশ্বে পথভ্রষ্ট এককের ধোঁয়ার মধ্যে ঘোরা আর ঘোরা (এলিয়টের হ্যারি মনচেন্সি যেমন বলে), একমাত্র চৈতন্যের বৈধ সূত্রটি দিয়ে জীবনের সঙ্গে বাঁধা থেকে ভয়ঙ্কর এক মুক্তিতে জীবন, মানুষ ও অনুভূতির জগতে পুনর্প্রবেশের অধিকার পাওয়া! কবি রাইনর মারিয়া রিলকের উপন্যাসে নায়ক মালতে লাউরিদস্ ব্রিগে প্যারিসের রাজপথে চলন্ত দেখে চলেছে প্রসূতিসদন, পেরাম্বুলেটরে শিশু, বাস, ট্রাম; শুনে চলেছে দরজা বন্ধ-হওয়ার শব্দ, জানলার শার্সিভাঙার শব্দ, নারী, পুরুষের কণ্ঠস্বর, কুকুরের ডাক আর একই মুহূর্তে ভাবছে সেই ভয়ানক নৈঃশব্দ্যের কথা, যে-নৈঃশব্দ্য আগুন-লাগা বাড়ীর একটা কালো কার্ণিশের মতো তলার কর্মঠ, চতুর মানুষদের সব জল্পনা নস্যাৎ ক'রে দুর্বার ভেঙে পড়বে। রিলকের আর একটি উপন্যাসে তরুণ এভালৎ গ্রাগি তা'র মা'কে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা চিঠিখানিও পুড়িয়ে ফেলে, কারণ সে বোঝে যে ব্যক্তির ক্ষুরধার নিঃসঙ্গতায় মাকেও বলি দিয়েছে সে, মা'ও বুঝতে পারবেন না আর তা'কে।

এই নৈঃসঙ্গ্যের কুক্ষিগত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি সাহিত্যে অবশ্যই দুর্লভ নয়। তবু য়ুরোপীয় উপন্যাসে নিঃসঙ্গতম তিনটি চরিত্রের কথা ভাবলে একটি অবশ্যই টমাস মানের আশেনবাখ (অপর যে দুইটির কথা বর্তমান লেখকের মনে আছে তা'রা নাবোকভের হাম্বর্ট হাম্বর্ট ও উইসমান্সের দ্য জেসাঁৎ, যথাক্রমে 'ললিতা' ও 'আরেবুর' উপন্যাসের নায়ক)। এই আশেনবাখের কাহিনীতে ব্যক্তি ও নির্জনতার টিউটনিক অনু-শীলন এক অবিসংবাদী তাৎপর্য লাভ করেছে।

গুস্তাভে আশেনবাখ মানের 'দের তৎ ইন ভেনেদিক' (ইং 'ডেথ ইন ভেনিস')-এর মূল চরিত্র। ভগ্নস্বাস্থ্য, প্রৌঢ়, লেখক আশেনবাখ : ছোটোখাটো চেহারার, শ্রীহীন একটি মানুষ। সাংসারিক অর্থে অভিজ্ঞ না-হলেও পোড়-খাওয়া; প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলেও, ক্লান্তীয় বনানীর আর মীবর, জীবন্ময় অস্তিত্বের স্বপ্নে তাড়িত। একা-একা আশেনবাখ জীবনের পথে মহত্ত্বের সন্ধানে ঘুরেছেন, ঘুরেছেন শুধু এই জানতে যে মহৎ—মানুষের শ্রদ্ধেয়, কাঙ্ক্ষিত মহৎ,—তা'র প্রাপ্তির পথ অনিন্দিত নয়। ব্যথা, দারিদ্র্য, নির্বাসন (Verlassenheit), দৈহিক দৌর্বল্য (Koerperschwaeche) পাপ আর কাম—এ সবের বিরুদ্ধে উঠতে হয় মহত্ত্বকে জেগে। আপন আন্তরিক মৌনের মধ্যে সঞ্চরমাণ একক আশেনবাখ একদিন হঠাৎ দেখলেন মুনিখের কোনও কবরখানার সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো অজানিত এক ব্যক্তিকে আর তা'কে দেখে আশেনবাখের মনে আকস্মিকভাবে জাগল ভ্রমণের ইচ্ছা। সে ব্যক্তি যেন তাঁকে বলল : যেতে হবে! আশেনবাখ, স্পষ্টতঃ স্থানু, অচপল, শূন্য, নিষ্কর্মা, উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন দেশান্তর যাত্রার জন্য। আড্রিয়াটিক সাগর আশেনবাখকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের মতলব দিল বটে, কিন্তু মন তাঁর ভরল না। তিনি এলেন ভেনিসে। এই ভেনিস শহর, প্রাকৃতিক আর মানুষিক রূপ, রীতি ও আবেগের ঐতিহ্যে উন্মন শহর, যেন ক্লান্ত আশেনবাখকে মানের ভাষায়, 'আমাদের নির্জন মানুষটিকে', ঠাঁই দেবার চক্রান্ত ক'রেই রেখেছিল। আশেনবাখ যে হোটেলে উঠলেন সেখানে সাক্ষাৎ ঘটল তাঁর তাদ্সিও নামক এক রূপবান পোলিশ কিশোরের সঙ্গে। ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীর চোখ দিয়ে আশেনবাখ তাদ্সিওর তনুদেহে তাঁর আরাধ্য সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ দেখলেন। তাঁর সেই অবাচ্য স্তুতি তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যের ঘোরে আরো আতুর করতে থাকল। এই অপ্রাকৃতিক লীলায় আশেনবাখের নির্জনতা এক আত্মহন প্রসাদে থেকে থেকে চমকিত, বিপন্ন ও ভয়াল হ'তে থাকে। নৈতিকতা, যৌনতা, সামাজিকতা, ব্যক্তিত্ব—সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে আশেনবাখের নিঃসঙ্গ মন একবার যেন শুদ্ধ সৌন্দর্যের আরতিতে অবসাদের জীবকোষ ভেঙে দিতে চায়। হোটেলে, সাগরতটে, পথে সর্বত্র খোঁজেন আশেন-বাখ তাদ্সিওর অমর্ত্য তবু জান্তব সেই কমনীয়তাকে, আর ক্রমেই সে অন্বেষণের রূপ, অনিবার্যভাবে, হয় নারীর পিছনে শিকারী পুরুষের প্রথাসিদ্ধ, লালস ধারণার। তবু, নৈঃসঙ্গ্যে বিষদষ্ট আশেনবাখ তাঁর লালসার প্রাপ্তিতেও শতধা বঞ্চিত: কারণ, সমকামের বিকৃত ঐশ্বর্যও ছিল না ঐ রিক্ত, নিঃস্ব, ক্ষীণ, আমাদের নির্জন-মানুষটির। তাই শেষ পর্যন্ত আশেনবাখের এই তামসিক আরতি কেবল এক মর্ত্যকাম। আর, করুণাময়ী ধরিত্রীকে ধন্যবাদ, আশেন-বাখের সেই কামনাটুকু মেটে : মহামারী, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ভেনিস শহরে এসে ঢুকেছিল, সুস্বাদু ফলের অঙ্গে তা'র অব্যর্থ জীবাণু লুকিয়ে রেখেছিল আশেনবাখের জন্য। লালসাহীন তবু নির্মোহ নয়, বিপন্ন তবু কামনার বজ্র তাঁর বুকে—আশেনবাখ ভেনিসের পথে পথে ঘুরলেন আপন সত্তার তুক্কাত' ঘূর্ণিতে ধরা-পড়া নিঃসহায় মানুষ। জাগতিক তবু মহানির্জন। ক্লান্ত, অসতর্ক আশেনবাখ তাঁর আকণ্ঠ পিপাসা মেটাতে পথ থেকে কিনে খেলেন ক'টা অতিপক্ব স্ট্রবেরি। তাদ্সিওর ভেনিস অভিশপ্ত আশেনবাখের প্রায়-শ্চিত্ত বিধান করল ফলের কমনীয় ত্বকের নীচে ধ'রে-রাখা মৃত্যুর উপঢৌকন দিয়ে। শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি সাগর-সৈকতে আসীন, শান্তিহীন আশেনবাখ, দূরে জীবন্ত তাদ্সিও নির্মমভাবে কমনীয়; আশেনবাখের শোণিতে মারীর বীজ নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রজননে নিযুক্ত। কয়েক মিনিট কেটে যায়। তারপর রাত্রির পূর্বে বিস্মিত ও সশ্রদ্ধ এক বিশ্ব আশেনবাখের মৃত্যু সংবাদ পেল।

---

*Thomas Mann: Koenigliche Hoheit, Fischer Bucherei

প্রদর্শনী

কলারসিক

তিনটি আর্ট গ্যালারীঃ চারটি প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতার তিনটি আর্ট গ্যালারীর পরিচালকমণ্ডলী একজন বিদেশী মহিলা শিল্পীসহ তিনজন প্রখ্যাত ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর চিত্র-কর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। মন-মেজাজ ও শৈল্পিক দক্ষতায় এই চারজন শিল্পীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও এঁরা সবাই আধুনিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির অনুসারী। প্রদর্শনীগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমার আর্ট গ্যালারীর উদ্যোগে চৌরঙ্গীর বিখ্যাত গ্রান্ড হোটেলের ব্যালকনীতে, প্রিণ্টার্স আর্ট গ্যালারীর পার্ক স্ট্রীটের নিজস্ব প্রদর্শনী কক্ষে এবং থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে। বছরের শুরুতেই আর্ট গ্যালারীগুলি যেভাবে তাঁদের চমৎকার প্রদর্শনী-সূচী নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন কলকাতার কলারসিকদের নিকট তা নিঃসন্দেহে এক আনন্দ-সংবাদ। আমরা এই সুযোগে কলকাতার আর্ট গ্যালারী-গুলির পরিচালকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

।।মার্কিন মহিলা শিল্পী ফ্রান্সেস ম্যানাচারের চিত্র-প্রদর্শনী।।

দিল্লীর কুমার আর্ট গ্যালারী, কলকাতাস্থ ইউ, এস, ইনফরমেশন সার্ভিস ও নিউ ইয়র্কের গ্যালারী মেয়ারের যৌথ উদ্যোগে ১৪ খানি চিত্র-কর্মের নিদর্শন নিয়ে শিল্পী শ্রীমতী ফ্রান্সেস ম্যানাচার গ্রাণ্ড হোটেলের ব্যালকনীতে কলারসিক-দের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য শ্রীমতী ম্যানাচার আমেরিকার প্রখ্যাত আধুনিক শিল্পীরূপে সর্বত্র পরিচিত। সুতরাং তাঁর শিল্প-কর্ম দর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা আমেরিকার আধুনিক শিল্পের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-সঞ্চয় করে ধন্য হলাম। সত্যি, শ্রীমতী ম্যানাচারের আঙ্গিক-দক্ষতায় আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি তাঁর বক্তব্যহীনতায় বিপন্ন বোধ না করেও পারিনি। এঁর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর 'ডার্ক সেণ্টার' (১৩), 'আউল' (৬), 'ক্যানডালাব্রা' (৭) ও 'ক্রুসিফিক্সন' (৯) চিত্রগুলি। শিল্পী রংয়ের পর রংয়ের প্রলেপে ইমপেস্টো পদ্ধতিতে ক্যানভাসের উপর চমৎকার জমিন সৃষ্টি করেছেন, মনোমুগ্ধকর তাঁর সেই বৈচিত্র্যময় রঙের সমাবেশ। কিন্তু তারপর? তারপর আর কিছু নেই। দর্শকেরা যে যার মর্জি অনুযায়ী যেটুকু গ্রহণ করবেন—সেইটুকুই যথেষ্ট। জানিনে এই বিমূর্ত শিল্পধারা আমাদের কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় টেনে নিয়ে যাবে।
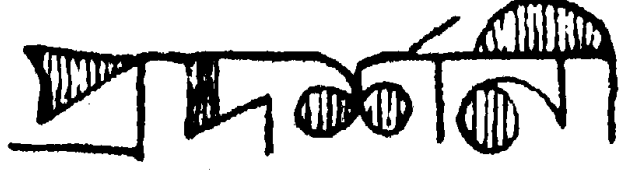
অথচ, এই শিল্পীরই রচনা 'মাদার এণ্ড চাইল্ড' (৫) চিত্রটি। রঙের আস্তরণে সিমেণ্টের মত জমিন সৃষ্টি হয়েছে। আর তারই ভিতর থেকে ধীরে ধীরে দর্শকের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হচ্ছে সেই 'মা ও ছেলের' শাশ্বত রূপ। ভারতীয়, অ-ভারতীয় সকল দর্শকের মনের দরবারে এর আবেদন গ্রাহ্য। তেমনি, 'লোন ফিগার' (১২), 'বয় লণ্ট' (১৪) কিংবা 'প্রফেট' চিত্রের মধ্যেও শ্রীমতী ম্যানাচারের প্রচণ্ড বলিষ্ঠতার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। রঙ নিয়ে এমন অনায়াস-স্বচ্ছন্দ লাবণ্য যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনি যদি আর একটু বাস্তবধর্মী হতেন তবে আমরা আরো খুশি হতাম। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য কুমার আর্ট গ্যালারী ও শ্রীমতী ফ্রান্সেস ম্যানাচারকে আমরা আবার অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী : কুলকার্ণি

।। শিল্পী 'আদিনাথ মুখার্জীর চিত্র-প্রদর্শনী।।

পার্ক স্ট্রীটের নব প্রতিষ্ঠিত প্রিণ্টার্স আর্ট গ্যালারীতে পর পর কয়েকটি চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এর মধ্যে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত শিল্পী 'আদিনাথ মুখার্জীর চিত্র-প্রদর্শনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী আদিনাথ মুখার্জী বাঙলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে স-সম্মানে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯৫৯ সালে আকস্মিক মৃত্যু তাঁর বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পী-জীবনের উপর নিষ্ঠুর যবনিকা টেনে দিয়েছে। মৃত্যুর পর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে প্রিণ্টার্স আর্ট গ্যালারী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

আদিনাথবাবুর ছাত্র ও পরবর্তী শিল্পী-জীবন ছিল নানা কৃতিত্বে পরি-পূর্ণ। প্রথম জীবনে তিনি প্রথাগত শিল্প-চর্চায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাছাড়া বাংলার গণ-জীবনের দুঃখ-দৈন্য, হাসি-কান্না, সংগ্রামী-চেতনার তিনি ছিলেন সত্যিই অংশীদার। এককালে তাঁর রচিত চিত্রের বলিষ্ঠ রেখায় আমরা বাংলার সংগ্রামী জীবন-স্পন্দন অনুভব করেছিলাম। তাঁর এই প্রদর্শনীতে সেই সব চিত্রের কিছু অংশ প্রদর্শিত হলে আমরা আরো খুশি হতাম।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে আদিনাথবাবুর চৌদ্দটি তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ও সাতটি স্কেচ এবং কাঠ-খোদাই স্থান পেয়েছিল। তৈল-চিত্রগুলির অধিকাংশই শিল্পীর ইতালী-ভ্রমণের (শিক্ষার জন্য) সময় রচিত। আদিনাথবাবু ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী জেনথেলিনির স্টুডিওতে ইতালীর আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের পাঠ গ্রহণ করেন। যদিও এই শিক্ষা তাঁকে অবয়ব ভেঙে জ্যামিতিক প্যাটার্ণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে তবুও তিনি মানুষকে আশ্চর্য বলিষ্ঠ রেখায়, চমৎকার বিন্যাসকৌশলে, স্নিগ্ধকর রঙে, আবেগ-ময় পরিমণ্ডলে এমনভাবে অঙ্কন করে-ছেন যা দেখে আমরা বাস্তবকে অনায়াসে স্পর্শ করতে পারি। এঁর চমৎকার নিদর্শন তাঁর 'ওয়েটার রিডিং নিউজ পেপার' চিত্রটি (৫)। প্রতীক্ষামান মানুষের সামগ্রিক রূপ সুন্দরভাবে এই চিত্রে বিধৃত। এই চিত্রখানিই ইতালীর প্রদর্শনীতে পুরস্কারে সম্মানিত হয়। 'ওয়েটিং রুম' (১০) চিত্রের অপেক্ষমান তিনটি পুরুষ ও নারীর সুন্দর কম্পো-জিশান, কালো পশ্চাৎপটে নীল ও অনুচ্চ রঙে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যঞ্জনাময় অভি-

শিল্পী : আদিনাথ মুখার্জী

শিল্পী ঃ সনৎ কর

ব্যক্তি. শিল্পীর গভীর শিল্প-চেতনারই স্বাক্ষর-দীপ্ত। 'স্ট্রীট কর্ণার' (১৩) চিত্রের ম্লান রঙে অঙ্কিত পুরুষ-নারীর ভালবাসার রমণীয় ভঙ্গীও ভুলবার নয়। শিল্পী আদিনাথ মুখার্জী ড্রয়িং সম্বন্ধে যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা তাঁর ন্যুড ষ্টাডিগুলির (৩, ৪, ১২) প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগে ফুটে উঠেছে।

স্কেচ ও কাঠ-খোদাইগুলি শিল্পীর অনেককাল আগের রচনা। এখানেও তাঁর শিল্পী-মনের বলিষ্ঠতা অনায়াসে লক্ষ্য করা গেছে। আদিনাথবাবু পশ্চিমবংগ সরকারের প্রচার বিভাগের প্রধান শিল্পী ছিলেন। সুতরাং তাঁর শিল্প-কর্মগুলি রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই শিল্পীর সামগ্রিক চিত্র-কলার সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যোগ্যতর ব্যক্তিরা আগ্রহী হবেন।

।। শিল্পী সনৎ করের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

আদিনাথবাবুর পরে প্রিণ্টার্স আর্ট গ্যালারী শিল্পী সনৎ করের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন চেকোস্লোভাকিয়ার কলকাতাস্থ কনসুলেট জেনারেল মিঃ লাডিস্লাভ হাবান।

এই প্রদর্শনীতে সনৎবাবুর ২৭খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। সমস্ত চিত্রেরই মাধ্যম তৈল-রঙ। সনৎ কর সমকালীন শিল্পী-সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক। ভারতের নানা স্থানে সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র-কলা ইতঃমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী।

শিল্পী সনৎ কর আধুনিক বিমূর্ত চিত্রধারার অনুগামী। সুর-রিয়ালিজমের প্রতিই তাঁর ঝোঁক। কিন্তু তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবং প্রকরণ-কৌশলে যথেষ্ট আস্থা আছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ চিত্রে তিনি মানুষকে প্রকৃতি-জগতের প্রেক্ষাপটে বিধৃত করতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রকৃতি আবার শুধু নিঃসর্গ নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবনার জগতে যে প্রাকৃতিক অলংকরণ প্রয়োগ করলে তাকে বিমূর্ত-চেতনায় মূর্ত করেও বাস্তবগ্রাহ্য করা যায় সনৎ-বাবু মূলতঃ সেই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তাই তাঁর বিকৃত ফর্মগুলি দর্শকের চোখে শুধু বিকৃতিতেই পর্যবসিত হয় না, কিছু ভাবনার সম্পদও রেখে যায়। এরি দৃষ্টান্ত তাঁর 'নিঃসংগ' (৫), 'ভালবাসা' (৭), 'বয়ঃসন্ধি' (১৯) প্রভৃতি চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর 'প্রতিবেশী' (১, ২) চিত্রের কম্পোজিশানও মনে রাখার মত। ভারতীয় চিত্র-কলার ললিত-সৌন্দর্য ও ফর্মকে ভেঙ্গে 'সিম্ফনী' (৮) ও 'কম্পোজিশান—১' চিত্রে তিনি আমাদের নতুন আস্বাদ পরিবেশন করতেও চেষ্টা করেছেন।

উপর্যুক্ত কথাগুলি সনৎবাবুর শক্তিমত্তার স্বীকৃতিমাত্র। কিন্তু একটি বক্তব্যও আছে আমার। সনৎবাবুর চিত্রে এত চড়া রংয়ের ছড়াছড়ি কেন? আর সর্বত্র কিন্তু প্রয়োজনে ফর্ম ভাংগা হয়নি। এ-যেন এক প্যাটার্ণ সৃষ্টির জনাই প্যাটার্ণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। আশা করি সনৎবাবু ভবিষ্যতে এ-দিকে তাঁর সজাগ শিল্প-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই ত্রুটি উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করবেন। আমরা শিল্পী সনৎ করকে অভিনন্দন জানাই।

।। শিল্পী কে এস কুলকার্ণির চিত্র-প্রদর্শনী ।।

অশোকা গ্যালারীতে শিল্পী কুলকার্ণির চিত্র-কলার প্রদর্শনী জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে উদ্বোধন করা হয়েছে। কলকাতার শিল্পরসিকদের কাছে সত্যি এটা সুসংবাদ।

শিল্পী কুলকার্ণি বোম্বাইয়ের শিল্পী। অধুনা দিল্লীতেই তিনি শিল্প-সাধনায় রত। এই প্রবীণ শিল্পী দেশে-বিদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরূপে পরিচিত। ইনি প্রকরণ-কলার দিক থেকে আধুনিক রীতি-নীতির অনুসারী হলেও বক্তব্যের দিক থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। ভারতের গ্রামীন জীবন, তার প্রকৃতি ও জীব-জন্তু, লৌকিক আবেষ্টন শিল্পী কুলকার্ণির চিত্র-কলার মুখ্য বিষয়। আশ্চর্য সুন্দর রঙে, বলিষ্ঠ রেখায় তিনি এই বিষয়-বস্তুকে তাঁর চিত্রে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যেটুকু বলা প্রয়োজন তার বেশি ইনি বলতে প্রস্তুত নন। ফলে তাঁর চিত্রে এক সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনার স্বাক্ষর বিরাজিত। কোনো কোনো চিত্রে স্থাপত্যের দৃঢ়তাও লক্ষ্যণীয়।

শিল্পীর আলোচ্য প্রদর্শনীতে ২০ খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। সবই তৈল-রঙে অঙ্কিত। রঙ প্রয়োগে তিনি এক সুন্দর মিশ্রণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবে সবুজের প্রতিই যেন তাঁর আসক্তি। জীবনকে ভালবাসেন বলেই বোধহয় তাঁর এই সবুজ-প্রবণতা।

আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর 'ঘরের দুয়ারে' (৯), 'গাড়ী' (১৪), 'চুম্বন' (১১), 'হারানো আলো' (১৫) ও 'নৃত্যে' (২০) চিত্রের বলিষ্ঠ পরিকল্পনা এবং রঙ প্রয়োগের পরিমিতবোধ। শিল্পী যা বলতে চান তা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগেই রূপায়িত হয়েছে। 'প্রসূতি' (৭) চিত্রে পিকাসোর প্রভাব আছে বলে মনে হল। অন্য কয়েকখানি চিত্র বিমূর্ত ধ্যান-ধারণার আচরণে সাধারণ দর্শকের কাছে একটু দুর্বোধ্য লাগবে বোধহয়। আমরা শিল্পী কুলকার্ণির আরো চিত্র-প্রদর্শনী দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।

এই প্রসংগে অশোকা গ্যালারী সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। অশোকা গ্যালারী এ পর্যন্ত তার কর্ম-সূচীতে প্রধানতঃ অবাংগালী শিল্পীদেরই স্থান দিয়েছেন। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা কি পারেন না অবাংগালী, বাংগালী নির্বিশেষে সকল প্রধান শিল্পীকে তাঁদের গ্যালারীতে স্থান দিতে? আশা করি, আমাদের প্রস্তাবটি তাঁরা সহৃদয়তার সংগে বিচার করে দেখবেন। অন্যান্য আর্ট গ্যালারীর পরিচালকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যেও আমাদের ঐ একই আবেদন রইলো।

শিল্পী ঃ আদিনাথ মুখার্জী

চায়ের ধোঁয়া

উৎপল দত্ত

(নয়)

॥ বাস্তব ও বাস্তবোত্তর ॥

সেদিন আলোচনার মধ্যমণি হলেন দার্শনিক। পরিচালক শুধু খেতে লাগলেন, বড় একটা কথা বললেন না। এদিকে দার্শনিক বললেন—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হিল নামক এক ভদ্রলোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে বসলেন। আর যাবে কোথায়? প্রকৃতিকে যে যথাযথ ধরে রাখা যায় এটা জানতে পেরে একদল মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বাস্তবকে অনুকরণ করা শুরু হোলো। আমি বলতে চাই এই বাস্তববাদীরা সাহিত্যে, চিত্রকলায়, নাটাশালায়, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে পদ্মবনে মত্তহস্তীর মতন শিল্পকলার সর্বনাশ করেছেন। আবার অচিরেই চিত্রকলায়, সাহিত্যে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে গেছে; বাস্তববাদ ওখানে ধ্বংস। কিন্তু নাটাশালায় তো কই বাস্তববাদীদের পিছু হঠতে দেখছি না। স্যার গর্ডন ক্রেগকে পাগল আখ্যা দিয়ে নাটাশালা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে; রবার্ট এড্‌মণ্ড্ জোন্‌স্ হতাশ হয়ে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন; জার্মান এক্‌স্‌প্রেশনিস্টরা আজ নির্বোধ অভিনেতার উপহাসের পাত্র; মায়ারহোল্ড-এর থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল; টলের আত্মহত্যা করেছিলেন; ভাখ্‌টাংগভ্ অকালে মরে গেলেন; একমাত্র ব্রেশ্‌ট্-এর থিয়েটার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে টি'কে আছে; আর যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই নাটাশালায় বাস্তববাদীদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এর কারণ কি?

অভিনেতা বললেন—কারণ জানি না, তবে বাস্তববাদীদের হাতে আছে বলেই এখনো থিয়েটার সহজবোধ্য। নইলে হিজিবিজি পিকাসোর ছবির মতন দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠতো।

ভাষাবিদ বললেন—পিকাসো-র ছবিকে হিজিবিজি আখ্যা দিয়ে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করছেন।

অভিনেতা স-খেদে বললেন—আগো আমি পিকাসোকে বুঝতে পারি না।

দার্শনিক বললেন—সেটা আপনার লজ্জা, গর্ব নয়। ও নিয়ে বড়াই করবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে থিয়েটার বাস্তববাদের ধ্যানে মগ্ন; এই বাস্তববাদ কি আর্টের পর্যায়ে পড়ে?

অভিনেতা বললেন—হ্যাঁ, পড়ে। জীবনকে যথাযথ তুলে ধরাই হোলো আর্ট।

দার্শনিক বললেন—জীবনকে যথাযথ তুলে ধরা কি সম্ভব? জীবন তো শুধু ঘটনাস্রোত নয়। জীবন বলতে একটা যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা স্বপ্নসাধনা, সব। তাকে দু ঘণ্টা অভিনয়ের সীমায় বাঁধবেন কি করে? কালস্থানের সীমায় বাঁধলেই জীবন যে খণ্ডিত হয়ে পড়ছে সে খেয়াল আছে?

এবার নাট্যকার কঠোর আত্মসমালোচনা শুরু করলেন—তা ছাড়া জীবনে কি গল্প থাকে? আমরা যে গল্পের কাঠামো তৈরী করে নিই জীবনে তার অস্তিত্ব কোথায়? জীবনে কি নায়ক-নায়িকা থাকে? জীবনে কি ভিলেন থাকে? যে মুহূর্তে নাটকে গুছিয়ে গল্প সাজাই, যে মুহূর্তে নাটকের চরিত্ররা বিশেষ এক টাইপ ধরে, সেই মুহূর্তে আমরা জীবন থেকে দূরে সরে গেছি। তার পরে বাস্তবের কথা বলা বা বাস্তবের ভান করা নিতান্ত মূর্খতা।

দার্শনিক বললেন—ঠিক। তবু দেখেছি নাটাশালার শিল্পীরা কিছুতেই বাস্তবতার মোহ কাটাতে পারছেন না।

অভিনেতা উগ্রস্বরে জবাব দিলেন—বাস্তবতার মোহটা খারাপ কিসে এটাই জানতে চাইছিলাম। আপনারা যা বলছেন তা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল ধাপ্পা। যা দেখছি, যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করছি, সে বস্তুর আলাদা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। শিল্পী তাকে যে চোখে দেখছেন, তার চেয়ে বড় সত্য হোলো বস্তুর অবজেক্‌টিভ্ অস্তিত্ব। তাকে আমার কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থিত করলে তবে সে আর্ট হবে? এ যে বিজ্ঞান-বিরোধি কথাবার্তা। বস্তুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, মনুষ্য-নিরপেক্ষ। তাকে যথাযথ তুলে ধরাই হচ্ছে প্রকৃত বস্তুবাদীর কাজ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বস্তুকে বুঝতে পারি; সেটাই হওয়া উচিত চরম বিচার—ইন্দ্রিয়ের বিচার। তার ওপর যদি বিমূর্ত চিন্তার ছায়া পড়ে তবে তা হোলো মেটাফিজিক্যাল ধাপ্পাবাজী।

দার্শনিক মৃদু হাসলেন; তারপর বললেন—আপনি মার্কস্‌বাদ বা মেটিরিয়েলিস্টদের যা বুঝেছেন তা আপনিই জানেন! আলবের্ট আইনস্টাইনকে তো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বাধা নেই?

অভিনেতা বললেন—না, নেই।

দার্শনিক বললেন—সেই আইনস্টাইন আপনার এবং সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের 'naive realism' সম্পর্কে বলছেন:

"According to it things 'are' as they are perceived by us through our senses. This ilusion dominates the daily life of men and animals; it is also the point of departure in all of the sciences, especially of the natural sciences." অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা দেখছি-বুঝছি তাই চরম—এটা হোলো সাধারণ মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা। বিজ্ঞান ঠিক উল্টো কথা বলছে।

ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব অতি-সরল বস্তুবাদকে তিনি বলেছেন: ৎেলবেইশে ইলিউসিওন ডেস নাইভেন রেয়ালিস্‌মুস্। এই বোকচন্দ্র-বস্তুবাদ ও মার্ক্‌স্-এর ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদে কোনো সাদৃশ্য নেই।

দার্শনিক বলে চললেন—বার্ট্রান্ড রাসেল আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

"We think that grass is green, that stones are hard, and that snow is cold. But physics assures us that the greenness of grass, the hardness of stones, and the coldness of snow, are not the greenness, hardness and coldness that we know in our own experience, but something very different. The observer, when he seems to himself to be observing a stone is really, if physics is to be believed, observing the effects of the stone

upon himself." অর্থাৎ আপনারা **বৈজ্ঞানিক** দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই দিয়ে **বাস্তববাদের** সাধনা করছেন। সেই **বিজ্ঞানই** কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে **দাঁড়িয়েছে।** বিজ্ঞান বলছে, যা দেখছ তা **কিন্তু** সত্যিই তা নয়। দেখার ফলে তোমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া **ঘটছে** সেটাকেই তুমি চরম ভেবে বসে **আছ।** অতএব বস্তুকে স্বতন্ত্র ভেবে লাভ নেই; সে আমাদের মনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। অতএব আজ পিকাসোরা যখন বাস্তবকে আঁকতে গিয়ে নিজেদের মনের উচ্ছ্বাস-টুকেও তার মধ্যে ঢেলে দেন তখন তাকে হিজিবিজি না বলে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিসেবে স্বীকার করুন।

নাট্যকারও এই সময়ে আর এক প্রমাণ দাখিল করলেন—শুধু বিজ্ঞান নয়, মনস্তত্ত্বও আধুনিক চিত্রকরদের পক্ষে রায় দিয়েছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থুলেস কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন; নানা আকারের, নানা ঔজ্জ্বল্যের, নানা বর্ণের কতকগুলি অপরিচিত বস্তুকে আঁকতে বলা হয় কয়েকজন শিল্পীকে। শিল্পীরা যা আঁকলেন তার কোনোটাই অভীষ্ট বস্তুগুলির সঙ্গে মিললো না। বাস্তব থেকে শিল্পীরা এই যে সরে এলেন ডাঃ থুলেস এই পার্থক্যের নাম দিয়েছেন ফেনোমেনাল রিগ্রেশন। বস্তুগুলি শিল্পীদের অপরিচিত ছিল; তাই সঠিক আঁকতে চেষ্টা করে এঁরা শুধু যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন; এবং যা দেখেছেন তা বাস্তব থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। বস্তুগুলি যদি চেয়ার-টেবিল-জাতীয় দৈনন্দিন পরিচিত আসবাব হোতো তবে ফেনোমেনাল রিগ্রেশন অনেক কম হোতো, কারণ যা দেখছি তাকে পরিপূরণ করতো যা জানি; চেয়ারের আকার আমার জানা, তাই চেয়ারের খানিকটা দেখেই বাকিটুকু নিজের অজান্তেই পূরণ করে এঁকে দিতাম। কিন্তু অপরিচিত বস্তুকে দূর থেকে খানিক দেখে যা আঁকলাম, তাতে একান্তভাবেই আমার চোখের পরীক্ষা হোলো। মানুষ আসলে কি দেখে, সেটাই আবিষ্কার করে বসেছেন ডাক্তার থুলেস; জ্ঞান বাদ দিয়ে, অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে, পূর্বে আহরিত তথ্য বাদ দিয়ে, কল্পনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চোখের উপর নির্ভর করলে আমরা যা দেখি তাতে বাস্তবের সঙ্গে ঘোর পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার বিখ্যাত কিছু আধুনিক ছবি পরীক্ষা করে থুলেস বলেছেন, এখানেও দেখছি সেই রিগ্রেশন; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীরা যতটা সরে এসেছেন বাস্তব থেকে ঠিক ততটুকুই সরেছেন বড় বড় শিল্পীরা; তবে এঁরা সরেছেন সজ্ঞানে। বস্তুটা কি জেনেও সেই জ্ঞাত তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চোখ যা দেখছে তাই এঁকেছেন। ডাক্তার থুলেস-এর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে আধুনিক শিল্পীরা যে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বস্তুকে আঁকছেন সেটাই হোলো আসল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, কারণ আসলে আমরা বাঁকাচোরাই দেখি। অতএব যাঁরা বাস্তবতার নাম ক'রে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন তাঁরাই অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেখা-জিনিষের উপর রং চড়িয়ে তাকে জানা-জিনিষে পরিণত করেন। যাকে বাঁকা দেখতে তাকে সোজা দেখাতে চেষ্টা করেন। যেটাকে অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে সেটাকে নিটোল সম্পূর্ণ করে উপস্থিত করেন। বাস্তববাদীরা আসলে অবাস্তববাদী। তাঁরা আসলে সেই প্রাচীন গ্রীক হার্মোনিবাদীদের নন্দনতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করছেন। সেই যে পাইথাগোরাস-এর শিল্পদর্শ, যার চরম প্রকাশ এরিস্টটল, এবং যার প্রভাব সেন্ট্ টমাস একোয়াইনাস-এর উপর প্রবল। সব জিনিষকে পূর্ণ, নিটোল, সুন্দর করে দেখাবার ইচ্ছে। হার্মোনি, অর্ডার, সিমেট্রি, ডেফিনিট্-নেস—প্রভৃতি নানা কথায় তাঁরা প্রকৃতিকে নকল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁরা যে আসলে বাস্তবকে অতিরঞ্জিত অতি-সুন্দর করে দেখাতেন তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।

দার্শনিক পেনসিলের ডগা সজোরে কামড়ে ধরে বললেন—প্লেটো কিন্তু তাঁর শেষ লেখা 'ফিলিবুস'-এ ঐ সৌন্দর্য-তত্ত্বের হাঁড়ি ফাটিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসুরীদের মাইমেসিস-তত্ত্বকে প্লেটো চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ঐ মাইমেসিস-তত্ত্বই তো হচ্ছে বাস্তবানুকরণের ভিত্তি। এমন কি সরল রেখা বা আয়ত ক্ষেত্র বা বক্র রেখা, বা বৃত্ত—এগুলোকেও তিনি পারফেক্ট বিউটি আখ্যা দিয়েছেন। প্লেটো-প্রদর্শিত পথেই তো অবলম্বন করেছেন আধুনিক ইওরোপের শিল্পীরা। কিউবিস্টরা তো স্পষ্টই ফিলিবুসকে তাঁদের বাইবেল বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেজান বলছেন, প্রকৃতির সব সৌন্দর্যের মূলে হোলো সিলিন্ডার, স্ফিয়ার এবং কোন্। অটোমেটিজ্‌ম্ বা এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টের মূলেও তাই। ফিলিবুসকে ভিত্তি পেয়েছিলেন বলেই পল ক্লী একটি রেখার মধ্যে আবেগ দেখতে পান। শত শত বৎসর ধরে ইওরোপীয় চিত্রকররা তথাকথিত বাস্তববাদের কব্জা ভেঙে নূতন বাস্তবোত্তর আর্ট সৃষ্টি করছেন।

ভাষাবিদ বললেন—ঠিক তেমনি ঠুনকো ন্যাকা-ন্যাকা সুন্দরপনা ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভয়াবহকে অসুন্দরকে অবচেতনের দুঃস্বপ্নদের ছবিতে স্থান দিলেন। তেমনি যামিনী রায় জীবনানুকরণের পাট চুকিয়ে কণ্টুর আর জ্যামিতির রেখায় বাস্তবোত্তরকে ধরেছেন। যেদিকে তাকাবেন দেখবেন ফটোগ্রাফির বাস্তববাদ পরিত্যাগ ক'রে বাস্তবোত্তরকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। একমাত্র নাট্যশালাই অন্ধের মতন জীবনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে চলেছে।

নাট্যকার বললেন—সংগীত দেখুন। সংগীতে কেউ বাস্তববাদের ছোঁয়া আশা করে? আগেই একদিন আলোচনা করেছি আমরা। আমাদের রাগসংগীতের কাঁধে বাস্তবের জোয়াল চাপানো সম্ভব হয়নি। তেমনি সম্ভব হয়নি পাশ্চাত্য সংগীতের কাঁধে। এমন কি, ওদের অপেরা দেখুন। পুরো কাহিনী আর আঙ্গিকটা রঙচঙে অতিরঞ্জনাশ্রিত। ভের্দি'র 'রিগোলেত্তো' অপেরার গল্প জানেন? জানেন 'টস্কা'-র গল্প? 'লা বোহেম' বা 'ফাউস্ট্' বা 'মাদাম বাটারফ্লাই'। উপকথার বিশালত্ব প্রতিটি গল্পে। কোথায় বাস্তবতা?

দার্শনিক পেনসিলটাকে চর্বিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে বলে চললেন—নৃত্যের গোড়ার কথাটা কি? গল্পও আছে, চরিত্রও আছে, জীবন-ভিত্তিক বটেই। তবু অসংখ্য মুদ্রা আর ভাব আর দেহ-সঞ্চালনের কায়দায় জীবনকে অতিক্রম করে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে যায় নাচ, তা ব্যালেই বলুন আর ভরতনাট্যমই বলুন। কই উদয়শংকরকে বা উলিয়ানোভাকে তো কোনোদিন দেখলাম না নৃত্যছন্দ বিসর্জন দিয়ে জীবনানুকরণ করতে! তেমনি দেখুন, কবিতার প্রধান কৌশলটা কি? কথাগুলো সব জীবন থেকে আহরিত; তাদের আভিধানিক অর্থ আছে। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ হয়ে তাদের আরেক অর্থ এসে পড়ে, ধ্বনিগত একটা অর্থ, যাকে কোনো অভিধানে বাঁধা যাবে না। কাব্য একান্তভাবেই বাস্তবোত্তর। বাস্তববাদী কবিতা আর সোনার পাথরে বাটি একই জিনিষ।

অভিনেতা মৃদু ঢেঁকুর তুলে জিগেস করলেন—কিন্তু উপন্যাস? সেখানে তো

ছন্দ নেই। প্রতিটি কথা অভিধান-ব্যাকরণের অর্থে ভারক্রান্ত। কথার অর্থকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তাই উপন্যাসকে বাস্তবোত্তরের পথে মুক্তি দেয়া অসম্ভব।

দার্শনিক বললেন—অসম্ভব বলবেন না; জেম্‌স জয়েস তাহলে এদ্দিন ধরে কি করলেন। গদ্যকেও এক নূতন চেহারা দিয়ে তার আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আরো কিছু এনে ফেলার চেষ্টা করে জয়েস কৃতকার্য হয়েছেন। দেখুন, প্রতিটি কথার অর্থ থাকতে পারে; কিন্তু কথাসমষ্টি যে বাক্য সে বাক্যের লজিকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি। ধরুন,

আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ।

প্রতিটি কথার অর্থ সুবিদিত। অথচ সব মিলে যা হোলো তার অর্থ এ জগতে পাবেন না; এক সুন্দরতর জগতের দিকে আপনাকে হেঁচকা টান দিয়েছে লাইনটা। অথবা,

I thought I saw an elephant
Practising on the fife,
I looked again and found it was
A letter from my wife.

লুইস ক্যারোল বা সুকুমার রায় অবলীলাক্রমে লজিকের গণ্ডী ভেঙে ভাষার বাস্তবোত্তরতা দেখিয়ে গেছেন। আবার দেখুন,

"দিনরাত তোমার ঐ হিদ হিদকারে আমার পাঁজপুরিতে তিড়িতংক লাগে।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন এ বাক্যটি বোঝবার জন্যে কোনো অভিধানের দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথের মাথায় খেলেছিল এক নূতন ভাষার সম্ভাবনা—যেখানে অর্থের শৃংখল ছিন্ন হয়ে যাবে। ধ্বনির দ্বারাই সুরের দ্বারাই সে ভাষা নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারবে। সুকুমার রায়-লুইস ক্যারোলের মতই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিশুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন "ছড়ার ছবি"। ভূমিকায় লিখলেন—

'ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না; খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থ-লোভী জাত নয়।'

জানি না বুইটেণ্ডিক-এর 'পেইন' গ্রন্থে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা; তিনি বলছেন মানুষ যন্ত্রণার মুহূর্তেই সত্যিকারের আত্মোপলব্ধি করে। তাই যদি হয় তবে "রোগশয্যায়" কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে বলছেন—

"অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে
অস্পষ্টের কারা—"

তার অর্থ কি? রোগ-জর্জরিত দেহে কি রবীন্দ্রনাথ সেই "ছড়ার ছবি" বা "গল্পসল্পে'র অর্থমুক্ত পাগল-ভাষার সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন? বাণীর ক্ষীণতা কেন? পার্থিব অভিধানে আবদ্ধ ভাষায় অপার্থিব বিশাল আবেগকে ধরতে পারছেন না, তাই কি এই ক্ষোভ? তাই কি আবার বলছেন—

"কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি
আঁকা-আঁকি।"

সেই জন্যেই কি আরো স্পষ্ট ভাষায় বলছেন,

মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি,
সব কথা বলা হয় নাই;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।"

আরো শুনুন,

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম।

লক্ষ্য করুন—ভাষা পাই নাই, অকথিত বাণীপুঞ্জ। এই অকথিতকে প্রকাশ করার কি উপায়? অর্থের শৃংখল মোচন করে কথাকে উদ্দাম অর্থহীন আবেগে ছুটিয়ে দেয়া অসম্ভবের পথে। শুনুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন "আরোগ্য" গ্রন্থে :

"মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার
শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী......
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃংখলপাশ।"

বাস্তবের শেষ রেশকে মুছে ফেলার এ আহ্বান! এখানে রবীন্দ্রনাথ জয়েস-সুকুমার-ক্যারোলের রাজ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উন্মুখ। তাইতেই তো কবির সুললিত ভাষা ছেড়ে চড়ুই পাখীর অর্থহীন প্রলাপের দিকে আকৃষ্ট হ'ন রবীন্দ্রনাথ; বলেন ভোরের চড়ুই পাখীর উদ্দেশ্যে,

"কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।"

এবং সেই পাখীর কাছে কবির একটিই প্রার্থনা,

"সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি।"

দৈনন্দিনের অবিরাম কর্ষণে ক্ষয়-প্রাপ্ত অতি-পরিচিত যে ভাষা তাকেও বাস্তব থেকে মুক্তি দিতে এ'দের সাধনা; তাইতেই শুনি,

"Under the bam
Under the boo
Under the bamboo tree"

তাইতেই পড়ি,

"Spring
Too long
Gongula."

অথচ কি বিচিত্র এই নাট্যশালার পুরো-ধারা। বাস্তবের আরাধনায় মগ্ন এ'রা। এ'দের কাছে তাই কাব্যনাট্য অপাংক্তেয়; কারণ জীবনে মানুষ তো কাব্যি করে কথা কয় না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই তাহলে অবাস্তব! অবাস্তব এলিয়টের "মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল"! শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকই বা থাকে কোথায়? মানুষ জীবনে যা করে বা বলে তা অত্যন্ত সীমিত, বেশির ভাগটাই সে ভাবে। জীবনানুকরণ মানে কি শুধু তার বলার আয়তনটুকু? না-বলার বৃহৎ জগৎটা তবে রইবে পড়ে? এইজন্যেই কি আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি নিষিদ্ধ? এই জন্যেই কি "ছেলে খায় নি" আর "মাইনে বাড়লো না" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবহারবাদে আমাদের নাটক আজ আচ্ছন্ন?

নাট্যকার সরোষে বললেন—আর বলবেন না, দাদা! পেটে টিউমার হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু খেয়ে খাদে গেল না না-খেয়ে গেল, এইসব অবান্তর খাটো কথায় নিজেকে আটকে রাখতে হয়! এই পরিচালকরা মুখে ক্ষীরোদবাবুর, গিরিশবাবুর নাম করবেন; অথচ কার্য-ক্ষেত্রে ক্ষীরোদ-আদর্শে গঠিত নাটক মঞ্চস্থ করবেন না। লোকে এখন যা চায় তাই দিয়ে যাবেনই এ'রা!

এবার পরিচালক কথা কইলেন, যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। নাট্যশালা প্রত্যক্ষ দর্শক-সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। আপনারা যা বললেন প্রত্যেকটি কথার সংগে আমি একমত। কিন্তু আমার দর্শক কি একমত? এগিয়ে চলা যাক। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন আমার দর্শকও বাস্তবোত্তরকে চাইবে। সেইদিনই আমি বাস্তবোত্তরের দিকে পা বাড়াবো। তার এক মুহূর্ত আগে নয়।

বই চাই গো, বই চাই
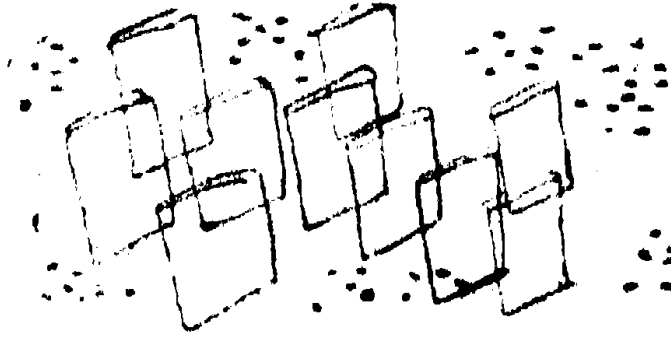
সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শিরোনামা দেখে পাঠক চমকে উঠবেন না। এই নিবন্ধের ছলে 'চণ্ডালিকার' মতো কোনো নৃত্যনাট্য আমি পরিবেশন করতে বসিনি। তবু শিক্ষা-সংকটের যে-কাহিনী আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করবো নাটকের মতই তা রোমাঞ্চকর একথা হলফ করে বলতে পারি। টেক্স্‌ট বই প্রকাশের উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু সম্প্রতি এই টেক্স্‌ট বই নিয়ে যে বাণিজ্য শুরু হয়েছে তা দেখে মনে হয় আমরা শিক্ষা সংকোচনের নীতিই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি। অন্নসংকট ও বস্ত্রসংকটের মতই শিক্ষা-সংকটের এই স্বরূপ উপলব্ধি করে বছরের গোড়াতেই শিক্ষাতংক উপস্থিত হয়।

এই টেক্স্‌ট বই নিয়ে যে নাটক আরম্ভ হয়েছে তার ঘটনাস্থল অবশ্যই কলেজ স্ট্রীট ও তার শাখা-প্রশাখা বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ও শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট অবধি প্রসারিত। নাটকের সূত্রধার দেশের শিক্ষা-প্রসারের অধিকর্তারা এবং এই বিরস নাটকের অসহায় কুশীলব সেই সব শিশুরা—যাদের হাতে জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এই ট্র্যাজিক নাটকের সমস্ত ঘটনাবলীর নিয়ন্তা—পুস্তক-বিক্রেতাদের কথা সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল; তাঁরা নিয়তির মতই অমোঘ।

সম্প্রতি যদি কলেজ স্ট্রীটের বই-পাড়ায় আপনি গিয়ে পড়েন তবে তীব্র হৈ-চৈয়ের ঠেলায় বিভ্রান্ত হয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করতে পারেন কিম্বা হয়তো আপনার মনে হতে পারে লায়ন্স রেঞ্জের শেয়ার ও ফাটকা বাজার এখানে উঠে এসেছে। কিন্তু না. নতুন ক্লাশের টেক্স্‌ট বই বিক্রি হচ্ছে। দোকানদারদের হাতে প্রয়োজনীয় বইয়ের লিস্টি পৌঁছে দিয়ে লাইন করে দাঁড়াতে হবে। বইয়ের দোকান থেকে লাইন ছাড়িয়ে চলে যাবে ট্রাম-বাসের রাস্তায়; সেই জনাই

"কেবা আগে প্রাণ, করিবেক দান
তারি লাগি কাড়াকাড়ি।"

সন্ধ্যের আগে বেচা-কেনা শেষ করতে হবে ভেবে হাতের জমানো লিস্টি দেখে বই-বিক্রেতা ধৈর্যচ্যুত, ক্রেতাও ততোধিক। তার ফলে তাপাংক যখন হিমাংকের দিকে চলেছে তখনও মেজাজের এই অগ্নিবিস্ফোরণ হাজারটা দমকল ডেকেও নেভানো যায় কিনা সন্দেহ।

ফুটপথের বইয়ের বাজার।

ফুটপথের বইয়ের বাজার

দুর্ভিক্ষের সময় থেকে চাল-চিনি-কয়লার লাইনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলে লাইন জিনিসটা আমি সন্দেহের চক্ষে দেখি। এখন লাইনে দাঁড়ানো অবশ্য চালু প্রথা। সিনেমা দেখতে লাইন মারতে হয় বলে সিনেমা দেখি না। বাসে উঠতে হলে লাইনে দাঁড়াতে হয় বলে পা দুখানিকেই অনেক ক্ষেত্রে সম্বল করেছি। বই কিনতে গিয়ে ছেলেবেলায় এমন লাইন মারতে হলে লেখাপড়া আমার হতো কিনা সন্দেহ। গুরুজন ব্যক্তিরা আমাকে অনেক লাইন দিতে চেয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুতেই কোনো লাইনের লোক হতে পারলাম না।

অবশ্য টেক্স্‌ট বইয়ের সার্থক ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই যাকে বলে ঠিক "লাইনের লোক"। জীবনের সার্থকতার লাইনে উভয় পক্ষই চড়চড় করে এগিয়ে চলেছেন। টেক্স্‌ট বই প্রকাশ করে ও বেচেই এক ধরনের প্রকাশকের এত

রব্‌রবা। নাটক উপন্যাস ছাপিয়ে ও বেচে কিছুই হয় না। যখন নেহাত কিছু করবার থাকে না হাতে অজস্র সময় তখনই ডাক পড়ে নাটক-উপন্যাসের। ওসব ছাপিয়ে একটু যেন ফুর্তি করা। উপমা দিতে গেলে বলতে হয় ক্রোড়পতি বণিক যেমন অনায়াসে দু'দশ হাজার কখনো কখনো বাঈজী নাচিয়ে ফুর্তি করে—এও ঠিক সেরকম।

সুদূর মফঃস্বল থেকে অজস্র ক্রেতা আসেন এখানে। অনেকেরই বোধ হয় এই সর্বপ্রথম কলকাতা দর্শন। বই 'গস্ত' করতে আসার ছলে চিড়িয়াখানা যাদুঘর দেখে, কালীঘাটে মা-কালী মন্দিরে পুজো চড়িয়ে, গ্রামের মেয়েদের জন্যে শাড়ী-চুড়ি, নিজের অনেক দিনের শখের টেপা-বাতি (টর্চ লাইট) ও ফরমায়েস মত এটা-সেটা সংগ্রহ করে স্বগ্রামে ফিরতে হয়। কেননা, গ্রামে ফিরে গিয়ে বছরখানেক ধরে আষাঢ়ে গল্প করার মত রসদ জোগাড় করে ফিরতে হবে তো! সেই সব সান্ধ্যবৈঠকে এভারেস্টের চূড়ো ও মনুমেণ্ট এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও তাজমহলে তফাত থাকবে সামান্যই।

বহু পুস্তক-ব্যবসায়ীর দরজায় ক্রেতারা ধর্ণা দিয়েও অবশ্য-পাঠ্য টেক্স্ট বই কিনতে পারেন না। হঠাৎ খবর আসে আর নেই, ফুরিয়ে গেছে। ফুরিয়ে হয়তো যায়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই সব বইয়ের দেখা মেলে ফুটপাথের দোকানে দোকানে। বইয়ের এই পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী শোনা যায়। কখনো শোনা যায় যে অদৃশ্য হাতের স্পর্শে স্কুল ফাইন্যাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা ঠাণ্ডা হয়ে নব কলেবরে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে, সেই হাতেরই যাদুস্পর্শে দপ্তরীর বাড়ী থেকে ছাপানো ফর্মা বই বাঁধাই হয়ে ফুটপাথে চলে এসেছে। কখনো বা শোনা যায় সাত গাঁ ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞ দোকানীরা "স্পেশিমেন কপি" মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে জলের দরে কিনে এনে ফুটপাথে বিক্রি করে দু' পয়সা করছেন।

আর একটা কথা গোপনে বলি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কোনো অবশ্য-পাঠ্য দশ আনা দামের বই কিনতে গিয়ে অনেককে আরো দেড় টাকা দামের নোট-বই কিনতে হয়েছে; যা না কিনলে অমুক বই পাওয়া অসম্ভব। জুগিয়েছে ঐ ফুটপাথের দোকান, অনেক জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে ফিরবার পরে। মনে পড়ে একটি বিশেষ দ্রব্যের মাহাত্ম্য-কীর্তন করে এক বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন—

"অমুক জিনিসটি বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য, কিন্তু তার ডাকমাশুল ৬৷৷ টাকা।" দশ আনার টেক্স্ট বই গস্ত করতে গিয়ে সেই বিজ্ঞপ্তির অর্থভেদ এতদিনে হয়েছে।

ছাপাখানা থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি বৎসর অজস্র বই ছাপানো হচ্ছে, এমনকি বই ছাপানোর ব্যাপারে সরকারি দপ্তরও অগ্রণী হয়ে যখন এগিয়ে এসেছে তখনও প্রয়োজনমতো বই সরবরাহ করা কেন যাচ্ছে না, কেন যে বইকেনার পথ সুগম হচ্ছে না—ভাবলে সমস্ত ব্যাপারটাই তামাশার মত লাগে। এই কৌতুক-নাট্য যাদের নিয়ে বেশ জমে উঠেছে তারা অসহায় ও নির্দোষ শিশু। বহু দুর্ভোগ তাদের ভুগতে হচ্ছে। যতদূর স্মরণ আছে আমাদের শৈশবে এত ঘন ঘন বই পরিবর্তন হতো না। সুতরাং দাদা-দিদির বই ছোট ছোট ভাই-বোনেরা পড়ে মানুষ হতে পারতো। প্রতি বছরে গাদা গাদা নতুন বই কেনার জন্যে দুর্ভোগ ও আর্থিক সংকটে অভিভাবককে ভুগতে হতো না।

পরিসংখ্যান বিভাগের মতে বর্তমানের শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় অতীতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হতে পারে। কিন্তু তখনকার শিক্ষার মান বর্তমানের চেয়ে নিম্নস্তরের ছিল—এমন প্রমাণ নিশ্চয়ই নেই।

অতীতের সুপাঠ্য টেক্স্ট বই ও তার প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত রচয়িতাদের নাম করে হা-হুতাশ নাই বা করলুম। এখন জানি, সাংসারিক সুরাহার তাগিদে এই গ্রন্থ-রচয়িতাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং বই ধরানোর উদ্দেশ্যে ডি, পি, আই অফিসে ও বিভিন্ন ইস্কুলে ধর্ণা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী ও কৃতী পুরুষের সংখ্যাও বিরল নয়। তাঁদের সকলকেই নমস্কার। প্রত্যেককে তাঁদের প্রাপ্য যথাযোগ্য সমাদর দিয়ে শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি অবশ্য-পাঠ্য পুস্তকের মান-বিচার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত হন এবং দুর্দিনের বাজারে ফি-বছর বইয়ের রদ-বদল না করেন তাহলে বিপন্মুক্ত অভিভাবক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন এবং জাতির ভবিষ্যৎ স্রষ্টারা এই নিদারুণ শিক্ষাসংকটের হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

॥ ২৬শে জানুয়ারী ॥

প্রজাতন্ত্রী ভারতের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানায়, তাই সেই দিন থেকে ২৬শে জানুয়ারী ভারতের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে পবিত্র দিন। ঐ পবিত্র দিনকে আরও পুণ্যময় ও স্মরণীয় করা হয়েছে স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান ঐ দিনে প্রবর্তিত করে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে নতুন সংবিধানমতে ভারত সার্বভৌম প্রজাশাসিত সাধারণতন্ত্র। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে জানুয়ারী, তাই নতুন ভারতের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস। বিশাল ভারতের কোটি কোটি মানুষের শতাব্দী-সঞ্চিত আশা-অকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পূরণের দিন ২৬শে জানুয়ারী।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার এক উজ্জ্বল আদর্শ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি দেশবাসীর স্বাধীন ইচ্ছামতে পাঁচ বছর অন্তর এখানে গঠন হয় নতুন সরকার এবং সে সরকারের প্রতিদিনের প্রতিটি কাজ চলে দেশবাসীর অনুমোদন অনুসারে। এ-দৃষ্টান্ত বর্তমান এশিয়ায় বিরল। প্রতিবেশী দুই ভারত-প্রভাবিত রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ছাড়া এশিয়ার কোথাও আজ আর প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। অধিকাংশ দেশে কোনদিনই গণতন্ত্রের আলো প্রবেশ করেনি, যে-সব দেশে করেছিল বলদর্পী সৈনিক বা ক্ষমতালুব্ধ নৃপতির নিষ্ঠুর তাড়নায় সে-আলো নিভে গেছে। প্রজাতন্ত্রী ভারত আজ তাই সারা এশিয়ার মুক্তিকামী মানুষের আশার আলো—নব-জাগ্রত আফ্রিকারও সে বিশ্বস্ত অগ্রপথিক।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় এই কারণে যে, এইবারই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীন ভারতের আসমুদ্র হিমাচল কোটি কোটি মানুষ এই দিবস পালনের সুযোগ পাবে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের তিনটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড—গোয়া, দমন, দিউ-র কয়েক লক্ষ মানুষ সাড়ে চারশ' বছর বাদে এক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে এইবারই সর্বপ্রথম পঁয়তাল্লিশ কোটি স্বদেশবাসীর সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে যোগদানের সুযোগ পাবে। ভারতের কোথাও আজ আর কলঙ্কিত উপনিবেশী শাসনের অস্তিত্ব নেই, এইটাই এইবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা। স্বাধীন ভারতের সকল প্রান্তের সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য-প্রভাত মুখরিত হয়ে উঠুক—এই আমাদের অন্তরের কামনা।
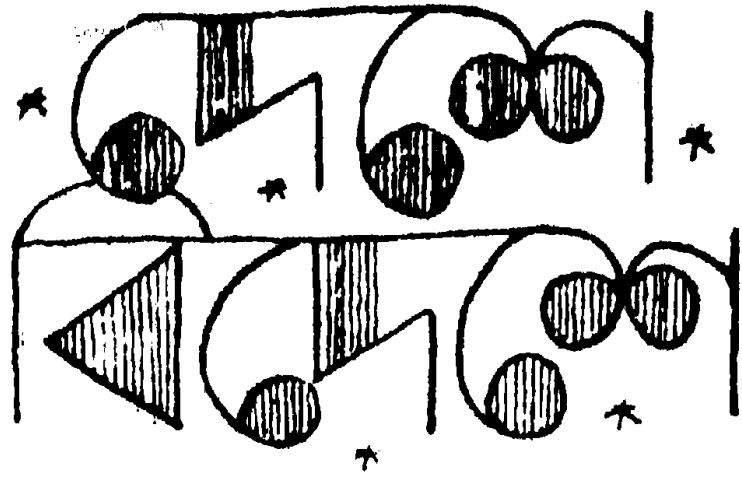
দেশে বিদেশে

॥ ওলন্দাজ প্ররোচনা ॥

ওলন্দাজদের প্ররোচনায় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী পশ্চিম ইরিয়ান উপকূলে প্রহরারত ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজ থেকে গুলীবর্ষণ করে ইন্দোনেশিয়া নৌ-বাহিনীর একটি মোটর টর্পেডোকে নিমজ্জিত করা হয় এবং আর একটি মোটর টর্পেডোয় আগুন জ্বলে ওঠে। এই আক্রমণাত্মক কাজের সমর্থনে ওলন্দাজদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার মোটর টর্পেডোগুলি পশ্চিম ইরিয়ানের উপকূল সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ওলন্দাজরা গোলা-বর্ষণ করেছিল এবং তাদের প্ররোচনা-মূলক কাজের ফলে, এইটাই প্রমাণ হয়ে গেল যে, পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে আলোচনার আর কোন সুযোগ নেই। এর পর ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসবে, তখন সে-আলোচনা হবে শুধু পশ্চিম ইরিয়ানের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে।

পশ্চিম ইরিয়ান থেকে হল্যান্ড প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দুর্বল দেশ। এর ওপর সুয়েজের পথ যদি বন্ধ হয়, তবে ঐ দূরত্ব আরও কয়েক হাজার মাইল বিস্তৃত হবে। আর ইন্দোনেশিয়াকে আক্রমণ করলে হল্যান্ড যে সুয়েজ খাল দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবে না, সে-কথা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি নিয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যিই যদি হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তবে সে-যুদ্ধ যে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হবে এবং গোয়া থেকে পর্তুগালের বিদায়ের মত পশ্চিম ইরিয়ান থেকে হল্যান্ডকে অনিবার্যভাবে গলা ধাক্কা খেয়ে বিদায় নিতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবুও ক্ষুদ্র হল্যান্ড যে এখনও পর্যন্ত ধরাকে সরা জ্ঞান করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে, সেটা সাম্রাজ্যবাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া হল্যান্ডের মনে এ-আশাও আছে যে, পশ্চিম ইরিয়ান আক্রান্ত হলে অস্ট্রেলিয়া তার সহায় হবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া যদি সত্যিই এ-ধরণের হঠকারিতা করে তবে ইন্দোনেশিয়া জানিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্ব-যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া অত বড় বিপদের ঝুঁকি কখনও নেবে না। তারা ইংরেজদেরই বংশধর, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হল্যান্ডকে আশ্বাস দিয়ে যাবে কিন্তু সত্যিই যখন অভিযান শুরু হবে, তখন পর্তুগালের মত হল্যান্ডও দেখবে যে, পাশে কেউ নেই। অতএব সব জেনেশুনেও হল্যান্ড যদি শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র আক্রমণের পথই বেছে নেয়, তবে চরম লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের মধ্যেই তাকে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইরিয়ান থেকে বিদায় নিতে হবে। ইন্দোনেশিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিম ইরিয়ানকে মুক্ত করতে তার দু' সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।

॥ কঙ্গো পরিস্থিতি ॥

কঙ্গোর অন্তর্ঘাতি রাজনীতিতে এখন কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট শোম্বের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে উঠেছেন কঙ্গোর জাতীয় সরকারের

উপ-প্রধানমন্ত্রী গিজেংগা। লুমুম্বা-পন্থী এন্টনী গিজেংগা ছিলেন কংগোর জাতীয় ঐক্যের সবচেয়ে বড় সমর্থক। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত ও নিরুপায় শোম্বে যখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে কংগোয় জাতীয় সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেছেন, এবং কাসাভুবুকে সমগ্র কংগোর প্রেসিডেণ্টরূপে স্বীকৃতি জানিয়ে কার্যত কাতাংগার কংগো-অন্তর্ভুক্তি মেনে নিয়েছেন, সেই সময় কোন এক রহস্যজনক কারণে কংগোর উপ-প্রধানমন্ত্রী গিজেংগা কংগোর কেন্দ্রীয় শাসনের সংগে অসহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বারংবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তিনি বসে রইলেন, তাঁর শক্ত ঘাঁটি কিভু প্রদেশের রাজধানী স্ট্যানলিভিলে। ফলে শোম্বের নতি স্বীকারের পরেই কংগোর কেন্দ্রীয় শাসনকে মনোনিবেশ করতে হয়েছে গিজেংগা-দমনে। গিজেংগার বিরোধিতা অবশ্য খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। তাঁর ব্যক্তিগত সৈন্য-বাহিনী ও দেহরক্ষীরা ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং গিজেংগা সম্বন্ধে সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তা যদি সত্য হয়, তবে তিনি এখন গৃহবন্দী। এ-কথা সর্বজন-বিদিত যে, কাতাংগা এত দিন মুখ্যত বেলজিয়াম ও বৃটেনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ও সমর্থনের জোরেই কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিল। সুতরাং ওপর তরফের আলোচনায় ঐ বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। আজ যে শোম্বে-কাসাভুবু বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হতে চলেছে, তার পেছনে যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রয়াস নেই, এমন কথা কোনমতেই জোর করে বলা চলে না। এ-অবস্থায় কমিউনিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত লুমুম্বার অনুগামী এণ্টনী গিজেংগা অবশ্যই কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে উঠতে পারেন। গিজেংগার প্রতি কমিউনিষ্ট দুনিয়ার প্রকাশ্য সমর্থনে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুতরাং কংগোর রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ এখন এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে বলে মনে হয়। কাসাভুবু-গিজেংগা বিরোধ হয়ত অনতিবিলম্বেই রুশ-মার্কিণ বিরোধের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে দাঁড়াবে এবং গিজেংগা-শাসিত কিভু প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যের দাবী হয়ত প্রকাশ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সমর্থিত হবে। বলা বাহুল্য, কংগো সমস্যার সমাধান তখন আরোও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

॥ রুদ্র প্রকৃতি ॥

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ থেকে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ এসেছে। রাজধানী লিমার ১৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হুয়াসকারাম পর্বতের শৃংগ হতে এক অতিকায় হিমানী সম্প্রপাতের ফলে হাউরাস নামে একটি ছোট শহরের প্রায় চার হাজার অধিবাসীর জীবনান্ত ঘটেছে। শহরটিও প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। পেরুর সংবাদপত্র এক্সপ্রেসোতে এসম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, কয়েকদিনব্যাপী বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় হুয়াসকারাম পর্বতের প্রায় বাইশ হাজার ফুট উচু শৃংগ হতে প্রায় তিন লক্ষ টন ওজনের বাইশ লক্ষ ঘনফুট বরফ ভেঙে পড়ে নিম্নগামী হতে আরম্ভ করে এবং নামার পথে ইউকালিপটাস গাছের একটি বিরাট অরণ্যও তার সংগে নির্মূল হয়ে শহরের ওপর আছড়ে পড়ে। ঐ বরফের স্তূপ ও গাছের তলায় চাপা পড়েই মুহূর্তের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তারপর ঐ বরফের জল গলে অবিলম্বে আর এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বরফের জলে স্থানীয় নদীর জল প্রায় কুড়ি ফুট স্ফীত হয়ে উঠে এবং তার ফলে শহরে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এই বন্যার ফলে যে ক্ষতি হয় তা নাকি তুষার ধ্বসের ক্ষতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

॥ নিষ্ঠুর সমাজ ॥

দুটি ক্ষুধার অন্নের নিষ্করুণ প্রয়োজনে সমাজের নীচের তলার মানুষকে আজ যে কি নিগ্রহ সইতে হচ্ছে তার একটি ভয়াবহ ছবি ক'দিন আগে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের একটি মামলায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। একটি আটাশ বছর বয়সের উদ্বাস্তু যুবক সংসারের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে গিয়েছিল রক্ত জমা দিতে। তার মত আরও অনেকগুলি মানুষই ঐভাবে ভোর থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্লাড ব্যাংকের দরজায়, রক্তের বিনিময়ে দশটি টাকা পাওয়ার আশায়। স্বভাবতই সেই মানুষের ভিড়ে একটা জটলার সৃষ্টি হয় এবং শান্তিরক্ষী পুলিশ এগিয়ে এসে ঐ হতভাগ্য যুবকটিকে হল্লা ও উচ্ছৃংখল আচরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেননি। পরন্তু যুবকটিকে মুক্তির নির্দেশ দেওয়ার কালে বিচলিত হয়ে তিনি বলেছেন, একদিকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি, অন্য-দিকে বঞ্চনা ও রিক্ততার অভিশাপ এই অবস্থায় সমাজ কখনও সুস্থ থাকতে পারে না। কিন্তু কোনপথে এই অসম্ভব দুর্বিষহ অবস্থার পরিত্রাণ তা বিচারক স্পষ্ট করে বলেননি। হয়ত তা বলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে সরকারী বিচারাসনে উপবেশন করে।

ঘটনা-প্রবাহ
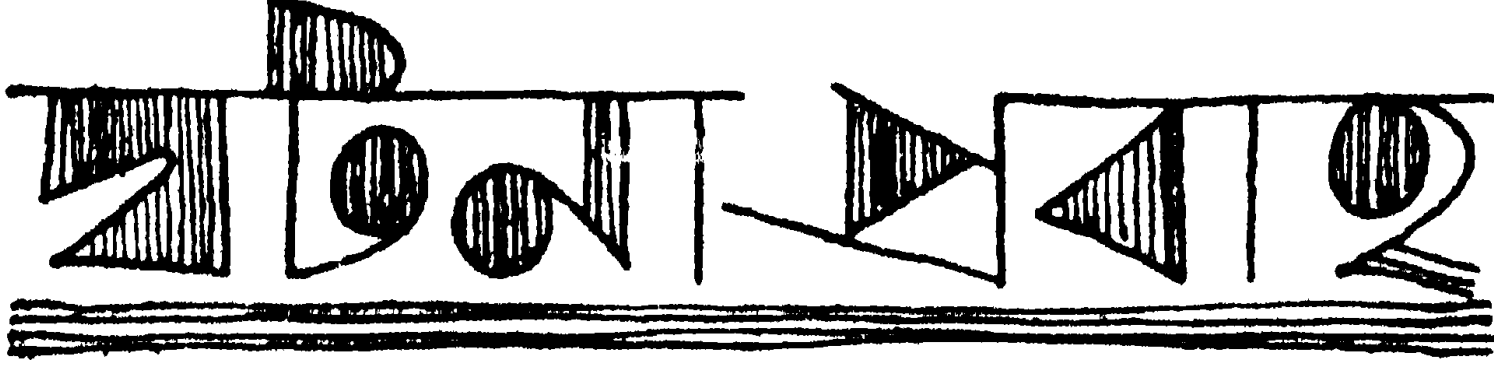
॥ ঘরে ॥

১১ই জানুয়ারী—২৬শে পৌষ : 'বিভিন্ন জাতির সম্মুখে একটিমাত্র পথই খোলা আছে : পারস্পরিক বোঝা-পড়া, একে অন্যের উপর প্রভুত্ব নয়'—দিল্লীতে কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) উদ্বোধনী ভাষণ।

ডায়মন্ডহারবারের অদূরে গঙ্গা-সাগরগামী যাত্রীবোঝাই নৌকা জলমগ্ন—লঞ্চের সহিত সংঘর্ষে দুর্ঘটনা।

১২ই জানুয়ারী—২৭শে পৌষ : 'গোয়া, দমন ও দিউ সংবিধান অনুসারেই ভারত ইউনিয়ন এলাকায় পরিণত হইয়াছে : অন্তর্ভুক্তির জন্য নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নাই'—নয়াদিল্লীর সরকারী মহলের সর্বশেষ অভিমত।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ—১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (শেষদিনে কলিকাতা) পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান।

১৩ই জানুয়ারী—২৮শে পৌষ : ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের (৫৩) পরলোকগমন।

১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ মধ্যে নির্বাচন সমাধা করার নির্দেশ রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের যুগপৎ ঘোষণা।

১৪ই জানুয়ারী—২৯শে পৌষ : মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সাগর সঙ্গমে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ—ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পুণ্য সলিলে অবগাহন।

'সমবায় ব্যবস্থা ছাড়া ভারতে কৃষির ভবিষ্যৎ শুভ হইবে না'—গোরক্ষপুরে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৫ই জানুয়ারী—১লা মাঘ : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় (ক্রিকেট) ভারতের সর্বপ্রথম 'রাবার' লাভের কৃতিত্ব অর্জন—ভারতীয় ক্রিকেট ক্রীড়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা।

'চীনা আক্রমণ প্রতিহত করিতে ভারতের যে-কোন ব্যবস্থায় (বলপ্রয়োগ সমেত) আমেরিকা সমর্থন জানাইবে'—কলিকাতার সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কেনেডির আন্তর্জাতিক ব্যাপার সংক্রান্ত বিশেষ উপদেষ্টা ডাঃ কিসিঙ্গারের ঘোষণা।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ গোয়ার ভারতের সহিত পূর্ণ সংযুক্তি দাবী—শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নিকট গোয়ান জাতীয় কংগ্রেসের স্মারকলিপি পেশ।

১৬ই জানুয়ারী—২রা মাঘ : কলিকাতার বাজারে সরিষার তৈল ও ডালের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি—ডাল ও তেলকলের ধর্মঘটের জের।

'কংগ্রেসকে ভোট দিয়া পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা উচিত'—আলোচ্য প্রসঙ্গে কলিকাতায় কংগ্রেসী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের যোগদানে আকর্ষণীয় বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান।

আসন্ন নির্বাচনে ডাঃ রায়ের (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) চৌরঙ্গী (কলিকাতা) ও শালতোড়া (বাঁকুড়া) উভয় বিধানসভা কেন্দ্র হইতেই প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত।

১৭ই জানুয়ারী—৩রা মাঘ : দিল্লীতে বিমান দুর্ঘটনায় দুইজন পাইলট নিহত—প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া উপলক্ষে পালাম বিমানঘাটির উপর দুইটি বিমানের সংঘর্ষ।

কলিকাতা মহানগরীতে আবার প্রচন্ড শীত—দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৭·৭ ডিগ্রী।

॥ বাইরে ॥

১১ই জানুয়ারী—২৬শে পৌষ : পেরুতে তুষারস্রোতে প্রায় ৪ হাজার নর-নারীর জীবন্ত সমাধি হওয়ার আশংকা—সমুদ্রবক্ষ হইতে ৯ হাজার ফুট উচ্চে মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

পশ্চিম ইরিয়ানে ইতস্ততঃ গণবিদ্রোহ ও খন্ডযুদ্ধ—ইন্দোনেশীয় সরকারী মহলের ঘোষণা।

১২ই জানুয়ারী—২৭শে পৌষ : রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য পাকিস্তানের তৎপরতা—প্রশ্ন আলোচিত হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক ভারতকে সমর্থনের আশ্বাসদান।

১৩ই জানুয়ারী—২৮শে পৌষ : পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তি অভিযানের সর্বাধিনায়ক পদে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুহরতো নিযুক্ত।

'পাকিস্তান যে-কোন শক্তিকেই বাধাদান করিতে সক্ষম'—সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে করাচী বেতারে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সদম্ভ উক্তি।

১৪ই জানুয়ারী—২৯শে পৌষ : ষ্ট্যানলেভিলে প্রচন্ড সংঘর্ষে ২৫ জন নিহত ও অসংখ্য সৈন্য আহত—জেনারেল লুন্ডুলার অধীন কঙ্গোলী কেন্দ্রীয় সরকারী বাহিনীর সহিত অ্যান্টনী গিজেঙ্গার (কঙ্গোর উপপ্রধান-মন্ত্রী ও লুমুম্বাপন্থী নেতা) অনুগত ফৌজদের অব্যাহত লড়াই।

১৫ই জানুয়ারী—১লা মাঘ : ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় নৌ-শক্তির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ ইরিয়ানের দক্ষিণ উপকূলে উভয় পক্ষের অস্ত্রবিনিময়ের সংবাদ।

ষ্ট্যানলিভিলে নিজ বাসভবনে বাম-পন্থী কঙ্গোলী নেতা মিঃ অ্যান্টনী গিজেঙ্গা বন্দী—অনুগামী তিনশত সৈন্যেরও আত্মসমর্পণ।

পশ্চিম নিউগিনি বিরোধের শান্তি-পূর্ণ মীমাংসার আবেদন—ইন্দোনেশিয়ার ও নেদারল্যান্ডের নিকট মিঃ উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনা-রেল) তারবার্তা।

১৬ই জানুয়ারী—২রা মাঘ : পাক্ প্রস্তাব অনুযায়ী কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনায় ভারতের আপত্তি—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদের সভাপতির (স্যার প্যাট্রিক ডীন) নিকট ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী সি এস ঝা'র পত্র।

পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের পরি-প্রেক্ষিতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা—শেষ পর্যন্ত বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক সোভিয়েট নীতি গ্রহণ।

১৭ই জানুয়ারী—৩রা মাঘ : পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিতে উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল) আহ্বান—ইন্দো-নেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ ও নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাভি কোরির নিকট অনুরোধলিপি প্রেরণ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ যদি ॥

পাঁচই ফেব্রুয়ারী তারিখটি নাকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐদিন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে একটা সামিট-কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন। অবশ্য কলকাতায় এই সম্মেলনের শোভা দেখা যাবে না, সূর্যগ্রহণ হয়ে যাওয়ার পর সূর্য আকাশে উদিত হবেন। নেপথ্য বিধানটুকু কলিকাতাবাসীদের দেখতে হবে না। সৌর-জগতের এই বিস্ময়কর দৃশ্য নিউগিনির মানুষেরা কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কলকাতার মানুষ এখনও শুধু শাদা চোখে এইসব গ্রহদের দেখতে পান না, কারণ তাঁরা সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই উঠেন এবং অস্ত যান। যাই হোক, এই ভয়ংকর কালে সূর্য এবং চন্দ্র থাকবেন মধ্যগগনে এবং চন্দ্রের দ্বারা সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহাদি আচ্ছন্ন হবেন। সুতরাং সূর্য এবং চন্দ্র নিয়ে অষ্টগ্রহ সম্মেলন হবে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২রা এবং ৩০শে এপ্রিল এমনই সম্মেলন ঘটে গেছে, আবার ২০০০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে এমনই ঘটবে। এইটুকু হ'ল সংবাদ। সুতরাং এমন গুরুতর পরিস্থিতিতে কোনো প্রকার 'সিরিয়াস' আলোচনা করা সমীচীন নয়। তাই চতুর্দিকে যাগ, যজ্ঞ, হোম ও হরিনাম চলেছে। মারামারিও হচ্ছে কোনো কোনো সভায়।

কলকাতার জ্যোতিষীরাই নাকি সর্বপ্রথম এই সংবাদ দিয়ে সতর্কবাণী প্রকাশ করেন। মকর সংক্রান্তি অতিক্রান্ত, এখন ১৬ই জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কুফল সর্বত্র ফলতে পারে। অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মানুষকে পড়তে হবে, এবং সমগ্র মানবজাতি এখন এই গ্রহদের কৃপার পাত্র।

শোনা যাচ্ছে, যে এই কালে গুরুতর ভূমিকম্প, ঝড় এবং নদীগুলিতে প্রবল জোয়ার বইবে। ভারতীয় জ্যোতিষ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারি মিশ্র বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মত প্রবল প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রও এই গ্রহগত ভ্রূকুটি থেকে ত্রাণ পাবে না।

ভারতবর্ষে ঝড়, বন্যা এবং ভূমিকম্প ঘটতে পারে। ৫ই ফেব্রুয়ারী অবশ্য নদীতে যে বান ডাকবেই সেটা এখন থেকেই বলা যায়। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো নামক গ্রহ তিনটি, কিন্তু কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দূরে দূরে থাকবেন। সৌর-রঙ্গমঞ্চে একটা বিরাট সমাবেশ ঘটবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। গ্রহাচার্য গণকরা বলছেন যে, এই গ্রহ-সম্মেলনের ফলে কোনও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে না, ভারতে নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। নবগ্রহ পূজার ফলেই এইরকম সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

মেলবোর্ণে দাবানল, পেরুতে অবশ্য হিমবাহের চাপে ৪০০০ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, চারটি শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, কাঠমুণ্ডুতে আতঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে ভূকম্পনের ফলে। বৃটিশ এবং আইরিশ জল-সীমানায় তিনটি জাহাজ ঝড়ের দাপটে ডুবে গেছে। স্কটল্যাণ্ডের রাস্তা গভীর তুষারপাতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং পথ বন্ধ, এমন কি সাংবাদিকরা দমদমেও তুষারপাত লক্ষ্য করেছেন। এসব শুধু প্রস্তাবনা, এখনও 'সামিট কনফারেন্স' শুরু হয়নি। মনে হয় সামিট কনফারেন্স সমবেত গ্রহবৃন্দ একত্রিত হয়ে বসে পৃথিবী সম্পর্কে কি করা কর্তব্য তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, হয়ত একটা প্রস্তাব পাশ করেই তাঁরা সরে পড়বেন, এবং পৃথিবীর মানুষেরা সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে ঘর-সংসার, চুরি-রাহাজানি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি যার যা কর্ম তা করে যাবেন।

দুঃখের বিষয় আমেরিকা এবং রাশিয়া এই দুই রাষ্ট্র ইদানীংকালে স্পেস্ অভিযান দ্বারা গ্রহদের এতটুকু আতঙ্কিত করতে পারেননি, কিংবা এমনও হতে পারে যে স্পেস অঞ্চলে আজকাল সময় অসময়ে আণবিক উপদ্রব ঘটার ফলেই গ্রহগণ সমবেত হয়েছেন, হয়ত তাঁরাই আমাদের মত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

এইদিকে ভারতবর্ষে এইসব গ্রহের রোষবহ্নির প্রভাব অতিশয় কম থাকায় অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকে ভারতে পালিয়ে আসতে পারেন, তাহলে কি মেহের চাঁদ খান্না সাহেবের দপ্তরের কাজ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাবে না। দণ্ডকারণ্যে কত মানুষ আর ধরবে।

সৌর-রঙ্গমঞ্চে পৃথিবী নিয়তই ঘূর্ণমতী। তাই সৌর-রঙ্গমঞ্চের, সূর্যের সঙ্গে তার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসুন্ধরা' নামক কবিতায় বলেছেন ঃ

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে—
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ।
সবিতৃ-মণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি—' —"

৯৩০ মাইল দূরত্বের ব্যবধান রেখে পৃথিবী ৩৬৫¼ দিন এই একইভাবে চোখঢাকা বলদের মত ঘুরছে, তার ভিতর মাঝে মাঝে এই জাতীয় লোমহর্ষক অবস্থা সৃষ্টি হয়। আর এই কারণেই সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অষ্টগ্রহ সম্মেলনের ফলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, কেউ সেটা প্রকাশ করে বোকা বনে যাচ্ছেন আর কেউ অবিশ্বাসের হাসি হেসে তা অগ্রাহ্য করছেন। গ্যালিলিও বলেছেন, জ্যোতিষের প্রতি মোহ শুধু 'ignorant and superstitious masses' এর মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়, যাঁরা অনেক জ্ঞানী তাঁরাও অনেকে জ্যোতিষে বিশ্বাসী।

রসায়নের অনেক পূর্বে ছিল কিমিয়া-বিদ্যা (Alchemy) এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনশীল রূপকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপশম মন্ত্রের ব্যবস্থাও ছিল—একথা সর্বজনবিদিত। এইভাবেই ফলিত জ্যোতিষ চর্চা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের পুরোগামী। আজো মানুষ কিমিয়া-বিদ্যায় বিশ্বাসী, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের চেয়ে অধিকতর বিশ্বাস ফলিত-জ্যোতিষে। গ্রহশান্তির জন্য তাই সর্বসাধারণের এই আগ্রহ। বোধ এবং বুদ্ধির সংঘর্ষ এইভাবেই ঘটে, বাস্তবের সঙ্গে এই আকস্মিকতার প্রতি বিশ্বাসের আগ্রহে কোন সংযোগসূত্র নেই। বুদ্ধি এখানে বোধের কাছে পরাজিত। বুদ্ধির

প্রতিপত্তি এইভাবে খর্ব হওয়ার ফলে মানুষের কল্পনাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে, বুদ্ধিকে গ্রাস করে সংস্কার। আর্থার কোয়েসলার ধর্ম এবং বিজ্ঞানের যুগল সত্রের সঙ্গে সংযোগের প্রসঙ্গে বলেছেন:
"Starting with the indistinguishable unity of the mystic and the savant in the Pythagorean Brotherhood, falling apart and reuniting again, now tied up in knots, now running on parallel courses, and ending in the polite and deadly 'divided house of faith and reason' of our day, where on both sides, symbols have hardened into dogmas, and the common source of inspiration is lost from view."

ইতিহাসের সকল পর্বের এক একটা বিশেষ ঝোঁক আছে, এবং সমসাময়িক ঘটনা বা বৈচিত্র্যকে নিজস্ব ধারণানুসারে বিশ্লেষণ করার আগ্রহও দেখা যায়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকাশে একটা নতুন তারাকে জার্মান-শিল্পী জর্জ বুসথ্ ধূমকেতু স্থির করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাতে লিখেছিলেন যে গ্রহটি "condensed from the rising vapours of human sin which had been set affire by the Wrath of God". স্বদেশপ্রেমিক এই ব্যক্তিটির মতে এই জাতীয় দুর্ঘটনার কারণ—'bad weather, pestilence and Frenchmen".

টাইকো ব্রাহে নামক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন যে, এই নতুন তারাটি ইউরেনাস। আজকাল জ্যোতিষীরা পর্যন্ত বলেন এই ইউরেনাস এক নিরীহ নিরুপদ্রব গ্রহ মাত্র। যুগে যুগে গানে, গল্পে, নাটকে এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। হেলীর কমেটও আকাশের গায়ে পাকা বাসিন্দা হয়ে গেছে।

তবু অত্যন্ত কুশলী মনোবিজ্ঞানীর দল এই জ্যোতিষীর দল, তাঁরা এই সপ্তাহ কেমন যাবে, এই দিনটি কেমন যাবে, এই ঘন্টাটি কেমন যাবে প্রভৃতি নানাবিধ ভবিষ্যৎবাণী দান করে মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের নির্দেশ দান করেন। মানবিক উৎকন্ঠা, উদ্বেগ, লোভ, মোহ, দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, অভাব প্রভৃতির ফলে যে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন মনোবিজ্ঞানী জ্যোতিষীরা। এই অষ্টগ্রহ সম্মেলনের যথোচিত সুযোগ যদি জ্যোতিষীরা না গ্রহণ করেন তবে বৃথাই তাঁদের গণনাকর্ম, বৃথাই তাঁদের পরিশ্রম। অষ্টগ্রহ সম্মেলন তাই যেন রাজনৈতিক রাষ্ট্রজোটের সামিট কনফারেন্স।

যদি এই কালটি বেশ ভালোয় ভালোয় কাটে তাহলেও তার কৃতিত্ব জ্যোতিষ-গোষ্ঠীর। যদি ধন ধান্যে দেশ উছলিয়া ওঠে, যদি সারা পৃথিবীতে শান্তির বন্যা প্রবাহিত হয়, যদি আকাশে-বাতাসে কেবল সুমধুর দখিন পবনের আমেজ ভেসে ওঠে, যদি কারো মনে বিদ্বেষ ও জ্বালা না থাকে, যদি সব ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করে তাহলেও ত' সেই জ্যোতিষীদেরই কৃতিত্ব। তাঁরা গ্রহ শান্তি করছেন, যাগ যজ্ঞ হোম জপ তপ ইত্যাদির দ্বারাই ত' এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছেন, নইলে—! অষ্টগ্রহের রোষদৃষ্টি থেকে কে আর বাঁচত!

নতুন বই

The Centenary Book Of Tagore—Edited by Sukomal Ghose: **(সংকলন-গ্রন্থ) প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দাম—ছয় টাকা।**

প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন যার বর্তমান নাম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তার সর্বপ্রথম সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬১-র জানুয়ারী মাসে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে একটা আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুধীরঞ্জন দাস এবং উদ্বোধন করেন জওহরলাল নেহরু। আলোচ্য গ্রন্থে ইস্ট জার্মাণীর ডঃ হাইনৎস নোভে, স্পেনের জুয়ান পেরেজ ক্রেমুস, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মার্টিন ক্যারল। ক্যানাডার মিঃ ট্রুম্যান, চেকোশ্লোভাকিয়ার দুসান জবাভিটেল, সোভিয়েট রাশিয়ার নভিসেংকো প্রভৃতির সঙ্গে রিচার্ড চার্চ, নরম্যান কাসিনজ, আবদুল্লা বাকে, তাৎসু মরিমটোর মূল্যবান রচনাবলী সংগৃহীত হয়েছে—এছাড়া আছে জওহরলাল নেহরু, ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ, হুমায়ুন কবীর, বি, ভি কেশকার, উমাশংকর যোশী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। শতাব্দী উপলক্ষে এমন একখানি সুসম্পাদিত পরিচ্ছন্ন এবং সুলভ সংস্করণ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সম্পাদক মহাশয় নরম্যান কাজিনসের সমগ্র প্রবন্ধটি মুদ্রিত করার ব্যবস্থা করলে ভালো করতেন, কারণ অতিরিক্ত ছাঁটাই-এর ফলে মূল প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের অঙ্গহানি হয়েছে। জওহরলালের উচ্ছ্বাসপ্রাণ প্রবন্ধটির মধ্যে অন্তরের পরিচয় আছে। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এই চারজন প্রতিনিধি তাঁদের দায়িত্ব সুযোগ্যভাবেই সম্পন্ন করেছেন। মুলকরাজ আনন্দের রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ক প্রবন্ধটি অনেক তথ্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী। শান্তিদেব ঘোষের সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-সংগীতের রসগ্রহণে সহায়তা করবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত, বাঁধাই মনোজ্ঞ।

এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ। তিনি তাঁর ভূমিকা শেষে জোহান বোয়ারের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা যথাযথ নয়, যোহান বোয়ার লিখেছিলেন:—"He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross but the Lotus". শ্রীযুক্ত দাশ লিখেছেন "He has brought to the world a new heavenly symbol Lotus"—দুটি উক্তির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জোহান বোয়ারের মূল

প্রবন্ধটি Golden Book of Tagore-এ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির বিদেশে প্রচারের সম্ভাবনা আছে বলেই এই ত্রুটিটুকু প্রদর্শন করতে হল।

ভারতীয় সংগীতের কথা—(প্রবন্ধ) : প্রভাতকুমার গোস্বামী। বুক সিন্ডিকেট লিমিটেড। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ৪-৫০ টাকা।

বাঙলা ভাষায় ভারতীয় সংগীতের আলোচনা চলছে বহুদিন ধরে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস-রচনার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের নয়। তবু সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট এ বিভাগটিও ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের একটা মোটামুটি পরিচয়দানের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত হওয়ায় বিশদ আলোচনার পথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। যাই-হোক ভাষা স্বচ্ছ ও সুখপাঠ্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বঙ্গ সংস্কৃতির রূপরেখা— বিনয় চৌধুরী : সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গ সংস্কৃতির একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। অল্প এই পরিচয়টা দেওয়া হয়েছে অনেকটা গল্প ও ঘটনা বর্ণনাচ্ছলে। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, গ্রন্থটি বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এতে তার ক্ষীণ রেখাটি মাত্র উপস্থিত করা হয়েছে। তিনি হয়ত আশা করেন যে, এই ক্ষীণ রেখাটিই পাঠকদের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানার প্রতি উৎসাহিত করবে। রচনাটি পড়ে আমাদের মনে হ'ল লেখক এদিকে অনেকটা সফলকাম হয়েছেন। বইটির ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

চা মাটি ও মানুষ—(উপন্যাস) (১ম, ২য়, ৩য় পর্ব)—বীরেশ্বর বসু। কথামালা প্রকাশনী। ১৮-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—১ম পর্ব—৫্ টাকা, ২য় পর্ব—৫-৫০ টাকা, ৩য় পর্ব—৫্ টাকা।

চা মাটি ও মানুষ উপন্যাসখানির প্রথম পর্ব প্রকাশের সঙ্গে সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। চা-বাগানের বিচিত্র মানুষ ও কুলি মজুরদের রোমাঞ্চকর জীবনকথা লেখক বীরেশ্বর বসু অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। লেখক দীর্ঘদিন চা-বাগানে কাটিয়েছেন, তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় সহায়তা করেছে অনেকখানি। প্রথম পর্বটি এক বৃহত্তর পটভূমিতে রচিত কাহিনীর পূর্বরঙ্গ মাত্র। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে ভাওনাথ আর বিলাসী চরিত্র পাঠকের অন্তরকে অভিভূত করে রাখে। উপন্যাসের নায়ক ভাওনাথ একটা আদর্শে বিশ্বাসী। তার সংস্পর্শে এসে বিলাসীর জীবনের সব কলঙ্ক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চা-বাগানের কাছে 'বিলাসী নাই' এই মহিয়সী ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধু আর নিরঞ্জনবাবু একদিন ভাওনাথকে পথ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই সাধুর জীবনের যবনিকা পতন হল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। ভাওনাথ ও বিলাসীকেও কারাগারের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। জেলে তাদের যেন নব-জীবনের দীক্ষা হল, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল। দেশে তখন গান্ধিজীর লবণ আন্দোলন, ওদিকে চারিদিকে চলছে শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টা। চা-বাগানের মজুরদের মধ্যে এর ঢেউ এসে লাগে। এর সঙ্গেই এসে হাজির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মহামারী, কালোবাজার, দুর্ভিক্ষ। এই সংকটময়কালে চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে গঠনমূলক সংগঠনী, পারস্পরিক ঈর্ষা ও সন্দেহ, আত্মঘাতী কলহ ইত্যাদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার একটা মীমাংসার আলোক দেখা যায়। নব-জীবনের প্রাতে নবীন আশার আলোকে চা-বাগানের অসহায় আদিবাসী, গোর্খা শ্রমিকরা যেন একটা পথ খুঁজে পায়। ধর্মঘাট এবং তার সাফল্যজনক পরিণতির ফলে শ্রমিকদের দাবীর স্বীকৃতি এই উপন্যাসটির উপসংহার সূচিত করে। শুধুমাত্র পটভূমিকা নয়, বক্তব্য, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে বীরেশ্বর বসু এক অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়দান করেছেন। তাঁর ভাষা ঝরঝরে এবং কাব্যধর্মী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অতিসুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তবে সংলাপ অংশে লেখক যদি কিছু পরিমাণে সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেন ত' ভালো হয়। সংলাপ বর্জন করে ইঙ্গিতের সাহায্যে গ্রন্থটিকে অধিকতর শিল্পগত এবং রসোত্তীর্ণ করা সম্ভব। এতবড় গ্রন্থ আগাগোড়া পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। জীবনে এবং জীবনধারণের যে সংগ্রাম এদিনের মানুষকে আচ্ছন্ন রেখেছে চা-মাটি-ও মানুষ তারই ইতিহাস। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ মনোরম।

শবযাত্রা— পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, কলিকাতা। দাম দু' টাকা।

অধুনা প্রকাশিত 'শবযাত্রা' পাঁচটি সর্গে বিভক্ত খণ্ড কাব্য। একটি বিভ্রান্ত যুবকের মানসিক অবস্থার কাব্যরূপ। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রাচীন কাব্যরীতিকে স্বীকার করে নিলেও সৃষ্টির দিক থেকে তাঁর মানসজগৎ অনেক আধুনিক। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় সংযমী কবিতা রচনার ওপর এ গ্রন্থ নিষ্ঠুর প্রহারের মত মনে হয়।

'শবযাত্রা' প্রমাণ করল এ সময়েও খণ্ড কাব্য রচিত হতে পারে; এবং সে কাব্যের নায়ক হতে পারে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর নয়, একালেরই একজন যুবক। এ কাব্যের নায়ক ক্রুর নিয়তির চক্রান্তে আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত। তারও ছিল সাধ, সংকল্প বিশ্বাস এবং সে চেয়েছিল বন্ধুত্ব, প্রেম; অথচ দেখল চতুর্দিকে মনুষ্যত্বের ও সভ্যতার বিপুল ধ্বংসস্তূপের অবিরল প্রবাহ। 'সমস্ত পৃথিবীজুড়ে বহমান ধ্বংসের প্রবাহের' মধ্যে দাঁড়িয়ে সে যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়েছে, মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে অবশ হয়েছে, স্বর হয়েছে শিথিল। ফিরে চেয়েছে পুনরায় প্রেম, বন্ধুত্ব যার অপর নাম জীবন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের বিনাশ দেখে আত্মধ্বংসের মধ্যে মিলিয়ে যেতে চেয়েছে :

আমাকে দাও দাও শ্মশান কাঠের
তীব্র উত্তাপ অগ্নিময়
মাংস যাক গলে, শূন্যে মিশে যাক
দেহের যাবতীয় অস্থিমেদ।

ঘাতক সভ্যতার 'নারকী চুল্লীতে' নিজের স্থান করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

একালের চিন্তাভাবনা এ কাব্যে প্রতিফলিত।

এ কাব্যগ্রন্থের ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন ছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার কবির ক্ষমতার পরিচায়ক।

ঝর্ণা তলার নির্জনে— (কবিতা) : চিত্ত ভট্টাচার্য : পরিবেশক গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম দু' টাকা।

'ঝর্ণা তলার নির্জনে' চিত্ত ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। বইটিতে পঁয়ত্রিশটি মৌলিক কবিতা ও চৌদ্দটি অনুবাদ কবিতা আছে। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, এবং কলকাতার বাইরের নিসর্গ, জীবন এবং অন্যান্য টুকিটাকি বিষয় বইটির কবিতার বিষয়বস্তু। আধুনিক বাংলা কবিতার অতি গাম্ভীর্য এবং সিরিয়াসনেসের বাইরেও আপাত রম্যতাও যে ভালো কবিতা সৃষ্টি করতে পারে, চিত্ত ভট্টাচার্যের 'ঝর্ণাতলার নির্জনে' তার প্রমাণ। কয়েকটি সুন্দর চিত্রকল্প এবং প্রতীক উল্লেখযোগ্য। চিত্ত ভট্টাচার্যের বহু কবিতাই প্রায় গল্পধর্মী। সুতরাং লিরিক কবিতার মেজাজ থাকলেও, কবির ব্যক্তিগত অনুভবের বাইরেও পাঠক পৌঁছাতে পারেন। কবি নিজেই প্রচ্ছদপট এঁকেছেন। প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও মুদ্রণ চিত্তাকর্ষক।

টাকার গাছ— (শিশু সাহিত্য)— লীলা দত্তগুপ্তা; প্রকাশক : এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য— দেড় টাকা।

টাকার গাছ গ্রন্থটির রচয়িত্রী নবাগতা, কিন্তু এই গ্রন্থের তেরটি কাহিনীর মধ্যে তিনি যে অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। ছোটদের গল্পের লেখকরা সাধারণতঃ যাদের জন্য কলম ধরেন তাদের কথাটাই ভুলে যান, লীলা দত্তগুপ্তা কিন্তু শিশুমনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গল্পগুলি রচনা করেছেন, তাই তাঁর গল্পগুলি যে ছোটদের মনোহরণে সক্ষম হবে একথা বলা যায়।

কালের বিচার—(নাটক) বঙ্কিমচন্দ্র দাস। প্রকাশক : বিভূতিভূষণ দাস, ২১, শ্যামনগর রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। মূল্য দুই টাকা।

কয়েক বছর ধরে বাংলার নাট্যসাহিত্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পেশাদার মঞ্চ ছাড়াও বহু সম্প্রদায় নাটকের নতুন রূপ ও রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাতে প্রয়োগশিল্প যেমন উন্নততর হয়েছে, নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও এসেছে বিষয়-বৈচিত্র্য ও নতুন স্টাইল। সম্প্রতি একখানা নাটক চোখে পড়লো, যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে শুধু অভিনব নয়, টেকনিকের দিক থেকেও বিচার করলে নতুনত্ব দাবী করতে পারে। বইটির নাম "কালের বিচার"।

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্রের পরিণতি নিয়ে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল বঙ্কিম আদর্শের মর্যাদা রাখতে গিয়ে আর্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। এ নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল প্রচুর। বর্তমান লেখক সেই বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে নাটকখানি রচনা করেছেন। একদিকে তিনি উপস্থিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সৃষ্ট-চরিত্র রোহিণী, ভ্রমর ও গোবিন্দলালকে। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সৃষ্ট-চরিত্র রমা, রাজলক্ষ্মী ও কমলকে। দুই মহান দিকপাল তাঁদের সৃষ্টির সমর্থনে আপন আপন বক্তব্য মহাকালের দরবারে হাজির করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখক উপস্থিত করেছেন বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপালের মানসগঠন, সামাজিক পরিস্থিতি ও তাঁদের জীবন-দর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানবীয় প্রেম ও সহানুভূতির দ্বন্দ্বে নাটককে করেছেন রসসমৃদ্ধ। তাতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, মনগড়া কোন সমাধান না চাপিয়ে কালের বিচারের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ভাবতেই পারা যায় না, এমন বিষয়বস্তু নিয়ে একখানা অপূর্ব নাটক রচিত হতে পারে। যা স্বভাবত থিসিসের বিষয়বস্তু, বক্তব্যের ভারে আড়ষ্ট না হয়ে সার্থক সৃষ্টির পর্যায় পৌঁছেছে। তাতে লেখকের অসাধারণ মননশীলতা ও সূক্ষ্ম মাত্রাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের প্লট, পরিকল্পনা, উপজীব্য বিষয় যে শুধু নতুন তা নয়, ভাষার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা ও বিচারের পক্ষপাতহীনতাও মুগ্ধ করে রাখবার মত। নাটক পড়া শেষ হয়, নাটকের রেশ মনের মধ্যে থেকে যায় এবং বইখানা বার বার পড়বার ও বিষয়বস্তুটিকে নতুনভাবে চিন্তা করবার ইচ্ছা জাগে। সৌখীন সম্প্রদায় ও কলেজে নাটকটির অভিনয় জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মর্মবাণী প্রচারে সাহায্য করবে। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

পরিব্রাজক— (প্রবন্ধ)। সংকলনে অজিতা দেবী ও কানাইলাল ঘোষ। প্রকাশক —হরি ঘোষ, সুসাহিত্য সংসদ, ২৬।২ বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ৫ টাকা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে ভারত-আত্মার মর্মবাণী প্রচার করে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব জাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাঁর প্রশস্ত তেজোময় প্রাণময় ব্যক্তিত্ব পঙ্গু ও জড় ভারতবাসীকে শুধু কর্মচঞ্চল করে তুললো না, রচনা করলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অভিনব এক সেতু। সূত্রপাত করলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সমন্বয়ের সাধনা।

আলোচ্য গ্রন্থে ধ্যানী, জ্ঞানী, উদার বৈদান্তিক বিবেকানন্দের পরিব্রাজক রূপটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। ভাষা স্বচ্ছ, ঔপন্যাসিকের সাবলীল স্বচ্ছতায় স্পষ্ট, বাহুল্য বর্জন ও সরসতায় সুন্দর একটি গ্রন্থ। তথ্যসম্ভারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটায়। যেমন গভীরতর তথ্যের সমাবেশ, তেমনি বিশ্লেষণের অবকাশ আছে প্রতিটি ছত্রে। জাতীয় জড়তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থের উপসংহারটি মনোরম।

শারদোৎসব দর্শন— (আলোচনা)— সমীরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছেলে-মেয়েদের জন্য রচিত নাটিকার মর্মকথা সুবিখ্যাত লেখক সমীরণ চট্টোপাধ্যায় অতিশয় সহজ ভঙ্গীতে এক নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। বাল্যকালে এই নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর মনে যে ভাব গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রাবলী সম্পর্কে যে কথা মনে হয়েছে এ তারই রেখাচিত্র। এ ধরণের আলোচনা গ্রন্থ বাংলায় বেশী নেই, তাই সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁর 'শ্রীগুরু দর্শন' গ্রন্থটির মতো আলোচ্য গ্রন্থটিও সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

চলচ্চিত্র ও জাতীয় সরকার :

১৯৪৯ সালে জাতীয় সরকার শ্রী এস. কে. পাতিলের নেতৃত্বে যে চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেছিলেন, সারা ভারতে তথ্যানুসন্ধানকার্য চালাবার পর সেই সমিতি ১৯৫১ সালে প্রকাশিত ২২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টের মধ্যে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্যে কতকগুলো সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশের মধ্যে প্রধানতঃ ছিল,

(১) একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠন করা। এই কাউন্সিলের কাজ হবে, ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের তদারক করা এবং শিল্পটি যাতে নিয়মতান্ত্রিক পথে সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়, সে-সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করা।

(২) কলাকুশলী এবং শিল্পীদের শিক্ষার জন্য একটি সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা।

(৩) একটি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন করা। এই সংস্থা চলচ্চিত্র প্রযোজনায় সাহায্য করবার জন্যে উপযুক্ত সর্তে ঋণদান করবে।

আমাদের জাতীয় সরকার এই সুপারিশ তিনটির মধ্যে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। ১৯৬১ সালের মার্চ থেকে পুণায় "ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিল্মস্" চালু হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা পরিচালনা, আলোকচিত্র-গ্রহণ, শব্দধারণ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা পাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা যাতে পুঁথিগত শিক্ষার সংগে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সরকার অধুনালুপ্ত প্রভাত স্টুডিওটি কিনে নিয়ে সেইখানেই এই ইনস্টিটিউটটি স্থাপিত করেছেন।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে রেজেস্ট্রীকৃত হয়ে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনও তার কাজ শুরু করে দিয়েছে (১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে) অন্ততঃ দু'খানি ছবিকে অর্থ সাহায্য ক'রে। গেল বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এঁদের কাছে বাইশখানি দরখাস্ত গেছে ৬৪,৭০,০০০ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। এঁরা এর মধ্যে মাত্র পাঁচখানি দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রে তিনটি ছবির জন্যে ৬,৪০,০০০ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই ঋণদান করেছেন এবং ১৯,৮৫,০০০ হাজার টাকার জন্যে সাতখানি দরখাস্ত সম্পর্কে বিবেচনা করছেন ঋণদানের প্রধান শর্ত হচ্ছে, ছবিটির বিষয়বস্তু বাস্তব ও জাতির উন্নতি-বিধায়ক হওয়া চাই এবং প্রযোজককে মোট ব্যয়ের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ বহন করতে হবে।

কিন্তু ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসায়কে এই দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করতে হ'লে আমাদের জাতীয় সরকারকে আর একটু এগিয়ে আসতে হবে এবং অযথা কালবিলম্ব না ক'রে চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির প্রথম সুপারিশটিকে কার্যকরী করতে হবে অর্থাৎ একটি "ফিল্ম কাউন্সিল" স্থাপন করতে হবে। জানি, এই ব্যবসায়ের মারফত যাঁরা আজ লাভবান হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সরকারী নাসিকাকে চলচ্চিত্র-জগতে প্রবিষ্ট হতে দেখে অনধিকার চর্চা বলে চীৎকার করবেন। কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্প ছাড়া এমন কোন্ ব্যবসায় আছে, যার পরিচালনার মধ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ নেই? যে-শিল্পের সংগে অন্ততঃ ১,৫০,০০০ কর্মীর ভাগ্য জড়িত, যে-শিল্পে অন্ততঃ একশত কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে, এবং যে-শিল্পে বৎসরে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন, সে-শিল্পকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার দায়িত্ব সরকারকে স্বীকার করতেই হবে। তা' ছাড়া জনমনের ওপর চলচ্চিত্রের গভীর প্রভাবের কথা চিন্তা করলে এই কথাই কি সুপরিস্ফুট হয় না যে, কতকগুলি লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তির ওপর চলচ্চিত্র সৃষ্টির দায়িত্ব ছেড়ে রেখে দেওয়া জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী? সেন্সার বোর্ডের যে-কাজ, সে-কাজ তো নেতি-সূচক। ছবির এইখানটা অশ্লীল এবং ওইখানটা সমাজ-বিরোধী, এই ব'লে ছবির মধ্যে কয়েক ফুট বা কয়েক শো ফুট কেটে বাদ দেওয়ার মধ্যেই তার কাজ সীমিত।

কিন্তু জাতি গঠনে, জাতীয় সংহতি-বিধানে, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানে চলচ্চিত্রের অমিত শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে শুধু "ফিল্মস্ ডিভিসন" মারফত সংবাদ-চিত্র বা দলিল-চিত্র প্রস্তুত ক'রে তা সাধারণে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে না, সরকারকে ভারতের সমগ্র চলচ্চিত্রজগতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। কি

বিমল রায়ের চিত্রার্ঘ 'কাবুলিওয়ালা'য় বলরাজ সাহনী ও সোনু

ধরণের ছবি তৈরী হবে, তা থেকে সুরু ক'রে সেই ছবিতে কত খরচ হওয়া উচিত, সারা ভারতে কতগুলি স্টুডিও চালু থাকা দরকার, দর্শক অনুপাতে ভারতের বিভিন্ন শহর বা গ্রামে কতগুলি এবং কি ধরণের চিত্রগৃহ থাকবে, দেশে এবং বিদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা বাড়াবার জন্যে কি করা দরকার, ছবির আয় প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা সঙ্গত প্রভৃতি সব রকম খুঁটিনাটিই সরকারকে দেখতে হবে ঐ "ফিল্ম কাউন্সিল" মারফত। "চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির" প্রস্তাবমত ঐ কাউন্সিলে থাকবে চলচ্চিত্র-জগতের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতি যথার্থ অনুরাগ ও সহানুভূতিশীল কয়েকজন সরকারী লোক এবং কাউন্সিলের নেতা হিসেবে একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন, জনসাধারণের আস্থা-[illegible] বিচার বিভাগীয় পদস্থ ব্যক্তি।

চিত্র সমালোচনা

কাবুলিওয়ালা (হিন্দী) : বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৩,১১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ; প্রযোজনা : বিমল রায়; পরিচালনা : হেমেন গুপ্ত; সঙ্গীত পরিচালনা : সলিল চৌধুরী; গীত-রচনা : প্রেম ধওয়ান ও গুলজার; চিত্র-গ্রহণ : কমল বসু; শব্দধারণ : সুরাট-ওয়ালা; সঙ্গীত-গ্রহণ : মিনু কাতার ও বি. এন্. শর্মা; শিল্পনির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : মধু প্রভাবল্-কার; রূপায়ণ : বলরাজ সাহনী, সজ্জন, অসিত সেন, পল মহেন্দ্র, ঊষাকিরণ, বেবী সোনু প্রভৃতি। ক্যালকাটা ফিল্মস্ সেণ্টার-এর পরিবেশনায় গেল ১৯-এ জানুয়ারী থেকে মিনার্ভা, পূর্ণ, লোটাস, কৃষ্ণা, ছায়া ও অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দী ছবির জগৎ থেকে একমাত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি হচ্ছে বিমল রায় প্রোডাকসন্স নিবেদিত "কাবুলিওয়ালা"। এই কারণে আমরা শ্রীবিমল রায় এবং তাঁর সহকর্মী-দের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" গল্পের নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়া নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। স্বাধীন, পর্বতচারী, প্রাপ্তবয়স্ক, দীর্ঘ-দেহী কাবুলি রহমৎ এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনির মধ্যে পিতা-পুত্রীর যে মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠেছিল, তার তুলনা শুধু বাঙলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। বিদগ্ধজনের মতে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে "কাবুলিওয়ালা" নিঃসংশয়ে উচ্চ স্থানাধিকারী।

বাঙালী দর্শক "কাবুলিওয়ালা"র বাঙলা চিত্ররূপ দেখেছেন এবং টিঙ্কু ঠাকুর ও ছবি বিশ্বাস অভিনীত মিনি ও কাবুলিওয়ালাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তপন সিংহ এই "কাবুলিওয়ালা" ছবিতেই পরিচালক হিসেবে প্রথম জন-প্রিয়তা অর্জন করেন এবং বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালে এই "কাবুলিওয়ালা"রই সুরকার হিসেবে রবিশঙ্কর সম্মানিত হন।

হিন্দী "কাবুলিওয়ালা"র চিত্রনাট্য কে রচনা করেছেন, জানিনা। ছবির ক্রেডিট টাইটেলে বা সংশ্লিষ্ট পুস্তিকাতে চিত্রনাট্যকারের নাম নেই। কিন্তু যিনিই ক'রে থাকুন না কেন, তিনি ছোট্ট গল্পটিকে যতদূর সম্ভব বর্ধিতায়তন করবার জন্যে অনেক অবান্তরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং অযথা নৃত্যগীতের সমাবেশে ছবির মূল কাহিনীগত রস-বস্তুকে ক্রমশঃ ঘনীভূত করবার পরিবর্তে ব্যাহতই করেছেন। ছবির প্রথমাংশে কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তার নিজের মেয়ে

তারাশঙ্কর রচিত "বিপাশা" কথাচিত্রে সুচিত্রা সেন ও লিলি চক্রবর্তী

আমিনার মধুর সম্পর্কটি অল্প পরিসরের মধ্যে উপস্থাপিত করা অত্যন্ত সুষ্ঠু কল্পনার পরিচায়ক। কিন্তু কলকাতা শহরের রাজপথে কাবলিওয়ালাকে এগিয়ে আসতে দেখে অপর খেলুড়ীরা যখন দুপদাপ ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল, তখন মিনির প্রায় অকুতোভয়ে একা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয় এই কারণে যে, পরে তাকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে বাপের আড়ালে—তাঁর গায়ের কাপড়ের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এবং রবীন্দ্রনাথের মিনি জানলার ভিতর থেকে 'কাবুলিওয়ালা' হাঁক দেবার পরক্ষণেই তাকে সত্যি সত্যিই তাদের বাড়ীর দিকে এগোতে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল।

[এখানে চিত্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে পারছিনা। এই যে 'কাবুলিওয়ালা' হাঁক দেওয়া এবং পরক্ষণেই চক্ষের নিমিষে উধাও হয়ে যাওয়া,—কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে শিশুচিত্তের যুগপৎ ঔৎসুক্য ও ভীতি—এটা যে সেকালের উত্তর-কলিকাতাবাসী বালক-বালিকাদের পক্ষে কতখানি বাস্তব সত্য, সে-সম্পর্কে আমাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। বিরাটদেহী, জাব্বাজোব্বা, উষ্ণীষ-আলখাল্লা-পরিহিত কাবুলীওয়ালা যখন বাঁশের লাঠি হাতে প্রকান্ড একটি মোটা কাপড়ের ঝোলা কাঁধে নিয়ে নালবাঁধানো শুঁড়তোলা নাগরা পায়ে খোয়াবিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে খট্‌খট্‌ ক'রে হেঁটে যেতে যেতে ভারী গলায় হাঁকত, 'চাই হিং, সুর্মা চাই, বাদাম পিস্তা আখরোট,—' তখন বাড়ীর ভিতর আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, সচকিত হয়ে উঠতুম এবং দৌড়ে চলে আসতুম রাস্তার ধারের দোতলার বারান্দায় একটা নিরাপদ দূরত্বে, দাঁড়িয়ে কাবুলিওয়ালা নামধারী সেই অদ্ভুত জীবটিকে দেখবার জন্যে এবং প্রাণের সমস্ত সাহসকে সঞ্চয় ক'রে 'কাবুলিওলা, ও কাবুলিওলা' ব'লে ডেকেই খুব তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে লুকিয়ে পড়তুম রেলিংয়ের থামের আড়ালে তার ঊর্ধ্ব-দৃষ্টিকে এড়াবার জন্যে। মনে রীতিমত ভয় থাকত, যদি কোনোক্রমে লোকটা হাত বাড়িয়ে ধরতে পারে, তা হ'লে নির্ঘাৎ সে আমাদের তার ঐ বড়ো ঝোলাটার মধ্যে ভ'রে ফেলবে, যার ভিতর সে ইতিমধ্যেই আরও কয়েকটি পুরে রেখেছে এবং পরে তার বাসায় ফিরে আমাদের সব কটিকে তার বড়ো ধারালো ছুরিটা দিয়ে কুঁচি কুঁচি ক'রে কেটে গরম মশলা সহযোগে কালিয়া বানিয়ে ফেলবে। কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট ভয় থাকা সত্ত্বেও দূরে থেকে তাকে দেখবার ও ডাকবার লোভ আমরা কিছুতেই সংবরণ করতে পারতুম না। কিন্তু মিনির মত বয়সে কোনো রহমতের হাত থেকে মুঠো মুঠো বাদাম-কিসমিস-পেস্তা-আঙুর নিয়ে তার সংগে ভাব জমাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।]

বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সাধারণ সরল-চিত্ত মানুষটিকে ছাড়িয়ে প্রায় একটি

মহামানবে পরিণত হয়েছে, যার দয়াধর্ম যে-কোনও লোকেরই আদর্শস্থানীয় হতে পারে। কাবুলিওয়ালাকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার পর মিনির মনে তাকে ছাড়িয়ে আনবার কল্পনা আদৌ অবাস্তব নয় এবং তাকে রূপ দেবার জন্যে স্বপ্ন-দৃশ্যের অবতারণাও যুক্তিগ্রাহ্য; কিন্তু সেই দৃশ্যকে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিলম্বিত ক'রে দেখানোর ফলে ছবির গতি হয়েছে ব্যাহত, ছন্দ হয়েছে ভ্রষ্ট। দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ করে জেলফেরৎ রহমতের বিয়ের কনে মিনিকে দেখে নিজের মেয়ে আমিনা সম্পর্কে বিলাপ এবং রহমতের পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মিনির বাবার তার সঙ্গে একাত্মবোধের দৃশ্যটি। কবি-চিত্রিত কাবুলিওয়ালা গল্প বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর হিন্দী চিত্রের মধ্যে অনেকখানি অটুট থাকলেও অবান্তরতা এবং আতিশয্য দোষের জন্যে সম্পূর্ণ রসঘন রূপ নিয়ে দর্শকসমক্ষে উপ-স্থাপিত হতে পায়নি।

অভিনয়ে বলরাজ সাহনী কাবুলি-ওয়ালা চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়টিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন এবং পস্তোভাষাকে সাধ্যমত আয়ত্ত করে চরিত্রটির কাবুলিত্বকে বাস্তব ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। মিনির ভূমিকায় বেবী সোনুর নির্বাচন নিশ্চয়ই তার কাবুলি ধাঁচের শারীরিক গঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হয়েছে। তাই এ-ভূমিকায় তাকে বাঙালী দর্শকের টিংকু ঠাকুরের মত মিষ্টি মনে হবে না। চরিত্রচিত্রণে সোনু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে পারদর্শিতা দেখিয়েছে; মনে হয়েছে, মেয়েটি যেন অভিনয়ই করছে না। মিনির বাবার ভূমিকায় সজ্জন একটি সুন্দর সহানুভূতিশীল চরিত্র অংকনে সমর্থ হয়েছেন। কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে একটি স্বাভাবিক সন্দেহ ও ভীতিপূর্ণ মায়ের চরিত্রকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন উষাকিরণ। ভৃত্য ভোলার ভূমিকায় অসিত সেন দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় সকলেই প্রায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

চিত্রগ্রহণ, শব্দানুধারণ এবং শিল্প-নির্দেশের কাজ বরাবরই একটি উচ্চমান বজায় রেখে গেছে। ছবির চারখানি গানই সুগীত; বিশেষ ক'রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'গংগা আয়ে কহাঁ সে, গংগা জায়ে কহাঁ রে' গানখানি শোনবার মতো। আবহ-সংগীত ছবির ভাবপ্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজংঘা' চিত্রের একটি দৃশ্য

স্ত্রী (হিন্দী)ঃ রাজকমল কলা-মন্দিরের টেকনিকলার চিত্র; ১৬,৬২০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ কালিদাসকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ হইতে গৃহীত; প্রযোজনা ও পরিচালনা ঃ ভী. শান্তারাম; সংগীত-পরিচালনা ঃ সি. রামচন্দ্র; চিত্রগ্রহণ ঃ ত্যাগরাজ পেন্টারকর; শব্দধারণ ঃ এ. কে. পারমার ও মঙ্গেশ দেশাই; গীত-রচনা ঃ ভারত ব্যাস; শিল্পনির্দেশ ঃ কানু দেশাই ও বাবুরাও যাদব; নৃত্য-পরিচালনা ঃ শ্যাম; সংলাপ ঃ অর্জুনদেব রাস্ক; রূপায়ন ঃ সন্ধ্যা, পদ্মা চাবন, বন্দনা, ইন্দিরা, নীলমবাঈ, চারুশীলা শান্তারাম, রাজশ্রী শান্তারাম, ভী. শান্তারাম, কেশবরাও দাতে, বাবুরাও পেন্টারকর, ভগবান, সেনজিৎ, কমল, ডি. বর্মা, বাবলু প্রভৃতি। মানসাটার পরিবেশনায় গেল ১৯-এ জানুয়ারী থেকে জ্যোতি, দর্পণা, প্রিয়া, গ্রেস, গণেশ ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

এই সুদীর্ঘ বিরাট মনোহরভাবে রঙীন ছবিটির নাম "স্ত্রী" রেখে প্রযোজক-পরিচালক শান্তারাম এক হিসেবে ভালই করেছেন। কারণ, কাহিনীটি মোটামুটিভাবে মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" অনুসরণে গ্রথিত হ'লেও চরিত্রচিত্রণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "স্ত্রী"র শকুন্তলা আর কালিদাসের শকুন্তলা এক ব্যক্তি নয়। কালিদাসের শকুন্তলা বনদেবী, বল্কলপরিহিতা সারল্যপূর্ণ বনহরিণীরই প্রতিমূর্তি; "স্ত্রী"র শকুন্তলা প্রগল্ভা নারী, বর্তমান যুগের ছলাকলাপূর্ণ
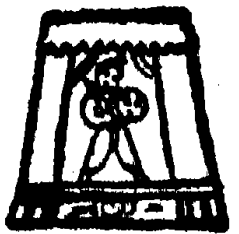
অবিবাহিতা বর্ষীয়সী যুবতীর প্রতীক, যে গাছের পাতার ফাঁক থেকে অপরিচিত পুরুষকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে, পায়ে কাঁটা ফোটার মিথ্যা ছলনায় সখীর সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীসহকারে রঙ্গ করে। দুষ্মন্তও কালিদাসের বর্ণিত শালপ্রাংশু নায়ক নন, নারীরূপপীড়িত সামান্য মানব মাত্র। "স্ত্রী"র শকুন্তলা যদিও দুহিতা, প্রিয়া, বধূ ও মাতা—নারীর এই চারটি রূপকেই যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছে, তবু সেই রূপগুলি প্রধানতঃ বর্তমান যুগের রূপ, বহু আড়ম্বর ও বেশভূষা সত্ত্বেও কালিদাসের কালের নারীর রূপ নয়।

অমিত অর্থব্যয়ের নিদর্শন "স্ত্রী"র প্রতিটি ফ্রেমে বিধৃত রয়েছে। কণ্বমুনির বিরাট আশ্রম পরিবেশে বহু দেশী-বিদেশী ফুলের সমারোহ থেকে সুরু ক'রে বিরাট জলাশয়ে অগণ্য আসনোপ-বিষ্ট বীণাবাদারত মুনিবৃন্দ পর্যন্ত সবই আছে। সেখানে কৃত্রিম পদ্মদল-শোভিত মুনি বালকবালিকারা নৃত্য করে, বিস্তীর্ণ ঝিলে যুবতী মুনিকন্যারা বিচিত্র-দর্শন তরণী ভাসিয়ে জলবিহার করে, জলের ফোয়ারা নিভৃতকুঞ্জকে জলোৎসারণে শীতল করে। দুষ্মন্তের হস্তিনাপুর প্রাসাদ আধুনিক বিড়লা-সিংহানিয়াদেরও ঈর্ষার সামগ্রী। ছবির শেষভাগে পার্বত্যভূমিতে বহুসংখ্যক সিংহ-সিংহিনীর আবির্ভাব রীতিমত রোমহর্ষক। এবং সেখানে শকুন্তলা-রূপিনী সন্ধ্যা ও শিশু-ভরতরূপী বাবলু ও অপর শিশুর সিংহের সঙ্গে মিতালী ভারতীয় চিত্রে অদৃষ্টপূর্ব।

ভী. শান্তারাম অভিনয় আদর্শে স্বভাবতঃই পুরাতনপন্থী। সেই কারণে কণ্ব, শারঙ্গ, গৌতমী, মন্ত্রী থেকে শুরু ক'রে বালক-ভরত পর্যন্ত সকলেই অল্প-বিস্তর মেলোড্রামাটিক আবৃত্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ভূমিকায় শান্তারামের নিজের এবং সন্ধ্যার অভিনয় বহুস্থানেই হৃদয়-গ্রাহী হ'লেও আতিশয্যদুষ্ট। ভগবান চিত্রিত মাধব্য বয়স্য হ'লেও প্রচুর ভাঁড়ামিপূর্ণ। প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়ার ভূমিকায় বন্দনা ও পদ্মা চাবণ আধুনিক সখীজনোচিত ভঙ্গীসহ তাদের সখীর চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত। মাত্র বালক-ভরতের

কালিদাসের অমর কাব্য 'শকুন্তলা' অবলম্বনে গঠিত 'স্ত্রী' চিত্রে সন্ধ্যা

ভূমিকাটি এবং এই ভূমিকায় বাবলুর অত্যন্ত সাবলীল অভিনয় আমাদের অতিমাত্রায় চমৎকৃত করেছে। আর নগর-বধূ মৈত্রিকার ভূমিকায় রাজশ্রী শান্তারামের অসামান্য নৃত্যপটুতা আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছে।

"স্ত্রী"র কলাকৌশলের কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছে। রঙগীন আলোকচিত্র, অপরূপ সুরযোজনা, চমৎকার দৃশ্যসজ্জা, সুন্দর শব্দধারণ,—ছবির প্রতিটি আঙ্গিকের কাজই উচ্চস্তরের দক্ষতার পরিচায়ক।

চন্দ্রের সুষমা, পদ্মের কোমলতা, ধনু ও যুগ্মবাণের বীরত্ব, বটবৃক্ষ পত্রের নির্মাণশক্তি—বন্ধনরজ্জুর দ্বারা এই সকল মিলিত হয়ে ভক্তিমতী স্ত্রীর উদ্ভব—এই গানের সঙ্গে "স্ত্রী" কথাটি লিখিত হবার পরেই মূলচিত্র আরম্ভ

"ডাকাতের হাতে" চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে রীতা সেনগুপ্ত ও পল্লব ব্যানার্জি

হয়, কোনো রকম ক্রেডিট-টাইটেল ব্যতিরেকেই। এ-বিষয়ে পুরাতনপন্থী শান্তারাম একটি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

বিবিধ সংবাদ

॥ বিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথ ॥

সম্প্রতি শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথে'র অভিনয় হয়ে গেছে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। শ্রীভট্টাচার্য শুধু নাটকটির রচয়িতা নন, পরিচালকও।

'ছায়াপথে'র কাহিনী আমাদের বর্তমান জীবনধারা থেকে সংগৃহীত। আশ্রয়হারা মানুষ ভেসে এসে আশ্রয় নিয়েছে রাস্তায়। সেখানে দুমুঠো ভাতের জন্যে কি কষ্টই না তাদের সহ্য করতে হয়। এর মাঝখানে দেখা যায় আধাপাগল একটি মেয়ে আর খোঁড়া একটি ভিখিরি ছেলে পরস্পরকে ভাল বাসছে। যখন তারা মিলতে গেল তখন অপর একটি সংসারের সব মানুষগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এই জীবনের পিছনে রয়েছে মদের দোকান। এ ধরণের কাহিনীর অভিনয় আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখেছি বহুবার। সাম্প্রতিককালে এই শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে নাটক রচনার প্রচেষ্টাও বড় কম নয়।

নাটকটি একটিমাত্র কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। বহু কাহিনী বা ঘটনার সংমিশ্রণেই এর পরিণতি। ফলে বহু চরিত্র সৃষ্টি করে অভিনয়কে জটিল করে তোলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নাটকটির অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর। নাটক যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, মঞ্চ-সাফল্যের ওপরেই তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নির্ভর করে। আর সে সাফল্য অধিক মাত্রায় নির্ভর করে অভিনয়ের ওপর। 'ছায়াপথ' দেখবার সময় একথা বার বার মনে হয়েছে। চাষী মানুষটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যখন ভিক্ষা করে তখন তার সেই অসহায় জীবনযাত্রা এত সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে যা সচারচর অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। কিম্বা খোঁড়া চরিত্রের অভিনয়। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এ চরিত্রটি সুঅভিনীত। অভিনেতা নিঃসীম দরদ দিয়ে অভিনয় করায় চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দৈনিক সমাচারের পাগল, বিজনবাবুর সংক্ষিপ্ত মাতাল চরিত্রাভিনয় এবং তার সংলাপ, চাষীছেলে, চাষীবউ পাগলী অন্ধ মানুষ প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য।

নাটকটির পশ্চাদপটে কোন অভিনবত্ব পাইনি। মোটামুটি আধুনিককালে প্রচলিত পশ্চাদপটেরই মামুলি সংস্করণ। তবে ওপরে আলোক সম্পাতের সাহায্য নেওয়ায় নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথের মানুষগুলির ক্রমাগ্রসরমানতার যে-দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য।

বিজনবাবুর এই সুঅভিনীত নাটকটির পরবর্তী অভিনয়ের অপেক্ষায় রইলাম।

।। ডাকাতের হাতে ।।

২৬শে জানুয়ারী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত কাহিনী অবলম্বনে গঠিত ডাকাতের হাতে কথাচিত্র মুক্তিলাভ করবে রাধা পূরবী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে। ওয়েস্ট বেঙ্গল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি প্রযোজিত এবং লিটল সিনেমার চিত্রার্ঘ এই চিত্রটি সমস্ত শ্রেণী দর্শকের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। রীতা সেনগুপ্ত, পল্লব ব্যানার্জি ও শেখর চ্যাটার্জিকে কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। নির্মলেন্দু চৌধুরী সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রঙমহলের পুনরুদ্ঘাটন :

১লা জানুয়ারী থেকে উনিশ দিন বন্ধ থাকবার পর গেল ২০-এ জানুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চের সাধারণ পাদপ্রদীপ আবার জ্বলে উঠেছে। এখন থেকে রঙমহলের শিল্পীরাই মঞ্চ-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন এবং আপাততঃ কয়েক রাত্রি "চক্র"ই অভিনয় করবেন। ২০-এ জানুয়ারীর অভিনয়ের আগে একটি সভার মাধ্যমে শিল্পিবৃন্দের পক্ষে শ্রীমতী সরযূবালা তাঁদের এই নূতন প্রয়াসে নাট্যরসিক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। এই সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অহীন্দ্র চৌধুরী ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সভাপতিরূপে শ্রীচৌধুরী জানান যে, লণ্ডনের সেণ্ট্ জেমস্ থিয়েটারকে ভেঙে যখন আবাসিক গৃহ নির্মাণের কথা হয়, তখন ঐ থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ বিখ্যাতা অভিনেত্রী ভিভিয়ান লে'-র নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা তা রক্ষা করতে পারেন না। তাই রঙমহলের শিল্পীদের আন্দোলন জয়যুক্ত হওয়া রঙ্গজগতে একটি অভিনব ঘটনা। এবং আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা হিসেবে কোনও একটি সাধারণ রঙ্গালয়ের অপ-

কমলা থ্রি রিং সার্কাসের অসংখ্য খেলার অন্যতম দৃশ্য।
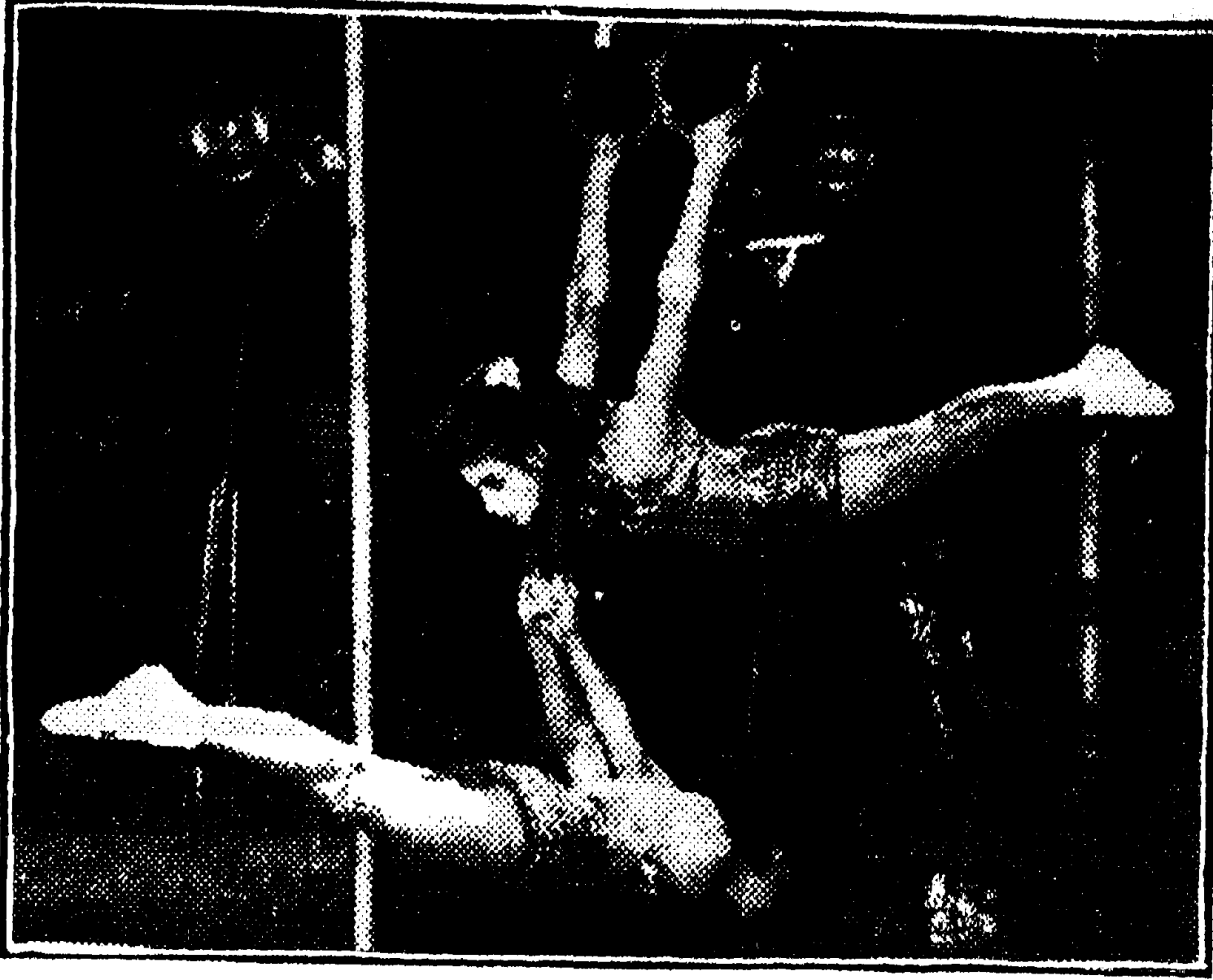
মৃত্যু দেখবার আগে তাঁর নিজের মৃত্যু তাঁর কাছে বেশী কাম্য। পরিশেষে তিনি বলেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে রঙ্গমঞ্চটির পরিচালনা করতে পারে, তাহ'লে তারা শীঘ্রই নিজেদের সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর প্রমোদ-কর বৃদ্ধি :

গেল ১৮-ই জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ওপর প্রচলিত প্রমোদ-করের হারকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর ফলে দর্শক সাধারণের পকেট থেকে আরও কিছু টাকা সরকারের তহবিলে জমা পড়বে। অবশ্য এই বর্ধিত হারের ফলে চিত্রগৃহগুলির টিকিট বিক্রির ওপর কোনও রকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিনা, সে-সম্পর্কে এখনই কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে না।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলিকাতা শাখাগুলির প্রথম মিলনোৎসব :

আসছে ২৯-এ জানুয়ারী ক্লাইভ রো-স্থিত আর্ট সেণ্টার হলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলিকাতা শাখাগুলির প্রথম মিলনোৎসব সম্পন্ন হবে। শ্রীজি, বাসু এবং শ্রীঅনিলবিহারী গাঙ্গুলী এই অনুষ্ঠানের যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

॥ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব ॥

বিগত ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর শনি ও রবিবার স্থানীয় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে প্রখ্যাত সংগীত ও নৃত্য-শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নারী-শিক্ষার প্রধান পরিদর্শিকা শ্রীমনোরমা বসু, কলিকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সি, এ, কর্নেলিয়াস, জেলা স্কুল পরিদর্শিকা শ্রীমীরা হালদার ও শ্রীসতীকুমার চ্যাটার্জি যথাক্রমে সভাপতি, সভানেত্রী, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর কুমারী শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত, নন্দিতা সেন মজুমদারকে 'ছন্দশ্রী' ও কুমারী অঞ্জলী চক্রবর্তীকে 'সংগীতশ্রী' ডিপ্লোমা বিতরণ করেন। শ্রীমনোরমা বসু, শিক্ষায়তনের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রীরা অধ্যক্ষ ননীগোপাল মিত্র ও অধ্যাপক হিমাংশু রায়চৌধুরীর পরিচালনায় কবিগুরুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় করেন। কৃতি ছাত্রীদের শিক্ষায়তন পুরস্কার বিতরণ করেন।

॥ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব ॥

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৮শে জানুয়ারী হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মোৎসব পালনের বিশেষ আয়োজন শ্যাম স্কোয়ারে চলছে। স্বামীজীর জীবন, বাণী ও ভাবধারার প্রচারের জন্য মনীষীগণের সক্রিয়ভাবে যোগদান, ধর্ম-মহাসম্মেলন, স্বামীজীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা, আবক্ষ মূর্তির প্রতিষ্ঠা, কলা ও শিল্প-প্রদর্শনী, স্বামীজীর জীবনী সম্বলিত গীতি-আলেখ্য, উচ্চাঙ্গ সংগীত, কীর্তন, আবৃত্তি, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শতবার্ষিকী কমিটি এগিয়ে চলেছেন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ১৮।১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

॥ জি, ডি, এ কেমিকেলস্ রিক্রিয়েশন ॥

গত ২রা জানুয়ারী মহারাষ্ট্র নিবাস হলে জি, ডি, এ কেমিকেলস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক প্রথম নাটক শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "চোর" সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দলগত ঐক্যের দ্বারা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভিনয়ে যাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে রামলালের ভূমিকায় কুমারী বেবী বোস এবং অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী জহরলাল গুপ্ত, ব্রজেশ্বর গাঙ্গুলী, সুব্রত নিয়োগী ও জীতেন্দ্রমোহন ব্যানার্জি অন্যতম। নাটকটি পরিচালনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

॥ বাগবাজার নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব ॥

গত ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বাগবাজার নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবের দীপালীর বিজয়োৎসব উপলক্ষে মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক্ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে বিভিন্ন শিল্পী সমন্বয়ে একটি সংগীতানুষ্ঠান হয় ও ২৫শে ডিসেম্বর উপরোক্ত স্থানে শৌভনিক সংস্থা কর্তৃক ম্যাক্সিম গোর্কীর "মা" নাটক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ॥

আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ভারতবর্ষ ৯টি খেলায় ১৮ পয়েন্ট পেয়েছে এবং ৫১টি গোল দিয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে কোন গোল হয়নি। প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি দেশ যোগদান করে এবং খেলা হয় লীগ প্রথায়। শেষ খেলায় ভারতবর্ষকে জার্মাণীর বিপক্ষে জয়লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ব্যাক পৃথিপাল পেনাল্টি কর্ণার থেকে জয়সূচক গোলটি করেন।

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ হকি দল জার্মাণী। জার্মাণী ৯টি খেলার মধ্যে ২টি খেলা ড্র করেছে—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১—১ গোলে এবং হল্যাণ্ডের বিপক্ষে গোলশূন্যভাবে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া ৯টি খেলায় ৫ পয়েন্ট নষ্ট করে ১৩ পয়েন্ট পায়। জার্মাণীর বিপক্ষে ০—৩ গোলে এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ০—৩ গোলে অস্ট্রেলিয়া হার স্বীকার করে এবং মালয়ের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে।

ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ১৫—০ গোলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ ক'রে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক গোলে জয়লাভের রেকর্ড করে। ভারতবর্ষ ১১—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে।

ভারতবর্ষের জয় (৯) : জাপানকে ১১—০ গোলে, ইন্দোনেশিয়াকে ১১—০ গোলে, মালয়কে ৩—০ গোলে, হল্যাণ্ডকে ৯—০ গোলে, নিউজিল্যাণ্ডকে ৪—০ গোলে, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিককে ৫—০ গোলে, অস্ট্রেলিয়াকে ৩—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ৪—০ গোলে এবং জার্মাণীকে ১—০ গোলে ভারতবর্ষ পরাজিত করে।

লীগ খেলায় চূড়ান্ত ফলাফল

দেশ	খেলা	জয়	ড্র	হার	পঃ	বিঃ	পঃ
ভারত	৯	৯	০	০	৫১	০	১৮
জার্মাণী	৯	৬	২	১	৩০	৩	১৪
অস্ট্রেলিয়া	৯	৬	১	২	৩০	৯	১৩
হল্যাণ্ড	৯	৫	২	২	১২	১৫	১২
মালয়	৯	৩	৩	৩	১৪	১২	৯
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২	৪	৩	১৫	৯	৮
জাপান	৯	৩	২	৪	১০	১৮	৮
বেলজিয়াম	৯	৩	০	৬	১১	১৮	৬
সংযুক্ত আরব	৯	০	১	৮	৪	৪২	১
ইন্দোনেশিয়া	৯	০	১	৮	২	৫৪	১

গোলদাতা : দর্শনসিং (ভারত) ২০ (দুইটি হ্যাট্রিকসহ); বি পাতিল (ভারত) ১১ (একটি হ্যাট্রিকসহ); পৃথিপাল সিং (ভারত) ও পরমলিংগম (মালয়—একটি হ্যাট্রিকসহ) ৯; গুরুদেব সিং (ভারত) ৮; সুলের (জার্মাণী) (হ্যাট্রিকসহ); ই পিয়ার্স (অস্ট্রেলিয়া) ও ডি পিপার (অস্ট্রেলিয়া) ৭; কানবে (জাপান) ৬; কেলার (জার্মাণী) ৫।

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে আটটি দল উঠেছিল। এই আটটি দলকে সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। 'এ' বিভাগে খেলেছিল সার্ভিসেস (১৯৬০ সালের বিজয়ী), রেলওয়েজ, অন্ধ্র এবং আসাম। সার্ভিসেস এবং রেলওয়েজ মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। শক্তিশালী অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে রেলওয়েজ গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

লীগের 'বি' বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করে বাংলা ৩টে খেলায় ৬ পয়েন্ট পেয়ে। বাংলা ১২টা গোল দেয়; বাংলাকে কোন দলই গোল দিতে পারেনি। বাংলা প্রথম খেলায় মহারাষ্ট্রকে ৩—০ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় মহীশূরকে ৪—০ গোলে এবং শেষ খেলায় দিল্লীকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে।

মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে দল ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ বাংলাকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল এই প্রথম ফাইনালে খেলবে।
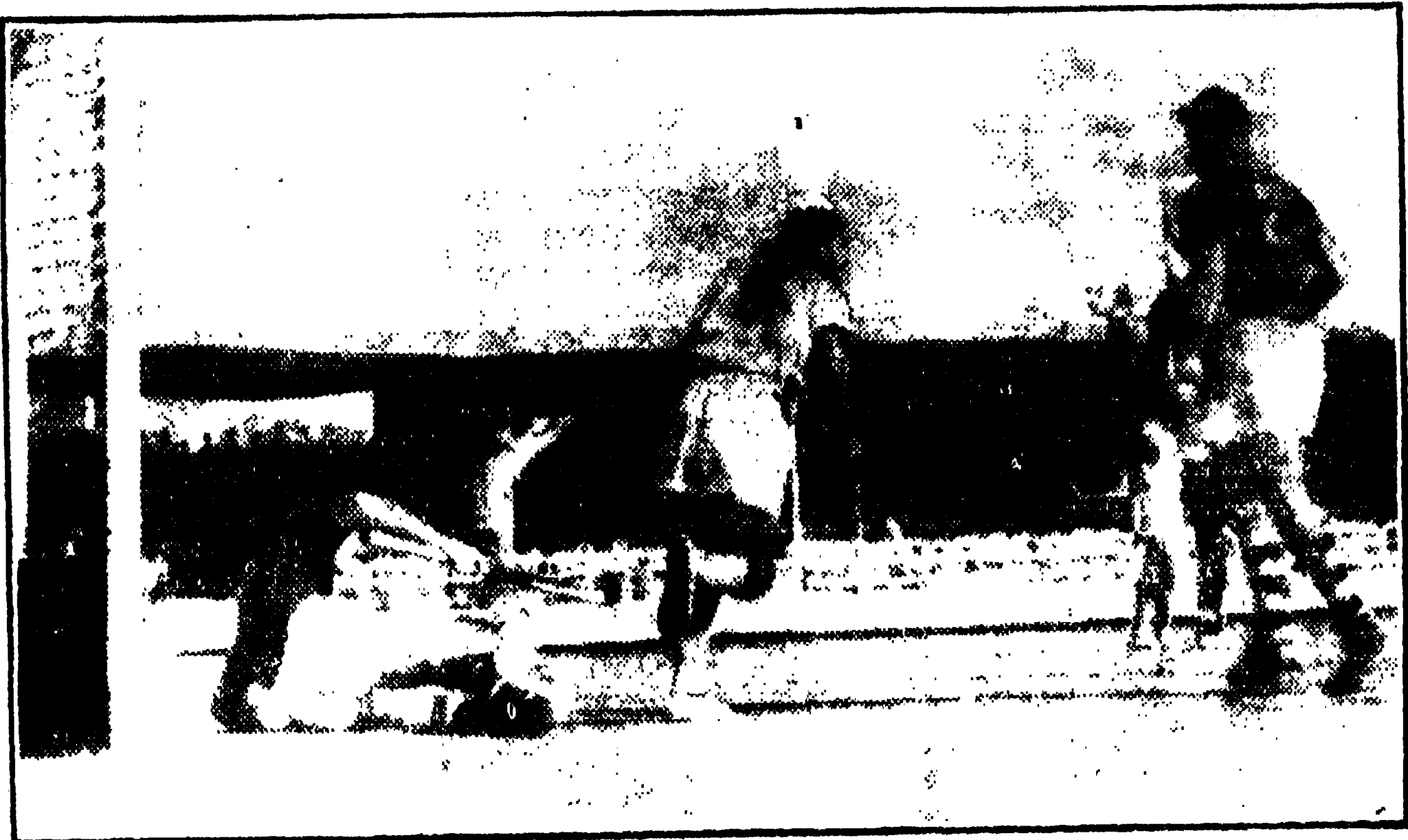
আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা : দর্শন সিংয়ের (ভারতবর্ষ) গোল দেওয়ার দৃশ্য

রেলওয়ে দল পরিচালনা করেন বাংলারই খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী। প্রথমার্ধের খেলার ২২ মিনিটে রেল দলের আম্পালারাজু প্রায় ৩৫ গজ দূরে থেকে অতর্কিতে জয়সূচক গোলটি দেন। ছয়জন অলিম্পিক খেলোয়াড়পুষ্ট বাংলা দল এই গোল পরিশোধের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

'বি' বিভাগে মহারাষ্ট্র বনাম মহীশূর দলের খেলাটি দু'দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। প্রথম দিনের খেলাটি গোল-শূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনে উভয় পক্ষই তিনটি ক'রে গোল দেয়। মহারাষ্ট্র দলের এন ডি সুজা একাই তিনটি গোল দিয়ে হ্যাট-ট্রিক করেন।

অপর দিকের সেমিফাইনালে গত বছরের সন্তোষ ট্রফি জয়ী সার্ভিসেস দলের সংগে খেলবে মহারাষ্ট্র। দু'দিন খেলা ড্র হওয়ার পর তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র ৫—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত ক'রে 'বি' বিভাগের লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৯৪১ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। তিন বছর (১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৮) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এ পর্যন্ত ১৭ বার খেলা হয়েছে এবং ৬টি দল 'সন্তোষ ট্রফি' জয়লাভ করেছে। বাংলা ১০ বার (১৯৪১, ১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৮-৫৯), দিল্লী ১ বার (১৯৪৪), মহীশূর ২ বার (১৯৪৬ ও ১৯৫২), বোম্বাই ১ বার (১৯৫৪), হায়দ্রাবাদ ২ বার (১৯৫৬-৫৭) এবং সার্ভিসেস ১ বার (১৯৬০) জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার 'সন্তোষ ট্রফি' পেয়েছে।

লীগ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

'এ' বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
সার্ভিসেস	৩	২	১	০	৫	০	৫
রেলওয়ে	৩	১	২	০	৫	০	৪
অন্ধ্র	৩	১	১	১	২	২	৩
আসাম	৩	০	০	৩	০	১০	০

'বি' বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বাংলা	৩	৩	০	০	১২	০	৬
মহারাষ্ট্র *	৩	২	০	১	১০	৭	৪
মহীশূর *	৩	১	০	২	৮	১৫	২
দিল্লী	৩	০	০	৩	০	৮	০

*মহারাষ্ট্র বনাম মহীশূর দলের খেলা প্রথম দিন ০—০ গোলে এবং দ্বিতীয় দিন ৩—৩ গোলে ড্র যায়। তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র ৫—১ গোলে জয়লাভ করে।

॥ ভারত সফরে এম সি সি দল ॥

১৯৬১-৬২ সালের ভারত সফরে এম সি সি দল পাঁচটি টেস্ট খেলাসহ মোট ১৫টি খেলায় যোগদান করে। এম সি সি দলের পক্ষে খেলার ফলাফল—জয় ৪, ড্র ৯ এবং হার ২ (৪র্থ ও ৫ম টেস্ট)। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির একাদশ দলের বিপক্ষে ৪ উইকেটে, উত্তরাঞ্চল দলের বিপক্ষে ৯ উইকেটে, সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে এক ইনিংস ও ৩৭ রানে এবং দক্ষিণাঞ্চল দলের বিপক্ষে ৩৭ রানে এম সি সি দল জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে ইংল্যাণ্ড নামে দলটি ভারতবর্ষের কাছে হার স্বীকার করেছে ৪র্থ টেস্টে ১৮৭ রানে এবং ৫ম টেস্টে ১২৮ রানে। লক্ষ্য করার বিষয়, ৪র্থ এবং ৫ম টেস্টের ঠিক আগের খেলাতে এম সি সি দল জয়লাভ করেছে। সাধারণত টেস্ট খেলার ঠিক আগের খেলায় দলের জয়লাভে খেলোয়াড়দের মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং খেলোয়াড়রা পরবর্তী খেলায় সাফল্য লাভও করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে।

ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' হারানোর ফলে ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলি ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছে এবং সেই সংগে ভবিষ্যতের জন্যে সাবধানও করেছে। ডেইলি স্কেচ এবং ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকা দাবী জানিয়েছে, হয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল পাঠানো হউক নতুবা বিদেশে ক্রিকেট সফরের প্রস্তাব বাতিল করা হউক।

ডেইলী স্কেচ পত্রিকার ক্রিকেট সমালোচক লিখেছেন, ইংল্যাণ্ডের আটজন নামকরা খেলোয়াড় ভারত সফরে যোগদান করতে অসম্মতি জানালে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল প্রেরণ করা ছাড়া এম সি সি কর্তৃপক্ষের কোন উপায় ছিল না, যদিও ভারতবর্ষ শক্তিশালী দলের জন্যে অনুরোধ করেছিল। ভারতবর্ষ তার এই অনুরোধের যৌক্তিকতা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিয়েছে। আশা করি, এম সি সি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হবেন।

ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি আর এ রবার্টস মাদ্রাজ থেকে জানিয়েছেন, ভারতবর্ষের মাঠে ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভাঙ্গা ইংলণ্ড দলের পক্ষে যে সম্ভবপর নয়, ভারতবর্ষ তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে। বর্তমান টেস্ট সিরিজের খেলায় অবিশ্যি দুই দেশের শক্তির যথার্থ পরীক্ষা হয়নি তবুও এই প্রসঙ্গে এম সি সি কর্তৃপক্ষ বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করার এবং ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট উপাদান পেয়েছেন।

টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা মাদ্রাজ থেকে লিখেছেন, কলকাতায় ভারতবর্ষের সাফল্য যে আকস্মিক ঘটনা নয় মাদ্রাজে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দলগত সংহতি এবং চৌকশ খেলোয়াড়দের দক্ষতার মূলধনে এবারের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ জয়লাভ করেছে।

এম সি সি'র সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওর্সলে মাদ্রাজের ৫ম টেস্ট খেলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষের বর্তমান জয়লাভ খুবই যুক্তিযুক্ত। ভারত সফররত ইংল্যাণ্ড দলটি দ্বিতীয় শ্রেণীর—অনেকের এই অভিমতের সংগে একমত হ'তে তিনি রাজী হননি। তিনি বলেন, এই দলটি তাঁদের এ বছরের শ্রেষ্ঠ দল। তিনি আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলে ট্রুম্যান এবং স্ট্যাথাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা দলের সংগে যোগদান করলে দলের বিশেষ কোন তারতম্য হ'ত না। টেস্ট খেলায় ভারতীয় আম্পায়ারদের বিচারবুদ্ধির মান সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম ওর্সলে বলেন, এই মান প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর, আমাদের খেলোয়াড়দের এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ করার কারণ ছিল না।

॥ রঞ্জি ট্রফি ॥

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা দল এই ইনিংস ও ১৭৬ রানে বিহার প্রদেশকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। বাংলা ৩টি খেলায় মোট ২৫ পয়েন্ট লাভ করেছে।

বিহার : ১৫৬ রান (একম্বরম ৪১ নট আউট। ভাণ্ডারী ৭০ রানে ৫ উইকেট) ও ১২৭ রান (নন্দ ৬১। কাপুর ৪০ রানে ৪ এবং ভাণ্ডারী ৩২ রানে ৩ উইকেট)।

বাংলা : ৪৫৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড'। কেনী ৯০, পংকজ রায় ৭৫, পোদ্দার ৬৩, ভাণ্ডারী ৬২ এবং কল্যাণ বিশ্বাস ৫৭ নট-আউট। ধীরেন ঘোষ ১২৩ রানে ৪ উইকেট)।

॥ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্যে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে রুসী সুর্তি বাদে সকলেই ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন। দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন নরী

নরী কন্ট্রাক্টর (অধিনায়ক)

পতৌদির নবাব (সহ-অধিনায়ক)

কন্ট্রাক্টর এবং সহ-অধিনায়ক পতৌদির নবাব মনসুর আলী। নির্বাচিত ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১০ জন খেলোয়াড়ের ব্যাটসম্যান হিসাবে খ্যাতি আছে। এ'দের মধ্যে ৬ জন 'অল-রাউণ্ডার'। দলের বেশীরভাগ খেলোয়াড়ই তরুণ। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে উদীয়মান খেলোয়াড়দের দলে স্থান দেওয়ার নীতি খুবই সমর্থনযোগ্য। দলে সুভাষ গুপ্তের স্থান না পাওয়াতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের যে আদেশ ছিল, খেলোয়াড় নির্বাচন পর্বের পূর্বে তার মীমাংসা হওয়াতে অনেকেই আশা করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তিনি দলে স্থান পাবেন। প্রসন্ন এখনও টেস্ট খেলায় বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেননি। দলে একজন অফ্ স্পিন বোলারের বিশেষ প্রয়োজন এই বিবেচনায় তাঁকে দলভুক্ত করা হয়েছে। সুর্তি ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বিগত টেস্ট সিরিজের কোন টেস্টেই খেলেননি। গতবার (১৯৬০-৬১) পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টো টেস্ট খেলেছিলেন। কিন্তু কোন উইকেট পাননি। এই দুটো টেস্টে তাঁর মোট রাণ ৭৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৪ (দিল্লী, ৫ম টেস্ট), ১৩০ রানে ০ উইকেট। এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ইতিপূর্বে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এই ৭ জন খেলোয়াড়—উমরীগড় ১১টা, মঞ্জরেকার ৮টা, কণ্ট্রাক্টর ৫টা, বোরদে ৪টে এবং ১টা ক'রে দেশাই, নাদকার্ণী এবং রঞ্জনে। আগামী ৩১শে জানুয়ারী বোম্বাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিমানযোগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে যাত্রা করবে। ভারতীয় দলের প্রথম খেলা পড়েছে ৫ই ফেব্রুয়ারী ত্রিনিদাদ কোল্টস দলের বিপক্ষে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর শেষ হবে ২৮শে এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হিসাবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন গোলাম আমেদ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর তালিকা

ফেব্রুয়ারী ৫ই ও ৬ই : ত্রিনিদাদ কোল্টস দলের বিপক্ষে।

ফেব্রুয়ারী ৯, ১০, ১২ ও ১৩ **:** ত্রিনিদাদ দলের বিপক্ষে।

ফেব্রুয়ারী ২৪ ও ২৬ **:** জামাইকা কোল্টস দলের বিপক্ষে।

ফেব্রুয়ারী ২৮, **মার্চ** ১, ২ ও ৩ **:** জামাইকা দলের বিপক্ষে।

উমরীগড় মঞ্জরেকার

মার্চ ১৬, ১৭, ১৯ ও ২০ **:** বারবাদোজ দলের বিপক্ষে।
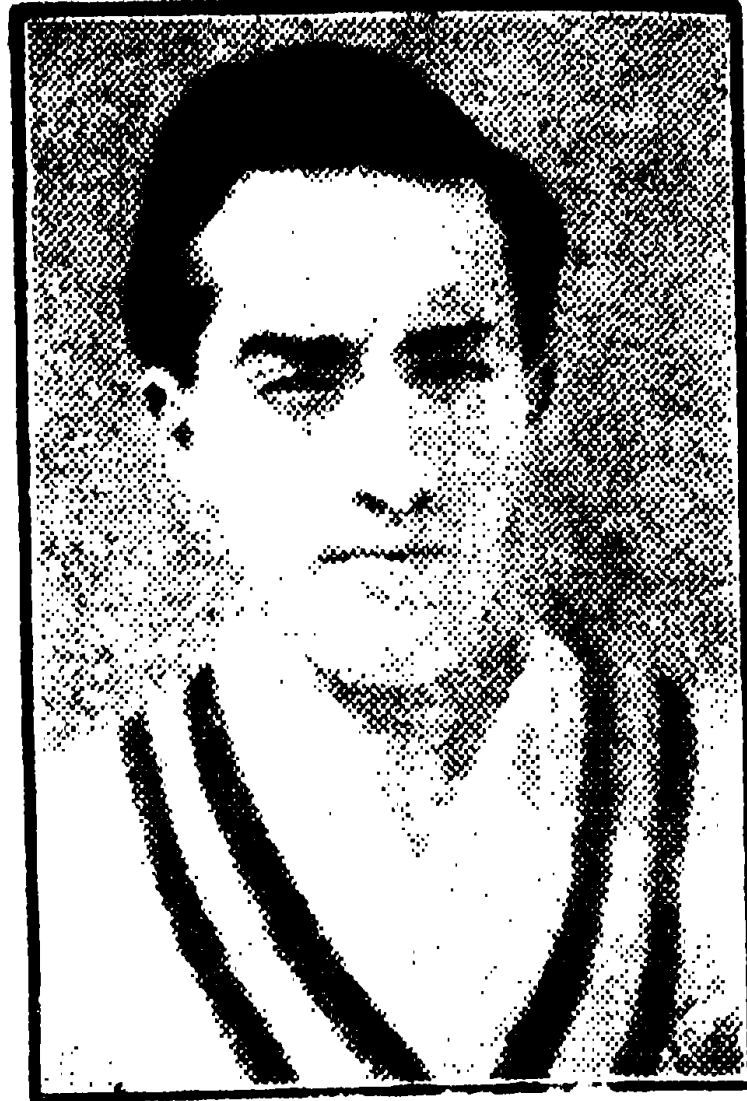
মার্চ ৩১, এপ্রিল ২, ৩ ও ৪ **:** বৃটিশ গায়না দলের বিপক্ষে।

এপ্রিল ২৭ ও ২৮ : উইণ্ডওয়ার্ডস এ্যাণ্ড লিওয়ার্ডস আইল্যাণ্ডস দলের বিপক্ষে।

বোরদে জয়সীমা

টেস্ট খেলার তারিখ

১ম টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১

২য় টেস্ট (জামাইকা) : মার্চ ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২

৩য় টেস্ট (বারবাদোজ) : মার্চ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮

৪র্থ টেস্ট (বৃটিশ গায়না) : এপ্রিল ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১২

৫ম টেস্ট (ত্রিনিদাদ) : এপ্রিল ১৮, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৪

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সাল	স্থান	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র	রাবার জয়
১৯৪৮—৪৯	**ভারতবর্ষ**	৫	০	১	৪	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫৩	**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ**	৫	০	১	৪	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫৮—৫৯	**ভারতবর্ষ**	৫	০	৩	২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
মোট		১৫	০	৫	১০	

১৯৪৮-৪৯ : ১ম টেস্ট (নিউ দিল্লী)—ড্র: ২য় টেস্ট (বোম্বাই)—ড্র: ৩য় টেস্ট (মাদ্রাজ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ইনিংস এবং ১৯৩ রানে জয়: ৪র্থ টেস্ট (বোম্বাই)—ড্র।

১৯৫৩ : ১ম টেস্ট (ত্রিনিদাদ)—ড্র: ২য় টেস্ট (বার্বাদোস)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৪২ রানে জয়: ৩য় টেস্ট (ত্রিনিদাদ)—ড্র: ৪র্থ টেস্ট (জর্জ টাউন)—ড্র: ৫ম টেস্ট (কিংস্টোন)—ড্র।

১৯৫৮-৫৯ : ১ম টেস্ট (বোম্বাই)—ড্র: ২য় টেস্ট (কানপুর)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২০৩ রানে জয়: ৩য় টেস্ট (ক'লকাতা)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ইনিংস এবং ৩৩৬ রানে জয়: ৪র্থ টেস্ট (মাদ্রাজ)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৯৫ রানে জয়; ৫ম টেস্ট (নিউ-দিল্লী)—ড্র।

॥ টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র
" ব ইংল্যান্ড	২৯	৩	১৫	১১
" ব অস্ট্রেলিয়া	১৩	১	৮	৪
" ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৫	০	৫	১০
" ব নিউজিল্যান্ড	৫	২	০	৩
" ব পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট :	৭৭	৮	২৯	৪০

॥ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে প্রথম দিন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনের ব্যবস্থাপনা অবশ্য প্রথম দিনের থেকে ভাল হয়। নীচে কয়েকটি অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত ফলাফল দেওয়া হ'ল :

চ্যাম্পিয়ানসীপ

সাধারণ দলগত : ১ম ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৬৮ পয়েন্ট) এবং ২য় মোহনবাগান (৬৫ পয়েন্ট)।

॥ টেস্ট সিরিজের ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	সিরিজ ড্র
" ব ইংল্যান্ড	৮	১	৬	১
" ব অস্ট্রেলিয়া	৩	০	৩	০
" ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩	০	৩	০
" ব নিউজিল্যান্ড	১	১	০	০
" ব পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট :	১৮	[illegible]	১২	৩

রমাকান্ত দেশাই

নাদকার্ণি

আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যে ষোলজন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্যের পরিচয় নীচের তালিকায় পাওয়া যাবে। **১৯৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলা পর্যন্ত নীচের ষোলজন খেলোয়াড় যতগুলি সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তার উপর ভিত্তি ক'রে তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে।**

খেলোয়াড়	মোট খেলা	মোট রাণ	সর্বোচ্চ রাণ ‡	সেঞ্চুরী সংখ্যা	অর্ধ সেঞ্চুরী সংখ্যা	রান	উইকেট
উমরীগড়	৫৪	৩১৮৬	২২৩	১১	১১	১২২৬	২৬
মঞ্জরেকার	৪২	২৫১৬	১৮৯	৫	১৩	২৯	১
কণ্ট্রাক্টর	২৯	১৫৮৫	১০৮	১	১১	৬৯	১
বোরদে	২৩	১২৩০	১৭৭*	২	৭	১৫০৭	৩৫
দেশাই	১৮	২৮৬	৮৫	০	১	২০৬২	৫২
নাদকার্ণী	১৬	৫৫৮	৭৬	০	৩	১০৫৫	৩২
জয়সীমা	১১	৭২৮	১২৭	১	৫	৫১	০
দুরাণী	৬	২১৭	৭১	০	১	৬৩১	২৩
কুন্দরাম	৬	১৬৭	৭১	০	১	—	—
ইঞ্জিনিয়ার	৪	১৩৫	৬৫	০	১	—	—
মেহেরা	৩	১১১	৬২	০	১	—	—
পাতৌদির নবাব	৩	২২২	১০৩	১	১	—	—
রঞ্জনে	৩	৩৮	১৬	০	০	৩৫৩	১০
সুর্তি	২	৭৫	৬৪	০	১	১৩০	০
প্রসন্ন	১	২৬	১৭	০	০	৩৯	১
সারদেশাই	১	২৮	২৮	০	০	৩	০

‡ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

* নট আউট
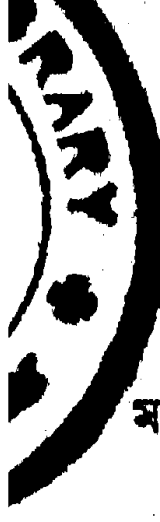
জুনিয়ার দলগত : ২৪ পরগণা (২৪ পয়েন্ট)।

মহিলা দলগত : ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব (৪৫½ পয়েন্ট)।

সাধারণ ব্যক্তিগত : ডি বীর (মোহনবাগান) ১৩ পয়েন্ট।

মহিলা ব্যক্তিগত : মরিণ হকিন্স (ক্যালকাটা রেঞ্জার্স) ১৮ পয়েন্ট।

জুনিয়ার ব্যক্তিগত : ব্যারী ফোর্ড (আই এ ক্যাম্প) ১২ পয়েন্ট।

ভারোত্তোলন (দলগত চ্যাম্পিয়ান) : কালীঘাট ব্যায়াম সমিতি (২২ পয়েন্ট)

জিমন্যাষ্টিক (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান) : দিলীপ ওঝা (চাঁপাতলা) ৩০·৯ পয়েন্ট।

জুনিয়ার বিভাগ (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান) : বিজন ভৌমিক (উষানগর) ২৯ পয়েন্ট।

কবাডি ফাইনাল : চন্দননগর ২০-১২ পয়েন্টে হুগলীকে পরাজিত করে।

খো খো ফাইনাল : দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ ৩৩-৬ পয়েন্টে চেতলা এসোসিয়েশনকে পরাজিত করে।

ভলিবল ফাইনাল : টাউন ইউনাইটেড ১৫-৬, ১০-১৫, ১৫-৫, ১৫-৭ পয়েন্টে পূর্বাচল দলকে পরাজিত করে।

কুস্তি (দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ) : ক্যালকাটা পুলিশ (২৪ পয়েন্ট)।

জাতীয় টেবল টেনিস—১৯৬১

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্বিংশ জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালের সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিংগলস : জে সি ভোরা (বোম্বাই) ১৫—২১, ২১—১৩, ২১—১২, ২১—১২ পয়েন্টে গত বছরের রানার্স-আপ হলদেনকারকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : উষা সুন্দর রাজ (মহীশূর) ২১—১৮, ২১—১৬, ২১—১২ পয়েন্টে গত বছরের রানার্স-আপ মীনা পারাণ্ডেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : গত বছরের রানার্স আপ গৌতম দেওয়ান এবং ডি পি সম্পৎ (বোম্বাই) ২৩—২১, ২২—২০, ১৫-২১, ১৯—২১, ২১—১৬ পয়েন্টে কে রামকৃষ্ণণ এবং এম আজমকে (হায়দ্রাবাদ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মীনা পারাণ্ডে এবং আর জন (রেলওয়ে) ২১—১৭, ২১—১৫ ২১—১৫ পয়েন্টে জয় পেরিয়া এবং গুল নাসিকওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : উষা সুন্দররাজ (মহীশূর) এবং কে নাগরাজ (রেলওয়ে) ২১—১২, ২৭—২৯, ২১—১৫, ২১—১৯ পয়েন্টে ভি রামচন্দ্রন এবং এ ব্র্যাংকলিকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস : এস কে দোশী (বোম্বাই) ১৯—২১, ২১—১৯ ২১—১১, ২১—১৮ পয়েন্টে ডি আর রাওকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিংগলস : অলকা ঠাকুর (মহারাষ্ট্র) ১০—২১, ২১—১৫, ১৪—২১, ২১—১২, ২১—১৪ পয়েন্টে উষা আব্রাহামকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেন।

॥ রোভার্স কাপ ॥

বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৬১) সেকেন্দ্রাবাদের ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেণ্টার দল ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম ভারতীয় সামরিক দল হিসাবে রোভার্স কাপ জয়লাভ করেছে।

গত ১২ বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী দল : ১৯৪৯ ইস্টবেংগল; ১৯৫০-৫৪ হায়দরাবাদ পুলিশ; ১৯৫৫ মোহনবাগান; ১৯৫৬ মহমেডান স্পোর্টিং; ১৯৫৭ হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ; ১৯৫৮ ক্যালটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব; ১৯৫৯ মহমেডান স্পোর্টিং এবং ১৯৬০ অন্ধ্র পুলিশ।

১৯৬০ সালের ফাইনাল : অন্ধ্র পুলিশ ০, ১ : ইস্টবেংগল ০, ০।

অলিম্পিক হকি খেলা : মালয়ের গোলের সামনে ভারতবর্ষ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সদ্য প্রকাশিত

৭ই কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের বই

নবেন্দু ঘোষের

গল্পগ্রন্থ

পাপুই দ্বীপের কাহিনী

তিন টাকা তিরিশ নয়া পয়সা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

'রবীন্দ্রজীবনী'-কার

রবি-কথা

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিশু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

কবি প্রণাম

পাঁচ টাকা

[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কবিতা-সংকলন]

স্মরণীয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

উপহারযোগ্য কাব্যগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

কখনো মেঘ ৪·০০

[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন পারিপাট্যে সমুজ্জ্বল]

প্রথমা ২·৫০

সম্রাট ২·০০

ফেরারী ফৌজ ২·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নীল আকাশ ২·০০

মোহিতলাল মজুমদারের

সুনির্বাচিত কবিতা ৪·০০

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের

কবি-চিত্ত ৫·০০

আমাদের প্রকাশনীর কয়েকখানি বাছাই করা উপহার গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
উপন্যাস
মৌসুমী ৩·০০

লীলা মজুমদারের
উপন্যাস
ঝাঁপতাল ২·৭৫

'বনফুল'-এর
উপন্যাস
জলতরঙ্গ ৪·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
উপন্যাস
ইস্পাতের ফলা ৩·৫০

বিমল মিত্রের
উপন্যাস
নিশিপালন ৪·৭৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
উপন্যাস
সৃষ্টি ৫·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
উপন্যাস
কৃষ্ণকলি নাম তার ৫·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
দিবারাত্রির কাব্য ৩·২৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
উপন্যাস
নীল রাত্রি ৩·৫০

বাণী রায়ের
উপন্যাস
আরো কথা বলো ২·৭৫

চিত্তরঞ্জন মাইতির
উপন্যাস
অগ্নিকন্যা ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
এক ছিল কন্যা ৬·৫০

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্পগ্রন্থ
সিন্ধুর টিপ ২·৫০

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্পগ্রন্থ
রূপহলুদ ২·৫০

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের
গল্পগ্রন্থ
কায়কল্প ৩·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্পগ্রন্থ
মালাচন্দন ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্পগ্রন্থ
জাতিস্মর ২·৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচী পত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১ গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা,
শুক্রবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 2nd February 1962
40 Naya Paise

নেহরুজী কর্তৃক কাশ্মীর সম্বন্ধে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান একদিকে যেমন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় কূটনীতির পক্ষে একটি গুরুতর পরাজয়। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি কাশ্মীরের ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ইউজিন ব্ল্যাককে মধ্যস্থতার ভার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি নূতন কূটনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছিল। প্রস্তাবটি পত্রযোগে দিল্লী ও করাচীতে প্রেরিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্থান এতে সাগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অন্যদিকে দিল্লী কিছু দিন নীরব থাকার পর, গত সোমবার নেহরুজী জানিয়েছেন যে, কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মধ্যস্থতার প্রস্তাব ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এই ঘটনায় পাকিস্থান যে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে, বিশ্বসভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে অধিকতর সহানুভূতি আকর্ষণের সুযোগ লাভ করবে এবং পাকিস্থানী দাবীর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে অনেকের মনে আস্থার সৃষ্টি করতে পারবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সুযোগ পাকিস্থানকে কেন দেওয়া হল? ভারত সরকার যে সব কারণে এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব বর্জন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ ভারতের পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে দুইটি প্রশ্ন: (১) কাশ্মীর থেকে পাকিস্থানের আক্রমণাত্মক দখল হঠাতে হবে; এবং (২) ধর্মীয় ভিত্তিতে কাশ্মীরের কোনো বাটোয়ারা স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ শুধু বিরোধ মীমাংসা নয়, মীমাংসার পদ্ধতি সম্বন্ধে নৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান। আমাদের মোট কথা এই যে, মীমাংসার পদ্ধতি যদি নীতিবিরোধী এবং আপত্তিকর হয় তাহলে মীমাংসার ফল যতই ভাল হোক্ না কেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তা আমাদের গ্রহণীয় নয়।

কিন্তু ভারতের বক্তব্য আমরা বিশ্বসভাকে কতটুকু বোঝাতে পেরেছি? দুনিয়ার জনমতকে কতটুকু আমাদের অনুকূলে আনা সম্ভব হয়েছে? এই কাশ্মীরের ব্যাপারেই যেখানে প্রচার, আন্তর্জাতিক মন্ত্রণা ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র, সেখানে পর পর কয়েকটি গুরুতর কূটনৈতিক পরাজয় আমাদের স্বীকার করতে হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ মনে করে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত নয়। এই ভ্রান্ত ধারণা সব ক্ষেত্রেই স্বার্থপ্রসূত এবং পাকিস্থানের প্রতি প্রীতিজনিত—এই সান্ত্বনায় নিজেদের প্রতারণা করে কিছু লাভ নেই। একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা উচিত যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমরাই মূলতঃ দায়ী; কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য যথার্থভাবে এবং দক্ষতা সহকারে বিশ্বসভায় রাখা হয়নি।

কিন্তু পাকিস্থানের সঙ্গে কূটনৈতিক যুদ্ধে যতবার আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর পরাজিত হয়েছেন, তার মধ্যে এই কেনেডি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সবচেয়ে মারাত্মক। এর প্রতিফল দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। অথচ এই প্রতিফল বা পরাজয় বহুলাংশে ভারতীয় দূতাবাসের অকৃতকর্মের ফল। প্রস্তাবটি লিখিতভাবে জ্ঞাপন করার পূর্বে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতকে আভাষে নিশ্চয়ই এর মর্ম জানানো হয়েছিল। কেনেডির চিঠি পাওয়ার পূর্বে দিল্লী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বিশ্বাস করা যায় না। আর, যদি একথা সত্যই হয় তাহলে এর থেকে ভারতীয় দূতের অপদার্থতা সুপ্রমাণিত। এতবড় একটি খবরের তিনি কোনো পূর্বাভাস পাননি! অপরপক্ষে, ভারত সরকারের কর্তব্য ছিল ওয়াশিংটনে উৎকর্ণ থাকা এবং লিখিতভাবে প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পূর্বেই মার্কিণ প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট আভাষ পৌঁছে দেওয়া যে, মধ্যস্থতার প্রস্তাবে ভারত সম্মত হতে পারে না। তা যদি করা হত তাহলে কেনেডি নিশ্চয়ই প্রস্তাবটি আদৌ পেশ করতেন না এবং এইটি প্রত্যাখ্যানের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ভারতকে সহ্য করতে হত না।

প্রস্তাবটি যাতে আদৌ উত্থাপিত ও বিজ্ঞাপিত না হয় তার চেষ্টা ভারত করতে পারেনি। এই ঘটনায় দুইটি জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে: প্রথমত, কাশ্মীর সম্বন্ধে ওয়াশিংটন ভারতের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে অবগত নয়—না থাকার দায়িত্ব ভারতের। দ্বিতীয়ত, ওয়াশিংটনের কার্যকলাপ বা মনোভাবের কোনো পূর্বাভাষ ভারতীয় দূত বা পররাষ্ট্র দপ্তর রাখেন না। দুইটি অপরাধই ক্ষমাহীন। অপরপক্ষে যদি একথা সত্য হয় যে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ সম্ভাবনা জেনেও মার্কিণ প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবটি পেশ করেছেন তাহলে বুঝতে হবে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতকে কোণঠাসা ও অপদস্থ করার চেষ্টা ওয়াশিংটনে আরম্ভ হয়েছে। সেক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতে হয় যে, পণ্ডিত নেহরু তাঁর মার্কিণ ভ্রমণ এবং কেনেডির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ভাববিনিময় সম্বন্ধে যেসব উচ্ছ্বাস কিছুকাল পূর্বেও প্রকাশ করেছেন, সেগুলি ভিত্তিহীন এবং কূটনৈতিক অজ্ঞতাপ্রসূত।

কবিতা
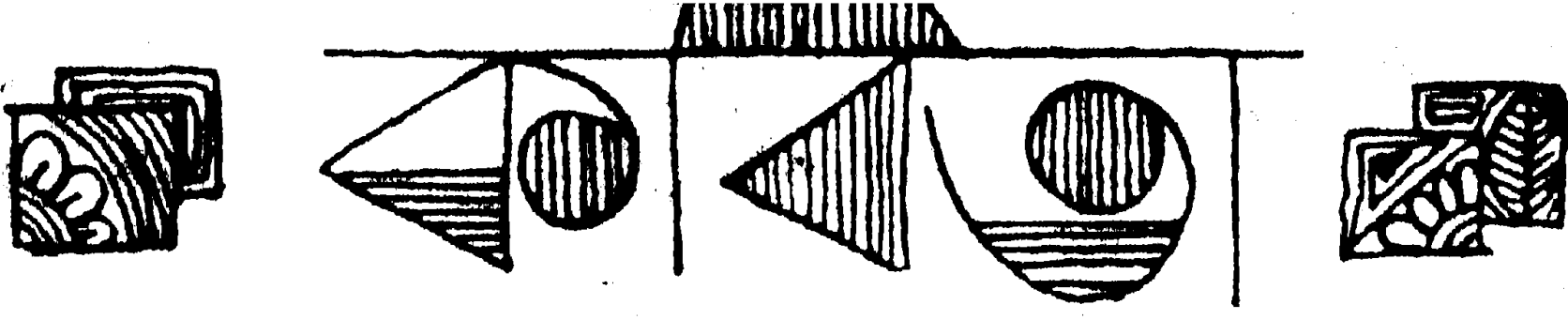
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে

বিষ্ণু দে

উদাসীন চোখে দীর্ঘপক্ষ্ম ভিড়ে
কার যাতায়াত? চিরকাল উদ্‌ভ্রান্তি!
চেনা-অচেনায় চেতনায় কোথা ক্লান্তি?
উভবলী ঐ হৃদয়ে উষ্ণ নীড়ে
সে কোন্ আকাশ বাসা বেঁধে পায় শান্তি?

ওগো মনসিজা, তুমি যে চাইলে ভিক্ষা
অতনুর আয়ু ত্রিকালের পদপ্রান্তে,
সে কি শুধু মনুপরাশর-মাপা শিক্ষা?
সে কি নিতান্ত প্রথা মতো? তুমি জানতে
প্রেমের তৃপ্তি-অতৃপ্তি একই দীক্ষা,

চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি,
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে?

*
* *
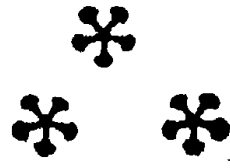
শিয়রে পাপের হাত

তুষার চট্টোপাধ্যায়

শিয়রে পাপের হাত। পতনের সশব্দ ঘোষণা
পদতলে বহুকাল। আত্মবৎ সক্ষম সমাধি
ধারণ করেছে দীর্ঘ অন্তরাল প্রাক্তন ঘটনা।

নির্মমতা তুমি নাম ধরে ডাক। বাহির দুয়ারে
দ্যাখো কত পরিচিত অবয়ব আস্বাদিত স্মৃতি
বিদায়ে করুণ হয়। বিপরীত হওয়ার প্রহারে
প্রস্তরের অবক্ষয়। স্বরচিত বিষণ্ণ প্রকৃতি।
নিষ্ঠা রাখে করতল মৃত্তিকার সিক্ত ব্যবহারে।

অযুত ফুলের বৃন্তে ওষ্ঠ রাখি। সমূহ সংবাদে
শ্রবণের কুশলতা। কোলাহলে অপেক্ষা ইত্যাদি
দ্যুতিময়। জ্বলে প্রীতি বিশ্বাসের বিপুল আস্বাদে।

শিয়রে পাপের হাত। পতনের অন্তিম তোরণে
বুঝি অন্তরাল ভাঙে। বহুবিধ শব্দ প্রতিবাদী।
মৃত্তিকায় নিষ্ঠা রাখি উদ্যানের দৈবাৎ স্মরণে॥

শেষ রাত্রের সনেট

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাহ, আরও শুষ্ক রুক্ষ জ্বালাময় যন্ত্রণা পোড়ায়
রাত্রির আকাশ, শুধু চতুর্দিকে তারা তীব্র তারা,
কুৎসিত বীভৎস ব্রণ ঝুলে আছে পীতাভ প্রভায়
ক্লেদাক্ত রক্তের স্ফীতি। আহা স্মৃতি আমি তোর সাড়া
সহসা জেনেছি এই দুঃসহ বিনিদ্র নভোতল
কারও চোখে তন্দ্রা নেই, কোনও খানে তন্দ্রা কারও চোখে
অতল সুষুপ্তি নেই, স্নায়ুর প্রচণ্ড কোলাহল,
ওরে ও কিশোর, দেখ, আমাকেও টানে সে-নরকে!

জানলায় সঙ্কোচে কাঁপে তোরই বয়সিনী অন্ধকার।
আহা স্মৃতি, দেখ সেই ছায়ার হাতছানি আমি তার
স্পর্শের তৃষ্ণায় জ্বলি, আর দেখ আমার চারদিক
আমার সর্বাঙ্গ এই রাত্রির আগুনে দগ্ধ। ওরে
ও স্মৃতি আমাকে আগলে রাখ সেই বিরাট বৃশ্চিক
রক্তপায়ী সূর্য যেন আমাকে খুঁজে না পায় ভোরে!

দূর দর্শন

জৈমিনি

আজকাল সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলেই আমি ভয় পাই। না, পাওনাদার বা ভোটপ্রার্থী নয়। তাঁরাও আসেন মাঝে মাঝে। কিন্তু তাদের দেখলে চেনা যায়। এরা একেবারে অন্যজাতের আগন্তুক। অত্যন্ত হাসিখুশি, নিষ্পাপ চেহারা। দল বেঁধে ছ'সাত জনে আসে একসঙ্গে, এবং এসেই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। যেন চক্রব্যূহে বাঁধা পড়েছি। লড়াই করা তখন অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রাণের বদলে দিতে হয় পণ—অর্থাৎ, মুক্তিপণ। দিনের মধ্যে এ-রকম চার-পাঁচবার। ক্রমাগত এইভাবে অভিমন্যুর লড়াই চালাতে চালাতে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছি। কড়া-নাড়ার ক্ষীণতম শব্দেই তাই বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে।

বুঝতেই পারছেন, আমি সরস্বতী পুজোর চাঁদা-আদায়কারীদের কথা বলছি। আমাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যে এদের যতো উৎসাহ তার একটা সামান্য ভগ্নাংশও যদি মা-সরস্বতীর কাছে বিদ্যা-আদায়ের জন্যে নিয়োজিত হত, আমি হলপ করে বলতে পারি তাহলে এরা সকলেই এক একজন দিগ্‌গজ পন্ডিত হয়ে উঠত।

কিন্তু, Nature abhors vacuum, সরস্বতীর শূন্য পীঠভূমিতে অনায়াসেই স্থান ক'রে নিয়েছেন দুষ্ট সরস্বতী। দুষ্টবুদ্ধিতে এই সব কিশোরবাহিনী তাক লাগিয়ে দিতে পারে তাদের পিতৃপুরুষকেও।

এই তো সেদিন আমারই কী কাহিল অবস্থা হয়েছিল শুনুন।

কলকাতা বিরাট শহর। পাশের বাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত মানুষ থাকলেও পাড়ার লোক তার খোঁজখবর রাখতে চায় না। এ-সবই আমার জানা কথা। তবু অহংবোধটা ভারি মজার জিনিস। সব জেনে-বুঝেও মাঝে মাঝে অবুঝ হ'য়ে যেতে হয়। কড়া-নাড়ার শব্দে সেদিনও যথারীতি হাতের মুঠোয় একটি আধুলি নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। যা আশঙ্কা করেছিলাম তা ঠিকই। চাঁদা-প্রার্থী। বয়স এদের ঈষৎ বেশী, আঠার-উনিশ হবে।

একজন সবিনয়ে নিবেদন করল— 'আমাদের ক্লাবের চাঁদাটা—!'

'কোন ক্লাব?'

'চলদ্‌গতি সংঘ।'

ঠোক্কর খেলাম যেন। প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'চলদ্‌গতি সংঘ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', ছেলেটি একটু হাসি টেনে বলল, 'আগে নাম ছিল অগ্রগতি সংঘ। কিন্তু পাশের গলিতে ঐ নামে আরেকটি ক্লাব খুলে বসেছে ওরা। আমরা তাই নাম পাল্টে চলদ্‌গতি রেখেছি।'

অন্য একটি ছেলে ব্যাখ্যার সুরে যোগ দিল, 'এর মাঝে এক বছর আমরা নাম রেখেছিলাম চরৈবেতি সংঘ, কিন্তু ওরা ঠাট্টা করত চড়ুইভাতি সংঘ বলে। তাই আমাদের প্রেসিডেন্ট ডক্টর অতনু হাজরা এই নাম রেখে দিয়েছেন আমাদের ক্লাবের।'

'ডাক্তারবাবু ক্লাবের কথা ভাববার সময় পান?' একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করে বসলাম।

'আজ্ঞে না', ছেলেটি আবার বলল, 'তিনি সে ডাক্তার নন, ডি-ফিল। সত্যেন দত্ত আর রবীন্দ্রনাথ—কার কবিতায় কতোবার সাঁতার কাটার উল্লেখ আছে, সেই বিষয়ে গবেষণা করে—।'

'বেশ বেশ।' আমি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করার জন্য আধুলিটি এবার তার হাতের দিকে এগিয়ে বললাম, 'এই নাও।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে গিয়ে সে চাপা আর্তনাদ করল, 'সেকি স্যার? মাত্র আট আনা?'

বক্তৃতাটা আমার মুখস্থই ছিল। বলতে শুরু করলাম, 'যে দিনকাল পড়েছে, বুঝতেই তো পারছ। তারপর মাসের শেষ। আট আনা করে দিতে দিতেই—!'

সে বাধা দিয়ে অমায়িকভাবে হেসে বলল, 'সে তো ঠিকই। কিন্তু আপনার মতো লোকের কাছ থেকে, বিশেষকরে সরস্বতী পুজোর ব্যাপারে—!'

মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। 'আপনার মতো লোক' এবং 'সরস্বতী পুজো' এই দুটো কথা খুব অর্থবোধক হ'য়ে উঠল আমার কাছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এরা আমার সাহিত্যিক সত্তার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এবং সাহিত্যিক হিসাবে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে আমার যে কিছু বেশী দেওয়া উচিত সেই কথাই বলতে চাইছে। ...তো বলতে পারে বৈকি। আমার মতো সাহিত্যিক, বিশেষ করে এইসব অপোগণ্ড যুবকও যখন আমার নাম জানে। মনে মনে বিলক্ষণ লজ্জিত হ'য়ে তাদের দাঁড়াতে বলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, এবং উৎসাহের প্রাবল্যে কড়কড়ে একখানি দু টাকার নোট সংসার খরচ থেকে হাত সাফাই করে এনে তাদের একজনের হাতে সম্প্রদান করলাম।

টাকাটা নিয়ে সযত্নে পকেটে রেখে ছেলেটি এবার চাঁদার খাতা বের করল। তারপর চাঁদার অঙ্ক, তারিখ-টারিখের সব ঘর ভরাট করে অমায়িকভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা—?'

'এ্যাঁ!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ছেলেটি পুনরাবৃত্তি করল, 'আপনার নামটা কি লিখব?'

মনে হল বলি 'তোমার মুন্ডু', কিন্তু তাতো আর সত্যিই বলা যায় না, যে দুটাকার নোটখানা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাও থাবা দিয়ে ওর পকেট থেকে তুলে নেওয়া যায় না, শুধু নিজের অসীম মূর্খতাকে নিজেই মনে মনে ধিক্কার দিয়ে চাপা গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করে দরজা থেকে ফিরে এলাম।

এমন ঠকা জীবনে খুব কমই ঠকেছি।

এক বন্ধুর বাড়ীতে সেদিন এই গল্প বললাম। বন্ধু-পত্নী হেসে বললেন, 'এ তো বড় ছেলেদের কথা। ছোটগুলোও কম যায় না। সেদিন রান্না-ঘরে বসে তরকারি কুটছি, এক দঙ্গল এসে বলল, মাসীমা চাঁদা দিন। বাজারের ফিরতি পয়সা পাশেই পড়ে-ছিল, তাই থেকে চার আনা তুলে দিতে গেছি, তা নেবে না। পুরো একটা টাকা চাই। আমি যতো বলি, নেই, ওদের যেন ততোই জেদ বেড়ে যায়—দিন মাসীমা, ও মাসীমা দিন না! আমি আর উত্তর দিলাম না। তাই দেখে ওদের মধ্যে একটা বলল কি জানেন? সঙ্গীটাকে মিছিমিছি ধমক দিয়ে বলল, মাসীমা মাসীমা করছিস কেন? দেখছিস কতো সুন্দর, বৌদি বল, তাহলে দেবে। তাই না বৌদি!... বলুন তো কাণ্ড!'

বন্ধুবর স্বগতোক্তি করল, 'কাণ্ড আর কি? একটা টাকাই যে ওরা পেয়েছে, সে তো ঠিকই?'

'মোটেই না। আহা কি কথার ছিরি,' বন্ধু-পত্নী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আট আনার বেশী এক পয়সাও দিইনি।'

'ওই একই কথা হল। চার আনা তো নয়!'

তিনজনেই এবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

এরপর বন্ধু বললেন তাঁর কাহিনী। তিনি তাঁর পাড়ার এক পাঠাগারের সভাপতি। সেখানে সরস্বতী পুজোও হয়ে থাকে প্রতি বছর। চাঁদা ওঠে একশ কি সোয়া শ' টাকা। এবার উঠেছে সাত শ'। অথচ এর জন্যে চেষ্টাও করতে হয়নি কিছু! প্রায় আপনা থেকেই এসে গেছে টাকাটা। ওদের নির্বাচনী কেন্দ্রের এক বিখ্যাত ব্যক্তির ভাই সেদিন কথায় কথায় পাঠা-গারটির দুরবস্থার কথা তুলে চাঁদা দিলেন একশ টাকা। ব্যস, পরদিন সকালেই অন্য একজন ততোধিক বিখ্যাত ব্যক্তির কাকা এসে দিলেন দেড়শ। তারপর দুদিনের মধ্যেই অনেক জ্যাঠা, মামা, পিসের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। ফলে ফাণ্ডের এখন টইটম্বুর অবস্থা।

বন্ধু একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই একটা নোটিশ দেব ভাবছি।'

'কিসের নোটিশ?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বসলাম।

'লিখব,' বন্ধুবর নিমীলিত চক্ষে বলল, 'চাঁদা দিতে চাহিয়া লজ্জা দিবেন না!'

পুনরায় তিনজনে উচ্চহাস্য!

আইনের দুনিয়ার চাক্ষুষ চিত্র

অর্বিন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার জেলা কোর্টে উকীল-মোক্তারগণের নির্মম ও মারাত্মক ষড়যন্ত্রে বিচার-প্রার্থী বাদী-প্রতিবাদীদের যে দারুণ দুর্দশা ও দুর্ভোগের ব্যবস্থা আছে তাহার করুণ কাহিনী কুশলী লেখক অচিন্ত্যকুমার সুকুমার রসচিত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার চাক্ষুষ চিত্র গগনেন্দ্রনাথের দুই একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র বাদ দিলে, তাহার রস-চিত্র বাঙালী চিত্রকরদের চিত্রপটে ফুটিয়া ওঠে নাই। অথচ এদেশের 'জেলা-কোর্টে' ও 'হাই-কোর্টে' তাহার প্রচুর উপাদান ও রসের উপকরণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আইনের জগতে তুলি চালাইলে যে কোনও চিত্রকর রসের জগতে সহজেই সোনা ফলাইতে পারেন, তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রকর ওনোরে দুমিয়ের রচিত পারী নগরের হাইকোর্টের আলেখ্যমালা। এই আলেখ্যমালায় আইনের দুনিয়াতে যে সকল ব্যবহার-জীবী বিচরণ করেন, এবং রাজত্ব করেন সেইসব ন্যায় ও অন্যায় বিচারের অবতারগণ জজ্, ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের "হুজুর'গণ এবং উকীল-মোক্তার ও ব্যারিস্টরের হৃদয়বিদারক ব্যাপারের করুণ নাট্যলীলার নায়কগণকে ওস্তাদ্ চিত্রকর দুমিয়ে অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্রে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে এ দেশের কোনও চিত্রকর আমাদের আইনের দুনিয়াকে চিত্রপটে লিপিবন্ধ করেন নাই। উল্লিখিত ফরাসী তুলি-বাজের অতুলনীয় তুলির তাজ্জবী সৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখিবার, অনেক কিছু ভাবিবার, অনেক কিছু উপ-ভোগের বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহা আলোচনার যোগ্য।

দুমিয়ের চিত্রিত ফরাসী আদালতে বিচরণকারী নায়কের টাইপ্-চিত্রে এ দেশের ব্যবহারজীবীগণের অনেকটা চাক্ষুষ সাদৃশ্য আছে। কালো রঙের দীর্ঘ গাউনে আবৃত তনু, গলদেশে 'বীব্' নামক শাদা লম্বা যুগল জিহ্বার অলংকারে সজ্জিত অনেক মহাপুরুষদের চিত্রে এ দেশের উকীল ব্যারিস্টরদের অনুরূপ মূর্তি আমরা সহজেই চিনিতে পারি। পূর্বে লম্বাকৃতি গাউন পরিধান করা কেবল হাইকোর্টের মহাপুরুষদের নিজস্ব অধিকার ছিল, এখন এই সম্মানের সজ্জা জেলাকোর্টে ও মুন্সেফী আদালতে-ও প্রচলিত হইয়াছে। এদেশের ও বিদেশের আইনজীবীদের সাজ-সজ্জার প্রভেদ এই যে, বিদেশের মহা-পুরুষরা মাথায় লম্বা কালো টুপী পরেন —যাহার রীতি এদেশে প্রচলিত নহে। এই প্রভেদের কারণ বোধ হয় এই যে, পুরাকালে মানী মানুষের নিকটে মাথা নীচু করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মস্তকের শিরোপা নামাইতে হইত। মোগলাই দরবারে কিন্তু প্রার্থী-দের পাগ্‌ড়ী অবশ্যপরনীয় সজ্জা ছিল এবং তাহারই ধারা অনুসরণে 'রাম-উকীলদের শির-সজ্জায় বহুদিন প্রচলিত মোহনী' পাগড়ী পরার প্রথা এ দেশের ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, টেকচাঁদ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাংলার বিখ্যাত মনীষীদের মূর্তি-চিত্রে আমরা এই শালের পাগড়ীর ব্যবহার দেখিতে পাই।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ব্যঙ্গ-চিত্রকর ওনোরে দুমিয়ের রচিত অসংখ্য চিত্রা-বলী জীবনের নানা বিচিত্র দিক্ চাক্ষুষ করে লিপিবন্ধ করিয়াছে, তাহার মধ্যে আইনের দুনিয়ার ব্যবহারিক জীবনের একাংশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের অন্যান্য সুপরিচিত ও অপরিচিত সমাজের ছবি তাঁহার অসংখ্য চিত্রমালার নানা অধ্যায় বিভক্ত হয়ে জীবন-আলেখ্যের সন্ধানী রসিক মানুষদের সমান ভাবেই আকর্ষণ ও আহ্বান করে, তাঁহার অলৌকিক রচনা-কুশল সরস ব্যাখ্যা-রীতির বাস্ত-বিক চাক্ষুষ পদ্ধতির অদ্ভুত তুলি-সঞ্চালনের যাদুকরী মোহে। অবশ্য তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল কেবল তৈলচিত্রে নহে, পরন্তু অসংখ্য রেখাচিত্রে এবং পাষাণ-চিত্রের লিথোগ্রাফে।

তাঁহার আদালতের লিথোগ্রাফে লিখিত চিত্রমালা প্রথমে প্রকাশিত হইয়া-ছিল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত "চারি ভারি" নামক পাক্ষিক পত্রিকায়। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "উকীল ও মক্কেল"। পরে এই চিত্রগুলি সংগৃহীত হয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয় নূতন শিরানামায় 'আদালতের ভদ্র-মহাশয়গণ'।

তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি ছিল বিপুল, অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্রে তিনি সমাজের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপি-বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার লিথোগ্রাফের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ ছবি। অন্যান্য চিত্র সংখ্যায় অন্ততঃ দুই হাজার। এই সংখ্যা হইতে বুঝা যায় কি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার জীবন-দর্শন চাক্ষুষ চিত্রে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এই সব চিত্রে সামাজিক সমা-লোচনা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এবং তাঁহার চিত্র-রীতি ও রেখাঙ্কন পদ্ধতি তখনকার শিল্পীদের বিস্ময় ও হিংসার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

আইন আদালতের ব্যঙ্গ চিত্রমালায় ভাবগম্ভীর এবং নির্মম সমালোচকের

একদিকে উকীল বেচারী মক্কেলের কেস্ অবলম্বন করিয়া অবিরত গর্জন করিতে-ছেন। কিন্তু, হাকিম মহাশয়রা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সশব্দে নাসিকা গর্জন করিতেছেন।

ভূমিকায় দ্যুমিয়ে আদালতের মানুষদের যে দেহ, অবয়ব, ও মুখের চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহা মানুষের চরিত্রের একটি মূল্যবান ও বাস্তব-প্রধান বিশ্বকোষ। তাঁহার চমৎকার ও চমকপ্রদ পাথরে আঁকা চিত্রাবলীতে (লিথোগ্রাফ্) বড় আদালতের উচ্চ প্রাসাদের (পালে দ্য জুস্তিস্) অধিবাসীদের যে নিখুঁত চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিপুণ দৃষ্টিশক্তি, সুনিপুণ চিত্রশক্তি ও নিদারুণ নির্ভীক ব্যঞ্জনায় পৃথিবীর চিত্র-বিদ্যায় অদ্বিতীয়। সমসাময়িক সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, পাপ ও অন্যায়ের পৃষ্ঠে যে নির্মম কশাঘাত তিনি করিয়াছেন, তাহা সমাজের নিখুঁত চিত্রহিসাবে এবং অন্যায়ের প্রচণ্ড প্রতিবাদরূপে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু তাঁহার আদালতের চিত্রাবলী ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণচিত্র। সমাজের অন্যান্য অংশ এত ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয় নাই।

এই চিত্রকরের বাস্তবিক চিত্রপটে যে ব্যবহারজীবী বচন-ব্যবসায়ী উকিলের টাইপ্ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তিনি হইলেন "শয়তানের সমর্থক" ('ডেভিলস্ এডভোকেট্') আইনজগতের এক রকম 'ছেঁড়া নেকড়া ও ভাংগা হাড়ের সংগ্রাহক' ভিক্ষুক,—যাঁহার বক্রদৃষ্টি, তেল্ চুক্-চুকে দাড়ী ও মদ্যপানে রক্ত-নাসিকা সহজে লক্ষণীয়, যিনি সমাদরে হাতে তুলে নেন—নোংরা, সম্মান-বিরোধী কেচ্ছা কাহিনীর মলিন নথিপত্র, যত্ন করে তুলে রাখেন তাঁহার কাগজের ধামায়—তাঁহার ব্রীফের থলিতে। ইনিই হইলেন—দেওয়ানী আদালতের ব্যারিস্টার সাহেব, চাতুরীর মহারাজা, আদালতের বিলাসী পুরুষ। তিনি কেবলমাত্র আইনের মানুষ নন, তিনি হইলেন আইনের মাননীয় ভদ্রলোক। ইনি ফৌজদারী আদালতের সহযোগীদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের নমস্কার ফিরাইয়া দেন না। দশ-পনের বৎসর আইনসাধনার পর তিনি এমন একটি লোভনীয় স্থানে দণ্ডায়মান হন,—যেখান হইতে তিনি তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি অন্ততঃ বাৎসরিক বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারেন। "আইনজীবীদের সৌভ্রাত্র" অতি পরিচিত ভাব-মূলক শব্দ। একজন ব্যবহারজীবী তাঁহার সহযোগী 'ভ্রাতার' মক্কেলকে স্পর্শ করিতে পারেন না, তিনি কেবল আপনার নিজের মক্কেলের বন্ধু। মক্কেল হইলেন উকীলের সম্পত্তি, বিষয়, টাঁকশাল ও জীবন্ত সোনার খনি। দুইজন সহযোগী উকীলের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা-পড়া আছে যে তাঁরা একটি মামলায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু। বাক্ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে লড়িয়া যাইতে হইবে। কিন্তু শুনানীর শেষে বার লাইব্রেরীতে বা গাউন রাখার ঘরে, কিংবা টিফিনের টেবিলে মিলিত হইয়া পরস্পর সহাস্য পিট্-চাপড়ানিতে রাখিবন্ধন-পর্ব আনন্দে সম্পন্ন করিবেন।

এই চিত্রে, ব্যারিস্টর মহাশয় গরীব মক্কেলকে বলিতেছেন "মাননীয় মহাশয়! আপনার কেস নিয়ে দাঁড়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার! আপনার কেসে আসল বস্তুরই অভাব।" (জনান্তিকে) : "একশত টাকা দক্ষিণার-ই ত অভাব!"

পারী শহরের ব্যবহারজীবীদের উপরে নির্দিষ্ট চিত্র ওনোরে দ্যুমিয়ের লিথোগ্রাফে উজ্জ্বল হইয়া আছে। এ দেশের আদালতের অনেক উকীলের ব্যবহারে অনেকটা তাহার সাদৃশ্য আছে। *

এই ফরাসী ওস্তাদ্-শিল্পীর চিত্র-মালায় সরকারী উকীল (পাবলিক্ প্রসিকিউটার), এজলাসের ন্যায়াধীশ মহাশয়গণের, আদালতের কারণিক, পেস্কার, নাজীর, বেলিফ্ প্রভৃতি নানা অংগ-প্রত্যংগ নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু, এই চিত্রকরের মতে আদালতের চাতুরী ও তথাকথিত তঞ্চকতার সাংগ-পাংগদের গণনায় এবং আইনের দেবলোকে মোক্তার মহাশয়কে (সলিসিটার) বাদ দেওয়া যায় নাই,—কারণ আদালতের ব্যাপারে, "তাঁহার অংশ টাকা লেন-দেনের ব্যবসায়ে দালালের অংশের অনুরূপ"।

এই যৎসামান্য ভূমিকার সংগে আমরা ওনোরে দ্যুমিয়ের আদালতের নির্মম চিত্রমালার কয়েকটি উদাহরণের পরিচয় পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

প্রত্নকেতকী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীচে জীপের শব্দ হইল। বিরাজবাবু ফিরিয়াছেন। অরুণা উঠিয়া পড়িল। সুটকেশ হইতে কাপড়, জামা, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিরাজবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে এক মুঠি ধূপের কাঠি। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, —'কি হে, কেমন অট্টালিকা? শ্যাল-বধূ কোথায়?'

সুবীর বলিল,—'বাথরুমে গেছে। চমৎকার অট্টালিকা। আপনি কোথায় শোবেন?'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'ভয় নেই, আড়ি পাতব না। আমার শয়ন-কক্ষ দোতলায়।—স্টেশনে এক আঁটি ধূপকাঠি কিনেছিলাম, জীপেই পড়ে ছিল।' বলিয়া তিনি কয়েকটা ধূপ জ্বালিয়া দিয়া চেয়ারে বসিলেন—'এ ঘরগুলোতে ধূপ-ধুনো দেওয়া দরকার, অনেক দিন শূন্যে পড়ে আছে।'

ধীরে ধীরে ঘরটি ধূপের গন্ধে ভরিয়া উঠিল।

সুবীর বলিল,—'চা খাবেন না?'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'তাঁবু থেকে চা খেয়ে এসেছি। এখানে কেবল রাত্রে ভোজন এবং শয়ন। তারপর সূর্যোদয়ের আগেই প্রস্থান।'

সুবীর বলিল,—'এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল—না?'

বিরাজবাবু সোৎসাহে বলিলেন,—'মরুভূমির মত জায়গা আছে। রোগের বীজাণু এখানে টিকতে পারে না, জন্মেপুড়ে খাক হয়ে যায়। তাছাড়া এমন রাত্রি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এ দেশটা রাজস্থানের অন্তর্গত হলেও আসলে মালব দেশ। মুসলমানেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে ওরা লক্ষ্য করেছিল, অযোধ্যার সন্ধ্যা, রাজোয়াড়ার সকাল আর মালবের রাত্রি জগতে অতুলনীয়। মুসলমানী ভাষায় বয়েৎ আছে।'

মালবের রাত্রি! বাক্যটির রোমান্টিক স্বাদ সুবীর মনে মনে গ্রহণ করিতেছে এমন সময় অরুণা শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে স্নিগ্ধ-শিখা মোমবাতি। সুবীরের মাথায় কবিতা গুঞ্জরিয়া উঠিল—হেন কালে হাতে দীপশিখা, ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা!

প্রবেশ করিয়াই অরুণা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, চকিত কটাক্ষে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, 'কেয়া ফুলের গন্ধ!'

বিরাজবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—'কেয়া ফুল নয়, অম্বুরী ধূপের গন্ধ। কেয়া ফুল এদেশে কোথায়। তাছাড়া এটা কেয়া ফুলের সময় নয়।—এস শ্যালবধূ।'

স্নিগ্ধমন্থর পদে অরুণা আসিয়া টেবিলের উপর মোমবাতি রাখিল, একটু প্রতিভ হাসিয়া বিরাজবাবুর পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার মনের মধ্যে যেন বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুবীরের মনে উদ্দীপন বিস্ময় পাক খাইতে লাগিল—অরুণা বারবার কেয়া ফুলের গন্ধ পাইতেছে! কী ব্যাপার?

বিরাজবাবু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটু বেশী কথা বলেন, কিন্তু কথাগুলি নীরস নয়। নানা প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা মিশাইয়া দুই ঘণ্টা-কাল কাটাইয়া দিলেন।

গিরধর ও রুক্মিণী রাত্রির আহার লইয়া আসিল। আহার্য দ্রব্যগুলি টেবিলে রাখিয়া গিরধর আরও কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়া দিল। তিনজনে টেবিলের ধারে চেয়ার টানিয়া খাইতে বসিলেন।

খাদ্যবস্তু সংখ্যায় এবং পরিমাণে প্রচুর। শাক-সবজীই বেশী, তার সঙ্গে ঘৃতপক্ক অন্ন ও চাপাতি, অল্প মাংস, মালাই এবং বরফি।

খাইতে খাইতে সুবীর বলল,—'এই মরুভূমির মাঝখানে তাজা শাক-সব্জি পান কোথেকে?'

বিরাজবাবু বলিলেন,—'মাইল দুই দূরে আভীরদের একটা গ্রাম আছে, তারাই দুধ আর শাক-সব্জি যোগায়। মাঝে মাঝে ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না। মরুভূমিতে জল কোথায় যে মাছ আসবে!'

সুবীর জলের গেলাসে চুমুক দিয়া বলিল,—'ভারি সুস্বাদু জল। এ জল কোথায় পান?'

বিরাজবাবু বলিলেন,— 'নীচের তলায় একটা ঘরের মেঝেয় ইঁদারা আছে। সেই দু' হাজার বছরের পুরনো ইঁদারা!

কিন্তু কী জল! বরফের মত ঠান্ডা, শরবতের মত মিষ্টি।'

অরুণা পুরুষদের বাক্যালাপে যোগ দিল না, একটু নিঃঝুম ভাবে আহার করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বিরাজবাবু বলিলেন,—'প্যালবৌ, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, শুয়ে পড় গিয়ে, আমরা আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। কাল ভোরেই আমি চলে যাব, হয়তো দু'তিন দিন আসতে পারব না।'

অরুণা একটু ঘাড় হেলাইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। তারপর দু'জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। বিরাজবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—'বৌকে কিছু বোলো না, কিন্তু গিরধরের মুখে শুনেছি এ বাড়িতে নাকি আছে।'

'কী আছে—ভূত-প্রেত! আপনি বিশ্বাস করেন?'

বিরাজবাবু হাসিলেন,— 'আমি বিজ্ঞানী, যার প্রমাণ পেয়েছি তা বিশ্বাস না করে উপায় কি? বিজ্ঞানী আর অবিজ্ঞানীর মধ্যে ঐখানেই তফাৎ, বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলে বিশ্বাস করে, অ-বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করে না, উল্টে নানা রকম কু-ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়।'

'আপনি তাহলে প্রমাণ পেয়েছেন?'

'দ্যাখো, ভূত-কাল নিয়েই আমার কারবার। ভূত-কালের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এমন কিছু পেয়েছি যাকে বাস্তব বলা যায় না। সে গল্প আর একদিন বলব। তবে এ বাড়িতে আমি নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করিনি। যা শুনেছি চাকর-বাকরের মুখে।'

'ওরা কী বলে?'

'ওরা বলে একটা আত্মা আছে। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়, তাজা ফুলের গন্ধ চারিদিকে ভর-ভর করতে থাকে—'

সুবীর চমকিয়া বলিল,—'কোন ফুল! কেয়া?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন,—'তা জানি না। আজ তোমার বৌ কেয়ার গন্ধ পেয়েছিল...... তাই, তা, এটা আমার খেয়াল হয়নি—'

সুবীর বলিল,—'অরুণার এই দু'টনা হবার পর থেকে সে তিনবার কেয়া ফুলের গন্ধ পেয়েছে; কোথাও কেয়া ফুল নেই, তবু গন্ধ পেয়েছে। এর মানে আপনি বলতে পারেন?' বলিয়া সুবীর মোটর দুর্ঘটনার পর হইতে ব্যাপার বিবৃত করিল।

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'এখানে আসার আগে যদি গন্ধ পেয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক কান্ড না হতেও পারে। হয়তো মাথার চোট লাগার ফলে olfactory nerves বিগড়ে গিয়েছে। স্নায়ু বড় বিচিত্র যন্ত্র। যা হোক ভাবনার কিছু নেই, আস্তে আস্তে normal হয়ে যাবে।'

তারপর, রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া তিনি দ্বিতলে শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। সুবীর শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার বহির্দ্বারের পর্দা সরাইয়া ছাদের দিকে উঁকি মারিল। বাহিরে মধুর শীতলতা; চাঁদ আকাশের মাঝখানে উঠিয়াছে, বালু-ঢাকা প্রকান্ড ছাদ চন্দ্রকিরণে কিংখাবের মত ঝিকমিক করিতেছে। তন্দ্রাজড়িত স্বপ্নসমাকুল দৃশ্য। মালবের রাত্রি। সুবীর একটি নিশ্বাস ফেলিল। অরুণা যদি সুস্থ থাকিত, দু'জনে মিলিয়া তাহারা মালবের এই অপরূপ রাত্রি উপভোগ করিতে পারিত।

সুবীর শয়নকক্ষে গেল। বৃহৎ কক্ষের মাঝখানে বিস্তীর্ণ পালঙ্ক, অরুণা শয্যার এক পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর পালঙ্কের পাশে ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—'অরুণা!'

অরুণা জাগিল না। তাহার দেহ এমন শিথিল ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে যে মনে হয়, শুধু ঘুম নয়, ঘুমের চেয়েও দূরবগাহ অবচেতনতার মধ্যে তাহার সংজ্ঞা ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া সুবীর তাহার বুকের উপর করতল রাখিল। না, হৃৎস্পন্দন মন্থর বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সচল আছে। সুবীর সযত্নে অরুণার গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিল, অপলক চক্ষে তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাথার শিয়রে নিঃশেষিত মোমবাতিটা নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল, নির্বাপিত হইবার পূর্বে দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল। সুবীর তখন সন্তর্পণে শয্যায় অরুণার পাশে শয়ন করিল।

পরদিন সকাল হইতে তাহার প্রকৃত প্রবাস-জীবন আরম্ভ হইল। নির্জন প্রবাসে জীবনযাত্রার সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। পরিচিত মানুষের অভাব কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা বলিয়া মনে হয়। কাজকর্ম নাই, খবরের কাগজ নাই, এরূপ অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখকর, কাহারও পক্ষে অসুখকর। কিন্তু যেখানে দু'টি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন আছে সেখানে প্রবাসের নির্জনতা মধুময় হইয়া ওঠে।

সুবীরের মন এই নিবিড় রসানুভূতির জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু অরুণার দিক হইতে তাহার প্রতিফলন আসিল না। বরং মনে হইল অরুণা সুবীরকে এড়াইয়া চলিতেছে। একসঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াও দু'জন মানুষ মনে মনে পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে পারে। অরুণা স্বভাবত সরল ও সিধা প্রকৃতির মেয়ে; কিন্তু এখন দেখা গেল অরুণার চোখে গোপনতার কটাক্ষ, সে যেন
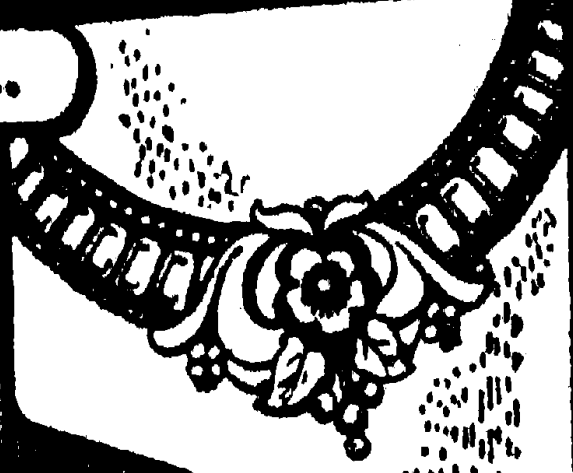
সুবীরের নিকট হইতে নিজের মানসিক অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার মনের মধ্যে এমন কিছু ঘটিতেছে যাহা সে সুবীরকে জানিতে দিতে চায় না।

রুক্মিণী প্রথম দর্শনেই অরুণাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সে নিজের কাজ হইতে ছুটি পাইলেই উপরে আসিয়া অরুণার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। অযাচিত ভাবে তাহার সেবা করে, চুলে তেল মাখাইয়া চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, আর অনর্গল গল্প করে। অরুণাও তাহার সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। মেয়েদের ঐ একটা গুণ আছে, তাহারা উঁচু-নীচ নির্বিশেষে সকল জাতের মেয়ের সঙ্গে মিশিতে পারে। পুরুষের সে গুণ নাই, থাকিলে সুবীরের ভারি সুবিধা হইত, গিরধর সিংএর সঙ্গে গল্প জমাইয়া সময় কাটাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে যেন একটু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে যে-কয়টা বই আনিয়াছে তাহা মাঝে মাঝে খুলিয়া বসে। কিন্তু বই-এ মন বসে না। তখন সে উঠিয়া প্রাসাদের দ্বিতলে অগণিত কক্ষগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘরগুলি পরিষ্কৃত নয়; কোথাও দেওয়াল হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ছাদের কোণে চামচিকা বাসা বাঁধিয়াছে। সব মিলিয়া পরিত্যক্ত লোকালয়ের প্রাণহীন কংকালসার শুষ্কতা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সুবীর ত্রিতলের খোলা ছাদে একাকী পরিক্রমণ করিতেছিল। আলিসার কিনারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে ভূত-প্রেতের চিন্তাও তাহার মনে আসিতেছিল। বিরাজবাবু বৈজ্ঞানিক হইলেও অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন। এ বাড়িটাতে বাজনার শব্দ শোনা যায়, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়; হয়তো কিছু আছে। হানা-বাড়ির কত গল্পই তো শোনা যায়, সবই কি মিথ্যা? এই বাড়িটা দু' হাজার বছর ধরিয়া মরুভূমির মাঝখানে পড়িয়া আছে; হয়তো জীবিত অবস্থায় যাহারা এখানে বাস করিত তাহাদেরই কেহ বাড়ির মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই, দু'হাজার বছর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে কে জানে। এই রাজস্থানেই নাকি কোথায় একটা রাজপ্রাসাদ আছে, সেখানে রাত্রিকালে প্রেতাত্মা 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।—

আজও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাসে সুবীরের গা শীত-শীত করিয়া উঠিল। সে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বসিবার ঘরে কেহ নাই, কিন্তু শয়নকক্ষ হইতে রুক্মিণীর কলকণ্ঠ আসিতেছে। সুবীর শয়নকক্ষের পর্দা সরাইয়া দেখিল সেখানে দু'টি মানুষের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাটি পাতিয়া অরুণা ও রুক্মিণী মুখোমুখি বসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে একটি আগুনের ছোট আংটা; রুক্মিণী খোসাসুদ্ধ চীনাবাদাম আগুনে ঝলসাইয়া খোসা ছাড়াইয়া অরুণাকে দিতেছে, অরুণা পরম সুখে নুন ও লঙ্কার গুঁড়া মাখাইয়া খাইতেছে।

সুবীরকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রুক্মিণীর বাকাস্রোত সংহত হইল, অরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। সুবীর তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল, হাসিমুখে বলিল,—'কি গল্প হচ্ছে? আমিও গল্প শুনতে এলাম।'

অরুণা একটু বিব্রত হইয়া বলিল,—'মেয়েলি গল্প কি তোমার ভাল লাগবে?'

সুবীর বলিল,—'ভাল না লাগে উঠে যাব। অন্তত চীনেবাদাম ভাজা তো ভাল লাগবে।' সে কয়েক দানা চীনাবাদাম মুখে দিয়া বলিল,—'আচ্ছা রুক্মিণী, তোমরা এ বাড়িতে ফুলের গন্ধ পেয়েছ?'

সুবীরের আগমনে রুক্মিণী একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল—'জি মালিক, পেয়েছি। তাছাড়া গভীর রাত্রে বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়, সিতারের আওয়াজ শোনা যায়।'

......দু'টি মানুষের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে।

'কোন্ ফুলের গন্ধ পেয়েছ — আতর গুলাব ধূপ-ধুনার গন্ধ নয়?'

'জি না, তাজা ফুলের গন্ধ। জাই জুঁহি চম্পা—এই সব।'

'কেয়া ফুলের গন্ধ কখনো পেয়েছ?'

অরুণা সুবীরের প্রতি একবার চকিত ভ্রূক্ষেপ করিল। রুক্মিণী উৎসুক স্বরে বলিল,—'কেওড়া ফুলের গন্ধ! না বাবুজি, কেওড়া ফুলের গন্ধ কেমন হয় আমি জানি না, কেওড়া ফুল কখনো

দেখিনি। তবে কেওড়া ফুলের গল্প জানি।'

'কেওড়া ফুলের গল্প!'

'হ্যাঁ বাবুজি, ভারি চমৎকার গল্প। আমি আমার দাদি'র কাছে শুনেছিলাম, আমার দাদি আবার তার দাদির কাছে শুনেছিল। বহুকাল ধরে এ গল্প চলে আসছে। এই মহল নিয়েই গল্প।'

'তাই নাকি! কী গল্প বল তো শুনি।'

তখন রুক্মিণী চীনাবাদাম পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প আরম্ভ করিল—

'অনেক অনেক দিন আগে এখানে একটি রাজ্য ছিল। মরুভূমির কিনারায় রাজ্য; ছোট রাজ্য হলেও বড় সুখের রাজ্য। শত্রুর উৎপাত নেই, অন্নাভাব নেই, মারী-মহামারী নেই; প্রজারা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে মনের আনন্দে বাস করে।

'রাজার নাম বিজয়কেতু। তরুণ রাজা, সম্প্রতি দক্ষিণ দেশের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন। অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা; যেমন তাঁর রূপ, তেমনি মধুর স্বভাব। নাম অরুণাবতী।'

সুবীর চমকিয়া প্রশ্ন করিল,—'কি নাম বললে?'

রুক্মিণী বলিল,—'অরুণাবতী। এ গল্পের নাম রাণী অরুণাবতীর গল্প।'

সুবীর ও অরুণা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিল, তারপর অরুণা চক্ষু সরাইয়া লইল। সুবীর বলিল,—'আচ্ছা, তারপর বল—'

রুক্মিণী বলিতে লাগিল।—

রাজা আর রাণীর মধ্যে গভীর ভালবাসা; কেউ কাউকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারেন না। রাজা যখন সভায় বসে মন্ত্রিদের সঙ্গে রাজকার্য করেন, রাণী তখন অলিন্দ থেকে উঁকি মেরে দেখে যান। রাজাও রাজকার্য করতে করতে হঠাৎ উঠে গিয়ে রাণীকে দেখে আসেন। রাজা আর রাণী যেন জোড়ের পায়রা।

রাণীর মনে কিন্তু একটি দুঃখ আছে। তাঁর বাপের বাড়ির দেশে যেমন ঋতুতে ঋতুতে নতুন ফুল ফোটে—বসন্তে অশোক নবমল্লিকা জাতী যূথী, গ্রীষ্মে চম্পক বকুল পিয়াল, বর্ষায় গোকর্ণ কদম্ব কেতকী—এদেশে তেমন ফুল ফোটে না।

একদিন সায়াহ্নে রাজা-রাণী চন্দ্রশালিকার বিস্তীর্ণ ছাদে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলেন, দেখলেন পশ্চিমের আকাশে মেঘ উঠেছে। দুজনের মনে খুব আহ্লাদ হল। এদেশে বৃষ্টি কম, মেঘ বেশী আসে না। রাণী কাজল-কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—'রাজা, অনেক দিন কেতকী ফুলের গন্ধ পাইনি। এ দেশে কি কেয়া ফুল পাওয়া যায় না?'

বিজয়কেতু বললেন,—'না। পশ্চিমে লাট দেশ, সেখানে বনে-জঙ্গলে কেয়া ফুল ফুটে থাকে, গ্রামের লোকেরা কেয়ার ঝাড় দিয়ে ঘরের বেড়া বাঁধে।'

অরুণাবতী কুতূহলী হয়ে বললেন, 'লাট দেশ! সে কত দূর?'

বিজয়কেতু বললেন,—'ঘোড়ার পিঠে দুই তিন দিনের পথ।'

রাণী অরুণাবতী তখন রাজার বুকের ওপর দুহাত রেখে পরম আগ্রহভরে বললেন,—'রাজা, লাট দেশ থেকে আমাকে কেয়া ফুল আনিয়ে দাও। কেয়া ফুলের জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।'

রাজা বিজয়কেতু বললেন,—'এ আর বেশী কথা কি! আমি নিজে গিয়ে

তোমার জন্যে কেয়া ফুল তুলে নিয়ে আসব।'

অরুণাবতী একটু শঙ্কিত হলেন,—'তুমি নিজে যাবে?'

বিজয়কেতু বললেন,—'কাল সকালেই যাত্রা করব। তিন চার দিনের মধ্যে তোমার কেয়া ফুল নিয়ে ফিরে আসব।'

রাণী কিছুক্ষণ রাজার বুকের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন,—তারপর হাসি মুখে তুলে বললেন,—'বেশ, তুমি যতদিন না ফিরে আসবে আমি ততদিন রোজ পাঁচ ফোঁটা মধু খাব, আর কিছু খাব না।'

রাজা বললেন,—'আর কিছু খাবে না কেন?'

রাণী বললেন, তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

পরদিন ভোরবেলা রাজা ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমমুখে যাত্রা করলেন। রাণী প্রাসাদের চূড়ায় উঠে যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইলেন।

তারপর একদিন গেল, দুদিন গেল। রাণী পাঁচ ফোঁটা মধু খেয়ে আছেন। তৃতীয় দিন থেকে রাণী আবার ছাদের উপর যাতায়াত আরম্ভ করলো। শরীর দুর্বল কিন্তু মন মানে না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিমদিকে চেয়ে থাকেন। চতুর্থ দিনও ওইভাবে কাটল। রাণীর শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোণে কালি। ছয়দিন কেটে গেল রাজার কিন্তু দেখা নেই। কোথায় গেলো রাজা। কী হল তার?

রাজা বিজয়কেতু দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা লাট দেশে পৌঁচেছিলেন। সেখানে জঙ্গল থেকে কয়েকটি কেয়াফুল তুলেছিলেন। তারপর একটি কেয়াফুল বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে নিজ রাজ্যের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছিলেন, ঘোড়া পবনবেগে ঘরের পানে ছুটেছিল।

রাজ্যের সীমানায় ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, এই গিরিসংকট পার হয়ে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা রাজা গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে চলেছেন এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক আশপাশের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ধরল।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একি! কে তোমরা?'

তারা বলল, 'আমরা যে হই, তুমি আমাদের বন্দী।'

রাজা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে বললেন, 'কি তোমাদের এত স্পর্ধা। জানো, আমি এ রাজ্যের রাজা?'

তারা জয়ধ্বনি করে বলল,—'তবে তো ভালই হয়েছে। চল আমাদের সেনাপতির কাছে।'

পাহাড়ের মধ্যে বিদেশী শত্রু ছাউনি ফেলেছে, প্রায় বিশ হাজার সৈন্য। সেনাপতি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সৈন্যরা বলল, তুমি আজ বন্দী থাকো, কাল সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবে।'

সৈন্যরা রাজা বিজয়কেতুর কথায় বিশ্বাস করেনি, তারা ঠাট্টা তামাসা করতে করতে তাঁকে একটা শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। রাজা জানতেন উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ শক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, কিন্তু তারা যে এতদূর অগ্রসর হয়েছে তা তিনি জানতে পারেননি।

পরদিন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হল না, সেনাপতি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার পরদিন দুপুর বেলা সৈন্যরা রাজাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। সেনাপতির প্রকাণ্ড চেহারা, টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ। তিনি রাজাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন,—'আপনি সত্যি এদেশের রাজা?'

বিজয়কেতু বললেন, 'হ্যাঁ, এই দেখুন আমার অঙ্গুরী, এই দেখুন কবচ।'

সেনাপতি বললেন, আপনি সত্যিই রাজা। আমরা আপনার রাজ্য জয় করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন ধরেছি তখন আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয় হয়েছে।

রাজা বললেন, 'আমার রাজ্য ক্ষুদ্র সৈন্যবল সামান্য। এ-রাজ্য জয়ে আপনার গৌরব নেই। তবে কেন এ-রাজ্য জয় করতে চান?'

সেনাপতি বললেন, 'রাজস্থান বীরভূমি। মাটির গুণে মানুষ বীর হয় মাটির দোষে কাপুরুষ হয়। তাই আমি রাজস্থান জয় করে নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চাই।'

'কিন্তু আমাকে বন্দী করে লাভ কি? আপনি যদি আমার রাজ্য আক্রমণ করেন রাজ্যের লোক স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে।'

'না। তারা যখন জানতে পারবে

আপনি আমার হাতে বন্দী, এখন আর যুদ্ধ করবে না, আত্মসমর্পণ করুন।'

রাজা চিন্তা করে বললেন, 'সেনাপতি, আমাকে একবার আমার প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে। আপনি আমাকে দু'দিনের জন্য মুক্তি দিন, আমি আবার ফিরে এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেব।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ রাজার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি যে ফিরে আসবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

রাজা সগর্বে বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় কখনো শপথ ভঙ্গ করে না।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু প্রাসাদে আপনার এত কী প্রয়োজন?'

রাজা বললেন, 'আমার পত্নী কেবল কয়েকবিন্দু মধু খেয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁকে দেখা দিয়েই আমি ফিরে আসব।' রাজা কেতকী ফুল আহরণের কাহিনী সেনাপতিকে বললেন।

শুনে সেনাপতি প্রীত হলেন, বললেন, 'ভাল। আমি আপনাকে মুক্তি দেব। কিন্তু আজ তো দিন শেষ হয়ে এল। আজ যদি যাত্রা করেন, দিন থাকতে প্রাসাদে পৌঁছতে পারবেন না। তার চেয়ে কাল সকালে আপনি যাত্রা করবেন। শর্ত রইল পত্নীর সঙ্গে দেখা করেই আপনি ফিরে আসবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে রাজা শূলশীর্ষে কেতকী ফুল গেঁথে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন।

ওদিকে রাণীর অবস্থা তখন শোচনীয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে শরীর এত দুর্বল হয়েছে যে শয্যা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়, মনের অবস্থা পাগলের মতন। এমন সময় বেলা তিন প্রহরে দাসীরা ছুটে এসে খবর দিল—রাজা আসছেন!

রাণী পালঙ্ক থেকে নেমে ছাদের পানে ছুটলেন। দাসীরা মানা করল, তিনি শুনলেন না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মনে হল অনেক দূরে মাঠের পরপার থেকে একজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহী আরো কাছে এলে রাণী চিনতে পারলেন, রাজা আসছেন; তাঁর ভল্লের মাথায় একটি কেয়া ফুল উঁচু হয়ে আছে। রাজাও রাণীকে প্রাসাদ-শীর্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লম-সুদ্ধ হাত তুললেন।

রাণী আর আত্ম-সংবরণ করতে পারলেন না, দু'হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। দাসীরা চীৎকার করে উঠল, কিন্তু রাণীকে ধরতে পারল না; তিনি আলিসা পেরিয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন।

রাজা এসে দেখলেন রাণী অরুণাবতীর মৃতদেহ প্রাসাদমূলে পড়ে আছে। তিনি দু'হাতে মৃতদেহ বুকে তুলে নিলেন।

তারপর রাণীকে চিতায় তুলে দিয়ে রাজা কেয়া ফুল দিয়ে চিতা সাজিয়ে দিলেন। চিতা জ্বলে উঠল। কেয়া ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

রাজা আর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন না, ঘোড়ায় চড়ে একলা শক সেনাপতির শিবিরে ফিরে গেলেন। সেনাপতিকে বললেন—'আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার রাজ্য আপনি পাবেন না। আসুন, যুদ্ধ করুন।'

শক সেনাপতির সঙ্গে রাজা বিজয়কেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাজা বিজয়কেতু মারা পড়লেন। তারপর শক জাতি এসে রাজ্য দখল করল, সেনাপতি রাজপুরী দখল করলেন। অনেক বছর কেটে গেল; মরুভূমি এসে রাজ্য গ্রাস করে নিল। দেশ জনশূন্য হল। প্রাসাদ শূন্য পড়ে রইল।

এই ভাবে কত শতাব্দী কেটে গেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখনো প্রাসাদের বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়, হঠাৎ নিশুতি রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়। যারা শুনেছে তারা বলে, রাজার আর পুনর্জন্ম হয়নি, তাঁর আত্মা এই প্রাসাদেই আছে। রাণীর জন্ম হয়েছে, তিনি ষাট-সত্তর বছর অন্তর দেহ ত্যাগ করে আসেন, রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। তারপর আবার তিনি চলে যান, রাজা প্রতীক্ষা করে থাকেন।

এই হচ্ছে রাজা বিজয়কেতু আর রাণী অরুণাবতীর গল্প।

(ক্রমশঃ)

কাগজে প্রকৃত ঘটনার কিছুটা উহ্য রেখেছে।

বছর পনেরো হোল আমার বয়সের প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। দশ ।।

বিমানযোগে তাসকন্দ থেকে মস্কোর দিকে যাচ্ছিলুম। অন্য যাত্রীও আছে এই জেটবিমানে। ভারতীয়রা হলেন মোট পনেরো জন। এটি প্যাসেঞ্জার জেট।

উত্তর পথে তাসকন্দ অতিক্রম করা-মাত্র আগে পাওয়া যায় বিশাল একটা কৃষ্ণাভ ভূভাগ। এগুলি তুলা উৎপাদন অঞ্চল। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন তুলা এবার উঠেছে এই উজবেকিস্তান থেকে। এই কৃষ্ণাভ ভূভাগ ছড়িয়ে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, কিরগীজ ও তাজিকিস্তানে। তাজিকিস্তান পামীরের মধ্যে। এই রিপাবলিকটি হল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মস্কো থেকে প্রকাশিত "Facts and Figures" নামক একখানি বইতে বলা হয়েছে, "The Soviet Union has no common borders with Pakistan and India, though the Tajik S.S.R., one of its Union republics, is seperated from the two by just a narrow strip of Afghani territory."

ভারত গভর্ণমেণ্ট বা পাকিস্তান একথাটি মেনে নিয়েছেন কিনা আমি জানিনে।

কৃষ্ণবর্ণ ভূভাগটি উত্তর পথে শেষ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ডানদিকে কাজাখস্তানের দক্ষিণ মরুজনপদ চিমকন্দ, এবং জহামবুল অতিক্রম ক'রে মোটরপথ নির্মাণ করা হয়েছে মরুলোকের মধ্যেই। একটি পথ গিয়েছে কিরগীজিয়ার রাজধানী ফ্রুনজ (Frunze) এবং অন্যটি কাজাখস্তানের রাজধানী 'আলমা-আতা'-র দিকে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী না হয়ে যদি ত্রিবাঙ্কুর হত, তাহলে বুঝানো যেত, সমস্ত কাজাখস্তান ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ পূর্বের শেষপ্রান্তে এসে রাজধানী বানাতে হল কোন্ যুক্তিতে। সমগ্র মধ্যএশিয়ার তুলনায় কাজাখস্তানের মরুভূমি অনেক ব্যাপক ও বিশাল। কিন্তু কাজাখস্তানের মরুলোক—যেটি ভারতবর্ষের আয়তন অপেক্ষা বড়—এত বড় এবং ব্যাপক ভূভাগ বৃষ্টিহীন হলেও নদীহীন নয়। পশ্চিম কাজাখ—যেটি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অঞ্চল—সেখানেও শিরদরিয়া, এম্বা, উরল, টোবল প্রভৃতি নদী ও অসংখ্য জলনালাপথ বর্তমান। পশ্চিম কাজাখে পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সী, এবং আরল সী। উত্তর এবং পূর্ব কাজাখে অগণিত নদী, পর্বত, উপত্যকা এবং উপজাতিগণের জনপদ।

আমাদের বিমান উড়ে যাচ্ছিল কাজাখস্তানের আদিঅন্তহীন মরুভূমির উপর দিয়ে। এই মরুলোক, অনুর্বর প্রান্তর, প্রস্তর পরিকীর্ণ, অনুর্বর পাহাড় পর্বতের তুষারলোক,—এমন একটা পৃথক 'পৃথিবীর' প্রারম্ভ কোথায়, সবিস্ময়ে সেইটি ভাবছি। এই পৃথিবীটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় কুমায়ুন ডিভিসনের উত্তর প্রান্তে—যেখানে হিমালয়ের দেওয়াল উঠেছে দাঁড়িয়ে সমুদ্র-সমতা থেকে কমবেশী ১৮,০০০ ফুট। তিব্বত থেকে এর আরম্ভ। তারপর সিন্‌কিয়াং, তাকলা মাকান, তারপর তিয়েন-সান পার হয়েছে কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া। অতঃপর সমগ্র সাইবেরিয়া পার হয়ে এই জনবিরল পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত গিয়ে মিলেছে উত্তরমেরু সাগরে।

পূর্ব কাজাখস্তানের মরুলোকে অগণিত জলনালাপথ সৃষ্টি করেছেন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ, এবং যে-ভূভাগের কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র সহসা চোখে পড়ে না, সেখানে দুটি নদীর সুযোগ লাভ করেছেন তাঁরা। একটির নাম 'ইলি', এটি নেমে এসেছে তিয়েনসান পর্বত থেকে। এই পর্বত শ্রেণীর অধিত্যকাপ্রদেশে যে শ্যামলতার বিস্তার ঘটেছে, সেই কিরগীজিয়ার উত্তর প্রান্তে কোমল হরিৎক্ষেত্রে কাজাখস্তানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—যার দক্ষিণে কিরগীজিয়ার সুবৃহৎ হ্রদ 'ইসিকুল' অবস্থিত। দক্ষিণের উর্বর মৎলোক এবং সুশ্যাম বনানীর শোভা দুটি বৃহৎ নগরী ফ্রুনজ এবং আলমা-আতাকে সর্বপ্রকারে সম্পদশালী ক'রে তুলেছে। ইলি নদীটি গিয়ে পড়েছে বলখাস হ্রদে।—কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বলখাস হ্রদ লবণাক্ত। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন, যে-কারণে তিব্বতের হ্রদগুলিতে লবণ পাওয়া যায়, সেই একই কারণে বলখাসের জল লোনা। আজ সেই সুপ্রাচীন কাজাখস্তানের আদিমকালাগত যাযাবর ও খণ্ডজাতির মেষপালক দলকে সহসা সর্বহারা মরুমানুষের দল ব'লে আর মনে হয় না। এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতনতর ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয়লাভ করেছে। এটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে-ভূভাগে বালু ও ঝাঁঝর-পাথর ছাড়া লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে আর কিছু চোখে পড়ে না, সেই ভূভাগের নবাবিষ্কৃত অগণিত খনিজ সামগ্রীর কৃপায় একটির পর একটি সর্বাধুনিক ডিজাইনের নগর গড়ে উঠেছে। পূর্ব-কাজাখস্তানের বৃহৎ নদী ইরটিশ নদীর দুই পারে দাঁড়িয়েছে এক একটি বৃহৎ নগরী।—তেমনি সমগ্র মরুলোকের ভিতর দিয়ে উর্ণনাভের জালের মতো রেলপথ ও মোটরপথ নির্মাণ ক'রে এই বালু-জগৎকে আয়ত্তে আনা হয়েছে। কারাগাণ্ডা সেমিপালাটিনস্ক, পেট্রোপাভলোভস্ক প্রভৃতির মতো এক একটি সুবৃহৎ শিল্পনগর এই ভূভাগে গ'ড়ে তোলা সম্ভব—এটি আজ প্রমাণিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা দুস্তর মরুলোক পশ্চিম কাজাখস্তানে দুটি বৃহৎ বন্দর কাস্পিয়ান সমুদ্রোপকূলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—যার একটির নাম পোর্ট শেভচেনকো, অন্যটি উরল নদীর মোহনায় অবস্থিত গুরিয়েভ। মরুভূমির উপর এতবড় ব্যাপক নির্মাণকার্য আর কোনও দেশে ঘটেনি।

উত্তর কাজাখস্তানের শহর কুস্তানাই পেরিয়ে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ার আকাশে প্রবেশ করলুম।

এখানকার প্রধান দুটি জনপদের নাম কুর্গান ও চেলিয়াবিনস্ক। এই দুটি ছোট শহর ছাড়িয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম সুবৃহৎ নগরী 'সোয়েদলভস্ক' বিমানঘাটিতে আমরা এসে নামলুম। সাইবেরিয়ার আকাশ মেঘময়,—ইস্পাতের মতো তার বর্ণ। এটি শীতার্ত অপরাহ্ন। তিন-চারটি জামার নীচেও পিঠের দিকে তুহিন ঠাণ্ডার কাঁটা দিল। গরম কোটের উপর একটি ওভার-কোট থাকলে ভাল হত। আজ অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে।

এই শহরটি তাতার দেশের অন্তর্গত। তাতাররা এককালে প্রবল প্রভুত্ব করেছিল রাশিয়ার ওপর। তারা মস্কোর সিংহাসনে বসে। এখন তাতার ও রুশ একাকার। তাতারদের গোলাকার পশমের টুপি রুশরাও পরে। ফিনল্যাণ্ডে পালাবার সময় লেনিনের মাথায় তাতারের ক্যাপ ছিল। রুশরক্তে তাতারের বহু রক্ত আজ প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেক রুশের মনে তাতার বাস করে। রুশ সৈন্য যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন সে তাতার হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনীর মধ্যে তাতার ও কসাক বাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যেমন গুর্খা ও ডোগরা সেনাদল।

ঠাণ্ডায় একটু জড়োসড়ো হয়ে বিমানঘাটির নিকটবর্তী এক হোটেলে এসে আমরা আশ্রয় নিলুম। খবর পাওয়া গেল, মস্কোর আকাশের চেহারা ভাল নয়। জেটবিমানের পক্ষে সেদিকে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ হবে না। আমরা হোটেলের বিছানায় ঢুকলুম। আহারাদির ব্যাপারটা উল্লেখ করছে না কেউ কোনদিক থেকে। সুতরাং ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে ক্ষুধার্ত মুখে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম মহাকাশভ্রমী কুকুর 'লাইকা' মার্কা সিগারেট একটির পর একটি ওড়াতে লাগলেন। চেয়ে দেখছি, এতবড় সোস্যালিস্ট হোটেল, কিন্তু আগাগোড়া সব ধোঁয়া!

সাড়ে তিন বছর আগেকার দিল্লীর কথা মনে প'ড়ে গেল। বাঙলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে ভারতের প্রথম 'ফিলম্ সেমিনারে' যোগদান করতে গিয়েছিলুম। দিল্লীর সরকারি অতিথিস্বরূপ রাত সাড়ে নটায় 'ওয়েস্টার্ণ কোর্টে'র বিরাট হোটেল-প্রাসাদে আমার এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাণীর জন্য একটি অতি সুসজ্জিত আরামদায়ক ঘর দেওয়া হয়েছিল। পিতাপুত্রী ক্ষুধার্ত ছিলুম। কিন্তু হোটেলের 'বয়টি' জানিয়ে দিল, আপনারা আজ নয়, আগামীকাল প্রভাত থেকে সরকারি 'অতিথি' হবেন! অতঃপর শ্রীমতী বাণী চাইল এক গেলাস জল! কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবিনয় হাস্যে বয় জানাল, এত রাত্রে জলের ব্যবস্থা ত' করা যাবে না! অবশেষে আমার দিল্লীবাসী বন্ধু ডাঃ বিজয়প্রতাপ মিত্র মহাশয় উপস্থিত হাল-চাল বুঝে নিজের বাড়ি থেকে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়ে পানীয় জলসহ যখন আমাদের ঘরে এসে পৌঁছলেন, রাত তখনও বারোটা বাজেনি! স্বাস্থ্যবান লোক,—কপাল বেয়ে তাঁর ঘাম নেমেছিল!

দক্ষিণ সাইবেরিয়ার এই সুন্দর হোটেলের কাঁচের জানলার বাইরে চেয়ে দেখছিলুম, ঘর্মাক্ত কলেবর সেই বিজয়প্রতাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা!

মানুষের দৃষ্টি কুড়ি মাইলের বেশি বোধ হয় যায় না। কিন্তু আমাদের সামনে মেঘময় ধূসর ও একপ্রকার বিবর্ণ ও শীতার্ত সাইবেরিয়া দিগন্তবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই সোয়েদলভস্কেরই কোনও এক তাতার গ্রামের প্রান্তে বুঝি আমেরিকান 'ইউ-২' প্লেনটিকে বিগত ১লা মে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে গুলী ক'রে নামিয়ে আনা হয় এবং প্রায় ১৪ মাইল উঁচু থেকে উক্ত বিমানের পাইলট ফ্রান্সিস পাওয়ার্স প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসেন। পাওয়ার্সকে দশ বছরের জন্য 'আটক' রাখা হয়েছে! কিন্তু ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার অপর একটি 'সাইবেরীয়' ঘটনার কথা পৃথিবীবাসীরা অনেকেই মনে রেখেছে। তখন জারের আমল। বোধ হয় দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রুশ সাম্রাজ্যের সম্রাট। দুর্গম সাইবেরিয়ায় তখন স্বভাব-দুর্বৃত্ত এবং রাজনীতিক বন্দীদেরকে নির্বাসন দেওয়া হত। কিন্তু দক্ষিণ সাইবেরিয়া চিরদিন গহন অরণ্যানীর দ্বারা পরিবেষ্টিত! পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ শেগুন বৃক্ষের অরণ্য সাইবেরিয়া ছাড়া অন্য কোথাও নেই! এ ছাড়া বার্চ, ওক, পাইন এবং অন্যান্য বহুমূল্যবান অরণ্যসম্পদে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল পরিপূর্ণ। এখানকার যে কোনও অঞ্চলে আড়াইশো থেকে তিনশো বছর বয়সের শেগুনের মহারণ্য দেখতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কোনও এক সময়ে সৌরলোক থেকে একটি বিরাট প্রজ্জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড শব্দে এই অরণ্যের কোনও একখানে ছিটকে এসে পড়ে। সেই অনৈসর্গিক উল্কাপিণ্ডের প্রচণ্ড বিদারণশব্দে সাইবেরিয়ায় যে প্রকার ভূ-কম্পন ঘটে, জনৈক রুশ বৈজ্ঞানিক মিঃ জোলোটভ সেটিকে এক হাজার আনবিক বোমার আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করেন! এই উল্কাপতনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হয়, এবং এর ভস্মরাশির মধ্যে নানাপ্রকার অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ মৃত্তিকার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। এই উল্কার বিদারণটি সম্ভবত ভূমিস্পর্শ করার আগেই ঘটে। সেই কারণে সাইবেরিয়ার বহু শত বর্গ-মাইলব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ ভস্মপরিকীর্ণ হওয়ার ফলে সমগ্র মৃৎলোকের উর্বরা-শক্তি সাত-আট গুণ বৃদ্ধি পায়! উক্ত বিজ্ঞানী বলেছেন, এই উল্কাটির প্রকৃতির সঙ্গে আনবিক শক্তির যোগ ছিল!

জনবিরল সেই হোটেল থেকে বেরিয়ে বিমানঘাটিতে এসে শোনা গেল, মস্কো অঞ্চলের আবহাওয়া যে প্রকার তাতে জেটবিমানের পক্ষে সেদিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এবং ভারতীয় অতিথিগণের জন্য কর্তৃপক্ষ সেই ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত নন্। অতএব একটি নবনির্মিত, ডাকোটা-প্লেন আমাদের জন্য বরাদ্দ হল। বিশেষ একটি 'ঘরপোড়া' জীব সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়! সেইজন্য 'ডাকোটার' নাম শুনেই আমি আঁৎকে উঠেছিলুম! কিন্তু এ ডাকোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ব্যবহৃত 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' বৃটিশ ডাকোটা পূর্ণমূল্যে কেনা নয়, অথবা তার ওপর পালিশ চড়িয়ে নূতন ব'লে বুঝিয়ে দেওয়াও নয়,—এটি এখানকারই নবনির্মিত। তবে এই বিমানটিতে ওঠবার আগে একটি কথা মনে প'ড়ে গেল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ কোথাও নাকি প্রকাশ করা হয় না, এবং সংবাদপত্রেও ছাপা হয় না, পাছে ক্যাপিটালিস্ট জগতে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র হন্, অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের অযোগ্যতা প্রকাশ পায়! মস্কো-পেকিং বিমানটি ছিল চীনা বিমান, এটি শুনলুম। কিছুকাল আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে অপর একটি বিমান দুর্ঘটনায় অনেকগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় লোক মারা যান্। কাগজে পড়েছি সেটিও সোভিয়েট বিমান নয়। সে যাই হোক, এগুলি সবই আমার শোনা,—জানা নয়।

মস্কোগামী ডাকোটায় যখন উঠলুম, দিল্লীতে তখন প্রায় ছ'টা বাজে, এখানে প্রায় সাড়ে তিনটে। আমরা তাতার দেশের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, এবং এটি যে হেতু 'ডাকোটা',—সেই কারণে সাত আট হাজার ফুট নীচে রুশভূমি দেখতে পাচ্ছিলুম। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটির পর একটি জনপদ, চাষবাস, ছোট ও বড় শহর, নদী এবং রেলপথ। যেহেতু এটি মেঘচ্ছায়াচ্ছন্ন গোধূলিকাল—সেই কারণে নীচের দিকের আলোগুলি দেখতে পাচ্ছিলুম। বনময় ভূভাগ প্রায়ই চোখে পড়ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিমনী এবং এঞ্জিনের ধোঁয়া।

বোধ হয় ঘন্টা দুই, তারপরেই বিমানটি সাইবেরিয়ারই অপর একটি শহরে নেমে এল। এটির নাম কাজান, এখানেও তাতারের ক্যাপপরা বহুলোককে দেখতে পাওয়া গেল। এদের সংগে যেমন পুরনো রুশইতিহাস প্রচুরভাবে জড়িত, তেমনি এই শহরটিও রুশবিপ্লবের সংগে বিশেষভাবে উল্লিখিত। রাশিয়াতে শীতকাল প্রায় এসে গেছে। সেই কারণে ওভারকোট ছাড়া মেয়ে-পুরুষ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েদের মুখে চোখে যথেষ্ট ধারালো ভাবটি দেখছিনে। একটু যেন ভোঁতা, একটু মোটা হাতের আহ্লাদী পুতুল, একটু বেশি যেন মোটাসুটি। তন্বী ললিতা বিগলিতা দলের কা'রোকে বিশেষ চোখে পড়ছে না, দেখছিনে তেমন কোথাও বাঁকা চোখের বিদ্যুৎ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 'নিপুণিকা চতুরিকাদের'। সম্ভবত সোভিয়েট ইউ-নিয়নে তারা বাস করে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জনৈক আমেরিকান লেখকের একটি মধুর পরিহাস:
"....Since the Revolution in 1917 people do not kill themselves for romantic reasons."

আমরা মোট ঘন্টা তিনেক পিছিয়ে পড়েছি। কাজান থেকে প্লেনটি ছাড়ল প্রায় আধ ঘন্টা পরে। এখন সন্ধ্যা ছ'টা। এবার সোজা মস্কো—এই কথাটি জেনে গুছিয়ে বসলুম। ঠাণ্ডার কথা শুনে একটু ভয় পাচ্ছিলুম। ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিল্লীর উপযুক্ত গরম পোষাক সংগে আছে, কিন্তু রাশিয়ার অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের অন্তকাল একটু অন্য রকম। এবার অন্ধকার হয়েছে, নীচের দিকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এবার মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে পরদেশী আকাশের জ্যোৎস্না চোখে পড়ছিল। ভুলে গিয়েছিলুম, কলকাতায় আজ মহানবমী পুজা!

কাজান থেকে ডাকোটায় তিন ঘন্টা লাগল মস্কো বিমানঘাঁটি পৌঁছতে। এই বিমানঘাঁটির বিশালতা চট ক'রে ঠাহর করা যায় না। কিন্তু চারিদিকের দূর-দূরান্তর অবধি ফ্লাড্-লাইটের অত্যুগ্রতার সংগে লাল-সবুজ আলোর যেমন ছড়াছড়ি, তেমনি অগণিত ও বিভিন্ন ডিজাইনের বিমান এক একদিকে শ্রেণী-বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের নামবার আগে প্রায় সকলেই যে-যার ওভার-কোট চড়িয়ে নিল। আমার সংগে ওটা নেই। প্লেন থেকে নামবার জন্য সেই একই ডিজাইনের হাল্‌কা নড়বড়ে অপদার্থ এবং অপসৃষ্টি এলুমিনিয়মের সিঁড়িটি আমাদের জন্য এগিয়ে এসে প্লেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। প্রতি যাত্রী ওইটির উপর পা দেবামাত্রই নিজেকে বিপন্ন বোধ বোধ করে,—এটি কর্তৃপক্ষের অবশ্যই অনুমান করা উচিত ছিল! এটির জন্য নিশ্চয়ই পার্টি মিটিং কিংবা কনগ্রেসের অধিবেশন দরকার হয় না! সে যাই হোক, আমরা পনেরো জন একে একে সভয়ে ও সতর্কতার সংগে নেমে যে-ভূমিতে পদার্পণ করলুম, সেটি আমার নিকট রহস্যে আতংকে সংশয়ে দুশ্চিন্তায় আবাল্য রোমাঞ্চকর! পৃথিবীর সকল রাজধানী অপেক্ষা মস্কো হল অস্বস্তি-দায়ক এবং সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যজনক! ১৯১৭ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল সে ছিল একক, নির্বান্ধব,—জগতের মধ্যে এমন নিঃসংগ এবং স্বজনহীন রাষ্ট্র ইতিহাসে কোনদিন ছিল না! ঘরের ভিতরে এবং সীমানার বাহিরে একটি 'নূতন সভ্যতা' বিস্তারের জন্য এমন ক'রে পৃথিবীব্যাপী মনোমালিন্যও কেউ বাধায়নি!

এক একটি 'সাহেব' এক একটি কলের গাড়ির হাতল ঠেলতে ঠেলতে বিমানঘাঁটির ময়দানের এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছিল। আমরা সাহেবী ইউরোপের মধ্যে ঢুকেছি! সামনের বৃহৎ অট্টালিকার কপালে রুশ-ভাষায় লেখা 'মস্কোয়া এইরোপোর্ট'। আমরা ভিতরের উষ্ণতার মধ্যে এসে জন-বহুল এবং কর্মব্যস্ত একটি লবীর আনা-গোনা পথে গদিআঁটা বেঞ্চ ও চেয়ারে আশ্রয় নিলুম। আমাদের সংগেকার দু'জন রুশ গাইড ও দোভাষী এখানে-ওখানে-সেখানে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলেন। মস্কোর বড় ঘড়িতে রাত ন'টা বেজে গেছে। কলকাতার ঘড়িতে রাত এখন সাড়ে বারোটা।

স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গীণ আধিপত্য এর আগে এমন ক'রে দেখিনি। যা কিছু প্রশ্নের জবাব স্ত্রীলোক দিচ্ছে। আমাদের দেশে ইদানীং মেয়েরা সরকারি অনেক আপিসে—বিশেষ ক'রে রেল, ডাক-বিভাগে, টেলিফোন, ষ্টেটব্যাঙ্ক, কমিউ-নিটি ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদিতে ফোড়নের মতো ছড়িয়ে থাকে। এখানে ব'সে-কাজ-করা কোনও কাউন্টারে ফোড়নের মতোও কোনও পুরুষ ছড়িয়ে নেই! এখানে সব মেয়ে। পুরুষ আছে দুচারজন—তারা মেয়ের তাঁবেদার। ফাই-ফরমাস ছুটোছুটি মাল-টানাটানি—এইসব কাজে পুরুষ। কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ জবাব এবং সর্বপ্রকার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপণা মেয়ের
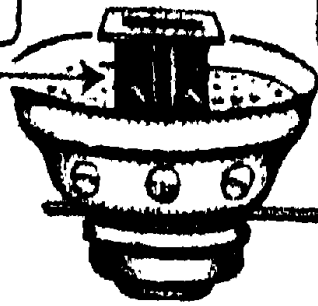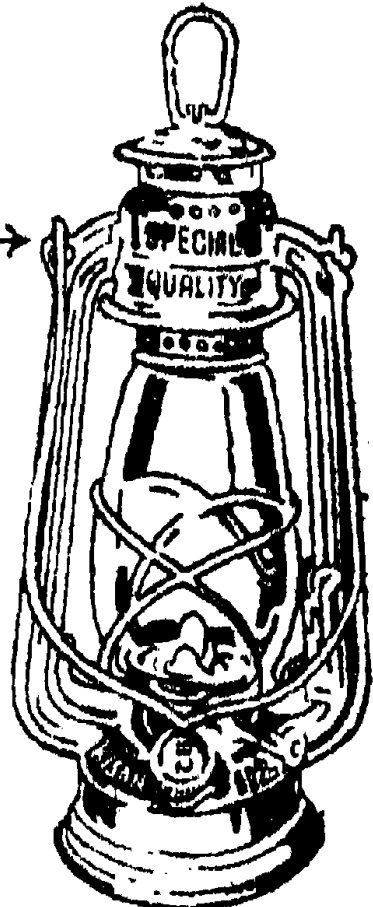
হাতে। বসে বসে আগাগোড়া সব লক্ষ্য করছিলুম।

আমাদেরকে কেউ অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসছে না, এবং কেউ মালা গলায় পরাবার জন্য হুড়োহুড়ি করছে না —এটি নতুন। খাতির পাওয়া যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এবং গলায় মালা পাওয়া যাদের পক্ষে এক প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক—তাদের পক্ষে ওদুটো চট করে না-পাওয়া শুধু যে গায়েই লাগে তা নয়, —নিমন্ত্রিত হলেও নিজেদেরকে তখন অবাঞ্ছিত মনে হয়। আমরা পনেরো জন মিলে এক ঘন্টাকাল সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং নিঃসহায় হয়ে বসে রইলুম। সেই দোভাষী দুজন রুশ ভদ্রলোকের চুলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য উভয়ের একজনের মাথার পিছন দিকে টাকপড়া, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে টিকি রাখার প্রচলন নেই—এটি বলাই বাহুল্য।

আমাদের দলের মধ্যে ১২ জন পুরুষ, এবং ৩ জন মহিলা। পুরুষের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার, কৃষ্ণকায়, বেপরোয়া, সুরসিক এবং বাকপটু—তিনি জাত-মারাঠা এবং বোম্বাইয়ের বিরোধী-দলের প্রধান নেতা আচার্য আত্রে। যিনি সর্বাপেক্ষা নীরব ও শান্ত—তিনি গুজ-রাটের নাট্যকার প্রাগজি দোসা। মেয়েদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা খরকণ্ঠী এবং বিদুষী—তিনি শ্রীমতী দুর্গা ভাগবৎ,— তিনিও মারাঠী। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, রোগা পাৎলা, তামার পয়সার মতো বর্ণ, এবং তিনি অবিবাহিতা। নানা কারণে তিনি আচার্য আত্রের প্রতি প্রসন্না নন্। যে-মহিলাটি সর্বাপেক্ষা শান্ত এবং প্রসন্নরূপিণী, তিনিও বেশ বয়স্কা,— তিনি রাণী লক্ষ্মীকুমারী চুন্দাবৎ, রাণা প্রতাপাদিত্যের বংশের কে যেন!

আমাদের কা'রো কা'রো মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিল—যখন পেরিয়ে গেল দু'ঘন্টা! অনেকে হিসাব করতে বসল, আমাদের প্রাতরাশের পর নাকি চৌদ্দ ঘন্টা কেটে গেছে! সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত প্রাক্তন রুশ বিপ্লববাদীর মতো এক সময় আচার্য আত্রে নিজের মধ্যেই আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, না হয় উপোস করেই রইলুম মশাই, তাই ব'লে একটা 'পানীয়ও' কি পাবো না?

কি প্রকার পানীয় পেলে তিনি এখনই তুষ্ট হন্, এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন আমরা কেউ মনে করিনি। দুর্গা ভাগবতের মুখের চেহারায় ঘোর বিরক্তি ফুটে উঠেছিল এবং লক্ষ্মীকুমারী শান্ত হাস্যে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ দু'ঘন্টা পেরিয়ে যাবার পর আমরা সবাই যেমন তন্দ্রায় অবসন্ন এবং রাত্রির ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হচ্ছিলুম, তেমনি নিজেদেরকে এমন বিরক্ত, অসহায়, অবাঞ্ছিত, উপেক্ষিত এবং অনুকম্পাশ্রয়ীও আর কখনও মনে হয়নি। কেউ যদি তখন আমাদের কানে কানে এই কথাটি বলত, "মান থাকতে-থাকতে এখনই নিজেদের দেশে ফিরে চলো, বিমান তোমাদের রেডি, এবং দেশে ফিরে গিয়ে আত্মসম্মান রক্ষার দায়ে এই অনাদরের ইতিবৃত্তটি ঢোক গিলে চেপে যেয়ো,"—তাহলে সেই শুভ মুহূর্তে আমাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ বোধ হয় উঠে দাঁড়াত!

কলকাতার ঘড়িতে সম্ভবত রাত তিনটে বাজে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, সোভিয়েট লেখক-সঙ্ঘের প্রতি-নিধিরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য যথাসময়ে এসে এই বিমান-ঘাঁটিতে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অর্থাৎ বিকাল পাঁচটা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টাকাল অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু মস্কোর আকাশে দুর্যোগপূর্ণ আব-হাওয়ায় আমাদের জেটবিমানটি আজকে আর আসবে না,—এই খবরটি নিশ্চিত-ভাবে জেনে তাঁরা তাঁদের পনেরোটি ফুলের মালা এবং পনেরোটি ফুলের তোড়া নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে গেছেন! আমাদের ডাকোটা-বিমানের খবর তাঁরা কিছুই জানেন না!

একম্প্রকার সান্ত্বনাবাক্য শুনেও কেউ কেউ তুড়ি দিয়ে হাই তুলছিল। সিগারেটে অরুচি ধরেছে, জনবৈচিত্র্য পুরনো হয়ে গেছে, কম্বল একখানা সঙ্গে থাকলে বাকি রাতটুকু কোথাও গড়িয়ে নেওয়া যেতো!

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছোটবেলাকার ভাদুড়ীদের বাড়ির শ্রাদ্ধভোজনের কথা ভাবছিলুম। উৎসাহ ক'রে নেমন্তন্ন খেতে গেছি! কিন্তু রাত দশটা বাজবার পরেও ডাক পড়ে না, সুতরাং ছেলেমানুষ ক্ষিধে-তেষ্টায় ও ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে! জামা-কাপড়ের ইস্তিরি সব নষ্ট, মাথার টেরি মুছে গেছে, একপাটি জুতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মামা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুখখিস্তি আরম্ভ করেছেন গৃহকর্তাদের উদ্দেশে,—এমন সময় বুঝি ডাক পড়ল, —"ব্রাহ্মণ আর কে আছ গো উঠে এসো, পাতা পড়েছে।"

ঠিক সেইরূপ ঘুমকাতর অবস্থায় এক সময়ে আমাদের ডাক এল, "ভারতীয় যাঁরা আছেন আসুন, গাড়ি এসেছে আপনাদের জন্য।"

আচার্য আত্রে মুখখিস্তি আরম্ভ করেছিলেন! চেয়ে দেখলুম, মস্কোর ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে। কলকাতায় প্রায় সাড়ে তিনটে। আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম। খান-পাঁচেক গাড়ি আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে!

বন্ধগাড়ির বাইরে ঠাণ্ডা ছিল প্রচুর। বৃষ্টি পড়ছে সপসপিয়ে। কিন্তু মেঘমলিন রাত্রে দুই পাশের অন্ধকার প্রান্তর এবং পাইনের প্রেতচ্ছায়াদল ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ছিল না। গাড়ির মধ্যে কা'রো কা'রো নাক ডাকছিল, এবং তাঁরা নিজদের নাকডাকার বহু বিচিত্র আওয়াজে নিজেরাই একসময়ে সচকিত হয়ে সলজ্জভাবে সোজা হয়ে বসছিলেন।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল কুড়ি-বাইশ পথ। কিন্তু দশ বারো মাইল পেরোবার পর দূরে-দূরে কয়েকটি রক্ত-তারকার চিহ্ন বহু উচ্চে দেখতে পাওয়া গেল। এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের ও সকলকালের সমস্ত বিপ্লববাদীগণের হৃৎপিণ্ডের প্রতীক কিনা, এটি আমার জানা নেই। কিন্তু অধুনা যেটি দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবন, সেটি যখন প্রাক্তন ইংরেজ আমলের ভাইসরয়ের প্যালেস ছিল, তখন সেখানে এবম্বিধ একটি রক্ত-তারকার আলোক ভারতব্যাপী রাজ-নীতিক অমানিশান্ধকারে দপ দপ ক'রে জ্বলত! তবে এখানে এবার পথের দুই পাশে যে সুবিস্তৃত বিশালতা এবং সচ্ছল আলোকমালাসজ্জিত গগনস্পর্শী নব-নির্মিত অট্টালিকা শ্রেণী দেখতে পাচ্ছিলুম, এই দৃশ্য এখন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্য কোথাও চোখে পড়েনি। মস্কোর প্রথম দৃশ্য পর্যটক মাত্রকেই অভিভূত করে।

তন্দ্রারুণ্মীন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্তটাই কেমন যেন একটা অবাস্তব রূপকথার আকার নিয়েছিল এবং সেই অন্ধকারে কোন্ পথ দিয়ে ঘুরে কোন্ একটি নদী পার হয়ে কোথায় আমাদের গাড়িগুলি একে একে এসে থামল, সেদিকে আর ঠাহর করা গেল না। শুধু এক বিশাল সোপানশ্রেণী বেয়ে উঠে দিল্লীর কুতব মিনারের মতো উঁচু যে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করলুম সেটিকে ময়দানবের প্রাসাদ ব'লে

প্রথমেই মনে হল। ভিতরে প্রবেশকালে একটি উষ্ণমধুর বাতাসের প্রবাহ পেরিয়ে যেতে হয়। তারপর লবীর ভিতরে এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারা গেল, দিল্লীর জানুয়ারী মাস এই হোটেলের মধ্যে এসে কলকাতার মধুর চৈত্রসন্ধ্যায় পরিণত হয়েছে। আমরা আধুনিক মস্কোর নবনির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল 'উক্রাইনা'-তে এসে উঠেছি। দেখতে দেখতে আমাদের পনেরো জনের মালপত্র হুড়হুড় ক'রে এসে পেঁছিল। যারা এগুলি তম্বির তদারক করছিল তাদের না বলতে পারি ভ্যালেট, না পোর্টার, না খানসামা, না বয়। তারা ঘননীল পোষাকের সংগে সোনালি ব্যাজ লাগিয়ে নিজেদের যে স্বতন্ত্র পরিচয়টি বহন করছে, সেটি হল হোটেলের 'ভৃত্য'! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে 'চাকর' কেউ নেই, সবাই হল ওয়ার্কার, 'রুবোচি'। তারা মাল নামায়, মাল তোলে, উপরে পেঁছয়, এঘর থেকে ওঘরে নেয়। তারাই আবার ওভার-কোট জমা রেখে টিকিট দেয়, পিছন থেকে ওভার-কোট গায়ে চড়িয়ে দেয়, একটু নলচে আড়াল দিয়ে সিগারেট ফুঁকে নেয়, আবার ওরই মধ্যে দুটো কানাকানি ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে। এদেরকে 'বকশিস' দেবার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, এবং অসভ্যের মতো এরা কখনও হাত পেতে বকশিসও চায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে বকশিস দেওয়া এবং নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু লোকচক্ষুর একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি যখন এক আধবার আমার বদ্ অভ্যাস মতো এই বেআইনী কাজ করেছি, তারা প্রীতি ও খুশী হয়ে সেটি গ্রহণ করেছে!

আধুনিককালের হোটেল মাত্রই প্রত্যেক দেশের রুচি, প্রকৃতি, সম্পদ্ ও বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই হোটেলের ভিতরকার আগাগোড়া প্রথম শ্রেণীর শ্বেতপাথর এবং শেগুন কাঠের কাজ, তার গঠনের কারুকার্য, তার শিল্প-কলা, চারিদিকে চারুশিল্পের বিবিধ চিত্রণ—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের ধন ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের সামনের সমস্ত ছবি বদলে গেছে। উজবেকিস্তান, তুর্কোমেনিস্তান, কাজাখ, তাজিক, কিরগিজ, আজেরবাইজান, এমন কি জর্জিয়া এবং সাইবেরিয়াও মুছে গেছে! আমরা এসেছি নতুন জগতে, যেখানে সব সাহেব আর মেম, যেখানকার বর্ণ অত্যুগ্র শ্বেতরক্তিম, লাল রেশমি চুল, অত্যন্ত বড়মানুষি পোষাক পরিচ্ছদ—যেখানে চারিদিকের পরিপাট্যের ফিটফাট, টিপ-টাপ চেহারা। নিজেদেরকে এবার যেন একটু বেশি কালো এবং একটু বেশি অকিঞ্চন মনে হতে লাগল।

মালপত্রের জটলার চারিদিকে ভারতীয়রা দাঁড়িয়ে যে-যার সুটকেস বা ব্যাগ মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, এবং তাঁদেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন অত্যুগ্রবর্ণা রুশ মহিলা চশমা চোখে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকখানি পাসপোর্টের ছবির সংগে মানুষটিকে মিলিয়ে তার জন্য অমুক নম্বরের ঘরটি আবন্টন করছিলেন। মহিলাটি বর্ষীয়সী, গোলগাল, নাদুস-নুদুস এবং হাসি-হাসি মুখ। আমাদের দেশের ভারিক্কে গৃহিণী! তিনি পাস-পোর্টের ছবিগুলি মেলাতে গিয়ে কোনও একখানিকে পরীক্ষা ক'রে বলছিলেন, আপনাদের মধ্যে এই মহিলাটিকে দেখছিনে কেন? এই যে ববকরা ঘন কোঁকড়া চুল, চোখে চশমা, সুন্দর মুখ,—এই যে ইনি! এ'র জন্য মেয়েদের ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করেছি।

ববকরা কোনও মেয়েকে আমরা সংগে আনিনি, সেইজন্য ছবিটি পরীক্ষা করতে গিয়েই দেখি, তলায় নাম লেখা রয়েছে "সুভাষচন্দ্র মুখার্জি"!

হাসির হট্টগোল পড়ে গেল, এবং সুভাষকে তাঁর সামনে দাঁড় করানো হল!

মহিলা আপন ভ্রম শোধরাতে গিয়ে একটি কলরব তুলে হাস্যমুখর হয়ে উঠলেন। তাঁর আচরণের মধ্যে এবং কথা-বার্তায় একটি গৃহস্থকন্যার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হল তিনি ঠিক সরকারি দপ্তরের কাঠখোট্টা মেয়ে নন্। হাসিমুখে তিনি বললেন, আলো নিবিয়ে সবে আমি শুতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় টেলিফোন বাজল—আপনারা সবাই আসছেন। শুনে অবাক, সারাদিন আপনাদের খাওয়া হয়নি! কত কষ্ট হয়েছে আপনাদের। চলুন, আর নয়, ওপরে আপনাদের জায়গা হয়েছে। এবার আপনাদের সব ভার নিলুম আমি। কাল থেকে আপনাদের আর কোনও কষ্ট হবে না, কথা দিচ্ছি। আসুন, আমি আগেই ব'লে রেখেছি রান্নাঘরে। আপনাদের এই হয়রানির জন্যে সবাই লজ্জিত। আসুন—

দোতলার একটি সরু লম্বা হলে ভারতীয় একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার সামনে ব'সে সেদিনকার সেই শেষ রাতে কতটুকু কি কি মুখে দিয়েছিলুম মনে নেই। তারপর সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এড়িয়ে একটি লিফট্-এর সাহায্যে আটতলায় উঠে সুদীর্ঘ করিডর পেরিয়ে যে ঘরটিতে সুভাষ এবং আমাকে মাল-পত্রাদিসহ পেঁছিয়ে দেওয়া হল, সেটির নম্বর ৭৮২। তখন মস্কো টাইম রাত সাড়ে তিনটে, কলকাতায় সকাল ৭টা!

সকাল আটটার আগে বিছানা না ছাড়লেও চলে, সেইজন্য একটু ঘুমোতে পেরেছিলুম। বিছানা ছেড়ে উঠে চায়ের চেষ্টায় গিয়েছিলুম একবার সেই দোতলাটার ওদিকে, কিন্তু এই বৃহৎ অট্টালিকার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে এমন দূরবিস্তৃত এবং জটিল যে, নতুন মানুষের পক্ষে পথ হারাবার ভয় ছিল।

সম্পদ এবং বৈভবের প্রাচুর্য প্রকাশ যদি হোটেলের পরিচয়পত্র হয় তবে কলকাতার গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্ণ থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর মেডন্, অশোক, জনপথ, ওয়েস্টার্ণ্ কোর্ট, ইম্পিরিয়াল এবং বোম্বাইয়ের 'তাজমহলের' অন্দরমহল যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা চট করে 'হোটেল উক্রাইনা' দেখে অভিভূত হতে চাইবেন না। 'হোটেল উক্রাইনার' নীচের তলায় সামান্য যে কয়টি দোকান আছে তাতে মেয়েভুলানো কয়েকটি ঝুটোধাতুর অথবা মূল্যের অলংকার ছাড়া দু তিনটি মামুলী পুতুলের প্রদর্শনী দেখতে পাওয়া যায়। বই এবং হাতঘড়ির দু-তিনটি দোকান। খদ্দেররা খুশী হয়ে যে মধ্যে মাঝে এটা ওটা কেনে তা নয়, হাতের কাছে অন্য কিছুর বৈচিত্র্য নেই বলেই কেনে। গ্র্যান্ডে, গ্রেট ইস্টার্ণে, তাজমহলে পণ্যাবিপণি-বৈচিত্র্যের যে অপরূপ শোভাসজ্জার প্রাচুর্য,—মস্কোর সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে তার শতাংশের এক অংশও নেই! আমাকে অভিভূত করেছিল এর বহিরাংশের গঠন-পারিপাট্য। যে সকল ইঞ্জিনীয়ার এটিকে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের সামনে লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদটির ছবি বোধ হয় ধরা ছিল। তবে এটি এখন সিমেন্টের যুগ, 'গোয়েথিক' খিলান নির্মাণের কথা এখন আর ওঠে না।

প্রাতরাশের মতো 'সকাল' এখনও হয়নি, সুতরাং হোটেলের মধ্যেই চাকর মতো খানিকটা ঘুরে যখন নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালুম, দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের ঘরটি 'বাঙ্গলাদেশে' পরিণত! সস্ত্রীক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর শ্যালিকা, সমর সেন, সস্ত্রীক শুভময় ঘোষ, এবং মস্কো রেডিয়োর বাঙ্গলা প্রোগ্রামের কর্তা শ্রীযুক্ত বিনয় রায়। বলা বাহুল্য, আনন্দটা উৎসবে পরিণত হল। বিনয়বাবু এই ঘরেই চা-কেক-বিস্কুটের আসর বসালেন। একটি ধবধবে সুবেশা রুশ মেয়ে এই ফ্লোরের 'বুফে' থেকে সামগ্রীসম্ভার এনে হাজির করল। প্রত্যেক তলায় এক একটি বুফেতে চা, কফি, রুটি, ডিম, মাংসর খাবার, আপেল, আঙ্গুর, লজেন্স চকোলেটাদি পাওয়া যায়। কিন্তু 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'—এইটি অলিখিত থাকে! এখানে "ফেলো কড়ি মাখো তেল।" সর্বত্র যেমন চা প্রস্তুত হয়, এখানেও তেমনি। এক গেলাস হলদেটে গরম জল, যার নাম 'চায়'—তার দাম এক রুবল! যদি দু' ফোঁটা সোভিয়েট পাতিলেবুর গন্ধ ভাসে তবে আরও পনেরো কোপেক! আমাদের হিসেবে দাঁড়ায় মোট এক টাকা ছয় আনা! কফির দাম এক রুবল। একটি ভদ্র প্রাতরাশ খেতে গেলে দশ থেকে পনেরো রুবল! মদ বাদ দিয়ে সভ্য সমাজের লাঞ্চ বা ডিনার পঁচিশ থেকে চল্লিশ রুবল! কামাক্ষীরা এখানে অনুবাদকের কাজ করেন। তাঁদের গড়-পড়তা আয় চার থেকে ছয় হাজার রুবল। কিন্তু তাঁদের ফ্ল্যাটভাড়া সামান্যই। এঁরা ছাড়াও এখানে আছেন ননী ভৌমিক এবং সস্ত্রীক প্রভাসচন্দ্র বসু। প্রাক্তন বঙ্গবাসীর অধ্যাপক এবং আকুমার ব্রহ্মচারী ও রুশ ভাষা জানা শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও এখানে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক মাত্রই এখানে প্রচুর বেতন পান্। এখানকার বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হলেন শ্রীযুক্ত কে-পি-এস মেনন। মস্কোতে কে- পি-এস মেনন এবং কৃষ্ণ মেনন, এঁরা দুজন খুবই জনপ্রিয়—এটি পরে শুনেছিলুম।

সুভাষ তাঁর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে চলে গেলেন এই হোটেল ছেড়ে। 'জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে' ছটফট করছিল, এবার জলে ডুবে বাঁচল! তিনি কলকাতা থেকে তাঁর বন্ধুদের জন্য এনেছিলেন মুগ-মুসুরির ডাল, খাবার জন্য মসলাপাতি, এটা ওটা। এবার 'দেশী' আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে তিনি হাঁপ ছাড়লেন। সুভাষ আবার ওরই মধ্যে একটু অগোছালো, একটু বেসামাল, একটু বেশি 'বাঙ্গালী'। কিন্তু আমি ওর ভদ্র এবং মিষ্ট সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে একদম একা প'ড়ে গেলুম। এবার আমি রইলুম, আর আমার সামনে রইল মস্কো! এখন থেকে উভয়ের মধ্যে সোজা ও বাঁকা কটাক্ষ বিনিময় চলবে! যা কিছু শুনে এসেছি, জেনে এসেছি, ভেবে এসেছি,—তা সম্পূর্ণভাবেই ভুলব! পূর্বসংস্কার বা প্রেজুডিস বিসর্জন দেবো! আমেরিকার চোখ নয়, ইংল্যান্ডের মন নয়, ফ্রান্সের অভিমত নয়, ভারতের সংশয় ও দুর্ভাবনা নয়, আমি দেখতে চাই মস্কোকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চক্ষে! কেবল-মাত্র মস্কো নগরীর বিশেষ বিশেষ অংশ গাড়ির ভিতর থেকে দেখে আমি একথা বলতে আসিনি "এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থেকে যেত।" আমি জানি এ-মস্কো ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মস্কো নয়। সেই মস্কো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি জানি রাষ্ট্রের বিশেষ আইডিয়া বিশেষ কাল থেকে অন্যকালে উত্তীর্ণ হয়ে তার চেহারা বদলায়, ভিন্নতর আইডিয়ার মধ্যে সে এসে পৌঁছয়। আমি জানি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে 'চণ্ডশোক' 'ধর্মাশোকে' পরিণত হয়েছিলেন, এবং অহিংসবাদী গান্ধী ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ঠিক আজকের এই ২২শে অক্টোবর তারিখে একদা হিংসাশ্রয়ী সশস্ত্র প্রতি-রোধের জন্য কাশ্মীরে সংগ্রাম ঘোষণার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বেলা দশটার সময়ে আমাদের সেই পরিচিত হল-এ প্রাতরাশের বৈঠক বসল। ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ সকলেই উপস্থিত। মুল্‌করাজ আনন্দ্ এসেন আমাদেরকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তিনি আজই চ'লে যাবেন রাত্রে। সাজ্জাদ জহীরকে দেখে বড় খুশী হলুম। তিনি ইতিমধ্যে আসকাবাদ হয়ে এসেছেন। লেনিনের শবাধারের উপর আমাদের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা উচিত, এবং সেই পুষ্পমাল্যের মূল্য কি পরিমাণ হওয়া সঙ্গত,—এই আলোচনাটি হচ্ছিল। অবশেষে স্থির হল, দুই-শত রুবল মূল্যের একটি ভাল মালা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। আগামী কাল আমরা সেই 'মসলিয়ম্' দেখতে যাব।

কাল রাত্রের সেই রুশমহিলা আমা-দেরকে খাওয়াতে বসেছেন। কোনও পরিচয় নেই, কিন্তু আড়ষ্টতাও নেই। আজ তাঁর নাম শুনলুম ওই হাসি-হট্টগোলের মধ্যে। তাঁর নাম লিডিয়া। এই আসরেই রয়েছেন কয়েকজন রুশ পুরুষ এবং মহিলা,—এঁদের অনেককেই দেখেছি তাসকন্দে। মহিলাদের মধ্যে নাটাশা, কালেরিয়া, মেরিয়ম প্রভৃতি আমাদের বিশেষ পরিচিত। যাঁরা হাসি তামাশা কৌতুক পরিহাস বেশি করেন তাঁরা পরস্পর কিছু ঘনিষ্ঠ হন্। সর্দার রাজিন্দর সিং বেদী কিন্তু প্রত্যেকের নিকট প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁর নির্মল ও মধুর পরিহাসপ্রিয়তার জন্য। তিনি বোম্বাই সিনেমা জগতে চিত্রনাট্যকাররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্বাপেক্ষা প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যাচ্ছিল আচার্য আত্রের আচরণে। তিনি যখন বজ্রনির্ঘোষ সহকারে কথা বলতে আরম্ভ করেন, আমরা তখন সভয় কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট বোধ করি—যদিও তিনি প্রচুর পরিহাসপ্রিয় এবং অনর্গল ইংরেজি বলেন। আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক 'অবশ্যম্ভাবী' শেখোন উপস্থিত আছেন। তিনি অনেকের কৌতুকের পাত্র।

নাটাশা আধুনিক রুশ মেয়ে। সাজ-সজ্জায় ও প্রসাধনে তিনি পরিপাটি। বয়স তাঁর বছর পঁয়ত্রিশ। নাচে গানে তিনি পটু। তাঁর সিপসিপে চেহারাটি সুশ্রী, ভঙ্গীটি সুঠাম—যেটি রাশিয়ায় দুর্লভ। ওদেশে সিপসিপে তন্বী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটাশা ভারতে ছিলেন বছর তিনেক। হিন্দী এবং ইংরেজী ভালই জানেন। তিনি বিবাহিত এবং একটি সন্তানের জননী। তাঁর চোখে মধুর কটাক্ষ, এবং মনে রামধনুর খেলা। শ্রীমতী নাটাশার তাঁবে অন্যান্য দোভাষীরা আমাদের সঙ্গে 'কাজ' করছিলেন। আমাদের একমাত্র কাজ যখন তখন যেখানে খুশি হৈচৈ ক'রে বেড়ানো। আমাদের জন্য সকল সময় গাড়ি প্রস্তুত।

শ্রীমতী কার্লোরিয়া এবং লিডিয়ার পোষাকপত্র বিশেষ সংযত। এ'রা বিশেষ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন না। কার্লোরিয়া ছুটি নেবে দু'একদিনের মধ্যে। ভারতীয়রা চলে গেলে লিডিয়ারও ছুটি। থাকবেন শুধু নাটাশা, কেননা তিনি সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নে কাজ করেন। প্রকাশ থাকে, দোভাষী অপেক্ষা দোভাষিণীর সংখ্যা মস্কোতে অনেক বেশি। প্রথমত এগুলি হালকা কাজ, দ্বিতীয়ত পর্যটক এবং অভ্যাগতদের নিকট মহিলারা সহজে প্রিয় হন। পুরুষের নিকট মেয়েরা আপন নিত্যকালীন ছলাকলার দ্বারা প্রিয় হতে জানে। মেয়েদের মুখ থেকে পুরুষ বক্তৃতা শুনতে চায় না, কিন্তু অন্যমনস্ক পুরুষের জামার একটি বোতাম সময়মতো শেলাই ক'রে দিলে পুরুষ বড় খুশী। খাবার টেবলে মেয়ে যদি স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেয়, পুরুষ তা'র কথা কানে তোলে না। কিন্তু আর সকলকে লুকিয়ে মেয়ে যদি একখানি ডিম-দিয়ে-ভাজা ভেটকি মাছ কড়াই থেকে তুলে এনে পুরুষের পাতে দেয়, তবে পুরুষের চিত্তলোকে রসের সাড়া পড়ে যায়।

লিডিয়া আমার মুখোমুখি বসেছিলেন। চারিদিকের হাস্য কৌতুকের মাঝখানে আমার মুখে চোখে কিছু আড়ষ্ট গাম্ভীর্য ছিল। তিনি হঠাৎ বললেন, কই, আপনার কিছু খাওয়াই হচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে কিছু নিচ্ছেন না ত? আমি দিচ্ছি—

এখন ওখান থেকে সুভোজ্য বস্তু তিনি আমার প্লেটে তুলে দিলেন। মেমসাহেবের শাদা রংয়ের দুখানা হাত সযত্নে আমার থালায় খাদ্যবস্তু গুছিয়ে দিচ্ছে— এটি আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা! বছর এগারো আগে আসামের অরুণবন্দ পাহাড়ের একটি বাংলোয় জনৈক ইংরেজ মহিলা এমনিভাবে খাইয়ে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন 'যুগান্তর' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এখানে এ মহিলাটির শেষের কথাটিতে টনক নড়ল। ইনি বললেন, বোধহয় বাড়ির জন্যে আপনার মন-কেমন করছে?

স্ত্রীলোকের সেই আদিম চাতুরীর কতটুকু এই নারীর মুখে চোখে প্রকট, সেটুকু নিরীক্ষণ করার জন্যই মুখ তুললুম। হাসিমুখে বললুম, খুব স্বাভাবিক!

আমাদের মুখ থেকে ভারতীয় অবস্থার সংবাদ শুনে নেবার জন্য কোনও ব্যক্তি আমাদের আশেপাশে নিযুক্ত আছে কিনা অথবা আমাদের সম্বন্ধে কি প্রকার তথ্য অলক্ষ্যে সংগৃহীত হচ্ছে, এটির সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলুম! আমি কথা বলতুম কম, এবং শুনতুম বেশি। নিজের দৃষ্টিবিভ্রমের দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি পৃথক জগৎ রচনা করে নিয়েছিলুম, অথচ বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই ভ্রান্তির উৎপত্তি অজ্ঞান থেকে। ফোড়া দিয়ে পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে যাবার পরেও ফোড়ার জায়গাটার ব্যথা এখনও মিলোয়নি! ভুলে গিয়েছিলুম ষ্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট
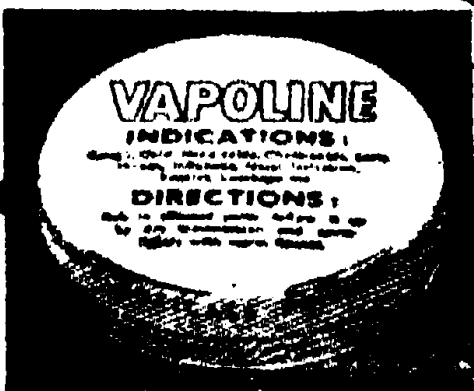
ইউনিয়নের আকাশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে!

বেলা এগারোটার ঠাণ্ডাটাও গায়ে লাগে বৈকি। সকালটা মেঘ ও রৌদ্র মেশানো। মাঝে মাঝে হাল্কা বৃষ্টির পশলা হয়ে যাচ্ছে। পথে এই প্রথম নামলুম। হাঁটতে ভাল লাগছিল। সামনেই মস্কো নদী, এবং নদীর দুই পারে শহর। অট্টালিকাশ্রেণী নবনির্মিত, যেমনই বৃহৎ তেমনি বিস্তৃত। একই অট্টালিকার বিভিন্ন প্রবেশপথ, সুতরাং এক একটি বনস্পতিতে কত সংখ্যক পাখীর বাসা বলা কঠিন। কিন্তু ভারতে আমরা বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করি। আমাদের দেশে যেমন প্রতি ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান নির্মাণকালে স্বকীয় রসকল্পনার পরিচয় দেয়, যেমন একটি অট্টালিকার ডিজাইন্ বা এলিভেশন অন্যটির সঙ্গে মেলে না, এখানে তেমন নয়। এখানকার যে কোনো রাজপথের দুইপারে যে মনোরম এবং নির্মাণশিল্পকলাযুক্ত অট্টালিকাশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি যথেষ্ট মনোজ্ঞ, কিন্তু ছাঁচ মোটামুটি এক। বারান্দা-বৈচিত্র্য এবং 'রিলিফ'—বিশেষ কোথাও নেই! পাছে সম্পূর্ণ নিরেট ইঁট-পাথরের সুবৃহৎ একটা স্তূপ হয়, এজন্য ছোট্ট ছোট্ট বারান্দা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি হাতীর বিরাট দেহের তুলনায় ছোট ছোট চক্ষু। এই অঞ্চলের বিস্তার এবং পথের বিশালতা দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। একা সোভিয়েট ইউনিয়ন হল পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ, এবং ভারতখণ্ড অপেক্ষা সাত গুণ বড়। জনসংখ্যা মরে-হেজে-দেশছাড়া হয়েও মাত্র কুড়ি কোটি। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্র তথা কমিউনিষ্ট পার্টির মতো এত বড় 'জমিদার গোষ্ঠি' পৃথিবীর অন্য কোথাও যেমন নেই তেমনি এত বড় 'জমিদারী'র সর্বপ্রকার সম্পদ্ ভোগ করতে গেলে প্রতি সোভিয়েট নারীর পক্ষে অন্তত দশটি সুস্থ সন্তান প্রসব করা ছাড়া গত্যন্তরও নেই! বলা বাহুল্য, অধিক সন্তান প্রসব করার জন্য ওদেশে যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করা আছে, এবং সেই কারণে পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও আছে! এ-পরিবার গলা বাড়িয়ে দেখছে ওই পরিবারের দিকে,—কা'র ক'টি হল! সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শুধু ফেডারেটেড রাশিয়ার অংশে জনসংখ্যা প্রায় বারো কোটি।

মস্কোর জনবহুল একটি পথের এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখি, ওভারকোট উঠেছে প্রায় সকলেরই গায়ে। 'প্রলেটেরিয়েট' কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গরীব কেউ এখনও চোখে পড়ছে না। পুরনো জুতো কারো পায়ে নেই, অথচ জুতোর দাম তিন-চারশ রুবল। তালি-মারা জামা বা ওভারকোট একটিও দেখছিনে। সেই অসন্তুষ্ট, রুক্ষচক্ষু, ছিন্ন-ভিন্ন জীর্ণবাস সর্বহারারা কোন্ দিকে? ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন, ক্ষুধার্ত এবং হতভাগ্যরা কই? আমার মনে থেকে যাচ্ছে এই অক্লান্ত প্রশ্ন! আমি যেন পথে পথে, নগরে ও প্রান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তাদেরকে, গোর্কির কাছে যাদের খোঁজ পেয়েছিলুম, যাদের বিপুল কাহিনী আবাল্য শুনে এসেছি টলষ্টয়ের মুখে! 'বুর্জোয়া' শব্দটার বাঙলা জানিনে, কিন্তু ব্যাখ্যাটা জানি। এরা সেই ভদ্রলোক, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়, এদের প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায় অবস্থা এদের সচ্ছল!

আমার সঙ্গে ছিলেন শুভময় ঘোষ। রাজপথের মাঝখানেই একটির পর একটি মাঝারি ধরনের বাড়ি দেখছিলুম। শহরের মধ্যে এমন বুঝি আছে পাঁচশটি বাড়ি। ছড়িয়ে আছে নানা অঞ্চলে। প্রত্যেকটির কপালে লেখা, 'মেট্রো'। পথচারী যেমন সহজে ফুটপাথে ওঠে, তেমনি এসে উঠলুম এমন একটি বাড়িতে। এটি যে রেলষ্টেশন, এবং ভূগর্ভস্থ রেলপথ এটি, হঠাৎ বিশ্বাস করতে বাধে। নিমেষের মধ্যে সমস্ত চেহারাটা বদলে গেল। শত শত নরনারী একই সঙ্গে পিলপিল ক'রে নামছে ভূগর্ভে এবং সেখান থেকে উঠেও আসছে। গভীরতায় একশ' ফুটেরও বেশি, কিন্তু নামা-ওঠার পরিশ্রম নেই। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে একটি বিদ্যুৎচালিত লৌহ-পটের উপরে দাঁড়ালে সেইটিই সিঁড়ি হয়ে নেমে যায় তরতর গতিতে। এটি কৌতুক ও কৌশলের খেলা,—একটু আমোদ লাগে। নীচের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে যক্ষপুরীর রূপকথার মতো! সামনে বিরাট প্লাটফর্ম, —দু পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আনাগোনা করছে। সমগ্র প্লাটফর্ম আলোয় ঝলমল করছে। মাথার উপরে মস্কো শহর। সর্বাপেক্ষা স্বস্তি, ভূ-গর্ভের মধ্যে মধুর মলয়-বাতাস। সব সময় ফুর-ফুর করছে মিষ্ট হাওয়া সকলের মুখে-চোখে। ভিতরটা আগাগোড়া শ্বেতপাথরের থিলান এবং পাথরের স্বর্ণালি বর্ণের কারুকার্যকরা সংখ্যাতীত স্তম্ভ। প্রতি স্তম্ভের গায়ে রুশ-বীর ও মনীষীর পরিচয় এবং চিত্র খোদিত। এই মেট্রোর রেলপথের ভাড়া পঞ্চাশ কোপেক, ওদের পঞ্চাশ নয়া পয়সা! 'নয়া পয়সা' শুনতে যেন কেমন-কেমন! বছর পাঁচশেক পরেও যখন শুনবো 'নয়া পয়সা',—তখন মনে হতে পারে আমরা যে-কোন পুরনোকেই বুঝি 'নয়া' ব'লে চালাই! এর চেয়ে বরং পাকিস্তানের সংজ্ঞাটি শুনতে ভাল—'পয়সা' এবং 'পুরনো পয়সা'। সে যাই হোক, ওই পঞ্চাশ কোপেকের টিকিট নিয়ে মাটির তলায়-তলায় সারাদিন যেখানে খুশি এবং যতবার খুশি যে-কোনো ট্রেনে আনাগোনা করা যায়। যতক্ষণ ডুব মেরেছ, উপ্‌রি খরচ নেই; ভুঁইফোঁড় হলেই টিকিট বাতিল।

একখানা ট্রেন এসে আমাদের দুজনকে নিয়ে প্লাটফরম ছাড়িয়ে যেন কোনদিকের অন্ধকার সুড়ঙ্গলোকে চ'লে গেল। প্রত্যেকটি কামরাই অল্প-বিস্তর জন-পূর্ণ। হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে। কোনও কামরায় বাথরুম চোখে পড়ছে না। কিন্তু কামরাগুলি আমাদের হাওড়া-বোম্বাই ইলেকট্রিক ট্রেনের মতোই সমুজ্জ্বল।

অজানা উত্তর মেরু-বলয়ের দক্ষিণে কোন্ সুড়ঙ্গগর্ভের ভিতর দিয়ে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলুম, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। মাথার উপরে রয়েছে আধুনিক পৃথিবীর নবতম সভ্যতার কেন্দ্র মস্কো নগরী,—ছাদ ভেঙ্গে যদি হুড়-মুড় করে পড়ে তবে ওদের সঙ্গে আমরাও মরেছি! কিন্তু থিলান বড় মজবুত। ওরা ওদের গুরুস্থানীয় প্যারিস, লণ্ডন এবং নিউইয়র্ক-এর অনুকরণেই এই টিউব-রেলপথটি নির্মাণ করেছে। এটি তাদের চেয়ে উন্নত কিনা জানিনে।

মাইল পনেরোর মধ্যে একাধিক ষ্টেশনে ট্রেন থামল। তারপর এক সময় আমরা আবার একই লৌহ-কৌশলক্রমে নগরের একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অঞ্চলে এসে উঠলুম। এখান থেকে কামাক্ষীদের বাড়ি কাছাকাছি। কামাক্ষী-প্রসাদের দুটি ঘরযুক্ত একটি পাঁচতলার ফ্ল্যাটে আজ প্রথম দিন আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের অতিথি। তারই উপর তলায় থাকেন সমর সেন সপরিবারে। আজ বহু-

দিন পরে একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী-ভোজ আমাদের কপালে জুটল।

কামাক্ষীপ্রসাদ ক্যামেরায় ছবি তুলে থাকেন এবং এতে তাঁর নাম আছে। সম্প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মালিক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় মস্কোতে এসেছিলেন, কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর নানা অবস্থার ছবি তুলেছেন। কামাক্ষীপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য এই, তাঁর ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির বয়স কম দেখায়!

বাঙলা অনুবাদের কাজ নিয়ে কয়েকজন প্রীতিভাজন বন্ধুর পক্ষে এই ভাবে একান্তে প'ড়ে থাকাটা আমার কাছে খুব উৎসাহজনক মনে হয়নি। এ'রা বিশেষ শিক্ষিত এবং ভিন্নতর কর্মে যোগ্যতাসম্পন্ন। এ যেন এক প্রকার দিন-মজুরি,—কোনওমতে ক'রে খাওয়া! ওখানে ও'দের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীকে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, পয়সা দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও'দের কাছ থেকে আপন খুশি ও রুচিমাফিক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন!

বছর দুই পরে ও'দের কেউ কেউ ভারতে ফিরে এসেছেন শুনে খুশী হয়েছিলুম।

আমার এক ভাগ্নের বিয়েতে আমার ওপর পাত্রী পছন্দ করার ভার ছিল। আমি এই সর্তে রাজি হয়েছিলুম যে, কোন্‌দিন এবং কোন্ সময়ে 'মেয়ে' দেখতে যাব সেটি আগে বলব না। মেয়েকে দেখব তার সাধারণ পোষাকে, বিনা সাজ-সজ্জায় ও বিনা প্রসাধনে! আসর পাতবে না, জানলার নতুন পর্দা ঝোলাবে না, মেয়েটার মাথায় কৃত্রিম চুল দিয়ে বড় খোঁপা দেখানো হবে না, এবং মুখে পাউডার দেবে না। আমি আসল মেয়েটাকে দেখব!

একথা যখন শুনলুম, আজই সন্ধ্যায় 'এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সমাজকে' সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হবে, তখন একটু ভয় পেলুম। আমি দেখতে এসেছি, এবং অতর্কিতভাবে আগাগোড়া সবটা দেখে নিতে চাই! আদর অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে যে-দেখা, সে-দেখাটা সত্য নয়। সেটার মধ্যে আবরণ আছে, সেটা অকৃত্রিম নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আমার আন্তরিক ঔৎসুক্য এবং অনুরাগের সামনে তাঁদের সকল দরজা খুলে দেন, যেমন তাসকন্দের অধিবাসীরা দুই হাত বিস্তার ক'রে আমাদেরকে আকণ্ঠ ভালবাসার আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিল,—ও[illegible] সেইটি[illegible] অভ্যর্থনা! আমরা গিয়ে হয়ত [illegible] নতুন পর্দা ঝুলেছে, নতুন গালিচা এসেছে, ফুল দিয়ে ঘর সাজানো, বাড়ির দেওয়ালে পাউডার বুলানো। দাঁত দিয়ে কেউ হাসবে, ওজন ক'রে ভালবাসবে, সবিনয় করযোড়ে স্বভাবের স্বরূপকে ঢাকবে, এবং বাছা বাছা মিষ্টবাক্য নিয়ে আসরে নামবে! সর্বাপেক্ষা বিপদ এই, 'এশিয়া-আফ্রিকার' লেখকস্বরূপে যাঁরা আজ মস্কোয় উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের রচনা সোভিয়েট ইউনিয়নের অপরিচিত। সুতরাং অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো! ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও নয়, কোনও লেখককেও দেওয়া নয়,—দেওয়া হচ্ছে অমুক-অমুক দেশের এক-একটা দলকে! তার মধ্যে পড়ে 'ভারত' নামক একটা দেশ, একটা সংজ্ঞামাত্র। সে-দেশ থেকে যারা এসেছে তারা নাকি লেখক! কিন্তু ছাইপাঁশ কী লেখে জানা নেই!

আমাদের বেলাও তাই। এখানে এসে থেকে কথায়-কথায় যাঁদের নাম শুনেছি,—টিকেনভ, সফ্রোনভ, ফাদিয়েভ, পোলেভয়, সুর্কভ, বরোডিন, আলেক্সি, চেকভস্কি,—কই, সাত জন্মে এ'দের নাম শুনিনি! কিন্তু ওরা শুনেছে বাল্মিকী, বেদব্যাস, কালিদাস, রবিঠাকুর—আমরা শুনেছি পুশকিন আর টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি আর গোর্কি! তারপর ওরাও এগোয়নি, আমরাও খোঁজ-খবর করিনি। সুতরাং সর্বাধুনিক ভারতের সঙ্গে সর্বাধুনিক সোভিয়েট দেশের মন-জানাজানির চেষ্টাটা হল কানামাছির খেলা!

বিকালের দিকে আমাদের হোটেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার দিকে সবাই একত্র হয়ে ক্রেমলীনের দিকে অভিযান করব এইটি স্থির হয়েছে। রুশীয় লিপিতে অতি যত্নে এক-একখানি কার্ডে প্রত্যেকের নাম লিখে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন। কার্ডখানির উপরে সরকারি প্রতীক চিহ্নে সোনালিবর্ণে হাতুড়ি এবং কাস্তের ছবি আঁকা। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে ইদানীং হাতুড়ি এবং কাস্তের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে! কেননা এখন মেসিনে সর্বপ্রকার লোহা এবং ইস্পাতের কাজ হয়, এবং শস্যক্ষেত্রে ফসল কাটবার কাজে যন্ত্রচালিত গাড়ির ব্যবহারই চলু হয়েছে। আমার ধারণা, রুশ জাতি কিছু সংরক্ষণ-শীল[illegible] ওদের মনে নেই. কাস্তে-হাতুড়ি [illegible] [illegible]রা এগিয়ে গেছে।

হোটেলের কাজ সেরে সন্ধ্যাকালে যাবার আগে পকেট হাতড়াচ্ছিলুম, এটি বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন আমাদের দোভাষিনী শ্রীমতী লিডিয়া, যিনি আমাদের সকলের প্রতি নিত্যপ্রসন্না। তিনি একবারটি কাছে এসে বললেন, একটু দাঁড়ান্, যাবেন না,—এই ব'লে কোন্ দিকে যেন চলে গেলেন এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে দু' বাক্স সিগারেট এবং একটি নতুন দেশলাই এনে হাতে দিয়ে বললেন, পকেটে রেখে দিন্। এবার থেকে যখন সিগারেট দরকার হবে আমাকে বলবেন।—বলা বাহুল্য, আমার সিগারেট ফুরিয়েছিল।

কিন্তু আমি বলিনি। তিনি নিজেই প্রতিদিন দুটি দেশলাই এবং তিন চার বাক্স সিগারেট এনে আমার কাছে গচ্ছিত করতেন। এই মহিলা আপন সৌজন্য ও আতিথেয়তার গুণে ভারতীয় মহলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ, এ'র হাসি, কৌতুক, পরিহাস এবং বাক-চাতুর্যের মধ্যে কোনও অসংযত চটুলতা, বাঁকা কটাক্ষ এবং কূটনীতিক চাপল্য প্রকাশ পেত না। এ'র চারিদিকে একটি শুচি ও স্বাস্থ্যদায়ক আবহাওয়া ছিল। বাঙালীর অভিজাত মহলে এ ধরনের মেয়ে অচেনা নয়।

নতুনের বিস্ময়চমক আমার তখনও ভাঙেনি। আলোজনালা দূরবিস্তৃত রাজ-পথ একটির পর একটি পেরিয়ে কোথা থেকে কোন্‌দিকে যাচ্ছিলুম, কিছুই ঠাহর করার যো ছিল না। কিন্তু বাইরে বরফানি বাতাসের একটা তাড়না ছিল। হু হু করছে পথ। সেই পথ পেরিয়ে আমাদের কয়েকখানি গাড়ি একটি প্রকান্ড দুর্গপ্রাকারের প্রেতচ্ছায়ার নীচে দিয়ে ঢুকল। অনুমানে বুঝলুম আমরা একটি অনুচ্চ উপত্যকার উপরে উঠে এসেছি। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি মস্ত তোরণদ্বারের সামনে।

সোভিয়েটের বৈভব-প্রাচুর্যের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের অনেকটা পরিচয় ঘটেছিল। ক্রেমলিনের গ্র্যান্ড প্যালেসের তোরণদ্বারে ঢুকেই সামনে লাল মোটা মখমল বাঁধানো সোপান শ্রেণী দিয়ে উঠলুম প্রথম হলটিতে। শ্বেতকায় ইউরোপ গিজগিজ করছে চতুর্দিকে এবং হলের বিশালতার জন্য প্রত্যেক নর-নারীকে ক্ষুদ্রকায় মনে হচ্ছে। প্রথম

চোখে পড়ে, বর্ণবিদ্বেষ বিন্দুমাত্র নেই কোনও সাহেব-মেমের মুখে-চোখে। আমরা ইংরেজ আমলের লোক, ওটা মর্মে মর্মে জানি। প্রথম আমলের ইংরেজ ভারত জয় করতে ব্যস্ত ছিল,—তখন আমরা অতটা 'ঘৃণ্য' হয়ে উঠিনি। দ্বিতীয় আমল আরম্ভ হয় 'সিপাহী বিদ্রোহের' পর থেকে। তখন ঘৃণা শুরু হল! তৃতীয় আমল, দিল্লী দরবারের পর ঘৃণার সংগে এল ঘন বিদ্বেষ! এখানে এই ক্রেমলিনের মধ্যে ঘৃণা কোথাও নেই—চোখে মুখে ভঙ্গীতে আচরণের আভাসে প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছলিত! করমর্দন শুধু নয়, হাত ধরে টানা, কাছে নিয়ে কথা, গলা জড়িয়ে গলগলিয়ে আলাপ। এটা কি রাজনীতি? নিজেদেরকে লোকচক্ষে প্রিয় ক'রে তোলার এ কি একটা নূতন আয়োজন? এটা কি লোক-দেখানো, মন-ভোলানো, বন্ধু-পাতানো? কমিউনিজম্ থাক্, ও আমি বুঝিনে! বিভিন্ন 'সোস্যাল সিস্টেমের' সহাবস্থান,—ওটাও থাক্ আন্তর্জাতিক কচকচির মধ্যে! আমি দেখতে এসেছি মানুষ এখানে পুতুল ছাড়া আর কিছু কিনা, এক ছাঁচে ফেলা কিনা, চলন্ত শবদেহ কিনা!—আমি দেখতে এসেছি তাদেরকে যারা আধুনিক জগৎসভায় ধিকৃত, নিন্দিত, লাঞ্ছিত, ও অপমানিত—সেই সব তথা-কথিত বাক্যহারা, স্বাতন্ত্র্যহারা, স্বাধীনতাহারা 'মূঢ় ম্লান মূক' কুড়ি কোটি আবালবৃদ্ধবনিতাকে! কোথাও কেউ এখানে অভ্যর্থনা না জানালে আমার পক্ষে কোনও দুঃখের কারণ নেই,—আমার নিজের প্রাণসমস্যার তাড়নায় এখানকার জনসমুদ্রের তলায় আমি তলিয়ে যেতে চাই!

এশিয়া-আফ্রিকার মোটামুটি শ'দুই লোক এসেছে। নিকট প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ ও সুদূর প্রাচ্য—কেউ বাকি নেই। কিছু ইংরেজ-আমেরিকান-ফরাসী-গ্রীক ইতালিয়ান-জার্মান ইত্যাদি সাংবাদিকও উপস্থিত। এই কক্ষ থেকে ঘুরে আমরা ক্রেমলিন দরবারকক্ষে উপস্থিত হলুম। সেটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্বেতপ্রস্তর সমাকীর্ণ—তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা, তার সম্পদ এবং বৈভব—যে কোনও জাতিকে অভিভূত করতে সমর্থ। আমি নিজে এসেছি হাজার হাজার মর্মর প্রাসাদের দেশ থেকে! আমি এসেছি গোয়ালীয়র জয়পুর মেবার যোধপুর দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ চিদাম্বরম, কাঞ্জি-ভরম, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম—সব নগরের পথ মাড়িয়ে। কিন্তু তবু এখানকার চারিদিকে আশ্চর্য দৃশ্য। আমি দেখছি প্রায় সাত আটশ' বছরের রাজন্যের ইতিহাস,—দেখছি তাদের আশ্চর্য ও অনবদ্য রুচি। দেখছি তাদের রসবোধ, শিল্পকলাবোধ, কারু ও চারুশিল্প সৃষ্টির মধ্যে অনন্য-সাধারণ মাত্রাবোধ! আমি দেখছি কিংবা মনে মনে গ্রাস করছি বলা কঠিন। আমি এখানে একক, নিঃসঙ্গ, নিরুদ্বেগ, নিশ্চেষ্ট,—বোধ হয় অনেকটাই নির্বিকার। আমি অজ্ঞাত, অখ্যাত,—আমার নাম ধাম পরিচয়,—সমস্তটাই অন্ধকারে ঢাকা।

পৃথিবীর নানান দেশের রাষ্ট্রদূতেরা উপস্থিত। ভারতীয় দূতাবাসের অধিনায়ক কে-পি-এস মেনন এসেছেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। অগণিত সংখ্যক সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান ঘিরে রয়েছেন চারিদিক থেকে। প্রাসাদের সেই বিরাট হর্মকক্ষ জনপরিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার মদের পাত্র শত শত লোকের হাতে ঘুরছে। ক্রেমলিনের প্রাসাদকক্ষ মদের গন্ধে যেন আতুর হয়ে উঠেছে!

এমন সময় ভিতরের একটি পথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ তাঁর এগারোজন সহকারী মন্ত্রী সংগে নিয়ে শান্ত হাস্যে বেরিয়ে এলেন। ভিড়ের ভিতর দিয়ে খর্বকায় মিঃ মিকোয়ানকে চিনলুম। অন্য কারো কারোর ছবি কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে। ও'দের মধ্যে সংস্কৃতি-মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভকে জানতুম—কলকাতায় লেডি রেণু মুখার্জির বাড়িতে ও'র সংগে দোভাষীর সাহায্যে আলাপ হয়। ও'দের মধ্যে বুলগানিন,মালেনকভ, কাগানোচিভ, মলোটভ নেই—প্রথম তিনজন 'নোংরা' পলিটিক্সের অভিযোগে অপসৃত হয়েছেন! ও'দের পোষাক যেমন-তেমন, কা'রো কা'রো নেকটাই নেই, কা'রো কোটের বোতাম খোলা, কারো পোষাক যথেষ্ট ধোপদস্ত নয়, দাড়ি আছে বুঝি দু'একজনের, অন্যরা প্রত্যেকে উপযুক্তভাবে ক্ষৌরি হয়ে এসেছেন কিনা লক্ষ্য করছিলুম। মিঃ খ্রুশ্চভ নেকটাই নেননি, কালো একটি কোট চড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন। উনি একটু মোটা, একটু বেঁটে, চোখ দুটি একটু ছোট, মাথায় প্রায় সমস্তই টাক, পিছন দিকে শাদা ধানের মতো ছাঁটা চুল। কিন্তু দুগ্ধ-রক্তিম বর্ণের জন্য শাদা চুল চোখে পড়ে না। মনে হচ্ছে ও'রা যেন একটু আগে জটিল রাজকর্মের পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। কৌতুকের বিষয় এই, ও'দের মধ্যে একজনও বোধ করি ইংরেজি ভাষা জানেন না।

সভাস্থল কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিশ্চল এবং নিশ্চুপ। সেই আমাদের পরিচিত দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানা রুশ পক্ষ থেকে এবার আহ্বান করলেন, ভারতীয়রা এবার এগিয়ে আসুন!

পলকের মধ্যে কী যেন ঘটল! কে যেন আমাকে ঠেলছে পিছন থেকে এবং আমি যেন চাপের মধ্যে পড়েছি! তারপর সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে পাশ থেকে জনতিনেক ভারতীয় আমাকে সোজা ঠেলে দিলেন 'রয়াল রাশিয়ান টাইগার' মিঃ খ্রুশ্চভের সামনে। যন্ত্রচালিতবৎ আমার অর্ধচেতন দেহখানা পৃথিবীর অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তার ঈষৎ খর্বদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এবং আমার ঠাণ্ডা হাত যখন তাঁর উষ্ণ হাতের মধ্যে ঢুকল, তিনি মধুর হাস্যের সংগে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, "নমস্তে।" ভারতীয় শব্দটি শুনে আমি খুশী হলুম।

আমি কি কারণে ওইটুকু সময়ের জন্য ভারতীয় দলের মুখপাত্র হয়ে উঠলুম আজও জানিনে। কিন্তু মিঃ খ্রুশ্চভকে তখনই শ্রীমতী অকসানার সাহায্যে বললুম, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, এবং তিনি যখন কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে মাঝপথ থেকে পুলিশের গাড়িতে 'বন্দী' করে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মিঃ খ্রুশ্চভ কি যেন ভেবে সহসা মধুর হাস্য ক'রে উঠলেন। পরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাহলে বাকিটা আমি বলি। অতবড় অভ্যর্থনা নেহরুর ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও আমি পাইনি! হ্যাঁ, ঠিকই ত! কলকাতার লোকের কী ভালবাসা, কী আগ্রহ। আমরা অভিভূত হয়েছিলুম!

শ্রীমতী অকসানা মিঃ খ্রুশ্চভের বক্তব্যগুলি বিশেষ যোগ্যতার সংগে আমাদের নিকট ধরছিলেন। সংখ্যাতীত ক্যামেরা দুই পাশ থেকে অশ্রান্তভাবে ক্লিক শব্দটি করছিল! আমি এবার পিছিয়ে এলুম। মিনিট তিনেকের জন্য একটি বিশেষ সম্মান লাভ করলুম বটে, কিন্তু নিজকে কেমন যেন বেকুব এবং অকিঞ্চন মনে হতে লাগল! চক্ষে ঝাপসা এবং কানে যেন তালা লেগে গিয়েছিল! ভারতের পক্ষ থেকে মুলকরাজ আনন্দ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন।

পরিশেষে মিঃ খ্রুশ্চভ বহু ব্যক্তিকে স্বহস্তে মদের গেলাস 'অফার' ক'রে আনন্দের সম্মেলনটিকে মুখর করে তুললেন এবং একটি টাইপকরা সংবর্ধনা পাঠের পর সকলকে আমন্ত্রণ করলেন ভিন্ন একটি কক্ষে মঞ্চোপরি নৃত্যগীতের আসরে।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন

কমল চৌধুরী

বাঙলা নাট্য সাহিত্যের উন্মেষযুগ ছিল বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত। এ প্রভাবই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের শিল্পী স্বভাবের সার্থকতা লাভের পথে ছিল প্রতিবন্ধক। দীনবন্ধু রামনারায়ণ প্রভৃতির নাটকগুলি থেকে এ সত্য কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। এ প্রভাব অবশ্য কেবলমাত্র প্রথম যুগেই বর্তমান ছিল; পরবর্তী কালে নাট্য জগতে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা এক অভূতপূর্ব যুগান্তর আসে। সেকালের অধিকাংশ নাটকের প্রসাধনকলায় যথেষ্ট নৈপুণ্য থাকলেও ভাষার অস্বাভাবিকতা ও জড়ত্ব নাটকীয় রসস্ফুরণে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এমনকি প্রাণহীন হয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু প্রহসনগুলির মধ্যে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেখানে পরিচিত জগতের মানুষ তাদের ভাষা ও পরিবেশকে নিয়ে সমুপস্থিত। প্রহসনকারগণের বাস্তবধর্মী চেতনা কল্পনা জগতের লীলাবিহারে আর কষ্ট-কল্পিত ভাষাজালে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। প্রকৃত বাস্তবজীবনের হাস্যপরিহাসমুখর সংকট বিকৃতি অসামঞ্জস্যের জগৎ রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাদের রসাবেদন একালেও কিছুটা অম্লান।

মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালেই বাঙলা নাট্য সাহিত্যের জন্ম। দেশের শিক্ষা জগতে পাশ্চাত্য জগতের ধারা যে নবজোয়ারের প্লাবন নিয়ে এল তার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হল এক নব-জাগ্রত সম্প্রদায়। তারা চাইলেন সমাজকে নতুন করে সাজাতে, শিক্ষা বিস্তার, নারীর মুক্তি সাধন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা দান, জীর্ণপ্রায় সমাজের সর্বোবিধ পরিবর্তন। কিন্তু রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গে সুরু হল পালাবদলের সংগ্রাম। সে সংগ্রামের ছাপ পড়ল সাহিত্যের বরণ ডালায়। প্রহসনকারগণ অপূর্ব বিষয়বস্তু পেলেন সেই উত্তপ্ত সংগ্রামের মধ্য থেকে। তাই তাদের সৃষ্ট ফসল নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যহীন না হলেও তার মধ্যে যে মুক্ত হাস্যরসধারা পরিস্ফুট, তার উজ্জ্বলতা একালের মানুষের চোখে ধরা পড়ে। এই নাট্য-কারদের নাটকগুলির আবেদন যেখানে সর্বজনীনতা বা সর্বকালীনতা লাভ করতে পারেনি, সেখানে প্রহসনগুলি প্রয়োজনীয়তা আর উদ্দেশ্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কালসীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকেনি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং মধুসূদন দত্ত এ তিন প্রতিভাধর নাট্যকার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী। এ তিনজনের লেখনী সম-কালীন জীবনাশ্রিত ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্য, বিকৃতিকে ক্ষুরধারে ব্যঙ্গ ও রহস্যপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে ক্ষমাহীন ও নির্মমভাবে রূপায়িত করেছে। দীনবন্ধুর হাস্যরস গ্রাম্য জীবনের নানাবিধ কৌতুক ও হাস্যমুখরিত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অবশ্য "সধবার একাদশী"তে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার্থক অনুকারী সমাজের বিকৃত রুচির পরিচয় মেলে। রাম-নারায়ণের হাস্যপ্রিয়তা বন্ধনসংকুল জীবনাবর্ত হতে উচ্ছল ধারায় উৎসারিত। প্রহসন রচনা ক্ষেত্রে মধুসূদন এলেন এঁদেরই স্মরণ করে। তবুও মধুসূদন পাশ্চাত্য ছাঁচে ফেলে ও বিষয়-বস্তুর অভিনবত্ব সাধন করে কৌতুকরস সৃষ্টিতে স্বীয় প্রতিভার সার্থকতা প্রমাণ করলেন। তাঁদের রচনাশৈলীর যে পার্থক্য তা শিল্পীমাত্রেই ঘটে থাকে।

এর পরেই আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রাগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। "হিন্দুমেলা প্রবর্তিত নাগরিক বাংলায় যৌথ জীবনভাবনা প্রথম সার্থক নাটকীয় মুক্তি পেয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের রচনায়।" জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের পরিশীলিত মন ও বাগ-বৈদগ্ধ নাট্য রচনার ধারায় যে নতুন ইতিহাস সংযোজিত করল তার দ্বারা সম্ভব হল "দুর্লভ আঙ্গিক চেতনা এবং স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন প্লট" ও সার্থক সংলাপ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একটি অভিজাত মন ও জগতের অধিবাসী। তাঁর চিন্তাজগত ছিল রুচিশীল, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্নশালীনতা বোধের অধিকারী। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলেই তাঁর শৈল্পিক মনভূমিতে এই মার্জিত ও দুর্লভ প্রতি-ভার উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল।

যুগপ্রভাবে বাত্যাতাড়িত নবোদ্ভূত সমাজের রোমান্টিক কল্পজগতের প্রতিচ্ছবি মেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন গুলির মধ্যে। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক এ সমস্ত চরিত্র আমাদের জীবনাশ্রিত সংস্কারবৃত্তি আর সমাজের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ভূত হয়নি। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের হাস্যরস পূর্ববর্তী প্রহসনকারগণ পরিবেশিত হাস্যরস অপেক্ষা বহু গুণে ভিন্ন। সাধারণ সরল জীবনযাত্রার মাঝখানে যে জটিলতা আর সেই জটিলতার অন্তরালে প্রবাহিত যে কৌতুকরসধারা তা তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিতে ধরা দিয়েছিল নিখুঁত ভাবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা চরিত্রের দোষত্রুটি অসামঞ্জস্য আর বিকৃতির স্বরূপ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেও কোন সম্প্রদায় বা চরিত্রের ওপর আঘাত সৃষ্টি করে না। এইখানেই তাঁর "হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সর্বকালীনতা এবং সর্বমানবিকতা।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিত জলযোগ' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খৃঃ। তাঁর চিন্তাজগৎ তখন ছিল রক্ষণ-শীল মনোভাবাচ্ছন্ন। কেশবচন্দ্র সম্প্রদায় নারী জাতির স্বাধীনতার স্বপক্ষে যে প্রচার শুরু করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মন সেই স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী ছিল। সেইকারণে স্ত্রী স্বাধী-নতার আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয় এ নাটক। পরে অবশ্য তাঁর চিন্তাজগতের পরিবর্তন হয় এবং এই নাটক রচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এই প্রহসনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। যে কাহিনী

অবলম্বনে হাস্যরস ও বিদ্রূপের প্রকাশ তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু পাওয়া দুষ্কর। এ ধরণের চরিত্র সকল যুগেই মেলে। এমনকি উদ্দেশ্যমূলক ও তীব্র বিদ্রূপাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এর শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যপ্রিয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবেই নয়, বাঙলা প্রহসনের মধ্যে অন্যতম হিসাবে "অলীকবাবু" উল্লেখ্য। প্রতিটি টাইপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে নিগূঢ় হাস্যরস প্রবাহিত তার দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর শ্লেষ বা আঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। এ রকম নির্মল হাস্যের চরিত্রের মধ্যে অতিরঞ্জনের মাত্রাধীক্য আমাদের মনে চরিত্রের অবাস্তবতা বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করলেও আনন্দ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যাঘাত করে না। কারণ অসামঞ্জস্য আর অতিরঞ্জনের মধ্যেই সার্থক হাস্যরস ধরা পড়ে। অলীকপ্রকাশ ও হেমাঙ্গিনী চরিত্র আজও সম্ভব। অলীক প্রকাশের মিথ্যা কথনের পরিমাণ যেমন অফুরন্ত, তেমনি জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছায়া সম্পন্ন হওয়ায় অলীকপ্রকাশ সার্থক হয়ে উঠেছে অতিরঞ্জনের গুণে। হেমাঙ্গিনীর রোমান্টিক নায়িকারূপে নিজেকে কল্পনা করা বাঙলা সাহিত্যের দরবারে চির অম্লান হয়ে থাকবে সার্থক চরিত্র সৃষ্টির গুণে। প্রহসনটি প্রথমে "আর করবো না" নামে ১৮৭৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়। পরে নামকরণ হল "অলীকবাবু"—এইটিই সঠিক নামকরণ। রবীন্দ্রনাথ বহুবার অভিনয় করেছেন নাম ভূমিকায়। সেকালে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক প্রহসন "হিতে বিপরীত"। হিতে বিপরীতের কাহিনী চিরপুরাতন হয়েও চির নতুন। বিয়ে পাগলা বুড়ো সে যুগে যেমন মিলত তেমনি এ যুগেও মেলে। রচনার সৌকুমার্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং পরিহাস উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছে। "বিয়ে পাগলা বুড়ো"র কাহিনীর সঙ্গে এর মিল আছে। তবুও দুটি নাটকের নায়কের মূল পার্থক্য হচ্ছে "রাজীব সেকালের সমাজের প্রতিনিধি, ভজহরি সর্বকালীন বিয়ে পাগলা কৃপণের অতিরঞ্জন সংস্করণ।" নাট্যকারের সুমার্জিত রুচি নাটকীয় পরিণতি সাধনে বিস্ময়করভাবে সার্থক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিখ্যাত ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েরের "লে বুর্জোয়া জাতিয়ম" ও "মারিয়াজ ফোর্সে" অবলম্বনে যথাক্রমে "হঠাৎ নবাব" ও "দায়ে পড়ে দারগ্রহ" স্বাধীন অনুবাদ করেন। বিজাতীয় গন্ধ এর মধ্যে খুব কমই চোখে পড়ে। মৌলিক নাট্যসৃষ্টি এ দুটি নয়। কিন্তু এ সত্য অবিসংবাদীরূপে স্বীকার্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা এখানেও পরিস্ফুট।

প্রহসন রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়েরের দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম মোহ তাঁকে দিয়েছিল মলিয়েরের সাহিত্যকৃতির নিকট সংসর্গ। সেখানেই তাঁর সাহিত্যদর্শন গড়ে ওঠে। করুণরস আর হাস্যরস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক হওয়া সম্ভব নয়। মলিয়েরে এ দুয়ের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যকৃতি চিরন্তনতা লাভ করেছে—আজও সে প্রতিভা সমাদৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এ দুয়ের সার্থক সমাবেশ না ঘটলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। মলিয়েরের হাস্যরস সৃষ্টির অপর বিশেষ দুটি গুণ তাঁকে সর্বজনীনতা দিয়েছে। প্রথমটি দ্বন্দ্বময় জীবনের অন্তরালে কৌতুকরসের যে ধারা প্রবাহিত তার সীমান্ত রেখায় করুণরস সঞ্চার। দ্বিতীয়টি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি—যার আবেদন সর্বযুগে স্বীকৃত। মলিয়েরের সৃষ্ট চরিত্রগুলি দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এ দুয়ের সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর প্রহসনগুলি এ যুগেও জনমানসে প্রভাব রাখতে সক্ষম। সুউপযুক্ত সংলাপ সৃষ্টির গুণে তাঁর প্রহসনগুলি সার্থক। আর পরিবেশ সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে যে হাস্যময় জগতের সৃষ্টি করেছেন তা পরশুরামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু যখন দেখি একালের সমালোচক বলছেন, "তাঁহার রচিত প্রহসন কয়খানি নিতান্তই প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইবে" তখন সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। নাটকের সংজ্ঞা, সার্থকতা কোথায় এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাল পরিধির মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির প্রয়োজনীয়তা আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। একালের নাট্যমঞ্চে যখন নাটকগুলির সার্থক প্রয়োগ দেখি তখন একমাত্র মনে হয় এ ধরণের টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করা একমাত্র শক্তিশালী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। আর সে ক্ষমতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছিল।

।। ঋণ-স্বীকার ।।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত।
বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—অজিত ঘোষ।
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ২য় পর্যায়—ভূদেব চৌধুরী।
বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—আশুতোষ ভট্টাচার্য।

মতামত
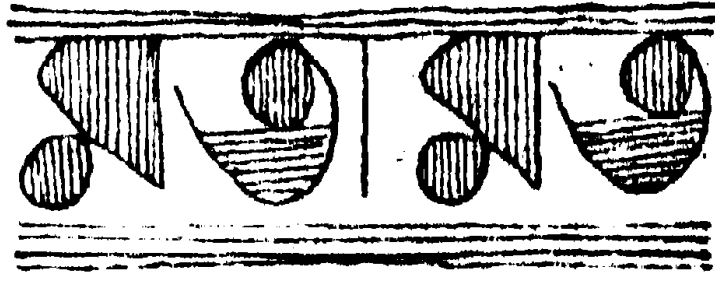
"লোক সংগীত ও শিল্পী-সমাজ" প্রসঙ্গে

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

আজ ১২ই জানুয়ারী সংখ্যার 'অমৃত' পত্রিকায় "লোকসংগীত ও শিল্পীসমাজ" শীর্ষক আলোচনায় শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহোদয় যে প্রসংগ উপস্থিত করেছেন তাঁর দৃষ্টির মধ্যে নিঃসন্দেহে লোকসংগীত শিল্পী-গায়কগণের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে, কিন্তু বিচারের দিক থেকে বড় রকমের একটি ফাঁক রয়েছে। শহরের আলো ও মাইকের আসরে পল্লীগানের শিল্পী আর সুদূর গ্রামের কোলে গ্রামবাসীদের নিজস্ব গায়কশিল্পী—এ দু'য়ের জাত আলাদা। আলাদা বলছি এই কারণে, শহরের মঞ্চে লোকসংগীতের শিল্পীদের

লেখক যা দিয়ে বিচার করেছেন, সে হল ধীরেন্দ্রবাবুর কথায় "আলোকিত মণ্ডপের মধ্যে সহস্র লোচনের সামনে শিল্পীরা গেয়ে আনন্দ পান পারিশ্রমিকও মন্দ মেলে না।" গ্রাম কিন্তু কোনদিনই পারিশ্রমিকের মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব গুণীকে বিচার করেনি বা দেখেনি। গ্রাম তার গুণীকে বিচার করেছে প্রাণে, অর্থাৎ গ্রামবাসীদের মরমে মরমে গুণীর দান বয়ে চলেছে। এবং এখানেই পল্লীর নিজস্ব সম্পদ বেঁচে আছে, যার কোন খাতা নেই, মুদ্রিত বইও নেই। রবীন্দ্রনাথের "লোক-সাহিত্য" অন্তর্গত 'গ্রাম সাহিত্য' রচনায় এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা আছে।

শহরের মঞ্চে যখন লোকসংগীতের অনুষ্ঠানে গায়ক এবং গায়িকাদের খাতা খুলে হারমোনিয়মের ওপর রেখে পল্লী-গীতি গাইতে দেখি, তখন আমার মনে পড়ে পদ্মানদীতে অথবা নদীর চরে বহু গায়ক এবং গায়িকাদের কথা। তাঁদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি; তাঁদের অধিকাংশই নাম স্বাক্ষর করতে পারতেন না। অথচ তাঁদের গানের আসরে সারাদিন ও রাত্রি শ্রোতারা কোঁচড়ের গিট্ খুলে চিড়া খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে গান শোনেন। এই যে গ্রামের গায়ক, এই যে পল্লীর শিল্পী এ'রা কিন্তু কোনদিন শহরের আলোকিত মঞ্চের শিকলে বাঁধা পড়েননি, অথবা চাইবেনও না—এ'দের জীবনে অর্থের কোন দাম আছে বলে মনে হয় না (পারিশ্রমিকের উল্লেখ বাহুল্য)। বাস্তবিকপক্ষে এ'রা গানের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি, যে আনন্দের প্রভাব উপলব্ধি করেন তাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করে শহরের চোখে ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনযাপন করেন। সুতরাং এই বনের পাখিদের শহরের আলোকিত মঞ্চের খাঁচায় বেঁধে রাখবার প্রয়াস যথার্থ নয়। এদের গানে যে মৌলিকতা রয়েছে সেটা পল্লীর মাটিতে বিশুদ্ধ খাঁটি। শহরে গেলেই সেটা আর বিশুদ্ধ থাকে না। কথা ও সুরে কমার্শিয়েল ভিয়েন মেশাতে হয়। অর্থাৎ আধুনিক, রম্যগীতি ইত্যাদি সত পাঁচ গানের পাশে এই পল্লীগানেরও 'লোক-সংগীত' নামে একটা পোষাক প'রে নিতে হয়। গ্রামের খোলা মাঠে বা গৃহস্থের উঠোনে এর কোনো আবশ্যক থাকে না। সেখানে শ্রোতা প্রাণের তন্ত্রীতে গানের ভাব গ্রহণ করে, দীর্ঘকাল সে গান শ্রোতার স্মরণ থাকে, কাজের ভিতর সামান্য অবসরে গুণ্ গুণ্ করে অথবা কয়েকজন একত্রে বসে সেই গানে গলা মেলায়। শহরের ক্ষেত্রে ঘটে এর বিপরীত। ধীরেন্দ্রবাবু ঠিকই বলেছেন, 'যেই আলো নিভে যায়, লোক চলে যায়, চারদিক অন্ধকার হয়, তখন গায়কদের (কিছুক্ষণ পূর্বে যাদের কণ্ঠে লোক-সংগীতের ছেলে-বুড়ো সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন) কথা সবাই ভুলে যান।"

সরকারের অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অর্থে শিল্পীদের সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনের দায়িত্বের কথা ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহোদয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটা শহরের শিল্পীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেখানে পল্লীর জীবন-শিল্পীদের স্থান দেখছি না এবং আবশ্যকও দেখছি না। ফকির, বাউল এদের জীবন থেকেই এ কথা বলছি। এদের জীবন হচ্ছে সাধনার এবং এদের অন্ন বাড়ী বাড়ী ঘুরে সংগ্রহ করতে হয়, নারায়ণ তাদের প্রতি ঘরে; রাজা-জমিদারের ধার তারা কোনদিন ধারেনি অথবা আজকের রাজ্য সরকারের দপ্তরে ভরণপোষণের দরখাস্ত পেশ করেনি বা আন্দোলনও তোলেনি। বাঙালী সংস্কৃতির ধারক পল্লীর সাধক জীবন-শিল্পী আর শহরের পেশাদার শিল্পী দুই এক নয়। আজকাল বেতারে লোক-সংগীত যাঁরা পরিবেশন করছেন অনেকেই দেখছি সকালে ভজন, সন্ধ্যায় আধুনিক ও রাত্রে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন। শিল্পী হিসাবে এ'রা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়। তথাপি এ'দের ওপরই যে বাঙালী সংস্কৃতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল তা বলা চলে না। বাঙলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র বাঙলার পল্লীগ্রাম। সেখানে জীবনশিল্পী বহু যুগ ধরে যে ট্র্যাডিশনের ওপর নির্ভর করে চলেছেন,

সেই ট্র্যাডিশনের ওপরই থাকবেন। তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পথ থেকে টেনে এনে শহরের পেশাদার শিল্পীদের পাশে বসিয়ে বিচার করা যাবেনা। কেননা তাঁদের এই সংস্কৃতি "পারিশ্রমিক" কাঙাল নয়, সে প্রাণের কাঙাল। এই প্রাণের স্পর্শ সে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা নিজের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। এবং কবি সেই পল্লী-সংস্কৃতির খনি থেকে পেয়েছিলেন স্বদেশী গানের সুর। আর সেইজন্যেই 'স্বদেশী গান' জাতির মর্মস্থলে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। ইতি,—

শ্রীবীরু সরকার, বারাসাত।

১২-১-১৯৬২

আগাথা-ক্রিস্টি

কণাদ চৌধুরী

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উৎসবদীপ নিভতে না নিভতেই ভারতবর্ষে আরেকটি শতবার্ষিকী শেষ হল। গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের দেশে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব শতবার্ষিকীর আয়োজন হয় এবং এই উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছিলেন স্বনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাত্র মালওয়ান স্বস্ত্রীক। কিন্তু সাধারণ্যে মালওয়ানের স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা অধিক পরিচিতা। এমন কি বলা যায় শ্রীমতী আগাথা ক্রিস্টির সংগেই যেন আসেন শ্রীযুক্ত মালওয়ান। বাস্তবিক গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকদের কাছে আগাথা ক্রিস্টির পরিচয় জ্ঞাপন প্রায় বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের খুব কম খবরই তাঁর পাঠকরা রাখেন।

ক্রিস্টির কুমারী নাম আগাথা ম্যারী ক্লারিসা মিলার। তিনি জন্মেছেন ডিভনশায়ারের টর্বেতে। ইংলণ্ডের কাউন্টিগুলোর মধ্যে ডিভন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। আগাথার বাবা ফ্রেডারিক আলভা মিলার ছিলেন নিউইয়র্কের লোক। কিন্তু বাল্যকালেই বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। মার স্নেহই ছিল তাঁর বাল্য-কৈশোরের একমাত্র অবলম্বন। মা ছিলেন বুদ্ধিদীপ্তা মহিলা। মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই তিনি গল্প কবিতা লিখতে প্ররোচিত করতেন। বাড়ির মধ্যে আগাথা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা এবং নিঃসংগ। নিজের চারদিকে একটি কোমল কল্পনার জগত এঁকে ভালবাসত ছোট মেয়েটি। কল্পনার অলীকসংগীদের সঙ্গে সে খেলত এবং সেইসব ছায়া-হরিণের দল তার রক্ত মাংসের বান্ধবীদের চেয়েও একান্ত আপন ছিল।

ষোল বছর বয়সে আগাথাকে প্যারিসে সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয় কিন্তু কন্ঠস্বরের বিশ্বাসঘাতকতায় হতাশ হয়ে সঙ্গীত সাধনায় ইস্তফা দিতে হয় তাঁকে। মার সঙ্গে কায়রোতে বেড়াতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন আগাথা। ইতিমধ্যে এদিকে ওদিকে কয়েকটি গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে বিয়ে করেন আগাথা। যুদ্ধের কাজে স্বামীকে থাকতে হত ফ্রান্সে। সময় কাটাতে টর্বের একটা হাসপাতালে চাকরী নিয়েছিলেন আগাথা। এই সময়েই বোনের সংগে একরকম বাজী রেখেই তিনি তাঁর প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস "দি মিস্টিরিয়াস এ্যাফেয়ার এ্যাট স্টাইলস" লেখেন। কিন্তু উপন্যাসটি প্রকাশ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে। পরপর কয়েকজন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর বডলে হেড প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে লেখাটা পাঠানো হয়। অনেকদিন পর্যন্ত কোনো খবর পাওয়া গেল না প্রকাশকপক্ষ থেকে। অবশেষে এক বছর পরে আগাথা মনোনয়নের আনন্দসংবাদটি পেলেন। এবং সেই থেকেই গোয়েন্দা কাহিনীর স্বর্গে আগাথা ক্রিস্টি ইন্দ্রাণী।

১৯২৮ সালে কর্ণেল আর্চিবোল্ড ক্রিস্টির সংগে আগাথার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং দু'বছর পরে পুনর্বিবাহ হয় তাঁর বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাত্র মালওয়ানের সংগে। প্রত্নতত্ত্বের কাজে স্বামীর সংগে বছরের কয়েকমাস তাঁকে সিরিয়া এবং ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হত। ছবি তুলে স্বামীর গবেষণায় সাহায্যও করতে হত আগাথাকে সময়ে সময়ে। এবং কোনো কাজ না থাকলে লেখা নিয়ে বসতেন তিনি। মরুভূমিকে ভীষণ ভাল লেগেছিল তাঁর। সিনেমা, থিয়েটার, বাড়ি এবং বাগানহীন নিরাভরণ মরুভূমি তাঁর মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাইরের খাঁ খাঁ শূন্য হাওয়া তাঁকে রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে টানত এবং মরুভূমিকেই যেন টেবিল করে লিখে আনন্দ পেতেন তিনি। আগাথার আরেকটি অদ্ভুত আনন্দ ছিল। বাড়ি কেনার বাতিক ছিল তাঁর। বাড়ি কিনে কিন্তু বাড়িটা আমূল বদলে ফেলতেন, সাজাতেন মনের মতন, বাস করতেন কিছুদিন, তারপর সমস্ত মায়া কাটিয়ে বিক্রী করে দিতেন। অবশ্য এই বিত্তশুল্ক বাতিকের জন্যে বিত্তের প্রয়োজন কম হত না কিন্তু সৌভাগ্যের অকৃপণ করে এই ধরণের "ছোট খাটো" সখ মেটানোর জন্যে বিত্তের অভাব কোনোদিন ঘটেনি তাঁর।

গোয়েন্দা কাহিনীর জগতে আগাথা ক্রিস্টি প্রথম নাম। তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই জনপ্রিয়তায় একমেব। এবং আজকের দিনের বাণিজ্যিক মূল্যযুক্ত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে তাঁকে অদ্বিতীয় বললেও সম্ভবতঃ বাড়িয়ে বলা হয় না। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা নায়ক হারকিউল পয়োরো অবিস্মরণীয় শার্লক হোমসেরই উত্তরসূরী। ফিটফাট কেতাদুরস্ত সেই ছোট্ট বেলজিয়ান লোকটি তাঁর প্রবল ইংরেজী বিতৃষ্ণা এবং এক মুখ মোমঘষা গোঁফ নিয়েও ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চলের একটি অপ্রতিহত চরিত্র। গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকগোষ্ঠীদের মতে ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠ রহস্য গ্রন্থ "দি মার্ডার অব রোজার এ্যাক্রয়েড।" ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়িত "উইটনেস ফর দি প্রসেকিউশন" জনপ্রিয় হবার মূলে কাহিনীর অবদান অসামান্য। অনেক সমালোচক অবশ্য আগাথার কাহিনী-গ্রন্থন পদ্ধতির ওপর তেমন সন্তুষ্ট নন। তাঁদের মতে লেখিকার প্রায় অধিকাংশ কাহিনীর অপরাধীরা হলো তারা যাদের সবচেয়ে কম সন্দেহ করা হয়। গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে গিয়ে, আগাথা সন্দেহভাবহীন লোকদের এতবেশী ব্যবহার করেছেন যে, তাঁর ভক্ত পাঠকরা সহজেই অপরাধী ব্যক্তিটিকে সহজেই সনাক্ত করে ফেলতে পারেন। হারকিউল পয়োরোর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে গোয়েন্দা কাহিনীর রসিকদের। পয়োরোর অনুসন্ধান পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে অনুভূতির হাতই সার্বভৌম। কিন্তু সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে পৃথিবীর অঙ্গুলিমেয় সার্থক গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আগাথা ক্রিস্টি অন্যতমা।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যাপারটা সাহেবের কানে তুলতে হল। তিনি ফাইল পড়ছিলেন, পড়েই চললেন। ডেপুটি জোর দিয়ে বললেন, এই ম্যাল্‌প্রাকটিস অনেক দিন থেকে চলছে।

—জানি।

ডেপুটি সুপারের বিস্ময়ের অবধি রইল না। জেনেশুনেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত একজন দায়িত্বশীল অফিসার কি করে এতদিন চুপ করে আছেন, তাঁর বোধগম্য হল না। বললেন, এগুলো স্যার এখনই বন্ধ করা দরকার।

—'সে চেষ্টাও করেছি', মাথা না তুলেই বললেন ঘোষসাহেব। 'টেলর মাষ্টারকে গোটাকয়েক পানিশমেন্টও দিয়েছি। ওর সার্ভিস-বুক খুলে দেখবেন। তারপর কী হল, জানেন?' (এবার তাকালেন তাঁর ডেপুটির দিকে) 'সব স্টাফ্ একদিন সার দিয়ে দাঁড়াল এসে ঐ গেটের মাঝখানে। বলল, "স্যার দোষ আমাদের সকলেরই। ও বেচারা একা কেন শাস্তি পাবে? আমাদেরও পানিশমেণ্ট দিন।" আমি চুপ করে রইলাম। একজনের হাতে ছিল পে-লিস্ট-এর খাতা। এগিয়ে এসে খুলে ধরে বলল, "শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। যা দেবেন মাথায় পেতে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে। এই দেখুন মাইনের স্কেল। বলুন, এ দুর্দিনে একটি ভদ্র পরিবারের এ দিয়ে কেমন করে চলে।"

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন সুপার সাহেব। ক্ষণিক বিরতির পর যোগ করলেন, 'ওদের প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়া হয়নি। শুধু বলেছিলাম, তোমরা কাজে যাও।'

ডেপুটি সুপার খাঁটী এবং কড়া মানুষ। দারিদ্র্যের অজুহাতে অসাধু আচরণ সমর্থন করা যায় না, সেটা তিনি জানেন। বললেন, কিন্তু স্যার, এ রকম ডিজ্‌অনেণ্ট ষ্টাফ্ নিয়ে—

'ডিজ্‌অনেণ্ট!' মৃদু হেসে বাধা দিলেন সাহেব। 'বুদ্ধদেবের সেই এক-মুঠো সর্ষের গল্প জানেন? জানেন না তো? তবে শুনুন। সদ্য সদ্য একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে একটি স্ত্রীলোক এসে কেঁদে পড়ল তথাগতের পায়ের তলায়। মনে করেছিল করুণাময় মহাপুরুষ; তাঁর কাছে গেলেই এ মহাশোকের সান্ত্বনা মিলবে। বুদ্ধ বললেন, যে গৃহে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটেনি, সেখান থেকে এক-মুঠো সর্ষে নিয়ে এসো। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াল মেয়েটি। মৃত্যু হানা দেয়নি তেমন ঘর পেল না। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে বলল, পেলাম না প্রভু। তবে একটা জ্ঞান লাভ হল—এ দুঃখ আমার একার নয়। সকলের।'

ডেপুটি সুপার এ গল্পের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চেয়ে সায়েব বললেন, আমি বুদ্ধদেব নই। আপনাকে সর্ষে আনতে বলবো না। কিন্তু একটি মানুষ খুঁজে আনতে বলবো, যে ডিজ্‌অনেণ্ট নয়—কাজে কিংবা চিন্তায়। যদি পারেন, সেদিন আমি এদের সবাইকে কঠিন শাস্তি দেবো।

ডেপুটি চুপ করে আছেন দেখে আবার বললেন, একবার উপরতলাটা ঘুরে আসুন, সন্তোষবাবু। দেখবেন, সেখানে গাদা গাদা রাঘব বোয়ালের ছড়াছড়ি। তারা যদি অবাধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, গোটা কয়েক চুনো-পুঁটি মেরে আর কার কী উপকার হবে?

বর্ষ্টালের শাসন-তন্ত্রে একজন 'ষ্টার' এবং 'হাউস-ক্যাপ্টেনের' ক্ষমতা কম নয়। চীফ্, উপচীফ, ইনস্‌ট্রাক্টরবাবুরা এবং অনেক সময় স্বয়ং ডেপুটি সুপার পর্যন্ত এদের কথা শুনে চলেন। কিন্তু সেও একটা দর্জী ছেলের পেছনে লাগা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। বিশেষ করে বিষয়টা যেখানে সামান্য একটা জাঙিয়া। ওটা বাজেয়াপ্ত হলে, ওর জায়গায় আরেকটা সে যখন তখন তৈরি করে নেবে। মাঝখান থেকে সে-ই ওদের বিষ-নজরে পড়ে যাবে। ক্যাপটেন তাই উদাত্ত শুঁড় নিঃশব্দে গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মন দিল।

ঘুম থেকে উঠে 'হাউস' ছেড়ে বেরোবার আগে প্রত্যেককে তার বিছানাটি পাট করে গুছিয়ে এক লাইনে সাজিয়ে রাখতে হয়। সকলের দেখাদেখি দিলীপও তার দুটো কম্বল ভাঁজ করে রাখতে যাবে, ক্যাপটেন চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়নি, হয়নি।' বলেই, পাশে দাঁড়ানো কেশবকে ধমকে উঠল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? নতুন ছেলে, শিখিয়ে দিতে হবে না?' কেশব তখন এগিয়ে এসে কম্বল দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে, আলাদা আলাদা পাট করে একটার পর একটা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। তার উপরে বাড়তি প্যাণ্ট, সার্ট, চাদর আর বালিশটা রেখে বলল, এমনি করে রাখবে। দ্যাখো না, ওরা সবাই কি করছে। ঠিকমত না রাখলে ডেপুটিবাবু বকাবকি করে, রিপোর্ট্ করে দেয় সায়েবের কাছে।

'রিপোর্ট' বস্তুটির খানিকটা ধারণা আসামাত্র হয়ে গেছে। কথাটা শুনেই দিলীপ মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ওর কবলে যেন পড়তে না হয়। ভয়ে

ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রিপোর্ট' করলে কী শাস্তি হয়?

—তার কিছু ঠিক আছে? এই সব ছোটখাটো দোষ করলে বেশী করে ড্রিল করায়।

'ড্রিল' জিনিসটা দিলীপের অজানা নয়। তাদের বস্তির ইস্কুলেও করতে হত। ভালোই লাগত তার। তাকে এরা 'শাস্তি' বলছে কেন বুঝতে পারল না। বলল, ড্রিল তো ভালো। আমরা ক-তো করেছি।

একটা কাটা দাগ দেখাল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, পা মেলাতে না পারলেই ঠোক্কর। সব্বার পায়ে আছে, দুচারজন ছাড়া।

ক্যাপ্টেনের হাঁক শোনা গেল, এই, কী করছিস তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে?

ছেলেরা তখন এগিয়ে গেছে। পাশা-পাশি অন্য ঘর থেকেও বেরিয়ে পড়েছে কয়েক দল। এদের চেয়ে মাথায় বড়। কেশব দিলীপকে তাড়া দিয়ে বলল,

আমরা ক-তো করেছি

—'ও-ও, সেই ড্রিল বুঝি? বোকা ছেলেটার অজ্ঞতা দেখে অবাক হল কেশব। 'এর নাম বোস্টাল ইস্কুল। থাকো না দুদিন; ড্রিল মাস্টারের জুতোর ঠোক্কর খেলে বাপের নাম ভুলে যাবে। এই দ্যাখ না? নীচু হয়ে ডান পায়ের গোড়ালির ইঞ্চিখানেক উপরে

চল, চল। দেরি হলে চীফ্ আর আস্ত রাখবে না।

দরজার মুখে এসে থেমে যেতে হল। একটি বছর নয়েকের রোগা টিনটিনে ছেলে অতি কষ্টে দুটো কম্বল বগল-দাবা করে বেরোবার আয়োজন করছিল। মনিটর পেছন থেকে বাধা দিল, আরে, কম্বল নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

ছেলেটা জবাব দিল না। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আশে-পাশে যারা ছিল, সকলেরই চোখ-মুখে কৌতুক হাসি উপচে পড়ছে। একজন এগিয়ে এসে আলগোছে কম্বলটা একবার শুঁখে নাক মুখ বিকৃত করে বলল, উঃ! হাসির রোল উঠল চারদিকে। ক্যাপটেন নিজেও তাতে যোগ না দিয়ে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, মার মার, চাঁদা করে চাঁটি মার ওর মাথায়।

কে একজন বলে উঠল, না, না; মাথায় মারলে আরো বেশী করে করবে।

ক্যাপটেন বলল, তাহলে জোরে জোরে দুটো থাপ্পড় মার ওর গালে। বুড়ো মদ্দ, রোজ রোজ বিছানা ভাসাবে!

ছেলেটা জলভরা চোখ তুলে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, আমি ইচ্ছে করে করেছি নাকি? বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মুখ ধোওয়া ইত্যাদি শেষ হতে না হতেই খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। আর্লি মর্নিং মীল—প্রাতরাশ। সাধারণতঃ খিচুড়ি;—চালের ভাগই বেশী, সঙ্গে সামান্য কিছু ডাল। চেহারাটা জেল্-এ যেমন হয়, ততটা কালো নয় (সেখানে লোহার ডেক, এখানে পেতলের), খেতেও বিস্বাদ বলা যায় না। তবু কেউ পছন্দ করে না। তার কারণ বোধহয় ঐ পদার্থটির প্রচলিত নাম—লপ্‌সি। কথাটার মধ্যেই কেমন একটা 'জেল-জেল' গন্ধ জড়িয়ে আছে। শুধু গন্ধ নয়, লপ্‌সির পেছনে একটা ইতিহাসও আছে। এখানকার বাসিন্দারা সেটা পুরোপুরি না জানলেও, যেটুকু জানে বা শুনেছে, এর বিরুদ্ধে একটা কঠোর মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। আজ লপসি ছিল না; তার বদলে চিঁড়ে-গুড়ের ব্যবস্থা। ছেলের দল প্রায় বাহু তুলে নৃত্য শুরু করল। বয়সটাই এমনি। কত সহজে খুশী করা যায়, আবার কত সহজে রুষ্ট হয়ে ওঠে!

একটা টিনের শেডের মধ্যে খাবার জায়গা। "ডাইনিং হল।" আগে সব উবু হয়ে বসত। ছোটদের বড় কষ্ট হয়। সাহেব ব্যবস্থা করেছেন লম্বা লম্বা পিঁড়ি—চারজন করে বসবে একটাতে। তার আগে এক সারিতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কিংবা ভজন গান। সহজ সুর। তাহলেও সকলের গলায় আসে না। কথাগুলোও জানা নেই অনেকের। তাতে

কিছু আসে যায় না। যাহোক একটা তান তুললেই হল। নাইবা মিলল অন্য কারুর সঙ্গে। সে বিষয়ে চীফ অফিসার অত্যন্ত উদার। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারবে না। ভগবানের নাম না করে পেট-পুজো—সেটা যে কত গর্হিত, এই বয়স থেকে না শিখলে শিখবে কবে?

সাহেবকে একদিন এই ভজন শোনাতে ডেকে এনেছিল চীফ্। বিশেষ-ভাবে নির্বাচিত গান। সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন দেখে কী আনন্দ! শেষ হতেই লম্বা স্যালুট দিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল, হুজুর? মনিব গম্ভীর গলায় বললেন, চমৎকার হয়েছে। এক কাজ করলে পার। এই কেষ্টর জীবগুলোকে মিছেমিছি কষ্ট না দিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে কতগুলো শেয়াল এনে ছেড়ে দাও। তাতে করে একটা সুবিধে হল, সময় মত তারা নিজে থেকেই গান ধরবে। ধর-পাকড় হাঁকডাক কিছুই করতে হবে না।

দিলীপ জীবনে কোনোদিন গান করেনি। সুতরাং চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কেশবের হঠাৎ নজর পড়তেই, সে ওর পিঠে চিমটি কেটে বলল, 'ঠোঁট নাড়।' দিলীপ ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ঠোঁট নাড়াও যে শিখতে হয়, এলোপাতাড়ি নেড়ে গেলে চলবে না। ক'দিন পরেই অবশ্য এ বিদ্যা সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল এবং দেখে অবাক হয়েছিল যে, তার মুরুব্বি কেশবচন্দ্র তিন বছরেও এর বেশী অগ্রসর হয়নি। কেউ কেউ বোধহয় আগাগোড়াই ঠোঁট নাড়ার ক্লাশে থেকে যায়। চীফ্ ধরতে পারে না।

লপসি বা চিঁড়ে-মুড়ির পরেই ড্রিল ও ব্যান্ড প্র্যাক্‌টিস্। ব্যান্ড পার্টির দলটি আলাদা। বেশীর ভাগই বড় বড় ছেলে, বর্স্টাল আইনে যাদের সাজা। কিছু ইনডাস্ট্রিয়ালও আছে। শহরে এদের প্রচুর নাম। রুটমার্চ্ বা ঐ জাতীয় রাষ্ট্রীয় উৎসবে পুলিশ ব্যান্ডের পেছনে "বর্স্টাল জেল"এর খুদে ব্যান্ডও যোগদান করে থাকে। দর্শকেরা আমোদ পায়, কেউ কেউ বড় বড় চোখ করে তারিফ করে, ঐটুকু টুকু ছেলে, কী চমৎকার শিখেছে দেখেছ? কেউ বলে না, ভেবেও দেখে না, ঐ অত বড় জয়ঢাকটা বুকে করে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ঐ বেঁটে ছেলেটার কাছে আশা করা যায় কিনা, কিংবা প্রাণপণে গাল ফুলিয়ে প্রমাণ সাইজের ব্যাগপাইপগুলো যারা বাজিয়ে চলেছে, তাদের ফুসফুসের জোর কতখানি।

বর্স্টালের মিউজিক্ ড্রিলের খ্যাতিও কম নয়। ব্যান্ড পার্টি বাঁশী বাজায়, তার তালে তালে পায়ের ও হাতের নানা রকম কসরৎ দেখায় ছোট ছোট ছেলেরা। কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, কখনো মার্চের উপর। কোনো কোনো দিন বাঁশীর সুরে এবং তার সঙ্গে ড্রামের উপর মৃদু গম্ভীর আওয়াজ তুলে ডি, এল, রায়; অতুলপ্রসাদ কিংবা কাজী নজরুলের গান বাজায়। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।' 'বল বল সবে'। 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'।

বহুদিন ধরে বহু পরিশ্রম করে শিখিয়েছে ব্যান্ডমাষ্টার বীর বাহাদুর। একসময়ে গোর্খা রেজিমেন্টে ব্যান্ড বাজাত। এক বাঙালী বন্ধুর মুখে বাংলা শুনে ভাল লেগেছিল। তারই কয়েকটা বাঁশীতে তুলে নিয়েছে। তখন জানত না, একদিন তাকে বর্স্টালে এসে মাষ্টারি করতে হবে। স্বাস্থ্যের দরুণ অকালে পেনসন নিয়ে কাজ খুঁজছিল। পেয়ে গেল এই চাকরি। সেদিনকার বাড়তি বিদ্যাটাও কাজে লেগে গেল। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

বর্স্টালের ভিজিটর বাবুরা, মাঝে মাঝে সস্ত্রীক সরকারী উপরওয়ালারা এদের ড্রিল দেখে ও মিউজিক শুনে মুগ্ধ হন। শতকণ্ঠে বীর বাহাদুরের তারিফ করেন। ব্যান্ডমাষ্টার বিনয়ে গলে গিয়ে হেঁ হেঁ করে, মাঝে মাঝে তার কাজটি যে কত কঠিন, তারও একটু আভাস দেয়, তার নিজের ভাষায় মোলায়েম করে বলে, আমি আর কী জানি, হুজুর? সব আপনাদের 'মেহের-বানী'। 'লেকিন' গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো—'

সে কষ্টটা যে কত বড়, অবশ্যই অনুভব করেন অনুগ্রাহকের দল। কিন্তু কতখানি পিটুনি খেয়ে খেয়ে গাধাকে ঘোড়া হতে হয়, সে ইতিহাস থাকে অন্তরালে। সে কথা কেউ ভুলেও ভাবে না। এই 'মিউজিক'-এর পেছনে দীর্ঘ-দিন ধরে কত যে শিশুকণ্ঠের কান্নার সুর চাপা পড়ে আছে তাও কারো কানে এসে পৌঁছায় না।

ছেলেরা যে বাহাদুরি দেখাল তার 'সিংহভাগ' নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের প্রাপ্য। বিশিষ্ট ভিজিটরদের মুখ থেকে তাঁরও অনেক প্রশস্তি-বাণী শোনানো হয়। উপরওয়ালারা যখন অভিনন্দন জানান, ঘোষসাহেব মুখে একটা গদগদ ধরনের মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে কৃতার্থ হবার ভাব দেখান। তাছাড়া উপায় নেই। সেইটাই সরকারী দস্তুর। অন্যথায় তাঁরা রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু বন্ধুরা যখন পিঠ চাপড়ে কিংবা হাতনাড়া দিয়ে বাহবা দেন, তাঁর পুরু পুরু ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে বাঁকা হাসির কুঞ্চন। মাঝে মাঝে এমন দু' একটা বেয়াড়া ধরনের মন্তব্য করে বসেন, এসব ক্ষেত্রে যেটা অত্যন্ত বেমানান। একবার এক-জনকে বলেছিলেন, তোমার সুখ্যাতি শুনে আমার সেই মামাবাড়ির গাড়োয়ানটাকে মনে পড়ল। আমার অবস্থাও অনেকটা তারই মত।

'কি রকম!' বন্ধু রীতিমত অবাক।

—তবে শোনো। বছর কয়েক আগেকার কথা। মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। সখ করে নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। মামা অনেক দিন থেকে ভুগছেন। একবার শেষ দেখা দেখে আসা। ছেলেবেলায় উনিই খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলেন। তা না হলে বর্ষার ঠিক পরে ও দেশে কেউ যায় না। ষ্টেশন থেকে পাক্কা পনর মাইল। আগাগোড়া পাঁক। বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানাই দেখেছ, তার পাঁক যে কী বস্তু নিশ্চয়ই পরখ করনি। শ্রীক্ষেত্রের পান্ডার চেয়েও নাছোড়বান্দা আর ধরা মানেই গ্রাস করা।

প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে দেখি একখানিমাত্র গোরুর গাড়ি পড়ে আছে। গাড়োয়ান পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। মামার ভিটেবাড়ির প্রজা। তা নাহলে পনরশ' টাকাতেও এই পনর মাইল ঠেঙিয়ে কেউ আসত না। তাছাড়া তাকে বলা হয়েছিল, 'একজন' বাবু আসছেন, সঙ্গে মালপত্তর কিছু নেই। 'এক' যে 'বহু' হতে পারে উপনিষদের সে গভীর তত্ত্ব এ জানবে কোত্থেকে? আমার এই বিশাল বপুটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিনদুপুরে ভূত দেখেছে। বিড়িটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, জানতেও পারল না। আমার চোখ পড়ল গোরু দুটোর ওপর। হাড়ের ওপর শুধু একটু চামড়ার ঢাকনা। তার ওপরে কেটে কেটে বসা লম্বা লম্বা দাগ।

কিন্তু বাহাদুর বটে লোকটা। যে-কান্ড করে, বেপরোয়া গালাগালি আর তার সঙ্গে বেধড়ক পাচনবাড়ি চালিয়ে ছ' ঘণ্টায় সেই পনর মাইল পথ ভেঙে সে আমাকে মামাবাড়ির দরজায় এনে

ফেলল, তা দেখে সেদিন শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল—লোকটা গাড়ি না চালিয়ে সার্কাসের দলে গেল না কেন? এর চেয়ে আশ্চর্য কসরৎ কোন্ সার্কাসে দেখানো হয়?

তারপর, তোমরা যেমন আমাকে কংগ্রাচুলেট কর, আমিও তাকে তার বাহাদুরির জন্যে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে বখ্‌সিস দিয়েছিলাম নগদ পাঁচ টাকা। গোরুগুলোর মুখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরছে, পিঠময় রক্তের দাগ। সেদিকে আর তাকাইনি।

ছেলেদের চিঁড়ে-চর্বণ শেষ হতে না হতেই মাঠের দিক থেকে ভেসে এল একটা টানা বাঁশীর সুর। ঘরময় হৈ রৈ পড়ে গেল। বাকী গ্রাসগুলো কেউ ফেলে রেখে, কেউ একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। ভীষণ কড়া মানুষ ড্রিলমাষ্টার যদুনাথবাবু। এক মিনিট দেরি হলে আর রক্ষা নেই। ডবল মার্চ করিয়ে করিয়ে জান বের করে দেবে।

দিলীপও খাওয়া ফেলে অন্য সকলের সঙ্গে উঠে পড়েছিল। বেরোতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেশব নেই। আর কাউকে সে চেনে না। হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। খানিকটা অভিমানও হল নতুন জোটানো বন্ধুর উপর, এইমাত্র ছিল তার পাশে; এর মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! এক কোণে দাঁড়িয়ে অচেনা মুখগুলোর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ একটি ফর্সামত জোয়ান ছেলে যেতে যেতে থেমে গেল তার কাছে। চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটা চাপা, চাকার মত মুখ। হেসে বলল, তুমি বুঝি নতুন এসেছ? কথাগুলোয় কেমন একটা অদ্ভুত টান। দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসো। আমার নাম মনবাহাদুর। সবাই 'বাহাদুর' বলে ডাকে।

বাহাদুর তার হাত ধরে ড্রিলমাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, নতুন ছেলে, স্যার। ভারী ঠাণ্ডা।—'গোড়াতে সবাই অমন ঠাণ্ডা থাকে', ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন যদুবাবু, 'দুদিন পরেই ন্যাজ গজায়। কি নাম রে তোর?'

দিলীপ পুরো নাম বলতেই ভেংচে উঠলেন ড্রিলমাষ্টার, ভট্টা-চার্য! সাধুভাষা বলছে ব্যাটা। ভট্টাচার্য বামুনের ছেলে, জেলে এলি কি করে? কী চুরি করেছিলি?

ধমকের চোটে দিলীপের পিলে চমকে গিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, চুরি করিনি।

—কী করেছিস তবে? ডাকাতি?

দিলীপ কি বলবে ভেবে পেল না। তার হয়ে জবাব দিল মনবাহাদুর, কিছু না করেও এখানে আসা যায়, স্যার।

ড্রিলমাষ্টার তার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, তোকে ফোঁপর দালালি করতে কে বললে? খুব লায়েক হয়ে গেছ, না?

মনবাহাদুর আর কিছু বলল না; বিরস মুখে ওদিকে চলে গেল। সে ব্যাণ্ড পার্টির লোক। তাদেরও প্রাকটিস্ শুরু হবে এখনই।

ড্রিলমাষ্টার দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলেন, ড্রিল করেছিস কখনো?

—করেছি।

—কোথায়?

—আমাদের ইস্কুলে।

—ইস্কুলে! কোন্ ইস্কুল?

—আমাদের বস্তিতে।

'বস্তিতে!' হা-হা করে হেসে উঠলেন যদুবাবু। ব্যাণ্ডমাষ্টার বীরবাহাদুর তখন মাঠে ঢুকছে। বলল, কী হোল, যদুবাবু? অতো হাসি কিসের?

—এই ছোকরা কি বলছে, জান? কোথাকার কোন্ বস্তিতে নাকি ড্রিল করতো! ব্যাস্ আর চাই কি? এবার আমার পোস্টটা ওকে দিয়ে দিলেই হয়।

বলেই আর এক দফা অট্টহাসি। বীরবাহাদুর কানো উত্তর না দিয়ে তার নিজের ছেলেদের দিকে এগিয়ে গেল। যদুবাবুর দুচোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। এক ঝামটায় মুখখানা সরিয়ে নিয়ে দিলীপকে বললেন, ঐদিকে গিয়ে দাঁড়া। এর পরে দেখা যাবে কী ড্রিল শিখেছিস, কতখানি তোর বিদ্যের দৌড়।

আর একবার বাঁশীতে ফুঁ দিতেই ড্রিলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়াল। তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই হেঁকে উঠলেন ড্রিলমাষ্টার, সে কোথায় গেল? সেই কোলা ব্যাঙটা?

উচ্চ হাসির রোল উঠল ছেলের দলে। কে একজন বলে উঠল, পালিয়েছে, স্যার।

—পালিয়ে যাবে কোন্ চুলোয়? তুই যা; চীফ অফিসারকে বলে আয়। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়তো পাইখানায় ঢুকেছে।

প্রথম নম্বরে যে দাঁড়িয়েছিল, ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, তাকেই ইঙ্গিত করলেন। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে গেল, এবং ফিরে এসে জানাল, চীফ অফিসার বললেন, আছে কোথাও। তোরা শুরু কর। আমি ওকে খুঁজে বার করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'তার মানে, আজও ফাঁকি দিল ছোঁড়া। এমনি করেই বদমাসগুলো মাথায় ওঠে। গোসাঁই দিয়ে কি আর জেল চলে!

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। অগত্যা বাকী সবাইকে নিয়েই ড্রিলের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

চীফ একজন পেটী অফিসারকে হুকুম করল কেশবকে খুঁজে নিয়ে আসতে। সে তামাম 'জেলটা' ঘুরে এল। তাকে পাওয়া গেল না। চীফ ঝাঁঝিয়ে উঠল, পাওয়া গেল না মানে? উড়ে তো আর যেতে পারে না। বলে, নিজেই বেরোল খুঁজতে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কোথাও নেই। তবে কি পালাল? তাহলে তো পাগলা ঘণ্টি দিতে হয়। তার আগে ডেপুটিবাবুকে রিপোর্ট করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই চলেছিল অফিসের দিকে। মেইন ব্যারাকের সামনে দিয়ে পথ। তার পাশে এক সার পেয়ারা গাছ। হঠাৎ মনে হল, একটা উঁচু ডাল যেন একটু নড়ছে। ভাল করে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল চীফ, এই বাঁদর, ওখানে গিয়ে উঠেছিস? দাঁড়া একবার তোর ঠ্যাঙ যদি-না ভাঙি আজ—নেমে আয়........।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা
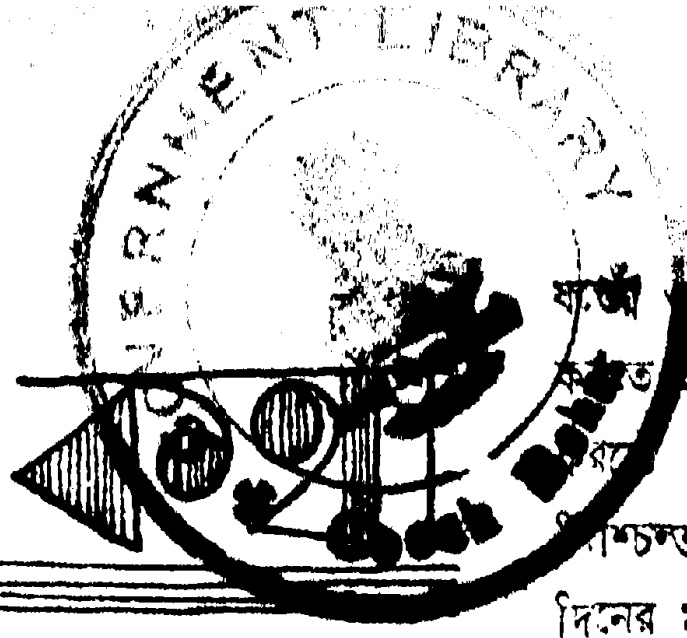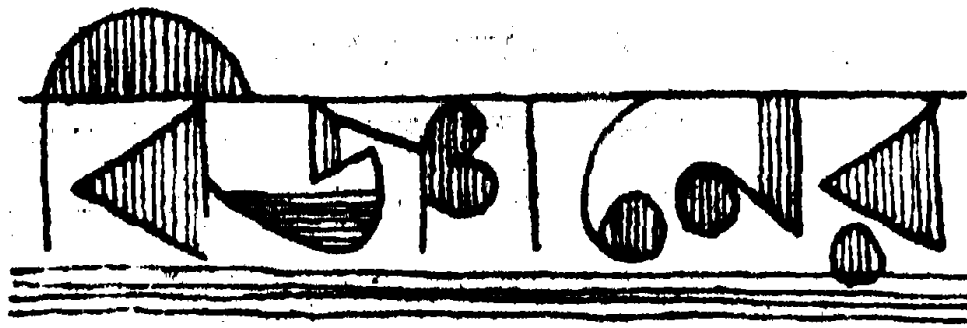
অয়স্কান্ত

॥ কালি ও কলম ॥

দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বা ফাউণ্টেন পেন দিয়ে যখন আমরা লিখি তখন একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন হয় না যে এই কালি ও কলমেরও বিচিত্র এক ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসটি জানা দরকার।

এমন সময়ও ছিল যখন মানুষ খাগের কলমে বা পালকের কলমে লিখত। আর কালি বলতেই তখন বোঝাত শুধু কালো কালি। লাল বা সবুজ রঙের কালির নামও তখন কেউ শোনেনি।

আর খাগের কলম বা পালকের কলম তৈরি করাটাও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কলম তৈরি করার জন্যে খাগের নল বা পালককে অতি নিপুণ হাতে চোখা করতে হত। আর এই কাজের জন্যে যে-অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা হত তাকে আমরা বলি ছুরি। আজকাল আমরা অবশ্য ছুরি ব্যবহার করি পেনসিল কাটার জন্যে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পেনসিল-কাটা-ছুরির ইংরেজি নাম পেন্ নাইফ। অর্থাৎ পেন বা কলম কাটা ছুরি। ছুরির এই বিশেষণটি যে-সময়ে যুক্ত হয়েছিল সে-সময়ে ছুরি দিয়ে সত্যিই শুধু কলমই কাটা হত। এতকাল পরেও পুরনো বিশেষণটি লোপ পায়নি।

খাগের নলকে বা পালকের গোড়ার দিককে তেরচাভাবে কেটে চোখা করলেই কিন্তু কলম তৈরি হয়ে যেত না। সেই চোখা মুখটাকে অতি সূক্ষ্মভাবে চিরে দু-ভাগ করতে হত। এমন কি আজকালও যে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে আমরা লিখি তার নিবের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, নিবের মাথাটি দু-ভাগে চেরা। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এই ভাগদুটি যতো বেশি ফাঁক হবে, কালির প্রবাহ হবে ততো বেশি। এই ভাগদুটি যতো বেশি জুড়ে থাকবে, কালির প্রবাহ হবে ততো কম। এই কারণেই নিবে একটু বেশি চাপ দিয়ে লিখলে লেখা মোটা হয়। আবার যে-নিবে এমনিতেই মোটা লেখা বেরোয় তাকে উলটিয়ে লিখলে সরু লেখা পাওয়া যেতে পারে।

নিব সম্পর্কে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। যে-ধরনের নিবই হোক না কেন, তা কখনো সমতল নয়, গোল করে বাঁকানো। খাগের নল বা হাঁসের পালক এমনিতেই গোল, কাজেই ছুঁচলো অংশটিও আধুনিক নিবের মতোই বাঁকানো হত। নিবকে বাঁকাবার প্রয়োজন হয় কালি ধরে রাখবার জন্যে।

এবারে তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটি বোঝা যাচ্ছে। কালির ফোঁটাটি যাতে দোয়াত থেকে কলম তোলার সঙ্গে সঙ্গেই নিবের গা বেয়ে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে নিবটিকে বাঁকানো হয়েছে। আধার কাগজে নিব ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে কালির একটি প্রবাহ যাতে তৈরি হয় সেজন্যে নিবের মাথাটিকে দু-ভাগে চিরে সরু একটি রাস্তা বানানো হয়েছে। এই রাস্তাটি কতখানি প্রশস্ত বা কতখানি সংকীর্ণ তারই ওপরে নির্ভর করবে কালির প্রবাহ কতখানি বেশি বা কতখানি কম।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, খাগের কলম তৈরি করতে হলেও রীতিমতো কারিগরী দক্ষতা থাকা চাই। যেমন তেমন ভাবে ছুরি চালালেই কলম তৈরি হয় না। সে-যুগের মানুষকে অনেক সময় নিয়ে অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে এক-একটি কলম তৈরি করতে হত। আবার একটি কলম তৈরি করতে পারলেই যে সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত তাও নয়। কিছু-দিনের মধ্যেই কলম হয়ে যেত ভোঁতা। তখন লিপিকরকে আবার নতুন আরেকটি কলম তৈরি করে নিতে হত। এবারে অনুমান করা যেতে পারে সে-যুগের মস্ত মস্ত পুঁথিগুলো লেখার জন্যে কতগুলো করে কলমের প্রয়োজন হয়েছে। লিপিকরের দোয়াতদানির পাশে নিশ্চয়ই গণ্ডাকয়েক খাগের নল বা হাঁসের পালক সব সময়েই মজুদ থাকত।

মজুদ থাকত আরো একটি পদার্থ। একরাশ বালি। কেন?

পৃষ্ঠাভর্তি লেখা হয়ে যাবার পরে লিপিকর লেখার কাঁচা কালির ওপরে বালি ছড়িয়ে দিত। বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমরা যে-উদ্দেশ্যে ব্লটিং-কাগজ ব্যবহার করি সেই উদ্দেশ্যেই বালির ব্যবহার। ছড়ানো বালির কণা মুহূর্তের মধ্যে কাঁচা কালিকে শুষে নিত। কতক্ষণে কালি শুকোবে সেজন্যে লিপিকরকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত না।

এবারে কালির কথা। সে-যুগের কালিও ছিল অন্য ধরনের। এখনকার কালির মতো রঙ-বেরঙের তো নয়ই, কুচকুচে কালোও নয়। সেই কালির রঙ হত গোড়ার দিকে কড়া চায়ের মতো, তারপরে আস্তে আস্তে কালো।

এই কালি তৈরি হত ফলের রস থেকে। অবশ্যই নির্ভেজাল ফলের রস
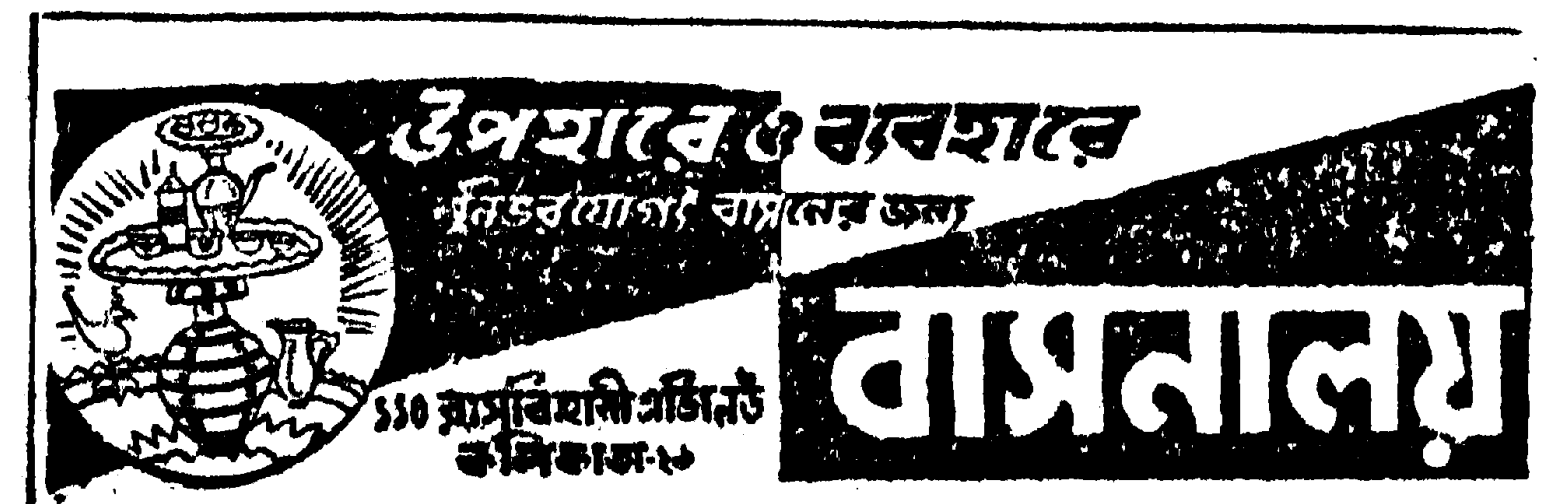
নয়, তার সঙ্গে কিছু কিছু খনিজ পদার্থও মেশানো হত। আর সব কাজই করা হত হাতে। সে-যুগে যারা কালি তৈরি করত তাদের হাত দুটো সব সময়েই কালি মাখামাখি হয়ে থাকত।

এ-যুগের কালি তৈরি হয় পুরো-দস্তুর একটি রাসায়নিক কারখানায়। এবং কালি তৈরি করার সমস্ত রকমের রঙ তৈরি হয় কয়লা থেকে।

নিবের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। মাটির নিচে রয়েছে আকর পিণ্ড যা থেকে তৈরি হয় লোহা। লোহা থেকে ইস্পাত। এই ইস্পাত রোলিং মেশিন থেকে পাত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই পাত থেকে টুকরো টুকরো অংশ কেটে নেওয়া হয়। এই টুকরোগুলোকে বাঁকালেই নিবের চেহারা বেরিয়ে আসে। বাকি থাকে শুধু একটি কাজ। নিবের ছুঁচলো মাথাটাকে দু-ভাগে চিরে দেওয়া। অবশ্য তারপরও কিছু কাজ বাকি থাকে। প্রথমে নিবগুলোকে লাল করে গরম করা হয়, তারপরে চুবনো হয় ঠাণ্ডা জলে বা তেলে। এই প্রক্রিয়ায় নিবগুলো শক্ত ও মজবুত হয়ে ওঠে। আর নিবে যাতে মরচে না পড়ে সেজন্যে নিবের ওপরে নিকেল-প্লেটিং করা হয়।

অবশ্যই ফাউণ্টেন পেনের নিব তৈরি করার প্রক্রিয়া জটিলতর ও বিস্তৃততর। বলা বাহুল্য, প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তই হোক বা বিস্তৃতই হোক, সরলই হোক বা জটিলই হোক, সবই করা হয় বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে। আধুনিক একটি নিব-তৈরির কারখানায় ঘণ্টায় কয়েক হাজার করে নিব তৈরি হতে পারে।

কালি-কলমের প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের আলোচনা তোলা যেতে পারে। তা হচ্ছে কালির দাগ তোলার রবার। আগে যেমন কালি তৈরি হত ফলের রস থেকে তেমনি রবার পাওয়া যেত রবার গাছের কষ থেকে। আজকাল কাঠের গুঁড়ো থেকে কৃত্রিম উপায়ে এই রবার তৈরি হচ্ছে।

॥ আসল থেকে নকল ॥

সামান্য একটা নিব বা সামান্য এক-দোয়াত কালি বা সামান্য এক টুকরো রবার তৈরি করতে গিয়েও মানুষ ক্রমশ আসল থেকে নকলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এক সময়ে মানুষ সামান্যতম উপকরণের জন্যেও প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত। প্রকৃতির কারখানায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যা-কিছু তৈরি হত তাই দিয়েই মিটত তার চাহিদা। কিন্তু এ-যুগের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। মস্ত মস্ত কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ। শুধু কালি-কলম-রবারই নয়, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত। উৎকর্ষের বিচারে হালের নাইলন বা রেয়নের সঙ্গে সুতীর বস্ত্রের তুলনাই হয় না। আর প্ল্যাস্টিক তো মানুষের এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। প্রকৃতির কারখানায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও এমন একটি উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এমন কি খাদ্যের ব্যাপারেও মানুষ প্রকৃতির ওপরে কারিগরি করতে শিখেছে। বরফ-ঢাকা জমিও এখন আর নিষ্ফলা নয়। জমির আয়তনের ওপরে এখন আর ফলনের পরিমাণ নির্ভর করে না।

এখানেই শেষ নয়। আগামী দিনের মানুষ পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিজের সমস্ত চাহিদার যোগান দেবার ব্যবস্থা করবে। সৃজনক্ষমতায় মানুষ হয়ে উঠবে প্রায় বিধাতাপুরুষের মতোই। এক সময়ে যার জীবনধারণের উপায় ছিল শিকার ও সংগ্রহ, প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ওপরে যাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত, সে-ই হয়ে উঠবে নিজস্ব এক জগতের মহান সৃষ্টিকর্তা, যে জগৎ চালিত হবে তার ইচ্ছার দ্বারা। শারীরিক মেহনতের কোনো প্রয়োজন সেদিন আর থাকবে না। প্রকৃতি হবে মানুষের দাস।

এ-সব কথার কথা নয়। সামান্য কালি-কলমের আলোচনাতেও এই ভবিষ্যতেরই আভাস রয়েছে। তবে সত্যিকারের ভবিষ্যত আরো অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। কারণ ইতিমধ্যেই এমন যন্ত্র তৈরি হয়েছে যা মানুষের মুখের কথাকে সরাসরি লিখে যেতে পারবে। যন্ত্রের মতো লেখা নয়, লিখতে লিখতে ভাষাকে পর্যন্ত শুদ্ধ করা। আগের কলম থেকে শ্রুতি-লিখন যন্ত্র এককালে হয়তো কল্পনাতীত ছিল ছিলত এখন তা বাস্তব ঘটনা।

সাহিত্য সমাচার

॥ বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যালোচনা ॥

ব্রুকলীন পাবলিক লাইব্রেরীর মূল গ্রন্থাগারে গত ডিসেম্বর মাস হতে ভারতীয় ও পারসীক সাহিত্যালোচনার ব্যবস্থা হয়। গত ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, নরেন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণমূর্তি এবং কুশবন্তের রচনা হতে অংশ বিশেষ এবং পারসীয় সাহিত্যের ওমর খৈয়াম সাদি, হাফিজ ও আওরের রচনাংশসমূহ পড়ে শোনান হয়। কেনেথ হুইটলক এবং মিস তাও স্ট্রং এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাঁরা ভারতীয় ও পারসীক সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন যে ভারত ও পারস্য এই দুটি দেশের কাব্য ও নাটকে মানব মনের যে রকম সুক্ষ্ম অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে এই রকম আর কোন সাহিত্যে হয়নি। কল্পনা-সৌন্দর্যের দিক থেকে এ রকম সমৃদ্ধ সাহিত্য আর কোথাও দেখা যায় না। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মহান প্রাচ্য সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে এই বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পড়ে শোনান হয়: রবীন্দ্রনাথের রচনা হতে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' ও আরও চারটি কবিতা, কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অংশবিশেষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চোর নামক গল্প, জে, কৃষ্ণমূর্তির কয়েকটি কবিতা।

॥ ভারতীয় লেখিকার মার্কিন পুরস্কার লাভ ॥

আমেরিকার উইমেনস ইন্টারন্যাশন্যাল লীগ ফর পীস এ্যান্ড ফ্রিডম নামে একটি বেসরকারী সংস্থা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের জন্য প্রতি বৎসর জন অ্যাডামসের নামে একটি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। যে শিশু-সাহিত্যে বিশেষ মুন্সিয়ানা এবং জনগনের মধ্যে আস্থা প্রকাশ পায় তাঁদের বিচারে তাকেই পুরস্কৃত করা হয়। এ বছরের পুরস্কার লাভ করেছেন, হোয়াইট দেন রমন নামে পুস্তকের ভারতীয় লেখিকা শান্তি এল অরোরা।

॥ সোবিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের সাহিত্য প্রকাশনা ॥

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের (অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস) প্রকাশনাভবন হ'তে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিই প্রকাশিত হয় না। এখান হতে রুশ সাহিত্যের ক্লাসিকস্ বা ধ্রুপদী গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় ত্রিশ-চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করা একমাত্র সোবিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষেই সম্ভব।

দৃষ্টান্ত হিসাবে সম্প্রতি প্রকাশিত তুর্গেনেফের রচনাবলীর কথা উল্লেখ করা যায়! এই নতুন সংস্করণে তুর্গেনেফের বহু চিঠিপত্র, রেখাচিত্র, বহু গল্পের অংশবিশেষ বা খসড়া স্থান পেয়েছে।

সোবিয়েতে বিজ্ঞান পরিষদের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হচ্ছে "লিতারেতুর্নয়া নাসলেদ্‌স্‌ৎভো" (সাহিত্যিক ঐতিহ্য)। এই ঐতিহ্য-মালার খণ্ডগুলি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। এর ৬৯তম খণ্ডটিতে সংকলিত হয়েছে রুশ সাহিত্যের অমর প্রতিভা টলস্টয়ের জীবন ও রচনা সম্পর্কে বিস্তর প্রামাণ্য নতুন তথ্য। ৭০তম খণ্ডটিতে থাকবে সোবিয়েত সাহিত্যিক-দের কাছে লেখা ম্যাক্সিম গোর্কির বহু-সংখ্যক চিঠিপত্র।

এই প্রসঙ্গে "রুশ শিল্পকলার ইতিহাস" গ্রন্থখানিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ পূর্ব জার্মানীর বইয়ের বাজার ॥

পুস্তক প্রকাশন ক্ষেত্রে পূর্ব জার্মানীর প্রকাশকগণ অন্যান্য দেশের তুলনায় কোন অংশে কম নন। ১৯৬০ সাল এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরে ১৩১৭ উপন্যাস, কবিতার বই, নাটক গল্প ও বিভিন্ন বইয়ের ১৮২৭১০০০ কপি প্রকাশকগণ প্রকাশ করেন। ৪৫৭ ধরনের শিশু-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। মোট কথা ১৯৬০ সালে প্রকাশকরা ৬১০৩টি বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ করেছেন। আর এর পরিমাণ হল নয় কোটি আঠারো লক্ষ কপি।

॥ নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী ॥

বিদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমাদর বোধ হয় সোবিয়েত দেশেই সব থেকে বেশী। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের নানাবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক-দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

বর্তমানে সোবিয়েত উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশালয় বিশ্বভারতী প্রকাশিত ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর বারো খণ্ডের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করছেন। এর ফলে রুশ দেশের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের অনেক নতুন কবিতা ও নাটক পড়বার সুযোগ পাবেন। সোজাসুজি বাঙলা থেকে অনুবাদ করা হবে। কবির সম্পূর্ণ রচনাশৈলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলবে। পূর্ব প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীও আবার সম্পাদনা করা হচ্ছে। উপন্যাসগুলি সাজান হয়েছে সময়ের ভিত্তিতে। শেষ দুটি খণ্ডে থাকছে প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী, জীবন-স্মৃতি।

নতুন সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম রুশ ভাষায় অনুদিত "বৌঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" এই খণ্ডে আছে। "জীবিত ও মৃত", "পোষ্টমাষ্টার", "কাবুলিওয়ালা" প্রভৃতি ৩০টি গল্প আছে যা ১৮৪৪-৯৩ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যুবাবয়সের ছবি এবং তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি ছবিও এর মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া আছে সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্র-জীবনকথা ও বিভিন্ন বিষয়ে টীকা-টিপ্পনী।

এই অনুবাদ কার্যে সাহায্য করছেন রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণ, সোবিয়েত ভারততত্ত্ববিদগণ ও কবি-অনুবাদকগণ। এদের সঙ্গে আছেন শুভময় ঘোষ, ননী ভৌমিক, সমর সেন, অভিজিৎ বসু প্রভৃতি বাঙালী লেখক ও সাহিত্যিকগণ।

॥ কাফ্‌কার গল্প সংকলন ॥

সম্প্রতি একখণ্ডে কাফ্‌কার গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে জার্মানীতে। কাফকা যে সমস্ত গল্প প্রকাশের অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র সেগুলিই প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে আছে অপ্রকাশিত রচনা ও নানাবিধ রচনার খসড়া। এগুলি প্রকাশিত হওয়ায় কাফ্‌কার রচনাবলীর ক্রমানুক্রমিক ধারা-বাহিকতা রক্ষা পাবে বলে মনে হয়। পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি, চিঠিপত্রাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান বিষয় সম্পাদক-মণ্ডলী সংগ্রহ করছেন। বড় গল্প, নীতিকথা, উপকথা এবং কাফ্‌কার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতির রচনা এতে সংকলিত হয়েছে। সমকালীন জার্মান সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি-লাভের পথে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিহার্য।

॥ টমাস মানের পত্রাবলী ॥

জার্মান কথাশিল্পী টমাস মান পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পরিচিত। দু'খণ্ডে তাঁর পত্রাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন মানের কন্যা এরিক মান। এর প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৯-১৯৩৬ সালের মধ্যে লিখিত পত্রগুলি স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। কতকগুলি পত্র পূর্বেই প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। পত্রগুলি ব্যক্তি মান অপেক্ষা সাহিত্যিক মানের শিল্প সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। পত্রালাপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন আলবার্ট আইন-স্টাইন, আঁদ্রে জিদ, স্তিফেন জ্বাইগ, ইভান শেমিলজভ, হেনরিখ মান (টমাস-মানের ভাই) প্রভৃতি।

প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা

সুব্রত ত্রিপাঠী

বাংলা দেশ ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ। বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি অঙ্গস্বরূপ; তথাপি একথা নিঃসংকোচে বলা যায় এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে পৃথক অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকখানি নির্ভর করে তার প্রাচীন গৌরবময় শিল্পকলার উপর। এটি একটি বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উল্লেখযোগ্য দিক। এই বিশেষ দিকটির বিকাশ শুধু যে নাগরিক সভ্যতাকে কেন্দ্র ক'রে হয়েছিল তা নয়; পল্লী-বাংলার শ্যামল সুন্দর কুটীরে কুটীরেও এই শিল্পকলার সাধনা চলেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদী লোক-শিল্পের স্রষ্টারা ও তাঁদের অপূর্ব শিল্প-নিপুণতা বাংলাদেশ হ'তে দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

বাংলার নিভৃত পল্লী-প্রান্তে সাধারণতঃ শিল্প-কলার তিনটি বিভাগের চর্চা হ'ত। প্রথমতঃ চিত্র-পট, দ্বিতীয়তঃ আলপনা, তৃতীয়তঃ মাটির অথবা কাঠের খেলনা।

চিত্রপট বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সাধারণ পটুয়াদের অঙ্কিত এই সব লম্বা পট-চিত্রগুলি বর্তমানের শিল্প-রসিক মহলে একটি বিশেষ আলোচনার বস্তু। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানের পোটোরা সাধারণতঃ এ ধরনের ছবি আঁকতেন। প্রতিমার চালচিত্রণের সাথেও আমরা এই পটচিত্রের কিছুটা মিল দেখি। এই সকল পটচিত্র আঁকার পদ্ধতিও অতি চমৎকার। অনেক দিনের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার ফলে পটুয়াদের পরিবারের প্রায় সবাই এই পট আঁকার সাহায্য করতে সক্ষম হ'তেন। বাপ মা ছেলে-মেয়ে সবাই এক একটি কাজের ভার নিতেন। কেউ. রং লাগাতেন। কেউ চুল আঁকতেন আবার কেউবা তুলির টানে ছন্দময় চোখ. মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করতেন। এইভাবে রামলীলা-পট, কৃষ্ণলীলা-পট, শক্তি-পট বা যম-পটের কাহিনী অঙ্কন ক'রে পটুয়ারা স্বরচিত গীতি-কবিতায় সুস-লিত ছন্দে আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে জনসাধারণকে দেখিয়ে যথেষ্ট অর্থো-পার্জন ক'রতেন। কাহিনীর শেষে মৃত্যুর পর মানবাত্মার যমপুরীতে নানাপ্রকার শাস্তিভোগের দৃশ্য থাকত' বলে এগুলিকে সাধারণ ভাষায় যমপট বলা হ'ত। হর্ষবর্ধনের সভাষদ বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিতে এই পট দেখাবার পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এর দ্বারা আমরা অনুমান ক'রতে পারি যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বাইরেও এই পটচিত্রের প্রচলন ছিল।

কৃষ্ণলীলা পট (মেদিনীপুর)
—আশুতোষ মিউজিয়ম

বাংলার পটচিত্রগুলি বর্ণবিন্যাস ও তুলির আঁচড়ের দিক থেকে বেশ উল্লেখ-যোগ্য। কাগজের সঙ্গে কাগজ জুড়ে একটা লম্বা পট তৈরী করে, তার উপর মাটি ও গোবরের একটা হাল্কা প্রলেপ দিয়ে আগে জমি তৈরী করে নিতেন পটুয়ারা। তারপর এক একটা বিশিষ্ট ঘটনার ছবি সাজিয়ে আখ্যানভাগ গড়ে তুলতেন। সাধারণতঃ পটচিত্রের ছবি-গুলিতে আমরা লাল, হলদে, সবুজ, নীল ও কালো রংয়ের বেশী ব্যবহার দেখি। বাংলার অতীত শিল্প-কীর্তির অতুলনীয় নিদর্শন এই পটচিত্রগুলি। পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও বিক্রমপুরের মুসলমানেরা ছড়া কেটে কেটে এক প্রকার গাজীর পট দেখিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। সেই সব ছড়ার কিছু কিছু আজও গ্রাম্যলোকের মুখে মুখে শোনা যায়—

রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা
হরণ করে
সূর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী
তারপরেতে দেখেন কর্তা ময়ূরমংখী
নাও।
গাজীর ভাই কালু আইল নিশান ধরিয়া
গাজীর কাছে একটা বাঘ নাম যে
খান্দিয়া। ইত্যাদি

এ ধরনের পটগুলি সাধারণতঃ প্রস্থে দু হাত ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত হ'ত। বাঁশের লাঠির মাথায় পটের দুটো দিক বেঁধে দেওয়া হ'ত। গান ও আবৃত্তির সাথে সাথে পটের ছবিগুলিকে

বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে তৈরী পোড়ামাটির পুতুল

সবার চোখের সামনে তুলে ধরতেন পটুয়ারা।

বাংলায় এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিদেশী চিত্র-শিল্পকুশলীদের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করেছে। বিদেশের বহু আর্ট গ্যালারী বা মিউজিয়ামে কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত সুদৃশ্য পটের সংগ্রহ আছে। সম্প্রতি বিদেশ থেকে এই ধরনের শিল্পকর্মের উপর সুন্দর বইও প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে এই সুদৃশ্য পটাঙ্কন পদ্ধতি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। এককালে যে সব পটুয়ারা বাংলা দেশকে এই অমূল্য ও অতুলনীয় রস-কলাসম্পদ দান করেছেন সেই সব পটুয়াদের দু-একজন বংশধর আজ জীবিত থাকলেও শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়ে তাঁরা এই প্রাচীন বিশুদ্ধ অঙ্কন-কৌশলটির ভুলতে বসেছেন।

পটশিল্পের ন্যায় আলপনাও এদেশের একটি অতি মূল্যবান শিল্পকর্ম। সাধারণতঃ হিন্দু মেয়েরা পূজা-পার্বন বা ব্রততে মাটির দেওয়ালে বা পিঁড়ির উপর পিঠুলির (চালের গুঁড়ো) সাহায্যে মাত্র কয়েকটা সহজ রেখার দ্বারা এক একটি অপূর্ব নক্সার সৃষ্টি করতেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্রততে ভিন্ন ভিন্ন আলপনা দেওয়ার প্রচলন ছিল। যেমন হরিচরণের ব্রততে শ্বেতচন্দনের দ্বারা প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে সুন্দর করে হরির ছোট ছোট 'যুগল চরণ' দুটি আঁকা হত। ভাদ্র মাসে ভাদুলী ব্রততে পিঠুলির সাহায্যে যে আলপনা দেওয়ার রীতি ছিল সে আলপনাটি সত্যিই মনোরম। এই আলপনাটির বিষয়বস্তু—জোড়া ছত্র মাথায় ভাদুলী ঠাকুরাণী জোড়া নৌকার উপর। আর তার আশে-পাশে লতাপাতা ও ফুলের সুন্দর একটি নক্সা। এইভাবে লক্ষ্মীপূজা বিবাহ উৎসব, রনে-এয়ো ব্রত, বসুধারা ব্রত, সেজুঁতি ব্রত, তুষ-তুষলী ব্রত, তারা ব্রত, মাঘ-মণ্ডল ব্রত, ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রত প্রভৃতিতে আলপনা আঁকার প্রচলন দেখা যায়। ঘরে ঘরে মেয়েদের হস্তাঙ্কিত এইসব চিত্রকলার সৌন্দর্যের গৌরবে গ্রামগুলি ছিল বাংলাদেশের গৌরবময় সম্পদ। কিন্তু আজকাল গ্রাম-বাংলার মেয়েরা এ ধরনের আলপনা আঁকার পদ্ধতি প্রায় ভুলতে বসেছেন।

বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে তৈরী পোড়ামাটির পুতুল

বাংলাদেশের মাটির পুতুল চিরকালই বিখ্যাত। এ ধরনের পুতুল বেশীর ভাগ কৃষ্ণনগর, বীরভূম, বাঁকুড়াতে তৈরী হ'ত। বাংলার কৃষ্ণনগরের নাম বহুযুগ আগে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে ইউরোপে পৌঁচেছিল। শোনা যায় এককালে কৃষ্ণনগরের পুতুলের আদর ইউরোপে এত ছিল যে, তৃতীয় নেপোলিয়ান সেকালের সেরা কুমার যদু পালকে ফ্রান্সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার এই নিজস্ব সম্পদ, অপূর্ব শিল্প-নিপুণতা আজ বিলুপ্তির পথে। এই সম্বন্ধে আমাদের সমাজের চিত্র-প্রেমীদের এবং জাতীয় সরকারের অনেক কিছু কর্তব্য আছে।
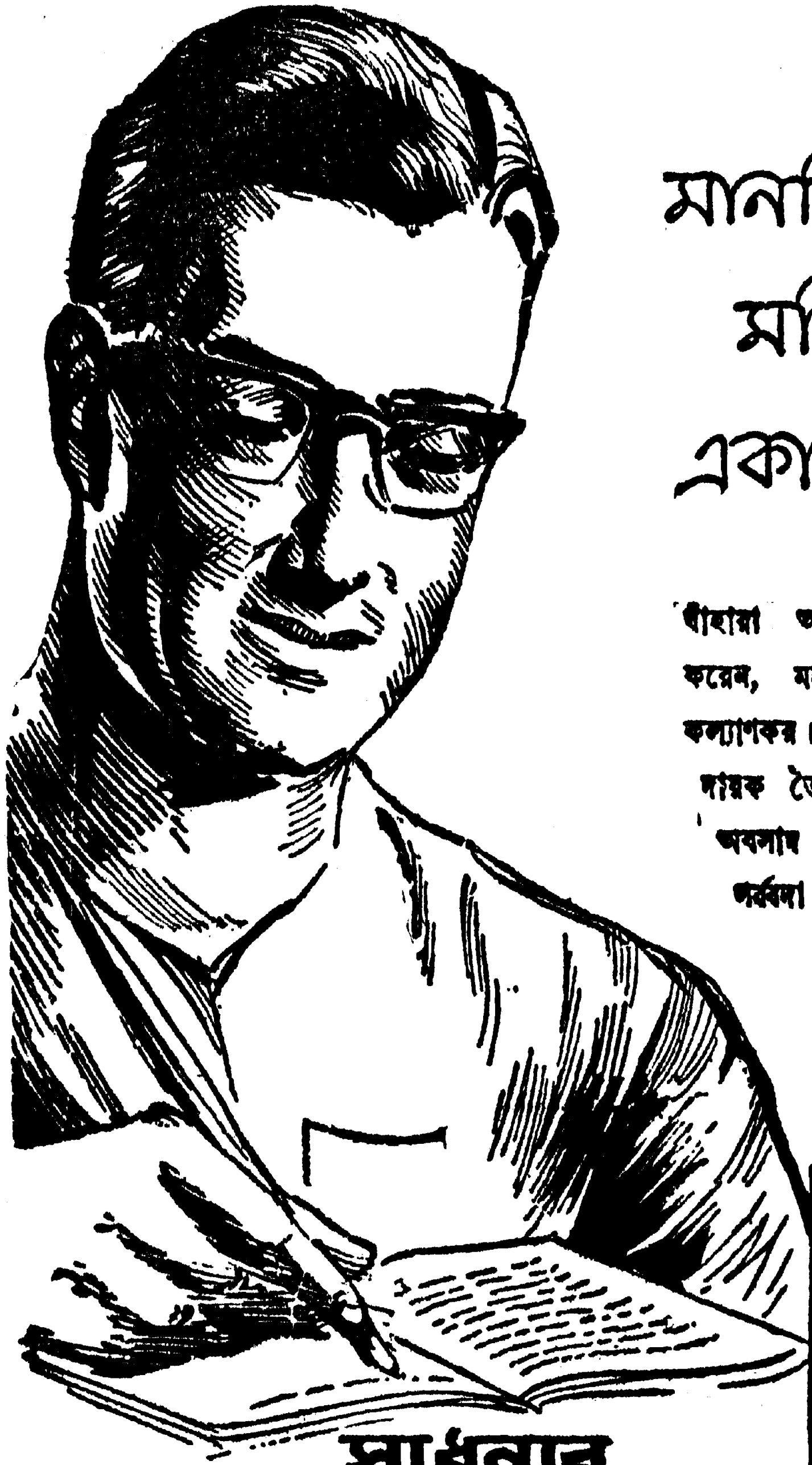
দিগন্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীতা এ সংসারের মেয়ে নয়। তবু নীতা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সংসারের মাঝখানে অনেকখানিটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল, নিরঞ্জনের চলে যাওয়াটা বোঝা যাচ্ছে না।

কাল রাত্রে চলে গেছে নিরঞ্জন। সকাল থেকে সংসারচক্রের ছন্দ একই-ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। নিরঞ্জনের ঘরের দরজার বাদামী রঙের ভারী পর্দাটা যেমন ঝোলে, তেমনিই ঝুলছে, তার ওপিঠটা যে ভয়ানক রকম একটা খাঁ খাঁ করছে, বাইরে থেকে দেখে তা' বোঝবার উপায় নেই।

নিরঞ্জন যে বাড়ী নেই, সেটা হয়তো টের পাচ্ছে শুধু সুবল। সকালে চায়ের সময়, ডেকচিতে ভাত চাপাবার সময়।

কিন্তু সুচিন্তাও বুঝি অনুভব করতে চান, নিরঞ্জন নেই, নিরঞ্জন চলে গেছে। তাই আস্তে আস্তে বাদামী-রঙা সেই ভারী পর্দাটা সরিয়ে নিরঞ্জনের ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালেন সুচিন্তা।

না সুচিন্তার এই দুর্বলতা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

একটু আগে নিরুপম সুশোভনকে নিয়ে ডাক্তারবাড়ী গেছে, ইন্দ্রনীল কখন কোথায় গেছে কে জানে। ঝি কাজ করে চলে গেছে। আর সুবলকে এইমাত্র ফল আনতে বাজারে পাঠিয়ে এসেছেন সুচিন্তা।

তবু সুচিন্তার যেন ভয় ভয় করছে।

যেন সুচিন্তার এই সাধারণ দুর্বলতাটুকু কে কোথা থেকে দেখে ফেলে হেসে উঠবে। অসাধারণ হওয়া কত কষ্ট! সাধারণেরা কত সুখী।

সুচিন্তা সাধারণ হলে তো এখুনি ছেলের ওই খাটটায় মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে কাঁদতে পারতেন, যে খাটটা থেকে তোশক, বালিশ আর চাদর তুলে নেওয়া হয়েছে, শুধু নিরাবরণ গদিটা রয়েছে বিছোনো।

নিরঞ্জন তার নিষ্ঠুরতাটাকে কতখানি নিরাবরণ করে বিছিয়ে রেখে গেছে, ওই শূন্য খাটটা যেন তার প্রতীক।

ওখানে বসলেন না সুচিন্তা।

চেয়ারটাতেও না। কোথাও বসে পড়লেন না, শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, সব পড়ে রয়েছে। নিরঞ্জনের চেয়ার টেবিল, ছোট আল-মারীটা, নিরঞ্জনের আলনা বুককেস টিপয় টেবল-ল্যাম্প!

খাটের নীচে ওর সৌখীন পাপোসটা পর্যন্ত স্থির হয়ে পড়ে আছে! এসবের কোন কিছুর এদিক ওদিক হলে চলত না নিরঞ্জনের। এগুলো না হলে কী করে চলবে নিরঞ্জনের!

আবার সব কিছু সংগ্রহ করে নেবে নিরঞ্জন?

পুরনো সঞ্চয়ের বোঝা মাটির ঢেলার মত তুচ্ছ করে ফেলে চলে গিয়ে, আবার নতুন সঞ্চয়ের নেশায় মাতবে?

তবু নিরঞ্জনকে কেউ নিন্দে করবে না। কেউ বলবে না 'এ কী করলে তুমি!'

নিরঞ্জন বলবে, 'আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল'—পাঁচজনে ঘাড় নেড়ে বলবে, 'ঠিক তো। তবে আর কি করে থাকা চলে?'

সুচিন্তা ভাবলেন আবার নতুন সঞ্চয়ে ঘর ভরে উঠবে নিরঞ্জনের! তার-পর আবার ভাবলেন নিরঞ্জন চলে যাওয়ার জন্যে কি আমি দায়ী?

নীতার দিকে বহু মুহূর্তে যে বহু রকমের দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থেকেছে সুচিন্তার ছেলে, সে কী সুচিন্তার চোখে পড়েনি! আর একটা মুহূর্তও কি চোখ এড়িয়েছে?

নীতাকে কি অভিশাপ দেবেন সুচিন্তা?

নিরঞ্জন কি আর আসবে না?

বইগুলো তো পড়ে আছে নিরঞ্জনের!

বইগুলো নিতে আসবে না, কোন একদিন, কোন একটা ছুটিতে! সেদিন কি সুচিন্তা সাধারণ হয়ে যাবেন? ছেলের হাত ধরে বলবেন, 'আর তোর যাওয়া হবে না! চলে গেলে আমার কষ্ট হয়!'

না, তা' পারবেন না সুচিন্তা।

যতটা কষ্ট হলে, অমন করে হেঁট হওয়া যায়; ততটা কষ্ট অনুপম মিত্তিরের ছেলেদের জন্যে হয় কিনা, অনুভব করতে পারলেন না সুচিন্তা।

তবু সুচিন্তা খাটের বাজুটায় হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

সামনের ওই আয়নাটার দিকে তাকিয়ে। যে আয়নাটার প্রায় সমস্তটাই শূন্য, শুধু শূন্যতাটাকে প্রকট করবার জন্যেই বুঝি নীচের দিকের রডটায় একটা ছেঁড়া তোয়ালে আর একটা আধময়লা গেঞ্জি ঝুলছে! যা তুচ্ছবোধে ফেলে দিয়ে চলে গেছে নিরঞ্জন।

ঠিক এই মুহূর্তে সুচিন্তার গালের চামড়াটার বুঝি কোন সাড় নেই। আর সুচিন্তার সামনেও কোন আরশী নেই, তাই সুচিন্তা টের পাচ্ছেন না, তাঁর গালের ওপর দিয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে একটা অবিরল ধারার সৃষ্টি করছে।

'মা!'

চমকে উঠলেন সুচিন্তা।

বাড়ীতে তো কেউ নেই, কে ডাকল তাঁকে! আর 'মা' বলেই বা ডাকল কে? সুচিন্তার ছেলেরা তো এমন করে 'মা' ডেকে কথা কয় না।

এ ডাক কি সুচিন্তার নিজের মনের আকুলতা আর ইচ্ছা?

বুকটা কেমন করে উঠল।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুচিন্তা। দেখলেন সামনেই সুশোভন আর নিরুপম দাঁড়িয়ে! এরা এসে গেছে? কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন সুচিন্তা? কিন্তু নিরুপম কি ডেকেছে সুচিন্তকে?

বুঝতে পারলেন না। সুশোভনই এগিয়ে এলেন, তুমি কী রকম অন্যমনা সুচিন্তা, এই ঘরবাড়ী সব খোলা পড়ে, আমরা এসে তোমার খোঁজ করছি, অার তোমার খেয়ালই নেই। যদি চোর এসে তোমার সব কিছু চুরি করে নিয়ে যেতো!

'চোর আমার কী নেবে?' 'বললেন সুচিন্তা।

নিরুপম আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সুচিন্তা সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে আবার বললেন মুখটা পাশ ফিরিয়ে, 'চলো যাই তোমার খাবার সময় হয়ে গেল।' গালের চামড়ায় সাড় ফিরেছে, তাই সেটাকে লোকলোচন থেকে গোপন করবার চেষ্টা চলছে।

'হবে হবে!' সুশোভন বলেন, 'তোমার খালি খাওয়ার ভাবনা, বোসো না, বোসো না একটু।'

'আচ্ছা এই বসলাম, বল তোমার কি বলবার আছে।' সুচিন্তা বসলেন।

সুশোভন গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন 'অমন করলে কি বলা যায়? সব গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু এই তো তুমি কাঁদছিলে সুচিন্তা। অথচ—'

'কী মুস্কিল সুশোভন, কাঁদবো কেন? সব সময় তুমি খালি আমাকে কাঁদতে দেখ!'

'কাঁদছিলে না? তবু ভাল। তবে বোধ হয় তোমার মুখটাই বদলে গেছে সুচিন্তা। আগে মনে হতো,— দিনাজপুরে মনে হতো তুমি হেসেই আছ, আর এখন খালি মনে হয় তুমি কাঁদছ।

মর্কট পুরাণ ৫

আমাদের বীর হনুমানের জন্ম কথা শুনেছ? জন্মিয়েই সে সকালবেলা লাল সূর্য্যকে দেখতে পেলো!

তখন শিশু হনুমান সেই টুকটুকে সূর্য্যকে ধরতে দিলো এক বিরাট লাফ! ঐ যেমন মনুষ্য শিশু চাঁদ দেখে বলে 'আয় চাঁদ!'

দেবরাজ ইন্দ্র দেখলো মহাবিপদ! সৃষ্টি তো রসাতলে যায়! অগত্যা ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ে মারলো হনুমানকে!

কিন্তু হনুমান ঠিক মরলো না! তবে বজ্রাঘাতে তার হনু, অর্থাৎ দাড়িটা গেল পুড়ে! তখন থেকেই তার নাম হলো 'হনুমান'!

কিন্তু তোমার এই বড় ছেলেটাতো রাগী নয়, সুচিন্তা। সে আমাকে যত্ন করেছে, আমাকে ভালবেসেছে।'

'তোমাকে যত্ন করেছে! ভালবেসেছে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! সে আমার নীতাকেও ভালবাসে।'

সহসা মনের সমস্ত ভার সবলে ঝেড়ে ফেলে ঝরঝরিয়ে হেসে ওঠেন সুচিন্তা, 'তাই নাকি? একথা আবার তুমি জানলে কি করে? ও তোমায় বলল বুঝি?'

সুশোভন অসন্তুষ্ট স্বরে বলে ওঠেন, 'বলবে কেন! বলবে কেন! না বললে বুঝি বোঝা যায় না? সাধে বলি তুমি যেন আমায় পাগল পেয়েছ সুচিন্তা।'

কিন্তু পাগল বোধ করি এবার সুচিন্তাই হচ্ছেন, তাই সহসা সুশোভনের একান্ত কাছে সরে এসে বলে বসেন, 'পাগল পাব কেন? না বললে কি করে বোঝ তুমি, তাই জিগ্যেস করছি। এই আমি তোমায় ভালবাসি কিনা তুমি বুঝতে পারো?'

সুশোভন আরও গম্ভীর হয়ে যান। আস্তে সুচিন্তাকে একটু ঠেলে দিয়ে দূরত্ব এনে বলেন, 'পারি! কিন্তু এত কাছে আসতে নেই সুচিন্তা, তোমার ছেলেরা তাহলে রাগ করে চলে যাবে।'

সহসা সুচিন্তা তীব্রস্বরে বলে ওঠেন, 'যাক, সবাই চলে যাক। আমি আর কারুর রাগকে ভয় করব না। কেন করবো? ওরা ভালবাসতে পারে, যে যাকে ইচ্ছে ভালবাসতে পারে, তার বেলায় দোষ হয় না, যত দোষ শুধু আমার বেলায়?'

সুশোভন ভয় পেয়ে যান।

সন্ত্রস্তভাবে বলেন, 'তুমিও আবার রাগ করতে সুরু করছ সুচিন্তা! রাগ দেখলে যে আমার মাথার মধ্যে রেলগাড়ীর মত শব্দ হয়। বুঝতে পার না?'

কিন্তু রেলগাড়ীর মত শব্দ কি শুধু মাথার মধ্যেই হয়? সুশোভনের মাথার মধ্যে। সুচিন্তার বুকের মধ্যে হয় না সে শব্দ! রেলগাড়ী চলার মত, হাতুড়ীর ঘায়ের মত!

কিন্তু সুচিন্তা পাগল নন, তাই সে শব্দকে বুকের মধ্যেই সংহত রেখে নিরুপমের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, 'কী বললেন ডাক্তার পালিত? এবার তো অনেকদিন পরে দেখলেন।'

নিরুপম হাতের বইটা মুড়ে মুখ তুলে বলে, 'বললেন তো বেশ আশাজনক উন্নতি দেখছেন!'

'আশাজনক উন্নতি দেখছেন!'

'তাইতো বললেন! আর এই একটা নতুন ওষুধ দিয়েছেন—' সামনের টেবল থেকে একটা প্যাককরা শিশি তুলে নিয়ে সুচিন্তার দিকে এগিয়ে দেয় নিরুপম।

দিয়ে বলে, 'ক্যাপসুল ট্যাবলেট! রোজ রাত্রে ঘুমের আগে একটা করে।'

সুচিন্তা যেন আরও কিছু শুনতে চান, যেন বিশদ বুঝতে চান, কোন সূত্র থেকে ডাক্তার বুঝতে পারল উন্নতি হচ্ছে তাঁর রোগীর।

নিরুপম মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি ভেবে ঈষৎ ঘরোয়া সুরে বলে, 'ওষুধটা নতুন বেরিয়েছে! খুব একটা তোলপাড় তুলেছে ডাক্তার মহলে। যেসব মানসিক রোগীর নার্ভ চঞ্চল, তাদের পক্ষে তো খুবই উপকারী, যাদের নার্ভ নিস্তেজ, মানে আর কি হতাশ মনোবল, অবসাদগ্রস্ত রোগীরও—'

'ওকে কোন দলে ফেলছেন ডাক্তার?' কথায় বাধা দিয়ে বলেন সুচিন্তা।

নিরুপম মৃদুস্বরে বলে, 'নানান গ্রুপ আছে ও'দের। ঠিক ওভাবে আলোচনা আমি করিনি, তবে মোটমাটি বোঝাচ্ছিলেন, ঠিক যেভাবে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে কুয়াশা কাটে, সেইভাবে কি করে বিস্মৃতি বা আচ্ছন্ন বুদ্ধির ঝাপসা ভাব কেটে গিয়ে গভীর স্তর থেকে আবার চৈতন্যের বিকাশ হয়। এ ওষুধটা আর কিছু নয় একটানা একটা শান্ত ঘুম এনে দেয়, তার ফলে স্নায়ুরা পূর্ণ বিশ্রাম পায়, আর ক্রমশঃ সতেজ হয়ে ওঠে।'

নিরুপম কি তা'র মাকে মায়া করছে?

সুচিন্তার গালের সেই অবিরল ধারার দাগটা কি এখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি? তাই নিরুপম এত ঘরোয়া সুরে এতগুলো কথা বলছে সুচিন্তাকে!

'নীতার চিঠি আসবার সময় হয়নি?'

'হয়েছে! অর্থাৎ চিঠি দিলে হয়েছে।'

'সেই তো টেলিগ্রাম এসেছিল!' বলে তাকিয়ে থাকলেন সুচিন্তা। সুচিন্তা কি দেখতে এসেছেন পাগল মানুষটা কি করে টের পেল সুচিন্তার বড় ছেলে তা'র মেয়েকে ভালবাসে।

কিন্তু নিরুপম সুচিন্তার ফাঁদে ধরা দেবে না।

সে হাতের বইটা মুখের সামনে তুলে ধরে বলে, 'হ্যাঁ!'

কৃষ্ণার মা বাপ চেপে ধরেছেন ইন্দ্রনীলকে।

বিয়ে করবে তো করে ফেলতে হবে চটপট, আমাদের মেয়ের সঙ্গে হরদম ঘুরে বেড়াবে, আর বিয়েটাকে টাঙিয়ে রাখবে এ কোনও কাজের কথা নয়। পিকনিকের দিনই স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে হয়ে গেছে কথাটা!

ইন্দ্রনীল বলেছিল 'এখন কি করে বিয়ে করা হতে পারে?'

কৃষ্ণার মা গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'কি করে আবার! অগ্নিনারায়ণ সাক্ষী করে। তোমরা আমাদের স্বঘর, এইটুকুই আমাদের পুণ্যির জোর।'

'আমার দাদাদেরই তো কারুর বিয়ে হয়নি।'

কৃষ্ণার মা আরও গম্ভীর হয়ে বলে-ছিলেন, 'দাদাদের বিয়ে হয়নি বলে, তুমি তো আর শিশু হয়ে নেই!'

'বিয়েটা আর কিছুদিন পরে হওয়ায় আপনাদের আপত্তিটা কি?'

'আপত্তি অনেক! শতকরা শতভাগই আপত্তি। মোটকথা, হঠাৎ একদিন বিয়ে করা অনিবার্য হয়ে উঠলে যে রেজেস্ট্রি ম্যারেজ করে দুজনে সামনে এসে দাঁড়াবে, এ পর্যন্ত গড়াতে দিতে রাজী নই আমরা। তোমাদের কোন স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করিনি, কোন ইচ্ছেয় বাধা দিইনি, আমাদের এটুকু ইচ্ছে পালন করতে হবে বৈকি।'

ইন্দ্রনীল তথাপি বলেছিল, 'কি দেখে এখন আমার হাতে মেয়ে দেবেন?'

এবার উত্তর দিয়েছিলেন কৃষ্ণার বাবা। কৃষ্ণার মার চাইতেও গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন তিনি, 'মেয়ে 'দেওয়ার' প্রশ্নটা তো এক্ষেত্রে একটা হাস্যকর নিরর্থক প্রশ্ন। সামাজিক একটা 'শো' করতে হবে এই পর্যন্ত। সম্প্রদানের প্রহসন! সবাই সব জানে, সব বোঝে তবু ওই প্রহসন দিয়েই সমাজে মুখ রাখা।'

'তবু বিয়ের পর তো আমার উচিত হবে স্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া।'

'উচিত কাজ করতে পারা খুবই ভাল কথা,' বললেন কৃষ্ণার বাবা, 'কিন্তু সেটা না পারলে তার চাইতে বেশী অনুচিত ব্যাপার একটা চালিয়ে যাওয়া, আমার মতে নির্বুদ্ধিতার চরম। বেশ যদি বিবেচনা কর বিয়ে করবার সামর্থ্য তোমার এখনও হয়নি, তাহলে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ রাখ।'

শুনে কৃষ্ণা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে বসেছিল।

কাজেই কন্যাবৎসলা কৃষ্ণার মাকে তাড়াতাড়ি বলতে হয়েছিল, মানে আর কি তিনি বলেছিলেন, 'বৌকে খেতে দিতে পারবে না বলে এখন থেকে তোমার অত ভাবতে হবে না বাছা। কৃষ্ণা আমাদের একটা মাত্র মেয়ে, আমাদের যথাসর্বস্ব কৃষ্ণারই—এতো আর তোমার অজানা নয়?'

'তবু একেবারে স্টুডেন্ট লাইফে বিয়ে, এটা কী করে হতে পারে আমি তো বুঝতে পারছি না—' বলেছিল ইন্দ্রনীল।

আর কৃষ্ণার বাবা প্রায় ধমকে উঠে বলেছিলেন,—'স্টুডেন্ট লাইফে যদি ভদ্র-ঘরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানো চলে, তো বিয়েটাই বা চলবে না কেন এও আবার আমি বুঝতে অক্ষম। বিয়ে করবার মত বুকের পাটা নেই, অথচ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবার সখ আছে—এটাই কি বেশ হাস্যকর নয়?'

ইন্দ্রনীল আরক্ত মুখে বলেছিল, 'বাক্‌দত্ত হয়ে দু'চার বছর অপেক্ষা কি কেউ করে না?'

'সে যে দেশে করে, আর যারা তাদের অনুকরণ করে, আমি তাদের দলে নই। আমি যে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছি, জেনো সেটা নেহাৎ নিরুপায় হয়েই। তোমার চাইতে অনেক ভাল পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতাম আমি।'

ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে বলে, 'দেওয়া' শব্দটাতেই তো আপনার আপত্তি।'

কৃষ্ণার বাবা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ সেটা তোমরা জেনে ফেলেছ। এই তোমরা এ যুগের ছেলেরা। তাই আমাদের সেই নিরু-পায়তার সুযোগ নিচ্ছ। একালের মা বাপ যে নিরুপায়, সেটা মনে কোর না —শুধুই আইনের কাছে। তারা নিরুপায় স্নেহের কাছে। মেয়ের সুখদুঃখের প্রতি নজর দিতে গিয়েই নিরুপায়। সেকাল হলে এইসব মেয়েকে ঘরে চাবি দিয়ে আটকে রেখে দিত বুঝলে? আর নয়তো হাত পা বেঁধে যেখানে ভাল বুঝতো সেখানে বিয়ে দিত।' বলে মেয়ের দিকে অধিকতর জ্বলন্ত একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন তিনি।

কৃষ্ণা খানিকক্ষণ বসে বসে রুমালে চোখ মুছেছিল, কৃষ্ণার মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ভুলিয়েছিলেন। তারপর পিক্‌নিকের হৈ হুল্লোড়ে মেতে গিয়েছিল সবাই।

একটা ছেলে তাসের ম্যাজিক দেখাচ্ছিল, আর কে একজন করকোষ্ঠী বিচার করতে বসেছিল। করকোষ্ঠী বিচারে ঝুঁকে পড়েছিল প্রায় সবাই। কৃষ্ণার হাত দেখে সে বলেছিল, কৃষ্ণার বিবাহ আসন্ন, আর ইন্দ্রনীলকে বলেছিল, হাতে বিয়ের রেখাই নেই। এই নিয়ে তুমুল তর্ক আর হাস্যরোল উঠেছিল, এবং ইন্দ্রনীল সদম্ভে জানিয়ে-ছিল, সে অচিরে প্রমাণ করে ছাড়বে, হাতের রেখার বিচারটা স্রেফ গুল!

ভবিষ্যৎ-বক্তা ছোকরা কৃষ্ণার মাসতুতো ভাই। সে এক ফাঁকে চুপি চুপি কৃষ্ণার মাকে জানিয়ে দিয়েছিল, 'সেজ-মাসী, তোমার মেয়ের বিয়ে এগিয়ে দিলাম।'

মোটের মাথায় খুব হৈচৈ হাসি-খুসিতেই কেটেছিল সে দিনটা। এমনকি কৃষ্ণার বাবা পর্যন্ত কার সঙ্গে যেন দাবায় বসেছিলেন।

বেশ উল্লসিত হয়েই ফিরেছিল সেদিন ইন্দ্রনীল। কিন্তু বাড়ী এসে দেখল আবহাওয়া একেবারে উল্টোমুখি।

অবশ্য বাড়ীতে অনুকূল আবহাওয়া ছিল না ইদানীং কিন্তু নিরঞ্জনের এই আকস্মিক চলে যাওয়ার মত আবহাওয়াও ছিল না।

কার কাছে আর কখন তবে কৃষ্ণার বাবার প্রস্তাবিত কথাটা তুলবে ইন্দ্রনীল?

আশ্চর্য বাড়ী ইন্দ্রনীলদের।

বাংলাদেশের হাজারটা বাড়ীর সঙ্গে তুলনা করতে যাও, করা যাবে না।

অতুলনীয় একেবারে।

নীতা যদি এ সময় এমনভাবে চলে না যেত।

নীতা তাদের কেউ নয়, তবু এই কিছুদিনের মধ্যে নীতা যেন অনেক-খানি হয়ে উঠেছিল এ বাড়ীর।

কদিন ধরে ভাবল ইন্দ্রনীল।

ভেবে ভেবে একদিন ওবাড়ী গিয়ে বলে ফেলল, 'আপনারা যত পারেন অনুষ্ঠান করুন, আমার বাড়ী থেকে কোনরকম সাহায্য বা সহযোগিতা পাবেন না। এতে আপনাদের আপত্তি না থাকে তো হোক আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহ। শুধু দয়া করে ওই টোপরফোপরগুলো বাদ দেবেন।'

কৃষ্ণার মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাদ কিছুই দেওয়া যাবে না, তোমাদের মত সৃষ্টিছাড়া বাড়ী তো আমার নয়। বেশ তো আমার বাড়ীতেই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক সব হবে।'

ইন্দ্রনীল চোখ কপালে তুলে বলল, 'শ্রাদ্ধ মানে? শ্রাদ্ধ কি?'

কৃষ্ণার মা সেকেণ্ড খানেক ভাবী জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শ্রাদ্ধ কি, তা' জানো না? বিয়ের সময় কনের মার শ্রাদ্ধ করতে হয় যে! শোনিনি বুঝি কখনো?'

ভাবী শ্বাশুড়ীর ওই শ্রাদ্ধঘটিত ঠাট্টাটা ঠিক ধরতে না পারলেও, পরক্ষণে অন্তরালে এসে কৃষ্ণাকে বলে ইন্দ্রনীল, 'এই অর্থহীন কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানের কী দরকার বলতে পারো? এর কোনো মানে আছে?'

'নিশ্চয় আছে!' কৃষ্ণা তর্কের সুরে বলে, 'নেই কেন? পৃথিবীর সব জাতে, সভ্য অসভ্য সব সমাজে, বিয়েকে ঘিরে নানান অনুষ্ঠানের নিয়ম আছে।'

'কিন্তু ওই নাপিত পুরুত শ্রাদ্ধ পিণ্ডি—'

'ওর মানে আর কিছুই নয়, একটা বিয়ে উপলক্ষে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটুক এই ব্যবস্থা।'

'তার মানে দেশসুদ্ধ লোককে ঘুস দিয়ে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা।'

'ঘুস কেন? খুসীকরা বলতে পারো বরং। সবাইকে খুসী করে আর সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া, এই তো ভেতরের কথা।'

'সে যুগে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল, এ যুগে অর্থহীন।'

'তা হোক—' কৃষ্ণা আদুরে গলায় বলে, 'চুক্তিপত্রে সই করেই বিয়ে শেষ হয়ে গেল, এমন বিয়ে আমার ভাল লাগে না। বিয়েটা তো আর একটা ব্যবসা-বাণিজ্য নয়?'

ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে বলে, 'নয় মানে? পুরোপুরি তাই।'

'পুরোপুরি তাই?'

'তবে আবার কি? তোমাদের ওই বিবাহের মন্ত্রগুলিই বা কী? 'আমার হৃদয় তোমার হোক' বলে দানপত্র লিখেই সঙ্গে সঙ্গে ক্লেম করা হচ্ছে, সেটা হোক, কিন্তু তার বদলে 'তোমার হৃদয়টিও আমার হোক।' একতরফা কিছুই নয়। যা একতরফা নয়, তাই ব্যবসা।'

'চমৎকার! অনবদ্য যুক্তি।'

'খণ্ডন করতে পারো?'

'দরকার নেই আমার। তবে তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে তোমার ওপর একটি জুলুম চাপানো হচ্ছে। এতে আমি অপমানাহত হচ্ছি তা' বুঝতে পারছো?'

মেয়েরা তো কত কিছুতেই অপমানাহত হয়। এই ধর না, আমি যদি হঠাৎ বলে ফেলি, তোমার ওই মুখ-সৌন্দর্যটি তোমার নিজস্ব নয়, ধারকরা, ভুরুটা নকল, চোখটা আঁকা, ঠোঁটটা রাঙানো, গালটা প্রলেপিত, তাহলেও তো অপমানে খানখান হয়ে যাবে তুমি।'

কৃষ্ণা তীক্ষ্মকণ্ঠে বলে, মোটেই তা হবো না, কারণ, তোমার অভিযোগটা ভিত্তিহীন।'

'ভিত্তিহীন! বলতে চাও এই সমস্তই তোমার নিজের?'

'বলতে চাই মানে?' কৃষ্ণা কাঁদো কাঁদো ভঙ্গীতে ভুরুতে রুমাল ঘসতে থাকে, 'তোল। দেখ নকল ভুরুটা তুলে ফেলতে পারো কিনা। দেখ চোখটা আঁকা আর—'

'ব্যাস ব্যাস! হয়েছে!' ইন্দ্রনীল হেসে ওঠে। 'এই সমস্ত যদি তোমার নিজের হয়, তাহলে আর একদিনও তোমাকে অন্য অন্য বর্বর পুরুষের চোখের সামনে বেওয়ারিশ ফেলে রাখা নিরাপদ নয়। এরকম রিয়্যাল জিনিস এ-বাজারে দুর্লভ।'

নকল কলহের মধ্য দিয়ে কখন যেন আবার খুসির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয় ওরা। কৃষ্ণা ভাবে, ও যে এইরকম বেপরোয়া, এই আমার সুখ। ও যদি গদগদ হয়ে প্রেমের বুলি আওড়াতে বসতো, সইতে পারতাম না। ইন্দ্রনীল ভাবে, দূর ছাই, বেশী ভেবে লাভ নেই, যা হচ্ছে হোক। বাড়ীর আবহাওয়া আর সহ্য হচ্ছে না।

বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকে না ইন্দ্রনীল, তবু যেটুকু থাকে, তা-ও যেন নিমের পাঁচন গেলার ভঙ্গীতে।

সুচিন্তা সুশোভনের মুখোমুখি বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সুচিন্তা সুশোভনের কাছাকাছি বসে আছেন নিমগ্ন হয়ে। এ-দৃশ্য সহস্র যুক্তি দিয়েও প্রসন্ন মনে মেনে নেওয়া যায় না।

"এই অর্থহীন কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানের কী দরকার বলতে পারো?"

নীতার বাবা হিসেবে যেটুকু সহানুভূতি আসে সুশোভনের উপর, সেটুকু নিঃশেষে দূর হয়ে যায় মায়ের প্রেমিক হিসেবে দেখলে।

আর সুচিন্তা যেন আজকাল বেশী সাহসী হয়ে উঠেছেন। বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। ছেলেদের পছন্দ-অপছন্দয় কিছু এসে যায় না সুচিন্তার।

(ক্রমশঃ)

যুগপুরুষ গুরজাড়া আপ্পারাও

বোম্মানা বিশ্বনাথম

রবীন্দ্রনাথের জন্মসালেই অন্ধ্রের যুগপুরুষ গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের জন্ম। ১৮৬১ সালে ৩০শে নভেম্বর, বিশাখ জেলার এলামাঞ্চিলি তালুকের রায়বরম পল্লীতে। পিতার নাম ভেঙ্কট রামদাস, মা কৌশল্যাম্মা।

বিগত ৩০শে নভেম্বর থেকে সমগ্র অন্ধ্রে এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

আপ্পারাওয়ের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। ১৭ বৎসর পর্যন্ত গ্রামে পড়াশুনা করে তারপর বিজয়নগরমে পদার্পণ করেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্য-জীবন।

বিখ্যাত কবি শ্রীশ্রীর মতে অন্ধ্রে তিনজন মহান্ কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিক্কন, ভেমান্না এবং গুরজাড়া আপ্পারাও।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মনীষার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল। ১৯১২ সালে ২রা ডিসেম্বর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই তিনি কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে তেলেগু এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। আপ্পারাওয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বহু পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। শম্ভুপ্রসাদ আপ্পারাওকে প্রতিভাবান বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভাকে রীভারাণী অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আপ্পারাও অদূরে থাকলে কিছু লিখবে না, দূর থেকে তোমার কলম সঞ্চালন দেখেই বলে দিতে পারবেন কি লিখছ।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস আপ্পারাওকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এখন অন্ধ্র সাহিত্য-জগতে আপনি যে-ধরনের বিপ্লব আনার প্রয়াস পাচ্ছেন সেই ধরনের কাজের জন্য টেকচাঁদ বাঙালীর কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।' আরো তাঁর বহু বন্ধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছিলেন। দেশভ্রমণের নেশাও তাঁর কম ছিল না।

গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনা। অন্ধ্রের সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা কান্দুকুরী বীরেশলিঙ্গমের পর সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের ভূমিকা বলিষ্ঠ। বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনের ঢেউ অন্ধ্রের বিপ্লবী-মনকে সতেজ করে তুলেছে। আপ্পারাওয়ের বিখ্যাত কবিতা 'দেশভক্তি' বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় লেখা। প্রত্যেক অন্ধ্রবাসীর কাছে এই কবিতা সুপরিচিত। 'দেশ' শব্দের এক নতুন ব্যাখ্যা তিনি এই কবিতায় প্রদান করেছিলেন : দেশামান্টে মাট্টি কাদোই, দেশামান্টে মানুষলোই।

গুরজাড়া আপ্পারাও

জাতীয় ঐক্য গঠনের উদ্দেশ্যে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। দেশ-সেবার যারা সৌখীন মজদুরী করে, গালভরা ভাষণ দিয়ে বেড়ায় তাদের কটাক্ষ করেছেন একাধিক কবিতায়। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই নয়, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যও তাঁর বহু কবিতা রচিত হয়েছে।

গুরজাড়া আপ্পারাওয়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য মহত্তম অবদান কথা ভাষায় 'কন্যাশুল্কম' নাটক রচনা। এই নাটক ১৮৯৬ সালে রচিত। প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-এর ১লা জানুয়ারী। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের জুন মাসে। সমসাময়িক কালের বিভিন্ন চরিত্র এই সপ্তাঙ্ক নাটকে স্থান পেয়েছে। সামাজিক জীবন-যন্ত্রণাকে সুনিপুণভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই নাটক রচিত হওয়ার ফলে অন্ধ্র বা তেলুগু সাহিত্যে শুধু যে একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব দূর হয়েছে তাই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে মৃচ্ছকটিকের মত তেলেগু সাহিত্যেও যে একটি বিখ্যাত নাটক রয়েছে তা অন্ধ্রবাসী গর্ব করে বলতে পারে।

ছোট গল্পরচয়িতা হিসেবেও আপ্পারাও সিদ্ধহস্ত। খণ্ডকাব্য 'পূর্ণাম্মা' প্রখ্যাতি লাভ করেছে। ছোট গল্পের মধ্যে দিদ্দুবাটু, মেটিল্ডা, মীপেরেমিটি, সংস্কর্তহৃদয়মু এবং পেদ্দামসীদু প্রভৃতি জনপ্রীতি অর্জন করেছে। এই সমাজ-ব্যবস্থায় নারী যে ভোগ্যপণ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় তা গভীর দরদ দিয়ে বিভিন্ন গল্পে ও কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যঅধ্যয়নকারীরা কিছুতেই ভুলতে পারবে না তাঁর চিত্রিত বিভিন্ন নারী-চরিত্র। মনে পড়ে বুচ্চাম্মার কথা। পূর্ণাম্মাকে ভুলতে পারি না,—অনন্যোপায় হয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। সমাজের অন্ধকার পিচ্ছিল পথে নেমে যেতে হয়েছে মীনাক্ষীকে। একজন বৃদ্ধকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়েছে মেটিল্ডাকে। গুণবতী হয়েও কন্যাশুল্কম্ নাটকে দেখি মধুরবাণীকে পতিতাবৃত্তিকেই বেছে নিতে হয়েছে।

'দিদ্দুবাটু' গল্পটা ভারি মজার। গোপাল রাও গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে পতিতালয়ে কাটিয়ে আসে। আর চারজনের মত ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে তার বউ হাত গুটিয়ে বসে থাকে না—সে একদিন উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তার জন্য গোপাল রাওকে বিলাপ করতে হয়েছে। গল্পটি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটা মোচড় আছে। সেই মোচড়টাই গল্পের প্রাণ। গল্পের শুরু থেকেই চাকর রামু হাসতে থাকে। তার হাসি গোপাল রাওয়ের নজরে পড়ে না। আর পাঠক ঐ হাসির তাৎপর্য বুঝতে পারে না। গল্প শেষ হলে সেই হাসিটি যে কত গভীর অর্থপূর্ণ তা বুঝতে পারা যায়।

আপ্পারাওয়ের সৃষ্ট মধুরবাণী, পূর্ণাম্মা, কন্যাক, মেটিল্ডা প্রভৃতি

চরিত্রের জন্য আমাদের মন যেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সমাজের নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা ও স্বার্থপরতার যেন প্রতিনিধিত্ব করছে রামাপ্পাপান্তলু, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, মানাওয়াল্লাইয়া, সরভাইয়া প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকে সমাজের এক একটি ক্ষত। তাঁর "মধুত্যালাসারালু" নাটকও খ্যাতি অর্জন করেছে।

শিক্ষকতাকেই জীবিকার্জনের পন্থা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৭ সালের অক্টোবর থেকে বিজয়নগরম কল্যাশালার অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ইংরেজী ও সংস্কৃত পড়াতেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'ও ছিলেন তিনি।

শুধু কবিতা, গল্প, নাটক রচনাই নয়, সমসাময়িক কালের প্রত্যেকটি সৃষ্টিশীল ঘটনার সঙ্গে তিনি নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তেলেগু ভাষার তিনি আমূল সংস্কার করেছেন এবং কথাভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম নাটক রচনা করেছেন। ভারতের যে-কোন প্রান্তে যখনই নানা জাতির কোন সম্মেলন বা ঐ ধরনের কিছু হত, তিনি ছুটে যেতেন। দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ পাঠ করলেও বন্ধুদের তিনি বলতেন, 'পড়তে হবে, অবশ্যই পড়তে হবে; কিন্তু পড়ার চেয়ে বেশী দেখতে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুধু শুধু পড়া বৃথা। আমাদের চোখের সামনে যে প্রকৃতি বা জগৎ নামক বিরাট গ্রন্থটি পড়ে রয়েছে সেইটেই হল সমস্ত গ্রন্থের সেরা। এই গ্রন্থ যে পড়েছে তার আনন্দের সীমা নেই।' যুবশক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ়। টাকার অভাবে কোন ছাত্রের পরীক্ষার ফী জমা দিতে না পারার কথা তাঁর কানে একবার পৌঁছলেই হল, যে-কোন ভাবে তার একটা সুব্যবস্থা করতেন। একাধিক কবিতায় যুব-শক্তির প্রশংসা তিনি করেছেন, যুব-শক্তিকে বাদ দিয়ে দেশের অগ্রগতি যে অসম্ভব তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

বহু নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা শুরু করেও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। ওগুলো শেষ করার আগেই অন্ধ্রের জীবনে এল সেই বিখ্যাত ৩০শে নভেম্বর—মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। প্রত্যেক বছর এই ৩০শে নভেম্বর তারিখটি অন্ধ্র তথা ভারতবাসীর জীবনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের স্মারক হিসেবে হাজির হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলেছে বহুদিন ধরে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা যে ভারতের এক অঞ্চলের অধিবাসী যাতে অন্যাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তিগুলির পরিচয় লাভ করতে পারে, তার কোন সুষ্ঠু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই। বাহুল্য হলেও বলা প্রয়োজন যে, আজও গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের রচনাবলী ভারতের বিভিন্ন প্রতিবেশী সাহিত্যে অনূদিত হয়নি।

ছুটির দিনের পড়া

শশাঙ্ক সেনগুপ্ত

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল।

শীতের উজ্জ্বল সকাল কিংবা শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদ্দুর হাত-ছানি দিয়ে সকলকে বাইরে বেরিয়ে পড়তে আমন্ত্রণ জানায়। সেই আহ্বানে কারো মনে সাড়া জাগে, কারো জাগে না। যাঁদের মনে প্রকৃতির এই আহ্বান পৌঁচেছে তাঁরা বেরিয়ে পড়তে পারেন—সবখানেই শীতের রোদ্দুরের আঁচল পাতা। আলিপুর চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়ম, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম—দর্শনীয় বস্তুর অভাব নেই এই কলকাতায়। ছেলে, বুড়ো, যুবা সকলেই দল বেঁধে এই দর্শনীয় স্থানে গিয়ে ভিড় করতে পারেন। এখানে বয়েসের কোনো প্রশ্ন নেই। আনন্দ ও শিক্ষা দুই এইগুলির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। চিড়িয়াখানা কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে অনায়াসেই উপলব্ধি হতে পারে যে, মানুষ ও প্রকৃতির সত্যকার সহাবস্থানেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যায়। নাহলে এই ইঁট-কাঠের শহরে হাঁফিয়ে-ওঠা মানুষ মাঝে মাঝে উদ্যানের পরিকল্পনা করতো না। যাদুঘরে সংরক্ষিত অতীতের প্রেতের কাছ থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের আদি ইতিহাস অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের দেয়—সে তথ্য আধুনিককাল সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে। বিশেষতঃ শিশুদের নিয়ে ইস্কুলের ছুটির বন্ধের সময়ে কিংবা কোনো ছুটির দিনে এইসব দর্শনীয় বস্তু দেখিয়ে আনা তাদের শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী। বিভিন্ন গাছ-পালা চিনতে শেখা, বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ, যাদুঘরের প্রত্ন ও অন্যান্য মিউজিয়মে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তাদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান পর্যায়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়ম ও বিড়লার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজি-ক্যাল মিউজিয়ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে অনেকেই দূর থেকে দেখে থাকেন। এর ভিতরে সংরক্ষিত মিউজিয়মে বিভিন্ন বিষয় ও দর্শনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অল্প। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষের একটি চূড়ান্ত উদাহরণ এই স্মৃতিসৌধ। এটা তৈরী করতে প্রায় এক ক্রোড় ও পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। চাঁদা জুগিয়েছিলেন ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সাল অবধি লেগেছিল এই সৌধ নির্মাণ করতে। আরো বাকি টুকিটাকি কাজ সারতে ১৯৩৫ সাল অবধি সময় গড়িয়ে গিয়েছিল। সার উইলিয়ম এমার্সনের নৈপুণ্যে এবং মার্টিন বার্ন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই সৌধ নির্মিত হয়। রাজপুতানার যোধপুর স্টেটের সেই মার্বল পাথর কেটে এই সৌধের নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করা হয়—যে পাথরে তৈরি হয়েছিল আগ্রার তাজমহল। এর মধ্যে সংরক্ষিত শুভ্র মর্মরের মূর্তির অনেকগুলিই ইতালির নিপুণ ভাস্করদের হাতের সৃষ্টি।

১৮৪ ফুট উঁচু এই মর্মর প্রাসাদের স্থাপত্য ইতালীয় রেনেসাঁসের স্থাপত্যের অনুরূপ। ভিক্টোরিয়ার সুন্দর সুগঠিত মর্মর মূর্তিই ১৬ ফুট উঁচু। এই স্মৃতিসৌধে উত্তরের প্রবেশ পথ দিয়ে প্রথমে ঢুকলে ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে পঞ্চম জর্জের আমল অবধি বিভিন্ন রাজপরিবারের চিত্র ও বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুরানো আমলের বিরাট একটি ঘড়ি—যার নাম 'গ্রান্ড ফাদার ক্লক'।

ডানদিকের হলের সামনে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ব্রোঞ্জ মূর্তি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে রয়্যাল গ্যালারিতে সারি সারি পেণ্টিং রয়েছে, তার মধ্যে 'জয়পুরে সপ্তম এডওয়ার্ডের ভ্রমণ' রাশিয়ান শিল্পীর আঁকা এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিয়ে', 'সপ্তম এডওয়ার্ডের বিয়ে' প্রভৃতির পারিবারিক ছবি এবং ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো ও লেখা-পড়ার টেবিল হলের মধ্যে সাজানো রয়েছে দেখা যাবে।

হলের বাঁদিকে একটি ঘরের মধ্যে বিখ্যাত ডাচ্ শিল্পীর আঁকা তদানীন্তন-কালের ভারতবর্ষের ছবি রয়েছে, যা দেখে তখনকার সময় ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে। এই ধরণের ছবির মধ্যে একটি 'সতীদাহের' ছবি খুবই মর্মস্পর্শী। তাছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, কেশব সেন এই দু'জন ভারতীয় যুগপুরুষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ গবর্ণরের ছবি রয়েছে। এই ঘরের মধ্যে কাঁচের সুরক্ষিত শো-কেসে পারস্যের ফেরদৌসী প্রমুখ মহাকবির শাহ্‌নামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে যা সুদৃশ্য হস্তলিপিতে নকল ও অলঙ্করণ করা। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পারস্য সাহিত্যের সাত ভল্যুম বই সম্রাট জাহাঙ্গীর মীর

এমদাদ-কে দিয়ে নকল করিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পাতা কপি করার মূল্য এক মোহর। পোর্টের গ্যালারির লাগোয়া ছোট ঘরের শো-কেসে কোম্পানীর আমল থেকে ভারতবর্ষের রাজা-রাজড়াদের বর্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে—যেগুলি উপহার দেওয়া হয়েছিল।

এর পরে উল্লেখযোগ্য প্রিন্স হলের মধ্যে লর্ড ক্লাইভের স্ট্যাচুর সামনে সুরক্ষিত দুটি পিত্তল নির্মিত ফরাসী কামান। সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে ব্রিটিশেরা যা দখল করে নিয়েছিল বলে শোনা যায়। প্রিন্স হলের পূর্বদিকে দরবার হল। দরবার হলের সাজানো মুঘল ও রাজপুত পেন্টিং দর্শনীয়। এই দরবার হলে বাংলার নবাব নাজিমের সিংহাসনের পাথরের পাদপীঠ সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া দুটি ইতিহাসবিখ্যাত রিভলবার সংরক্ষিত রয়েছে—যে দুটি নিয়ে কোম্পানীর আমলে হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়েছিল। খিদিরপুরের নির্জন রাস্তায় এই ঐতিহাসিক ডুয়েল লড়েছিলেন দুই ব্রিটিশ মহারথী। টিপু সুলতান ও হায়দর আলির দুটি তরবারির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে দর্শক ভুলবেন না। কেননা, এই দুই তরবারি একদিন ব্রিটিশ সিংহের উদ্দেশে আস্ফালিত হয়েছিল।

প্রিন্স হল পেরিয়ে একটি বারান্দা দিয়ে দর্শক পৌঁছবেন ড্যানিয়েল-এর হলে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টমাস ড্যানিয়েল (১৭৪৯-১৮৪০) ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়ম ড্যানিয়েল (১৭৬৯-১৮৩৭) ভারত ও ভারতের জীবন-যাত্রা বিষয়ক বহু ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি থেকে তখনকার সময় সম্বন্ধে বহু ধারণা লাভ করা যায়।

আসন্ন অটোমেশন যুগে।

কুইন মেরী হলে রাজা রবি বর্মা, রাডিয়ার্ড কিপলিং, ইলাইজা ইম্পের ছবি এবং চিত্রশিল্পী জোফানীর আঁকা বহু চিত্রাবলী আছে। কুইন মেরী হলের লাগোয়া ছোট ঘরে 'পলাশির যুদ্ধের' মডেল থেকে পলাশি যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা ইংরেজের চোখে দেখা। এছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের মডেল ও প্রথম আবিষ্কৃত তারবার্তা-প্রেরক যন্ত্রের নিদর্শনসমূহও দেখতে পাওয়া যাবে। এর পরে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বিষয়-বস্তু উপরের হেস্টিংস হলে "কর্ণওয়ালিশ সকাশে টিপু সুলতানের বন্দী পুত্রদ্বয়"-এর ছবি এবং জোফানীর ঐ বিষয়ে আঁকা তৈলচিত্র এবং ১৮০০ সালের শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের মডেল রক্ষিত আছে। এছাড়া পরবর্তী পাশের ঘরে পুরোনো কলকাতার রাস্তাঘাট ও দৃশ্যাবলীর বহু চিত্র ও ঐতিহাসিক সনদ, চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র ও মহারাজা নন্দকুমারের জাল দলিল সমূহ সংরক্ষিত আছে—যা দেখে বিগত যুগের প্রাচীন ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এইতো গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কথা। এর পর চলুন বিড়লা মিউজিয়মে। বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত আধুনিক যুগের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে এই বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজি-ক্যাল মিউজিয়ম পরিদর্শন করে এলে। যে শিশুরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক বা যাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য জাগ্রত করার প্রয়োজন; যে কিশোররা বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরাও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করে আসতে পারেন এই মিউজিয়মে গিয়ে। এই মিউজিয়ম গৃহের দ্বিতলে ও ত্রিতলেই দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহকে বিষয়ানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। ধাতু নিষ্কাশনের বিভাগটি এখনো সম্পূর্ণ খোলেনি। মিউজিয়মের অন্যান্য অংশেও এখনও নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি। তবুও দ্বিতলে ও ত্রিতলে দ্রষ্টব্য জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত। দ্বিতলে ইলেক্‌ট্রনিকস্‌ বিভাগ। প্রথম ঘরে একটি যন্ত্রের মডেলের সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন ও তৈল কীভাবে পরিশ্রুত করে মানুষের ব্যবহারে লাগানো হয় তা দেখানো
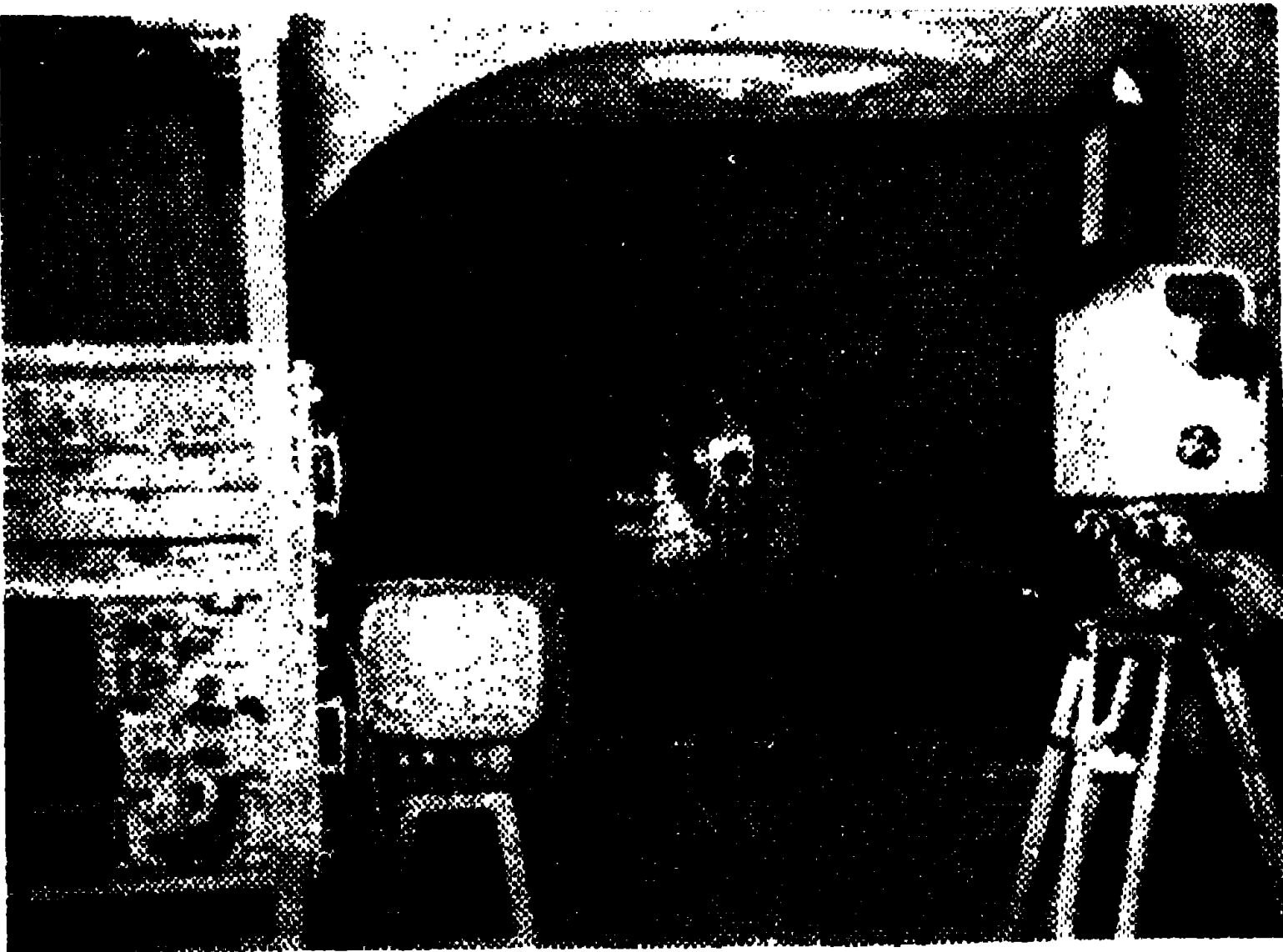
টেলিভিসন সেট।

হয়েছে। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে দেখানো হয় পৃথিবীর মৃত্তিকাস্তরের কোনখানে খনিজ তৈল আছে। ভূকম্পন নির্ণয় ছাড়াও সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে তৈলানুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। এ ব্যতীত পৃথিবীর মৃত্তিকার কোন্ স্তরে ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু প্রাপ্তব্য তাও একটি যন্ত্রের মডেলের সাহায্যে রশ্মি দ্বারা নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রপ্রেরিত রশ্মি ইউরেনিয়ামের সংস্পর্শে এলেই গ্যাসপূর্ণ টিউবে একপ্রকার শব্দ উত্থিত হয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানেই ঐ শ্রেণীর ধাতু আছে।

এর পরে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য শব্দ-ধ্বনি তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্র। মাইক সংলগ্ন ক্যাথড্ রে-এর সাহায্যে 'pure tone' ও 'complex tone' নির্ণয়। শব্দধ্বনিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কীভাবে জানা যায় গৃহস্বামী বাড়ীতে আছে কি নেই (In or Out) তাও দেখা যায়। আসন্ন অটোমেশনের যুগে আগন্তুকের সাড়া পেয়ে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল, ফ্যান আপনা থেকেই চলতে লাগলো, আগন্তুক এসে চেয়ারে বসতেই চোরা বোতামে চাপ লেগে আলো জ্বলে উঠলো আপনা থেকেই—শুধু আপনা থেকে এক কাপ চা আসার অপেক্ষা। আগামীকালে বোধ হয় তাও অসম্ভব থাকবে না। এরপর রেডিওচালিত এরিয়ালবিশিষ্ট মোটর-লঞ্চও দেখা যাবে। বৈজ্ঞানিক যুগে কী সম্ভব হয়েছে তার আভাস পাওয়া যাবে এক পলকেই। এ ছাড়া আরো কী কী সম্ভব হতে পারে তা ভেবে দর্শকের কল্পনাশক্তি আপনা থেকেই সজীব ও প্রখর হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মার্কনি উদ্ভাবিত বেতারের প্রাথমিক যন্ত্রাদি এবং ভোল্টাস্ উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহ দেখা যেতে পারে।

মিউজিয়মের টেলিভিসন সেট সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রবলতর হওয়া স্বাভাবিক। এখানে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা প্রোগ্রাম হয়। অনেক ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসতে পারে। টেলিভিসনে প্রোগ্রাম করতে হলে লটারীতে যোগদান করতে হবে। যারা 'লাকি নাম্বার' পাবে, গেটে সেই নম্বর দেখিয়ে তারা প্রোগ্রাম করার সুযোগ পায়। এই সেট দেখে টেলিভিসন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা অনেকাংশে স্পষ্টতর করা যেতে পারে। যদিও সেটটি সম্পূর্ণ হাল-আমলের নয়। তাই জোর আলোর সামনে বসে দু'একটি শিশু দেখা গেল চোখ বন্ধ করে গান গেয়ে যাচ্ছে। তবুও এরই দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তিন লাখ টাকা খরচ করতে পারলে সম্পূর্ণ আধুনিক টেলিভিসন আনা যাবে। তখন অল্প আলোতেই প্রোগ্রাম চালু করা যাবে সুষ্ঠুভাবে। টেপ রেকর্ডারে গান রেকর্ড করার সুযোগও শিশুরা পায়।

ত্রিতলে 'Motive Power' বিভাগে বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন থেকে শুরু করে কিভাবে সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হলো এবং কারখানার প্রচণ্ড শক্তিশালী আধুনিকতম বয়লার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কল-কারখানা চালু করা গেল নানা মডেলের উদাহরণের সাহায্যে তারই ক্রমিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রিতলের 'Electricity' বিভাগে চুম্বক ও তার ব্যবহারে কি করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যায়—বিজ্ঞানের এইসব প্রাথমিক পাঠ নানা যন্ত্রের পরীক্ষার সাহায্যে শিশুদের দেখানো হয়। প্রতি ঘরেই 'ডিমনেস্ট্রেটররা' অনর্গল বক্তৃতার সাহায্যে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে থাকেন। বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই ল্যাবরেটরির পরীক্ষা থেকেও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। একটি নাতিবৃহৎ 'X-ray plant'ও স্থাপন করা হয়েছে—জনসাধারণকে এর উপ-যোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্যে।

মিউজিয়মের আর একটি বিভাগ শীগ্‌গির খোলা হচ্ছে। সেখানে খনিজ তামা ও লোহার ধাতুনিষ্কাশন ও শোধনের পদ্ধতি দেখানো হবে। সর্ব-সাধারণের জন্যে এখনো তা খোলা হয়নি। কিন্তু ধাতুনিষ্কাশন ও পরি-শোধনের ছোট 'Model plant' বসানো হয়েছে। এছাড়াও নির্মীয়মান অংশে আরো অনেক কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

আধুনিক পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করে দিতে এই ধরণের মিউজিয়মের উপ-যোগিতা সীমাহীন। আমরা যে আণবিক যুগে বাস করছি, তার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিশুদের অজানা। বিজ্ঞানের অবদান আমাদের জীবনে কত অসামান্য, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধ্যান-ধারণা এ সব না দেখলে শিশুমনে বদ্ধমূল হওয়া সম্ভব নয়। অথচ অভি-ভাবকদের সঙ্গে ছুটির কয়েক ঘণ্টা এ সব জায়গায় খেলাচ্ছলে কাটিয়ে এলে লাভ বই লোকসান হয় না।

বসন্ত

কালিদাস দত্ত

নিশির ট্র্যামে উঠতে ইচ্ছে করল, কিন্তু ভাড়ার কথা মনে পড়ায় ফুটপাথ ধরল। ইচ্ছে হলেই কিছু করতে যারা পারে তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান, নিশি নয়। অবশ্য ভাড়া না দিয়ে কিছু দূরে যাওয়া যায় এবং সে কোন কোন দিন গেছেও, তবু আজ যেতে ইচ্ছে করল না। ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেসটাকে সে রপ্ত করতে চায় না, সে সৎ থাকতে চায়, তাই সেই ইচ্ছেটাকে সে নিয়ত প্রাণপণে দমন করে। তার আই-এ পরীক্ষাটা দেবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু টাইফয়েডে তিন মাস ভুগে, পাঁচ মাসের মাইনে কলেজে বাকি ফেলে, সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই তাকে পড়ায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল। চেষ্টা করলে দু-এক মাসের মাইনে মকুব হয়তো হত, কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হত না, তা ছাড়া প্রার্থী হতে অর্থাৎ কিছু বিনিময় না করেই দান গ্রহণে তার ইচ্ছে হয় না। ভিক্ষে করার ইচ্ছেটাও তাই সে দমন করেছে। হাত পেতে ভিক্ষে করতে, তা সে যার কাছেই হোক না কেন, সে পারবে না, পারে না। মাধবী তার কোন এক জন্মদিনে (মাধবীরও জন্মদিন হয়, মানে হয়েছিল!) বড়লোক মাসির কাছ থেকে পাওয়া তিন আনি সোনার আংটিটা নিশিকে দিতে চেয়েছিল, সরাসরি নয়, মাত্র একটা ইঙ্গিত করেছিল। নিশি সেই ঘটনার পর দেড় মাস মাধবীর সঙ্গে দেখা করেনি।

মাধবীর কথা মনে পড়ায় নিশির ইচ্ছে হল এক্ষুণি মাধবীর সঙ্গে সে দেখা করে। দিন সাতেক হয়ে গেল মাধবীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি, মাধবীদের বাড়িতে সে যায়নি। কিন্তু ইচ্ছে হলেই এক্ষুনি সে ইচ্ছেটা পূরণ করা যায় না। এখান থেকে, শহরের এই হৃদয়স্থল থেকে শহরতলীর পাদনখের দূরত্ব অন্ততঃ সাত মাইল। পৌঁছুতে পৌঁছুতে হয়তো ইচ্ছেটা আর থাকবেই না। এই ইচ্ছে না থাকার, গত সাত দিন যাবৎ সময় না পাওয়ার আরও একটি কারণ অবশ্য আছে। মাধবীর চোখে সহানুভূতির ছায়া বড়োই বেশি। স্বাগত ভাবণটা বিরক্তিজনক। করুণ দুটি চোখ তুলে মাধবী বলবে, "কিছু হল?" আর মাধবীর মা অসহ্য আরও। তাঁর চোখের প্রত্যাশাটা প্রায় হ্যাংলামির মত। নিশিকে তিনি খুব স্নেহ করেন, ঘরে যা থাকে তাই "নিশি তো আমার ছেলের মত" বলে খেতে দেন, কিন্তু কেন তিনি বলবেন, "অ মাধু, শুধু শুধু বসে রয়েছিস, নিশিদাকে একটা গান শোনা না?" আর তাই শুনে মুখ আরও গোঁজ করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে মাধবী ঠায় বসে থাকবে অবাধ্য ঘোড়ার মত। মায়ের ওপর বিতৃষ্ণায় ওর মনটা ভরে উঠবে।

শুধু কি এই জন্যই নিশি এই সাত দিন মাধবীদের বাড়ি যায়নি, মাধবীর সঙ্গে দেখা করেনি? না, তা নয়। আরও একটা কারণ অবশ্য আছে। মুখে তা মাধবীর কাছে কিংবা কারুর কাছেই স্বীকার করবে না। নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না। তবু হঠাৎই মনে পড়ে যায়। এবং তখন নিজেকে ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ মনে হয়। হঠাৎ নিশি বিড়বিড় করে উঠল, "না, আমি ভীরু নই, আমি কাপুরুষ নই।"

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসে ভাবল, "এবার আমি কি করব।" অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, "ভয়ংকর খিদে পেয়েছে, আমি খাব।' সত্যি সত্যি খিদে পেয়েছে কিনা পেটে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল হাতে কার্ডটা এখনও ধরে আছে। হাতের তেলোর ঘামে ভিজে কার্ডটা প্রায় রোদে-পোড়া টয়লেট সাবানের মত নরম হয়ে গেছে। এই কার্ডটা রিনিউ করাতেই

সকাল সাতটায় সে রওনা দিয়েছে। এখন বারোটা বাজে। কার্ডের মত জীবনটাও যদি মাঝে মাঝে রিনিউ করা যেত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিশি ভাবল। সেই বিরক্ত কেরানী ভদ্রলোককে নিশি আত্মীয়তার সুরেই জিজ্ঞেস করেছিল, "আশা প্রায় ছারিয়েই ফেলছি স্যর। এই নিয়ে ছ' বার রিনিউ হল। একটা ডাকও কি আমাদের আসতে নেই? অনেকেই তো পায়-টায় শুনি।" একটু ঠাট্টা করেই শেষের কথাটা নিশি বলেছিল অবশ্য।

ভদ্রলোক (আসলে ভদ্রলোক কিনা এখন নিশির সন্দেহ হচ্ছে) মর্মান্তিক রকমের নির্মম। উত্তর (উত্তরটা কি বলব না) শুনে নিশি বোকার মত একটু হেসে বলেছিল, "ও, তাই বটে। মানে, ম্যাট্রিকুলেটও তো পায় শুনি, আমি তবু তো সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছি। পাশ করিনি, শিগ্গির করব, মানে করার ইচ্ছে আছে।"

অনেকটা চুরি করে ধরা পড়ে যাওয়ার পর, মার খেয়ে পালিয়ে আসার মত, সে মুখে হাসির ভাবটা বজায় রেখেই (যেন একটা মজা করছিল) রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। এবং রাস্তায় বেরিয়ে এসে, রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সামনে পেছনে মোটরের তীব্র হর্নের মধ্যে নিবিষ্ট থেকে একটি কথাই ভেবেছিল, করোনারি থ্রম্বোসিস্ মানে কি? সেটা একমাত্র বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন? এক্ষুণি, এই মুহূর্তে, আমারও কেন থ্রম্বোসিস্ হবে না? অনেক ইচ্ছের মত এই ইচ্ছেটাও যখন নিশির পূরণ হল না, তখন নিশি হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

কার্ডটা নিশি পকেটে রাখল পেটে হাত বুলোবার জন্যে। এইবার সে পেটে হাত রাখল।

ফেব্রুআরির শেষ, অথচ এরই মধ্যে রোদ্দুরের তেজ আগুনে পুড়িয়ে তোলা ক্ষুরের মত। বেশ কেটে কেটে বসছে। অনেকক্ষণ রোদ্দুরে হাঁটার প্রতিক্রিয়া অথবা নিজের ভিতরের দাহের উত্তাপ ঠিক করতে পারার আগে নিশি সিদ্ধান্ত করল, কাল রাত্তিরে আলুভাজা দিয়ে রুটি খাবার পর আজ সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়ে পড়া এবং এখন পর্যন্ত অর্থাৎ এই মোট পনেরো ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে খিদে পাওয়া উচিত। সে ঠিক এই মুহূর্তে বুঝতে যদিও পারছে না, কারণ অনেকক্ষণ আগেই তার খিদেটা মরে গেছে, তবু খিদে তার পেয়েছে।

"এবার আমি কিছু খাই" এই ভেবে সে সামনের সাজানো খাবারের দোকানে গিয়ে ভরে-রাখা এক গ্লাস জল তুলে খেয়ে, জামার হাতায় মুখ মুছে রাস্তায় নেমে পড়ল। চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, যাদের আর কিছুই খাবার অধিকার নেই, তারা জল খেতে পারে, যেমন কোন কিছুই করার অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই শুধু শিল্পের সাধনায় অধিকারী। তার বন্ধু হিমু তাই কবিতা লেখে এবং অনেকেই বলেছেন, সে-সব স্থায়ী কবিতা হবে, যদিও হিমু নিজে বেশিদিন স্থায়ী হবে না। নিশি ভাবল, আমিও এই পথে যেতুম, কিন্তু আমার কিছু করার এখনও অধিকার আছে আমি মনে করি, যেমন, আই-এ পরীক্ষাটা আমায় দিতে হবে, এবং মাধবীর মা আমার ওপর একটা প্রত্যাশা রাখেন যেটা আমি পূরণ করতে পারি চাই না-পারি, তাতে একথা মিথ্যে হয়ে যায় না যে, আমি মাধবীকে ভালোবাসি। ভালোবাসা একটা কাজ, কিছু একটা করা। হিমু সেদিন বলছিল, যারা শিল্পী তারা যদি নিজেরা ভালোবাসা-বাসিতে জড়িয়ে থাকে, মানে, জড়ানো অবস্থায় থেকে চলে, তা হলে তারা আর শিল্পী থাকে না, শিল্পীর দরকারী চরিত্রের 'র মেটিরিয়াল' হয়ে যায়। হিমু অবশ্য খানিকটা পাগল, কারণ কেউ আদর করেও কিছু খেতে দিলে সে "আমার খাওয়ার যোগ্যতা নেই" বলে খায় না, যদিও আমার কাছে সে স্বীকার করেছে, "না খেয়ে থাকলে অনুভূতির তীব্র উপলব্ধি জন্মে। তাই শিল্পিদের বেশি খেয়ে ভোঁতা হয়ে যাওয়া উচিত নয়।" খাওয়ার মর্মটা বোধ হয় কোনদিনই বেচারী টের পেল না। তাই ওই ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

এই খাওয়া অবশ্য একটা কারণ যার জন্য এই মুহূর্তে নিশির ইচ্ছে করল মাধবীদের বাড়ি যেতে, কারণ, দুপুর-বেলা গেলেই মাধবীর মা জোর করে ভাত খাইয়ে দেন, তাতে আমিষের মুখরোচক গন্ধ কখনো-সখনো থাকে, কিন্তু বাড়িতে বিধবা মায়ের সঙ্গে আলুসিদ্ধ ভাত খেয়ে খেয়ে নিশি নিজেও নাকি বিধবা হয়ে গেছে। তবু ভাগ্যিস মা বুড়ীটা ছিল এবং ভাগীদার অন্য ভাইবোন নেই তাই এখনও যা গেলেই জুটছে তা ঠিকই জোটে। মা টীকে বানিয়ে, ঠোঙা গড়ে এখনও ভাত আর আলুসিদ্ধর ব্যবস্থাটা চালু রেখেছে, নিশিও মাঝে মধ্যে সিকি আধুলি টাকা মায়ের হাতে দিতে পারে,

তাইতে শুধু সিদ্ধ নয় মাঝে সাঝে আলু-ভাজাও হয়। টীকের বাজার খারাপ, কল-কাতার লোক এখন সন্ধেয় ধুনো দেওয়ার পাট তুলে দিয়েছে, গড়গড়ার চলটাও পড়তির মুখে। বরানগর থেকে বেলেঘাটা অনেক দূর, নইলে টীকে-বুড়ীর ছেলে নিশিকে মাধবীরা কোনদিনই মাস্টার রাখত না এবং মাধবী ক্লাস নাইনে উঠে পড়ায় ইস্তফা দেবার পরও নিশিকে বাড়ি ঢুকতে দিত না। অবশ্য মাধবীরাও লাট-বেলাট নয়, তার বাবাও পুরুতগিরি করে, তবু নিশিকে তারা কেউ-কেটাই ভাবে। মাধবীর মা একদিন বলেছিলেন, আমার মাধুর খুব ইচ্ছে, তোমার মাকে গিয়ে একদিন দেখে আসে। যাঁর ছেলে এমন হীরের টুকরো তিনি না জানি—

নিশি মনে মনে চমকে উঠলেও মুখে বলেছিল, সে তো ভালোই। যাবে না হয় একদিন। শুনে তিনি বলেছিলেন, যা না মাধু, যাবি যাবি করছিলি যে। যা, দেখে আয় গিয়ে, একটু বেড়ানোও হবে। ঘর থেকে তো বেরুস না, যা।

নিশি বুঝল মাধবীর মা সুযোগ দিচ্ছে। হুঁ, খুবই চালাক। না হয়ে উপায় কি?

রাস্তায় বেরিয়ে মাধবী বলেছিল, আমার ভয় করছে, উনি যদি কিছু ভাবেন।

নিশি বলেছিল, ভাবেন মানে? আমাকে একেবারে কেটেই ফেলবেন। তোমার মার মত আমার মা অত উদার নন। ভয়ংকর কনজারভেটিব। মা মোটে পছন্দ করেন না মেয়েদের সঙ্গে মিশে আমি গোল্লায় যাই। ধাড়ী মেয়েরা কামাখ্যার মন্ত্র জানে, জানো?

ঃ আমি ধাড়ী বুঝি?

ঃ অই আর কি কথার কথা, তিনি তাই বলবেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে হাজার টাকা পণের স্বপ্ন দ্যাখে বুড়ী। তোমার মার সামনে তো আর সব খুলে বলতে পারি না। বললেন নিয়ে যাও, নিয়ে এলাম। এই ফাঁকে একটু বেড়ানো হবে।

ঃ তা হলে এখন কী করব?

সমস্যা। নিশি মেয়েদের নিয়ে এর আগে কখনও রাস্তায় বেরোয়নি, তার কেমন লজ্জা এবং গর্ব হচ্ছিল। পকেটে যথেষ্ট পয়সা থাকলে ট্যাক্সি করে একটু বেড়ানো, কিংবা সিনেমায় গিয়ে বসা যেত। সে সব কিছুই হল না। শিয়ালদা স্টেশনে একটু বেড়াল, চোরা বাজারে

ঢ়কে ফার্নিচার দেখল, দাম করল, তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় ঘুঘনি খেয়ে বেলেঘাটা ফিরে গেল।

বেলেঘাটায় পৌঁছে সেদিন নিশি নিজেকে খুব দুর্বল, অক্ষম, ভীরু, অসমর্থ ইত্যাদি ভেবেছিল, কারণ সে ইচ্ছে করলেই ট্যাক্সি করে হাওয়া খেতে পারে না, সিনেমা যেতে পারে না, কাজেই মাধবীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তার উচিত হবে না যতদিন না সে—। ঠিক এই সময় মাধবীর মা এসে বলেছিলেন, হয়ে গেল? কেমন দেখলি, মাধু? যেও না, বাবা। তালের বড়া ভেজেছি, গরম গরম দুটো মুখে দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এই খাওয়া। খাওয়ার জন্যেই সে এই মুহূর্তে যেতে চাইছে মাধবীদের বাড়ি। তা হলে এই সাত দিন সে যায়নি কেন মাধবীদের বাড়ি? তার গূঢ় কারণটা কী? কারণ আছে। কিন্তু এতদিনে মাধবীও নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে।

প্রায় দশ-বারোদিন পর, দিন সাতেক আগে, নিশি মাধবীদের বাড়ি গিয়েছিল। নিশি ইচ্ছে হলেই যখন তখন মাধবীদের বাড়ি যেতে পারে না তার কারণ প্রচুর হাঁটতে হয়, পা ব্যথা হয়ে যায়। যেদিন বাসের পয়সা পকেটে থাকে সেদিন অবশ্য আর হাঁটে না। দ্বিতীয় কারণ, তার জামা কাপড় ইদানীং সব সময় মাধবীদের বাড়ি যাবার মত থাকে না, শুধু ময়লা নয়, ঘামে ভিজে কেমন একটা টকটক গন্ধ হয়ে যায়, কারণ তাকে চাকরির জন্যে, না শুধু চাকরির জন্যে নয়, যে কোন সৎ উপায়ে উপার্জনের জন্যে সব সময় রোদে জলে হাঁটাহাটি করতে হয়। তৃতীয় কারণ, এই বয়সেই তার দাড়িটা এখন খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয় যা নিয়মিত সে কামাতে পারে না। এক মুখ দাড়ি নিয়ে কেন যেন তার মাধবীদের বাড়ি যেতে মন টানে না। এটার কোন সন্তোষজনক কারণ অবশ্য সে খুঁজে পায় না। চতুর্থ কারণ এবং এটাই সব চাইতে বড়ো কারণ, সে ভাবে, গিয়ে কী হবে? ওর মার সেই অতি প্রত্যাশার হ্যাংলামি, মাধবীর মুখ গোঁজ করে বসা, কিছু হল কিনা জিজ্ঞাসা করে মাঝে মাঝে উত্যক্ত করা—তার চাইতে না গিয়ে একটি মেয়ে এবং তার মা আমার সম্পর্কে ভাবছে একথা ভাবতে ভালো লাগে এবং এই পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের ভাবাভাবি, কাছাকাছি হওয়ার ইচ্ছা অথচ না হওয়া অথবা না হতে পারা ইত্যাদি মানসিক দ্বন্দ্বগুলিকেই বোধহয় ভালোবাসা বলে। এঃ, নিশি ভাবল, অনেকটা হিমুর মত চিন্তা হয়ে গেল। হিমুর সঙ্গে মিশে হিমুর অনেক ইনফ্লুয়েন্স আমার ওপর পড়েছে। বহুদিন হিমুটার সঙ্গে দেখা নেই, বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

এই সমস্ত কারণেই মাধবীদের বাড়ি যাওয়া আজকাল তাকে অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে। টাকার জন্যে তাকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এ বছরটা নষ্টই হল, সামনের বছর তাকে পরীক্ষাটা দিতেই হবে, মাধবীকেও ম্যাট্রিকটা দিতে বলবে, আসলে টাকার জন্যেই ওরও পড়া খতম হল সেটা মাধবীর মা অত ঢাকার চেষ্টা করলেও নিশি ঠিকই বোঝে, মার টাঁকে-বেচা সম্বল থেকে তিন টাকা ধার নিয়েছিল হিমুকে ধার দেবার জন্যে, সেটা শোধ দিতে হবে, পাইকপাড়ায় মাসিক আট টাকা মাইনেয় ক্লাশ থ্রি'র যে ছাত্রটিকে পড়াতো এবং যার বাবার কাছ থেকে অনেক চেয়ে চিন্তে এক মাসের অগ্রিম টাকা নিয়েছিল, তার এই দুর্দিনের বাজারের সেই একমাত্র ছাত্রটি দিন তিনেক হল কলেরায় মারা গেছে, কাজেই অ্যাডভান্স নেওয়া টাকার কতটা ফেরৎ দেওয়া উচিত, অথবা আদৌ সে টাকাটা হাতে করে ফেরৎ দেওয়া চলে কিনা, যদি চলে তবে সেই টাকা কোত্থেকে আসবে—এই সব সমস্যার সমাধানের জন্যই তাকে আজকাল ছুটোছুটিটা বেশি করতে হচ্ছে। এই ছুটোছুটির মধ্যেই মাধবীর চেহারাটা হঠাৎ মনে ভেসে ওঠে। ওর করুণ অসহায় চোখ, আবার পরক্ষণেই নিশির জন্যে ওর সহানুভূতির গাঢ় ছায়াময় চোখ, কেমন যেন কাজে কর্মে অবসাদ এনে দেয়, তখন মাঝে মাঝে ওকে বেলেঘাটায় যেতে হয়, দু-চারটে কথাবার্তা বলে অবসন্ন ভাবটা যখন কাটে, একটা দুর্দান্ত আশার ছবি সামনে ভেসে ওঠে তখন আবার ও ঠিক হয়ে যায়। মনে মনে ঠিক করে একটা কিছু ওলট-পালট না হওয়া তক্ সে আর বেলেঘাটা আসবে না। কিন্তু সব ইচ্ছের মত শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছেটাও সে ঠিক রাখতে পারে না। সে তখন মনকে এই বলে বোঝায় যে, ইচ্ছেটাই বড়ো কথা এবং সেই ইচ্ছেটা পূরণের সৎ চেষ্টা আরও বড়ো কথা, কিন্তু তারপরও

পূরণ যদি না হয় তখন মানুষের পরবর্তী ইচ্ছের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই পুনরায় না যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগে সে একবার মাধবীর সঙ্গে দেখা করে আসে।

সেদিন তাই মাধবীদের বাড়ি গিয়েছিল নিশি। দরজার গলি পার হয়ে ওদের ঘরের দিকে যেতে যেতে মনে হয়েছিল বাড়িটা কেমন ঝিমিয়ে আছে, মনে হচ্ছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে ক্লান্ত হয়ে। অবশ্য তখন সন্ধ্যের আগে বিকেল বিকেল, ভাড়াটে বাড়ির কর্তারা কেউ বাড়ি ফেরেননি, ছেলেরা বোধ হয় খেলতে বেরিয়ে গেছে কিংবা ওই রকম কিছু একটা হবে। মাধবী বোধ হয় নিশির পায়ের শব্দ চেনে, কিংবা কুকুরের মত একটা বিশেষ ঘ্রাণশক্তি আছে যার ফলে নিশি দরজায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আজ এল না। নিশি ওদের বড়ো ঘরে ঢুকে কাউকে না দেখে ফিরবে কিংবা ডাক দেবে ভাবছে এমন সময় মাধবীর মা ঘরে ঢুকে "ওমা, নিশি যে" বলে একটু হেসে মাথার কাপড় ঠিক করে টুলটা এগিয়ে দিলেন বসতে। নিশি বসল। যেন মাধুর মার কাছেই সে বেড়াতে এসেছে!

মাধবীর মা বললেন, এতদিন আসোনি, আমরা ভাবলুম তুমি বোধ হয় চাকরি পেয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছ। মাধবী তো সেই রকমই বলছিল, তোমার নাকি কলকাতার বাইরে যাবার কথা।

নিশির মনে পড়ল। মাধবীর প্রশ্নে উত্যক্ত হয়ে একদিন সে অবশ্য বলেছিল, চাকরি একটা পেয়েছে কলকাতার বাইরে, যাবে কিনা ভাবছে, মাকে ফেলে যাওয়া অবশ্য শক্ত, তবু ভাবছে। শুনে মাধবীর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ নিশি প্রথমেই মাকে ছেড়ে যাবার প্রশ্নে চিন্তিত, অন্য কারুর কথা ভেবে নয়।

নিশি বললে, যাবার কথা ছিল, গেলুম না। মানে, কলকাতা ছেড়ে গেলে অনেক অসুবিধে এখন। পরীক্ষাটা দেব ভাবছি। এর মধ্যে এদিকেও একটা কাজ হয়ে যাবে যাবে মনে হচ্ছে। তারপর, আপনারা কেমন আছেন? মেশোমশাই, সিণ্টু, মিণ্টু, মাধু ওদের দেখছি না। বেরিয়েছে বুঝি?

মাধুর নামটা করে নিজেকে কেমন ছোট মনে হল। ওর কথা জিজ্ঞেস করে মাকে প্রফুল্ল না করলেই ভালো ছিল।

ঃ মাধুর তো অসুখ।

শুনে নিশির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাধুর নাকি আবার অসুখ হয়? একথা তো সে কোনদিন ভাবেনি। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে অথচ না পেরে সে বললে, অসুখ? কি অসুখ?

ঃ কিছুই বুঝছি না বাবা। দিন চার-পাঁচ হল গায়ে কেমন সব গোটা গোটা বেরিয়েছে। উনি তো বলছেন হাম।

তারপর কপালে খাঁড়ার মত জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, আমার কিন্তু ভয় হয় হাম নয়, মায়ের দয়া, আসলই হবে। কী যে ভয়ে আছি, তুমি একটু এসে দ্যাখো তো বাবা!

নিশির গায়ের রক্ত প্রায় জল হবার উপক্রম। গা-টা তার কেমন শিরশির করে উঠল। ইচ্ছে হল, ওই মুহূর্তে সে ছুটে পালায় এখান থেকে। পরক্ষণেই মনে হল, সে কি, মাধুকে না সে ভালোবাসে? মাধুকে সে নিশ্চয়ই ভালোবাসে, কিন্তু অসুস্থ মাধুকে কি সে ভালোবাসে? তার ওপর, এতক্ষণে তার মনে পড়ল, সে নিজে টিকে নেয়নি, আর এ বছর এমন বিচ্ছিরি বসন্ত হচ্ছে। নিশি বললে, ভয়ের কি? এ বছর খুবই বসন্ত হচ্ছে চারদিকে। টিকে-ফিকে নেয়নি নিশ্চয়ই?

ঃ হ্যাঁ, নিয়েছিল তো।

ঃ তবে ভয়ের কিছু নেই। চিকেন পক্স হতে পারে। বেশ গোটা গোটা, ভেতরে জল জল মনে হয়?

ঃ মুখটা খুব ফুলেছে, বুক পিঠ ভর্তি হয়ে গেছে, মেয়ে আমার কাৎ হয়ে ছাড়া শুতে পারে না, ব্যথা! ঘায়ের মত, জল, এ সব তো মনে হল না। এসো না, বাবা, একটু দেখবে।

"চলুন"—নিশি ভয়ে ভয়ে উঠল, বললে, এ বছর খুব হাম বসন্ত হচ্ছে। অন্য ছেলেমেয়েদের একটু সাবধানে রাখবেন। বলে হাত দুটো সে পকেটে রাখল যেন হাতেই ছোঁয়াচের ভয় বেশি।

পাশের ঘরে মাধবীকে রাখা হয়েছে। ঘরের জিনিসপত্তর যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ধূপ-ধুনো দেওয়ায় অনেকটা পুরনো মন্দিরের ভেতর যেমন গন্ধ বেরোয় তেমনি মনে হচ্ছে ঘরটা। মেজের ওপর বিছানা পাতা, ঘন মশারির মধ্যে মাধবী শুয়ে আছে। অনেকটা শ্বেত পাথরের কবরের মত দেখাচ্ছে মশারিটা। এখনও হ্যারিকেন জ্বালানো হয়নি, বিকেলের আবছা ম্লান আলোয় মশারির ভেতর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মাধবীর মা বললেন, অ মাধু, দ্যাখ কে এসেছে। মশারিটা তুলে মুখটা একটু দেখা তো, নিশি দেখুক।

মশারির ভেতরে কেমন একটা অনুনাসিক কাতর গোঙানির শব্দ বেরুল। মাধবী, এত বড়ো মেয়ে, কাঁদছে ঃ না, আমি এ মুখ কাউকে দেখাবো না, ফুলে রাক্ষুসীর মত হয়েছে। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি। আমি কাউকে দেখাবো না। তুমি যেতে বলো মা।

বলল, কিন্তু মশারির একটা কোণ তুলে মুখ বের করে নিশিকে দেখল। চোখদুটো জলে টলটল করছে, ফুলেছে। এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে। মা 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেলেন, নিশি কাছে এসে মাধুর হাত ধরল, আহা বেচারী।

মাধবী বললে, নিশির হাতটা মুঠোয় চেপে ধরেই বললে, ছুঁয়ো না, ছুঁতে নেই। বসন্ত।

শুনে মমতায় নিশির মনটা ভরে গেল। বললে, ভয় কি মাধু, শিগগির সেরে যাবে। মাধবী শুনে কাঁদছে। মশারির কোণ গুঁজে ভিতরে কাঁদছে।

মা এলেন। নিশি বললে, ভাববেন না, মাসিমা, ভয়ের কিছু নেই।

ঃ তাই বলো, বাবা। ভয়ের যাতে কিছু না থাকে সেই কথাই বলো। আমি তো ভেবে অস্থির। মেয়ের আমার বারো বচ্ছরে অসুখ করে না, এত ভালো মন, তারই কি না এই শাস্তি। বসো তুমি, বাবা, চা খেয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে নিশির প্রথমেই মনে হল মাধবীর মা শুধু নির্বোধ নয়, মহা-নির্বোধ। আমাকে ওঘরে নিয়ে গেল। চা-জলখাবার খাইয়ে দিল। অথচ এদিকে আমি আবার টিকে নিইনি। আজই টিকেটা নেওয়া দরকার। কর্পোরেশন অফিসের চাকুগুলো

বিচ্ছিরি ভোঁতা, কোন হসপিটালে গেলে হয়।

তারপর থেকে বেলেঘাটা সে আর যায়নি, মানে যেতে ইচ্ছে হয়নি, ভয় হয়েছে। যদিও এটা সে কারুর কাছে স্বীকার করবে না, নিজের মনের কাছেও নয়, তবু এখন মনে হচ্ছে এ-ও বোধ হয় একটা কারণ। কিছুক্ষণ আগেই তার মাধবীকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, এবং আজই একবার মাধবীদের বাড়ি যাবে ভাবছিল, এখন মনে হল, আজ অনেকগুলো কাজের চাপে সে জড়িয়ে পড়বে, কিছু টাকা জোগাড় না করলেই নয়, কাজেই হয়তো বেলেঘাটা যাবার সময় আর পাওয়া যাবে না। এই তো সাত দিন আগে গিয়েছিল, এখনি আবার যাওয়া কি। আর দিনকতক থাক, মাধবী সেরে উঠুক, তারপর যাবে। মাধবীকে সে ভালোবাসে, কিন্তু তাই বলে ফুলো-মুখো বসন্তওয়ালা মাধবী-- নাঃ, সেদিন ওর ঘরে যাওয়া, চা-পরোটা খাওয়া উচিত হয়নি।

নিশি ভেবে দেখবার চেষ্টা করল, ভালোবাসা কতগুলো শর্তের সমষ্টি, সেখানে প্রয়োজনের "মার্জিনাল ইউটিলিটি" মনের মধ্যে কাজ চালায় এবং পোষালে মন সায় দেয়, নইলে কেটে পড়ে। যুক্ত-বসন্ত মাধবী এবং বি-যুক্তবসন্ত মাধবী ইউটিলিটি বোধে অবশ্যই হের-ফের ঘটায়। হিমুর বাড়ি যতই কাছে এগিয়ে আসছে, নিশির মনে হল, ততই সে হিমু হয়ে যাচ্ছে। হিমুটা বসে বসে কী সব কবিতা লেখে আর ভেবে ভেবে এমন অদ্ভুত সব থিয়োরী বের করেছে যার আর্ধেক বোঝা যায়, আর্ধেক যায় না। কালে নিশ্চয়ই ও একটা কেউকেটা হবে।

বুধু ওস্তাগার লেনের খুপরিতে যখন সে মাথা গলাল তখন মাথাটা ঘেমে গেছে। পানের দোকানে দেখেছে একটা বাজে। ভয় ছিল কবি আছে কি-না কে জানে। মাথা গলিয়ে দেখল কবি উবুড় হয়ে বসে হাতের দুই তেলোয় থুতনি রেখে দুলে দুলে কী মখস্ত করছে। দেখে শুনে নিশি ডাকল, হিমি আছিস? টাকা ক'টা দে। দুলে দুলে কী মুখস্ত করছিস? কবিতা?

ঘাড় ফিরিয়ে হিমানীশ দেখল নিশিকে। তারপর এক গাল হেসে বললে, নিশিচন্দ্র যে। এসো বাবা ভেতরে এস, চটি জোড়া নিয়েই এসো, মন্দির নয়। তারপর, বাবা নিশিচন্দ্র, হঠাৎ দুপুরে উদয়?

নিশি ঘরে ঢুকে আড়মোড়া ভেঙে বসে মুখ চোখ কুঁচকে বললে, তার মানে হল, বাবা হৈমরাণী, কবিকুল-তিলক, আমার টাকা কটা দাও? এক মাস হতে চলল, এমন তো কথা ছিল না? কবিতা লিখে তুমি এখন টাকা পাচ্ছো, সলভেন্ট পার্টি। খবর রাখি।

ঃ বিড়ি খা। আদার ব্যাপারী, এ সব জাহাজের খবরে মাথা গলানো কেন? গত তিন মাসে দেখেছিস কোথাও একটা লেখা?

"হুঁম"। নিশি বিড়ির ঠোঁটে ফুঁ মেরে ল্যাজটা দাঁতে চেপে ধরল। দেশলাইয়ের আগুনের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে শেষ করলে, "স্লাম পিরিয়ড?" লেখা ছেড়ে তাই বুঝি এখন মুখস্ত ধরেছ" ব'লে আড় চোখে বইটা দেখে বললে, "নোট" মুখস্ত করছিস, ব্যাপার কিরে হৈমবতী, তুইও শেষে— আঁ নোট— ?

কথাটা শেষ হল না। হিমানীশ হাসল। 'স্লাম পিরিয়ড। তাই পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলছি, দু মাস খেটে যা হয় আর কি। ব্যাটা নিশিকান্ত, তুমি কি জানো, কবি হিমানীশ কবিতা ছেড়ে কালোয়ারপট্টির সখারাম দাসের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখে পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করেছে?'

ঃ আমার টাকাটা দে। তুই তবু আত্মজীবনী লিখে দিতে পারিস, আমার অবস্থাটা বোঝ, শুধু টুইশান আর কুলি—যাগ্‌গে, শুধু ওই ভরসা। তাও ছাত্তরটি শত্তুর রে, অকালেই সেদিন মারা গেল। টাকা তিনটে দে। ওর সঙ্গে আরও পাঁচটা টাকা দিস, পরে দেব। পরীক্ষা কবে?

ঃ সতেরই বুধবার, আর ষোলটা দিন। লোক হাসাবো।

ঃ টাকাটা দে। চলি।

ঃ হঠাৎ গম্ভীর যে? ফিয়াঁসে'র সঙ্গে ঝগড়া বুঝি?

ঃ বাজে বকিসনি। টাকা ছাড়, আবার দৌড়ুতে হবে। বিনা ক্যাপিটালে ব্যাটা কবিতা লেখো, আত্মহীনের আত্ম-জীবনী বানাও, কত ধানে কত চাল, তুমি তার বুঝবে কি? ওঠ, টাকাটা দে। পরীক্ষার পরে আসবো, অনেক কথা আছে। দেরী করিসনি হিমি, ওঠ ভাই।

ঃ মাধুর খবর কি?

ঃ জানি না, তুই টাকা দে।

ঃ তুমি একটি আস্ত বুদ্ধু। আমিই তোর কাছে টাকা চাইতে যাবো ভাবছিলাম। অ্যাদ্দিন ও টাকা থাকে? কবিতার বই বেরুতে এখনো ছ' মাস। প্রেসে দিয়ে এলুম কুড়ি টাকা, পরীক্ষার ফি দিয়েছি। তারপর থেকে তো গৌরী সেনের টাকায় চলছে। তোর কাছ থেকে তিন টাকা নিলুম, ধীরেনের কাছ থেকে সাত, নীতার কাছ থেকে পাঁচ, আখতারের কাছ থেকে—

ঃ থাম হয়েছে। তোর বন্ধুভাগ্য ভাল। আর আমার ভাগ্যটা তোকে দিয়েই বুঝতে পারছিস। সত্যি হিমি, টাকার খুব দরকার রে। সেদিন প্রফেসর চৌধুরীও ঠকালো। কেবল ঠকছি।

ঃ প্রফেসর চৌধুরী? হিতেন চৌধুরী? তোকে ঠকালো? মানে?

ঃ পরে একদিন বলব। পারিস তো

টাকাটা জোগাড় করে রাখিস। পরীক্ষা কবে থেকে বললি?

ঃ সতেরই। নে, বিড়ি খা। এই রোদে এখুনি বেরুচ্ছিস? আনা কয়েক দেব?

ঃ না।

নিশি বেরিয়ে এল। সতেরই থেকে পরীক্ষা। কথাটা মাথার মধ্যে চরকির মত পাক খেয়ে গেল। ফিরে এসে বললে, আচ্ছা, আনা চারেক পয়সা দে তো, হৈমবতী।

ঃ উঃ জ্বালালি।

ট্রামে উঠতে গিয়ে এবারও ট্রামে উঠল না নিশি। থাক, এইটুকু তো রাস্তা। হেঁটেই মেরে দেব। পয়সা কটা জমুক। সতেরই পরীক্ষা শুরু। বুধবার। ষোল দিন। নাঃ আজই যাওয়া দরকার। "বিলম্বে হতাশ হইবেন" বিজ্ঞাপনের ভাষা মনে পড়ল নিশির। আজই যাওয়া দরকার।

নিশি পা চালালো। হিমেটাও শেষে পরীক্ষা দিচ্ছে। হিমে টাকা জোগাড় করতে পেরেছে। ওর বন্ধবান্ধব আছে, কলম আছে। আমার শুধু মাধু আছে। মাধুকে নিয়ে আমি কী করব? অসহায়, করুণ মাধু। আমি নিজে অসহায়, মাধু আবার সেই আমাকে সহায় চায়। মাধুর মা তার মেয়েকে গছাতে চায় আমার কাঁধে যে কাঁধ দুর্বল, নিস্তেজ, নিজেই ঠেকা চায়। সব মানুষই অসহায় একা একা। দুটো অসহায় মানুষ একত্রে কিছুটা সহায় পরস্পরের। হায় রে! ভালোবাসার মানে? ভালোবাসার মানে পরস্পরের কাছে নীরব সহায়তা প্রার্থনা। যেখানে তার প্রতিশ্রুতি নেই সেখানে ভালোবাসা উবে যায়, অধিকতর সহায়তার প্রতিশ্রুতি যেখানে বিকাশের আর প্রতিষ্ঠার, ভালোবাসা সেদিকেই এগিয়ে যায়, যাবেই। মাধু আমার কাছে সহায়তা চায়, আমি মাধুর কাছে। তাই আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি, কারণ এই সহায়তা, এতটা সহায়তা, এখনো ভিন্নতর কেউ দিতে পারে না। এই সহায়তার প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করতে হবে, দুর্বল কাঁধকে শক্ত করতে হবে, চাকরি চাই, পরীক্ষা দিতে হবে, টাকা চাই, সং উপার্জনের টাকা, টুইশনের বাজার কড়া। গ্র্যাজুয়েট, এম-এ-রা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, হায়রে। আমি দালালি করেছি, ঘৃণা হয়েছে, কুলিগিরি, হ্যাঁ কুলিগিরি করতে চেয়েছি, পারিনি। পারা যায় না। আমি চেষ্টা করেছি, পারিনি। পারা যায় না।

দ্রোণাচার্য বলেছিলেন, কী দেখছো। একটা পাখি। ব্যর্থ। সরে যাও। তুমি কী দেখছো। পাখির মাথা। ব্যর্থ। সরে যাও। অর্জুন, তুমি কি দেখছো। একটি চোখ, গুরুদেব। হ্যাঁ, তুমিই পারবে।

আমি তেমনি যাত্রীদের বুক দেখিনি, মুখ দেখিনি। পেটে ফাঁস লাগানো বেডিং জল কাদা গায়েরে চুমু খেতে খেতে এগোচ্ছে। গলায় দাঁড়-লোটা, হোল্ডঅল, বালতি সুটকেস কুলিদের কাঁধে পিঠে কব্জিতে মাথায়। আমি পারিনি। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দুঘণ্টা। পারিনি।

দামী ট্রাউজারের পাশে ছোট্ট হোল্ড-অলটি অসহায়ভাবে দুলছে। কুলি নেই। আমি এক পা পেছিয়ে এসে ছুট লাগিয়েছি ঃ আমায় দিন স্যর, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে। একটু পা চালিয়ে স্যর। ছুট, ছুট।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা। গুঁতোগুঁতি নেই। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল নিশি।

ঃ থ্যাংক য়্যু, মাই বয়। ভাগ্যিস তুমি ছিলে। আদারওয়াইজ, আউড্যাভ মিস্‌ড্ দ্য ট্রেন।

ট্রেনের হুইস্‌ল্ দিয়েছে। চোখ তুলে তাকাল নিশি। প্রফেসর চৌধুরী। ভাড়া নেবার জন্য প্রসারিত ডান হাতটা মড়ার খুলির মত চকচকে বুটের ডগায় চলে এলো। ধুলো নেই। আঙুলের ডগা মাথার দিকে তুলল, ঠেকাল না। বাইরে বেরিয়ে সাবান দিয়ে ধুতে হবে।

ঃ কাউকে সি-অফ করতে এসেছিলে? —প্রফেসর সিগারেট ধরালেন। মুখে-চোখে বিষণ্ণতা এবং তৃপ্তি। ইকনমিক্সের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট—তৃপ্তি। ডক্টরেট পাননি—বিষণ্ণতা।

মিথ্যে কথা বলব না, বলব না, বলব না। তবু নিশির ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ, স্যর, দাদাকে।

ঃ খুব রুগ্ন মনে হচ্ছে, অসুখ নাকি?

ঃ চাকরির চেষ্টায় ছোটাছুটি করছি, তাই।

ঃ আনএম্‌প্লয়মেন্ট? সেইটেই তো সব-চাইতে বড়ো অসুখ হে। নাউ গেট ডাউন, গেট ডাউন, মাই বয়, দি ট্রেন মুভ্‌স্।

চলন্ত ট্রেন থেকে, খালি হাতে, লাফিয়ে নেমে পড়ল নিশি। পরের দিন একজন পোর্টার জিজ্ঞেস করেছিল, ক্যা বাবু, কুলিকা লাইসিন বা?

বিনা লাইসেন্সে সব কাজই অপরাধ। সর্বত্রই লাইসেন্স, অধিকার-ভেদ। মৃত্যুর জন্যও একদিন লাইসেন্স লাগবে। জন্মের জন্যেও।

তারপর আর যায়নি নিশি। একটা লাইসেন্সের চেষ্টা করলে হয় ভেবেছিল। কাকে পাকড়াবো?

প্রফেসর চৌধুরী আমাকে ছ' আনা ঠকিয়েছিলেন। তিনি একবারও আমার নাম বলেননি, নাম জানেন না। মুখটা এখনও চিনে রেখেছেন, কারণ একদিন আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি কোন দিনই তাঁকে ক্লাস থেকে বের করে দিতে পারব না।

কলেজের গেটে এসে নিশি একটু দাঁড়াল। দরজা জানলা বন্ধ। অফিস খোলা। প্রফেসর ব্যানার্জিই একমাত্র চেনেন তাকে।

ঃ প্রফেসর ব্যানার্জি আছেন, পরিতোষ ব্যানার্জি?

ঃ হোস্টেলে।

ঃ অ। ধন্যবাদ।

পরিতোষবাবু সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠেছেন তখন। বাংলার অধ্যাপক। সৌম্য, ঋষিতুল্য চেহারা। নয়নাভিরাম রূপ, বোধ হয় প্রাণায়াম করেন। এত বয়েস, এখনও বয়সের ছাপ নেই চেহারায়। কথা বলেন মিহি-মিষ্টি ভরপুর, যেন নাভিমূল থেকে শব্দ উঠে আসে, রেচক কুম্ভক করার অভ্যেস আছে মনে হয়।

ঃ কি গো, কি খবর? গতবার তো

পরীক্ষা দিয়েছিলে? কোন্ কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছো?

প্রণাম করে নিশি বললে, পরীক্ষা দিইনি স্যার।

: এবার দিচ্ছ?

: না।

: তবে?

: পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি স্যার।

: ছেড়ে দিয়েছ? চাকরি করছ?

: খুঁজছি, স্যার।

পরিতোষবাবুর মুখটা বিষণ্ণ হল, একটু গম্ভীর দেখাল। চুপচাপ। নিশি ভাবল, এখানেও প্রার্থী হওয়া যায় না। যেখানে আমি শুধুমাত্র বিদ্যার প্রার্থী হতে পারি, অর্থের প্রার্থী হতে সেখানে বাধে, সম্পর্ক কেটে যায়। লেট মি গো ব্যাক।

: কি গো, কি দরকারে এসেছো বললে না? বলো।

: স্যার, পরীক্ষা তো সতেরই আরম্ভ হচ্ছে। আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।

: বলো।

: আমি গার্ড হতে চাই। আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায়। এটা করে দিতেই হবে। দিনে তিন টাকা করে পাব, আমার অনেক উপকার হবে।

: তুমি এক কাজ করো। নিবারণদার কাছে যাও। একটু দুর্মুখ, কিন্তু লোক ভালোই। আমার কথা বোলো, তা হলেই হবে।

: আচ্ছা, স্যার।

তা'হলে হবে। নিবারণবাবুকে গিয়ে ধরল নিশি লাইব্রেরী রুমে। পরীক্ষার রুটিন-ওয়ার্ক ঠিক করছেন। হেড ক্লার্ক। বছর পঞ্চাশ বয়স। সুতোয় বাঁধা চশমার ফ্রেমের পাঁচিল ডিঙিয়ে তাকালেন নিশির দিকে : তুমি পরিতোষের লোক? পরিতোষকে গিয়ে বলো লোক নেওয়া হয়ে গেছে। ফের যেন সে কাউকে আমার কাছে না পাঠায়। বুঝেছ?

শুনে মাথা গরম হয়ে গেল নিশির। ষোল দিন আগেই সব লোক নেওয়া হয়ে গেছে? আশ্চর্য। কিন্তু মাথা গরম করলে লাভ নেই। পদে অধিষ্ঠিত নিবারণবাবু। তাঁর হাতেই সব ক্ষমতা। ক্ষমতাবানের সঙ্গে সমকক্ষ না হয়ে লড়াই করে কি লাভ? সবিনয়ে তাই সে বললে, পরিতোষবাবু বললেন তাঁর নাম করলেই হয়ে যাবে।

: কেন বাজে বকাচ্ছো? পরিতোষটা জানে কি? পরীক্ষা কন্ডাক্ট করেছে কোন দিন? এ দু'পাতা বই পড়ানো নয়। কুড়ি দিন আগেই নাম সব এনলিস্ট হয়ে যায়, আপয়েন্টেড ভিজিলেটরদের নামে কার্ড চলে গেছে। পঁচিশ তিরিশজনকে এমনিই বাদ দিতে হয়েছে। তার মধ্যে এম-এ, বি-এ-ও অনেক আছে, তুমি তো—যাও এখন। বিরক্ত কোরো না, বাপু।

নিশি ভাবল, এটা আমার একটা অভিজ্ঞতা। আমার দারিদ্র্যের বেতন। কিন্তু এখানেও এমন ভিড় জানতুম না। আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। পারিনি। পরীক্ষার দরোয়ান হতে চেয়েছি, পারিনি। বাঁচতে চাইছি, পারব না। পারব না? আমাকে পারতেই হবে যে, স্যার। এই আমি। পরীক্ষা। মাধবী।

পরিতোষবাবু সব শুনে বললেন, আজকাল ভয়ঙ্কর রাশ্ হয়। ভেরি স্যাড্। তুমি সিক্ বেডে গার্ড দিতে পারবে? মানে, ভয় করবে না তো? এবার ভয়ংকর পক্স হয়েছে, সিক সেণ্টার থাকবে কলেজে। দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো। রিস্ক্ আছে অবশ্য। না, না, তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। যদি মনস্থির করতে পারো নিবারণদার কাছে নামটা লিখিয়ে যেও। কেমন?

নিশি রাস্তায় নামল।

সিক্ বেড। বসন্ত। টাকা চাই। ভয়। আমি ভয় পাচ্ছি? আমি কি ভয় পাচ্ছি? আমি বাঁচতে কি ভয় পাই? না, আমি ভীরু নই, আমি ভীরু নই। ভীরু হলে আমার চলে না, স্যার।

দ্রুত পায়ে আবার গেল সে নিবারণবাবুর কাছে। এবার যোগ্যতা নিয়েই।

: সিক সেণ্টারে গার্ড দেবো, আমার নামটা লিখে নিন, স্যার।

: পক্স হয়েছিল?

: না।

: এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

: পরিতোষবাবু যে বললেন।

: পরিতোষ তের বছর দু'পাতা পড়িয়ে বংলা ডিপার্টের হেড হয়েছে এই সেদিন, আমি তেত্রিশ বছর পরীক্ষা কন্ডাক্ট করছি, আমার চাইতে বেশি জানবে সে? আঁ? সে বেশি জানবে? পক্স হলে এসো। যেমন গুরু, তেমনি তার চ্যালা। অমানুষ।

নিশি শুনে খুব খুশী হল। তা হলে কাজটা আমার হচ্ছে। আমি টিকে নিইনি। পক্স হলে এসো। কিন্তু মাধবী কি রাজী হবে? আমি ভীরু নই। ভয়ংকর খিদে পেয়েছে গো। মাধু, আমার খুব খিদে পেয়েছে। মাধু এখন কি করছে? মাধু কি রাজী হবে? টাকার খুব দরকার। আঃ চাকরিটা হচ্ছে। চাকরি।

শিয়ালদা পেৌঁছে বেলেঘাটার বাস ধরল নিশি। মাধবীদের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। আঃ, একটা কাজ হচ্ছে দেখে কী আরাম লাগে। কাজটা তা হলে হচ্ছে আমার।

মাধবীর বোধ হয় কুকুরের মত ঘ্রাণশক্তি আছে। দরজায় দেখা দিল। ফর্সা মুখে ছাকনির ফুটোর মত বসন্তের শুকনো কালো চিমড়ি ভর্তি।

নিশির মনে হল, তারায় ভরা আকাশ। চোখ দুটো ম্লান, রুক্ষ চুল, শুকনো ঠোঁট।

: এতদিনে বুঝি সময় হল?

: হুঁ।

মাধবীর চোখে টলটলে জল। অভিমান হয়েছে। ঘাড় গুঁজে নিশির পিছু পিছু ও ঘরে এল।

: একটা লোক মরল কি বাঁচল সে খবরে বুঝি কারুর দরকার নেই?

: মাধু, একটা কাজ বোধ হয় হচ্ছে। তোমার কাছে একটা জিনিস চাইবো, দেবে? কোনদিন চাইনি।

মাধবী তাকাল নিশির দিকে। তারপর নিজের আঙুলের আংটির দিকে। নিশি মাধুর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে চাপ দিল। সেই চাপে মাধবীর হাতের পিঠে বসন্তের কালো চিমড়ি একটা চিড় খেল। মাধবী কাঁপছে থেকে থেকে। যদি রাজী না হয়, তা হলে? তা হলে জোর করেই—

মাধবীর মা ঘরের চৌকাটে পা দিলেন। নিশি মাধুর হাতটা ছেড়ে দিল। মাসিমা সরে গেলেন। সুযোগ দিতে চান। নিশি বোঝে। তবু সে-ই সুযোগ নেয় না। কারণ সে সৎ থাকতে চায়। এবং সুযোগ দিচ্ছে বুঝলে আগ্রহ ফুরোয়, রুচি থাকে না।

: মাসিমা, চা খাবো।

মাসিমা ফিরলেন : পরোটা ভাজছি।

: চমৎকার।

: আহা, মেয়ে যেন সঙ। নিশিদা ঘামছে, পাখা দিয়ে একটু হাওয়া করতে পারিস তো। কত শেখাবো? দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবি। বসে বাতাস কর্।

মাধবীর মা চলে গেলেন।

নিশির খারাপ লাগল। মনে হল ছুটে পালায়। এই জন্যেই মাধবীদের বাড়ি সে আসে না। মাধবীর মার হ্যাংলামি এত প্রকাশ্য এবং নিচু যে মাঝে মাঝে তার ঘেন্না করে। কিন্তু মাধবী আর মাধবীর মা এক নয়। মার কথা শুনে মাধবী আরও সরে গেল এক হাত। কঠিন চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পাখা ছুঁল না।

: আপনি আর আমাদের বাড়ি আসবেন না।

: বেশ, আসবো না। আমি যে একটা জিনিস চাইলুম।

: বলুন?

বলে উত্তরের আগেই আঙুল থেকে আংটিটা খোলার চেষ্টা করল মাধবী।

: না, আংটি নয়। আগে বলো দেখে?

: হ্যাঁ।

: তোমায় একটা চুমু খাব?

চোখ তুলে তাকাল মাধবী। গভীর দুটি চোখ, শান্ত, নির্জন।

: বলো?

: না। হঠাৎ? এমন ইচ্ছে?

: এমনি।

চুপচাপ। মাধবীর মা পেয়ালাটা চা নিয়ে এলেন। নিশি খেল। তারপর উঠল : চলি, মাসিমা।

: আবার এসো।

মাসিমা কাপ প্লেট নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

নিশি মাধবীর দিকে চাইল। মনে মনে ভাবল, আমি জানতুম আমি জানতুম, মাধবী এই কথা বলবে। কিন্তু আমার যে উপায় নেই। চুমু আমি

খাবই মাধু, তুমি বাধা দিলেও খাব। খেতে আমাকে হবেই।

নিশি তাকাল মাধবীর দিকে। বললে, সদর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে না, মাধু?

ঃ চলুন। আবার কবে আসবেন?

ঃ এই যে তুমি বললে, আমাদের বাড়ি আর আসবেন না?

ঃ আপনার ইচ্ছে। মাধবীর মুখ শুকলো, বললে, আমি এ বাড়িতে থাকব না, একদিন কোথাও পালিয়ে যাব। ঠিক। মার কাছে আর থাকব না। চাকরি করব।

ঃ ছিঃ, মার ওপর এমন রাগ করে? অতিষ্ঠ হয়ে বলেন ও-সব। দোষ তো আমারই। আমিই তো হ্যাঁ-না কোন আশ্বাস দিইনি, দিতে পারিনি। তাই।

মাধবীর চোখের জল মুছিয়ে দিল নিশি রুমালের খুঁট দিয়ে। ওর হাতটা ধরল। বসন্তের চিমড়িগুলো কেমন খরখর করছে মাছের শুকনো আঁশের মত। আর পারল না মাধু, নিশির গলা দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল, বুকে মাথা রেখে কণ্ঠায় নাকটা ঘষল। চামড়াটা খর্‌খর্‌ করছে। নিশি মাধবীর অমাবস্যায়-তারা-ভরা-মুখটা দু হাতে তুলে ধরে চুমু নয়, ওর জিভটিকে একেবারে লেহন করে এক দলা থুতুই গিলে ফেলল চোখ বুজে। জীবনে কারুর ঠোঁটে এই প্রথম চুমু খেল নিশি। মুখটা বিস্বাদ লাগছে। বড়ো বিস্বাদ। জীবনের প্রথম চুম্বন।

বাইরে এসে থুতু ফেলল। ভাবল আর পনেরো দিন, না যোল। ক'দিন পরে বেরুবে? জানি না। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব। সাত দিনের মধ্যে সারবে কি? দশ দিন? জিজ্ঞেস করব। চাকরিটা হচ্ছে তা হলে? টেম্পোরারি। হোক টেম্পোরারি। অনেকগুলো আছে—আই-এ, বি-এ, বি-কম, ——ততদিনে একটা কিছু হবেই। আর একটা ভালো কিছু।

ঃ সাবধানে থাকবেন। শুশ্রূষার সময় ভয় নেই, ঘা-পুঁজ চাটলেও কিছু হয় না। শুকুবার সময় ওই চিমড়ি ওতে বীজ থাকে, নিশ্বাসের সংগে ঢোকে, সংক্রমণ হয়। সেই সময়টা সাবধান।

ঃ সংক্রমণ হলে কতদিনে বেরোয়—মানে, গুটি?

ঃ একুশ দিনের মধ্যে। তবে সাতদিনের আগে নয়। ঘরে লোশন ছিটিয়ে দেবেন, ধুপ-ধুনো দেবেন। খুব খুশী হয়েছি, আপনি জানতে এসেছেন। এই তো চাই, কেননা অজ্ঞতার জন্যই বসন্ত বেশি ছড়ায়। আমরা কর্পোরেশনের লোকেরা এই চাই, এই অনুসন্ধিৎসা—

ঃ চলি, ডাক্তারবাবু, দরকার হলে আসব—আবার আসব।

আঃ! তাহলে চাটলেও কিছু হয় না। বাঁচলুম। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি, নতুবা এভাবে—ইস্‌! কিন্তু চাকরিটা? চাকরিটা তো হত!

বিষাদে মনটা ভরে গেল।

যন্ত্রণা, জীবনে যন্ত্রণা। বিছানাটা চিতা। জ্বলছে। পিঠ রাখা যায় না। কি করে হল? আমার? এবং মাধুর? মাধুকে কে ছোঁয়া দিল?

নিশি তার যৌবনে বসন্তের পলাশ নিয়ে আছে অংগে, তার জীবনে। আর

মাধবী কাঁপছে থেকে থেকে। যদি রাজী না হয়,......

ছ'দিনের মাথায় ওরা বেরুল—তপ্ত বালির খোলায় ফোটা খইয়ের মত, সারা গা মুখ ছেয়ে। সারা আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের মত।

দু'দিনেই মনে হল, কে যেন নখ দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আমার যৌবনের বসন্ত। বুকে পিঠে মাথায় যন্ত্রণা। এই শরীরে টীকে-দিউনী মায়ের বিছানায় শুয়ে ভাবছে এতক্ষণে এত সব যার জন্যে সেই পরীক্ষা শেষ হয়ে এল। মাধু এবার ফুল নিয়ে আসবে। জুঁই ফুল। অংগেও তার জুঁই ফুল আঁকা। এখন তখন সব সময়। কোমল এবং খর। এই আর ওই—দুই বসন্ত।

প্রদর্শনী

কলারসিক

।।চারটি চিত্র-প্রদর্শনী।।

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে কলকাতায় চারটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত ও শিল্পাঞ্জলী নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী রবীন মণ্ডল ও পার্ক ম্যানসনের আর্টস এণ্ড প্রিণ্ট গ্যালারীতে শিল্পী প্রকাশ কর্মকার তাঁদের চিত্রকলার নিদর্শন নিয়ে কলা-রসিকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত দুটি ছিল একক চিত্রকলার প্রদর্শনী, দ্বিতীয়টিতে ঘটেছিল সাতজন শিল্পীর বিচিত্র সমাবেশ। এবার একে একে আমরা চারটি প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

।। শিল্পী শ্রীমতী মাধুরী গুপ্তের একক প্রদর্শনী ।।

আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্তের প্রদর্শনীটি ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলেছে। এটিই শ্রীমতী গুপ্তের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। ইতঃপূর্বে এই শিল্পী কয়েকটি সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে পড়ছে। সেই অনেকের ভিড়ে হারিয়ে-যাওয়া শ্রীমতী গুপ্তের ৫০টি চিত্রকলার নিদর্শন এক সঙ্গে দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি।

প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ৩০ খানি তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত এবং ২০ খানি প্যাস্টেলের কাজ। শ্রীমতী গুপ্ত সম্প্রতি শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্তের 'স্টুডিও' গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছেন। প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্রগুলি 'স্টুডিও' গ্রুপে শিল্পচর্চার ফল বলে মনে হল। এর সবগুলিই প্রতিকৃতি চিত্র। শিল্পী প্যাস্টেলের মাধ্যমে সুন্দর ড্রয়িং ও বর্ণ-বিন্যাসের পরিচয় দিয়েছেন। 'গায়ক' (৩১ নং) ও 'খ্যান্ত পিসি' (৫০ নং) প্যাস্টেলে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্রের দুটি চমৎকার নিদর্শন।

তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে তথাকথিত আধুনিকতার কোনো চিহ্ন নেই। বরং তাঁর রচনায় আমাদের পরিচিত পরিবেশ প্রথাগত ভঙ্গীতে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে বিধৃত করতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। শিল্পীর চিত্র-সংস্থাপন সত্যি চমৎকার। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলুদ আর নীল রঙের প্রাধান্য একটু দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাঁর 'টিফিন আওয়ার' (৮ নং), 'সুইমিং পুল' (২৭ নং) 'আম্র-কুঞ্জ' (১৪ নং) প্রভৃতি চিত্র এরই দৃষ্টান্ত। শিল্পী যেখানে অনুচ্চ মিশ্র রঙের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কিংবা কালো আর হলুদের বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে তাঁর চিত্র অনেক বেশি রমণীয় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর 'বোঝাই নৌকা' (৬ নং), 'টিউবয়েল' (১৭ নং), 'স্নানের ঘাট' (২০নং), 'উইনডো শপিং' (১ নং), 'শীতের রাত' (২৩ নং), 'কুয়াশাবৃত সকাল' (২৪ নং) প্রভৃতি রচনাগুলি এ-জন্যেই সকলের ভাল লাগবে বোধ হয়। এখানে চিত্র-সংস্থাপন ও বর্ণ-বিন্যাস—
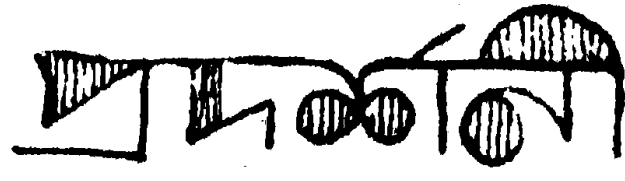
মহাভারত থেকে—বস্ত্রহরণ   শিল্পী : প্রকাশ কর্মকার

দুই মিলে সত্যিকার শিল্প-জগৎ সৃষ্টি করতে শ্রীমতী গুপ্ত অনেকখানি সফল হয়েছেন।

আমরা আশা করবো শিল্পী শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত চিত্রে রং-প্রয়োগ সম্বন্ধে আরো সজাগ হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের নতুনতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে দ্বিধান্বিত হবেন না। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

।।শিল্পাঞ্জলীর চিত্র-প্রদর্শনী।।

নবগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্পাঞ্জলী' তার অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে চারুকলাচর্চাকেও স্থান দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 'শিল্পাঞ্জলী' আয়োজিত এই চিত্র-প্রদর্শনীটি গত ১৮ই জানুয়ারী শুরু হয়ে ২৪শে জানুয়ারী শেষ হয়েছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে শ্রীমতী রমা ঘোষ, ঝর্ণা চৌধুরী, রমা বসু (কর), সুরেন সিংহ, প্রভাংশু আইচভৌমিক, সুহাস রায়, বেণু ভট্টাচার্য—এই সাতজন শিল্পীর মোট ৩৮টি চিত্র স্থান পেয়েছিল। এখানে যেমন ছিল তৈল-রঙ, জল-রঙ ও গ্রাফিক্স চিত্রকলার নানা নিদর্শন, তেমনি ছিল প্রথাগত ও বিমূর্ত শিল্প-শৈলীর ভিন্নধর্মী রচনা।

শিল্পী রমা ঘোষের তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'সমুদ্র সৈকতে' (১নং) ও জালের ঢাকনার মধ্যে 'বিক্রয়ের জন্য' (২নং) রক্ষিত মোরগগুলি সত্যি সুন্দর। ঝর্ণা চৌধুরীর চিত্রগুলিও আমার বেশ ভাল লেগেছে। বিশেষ করে তাঁর 'দুপুর' (৭নং) চমৎকার কম্পোজিশান ও রঙ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। ৬নং নিঃসঙ্গ চিত্রটিও দর্শকদের ভাল লেগেছে বলে আমার বিশ্বাস। রমা বসু (কর)-র কাঠখোদাই ও লিনোকাট মন্দ নয়।

শিল্পী সুরেন সিংহের চারটি চিত্রই প্রতিকৃতি-চিত্র। প্রতিকৃতি রচনায় প্রভাংশু আইচভৌমিকের 'পাখী-বিক্রেতা'ও একটি সুন্দর রচনা। শিল্পী সুহাস রায় বিমূর্ত শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট বলে মনে হয়। জ্যামিতিক প্যাটার্ণের এই চিত্রকলার দিকে অধুনা অনেক তরুণ শিল্পীর ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পী সুহাস রায়ের নিষ্ঠা আছে কিন্তু তাঁর রচনার চড়া রঙ আমার কাছে নয়নসুখকর মনে হয়নি। শিল্পীর 'গল্প-গুজব' (২৬নং), 'লেডি উইথ সেতার' প্রশংসার যোগ্য। শিল্পী বেণু ভট্টাচার্য তাঁর সমস্ত রচনার মাধ্যমরূপে জল-রঙকে বেছে নিয়েছেন। সবগুলিই ক্ষুদ্রাকৃতির কাজ। তবু শিল্পী

ভট্টাচার্যের কাজের মধ্যে সত্যিকার শিল্পীমনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর 'সবুজ ভূমি' (৩৪নং) 'লাল টালি' (৩৬নং) ছোট হলেও জল-রঙের কাজ হিসাবে আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

'শিল্পাঞ্জলী'র এই প্রথম প্রচেষ্টা সাথক হয়েছে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যদি চিত্র-শিল্পীদের প্রতি এ'দের মত সদয় হন তবে অনেক নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পী-জীবন অকাল বিনষ্টির হাত থেকে হয়তো বা রক্ষা পেতে পারে। আমরা এদিকে অন্যান্য সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

।। শিল্পী রবীন মণ্ডলের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী রবীন মণ্ডলের চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত ২৩শে জানুয়ারী। এটিই শিল্পীর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী রবীন মণ্ডল ব্যক্তিগত জীবনে সরকারী অফিসের একজন কেরানী। কিন্তু কেরানী জীবনের অন্তরালে তাঁর যে শিল্পী-মন ঘুমিয়েছিল নিজের নিষ্ঠা ও সাধনায় তাকে তিনি জাগ্রত করেছেন। শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে নৈশ বিভাগে ক্লাস করে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন কলা-বিভাগের পরীক্ষায়। আর, এবার ৩৪খানি চিত্র নিয়ে কলকাতার কলা-রসিকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন নতুন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা সানন্দে স্বীকার করছি শিল্পী রবীন মণ্ডল এ-পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণতার ছাড়পত্র পাবেন।

রবীনবাবুর ৩খানি চিত্র বাদে আর সবই তৈল-রঙে অঙ্কিত। চিত্রের বিষয় হিসাবে তিনি কোনো বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। মানুষের বিচিত্র জগতের দিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। অন্যান্য তরুণ আধুনিক শিল্পীর মত জ্যামিতিক প্যাটার্ণ সৃষ্টির দিকেই তাঁর প্রবণতা। এটা এখন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে প্রায়। আশাকরি রবীনবাবু অচিরে এই একঘেয়েমী মুক্ত হয়ে অন্যতর শিল্প-আঙ্গিক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবেন।

রবীনবাবুর অনেকগুলি রচনা আমার ভাল লেগেছে। তাঁর কম্পোজিশান নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বিশেষকরে 'দি মিউজিশিয়ান' (১নং), 'মেণ্ডিং নেটস' (৫নং), 'অ্যামিউজড' (১৮নং), 'ফ্যামিলি মেম্বারস' (২১নং), 'টয়লিং' (২৪নং) ও 'অ্যাবসর্বড' (৩৩নং) রচনাগুলিতে তাঁর শিল্প-দক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সবই তৈল-রঙের মাধ্যমে রচিত। জল-রঙের মাধ্যমে রচিত 'পেজাণ্ট লাইফ (১১নং) ও 'বার্থ অফ ক্রাইস্ট' (৮) মন্দ লাগলো না। গণিকাদের জীবন নিয়ে শিল্পী কয়েকখানি চিত্র সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে সমাজের অবক্ষয়ের রূপ হয়তো শিল্পী তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু একমাত্র ১৫নং চিত্রটি ভিন্ন অন্য কোনো চিত্রের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়াই দায়। বিমূর্ত সৃষ্টির এও বোধহয় এক কষ্ট-কল্পিত শিল্প-প্রচেষ্টা।

রবীনবাবুর রঙ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। যিনি নানারঙের সমাবেশে চমৎকার জমিন সৃষ্টি করতে পারেন, (অন্ততঃ এমন তিনটি চমৎকার রচনা তাঁর এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে), তিনি কেন মাঝে মাঝে অত চড়া নীল রঙের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তা ঠিক বোধগম্য হল না। যাহোক্, আমরা এই প্রদর্শনী উপভোগ করেছি। শিল্পী রবীন মণ্ডলকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

।। শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের চিত্র-প্রদর্শনী ।।

আলোচ্য প্রদর্শনীগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শ্রীপ্রকাশ কর্মকার। কিছুকাল আগে স্টুডিও গ্রুপে যাকে আমরা দেখেছিলাম বাস্তবধর্মী চিত্র-রচনায় উদ্যত, বছর-খানেক আগে ফুটপাতকে যিনি চিত্র-প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন করে কলকাতার কলারসিকদের চমকে দিয়েছিলেন, এবার আর্টস এণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে তাঁর চিত্রকলা দেখতে যেয়ে তাঁকে আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার তাঁর সমস্ত অতীতকে প্রায় অস্বীকার করে নতুনভাবে, নতুন বিষয়বস্তু, নতুন আঙ্গিক নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযান সাগ্রহে লক্ষ্য করার মত।

এবারকার প্রদর্শনীতে প্রকাশবাবুর ২০টি চিত্র স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটি গত ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতাস্থ সোভিয়েৎ কন্সাল জেনারেল শ্রীএস, আই, রাগব উদ্বোধন করেন।

প্রকাশবাবুর এই চিত্রগুলির অধিকাংশ পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। কিন্তু তিনি ভারতীয় চিত্রকলার তথাকথিত আঙ্গিক গ্রহণ করতে উৎসাহবোধ করেননি। মূলতঃ তিনি হিন্দু-শিল্পশৈলীর লৌকিক-ভঙ্গী, বিশেষ করে আলপনার বস্তাকৃতি ভেঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার জ্যামিতিক প্যাটার্ণকে এমন কৌশলে ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে আদিম শিল্পকলার সারল্যই ফুটে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের একটি প্রদর্শনীতে এই ধরণের কাজ লক্ষ্য করেছিলাম। শুনেছি প্রকাশবাবু বর্তমানে নীরোদবাবুর কাছে শিল্প-শিক্ষায় দীক্ষা নিচ্ছেন। এই দীক্ষার ফসল বেশ ভালভাবেই ফলেছে। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যা-কিছু নতুন তাকেই সানন্দে গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো একরোখা মনোভাব না থাকাই বোধহয় শিল্পীর পক্ষে কাম্য।

প্রকাশবাবুর এই দুঃসাহস দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমনি একটি মৌলিক প্রশ্ন না উত্থাপন করেও পারছি না। এই যুগে বাস করে আজ এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ কি পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় নয়? আর, এই পৌরাণিক কাহিনী যদি অন্যতর মূল্যবোধে শিল্পী নতুনভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতেন তাহলেও তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতাম। কিন্তু শুধুমাত্র আঙ্গিকের প্রয়োজনে যদি প্রকাশবাবুর এই রূপান্তর ঘটে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা হবে দুঃখের কথা। অবশ্য প্রকাশবাবু সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে স্থির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ একেবারে অসম্ভব।

যাহোক্, তাঁর এই প্রদর্শনীর 'মহিষ-মর্দিনী' (১৬নং), 'ননী-চোরা' (১৭নং), 'মহাভারতের একটি দৃশ্য' (১৯নং), 'রাসলীলা' (২০নং) পৌরাণিক বিষয়বস্তু নব আঙ্গিকে রচিত উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন। এই সব চিত্রের সংস্থাপন, সরলরেখা, অলংকৃত রূপ এবং অনুচ্চ জল-রঙ প্রয়োগের দক্ষতা সত্যিকার পরিণত শিল্পী-মনের পরিচয়ই বহন করছে। অবয়ব বিভাজনে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক চেতনা এবং ড্রয়িং সম্বন্ধে এমন নিখুঁত ধারণা অন্য কোনো প্রদর্শনীতে কোনো তরুণ শিল্পী প্রদর্শন করেছেন বলে আমার অন্ততঃ মনে পড়ছে না। এদিক দিয়ে তাঁর 'ইণ্টিরিয়র' (৫নং), 'টয়লেট' (১৯নং), 'ফিশার উয়োমান' (১৪নং), 'লেডি উইথ ফ্লাওয়ার' (৪নং) মনে রাখবার মত কাজ। 'অন দি সি বীচ' (৬নং) ও 'বোটস এ্যাট রেস্ট' (৮নং)ও আমার খুব ভাল লেগেছে।

শিল্পী প্রকাশ কর্মকার সম্পর্কে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আশা করি এই নতুন পথ-পরিক্রমায় তিনি আমাদের আরও সুন্দরতম শিল্পের ফসল উপহার দেবেন। তাঁকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

সঙ্গীত বীক্ষণ

আনন্দভৈরব

॥ নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন ॥

সংগীতের যা মুখ্য উদ্দেশ্য—সুর ছন্দ ও লয়ের মিলিত আনন্দলোকের সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া—এই সত্যটিকে যিনি নিজের জীবনে নিবিড়ভাবে গ্রহণ ও প্রমাণ করেছিলেন কলাকারশ্রেষ্ঠ সেই তানসেনের নামে নামাঙ্কিত চতুর্দশ বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন গত ১৭ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ছয় দিনের ছয়টি অধিবেশনে নেতাজীর পুণ্যস্মৃতিস্থাপিত মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল। তার মধ্যে বর্তমান আলেখ্যের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা কয়েকটি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

এই সম্মেলনের এবারকার অনুষ্ঠান-সূচী সুপরিকল্পিত ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলকাতায় একই সময়ে অথবা নিকটবর্তী বিভিন্ন সময়ে নানা সংগীত সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণ অর্থকরী প্রয়াস ব্যতীত তাঁদের শিল্প-কর্মের মান প্রদর্শনে সুযোগ পান না বা মনোযোগ দেন না। এ বিষয়টি একদিকে যেমন সত্য, অন্যদিকে বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের গঠনমূলক চিন্তাধারা ও সহযোগিতার মনোভাব আছে কিনা, সমঝদার শ্রোতৃগণের আগ্রহ ও উপস্থিতির বৃদ্ধি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলিতেও ভাববার কথা আছে। কেননা উদ্যোক্তা, শিল্পী ও শ্রোতা এই তিনের উপরেই সম্মেলনের সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রথম অধিবেশনে পূর্বীকল্যাণ রাগে চৌতালে ও আড়ানা রাগে ধামার তালে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন তানসেনবংশাব-তংস ওস্তাদ দবীর খাঁ। তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। সম্মেলনের সূচনায় ধ্রুপদানুষ্ঠানের পরিকল্পনাটি উত্তম। বাগেশ্রী রাগে প্রথমে বিলম্বিত একতালে ও পরে ত্রিতালে গীটার বাদ্য (আলাপ ও গৎ) পরিবেশন করেন শ্রীদেবব্রত রায়। তাঁর এই অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য আছে মনে করি এইজন্যে যে, যাঁরা গীটারকে মুখ্যত ছন্দাঘাতের যন্ত্র মনে করেন তাঁদের ভ্রম দূরীকরণের জন্য শ্রীদেবব্রত রায়ের অনুষ্ঠানটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। অ-হিন্দুস্থানী সংগীতের যন্ত্রকে হিন্দুস্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে তার বাদন-পদ্ধতিও তদনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীবিশ্বনাথ বসুর পরিচালনায় তানসেন সংগীত কলেজের ছাত্র-গণের 'তবলা মেলডি' পরিবেশন প্রশংসনীয়। ত্রিতালে চন্দ্রকোষ রাগের গতের এক-ফেরতা অংশ নিয়ে তাঁরা নানা ছন্দ ও লয়কারি প্রদর্শন করেন। নতুনত্ব ও প্রস্তুতির দিক থেকে পরিচালক ও তরুণ শিক্ষার্থীগণ সাধুবাদ পাবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। প্রথমে 'শুদ্ধ কল্যাণ' রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরি ও ভজন পরিবেশন করেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। স্বরপ্রয়োগের কৃতিত্ব, রাগ-রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য ও মেজাজের গুণে তাঁর গায়ন উপভোগ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্যামকল্যাণ রাগে খেয়াল তারানা এবং পরে বিষ্ণু-দিগম্বর ঘরানার বিখ্যাত 'জোগী ম্যায় তো' ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক। এই শিল্পী নিষ্ঠার সহিত স্বরপ্রয়োগ ও রাগ-রূপায়ণ করেন। বিচিত্র আলাপ, সরগম্, বোলতান ও তান সহযোগে তাঁর খেয়াল-গায়ন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য আলোচ্য অনুষ্ঠানে তিনি সরগম্ তেমন প্রয়োগ করেননি। ত্রিতালে তবলার লহরা বাজান বারানসীর পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের শিষ্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর বাজনাতে শৈলী-কৃতিত্ব আছে, সন্দেহ নেই। ধুনু না, ধেরেধেরেকিটিতাক্ বাণীগুলি আরও বেশি আশা করা গিয়েছিল। চন্দ্রকোষ ও কলাবতী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীমতী গাংগুবাই হাংগল্। সুকণ্ঠে সুন্দর মেজাজে তিনি রস-সৃষ্টি করেন। তাঁর সংগে কণ্ঠ সহকারিতা করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা হাংগল। শ্রীমতী কৃষ্ণার কণ্ঠ-স্বরটি উত্তম—তার-ষড়জ স্থিতি মনোগ্রাহী। শ্রীমতী গাংগুবাই হাংগলের অনুষ্ঠানে তবলা সহযোগিতা করেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীশেষগিরি হাংগল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে যে পরি-প্রেক্ষিতে শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ককে প্রশংসা করা হয়েছে ঠিক সেই সেই পরি-প্রেক্ষিতে শ্রীমতী গাংগুবাই হাংগলকে প্রশংসা করলে ভুল করা হবে। কারণ ঘরানাভেদে গায়ন রীতি ও পদ্ধতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। সেতারে শ্রীইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের কৌশিক কানাড়া রাগে আলাপ-অংশ সুশ্রাব্য ও পরিচ্ছন্ন, গৎ-অংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছে।

তৃতীয় অধিবেশনে আভোগী কানাড়া রাগে বেহালা বাজিয়ে শোনান শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তাঁর সংগে তবলা-সহযোগিতা করেন ওস্তাদ আল্লা রাখা। শ্রীমতী ধরচৌধুরীর বেহালা-বাদনে আলাপ-অংশ উপভোগ করা গেছে। কিন্তু গৎ-অংশের সংগে তবলা-বাদনে পড়নের এত আধিক্য হয়েছিল যে মাঝে মাঝে এই অনুষ্ঠানটিকে তবলা লহরার অনুষ্ঠান বলে ভ্রম হচ্ছিল। সাথ-সংগতের সময় তবলা-বাদকের সংযম ও সহ-যোগিতার ভাব না থাকলে রসভংগ হয়। সেতারে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় হেম-বেহাগ রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা পরিবেশন করেন। তার পরের গৎ-এর সংগে তবলা সংগত করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। কল্যাণ রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন পণ্ডিত কুমার গন্ধর্ব। এই শিল্পীর রাগের পরিবেশ-সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। তবে মাঝে মাঝে সুরের রেশ ধরে রাখার (বিশেষ বিশেষ স্বরে স্থিতির) অভাব অনুভূত হয়েছে। আর এক-একটি গানের সমাপ্তি যেন হঠাৎই হয়ে যায়, মনে হয়েছে।

চতুর্থ অধিবেশনে—তানসেন সংগীত সম্মেলনের পরিচালকগণ তাঁদের

অনুষ্ঠানসূচীতে সংগীত সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে সুবিবেচনার কাজ করেছেন। পূর্বেও তাঁরা এরূপ আয়োজন করেছিলেন। বর্তমানে এই সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনো সম্মেলনে এবম্বিধ আলোচনার ব্যবস্থা হয় বলে আমাদের জানা নেই। এবারকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ধ্রুপদ ও খেয়াল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ওস্তাদ দবীর খাঁ, পণ্ডিত কুমার গন্ধর্ব, প্রোফেসর লক্ষ্মণপ্রসাদ জয়পুরওয়ালা, শ্রীমতী গঙ্গুবাই হাঙ্গল, ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ, সালামত আলি খাঁ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীগণ। আমরা আশা করব ভবিষ্যতেও এই সম্মেলনে শ্রুতি-তত্ত্ব, রাগের উৎপত্তি, প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ, ঠাট-পদ্ধতির যৌক্তিকতা, রাগ-মিশ্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হবে। এই অধিবেশনের সংগীতানুষ্ঠানের সূচনায় পূরবী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন কিশোরী শিল্পী কুমারী সুচিস্মিতা মিত্র। তাঁর ভবিষ্যত-সম্ভাবনা আছে। শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত ভারতনাট্যম আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। নৃত্যশৈলীর সঙ্গে যখন দেহবল্লরীর সুষমা ও নৃত্যভঙ্গীর সৌষ্ঠবতা মিলিত হয় তখনই নৃত্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আলারিপু, জাতিস্বরম, কীর্তন প্রভৃতি নৃত্যে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ক্ল্যাসিকাল নৃত্যভঙ্গী ভারতের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গিমা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর নবরসের অভিব্যক্তিও যথাযথ হয়েছে—তার মধ্যে বীর, করুণ, ভয় ও শান্ত রসের অভিব্যক্তি চমৎকার। এই নৃত্যানুষ্ঠানে আনুষাঙ্গিক কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত উত্তম। মৃদঙ্গের বোলগুলি পর্যন্ত প্রায়শঃ সুরে উচ্চারিত হয়েছে। এরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সংগীত শব্দটির অর্থ অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মিলিত রস পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চম অধিবেশনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর স্বরোদ-বাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে পূরিয়া-কল্যাণ রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা এবং পরে মধুবন্তী রাগে গৎ ও গারা রাগে ঠুংরি পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে স্বরোদে সাফল্যের সহিত সহকারিতা করেন তৎপুত্র তরুণ-শিল্পী আশীষকুমার। —তবলা সহযোগিতা করেন ওস্তাদ আল্লা রাখা। শিল্পী আশীষকুমারের হাত বেশ তৈরি। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে যথাযথ বাজিয়ে নিজের গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। পিতা-পুত্রের এই দ্বৈত অনুষ্ঠানটি আমরা উপভোগ করেছি।

ষষ্ঠ ও শেষ অধিবেশনটি ছিল সারারাত্রিব্যাপী। সূচনায় ধ্রুপদ পরিবেশন করেন ওস্তাদ নাসির মৈনুদ্দিন ও নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়—প্রথমে কাম্বোঝী রাগে চৌতালে এবং পরে অনুরোধক্রমে বাহার রাগে ধামার তালে। সাধারণত স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ এই চার কলিযুক্ত ধ্রুপদ গান ও স্থায়ী অন্তরাযুক্ত হোরী গান সম্পূর্ণরূপে গীত ও বিভিন্ন লয়কারির সহিত পরিবেশিত হলে যে গীতিরীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এ ক্ষেত্রে তার অভাব অনুভূত হয়েছে। সম্ভবত সময়ের সংকীর্ণতাই তার কারণ। ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় আর-একটু বেশি সময় নিয়ে বেশ গুছিয়ে তাঁদের ধ্রুপদানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে পারলে আমরা আরও খুশি হতাম। দরবারী কানাড়া রাগে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন কিশোর-শিল্পী কুনওয়ার রাজেন্দ্র সিং। তাঁর যন্ত্রটি অনেকটা বেহালার মতো দেখতে হলেও ঠিক বেহালা নয়। ইতোপূর্বে যন্ত্রটি সুরমাধুরী নামে প্রচারিত হয়েছে। এই শিল্পীর হাত বেশ তৈরি। রাগ-রূপায়ণে আর-একটু স্থৈর্যের প্রয়োজন—সেটা বয়সের পরিণতির সঙ্গে আয়ত্তে আসবে আশা করা যায়। গৎ-অংশে তিনি অনেক তেহাই যোজনা করেছেন। তেহাইয়ে মাত্রাসংখ্যার সাম্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলে ভালো হয়। সেতারে মারুবেহাগ রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমণিলাল নাগ। তাঁর সঙ্গে তবলা-সংগত করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। দ্রুত তানের কাজে শ্রীনাগের হাত ভালো তৈরি। কিন্তু আলাপের যথাযথ পরিবেশন দ্বারা রাগের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা তেমন সম্যক মনে হয়নি। অন্যদিকে, দ্রুত লয়ের গৎ যখন দ্রুততর থেকে দ্রুততম অবস্থায় পৌঁছায়, সেই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে তার চমক কমে যায় ও একঘেয়ে মনে হয়। এই অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে শ্রীভট্টাচার্যের তবলা-সঙ্গতে আধিক্য অনুভূত হয়েছে। গোরখ-কল্যাণ রাগে খেয়াল এবং কাফি ও ভৈরবী রাগে ঠুংরি গীত হয় ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ ও সালামত আলি খাঁ কর্তৃক। রাগালাপের পূর্বাংশে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি বোধ হয়েছে। খেয়াল গায়নে তাঁরা হাল্কা তান ও গমকী তান উভয় প্রকারই প্রয়োগ করেছেন। গোরখ-কল্যাণ রাগে, কল্যাণ রাগের একমাত্র বিকৃত স্বর তীব্র মধ্যম বর্জিত। রাগনামের দিক থেকে সেজন্য কতক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। আলোচ্য শিল্পীদ্বয়ের ঠুংরি-গায়ন ভালো হয়েছে।

মিঞা বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় কর্তৃক সানাই-বাদনের দ্বারা এই সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। তাঁরা ললিত রাগ পরিবেশন করেন। ললিত রাগে দুই মধ্যমের প্রয়োগ ও শুদ্ধ মাধ্যমে স্থিতি শ্রুতিমধুর। মিঞা বিসমিল্লা সুষ্ঠুভাবে রাগের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের পরিবেশন মনোগ্রাহী হয়েছে।

চতুর্দশ বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনে উল্লিখিত ও আলোচিত শিল্পীগণ ছাড়াও অনেক স্থানীয় ও বহিরাগত, পূর্বাগত ও নবাগত শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। বর্তমান আলেখ্যের সূচনায় যে প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ সংগীতের আনন্দলোকের সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অনুষ্ঠানাবলীর আরো বিস্তারিত ও তীক্ষ্ম সমালোচনা হয়ত করা যায়। কিন্তু সে সমালোচনাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। আনন্দলোকের সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া'র বিষয়টি মনে জাগ্রত রেখে সংগীত-কর্মে লিপ্ত থাকা ও অগ্রসর হওয়াই বড়ো কথা।

॥ রাষ্ট্রীয় সম্মান ॥

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে যাঁরা রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, অর্থনীতিবিদ ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় বুক ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নয়াদিল্লীর শল্য চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতির রাজ্যে তাঁরা সুপরিচিত এবং বলা বাহুল্য এ সম্মান তাঁদের দীর্ঘজীবনের সকল সাধনারই স্বীকৃতি মাত্র। বহুসম্মানিত ব্যক্তিদের এই নূতন সম্মানে আমরা আনন্দিত।

॥ জাতীয় স্বাস্থ্য ॥

জাতীয় স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে সান্ত্বনার কোন অবকাশ নেই। হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, শয্যা, সেবিকা ও ডাক্তারের সংখ্যা অবশ্য যথেষ্টই বেড়েছে এবং জনসংখ্যানুপাতিক হারও পূর্বের চেয়ে উন্নত। বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগগুলি এখন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ করে, ম্যালেরিয়া দেশে নেই বললেই হয়। কুষ্ঠ, ট্রাকোমা, যৌনব্যাধি প্রভৃতির বিরুদ্ধেও সরকারী অভিযান উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ শহরে অন্তত যথেষ্ট সন্তোষজনক এবং স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন জাতীয় স্বাস্থ্যের অধিকর্তারা। তবুও অভাব আজো এমনই সর্বগ্রাসী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমনই অবিশ্বাস্য যে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জাতির গত পনের বছরের উন্নয়ন প্রয়াস প্রায় তেলা বাঁশ আঁকড়ে ওঠার মতই দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৪৩ সালে ভারতে হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৭,৪০০, সে জায়গায় '৬০ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২,০০০। কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সতের বছর আগের জনসংখ্যানুপাতিক হার ১:৪০,০০০ থেকে কমে হয়েছে ১:৩৫,৮০০। '৪৬ সালে

দেশে বিদেশে
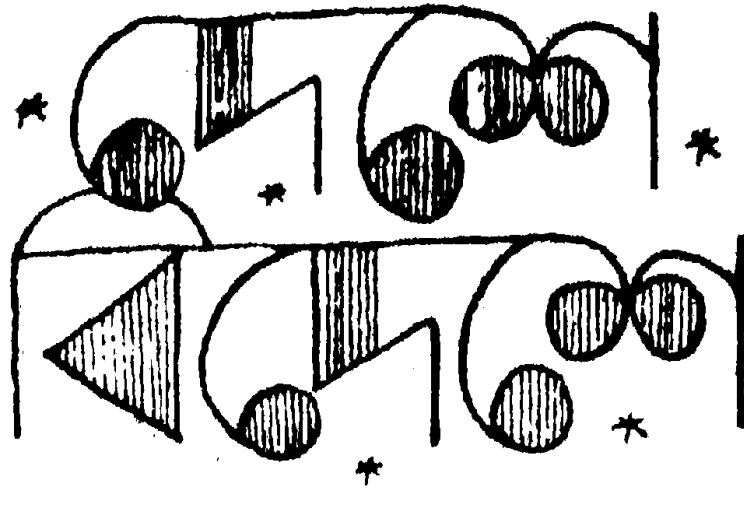
প্রতি হাজার পিছু শয্যাসংখ্যা ছিল ০·২৪; গত চোদ্দ বছরে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঐ আনুপাতিক হার হয়েছে ০·৪০। '৪৬ সালে প্রতি ৬,৩০০ লোকের জন্যে ডাক্তার ছিলেন একজন। আজ ডাক্তার আছেন প্রতি ৪,৮৫০ লোকের জন্যে একজন। এর ওপর আছে শহর ও গ্রামের মধ্যে ডাক্তারের অসম বন্টনের সমস্যা। অথচ গত চৌদ্দ বছরে এদেশে পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা ৪৭,৫২৪ থেকে বেড়ে ৮৮,০০০, প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বোধহয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল নার্সের অপ্রতুলতা। '৬০ সালে এদেশে নার্সের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০ (যেখানে '৪৬ সালে ছিল মাত্র ৭,০০০), কিন্তু জনসংখ্যানুপাতে এ হার হ'ল ১:১৪,০০০।

জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির শর্তরূপে কমিশনের সুপারিশ হল—ভাল বাসস্থান, যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত শৌচ ব্যবস্থা, মুক্ত বায়ু অনুপ্রবেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা, নগরে জনবাহুল্য নিয়ন্ত্রণ ও বস্তী সংস্কার; ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে শিশুদের জন্যে, খাঁটি দুধের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি দেশবাসীর সামাজিক শৌচ চেতনা। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থা সৃষ্টি যে কতখানি অসম্ভব তা উল্লিখিত কয়েকটি সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই অনুমান করা যায়।

॥ শিক্ষাব্রতীর অবমাননা ॥

বহু আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়ার পর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সারা পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে পথে নেমেছিলেন বাঁচার দাবী জানাতে। ধর্মঘট শুরু হওয়ার দু'দিন পরে সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন, অবিলম্বে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হবে এবং পুলিশের হাতে প্রায়ই যে তাঁদের নিগৃহীত হতে হয় তারও প্রতিকার করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু সরকারও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলেন তাঁদের আশ্বাসের কথা। কারণ তারপর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বেতন বৃদ্ধির আশায় শিক্ষকের নিরানন্দ গৃহে ক'মাস আগে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলেছিল, সরকারের হৃদয়হীন নীরবতায় ইতিমধ্যেই তা নিভে গেছে আর সে জায়গায় ভয়াবহ হয়ে উঠছে পুলিশী সন্ত্রাস। ক'দিন আগের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নাকি বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন কারা। এ যদি সত্য হয় তবে একথা বলতেই হবে যে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা আর কল্পনা করা যেতে পারেনা।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, অভাবের দাবী অপ্রতিরোধ্য। তাই চোখের সম্মুখে অনুজ সহকর্মীদের এই প্রবঞ্চনা ও নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করেও একই পথে পা বাড়িয়েছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রতীরা। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হওয়ার পর ক'দিন আগে এক মৌন মিছিল বেরিয়েছিল অধ্যাপকদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের, দুর্ভাগ্য বাঙলা দেশেরও, তাঁদের আবেদনে কেউ কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল সেদিন বাসভবনে উপস্থিত থেকেও শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেছেন; রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীও সেদিন তাঁদের কথা শোনার জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন মনে করেননি। পরন্তু গত ২৪শে জানুয়ারী সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অধ্যাপকদের দাবী তাঁরা পূরণে অক্ষম। সুতরাং এরপর হয় অধ্যাপকদের নিজেদের দুর্ভাগ্য মেনে নিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে, না হয় নিতান্ত নিরুপায়ের মত বেপরোয়া হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, শিক্ষাব্রতীরা শেষের পথই বেছে নেবেন। ওদিকে আশাহত বিদ্যালয় শিক্ষকরাও হয়ত তাঁদের সঙ্গে একই পথের অনুগামী হবেন। আর তার ফলে অনিবার্যভাবে সারা রাজ্য জুড়ে এক বিরাট বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, যেদেশে শান্তিকামী শিক্ষাব্রতীদেরও বাঁচার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে চরম অশান্তির পথে নামতে হয়, সেদেশ অভিশপ্ত।

সকল কল্যাণের পথ সেখানে রুদ্ধ। আমরা শেষ পর্যন্ত আশা করব, এতবড় দুর্গতির মধ্যে বাঙলা দেশকে বাঙলার ভাগ্যবিধাতারা ঠেলে দেবেন না।

॥ লাওসে জাতীয় সরকার ॥

দীর্ঘ আলোচনা ও বারংবার ব্যর্থতার পর লাওসের তিন প্রিন্স একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে একমত হতে পেরেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। নিরপেক্ষ প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে এই জাতীয় সরকার গঠিত হবে এবং তাতে মন্ত্রী থাকবেন সাতজন ও উপমন্ত্রী দুইজন। তবে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তর কোন পক্ষীয় মন্ত্রীর হাতে থাকবে সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয়নি। বলাবাহুল্য, প্রশ্নটি একটিমাত্র হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধুমাত্র এরই মীমাংসার অভাবে যদি শেষ পর্যন্ত লাওস রাজনীতিতে আবার সংকট ঘনিয়ে ওঠে তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না। তবুও জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে লাওসের ত্রিমুখী রাজকীয় নেতৃত্ব যে একমত হতে পেরেছে, সেইটাই দ্বন্দ্ব-দীর্ণ লাওসের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশার কথা।

॥ মীমাংসা প্রয়াস ॥

পশ্চিম ইরিয়ানের অধিকার নিয়ে হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিরোধ চরম পর্যায়ে ওঠার পর রাষ্ট্রসংঘ তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার সংগে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত হল্যান্ডের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন হল্যান্ড তাতে সাড়া দিয়েছে। অপরপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকেও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ উ থান্তকে জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়াসে সাড়া দিতে ইন্দোনেশিয়া সব সময় প্রস্তুত। তবে সেইসংগে একথাও ডঃ সুকর্ণ জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি এই বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে এবং জাতির প্রতিরক্ষা-বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে সৈন্য-বাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, জাতির ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা যেন সবসময় প্রস্তুত ও সতর্ক থাকেন। ইন্দোনেশিয়ার এই অনমনীয় মনোভাব হল্যান্ডের ওপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। হল্যান্ডের নিউগিনি বিষয়ক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ থিও বট সম্প্রতি পশ্চিম ইরিয়ানের হল্যান্ডিয়া শহর পরিদর্শন-কালে বলেছেন—আমরা নিউগিনিতে থাকার চেষ্টা করছি না, ইন্দোনেশিয়ার সংগে হল্যান্ড সব সময়েই আলোচনায় প্রস্তুত।—এইসব উক্তি ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হয়, পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি শেষপর্যন্ত হয়ত বিনা যুদ্ধেই সম্ভব হবে।

॥ ফিজোর দম্ভ ॥

বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজো বৎসরাধিককাল ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন। তিনি নাগা অঞ্চল ত্যাগ করার আগেই নাগা বৈরীদের অন্তর্ঘাতী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তারপর তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে ও নাগাভূমির অধিবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে স্বতন্ত্র নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রায় সম্পূর্ণই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে ফিজো লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে হুংকার ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর নেই, কিন্তু ভারত সরকার যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত না হন তবে আন্তর্জাতিক আইন পরিষদের কাছে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে পঁচাত্তর হাজার নাগাকে পাইকারীভাবে হত্যার অভিযোগ আনবেন। সেখানে যদি তিনি ব্যর্থ হন তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ব্রীগেডের শরণাপন্ন হবেন। তাতেও যদি কোন সুরাহা না হয় তবে, তিনি বলেছেন, চীন ও পাকিস্থানের সহযোগিতায় ভারতকে নাগাভূমি ত্যাগে বাধ্য করবেন। ফিজোর এইসব কথা অবশ্য নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুটির নাম করেছেন তাদের কোন দেশের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দায়িত্ব নেই, এবং ভারতও কোন অবস্থাতেই তাদের কাছে নিজ কাজের জবাবদিহী করবে না। এমনকি চীন পাকিস্থানের সহায়তার হুমকিও ভারতের কাছে অর্থহীন। যদিও পাকিস্থানের কাছে এবং হয়ত বা চীনের কাছেও ইতিমধ্যে কিছু কিছু সাহায্য ফিজো পেয়ে থাকবেন। তবে গোয়া সমস্যার সমাধানে ভারত শেষ-পর্যন্ত যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে পাকিস্থান বা চীন অবশ্যই আর ফিজোকে কোনভাবে সাহায্য করতে সাহসী হবে না। কিন্তু এই সকল উক্তির মধ্য দিয়ে ফিজোর যে ভয়ংকর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে তার সম্পর্কে কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করা ভারতের পক্ষে উচিত হবে না। ঐ ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করার ও তাঁর দেশদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রস্বার্থ-বিরোধী প্রচার সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব দৃঢ় হলে আরও অনেক রাষ্ট্রস্বার্থ-বিরোধী সংযত হবে।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ : "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : ভারতের জনগণই কাশ্মীরের প্রকৃত "স্বস্তি পরিষদ' ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা"—জনসভায় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ : "দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত"—কারখানার 'মার্চেন্ট মিল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

'গোয়া অভিযানের ফলে ভারতের নীতির কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই'—প্রেসিডেন্ট কেনেডির (মার্কিণ) নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পত্র।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ : কলিকাতায় অধ্যাপকদের (পশ্চিমবঙ্গ) মৌন শোভাযাত্রা—বেতন বৃদ্ধি, কলেজ কোড প্রবর্তন, ছাঁটাই বন্ধ প্রভৃতির দাবী।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে মোট ১৪ শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল—কলিকাতায় ২৬টি বিধানসভার আসনের জন্য ১১১ জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ।

পাঞ্জিমে ২০ হাজার প্রাক্তন পর্তুগীজ কর্মচারীর ভারতের রাষ্ট্রপতি ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ।

২১শে—জানুয়ারী ৭ই মাঘ : 'ভারতের চীনা আক্রমণ প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করা হইবে।' নয়াদিল্লীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু দৃঢ় ঘোষণা।

'শতকরা মাত্র ১৫ জনের হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত : শহরাঞ্চলে শতকরা ৮৫টি পরিবার সঞ্চয়ে অক্ষম'—জাতীয় বৈষয়িক গবেষণা পরিষদের রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তদন্তকল্পে সরকারী কমিশন নিয়োগ; চেয়ারম্যান : বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন সদস্য শ্রী ডি সি পাণ্ডে।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ : বাংলা ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের দাবী—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত বাংলাভাষী সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ : পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৬তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু ও কেনেডির মধ্যে পত্র বিনিময়ের সংবাদ—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট পাকিস্থানী দাবী অনুযায়ী স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনে বিরোধী বলিয়া ইঙ্গিত।

'পাঞ্জাবী সুবার দাবী কথনই স্বীকার করা হইবে না'—লুধিয়ানায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ : ভারত কথনও পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ বাধাইবে না : পাকিস্থান যুদ্ধ বাধাইলে ভারত উপযুক্ত জবাব দিবে'—ফিরোজপুরে জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ : মার্কিণ কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ৯২৫৩ কোটি ডলারের বাজেট পেশ—সামরিক খাতে প্রচুর ব্যয়-বৃদ্ধির দাবী।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ : ডোমিনিকান রিপাবলিকে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান—বিমান বাহিনীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন বিষয়ে প্রিন্সত্রয়ের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার সংবাদ।

'বৈমানিকের ভুলের জন্যই হ্যামারশীল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল) মৃত্যু ঘটে'—সুইডিশ পাইলট সমিতির পত্রিকায় বিমান দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে মন্তব্য।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে কেনেডি-উ থান্ট দুই ঘন্টাব্যাপী বৈঠক।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ : কঙ্গোর পদচ্যুত সহকারী প্রধানমন্ত্রী গিজেঙ্গার লিওপোল্ডভিলে প্রত্যাবর্তন ও রাষ্ট্রসংঘে আশ্রয় গ্রহণ। ভারতীয় জেট বিমানের উপর বিদ্রোহী কঙ্গোলী সৈন্যদের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

'জরুরী অবস্থায় পাকিস্থান মজুত সকল অস্ত্রই ব্যবহার করিবে'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সদম্ভ ঘোষণা।

২১শে জানুয়ারী—৭ই মাঘ : নেপালে কংগ্রেস কর্মীদল কর্তৃক তিনটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল—সৈন্যদের সহিত ছয় ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে দশজন হতাহত।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ : নাগাভূমির প্রশ্নে আপোষ-আলোচনায় ভারত অসম্মত হইলে ব্যাপক আক্রমণ'—লণ্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর হুমকী—নাগাভূমির স্বাধীনতার ভিত্তিতে আলোচনা সুরু করার জন্য ভারত সরকারকে তিন সপ্তাহ সময় দান।

নেপালের রাজা মহেন্দ্রের প্রাণনাশের চেষ্টা—জনকপুরের পথে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ।

অ্যাঙ্গোলার মুক্তির জন্য পর্তুগালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়নের বক্তব্য পেশ।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ : ইরিয়ানে রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন প্রেরণের অনুরোধ—পশ্চিম নিউ গিনি জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব।

কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার জন্য কেনেডির পক্ষ হইতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব—নেহরু ও আয়ুবের নিকট মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্র—মধ্যস্থ হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইউজিন ব্ল্যাকের নাম সুপারিশ।

উপনিবেশবাদের অবসানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভারত সমেত সতেরটি রাষ্ট্র লইয়া তদারকী কমিটি গঠন।

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ : রাশিয়া একটি পারমাণবিক রকেটের আঘাতে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাইতে সক্ষম—সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনোভস্কির ঘোষণা।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

।। মানবিক রহস্য ।।

১৮৬৪ খৃীষ্টাব্দে অকস্‌ফোর্ডে এক বক্তৃতা প্রসংগে বেনজামিন ডিস্‌রেলী প্রশ্ন করেন— "What is the question now placed before society with a glib assurance the most outstanding?" —এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় থমকে না দাঁড়িয়ে সেদিন ডিস্‌রেলী নিজেই জবাব দিয়েছিলেন—"The question is this—Is man an ape or an angel? by Lord I am on the side of angels."

ডিস্‌রেলী স্বয়ং ছিলেন দেবদূতদের দলে, ডারউইনের প্রতি কটাক্ষপাত করলেও তিনি নিঃসন্দেহে এনজেল, যেমন আরো অনেক সরল এবং সাধারণ প্রাণী—এমন কি বৈজ্ঞানিকরাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। বিবর্তনবাদের সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে যার ব্যক্তিগত সমস্যায় মাথা ঘামিয়েছেন অনেক বেশী।

১৮৭১ খৃীষ্টাব্দে The Descent of Man প্রকাশিত হওয়ার পর ডারউইনের সমালোচকদের দৃষ্টিভংগীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। ডারউইনীয় মতবাদের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন টি, এইচ, হাক্‌সলী। এক হিসাবে 'ডাউন হাউসের' বাইরের জগতে ডারুইনের মতবাদ তিনিই অসীম উৎসাহে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—"অজ্ঞতা এবং ঔদ্ধত্যের সংমিশ্রণেই ডারউইনীয় মতের বিরোধিতা হত গোড়ার দিকে, অধিকাংশ আক্রমণ এই অজ্ঞতাপ্রসূত, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের এর এই ডারুউইন-বিরূপতার অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেল।

ভিক্টোরীয় যুগের সাহসিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও বিবর্তনবাদ প্রয়োজনীয় প্রগতিবাদের সংগে সংযুক্ত হয়ে মানুষকে দেবদূতের উচ্চ সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে একেবারে মাটির বুকে পশুদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষ পশুদের আত্মীয়, একই বংশ এবং গোত্রসম্ভূত, শুধু মাত্র জীবনযুদ্ধের প্রচন্ড সংঘর্ষে মানুষ বেঁচে আছে তার সেই বিরামবিহীন জীবন-ধারণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এমনই বেঁচে থাকবে যতক্ষণ না থার্মো-ডাইনামিকসের (উত্তাপের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি) নীতি অনুসারে ক্লান্ত ধরণীকে সব রকমেরই জীবিত প্রাণীর ভার বহনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া না হয়। থার্মো-ডাইনামিকস্‌ একদিন নাকি এই বিশ্বজগতকে তার গুরুদায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেবে, তখন আর পৃথিবীতে প্রাণের এতটুকু স্পর্শ পাওয়া যাবে না।

বিবর্তন সম্পর্কে আজো কুসংস্কার আছে, আমরা যে বিবর্তনের ফসল এ কথা মনে করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই সংগে এই প্রশ্নেরও প্রয়োজন আছে আমরা এ ছাড়া অন্য আর কিছুও ত' হতে পারি। এই প্রশ্নের দ্বারা জীববিদ্যাগত সিদ্ধান্তানুসারে প্রায় এই প্রশ্নই ওঠে যে বিবর্তনবাদই কি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা? সব প্রশ্নের কি একটিই উত্তর? অপরপক্ষে এই প্রশ্নও মনে জাগে যে মানবিক প্রকৃতির এমন সব দিক আছে যে বিষয়ে বিবর্তনবাদের আলোকে কিছুই পাওয়া যায় না:

দার্শনিক প্রজ্ঞায় আরূঢ় এ যুগের মনীষীরা দু' পুরুষ আগেও জীবতাত্ত্বিক বিবর্তনবাদের প্রতি যে মূল্য আরোপ করতেন বর্তমানে আর তা করেন না একথা ঠিক, তবে তার অর্থ এই নয় যে মানবিক চরম পরিণতিতে বিবর্তনবাদের গুরুত্ব কতটুকু তা তাঁরা পরিমাপ করেন না, কিংবা তাঁরা আর বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী নন। জন ল্যাংডন-ডেভিসের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "On The Nature Of Man" এই বিষয়ে নূতন আলোকপাত করেছে, (গ্রন্থটির প্রকাশক নিউ আমেরিকান লাইব্রেরী, দাম পঞ্চাশ সেন্ট),—।। যুক্তির যুগে (age of reason) এই বিষয়ে লব্ধজ্ঞানকে একালের প্রজ্ঞার যুগ (age of sanity) একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চায় না, একথা ল্যাংডন-ডেভিস বলেছেন, তবে এ যুগের মানুষ যা গ্রহণ করেন তার থেকে অনেক অবাস্তব ও অবাঞ্ছনীয় অংশ বর্জন করেন, অজ্ঞ, অল্প-শিক্ষিত, সহজ-বিশ্বাসী মানুষ যা নির্বিচারে গ্রহণ করেছে তার থেকে সারটুকুই নিতে হবে।

যুক্তির যুগের যে সব ভ্রান্ত ধারণার জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে তা যদি পরিষ্কার করে অগ্রসর হওয়া যায় এবং প্রশ্নের প্রত্যক্ষ দিকটা নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে হয়ত সেই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। মানুষ কি? এই বিচার কালে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সৃজনধর্মী শিল্পী বন্দী হয়ে আছে তাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

মানব-প্রকৃতির গোপন সৃজনীশক্তি থেকেই ল্যাংডন-ডেভিসের মতে নূতন সন্ধান-সূত্র পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে নতুন জ্ঞান। সেকেলে এবং গোঁড়া প্রবৃত্তির রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকরা এই সব দিক এতকাল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, মানব-প্রবৃত্তির মধ্যে যে তথাকথিত প্যারানরম্যাল বা অ-প্রাকৃত শক্তি বা গুণ আছে তার কোনও বিশ্লেষণ করা হয়নি। ল্যাংডন-ডেভিস বলেছেন:

"Let me say at once that in so far as these faculties exists—telepathy, clairvoyance, precognition, and other stranger things still—they are not abnormal, supernormal or super-natural Anything that exists is natural and, until it has been seen to fit into the pattern of nature, it is not safe to think that we understand it—or the rest of nature either And of course we may find that some pieces of the puzzle, wrongly fitted hitherto, must be differently arranged to make room for the new facts."

পুরাতন ধাঁধার নতুন উত্তর খুঁজতে হবে, তবেই সব কিছুর একটা অর্থ পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থের এই হল মূলকথা এবং প্রধান বক্তব্য। নিঃসন্দেহে একটি অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ ল্যাংডন-ডেভিসের এই "On The Nature Of Man"। শিক্ষিত অথচ এই বিষয়ে জ্ঞানহীন মানুষের কাছে একালের এই চিন্তানায়কের অসীম শক্তিমত্তা এবং মানসিকতার আভাষ এই গ্রন্থপাঠে পাওয়া যায়। মিঃ জন ল্যাংডন-ডেভিস বৈপ্লবিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দান করেছেন, সেই সংগে তাঁর সাহসিকতা ও মননশীলতার দ্বারা তিনি সর্বোত্তম রহস্যময় হেঁয়ালির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেই হেঁয়ালির নাম—মানুষ। মানুষকে ঘিরে যে অপরূপ রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় জগৎ আছে ল্যাংডন-ডেভিস অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সংগে তার পরিচয় দিয়েছেন। তবে লেখকের অহংমন্যতার পরিচয়ও কিছু আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়া মতবাদানুসারে সূর্যের বিনাশের সংগেই পৃথিবীর বুক থেকে মানবজাতি বিলুপ্ত হবে। সেই মতবাদকে এই গ্রন্থে খন্ডন করার প্রচেষ্টা হয়েছে, এবং সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আছে যুক্তি, তীক্ষ্ণতা এবং উপলব্ধি। ল্যাংডন-ডেভিসের মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত, তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র বিচিত্র এবং পাশ্চাত্য জগতের মনের চাইতে প্রাচ্য দেশের মনের সংগে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের সমমর্মিতা অনেক বেশী।

লেখক বিশদভাবে "extra-sensory perception" বা "জ্ঞেয় উপলব্ধি বহির্ভূত প্রবৃত্তি তার উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এক কথায় বলেছেন—The fact of 'Telepathy' cannot be explained in accordance with known laws of energy, motion and matter, any more than it would be possible to explain a flower suddenly appearing in a hermetically sealed, hitherto

empty glass jar, in accordance **with the known** properties of **matter, one of** which is that solid **matter can** not pass through solid **matter.**"

বর্তমান জগতে অনেক বিস্ময়কর **কিছু ঘটার সম্ভাবনা** আছে বলেই **telepathy** বা **'পরচিত্তজ্ঞান'** সম্পর্কে **অধিকতর জ্ঞানার্জন** করার প্রয়োজন **মানবজাতেরই** আছে। বর্তমান কালে **হয়ত দৈনন্দিন** জীবনের কাজেও তার **ব্যবহারিক প্রয়োগ** সম্ভব হবে না, কিন্তু **কোনো** দিন যে সেই প্রয়োজন ঘটবে না **এ কথা** চিন্তা করা **হঠকারিতার** সামিল। **পদার্থ (matter) এবং তেজ (energy) সম্পর্কিত আইনষ্টাইনের** মতবাদ সর্ব-**প্রথম ঘোষিত হওয়ার পর** তেমন প্রয়ো-**জনীয় বস্তু বলে কারো মনে হয়নি**, কিন্তু **অতি শীঘ্রই** তার ফলে 'হিরোশিমা'-র **ধ্বংস ঘটেছে এবং 'থার্মোনিউক্লিয়ার' পারমাণবিক অস্ত্রাদি** নির্মাণের পথ **উন্মুক্ত হয়েছে।**

এই "অধিকতর বিস্ময়কর" বস্তুটি কি, এবং **পরমাশ্চর্য** কি কাণ্ড ঘটা **সম্ভব**? লেখক তার জবাবে বলেছেন : "I do not know. Nobody knows. **We have** as yet nothing but **awkward facts**; but they are sufficiently well authenticated for us **to realise** that our knowledge of **human nature** may at any moment **be** revolutionised in the **same way** as Einstein revolutionised **our** knowledge of time and space."

প্রচলিত কয়েকটি ধর্মমতের অনুজ্ঞানুসারে আত্মার বিনাশ নাও ঘটতে পারে, **আত্মা অবিনাশী।** এই প্রশ্ন সম্পর্কে **মানুষের মনোভঙ্গী** কিন্তু তার ভাবগত **মনোভঙ্গীর সঙ্গে অনেকটা** পৃথক। এই **মূল্যবান প্রশ্ন সম্পর্কে** সকলেই হয়ত **আগ্রহান্বিত হয়ে** উত্তর খুঁজতে ব্যাকুল **হতে পারেন,** কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে সেই গোপন তথ্য আদায়ের জন্য খুব কম **সংখ্যক** লোকেরই কোনোরকম আগ্রহ **থাকতে** পারে।

মৃতের সঙ্গে কথোপকথন বা সংযোগ **সাধনের দ্বারা** কি অবিনাশী আত্মার **প্রমাণ পাওয়া যায়?** মিডিয়ম মারফত প্রাপ্ত কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর সততা বিশ্বাসযোগ্য। তবে তাঁরও বিশ্বাস যে পরলোকতাত্ত্বিকদের দ্বারা আসল তথ্য অনেক সময় জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং তাঁদের মতবাদও অনেক সময় তেমন জোরালো নয়।

যে যা বলে বলুক, বা ভাবুক ভৌতিক বা পারলৌকিক এই সব ঘটনা নির্বিচারে গ্রহণ করাও যেমন উচিত নয় **তেমনই** লেখকের মতে যে কোনো মনীষী **এই বিষয়** নিয়ে গবেষণা করতে পারেন **উন্মুক্ত মন** নিয়ে। যাঁদের মনে সংশয় **আছে**— 'we need not wait for the **orthodox** ostriches to take their **heads out of the sand'** —**তাঁরা তাঁদের** গোঁড়া মন নিয়ে অষ্ট্রিচের মত বালিতে মুখ লুকিয়ে বসে থাকুন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

নতুন বই

The Great Wanderer — Maitraye Devi. Grantham. — 22/1, Cornwallis Street, Calcutta-6. India. Price — Rs. 7.50 nP. (with 4 photographs by Sambhu Saha)

সুকবি মৈত্রেয়ী দেবী বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে সুপরিচিত। তাঁর রবীন্দ্রভক্তি সর্বজনবিদিত, মংপু বাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁকে 'মংপাবী' এই নামে অভিহিত করেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপর্বের এক অনুপম আলেখ্য। ১৯৬০-এ তিনি 'বিশ্ব-সভায় রবীন্দ্রনাথ' নামক যে সুন্দর গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, বর্তমান গ্রন্থটি তার ইংরাজী অনুবাদ। এই গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের বহু প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটির ডকুমেন্টারি মূল্য অসীম। তবে মাঝে মাঝে কিছু ত্রুটি দেখা যায়, যেমন ৮৯ পৃষ্ঠায় যে গ্রন্থটি থেকে উইলিয়াম রথেনষ্টাইনের চিঠিখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার নাম "Testing Apostle", "Testing Prophets" নয়। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থ সংখ্যায় বেশী নেই, সেই কারণে The Great wanderer রবীন্দ্র-জীবনী-সংগ্রাহকদের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই।

চালচিত্র—(স্মৃতিকথা) ।। কালিদাস রায় ।। প্রকাশক— অ্যাকাডেমিক পাবলিসার্স, ১১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

প্রবীণ কবি ও শিক্ষাবিদ্ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের গদ্যরচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের বিশেষ পরিচয় নেই। আজীবন তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করেছেন। পরিণত বয়সে জীবনসায়াহ্নে সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক কালের বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে কিছু কিছু রসরচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছেন। চিন্তাশীল লেখকের দৃষ্টিকোণে আধুনিক লোকাচারের যে অপূর্ব রেখাচিত্র এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধগুলিতে পরিবেশিত হয়েছে তার তুলনা নেই। প্রবীণ লেখক যেমন একধারে কৃত্রিম সামাজিকতার আধুনিক রীতির প্রতি তীব্র কষাঘাত করেছেন তেমনই তাঁর করুণা ও মমতাভরা মনের ব্যথার আভাসও তাঁর এই রচনার মধ্যে পরিস্ফুট। নিষ্পেনজন পিতা ইদানীং কালের একটি বহুল আলোচিত রচনা। পাঁচশ টাকার হিসাব, দুই পুরুষ আগে, পণপ্রথা, আত্মীয়তা মাসীমা, অবাধ্যতা, কালচার, মেকি, ভাতৃ-গৌরব, নারীপ্রগতি প্রভৃতি নিবন্ধগুলি শুধু যে তথ্যমূলক তা নয়, একালের সমাজচিত্র হিসাবে একটা দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদা লাভ করবে একথা বলা যায়। প্রায়-গল্পের আঙিনাকে লেখক অনেক গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতও দান করেছেন। বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, সত্য কথা বলার সাহস খুব কমসংখ্যক ব্যক্তির আছে, লেখক অকুতোভয়ে সেই অপ্রিয় সত্য কথাই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বলেছেন এবং সেই কারণেই তিনি অভিনন্দন-যোগ্য। গ্রন্থটির ছাপা এবং প্রচ্ছদ অতিশয় মনোরম এবং সুরুচিসঙ্গত।

মনোনীতা— (গল্প সংগ্রহ) ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। মুকুন্দ পাবলিসার্স, ৮৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। পরিবেশক মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রকাশকালে তিনি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে সমস্ত গল্পের কতকগুলি নিয়েই এ গ্রন্থের প্রকাশ। সমসাময়িক জনজীবনকে ভিত্তি করেই তাঁর গল্প রচিত হয়েছে। সমরেশের সাংবাদিক জীবনের ট্রাজেডি, প্রবীর ও নীতার সাংসারিক জীবন, শহর-জীবনের নানাবিধ বিড়ম্বনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষের ছবিও ফুটে উঠেছে। মোট কথা লেখক শহর ও গ্রাম্য জীবনের বিশেষ রূপকে উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁর কোন কোন গল্প সার্থক হয়ে উঠেছে। 'মনোনীতা', 'হীরামানিক', 'পলাতক', 'মহাল', 'স্নেহ-নীড়' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গল্পে বক্তব্যের অভাব না থাকলেও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত প্রবেশে গল্পগুলির সার্থকতা নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ গল্পেরই বর্ণনা-ভঙ্গী খুবই পুরনো।

নওগাঁর প্রাসাদ—(উপন্যাস) সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়; ৪৪, কালীকুমার মুখার্জি লেন; শিবপুর, হাওড়া। দাম ৭·৫০ টাকা।

অত্যাচারী জমিদার বংশের কাহিনী। জমিদার নিখিলেশের ষড়যন্ত্রে নিহত হল তারই ছোট ভাই সমরেশ। নাবালক পুত্রকে নিয়ে সমরেশের বিধবা পত্নী যখন সম্পত্তির দাবীতে মামলা দায়ের করল তখন তাদের পাশে এসে

দাঁড়াল সৎ মানুষ রমানাথ ভট্টাচার্য ও শচী সামন্ত। নিখিলেশের মৃত্যু হল। সমরেশের বিধবা স্ত্রী মামলা জিতল। কিন্তু নিখিলেশ পুত্রের হাতে সুমিত্রা লাঞ্ছিতা হল আর শচী সামন্তের প্রাণ গেল। অবশেষে এক চরম বেদনা-দায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদার বংশের পতন হল।

লেখকের বর্ণিত বিষয় খুবই জটিল। মোটামুটিভাবে জমিদারদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু পরিণতির দৃশ্যটি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। ভাষা সুন্দর হলেও কাহিনী পরিবেশনায় ভাবার ছটা-কে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রাখলে তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা আরও সার্থক হবে বলে আশা করি।

পিরামিডের মাথায় মানুষ— (কিশোর সাহিত্য) জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। নিউস্ক্রিপ্ট। এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ২-৫০ টাকা।

মিলক গ্রহে মানুষ— (কিশোর সাহিত্য) অদ্রীশ বর্ধন। আলফা বিটা পাবলিকেশনস। পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলিঃ—১। দাম ৩-০০ টাকা।

বেশ কিছুকাল হল বাঙলা ভাষায় ছোটদের জন্য নানাবিধ বই প্রকাশিত হয়েছে। তা আমাদের গর্বের বস্তু, তবে তার মধ্যে প্রকৃত কিশোর উপযোগী গ্রন্থ কতগুলি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সে বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "পিরামিডের মাথায় মানুষ" গ্রন্থখানি বাঙলা দেশের কিশোরদের উপযোগী একটি সাম্প্রতিকতম প্রকাশন। বাঙলা-দেশের একটি কিশোর পিরামিডের মাথায় ওপরকার সাড়ে সাত ইঞ্চি একটি লোককে (যে শ' পাঁচেক ফুচকা, আড়াই মন হজমি, আর সাড়ে তিরিশ সের কড়া চিনে-বাদাম ভাজা খায়) কি করে নিয়ে এল বাঙলা দেশে তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী। 'প্রফুল্লবিকাশবাবু', 'প্রজ্ঞানারায়ণবাবু', 'বোকাদা', 'ঈশ্বরভক্ত-বাবু', 'প্রপন্নপালকবাবু' প্রভৃতি নাম-গুলি ছোটদের মনোপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। শঙ্করের অভিযানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মান্য ব্যক্তির সহযোগিতার চিত্রাঙ্কনে লেখকের অপরিসীম পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষার স্বাভাবিকতা গ্রন্থটিকে সার্থক করে তুলেছে। বাঙলা ভাষায় এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। মহাকাশের বুকে আছে 'মিলক' নামে একটি গ্রহ। সেখানে যে চারজনের এক অভিযাত্রী দল গেল তারা নানাবিধ বিপদের মধ্য দিয়ে অবশেষে মুক্তি লাভ করেছে। বিজ্ঞানের এক রহস্য ও চাঞ্চল্য-কর জীবনধারাকে লেখক তুলে ধরেছেন। লেখকের রচনারীতি স্বচ্ছ। বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্ব রয়েছে। গল্প সৃষ্টি করবার জন্য তার উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি রচনায় শ্রীযুক্ত বর্ধন নিপুণ শিল্পী। তাঁর ভাষা ভঙ্গীমা সুন্দর। এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর উপন্যাস আরও রচনা করা উচিত বলে মনে করি।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ— (প্রবন্ধ) শ্রীবিনয় চৌধুরী, সাহিত্য চয়নিকা, কলি-কাতা। দাম—২-০০।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস দীর্ঘ এবং সংঘাতপূর্ণ। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে একজন বিদেশী গেরাসিম লেবেদিয়েফ কলকাতার বুকে প্রথম যে নাট্যশালা স্থাপন করেন তারই অনুপ্রেরণায় প্রায় চল্লিশ বছর পরে বাঙালী কর্তৃক বেলেঘাটায় হিন্দু থিয়েটারের দ্বারো-দ্ঘাটন হ'ল। নাট্যরস আস্বাদ করবার জন্যে এর পর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ (ন্যাশানাল থিয়েটার) ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানেই দীন-বন্ধুর নাটক 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয়। 'নীলদর্পণ', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর চিত্ত-জাগরণের দায়িত্ব গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকাররা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন লেখক তা' সবিস্তারে জানিয়েছেন।

আধুনিক নাটকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে বিরাজিত। দৃশ্যপট, মঞ্চ-উপস্থাপনা ও আঙ্গিক বাহুল্যবর্জন করে বাংলার রঙ্গ-মঞ্চকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলে-ছিলেন।

১৯২১ সাল থেকে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগ থেকে রঙমহল, স্টার, শ্রীরঙ্গম বা বিশ্বরূপা, মিনার্ভা, থিয়েটার সেন্টার ও মুক্ত অঙ্গনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নাট্যান্দোলন সম্পর্কে লেখকের মতামত প্রণিধানযোগ্য।

কলকাতার নাট্যান্দোলনের সঙ্গে মফঃস্বলের নাটক-অভিনয়ের একটা ধারা-বাহিক স্রোত প্রবহমান। সে সম্পর্কে কোন আলোচনা "বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে" নেই। এই অভাবটি এই গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি।

সম্পূর্ণ দোষমুক্ত না হ'লেও বাংলা নাটমঞ্চের দেড়শতাধিক বছরের ইতিহাসকে স্বল্প পৃষ্ঠায় তুলে দেবার যে দুরূহ প্রয়াস নিয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সার্থক।

কালীঘাটের পট— (কবিতা)। শান্তি লাহিড়ী। মূল্য : দু'টাকা। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন। কলিকাতা—এক।

প্রকরণ এবং মননের একটি পরিণত-রূপ অঙ্গীকার করে কবি শান্তি লাহিড়ীর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। চয়িত কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিধুর রোমান্টিকতা সুরের মতন ধ্বনিত, যা সঞ্চারিত হতে সক্ষম কবিতা-পাঠকের মনে। এই কবিতাগুচ্ছে কবিত্বের উজ্জ্বল অভিজ্ঞানরূপে দীপ্তি-ময় কিছু পংক্তি রয়েছে যা আমাদের আকৃষ্ট করে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, কিছু যান্ত্রিকতা মাঝে মাঝে যেন এই কবিতা-পুস্তকের শরীরে সংক্রমিত হয়েছে। এবং প্রত্যেক সৎ কবির যান্ত্রিকতা পরিহারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

বহির্ভারতে ভারতীয় ছবির বাজার :

স্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখিকা শ্রীমতী অমিতা মল্লিককে ধন্যবাদ। তিনি ভারতীয় ছবির বহির্ভারতীয় বাজার সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন সম্প্রতি। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি, যে-পাঁচটি দেশে ভারতীয় ছবির সবচেয়ে বেশী চাহিদা, সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা, মালয়, সিংহল, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের চাহিদায় পড়ে ছ'টি অঞ্চল—পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্য (অবশ্য ইংলন্ডে দেখানোর জন্যে নয়; ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে), ত্রিনিদাদ ও কাম্বোডিয়া। আর যে-সব দেশেও অল্প-বিস্তর ভারতীয় ছবি দেখানো হয়ে থাকে, সেগুলি হচ্ছে ইরাণ, লেবানন, ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মরিসাস, ঘানা ও পাকিস্তান।

এই সব দেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানী হওয়ার প্রধান কারণ, ও-সব জায়গায় বহু ভারতীয়ের বাণিজ্য বা অপর কোনো কর্মব্যপদেশে বসবাস। এ ছাড়া ঐ সব অঞ্চলের অপরাপর বাসিন্দারাও সাধারণ ভারতীয় দর্শকদের মতোই অনগ্রসর ও অল্পশিক্ষিত। ১৯৬০ সালে বিদেশে রপ্তানীর ফলে ভারতীয় ছবি বিদেশের বাজার থেকে ১,৭৫,৮৯.০০০ (প্রায় এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ) টাকা উপার্জন করলেও পাশ্চাত্য জগতে এর চাহিদা অত্যন্ত সামান্যই; এমন কি নেই বললেও চলে। রাশিয়া, পোলাণ্ড, চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে খুব অল্প কয়েকখানি ভারতীয় ছবি বিক্রী হলেও ও-সব দেশে ভারতীয় ছবির একটা নিয়মিত বাজার আজও সৃষ্টি হয়নি। আর ছবির রাজ্য আমেরিকা ও ইংলণ্ডের তো কথাই নেই। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ছবির নাম ওখানে শুনতে পাওয়া যায় না। শ্রীরায় ভারতকে এনে দিয়েছেন জাতীয় সম্মান, ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিদগ্ধজনের প্রশংসা। কিন্তু তাঁর পর?

অথচ ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই। সকল দেশের লোকেই ভারতবাসীর চিন্তাধারা, দৈনন্দিন রীতিনীতি, কার্যকলাপ প্রভৃতির সংগে পরিচিত হ'তে চায়। যে-ভারতের হয়ে পণ্ডিত নেহরু পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন, সেই ভারত কেমন, সেখানকার গ্রাম, শহর, পাহাড় পর্বত, নদী, পথ, ক্ষেত, বন, বাড়ীঘর সব কেমন, সেখানকার লোকজন সমেত সমস্ত দেশটাকেই ঐসব দেশের লোকেরা জানতে বুঝতে চায়। এবং এ-পরিচিতি ভারতীয় চলচ্চিত্র যে-রকম প্রত্যক্ষভাবে দিতে পারবে, সে-রকমটি আর কোনো কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব নয়। তবুও পৃথিবীর সকল দেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা নেই কেন?

প্রথম কারণ, বেশীর ভাগ ভারতীয় ছবিরই বিষয়বস্তু স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সার্বজনীনতা তার মধ্যে অত্যন্ত অল্প। গল্পগুলির মধ্যে এমন সব চরিত্রসৃষ্টি করা হয়, যাদের কার্যকলাপ স্থানীয় দর্শক ছাড়া অন্য সকলের কাছেই দুর্বোধ্য। অথচ ইতালীয় ছবি 'বাইসিক্‌ল থিফ' বা জাপানী ছবি 'ইউকিওয়ারিশু' বা 'হ্যাপিনেস ফর্ আস অ্যালোন' প্রভৃতি ছবির গল্প বা চরিত্রগুলি—পৃথিবীর সব দেশের, সব কালের, সব শ্রেণীর লোকেরই সহজবোধগম্য। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় ছবিতে সংলাপ অত্যন্ত বেশী। ভাবাবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যেমন, হাল্কা হাস্যরস সৃষ্টির বেলাতেও তেমনি—সংলাপের সাহায্য ছাড়া ভারতীয় ছবি যেন চলতেই চায় না। তাই যাঁরা ভাষা জানেন না, তাঁদের কাছে ছবিগুলিকে গতিহীন বলেই মনে হয়; যেখানে কথার প্রস্রবণে ভারতীয় দর্শকের হৃদয় বিগলিত হয়ে ভেসে যায়, সেখানে ভাষানভিজ্ঞ অভারতীয় দর্শক কোনো রকমে মনোযোগী হবার কারণই খুঁজে পান না। তৃতীয় কারণ, ভারতীয় ছবিতে নাচগানের অত্যধিক ছড়াছড়ি। আমাদের ছবির পাত্রপাত্রীরা আনন্দেও গান গায়, দুঃখেও গান গায়; তাদের প্রেম করার উপকরণ গান, ব্যঙ্গ করার উপকরণও গান। এর ওপর আছে নাচ; একক, দ্বৈত এবং বহুজনের সম্মিলিত। কেন নাচ হচ্ছে, অনেক সময় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। এবং ভারতীয় গানের সুর বা নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী আমাদের কাছে যতই উপভোগ্য হোক না কেন, সকল বিদেশীর কাছে তাদের আবেদন কতখানি, সেটা যথেষ্ট অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। চতুর্থ কারণ, ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকারের নিস্পৃহতা এবং কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করা। আমাদের সরকারের একটি সংস্কৃতি বিভাগ আছে; কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রকে সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন কিনা, সে-বিষয়েই ঘোরতর সন্দেহ আছে। এবং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ চলচ্চিত্র মারফত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে কতখানি যত্নশীল, তার বাহ্য নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

"সাহেব বিবি গোলাম" চিত্রে মীনাকুমারী

ভারতীয় কাহিনী-চিত্রকে বিদেশে বিস্তৃতর বাজার ক'রে নিতে হলে শ্রীমতী মল্লিকের এবং ঐ সংগে আমাদেরও মতে এই ক'টি জিনিষের প্রয়োজন : (১) আমাদের প্রযোজকদের বিদেশের বাজারের দিকে তাকিয়ে ছবির দৈর্ঘ, বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; এ-ব্যাপারে জাপানের প্রচেষ্টা আদর্শস্থল। (২) এই সব ছবির প্রস্তুতির জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন, তার দিকে সরকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। (৩) ভারতে বৈদেশিক ছবি (হলিউডের তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র সমেত) দেখিয়ে যে প্রভূত লাভ হয়, তার বেশীর ভাগ অংশই ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে যাতে ব্যয়িত হয়, তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং বিদেশের যে-সব অঞ্চলের ছবি ভারতে দেখানো হয়, বিশেষ চুক্তিবলে সেই সব অঞ্চলে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমরা তখনই এই ধরনের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কথা কইতে পারব, যখন আমরা আমাদের ছবির মানকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলব। (৪) ভারতীয় ছবিকে বিদেশের বাজারের উপযোগী জনপ্রিয় করবার জন্যে জাতীয় সরকারের উচিত, ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন বৈদেশিক পত্রিকার প্রতিনিধিদের এবং কূটনীতিজ্ঞদের নিয়মিতভাবে ভারতীয় চিত্র দেখানো। এর ফলে বৈদেশিক চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে আমাদের প্রযোজকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূত পরিচালিত "বিপাশা" চিত্রে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

চিত্র সমালোচনা

বিপাশা : চিত্র-প্রযোজকের নিবেদন; ১২,০০০ হাজার ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিচালনা : অগ্রদূত; চিত্রনাট্য ও গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; সংগীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; চিত্র গ্রহণ : বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ; শব্দধারণ : যতীন দত্ত; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প নির্দেশনা : সতোন রায় চৌধুরী; নৃত্য পরিচালনা : অতীন্দ্রনারায়ণ গাংগুলী; রূপায়ণ : সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, লিলি চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, ছায়া দেবী, গ্লোরিয়া ডাউনিংটন প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২৬শে জানুয়ারী থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

আজকাল বাঙলা ভাষায় এমন অনেক দুঃসাহসের পরিচয়বহনকারী গল্প লেখা হচ্ছে, যা সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকাকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই সমস্ত গল্প অবলম্বন করে যদি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, তাহ'লে সেগুলি লেখকের প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষার আবরণমুক্ত হয়ে দর্শক মনে বিরূপতারই সৃষ্টি করে। তারাশংকর রচিত "বিপাশা" উপন্যাস একটি উচ্চাংগের রচনা হিসেবে পাঠকদের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু ছবির পর্দায় তার যে-রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সমভাবে প্রশংসা করা যায় কি? ছবির নায়ক দিব্যেন্দুর পিতা শরবিন্দুর চরিত্রকে কোনো রকম যুক্তি দ্বারাই গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সহ্য পর্যন্ত করতে পারা যায় না এবং যখন দেখা যায় যে, ঐ কামান্ধ লোকটাই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত 'স্বামিজী'-রূপে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে, তখন ঐ ন্যক্কারজনক চরিত্রটির সংগে সারা গল্পটির প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবার সময় মনে হয়, যেন মুখে একটি তিক্তস্বাদ লেগে রয়েছে। 'বিপাশা' গল্পকে ছবির জন্যে নির্বাচিত করে প্রযোজক এবং পরিচালক—কেউই সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি এবং যদিই বা বিপাশা ও দিব্যেন্দু—

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও বিদ্যা সিং

ঋত্বিক-এর পরিচালনায় চিত্রযুগ-এর চিত্রোপহার 'কাঁচের স্বর্গ'-র একটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায়

এই দুই চরিত্রে সুচিত্রা এবং উত্তম-কুমারকে দিয়ে অনবদ্য অভিনয় করাবার লোভে গল্পটিকে নির্বাচিত করেই থাকেন, তাহলে শরবিন্দু চরিত্রকে তার বিবাহব্যাপারে এমনভাবে পরিবর্তিত করা উচিত ছিল, যা ছবির দর্শকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু তা হয়নি।

বাঙালী-বাপ এবং পাঞ্জাবী মায়ের মেয়ে বিপাশা (বিয়াস্ যার ডাক নাম) বাঙালী যুবক দিব্যেন্দুকে যে-বিচিত্র পরিবেশে প্রথমে অপমান এবং পরে অপমানের অন্যায় শোধরাতে গিয়ে ক্রমেই ভালোবেসে ফেলেছিল, তার মধ্যে খুব বেশী নতুনত্ব না থাকলেও সাধারণ দর্শককে আনন্দ দেবার উপাদান যথেষ্টই ছিল। দিব্যেন্দুর কাছে বিপাশার নিজের অতীত জীবন বর্ণনা বহুলাংশে চিত্ররীতি বিরোধী। ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে উত্তরণের ঘটনাটি একান্ত অবিশ্বাস্য-রূপে উপস্থাপিত হলেও অভিনয়গুণে মনোহর। এর পর পাঞ্চেতে বিবাহরাত্র পর্যন্ত ঘটনাগুলি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হলেও সুন্দর উপস্থাপনা, অভিনয় এবং নয়নসুখকর দৃশ্যগ্রহণের গুণে বহুলাংশে উপভোগ্য। কনিষ্ঠ মাতুলের পত্রপ্রাপ্তির পর দিব্যেন্দুর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এলাহাবাদে সঠিক জন্ম-রহস্য জানবার জন্যে মাতৃ-অন্বেষণ, দিব্যেন্দুর সন্ধানে বিপাশার এলাহাবাদে আগমন, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় দিব্যেন্দুর আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর সাহায্যে প্রাণরক্ষা ও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাসপাতালে তার সঙ্গে বিপাশার কথোপকথন—এ পর্যন্ত দর্শক বেশ ভালো ভাবেই গ্রহণ করে এবং কেমন ক'রে ছবির পরিসমাপ্তি ঘটে, তার জন্যে একটি কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে। অবশ্য ছবির গোড়ার দিকে "উপনয়ন" নামে যে সুদীর্ঘ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান আছে, তা তার দৈর্ঘ্যের জন্যেই দর্শকের ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু পরে দিব্যেন্দুর জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের যে-তথ্য যেমনভাবে স্বামিজীরূপী ছবি বিশ্বাসের মুখ দিয়ে বলানো হয়, তা' চোখ এবং মন, উভয়কেই পীড়িত করে। এবং পুরীর বাড়ীতে দিব্যেন্দুর মা-রূপিনী ছায়া দেবী যখন দিব্যেন্দু ও বিপাশাকে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরেন, তখন সে-দৃশ্যকে অন্তর দিয়ে অনুমোদন করতে পারা যায় না।

আজও পর্যন্ত রোমান্টিক নায়ক-নায়িকারূপে যে সুচিত্রা সেন ও উত্তম-কুমার অদ্বিতীয়, তা এই "বিপাশা" চিত্রেও আর একবার প্রমাণিত হল। বিরাগ, অনুরাগ, আকুতি, প্রণয়, বিরহ, বিলাপ—সমস্তই অপরূপভাবে অভিব্যক্ত হয় সুচিত্রা সেন দ্বারা এবং উত্তমকুমার তাঁর গৃহীত চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয় দ্বারা। ছবি বিশ্বাস গৃহীত স্বামিজী সংযত অভিনয়ে উজ্জ্বল। পরিত্রাতা শিখের ভূমিকায় কমল মিত্রের রূপসজ্জা ও বাচন দর্শকচিত্তে মুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অপরাপর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল (ব্যারিস্টার গৃহ), জীবেন বসু (মিত্র), তুলসী চক্রবর্তী (পানওয়ালা), লিলি চক্রবর্তী (যশোদা), নীতিশ মুখোপাধ্যায় (ছোট মামা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, শিল্পনির্দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় কলাকৌশলের কাজ অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। সুর-যোজনায় বিশেষ অভিনবত্ব না থাকলেও সংগীত ও সুপ্রযুক্ত। আবহসঙ্গীত দৃশ্যানুযায়ী ভাবসৃষ্টির সহায়ক। "বিপাশা" চিত্র অভিনয়, কলাকৌশল এবং অপরাপর অঙ্গিকে সুসমৃদ্ধ।

ডাকাতের হাতে : লিট্‌ল্ সিনেমার নিবেদন; ১০,১৯২ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী **:** অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; চিত্রনাট্য ও সংলাপ **:** কমল-কুমার মজুমদার ও শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী; পরিচালনা **:** শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী; সংগীত-পরিচালনা **:** নির্মল চৌধুরী; চিত্রগ্রহণ **:** গোপাল সান্যাল; শব্দধারণ **:** জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা **:** নানা বসু; রূপায়ন **:** শেখর চট্টোপাধ্যায়, রীতা সেনগুপ্ত, পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণু গুপ্ত, অনুরাধা গুহ, নির্মল চৌধুরী, কালিপদ চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য, শৈলেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনায় গেল ২৬-এ জানুয়ারী থেকে রাধা, পূরবী, মেনকা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেংগল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি (শিশুচিত্রম) একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংশাসিত সমিতি। এর উদ্দেশ্য, বিশেষ ক'রে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও অনুদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ। এই সমিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধির সংগে বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকজন আস্থাবান প্রযোজকও আছেন ব'লে শুনেছি। এ'দেরই প্রযোজনায় প্রথম ছবি

হচ্ছে "ডাকাতের হাতে।"। বিজ্ঞাপিত হয়েছে যে, ছবিটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ঐ নামের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন বিজ্ঞাপনচিত্র-নির্মাতা লিটল্ সিনেমার কর্ণধার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, যিনি এই সেদিন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে দলিলচিত্র "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" নির্মাণ ক'রে আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হয়েছেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন কমলকুমার মজুমদার (ইনিই কি কিশোরকুমার প্রযোজিত 'লুকোচুরি'র পরিচালক?) ও শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। এ'রা দু'জনে অচিন্ত্যকুমারের মূল গল্পটিকে চলচ্চিত্রের উপযোগী—অনুপযোগীও বলতে পারা যায়—করবার জন্যে এমনভাবে খোল-নলচে বদলে খাড়া করেছেন বা শুইয়ে দিয়েছেন। একমাত্র মূলে ডাকাতের নাম গণেশ, ডাকাতের হাতে-পড়া ছেলেমেয়ে দু'টির নাম অনিল ও বুলু, বুলুর বাবার নাম অমরেশবাবু এবং বইয়ের নাম "ডাকাতের হাতে" রাখা ছাড়া ও'রা আর কিছুই মিল রাখেননি। নৌকোর ডাকাতকে তাঁরা ডাঙায় এনে তুলেছেন, ডাকাতদের বাসস্থানকে বনের মধ্যে দু'খানিমাত্র খড়ের ঘরের পরিবর্তে বিরাট ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ীতে পরিণত করেছেন, ডাকাতে কালী এবং তার পুজারীকে পর্যন্ত ডাকাতদের থেকে আলাদা এক-তান্ত্রিকের প্রতিষ্ঠিত মূর্তিরূপে দেখিয়েছেন। মাত্র বাকপটুতায় ছবির বুলু মূলে গল্পের বুলুকে অল্প অনুসরণ করেছে, যদিও মূল গল্পের বুলু তার সারল্য ও নির্ভয়তাময় কথাবার্তার দ্বারা যে-ভাবে সর্দার গণেশকে অভিভূত করেছিল, ছবির বুলু তার ধারে কাছেও যায়নি।

জিজ্ঞাসা জাগে, এতখানি স্বাধীনতা নেওয়ার আবশ্যকতাই বা কি ছিল এবং চিত্রনাট্যকারের এই স্বাধীনতাকে কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করলেন কি কারণে? ব্যয়-

শিশু-চিত্র 'ডাকাতের হাতে'এর একটি দৃশ্যে শেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান পল্লব ও কুমারী রিতা।

ভার লাঘব করবার জন্যে যদি এই কাজ করা হয়ে থাকে, তা'হলে অচিন্ত্যকুমারের বই গ্রহণ করা হ'ল কেন? এবং অচিন্ত্য-কুমারের রচনার যদি কিছুই না রাখা হবে, তা'হলে অনর্থক অচিন্ত্যকুমারের নাম বিজ্ঞাপিত হ'লই বা কেন? আমরা পশ্চিমবঙ্গ শিশুচিত্রমের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আশা করছি।

বিজ্ঞাপন-চিত্র বা দলিল-চিত্র নির্মাণ করার মধ্যে যথেষ্টই মুন্সীয়ানা আছে: কিন্তু সেই মুন্সীয়ানা যে একটি পূর্ণ-দীর্ঘ কাহিনীচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আদৌ সহায়তা করে না, তা দেখা গেল এই "ডাকাতের হাতে" চিত্রে, যার পরি-চালক হচ্ছেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। "ডাকাতের হাতে"র মধ্যে যে অ্যাড-ভেঞ্চার-চিত্রসুলভ রোমাঞ্চ ও নিশ্বাস-রোধী কৌতূহল জাগানো একান্ত প্রয়োজন, এই ছবিটিতে তার একান্তই অভাব। শিশুচিত্তও বিশ্বাস করতে পারবে না, এমনই আজগুবিভাবে এর গল্পের অবতারণা এবং প্রসার। কেন যে কি ঘটছে, তা দেবতার বুদ্ধিরও অগম্য। এমন একখানি নিরর্থক চিত্র আজকের দিনে নির্মাণ করা রীতিমত বাহাদুরীর পরিচায়ক।

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দ-ধারণ, অভিনয় প্রভৃতি সকল দিকেই এমন অসামান্য ব্যর্থতা সম্প্রতি আমরা ক্বচিৎ দেখেছি। এই সমূহ ব্যর্থতার মাঝেই বুলু ও অনিলের ভূমিকায় রীতা সেন-গুপ্ত ও পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় মরুভূমিতে ওয়েসিস্ সদৃশ।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীবিষ্ণুর "অগ্নিশিখা"

রাজেন তরফদারের পরিচালনায় শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন "অগ্নিশিখার" কাজ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই ভাবসমৃদ্ধ ছবিটির নায়ক-নায়িকা-রূপে দেখতে পাওয়া যাবে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদারকে। এবং এ'দের সংগে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অনুপ-কুমার, দ্বিজু ভাওয়াল, ছায়া দেবী, মঞ্জুলা, জয়শ্রী সেন এবং নবাগত শর্মিষ্ঠা। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

রূপভাস্বর-এর "তারপর"

রূপভাস্বর সংস্থা গেল ২৩শে জানুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতার "অনু

অঙ্গন" রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নতুন নাটক "তাম্রপত্র" মঞ্চস্থ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিনোদ পাল, জে-পি।

* * *

রূপকার-এর "কালের যাত্রা"

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা রূপকার আসছে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রতি সোম ও বুধবার সন্ধ্যা ৬॥টায় দক্ষিণ কলকাতার "মুক্ত-অঙ্গনে" নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের "কালের যাত্রা" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নির্দেশনা ও মঞ্চপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সবিতাব্রত দত্ত এবং খালেদ চৌধুরী।

* * *

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সৌজন্যে আমরা গেল ২৩শে জানুয়ারী জনতা সিনেমা গৃহে "গোল্ডেন ফিশ" নামে একখানি ফরাসী রঙীন ছোট ছবি দেখেছি। টেবিলের ওপর রাখা বোতলের ভেতর সোনালী মাছ, খাঁচার পাখী এবং কালো বিড়ালের চমকপ্রদ দৃশ্যগুলি অবিস্মরণীয়। কি অসামান্য কৌশলে, কত ধৈর্যের সঙ্গে ঐ দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে, তা চিন্তা ক'রেও হদিশ পাওয়া যায় না। এরই সঙ্গে দেখানো হয়েছিল ডেভিড নীল পরিচালিত বৃটিশ ছবি "হবসন্স চয়েস"।

* * *

চলচ্চিত্র শিল্পীদের ক্রিকেট খেলা :

আসছে রবিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্বজনপ্রিয় শিল্পী শ্রীছবি বিশ্বাসের একাদশ বনাম প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের একাদশের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এক মনোজ্ঞ চ্যারিটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলার সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সিনে টেকনিসিয়ান্স এ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাহায্য তহবিলে জমা হবে।

ছবি বিশ্বাস ও সত্যজিৎ রায় ছাড়াও এই খেলায় উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বসন্ত চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, তপন সিংহ, অজয় কর, অসিত সেন, বিভূতি লাহা, সুধীর মুখোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা অংশ গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কানন দেবী, সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, শর্মিলা ঠাকুর, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, রুমা গুহঠাকুরতা, নন্দিতা সিংহ, তপতী ঘোষ, মঞ্জুলা সরকার প্রমুখ সর্বজনপ্রিয়া মহিলা শিল্পীরা। বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এ জাতীয় বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি।

* * *

সাহিত্যিকদের অভিনয়

গত ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে যুগান্তর ছোটদের পাততাড়ির ব্যবস্থাপনায় সব-পেয়েছির আসরের ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাঙলা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক সুকবি সুকমল দাশগুপ্ত রচিত "কি বিচিত্র এই দেশ" সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী কেশব গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, মন্মথ রায়, কুমারেশ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হিমালয়নির্ঝর সিংহ, কিরণ মৈত্র, বিমল রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রণজিৎকুমার সেন, সুনীল দত্ত, রাণা বসু, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, সুকমল দাশগুপ্ত, ধীরেন বল, ক্ষিতীশ বসু, রমেন মল্লিক, অরূপ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, রেবতীভূষণ ঘোষ, হরেন ঘটক ও স্বপনবুড়ো ।। স্ত্রী-ভূমিকায় ছিলেন শর্বরী দেবী, বেলা দেবী ও উমা দে শীল ।। অভিনয় পরিচালনা করেন প্রথিতযশা নাট্যকার মন্মথ রায় এবং উপদেষ্টা রূপে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

* * *

বৈশাখীর নাট্যোৎসব :

গেল ১৫ই, ২২-এ এবং ২৪-এ জানুয়ারী মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বৈশাখী সম্প্রদায় তাঁদের নাট্যোৎসবের অনুষ্ঠান করলেন। ও'রা ১৫ই মঞ্চস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা'। ২২-এ পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' এবং ২৪-এ দুটি একাঙ্কিকা— কমল চট্টোপাধ্যায়ের 'শাশ্বতিক' এবং পরশুরাম বিরচিত বটেশ্বরের অবদান অবলম্বনে 'কে থাকে কে যায়'। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এ'দের উৎসবে উপস্থিত ছিলুম।

বহুদিন ধ'রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক (purposeful) নাটকের কথা শুনে আসছি। কিন্তু নাগরিক জীবনের মধ্যবিত্ত সমাজের রকবাজ ছেলেদের নিয়ে পৃথ্বীশ সরকার 'লবণাক্ত' নামে যে উদ্দেশ্যমূলক নাটকখানি রচনা করেছেন, এমন সার্থক নাটক আমরা আগে দেখেনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলে অরুণ (শান্তি দে অভিনীত) এই রকবাজ ছেলেদের প্রতীক। আমরা ওদের দূর-ছাই করি, কিন্তু ওদের ওই অবস্থার জন্যে আমরাই দায়ী, এই পরম সত্যটি নাট্যকার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কমল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয়ও হয়েছে মোটের ওপর হৃদয়গ্রাহী। "কে থাকে কে যায়"— নাটিকায় ঔপন্যাসিকের বিড়ম্বনা অপূর্ব ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বটেশ্বরের ভূমিকায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কৃতী চরিত্রাভিনেতা তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। এবং তাঁর উপযুক্ত চাকর কেষ্টা চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে চণ্ডিদাস চক্রবর্তীর অভিনয়-গুণে। "শাশ্বতিক" রচনা এবং অভিনয় উভয় দিক দিয়েই ব্যর্থ।

টুকিটাকি
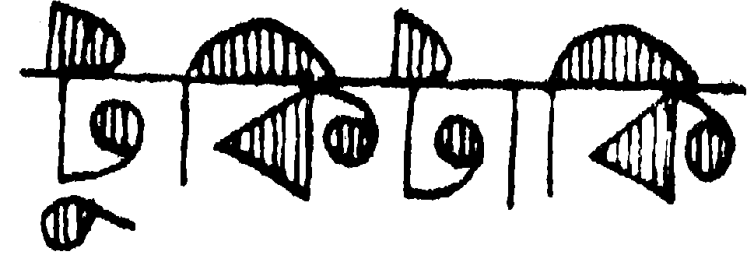
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলচ্চিত্রের বিষয়রূপে চিত্রনির্মাতাদের কাছে আজো পুরোনো হয়নি। তবে যুদ্ধকে ইদানীং পটভূমি হিশেবেই ব্যবহার করা হয় বেশী। বিশেষ জোর দেয়া হয় মানবিক আবেদনের ওপর। ঠিক এই জাতের একটি ছবি সম্প্রতি বৃটেনে তোলা হয়েছে। "দি বেণ্ট অফ এনিমিজ" ছবির কাহিনী যেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। ১৯৪১ সালে ইথিওপিয়ার মরুভূমিতে ছোট্ট একটি ইটালিয় প্রহরীদলের সঙ্গে শত্রুপক্ষীয় দুজন ইংরেজ সৈনিকের বিরোধ-মধুর কাহিনী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। মেজর রিচার্ডসন এবং ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট বার্কে বিমান দুর্ঘটনা হয়ে ইথিপিয়ার মরুভূমিতে গিয়ে পড়েন এবং ইটালীয় প্রহরী সৈন্যের ক্যাপ্টেন ব্রাসির হাতে বন্দী হন। রিচার্ডসন এবং ব্রাসি কেউই ঠিক পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধকে তাঁরা দুজন দুই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। রিচার্ডসন যুদ্ধকে খাঁটি মিলিটারী অফিসারের মতই গ্রহণ করতে চান এবং ব্রাসির মন বিদেশ বিভূঁয়ে থাকতে থাকতে যথেষ্ট কোমল এবং ঠিক সৈনিকের মতন না। কিন্তু ব্রাসিকে ফাঁপরে পড়তে হল যখন তাঁর কমাণ্ডারের মৃত্যুতে তাঁরই ওপর ছোট্ট সৈন্যবাহিনীর ভার পড়ল। এদিকে শত্রুপক্ষের আক্রমণের তীব্রতাও অসম্ভব বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধবন্দী রিচার্ডসন অসীম কৌতুকে ব্রাসির অসহায় অবস্থাকে উপভোগ করতে লাগলেন। অবশেষে ব্রাসি ঠিক করলেন যুদ্ধবন্দীদের তিনি পালাবার সুযোগ দেবেন, যাতে তারা তাদের শিবিরে ফিরে খবর দেয় যে, ব্রাসির সৈন্যবাহিনী এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার পেছনে গোলাগুলি খরচ করে লাভ নেই। বন্দীরা যথারীতি পালালেন এবং ঘটনাচক্রে কয়েকদিন পর ব্রাসির সৈন্যদলটিই বন্দী হল রিচার্ডসনের হাতে। এরপর স্থানীয় আদিবাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিজিত এবং বিজেতা উভয় দলই একত্রে যুদ্ধ করলো। এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান' চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

রাসি এবং রিচার্ডসন অকৃত্রিম বন্ধু হলেন।

ছবির শেষটি পরিচালক বন্ধুত্বের মধুর রসে সিঞ্চিত করেছেন। "দি বেল্ট অফ এনিমিজ" এর অভিনয়াংশ তারকা-শোভায় চিত্রিত। রিচার্ডসনের ভূমিকায় ডেভিড নিভেন, রাসির ভূমিকায় আলবার্টো সর্ডি অভিনয় করেছেন। গাই হ্যামিলটন হচ্ছেন পরিচালক। ছবিটি তোলা হয়েছে ইজরেইলে।

●

ওয়ারউইক ফিল্মসের পনেরো লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে নির্মীয়মান "ক্রময়েল" ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে পিটার ফিঞ্চ নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি নাগাদ স্পেনে বহির্দৃশ্য তোলার কাজ আরম্ভ হবে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কেন হিউজেস।

●

ডেবোরা কারের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হল "দি ইনোসেন্টস" চিত্রে গভরনেস-এর ভূমিকায় অভিনয়টি। চিত্রের কাহিনীকার হেনরি জেমস। পরিচালক হলেন জ্যাক ক্লেটন। ক্লেটনের সঙ্গে ডেবোরা কাজ করে বিশেষ আনন্দিত কারণ ডেবোরার প্রথম ছবি শ'র "মেজর বারবারা'র দ্বিতীয় পরিচালক ছিলেন ক্লেটন।

●

'ইনভেশন কোয়ার্টেট' বৃটেনের একটি অনন্য যুদ্ধের ছবি। গত বিশ্বযুদ্ধে ইংলন্ডের দক্ষিণ উপকূলে প্রায়ই জার্মান কামানের গোলায় বিপর্যস্ত হত। জার্মানরা অধিকৃত ফরাসী উপকূলে থেকে কামান দেগে দেগে ইংলন্ডের দক্ষিণ উপকূলস্থ একটি সামরিক হাসপাতালের তিনজন রুগীর বিকেলটিকে বিষময় করে তুলেছিল। কারণ ঠিক বিকেল হলেও হাসপাতালের চারপাশে গোলাগুলো এসে পড়ত। শেষে একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে তিনজন রুগী ঠিক করল তারা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে কামানগুলোকে স্তব্ধ করে দেবে। একটা নৌকা জোগাড় করে একরাত্রে তারা পাড়ি দিল ফ্রান্সের দিকে। অসম সাহসী এই তিনজন রুগী এবং তাদের জনৈক বোমাবিশারদ বন্ধু কিভাবে ফরাসী উপকূলে অভিযান চালিয়ে সফল হয়ে ফিরে এল তারই চিত্তাকর্ষক ছবি "ইনভেশন কোয়ার্টেট।" ভূমিকালিপিতে আছেন বিল ট্রেভার্স, গ্রিগর অ্যাসলান, জন লে মেসুরিয়ে, স্পাইক মিলিগ্যান, মরিস ডেনহাম প্রভৃতি।

●

"অন ফ্রাইডে এ্যাট্ ইলেভেন" একটি অপরাধ-চিত্র। চিত্রের কাহিনীকার জেমস হেডলে চেজ গোয়েন্দা গল্পের জন্যে ওদেশে বিখ্যাত। এই ছবিতে ষড়যন্ত্রকারীরা পাঁচজন। চারটি পুরুষ এবং অপরজন একটি তরুণী। দশ লক্ষ ডলারের একটি মিলিটারী ভ্যান লুঠ করবার প্রস্তাব অনায়াসে তারা বাস্তবে কার্যকরী করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যেকার দুর্বলতাই তাদের আইনের হাতে তুলে দেয়।

চিত্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বললে অন্যায় হয় না। ছবিটির চিত্র-নাট্যকারদ্বয় চেজ এবং ফ্রাংক হারভে হলেন ইংরেজ। ছবি তোলা হয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সে এবং মিউনিকের একটি স্টুডিওতে। শ্রেষ্ঠাংশের পাঁচজন অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে রড ষ্টিগার হলেন আমেরিকান, আয়াস হলেন স্কটল্যান্ডের লোক, পিটার ভ্যান আইক হচ্ছেন ডাচ, জাঁ সারভে ফরাসী এবং নাজা টিলার হলেন জার্মান। চিত্রের প্রযোজক আলেকজেন্ডার গ্রুটার জার্মান-দেশীয় এবং পরিচালক আলভিন রেকফ, নাম দেখেই চেনা যাচ্ছে রাশিয়ান।

●

টনি রিচার্ডসন বাস্তববাদী 'আধুনিক চিত্রের প্রযোজক হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন ইদানীং। তাঁর 'লুক ব্যাক্ ইন্ এ্যাঙ্গার' এবং 'এ টেস্ট অফ হানি' চিত্রজগতের দুটি বিশিষ্ট প্রযোজনা। এবার রিচার্ডসন তুলেছেন হেনরি ফিল্ডিং-এর চিরকালের উপন্যাস "টম জোনস"। ছবিটি তোলা হবে টেকনিকলারে।

●

ওয়াল্ট ডিসনের নবতম ছবি "আই ক্যাপচার দি ক্যাসেল" তোলা হবে ইংলন্ডে। বডি স্মিথের উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রটি তোলা হবে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে ১৫ বছরের একটি বালক, হেলে মিলস।

খেলাধুলা

দর্শক

খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় সম্মানলাভ

ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের যে সকল গুণীজন তাঁদের কর্মজীবনের সাধনা এবং সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই চারজন খেলোয়াড় 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন—প্রখ্যাত প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড় ও নরী কন্ট্রাক্টর এবং ভারতের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান। এই চারজনের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল বয়োজ্যেষ্ঠ এবং খেলাধুলো থেকে বহুকাল পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছেন।

গোষ্ঠ পাল

পলি উমরিগড়

নরি কন্ট্রাক্টর

রমানাথন কৃষ্ণন

এক মাইল দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড

নিউজিল্যান্ডের অলিম্পিক দৌড়-বীর পিটার স্নেল এক মাইল দূরত্ব পথ ৩ মিনিট ৫৪·৪ সেকেন্ডে অতিক্রম ক'রে নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব রেকর্ড : ৩ মিনিট ৫৪·৫ সেকেন্ড—হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া)।

ইংলণ্ড-পাকিস্তান—২য় টেস্ট

পাকিস্তান : ৩৯৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হানিফ মহম্মদ ১১১, জাভেদ বার্কি ১৪০, সয়িদ আমেদ ৬৯। লক ১৫৫ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৯৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২১৬ রান (হানিফ মহম্মদ ১০৪, আলিমুদ্দিন ৫০। লক ৬৯ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৩০ রানে ৫ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৪৩৯ রান (জিওফ পুলার ১৬৫, বারবার ৮৬ এবং ব্যারিংটন ৮৪ রান। ডি' সুজা ৯৪ রানে ৪, সুজাউদ্দিন ৭৩ রানে ৩ এবং নাশিমুলগনি ১১৯ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে। পুলার ৭ রান এবং রিচার্ডসন ২১ রান ক'রে নট আউট)

১ম দিন (১৯শে জানুয়ারী) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস—১৭৫ রান (২ উইকেটে) হানিফ মহম্মদ ৬৪ রান এবং জাভেদ বার্কি ৩০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (২০শে জানুয়ারী) : পাকিস্তান ৩৯৩ রানে (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ৫৭ রান ওঠে। পুলার ৩১ রান এবং বারবার ২৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (২১শে জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস—৩৩৩ রান (১ উইকেটে)। পুলার ১৬০ রান এবং

জিওফ পুলার

ব্যারিংটন ৬৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (২৩শে জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৯ রানে সমাপ্ত হয়। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ২৮ রান ওঠে। হানিফ ১৮ রান এবং আলিমুদ্দিন ৮ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন (২৪শে জানুয়ারী) : পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৬ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

ঢাকায় ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের এখন আর 'রাবার' হারানোর কোন ভয় রইলো না। বড়জোর টেস্ট সিরিজ ড্র যাবে যদি পাকিস্তান করাচীর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে। তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তানের হার হ'লে ইংল্যান্ড ২—০ খেলায় অথবা খেলাটি ড্র গেলে সেক্ষেত্রে ১—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করবে।

ঢাকার দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি সম্পূর্ণ নিষ্ফলা বলা যায়। খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা তো হয়নি এমন কি অমীমাংসিত খেলার মধ্যেও কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। প্রথম দিন থেকেই খেলার গতি অমীমাংসিত ফলাফলের পথে চলেছিল এবং কোন সময়েই মোড় ফেরায়নি। একমাত্র কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়া দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় উল্লেখ করার মত বিশেষ কিছু নেই। পাকিস্তানের পক্ষে হানিফ মহম্মদ টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১১ ও ১০৪) করার প্রথম গোরব লাভ করেছেন। আরও দু'জন সেঞ্চুরী করেছেন, পাকিস্থানের জাভেদ বার্কি (১৪০) এবং ইংল্যান্ডের জিওফ পুলার (১৬৫)। ইংল্যান্ডের টনি লক তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১৫০টি উইকেট পাওয়ার গোরব লাভ করেছেন এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় লকের বলে ইন্তিখাব আলাম ব্যারিংটনের হাতে ধরা পড়লে লকের ১৫০ উইকেট পূর্ণ হয়। তাঁকে নিয়ে ইংল্যান্ডের এই সাতজন খেলোয়াড় টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ১৫০ অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার গোরব লাভ করেছেন : বেডসার (৫১টা টেস্টে ২৩৬ উইকেট), স্ট্যাথাম (৫৯টা টেস্টে ২১৩ উইকেট), ট্রুম্যান (৪৫টা টেস্টে ১৯৪ উইকেট), লেকার (৪৬টা টেস্টে ১৯৩ উইকেট), এস এফ বার্নেস (২৭টা টেস্টে ১৮৯ উইকেট), টেট (৩৯টা টেস্টে ১৫৫ উইকেট) এবং লক (৪০টা টেস্টে ১৫৬ উইকেট)। এই সাতজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে স্ট্যাথাম ৪টে, ট্রুম্যান ৪টে এবং লক ৩টে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন।

হানিফ মহম্মদ

পাকিস্তানের বিপক্ষে এবারের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় লক খেলেননি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় যোগদানের আগে লক ৩৪টা টেস্ট খেলেছিলেন এবং উইকেট পেয়েছিলেন ১২৬। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫টা টেস্ট খেলে তিনি ২২টা উইকেট পান। তখন তাঁর মোট উইকেট দাঁড়ায় ১৪৮, ৩৯টা টেস্ট খেলে।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডেক্সটার টসে পরাজিত হন। এবারের ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরের টেস্ট সিরিজের টসে এই তাঁর ৬ষ্ঠ পরাজয়, ৭টা টেস্টে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলার টসে তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

প্রথম দিন ৫½ ঘণ্টার খেলায় পাকিস্তান ২টো উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৭৫ রান করে। লাঞ্চের আগের দু' ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৪৩ রান উঠেছিল। দলের ৫০ রান ওঠে ১৩২ মিনিটের খেলায়।

বব বারবার

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান ৩৯৩ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। হানিফ মহম্মদ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করেন। তাঁর ১১১ তুলতে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লেগেছিল।

হানিফ ৪৫৫ মিনিট খেলে তাঁর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করেন। জাভেদ বার্কি ১৪০ রান ক'রে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দু'টি টেস্ট খেলায় উপর্যুপরি দু'টি সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেন। হানিফ এবং বার্কি ৩য় উইকেটের জুটিতে ২৮৫ মিনিট খেলে দলের ১৫৬ রান তুলে দেন। হানিফের ৯৮ রানের মাথায় একবার আউট হওয়ার আবেদন ওঠে এবং একবার তিনি লকের বলে লকেরই হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে খুব জোর বে'চে যান। এই দিনের খেলায় কোন উইকেট না পড়ে ইংল্যান্ডের ৫৭ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের এক উইকেট পড়ে ৩৩৩ রান দাঁড়ায়। পুলার এবং বারবার প্রথম উইকেটের জুটিতে দলের ১৯৮ রান তুলেন। বারবার ৮৬ রান ক'রে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেটে এই ৮৬ রানই তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৯ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড মাত্র ৪৬ রানে অগ্রগামী হয়। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের বাকি উইকেট খুব অল্প রানের মধ্যে পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেট পড়ে দলের ৩৪৫ রানের মাথায়। তারপর বাকি ৮টা উইকেট পড়ে যায় ৯৪ রানে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে পুলার এবং ব্যারিংটন দলের ১৪৭ রান তুলে দেন ২০০ মিনিট খেলে। পুলার ১৬৫ রান

ক'রে ডিস্‌জার বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে আউট হন। আর ১২টা রান তুলতে পারলে তিনি দঃ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের যে সর্বোচ্চ ১৭৬ রান করেছিলেন তা অতিক্রম করতে পারতেন। পাকিস্তান দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা চা-পানের বিরতির ঠিক পূর্বে আরম্ভ করে; কিন্তু তারাও রান তুলতে খুব অসুবিধায় পড়ে। কোন উইকেট না পড়ে মাত্র ২৮ রান ওঠে।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৬ রানে শেষ হয়। ডেভিড এ্যালেন ৩০ রানে ৫টা এবং লক ৬৯ রানে ৪টে উইকেট পান। তাক্ লাগালেন ব্যাটসম্যান রিচার্ডসন, তিনিও উইকেট পেলেন ২৭ রানে ১টা। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ৩৫ মিনিটের খেলায় ৩৮ রান তুলে দেয়, হাতে সমস্ত উইকেট জমা রেখে। হানিফ মহম্মদ প্রথম ইনিংসে ১১১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৪ রান, মোট এই ২১৫ করতে ৮৯৩ মিনিট সময় ব্যয় করেন। অর্থাৎ মোট খেলার সময়ের অর্ধেকের বেশী সময় তিনি খেলেছিলেন।

একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

আজ পর্যন্ত (২৯।১।৬২) নিম্নলিখিত ১৮ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন। এ'দের মধ্যে ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ১৯৫৪-৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে দুটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মাত্র তিনজন খেলোয়াড়—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ক্লাইড ওয়ালকট এবং জর্জ হেডলি এবং ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সার্টক্লিফ টেস্টের একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন দু'বার। ভারতবর্ষের পক্ষে মাত্র বিজয় হাজারে একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন এবং মাত্র ৪ রানের জন্যে চান্দু বোরদে এই কৃতিত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের পঞ্চম টেস্ট খেলায় বোরদে প্রথম ইনিংসে ১০৯ রান করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রান ক'রে গিলক্রিস্টের বলে হিট-উইকেট আউট হন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে

১১৪ ও ১ ১২ জর্জ হেডলি, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, জর্জ টাউন, ১৯৩০

১০৬ ও ১০৭ জর্জ হেডলি, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লর্ডস, ১৯৩৯

১২৬ ও ১১০ ক্লাইড ওয়ালকট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, পোর্ট অব্ স্পেন, ১৯৫৪-৫৫

১৫৫ ও ১১০ ক্লাইড ওয়ালকট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কিংস্টোন, ১৯৫৪-৫৫

১৬২ ও ১০১ এভার্টন উইকস, বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ক'লকাতা, ১৯৪৮-৪৯

১২৫ ও ১০৯* গারফিল্ড সোবার্স, বিপক্ষে পাকিস্তান, জর্জটাউন, ১৯৫৭-৫৮

১১৭ ও ১১৫ রোহন কানহাই, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৬০-৬১

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১৪৭ ও ১০৩* ডেনিস কম্পটন, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৪৬-৪৭

১১৯* ও ১৭৭ ওয়াল্টার হ্যামন্ড, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯২৮-২৯

১৭৬ ও ১২৭ হার্বার্ট সার্টক্লিফ, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫

১১৭ ও ১০০ এডওয়ার্ড পেন্টার, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৩৮-৩৯

১৪০ ও ১১১ এ সি রাসেল, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯২২-২৩

১০৪ ও ১০৯* হার্বার্ট সার্টক্লিফ, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওভাল, ১৯২৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১৩৬ ও ১৩০ ডরান্ বার্ডসলে বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ওভাল, ১৯০৯

১২২ ও ১২৪* আর্থার মরিস, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, এডলেড, ১৯৪৬-৪৭

১১৮ ও ১০১* জে আর মোরোনি, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৪৯-৫০

১৩২ ও ১২৭* ডন ব্র্যাডম্যান, বিপক্ষে ভারতবর্ষ, মেলবোর্ণ, ১৯৪৭-৪৮

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে

১৮৯ ও ১০৪* এ মেলভিল, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, নটিংহ্যাম, ১৯৪৭

১২০ ও ১৮৯* বি মিচেল, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ওভাল, ১৯৪৭

ভারতবর্ষের পক্ষে

১৪৫ ও ১১৬ বিজয় হাজারে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৪৭-৪৮

পাকিস্তানের পক্ষে

১১১ ও ১০৪ হানিফ মহম্মদ, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ঢাকা, ১৯৬১-৬২

* নট আউট

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

১৯৬১ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ৩—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করেছে। রেলওয়ে দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়। মহারাষ্ট্রের পূর্ব নাম বোম্বাই। বোম্বাই ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সার্ভিসেস দলকে ২—১ গোলে পরাজিত ক'রে প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করেছিল। তাছাড়া বোম্বাই প্রতিযোগিতায় রাণার্স-আপ হয়েছে ৬ বার।

ফাইনালে মহারাষ্ট্র শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রথমার্ধের খেলার প্রথম দিকে দুই দলই গোল দেওয়ার কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে। খেলার ২৭ মিনিটে রেল দলের নারায়ণ প্রথম গোল করেন। প্রথমার্ধের খেলায় আর কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের ২৮ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি দেন আপ্পালারাজু। সমাপ্তির দু' মিনিট আগে প্রদীপ ব্যানার্জির বদলী খেলোয়াড় দীপু দাস দলের তৃতীয় গোলটি দেন। রেলওয়ে দলের অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জি প্রথমার্ধের খেলার ২১ মিনিটে পায়ের পেশী সংকোচনের জন্যে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হ'ন।

মহারাষ্ট্র দল অনেকটা সৌভাগ্যক্রমেই সেমি-ফাইনালে গত বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। সার্ভিসেস এবং মহারাষ্ট্র দলের সেমি-ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা এক দিনে হয়নি, তিন দিন খেলার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলাটি ৩—৩ গোলে অমীমাংসিত থাকে। প্রথম ১০ মিনিটের খেলায় সার্ভিসেস দল ২—০ গোলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র দল বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে দু'টি গোলই শোধ দেয় এবং বিশ্রামের সময় ৩—২ গোলে অগ্রগামী হয়। ইনাস সার্ভিসেস দলের পক্ষে তৃতীয় গোল দিলে উভয় দলের গোল সংখ্যা সমান (৩—৩) দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধের খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ মিনিটে সার্ভিসেস দলের শিরি-বাহাদুর প্রথম গোল করেন; কিন্তু খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে সার্ভিসেস দলের ষ্টপার রামকৃষ্ণণ একটা অতি সহজ বল বাধা দিতে গিয়ে নিজ দলের গোলের মধ্যে বল ঢুকিয়ে দেন। এই আত্মঘাতী গোলের দরুণ এই দিনের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়।

তৃতীয় দিনের খেলায় মহারাষ্ট্র ৩—১ গোলে জয়ী হয়। মহারাষ্ট্র দলের তৃতীয় গোলটি সার্ভিসেস দলেরই রাইট ব্যাক ত্রিলোক সিংয়ের বুটে লেগে সার্ভিসেস দলের গোলে প্রবেশ করে। সার্ভিসেস দলের দুর্ভাগ্য, দু' দিনের খেলায় তারা দুটি আত্মঘাতী গোল খায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th February, 1962.
40 Naya Paise.

সোহরাবর্দি গত সপ্তাহে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর, পূর্ব পাকিস্তানে আরও কতকগুলি ঘটনা নাটকীয় গতিতে এবং দুঃসাহসিক আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা একদা বাংলাভাষার জন্য যে রক্তদান করেছিলেন, সেই স্মৃতির আগুন অকস্মাৎ আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এবং প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এমন সময়ে যখন পাকিস্তানের ডিক্টেটর স্বয়ং আয়ুব খাঁ সপারিষদ ঢাকায় উপস্থিত।

ফৌজী ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের পরিণতি যাই হোক, যদি আপাতদৃষ্টিতে তা ক্ষণস্থায়ীও হয়, তথাপি ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এই কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। ঢাকায় এই ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের মাতৃভাষার শহীদদের রণক্ষেত্রের পাশেই। এই সভায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন একটি নির্ভীক ও প্রকাশ্য প্রতিবাদ ছিল যে, সামরিক কর্তারা এর সম্মুখীন হতে সাহস করেননি। সংবাদপত্রে এই সভার বিবরণী প্রকাশ, কিংবা সোহরাবর্দির গ্রেপ্তার সম্পর্কিত যে কোনো মন্তব্য প্রকাশই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানের বাইরে মুদ্রিত যে একটি মাত্র পত্রিকার এখনও পাকিস্তানে প্রবেশাধিকার আছে, সেই ষ্টেটসম্যান স্বভাবতই যথেষ্ট সন্তর্পণে সংবাদটিকে তাঁদের পাতায় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে ষ্টেটসম্যানের পর পর ৩ দিনের মধ্যে ২ দিনের সার্কুলেশান ঢাকায় বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঢাকার সংবাদপত্রগুলিও বলাই বাহুল্য আয়ুবশাহীর দ্বারা নিরুদ্ধ-কণ্ঠ। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভানুষ্ঠানের পরের দিন প্রেস ক্লাব ভবনের সম্মুখে সংবাদপত্রের বহ্নি উৎসবের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতার চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এই ঘটনাগুলি কোনো গণতন্ত্রের দেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফৌজী শাসনের সীমাহীন অত্যাচার-ক্ষমতা যেখানে বলবৎ, যে দেশে ইমারজেন্সি আইন অনুযায়ী যে-কোনো লোকের নির্বিচারে শাস্তি ও কারাদণ্ড যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে এবং যে দেশ বর্তমানে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরবৃত্তির দ্বারা অক্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ, সেই দেশে এই নিরস্ত্র, প্রকাশ্য প্রতিবাদ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নুরুল আমিনের গভর্ণমেণ্টের আমলে ঢাকার ছাত্রেরা যে গুলীবর্ষণ ও রক্তপাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার চেয়েও এই সাহস আরও দুর্জয় সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, এর পরের দিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভায় তিরস্কৃত হয়ে দেহরক্ষীদের পাহারায় সভাস্থল ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন!

কিন্তু এই প্রতিবাদ কি শুধু সোহরাবর্দির প্রতি যুবসম্প্রদায়ের প্রীতি ও আনুগত্যই প্রতিফলিত করছে? আসলে তা নয়। কোনো বৃহৎ আদর্শ এবং প্রচণ্ড কোনো জাতীয় আবেগের তাড়না ছাড়া এই সাহস ও সংকল্প কখনো কোনো তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সোহরাবর্দির ন্যায় একটি রাজনৈতিক চরিত্রের জন্য পূর্ব বাঙ্গালার ছেলেরা ফাঁসীর বাঁধন গলায় ঝোলাতে চাইছে, একথা অবিশ্বাস্য। যে সংকল্প মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং যে প্রতিজ্ঞা নিরস্ত্র মানুষকে মিলিটারী শাসনের উদ্যত বেয়নেটের সম্মুখে নির্ভীক মন্ত্রে দাঁড় করিয়ে দেয়, তার পিছনে আছে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার তীব্র অগ্নিদাহন। আয়ুব গভর্ণমেণ্ট যে গণতান্ত্রিক শক্তিকে পিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, সেই শক্তি আজ তাকে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, এর মধ্যে দীর্ঘ সিভিলিয়ান শাসনের বদভ্যাসজনিত দুর্নীতি ও অক্ষমতা মিলিটারী শাসক-বর্গের ভিতরেও দেখা দিয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক মোহ ও ভীতি কতকাংশে দূরীভূত হয়েছে। কাজেই পূর্ব বাংলার ছেলেরা আজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অবকাশ খুঁজে নিয়েছে। এই বিরুদ্ধতার মূল কথা হচ্ছে, তারা পাকিস্তানের কৃত্রিম জাতীয়তাকে অস্বীকার করতে চায় এবং তারা চায় অস্বীকার করতে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতাকে, যে ঔপনিবেশিকতা ইসলামিক জাতীয়তার ছদ্মবেশে মিলিটারী রুদ্রমূর্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে আবির্ভূত।

কবিতা
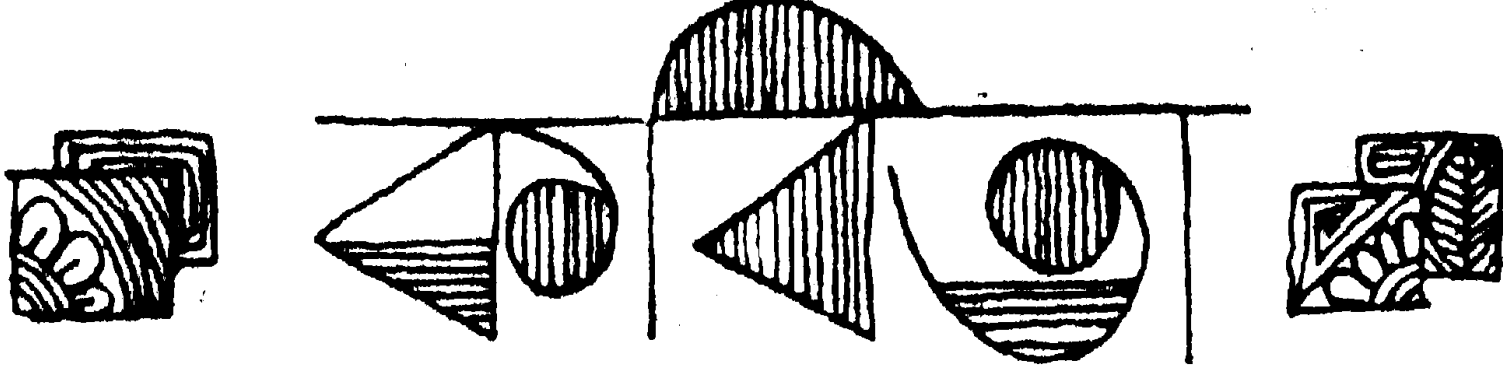
হয়তো

দিলীপ রায়

এই ব্যাকুল বাদল হাওয়ায় হাওয়ায়
ডাকছে আমাকে কে? তার
অদৃশ্য অস্ফুট কথার শব্দ
আমি শুনতে পাচ্ছি যেন এই
শহরের ট্রামের শব্দ, এঞ্জিনের শব্দ
অমনিবাসের শব্দ সব অতিক্রম ক'রে তার
কান্নার আওয়াজ এলো ভেসে।

হায়, এই অদ্ভুত বাদলের দুপুরে
এখন, এখন আমি কী করি!

অন্ধকার অবতীর্ণ এর পরে;
চকিত বিকালের হাতছানি অনুসরণ ক'রে
দীর্ঘ থমথমে রাত্রি, বিদীর্ণ ক'রে দেবে
মাঝে মাঝে তীক্ষ্ম দন্তে যন্ত্র।

তখন, রাত্রিবাস প'রে
সে এসে হয়তো দাঁড়াবে নিঃশব্দে জানালার ধারে
যে বাতাস স্পর্শ ক'রবে তার দেহকে
ঈষৎ চুম্বন ক'রে, তা এসে লাগবে হয়তো
আমার চুলে, কপালে; ঢেউ যেমন
মৃদু ধীর ধাক্কায় আছড়ে পড়ে তটপ্রান্তে॥

মধ্যখানে তুমি আমি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

অণুপরমাণু জানে নিরবধি কালের স্বরূপ।
আলোকের মুক্ত প্রাণ পান করে পৃথিবীর রূপ।
তোমার সম্পদ স্রোতে বহমান নগর-সভ্যতা,
মধ্যখানে তুমি আমি কথা আর কথানীরবতা।

সূর্যের প্রথম স্পর্শে ওই দেহ রোদ্দুরের কণা।
অযুত বালুকাদৃপ্ত মধ্যাহ্নই প্রকৃষ্ট সৌরভ;
জলরাশি স্বভাবের, মনে ফোঁসে চৈতন্যের ফণা!
মধ্যখানে তুমি আমি নিষ্পলক কথাই নীরব।

বর্ণে নয় অর্থে নয় অন্ধঘোরে আশ্চর্য জীবন:
অহর্নিশি রৌদ্রডোরে, পরিণতি উত্তাপে স্পন্দন।
এ মুখ ফেরালে দেখি উদ্বেলিত সায়াহ্ন-সাগর!
মধ্যখানে তুমি আমি চরাচর শূন্যতার ঘর।

তোমার সম্পদ স্রোতে সময়ের বঞ্চনার রূপ।
অণুপরমাণু জানে তুমি আমি কালের স্বরূপ।

পৌত্তলিক

শিবশম্ভু পাল

ভেঙে গেল বর্মখানি। ক্ষরিত রক্তের শতধারা
বক্ষ বেয়ে ক্রমে ক্রমে সিক্ত করে মর্মতল। ভাঙে
চোয়ালে চোখের কোণে অধরের প্রান্তে যত প্রচ্ছন্ন ছুরির
শাণিত দ্যুতির কণা। বদলে পেলব নম্র কুসুমানন্দিত
কোমলতা অধিকার করে নিল সারা অঙ্গ, আর
অগম আত্মার দুর্গ।
তুমি সেই কোমলতা, তুমি
বাধ্য কর পরাজয়; কাছে আসি বিনত পাহাড়।
তুমি স্থির। দম্ভ তব জয়যুক্ত এই যুদ্ধে, জানি!

তুমি সেই কোমলতা, কিম্বা প্রেম, রমণী অথবা;
যদিচ প্রতাপ কিছু অল্প নয়, বিশাল বাহিনী
পরাভূত কর শুধু চোখের তিমির মণি জেবলে
শুধুমাত্র বিদ্যুতের চকিত বঙ্কিমা অধরের
প্রজ্ঞারে বিনষ্ট করে। অন্যথায় মূর্তিপূজা কেন
অধুনা আমার ব্রত! রূপান্তর, দেখ, রূপান্তর।

দূর্বাদল্য

জৈমিনি

ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কথাই আবার বলছি।

আজ রবিবার। এখন পর্যন্তও মারাত্মক কিছু ঘটেছে বলে জানিনে। সূর্য যথারীতি পূর্বাকাশে উদিত হ'য়েছেন, সকালে ঘুম ভেঙে নিত্যকার মতো আজও জমাদারের কর্মদক্ষতার বিষয়ে গৃহপরিচারকের উচ্চকণ্ঠ সমালোচনা শুনতে পেয়েছি, এবং নিয়ম-মতো বাজারের থলি-হাতে প্রোটিন কার্বো-হাইড্রেট ইত্যাদি শরীর-পোষণের উপাদান সংগ্রহের জন্যে আমাকে ধাবিত হ'তে হ'য়েছে। অন্যদিনের সঙ্গে আজকের কোনো পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। জীবন সেই একই চালে চলতে শুরু করল আজও। এত বড় একটা সুযোগ মাঠে মারা গেল।

সত্যিই বলছি, আমি হতাশ হ'য়েছি। একেবারে মহাপ্রলয় না হোক, ছোটখাট একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটলে কারই বা এমন কি অসুবিধে ঘটত?

সব থেকে বড় দুর্ঘটনা হল প্রাণ-হানি। তা কি এমনিতেই আর ঘটছে না? অ্যাক্সিডেণ্ট তো জীবনে লেগেই আছে। তা-ছাড়া চাল-ডাল-ওষুধের সমস্যায় পড়ে কতো লোকের প্রাণ রাখতেই যে প্রাণান্ত হ'চ্ছে তাও তো চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি। এমতাবস্থায় বিপদগুলো একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে যদি একসঙ্গে তুলে ধরা হতো, তাতে কার কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো জানিনে। এই অত্যন্ত অগোছালোভাবে ম্লান হ'য়ে নিভে যাওয়ার চেয়ে বেশ একটা লাগডাঁট হুহুঙ্কারের সঙ্গে যদি দুর্ঘটনা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, মৃত্যুর মধ্যেও তাহলে হয়ত মহত্ত্ব থাকত। কিন্তু কিচ্ছুই ঘটল না সে রকম। আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া এবং, বাকীটা বলতে হাই উঠছে!

আয়োজনের মধ্যে কিন্তু কোনো ফাঁক ছিল না।

মধ্য-ইউরোপে তুষার-ঝড়, আমেরিকায় হিমাঙ্কের ১২ ডিগ্রী নিচে উত্তাপ নেমে যাওয়া, আলজিরিয়া এবং মিশরে প্রভঞ্জনের তাণ্ডব, এইভাবে আসরটা জমে উঠছিল বেশ। কিন্তু ঢোলক-ক্ল্যারিওনেট সবই বাজল, দ্রৌপদীও আর্তকণ্ঠে 'প্রাণনাথ' বলে ডাক ছাড়ল, অথচ ঠিক যে-মুহূর্তে গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ

করার কথা, তখনি সব চুপচাপ। এ 'টেম্পো' কি আর বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায়? সবই যে বরবাদ হ'য়ে গেল!

অথচ আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। ভেবেছিলাম, পার্কে পার্কে যেমন স্তোত্র-পাঠ আর যজ্ঞ চলছে তা চলতেই থাকবে। আপিস-আদালতে লোক কম পড়তে পড়তে একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যাবে। ট্রেনের কামরাগুলো ফাঁকা হ'তে হ'তে ট্রেন চলাই শেষে বন্ধ হ'য়ে যাবে। বাজারে মাল আসবে না, কয়লার দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে, কল থেকে জল পড়বে না, ঘরে আলো জ্বলবে না, এবং তখন অন্য কিছু ঘটুক আর না ঘটুক আপনা থেকেই শুরু হবে যদুবংশ ধ্বংসের মতো এক আত্মঘাতী মহাসংঘর্ষ।

অথবা, আমি ভেবেছিলাম, এ সব কিছু না ঘটলেও কলকাতার সমস্ত লোক হাজির হবে গড়ের মাঠে। চালা তুলবে, তাঁবু খাটাবে—দিব্যি একটা হরিহরছত্রের মেলা ব'সে যাবে। আমরা সব স্বেচ্ছা-সেবক হ'য়ে সেখানে টহল দেব। আরো অনেকে যাবে, যারা ঠিক স্বেচ্ছাসেবক নয়, স্বয়ং সেবক। তারা সেবা করতে চাইবে নিজেদের। আমরা তাদের হাতে-নাতে ধ'রে গৃহস্থ ও গৃহকন্যাদের বাহবা অর্জন করব। তারপর এখানে-সেখানে লিখে দেব 'সাবধান! জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

এদিকে লোক-সমাগমের ফলে রীতি-মত দোকানপাট বসবে চারপাশে।

সকলেরই মনে মৃত্যুভয়, কে বাঁচে কে মরে স্থিরতা নেই। দোকানের গায়ে লেখা থাকবে 'হরি হে তুমিই ভরসা।' এবং ঠিক তার নিচেই 'আজ নগদ, কাল ধার।'

নামাবলী-ধারী জ্যোতিষী এবং বেটনধারী পুলিশের কাজ বেড়ে যাবে। কিন্তু সময় পেলেই সকলে জিজ্ঞাসা করবে, কটা বাজে?

তারপর আসবে সেই চরম ক্ষণ। হঠাৎ কী হবে বুঝতে পারব না—অষ্টগ্রহের টান, প্রচণ্ড শব্দ এবং বিস্ফোরণে সম্বিৎ হারিয়ে শতধা-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর একটা বড় অংশের সংগে আমি ছিটকে পড়ব মঙ্গল গ্রহে; আমার পরিচিত মানুষের কেউবা যাবে চাঁদে, কেউ বুধে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি আকাশবাণীর ঘোষণাকারীর মতো মোলায়েম কণ্ঠে দিগ্বিদিকে বেতার-ভাষণ পাঠাব—'হ্যালো, জৌমিনি কলিং। দিস ইজ মার্স। হ্যালো—!' কী ভয়ানক সেই উত্তেজনা, কি থ্রিল!

কিন্তু কিছু হল না।

দেখে শুনে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। জীবনস্মৃতির এক জায়গায় তিনি তাঁর প্রথম ট্রেন-চড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

'সত্য (কবির সমবয়সী ভাগিনেয়।—লেখক) বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট, পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু, গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়ত গাড়ি-ওঠার আসল অংশটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাষ না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।'......

আমারও ঠিক সেই অবস্থা। তবে আগেই বলেছি, আজ মাত্র রবিবার। সোমবার এখনো আসেনি। কাজেই কবির মতো আমারও মনে হচ্ছে 'এখনো হয়ত ...আসল অংশটাই বাকি আছে!'

বলা যায় না, তেমন সময় হয়তো সত্যিই এসে যাবে, যখন জৌমিনি ধরাধাম ত্যাগ ক'রে চলে যাবে মঙ্গল গ্রহে, এবং কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুকরণে বলবে—

আছি এখন মার্সে
এখানে কই
রেফ্রিজেরেটারের দই!......
আহা, তেমন দিন কি আর আসবে!

পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উদ্ভিদ জগতে ফণিমনসার মত ক্যাক্টাস জাতীয় গাছ যেমন আছে তেমনি আছে অশ্বত্থ বট শাল শিমুল। এক জাতের গাছ নিজেকে নিজের মধ্যে মুড়ি দিয়ে সংগোপন করে রাখে, বাইরে নিজেকে যতটুকু কম প্রকাশ করে রাখা যায় তারই চেষ্টায়। আর অন্য জাতের গাছ ডাল-পালার বিস্তারে ফুল আর পাতার অজস্রতায় নিজেকে শুধু মেলে ধরবার জন্যেই উন্মুখ, সেই আনন্দে বিভোর। আকাশ বাতাস রোদ বৃষ্টিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাড়া দেয় প্রতি পলে পলে। জমিয়ে রাখার কোন গরজ তার নেই। প্রতিক্ষণের পাওনা প্রতিক্ষণেই সে অসংকোচে ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে যায় ডাল-পালা দুলিয়ে পাতা গজিয়ে কাঁপিয়ে ঝরিয়ে।

গাছপালার জগতে যেমন মানুষের মধ্যেও তেমনি এই দুই জাতই আছে, এমন কি সাহিত্যের রাজ্যেও।

প্রকাশ করাই সাহিত্য। তবু এমন সাহিত্যিকও অনেক আছেন ক্যাক্টাসের মত যাঁরা প্রকাশ-কৃপণ। তাঁরা অনেক সঞ্চয়ের পর কদাচিৎ কিছু দুর্লভ ফুল ফোটান হয়ত, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সব-কিছুতেই সাড়া দেবার শক্তি বা উৎসাহ তাঁদের নেই।

সাহিত্যের রাজ্যে সৃষ্টি ও জীবনের সর্বকিছুতে অনায়াস সাড়া দেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথে। মানুষের চেতনায় যা প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে মূল্যবান এমন কিছু নেই বললেই হয়, যা তাঁর লেখনীমুখে রূপান্তরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়নি।

সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রকেই উর্বর করে তুলে তিনি বিস্ময়কর নতুন ফসল ফলিয়েছেন তবু তাতেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়ে না বলে মনে হয়। পরমাশ্চর্য এক বাদ্যযন্ত্রের মত এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পর্শসচেতন তাঁর মন যে ছুঁতে না ছুঁতেই বেজে ওঠে। তাঁর সেই মনের রণন আমরা কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ছবি ইত্যাদি সব কিছুতেই পেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে তা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর পত্রাবলিতে পেয়েছি যদি বলি খুব অত্যুক্তি হয় কি?

চিঠি ত আমরা সবাই লিখি, সাহিত্যিকেরা ত বটেই। নানা দেশের নানা যুগের প্রতিভাধরদের চিঠি সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগই সৃষ্টি করেছে। অনেক সাহিত্যিকের রচনার চাবিকাঠি তাঁর চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়, চিঠির ইঙ্গিতে ও আলোয় কোন কোন লেখককে আমরা নতুন করে চিনি।

শুধু সাহিত্য কি সাহিত্যিককে বোঝানো চেনানো কিংবা সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও চিঠিপত্রের আর একটি বিশেষ মূল্য ও আকর্ষণ আছে। সে মূল্য ও আকর্ষণ একদিক দিয়ে সার্থক সাহিত্যের চেয়ে বেশী বই কম নয়।

চিঠিপত্র যেখানে স্বতঃউৎসারিত সেখানে তার মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে যা মার্কামারা সাহিত্যের পক্ষে শুধু দুরায়ত্ত নয় কিছুটা প্রকৃতি বিরুদ্ধও বটে। সাহিত্য যত সহজই হোক তাঁর একটু পোষাকী ভাব যাবার নয়। তাকে সচেতনভাবে সভায় গিয়ে বসতে না হোক পাঁচজনের সামনে বার হতে হয়। চুলের পাট কি পোষাকের ভাঁজটা তাই সে অবজ্ঞা করবার কোথাও চেষ্টা করলেও ভুলে থাকতে পারে না একেবারে। অযতনের ভঙ্গিটার মধ্যেও সযত্ন প্রয়াস তাই নিজেরও অগোচরে লুকিয়ে থাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত চিঠিপত্রের জাত ও চেহারাই কিন্তু একেবারে আলাদা। বাইরে যিনি বিশিষ্ট, এ যেন তাঁকে ঘরের মানুষ হিসেবে অসতর্ক অন্যমনস্কতার সুযোগে পাওয়া।

অসামান্যদের সব চিঠিপত্র অবশ্য এমন নয়। বাঁধা ধরা প্রসঙ্গ-সীমার শাসন একটু আধটু শিথিল করে নিয়েও অনেকের অনেক চিঠি ধারালো ও ভারালো পোষাকী সাহিত্যেরই মহলা। যেমন গ্যেটের চিঠির কথা বলা যায়। গ্যেটে জীবনে প্রায় দশ হাজার নাকি চিঠি লিখেছেন, তাঁর শিলার শ্লেগেল ও তখনকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তানায়কদের কাছে লেখা বিখ্যাত চিঠিগুলি, বিষয় বৈচিত্র্যে অপূর্ব ও বাক্‌বৈদগ্ধে উপাদেয় হলেও বিশুদ্ধ চিঠির চেয়ে ভাষণেরই নিকটাত্মীয়।

রবীন্দ্রনাথ এ ধরণের চিঠিপত্র লেখেন নি এমন নয়। শাঁসালো ধারালো গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা অনেকের সঙ্গে অনেক চিঠিতে তিনি করেছেন। কখনো উপদেষ্টা কখনো ব্যাখ্যাতার আসনে বসে ভাষণ জাতীয় চিঠিও তাঁকে লিখতে হয়েছে কিন্তু তাঁর যে চিঠির জন্যে আজ ও সুদূর কালের পাঠকসমাজ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, তার উৎস প্রেরণা ও প্রকৃতি সবই ভিন্ন। সে চিঠি আকাশ-বাতাসের আমন্ত্রণে ও স্পর্শে অরণ্যের পাতা ধরা ও ঝরার মত অনায়াস স্বতঃ-স্ফূর্ত। এসব চিঠি যাদের লেখা হয়েছে তারা উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তরের অদম্য আনন্দোচ্ছলতায় এসব চিঠি লেখা হয়েছে কোনখানে কোন লাভের আশা না রেখে বাইরের কোন তাগিদ ছাড়া-ই।

এসব চিঠির গূঢ় রহস্যের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে।

তিনি বলছেন......সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে—তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাব নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে। কাউকে ত বলা চাই। অনেকে বলে, এ তো সারবান নয়। এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।... আমি একটা গর্ব করে থাকি, ঐ চিঠি লিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন তখন আমি শুনে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার সেই বিশ্ব-বকুনি শুধু শোনেন নি, তাই আবার আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি শুনেছেন দেখেছেন আর দেখিয়েছেন শুনিয়েছেন তাঁর সেই অপরূপ মুকুর-স্বচ্ছ ভাষায়

কোনো ক্যামেরা কি রেকর্ডার যার নাগাল পায় না।

তিনি যা দেখেছেন শুনেছেন তাও সাধারণ শ্রাব্য দ্রষ্টব্যের কোঠায়'ত পড়ে না। সে দেখা শোনা তথাকথিত বিজ্ঞ বিশ্বান বিচক্ষণের দেখাশোনা নয়। এ যেন এক আশ্চর্য চিরশিশুর তীক্ষ্ম সজাগ চেতনা যা এই বিশ্বলীলার সব কিছু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিফলিত করে।

এই দেখা সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন, —মোহের কুয়াশায় অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করবার আমরা না পাই অবকাশ না পাই শক্তি। সেইজন্যে জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলাম।

তিনি আবার বলছেন,—আমি বলি দেখো। তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার প্রবাহিণী ঝরে পড়ছে। তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক। ছোটো বড় সুন্দর অসুন্দর সব কিছু নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশ ধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ করলে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের অগণন চিঠিপত্রের মধ্যে প্রবাহিণী সত্তার এই নিরন্তর বিচ্ছুরণই আমরা সব চেয়ে বেশী করে পাই।

সতেরো আঠারো বছর বয়সে লেখা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রেই তার স্পষ্ট আভাস।

লিখছেন,—মেঘ বৃষ্টি বাদল অন্ধকার শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ ঝড়—তাতে কেমন একটা উল্লাসের ভাব আছে। এখানে এ তা নয়, এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলেছে ত চলেছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার ওপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে। এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে। মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে কাল বজ্র ডেকেছিল কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য ত এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখা চিঠিপত্র থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি এই জন্যেই করলাম যে পরবর্তি সারা জীবনে তাঁর পত্র সাহিত্য যে অভিনব রসলোক সৃষ্টি করবে তার সূচনা এইখানেই দেখা যায়।

ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে ওই বয়সের এক যুবকের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য বিচারবোধ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় যেমন পাই সেই সঙ্গে পাই সেই দুর্লভ প্রকৃতি-চেতনার প্রথম উন্মেষ যা তাঁকে পৃথিবীর সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে মহিমাময় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে একটু অবহিত হলে ভাবী রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিচিত্র প্রতিভার অনেক অংকুরই বোধহয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্রালাপের সমস্ত সুরের খেলার ত বটেই। স্নিগ্ধ শান্ত মধুর করুণ থেকে কৌতুকোজ্জ্বল শ্লেষতীক্ষ্ম প্রায় সমস্ত রসই তার মধ্যে উপস্থিত।

য়ুরোপ তাঁর আগেও অনেকে গেছেন, তাঁর পরেও। সে যুগের সে য়ুরোপও আর নেই। কিন্তু সেই য়ুরোপের যে ছবি তিনি সেই বয়সে এঁকে গেছেন তার তুলনা আমাদের ভাষায় অন্তত এখনো আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এ রচনার বিশেষত্ব এইখানে যে সত্যিই আগাগোড়া তা চিঠির মেজাজে লেখা,—সেই স্বচ্ছ স্বাভাবিক স্রোত যা অবলীলাক্রমে বয়ে যায় আর তরল লঘু ভঙ্গিতেই একটু ছুঁয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করে।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে যা সুরু, পত্রালাপের সেই আশ্চর্য অভিনব রসমাধুর্য ও বৈচিত্র্য আরো পরিণতভাবে তাঁর সারা জীবনের অজস্র চিঠিতে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবু নমুনা হিসেবে তাঁর ভাবী পত্রসাহিত্যের বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীর কয়েকটি অংকুর সেখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, হাল্কা কৌতুকরসের সাক্ষাৎ ত প্রথম পত্রের সুরু থেকেই পাই। সমুদ্রে প্রথম পাড়ি দিয়েই সমুদ্র পীড়ায় ছ'দিন শয্যাশায়ী থাকার পর প্রথম

এডেনের কাছাকাছি এসে বিছানা ছেড়ে উঠে লিখছেন,—বিছানা থেকে ত উঠলাম। উঠে দেখি যে সত্যিই ই'দুরের মত দুর্বল হয়ে গেছি। মাথা যেন ধার করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো করে বনে না। চুরি করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার গায়ে ঠিক লাগছে না।

টনব্রিজ ওয়েলসের স্বাস্থ্যকর জলের উৎস সম্বন্ধে লিখছেন,—উৎস শুনেই কল্পনা করেছিলাম না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে। চারিদিকে পাহাড়-পর্বত গাছ-পালা সারস মরালকুল কূজিত কমল কুমুদ কহ্লার বিকশিত সরোবর, কোকিল কূজন মলয় বীজন ভ্রমর গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো।

পরে সেই জায়গা সম্বন্ধে আবার লিখছেন,—যখন টনব্রিজ ওয়েলসে ছিলাম তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটা-গাছ হাতড়ে দু'চারটে বুনো ফুল নিয়েই তাকে কোনমতে ফুলশর বানাতে হয়—

য়ুরোপ ও বিলেতের মানুষজন আচার-ব্যবহার সামাজিক রাষ্ট্রিক রীতি-নীতির অম্লমধুর সরস বিবরণের মাঝে সেই যুগেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি তন্ময়তার পরিচয় নানা জায়গায় ছড়ানো। একটি উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। আর একটিও এই সূত্রে দিলে বোধহয় বাহুল্য হবে না।

ডেভেনসায়ারের সমুদ্রতীর সম্বন্ধে লিখছেন,—এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মত দেখায়।...এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পড়েছে, আমরা প্রাণ পণ করে এক এক দিন সেই অতিদুর্গম পাহাড়গুলোর ওপর উঠে বসে নিচে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখি। শব্দ উঠছে, ছোট ছোট নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চারি-দিকে রোদ্দুর, মাথার ওপর ছাতা খোলা...আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা কোথায় পাব?

এই বর্ণনা আমাদের মনকে আপনা থেকেই সুদূর ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর থেকে বাংলার প্রান্তে অপরূপ একটি নদীর রাজ্যে নিয়ে যায় না কি? ডেভেন-শায়ারের টর্কির সমুদ্রকূল থেকে শিলাইদহের পদ্মার ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রই ছিন্ন-পত্রে পৌঁছোবার প্রথম সেতু।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কত চিঠি লিখেছেন তা পণ্ডিতদের কাছে জানবার অপেক্ষায় রইলাম। আমাদের তা গণনার বাইরে। তাঁর চিঠিপত্রের সন্ধান আজও শেষ হয় নি, এখনও তা প্রায় অফুরন্ত-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মহারণ্যের পত্র-পুঞ্জের মতই তাঁর চিঠির রাশি তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে সমস্ত চিঠি সংগৃহীত হবার পরও কিন্তু ছিন্নপত্রের মর্মরই তার মধ্যে প্রধান বলে জানা যাবে বলে মনে হয়।

ছিন্নপত্র শুধু রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্রের মধ্যেই নয় পৃথিবীর সমস্ত পত্র-সাহিত্যের মধ্যেও অনন্যপূর্ব বললে বোধ হয় বেশী বলা হয় না। বাংলা সাহিত্যে শুধু নয় বাংলা ভাষার বিবর্তনে, ছিন্নপত্র এবং তাঁর সেই প্রথম যৌবনের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের দান ত অবিস্মরণীয়। তা এখনো আমাদের যথোচিত সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পায়নি বলেই সন্দেহ হয়। বাংলা গদ্যে কথ্য-ভাষার সাবলীল বেগ প্রথম সঞ্চারিত করবার দুঃসাহসী সার্থক পরীক্ষা সবুজ পত্রের ঘোষণামুখর আন্দোলনের বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন।

কিন্তু ছিন্নপত্রের কাছে ভাষার এই মুক্তি-প্রেরণা আমাদের উপরি পাওনা মাত্র। ছিন্নপত্রে আমরা এমন কিছু পাই, যে কোন দেশের সাহিত্যে যা দুর্লভ। তুলনা হিসেবে অ্যামিয়েলস জার্ণাল বা সেই জাতীয় কিছু যদি মনেও আসে একটু বিচার করলেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হবে না। রবীন্দ্রনাথের পত্র রোজনামচা ত নয়ই, এমন কি সচেতন চিন্তা বিলাসও নয়, তা যেন আশ্চর্য এক আনন্দঘন চেতনার গুঞ্জন যা অন্তরঙ্গভাবে উপভোগ করবার আশাতীত সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। সাহিত্যের অন্য যে সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সচেতন স্রষ্টা সেখানে অসামান্য সব কীর্তি তিনি রেখে গেছেন আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগাতে, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে আমরা যা পাই তা যেন তাঁর সেই প্রবাহিণী সত্তারই অবিরাম আত্মবিস্ফোরতার কলতান, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও সচেষ্ট যে কৃত্রিমতাটুকু প্রায় অপরিহার্য বলা যায় তাও যার মধ্যে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক আত্ম-জীবনী লিখে যান নি এবং তাঁর বিস্তারিত জীবনী লেখার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য বলে অনেককে দুঃখ করতে শুনি। এমন কি তাঁর পঠিত পুস্তকের তালিকা না পাওয়ার জন্যেও নাকি আক্ষেপ শোনা যায়। আমার ত' মনে হয় এ যেন তীর্থ দর্শন সেরে এসে ছাপানো টাইম টেবল না পাওয়ার আক্ষেপ। তীর্থ মানে ত' স্টেশনের খবর, গাড়ী বদলের হদিশ আর পাণ্ডার নাম-ঠিকানা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের জীবনও তেমনি নয় শুধু কটা বাইরের ঘটনা আর তারিখের ফিরিস্তি। স্থূলে কৌতূহল মেটাবার ঘটনানির্ভর বিবরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আরো গভীর কিছু দুর্লভ কিছু আমরা পেয়েছি,— পরমাশ্চর্য এক চেতনা প্রবাহের প্রায় নিত্যকার দিনলিপি।

তাঁর সারা জীবনের অপরূপ অপর্যাপ্ত পত্রধারাই সাহিত্য লোকের অনন্যপূর্ব সার্থকতম আত্মজীবনী নয় কি?
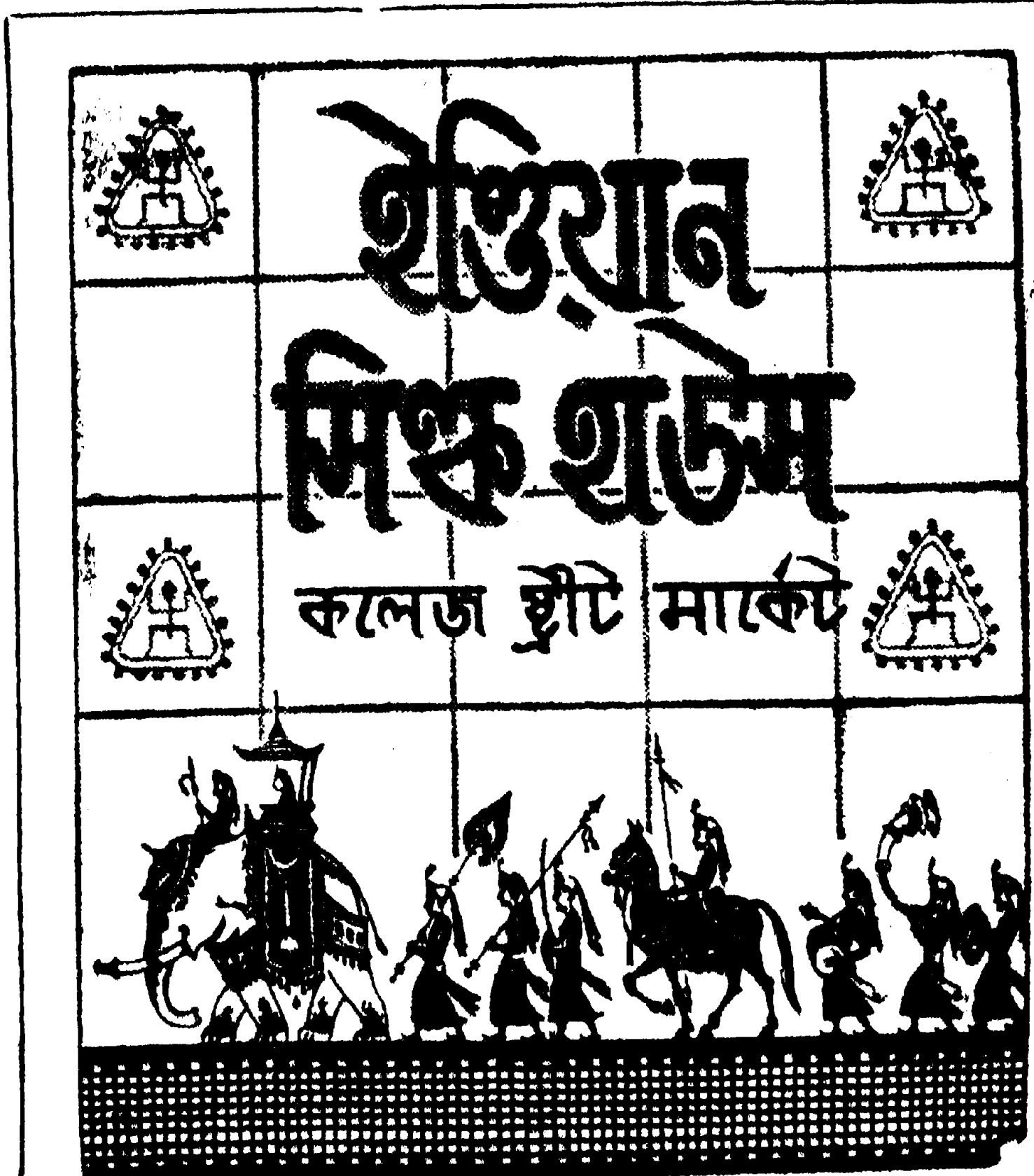
॥ প্রেক্ষাগৃহের 'সঁরি ম্যাডাম' ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

অমৃত

সবিনয় নিবেদন,

আমি অমৃত পত্রিকার অনেক অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে অন্যতম। অল্প কয়েকমাসের মধ্যে অমৃত পত্র-পত্রিকার জগতে যে বিশিষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, তা বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের বিষয়, আপনাদের নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে 'পূর্বপক্ষ' ও 'ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা'র আমি অনুরক্ত পাঠক। কিন্তু আপনাদের ছায়াচিত্র বিভাগটির চিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার কিছু আপত্তি আছে। কয়েক সংখ্যা আগে 'সঁরি ম্যাডাম' ছায়াছবিটির দেখলাম প্রায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করা হয়েছে। অথচ আমি নিজে ছবিটি দেখেছি। বিশ্বাস করুন উক্ত চিত্রটি দেখতে দেখতে আমি একটি দড়ির অভাব প্রবলভাবে অনুভব করেছি। কারণ দড়ি দিয়ে নিজেকে সিটের সঙ্গে না বেঁধে রাখলে একনাগাড়ে ছবিটি বসে দেখা প্রায় অসম্ভবই। আপনারা বলতে পারেন বাংলা ছবি যাতে একেবারে মার না খায় তাই সমালোচককে রূঢ় সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।, কিন্তু অন্য কোনো কাগজেই 'সঁরি ম্যাডাম'এর এতটুকু প্রশংসা দেখলাম না। আবার 'ডাকাতের হাতে' ছবির প্রায় রূঢ় সমালোচনাই কোরেছেন সমালোচক। অথচ 'সঁরি ম্যাডাম'এর তুলনায় 'ডাকাতের হাতে' অনেক ভাল ছবি ত বটেই—অন্ততঃ প্রচেষ্টা হিসাবেও মহৎ।

অন্তে নিবেদন করি, সমালোচনা যদি গোষ্ঠিতোষণে অথবা চাটুকারিতার পক্ষে অথবা নিমজ্জিত হয়, তাহলে 'সমালোচনা' এবং 'বিজ্ঞাপন' শব্দদ্বয়ের কোন মৌলিক পার্থক্যই আর থাকেনা এবং সেক্ষেত্রে এই ধরণের চিত্র-সমালোচনার নিচে 'A' অর্থাৎ অ্যাডভারটাইজমেন্ট লিখে দেওয়াই বিধেয়।

নিজগুণে প্রগলভতা ক্ষমা কোরবেন।

বিনীত

বিশ্বনাথ রায়, কলিকাতা-৩৭।

(২)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু :—

মহাশয়,

সাপ্তাহিক অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসেবে চিত্রসমালোচক 'নান্দীকর' মহাশয়ের কাছে আমার গুটিকয়েক কথা বলার আছে। গত ১৯শে জানুয়ারী ও ২৬শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত পর পর দুখানা 'অমৃতে' 'সঁরি ম্যাডাম' ও 'কাবুলীওয়ালার' অদ্ভুত চিত্র-সমালোচনা পড়ে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়েছে। 'সঁরি ম্যাডাম' বাংলা চলচ্চিত্রাকাশে এক বিভী-

মতামত
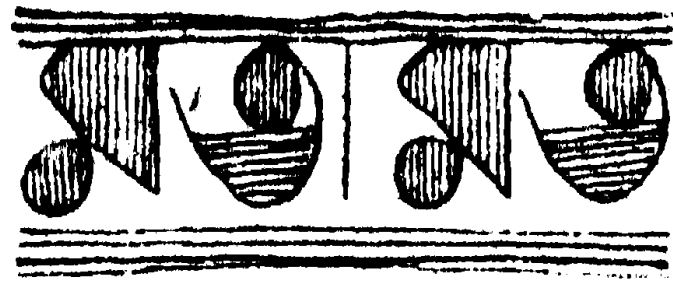
ষিকাময় দুর্ঘটনা—যার অবাস্তব কাহিনী, অভব্য উপকরণ, সাদৃশ্যহীন বিন্যাস-ধারা, নির্লজ্জ অশ্লীলতা বাংলার মহান খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছে। দুর্বল পরিচালকের হাস্যকর অপচেষ্টাকে নান্দীকর কেন যে স্বাগত জানিয়েছেন ভেবে পাইনি। 'বাংলা দেশের গতানুগতিক ছবি থেকে 'সঁরি ম্যাডাম' একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম'...... বাংলা দেশের ছবি গতানুগতিক!! আর তাদের বিশিষ্ট ব্যতিক্রম সঁরি ম্যাডাম!!! "......এবং যে প্রাণোচ্ছলতার গুণে বোম্বাই দেশের ছবি সাধারণ বাঙালী দর্শককে ক্রমেই হিন্দী ছবির দিকে আকৃষ্ট করছিল......" কে খবর দিয়েছে তাঁকে যে বাঙালী দর্শক ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছেন? আর "প্রাণোচ্ছলতার" অর্থে তিনি কি বলতে চেয়েছেন? এমন অনেক কথা লিখেছেন যা নাকি প্রকৃত সমালোচক হিসেবে তাঁর লেখা উচিত হয়নি—অন্যায় হয়েছে তাঁর, যেহেতু তিনি তাঁর মন্তব্যে বলেছেন "সঁরি ম্যাডাম একটি চমৎকার উপভোগ্য চিত্র।"

কাবুলীওয়ালা চিত্রের সমালোচনায়ও নান্দীকর তাঁর বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। হিন্দী চিত্ররূপ অনাবশ্যকভাবে বর্ধিত হয়েছে সত্য কিন্তু সেই অনাবশ্যকতারও প্রয়োজন ছিল, কেননা স্থূল দর্শকসমাজের কাছে স্নেহবুভুক্ষু কাবুলীওয়ালার অন্তর্লীন মানবিকতার সূক্ষ্ম রসবোধটুকুকে উপস্থাপিত করার আর কি পথ ছিল? অনাবশ্যক হয়েছে বিদগ্ধ-দর্শকের কাছে কিন্তু তাই বলে 'অবান্তর' হয়নি মোটেও।

স্বপ্নদৃশ্য ছোট হলেই কি আতিশয্য-দুষ্টতা দূরে হোত? কবিগুরুর কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে কতকাংশ অনাবশ্যক হলেও পরম-উপভোগ্যতার গুণে কি ক্ষমাহ হয়নি? হিন্দী চিত্র কাবুলীওয়ালাতে কাহিনীর অন্তর্লীন সূক্ষ্ম শিল্পরূপ ও ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেনি আর মিনি-কাবুলীওয়ালার সম্পর্কটুকু যেন কেমন একটা উচ্ছ্বাসোদ্দীপক মিলনান্ত নাটকীয়তায় মথিত হয়েছে—ছোট্ট এ দুটো কথা বলা কি সত্যিই কঠিন? মিনির কাবুলীওয়ালাকে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়া, ও পরে ছুটে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কয়েকটা বিষয় নিয়ে যে ব্যক্তিগত শৈশবের অপ্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে শিশুমনস্তত্ত্বের উপর কটাক্ষ করেছেন—এটাও কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? 'সঁরি ম্যাডামে' যা করে শেষ করেছেন এটাতেও যদি তার আভাস মাত্র থাকতো তবে হয়তো কিছু লেখায় প্রয়োজনীয়তা থাকতো না, কিন্তু তিনি তা করেননি। প্রকৃতপক্ষে 'প্রাণোচ্ছলতা'-পিয়াসী নান্দীকর এতে হয়তো হতাশ হয়েছেন, কিন্তু হিন্দী চিত্রজগতে 'কাবুলীওয়ালা' চিত্রটি এক পরম সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে।

আমার এ চিঠির জবাব পেলে খুশী হবো। নমস্কারান্তে—

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১।

॥ উত্তর ॥

প্রথমেই প্রথম পত্র সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করছি।

"সঁরি ম্যাডাম" একখানি হালকা ছবি। আমাদের ধারণা, হাসির ছবিকে হালকাভাবেই নেওয়া উচিত। তাতে কার্য-কারণ খোঁজবার চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাংলা দেশে হালকা রোমান্সের ছবি হয়না বললেই চলে। অথচ ঐ ধরণের ছবি ক'রে বোম্বাই আমাদেরই কাছ থেকে দুহাতে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই নাচে-গানে-হাসিতে ভরপুর "সঁরি ম্যাডাম" একটা নূতনত্ব আমদানীর চেষ্টা করেছে ব'লে আমাদের প্রশংসা পেয়েছে। আবার "ডাকাতের হাতে" ছোটদের জন্যে ছবি হয়েও কারুরই জন্যেই ছবি হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি ছবিখানির প্রযোজক। ছোটদের জন্যে প্রথমেই এমন একটি morbid জিনিষ উপহার দেবার অর্থ হয়না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত কাহিনীর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি ছবিখানি দেখে ব্যথিতই হবেন। রসগোল্লার সঙ্গে সিঙ্গাড়ার যেমন তুলনা চলে না, তেমনই চলে না 'সঁরি ম্যাডামে'র সঙ্গে 'ডাকাতের হাতে'র তুলনা। সবশেষে জানিয়ে দি, আমি কোনো গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত নই।

এইবার দ্বিতীয় চিঠিতে আসা যাক। "সঁরি ম্যাডাম" সম্পর্কে কিছুটা বক্তব্য ওপরেই রয়েছে। ভব্যতা, শালীনতা, শ্লীলতা জ্ঞান সকলের সমান নয়। মহাত্মা গান্ধীর পরিচ্ছদ দেখে চার্চিল তাঁকে 'অর্ধ নগ্ন' বলেছিলেন। ঘোমটা-টানা পল্লীবধূ এবং জিনস্-পরা আধুনিক তরুণী—দুজনেই দুজনের কাছে অভব্য।

হিন্দী "কাবুলীওয়ালা"-তে স্নেহবুভুক্ষু কাবুলীওয়ালা মাত্র স্নেহবুভুক্ষু থাকলে ত' কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু এখানে কাবুলীওয়ালা পরোপকার ক'রে বেড়াচ্ছে—নানা রকম মহানুভবতার পরিচয় দিচ্ছে। মিনি হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ না দিলে কি কাবুলীওয়ালার চরিত্র বিকশিত হ'ত না। আমি হিন্দী "কাবুলীওয়ালা"তে সূক্ষ্ম শিল্পরূপের অভাবই দেখেছি। —নান্দীকর

প্রত্নকেতকী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গল্প শেষ করিয়া রুক্মিণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার এখনও অর্ধেক রান্না বাকি।

সুবীর দেখিল, অরুণা আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসিয়া আছে। তারপরই অরুণা চমকিয়া সুবীরের পানে চোখ তুলিল, মুখে ক্ষুদ্র হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—'আষাঢ়ে গল্প—না?'

সুবীর বলিল,—'একেবারে আষাঢ়ে গল্প নাও হতে পারে। মূলে হয়তো একটু সত্যি আছে।'

অরুণা আর কিছু বলিল না। তাহার মুখের উপর রহস্যের পর্দা নামিয়া আসিল। তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে সুবীর তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে না পারিলেও তাহার মনও অশান্ত হইয়া উঠিল। এ কোন্ অদৃশ্য কুহক জালে তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে! যে সন্দেহটা সুবীর জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল তাহা এই : অরুণা কি নিজেকে জন্মান্তরের রাণী অরুণাবতী মনে করিতেছে এবং মনে মনে বিদেহাত্মা রাজা বিজয়কেতুর উদ্দেশ্যে অভিসার যাত্রার জন্য উৎসুক হইয়াছে। অসুস্থ শরীরে মনও অসুস্থ হয়। ইহা কি সেই অসুস্থতার লক্ষণ?

কিন্তু যাহাই হোক, গল্পের রাণীর অরুণাবতী নাম আশ্চর্য রকমের সমাপতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে রাত্রে অরুণা 'ক্ষিদে নেই' বলিয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেল। সুবীর যথাসময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিল অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর তাহাকে জাগাইল না, অস্বচ্ছন্দ মন লইয়া কিছুক্ষণ খাটের চারি পাশে পায়চারি করিল, তারপর শয়ন করিল।

গভীর রাত্রে সুবীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দূর হইতে যেন বীণা যন্ত্রের অস্ফুট মূর্চ্ছনা আসিতেছে। সুবীরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। ঘরে আলো নাই, মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সুবীর পাশের দিকে অনুভব করিল, অরুণা শয্যায় নাই।

বালিশের পাশে সুবীর একটা বৈদ্যুতিক টর্চ রাখে, সেটা জ্বালিয়া দেখিল শয্যা শূন্য। ঘরের চারি পাশে আলো ফেলিয়া দেখিল তবুও অরুণা নাই। দূরাগত বীণা ধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল।

সুবীর স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু অরুণা ফিরিয়া আসিল না। তখন সে উঠিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া লইল, টর্চ জ্বালিতে জ্বালিতে অন্য ঘর দুটা দেখিল। সেখানেও অরুণা নাই।

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া সুবীর ঘরের বাহিরে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিম আকাশে প্রায় পূর্ণাঙ্গ চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশ এবং মরুভূমিতে চাঁদের কিরণ যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বরফের কাঁটার মত সুবীরের গায়ে বিঁধিল।

বিশাল ছাদ চন্দ্রকুহেলিতে ঝিমঝিম করিতেছে; সুবীর চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অরুণাকে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথায় গেল অরুণা? এই নির্জন পুরীতে গভীর রাত্রে একাকিনী কোথায় গেল? তবে কি নীচে গিয়াছে! কেন? তাহাকে না জাগাইয়া একাকিনী নীচের তলায় যাইবে কেন?... নিশির ডাক?...না, না, এ সব কী অবিশ্বাস্য কথা সে ভাবিতেছে! আজ সন্ধ্যাবেলা যে গল্প তাহারা শুনিয়াছে, এ সব তাহারই অনুরণন। অরুণা নিশ্চয় কাছেই কোথাও আছে—

সে গলা চড়াইয়া ডাকিল—'অরুণা!'

সাড়া নাই। কেবল ঠাণ্ডা বাতাস তাহার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সুবীর নিজের মনকে দৃঢ় শাসনে রাখিয়াছিল। এইবার তাহার সংযমের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া আলিসার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিল, তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সারা ছাদ পরিক্রমণ করিল। না, অরুণা ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যায় নাই। তবে সে কোথায়?

সুবীর ক্ষণকাল মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। শয়নকক্ষটা ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, হয়তো অরুণা

ঘুমের ঘোরে খাটের পাশে পড়িয়া গিয়াছে!

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে কেয়া ফুলের গন্ধ ভরভর করিতেছে। স্থানুর মত দাঁড়াইয়া সুবীর ভাবিল—কেয়াফুলের গন্ধ তবে মিথ্যা নয়, রোগ-বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। অতি-প্রাকৃত যতদূর প্রাকৃত হইতে পারে কেয়া ফুলের গন্ধ তাই। বীণাধ্বনিও তাই। এক সূক্ষ্ম জগতের অলৌকিক পরি-বেশের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

সুবীর টর্চ জ্বালিল। বিছানার এক পাশে অরুণা শুইয়া আছে। তাহার বেশবাস বিশ্রস্ত, চুল এলোমেলো; সে গভীর ক্লান্তির ঘুম ঘুমাইতেছে। সুবীরের সংশয় জাগিল, তবে কি অরুণা সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছিল! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়া সুবীর শয্যাশিয়রে রাখিল, তারপর শয্যায় উঠিয়া অরুণার পাশে বসিল। তাহার নিদ্রাশিথিল মুখের পানে চাহিয়া সুবীরের হৃদয়ে একটি বাষ্পপীড়িত স্নেহের উচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত উদ্‌গত হইয়া উঠিল। সে দুই বাহু দিয়া নিবিড়-ভাবে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল,—'অরুণা! অরুণা!'

অরুণার কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল না; তাহার শ্লথ অঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া নাই। ক্লান্ত শিশুর মত সে ঘুমাইয়া রহিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুবীর তাহাকে ছাড়িয়া দিল, তারপর আলো নিভাইয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া শয়ন করিল। সে লক্ষ্য করিল, কেতকীর গন্ধ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বিলীন হইয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে সুবীর অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

অরুণার চোখে সদ্য ঘুম ভাঙ্গার জড়িমা; সে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'কোথায় গিয়েছিলুম! যাইনি তো কোথাও।'

সুবীর বলিল,—'গিয়েছিলে। দুপুর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি তুমি বিছানায় নেই।'

অন্তর্লীন কণ্ঠে অরুণা বলিল,—'কি জানি—মনে পড়ে না—' সুবীর দেখিল অরুণার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। সে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অরুণা নত নেত্র তুলিয়া সুবীরের পানে চাহিল; চোখে শঙ্কা ও গোপন উত্তেজনা। সে জড়ানো গলায় বলিল,—'ঘুমের ঘোরে কি করেছি মনে পড়ছে না।' তাহার মুখের উপর অদৃশ্য মুখোশের আবরণ পড়িয়া গেল।

বাহিরের ঘর হইতে চায়ের সরঞ্জামের ঠুং ঠাং শব্দ আসিল, গিরিধর প্রাতঃ-কালীন চা আনিয়াছে। সুবীর উঠিয়া পড়িল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কাল রাত্রির কথা অরুণার মনে পড়িয়াছে কিন্তু সে তাহা সুবীরের কাছে গোপন করিতে চায়। কী কথা গোপন করিতে চায়? স্বপ্নাভিসার?

দিনটা অবসন্ন আলস্যে কাটিয়া গেল। দুজনেই শামুকের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছে। সুবীর এইরূপ বিচিত্র পরিস্থিতিতে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। অরুণা একটা অন্তর্গূঢ় মাদকতায় নিমজ্জিত হইয়া আছে। তাহারা যেন দু'টি সচল যন্ত্র, পরস্পরের সহিত কোনও সচেতন সংযোগ নাই, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে।

সূর্যাস্তের পর রুক্মিণী ছাদের উপর পাটি পাতিয়া অরুণার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধার সঙ্গে মৃদুস্বরে জল্পনা চলিতেছে। সুবীর দূর হইতে দেখিল অরুণার মুখ উৎসুক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকবিমূঢ় ভাব আর নাই। সে একটু আশ্বস্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। সায়ন্তন জ্যোৎস্নার ম্লান বিজনতায় বালুর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জামাইবাবু আজ যদি আসেন ভাল হয়.....এ স্থানটা বিজনবাসের পক্ষে খুবই চমৎকার, কিন্তু......প্রাসাদে কোনও বুভুক্ষু আত্মা অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে......কেয়া ফুলের গন্ধ, বাজনার আওয়াজ, এসব মিথ্যা নয়......অরুণার মানসিক অবস্থা এখানে আসার পর আরও অবোধ্য রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে......তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে তাহা যদি দেখা যাইত......জামাইবাবু আসিয়া পড়িলে ভাল হয়...

ঘন্টাখানেক পরে সুবীর বালির বাঁধ বাহিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বসিবার ঘরে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বলিতেছে; অরুণা একটি আয়না হাতে লইয়া নিজের মুখ দেখিতেছে। সুবীর চমৎকৃত হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল। অরুণার চুলে নূতন ধরণের কবরীবন্ধ, মুখে অলকা-তিলকা, সীমন্তে একগুচ্ছ মুক্তার ঝুমকা; তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে একটি অজন্তার ছবি। রুক্মিণী তাহাকে সেকালের ভঙ্গিতে সাজাইয়া দিয়াছে।

সুবীর কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—'বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!'

অরুণা সুবীরকে দেখিতে পায় নাই, ধরা পড়িয়া গিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল, তারপর ছুটিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

অরুণার লজ্জা যেন অস্বাভাবিক। সুবীর ক্ষণকাল অবাক থাকিয়া শয়নকক্ষে অরুণাকে অনুসরণ করিল। দেখিল অরুণা শয্যায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছে। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া সুবীর হাল্কা সুরে বলিল,—'এতে লজ্জার কী আছে? ওঠো, আর একবার ভাল করে দেখি।'

অরুণা কিন্তু মুখ তুলিল না। কিছুক্ষণ সাধ্যসাধনা করিয়া সুবীর বসিবার ঘরে ফিরিয়া গেল, চেয়ারে বসিয়া চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিল। জীবনটা হঠাৎ অত্যন্ত শুষ্ক এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রির আহারের পর অরুণা একটা বই লইয়া পড়িতে বসিল। তাহার নূতন সাজসজ্জার লজ্জা কাটিয়া গিয়াছে।

সুবীর বলিল,—'শুতে যাবে না?'

অরুণা বলিল,—'না, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছি, এখন শুলে ঘুম আসবে না।'

তিক্ত মনে সুবীর একাকী শয়ন করিতে চলিয়া গেল।—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সুবীরের ঘুম ভাঙিল। এবার বীণাধ্বনি নয়, কেয়া ফুলের হিম-গদ্‌গদ গন্ধ। সুবীরের ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

শয্যায় অরুণা নাই; সে যে শয়ন করিয়াছিল তাহার চিহ্নও শয্যায় নাই। টর্চ হাতে লইয়া সুবীর খাট হইতে নামিল। পাশের ঘরও নিষ্প্রদীপ, সেখানে অরুণা নাই। সুবীর ছাদে গেল।

আজও চাঁদ অস্ত যাইতেছে, পশ্চিম আকাশে আলোর বন্যা। কিন্তু অরুণা এখানে নাই। ছাদে কেয়া ফুলের গন্ধও কম।

সুবীর ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল। এখানে কেয়ার গন্ধ বেশী, মনে হয় নীচের তলা হইতে গন্ধটা আসিতেছে। সুবীর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

যে ঘরটাতে প্রত্নবস্তু রাখা ছিল সেই ঘর হইতে গন্ধ আসিতেছে। সুবীর টর্চ জ্বালিল না, দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকাণ্ড ঘর অন্ধকার, কেবল দূরে ঘরের অন্য প্রান্তে মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলোয় ঘরের ইতস্তত-বিন্যস্ত টেবিল প্রভৃতি আসবাব-গুলি অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

সুবীর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্তর্পণে টেবিলগুলি বাঁচাইয়া ওই আলোকবিন্দুর দিকে অগ্রসর হইল।

অর্ধপথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বিগলিত হাসির শব্দ! যেন দুইটি প্রণয়ী বাসক শয্যায় শুইয়া চুপিচুপি কথা বলিতেছে, গভীর রসালুতার গদ্‌গদ হাসি হাসিতেছে। দীপের ক্ষীণ আলোকে কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না।

সুবীরের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বোধকরি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা অন্ধ আবেগ

তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দপ করিয়া টর্চ্ জ্বালিল।

দেয়াল ঘেঁষিয়া পাটি পাতা, তাহার উপর অরুণা একাকিনী শুইয়া আছে। টর্চের তীব্র আলোয় তাহার অঙ্গের অলংকারগুলি ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। সে তড়িদ্বেগে উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল।

'অরুণা!'

ব্যাধের সাড়া পাইয়া ত্রস্ত হরিণী যেমন পলায়ন করে, অরুণাও তেমনি ছুটিয়া পালাইল। সুবীর ক্ষণকাল হত-বুদ্ধির মত দাড়াইয়া রহিল, ঘরের এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল পাটির শিয়রে পীতাভ দীপশিখা জ্বলিতেছে। সুবীর দৈহিক এবং মানসিক জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত উপরে ফিরিয়া গেল।

শয়নঘরে অরুণা খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সুবীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।—'অরুণা।'

অরুণা উঠিয়া বসিল, গলদশ্রু চক্ষে চাহিয়া বলিল,—'কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?'

স্তম্ভিত হইয়া সুবীর বলিল,—'আমি তোমাকে নির্যাতন করছি!'

অরুণা মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল,—'আমাকে ছেড়ে দাও। মুক্তি দাও।'

সুবীর খাটের পাশে বসিল, অরুণার হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল,—'অরুণা চল আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই অভিশপ্ত বাড়ী ছেড়ে দেশে ফিরে যাই।'

অরুণা সত্রাসে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—'আঁ! না না না—'

সুবীর বলিল,—'এখানে তোমার মনের রোগ সারবে না। আমি তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না। জামাইবাবু আসুন, কালই আমরা চলে যাব।'

'না না না—আমি যাব না—'

'হ্যাঁ, যাবে। তোমাকে আমি জোরে করে নিয়ে যাব। এ বাড়িতে আর নয়।'

'না না না—' অরুণা ধড়মড় করিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর তীর বেগে ছাদের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

'অরুণা-অরুণা—' ডাকিতে ডাকিতে সুবীর তাহার পিছনে ছুটিল।

চাঁদ অস্ত যাইতেছে, আকাশে বাঁধ-ভাঙা জ্যোৎস্নার প্লাবন। সুবীর দেখিল অরুণা ছুটিতে ছুটিতে ছাদের পশ্চিম কিনারার দিকে যাইতেছে। সেও উচ্চ-কণ্ঠে অরুণার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল।

ছাদের আলিসার কাছে আসিয়া অরুণা একবার পিছন দিকে চাহিল। দেখিল সুবীর ছুটিয়া আসিতেছে। অনৈসর্গিক চীৎকার করিয়া অরুণা ছাদ হইতে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুবীর আলিসার উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নালোকে অরুণা বিশ হাত নীচে বালুর উপর পড়িয়া আছে। সুবীর দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস টানিয়া অন্ধের মত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আল্‌গা নরম বালুর উপর অরুণার দেহ বিস্রস্তভাবে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। সুবীর দেখিল তাহার জ্ঞান নাই কিন্তু প্রাণ আছে। আল্‌গা বালুর উপর পড়িয়াছিল বলিয়া দেহে আঘাত লাগে নাই। তখন সুবীর নিজের অজ্ঞাতসারে 'অরুণা, অরুণা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে দুই বাহু দিয়া তুলিয়া লইল, অসীম কষ্টে বালুর বাঁধ পার হইয়া উপরে উঠিয়া আসিল; অরুণার বালু-ধূসর দেহ বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

সকাল হইতে এখনও দুই-তিন ঘন্টা বাকি। সুবীর ভিজা তোয়ালে দিয়া অরুণার মুখ ও দেহ মুছাইয়া দিল। অরুণার কিন্তু জ্ঞান হইল না।

নিঝুম রাত্রি! ঝি চাকরদের জাগাইবার কথা সুবীরের মনে আসে নাই। সে অরুণার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাত কাটাইয়া দিল।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় জীপে চড়িয়া বিরাজবাবু আসিলেন। সুবীরের মুখে সমাচার শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'এখনি হাসপাতালে নিয়ে চল।'

রেল স্টেশনের কাছে হাসপাতাল। অরুণাকে জীপে তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবীণ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শরীরে কোনও আঘাত নাই, কেবল কংকাশন হইয়াছে, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে।

অপরাহ্নে তিনটার সময় অরুণার জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুবীর পাশে বসিয়া ছিল, সে অরুণার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—'অরুণা!'

অরুণার ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল,—'আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

'বাড়ি!'

'হ্যাঁ। কলকাতায় আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাব।'

বিহ্বল উল্লাস দমন করিয়া সুবীর বলিল,—'আজই আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।'—

মেল্ ট্রেণ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়াছে। এখানে মরুভূমি নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় হিমচর্চিত শ্যামলতা।

কুপে কামরার মধ্যে সুবীর অরুণার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল, আস্তে আস্তে বলিল,—'অরুণা, মরুভূমির মাঝখানে সেই পাথরের বাড়িটির কথা তোমার মনে আছে?'

অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—'ও কথা আর কোনো দিন আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমি ভুলে যেতে চাই।'

সুবীর তাহার মুখখানা গাঢ়ভাবে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব। তুমিও একটা কথা মনে রেখো, ইহজন্মে তুমি আমার।'

।। সমাপ্ত ।।

...জ্ঞান নাই, কিন্তু প্রাণ আছে।
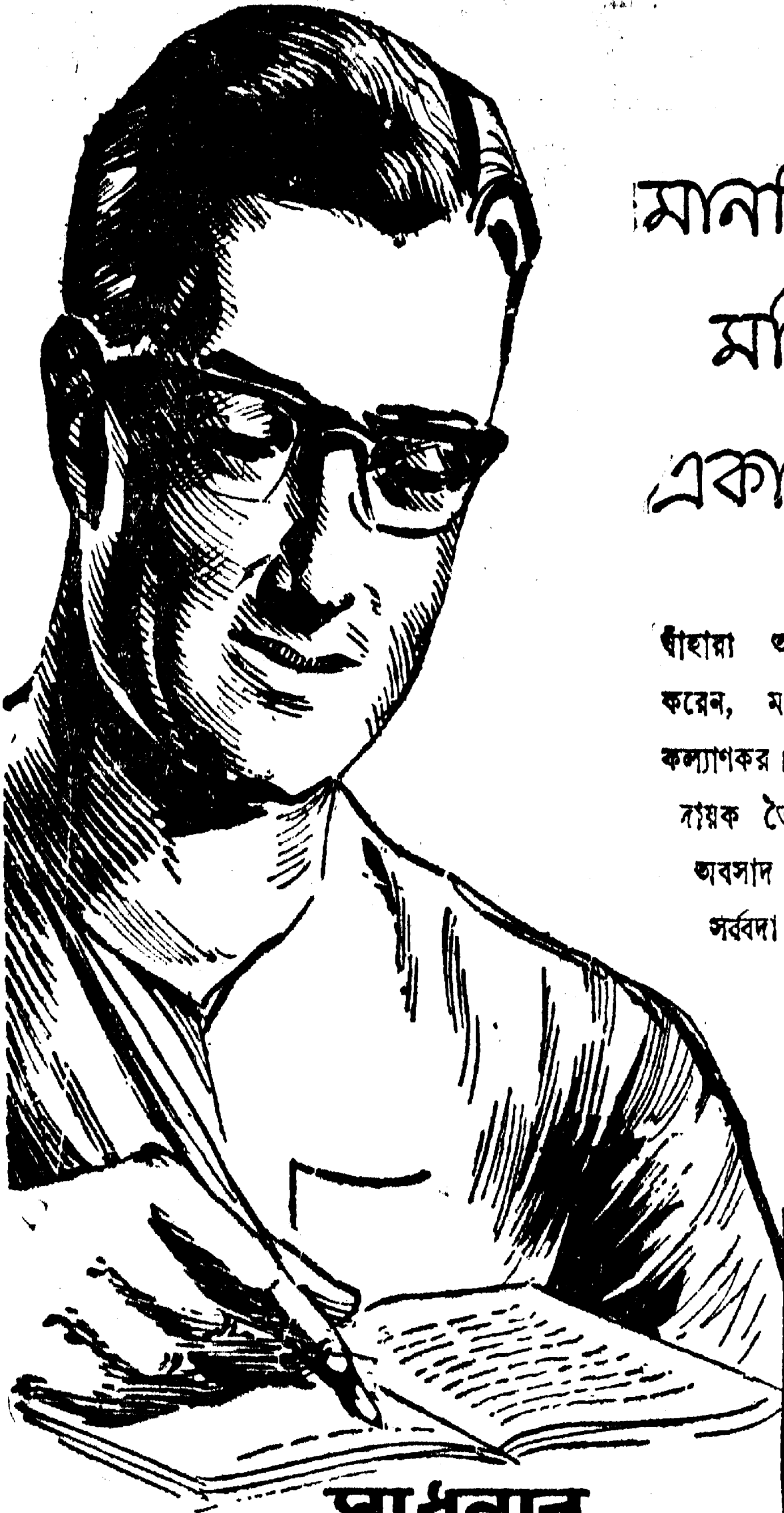
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !

যাহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮

SA-2
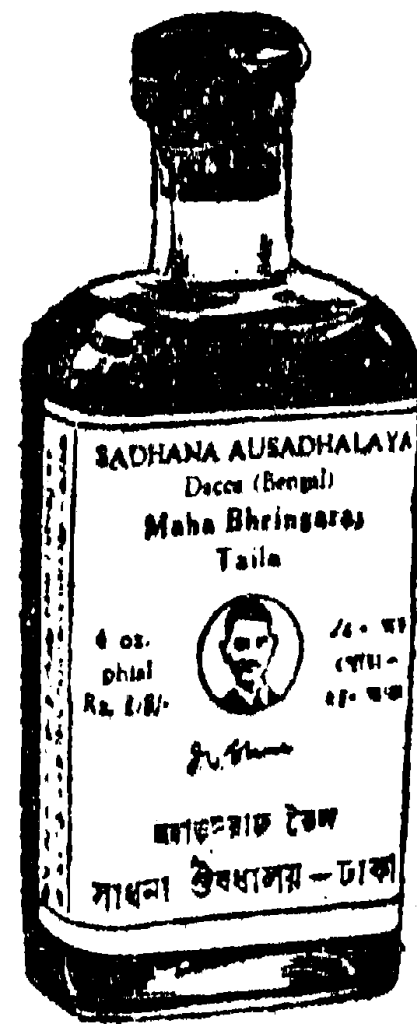
কলিকাতা কেন্দ্র — ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। এগার ।।

মস্কোর বয়স আটশ' বছরের কিছু বেশি। একদা সেই প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটির নাম ছিল মাস্কোভি, এটি পাহাড়ি উপত্যকা, এবং তলা দিয়ে যে অপ্রশস্ত নদীটি বইছে তার নাম মস্কোয়া। 'মস্কো'—এই নামটি প্রথম উচ্চারিত হয় ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেইকালে জনৈক রাজপুত্র এই উপত্যকার উপরে এসে প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে এর উচ্চ-শীর্ষে কয়েকটি মোটা মোটা কাঠের ঘর নির্মাণ করেন। এই রাজকুমারের নাম ছিল 'যুরি দোলগোরুকি'। পরবর্তীকালে আপর একজন শক্তিশালী ব্যক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। তিনি মাস্কোভি অঞ্চলকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন এবং দেখতে দেখতে যে-জনপদটি গড়ে ওঠে সেটি তৎকালীন রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ জনপদ, তার নাম 'মস্কো'। দ্বাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি ক্রেমলিন শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রিন্স দোলগোরুকি যে দারুপ্রাসাদটি নির্মাণ করেন সেটিকে প্রথম কালে ক্রেমলিন বলা হত। দুশো বছর পরে এটি আইভান কালিতার আমলে মস্কো পাকা-পাকিভাবে রাজধানী হয়ে ওঠে এবং আরেকটি দারুপ্রাসাদ ওই পাড়াতেই নির্মিত হয়। ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি শ্বেতপাথরের 'মন্দির' মাথা তুলতে থাকে। তৃতীয় আইভানের রাজত্ব-কালে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে আবার নূতন ক্রেমলিনের জন্ম হয়। বিশাল রক্তিম প্রাকারের দ্বারা সেই ক্রেমলিন চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত হয়। তখন থেকে একদিকে যেমন রুশরাষ্ট্র সংহত হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি একটির পর একটি প্রাসাদ, গির্জা ও অট্টালিকা মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায়। মস্কো নগরীর মূল প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার দোলগোরুকির অশ্বারূঢ় প্রস্তরমূর্তি আজও মস্কোর রাজপথে সগর্বে বিদ্যমান।

ভারতীয় দলকে আনন্দিত ক'রে তোলবার এবং নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অভ্যর্থনা জানাবার একটি আন্তরিক আগ্রহ প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করছিলুম। এটি লোক-দেখানো, আমি মনে করিনে। এও মনে করতে ইচ্ছা করে না, যেহেতু ক্রেমলিনের ছাপ আমাদের কপালে জুটেছে, সেই হেতু একে একে সবাই এসেছে এগিয়ে। মানুষ শৃগাল নয় যে, একটি ডাক দিলে একশতটি ডাক ছাড়বে! আমার ধারণা, ভারতের প্রতি ওদের একটি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

সেই পক্ষপাতিত্বটি কেমন, সেটি লক্ষ্য করলুম সেদিন সকালে ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সংহতি সম্মেলনে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ শান্ত ও ভদ্রমূর্তি মিঃ বারাব্রুশেভিচ এবং তাঁর সহকারী ও আমার বিশেষ পরিচিত মিঃ চেলিশেভ। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ প্রেরণাদায়ক এটি তাঁদের প্রায় সকল কথা-বার্তায় প্রকাশ পাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষপ্রান্ত থেকে ভারতীয় সাহিত্য ও কাব্যের সঙ্গে রুশজাতির কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ও'রা ভারত সম্পর্কে যেখানে যা কিছু খুদকুঁড়ো পেয়েছেন এবং তিন চারশত বছরের মধ্যে যে সকল রুশ পর্যটক কথনো-সখন ভারত থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, সেগুলি এখানে সযত্নে গচ্ছিত আছে। ওরা বিশ্বাস করেন, ভারতভূমির সংস্কৃতির মূল স্বভাব হল করুণা, অসীম ক্ষমা, পৃথিবীর সকল জাতির প্রতি তার নিত্যপ্রসন্ন আশীর্বাদ,—এবং এইগুলিই তার বৈশিষ্ট্য। হিংস্র দুর্জনের প্রতি ভারতের ঘৃণা নেই, কোনও জাতির প্রতি তার বিদ্বেষ নেই, এমন কি যারা বৈরী তাদের প্রতিও আক্রোশ নেই! ভারতের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহজাত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্তমান। শান্তিকামী ভারতের আদর্শে পৃথিবীর সকল জাতি আজ অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই সুপ্রাচীন এবং আধুনিক ভারতের সর্ব-শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি!

সভাপতি এবং তাঁর সহকর্মীগণের ভাষণে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করে-ছিলুম। আমাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শিউদান সিং চৌহান তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

ডিক্টেটর ষ্টালিন মারা গিয়েছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর শাসন-কালের মধ্যে একটিবারের জন্যও ভারত-বাসীর প্রতি একছত্রও প্রীতিবাক্য প্রকাশ করেছিলেন কিনা, সেকালের বিলেতী রয়টারের গোপন কাগজপত্রে হয়ত তার চিহ্ন কিছু জমা থাকতে পারে,—কিন্তু কোনও ভারতবাসী সেটির খোঁজ পায়নি! ভারতবর্ষে ষ্টালিনের পরিচয় থেকে গেছে দুটি। প্রথম, তিনি অনন্যসাধারণ কর্ম-বীর, ইতিহাসের কঠোরতম শাসনকর্তা, এবং তাঁর আমলেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বপ্রকার বস্তুতান্ত্রিক ও বৈষয়িক উন্নতি ঘটে। তাঁরই কালে পনেরো ষোলটি রিপাবলিক ঐক্য ও পরস্পর সংহতিলাভ করে। তিনি তাঁর আশ্চর্য শক্তির দ্বারা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে দুর্দশা, দারিদ্র্য, অপমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির থেকে তুলে তাকে সম্পদে ও ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল করে তোলেন! তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় তিনি হত্যাকারী এবং বিশ্বাস-হন্তা, তিনি অগণিত সহস্র অহেতুক হত্যা, অপমৃত্যু, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের লাঞ্ছনা, তাদের উপর কায়িক ও মানসিক উৎপীড়ন, তাদের প্রতি শক্তির বীভৎস অনাচার, প্রতিকারহীন অপমান,—এবং তিনি নাকি দেশের চারিদিকের দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে কুড়ি কোটি মানুষকে পোষা কুকুরে পরিণত করেছিলেন,—এই-গুলির জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী! তাঁর এই ইতিহাসকুখ্যাত বর্বরতা বরদাস্ত করেছিল সব চেয়ে বেশি তারাই, যারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট, তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী, কমিউনিষ্ট সমাজের

নির্মাতা, পার্টির প্রাণপ্রতিম এবং জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি। তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো অনগ্রসর এবং চাষী-প্রধান জনসাধারণকে শিল্পপ্রধান এবং বিজ্ঞানোন্নত জাতিতে পরিণত ক'রে তোলার জন্য স্টালিনের এই আরণ্যক বর্বরতার প্রয়োজন ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কয়জন স্টালিনের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং হয়ত বা এখনও কয়জন আছে—তারা আজও ভারতের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে সম্মান-জনক আসন পায়নি! তারা বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের কালে যখন স্টালিনের ছবি কাঁধে তুলে এপাড়া ওপাড়ায় হুজুগ বাধিয়ে তুলত, তখন ভারতের মন তাদের এই বিজাতীয় বিধর্মীয় এবং অশ্রদ্ধেয় আচরণ লক্ষ্য করে কৌতুক এবং ঘৃণায় ভরে উঠত! কিন্তু দোল-পূর্ণিমার রাত্রে হোলির রংয়ের বদলে এক শ্রেণীর মাতাল যেমন নর্দমার কাদা ছোড়াছুড়ি করে এবং পরদিন নেশা কাটবার পর আপন আপন দেহের দুর্গন্ধে নিজেরাই অপমানিত বোধ করে, এদের সেই দুর্দশা দেখে ভারতবাসী অসীম বেদনা ও করুণায় চুপ করে স্নেহের হাসি হাসত।

মস্কোর রাজপথে আমোদ-প্রমোদ বা কোলাহল কলরবের উচ্চগ্রাম নেই। মেলা নেই, মিছিল নেই, রসোচ্ছলতা নেই, হৈ-চৈ, রৈ-রৈ কিছু নেই। আমি আসছি 'মিছিল শহর' কলকাতা থেকে। সেখানে রাজপথে সাপ খেলায়, পায়ে ঘুঙুর চোঙা ফুঁকে সাড়ে-বত্রিশ ভাজা বিক্রি করে, নয়া পয়সা নিয়ে স্টেট বাসে মারা-মারি বাধায়, গরু বাঁচাতে গিয়ে বুড়ির ওপর দিয়ে মোটরের চাকা চলে যায়, পথে পথে নিলাম হাঁকে, ফুটবল-ক্রিকেটের মরশুমে উন্মত্ত অসভ্যতায় গগন-পবন মুখরিত হয়,—আমি আসছি সেই আজব শহর থেকে। এখানে দেখছি সমস্তটা চঞ্চল, কিন্তু গম্ভীর। প্রতি পদক্ষেপ বলিষ্ঠ, কিন্তু আত্মগত। হাজার হাজার নরনারী পেরিয়ে যাচ্ছে এদিকওদিকে কেমন যেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে। কেউ কোথায় হেসে গ'লে পড়ছে না, কেউ তর্ক বাধিয়ে তুলছে না, পথ আটক ক'রে কেউ গল্প করছে না। অতিশয় ভদ্র সবাই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী যেন নিয়মতান্ত্রিক। বিন্দুমাত্র অশান্তি দেখছিনে কোথাও, ঈষন্মাত্র অভব্যতা চোখে পড়ছে না। এমন কঠিন, বলিষ্ঠ, গম্ভীর এবং স্বাস্থ্যময় জনসাধারণকে দেখার অভ্যাস নিয়ে আমি আসিনি।

ঠাণ্ডা প্রচুর। রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে আকাশ মেলানো। শুভময় আশা ও সদ্ভাবের সঙ্গে এপাড়া ওপাড়া ঘুরেছিলুম। হাঁটছি অনেক দূরে। মস্কো শহর নতুন এবং পুরনোয়-মেশানো। পুরনো অংশগুলি আমাদের ধর্মতলা বৌবাজার এলিয়েট রোডের চেয়ে উন্নত নয়, এবং পুরনো মস্কোই রুশজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস বহন করে। ওরই মধ্যে বাস, ট্রলিবাস, মোটরকার বা ট্যাক্সি। ওরই মধ্যে ছুটোছুটি করে রাস্তার এপার ওপার হওয়া, জল-কাদার ছোপ মাড়ানো, এবড়ো-খেবড়ো সঙ্কীর্ণ ফুটপাথে হোঁচট খাওয়া জনতার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া! এধারে ওধারে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জলের পাইপটি নেমে এসেছে ফুটপাথের ওপর, পথচারীর পায়ের তলা দিয়ে সে জল ফুটপাথের ওপর দিয়েই গড়াচ্ছে, এটি অতিশয় বিরক্তিকর এবং অশোভন। পুরনো শহর, বাজার নিতান্তই ঘিঞ্জি, বহুস্থলে আমাদের বড়বাজারের অলি-গলি, বহু পুরনো অতি সাধারণ বাড়ির দেওয়ালের চাপড়া খসে গিয়ে ভিতরের কাঠের জালি এবং বদ রং বেরিয়ে পড়েছে। ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথায় যেমন ভিন্ন কাপড়ের তালি পড়ে এখানে ওখানে! কিন্তু আনন্দের কথা এই, পথে রিক্সা গরুর গাড়ি নেই, নেড়ি কুকুরের দল জঞ্জাল শুঁকে বেড়ায় না, ধর্মের ষাঁড় পথ অবরোধ করে না, নোংরার রাশির মধ্যে কোনও ভিখারী খাদ্যবস্তু খোঁজে না, উনুনের ছাই ফেলার মধ্যে বসে বালক বালিকা পোড়া কয়লা বাছে না, কাঁধে চটের থলি ঝুলিয়ে কেউ পচা নর্দমা থেকে ময়লা কাগজ কুড়োয় না! পুরনো মস্কোর সর্বত্র বহু জরাজীর্ণ এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহস্থপল্লী থাকা সত্ত্বেও পথ-ঘাট মোটামুটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন!

মস্কো দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ আজ যেমন ঢুকেছে হোটেলের মধ্যে, পারিবারিক জীবন ভেঙে দিয়ে যেমন সে একক ইউনিট নিয়ে এক হোস্টেল থেকে অন্য হোটেলে ঘুরে বেড়ায়, যেমন সে শৃঙ্খল-হীন এবং শিকড়বিহীন,—সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং মস্কোয় সেটি নেই, হোটেলে বসবাস রুশজাতি পছন্দ করে না। রুশরা পছন্দ করে ঘর, গৃহস্থালী, কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা, পাড়া-প্রতিবেশীর সমাজ, সুখ-দুঃখের সঙ্গী, মেয়ের জন্য জামাই পছন্দ করা, পুত্রবধূকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ—ইত্যাদি সামাজিক জীবন। রাশিয়ার প্রকৃতি অত্যন্ত সংরক্ষণশীল,—এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি নৈতিক শাসনের সীমা নেই। হাজার হাজার পরিবার আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে যারা ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি পিসি,—এদের সবাইকে নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করছে। বুড়ো বাপ সামান্য পেন্সন পায়, বৌদিদি মাষ্টারি করে, ভগ্নি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বড়দা কাজ করে অমুক আপিসে, মা রান্না করেন, ঠাকুমা মাঝে মাঝে থলি ঝুলিয়ে বাজার যান, বিধবা পিসি আমাদের এখানে থাকেন,—এমন পরিবার প্রতিপদক্ষেপেই মিলবে! আমাদের দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানা বিধবা, একটিমাত্র তাঁর কন্যা,—তিনি কন্যা-জামাতাকে নিয়ে একটি সরকারি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। জামাই চাকরি করে, মেয়েটি শুধু ঘরকন্না দেখে। শ্রীমতী মীরা—যার অপর একটি নাম মেরিয়ম তিনি এবং তাঁর স্বামী জর্জ,—যে-ছোকরা আমাদের সঙ্গে তাসকন্দ-বিলিসিতে দোভাষী ছিল,—দুজনেই চাকরি করে। কালেরিয়া অতিশয় স্বামীগতপ্রাণা,—স্বামীনিন্দা শুনলে দক্ষযজ্ঞে 'সতী' দেহত্যাগ করতে পারেন, এই ছিল আমাদের ভয়।

মস্কোর উপর দিয়ে তুহিনকণাযুক্ত বায়ুতরঙ্গ বইছে। বাইরের চেহারা দেখলে ভয় করে। কিন্তু মস্কোবাসীরা হাঁটতে বেশি ভালবাসে। মেয়ে-পুরুষ-বালক-বালিকা বাইরের দুর্যোগের পরোয়া করে না। প্রত্যেকের গায়ে ওভারকোট। পুরুষের মাথায় টুপি, মেয়ের মাথায় গরম ওড়না বাঁধা। ওরা চওড়ায় যতটা, লম্বায় ততটা নয়। মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে পুরুষমাত্রেরই দুর্ভাবনা আসে, এবং চর্বি দেখলে মন শঙ্কিত হয়। প্রতিদিন তিনটে ক'রে সম্পূর্ণ খোরাক, কারো কারো চারটে,—কেউ বা পাঁচবার পেট ভরায়। ওরা খায় বড় বড় ফালার চমৎকার রুটি, কুচিমাংস মেলানো আনাজের ঝোল,—তার উপরে ক্রীম, তার সঙ্গে উপাদেয় শুকর-মাংসের চাকলা, এবং তার সঙ্গে শাক, শশা, টমাটো, আপেল, মাখন বা চীজ। সর্বাপেক্ষা সুলভ, শুকরের মাংস। ওদের ধারণা, শুকরের মাংসের যে বড়া তৈরি হয় তার মতো উপাদেয় এবং খাদ্যপ্রাণ আর কিছু নয়। এ মাংস সর্বসাধারণের পাতে পড়ে। অনেক মেয়ের স্বাস্থ্যলাবণ্যের উপর শ্বেতশুকরের দেহপেলবতার ছায়া

দেখেছি! কিন্তু প্রতিদিন ঝুড়ি কোটি নরনারী প্রতিদিন তিনবার মাংস বা মাংসমিশ্রিত ভোজ্যসামগ্রী খাচ্ছে,—এবং এত মাংসের জন্য কত সংখ্যক জন্তু বধ করা হচ্ছে, এটি ভেবে যেন কূলকিনারা পাইনে।

হোটেলের মধ্যে এসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নাটাশা যেমন ভারতীয় গোষ্ঠিকে বাকচাতুর্যের দ্বারা আনন্দদানের কাজে ব্যস্ত, শ্রীমতী লিডিয়া তেমনি আমাদের তদ্বির তদারকে হন্তদন্ত। কে কি খাবে, কে কোথায় যাবে, কা'র কোন্ সামগ্রী দরকার, কেউ ওভারকোট ভুলে গেল কিনা, কেউ চায়ের বদলে কফি চায়, কারো ধোবা-নাপিত-মুচির দরকার, কেউ চাইছে অমুক ঠিকানার নির্দেশ, কেউ সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট খোঁজ করছে, কেউ ভারতীয় টাকার বদলে রুবল চায়, কা'র কা'র বাড়িতে চিঠি পাঠানো দরকার,—আমি দেখছিলুম শ্রীমতীর রুদ্ধশ্বাস কর্মব্যস্ততা! চারিদিকের এবম্প্রকার হায়রানির মধ্যে তাঁর নিরলস কর্মপটুতা আমার পক্ষে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। তিনি যেন আমাদের সকলের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাটা সস্নেহ হাসি-পরিহাসের সঙ্গে সাদরে গ্রহণ করছিলেন। অনুমানে বুঝতে পারা যায়, লেখকসঙ্ঘের দোভাষিণীর কাজটি তাঁর পক্ষে নতুন। পরে জেনে-ছিলুম অনুমান আমার মিথ্যা নয়। তিনি বাইরের লোক।

এক সময় এগিয়ে এসে তিনি বললেন, ফরেন্ লিটারেচার ম্যাগাজিন থেকে আপনার খোঁজ করছিল। আপনার লেখার জন্য সেখানে আপনার টাকাও পাওনা আছে। আপনি প্রস্তুত থাকলে আমি নিয়ে যেতে পারি।

চলুন, যাবো।

গহনার গন্ধে মেয়েমানুষ এবং টাকার গন্ধে মানুষ চঞ্চল হয়। কিন্তু আমি ইতি-মধ্যেই কিছু 'টাকা' অর্থাৎ রুবল পেয়েছিলুম। তাসকন্দে থাকতে তারাশঙ্করের জবানীতে ছোট ছোট দু' একটি লেখা লিখতে হয়েছিল। সেগুলি এখানকার ইংরেজি "সোভিয়েট লিটারে-চারে" এবং তাদের রুশ অনুবাদ বুঝি অন্যত্র ছাপা হয়েছে। সে-টাকা তারাশঙ্কর আমার নামে 'উইল' ক'রে যাবার ফলে আমার বর্তমান অবস্থা সচ্ছল!

শ্রীমতী লিডিয়ার কল্যাণে একটি মাসিক পত্রের আপিসে এসে ঢুকলুম। এখানকার কর্তা হলেন সেই আমাদের চেকভপন্থী,—সেই পাতলাছিপ্‌ছিপে বুদ্ধিমান মানুষটি,—যাঁর সঙ্গে তাসকন্দে আলাপ। তাঁর আপিস-বাড়িটি পুরনো আমলের এক গৃহস্থের। সেই গৃহস্থের কাছ থেকে এটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিনা জানিনে। তবে মস্কোতে এমন বহু শত বাড়ি আছে যেগুলি গভর্ণমেন্ট দখল করেছেন। যাই হোক, সঙ্কীর্ণ কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে উপরতলার একটি কক্ষে এসে দেখি, মস্ত আপিস, এবং সেখানে প্রায় সবই মেয়ে। সবাই যে-যার নিজের টেবিলে বড় বড় ফাইলের গোছা সামনে নিয়ে কাজে ব্যস্ত। সকাল ন'টায় আসে, একটায় 'ডিনার', পাঁচটায় ছুটি। এই কক্ষে ব'সে অন্তত ১৫টি মেয়ে কাজ করছে। শ্রীমতী লিডিয়ার আলাপের পর একটি স্বাস্থ্য-বতী মেয়ে ফাইল থেকে একটি কাগজ বার ক'রে দিল। সেই কাগজটি উনি এসে ক্যাশ-কাউন্টারে দিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাউন্টারের গর্তটি দিয়ে আমার জন্য একটি রসিদ বেরিয়ে এল। আমি তা'র ওপর একটি সই ক'রে দিলুম। অতঃপর আধ মিনিটের মধ্যে গর্তের ভিতর থেকে একখানি নধর ও সুকোমল হাতের সঙ্গে এক গোছা 'লেনিন মার্কা' বড় ও ছোট নোট এবং কয়েকটি ছোট বড় কোপেক মুদ্রা বেরিয়ে এল। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, আপনাকে চারশ' একানব্বই রুবল এবং তেতাল্লিশ কোপেক দেওয়া হয়েছে! আট রুবল এবং সাতান্ন কোপেক ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দিলেন!

আমি গুণে নেবার চেষ্টা পাচ্ছি দেখে তিনি পুনরায় হেসে বললেন, না গুণলেও পারেন! এখানে ওটার দরকার নেই!

যিনি টাকা দিচ্ছেন তাঁর সামনে গুণে নেওয়াটা যে উভয় পক্ষেই অসম্মানজনক এটি আমার আগে জানার দরকার ছিল! এরপর অনেকবার অনেক রুবল রোজগার করেছি,—এবং তা'র পরিমাণ বহু সহস্র, অনুরোধ ছাড়া কিন্তু আর কখনও গুণে নিইনি। পরে হিসাব মিলিয়ে দেখেছি নির্ভুল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে কারোকে গুণতে দেখিনি, কিন্তু টাকা গচ্ছিত রাখার সময় ব্যাঙ্কের মেয়েরা সব সময় গুণে নেয়! চেক-এর ব্যবহার নেই। সর্বত্র নগদ কারবার। যারা টাকা তোলে, তা'রা একটি ছোট্ট ছাপা কাগজ ব্যাঙ্ক থেকে পায়,—সেইটিতে টাকার অংকটি লিখে সই ক'রে দিতে হয়। তার সঙ্গে পাসবইটি। সই মিললেই টাকা! একই দিনে যখন-তখন টাকা তোলা যায়। এক একজনের নামে হাজার হাজার বা লক্ষাধিক রুবল ব্যাঙ্কে খাটছে। বহু শত লোক বাড়িভাড়া পায়,

তাদের টাকাও ব্যাঙ্কে খাটে। মস্কোতে অমন হাজার হাজার বাড়িওয়ালা আছে যারা বিশেষ কমিটির নির্দেশক্রমে নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কে ভাড়াটে বসায়। বাড়িওলার অনাচার আমি শুনিনি, এবং ভাড়াটেরা কথায় কথায় বাড়িওলার বিরুদ্ধে মামলা করতে ছোটে না। কমিটি আছে মাঝখানে দাঁড়িয়ে। জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে হয় একটি কমিটি, আর নয়ত একটি ইউনিয়ন জড়ানো। এরা পার্টিরই অঙ্গ। মস্কোর জনসংখ্যা মোট পঞ্চাশ লক্ষ এবং শহরতলী ও শিল্পাঞ্চল যোগ করলে নব্বই লক্ষ হয়। এর মধ্যে শতকরা চল্লিশজন পার্টির সভ্য। বাকিরা জনসাধারণ। সোভিয়েট ইউনিয়নে মৃত্যুসংখ্যা কম নয়। হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা বসন্ত—এগুলি এখন নেই বললেই হয়। খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি কাকে বলে ওরা জানে না, কিন্তু ক্যান্সার অসুখ এখনও যথেষ্ট। ওটার ভয়ে বহুলোকেই ভীত। মানুষের মৃত্যু ঘটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব দাহ করা হয়।—আমি শ্মশানে গিয়ে দেখছি! কবরের তলায় পুঁতে ফেলাটা ইচ্ছাধীন। ওখানে এখন ফাঁসী বা 'ইলেকট্রিক চেয়ার' নেই। অপরাধীকে গুলী ক'রে মারা হয়। লেনিনকে যে-মেয়েটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গুলী ক'রে আহত করেছিল, তার নাম শ্রীমতী কাপলান। তাকে গুলী ক'রে মারা হয়। সব সময়েই পিছন থেকে গুলী করার নিয়ম! এখানকার সংবাদপত্রে সামাজিক অপরাধের খবর ছাপা হয় না। কুরুচিপূর্ণ, রুচিবিগর্হিত, অশ্লীল বা নোংরা উত্তেজনা আনে—এমন কোনও খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সোভিয়েট ইউনিয়নে নিষিদ্ধ।

আজ সন্ধ্যায় ভারতীয় দূতাবাসে মাননীয় শ্রীযুক্ত কে-পি-এস মেনন ভারতীয় লেখকগণকে একটি সংবর্ধনা দেবেন। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলুম পথে-ঘাটে। আমার উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাথের কোনও রোয়াকে বসে থাকব, টমাটো জুস কিনে খাব কোথাও, খবরের কাগজের স্টলে দাঁড়াব, পথে-পথে মেয়েপুরুষ হৈ-হল্লা বা বেহায়াপণা করে কিনা দেখব, পুলিশের কাজ লক্ষ্য করব, হোটেলের কফি ও 'শামুসা' ওরফে 'শিঙাড়া' কিনে খাব।

অর্থাৎ 'রথ দেখব' এবং 'কলা বেচব'! কিন্তু সর্বাপেক্ষা অসুবিধা—ঠাণ্ডা। এমন ঠাণ্ডা যে, বাইরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না! শরীর সচল না রেখে উপায় নেই।

যখন ফিরলুম, দেখি ভারতীয়রা কেউ নেই। আমার খোঁজ পড়তে পারে সেটি ভেবে আড়ষ্ট বোধ করলুম। তা ছাড়া আমাদের দূতাবাসের খাতায় এখনও নাম সই করিনি, এটি অন্যায়। লিডিয়া বললেন, বেশত, আপনি সেখানে যান, আমি ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি।

একা কেমন ক'রে যাব? আপনি সঙ্গে চলুন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে উনি আমার সরলতা অথবা অজ্ঞতা—ঠিক কোন্‌টি লক্ষ্য করলেন বুঝলুম না। শুধু বললেন, অন্যের দূতাবাসে আমাদের যেতে নেই! চলুন, আপনার জন্যে ট্যাক্সি ডেকে দিই—।

ওভারকোট কাউন্টারের কাছে এসে তিনি বললেন, ওভারকোট না নিয়ে বাইরে যাবেন না। আমারটা নিয়ে যান—।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করলুম, তিনি নিজেও তাঁর ওভারকোটটি গায়ে চড়ালেন না। আমার সঙ্গে সেই ভরসন্ধ্যার কঠিন ঠাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন। অদূরে সবুজ আলো-জ্বালা একটি ট্যাক্সি আমাদের দেখে এগিয়ে এল, এবং তিনি যথোচিতভাবে সেই ড্রাইভারকে বহুবিধ নির্দেশ দিলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সিভাড়া মোটামুটি এক কিলোমিটারে এক রুবল পড়ে। ট্যাক্সিওলাকে বকশিস নিতে দেখেছি অনেকবার, কিন্তু কখনও বকশিস চেয়ে নেয়নি। ট্যাক্সিওলার কাছে রুবল ভাঙিয়ে কোপেকগুলি অনেকেই ফিরে চায় না। আরোহীর সঙ্গে ড্রাইভারের এমন একটি সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঘটে যায়, যেটি লক্ষ্য ক'রে অনেক সময় আনন্দ পেতুম। শতকরা ৩০ ভাগ ট্যাক্সিচালক হল মেয়ে! বাস-কন্ডাকটর মাত্রই মেয়ে। মেয়ে ছাড়া কোনও দোকান নেই!

মস্কোর প্রশস্ততর রাজপথ হল 'মুয়ে গোর্কি', অর্থাৎ গোর্কি স্ট্রীট। এটি পরলোকগত ম্যাক্সিম গোর্কির নামে উৎসর্গীকৃত। প্রায় সকল সময়েই এই রাস্তা দিয়ে আমাদের আসতে যেতে হয়। এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপারের লোককে একটু ছোট দেখায়। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য পথের মাঝখানে বহু উঁচু শূন্যে লাল নিশানা দেওয়া হয়,—দূরের থেকে সর্বাগ্রে যেটি চোখে পড়ে। মোটরের প্রত্যেক ড্রাইভার অতি সাবধানী ও সতর্ক। যদি কখনো কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে তবে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে অথবা গাড়ি নিয়ে পালায় না! দুর্ঘটনা ঘটলে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও শহরে জনতা উত্তেজিত হয়ে ড্রাইভারকে ধরে ঠ্যাঙায় না, কিংবা গাড়িখানাকে ভেঙে নিকেশ করে না। ড্রাইভার আহত অথবা মৃত ব্যক্তিকে গাড়িতেই তুলে নেয় এবং পথচারীরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। ড্রাইভারের অপরাধ প্রমাণিত হলে তার সশ্রম কারাবাস ও জরিমানা হয়। কোনও ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে এটি প্রমাণিত হলে তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। আমি প্রথম দফায় তিন সপ্তাহকাল মস্কোয় ছিলুম, কিন্তু একটিও মোটর দুর্ঘটনার খবর পাইনি।

কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এসে থামলুম, কিছু বুঝতে পারলুম না। আন্দাজে পাওয়া গেল আট থেকে দশ মাইল পথ। এটি পুরনো মস্কো, এবং ভারতীয় দূতাবাসের বাড়িটি পুরনো কালের হলেও মস্ত বাগানবাড়ি। ফটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সশস্ত্র রুশ পাহারা। আমার ট্যাক্সিভাড়া হয়েছে আঠারো রুবল। দুখানা দশ রুবলের নোট দিয়ে দুটি রুবল তাকে বকশিস দিতে গেলুম, লোকটা হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে গেল।

রুশ প্রহরী আমাকে ভিতর দিকের পথটি সহাস্যে দেখিয়ে দিল। আমি ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছি, তখন এক ভদ্রলোক দ্রুতপদে নেমে আসছিলেন। তিনিই মিঃ মেনন। মুখখানি সুশ্রী নয়, কিন্তু ব্যবহার অতি শোভন ও ভদ্র। তিনি প্রসন্নহাস্যে আমার হাতখানা ধ'রে আবার ওপরে উঠে এলেন এবং বৃদ্ধ সর্দার গুরবাক সিংয়ের কাছে আমাকে গচ্ছিত ক'রে দিয়ে গেলেন। তাঁকে বিশেষ কাজে এখনই বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। এখানে আমাদের জলযোগের আয়োজন ছিল।

যেখানে বসেছিলুম, সেই ভারতীয় দূতাবাসটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন যখন মস্কো অধিকার করেন, তখন এই বাড়িটি তাঁর বাসস্থান ছিল! এই বাড়িটি একটি অনুচ্চ উপত্যকার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঠিক যেমনটি ছিল, আজও তেমনি আছে। অদল-বদল কিছুই হয়নি। আমাদের সামনের এই জানলাটির ধারে দাঁড়িয়ে এই উপত্যকার উপর থেকে নেপোলিয়ন সেদিনকার সেই প্রাচীন মস্কো নগরীর

চেহারা দেখছেন, এবং এই বাড়ি থেকেই তাঁর হুকুমনামা নিয়ে ফরাসী সৈন্যরা সমগ্র মস্কো নগরীতে আগুন জ্বালায়, ক্রেমলিনের একটা অংশ পোড়ায়, এবং তাদের সেই অগ্নিকাণ্ডে মোট আড়াই হাজার প্রস্তর-প্রাসাদ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়। সেই জানলায় দাঁড়িয়ে আজ আমি দেখলুম, সমগ্র বিরাট মস্কো নগরীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লক্ষ লক্ষ প্রদীপের মালায় চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যাকেও উদ্ভাসিত করেছে। আজ শুক্লা একাদশী, রাত্রি বড় সুন্দর!

সেদিন সন্ধ্যার পরে সদলবলে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম মস্কো আর্ট থিয়েটারের নীলাভ অট্টালিকার সামনে। এটি পুরনো কালের এবং সবাই বলে এটির খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। পৃথিবীর কোনও দেশে রুশ থিয়েটারের জুড়ি নেই, এটি নাকি সর্বজনজ্ঞাত। রুশ থিয়েটর হল রুশজাতির অপরাজেয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মুকুর। এই থিয়েটারের আদি নাম 'মস্কো একাডেমিক আর্ট থিয়েটার', এবং এর বর্তমান পরিবর্তিত নাম 'গোর্কি থিয়েটার'।

পুরনো মস্কোর পথঘাট মাত্রই অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ এবং যানবাহন ও জনতায় পরিপূর্ণ। এই পথের উপরেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার—এক কালে যেটির থেকে কলকাতার 'ষ্টার থিয়েটারের' নামের হেরফের করা হয়। কিন্তু বাইরে থেকে এর প্রকৃত চেহারাটি বুঝবার উপায় নেই। না আছে তেমন আলোক-সজ্জা, না বা বিজ্ঞাপনের 'চিৎকার'। সিনেমাতেও এই। কোথাও পথের দেওয়ালে বিজ্ঞাপন নেই! সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও শহরের কোথাও নারীর আনগ্ন দেহ-সৌষ্ঠবকে কোনও বিজ্ঞাপন বা প্রাচীরপত্রে দেখানো হয় না! এটি নাকি সোভিয়েট নীতিবিরুদ্ধ। ওদের বিশ্বাস, যৌন আবেদন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আবেদন! মেয়েদের যৌবনশ্রী উপার্জনের মূলধন নয়।

ভিতরটি জনতা পরিপূর্ণ। সমগ্র অন্দরমহলটি পুরনো কালের, এটি প্রথমেই বুঝতে পারা যায়। বাঁ-হাতি ওভারকোট কাউন্টার। প্রতি জায়গায় প্রতি প্রতিষ্ঠানে প্রতি আপিসে প্রতি রঙ্গালয়ে —কোট খোলো, টোকেন্ নিয়ে কোট জমা দাও, আবার পরে সেই কোট ফিরিয়ে নিয়ে গায়ে চড়াও! বহুস্থলে কাউন্টারের লোক কোটটি গায়ে চড়িয়ে নিতে সাহায্য করে। এই সামান্য কাজে সর্বত্র হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ প্রতিপালিত হচ্ছে।

আমার ওভারকোট নেই। কিন্তু আমার সামনে ছিলেন কেরালার সেই কমিউনিষ্ট প্রফেসর মিঃ দামোদরন, যিনি কারোকে বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই তাসকন্দ থেকে হঠাৎ একদিন মস্কো এসে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন। তাঁর জন্য একজন পৃথক দোভাষিণী। দামোদরণ পৃথক টেবলে বসে খান্ আমাদের কাছ থেকে দূরে। আমাদের সঙ্গে তিনি তেমন বাক্যালাপও করেন না। তিনি কখন আসেন, কখন এবং কোথায় যান্, কোন্ কাজে ঘুরে বেড়ান, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কি প্রকার যোগাযোগ, —এ আমরা কিছুই জানিনে। প্রথম দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, শুভময় ঘোষের নামে আমার চিঠিখানা কি তাঁকে দিয়েছিলেন?—তিনি মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা ক'রে বললেন, মনে ছিল না!

তাহলে ওখানা আমাকে ফেরৎ দিন? খুঁজে দেখব!

আমি আজ সেই দামোদরনের ঠিক পিছনে পড়েছিলুম। তিনি যখন ওভারকোট কাউণ্টারের সামনে তাঁর জামাটি খুলতে গেলেন, তার ঝাপটায় হঠাৎ আমার চশমা জোড়াটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গেল। অপরাধ তাঁর নয়, এ রকম দৈবাৎ ঘটনা ঘটেই থাকে। চশমা তুলে আমি দেখলুম, দুখানা কাচই ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ঈষৎ হাস্যে আমি যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, তিনি বললেন, আমি কি করব? আমার কি দোষ?

দামোদরন এগিয়ে গেলেন। ভাঙা চশমা তুলে নিয়ে আমিও ভিতরে ঢুকলুম। ঘটনাটা সামান্য। অপরাধ আমারই,— আমিই ছিলুম কমিউনিষ্ট কেরালার ঠিক পিছনে। কিন্তু দামোদরণ একটুকু দুঃখ প্রকাশ বা বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করে গেলেন না, এইটুকু আমার কাছে বিস্ময়।

'মস্কো ব্যালে' মস্কো আর্ট থিয়েটারে হবার কথা নয়। বলশয় থিয়েটার-এর বাড়িটি সম্প্রতি মেতামত করা হচ্ছে, এবং সেখানকার দলবল এখন বাইরে-বাইরে ঘুরছে। এই কারণেই এই থিয়েটারে 'ব্যালে' অভিনীত হচ্ছে। ভিতরে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। প্রতি সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা হাউস, সার্কাস গৃহ,— প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন সর্বত্র জনপরিপূর্ণ থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও নগরে বা গ্রামে কোনও প্রমোদ-ভবন জনস্বল্পতায় অর্ধশূন্য থাকে না। টিকিট কাটতে হয় দুদিন, তিনদিন, সাতদিন বা পনেরোদিন আগেও। স্পোর্টস স্টাডিয়ম, সুইমিং পুল, যাদুঘর, চিত্রশালা, চিড়িয়াখানা, গ্রন্থাগার, প্রতি দোকান বাজার, ইউনিয়নগুলির ক্লাব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি রেস্তোরা—সব সময় লোকারণ্য। সর্বাপেক্ষা জনবিরল হল পার্ক এবং বন-বাগান। ঠাণ্ডার ভয়ে সেদিকে বিশেষ কেউ এগোয় না!

আমাদের সামনে মস্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে "হংস সরোবরের" নৃত্য। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'সোয়ান্ লেক

ডান্স'। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া এটি নাকি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। মঞ্চের উপর চতুর্দিক অরণ্যসমাকীর্ণ, প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ! সেখানকার নির্জন একটি সরোবরের সলিলে একটি কিংবা দুটি হংস এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বনহংসী রমণীয় নৃত্যে আত্মহারা! এটি পরিকল্পনা করেছেন রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার চেকভস্কি। এর মধ্যে একটি কাহিনী লুক্কায়িত, সেটি ক্বচিৎ কলকাকলীর মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। সেই কাহিনীটি কি,—পাশ ফিরে দোভাষী অথবা দোভাষিণীকে আমি প্রশ্ন করিনি। দোভাষীরা পাশ থেকে যখন কানে-কানে চুপি-চুপি কথা কয়, আমি ভয় পাই। ওরা অনেক সময় উত্তমরূপে দাঁত মাজে না বা জিভ ছোলে না! কিন্তু মেয়ে-দোভাষীরা অতি সতর্ক এবং সজাগ। রুশ মেয়ের ভিতর-বাহির অতি পরিচ্ছন্ন। আমাদের কয়েকজনের কাছাকাছি শ্রীমতী কালেরিয়া ও মীরা বসেছিল।

আমার চশমার কাঁচ ফুটিফাটা। কিন্তু লং-সাইট বলেই ভাল দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "চল্লিশের পর দূরের দৃষ্টি স্পষ্ট ও ভীষণ হয়, কাছের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যায়!' হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল মহাকবির কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন,—তবে ষষ্ঠ মহাদেশ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন কিনা এখনই মনে পড়ছে না। তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য মস্কোতেও ঘুরে গেছেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও নৃত্য-গীত, বল্‌ডান্স, অপেরা ইত্যাদির যথেষ্ট সুখ্যাতি এবং যথোচিত উল্লেখ তাঁর কোনও রচনায় করেছেন কিনা, এটিও তেমন আমার মনে পড়ছে না। বরং দক্ষিণ প্রাচ্যের নৃত্য-গীতাদির সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তির কথা শুনেছি। কেন এমনটি ঘটল, এটি ভাবছিলুম 'হংস সরোবরের' দিকে তাকিয়ে। রুশনৃত্যের আঙ্গিক বা শৈলী আমার জানা নেই। চোখের সামনে যেটি দেখছি, সেটি দৃশ্যতঃ পরম রমণীয় এবং উপাদেয়, কিন্তু কার্যতঃ সেটি কলাকৌশলপূর্ণ দুরন্ত ব্যায়ামক্রীড়া বা জিম্‌নাস্টিক্‌। প্রত্যেকটি হংসীর পাখা উঁচু হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে-পাখা বন্ধ হয় না। হংসীদলের অধোমাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন কিনা এটি দূরের থেকে নিরীক্ষণ করার জন্য অনেকে তিন রুবল ভাড়া দিয়ে কাউন্টার থেকে এক একটি বায়নোকুলার সঙ্গে এনেছেন। সেই সকল হংসীর এক একটিকে উঁচিয়ে এবং ঘুরপাক খাইয়ে কোলে, পিঠে, পায়ে, মাথায় এবং দেহের নানা আঁকে-বাঁকে যেভাবে মোচড়ানো, দোলানো, মচ্‌কানো এবং ঘোরানো হচ্ছে সেটি দ্রষ্টব্য। এই সকল কর্ম যিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন, তিনি পুরুষ-হংস। হংসীগণের লজ্জাঙ্গ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা আমার দেখতে বাকি ছিল! কিন্তু দর্শক সাধারণ যে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত (warmed up) হয়ে উঠেছেন, তাঁদের মুহুর্মুহু করতালিধ্বনিতে সেটি বুঝতে পারা যায়। শুধু হংসীনৃত্য হলে হয়ত মেয়ে-দর্শকের পক্ষে হাততালি দিতে বাধবে; শুধু হংস পুরুষদর্শকের দু'চোখের বিষ! সুতরাং মঞ্চের উপরে পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতিকে এনে উভয়ের শৃঙ্গার-কৌতুক দেখা দরকার বৈকি। এই 'হংস-সরোবর'-এর স্বপ্নিল এবং অপরূপ নিসর্গশোভার মধ্যে সর্বপ্রধান যে-ব্যঞ্জনাটি প্রকাশ পায়, সেটি হল দর্শক-সাধারণের মধ্যে যৌন-চৈতন্যের একটি মনোরম উত্তাপ সৃষ্টি করা! আমার বিশ্বাস, শীতপ্রধান দেশগুলিতে এদের প্রয়োজন আছে।

ঠিক মনে পড়ছে না, আর্ট থিয়েটারের টিকিটের দাম বোধ হয় সাত থেকে প'য়ত্রিশ রুবল পর্যন্ত। টিকিট এবং দর্শকের শ্রেণীবিভাগ আছে বৈকি, কেন না শ্রেণীবিভাগ সর্বত্রই। দর্শক সাধারণের পোষাক ও পরিচ্ছদ যথেষ্ট মূল্যবান,—এ বিষয়ে মধ্যএশিয়া ও মস্কোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এটি রাজধানী,—ভদ্র, গম্ভীর, সংযত, স্বল্পবাক এবং সচ্ছল—এটি ভুললে চলবে না। সমগ্র মধ্যএশিয়াকে এই রাজধানীই টেনে তুলেছে তার ধূলো-বালি ঝেড়ে—এটিও মনে রাখা দরকার। দেশভেদ, আবহভেদ, রুচি ও প্রকৃতিভেদ, অবস্থাভেদ—এগুলি স্মরণীয়। কিন্তু আমি নিজে মধ্যএশিয়ার নৃত্যগীত দেখে অনেক বেশি অভিভূত হয়েছিলুম। তাদের মধ্যে ছিল প্রকৃত প্রাণসত্তা, গভীরতর একটি ব্যঞ্জনা, একটি অতি মধুর শরমজড়িত ভাব, সংযত এবং সুশোভন পরিচ্ছদ ও প্রকাশভঙ্গী। হয়ত 'শান্তি নিকেতনের' নাচগান ও গীতি-নাট্যাদির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বের দরুণ আমি এই সৌন্দর্যময় মস্কো ব্যালে-কে ঝাপসা চোখে দেখেছিলুম, চশমা আমার ভাঙ্গা ছিল।

মস্কো রেডিয়োর বিশাল অট্টালিকাটি নতুন আমলের নয়। এটি পুরনো মস্কোর একটি অঞ্চলে। সেদিন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "কি ভাগ্যি চেঙ্গিস খানের আমলে টেলিফোন ছিল না! থাকলে সর্বনাশ হয়ে যেত!" মস্কো রেডিয়োর বাড়িতে এসে ভাবছিলুম, কি ভাগ্যি জারের আমলে 'আকাশ বাণী' ছিল না! থাকলে শত শত 'সোভিয়েট ক্লাবের' সেদিন সর্বনাশ হয়ে যেত! ইংরেজ আমলে ভারতে মোটর, রেলপথ, টেলিফোন, বিমান, রেডিয়ো, রেডিয়োগ্রাম, সামুদ্রিক কেব্‌ল্‌—প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হাতে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসী ভারত লড়াই করেছে তাদের বিরুদ্ধে। জারের আমলে বৃহত্তর রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা অতিশয় আদিম এবং অকিঞ্চিৎকর থাকার জন্য বিপ্লববাদীরা আত্মগোপনের সুবিধা পেয়েছিল প্রচুর। তাদের পক্ষে প্রচারের সুযোগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণ। ধরা পড়ে মার খেয়েছে এবং উৎপীড়িত হয়েছে যত, তার চেয়ে অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র তাদের পক্ষে ছিল দেশজোড়া। ভারতের কন্‌গ্রেসকে লড়াই করতে হয়েছে অনেক বেশি বিজাতীয় এবং বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে।

শ্রীযুক্ত বিনয় রায় মস্কো রেডিয়োর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তানে স'রে গিয়ে বোধ করি মুসলমান নামাঙ্কিত ছাড়পত্র সংগ্রহ ক'রে নয় বৎসর আগে মস্কোয় আসেন। আমি তাঁর অমায়িক মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কন্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত চট ক'রে যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। তিনি অতি পরিচ্ছন্ন রুশ ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে পারেন। সম্ভবতঃ কোনও এককালে তিনি কমিউনিস্টপন্থী ছিলেন, এবং ইন্ডিয়ান্‌-পীপ্‌ল্‌-থিয়েটারের একজন সুদক্ষ শিল্পী বলে পরিচিত। তিনি বহু সরকারি মহলে এবং ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিব্যক্তির নিকট প্রিয়। মস্কো রেডিয়োর বাঙ্গলা বিভাগ তাঁর হাতে। এখান থেকে তিনি কবিতা, নাটক, গান, গল্প, কথকতা—ইত্যাদি প্রচার করেন। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিজম-এর কোনও প্রকার প্রচার তাঁর হাতে নেই। তাঁর সকল কাজ রাজনীতির বাইরে। রুশমহলে বিনয়বাবু বিশেষ জনপ্রিয়।

আমি এসেছিলুম শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে একটি বাঙ্গলা কথিকা টেপ-

রেকর্ড করার জন্য। সেটি নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি অনুযায়ী লিখে এনেছিলুম। মিনিট পাঁচেকের কাজ। এখানে বোধকরি শব্দ গুণে টাকা দেওয়া হয়। আমি এই কথিকাটির জন্য ইন্‌কম্‌ট্যাক্স বাদ দিয়ে দুইশত একাত্তর রুবল এবং ছত্রিশ কোপেক পেয়েছিলুম। সোস্যালিস্ট দেশে বিনামূল্যে কা'রো পরিশ্রম নেওয়া হয় না। আমি বোধ হয় মোট সাতবার মস্কো রেডিওয় 'কথা' বলেছিলুম এবং তার জন্য প্রায় তিন হাজার রুবল আমাকে দেয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র একদিন আমাকে পনেরো মিনিটের জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করবার অনুরোধ করা হয়। সেদিন প্রায় পনেরো মাইল মোটরে গিয়ে শ্রীমতী অকসানা শুভময় ঘোষের কাছ থেকে আমার জন্য মহাকবির 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থখানি চেয়ে আনেন। অকসানার ভারত প্রীতি আমাদের জানা ছিল। রেডিও থেকে ফিরবার সময় একজন রুশ কর্মচারী আমার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন এবং একখানি মোটা রুশভাষা ও শব্দতত্ত্বের বই আমার হাতে দিয়ে পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় অনুরোধ জানালেন, বইখানি আমি যেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিই। আমি তাঁর অনুরোধ পালন করেছিলুম।

তরুণ বয়সে আমি একদা আন্তন চেকভের অতিশয় অনুরাগী ছিলুম এবং তাঁর যে কোনও লেখা, গল্পই অধিকাংশ,—অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতুম। তাঁরই নাটক 'চেরী অর্চার্ড' অভিনীত হচ্ছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারে। শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে আজ সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে টিকিটের ফরমাস করে সন্ধ্যার সময় গিয়ে সেখানে ঢুকলেন। দুটি মখমল বাঁধানো সীট নিলেন পাশাপাশি। মেয়েকে এতকাল মেয়েছেলে বলেই জানতুম! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে প্রথম জানলুম, বাইরে তাদের যত লাবণ্য এবং পেলবতাই থাকুক, এখানে মেয়েমাত্রই মেয়ে নয়,—শক্তিমান 'পুরুষ' আছে ওদের অনেকের মধ্যে। দরকার যদি হয়, মধ্যরাত্রে তুষার ঝটিকার মধ্যে মেয়েমানুষ একা ছুটল বিশ তিরিশ মাইল, ডেলিগেশনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়ে সে ঘুরিয়ে আনল একটির পর একটি রিপাবলিকে, কমিটির পর কমিটির জটিল ঘূর্ণাবর্তে বিভিন্ন ও বিচিত্র মানব চরিত্রকে চরিয়ে মেয়েমানুষ কাজ হাসিল করে এল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে একশটি টেলিফোন করে সে আপন কর্মজাল বিস্তার করল, এবং একই সঙ্গে ও একই কালে এই হোটেলের সর্বপ্রকার বিলি-ব্যবস্থা, বিমানের মধ্যে সীটের রফা, সিনেমা ও সার্কাসের টিকিট, অমুক মিউজিয়ামের সঙ্গে বন্দোবস্ত, ডেলিগেশনের প্রতি সভ্যের কৌতূহল মেটানো প্রতিজনের পৃথক পৃথক অভিযানের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা, প্রত্যেকের রুচি ও ফরমাস মেটানো,—এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে হাসি পরিহাস গল্পগুজব তর্ক-বিতর্ক! বলা বাহুল্য, অকসানা, লিডিয়া, নাটাশা, কালেরিয়া, মেরিয়ম, লোলা, মায়া ইত্যাদি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম, ওরাই পুরুষ, আমরাই মেয়ে! নিজেদেরকে অত্যন্ত অসহায়, নিরুপায়, পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল এবং অন্যের কাঁধের বোঝা বলে মনে হতো। ওদের সহায়তা ছাড়া এক পা কোথাও নড়বার উপায় নেই, ভাষা না জানার জন্য এক ব্যক্তির সঙ্গেও কথা বলতে পারিনে, দোকান বাজারে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ নেই, পথ চিনিনে, কোথায় কি আছে জানিনে, হোটেলে দশবার চেষ্টা করে একটি বিশেষ কোনও খাদ্য চেয়ে নিতেও পারিনে। মাঝ থেকে উভয় পক্ষে একটা দুর্ভোধ্য হাসাহাসি প'ড়ে যায় মাত্র!

মঞ্চের উপর অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। 'চেরী অর্চার্ড' আমার পরিচিত বই। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গল্পটা বুঝে নিলুম। 'সূর্যের' আলো এমনভাবে ফেলা হয়েছে, —দেখতে পাচ্ছি বেলা ন'টা! বেলা একটা পর্যন্ত একটি নাটকীয় পরিণতি হল, এটি বুঝিয়ে দিতে হয় না। চরিত্র অভিনয়, চাহনি, ভঙ্গী, প্রকাশ, বৈশিষ্ট্য, মেক-আপ চলাফেরা,—নিখুঁৎ শুধু নয়, আশ্চর্য নিখুঁৎ! মঞ্চের উপরকার যে সমস্ত খুঁটিনাটি আয়োজন এবং সাজসজ্জা, যেগুলি প্রতি চরিত্রকে বিশদভাবে প্রকাশ করার কাজে লাগে,—তার আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খ চেহারা দেখে আমি বিস্ময়-বিমূঢ়। আমাদের কলকাতায় শিশির ভাদুড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ যুগেও এগুলি ছিল স্বপ্নবৎ। তার কারণ, আমাদের নাট্যশালা কোনও কালেই সরকারী সহযোগিতা পায়নি! আজ যখন সেই সুযোগ ঘটবার সম্ভাবনা এল তখন না আছে নাট্যকার, না অভিনয়-প্রতিভা, না বা প্রয়োগশিল্পী। কিন্তু সে দুঃখ এখন থাক্‌। উৎকৃষ্ট নাটকে গানের জায়গা নেই, এটি আবার এখানে এসে বিশ্বাস করলুম! মঞ্চকলা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ষ্টেজ-ক্র্যাফট্‌,—সেটির প্রথম শিক্ষা এখানে হওয়া উচিত। শ্রীমতী লিডিয়ার কৃপায় দিনের পর দিন আমি এই থিয়েটারে বসে টলষ্টয় চেকভ, শেক্সপীয়র প্রভৃতি গ্রন্থকারের বিভিন্ন নাটক অভিনয় একটির পর একটি দেখেছি এবং সর্বপ্রকার পারিপাট্য ও শ্রেষ্ঠতার সম্মুখে বিস্ময়াভূত হয়ে বসে থেকেছি। 'আনা কারেনিনা' দেখতে দেখতে শ্রীমতীকে যখন সেই অন্ধকারে বসে ঝরঝরিয়ে শেষ দৃশ্যাগুলিতে চোখের জল ফেলতে দেখেছি, তখন আমাকে পাশ থেকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে, এটি প্রেক্ষাগৃহ এবং গ্রন্থকর্তার পরিকল্পিত গ্রন্থের এটি নাটকীয় অভিনয় মাত্র! শ্রীমতী লিডিয়া এবার নিয়ে বোধ করি কুড়ি বাইশবার এই নাটকটি দেখলেন। তিনি নাকি যখন আসেন একাই আসেন। আমি প্রশ্ন করেছিলুম, এই নাটকে কোন অঙ্ক বা কোন্‌ দৃশ্যটি সবাপেক্ষা আপনাকে অভিভূত করে?

লিডিয়া বললেন, আগাগোড়া! একটি নারীর জীবনে সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও পরম ব্যর্থতাবোধের জন্য সে আত্মনাশের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বেদনা এইখানে!

পরে আমি জেনেছিলুম, টলষ্টয়ের প্রতি লেনিন অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এবং টলষ্টয়ের উপরে তিনি পর পর সুদীর্ঘ সাতটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সোভিয়েট দেশের পরাশ্রিত ও পরপদ-দলিত নারী-জাতি ও চাষী সমাজ সম্পর্কে যতগুলি আইন-কানুন লেনিন প্রবর্তন করেন, সেগুলির মধ্যে টলষ্টয়ের অনুপ্রেরণা ছিল প্রচুর। সাহিত্য-কর্মী ও কবিগণ সম্বন্ধে লেনিনের যথার্থ অনুরাগ কি প্রকার ছিল, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ না করলে সেটি সম্যকভাবে বোঝা যায় না। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনও দেশে সাহিত্য প্রতিভাকে অকৃপণ ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাবার এমন ব্যাপক আয়োজন অন্য কোথাও নেই। কিছু দিন আগে জনৈক ইংরেজ নাট্যমঞ্চকার দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, 'শেক্সপীয়রের নাটকের সর্ব-শ্রেষ্ঠ অভিনয় এবং প্রয়োগ কৌশল একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই হয়ে থাকে, এটি আক্ষেপের বিষয়।"

ওদের দেশের 'শিশির ভাদুড়ি' হলেন পরলোকগত মিঃ ষ্টানিসলাভস্কি।

বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে একটি 'স্লাভর্যাস্তর' হাটের পাশে একটি হোটেলে তিনি তাঁর সতীর্থ দান্‌চেন্‌কোর সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতে মস্কোর 'আর্ট থিয়েটারের' পরিকল্পনা করেন। হাতের কাছে তখন ছিলেন অন্যসাধারণ গল্পলেখক মিঃ চেকভ। তাঁকে ডাকা হল। তিনি তাঁর "সী গাল" বইটি হাজির করলেন। সেই নাটক দিয়ে আর্ট থিয়েটারের প্রথম যাত্রারম্ভ। তারপর একে একে সবাই এসে হাজির হলেন, টলষ্টয় ও গোর্কি পর্যন্ত। থিয়েটার জমজম ক'রে উঠল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টানিসলাভস্কি মারা যান। সোনালি-বর্ণের একটি সমুদ্র-পাখীর ছবি মঞ্চের যবনিকার ওপর আজও আঁকা। ওইটি হল আর্ট থিয়েটারের জন্ম-ইতিহাসের সূচনা-নাট্য। সাগরপক্ষীটি ডানা বিস্তার ক'রে উধাও শূন্যে উড়েছে অনন্ত নীলিমায়! যবনিকাটির বর্ণ নীলাভ, এবং আর্ট থিয়েটারের ওইটিই প্রতীক-চিহ্ন!

"চেরী অর্চার্ড" অভিনয়ের শেষে আমি গিয়েছিলুম যবনিকার অন্তরালে নাটকের পাত্রপাত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্য। তাঁদের পক্ষে এটি বোধ হয় একটু নতুন। সেজন্য প্রথমটা তাঁরা একটু যেন হকচাকিয়ে যান। লিডিয়া তাঁদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই "মার্চেন্ট" দু-হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন!

ঘন মেঘময় দিন, বৃষ্টি পড়ছে সপসপিয়ে। বাইরের প্রবল হাওয়ায় তুহিন কঠিন ঠাণ্ডা। সমগ্র 'উক্রাইনা হোটেলে' কৃত্রিম উপায়ে উষ্ণতার সৃষ্টি করাই আছে। ভিতরে ফাল্গুন মাস। প্রাতরাশ শেষ হল এগারোটায়। এমন সময় পতিগতপ্রাণা শ্রীমতী কার্লোরিয়া এসে উপস্থিত। আজ আমাদের ঘুরিয়ে এনে তিনি এযাত্রা ছুটি নেবেন। তাঁর বাড়িতে নাকি নানাবিধ অসুবিধা ঘটছে। কখন রান্না, কখন বা বাচ্চার দেখাশোনা,—তার ওপর 'ও'দের' আবার মান-অভিমানের পালা। চলুন—উঠুন—

আমরা চার-পাঁচজন সেই দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবৎসল চৌহান এবং বৃদ্ধ ও অমায়িক সর্দার গুর্বাক সিং। তিনি বর্তমানে ভারতীয় 'শান্তি' কমিটির সভাপতি। সব ক'খানা গাড়ি বেরিয়ে গেছে একে একে বন্ধুগোষ্ঠিকে নিয়ে। আমাদের কপালে আজ মোটর বাস। তাই সই। গত বছর কৈলাস-মানস সরোবরের পথে আঠারো-উনিশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে বহু তুষার ও তুহিন ঝাপটার অভিজ্ঞতা আমার ছিল। সুতরাং অতটা ঠাণ্ডা আমার গায়ে লাগে না। তবু যা হোক ক'রে সবাই আমরা বাসে উঠলুম, এবং দরজাগুলি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। টিকিট-কন্‌ডাকটর মেয়ে,—সর্বাঙ্গ তার গরম পোষাকে ঢাকা। এই বাসেই এক পাঞ্জাবী হিন্দুকে পাওয়া গেল। তিনি আঠারো বছর আগে এখানে অন্ন-সংস্থানের জন্য নানা কৌশলক্রমে চ'লে আসেন। এখানে মাষ্টারী করেন। বেশ আছেন। তবে বিগত যুদ্ধের কালে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট মনে করেন, এ ব্যক্তি বোধ হয় ইংরেজদের গুপ্তচর! সুতরাং অনেক দিন অবধি তিনি নজর-বন্দী থাকতে বাধ্য হন। এখন তিনি আছেন পরমানন্দে।

বৃষ্টিবাদল সত্ত্বেও পথঘাট জনাকীর্ণ। নানা পথ ঘুরে মোটর বাস এসে এক স্থলে আমাদের নামিয়ে দিল। এটি 'রেড স্কোয়ারের' প্রান্ত। অদূরে সেন্ট বেসিলের সেই মোট নয়টি মিনারযুক্ত জগৎপ্রসিদ্ধ গির্জা (Vasily Blazhenny) যেটি 'পটভস্কি' গির্জা নামেও বিদিত। এটি ষোড়শ শতাব্দিতে নির্মিত হয়। তদনীন্তন রাশিয়ার এইটি স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। এটি ল্যান্ডমার্ক। অন্য দিকে ক্রেমলিনের সুবিশাল প্রাকার—দিল্লী-আগ্রা দুর্গের মতো তার গঠনভঙ্গী, যেটি আমার কাছে নতুন নয়।

'রেড স্কোয়ার' নামটি শুনলে একটু চমক লাগে, একটু ভয় করে। কলকাতার 'রেড রোড' এবং 'লাল পাগড়ি' এককালে আতঙ্কের বস্তু ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু শহরে আছে এক একটি রেড স্কোয়ার। মস্কোর রেড স্কোয়ারের নাম দুনিয়ার লোক জানে। সপ্তম শতাব্দির মধ্যকাল অবধি এই রেড স্কোয়ারের নাম ছিল, 'পোজার' অর্থাৎ আগুন। এই অঞ্চলে কবে যেন একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেই রক্তিম চেহারার থেকে আসে এই নাম, রেড স্কোয়ার! রুশ ভাষায় রেড শব্দটির তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, যেমন আগুন, ফুল এবং সুন্দর! এই রেড স্কোয়ারে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বসমক্ষে সকল শ্রেণীর অপরাধীর ফাঁসি হত। জারের আমলে রাজনীতিক বন্দী এবং সাধারণ অপরাধের কয়েদীরা একই শ্রেণীভুক্ত ছিল! মস্কোভাইটরা বলে, রেড স্কোয়ার রুশ জাতি তথা ক্রেমলিনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কিত। এই স্কোয়ারের একটি মঞ্চের নাম 'লবনয় মেস্টো'—যেখানে ফাঁসি দেওয়া হত, যেখানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের শাসননামা জারি করা হ'ত, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে জাতিকে অস্ত্রধারণ করতে বলা হত। একালে এই রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়েই জারের অনাচারের বিরুদ্ধে জাতিকে প্রবলতম আন্দোলনে আহ্বান করা হত।

সেই রেড স্কোয়ারে পৌঁছে দেখি, এদিক ওদিক মিলিয়ে কম-বেশী আধ মাইল লম্বা সারবন্দী পিপিলিকা শ্রেণীর মতো নরনারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে 'লেনিন-ষ্টালিন মসোলিয়ম'-এর প্রস্তর-সমাধি গৃহের দিকে। খবর পাওয়া গেল, এই জনশ্রেণী প্রাত্যহিক। প্রতিদিন সকাল থেকে অপরাহ্নকাল পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে প্রায় দেড় লক্ষ লোক সারবন্দী হয়ে নিঃশব্দে ধীর গতিতে এবং অসীম ধৈর্যসহকারে এই সমাধিনিবাসের মধ্যে ঢুকে একে একে লেনিন-ষ্টালিনের দুটি সুরক্ষিত শবদেহ দেখে যায়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-তুষার-ঝড়,—কোনও আবহ-দুর্যোগেই এই শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বাধা পায় না। আমরা যদি সেই সার-বন্দীর মধ্যে দাঁড়াতে চাই, তাহলে প্রায় তিন ফার্লং দূরে সব শেষের দিকে যেতে হবে। এমন সময় একজন কালো-সোনালি পোষাকপরা 'মিলিচ্‌-ম্যান' (পুলিশ) এসে শ্রীমতী কার্লোরিয়ার সঙ্গে কি যেন কথা বলল, এবং বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বরং আমাদেরকে কতকটা এগিয়ে দিয়ে সারবন্দীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। অনেকের মাথায় ছাতা, অনেকের হাতে মালা, প্রত্যেকের গায়ে ওভার-কোট কিংবা রেন-কোট,— এবং ভিড়ের চেহারাটা, যাকে বলে, আবালবৃদ্ধবনিতা! ওর মধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান,—কে নেই? কোন্ জাতি বাকি আছে সোভিয়েট ইউনিয়নের? কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এই, কারও মুখে কথা নেই, না তামাশা, না অন্যকে শোনাবার জন্য খেলো রসিকতা! এমন একটি নিঃশব্দ, নিয়মানুগত্যশীল, সুভদ্র, গম্ভীর—সুনিয়ন্ত্রিত জন-

সাধারণের সমাবেশ দেখতে আমার বাকি ছিল।

মিনিট পনেরো অবধি এক এক পা ক'রে সেই ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে আমরা অবশেষে একটি মিশিবর্ণ প্রস্তর-দৃঢ় সুদৃশ্য পাথর-সমাধিনিবাসের মধ্যে ঢুকলুম। সশস্ত্র মিলিটারী পাহারা প্রতি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু কিছু দাঁড়িয়ে দেখার সময় নেই। একধার দিয়ে দেখতে দেখতে অগ্রসর হও, দেখতে দেখতে পায়ে-পায়ে চলে যাও, দাঁড়িয়ো না কোথাও! পিছনে লোক আছে, দাঁড়ালেই ভিড়! ভিতরটা ঈষৎ ছমছমে অন্ধকার, যেন ছায়াচ্ছন্ন। চারিদিকে কালো আর মিশি পাথরের পালিশ ঝলমল করছে। নীরেট, শ্বাসরোধী, আতঙ্কাশ্রিত, যেন কঠিন শীতল মৃত্যুলোক, যেন একটা গুহাগর্ভ! প্রথমেই পাওয়া যায় 'লেনিনকে' একটি কাঁচের আধারের মধ্যে। ভিতরে আলো দেওয়া হয়েছে! দীর্ঘ বিশাল নয়, ক্ষুদ্রকায়, যেমনটি দেখেছি ছবিতে। সেই দেহ, সেই টাক, সেই ছোট দাড়ি,—অর্ধজাগ্রত চক্ষু, শরীরের খানিকটা অংশ ঢাকা, শাদা-হলদে মেশানো রং। কিন্তু তাজা দেহ যেন ঘুমিয়ে! ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী নয়,—যেন গত পরশু সকালে মৃত্যু ঘটেছে! দেহ যেন দেহ নয়,—বারুদ,—যে-বারুদের ফরমুলা নতুন সভ্যতার পত্তন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করেছে। এক পা এগোলেই ষ্টালিন! জেনারালিসিমো ষ্টালিন। খাকি পোষাক, সামরিক ব্যাজ ও তারকা, সেই গোঁফ, সেই ওলটানো চুল,—অবিকল যা ছবিতে। চেয়ে থাকতে ভয় করে, মৃত কিনা নেড়ে দেখতে ইচ্ছা যায়! ও'র যেন মৃত্যু হয়নি, দেহ এত তাজা! শরীরে রোমাঞ্চ শিহরণ আসে, গলা শুকিয়ে ওঠে। বার বার দেখে মন যেন নিশ্চিত হতে চায় যে, মৃত্যু হয়েছে! ষ্টালিনের মৃত্যু হয়েছে বলেই ত' আমরা লেনিনকে দেখতে পেলুম! নৈলে কে আমাদের খোঁজ নিত, কে এদেশে ঢুকতে দিত, কা'র হুকুমে এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ পেতুম?

বেরিয়ে এলুম। সমাধিনিবাসের পাশেই ক্রেমলিনের উচ্চ প্রাকার এবং তারই নীচে নীচে রয়েছে অগণ্য বিপ্লববাদী, যোদ্ধা, এবং জাতীয় নেতা-গণের সমাধিফলক। এদের মধ্যে আছে আমেরিকান, বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, সুইডিস, ইতালিয়ান প্রভৃতি বহু জাতির প্রতিনিধি—যারা সোভিয়েটের শিশু-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালে সোভিয়েট ভূমিতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। ওদের মধ্যে আমেরিকার সাংবাদিক জন রীড—যিনি লেনিনের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং যাঁর সামনে তড়িৎগতিতে পেট্রোগ্রাডে রুশ বিপ্লবটি ঘটে,—তাঁর সমাধিটি বিশেষ আকর্ষণীয়। জন রীড এই ঘটনাবলী নিয়ে "Ten days that shook the world" নামক এক-খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমতী কালেরিয়া আমাদের নিয়ে এলেন, 'শিশুস্বর্গে'।' সেই অতি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে যে বিপুল খেলনার জগৎটি দেখলুম সেটি বিস্ময়কর এবং তার মধ্যে ক্রেতাদলের যে নিরবচ্ছিন্ন জনতা, সেটি আমাকে অভিভূত করে-ছিল। শিশু ও বালক-বালিকার মন-ভোলাবার জন্য একটা খেলনা-জগৎ করা হয়েছে যার অন্তহীন বৈচিত্র্যের শেষ খোঁজা কঠিন।

হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সারতে বেলা গেল। খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে প্রচারকার্য আছে কিনা আমি জানিনে। কিন্তু বহু সময়ে এমন অজস্র খাদ্যসম্ভারের নির্বিকার অপচয় দেখে দুঃখবোধ করতুম। আমার প্রশ্ন শুনে এক দিন শ্রীমতী লিডিয়া বলেছিলেন, হোটেলের খাদ্যের সমস্ত উচ্ছিষ্ট চলে যায় মস্কোর বাইরে 'পোলট্রি ফার্মে', শুকরদের ঘরেও যায়। আমাদের দেশের এক একটি শুকর পাঁচ-ছয়শ' কিলোগ্রাম ওজনেরও হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারও বেশী। একটি মেয়ে-শুকর বারো-চৌদ্দটি বাচ্চা প্রসব করে। শুকরের মাংস রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা সস্তা এবং জনপ্রিয়।

গত কয়েক দিন আমার 'ফুটিফাটা' চশমায় কাজ চালাচ্ছিলুম। এটি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, এবং এর জন্য আমার দুই চোখে একটি ক্রুর বক্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল! খেয়ে-দেয়ে উঠে এক সময় লিডিয়া বললেন, চলুন আমার সঙ্গে, এখন বৃষ্টি-বাদল নেই। কিন্তু সময় কম, চলুন ট্যাক্সি ধরি একখানা। একটি চশমা আপনার দরকার।

মস্কো তাঁর নখদর্পণে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন একটি জনবহুল পথের এক চশমার দোকানে। দোকান মানেই মেয়ে। বিক্রেতা মেয়ে। হিসাব-

নার্বিশ মেয়ে। ডাক্তারবদ্যি মানেই মেয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন মেয়ে। একটি মেয়ে-ছেলে এগিয়ে এসে যন্ত্রসহযোগে আমার চক্ষু পরীক্ষা করলেন। আমি প্রশ্ন করলুম, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার জন্য অতি উৎকৃষ্ট একজোড়া বাইফোকাল চশমা ক'রে দিতে পারবেন? কত দাম চান?

মহিলা বললেন, সেটা সম্ভব নয়। অন্তত চার-পাঁচ দিন লাগে। আপনার কাজ চলাগোছ একটি চশমা এখনই করে দিতে পারি। সূক্ষ্ম কাজে সময় লাগে।

বলা বাহুল্য, লিডিয়ার মারফৎ কথা হচ্ছিল। আমি বললুম, চশমা আমার এখনই পেলে ভাল হয়।

পনেরো মিনিট পরে যেমন-তেমন একটি চশমা পরে বেরিয়ে এলুম। কাঁচের নিচের দিকটা চন্দ্রাকার, উপর ও নিচের মাঝখানে সীমারেখাটা বেশ মোটা। এমন চশমা পরে কলকাতার কাঠগোলার বাবু, আদালতের মুহুরি, ইস্কুলের কেরানী, ছাপাখানার প্রুফ রীডার, স্যাকরার দোকানের খাতা-লিখিয়ে! কিন্তু এবার থেকে আমার চোখে রুশ-চশমা, যা দেখব তা হয়ত সোভিয়েট-রঙে ঈষৎ রঙীন। এ চশমা ফিট্ করেনি আমার চোখে। রাস্তায়-রাস্তায় দেখছি ঈষৎ বাঁকা, ঈষৎ ঝাপসা, ঈষৎ এলোমেলো! কাঁচের উপরটা যেন ভারতীয় নিচের অংশটা সোভিয়েট! আগের চশমায় দুই কাঁচের মাঝখানের দাগ ছিল বেমালুম, এবার সেটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা। দুইয়ে মিলে এক হচ্ছে না, স্পষ্টভাবেই দুটো পৃথক। দূরের দৃষ্টিতে ভারত, কাছের দৃষ্টিতে মস্কো। চশমাটির দাম আমাকে দিতে হল বত্রিশ রুবল। দামোদরনের প্রায়শ্চিত্ত!

কেমন লাগছে এবার?—লিডিয়া প্রশ্ন করলেন।

একটু লাগছে!—বললুম, তবে দেশে ফিরে আবার নতুন চশমা নেবো!

শ্রীমতী লিডিয়ার মধ্যে সোভিয়েট মূর্তি অতি প্রবল তেজস্বিতায় ভরা। বাহিরে হাসা পরিহাস, ভিতরে অত্যুগ্র স্বদেশপ্রাণ রাশিয়ান। সোভিয়েট ব্যবস্থা বা কমিউনিষ্ট সমাজের বিন্দুমাত্র নিন্দা বা সমালোচনা তাঁর পক্ষে অসহনীয়। কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই বটে কিন্তু পার্টির এমন অন্ধস্তাবক আর কোনও ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নি। তাঁর প্রতি-শ্বাসপ্রশ্বাসে সোভিয়েট নীতির প্রশস্তি প্রকাশ পায়। এমন মেয়েকে আমার জানা দরকার বৈকি।

আবার উঠলুম ট্যাক্সিতে। গাড়িভাড়া তিনিই দিচ্ছেন হাসি-মুখে এবং অকা-তরে। প্রশ্ন করলুম, এ সব টাকা-পয়সা কার? কে দিচ্ছে?

জবাব পেলুম যার কাছে, সে-মেয়ে অন্য লিডিয়া। মিষ্টকণ্ঠে তিনি বললেন, আপনি কেন বার বার ব্যস্ত হচ্ছেন? এ আমার নিজের খরচ নয়। আপনারা সবাই সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের অতিথি!

কিন্তু এখন যে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি ভারতীয় বন্ধুর বাড়িতে?

হোক না কেন? এ আপনাদের সম্মান! আপনাদের সব রকমের খরচ ও'রা বহন করবেন।

প্রশ্ন করলুম, আপনি যদি টাকা তছরুপ করেন, কে দেখছে?

লিডিয়া কঠিন হেসে বললেন, আমিই দেখছি আমাকে! শুনে রাখুন, কোনও 'ওয়ার্কার' কখনও মিছে কথা বলে না! সবাই সবাইকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে, সেজন্য প্রতারণা কোথাও পাবেন না!

কিন্তু খুচেরো খরচ যদি ভুলে যান?

হাসিমুখে লিডিয়া বললেন, আপনি লক্ষ্য করেননি, প্রতি বেলায় আমরা প্রত্যেকটি খরচ লিখি, এবং এক সময় সেটি পেশ করে দিই। গাড়ি ছুটেছিল গোর্কি ষ্ট্রীট দিয়ে। বাইরে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি বললুম, ক্ষমা করবেন, এ কাজে আপনি কত পাবেন?

তিনি বললেন, আমার কাজ সাময়িক, তাই সকলের চেয়ে কম মাইনে। আমি এক হাজার রুবল পাব। এর আগে আমি 'পীস' কমিটিতে কাজ করছিলুম।

আসলে আপনার প্রধান কাজ কোনটি?

আসলে মাষ্টারি করি।—লিডিয়া হাসলেন।

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার অবাধ্য প্রশ্ন করলুম, আরেকবার ক্ষমা করবেন যদি অর্বাচীনের মতন আরেকটি কথা জানতে চাই। আপনার নিজের জন্য মাসে ঠিক কত খরচ পড়ে?

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার নিজের ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। ছেলে বাইরে পড়ে। আমার সর্বসাকুল্যে খরচ হয় পাঁচশ রুবল। বেশি বড়মানুষী করলে আরও দুশো পড়ে। একটি ঘরে আমি থাকি। নিজে রান্নাবান্না করি। এবার খুশী ত?

আমি চুপ ক'রে গেলুম। লিডিয়া ঠিকানা মিলিয়ে আমাকে শুভময় ঘোষের ফ্ল্যাটে তুলে নিয়ে এলেন। এখানে শুভ-ময়ের নবজাত শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশনের আনন্দোৎসব। ধূপ ধুনো চন্দন নৈবেদ্য শাঁখ এবং পুজো! একটি ভারতীয় পরি-বেশ রচনা করা হয়েছে। রুশ বন্ধুরা এসেছেন অনেকে। অল্প পরিসর ফ্ল্যাটটিতে সকলের জন্য ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আমি লিডিয়াকে সকলের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেবার পর নিমন্ত্রিতদের জন্য পাতা পড়ল এবং সেইখানে বসিয়ে লিডিয়াকে আমি বাঙালী ঘরের লুচি তরকারি বেগুন-ভাজা ডাল মাংস চাটনি ইত্যাদি সব অপরিচিত এবং 'অস্বাভাবিক' খাদ্য গিলতে বাধ্য করলুম! তিনি সহাস্য ক্রুদ্ধ এবং চাপা কণ্ঠে আমাকে শুনিয়ে বলছিলেন, 'টেরিবল, আনথিংকেবল, আই ক্যান্নট্ ইম্যাজিন—"

এর পর আরেক দিন তাঁকে বাগে পেয়ে কামাক্ষীপ্রসাদের ঘরে তাঁকে খিচুড়ি এবং মাছভাজা খাইয়ে নেমে আসবার সময় তিনি করুণ কণ্ঠে বলে-ছিলেন, আমার যদি বমি হয়, কিংবা অসুখ করে, আপনি দায়ী!

অন্নপ্রাশনের ভিড়ের মধ্যে এক সময় তিনি আমাকে ধ'রে বসলেন, ওই শিশু-ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আমি আসনে বসব, আপনার বন্ধুকে বলুন ছবি তুলতে!

বললুম, গাউন পরে মেঝেতে বসা বেমানান!

তা হোক, আপনি বলুন। বাচ্চাটি ভারি চমৎকার।

কামাক্ষীপ্রসাদ হাসিমুখে তখনই সেই ছবিটি তুলে নিলেন। ছবিখানা বেমানান হয়নি, কেননা শুভময়ের শিশু পুত্রটি ছিল প্রকৃতই শুভ্রতনু!

ফিরবার পথে ট্যাক্সিতে ব'সে তিনি বললেন, আপনার কথাবার্তা একটু রূঢ়। এতে কি মনে হয় জানেন? আপনি বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত—।

বললুম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। শুধু যাদুঘর চিত্রশালা আর এট-ওটা দেখে চ'লে যেতে আসিনি। এর চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন। পরে বললেন বেশ, আমি আজ থেকে আপনার 'কাজ' করব। আপনি খুশী হয়ে এক দিন বাড়ি ফিরবেন, তার সব দায়িত্ব আজ থেকে আমি নিলুম।

(—ক্রমশঃ)

ভোট রঙ্গ

দেবাংশু দস্তিদার

'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ কত রঙ্গ ভরা'। সবচেয়ে বড় রঙ্গ বোধ হয় ভোটরঙ্গ। রঙ্গ জমে উঠলে মাঝে মাঝে রণ অবধি হয়। সেই ভোটরঙ্গ আজ আসন্ন।

দিন দিন আসর জমে উঠছে। পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার পড়ছে। প্রার্থীরা ক্লাবের দরজায়, সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৈঠকখানায়, দাতব্য হাসপাতালের অফিসে প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করেছেন। আর অপ্রকাশ্যে যা চলছে এবং চলবে তার বিবরণ অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।

প্রচার ও অপপ্রচার, কুৎসা ও প্রশংসা, নিন্দা ও সাধুবাদ এক সঙ্গে ধ্বনিত হতে হতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, মাথা ঝিমঝিম করবে, গা টলে উঠবে। তবু সমর্থকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। শুনতেই হবে। আবার বেশিক্ষণ শোনাও বিপদের। হয়ত দেখা যাবে পাশ দিয়ে একবার আড়চোখে চেয়ে চলে যাচ্ছেন প্রতিপক্ষের দলপতি, পাড়ার মাননীয় 'দাদা'। সাংসারিক জ্ঞান আপনার ঘটে যত কমই থাক, মানুষ বলেই, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি টনটনে। তাই আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি একবার পাড়ার দাদার আড়চোখের দিকে আড়চোখে চাইবেন এবং সেই সঙ্গে সমর্থকদের দিকে বিনীত হাসি ছুঁড়ে দেবেন। দাদা বুঝে গেলেন যতই বেয়াক্কা ছোকরা ওখানে ফুট কাটতে হবে না। সমর্থকরা বুঝলেন যাক ভোটটা পাওয়া গেল। আপনিও বুঝলেন যাক কৌশল করে প্রাণটা ত এ যাত্রার মত বাঁচান গেল।

হরেক রকমের বিপদ আছে, আনন্দ আছে। তাই সব চেয়ে বড় রঙ্গ ভোটরঙ্গ। এই রঙ্গে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল, সমাজহিতৈষী সংগঠন কিংবা পাড়ার ক্লাব জড়িয়ে পড়ে না। জড়িয়ে পড়ে ছা-পোষা সাধারণ মানুষ। এদের সঙ্গে কোন সংগঠনের কোন যোগ নেই, পরিচয় নেই। বাবা যায় ছেলের বিরুদ্ধে; ছেলে যায় বাবার বিরুদ্ধে। মা ও মেয়ে গাছ-কোমর বেঁধে লেগে পড়ে দুজনের বিরুদ্ধে। কত মন ভাঙে, আবার মন মেলাবার পালাও চলে কারো কারো।

দলের কথা বাদ দেওয়া ভাল। ওটা ক্ষমতার কথা, রাজনীতির কথা। ওটা ওদের জীবন-মরণের সমস্যা। সহজে তাই নিস্তার নেই। অ-করণীয় কিছু নেই। নাচতে এসে ঘোমটার সংস্কার যাদের থাকে তাদের এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তাই উত্তেজনা বাড়তে থাকে যত, ততই ন্যায়-নীতির সাবেকী প্রশ্নগুলো ঝাপসা হয়ে যায়। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আগে জয় হোক, তারপর প্রায়শ্চিত্ত করে পাপক্ষালন করা যাবে।

কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচনটা এখনও নেহাৎ উত্তেজনার স্তরে রয়ে গেছে। কয়েক মাস জ্বর ও বিকারের ঘোরে গোটা সমাজটাই কাহিল হয়ে পড়ে। রাজনীতির কথা, দলের কথা বাদ দিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে ভোটরঙ্গকে দেখলে কিন্তু কোথাও রঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক শক্তির অপচয়ে ব্যথিত হতে হয়। অথচ নির্বাচনটা শুধুমাত্র দলের ব্যাপার, ক্ষমতার ব্যাপার নয়। তার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। সে প্রশ্নটি সামাজিক ব্যক্তির প্রশ্ন, ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন। ব্যালট কাগজে কোন দাগ কাটতে পারলেই কোন বিশেষ দল হয়ত ক্ষমতা পেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা যায় ভোটারদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারা ও প্রকৃতি, রুচি ও বিবেক। তাই ভোটের সময় রাজনৈতিক পাণ্ডারা মাতেন মুকুট-মোচন খেলায় আর সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা মাতেন বিশ্লেষণের অঙ্কে।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় সমাজ-বিজ্ঞান বিশেষ উন্নত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ গ্রুপ ও সংগঠন রীতিমত গবেষণা করে থাকে। নানা রকমের চার্ট ও প্রশ্ন তৈরী হয়; বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান তৈরি হয়। তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়, সামাজিক। তারা জানতে চায় কি ভাবে জনমত গঠিত হচ্ছে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মিলন ও সংঘর্ষ হচ্ছে কিভাবে। এক কথায়, ব্যাপক অর্থে ভোটারদের ব্যক্তিত্ব কি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। খুবই দুঃখের কথা, আমাদের দেশে এমন ধরনের গবেষণা হয় না। হলেও, সাধারণ্যে তার প্রচার নিতান্তই সামান্য।

আমরা সকলেই ভাবি ভোটের সময় মানুষ ভেবে-চিন্তে বিচার-বিবেচনা করে ভোট দেয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের কেউ কেউ সাধারণ মানুষের এই সহজ বিশ্বাসের অংশীদার। তাই পাড়ায় পাড়ায় চলে সভা ও বৈঠক। বাড়িবাড়ি যায় ছাপানো প্রচারপত্র। দোরেদোরে বকে যায় অনলস ক্যানভাসার। কথার পিঠে কথা গেঁথে, হেসে কেঁদে অভিনয় করে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টার অন্ত থাকে না।

কিন্তু চেষ্টার কি ফল? মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রুপ এই বিষয়ে ব্যাপক পরিসংখ্যান তৈরি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলির এই প্রচার একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার মতই ব্যর্থ ও নিরর্থক। ভোটাররা সাধারণভাবে নতুন দল নির্বাচন করে না। বরং তারা পুরুষানুক্রমিক ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে ভালবাসে। রীতি ও প্রথার বেলা মানুষের চরিত্রে বদ্ধমূল সংরক্ষণশীলতা আছে। মানুষ স্বভাবত রীতি ও প্রথাকে মান্য করে, মেনে চলে। এমন কি দেখা যায় যে রীতি ও প্রথা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও আমরা রীতি ও প্রথাকে সহজে আঘাত করতে চাই না। বরং প্রশ্নহীন আনুগত্যই আমাদের রুচি ও বিবেকের পক্ষে স্বস্তিকর। তাই মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক গ্রুপের মতে ভোট দেবার প্রশ্নটি একটি পারিবারিক প্রথার অনুরূপ। অর্থাৎ বাপ ঠাকুর্দা যে দলকে সমর্থন করে এসেছে সেই পরিবারের নতুন ভোটাররাও বিশেষ গুরুতর কিছু না ঘটলে পুরাতন ও পরিচিত দলের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন।

প্রার্থী নির্বাচনের সঙ্গে ভোটারদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। যে পার্টিকে আমি সমর্থন করি, আমার বন্ধুবান্ধবও সেই পার্টিরই সমর্থক। আত্মীয়-স্বজন যদি আমার অবাঞ্ছিত দলকে সমর্থন করে তবে আমি অপ্রসন্ন হই। যুক্তিতর্কের বাণ ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগত মান অভিমান করে সেই আত্মীয়কে রাহুমুক্ত করতে পিছ-পা হই না। আমি এক প্রেমিকযুগলকে জানতাম। প্রেমের গভীরতা ছিল নাকি তাদের অতলস্পর্শী। অন্তত এ কথা বহুবার তারা আমার কাছে হলপ করে বলেছে। কিন্তু গত নির্বাচন তাদের কালজয়ী প্রেমেও চিড় ধরিয়ে দিয়েছে। প্রেমিকটি এমন একটি দলের সমর্থক হয়ে উঠল যা প্রেমিকার কাছে অসহ্য। দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ এল। ভোটের উত্তেজনা থেমে যাওয়ার পরও তারা অমিল থেকে মিলে ফিরে আসতে পারেনি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, পারিবারিক জীবন ভোটের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভোটের আগে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক কারণে বিবাদ-বিসম্বাদ হয়, তবে জানতেই হবে যে সেই দম্পতির দুটি ভোটই সরকারের বিরোধীদল পেয়েছেন। পারিবারিক জীবনে যতই হতাশা আসবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, পারিবারিক বন্ধন যতই শিথিল হতে থাকবে ততই সরকারের বিরোধী দলগুলি লাভবান হবে। পারিবারিক জীবন যতই সুস্থ ও অটুট থাকবে, পারিবারিক বন্ধনগুলি যত দৃঢ় ও স্বচ্ছ হবে, ততই

প্রতিষ্ঠিত সরকারের সুবিধা এবং সরকারের-বিরোধী দলের অসুবিধা।

এই যুগটা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যুগ। এই অধিকার আইনত স্বীকৃত। অফিসে কাছারিতে এর প্রমাণ আছে। ট্রামে বাসে এই অধিকারের ঘোষণা অহরহ নন্দিত। কিন্তু ভোট দেবার ব্যাপারে নারী-পুরুষের বিরাট পার্থক্য ফুটে ওঠে। যে ভদ্রমহিলা দর্শনের কূট প্রশ্নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারেন, অতি সাম্প্রতিক সাহিত্যের ওপর নির্ভয়ে মতামত দিতে পারেন, সেই তুহিন ইন্টেলেকচুয়াল ভদ্রমহিলা কিন্তু ভোট দেবার সময় ঘোর এ্যান্টি-ইন্টেলেকচুয়াল কাজ করে বসেন।

কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজত্ব। সুতরাং প্রার্থী ব্যক্তি-হিসাবে খুব একটা কিছু করতে পারে না। তাই দলকে বিচার করতে হয়, বিচার করতে হয় সেই দলের কার্যক্রম, অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি। কারণ শেষ বিচারে গণতন্ত্রে শাসনকাজ চালায় দল, ব্যক্তি নয়। ভোট দেবার সময় মহিলারা কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করে থাকেন।

হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বিরাট সার্ভে করার পর জানিয়েছেন যে, মহিলারা ভোট দেবার সময় দল কিংবা দলের কার্যক্রম মোটেই চিন্তা করেন না। তারা বিচার করেন একমাত্র প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব। প্রার্থী যদি কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার পরও আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন হন তবে বামাকুল তাঁর প্রতিকূলে হবেনই।

এ শুধু হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মত নয়। আমেরিকার গত নির্বাচনে শুধুমাত্র মহিলা ভোটারদের মনোভঙ্গি লক্ষ্য করার জন্য একটি সার্ভে করা হয়। এইসব গবেষকদের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল কি কি প্রশ্ন ও কথা মাথায় রেখে মার্কিন মহিলারা ভোটে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বিষয়টি আমেরিকায় বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ আগে আমেরিকায় মহিলা ভোটার ছিলেন না। মাত্র চল্লিশ বছর আগে মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছেন। আমেরিকায় মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। পুরুষের জন্মের হার কম। সুতরাং বর্তমানে ভোটারদের একটি বিরাট অংশ মহিলা।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, রাজনীতির হালচাল ও খবরাখবর মেয়েরা খুব কম রাখেন। বেশ বিরাট অংশ অতি সামান্য ও সাধারণ খবরটিও জেনে রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। ১৯৫২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে শতকরা প্রায় ষাটটি মহিলা ভোটার জানিয়েছিলেন যে, সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে এ খবর তাঁরা রাখেন না।

রাজনীতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এতদূর অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ভোটে মহিলারা অংশ গ্রহণ করছেন ক্রমাগত বেশী পরিমাণে। ঘটনাটি মজার। রাজনীতিতে উৎসাহ নেই অথচ ভোট দিতে আগ্রহ প্রচন্ড। এই বৈপরীত্যকে বুঝতে গিয়ে গবেষকরা মার্কিন মহিলাদের একটি চারিত্রিক বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, আমেরিকান মেয়েরা সংগঠিত রাজনৈতিক দল, তাঁদের কার্যক্রম ইত্যাদির চেয়ে স্বয়ং প্রার্থীকে ব্যক্তি হিসাবে বুঝতে চান। তাঁরা একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান : নির্বাচন-প্রার্থী নির্ভরযোগ্য হবে কি না। তাই কোন গিন্নীকে কোন প্রশ্ন করলেই তিনি সোজা উত্তর দিয়ে বলেন : আমি কিছু জানি না। আমার ধারণা আইজেন-হাওয়ার সব ঠিক করে দেবে।

মহিলারা প্রথমেই প্রার্থীর ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেন। সাধারণত তাঁরা প্রার্থীর বয়স (৫০ বছরের কম হলে ভাল), কলেজের ডিগ্রি, পারিবারিক জীবন (বিবাহিত কি অবিবাহিত), ধর্মমত জানতে চাইবেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, রাজনীতিতে এই ব্যক্তিগত ব্যাপার আসছে কি করে? উত্তর বাঁধা। এক বাক্যে অধিকাংশ মহিলা ভোটার জানান : প্রেসিডেন্টের চাই ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র। প্রেসিডেন্ট এমন লোক হওয়া দরকার যিনি মানুষের মনে বিশ্বাস আনতে পারবেন, চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। মহিলা ভোটার মনে করেন যে, প্রার্থীটি সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি না হলে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করিতে পারেন না।

আন্তর্জাতিক সমস্যার চেয়ে ঘরোয়া সমস্যা মেয়েদের কাছে প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মেয়েরা ঘরমুখী হতে আরম্ভ করেছে আরো বেশীভাবে। মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাইরের দেশগুলোকে সাহায্য করা উচিত কিনা, অন্য দেশগুলোতে অধিকতর অস্ত্র সাহায্য দেওয়া উচিত কিনা—এই বিষয়ে একটি প্রশ্নোত্তর আহ্বান করা হয়েছিল। যেসব মহিলা এই প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছিলেন তাঁদের তিন ভাগের মত এই যে, আমেরিকাকে এইসব ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। এই উত্তর থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে ভয় ও উদ্বেগ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী। অধিকাংশ মেয়েরা জানেনই না যে আমেরিকা মহাজগতে রকেট পাঠাবার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল। যাঁরা জানেন তাঁরা আবার এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁদের ধারণা এ বিষয়ে খরচা করা নির্বুদ্ধিতা।

সংগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রতি আমেরিকান মহিলাদের সংশয় প্রচুর। দলের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁদের কাছে অপরাধ। তাঁরা চান প্রার্থী যেন দলের নির্দেশ না মেনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন।

রাজনৈতিক জ্ঞানের অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মহিলা ভোটার কিন্তু স্বামী কিংবা বন্ধুদের নির্দেশ মত ভোট দেন না। তাঁরা নিজেরাই বিচার করতে ভালবাসেন। বরং মহিলারা জানতেই দেন না তাঁরা কাকে ভোট দেবেন। যদি কখনও স্বামী কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন, তার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। কারণ ওটা কথার কথা। এই বিষয়ে স্বামী কিংবা বন্ধুরা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না।

মহিলা ভোটার যত সংরক্ষণশীল হোন না কেন, এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, তাঁরা মোটেই পুরুষদের কার্বন কপি নন। আজকের রাজনৈতিক জীবনে তাঁদের অংশগ্রহণ যত সামান্যই হোক আগামী দিনে তাঁরা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করবেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের এই অনুসন্ধানে লাভবান হবেন দলপতিরা।

ভোটের অধিকার পেয়েও আমরা ভোট দিতে বিরত থাকি। স্বদেশে বিদেশে এই একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। অথচ ভোট দেবার অধিকার অর্জন করার জন্যে ইতিহাসে কত সংগ্রামের কথা পড়া যায়। এইসব ভোটারদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করা হয় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে। ফাউন্ডেশনের অধীনে যে গবেষকরা কাজ করেছিলেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভোটের অধিকার পেয়েও ভোট দিতে বিরত থাকেন সাধারণত কুনো ও সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিরা। তাঁদের কল্পনাশক্তি কম, জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁদের নেই। বরং দেখা যাবে যে, এ'রা অধিকাংশই জীবনে বীতস্পৃহ। এইসব ব্যক্তিরা অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের লোক। যে কাজে তাঁরা নিযুক্ত আছেন সেই কাজের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও উৎসাহ নেই। দিনগত পাপ-ক্ষয় করে যান কোনমতে। এক কথায় গবেষকদের ধারণা এই যে, এই সব ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে ব্যর্থ। তাই জীবনের প্রতি এত অনিচ্ছা।

অবশ্য সমস্ত সার্ভেগুলি আমেরিকার। আমাদের দেশে এমন সার্ভে হয় না। তাই আমাদের দেশের ভোটারদের মতিগতি ও রুচি নির্ধারণ করতে হয় আন্দাজের ওপর। বলাবাহুল্য, এটা আদৌ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। এই সব সার্ভে থেকে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বহু বিশেষত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এইসব বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়ে থাকে। মনে হয় সমস্ত বিবরণটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারলে ভোট শুধু রঙ্গ ও রস হবে না। তার চেয়েও আরও গভীর ফল আশা করা যেতে পারে।

বৃটিশ নাট্যকলা প্রসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতালী যদি ইউরোপের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের তীর্থ হয়, তবে জার্মাণী হচ্ছে সংগীতের, রাশিয়া ব্যালে নৃত্যের, ফ্রান্স ফ্যাশান ও সুরুচির এবং বৃটেন নাট্যকলার তীর্থ।

নাট্যকলায় ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, একদিকে যেমন তার দীর্ঘ নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহ্যে সেক্সপীয়ার-ইবসেন-বার্ণাড শ থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের জন অসবর্ন, হিউ মিলস ও পল গ্রীন প্রভৃতি অনেক জগদবিখ্যাত ও শক্তিমান নাট্যকারেরা জন্মেছেন, তেমনি অন্যদিকে মিসেস সিডান, ও স্যার হেনরী আর্ভিং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্যার জন গিলগুড, স্যার লরেন্স অলিভিয়ে, হ্যারী এনড্রুজ, ডেম সিভিল থর্নডাইক, এডিথ ইভানস ও ভিভিয়ান লে প্রভৃতি স্মরণীয় নট ও নটীর প্রতিভায় বৃটেনের নাট্যমঞ্চ বারবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তবু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গত শতাব্দীতে অপেরার সঙ্গে প্রতিযোগিতার মতই বর্তমানে বৃটিশ নাট্যশালাগুলি সিনেমা ও টেলিভিসনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

গত ১০ বছরের মধ্যে বৃটেনে প্রায় ১০০টি নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে মধ্য লন্ডনে, ১২টি তার সহরতলীতে, বাকিগুলি লেষ্টার নিউ-ক্যাসেল প্রভৃতি মফঃস্বল শহরে।

কিন্তু নাট্যশালাগুলির সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে আলোচনায় আসবার আগে তাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

বৃটেনের নাট্যশালাগুলি সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, কমার্শিয়াল, অর্থাৎ যেগুলিকে নিছক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত চালানো হয়। এখানে সব কিছুই মৌশুমী। কর্তৃপক্ষ বাজার বুঝে কোন বিশেষ ধরনের বাছাই-করা নট-নটীদের দিয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

দ্বিতীয় ধরনের নাট্যশালা হচ্ছে রিপারটরি (Repertory)। এগুলি হচ্ছে এক-একটি বিশেষ নাট্য-সম্প্রদায়ের স্থায়ী অভিনয় কেন্দ্র। যেমন লণ্ডনের বিখ্যাত ওল্ড ভিক নাট্যাগার ও ষ্ট্রাট-ফোর্ড আপন-এ্যাভনে সেক্সপীয়ার মেমরিয়াল থিয়েটার।

বৃটেনে কমার্শিয়াল নাট্যশালাগুলির বর্তমান সংখ্যা প্রায় দুশ। তার মধ্যে একশ কুড়িটি সারা বছর ধরে চলে। লন্ডনে তাদের সংখ্যা ৩৮টি, যুদ্ধের আগে ছিল ৫১টি। লন্ডনের প্রাচীনতম নাট্যশালা হচ্ছে ড্রুরি লেনের থিয়েটার রয়াল। এটি স্থাপিত হয় ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে। কয়েকবার ভাঙা-গড়া হলেও সাবেকী কাঠামোটি প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। লন্ডনের কয়েকটি নাট্যশালা আবার বিশেষ ধরনের নাটকের জন্যে নির্দিষ্ট, যেমন ওল্ডভিক সেক্সপীয়ারের নাটকের এবং ইন্ডিয়া হাউসের প্রায় বিপরীত দিকে অলউইচ থিয়েটার প্রহসনের জন্যে।

কমার্শিয়াল নাট্যশালাগুলির প্রায় সমগ্র মালিকানা 'ষ্টল থিয়েটার কর্পোরেশন' ও 'মস এম্পায়ার্স' নামে দুটি ব্যবসা-জোটের হাতে। কেবল লন্ডনের কয়েকটি নাট্যশালার মালিক ক্ষুদ্রতর সংগঠন কিম্বা ব্যক্তি বিশেষ।

উপরোক্ত নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি চলে নাট্যশালাগুলির মালিক ও প্রডিউসিং কম্পানীর সহযোগিতায়। নাট্যশালার মালিকদের আয়, প্রবেশমূল্যের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ, তা ছাড়া বার-রেষ্টুরেন্ট, প্রোগ্রাম বিক্রী এবং ছাতি-বর্ষাতি-ওভার কোট জমা রাখার টিকিট প্রভৃতি থেকে। আর ব্যয়,—আলো, উত্তাপ, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মচারীদের মাইনে প্রভৃতিতে।

প্রডিউসিং কম্পানীর দায়িত্ব হচ্ছে নাটকটিকে মঞ্চস্থ করা। তার প্রধান ব্যয়, নট-নটী, পরিচালক ও নাট্যকারদের পারিশ্রমিক। ১০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী সমেত একটি সাধারণ নাটককে মহড়া প্রভৃতি দিয়ে মোটামুটি খরচ হয় ৫ হাজার পাউন্ড। কিন্তু তা গীতি কি নৃত্যনাট্য হলে খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ২৫ থেকে ৫০ হাজার পাউন্ডে। বক্স অফিস থেকে যদি সপ্তাহে গড়পড়তা অন্তত ১৫০০০ পাউন্ড আয় না হয় তা হলে নাটকটি লোকশান দিতে থাকে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর থেকে '৬০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৬৩টি নতুন প্রডাকশানের মধ্যে ৪২টির লোকসান হয়েছে।

বলাবাহুল্য কমার্শিয়াল নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলিরই যখন এই অবস্থা তখন রিপারটরিগুলির অবস্থা আরো সঙ্গীণ। এদের সংখ্যা সমগ্র দেশে ৫১টি। তাদের মধ্যে ১৭।১৮টি মাত্র কিছুটা লাভ করে। বাকিগুলি সরকারী আর্ট কাউন্সিল ও বিভিন্ন স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পায়। —এই আর্থিক সংকটের জন্যে 'রিপারটরি' নাট্যশালাগুলি বেশির ভাগ সময়েই নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা না করে পুরোনো ও সফল নাটকই মঞ্চস্থ করে। সময়-সময় অবশ্য কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন নাটক পরীক্ষার জন্যে এদের সাহায্য করে এবং সে-চেষ্টা সফল হলে নাটকগুলি নিজেরা মঞ্চস্থ করে।

ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে সরকার নাট্যশালা, অপেরা, সংগীত ভবন ও ব্যালে প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে আর্থিক সাহায্য করে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে বৃটিশ সরকারের সাহায্যের পরিমাণই সবচেয়ে কম। বৃটিশ সরকারের ললিত-কলার সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৫ লক্ষ পাউন্ড, ফ্রান্সের ২০ লক্ষ পাউন্ড, পঃ জার্মাণীর ২৮ লক্ষ পাউন্ড আর ইতালী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ হলেও তার সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ৩৭ লক্ষ পাউন্ড।

আর্ট কাউন্সিল মারফৎ বৃটিশ সরকারের এই সাহায্যের বিশ্লেষণ করলে যা দেখা যায় তা হচ্ছে প্রতি নাগরিক পিছু ৭ পেন্স। এই সাত পেন্সের মধ্যে মাত্র ½ পেন্স অর্থাৎ আমাদের দেশের এক পয়সার কিছু কম পায় নাট্যশালাগুলি। বাকি ৬½ পেন্স পায় সংগীত-ভবন, অপেরা ও ব্যালে প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

আর্ট কাউন্সিলের সাহায্যের ওপরে আছে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য। কিন্তু সেখানেও, তারা যেখানে ৫ শিলিং ৯ পেন্স খরচ করতে পারে, সেখানে তারা খরচ করে মাত্র ১ শিলিং ১ পেন্স।

—অথচ প্রয়োজনীয় আর্থিক সমর্থন না পেলে নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে নতুন নতুন নাটক কিম্বা অভিনয় কিম্বা মঞ্চ-কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সহজসাধ্য নয়। আর তা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাট্যশালাগুলিতে দর্শকদের ভীড় বাড়ানো যাবে না। আজ বৃটেনে শতকরা মাত্র দুজন লোক নিয়মিত নাটক দেখতে যায়।

নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরেকটি উপায় হচ্ছে ফরাসী দেশের মত সরকারী সাহায্যে একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন করা। সেখানে নতুন-নতুন নাটক, অভিনয় আঙ্গিক ও মঞ্চ-কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে পেশাদার নাট্যশালায় যাবার আগে পর্যন্ত তরুণ নট-নটীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও শিক্ষা পাবেন।

বৃটেনে ঐ জাতীয় একটি নাট্যশালা গঠনের পরিকল্পনা বহুদিনের। ঐ উদ্দেশ্যে লণ্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিল বা কর্পোরেশন ১০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করেছে এবং সরকার করেছে ১৩ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়নি, এমনকি সংস্কৃতির ঐভাবে জাতীয়করণ আদৌ বাঞ্ছনীয় কিনা সে বিষয়েরও মীমাংসা হয়নি।

তবে সরকারী কিম্বা বেসরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থেকেও যে কোথাও কোথাও নাট্যানুরাগীরা নাট্যান্দোলনে নবপ্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেননি এমন নয়। যেমন লণ্ডনের 'থিয়েটার ওয়ার্কসপ' ও 'ইউনিটি থিয়েটার।' কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবার পরও প্রথমটি এ বছর অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টির অবস্থা মুমূর্ষু।

নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট

অবশ্যই একথা অনস্বীকার্য যে, কোন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি স্বকীয় প্রাণশক্তিতে বেগবান হয়, অর্থাৎ যুগের মানসিক প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে সমর্থ হয় তা হলে একমাত্র আর্থিক অনটনই তাকে ম্রিয়মান করে তুলতে পারে না।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে ইংরাজ নাট্যকার জন ওয়েন বলেছেন, "এ হচ্ছে একটা মিলন ক্ষেত্র। এখানে লোকে দল বেঁধে আসে, কেউ টগুলিকে যথাস্থানে রাখে, পরস্পরের দিকে তাকায়, তারপর সমবেতভাবে নাটকটি দেখবার জন্যে তৈরী হয়।......

বিখ্যাত মনীষী জাঁ ক'কতো সিনেমা সম্পর্কে বলেছেন যে তা এমন স্বপ্ন যে বহু লোক এক সঙ্গে দেখতে পারে। সিনেমায় বহু দর্শকের সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন মত ছবির ছায়ায়, সঙ্গীতে ও অনুভূতির পরিবর্তনে গভীরভাবে সাড়া দেয়।

কিন্তু নাটকের দর্শকমণ্ডলী ভিন্ন প্রকৃতির। তারা স্বপ্ন দেখে না, ফরাসীরা যাকে বলে 'সহযোগিতা করা'—তাই করে। তার নিকটতম বিকল্প হচ্ছে রাজনৈতিক সভা।

জাঁ পল-সা'তর বলেছেন, "নাটকের দর্শকমণ্ডলী হচ্ছে একটি সভার মত। —যার মানে দর্শকেরা শুধু নাটকটি সম্পর্কে নিজেদের মতামতের চিন্তা করে না, তার পাশের লোকটি কি ভাবছে সে কথাও চিন্তা করে। আমি যখন কোন নাটক দেখতে গিয়ে কোন সংলাপ শুনি, তখন ভাবি আমার সঙ্গে একমত নয় এমন বহু লোক এই নাট্যশালায় আছে যারা এই সংলাপ শুনে মর্মাহত হচ্ছে। সেই কথা ভেবে আমার সমালোচনা শক্তি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তাদের জন্যে বিব্রত বোধ করি।"

সেক্সপীয়র স্মৃতি নাট্যশালায় অভিনীত 'রোমিও জুলিয়েটের' একটি দৃশ্য।

মনে হয় নাট্যশালার সংকটের গভীরে আছে বর্তমানের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশ। আজকের শিথিল-বিশ্বাস, স্নায়ুযুদ্ধ শঙ্কিত পৃথিবীতে মানুষ নাট্যশালার পরিবেশে বসে সামাজিকভাবে মন-দেওয়া করতে যেন অপারক।

অবশ্য আজ যদি এমন নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটতো মানুষকে যাঁরা যুগ-সংকট ত্রাণের বাণী শোনাতে পারতেন, মুক্তির পথনির্দেশ করতে পারতেন তা হলে হয়তো অবস্থা অন্য রকম হতো। কিন্তু তার বদলে বর্তমানে পাশ্চাত্যের নাট্যকারদের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিবারিক সংকট,—যেখানে একই পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের শত্রুর মত সম্মুখীন হয়। সেই বিরামবিহীন বিদ্বেষ ও বিরোধ দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের মন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের মুক্ত

আলো বাতাসে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচে।

কয়েক বছর আগে মস্কো আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টার শ্রীআলেকজেণ্ডার সোলডোভনিকভ বৃটেনের নাট্যশালাগুলিতে অনেকগুলি নাটক দেখবার পর লেখেন যে বৃটিশ নাট্যকারদের সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে 'বিশ্বাসের অভাব।'

কারণ নাটক রচনার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ, "কার জন্যে, কোন উদ্দেশে, কার নামে সেই নাটক উৎসর্গীত হবে? আজকের সমাজ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে এই নাটকের স্থান কোথায়? কোন-কোন জরুরী প্রশ্নের তা উত্তর দেবে? থিয়েটারকে শুধু আমাদের ক্ষেত্র,—যবনিকা পতনের এক ঘণ্টা পরেই যা ভুলে যেতে হবে,—মনে করাটা দুঃখের বিষয়।

শ্রীসোলডোভনিকভ বৃটিশ নটীদের মধ্যে আরেকটি অবাঞ্ছিত প্রবণতাও লক্ষ্য করেছিলেন। যাকে তিনি বলেছিলেন 'Standardisation of stage characters' অর্থাৎ কয়েক প্রতিভাধর নট-নটী যখন বিশেষ কোন অভিনয়নৈপুণ্যে ও কৌশলে দর্শকচিত্ত জয় করেন তখন স্বল্প প্রতিভাধরেরা কিম্বা তরুণ নট-নটীরা তাঁদের একঘেয়ে অনুসরণ করতে সুরু করেন।

বৃটিশ নাটকলার বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ যা বল্লাম তা শুনে মনে হতে পারে বৃটেনের নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি বুঝি একেবারে মুমূর্ষু এবং মানব সংস্কৃতির এই স্বর্ণ-নির্ঝরটি বুঝি বা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। চলার পথে বাঁক ও বাধার সম্মুখীন হলেও বৃটিশ নাট্যান্দোলনের ধারা আজো প্রাণবন্ত ও বহু সম্ভাবনাময়। নাটক উপভোগ্য হলে তার দর্শকের অভাব হয় না। আগাথা ক্রিষ্টির 'মাউস ট্রাপ' আজ একই নাট্যগৃহে একটানা নয় বছর ধরে চলছে।

বার্ণার্ড শয়ের 'পিগমিলিয়নে'র সংগীত ভাষ্য 'মাই ফেয়ার লেডি' চলছে পাঁচ বছরের ওপর।

খুব সংক্ষেপে যদি বৃটিশ অভিনয় কৌশলের সংগে ইউরোপের অন্যান্য দেশের পার্থক্য বর্ণনা করতে হয় তা হলে বলতে হয় তা হচ্ছে প্রসাধন ও রূপসজ্জার পরিমিতি বা বাহুল্য বর্জন। এ সম্পর্কে সোলডোভনিকভের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "লণ্ডনের অভিনেতারা রূপসজ্জা পরিহার করেন। তাতে তাঁদের মুখকে জীবন্ত ও অভিব্যক্তিময় করে তোলা সহজ হয়। ফলে তাঁরা মঞ্চচরিত্র সৃষ্টির এই শক্তিশালী হাতিয়ারটির চরম ব্যবহার করতে পারেন। অভিনেতারা নিঃসন্দেহে রূপসজ্জার বর্জনের জন্যেই দর্শকচিত্তের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার এই সনাতনী কৌশলটিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

তবে রূপ-সজ্জা বর্জনের একটা অসুবিধার দিকও আছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে লণ্ডনে নাটক বর্ণিত কোন চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে অভিনেতার দৈহিক গঠনও সাদৃশ্য এবং মেজাজের ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অভিনেতার সৃজনীশক্তির সম্প্রসারণের জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির বাইরেও নূতন কোন চরিত্রের মধ্যে পুনর্জন্মলাভের চেষ্টা করা উচিত। এমন তো প্রায়ই ঘটে যে দর্শকরা কে অভিনয় করছেন সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে যান এবং মঞ্চে আবির্ভূত ব্যক্তিটিকে নতুন ও অজ্ঞাতপূর্ব ব্যক্তিত্ব হিসাবে আবিষ্কার করেন।— এই নতুন আবির্ভাবকেই আমি পুনর্জন্ম বলছি। এ রকম ক্ষেত্রে প্রসাধন ও রূপসজ্জা নির্ভরযোগ্য সহায়।"

বৃটিশ অভিনেতাদের সম্পর্কে সোলডোভকনিভ আরেকটি মহাপ্রশস্তি করে গেছেন, "এমন কি ভাষা না জানলেও দর্শক (তিনি নিজে ইংরাজি ভাষা খুব ভাল জানেন) গভীর কৌতূহলের সংগে নায়কের হৃদয় সংঘাত ও মেজাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারেন। সব কিছুই তাঁর মুখে ও কণ্ঠে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। মনে হয় যেন তাঁর আত্মার সমগ্র রূপটি তুলে ধরা হচ্ছে।"

আমাদের দেশের সংগে তুলনা করলে বৃটেনের মঞ্চকৌশল সম্পর্কেও অনেক কথা বলার থাকে। কিন্তু তা দীর্ঘতর স্থান সাপেক্ষ।

স্টার্টফোর্ড-আপন-এভেনে সেক্সপীয়র স্মৃতি নাট্যশালা।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ অন্ধজনের দৃষ্টি ॥

"আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা-সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য প্রকরণ ছিল— সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়রা বহু কাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষের দৃষ্টি সৃজন করিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কলমের জোরে রজনী অনায়াসেই চোখের দৃষ্টি পেয়েছিল। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনো এতখানি ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা মহাকাশকে জয় করতে চলেছেন, অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে নানা আশ্চর্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো জন্মান্ধকে চোখের দৃষ্টি দিতে পারেননি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্ধত্বকে নিরাময় করার জন্যে চিকিৎসাসম্বন্ধে কোনো আশ্চর্য প্রকরণ ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানী ফিলাতভ পরবর্তী জীবনের অন্ধত্বকে বহু ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতিতে নিরাময় করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য কৃতিত্ব। ফিলাতভের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে। আশা করা চলে, এমন দিন শীঘ্রই আসবে যেদিন রজনীর মতো জন্মান্ধরা আধুনিক বিজ্ঞানের চিকিৎসাতেই চোখের দৃষ্টি লাভ করবে।

তবে এই মুহূর্তেই অন্ধকে চক্ষুষ্মান করা না গেলেও পরোক্ষ উপায়ে অন্ধকে কিছুটা দৃষ্টি দেবার আয়োজন চলেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অন্ধের জন্যে নতুন ধরনের এক যষ্টি, যার সাহায্যে পরিবেশের হদিশ পাওয়া যাবে এবং প্রতিবন্ধক সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান হওয়া চলবে।

বোঝাই যাচ্ছে, এই যষ্টি এক যন্ত্র-বিশেষ। আলো বা শব্দতরঙ্গের সাহায্যে এই যন্ত্র পথের হদিশ সংগ্রহ করবে।

শব্দতরঙ্গের সাহায্য নিয়ে যে সব যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে তার মূলনীতির প্রয়োগ অন্যত্র আগে থেকেই ছিল। যুদ্ধের সময়ে জলের নিচের অদৃশ্য ডুবোজাহাজের হদিশ পাবার জন্যে শব্দতরঙ্গ পাঠানো হত। ডুবোজাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সেই শব্দতরঙ্গ ফিরে এলেই বোঝা যেত যে শব্দতরঙ্গের গতিপথে প্রতিবন্ধক রয়েছে। তারপরে নানা ধরনের হিসেব ও মাপজোখের মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধকটির অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালে জলের নিচে মাছের ঝাঁকের অস্তিত্ব টের পাবার জন্যেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের আরো অনেক সব আশ্চর্য প্রয়োগ সম্ভব হবে।

এ-প্রসঙ্গে আগের আলোচনায় আমরা বাদুড়ের কথা তুলেছিলাম। সকলেই জানেন যে বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি প্রায় না-থাকার মতো। অনেকের ধারণা, বাদুড় একেবারেই অন্ধ। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাজার রকমের বাধা ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে দিয়ে বাদুড় অতি অনায়াসেই পথ করে নিতে পারে। এমন কি বাদুড়ের চোখ পুরোপুরি অন্ধ করে দিয়েও দেখা গিয়েছে যে বাদুড় পুরোপুরি চক্ষুষ্মানের মতোই উড়ে বেড়ায় ও পোকামাকড় ধরে। বাদুড়ের এই আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করার পরেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন, যে-পদ্ধতিতে বাদুড় পথের হদিশ পায় সেই একই পদ্ধতিতে অন্ধ মানুষের পক্ষেও পথের হদিশ পাওয়া সম্ভব কিনা। এই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানীরা বাদুড়ের চালচলন খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, বাদুড় অতি-উচ্চমাত্রার ফ্রিকোয়েন্সির শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছেড়ে পথের হদিশ নিয়ে থাকে। কাজেই গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের যন্ত্র সম্বলিত একটি যষ্টি অন্ধের হাতে তুলে দিতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই। ঘোর অন্ধকারেও বাদুড় যেমন অনায়াসে উড়তে পারে তেমনি শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের যন্ত্র হাতে নিয়ে অন্ধরাও ট্র্যাফিক-সমাকীর্ণ শহরের রাজপথে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা তেমন সরল নয়। কারণ, দেখা গেল শুধু শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গই যদি বাদুড়ের একমাত্র সম্বল হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে এতখানি ক্ষিপ্রতা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, দেখা গেল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিবন্ধক, যা শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট, তাও বাদুড়ের কাছে গোপন থাকে না। আস্তো একটি ডুবোজাহাজ বা কোনো বৃহৎ বস্তুকে খুঁজে পাওয়া শব্দতরঙ্গের পক্ষে কিছুই শক্ত কাজ নয়। কিন্তু একটি আণুবীক্ষনিক বিন্দুসদৃশ পোকার হদিশ পেতেও যখন কিছুমাত্র ভুলচুক হয় না—তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে হয় যে ব্যাপারটি জটিলতা-বর্জিত নয়।

তাছাড়াও কথা আছে। বাদুড় যখন শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে তখন তার স্থায়িত্ব হয় এক মিলিসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ) থেকে দশ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত। শব্দতরঙ্গের বেগ যদি ধরা যায় সেকেন্ডে হাজার ফুট তাহলেও এই স্থায়িত্বকালের মধ্যেই শব্দতরঙ্গ এক ফুট থেকে দশ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, বাদুড় যতোক্ষণ ধরে ডাক ছাড়ছে ততক্ষণের মধ্যেই—অর্থাৎ তার ডাক শেষ হবার আগেই—অন্তত পাঁচ ফুট পর্যন্ত দূরত্বের প্রতি-

বন্ধক থেকে শব্দতরঙ্গ বাদুড়ের কাছে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাদুড় একই সঙ্গে ডাকও ছাড়ে আবার প্রতিধ্বনিও শোনে। এ অবস্থায় খুব কাছের জিনিসের হদিশ নেবার ব্যাপারে বাদুড়ের মধ্যে খানিকটা দিশেহারা ভাব আসা উচিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এক মিলিমিটার ব্যাসের তারও যদি প্রতিবন্ধক হিসেবে সামনে খাড়া থাকে, আর বাদুড় যে ফ্রিকোয়েন্সিতে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রচণ্ড একটা সোরগোলও যদি বাদুড়ের কানের পর্দার ওপরে আছড়ে ফেলা হয়, তাহলেও বাদুড় অতি অনায়াসেই প্রতিবন্ধক এড়িয়ে যেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রতিধ্বনি থেকে হদিশ নেবার ব্যাপারটা বিজ্ঞানীরা যান্ত্রিক উপায়ে যেভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, আর সত্যিকারের একটি বাদুড় যেভাবে সম্পন্ন করে—এ দুয়ের মধ্যে খুবই পার্থক্য।

তবে অন্যদিক থেকেও বলার কথা থেকে যায়। ধরে নেওয়া গেল যে বাদুড় যতখানি দক্ষতার সঙ্গে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনিকে যাচাই করতে পারে, একটি যন্ত্রের সাহায্যেও তা করা যাচ্ছে। তাহলেই কি একজন অন্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটবে? বিজ্ঞানীরা তা মনে করেন না।

বাদুড়ের একটি কান যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাদুড় পথের হদিশ নিতে গিয়ে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিধ্বনি যাচাই করতে গিয়ে বাদুড় তার দুটি কানকেই ব্যবহার করে থাকে। উড়বার সময়ে বাদুড়ের ডানাদুটি থাকে শ্রবণপথের একই সমতলে। তাছাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ডান বা বাঁ দিক দিয়ে উড়ে-যাওয়া পোকা ধরবার জন্যে বাদুড় অনেক সময়ে ডানা ব্যবহার করে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় বাদুড়ের দিগ্‌নির্ণয় ও লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা কতখানি নির্ভুল।

কিন্তু বাদুড়ের পক্ষে একটি সুবিধের ব্যাপার হচ্ছে এই যে তার শরীরটি খুবই ছোট। কাজেই বাদুড়ের পক্ষে শরীরকে খুশিমতো নাড়চাড়া করা এবং শরীরের যে-কোনো প্রত্যঙ্গকে খুশিমতো অবস্থানে নিয়ে আসা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

মানুষের বেলায় তার সমস্ত শরীরটাই দারুন একটা অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ মানুষ বাদুড়ের মতো ডানা মেলে আকাশে ওড়ে না। তাকে এই অসমান মাটির ওপরেই পা রেখে চলাফেরা করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ বাদুড়ের মতো তার শরীরটাকে সটান মেলে দিতে পারে না, তাকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাদুড় যদি ফুট ছয়েক দূরত্ব পর্যন্ত হদিশ রাখতে পারে তাহলেই বাদুড়ের আর উড়ে বেড়াতে বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু মানুষের কাছে ছ'ফুট মানে বড়ো জোর তিনটি পদক্ষেপ। তাকে চলাফেরা করতে হয় আরো অনেক বিস্তৃত সীমানার হদিশ রেখে। আর শেষ কথাটা এই যে বাদুড় হচ্ছে বাদুড়। সে তার পরিবেশ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মানুষের মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে তীব্র একটা কৌতূহল। অন্ধকে পথের হদিশ দিতে হলেও এই কৌতূহলের কিছুটা নিবৃত্তি হওয়া দরকার। এই কারণেই শুধু প্রতিবন্ধককে এড়িয়ে চলতে পারলেই অন্ধদের প্রয়োজন মেটে না। মানুষ বলেই তাদের জন্যে আরো কিছু চাই।

যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, অন্ধব্যক্তি যখন রাস্তা দিয়ে চলবেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই জানতে দিতে হবে যে রাস্তার দু-পাশে কী আছে—নর্দমা না রেলিং না ঝোপঝাড় না মাঠ-ময়দান? অন্তত এইটুকু খবর যদি অন্ধের কাছে পৌঁছতে পারা না যায় তবে যান্ত্রিক সহায়তার কোনো অর্থই হয় না। বলাবাহুল্য, অন্ধের কাছে সমস্ত খবরই পৌঁছে দিতে হবে কানের মাধ্যমে। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের একটা শব্দগত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। কথাটা শুনতে যতোটা অসম্ভব মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। ক্লাসিক গানের কান যাঁদের আছে তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে গানের সুরও নানা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। এমন কি অনেক সময়ে এই গানের সুরের ছবি মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যা চোখের দেখা ছবি পারে না।

প্রাণীজগতে, যতোদূর জানা গিয়েছে, শব্দের সাহায্যে ছবি গ্রহণ করার ক্ষমতা বাদুড়েরই সবচেয়ে বেশি। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা এই স্তন্যপায়ী জীবটিকে এত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বাদুড় যখন শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে তখন তার মধ্যে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সির মেশাল থেকে যায়। সংখ্যার হিসেব দিয়ে বললে কথাটা আরো স্পষ্ট হবে। আমরা মনে করতে পারি, বাদুড় যখন ডাক ছাড়ছে তখন সেই ডাকের শব্দতরঙ্গের মাপ বরাবরই ৫০ কিলোসাইক্লস্। এক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত। কিন্তু এমনও হতে পারে, শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ৮০ কিলোসাইক্লস্-এ শুরু হয়ে ৪০ কিলোসাইক্লস্-এ নেমে আসছে। এক্ষেত্রে পুরো একটি ডাকের মধ্যে অনেক গুলো ফ্রিকোয়েন্সি এসে গেল। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এ-ধরনের মিশ্র শব্দতরঙ্গের সাহায্যে পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা হওয়া সম্ভব।

এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এসব যন্ত্রের কার্যকারিতা এতকালের নির্মিত অন্য সমস্ত যন্ত্রের চেয়ে উন্নততর ও ব্যাপকতর। কারণ এসব যন্ত্রের সাহায্যে শুধু প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ধারণা হয় না, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের মধ্যে পার্থক্যও টের পাওয়া যায়। অবশ্য এজন্যে যন্ত্রব্যবহারকারীর কিছুটা ট্রেনিং থাকা দরকার। অন্ধদের এমনিতেই শ্রবণেন্দ্রিয়টি খুবই প্রখর। জন্মান্ধরা এমনিতেই শব্দের ভাষায় জগৎ সম্পর্কে একটি ছবি তৈরি করে নেয়। কাজেই এ-ধরনের একটি যন্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া তাদের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। তারপরে এই যন্ত্রটির সাহায্যেই তারা নিমেষে বুঝে নিতে পারবে, কোনটি দেওয়াল, কোনটি সিঁড়ি, কোনটি গাছ, কোনটি রেলিং, ইত্যাদি। তারপরে যন্ত্রটির আকার যদি ছোট হয় আর যন্ত্রটি দেখতে যদি সুন্দর হয়— তাহলে এই যন্ত্রটিকে নিয়ে অন্ধ শিশুরাও ছুটোছুটি খেলায় মেতে উঠতে পারবে।

পৃথিবীর সব দেশেই কিছু সংখ্যক জন্মান্ধ আছে। তারপরে মহাযুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু লোককে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয়েছে। অন্ধদের চক্ষুষ্মান করা হবে এমন দাবি বিজ্ঞানীরা করছেন না।

কিন্তু অনেকখানি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন যে করে তোলা যাবে তার বাস্তব প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

॥ অদৃশ্য চশমা ॥

চোখের সামনে নাকের ওপরে একটা চশমা থাকাটা সব সময়েই একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের দেশে গরমের সময়ে চশমা প্রায় একটা শারীরিক যন্ত্রণার সামিল। খেলোয়াড় বা পাইলটদের ক্ষেত্রে চশমার মতো অভিশাপ আর কিছু নেই।

চশমাধারীদের পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ এই যে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় অদৃশ্য চশমার প্রচলন হয়েছে। এই অদৃশ্য চশমাকে বলা হয় কর্নিয়াল লেন্স। এই লেন্স কর্নিয়া বা চক্ষুতারকার ওপরে পাতলা একটি পর্দার মতো লেগে থাকে। খুব অভিজ্ঞ চোখ না হলে এই লেন্সের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন স্বাভাবিক চোখ। এই কারণেই এই লেন্সকে খবরের কাগজের ভাষায় বলা হয় অদৃশ্য চশমা।

আমরা সাধারণত যে ফ্রেম-লাগানো চশমা ব্যবহার করি তার লেন্সের ব্যাস হয় প্রায় ২২ মিলিমিটার। আর এই কর্নিয়াল লেন্সের ব্যাস হয়ে থাকে ৯ থেকে ১১ মিলিমিটার। আর ওজনও হয় খুবই সামান্য—এক গ্রামের দশভাগের এক বা দুই ভাগ। এই সামান্য ওজনের জন্যেই অদৃশ্য চশমায় পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগে না।

ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই অদৃশ্য চশমার প্রচলন খুবই বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ চশমার চেয়ে এই অদৃশ্য চশমা দৃষ্টিশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

দামের দিক থেকেও খুব একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। সাধারণ চশমার যা খরচ তার ছ-গুণ বেশি খরচ করতে পারলেই এই অদৃশ্য চমশা নেওয়া চলে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলেই এই চশমার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, তবে এখনো পর্যন্ত তেমন ব্যাপক হতে পারেনি। জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠানের হিসেব থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানে যতো লেন্স তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ছিল সাধারণ লেন্স, বাকি ৯৬ ভাগ কর্নিয়াল লেন্স।

তবে এই লেখাটি পড়ে অদৃশ্য চশমা সম্পর্কে যদি কেউ আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। অদৃশ্য চশমায় চোখের ভাষা খানিকটা যেন চাপা পড়ে যায়, চোখের ঝিলিক ঠিকমতো যেন ফুটে বেরোয় না। কাজেই আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ এই যে চোখে ছানি পড়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য চশমা না পরাই ভালো। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে, কারণ অদৃশ্য চশমায় চোখের কটাক্ষ ভোঁতা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেশবের নামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চীফ্ এবং দু-একজন পেটী অফিসার কিছুক্ষণ লাঠি আস্ফালন করল। যাকে লক্ষ্য করে করল, সে একেবারে নির্বিকার, যেন কানেই যায়নি কী বলছে এরা। দুড'লের ফাঁকে আর একটু ঘন হয়ে বসল। বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরল চীফ্। নরম সুরে বলল, এখনো যদি নামিস, কিছু বলবো না। দেরি করলে আর রক্ষে নেই।

এবারে গুটি গুটি নামতে শুরু করল কেশব। মাটিতে পা দিতেই চীফ্ গর্জে উঠল, গাছে উঠেছিলি কেন?

কোনো উত্তর নেই।

—বল, কি করছিলি ওখানে?

কেশবের মাথাটা আরো খানিকটা নুয়ে পড়ল মাটির দিকে। পেটী অফিসারদের মধ্যে কে একজন বলল, পেয়ারা খাচ্ছিল, আর করবে কী?

—কোথায় পেয়ারা? এটা কি পেয়ারার সময় নাকি?

তাইতো। সকলেরই নজর পড়ল গাছগুলোর দিকে। নতুন পাতা গজিয়েছে। ফলের নাম-গন্ধও নেই।

চীফ্ আর একবার তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করেও যখন জবাব পেল না, এগিয়ে এসে ঠাস করে চড় কসিয়ে দিল ওর গালের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতর থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল একটা গোলগাল ডাঁশা পেয়ারা। ততক্ষণে আরো লোক এসে জড়ো হয়েছে চারদিকে। সকলেই অবাক! এ সময়ে পেয়ারা এল কোত্থেকে!

—'ঐ একটাই ছিল,' ধুলোজড়ানো পেয়ারার দিকে করুণ চোখ রেখে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কেশব।

চীফ কোনো রকমে হাসি চেপে বলল, তা তো ছিল বুঝলাম। কিন্তু তোর এই রাক্ষুসে খিদে মিটবে কিসে বলতে পারিস? এই না একবাটি চিঁড়ে গিলে এলি?

এর প্রায় বছর খানেক পরে চীফ অফিসারের এই প্রশ্নটা কেশব নিজেই একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল তার বন্ধু দিলীপের কাছে—এত খাচ্ছি, তবু পেট ভরে না। কেন, বলতে পারিস? তখন দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। সেদিন বর্স্টাল স্কুলে একটা ছোটখাটো উৎসব লেগে গিয়েছিল। ছোট বড় সকলের চোখেই উত্তেজনা। কী ব্যাপার? না, বেগুনি হচ্ছে। জেলবাগানের বেগুন,—পালং শাক, শালগম আর মুলোর সঙ্গে ঘেঁটে যা দিয়ে রোজই একটা একই ধরণের কৃষ্ণবর্ণ রসায়ন তৈরী হয়ে থাকে, এবং যার চেহারা দেখেই অতগুলো নাক একসঙ্গে কুঁচকে ওঠে,—তাকে আজ আলাদা করে বেসনে ডুবিয়ে ভাজা হবে। বেসনটাও বাড়তি নয়। যে-ছোলার ডাল ওদের সপ্তাহে তিনদিন গলাধঃকরণ করতে হয়, এবং বহু কসরৎ করেও জলের সঙ্গে তার মিলন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হয় না, তারই খানিকটা করে কেটে রেখে জমিয়ে জমিয়ে আজ হামান দিস্তায় গুঁড়িয়ে বেসনে রূপ দেওয়া হয়েছে। তেলটাও রোজকার রেশন থেকে একটু একটু করে জমানো। অর্থাৎ সরকারের অতিরিক্ত খরচ কিছু নেই। তবু সমস্ত ব্যাপারটাই বে-আইনী। মাথা প্রতি চাল ডাল তেল, নুন, মায় হলুদ-লঙ্কার বরাদ্দ সব বাঁধা আছে স্কুল-কোড-এ এবং তার এক চুল এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা সুপারকে দেওয়া হয়নি। প্রাত্যহিক রেশন সেইদিনই খরচ করতে হবে, তার কোনো অংশ জমিয়ে রাখা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। খাদ্যবস্তুর স্কেল যারা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা তো আর খেয়াল খুশি মত যা হোক একটা দাঁড় করাননি, প্রতিটি জিনিসের খাদ্যমূল্য কষে, ক্যালরি হিসাব করে তবে তার পরিমাণ স্থির করেছেন। তারপর তাকে কোডিফাই অর্থাৎ আইনবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে এদিক ওদিক করা শুধু আইনভঙ্গ নয়, ক্যালরির তারতম্যের দরুণ ছেলেদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটানো।

কিন্তু মিলিটারী সুপার মাঝে মাঝে আইন ও ক্যালরি—দুটোকেই অগ্রাহ্য করে চলেন। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন চীফ অফিসারকে ডেকে বললেন, আসছে রবিবার দিন নিমকি খাবে ছেলেগুলো, প্রত্যেকে চারখানা করে।

'যে আজ্ঞে, হুজুর' বলে সেলাম করে চলে যায় চীফ। হুকুমটা জানিয়ে দেয় 'রেশন-ষ্টোর'এর কেরাণীবাবুকে। তার মুখে অন্ধকার নেমে আসে, একগাদা কাজ বেড়ে গেল। তার সঙ্গে একঝুড়ি হিসাব। অতটা করে আটা আর তেল কেটে রাখো রোজকার রেশন থেকে, আটার বদলে ইস্যু কর চাল, সেই পরিমাণ 'বিহার ডায়েট' অর্থাৎ যারা একবেলা ভাত, আরেকবেলা রুটি খায়, তাদের সংখ্যা কমিয়ে 'বেঙ্গল ডায়েট' অর্থাৎ দুবেলা অন্নভোজীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, বাড়তি চাল যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আলাদা একজায়গায় নোট করে রাখো, ছ'মাস পরে 'রাইট অফফ্' করবেন সুপার। তেলের বেলাতেও খাতাপত্রে অমনি সব জটিল ডান দিক বাঁ দিকের ব্যাপার। এসব নির্দেশ আগে থেকেই দেওয়া আছে। পালন না করে উপায় নেই। 'কাগজপত্তর ঠিক রেখো'—সাবধান করে দিয়েছেন সাহেব। 'অডিট যেন কিছু

ধরতে না পারে। আর যদি ধরে আমি তো আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।' তবু হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। খেয়ালী হলেও প্রাণ আছে লোকটার, বুকের পাটা আছে,—নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেরাণীবাবুরা। এরকম 'বস্' যাতে বিব্রত না হন, অবশ্যই দেখতে হবে।

খেয়ালী 'বস'এর অত্যাচার যে কর্মীরাই ভোগ করে তাই নয়, কনট্রাক্টর-বাবুরাও বাদ যায় না।

ছেলেদের খাবার 'ফাইলে' উপস্থিত থাকা সুপারের অবশ্য কর্তব্য নয়। কালে ভদ্রে এলেই চলে। কিন্তু ঘোষসাহেবের আলাদা নিয়ম। বিকাল বেলা আফিস নেই; তবু প্রায়ই এসে হাজির হন এবং সোজা চলে যান 'ডাইনিং সেড'এ। দুপুরে থাকেন তার চেয়েও বেশী। এক-দিন ফিডিং প্যারেড থেকে ফিরে ডেপুটিকে ডেকে বললেন, বাঁধাকপিটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা বদলান।

—এ সময়ে বাগানে তো আর কিছু নেই, গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন সন্তোষ-বাবু।

এ ব্যাপারেও সরকারী বিধিনিষেধ রয়েছে। বাগানের তরকারী যদ্দিন না শেষ হচ্ছে, কিংবা ঘাটতি পড়ছে, ততদিন উপরওয়ালারা বাইরে থেকে এক ছটাকও কিনবার অনুমতি দেবেন না। এ নিয়ে হেড অফিসের সঙ্গে অনেক অপ্রিয় চিঠি চলাচল হয়ে গেছে, সুপার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় জেল-বাগানে কেবল এক কি দু রকমের সবজি পড়ে থাকে, যদিও পরিমাণের দিক দিয়ে প্রচুর। কিন্তু তাকে খাদ্যবস্তুর রূপ দিতে হলে তার সঙ্গে অন্য দু'চারটা তরকারী মেশাতে হয়। মানুষের বিশেষ করে এইসব ছোট মানুষের, রসনা বৈচিত্র্য-পিয়াসী। বলা বাহুল্য এসব হাস্যকর যুক্তি উপর মহলে পাত্তা পায়নি। সর-কারী অর্থের অযথা অপব্যয়ে তাঁরা রাজী হননি।

ডেপুটির জবাব শুনে ঘোষসাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, বিষ্টুকে দেখলাম যেন গেটে। ডাকুন তো।

বিষ্টু সরকার একজন কনট্রাক্টর। ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল সাহেবের সামনে। কী একটা লিখছিলেন। লিখতে লিখতেই বললেন, কাল এক মণ আলু দিও তো বিষ্টু।

বিষ্টু আকাশ থেকে পড়ল। চুণ, আলকাতরা আর নারকেল দড়ির ঠিকাদার সে। আলুর কনট্রাক্ট অন্য লোকের। জোড়হাত করে বলল, আজ্ঞে, হুজুর, আলু তো আমার নয়। ওটা বোধহয় ভুবন শা পেয়েছে।

—জানি। তোমাকে দুমণ চুণের অর্ডার দিচ্ছি। তার বদলে এক মণ আলু দেবে।

বিষ্টু প্রমাদ গণল। চুক্তি অনুসারে সে বাধ্য নয়। কিন্তু এ ব্যক্তিটির সামনে সেকথা বলবার সাহস কারো নেই। আমতা আমতা করে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, দুমণ চুণের দামে কি একমণ আলু হয়, হুজুর?

—খুব হয়। কিছু না হয় খসালে ট্যাঁক থেকে, কতগুলো বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো ছেলের জন্যে। ওদের কল্যাণেই তো করে খাচ্ছ।

বিষ্টু নমস্কার করে চলে গেল। ডেপুটি ব্যাপারটা বুঝলেন না। সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, অর্ডার যাবে চুণের, গেট বই এবং স্টক বুকে লেখা হবে চুণ, তারই দাম পাবে কনট্রাকটর। আসলে আসবে একমণ আলু, তা দিয়ে তৈরী হবে আলুর দম।

—কিন্তু এটা কি রীতিমত ইররেগু-লার নয়, স্যর? বিস্ময়ের সুরে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন ডেপুটি সুপার।

—হ্যাঁ, ইররেগুলার বৈকি? অত্যন্ত সহজভাবে, লেখা থেকে চোখ না সরিয়েই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঘোষ-সাহেব।

ডেপুটি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তা ছাড়া আমার মনে হয়, এইসব স্পেশাল ফুড খাইয়ে ছেলেগুলোকে আমরা বিগড়ে দিচ্ছি।

এবার মুখ তুললেন সুপার। কিছু-ক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তার ডেপুটির মুখের দিকে। তারপর বললেন, আপনার কটি ছেলে-মেয়ে, সন্তোষবাবু?

—তিনটি?

—কত বয়স তাদের?

—বড়টির ষোল, ছোট ছেলেটা সাত বছরের।

—তাদের কি রোজ রোজ একই জিনিস খেতে দেন?

সন্তোষবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে সাহেব বললেন, আপনি হয়তো জানেন না। আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, দেন না। আপনার এই সামান্য আয়ের মধ্যেই তাঁকে ওদের জন্যে আজ এটা কাল ওটার ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে ওরা খায় না, ফেলে ছড়িয়ে উঠে যায়। মনে রাখবেন, আমরা যাদের নিয়ে আছি, তারাও ঐ বয়সী ছেলে। ভাগ্যদোষে জেলে এসেছে বলে স্বভাবটা পালটে যায়নি, যেতে পারে না।

চীফ্ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেগুনি ভাজাচ্ছে। কিচেনের ছেলেরা তো আছেই, আরো কতগুলো ফালতু ছেলেও ভিড় করেছে চারপাশে। কিচেন-এলাকার পেটী অফিসার মাঝে মাঝে বেটন উঁচু করে তাড়া করতেই পালিয়ে যাচ্ছে, আবার এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে উনুনের ধারে। ভাজা বেগুনির পাহারায় রয়েছে জনকয়েক "স্টার বয়"। হঠাৎ তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, "এই, নিল, নিল! ঐ যে যাচ্ছে।" এক পাল ছেলে ধর ধর করতে করতে ছুটে গিয়ে বমাল চেপে ধরল চোরকে। কেশব সিকদার। গোটা একটা বেগুনি তার মুখের মধ্যে, আর একটা হাতে। চারদিক থেকে শুরু হল চড় চাপড়, কীল ঘুষি, তার সঙ্গে মুঠি খুলে চোরাই মাল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা। সে কি সহজে ছাড়তে চায়? দু তিনজনে মিলে অতি-কষ্টে যখন উদ্ধার করা হল, সেটা আর খাবার মত নেই, থেঁতলে চেপ্টে টুকরো হয়ে গেছে। মুখের খানা অবশ্য সে নষ্ট হতে দেয়নি। ধস্তাধস্তির মধ্যেই কোঁৎ করে গিলে ফেলেছে।

চীফ্-এর হুকুম মত একজন পেটী অফিসার কেশবের কান ধরে সেল্-এ নিয়ে বন্ধ করল। সে বেলার মত খাওয়াও বন্ধ। 'যেমন নোলা হতভাগার; থাক খানিকটা উপোস করে'—রায় দিল চীফ্ অফিসার। ছেলেরাও অনেকে সমর্থন করল, ঠিক হয়েছে। খেয়ে খেয়ে কুমড়ো হয়েছে, তবু লোভ দ্যাখ না?

জনাপ্রতি দুখানা করে বেগুনি। দিলীপের পাতে পড়তেই সে এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে তুলে নিয়ে কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আশে-পাশে যারা বসেছিল, তাদের একাগ্র লোলুপ দৃষ্টি তখন পড়ে আছে পরি-বেশনের বুড়ির দিকে। কে জানে যদি

বেঁচে যায়, আরেকখানা করে জুটে যেতে পারে।

খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হৈচৈ হল্লার মধ্যে বেগুনি দুখানা কোল থেকে পকেটে চালান করাটাও বিশেষ কঠিন হল না। শীতের দিন। খাবার পরে বেশীর ভাগ ছেলে যখন মাঠের দিকে রোদ পোহাতে গেল, সকলের অলক্ষ্যে দিলীপ চলল সেল্-এর দিকে। সেখানে একজন পেটী অফিসারের পাহারায় থাকবার কথা। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। সেল-ব্লকের সামনেই কতগুলো কাঁঠাল গাছের জটলা। দুপুরবেলাতেও অন্ধকার মত। শীতের দিনে ভীষণ ঠাণ্ডা। হয়তো সেইজন্যেই সিপাই সেখানে নেই, ওদিকের মাঠের ধারে খোলা জায়গায় রোদে বসে আরাম করছে। সেল-এর সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা উঠোন, ঢুকবার মুখে কাঠের দরজা। সেটা খোলা ছিল। তারই ভিতর দিয়ে দিলীপ নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে গরাদে দেওয়া গেটের ফাঁক দিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল কেশো......। হাতদুটো জড়ো করে তার উপর মাথা রেখে ঠাণ্ডা মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল কেশব। ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখের কোল বেয়ে নেমে আসা দুটো জলের ধারা তখনো ভাল করে শুকায়নি। তার উপরে ফুটে উঠল এক ঝলক হাসি। ছুটে এসে বন্ধ গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোদের খাওয়া হয়ে গ্যাছে?

“এই, নিল নিল। ঐ যে যাচ্ছে।”

দিলীপ পকেট থেকে বেগুনি দুটো তুলে নিয়ে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, এই নে।

কেশবের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল, মুখেও জল এসে গেল। ডান হাতটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ সামলে নিয়ে বলল, না, ভাই, ওটা তোর; তুই খা।

—যাঃ, আমার কেন হবে? সে তো আমি তখনি খেয়ে নিয়েছি। এ দুটো তোর জন্যে এনেছি।

—সত্যি বলছিস?

—বা রে! মিথ্যে বলতে যাবো কেন?

—কি করে আনলি?

—সে সব তোকে ভাবতে হবে না। নে ধর। চট করে খেয়ে ফ্যাল্। আবার কে এসে পড়বে।

কেশব আর আপত্তি করল না। বেগুনি দুটো নিয়েই মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বলল, খুব ভালো হয়েছে, না রে?

দিলীপ জবাব দিল না; অবাক হয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অমৃতও বোধহয় এমন করে কেউ খায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অনুযোগের সুরে বলল, আচ্ছা, তুই হঠাৎ ঝুড়িতে হাত দিতে গেলি কেন বল ত? খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, বাহাদুরকে বললেই হত। সে তো তোকে কত জিনিস এনে দেয়।

—ও সব কি আর তখন মনে ছিল? গরম গরম বেগুনি! দেখে এমন লোভ লেগে গেল—! কি জানিস ভাই, প্রাণটা আমার সব সময় খালি খাই খাই করে। কি জানি কেন?

বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে কেমন একটা উদাস করুণ সুরে বলল, কতদিন যে পেট ভরে খেতে পাইনি। কিছু খেতে দিত না লোকটা।

—কোন্ লোকটা? কার কথা বলছিস?

—সেই আমার বাবাটা। আবার কে?

দিলীপ চমকে উঠল। বাবা সম্বন্ধে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে না। নিজের বাপকে সে দেখেনি বললেই হয়, মার মুখে যতটুকু শুনেছে, তার থেকেই একটা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। কখনো তাঁর উল্লেখ করতে গেলে সেই সুরটাই বেরিয়ে আসে। বাবার স্মৃতি জেগে উঠতেই হঠাৎ মাকে মনে পড়ে গেল। হয়তো সেই থেকেই বেরিয়ে এল প্রশ্নটা, তোর মা? তিনি কিছু বলতেন না?

—থাকলে তো বলবে। সে তো সেই ক-বে মরে ভূত হয়ে গেছে।

আরেকবার হেসে উঠল কেশব। কিন্তু দিলীপের কানে সেটা শোনাল ঠিক কান্নার মত।

এর কিছুদিন পরে, একদিন বিকাল-বেলা খেলার ঘণ্টা পড়তেই অন্য ছেলেরা যখন 'ভলিবল' নিয়ে ব্যস্ত, ওরা দুজন সকলের অলক্ষ্যে সরে গিয়ে উত্তর দিকের পাঁচিলের ধারে একটা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়ল। কেশব সেদিন কি কারণে বকুনি খেয়েছিল 'লোহা-মাষ্টারের' কাছে। মনটা ভাল ছিল না। হয়তো তার থেকেই বর্স্টালে ঢুকবার আগের দিনগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। সমব্যথী বন্ধুর কাছে আপনা হতেই বেরিয়ে পড়েছিল সব কথা, যা সে কোন-দিন কাউকে বলেনি। এ যেন তার স্বগতোক্তি, এমনিভাবে ধীরে ধীরে বলেছিল, "মা কবে মরে গেছে আমার কিছু মনে নেই। বাবা নাকি রাত্তিরবেলা মদ খেয়ে এসে লাথি মেরেছিল পেটের ওপর। সে সব আমি কিছু জানি না; পটলার মার কাছে শুনেছি। তাকে আমি মাসি বলতাম। তার কাছে খেতাম, শুতাম। তারপর একটু বড় হতেই বাবা এসে নিয়ে গেল। দুজনে সে কী ঝগড়া! মাসি আমাকে যেতে দেবে না, বাবাও ছাড়বে না। তারপর কারা সব এসে পড়ল এদিক ওদিক থেকে। আরো অনেকক্ষণ চেঁচামিচি হল। শেষটায় দেখলাম মাসি বসে বসে কাঁদছে, আর বাবা আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। আমার একটুও যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবার যা রাগ, আর যে রকম গুণ্ডার মত দেখতে; ভয়ে কিছু বলতে পারিনি।"

তারপর থেকেই শুরু হল তার জীবনের দুঃখের ইতিহাস। একটি একটি করে কেশব তার সব অধ্যায়গুলো খুলে বলেছিল বন্ধুর কাছে। প্রথম থেকেই না খেতে দেবার পালা। অথচ, বাবার অবস্থা খারাপ ছিল না, বেশ সচ্ছলই বলা চলে। কোন্ একটা বস্তিতে একটা খোলার ঘরে তারা থাকত। সকালে উঠেই একটা করে পয়সা পেত কেশব মুড়ি খাবার জন্যে। এক পয়সার মুড়িতে তার পেট ভরত না। একদিন বলেছিল, আর একটা পয়সা দাও না বাবা? বাবা এমন তেড়ে উঠেছিল যে আর কোনোদিন আর কিছু চাইতে সাহস করেনি। বাজার করে এসে নিজেই রাঁধত বাবা। রান্না হলে একটা কলাই-করা থালায় একমুঠো ভাত একটু ডাল কোনোদিন বা এতটুক তরকারী দিয়ে বসিয়ে দিত তাকে। আধ-পেটাও নয়। চেঁছে মুছে শেষ কণাটুকু পর্যন্ত খেয়ে বসে থাকত, যদি আর দুটো ভাত দেয়। বাবা ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিত। তারপর মস্ত বড় এক থালা ভাত আর বাটি ভর্তি ডাল তরকারী নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে বসে বসে খেত। খেয়েই শুয়ে পড়ত। উঠত সেই সন্ধ্যার মুখে। রাত্রে রান্নার পাট ছিল না। ন'টার সময় ছেলের হাতে চারটা পয়সা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেত। এই ছিল রোজকার রুটিন। কোথায় যেত, কেশব তখনো জানত না। বেরোবার আগে কোমরে একখানা ছোরা গুজে নিত, আর গায়ে একটা চাদর। অনেক রাত পর্যন্ত খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত কেশব। তার বাবা যখন ফিরত, তখন ভোর হয়ে গেছে।

তারপর একদিন এই নৈশ অভি-যানের রহস্য আর তার কাছে গোপন রইল না। শুধু যে জানল তা নয়, যোগও দিতে হল বাবার সঙ্গে। তখন সে আরো খানিকটা বড় হয়েছে কিন্তু সে শুধু মাথায়। রোগা পাকাটে চেহারা; পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট গোনা যায়। তার উপরে বেশ খানিকটা তেল মেখে ছোট্ট একটা জাঙিয়া পরে প্রায় রাত্রেই বেরোতে হত। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যেত কোনো কোনো দিন। তারপর, রাত যখন গভীর, কোনো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তার বাবা। শুধু বাড়িটা নয়, তার আশপাশ, সামনে পিছনের রাস্তা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ফিস ফিস করে বলত, জাঙিয়া খুলে আমার কাঁধে ওঠ। কাঁধে চড়ে পাঁচিলের উপর উঠে বন্ধ দরজার চৌকাঠ বেয়ে নেমে গিয়ে ওপাশ থেকে খিল খুলে দিত। বাবা ঢুকত পা টিপে টিপে। খোলা জানালা দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখত ঘরের ভিতরটা। কখনো উঠে যেত দোতলায়। তারপর যে ঘরে ঢুকতে হবে তার জানলার শিক ধরে বেঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করত। কোনোদিন শুধু হাতে; কিন্তু বেশীর ভাগ দিন একটা মোটা কাঠির সঙ্গে দড়ি বেঁধে আস্তে আস্তে চাড় দিতে থাকত। দুটো শিকের মাঝখানের ফাঁকটা একটু বেড়ে যেতেই ছেলেকে বলত ঢুকে পড়। কেশব সহজে ঢুকতে পারত না। পিঠের চামড়া উঠে যেত কখনো বা মাথাটা গলত না। ঠেলাঠেলি করে সেই শীর্ণ দেহটাকে ভিতরে চালিয়ে দিতে দিতে চাপা গলায় দাঁত কড়মড় করে বলত তার বাবা দিন দিন খাসী হচ্ছে হারামজাদা। কাল থেকে কিচ্ছু খেতে দেবো না; শুধু জল খেয়ে থাকবি।

ঘরে ঢুকেই কেশবের প্রথম কাজ ছিল দরজাটা খুলে দেওয়া। এতটুকু শব্দ না হয়, ঘরে যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা না টের পায়। তাহলেই মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বাবা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ ঢুকে পড়ত, আর ছেলের উপর নির্দেশ ছিল সদর দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, যতক্ষণ সে কাজ সেরে না ফেরে।

সবদিন সুবিধা হত না। আয়োজন-পর্বের মাঝখানেই কোনো এক সময়ে জেগে উঠত কেউ না কেউ। তখন প্রাণ-পণে পালাতে হত। আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বিনা বাধায় মনের মত কাজ হাঁসিল হয়ে যেত। হাতের কাছে যা পেত হাতিয়ে নিয়ে আসত ওর বাপ—ঘড়ি, কলম, সোনার বোতামসমেত সিল্কের জামা, দামী শাড়ি, টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এবং ঐ জাতীয় খুচরো মাল। বাক্স-প্যাটরা বা অন্য কোনো ভারী জিনিসে হাত দিত না। একবার একটা সুটকেস সমেত রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে বাপ-বেটায় দে ছুট।

গৃহস্থের হাতেও একবার ধরা পড়েছিল কেশব। পাঁচিল ডিঙিয়ে সদর দরজা খুলতেই একজন ষণ্ডামতন হিন্দুস্থানী ছুটে এসে তার একটা হাত চেপে ধরেছিল। রাখতে পারেনি। পিছলে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন বুঝেছিল, তেল মাখা নিয়ে বাবা এত খিট খিট করত কেন। ঐ তেলই সেবার বাঁচিয়ে-ছিল তাকে। কিন্তু এর পরের বার আর কাজে লাগল না।

একতলার ঘর। গরাদেগুলো মোটা মোটা। অনেক চেষ্টা করেও বাঁকানো যাচ্ছিল না। কাঠির সঙ্গে লেগে বোধহয় একটু শব্দ হয়ে থাকবে। একজন মেয়ে-ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—চোর! চোর! কাঠি আর দড়ি ফেলে বাবা এক লাফে উঠোন পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল কেশব পারল না। সে-ও ছুটেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্ত গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মাথাটা ঘুরে উঠল। সে রাতে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। 'মোটা' হয়ে যাচ্ছে বলে রোজকার সেই সামান্য বরাদ্দ থেকেও খানিকটা কমিয়ে দিয়েছিল তার বাপ। ছুটতে গিয়ে পা দুটো যেন জড়িয়ে গেল। বসে পড়ল দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এলো-পাতাড়ি চড় চাপড়। সে পর্বটা কতক্ষণ চলেছিল কেশব ঠিক জানতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। যখন জ্ঞান হল, দেখল একটা কোন অচেনা জায়গায় বেঞ্চির উপর শুয়ে আছে। পরে জেনেছিল সেটা থানা।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ বিচিত্রা

॥ একটি অতিকায় বাজার ॥

যে সমস্ত বাজারের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলি খুবই পুরনো ধরনের। ইউরোপের অতিকায় বাজারগুলি আমাদের চোখে এখনও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। আমাদের দেশের আধুনিক ধরনের বাজার তৈরীর আগে এ সমস্ত বিদেশী বাজারগুলি থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বাইরে দু'লক্ষ বর্গমীটার জায়গার ওপর নির্মিত হচ্ছে ইউরোপের সর্ববৃহৎ অতিকায় বাজার। এটি নির্মাণে জমির জন্য মোট ব্যয় হবে এক কোটি মার্ক এবং নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মার্ক। সম্প্রতি বুলডোজারগুলি তার জন্য জমি নির্মাণের কাজ শুরু করেছে এবং ১৯৬৩ সালে এর নির্মাণকার্য শেষ হবে। অবশ্য কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক অবস্থায় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর পার্লামেণ্টে পর্যন্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা হয়। এরকম একটি বৃহৎ বাজার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগেই পরিচালকগণ দু'বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীর বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যে কোম্পানী বাজারটি তৈরী করছেন তাঁরা পরিচালনাগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে এই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। দোকান ভাড়া নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে যত অনুরোধ এসেছে তার সংখ্যা বাজারের দোকান সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে থাকবে ১২০০০ বর্গমীটার জায়গার ওপর একটা নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দোকান। দুটি বড় কাপড়ের দোকান (৪০০০ ব, মী,), একটি ছোট ধরনের বাজার (১০০০ ব, মী,), বিপুল আকারের মুদিখানা (৩০০০০ ব, মী,), একটি ছোট ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর (২০০০ ব, মী,)। পোষ্ট অফিস, খেলার জায়গা, চুল কাটার ও হেয়ার ড্রেসারের দোকান, ক্লীনারের দোকান, রেস্তোঁরা, পেট্রল পাম্প এবং বিবিধ বিষয়ের ৫০টি খুচরো দোকান। মোটরগাড়ী থেকে চুলের কাঁটা পর্যন্ত টুকিটাকি জিনিস পাওয়া যাবে। শিশুদের জন্য একটি কিণ্ডার গার্টেন থাকবে—যাতে শিশুদের রেখে বাবা-মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করতে পারেন। বেশীর ভাগ খরিদ্দারগণের মোটরে করে আসবার সম্ভাবনা থাকায় একটি পার্কিংয়ের জায়গা করা হয়েছে. যেখানে একসঙ্গে ১৫০০ মোটরগাড়ী রাখা চলবে। নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর এই অতিকায় বাজারে ২৫০০ থেকে ৩০০০ লোক নিযুক্ত হবে। আমেরিকার মতো এখানকার ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর ও অন্যান্য দোকানের পাশের ফুটপাথগুলিরও ছাদ থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে ক্রেতাগণ বর্ষাকালেও নিশ্চিন্তমনে কেনাকাটা করতে পারবেন।
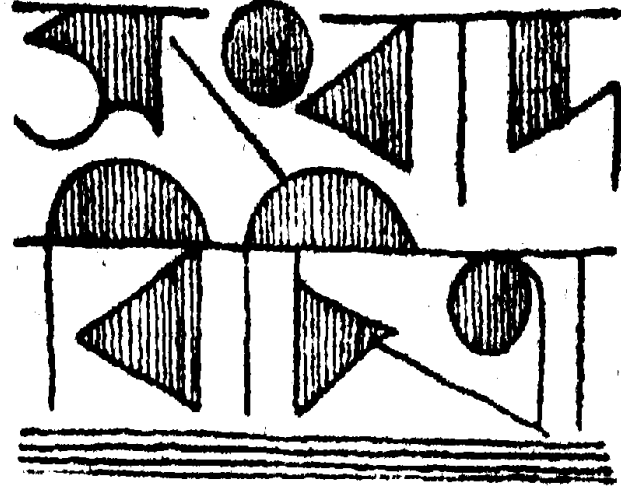
॥ কৃত্রিম কণ্ঠনালী ॥

বেল সিস্টেম অব দি আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী নামক একটি বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান ট্রানজিস্টার চালিত কৃত্রিম ইলেকট্রনিক কণ্ঠনালী তৈরী করেছেন। এর ফলে পৃথিবীর হাজার হাজার বাকশক্তিহীন মানুষ আবার কথা বলতে পারবে। এই মহৎ মানবিক কাজে নিউইয়র্কের বাকশক্তি ব্যাধি চিকিৎসালয়ের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

এ প্রচেষ্টার শুভ সূচনা হয় ১৯২৫ সালে—বেল টেলিফোন কোম্পানীর

কৃত্রিম কণ্ঠনালীর নমুনা

কর্তৃত্বাধীনে। ১৮৫৯ সালে ভিয়েনার ডাক্তার জোহান নেপোমুক জারমাক কৃত্রিম কণ্ঠনালী তৈরির যে পদ্ধতি বর্ণনা করে গিয়েছিলেন তার দ্বারা কয়েক রকম কণ্ঠনালী তৈরী করা হয়। কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হওয়ায় শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকগণ দীর্ঘ পরিশ্রমের পর মাত্র ৪৫ ডলার মূল্যের এই কণ্ঠনালীটি আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটির ওজন ৭ আউন্স। ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হয়।

নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। কথা বলবার প্রয়োজন হলে যন্ত্রটিকে কণ্ঠনালীর সঙ্গে চেপে ধরতে হবে। কণ্ঠনালীর মধ্যে উদ্ভূত কম্পন কথারূপে প্রকাশ পাবে। শব্দ জোর এবং কম করারও ব্যবস্থা আছে। আমেরিকায় কণ্ঠনালীহীন লোকের সংখ্যা ২৫ হাজার কণ্ঠনালী ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও প্রচুর। তারা এবার কথা বলবার সুযোগ পাবেন। বেল কোম্পানী যন্ত্রটি সমগ্র মানব সমাজের উপকারের জন্য ব্যবহারে উদগ্রীব। তাই তাঁরা কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় নিয়ে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যন্ত্রটি বিক্রি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

॥ পুরনো প্রেম ॥

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। শ্রীমতী ল্যাভিনিয়া বেয়ার্ড তাঁর স্বামী টম বেয়ার্ডের সঙ্গে যখন বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ৪৩ এবং টমের ছিল ৪৯।

এতদিন বাদে শ্রীমতী বেয়ার্ডের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ছেলেকে দেখবার জন্য। ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রাক্তন স্বামী-গৃহে ছেলেকে দেখতে গিয়ে পুরনো দিনের কথা তার মনে পড়ল। সেই সঙ্গে টমেরও। স্মৃতিচর্চায় তাদের মন ভরে গেল। দুজন যেন ফিরে গেলেন তাদের অতীত জীবনে। সেখান থেকে কেউই ফিরতে চাইলেন না। 'বাতিল করা' বিয়ে এতদিন পর আবার জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীমতী বেয়ার্ড থাকেন ইংলাণ্ডের সমরসেট সায়ারে তাঁর নিজের বাড়ীতে। কিছুকালের মধ্যেই কার্লসবাদে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হওয়ার পর তাঁরা সকলে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। স্বামীর বয়স নিরানব্বই আর স্ত্রীর তিরানব্বই।

॥ নতুন ক্যামেরা ॥

গত ১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত লণ্ডনে ফিজিক্যাল সোসাইটির বিশেষ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ব্রিটিশ এটমিক এনার্জি অথরিটি প্রতি সেকেণ্ডে ৮,০০০,০০০ চিত্র গ্রহণক্ষম একটি নতুন ধরনের ক্যামেরা প্রদর্শন করেন। এই অতি-উচ্চ-গতি-সম্পন্ন ক্যামেরাটি বার্কশায়ারের অন্তর্গত অল্ডারম্যাস্টন-এর বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক যে অস্থিরতা থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট রক্তরসের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটায় তার চিত্র গ্রহণের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে।
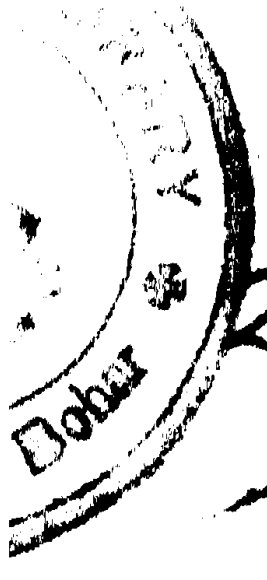
বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব

মাধব রায়

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দেখা যায় বাংলা নাটকের অনেকাংশ জুড়ে যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। কেউ কেউ বলেন, ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বর্তমান বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে; আবার অন্য দলের মতে বর্তমান নাটকের স্বরূপ নাট্যসাহিত্যেরই ক্রমবিবর্তনের ফলে সম্ভব হয়েছে। একজনের অভিমত অন্যজনের অভিমত দিয়ে ধামাচাপা দিলে কটূক্তির আর শেষ থাকবে না। তবে সমকালীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভাব এবং যুগচেতনার উপযোগী প্রকাশের মাধ্যমে যে নাটক সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।

আমাদের জাতীয় ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে নাটকাভিনয় হত এবং তার উদ্দেশ্যও ছিল দেবতার লীলা-মাহাত্ম্যের রূপায়ণ ও মূল্যায়ণ। সেই প্রাচীনতম উৎস থেকে প্রথম নাটকের সৃষ্টি ও পরবর্তীকালে এর কাহিনী, আঙ্গিক, কলাকৌশলের উন্নতি বর্তমান নাট্যসাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সকল দেশেই এইরূপ ক্রমানুসারে উন্নতি ঘটে। কিন্তু বাংলা নাটকে এর আগমন পালাগান বা কীর্তনের মাধ্যমে। এইসব পালাগানের মূল গায়ক গান করবার সময় লীলাকাহিনীর মধ্য-চরিত্রগুলোর কথা ও ভাব আমাদের কথক-ঠাকুরদের মত উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও স্বর পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করতেন। প্রয়োজনবোধে আবার অনেক সময় চরিত্রোপযোগী মুখোস ধারণও করতেন।

নাটকের তিনটি পর্যায়—নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য। নৃত্ত অর্থাৎ তাল-লয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র; নৃত্য অর্থাৎ হাবভাব-যুক্ত বিবিধ মুদ্রা সহযোগে মূক অভিনয়-করণ; পরিশেষে নাট্য অর্থাৎ নৃত্যগীত-সহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়। প্রত্যেকটি পর্যায়ে ব্যক্তির সশরীরে অবস্থান ও প্রকাশকলায় নিয়োজিত থাকতে হয়। হয়তো বা মানুষের অনুকরণপ্রবৃত্তি থেকে অভিনয়শিল্পের উৎপত্তি।

প্রাচীন বাংলার সকল সাহিত্যই যে অভিনেয় সে প্রমাণ প্রাচীন রামায়ণ-গান, বুদ্ধ-নাটক দানখন্ড নৃত্য, মনসার গান, ভাসান গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি। এই সকল গান শুধুমাত্র সুর-তাল-লয় সহ-যোগে গাওয়া হত না। জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে বহু পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র ভূমিকা, ভূমিকার উপযোগী মুখোস-ধারণ, নৃত্যগীত ইত্যাদির ব্যবহারও থাকতো।

কিন্তু এর দ্বারা কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না যে, সুসংবদ্ধ নাট্য-শৈলীর প্রেরণা এই সকল সাহিত্যের উৎস। পৌরাণিক কাহিনীকার ও রামায়ণ-মহাভারতের খন্ড-আখ্যান মধ্য-যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও রাম-সীতার ভাগ্যবিড়ম্বনা বা সতী বেহুলার মত স্বামীর জন্যে শুধুমাত্র মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ নাট্যকল্পনাকে উদ্রিক্ত করতে পারেনি। এখানে ভাবঘন মুহূর্ত-গুলোকে তুলে ধরা হয়, রস-রূপের ব্যাখ্যার প্রাবল্য দেখা যায়। এই মুহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে দার্শনিকতা, মানসিক ব্যাখ্যা ও চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই যাত্রার নাটকে চরিত্র-বিকাশের কোনো অবকাশ প্রায় থাকে না। আপন গতিপথে যাত্রার নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রকাশ। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা-উদ্বুদ্ধ চরিত্রের উত্থান-পতন দিয়ে সংলাপ তৈরি হয় না। একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনার দৃশ্যরূপ দেওয়াই যাত্রা-নাটকের প্রকৃতি। যাত্রা ঘটনার গতিতে আনে পাত্র-পাত্রীর প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, নাটক তখন পাত্র-পাত্রীর সংঘাতের মাঝখানে চরিত্র-আত্মপ্রকাশের রূপটা তুলে ধরে। স্বভাবতই সেখানে পরিণতির কৌতূহল ও ক্রমটান থাকে। যেখানে এসে বাস্তব বিশেষ চরিত্রের ওপর আঘাত—বিরুদ্ধ আঘাত হানছে সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, 'ক্লাইমেক্স' সৃষ্টির কারণ ঘটছে। কিন্তু যাত্রার নাটকে একটা আবাহনকালের পরিণতি থাকে এবং যদিবা সংঘাত সৃষ্টির উপকরণ থাকে তথাপি তার মধ্যে "যথা ধর্ম তথা জয়" ভাবের আত্মপ্রকাশই বেশী। একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার দূরীকরণই যেন এর প্রধান লক্ষ্য।

যাত্রার ভাব-ব্যাকুলতা ও দার্শনিকতা নাট্য-চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি নয়। কৃষ্ণ, রাধা বা সখীদের ভাব-ব্যাকুলতা প্রকাশের মাঝখানে চরিত্রের ক্রমগতি লক্ষ্য করা যায় না। এখানে যাত্রাওয়ালার মানসিক সংস্কার ও মনোভাবের প্রকাশ পাত্র-পাত্রীর অন্তরে যতখানি কাজ করে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের অবকাশ ততখানি থাকে না। পাশ্চাত্যের নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশীয় নাটকের পার্থক্য এখানে। পাশ্চাত্যের নাটকে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চরিত্র-সৃষ্ট ঘটনার রূপটি প্রথম ও প্রধান।

যাত্রার প্রথম যুগে যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয়—পৌরাণিক ও অলৌকিক ঘটনার পরিবেশন। পরবর্তীকালে তা'ও বদ্ধ হয়ে মহাকাব্যের দেবতুল্য চরিত্র বা ইতিহাস-প্রোক্ত শ্রেষ্ঠ রাজা ও বীরগণের জীবনচরিত নিয়েই নাটক-রচনা আরম্ভ হয়। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর লক্ষ্য ছিল নীতিশিক্ষা, উপদেশ, ধর্মভাবের উন্মোচন, দার্শনিকতা ও কাব্যগুণের প্রকাশ। তাই বহু পুরাতন ও জানা ঘটনার আত্মপ্রকাশে হয়তো নাটকের কৌতূহল, ঘটনার চমৎকারিত্ব, চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা ইত্যাদি থাকে না। তথাপি সেই বহুজন পরিচিত কাহিনী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতো; আনন্দ, দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী, উপভোগ্য এবং একই দার্শনিকতার চর্বিতচর্বণ ভাবনা ও জ্ঞানের উল্লাসে নিয়োজিত করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হত না। "The play was the thing" ছিল যাত্রার নাটকের আসল বস্তু। যাত্রার দর্শককুল নাটকের রসে বার বার আপ্লুত

হয়ে যেতো। পুরাতন ভাবনার রোমন্থনে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। ভগবৎলীলা-মাহাত্ম্যে হয়তো তারা নতুন মানসিক খোরাক পাচ্ছে না, কিন্তু ঐ লীলারসের আবেগটুকু বিশ্বাসে ও অনুভবে বার বার দৃশ্যকাব্যের রূপায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতো। যাত্রার নাটকে সংগীতে বা সংগীতের গদ্য ব্যাখ্যা, বিবেকের প্রবেশ-প্রস্থান, পাপাত্মার পতন ও পুণ্যাত্মার জয়, জন্মান্তরবাদ, পরলোকের সুফল ইত্যাদিতে মানুষ নিজের বিশ্বাসের জগৎ-সংসার দেখতে পায়। আবার তাদের যে জিনিষে বিশ্বাস করানো হয়েছে তার সমর্থনের সাড়া পাওয়াও কোনো কম কৌতূহল নয়। এমনি করে যাত্রার নাটক নাট্যসাহিত্যের জটিলতা, কৌতূহল ও ঘটনার চমৎকারিত্ব ছাড়াও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল।

যাত্রা-সাহিত্যে সমাপ্তির মধ্যে নাট্যবস্তুর এক অদ্ভুত শৈলী চোখে পড়ে। সে হচ্ছে, যাত্রা-নাটকের পরিণতি বিয়োগান্ত হোলেও, তার মধ্যে কোথায় এক অভূতপূর্ব ও মহান অর্থের আস্বাদ দর্শকমাত্রই অনুভব করে থাকেন। এখানে নাটকের যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষ নয়। পরিণতিতে মনের এমন এক জায়গা নাড়া দেওয়ার রীতি যাত্রা-নাটকে আছে, যার পরেও জীবনের এক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। অভিমন্যুবধ, রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদে বা নিমাই-সন্ন্যাস ইত্যাদি যাত্রা-নাটকে দেখি—অভিমন্যু জয়দ্রথের দ্বারা নিহত হোলেও অভিমন্যুর সে-মৃত্যু মৃত্যু নয়, জীবনের লীলা মাত্র; বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের বিচ্ছেদের কারণ অবতার-গ্রহণের জন্যে মর্তে নারায়ণের আবির্ভাব বা নিমাই-সন্ন্যাসে নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের মাঝে বৃহত্তর জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর সংসার ত্যাগ। বিচ্ছেদের মাঝে মিলনের এই সুরটি সত্যিই বড় অপূর্ব। বিচ্ছেদে মিলনের ইঙ্গিত বোধ হয় ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্কার, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির পরিচয়। অবশ্য এই আঙ্গিক সংস্কৃত নাটক থেকেই যাত্রাওয়ালারা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে-যাত্রা, খুব বেশী দিনের কথা নয়, গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎপ্রেমের পরিবেষকরূপে আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় মুখপাত্র ছিল, তার পতনোন্মুখতা বা পতন ঘটল কেমন করে! আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার মধ্যে রুচির পরিবর্তন অন্যতম। এই রুচির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যাত্রা-শৈলী যুগোপযোগী তো নয়ই, উপরন্তু পদাবলীর যে উন্নত ভাবধারা ও দার্শনিকতা যাত্রা-নাটকের প্রাণস্বরূপ, পরবর্তীকালে সে ভাবপ্রেরণার অনুপস্থিতি এবং বৈষ্ণবের বিষয়ে যাত্রা-সাহিত্যে কুরুচি, ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার প্রবেশ যাত্রা-নাটককে শিক্ষিত সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা-নাটকের নিদর্শন।

যদিও তৎকালীন শিক্ষিতশ্রেণী যাত্রার নাট্য-প্রয়োগরীতি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি বা কোনো সমর্থন জানায়নি, তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত থিয়েটারের নাটক খুব বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। তাদের মনে তখন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এবং মঞ্চের ভাবধারা ও প্রভাব প্রকট। সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে থিয়েটারী নাটক অভিনয়াদি হোত। যাত্রা-নাটকের কুশ্রীতা ঢাকতে ও নাট্যবস্তুর আমদানীর জন্যে অবশ্য এই প্রচেষ্টা। থিয়েটারের জন্যে লেখা নাটক 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অভাবের দরুণ তৎকালীন শিক্ষিত নাট্যানুরাগিগণ যাত্রা-নাটক অভিনয় করতে থাকে। যাত্রার নাটকে প্রধানতঃ সঙ্গীতাংশের পরিমাণ বেশী থাকে। সেই সঙ্গীতাংশ কমিয়ে সংলাপ ও নাট্যক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়ে থিয়েটারী-নাটকে পরিবর্তন এমন কিছু শক্ত নয়।

এমনি করে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চে যাত্রা ও থিয়েটারী নাটক পাশাপাশি অভিনয় হতে থাকে। যাত্রার নাটকে সংস্কার করতে গিয়ে হয়তো পাশ্চাত্যধারায় নাটকে মনোবিশ্লেষণ ও মানসিক জটিলতার প্রবেশ ঘটান হল, কিন্তু আমাদের দর্শকগণ আজও পর্যন্ত নাটকে নাচ-গান, কৌতুকদৃশ্য, ভাঁড়-চরিত্রের উপস্থিতি, অদৃশ্য বিধাতার হস্তস্পর্শ কম-বেশী পছন্দ করেন। বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটারের নাটক যে যাত্রারই পরিমার্জিত সংস্করণ, আজ পর্যন্ত গান, কৌতুকদৃশ্য ও দার্শনিক ভাবধারা বর্জন করতে না পারা তার অন্যতম কারণ।

পণ্ডিত-প্রবর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে একবার বলেছেন—"অদ্বৈতবাদ-পুষ্ট, প্রীতি ও শান্ত রসে অভিষিক্ত বাঙালীর মনে মানবিক দ্বন্দ্ব ও চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত কখনই চরম সত্যরূপে অনুভূত হয় নাই। এমন কি নাটকীয় ভাব-স্ফুরণ ও সংঘাত-তীব্রতার যে লীলাভূমি যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানেও নাটকীয়তার পরিপূর্ণ বিকাশ রসান্তর-পরিণতি লাভ করিতেছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা ও নাটকীয় উত্তেজনা বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ কোথা হইতে ভক্তি-প্লাবন বহিয়া নায়ক-প্রতিনায়কের মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্কটিকে ভক্ত-ভগবানের মধ্যবর্তী স্নেহ-প্রীতির উদ্বেলতায় অভিষিক্ত করিয়াছে।"

বাংলা নাটকের অনেকাংশ জুড়ে যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব যে আছে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও মানসগঠন বিশ্লেষণ সে সত্য স্বততঃই প্রমাণ করে।

১৮৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যকার মনোমোহনবাবু বলেছিলেন—"গান ছাড়া এদেশে নাট্যাভিনয় হইতে পারে না। কথায় কথায় গান না দিয়া পরিমিত গান থাকা উচিত। কেমনা দর্শকগণ গান ও 'সং-রং-ঢং' প্রদর্শন ভালবাসে।"

পরিপূর্ণ যাত্রা থেকে আংশিক পাশ্চাত্য নাট্যধারাটি তৎকালীন 'বঙ্গদর্শন'ও সাদরচিত্তে গ্রহণ করেনি। পাশ্চাত্যের থিয়েটারী-নাটক প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"ইহাতে শামলা আছে, পেন্টলুন আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার জিনিস যথেষ্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নূতন যাত্রাতে বেশভূষার এত জাঁক। সঙ্গীত ও কাব্যরসের এত অভাব।"

বাংলা নাটকে যাত্রার এই যে প্রভাব, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যরসিকদের শত-চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি ভাবতেও আনন্দ লাগে। অবশ্য এর ঔচিত্য নিয়ে অন্য কথা তোলা যেতে পারে।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী
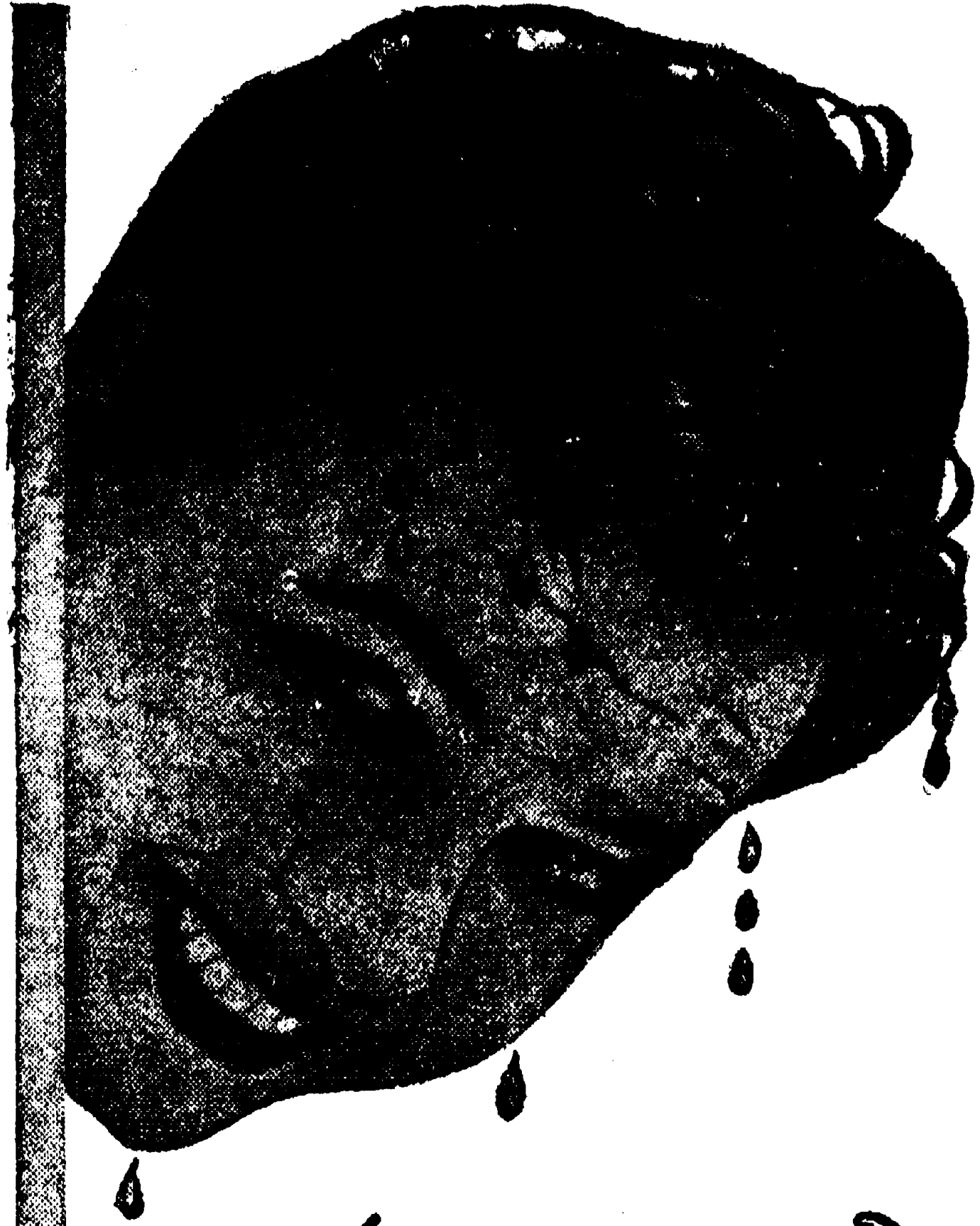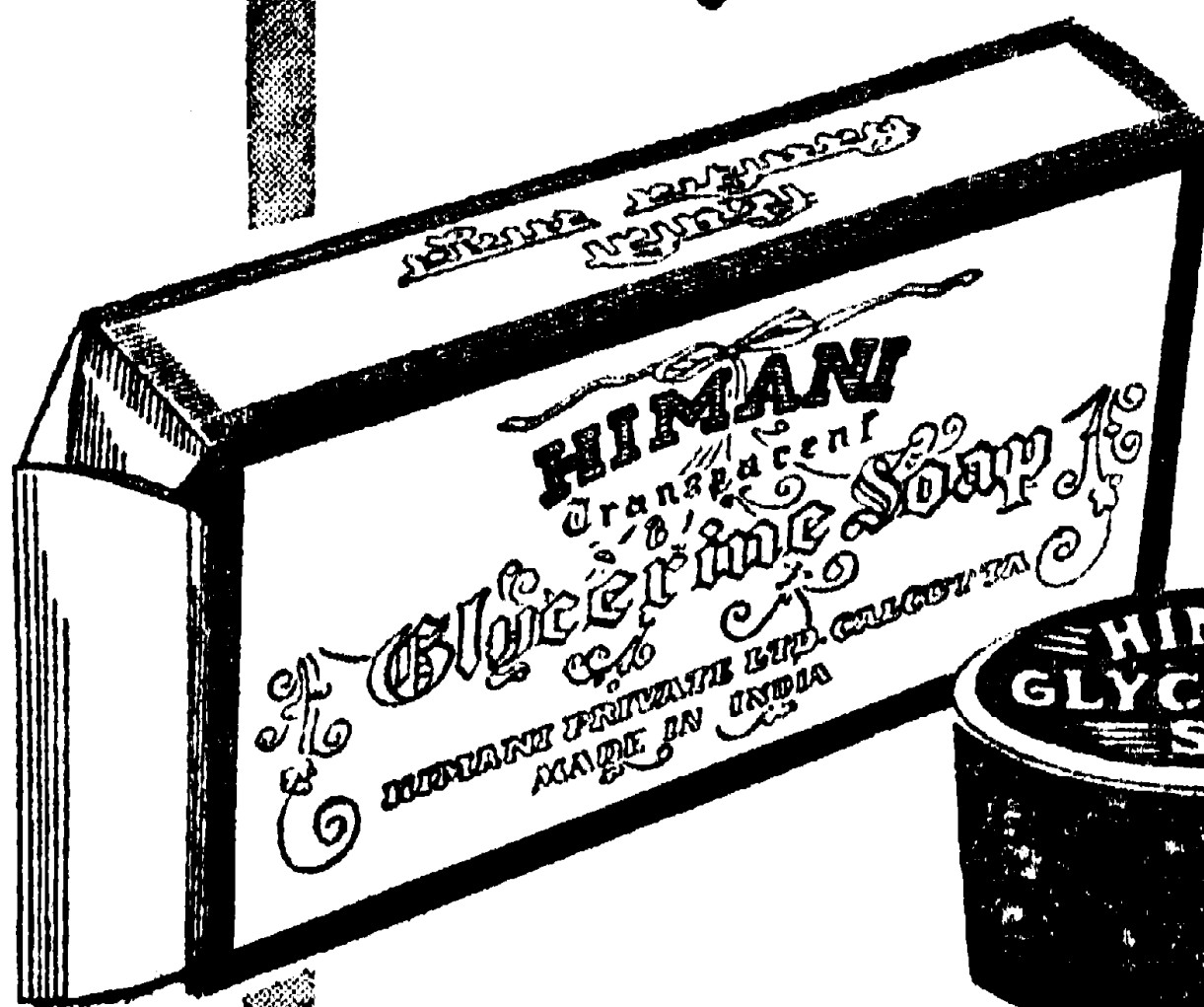
(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'নীতার চিঠি!'

চিঠিখানা সামনের টেবিলে রাখে নিরুপম। যে টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসে আছেন সুশোভন আর সুচিন্তা। সুচিন্তার সামনে একখানা খোলা বই। সুশোভনকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন নাকি? তীব্র হয়ে ওঠে কি সুচিন্তার বড় ছেলের শান্ত দৃষ্টি!

নীতার চিঠি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন সুচিন্তা, তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছেন সুশোভন। তুলে নিয়েছেন চিঠিটা। 'নীতার চিঠি! আমার কথা লিখেছে নীতা।'

চিঠি-ধরা হাতটা সুশোভনের কাঁপতে থাকে, বার কয়েক দ্রুতভঙ্গীতে চোখ বুলিয়ে হতাশভাবে মুখ তুলে বলেন, 'এত সব কি লিখেছে নীতা! বুঝতে পারছি না।'

বুঝতে পারবেন এ আশা অবশ্য করেও নি কেউ।

সকাল বেলা খবরের কাগজখানা দেখতে পেলেই একবার চোখের সামনে মেলে ধরেন তিনি রোজই, কিন্তু একটু পরেই ফেলে রেখে কপালে হাত বুলোতে থাকেন আর বলেন, 'এত কথা কেন যে লেখে? মানে বোঝা যায় না।'

সুচিন্তা হেসে বলেন, 'কেন তোমার বুঝি মনে হয় সব বাজে কথা লেখা আছে?'

'বাজে কথা নয়?' উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন সুশোভন, 'পড়তে গেলে মাথার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না?'

সুচিন্তা এক পলক তাকিয়ে দেখেন, দেখে বলেন, 'মাথার মধ্যে কী হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়?'

'দেখতে পাওয়া যায় না? বাঃ বেশ বলেছ? দেখতে পাওয়া যায় না!'

'কই আমি তো দেখতে পাই না। তুমি পাও? দেখতে পাচ্ছ আমার মাথার মধ্যে এখন কী হচ্ছে?'

সুশোভন সহসা হাহা করে হেসে ওঠেন হাসতে হাসতে মুখ লাল করে বলেন, 'তোমার কথাগুলো ঠিক পাগলের মত সুচিন্তা।'

ঘরের মধ্যে সুচিন্তার বড় ছেলের মুখও লাল হয়ে ওঠে। তারপর ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে—'হাহা করে হাসবার মত কী কথা লেখা আছে নীতার চিঠিতে? এই মাত্র তো নিরুপমও নীতার চিঠি পেয়েছে! সে চিঠি কি উল্লাসজনক?

পড়া চিঠিটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরে নিরুপম।

নীতা জানিয়েছে সাগরময়ের জ্ঞান ফিরেছে বটে, মৃত্যুর আশঙ্কাও আর বোধ হয় নেই। কিন্তু ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন পৃথিবী তার কাছে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ভরসা রাখছে না সাগরময়ের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। সবচেয়ে আঘাত লেগেছিল চোখে কপালে মাথায়।

একথাও জানিয়েছে নীতা, সাগরকে নাড়াচাড়া করার মত অবস্থা হলেই হয়তো তারা তাকে নিয়ে সাগরে ভাসবে। 'তারা' মানে নীতা আর সাগরের বন্ধু শিশির। যে বন্ধু এই দুর্ঘটনার সময় কেবলমাত্র বহিরঙ্গ থেকে একেবারে অন্তরঙ্গতায় এসে পৌঁছেছে। সাগরময়ের অবস্থার জন্যে সে কন্টিনেন্টাল টুরের প্রোগ্রাম বর্জন করে নীতার সাহায্যকারী হয়ে সাগরকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনবার সংকল্প স্থির করে ফেলেছে। পড়ার মেয়াদ হয়ে গিয়েছিল শিশিরের, সেইটুকুই ভাগ্যের কথা।

এরপর সুশোভন সম্পর্কে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে নীতা, কী বলছেন ডাক্তার, কেমন হয়েছে অবস্থা, নীতার অনুপস্থিতিতে নতুন কোন বৈলক্ষণ দেখা গিয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি!

নীতার অনুপস্থিতিতে!

নিরুপম ভাবলো, লক্ষণ যদি কারো বদল হয়ে থাকে তো সে ওই পাগল মানুষটার নয়, সুস্থ মানুষটার। সুচিন্তাই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। নইলে রাত বারোটা পর্যন্ত রোগীকে ঘুম পাড়ান তিনি তার ঘরে মৃদু নীল জেলে! ঘরে কেউ না থাকলে নাকি ঘুম আসে না সুশোভনের!

আগে বরং বিসদৃশ কোন ব্যাপার ঘটলে কিছুটা কৈফিয়তের মত দেবার চেষ্টা ছিল সুচিন্তার, ছেলের, কান না

দিলেও সে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন?......চিন্তার মাঝখানে আর একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল।

আবার হাহা করে হেসে উঠেছেন সুশোভন। হাতুড়ির ঘায়ের মত সেই শব্দ। আর তার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোষে কোষে পিন ফোটার মত একটা যন্ত্রণা ঘটিয়ে মৃদু তীক্ষ্ম আরও একটা হাসির ধ্বনি।

কিন্তু সুচিন্তার চিঠিতে কি সত্যিই নীতা উল্লাসজনক কিছু লিখেছে? নইলে এত হাসবার কী হল?

না, নতুন কোন বার্তা পাঠায়নি নীতা, নিরুপমকে যা লিখেছে তাই। শুধু সুচিন্তাকে জানিয়েছে 'আলাদা চিঠিতে বড়দাকে ডাক্তার পালিত সম্পর্কে যা কিছু ব্যবস্থা, জানালাম। সুচিন্তার চিঠিতেও তো সাগরময়ের দুর্ভাগ্যের বার্তা!

কিন্তু সে চিঠি সুচিন্তা পড়তে পেলে তো?

এক লাইন পড়তে না পড়তে অসহিষ্ণু সুশোভন সুচিন্তার চিঠি পড়া হাতটা ধরে নাড়া দেন, কী হচ্ছে সুচিন্তা? মনে মনে পড়ছ কেন? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে পার না? নীতার চিঠি তুমি মনে মনে পড়বে?

সুচিন্তা মুখ তুলে বলেন, 'রোসো আমি আগে পড়ে নিই, তারপরে চেঁচিয়ে পড়বো।'

সুশোভন ধৈর্য ধরার ভান করেছেন। অপেক্ষা করার ভঙ্গীতে দু'-চার পা পায়চারি করেছেন, কিন্তু সে তো মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই আবার সুচিন্তাকে নাড়া দিয়েছেন, 'কী হল সুচিন্তা! নীতার চিঠি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে? মতলবটা কি তোমার?'

সুচিন্তা আর একবার মিনতি জানিয়ে আর দু'-এক লাইন পড়েন কিন্তু হঠাৎ ফস্ করে চিঠিটা তাঁর হাত থেকে টেনে নেন সুশোভন, নিয়ে মুঠোর মধ্যে পিষতে থাকেন।

'কী করছো! কী করছো!'

সুচিন্তা ব্যস্ত হয়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পাগলের সঙ্গে কে পারে কাড়াকাড়ি করে জিততে?

সুশোভন সহসা চেয়ার ডিঙিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে চিঠি ধরা হাতটা উ'চু করে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'কী? পারবে আমার সঙ্গে জোরে?'

'দোহাই সুশোভন মুচড়ে ফেলো না, দাও আমাকে। পড়তে দাও। খবরের জন্যে হাঁ করে রয়েছি। পড়বো, চেঁচিয়েই পড়বো, দিয়ে দাও।'

মুখ উ'চু করে মাটিতে দাঁড়িয়ে মিনতি করতে থাকেন সুচিন্তা। আর বোধ করি সেইটাই হয়ে ওঠে পাগলের কাছে পরম কৌতুককর। কৌতুকে উছলে পড়া মুখে হাতটা আরও উ'চু করেন সুশোভন, পায়ের ভরটা সম্পূর্ণ বুড়ো-আঙুলের ডগার ওপর রেখে, আর সুচিন্তা চিঠির ভাবনা ছেড়ে সুশোভনের জনাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। পড়ে যাবে সুশোভন পড়ে যাবে। লক্ষ্মীটি নেমে এসো দোহাই তোমার। সুশোভন তোমার পায়ে পড়ছি।' টেবিলের দুটো কোন চেপে ধরে উর্ধ্বমুখে প্রায় কাৎরাতে থাকেন, আর তাতেই যেন আরও উল্লসিত হন সুশোভন।

'কেমন আর নিয়ে নেবে নীতার চিঠি? মনে মনে পড়বে?'

সহসা সুচিন্তা অন্য চাল ধরেন। উদাস কণ্ঠে বলেন, 'বেশতো দিও না চিঠি। কী দরকার আমার নীতার চিঠি নিয়ে, না হয় পড়বোই না।'

চাল ব্যর্থ হয় না।

'পড়বোনা নেবনা' বলার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানা হাত থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে জোরে হেসে উঠে বলেন সুশোভন, 'ঈস্ কী দরকার আমার! এতক্ষণ তবে চেঁচাচ্ছিলে যে? সুচিন্তা তোমায় কী রকম দেখাচ্ছিল জানো? সেই কথামালার শৃগালটার ছবির মত। মুখ উ'চু করে বসে থেকে থেকে শেষটা কি না দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল!' নেমে আসেন সুশোভন বিপজ্জনক ঠাঁই থেকে।

সুচিন্তা ব্যস্ত হয়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন।

চিঠিটা ততক্ষণে হাতে পেয়ে গেছেন সুচিন্তা, তাই বোধ করি এ উপমায় হেসে ওঠেন, 'কথামালার গল্প-ছবি এখনো মনে আছে তোমার?'

'মনে থাকবে না? কথামালার গল্প আবার ভোলে নাকি কেউ? একদা এক

বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল—তোমার মনে নেই এ কথা?'

সুচিন্তা একটা গভীর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আছে বৈকি! খুব মনে আছে।' তারপর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আচ্ছা চিঠিটা একবার পড়তে দাও সুশোভন। তারপর তোমাকে বলছি কি লিখেছে নীতা। নীতার জন্যে তোমার ভাবনা হচ্ছে তো?'

'ভাবনা হচ্ছেনা? আলবৎ ভাবনা হচ্ছে। নীতাকে আমি ভালবাসি জানো না।'

খানিকটা হেঁটে বেড়ান সুশোভন, তারপর সুচিন্তার কাছে এসে বলে ওঠেন, 'সবটা আমাকে শোনাতে হবে বুঝলে সুচিন্তা! বাদ দিয়ে দিয়ে ফাঁকি দেবে না।'

সুচিন্তা কেমন একটু হেসে বলেন, 'আমি তোমায় ফাঁকি দিই?'

সুশোভন সজোরে বলেন, 'দাও বৈ কি! খবরের কাগজ পড়ার সময় খালি তুমি বাদ দাও, ধরতে পারি না ভেবেছ?'

'কি করে পারো?'

'কি করে পারি মানে? পড়ার সময় আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি না? তোমার চোখ কোথা থেকে কোথায় যায় দেখতে পাই না?'

সুচিন্তার কি ক্রমশঃই আগুন নিয়ে খেলার সাধ বাড়ছে? তাই বলেন, ফাঁকি দিই, সে কথা যদি ধরতে পারো তো বক না কেন?'

'বকবো? তোমাকে বকবো? কী যে তুমি বল সুচিন্তা। তোমাকে বকলে আমার কান্না পাবে না?'

'আমাকে বকলে তোমার কান্না পাবে?'

'নিশ্চয় পাবে। কিন্তু ওই তো তুমি ফাঁকি দিচ্ছ সুচিন্তা। নীতার চিঠিটা পড়ছ না। পড়ে সবটা বল শীগগির।'

কিন্তু সবটা কোথা থেকে বলবেন সুচিন্তা?

সবটা পড়তে পেলে তো?

কোন লাইনটাই কি ভাল করে পড়তে পারেন?

পড়া সম্ভব? যদি ভারী একটা মানুষ চেয়ারের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে ওই একই চিঠি পড়তে চেষ্টা করে গালে গলায় কানে তার উত্তপ্ত নিশ্বাসের তাপ লাগিয়ে লাগিয়ে।

পাগলের নিশ্বাস এত উত্তপ্ত হয় বুঝি? যার তাপে গালের চামড়া গলার চামড়া যেন পুড়ে যেতে থাকে, কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে?

সুচিন্তার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া রক্ত এখনো এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার মত উপাদান বহন করে তার ধারার মধ্যে?

আরও পিছনে নিঃশব্দে কখন ইন্দ্রনীল এসে দাঁড়িয়েছে টের পাননি সুচিন্তা, টের পেলেন সে যখন ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল।

পরিবেশের থেকে যেন ইচ্ছে করেই চোখ ফিরিয়ে রেখে ইন্দ্রনীল কাটা-কাপড়ের টুকরোর মত একটুকরো কথা ফেলে দিল, "একটা কথা বলার ছিল।"

সুচিন্তা মুখ তুললেন। বোধকরি শঙ্কিত হলেন।

কি না জানি কথা।

শঙ্কাতেই বোধ করি আমল দিতে চাইলেন না সে কথাকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'নীতার চিঠি এসেছে—'

চিঠিটা যে নীতার সে তো ইন্দ্রনীল দেখেই বুঝেছিল, কিন্তু 'কি লিখেছে নীতা, কখন এল নীতার চিঠি? কী খবর তার ভাবী স্বামীর?' এসব কথা বলবে কখন? বলবার সাধটাই বা থাকবে কি করে? যদি ইন্দ্রনীল এসে দেখে--

অতএব ইন্দ্রনীল নীতার খবরের মত ব্যাপারটাকেও অবহেলা দেখিয়ে বলে, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'অবস্থাতো আর এক অদ্ভুত পরিণত হল। লিখেছে প্রাণের আশঙ্কা আর নেই মনে হয়, কিন্তু—'

'সুচিন্তা!' সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন 'চিঠিটা তুমি আমায় না বলে ওকে বলছ কেন?'

'বাঃ ও শুনবে না নীতার খবর?'

'না শুনবে না!' সুশোভন সহসা সরে এসে একেবারে ইন্দ্রনীলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, 'ইয়ংম্যান! সুচিন্তার ছোট ছেলে! নীতার খবরে তোমার দরকার কি? বল বলতে হবে তোমায় কী দরকার?'

'আমার কোন দরকার নেই। উদ্ধত-ভাবে বলে ইন্দ্রনীল।

'দরকার নেই! তোমার—কোন দরকার নেই?' প্রায় ধমকে ওঠেন সুশোভন, 'নীতা একটা যে সে বাজে লোক? তাই তার খবরে কিছু এসে যায় না তোমার? জানো এতে নীতার অপমান হয়?'

ইন্দ্রনীল তীব্র সুরে বলে 'হোকনা একটু!'

'হোকনা? হোকনা একটু? সুচিন্তা তোমার ছেলেদের বুদ্ধিতো ভাল নয়? তুমি শাসন কর না কেন বলতো?'

সুচিন্তা সহসা বলেন, 'তুমি ঘরে চল সুশোভন।'

'ঘরে যাব?'

'হ্যাঁ। তোমাকে গীতায় [illegible] শোনাইগে চল।'

সুশোভনের পিঠে আলতো একটা হাত রেখে ইন্দ্রনীলের সামনে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন সুচিন্তা।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনীল।

কৃষ্ণার বাবার প্রস্তাবের কথা বলতে এসেছিল সে। বলতে এসেছিল আজ বিকেলে কৃষ্ণার বাবা-মা সুচিন্তার সঙ্গে দেখা করতে চান। বলা হ'ল না।

ভাবল এখন গিয়ে কী বলা যায় কৃষ্ণার বাবাকে?

অনেক নিষেধ তো করেছিল সে আগেই। বলেছিল 'মার কাছে গিয়ে তাঁর পুত্রের বিয়ের জন্যে আবেদন করতে যাওয়াটা একটা অর্থহীন বাহুল্য কাজ হবে, ইন্দ্রনীলের মা এত বেশী উদার-পন্থী যে, ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে একথা শুনলেও বিস্মিত হবেন না, ক্ষুব্ধ হবেন না।'

তবু কৃষ্ণার বাবা গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, 'আবেদনের প্রশ্ন ওঠে না, তবে সাধারণ সৌজন্য বলে একটা কথা আছে।'

'আমার মা সাধারণ নিয়মমাফিক সৌজন্য-সামাজিকতার ধার ধারেন না।'

কৃষ্ণার মা ফোড়ন কেটে উঠেছিলেন, 'বুঝতে পারছি তোমার মা অসাধারণ, কিন্তু আমরা তো তা' নই? আমাদের কাছে 'লোকদৃশ্য' বলে একটা কথা আছে। আমাদের কর্তব্য আমরা করে আসবো ব্যস।'

আর কি বলবে ইন্দ্রনীল?

তাই মাকেই বলতে এসেছিল তাঁদের আগমনের অগ্রিম খবর। মনে করেছিল একটু অবহিত করিয়ে রাখবে মাকে।

কিন্তু তার ছিঁড়ল।

সুচিন্তার ওই চলে যাওয়ার ভঙ্গীর মধ্যে যেন এক দুঃসাহসিক সংকল্পের ঔদ্ধত্য!

ইন্দ্রনীল কি ভাবী শ্বশুরকে গিয়ে বলবে তার মাকে না জানিয়ে যদি বিয়ে দিতে রাজী থাকেন তাঁরা, তবেই বিয়ে হওয়া সম্ভব!

কিন্তু যে অহঙ্কারী ভদ্রলোক! হয়তো বলে বসবেন 'ঠিক আছে এমন একটা অদ্ভুত শর্ত ভিন্ন যখন বিয়ে সম্ভব নয়, তখন বিয়েটাই বন্ধ থাক।'

অথচ সেকথা শুনলে কৃষ্ণা রুমালে চোখ ঘসবে, আর আড়াল পেলেই ইন্দ্রনীলের কাঁধে মুখ ঘসবে!

সহসা মনে হয় ইন্দ্রনীলের কৃষ্ণার সঙ্গে যদি তার আলাপ না হতো!

কেন কে জানে, আলাপের শুরু থেকেই কৃষ্ণা যেন ধরে নিয়েছিল ইন্দ্রনীল তার প্রেমে পড়ে বসে আছে। এই ধরনের বোকামীটা তরুণ পুরুষের কাছে কৌতুকপ্রদ। প্রথম প্রথম সে কৌতুক উপভোগ করতো তারপর এমনি করে নিজেও যেন সে কথা বিশ্বাস করতে শুরু করল।

কবে থেকে?

কখন থেকে?

সে কথা কে মনে রাখে? একটি সুন্দরী তরুণীর অবিরাম প্রেম নিবেদনের আকর্ষণ তরুণ বয়সের একটা ছেলেকে বিচলিত করে তোলে বৈ কি। আর এক্ষেত্রে তো আরোই। কারণ ইন্দ্রনীলের সদা উন্মেষিত মন তখন যেন একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নীতা সম্বন্ধে প্রেমের কথা সে ভাবেনি সত্যি, শুধু মুগ্ধ-হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তখনই একদিন টের পেল নীতার মন অনেক আগে থেকেই বন্ধক দেওয়া। বন্ধুর বিশ্বস্ততা নিয়ে নীতা সোজাসুজিই এ গল্প করেছে ইন্দ্রনীলের কাছে। মাত্র ইন্দ্রনীলই দেখেছে সাগর পার থেকে চিঠি আসে নীতার।

মেয়েদের প্রতি যে মোহবোধ, সে জিনিসটা উঠল জেগে, অথচ নীতা সম্বন্ধে মনকে যে আর অগ্রসর হতে দেওয়া চলবে না, এমন একটা চেতনাও রইল সজাগ হয়ে। এমনি সময়ে এল কৃষ্ণা। ইন্দ্রনীল দেখল—নীতা যেন উঁচু আকাশের তারা! ওর হাসি, কথা, উচ্ছলতা, উজ্জ্বলতা সেটাই ওর সবটা নয়। সেটা যেন ওর আচরণ মাত্র। ওকে বুঝি ঠিক বোঝা যাবে না কোনদিন। ইন্দ্রনীলের এত ক্ষমতা নেই, চিরকাল একটা 'না বোঝার' বোঝা বইতে পারে। ইন্দ্রনীলের পক্ষে কৃষ্ণার মত মেয়েই হয়তো ঠিক। যাকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, পড়ে আর পাঠ্যবস্তু নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। সোজা সহজ কৃষ্ণার মধ্যেই আশ্রয় নিল ইন্দ্রনীলের সদাজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু আজ!

আজ ইন্দ্রনীল ভাবছে যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো! ভাবছে, যদি মেজদার মত পালাতে পারতাম।

হয়তো এমনিই হয়।

যে মেয়ে নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করে বসে' সকল রহস্য হারায়, সে মেয়ে পুরুষের কাছে দুর্বহ ভার হয়ে দাঁড়ায়।

'ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই—
তবে আর কোথা যাই? ভিখারিণী
হ'ল যদি কমল-আসনা।'

পুরুষ কমল-আসনাকে পূজো করতে চায়, ভিখারিণীর আকুতি বেশীদিন সয় না তার।

তার মন হতাশ হয়ে বলে, 'কৃতার্থ হইব আশে, গেলাম তোমার পাশে, তুমি এসে বসে আছ আমারই দুয়ারে!'

সহজে আয়ত্ত করতে পারার প্রথম দিকটা উন্মাদনাময়। পরিতৃপ্ত হয় পৌরুষ। আত্ম অহমিকায় নিজেকে বিজয়ী ভেবে উল্লসিত হয় পুরুষ মন। কিন্তু সেই নিতান্ত সহজে জয় করে ফেলা আয়ত্তাধীনকে অসহনীয় মনে করতে বেশী দিন লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই। যদি ধরা পড়ে যায় জয়লব্ধ সম্পত্তি ধনের আঁটি নয়, ঘাসের বোঝা; তবুও মাথায় করে বইতে হবে। নইলে যে অপরের কাছে ধরা পড়ে যাবে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা। হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই 'প্রেমে পড়ে বিয়ে'র ভিতরের ইতিহাস এই।

পূর্বরাগ মধুর মদিরাময়! কারণ সে ভারহীন।

পূর্বরাগ বিভ্রান্তিকর, কারণ সেখানে একে অপরের কাছে মনোহর হবার সাধনায় সজাগ হয়ে থাকে।

কিন্তু সে মাধুর্য বিবাহের বন্ধনে বাঁধা পড়লেই মোহ হারাতে শুরু করে। শুধু তো এদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই সমাজ-কৌলিন্য আর অর্থ-কৌলিন্য ভিন্নতর চেহারায় সর্বত্র বিদ্যমান, কাজেই সেই 'কুলশীল' মেনে প্রেমে না পড়তে পারলেই অভিভাবকের সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হতেই হবে। আর দাম্পত্যজীবনের ভারটা সম্পূর্ণ তুলে নিতে হবে নিজের কাঁধে।

এ ভার বোঝা না হয়ে ফুলের মত হালকা হয়ে উঠতে পারে এমন জীবন-সঙ্গিনী ক'জনের জীবনেই বা জোটে? কৃষ্ণার মত মেয়েই তো বেশী। তাই প্রেমের বিবাহেই বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাধিক্য।

তবু ইন্দ্রনীল হয়তো এখন থেকেই এমন কথা ভাবতে শুরু করত না 'যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো'! শুরু করত না যদি সে আজ বাড়ীর 'ছোট ছেলে'র সুবিধে সুযোগটা পেতে পারত। মায়ের সাধে আর দাদাদের ব্যবস্থাপনায় আহ্লাদে গোপালের মত শুধু টোপর পরে বেরিয়ে পড়াটাই যদি ওর আপাততের কর্তব্য হতো, তা'হলে কৃষ্ণাকে পাওয়াটাই বেশ বড় পাওয়া বলে মনে হতো ইন্দ্রনীলের।

কিন্তু তাতো হচ্ছেনা ইন্দ্রনীলের ভাগ্যে। এ পাওয়া ওর অনেকখানির বদলে তাই ক্ষণে ক্ষণে মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে কৃষ্ণার বাবা লোকটা সুবিধের নয়, কৃষ্ণার মা নেহাৎ সুবিধাবাদী আর কৃষ্ণা ইন্দ্রনীলের পক্ষে মস্ত অসুবিধেকর!

তবু এখন আর পিছিয়ে আসা চলে না।

আর পিছিয়ে 'আসবেই' বা কোথায়? মৃত বিবর্ণ এক শবসাধনার শ্মশানে? অনুপম কুটিরে জীবনের উত্তাপ কোথায়? স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুললিত ছন্দ কোথায়? এই ছন্দহীন স্তব্ধ জীবন থেকে পালাতে চেয়েছে বলেই বুঝি ইন্দ্রনীল এত সহজে কৃষ্ণার কাছে ধরা দিয়েছে।

কিন্তু তার অন্তরালবর্তী মন গভীর নিশ্বাস ফেলে বলছে—'যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো।' বলছে—'যদি মেজদার মত পালাতে পারতাম।'

অনেকদিন পরে আজ বাপকে মনে পড়ল ইন্দ্রনীলের। হয়তো অনুপম মিত্তির বেঁচে থাকলে তাঁর ছোট ছেলের জীবন এত সমস্যাকণ্টকিত হতো না! না কি তিনিই আর এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতেন? কে জানে। তবু এখন এক সমস্যা তাকে বিব্রত করছে। এ সমস্যার কাছ থেকে পালাবার পথ নেই। কৃষ্ণার মা বাপ সুচিন্তার কাছে আসবেনই।

আর এলেই তো এ প্রশ্ন উঠবে সুশোভন কে? সুশোভন কেন?

কি করে ও'দের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করা যায় সে চিন্তা করতে করতেই ও'রা এ বাড়ীতে এসে গেলেন। আর ইন্দ্রনীল কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে 'বসুন আপনারা আমার একটু দর-

কার আছে'—বলে চটপট পালালো, মার দিকে না তাকিয়ে। সুচিন্তা তাকিয়ে দেখলেন ছেলের গমন পথের দিকে।

ও'রা বললেন, 'আরো আগেই আপনার কাছে আসা উচিত ছিল। যাই হোক না হওয়ার চাইতে দেরীতে হওয়া ভাল, কি বলেন? কথাটা এই—আপনার ছোট ছেলেটিকে আমরা জামাই করে নিচ্ছি।'

সুচিন্তা কি চমকে উঠলেন?

আকস্মিকতার আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন?

ঠিক বোঝা গেল না। সুচিন্তার সব কথা বোঝা যায় না। সুচিন্তা আপাত-দৃষ্টিতে অন্তত চমকালেন না, বরং একটুকরো হেসে বললেন, 'করেই যখন নিচ্ছেন, তখন তো সব কথা মিটেই গেছে।'

কৃষ্ণার বাবা বোধ করি এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ইন্দ্রনীল যতই অবহিত করিয়ে রাখুক—ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা জ্বলে উঠবেন, ফোঁস্ করে উঠবেন। অথবা আহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবেন। সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেই তিনি 'জামাই করতে চাই', না বলে বলেছিলেন 'জামাই করে নিচ্ছি।'

মানুষের হৃদয়-রহস্য বোঝা ভার।

কেন সুচিন্তাকে আহত করে আমোদ পাবার ইচ্ছে ভদ্রলোকের? সুচিন্তা কী তাঁর ক্ষতি করেছেন?

হয়তো তিনি নিজে যে সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন, সে জ্বালা কোথাও ছোবল হানবার জন্যে ফুঁসে বেড়াচ্ছিল। আর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল ছোবল হানবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অবশ্যই ইন্দ্রনীলের মা। যে নাকি তার অভিভাবক। ইন্দ্রনীলের মত একটা বেকার ছোকরার হাতে তাঁর মহামূল্যবান একমাত্র কন্যাকে তুলে দিতে হ'চ্ছে এ নিরুপায়তার জ্বালাতো কম নয়।

এ নিরুপায়তার মূলে যে তাঁর নিজের ঘরেই, সে কথা বিস্মৃত হয়েছেন ভদ্রলোক, দায়ী করছেন লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে। অতএব তার সঙ্গে তার মাকে।

সুচিন্তার কথায় ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন।

গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মিটে অবশ্য গেছেই তবে সৌজন্য হিসেবে একবার আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করলাম বলেই—'

সুচিন্তা আবার হাসলেন, 'শুনে খুশি হলাম।'

রূপসী কন্যার গরবে গরবিনী কৃষ্ণার মা বলে উঠলেন 'আমার মেয়েকে অবশ্যই আপনি দেখেছেন! আপনার বাড়ীতেও এসেছে।'

সুচিন্তা বললেন, 'দু'-তিনটি মেয়ে তো আসতো মাঝে মাঝে, তেমন ভাল করে তাকিয়ে কোনদিন দেখিনি। ঠিক বুঝতে পারছিনা কোনটি আপনার মেয়ে।'

কৃষ্ণার মা আরক্ত মুখে বললেন 'আপনার বাড়ীতে যদি কেউ আসে, আপনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন না?'

সুচিন্তা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কী মুস্কিল! দেখব না কেন, আমার কাছাকাছি এলে তো দেখতেই পেতাম। ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা কে কখন আসে যায়, সব সময় লক্ষ্য রাখি এত সময় কোথা? আর দরকারই বা কি?'

'কী ধরনের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আপনার ছেলেরা মিশছে, এ আপনি লক্ষ্য করা দরকার মনে করেন না?'

'লাভ কি?' সুচিন্তা বললেন, 'ওদের সমস্ত গতিবিধির ওপর খবরদারি করে বেড়াই এমন সাধ্য তো নেই। আমার এই ছোট্ট বাড়ীর ছোট ঘর দু'খানা ওদের জীবনের কতটুকু?'

'চমৎকার!' কৃষ্ণার বাবা বলে ওঠেন বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে, 'আপনার মত এত উদার মা ঘরে ঘরে সৃষ্টি হলে দেশটা বিলেত হয়ে উঠতে বেশী দিন লাগবে না।

এই সরাসরি আক্রমণে সুচিন্তা বোধ করি সহসা বিমূঢ় হলেন, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই হেসে উঠে বললেন, 'ক্ষেপেছেন! তাই কখনও হয়? আপনারা নেই? বাঁধ দেবেন না?'

ভদ্রলোক তিক্ত স্বরে বলেন, 'বাঁধ দিতে আর পারছি কোথা? সে ক্ষমতা থাকলে কি আর আমার একমাত্র মেয়েকে এইভাবে অপচয় হতে দিই? জাষ্টিস্ ঘোষের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করতে পারতাম আমি তা জানেন? অথচ—' থেমে গেলেন ভদ্রলোক। আর থামলেন বলেই সুচিন্তা অমায়িক মুখে উত্তর দিলেন, 'তা সত্যি! আমিও ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি, 'অথচ'—আপনি কেন আমার ওই বাউণ্ডুলে বেকার ছোট ছেলেটাকে জামাই করছেন!'

কৃষ্ণার মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কেন করছি, সেটুকু বোঝবার মত ক্ষমতা অবশ্যই আপনার আছে?'

সুচিন্তা এবার গম্ভীর হলেন।

আর সেটা ঢাকবার চেষ্টাও করলেন না। গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'তা হয়তো আছে। কিন্তু এটা বোঝবার ক্ষমতা সত্যিই নেই, আপনার মেয়ে আপনার আয়ত্তের বাইরে, এ খবরটা ঘটা করে আমার কাছে এসে শোনাচ্ছেন কেন! সত্যিই ব্যাপারটায় বিস্ময় বোধ করছি।'

'বোকামী হয়েছিল!' কৃষ্ণার বাবা উঠে দাঁড়ান, রূঢ়স্বরে বলেন, 'ভেবেছিলাম বিয়ের আগে একবার আপনাকে জানানো একটা সাধারণ ভদ্রতা। দেখছি সেটা ভুল ভেবেছিলাম। আচ্ছা উঠি।' হাত তুলে নমস্কারের একটা ভঙ্গী করেন ভদ্রলোক।

সুচিন্তাও তাই করেন সঙ্গে সঙ্গে।

এইবার কর্তা গিন্নীর চলে যাবারই কথা। কিন্তু কৃষ্ণার মায়ের বোধকরি এত তাড়াতাড়ি নাটকের যবনিকা পতনে মন ওঠে না। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়েও বলে বসেন, 'আপনার বাড়ীতে অতিথি এলে একটু চায়ের অফার করার অভ্যাসও বোধকরি আপনার নেই?'

সুচিন্তা বোধকরি বর্মাবৃত হ'য়েই ছিলেন, তাই এ প্রশ্নেও বিচলিত হলেন না, শুধু প্রায় হাসিমুখে বললেন, 'অতিথির আবির্ভাব আমার বাড়ী এত কম যে, কী অভ্যাস আছে কি নেই, মনে করতে পারছি না?'

'যাবে তুমি?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক রুদ্ধ প্রশ্ন করেন। স্ত্রীও অবশ্য সক্রোধ ভ্রূ-ভঙ্গীতে উত্তর দেন, 'যাব না তো কি থাকতে এসেছি? যাচ্ছি।...... আচ্ছা আপনার একটি ছেলে হঠাৎ কোথায় যেন চলে গেছে শুনলাম!'

সুচিন্তা এ প্রশ্নের আঘাতও পরিপাক করে সহজভাবে বলেন, 'বিদেশে চাকরী করতে যাওয়াটা খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়েছে আপনার?'

চাকরী! শুনলাম তো না বলা কওয়া হঠাৎ—'

সুচিন্তা হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, 'বাড়ীর ঝি চাকরের কাছে শুনে থাকবেন বোধ হয়? ওরা অমন মুখরোচক গল্প করে বেড়ায়।'

'ঝি-চাকর' শব্দটার মধ্যে যে অবহেলা নিহিত ছিল তাতে কৃষ্ণার মার ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঝি-চাকরের সঙ্গে গল্প করা যে তাঁর পেশা নয়, সেই কথাটাই বোধকরি বলতে যান কিন্তু অকস্মাৎ এক বিপর্যয় ঘটে যায়।

ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুশোভন বলে ওঠেন, 'এতক্ষণ ধরে ওই সব বাজে বাজে লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কী হচ্ছে তোমার সুচিন্তা! তাড়িয়ে দাও না ওদের।'

মুহূর্তকাল যেন ঘরের তিনটে মানুষই বিদ্যুতাহত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সুচিন্তা শান্ত সুরে বলেন, 'তুমি নেমে এলে কেন সুশোভন! ওপরে যাও।'

সুশোভনের এই নীচে নেমে আসাটা সত্যিই অভাবনীয়। নীচের তলার এই সাজানো-গোছানো বসবার ঘরটায় বোধকরি কোনদিনই পা পড়েনি সুশোভনের। রাস্তার দরজার সামনে থেকেই সিঁড়ি, সেইটাই শুধু পরিচিত হয়ে গেছে তাঁর কাছে। (ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

স্বার্থ বাহ

জার্মান নাটক : অনুকৃতি ও অধ্যয়ন

নাটকের সংগে কবিতার কোথায়, কতখানি যোগাযোগ এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনার সূত্রপাত না-করেই বোধ হয় বলা যায় যে, নাটকের প্রতি কবিদের সহজাত আকর্ষণ। অনেক নাট্যকার যদি-বা কবিত্বের কোনও সংস্রবে থাকেননি, কম কবিই নাটকের সংস্পর্শ একেবারে এড়িয়ে গেছেন। এমনকি ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের অনেককেই নাটক-রচনার আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছিল, যদিও তাঁদের কবিতা-লেখার পূর্ণাঙ্গ ব্রতে ফাঁকির অবসর ছিল সামান্যই। তবে, নাটকের ভাষা উক্ত কবিদের কাছে যেহেতু কদাচই গদ্য হ'ত, নাটক-রচনা তাঁদের কাছে কাব্যচর্চারই নামান্তর ছিল, বললে ভুল হয় না। আর, ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের রচিত নাটকগুলিতে কাব্যের উপাদান সজোর ও উদার হয়ে অনেক ক্ষেত্রে নাটককে তা'র তাঁবেদার বানিয়েছিল এমনভাবে যে, সেগুলি সার্থক রচনা হয়ে ওঠেনি। ওঅর্ডসওয়র্থের 'দি বর্ডরর্স', কিংবা কীটসের 'ওথো দি গ্রেট', কিংবা এমনকি শেলির 'চেঞ্চি' উল্লিখিত কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত হয় না। তাঁদের সাহিত্য-জীবনে মূল সম্পাদক কবিত্বের সাময়িক চিত্ত-বিভ্রমের সাক্ষ্য যেন ঐ নাটকগুলি! কিন্তু এই হিসাবে সমসাময়িক জার্মান কবিদের নাট্যপ্রেরণা স্পষ্টতঃ ইংরাজ কবিবর্গকে পরাস্ত করেছিল আন্তরিকতায় ও সম্পদে। অন্ততঃ দু'ইজন কবি তখন জার্মানীতে ছিলেন যাঁদের মস্তিষ্ক ও কল্পনা, কাব্য-লক্ষ্মীর কাছে বাঁধা থাকলেও, যথাযথ অভিনিবেশে নটরাজের ভজনা করতে দ্বিধা করেনি। যে অচ্ছেদ্য স্বরসাধনায় ব্রতী ছিলেন গোয়তে ও শিলর তা'তে কাব্য ও নাটক যেন সমান উচ্চারণে পরস্পরের সহকারিতায় পুষ্ট হয়েছিল। ঐ দুই মহাকবির রচনায় কোনওরূপ গৌণতা না-লাভ ক'রে নাটক যে-সরাসরি অগ্রগতির পথে পরিচালিত হয় তা'র মধ্যে নিঃসংশয়ে নিহিত ছিল ঊনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর জার্মান নাটকের অভ্যুত্থান।
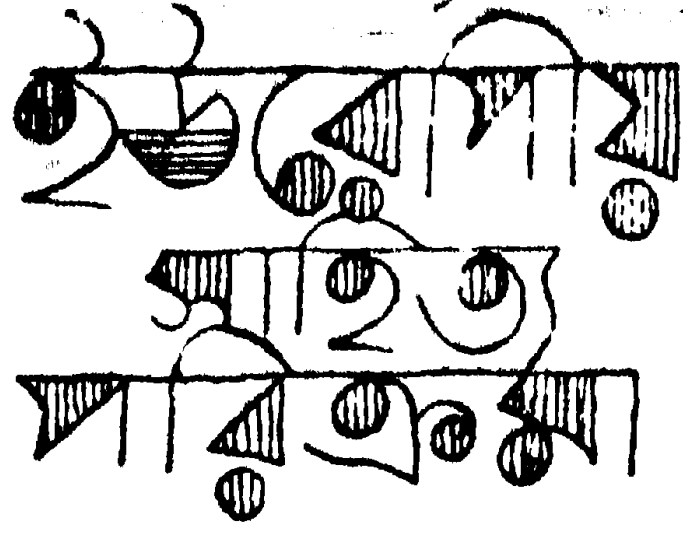
গোয়তের মহাকাব্য 'ফাউস্ত' তাঁর মতেই 'একটি বিয়োগান্ত নাটক।' 'ফাউস্তের' নাট্য-কেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে যদি কারও সন্দেহ জাগে তবে তাঁকে দেখতে বলি গোয়তের আঁকা 'ফাউস্ত'-বিষয়ক চিত্র : 'প্রলক ইম হিমেল' বা 'স্বর্গলোকে নান্দীপাঠ।' এই চিত্রে মেফিস্তোফেলেস ও ঈশ্বরের দাঁড়ানর ভঙ্গীটিতে কী নিঃসন্দিগ্ধ মঞ্চ-নির্দেশনার বুদ্ধি প্রকাশিত। মঞ্চের সম্মুখ ভাগে, পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, হাত-তুলে বক্তার মেফিস্তোফেলেস,— দূরে ব্যাকড্রপের লাগোয়া, মাঝখানে আবির্ভূত ঈশ্বর। অভিনয় রজনীর গন্ধ যেন চিত্রটিতে মাখানো! আর, এই 'ফাউস্তের' নাট্য-স্বরূপ নির্ধারণ করতেই বা নাট্যকার গোয়তের কতো দুশ্চিন্তা ছিল। সে দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায় নাটক নিয়ে কতোখানি মাথা ঘামাতেন গোয়তে। শুরুর দিকে 'ফাউস্তে' বিয়োগান্ত ও মিলনান্তের জগাখিচুড়ির স্বাদ পেয়ে গোয়তে তাঁর বন্ধুবর মিলরের কাছে লেখা পত্রে নাটকটিকে বিদ্রূপাত্মক সংজ্ঞায় অভিহিত করেন 'ত্রাগেলাফ' ব'লে, যেন উক্ত রচনায় গ্রীক 'ট্রাজেডি'র ব্যুৎপত্তিগত 'ত্রাগস' বা 'ছাগলের' সংগে অশোভন মিলন ঘটেছিল "এলাফস' বা 'মৃগের'!

গোয়তে-শিলর মারফত নাটকের এই উন্নতিসাধন যে যথেষ্ট শ্রী ও সামর্থ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল তা'র কারণ অবশ্যই কবিদ্বয়ের ব্যক্তিগত প্রতিভা। তবু, এ প্রসংগে অনুল্লেখ বেমানান যে, এই দুই কবিই য়ুরোপীয় নাট্য-বিদ্যার ঐতিহ্যে নিজেদের চিনে-নিতে পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করেছিলেন সচেতনভাবে। গোয়তে ও শিলর নাট্যকলার ব্যাকরণে গ্রীক আরিস্ততিলিস ও নাট্য-সাহিত্যের বিকাশধারায় সেক্সপীয়র ও গ্রীক নাট্যকারদের অনুধাবন করেছিলেন। ফলে, যেমন গোয়তের পক্ষে 'ত্রাগোয়দিয়া' বা 'বিয়োগান্ত'র শুদ্ধ রূপ সন্ধানে 'ফাউস্তের' জন্য বছরের পর বছর পরিশ্রম করতে হয়, তেমন শিলরের নাটকে ব্যক্তি-চরিত্র অনুশীলনের পরিকল্পনা যথার্থ নাটকের দাবীতে 'চরিত্র' ছেড়ে 'কর্ম' ও 'ঘটনার' মাধ্যমকে গ্রাহ্য করে। উপযুক্ত ক্ষমতা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে গোয়তে য়্যুরিপিদেশের বিখ্যাত নাটক 'ইফিগেনেইয়া ই এন তাউরয়স'-এর অষ্টাদশশতকী ভাষ্য 'ইফিগোনিয়া আউফ তাউরিস' রচনা করেন একই আখ্যান অবলম্বন ক'রে এবং যেখানে গ্রীক নাট্যকার ভ্রাতৃপ্রাণ-রক্ষায় ইফিগেনিয়া-কে চাতুরী ও মিথ্যা-ভাষণে উপনীত করেন, সেখানে গোয়তে তাঁর নায়িকাকে সত্যসন্ধ, মানবিক পথে কার্যসিদ্ধি করান ক্লাসিকল নাট্যবস্তুর এক সদুদ্দেশ রূপান্তর ঘটিয়ে। স্বীকার করতে হয় যে, গ্রীক নাটকের পূজারিণী ইফিগেনিয়া ও রাজা থাঅস উভয়েই গোয়তের ভাষ্যে তাদের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে মহত্তর আয়তন লাভ করেন।
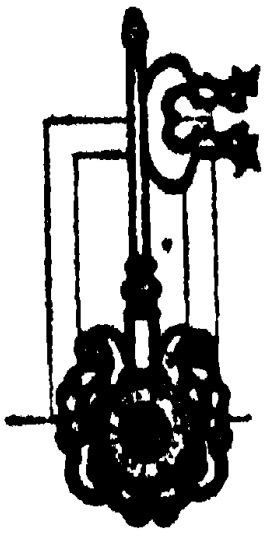
নাট্য-শিল্পে সমাহৃত গোয়তে ও শিলর, স্বাভাবিকভাবেই, আঙ্গিক অপেক্ষা বস্তুর প্রতি অধিকতর উৎসাহ পোষণ করেছিলেন। বিশেষতঃ গোয়তে। 'ফাউস্ত' যে অনেকাংশেই কবিতা, ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা, দার্শনিক ভাষণ, আলাপ ও প্রলাপ এবং গোয়তের আরেকটি নাটক 'তরকুয়াতো তাস্সো'-যে অনুরূপে উক্তিবহুলতায় দুষ্ট, একথা 'ইফিগেনিয়া আউফ তাউরিস'-এর সার্থকতার পরও স্মর্তব্য। শিলর অবশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী আঙ্গিক-সচেতন। নাট্যবস্তুর সন্ধানে শিলরকে যেমন সচল মনে হয়, তেমন আঙ্গিক সম্বন্ধে বহুলাংশে অবহিত ও উৎসাহী। বিচিত্র বিকাশ শিলরের নাট্য-প্রতিভার। তাঁর প্রথম নাটক 'কাব্যালে উন্ত লিবে' ('রহস্য ও প্রেম') সামাজিক-নাটকের এক নব্য প্রচেষ্টা। দস্তুরমতো কাব্য-নাট্য রচনা করেন শিলর তাঁর 'দোন কার্লোস'-এ। উক্ত নাটকের উপযোগী বস্তু যদিবা হিস্পানী উচ্ছলতা ও স্থান-কালের জন্যে শিলর দেশান্তরী, তাঁর তিন খণ্ডের প্রকাণ্ড নাটক, 'ভালেনস্তাইন'-এ খাঁটি স্বদেশী বিষয়বস্তুর দিকে পূর্ণ অবধান শিলরের। সমানে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাবনার পরিবেশে সৃষ্ট শিলরের এই নাটক অনায়াসেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হতে পারে, যদিও তাঁর শেষ নাটক 'ভিলহেলম তেল'-কে সমালোচকরা আরো সম্পন্ন ও নির্দোষ রচনা বলেছেন।

'ভিলহেলম তেল' একাধিক কারণে বিশিষ্ট। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে নাটকটি ফরাসী বিপ্লবোত্তর মানবতাবাদের আদর্শে পরিপুষ্ট। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জন-জাগরণ ও বিপ্লবী নেতা, বীর ভিলহেলম তেল-এর শর-সন্ধানে প্রবল প্রতাপ গেসলরের জীবনাবসান এই নাটকের মূলে বর্ণিত বিষয়। ঘটনা-বিন্যাসে ও সংলাপ-রচনায় শিলরের নাট্যপ্রতিভা প্রকৃষ্ট প্রয়োগ এই নাটকে। দৃশ্য-পরিকল্পনায়, পাত্রপাত্রী-সমাবেশে, নাট্য-গতিনিয়ন্ত্রণে শিলর স্বাচ্ছন্দ্য ও সংযমের এক বিরল সংযোগ ঘটিয়েছেন এই নাটকে। ভিনদেশী আবহাওয়া ধাতস্থ করতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান উত্তীর্ণ হয়ে শিলর সুইস জীবনের কোনও অন্তরঙ্গ স্তরে দ্রষ্টারূপে হাজির হয়েছিলেন তাঁর নাটকের রসদ জোগাড় করতে। নতুবা, কাব্যে যে-অভিজাত তন্ময়তা শিলরকে আশ্রিত রেখেছিল, তার হেপাজত ডিঙিয়ে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সুইস গ্রামীণদের অমন মর্মস্পর্শী জীবনালেখ্য রচনা করা।

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদী কুশাসনের কবল থেকে সুইস জনগণের ত্রাণকর্তা এই ভিলহেলম তেল সম্বন্ধে যদিও ইতিহাস অপেক্ষা জনশ্রুতির সাক্ষ্যই বেশী, তবু এক সময়ে তেল-এর চরিত্র অবলম্বনে মহাকাব্য লেখার জোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন স্বয়ং গোয়তে। অর্ধসভ্য তবু মুক্তিকামী, বীর ভিলহেলম তেল গোয়তেকে ব্যক্তি-চরিত্রের মহত্বে যে কতখানি বিচলিত করেছিল তা তিনি একেরমানের কাছে ব্যক্ত করেন এবং একাধিক পত্রে শিলরকেও জানান। বস্তুতঃ, অন্য কাজের তাড়ায় গোয়তে যখন তেল-বৃত্তান্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'ন তখনি শিলরকে 'ভিলহেলম তেল' রচনার দায়িত্ব নিতে হয়। হাত বদল ক'রে তেল-বৃত্তান্ত যে ভাষ্য লাভ করল, তাতে ধরা পড়ল প্রত্যক্ষভাবে শিলরীয় নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। শিলর যে পঞ্চমাঙ্ক নাটক লিখলেন তা'তে 'ভিলহেলম তেল' নায়ক হ'লেও, নাটকটি গ'ড়ে উঠল আরো অনেককে নিয়ে এবং তেল-এর ব্যক্তি-স্বরূপ অনুধাবনের গোয়তীয় পন্থা ত্যাগ ক'রে শিলর ঐ একক বীরকে ঘটনার বিচ্ছিন্নতা, ঘরোয়া তুচ্ছতা ও পাঞ্চজনের মাঝখানে টেনে এনে তার নাট্যরূপ অনুসন্ধান করলেন। তেল-এর আশে-পাশে মুক্তিসংগ্রামের সমর্থক হিসবে অভিজাত শ্রেণীর আতিঙহাউসেন ও স্তাউফাকর এবং নিম্নশ্রেণীর কুয়োনি, রুয়োদি, ভের্নান, উলরিখ ইত্যাদি বেশ কতিপয় চরিত্র সৃষ্টি ক'রে শিলর নাটকের কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি থেকে বহুতে,—বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, এমন সাবলীলভাবে আরোপ করলেন যে গোয়তে-কৃত 'তাস্সো' অপেক্ষা অনেক ফলপ্রদ নাটকীয়ত্ব ও সার্থক রূপায়ণ লাভ হ'ল ভিলহেলম তেল-এর। চরিত্র ও ঘটনার যে বাহুল্য শিলরের এই নাটকে প্রথমতঃ অনাবশ্যক, এমনকি অপ্রেয়, ঠেকে তা-ই শেষ পর্যন্ত নাটকটির সাফল্যের প্রধান উপাদানরূপে প্রতীয়মান হয়। নাটকটি ভিলহেলম তেল-এরই কাহিনী যদিও, তবু সে কাহিনীর নাট্যরূপ যে জীবন ও ঘটনা মারফতই সম্ভব, ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ঘাটনের কোনও পৃথক বনেদী পথ নেই,—এ সত্য শিলর সম্ভবতঃ আরিস্ততিলিসের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। *

*ট্রাজেডি প্রসঙ্গে আরিস্ততিলিসের বক্তব্য সাধারণভাবে নাটকের সত্বও বিশেষিত করে : ব্যক্তি নাটকে প্রধান উপলক্ষ্য হলেও, নাটক কখনও ব্যক্তির অনুকৃতিতে উদ্ভূত হয় না, অনুকৃতি সদৈব ঘটনার ও জীবনের ('হি গার ত্রাগোয়দিয়া মিমেসিস এস্তিন উক আনথ্রোপোন আল্লা প্রাক্সেওস কাই বিয়ু।' —পোয়েটিকস, ৬, ৯)। প্রণোদনার আতিশয্যে এই সহজ সত্য অনেক নাট্যকারই বিস্মৃত হ'ন।

শিলরের 'ভিলহেলম তেল' নাট্য-সাহিত্যে এমন নিশ্চিত মূল্যবান এক অবদান যে, নাটকটির বিস্তারিত আলোচনা একমাত্র স্থানাভাবেই বর্জিত হ'ল বর্তমান প্রবন্ধে। তবু, বাচন ও পরিবেশ-নির্মাণে নাট্যকারের আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য কীভাবে এই নাটকটিকে গতি ও তীব্রতা দিয়েছে তার সর্বোকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ : নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ভিলহেলম তেল-এর বন্দী হওয়ার সংবাদ যখন পৌঁছল ধীবর রুয়োদির কানে, তখন ঐ অশিক্ষিত ধীবরের মুখে শিলর যে বচন দেন তাতে যেমন নেতার বিনাশে জাতীয় জীবনে প্রলয়ের সংবাদ, তেমন স্বাধীনতা অর্জনে সাধারণ মানুষের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা সূচিত হয় সমান প্রাবল্যে। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের বাচনিক অনুকার খুঁজতে শিলর সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র'—অর্ধোন্মাদ, পরাভূত লিয়রকেই মনে করেন :

ধীবর। প্রভঞ্জন, হও প্রবাহিত!
বিদ্যুৎ শিখারা, জ্বালিয়ে দাও
এ অঞ্চল! মেঘদল, হও বিদারিত!
স্বর্গের নদীরা,
ঢালো নীচে! নিমজ্জিত করো
দেশটাকে! **

নির্দয় করগ্রাহী গেসলর, তাকে তেল-এর বাণে মরতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণটিতে পর্যন্ত নাট্যসুবিচারের যোজনা চাই শিলরের নাট্যমীমাংসার ছকে। তাই চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শরবিদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমরা শুনি মিনতিময়ী আর্মগার্তকে বিদ্রূপ ক'রে অত্যাচারী গেসলর আবারো দাবড়ে উঠছে : 'ভাঙবো আমি এই মুক্তিলাভের বজ্জাত ইচ্ছেটা, এ দেশে নতুন একটা আইন জারি করবো!'

**Wilhelm Tell : Schauspiel von Friedrich Schiller (ed. Karl Breul) ৪র্থ অংক, ১ম দৃশ্য, লাইন ২১২৯-৩১

শিলরের পর জার্মান নাট্যসাহিত্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য ও কলরব অনুভূত হ'ল কয়েক দশক বাদ দিয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে। উত্তর য়ুরোপীয় দুইজন নাট্যকার, ইবসেন ও স্ট্রিণ্ডবের্গ তখন নাটকে 'যুগের হাওয়া' নিরূপিত ক'রে দিয়েছেন বাস্তববাদের নামে। এই পর্যায়ে জার্মানীতে অন্ততঃ চারজন শক্তিমান নাট্যকার বাস্তববাদী নাট্য-আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন: হেরমান সুদেরমান, ফ্রাঙ্ক ভেদেকিন্ত, গেরহার্ত হাউপ্তমান ও আর্তুর শ্নিৎসলর। পারিবারিক নৈতিকের নাগপাশে আটক একটি মেয়ের বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে-ভরা সুদেরমানের 'দি হাইমাৎ' (গৃহ)। বাস্তবের আরো তীক্ষ্ণ অধ্যয়ন সুদেরমানের 'জদমুস এন্দে' (সডমের শেষ) নাটকে। ব্যাভিচারী ধনিক সম্প্রদায়কে বে-আব্রু করতে নির্মম লেখনী ধরেছিলেন বাস্তববাদী সুদেরমান। ফ্রাঙ্ক ভেদেকিন্ত নাট্যচিকীর্ষায় দুঃসাহসিক নূতনত্বের নির্দেশ দেন যৌন বিষয়ক কাহিনীর রূপায়ণে। ভেদেকিন্ত বাস্তববাদ শপথ ক'রে মানুষকে অবদমিত যৌনতার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কতকটা জিদ্ ধরেই নাট্যজগতে কিছু পরিমাণ শিহরণ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি করেন। ভেদেকিন্ত আসলে ছিলেন ঊনবিংশ শতকী গেয়র্ক বায়েখনরের ভক্ত (যে বায়েখনরের বিখ্যাত নাটক 'দাঁতর মৃত্যু' সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে), এবং বায়েখনরের নাটকে ভাষা ও কল্পনার দৌরাত্ম্য যে অসাধারণত্বের প্রসব করেছিল তার সহজাত সন্ধান ভেদেকিন্ত পেয়েছিলেন যৌনমূলকের পরিবেশন করায়। শ্নিৎসলারের নাটকে সংলাপ লক্ষণীয়ভাবে প্রাধান্য পায়, এ্যাকশন বা সংঘটনের আয়োজন ও বুননে তদনুপাতে শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যৌনতা বা সমাজনৈতিক চিন্তা, এ-দুয়ের কোনওটিতেই তাঁর নাট্য-প্রচেষ্টা ধাতস্থ হতে পারেনি, কারণ প্রেমকাহিনী মনস্তত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধ তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে জটিলতা ও রুক্ষতার থেকে দূরে রেখেছিল। শ্নিৎসলরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'লিবেলাই' (ছেনালী) বিয়োগান্ত নাটক হিসাবে বেশী বর্ণময় মনে হলেও, সংলাপে ও আবহাওয়ায় মুগ্ধকর। সংলাপের ক্ষমতা আরো সপ্রকাশ শ্নিৎসলরের 'দের আইন-সামে ভেক' (নির্জন পথ) নাটকে, যেখানে সংঘটনের ঝুঁকি নাট্যকার প্রায় নেননি বললেই হয়।

গেরহার্ত হাউপ্তমান, যাঁর প্রথম নাটক, 'ফর জনেনুন্তেরগাঙ' (সূর্যোদয়ের পূর্বে) কিছু দিন আগেও হামবুর্ক শহরে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে 'দ্যুয়েসেলদর্ফ' নাট্যভবনের' অভিনেতৃবর্গের দ্বারা, অর্ধশতাব্দীরও বেশী ব্যবধানে যে দর্শকচিত্তে যথাযথ আবেদন করতে পারেন, তার কারণ অবশ্যই তাঁর নাট্যকলায় কয়েকটি অনস্বীকার্য সদগুণের উপস্থিতি। নাট্যকারের প্রধানতম আয়ুধ পর্যবেক্ষণ—বা জীবন-দেখার চোখ, হাউপ্তমানের অন্ততঃ গোড়ার দিকে ছিল। সংলাপ-রচনায় শৈলী ও বুদ্ধিমত্তা (আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা) তাঁর আরেকটি গুণ। আর, বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টাও তিনি কদাচই ত্যাগ করেছেন (যদিবা থেকে থেকে রূপক-নাট্য, রস্তা ও মেতরলিংক মারফত, তাঁকে আকৃষ্ট করেছে)। অপরিমিত ক্ষমতা ও সিসৃক্ষা হাউপ্তমানের বহুধাব্যক্ত নাট্য-সৃষ্টিতে সপ্রমাণ। প্রথম দিকের একটি নাটক 'দি ভেবর' (তন্তুজীবীরা)-এ হাউপ্তমান তাক্ লাগিয়েছিলেন একের বদলে একটি দঙ্গলকে নায়কত্বে বরণ ক'রে; পরবর্তী নাটকগুলিতেও চমকপ্রদের অভাব ঘটাননি তিনি, যদিও সে চমক এনেছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যজগতের গভীরতর উপপত্তিগুলি। স্ট্রিণ্ডবের্গের মতো বাস্তব-অধ্যয়নে হাউপ্তমানকে জটিল, প্রবল, অন্ধকার, রিপুপরবশ—ভীষণতাকামী মনে হয়,—

এবং তাঁর নাটকের কাহিনীগুলি প্রায়ই যেন সুপরিকল্পিত আবেগে দারুণ কোনও বিয়োগান্তকে আদৃত করে। তবু, কদাচই হাউপ্তমান অতি-নাটকীয় বা অবাস্তব এবং সেই কারণেই তাঁর নাটক কখনও বিস্বাদ বা ধিক্কার আনে না। 'দি ফেরসুঙ্কেনে গ্লোকে' (ডুবন্ত ঘণ্টা) নাটকে রূপকথার মাধ্যমে হাউপ্তমান যে প্রতীকী-নাট্য রচনা করেন তা যথেষ্ট কাব্যময় হলেও বিয়োগান্ত। এই বিয়োগান্তেরই সাধনা হাউপ্তমানের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনকে চালিত করে। আত্মহত্যাকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিতে হয় তাঁর একাধিক নাটকের নায়কদের। বৃদ্ধ বয়সে নাৎসীবাদে বিশ্বাসী হওয়াও হয়ত বা হাউপ্তমানের জীবন-নাট্যে অনুরূপ পথ নির্দেশ (যা, বলা বাহুল্য, এক অশোভন, দুর্বল পর্যবেক্ষণলব্ধ)।

গেয়র্ক কাইসর, কুর্ত হিলর ও এর্নস্ত তোলর : হাউপ্তমানের পরবর্তী জার্মান নাটকে এই তিনজন ক্ষমতাবান শিল্পী এক্সপ্রেশনিজমের আওতায় নাটক লেখেন। বাস্তববাদের যে ভাবসমৃদ্ধ অনুসৃতি দাবী করেছিল উক্ত সাহিত্যিক পন্থা তাতে ঘটনা-বিন্যাসের দায় ছাড়াও শিল্পীকে পোহাতে হ'ত তাঁর আপন মনোজগতের প্রতিক্রিয়া ও তাঁর ধ্যান-ধারণা বিজ্ঞাপিত করার আন্তরিকতাকে। এবং সে-হিসাবে বাস্তবের অধ্যয়নে কোনও তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক কারচুপি ক'রে শিল্পীর পক্ষে দূরে সরে থাকা কণ্টকর হয়েছিল। বর্ণনার চেয়ে গভীরতর বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব পড়েছিল ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের উপর। তাঁর সৃষ্টি মারফত শিল্পী সচেতনভাবে বাস্তবের ভাষা-নির্মাণে অভিব্যক্ত করছিলেন নিজেকে। এই এক্সপ্রেশনিজম বাস্তব অথবা স্বভাব-কেন্দ্রিক প্রকাশ-রীতিকে স্পষ্টতর গুরুত্ব ও নিষ্ঠায় ঘনীভূত করেছিল। তাই, নাটকে হাউপ্তমানের প্রতিভাও উদ্ভাসিক প্রমাণিত হ'তে পা'রল। প্রয়োজন হ'ল আরো দায়িত্বপূর্ণ কল্পনার, আরো জীবননিষ্ঠ সংলাপের, এবং স্বচ্ছতর পথপ্রদর্শনের। এই নব নাট্য-প্রচেষ্টায় কাইসরের 'গাস' (গ্যাস) ও 'ফন মর্গেনস বিস মিতেরনাখত' (প্রভাত থেকে মধ্য রাত্রি) শিল্পযোজিত বিংশশতকী জীবনে ঘটনা ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধানের ইঙ্গিত। সমকালীন সভ্যতার গোপন গলদ, তার ভিত্তিতে সঞ্চিত অপলাপ, সভ্য মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা কাইসরকে এবং আরো সরাসরি, তোলর-কে নাটকের মাধ্যমে জীবনের সমালোচনা ও বিচার করায়। সমাজ ও সভ্যতার এক প্রখর বিশ্লেষণ তোলরের বিখ্যাত নাটক, 'হপলা, ভির লেবেন' (কী মজা, আমরা বাঁচছি)-এ আঙ্গিক ও বস্তুর বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়, ঘরে-ফেরা এক বিজয়ী সৈনিকের আত্মগ্লানি কিভাবে তাকে বাস্তববাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে ব্রতী করে তার কাহিনী তোলরের আরেকটি সুপরিচিত নাটক 'দি ভান্দলুঙ' (পরিবর্তন)এ। তোলর বলেন : যন্ত্রযুগের ব্যাধি নিরাময়-কল্পে যন্ত্রের নিপাত চাই না (যদিও কাইসরের কাছে ঐ নিপাতই প্রেয়), চাই যান্ত্রিকতা থেকে মানবিক মুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বতন।

শিলর থেকে এর্নস্ত তোলর পর্যন্ত রীতি ও বক্তব্যের নানান অভিধায় পরিভ্রমণ ক'রে জার্মান নাটক আদর্শ, বাস্তব, স্বভাব ও চিন্তার সংজ্ঞায় যে সকল ভ্রান্তি ও ক্ষতির জের টেনে তার আধুনিকতম পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, তাদের ইতিবৃত্তে অন্ততঃ মৌখিক এক বীতরাগ দেখিয়ে শুরু করেন এ যুগের অন্যতম প্রধান জার্মান নাট্যকার, বের-তোলত ব্রেখত। রাজনীতির পাকচক্রে প'ড়ে ব্রেখতের বরাতে যে উপযুক্ত পরিচিতি ও সুখ্যাতি আদপেই অবিলম্বে আসেনি, তা স্বীকার করতেই হয়। ভাবনা ও বাচনের যে-অবিসংবাদী মহত্বে ব্রেখত আলোকসামান্যের কিছু কম নন, তার সমাদর রাজনৈতিক বিদ্বেষ্য ব্যাহত ও বিলম্বিত না-হলে, ব্রেখত প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেক রক্ষণশীল পশ্চিমী নাট্য-সমালোচকদের কম আড়ষ্ট দেখা যেত। কম্যুনিস্ট হিসাবে সুপরিচিত ব্রেখত দলমাত্র ছাপেই নিস্তার পান না। এক চপল উৎকণ্ঠা নিয়ে দক্ষিণপন্থীরাও ব্রেখতের ভোগ-দখল দাবী করতে যে পিছপা নন তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছে একটি বহু-প্রচারিত ইংরেজী মাসিকের পাতায়। ব্রেখতের একটি নিষিদ্ধ কবিতা, 'গেসাঙ দেস জলদাতেন দের রোতেন আরমে' (রেড আর্মির সৈনিকের স্তব), উদ্ধৃত ক'রে উক্ত পত্রিকা ব্রেখতের রুশ-বিদ্বেষও প্রচার করেন! (এ জাতীয় বাম-দক্ষিণ টানাপোড়েনে এক সময়ে কাহিল হ'তে হয়েছিল ফরাসী সার্ত্রকে)।

অবশ্য যে কোনও প্রকার নাকানি-চুবানি সহ্য করেও জলজ্যান্ত উঠবার সামর্থ ব্রেখতের রচনাগুলির আছে। সৃষ্টিশীলতার যে অখণ্ড প্রতাপ ও নির্বিরোধ প্রেরণায় ব্রেখতের অজস্র

সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে কল্পনার সমারোহ ও শিল্পের শুচিতা অনায়াসে রাজনীতিপ্রসূত প্রতিক্রিয়া বা দিশা অতিক্রম করতে পারত। কারণ, ব্রেখত রাজনীতি থেকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার সুগম করেননি, সরাসরি, প্রায় বৈপ্লবিক জোর নিয়ে, সাহিত্যক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হন তিনি। তাঁর এই জোর এক্সপ্রেশনিজমের আবহাওয়ায় তাঁকে বেমানান, এমনকি রোমান্টিক প্রমাণ করতে পারত। মতামতের দিক থেকেও রোমান্টিকতা ব্রেখতের প্রথম জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যেমন ব্যুয়খনর ও ভেদেকিন্তের প্রতি তাঁর অনুরাগে। তাঁর তরুণ বয়সের রচনা 'ত্রোমেলন ইন দের নাখত' (রাত্রিতে দামামাধ্বনি) নাটকের কাহিনীতে, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন উপলক্ষ্য ক'রে লেখা 'ফন আরমেন বে-বে'-র মতন কবিতায় ব্রেখত নিশ্চিতভাবে অরাজনৈতিক, আত্মমভাবে মানুষিক ব'লে ধরা দেন। উক্ত কবিতায় যে-আশ্চর্য নিরাবেগে ব্রেখত তাঁর আত্মপরিচিতিতে জানান তিনি 'সন্দেহঠাসা, আর পচা, আর পরিশেষে, তুষ্ট মানুষ' ('মিসত্রাউইশ উন্ড ফাউল উন্ত ৎসুফ্রিদেন আম এন্দে') তা কেবল তাঁর মানবিক চেতনাকেই প্রাজ্জল করে।

নাট্য-সাহিত্যে ব্রেখতের অবদান সর্বাঙ্গীণ। পর্যবেক্ষণ, অনুভব, সংলাপ, আঙ্গিক ও সর্বোপরি ভাব-সংগ্রহ বা আইন্ডিয়েশন, তাঁর নাটকে দর্শক বা পাঠককে অভিভূত করে। উক্ত লক্ষণগুলির পর্যায় আলোচনা বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। তবু, মোটাভাবে এটুকু বলা যায় যে, নাট্য-তত্ত্বে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিলাভ হয়েছিল ব্রেখতের। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলিতে কোনও একটি অঙ্গকে দুর্বল বা দুষ্ট ব'লে নির্ধারিত করা ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও শক্ত। ভাব-সংগ্রহ ও বাচনের অভিনবত্বেই ব্রেখতের নাটক পাঠকচিত্ত এভাবে আলোড়িত করে যে, তার গুণাগুণের আপেক্ষিক বিচার গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া, প্রশংসনীয় নূতনত্ব ব্রেখতের আঙ্গিক ও নাট্য-সামগ্রী আহরণে। মঞ্চের আয়ত্তে ও নাট্য-পরিচালনার অধিকারে তিনি এমন সব কলাকৌশল ন্যস্ত করেন যা অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারের পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণ হিসাবে মধ্যবয়সী ব্রেখতের রচনা, 'লেবেন দেস গালিলাই'* (গালিলেও-জীবনী) নাটকটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন।—প্রথমতঃ একাঙ্কিককার ধারে-কাছে না-এসেও ব্রেখতের এই নাটক অঙ্কে-বিভক্ত হয়নি। পনেরটি অনতি-বিচিত্র দৃশ্যে বৈজ্ঞানিক গালিলেওর ঘটনাবহুল জীবন নাট্যরূপ পেয়েছে। দৃশ্য-সংস্থাপনার গুণে এমতো ব্যবস্থায়ও ব্রেখত ষোড়শ শতাব্দীর ঐ চিন্তা-নায়কের যে-অনুকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তাতে প্রত্যয় ও সমৃদ্ধির অভাব ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, এই নাটকে দৃশ্যের শিরোনামা ও দৃশ্য-ফলক ব্যবহার। নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নীত হওয়ার সূত্রধার-শোভন ঐ শিরোনামাগুলি বাহ্যতঃ যারা অষ্টাদশ শতকী উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতি অধ্যায়ের মূল কার্যক্রম-নির্দেশক শীর্ষলিপির কথা স্মরণ করায়, এবং বোধ হয়,—এখানে নাট্যকলা বিষয়ে ব্রেখতের প্রস্তাবিত ও অনুসৃত পন্থা, 'পার্থক্য-ভোগ' বা 'ফেরফ্রেমদুঙসএফেক্ট'-এর কথা চিন্তনীয়,—স্থানকাল-পাত্রের দূরত্বটি নির্বিবাদে ধরিয়ে দেয়। দৃশ্য-ফলকের আমদানি আরো বিচিত্র : ছড়ার ঢঙে রচিত, ছোট ছোট কবিতায় প্রতি দৃশ্যের শুরুতে ব্রেখত হাল্কাভাবে ব্যক্ত করেন গালিলেও-সংক্রান্ত এমন দু-একটি সত্য যা'তে উচ্চকিত হয়ে কান খাড়া করতে হয় দর্শককে, এবং শুনে তা'র যেমন মজা লাগে, জ্ঞানও তেমন বাড়ে। কবি ও রসিক ব্রেখত দ্রষ্টা-শ্রোতাকে শিল্পের সীমানার মধ্যে ডেকে এনে বিনোদনের পাত্র যেন উজাড় ক'রে দেন। 'বের্লিনের অ'সাঁবল' নামক নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক 'গালিলেও-জীবনী' অভিনয়ের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে রচিত এই দৃশ্য-ফলকগুলিতে ব্রেখতের বাচনিক ঋজুতা ও সংযমের কী চমৎকার সাক্ষ্য :

> মহামানব যা করেন সব কীর্তি নয়,
> খেতেন জবর গালিলেও মহাশয়।
>
> এখন শুনুন ঠাণ্ডা রেখে মাথা
> টেলিস্কোপে সত্য কয় কথা। (দৃশ্য ২)

গালিলেওকে তাঁর যথার্থ লাতিন-চরিত্র দান করার জন্য ব্রেখত যথেষ্ট উদ্যোগী। জ্ঞান-তপস্যায় আটক না রেখে রক্তমাংসের মানুষ ক'রেই গালিলেওকে তাঁর সাধনা ও পদস্খলনের ইতিবৃত্তে লজ্জিত মহামানবরূপে দেখিয়েছেন ব্রেখত। ভোজনবিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরবশ, বিজ্ঞানভিক্ষু তবু ধর্মভীরু, নিশ্চিত তবু ভঙ্গুর ব্রেখতের গালিলেও গালিলাই। পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করে—এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের ব্যত্যয় যদিও তাঁর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছিল, তবু গালিলেও ধর্মীয় প্রজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। চার্চের সঙ্গে আপস করলেন তিনি তাঁর বিশ্ববীক্ষা উল্টে দিয়ে। চার্চের পুনরনুমোদন লাভ করলেন তিনি—ঢাক পিটিয়ে সারা রাজ্যে জানান হ'ল তাঁর 'ভিন্নপন্থা-গ্রহণের' ('ভিদেরুফ') বার্তা। গুরুর এই পরাজয়ের ঘোষণা কানে-যেতেই শিষ্য আন্দ্রেয়া গালিলেওকে ধিক্কার দিয়ে বলল : 'দুর্ভাগা সেই দেশ, যা'তে বীর নেই একটি!' পরাভূত গালিলেওর জবাবে শুধু আত্মগ্লানির পঙ্গু চীৎকার : 'না, দুর্ভাগা সেই দেশ, যা'তে বীরের দরকার নেই!' কিন্তু গালিলেও শান্তি পান না। তিনি আন্দ্রেয়ার কাছে পরে স্বীকার করেন যে, তাঁর পথ ভ্রান্তির পথ ('বাহন দেস ইরতুমস')। যদি বা একবার অবমাননার অসহ্য যন্ত্রণায় হেঁকে ওঠেন গালিলেও যে হাত 'না-থাকার চেয়ে নোংরা হাত ভাল' (বেসের বেফ্লেক্ত আলস লের), তবু পরক্ষণেই তাঁর যুক্তির স্পৃহা অনুতাপের অবসাদে হারিয়ে যায়। ব্রেখতের চরম কৃতিত্ব এই-যে, মহাজ্ঞানী গালিলেওকে, কি চৈতন্যে, কি নরদেহে, অতি-মানবিক ঐশ্বর্য না-দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক স্বরূপটি তিনি উদ্ধার করেছেন। টেলিস্কোপ, গ্রহতারা ও গণিতের জগতে নির্বাসিত না-করে গালিলিওকে ব্রেখত মানুষিক আকাঙ্ক্ষা দিয়ে পার্থিব জগতের বাসিন্দা করেছেন। তাঁর গালিলেও হোরাতিয়ুসের অষ্টম ব্যঙ্গ-কবিতা আবৃত্তি করেন, নাচঘরে গিয়ে আপন কন্যার কাছে কবিতায় কেঁদে বলেন যে, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

* Leben des Galilei: Bertolt Brecht (Heinemann German Texts), 1958.

বোবা মরশুম

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান
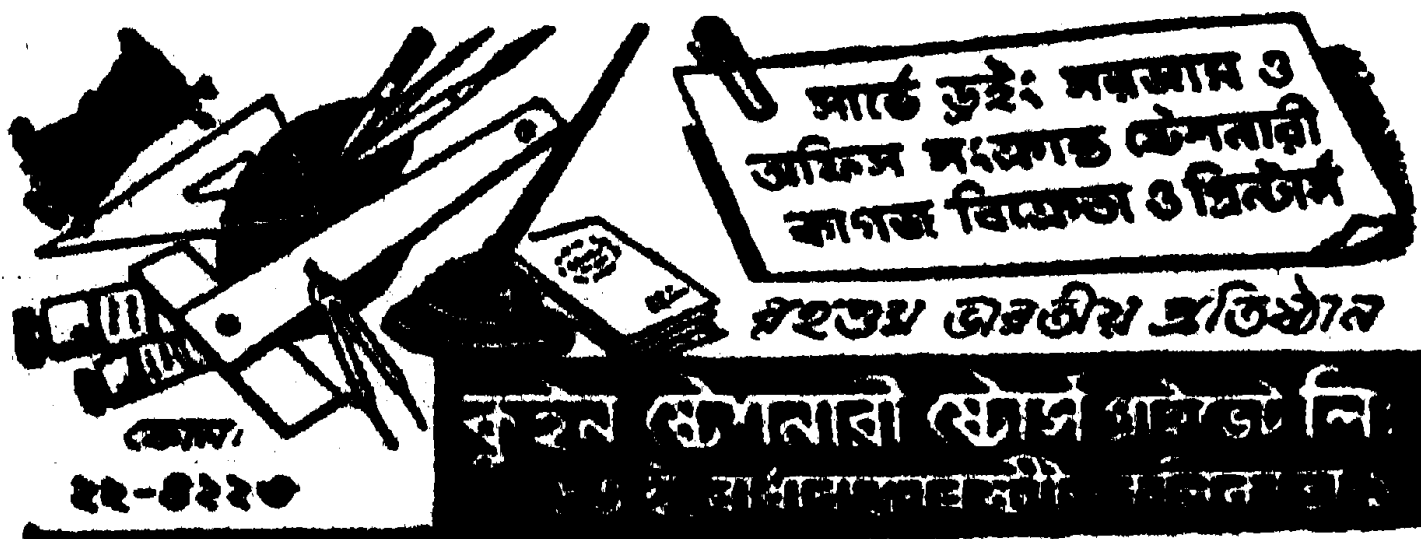
শীত শীত পোষের হাওয়াতেও ঘেমে উঠল শাহানা। শাহানা বেগম। কপালে-ভ্রুতে কুয়াশার মত কুচি জম্‌ছে। পাতলা নীল কাচের টুকরোগুলো চার-দিকে ছড়ান। চোখের দৃষ্টিটা ওদিকে ছড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শাহানা যেন তার অনুভূতি হারিয়ে ফেল্‌ছে। চেতনা অবলুপ্ত হয়ে দেহটা পাথর হয়ে উঠ্‌ছে।

এইমাত্র হাত থেকে পড়ে আহ্‌সানের প্রিয় গ্লাসটা ভেঙে গিয়েছে। ধীরে অতি ধীরে অনুভূতিহীন দেহে যেন আবার চেতনা ফিরে আসছে একটু একটু করে। গাছের পাতার বুক থেকে সকালের সোনা-সূর্য যেমন মাটি ছুঁইছুঁই করে। দুর্বলতার জঞ্জাল মনের কানাচে ফেলে দিতে চায় শাহানা। কি হবে চিন্তা করে। যা' হবার হয়েছে। জল খেতে চাইলে অন্য গ্লাসে নিয়ে সামনে ধরবে, তারপর কিছু বলার আগেই—অপরাধ স্বীকার করবে, লক্ষ্মীটি কিছু মনে ক'রো না—

তোমার সেই বেলজিয়াম-তৈরী পাতলা নীল গ্লাসটা......

লক্ষ্মীটি! অতিকষ্টে হাসল শাহানা। আজ পর্যন্ত অমন কোন কথাই বলতে পারল কী! সোহাগের বিশেষণগুলিতে আহ্‌সানকে সম্বোধন করতে মনটা কতবারই না কি গভীর আবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিরাট-দেহী লোকটা গম্ভীরমুখে কাছে এসে দাঁড়ালেই সব ভুলে যায় শাহানা। কিছু মনে থাকে না। রাত-দিনের পার্থক্য অবলুপ্ত হয়। আলোআঁধার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন সংযতভাবে চিন্তা করে' কথা বলার খেই হারিয়ে ফেলে শাহানা।

তীক্ষ্ণাগ্র কাচের কুচিগুলো সরিয়ে একপাশে রাখতে যাবে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। কান পেতে আর একবার শব্দটা শুনল। আশ্চর্য—দরজায় কড়া নাড়ার শব্দটাও কি নির্মমভাবে সংযত আর গম্ভীর। মনের মাটিতে আর কোন নতুন চিন্তার উঁকি ঝুঁকি নেই। নিজের চিন্তাভাবনা বলে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট রইল না তার। সে এখন অপরের ইংগিতের দাস। নীল কুচি-গুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ে রইল রোয়াকের ওপর, শাহানা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে এল দীর্ঘদেহী লোকটা। দরজাটা বন্ধ করতে যাবে, শাহানা বল্ল—আমি খিল দিয়ে দিচ্ছি,—তুমি......

ঐ পর্যন্তই। শান্তভাবে কপাটদুটো লাগিয়ে খিল তুলে দিল আহ্‌সান। তারপর ধীর সংযত পদবিক্ষেপে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রোয়াকে ছড়ান নীল টুকরোগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে জুতোর শব্দটা আরো মৃদু হয়ে এল, গতি শ্লথ হ'ল, আর পিছনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল শাহানা।

কিছু বলল না আহ্‌সান। একবার ফিরেও তাকাল না। শ্লথ গতিটা আরো কিছু দ্রুত হল। তারপর ঘরের ভিতর গিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে লাগল একমনে। দুরুদুরু বুকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে এসে সুইচ টিপে পাখা খুলে দিল শাহানা। লুংগী তোয়ালে রাখল যথাস্থানে। জামা-কাপড় খুলে মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমের দিকে যাবে, শাহানা বলল—একটু বিশ্রাম করে তারপর মুখ ধুয়ো'খন।

বাথরুম থেকে তখন জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল আহ্‌সান। তারপর আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর

খবরের কাগজের পাতাটা পাখার হাওয়ায় উ'কি দিচ্ছে। আহ্‌সান ওদিকে হাত পাতল। শাহানা তৎক্ষণাৎ কাগজটা এনে দিল হাতে। সিগারেট টানতে টানতে কাগজের মধ্যে ডুবে গেল ও।

দুশ্চিন্তায় শাহানার মনটা একেবারে কানায় কানায় ভরে ওঠে। কি জানি, গ্লাস ভাঙাটা আহ্‌সান কোন্ আলোকে নিল। একটুখানি ইতিউতি করে শেষকালে বলেই ফেলল্ কথাটা। যতখানি হাসার দরকার, তার থেকে অনেক বেশী হেসে বলল—জান, তোমার সেই গ্লাসটা আমি ভেঙে ফেলেছি।

পাখার শব্দটা ঠিক আগের মতই শোনা গেল, আর কিছু না। এই গুমোট দাহন সহ্য করতে পারে না শাহানা। অন্যায় করেছে—চীৎকার করুক আহ্‌সান। তাকে ধমক দিক। কিন্তু একি! উচ্ছলিত ব্যথার একটা প্রথম ঢেউ মনের উপকূলে এসে আছাড় খেল। কিছু বিরতির পর বলল্—ও বাড়ীর সেই মেয়েটাকে আজ দুপুরে ধরে বেঁধে শ্বশুরবাড়ী পাঠালে সবাই। মাগো—যাওয়ার সময় সে কি কান্না আর গালিগালাজ।

কথা বলার সময় শাহানাকে অনেক বেশী খুশীখুশী দেখাল।

তেমনি নীরবতা। কেবল খবরের কাগজটা একটু নড়ে উঠল খশ্‌খশ্ করে। আর সিগারেটে টান দিয়ে একটু কাশল আহ্‌সান। নীলচে ধোঁয়াটা পাখার বাতাসে স-জোরে ঘূরপাক খেয়ে মিলিয়ে গেল কোথায়।

মনের খালি অংশগুলো ব্যথার আমেজে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশায় বুক বাঁধার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। শিরা-উপশিরা ভরা ব্যথার ম্লান বিষণ্ণতাকে আপন মনেই হজম করতে হবে শাহানাকে। ইচ্ছা করেও আর হাসা যায় না এখন। বুকটা ছম্‌ছম্ করে। পাথরের মত ভারী। লোকটা তেমনিই নির্বিকার চিত্তে গম্ভীরমুখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে।

কুণ্ঠাভরা স্বরে শাহানা শুধায়—চা করে আনব?

খবরের কাগজটা নীচু করে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে কেবল ঘড়ির দিকে তাকাল আহ্‌সান। দেওয়াল-ঘড়ির টিক্-টিক্ আর হাওয়ার সমুদ্রে পাখার আলোড়ন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে উঠে পড়ল শাহানা। যেতে যেতে কতকটা নিজের মনেই বল্‌ল—যাই কলতলায় হয়ত বালতিটা বোঝাই হয়ে গেছে এতক্ষণ।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে যাবে, আহ্‌সান ডাকল—শোনো।

একসাগর আশা নিয়ে মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল শাহানা।—আমাকে ডাকছ?

কাগজের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিরুত্ত স্বরে আহ্‌সান বলল্—ড্রয়ারে আইডিন আছে—পায়ে দিয়ে নাও।

এই প্রথম নিজের পায়ের দিকে তাকাল শাহানা। পা-টা অনেকখানি কেটে গেছে। নীল কুচির একটা কখন ছিটকে এসে পড়েছিল।

ছিট্‌কে এসে পড়েছিল পায়ে? না মনে? কাটল পা, না মন?

বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দু' বছর ধরে সেই চিন্তাই করে আসছে শাহানা। তন্বী শাহানা। হাস্যে লাস্যে যে জীবনটাকে কাটাতে চেয়েছিল সুন্দরতর করে। শিক্ষিত, বিত্তবান, রুচিসম্পন্ন স্বামী চেয়েছিল—তা' সে পেয়েছে। অর্থে, শিক্ষায়, পদমর্যাদায় আহ্‌সান অনেকেরই হিংসার পাত্র। তবু জীবনের মুকুলগুলো ফুল হয়ে ফুটল না শাহানার। একটা দারুণ দুঃসহ গুমোটের মধ্যে তার সুকুমার বৃত্তিগুলি যেন ঝলসে গেল। এই তপ্ত গুমোটের মধ্যে মনের অলিন্দ বেয়ে এক ঝলক হিমশীতল দখিনার মত আবিদের স্মৃতি কেঁপে কেঁপে স্থির হয়। দুপুরের ধূসর নিস্তব্ধতায় আবিদ এসে দাঁড়ায়। কানে কানে কথা বলে। হাসায়, হাসে। ছিমছাম একহারা চেহারা। শিক্ষা তার যথেষ্ট কম। অর্থও। তবুও জীবনটা কি অপূর্বই না হতে পারত। অথচ কী হ'য়ে গেল!

দুপুরে ঘুম আসে না। এমনি সাত-পাঁচ চিন্তা করেই কাটে। হঠাৎ দরজায়

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চোখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল শাহানা। সবে দু'টো। তবে? শব্দটা আর একবার কান পেতে শুনল শাহানা, না, এ শব্দে সে গাম্ভীর্য নেই।

দরজা খুলতেই এগিয়ে এল অফিসের বেয়ারা। একটা বড় প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল—সাহেব পাঠিয়ে দিলেন।

—আচ্ছা।

বিদেশী লেবেল আঁটা এক কৌটো স্নো, তিনটে সাবান আর শাড়ী। ফিরোজা রংএর এই ধরনের একটা শাড়ীর কথাই হচ্ছিল কাল। সব দেখেশুনে কান্নাটা যেন আরো চেপে এল শাহানার। টেবিলের ওপর ওগুলো ছড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেমন করে তাকিয়েছিল সেদিন নীল কুঁচিগুলোর দিকে।

আজকাল অফিস থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে আহ্সানের। গাছ-গাছালির ছায়াগুলো লম্বা হ'তে হ'তে যখন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সূর্যের কমলা রং-এর ছোপ খেয়ে বিচিত্রবর্ণ মেঘগুলো যখন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন দরজায় সেই কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। আজও পড়িমরি করে ছুটে গেল শাহানা। এবং দীর্ঘ দু'বছরের জীবন-যাত্রায় যেন একটা নতুন সুর বেজে উঠল।

দরজায় খিল তুলে দিয়ে এই দু'বছরের মধ্যে আজই প্রথম কথা বলল আহ্সান—হাতে কোন কাজ আছে এখন?

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল শাহানা—না—কেন?

কাপড় ছেড়ে খাটের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলল,—বড্ড মাথা ধরেছে।

কপালে হাত দিয়ে আছাড় খেল শাহানা। তারপর ব্যাকুলকণ্ঠে বলল—এত জ্বর নিয়ে কেন অফিসে ছিলে এতক্ষণ?

নিজের হাত দিয়ে শাহানার হাতটা কপালে চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলল—অফিসে যে বড় কাজ শানু।

একেবারে নতুন সুর, নতুন স্বর। সকালের সেই নিরক্ত মানুষের গাম্ভীর্য গলে গিয়ে যেন নতুন রূপ নিয়েছে। প্রথম থেকে এ স্বরের স্পর্শ পেলে মাটির পৃথিবীকে বেহেস্ত করে দিতে পারত শাহানা। একেবারে বিগলিত কণ্ঠে বলল—থাক কাজ। তা' বলে জীবনটা শেষ করে দিতে হবে?

শাহানাকে একেবারে বুকের কাছে এনে বলল আহ্সান—আরো কাছে সরে এসো। উঃ, বড় শীত করছে।—কিছু একটা চাপা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধর। একটু বিরতির পর বলল আবার—বহুদিন কোন অসুখ-বিসুখ হয় না,—কি যে হবে লক্ষ্মীটি।

একেবারে পাগলের মত ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল শাহানা। বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে বলল—কি সব আবোল-তাবোল বকছ। কিছু হবে না—দেখো, তুমি কালই ভাল হয়ে উঠবে।

রাত একটু গভীর হলে নিথর হয়ে গেল আহ্সান। ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামীর বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল কেবল, খাওয়া-দাওয়া সব পড়ে রইল। আবার এসে শুয়ে পড়ল স্বামীর পাশে। একটি-বারের জন্য কেবল দূরে অসীমের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—এত জ্বর, তুমি ভাল করে দাও!

কিন্তু ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ব্যাকুল মনে বলল—না, তুমি ভাল করে দিও না। এক মাস, দু'মাস, আহ্সান অনেকদিন ভুগুক এ জ্বরে।

হঠাৎ পাশ ফিরে শাহানাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘসুরে আহ্সান বলল—'শানু গো—!'

এই দীর্ঘ দু' বছর বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সকল অভিযোগ হঠাৎ যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল শাহানার। একটা পরিপূর্ণ প্রাপ্তির উল্লাসে জীবনের অ-ফোটা মুকুল আবার রং ছড়াতে চাইছে।

ডাঃ সামন্ত বোধহয় ধন্বন্তরী। মাত্র এক সপ্তার মধ্যেই ভাল হয়ে উঠল আহ্সান। আগামীকাল পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

রাতে শুয়ে কি যেন একটা কথা জিগ্যেস করছিল শাহানা। প্রায় ধমক দিয়ে উঠেছিল আহ্সান। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে—আমাকে বকিও না। তারপর আর কোন কথা হয়নি সারারাতে।

সকালে চা দিয়ে শাহানা জিজ্ঞেস করেছিল—কই মাছ আনতে দেবো, না সিঙি?

আহ্সান চায়ে চুমুক দিয়ে কেবল একবার তাকিয়েছিল। আর কিছু না।

চা খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটগুলো নিয়ে যেতে যেতে শাহানা বলেছিল—তাহলে কই মাছ আর কাঁচাকলার ব্যবস্থা করি?

চোখের কোণে কালবৈশাখীর ঘন-ছায়া। গম্ভীরকণ্ঠে আহ্সান উত্তর দিল—সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

সাতদিন সাতরাত যে গাম্ভীর্য দেখা যায়নি, আজ অষ্টম দিনের সোনালী সকালে তার ছায়া পড়েছে ওমুখে।

আতঙ্কের আতঙ্ক

কণাদ চৌধুরী

অল্প-বিস্তর আমরা প্রায় সকলেই আতঙ্কের হাতে খেলনা। কিছু না কিছুর ভয় আমাদের আছেই। ভূতের ভয়কে ত প্রায় গৃহপালিতই বলা যেতে পারে। তবে বিপদসীমা অতিক্রমিত না হলে আমরা অহেতুক আতঙ্ককে বিশেষ আমল দিই না। আতঙ্কের ইংরেজী প্রতিশব্দ "ফোবিয়া"। সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান মনোসমীক্ষক আতঙ্ক সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, একজন সাধারণ লোক ২·২১টি আতঙ্কে মুহ্যমান। মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশী ফোবিয়াকবলিত। প্রতিটি মহিলাই প্রায় ৩·৫৫টি আতঙ্কের আক্রোশে অস্থির। যে ১৭০১টি লোককে উক্ত মনোচিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন তারা মোট ৬,৪৫৬টি ভয়ের কথা স্বীকার করেছেন। তাদের ফোবিয়াগুলি বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের। যথাঃ

Gynephobia
—মহিলাতঙ্ক!

Cynophobia
—কুকুর ভীতি

Ailurophobia
—মার্জার ভীতি

Mysophobia
—সংক্রমণ ভীতি

Tapophobia
—জীবন্ত সমাধির ভয়

Pyrophobia
—অগ্নিভয়

Keraunophobia
—বজ্রাতঙ্ক

Astrapophobia
—বিদ্যুতাতঙ্ক

Klopsophobia
—তস্করাতঙ্ক

Triskaidekaphobia
—১৩ সংখ্যার ভীতি (আনলাকি থার্টিন!)

Gephyrophobia
—সেতু অতিক্রম ভীতি

Nyctophobia
—অন্ধকার ভয়

Claustrophobia
—আবদ্ধ ভীতি

Acrophobia
—উচ্চতা ভীতি

Agoraphobia
—মুক্তাঙ্গন ভীতি

Ophidiorophobia
সর্পাতঙ্ক

Ochlophobia
—জনতা ভীতি

Panophobia
—সর্ব ভূতে ভয়

Androphobia
—মনুষ্য ভীতি
ইত্যাদি।

উল্লিখিত আতঙ্কগুলির মধ্যে 'জনপ্রিয়তায়' শ্রেষ্ঠ হল বজ্র-বিদ্যুৎ, সরীসৃপ, অন্ধকার, উচ্চতা, আগুন, ভূত, জন্তু-জানোয়ার, পোকামাকড় (আরশোলা, টিকটিকি ত আমাদের প্রত্যহের চেনা ভয়!) এবং বন্যা-ঘূর্ণীবাত্যা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ফ্যাশনের মত আতঙ্কও পরিবর্তনশীল। আজকের আতঙ্কে কালকের লোক অকুতোভয়ও হতে পারে। আমেরিকাতে কয়েক বছর আগে জীবন্ত কবরের ভীতি ব্যাপক ছিল। গত শতাব্দীর অনেক বিখ্যাত লোকেরই এই আতঙ্ক ছিল। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন, হারবার্ট স্পেন্সার, বেঞ্জামিন ডিসরেলী প্রত্যেকেই ম্রিয়মাণ ছিলেন এই সমাধির ভীতিতে। ডীন সুইফট ভুগতেন মনুষ্যভীতিতে। 'গ্যালিভার্স ট্রাভেল' তাঁর মনুষ্য বিতৃষ্ণার গরলে তীব্র। ফরাসী প্রতীক কবি (হাল আমলেও যাঁর প্রভাব এতটুকু কমেনি, এমন কি বাঙালী কবিদের মধ্যেও) শার্ল বোদলেয়ার কেবল ভাবতেন তাঁকে বুঝি একা ফেলে রেখে যারা যাবার তারা কখন গেছে চলে। চিত্রাভিনেত্রী নর্মা শিয়ারার, এবং ডাচেস অফ উইন্ডসর ছিলেন আবদ্ধ ভয়ে সন্ত্রস্ত। ডাচেস যখন প্যারিসে ছিলেন গত মহাযুদ্ধে বিমানাক্রমণের সংকেত হবার পর কিছুতেই তাঁকে ভূগর্ভ ঘরে আশ্রয় নিতে রাজী করানো যায়নি।

যে কোনো রকমেই আতঙ্কের উৎসকাল হচ্ছে শৈশব। মার ভয় প্রায়ই সন্তানে সংক্রামিত হয়। অন্ধকারের ভয় "জুজু" বাহিত হয়ে অনেক সময় উত্তর জীবনের আহ্লাদকেও পণ্ড করে দিতে পারে। আটকে-পড়ার ভয়ে যাঁরা সদাই ভীত, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাঁদের অধিকাংশই ছোটবেলায় ঘরে আটক থাকার শাস্তি পেয়েছেন। ভিক্টোরীয় যুগে এই আবদ্ধ ভীতি প্রসারের একমাত্র কারণ ছিল ভিক্টোরীয় জননীরা ছেলে দুষ্টুমী করলে আলমারীতে বন্ধ করে শাস্তি দিতেন।

আতঙ্কের আতঙ্ককে জয় করার উপায় হল এই অহেতুক ভয়ের উৎসের দিকে চোখ ফেরানো। একবার যদি শৈশবের কুয়াশার মধ্যে শায়িত এই ভয়ের ভূতটাকে ধরতে পারেন, ভয় আর ভয়ংকর থাকবে না আপনার কাছে। এ সম্বন্ধে জনৈক মনোসমীক্ষক একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলেছেন। বাইশ বৎসরের জনৈক মহিলার ছোটবেলা থেকেই জল শব্দে নিদারুণ ভীতি ছিল। এমন কি কল থেকে জল পড়ার শব্দেও তিনি আতঙ্কিত হতেন থেকে থেকে। ছোটবেলায় তাঁকে স্নান করানো ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। একবার মহিলাটির বাড়ীতে তাঁর এক মাসী এলেন বেড়াতে। সুদীর্ঘ ১৩ বছর বোনঝির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। মহিলাটির এই আতঙ্কের কথা যখন শুনলেন মাসী, অনেক দিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। যখন বোনঝির বয়েস সাত তখন তিনি, তাঁর বোন আর বোনঝি একবার পিকনিকে যান। মা বোনের কাছে মেয়েকে রেখে একটু সকাল সকাল চলে যান। হঠাৎ মাসীর হাত ছাড়িয়ে সাত বছরের মেয়েটি ছুটোছুটি করতে করতে চোখের আড়ালে চলে যায়। খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল একটা ঝর্ণার ধারের কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই-এর ফাঁকে। এবং তখন তার মাথার ওপরে এসে পড়ছিল ঝর্ণাটার ক্ষীণ এক ধারা। মেয়েটি আতঙ্কে ভীষণ চীৎকার করছিল। বাড়ী ফিরে বোনকে এই দুর্ঘটনার কথা ভয়ে বলেননি মাসী এবং পরেও বলার অবকাশ পাননি তিনি। পরের দিনই তিনি চলে গিয়েছিলেন। এবং এই ঘটনার কিছু দিন পর থেকেই মেয়েটি জলধারাতঙ্কে (জলাতঙ্ক নয়!) ভুগতে থাকে।

মাসীর কাছ থেকে ছোটবেলার ঘটনাটি শোনার পর থেকে মহিলাটি ক্রমশঃ সাহসী হয়ে ওঠেন এবং আতঙ্কটিকে জয় করতে সক্ষম হন।

আতঙ্ক-লজ্জায় ম্রিয়মাণ লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রায় অল্পবিস্তর আতঙ্ক-ভীরু তাহলে লজ্জার ঘাটে আর পা ধুতেন না।

প্রদর্শনী

কলারসিক

একটি একক অন্যটি সমবেত প্রদর্শনী
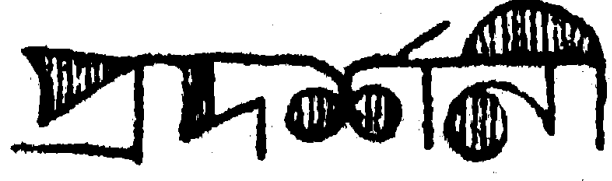
জানুয়ারীর শেষসপ্তাহে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী অভয় খাটাউ এবং পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে পাঁচজন মহিলা শিল্পী দুটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে কলকাতার কলারসিকদের প্রশংসা-ভাজন হয়েছেন। প্রদর্শনী দুটি ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা অবধি সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল।

॥ শিল্পী অভয় খাটাউ-এর চিত্র-প্রদর্শনী ॥

শিল্পী অভয় খাটাউ বোম্বাইয়ের শিল্পী। ১৯৪৬ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বোম্বাই শহরে যখন এই শিল্পীর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তখন অনেক প্রখ্যাত কলা-সমালোচক তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে স্বাগত অভিনন্দনে অভিষিক্ত করেন। তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। সেই তরুণ শিল্পী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন, প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন এবং বিদেশী কলা-সমালোচকেরও অনেক প্রশংসার বাণী কুড়িয়ে আবার ফিরে এসেছেন স্বদেশে। শিল্পী হিসাবে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত। আমরা শ্রীখাটাউ-এর এই নিষ্ঠা ও সততাকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতে পারি।

কলকাতার মানুষে এই সর্বপ্রথম শিল্পী খাটাউ-এর এতগুলি চিত্র-কলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত রচিত প্রায় ৭০টি চিত্রকলা এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। নানা রীতি, নানা মাধ্যমে রচিত হয়েছে চিত্রগুলি। বিষয়বস্তু নির্বাচনেরও কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা গ্রহণ করা হয়নি। যখন শিল্পীর যা ভাল লেগেছে, মন টেনেছে, তখন তাকেই তিনি কখনো প্যাস্টেলে, কখনো জল-রঙে আবার কখনো তেল-রঙের মাধ্যমে কাগজে কিংবা ক্যানভাসের উপর ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। শিল্পী অভয় খাটাউ যেন এক রূপমুগ্ধ মুক্ত শিল্পী। ফলে, তাঁর চিত্র-কলাও কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষা করতে পারেনি। তবে সামগ্রিক বিচারে এই প্রদর্শনী দেখে যে-কোনো দর্শক শিল্পী খাটাউ-এর সজীব শিল্পী-সত্তাকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত কাজের মধ্যে যেমন কিছু সাধারণ-স্তরের কাজ আছে তেমনি কিছু কাজ আছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তবে একটি ব্যাপারে তিনি প্রায় সর্বত্রই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেটি হলো তাঁর ড্রয়িং সম্বন্ধে চেতনা। অনেক চিত্রের সংস্থাপন কিংবা রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি হয়তো ভাল নাও লাগতে পারে কিন্তু তার বলিষ্ঠ রেখার টান চোখ না টেনে পারবে না। যাহোক তাঁর প্রতিকৃতি চিত্র 'কারমেন' (৬), 'কর্মকার' (১৩), 'ক্যাথিওয়াড়ের কৃষক' (১৫), 'গ্রামের আসর' (১৭), বালি, জাপান, স্পেন ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানের নৃত্য, বিশেষ করে মাঁসাই উপজাতিদের বিভিন্ন বলিষ্ঠ-রূপ তাঁর চিত্রের মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে আমরা খুশি হয়েছি।

১৯৪৯ সালের শিল্পী খাটাউ ১৯৬১ সালে যে নতুন শিল্প-জিজ্ঞাসায় উদ্বেলিত তা এই প্রদর্শনী দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। উপেক্ষিতা ছায়াবৃতা আফ্রিকার জন্য তিনি তাঁর শিল্পী-মনের যেটুকু দরদ ঢেলে দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। আশা করি শিল্পী খাটাউ এইভাবে তাঁর শিল্পী-জীবনের ক্রমঃবিকাশমান জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। এই কলকাতায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাঁর নতুন প্রদর্শনী দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।

॥ পঞ্চ মহিলাশিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী ॥

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে আয়োজিত পঞ্চ মহিলাশিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীটি একটু নতুন আস্বাদ পরিবেশন করেছে। কলকাতায় ইদানীং সমবেতভাবে চিত্র-প্রদর্শনী করার রেওয়াজ চালু হয়েছে, তবে তার প্রায় সবগুলিরই উদ্যোক্তা হলেন পুরুষশিল্পী। নারী-শিল্পীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এদিকে এখনো লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হননি। সব দিক দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তাঁরাও আর পিছিয়ে থাকবেন না। এই পঞ্চ মহিলা-শিল্পী সেদিক দিয়ে পথ-প্রদর্শকের কাজ করলেন বোধহয়। পঞ্চ মহিলাশিল্পীর এই প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম। পঞ্চজনের একজন মাত্র বাঙালী মহিলা অন্য চারজনই বিদেশিনী। চারজন বিদেশিনীর সঙ্গে একজন বঙ্গ-ললনার এই সংযোগ নিশ্চয়ই অনেকের কৌতূহলের কারণ হবে।

আমরা সেই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে প্রদর্শনীর চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ মনে করছি। বস্তুতঃ, শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য, তাঁদের জাত-গোত্র নির্ণয়ের প্রশ্ন অবান্তর।

পঞ্চ মহিলার এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী মীনাক্ষী গুপ্তার ১৪ খানি, জাঁ য়োংগেনীলের ১০ খানি, গুলু ম্যাকঘির ১৯ খানি, লোলী পারেখের ১৭ খানি ও হেট্টি রোগের ২৪ খানি চিত্রকলার নিদর্শন স্থান পেয়েছে। সর্বমোট এই ৮৪ খানি চিত্রের মধ্যে দু'খানি বাদে আর সবই রচিত হয়েছে তৈল-রঙের মাধ্যমে। আলোচ্য শিল্পীদের কাজ এখনও পরিণতির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেও এই পাঁচজনই একটি বিষয়ে খুবই সাফল্য অর্জন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এঁরা প্রত্যেকেই ফুলের স্থিরচিত্র রচনায় চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ফুলের এমন নিখুঁত জীবন্ত স্টাডি সম্প্রতি-কালের খুব কম প্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করা গেছে। ফুলের স্টাডির মধ্যে ৭, ২২, ৩৩, ৪০, ৪১, ৭৯ নং চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে সকলের ভাল লাগবে। আর, এই ব্যাপারে শ্রীমতী গুলু ম্যাকঘি সবচেয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

নিসর্গ চিত্র রচনাতেও শ্রীমতী মীনাক্ষী গুপ্তার 'সুইস লেক' (২), জাঁ য়োংগেলীনের 'দি বিডো' (২৪), গুলু ম্যাকঘির 'ব্রিজ' (৩৬), দার্জিলিং (৩৭), হেট্টি রোগারের 'হেমন্ত' (৬৬), 'প্রতিবিম্ব' (৬৯), 'দি ব্রুক' (৭৭) যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এর মধ্যে শেষোক্ত দুইজন শিল্পীর কাজ সবচেয়ে ভাল হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে 'দি রিভার' (৪), 'দি ডকস' (১৯), 'স্টীম লাইফ উইথ ফিশ' (২৯), 'স্পেনিশ মুরাল' (৫৬), 'দি পিপার্স' (৬২), 'ড্রিফট উড' (৭৫) প্রভৃতি চিত্রগুলিও অনেকের ভাল লাগবে।

পঞ্চ মহিলাশিল্পীরা যদি অবসর-বিনোদনরূপে শিল্পের এই জগৎকে গ্রহণ না করে থাকেন এবং যদি প্রকৃত শিল্প-নিষ্ঠা ও সততার ভবিষ্যতে এদিকে অগ্রসর হন, তবে তাঁরা তার পুরস্কার পাবেন বলে আমরা আশা পোষণ করি। আমরা এই পঞ্চ মহিলাশিল্পীর উদ্দেশ্যে আজ তাই অভিনন্দন জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

॥ সিংহলে সামরিক ষড়যন্ত্র ॥

গত ২৭শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রে সিংহলের মহিলা প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে' সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা সরকারী তৎপরতায় অংকুরেই বিনষ্ট হয়েছে। যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁদেরও প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছেন।

কিন্তু সিংহলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন মোটেই শান্ত বা নিরাপদ নয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে জোরালো বিরোধ ত আছেই সেখানে, তার সংগে যুক্ত হয়েছে ভাষা-বিরোধ, ধর্ম-বিরোধ, সিংহলী-ভারতীয় বিরোধ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সংকট। সিংহলের জাতীয় সম্পদ বলতে আছে শুধু কফি, রবার ও নারকেল। কিন্তু তিনটি পণ্যেরই আন্তর্জাতিক বাজার এখন ভাল নয় বলে সিংহলের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে সিংহলের বন্দর-শ্রমিকদের ধর্মঘট চলেছে, তার সংগে যুক্ত হয়েছে বাগিচা, শ্রমিকদের ধর্মঘট, ব্যাংক ধর্মঘট ইত্যাদি বহুতর শ্রমিক অসন্তোষ। গত ৫ই জানুয়ারী শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়ে একটি সাধারণ ধর্মঘটেরও আহ্বান জানানো হয়েছিল, যদিও তা সফল হয়নি। সুতরাং সামরিক অভ্যুত্থান জাতীয় বেপরোয়া ঘটনাবলীর উপযুক্ত পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছে সারা সিংহলে। এ অবস্থায় আপাতত ক্ষমতালুব্ধদের অভ্যুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হলেও তার সমূহ সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। যতদিন সিংহলের অর্থনৈতিক সংকটের প্রকৃত সমাধান না হচ্ছে ততদিন ষড়যন্ত্র ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকা অপরিবর্তিতই থাকবে। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভা যে কৃতিত্ব ও তৎপরতা দেখিয়েছেন জাতীয় সমস্যাগুলিরও তাঁরা সেইভাবে সমাধান করুন, সিংহলের শুভার্থীমাত্রেরই আজ এই কামনা।

॥ নেপালে অভ্যুত্থান ॥

স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে নেপালের প্রজাপুঞ্জের অভ্যুত্থান ক্রমেই শক্তিশালী ও দুর্নিবার হয়ে উঠছে। শাসকপক্ষ থেকে গোড়ার দিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভগুলিকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই তা সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ করাতে সরকারী পীড়নযন্ত্রও উত্তরোত্তর সক্রিয় ও নির্মম হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ অবশ্য তাতে থামেনি। সম্প্রতি রাজা মহেন্দ্রের বক্তৃতার উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি বক্তৃতা-মঞ্চ বিক্ষুব্ধ দেশকর্মীদের বোমার আঘাতে ভূমিসাৎ হয়েছে। তার পরদিন স্বয়ং রাজা মহেন্দ্রকেই লক্ষ্য করে বোমা-বর্ষণ করে' তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। নেপালের অধিকাংশ নেতা আজ কারাগারে বন্দী, অল্প কয়েকজন গ্রেপ্তারী এড়িয়ে পালিয়ে এসেছেন প্রতিবেশী রাজ্য ভারতে। অপর প্রতিবেশী রাজ্য কমিউনিস্ট চীন আজ রাজতন্ত্রী নেপালের বিশেষ বন্ধু, সেকারণে সেখানে আশ্রয়প্রার্থী নেতাদের যাওয়া সম্ভব ছিল না। গণসমর্থনহীন নেপালের বর্তমান শাসকবর্গের সব আক্রোশ এখন তাই ভারতের ওপর ফেটে পড়েছে। নেপালের বর্তমান বিক্ষোভগুলির পরিচালক কয়েকজন পলাতক 'দেশদ্রোহী'কে ভারত আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করেছে এই হল ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ। নেপালে অবস্থিত ভারতের কয়েকটি বাণিজ্য ও রাষ্ট্র দূতাবাসেও বিক্ষোভ দেখিয়ে নেপালের পক্ষ থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী নেতৃবৃন্দের প্রত্যর্পণ দাবী করা হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কয়েকবার নেপালের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে কিন্তু নেপাল সরকার তাতে কর্ণপাত করেননি।
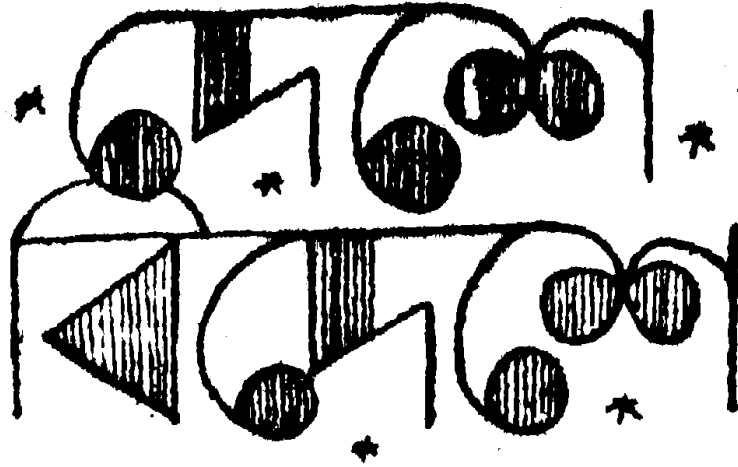
তবে নেপাল সরকারের বক্তব্য যাই হোক না কেন, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আজ নেপালকে একথা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাজনৈতিক অপরাধীকে আশ্রয় দিতে ভারত সরকার বাধ্য। নেপালের অনুরূপভাবে রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগী কোন ব্যক্তির প্রত্যর্পণের দাবী জানানোর অধিকার নেই। তাছাড়া প্রতিবেশী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলেছে সেটাও ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

॥ সুরাবর্দী গ্রেপ্তার ॥

ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পাক সরকার পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করেছেন। তিরিশে জানুয়ারী সকাল পাঁচটায় পুলিশ তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে এবং বেলা সাড়ে সাতটায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে' অজ্ঞাত স্থানে চালান দেওয়া হয়। সুরাবর্দীর অন্তরঙ্গ মহলের সংবাদে প্রকাশ, তাঁকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে এক বছরের জন্যে আটক রাখা হবে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, জনাব সুরাবর্দী যে আইনে বন্দী হয়েছেন, সে আইন তাঁরই মন্ত্রিত্বকালে দুই-বার সংশোধিত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়েছে—"দুঃখের বিষয়, তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের মত দেশসেবায় লিপ্ত না হইয়া ধ্বংসমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।... এমতাবস্থায় সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ সুরাবর্দীকে আটকের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

তাঁর গ্রেপ্তারের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি, সুতরাং এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবে সত্যিই দুঃখ হয় এইসব অতি-বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্যে। আজ যদি ভারত অবিভক্ত থাকত তবে জনাব সুরাবর্দী, খুরো, ফিরোজ খাঁ নুন প্রমুখ ব্যক্তিরা শুধু নিজ নিজ প্রদেশের অবিসংবাদিত শাসকই হতেন না, দশ কোটি মুশ্লিমের নেতারূপে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও তাঁদের প্রভাব হত অপ্রতিহত। কিন্তু আরও বেশী চাইতে গিয়ে আজ এক উদ্ধত সৈনিকের চাবুকের নীচে সার্কাসের বাঘের মত তাঁদের নিতান্ত নিরুপায়ের মত ওঠ-বস করতে হচ্ছে। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ পাকিস্থানের স্রষ্টাদের, তাতে মনে হয়, কায়েদে আজম জিন্না বা জনাব লিয়াকৎ আলী বোধ হয় মরে বেঁচেছেন।

॥ অবলুপ্ত ॥

সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনক্রমে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র মলোটোভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ ও মালেনকোভের নাম মুছে ফেলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনক্রমেই একদিন রাশিয়ার এই চারজন হৃতগৌরব নেতার নামে ৮৪টি শহর, গ্রাম, রাস্তা, খামার, কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল। আজ আবার সেই সুপ্রীম সোভিয়েটেই তাঁদের নাম মুছে ফেলার প্রস্তাব অনুমোদন করল, এবং বলা বাহুল্য, সুপ্রীম সোভিয়েটের পরস্পর-বিরোধী এই দুটি সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমেই। ঐ চারজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল যে তাঁরা পার্টি-বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রাক্তন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটোভের নামে মোট ৩৫টি শহর, গ্রাম, খামার, কারখানা প্রভৃতির নামকরণ করা হয়েছিল। আর গত ৩০শে জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রজীবনে মলোটোভের আর কোন অস্তিত্ব

নেই। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। তিনি যে কোথায় আছেন এখন তাও কেউ জানে না। গত মাসে মঃ ষ্টালিনকেও ঠিক এমনি ভাবেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে সমগ্র রাশিয়া থেকে।

॥ আফ্রিকার শীর্ষ সম্মেলন ॥

নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে আফ্রিকার কুড়িটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। 'কাসাব্লাঙ্কা জোট' নামে পরিচিত আফ্রিকার পাঁচটি রাষ্ট্র ঘানা, গিনি, মালি, মরক্কো ও মিশর এই সম্মেলনে যোগ দেয়নি, কারণ তাদের দাবী মত আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারকে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানাননি। বলা বাহুল্য, আফ্রিকার এই কুড়িটি রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে পশ্চিমী জোটের সমর্থক বলেই তারা আজাদ আলজিরিয়া সরকারকে সম্মেলনে ডেকে ফ্রান্সকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বৃহৎ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র গঠন অসম্ভব ধরে নিয়েই আলোচনা শুরু করেছিলেন এবং নিজেদের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কঙ্গো সমস্যাকে স্বস্তি পরিষদে উত্থাপনের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সম্মেলনে তার নিন্দা করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যথেষ্ট দক্ষতার সংগে আভ্যন্তরীণ সংকট ও সমস্যাগুলির সমাধান করছেন। এ অবস্থায় কঙ্গো প্রসঙ্গ আবার স্বস্তি পরিষদে উত্থাপিত হ'লে কঙ্গোর সমূহ ক্ষতি হবে।

অপর এক প্রস্তাবে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এঙ্গোলায় পর্তুগীজদের বর্বর নির্যাতন ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বর্ণ-বিদ্বেষী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঐ দুটি রাষ্ট্রকেই অর্থনীতিক একঘরে করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

॥ নিষ্ফল বৈঠক ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জারাপকিন গত ২৯শে জানুয়ারী সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, সম্মেলন সফল হওয়ার আপাতত আর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তিনি মস্কো ফিরে যাচ্ছেন। এপর্যন্ত ৩৫টি বৈঠক হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের পক্ষ থেকে একটা যুগ্ম বিবৃতি প্রচার করাও সম্ভব হয়নি।

দু'পক্ষই যখন নতুন করে আবার বেপরোয়াভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করেছেন তখন পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা সত্যই অর্থহীন, সুতরাং অসম্ভবের পেছনে অর্থহীনভাবে ছুটে অকারণে সময় অপচয় না করে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজই করেছেন। কিন্তু এই ধরনের একটা সম্মেলনে বসে পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা যে বিশেষ জরুরী ছিল তাই বা ভোলা যায় কি করে?

॥ কিউবার বিদায় ॥

আমেরিকা মহাদেশের একুশটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জেদই বজায় রইল। 'অর্গানিজেশন অফ দি আমেরিকান ষ্টেটস' নামক আন্তঃ আমেরিকা রাষ্ট্র-সংস্থায় কিউবা এতদিন পর্যন্ত অন্যতম সদস্য ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবীর কাছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করাতে কিউবাকে সে সদস্যপদ ত্যাগ করতে হ'ল। কিউবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র, অতএব আমেরিকার কোন রাষ্ট্রসংস্থায় তার থাকার অধিকার নেই—এই অর্থহীন যুক্তি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বহিষ্কার দাবী করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে পাঁচদিন ধরে আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে ১৪টি ভোট সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় স্বয়ং কিউবা, এবং ছয়টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। বলা বাহুল্য, কিউবার এতে কোন ক্ষতি হবে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংগে যেদিন তার বিরোধ শুরু হয়েছে, আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগেও কার্যত সেই দিন থেকেই তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এমন নেতৃত্ব আজ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রেই নেই। আন্তঃমার্কিন সংস্থার ওপর চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আজ যা করল তার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাকেই হতে হবে সবচেয়ে বেশী। সারা আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে আজ এইটাই আরও একবার যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করল যে, তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নামমাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা বা স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করার স্বাধীনতা তাদের নেই। সুতরাং এর পরে যদি ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে ওঠে তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

॥ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥

সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ কয়েকদিন আগেই পরলোক গমণ করেছেন। "চরকাশেম" খ্যাত এই কথাশিল্পীর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ; অধুনা পূর্ব পাকিস্থান। সাহিত্যিক খ্যাতি তিনি লাভ করেন এই উপন্যাসখানি রচনার পর। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে চরকাশেম, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, একটি সংগীতের জন্মকাহিনী, দক্ষিণের বিল, পদ্মাদিঘীর বেদেনী উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী ও অমায়িক ব্যবহারের জন্যে সকলেরই প্রিয়ত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা তাঁর আত্মীয়বর্গের সংগে প্রিয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছি।

ঘটনা-প্রবাহ
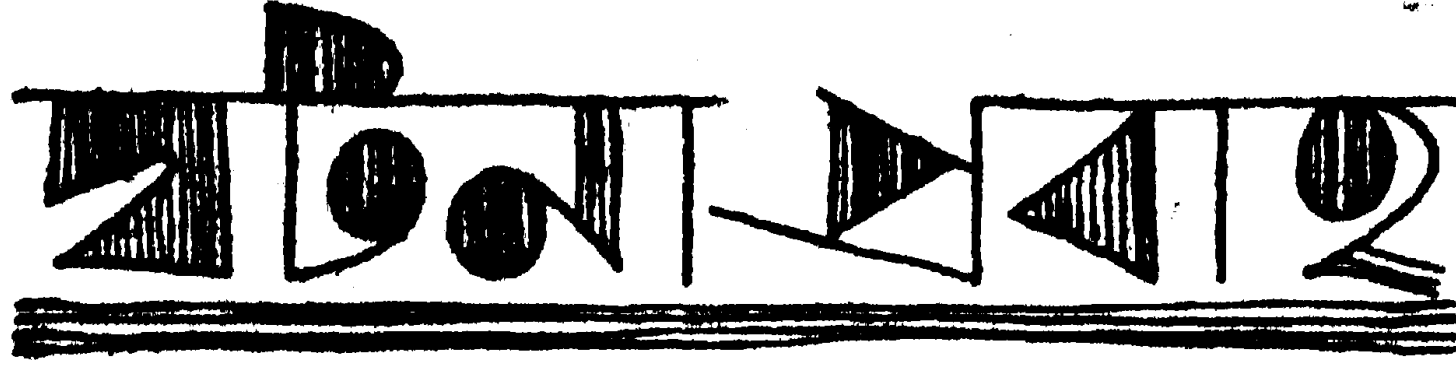
॥ ঘরে ॥

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ : শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পদ্ম-বিভূষণ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ—সাধারণতন্ত্র দিবসে বড়ে গোলাম আলি খান, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পদ্মভূষণে সম্মানিত—সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৫ জনের পদ্মশ্রী সম্মান লাভ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম 'ভারতরত্ন' বলিয়া ঘোষণা।

দেশবাসীকে সম্প্রদায় ও জাতিগত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান—ভারতের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ।

কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ আবদুল্লাসহ ২৪ জন আসামী দায়রায় সোপর্দ।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ : ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত—নয়াদিল্লীর কুচ-কাওয়াজে উপরাষ্ট্রপতির অভিবাদন গ্রহণ—সদ্যমুক্ত গোয়ায় সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান—কলিকাতার ময়দানে কুচ-কাওয়াজ ও বিরাট জনসভা।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ : গোয়া অভিযানকালে ধৃত পর্তুগীজ বন্দীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন—পর্তুগাল সরকারের নিকট ভারত সরকারের নূতন লিপি প্রেরণ।

অষ্টগ্রহ সম্মেলনের (৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, '৬২) ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে আলোড়ন সৃষ্টি—দেশের নানা স্থানে সমারোহসহকারে শান্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সংবাদ।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ : যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মোৎসবের উদ্বোধন—কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বর অনুষ্ঠান—স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও প্রদর্শনী।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণের (প্রতিশ্রুতি অনু-যায়ী) দাবী—অন্যথা ডাঃ রায়ের (মুখ্য-মন্ত্রী) নির্বাচন-কেন্দ্রে (চৌরঙ্গী) বিরুদ্ধে প্রচার কার্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ : 'কাশ্মীরের ব্যাপারে কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চলিবে না'—প্রেসিডেণ্ট কেনেডির (মার্কিন) নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পত্র—বিরোধ মীমাংসার সালিশের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

'চীন ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ভঙ্গের কাজ করিয়াছে'—কানপুরে সাংবাদিক বৈঠকে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এস এ ডাঙ্গের স্বীকৃতি।

গোয়ায় বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অবসান দাবী—দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সারা গোয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে (পাঞ্জিম) প্রস্তাব গৃহীত।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ : স্বাধীনতা যজ্ঞের শহীদদের স্মরণে সমগ্র দেশে দুই মিনিট (বেলা ১১টায়) নীরবতা পালন—গান্ধীজীর তিরোধান দিবসে কলিকাতা ও দিল্লীসহ ভারতের সর্বত্র শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠান।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১১ হাজার কর্মীর দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি—অতিরিক্ত মাগ্গী ভাতা নামঞ্জুরের প্রতিবাদ।

৩১শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ : 'পাক দাবী অনুযায়ী স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনায় অবস্থার প্রতিকার হইবে না'—জম্মুর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ : ইন্দোনেশীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক সাধারণ সমাবেশ বিল অনুমোদিত—১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিককে লইয়া বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ : কাঠমণ্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ—ভারতস্থিত নেপালী রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মসমর্পণ দাবী।

নেপালী সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ—গ্যাংটকে সাংবাদিক বৈঠকে সিকিমের মহারাজকুমারের ঘোষণা।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ : মলোটভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ ও ম্যালেনকভ—এই চারজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতার নাম সমগ্র রাশিয়া হইতে বিলুপ্ত—সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্দেশে অভাবনীয় কার্য-ব্যবস্থা।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ : সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরাট ষড়যন্ত্র বানচাল—সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার গ্রেপ্তার।

স্বস্তি পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) কঙ্গো প্রসঙ্গ উত্থাপনে সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্যম—কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিরিল আদুলা কর্তৃক তীব্র প্রতিবাদ।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ : জেনেভা ত্রিশক্তি আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বৈঠক ব্যর্থ—ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সহিত সোভিয়েট পক্ষের মত-বিরোধ।

কাশ্মীর প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদের বৈঠকের জন্য পাকিস্থানের অব্যাহত পীড়াপীড়ি—পরিষদ সভাপতি স্যার প্যাট্রিক ডিনের নিকট স্যার জাফরুল্লার (পাক প্রতিনিধি) দ্বিতীয় দফা পত্র—পাক দাবীতে ভারতের পুনরায় আপত্তি।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ : রাশিয়ার দাবী অনুযায়ী কঙ্গো প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য স্বস্তি পরিষদের বৈঠক সুরু।

পাক নিরাপত্তা আইনে পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী করাচীতে গ্রেপ্তার—দেশদ্রোহ ধরণের কার্যকলাপের অভিযোগ।

আন্তঃ আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা হইতে কিউবা (কাস্ট্রোর নেতৃত্বাধীন) বহিষ্কৃত।

অ্যাঙ্গোলায় দ্রুত শাসন সংস্কার প্রবর্তনকল্পে পর্তুগালের প্রতি আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত।

৩১শে জানুয়ারী—১৭ই মাঘ : সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে পাকিস্থানের শত্রু-দের সহিত সহযোগিতার অভিযোগ—ঢাকায় পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা, তুষারপাত ও হিম-প্রবাহে ইউরোপে ব্যাপক ধ্বংসলীলা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবল হিমপ্রবাহ ও বহু লোকের মৃত্যু।

স্বস্তি পরিষদে পাক দাবী অনু-সারে কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে বিতর্ক সুরু।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
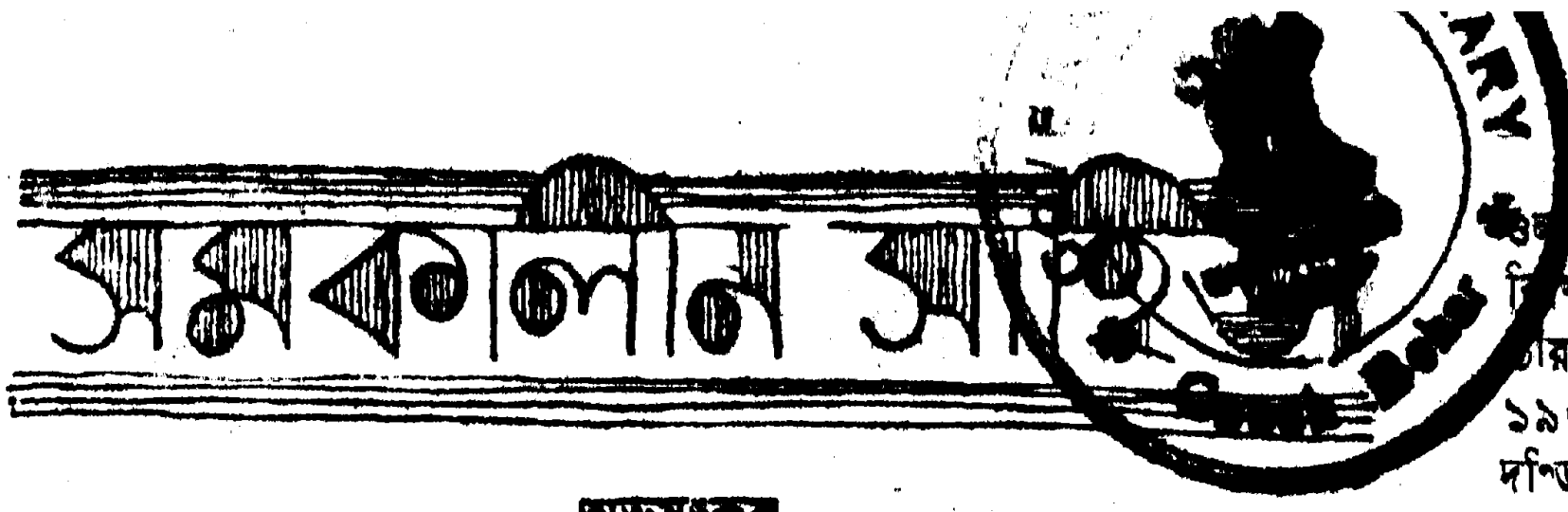
॥ পাস্তেরনাকের পুনর্বাসন ॥

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গতঃ বোরিস পাস্তেরনাকের "ডঃ জিভাগো" উপন্যাসের খ্যাতি এবং তাঁর জীবনের নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা আজ সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীর মতো বোরিস পাস্তেরনাকেরও "মরিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তিনি মরেন নাই"। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ও তজ্জনিত প্রাপ্ত শীতল শাস্তি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। সেই পাস্তেরনাকের এখন পুনর্বাসনের চেষ্টা চলেছে তাঁরই স্বদেশে। এই সংবাদ অবশ্য শুভ। কিন্তু সেই সূত্রে বোরিস পাস্তেরনাকের বান্ধবী এবং "ডঃ জিভাগোর" বিখ্যাত নায়িকা লারিসা গুলেসার চরিত্রের যিনি আদর্শ, সেই মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার যে শাস্তি হয়েছে তা রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। তাঁর উনিশ বছরের মেয়েটিও দণ্ডিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পি-ই-এন সংস্থার ইংরাজী শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডেভিড কারভার মাদাম আইভিনস্কয়ার এই শাস্তি সম্পর্কে সোভিয়েট লেখক সংঘের সেক্রেটারি মিঃ আলেক্সী সুরকোভকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তর সুরকোভ ইংরাজীতেই দিয়েছেন, তার কিয়দংশ উধৃত করছি :

"Who is Ivinskaya? Ivinskaya is a forty eight year old woman, who since 1946, was known as the private secretary of Pasternak and the last mistress of this elderly man who lived until his very last day with his family. In literary circles Ivinskaya was known as an unscrupulus adventuress who advertised her intimacy with Pasternak. Despite her advanced age she did not stop to have many parallel and frequent intimate relations with other men".

মিঃ ডেভিড কারভার আন্তর্জাতিক পি-ই-এনের ইংরাজী শাখার তরফ থেকে এবং "সোসাইটি অব অথরসে"র তরফ থেকে মিঃ সুরকোভকে চিঠি লিখেছিলেন, তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন—মার্জনা-প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়ে। পরে এই বিচারের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রার্থনা করেছিলেন। (মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার আট বছরের কারাদণ্ড হয়েছে মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ এবং জালিয়াতির জন্য রীতিমত বিচারের পর।) সোসাইটি অব অথরস এবং পি-ই-এনের এই প্রচেষ্টা সুরকোভ একরকম উপেক্ষা করে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিলেন। পি-ই-এন কিন্তু সুরকোভের উত্তর মেনে নেননি। সুরকোভের যে-চিঠিখানি পি-ই-এন আজ সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন সেটি অনেক বিলম্বিত জবাব। লিখিত হয়েছে ৩রা এপ্রিল ১৯৬১-তে মিঃ কারভারের তৃতীয় অনুরোধ সম্বলিত ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬১-র চিঠির জবাবে। মিঃ কারভার শেষপর্যন্ত বিচারের একটি বিবরণ, কিংবা মস্কোস্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিচারের রিপোর্টের কপি প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ সুরকোভ বলেছিলেন এ একটা মামুলী ধরনের বিচারমাত্র। তথাপি এর বিবরণ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। বিচারের বিবরণও মিঃ কারভার পাননি।

পাস্তেরনাকের বন্ধুরা অবশ্য মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার এই কারাদণ্ডে বিস্মিত হননি। আইভিনস্কয়া এবং তাঁর উনিশ বছরের মেয়ে আইরিনাকে ১৯৬০-এর শেষের দিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জননীর আট বছর এবং কন্যার তিন বছর কারাদণ্ড। পাস্তেরনাক নাকি ওদের সতর্ক করে বলেছিলেন এমনটি ঘটতে পারে। তাঁর জীবদ্দশায় এমনটা হতে পারে এই সংশয়ও তাঁর মনে ছিল। পাস্তেরনাকের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েট সরকার তাঁকে স্পর্শ না করলেও ওলগাকে শাস্তি দিয়ে তার মারফত ওর প্রতি আঘাত হানবেন। জুলাই ১৯৬০-এ পাস্তেরনাকের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কিছুই অবশ্য হয়নি। তারপর শুরু হল এই বিচার।

আইভিনস্কয়ার এই দণ্ডের কথা যখন ১৯৬০-এর শেষাশেষি পশ্চিমাঞ্চলে পৌছায় তখন পাছে ওলগার শাস্তির পরিমাণ বেড়ে যায় তাই তার সাহায্যের জন্য প্রকাশ্যে কোনও চেষ্টা না হলেও গোপনে কিছু কিছু তদ্বির তদারক করা হয়। তারপর যখন সমগ্র ঘটনা প্রকাশিত হয় তখনই মিঃ কারভার পি-ই-এন এবং 'সোসাইটি অব অথরসে'র তরফ থেকে সাহায্যের যে

নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেন তার ফলেই আজ সমগ্র ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে। সুরকোভ মিঃ কারভারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার সম্পর্কে চরিত্র-বিধ্বংসী এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন যে—

"It is very unpleasant to write all this about a woman, but those who take her under their protection must know what sort of a person Ivinskaya is."

পি-ই-এন কিন্তু মাদাম আইভিনস্কয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এতটুকু অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না। তাঁর অপরাধ এবং তার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সুরকোভ যদিচ বলেছেন যে তিনি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ বিচারকাহিনী স্বয়ং পাঠ করেছেন, তথাপি সেই বিষয়ে কোনো তথ্যই তিনি তাঁর এই পত্রে পরিবেশন করেননি।

মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়া নাকি নিয়মিতভাবে 'ডঃ জিভাগো'-র বিদেশী সংস্করণ বাবদ পাস্তেরনাকের প্রাপ্য রয়্যালটি আত্মসাৎ করেছেন। এই অর্থ বে-আইনীভাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় আনা হত সিনর দা' এঞ্জেলো নামক জনৈক ব্যক্তি মারফত। সেই সমস্ত অর্থ ওলগা ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যয় করতেন। এই লেন-দেন সম্পর্কে পাস্তেরনাক ও তাঁর পরিবার কিছুই জানতেন না। সুরকোভ বলেছেন—এই জালিয়াতির প্রমাণ হিসাবে জানা গেছে যে প্রথম দফায় পাস্তেরনাকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ওলগা মোটা টাকা পেয়েছেন, এবং পাস্তেরনাকের স্ত্রী এবং পরিজনবর্গ তাঁকে বলেছেন যে পাস্তেরনাক কখনই এই অর্থ নিতেন না। তিনি তাঁর ন্যায়সংগত সোভিয়েট উপার্জনেই দিন কাটিয়েছেন। এই উপার্জনের পরিমাণ সুরকোভের মতে পাস্তেরনাকের জীবনের শেষ আড়াই বছরে প্রায় ৪১৬,০০০ রুবলের মত।

পি-ই-এন মিঃ সুরকোভের এই-সব উক্তিতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করে মাদাম ওলগার প্রতি মার্জনা-ভিক্ষার জন্য বিচারের একটা প্রকৃত বিবরণ প্রার্থনা করেছিলেন। তাই মিঃ কারভার আবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে লিখলেন :-

"মাদাম আইভিনস্কয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র পাস্তেরনাকের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে যাই থাকুক না কেন, কবির জীবনে যে বিগত চোদ্দ বছরকাল ধরে তিনি এককভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে গেছেন, এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে যাই কিছু প্রমাণিত হোক বিচারের ধারা তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হবে না আশা করা যায়।

আপনার চিঠিতে মাদাম ওলগার কন্যা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তার দণ্ডের সংবাদ পশ্চিম জগতের মানুষকে বিশেষভাবে আহত করেছে। আমি এই আশা করি যে আপনি আপনার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মাদাম আইভিনস্কয়া কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তিলাভ করবেন। আশা করি আপনার চিঠিতে যে সব কথা উল্লেখ করেছেন তজ্জন্য তাঁর মুক্তির পথ রোধ হবে না।"

মার্চ ১৯৬১-তে যখন সুরকোভ ইংলণ্ডে এসেছিলেন তখন পাস্তেরনাকের জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংগে এইসব কথা হয়। সেইকালে তাঁর সংগে ছিলেন ক্রুশ্চেভ জামাতা "প্রাভদা" সম্পাদক মিঃ এডজুবেই। 'প্রাভদা' সম্পাদকের কাছে কিছু প্রামাণিক তথ্যাদিও ছিল। পি-ই-এনের কর্তৃপক্ষদের মতে তার মূল্য অতি তুচ্ছ। আর ছিল একটি স্বীকৃতির ফটোস্টাট কপি,—স্বীকৃতির তলায় মাদামের স্বাক্ষর ছিল। তাঁর এই স্বীকৃতির সংগে অন্য অসংখ্য স্বীকৃতির কোনো প্রভেদ নেই।

এডজুবেই এবং সুরকোভ যখন দেখলেন যে তাঁদের দলিল দস্তাবেজের প্রতি কেউ তেমন গুরুত্বদান করছেন না, তখন তাঁরা মাদাম ওলগার যৌন-জীবন সম্পর্কিত কুৎসা প্রচার শুরু করলেন। যা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

সুরকোভ সেইসঙ্গে ইংলণ্ডে বলেন যে সোভিয়েট সরকার পাস্তেরনাকের প্রাপ্য অর্থাদির আইনসংগত হস্তান্তরের জন্য সহায়তা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাস্তেরনাক সেই ব্যবস্থায় সম্মতিদান করেননি। এই কথার অর্থ এই যে তিনি এই অর্থ স্পর্শ করতেও চাননি। আইভিনস্কয়া পাস্তেরনাকের ইতালীয় প্রকাশককেও প্রতারণা করেছেন।

পি-ই-এনের মতে, পাস্তেরনাকের বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখিত পত্রাদি এই কথার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দান করে। পাস্তেরনাক-ই আইভিনস্কয়ার সংগে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে সংবাদ প্রচার করেছেন, আইভিনস্কয়া নয়। বিশেষতঃ ১৯৪৬-এ আইভিনস্কয়ার প্রথমবার রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের পর পাস্তেরনাকই তাঁর এই বান্ধবীর সংগে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা প্রচার করেন। দুর্দিনের দুঃসহ মুহূর্তে আইভিনস্কয়াই পাস্তেরনাককে নিজের বিপদ তুচ্ছ করেও অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতামূলক সকল প্রকার অভিযোগের বিরুদ্ধে আইভিনস্কয়া সেদিন বর্মের মত ব্যবহৃত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষদের সংগে পাস্তেরনাকের পক্ষ থেকে পত্রাদি লিখতেন আইভিনস্কয়া, তাদের রোষবহ্নিতে শান্তির জল সিঞ্চন করতেন, এবং অন্তিমকাল পর্যন্ত পাস্তেরনাকের সংগে তিনি পত্রালাপ করেছেন। সুতরাং সুরকোভের ইংগিত যে পাস্তেরনাক কপর্দকহীন ছিলেন না একথা ঠিক নয়, সিনর দা' এঞ্জেলোর সাহায্যে তাঁকে অর্থসংগ্রহ করতে হয়েছে, অন্য কোনো পন্থা না থাকায়।

৬ই মে তারিখের Sunday Telegraph নামক পত্রিকায় সিনর দা'এঞ্জেলোর এক বৃহৎ খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সোভিয়েট নিরাপত্তা বিভাগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই অর্থাদি হস্তান্তরিত হত। পাস্তেরনাকের মৃত্যুর পর মাদাম আইভিনস্কয়া এবং তাঁর কন্যাকে বিলুপ্ত করার জন্যই এই সব অভিযোগের উদ্ভাবনা। সুরকোভ দা'এঞ্জেলোকে বলেছেন, "International swindler" এবং মাদাম আইভিনস্কয়া হলেন "dirty cynics, profiteers and evil spirits in the life of the outstanding and subjectively profoundly honest poet Boris Pasternak"..

দা'এঞ্জেলোর খোলা চিঠি প্রকাশের পরই পি-ই-এনের তরফ থেকে মিঃ কারভারকে সুরকোভ-লিখিত পত্র প্রকাশ করতে হয়েছে। দা'এঞ্জেলো বলেছেন—

—"...this is utterly false, as was demonstrated last May when I caused to be published some letters written in Pasternak's own hand in which the writer, whom you persecuted during his life and pretend to admire him after his death, said that he was in a precarious economic state and asked that a part of the income from "Dr. Zivago" should be sent to him directly, that is in the only way he considered possible...."

সিনর দা'এঞ্জেলো মাদাম আইভিনস্কয়াকে তছরূপের বা জালিয়াতির দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সে সম্পর্কিত দলিলপত্র তাঁর কাছে আছে। পাস্তেরনাক ও তাঁর পরিজনবর্গ প্রভৃতি সকলের জ্ঞাতসারেই এই অর্থাদি হস্তান্তরিত হয় তার প্রমাণ আছে। সিনর ফাটিনেলী (ইতালীয় প্রকাশক) বা সিনর দা'এঞ্জেলো গোপনে কিছু করেননি। এ সব কথা পাস্তেরনাকের চিঠিতেই সমর্থিত।

পরিশেষে সিনর দা' এঞ্জেলো বলেছেন যে সোভিয়েট অপরাধ আইনের যে-ধারানুসারে মাদাম আইভিনস্কয়া ও তাঁর কন্যা অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছেন তাঁর চূড়ান্ত শাস্তি দশ বছরের কারাবাস, কিন্তু সেই ধারা "Concerns only the case of professional smugglers who personally carries accross explosives,

drugs, poisons, arms and munitions."

বর্তমান রাশিয়ায় সাহিত্য সমাজের সমাজপতি কবি সুরকোভ কেন এই রমণীর প্রতি প্রদত্ত নিষ্ঠুর দণ্ডের সমর্থন করলেন, কেন তাঁর কন্যার অপরাধ সম্পর্কে নীরব রইলেন এবং অবান্তরভাবে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন তা আজ আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগতের বিস্ময়। মিঃ ভিসিনিস্কির বিচার ও তাঁর সঙ্গে যৌনাপরাধের সংযোগ এই মামলার সঙ্গে তুলনীয়। তাই পি-ই-এনের মিঃ কারভারের মনে হয় যে রাশিয়ায় আজ বোরিস পাস্তেরনাকের পুনর্বাসনের আয়োজন চলেছে। কবির মৃত্যুর পর তাঁকে স্বীকার করতে আর বাধা কি! শুধু তার মহৎ সৃষ্টি Dr Zivago কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক. সেই উপন্যাসের প্রেরণা ছিলেন মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়া, তাই তাঁকেও মুছে দেওয়া এই পুনর্বাসনের অঙ্গ। মিঃ কারভার বলেছেন মাদাম ও তাঁর কন্যার এই শাস্তিতে বিশ্ববাসী অজ্ঞ স্তম্ভিত। বোরিস পাস্তেরনাকের বিয়োগান্ত জীবনেতিহাসের এই পর্বটিই কি একমাত্র পরিশিষ্ট না আরও এক অঙ্ক এখনও অপ্রকাশিত, সাহিত্য সমাজে সেই সংশয় জেগেছে।

নতুন বই

আর্চবিশপের মৃত্যু—উইলা ক্যাথার। অনুবাদ—ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম : চার টাকা।

মার্কিন ঔপন্যাসিক উইলা ক্যাথার রচিত 'ডেথ কামস্ ফর দি আর্চবিশপে'র অনুবাদ করেছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক কালের সার্থক অনুবাদকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিশপ লাতুর জাতিতে ফরাসী হলেও যুক্তরাষ্ট্রের একজন ধর্মযাজক। প্রকৃত ধর্মময় জীবনযাপন তিনি করেছেন। নানাবিধ ধর্মকার্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটেছেন। মানুষকে ভালবাসা আর স্নেহের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছেন। অনুর্বর অগম্য স্থানে গমন করেছেন ধর্ম এবং মানবিক আবেদন নিয়ে। সত্যের মর্যাদা কখনও তাঁর কাছে ব্যর্থ আবেদন সৃষ্টি করেনি। দিনের পর দিন বিপদকে তুচ্ছ করে ঈশ্বরে আস্থা রেখে উদ্দেশ্য সাধনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। শেষদিনের বর্ণনা—এমনকি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত আগত ক্ষণকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা সত্যিই ক্যাথারের সার্থক শিল্পী-ক্ষমতার পরিচায়ক। অনুবাদের মাধ্যমেও এ চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটেছে। প্রকৃত ধর্মযাজকের জীবন কত সুন্দর এবং পবিত্র তা এ গ্রন্থ পাঠে জানা যাবে। বিচিত্র চরিত্রের উপস্থিতি গ্রন্থখানির রসাস্বাদনে পাঠককে আকৃষ্ট করে। ঘটনার জটিলতা কোথায়ও অস্বাভাবিক না হয়ে স্বচ্ছ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ক্যাথারের এই রচনা নিতান্ত ধর্মভিত্তিক নয়। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপযোগী করে লেখার জন্য গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা সংকরণটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুদ্রণ, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ। এ ধরণের গ্রন্থ-প্রকাশ বাংলাদেশে খুব কমই দেখা যায়।

ফাউস্ত—(অনুবাদ) [১ম খণ্ড] যোহান ভোল্‌ফগাঙ গ্যোতে। অনুবাদ : কানাইলাল গাঙ্গুলী। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পারিশার্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—১৩। দাম—ছয় টাকা।

যোহান ভোল্‌ফগাঙ গ্যোতে (১৭৪৯-১৮৩২) জারমান ভাষার একজন মহান কবি ও বিশ্বের এক স্মরণীয় চিন্তা-নায়ক। তাঁর 'ফাউস্ত' নামক দার্শনিক নাটকের নাম শোনেননি এমন শিক্ষিত মানুষ এই যুগে বিরল। কুড়ি বছর বয়সে গ্যোতে এই নাটক-রচনার কর্মে নিযুক্ত হন এবং ষাট বছর বয়সেও এই রচনার পরিবর্ধন ও পরিবর্জন কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই গ্রন্থটি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় গ্রন্থ। 'ফাউস্ত' নাট্যকারের এক রূপকাশ্রিত দার্শনিক মহাকাব্য। ডকটর ফাউস্ত জারমানিতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ছিলেন, তিনি কিছু অলৌকিক কর্মে পটু ছিলেন। তার জন্য সাধারণের ধারণা ছিল তিনি শয়তানানুগৃহীত ব্যক্তি। সাধারণের বিশ্বাস যে, ডঃ ফাউস্ত শয়তানের কাছে আত্ম-বিক্রয় করে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন। ফাউস্ত অবশেষে কুখ্যাত জীবন-যাপনের পর নিহত হন। জনসাধারণেও তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গুজবাদি বিশ্বাস করতে শুরু করে। গ্যোতে এই লোক-কাহিনীকেই অবলম্বন করে এক আশ্চর্য সুন্দর মহাকাব্য রচনা করেন। ফাউস্ত চরিত্র মানবাত্মার বৈচিত্র্যময় জীবনের লীলা। 'ফাউস্ত' মহানাটক সামান্য বস্তু নয়, এর তত্ত্ব অতি গভীর। ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী দীর্ঘকাল জারমানীতে বাস

করেছেন এবং স্বয়ং জারমান ভাষায় সুপণ্ডিত। তাই মূলে জারমানি থেকে অনূদিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। অনুবাদ সুন্দর ও সহজবোধ্য হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সত্যই এই গ্রন্থের অনুবাদককে অশেষ সাধুবাদ দান করা উচিত।

যুগ পরিক্রমা— (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (প্রবন্ধ) ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশক : ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২। মূল্য প্রতি খণ্ড আট টাকা।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর উপন্যাসাবলী একদা পাঠক মহলে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে, শরৎচন্দ্রের পর পাঠক ও সমালোচক সমাজ তাঁকেই সম্মানের সর্বোচ্চ আসন দান করেছিলেন। অনলস সাহিত্যসেবার বাংলার কথাসাহিত্য বিভাগে নরেশচন্দ্র যে স্থান লাভ করেছিলেন একালের সাহিত্যিকের কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু আজ নরেশচন্দ্র প্রায় বিস্মৃত লেখকের পর্যায়ে পড়েছেন, সে কথা তিনিও জানেন, তাই "আমি ছিলাম" নামক গ্রন্থে তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় দান করেছেন অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। যেদিন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ পাঠের পর আধুনিক সাহিত্যিকদের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় সেইদিন নরেশচন্দ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পাশে বসে তরুণ সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে কবির কাছে আধুনিকের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আজ তিনি জীবনসায়াহ্নে উপনীত। তাঁর পুত্র শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত নরেশচন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধাবলী দুই খণ্ডে সংকলিত করে প্রকাশ করেছেন তাঁর আশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে। প্রথম খণ্ডে আছে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নবযুগের কথা-সাহিত্য, সাহিত্যে জাতীয়তা, সাহিত্য-ধর্মের সীমানা, সাহিত্য সংগ্রাম প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র, আশুতোষ এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধগুলিতে সমকালীনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতার প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে 'ধর্ম ও দর্শন', 'সমাজনীতি', 'রাষ্ট্রনীতি' এই তিন বিভাগে বিভক্ত প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এই খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'সাংখ্যের মূল-কথা', 'সমাজসংগতি', 'যৌথপরিবার' এবং 'ভাত-কাপড়ের কথা' এবং 'পরিয়ালিসি বেদ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি, প্রকাশ কালে বিশেষ আলোচিত হয়েছিল একথা আমাদের স্মরণে আছে। ডঃ নরেশচন্দ্র ভূমি-সংক্রান্ত আইনেও যে কি গভীর জ্ঞানের অধিকারী তার প্রমাণ তাঁর শেষোক্ত প্রবন্ধাবলী। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় নরেশচন্দ্র অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে সরসতার সঙ্গে আছে তীক্ষ্ম যুক্তি-জাল, সেখানে তাঁর ব্যবহারজীবী সত্তা অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করেছে। এ যুগের পাঠক নরেশচন্দ্র-জীবন-সাধনার ফসল 'যুগপরিক্রমা' পাঠে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। এমন মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই। তবে গ্রন্থটিতে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহিত্য-কর্মের একটা বিশদ আলোচনা থাকা উচিত ছিল। এই জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে সেই আলোচনা অপরিহার্য। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

মহানির্বাণতন্ত্রম্—(প্রবন্ধ) ১ম খণ্ড —শ্রীমদ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত। ১৭৪।৬।১, নেতাজী সুভাষ বসু রোড, পোঃ রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০। দাম ৬ টাকা।

তন্ত্র কি এবং বিশেষ করে মহানির্বাণ তন্ত্র যে কি, হিন্দুর নিকট তা অপরিচিত নয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে কলিযুগে করণীয় কার্যের সদুপদেশ পদে পদে পূর্ণ। এ পর্যন্ত যতগুলি মহানির্বাণতন্ত্র মুদ্রিত হয়েছে, তন্মধ্যে 'বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালংকার মহাশয়ের অনুবাদ ও টিপ্পনীসমেত মহানির্বাণ-তন্ত্রই যে শ্রেষ্ঠতম তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এতে শ্রীমদ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা এবং স্বর্গত তর্কালংকারকৃত অনুবাদ ও টিপ্পনী সন্নিবেশিত হওয়ায় অনেক গূঢ়তত্ত্বের সুন্দররূপে মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। 'তর্কালংকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক মহানির্বাণতন্ত্র পরিবর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তদীয় পুত্র শ্রীপরমানন্দ তীর্থনাথ, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় এর পঞ্চম সংস্করণ ইতিপূর্বে নিঃশেষিত হওয়ায় এই নূতন ষষ্ঠ সংস্করণ ১ম হ'তে ৯ম উল্লসাযুক্ত প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। শাস্ত্রতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকদিগের পক্ষে এ যে একখানি অমূল্য পুস্তক তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আলোর পরিধি— (কবিতা)। সলিল মিত্র। মূল্য : দেড় টাকা। পরিবেশনায়—কারেন্ট বুক সপ্। ৫৭, কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা—১২।

গদ্য এবং ছন্দে লেখা মোটামুটি আধুনিক রীতির কিছু কবিতা রয়েছে এই পুস্তিকায়। প্রথম কবিতাটি এবং অন্যত্র দু-এক জায়গায় ভালো লাগল। স্থানে স্থানে ছন্দ এবং মিলের ত্রুটি লক্ষিত হোল। পরিশ্রম ও একাগ্র প্রযত্নের বিনিয়োগ করলে কবি ভবিষ্যতে কিছু সার্থক কবিতা রচনা করতে পারবেন বলে আশা করি।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

কাঁচের স্বর্গ : চিত্রযুগের নিবেদন; ১২,৯০৪ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; **কাহিনী চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা** : যাত্রিক; **সংগীত পরিচালনা** : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র; **চিত্রগ্রহণ** : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা; **শব্দধারণ** : মৃণাল গুহঠাকুরতা; **শিল্পনির্দেশ** : সুবোধ দাস; **সম্পাদনা** : দুলাল দত্ত; **রূপায়ণ** : দিলীপ মুখোপাধ্যায় অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, জীবেন বসু, সবিতাব্রত দত্ত, ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, অমর মল্লিক, সোমনাথ, মঞ্জুলা, কাজল গুপ্ত, মঞ্জু দে, গীতা দে, ছায়া দেবী, আরতি দাস এবং আরো অনেকে। মিতালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় আজ শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনী "কাঁচের স্বর্গ"-এ যে-প্রশ্নটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে এই : কোনো মানুষ যদি বিশেষ কোনো বৃত্তিতে চরম পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়, তাহলে তার পিছনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তকমা না থাকলেই কি সে জীবিকার্জনে বঞ্চিত হবে? তার জন্যে কি দেশের প্রচলিত আইনকে অতিক্রম করে কোনো বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা রাস্তা ধরে যে অগ্রসর হয়নি, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিরদিন বঞ্চিত রেখে সমাজ কি নিজেই তার প্রতিভার পুণ্যস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না?

"কাঁচের স্বর্গ"-এর নায়ক সঞ্জীব চৌধুরী এই রকমই এক লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শল্য-চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজের কৃতি ছেলে হয়েও কোনো অজ্ঞাত কারণে সে শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারেনি এবং সেই কারণে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ডাক্তার নয়। অথচ রণক্ষেত্রে তারই শল্য-চিকিৎসার ফলে সুশোভন সেন নামে একজন যুবক তার প্রাণ ফিরে পায়। যুদ্ধ-দামামা থেমে যাবার পর সে যখন কলকাতার পথে পথে সামান্য কোনো চাকরীর সন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে জীবনে বীতশ্রদ্ধ, তখন একান্ত অকস্মাৎ তার দেখা হয় সেই লব্ধপ্রাণ যুবকের সঙ্গে। যুবক তখন বাতাসপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। বহু মানসিক দ্বন্দ্বের পর সঞ্জীব বাতাসপুর মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেনের পদ গ্রহণ করে। সেখানকার চীফ সার্জেন ডাঃ ব্যানার্জি প্রথমে তাকে নেওয়ার বিরোধিতা করলেও পরে তার কৃতিত্বপূর্ণ শল্য-চিকিৎসার পরিচয় পাবার পর তাকে দাঁড় করিয়ে, সঞ্জীব তার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না। যক্ষ্মাচিকিৎসক সঞ্জীবকে ভুল বুঝে নিমিষে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং যখন তার অসামান্য শল্য-চিকিৎসার স্বীকৃতি স্বরূপ সঞ্জীব সংবর্ধনা পায়, তখন তার প্রশস্তিসূচক করতালি ধ্বনিকে ডুবিয়ে সে তার বিচিত্র করতালি দ্বারা সঞ্জীবকে উপহসিত করে। এই উপহাস বিদ্রূপ সঞ্জীব আর সহ্য করতে পারে না, সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, সে শল্য-চিকিৎসক বটে, কিন্তু কোন ডিগ্রীধারী নয়। এই স্বীকারোক্তি সঞ্জীবের জীবনে আনে চরম বিপর্যয়। দেশের প্রচলিত আইন

অগ্রগামী পরিচালিত প্রযোজিত "নিশীথে" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু মফঃস্বল হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসক সঞ্জীব তার নামের প্রচার পছন্দ করতে পারে না; কারণ তার মনে সর্বক্ষণই ভীতি রয়েছে, ডাক্তারী তকমাধারী না হয়েও সে হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেনের পদে কাজ করছে। তাই যখন তার বন্ধু যক্ষ্মাচিকিৎসক ডাঃ অসীম মৈত্র তার প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে চায় তাকেই প্রধান সাক্ষী হিসেবে অনুসারে সে আদালতে অভিযুক্ত হয় এবং তার কৌঁসুলীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দু'বছরের সশ্রম কারাবাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। সকলের সঙ্গে দণ্ডদাতা বিচারকের মনেও জিজ্ঞাসা জাগে—প্রতিভার এমন অপমৃত্যু দেশ আর কতদিন সহ্য করবে?

"কাঁচের স্বর্গ"-এর চিত্রনাট্য অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ এবং নিপুণতার সঙ্গে গ্রথিত। কোথাও কোথাও কিছু হাস্যগতি এবং উচ্ছ্বাসের কিছুটা বাড়াবাড়ি

থাকলেও মোটের উপর এমন সুগঠিত চিত্রনাট্য সহসা নজরে পড়েনা। যে-দু'তিনটি অসংগতি মনকে পীড়িত করে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে : কাউকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন পদ দেবার সময় কর্তৃপক্ষ তার উপযুক্ততা বিবেচনার জন্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করেন না, এটা যদি বাস্তব ঘটনাও হয়, আর্টের জগতে একান্তভাবেই অসম্ভব্যতাপূর্ণ (improbable): ; বাতাসপুর মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ও-রকম একটি দুরূহ শল্য-চিকিৎসা হওয়া সম্ভবপর বলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন: দু'আড়াইশো লোকের জনতার পক্ষে অমন বেপরোয়া হয়ে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের গৃহ আক্রমণ করা যতটা সহজ ব'লে দেখানো হয়েছে, সত্যই কি ততটা সহজ ? কিন্তু এ ধরনের ছোটখাট অনেক প্রশ্নকেও ছাপিয়ে যে-মহত্তর প্রশ্ন নিয়ে কাহিনীটির সৃষ্টি, তাই শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনকে অধিকার ক'রে থাকে এবং এমন রসোত্তীর্ণভাবে এই প্রশ্নটিকে কাহিনীর সংগে অংগাংগীভাবে বিধৃত করা হয়েছে, যার অকুণ্ঠ প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

"কাঁচের স্বর্গ"কে যাত্রিক-গোষ্ঠী যে অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত ক'রে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন, যার তুলনা কদাচিৎ মেলে। এবং এ-ব্যাপারে যে-দু'জন কুশলীর কৃতিত্ব সর্বাধিক, তাঁরা হচ্ছেন চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত ও শিল্পনির্দেশক সুবোধ দাস। ছবিখানি দেখতে দেখতে মনে হয়, যেন কোনো উচ্চাংগের আমেরিকান চিত্র দেখছি। শট এবং দৃশ্যকে এমন সার্থকভাবে ক্যামেরার মাধ্যমে গ্রহণ করা বিশিষ্ট শিল্পবোধের পরিচায়ক। বাস্তব এবং কাব্যের এমন সুষম মিলন ও চিত্রায়ণ সহসা নজরে পড়ে না। এদের সংগে বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবপ্রকাশক আবহ-সংগীত চিত্রটিকে রসোত্তীর্ণ হ'তে প্রভূত সাহায্য করেছে; এক একটি বিশেষ মুহূর্তে উচ্চগ্রামের আবহ-সংগীত চিত্তকে সচকিত ক'রে তোলে। ছবিখানির সুরকার হিসেবে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'কাঁচের স্বর্গ'-এ অভিনয় ব্যাপারে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী অল্প-বিস্তর প্রশংসা দাবী করতে পারেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়—দু'জনেই তাঁদের স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে তাঁদের গৃহীত চরিত্র দু'টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ'দের পরেই নাম করতে হয় পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, তরুণকুমার, মঞ্জুলা, কাজল, মঞ্জু দে, গীতা দে, সোমনাথ, অমর মল্লিক, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ প্রভৃতি বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এমন কি, কুলী-সর্দার, ভৃত্য প্রভৃতি ছোটখাট ভূমিকাও অত্যন্ত সুঅভিনীত।

'যাত্রিক'-গোষ্ঠীকৃত 'কাঁচের স্বর্গ' বাঙলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় যোজনা।

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও রুমা দেবী।

বিবিধ সংবাদ

মার্ক রবসনের "ডে অব ডার্কনেস" :

মার্কিন প্রযোজক-পরিচালক মার্ক রবসন ভারতবর্ষে এসেছিলেন "ডে অব ডার্কনেস" বা "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামে ছবির কিছু বহির্দৃশ্য তুলতে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, ভারতীয় কাহিনী নিয়ে নির্মিত এই ছবির নায়ক হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নাথুরাম গডসে। এই কাহিনীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীকেও দেখতে পাওয়া যাবে। গান্ধী এবং তাঁর হত্যাকারী নায়কের ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হচ্ছেন জে, এস, কাশ্যপ এবং সুখ্যাত জার্মাণ অভিনেতা হর্স্ট বুকহোলৎস। আজকের দিনের পাঠকেরা জানেন কিনা বলতে পারিনা, জে. এস. কাশ্যপ হচ্ছেন অতীতের সেই খ্যাতিমান হিন্দী সংলাপ-লেখক, যাঁর লেখনীনিঃসৃত সংলাপের গুণে বোম্বে টকীজ নির্মিত 'অছুৎকন্যা', 'বন্ধন', 'কঙ্কন' প্রভৃতি চিত্র এবং জেমিনীর 'চন্দ্রলেখা', 'নিশান' প্রভৃতি চিত্র সর্বভারতীয় সমাদর লাভ করেছিল। একদা উত্তর-প্রদেশের গ্র্যাজুয়েট-শিক্ষক, শ্রীকাশ্যপ হিন্দী এবং উর্দু—উভয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ব'লে সারা ভারতের উপযোগী এমন এক সহজ হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের জন্যে যে, হিন্দী চিত্রের প্রসারের পথে তা অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এবং হিন্দী ছবি যে হিন্দী ভাষার প্রচারে অপরিমিত সাহায্য করে, এ-কথা আমরা না জানলেও ভারত সরকারের অত্যুৎসাহী হিন্দীপ্রচারক সদস্যরা বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু এদিকে রেড লায়ন ফিল্মস লিমিটেডের প্রযোজক-পরিচালক মার্ক রবসন ছবিখানির বহির্দৃশ্য তুলতে ভারতে এসে বেশ যে কয়েকটা বড় রকম গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন, তা বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত ক্রমশঃই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম গোলযোগ তাঁর ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে। ডঃ স্ট্যানলি উওলপার্ট লিখিত মূল উপন্যাস অবলম্বনে রচিত যে-চিত্রনাট্যখানি (মূল এবং সংশোধিত) কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয় প'ড়ে দেখেছেন, তাতে নাকি নাথুরাম গডসের জীবন-নাট্য রচনায় প্রচুর কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং তাই দেখে সরকারের তরফ থেকে প্রযোজক-সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ্যে মুক্তির আগে ছবিখানিকে ভারত সরকার বা লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারকে

দেখাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধন করতে হবে। এ-ছাড়া ভারতে মুক্তির আগে সাধারণ প্রথামত ভারতীয় সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র নেওয়া দরকার হবে। চিত্রনাট্যখানিতে নাকি এমন ইঙ্গিত আছে যে, যে-হেতু গড়সে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চেয়েও বিফলমনোরথ হয়েছে, সেই হেতুটিও গান্ধী-হত্যার অন্যতম কারণ। অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, নাথুরাম গড়সের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়; বিশেষ যখন হত্যাপরাধে গড়সের বিরুদ্ধে আদালতে যথারীতি মামলা চলেছিল। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, হয়ত' জুলিয়াস সীজারের হত্যাকারী ব্রুটাসের মতো মহাত্মা হত্যাকারী গড়সেও রবসন-চিত্রে গৌরবের আসন লাভ করবেন। দ্বিতীয় গোল বেধেছে, ঐ ছবিতে যে-সব ভারতীয় কলা-কুশলী ও শিল্পী কাজ করছেন, তাঁদের নিয়ে। কথা ছিল, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ে বহির্দৃশ্য তোলার পর ছবির অন্তর্দৃশ্যগুলি বোম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে তোলা হবে। কিন্তু ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে-এমপ্লয়িজ ঐ ছবিতে যে-সব বিদেশী কলাকুশলী কাজ করছিলেন, নির্দিষ্ট চাঁদা জমা দিয়ে তাঁদের এখানকার কুশলী-সঙ্ঘের অস্থায়ী সভ্য হবার জন্যে দাবি জানানোয় প্রযোজক-পরিচালক রবসন পূর্বমত পরিবর্তন ক'রে সদলবলে লণ্ডনের এলস্ট্রি স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্যগুলি তোলবার জন্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন। কাজেই ফেডারেশনের দাবি এইভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় ফেডারেশন তার সভ্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রেছে যাতে তারা এই ছবিতে কাজ না করে। বোম্বাইয়ের যে-সব শিল্পী ছবিখানিতে অভিনয় করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরও ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে ব'লে প্রকাশ। দেখা যাচ্ছে, রবসন তাঁর এই চিত্র মারফত ভারতে ইতিমধ্যেই রীতিমত সোরগোল তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

"কথাকলি"র নবম বার্ষিক সম্মেলন :

গেল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে "কথাকলি" সম্প্রদায় তাঁদের নবম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে পরশুরাম বিরচিত যে-তিনটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন, সেগুলি হচ্ছে : (১) সরলাক্ষ হোম, (২) বটেশ্বরের অবদান এবং (৩) রাতারাতি। নাট্যরূপগুলিকে একাঙ্কিকা আখ্যা দিলেও আমরা ওগুলিকে ঠিক একাঙ্কিকা ব'লে মেনে নিতে পারছি না। বদানুবাদ এড়িয়ে ওদের মাত্র প্রহসন আখ্যা দেওয়াই ভালো। বটেশ্বরের অবদান ও রাতারাতি—এই গল্প দুটিকে অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ও নাট্যরূপান্তরিত করে অভিনয় করেছেন। "কথাকলি"র অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে নাট্যরূপগুলিতে অভিনয় করেছেন। এরই মধ্যে নাট্যরূপদাতা ও যুগ্ম-পরিচালক প্রকাশ পাল, যুগ্ম-পরিচালক সুনীল বসু, ভূপেন মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ রাহা, মীনাক্ষি রায়, উমা দাশগুপ্তা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কিনী পুতুলনাচ :

নিউ এম্পায়ারে বিল বেয়ার্ড এবং কোরা বেয়ার্ড প্রদর্শিত মার্কিনী পুতুলনাচ যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা স্বীকার করবেন, তাঁদের নূতনতর অভিজ্ঞতার কথা। চেকোশ্লোভেকিয়া বা রাশিয়ার পুতুলনাচ থেকে এই মার্কিনী পুতুলনাচ নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। "ডেভি জোন্স লকার" নামে একটি পুরো রূপকথাকে বাঙালী পুতুল ভাষ্যকারের সাহায্যে বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে এ'রা যেভাবে রূপদান করেছেন, তা আমরা আগে দেখিনি। তা ছাড়া মঞ্চের ওপর এ'দের দলের বেশ কয়েকজন মিলে যে-ভাবে "ক্যানক্যান" নাচ দেখালেন পুতুলগুলিকে সুতোর সাহায্যে নেড়ে-

চেড়ে. তাতে মনে হ'ল, বেয়ার্ড-দম্পতি দর্শকদের পতুলনাচের কায়দা-কানুন সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ রাখা পছন্দ করেন না। সমস্ত ব্যাপারটা trade Secret না রেখে দর্শকের সঙ্গে এই যে খোলাখুলি ভাব, এটি আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

চলচ্চিত্র-জগতে ক্রিকেট খেলা :

দি সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে গেল রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীরা "ছবি বিশ্বাস একাদশ" বনাম "সত্যজিৎ রায় একাদশ" নাম দিয়ে একটি উপভোগ্য প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন দুঃস্থকলাকুশলী সাহায্য-ভান্ডারের জন্যে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পী ও কলাকুশলী নিপুণ হাতে ব্যাট ও বল ক'রে সমবেত দর্শকদের দেখিয়ে দিলেন, শিল্পী ও কুশলী হলেও তাঁরা মানুষ এবং মানুষের মতোই এককালে খেলাধুলোও করেছেন।

বিবেকানন্দ উৎসবে শিল্পীমহলের "যুগসূর্য" :

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার শ্যাম স্কোয়ারে সাড়ম্বরে যে-উৎসব চলছে, তারই প্রাঙ্গণে গেলকাল বৃহস্পতিবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী শিল্পীমহল সম্প্রদায় স্বামিজীর জীবনী নিয়ে রচিত "যুগসূর্য" নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

অন্বেষা কর্তৃক "কাঞ্চনরঙ্গ" :

উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা "অন্বেষা" আজ শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত রঙ্গনাটক "কাঞ্চনরঙ্গ"-এর পুনরাভিনয় করবেন। 'টাকা থাকলেই মানুষ, নইলে মানুষ নয়,'—আধুনিক যুগের এই বিচিত্র মনোভাবকে কশাঘাত ক'রে লেখা এই নাটকখানির পরিচালনা করবেন স্বদেশ বসু এবং এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেকা নিয়োগী, কমলা দাস, প্রশান্ত সেন, স্বপন বসু, সুদর্শন দাস, শ্যামল দত্ত, সুনীলবরণ চৌধুরী, নির্মল ঘোষাল, ফজলুর রহমান ও পরিচালক স্বয়ং।
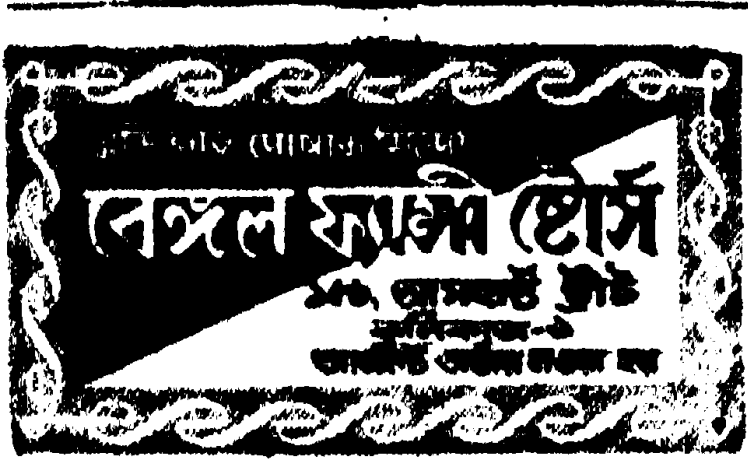
চলচ্চিত্র প্রয়াসের 'সূর্যস্নান' চিত্রে তৃপ্তি মিত্র।

চিত্রম্‌আশায় "মেঘলা আকাশ" :

গ্রাম্য কুসংস্কার অপসারণের বাণী নিয়ে 'প্রি-না-দ' রচিত "মেঘলা আকাশ"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অমল দত্ত। সম্প্রতি তিনি সোনারপুরের পল্লীঅঞ্চলে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সোমা সরকার, মনীষা রায়, আরতি দাস এবং নবাগত নায়ক অশোক চক্রবর্তী ও নায়িকা শম্পাকে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে চিত্রগ্রহণের কাজ চালিয়েছেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন বিজয় দে ও শান্তি দত্ত, সম্পাদনা করছেন অনিত মুখোপাধ্যায় এবং সুরযোজনা করছেন ননী মুখোপাধ্যায়। "মেঘলা আকাশ"-এর প্রযোজনা করছেন "অমল দত্ত" ইউনিট।

দিশারীর উদ্যোগে "যাত্রা উৎসব" :

মধ্য কলকাতার "দিশারী" সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে আসছে মাসের আটই থেকে পনেরো দিন ধ'রে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা উৎসবের আসর বসবে। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, প্রাচীন প্রথায় এই আসর তৈরী হবে, যাতে দর্শক আর শিল্পীদের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না এবং সকলেই যাতে এই উৎসবে যোগ দিতে পারেন, তারজন্যে খুব অল্পমূল্যের প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রা-

য়াতের সুবিধার জন্য অনুষ্ঠানগুলিকে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ১০টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। যোগাযোগের জন্যে দিশারী কার্যালয় ১।৬এ, ডঃ সুরেশ সরকার রোডে বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে।

॥ ভিনদেশী ছবি ॥

চার্চ বনাম চলচ্চিত্র ঃ

বাইবেলের টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস-এর একটি অনুশাসন হল 'দাউ শ্যাল নট কিল'। এই অনুশাসনবাণীকে ভিত্তি করে জনৈক ফরাসী চিত্র-পরিচালক ক্লদ্ লারা একটি ছবি তুলেছেন। কিন্তু এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য করে ইতালী-ফ্রান্স-ভাটিকানের মধ্যে কূটনৈতিক সংঘর্ষের ঝড় বয়ে গেছে। যদিও এই চিত্রের পরিচালক জনৈক ফরাসী, তবুও ফ্রান্সে এই ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং এই চিত্রের প্রদর্শনীও ফরাসী দেশে নিষিদ্ধ। 'দাউ শ্যাল নট কিল' ছবিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, চিত্রটি নাকি মূলতঃ ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী। ছবির নায়ক একজন ফরাসী ক্যাথলিক যুবক। সে যুদ্ধের সময় সামরিক শিক্ষা নিতে রাজী নয়, কারণ তার আদর্শগত বিশ্বাস যে, ক্যাথলিক হিসেবে, টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস-এর অহিংসা অনুশাসনবাণী 'দাউ শ্যাল নট কিল' মানতে সে ধর্মতঃ বাধ্য। কিন্তু সে অপরিসীম দুঃখে জানলো যে তার এই আদর্শের পেছনে তার চার্চের এতটুকু সমর্থন নেই। লারা পরিচালিত, লিখিত, অভিনীত এই ছবিটি যে কোনো-দিন মুক্তির স্বর্গে পৌঁছতে পারবে প্রযোজক সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, এমন সময় গত আগষ্ট মাসে ভেনিস ফেস্টিভ্যাল থেকে ফ্রান্সের কাছে এই চিত্রের জন্যে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ এল। ফরাসী সংস্কৃতি-মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো ছবিটি পাঠাতে অস্বীকার ত করলেনই, উপরন্তু ভেনিস ফেস্টিভ্যাল কমিটিতে জানালেন যে, ছবিটি যদি চিত্র-উৎসবে প্রদর্শিত হয়, তিনি সমস্ত ফরাসী ছবি প্রত্যাহার করে নেবেন ভেনিস থেকে। প্রযোজক উপায়ান্তর না দেখে সুইজারল্যাণ্ডের শরণাপন্ন হলেন—তাঁরা যদি তাঁদের দেশের চিত্র-প্রতিনিধি করে 'দাউ শ্যাল নট কিল'-কে পাঠান ভেনিসে। সুইস কর্তৃপক্ষও সরাসরি অস্বীকার করলেন এই ছবিকে পাঠাতে। অবশেষে ভেনিসে ছবিটি প্রদর্শিত হয় যুগোশ্লাভ দেশীয় চিত্র হিসেবে। ফরাসী মন্ত্রী মালরোকে সন্তুষ্ট করা হয় তাঁর প্রিয় একটি ছবি 'লি'য় মারিন, প্রিন্ট'-এর বিশেষ প্রদর্শনী মারফৎ। সেই মাসেই মিলানের এক চিত্র-সপ্তাহে এই ছবিটিকে দেখানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে ঠিক হয় 'দাউ শ্যাল নট কিল' মিলানে দেখানো হবে। কিন্তু প্রদর্শনী আরম্ভ হওয়ার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে পুলিশ প্রেক্ষাগৃহে এসে জানায় যে, সেন্সারের অনুমতি ছাড়া চিত্রের প্রদর্শনে তারা অনুমতি দিতে পারবে না। পরে সেন্সারকে যখন দেখানো হয় ছবিটি, সেন্সার সমিতি সরাসরি ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেন। সেন্সারের এই অস্বীকৃতির মূলে ইটালীর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী গুইলো আন্দ্রোত্তির হাত আছে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। কারণ আন্দ্রোত্তি এর কিছুদিন আগেই ফ্রান্স থেকে 'লিজিয়ন অফ অনার' উপাধি পেয়েছেন। অনেকের বিশ্বাস ফরাসী সেনাপতিদের চাপে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইটালীতে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করিয়েছেন।

ছবিটি নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হবার ফলে ইটালীতে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। চিত্রটির সম্বন্ধে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক জর্জিয়ো লা পিরা ঠিক করলেন, ইটালীর সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, ভ্যাটিকানের পোপ, দাগল প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি একাই দাঁড়াবেন। লা পিরা নিজে অবশ্য ছবি দ্যাখেন না বিশেষ। কিন্তু বিরোধী-পক্ষের নেতা হবার উৎসাহ তাঁর অনেক-কালের অভ্যেস। অতীতেও এরকম কোনো গোলমেলে ব্যাপার উপস্থিত হলেই পিরা প্রথম এগিয়ে যেতেন। কাজেই এই ব্যাপারেও যথারীতি নিজেকে জড়িয়ে ফেল্লেন তিনি। ঠিক করলেন সাতশো লোককে তিনি ফ্লোরেন্সে নিমন্ত্রণ করে একটি ঘরোয়া প্রদর্শনীতে 'দাউ শ্যাল নট কিল' দেখাবেন। এবং বলতে গেলে কর্তৃপক্ষের নাকের ওপরেই চিত্রটি প্রদর্শিত হল। এবং এইটিই এখন পর্যন্ত এই চিত্রের শেষ প্রদর্শনী। কারণ এই প্রদর্শনীর পরেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ সার্কুলার দিলেন যে, বাইরের লোক নিমন্ত্রিত হলেই কোনো প্রদর্শনী আর 'ঘরোয়া' থাকবে না এবং সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র একান্তই আবশ্যক।

ভাটিকানের 'ল' অসরভেতর রোমানো ছবিটি সম্বন্ধে পরে লিখলেন—'চিত্র-নির্মাতা সুকৌশলে ক্যাথলিক ধর্মনীতি, পুরোহিত গোষ্ঠি এবং চার্চের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার করেছেন। চিত্রের নায়কের অসামরিক মনোভাব কখনই সমর্থনীয় নয়, কারণ অন্যায় এবং অবিচার যতদিন থাকবে পৃথিবীতে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার অধিকারও থাকবে ততদিন।'

(প্রতিনিধি)

খেলাধুলা
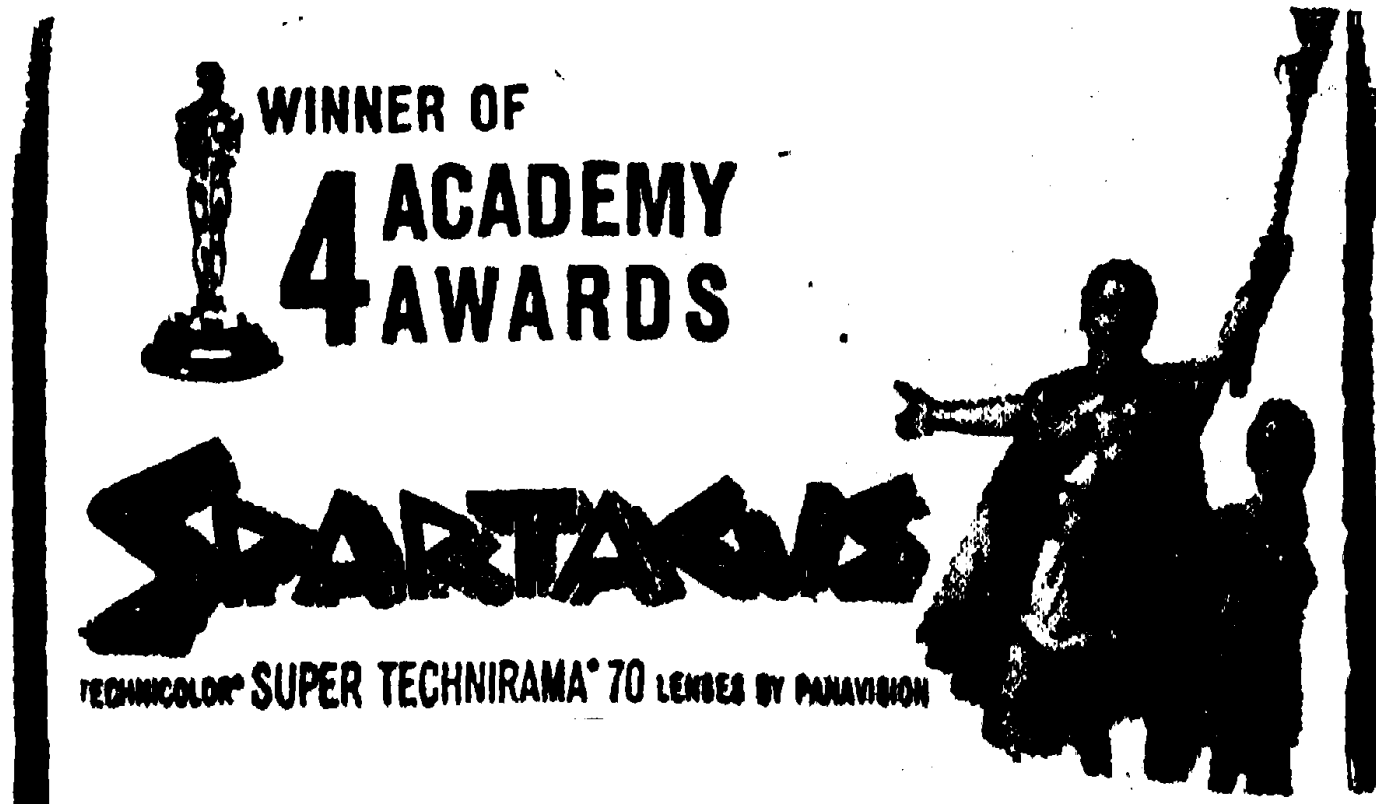
দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ক্রিকেট

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমানায় অবিভক্ত বিশাল জলরাশি—একদিকে ক্যারিবিয়ান সাগর এবং তারই সংলগ্ন অপর দিকে আটলান্টিক মহাসাগর। ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে মাথা তুলে আছে শত শত ছোট-বড় দ্বীপ এবং কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সুসজ্জিত হয়ে এই অঞ্চলের দ্বীপগুলি দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য-পিপাসু পর্যটকদের ঘরছাড়া ক'রে নিয়ে আসে এখানে। বেশীর ভাগ ভ্রমণকারী আসেন আমেরিকা এবং কানাডা থেকে। সভ্যজগত থেকে আকস্মিকভাবে এই অঞ্চলে প্রথম এসে পড়েছিলেন দুঃসাহসিক দেশ-আবিষ্কারক এবং ভূপর্যটক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের সংকল্প নিয়ে দুর্গম সমুদ্র-পথে পাড়ি দিয়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের কোন একদিন ক্যারিবিয়ান সাগরের এই অজ্ঞাত এবং অখ্যাত দ্বীপময় অঞ্চলে পথ হারিয়ে উপস্থিত হন এবং ভারতবর্ষের কোন অংশ মনে ক'রে তিনি এই অঞ্চলের নাম দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই থেকেই এই অঞ্চল ঐ নামেই পরিচিত। অবশ্য আরও একটা নাম আছে—ক্যারিবিয়ান। এই অঞ্চলের আদিবাসী ক্যারিব জাতির নাম থেকেই ক্যারিবিয়ান শব্দের উৎপত্তি। যে সময়ে কলম্বাস এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেন তখন এই অঞ্চলে দু' রকম জাতির লোক বাস করতো। তারা—আরাওয়াকস এবং ক্যারিব। এরাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসী। এই দুই জাতির লোকের স্বভাব-চরিত্র এবং দৈহিক আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। উত্তরাঞ্চল দ্বীপগুলির আদিবাসী আরাওয়াকসরা ছিল খুব ভদ্র

লরী কন্সটানটাইন

এবং শান্তিপ্রিয়। কিন্তু ক্যারিব আদিবাসীরা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। এদের দৈহিক আকৃতি এবং স্বভাব-প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। রণলিপ্সু স্বভাবের কারণে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কলমে ক্যারিব জাতি কুখ্যাত হয়ে আছে। শ্বেতাদেশের লোলুপ দৃষ্টি থেকে স্বদেশ রক্ষার জন্যে এই ক্যারিব জাতি দু'শ্যত বছর ধরে যুদ্ধ করেছে স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে শ্বেত জাতির অনেক অর্থ, সময় এবং রক্ত ক্ষয় হয়েছে। ইংরেজরা ক্যারিব জাতির বর্বরতা এবং ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে পারেনি। ইংরেজি ভাষায় 'ক্যানিবল্' শব্দের প্রচলন দেখা গেল। এই শব্দের অর্থ স্বগোত্র-ভোজী বা নরখাদক। ক্যারিব জাতি থেকেই এই কথাটার উৎপত্তি।

জর্জ হেডলি

ইউরোপের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীরা শেষে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীরা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'তে চলেছে।

আদিবাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ-জয়-

এভার্টন উইকস

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল
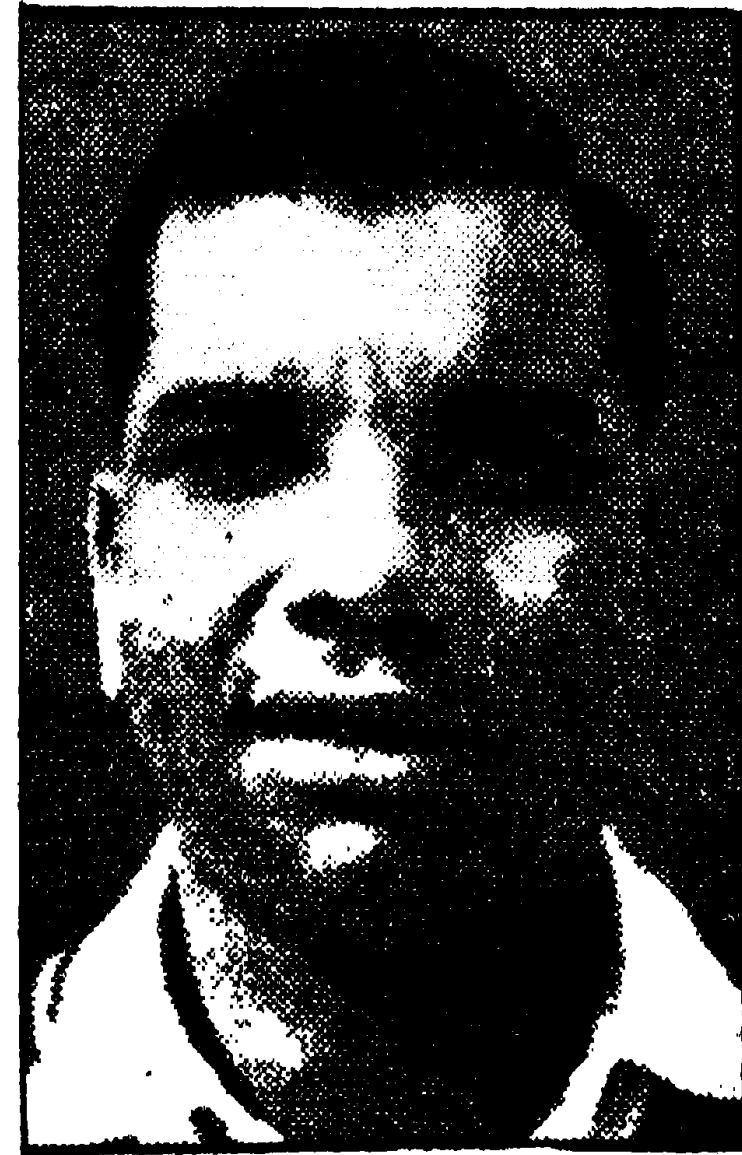
ক্লাইড ওয়ালকট

আলফ্ ভ্যালেনটাইন

লাভের পর সেখানে শুরু হয় উপনিবেশ স্থাপনের কাজ। আফ্রিকা থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে আসতে থাকে হাজারে হাজারে নিগ্রো ক্রীতদাস। তাদেরই রক্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপগুলি ইউরোপের ধন-ভাণ্ডারে সোনার ফসল তুলে দেয়। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয় এবং একদিন ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাজারে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। জাহাজ ভর্তি হয়ে দলে দলে ভারতীয় শ্রমিকদের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাত্রার ধুম পড়ে যায়। বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তার বেশীর ভাগই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আগত পূর্বকালের ভারতীয় শ্রমিকদের বংশধর। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতীয়দের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যথেষ্ট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র বলা যায়। এখানে বসবাস করছে ভারতীয়, নিগ্রো, স্পেনীস, ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, চীনা এবং উত্তর আমেরিকার বহু লোক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রোরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত এবং তাদের রসজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতীয় এবং নিগ্রোদের আতিথেয়তার খ্যাতি আজ প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বৈদেশিক শাসন কর্তৃত্ব আছে ইউরোপের তিনটি জাতির—ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজের। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিন ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ডাচ এ্যান্টিলিজ।

ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলে বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজই আকারে অনেক বড়। লোকসংখ্যা তিন মিলিয়ন; এই অঞ্চলটি দশটি স্থানীয় সরকার দ্বারা শাসিত। বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে জামাইকা সব থেকে বড় দ্বীপ এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের 'রাণী'। ত্রিনিদাদ সব থেকে সমৃদ্ধিশালী দ্বীপ।

ভারতীয় ক্রিকেট দল এই বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অঞ্চলেই খেলতে গেছে।

ক্রিকেট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জাতীয় খেলা। শুধু ছোট-বড় সহরে নয়, অতি নগণ্য গ্রামাঞ্চলেও ক্রিকেট খুবই জনপ্রিয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আনন্দোৎসবের প্রধান উৎসই এই ক্রিকেট। রবিবারের ক্রিকেট খেলার আকর্ষণ অন্য রকম। রবিবার ছুটির দিন, তাই বিশ্রামের দিন এবং ফুর্তির দিন। বিশ্রাম ও ফুর্তি ঘরে বসে নয়। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা এবং বড়রা সাজ পোষাকে
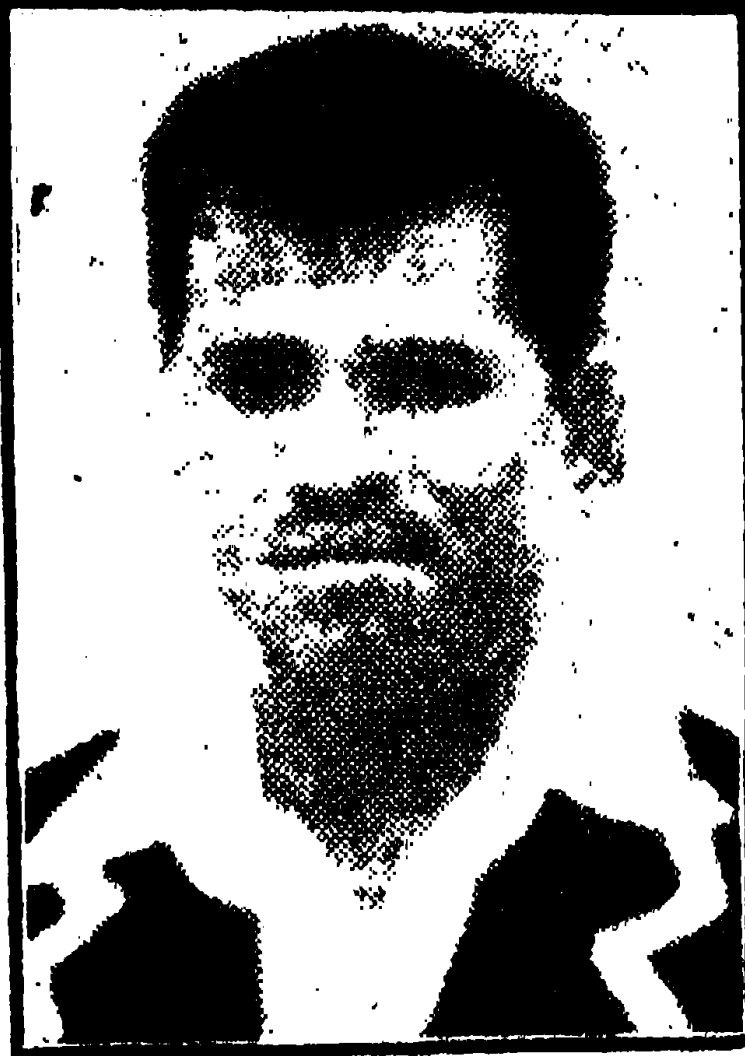
সনি রামাধীন

ধোপদুরস্ত হয়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে যায়। আমাদের দেশে বিশেষ পালা-পার্বণে যেমন জনসমাগম, তেমনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে রবিবারের ক্রিকেট

রোহন কানহাই
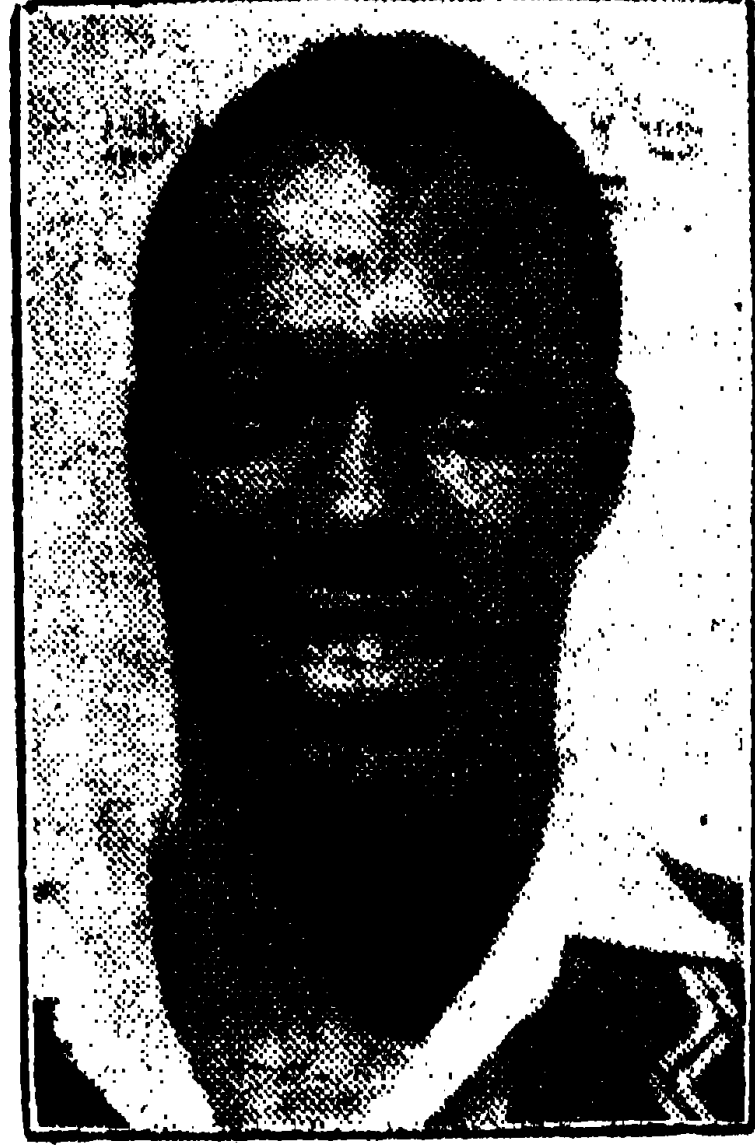
ওয়েসলী হল

খেলায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ঘর-কুনো নয়। তারাও বর্ণাঢ্য পোষাকে সাজগোজ করে দলে দলে উড়ে আসে ক্রিকেট মাঠে। ক্রিকেট মাঠ রঙীন প্রজাপতিতে ভরে যায়। মেয়েদের সাজ-পোষাকের এমন জাঁকজমক আমাদের দেশে বিশেষ উৎসবের দিনেই চোখে পড়ে। শুধু নির্দিষ্ট ক্রিকেট মাঠেই খেলা হয় না, খেলা হয় যত্রতত্র—কেবল নদনদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল বাদ দিয়ে। আর সে খেলার উত্তেজনা একমাত্র চোখে দেখে উপলব্ধি করা যায়। ক্রিকেট খেলছে দলে দলে—নিগ্রো, ভারতীয়, চীনা এবং সময়ে সময়ে শ্বেতাঙ্গরাও খেলায় ভিড়ে যায়। প্রতি দলেই থাকবে দু' তিনজন ফাস্ট বোলার এবং শক্তিমান 'হিটার'। ছয়ের মারে ছয়-ছয়াকার—দূরের তাল-নারকেল গাছের মাথার ওপর দিয়ে ছয়ের বল আনন্দ ক'রতে ক'রতে উড়ে যায়। সে আনন্দের শিহরণ লাগে গেছো দর্শকদের। চওড়া ঠোঁটে শিস দিতে গিয়ে কিংবা আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিতে গিয়ে দু'চারজন ছেলে-ছোকরা মাটিতে পড়ে যায়। সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, না কোন আক্ষেপ। এ রকম ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। ওরা বলে, নারকেল গাছের পাকা ফল পড়লো। চুয়াল-ভর্তি শ্বেত-পদ্ম ফুটে উঠলো—একটা-আধটা নয়, সারি সারি, সাদা দাঁতের সে হাসি গুণে শেষ হয় না। খেলার শেষে পেটপুরে খাওয়া, পানোৎসব, মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচ-গান। এই পরিবেশ থেকেই একাধিক বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আবির্ভাব।

জনপ্রিয়তার তুলনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়নি, তাছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট

এফ আলেকজান্ডার

গারফিল্ড সোবার্স

কনার্ড হান্ট

খেলার আসল রূপও প্রকাশ পায়নি। নানা কারণের মধ্যে প্রধান কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলার উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভাব। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎকট বর্ণবৈষম্য নীতি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট খেলার অগ্রগতির পথে এতদিন প্রধান বাধা হয়ে ছিল। প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলার বহু ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা উপেক্ষিত হয়েছে এবং সেই জায়গায় নিঃকৃষ্ট শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের সসম্মানে দলভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশের ক্রিকেট সফরে এবং স্বদেশের টেস্ট খেলায় অধিনায়কের পদ লাভ করেছেন শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়রা। মাত্র দু' একটি ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় দল পরিচালনার ভার পেয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেছে অতি সম্প্রতি। সে পরিচয় দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৬০—৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে। এই সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০—৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১—২ খেলায় হেরেছে। তবুও অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ধ্বনি করেছে। মেলবোর্ণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের জন্যে বিরাট নাগরিক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে অগণিত জনগণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দর্শনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ৫ লক্ষের মত। এ রকম জনসমাগম একমাত্র ১৯৫৪ সালে রাণীর আগমনে হয়েছিল।

চারদিক থেকেই জয়ধ্বনি উঠেছে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নামে। ওরেলের নামে অস্ট্রেলিয়া—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার 'ওরেল কাপ'। এই পুরস্কারের প্রবর্তকও অস্ট্রেলিয়া। এ জয়গান শুধু ওরেল বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের নয়, ক্রিকেট খেলার নতুন জীবনের। সেই নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্রিকেট খেলার সূচনা ভারতবর্ষের অনেক পরে। সেখানেও ক্রিকেট খেলার পথপ্রদর্শক ইংরেজ জাতি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আর এস লুকাসের নেতৃত্বে প্রথম ইংলিশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যায়। পাঁচ বছর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে খেলতে যায়। এই সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৭টা খেলায় যোগদান করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ৫, হার ৮ এবং খেলা ড্র ৪। ইংল্যান্ড সফরের অনেক আগে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল কানাডা এবং আমেরিকায় ক্রিকেট খেলে এসেছিল। আমেরিকা থেকেও প্রথম ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এসেছিল, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষকে এই যোগ্যতা পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ প্রথম সরকারী টেস্ট খেলতে নামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সরকারী টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল গডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নামে নিউদিল্লীতে ১০ই নভেম্বর।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যায়—তিনটে টেস্টেই ইংল্যান্ডের ইনিংস জয়। এর পর ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইংল্যান্ড দলকে বেশ বেগ পেতে হয়। মোট ৪টে খেলায় দুই দলেরই একটা ক'রে খেলায় জয় এবং দুটো খেলা ড্র। 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে যায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম 'রাবার' পায় ১৯৩৪-৩৫ সালের টেস্ট সিরিজে, স্বদেশের মাটিতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম 'রাবার' লাভ করেছে ১৯৫০ সালে জে ডি গডার্ডের নেতৃত্বে। এই সময়ের মধ্যে দুই দেশ ৭টা টেস্ট সিরিজ খেলেছে। টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান, দুই দেশই তিনটে ক'রে 'রাবার' লাভ করেছে এবং একটা টেস্ট সিরিজ (১৯২৯-৩০) অমীমাংসিত।

১৯৫০ সালের পর ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মধ্যে আরও তিনটে টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র যায়। ইংল্যান্ড পরবর্তী দু'টো টেস্ট সিরিজে (১৯৫৭ ও ১৯৫৯-৬০) 'রাবার' পায়। ১৯৫৯-৬০ সালের টেস্ট খেলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ইংল্যান্ড প্রথম 'রাবার' লাভ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে যে ৫টি টেস্ট সিরিজ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১) খেলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন সিরিজেই হার স্বীকার করেনি—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২ (১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৪৭-৪৮) এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ (১৯৫৩)। উপর্যুপরি তিনটি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' পায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২টি টেস্ট সিরিজ (১৯২৯-৩০ ও ১৯৫৩-৫৪) ড্র যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বৈদেশিক ক্রিকেট দল হিসাবে

প্রথম 'রাবার' লাভ করে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজে।

পাকিস্তান ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যায় এবং টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ১—৩ খেলায় হার স্বীকার করে। এর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলতে যায় ইংল্যাণ্ড, ১৯৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বৈদেশিক দল হিসাবে 'রাবার' লাভ করে। এ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৮টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৪, হার ২ এবং ড্র ২।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের ইতিহাসে লরী কনস্টানটাইন এবং জর্জ এডলফ্ হেডলি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। কনস্টান-টাইন সম্পর্কে বলা হয়, তিনি শুধু বিশ্বখ্যাতিমান খেলোয়াড় নন—তিনিই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট, যেমন ইংলিস ক্রিকেট ডবলউ জি গ্রেস। জর্জ হেডলি তাঁর খেলোয়াড় জীবনে সাধনা এবং সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে 'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান' আখ্যালাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের আকাশে তিনটি নক্ষত্রের উদয় হল—তিনজনেরই নামের আদ্যঅক্ষর 'ডবলউ'। এ'রা হলেন ওরেল, ওয়ালকট এবং উইকস। এই তিনজন আউট না হওয়া পর্যন্ত কোন দল নিশ্চিন্ত হতে পারতো না, এমন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এ'রা। খেলার ভাষায় এ'রা ছিলেন এক নম্বর শত্রু। যুদ্ধ পরবর্তীকালের খেলায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন আরও অনেকে—রামাধীন, কানহাই, সোবার্স, হাল্ট, হল, প্রভৃতি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন চারজন ভারতীয় রামাধীন, কানহাই, সি সিংহ এবং আসগর আলী। ক্রিকেট খেলায় চীনের নাম গন্ধ নেই। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রবাসী ই চাং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে মোট ৬টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, সবগুলি ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র চীনা খেলোয়াড় তিনিই।

পাশের তালিকায় ১৪ জন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়ের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সাফল্যের রেকর্ড দেওয়া হল। এই চোদ্দজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৬ জন খেলোয়াড়—ওরেল, নার্স, সি স্মিথ, ভ্যালেনটাইন, ল্যাসলি এবং ওয়াটসন ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের টেস্ট সিরিজে খেলেন নি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন। তালিকার বাকি ৮ জন খেলোয়াড় ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের টেস্ট সিরিজে যথাক্রমে ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন। এই ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অনেকেরই আগামী ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের বিপক্ষে যোগদানের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ত্রিনিদাদে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা সুরু হবে। সুতরাং প্রথম টেস্ট খেলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই রেকর্ডগুলির পরিবর্তন হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

(এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রানের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড : ৭৯০ (৩ উইকেটে), পাকিস্তানের বিপক্ষে, কিংস্টোন, ১৯৫৭-৫৮। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রানের রেকর্ড : ৮৪৯ ইংল্যাণ্ড, কিংস্টোন, ১৯৩০)

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন
দলগত রান
ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১২৪, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

	ব্যাটিং			বোলিং		
	মোট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী সংখ্যা	মোট রান	মোট উইকেট
রামাধীন	৪৩	৩৬১	৪৪	—	৪৫৭৭	১৫৮
ওরেল	৪১	৩০৮৬	২৬১	৯	২৪৪৮	৬৪
সোবার্স	৩৭	৩৩৫২	৩৬৫*	১১	২৩৮৮	৫৫
ভ্যালেনটাইন	৩৪	১২৩	১৪	—	৪১০১	১৩৭
কানহাই	২৫	২১৪৫	২৫৬	৫	২	০
আলেকজাণ্ডার	২৫	৯৬১	১০৮	১	—	—
হান্ট	২১	১৫২৭	২৬০	৪	৩০	১
হল	১৮	২৬০	৫০	—	২১১২	৮৯
সলোমন	১৪	৭৯৫	১০০*	১	১৩৬	১
গিবস	১১	১৬৬	২২	—	১০২৮	৪৪
ওয়াটসন	৬	১২	৫	—	৬৯৮	১৮
নার্স	৪	২৬২	৭০	—	—	—
স্মিথ (সি)	৪	২০৬	৫৫	—	—	—
ল্যাসলি	২	৭৮	৪১	—	—	—

* নট আউট। দ্রষ্টব্য : উইকেট-কীপার আলেকজাণ্ডার আর ৩৯ রাণ এবং ১০ জনকে আউট করতে পারলেই 'ডাবল' সম্মান (১০০০ রাণ এবং ১০০ জনকে আউট) লাভ করবেন।

টেস্ট রেকর্ড

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

মোট খেলা ১৫, **ভারতবর্ষের জয়** ০, **হার** ৫, **খেলা ড্র** ১০

মোট সিরিজ ৩, **ভারতবর্ষের জয়** ০, হার ৩

এক ইনিংসে সর্বাধিক
দলগত রান
ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৫৪, নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৪৪৪, কিংস্টোন, ১৯৫৩

(এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রানের ভারতীয় রেকর্ড : ৫৩৯ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), পাকিস্তানের বিপক্ষে, মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১। ভারত-বর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রানের রেকর্ড : ৬৭৪ অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৪৭-৪৮)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৫৭৬, কিংস্টোন, ১৯৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ১২৯, বার্বাদোজ, ১৯৫৩

(এক ইনিংসে সর্বনিম্ন দলগত রানের ভারতীয় রেকর্ড : ৫৮ রান, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮ এবং ৫৮ রান, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন দলগত রানের রেকর্ড : ১০৫ অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২২২, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২২৮, বার্বাদোজ, ১৯৫৩

(এক ইনিংসে সর্বনিম্ন দলগত রানের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড : ৭৬ রান, পাকিস্তানের বিপক্ষে, ঢাকা ১৯৫৮-৫৯। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড : ৮২ রান অস্ট্রেলিয়া, এডলেড, ১৯৫১-৫২)

সেঞ্চুরী সংখ্যা

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২৮

১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলার তারিখ ঃ ১ম টেস্ট (ট্রিনিদাদ) ঃ ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১। ২য় টেস্ট (জামাইকা) ঃ মার্চ ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২। ৩য় টেস্ট (বারবাদোজ) ঃ মার্চ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮। ৪র্থ টেস্ট (বৃটিশ গায়না) ঃ এপ্রিল ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১২। ৫ম টেস্ট (ট্রিনিদাদ) ঃ এপ্রিল ১৮, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৪।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ

ভারতবর্ষে ঃ ১৩৪* বিজয় হাজারে, বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ঃ ১৬৩* মাধব আপ্তে, ট্রিনিদাদ, ১৯৫৩

(এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ভারতীয় রেকর্ড ঃ ২৩১ রাণ—ভি মানকড়, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ঃ ২৫৬ রান—কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ

ভারতবর্ষে ঃ ২৫৬ আর কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ঃ ২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টোন, ১৯৫৩

(এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড ঃ ৩৬৫ নট আউট—গারফিল্ড সোবার্স, পাকিস্তানের বিপক্ষে, কিংস্টোন, ১৯৫৭-৫৮ (বিশ্ব রেকর্ড)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে রেকর্ড ঃ ৩৩৭ হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), বার্বাদোজ, ১৯৫৭-৫৮)

ডাবল সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ শূন্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ৩টি—২৫৬ রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯; ২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টোন, ১৯৫৩ এবং ২০৭ এভার্টন উইকস, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৫৩।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রান

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ ৫৬০ (এভারেজ ৫৬·০০)—রুসী মোদী, ১৯৪৮-৪৯ (ভারতবর্ষে)। ৫৬০ (এভারেজ ৬২·২২)—পলি উমরীগড়, ১৯৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ৭৭৯ (এভারেজ ১১১·২৮)—এভার্টন উইকস, ১৯৪৮-৪৯ (ভারতবর্ষে) এবং ৭১৬ (এভারেজ ১০২·২৮)—এভার্টন উইকস, ১৯৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে))।

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ শূন্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ১৬২ ও ১০১—এভার্টন উইকস, কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯।

বোলিং রেকর্ড

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট ঃ

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ ৯ উইকেট ১০২ রানে—সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ৬ উইকেট ৫০ রানে—হল, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯ এবং ৬ উইকেট ৫৫ রানে—গিলক্রিস্ট, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

একটি টেস্টে সর্বাধিক উইকেট ঃ

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ ১০ উইকেট (২২৩ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ১১ উইকেট (১২৬ রানে)—হল, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট ঃ

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ ২২ উইকেট (এভারেজ ৪২·১৩)—সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫৮-৫৯ (ভারতবর্ষে) এবং ২৭ উইকেট (এভারেজ ২৯·২২)—সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ৩০ উইকেট (এভারেজ ১৭·৬৬)—হল, ১৯৫৮-৫৯ (ভারতবর্ষে) এবং ২৮ উইকেট (এভারেজ ২৯·৫৭)—ভ্যালেনটাইন, ১৯৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে)।

উইকেট-কিপিং

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট ঃ

ভারতবর্ষের পক্ষে ঃ ৭—এন তামহানে, ১৯৫৮-৫৯ (৪টি টেস্টে)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ঃ ১৮—আলেকজাণ্ডার, ১৯৫৮-৫৯ (৫টি টেস্টে)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th February, 1962
40 Naya Paise.

সজনীকান্ত দাস

সুপরিচিত সাহিত্যিক এবং 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের জীবনাবসান হ'য়েছে, এসংবাদে সকলেই মর্মাহত হবেন।

সজনীকান্ত কবি, গল্পকার এবং উপন্যাস-লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল সমালোচক হিসাবে। একদা তিরিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই বাংলা-সাহিত্যে একবার হাওয়াবদল ঘটে। গল্প-উপন্যাস-কবিতায় তখন দেখা দেয় সেই সব যুগলক্ষণ যাকে আমরা বলি আধুনিকতা। ফ্রয়েড এবং মার্ক্সের যুগান্তকারী মতবাদের প্রভাবে সেই যুগের তরুণ কবি-সাহিত্যিকগণ জীবনকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। তাঁরা প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে মানবিক সম্পর্ক এবং মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার ব্রত গ্রহণ করেন—তাঁদের বিষয়বস্তু-নির্বাচন এবং ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে দেখা দেয় বেপরোয়া বিদ্রোহের আভাষ।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায়, এই বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল। 'কল্লোল-যুগ' নামে পরিচিত সেইকালের তিরিশ বছর পরে আজ আমরা নিঃসংশয়েই দেখতে পাচ্ছি, সেদিনের তরুণ লেখকদের ঐ পরিবর্তনপ্রয়াস বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সুফলপ্রসূ হ'য়েছে। কিন্তু যে-সময়ে ঐ আন্দোলন বাংলার স্তিমিতবেগ সাহিত্য-ধারায় 'পাহাড়ী ঢল' এনেছিল তখন তার মধ্যে গতির প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে তলানি-গুলিয়ে-ওঠা আবিলতাও দেখা গিয়েছিল প্রচুর পরিমাণেই।

সজনীকান্ত ঐ আবিলতার বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচক হিসাবে আবির্ভূত হন বাংলা-সাহিত্যে। আজ তিরিশ বছরের ব্যবধানে সে যুগের উত্তেজনা ও উদ্বেগ শান্ত হ'য়ে আসার পর একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা গেছে যে, সজনীকান্তের সেই আবির্ভাব ছিল ইতিহাস-নির্দিষ্ট। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যেমন শাসকদলের মুখোমুখী থাকে বিরোধীপক্ষ, সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যেও তেমনি দরকার শক্তিশালী প্রতিবাদের কণ্ঠ। সজনীকান্ত বাংলাসাহিত্যের আসরে সেই বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন তাঁর দায়িত্ব।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সজনীকান্ত কবিতা, বিশেষ করে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন যথেষ্ট, নকসাজাতীয় ছোট গল্পেও ছিল তাঁর গদ্য রচনার মন্তব্যগুলি একাধারে সরস ও তীক্ষ্ম। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক, সে বিষয়ে তাঁর মনীষাও ছিল তেমনি গভীর। বস্তুত তাঁর মতো মনেপ্রাণে সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ সমস্ত যুগেই দুর্লভ।

ব্যক্তিগত জীবনে সজনীকান্ত অত্যন্তই সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'তে তিনি কেবল আধুনিকতার নামে আতিশয্যকেই আঘাত করেননি, নতুন একদল সাহিত্যিককেও নবপ্রেরণায় উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, তাঁরা আজ অনেকেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সজনীকান্তের বন্ধুকৃতির বিষয়ে মুক্তকণ্ঠ।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর বৎসরে হারিয়েছি আমরা অনেক সুসাহিত্যিককেই। সেই শোকার্ত তালিকায় সজনীকান্তের নামও যুক্ত হল, কিন্তু সে নাম মহাকালের বিচারে ভাস্বর হ'য়ে থাকবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কবিতা
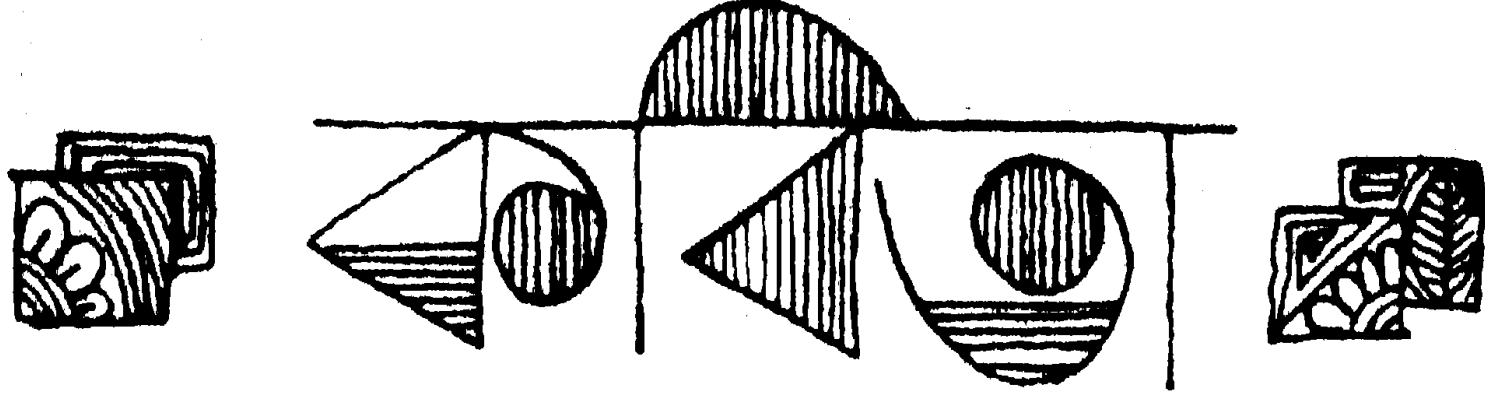
অধরা পীবর হাসি

তরুণ সান্যাল

অধরা পীবর হাসি অধরে ছোঁয়ায়ে রেখেছিলে,
আপাতগম্ভীর চক্ষু—কূপকেন্দ্রে গভীর তমসা
যেমন স্ফটিকস্বচ্ছ আকাশ ও মেঘখণ্ড, নীলে,
দর্পণে মুখশ্রী হেরে, ঐরূপ দান্ত, তন্দ্রালসা।
মাঠের রাত্রির দীর্ঘ পথশ্রমে প্রাগুষার আগে
যেমন ধবলছায়া চেনাজনপদে অট্টালিকা,
অথবা কুয়াশাঘন সাঁঝে সন্ধ্যাতারকার দাগে
দূরত্ব যেমন, তুমি অনুরূপ অচেনা, বালিকা।

অথচ ক্ল্যাসিক কবিকুলে লয়ে তোমার চক্ষের
অপাঙ্গের হিঙ্গুলাভা বক্ষ দেয় পদে, লাক্ষারসে,
আমারও মঞ্জীর হতে সাধ হয়, কিবিধ লক্ষ্যের
স্বেচ্ছাধরাশায়ী হব আক্রমণে এমন বয়সে!
ভুলিব না, অধরোষ্ঠে হাসি ছিল বঙ্কিম, সজলে,
আশ্বিনে উষায় যথা থাকে ফুল, শাদা, শিউলি তলে॥

* * *

প্রাতিভাসিক

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সমস্ত নদীর জলে জেগে ওঠে প্রবল উৎসাহ।
প্রতিটি শরীরে জ্বলে নির্জন মরণশীল আলো,
অন্ধকারে শব্দহীন আদিগন্ত শোণিতপ্রবাহ
নক্ষত্রখচিত খড়্গে ঝলসে ওঠে কেমন ধারালো!

মধ্যরাত্রে অরণ্যের স্বাভাবিক বিক্ষোভ বিরোধ
আপাতত আন্দোলনহীন।
পরিশ্রান্ত বাতাসেরা ভুলতে চায় বেগবান বোধ
হৃদ্‌পিণ্ড রক্তাক্ত করে চাঁদের সঙ্গীন।

অথচ প্রতিটি দেহ বিনিদ্র স্রোতের প্রতিকূলে,
গলায় বিচিত্রবর্ণ আকাঙ্ক্ষার ফাঁস;
কেবল সমস্ত নদী দেখতে পায় হৃদয়ের বাতায়ন খুলে
কয়েকটি যিশুর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ভোরের আকাশ।

এই ঠাণ্ডা, নির্জন আঁধারে

বংশীধারী দাস

যেখানে আলোও নেই, স্বপ্ন নেই, সেই অন্ধকারে
তাকে তোমরা দুই হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতে দাও—
কে তোমরা ত্বকের নিচে ক্ষুব্ধ ঝড় গোপনে ছড়াও?
হে স্মৃতি, হে প্রিয় সখী, তুমি থাকো শিয়রের ধারে।

না, তুমিও ফিরে যাও, হে বিষাদ, স্মৃতির বিষাদ,
তোমার দন্তিল রূপ সহ্যাতীত, তুমি যে গোপনে
কুরে-কুরে খাও তার বুকের পাঁজর। বিস্মরণে
বরং শান্তিতে ঝরে যাক ওই রক্তহীন চাঁদ।

তাকে তোমরা থাকতে দাও এই ঠাণ্ডা, নির্জন আঁধারে
দুই হাতে মুখ ঢেকে; এই যে পৃথিবী চারধারে
রূপময়, দৃশ্যময়, নিশ্চরিত্র এই যে আলোক—
স্মৃতির যন্ত্রণা হানে, যন্ত্রণায় বিশ্ব করে চোখ।

বাক্যহীন আমি যাবো তার পাশে, যেহেতু ভাষার
সাধ্য নেই ছোঁয় তার গভীর যন্ত্রণা, অন্ধকার।

দূরদৃষ্টি

জৈমিনি
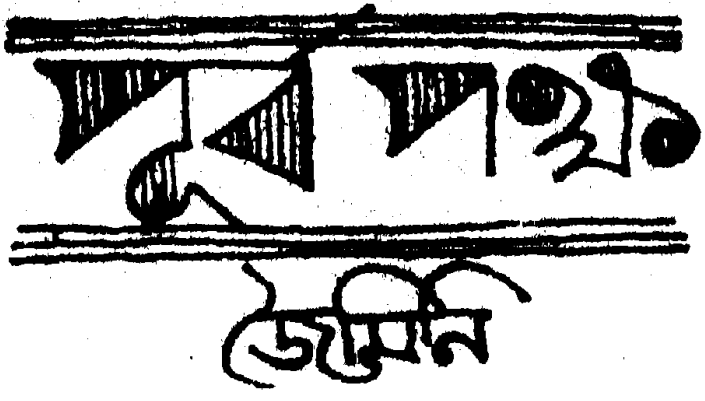
ভদ্র মহোদয়গণ! আমি কালাপাহাড় নই। নির্বিচারে সৌন্দর্য-ধ্বংস করাই আমার জীবনের পরম ব্রত নয়। পরন্তু আমি বর্তমান কালের মানুষ, এবং একালে রচিত শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবে একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে-পরিমাণে চিত্তোৎকর্ষ ঘটা সম্ভব তাও আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আধুনিক যুগের কথাসাহিত্য আনন্দের সঙ্গে পাঠ করি, আধুনিক কবিতাও কিছু পরিমাণে আমাকে নাড়া দেয়। একালের সিনেমার আমি একজন উৎসাহী ভক্ত, আধুনিক রঙ্গমঞ্চও আমাকে অনেকখানি আশান্বিত করে তোলে। কিন্তু, হায়, আধুনিক গান এবং আধুনিক চিত্রশিল্প আমাকে কিছুতেই আনন্দিত করতে পারে না—এতে আমি উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করি।

গানের কথা আগে একবার নিবেদন করেছি, পরে না হয় আবার বলা যাবে। এবার চিত্রশিল্পের বিষয়ে আমার চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ নিবেদন করি।

চিত্রশিল্প অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে বলে ছবি, সেটা নেহাৎই চোখে দেখার ব্যাপার। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাগজ বা ক্যানভাসের উপর রঙ আর রেখার সাহায্যে রূপের আভাস ফুটিয়ে তোলাই বোধহয় ছবির স্বধর্ম। রূপ-বস্তুটির এমনি মহিমা যে দেখা মাত্রই মানুষকে তা আকৃষ্ট করে। অবশ্য 'মানুষ' বলে কোনো সাধারণ গণ্ডি টানা আজকের দিনে ভুল তা আমি স্বীকার করি। যে অর্থে সব মানুষই আজকের দিনে ভোটের অধিকারী সেই অর্থে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যে শিল্প-সচেতন হবে এমন কোনো কথা নেই। সভ্যতার বিস্তীর্ণ ইতিহাস অতিক্রম ক'রে শিক্ষিত মানুষ আজ এমন ধরনের সূক্ষ্ম রসবোধের অধিকারী হ'য়েছে যা আমাদের আদিম যুগের পূর্বপুরুষ কিংবা বর্ত-মান যুগের অ-সংস্কৃতচিত্ত মানুষের অনধিগম্য। কাজেই একালের ছবিও একালের শিক্ষিত মানুষেরই প্রত্যাশী—যে মানুষ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়িক অর্থেই শিক্ষিত নয়, যার চোখজোড়াও চিত্রদর্শনে শিক্ষিত।

এ সবই আমি সবিনয়ে মেনে নেব। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি নিবেদন করব, ছবি দেখার প্রাথমিক সর্তে ফেল হ'য়ে যাই এমন দর্শক হয়ত আমি নই। অন্তত, আমার মতো দর্শককেও যদি অস্পৃশ্য জ্ঞানে সরিয়ে রাখতে হয় তাহলে কল-কাতার মতো শহরে ছবির এগ্‌জিবিশন খোলার যে কোনো মানেই হয় না, সেটা আমি সরবেই ঘোষণা করব। কারণ, অপ্রিয় সত্য হলেও আমি বলতে বাধ্য, ও-সব প্রদর্শনীতে যাঁরা নয়ন সার্থক করতে (এবং করাতে) যান তাঁরা শতকরা নিরানব্বুই জনই আমার মতো দর্শক। তাঁদের যদি বাদ দিতে হয় তাহলে প্রদর্শনী ঘরের চারদিকে ছবি টাঙানোর পর সদর দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে উদ্যোক্তাদেরই পরস্পরকে বাহবা দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

হয়তো সদর দরজা খোলা রেখেও পরিণামে ব্যাপারটা ঐ রকমই দাঁড়ায়। প্রদর্শনীটির উদ্‌ঘাটনের জন্যে যদি কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন,

তিনি অনিবার্যভাবেই ছবির বিষয়ে কতকগুলি মামুলি কথা বলে কর্তব্য সমাধা করেন। কিংবা, শিল্পী যদি প্রভাবশালী ব্যক্তি হন, তাঁর বরাতে জোটে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যার এক বর্ণও যদি সত্যি হত তাহলে অনায়াসে তিনি স্থান পেতেন পিকাসোর পাশে!

কিন্তু এসব কথা না হয় বাদ দিলাম। প্রশংসা না করলে শিল্পীরা তাঁদের আদর করে ডেকে আনবেন কেন? সে কথা থাক। ছবি দেখার পর শিল্প-সমালোচকেরা যা বলেন এবং লেখেন সেইটেই হল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বাংলা দেশে, ছবির সমালোচনাও যেন সেই ধরনেরই একটি উচ্চমার্গের আর্ট! জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল, জ্যামিতিক প্যাটার্ন এবং সর্বশেষে কিন্তু সর্বোপরি সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম—এই কথাগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রয়োগ করাই হল চিত্র-সমালোচনার পরম কৌশল। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, সমালোচকেরা ছবির বিষয় কিছু বোঝেন না। অনেকেই সম্ভবতঃ বোঝেন। কিন্তু তাঁরা তো ভ্যাকুয়ামের মধ্যে কাজ করেন না, কাজ করতে হয় একটা পরিবেশের মধ্যে। সেই পরিবেশের আচরণবিধিই সর্বপ্রযত্নে মেনে চলেন তাঁরা। ফলে যেমন করে সমালোচনার কথা বলা রেওয়াজ তেমনি করেই বলেন তাঁরা। এবং পরিণামে একটি ছবির প্রদর্শনী থেকে অন্য প্রদর্শনীর বিন্দুমাত্র গুণগত পার্থক্যও তাতে ধরা পড়ে না।

এ এক অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। মুড়ি আর মিছরি এখানে প্রায় সমান দরে বিকোয়। ফলে একদিকে যেমন এখানে প্রকৃত গুণগ্রাহিতার অভাবে ক্ষমতাবান শিল্পী মাঝারীর ভিড়ে হারিয়ে যান, অন্যদিকে তেমনি সহজে বাহবা কুড়োনোর প্রলোভনে অজস্র অপটু ভাগ্যান্বেষীর সমাগম ঘটতে থাকে। বস্তুত কিছুকাল যাবৎ এ'দের ভিড়ই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যেন!

যে-কোনো ব্যক্তি তুলি-ধরা শিখেই দেখছি আজকাল ছবির এগজিবিশানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠছেন। দুখানি হাত থাকলেই যে ছবি আঁকা যায় না, অনেক প্রদর্শনী দেখেই সেটা বিশ্বাস হয় না। অ্যাবস্ট্রাকশানের নামে অজস্র বিকৃতি পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চারদিক থেকে। বিমূঢ় সমালোচক ও দর্শক তাদের ব্যাখ্যা করার জন্যে গলদ্‌-ঘর্ম হচ্ছেন।

কিন্তু আসল কথাটা কেউই স্পষ্ট ক'রে বলছেন না। সেটা হল এই যে, অধিকাংশ ছবিই ছবি নয়, চিত্রকরেরাও বেশীর ভাগই শিল্পী নন। তাঁরা হলেন নকলনবীশ, বিদেশী ছবির নিকৃষ্ট প্রতিলিপির অক্ষম অনুকারী মাত্র। তাই বেশীর ভাগ আঁকিয়েরই নিজের কোনো অংকনশৈলী নেই, চারিত্র্য নেই, এবং বক্তব্য তো নেই-ই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যে কয়খানি ছবি এ'রা এগজিবিশানে হাজির করেন তার বেশী ছবি এ'রা আঁকেননি অনেকেই। সাধনার কথা দূরে থাক, যে-কোনো শিল্পরূপের মতোই ছবিও যে একটি নিয়ত চর্চার যোগ্য বস্তু তাও এ'রা জানেন কিনা সন্দেহ। হুজুগের টানে দু দশ টুকরো ক্যানভাসের উপর রঙ বুলিয়েই এ'রা ছোটেন এগজিবিশান করতে, এবং সেই সব এগজিবিশানেই আমরা চোখ গোল করে ঢোক গিলতে গিলতে বাহবা দিতে থাকি। আত্মছলনারও একটা সীমা থাকা দরকার!

আমরা ছবি চাই, ভালো ছবি। আমরা এমন সব প্রদর্শনীতে গিয়ে দাঁড়াতে চাই যেখানে উপস্থিত হলেই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আমাদের সচেতন করে তুলবে। আমরা পরিচিত জীবন ও জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অস্তিত্বের অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাব। আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত আরো একটু প্রসারিত হ'য়ে মানুষ হিসাবে আমরা কিছুটা পরিবর্তিত হব—সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হব।

তেমন ছবি যদি শ'য়ে শ'য়ে না পাই, ক্ষতি নেই, দু দশখানা পেলেই খুশি আমরা। কিন্তু আগাছাকেই মনোরম উদ্যান বলার ভ্রান্তিবিলাস থেকে মুক্তি চাই। সমালোচকেরা কঠিন হাতে নিড়ানি ধরুন। জাত ফুলের গাছ যদি একটি কি দুটিও থাকে তো সেগুলি নিশ্বাস ফেলে বাঁচুক—কুসুমিত হয়ে উঠুক। এই অযোগ্যের ভিড় অসহ্য!

ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্কট ও শিল্পী

রবীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর থেকে যুগে যুগে, পুরুষানুক্রমে ইউরোপ আমাদের শিক্ষায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে ও চিন্তাশীলতায় অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে ও প্রভাবান্বিত করে এসেছে। আমাদের জাতীয়তাবোধের সূচনা থেকে শুরু করে উগ্র ইউরোপ-প্রীতি এবং তার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদ, উভয়ই সেই অনুপ্রেরণা ও প্রভাবের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। মধ্যবিংশ শতাব্দীতে তাই যখন স্বভাব ও অভাব-বশে ইউরোপের দিকে তাকাই তখন দেখি ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, সাহিত্যে ও শিল্পে নিদারুণ রিক্ত এবং ইউরোপের মানুষেরও নতুন কোন জীবনাদর্শ নেই বরং গভীর আত্মিক অসুস্থতায় সে মুহ্যমান।

মধ্যবিংশ শতাব্দীর মানুষের এই যে 'অসুস্থতা' সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় চিন্তা-শীল শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা সচেতন হয়েছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। Colin Wilson-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে (G. P. Oটিতে X' mas-এর ছুটিতে কাজ করার সময়) তিনি যখন জানালেন যে, মধ্যবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট-মোচনের জন্যে 'Visionary' হওয়া চাই যেমন ভারতবর্ষের 'রামকৃষ্ণদেব' ইত্যাদি, তখন স্বভাবতই ধর্মপ্রসবিনী ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম যে, যে দেশ গীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জন্মদাত্রী সে দেশের মানুষের 'অসুস্থতা' ও সংস্কৃতির যে সংকট তার সমাধান কি বা কে করবে? এর জবাব পেলাম না; তার পরিবর্তে Colin জানালেন যে, এই 'সংকট' ইয়োরোপের এবং তিনি ভারতবর্ষের দেশ, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষজনকে জানতে উৎসুক নন্, তিনি শুধু চান ভারতের বুদ্ধ, রামকৃষ্ণের মত 'Visionary'দের। Colin ও তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যিক ও সমালোচক বন্ধু Stuart, শিল্পী David এবং কয়েকজন বোহেমিয়ান 'ইনটেলেকচুয়াল'-এর সঙ্গে আলাপে বিশেষ করে Colin-এর "Emergence From Chaos" ও "Outsider"-এর পাণ্ডুলিপি পাঠের আলোচনায় জানলাম যে খৃীষ্টধর্ম ইউরোপকে বিফল করেছে এবং ধর্মহীন ইউরোপের অসুস্থতার একমাত্র সমাধান একটা 'Scientific Religlon'-এর প্রবর্তন এবং শিল্পীরা যাঁরা 'Vision' দিয়ে অজানায় যাত্রা করেন, 'জানা'র সীমাকে বিস্তৃততর করেন তাঁদেরই এ দায়িত্ব। কিন্তু অসুস্থ, রুগ্ন সমাজ ও মানুষের মধ্যে শিল্পীরা থাকতে পারেন না। তাই Colin জানালেন যে তিনি সমাজবিরোধী—একজন "Outsider"। ইউরোপীয় সভ্যতার সংকট সমাধানের এই যুক্তির বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে যে, সভ্যতার এই সংকট ও মানুষের আত্মিক অসুস্থতা কি কেবলমাত্র ইউরোপের এবং তার সমাধান কি বৈজ্ঞানিক যুগে "Scientific Religlon"এ? এবং ইউরোপ কি কোনও "Religion"এর জন্ম দিয়েছে বা জন্ম দিতে পারবে? মানুষ, সমাজ, ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য ও ঐকাত্ম্য সম্পর্কের যে অভাব তা কেবলমাত্র ইউরোপীয় জীবনেই সীমিত নয়; বর্তমান সভ্যতার এ সংকট সর্বমানবীয়। ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মননশীলতায় বিশ্ব-রহস্যের "এক হতে বহু ও বহু হতে এক" বোধের দারিদ্র্য ইউরোপের বৈশিষ্ট্য এবং এর ফলে ইউরোপ ক্রমাগত নতুন নতুন "মূল্য" সৃষ্টি করে আসছে এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চলিত মূল্যকে বর্জন করে নতুন মূল্য সন্ধান করছে। ইউরোপের চিন্তাধারার বিবর্তন ইতি-হাসের গতি লক্ষ্য করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙাগড়ার সঙ্গে পা ফেলে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক যে অদলবদল, ভাঙাগড়া হয়ে আসছে, তাদের সমর্থনে নতুন নতুন জীবন মূল্যায়নেরও উদ্ভব হয়েছে। কখনও ভাঙার প্রয়োজনে, কখনও পরিপোষণের জন্যে এবং সর্বদাই চলিত অবস্থা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—তাই ইউ-রোপের বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক ছবি হচ্ছে চলিষ্ণুতার—এবং সেই চলার পথে সর্বদাই একটা পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। ছোট ছোট বিপ্লব আর বিবর্তনের সম্ভাবনায় ইউরোপ স্পন্দিত হচ্ছে—এবং তার প্রথম ও স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় ইউরোপের মনন-শীলতায়, শিল্পে সাহিত্যে। শিল্পীরা সব সমাজেই সবচেয়ে বেশী অনুভূতিশীল। ইউরোপে আবার সমাজ ও শিল্পীর মধ্যে সমতার অভাবটা প্রায়ই বেশী। এই নিত্য অস্থির প্রবাহের মধ্যে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিপ্লবগুলো সঞ্চিত প্রতিক্রিয়ার
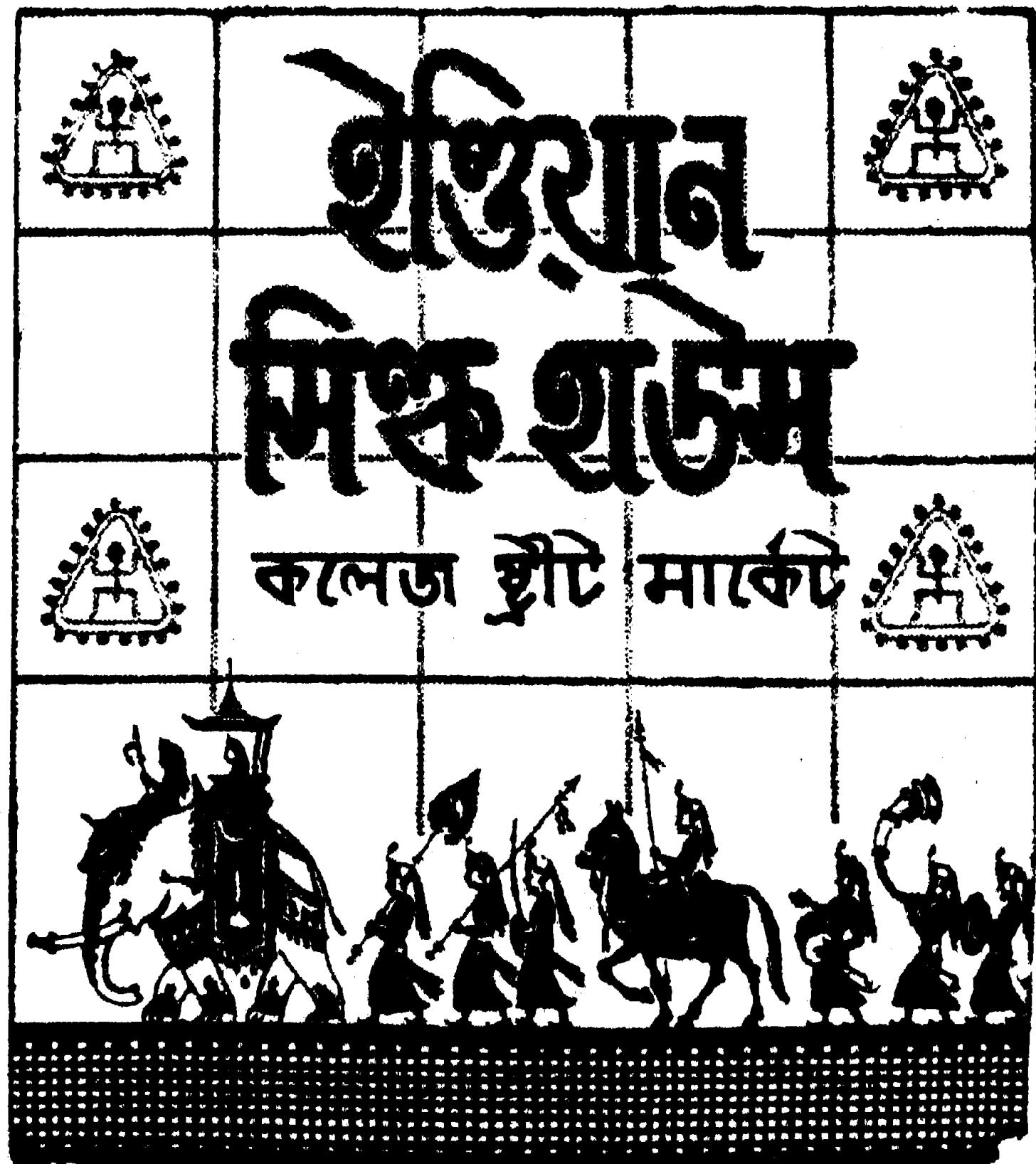
বিস্ফোরণ এবং অব্যবহিত ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অন্তরবর্তীন ছেদ।

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব এবং নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাক-বিপ্লব, চলিত অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া মাত্র। বুদ্ধি ও যুক্তি হল হাতিয়ার; ধর্ম, বেদী ও সিংহাসনকে গিলোটিনের তলায় বলি দেওয়া হ'ল। ফরাসী বিপ্লবের আদি চেহারাটা হারিয়ে গেল। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবকে সমগ্র ইউরোপের বিপ্লব করে তার পুরোহিত হলেন নিজের অজ্ঞাতেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিপ্লব ও যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নতুন শ্রেণী তার অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একত্রীভূত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারক হ'ল। ইউরোপের শিল্পী-সাহিত্যিক মননশীলেরা ফরাসী বিপ্লবকে উচ্ছ্বাসভরা আহ্বান জানিয়েছিলেন গোড়াতে। বিপ্লবোত্তর ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের চেহারা দেখে ইউরোপীয় চিন্তায় আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ততদিনে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী নব মূল্যায়নে সমাজ গড়ে তুলছে পাকাপাকিভাবে অনুভূতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সমাজের পরগাছা হয়ে Outsider গোষ্ঠী গড়ে তুললেন সঙ্গীহীন অসন্তোষ ও ক্ষোভে।

ইউরোপীয় চিন্তাসূত্রে ধনভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার যুগান্তকারী প্রতিক্রিয়া মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ। চিরাচরিত আদর্শবাদের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ও বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়ার জন্যে নতুন "বাদের" ভিত্তির নাম দেওয়া হল "বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রবাদ"। খৃষ্টীয় ধর্ম ও বিশ্বাসের যে শূন্যস্থান বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ পূরণ করেছে তার ওপর একমাত্র বিজ্ঞানেরই বেদী হওয়া স্বাভাবিক ছিল—এবং মার্ক্সবাদ একান্তই ইউরোপীয় চিন্তা প্রবাহোদ্ভূত আর একটা দশা। পশ্চিম ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় নতুন শোষণ নীতি পুরোদমে চালু থাকলেও এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে শোষিত সম্পদসমৃদ্ধির ফলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ভেতরের ব্যবস্থা অবস্থানুযায়ী সংশোধিত ও সহনীয় হতে লাগল ফলে চলিত ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক বিপ্লব দিয়ে ভেঙে ফেলার মত চরম অবস্থায় পৌঁছল না। [illegible] শ্রেণী ও তাদের [illegible] মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রভাবে শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠী [illegible] ব্যবস্থার নতুন শোষণ নীতির [illegible] হলেন। "Outsider" গোষ্ঠী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশের শহর ও নগরগুলি ছাড়া থাকতে পারেন না অথচ নতুন নগরজীবনের অসহনীয় নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার পরিবেশই তাদের নব নব প্রতিক্রিয়ার চেতনা যোগায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত) পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যখন দেশের ভেতরের অবস্থা উন্নততর করেও এশিয়া আফ্রিকা ও নতুন মহাদেশগুলিতে পূর্ণমাত্রায় শোষণযন্ত্র চালিয়ে একটা স্থিতিস্থাপকতা ও সমৃদ্ধির পাকা বন্দোবস্ত করে এনেছে, সেই সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক জগত নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া, বৈপ্লবিক বুদ্বুদ ও সামগ্রিক লুণ্ঠিত-বিলাসের বিভিন্ন প্রকাশে ভরা। এই যুগের ইউরোপীয় শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ইতিহাস পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রায় সবাই Isolate আর Outsider।

Cezanne ইউরোপীয় শিল্পবিবর্তনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। সমাজের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না। মানুষ ও সমাজ থেকে নিজেকে একান্তে সরিয়ে এনে উন্মুক্ত প্রকৃতির Idyllic পরিবেশে Cezanne তাঁর Promised land ও Absolute কে খুঁজে বেড়ালেন। সমসাময়িক শিল্পী Van Gogh Ganguin, Matisse, Zola, এবং Rilke সবাই Isolate,—উন্মাদ ও মুমুক্ষু।—সমসাময়িক পরিবেশ ও সমাজের কাছে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত, সমাজ, মানুষ ও ইউরোপীয় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তাঁরা একান্তই সমাজবিরোধী।—হয়ত তাই Ganguin পারিপার্শ্বিক ইউরোপীয় সভ্যতার বার্ধক্যকে "rejuvenation through barbarism" করতে তাহিতি দ্বীপে বৃথা আশ্রয় খুঁজলেন। Van Gogh-এর প্রায়-আত্মহত্যার জন্যে তাঁর নিজের কোন আক্ষেপ ছিল না। সমসাময়িক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বরবাদ করতে ইউরোপের শিল্পীগোষ্ঠী অজানা নতুনের খোঁজে হাতড়ে বেড়ালেন নানান সূত্র ধরে—barbaric simplicity থেকে solidity এবং Cubism থেকে Russeaue-র Naivity: শিশু শিল্পকলার নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হল। যন্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার বন্ধ অনুভূতি শিল্পী ও চিন্তাশীলদের ঘাড়ে জগদ্দল মত বসে আলো ও বাতাস কেড়ে নিল। ইউরোপীয় শিল্পীরা ছুটলেন আফ্রিকার ও Pacific Islands-এর বর্বর আদিমদের কাছে নতুন জীবনের দীক্ষা নিতে।—Picasso ইউরোপীয় শিল্পের পৌরহিত্য নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা শুরু করলেন। Guillanue Apollinaire, Max Jacob, Gertrude Stein, Alfred Jarry সকলেই প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া ও ধ্বংসের জয়গান গাইলেন। ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্যজগতে যখন Isolate ও Outsider শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা absolute-এর খোঁজে বৈপ্লবিক ভাঙাগড়ার গবেষণায় ব্যস্ত, তখন বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা (metaphysics) জগতে নতুন নতুন আবিষ্কার আর এক বিপ্লবের সূচনা করল। Einstein-এর Space ও time-এর ওপর নতুন আলোকপাত জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চিরাচরিত ধারণাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিল। শিল্পীরা যেমন আদিম বর্বর মানুষের কাছে ছুটলেন মূলসূত্র খুঁজতে তেমনি Freud তাঁর Interpretation of Dreams ও Psychopathology of Everyday life-এ মানুষের মনের নানান আবেগের অন্তর্নিহিত সূত্র খুঁজলেন। ইউরোপীয় চিন্তাজগত থেকে ধর্ম ও বিশ্বাসকে উৎখাত করার ফলে প্রকৃতি ও জগৎ যেমন বস্তুময় ও অপরিচিত হল, তেমনি তাকে বোধগম্য করার জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষণ এগিয়ে এল। বিশ্বাসহীনদের কাছে বিজ্ঞান তখন নতুন ও একমাত্র ভরসা। যৌন বিকারের ভিত্তিতে মানুষের মনের ও চেতনার যে নানা প্রকাশ—Freud-এর এই বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী তত্ত্বের প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। Sexকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ায় তার নবজন্ম লাভ ঘটল। Hedonism নবজন্ম লাভ করে দুর্দম হ'ল।

ইতালীর অতীত শিল্পউৎকর্ষের ভগ্নস্তূপের লজ্জাকে ঢাকতে Futurist দল তৈরী হ'ল।—শিল্পী Vincির চেয়ে যন্ত্র আবিষ্কারক Vinci বড়—রণতরী নারী দেহের চেয়ে সুন্দরতর এবং প্রেম—ঘোষিত হল ঊনবিংশ শতাব্দীর নক্কারজনক মিথ্যাচাররূপে। Mussoliniর কণ্ঠস্বর খুব কাছাকাছি শোনা গেল: Futurist-দের সাহিত্যে ভাষাপ্রয়োগ চিরাচরিত নিয়মমাফিক হল, সঙ্গীত হল শব্দ (noise) সমন্বয়, তাতে চিৎকার, আর্তনাদ, নিনাদ রেল-

গাড়ীর বাঁশী, যন্ত্রের গর্জন, যোজিত হ'ল! নিগ্রোসঙ্গীতের আদিম ও বর্বর বন্ধনহীন স্পন্দন ইউরোপের সুসভ্য সঙ্গীতকে নতুন দীক্ষা দিল। অঙ্কন-শিল্পে একমাত্র স্থান পেল উদ্দাম বেগ-মত্ততা ও বন্ধনহীন আত্মপ্রকাশ—মাধ্যমের কোন বিচার রইল না।—অঙ্কনশিল্পে নিয়মভঙ্গই হ'ল উৎকর্ষের মাপকাঠি। ইতালীর Futurism, সুইজারল্যান্ডে Tristan Tzaraর নেতৃত্বে আর এক রূপ নিয়ে Dadaism, আন্দোলনে পরিণত হল।

ইতালীতে যেমন Futurism, অতীত গৌরবের ভগ্নস্তূপের নপুংসতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, জার্মানীতে তেমনি, ধর্ম, জাতি ও স্বপ্নবাদ থেকে মুক্তির সন্ধানে সেখানকার শিল্পী সাহিত্যিকরা Expressionism নাম দিয়ে নতুন আন্দোলন গড়ে তুললেন। মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষকে যে নতুন করে আবিষ্কারের দরকার হ'ল, ইউরোপের এই বৈপ্লবিক যুগের শিল্পী সাহিত্যিক ও মননশীলেরা তার জন্যে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নগ্ন করে মূল-সূত্রের সন্ধানে উঠেপড়ে লাগলেন। ব্যাখ্যাহীন জটিলতম মানুষের মন ধরা-ছোঁয়ার সব চেষ্টাকে বরাবর ফাঁকি দিয়ে এসেছে এতদিন, Freud-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তাই, ইউরোপের শিল্পী সাহিত্যিকরা নির্বিচারে গ্রহণ করলেন।

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যিক ঐশ্বর্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান বৃটেনের সম্পদ ও সুখের আরামী নিরাপত্তাকে ভেদ করে কন্টিনেন্টের বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্ত যখন পৌঁছল, তখন তার তাপ ও উগ্রতা ইংলিশ চ্যানেলে হারিয়ে গিয়েছে। তবু Cambridge, Oxford, Bloomsbury-র Intellectual-রা Roger Fry, Russell, Virginia Woolf, W. B. Yeats, Lytton Strachy আর Aldous Huxley-র দল পুঞ্জীভূত ইউরোপীয় সভ্যতার জড়ত্ববোধ ও মহাদেশের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মুক্তি সমস্যায়, নিজ নিজ সমাধানের জন্যে হাতড়ে বেড়ানর তাগিদ অনুভব করলেন। কিন্তু বৃটেনের Cambridge-Oxford-Bloomsbury -র অভিজাত বুর্জোয়া Intellectual গোষ্ঠী ইউরোপের নতুন নতুন বৈপ্লবিক গবেষণাকে পরিচিতের মত গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃটেনে Futurism-এরও স্থান হল না। আমেরিকার সাংস্কৃতিক উৎসের সন্ধানে, ভৌগলিক সংকীর্ণতার বাধা ভেঙে, Ezra Pound, Eliot, Henry James এ'রা ইউরোপ ঘুরে লণ্ডনে এসে নতুন দল করলেন। Pound তাঁর বিরাট প্রতিভার পক্ষপুটে বিস্তার করলেন। London-এ Vorticist গোষ্ঠী তৈরী হ'ল। যাঁরা ইউরোপের চরমপন্থী Futurist-দের এবং Bloomsbury Intellectual-দের অতি মানবীয় আকাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, তাঁরা Wyndham Lewis-এর নেতৃত্বে Vorticist হয়ে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সমাজ ও সভ্যতাকে অস্বীকার করে ও সীমিত মানুষের একান্ত দুর্বলতাকে স্বীকার করে, "Higher Authority"-র দরবারে শক্তি প্রার্থনায় বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানালেন—বিশ্বাস তার একমাত্র মন্ত্র। 'Rebel Art Centre' চালিত পরিবেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাল। একান্ত স্বতন্ত্রবাদী Lawrence, অভিজাত Bloomsbury intellectuals, Vorticist এবং ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজ চেতনার মধ্যে একান্তই Rebel ও Outsider। এ'দের চেতনার সঙ্গে তিনি নিজের কোনও সহানুভূতির সূত্র খুঁজে পেলেন না।—তাঁর মতে মানুষকে খুঁজতে মানুষের আদিম ভিত্তিকে জানতে হবে; আর তা জানতে হলে, মানুষের চেতনাকে সংস্কার, সভ্যতা ও মানবীয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে তার আদিম আবেগের বন্ধনমুক্ত প্রকাশের আশ্রয় নিতে হবে।—রক্ত মাংস ও দেহ, মানুষের মননশীলতা এবং বুদ্ধির চেয়ে বেশী জ্ঞানী;—তাই Lawrence-এ যৌনবোধের অভিব্যক্তি সংস্কারমুক্ত।—Lady Chatterley's Lover-এর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে ঝড় উঠল। James Joyce -এর স্বাতন্ত্র্যবাদী আত্মচেতনা অন্তর্মুখীন প্রতিভাও দেশে ও কালে "Outsider"।—Lawrence মুক্তির খোঁজে দেহ ও ইন্দ্রিয়গত আদিম-তম প্রবৃত্তি ও চেতনার বন্ধন ও সংস্কার মুক্তির দাবী করেছিলেন—Joyce চেতনমনের ওপর বাহ্যিক জগতের প্রতি-ক্রিয়া, জৈব প্রবৃত্তির ও আহরিত জ্ঞানের সংঘাত ও সংমিশ্রণে অচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও সংপ্লবের জগতের মধ্যে অতিপ্রাকৃত একত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার সন্ধান করলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত চেতন ও অচেতন জগতের সকল দ্বন্দ্ব ও সংপ্লবের মধ্যে বিরাট নিয়মানুবর্তিতার সূত্র সন্ধানে তিনি মানুষের সন্ধান করলেন।—Joyce এর এ Catholic চিন্ত' বাহ্যিক কোন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে না। সে আত্মবশ।

ইটালীতে Futurism যখন এক পা এগিয়ে গিয়ে Facism হ'ল, ফ্রান্সে যখন Cubist Apollonaire-এর সাহিত্য ও Picasso-র শিল্প-পৌরহিত্যে এবং জার্মানীতে Expressionist Klee, Klandinsky-র পৌরহিত্যে নতুন নতুন গবেষণা চলছে তখন লন্ডনে Pound ও Elliot-এর পৌরহিত্যে সাহিত্যের চিরাচরিত প্রথার বন্ধনমুক্তির গবেষণা চলল। পশ্চিম ইউরোপের এই মুমুক্ষু চেতনার বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে Diaghilev, Stravnisky, Nijinisky-র দল একই তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়ে Russian Ballet যা একান্তই Slavonic ছিল তাকে প্যারিসে এনে নগ্ন বর্বর আদিম জীবন-সন্ধানের সঙ্গে গ্রথিত করে সর্বইউরোপীয় করে দিলেন। Nijiniskyর অনুপ্রেরণা কবলিত উন্মত্ত নৃত্য আর Stravnisky-র লালিত্য বিবর্জিত সংগীতের বর্বর আদিম ইন্দ্রিয়ভেদী শব্দে সুসভ্য ইউরোপে আফ্রিকার অরণ্যের স্পন্দন শোনা গেল।

প্রাক প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপের সাংস্কৃতিক চিন্তা শিল্প ও সাহিত্য জগতের এই যে নানামুখীন প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন,—প্রাক Cezanne Impressionist দের অবচেতন বৈজ্ঞানিকতা, Cezanne-এর Impressionism-এর সঙ্গে জ্যামিতিক Solidity যুক্ত করে Promised Land-এর সন্ধান, Van Gogh-এর বলিষ্ঠ মহাজীবন পিপাসার বিকার, Ganguin-এর ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কার হতে পালিয়ে গিয়ে আদিম নগ্নে মুক্তির অনুসন্ধান থেকে শুরু করে Futurism, Expressionism, Vorticism, Dadaism, Freudism, Imagism, Surrelism, Absolutism ইত্যাদি আন্দোলনের সংশয়সৃষ্টিকারী বিপরীতমুখী আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার সামগ্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই যে প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরপর্বে তীব্রতর হয়ে পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ার যুগান্তকারী বিস্ফোরণ—প্রথম মহাযুদ্ধে হারিয়ে গেল। ইউরোপীয় জগতে সত্যি সত্যি 'বিসভ্য' হবার নিষ্ফল সুযোগ এল। "ইউরোপের বাতি নিবে গেল—" আর্তনাদে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক ইঙ্গিত শোনা গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

মতামত

চায়ের ধোঁয়া প্রসঙ্গে

সম্পাদক সমীপেষু,

নাটকের মূল্যায়নে আঙ্গিকের স্থান কোথায় হবে, এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি শ্রীউৎপল দত্তের আলোচনায় নতুন করে দেখা দিয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, বেশ কিছু দিন আগে কোন এক খ্যাত-নাম্না বাংলা দৈনিকে এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট মতামত প্রকাশিত হয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর কালে নব নাট্য আন্দোলনের যে ঢেউ আজ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে অল্প কয়েকটি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় গোষ্ঠী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে ক'টি সৌখীন গোষ্ঠী বা তরুণ পরিচালক—যাঁদের মধ্যে আছেন শম্ভু মিত্র, সলিল সেন, উৎপল দত্ত প্রমুখ—যাঁরা মানুষকে নতুন করে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করলেন—মনে পড়ে যায় তাঁদের প্রথম দিনের সেই নাটকগুলির কথা। রক্তকরবী বা নতুন ইহুদী বা পথিক সমানভাবেই আমাদের মত সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল তার অভিনয়, ব্যঞ্জনায়, প্রকাশনায় এবং তার সুন্দর টিম-ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে। এই নাটক আমাদের ভালো লাগল, আমরা নতুন করে নাটককে ভাল বললাম—ক'লকাতার স্থায়ী মঞ্চগুলি উঠে যেতে যেতে আবার জাঁকিয়ে বসলো।

কিন্তু সেই সাথে আমরা লক্ষ্য করলাম—নাটক যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো—তার সুযোগ ব্যবসাগত ভিত্তিতে কাজে লাগানো হল। ঠিক যে কারণে 'তিন কন্যার' জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অনেক হাল্কা ও সস্তা হিন্দী ছবি বক্স অফিসের দিক থেকে সাফল্য আনে—নাটককে পাঁচশতাধিক রজনী অতিক্রম করানোর পেছনে এই মানসিকতা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ খা-চড়া পর্দায় বাঁধা নাটকের সুরে বিদগ্ধ ব্যক্তির সপ্রশংস দৃষ্টি হয়তো আকর্ষণ করবে; কিন্তু সিনেমার ২।১ জন নাম-করা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও আঙ্গিকের ভেল্কী বক্স অফিসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখবে একথা কে না জানে? স্টেজের মধ্যে থেকে চোখ ধাঁধানো আলো দিয়ে রেলগাড়ী যাওয়ার দৃশ্যের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে আলোক সম্পাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু নাটককে যে হত্যা করা হ'ল তা' অস্বীকার করি কি করে?
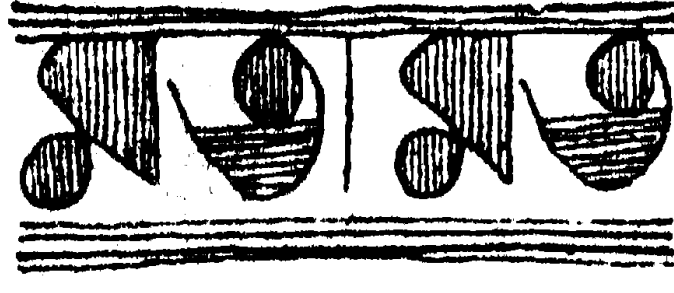
আমি নিজে বহু লোককে উক্ত দৃশ্যটি দেখার জন্যেই প্রধানতঃ সেই নাটকটি দেখতে যেতে দেখেছি বা প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের শেষে দরজায় কান পাতলেই দেখা যাবে নাটকের পাত্র-পাত্রী-অভিনয়ের চাইতে উক্ত ট্রেণ যাওয়ার দৃশ্যটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। সে কথা "অঙ্গারের" ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পেশাদারী মঞ্চে ব্যবসা-ভিত্তিক নাটকে আঙ্গিকের এই বাহুল্য বুঝতে পারি, কিন্তু অবাক হয়ে যাই নব নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক উৎপল দত্তকে অভিনয়ের চাইতে আঙ্গিকের গুরুত্ব বেশী দিতে দেখে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন সৌখীন নাট্য পরিচালক উৎপল দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারের পেশাদার পরিচালকের ব্যবসাদার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাথে একাকার হয়ে গেছেন। অঙ্গার দেখে যে কথা মনে হয়েছিল—উৎপলবাবুর লেখা পড়ে সে ধারণা দৃঢ় হ'ল। ইতি—

দেবব্রত ঘোষ, কলিঃ—২৭

॥ মন্দিরে-মন্দিরে ॥

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

'অমৃত' পত্রিকায় 'মন্দিরে মন্দিরে' এই বিভাগে বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাধনার ইতিহাস বর্ণনা করবার যে প্রচেষ্টা আপনারা করেছেন তা' খুবই প্রশংসনীয়। লেখার সঙ্গে মন্দিরের ছবি থাকলে আরও উপভোগ্য হত এই বিভাগটি।

বিগত ২২-১২-৬১ তারিখে প্রকাশিত 'জটেশ্বর নাথের মন্দির' ওই জাতীয় একটি সুখপাঠ্য রচনা। লেখক জটেশ্বর নাথের মন্দির সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রায় সকল তথ্যই পরিবেশন করেছেন। তবে মহানাদ গ্রামটির ঐতিহাসিক ও প্রাচীনত্বের সম্পর্কে তিনি কিছুই লেখেননি। মহানাদ গ্রামের প্রাচীনত্ব ও অতীত ইতিহাসের সঙ্গে জটেশ্বর নাথের মন্দিরের পুরাতত্ত্বের একটি নিকট-সম্পর্ক আছে।

মহানাদ এই গ্রামটি একটি প্রাচীন জনপদ। গুপ্তযুগে এই স্থানে গুপ্ত-বংশীয়দের বসবাস ছিল। মহারাজ চন্দ্রকেতু গুপ্তবংশীয় কোন সামন্তরাজ ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। গুপ্ত-যুগে বাংলা দেশে 'রাঢ়াপুরী' বলে যে সমৃদ্ধিশালী নগরের কথা শোনা যায়, তা ছিল বর্তমানের মহানাদ ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম দ্বারবাসিনীকে কেন্দ্র করে।

মহানাদ গ্রামে গুপ্তযুগের সুবর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গেছে,—পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের প্রস্তর-নির্মিত নানা মূর্তি। গুপ্ত রাজারা ছিলেন শৈব,—জটেশ্বর নাথের মন্দির তাই গুপ্তযুগেই নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

১৯৫৬ সালে মহানাদ ভ্রমণের সময়, মন্দিরের নিকটেই একটি উঁচু ঢিপি খনন করে গুপ্তযুগের তৈজস-পত্রাদি ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, তা আমি দেখেছি। আমার মনে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষায় ও গবেষণায় মহানাদের অনেক গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কার হতে পারে।

জটেশ্বর নাথের মন্দিরের প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মন্দিরের ভিত্তিগাত্র লক্ষ্য করলে মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের সমকালীন বলে মনে হয়। গুপ্ত-পরবর্তী কালের বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবও আছে মন্দিরের আশে-পাশে ছড়ানো নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে।

তীর্থঙ্কর পাণ্ডুয়ার 'গরুকাটা যুদ্ধের' সন-তারিখে মস্ত ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন—'...মুসলমান আক্রমণ হয় প্রায় তিন শ' বছর আগে। দিল্লীর বাদশা তখন ফিরোজ শা'।...' হিসাবটি কিন্তু ভুল। পাণ্ডুয়ার গরুকাটা যুদ্ধ হয় তুঘলক বংশীয় ফিরোজ শা'র রাজত্বকালে—তিনি মহম্মদ বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হ'ন। সুলতান হবার কয়েক বছর পরেই বাংলার ইলিয়াস শাহর বিরুদ্ধে সুরু হয় তাঁর বাংলা অভিযান। আরও একটি কথা। ফিরোজ শাহকে সুলতান বলা হত, বাদশা নয়। মুঘল বাবর-পূর্ববর্তী দিল্লীর মুসলমান রাজত্বকালকে ইতিহাসে বলা হয় দিল্লীর 'সুলতান' আমল। মুঘল সম্রাটদেরই বাদশাহ বলা হত, দিল্লীর সুলতানদের নয়। নমস্কার ইতি—

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রিষড়া

গোয়া

দীপক চৌধুরী

বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন বিভাসবাবু, বিভাস চৌধুরী। দু'তলার ছাদের ওপর মস্ত বড় হল-ঘর। এক কোণায় ডবল খাট। তারই উল্টো দিকে বসবার জায়গা। কার্পেটের ওপর গদি-আঁটা তিন খণ্ডের সোফ্যা। দুটো ছোট আকারের, অন্যটা স্প্রীং-বসানো বেঞ্চি-বিশেষ। দু'দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সেগুন কাঠের শেলফ্। বুক-শেলফ্। এক ইঞ্চিও খালি জায়গা নেই। মরক্কো চামড়া আর রেক্সিনে বাঁধানো পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারটিকে সাজিয়ে রেখেছেন বিভাস চৌধুরী। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যের অতি উত্তম সংগ্রহ। উত্তর পঞ্চাশের হুজুগ থেকে নিষ্কৃতি পাননি তিনি। বিজ্ঞানের মৃগমদ পান করেছেন প্রচুর পরিমাণে। তাঁর মাতলামীর চিহ্নগুলো সুস্পষ্ট। সদ্য-কেনা বিজ্ঞানের বইগুলো তৃতীয় দেয়ালের গা ঘেঁষে উঁচু হয়ে রয়েছে। হাত দেননি তিনি, হাত দেয়নি কেউ। যেন কয়েক শত আজীবনের কুমারী সতীত্বের জয় ঘোষণা করছে। দেহের চাকচিক্য ম্লান হয়নি এখনো।

ঘরের দক্ষিণ কোণায় তাঁর খাট। দেহে মেদবাহুল্য নেই, তবু ডবল খাটের ব্যবস্থা। সহধর্মিণী বর্তমান, তবু একলাই তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। নিদ্রার মধ্যেও একা—আগেও একা, পরেও একা। ব্রিটিশ আমলের রায়-বাহাদুর, এই আমলের দেশ-প্রেমিক। গোয়ার মুক্তিসংগ্রামে মনে মনে অংশ নিয়েছেন। মুক্তির পরে চাঁদা পাঠিয়ে-ছেন প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফাণ্ডে। মস্ত ধনী লোক। ষাট বছর বয়স। পায়ে বাত, বুকে শ্লেষ্মাসিসের আসন্নতা।

ডবল খাট। তারই ওপর রেডিও। অল-ওয়েভ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খবর আসে। বালিশের এক দিকে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ। ইংরেজী আর বাংলা। অন্য দিকে ফিল্মসাহিত্যের ম্যাগাজিন। ছবি দেখে আর স্বাদ মেটে না। দশ আঙুলের ময়লা লেগে ছবি-গুলো কলঙ্কিত। ধর্ষিতা, কিন্তু পথের ধারে বিবর্জিতা নয়। বালিশের পাশে উঁচু হ'য়ে আছে। পুরনো ব'লে ম্যাগাজিনগুলো ফেলে দেননি বিভাস-বাবু। শস্তা দরে ফিরিওয়ালাদের কাছে বেচেও দেননি তিনি। সযত্নে রক্ষিত। আজীবনের রক্ষিতার মতো প্রতিটি ম্যাগাজিনই নূতনত্বের স্বাদ সৃষ্টি করে। তিন দেয়ালের শেলফে-আবদ্ধ কুমারী-দের চোখে ঈর্ষার আগুন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গায়ে তবু হাত দেন না বিভাস চৌধুরী। ডুবে থাকেন শুধু ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে। ডুবে থাকেন, তলিয়ে যান—আবার ভেসেও ওঠেন। মস্ত খাট, বিস্তৃত পরিসর। স্ত্রী বর্তমান, খাটের পরিসরে আবদ্ধ নন। তিনি থাকেন দোতলায়। আর থাকে সুমি, সুমিতা চৌধুরী। এ'দের একমাত্র সন্তান। বয়স উনিশ।

মধ্যবয়সের সন্তান। আদুরে, সাত-রাজার ধন এক মানিকের মতো সর্বোচ্চ মূল্যের কুমারী। পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা সমুদ্রতটের বালুকাবৎ, গোনা যায় না। রায়বাহাদুর চোখ বুজলেই তাঁর সাম্রাজ্যের মালিক হবে সুমি চৌধুরীর স্বামী। এখন সাম্রাজ্য বলতে কয়েকটি শুধু ব্যাঙ্ক একাউন্ট, আর ভল্ট। ব্রিটিশ আমল শেষ হওয়ার আগেই জমিদারিটা সর্বোচ্চ মূল্যে বেচে দিয়ে-ছিলেন। প্রচুর নগদ তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর প্রতিপত্তি। রাশভারি লোক, গোঁফ রাখতেন। দেখতে অনেকটা উঁচু ক্লাসের মতো। চাকর, দরোয়ান আর কর্মচারীরা বলত, "কর্তাবাবুর যখন গোঁফ ছিল না তখন তাঁকে ভয় পেতুম

না আমরা। খুবেই মাইডিয়ার লোক ছিলেন।" তারপর তিনি গোঁফ রাখলেন, রায়বাহাদুরে খেতাব পেলেন। তাঁর ভয়ে সাম্রাজ্যের সবাই হুকুম তামিল করবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মদ চলত। মডার্ণ বাঈজীরা আসা-যাওয়া করত হাইহিল প'রে। কলকাতার পুরনো কালচার তাঁকে স্পর্শ করেনি। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করলেন বিভাস চৌধুরী। বিয়ে করতে বাইরে গেলেন না। নিজের বাড়িতেই ছাঁদনাতলা তৈরি হ'ল। মধ্যবিত্তের ঘর থেকে তুলে নিয়ে এলেন সুমিতার মাকে। সামাজিক প্রথা না মানলে চলে না। ঘরে একজন স্ত্রী না থাকলে নানা রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। সময় নষ্ট হয় তাঁর। বিয়ের বছর দুই পর মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। যথা সময়ে সুমির জন্ম হ'ল। তাতেও বিভাসবাবুর মধ্যে পরিবর্তন কিছু দেখা গেল না। ভেতরে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, বাইরে শিথিল। নানা ধরণের স্ত্রীলোক নিয়ে মেতে থাকেন। বাড়ি ফেরেন ঘুমবার জন্য। তারপর হঠাৎ একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'য়ে গেল। টুথ-ব্রাশের মতো গোঁফটা চেঁছে ফেললেন। মাথায় গান্ধী টুপি প'রে এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করলেন। লেগে থাকলে হয়তো ছিপ্রে একটা হ'য়ে যেত। লীডার হ'য়ে বসতে পারতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-শিবিরের খুঁটি পড়ল ভেঙে। নানা রকমের ব্যাধি, নানা রকমের দুর্ভাবনা। শয্যা গ্রহণ করলেন। পঞ্চাশতে আশি বছরের ভগ্নতা। স্ত্রী এবং কন্যার ওপর নির্ভর করতে চাইলেন। তাঁরা ও'কে তুলে দিলেন দু'তলার ছাদে। ক্রমে ক্রমে ও'রা আলগা হ'য়ে যেতে লাগলেন। তার আগে অবিশ্যি গুটিকয়েক ব্যাংক একাউন্ট চ'লে এল মিসেস চৌধুরীর নামে। চেক সই করতে আজকাল হাত কাঁপে বিভাসবাবুর। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, রায়বাহাদুরের অসহায়তা যতো বাড়ল মিসেস চৌধুরীর স্বাস্থ্য ভাল হ'ল ততো বেশি। কলকাতার সামাজিক জীবন তাঁকে ছাড়া চলে না—তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে সজীব অংগ। সুমি চৌধুরী সজীবতর। এ'দের দেখলে মা আর মেয়ে ব'লে চেনা যায় না। দুই বোনের মতো মনে হয়।

শয্যার পরিসর কম নয়। গোটা তিন গরম জলের ব্যাগ সব সময় তৈরি করে রাখতে হয়। কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি বাতের ব্যথা। নিজেই টেনেটুনে পায়ের ওপর ফেলে রাখেন। পুরনো আমলের চাকর একটা আছে। নাম শশী জানা। সে তার খেয়াল-খুশী মতো ডিউটি দেয়। আগের দিনের মতো মাঝে মাঝে রেগে ওঠেন বিভাসবাবু। হুমকি দেন, "তোকে কাজ থেকে বরখাস্ত করব রে শশী।" জবাব দেয় না পুরনো ভৃত্য। টিনের একটা সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে চ'লে আসে দোতলার ছাদের ওপর। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঘোষণা করে, "পেন্নাম কর্তাবাবু। দেশে চললাম।" চোখ দুটো উঁচু ক'রে তুলে ধরেন রায়বাহাদুর। ডুবন্ত মানুষের মতো অসহায়তার ভংগীতে প্রশ্ন করেন, "আমার মতো একটা কচি শিশুকে ডুবে যেতে দিবি? তুই হচ্ছিস গিয়ে অন্ধের হাতের লাঠি। তোকে দিয়ে যাব রে শশী, অন্তত লাখ খানিক টাকা তোর হাতে দেব। ভাবছিস গিন্নীমায়ের হাতে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি? পাগল! লাখ পাঁচেকের বেশি নিতে পারেনি ওরা। মালিশটা নিয়ে আয় তো, উরুর মাংসেও ব্যথা শুরু হয়েছে।" টিনের সুটকেসটা পাশে সরিয়ে রেখে শশী জানা মালিশ করতে বসে। গোটা পাঁচেক টাকা নগদ চেয়ে নেয় আগে। রায়বাহাদুর জানেন, নগদ না ঢাললে সেবা পাওয়া যায় না। সুমির মা তো পাঁচ লাখ সরিয়ে নেয়ার পরেও সেবা করতে আসে না। সেবা তো দূরের কথা, আজকাল মাসের মধ্যে একবারও দেখতে আসে না তাঁকে।

দোতলা থেকে মাঝে মাঝে শুধু টেলিফোন ক'রে খবর নেয়, স্বামীটি তার বে'চে আছেন কি না। খাটের কিনারে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে মানব জীবনের অসারতার কথাই ভাবছিলেন তিনি। টেলিফোন ক'রে খবর নেয় সুমির মা। মরে গেলে ডেথ-ডিউটি কতো লাগবে তার হিসেব জানতে চায়। এদের চেয়ে বরং শশী জানার ব্যবহারটা ভাল। দেশে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে মাত্র পাঁচটা টাকা চায়। সংগে সংগে মালিশ করতে বসে। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে পৃথিবীর কোন্ মানুষটা উরুর মাংসে মলম লেপে দিত? রায়বাহাদুর জানেন, দিনকাল বদলে গিয়েছে। পাঁচ টাকা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে সেবা পাওয়া অসম্ভব। আজকাল এক কিলো পচা পোনার দামই সাড়ে চার টাকা। তাঁর উরুর মাংস পচাপোনার চেয়েও বেশি পচা। শশী তাতে হাত লাগাবে, মলম ঘসবে। তারপর গরম কাপড়ের টুকরো দিয়ে পটি বাঁধবে। এ সব হচ্ছে শশীর বাড়তি কাজ। না করলেও পারত। পুরনো আমলের লোক ব'লেই করে। আজকালকার ছোকরা চাকরদের দিয়ে এ সব কাজ করানো যায় না। হুমকি দিলে পাল্টা হুমকি দিয়ে কাজ ছেড়ে দেয় ওরা। রায়বাহাদুর শুনেছেন, দিন পাল্টে গিয়েছে। মাইনের সংগে মর্যাদা থাকা চাই। আগে মর্যাদা, পরে মাইনে। উরুর মাংসে মর্যাদা কই? শশীর কথা আলাদা। পুরনো লোক। মাসের মধ্যে মাত্র বার পাঁচেক টিনের সুটকেসটা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় ছাদের ঘরে। ওকে ধ'রে রাখবার জন্য প'চিশটা টাকা মাত্র বাড়তি খরচ করেন রায়বাহাদুর। সুমির মাকে পাঁচ লাখ দিয়েছেন। সেই টাকা থেকে ডেথ-ডিউটি দিতে চায় না সে। দেবেও না। সুমি বলে, "ঐ টাকাটা তুমি আলাদা ক'রে রেখে যেও বাবা।"

ডবল খাট। বিছানার ওপরেই টেলিফোনের রিসিভার। হাতের নাগালের বাইরে রাখতে ভয় পান। বাতের ব্যথায় হঠাৎ তিনি মরে যাবেন না। থ্রম্বসিসের ভয়টাই বেশি। গুটিকয়েক ডাক্তারকে বলা আছে, টেলিফোন পেলেই তাঁরা যেন চ'লে আসেন। মধ্যরাত্রির অসুবিধা থাকলেও চ'লে আসতে হবে তাঁদের। রায়বাহাদুরের বিশ্বাস, ক্রাইসিস আসবে মধ্যরাত্রিতেই। ভিজিটের নগদ টাকা আলাদা ক'রে রেখেছেন। আলাদা আলাদা খাম, তার ওপরে আলাদা আলাদা নাম। প্রতিটি খামে নগদ টাকা।

বত্রিশ, চৌষট্টি নয়, একেবারে একশো আটাশ। খামগুলো যে কোথায় আছে তাও তাঁরা জানেন। জায়গায়টা দেখিয়ে দিয়েছেন বিভাসবাবু নিজেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর নেই। সেই সংগে নিজের সাম্রাজ্যটাও ভেঙে পড়েছে। সব গিয়ে যা আছে তার আয়তন খুব কম। চেকবই আর ভল্টের চাবিও তাঁর বালিশের তলায়। ডবল খাটের বাইরে আর কিছু নেই। যা আছে তার সবটুকুই অসহায়তা। খানিকটা হাহাকারও থাকতে পারে। কিংবা সাম্রাজ্যশাসনের অনুতাপ। একটা লোকও সুখী নয়, একটা প্রাণও আনন্দোজ্জ্বল নয়—কৃতজ্ঞ নয় কেউ। এমন কি স্ত্রী এবং কন্যা পর্যন্ত বিরূপ। একনায়কত্বের ফল ভাল হয়নি।

তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। পারা সম্ভবও নয়। স্ত্রী এবং কন্যাও তাঁর বিরুদ্ধে। বে'চে থাকলেই শত্রু বাড়বে, কষ্ট বাড়বে, হাহাকার বাড়বে। অসহায় গোয়ার মতো বে'চে থেকে লাভ কি? অসহায়তা চরিত্রের গুণ নয়। অসহায় গোয়াও যা, দমনও তাই। দিউই বা আলাদা হবে কি ক'রে?

বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন রায়বাহাদুর। রাত দুটো। বাতের ব্যথা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। কলকাতায় ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। সারা উত্তর ভারতের গা দিয়ে বরফ গ'লে পড়ছে। তারই স্পর্শ লেগেছে কলকাতার বুকে। ঠাণ্ডার তীব্রতা উঠে আসছে দোতলার ছাদে। মস্ত বড় হল-ঘরটার দিকে এগিয়ে

"ঐ টাকাটা তুমি আলাদা করে রেখে যেও বাবা।"

তাই কি রায়বাহাদুর একা পড়লেন আজ? মানুষ যদি না রইল তা হ'লে সাম্রাজ্যশাসনে লাভ কি? সুখ কোথায়? ঐশ্বর্যের ভরা-নৌকা কোন্ ঘাটে ভেড়াবেন তিনি? আগ্রহের হাত যদি না রইল তবে উত্তরণস্থান স্পর্শ করার অর্থ কি? তাই আজ তিনি দোতলার ছাদে একা পড়েছেন। সবাই বিরুদ্ধে, স্বপক্ষে কেউ নেই। গোয়ার মতো অসহায়, আর দুর্বলও। ত্রিশ হাজার সৈন্যের আক্রমণ

আসছে বরফের ঢেউ। বালিশের তলায় হাত ঢোকালেন বিভাস চৌধুরী। ভল্টের চাবিতে উত্তাপ নেই। চেক-বইটাও হিমশীতল। বরফের কুচি জমল নাকি? নিজের বুকে হাত রাখলেন। আসল ক্রাইসিস ওখানেই। রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে নিশ্চয়ই। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। থ্রম্বসিস? শেষ পর্যন্ত এল না কি? সীমান্ত অতিক্রম করল না কি ভারতীয় সেনাবাহিনী? এখনো জ্ঞান

আছে। রিসিভারটা টেনে নিলেন হাতে। কাৎ হ'য়ে ডাক্তারদের টেলিফোন করতে লাগলেন। বার বার নম্বর ঘোরাচ্ছেন। কেউ জবাব দিচ্ছে না। ঐ প্রান্তে নিঃশব্দ। কয়েক শতাব্দীর ঘন নৈঃশব্দ। এই প্রান্ত আলোড়িত, ঐ প্রান্ত শীতল। মাঝখানটায় তবে কি?, কিছুই না। ফাঁকা। শূন্যতার বুকে, অন্ধকারের টানা-পোড়েন। শয্যার সাম্রাজ্যটার অসহায়তার বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। রিসিভারটা হাত থেকে প'ড়ে গেল তাঁর। মেঝে থেকে তোলবার সামর্থ পর্যন্ত নেই! হাতের আঙুল অবশ। যোগাযোগের তারটা ফসকে গেল হাত থেকে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'য়ে গেলেন রায়বাহাদুর। ঘামতে লাগলেন তিনি। চিৎ হ'য়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন। হাতের অস্তিত্ব অনুভব করছেন না। বোধ হয় অসাড় হ'য়ে গেল! এই অঞ্চলে মশা নেই। হঠাৎ একটা মশা কোথা থেকে উড়ে এল। বুভুক্ষু মশা, রক্তের স্বাদ খুঁজছে। রায়বাহাদুরের নাকের ডগায় হুল বিঁধিয়ে বসল। হয়তো হুল ফোটাচ্ছে মশা। ভয়ে রায়বাহাদুর হাত তুলতে পারলেন না। ঘাড় দোলাতেও ভয় পাচ্ছেন তিনি। ঈষৎ আন্দোলনই হঠাৎ-মৃত্যুর কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। গোয়া অসহায়, কিন্তু রক্তের বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়নি এখনো। শুঁড় দিয়ে রক্ত টানছে মশা। রায়বাহাদুরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। অক্ষমতা চরমে উঠেছে। একটা মশার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। সশব্দে কেঁদে উঠলেন বিভাসবাবু।

জানলার বাইরে থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? কাঁদছেন কেন?"

মানুষ? হ্যাঁ মানুষের কণ্ঠস্বরই তো! রায়বাহাদুর বললেন, "সিগারীর ভেতরে এসো। বোধ হয় থ্রম্বসিস—"

"কি ক'রে আসব? দরজা সব বন্ধ।"

"জানলার শিক ভেঙে ঢুকতে পারবে না?"

"তা পারব। বোধ হয় পারব। দেখি চেষ্টা ক'রে।"

সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন রায়বাহাদুর। অপেক্ষা করতে লাগলেন। জানলা দিয়ে প্রবেশ করল একটি যুবক। তার দিকে না চেয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি নাম তোমার?"

জগন্নাথ ঘোষ। সবাই জগু ব'লে ডাকে।"

নামটা এই অঞ্চলের ভীতি। এ-পাড়ার সবচেয়ে বড় গুণ্ডা। ডন-কুস্তীতে জগু এক সময়ে নাম কিনেছিল খুব। বুক দিয়ে মোটরগাড়ি আটকাত। রায়বাহাদুর একে চেনেন। বার কয়েক পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কি যে তার অপরাধ ছিল জগু তা জানত না। হয়তো সুমির দিকে দু'-একবার দৃষ্টি দিয়েছিল সে। সুমিতা সুন্দরী। তার দিকে তো সুস্থ মানুষেরা লোভের দৃষ্টি দেবেই। প্রমাণের অভাবে পুলিশ ওকে ধরে রাখতে পারেনি।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ইলেকট্রিক হিটারে জল গরম করো। তারপর ওখান থেকে ঐ শিশিটা আনো। একটা ট্যাবলেট বার ক'রে দাও।"

কাজ দুটো চটপট শেষ ক'রে ফেলল জগু। মিনিট পাঁচেক পর একটু সুস্থ বোধ করলেন বিভাস চৌধুরী। খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। বসিয়ে দিল জগন্নাথ ঘোষ।

"এবার মালিশের টিউবটা নিয়ে এসো। কোমর থেকে পা-এর পাতা অবধি ব্যথা। মনে হচ্ছে যেন সূচ ফুটছে......একটা দুটো নয় কয়েক হাজার।" লেপের তলা দিয়ে পা দুটো বার ক'রে দিলেন রায়বাহাদুর। তারপর তিনি বললেন, "আগে পায়ে মালিশ লাগাও......গণ্ডারের চামড়ার মতো হাতের চামড়া তোমার খসখসে নয় তো? আমার স্কিন খুব ডেলিকেট, পেঁজা তুলোর মতো মসৃণ......শোনো, আগে পা দুটো শেষ করো, তারপর উরুর চামড়ায় হাত দেবে। ঐখানে বাথরুম। হাতে তোমার ময়লা নেই তো? সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসো......দেরাজ থেকে একটা তোয়ালে বার করে নাও—"

রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে বৃটিশ আমলের পুরনো ঔদ্ধত্য প্রকট হ'য়ে উঠল। শশী জানার সঙ্গেও আজকাল তিনি ভেবেচিন্তে কথা বলেন। কিন্তু জগন্নাথ ঘোষকে তিনি মানুষ ব'লেই বিবেচনা করছেন না। বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এল জগু। হাতের চেটোয় টিউব থেকে মালিশ বার করতে যাচ্ছিল, এমন সময় রায়বাহাদুর বললেন, "একটু দাঁড়াও। বাথরুমের তাকে দেখবে একটা বোতল আছে......ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্যান্ট। তা থেকে কয়েক ফোঁটা হাতের চেটোয় ঢেলে নাও। তারপর জল দিয়ে আরেক-বার হাত দুটো ধুয়ে নিয়ে মালিশ করতে বসো। এত বড় একজন ধনী এবং মানী লোকের উরুতে হাত দেওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলো?"

তাঁর আদেশ মতো আরও একবার হাত ধুয়ে এল জগু। তারপর খাটের পাশে মেঝের ওপর নতজানু হ'য়ে ব'সে পায়ের গাঁটে মালিশ লাগাতে লাগল। আরাম বোধ করছেন রায়বাহাদুর। বুকের কষ্টবোধও কমে এসেছে। অসহায় গোয়ার চোখে-মুখে পুনর্জীবন লাভের সাময়িক ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠতে বিলম্ব হ'ল না।

মিনিট পনেরো নিঃশব্দে কাটল। তারপর রায়বাহাদুর বললেন, "গরম জলের ব্যাগটা এবার নিয়ে এসো। দাঁড়াও। ফ্ল্যানেলের টুকরো দুটো দিয়ে পায়ে পটি বাঁধো আগে। বেশ এঁটে বাঁধবে। গায়ে তো দেখছি উস্‌রী বাঘের মতো শক্তি রাখো......এতো প্রোটিন পাচ্ছ কোথায়? আজকাল কি গৃহস্থ-বাড়ির জানলা-দরজা ভেঙে উপার্জনের পথ খুলেছ? শোনো—পুরো কেট্‌লীর জল ব্যাগে লাগবে না। বাকী যা থাকবে

তাই দিয়ে বেশ ভাল ক'রে দু' বাটি কফি তৈরি করো। হট্ কফি......পাইপিং হট্—" জিব দিয়ে তলার ঠোঁটটা চেটে নিয়ে রায়বাহাদুরই বললেন, "কফিতে কি তোমার তেষ্টা মিটবে? আজকাল তো শুনতে পাই, বারোদুয়ারীতে বসছ তুমি......"

কথাগুলোতে কান দিল না জগৎ। মনোযোগ দিয়ে কফি তৈরি করতে বসল। ঘরের উত্তর কোণায় প্যানাট্রি। শৌখিন পার্টিশন দিয়ে কোনাটা আড়াল করা। খাটে ব'সে প্যানাট্রিটা দেখতে পাওয়া যায় না।

মস্ত বড় হল-ঘর। সাম্রাজ্য হিসেবে ক্ষুদ্র, কিন্তু ঘর হিসেবে বিরাট। অবাক হচ্ছিল জগন্নাথ ঘোষ। বিভাসবাবু কেন এখানে একা একা থাকেন? দোতলায় তাঁর জায়গা হ'ল না কেন? কফি তৈরি করবার আগে নানা রকমের প্রশ্ন উঠতে লাগল ওর মনে। মা আর মেয়ে তো প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায় কলকাতার ক্লাব-হোটেলে। দোতলার ছাদ পর্যন্ত উঠতে পারে না কেন?

খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন রায়বাহাদুর। হাতে কফির পেয়ালা। কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কফি খাবে না?"

"না। এবার উরুর কাপড় আলগা করুন।" ঝুঁকে বসল জগৎ।

"আগেই কেন উরুতে হাত লাগাতে চাইছ? কফি খেয়ে নাও—"

"কফি আমি খাই না।"

"কি খাও তবে সারাটা দিন?"

"ভাত—তার সংগে ডাল, তরকারি, মাছ।"

"সন্ধ্যের পর? কালী-মার্কা চলে বুঝি?" পেয়ালায় চুমুক দিলেন বিভাসবাবু।

"না। মদ-গাঁজা আমি খাই নে। নেশাটেশা কিছু নেই।"

"তবে এখানে এসেছিল কেন?"

"এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল—"

"আমার এখানে? ছাদে উঠলে কি ক'রে তুমি? দারোয়ান ব্যাটা ফটকটা কি বন্ধ করেনি?"
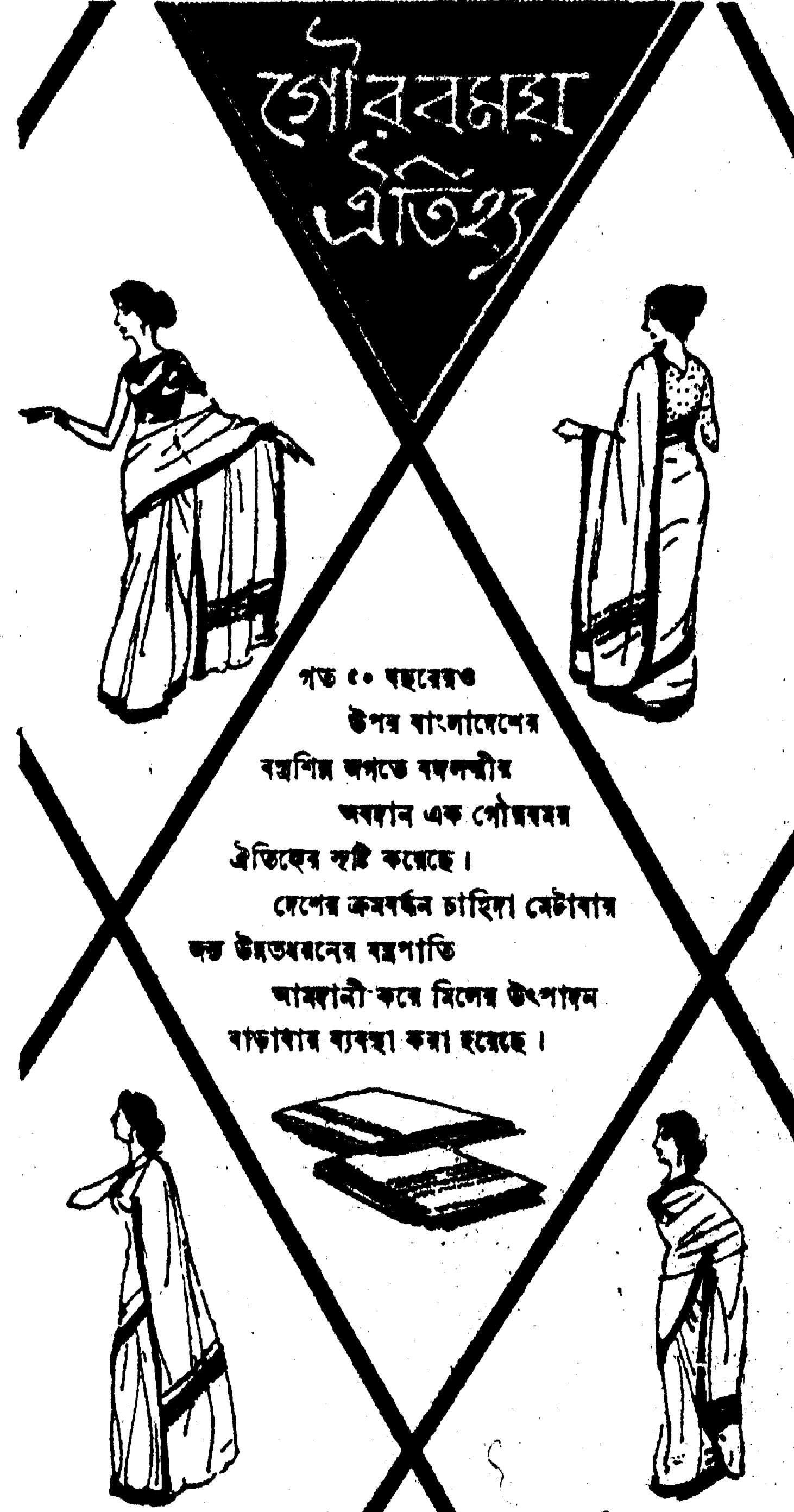
"আপনার ফটকের সংখ্যা তো একটা নয়, অনেকগুলো। বড় বড় তালা ঝুলেছে সেখানে," রায়বাহাদুরের উরুর দিকে হাত বাড়াল জগৎ, "মিসেস চৌধুরী আজকাল রাত একটার আগে বাড়ী ফেরেন না...... দারোয়ানটা ব'সে ব'সে ঝিমোয়—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দুটো পা-ই তাঁর টল-মল ক'রে ওঠে। মদ খাওয়া যদি অপরাধ না হয়, তা হ'লে বারোদুয়ারী আর ক্যালকেটা ক্লাবের মধ্যে তফাৎটা কি? এবার ডান দিকের উরুটা ঘুরিয়ে দিন—"

"দিচ্ছি—" দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল

বিজ্ঞাসবাবুর চোখে, "দিচ্ছি। কিন্তু তুমি তা হ'লে ছাদে উঠলে কি ক'রে?"

"পাইপ বেয়ে।"

"কেন?"

"এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।"

দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠল। খোলা দরজার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বিজ্ঞাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ছাদের উপর কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না কি? পায়ের শব্দ পেলাম যেন। ক'টার সময় এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তোমার?"

"আড়াইটায়।"

"রাত আড়াইটায়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন প্রায় তিনটে বাজে।"

"পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে একবার টেলিফোন করি—" কাৎ হ'য়ে রিসিভারটা ধরতে গেলেন রায়বাহাদুর। খুঁজে পেলেন না। মেঝের ওপরে সেটা প'ড়ে গিয়েছিল। নাগালের বাইরে। তিনি বললেন, "নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছি। ছোটখাটো একটা আক্রমণ ঘটে গিয়েছে আজ হার্টের ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দাও।"

"কেন?" আরও খানিকটা মালিশ টিউব টিপে বার করল জগু।

"তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্টের বারোটা বাজাতে চাই। হাতনাতে ধরিয়ে দিতে চাই তোমাকে।"

"কেন?" মনোযোগ দিয়ে মালিশ ঘসছে জগু।

"সমাজ-বিরুদ্ধ লোক তুমি। এ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেন্ট—"

"তা হ'লে তো পুরো কলকাতাকেই গ্রেপ্তার করতে হয়। যারা গ্রেপ্তার করতে আসবে তাদের হাতেও হাতকড়া লাগাতে হবে—"

"কে লাগাবে হাতকড়া?"

"আমি।" জবাবের যথাযথতায় উজ্জ্বল হ'ল জগন্নাথের মুখ।

কফির পেয়ালাটা জগুর হাতে তুলে দিয়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, "সুমি তা হ'লে রাত একটা পর্যন্ত করে কি?"

"দোতলার কারাকক্ষে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। শৃঙ্খলিতা......মিসেস চৌধুরী দোতলার ফটকে তালা লাগিয়ে যান। ডুপ্লিকেট চাবিটাও সঙ্গে রাখেন তিনি। হোটেল-ক্লাবে সুমিকে যেতে দেন না।"

"কেন?" বিস্ময়ে ভুরু কুঞ্চিত হয়ে এল।

"সুমির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠেন না মিসেস চৌধুরী। ওকে দেখলে কেউ আর মিসেস চৌধুরীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না।"

"দোতলার সাম্রাজ্যে তা হ'লে ভীষণ অরাজকতা চলেছে বলো? ও কি, উরুতে ব্যথা দিচ্ছ কেন?"

"দোতলার বাথা চরমে উঠেছে। এক সময়ে আপনিও মিসেস চৌধুরীকে শাসন করতেন—"

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "কিন্তু তাঁর চলাফেরার স্বাধীনতায় হাত দিইনি আমি। এখন তো দেখছি আমার একনায়কত্বে মানুষের আরাম ছিল অনেক বেশি। সুমি কেন তা হ'লে আমার কাছে আসে না? মিসেস চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমরা তো দল গড়তে পারি?"

"শাসনের মধ্যে ঔদার্য না থাকলে সব শাসনই এক। তা ছাড়া, আপনার মতো একজন বেতো রোগীর সঙ্গে সুমি কেন যাবে দল গড়তে? এখান থেকে পালিয়ে না গেলে সুমি দল গড়তে পারবে না। আপনার সাম্রাজ্যে বলিষ্ঠতা নেই—"

"তাই বলে কোমরে আমার গুঁতো মারবে না কি?" আর্তনাদ করে উঠলেন রায়বাহাদুর।

হেসে উঠল জগু। বলল সে, "সামর্থ্য নিঃশেষ বলে আমার ছোঁয়া লাগলে বাথা পান আপনি।"

অসন্তুষ্টির সুরে মন্তব্য করলেন বিজ্ঞাস চৌধুরী, "জানলার শিক ভাঙলেই মানুষ বলিষ্ঠ হয় না। আবার যেন পায়ের শব্দ পেলাম ছাদে! সুমির সঙ্গে কি তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল? টেলি-ফোনের রিসিভারটা তুলে দাও তো—"

"কাকে ফোন করবেন?"

"পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে। আমি এখনো মরিনি। না ডাকতেই লক্ষ হাত এগিয়ে আসবে আমায় সাহায্য করতে।"

মৃদু হাসি ভেসে উঠল জগন্নাথের ঠোঁটে। বললে সে, "আপনি অতীত, আমি ভবিষ্যৎ। আপনি পরাজিত গোয়া, আমি জাগ্রত ভারত। আপনার ডেপুটি কমিশনার এখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। কেউ তাঁকে ঘুম থেকে তুলবে না। আপনার আহ্বান কেউ শুনবে না। হয়তো রিসিভারটা তাঁর যোগাযোগ চ্যুত—টেবিলের ওপর নামানো রয়েছে।"

"আমি ইমারজেন্সি কল পাঠাব।" রুখে উঠলেন রায়বাহাদুর।

"কেউ শুনবে না। পৃথিবী ব্যস্ত। আপনার ইমারজেন্সিতে কান দেবে না ওরা। আপনার আর্তনাদ শুধু আমিই শুনতে পেয়েছিলাম। এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠতাম না আমি। আপনি নিবে যাওয়ার আগেও দপ করে জ্বলে উঠলেন। আপনি ভাগ্যবান। আর এক পেয়ালা কফি দিই?"

"দাও। কফি তৈরির কায়দা জানো তুমি। শোনো—" আগ্রহের টানে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বললেন, "তাই বলে তুমি ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে মাঝ-রাতে পালিয়ে যাবে? ইলোপ করবে? জগু—"

"রায়বাহাদুর—" ঘুরে দাঁড়াল জগন্নাথ ঘোষ।

বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চেক-বই বার করলেন বিজ্ঞাস চৌধুরী। জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললেন, "কলমটা দাও। হাজার পঞ্চাশ দিয়ে দিচ্ছি। গুণ্ডামী করবার দরকার হবে না। সারা জীবন বসে খেতে পারবে।"

ফিক করে হেসে উঠল জগু। বললে, "আমি তো এখন কাজ করছি।"

"কোথায়?"

"শ্যামনগরে।"

"কি কাজ?"

"পাওয়ার হাউসের মিস্ত্রী।"

"বাঙালীরা মিস্ত্রীর কাজ করে বলে জানতাম না। ও কি কোথায় চললে?"

"বাড়ি যাচ্ছি।"

"কোন পথ দিয়ে?"

"যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম।"

"এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবে না?"

"না।"

"কেন?"

"দিনের বেলায় আসব। আর আসব আপনার সামনের দরজা দিয়ে—" খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল জগু।

রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বুকের কষ্ট আপাতত আর নেই। খাটের কিনারে পা' দুটো ঝুলিয়ে দিলেন। হেঁটে গেলেন দরজার কাছে। কার্ণিশের ওপাশে নেমে পড়ল জগু। তারপর ডান দিকে চোখ ঘোরালেন তিনি। ঐ দিকেই দোতলায় নামবার সিঁড়ি। মনে হল কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল সিঁড়ির মুখে। সুমি নয়তো?

পায়ে পটি বাঁধা অসহায় গোয়া শুধু ক্লান্ত নয়, জীর্ণ এবং বিধ্বস্তও। অতীতের দুঃস্বপ্নটা আবার গিয়ে ঢুকে পড়ল লেপের তলায়।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বারো ।।

বিংশ শতাব্দির ঠিক প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চাষীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মূলে বক্তব্য ছিল 'সমবায় পদ্ধতির' চাষ, যেটিকে একালে কনগ্রেসের পক্ষে বলা হচ্ছে, 'কো-অপারেটিভ ফার্মিং'। কবির বক্তব্য ছিল, জমির বণ্টন-ব্যবস্থাপনার মধ্যে চাষীর জমি চাষীর মালিকানাতেই থাকবে এবং রাষ্ট্র তার সহায়তা করবে জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। চাষীকে মাঠের মজুরে যদি পরিণত করা না হয়, এবং সে যদি এটি জানে, এ জমি তার নিজের, তবে তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে! কবির সঠিক বাক্যগুলি আমার হাতের কাছে নেই, কিন্তু মানবতার দিক থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত অনেকটা এই প্রকারই ছিল।

জনকল্যাণের আদর্শ পৃথিবীর প্রতি রাষ্ট্রেরই মন্ত্র—সেখানে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ভারত আজ একই চিন্তায় চিন্তিত। চাষীসাধারণের হাত থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোথাও জমি কেড়ে নেয়নি, কেননা সবাই জানে জমির আদি মালিক তারাই যারা জমি স্বহস্তে কর্ষণ করে। কিছুকাল আগে মিঃ খ্রুশ্চভের সহকারী মন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান গিয়েছিলেন আমেরিকায়। তিনি মাঠের চাষী এবং কল-কারখানার মজুরদের সম্পদ-সমৃদ্ধ অবস্থাটির দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে যান্। আমেরিকান চাষী ও মজুর সোভিয়েট দেশের চাষী-মজুর অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত এবং বৈভবশালী—এটি মিকোয়ান সাহেব স্বচক্ষে দেখে আসেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কো-অপারেটিভ ফার্মিংয়ের কাজে হাত দিয়েছেন, যেটিতে চাষীর মূল মালিকানা ক্ষুন্ন না ক'রেও 'যৌথ' চাষের কাজ করা যাবে। যৌথ-চাষ যে উন্নতির পথ তাতে সন্দেহ নেই। অধিকতর ফসল ফলাবার জন্য যৌথ-চাষের প্রণালী সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু তর্ক বাধে শুধু তার প্রয়োগ-পন্থা নিয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন জনগণের রাষ্ট্র, এবং সোভিয়েট ভূমির নিয়ন্তা হলেন রাষ্ট্র,—কিন্তু ভূমির মালিক চাষী নয়! সবাই সবাইয়ের জন্য চাষ করছে, কিন্তু কে কা'র জন্য করছে সেটি অস্পষ্ট! সর্বাগ্রে আমি দেখব, যে-জমিতে চাষ করছি সেটি একান্তভাবে আমার নিজস্ব কিনা,—তবেই ত তাকে 'সাজাব যতনে কুসুম রতনে—!' জননীর কোলে মানুষ হওয়া এক জিনিস, ধাত্রীর হাতে পালিত হওয়া অন্য বস্তু!

মস্কো থেকে মাইল কয়েক দূরে গিয়ে সেদিন সকালে ছোটখাট একটি কলেক্টিভ ফার্ম, যাকে বলে, 'কলখোজ'—দেখছিলুম। আশেপাশে দেখতে পাচ্ছিলুম একটি দারিদ্র্যদশা, একটু যেন অনড়তা এবং ক্লান্তির আবহাওয়া। বিদেশীরা গিয়ে যদি পাঁচ রকমের প্রশ্ন করে, তাদের জবাবগুলি গুছিয়ে না বললে চলবে কেন? আমাদের ঘরে নবাগত এবং অপরিচিত কেউ এলে আমরা আমাদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাই দেখাতে চাই! এটা নিয়ম। সে যাই হোক, এই 'কলেক্টিভ ফার্ম'টি'র এখনও যথাযথ উন্নতি করা সম্ভব হয়নি, এখনও সর্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায়নি, তবে এই লাইনে কাজ চলছে, ইত্যাদি। আগাগোড়া সব আমাদেরকে বুঝিয়ে বলা হল। এখানে একটি পুরনো নীচু বাড়িতে হেড আপিস, দেওয়ালগুলিকে যথাসম্ভব সুদৃশ্য করার জন্য কাঁচা রং লেপা,—আনুপূর্বিক চেহারাটা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। মস্কোর এত কাছে এমন একটি দৈন্যদশা ঠিক আশা করিনি। বোধ হয় প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার। আপিসের সামনে বড় রাস্তায় উঠে আসবার পথটা জল-কাদায় ব্যাড়ব্যাড় করছিল, আমরা জুতো এবং পোষাক বাঁচিয়ে কোনওমতে পেরিয়ে এলুম।

বস্তুত, মস্কো অঞ্চল থেকে পল্লীগ্রামের দিকে বেরিয়ে এলে দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের জীবনযাত্রা এখনও যথেষ্টই অনুন্নত। বহু ক্ষেত্রেই পথঘাট এখনও তৈরি হয়নি, নালা-নর্দমার সুবিধা নেই, টিউব-ওয়েলের দ্বারা দূর-বিচ্ছিন্ন গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সন্ধ্যার পরে আলোর ব্যবস্থা যথোচিত নয়, আহার্য সামগ্রী সংগ্রহ করায় বিবিধ অসুবিধা, সচ্ছন্দ বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক ঘরদোর কম, বড় বড় দোকান হাতের কাছে না থাকার জন্য দূর-দূরান্তর পেরিয়ে শহর-বাজারের দিকে ছুটোছুটি,—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এখনও কষ্টকর অবস্থার শেষ যেন হয়নি! গ্রামের ধার দিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে ধুলো বা কাদা, জল বা ডোবার ধার পেরিয়ে খানা-খোন্দল ডিঙিয়ে যখন মেয়ে-পুরুষকে বহুদূর পর্যন্ত পেরিয়ে অন্য গ্রামের দিকে যেতে দেখতুম,—তখন আমাদের চেয়ে ওদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী যে খুব বেশি উন্নত, এমন কথা মনে হত না। অনেক সময় আমি ব্যথিত চক্ষে চেয়ে থেকেছি!

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের পার্টিশনের পর পাঞ্জাবীদের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি! পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা চলে এসেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ সর্বস্বান্ত, কিন্তু তা'রা পথে ব'সে নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে হা-হুতোশ করেনি, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে পথে ঘোরেনি, মন্ত্রীদের উমেদারদের উমেদারি করেনি,—তারা কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে, নিজের হাতে ঘর বেঁধেছে, বন-জঙ্গল সাফ ক'রে এক-একটি উপনগর বসিয়েছে, জমিদারের বউ হয়ে খাবারের দোকানে বসেছে, এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, কষ্ট এবং দুর্গতিকে একেবারেই আমল দেয়নি। তারা দুঃখ ভুলেছে, চোখের জল মুছেছে, নিজের চারিদিকে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা পূর্ব পাঞ্জাব থেকে রেফুজি সমস্যা সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। অতঃপর নিজের হাতে আজ তা'রা একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছে। পূর্ব পাঞ্জাব সম্পদে এবং ঐশ্বর্যে আজ সমুজ্জ্বল।

এ ব্যাপারে আধুনিক পৃথিবীর আর মাত্র তিনটি জাতি পাঞ্জাবের সমকক্ষ,—একটি পশ্চিম জার্মানী, আরেকটি ইসরায়েল, এবং তৃতীয়টি সোভিয়েট উক্রাইন।

সেই পাঞ্জাবীপ্রকৃতি রুশপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এরা কষ্ট এবং দুর্গতিকে স্বীকার করে না, সুকঠিন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা দুস্তরকে সহজ করে। জলে, কাদায়, বরফে হি হি করছে, দুর্যোগে অন্ধকার চারিদিক, বাসস্থানের ও স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত অভাব, তুহিন ঠান্ডার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করতে অসমর্থ হচ্ছে, —কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। অবস্থাকে উন্নত করার জন্য সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম সুকঠিন,—কিন্তু মুখে সজ্জল হাসি। নিয়মিত স্নানাদির অভাব, পায়খানার অব্যবস্থা, একই রান্নাঘরে পাঁচটা পরিবার, একই শোবার ঘরে সাতজন, গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, উত্তাপের অভাবে হয়ত কাঁপছে, আলোবায়ুহীন ঘরটিতে মন টিঁকছে না,—কিন্তু তারা জানে, এ অসুবিধা থাকবে না, তা'রা রাষ্ট্রের কল্যাণ আদর্শে বিশ্বাসী, এবং তা'রা কোনও দুঃখ-যন্ত্রণার ভয় পায় না! মস্কো নগরীর ভিতরে ও বাহিরে শত শত 'ক্রেন' প্রতিদিনের বিরাট নির্মাণ তালিকার নিরত সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষের এই অদম্য প্রাণশক্তির দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কতদিন চেয়ে থেকেছি।

সেদিন সন্ধ্যায় উক্রাইনা হোটেলের নীচের তলাকার মস্ত হল-এ ভারতীয় লেখক ও কবি-সম্মেলন বসল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন বিনয় রায়, ননী ভৌমিক, সমর সেন, প্রভাস বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন রায়, শুভময় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এ'রা। ওদিকে আছেন প্রিয়দর্শী সাজ্জাদ জহীর, চৌহান, তাবান, শেখোন, আত্রে, দুর্গা ভগবৎ, লক্ষ্মীকুমারী, প্রদ্যোৎ কাউর, যশপাল, দোসা, সত্যানন্দ, পট্টনায়ক, মালসুখানি, হরচরণ সিং, প্রীতম সিং ইত্যাদি। পাকিস্তান থেকে আছেন ফৈয়াজ আহমেদ ফয়েজ এবং হাফিজ জলন্ধরী। রুশ লেখক আছেন অনেকেই, তাঁদের কয়েকজনকে আজকাল বেশ চিনতে পারি। আহারাদি এবং পানাদি আরম্ভ হয়ে গেল। প্রচুর খাচ্ছে সবাই। এমন ব্যয়বহুল পানাহার কে দিচ্ছে, আমার জানা নেই। কিন্তু এটি জানি, সব ভারতীয়গুলিকে একসঙ্গে ধ'রে মস্কোর হাটতলায় গিয়ে বেচলেও আজকের খাই-খরচের সিকি ভাগও হবে না! হলের শেষ দিকে আজ একটি মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, সেখানে সাজ্জাদ জাহীর প্রমুখ কয়েকজন শোভা পাচ্ছেন। এদিকে সমগ্র হল-এ সেই বিপুল পরিমাণ পানাহারের আসরে পরস্পর হাসি-তামাসা ও গল্প-গুজব চলছিল। এ যেন একটা রুশ-ভারত লেখক সম্মেলনের মতো—যেটি একদা তাসকন্দে রবীন্দ্র-সভায় দেখে এসেছি।

ভারতীয় কবি-সম্মেলনের উদ্বোধনকালে শ্রীযুক্ত সাজ্জাদ জহীর প্রস্তাব করলেন, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রপাঠ ক'রে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করা উচিত! তাঁর এবম্বিধ প্রস্তাবটি শোনামাত্র সমগ্র সভায় করতালিধ্বনি উঠল। কিন্তু তিনি এই সূত্রেই হঠাৎ এক সময়ে আমার নামটা উচ্চারণ ক'রে আমাকে একটি আবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি একান্তে ব'সেছিলুম এতক্ষণ, সহসা আমার নাম প্রস্তাবিত শুনে প্রথমটা একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলুম। আমার ডানপাশে বসেছিলেন শ্রীমতী লিডিয়া এবং বাঁদিকে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্তা হেলেন রমানোভা। শ্রীমতী লিডিয়ার সানন্দ হাততালির দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন তাঁরই জয়ঘোষণা। তিনি প্রায় আমাকে ঠেলে তুলে এগিয়ে দিলেন। আমি কাঁচুমাচু মুখে অগ্রসর হয়ে সোজা গিয়ে মঞ্চের উপরে উঠলুম এবং অতঃপর মহাকবির একটি কবিতা আবৃত্তি করার আগে ছোট একটি ভাষণ দিয়ে সকলকে এইটি জানালুম, মহাসমুদ্রের থেকে এক চামচ জল তুলে এনে অন্তহীন এবং অগাধ জলধির পরিচয় দেওয়া চলে না! তা ছাড়া তাঁর মূল বাঙ্গলা ভাষা আপনাদের প্রায় সকলেরই নিকট অজ্ঞাত। আমার আবৃত্তির মধ্যে কেবলমাত্র ধ্বনি, ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা যদি আপনাদের মনে কিছু রেখাপাত ঘটে, আমার সেইটিই আনন্দ।

কবিতা আবৃত্তির পর শ্রোতৃসাধারণ আন্তরিকভাবে করতালিধ্বনির দ্বারা কবির উদ্দেশেই তাঁদের নৈবেদ্য নিবেদন করেছিলেন। অতঃপর পাকিস্তানের দুই-

জন্ম কবি ফয়েজ আহমেদ এবং হাফিজ জলন্ধরী সেই রাত্রে গান গেয়ে-গেয়ে তাঁদের কবিতা যেভাবে শুনিয়ে সকলকে নির্মল আনন্দ দান করেছিলেন সেটি আমাদের অনেকের পক্ষেই স্মরণীয়। তাঁদের উভয়ের সেই কবিতাগুলির মধ্যে পাকিস্তানের প্রপীড়িত আত্মার বন্ধন-জর্জরতা ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠেছিল। অনেকে অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। পরিশেষে রুশ-লেখক এবং 'অগানিয়োক' (আগুন) সাপ্তাহিকের সম্পাদক সৌম্যদর্শন এবং দীর্ঘ-স্থূলকায় মিঃ সফ্রোনভ তার নৃত্য ও কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেষন ক'রে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। এ-আমোদ উপভোগ করার মতো ছিল।

আসর শেষ হবার আগেই আমি বেরিয়ে আসছিলুম। দরজার বাইরে পা দিতেই ওদিক থেকে জনৈক শ্যামবর্ণ ব্যক্তি আমার জন্য এসে সামনে দাঁড়ালেন। মনে হল, তিনি বাইরে এতক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। আমি থমকিয়ে গেলুম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি ভারতীয়। ভদ্রলোক এবার সহাস্যে পরি-চ্ছন্ন বাঙলায় বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনার জনাই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমাকে এখানে 'লিটন্ জ্যাক্' ব'লে সবাই জানে।

এবার মুখ তুললুম ভাল ক'রে,—আপনি বাঙালী?

আজ্ঞে, হাঁ। আমার পূর্বনাম ছিল হরেন্দ্রলাল দত্ত। ১৯৩০-এ আমি রাজ-নৈতিক কারণে বোম্বাই থেকে ছদ্মবেশে জাহাজে পালিয়ে আসি। আমি বিপ্লবী-দলে ছিলুম। ইউরোপে কোথাও আমার ঠাঁই হয়নি। এখানে এসে জায়গা পাই। সে অনেক কাহিনী। দেশে আমার বৃদ্ধা মা আছেন জানতুম। আমি নানা দুঃখ-কষ্টে মানুষ হয়েছিলুম। আমি একই সন্তান। ছোটবেলায় পিতৃহীন হই।

প্রশ্ন করলুম, ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে ফেরেননি কেন?

লিটন্ জ্যাক্ জবাব দিলেন, আমি এখন সোভিয়েট নাগরিক! এখানে আমি রুশ মহিলাকে বিবাহ করেছি, আমার ছেলেপুলে আছে। এখানে খবরের কাগজে আমি কাজ করি। আমার ভালই উপার্জন।

এবার আমি পার্শ্ববর্তিনী লিডিয়াকে শুনিয়ে ইংরেজীতে তাঁকে প্রশ্ন করলুম, ভারতীয় 'ক্যাপিটালিস্টদের' বিরুদ্ধে কি আপনাকে নিয়মিত গালমন্দ লিখতে হয়?

ভদ্রলোক এবার খুব হেসে উঠলেন, এবং লিডিয়া ছটফট ক'রে উঠে বললেন, আপনার কেবল কথায় কথায় খোঁটা! আমাদের কি খেয়ে-দেয়ে আর কোনও কাজ নেই? বেশ, ও'কে যা খুশি আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি স'রে যাচ্ছি।

লিডিয়া রাগ ক'রে ঠরঠরিয়ে হাত প'চিশেক দূরে গিয়ে একখানা মখমলের কুশন-কেদারায় বসে রইলেন।

হরেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় হাসিমুখে বললেন, আমি রুশভাষায় লেখাপড়া করি। আরও তিন-চারটে ভাষা ভালই জানি। মস্কো বা অন্য সোভিয়েট ইউ-নিয়ন রিপাবলিকের কোনও ভাষার কাগজে ভারত-বিরোধী একটি বাক্যও প্রকাশ পায় না! বরং এর উলটো। ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, এ'রা সেগুলি নিয়মিত প্রকাশ করেন। এইটিই এ'দের নীতি। আপনি যখন এসেছেন, এদেশ ভাল ক'রে দেখে যান, ভারতের প্রতি এ'দের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

বললুম, গান্ধীজির সম্বন্ধে এ'রা একবার খুব মন্দ কথা ছেপেছিলেন, মনে আছে আপনার?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, সেটি ষ্টালিন আমলের কুকীর্তি। সে-সব লেখা বাজার থেকে একদম তুলে নেওয়া হয়েছে। ভারত স্বাধীনতার পর গান্ধীজি রাতা-রাতি কমিউনিস্ট হননি কেন, এইটি ছিল ষ্টালিনের আক্রোশ!

আপনি কি কমিউনিস্ট?

আমি পার্টির সভ্য নই, কিন্তু আমি সোভিয়েট নাগরিক। ভারতে যেমন কন্-গ্রেসের 'ওয়ার্কার' না হয়েও ভারতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, এখানেও তাই!

আবার একটি বেয়াড়া প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা হরেনবাবু, ভারতবর্ষে যদি কখনও কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়,—আপনি সুখী হবেন?

লিটন্ জ্যাক্ জবাব দিলেন, আমি সোভিয়েট নাগরিক! ভারতবর্ষ সুখে থাক্, তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হোক,—দূরের থেকে এই আমার কামনা। তার পথ সে জানে, আমার কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই!

বললুম, ভারত গভর্ণমেন্ট সম্বন্ধে আপনার ধারণা কেমন?

অত্যন্ত ভালো!—ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আমার গর্ব, আমার আনন্দ! আমি কাঠখোট্টা মানুষ, দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভে আমার সব দুঃখ মুছে গেছে!

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আপনি ত' এখন সোভিয়েট নাগরিক!

হরেনবাবু বললেন, আমার জীবন যে দুই দেশে গড়া! দুই আমার আপন। আপনি বিশ্বাস করুন, দশ এগারো বছরের মধ্যে ভারতের এই উন্নতি দেখে এরা অবাক হয়ে গেছে! তা ছাড়া ভারত এদের বড় প্রিয়।

আমি প্রশ্ন করলুম, আপনি কি আমাকে এই কথাগুলি বলবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

না,—হরেনবাবু জবাব দিলেন, আপনার দু' একখানি বই আমি রুশভাষায় অনুবাদ করব, আপনি অনুমতি দিন্।

এ'রা কি অনুমতির অপেক্ষা রাখেন? শুনেছি পৃথিবীর সব বই এ'রা যখন খুশি অনুবাদ করিয়ে নেন্?

ভদ্রলোক একটু থতিয়ে গেলেন। পরে বললেন, এ'দেরও ক্লাসিক গ্রন্থ পৃথিবীর সবাই নিজের ভাষায় নিয়ে নিয়েছে, কেউ অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি! আপনি যদি দেশে ফিরে আমাকে একখানা অনুমতি-পত্র পাঠান্ আমি খুশী হই। আপনার খান পাঁচেক বই আমার কাছে আছে।

ভদ্রলোককে আজও আমার চিঠি দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে বছর খানেক আগে রুশভাষায় Dolls নামে আমার একখানি গল্পের বই ছাপা হয়। সেখানি প্রকাশ করেন মস্কোর 'ফরেন লিটারেচার পাবলিশিং হাউস'।

ভদ্রলোকের বিদায় নেবার আগে হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করলুম, দেশে ফিরতে আর আপনার ইচ্ছা করে না?

লিটন্ জ্যাক-এর বাড়ি ছিল পূর্ব-বঙ্গের কোন্ সুদূর অন্ধকার পল্লীগ্রামে। প্রশ্ন শুনে তিনি ক্ষণকাল আমার দিকে তাকালেন। পরে একপ্রকার অদ্ভুত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, সেখানে আর ঠাঁই নেই আমার!

ওভারকোটটা কাউণ্টার থেকে চেয়ে নিয়ে নমস্কার জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। বাইরে তখন দুর্যোগ, তুষার-মেলানো দুরন্ত ঝাপটা চলছে। ওপাশে চেয়ে দেখলুম, কবি-সম্মেলনে পানাহারের প্রবল আনন্দের আসর। এপাশে অদূরে কে এক নবাগতা নারীর সঙ্গে শ্রীমতী লিডিয়া উচ্ছ্বসিত আলাপের মধ্যেও আমার দিকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলেন।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, কিংবা ওই তুষার দুর্যোগের ভিতর দিয়ে লিটন্ জ্যাকের পিছু নিয়েছিলুম, আজ আমার সঠিক মনে নেই! বোধ হয় আমার সেদিনকার নিখুঁৎ সাহেবী পোষাকের ভিতর থেকে বংসহারা এক দরিদ্রা বাঙ্গালী জননী হঠাৎ শাসন-বাঁধন ছিঁড়ে অন্ধকার পল্লীপথের ভিতর দিয়ে বিপ্লব-বাদী সন্তানের পিছু পিছু ছুটেছিল কাঁদতে কাঁদতে। সেই জননীর কান্না ওইখানে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই শুনেছিলুম!

শ্রীমতী লিডিয়া ইশারায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন দোতলার একটা নিরিবিলি লবীতে। এখানে সর্বত্র ঘন সবুজ মখমলের আসবাব। আলোটা সবুজ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করছে। মেঝের কার্পেটটিও সবুজ। রাত্রের দিকে সর্বত্র যেন এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। সম্পদের প্রাচুর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে চারি-পাশে। রাত্রি অনেক।

সেখানে ঘন কালো আঁটসাঁট পোষাক-পরা একজন দুগ্ধবর্ণা সুশ্রী যুবতী-মহিলা একাকিনী বসেছিলেন। আমাকে আসতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখশ্রী তাঁর অতি কমনীয় এবং শান্ত-মধুর। কিন্তু তাঁর ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদের আঁটুনি পেরিয়ে ভরা যৌবনসমৃদ্ধ দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন সুপরিস্ফুট যে, তাঁর সুন্দর মুখখানির উপর ছাড়া আর কোনটার দিকে চোখ রাখা যায় না! পরিচ্ছদ পরিধানের সুকৌশল পারি-পাট্যের দ্বারা পৃথিবীর সব দেশে, এবং ভারতেও—যৌন-আবেদন প্রচারের একটি রীতি নারীসমাজে প্রচলিত আছে। সেই আবেদনের দ্বারা মেয়েমানুষ যদি তার চক্ষু ও ভঙ্গীর ইশারায় নিজের দিকে পুরুষকে আকর্ষণ করতে থাকে, তবে সেটি নারী-প্রকৃতির দৈন্য, সেখানে পুরুষের বলিদান ঘটে, এবং মেয়েরা জয়ের উল্লাসে মদমত্ত হয়ে ওঠে। এখানে এই নম্রমুখী নারীর সেই অভিসন্ধী নেই লক্ষ্য ক'রে কতকটা যেন স্বস্তি পাওয়া গেল। আমি তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ জানালুম। কৃষ্ণবসনঢাকা অগ্নিকুণ্ড যেন সামনে বসল।

মহিলাটি উক্রাইনের মেয়ে। বাড়ি রাজধানী 'কিয়েভ' শহরে। তিনি 'সেস্উইথ' নামক একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদিকা। তাঁর নাম শ্রীমতী অলেসিয়া ক্রাভেজ। "সেসউইৎ" শব্দটির ইংরেজি অর্থ হল, 'ওয়ান ওয়ার্লড'—পৃথিবী এক। অলেসিয়া নিজে একজন ঔপ-ন্যাসিক, এবং একখানি উক্রাইন ভাষায় ও রুশলিপিতে লেখা বই আমার জন্য এনেছেন। বইখানি বিশেষ মোটা এবং গেরুয়াবর্ণের মলাট। সোনালি অক্ষরে মলাট ছাপা। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারা গেল, তাঁর এই আসার মধ্যে লিডিয়ার হাত আছে। অলেসিয়া একবর্ণও ইংরেজি বোঝেন না, সেইজন্য লিডিয়া আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলেন। ও'রা দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমি বললুম, আপনি আমাদের কবি সম্মেলনের আসরে কেন গেলেন না?

অলেসিয়া কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে জবাব দিলেন, ওখানে ঢুকতে ভারি লজ্জা করছিল!

তাঁর এবম্বিধ লজ্জা তাঁর এই আঁট-সাঁট পোষাকটির সঙ্গে জড়িয়েছিল কিনা সেটি যখন ভাবছিলুম, তখন লিডিয়া বললেন, আপনার সঙ্গে উনি আলাপ করার জন্য এসেছেন। এখানে ও'র কোনও কাজ ছিল না!

অলেসিয়া বললেন, আপনাকে আমি কফি খাওয়াতে চাই!

হাসিমুখে বললুম, রাত একটা বেজে গেছে। কফি খেলে ঘুম হয় না শুনেছি?

তা হলে বার দুই কফি খান্!

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলুম। লিডিয়া একবার উঠে গিয়ে কফির ব্যবস্থা ক'রে এলেন। আজ না ঘুমোলেও চলবে! অতঃপর আমরা দেশ-কাল-পাত্র এবং পরস্পরের পারিবারিক গল্পে মেতে উঠ-লুম।

এক সময় আমি ধ'রে বসলুম, পশ্চিম সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারের হাতে ছিল বছর তিনেক। কিন্তু জার্মানরা যখন উক্রাইন আক্রমণ করে, তখন আপনার বয়স কত?

অলেসিয়া হাসিমুখে বললেন, তখনও আমি সতেরো বছরে পৌঁছইনি।

লিডিয়াকে প্রশ্ন করলুম, আমার কথায় অলেসিয়া হাসছেন কেন? দাঁত-গুলি ও'র মুক্তোর মতন, দেখতেই পাচ্ছি! তাহলে—?

না মশাই, সেজন্যে নয়। আপনাকে বলতে ও লজ্জা পাচ্ছে,—অলেসিয়া তখন স্বামী নিয়ে ঘর করছিল!— লিডিয়া আমাকে সহাস্যে ধমক দিলেন।

বেশ ত, তারপর?

এবারে আর হাসির অবকাশ রইল না। দেখতে দেখতে অলেসিয়ার সেই চুলটেনে-বাঁধা মুখখানি কতকটা গম্ভীর ও ছলছলে হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আজ আমার মনে পড়ছে না সেদিন কেমন ক'রে বাঁচলুম, কী খেলুম, কোথায় গেলুম! জার্মানী আক্রমণ করবে আমরা কেউ জানতুম না! আমার শ্বশুরবাড়ির ওপর যখন বোমা পড়ল, তখন ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলুম বাপের বাড়িতে। সেখানে মা-বাবা-ভাই-বোন কা'রোকে দেখলুম না। স্বামী কাজে বেরিয়েছিলেন, আর ফির-

লেন না,—এবং আর কোনওদিন তাঁর দেখাও পেলুম না! শহরের সব জায়গায় বেমার বৃষ্টি হচ্ছে, বড় বড় বাড়ি ছিট্‌কে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে—! চারদিকে কত লোক মরছে! কিন্তু আমি কেমন ক'রে বেঁচে যাচ্ছি বুঝতে পারছি নে—আমি আবার সেই ভাঙা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলুম। কোনমতে সেখান থেকে একটা পুঁটলি কোমরে নিয়ে ছুট দিয়েছিলুম একদিকে—। চোখের ওপরে আমাদের সাজানো বাগানের সর্বনাশ হতে লাগল—!

বললুম, ভবিষ্যৎ কালের ঔপন্যাসিক এই অবস্থাতেই বেঁচে যায়! হ্যাঁ, তারপর —গেলেন কোথায়?

অলেসিয়া বললেন, কোথা গেলুম! তা জানব কেমন ক'রে? আমি কি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি কোনদিন? চারদিকে তখন মিলিটারি, পশ্চিম থেকে জার্মানরা আসছে, মাথার ওপর প্লেনের যুদ্ধ, দেশের লোকরা সব ছেড়ে পূর্বদিকে পালাচ্ছে,—আমার মনে নেই কোথায় গেলুম। তবে ওই বোধ হয় পূর্বদক্ষিণের পথ দিয়ে ছুটেছিলুম একদিকে...... রাস্তায় রাস্তায় কোথাও কলের জলও ছিল না—। আমার মতন হাজার হাজার ছুটেছিল—কত লোক মরেছে না খেয়ে—কত লোক পাগল হয়ে গেছে...... ওলাওঠায় কত মরেছে.........

লিডিয়া শান্ত গম্ভীরভাবে বসেছিলেন। এবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমাদের সেদিনের দুঃখ আপনাদের কল্পনারও অতীত!

অলেসিয়া বললেন, প্রায় সাত মাস। একে একে জামা-জুতো-মোজা—সব ছিঁড়তে লাগল। কখনও মাঠে ঘুমোচ্ছি... মাথার ওপর প্লেন দেখে গাছতলায় লুকোচ্ছি! গ্রামাঞ্চল অন্ধকার, সেখানে আশ্রয় নিয়ে হয়ত বা দুদিন কাটল: আবার পিছন থেকে তাড়া এল......আবার পাততাড়ি গুটিয়ে ছুটতে লাগলুম। হিসেব ক'রে দেখলুম, প্রায় এক হাজার মাইল হেঁটে শেষ করেছি! ভয় ছিল পাছে জার্মানদের হাতে পড়ি—!

ভয় কেন! ওদের খাকি পোষাকের আড়ালে অনেক সত্যিকার মানুষ হয়ত চাপা ছিল!

না, একজনও না!—অলেসিয়ার সেই নধর সুন্দর চক্ষু এবার দপ ক'রে জ্বলে উঠল,—একজনও মানুষ ছিল না! ওরা ছিল পাগলা কুকুর! আপনি কি জানেন, শেষের দিকে ওরা এদেশের মানুষের মাংসও আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে গেছে? আমাদের যুদ্ধ ছিল মানুষের সঙ্গে বনমানুষের! তারা না পারে হেন কাজ ছিল না।

আমাদের কফির আসর বেদনার আসরে পরিণত হয়ে উঠল। ওধারে হোটেলের সেই অপর প্রান্তে টেবলের ওপর মাথা রেখে একটি 'ফ্লোর মেড' ঘুমিয়ে। টেবলল্যাম্পটি জ্বলছে তা'র মাথার কাছে। এদিকটা নিশুতি। নিচের তলায় ক্বচিৎ এক একবার জুতোর মসমস শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এবার বললুম, আপনারা কি পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছিলেন?

না, ভিক্ষে কেন করব?—অলেসিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, চেয়ে খেতে হয়নি! উপবাস করতে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু গ্রামে যখন পৌঁছেছি, দু'হাত বাড়িয়ে সবাই ডেকে নিয়েছে। খেতে দিয়েছে যার যা কিছু ছিল! ছেঁড়া জামা ছাড়িয়ে আস্ত জামা পরিয়ে দিয়েছে, জুতো মোজা যেমন ক'রে হোক যুগিয়ে দিয়েছে,—কেউ কখনো কৃপণতা করেনি! এমনি করে প্রায় সাত মাস পরে যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, জার্মানরা সেখানে কোনদিন নাগাল পায়নি। তারপরে এক কারখানায় কাজ পাই। সে-অঞ্চলে মস্ত বড় এক 'চীনা-বস্তি' ছিল। সেখানে পঁচিশ তিরিশ হাজার চীনা বাস করে বহুকাল থেকে। সেটা ছোট্ট একটি শহর। সেখানে আমি চীনাভাষা শিখি!

অলেসিয়া ম্লান হাস্যে বললেন, আমার প্রথম জীবনে সেই যে ঘর জার্মানরা ভেঙে দিয়েছিল, সে-ঘর আর জোড়া লাগেনি!

আপনার কি সন্তানাদি ছিল?

লিডিয়া দপ করে বললেন, নন্‌সেন্স্‌, ওর তখন সবে বিয়ে হয়েছে! ওর বাবা ভাল পাত্র খুঁজে ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনাদের কি চার্চে গিয়ে বিয়ে হয়?

না—অলেসিয়া জবাব দিলেন, আগেকার কালে অবশ্য চার্চের সম্মতি ছাড়া বিয়ে হত না এবং চার্চের সম্মতি ছাড়া ডাইভোর্সও হত না। এখন সব কিছু রেজেস্ট্রি ক'রে হয়। অনেকে এখনও বিয়ের পরে আশীর্বাদ নিতে চার্চে যায়। যার যেমন খুশি।

প্রশ্ন করলুম, আপনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন কবে? আপনার ছেলেপুলে কি?

লিডিয়া আবার আমাকে ধমক দিলেন, —বড্ড বেমক্কা প্রশ্ন করেন আপনি! বিয়ে আর উনি করেননি! নিন্‌, কফি যে আপনার ঠাণ্ডা হয়ে এল!

অলেসিয়া তখন মধুর হাসি হাসছিলেন। রাত্রি তখন শেষ হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েক মাস অবধি কলকাতায় বসে এই মহিলার কয়েকখানি চিঠি পাই। সব চিঠিগুলি একে একে শ্রীমতী লিডিয়া অনুবাদ ক'রে মূল পত্র

সহ পাঠিয়ে দেন্। একখানি চিঠি বেশ কৌতুকজনক ছিল। শ্রীমতী অলেসিয়া চীন ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। ইয়াংসি নদী পার হবার সময় তিনি 'মহুয়া' গাছের একটি ছোট্ট ডাল আমার জন্য সংগ্রহ করেন! তারপর পেকিং থেকে ফিরবার সময় তিনটি কফির পেয়ালা আমাদের তিনজনের জন্যে, এবং ছোট একটি কাঁচের বাক্সে ডালে-বসা দুটি পুতুল-পাখী আমার জন্য আনেন! কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি। তিনি মঙ্গোলিয়া হয়ে তাঁর নিজের কাজে তাসকন্দ যান, এবং সেখানে আমার 'কন্যা' শ্রীমতী সোয়েৎলানা যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে এই খবরটি নিয়ে মস্কো ফেরেন।—"আপনি আবার যখন মস্কোয় আসবেন তখন ওই পেয়ালায় আমরা তিনজনে কফি খাব এবং পাখী-পুতুলের বাক্সটি আপনার হাতে দেবো। সেই প্রথম রাত্রে আলাপকালে আপনার কথাগুলি আমার কানে ও স্মৃতিতে আজও রয়েছে। আপনার সেই মহৎ বাক্যগুলি থেকে আমি জীবনের শক্তি, গর্ব এবং বিশ্বাসকে যেন আবার খুঁজে পাই! বাঁচতে হয় অন্যের সেবায়—এই অবিস্মরণীয় শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছিলুম! আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি আপনার অলেসিয়া।"

নয় মাস পরে পুনরায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণে গিয়েছিলুম। কিন্তু অলেসিয়াকে আর কখনও দেখিনি। তিনি বুঝি তখন দক্ষিণ সাইবেরিয়ার দিকে একাকিনী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন কেউ জানে না!

ঠিক মনে নেই, লেনিনই বোধ হয় প্রথম রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, "ধর্মটা হল আফিঙের মতো। ওটা নেশা। ওটার প্রভাবে মানুষ বন্দ হয়ে থাকে, এবং ওর বাইরে জীবনের আর কোনও রূপ চোখে পড়ে না।

লেনিনের এই মন্তব্যটি নিয়ে আমরা তরুণ বয়সে লোফালুফি করতুম। কলকাতার কালিঘাটে যাওয়া বন্ধ করলুম, কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকতুম না, কেউ কেউ বাপ-ঠাকুর্দার পিন্ডদান বন্ধ করল, কেউ গির্জার দিকে চেয়ে হাসল, মসজিদ দেখে কেউ কৌতুক বোধ করল। গান্ধীজির সর্বব্যাপী অভ্যুত্থানের আগে রাজনীতিক চেতনার মধ্যে আমরা মনে মনে লেনিন এবং তাঁর বিপ্লববাদকে বরণ করেছিলুম।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে একটি ভিন্ন প্রকার ধর্ম বর্তমান—সেদিকে নবসভ্যতার উদ্গাতা মহামতি লেনিনের চোখ পড়েছিল কিনা আমার জানা নেই। সেটি হল 'ভূতের' ভয়। পাশ্চাত্য দেশে এই 'ভূত' যেমন প্রচুর, প্রাচ্যেও তেমনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংস্কার হল প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের একটি মিশ্রিত রূপ—পাঁচ রকম ঔষধ মিলিয়ে এক শিশি 'মিক্সচার'! বাইরে কেউ খৃষ্টধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যাকে জিজ্ঞাসা করছি সেই বলছে, "am not a believer",—যেন বিশ্বাস করতে গেলে ছোট হয়ে যাবে, যেন অবিশ্বাস করলেই সুখে থাকবে! কিন্তু ভিতরে গিয়ে যখন ঢুকলুম, দেখি সামান্য একটা কালো রংয়ের বিড়াল দেখলেই আঁৎকে ওঠে গৃহস্থরা,—কেননা ওটা 'অলক্ষণে!' হরিৎবর্ণ একটি গাছের ডাল যত্ন ঘরে পুষে রাখে বছরে আট মাস—শুধু চোখের তৃপ্তির জন্য, তারা সবুজ রংয়ের কোনও সামগ্রী পেলে বলে, ও রংটা আমাদের পক্ষে অশুভ! গ্রামের মধ্যে সাপ বেরোলে আঁৎকে ওঠে সবাই,—কি জানি, এ বোধ হয় কোনও অজানা বিপদের সংকেত! ভারতীয়রা 'হাত' দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, এজন্য গৃহস্থ মেয়েরা হাত বাড়িয়ে ছুটোছুটি করে। আমি নিজে গণৎকার কিংবা ভবিষ্যৎবেত্তা নই, কিন্তু তামাশা করে হাত দেখার ফলে আমার বন্ধু জাইৎজেভ এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিপ্লব বেধে ওঠে আর কি! যারা বিপ্লবের এত বড় পূজারী, তারা যখন খৃষ্টের তিথি ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "খৃষ্টমাস ফাদারের" সেই পক্বশ্মশ্রুযুক্ত বৃদ্ধের ছবিটি লক্ষ লক্ষ কার্ডে ছেপে বিলি করে, এবং সমগ্র রাশিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থঘরে উৎসব-আমোদ-আহ্লাদের সাড়া পড়ে যায়, তখন বুঝতে পারি "নস্-বিলিভার" হল ওদের বাহ্বাস্ফোট, অন্তরে-অন্তরে ওরা সেই আদিকালেরই স্বাভাবিক মানুষ! বিপ্লবের দ্বারা ওরা সমাজ-ব্যবস্থা বদলেছে, কিন্তু সামাজিক মনকে কোথাও ওরা 'অধার্মিক' ক'রে তোলার চেষ্টা পারেনি—। 'বৃহস্পতিবারের বারবেলা, হাঁচি-টিকটিকি' ধোবার মুখ দেখলে অশুভযাত্রা, ভোরবেলা উঠেই অমুকের মুখ দেখা, অমুক বস্তুটি আজ খেতে নেই, অমুক লোকের মুখ দেখলে আজকের দিনটা ভাল যাবে না—' এই ধরনের চিন্তাভ্যাস নিয়ে ওদের দেশের বহু গৃহস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ওদের দেশের অতি দরিদ্ররা হয়ে উঠেছে অবস্থাপন্ন এবং অবস্থাপন্নরা হয়ে উঠেছে ধনাঢ্য। আমি যাদের সঙ্গে দিবারাত্র মেলামেশা করছি তারা যথেষ্ট ধনবান, এবং যথেষ্ট প্রকারে সুবিধাভোগী,—তাদের ব্যয়-বহুলতা দেখে অনেক সময় চমৎকৃত হয়েছি। যাদের সঙ্গে কোনমতেই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাচ্ছিনে তারা হল ওই বৃদ্ধা ঝাড়ুদারনি—আপাদমস্তক গরম পোষাক বেঁধে যে 'ঠাকুমা' রাজপথের দুদিকের নর্দমায় বরফ ঝাঁট দিচ্ছে। আমি হাতের কাছে পাচ্ছিনে ধোবা, নাপিত, মুচি, জেলে, চাষী, সাধারণ জীর্ণ পোষাকপরা মজুর,—ওই যাদের দেখছি ট্রাকে চড়ে ছুটছে কারখানার দিকে, মস্ত ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে ঘাসপাতা নিয়ে যাচ্ছে। আর পাচ্ছিনে ওই হাজার হাজার রাজমিস্ত্রি মজুর মেয়ে-পুরুষকে—যারা হাত-কনকনানো কঠিন তুহিন ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় বসে অমানুষিক পরিশ্রম করছে মুখ বুজে। কী কঠিন সব মেয়ে-মজুর! কে বলেছে ওদেরকে অবলার জাতি? পাথরের মতো নীরেট স্বাস্থ্য, কালোবর্ণ ও ধূলিসমাকীর্ণ পাজামা পরা, লোহার-তালের মতো বুক আর পাছা, সাংঘাতিক বলিষ্ঠ দুই নিরাভরণ হাত, ধুলোবালি-মাখা 'পাথরের' চোয়াল,—কী খায় ওরা? ওদের কি অসুখ নেই? ওরা কি ছেলে-পুলের মা হয় না?—ওদের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালে নিজেকে মনে হয়, আমি দুর্বল, স্বল্পভোজী, শ্রমভীরু, সুখান্বেষী, মেরুদণ্ডহীন, খর্বকায়—শুধু বাঙ্গালী! আমি যেন চিরকাল 'ভদ্রলোক' হয়ে রইলুম, কিন্তু মানুষ হলুম না! বাঁচার মতো আমি বাঁচলুম না, মরার মতো মরতে পারলুম না,—শুধু বন্ধ্যায় শেষ হয়ে গেলুম! চারিদিকে সৌভাগ্য রচনায় অশ্রান্ত আড়ম্বর দেখে ঘরের মধ্যে যখন ফিরে একা বসে থাকি, তখন নিজের মধ্যেই যেন একটা অশিক্ষিত, গ্রাম্য, বিদ্বেষপরায়ণা, অলঙ্কারলোভী এবং ঈর্ষাতুর মেয়ের কান্না শুনতে পাই!

বছরে চার পাঁচ লক্ষ রুবল নিয়মিত উপার্জন করেন এমন কয়েকজন লেখক ও সাহিত্যকর্মীর কথা যখন ভাবছিলুম, তখন একজন অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে একদিন অপরাহ্নকালে উঠলুম। এঁকে আগেকার দেখেছিলুম এবং এঁর নাম 'মালৎজেভ'। ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। দুচারখানি বই ইনি লিখেছেন

এবং 'স্টালিন পুরস্কার' পেয়েছেন। মস্কো থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি 'লেখক-উপনিবেশ' আছে,—যেমন প্রায় প্রত্যেক শহরেই আছে,—সেই উপনিবেশটির নাম 'পেরেডেল্‌কিনো', এবং সেখানে মালংজেভের একটি বাগানবাড়ি অর্থাৎ 'দাচা' আছে। তিনি মস্কোয় একটি ফ্ল্যাটে থাকেন, এবং তাঁর নিজের একখানি দামী বড় মোটরগাড়ি আছে। গাড়ির যাঁরা মালিক তাঁরা নিজেরাই গাড়ি চালান। আঁচে বুঝতে পারি ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য গাড়ির ড্রাইভার নিযুক্ত করা বেআইনী। এটি ট্রেড ইউনিয়নের দেশ। যদি ইউনিয়ন থেকে ডেকে এনে ড্রাইভার নিযুক্ত করা যায়, তবে সে-ব্যক্তি টাকা নেবে অনেক বেশি, এবং দিনের একটা বিশেষ সময়ে 'কাজ' করতে আসবে,—মোটরের মালিকের সঙ্গে সেটি হয়ত মিলবে না! অতএব গাড়ি কেনবার আগে গাড়ি ড্রাইভ করতে শেখা অনেকটা অত্যাবশ্যক। আমরা বরাবর যেসব গাড়িতে চড়ে আসছি সেগুলি অমুক ইউনিয়ন বা কমিটির গাড়ি। সেখানে ড্রাইভার বহুসংখ্যক এবং তাদের 'কাজ' ভাগ করা আছে। 'সোভিয়েট লেখক-সঙ্ঘের' মস্কো আপিসে বোধ করি ছয়খানা দামী, বড় এবং নতুন গাড়ি সকল সময়ে মোতায়েন রয়েছে। লেখকদের উপার্জনের একটি বিশেষ ভাগ লেখক-সঙ্ঘের তহবিলে দিতে হয়। উপার্জনের পরিমাণ বিবেচনা করলে সেটি গায়ে লাগে না। লেখক-সঙ্ঘের নিজস্ব শাসনতন্ত্র বর্তমান।

মালংজেভের ফ্ল্যাটটির পরিসর খুব কম। দুটি মাঝারি শোবার ঘর, সামান্য চলাফেরার জায়গা, খুব ছোট ছোট দুটি রান্না-ভাঁড়ার ঘর, একটি বাথরুম, এটা-ওটা রাখার জন্য একটু আধটু খোঁজ-খাঁজ,—কোনও মতে মাথা গোঁজা! প্রবেশ-পথের দরজাটি সিঁড়ির পাশে বন্ধ করে এলে একেবারে কৌটোর মধ্যে ঢোকা। আমরা দোতলায় এসেছি। ফ্ল্যাটের জানলা ও দরজাগুলি ভাল, আলো হাওয়া আছে। পাশের সরুগলির গায়ে-গায়ে পুরনো মস্কো, সেখানে বহু বাড়িওলা—তাদের বহু ভাড়াটে। জারের আমলে তাদের ঠাঁকার ছিল অনেক বেশি, ১৫৲ টাকার ঘরের ভাড়া নিত ৪৫৲ টাকা। এখন তারা জব্দ, কমিটি ভাড়ার রেট্ নির্দেশ ক'রে দেয়। সেকালের পেন্‌সন্‌ভোগীদের রাগ সেজন্য কম নয়। গোয়ালঘরের মতন এঁদোপড়া পুরনো ঘর ভাড়া দিয়ে আগেকার মতন আর মোটা মোটা টাকা পিঠবার উপায় নেই। সেইজন্য আগেকার-কালের বুড়ি দিদিমা আর বুড়োকর্তারা এখানে ওখানে বলাবলি করে, দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে গা? মানীর মান নেই? পায়ের জুতো সব মাথায় উঠল? ঘর ভাড়া দিয়ে দুটো পয়সা পেতুম, হিংসের ওদের বুক ফেটে গেল? জারের আমলে দু'খানা ঘর ভাড়া দিলে বুড়োবুড়ির বেশ চ'লে যেত, আর এখন? মরণ দশা! পাঁচশ' রুবলে থৈ নেই!

নাতিরা ক্ষেপায়,—বটে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নটা চোখে পড়ছে না?

থাম্, মস্করা করিসনে! নিজের জ্বালায় মরি! দাঁতের ব্যামোয় ভুগছি আজ দু'বছর! 'আনতেকায়' ওষুধ কিনতে গেলুম, দাম শুনে চোখ কপালে উঠল! বললে, বুড়ো মানুষের আবার দাঁত কি হবে? কী দেশের ছিরি! দুটো দাঁত বাঁধাতে গেলে ঘটি-বাটি বেচতে হয়!

বটে!—নাতিরা খোঁটা দেয়,—ওসব জারের আমলের বিষদাঁত, বুঝলে ঠাকুমা? দাঁতের ব্যথা! নতুন ওভারকোট পেলে কোথায়? কাঁথামুড়ি দিয়ে গোয়াল ঘরে একদিন পড়ে থাকতে না? কেরোসিন তেল সেদিন জুটত? বোতাম টিপে গরম জল পেতে? গ্যাসে রান্না করতে? মনের মতন কাজ পেতে? মেয়েমানুষ ইস্কুলে যেত, না লেখাপড়া শিখে কাজ পেত? বাড়ি-বাড়ি ডাক্তার আসত কখনো? পাড়ার গুণ্ডা ছেলেরা মেয়েদের মান রেখে কথা কইত? বলো, জবাব দাও?

থাম্, ছোট মুখে বড় কথা ক'সনে! ভেড়ার পাল তৈরি হচ্ছে! যা শেখাচ্ছে তাই শিখছে!—বুড়ো বেরিয়ে এসে চোখ রাঙায়,—ভারি তর্ক করতে শিখেছিস! কথায় কথায় কালোকে শাদা বলতে হচ্ছে, শাদাকে বলতে হচ্ছে কালো! তুই কি বুঝিস? পাখীপড়া বুলি মুখস্থ ক'রে এসেছিস! দেশের ধর্ম গেল, মান-ইজ্জত গেল, গেরস্থদের পুরনো আমলের ঘর-কন্না ভেঙে গেল! কুমারী মেয়ের কলঙ্কে কান পাতবার জো নেই, ঘরের বউ পাঁচটা পুরুষের হাত-ফেরতাই হয়ে ঘুরছে, গির্জেয় গিয়ে দুটো ভগবানের নাম করলে নিন্দে রটে,—তুই এসেছিস ওকালতি করতে! যা-বেরো—

নাতি চোখ টিপে হেসে চলে যায়। বুড়োরা না মরলে বদনাম ঘুচবে না!

সোভিয়েট ইউনিয়নে সাধারণ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার কোনও প্রকাশ্য সমাদর আমার চোখে পড়েনি। বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির অলস এবং 'প্রাণহীন' চেহারা অতি ধীরগতিতে ফুটপাত ধ'রে নিজের মনে চলেছে অসীম বৈরাগ্য নিয়ে,—এটি যখন তখন দেখতে পেতুম! অনেক সময় লক্ষ্য করেছি তারা মদ খেয়ে চুরচুরে হয়ে রয়েছে। মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে দেখেছি, তারা যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষার অভাবে পারে না। তাদের অনেক সময়কার বিষণ্ণ ও ক্লান্ত মূর্তি দেখে আমার মনে এসেছে অনেক প্রকারের দুর্ভাবনা। কিন্তু সেগুলি আমার নিজের অনুমান মনে ক'রে নিজেকেই সংযত করেছি! আমি ত' এই সুন্দর দেশে সামাজিক গোয়েন্দা হয়ে আসিনি! আমার মনে ত' বিন্দুমাত্র বৈরীভাব নেই! আমার মন ত 'মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি' নয়! আমি যে আমার দেশের চিরকালীন সংস্কৃতির ধারা বহন ক'রে এদেশে এসেছি! বলা বাহুল্য, আমার নোংরা কৌতূহলের জন্য অনেকবার নিজকে ধিক্কার দিয়েছি!

মালংজেভ অতি সজ্জন এবং ভদ্র। বারম্বার দেখেছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের লোক হ্যাণ্ডসেক করবার আগেই আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। ওরা যখন মস্কোকে বলে ইউরোপ, আমি তখন দেখি, এর পাড়ায়-পাড়ায় 'ঠনঠনে-কালিতলা!' এক একজন মেয়ে বা প্রবীণ পুরুষ বাজারের সেই জালি-থলেটি ঝুলিয়ে ফিরছে, বাঁ হাতে পাঁচ বছরের ছেলেটার নড়া ধরেছে, —সেই অবিকল মধ্যবিত্তের ঘর! বেগুন, পটোল, ঝিঙে, চিচিঙ্গে বা কুমড়ো ওদেশে ফলে না তাই! বেলে-পুলে-পার্সে ট্যাংরা মাছ ওদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে জন্মায় না! ওরা এক প্রকার বন্য পাতা চিবোয় স্যালাডের সঙ্গে বড় দুঃখে, আমাদের দেশের মতো অগ্রহায়ণের নধর পালং, চৈত্রের নটে শাক, কাঁচা আম, কার্তিক মাসের ট্যাঁড়শ, বারুইপুরের লিচু, বেনারসী ল্যাংড়া, চন্দননগরের মর্তমান, দক্ষিণের ন্যাওয়া-পতি ডাব, জয়নগরের মোয়া—এসব ওদের কল্পনাতীত! সব্জি কোথায় ওদেশে? খাদ্যের প্রাচুর্য দেখছি, কিন্তু ভোজ্যের বৈচিত্র্য কোথা? হাঁস, না হয় মুর্গি; গরু, না হয় শুয়োর,—কিন্তু মাংস ছাড়া আর কিছু নয় ত? তারপর ওই আদি ও অকৃত্রিম আলু, খাও যত পার! শুধু চিবোও ভিনিগারে-পচা শশা, নয়ত আপেল-আঙুর কাঁচা পিয়াজ আর সেই রাঙা রাঙা জাম। কাঁকড়ার শাঁস খাও, আর নয়ত টম্যাটো! তার সঙ্গে অধমতারণ পেঁয়াজ,—আর কিছু চেয়ো না।

এ নিন্দে নয়, গালি নয়,—এটি বৈচিত্র্যহীনতাসঞ্জাত বিরক্তি। একই ভোজ্য

জিহ্বাকে আড়ষ্ট করে, প্রতিদিন প্রতি-বেলা একই খাদ্যের দিকে চেয়ে দেখলে জিহ্বায় লালারস আসে না! বকৃত তাকে গ্রহণ করতে নারাজ। রুচি পীড়িত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অগ্নিমান্দ্য আসে। এ যেন দেশব্যাপী এক মস্ত ছাঁচ। একই খাদ্য, একই পানীয়, একই নীতি, একই দশা! কোথাও দুই নেই, দ্বিধা নেই, ভিন্ন অভিমত নেই, বিরোধ নেই, আক্রোশ নেই, অনৈক্য নেই। ওদের দেশে পাঁচটি সামগ্রী শতকরা একশ' জনেরই চাই। মদ, মাংস, আশ্রয়, জুতো এবং ওভারকোট। আমাদের দেশে শতকরা পাঁচজন মদ এবং শতকরা পনেরো জন মাংস খায় কিনা সন্দেহ। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে শীতকালেও বহু লোক গাছতলায় শুতে ভালবাসে। ওভারকোট চড়ায় লাখে একজন। জুতো পায়ে দিতে চায় না কোটি কোটি লোক। ওদের দেশে দশজনের কাজ একজনে করে মেসিনের সাহায্যে—কারণ ওদের মানুষ কম, দেশটা বড়। আমাদের দেশে মেসিন তেমন নেই, তাই দুজনের কাজ দশজনে করে। কেননা লোক আমাদের বেশি, সেই তুলনায় দেশ ছোট। মেসিনের সংখ্যা বেশি হলে বেকার সমস্যা বাড়বে, এই আমাদের ভয়।

মালৎজেভের ঘরটি সুসজ্জিত। ঘরে তাঁর বৃদ্ধা জননী, বছর আষ্টেকের একটি ছেলে এবং স্ত্রী। ঠিকে ঝি আছে, কিন্তু সে ইউনিয়নের মেয়ে। বিশেষ সময় আসে, কাজ সেরে আবার বিশেষ সময়-টিতে চলে যায়। মা রান্না করেন, আর নয়তো হাতখালি থাকলে স্ত্রী! আর রান্নাই বা কি? ডিম যদি বা থাকে ডালনা নেই! মাছ যদি ক্বচিৎ থাকে, কালিয়া নেই! তৈরি মাংস বাজারেই কেনা যায়,—সেটি শুকনো, নুন-দেওয়া সিদ্ধ! রুটি বাজারের। রান্নার মধ্যে একটা খোল! তাতে মাংসের কুচি, আলুর কুচি, গোটা আষ্টেক চাউলের দানা, দুটো বুনো শাকের পাতা,—তাতে নুন, হলুদ, জল আর খানিকটা 'বাটার অয়েল' অর্থাৎ তেলের বর্ণ ঘি ছেড়ে দাও,—সেইটিই ঝোল! রান্নার মধ্যে ওই একটি। লঙ্কার বালাই নেই, জিরে-ধনে-পাঁচ-ফোড়ন, গরম মসলা,—এদের কেউ চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি! মনে পড়ে, তাসকন্দের হোটেলে সিঁড়ির জানলাগুলি নানা বর্ণের ফুলগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল একটি পুষ্পিত চারাগাছ বহু যত্নে রাখা। সেইটি দেখে সন্দেহক্রমে আমি এক রুশ বন্ধুকে প্রশ্ন করি। তিনি ইংরেজিতেই জবাব দেন, "Haven't you seen before? It is called chilli-plant! Beautiful" অর্থাৎ লংকাগাছ! মস্কোর কোনও যাদুঘরে পান-সুপারি-লবঙ্গ ইত্যাদি রাখলে অন্তত দশ হাজার লোকের ভিড় জমে যেত! একটি মহিলা একদিন আমার কাছে 'আম' ফলটির ইংরেজি জানতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় ওটার প্রকৃত উচ্চারণ জানতে চান্।—ওটা 'ম্যান-গো' না 'ম্যাং-গো'!

আমার দ্বিতীয় দফায় মস্কো যাত্রা-কালে আমি পাঁচটি আম, কয়েকটি পান এবং চুন-খয়ের-সুপুরি - মসলা-লবঙ্গ-এলাচ নিয়ে গিয়েছিলুম। আমের জন্য আমার ঘরটিতে একটি আনন্দের আসর বসেছিল, এবং আমি নিজের হাতে তাঁদেরকে পান সেজে খাওয়াবার ফলে বেচারিদের যে-অবস্থা ঘটল, সেটাকে রক্তারক্তি কাণ্ড বলা চলে। কোট-প্যাণ্ট-শার্ট-গাউন-ঘাঘরা - রুমাল ইত্যাদির অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। কারো মাথা-গা ঘোরা, কারো বমনেচ্ছা, কেউ বা ভাবল ভারতীয় সাংঘাতিক বিষ এনে খাইয়ে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছি। পান খেতে গেলে যে ওষ্ঠাধর, তালু ও জিহ্বার একটি বিশেষ সংযম-কৌশলের দরকার হয়, সেটি ও'দের জানা ছিল না। অবশেষে বাথরুমে গিয়ে মাথায় ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ছাট এবং কুলকুচো! শেষ পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি। আমার পান খাওয়া দেখে ও'রা বোধহয় আমাকে ভারতীয় কোনও 'যোগী' ঠাউরেছিলেন! রাশিয়ায় ভারতীয় যোগী এবং যৌগিক ব্যায়াম আজকাল খুব প্রিয়। ওদের চর্বি-প্রধান স্বাস্থ্যের পক্ষে এটির প্রয়োজন আছে।

মালৎজেভ আপন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা জানেন না। সুতরাং শ্রীমতী লিডিয়া সঙ্গেই ছিলেন। আর ছিলেন সর্দার সন্তসিং সেখোন! এটি বৈঠকখানা, কিন্তু রাত্রের দিকে এটি সম্ভবত শয়নকক্ষ হয়ে ওঠে! ঘরে আস-বাবপত্রের সুসজ্জার মধ্যে লেখককে বেশ চিনতে পারা যায়। আমি যখনই কোনও গৃহস্থঘরে ঢুকেছি, দুই একটি বইঠাসা কাঁচের আলমারি ঠিকই চোখে পড়েছে। যে-মেয়ে লিফটের বোতাম টিপে ওপর-নীচে করে, তাকেও দেখেছি ওইটুকু অবকাশের মধ্যে বই পড়ে নিচ্ছে। 'ফ্লোর-মেডরা' রাত জেগে বই পড়ে। যে-ব্যক্তি হোটেলের বাথরুমে সাবান-চিরুনী-তোয়ালে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে কিছু পয়সা নেয়, সেও তার অবকাশ মতো বই পড়ে। বই নিয়ে লোকে ট্রেনে ওঠে এবং মেট্রো-স্টেশনে নামে। লেনিন লাইব্রেরীর হলগুলিতে প্রতিদিন সাত হাজার মেয়ে পুরুষ পড়াশুনো করে।

মালৎজেভ আমাদেরকে বিশেষভাবে যখন আপ্যায়িত করছিলেন বাইরে তখন তুলোর গুঁড়ির মতো তুষারপাত হচ্ছিল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। আকাশ পাংশু-বর্ণে ঘোরালো। মালৎজেভ আমাদের কয়েকজন ভারতীয় লেখককে কি প্রকার দৃষ্টিতে দেখেছেন—তাই নিয়ে তিনি সম্প্রতি একখানি গ্রন্থরচনায় ব্যস্ত। আমার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখে-ছেন সেটি তিনি আমাকে শোনাতে চান্, কিন্তু আমি প্রস্তুত নই! বইখানি নাকি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মালৎজেভ আমাকে অশেষবিধ প্রশ্ন করেন। কিন্তু আমার একেকটি জবাব শুনে শ্রীমতী লিডিয়া হয় রেগে আগুন হন্, আর নয়ত হেসে ফেটে পড়েন। অবশেষে এইটি দাঁড়াল, আমি নিজের সম্বন্ধে যা বলি তা আগাগোড়া ভুল, যা ভাবি তা সম্পূর্ণ উদ্ভট, এবং যা জানি তার আদ্যোপান্ত অলীক! মিঃ মালৎজেভ আমার সম্বন্ধে প্রথম থেকেই স্নেহান্ধ। ফলে, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন, আমি নাকি "মোস্ট ল্যাভেবল্" এবং "ইন্‌টরেস্টিং!"

মালৎজভের বাড়িতে গিয়ে এই প্রকার বকশিষ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু রাত্রে খাবার টেবলে ব'সে লিডিয়ার কাছে আমার মস্ত লাঞ্ছনা ঘটল।

বলা বাহুল্য, যে আধুনিক রুশীয় রাজপ্রাসাদটিতে সম্প্রতি পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একটি আশ্রম বানিয়ে বসেছি, সেটি 'হোটেল উক্রাইনা'। সেদিন ভোরবেলা অর্থাৎ সাড়ে সাতটার সময় উঠে ডবল কাঁচের জানলার বাইরে হঠাৎ দূরের দিকে চেয়ে দেখলুম, মস্কো মহানগরী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! বারোয়ারীতলার খুঁটি ন'ড়ে গিয়ে খেম্‌টা নাচের আসরের উপর সহসা যেমন পাল চাপা পড়ে, এও ঠিক তেমনি। মস্কোর যতদূর দেখা যায়, কঠিন শাদা তুষার-আবরণে আগাগোড়া সব চাপা পড়েছে। তিন চার দিন আগে থেকে এটি অনুমান করছিলুম। গত-কাল আমাদের বন্ধু মালৎজেভের গাড়িটির তলায় কলকব্জার মধ্যে বরফ

ঢুকে গাড়ি অচল হয়েছিল, আজ সকালে আটতলার উপরের জানলা দিয়ে নীচের দিকে দেখি, চার পাঁচখানা মোটরগাড়ি কাল রাত থেকে বরফের তলায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। বরফ না কাটলে গাড়ি বেরোবে না। 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'—বরফ কাটবার জন্য সরকারি লোকও মোতায়েন আছে। ঝাপটা হাওয়ায় মস্কোর পথে পথে তুলোর মতো বরফ উড়তে থাকে। পথ পিছল হয়।

এ বছরে আজ প্রথম মস্কো বরফ চাপা পড়ল,—এই খবরটি লোফালুফি চলছে টেলিফোনে এঘরে ওঘরে। এটি একটি খবর,—'প্রাবদায়' কাল বেরোবে। আমাদের দেশে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যেমন এক পশলা বৃষ্টির সংবাদ কাগজে ছাপা হয়!

ননী ভৌমিক এবং বিনয় রায় এ'রা দুজন আমাকে একটি ওভারকোট এবং একটি ফুলহাতা মোটা সোয়েটার ধার দিয়েছেন। ও দুটি সংগে নিয়ে উত্তর মেরু বলয়ের মধ্যেও যাওয়া চলে। কিন্তু আজ আমরা লেনিনগ্রাড রওনা হচ্ছি। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড সোজা উত্তরে আন্দাজ তিনশ মাইল রেলপথ। মস্কো স্টেশন থেকে এই গাড়িটি ছাড়ে রাত বারোটায়। লেনিনগ্রাডে পেঁছয় সকাল সাড়ে আটটার কিছু পরে।

ভারতীয় দলের অধিকাংশই ভারতে ফিরে গেছেন। মহিলাদের মধ্যে আর কেউ নেই। আমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, উড়িষ্যার সেই তরুণ কনগ্রেসী এম-এল-এ সত্যানন্দ চম্পতরায়,—তাকে ছাড়তে আমি যেন একটু দুঃখই পেয়েছিলুম। ছোকরা অতি মধুর প্রকৃতি। পশুরাজ আচার্য আত্রের সেই প্রবল হুংকার আর শুনছিনে, এ যেন অস্বস্তিদায়ক শান্তি! শ্রীমতী প্রদ্যোৎ কাউরের নিত্য নব প্রসাধন সজ্জা আর চোখে পড়ছে না,—আমরা যেন কৌতুকের লক্ষ্য হারিয়েছি! প্রদ্যোৎ কাউরের বিদায় নেবার পর আমরা প্রায়ই সর্দার অধ্যাপক শেখোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলুম! ভদ্রলোক যেন কিছু বিমর্ষ। আমার নিজের মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি কেন আমি জানিনে।

আমরা যথারীতি শ্রীমতী নাটাশা ও লিডিয়ার তত্ত্বাবধানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। ও'রা দুজন ছাড়া সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের আপন সম্পর্কে আর জোট নেই। কা'র কা'র ভাগে কোন্ কোন্ নারী পড়েছে সেটি স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত সাজ্জাদ জহীরের দলে গেছেন মেরিয়ম তথা মীরা, ফয়েজ আহমেদের সংগে আছেন লোলা, মায়া যেন কা'র ভাগে। শ্রীমতী অকসানা—যিনি দোভাষিণী মহলে বিশেষ বিদুষী বলে পরিচিত, তিনি পড়েছেন জনচারেক অস্ট্রেলিয়ানের ভাগে। আমার নিজের অবস্থা যেন অনেকটা দলে ভিড়ে থাকা। আমার কপাল মন্দ, আশেপাশে কেউ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না!

রাত্রির আহারাদির পর সেই তুষার-ঝাপটের ভিতর দিয়ে দুখানি গাড়িতে ক'রে যখন স্টেশনে এলুম, তখন এগারোটা বেজে গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই প্রথম স্টেশনের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, মালবহনের জন্য 'কুলি' নেই! লোহার ঠেলাগাড়ি প্ল্যাটফরমে আসে বটে মধ্যে-মাঝে, নৈলে, নিজের সামগ্রী নিজেই বহন করতে হয়। এটি প্রায় সকল সময়েই পীড়াদায়ক এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয়। শ্রীমতী নাটাশা ও লিডিয়াকে বাদ দিলে আমরা মোট ছয়জন,—চৌহান, শেখোন, যশপাল, বেদী, তাবান ও এই অধম। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দুজন পাগড়িপরা শিখ, একজন উত্তরপ্রদেশী, একজন পাঠান কবি, একজন পাঞ্জাবী রাজপুত এবং একজন 'বংগালি'। আমরা প্ল্যাটফরম পেরিয়ে এসে একখানা 'বোগি' দখল করলুম। এখানি লেনিনগ্রাড-মস্কো ট্রেন, অন্য কোথাও যায় না। গাড়িখানার নাম 'রেড অ্যারো এক্সপ্রেস।' এখানি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গাড়ি। সমগ্র স্টেশনের চেহারা হাবড়া স্টেশন অপেক্ষা উন্নত নয়, বরং আকারে কিছু ছোট। গাড়ি ছাড়তে বিলম্ব নেই। বোগির মধ্যে আমাদের জন্য মোট চারটি ডবল-সীটের ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে একটি ঘরে থাকবেন দুটি মহিলা। রাত্রে এবার কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে।

এই বৃহৎ বোগিটি আমাদের। দুই প্রান্তে দুটি বাথরুম, এক কোনে একটি ছোট হোটেল, অন্য কোনে একটি খিদমদগারের ছোট শোবার ঘর। হোটেলে একটি প্রবীণা স্ত্রীলোক মোতায়েন রয়েছে। সেখানে মদ, মাংস, কাটলেট, কেক-বিস্কুট, কফি ও চা, আপেল আঙুর, রুটি চীজ-মাখন—মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, রাত্রির আহারাদির পর একমাত্র 'বংগালি' ছাড়া প্রায় আর সকলেরই পেটে ক্ষুধা ও কণ্ঠে তৃষ্ণা রয়েছে। অতএব গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই ক্ষুধাতৃষ্ণায় রৈ রৈ ক'রে উঠল পাঁচজনে, এবং শ্রীমতী নাটাশা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন! একটির পর একটি খাদ্য ও পানীয়র অর্ডার পড়তে লাগল সেই হোটেলে। কেন জানি, আমি একটু আড়ষ্টই বোধ করলুম। বোধ হয় আমার মধ্যে কি যেন একটা প্রতিবাদ ক'দিন থেকে ধূমায়িত হচ্ছিল। নিছক আনন্দ এবং হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে প্রকৃতই কোনও তফাৎ আছে কিনা এটি আমি তোলাপাড়া করছিলুম। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে প্রথম থেকেই নানা বিষয়ে আমি সতর্ক ছিলুম। সুযোগ সুবিধা এবং স্বাধীনতা থাকলেই যে সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। পৃথিবীর সব দেশেই লোভ এবং অসংযমের ফাঁদ পাতা আছে। ভারতেও আছে এবং বলা বাহুল্য, বিলেত, আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়নেও আছে। কিন্তু এটি আজ পর্যন্ত আমার কানে ওঠেনি, কোনও সোভিয়েট নাগরিক ভারতে এসে কোনও অসংযত মন্দ জীবনের ফাঁদে পা দিয়েছে। বরং এটি লক্ষ্য করেছি তারা আমাদের দেশের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না, অকারণে পথেঘাটে ঘোরে না, আমাদের দেশের পারিবারিক জীবনের খোঁজখবর রাখে না,—কেমন যেন একটা নিরুৎসুক গাম্ভীর্য তারা বহন করে। একালের ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ফরাসী ইত্যাদিরা ঢালাও মিশে যায় আমাদের বন্ধুসমাজে, তারা পেটে কথা রেখে কেউ বাইরে সৌজন্য প্রকাশ করে না, এবং শুধু নিজেদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে দিন কাটাতে চায় না। ভারতে এসে সোভিয়েট নাগরিকরা যেন আপন-আপন জাত-গণ-গোত্র-সম্প্রদায়-অভিজাত—এগুলিকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে। ওরা এখনও বুঝতে শেখেনি, ভারতের উদার আতিথ্যের চেহারা কি প্রকার! ভারতের দিকচিহ্নহীন নীলকান্ত আকাশে রংগীন বর্ণসমারোহ খেলা করেছে অনাদ্যন্ত কাল থেকে। সম্রাট আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ ক'রে এই সেদিনের ফরাসী ইংরেজ,—কোনও রং বাদ যায়নি। কিন্তু একে একে সব রং ধুয়ে-মুছে গেছে সেই উদার নীলিমায়! ভারত কোনদিন কোনও মতবাদে ভয় পায়নি। কত জাত এল, কত যাত্রী এল, কত জনতা এল-গেল! 'পিতামহ' বসে

রয়েছেন শান্ত স্নেহের হাস্য মুখ নিয়ে! শুধু তাঁর হাতে রয়েছে একটি কষ্টিপাথর। এই পাথরে ঘষাঘষি চলছে পৃথিবীর সকল মতবাদ, সকল রাষ্ট্রধর্ম, সকল সমাজনীতি। এই কষ্ঠিপাথরে ধরা পড়বে, সেগুলি আসল, কি ঝুটো; সোনা কিংবা সোনালী; চোখধাঁধানো, বা মনমাতানো; শুধু প্রচার, না কিছু সদাচার! কমিউনিজমের সেই 'নবসভ্যতা' আজ ভারতের সামনে এসে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার চেহারা নিয়ে কাঁপছে! এর মধ্যে কতখানি হিংসা, কতটুকু নিরীশ্বরবাদ, কতখানি মানবতা, কতখানি সত্যের বীজ, কি প্রকার কল্যাণবোধ, তার প্রখর জড়বাদের তলায় সুদূর ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্ববাদের কোনও স্বপ্ন নিহিত আছে কিনা, পরবর্তী শতাব্দীগুলির জন্য তার ভাঁড়ারে কোনও উজ্জীবনী মন্ত্র খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা, নতুন সমাজ বিজ্ঞান বা যন্ত্র ও মারণ বিজ্ঞানের দ্বারা এই 'জাতিগোত্রহীন' জাতিরা আরেকটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায় কিনা,—ভারত তার আপন কষ্টিপাথরে এগুলি ঘষতে বসেছে! চেয়ে দেখছি ভারতের স্বাধীনতালাভের দশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে স্টালিন পন্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যুগোশ্লাভিয়া-হাঙ্গেরী-পোল্যান্ড প্রভৃতি 'জাতীয়তাবাদী' হয়ে উঠল, এবং চীনের ভিতর থেকে প্রাচীন চেঙ্গিস খাঁর তরবারির ফলক দেখা দিল! এই সেদিন মস্কোয় দাঁড়িয়ে শ্রীযুক্ত চৌ-এন-লাই বলে গেলেন, "আশা করি চীনের তরবারি কোষমুক্ত হবার আগেই ভারতের সুবুদ্ধির উদয় হবে!"

মস্কো চুপ। 'প্রাবদা'—যার অর্থ হল 'সত্য'—সেও চুপ। শুধু হিমালয়ের তপোবন আশ্রমে বসে পরম তপস্বী পিতামহ তাঁর ধ্যাননিমীলিত নেত্র তুলে পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের সর্বশেষ উত্তরাধিকারীর দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন!

জ্যোৎস্নালোকের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে লেনিনগ্রাডের দিকে। মাঝে মাঝে দূর প্রান্তরের থেকে এক-একবার আলো দেখছিলুম। দিবাভাগের যাত্রা নয়, এবং পররাষ্ট্রের থেকে অভ্যাগত ব্যক্তিদেরকে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত চেহারাটা দেখাবার ইচ্ছা আছে কিনা, তাও জানা নেই। সুতরাং অস্পষ্ট ও ধূসর প্রান্তরের দিকে চেয়ে নানা কথা অনুমান করছিলুম। কিন্তু সামনের দিকটার আগাছার ঝোপঝাড় পেরিয়ে দূরের দিকে কোনও জনবসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না। গাড়িখানা চলেছে আমাদের দেশের 'ফাস্ট' প্যাসেঞ্জারের' মতো। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম, দৈবদুর্বিপাকের ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও যানবাহনের অতিশয় দ্রুতগতি নিষিদ্ধ। সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম-প্রান্ত থেকে দূর পূর্ব-প্রান্তে ট্রেনে যেতে গেলে নাকি পনেরো দিনেরও বেশি লাগে। রুশীয় প্রকৃতির মধ্যেও স্পীড কম! অত্যন্ত জরুরী চিঠির জবাব দিতে তাঁরা মাস দুই টাইম নেন, কেননা ওটা প্রকৃত জরুরী কিনা সেটি দলবল ডেকে গোপনীয় শলা-পরামর্শ ক'রে ভাবতে বসলে কিছুকাল সময় লাগে বৈকি। অতঃপর জবাব যখন পাওয়া গেল,—তখন দেখা গেল, সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্নের জবাবটি সর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট! সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে পৃথিবীর সকল জাতিকে ভালবাসেন, অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করেন বহু জাতিকে, কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করতে কিছু সময় নেন। সেইজন্য আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ভারতীয় কমিউনিস্ট কেউ ও'দের দেশে গেলে ও'রা বাইরের বৈঠকখানায় হয়ত নানাবিধ চাকচিক্যের মধ্যে তাঁকে বসতে দেন, পার্টি আপিসে ঘুরিয়ে দেন, কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেন না! ভারতের কোনও কমিউনিস্ট ও'দের দেশে গিয়ে অগণ্য-নগণ্য জীবনের মধ্যে ঢুকে তাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা-দুর্গতি-সংগ্রাম, কপালের ঘাম, তাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যা, তাদের জটিল এবং রক্তক্ষয়ী কর্মসম্পাদন, তাদের ব্যথিত বেদনাহত ও সমস্যাসঙ্কুল প্রতিটি দিন,—এগুলি লক্ষ্য ক'রে আসেন না। ভারতীয় কমিউনিস্টরা ওখানে গিয়ে এটি আজও দেখে আসেননি, ওদের দেশের শত সহস্র গ্রামাঞ্চলে আজও স্বচ্ছলভাবে পরিধেয় বস্ত্র জোটেনি, আজও হাজার হাজার পরিবারের লোকের স্নান করবার সুবিধা নেই, মেয়েদেরকে রান্না ও খাবার জল আনতে হয় বহুদূর থেকে এবং শুকনো রুটি ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে নরম করে চিবোতে হয়! সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এখনও সংখ্যাতীত গ্রাম রয়েছে যাদের দুর্গম, দুর্গত ও সকরুণ মূর্তির দিকে তাকালে যে কোনও ভারতবাসীর হৃদয় আত্মীয়তাবোধের মমতা ও সহানুভূতিতে অভিভূত হবে! এ সব খবর আমরা জানিনে, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে। যে-কোনও 'কলেকটিভ ফার্মে' গিয়ে সব দেখে-শুনে ওদের মুখের উপরে যদি স্তাবকতা করো, ওরা নিজেরাই সলজ্জ নতমুখে বলবে, "আমরা যেন আপনাদের সুখ্যাতির যোগ্য হতে পারি। আমাদের কাজ এখনও অনেক বাকি। দেশের লোকের সুখ-সুবিধার এখনও অনেক অভাব।"

ট্রেনের মধ্যে আমাদের ঘরগুলি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। শুনলুম এ গাড়িখানা গত যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ জার্মানীর কাছ থেকে পাওয়া! এখানকার নাম 'রেড য়্যারো', কিন্তু বর্ণ হল নীল! যাই হোক, চা ও জলখাবার প্রথম দিয়ে গেছে এই গাড়িরই একজন সেবিকা। বাইরের বারান্দাটা সরু, কিন্তু সেখানে বসে জানলা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখা বা প্রলাপজড়িত মৃদু গলায় কানে কানে কথা বলার জন্য পাশাপাশি দুটি ক'রে চেয়ার। ছোট ঘরটি একটি প্রথম শ্রেণীর শয়নকক্ষ। মেঝেতে কার্পেট নৈলে শীতের দেশে চলবে কেন? দুখানি চেয়ার চাই বৈকি। জানলাটিতে রেশমের কুঁচি দেওয়া পর্দা, সুন্দর দুটি আয়না, টেবল-ফ্যান, য়্যাশ-ট্রে, রেডিয়ো যন্ত্র, কোট-প্যান্ট ইত্যাদি ঝোলাবার হ্যাঙ্গার, টেবলের ওপর কভার, জুতো-মোজা ছাড়ার সুব্যবস্থা, বই ইত্যাদি রাখার শেল্প। শোবার ব্যবস্থা মনোজ্ঞ। গদি, তোষক, নধর দুটি বালিশ, ধবধবে চাদর, কোমল কম্বল,—কি নেই? সীটের পাশে বোতামটি টেপো—মেয়ে-য়্যাটেনডান্ট তখনই ছুটে আসবে। একটি রাত্রির আরাম বিলাসের পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীমতী নাটাশা ও লিডিয়ার ঘরটিতে উচ্চরোলের উল্লাসধ্বনিতে আমার চমক ভাঙলো। তাঁদের সেই ছোট্ট ঘরটিতে বসেছেন সাতজন এবং আমাকে দেখামাত্রই তিন চারজন সোচ্ছ্বাস অভিনন্দনের দ্বারা মাঝখানে বসালেন। বিশুদ্ধচরিত্র বেদী এবং চৌহানকে আমি বিশেষ পছন্দ করতুম। যশপাল সর্বপ্রকার আমোদে যোগ দেন, কিন্তু সংযত। তিনি শুকদেব। বাকি আর সবাই কাঁচা-পাকা। নাট্যশালায় বিলাস হল

শ্রীমতী লিডিয়ার প্রতি সহাস্য বক্রোক্তি। অন্য সবাই লিডিয়াকে পরিহাস করছেন। লিডিয়া জাত-কমিউনিস্ট, প্রবল হাস্য এবং বাক-পটুতার দ্বারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তিনি ভারতীয়গণের নিকট প্রিয়। মনে হচ্ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁর পক্ষে শুভ হয়নি। আমরা সবাই হাসছিলুম।

শ্রীমতী নাটাশার গাম্ভীর্য এবং সতর্কতার কিছু অভাব আমি লক্ষ্য করছিলুম। আমি ভারতীয়, এসব দৃশ্য দেখার অভ্যাস আমার কম। তিনি সন্তানের জননী, গৃহস্থ নারী, শিক্ষিতা এবং স্বামীসহবাসিনী। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, মধুর প্রকৃতি এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। শ্রীমতী লিডিয়া হলেন প্রখরা, মধুরহাসিনী, কিন্তু কঠিনভাষিণী, পুরনো ইংরেজ আমলের মেয়ের মতো আপাদমস্তক বসনাবৃতা,—এবং সেটি যেন আগাগোড়া ইস্পাতের বর্মে ঢাকা। পুরুষের পক্ষে প্রিয় নাটাশা, কিন্তু টুরিস্টের পক্ষে প্রয়োজন লিডিয়াকে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে লিডিয়ার জন্মান্ধ অনুরাগ আমাদের পক্ষে কৌতুকের বস্তু ছিল। এদেশের বিন্দুমাত্র সমালোচনা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

ঘরের ভিতরকার এই হাস্যরসোৎসবটি আমার পক্ষে একটু মাত্রাধিক বোধ হচ্ছিল। কিছু একটা অছিলায় আমার নিজের ঘরটিতে এসে একাই বসে রইলুম। রাত আড়াইটে বেজে গেছে। মেয়েরা বিশ্রাম নিন, এইটি আমার ইচ্ছা। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি, লিডিয়া আমার ঘরটিতে এলেন। দেখতে পাচ্ছি তাঁর শ্রান্ত রাঙা চোখ ঘুমের জন্য কাতর। কিন্তু তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি 'আসছি' বলে এলেন না কেন, আমি জানি। ওখানে আপনি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলেন।

আমি হাসিমুখে বললুম, আপনি রাগ করছেন কেন? আমার বয়স হয়েছে যথেষ্ট, ও'দের মধ্যে আমি একটু অসুবিধায় পড়ি!

লিডিয়া বললেন, আপনার চেয়ে বেশি বয়সের লোক ওখানে আরও আছেন। কিন্তু আমি বলতে এসেছি আমিও সোভিয়েট মেয়ে, অপমান আমার ভয়ানক গায়ে লাগে। আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। আমি না এলেই পারতুম......বলতে বলতে তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

তাঁর কথা শেষ হয়নি, এমন সময় আমার এক ভারতীয় বন্ধু—যাঁকে লিডিয়া সম্মান করেন—তিনি একটু টলটলে অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি একটু ভয় পেলুম। তিনি বললেন, লিডিয়া, তুমি কি আমার ওপর রাগ ক'রে চলে এলে ওঘর থেকে?

লিডিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের কঠিন চেহারা পালটিয়ে শান্ত হাস্যে বললেন, কই না? আমার গলা স্বভাবতঃই একটু চড়া,—রাগ আমি করিনি।

হাসি মুখে আমি বলতে গেলুম, ভারতীয়দের প্রতি উনি রাগ করেন না!

এটি আপনার মিথ্যে কথা—লিডিয়ার কণ্ঠ ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল আমার প্রতি। বললেন, রাগের কারণ ঘটেনি!

ভারতীয় বন্ধুটি তাঁর একটু কাছ ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করতেই লিডিয়া আবার বললেন, একটু সরে বসুন, মিস্টার—। এটা আমার পছন্দ নয়। —এই বলে তিনি নিজেই সরে বসলেন।

মিস্টার অমুক কিন্তু একটু বেশি স্নেহশীল। তিনি বোধ করি, হাতখানা ঘুরিয়ে শ্রীমতী লিডিয়ার কাঁধে রেখে মিষ্ট শ্রদ্ধাই জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সোভিয়েট মেয়ে রক্তচক্ষে এবার চাপা গর্জন করে উঠলেন, আপনাকে আবার সতর্ক করছি মিস্টার—মেয়েদের সঙ্গে শোভন ব্যবহার করুন!

মিস্টার অমুক এবার ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কই, নাটাশা ত' তোমার মতন উগ্রমূর্তি হন না?

নাটাশা আমার 'চীফ',—তাঁর কাজের সমালোচনা করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা সোভিয়েট নাগরিক, মনে রাখবেন মিস্টার—

এবার আমি বলতে বাধ্য হলুম, আপনি একটু বেশি রূঢ় হচ্ছেন, ম্যাডাম!

মোটেই না,—লিডিয়া হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন,—পুরুষ পাশে এসে বসলে মেয়েমানুষ মাত্রই বুঝতে পারে তার মনোভাব! মিস্টার..., আপনি যদি শান্ত হয়ে এখানে বসতে চান বসুন, নৈলে একজনের আচরণের জন্য ভারতের সুনাম এইভাবে কলঙ্কিত (blemished) হবে, এ আমি কোনমতেই বরদাস্ত করব না!

বিষধর সর্প যেন বেরিয়ে এল! চকচক করছে তার চোখ। ফণাটা উদ্যত। ভারতীয় বন্ধুটি পুনরায় টলটলে অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন। হাসবার চেষ্টা করে শুধু বললেন, তোমার মন-মেজাজ আজ ভাল নেই, ম্যাডাম!

তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু ওঘরের সামনে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, এবার আপনারা মেয়েদের ছুটি দিন। চৌহান, বেদী, যশপাল, আপনারা শুয়ে পড়ুনগে।

গাড়ি চলছিল। ও'রা একটু লজ্জা পেয়ে যে-যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

পরবর্তীকালে কোনও এক রাত্রে যখন মস্কোর ক্রেমলিনের প্রাচীর-সংলগ্ন একটি বাগানের ভিতর দিয়ে ফিরছিলুম তখন জনৈক প্রবীণ মদ্যপ টলতে টলতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। আমি তাঁকে হাসিমুখে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিই। ওটা তাঁর প্রয়োজন ছিল ওই ঠাণ্ডা রাত্রে। কিন্তু তাঁকে কাছে আসতে দেখে শ্রীমতী লিডিয়া ঈষৎ দুর্ভাবনায় জড়োসড়ো হয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম, একজন মাত্র রুশ মাতাল সোভিয়েট ইউনিয়নের সুনামকে কলঙ্কিত করতে সমর্থ—আমি কিন্তু এটি বিশ্বাস করিনে।

লিডিয়া তাঁর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

।। এক : মুখবন্ধ ।।

গত ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক সাহিত্যসম্মেলন হ'য়ে গেল। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য উভয় বাঙলা থেকে প্রায় শতাধিক কবি, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রায় অর্ধশত রবীন্দ্রানুরাগী আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছিলেন। তিনদিনের আলোচনায় মূল বিষয় ছিল : 'রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'। মোট পাঁচটি সভায় আলোচনাগুলিকে বিন্যস্ত করা হ'য়েছিল, তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছিলো সংগীতের জন্য। সভায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কবির সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তাঁরা অনেকেই কোন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন নি এবং আলোচনায় কোনরূপ অংশগ্রহণেই তাঁদের মনে দ্বিধা ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সজনীকান্ত দাস অবশ্য লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং অরুণ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস ও দক্ষিণারঞ্জন বসু আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মণীশ ঘটক, সুশীল রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাণী রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ—এঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের সভায় এসেছিলেন শুনতে এবং বলা বাহুল্য আমিও ছিলাম এঁদের দলে। আলোচনা-সভায় যখনই এঁদের নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে, এঁরা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তথাপি বিশ্বভারতীর আহ্বানে এঁরা অন্য সমস্ত কাজ ফেলে শান্তিনিকেতনে ছুটে গিয়েছিলেন কেন? আমার মনে হয়, শান্তিনিকেতন এঁদের তীর্থক্ষেত্র ব'লেই, রবীন্দ্রনাথকে এঁরা কবি-সমাজের মধ্যমণি ব'লে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন ব'লেই বিশ্বভারতীর আহ্বানে এভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই সম্মেলনের আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা একজন কবি, পাঁচটি সভার তিনটিতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কবি; এবং একমাত্র কবিতা-পাঠের অনুষ্ঠানটিই, তিনদিনের আলোচনা-সভার যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলে বিশ্বভারতীর শ্রোতৃবৃন্দ অনেকে অনুভব করেছিলেন, অনুষ্ঠান-সূচীতে না থেকেও হ'তে পেরেছিলো।

শান্তিনিকেতনের পরিচিতি আমার কাছে তাই কবিতীর্থ ব'লেই। কবি রবীন্দ্রনাথই কি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা নন? পাঁচটি সভায় যে চৌদ্দটি প্রবন্ধ পঠিত হয় (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন নি এবং শেষ পর্যন্ত সভায় উপস্থিত হন নি) তার শ্রেষ্ঠ তিনটি রচনার দুটিই কবির লেখা। অন্য যা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বলে আমার মনে হ'য়েছে তা গানের ওপর এবং ছবির ওপর, যাঁরা গান করেন এবং ছবি আঁকেন তাঁদের লেখা।

তিনদিনের আলোচনার ধারা-বিবরণী আমি এখানে দেবো না। কবিতীর্থে গিয়েছিলাম একটি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। সে প্রত্যাশা আমার পূর্ণ হ'য়েছে। শুধুই বিশ্বভারতীর শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলের সহৃদয়তায় নয়। আমরা, যাঁরা কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলাম, যেন সেখানে গিয়ে পরিবর্তিত মানুষ হয়েছিলাম। কাজি আবদুল ওদুদ, মণীশ ঘটক, গোপাল হালদার থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু ও শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত সকলেই যেন এই তিনদিন একসূত্রে বাঁধা হ'য়ে গিয়েছিলাম। কোনরূপ কৃত্রিমতাই এই তিনদিনের শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে ছিল না। রাত বারোটা পর্যন্ত ছোটদের মধ্যে ব'সে গোপাল হালদার ভূতের গল্প শুনুলেন। সভা'য় ব'সে হাল্কা মুহূর্তগুলিতে মণীশ ঘটক ও প্রেমেন্দ্র মিত্র পরস্পরকে নিয়ে ছড়া কবিতা লিখলেন। এই তিনদিন আমরা যেন এক নূতন পৃথিবীতে বসবাস করছিলাম। একটি ভয় অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের মনে ছিল, যা নীরেন্দ্র চক্রবর্তী সভায় ব্যক্ত করেছিলেন; তা হ'লো, সভায় কিছু বলতে হবে এমন আহ্বান আসবার ভয়। এ যন্ত্রণা আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা আমাদের দিয়েছিলেন সত্য; তবু তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আমাদের অন্য সকল রকমেই আনন্দ দিয়েছিলেন।

।। দুই ।।

ঠিক এক সপ্তাহ হ'ল শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসেছি। তার আগে ক'দিন ছিলাম সেখানে? দিনের হিসেব নিলে তিনদিন, অথবা তিন রাত; আর ঘণ্টার হিসেব নিলে ৬২ থেকে ৬৩ ঘণ্টা, তার বেশী নয়। অথচ এক সপ্তাহ হ'য়ে গেল ঐ কয়েক ঘণ্টার স্মৃতি এক মুহূর্ত ভুলতে পারছি না কেন?

কি দেখেছি শান্তিনিকেতনে, কি শুনেছি, যা ভুলবার নয়? আমলকী আর আম্রকুঞ্জ, শাল ও তালবীথি, রামকিঙ্করের ভাস্কর্য, তিন ঠাকুরের হাতে আঁকা কিছু ছবি; তিনদিনের সভায় গুরুদেবের আলোচনা, কিছু গান আর চেনা ও অচেনা অনেক মানুষের মুখ। এমন দেখা, এমন শোনার সুযোগ শান্তিনিকেতনে আরো হ'য়েছে এবং সে দিনগুলির স্মৃতিও আনন্দের। কিন্তু এমন বুকভরা আনন্দ, তারপর সপ্তাহব্যাপী বিচ্ছেদের এই যন্ত্রণা—আমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আর, এই আনন্দ ও যন্ত্রণা কি শুধুই আমার? আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী। ঠিক দুদিন আগে গিয়েছিলাম কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, তারপর দেখা হ'য়েছে অরুণ ভট্টাচার্য এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁরা তিনজনই কবি। জিজ্ঞাসা করেছি, কেমন লাগলো এবারকার শান্তিনিকেতন? কেউ ভুলতে পারছেন না শান্তিনিকেতনকে। কামাক্ষীপ্রসাদ স্পষ্টই বলে ফেললেন, এবারকার অভিজ্ঞতার কোন তুলনা হয় না। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেই তিনি নূতন কবিতা লিখেছেন, সে কবিতা পড়ে শোনালেন। যেন অনেক দিনের রুদ্ধ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'য়েছে।

শান্তিনিকেতনের সভায় আমরা কেউ বক্তা ছিলাম না। অরুণ তবু গান সম্পর্কে

দু'চার কথা বলেছেন; কিন্তু আর সবাই কিছু বলতে হবে ভেবে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য মনে দিন কাটাতাম। কামাক্ষী-প্রসাদ তো নামঘোষণার সময় পলাতক থাকারই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে এবং সমরেশ বসুকে অনেক বুঝিয়ে ডায়াসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, নিমন্ত্রিত অতিথিরা সভায় উপস্থিত নেই, এ'তে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অবহেলা করাই হয়। সভায় দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রায় কিছুই বলতে পারেন নি। আমার এবং মঙ্গলাচরণের অবস্থাও তাঁদের তুলনায় ভাল ছিল না। তিনদিনের সভাই ছিল প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনার সভা। মণীশ ঘটক, আমি ও মঙ্গলাচরণ শেষ পর্যন্ত নিয়ম ভেঙ্গে কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানালাম; কেননা, সভায় নাম ধরে ডাকলে চুপ ক'রে থাকা যায় না। অথচ তিনদিনের সভায় উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কবির সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। কেন সভায় বক্তৃতা দেবার কোনরূপ দক্ষতা নেই জেনেও, মণীশদা থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়েসের কবিরা, সবাই আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র শান্তিনিকেতনে ছুটে এসেছিলাম? এ-ও এক প্রশ্ন।

আমার মনে হয়, ওপরের সব প্রশ্নের একটিই উত্তর। তা হ'ল, শান্তি-নিকেতন কবিমাত্রেরই তীর্থস্থান; এই তীর্থস্থানে আমরা কয়েকজন কবি তিন-দিন একত্র হ'য়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে, তাঁর কীর্তিকে সামনে রেখে। আমরা অনেকেই তিনদিনের সভায় শুধু শ্রোতা ছিলাম। সভার বাইরে আমরা যখন আমলকী কুড়িয়েছি, অনেক দূরে থেকে সাঁওতাল-কণ্ঠের কোন গুণ-গুণ গান শুনেছি, অথবা ধূমপানের জন্য সভাস্থলের একটু বাইরে গিয়ে প্রকারান্তরে বিশ্বভারতীর নিয়ম রক্ষা করেছি, তখনো আমাদের ভূমিকা একই—দর্শকের, শ্রোতার, বাইরের লোকের। তথাপি, ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী, তিনদিনের একটি মুহূর্তেও আমরা এ অনুভব থেকে দূরে ছিলাম না যে, আমরা এখন যেখানে আছি তা তীর্থ-ক্ষেত্র—এখানকার মাটিতে শুধু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নয়, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালেরও স্নেহ মেশানো; এখানকার বাতাসে শুধু গান ও কবিতাই নয়, বিংশ শতাব্দীর যা কিছু মানবীয় ও শ্রেষ্ঠ চিন্তা, যেন আমাদের স্পর্শ করছে।

।। তিন ।।

কাল লেখা শুরু করার সময়ে স্পষ্ট সঙ্কল্প নিয়েই বসেছিলাম, 'অমৃত' পত্রিকার পাঠকদের কাছে বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক সাহিত্য-সম্মেলন সম্পর্কে কিছু তথ্য নিবেদন করবো। গতকাল কিন্তু লিখতে শুরু করে দিলাম, নতুন তথ্য দেবার মত আর কি আছে? মোটামুটি খবর তো 'যুগান্তর' পত্রিকাই পরিবেশন করেছেন। অন্য একটি পত্রিকাতে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে দেখলাম। ও ধরণের সমালোচনায় আমার মন সায় দেয় না, কেননা এতে করে বাইরের ঘটনাবলীকেই বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সমগ্র পরিবেশটাকে ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না। ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারীর সভায় বক্তারা যে কি লিখিত ভাষণ পড়েছেন, সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা তিনদিনের অনুষ্ঠান কি ভাবে পরিচালিত হ'য়েছে, শ্রোতারা কি ভাবে এই সাহিত্য-সম্মেলনকে নিয়েছেন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিরাই বা কি অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরে আমি একটি কথাই বলতে পারি—আনন্দ। তিনদিনের সভা পরি-চালিত হয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে, যদিও কোনো একজন সাহিত্যসেবীর একটি দিনের ভাষণ, অন্য একজন সম্মা-নিত অধ্যাপকের প্রতি অকারণে তাঁর তীব্র শ্লেষ এই আনন্দকে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। শ্রোতারা তিন দিনের পাঁচটি সভায় সমবেত হ'য়েছিলেন মনে আনন্দ নিয়ে, কেননা এ সভা তাঁদের অতি শ্রদ্ধা ও মমতার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আর আমরা, যাঁরা কেউ কেউ বক্তা এবং অধিকাংশই শ্রোতা ছিলাম, আমরাও শান্তিনিকেতন থেকে আনন্দের অভিজ্ঞতাই নিয়ে এসেছি। যুগান্তরের তিন কলম খবরের মধ্যে এ সত্যটাই কিছুটা প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু অন্য পত্রিকার খবরে তেমন নেই। এই সত্যটুকু সামনে রেখে যদি আমরা বিশ্বভারতীর আহূত সভার সমালোচনা করি, তাহলেই বোধহয় সঙ্গত ও শোভন হয়।

অনুষ্ঠানের যে ত্রুটির কথা কোনো কোনো পত্রিকা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এ যেন অনেকটা অধ্যাপকদের সভা, তা তো একেবারে মিথ্যে নয়। সভায় অধ্যাপকরা কথা বললেন, কবি এবং সাহিত্যিকরা শুনলেন। অথচ যে কটি ভাল প্রবন্ধ তিনদিনের সভায় পঠিত হয়েছে তা কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারাই রচিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং রাজেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ তিনটিই সম্ভবতঃ তিনদিনের সভার শ্রেষ্ঠ রচনা। তুলনায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্যাতনামা অধ্যাপক যাঁরা এসেছিলেন, অনুল্লেখযোগ্য প্রবন্ধই পড়েছেন। গানের ওপর আলোচনাচক্রটি কিন্তু খুবই মনোরম হয়েছিল। রাজেশ্বর

মিত্রকে বাদ দিয়েও বলা যায়, শান্তিদেব ঘোষ এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তাতে নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম দুইই লক্ষ্য করা গেছে। অরুণ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তর আলোচনাও এদিন ভাল হয়েছিল। এমনি আরেকটি শোভনীয় এবং সার্থক সভা হতে পারতো যদি নিমন্ত্রিত কবিদের নিয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রকাব্যের-আলোচনা ও কবিতা-পাঠের একটি সভা ডাকতেন। তিনদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপর জোর দিয়ে একটি প্রবন্ধও পঠিত হয়নি; এবং কবিদের কবিতাপাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রায় প্রস্তুত হবার কোন সময় না দিয়েই। এই কবিতা-পাঠের ব্যবস্থাও, আমরা যতটুকু জানি, ২৬শে তারিখ অন্নদাশঙ্কর রায়ের উৎসাহে হয়; আলোচনা-সূচীতে কোথাও তা ছিল না।

কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও যে নিরাড়ম্বর ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীর সভাগুলি একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দেখবার, জানবার এবং অনুভব করবার মতো। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে কম সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়নি। সর্বত্র না হোক, অনেক জায়গাতেই অস্বাভাবিক প্রহসন, এবং এই শ্রদ্ধার অভাব দেখেছি চিৎকার দিয়ে ঢাকা হয়। বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানগুলিতে এই নাটুকেপনা ছিল না। যেটুকু নাটক মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেখানে অভিনয় করা হয়েছে, তা কলকাতার কোনো একজন তরুণ সাহিত্যিকের 'সৌজন্যেই' হয়েছে। তাঁর জন্য আমরা লজ্জিত বোধ করেছি। বিশ্বভারতীর আয়োজনে আর যা ত্রুটিই থাক, তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে জানেন এবং আগন্তুক প্রতিনিধিদের শুধু আনন্দিত করাই নয়, তাঁদের সর্বপ্রকার ধৃষ্টতা ক্ষমার চক্ষে দেখার মনোবল তাঁদের আছে; এ আমাদের মেনে নিতেই হবে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রশতবর্ষের শান্তিনিকেতনকে জানতে হ'লে শুধু সভায় যোগ দেওয়া ছাড়াও অন্য কাজ থাকে। এমন দু'চারটি টুকরো কাজ অনেকে মিলে একত্রে করতে হ'য়েছে। এমন একটি কাজ হ'লো ২৫শে তারিখে বিকেলের দিকে বি এম সেন-এর বাড়ি বসে পাঁচ থেকে বারো-তেরো বছরের শিশু এবং বালক-বালিকাদের গান শোনা। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো এঁদের সমবেত সংগীতগুলি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গাইছে যারা কেউই গানের স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রী নয়। অথচ কোথাও একটি কণ্ঠস্বর আগে-পরে শোনা যাচ্ছে না, কেউ গানের তালভঙ্গ করছে না। কলকাতার কোন আসরে এ ধরণের ঘটনা ঘটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সবশুদ্ধ প্রায় দশ-এগারো জনের গান শুনলাম; এরা নাকি বি এম সেন-এর জিপ-বাহিনী একটি গাড়ীতে ২০।২৫ জন মিলে শান্তিনিকেতন তথা বোলপুরের বাইরেও এরা আহ্বান পেলে গান গেয়ে আসে। হিরণকুমার সান্যাল, মণীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, সস্ত্রীক কাজি মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, দিনেশ দাস প্রভৃতিও আসরে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে গান, কাজেই আমরা আর আশ্চর্য হ'লাম না।

ঐদিনই মন্দিরের উপাসনায় যোগ দেবার পর আমরা কয়েকজন রওনা হ'লাম যামিনী চক্রবর্তীর বাড়ি। তিনি বিশ্বভারতীর রাগসঙ্গীতের অধ্যাপক। যামিনীবাবুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র। একে একে তারা প্রত্যেকেই গান গেয়ে শোনালো, এবং একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হ'লো। অরুণ ভট্টাচার্য, আমি, মঙ্গলাচরণ ও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বোধহয় এই চারজন বাইরের শ্রোতা ছিলাম। যামিনীবাবুর বাড়ি আমরা আগেও গান শুনেছি; অপর বন্ধুরা মুগ্ধ হলেন এই ভেবে যে বাড়ির পাঁচটি ছেলে-মেয়েই ভালভাবে গাইতে ভালবাসে।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এ ধরণের উদাহরণের কোন অভাব আছে কি? আমাদের তো তেমন মনে হয় না। ঘটনা দুটি শুধু তাঁদের জন্যই লিপিবদ্ধ করলাম, যাঁরা শান্তিনিকেতন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই জানেন না। সেখানে রবীন্দ্র-শতবর্ষ ঘরে ঘরে এবং সারা বছর ধরেই। অন্ততঃ গানের ব্যাপারে তো বটেই!

২৬শে শান্তিদেব ঘোষের ঘরে বসে টেপ রেকর্ডে তাঁর নিজের গান প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে শুনলাম। আরো গান ছিল এবং শুনবার মনও আমাদেরও ছিল। কিন্তু সময় ছিলো না। তখন রাত প্রায় গভীর হয়ে এসেছে, আমাদের গেস্ট-হাউসে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং ফিরতে হ'লো।

ঐদিন দুপুরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ি গেলাম আমি, অরুণ ভট্টাচার্য এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এবং শ্রীযুক্তা লীলা রায় দুজনেই অপেক্ষা করছিলেন। বাংলা কবিতায় ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করা গেল। অন্নদাশঙ্করের ছড়া কবিতা নিয়েও কিছু কথা হ'লো। কথায় কথায় তিনি এমন প্রস্তাব দিলেন যে বিকেলে কবি-সম্মেলন করলে কেমন হয়। অবিশ্যি কোন পৃথক সম্মেলন নয়। শেষদিনের সভায় তিনিই সভাপতি; ঐ সভাপতির ভাষণ না দিয়ে যদি অতিথি কবিদের কবিতাপাঠের জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান কেমন হয়?

আমরা জানালাম, খুবই ভাল হয়। এসময় শান্তিনিকেতনে একটি কবি-সম্মেলন হওয়া খুবই উচিত ছিল। দেখলাম শ্রীযুক্তা রায়েরও অসীম উৎসাহ। অন্নদাশঙ্কর অনুরোধ জানালেন, সাধ্যমত কবিদের খবর দিতে। আমরাও তাঁকে পাল্টা অনুরোধ জানালাম, তাঁর নির্দেশ আমরা মান্য করবো; কিন্তু তিনি যেন সভায় কিছু ঘোষণা করার আগে আহ্বায়কের সঙ্গে একবার আলাপ করেন।

বিকেলের সভায় আহ্বায়ক অশোক-বিজয় রাহা কবি-সম্মেলনের কথাটি ঘোষণা করলেন। কবিরা কেউ-ই প্রস্তুত ছিলেন না, তবে সাধ্যমত সহযোগিতা করে উপস্থিত প্রায় সকল কবিই তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে এখনো আমার একথাটাই বারে বারে মনে হয়, কবিতীর্থের রবীন্দ্র-শতবর্ষ অনুষ্ঠানে এই একটি অভাব রয়েই গেল। বিশ্বভারতী কবি ও সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ও আদর দুই-ই করেছেন; কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করার তা-তো তাঁরা নেন নি। এতে অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি; কেননা, আমরা যে প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম, তা পেয়েছি। শান্তিনিকেতনকে চিরদিনই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি, এবার সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা গভীরতর হ'লো।

এবং এজন্য শুধু রবীন্দ্রশতবর্ষের অনুষ্ঠানসূচীর উদ্যোক্তারা নন, বিশ্বভারতীর প্রতিটি মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী সবাইকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার আছে। একজন বা কয়েকজনের চেষ্টায় কোন পরিবেশই আনন্দের হয়ে ওঠে না; এ আনন্দের যেখানেই সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে সমগ্র সংসারটাই সরল এবং সুন্দর।

বিশ্বভারতী, এখন আমার মনে হয়, এমন একটি সুন্দর সংসারের ছবিই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে উপহার দিতে পারে।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়

মানুষের জীবন নিয়ে কত লোক কত গবেষণা করে গেছেন, এখনো করছেন। কবি, দার্শনিক এবং কর্মবীর প্রত্যেকে একে আলাদা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং নানা বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ বলেছেন নদীস্রোত, কেউ বলেছেন রঙ্গমঞ্চ; কারো মতে এ জীবন শুধু স্বপ্ন, কারো মতে মরীচিকা। তাদের উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছেন আর এক দল, বলেছেন, জীবন একটা বিরামহীন সংগ্রাম; গোলাপ-কুঞ্জ নয়, কঠিন কঠোর রাজপথ।

বর্স্টাল স্কুল পরিচালনার পিছনে যে নীতি, তার মধ্যে বোধহয় এই শেষ উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যাবে। যে-কারিগর রাজপথ তৈরী করে, তার প্রধান লক্ষ্য হল, পীচ্ ঢেলে কিংবা সিমেন্ট এঁটে নিশ্ছিদ্র করে তোলা, কোথাও যেন কোনো ফাঁক না থাকে। এখানকার 'ইন্‌মেট'দের দৈনন্দিন জীবনটাও তেমনি একটানা রুটিনের শক্ত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, উদয়াস্ত ডিসিপ্লিনের শিকল দিয়ে গাঁথা। উদয়াস্ত কথাটা বোধহয় যথাযথ হল না। উদয়ের খানিকটা আগে থেকে অস্তের অনেকখানি পর পর্যন্ত, অর্থাৎ একটা ঘুমের ঘোর থেকে উঠে আরেকটা ঘুমের কবলে নেতিয়ে পড়বার নির্দিষ্ট ক্ষণ যতক্ষণ না আসে, তার প্রতিটি মুহূর্ত কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত। সমস্ত সময়টাকে ঘণ্টা মিনিটে ভাগ করে তারা নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কখন সে কী করবে এবং কী করবে না। আহার বিহার, শ্রম ও বিশ্রামের কোনো ফাঁকে একটি মিনিটও তার নিজের নয়, যার আশ্রয়ে বসে সে বলতে পারে—'করব আমার যা মনে লয়।'

তার মানে এ নয় যে, ওরা শুধু কাজ করে, খেলাধুলো ফুর্তি আমোদ করে না। তারও ব্যবস্থা আছে , এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যতটা আশা করা যায় তার চেয়ে বেশী বই কম নয়, কিন্তু সব কোডিফায়েড্, বিধিবন্ধ রুটিন মাফিক, খেলার ঘণ্টায় খেলতেই হবে। যদি বল, আজ আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, ইউ আর লায়বল্ টু বি পানিশ্‌ড। তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'ইচ্ছা বলে তোমার হাতে কিছু নেই; তোমারি কল্যাণের জন্যে ওটা এখন সরকারী হেফাজতে গচ্ছিত। খাটনি'র মত খেলাটাও তোমার 'কমপালসারি,' অবশ্য করণীয়। তোমার চিত্তবিনোদনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন সরকার। রেডিও আছে, নিয়মিত গান, বাজনা, নাটক, আবৃত্তি, সরস্বতী পুজোর হৈ হুল্লোড় আছে। যখন তোমার দলবদ্ধ রিক্রিয়েশনের পালা, তখন যদি বলে বস, আমার ভালো লাগছে না, আমি একটু একা থাকতে চাই, সেটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ—পানিশেবল অফেন্স্। তোমার জন্যে চিন্তিত হবেন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানেন, কিছু না করে, নিজের মনে একা থাকা বিপজ্জনক। এম্‌প্‌টী ব্রেণ ইজ্-এ ডেভিল্‌স্ ওয়ার্কসপ্।

এতগুলো বিপথগামী বালকের জীবনতরীটাকে নিস্তরঙ্গ কাটা খালের ভিতর দিয়ে সমান তালে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব যার হাতে, তিনি নিজেই এসে মাঝে মাঝে সেখানে তুফান সৃষ্টি করে বসেন। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ এসে হয়তো দেখলেন গল্পের ক্লাশ নেবার আয়োজন করছেন হেড্-মাস্টার। ছেলেগুলোর মুখে নেমে এসেছে অমাবস্যা। গল্পের নামে নীতিবচন তাদের কাছে কুইনাইনের মত তেতো হয়ে গেছে। সাহেব বলে বসলেন, গল্প নয়, এখন তোদের 'যা খুশির ক্লাস'। যা খুশির ক্লাস মানে? মানে, যার যা খুশি কর—ছবি আঁকা, ঘোরা-ফেরা, লুকোচুরি, আড্ডা, কিংবা যদি ইচ্ছে হয়, আপন মনে চুপচাপ বসে থাকা। চোখের নিমেষে ঠিক এক ঝাঁক পাখীর মত কোথায় যে উড়ে গেল ছেলেগুলো, তারাই শুধু জানে।

বাঁকা চোখে হেডমাস্টারের ক্ষুব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন অধ্যক্ষসাহেব। গোঁফের কোণে ফুটে উঠল একটি সরু মৃদু হাসির রেখা। তারপর বিশাল দেহ এবং ক্ষুদ্র ছড়িখানা নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে চলে গেলেন।

আরেক দিন। অফিসে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হল। চললেন ভিতরে। হল ঘরে ক্লাস নিচ্ছেন মাস্টারমশাইরা। চার পাঁচটি শ্রেণী। মাঝখানে মাঝখানে কাঠের পার্টিশন। সাহেবকে দেখে টিচারদের গলার জোর উচ্চতর হল সেই সঙ্গে চড়ে গেল ছাত্রদের গুঞ্জন। এখানে যারা পড়ছে, মোট সংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ। বাকী সব ওয়ার্কসপে—তাঁত, দর্জীশালা, কামার-খানা, কাঠকামান, বুক বাইণ্ডিং, প্রেস ইত্যাদি। চীফ্ অফিসারকে হুকুম করলেন অধ্যক্ষ ঘণ্টি দে দেও। ঢন্‌ঢন্ করে অসময়ে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই, সুপারের নির্দেশে তাদের দাঁড় করানো হল মাঠের পাশে দেবদারু-বীথির ছায়ায়। পেছনে আরদালীর হাতে একটা বড় গোছের হাত-ব্যাগ। ভিতরে কী আছে কেউ জানে না। নানা রকম আন্দাজ চলছে নানাজনের মনে। সব গবেষণা মিথ্যা করে দিয়ে

সবাইকে অবাক বানিয়ে বেরিয়ে এল কতগুলো ছোট রঙিন নোট বুক, তার সংগে একটি করে পেন্সিল। নিজের হাতে, ছোট বড় প্রতিটি ছেলেকে এক খানা করে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো ইস্কুলের নয়, তোদের। যার যা খুশি লিখবি। সাপ, বাঘ আঁকতে হয়, আঁকবি। কাউকে দেখাতে হবে না।

লেফটেনান্ট ঘোষের নিত্য-নতুন পাগলামি নিয়ে শহরের সরকারী মহলে সরস আলোচনা প্রায়ই লেগে থাকত। এই ব্যাপারটা যখন রাষ্ট্র হল, শাসন বিভাগের উচ্চস্থানীয় জনৈক কর্তাব্যক্তি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, বর্স্টালের বাছাধনদের বুঝি এখন থেকেই লেখক বানাতে চান?

—বানাতে হবে কেন? অন্য সকলের মত ওরাও জন্ম-লেখক, বর্ণ রাইটার।

—কি রকম!

—লেখক নয় কে? আমি আপনি টম্, ডিক্, হ্যারি, মানুষ বলতে যে দ্বিপদ প্রাণীক বোঝায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখছে, মানে সৃষ্টি করছে। কেউ মনে মনে, কেউ মুখে মুখে, কেউবা কাগজের পাতায় কিংবা ক্যানভাসের পিঠে। আপনাদের কেতাবেই তো আছে, মানুষ বিধাতার প্রতিচ্ছায়া,— ইমেজ্ অব্ গড্। তাই যদি হয়, তাহলে সেও স্রষ্টা, এক একটি খুদে রবিঠাকুর।

ভদ্রলোক বাঙালী খৃষ্টান। লক্ষ্য করেছিলেন আশে-পাশে যারা উপস্থিত সকলেই একটি বিশেষ কৌতুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর পদ-মর্যাদার কথা মনে করেই বোধহয় প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন না। আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ 'পাগলটাকে' আর ঘাঁটাবেন না।

এই 'নোটবুক' নিয়েই আর একদিন কথা হচ্ছিল স্কুল-সেকশনের সেকেন্ড মাষ্টার আশুতোষবাবুর সঙ্গে। এখানকার কর্মীদের মধ্যে, দুচারজন সিপাই সান্ত্রী বাদ দিলে, ইনিই ছিলেন সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ। শুধু সে জন্যে নয়, আরো কিছু ছিল বাইরে বৃদ্ধ, অন্তরে শিশু, সাদা-সঙ্কুচিত, দরিদ্র লোকটির মধ্যে, অধ্যক্ষ যাকে মনে মনে সম্ভ্রম করে চলতেন। মুখে অবশ্য ঠাট্টা তামাসার বাছ-বিচার ছিল না। একটি মাত্র জামা ছিল আশুতোষবাবুর— মান্ধাতার আমলের টুইলের সার্ট। সপ্তাহে একবার নিজের হাতে সাবান-কাচা করে নিতেন। একবার কাচতে গিয়ে পিঠের দিকে ছেঁড়াটা অনেকখানি বেড়ে গেল। তাই পরেই এসেছেন পরের দিন। গেট পেরোবার মুখে হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়ে গেল। ওঁকে কিছু বললেন না, পাশে দাঁড়ানো ডেপুটিকে বললেন, 'স্যার আশুতোষের সবই উল্টো। আমরা ঘরের দরজা করি সামনের দিকে, উনি লাগিয়েছেন পেছনে।' কথাটা কানে যেতেই তখনকার মত কোনো রকমে মাথা নীচু করে পালিয়ে বেঁচেছিলেন আশুবাবু। কিন্তু পরদিন পার পাননি। কী একটা কাল্পনিক ব্রত উপলক্ষে 'মেমসাহেবের' কাছ থেকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ এসে উপস্থিত। না গিয়ে উপায় নেই। আহারান্তে যখন বাড়ি ফিরবার আয়োজন করছেন, মনিব-গৃহিণী দু'হাতে এগিয়ে ধরলেন ভোজন-দক্ষিণা—ধব্‌ধবে থান কাপড়, তার সংগে একটি টুইলের সার্ট। আশুবাবু অসহায় ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকালেন সাহেবের পানে। তিনি যেন ধমক দিয়ে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কী হবে? আমি কী করবো! দক্ষিণা না দিলে ব্রাহ্মণ-ভোজনে পুণ্য নেই—এ-সব বিধান তো আপনারাই দিয়েছেন একদিন। গিন্নীর পাপে শেষটায় আমি সুদ্ধ নরকে পচবো?

আশুবাবু বিবাহ করেননি। দু'-একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা দূরেই থাকত এবং মাসান্তে কিছু কিছু মাসোহারা পেত। আর ছিলেন এক গুরু। আত্মীয়দের দাবী মিটিয়ে সামান্য মাইনে থেকে যা বাঁচত, প্রায় সবটাই চলে যেত তাঁর আশ্রমে। নিজের জন্যে ভাতে-ভাত কিংবা এক তরকারীর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে, অর্থাৎ মাসের শেষ কদিন তা-ও রোজ জুটত না। সহকর্মীরা সবকিছু জানতেন। সুতরাং 'ব্রাহ্মণ-ভোজন' প্রায়ই লেগে থাকত। তাছাড়া, এ-বাড়ি-ও-বাড়ি থেকে কখনো একটু কুমড়ো-শাক দিয়ে রাঁধা মটর ডাল, কখনো এক বাটি বড়ি দিয়ে শুকতো প্রায়ই এসে যেতো খাবার সময়। রান্না জিনিস যারা পাঠাতে পারত না, তারা দিত সিধে—পাঁচপো থানেক চাল, তার সংগে খানিকটা করে তেল-নুন, ডাল-মশলা। আশুবাবু আজন্ম নিরামিষভোজী, কিন্তু খেতে পারতেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা মানে অন্ততঃ দুজনের মত আয়োজন। সহকর্মীরা জানতেন এবং সেই ব্যবস্থাই করতেন। উপলক্ষ কিছু থাক বা না থাক, খেতে বললে, আশুবাবু কোনো দিন 'না' বলতেন না। বাড়ির ছেলেপিলেরাই প্রায় আসত নিমন্ত্রণ করতে। জিজ্ঞাসা করতেন —লাউঘণ্ট হবে তো রে?

—হবে।

—বেশী করে করতে বলিস মাকে।

ফোক্‌লা-মুখে এক গাল হেসে 'জয় গুরু' বলে ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হতেন। জাত সম্বন্ধে কোনো বাছবিচার ছিল না। ভোজ্যবস্তু সম্পর্কেও তাই। লাউঘণ্টের উপরে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল। আর একটি প্রিয় খাদ্য ছিল আশুবাবুর —পায়েস। সেটা প্রায়ই জুটতো না। বর্স্টালে চাকরি করে পায়েস খাওয়াবে কে? কালেভদ্রে বিয়ে-থা উপলক্ষে হয়তো কখনো মিলত এক-আধটু। কিন্তু বছরে একটি দিন প্রাণভরে পায়েস খেতেন আশুমাষ্টার—স্কুলে যেদিন সরস্বতী পুজো করত ছেলেরা। সেদিন স্পেশাল রান্না হত ছেলেদের চাঁদায়। একেক বার একেক রকম 'মেনু', কিন্তু পায়েস ছিল কমন্ ফ্যাক্‌টর। আশুবাবু একটা গামলা নিয়ে বসতেন, ছেলেরা ঘিরে বসে খাওয়াত। 'সেকেন্ড স্যার'-কে সবাই ভালবাসত।

নোটবুক-বিতরণের ব্যাপারটাকে আশুবাবু অন্য সকলের মত হাল্কা করে দেখেননি। এ শুধু তাঁর অর্থহীন খেয়াল নয়, এই সামান্য বস্তুটির ভিতর দিয়ে সাহেব হয়তো শিশু-মনের একটা চিরন্তন চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মবিকাশের চাহিদা। ফুলের মত সে মনও নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সে-ই তার প্রকৃতি। অন্যের ইচ্ছায় নয়, বিধানবদ্ধ প্রয়োজনের তাড়ায় নয়, নিত্য-প্রয়োজনের বাইরে তার যে খেয়াল, খুশি, অনিয়মের রাজ্য তারই তাগিদে। সেখানে প্রত্যেকে স্বরাট্, প্রত্যেকের আলাদা পথ, আলাদা রীতি।

প্রতিটি ছেলের কাছে আরেকটা গভীর তাৎপর্য ছিল খাতাগুলোর। এখানে তার যাকিছু, সব সরকারের, ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র জিনিস তার নিজস্ব। ঐটিকে নিয়ে সে যা মন চায় করতে পারে। তার জন্যে কারো কাছে কোনো জবাবদিহির দায় নেই।

নোটবুকগুলোর কী দশা হল, জানবার জন্যে সাহেবের মনে প্রচুর

কৌতূহল ছিল। আশুবাবুর সঙ্গে সড় করে সেই খবরটা গোপনে সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। ছেলেবয়সের যা নিয়ম, দু'-চার দিন চাপাচাপির পর খাতা সম্বন্ধে তার মালিকদের হুঁসিয়ারি অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ল। এখানে-সেখানে ফেলে রাখতেও দেখা গেল কাউকে কাউকে। তারই গোটাকয়েক সকলের আড়ালে পকেটস্থ করে আশুবাবু একটা ফাঁক খুঁজে সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিটিতেই কিছু-না-কিছু লেখা হয়েছে। একজন শুধু ছবি এঁকেছে। প্রথম ছবিটা বেশ কিছুক্ষণ তাকালে মনে হবে মানুষের চেহারা। মাথাটা একদম গোল, সরু গলা, তার পর থেকে সবটাই পেট, নীচে দুখানা ছোট ছোট পা ঝুলছে। তলায় পরিচয় দেওয়া আছে—'সায়েব'। পরের পাতায় একটি পাখি আঁকবার চেষ্টা হয়েছে। কী পাখি এক-মাত্র চিত্রকরই বলতে পারেন। আর একটা খাতায় পাওয়া গেল চার লাইন কবিতা। বোধ হয় কবির কোনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত—

এমন চাটি মারবো Head-এ
ফট্ ফটাস্ ফট্।
Teeth কিলিয়ে থাকবি পড়ে,
বাঁচতে হবে Not

পাতা ওল্টাতেই আর একটা, তার সুর আরো গভীর।

Mango গাছের ফাঁকে
মৌমাছিরা ডাকে।
চাক বানাবে যবে,
অনেক Honey হবে।

'এতো দেখছি সব্যসাচী অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে', গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন অধ্যক্ষ। 'তিনি দুহাতে বান চালাতেন, আর ইনি একই কবিতায় দু-দুটো ভাষা চালাচ্ছেন।'

আর একখানা বই খুলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন সুপারসাহেব। কাঁচা অক্ষরে ভুল বানানে লেখা—সতিষদা অমিয়কে যোড় করে চুমু খেয়েচে। অমিয় কানছিল। ভয়ে নালিষ করে না।

লেখাটা আশুবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরতে, তিনি বললেন, দেখেছি স্যার। সতীশ ছেলেটাকে নিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছে। শুধু সতীশ নয়, ঐরকম আরো কয়েকজন আছে। ছোটগুলোকে, বিশেষ করে অমিয়, মকবুল, দিলীপ, বিজয়—এদের রীতিমত আগলে রাখতে হয়।

—'জানি', তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন ঘোষসাহেব, 'সতীশ বা সিরাজুলের দোষ নেই, দোষ ঐ বয়সটার। আর্লি পিরিয়ড অব অ্যাডোলেসেন্স্। বড় গোলমেলে সময়। কিন্তু কী করবো! কর্তাদের এত করে বোঝালাম, এক ঢিলে দুপাখি মারাটা সব জায়গায় চলে না। এই দুটো গ্রুপকে একসঙ্গে রেখে দুটোরই সর্বনাশ হচ্ছে। বর্স্টাল আর

ভোজন-দক্ষিণা—ধব্‌ধবে থান কাপড়, তার সঙ্গে একটি টুইলের সার্ট।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সব দিক দিয়েই আলাদা। দুটো আলাদা স্কুল চাই। কেউ কানেই তুললো না। এক কর্তা বলে বসলেন, "ঐ কটা ছেলে নিয়ে দুটো ইনস্টিটিউশন!" আরে, সংখ্যাটাই কি সব? এক লক্ষ ছেলেকে হেলায় ফেলায় মানুষ করার চেয়ে একটা ছেলেকে ঠিক মত দাঁড় করাবার দাম অনেক বেশী। তা কে বোঝে?......মরুকগে, আমার কী!

মনিবের মুখে নৈরাশ্য ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে, আশুবাবু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন। তারপর খানিকটা দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বললেন, একটা কথা ভাবছিলাম; কিন্তু আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

—খুব হবে। বলুন না?

—রাত্তির বেলা তো আলাদাই রাখা হয়। স্কুলে যতক্ষণ থাকে, নজর রাখায় বিশেষ অসুবিধে নেই, যদিও অনেক সময় ছোট-বড় মিলিয়ে ক্লাস করতে হয়—(কতগুলো বড় ছেলে তো 'ক' 'খ'ও জানে না)। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, যখন ওয়ার্কশপে যায়। অতটা সময়। তার ওপরে—

—ইনস্ট্রাক্‌টরবাবুরা কিছুই দেখে না।

—আজ্ঞে, সে-কথা আমি বলছি না।

—আপনাকে বলতে হবে কেন? আমি সবই জানি। ভেবেওছি অনেক।

কিন্তু—থাক. আপনি এবার আসুন। আবার যখন দরকার হবে, ডাকবো।

—আর একটা কথা, স্যার। দিলীপের মার কোনো খবর পাওয়া গেল না?

—'আর বলবেন না', মুখে একটা হতাশাসূচক শব্দ করে মাথা নাড়লেন সুপার এবং 'এই দেখুন না?'—বলে, ডান দিকে রাখা একটা মোটা ফাইল দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ক্যালকাটা পুলিশ তো প্রথমটা কোনো পাত্তাই দিতে চায়নি। 'ওরকম মীগার ইনফরমেশনের ওপরে প্রসীড করা যায় না, আরো পারটিকুলারস দাও'। আরে, থাকলে তো দেবো? ছেলেটা যে মায়ের নামটাও বলতে পারে না। কেউ শেখায়নি তো, পাড়ার লোকে 'খোকার মা' বলে
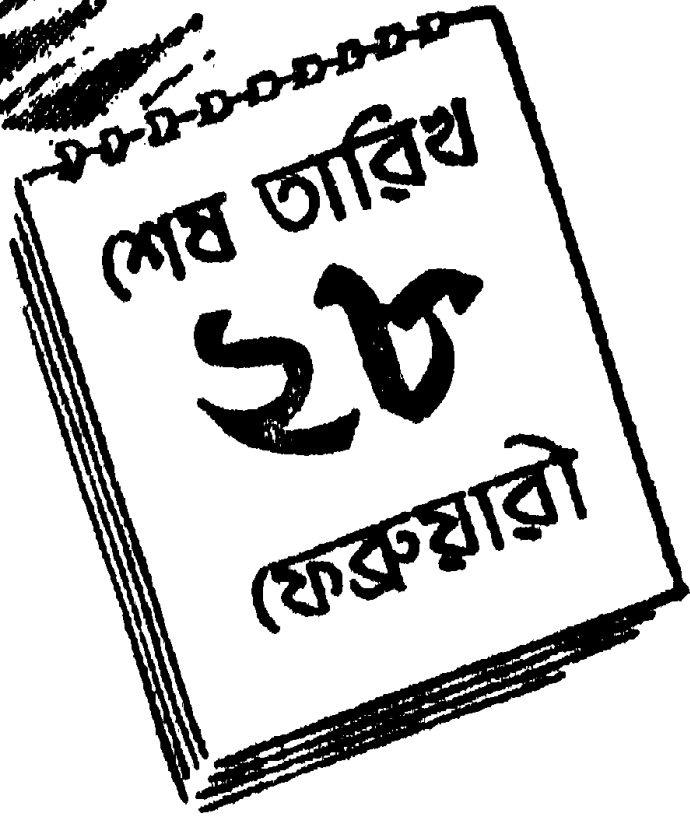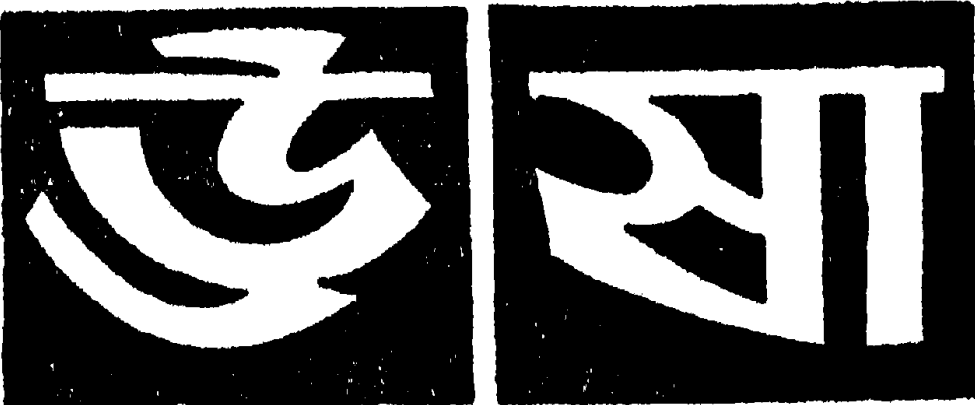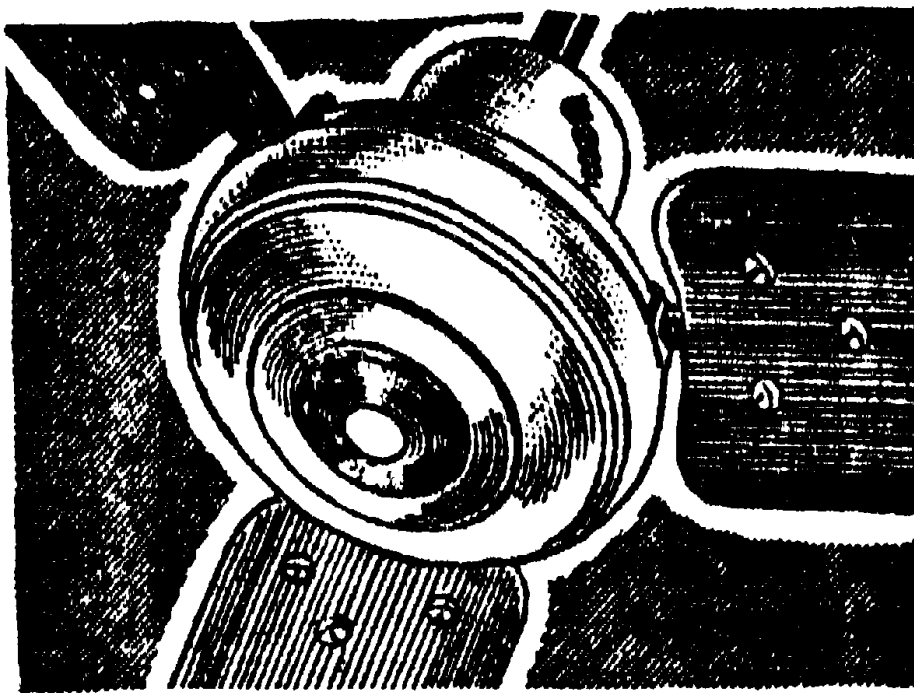
ডাকে, সেইটুকুই জেনে রেখেছে। ওর কথা ছেড়ে দিন, আমিও ঐ বয়সে আমার মায়ের নাম জানতাম না, কিন্তু বৃদ্ধ প্র-পিতামহের নাম গড়গড় করে মুখস্থ বলেছি।......

বলে হেসে উঠলেন লেফটেনান্ট ঘোষ। হাসি থামিয়ে বললেন, যাই হোক, এখনো হাল ছাড়িনি। ডি, সি, কে একটা ডি, ও, লিখেছি। আজ ভাবছি রিমাইন্ডার দেবো। কেন, মায়ের কথা কিছু বলছিল নাকি আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ওর খাতাটা দেখছিলাম, বলে আশুবাবু দিলীপের নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন।

প্রথম পাতায় শুধু নাম। ঠিক মাঝখানে, দুপাশে সমান ফাঁক রেখে গোটা গোটা অক্ষর—শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুপার। তারপর পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল কাঁচা কিন্তু পরিষ্কার হাতে লেখা কয়েকটি লাইন—মাগো, কাল রাতেও আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। তুমি বারান্দায় বসে কাঁদছিলে। সেই যে ঘুম ভেঙে গেল, আর ঘুমুতে পারিনি। আমার জন্যে কেঁদো না। আমি খুব ভাল আছি। এঁরা সকলে আমাকে ভালবাসেন।

তোমার খোকা।

কিছুই নয়; অত্যন্ত সাধারণ একখানা চিঠি, সব ছেলেই যা মায়ের কাছে লিখে থাকে। তফাত শুধু এই, সে চিঠি পাঠানো যায়, তার জবাব আসে; কিন্তু এ চিঠি কেবল লেখা রইল ঐ খাতার পাতায়। যার উদ্দেশে লেখা, তার কাছে কখনো পৌঁছবে না, সামান্য একটা উত্তরও আসবে না কোনোদিন।

নোটবুকখানা আস্তে আস্তে বন্ধ করে জানালার বাইরে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ঘোষ-সাহেব। আশুবাবুও আর কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে নোটবুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নত হয়ে নমস্কার করলেন এবং অনেকটা আচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ডেপুটি সুপারের প্রশ্নটা মনে হল, ভুল শুনেছেন। তার পরেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন,—বলেন কি স্যার! এতগুলো ছেলে, ওয়ার্কশপে না গিয়ে করবে কী?

সাহেব হালকাভাবেই বললেন, ওখানে গিয়েই বা করছে টা কী? কাঠ-মাষ্টারের পাকা চুল তোলা, নয় তো লোহা-মাষ্টারের পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া? এই ভয়ানক ভয়ানক দরকারী কাজগুলো না-ই বা করল।

সন্তোষবাবু 'সিরিয়াস' মানুষ। কাজের কথার মধ্যে ঠাট্টা-তামাসার আমদানী পছন্দ করেন না। বললেন, রুল-এ তো ওদের বেলায় কোনো 'এক্সেপশেন' নেই। বড়, ছোট সব এজ-গ্রুপ'এর জন্যেই এক ব্যবস্থা। তিনঘন্টা স্কুল আর পাঁচ ঘন্টা 'ওয়ার্কশপ'। সে রুটিন আমরা বদলাই কেমন করে?

সাহেবও সেকথা জানেন। জানেন বলেই, দশ-বারো বছরের অপগণ্ড ছেলে-গুলোর এই পাঁচঘন্টা ওয়ার্কশপ-ট্রেণিং-এর হাস্যকর প্রহসন প্রতিদিন চোখের উপর দেখেও নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। ঠিক নিঃশব্দে নয়, নিজের মনে গজগজ করেছেন, মাঝে মাঝে মেজাজ চেপে রাখতে না পেরে নিজের ষ্টাফ-এর উপর অযথা ঝাল ঝেড়েছেন, তার বেশী আর কিছু করতে পারেননি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লেখালেখি চালাতে পারতেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন, তার থেকে কাগজ কলম ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনো বস্তুই লাভ হয় না। যে পদার্থ অনড়, তাকে নড়ানো যায় না। তাই লেখালেখিতে আর উৎসাহ পান না। অথচ, ছেলেগুলোকে যখনই দেখেন, ছটফট না করেও পারেন না। সেক্রেটারিয়েটের দূরে পাল্লায় বসে যারা লেখনী চালান, তাঁদের সুবিধা হল ঐ দূরত্ব। সেই লেখনীর প্রতিটি খোঁচায় যারা উঠছে পড়ছে, তারা থাকে চোখের আড়ালে। দেখতে হয় না খোঁচাটা কোথায় গিয়ে লাগল, অথবা ঠিকমত লাগল কিনা।

ডেপুটি যে আপত্তি তুললেন, তার উত্তরে ঐ ধরণের প্রসঙ্গই শোনা গেল ঘোষসাহেবের মুখে। বললেন, মুস্কিল কি জানেন? 'রুল' যারা তৈরী করেছেন, তাদের হাতে ছিল শুধু দিস্তা কয়েক কাগজ আর একটা করে কলম; আর আমাদের হাতে এসে পড়ছে কতগুলো জল-জ্যান্ত মানুষ, তাও পুরো মানুষ নয়, কোনোটা আধখানা, কোনোটা সিকি। প্রত্যেকের জাত, গোত্র আলাদা, মন, মেজাজ আলাদা, রুচি, প্রকৃতি, মেধা, বুদ্ধি সব আলাদা। অথচ একই রুল-এর রোলার চালিয়ে সবগুলোকে লেভেল করতে হবে! কেন? এরা কি কতগুলো গাছ না ইঁট পাথর?

এই জাতীয় "বড় বড়" কথায় মূল্য যে কী, সন্তোষবাবু কোনোদিন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ উপরওয়ালার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অফিস ডিসিপ্লিনের খাতিরে এগুলো অনেক সময় শুনতে হয়; তাই শুনে গেলেন। ঘোষ আবার বললেন, কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ভোকেশনাল ট্রেণিং। কি করতে হবে? না; কতগুলো দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলেকে ধরে রোজ পাঁচ-ঘন্টা ওয়ার্কশপে কাজ করাতে হবে। ইজ্ ইট্ নট্ রিডিকুলাস্? হাতে-কলমে কোনো কাজ শেখবার মত বয়স হয়েছে এদের না বুদ্ধি হয়েছে? তাছাড়া কী অধিকার আছে আমাদের—এই কচি ছেলেগুলোকে এখন থেকে মিস্ত্রী তৈরী করবার। সব সভ্য দেশের ছেলেমেয়েরা অন্ততঃ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ইস্কুলে যায়। এদের সে সুযোগ কেন দেওয়া হবে না? না, মশাই; রুলএ যাই থাক, ওয়ার্ক-শপের নামে এই বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে পারি না। কাল থেকে চৌদ্দ বছরের নীচে যাদের বয়স, সব কটাকে আপনার ঐ 'কামান'এর মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসুন। আপনিও জানেন, আমিও জানি, ওদের দিয়ে ওখানে কোনো কাজ হয় না, শুধু গোল্লায় যাবার রাস্তা তৈরী হয়।

—'ঐ সময়টা কী করবে তাহলে?' বিরক্তিপূর্ণ শুষ্ক মুখে জানতে চাইলেন ডেপুটি।

—পড়বে। হেডমাষ্টারকে বলে দিন, ওরা যেন ভালোমত পড়াশুনো করে। সেদিকে স্ট্রিক্ট হতে হবে।

সন্তোষবাবু চলে যাচ্ছিলেন। সাহেব ঐ সংগে আর একটা নতুন নির্দেশ যোগ করলেন, 'ওদের মধ্যে যারা কিছুটা লেখাপড়া জানে, যেমন দিলীপ বা মকবুল, তাদের কয়েকঘন্টা করে প্রেস-এ কাজ শিখতে দিন। মেশিনে নয়, কম্পোজ শেখাতে বলুন।'

(ক্রমশঃ)

ছুটির দিনের পড়া

শশাঙ্ক সেনগুপ্ত

(২)

শিক্ষামূলক ভ্রমণ অনেকের মতে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। বহু দেশ-দেশান্তর পর্যটন করে প্রকৃতি ও বিভিন্ন মানুষের ঠিক-ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়—এ ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন। চোখ আমাদের সুদূরের তারার দিকেই নিবদ্ধ এবং তার ফলে হাতের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বহু অপরূপ জিনিসই আমাদের হাতের মুঠোয় এসেও আসতে চায় না—নাগাল এড়িয়ে যায়, সে কথা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি? 'স্ফুলিঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ জানিয়েছেন যে, বহু দেশ ঘুরে বহু জিনিস তিনি অন্বেষণ করে বেড়িয়েছেন, কিন্তু তৃণফলকে একটি শিশিরবিন্দুর সহজ সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে গিয়েছে। এতদিন দেখেও দেখেননি। আমাদের জীবনেও এই কথা কত মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠছে বিশ্লেষণ করলেই তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে।

শিশুরা পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন দেশের জন্তু-জানোয়ারের কথা পড়ে। কিন্তু আমরা কি একবারও তাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশের জন্তু-জানোয়ার পাখি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলি। অনেক সময় হয়তো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু চোখের সামনে যা দেখা যায় তার সম্বন্ধে যথেষ্ট খবরা-খবর তাদের জানানো হয় না।

প্রকৃতিবিজ্ঞানে তারা গাছ-পালা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রবন্ধ পড়ে থাকে, কিন্তু সেখানেও কি বট্যানিক্সে নিয়ে গিয়ে ঐ সব বিষয়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না?

আলিপুর চিড়িয়াখানায় জলহস্তী

এমনি করে যাদুঘর থেকেও তারা অতীতের লুপ্তপ্রায় অতিকায় জন্তু, মানুষের সভ্যতা এবং তাদের জ্ঞাতব্য আরো বহু বিষয় সম্বন্ধে যাতে ওয়াকিবহাল হতে পারে সে সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করছি।

প্রাণীজগত সম্বন্ধে শিশুমনে কৌতূহল অসীম। তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, তাদের শোভা-সৌন্দর্য সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুরা যাতে উপভোগ করতে পারে সেজন্যে গত অক্টোবর মাসে গভর্ণমেন্ট হাউসে একটি 'মিনিয়েচর জু' খোলা হয়েছিল। শিশুরা বড় হয়ে এই প্রাণীজগত সম্বন্ধে যাতে গভীর জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং তার সূত্রপাত যাতে বর্তমানেই করা সম্ভব হয় এজন্যে চিড়িয়াখানার মধ্যেই ছোট ছোট 'চিলড্রেনস জু' তৈরী করা হচ্ছে। এই 'মিনিয়েচর জু' দেখে শিশুরা প্রচুর রোমাঞ্চ ও আনন্দলাভ করবে। খাঁচার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারকে না রেখে উন্মুক্ত পরিবেশে তাদের ছেড়ে রাখা হবে। অবশ্য দূরে সতর্কতামূলক জাল ও পরিখা দিয়ে ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে এর ফলে কোনো বিপদ না আসতে পারে। এখানে অনেক জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চাকে শিশু অবস্থায় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে

আলিপুর চিড়িয়াখানায় হরিণের পাল

রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই অবস্থা মেনে নিয়ে তাদের অনেকেই পোষ মেনে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে সর্বপ্রথম গীর-জঙ্গলের সিংহশাবকদের কথা উল্লেখ-যোগ্য। তৈরী-করা কালো পাহাড়ের কোলে তিন-চারটি সিংহশিশুকে ছেড়ে রাখা হয়েছে। এই নকল পাহাড়ে গুহাও আছে। সেখানে তারা নিজেদের প্রয়োজনমত ঢুকে পড়ে বিশ্রাম করতে পারে। দূরে জাল ও পরিখা দিয়ে ঘিরে দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিত্র থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে সিংহের সৌন্দর্য আরো নয়নাভিরাম লাগে।

শিশুদের মনোরঞ্জনার্থে মুক্ত-অঙ্গনে আরো যা যা রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে 'লজ্জাবতী বানর' অতি মজার জিনিস। এরা দিনের বেলা ঘুমোয় এবং রাত্তির হলে খুঁজে বেড়ায় ফলমূল, পোকা, পাখির ছানা আর পাখির ডিম।

পিঠে তারকা-চিহ্নিত কচ্ছপ আর একটি কৌতুককর দ্রষ্টব্য। পিঠের শক্ত ঢালে যে কোনো আঘাতই এরা রুখতে পারে এবং অনেকদিন বাঁচে। হরেকরকম কাকাতুয়াও থাকবে এই জ়ু-তে। 'হগ্-ডিয়ার' বলে শুয়োরের মত দেখতে এক-রকম হরিণ রাখারও আয়োজন চলছে। এদের বেঢপ শরীরের তুলনায় পা-চারটি আকারে নিতান্ত ছোটো। ভারতীয় সজারুও থাকবে দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে। সজারু তার তীক্ষ্ন কাঁটার ঘায়ে কখনো কখনো কালো 'প্যান্থার' ও বড় বাঘকে মেরে ফেলেছে—এমন নজিরও আছে। নানান ধরনের বিচিত্রিত বহু বর্ণের পাখিকে ছেড়ে রাখার ব্যবস্থা করা হবে যাদের প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলতে হয়। এ ছাড়াও শিম্পাঞ্জি, নীল গাই, ডোরাদার হায়েনা, বুটিদার চিতা এবং আরো অনেক রকমের জন্তু রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে মনের সহজাত কৌতূহল চরিতার্থ হয়।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় নকল পাহাড় এলাকায় সিংহ-শাবক (সাদা বৃত্তের মধ্যে)

প্রসাধনরতা নারী-মূর্তি (কলকাতার যাদুঘর)

কলকাতার যাদুঘর আরো একটি অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার। ছুটির দিনে সহজেই এখানে আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লেখাপড়ার চর্চা করা যেতে পারে। এখানে সংরক্ষিত প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে খুঁটি-নাটি তথ্য দিয়ে শিশু-মনকে ভারাক্রান্ত না করে প্রাগৈতি-হাসিক ও অতীত সভ্যতার মোটামুটি একটি ছবি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায়। যাদুঘরে ঢুকেই অশোক-স্তম্ভের সিংহের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে তাদের কিছু বলা যেতে পারে। তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বৌদ্ধযুগের অন্যান্য স্মারকের সঙ্গে। সাঁচীস্তূপের ভাস্কর্যের নমুনা দেখেও তাদের মনে অতীতকালের স্বদেশের ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মাঝের হলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাদের দেখানো যেতে পারে খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ধীরে ধীরে কী ভাবে বুদ্ধমূর্তি ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। কী ভাবে গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গান্ধার শৈলীর বুদ্ধ-

মূর্তি তৈরী হয়েছে। তারপরে ধীরে ধীরে মৌর্যযুগে বুদ্ধমূর্তি মোটামুটি একটি স্থিরত্ব লাভ করেছে। বোধিসত্ত্ব মূর্তিও গান্ধার শৈলী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বুদ্ধমূর্তির মত ভারতীয় ঢঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্শ্বনাথের মূর্তিও চোখে পড়বে— বুদ্ধমূর্তির আদর্শে তা' রচিত হলেও তার বুকে জৈনদের একটি বিশেষ স্মারক-চিহ্ন দেখে আলাদা করে চেনা যায়। এ-ছাড়াও মৌর্যযুগের বহু মূর্তি, ভুবনেশ্বরের 'পত্রলেখা', পুরী মন্দিরের 'শালভঞ্জিকা', মোগল ও পারসিক স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যেতে পারে। আকবরের নকল-করা বিচিত্রিত 'লায়লা-মজনু'র কপিও সেখানে সংরক্ষিত আছে।

মাঝের হল থেকে ডানদিকের হলে ঢুকে মানব সভ্যতার শৈশবকাল থেকে ক্রমবিকাশের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্যালিওলিথিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, তীরের ফলা, নিত্যব্যবহার্য পাত্রাধার, নিওলিথিক যুগের প্রচুর নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হবে। মাঝখানে কাঁচের শবাধারে রক্ষিত মিশরের মমি বিশেষ দ্রষ্টব্য। মহেঞ্জোদড়ার কলস, পাত্রাধার, আভরণ, অলঙ্কার এবং শিল্প-সামগ্রী ও বহু স্মারকচিহ্ন থেকে ঐ যুগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করা সহজ হবে। মাকরান (বালুচিস্তান) থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ নিদর্শনাদি থেকেও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য লাভ করা যাবে। সিন্ধুসভ্যতার অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-পত্র স্বচক্ষে দেখলে ইতিহাসে বর্ণিত পাঠ-বিষয়াদি সকলের কাছেই আরো মনোরম হয়ে ওঠা সম্ভব।

বাঁদিকের হলে ঢুকে আদিম যুগের অতিকায় হাতী, বিশালকায় কচ্ছপ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করা সম্ভব। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-স্তরের কার্যকারিতা ও প্রকৃতি, বিভিন্ন খনিজ পাথর এবং খনিজ লোহ ও অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞাতব্য বহু দুর্লভ তথ্য পাওয়া যাবে। যাদুঘরের উপরতলে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় ম্যামথের কঙ্কাল, অধুনালুপ্ত অতিকায় স্তন্যপায়ী ম্যামালস্, সমুদ্র-গর্ভের প্রবালদ্বীপ ও সমুদ্রতলদেশের অন্যান্য রহস্যময় বস্তু রক্ষিত আছে—যে জিনিস বারবার দেখলেও কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না।

ছুটির দিনে বেড়াবার আর একটি সুরম্য উপভোগ্য স্থান বেলগাছিয়ার পার্শ্বনাথের মন্দির। এই মন্দিরের চতুষ্পার্শে ছায়াশীতল বাগান, নকল পাহাড়, মৎস্যাকীর্ণ ঝিল দিয়ে সাজিয়ে জায়গাটি সুন্দর করে তোলা হয়েছে। জৈনদের মতে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর মহাপুরুষ জৈনধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এ'দের মধ্যে শেষ দুজনের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর।। পার্শ্বনাথ বারাণসীর এক রাজপুত্র ছিলেন। এক কথায় রাজবেশ ত্যাগ করে শিষ্যদের মধ্যে চারটি বিষয়ে সংযত হবার ব্রত প্রচার করলেন। অহিংসা, সত্যভাষণ, চৌর্যকর্ম হ'তে বিরতি এবং অনাসক্তি। এই চারটি নিয়ম—যা জৈনরা সযত্নে মেনে চলেছিলেন, পরবর্তীকালে মহাবীর তার সঙ্গে জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কল্প যোগ করেন। পার্শ্বনাথের এই বাগানে যে পাহাড়টির উপরে একটি মঠ তৈরী করা হয়েছে, অনুরূপ একটি পর্বতে পার্শ্বনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

ছুটির দিনে চড়ুইভাতি উপলক্ষ্যে বটানিক্স-এ অনেকেই যেতে পারে। এখানের হার্বেরিয়ামে রক্ষিত বিভিন্ন গাছ-পালা সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সহজেই লাভ করা যায়। অর্কিড, বিভিন্ন রকমের ম্যাগ্নোলিয়া ও দুষ্প্রাপ্য বহু গাছের চারা এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। এখানের নার্শারিতে বহু গাছ ও ফুলের চারা সযত্নে লালন করা হয়—যার সম্বন্ধে অতি সহজেই জ্ঞান আহরণ করা যায়।

কলকাতা অতি রহস্যময়ী নগরী। বহু মনোরম দ্রষ্টব্য বিষয় তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে—কাছে থেকেও তা বহু দূরে। ছুটির দিনে ঘুরে ঘুরে সময়মত যদি আমরা সে রহস্যের অনুসন্ধান করি তাহলে খনির তলায় লুকানো হীরের মত একেকটি উজ্জ্বল মুহূর্তকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি—যা আমাদের মনে স্থায়ী আলোক বিচ্ছুরণ করবে।

মেহেদী

কনাদ চৌধুরী

রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের শ্রাবণ মাসটি হল বিবাহিতা মেয়েদের কাছে পরম প্রত্যাশার মাস। আকাশে যখন ধূসর মেঘের ভেলা, ভিজে মাটির গন্ধে বাতাস যখন মন্থর প্রায় তখনই শ্রাবণ মাসের অষ্টাদশ দিনে, উত্তর ভারতে তীজ পরব আসে। এই দিন স্বামীর ঘর থেকে বাপের বাড়ি ফেরে মেয়েরা। শ্রাবণ-সঙ্গীতে মেয়েরা মিনতি জানায় তাদের স্বামীকেঃ

এতদিন পরে তীজ পার্বনে ফিরে এল
ছোটবেলা
মেহেদী রঙের কুমারী দিনের হাত
রাঙানোর খেলা
হে প্রিয় আমার বাড়ি যাবো আমি,
ডাক দিয়ে গেছে সই
এতদিন পরে তীজের পরব আবার
ফিরেছে ওই॥

তীজ পরবে সুখী গৃহকোণ আরো সুখী হয়। সকালবেলায় পাখী হয়ে ছোটবেলাটা যেন ফিরে আসে হঠাৎ।

গাছে গাছে দোলনা খাটানো হয়। "ঝুলা" গানে বনস্থলীর হরিৎ পত্র যেন নতুন প্রাণস্পন্দনে কাঁপতে থাকে। "রাজা-শাহী", "কাজলি লহরিয়া" শাড়ির হঠাৎ রঙের ঝলকানিতে সমস্ত গ্রামটাই যেন রামধনুর দেশে ফেরারী হয়ে যায়। বাড়ির সব মেয়েরা রঙীন কাপড়ে, নতুন সাজে তীজ পরবকে স্বাগত জানায়। অলঙ্কারে প্রসাধনে পুরোনো মুখে নতুন আলো ফোটে। কিন্তু এই তীজ পরবের প্রধান প্রসাধন হল মেহেদী। উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের ১৮ই শ্রাবণ মেহেদীর রঙে লাল।

প্রাক্‌ঐতিহাসিক কাল থেকেই ভারতবর্ষে মেহেদী সৌন্দর্য চর্চার একটি রমণীয় উপকরণ। হেনা গাছের পাতাই হল সমস্ত রক্তিমতার উৎস। গাছটির বিদেশী উপাধি "লসোনিয়া আলবা"। মেহেদী পাতাকে থেঁতলে মন্ড তৈরী করে হাত, পায়ের পাতা চিত্রিত করা হয়। শুকিয়ে গেলে মেহেদীর রঙ সাধারণতঃ অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। অজন্তা গুহা-চিত্রের অবিনশ্বর নর্তকীরা মেহেদীর লালে প্রসাধিত। পরবর্তী সময়ের রাজস্থানী চিত্রকলায়ও মেয়েদের মেহেদী-প্রসাধনের দৃশ্য বহুরূপে চিত্রিত। তীজ পরবের দিনটিতে গাঁয়ের সব মেয়েরা মেহেদীপাতার মন্ড তৈরী করে প্রথমে। মিহি মন্ডে নক্সা আঁকার বেশী সুবিধে। মন্ডের সঙ্গে সাধারণতঃ লেবুর রস অথবা তেঁতুলের জল মেশানো হয়। কখনো কখনো জাম কিংবা ওকরার রসও দেয়া হয় রঙটাকে গাঢ় করবার জন্যে। জংলা এবং জ্যামিতিক নানান ধরনের নক্সা আঁকে মেয়েরা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেহেদীর রঙ দিয়ে হাতে নাম লেখে উল্কির মত। নক্সার ওপর নারকোলের তেলের প্রলেপ দিয়ে অনেক সময় উজ্জ্বলতাও বাড়ানো হয়।
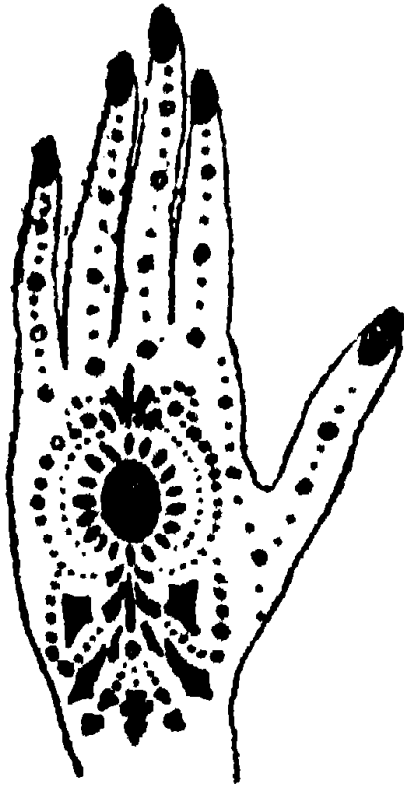
উত্তর ভারতের অনেক স্থানে গয়না এবং ফুলের মতই মেহেদী কনে-সাজানোর একটি দেশজ উপাচার। বরের বাড়ি থেকে কনেকে শুকনো মেহেদী পাতার গুঁড়ো তত্ত্ব দেয়া হয়। এই তত্ত্ব-লব্ধ মেহেদীতে প্রসাধিত হয়ে কনে যায় বিবাহ-বাসরে ঃ

মেহেদী রাঙানো দুটি হাতে
গান গেয়ে সখীদের সাথে
ভীরু পায়ে চলে ধীরে বালা
গলে তার দিতে বর-মালা॥

বরকেও মেহেদীতে লাল হতে হয়। মারওয়ার দেশের মেয়েরা মেহেদী-শিল্পে অদ্বিতীয়। কোনো তুলির সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র আঙুলের সাহায্যেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নক্সা ফুটিয়ে তোলে তারা হাতের এপিঠে ওপিঠে।

মুসলমানদের মধ্যেও মেহেদী ধর্মা-চারের পবিত্র উপকরণ। মক্কা এবং মদিনায় হজযাত্রার শেষে মুসলমানরা তাঁদের চুল ও দাড়ি মেহেদীতে লাল করেন। শুধু প্রসাধন বা ধর্মার্থেই না, মেহেদী ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অতিরিক্ত গরমে পা ঘামে হেজে গেলে মেহেদীর প্রলেপে ভাল হয়ে যায়।

মহীশূরে দশেরা

আভা পাকড়াশী

সবাই চলেছে মহীশূরে। শহরটিই একটি দ্রষ্টব্য বিশেষ। তবে এখানকার আকর্ষণ হল ভারত-বিখ্যাত সেই মহীশূরের মহারাজার দশেরা প্রশেসান। দূর-দূরান্তর থেকে লোক চলেছে এখন ঐ প্রশেসানের আকর্ষণে। আমরাও চলেছি ঐ একই কারণে। ট্রেনে অসম্ভব ভীড়। কানপুর থেকে বেরিয়েছি প্রায় তিন-চার দিন হল। চলেছি তো চলেইছি। পথে পড়েছে হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর। ওখানকার যা দ্রষ্টব্য তাও অল্প সময়ের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব দেখে এসেছি। তবে আমার আজকের বক্তব্য তা নয়। বিজয়া দশমীর দিন বেরোবে ঐ প্রশেসান। তাই অষ্টমীতেই লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছে গেলাম।

এখানে পেঁৗছেই মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেন্স দেখতে এসেছি। অদ্ভুত এর আকর্ষণী শক্তি। এই বাগানটিকে নিছক বাগান বলে মনে হয় না। এর নৈঃসর্গিক মনোহারিতায়, রঙিন ফোয়ারায় সত্যিই শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাভূমি বৃন্দাবনেরই সমতুল্য বলে মনে হয় এটিকে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। ড্যামের ওপর বৃন্দাবন গার্ডেন্স দেখছি। এত বড় বাগান এক দিনে সবটা ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। তাই ওপরে দাঁড়িয়ে এই বাগানের ছকটির কিছুটা আন্দাজ নেবার চেষ্টা করছি। মহারাজা কৃষ্ণরাজাওয়াডিযর এখানে কাবেরী নদীতে একটি বাঁধ তৈরী করেন। তারই জল দিয়ে এই অপূর্ব নয়নাভিরাম উদ্যান বৃন্দাবন গার্ডেন্স-এর সৃষ্টি। এর বিশেষত্ব ফুলে নয় ফোয়ারায়।

এবার ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছি। বাগানটিও ফোয়ারা বাগিচা সমেত ধাপে ধাপে নীচে চলেছে। প্রথমেই রাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনাবদ্ধ মধুর যুগলমূর্তির পদপ্রক্ষালন করে শুরু হয়েছে রঙিন ফোয়ারা। এক একটি স্টেপে এক এক রকম ফোয়ারার ডিজাইন। কোনখানে এই উৎক্ষিপ্ত জলধারা একত্র হয়ে ছাতার আকার ধারণ করেছে কোথাও বা একটি ধারা অন্যটির গায় লীলাভরে হেলে পড়ে রামধনুর সৃষ্টি করেছে। কোনটি বা উদ্ধত ভঙ্গীতে সোজা উঠেছে ওপরে। কি অপরূপ! প্রত্যেকটি ধাপের আলাদা বৈশিষ্ট্য। কোনটির সঙ্গে কোনটির ভঙ্গীর মিল নেই। নীচু সেডে আলো দেওয়া ফ্লাওয়ার বেড, আর তারই সঙ্গে রং মিলিয়ে ফোয়ারার ধারা উঠেছে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ফোয়ারাগুলির নীচে রঙিন আলো দেওয়ায় অমনি লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সবুজ রং ধরে সেই উৎক্ষিপ্ত জলধারা মরকত মণির মত দ্যুতি বিকিরণ করছে। এখানকার ঝাউগুলি বড় বড় ডোমের আকারে ছাঁটা। অমনি একটি ঝাউ-এর নীচে বসে চোখ ভরে ঐ অপরূপ দৃশ্য ও অগণিত মানুষের মিছিল দেখছি। এই বাগানের ঐ অপরূপ শোভার কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম ভি শান্তারাম-এর 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' ছবিতে। তবে সেই রঙিন ছবিতে রঙিন ফোয়ারা বড় যেন আর্টিফিসিয়াল মনে হয়েছিল।

আজ নবমী। এখানকার চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়ম দেখতে এসেছি। ছোটর মধ্যে বেশ ভরা চিড়িয়াখানাটি, সিংহ আছে অনেকগুলি। হাতীও রয়েছে দিশী আর অ্যাফ্রিকান। তিন-চার রকম ভাল্লুক। আর নানান বরণী পাখী রয়েছে। এখানে গেটে ঢুকতেই একটি নুব্জদেহ, ফেজপরা, বামন মুসলমান পরিষ্কার ইংরেজীতে আমাদের ক্যামেরা নিয়ে যেতে বারণ করল।

এবার গেলাম মিউজিয়াম দেখতে। জগমোহন প্যালেসেই মিউজিয়ম। কৃষ্ণরাজাওয়াডিয়রের ও অতীতের অন্য রাজাদেরও ব্যবহৃত জিনিসে ভরা এই মিউজিয়াম। বর্তমান রাজার ঠাকুর্দাদা ছিলেন ইনি। ওঁর সংগ্রহ দেখেই বোঝা যায় উনি কি রকম গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। কত দেশের কত রকমারী বাজনা রয়েছে। এক বীণা তাই কত রকমের। সরস্বতী বীণা, বিচিত্র বীণা, মোহন বীণা। কত রকমের বাঁশি। রবাব, বেহালা, সেতার, সরোদ এই সব বাজনা নাকি তিনি নিজে বাজাতে পারতেন। এ ছাড়া ছবির কালেকসনও চমৎকার। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবিবর্মা আরও কত বড় বড় আর্টিস্টের যে ছবি আছে তার ইয়ত্তা নেই। রবিবর্মার আঁকা অহল্যা ও রামচন্দ্রের বিরাট দেয়াল-জোড়া একখানি তৈলচিত্র রয়েছে। ছবিখানিতে বহু যুগ আগের অহল্যার সেই দিনের সেই সদ্যমুক্তি-প্রাপ্তির আনন্দ ও লজ্জা যেন মেঘ রৌদ্রের খেলার মত মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এবার চললাম চামুণ্ডা মন্দির দেখতে। বাসে করে উঠছি পাহাড়ের উপরে। মনে হচ্ছে যেন আবার চলেছি সেই তুহিনতীর্থ কেদার-বদ্রী দর্শনে। বাস এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠছে। দূরে মহারাজার সামার প্যালেস "ললিতা মহল' একটি বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। এই চামুণ্ডা পাহাড় থেকে মাইশোরের দৃশ্য ভারী সুন্দর। মন্দিরটি বহু পুরাতন। অপূর্ব কারুকার্য এই মন্দিরের। অবশ্য দক্ষিণের মন্দিরের বৈশিষ্ট্যই এই। মনে পড়ছে হ্যালিবিডু ও বেলুড় মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ অদ্ভুত জীবন্ত সেই নৃত্যপরা মূর্তিগুলি ও মহাভারতের পুরো কাহিনীর সেই মূর্তির মাধ্যমে প্রকাশের কথা। বহু দূর থেকে চোখে পড়ে বিশাল মহিষাসুর মূর্তি ও বিরাট নন্দীর দেহ। কালো কষ্ঠিপাথরে গড়া মহাদেবের এই বাহনটির উচ্চতা প্রায় দোতলা সমান। মহিষাসুরটি উচ্চতর। মন্দিরাভ্যন্তরে মা দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি। এরা বলে চামুণ্ডী বেটো। বেটো মানে অন্ধ্র ভাষায় পাহাড়। ছোট ছোট ডালায় পুজার উপকরণ নিয়ে বসেছে দাক্ষিণী মেয়েরা। পুজো অন্তে ডালিটি ফেরৎ দেওয়া নিয়ম। আস্ত নারকোল, কলা, ধূপ, রোলি, সামান্য ফুল এই হল পুজার উপকরণ। কিনে নিলাম। নবমী পুজো শেষ পর্যন্ত মা দুর্গার চরণেই অর্পণ করতে পারব এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চলেছি পুজো দিতে। দেখি বিরাট লাইন লেগেছে। নিয়মানুবর্তিতার দেশ, তবে পুজো দেবার বেলাই বা তার ব্যতিক্রম হয় কেন? অধৈর্য হয়ে দেখি এখানে আবার পুজো দেবার টিকিট কিনতে হয়। এত বাঁধাবাধি নিয়মের প্রবর্তন সত্ত্বেও দেখি ভেতরে অসম্ভব ভীড়। অত রোদ্দুরের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিলাম তাই প্রথমটা ভেতরে ঢুকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, পরে দেখলাম মন্দিরটি বেশ বড়। মূর্তিটিও সুন্দর। মায়ের মুখে যেন মাতৃভাবের অভিব্যক্তি ফুটে রয়েছে। বেশীক্ষণ

দাঁড়িয়ে দেখার অবকাশ কই? লাইন এগুচ্ছে। বেরিয়ে এসে সঙ্গীদের—মানে স্বামী-পুত্রকে আর খুঁজে পাই না। ওরাই আমাকে খুঁজে বার করল। কি করে আমাকে এত লোকের মাঝে খুঁজে পেলে? জিজ্ঞেস করায় বলল এই অন্ধ্র দেশের মেয়েরা নিজেদের গায়ের ঘোর রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে বিকট ঘোর রংয়ের শাড়ী পরেছে, এর মধ্যে তোমার সাদা শাড়ী ব্যতিক্রম বৈকি। প্রচুর ডাব বিক্রি হচ্ছে এখানে। প্রাণ ভরে ডব খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। উত্তর প্রদেশে এই বস্তুটি মেলে না। ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। এখানে এই অক্টোবরেও বেশ গরম লাগছে।

আজই বিজয়া দশমী। এদেশের চিরকালের প্রথানুযায়ী মহারাজ আজকের দিনে রাজবেশে সজ্জিত হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণনির্মিত হাওদায় সমাসীন হয়ে সাধারণে দর্শন দেবেন। শুধু তাই নয়, আজ হবে বিজয় অভিযান। হাতি, ঘোড়া, সৈন্য, সামন্ত নিয়ে পুরোদস্তুর যুদ্ধযাত্রা করে যাবেন সাত মাইল দূরবর্তী তারা দেবীর মন্দিরে। সেখানে সমস্ত দিন আরাধনার পর সন্ধ্যায় আবার ঐ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন। অতীতে এই দিনে রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। এই যাত্রা তারই প্রতীক। বিরাট দর্শনীয় প্রশেসন বেরোয় প্রাসাদ থেকে। কত দূর-দূরান্তর, দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক সমাগম হয় এই অতীতের যুদ্ধযাত্রার বিপুল সমারোহ দেখতে। এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা পায় দূর অতীতের বিগত দিনের বীরত্বের ও বাহুবলের স্বাদ। সমস্ত মহীশূর শহর আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করে। রাজপ্রাসাদটি মনে হয় ইন্দ্রপুরী।

এমনিতে শহরটিই বড় সুন্দর। ফোয়ারা আর ফুলের দেশ। শুধু যে বৃন্দাবন গার্ডেনস্-এই ফোয়ারা আর ফুলের বৈচিত্র্য আছে তা নয়। প্রত্যেক চৌরাস্তায় আছে বড় বড় ফোয়ারা আর সব রাস্তার ধারে ধারেই আছে ফুলের কেয়ারি। রাস্তাগুলি পরিচ্ছন্ন। আজ শহর লোকে লোকারণ্য। তবু হৈ-চৈ মারামারি নেই। ঝগড়া ঠেলাঠেলি নেই। সবাই পুলিশের নির্দেশমত চলেছে।

হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণনির্মিত হাওদায় মহীশূরের মহারাজা

রাস্তার দুধারে সামিয়ানা টাঙ্গান, চেয়ার পাতা, এখনই লোকে ভরে উঠেছে। অথচ সেই বেলা তিনটেয় প্রশেসন বেরুবে। কত লোক ফুটপাতের ওপর ঐ রোদ্দুর মাথায় করে বসে রয়েছে। অতি দীন-দরিদ্র যারা তারাও এসেছে রাজদর্শনে—কিন্তু তাদের চীরবাসখানিও কত পরিচ্ছন্ন। এই পরিচ্ছন্নতাবোধই দক্ষিণের বৈশিষ্ট্য। কত আমেরিকান সাহেব-মেম এসেছে তাঁদের মুভি-ক্যামেরা নিয়ে—বর্তমানের এই অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যের কিছু আভাস পাবার আশায়। আমারও এই বিষয়ে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আজই দেখে চক্ষু সার্থক করব।

ঐ আসছে শোভাযাত্রা। প্রথমে আশা-সোঁটাধারী পদাতিক সৈন্য সমস্ত রাস্তা কাঁপিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ওদের পেছনে এলো গুর্খা শান্ত্রীর দল। তারপর চলল ঢাল-তরোয়াল হাতে দক্ষিণী সৈন্য। মাঝে মাঝে এক একদল বাজনদার চলেছে। গোরার বাজনা, দিশী বাজনা সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা। এরপর মেয়ে-পল্টন। তাদের পেছনে এল বিরাট এক রণহস্তীর মিছিল। বড় থেকে ছোট সুন্দর সাজে সাজে সাজান। যেমন সুন্দর এদের দেহের আলপনা, আর তেমনি বৈচিত্র্য এদের অলঙ্কারে। বহুক্ষণ ধরে চলেছে হস্তীযূথ। এই অদ্ভুত রণসজ্জা দেখছি অভিভূত হয়ে। এর পর এলো নানারকম ট্যাবলো। বড় বড় লরিতে সাজান। কিটুরের রানী বিনামা তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়ার উপর বীরাঙ্গনা সাজে বসে আছেন। এই মহীয়সী মহিলা ঝাঁসীর

রানীর মতই নিজের দেশ কিটুরের স্বাধীনতা রক্ষার জন অসিহস্তে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরেরটিতে সিংহকুলতলে জ্যোতির্ময় শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যানে বসেছেন। তারপর দশপ্রহরণধারিণী চামুণ্ডামূর্তি। ট্যাবলো শেষ হতেই দেখলাম আমাদের সেই রূপকথার গল্পে শোনা সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথ। সূর্যালোকে ঝলমল করছে। ভিতরে অসূর্যম্পশ্যা কেউ থাকায় চারিদিক কিংখাবের পর্দায় মোড়া। এবার এক কালো পাহাড়ের মত উঁচু মেঘবর্ণের রাজহস্তীর পৃষ্ঠে ঝলমল করে উঠলো সোনার হাওদা। মহারাজা বসে আছেন। পরিধানে ব্রোকেটের আচকান, চুড়িদার পায়জামা। কণ্ঠে মুক্তার সাতনরী—প্রকোষ্ঠে হীরকবলয়, মস্তকে উষ্ণীষ, তার মধ্যমণি একটি মস্ত হীরে ঝকমক করছে সূর্যের আলো পড়ে। ক্ষণকালের জন্য পারিপার্শ্বিক ভুলে মুগ্ধবিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে হল বহু শতাব্দী পেরিয়ে কোন অতীতের গৌরবময় রাজ্যে উপনীত হয়েছি। শুধু আমিই আত্মবিস্মৃত হইনি, দেখলাম আপামর জনসাধারণ দুহাত দিয়ে রাজার চলে-যাওয়া পথের ধুলো তুলে মাথায় রাখছে, ফেলে-যাওয়া ফুল আঁচলে বাঁধছে। এখনো রাজার প্রতি এত শ্রদ্ধা! আড়ম্বরের প্রতি গ্র্যাঞ্জারের প্রতি এত মোহ! তাহলে জমীদার শ্রেণী শুধু শোষণই করেনি, সুশাসনও করেছে, প্রজাদের দুঃখ-দরদও বুঝেছে। দান-ধ্যানও করেছে।

হায়দ্রাবাদ-এর শালারজংগ মিউজিয়াম দেখার পর গিয়েছিলুম নিজাম বাহাদুরের ফালাকনুমা প্যালেস দেখতে। ঐ ছোট্ট ফালাকনুমা স্টেসনের স্টেসন-মাস্টারের সংগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেটুকু বুঝেছিলাম তাই বলি। ঐ বৃদ্ধ স্টেসন-মাস্টার আলা হজরৎ নিজাম বাহাদুরকে শত কোটি ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'বড় সুখে ছিলাম ঐ সময়ে, কারণ তখন কোয়ার্টার, কয়লা, ইলেকট্রিক ও চিকিৎসা ছিল ফ্রি। ওর রেশনও পেতাম কম দামে। তা'ছাড়া রিটায়ার করার পর সমগ্র ভারত ভ্রমণের জন্য ফ্রি ফ্যামিলি পাশ পাওয়া যেত। আর এখন তো কোনটিই ফ্রি নয়। জিনিসপত্রও আগের তুলনায় অগ্নিমূল্যে, কিন্তু মাইনে বাড়েনি। সেই একই অঙ্কে আটকে আছে বেতন।

দিনের দেখা মাইশোর রাত্রে যেন আর চেনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোন অলকাপুরীর দেব-ভবনে বিবাহ-বাসর বসেছে। প্রাসাদের তোরণে বসেছে রোশনচৌকি। নহবতে তান ধরেছে পুরবীতে। আলোয় আলোয় সমস্ত শহর ঝলমল করছে। প্রতিটি ফোয়ারা, গাছ সবেতেই আলোর ঝিকিমিকি। প্রাসাদ-টি তো, কি আর বলব—আগেই বলেছি যেন ইন্দ্রপুরী। এবার প্রশেসন ফিরবে।

উৎসুক হয়ে উঠেছে জনতা। ঐ এসে পড়ল প্রশেসন। এর নাম টর্চলাইট প্রশেসন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত মশাল থাকায় দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একরাশ জোনাকি জ্বলছে। এবার কাছে এসে পড়লো সেই আলোকোজ্জ্বল বিরাট শোভাযাত্রা। এই মশালবহন জয়ের পরিচায়ক। প্রাসাদে মঙ্গল-শঙ্খ বাজছে, বিজয়ী সেনানীকে অভিনন্দন করছেন পুরনারীরা। আরও তিন-চারটে ব্যান্ডপার্টি মিলে থাকবে পরে। বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলেছে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা। যেমন সুন্দর তেজী ঘোড়া, তেমনি জমকালো জরীর পোষাকে সজ্জিত তাদের নওজওয়ান সওয়াররা। খাপ-খোলা তলোয়ার হাতে বীরবিক্রমে চলেছে শোভাযাত্রার পুরোভাগে। ঘোড়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ ও সওয়ারের হাতের তরোয়ালে মশালের আলো যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। যাবার সময় এরা ছিল সবচেয়ে পেছনে। মহারাজ এখন ক্লান্ত—তাই রোলস রয়েসে ফিরলেন। মুভি ক্যামেরা হাতে সাহেব-মেমদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। শোভাযাত্রার সংগে সংগে ছবি তুলতে তুলতে তারাও প্রাসাদের ভেতর চলে গেল।

এই প্রশেসন গভর্ণমেন্ট থেকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কারণ মহারাজা তো আর এখন সত্যি মহারাজা নন। মহারাজা সেজেছেন। তিনি তো এখন এই মহীশূরের গভর্নর, সুতরাং তাঁর কি এক্তিয়ার আছে এই শোভাযাত্রা করার? কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিপুল আন্দোলন আর দাবী এই শোভাযাত্রা বার করিয়ে ছেড়েছে, তারা অন্ততঃ একদিনের জন্যও তাদের রাজাকে সত্যিকারের রাজ-বেশে দেখতে চায়।

উৎসবান্তে এবার ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলাম 'দশপ্রকাশ' হোটেলে। বিরাট পাঁচতলা হোটেল-বাড়ী। যেন রাজভবন। তবে রাজকীয় খরচ লাগে না এই রক্ষে। দক্ষিণের খাবার স্বাদে ও দামে ভালই। উৎসব-শেষে এবার যাবার তাড়া পড়েছে সকলের। অতবড় হোটেলে সকাল থেকে তিল ধারণের স্থান ছিল না। অথচ এই রাতেই তার অর্ধেক খালি হয়ে গেল। আশ-পাশের গ্রাম বা শহর থেকে যারা এসেছিল চলে গেল তারা। আমরাও কাল রওনা হব। আবার ফিরে যাব সেই বৈচিত্র্যহীন অভ্যস্ত জীবনযাত্রায়। শুধু মনের মণিকোঠায় চিরজাগরূক হয়ে থাকবে এই দক্ষিণ ভ্রমণের অপরূপ স্মৃতি। আর কখন কখন স্বপ্নঘোরে দেখব এই বিরাট শোভাযাত্রার অপূর্ব শোভা।

বিজ্ঞানের গল্প

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক ॥

রবীন্দ্রনাথের 'সে' এক গেছো বাবার গল্প বলেছিল। "বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তাঁর হাঁড়ি গেল টলে—চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর। বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্‌। ভেকুটা বোকা, বললে, বাবা, একখানা টানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই।" শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! কিন্তু এই গামছার দৌলতেই ভেকুর কপাল ফিরে গিয়েছিল।

এমনি আর এক গেছোবাবার গল্প বলেছেন বিখ্যাত লেখক ভ্যান লুন। এই গেছোবাবা সারা পৃথিবীর মানুষকে জীবজগতের শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভেকু একহাঁড়ি চিটেগুড় নিয়ে যাচ্ছিল। আর ভ্যান লুনের গল্পের 'আমি' ও তার বন্ধু কল্পনার ডানা মেলে এমন এক জগতে হাজির হয়েছিলেন যেখানে সময়কে খুশিমতো পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। এই দুই বন্ধু এমনিভাবে অতীতের বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের ডিনারে আমন্ত্রণ করতেন। প্রতি শনিবার সন্ধে সাতটার সময় এই ভোজের আসর বসত।

একবার দুই বন্ধুর কী খেয়াল হল, ভোজের আমন্ত্রণ পাঠালেন সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের উদ্দেশে। বিশেষ কারও নাম করা হল না, অনির্দিষ্ট একটি আমন্ত্রণ। কাজেই দুই বন্ধুর আগে থেকে কোনো ধারণাই ছিল না—ভোজের টেবিলে সেদিন কার শুভাগমন হবে।

দুজনে অনেক জল্পনাকল্পনা করলেন। এডিসন আসবেন কি? কিংবা শেবোয়ার্ৎস? মধ্যযুগে যাঁরা বারুদ আবিষ্কার করে মানুষকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? মার্কনিই বা নয় কেন? এই বেতার যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি তো তাঁরই। রাইট ভাইদুটিও তো আসতে পারেন। এই রকেট-যুগের মানুষকে তাঁরাই তো প্রথম উড়বার কায়দা শিখিয়েছিলেন। এমনি ভাবে অজস্র নাম তাঁরা ভাবতে লাগলেন। যে-নামই ভাবছেন মনে হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের সম্মান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আবার অন্য নাম মনে পড়তেই সেই নামটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে অন্য সমস্ত নাম বাতিল করে দিয়ে ধরে থাকলেন শুধু একটি নাম। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। যিনি বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণটি হাজির হল। শনিবারের সন্ধ্যে সাতটা।
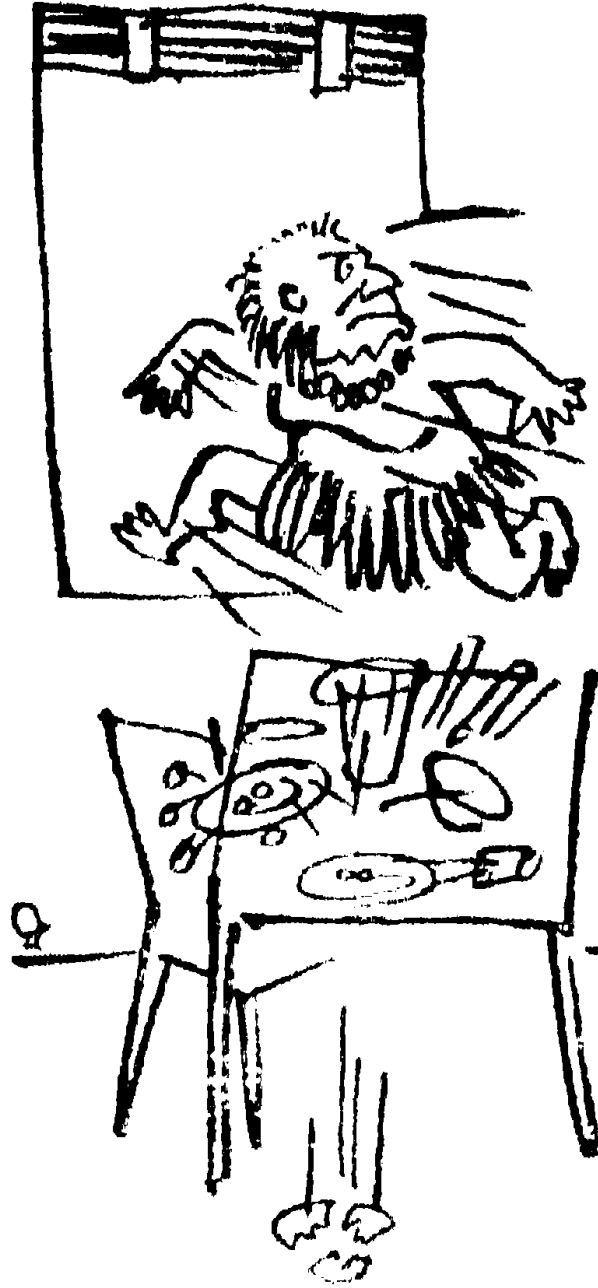
দুই বন্ধু আমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সদরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সাতটা বাজল। দুই বন্ধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন বাড়ির ভেতরে প্রচণ্ড একটা সোরগোল ও লুটোপাটি। শব্দটা যেন খাবার-ঘর থেকেই। দুই বন্ধু ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন খাবার-ঘরে।

তারপরে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে দুজনেরই চক্ষুস্থির। সবকটি চেয়ার ওলোট-পালোট, টেবিলের ওপরে মদের বোতল সাজানো ছিল, সেগুলোরও একই অবস্থা। পেয়ালা ও পিরীচ ভাঙা-চোরা। মদের বোতল থেকে মদ গড়িয়ে পড়ে মেঝে থৈ-থৈ। জ্বলন্ত মোমবাতি উলটিয়ে পড়েছে ফুলদানির ওপরে আর ফুলগুলো পুড়ে পুড়ে অঙ্গার। দুই বন্ধু একনজরেই বুঝতে পারলেন যে খাবার-ঘরে একটা তাণ্ডব ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

কিন্তু কোনো মনুষ্যমূর্তি দুই বন্ধুর চোখে পড়ল না।

শেষকালে একজনের চোখে পড়ল। তিনি অপর জনকে ইসারা করে দেখিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ! ওটা কী?'

"ওটা"-ই বটে! রবীন্দ্রনাথ যে গেছোবাবার কথা লিখে গিয়েছেন তিনিও বোধহয় এই রকমটিই দেখতে ছিলেন। দুই বন্ধুর মনে হল, ঘরের ভেতরে যে জীবটির আবির্ভাব হয়েছে সে মানুষও নয়, বানরও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং জাতীয় বনমানুষ বললেই যেন ঠিক বোঝানো যায়। কিন্তু তাও নয়। বনমানুষ বটে কিন্তু চেহারায় ও চালচলনে মানুষের লক্ষণটাই যেন বেশি প্রকট।

লম্বায় ফুট পাঁচেক হবে। সর্বাঙ্গ ঘন লোমে ঢাকা, এমন কি মুখমণ্ডলও। হাতদুটো থাবার মতো। কপালটা ছোট আর ঢালু। সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মাথাটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে আর হাঁটুদুটো বেঁকে যায়।

দুই বন্ধুর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন। মানুষ অথচ পুরোপুরি মানুষ নয় এই জীবটিকে দেখে তাঁরা স্বভাবতঃই সন্ত্রস্ত হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহলীও কম হননি। জীবটি না ওরাং-ওটাং, না মানুষ। অথচ দুই-ই।

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে দুই বন্ধুর একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন। জবাবে উৎকট রকমের ঘড়-ড়-ড় ঘড়-ড়-ড় একটা আওয়াজ পাওয়া গেল মাত্র। এই আওয়াজের কোনো অর্থ দুই বন্ধুর বোধগম্য হল না।

দুই বন্ধুর চোখের সামনেই জীবটি টেবিলের ওপর থেকে মস্ত একটা মুরগির ঠ্যাঙ তুলে নিয়ে পরমানন্দে চিবোতে লাগল। চিবোবার ধরন দেখে বোঝা গেল, খাদ্যবস্তুটির স্বাদ সে খুবই তারিফ করছে। দুই বন্ধু তাকিয়ে দেখলেন, টেবিলের ওপরে যতো খাবার সাজানো হয়েছিল সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

ঘরের এককোণে একটা লাঠি ছিল। দুই বন্ধুর একজন সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে জীবটিকে তাড়া দিতে চেষ্টা করলেন। চকিতে দৈত্যের মতো হিংস্র চেহারার সেই জীবটি প্রচণ্ড রকমের একটা হুংকার ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। আর তখন দেখা গেল, তার হাতে রয়েছে ঘষা পাথরের চকচকে একটা টুকরো। এই পাথরের টুকরোটা নিশ্চয়ই সে সঙ্গে করে এনেছিল এবং পাশে নিয়ে বসেছিল। তারপরে সে থাবার মতো হাত বাড়িয়ে আর ছুরির ফলার মতো ধারালো পাথরের টুকরো-টাকে উঁচিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

কিন্তু বন্ধুটির ভাগ্য বলতে হবে, হঠাৎ এই মারমুখী দৈত্যের নজর গিয়ে পড়ল একখণ্ড চকোলেটের ওপরে। আর সম্ভবত মদের নেশাটাও পুরো মাত্রাতেই ধরেছিল। কাজেই খুব সহজেই সে ভুলতে পারল কেন সে অস্ত্র উঁচিয়েছিল। তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হল চকো-লেটের খণ্ডটির ওপরে। এবং চকোলেটের খণ্ডটি উদরসাত করার পরে তার কাছে ঘুমের প্রয়োজনটাই বড়ো হয়ে উঠল। বন্ধুটি বেঁচে গেলেন।

দুই বন্ধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে ঘরে ঢুক-লেন এক পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনিই ছিলেন দুই বন্ধুর ভোজের আসরে প্রথম আমন্ত্রিত অতিথি এবং পরবর্তী কালের ভোজেও তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'বাপু হে, এতে তোমাদের শিক্ষা হবে কি? এর পরের বার যখন কাউকে নেমন্তন্ন করবে, তখন তার নাম-ধাম স্পষ্টভাবে জানাতে ভুলো না।'

দুইবন্ধু বললেন, 'কিন্তু আমরা তো নিমন্ত্রণ করেছিলাম সর্বকালের সর্ব-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারককে!'

পণ্ডিত বললেন, 'তিনিই তো এসে-ছেন।'

'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি।'

দুই বন্ধু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা ইনি কী আবিষ্কার করে-ছিলেন শুনি?'

পণ্ডিত বললেন, 'খুবই সামান্য একটি জিনিস। কিন্তু এই সামান্য জিনিসটিই মানুষকে মানুষ করে তুলেছে আর জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।

দুই বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনিসটা কী?'

পণ্ডিত বললেন, "একটুকরো ঘষা পাথর যা তোমরা ওঁর হাতে দেখেছ। পাথর ঘষে ঘষে কি-ভাবে অস্ত্র ও হাতিয়ার বানাতে হয় তা ওঁরই আবিষ্কার।'

অনেকক্ষণ পরে সর্বকালের সর্ব-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকটির ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া ভেঙে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঘন ভুরুতে ঢাকা কুতকুতে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন দুই বন্ধুকে এবং হুপ্ করে একটি ডাক ছেড়ে খোলা জানলা দিয়ে গাছের ডালে ঝুলে পড়লেন।

বিদেশী গল্প

যে লিফট নরকে গেল পর

নাগারকভিষ্ট

বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ স্মিথ সৌখিন হোটেলের লিফ্টের দরজা খুলে স-প্রেম অভ্যস্থতার সঙ্গে ফারকোট ও পাউডারের গন্ধ-বহ শ্রীময়ী এক নারীকে নিয়ে হাজির। লিফ্টের নরম আসনে জড়াজড়ি করে বসল তারা এবং লিফ্ট নিচের দিকে যেতে আরম্ভ করল। মেয়েটি মদে-ভিজা আধ-খোলা গাল বাড়িয়ে দিল এবং তারা চুমু খেল। নক্ষত্রের নিচে বারান্দায় বসে এখুনি তাদের ভোজন সমাপ্ত হয়েছে। এখন একটু আমোদ করার জন্য বাইরে যাচ্ছে।

মেয়েটি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "হোটেলে কি সুন্দর কেটেছে, লক্ষ্মীটি। তোমার কাছে বসলে যেন কবিতার যাদু নেমে আসে। মনে হয় আমি যেন নক্ষত্রের দলে মিশে আছি। সেই সময় আমি ভাবি তুমি সত্যিই জানো প্রেম কাকে বলে। তুমি আমায় ভালবাস। বাস না?"

একটা দীর্ঘস্থায়ী চুমু দিয়ে উত্তর দিল মিঃ স্মিথ; লিফট নিম্নগামী হল।

মিঃ স্মিথ বললে, "তুমি এসেছ এ আমার সৌভাগ্য। তা না হলে আজ আমার অবস্থা কত ভয়াবহ হত।"

"সত্যিই। কিন্তু তুমি কল্পনা করতে পার ওর সঙ্গে বাস করা আরও কত ভয়াবহ। যে মুহূর্তে আমি আসবার জন্য তৈরী হচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই ও জিজ্ঞাসা করে বসল আমি যাচ্ছি কোথায়। আমি উত্তর দিলাম, 'যেখানে খুসি সেখানে যাবো। আমি তোমার কেনা বাঁদী নই।' তারপর সে জোর করে বসে আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকল। আমি জামা ছাড়ছি, তবু সে তাকিয়ে। নোতুন পাথর পরছি, সে তাকিয়ে রয়েছে। পাথরটা মানিয়েছে? বল ত' কোন্ রঙের পাথরে সব চেয়ে বেশী মানায়? তোমার কি মত? পাটল রঙের, না?"

"যে কোন সাজে তোমাকে মানায়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তোমাকে এমন রূপসী দেখাচ্ছে; তোমার এত রূপ আমি কখন দেখিনি।"

পরিতৃপ্তির হাসিমুখে মেয়েটি তার ফার কোট খুললে। তারা অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল আর লিফট নিম্নগামী হল।

"তারপর আমি যেই বাড়ির বাইরে আসতে যাব ঠিক সেই সময় সে আমার হাতটা নিয়ে কোন কথা না বলেই চাপ দিতে লাগল। এত জোরে চাপ

দিয়েছে যে হাতে আমার এখনও ব্যথা লাগছে। সে যে কত বড় পশু, তোমার কোন ধারণা নেই। আমি বললাম, 'তা হলে চলি।' সে কোন কথা বললে না। সে যে কত ভীষণ অবুঝ। আমি ওকে সহ্য করতে পারি না।"

মিঃ স্মিথ বললে, "সত্যি কত কষ্ট তোমার।"

"আমি যেন এক নিমেষের জন্য বাইরে যেতে পারবো না, একটুও আনন্দ করতে পারবো না। তার ওপর ও এত গুরু-গম্ভীর। তোমার কোন ধারণা নেই। ও কোন কিছুই সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে, মেনে নিতে পারে না। সব সময় সব সমস্যাই এত গুরুতর, যেন তার ওপর ওর জীবন নির্ভর করছে।"

"সত্যি, তুমি কত কষ্ট পেয়েছ।"

"সত্যি, আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। ভীষণ। এত কষ্ট কেউ কখনও পায়নি। কিন্তু তুমি আমার জীবনে আসবার আগে আমি বুঝতামওনা প্রেম কাকে বলে।"

স্মিথ তাকে বুকের কাছে টেনে বললে, "লক্ষ্মী আমার", আর লিফট নিম্নগামী হল।

আলিঙ্গনের পর হাঁফ ছেড়ে মেয়েটি বললে, "তোমার সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা, তোমার সঙ্গে স্বপ্ন দ্যাখা, সে যে কি রোমাঞ্চকর। এ আমি কখন ভুলবো না। সত্যি কথা কি জানো? আর্চিজকে নিয়ে বাস করা অসম্ভব। ও সব সময় এত গুরুগম্ভীর। ওর ভিতর কবিতার নাম-গন্ধ নেই। কবিতার জন্য ওর বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নেই।"

"সত্যিই এ অসহ্য।"

"অসহ্য না? সত্যিই অসহ্য। কিন্তু," মেয়েটি হেসে স্মিথের হাত ধরে বলে উঠল, "আর ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে না। আমরা আনন্দ করতে বার হয়েছি। তুমি সত্যিই আমাকে ভাল-বাস?"

"বাসি না!" এই বলে স্মিথ এত জোরে মেয়েটিকে কাছে টানল যে সে ফুঁপিয়ে উঠল; লিফট নিম্নগামী হল। মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়ে স্মিথ আদর করতে থাকল; মেয়েটি লজ্জা পেল।

স্মিথ ওর কানে কানে বললে, "আজ রাত্রে আমরা ভালবাসব—এমন ভালবাসা যা আমরা কখন বাসিনি।"

মেয়েটি স্মিথকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ বোজাল। লিফট নিম্নগামী হল।

লিফট নামছে ত নামছেই।

শেষ কালে স্মিথ লাফিয়ে উঠল। তার মুখ জ্বলছে।

"লিফটের কি হল? থামছে না কেন? আমরা যেন কত যুগ ধরে এই লিফটের মধ্যে বসে গল্প করছি, তাই না?"

"তাই হবে বোধ হয়। আমারও তাই মনে হয়। সময় এত তাড়াতাড়ি যায়।"

"কিন্তু কি ব্যাপার? আমরা কত যুগ ধরে বসে আছি। কি হল?"

লোহার ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল স্মিথ। গাঢ় গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। সমান দ্রুত-বেগে লিফ্‌ট নীচের দিকে নামছে, নামছে; ক্রমাগত নীচের দিকে নামছে।

"কি অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু কেন? মনে হয় আমরা যেন এক অতল গহ্বরের দিকে যাচ্ছি।"

সে একবার পাতালের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করল। সেখানেও গাঢ়তম অন্ধকার। তারা ক্রমাগত সেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

স্মিথ বললে, "আমরা যেন নরকে যাচ্ছি।"

মেয়েটি আর্তনাদ করে বললে, "আমার ভীষণ ভয় লাগছে। তুমি তাড়া-তাড়ি ব্রেক চেপে ধর।"

স্মিথ প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক চাপল। কিন্তু তাও নিষ্ফল। লিফ্‌ট ক্রমাগত নীচের দিকে যাচ্ছে।

মেয়েটি কেঁদে পড়ল, "কি ভয়ঙ্কর! আমরা কি করব?"

"সত্যিই আমাদের কিইবা করার আছে? এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।"

হতাশ মেয়েটি অঝোরে কাঁদতে লাগল।

কেঁদো না, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি আমার। অবুঝ হয়ো না। আমাদের আর কিছু করার নেই। এস, আমরা বসি। আমরা দুজনে এখানে চুপ করে বসে বসে থাকব। খুব কাছাকাছি বসব। দেখব কপালে কি ঘটে। লিফ্‌টটা থামবে, কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবেই।"

তারা বসে প্রতীক্ষা করতে থাকল।

মেয়েটি বললে, "ভেবে দ্যাখো কি কপাল আমাদের। আমরা যাচ্ছিলাম একটু আনন্দ করতে। আর কি হল।"

"এ যেন শয়তানের কারসাজি," স্মিথ বলে উঠল।

"তুমি এখনও আমাকে ভালবাস; বাস না?"

"মণি আমার," স্মিথ হাত দিয়ে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরল এবং লিফ্‌ট নিম্নগামী হল!

শেষ কালে লিফ্‌ট আচমকা এক জায়গায় থেমে গেল। চারপাশে অতি প্রখর আলো; চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওরা নরকে নেমেছে। এক ছায়ামূর্তি এক পাশে সরে গিয়ে বিনীতভাবে লোহার ঝাঁঝরিটি ফাঁক করে দিল।

চোখ-ঝলসানো আলোয় হোঁচট খেতে খেতে স্মিথ ও মেয়েটি নামল। চার পাশে ভূতুড়ে অপচ্ছায়া দেখে ওরা দুজনেই চিৎকার করে উঠল, "আমরা কোথায় এলাম?" একটু লজ্জিত হয়ে ছায়ামূর্তি জায়গাটার বিবরণ দিল।

শেষে বললে, "যতটা খারাপ শুনতে আসলে জায়গাটা কিন্তু অত খারাপ নয়। আপনারা এখানে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন। কোন অসুবিধা আপনাদের হবে না। আমি শুনেছি এক রাত্রির জন্য আপনাদের এখানে বাস।"

খুব তাড়াতাড়ি স্মিথ বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, মাত্র এক রাত্রির জন্য। তার বেশী আমরা আর এখানে থাকতেও চাই না।"

মেয়েটি স্মিথের হাতের ওপর ভর দিয়ে কাঁপছে। আলো বড় চোখে লাগে। কেমন যেন হলদেটে-সবুজ। কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। ওদের মনে হল চার পাশে ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। আলোয় চোখ একটু সয়ে গেছে। চেয়ে দেখল ওরা একটা পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে। চার-পাশে ঘর-বাড়ি। দরজাগুলো জ্বলন্ত। বাড়ির মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার। পর্দা ফেলা; তবু পাশ দিয়ে দেখা যায় যে বাড়ির ভিতরে কি যেন পুড়ছে।

ছায়ামূর্তি জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা দুজন কি দুজনকে ভালবাসেন?"

মেয়েটি তার সুন্দর চোখ সুন্দরতর-ভাবে ছায়ার চোখের ওপর রেখে উত্তর দিল, "খুব।"

"তা হলে এ পথে আসুন," এই বলে পিছনে আসার জন্য ইংগিত করল। পার্কের বাইরে এক অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে তারা পড়ল। চর্বি মাখান দরজার ওপর পুরানো ভাঙা লণ্ঠন দুলছে।

"এখানে আসুন।" সে দরজা খুলে দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ওরা ভিতরে গেল। ওদের এবার অভ্যর্থনা জানাল এক নারী মূর্তি। মূর্তিটা বেশ মোটা-সোটা, কপালে থাক থাক রেখার ভাঁজ পড়েছে, বিপুল স্তন, গোঁফের গোড়ায় পাউডারের ছোপ। এই অদ্ভুত নারীমূর্তি যখন হাসে তখন সাঁ-সাঁ করে শব্দ হয়। একে দেখে খুব সদা-শয় মনে হয়। পুতির মত খুদে খুদে চোখে সর্বজ্ঞ ভাব লেগে আছে। কপালের দুই শিঙের ফাঁকে সবুজ সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা দু গাছা বিনুনী দুলছে।

নারী মূর্তি বললে, "মিঃ স্মিথ ও তার বান্ধবী? আট নম্বর ঘরে যান।" ওদের দিকে বিরাট চাবি বাড়িয়ে দিল সে।

অস্পষ্ট আঁধারে চর্বিমাখান সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকল ওরা দুজন। সিঁড়িটা চর্বিতে তেল-তেলে; মাঝে মাঝে পা পিছলে যায়। তিনতলায় ওপর মিঃ স্মিথ তার আট নম্বর ঘর খুঁজে পেল। ঘরটি

বেশ বড়, কিন্তু বড়ই সাবেকী। পুরোনো-গন্ধ ভর-ভর করছে। মাঝখানে টেবল ক্লথে ঢাকা বড় টেব্‌ল। কিন্তু টেবল-ক্লথের ওপর পোকা-মাকড় কিলবিল করছে। দেওয়ালের কাছে চাদর-মোড়া বিছানা। ঘরটা ওদের বেশ মনে ধরে গেল। ওরা কোট খুলে আবার চুমু দিল। অনেকক্ষণ ধরে।

কোন সাড়া না দিয়ে অন্য ঘর থেকে আর একটা লোক এল। সাজ-গোছ দেখে তাকে ওয়েটার বলে মনে হয়। তার জ্যাকেটের কাটিং খুব অভিজাত। বুকের কাছে ঝোলানো তোয়ালে ধপ্‌ধপে সাদা। সব মিলিয়ে তাকেও দেখতে ভূতের মতন। হাঁটলে তার পায়ের কোন শব্দ হয়না। তার অঙ্গভঙ্গি যান্ত্রিক; মনে হয় ঘোরের ভেতর চলাফেরা করে। তার শরীরে কঠোরতা, দৃষ্টি সব সময় সামনের দিকে দৃঢ়-নিবদ্ধ। তাকে ভীষণ পাণ্ডুর দেখায়; এক দিকের রগে বুলেটের দাগ। টেবল মুছে ঘরটা গোছ-গাছ করে রাখল সে।

ওয়েটারের দিকে খুব একটা নজর দেয়নি ওরা। ওয়েটারকে চলে যেতে দেখে স্মিথ বললে, "আমাদের জন্য মদ দাও। এক বোতল ম্যাডেইরা।" ওয়েটার মাথা নীচু করে অভিবাদন করে চলে গেল।

স্মিথ জামা-কাপড় খুলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি দ্বিধায় পড়ল।

মেয়েটি বললে, "ওয়েটার এখুনি ফিরবে।"

"দূর, এই সব জায়গায় ও রকম সংকোচের কোন মানে হয়? ও দিকে চাইতে হবে না। নাও, তুমিও পোষাকের বোঝা নামাও।" মেয়েটি ছলাকলার বাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে জামা-কাপড় খুলে স্মিথের হাঁটুর ওপর বসল। ওদের সুন্দর মানায়।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বললে, "এই বিচিত্র জায়গায় ভেবে দ্যাখো আমরা দুজন। কি রোম্যাণ্টিক; কবিতার মত। আমি কখন ভুলব না।"

নিঃসাড়ে ওয়েটার আবার ঘরের ভিতর এল। অতি ধীর ও যান্ত্রিক নিপুণতায় টেবলের ওপর গ্লাসগুলো নামিয়ে মদ ঢালতে আরম্ভ করল। টেবল-ল্যাম্পের আলো ওর মুখে পড়েছে। বৈশিষ্ট্যহীন মুখ; কিন্তু ভীষণ পাণ্ডুর। রগের এক দিকে বুলেটের দাগ।

মেয়েটি অকস্মাৎ লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল।

"সর্বনাশ, আর্‌ভিড তুমি! তুমি? আর্‌ভিড? সর্বনাশ, ও মারা গেছে। গুলি করেছে নিজেকে! আত্মহত্যা করেছে।"

ওয়েটার স্থির ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখে যন্ত্রণার লেশ-মাত্র নেই। মুখটি কেবল কঠোর এবং ভীষণ গম্ভীর।

"কি করেছ আর্‌ভিড! এ কি সর্বনাশ করলে! এ কাজ তুমি কি করে করতে পারলে! যদি জানতাম, আগে যদি বুঝতাম আমি কিছুতেই বাড়ির বাইরে পা বাড়াতাম না। তুমিও আমায় কিছুই বলনি। এ বিষয়ে একটা কথাও আমার সঙ্গে হয়নি। আমায় যদি কিছু না বল আমি কি করে বুঝব? সর্বনাশ, ভগবান........"

মেয়েটির সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ওয়েটার অপরিচিতের মত মেয়েটির দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি শীতল ও নিষ্প্রভ। তবু তার নজর সমস্ত ভেদ করে সামনের দিকে পড়েছে। ঈষৎ পীতবর্ণ মুখ যেন একবার জ্বলে উঠল, ক্ষতস্থান থেকে একবিন্দুও রক্ত ঝরল না; কেবল রগের কাছে একটা গর্ত দেখা গেল।

মেয়েটি ডুকরে উঠে বললে, "সাংঘাতিক, কি ভয়ানক! আমি কিছুতেই এখানে থাকবো না। চল, এখুনি নিয়ে চল এখান থেকে। আমি সহ্য করতে পারছি না।"

জামা-কাপড়-টুপি ও ফারকোট কোন-ক্রমে মুঠো করে ধরে দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। তার পিছনে পিছনে ছুটলো স্মিথ। দৌড়ে যেতে যেতে সিঁড়ির ওপর পা পিছলে পড়ে গেল ওরা। মেয়েটি বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। পিছনে থুথু আর সিগারেটের ছাই লেগে গেল। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে গোঁফ-ওয়ালা নারী মূর্তি। সে যেন সব জানে, সব বোঝে। তাই মৃদু হেসে শিং দোলাতে থাকল মূর্তিটি।

রাস্তায় পড়ে ওরা প্রকৃতিস্থ হল একটু। মেয়েটি জামা-কাপড় পরে, মুখে পাউডার বুলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। ত্রাণ-কর্তার ভঙ্গিতে স্মিথ মেয়েটির কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। চোখ থেকে পড়-পড় অশ্রু ঠোঁট দিয়ে মুছে দিল। স্মিথ বড় সদাশয়। ওরা পার্ক অবধি হেঁটে গেল।

ছায়ামূর্তিদের বড় কর্তা পায়চারি করছিল। ওদের দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে বললে, "আপনারা বড় তাড়াতাড়ি ফিরলেন দেখছি। ওখানে কোন অসুবিধে হয়নি তো আপনাদের!"

মেয়েটি বললে, "কি ভয়ংকর! সাংঘাতিক!"

"না, না, এসব অভিযোগ এখন আর করতে পারেন না। একথা মনেও ঠাঁই দেবেন না। আগে যদি আসতেন তবু এ-কথার কোন মানে থাকত। আজকাল অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। এ-নরক আর আগেকার নরক নয়। আজকাল এখানে অভিযোগ করার মত কিছু নেই। আমরা অবশ্য এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে ঢাক পেটাই না। আমরা চাই জায়গাটা নরকের ভাল লাগুক।"

উত্তর দিল স্মিথ, "ঠিক, ঠিক কথাই। ব্যবস্থা ভালই, খুব উদার বলতেই হবে।"

ছায়ামূর্তি বললে, "যাবতীয় আধুনিক ব্যবস্থা আমরা এখানে চালু করেছি। সব কিছুই নোতুন করে সাজিয়েছি।

"নিশ্চয়ই, যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে হবে বৈকি।"

"ঠিক কথা, দেখবেন আজকাল মানুষের একমাত্র আত্মাই কষ্ট পায়।"

মেয়েটি বললে, "ঈশ্বরের করুণা, তাই।"

ছায়ামূর্তি ওদের লিফটের কাছে নিয়ে গেল। খুবই বিনীতভাবে মাথা নিচু করে বললে, "নমস্কার। আবার আসবেন।" লোহার ঝাঁঝরি বন্ধ করে দিল ছায়ামূর্তি এবং লিফট ঊর্ধ্বমুখী হল।

সিটে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে বললে, "যাক বাঁচা গেল।"

মেয়েটি ফিস ফিস করে বললে, "তুমি আমার সঙ্গে ছিলে তাই কোনক্রমে এ-যাত্রা পার পেলাম।" স্মিথ মেয়েটিকে কাছে টেনে অনেকক্ষণ ধরে চুমু দিল। আলিঙ্গনের পর নিঃশ্বাস নিয়ে মেয়েটি বললে, "দেখলে আর্‌ভিডের কাণ্ডটা দেখলে! চিরকালই ও বড় অদ্ভুত। ও জীবনে কখন কোন কিছু সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। অথচ, তাই ত নেওয়া দরকার। যে কোন ব্যাপারই হোক না; সবটাই যেন ওর জীবন মরণ সমস্যা।"

স্মিথ বললে, "অদ্ভুত।"

"আমাকে বললেই পারতো। আমি না হয় বাড়িতেই থাকতাম। তুমি আর আমি না হয় আর একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যেতাম। কি ক্ষতি হত বল!"

"সত্যিই ত। আর একদিন সন্ধ্যা-বেলা আমরা যেতাম।"

মেয়েটি স্মিথের গলা ধরে বলল, "ও প্রসঙ্গ ত চুকে গেল। এখানে বসে এখনও কি আমরা ওই সব ছাই-পাঁশ ভাববো?"

"না, ও প্রসঙ্গ চুকে গেছে। এখন আর ওই কথা নয়।" স্মিথ মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল আর লিফট ঊর্ধ্বগামী হল। অনুবাদ : রাম বসু

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি হিসাবে সুইডিশ সাহিত্যে বড় আসন অধিকার করে আছেন লাগারকভিস্ট। ১৮৯১ সালে এঁর জন্ম হয়। প্রথমে ইনি কবিতা লিখতেন। ১৯১২ সালে এঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ফরাসী দেশে যান এবং কিউবিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। সুইডিশ কবিতায় এঁর দান ইংরাজী কবিতায় এলিয়টের অনুরূপ। ১৯৫১ সালে এঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুবাদক :

ধম্মপদ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাৎকালিক পৃথিবী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

"পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কামের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে, আজ ভারতবর্ষ যদি, জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে, জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধ-মুক্তির আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে, এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবিচলিত দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিত, তবে অন্য সকলে তাহাকে যতই ধিক্কার দিক, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।"

আশ্চর্য মনে হয়, এই উক্তি পারমাণবিক বোমার আঘাতে মহতী বিনষ্টির আশংকায় কম্পিত আজকের পৃথিবী সম্পর্কেই বিশেষ প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। সেদিন উপলক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ধম্মপদের চারুচন্দ্র বসুকৃত বঙ্গানুবাদের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল, ভারত ও ইয়োরোপের ভিন্নতর জীবন-সাধনা।

ধম্মপদের আলোচনা বাংলা দেশে একদিন বিস্তারিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতিকালে ঐ বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয় না। হিন্দু ধর্মে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যে স্থান বৌদ্ধ ধর্মে ধম্মপদের সেই স্থান। ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসহস্রাধিক জয়ন্তী উৎসব সারা ভারতে মহাসমারোহে উদযাপিত হলো ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ধম্মপদের আলোচনায় আমরা হৃদয় সমর্পণ করিনি।

যে ঐক্যসূত্রে ভারতের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত, সে ঐক্যসূত্রের বৃহত্তর উপকরণ বৌদ্ধশাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ধম্মপদং' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।......এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে. একথা মনে করিয়াও কি দেশের জন-কয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?"

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সামনে একমাত্র চারুচন্দ্র বসু অনূদিত 'ধম্মপদং' ছিল। এবিষয়ে আলোচনাকারী বাঙালীদের নাম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীমৎধর্মাধার মহাস্থবির।

আধুনিক ভারতীয়দের পূর্বেই ইয়োরোপীয় মনীষীরা ধম্মপদ উদ্ধার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এ. জে. এডমাণ্ডস্, ডঃ ফসবেল্লে, বানুফ, গগার্লি, উফম, ওয়েবর, ম্যাকসমুলের লাতিন, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান ভাষায় ধম্মপদের অনুবাদ করেন। গত শতাব্দের ষষ্ঠ থেকে নবম দশকের মধ্যেই এই কাজ হয়েছে।

ভারতীয় ভাষায় ধম্মপদের প্রথম অনুবাদ বাংলায়। অনুবাদক চারুচন্দ্র বসু (১৯০৪) : একথা পূর্বেই বলেছি। সে-সময়েই কপিলাশ্রম থেকে স্বামী হরিহরানন্দ সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ হিন্দীতে ধম্মপদ অনুবাদ করেন (১৯২১)। শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির বাংলায় গদ্যানুবাদ করেন (১৯৫৪)।

ইয়োরোপ ও এশিয়ার সকল প্রধান ভাষায় ধম্মপদের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা বাংলাদেশে ধম্মপদের চর্চা নিতান্ত ক্ষীণ।

একদা এশিয়ার চিত্তবিজয়ে ধম্মপদ শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে গীতার জনপ্রিয়তার কাছে ধম্মপদ ক্ষীণপ্রভ। বোধকরি আচার্য শংকরের হিন্দুধর্ম পুনরুত্থান অভিযানের ফলে যখন বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি ভূমিতে মর্যাদা-ভ্রষ্ট হয়েছিল, তখনই ধর্মপদ ভারতের মন থেকে অপসৃত হয়েছিল। ধম্মপদ ও ভগবান বুদ্ধের অমৃত-জীবন-কাহিনী আধুনিক পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদাবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সে-কারণে ধম্মপদের পুনঃ প্রচলন ও চর্চা আমাদের দেশে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত—এই তিন ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ এদেশে সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি ভাষাতেই ধম্মপদ সুরক্ষিত ছিল।

বোধিলাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জগদ্ধিতায় মুমুক্ষুদের মধ্যে যে অমৃতবাণী বিতরণ করেন, তারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে প্রথম সংকলিত হয়।

ধম্মপদ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের অঙ্গবিশেষ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় (অংশ)। তার পঞ্চমটির নাম খুদ্দক নিকায় (ক্ষুদ্র অংশ)। এই নিকায় ষোলটি পুস্তকের সমষ্টি; তার দ্বিতীয় পুস্তকটিই 'ধম্মপদ'। ধম্মপদ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিশ্বমানবের চিত্তে দু-হাজার বছর ধরে শান্তি সঞ্চার করছে।

ধম্মপদের রহস্য বা তত্ত্ব-বিচারের স্থান নেই। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ উপাদান থেকেই এর উপমাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। ধম্মপদের উপদেশ সহজেই প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্ত স্পর্শ করে। শান্তিসন্ধানী মানুষের কাছে ধম্মপদের মূল্য অপরিসীম।

ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ণ ধম্মপদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "যদি একটিমাত্র পুস্তককে কেহ সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিশ্বের গ্রন্থাগারে ধম্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তক পাওয়া অসম্ভব।"

অধ্যাপক এ. জে. এডমাণ্ডস ধম্মপদ অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এশিয়া মহাদেশে যদি কোনো অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হয়ে থাকে তবে, তা হলো ধম্মপদ। ভারতের ঋষি-মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু-হাজার বছরের রোমক ও খৃষ্টান সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী

কোপেনহাগেন থেকে কেম্ব্রিজ এবং শিকাগো থেকে সেন্টপিটার্সবার্গ পর্যন্ত প্রতি শিক্ষাসত্রে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।"

প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনসমূহের দ্বারা পূজিত এই ধম্মপদ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা লজ্জাকর। কেবল এই অজ্ঞান ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নয়, ধম্মপদের গূঢ় আকর্ষণেও আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের ও কর্মের তাড়নায় বিরতিহীন প্রয়াসের অন্ধতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষ যে সাধনা করেছে, সে-সাধনা অদ্যাবধি আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনকে এবং ইহলৌকিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমরা কর্মকে জয়ী করতে চাই না, কর্মের উপরেই জয়ী হতে চাই : আমাদের জীবনে এই ভাবেরই আধিপত্য।

রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় তাই বলেছেন, "আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহার-বিহারের সমস্ত নিয়ম-সংযম, আমাদের বৈরাগী-ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, বুদ্ধিপূর্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।"

রামপ্রসাদের শাক্ত গানে এই মুক্তি-পথের ইঙ্গিত আছে, আবার উপনিষদের অদ্বৈতানুভূতি-মন্ত্রেও আছে। সরল থেকে কঠিন, সহজ থেকে দুর্গম—সকল চিন্তাপথের পাথেয় ও লক্ষ্য একই। ধম্মপদ এই মুক্তি-সাধনার অন্যতম প্রধান সরণি।

ধম্মপদের জনপ্রিয়তার রহস্য রামপ্রসাদী গানের জনপ্রিয়তার মতই জীবন-নিহিত, অর্থাৎ দুরূহ দর্শনচিন্তা-বর্জিত প্রত্যক্ষ সংসারাভিজ্ঞতা ও সরল হৃদয়ানুভূতি। ভগবান বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত এই বাণী পালি ভাষার মাধ্যমে শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে আমাদের হৃদয়-দ্বারে এসে পৌঁছেছে। আমরা কি এর প্রতি উদাসীন থাকব?

ধম্মপদ ছাব্বিশটি বগ্‌গ (বর্গ)-এ বিভক্ত। প্রতি বর্গে বিশ-ত্রিশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে। বগ্‌গসমূহের নাম : যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্ফ, বাল, পণ্ডিত, অহরন্ত, সহস্স, পাপ, দণ্ড, জরা, অত্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, ক্রোধ, মল, ধম্মট্‌ঠ, মগ্‌গ, পকিণ্ণক, নিরয়, নাগ, তণ্‌হা, ভিকখু, ব্রাহ্মণ বগ্‌গ।

বাঙালীমাত্রের কিছুটা সংস্কৃত ভাষা জানা আছে, অন্ততঃ জানা উচিত। সংস্কৃতের সাথে পালিভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই একটু ধৈর্য ও সাহসভরে অগ্রসর হলে আমরা সহজেই ধম্মপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারব।

উদাহরণে বক্তব্য পরিচ্ছন্ন হবে।

মূল শ্লোক : পালি ভাষায়—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ
কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো
[যমকবগ্‌গো]

সংস্কৃত রূপান্তর—

ন হি বৈরেন বৈরানি শাম্যন্তীহে
কদাচন।
অবৈরেন চ শাম্যন্তি এষ ধর্মঃ সনাতন॥

বাংলা পদ্যানুবাদ (বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি-কৃত)—

বৈরিতা বৈরিতা শান্ত নাহি
করে কদাচন;
অবৈরিতা শান্ত করে :
এই ধর্ম সনাতন।

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির-কৃত বাংলা গদ্যানুবাদ—

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়; ইহাই সনাতন ধর্ম।

ধম্মপদের ছাব্বিশটি বর্গের শ্লোক-রাজ্যে বাঙালী পাঠক স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ পাবেন, এই আশ্বাস দিতে পারি। ধর্মজিজ্ঞাসু না হয়েও ধম্মপদ পাঠে আনন্দ লাভ করা যায়, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উপমার নৈকট্য, প্রকাশের ঋজুতা অনুভূতির সারল্য সংশয়ী পাঠক-হৃদয়কেও স্পর্শ করে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আশাকরি ধম্মপদের প্রতি পাঠকের অনুরাগ জন্মাবে।

(ক) উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা
উসুকারা নময়ন্তি তেজনং।
দারু নময়ন্তি তচ্ছকা অত্তানং
দময়ন্তি পণ্ডিতা॥
[পণ্ডিতবগ্‌গো]

সেচকগণ জলকে (যথেচ্ছ) পরিচালিত করে, শরনির্মাতা শরকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে আয়ত্ত করে; আর পণ্ডিতগণ দমন করেন নিজেকে।

[ধর্মাধার মহাস্থবিরের অনুবাদ]

(খ) অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি
মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয় হন্তি বেরং
তেসূপ সম্মতি॥
[যমকবগ্‌গো]

আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে তাহাদের বৈর শান্ত হয়।

[রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ]

(গ) যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো
পাচেতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি
পাণিনং।
[দণ্ডবগ্‌গো]

গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গোরু তাড়াইয়া গোচারণে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে তাড়না করিতেছে। [ধর্মাধার মহাস্থবিরের অনুবাদ]

(ঘ) চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো
আপজ্জতি পরদারূপসেবী।
অপুঞ্‌ঞ্‌লাভং ন নিকামসেয়্যং
নিন্দং ততিয়ং নিরয়ং চতুত্থং॥
অপুঞ্‌ঞ্‌লাভো চ গতী
চ পাপিকা
ভীতস্স ভীতায় রতী
চ থোকিকা।
রাজা চ দণ্ডং গরুকং পণেতি—
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে॥
[নিরয়বগ্‌গো]

পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দুঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপুণ্যলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন, তৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক। তাহার অপুণ্যলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয়। ভীত নরনারীর রতিও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না। [অনুবাদ : তদেব]

(ঙ) তং বো বদামি ভদ্দং বো
যাবন্তেত্থ সমাগতা
তণ্‌হায় মূলং খণথ
উসীরত্থো'ব বীরণং,
মা বো নলং'ব সোতো'ব
মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং॥
[তণ্‌হাবগ্‌গো]

এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিতেছি, উশীরার্থীর বেণাতৃণের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন করো, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মতো মার যেন তোমাদিগকে বারবার বিধ্বস্ত না করে। [অনুবাদ : তদেব]

(চ) তিণদোসানি খেত্তানি,
রাগদোসা অয়ং পজা।
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং
হোতি মহপ্ফলং॥
[তণ্‌হাবগ্‌গো]

তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মে না, ভোগানুরাগবশতঃ এই জনসমাজ কলুষিত হয়; সুতরাং বীতরাগীদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।

[অনুবাদ : তদেব]

ধম্মপদের আলোচনায় লাভ বই লোকসান নেই, এই আশ্বাসে বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী
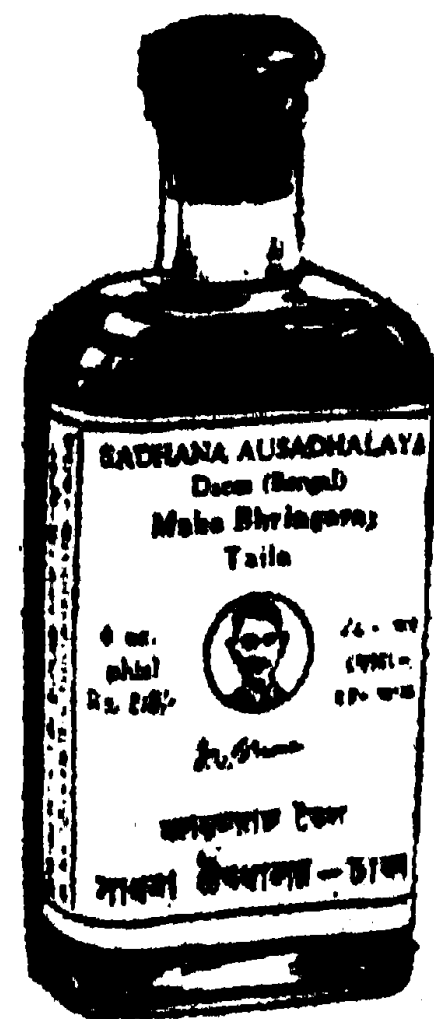
(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সুচিন্তাই বা ক'দিন এসে বসেন এখানে?

সুশোভন আসার পর একদিনও কি? আজ এসে বসেছেন।

সুশোভন তখন ঘুমোচ্ছিলেন। কিছুদিন থেকে মাঝে মাঝে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ছেন সুশোভন। যেটা আগে আদৌ ছিল না। কে জানে এ লক্ষণ ভাল কি মন্দ। চিকিৎসকরা তো বলেন মানসিক রোগীর ঘুম সুলক্ষণ।

আশ্চর্য, তবু সুচিন্তা সুশোভনকে হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে শঙ্কিত হন। বিকেলের খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে ছুতো করে ঘুম ভাঙান। ঘুম না ভাঙলে নিজে নিজে সহজে ভাঙতে চায়ও না।

সুচিন্তা তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ অতিথির আগমন সংবাদে নীচে নেমে আসার সময় দেখে এসেছিলেন সুশোভন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কে জানে কখন উঠেছে মানুষটা! হয়তো এঘর ওঘর ঘুরে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে নেমে এসেছে।

সুচিন্তা বললেন, 'তুমি নীচে এলে কেন? ওপরে যাও।'

সুশোভন যাবার জন্যে পা বাড়ালেন, কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ না করে ছাড়লেন না। 'তুমিই বা নীচে কি করবে? চলে এস।' বলে ভারী ভারী পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

এতক্ষণে বাক্ স্ফূর্তি হ'ল কৃষ্ণার মার। কুঞ্চিত ভ্রূ আর সন্দেহাকুল কণ্ঠে বলেন, 'উনি কে? আপনার ভাই?'

'না।'

'তা হলে?'

সুচিন্তা মুখ তুলে স্থিরস্বরে বললেন, 'আমার বাল্যবন্ধু।'

'বাল্যবন্ধু!'

এমন সুরে কথাটা বলেন কৃষ্ণার মা, মনে করা চলে বাল্যবন্ধু শব্দটা বুঝি জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

সুচিন্তা আর কোন কথা বললেন না শুধু বিদায়দানের ভঙ্গীতে আর একবার হাত তুলে নমস্কার করলেন।

তথাপি কৃষ্ণার মা না বলে পারলেন না—'শুনেছিলাম আপনার বাড়ীতে কে একজন পাগল এসেছে, উনিই তিনি বুঝি?

সুচিন্তা সহসা দস্তুরমত খোলা গলায় হেসে ওঠেন, আর হাসতে হাসতেই বলেন, 'পাগলকে একনজর দেখেই পাগল বলে চিনতে পারেন! আশ্চর্য ক্ষমতা তো আপনার! আচ্ছা নমস্কার যাই। ওই পাগল নিয়ে তো জ্বালার শেষ নেই আমার।'

বলেন বটে, কিন্তু মুখ দেখে কে এ'রা বিশ্বাস করলেন পাগল নিয়ে সুচিন্তার জ্বালা!

'আমাকে না বলে চলে যাও কেন সুচিন্তা?' বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে, 'আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে পাইনা।'

'তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে।'

'বাঃ বেশ! চিরকাল ধরে ঘুমোব বুঝি?'

'তা আমি বুঝি লোকজনের সঙ্গে কথা বলব না?'

'না না ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে না'—সুশোভন প্রবলভাবে বলে ওঠেন, 'ওরা তো ভাল লোক নয়।'

সুচিন্তা হেসে ফেলে বলেন, 'কে বলল ভাল লোক নয়। ভাল তো।'

'না না! দেখলে না কী রকম করে যেন তাকাচ্ছিল তোমার দিকে।'

'কী রকম করে আবার?'

'রাগ রাগ করে। দেখতে পাচ্ছিলে না?'

'কই না তো। তুমি দেখতে পেলে বুঝি?'

'পাবনা?' সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'তোমার দিকে, রাগ করে তাকালে দেখতে পাব না? ওদের বকে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার।'

সুচিন্তা কাছে সরে এসে বলেন 'তা' সবাইকি তোমার মত করে তাকাবে?'

সুশোভন সহসা যেন ভারী বিপন্ন বোধ করেন। চঞ্চলভাবে বলেন, 'আমার মত? আমি কী করে তাকাই সুচিন্তা? কই আমি তো বুঝতে পারি না।'

'থাক তোমায় বুঝতে হবে না। কিন্তু ওরা যদি আবার আসে তুমি ওদের সামনে যেও না বুঝলে? ওরা তো তোমাকে ভালবাসে না।'

'আমাকে ভালবাসে না! কিন্তু কেন বলতো সুচিন্তা। আমাকে তো সবাই ভালবাসে।'

'তুমিই তো বললে ওরা লোক ভাল নয়।'

'ওঃ ঠিক ঠিক। কিন্তু সুচিন্তা ওর কে?,

'ওরা কে?'

সুচিন্তা কৌতুকের স্বরে বলেন, 'ওরা আমার ছোটছেলের শ্বশুর আর শ্বাশুড়ী।'

শ্বশুর শাশুড়ী! ছোট ছেলের শ্বশুর শাশুড়ী! এ কথার মানে কি সুচিন্তা?'

'বাঃ বেশ! মানে জানো না? ওদের মেয়ের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের বিয়ে হবে।'

'না না কিছুতেই বিয়ে হবে না—' বীরবিক্রমে বাধা দেবার ভঙ্গীতে হাত তোলেন সুশোভন, 'ওরা ভাল লোক নয়।'

'কিন্তু ওদের মেয়ের সঙ্গে যে আমার ছোট ছেলে ভাব করেছে, সুচিন্তা আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন, 'আমার ছোট ছেলেকে ওদের মেয়ে পছন্দ করেছে, ভালবেসেছে। বিয়ে না হলে ওদের মেয়ের মনে কষ্ট হবে।'

ঠাণ্ডা হয়ে যান সুশোভন, একেবারে নরম হয়ে যান। সহানুভূতির কোমল গলায় বলেন, 'মনে কষ্ট হবে? ওদের মেয়ের মনে কষ্ট হবে?'

'হ্যাঁ, আর আমার ছেলেরও কষ্ট হবে।'

'ওদের মেয়ে ওদের মত নয়তো সুচিন্তা?' সুশোভন যেন আর এক দুশ্চিন্তায় কাতর হলেন, 'তোমার দিকে রাগ রাগ করে তাকাবে না তো?'

'না না সে ভাল মেয়ে।'

'ভাল মেয়ে!' সুশোভন পছন্দর ভঙ্গীতে বার দুই মাথা হেলিয়ে হঠাৎ আর এক চিন্তায় চলে যান, 'কিন্তু সুচিন্তা ওরা তো মুখুয্যে ওদের সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে?'

সুচিন্তা অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই পাগলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কে বললে ওরা মুখুয্যে! মুখুয্যে তো নয়।'

'নয়? ঠিক বলছ সুচিন্তা?' সুশোভন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন 'ভাগ্যিস নয়।'

সুচিন্তা তেমনিভাবেই বলেন, 'মুখুয্যে হলে কি হয়?'

'পাগলকে একনজর দেখেই পাগল বলে চিনতে পারেন। আশ্চর্য ক্ষমতা তো আপনার...'

'কী হয়! অমনি বোকার মত বলে দিলে কী হয়। বিয়ে হয় না তা'জানো?'

সমস্ত পথটুকু অর্থাৎ পথের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত এইটুকু কর্তা-গিন্নী নিস্তব্ধ, বাড়ী ঢুকে বসে পড়ে প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলেন গিন্নী, 'খুকুর কপালে শেষে এই ছিল!'

'থাকবেই তো!' কর্তার স্বর ভীষণ হয়ে ওঠে, 'এখুনি কপালের হয়েছে কি! আরও কত হবে।'

'ছি ছি, একেবারে যা তা।' আজ আর কর্তার কথায় ফোঁস করে ওঠেন না গিন্নী, বরং কাঁদো কাঁদোই হন, 'মা টা তো দেখছি ভাল নয়। এতদিন পাড়ায় আছি, এসব তো জানি না। হতভাগা মেয়ে বেছে বেছে শেষে কিনা—'

'বেছে বেছে?'

ভয়ংকর শব্দে ধমকে ওঠেন কৃষ্ণার বাবা, 'হতচ্ছাড়া মেয়ে ছেলেদের বাছ-বিচার কিছু থাকে? যাকে সামনে পায় তাকেই— ছি ছি। কী বলবো, তোমার ওই আদুরে মেয়ে আবার সুইসাইড্ করবো বলে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন। নইলে ওই মেয়েকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে, দেখিয়ে দিতাম ছোঁড়াটাকে কী করে শায়েস্তা করতে হয়। জলবিছুটি মেরে ছাল চামড়া তুললেই দেখতে 'বাপ বাপ' করে পালাতে পথ পেতেন না বাছাধন। ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে প্রণয় করতে আসার বাসনা জন্মের শোধ মিটে যেত।'

কৃষ্ণার মা চোখ মুছে বলেন, 'কী করবো, মেয়েই তোমার বাদী। যেমন আহ্লাদ দিয়ে মানুষ করেছ। আজ আমায় দুষছো, তুমি আস্কারা দাওনি ছেলেবেলা থেকে? একটা মেয়ে বলে, যা বলেছে তাই করনি? যা চেয়েছে তাই এনে দাওনি?'

'দিয়েছি!' ভদ্রলোক ভীষণতর স্বরে বলেন, 'ভাল ভাল জিনিস চেয়েছে, দিয়েছি। রাস্তার পাঁক নিয়ে খেলতে চাইলে, তুলে এনে দিতাম না নিশ্চয়!'

কৃষ্ণার মা আরও কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, 'তা বয়েসকালে কি আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে? কিন্তু ইন্দ্রনীল ছেলে খারাপ নয়। পাঁকের সংগে তুলনা কোর না তুমি ওকে। খুকুর কানে গেলে দারুণ শক্ পাবে।'

'শক্ পাবে! ওঃ। কিন্তু শক্ পেলে কী হয় বলতে পারো? কিছু যদি হতো, তাহলে তোমার মেয়ে যেদিন সুইসাইডের ভয় দেখিয়েছিল, আমার সেইদিনই হার্টফেল হতো। বুঝলে? কীল খেয়ে কীল চুরি করলাম কেন জানো? মেয়ের মায়ায় নয়, পাছে মেয়ে লেকের জলে ডুবে মরে আমার মুখ হাসায় এই ভয়ে। উঃ এখন ভাবছি একেবারে গোড়াতে কেন গোড়ায় কোপ মারিনি।

কৃষ্ণার মা সভয়ে বলেন, 'দোহাই তোমার চুপ করো। খুকু শুনতে পাবে। খুকুকে তো আর ওই শ্বাশুড়ীর কাছে ঘর করতে পাঠাচ্ছি না। মেয়ে জামাই আমার কাছেই থাকবে।

পারো তো তাই রেখো। সুখে সংসার কোরো মেয়ে জামাই নিয়ে। কর্তা গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমার থাকার ব্যবস্থা অন্যত্র কোরবো।'

কৃষ্ণার মা এ গর্জনে অবশ্য ভয় পান না।

কর্তা তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র থাকতে পারবেন, এ আশংকাকে নস্যাৎ করেন তিনি।

সংসারের চক্র এইভাবেই আবর্তিত হয়। নিজের নিজের সমস্যার ক্ষেত্রে যখন পড়ে মানুষ, তখন কেবলমাত্র তার দিকটা বিবেচনা করলে কিছুতেই তার কোন আচরণকে দোষ দেওয়া চলে না। দোষ দেওয়া চলেনা তার অসহিষ্ণুতাকে।

অথচ সকলের সমস্যার মীমাংসা কোন কিছুতেই হবে না কোন দিন।

একই ঘটনা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। যে বর্ষাকে গ্রামের চাষীরা দুহাত তুলে অভিনন্দন জানায়, সেই বর্ষাকেই শহরবাসীরা ভ্রূকুটি করে অভিসম্পাত দেয়। যে আইনকে ভাড়াটিয়ারা নিত্য প্রণাম করে, সেই আইনকেই বাড়ীওয়ালারা নিত্য দাঁত খিঁচোয়।

বড়লোকের কাছে গরীবের অসন্তোষ বিরক্তিকর, গরীবের কাছে বড়লোকের বাবুয়ানা চক্ষুশূল। বড়দের চোখে ছোটদের ব্যবহার আপত্তিকর, ছোটদের চোখে বড়দের ব্যবহার নিষ্ঠুরতাপূর্ণ।

অথচ দোষ দেওয়া যায় কাকে?

কৃষ্ণা প্রেমে পড়েছে সেটা কি তার দোষ?

কৃষ্ণার অভিভাবক তার ভুল নির্বাচনে ক্ষেপে উঠেছেন, এটাও কি তাঁদের পক্ষে অসংগত?

সুচিন্তা তাঁর উদ্ধত প্রতিবেশীকে অবহেলা করলেন, এটা যেমন সুচিন্তার অবস্থায় স্বাভাবিক, ঠিক তেমনিই স্বাভাবিক সুচিন্তার প্রতিবেশী যদি সুচিন্তাকে অপবাদ দিয়ে বলেন 'খারাপ'।

ঈশ্বর জানেন সত্য মিথ্যার মাপকাঠি কার হাতে।

পরস্পরবিরোধী সত্য সমস্ত সংসারটাকে এমন এক অদ্ভুত কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে তার থেকে সূর্যের সত্যকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। গুরুভক্ত শিষ্য যখন তার পুত্রের মৃত্যুরোগে ডক্তার না ডেকে গুরুর চরণামৃত খাওয়ায়, তখন তার নিবুদ্ধিতাকে নিন্দাবাদ দেব না তার গুরুভক্তিকে তারিফ করব? দুশ্চরিত্র স্বামীর অবমানিতা স্ত্রী যখন তার শিশু সন্তানকে পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে, তখন সে স্ত্রীর আত্মমর্যাদাবোধকে সাধুবাদ দেব, না তার নির্মমতাকে নিন্দাবাদ করবো?

মানুষকে বিচার করা বড় কঠিন।

মানুষকে বিচার করা কঠিন, কর্তব্য বিচার করে ওঠাই কি সহজ?

অন্ততঃ আপাততঃ বুদ্ধিমান উকিল সুবিমল মুখোমুখি পারছেন না কর্তব্য নির্ধারণ করতে। ব্যাপারটা সুশোভনকে নিয়েই। ইতিপূর্বে নিজেই সুবিমল মায়ালতাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে। কিন্তু নীতা চলে গিয়ে পর্যন্ত অবিরতই ভাবছেন সুবিমল, নীতির ওপর রাগ করে ভাই সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার থাকা তাঁর পক্ষে সংগত কি না।

একটা দুর্বিনীত মেয়ের অকর্তব্য সুবিমলকে কি কর্তব্যচ্যুত করবে? অসুস্থ ভাইকে একবার দেখতেও যাবেন না? অথবা শুধুই দেখতে যাওয়া কেন, তাঁর তত্ত্বাবধানই বা নয় কেন। সুচিন্তা নিয়ে নিতে চাইছে বলে, তিনি একেবারে দিয়ে দেবেন তাঁর ভাইকে?

সত্য বটে এখানে দেওয়া নেওয়া কথাটা অর্থহীন, সেদিন সেই বন্ধ-পাগলের যে বাধ্যতা দেখেছেন তিনি সেটা এক পরম বিস্ময়ের অনুভূতি। সেই অনুভূতির কাছে স্বীকার করেছেন সুবিমল সম্পর্কের দাবীই সব নয়।

তবু সুবিমলেরও লোক সমাজ আছে।

আত্মীয়জন মাঝে মাঝেই সুশোভন সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, এবং সুচিন্তা কোন অধিকারে সুশোভনকে ভাগিয়ে খাচ্ছে, তা' নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে। একদিন তো সুবিমলদের ছোট পিসি এসে এ কথাও বলে গেলেন 'আমাকে একবার নিয়ে চল দিকি সেই সুচিন্তার বাড়ী। দেখে আসি কেমন সে দজ্জাল মেয়ে! দেখে আসি কী গুণতুক করেছে সে। আর ছেলেটাকেও দেখে আসি।'

সুবিমল 'ক্ষেপেছ' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রস্তাব। কিন্তু সেই অবধি নিজে ভাবছেন একবার যাওয়া উচিত। তা' ছাড়া অন্য কারণও তো একটা রয়েছে। নীতার খবর জানতে যাওয়ার মত বড়সড় একটা কারণ।

একটা রবিবারের সকাল ধার্য করলেন তিনি যাবার জন্যে। আর মনে মনে ঠিক করলেন সুমোহনের ছেলে দুটোকে নিয়ে যাবেন। দেখবেন কী প্রতিক্রিয়া হয়।

ছেলে দুটোকে সুশোভন বেজায় ভালবাসতেন।

কখন যে সুবিমল অশোকাকে বলেছেন ছেলেদের সাজিয়ে দিতে. আর কখন যে অশোকা সে আদেশ পালন করেছে, মায়ালতা তার কিছুই টের পাননি। দেখতে পেলেন একেবারে যখন বেরোচ্ছেন।

রবিবার সকালে প্রায়শঃই ভাইপোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন সুবিমল, তবে মায়ালতা সেটা কোনদিনই 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিতে পারেন না। প্রত্যেক সপ্তাহেই দেয়ালকে শুনিয়ে বলেন, 'আদিখ্যেতা! ঢং! অমনি ছেলেদের নেলিয়ে দেওয়া হল। মানুষের যেন আর কাজকর্ম নেই! একে তো রাতদিন কোর্ট আর মক্কেল, মামলা আর নথি, যদি বা একটু ছুড়ান হল তো ভাইপো

নিয়ে সোহাগ করতে হবে। নিজের ছেলেদের নিয়ে তো কখনো এক পা বেড়াতে যেতে দেখিনি! তা' কেন, পাচ্ছে, একটা কাজের কথা বলি, তাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো।'

বলাবাহুল্য মায়ালতার এত অভিযোগেও দেয়াল যথারীতি নীরব থাকে, এবং সুবিমল যথারীতি 'কইরে তোদের হল?' বলে তাড়া দিয়ে বার করে নিয়ে যান।

আজ কিন্তু এ তাড়াটুকুও দেননি সুবিমল, এমনিই বেরোতে উদ্যত হয়েছিলেন, চোখ পড়ে গেল মায়ালতার। এবং যথারীতি তিনি ঠিকরে এসে প্রশ্ন করলেন, 'অতি সকালে আবার ভাইপো ঘাড়ে করে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

একটা বছর চার এবং একটা ছয়, দুটো ছেলেই দুদিক থেকে জ্যাঠাবাবুর আঙুল ধরে অধিকার কায়েম রেখেছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করে সুবিমল মৃদু হেসে বলেন, 'ঘাড়ে কই? বরং হাতে করে বলতে পারো।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাকরণের ভুল হয়েছে আমার। তা' এত সাজগোজ করে যাওয়াটা হচ্ছে কোথায়?'

সুবিমল বলেন, 'আন্দাজ করতে পারছ না?'

'গণৎকার তো নই।'

'ওদের মেজজ্যাঠার কাছে নিয়ে যাচ্ছি ওদের।'

'মেজজ্যাঠার কাছে! অ!' মায়ালতা একটি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, 'তা' ওদের ছুতোটা আর করা কেন! নিজের কথাটাই বললে পারতে। যেটা সত্যি। তা' সেই প্রেমের তাজমহলটিকে নিজে দেখতে যাচ্ছো যাও ছেলেদুটোকে আবার টানা কেন?'

'তাজমহল তো দেখাবারই জিনিস।' বলে বেরিয়ে যান সুবিমল। আর মায়ালতা ছেলেদের কাছে গিয়ে হাপুসে পড়েন, 'দেখলি? দেখলি তো তোরা? আমাকে একবার বলা পর্যন্ত নয়। তলে তলে ভাদ্দরবৌকে বলা হয়েছে, তলে তলে, ছেলেদের সাজানো হয়েছে, বাড়ীর দাসীবাঁদী ছন্দাংশও টের পায়নি।'

'তুমি যাই নির্লজ্জ—' তপোধন হাতের সিগারেটটা পিছন দিকে আড়াল করে সতাচ্ছিল্যে বলে,—'তাই এখনও বাবার সঙ্গে কথাবার্তা কও। কোন প্রেস্টিজসম্পন্ন মহিলা হলে, কখনই এরকম অপমানে, কোন রকম কো অপারেশন রাখে না।

মায়ালতা এবার ছেলের উপরই আক্রমনের অস্ত্র ধরেন। কারণ ছেলের অভিযোগটা মর্মান্তিক। সেই মর্মান্তিকের জ্বালায় ছটফটিয়ে ওঠেন মায়ালতা, 'তা' সে নীচুতা স্বীকার না করে আমার উপায়? তোমরা আমার একটা কাজ করে দেবে? একটি আঙুল নাড়বে সংসারের জন্যে? কাজগুলো করিয়ে নিতে হবেনা আমাকে? কথা বন্ধ করলে আমার চলবে?'

অদূরে 'দেয়াল' বসে চা ঢালছিল। বড় একটা কাঁচের প্লাশের এক প্লাশ চা এনে বড়জায়ের হাতে দিয়ে সে সহাস্যে বলে, 'কী যে বলেন দিদি! বলে রাজা নইলে রাজ্য চলে—'

'কী! কী বললে ছোটবৌ?' মায়ালতা 'ধেই ধেই' করে ওঠেন, 'মরণ কামনা করলে তুমি আমার?'

'কী আশ্চর্য! কী যে বলেন দিদি। চাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আগে খেয়ে নিন।' বলে আর একটা চটাওঠা এনামেলের প্লাশে চা ঢালতে থাকে অশোকা।

এ চাটা বাড়ীর বুড়ো ঝিয়ের।

সহসা বর্তমান রাগ ভুলে মায়ালতা আর একটা প্রসঙ্গে এসে পড়েন, 'ও চা কার শুনি?'

'এ গেলাশে আবার কার চা হবে দিদি—'

'তা' বুঝেছি! কিন্তু এও তোমাকে বলছি ছোটবৌ, পরের জিনিস বলে অত বেদরদ হওয়া ভাল নয়। এই দামী চা, তাই থেকেই ঝিকে দেওয়া হচ্ছে আধসেরি গেলাশ ভর্তি করে! সাধে কি আর কথায় বলেছে কোম্পানীকা মাল, দরিয়া মে ডাল্! কেন একটু সস্তা চা ঝিয়ের জন্যে, আনানো যায় না?' একটু হাত রেখে কম করে দেওয়া যায় না?'

অশোকা গরম চা টা সযত্নে আঁচল দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে বলে যায়, 'আমি তো ও দুটোর একটাও বোধহয় পেরে উঠব না দিদি, কাল থেকে বরং গোপালের মার চা টা আপনিই করবেন।

'হল তো!' তপোধন মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া হলতো! সাধে বলি, তুমি না হয়ে কোন প্রেস্টিজসম্পন্ন মহিলা হলে এদের সঙ্গে কথা বলতো?'

মায়ালতা রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'মান-মর্যাদা কেউ দিলে তবে তো থাকবে? দিয়েছে আমায় কেউ কোনদিন? সংসারের দাসী-বাঁদী হয়েই রইলাম চিরদিন। এখনই বা হয়েছে কী। এর পর ছেলের বৌরা এসে উঠতে বসতে অপমান করবে।'

মুহূর্তে মুহূর্তেই রাগের কারণ আর পাত্র বদলায় মায়ালতার।

ঠিক পর মুহূর্তেই দ্রুত পাশের ঘরে চলে যান তিনি সুমোহনের সঙ্গে লড়তে। কারণ শুনতে পেলেন সুমোহন ব্যঙ্গ-মিশ্রিত একটি মন্তব্য করছেন বোধকরি স্ত্রীকে উদ্দেশ করেই। 'এই তোমাদের রবিবার সকালের জলখাবার? বাঃ বাঃ! বেড়ে। অতি দীন-দরিদ্রর বাড়ীতেও রবিবারের সকালটায় একটু ভাল-মন্দ খায় জানি।'

এ মন্তব্য কানে যাওয়ার পর আর ধৈর্য ধরতে পারেন না মায়ালতা, স্বামী-স্ত্রীর আলাপের মাঝখানেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'বলি ছোট ঠাকুরপো, বার তারিখ তোমার মনেও বা থাকে! ধন্যি স্মরণশক্তিতো! নইলে কাকে বলে রবিবার আর কাকে বলে বুধবার, তোমার তো মনে থাকার কথা নয়।'

মায়লতা এমনিই।

কেবলমাত্র বাক্ সংযমের অভাবেই সংসারের গৃহিণীর মর্যাদা হারিয়েছেন। অনেক কৃপণ, অনেক স্বার্থপর, অনেক নীচমনা গৃহিণীও দিব্যি তরে যায়। কেবলমাত্র স্বল্পভাষণের বর্মে। কিন্তু মায়ালতা যত বলেন, সত্যিই হয়তো তত খারাপ তিনি নয়।

'উচিত কথা' শুনিয়ে দেবার লোভই মায়ালতার সমস্ত সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে।

কারো সঙ্গে 'কথা বন্ধ' করে প্রেস্টিজ বজায় রাখবেন, এ সাধ্য মায়ালতার কোথায়? 'কথা'ই যে তাঁর অসীম অফুরন্ত। নিরন্তর তারা বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।

ছোট দ্যাওরের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক-যুদ্ধ করে উত্তপ্ত মায়ালতা বড় ছেলের কাছে গিয়ে পড়েন। বলেন, 'তপোটাতো কোন কর্মের নয়, এদিকে তুইও কিছুতে গা লাগাবিনা। বলি তোদের মেজকাকার ব্যাপারটা এমনিই চলতে থাকবে?'

'তা' ছাড়া?'

'তুই তো ওরকম ঝেড়ে জবাব দিবি তা' জানা কথা। বলি পুলিশের সাহায্য নেওয়া যায় না? বলা যায় না পাগল পেয়ে মানুষটাকে আটকে রেখেছে? এ কথাও তো বলা যায় ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে সুচিন্তা।'

সাধন হেসে ফেলে বলে, 'তাতে তোমার ওই সুচিন্তাকে কিছু ভোগানো যায় হয়তো! কিন্তু লাভ কি?'

'না কিছুতেই কিছু লাভ নেই! যত লাভ রাতদিন ভাল ভাল পোষাক পরায়, আর হপ্তায় তিন দিন সিনেমা দেখায়! ঠিক আছে, তোদের কাউকে কিছু করতে হবেনা, আমি একবার রাধুর কাছে যাচ্ছি।'

রাধু বা রাধানাথ মায়ালতার বোনঝি-জামাই, লালবাজারে কাজ করে। মায়ালতার ধারণায় রাধুই লালবাজার অফিসের সর্বময় কর্তা। কাজেই যে কোন মুস্কিলের সময়ই মায়ালতা অহঙ্কার প্রকাশ করেন, 'রোস আমি রাধুকে বলছি।'

যদিও রেকাবী-ভর্তি খাবার ও কাপ কাপ চা ধ্বংসানো ছাড়া আর কোন কাজ আজ পর্যন্ত মায়ালতার বোনঝি-জামাইকে দিয়ে হয়নি।

তবু অহঙ্কার করতে ছাড়েন না এবং রাধুকে বলতে যাওয়ার উপলক্ষে ঘটা করে সন্দেশের বাক্স হাতে নিয়ে বোনঝির বাড়ী বেড়াতে যাওয়াটা তাঁর মাঝে মাঝেই ঘটে। কারণ রাধুর বাড়ী মায়ালতার বাড়ীর কাছেই। একাই যেতে পারেন রিকশ করে। আজও গেলেন।

সন্দেশের বাক্সটা হাত থেকে নামিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'এই এলাম বাবা তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে।'

পরামর্শ করতে লোকে এ বাড়ী ও বাড়ী ছোটে। অথচ নিজের সংসারে সুচিন্তা কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন না। পরামর্শ করে না সুচিন্তার ছেলেরাও।

হয়তো বা অনভ্যস্ত কাজটা নতুন করে করতে ওদের লজ্জা করে। নইলে ইন্দ্রনীল? কিন্তু তারই বা আর কি উপায় ছিল?

কৃষ্ণার মা বলেছিলেন, 'বিয়ের পর তোমরা দু'জনে কিছুদিন কোথাও বেড়িয়ে এসো। 'হনিমুন' করাও হবে, আর এই পাড়ার লোকের চোখের সামনে থেকেও দু'দিন সরে যাওয়া হবে। বিয়ে হয়ে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পাবে না এর চাইতে লজ্জার আর কি আছে?'

ইন্দ্রনীল বলেছিল, 'শ্বশুরের টাকায় 'হনিমুন' করতে যাবো এর চাইতে লজ্জারই বা আর কি আছে?'

কৃষ্ণার মা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'শ্বশুরের টাকাতেই যখন তোমাকে এখনও বেশ কিছুদিন চালাতে হবে, তখন সে টাকাকে সর্বদা অশুচি অপবিত্র ভেবে কষ্ট পাবার কোন দরকার নেই: সেটা বোকামী। আমি তো তোমার বারবার বলেছি আমাদের যা কিছু সর্বস্বই খুকুর।'

ইন্দ্রনীল তবু বলেছিল, 'তা' হতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে তো অধিকারের কোন প্রশ্ন নেই।'

কৃষ্ণার মা ধমকে উঠেছিলেন, 'থামো তুমি বাবা! ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতন থাকো, হাসো খেলো, খাও মাখো, পাকামী করে করে আর আমার হাড় জ্বালিও না। ঘরে বাইরে জ্বলছি আমি। এই বিয়ের আগে থেকেই দার্জিলিঙের কোনও ভাল হোটেলে সীট বুক করিয়ে রাখছি, ফুলশয্যের পরদিনই রওনা দেবে। তারপর ফিরে এসে দেখা যাক কি ব্যবস্থা হয়।'

(ক্রমশঃ)

সাতপাঁচ

॥ পরকীর্তি ॥

আপনি যদি রূপসী তরুণী অথবা ধনী-তনয়া হয়ে থাকেন, তাহলে নিজের সম্পর্কে আপনার বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন। অপরিচিত অথবা অর্ধ-পরিচিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে আকস্মিক ঘনিষ্ঠতা করে আপনি যদি তার সঙ্গে বেড়াতে যান অথবা গোপন স্থানে মিলিত হন, তাহলে দয়া করে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে আপনার নামধাম লিখে রাখতে ভুল করবেন না। কেননা, অন্তরঙ্গতার ফাঁদে পড়ে আপনার যদি জীবনাশঙ্কা ঘটে, তাহলে অন্তত পুলিশ অথবা পথচারী আপনার মৃত বা অর্ধমৃত দেহকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আপনার আত্মীয়-পরিজনকে নিদেন খবরটা জানাতে পারবে।

অবশ্য জানি, আমার এই হিতোপদেশটা কোন কাজেই লাগবে না, যদি হফম্যানের মত সুদর্শন সৌজন্যসুজন কোন ধনী-তরুণের প্রেমের ফাঁদে আপনি পড়ে যান। তখন হয়ত মনে হবে, জীবনের পরম সার্থকতা এই পুরুষের একটি অঙ্গুলি-সংকেতের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন না—

তাহলে স্পষ্ট করেই বলি! হফম্যানকে আপনি চেনেন না, চেনে বেলগ্রেডের পুলিশ দপ্তর এবং জনসাধারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই বেলগ্রেড শহর, যেখানে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে নেহরু নাসের সুকর্ণ শ্রীমতী বন্দরনায়ক প্রভৃতি টিটোর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বেলগ্রেড শহরের একটি প্রেক্ষাগৃহের প্রতীক্ষাঘরে হফম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রূপসী লুইজের।

লুইজ সুন্দরী, বয়স কুড়ি-একুশের বেশি নয়। স্থানীয় এক অফিসে কাজ করে। অনেক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তার, কিন্তু এমন কোন মানুষের সন্ধান পায়নি যাকে সব কিছু দিয়ে ভালবাসা যায়। মেজাজেও সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সংবেদনশীল। তাই দেহে মনে সে যখন ফুলের মত ফুটে উঠেছে তখনও প্রেমের স্পর্শ না পেয়ে মন তার অকারণ বেদনায় বিহ্বল। এমনি এক আর্ত মনের বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলে ভাল লাগবে ভেবে না পেয়ে অনামনস্কভাবে এসে দাঁড়াল এক প্রেক্ষাগৃহের সামনে। তখনও সান্ধ্য প্রদর্শনী শুরু হতে এক ঘন্টা বাকি। টিকিট কেটে সে প্রতীক্ষাঘরের সোফায় বসে সংবাদপত্রটা খুলে ধরল। প্রথম পৃষ্ঠায় একটা তাজ্জব খবর বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা। রোমহর্ষক নারী হত্যার কাহিনী রিপোর্টারের সরস ভাষায় আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে। একটি অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে এক নির্জন রাস্তার উপর, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ডাক্তার অনুমান করেন। এ নিয়ে পুলিশ দপ্তর বিশেষ বিব্রত, কেননা গত ছয় মাসের মধ্যে বেলগ্রেড শহরে চারটি তরুণী এমনভাবে নিহত হয়েছে, অথচ হত্যার কূল-কিনারা করা পুলিশ দপ্তরের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পুরো খবরটা পড়ে লুইজের কেমন আতঙ্ক দেখা দিল। হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে উঠল, শিরা-প্রবাহে একটা হিম-বিদ্যুৎ শিরশির করে ছড়িয়ে গেল। তার হাত থেকে দস্তানাটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে। সে হাত বাড়িয়ে দস্তানাটা তুলতে যাবে কিন্তু তার আগেই এক সুবেশ সুশোভন ভদ্রলোক নিচু হয়ে দস্তানাটা কুড়িয়ে হাতে তুলে দিলেন। কৃতজ্ঞতার ভান করে ভদ্রতার হাসি হেসে লুইজ বলল, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক বললেন, ধন্যবাদ জানিয়ে লজ্জা দেবেন না।

লুইজ আরেকটু বিনয়ের হাসি ঠোঁটের ফাঁকে ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজটায় মনোনিবেশ করল। কিন্তু আর মনোনিবেশ করা সম্ভব হল না। অপরিচিত ভদ্রলোকটির উজ্জ্বল দুটি চোখ তার মনের মধ্যে বারে বারে ছায়া ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে অনামনস্কভাবে চোখ তুলে দেখতে লাগল ভদ্রলোককে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ নামাতে হল। কেননা যতবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছে, চোখে চোখ মিলে গেছে। ভদ্রলোকও সর্বক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

কিন্তু লুইজকে আরো অবাক হতে হল যখন প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখতে ঢুকে তার পাশের সীটে ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখল। লুইজ খুশী হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম হফম্যান, পেশায় ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কে মজুত অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য নয়, কিন্তু অসামান্য নিঃসঙ্গতায় মন তার ভরপুর।

শুনে লুইজ রোমাঞ্চিতা হল। সেও একা, নিঃসঙ্গতার নির্জনতায় তারও মন বিষণ্ণ বিবর্ণ। ছবি শেষ হবার আগেই দুজনের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁয়। বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ লুইজ গুণগুণ করে গান গাইল।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে দুজনে গেল পিকনিকে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এক নাচের আসরে। চতুর্থ দিন বিকেলে এক পার্কে মিলিত হয়ে দুজনে স্থির করল বিবাহের পবিত্রতা দিয়ে দুজনের মিলনকে চিরস্থায়ী ও সার্থক করে তুলতে হবে। সেদিনই হফম্যান বলল, চলো না আমার বাড়িতে। বিয়ের পর তুমি কেমন করে বাড়িটা সাজাবে সে কথা শুনব।

সানন্দে রাজি হল লুইজ। তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে শহরের বুকে। ট্যাক্সি চেপে দুজনে শহরতলীর এক নির্জন রাস্তায় হফম্যানের বাড়ি গেল। বড় তালা খুলে হফম্যান ঘরে ঢুকল তারপর লুইজকে নিয়ে ড্রইংরুম পেরিয়ে শোবার ঘরে এল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠল লুইজ, তারপর এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালাল সে। এক পলকের জন্য হফম্যান তাকে ধরতে পারলেন না।

লুইজের ভয় পাবার কারণ, ঘরের মধ্যে একটি নারীর উলঙ্গ মৃতদেহ ঝুলতে দেখেছিল। লুইজ সোজা দৌড়ে গেল থানায় কিন্তু বাড়িটা খুঁজে বার করে পুলিশকে দেখাতে পারল না। খবরের কাগজে লুইজের ছবি ছাপা হল, ফলাও হয়ে বেরোল তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

কিন্তু এক মাস না পেরোতেই আরেকটি হতভাগা তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেল এক ফেলে যাওয়া মোটর-গাড়ির মধ্যে। তিন সপ্তাহ পরে আরো একটি তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেল স্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে। দুটি তরুণীকেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ দপ্তর অনুমান করলেন।

এই হত্যার রহস্য অনেকদিন পর্যন্ত উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। ছয় মাস পর একটি মাঝারি বয়সের ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির আত্মহত্যা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল তাঁর শোবার ঘরে ছাব্বিশ জন সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহ। মৃতদেহগুলিকে রসায়ন দ্রব্যের সাহায্যে অবিকৃত রাখা হয়েছিল।

যে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে শুধু বেলগ্রেড নয় য়ুরোপের আন্তর্জাতিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল, সেই ভয়ঙ্কর লোকটি সকলের চোখের সামনে শিক্ষা, প্রতিপত্তি ও দৈহিক সৌন্দর্যের আলো জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অতএব, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাতেই মন ভুললে পরে কখনো কখনো তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও হতে পারে!

সাহিত্য সমাচার

।। জার্মানীতে বৌদ্ধ সাহিত্য ।।

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যের নানাবিধ গবেষণায় খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমানে জার্মাণীতে বৌদ্ধসাহিত্যের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। এটি নিঃসন্দেহে বিদেশী ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি জার্মাণদের ঔদার্যের পরিচায়ক। জার্মাণদের মনোভাবের বিশেষত্ব তারা বিশ্বকে জানতে চায়। তারা যা জানে না সে সম্বন্ধে অবগত হতে চায়। তাই বৌদ্ধ ধর্মের ভিন্ন পথ ও মত সম্বন্ধে তারা আজ জানতে উৎসুক। সম্প্রতিককালে মিউনিখ থেকে প্রকাশিত বৌদ্ধ সাহিত্যের দুটি নবযোজনা একাধারে বিদগ্ধ ও সাধারণ লোকের কাছে কালজয়ী বৌদ্ধধর্মের মহিমা ও তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

মিউনিখ শহরের একটি প্রকাশালয় "দি স্মল অ্যান্ড দি গ্রেট ক্রসিং" নামে সম্প্রতি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তার গ্রন্থকার মিঃ রাইনহার্ট র‍্যাফল্ট প্রস্তাবনায় বলেছেন, বুদ্ধের ভক্ত নরনারীদের প্রতি প্রণতি। কাব্যময় রূপকথা ও চিত্রে বুদ্ধের জীবনী ব্যাখ্যা করায় তাঁর গ্রন্থটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে তাঁর বিশদ আলোচনা সম্পর্কে একজন জার্মাণ সমালোচক বলেছেন, "বৌদ্ধধর্মের জাগতিক দুঃখ কষ্টের মূলনীতিকে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারায় ব্যাখ্যা না করে রূপকথায় ও চিত্রে কাগজের ওপর ইতিহাস রচনা করেছেন। ধর্মীয় আচার উৎসব, দশভূজা দুর্গার বর্ণনা, সুবিখ্যাত কালিন্দ মন্দিরের ঢাকের বাজনা ও শানাইয়ের সুর লেখকের বর্ণনা গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে।" সবশেষে সমালোচক বলেছেন "পুস্তকটি শুধু যে বিশ্বস্ততা সহকারে লিখিত তাই নয় উপরন্তু পরম যত্নের সংগে অঙ্কিত এক বিচিত্র জগতের চিত্রসমূহ দ্বারা আশ্চর্যরূপে শোভিত। পুস্তকটি যেন পাশ্চাত্যের সমগোত্রীয় মানসের স্মারকচিহ্ন।"

একই ভাবের কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়বস্তুপূর্ণ "বুদ্ধিষ্ট টেলস্ ফ্রম্ অ্যানসিয়াণ্ট ইন্ডিয়া" নামে বৌদ্ধ অধ্যাত্ম জগতের তথ্যপূর্ণ দ্বিতীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছে পশ্চিম জার্মাণীরই ডুসেলডর্ফ সহরের একটি গ্রন্থালয়। এটি সাধারণ পাঠকের জন্য রূপকথার ধরণে বুদ্ধের অবতার জীবনের কাহিনীগুলো নিয়ে লিখিত। বিখ্যাত ভারতবিদ মিঃ এইচ লুয়েডার্সের সহধর্মিণী পালি ভাষা থেকে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন। পুস্তকটির সমালোচনায় বিখ্যাত একটি জার্মাণ সংবাদপত্র লিখেছেন, "এই রূপকথাগুলির মূল নীতি মধ্যযুগীয় খৃষ্টান প্রচারকদের অনুরূপ।"

প্রকাশিত পুস্তক দুখানি বৌদ্ধধর্মের প্রতি পশ্চিম জার্মাণীর জনসাধারণের প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ ও উপলব্ধির নিদর্শন।

।। বাঙলায় নোবেল সাহিত্য ।।

ইংরিজি না-জানা বাঙালীর পক্ষে বিশিষ্ট বিদেশী লেখকদের রচনা সবসময়ে পড়া সম্ভব নয়। বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে হয়। কারণ বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকদের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে খুব কমই। কিছুদিন আগে অনূদিত 'ডক্টর জিভাগো' এবং অন্যান্য কয়েকটি বই ছাড়া বিশেষ কিছুই হয়নি।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি আশাপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেছে। কটকের নোবেল সাহিত্য প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস নোবেল পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকদের রচনার বাঙলা তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'বুড়ো ও সাগর', সাঁ জন প্যার্সের 'বৃত্তান্ত', হ্যাল্ডর ল্যাক্সনেসের 'স্বাধীন যারা', হিমনেথের 'আমি আর প্লাতেরো', আলব্যার কামুর 'অচেনা, ভুল, পতন', ইভান বুনিনের 'ছায়া বীথি গ্রাম', এমিল সিল্লানপার 'সিলজা' এবং সালভাতোর কোয়াসিমোদোর কবিতা। এতগুলি নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকের বই ইংরিজি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় একসংগে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

।। পুস্তক প্রতিষ্ঠানের পনের বছর ।।

গত পনের বছরে পোলিশ গ্রন্থ প্রকাশলয় থেকে তিন হাজার রকমের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ কপির বেশী। গত যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের নষ্টপ্রায় গ্রন্থগুলির পুনরাবিষ্কার প্রকাশালয় প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে দ্রুততার সংগে পালন করা হলেও বিশ্ব সাহিত্যের সংগে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি। সমকালীন পোলিশ ও বিশ্বসাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্যের অমর গ্রন্থরাজির যে সমস্ত পোলিশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন বায়রণ, কনরাড, ডিকেন্স, গলসওয়ার্দি, হার্ডি, সেক্সপিয়র, থ্যাকারে, দিদর্ত, ফ্লবার্ট, হুগো, স্টেন্ডহল, সাভেন্টিস, গোটে, শিলার, চেখভ, গোর্কি, ডস্টয়েভস্কি, লেরমেনটভ, পুশকিন, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ইবসেন, শেভচেঙ্কো, গনচেরভ, হাইনে প্রভৃতি। এস্কিলাস, এরিস্টে ফিনিস, হোমার, ওভিদ, সফেক্লিস ও থিয়োক্রিটাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সমকালীন সাহিত্যকারদের উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহও প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের কেবলমাত্র বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য সমিতিগুলির সংগে সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করে কাজ করে না লেখক ও অনুবাদকদেরও সাহায্য করে থাকে। গত বছর প্রতিষ্ঠানটির ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়েছে।

।। অন্য ভাষায় বাঙলা সাহিত্য ।।

বিদেশে বাঙলা সাহিত্যের সমাদর খুব বেশি না হলেও মস্কো, লণ্ডন আর ফ্রান্সে বইয়ের বাজারে বাঙলা বইয়ের অনুবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে সোবিয়েৎ দেশের বিভিন্ন ভাষায় আধুনিক বাঙালী কবি ও গল্পকারদের রচনা অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বাঙলা ভাষাকে কতদূর সমাদর করছে তা নিশ্চয়ই জানবার অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক বাঙালী কথাশিল্পীদের মধ্যে বিমল মিত্র অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা কম নয়। বৃহদায়তনের গ্রন্থ রচনায় তাঁর সমকক্ষ লেখক বাঙলা দেশে বর্তমানে খুব কমই আছেন। 'সাহেব বিবি গোলাম' রচনার পর তিনি লিখেছেন 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। ক্লাসিকধর্মী এ-উপন্যাসটি পাঠক সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। খবরে প্রকাশ গ্রন্থটি হিন্দীতে অনুবাদ হবে। দিল্লীর বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক আত্মারাম এই গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন কয়েকটি খণ্ডে।

* * *

রমাপদ চৌধুরীর নামও হিন্দী সাহিত্য জগতে অপরিচিত নয়। তাঁর "লালবাই" উপন্যাসটি খুব শীঘ্রই হিন্দীতে অনুবাদ করে একটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। ভৈরবপ্রসাদ সম্পাদিত "নৈ কহনীয়া" মাসিক পত্রিকাটির সংগে অনেকেই পরিচিত। এই পত্রিকায় রমাপদ চৌধুরীর 'লেখালিখি' গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

এছাড়া বিমল মিত্র ও রমাপদ চৌধুরীর গল্প বিভিন্ন ইংরিজি সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে।

॥ অসুস্থ যৌবন ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেল্‌থ্ বোর্ড ৩,৬৮৬ জন কলেজের ছাত্র ও ১৫৯৯ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন, তা এককথায় ভয়াবহ। ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৭০·৫৪ জনের আছে চক্ষুরোগ, ৪৫·৫৩ জনের আছে কণ্ঠব্যাধি ৩৫·৪০ জন ভুগছেন দন্তরোগে আর ২০·০১ জনের আছে পাকাশয় প্রদাহ ও আন্ত্রিক ব্যাধি। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ১৬·৪৭ জন ভুগছেন চর্মরোগে (ছাত্রীদের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ বেশ কম, মাত্র ০·৬৯ জন ছাত্রীর আছে চর্মরোগ)। শতকরা ২৪·৬১ জন ছাত্রের আছে কণ্ঠব্যাধী, ২৩·৩০ জনের আছে চক্ষুরোগ এবং ২০·৬৭ জন ভুগছেন পুষ্টিহীনতা রোগে।

॥ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ॥

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের অনুরোধে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার জন সার্জেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করেছেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, অবস্নাতক ও উত্তরস্নাতক এই চার পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারের সুপারিশ করেছেন তাতেই বোঝা গেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর বিবেচনায় কতখানি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি ১৪ বছর বয়স এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন এবং সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষণকালও এক বছর থেকে বাড়িয়ে দু' বছর করার জন্যে তিনি সুপারিশ করেছেন।

বর্তমানে যে ক্লাস টেন স্কুলগুলিকে ক্লাস ইলেভেন স্কুলে পরিণত করা হচ্ছে তা সার্জেণ্ট সমর্থন করেছেন কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমান শিক্ষকদের যোগ্যতার মান অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

দেশে বিদেশে
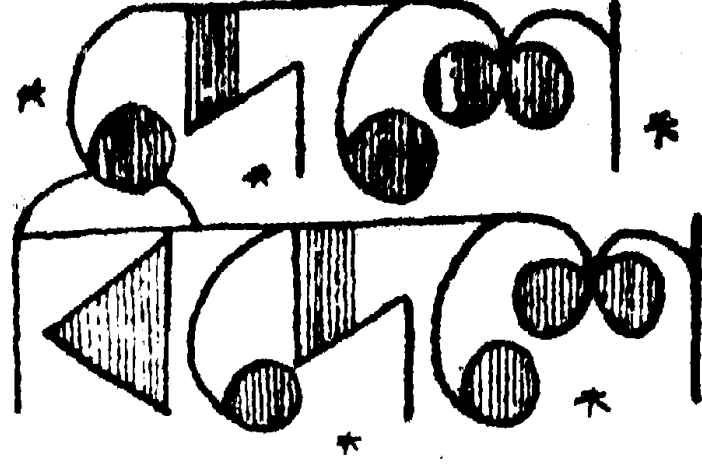
কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য। এতদিন পর্যন্ত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, লজিক, সিভিক্স প্রভৃতি যে সকল বিষয়গুলি ছাত্ররা কলেজে অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ পেত, নতুন ব্যবস্থায় সেগুলি পড়ানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে স্কুল-শিক্ষকদের উপর। যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের চেয়ে কম। এ ব্যবস্থার একমাত্র প্রতিকার হল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও কলেজের অধ্যাপকদের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা। কিন্তু ১৪০্ টাকা বেতনে (তাও শুধুমাত্র সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে) দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম-এ, এম-এস-সি পাস শিক্ষক পাওয়া কল্পনাতীতরূপে অসম্ভব ঘটনা। কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে কোন স্কুলের ভাগ্যে অস্থায়ীভাবে এক-আধজন জুটলেও মফঃস্বলে ঐ বেতনে অধ্যাপকের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সুতরাং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন আপাতত অসম্ভব বলেই মনে হয়, শিক্ষকদের ধর্মঘটের প্রাকমুহূর্তে গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকার শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতনবৃদ্ধির কথা বলেছিলেন, কিন্তু এতদিনে সেকথা বোধ হয় তাঁরা ভুলে গেছেন।

কোন কলেজে এক হাজারের বেশী ছাত্র থাকা উচিত নয় বলে সার্জেণ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বড় কলেজগুলিতে ছাত্ররা সব সময় বসার সুযোগও পায় না। কলেজে যথেচ্ছ ছাত্র-ভর্তি বন্ধ করার সুপারিশ করে সার্জেণ্ট বলেছেন কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ছাত্রদের আর একবার পরীক্ষা নেওয়া উচিত। সাধারণ মেধার ছাত্রদের জন্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট বলে সার্জেণ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যাও ছয় হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে সার্জেণ্ট সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে 'বিশেষ' শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত বলেও সার্জেণ্ট জানিয়েছেন।

সার্জেণ্ট সাহেবের এই মূল্যবান সুপারিশগুলির জন্যে বাঙলা সরকার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এই সুপারিশগুলি নিতান্তই অর্থহীন কথার বোঝা হয়ে থাকবে যদি না তাকে কার্যকর করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়। বাঙলা সরকার কি করবেন জানি না।

॥ ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ ॥

ঢাকায় তরুণ-প্রাণ আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আয়ুবশাহীর নিষ্ঠুর পীড়নযন্ত্র উপেক্ষা করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির হাজার হাজার যুবক বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে সমগ্র পাকিস্থানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানুষকে নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে তার অভিযোগ জানাবার সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রদের এই হঠাৎ বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ কারণ পূর্ব পাকিস্থানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরাবর্দীর গ্রেপ্তার হলেও পরোক্ষ কারণ অন্তহীন। জগদ্দল পাথরের মত সারা পাকিস্থানের বুকে গত চার বছর ধরে চেপে আছে এক জবরদস্ত সৈন্যশাসন। সংখ্যাতীত সমস্যাক্লিষ্ট পাকিস্থানের একটি সমস্যারও এই সৈন্যশাসনের দীর্ঘ মেয়াদে সমাধান হয়নি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটি কথা বলার অধিকারও সেদেশের মানুষের নেই। যাঁদের কাছ থেকে এতটুকুও প্রতিবাদের আশঙ্কা পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকরা করেছেন তাঁদেরই তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছেন। তাই বছরে পর বছর বন্দী হয়ে আছেন ভাসানীর মৌলানা, সীমান্ত গান্ধী গফুর খান। এই জঘন্য পীড়ন ও সৈন্যশাসনের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের তরুণ-প্রাণ যে একদিন গর্জন করে উঠবে তা একরকম জানাই ছিল। ইতিপূর্বেও দশ বছর আগে ঢাকার দুঃসাহসী ছাত্রদল এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ

বিসর্জন করে। যা আমরা পারিনি, তাঁরা তা করেছেন। গৌরবময়ী বঙ্গভাষা আজ পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা। তাঁদের এবারের অভ্যুত্থানও পূর্ণ সাফল্যে গৌরবান্বিত হ'ক—এই আমাদের একান্ত কামনা।

॥ কিউবা একা নয় ॥

লাতিন আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জোট পাকিয়ে কিউবাকে আন্তঃআমেরিকা রাষ্ট্রসংস্থা থেকে বহিষ্কৃত করে যুক্তরাষ্ট্র যে কোন ভাবেই লাভবান হবে না এবং কিউবারও হবে না কোন ক্ষতি একথা গত সপ্তাহেই বলা হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাবলীতে যুক্তরাষ্ট্র বোধহয় তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আন্তঃআমেরিকা রাষ্ট্রসংস্থার সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করেই কিউবার রাষ্ট্রপতি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হাভানার এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেছেন, কিউবা আগের মতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই কিউবার বিপ্লবকে ধ্বংস করতে পারবে না। অপর দিকে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভও কিউবার রাষ্ট্রনায়কদের কাছে এক বাণী প্রেরণ করে জানিয়েছেন, কিউবা একা নয়। সোভিয়েট জনগণ সব সময়েই তাদের পাশে থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাস ও দাসত্ব হতে মুক্তিলাভের জন্য জনগণের সংগ্রাম স্তব্ধ করা অসম্ভব। কিউবার বিপ্লব তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥ আলজিরিয়া ॥

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগল গত ৫ই ফেব্রুয়ারী আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বেতারভাষণ দিয়েছেন তা যদি সত্য হয় তবে এটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে যে, আলজিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। হয়ত এ বছর শেষ হওয়ার আগেই আলজিরিয়ার সপ্তম বর্ষব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটবে। অতীতেও অবশ্য প্রেসিডেন্ট দ্যগলের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অদূরবর্তী বলে মনে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবিতপূর্ব সংকটের ফলে সে সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবারও সমস্যার অভাব নেই সুতরাং আলজিরিয়া সত্যিই স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ঐ অভিশপ্ত আরব দেশটি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করাই নিরাপদ নয়। আলজেরিয়ায় অবস্থানকারী শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীরা ইতিমধ্যেই সতর্ক হয়ে উঠেছে এবং তাদের ইতস্তত আক্রমণের ফলে ইতোমধ্যেই কয়েকজন আরব আলজিরিয়কে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ফ্রান্সেও এই দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থকের অভাব নেই। পরপর কয়েকবার তারা প্রেসিডেন্ট দাগলের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে। এবং যতই আলজিরিয়ার স্বাধীনতার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে ততই তাদের বেপরোয়া কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রাণনাশের চেষ্টাও ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আলজিরিয়াবাসীদের পক্ষে এটা বিশেষ আশার কথা যে জেনারেল দ্যগলের মত একজন শক্ত মানুষের হাতে ফ্রান্সের শাসনদায়িত্ব অর্পিত আছে। নইলে এই আলজিরিয়ার প্রশ্নেই যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে যে প্রায় দুই ডজন মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। জেনারেল দ্যগলের পক্ষে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় অসুবিধা হল আলজিরিয়ার বে-আইনী শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও-এ-এস-এর প্রতি খোদ ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর এক অংশের প্রচ্ছন্ন সমর্থন, আর এই সৈন্যবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জেনারেল দ্যগলের পক্ষে সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। সৈন্যবাহিনীর খুব বেশী বিরোধিতা করতে গেলে ফ্রান্সে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং আলজিরিয়ার স্বাধীনতা জেনারেল দ্যগলের যতই কাম্য হোক না কেন, ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী যদি তাঁর প্রতি বিরূপ হয় তবে তাঁকে শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে আসতেই হ'বে, নয়ত পদত্যাগ করতে হবে।

॥ কোন মধ্যস্থতা নয় ॥

কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত যে কথা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়াও ঠিক সেই কথাই বলেছে পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে। উভয়েরই বক্তব্য হ'ল, তাঁদের দাবীর প্রশ্নে মধ্যস্থের মীমাংসার কোন অবকাশ নেই। কারণ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন সালিশী চলে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শুধু শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানাতে পারে। কিন্তু অন্যায় জেনেও যে পক্ষ অন্যায় করে তার কাছে শান্তির আবেদন ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। চোদ্দ বছর ধরে ভারত পর্তুগালের কাছে আবেদন জানিয়েছিল গোয়া ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু সে আবেদনকে পর্তুগাল কর্ণপাত করার যোগ্য বলেও মনে করেনি। কিন্তু যখনই ভারত রুখে দাঁড়াল প্রাণভয়ে ভয়ার্ত পশুর মত পর্তুগাল পালিয়ে গেল গোয়া ছেড়ে। পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কেও ঠিক সেই একই কথা প্রযোজ্য। যতদিন না হল্যাণ্ডকে বাধ্য করা হবে ঐ দ্বীপাংশটুকু ত্যাগ করতে, ততদিন সে কিছুতেই যাবে না। সুতরাং বন্ধ্যা আলোচনায় অকারণ কালক্ষেপ না করে ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির উদ্দেশ্যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মপ্রধান উ থান্তকে জানিয়ে দিয়েছেন, ওলন্দাজদের বর্তমান মনোভাবে আলোচনা অর্থহীন, সুতরাং উ থান্ত যেন আর মধ্যস্থতার চেষ্টা না করেন। বলা বাহুল্য, ইন্দোনেশিয়ার এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের শংকিতই করে তুলবে। কারণ এর প্রকৃত তাৎপর্য কি পর্তুগালের সাম্প্রতিক ভাগ্যবিপর্যয় থেকে তার বুঝতে বাকি নেই।

ঘটনা-প্রবাহ
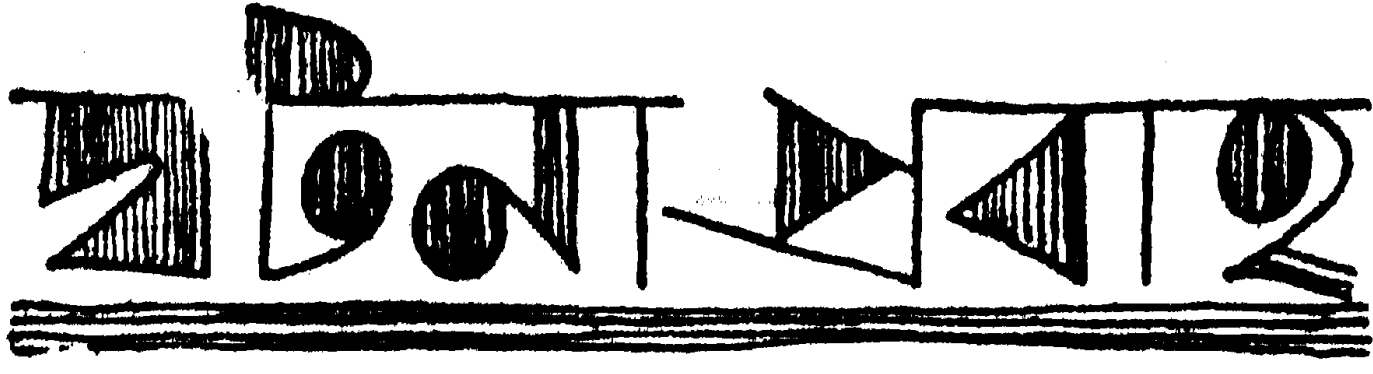
॥ ঘরে ॥

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ : 'সাম্প্রদায়িক দলগুলিই দেশ-বিভাগের জন্য দায়ী'—জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—জনসংঘ, হিন্দু-মহাসভা, আর এস, এস, স্বতন্ত্র পার্টি ও আকালী দল দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

বেতারের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চালানোর পরিকল্পনা বাতিল—প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতানৈক্যের জের।

প্রায় তিনশত কংগ্রেসকর্মী সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত—নির্বাচনে সরকারী কংগ্রেসপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ : শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশকে সমৃদ্ধ করিতে বাংলার যুবকদের প্রতি আহ্বান—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-এর (কলিকাতা) ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

'ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তৃতীয় পক্ষের সালিশী মানিব না'—লক্ষ্ণৌ-এর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কাশ্মীর সম্পর্কে কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) প্রস্তাব অগ্রাহ্যের কারণ ব্যাখ্যা।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ : অষ্টগ্রহ সম্মেলনের প্রথম দিবস (শনিবার) নির্বিঘ্নে অতিবাহিত—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—গ্রহ-শান্তির জন্য সর্বত্র যথারীতি যাগযজ্ঞ, হোম ও নামকীর্তন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহ-যোগিতা চুক্তি সম্পাদিত—কলিকাতায় রুশ প্রতিনিধি মঃ জুকভ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি মিঃ হুমায়ুন কবীরের মধ্যে স্বাক্ষরিত দলিল বিনিময়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ : 'ক্ষুধিত দেশবাসীর মুখে অন্নদান করাই কংগ্রেসের ব্রত—'হায়দ্রাবাদে নির্বাচনী জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—সমাজ-তান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় আহ্বান।

অষ্টগ্রহ সমাবেশের দ্বিতীয় দিনেও (রবিবার) ভারতের কোথাও প্রলয় কিংবা অভাবনীয় কিছু ঘটে নাই—বিশ্বশান্তির জন্য পূজা-অর্চনা ও যাগযজ্ঞ অব্যাহত।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ : 'কংগ্রেসের আদর্শেই দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সম্ভব'—কলি-কাতায় নির্বাচনী সমাবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন শেষ অবধি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত— গ্রহ-সমাবেশের তৃতীয় দিনে (সোমবার) সন্ধ্যায় চন্দ্রের মকর রাশি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ : দুর্গাপুরে নূতন এ, ভি বি শিল্প-সংস্থার (বাংলা ও বৃটেনের সহ-যোগিতার নিদর্শনবাহী) উদ্বোধন অনু-ষ্ঠান ডাঃ রায় (মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক সম্পন্ন।

'সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ ভিন্ন ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইবে'—মাদ্রাজের জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : আসামের বিভিন্ন সহরে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট—দাবী পূরণে সরকারের ব্যর্থ-তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ডিব্রুগড়ে ১১ হাজার ছাত্রের শিক্ষায়তন বর্জন।

'একমাত্র কংগ্রেসই জাতিকে অগ্র-গতির পথে পরিচালনা করিতে সক্ষম'—আসানসোলে নির্বাচনী সভায় মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায়ের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ : মিঃ সুরাবর্দী (প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী) গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র-বিক্ষোভ ও ধর্মঘট—অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বন্দীর মুক্তি দাবী।

পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দো-নেশিয়া-নেদরল্যাণ্ড বিরোধের মধ্যস্থতায় উ থাণ্টকে (রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল) বিরত থাকিতে ইন্দোনেশীয় সরকারের অনুরোধ—পশ্চিম ইরিয়ানে, সৈন্য প্রেরণে ওলন্দাজ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ : স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক মার্চ মাস পর্যন্ত স্থগিত—রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সি এস ঝার যুক্তিপূর্ণ ভাষণের পর কার্য-ব্যবস্থা।

ভূগর্ভে রাশিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ (পরীক্ষামূলক) ঘটানোর সংবাদ।

প্রচণ্ড মরু-ঝঞ্ঝায় সমগ্র সুয়েজ অঞ্চল প্রায়ান্ধকার—সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ : ঢাকায় ছাত্রদের সভায় পাক্ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ মনজুর কাদির নাজেহাল—প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইয়া শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন।

কিউবা হইতে আমেরিকায় সর্ব-প্রকার আমদানী নিষিদ্ধ—কাস্ট্রো সর-কারকে (কিউবান) শায়েস্তা করার জন্য কেনেডির ব্যবস্থা অবলম্বন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ : পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজদের সৈন্য ও যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ।

পূর্ব পাকিস্তানের স্থানে স্থানে মিঃ সুরাবর্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ : সর-কারের 'মজুরী বৃদ্ধি স্থগিত' নীতির প্রতিবাদে বৃটেনে ৩০ লক্ষ শ্রমিকের (জাহাজ নির্মাণ ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগীয়) ধর্মঘট।

শান্তিপূর্ণ আলোচনা মারফৎ আলজিরিয়ায় শীঘ্র যুদ্ধাবসানের সম্ভা-বনা—ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের বেতারভাষণ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ : ঢাকায় পুলিশ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ—লাঠি-চালনায় ৭জন ছাত্র আহত : সমস্তদিন ব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ।

টোকিও-এ প্রচণ্ড ভূকম্পনের সংবাদ।

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : কাঁদুনে গ্যাস উপেক্ষা করিয়া নারায়ণ-গঞ্জ হইতে ঢাকা অভিমুখে বিরাট মিছিল—ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে দিশেহারা পাক্-প্রেসিডেন্টের (আয়ুব খান) ঢাকা হইতে বিদায় গ্রহণ।

আলজিয়ার্সে অব্যাহত সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা।

পশ্চিম জার্মাণীর খনিগর্ভে প্রবল বিস্ফোরণ—প্রায় তিনশত শ্রমিক নিহত।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ সাহিত্য ও শিল্পে রাষ্ট্রীয় বদান্যতা ॥

সম্প্রতি জনৈক কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে চারুশিল্প সম্পর্কে সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেই বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অবহিত, চারুশিল্প উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতির পথে। রাষ্ট্রীয় আগ্রহ এক বস্তু, উন্নয়নের প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নামক বস্তুটি বিস্ময়কর. এই গুরুদায়িত্ব তাঁরা কাঁধে তুলে নিতে চান এবং সেইখানেই সমগ্র বিষয়টি বিশেষভাবে বিচারের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা সহসা কলালক্ষ্মীর প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন কেন, রাজনৈতিক মঞ্চ ত্যাগ করে মুকুটহীন রাষ্ট্রপ্রধানগণ কি অতীতের মুকুটধারী রাজন্যবর্গের সকল দোষগুণ অধিকার প্রয়াসী। আগে রাজাদের সভাকবি, সভাশিল্পী, সভাগায়ক প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। উনবিংশ শতকের গোড়ার-দিকে বহু বাংলা গ্রন্থ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার মহারাজা, বর্ধমানের মহারাজা, বগুড়ার নবাব নবাব আলি চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্য-প্রেমিক মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছে। পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতির মত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক একালে আর দেখা যায় না। বাংলা দেশের ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকবর্গ ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। মথুরেশের অভিধান "শব্দ রত্নাবলী"তে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মুসা খানের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"যল্লক্ষ্মীর্বৈরিণাং কুলবধূ সিন্দুর
বিধ্বংসিনী—
যদ্বাণী ললিতা সতাং
গুণবতামানন্দকল্লোলিনী।
যদ্বাক্যোত্তরকল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদি
পৃথ্বীভুজাং
সোঽয়ং শ্রীমশনন্দ এল্লিনৃপতি
র্জীয়াচ্চ চিরং ভূতলে।।"

অর্থাৎ যাঁর সৌভাগ্যে প্রধান শত্রুবর্গের কুলবধূদের সিঁদুর মুছে যায়, যাঁর ললিতবাণী সৎ ও গুণবান লোকের অন্তরে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত করে। যাঁর দানশীলতা কর্ণাদি রাজাদেরও গৌরব ম্লান করেছে, এই সেই মশনদ আলি ভূতলে চিরজীবী হোন।। (মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী॥ ডঃ সুকুমার সেন)

পরে এইভাবে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত প্রবল প্রতাপান্বিত মশনদ আলির অনুজ শ্রীমহম্মদ খান এবং কন্দর্প সহোদর অতিরসিক আবদুল্লা খানের প্রশস্তিও আছে।

এই জাতীয় প্রচুর উদ্ধৃতিদান করা যায়, এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার যুগের মহাজন আনুকূল্য-পুষ্ট গ্রন্থাদির উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি একটি দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই পৃষ্টপোষকতার মধ্যে একটি জিনিস ছিল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ধনী এবং প্রতাপশালীদের যে তোষামোদ করা হত তা কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশায়—তাঁদের নির্দেশে নয়। দানের পুঁটুলির সংগে আর কোনো অদৃশ্য তার বাঁধা থাকতো না। সংগীত, সাহিত্য, শিল্প, স্বতোৎসারিত গতিতেই অগ্রসর হয়েছে, কোনোরকম প্রতিযোগিতা, বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি।

সরকারি আনুকূল্যের উল্লেখ কিন্তু একটা সাধারণ ঘোষণা মাত্র নয়। অনেক সময় সভার মধ্যে অনেক কথা ভাবাবেগে অনেকেই বলেন, উপস্থিত জনগণের করতালির দ্বারা তার তাৎক্ষণিক প্রশস্তিও পাওয়া যায়, তারপর মহারাজ দুষ্মন্তের মত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সংগেই সব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়। এই ঘোষণাও সেই জাতীয় কি না কে জানে। যদি তাই হয়, তাহলে মঙ্গলে নতুবা সরকারি কর্মচারীরা চারুশিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতির যদি কর্ণধার হন, এবং প্রতিটি আঞ্চলিক রাজ্যে কড়া পাহারায় তার উন্নয়ন ব্যবস্থা করেন তাহলে কিন্তু দেশের পক্ষে, চারুকলা বা সাহিত্যের পক্ষে, কোনো দিক থেকেই তার ফল শুভ হবে না। রাজপুরুষরা অতিশয় কর্মব্যস্ত, তাঁদের সর্বদাই কাজের ভিড়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তারপর নিরন্তর সফর আছে, আজ এখানে কাল ওখানে, তাছাড়া নিজস্ব জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা, দিয়ে [illegible] প্রবৃত্ত হন তাহলে শিল্প ও সাহিত্যের পক্ষে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। টেকস্‌ট বুক কমিটির আনুকূল্যে পাঠ্যপুস্তকের যে দুর্দশা সাহিত্যেরও সেই দুর্দশা ঘটা অসম্ভব নয়। আধুনিক যুগের যেসব সরকারি কর্মচারী উচ্চপদাধিকারী তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, এবং সুরুচিসম্পন্ন। কদাচিৎ যে এর মধ্যে উন্নাসিক, বিকৃত রুচির মানুষ পাওয়া যায় না তা নয়, তবে সেই জাতীয় মানুষ শুধু সরকারি দপ্তরে নয়, সর্বশ্রেণী এবং সমাজেই আছে। মোটামুটিভাবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সরকারী কর্মীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সহানুভূতিতে সমৃদ্ধ মানুষ অসংখ্য আছেন, কিন্তু সেই সংগে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ঠিক মানুষটি ঠিক জায়গায় বসে নেই। যিনি শিল্প সম্পর্কে বিচারের অধিকারী, তিনি হয়ত কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা, যিনি সাহিত্য বিচারের অধিকারী তিনি পূর্ত বিভাগের কাজে ব্যস্ত, সুতরাং সাহিত্য ও শিল্পের রাষ্ট্রীয় বিচার, উন্নয়ন, পুরস্কার বা তিরস্কার কিভাবে যে হবে তা অনুমেয়। যদি উমেদারীর দ্বারা অক্ষম ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ লাভ করে তাহলে তার ফলে যে গভীর হতাশা ও ক্ষোভের উৎপত্তি হয় তা নয়, সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা বিষয়ে সাধারণের অন্তরে একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়, এবং অনেক সময় দেখা যায় প্রশংসনীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাও সাধারণের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করে না।

সাহিত্য ও চারুশিল্প শুধুমাত্র বাধাবন্ধহীন মুক্ত পরিবেশেই বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রচুর অবসর এবং অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে। সৃজনশীল মানুষ চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এতটুকু বাধা বা বিপত্তি তার স্বাধীন চিন্তাকে ক্ষুণ্ণ করে। অনুকূল পরিবেশটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, সামান্য একটা শব্দ, একটা সাময়িক উক্তি, বা প্রতিকূল পরিবেশ অনেক মহৎ সৃষ্টির সর্বনাশ সাধন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমাদের বলেছিলেন— "লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী, গর্ভিণীকে যেমন পরিচর্যা করতে হয়, তবে তিনি সুপ্রসব করেন, লোকলক্ষ্মীকেও তেমনি সন্তর্পনে পরিচর্যা করতে হয়, তবে সৃষ্টি হয় মহৎ সাহিত্যের, মহৎ শিল্পের।" রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি সেদিন শুনে-

ছিলাম তা আজো আমাদের মনের মাঝে দাগ কেটে আছে। কারখানায় বসে ফোরম্যানের নির্দেশে সাহিত্য সৃষ্টি বা শিল্প সৃষ্টি করা কোনোকালেই সম্ভবপর নয়। স্বাধীনতা ও অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য আজকের দিনে কোথায়, : বেতার-শিল্পীদের দুর্দশা সংবাদপত্র-পাঠকের অজানা নেই, ফিল্মের জন্য উপযুক্ত কাঁচা মালের অভাব, তার ওপর আছে সেনসরের কাঁচি, সবরকম সাহিত্য-গ্রন্থ আমদানি করার অবাধ অধিকার নেই, চিত্র সম্পর্কেও সেই কথাই বলা যায়। ভাস্কর যে জাতীয় মৃত্তিকায় মূর্তি-গঠনপ্রয়াসী সেই মৃত্তিকা হয়ত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। বাজারে পাওয়া যায় না। শিল্পীর রঙ আমদানী নীতি অনুসারে বিদেশ থেকে আনা যাবে না, যদিও যায় তার মূল্য অনেক বেশী, করভার প্রচণ্ড। স্থপতি দেশলাই বাক্সের মত বাড়ি করবেন কিন্তু সিমেন্টের অভাব। সংগীতকার কিংবা কবি যে নিভৃতে বসে সংগীত বা কবিতা রচনা করবেন তার উপায় নেই, চারপাশে কলকারখানা, ট্রাম বাস, মোটরের বীভৎস চীৎকার, ছন্দ যতি মিল সব সেই আসুরিক উৎপাতে দেশ ছেড়ে পালানোর উপক্রম করে।

সরকারি ব্যবস্থায় যদি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের মত একটা চারু-শিল্প ও সাহিত্যের কারখানা খোলা হয় তাহলে সেটা হয়ত সাহিত্য ও শিল্পের আতুরাশ্রম হয়ে উঠবে সং এবং মহৎ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম সরকারি আওতায় গড়ে উঠতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশে ত নয়ই। এদেশে এখনও ইংরাজ আমলের "প্যারিটি" ব্যবস্থা বজায় আছে। জন-সংখ্যা অনুপাতে যেমন করের বণ্টন হয়, সাহিত্য বা শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়োজন আঞ্চলিক অবস্থা বিবেচনা করেই স্থিরীকৃত হয়, নিছক গুণানুসারে নয়।

তাই মনে হয়, সরকারি আনুকূল্যে সবরকম বাধা-বিপত্তি দূর হোক, মহৎ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মতো অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠুক। কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে অহেতুক অশোভন প্রতিযোগিতা দূর হোক, আনুকূল্য আর অনুগ্রহ এই দুটি বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা যদি বিচার করা যায়, তাহলেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার একটা সুন্দর ফললাভ করা যায়। যোগ্য ছাত্রদের যেভাবে বৃত্তি দান করা হয় ঠিক সেই মনোভঙ্গীতে এবং মাপকাঠিতে সাহিত্য বা শিল্পের বিচার করা অসংগত, অশোভন এবং অমর্যাদাকর—এই কথা স্মরণ করা সকলের কর্তব্য। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নের চরম দায়িত্ব শিল্পী ও লেখকের, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের নয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও রাষ্ট্রীয় বদান্যতার মোহমুক্ত হতে হবে।

নতুন বই

প্রতিধ্বনি ফেরে— (উপন্যাস) : প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলি-৯। দাম—৪·০০।

কবি এবং গল্পকার হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এক অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার অধিকারী। উপন্যাস রচনায় ইতিপূর্বে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা না গেলেও সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কথাসাহিত্যের সে বিভাগেও যাতায়াত করেছেন তিনি একাধিকবার। এবং তার মধ্যেও প্রেমেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে।

আলোচ্য উপন্যাসখানি কিন্তু সেদিক দিয়ে অন্য জাতের সৃষ্টি। এর মধ্যে কেবল প্রতিভার হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়, এমন একটি সাধনার স্বাক্ষর দেখা যায়, যার ফলে নির্ভুলভাবেই একে লেখকের সমগ্র জীবনের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি বলে সনাক্ত করা সম্ভব। বাস্তবিক, একদিকে অত্যন্ত স্বচ্ছ বাস্তবনিষ্ঠা এবং অন্য-দিকে কাহিনীর বহিরঙ্গের আড়ালে একটি দ্বিতীয় বক্তব্য উপস্থাপনার দক্ষতায় এই উপন্যাস কেবল প্রেমেন্দ্র-বাবুরই নয়, সাম্প্রতিককালে রচিত সমস্ত কথা-সাহিত্যের মধ্যেই অবিস্মরণীয়।

কাহিনীর নায়ক উমাপতি ঘোষাল অগ্নিযুগের দেশকর্মী, বর্তমানকালের সাংগঠনিক নেতা, কিন্তু উপন্যাস যখন শুরু হ'য়েছে তখন তিনি মৃত। তাঁরই প্রতিধ্বনি ফেরে পরিচিত নারীপুরুষের স্মৃতির দেয়ালে প্রত্যেকের কাছেই তিনি বিভিন্ন—একটি ত্রিশির পরকলায় বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণে ছড়িয়ে পড়ে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কেউই তাঁকে সম্পূর্ণ করে পায়নি, বোঝেনি। ব্যতিক্রম বোধহয় শুধু অশীতিপর বৃদ্ধ নিশীথবাবু এবং যৌবনমত্তা তরুণী মলয়া। একজন সস্নেহ অভিজ্ঞতা আর অন্যজন সপ্রেম অভিজ্ঞানে উমাপতিকে বুঝতে পেরেছিলেন কিছুটা। অন্য সকলে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভগ্নাংশকেই পূর্ণতর মর্যাদা দিতে গিয়ে বিড়ম্বিত হ'য়েছেন।

কিন্তু নিশীথবাবু আর মলয়ার দৃষ্টিকোণ একেবারে পরস্পর-বিরোধী। উমাপতির স্মৃতিসভায় নিশীথবাবু বলেন, '......এক আশ্চর্য মিছিলের মশাল সে জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি বলে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে।......' আর মলয়া তার মা নীরজাদেবীকে (যিনি সে সময়ে উমা-পতির অন্যতম ভক্ত ছিলেন, তাঁকে) ধমক দিয়ে বলেছে, 'তুমি থামো তো মা। ও'র ভেতরেও যে একটা মানুষ আছে আমাদের মত, সেইটে সবাই মিলে তোমরা ভক্তি আর ভয় দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে চাও।'

আর এ দুই মেরুর মধ্যবর্তী অংশের অভিজ্ঞতা হল জয়ার। তার উদ্দীপ্ত দেশপ্রেম, যুক্তিবাদের প্রতি নিষ্ঠা এবং কল্যাণময়ী আত্মসংযম তাকে দিয়ে মনে মনে উমাপতির উদ্দেশ্যে বলিয়েছে, 'তুমিও বাঁধা পড়বার জন্যে তৈরী হওনি, আমিও বাঁধবার জন্যে নয়। ঘর আমাদের জন্যে নয়, আলো-আঁধারী এই নির্জন শহরের একটা নিরুদ্দেশ রাতই আমাদের সম্বল হ'য়ে থাক।'

একশ পচাঁত্তর পৃষ্ঠার এই অনতি-বৃহৎ উপন্যাসখানির সুনিপুণ রচনা-কৌশলে বৃহদায়তন একটি মহাকাব্য পড়ার অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। এ জগতে কিছুক্ষণ বাস করার পর আমাদের নিজেদের অস্তিত্বও অন্যতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এতে কেবল বিভিন্ন নারীপুরুষের স্মৃতিচারণে উমাপতিকেই স্পষ্টতর করে চেনা গেল তা নয়, উমাপতির সংগে তাদের বিচিত্র আচরণের টানাপোড়েনে একটা সম্পূর্ণ যুগকেও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হল। বর্ণনার তীক্ষ্ণ-তায়, প্রাসংগিক মন্তব্যের বৈদগ্ধ্যে, এবং সর্বোপরি চরিত্রসৃষ্টির অপরিমেয়

মমতায় 'প্রতিধ্বনি ফেরে' আমাদের কালের মতোই অনাগত ভবিষ্যতের পাঠকদের মনেও যে প্রতিধ্বনি তুলবে তাতে সন্দেহ নেই।

বইখানির প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা অভিনব।

বেণু ও বীণা— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস, এন, রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪-০০।

রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে যে দু'চারজন কবি স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। মৌলিক ভাব-ভাবনার প্রকাশ তাঁর কবি-মানসকে বিহ্বল না করলেও, বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্যে তাঁর কাব্যসৃষ্টির আনুকূল্যে অনাস্বাদিতপূর্ব আস্বাদন দান করেছে আমাদের। শব্দের চয়ন-বয়ন ও প্রয়োগ-কৌশলের অদ্ভুত যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ। অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর মধ্যে। বিভিন্ন ছন্দের উপর ছিল তাঁর অপরাজিত প্রত্যয়। নানা ছন্দের বেসাতীকার ছন্দ-সরস্বতী সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যলক্ষ্মীর যে অফুরান ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে গিয়েছেন, আজও তা যেমন রসিকজনের বিলক্ষণ উপভোগের সামগ্রী হয়ে আছে, নিরবধিকালও তেমনি থাকবে।

'বেণু ও বীণা' সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-মাধুর্যের প্রাথমিক প্রকাশ। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বয়ঃক্রমকালেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। এই গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩১৩ সালের আশ্বিনে, এবং এই কাব্যগ্রন্থের সমূহ কবিতাগুলিই তাঁর দ্বাদশ বর্ষ থেকে পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯শে মাঘ। কবিতা-রচনার এই কাল ও কবির জন্মকাল নির্ণীত হয়েছে সত্যেন্দ্র-নাথ লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ও কবিবন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়'-এর মধ্যে। আলোচিত বর্তমান সংস্করণে এই দ্বিবিধ বিষয়ই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সর্বসমেত বিবিধ বিষয়ের পঁচাশিটি কবিতায় 'বেণু ও বীণা' সমৃদ্ধ। অধিকাংশ কবিতা আকারে দীর্ঘ হলেও, নাতিদীর্ঘ কবিতাও আছে বহুসংখ্যক। দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর, প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ এরূপ একখানি সুমুদ্রিত ও উল্লেখযোগ্য কাব্যরসসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করে কাব্যরসিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা—(প্রবন্ধ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম—পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ— (প্রবন্ধ) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবন্ধকার হিসাবে বাঙলা দেশে সুপরিচিত। বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও দীর্ঘ-দিনের। তিনি দীর্ঘকাল রবীন্দ্র-সাহিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতিবাহিত করে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়', 'বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ', 'শিক্ষার লক্ষ্য', 'শিক্ষাসমস্যা', 'শিক্ষার মুক্তি', 'ভাষার মুক্তি', 'সাহিত্যের মুক্তি' প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে যে অভিমতসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে তার দ্বারা বিদগ্ধ পাঠক অনেক কিছু জানতে পারবেন। এমন কি শিক্ষা-ব্রতী মানুষকে শিক্ষাব্যাপারে অনেক কিছু জানবার প্রেরণা দেবে এ প্রবন্ধ-গুলি। কেবলমাত্র রবীন্দ্রচর্চা নয় বর্ত-মান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় আলোকপাত করবে আলোচিত বিষয়-সমূহ। শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থ পর্যায়ে আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দ্বিতীয় গ্রন্থটির রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণ। পূর্ববর্তী সংস্করণে

গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের রচনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে সত্যকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তার দ্বারা রবীন্দ্রশিল্প ও সাহিত্যজগতের স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের রসাবেদন কেবলমাত্র বুদ্ধির কাছে নয় তার জন্য স্বতন্ত্র রসঘন জগতে উত্তরণের প্রয়োজন আছে। সেকথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই দরদী রবীন্দ্র-পাঠকের কাছে গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ', 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা', 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা', 'রবীন্দ্রনাথের তুমি ও আমি' আলোচনাগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। রবীন্দ্র-সাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অপরিহার্য।

প্রাচীর— (উপন্যাস), মীরা মজুমদার প্রকাশক : নবযুগ সাহিত্য মন্দির। ৩নং বেলিয়াঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা-১০। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—তিন টাকা।

একটি বিশেষ আদর্শ মনে রেখে এই উপন্যাসখানি রচিত। এবং সে আদর্শ সাধারণ গল্পের মনস্তাত্ত্বিক কসরৎ দেখানোর কৃতিত্বে শেষ নয়। এর মানস-পরিধি আরও ব্যাপক এবং গভীর। একটি নারী তার অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে মাথা তুলতে যে আত্মত্যাগ করেছে, তার সঙ্গে দেশের সকল 'এক চাকাতেই বাঁধা" নারীর চিত্রের যোগ স্থাপন করাই লেখিকার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে লেখিকা ঘরের এবং বাইরের পরিবেশ চিত্র যা এঁকেছেন তা যেমন বাস্তব, তেমনি সুন্দর। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকারের কথা শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেখিকা ঠিক সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই মনে রেখেছেন কাহিনী রচনার সময়। এ বইতে স্বভাবতই সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অনেক মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে লেখিকার। সে সব মতামত যেমন জোরালো তেমনি স্পষ্ট। লেখিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং লেখিকারূপে আশাপ্রদ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন এ বইতে। ভাষা স্থানে স্থানে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে, মনকে নন্দিত করে। শক্তির পরিচয় এর প্রতি পৃষ্ঠায়।

শান্তির পাখিরা এবং তুমি— (কবিতা)। সুধাংশু তুঙ্গ। দিশারী। ৫২ গ্রে স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। মূল্য : দু'টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলে কবির সত্তা এবং কবিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রেম এবং নিসর্গের পরিমন্ডলে আশ্রিত একটি অনুভূতিশীল কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতানিচয়ে। কিছু আবেদনক্ষম চিত্রকল্প এবং পংক্তিও রয়েছে কবিতাগুলিতে। কিন্তু, এই কাব্যের ভাবনায় এবং কবিতার ভাষাশরীর-নির্মাণে জীবনানন্দের প্রভাব এতই অধিক এবং সুস্পষ্ট যে, প্রায়শই তা আলোচ্য কবিকৃতির আবেদনের স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্বতাকে ক্ষুন্ন করে। কবির সিদ্ধির পক্ষে তা একটি প্রধান অন্তরায়। তবু, কাব্যগ্রন্থটি কবির পরবর্তী সৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে।

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র কবিতাপুস্তকটির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

প্রথম তারার আলো— (কবিতা)। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য : দুই টাকা। নব নীপম্। ১৪, ভুবন ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা—৭।

অনাধুনিক ভঙ্গিমায় লিখিত চল্লিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে এই পুস্তকে। অবশ্য আধুনিকতার অনিবার্য কিছু প্রভাব রয়েছে কাব্যভাষায়। বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও রচনা হিসাবে সার্থক, নতুন এবং নিপুণ কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই গতানুগতিক এবং অনুজ্জ্বল। কদাচিৎ দু-একটি চকিত প্রতিশ্রুতিময় পংক্তি চোখে পড়ে।

পল্লী পুনর্গঠন—(সমাজ - বিজ্ঞান) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।। অনুবাদক—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকনিধি (বাংলা শাখা)— পরিবেশক— সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি। সি৫২০, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

মহাত্মা গান্ধী পল্লী সংগঠন এবং সংস্কার সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং সেই সব রচনা তাঁর সম্পাদিত Young India এবং 'Harijan' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই সব প্রবন্ধ এবং অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সংকলন করে স্বর্গীয় ভরতন কুমারাপ্পা মহাশয় নবজীবন ট্রাস্টের পক্ষে "Rebuilding our Villages" নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন আলোচ্য গ্রন্থটি সেই ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গান্ধীজী ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ উন্নতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিতেন। তিনি বলতেন—ভারত আসলে বাস করে গ্রামে। গ্রামবাসীদের শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল, তাদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহামানবের কি আদর্শ ছিল, কি তিনি চেয়েছিলেন তা এই গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যাবে। শুধু গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতি নয় তাদের আত্মিক উন্নতির প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা আর্থিক দিকটার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়ে আত্মিক দিকটির অবহেলা করছি একথা বলা বাহুল্য। আজ গান্ধীজীর শারীরিক উপস্থিতি আমাদের মধ্যে নেই, এই জাতীয় রচনার মাধ্যমে সেই মহাপুরুষকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য আমাদের সহজ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির অনুবাদ সুন্দর, স্বচ্ছ এবং সাবলীল। পরিশেষে লেখক ভূদান আন্দোলনের লক্ষ্য এবং তাৎপর্য নামক প্রবন্ধটি মহাত্মাজীর রচনাবলীর লেজুড় হিসাবে না জুড়লেই হয়ত ভালো করতেন। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা— (প্রবন্ধ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—২-৫০।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসবের সঙ্গে আজ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম মনীষী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসবও জড়িত। বিপ্লবী 'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বৎসর ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানতপস্বী ব্রহ্মবান্ধব যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতাও করেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে সুহৃদ হিসাবে গ্রহণ করে,

তাঁর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উক্তি করে গিয়েছেন। একস্থানে তিনি ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক, —তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

'Sophia' পত্রিকায় 'The World-Poet of Bengal' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 'The Twentieth Century' পত্রিকায় কবির 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা করেন। এতদ্-ব্যতীত অন্যান্য নানা বিষয়ে বহু জ্ঞান-গর্ভ রচনায় সমৃদ্ধ ছিল উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী। এই রচনা-সম্ভারের মধ্যে পুস্তকাকারে 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' অন্যতম। বাংলার ১৩১৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা'র মধ্যে এই গ্রন্থখানি ব্যতীত 'বাংলার পাল-পার্বণ' ও 'আমার ভারত উদ্ধার' একত্রে স্থানগ্রহণ করেছে।

'বাংলার পাল-পার্বণ'-এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, জামাইষষ্ঠী, স্নান-যাত্রা, রথ-যাত্রা, 'কোজাগর লক্ষ্মী পূজা, শিব চতুর্দ্দশী, দোল-লীলা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে নিরপেক্ষ শ্রদ্ধায়। 'আমার ভারত উদ্ধার' প্রবন্ধটির মধ্যে ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিগত জীবনে স্বাদেশিকতার প্রভাব কিভাবে সূচিত হয় তারই রসগর্ভ চিত্র চিত্রিত হয়েছে। দার্শনিক ও সাংবাদিক হয়েও তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে বক্তব্যস্পষ্টতা ও সাবলীল ভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিস্মৃতপ্রায় এই সকল রচনাসমূহের একত্র প্রকাশ অত্যন্ত যুগোপযোগী ও সৎসাহিত্যপ্রকাশ-চিকীর্ষার নিদর্শন।

স্বরকল্লোল (গান ও স্বরলিপি)—**ননীগোপাল আইচ। প্রকাশক : প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়। শতদল। ৪৯১, ডায়মণ্ডহারবার রোড। কলিকাতা-৩৪। দাম—২-৭৫ নয়া পয়সা।**

এই গ্রন্থে চব্বিশটি গান ও সংগীত-লিপি মুদ্রিত হয়েছে। সব গানেরই কথা ও সুর গ্রন্থকার শ্রীননীগোপাল আইচ-কৃত। উক্ত গানগুলিতে যে-সব রাগ প্রয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশই প্রচলিত। তা ছাড়া, হংস, সুখল খাম্বাজ ও নাটিকা রাগের গানও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে ব্যবহৃত রাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাল-নির্দেশ দেওয়া আছে। দু-একটি রাগ পরিচিতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু মতান্তরের অবকাশ আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে যে স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বহুল প্রচলিত বাংলা 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি'র সঙ্গে তার অনেকাংশে সামঞ্জস্য থাকলেও হুবহু এক নয়; আবার উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল রাগসংগীতের ক্ষেত্রে যে স্বরলিপি পদ্ধতিগুলি বর্তমানে অধিক প্রচলিত তা থেকেও ভিন্ন।

কবিতা ও গানের ছন্দে প্রায়শঃ পার্থক্য থাকে। গানের উদ্দেশ্যে যে-কবিতা রচিত তাতে যদি কাব্যগত ছন্দের সাবলীলতার অভাব ঘটে, নিয়মিতভাবে সুর-তালবদ্ধ হয়ে সে-কবিতা গানের রূপ নিলে ওই অভাব ঘুচে যায়। পূর্বে আলোচিত 'সুর ও বাণী' গ্রন্থে এবং আলোচ্য গ্রন্থে তার কতক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

'স্বর কল্লোল' গ্রন্থে শ্রীননীগোপাল আইচ রাগসংগীতের ভিত্তিতে স্বকীয় রচনাকে সুর-তালাবদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

ঐতিহাসিক ও জীবনী-চিত্র :

"রাজসিংহ" বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, "ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।......উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।......উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।" ......অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে যদি উপন্যাস বা নাটক কিংবা কাহিনী-চিত্র রচনা করা যায়, তাহলে তাদের যোল আনাই যে ইতিহাস হতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। উপন্যাস বা নাটকের একটা ধর্ম আছে। তার ভিতর দিয়ে যে-কাহিনী বলা হয়, তাকে হৃদয়গ্রাহী, রসঘন, রোমাঞ্চকর বা নাটকীয় করবার জন্যে কাহিনীকারকে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ করতে হয়। নইলে ইতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাস বা নাটকের উপজীব্য করে তোলা যায় না। ঠিক সমানই কথা বলা যায় জীবনী-নাটক বা জীবনী-চিত্র সম্বন্ধে। আত্মজীবনীর ওপর রং চড়িয়ে উপন্যাস লেখা বহু হয়েছে, যেমন আমাদের শরৎচন্দ্র-লিখিত 'শ্রীকান্ত'; কিন্তু অপরের জীবনী নিয়ে—যেমন, লুই পাস্তুর এমিল জোলা, ইজাডোরা ডানকান, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নিয়ে—জীবনচরিতই লেখা হয়েছে, উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু জীবনী নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহু নাটক এবং সাম্প্রতিক কালে কাহিনী-চিত্র রচিত হয়েছে। এই জীবনী-নাটক রচনার ব্যাপারে 'এব লিঙ্কন ইন ইলিনয়েস'-এর নাট্যকার রবার্ট এমেট শেরউড বলেছেন, "The playwrights' chief stock in trade is feelings, not facts. When he writes of a subject out of history, or out of today's news, he cannot be a scholarly recorder or a good reporter; he is, at best, an interpreter, with a certain facility for translating all that he has heard in a manner sufficiently dramatic to attract a crowd. He has been granted, by a tradition that goes back to the kings of Thebes, considerable poetic license to distort and embellish the truth; and he generally takes advantage of far more license than he has been granted."

তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে, অগ্রগামীর 'কান্না' চিত্রের একটি দৃশ্যে নন্দিতা বসু ও উত্তমকুমার।

(নাট্যকারের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে তার অনুভূতি, ঘটনার যাথার্থ নয়। ইতিহাসের কোনো বিষয়, বা আজকের দিনের কোনো সংবাদকে অবলম্বন করে যখন সে রচনা করে, তখন সে একজন বিদগ্ধ দলিল-লেখক বা উৎকৃষ্ট সংবাদদাতা নয়; সে বড় জোর একজন ব্যাখ্যাতার কাজ করে এবং তাও সে যা-কিছু শুনেছে, তাকে তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এমন নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করে, যাতে বহুজন আকৃষ্ট হয়। থিব্‌সের রাজার যুগ থেকে লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐতিহ্যসূত্রে এতখানি কবিসুলভ স্বাধীনতার সে অধিকারী যে, সে সত্যকেও বিকৃত এবং সুসজ্জিত করতে পারে। এবং সাধারণতঃ তাকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার থেকেও বেশী স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে।) উদাহরণচ্ছলে তিনি বলেছেন, যিনি আসল ক্লিওপেট্রা ছিলেন, সেক্সপীয়ারের সৃষ্ট ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর হয়ত কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না এবং বার্নার্ড শ' কর্তৃক সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অঙ্কিত ক্লিওপেট্রা থেকেও তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ছিলেন। অথচ এ নিয়ে

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'সুবর্ণমান' চিত্রের একটি দৃশ্যে তৃপ্তি মিত্র, আরতি মৈত্র ও বেচু সিং।

মশরবাসীদে মধ্যেও কেউ আজ মাথা ঘামায় না।

নাট্যকার বা চলচ্চিত্র-কাহিনীকারের প্রধান লক্ষ্য, কাহিনী বা নাটক হিসেবে তার রচনা সার্থক কিনা। তিনি ইতিহাসও লিখতে বসেন না বা জীবন-চরিতও লিখতে বসেন না। তাই ঐতিহাসিক পারম্পর্য বা খুঁটিনাটির দিকেও যেমন তাঁর নজর দেবার সুযোগ নেই, তেমনই কোনো জীবনীর সকল ঘটনা যথাযথ লিপিবদ্ধ হ'ল কিনা, তাও তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। মাত্র তাঁকে মনে রাখতে হয়, ইতিহাস বা জীবনী যেন 'অযথা' বিকৃত না হয়। অর্থাৎ 'যথা' বিকৃত করবার অধিকার তাঁর আছে। নাটক বা কাহিনীর গুরুতর প্রয়োজনে তিনি ঐতিহাসিক বা জীবনী সংক্রান্ত তথ্যকেও বিকৃত করতে পারেন। ইতিহাসে কোনও দুটি ঘটনা হয়ত' কিছু-দিন—সে দু'দিন বা দু'বছরও হতে পারে—বাদে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকার বা কাহিনীকার তাঁর রচনার সৌকর্যার্থে সেই দুটি ঘটনাকে একই সঙ্গে বা আগে-পিছে করেও ঘটাতে পারেন। আর ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে ত' কথাই নেই। লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেন। যেমন সেক্সপীয়র এবং শ'র ক্লিওপেট্রা, তেমনি আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ অঙ্কিত ঔরংজীব চরিত্র। বিভিন্ন লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই ঐতিহাসিক চরিত্রকে দেখতে পারেন। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্য, আর ক্ষীরোদপ্রসাদ অঙ্কিত প্রতাপাদিত্য এক নয়। তবে লেখককে কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ ধারণার প্রতি অবহিত থাকতে হয়। ভগবানকে শয়তান এবং শয়তানকে ভগবান রূপে অঙ্কিত করায় বিপদ আছে বহুতর।

কোনও প্রসিদ্ধ জীবনী অবলম্বন করে নাটক বা চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করতে বসে লেখক সেই জীবনের মধ্যে নাট্যবস্তু কোথায়, তারই সন্ধান করেন প্রথমে। এবং সেই জীবনের কোন্ কোন্ ঘটনাকে নাটকীয়তা দেওয়া যেতে পারে, তাও তিনি তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। তাই দেখি, এমিল জোলার জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র করতে গিয়ে কাহিনীকার 'ড্রাইফাস্ মামলা'র ঘটনাটিকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। স্যুবার্টের জীবনীতে দেখি, বেথোফেন কর্তৃক স্যুবার্টের সুরসৃষ্টির অপরূপত্ব আবিষ্কারের ঘটনাই সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। শ্রীমধুসূদনের জীবনের সবচেয়ে বড়ো নাটক হচ্ছে, তাঁর অশান্ত প্রমত্ত মনের আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। যশের শিখরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অগাধ অর্থোপার্জনের জন্যে দত্তকুলোদ্ভব কবি কি না করেছেন?

জীবনী-নাট্যকার বা কাহিনীকারদের একটি বিষয়ে সদাই সতর্ক থাকতে হয়। শ্রদ্ধেয় চরিত্রকে যেন কোনক্রমে অশ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কিত করার মারাত্মক ভুল না ঘটে। জনমানসে এক একটি চরিত্র সম্বন্ধে এক একটি বিশেষ চিত্র মুদ্রিত থাকে। সেই চরিত্রের সঙ্গে লেখক-অঙ্কিত চরিত্রের কিছু গরমিল হলেই সাধারণের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগে; এমন কি, সময় সময় আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করে। তাই জনবরেণ্য জীবনী নিয়ে রচনার সময় শেরউডের উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত:

"A strict regard for the plain truth is more than obligatory; it is obviously desirable"

(সরল সত্যের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা একান্ত বাধ্যতামূলক; এটা সুস্পষ্ট-ভাবেই কাম্য।)

ভি, বালসারার নবসৃষ্টি :

গেল রবিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিউ এম্পায়ারের প্রেক্ষাগৃহে যাদের উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরা নিশ্চয়ই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের

'ভগিনী নিবেদিতা' চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (নিবেদিতা) ও অমরেশকুমার (বিবেকানন্দ)।

অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন, ভারতীয় সংগীত-জগতে এক নবযুগের সূচনা করলেন সুখ্যাত যন্ত্র-শিল্পী ভি. বালসারা। ঐদিন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির সংগীত-রূপ পরিবেশন করলেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সকাশে। আমরা পাশ্চাত্যসংগীত জগতের বীথোফেন, চেকোয়োস্কি, সুবার্ট প্রভৃতি বরেণ্য সংগীতস্রষ্টার 'মুনলাইট সোনেটা', 'সোয়ান লেক', 'আনফিনিস্ট সিম্ফনি', 'ব্লু ডানিয়ুব' প্রভৃতি সংগীত-আলেখ্য শুনে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। কিন্তু কোনো দিনই ভাবতে পারিনি, বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় সংগীত-জগতে ঐ ধরনের সংগীত-আলেখ্য সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। ভারতীয় সংগীত চিরদিনই সুর-মাধুর্য (melody) সৃষ্টি করে এসেছে; তার লক্ষ্য একটি সুরকে আশ্রয় করে ছোট ছোট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করা—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু রূপায়িত করা, একের মধ্যে বহুর প্রকাশ করা। পাশ্চাত্য-সংগীতই আমাদের কাছে বহু যন্ত্রের সমন্বয়ে একতান সৃষ্টির বার্তা বহন করে আনে; ইউরোপ করেছে বহুর মধ্যে একেকে খোঁজবার সাধনা, যেমন আমরা করেছি একের মধ্যে বহুকে প্রকাশের। আমরা খুঁজেছি variety in unity, আর ওরা চেয়েছে unity in variety. কিন্তু ইউরোপীয় রীতির অনুকরণে আমরাও ধীরে ধীরে বিভিন্ন যন্ত্র-সংগীতের সমন্বয় সাধন করে অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান বাদন সুরু করে দিয়েছি এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই। দক্ষিণাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা আমাদের প্রথম শোনায় যন্ত্র-সংগীতে 'বন্দেমাতরম্' গান। তবে বলতে বাধা নেই, এই একতান যন্ত্র-সংগীতে সুরমূর্চ্ছনা বা মেলডি সৃষ্টির দিকে যতটা ঝোঁক ছিল, যন্ত্রগুলিকে বিভিন্ন পর্দায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লয়ে বাজিয়ে একতান বা হার্মনি সৃষ্টির দিকে ততটা ঝোঁক ছিল না। আমরা সে যুগে যত ব্যাণ্ড-মিউজিক এবং অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে হার্মনিক মিউজিক শুনেছি, সমস্তই পাশ্চাত্য; কিন্তু যখনই যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় কোনো রাগ-রাগিনী বা পরিচিত কোনও গান বাজানো হয়েছে, তখনই হার্মনি অন্তর্হিত হয়ে মেলডি বেজে উঠেছে। যতদূর মনে পড়ে, বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা-পরিচালক ক্ল্যাণ্ডোপোলোই প্রথম ভারতীয় রাগ-রাগিনী বা গানের মধ্যে কিছু কিছু হার্মনি সৃষ্টির চেষ্টা করেন যন্ত্রের একতানবাদনের মাধ্যমে। খাঁটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে হার্মনি-মিউজিক সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন তিমিরবরণ উদয়শংকর-নৃত্যসম্প্রদায়ের সংগীত-পরিচালক রূপে। ভারতীয় নৃত্যসংগীতের জগতে তিমিরবরণের দান অবিস্মরণীয়। গ্রামোফন রেকর্ডে তাঁর 'সাকী' ও 'রাধাকৃষ্ণ' যন্ত্রসংগীত তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। এর পর যেদিন থেকে ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্রে আবহ-সংগীতের প্রবর্তনা হ'ল, সেদিন থেকে ভারতের বিভিন্ন সুরকার পাশ্চাত্য-সংগীতের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য বা ভারতীয় সংগীতকেও চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবপ্রকাশক আবহ-সংগীত রূপে ব্যবহার করবার চেষ্টায় অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করেছেন। এ-ছাড়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশেও আবৃত্তির সঙ্গে হার্মনিক মিউ-জিকের ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয়েছে। প্রতি বছর মহালয়ার প্রত্যূষে কলকাতা ব্রডকাস্টিং অনুষ্ঠিত 'মহিষমর্দিনী' পালার কথা নিশ্চয়ই কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড-আবৃত্তি 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'-র সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় আবহ-সংগীত। কিছুকাল আগে জোসেফ নস্কর 'ফিলহার্মনিক অর্কেস্ট্রা' নাম দিয়ে কিছু ভারতীয় রাগ-রাগিনীকে সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার রূপদান করে-ছিলেন।

কিন্তু গেল রবিবার প্রায় আশিজন যন্ত্রীর সহযোগে ভি. বালসারা যে সংগীত-আলেখ্য পরিবেশন করলেন, তা ভারতীয় সংগীত-জগতে একান্তই অভিনব এবং অভূতপূর্ব। 'মুনলাইট সোনেটা', 'সোয়ান লেক' প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীত-আলেখ্য এবং 'ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিক' পরিবেশিত বহু পাশ্চাত্য একতান-যন্ত্রসংগীত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভি. বালসারা এই 'নিউ ইণ্ডিয়ান সিম্ফনি' সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ

'নিশীথে' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে উত্তমকুমার।

করেছেন। প্রায় মাস তিনেক আগে যখন তাঁর মুখে প্রথম শুনি যে, তিনি 'দেবতার গ্রাস'-এর সংগীত-রূপ দিতে মনস্থ করেছেন, তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে, তা ধারণা করতে না পেরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'আপনি এটাকে ব্যালে হিসেবে উপস্থাপিত করবেন?' তিনি হেসে বলেছিলেন, 'ওসব কিছুই নয়; খালি যন্ত্র-সংগীত শুনবেন।' তখনও আমি আবার বলি, 'কবিতাটা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র বাজবে?' উনি আবার হেসে বলেন, 'না, তাও নয়। ঐ কবিতার বিভিন্ন পংক্তির বা বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাবকে আমি সংগীতের রূপ দেব—আপনারা খালি সমবেত যন্ত্র-সংগীত শুনবেন, আর কিছু নয়।' স্বীকার করি, ওঁর এ-কথার পর আমি যদিও আর কোনও প্রশ্ন করিনি, তবুও আমি ওঁর পানে বেশ বোকার মত তাকিয়েছিলুম। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, 'দেবতার গ্রাস'-এর বিভিন্ন ভাবধারাকে সমবেত যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে সুরের রূপে প্রকাশ করলে শ্রোতারা তা' অনুধাবন করতে পারবে কি? মনে হয়, আমার এই মনোগত প্রশ্ন আমার ঐ বোকা-বোকা চাহনির মধ্যে ফুটে উঠেছিল। তাই দেখলুম, যখন তিনি ঐ সংগীত-আলেখ্য পরিবেশন করলেন, পশ্চাদ্‌পটে প্রতিফলিত হচ্ছিল দেবতার গ্রাসের পংক্তিগুলি, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন, কখন কোন্ ভাবটি সুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। পুরো বাত্রিশ মিনিট স্থায়ী এই সংগীত-আলেখ্য সেদিনের শ্রোতৃমণ্ডলীকে যে সুরলোকে উন্নীত করেছিল, তা বিচিত্র মাধুর্যমণ্ডিত। বেহালা, বাঁশী, ভায়োলা, চেলো, ক্ল্যারিয়োনেট, স্যাক্সোফোন, ট্রাম্পেট, ট্রম্বোন, ভাইব্রোফোন, স্প্যানিশ গীটার, ইলেক্‌ট্রিক গীটার, সেতার, স্বরোদ, ম্যাণ্ডোলিন, জলতরঙ্গ, জাইলোফোন, তবলা, সুরমণ্ডল এবং পিয়ানোর সহযোগিতায় বিভিন্ন ভাবকে বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে মেলডি ও হার্মনির সংমিশ্রণে প্রকাশ করেও একটি সামগ্রিক অখণ্ডতা বজায় রেখে যে সংগীত-আলেখ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি তা দেখে শ্রীবালসারাকে ভারতীয় সংগীতের নব-পথিকৃৎ বলে অভিনন্দিত করতেন। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, শ্রীবালসারা তাঁর এই নবাবিষ্কৃত পথে দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সংগীত-সিম্ফনিকে জগদসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

'দেবতার গ্রাস'-এর সংগীত-রূপ পরিবেশনের আগে শম্ভু মিত্র প্রথমে কবিতাটির ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার শোনান এবং পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কবিতাটি শ্রোতৃবৃন্দের সামনে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী-ভাবে আবৃত্তি করেন। কিন্তু এ সমস্তই হয় সেদিনের অনুষ্ঠানসূচীর শেষের দিকে। অনুষ্ঠানের সুরুতে ভি. বালসারা একক পিয়ানোর মাধ্যমে 'আহির ভৈরবী' রাগিনী বাজিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে সম্মোহিত করেন। এবং

চন্দ্র ফিল্মসের হিন্দীচিত্র "সোহাগ সিন্দুরে" মালা সিনহা

তাঁর সংগে কিছুটা অর্কেস্ট্রা ও প্রধানতঃ তবলা ও মৃদঙ্গ সংগত চলে। প্রায় পনেরো মিনিটব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শ্রীবালসারা যে অপরূপ ভঙ্গীতে যৎ, বিস্তার, ঝালা প্রভৃতি শুনিয়েছেন, তা এতকাল আমরা সেতার বা স্বরোদের মাধ্যমেই শুনেছি। পিয়ানোতেও যে ভারতীয় রাগরাগিনীর অত সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব, তা আমাদের অবিদিত ছিল।

'সাজ ও আওয়াজ' (যার অর্থ যন্ত্র ও শব্দ) প্রযোজিত সেদিনের এই অভিনব অনুষ্ঠান শ্রোতৃবৃন্দকে অপার আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

'অন্বেষা'র 'কাঞ্চনরঙ্গ' :

গেল শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রাজাবাজার প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে 'অন্বেষা'-গোষ্ঠী শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' কৌতুক-নাট্যখানিকে মঞ্চস্থ করেন। 'বর্তমান সমাজে রঙ্গময়ী কাঞ্চনের প্রভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে কী রকম বদলে যায়, তাই বলা হয়েছে' এই নাটকটিতে প্রধানতঃ কৌতুকের মাধ্যমে। 'আজ আর মানুষের মূল্যায়ন তার নিজস্ব গুণপনার ওপর নির্ভর করে না, করে তার টাকার অঙ্কের ওপর—এই পরম সত্যটিকে প্রকাশিত করবার জন্যে যে লটারীর টাকা পাওয়া, না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সেটি অত্যন্ত অবাস্তব ভিত্তি (false promise); কারণ লটারীর টিকিটের টাকা পাওয়া বা না-পাওয়া এমনই হৈ-হৈ ব্যাপার যে, মাত্র একজন বন্ধুর মুখের খবরের ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করে না। কিন্তু এই বৃহৎ ত্রুটি সত্ত্বেও নাটকের নায়ক পাঁচু এমনই জীবন্ত গোটা চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে যে, দর্শক তার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের সুযোগ পায়। এবং 'অন্বেষা'র নাট্যনির্দেশক ও প্রধান চরিত্রাভিনেতা স্বদেশ বসু পাঁচু চরিত্রটির সংগে নিজেকে এমন অবলীলাক্রমে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন যে, আমরা ঐ জীবন্ত চরিত্রটিকে অত্যন্ত উপভোগ করেছি। এ ছাড়া তরলা রূপে শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরকর্তা ও ফিল্ম ডাইরেক্টাররূপে সুনীলবরণ চৌধুরী, কর্তারূপে স্বপন বসু, নটী ও ভদ্রমহিলারূপে কেকা নিয়োগী এবং সীমারূপে কমলা দাস প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

প্রতাপ মেমোরিয়াল হলের মঞ্চটি কিন্তু অত্যন্ত অপরিসর হওয়ায় সুষ্ঠু অভিনয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

শিল্পীমহলের "যুগসূর্য" :

বিবেকানন্দ শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় হাওড়ার শিল্পীমহল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত "যুগসূর্য" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ী সংশ্লিষ্ট লীলা অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত প্রধান ভূমিকায় অমিয়কান্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী অভিনয়কুশলতার পরিচয় দেন। এ ছাড়া মীনা বসু (রাসমণি), অচিন গুহ (রামকুমার), দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী (মথুরবাবু), শ্যামল বসু (পাগল) প্রভৃতি অনেকেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। নাটকের প্রথমে মহাজীবন বন্দনার দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত।

বিচিত্রা-গোষ্ঠীর 'সাজাহান" :

গেল ২রা ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা বিচিত্রা গোষ্ঠীর উদ্যোগে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" অভিনীত হয়। সাজাহানের ভূমিকায় ঠাকুরদাস মিত্র এবং ঔরংজীবের ভূমিকায় সুধীর মুস্তাফীর অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। এছাড়া মোরাদ, দারা, সুজা, সোলেমান, যশোবন্ত সিংহ, জিহনআলী, সিপার, জাহানারা, পিয়ারা এবং নাদিরার ভূমিকায় যথাক্রমে শিবনাথ ভট্টাচার্য, নলিনী ভদ্র, বিমল চট্টোপাধ্যায়, আধীরেন্দ্র ঘোষ, বিশ্বনাথ দে, বিভাস মুখোপাধ্যায়, বেবী মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী (ছোট), শেফালী দে এবং শাশ্বতী রায়ের অভিনয় হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। সুধীর মুস্তাফী নাটকখানি পরিচালনা করেছিলেন।

পেটেন্ট অফিস ক্লাবের ষোড়শ বার্ষিক উৎসব :

ভারত সরকারের অধীনস্থ "পেটেন্ট অফিস" ক্লাবের সভ্যবৃন্দ গেল মঙ্গলবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ষোড়শ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা মঞ্চে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানসমেত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত "ঊনপঞ্চাশ নম্বর মেস" নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকটির পরিচালনা করেছিলেন ক্লাব ইউনিট এবং সংগীত-পরিচালনা করেন নলিনীকান্ত করণ।

শৌণিক মিত্র গোষ্ঠীর নাট্যানুষ্ঠান :

গেল ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিয়ালদার ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে শৌণিক মিত্র গোষ্ঠী অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "এক অধ্যায়" এবং "পকেটমার" নাটক

দু'খানিকে মঞ্চস্থ করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মৃণাল সেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ কর্তৃক "উন্বার্ষিকী" :

গেল ৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে স্কটিশ চার্চ কলেজ-প্রাক্তনছাত্র-পরিষদের সভ্যগণ অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক "উন্বার্ষিকী"র অভিনয় করেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। বর্তমান বাঙালী জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক হাল্কা ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এই নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। অভিনয়ে ইটখোলার মালিক জগৎ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন নাট্যকার-পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী। গুরুদেব ও তাঁর ভক্ত, অবসর-প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে সদানন্দের ভূমিকায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভোম্বল), বিমান গুপ্ত (ঝঙ্কারপ্রিয়), ধীরেন বসু (নেপালবাবু), কুসুমিকা বাগচী (মিসেস চাকলাদার), কাজল ঘোষ (শান্তি) ও পূরবী মুখোপাধ্যায় (মণিকা)। এইসঙ্গে গীতভারতী মীরা মিত্রের কীর্তনগান অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

"রূপকার"-গোষ্ঠীর "কালের যাত্রা" :

গেলে সোমবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী রূপকার গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ বিরচিত "কালের যাত্রা" নাটকটি মুক্ত-অঙ্গন-এ মঞ্চস্থ করেন। এই অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আসছেবারে পাঠকদের জানাব।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর পরবর্তী চিত্র :

প্রথম প্রচেষ্টা "বধূ"র কাজ শেষ করবার পর বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স এবার যে-দু'খানি ছবিতে হাত দেবেন, তার প্রথমটি হবে শৈলেশ দে রচিত সমস্যাবহুল সামাজিক কাহিনী "অগ্নি-স্বাক্ষর" এবং দ্বিতীয়টি হবে পৌরাণিক কাহিনী "বামনাবতার"।

নবচিত্রমের "স্বপ্নসমুদ্র" :

"মাণিক"-চিত্রের অসামান্য সাফল্যের পর পরিচালক বিজলীবরণ সেন নবচিত্রম-এর হয়ে শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক চিত্রনাট্যাকারে গ্রথিত "স্বপ্ন-সমুদ্র"-এর চিত্ররূপ দেবেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, বালসারা। সুভাষচন্দ্র চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ছবিখানির প্রযোজনা করবেন বেনু দাস।

প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর "হামরাহী" :

প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর নতুন ছবি "পতিপত্নী"র নব নামকরণ হয়েছে "হামরাহী"। এ'দের "শ্বশুরাল" ছবির মত এ-ছবিখানিরও বিশ্ব পরিবেশনসত্ত্ব নিয়েছেন রাজশ্রী প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড। টি, প্রকাশরাওয়ের পরিচালনায় ছবিখানির একটি সেটের কাজ সম্প্রতি হয়ে গেল কারদার স্টুডিওতে। এর হিন্দী সংলাপ লিখেছেন ইন্দরাজ আনন্দ এবং গীত রচনা করেছেন হসরৎ ও শৈলেন্দ্র। সুরযোজনা করছেন শঙ্কর জয়কিষণ। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দ্বারকা ডিভেচা, শান্তি দাস ও শিবাজী অবধূত।

ভগিনী নিবেদিতা ও সূর্যস্নান :

এ হপ্তায় দু'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। অরোরার শ্রদ্ধাঞ্জলি "ভগিনী নিবেদিতা" দেখানো শুরু হচ্ছে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে। বিজয় বসু পরিচালিত ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী, অসিতবরণ, প্রবীর মজুমদার এবং অমরেশ দাশ। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন অনিল বাগচী।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নবতম চিত্র "সূর্যস্নান" রঞ্জিত পিকচার্সের পরিবেশনায় আজ থেকে দেখানো হচ্ছে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর ছবিঘরে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র ছবিখানির যুগ্মপরিচালক। চিত্রগ্রহণ করেছেন দেওজীভাই। প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তৃপ্তি মিত্রকে।

মুক্তির অপেক্ষায় বাঙলা ছবি :

যে-কটি বাঙলা ছবি আসন্নমুক্তির অপেক্ষায় দিন গুণছে, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় এন্-সি-এ প্রোডাকসান্স-এর সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ইস্টম্যানকালারে তোলা ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"। এরপরেই নাম করতে হয় মূলচাঁদ জৈন নিবেদিত ও বিভূতি চক্রবর্তী পরিচালিত "শেষচিহ্ন", শিবানী ফিল্মসের অমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "[illegible] সংসার", মুভিটেক লিমিটেডের পীযূষ বসু পরিচালিত "শিউলীবাড়ী", শুভকল্প চিত্রমের সুনীলবরণ পরিচালিত "রূপ-সনাতন", ফিল্ম ক্র্যাফ্ট্ প্রাইভেট লিমিটেডের হয়ে অরূপ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় তোলা "বেনারসী" প্রভৃতি ছবি।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তান—৩য় টেস্ট

পাকিস্তান : ২৫৩ রান (আলিমুদ্দিন ১০৯ এবং হানিফ মহম্মদ ৬৭। নাইট ৬৬ রানে ৪ এবং ডেক্সটার ৪৮ রানে ২ উইকেট) ও ৪০৪ রান (৮ উইকেটে। হানিফ ৮৯, ইমতিয়াজ ৮৬, আলিমুদ্দিন ৫৩। ডেক্সটার ৮৬ রানে ৩, বারবার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ৫০৭ রান (টেড ডেক্সটার ২০৫, পিটার পারফিট ১১১, জিওফ পুলার ৬০ এবং মাইক স্মিথ ৫৬। ডি'সুজা ১১২ রানে ৫, নাশিমুল গণি ১২৫ রানে ৩ এবং হাসিব আসান ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্টেও ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান টসে জয়ী হয়—উপর্যুপরি তিনটে টেস্টের টসে জয়।

প্রথমদিনেই পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে শেষ হয়, খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের দু'মিনিট আগে। ৪র্থ উইকেট পড়ে যায় দলের ৫৬ রানের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে হানিফ মহম্মদ এবং আলিমুদ্দিন ১১২ মিনিটের খেলায় দলের ৯২ রান তুলে শোচনীয় অবস্থা থেকে দলকে উদ্ধার করেন। ইংল্যাণ্ডের ফিল্ডিংয়ের দোষে দুজনই কয়েকবার আউট হওয়ার থেকে ছাড়ান পান। আলিমুদ্দিন ২০৭ মিনিট খেলে তাঁর দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করেন। হানিফ তিন ঘন্টা পনের মিনিট খেলে তাঁর ৬৭ রান করেন, বাউণ্ডারী ১০টা। আলিমুদ্দিনের ১০৯ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী ছিল।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে সাড়ে পাঁচ ঘন্টায় খেলায় ২১৯ রান তুলে, উইকেট পড়ে দুটো। ডেক্সটার ৮৭ রান এবং স্মিথ ৪২ রান ক'রে নটআউট থাকেন। নাশিমুল গণি ৭১ রানে এইদিনের খেলায় দুটো উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪৫৩, মোট ৪টে উইকেট পড়ে। অর্থাৎ এইদিনের খেলায় আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ২১৯ রানের সঙ্গে ২৩৪ রান যোগ করে। লাঞ্চ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড মন্থরগতিতে রান করে। ২ ঘন্টার খেলায় মাত্র ৫৯ রান। লাঞ্চের পর ইংল্যাণ্ডের হাত খুলে দ্রুত রান ওঠে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটার ডবল সেঞ্চুরী (২০৫) করেন—টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ডেক্সটারের সর্বোচ্চ রান। এই ২০৫ রান তুলতে তিনি ৪৯৫ মিনিট সময় নেন এবং ২২টা বাউণ্ডারী মারেন। অনেককাল পর বিদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড় ডবল সেঞ্চুরী করলেন টেস্ট খেলায়। ১৯৫৩-৫৪ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে স্যার লিওনার্ড হাটন শেষ ডবল সেঞ্চুরী (২০৫ রান) করেছিলেন কিংস্টোনে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং মাইক স্মিথ (৫৬ রান) ২৩০ মিনিটে দলের ১৪৩ রান এবং চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং পিটার পারফিট ২২২ মিনিটে দলের ১৮৮ রান তুলে দেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বর্তমানে টেড ডেক্সটারের মোট রান দাঁড়িয়েছে ২,১২৭, পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তিনি ২০০০ রান পূর্ণ করেন। তৃতীয় দিনের খেলায় পারফিট ৮৮ রান এবং বারবার ৪ রান করে নটআউট থাকেন।
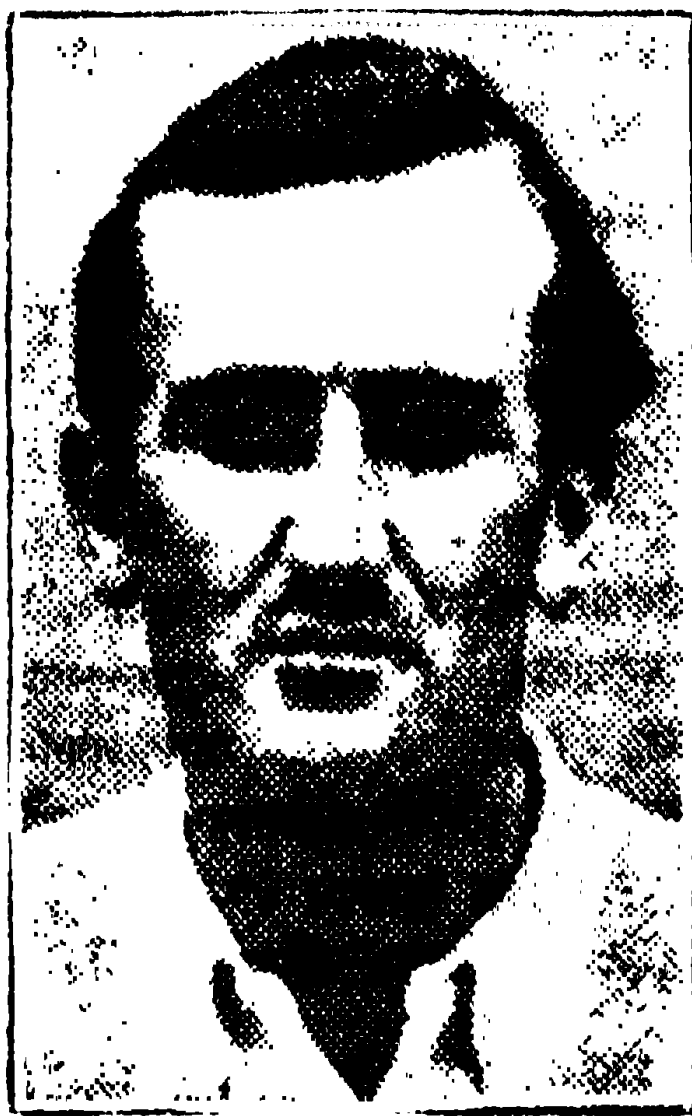
টেড ডেক্সটার

চতুর্থ দিন ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫০৭ রানে শেষ হয়। পারফিট তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১১১ রান) করেন। ডি'সুজা ১১২ রানে মোট ৫টা উইকেট পান। পাকিস্তানের এই দিনটা খুব ভাল ছিল। ৯০ মিনিটের খেলায় তারা ইংল্যাণ্ডের বাকি ৬টা উইকেট ফেলে দেয় ৫৪ রানে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার আরম্ভও খুব ভাল হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আত্মরক্ষামূলক খেলায় বেশী জোর দেয়। ২টো উইকেট পড়ে এইদিন ১৪৭ রান দাঁড়ায়। হানিফ ৫৮ এবং বার্কি ১০ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ইংল্যাণ্ডের থেকে পাকিস্তান তখনও ১০৭ রানের পিছনে থাকে।

খেলার শেষদিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ৮টা উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ৪০৪ রান দাঁড়িয়েছে। দলের অধিনায়ক ইমতিয়াজ আমেদ এর আগে উপর্যুপরি তিনটে 'গোল্লা' ক'রে এবার ৮৬ রান করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইমতিয়াজ আমেদ এবং মুস্তাক মহম্মদ ১০৩ মিনিটের খেলায় দলের ৮১ রান তুলে দিলে খেলার মোড় অমীমাংসিত ফলাফলের পথে ঘুরে যায়।

লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের স্কোর ছিল ২২৮, ৪ উইকেট পড়ে। অর্থাৎ তখনও ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ২৬ রান কম। খেলা ভাঙ্গতে যখন আর ৯৫ মিনিট বাকি এবং পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পড়ে ৩১০ রান অর্থাৎ পাকিস্তান ৫৬ রানে অগ্রগামী, তখন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক খেলায় জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে পিটার রিচার্ডসনকে বল করতে দিলেন। চা-পানের বিরতির সময় পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ৩২১, ৫টা উইকেট পড়ে।

নাশিমুল গণি ৪১ এবং ডি'সুজা ১০ রান করে নটআউট থাকেন। প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। ফলে ইংল্যাণ্ড ১—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে ইংল্যাণ্ডের এই তিনজন খেলোয়াড় তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে দুই সহস্র রান পূর্ণ করেছেন—ব্যারিংটন, ডেক্সটার এবং রিচার্ডসন। পাকিস্তান সফরের শেষ টেস্ট খেলা ধরে তাঁদের মোট টেস্ট খেলা এবং মোট রান দাঁড়িয়েছে : ব্যারিংটন—২৮টা টেস্টে ২২৪৩ রান, ডেক্সটার—৩০টা টেস্টে ২১২৭ রান এবং রিচার্ডসন—৩৩টা টেস্টে ২০৪৫ রান। বোলিংয়ে টনি লক ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১৫০টা উইকেট পাওয়ার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। ৪১টা টেস্টে তিনি ৩৭৬৯ রানে ১৫৮টা উইকেট পেয়েছেন।

ডেলী মেল পত্রিকার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার সমালোচক এলেক্স ব্যানিস্টার ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজ খেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যাণ্ডের দুটি টেস্টে পরাজয় বরণের একমাত্র সান্ত্বনা হয়েছে, পাকিস্তানের বিপক্ষে

প্রথম টেস্টে ৫ উইকেটে জয়লাভ ক'রে 'রাবার' লাভ।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরের মোট ৮টি টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ২টি খেলায় হার, মাত্র ১টি জয় এবং ৫টি খেলা ড্র করা প্রসঙ্গে ব্যানিস্টার এই ৩টি কারণ উপস্থাপিত করেছেন, (১) ইংল্যাণ্ড দলে দক্ষ স্লিপ-ফিল্ডসম্যানের অভাব, (২) আটটি টেস্ট খেলায় ৭টিতে ইংল্যাণ্ডের টসে পরাজয় এবং (৩) ফাস্ট বোলার হিসাবে ব্রাউন এবং হোয়াইটের ব্যর্থতা।

টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলার ধারা লক্ষ্য ক'রে লণ্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্রিকেট সমালোচকেরা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। 'ডেলী মীরার' পত্রিকায় রায়ান চ্যাপম্যান মন্তব্য করেছেন, এ ধরণের খেলায় ইংল্যাণ্ডের দর্শকদের পক্ষ থেকে বিদ্রূপ করার প্রয়োজন হবে না কারণ তাঁরা মাঠেই উপস্থিত হবেন না। ডেলী এক্সপ্রেস মন্তব্য করেছে, শক্তিশালী দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তাদের অতিরিক্ত কিছু থাকা দরকার।

॥ কুচবিহার কাপ ॥

অল্-ইণ্ডিয়া স্কুল ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে ইস্ট জোন দল ৯ উইকেটে ওয়েস্ট জোন দলকে পরাজিত ক'রে 'কুচবিহার কাপ' জয়লাভ করেছে। ইস্ট জোন দলের এই প্রথম কুচবিহার কাপ জয়। চারদিনের ফাইনাল খেলা তৃতীয় দিনেই শেষ হয়। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত চৌকস প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিনু মানকড়ের পুত্র শ্রীমান অশোক মানকড় পশ্চিমাঞ্চল দলের পক্ষে খেলে ব্যাটিংয়ে বিশেষ ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেয়। সেমি-ফাইনালে সেণ্ট্রাল জোন দলের বিপক্ষে অশোক ৯০ রান করে। ফাইনালে ইস্ট জোন দলের বিপক্ষে তার দুই ইনিংসের রান ৩৩ ও ৪৯। ব্যাটিংয়ে এই সাফল্যের দরুণ তাকে জে সি মুখার্জি পুরস্কার দেওয়া হয়।

ওয়েস্ট জোন : ১৩৬ ও ১৯৭
ইস্ট জোন : ২৩২ ও ১০৭ ...
(১ উইকেটে)

জাতীয় স্নুকার ও বিলিয়ার্ডস

অল-ইণ্ডিয়া স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এ্যামেচার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান এবং ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বব মার্শাল ৬—১ ফ্রেমে বি ভি কোমটিকে পরাজিত করেন।

বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে বব মার্শাল গত বছরের বিজয়ী উইলসন জোন্সকে পরাজিত ক'রে একই বছরে স্নুকার এবং বিলিয়ার্ডস খেতাব লাভ করেন।

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন (বামে সর্বশেষে) এবং ফ্রেড স্টোলি (দক্ষিণে সর্বশেষে) দুজনের মধ্যে বিজিত নরেশকুমার এবং রমানাথন কৃষ্ণান

এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের লনে এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গেই শেষ হয়েছে। প্রথম এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হয় এই মাঠেরই ঘাসের ওপর ১৯৪৯ সালে। আলোচ্য বছরে অস্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় প্রতিযোগিতার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ লন্ টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পদমর্যাদা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের সমান। পৃথিবীর বিখ্যাত লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা—ডেভিস কাপ, উইম্বলডন, আমেরিকান লন্ টেনিস, অস্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার গত কয়েক বছরের সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার কোন খেলোয়াড় যোগদান করেন নি। ভারতবর্ষের খেলোয়াড় ছাড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করে অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট বৃটেন, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়রা।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রমপর্যায় তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা স্থান পান :

পুরুষ সিংগলস :—(১) রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া); (২) রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ); (৩) ফ্রেড স্টোলি (অস্ট্রেলিয়া); (৪) ডব্লিউ এ নাইট (গ্রেট বৃটেন); (৫) জয়দীপ মুখার্জি (ভারতবর্ষ); (৬) ডবলিউ জেকস (অস্ট্রেলিয়া); (৭) প্রেমজিৎ লাল (ভারতবর্ষ); (৮) নরেশকুমার (ভারতবর্ষ)।

পুরুষ ডাবলস :—(১) রয় এমার্সন ও ফ্রেড স্টোলি (অস্ট্রেলিয়া); (২) প্রেমজিৎলাল ও জয়দীপ মুখার্জি; (৩) রমানাথন কৃষ্ণান ও নরেশকুমার; (৪) ডবলিউ নাইট এবং জে এ পিকার্ড (গ্রেট বৃটেন)।

মহিলা সিংগলস :—(১) লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া); (২) এম স্যাকুট (অস্ট্রেলিয়া); (৩) পি বেলিং (ডেনমার্ক); (৪) মিস আপ্পিয়া (ভারতবর্ষ)।

পুরুষদের সিংগলস খেলার শেষ ষোলজন খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ৬ জন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন—রমানাথন কৃষ্ণান, নরেশকুমার, জয়দীপ মুখার্জি, সুমন্ত মিশ্র, প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলী। এ'দের মধ্যে সুমন্ত মিশ্র এবং আখতার আলী কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেন নি এবং সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি। সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান অস্ট্রে-

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে বিজিত মিস পি বর্লিং ও ডি আম্পিয়া (বাম দিক থেকে) এবং মিস এল টার্ণার ও মিস এম সোকর্ট (বিজয়ী)

লিয়ার ফ্রেডী স্টোলিকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যান এবং অপর দিকে জয়দীপ মুখার্জি প্রতিযোগিতায় ১নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সনের কাছে পরাজিত হ'ন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রমানাথ কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) স্ট্রেট সেটে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রয় এমারসনের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে পরাজিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে এমারসনকে পরাজিত করেছিলেন। তারপর উভয় খেলোয়াড়ের মধ্যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ফাইনালে কৃষ্ণান নিজের সুনাম অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেননি। এমারসন সমস্ত মাঠ জুড়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার ক'রে খেলেন। তাঁর সুতীব্র সার্ভিস, ভলি এবং প্লেসিংয়ের কাছে রমানাথ দাঁড়াতে পারেননি।

প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মিস্ লেসলি টার্ণার তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ ক'রে 'ত্রি-মুকুট' সম্মান লাভ করেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন 'দ্বি-মুকুট' লাভ করেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪, ৬-৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : প্রতিযোগিতায় ১নং বাছাই খেলোয়াড় মিস লেসলি

এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া)।

টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ সেটে ২নং বাছাই খেলোয়াড় মিস ম্যাডোনা সাকর্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মিস টার্ণার এবং মিস সাকর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-১ সেটে মিস পি বেলিং (ডেনমার্ক) এবং মিস আম্পিয়াকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি রয় এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলি (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২, ৯-৭ সেটে ৩নং জুটি রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমারকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ফ্রেড স্টোলি ও মিস্ লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৩, ৬-১ সেটে রয় এমার্সন ও মিস্ ম্যাডোনা সাকর্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

ত্রিনিদাদ কোল্টস : ২৩৭ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এল্লিয়িং ৪৭, ডোর ৪২, রবিনসন ৩৭ এবং আসগর আলী ৩৬। সুর্তি ৪৫ রানে ৩ উইকেট, দুরাণী ৬০ রানে ২, প্রসন্ন ৬১ রানে ২ উইকেট) ও ১৪৩ রান (৫ উইকেটে। রবিনসন ৮৪)।

ভারতীয় একাদশ : ৩১৭ রান (সারদেশাই ১১৮, উমরীগড় ৭৩, সুর্তি নটআউট ৫২ এবং জয়সীমা ৪৫)

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম খেলাটি ড্র গেছে। ভারতীয় দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামতে পারেনি। দীর্ঘ ভ্রমণের পর ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা মাত্র একরাত্রির বিশ্রাম নিয়ে দু'দিনের খেলায় যোগদান করে। দলের কয়েকজন খেলোয়াড় এই দীর্ঘ বিমান ভ্রমণে বেশ কাবু হয়ে পড়েন।

ত্রিনিদাদ কোল্টস দল প্রথম ব্যাট ক'রে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দল এইদিন ২টো উইকেট খুইয়ে ৬২ রান তুলে। জয়সীমা ৪৫ রান এবং কন্ট্রাক্টর ৬ ক'রে আউট হ'ন। তৃতীয় উইকেটের জুটি সারদেশাই এবং উমরীগড় যথাক্রমে ৩ ও ৪ রান ক'রে নটআউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষদিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানে শেষ হয়। সারদেশাই উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১১৮ রান করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং উমরীগড় পিটিয়ে খেলে ৮০ মিনিটে দলের ১৩২ রান তুলে দেন। উমরীগড় এইদিন প্রথম আউট হন। তাঁর ৭৩ রানে ছিল ১২টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। সারদেশাই তাঁর ১১৮ রানে ২০টা বাউণ্ডারী করেন। লাঞ্চের সময় ভারতীয় দলের স্কোর ছিল ২১১ রান, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন সারদেশাই (৭৫)

এবং সুর্তি। সুর্তি শেষ পর্যন্ত ৫২ রান করে নটআউট থেকে যান। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মোট ২০৫ মিনিট খেলার পর ৩১৭ রানে শেষ হলে তারা ৪০ রানে অগ্রগামী হয়।

ত্রিনিদাদ কোল্টস দল খেলার ১৩০ মিনিট সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৫ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে দিলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

বছরের শ্রেষ্ঠ হকি দল—ভারতবর্ষ

বছরের শ্রেষ্ঠ হকি দল হিসাবে ভারতবর্ষ ১৯৬২ সালে প্রখ্যাত 'লিউটি কাপ' লাভ করেছে। ইণ্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের প্রথম সভাপতির স্মৃতিরক্ষার্থে এই পুরস্কার। প্রতি বছর হকি খেলায় শ্রেষ্ঠ দলকে এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৯৬০ সালে ইটালী এবং ১৯৬১ সালে স্পেন এই পুরস্কার লাভ করেছে। ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষে ইণ্টারন্যাশানাল হকি ফেডারেশনের অধিবেশন, সাফল্যের সংগে ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা পরিচালনা এবং এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ—এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের পক্ষে ভারতবর্ষের যোগ্যতারই পরিচয়।

॥ ভারতীয় মহিলা হকি দল ॥

সিংহল সফরে ভারতীয় মহিলা হকি দল অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। এই সফরে তারা মোট সাতটি খেলায় (তিনটি টেস্ট ম্যাচ সহ) যোগদান করে এবং কোন গোল না খেয়ে ৫৯টি গোল দেয়।

টেস্ট খেলা : ভারতীয় মহিলা হকি দল ১ম টেস্টে ২—০ গোলে, ২য় টেস্টে ৩—০ গোলে এবং ৩য় টেস্টে ৫—০ গোলে জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাত্রার প্রাক্কালে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্ট

তারিখ : ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী

কুইন্স পার্ক ওভাল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষ ১ম ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ খেলবে পোর্ট-অব-স্পেন শহরের 'কুইন্স পার্ক ওভাল' মাঠে। প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর এই পোর্ট-অব-স্পেন। ত্রিনিদাদ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পেরিয়া উপসাগরের উপরে পোর্ট-অব-স্পেন বন্দরটি অবস্থিত। এই পেরিয়া উপসাগর উত্তর আমেরিকার ভেনিজুয়েলা থেকে ত্রিনিদাদ দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে। কিন্তু এই সব উপসাগর, সাগর, মহাসাগর ত্রিনিদাদ দ্বীপকে পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেও এই দ্বীপের আদিবাসী এবং প্রাকৃতিক

দ্বীপের আদিবাসী আরওয়াক এবং কারিব জাতির বংশে বাতি দেওয়ার মত আজ একজনও জীবিত নেই। বহু জাতির সমাবেশে আজ ত্রিনিদাদ দ্বীপের জীবন আধুনিক সভ্যতায় গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার প্রধান অংশ অধিকার করে আছে আফ্রিকা থেকে আগত নিগ্রো জাতির বংশধরেরা। তারপরই ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের থেকে বেশী। শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে আছে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ

[illegible] স্পেনীয়। কিছুসংখ্যক চীনের লোকেও এখানে বসবাস স্থাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মানচিত্রে ত্রিনিদাদ দ্বীপের নাম আছে। এখানের পোর্ট-অব-স্পেন শহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে গেছে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ত্রিনিদাদ তথা ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মানচিত্রে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন ত্রিনিদাদ দ্বীপের অধিবাসী লরী কন্সটানটাইন। ত্রিনিদাদ দ্বীপের আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলোয়াড় সনি রামাধীন, গেরী গোমেজ, পি জোন্স, জে টেলার, এফ ফার্গুসন, জে স্টলমেয়ার, ডেনিস এ্যাটকিনসন প্রভৃতির খেলার সংগে আমরা সুপরিচিত।

পোর্ট-অব-স্পেন শহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে এ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ৫টি খেলায় এবং ৬টি খেলা ড্র গেছে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৬টি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয় ১, হার ২ এবং ড্র ৩। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২টি খেলাই ড্র গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাত্র ১টা খেলা হয়েছে, ফলাফল ড্র। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয় ১ এবং হার ১। এই মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল থেকে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে এখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করতে পারেনি এবং এখানে অনুষ্ঠিত মোট ১১টি টেস্ট খেলার মধ্যে বেশীর ভাগ টেস্ট খেলাই (৬টি খেলা) ড্র গেছে।

কুইন্স পার্ক ওভেল মাঠের টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্টইণ্ডিজের পক্ষে : ৬৮১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩-৫৪।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৬০০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১১২ রান, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯-৬০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ১০৭ রান—ইংল্যাণ্ড, ১৯৩৪-৩৫।

সেঞ্চুরী (২৮)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১৩ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৬, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৪ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ০)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ১৫ (ইংল্যাণ্ড ৯, অস্ট্রেলিয়া ৩, ভারতবর্ষ ২ এবং পাকিস্তান ১)

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২০৭ রান—এভার্টন উইকস, ভারতবর্ষের বিপক্ষে, ১৯৫২-৫৩; ২০৬ রান—এভার্টন উইকস, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ২০৫ নট-আউট—ই হেনড্রেন (ইংল্যাণ্ড), ১৯৩০

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

১৯৫৩ সালে পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ও ৩য় টেস্ট খেলা ড্র যায়।

প্রথম টেস্ট খেলার ফলাফল

ভারতবর্ষ : ৪১৭ রান (উমরীগড় ১৩০) ও ২৯৪ রান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৩৮ রান (উইকস ২০৭ এবং পেয়ারোদো ১১৫। সুভাষ গুপ্তে ১৬২ রানে ৭ উইকেট) ও ১৪২ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

তৃতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩১৫ রান (উইকস ১৬১ এবং স্টলমেয়ার ১০৪ নটআউট। গুপ্তে ১০৭ রানে ৫ উইকেট) ও ১০৮ রান (২ উইকেটে)।

ভারতবর্ষ : ২৭৯ রান (রামচাঁদ ৬২ এবং উমরীগড় ৬১) ও ৩৬২ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মাধব আপ্তে ১৬৩ নটআউট এবং ভিনু মানকড় ৯৬)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও টেস্ট ক্রিকেট

(বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

	মোট খেলা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হার	খেলা ড্র
ব ইংল্যাণ্ড	৪০	১০	১৫	১৫
ব অস্ট্রেলিয়া	২০	৩	১৩	৪*
ব নিউজিল্যাণ্ড	৬	৪	১	১
ব ভারতবর্ষ	১৫	৫	০	১০
ব পাকিস্তান	৮	৪	৩	১
মোট	৮৯	২৬	৩২	৩১

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

	মোট সিরিজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হার	রাবার ড্র
ব ইংল্যাণ্ড	১০	৩	৫	২
ব অস্ট্রেলিয়া	৪	০	৪	০
ব নিউজিল্যাণ্ড	২	২	০	০
ব ভারতবর্ষ	৩	৩	০	০
ব পাকিস্তান	২	১	১	০
মোট	২১	৯	১০	২

* টেস্ট খেলার ইতিহাসে প্রথম 'টাই' ম্যাচ (১৯৬০—৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট) নিয়ে মোট ৪টি খেলা ড্র।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচী পত্র

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪২শ সংখ্যা—মূল্যে ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd. February, 1962.
40 Naya Paise

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নিমতলার শ্মশান থেকে বেরোবার সময় যুগান্তর সম্পাদক একটি দীর্ঘশ্বাস সহকারে প্রথম এই কথাটি বলেছিলেন ঃ বাংলা সংবাদপত্রের পিতামহের মৃত্যু হল।

১৮৯৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একাদিক্রমে ৬৩ বৎসর যিনি বাংলা সংবাদপত্রের সংগে জড়িত ছিলেন এবং যাঁর লেখনীর স্মৃতি বহন করছে স্বদেশী যুগের প্রত্যেকটি স্মরণীয় সংবাদপত্র—বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা ইত্যাদি, বাংলাদেশের সেই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যুতে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কোনো শোকোক্তি হতে পারে কিনা সন্দেহ।

তাঁর মৃত্যু আকস্মিকও নয়, মর্মান্তিকও বলা চলে না। ৮৬ বৎসর বয়সে এবং সুদীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন কর্মজীবনের অত্যন্ত সুমিত পরিণতিতেই মৃত্যু এসে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছিল—কোনো কাজ ফেলে রেখে তাঁকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে হয়নি। তিনি অবকাশ পেয়েছিলেন সাহিত্য, সমালোচনা ও সাংবাদিকতায় তাঁর কর্মজীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার। বিংশ শতাব্দীর গোটা প্রথমার্ধ তাঁর এই সম্ভাবনা সাংবাদিক জগতে শাখা-প্রশাখায় বিচিত্র এবং অত্যন্ত গম্ভীর, মহনীয় সম্ভার নিয়ে আত্মবিকাশ করেছিল, যার পরিণতি আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দেখেছি একটি বিরাট মহীরুহের ন্যায়।

তিনি ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রের মধ্যে ৬৩ বৎসরব্যাপী এমন একটি কর্মজীবন বিস্তার করেছিলেন, যা এই দুই যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটি সহজ সেতুবন্ধের মতো! এই সেতুবন্ধ দিয়ে সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ এবং যুগান্তর ইত্যাদি আগ্নেয় সংবাদপত্রের যুগ পেরিয়ে আমরা বর্তমানের সংবাদপত্রে এসে পৌঁছেছি। প্রকৃতপক্ষে বিগত ৬৩ বৎসরের বাংলা সংবাদপত্রের বিরাট বিবর্তনের ইতিহাস একটি মানুষের জীবনের মধ্যেই প্রতিফলিত হতে পেরেছে, একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, যিনি বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহকর্মীরূপে নিজেকে দাবী করতে পারতেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও তাঁর রচনা আমাদের এই নবজাত পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রের একাল ও সেকালের মধ্যে এই জীবন্ত যোগসূত্রটি তাঁর মৃত্যুতে ছিন্ন হয়ে গেল।
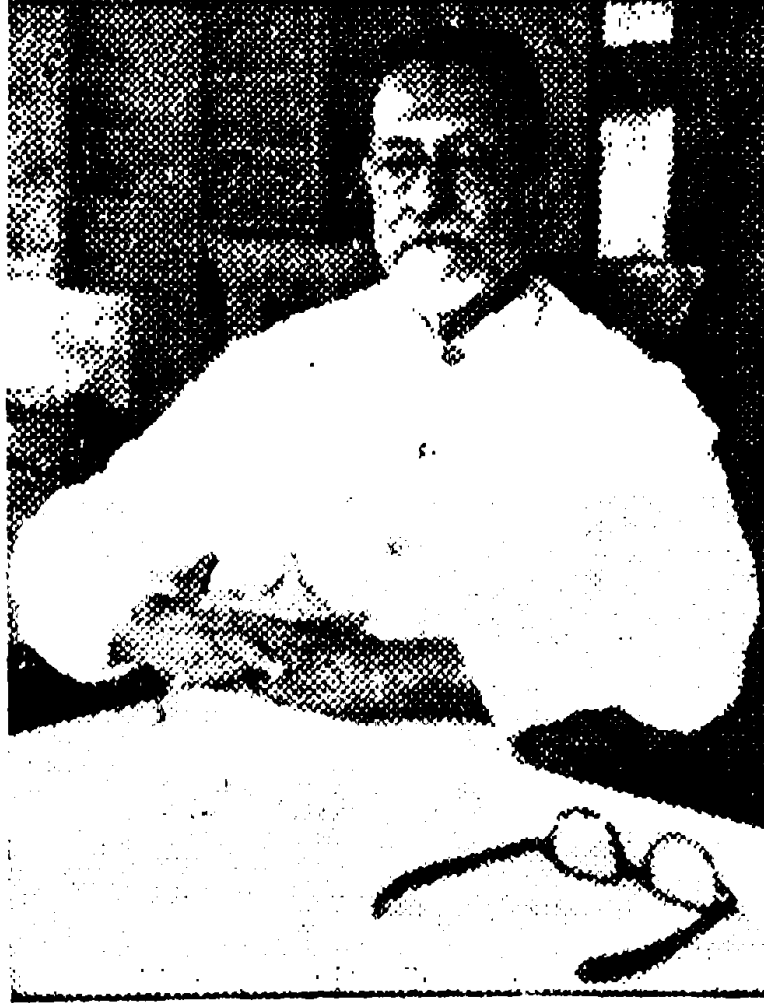
কিন্তু শুধু সক্রিয় সাংবাদিকতার সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসরব্যাপী এই রেকর্ডের জন্য নয়, তাঁর ভূমিকা বাংলা সংবাদপত্রে একটি অদ্বিতীয় অধ্যায়রূপে লিখিত থাকবে অন্য কারণেও। বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় তাঁর সমান ওজস্বিতা যে-কোনো দ্বিভাষিক সাংবাদিকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। তাঁর সযত্নরক্ষিত সংগ্রহশালায় সংবাদ ও ঘটনার যে বিপুল রেফারেন্স বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হয়েছিল, তা যে-কোনো গবেষণামন্দিরের সমকক্ষ। প্রকৃতপক্ষে বাংলার জীবন্ত বিশ্বকোষরূপে তাঁর যে পরিচিতি, সে ধরনের পরিচিতি অদ্যকার দিনে আর কোনো প্রতিভাবান সাংবাদিকের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব নয়। বর্তমান স্পেশালাইজেশানের যুগে ঐ শ্রেণীর সামগ্রিক জ্ঞান, ঔৎসুক্য এবং বহু বিদ্যায় সমান পারদর্শিতা ও অধিকার ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে আসছে। তথ্যনির্ভর, যুক্তিশীল এবং ওজস্বী—একাধারে এই তিনটি গুণেই তাঁর লেখনীর মধ্যে ছিল। তদুপরি, বাংলা রচনায় তাঁর আর একটি দান এবং বিশেষত্ব—দেশজ প্রবচন এবং উপমা ব্যবহার, যার ফলে তাঁর সম্পাদকীয় রচনাগুলি সাধারণ মানুষের মর্মের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছে।

বাংলা সংবাদপত্রে তিনিই প্রথম সাংবাদিক যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্র পরিদর্শন এবং রিপোর্ট করেছিলেন। পরিহাসচ্ছলে তাঁর সম্বন্ধে অনেকে বলতেন, এই সেই সাংবাদিক—সম্রাটের সংগে করমর্দনরত চাণক্যতুল্যবুদ্ধি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বাকিংহাম প্রাসাদে ১৯১৯ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সংগে করমর্দনরত তাঁর একটি ছবি অনুরূপ শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল)! কিন্তু পরিহাস বাদ দিয়ে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় যে বহুমুখী, দূরবিস্তৃত বিপুল অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন এবং অবিরত অক্লান্ত লেখনীর দ্বারা সেই অভিজ্ঞতাকে যেমন শেষদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রের পাতায় উৎসর্গ করে গেছেন, তার দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এমন একটি পরিণত জীবন সম্বন্ধে শোকোচ্ছ্বাসের হয়ত কোনো কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাসের একটি জীবন্ত পৃষ্ঠা বন্ধ হল, একথা শ্রদ্ধামিশ্রিত বেদনায় আমরা স্মরণ না করে পারছি না।

কবিতা
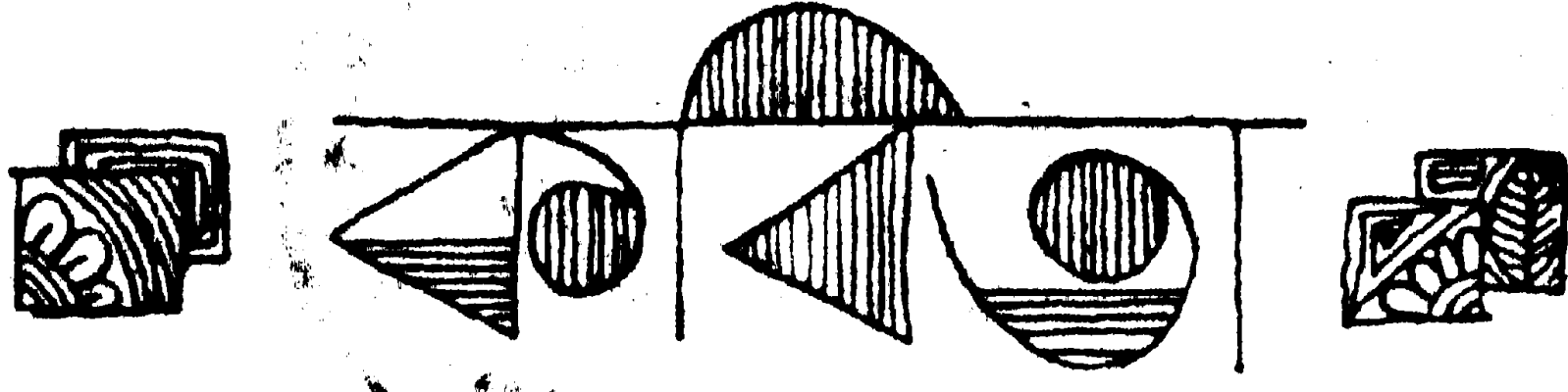
জীবন : কবিতা

দিনেশ দাস

আমার জানলায় শুধু কাক ডাকে সকালে-বিকেলে
নীচে তার দিনরাত রাতদিন শব্দ হয় টিউবওয়েলে :
এটি ঘিরে বস্তীপুরনারীদের কলহ-বচসা
মাঝে মাঝে অতর্কিতে শিশুদের চীৎকার সহসা।

অথচ ভোরের এই বেলোয়ারী কাঁচের রোদ্দুর
মনের ত্রিকোণ-কাঁচে যেই এসে ছোঁয়,
তখনি কে যেন এই বস্তীর ধারেই
সাতরঙা সতরঞ্চি সহসা বিছোয়।

তখন কুয়াশামাখা কাকগুলো
ছাই-ছাই বেলুনের মত ঠিক ভাসে,
সেই পথ ধ'রে মন শূন্যে দেয় পাড়ি :
টিউবকলের ধারে লাল-নীল-বেগুনী রঙের শাড়ি
মরসুমী ফুলের মত ফুলে ওঠে শীতের বাতাসে :
শিশুদের কলরব
মনে হয়, এক মুঠো মুড়ি নিয়ে
এক ঝাঁক শালিখের পউস-উৎসব।
কাগজে-কলমে দেখি হৈ-চৈ থেমে গেছে সবই—
জীবনের দুধের বাটিতে
ভেসে ওঠে নরম সরের মত শুচিশুভ্র নৈঃশব্দ্যের ছবি॥

* *

শোক থেকে

ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার

বেদনা ভাস্কর্য হলে জেগে উঠবে সমস্ত পৃথিবী
মুখে নিয়ে শতাব্দীর ক্ষতচিহ্ন, স্থির ম্রিয়মাণ
শায়িত রাত্রির শবে অবিলাসী মনের প্রয়াণ,
কত যে যন্ত্রণা, জানি। কে আর এখন টেনে নিবি
সন্ধ্যার হাওয়ার হাত থেকে রোজ রাত্রির আলোকে?
রাত্রি বড় স্নিগ্ধ জানি, গাঢ় আলো, নারী ব্রোহিসিবী
উজ্জ্বল উত্তাপ, বন্ধু, তথাপি কেবলি মন শোকে
ডুবে থাকে। দৃশ্যমানে, অদৃশ্য হাতের আজ্ঞাজীবী
সমস্ত নৌকোর ঝাঁক চলে গেলে দৃশ্যের অন্তরে,
তখনি আঁধারে যেন কারা ভাটিয়ালী গান করে
মাঠ বন পার হয় নৌকো খুঁজে, পারের পারাণি;
খুঁজতে খুঁজতে তারা সব লণ্ঠন কাঁপিয়ে ঘুরেফিরে
পায়ে পায়ে চলে যায় গান গেয়ে রাত্রির বাহিরে।

বেদনা ভাস্কর্য হলে আত্মা জেগে উঠবে, আমি জানি॥

কুয়াশার আকাশের মুখ

আদিনাথ ভট্টাচার্য

অজানা ফুলের গন্ধে আজন্মের শৈশব চেতনা
ম্লান কুয়াশার মত হেমন্তের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
কুয়াশায় মুখ ভাসে—কুয়াশার মুখ—দৃশ্যান্তরে
অশরীরী ভবিষ্যের মুখহীন চোখের দ্যোতনা।

অজানা পাখির ডাকে কৈশোরের গাঢ় নিঃসঙ্গতা
মলিন জ্যোৎস্নার মতো কার্তিকের কুয়াশা-আকাশে;
আকাশে একটি মুখ—আকাশের মুখ—নীরবতা
স্পর্শরিক্ত অঙ্গুলির ক্ষমাহীন অক্ষম প্রকাশে।

ধুধু মাঠে আমি একা। কুয়াশার পাতলা চাদরে
ঢাকা কোজাগরী চাঁদ ওঠে। একান্তে আমাকে ডাকে
কুয়াশার আকাশের মুখ, সোনালী চুলের ফাঁকে
দুটি চোখে নীল দৃষ্টি, ধোঁয়া ধোঁয়া দুটি ঠোঁট নড়ে।

দুহাত বাড়িয়ে দিই—চোখে দেখি গাঢ় কুটিলতা;
সংশয়ে পেছনে সরি—ঠোঁটে দেখি মত্ত শিথিলতা।

দূর দাক্ষা

জৈমিনি

আমরা, বাঙালীরা, খুবই সংস্কৃতি-অনুরাগী জাত। আর বাংলা দেশ বলতে যেহেতু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেবল কলকাতা শহর, সেইহেতু আমাদের সংস্কৃতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা যে দেখা যাবে এই শহরেরই চৌহদ্দির ভিতরে তাতে আর আশ্চর্যের কি!

বাংলার মেলা নাকি এক অতি উত্তম সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের উপায়। যে যুগে, যে প্রয়োজনে এই মেলাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল সেই যোগাযোগের ব্যবস্থাহীন যুগের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ আজ বহুদূরে অপগত হলেও আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে কলকাতার বুকে বছরের পর বছর ধরে নানা উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়ে আসছি। অথচ এ শহরে তো প্রতিদিনই মেলা বসে আছে। বড়বাজার বাদ দিলেও, কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়ে, বা জগুবাজার বা গড়িয়াহাটের মোড়ে বিকেল এবং সন্ধ্যের দিকে যে রকম নর-নারীর সমাগম হয়, প্রকৃত মেলাতেও তেমন হয় কিনা সন্দেহ।

তবু আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা বসে এবং লোকও আসে। এসব জায়গায় ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের প্রদর্শনীর পাশে পাঞ্জাবী চটের দোকান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সমাবেশের কাছে নাগরদোলার ব্যবস্থা এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টরের সন্নিহিত কৃষ্ণলীলার তাঁবু সত্যিই এক বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে দর্শকের সামনে। কিন্তু সেটা বোধহয় বড় কথা নয়, অন্তত উদ্যোক্তাদের কাছে তো বটেই। বড় কথা হল সংস্কৃতি। তাই মেলা-প্রাঙ্গনের গাছগুলিতে লাগানো হয় লাল-নীল বৈদ্যুতিক বাল্‌ব, উচ্চকিত অ্যাম্প্লিফায়ারে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো হয়, 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি...' এবং চায়ের স্টলে চেয়ার খালি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে অবশ্য নির্ধারিত মঞ্চে বক্তৃতা আছে, লোকসংগীত আছে এবং আছে ফিল্ম শো।

আমি শুনেছি, ববণীয়া শিক্ষানেত্রী শ্রীযুক্তা মন্তেসরীর শিক্ষা প্রণালী, যাকে

বলে 'মন্তেসরী পদ্ধতি' তার মূলকথা হল—আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদান। মেলার ভিতর দিয়ে আমরা যা সংস্কৃতি-অনুরাগ সঞ্চয় করি তারও মূলকথা হল আনন্দ। সেদিক থেকে আমাদের এই 'মন্তেসরী পদ্ধতি'র সাংস্কৃতিক শিক্ষা যে অত্যন্তই উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঈষৎ-সচ্ছল বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরে পেঁাছে এই সংস্কৃতি-অনুরাগের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাতে অবশ্য একটু হোঁচট খেতে হয়।

'সূচনাটা হ'য়েছিল বেশ কিছুকাল আগে থাকতেই। শান্তিনিকেতনী মোড়া, নিচু তক্তপোষ, আধুনিক চিত্রকরের দু' একটি ছবি দেখা যাচ্ছিল পনের-বিশ বছর আগে থেকেই। ইদানীং বছর কয়েকের মধ্যে এই গৃহসজ্জার ব্যাপারে উপকরণ-বৈচিত্র্য ঘটেছে অসম্ভব রকম।

সত্যিই তো, মুখ যেমন মানুষের মনের দর্পণ, তেমনি বাড়ির বসবার ঘরটির রূপসজ্জা সমস্ত পরিবারটির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে বইকি! তাছাড়া নিছক বসবার ঘরটির বৈশিষ্ট্যেই যদি সংস্কৃতিবান বলে ছাড়পত্র পাওয়া যায় তো সেদিকে যে সকলেরই নজর পড়বে সেটাও বিচিত্র নয়। ফলত, হয়েছেও ঠিক তাই। পরশুরামের গল্পে যে গৃহিণীটি ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত বিদ্যালাভ করে স্বামীকে 'হোয়াট' 'হোয়াট', হোয়াট' বলে চমকিত এবং পুলকিত করে তুলেছিলেন, তেমন গৃহিণী হয়তো আজ অনেক পরিবারেই নেই। কিংবা যে গৃহিণী যুদ্ধের সময় শাদা উল বাজারে দুর্লভ হওয়ায় নীল রঙের উল দিয়ে কার্পেটের উপর নীল বিড়াল বুনে সাধারণের অবগতির জন্যে তার নিচে ইংরিজীতে লিখে দিয়েছিলেন 'দি ক্যাট', তেমন গৃহিণীও বোধকরি আজকাল সংসার-আলো করে নেই। কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই যে খুব একটা সুরুচির পরিচয় দিচ্ছেন এমনও বলা যায় না। বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে এমন সব জিনিস বৈঠকখানায় জড়ো করছেন তাঁরা যার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কাঠের পুতুল খুবই সুন্দর জিনিস; পুরোনো পোড়া-মাটির পুতুলও অতি অপূর্ব। স্থান পেল ঘর সাজানোর কাজে। ভালো কথা। কিন্তু তার পাশেই দেখা যাবে দেয়ালের উপর ঝুলছে এক টুকরো মাদুর, দুটি সোলার মালা এবং তিনটি পাখা-মেলা কাঠের হাঁস—থাকে থাকে উড়ছে! অন্য দেয়ালে একটি চিত্রিত চ্যাটাই, তার দুপাশে রঙকরা বাঁশের আধারে দুটি নধরকান্তি সবুজপত্র লতা—যার পয়মন্ত নাম হল 'মানি প্ল্যান্ট'।

ফলে দাঁড়াল এই যে, প্রমাণিত হল, আপনি একজন রুচিবান, বিদগ্ধ মানুষ। পুতুল, মাদুর, সোলা, চ্যাটাই, এসব দেখাল আপনি মনেপ্রাণে বাঙালী, বাংলার দেশজ ঐতিহ্য এবং লোকশিল্পের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আবার সেই সঙ্গেই 'মানি প্ল্যান্ট' অভিমানী দেহহিল্লোলে বুঝিয়ে দিল আপনি আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনারও অংশীদার!

এরপরে সে ঘরে যদি কেউ নাইলন শাড়ীতে সুসজ্জিতা হ'য়ে চড়া রঙের পদ্মফুল-আঁকা বরণডালার উপরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আবির্ভূতা হন তো সোনায় সোহাগা। একই লগ্নে আপনি শ্রাবস্তী এবং প্যারিসের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরে ধন্য হবেন।

এমনই ধরণের এক বাড়িতে আমি মসৃণ নারকেলের মালায় ফ্রিজে-রাখা ঠাণ্ডাজল পরিবেশিত হতে দেখেছি; অন্যত্র আতঙ্কিত হয়েছি দেয়ালের গায়ে দুখানি কুলো ঝোলানো দেখে। সে বাড়িতে ভদ্রমহিলারা কেউ কুলো দিয়ে চাল-ডাল ঝাড়তে উৎসাহী বলে অনুমান করতে পারিনি বলেই সন্দেহ হয়েছে, ওদুটির ব্যবহার হয়তো অবাঞ্ছিত অতিথিদের বাতাস দিয়ে বিদেয় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ! সমস্ত সময়টা বেশ আড়ষ্টভাবে কাটাতে হয়েছিল আমাকে।

রুচি বস্তুটি বড়ই অদ্ভুত। যার নেই সে বুঝতেই পারে না, কোথায় তার ঘাটতি। সস্তা অনুকরণে চোখ-ধাঁধানোর দিকেই তখন ঝোঁক পড়ে যায় বেশী, কী করছি বা কেন করছি, সেদিকে আর খেয়াল থাকে না। কিন্তু ঘর সাজানোর ব্যাপারটা তো শুধু আজব কিছু করার বাহাদুরি নয়, নিজের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্নই যে ওর সঙ্গে জড়িত। তাই সে ব্যাপারে একটু চিন্তা করতে হয়। নকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নকলস্য নকল উপকরণের যত্রতত্র ব্যবহারে কেবল রুচি-দৈন্যই প্রকটিত হয়, পরিবারের বিষয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান তাতে মেলে না।

আমাদের সংস্কৃতি-পিপাসু হবু-অভিজাত নরনারীকে এ বিষয়ে সচেতন হ'তে অনুরোধ করি।

ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্কট ও শিল্পী

রবীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাচীনতার বিরুদ্ধে যখন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাচ্ছেন—ঠিক এমনি সময়ে ঐতিহ্যহীন আমেরিকার শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা মার্কিনী সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জানালেন। অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে ইউরোপের মত— আদিম ও প্রাচীন আফ্রিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরে ছুটলেন না তাঁরা। তাঁরা আশ্রয় নিলেন আমেরিকান সভ্যতার আদি ও প্রাচীন ইউরোপে। অতিনীতিবাদী ঔপনিবেশিক পূর্বপুরুষেরা মানবীয় আবেগের কণ্ঠ কঠোর সংযম দিয়ে রুদ্ধ করে, ধর্মোন্মাদের অত্যুৎসাহ দিয়ে যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাতে ভারসাম্যের একান্ত অভাব ঘটল। "নতুন" মহাদেশের নতুন সভ্যতা, একদিকে যেমন মানুষের সৃজনশীলতার বিস্ময়কর ঐশ্বর্যদানব, অন্যদিকে তেমনি আত্মিক দারিদ্র্য ও অপরিপূর্ণতার বিকলাঙ্গ শিশু হল। অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন মৃত ধর্মাচার, অতিঐশ্বর্যলিপ্সা এবং জীবনমূল্যের বিকৃতি ও অসঙ্গতিতে, অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ জানালেন। দার্শনিক তত্ত্বের আপোষী চেষ্টা সত্ত্বেও বিজ্ঞানগত সমাজ ও সভ্যতায় মানুষের আত্মিক সমস্যা সমাধানের উপায় হল প্রকৃতি। একদিকে এই ভগবৎচেতনাহীন বস্তুময় জড়প্রকৃতির কাছে মানুষের শক্তি ও স্বকীয়তার ক্ষুদ্রত্ব, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যার অপব্যবহারে ঐশ্বর্যকামনা-সম্বল সমাজের কবন্ধতা ও অশ্লীলতার সম্মুখীন হয়ে চিন্তাশীল শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা প্রকৃতিবাদী হলেন, তাঁদের চেতনার প্রকাশ হ'ল নিরাশাব্যঞ্জক। এই নৈরাশ্য ইউরোপীয় নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে Balzac, Zola Flaubert-এর সাহিত্যে এবং Impressionist ও তার পরবর্তী শিল্পপ্রচেষ্টায় যে প্রকৃতিবাদ, আমেরিকার সমসাময়িক **Mark Twain, Herman Melville, Stephen Crane, Henry Adams, Frank Noris ও Theodre Dreiser** প্রভৃতির সাহিত্যেও তার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। আটলান্টিকের উভয় পারেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার শিল্প-সাহিত্যগত প্রকাশ সমধর্মী। এই যুগের শিল্প ও সাহিত্য প্রচেষ্টা হ'ল পচনোন্মুখ সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাকে বাতিল করে দেবার আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার নৈরাশ্যের ভেতরেও নতুন ও সুস্থ ভাবী সমাজের সম্ভাবনার আশা শিল্পী ও সাহিত্যিকরা হারায়নি, কিন্তু ভাবী সমাজের কোন ছবি বা সংস্কারের ইঙ্গিতও নেই। Ezra Pound, Upton Sinclair-এর মত অনেকেই একটা নবযুগ ও নব চেতনার আশায় উদ্বুদ্ধ হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার এই আশাভঙ্গ, ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়াময় পুঞ্জীভূত সংকটের মধ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ঐতিহাসিক গুরুত্বের আরও একটি বিশেষ কারণ হ'ল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। জটিল অর্থনৈতিক সংকট, অথবা আত্মিক সংকট, অথবা এই দুয়ের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া যা-ই এই ঐতিহাসিক বিস্ফোরণের কারণ হোক না কেন, এর প্রভাব ও প্রতিফলন যেমন পৃথিবীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক চিন্তা ও ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করল, তেমনি ইউরোপীয় চিন্তাধারার এক বিশেষ ছেদ টানল। যুদ্ধের আরম্ভে ইউরোপের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যুদ্ধকে নানাভাবে গ্রহণ করেছিলেন। Futuristরা তাঁদের বহুঘোষিত মতবাদের বাস্তবরূপ দেখলেন; Cubistরা যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চিত্রের Cubism-এর ফলিত রূপে উৎফুল্ল হলেন। অনেকের চোখে যুদ্ধ, প্রাচীনতার বিরুদ্ধে নতুনের, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম এবং এর ভেতর দিয়েই আকাঙ্ক্ষিত সংজ্ঞাহীন ভবিষ্যতের খোঁজ চলছিল। অনেকে দার্শনিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শান্তি ও যুদ্ধ দুয়েরই ভেতর বাস্তবকে দেখলেন। পলায়নী বৃত্তি দিয়ে মানুষের মনকে এই সীমিত বাস্তব থেকে মুক্ত করে, এক অতিবাস্তবের খোঁজ কেউ কেউ করলেন যেখানে মানুষের সঙ্গে জগতের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এই নবসম্পর্ক ভিত্তিগত অতিবাস্তববাদের নাম দেয়া হল "Surrealism"। প্রাক-যুদ্ধ সমাজের শান্তি ও স্বাধীনতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের আরম্ভে যাঁরা যুদ্ধের ভেতর আদর্শ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধোত্তর অবস্থায় যুদ্ধের নারকীয়তায় বিহ্বল ও সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হলেন।
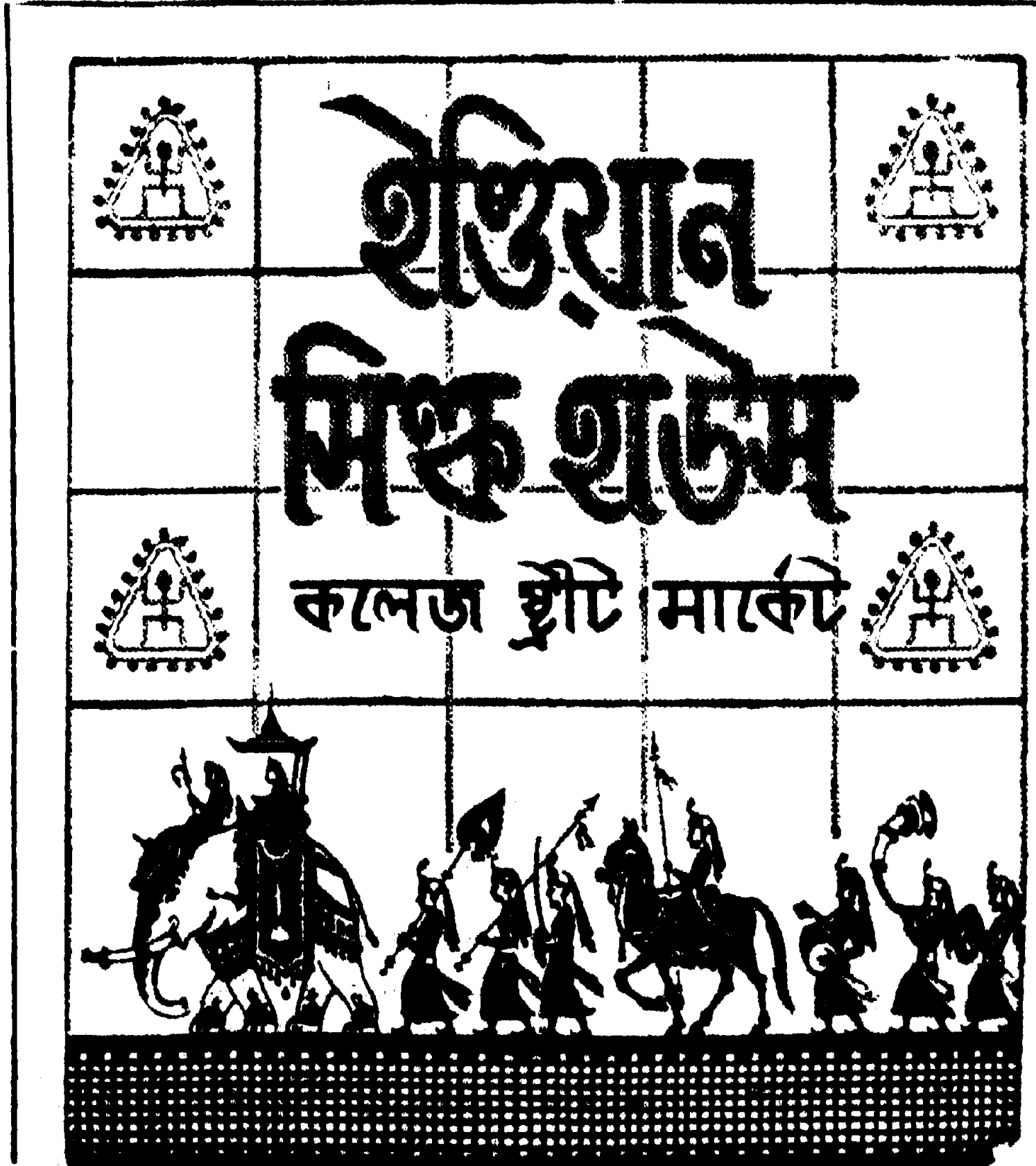
Russel, T. S. Eliot প্রভৃতি যুদ্ধের কারণ হিসেবে মানুষের বুদ্ধি-ভ্রংশ ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে মানুষের অক্ষমতাকে দোষারোপ করলেন। Shaw, H. G. Wells, Bennett-এর মত যাঁরা প্রাক-যুদ্ধকাল থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পোষণ করতেন তাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শ্রেণীবৈষম্যগত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখলেন। Hemingway, Barabusse, Remarque -এর মত সৈনিক-সাহিত্যিকরা তাঁদের যুদ্ধবিরোধী সাহিত্যে এবং Bloomsburyর বুদ্ধি-প্রবণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা সকলেই মহাযুদ্ধে মানুষের অসহনীয় দুর্দশার জন্যে শ্রেণীগত সমাজের মালিক শ্রেণীর নিদারুণ লোভ ও তাদের হাতে সাধারণ মানুষকে কামানের রসদ হিসেবে ব্যবহারকে দায়ী করলেন। তবু Hemingway-এর Farewell to Arm[illegible] Barabusse -এর Under Fire এবং Remarque -এর All Quiet on the Western Front -এ মানুষের স্বাধীনতার ওপর একান্ত আস্থা রাখা হয়েছিল। তাঁরা বললেন, ব্যক্তিগত মানুষ তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে যুদ্ধকে অস্বীকার করতে পারে, সমাজকে যুদ্ধমুক্ত করতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধকে শিল্প ও সাহিত্য-ধারার আধুনিক ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট ছেদরেখা বলে ধরা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ওপারে ইওরোপীয় মুমুক্ষু অনুভূতিপ্রবণ মন, সমসাময়িক সমাজ ও জীবনমূল্যের বিকৃতিতে প্রতিবাদ করলেও এবং ইওরোপীয় সভ্যতায় নিরাশ হলেও, "ব্যক্তির" শাশ্বত স্বাধীনতার ওপর আস্থা রেখে একটি সংজ্ঞাহীন আদর্শ ভবিষ্যতের আশা পোষণ করছিল। সভ্যতাবিবর্জিত আদিম মানুষ ও আর্তমানুষের নানান গবেষণার বহুমুখীন প্রকাশ ও প্রতিফলন সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনার প্রকাশ থাকলেও সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য, রাজনৈতিক চেতনা ও মতবাদ বিবর্জিত। প্রথম মহাযুদ্ধের এপারে ইওরোপীয় শিল্প, সাহিত্য ও চিন্তায় যে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হ'ল, তা রাজনৈতিক চেতনা ও মতবাদ-মুখীনতা। ক্রমশঃ তাকে কেন্দ্র করে ইওরোপের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক-জগতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগত গোষ্ঠী তৈরী হ'ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্ক্সীয় মতবাদের পরিচয় ও গ্রহণের যে সময়ক্ষেপের প্রয়োজন, তা শেষ হল প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে। বিশেষ করে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক গোষ্ঠীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শও বৃহৎ পরিকল্পনার রূপগ্রহণ ইওরোপের তথা বিশ্বের চিন্তাজগতে যে প্রচণ্ড নাড়া দিল, তাতে বিশ্বের মুমুক্ষু মানুষের কল্পনা ও অনুভূতিপ্রবণতা রাজনীতিচেতন হ'ল। ইওরোপের শিল্পী ও সাহিত্যিক মন নতুন আশা ও আলোকের সন্ধান পেল। "খৃষ্টধর্ম" এতদিন ইওরোপকে নিরাশ করেছে ও নিজে নিষ্ফল হয়েছে। রিলিজিয়ন-হীন ইউরোপ নতুন অবলম্বনের সন্ধানে নানান গবেষণা ও ভাঙগাগড়ার মধ্যে দিয়ে এসে প্রথম মহা-যুদ্ধকাল পর্যন্ত নিরবলম্ব হয়েছিল। তাত্ত্বিক মার্ক্সবাদ, বলশেভিক পার্টি ও রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রাদর্শের যে ইঙ্গিত দিল তাতে অবলম্বনহীন ইওরোপের মন অবলম্বন পেল। আন্তর্যুদ্ধকালীন ইওরোপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্রুত পরিবর্তন ঘটলেও এবং রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী হবার চেষ্টা করলেও, একমাত্র রাশিয়া ছাড়া ইউরোপীয় সংজ্ঞায় মানুষের স্বাধীনতা নষ্ট হয়নি এবং ইওরোপের শিল্পী-সাহিত্যিক ও চিন্তা-শীলদের রাষ্ট্রের বিশেষ আদর্শ প্রচারের জন্য পীড়ন করা অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবু সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্যের রাজনীতিমুখীনতা এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মার্ক্সীয় মতবাদকে কেন্দ্র করে সমগোত্রীয় ও সহযাত্রী হবার যে নানান রূপ তা ইওরোপের সর্বভ্রষ্টতার ও আত্মবিশ্বাস-লুপ্তির প্রকাশ মাত্র। Spengler-এর দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী অতিশয়োক্তি ও মিথ্যা হলেও নিরর্থক হয়নি। ইংলণ্ডের ধর্মবাদী James Joyce, Aldous Huxley, T, S, Eliot অথবা H. G. Wells, Ezra Pound, H. D. Lawrence-এর মত অনেকে Communism ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, আন্তর্যুদ্ধকালীন ইওরোপের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মুক্ত মানুষের মহৎ সমাজ ও জীবনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার একমাত্র ও নতুন ভরসা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানালেন। কম্যুনিজম ও মার্কসবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে পথিকৃৎ হ'ল। Spender, Koestler, Sartre Picasso, Wright, Silone প্রমুখদের মত Andre Gide, Malraux, Fischer — এঁরা "পার্টি মেম্বার" না হলেও সকলেই মার্ক্স-বাদে আবর্তিত হলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন হ'ল এই যুগের ইওরোপীয় অনুভূতিপ্রবণ মনের পীঠস্থান। ধর্ম-চেতন Silone এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী Gide, Koestler-এর মত যাঁরা মার্কসিজমে দীক্ষা নিলেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে তীর্থপীঠ জ্ঞানে সেখানে ছুটলেন, তাঁরা মার্কসিজমের আকর্ষণের চেয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রবাদের অন্তঃ-সারশূন্যতায় ধর্মলুপ্ত সমাজের নিরবলম্বতার মধ্যে নরদেবতাকে সন্ধান করলেন। এই সব ইওরোপীয় নৈরাশ্য ও চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থায় যুদ্ধোত্তর জার্মানীর বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা ও শ্বাসরোধকারী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার নৈরাশ্য সর্বাত্মক হ'ল। দারিদ্র, অবিশ্বাস, নৈরাশ্য থেকে বিদ্বেষ, ঘৃণা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় গৌরববাদ ও রাষ্ট্র সর্বস্বতার মধ্যে Nazism-এর জন্ম হল। একদিকে জার্মানীর Nazism ও ইতালীর Facism, অন্যদিকে পশ্চিমী Democracy-র সমাজ ও জীবন-মূল্যের বিকৃতি ও অন্তঃসারশূন্যতা ও Facism তুষ্টি প্রচেষ্টা। এই উভয় সংকটের মধ্যে সর্বমূল্যভ্রষ্ট ইওরোপীয় অনুভূতিপ্রবণ মনের শূন্যতা Communism ও সোভিয়েট সমাজ-তন্ত্রবাদকে নান্য পন্থা হিসাবে সাগ্রহে গ্রহণ করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক মানুষ প্রথম যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-রাজ-নৈতিক মানুষে পরিণত হ'ল। Gide, Camus, Malraux, Sartre, Spender, Hemingway, Steinbech, Remarque, Picasso, W. Lewis-দের মত ইওরোপীয় শিল্পীগোষ্ঠীরা সমসাময়িক ইউরোপীয় মনের প্রতিনিধি। T. S. Eliot, Aldous Huxley-দের ইওরোপীয় খৃষ্টীয় ঔপনিবেশিকতা একান্তই বিদ্যাসবস্ব। H. G. Wells প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা নঞর্থক। যাঁরা নান্যপন্থী হয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে মানবত্রাণকর্তা নরদেবতাকে খুঁজতে গেলেন তাঁরা ঐতিহাসিক Stalin-Hitler চুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও "disillusioned" হলেন। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও শূন্য ইউরোপ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদদের হাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

আন্তর্যুদ্ধকালীন আমেরিকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও ইওরোপীয় জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন-সম্ভূত সমসাময়িক আমেরিকার সাহিত্যে একই সংশয় বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। ধনভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ জীবনের সংকট ও নৈরাশ্য প্রকাশ পেল। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য ধ্বংস আশঙ্কায় যাঁরা নতুন বিশ্বাস ও আস্থার সন্ধানে Marxism-এ আশ্রয় নিলেন তাঁরা প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালের সোভিয়েট নীতিতে নিরাশ হয়ে ইউরোপের শিল্পী সাহিত্যিকদের মতই নিরাশ্রয় হলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধকালীন শিল্প ও সাহিত্যে যদিও নিরাশা ও স্বপ্নভঙ্গের

প্রকাশ ছিল, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি। সেই নিরাশার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া ছিল চলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও নায়কগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। নতুন ব্যবস্থা ভিত্তিতে নতুন ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি সেই প্রতিবাদ কখনো আস্থাহীন হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্যের মত যুদ্ধ-বিরোধিতা ও শান্তির বাণী নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যুদ্ধ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনায়কদের বিচার করেননি, যুদ্ধের কার্য-কারণ নিয়ে প্রশ্নও করেননি, শান্তির মতই যুদ্ধ ও বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের শিল্প ও সাহিত্যে। প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চলিত সমাজ ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তি সঞ্চয় করে নানান ভাঙাগড়া ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে এসে আদর্শ ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, Marxist দর্শন এবং Bolshevic রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে আশ্রয় দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই সিদ্ধান্ত ও দর্শন সম্বন্ধে বিরাট প্রশ্ন উঠল ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ অবস্থায় অতীতের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতের আদর্শে সম্পূর্ণ-রূপে আস্থাহীন হয়ে ইওরোপীয় "মন" "কর্ম" ছেড়ে "কর্তা"কে সন্ধান করল—"I am that I am"—"I am my own justification" এই হ'ল নতুন দর্শন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তাই অতীতের নানান "বাদ" ও "তত্ত্বের" জন্ম হয়নি। এ যুগের নবদর্শন হ'ল "Existentialism".

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানব ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ছেদ। মানব-ইতিহাস-প্রবাহে মধ্যবিংশ শতাব্দী একটা বাঁক। খণ্ড খণ্ড ঘটনা সম্বলিত ও খণ্ডিত সময় দ্বারা পরিমিত ইতিহাস মহাযুদ্ধকালে সম্মুখের পথহারা হয়ে অতল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সর্বস্বান্তির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ইউরোপ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক লুণ্ঠিত আশংকায় যখন অবসন্ন, তখন আটলান্টিকের ওপারের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল হতবল ইওরোপকে পুনর্জীবিত করার জন্যে এবং অর্ধইওরোপ-কবলিত সোভিয়েট ইউনিয়নের কবল থেকে বাকী ইওরোপকে রক্ষা করার জন্যে। এর ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জীবন ঘটলেও আত্মিক শূন্যতা অপূর্ণ রয়ে গেল। পশ্চিমী বুর্জোয়া ডেমোক্রেসী নববলীয়ান বলশেভিক কম্যুনিজমের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আত্মিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগল। এবং ইওরোপীয় সভ্যতার এই সংকট সমাধানের ভার বর্তেছে A. Toynbeeর মত সৃজনশীল মুষ্টি-মেয়ের ওপর। এবং Colin Wilson-দের মত যাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন তাঁরাও সমাজের নেতৃত্ব দাবী করছেন আজকে।

প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইওরোপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ভাল-মন্দের দায়িত্ব ব্যক্তিগত ছিল না এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সে দায়িত্ব স্বীকার করেনি। রাষ্ট্রগত, শ্রেণীগত ও স্বার্থের আন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত বিভিন্ন জটিল শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যে Leviathan, তার পাপপুণ্য, ভালমন্দের দায়িত্ব ব্যক্তি নেয়নি বা তার ছিল না। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতের মিশ্রণের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতির যে আশা, তার সর্বধ্বংসী পরিণতিতে যুদ্ধোত্তর ইওরোপ নতুন মূল্যায়নে সজাগ হ'ল। এতদিন নৈতিক চেতনা ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল; সমগ্র সামাজিক জীবনের নৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বোধ ছিল না। যুদ্ধোত্তর মধ্য-বিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল মানুষ সর্বধ্বংসী অথবা সর্বসৃষ্টিকারী এই দুই বিপুল সম্ভাবনার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-ব্যবস্থায় তার সক্রিয় দায়িত্বে সচেতন হল। মানুষের বিশেষ করে ইউরোপের মানুষের এই যে নবচেতনা—"that the inner forces of existence are suddenly revealed as the supreme forces on which the external future of civilization will depend, just at a moment when men were consoling themselves for the decadence of the inner life by the systematic development of Science",যার ফলে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় শিল্পে সাহিত্যে চিন্তার দাবী হ'ল—"on being rather than on making" এবং সে "being" হবে "moral being"। যুদ্ধোত্তর মুমুক্ষু ইওরোপের "Angry young men"রা ইউরোপের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি যা কিছু চলিত ও স্বীকৃত এবং যা কিছু একান্তই ইওরোপীয় তাকে বরবাদ করে দিয়ে নতুন জীবন-পদ্ধতি ও জীবনমূল্যের সন্ধানী হলেন। একদিকে বর্তমান ইওরোপ যেমন মার্ক্সীয় দর্শনের গবেষণাগার সোভিয়েট ইউনিয়নে যেমন আস্থাহীন, অন্যদিকে তেমনি ইওরোপের ধনভিত্তিক সভ্যতা ও জীবনবোধ যার ভিত্তি হ'ল "Culture", তাকে বাতিল করে নতুন সমাজ ও জীবনের সন্ধান করছে, যার ভিত্তি হ'ল নৈতিকতা ও ধর্ম।

ইউরোপের এই ঐতিহাসিক নব-চেতনার পটভূমিকায় ফরাসী সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের ইন্দ্রিয়গত ও আত্মিক সংমিশ্রণের একান্ত রূপকে বর্জন করে

"engaged" সাহিত্যে উৎসাহী হল এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্বের দাবী শোনা গেল সমসাময়িক Camus, Sartre-দের সাহিত্যে। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর ধ্বংস সম্পূর্ণ হ'ল,—জৈব ও আত্মিক বিনাশে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আত্মপাপ-সচেতন জার্মানী তার নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন তুলল। শ্রেষ্ঠ জার্মান শিল্প, সাহিত্য ও জার্মান সংস্কৃতির বিমূর্ত প্রকৃতিকে বরবাদ ও অস্বীকার করে নতুন সংস্কৃতি, শিল্প ও জীবন মূল্যায়নের যে দাবী হল, তার ভিত্তি "moral realism"। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই দাবীকে Thomas Mann সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও জাতীয় নৈতিক গুরু হিসেবে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধোত্তর জার্মানীর বুদ্ধিজ ও আত্মিক প্রতিক্রিয়া এবং মুমূর্ষার প্রকাশ দেখা যায় এই উক্তিতে; "There are no such alternatives as good and evil. There are truths and untruths. Truth is a diabolic and energetic and destructive. What is called good is only a facade of untruths. All social aims of democracy and progress and reconstruction and re-education — seek to establish a kind of routine on the false assumption that there is something concrete and enduring in nations, parties business and machinery which can absorb peoples lives and make them think of themselves as parts of the structure which has nothing to do with the innermost reality of their existence. All talks of rights and wrong is an attempt to make one loyal to something outside the truth about oneself — which is that one is alive and is going to die and that one has no loyalty to anyone except one self........ The Third World War which will complete the unfinished task of this war......Destroy the whole of this unnatural decadent civilization of great cities and false values".

প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের সাম্রাজ্যপুষ্ট বুর্জোয়া সমাজের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে Keynesian অর্থনীতি তত্ত্ব ও Neo Fabian রাজ-নৈতিক চিন্তা সাহায্য করল। এবং পুরোন শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীস্বার্থের সংস্কারের যে অবশ্যম্ভাবী ও আশু প্রয়োজন ছিল, তা সম্ভব হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারফত। নব শ্রেণীবিন্যাস ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে মানুষের যে আর্থিক উন্নতি ও জৈব স্বাচ্ছন্দ্য ঘটল, তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও আত্মিক সমস্যার সমাধান হল না, বরং সেখানকার চিন্তাশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা ইউ-রোপীয় "Culture"গত সভ্যতার সংকট গভীরভাবে অনুভব করলেন। প্রজাহিতকামী রাষ্ট্রের জৈব নিরাপত্তা ও অভূতপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও যুদ্ধোত্তর বুর্জোয়া সমাজে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া ও সংকটের প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৫০-৬০ দশকের সাহিত্য ও সাহিত্য প্রচেষ্টায়। Angus Wilson, Osborne, Braine, Elizabeth Sitwell, W. Cooper, Iris Murdoch Beckette, Denis-দের মত "Angry young men"-দের সাহিত্য সমাজের অন্তঃসারশূন্য পচনশীল সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও ব্যঙ্গে ভরা। প্রাক্ মহাযুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর শিল্প ও সাহিত্যের তফাত হল যে, উভয়েরই ধর্ম বাস্তববাদ। চিরাচরিত ও চলিত যা কিছু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত বা আদর্শ ভবিষ্যত সৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। Beckette-এর "Waiting for Godot"-তে নিরলম্ব জড় ও অসুস্থ মানুষের যে নির্জীবন "অপেক্ষা" তা একান্তই মধ্যবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রতিচ্ছবি;—সে "অপেক্ষা" কিসের জন্যে তার সংজ্ঞা নেই। যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের সাহিত্যের এই নঞর্থক মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যে Colin Wilson-এর "An enquiry into the Sickness of the Mid-Twentieth Century Man" আটলান্টিকের উভয় পারেই সনিনাদ সাড়ম্বরে গৃহীত হ'ল নব আলোক ও নবজীবন দর্শনের প্রত্যাশায়। "Out-sider" এবং "Religion and the Rebel", প্রাক Colin Wilson চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের দুশ্চিন্তা ও নিরাশাবাদের প্রতিধ্বনি। Eliot-এর ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, Spengler-এর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনিবার্য পতন প্রভৃতি নিরাশাবাদের সঙ্গে Shaw, Eliot-এর "ধর্ম"কে জুড়ে Colin Wilson-এর যে নব "Existentialist" দর্শন ও সমাজ তার কারুকুৎ হবে Nietzchean Superman-রা, যারা Colin Wilson-এর মত "Inside"—Out-sider, কিন্তু এই আদর্শ, ভাবী সমাজ ও জীবনের অন্তরায়। Colin Wilson-এর মতে "No man can become a superman in a world of apes. it is impossible to be a genius among pygmies.... Vast mass of people are so stupid they fight as well as be dead. they are lepers — morally and spiritually." Colin Wilson আশা-বাদী, —তাই ইউরোপীয় সভ্যতার সংকট ও সমস্যার প্রতিবিধানের জন্যে তিনি একটা "Scientific" ও "Community Religion" এবং নব Church-এর প্রয়োজন জানালেন কারণ—Christian Church ও "Christianity has failed Europe"! তাঁর এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে "One can only hope that he has failed."

যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব, দম্ভ ও বৈশিষ্ট্যে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে ইউরোপ নিজেকে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়েছিল সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ ও ধর্ম হ'ল দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রিক। ইউরোপ তার অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান যুগে যুগে করেছে নতুন নতুন "মূল্য" সৃষ্টি করে এবং ইউরোপের গতি ও প্রকৃতি হয়েছে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুসরণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দ্বিধা-বিভক্ত ইউরোপের ঐতিহাসিক সভ্যতা, সংস্কৃতি-চেতনা ও মূল্যবোধের ধারক পশ্চিম ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রগুলি একদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক অন্তঃসারশূন্যতা ও অন্যদিকে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির কাছে আত্মলুপ্তির আশংকা, এই উভয় সংকটের মধ্যে নতুন দর্শন ও মূল্য সৃষ্টির জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এবং সেই সন্ধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর যাঁরা নগর-কেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের পরগাছা ও জীবন-যোগসূত্রহীনতার ফলে Outsiders। বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যগত সাংস্কৃতিক যে বিশেষ জগৎ, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন জীবনে বিগত সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন,—পরিচিত জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন— তাই অপরিচিত। শিল্পীর বাস্তব সাধারণের বাস্তব নয়। শিল্পী সাহিত্যিকেরা পোষা, পরগাছা এবং ভারসাম্যচ্যুত। খৃষ্টীয় ধর্মের চার্চগত যে রূপ তা বুর্জোয়া চেতনার পরিপন্থী তাই বিজ্ঞানও যান্ত্রিক শিল্প। কিন্তু মধ্যবিংশ শতাব্দীর আত্মিক এ সংকট শুধুমাত্র পশ্চিম ইউ-রোপীয় কিনা এ সন্দেহ দেখা দিল Dudinstev ও Pasternac-এর চাঞ্চল্যকর "Not by Bread Alone" ও "Dr. Zivago"-তে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ সংকট সর্বমানবীয়। আশা করা যায় এই শতাব্দীতেই মানুষ "Grand Synthesis"-এর সন্ধান পাবে।

তীর্থ-যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গোড়াতেই ব'লে রাখি আমি দেব-দ্বিজ এবং সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাসী। আপনারা বলবেন ওসব বোগাস্, এ যুগে অচল। আমি তা কি ক'রে মেনে নোব? বিশ্বাস আছে বলেই তো সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিতে পেরেছিলাম, আর তাইতেই তো অতবড় একটা সংকট থেকে পরিত্রাণও পেয়ে গেলাম।

তীর্থে যাওয়ার আয়োজন করছিলাম। গোবর্ধন এসে প্রশ্ন করল—"যা সব শুনছি সে কি সত্যি দাদা?"

বললাম—"বয়েস হয়েছে তো গোবর।"

"ওটা আমাদের দেশে চল্লিশের আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্তত একথা মানতে চাইবেন না যে যাঁকে ঘরে, এত কাছে থেকে পাওয়া গেল না—তাঁকে অত দূরে গিয়ে পাওয়া যাবে।"

বললাম—"আমি তো বলি, যখন সারা জীবনটা এত কাছে থেকে পাওয়া গেল না, তখন 'কাছে' ব্যাপারটার মধ্যেই হয়তো কোনও গলদ আছে। তাই মনে করছি একবার দূরটাও দেখে নেওয়া ভালো। সময় আর কোথায়?"

একটু চুপ করেই রইল গোবর্ধন, ঘাড় হেঁট করে, আয়ুর কথা তুললে একটু পীড়িতই হয়। একটু পরে মুখ তুলে বলল—"তা একাই যাবেন?"

"একারই পথ নয় কি ওটা?"—আমি উত্তর করলাম।

বলল—"তীর্থের পথ অনেকটা স-শরীরে স্বর্গে যাওয়ার পথ, এটা স্বীকার করতেই হবে দাদা। স্থায়ী নয়, অস্থায়ী স্বর্গ, এইটুকুই মেনে নিতে পারি। সে-নজীরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা ধরে বলা যায়, মহাপ্রস্থানের পথে তিনি সঙ্গী নিয়েছিলেন।"

বললাম—"ধর্মরাজ ব'লে তিনি তাদেরও অনেক দূরে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারবেন, সে-সাহসটা ছিল তাঁর। আমি উলটে তাদের বোঝাই হব না গোবর?"

একটু ঠোঁট মুচকে হাসল গোবর্ধন, মনে হোল যেন রুখবার চেষ্টা সত্ত্বেও হাসিটুকু ফুটে উঠল। প্রশ্ন করলাম—"হাসলে যে?"

বলল—"আপনার সঙ্গে তর্ক চালিয়ে যাব সে আস্পর্দা নেই আমার দাদা। আমি যে-কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটা বেশ আপনার মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল। ঐ 'বোঝা'। যুধিষ্ঠির ফাঁকা মহাপ্রস্থানের পথ ধরেছিলেন দাদা। আপনার পথে চাপ ভিড়, আর তার মধ্যে এমন বহুত লোক আছে যারা মনে করে যাত্রীদের বোঝা হাল্কা করা স্বর্গলাভের আরও সোজা পথ। তাদের পক্ষে সে বিশ্বাসটা নির্ভুল, এটা অস্বীকার করবেন? এমন কি যুধিষ্ঠিরও এ বিষয়ে হুঁসিয়ার ছিলেন দাদা; অত ফাঁকা পথ, তবু রক্ষী হিসেবে যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাকে আগা-গোড়া সঙ্গে রেখেছিলেন।"

ওর বলবার যা ঢং তাতে না হেসে উপায় থাকে না; বললাম—"তুমি গাঁট-কাটা-পকেটমারদের কথা বলছ নিশ্চয়, কিন্তু আমি অত ভালো রক্ষী পাবই বা কোথায় গোবর?"

"আছে একটা দাদা। হয়তো অতটা ভালো নয়—যুগটাও তো বদলেছে......"

"তালিম-দেওয়া এ্যালসেশিয়ান?—স্পেনিয়েল্?"—কুকুরের প্রসঙ্গ চলছিল ব'লেই আমি কতকটা উৎসুক হয়েই প্রশ্নটা করলাম, বললাম—"তাহলে না হয় নেওয়া যেত একটা সঙ্গে।"

মুখ নীচু করে ঠোঁট চেপে হাসছিল গোবর্ধন; তুলে, মুখের দিকে চেয়ে বলল—"অত ভালো ব'লেও গুমর করতে পারি না, তবে....."

বললাম—"ছিঃ, তুমি নিজেকে কুকুরের সামিল করছ গোবর?" বাধা দিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম আমি। তিরস্কারটা বাড়াতেই যাচ্ছিলাম, সেটা আন্দাজ করেই পাশ কাটিয়ে আরম্ভ করে দিল—"ওসব তীর্থ-ধর্মের দিকে মতি-গতি তো দিলেন না ভগবান, দাদা, কখনও যে দেবেন এমন লক্ষণও দেখছি না। তাই বলছিলাম যদি সঙ্গে নিতেন, ও-কাজটুকু হয়ে থাকত। বলবেন—বিশ্বাস তো করো না। তা সাপের বিষ আছে বিশ্বাস না করলেও যমে তো ছাড়ে না।"

এই রকম উদ্ভট উপমা ছাড়ে মাঝে-মাঝে, হাসিয়ে যুক্তি-তর্কের ঝোঁকটা কাটিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করে। তবুও বললাম, কতকটা তর্কের খাতিরেই বললাম—"থাক'ই না এখন গোবর। সাপের বিষের কথা যাই হোক, ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে কাজ করাটাতেই বেশি ফল তো। তোমার তো এখনও সময় আছে তার জন্যে অঢেল।"

"ঐ একটা জিনিস দাদা, যখন মনে হয় অঢেল রয়েছে হাতে, হঠাৎ দেখা যায় এক লহমাও নেই আর। আর এমনই সওদা যে, কারুর কাছে হাত পাতলে ধার পাওয়া যাবে তারও উপায় নেই। এই সব বুঝে-সুঝেই যারা বুদ্ধিমান, অন্য

উপায় না থাকলে নিজের শ্রাদ্ধটাও আগে-ভাগে করিয়ে রাখে। তাই......"

আর বাড়ানো চলে না। বললাম—"চলোই তাহলে।"

সঙ্গে থাকলে কোনও কাজই তো করতে দেয় না নিজের। কোন ঝুঁকিই তো নিতে দেয় না; স্নান, আহার আর ঘুরে ঘুরে দেব-দর্শন, খুঁজে খুঁজে সাধু-সঙ্গ—দিব্য আরামে প্রায় মাসখানেক ধ'রে কয়েকটা তীর্থ সেরে বাড়ি-মুখো হয়েছি, হঠাৎ একটা লোভে পড়ে যেতে হোল।

তখন আমরা উত্তরাখণ্ডের পাহাড়-অঞ্চল থেকে সমতলে অনেকখানি নেমে এসেছি। গাড়িতেই খবর পাওয়া গেল, স্টেশন থেকে মাইল কুড়ি দূরে হঠাৎ পাথর ফেটে এক দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, এতই জাগ্রত যে, দেশ-বিদেশ থেকে দলে দলে লোক জড়ো হয়েছে, কাউকে খালি হাতে ফিরে আসতে হচ্ছে না। একটা রীতিমতো শহর ব'সে গেছে।

তখন আমরা ক্লান্ত, তার ওপর পয়সা-কড়ির ব্যাপারেও প্রায় রিক্ত হয়ে এসেছি। কিন্তু মাসখানেক ধরে এই ক'রে ক'রে তীর্থ-তীর্থ আর সাধু-সন্ন্যাসী বাইটা হাড়ে-হাড়ে গেছে ঢুকে। মনে করলাম এমন প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্য, এটাও সেরেই নিই তাহলে।

বাই অবশ্য আমারই। গোবর্ধনকে বলতে সে আর একটা তার উদ্ভট উপমা বের ক'রে বলল—"ইংরিজীতে শুনেছি Last straw on the camel's back (লাস্ট্‌-স্ট্র অন্ দ্য ক্যামেল্‌স ব্যাক্) বলে একটা কথা আছে। মানেটা নাকি এই যে, উটের পিঠে বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, শেষে একগাছা খড় চাপাতেই পিঠটা মচাৎ ক'রে ভেঙে পড়ল। আমার কথা বাদ দিন, আপনার আর বরদাস্ত হবে কি? পুণ্যের সবই গুণ, শুধু একটা দোষ, মেদ-মাংস-রক্ত—এই সব বাজে জিনিস কমাতে কমাতে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে আনে যে......"

"কৈ, তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না তোমায়! ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ কর কি কোনরকম?"—একটু ভীত হয়েই প্রশ্ন করলাম আমি।

পরের ছেলে সঙ্গে এনেছি, সব ঝুঁকিটাও বেচারার ওপর দিয়েই গেছে তো।

বলল—"ভুল করছেন দাদা। আমি তো পুণ্য সঞ্চয় করতে আসিই-নি, পশ্চিমের রাবড়ি-মালাই সঞ্চয় করতে এসেছিলাম। সেদিন হরিদ্বার স্টেশনে মাল ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর শরীরটাকে তুলে দিয়ে দেখলাম কুড়ি পাউণ্ড অর্থাৎ এই এক মাসে তার সের দশেক পুরে ফেলেছি ভেতরে।......আমি বলছি আপনার কথা......"

"রোগা হয়ে গেছি খুব?"

"বললে তো বিশ্বাস করবেন না। ঘর থেকে কোন্ পুণ্যার্থী গোড়াতেই সেই যে আরসিটা লোপাট করলে, আর একটা কিনতেও তো দিলেন না, নৈলে দেখিয়ে দিতে পারতাম সামনে ধ'রে....."

"একবার হয়েই আসি চলো গোবর।"—পিঠে হাত দিয়ে একটু হেসেই বললাম আমি। বললাম—"বেশ তো, দেবতার কাছে না হয় ঐগুলোই আবার চেয়ে নোব, শুনছি কেউ-ই খালি হাতে ফিরছে না। বলব—আমার সেই মেদ-মাংস-রক্ত, যেমনকার তেমনি ফিরিয়ে দাও প্রভু। কথাটা কি জান, এত দূর-দেশ থেকে এত কষ্ট ক'রে আসছে সবাই, আর আমরা সামনে দিয়েই বেরিয়ে যাব, নেমে দু'পা গিয়ে একটু দেখে আসব না, এর আপশোষ জীবনে হয়তো কখনও যাবে না। বিশেষ ক'রে তুমি রয়েছ সঙ্গে, আমার একটা মস্ত বড় সুবিধে। এমনটা আর কবে হবে?"

তবু খানিকটা চেষ্টা করল। শেষে বোধ হয় এই আশঙ্কা করেই রাজি হোল যে, আমি মনে করতে পারি ওকে সঙ্গে এনেছিলাম বলেই আমার এত বড় সুযোগটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় আমাদের গাড়িটা যে-স্টেশন থেকে যাত্রা সেখানে এসে পৌছাল। আমরা নেমে পড়লাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ওর উপমাটাই যেন হাতে-হাতে ফলে গেল।

স্টেশনেই একটা দোকানে কোন রকমে স্নানাহার সেরে আমরা একটা শেয়ারের টাঙ্গা ক'রে যখন পৌঁছুলাম, তখন দিনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক অবশেষ আছে। পাহাড়ের গোড়ায় একটা উঁচু-নীচু মেঠো জায়গায় বোধ হয় হাজার পঞ্চাশেক লোক জড়ো হয়েছে। বিশৃঙ্খল, অবিনাস্ত। যেন অকূল সাগরে পড়া গেল। কোথায় পাথর ফাটিয়ে-ওঠা ঠাকুর, দোকান পাট বা থাকবার জায়গা কোথাও থাকে তো তাই বা কোথায়, কিছুই বোঝা যায় না; তার ওপর সামনে রাত্রি। এর ওপর, আমার দিক থেকে এত লজ্জিত হয়ে পড়েছি গোবর্ধনের কাছে যে, তাকে যে একটা প্রশ্ন করব, একটা সলা-পরামর্শ করব তার সঙ্গে, সেটুকুও পারছি না। সঙ্গে একটা সুটকেস, দু'জনের সংক্ষিপ্ত বেডিং, আর একটা বেতের ব্যাস্কেট, টুকিটাকিতে ভরা। টাঙা থেকে নামিয়ে দিয়েছে, পায়ের কাছে রেখে চারিদিকে কলোচ্ছ্বাসময় জনসমুদ্রের দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁ করে দেখছি।

গোবর্ধন অবশ্য মনোবলটা পুরো-মাত্রায় রেখেছে। বলল—"দাদা, দৃষ্টি দিয়ে সমুদ্র মেপে কোন ফল নেই এখন। ভয়ই বেড়ে যাবে। আপনি চোখ দুটিকে এই তিনটি মালের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকুন। বিছানাটার ওপর বসেই থাকুন বরং, আরও কাছে কাছে থাকবে। আমি একটু বেরিয়ে দেখি, সন্ধান নিই একটু।"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এল। বলল—"অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লেন ঠাকুর, দাদা।"—নিশ্চয় আমায় ভরসা দেওয়ার জন্যই বলল গোবর্ধন—"খালি হাতে ফেরালেন না। একটু শুধু রাত্তির কাটাবার জায়গা—আপাতত এই হালকা প্রার্থনাটুকুই ঠোঁটে করে' বেরিয়েছিলাম—সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন, মেলা চাপ দেওয়া ঠিক নয়তো—তা পাপ-মুখে বলতে নেই—পথেই দেখা। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেবতাই বলব না তো অন্য কে? নিতান্ত সাধারণ বেশেই আসছিলেন। প্রশ্ন করলেন—রাত কাটাবার আশ্রয় চাই? বললাম—সেই সন্ধানেই বেড়াচ্ছি, দুজন আছি, তিনটে মাল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন। টানা ফুসের চালা, দুদিক খোলা, মাঝে মাঝে ফুসের বেড়ারই পার্টিশন দিয়ে কয়েকটা খুবুড়িতে ভাগ করা। খালি একটি। বললেন আমাদের জন্যে আদেশ পেয়েই ধরে রেখেছেন। এই ছোঁড়াটাকে দিলেন মাল বয়ে নিয়ে যেতে।"

প্রশ্ন করলাম—"ভাড়া?"

"বললেন—যেমন আদেশ হয় জানাবেন পরে।"

বললাম—"আগে ঠিক করেই ঢুকলে যেন ভালো হোত।"

আমি মনোবলটা বেশ ধরে রাখতে পারছি না। বললাম—"বেশ চলো তো এখন। দেখা যাবে।"

চিঁড়ে-গুড় কিনে নিয়েছিল স্টেশনের

দোকানে। চিবিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে দেখলাম শুধু আমরাই দুজনে রয়েছি, সুটকেস আর বেতের ব্যাসেকটটা নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। আমাদের দুজনের মধ্যেও গোবর্ধন তখন ঘুমিয়েই। কিছু শুঁকিয়ে দিয়েই থাকতে পারে, যার এই অপকর্ম, কিংবা হয়তো ভেতরে ভেতরে হারিয়েই ফেলেছে মনোবল গোবর্ধন, আজকের ব্যাপারের পর একেবারেই এলিয়ে অসাড় হয়ে পড়েছিল।

উঠে দেখে-শুনে বলল—"ও ব্যাটার নিশ্চয় আরও জোর প্রার্থনা ছিল দাদা, যাতে শূন্য হাতে না ফিরতে হয়। ঠাকুর দেবতাদেরও গেরো দেখুন না, কাকে মেরে কাকে রাখেন? যাক, আমি একটু সন্ধান নিই দাদা, আপনি এখানেই চুপ

করে বসে থাকুন ততক্ষণ; ঝেটো অন্ততঃ একটা উপকার করেছে, আর জিনিসগুলোর দিকে একঠায় চেয়ে বসে থাকতে হবে না।"

মিনিট দশেক পরে ফিরে এল। বলল—"বেশি ঘোরাঘুরি করতে হোল না দাদা। এই চালারই ওদিককার একটা খুবরিতে পাওয়া গেল সন্ধান।"

"নিয়ে এলে না যে?"—আশান্বিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম, গোবর্ধন বলল—"বামালের নয় দাদা; এ গভীর সমুদ্রের অতল থেকে তাদের টেনে তুলবে এমন ডুবুরি তো আজও জন্মায়নি। আমি সন্ধান পেলাম—একদল লোক আছে যারা এই রকম সদ্য পুণ্যি-লোটার ব্যাপারে লাগিয়ে দিয়েছে নিজেদের—সেই গোড়াতেই আপনাকে বলেছিলাম না? এ-চালা সে ব্যাটার মোটেই নয়, কোন্ এক শেঠ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, খালি পাও, থাকো। ও ব্যাটারা, একটা খালি হলেই দৈবাদেশ বলে আমাদের মতন শাঁসালো পুণ্যার্থীদের পুরে ফেলছে, তার পরের ইতিহাস এই দেখতেই পাচ্ছি।"

"আর আমি এর ওপর জোর করে ব্যাটাকে দুটো টাকা আগাম ভাড়া হিসেবে গছিয়ে দিলাম হে!"—নিতান্ত অনুতাপে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল আমার।

গোবর্ধন বলল—"শাস্ত্রকারেরা এ সবেরও ব্যবস্থা করে গেছে দাদা; বৃথা মন খারাপ না ক'রে আমি তো সেই পথই ধরি..."

"কী সেটা?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

"বিধানটা হচ্ছে—উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। খইগুলো হাওয়ায় যখন উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছে তখন ঐ মন্ত্রটুকু ব'লে পুণ্যটা হাতিয়ে নিই না কেন? কথাটা হচ্ছে, এখন পুণ্যক্ষেত্রে আমার যা গেল সেটাকে দান করলাম ধরে নিলেই তো ক্ষতির জায়গায় লাভই থেকে যাচ্ছে হাতে। ও দুটো টাকা? নিকগে, দানের দক্ষিণে বলে ধরে নিলে আর খেদ থাকে না। দক্ষিণে না হলে পুরো ফল তো পাওয়া যায় না। ঠাকুরই বা সে খুঁৎটুকু থাকতে দেবেন কেন?"

কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও অবস্থা দ্রুত একেবারে সঙ্গীন হয়ে উঠল। পয়সা কড়ি যৎসামান্য যা ছিল তা পকেটমারের ভয়ে সুটকেসেই। সদ্য খরচের জন্য গোটা দশ টাকা আর কিছু খুচরা গোবর্ধনের কাছে ছিল, তা থেকে টাঙা ভাড়ায় আর আগাম বাড়ি ভাড়ায় আট টাকা বেরিয়ে গেছে, বাকি প'ড়ে আছে দুটো টাকা আর ঐ খুচরা ক'টা। খাওয়ার জিনিস, অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য জিনিস একেবারেই নেই বাজারে। চিঁড়া, চালভাজার মতো মুড়ি, ছাতু আর মুড়ি কিংবা চিঁড়ের মোয়া, ধুলো-বালির সঙ্গে মেশানো; তাও অগ্নিমূল্য। আর এখানে একদণ্ডও থাকার কথা আসে না, পাথর-ক'টা ঠাকুর দেখার শখ মাথায় উঠে গেছে, কিন্তু ফিরে যাওয়া যায়ই বা কি ক'রে?

শেষে গোবর্ধনই এক বুদ্ধি বের করল। বলল—"ধুলো-পায়েই ফিরে যেতে হবে দাদা। আমাদের দর্শন দেওয়া ঠাকুরের ভাগ্যে নেই, কি করব? এখন উপায় তো এক পা-গাড়ি। তার চেয়ে আমি বলছিলাম—বিছানাগুলো বেচে দিই। যা ছিল ভরা-পেটের আরাম তা এখন খালি-পেটের বোঝা বৈতো নয়। বিক্রমপুরে চালান করে দিলে হাতে কিছু আসবে। তাই থেকেই টাঙ্গা-ভাড়া দিয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত তো পেঁছানো যাবেই, বাকি পথটাও এক রকম করে কাটিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াও যাবে। কি বলেন?"

বিছানা—দুজনের দুটো রাগ (Rug), ওর পাতার জন্য একটা কম্বল আর চাদর, আমার একটা পাৎলা তোষক আর সুজনী। আমারগুলো ছেড়ে দিতেই চাইছিল, আমি জিদ করতে আমার র‍্যাগ আর ওর চাদরটা ছেড়ে সবগুলো জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গোবর্ধন।

সেই ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

তার পর দুটো দিন যে ছিলাম, যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। মনি-ব্যাগটা আমার কাছেই রেখে গিয়েছিল—সেই দুটো টাকা, খুচরা আর আর দুজনের টিকিট—ঐটে পকেটে করে, কাঁধে সুজনী আর র‍্যাগটা নিয়ে সমস্ত দিন-রাত্র খুঁজে বেরিয়েছি ওকে। একটা পুলিশের আড্ডা হয়েছে। খবর দিয়েছি, কোন সন্ধান পাইনি। ওরই ওপর নির্ভর ক'রে ক'রে ওর অবর্তমানে যেন হাল-ভাঙা নৌকার মতো অসহায় হয়ে পড়েছি। ওকে ছেড়ে বাড়িই বা ফিরে যাব কোন্ মুখে?

শুকনো চিঁড়ে সম্বল করেছি। তাতেও দ্বিতীয় দিনে মাত্র সেই খুচরা কটা সম্বল রইল। বুদ্ধিতে কিছুই কুলুচ্ছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পরিণাম বিঘোরে মৃত্যু। কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু অদৃষ্টে আছে নাকি—ভিক্ষা?

যাই থাক, গোবর্ধনকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না—জিদ ধরে গেছে একটা। এক দিক দিয়ে নিরুপায়ও; দ্বিতীয় দিন মাঝরাত্রে টিকিটের মেয়াদও যাচ্ছে ফুরিয়ে।

একেবারে চরম অবস্থার মধ্যে সন্ধ্যার সময় একটা কথা মনে হোল—হাতে তখনও একটা টাকা আর গণ্ডা পাঁচেক পয়সা আছে। স্থির করলাম—ষ্টেশনে চলে যাব, অবশ্য হেঁটেই, যে অবস্থায় যখন পেঁছাই। দুটো ষ্টেশন পরেই শহর; বাঙালী আছে, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। বিদেশে বিপন্ন স্বজাতি, একটা কিছু উপায় হবেই, গোবর্ধনকে ওপর করা পর্যন্ত।

আর দ্বিধা না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর, গোড়াতেই যেমন বলেছি, কাজ দিল দেব-দ্বিজ-সন্ন্যাসীতে সেই অটুট বিশ্বাস, যা, হয়তো মোচড় খেয়ে আসছিল খানিকটা, কিন্তু একেবারেই ভেঙে পড়েনি।

মেলা ছেড়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছি, ভিড় পাৎলা হয়ে এসেছে, পেছন থেকেই একটি লোক পাশে এসে সঙ্গ নিল। একটু চাপা গলাতেই প্রশ্ন—"আপনি ফিরেই যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত?"

চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম প্রশ্নের ধরনে। লোকটা কালো, মাঝ বয়সী, বড় বড় কটাসে দাড়ি-চুল। কোনও সন্ন্যাসীর চেলা-টেলা বলেই মনে হয়।

নিরুত্তরই রয়েছি। বলল—"বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বাবাটা কে?—প্রশ্ন করলাম আমি। কথাবার্তা চলছে ওর ভাঙা বাংলায়, আমার ভাঙা হিন্দীতে।

"দর্শী বাবা।"

"ঐ নতুন ঠাকুরের নাম হয়েছে?"

"না, সন্ন্যাসী। ও'র হয়েই কাজ করছেন বলতে পারেন। এই মেলায় প্রত্যেকটি লোককে দেখতে পাচ্ছেন ব'লে 'দর্শী বাবা' নাম পড়েছে, আমায় পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।"

"জানেন আমার কথা সব?"

"প্রত্যেকটি ব্যাপার তাঁর নখ-দর্পণে। এখনও এখানে পুলিশের ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়নি, ভলাণ্টিয়ারও তেমন এসে পড়েনি, সামলে দিচ্ছেন। ওদের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলেই হিমালয়ে উঠে যাবেন।"

বিস্ময়ে কূল পাচ্ছি না, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম—"কি জানেন আমার সম্বন্ধে?"

"তা আমায় বিশেষ কিছু বলেননি। সব কথা বলেন নাও তো। তবে পাছে আপনি বিশ্বাস না করেন, তাই আপনার নামটা শুধু আমায় বলে দিয়েছেন, আর কোথায় বাড়ি।"

নাম আর শহরের নাম দুটিই বলল।

আর দু' একটা প্রশ্ন করা যেত। কিন্তু সন্ন্যাসী নিয়ে ব্যাপার, অবিশ্বাসের আঁচ পেলে চলে যেতে পারেন ভেবে আর ইতস্ততঃ করলাম না, বললাম—বেশ চলুন; কতদূর?"

মেলা থেকে খানিকটা সরে একটা পাথরের টিলা, তার এক পাশে একটা অগভীর গুহার মতো। সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসে আছেন তার মধ্যে। সত্যই দেখলে আপনিই কোথা হতে যেন ভক্তি আর ভরসা এসে পড়ে। পিঙ্গল জটা-কেশ-

দাড়িতে সমস্ত মুখমণ্ডল আর দেহ প্রায় অবলুপ্ত, পরণে একটি সংক্ষিপ্ত কৌপীন। জায়গাটা পরিষ্কার, বনবাদাড় নেই। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গিয়ে আরও যেন আশ্চর্য মনে হচ্ছে। বাইরের চাতাল ঘিরে কিছু দর্শনার্থী ব'সে রয়েছে। একটি ধুনি জ্বলছে। পাশে একটা রেকাবিতে বেশ কিছু দর্শনী পড়েছে। একটা আস্ত কলাপাতে ফলমূল।

সঙ্গী আমায় আগেই বলে দিয়েছিল প্রণাম করে অপেক্ষা করতে। পৌঁছালে ভেতরে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন ক'রে এসে আমায় জানাল—বসতে আদেশ হয়েছে। আমার ব্যবস্থাটা একটু জটীল, সব শেষে হবে।

বেশ রাত হয়ে গেল। যার জন্য যা বিধান, একে একে নিয়ে সবাই উঠে যেতে লাগল। ঐ পদ্ধতি; লোকটি যায়, শুনে এসে বলে, কপালে একটা ধুনির ছাইয়ের টিপ দেয়, জয় দর্শী বাবা"।—বলে চলে যায় সবাই। সত্য কথা বলতে কি, যতই পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল, গাটা ছমছম করতে লাগল। বুঝলাম সেটা জায়গাটার গাম্ভীর্য এবং নির্জনতার জনাই কেন না ওরই সঙ্গে সেই বিশ্বাসটি কিভাবে জানি না আরও দৃঢ়ই হয়ে আসছে যে সব ঠিক হয়ে যাবেই।

যখন আর কেউই বাকি নেই, রাত্র প্রায় দশটা হবে, গোবর্ধন গোঁফ-দাড়ি-জটা সব এক এক টানে খুলে ফেলে পেছন থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল। বলল—"দাদা, সব বলছি, আগে এগুলো সব বুঝে নিই একটু।"

অবাক হয়ে গেছি। প্রণামী গুলো তুলে নিল গোবর্ধন। ফলমূলের কিছু ঐ লোকটাই একটা গামছা বেঁধে দিল, বাকি গুলো নিজেই সংগ্রহ করে নিলে, গোবর্ধন তাকে প্রণামী থেকে একমুঠো নোট দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলল—"যাও বেটা, মস্ত্ রহো।"

লোকটা পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

গোবর্ধন বলল—"একটা খালি টাঙ্গাই ধরি দাদা; ভ্যাজাল বাড়াব না। দুদিনে প্রায় তিপ্পান্ন টাকা কয়েক আনা হয়েছে, চলে যাবে।"

ষ্টেশনের পথে যেতে যেতে ব্যাপারটা সব বলল। কম্বল চাদর বেচতে গিয়ে একেবারে পুলিসের হাতে। চোরাই মাল বেচার ধুম পড়ে গেছে, ওরাও তর্কে তর্কে রয়েছে। র‍্যাগ, কম্বল, সুজনী তিনটে পুলিসকে ঘুষ দিয়ে কি করবে ভাবছে, এই লোকটার সঙ্গে দেখা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিসের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে ওই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে মতলবটা দিলে। ওস্তাদ লোক—মেলাতে মেলাতে ঘুরে বেড়ানই পেশা, ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব জানে। ঠিক লোককে ধরে, টেনে আনে। আধাআধি বখরা। সবিস্তারেই সব বলে যাচ্ছে গোবর্ধন। আমায় কতকগুলো ফল বের করে দিয়েছে, খেয়ে যাচ্ছি। একটা ছোট-রাবড়ির ভাঁড়ও ছিল, এগিয়ে দিয়ে বলল—"ধরুন দাদা। এই রাবড়ি মালাইয়েরই জয় জয়কার। চেহারাটা দেখেই পছন্দ হয়েছে' তো ব্যাটার।"

ক্ষুধার জ্বালা, তার ওপর সদ্য চোখের সামনে যা ঘটল তাতে মনটাও অসাড় হয়ে গেছে, অন্যমনস্ক হয়েই ফলগুলো চিবিয়ে যাচ্ছিলাম, রাবড়ির কথাটায় যেন একটা ধাক্কা খেয়ে সাড়াটা ফিরে এল। হাতটা টেনে নিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠেই বললাম—"শেষে আমাদের এই প্রতারণার আশ্রয় নিতে হোল গোবর...তীর্থক্ষেত্রে?"

একটু চুপ করেই রইল। তারপর বলল—"আপনার সঙ্গে তর্ক করব সে আস্পর্ধা নেই। তবে দেবতা-সন্ন্যাসীতে হতভাগা গোবরার বিশ্বাস না থাকলেও প্রায়শ্চিত্তে আছে বলেই তো কাটিয়ে যাচ্ছে কোন রকমে। নয়তো শাস্ত্রকে যে মিথ্যা বলা হয়, সে অপরাধের তো আবার প্রায়শ্চিত্তও নেই।...আরও একটা কথা দাদা।"

বললাম—"কি বলো।"

"বাড়ি থেকে একান্তই সাধুভাবে অর্জন করা টাকাকড়ি, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে এসে তীর্থে বিলিয়ে এই রকম অকূল পাথারে পড়ার চেয়ে, অসাধু উপায়ে সেখানে কিছু হাতিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া ভালো নয় কি? —অবশ্যি শখ করে নয়, আপৎধর্ম হিসেবেই—এই রকম অবস্থায় প'ড়ে..."

—আপেলটা বড় মিষ্ট। কোথা থেকে একটা হাসিও এসে গুড়গুড়িয়ে উঠছে পেটে। হাতটা বাড়িয়ে বললাম—"দাও তোমার রাবড়ির ভাঁড় গোবর্ধন, দেখিই না হয় কি রকম।"

"দাও তোমার রাবড়ির ভাঁড় গোবর্ধন,......"

॥ চায়ের ধোঁয়া প্রসঙ্গে ॥

মাননীয় সম্পাদক, অমৃত
সমীপেষু,

আপনার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উৎপল দত্তের 'চায়ের ধোঁয়া' নামক ধারাবাহিক রম্য-রচনা (না প্রবন্ধ?) পাঠ করছি এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করছি।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত দত্তের লেখার রীতির কথা বলতে হয়। কারণ আমি বুঝতেই পারছি না চায়ের ধোঁয়াকে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ না লঘু রম্য-রচনা হিসাবে গ্রহণ করব। প্রবন্ধে সাধারণত প্রবন্ধকার উপস্থাপিত বক্তব্য বা মতামতের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যুক্তিসহ সেই মতামত পেশ করে থাকেন। রম্য-রচনায় সে দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। কারণ রম্য রচনা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই, পাঠককে পূর্বাহ্নে সাবধান করে দেয়। রচনার বিষয়বস্তুও হয় হাল্কা। কিন্তু চায়ের ধোঁয়াতে শ্রীযুক্ত দত্ত গুরুত্বের বিষয় নিয়ে যেমন হাল্কাভাবে আলোচনা করছেন তাতে বিষয়বস্তু গুরুতরভাবেই জখম হচ্ছে বলে আমার ধারণা। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর পরিচালক বা নাট্যকার ইত্যাদি পাত্রের মুখে বহু তর্ক-সংকুল মতামত বিনা প্রমাণ-প্রয়োগ সহ জুগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ সেই উক্তির দায়িত্ব কার? রচনার পাত্রের না লেখকের? বোঝা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত দত্ত মেঘের আড়ালে থেকে বাণ ছোঁড়ার সুচতুর পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন। অথচ সেই বাণের জন্য শ্রীযুক্ত দত্তকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা মুস্কিল।

বহু উক্তির মধ্যে আমি একটিকে বিচারের জন্য বেছে নিচ্ছি। ৩৭ সংখ্যা অমৃতে চায়ের ধোঁয়ার নাট্যকার পাঠকদের জানাচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় শ্রেণীর গল্প-কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অধিকাংশ নাটকও হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং আফশোষের কারণ নেই। নাট্যকার আরও জানালেন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস কবিতা যদি কেউ লিখে থাকেন তবে তাঁরা হলেন বনফুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক আমার বিশ্বাস এই যে, নাট্যকার এবং পরোক্ষে শ্রীযুক্ত দত্ত, কোন্ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অধুনা বাংলা সাহিত্যের গল্প, কবিতা তৃতীয় শ্রেণীর? আমরা ত জানি বাংলার সাম্প্রতিক গল্প, কবিতা শিল্প হিসেবে উন্নত। আমাদের এই ধারণা, শ্রীযুক্ত দত্তের মতে ভ্রান্ত ধারণা, নিরসন করার মত কোন যুক্তি নাট্যকার, তথা শ্রীযুক্ত দত্ত দিলেন না। শ্রীযুক্ত দত্ত কি আশা করেন তাঁর নাট্যকারের এই উক্তিকে আপ্তবাক্য হিসাবে পাঠক সমাজ গ্রহণ করবে? শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিক সমাজের বাসিন্দা বলে এ কথা অন্তত তর্কের খাতিরে স্বীকার করবেন

মতামত
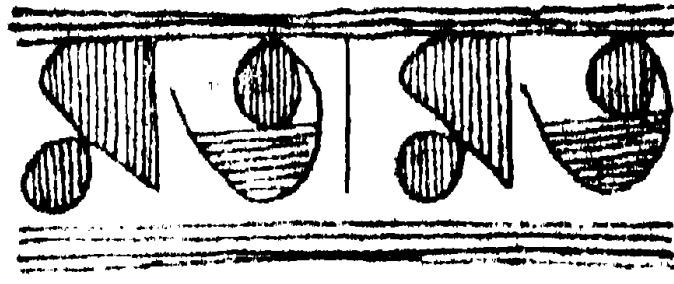
যে, ব্যক্তিগত রুচি থাকা ভাল এবং তা ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু ব্যক্তিগত রুচির স্বৈরাচার অকল্যাণকর এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

আমি বিশ্বাস করি যে, বনফুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে কীর্তিমান লেখক। আমার এই বিশ্বাসকে যুক্তিবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করতেও প্রস্তুত। কিন্তু সাহিত্য বিচারের কোন নিরিখে প্রবীণ সাহিত্যিক যথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় বা তরুণ সাহিত্যিক সমরেশ বসু ইত্যাদির নাম উল্লেখের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? আমি কোন্ বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে নাট্যকার তথা শ্রীযুক্ত দত্তের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারি যে, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের কোন দান নেই? যে কোন মতাবলম্বী সাহিত্যের সৎ পাঠকমাত্রই নাট্যকার তথা শ্রীযুক্ত দত্তের এই চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিতে লজ্জা বোধ করবেন এবং হয়ত এ কথাও ভাবতে পারেন যে, চায়ের মত নিরাপদ ধোঁয়ায় ঘোরে এত বড় বিপজ্জনক উক্তি করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিক প্রয়োগকর্তা হিসাবে খ্যাত। তাঁর নাটকে যন্ত্রের দৌরাত্ম্য দর্শকদের বিহ্বল করে। বিশ শতকের একটি উদ্ভাবনকে অন্তত শ্রীযুক্ত দত্ত মঞ্চে বিরাট স্থান দিয়ে থাকেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিকতাকে সামগ্রিক হিসাবে এবং জীবনের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার ধারণা ভুল। তিনি ষ্টেজে প্রয়োগকর্তা হিসাবে আধুনিক। কিন্তু সাহিত্য-রসিক হিসাবে ত্রিশের যুগের ভাবনা-রীতির কাছে বিক্রীত। তাই যে যুগে তিনি মানুষ হয়েছেন সংস্কারবশে সেই যুগকেই তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু সেই যুগকে অতিক্রম করে সাহিত্যের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, এবং যা শ্রীযুক্ত দত্তের বিরূপতা সত্ত্বেও হতে থাকবে, তার প্রতি তিনি উদাসীন। আমার এই উক্তির প্রমাণ তাঁর রচিত নাটক-নাটিকার লিখন-ভঙ্গি ও চরিত্র-সৃষ্টি থেকে উত্থাপিত করতে পারি। কিন্তু সে পরিসর হয়ত আমার নেই এবং বর্তমান পত্রটির পটভূমিতে তা অপ্রাসঙ্গিক।

আমি শ্রীযুক্ত দত্তকে এই অনুরোধ জানাবো যে, নাট্য-সাহিত্যের নিম্নমানের সাফাই গাইতে গিয়ে সাহিত্যের অপরাপর উন্নত শাখা ও তার কীর্তিমান সাহিত্যিকদের হেয় করা রুচি-বিরুদ্ধ। তিনি যে সব মতামত উপস্থিত করছেন তার পিছনে কোন যুক্তির অবতারণা তিনি করছেন না এবং এই কালাপাহাড়ী রচনা পদ্ধতি বিরক্তিকর।

বিনীত
অমরনাথ কর
রাউরকেলা

• • •

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়,

উৎপল দত্ত মহাশয় 'চায়ের ধোঁয়া'র মাধ্যমে অঙ্গারের 'জল', সেতুর 'ট্রেন', ফেরারী ফৌজের 'আগুন' প্রভৃতির পক্ষে অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাঁর জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং তাপস সেন মহাশয় এক কথায় তাঁর সকল যুক্তি নস্যাৎ করে 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে' দিয়েছেন। গত ৩৪শ সংখ্যা (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬১) 'অমৃত'-তে তাপস সেন লিখিত 'অভিনয়ে—আঙ্গিক' থেকে —"কিন্তু সমগ্র অভিনয় যার দ্বারা নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত...... তিনি সত্যিই যখন বলেন, এইখানটায় একটা খুব বড়ো রকম চমক না দিলে আমি নাটককে ধরে রেখে দিতে পারব না, তখন আমাদের মাথায় হাতুড়ী মেরে চমকের বস্তু আবিষ্কার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।" তাপসবাবুর এই সহজ সরল স্বীকারোক্তির মধ্যে ট্রেন', 'আগুন', 'জল' প্রভৃতির যেন একটা সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফেরারী ফৌজ বেশ কিছুদিন ধরে নাটকাভিনয়ের পরে শেষ দৃশ্যে উক্ত 'আগুন'—দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কলাবিদ্যা' থেকে হুবহু কয়েকটি লাইন ঃ "—যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর হাতে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর, কলের হাতে কলার অপমান বর্তমান যুগের ললাটে লেখা আছে।"

'নবনাট্য আন্দোলন' কথাটি ইদানিং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। উৎপলবাবুর 'চায়ের ধোঁয়া'তেও প্রচুর ব্যবহৃত। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে যুগের প্রভাবে তার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সর্বকালে সর্ববিষয়েই উন্নতির চেষ্টা চলছে। কোথাও উন্নতি হচ্ছে না, কোথা-ও হচ্ছে। যেখানে উন্নতি হচ্ছে না সেখানে আজ না হলেও আগামী কালে তা হবেই। আবার আজ যা নতুন বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল তা অবশ্যম্ভাবী ভাবেই পুরনো হতে বাধ্য। আর এই সহজ-সরল চিরন্তন সত্যটি যদি সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাহলে 'নবনাট্য আন্দোলন' এই কথাটির প্রকৃত কোনো অর্থই বোধ হয় থাকে না।

নমস্কারান্তে,
ইতি
শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার
কলিকাতা—৪।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ১৩ ॥

ছোটবেলায় আমরা আলোচনা করতুম, কোন্‌টা কোন্‌ দেশের জন্তু! রুশ হল শ্বেতভল্লুক, ইংরেজ হল সিংহ, জার্মানী ঈগল, কিন্তু চীনের ওই জন্তু ড্রাগন—ওটাকে চিনতে পারতুম না! ওটা না সিংহ, না বাঘ, না ভাল্লুক। কিন্তু ওটার দংষ্ট্রা, ওটার থাবা, ওটার স্বাস্থ্য এবং সাংঘাতিক চক্ষু দেখে আসছি আবাল্য। জাপানের প্রতীক ছিল বোধ হয় 'সূর্যোদয়'। এই 'সূর্যোদয়' দেখে একদা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশভল্লুক পালিয়েছিল 'রুশ-জাপান রণক্ষেত্র' থেকে। খরগোসের ভয়ে হিংস্র ভালুক পালাল! ক্ষুদ্র জাপানের কাছে রুশ সম্রাট নিকোলাসের এত বড় পরাজয় এবং অপমান বর্তমান শতাব্দিতে আর ঘটেনি। 'রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস' নামক বইটি বড় আনন্দে বাল্যকালে পড়েছিলুম।

কিন্তু তারপর রাশিয়ার কি কি ঘটনা ঘটল, আর জানিনে। আমরা তখন বৃটিশ সিংহের থাবার তলায়, এবং তার কেশরজালে আবদ্ধ। তা'র গর্জনে ধরাতল কম্পমান। মানচিত্র খুললেই দেখা যায়, পৃথিবীর বহু দেশ ছোপ-ছোপ লাল রঙে রঙীন, এবং ইস্কুলে আমাদের শেখানো হতো বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না! সেই 'বৃটিশ' ছিলেন রুশ-সম্রাট জার নিকোলাসের বন্ধু; এবং কি একটা বৈবাহিক সূত্রেও আবদ্ধ। ফলে, আমাদের বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকে এক সময়ে নিকোলাসের স্তবগান পাঠ করে পরীক্ষা দিতে হত। আমাদের মিশনারী স্কুলের খৃষ্টান হেডমাষ্টার লিখিত 'ভারতে ইংরেজ শাসন' নামক একটি বাংলা চটি বই এবং এন-এন-ঘোষের "England's work in India"—এ দুখানি বই মুখস্থ না করলে কেউ প্রমোশন পেতনা। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসের ফটকের দুই পারে দুটি ক'রে 'সিংহমূর্তি' একদা দাঁড়িয়ে থাকত। সেই সিংহগুলি যে লোহার তৈরী, এতকাল ধ'রে জানতুম না। তাদের ভাঙ্গা টুকরোগুলি এই সেদিনও ফটকের পাশে পড়েছিল। সেই লোহা বোধ হয় দুর্গাপুরের 'ব্লাষ্ট্ ফারনেসে' গ'লে গেছে।

ওদিকে জার নিকোলাসের রুশ সাম্রাজ্যে 'পরাজিত' দেশবাসীর খবর আর পাওয়া যায়নি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাতি জারের বিরুদ্ধে যে দেশজোড়া বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, এর আনুপূর্বিক সংবাদ ইংরেজ আমাদের কাছে চেপে গিয়েছে সযত্নে। বলা বাহুল্য, সেইটিই বর্তমান শতাব্দির প্রথম রুশ-বিপ্লব। সেটি সাফল্য লাভ করেনি, কিন্তু সার্থক হয়েছিল! রুশসম্রাট নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং প্রচণ্ড উৎপীড়নের দ্বারা সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গলায় এবং মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদের অভ্যুত্থান ঘটে। এখন দেখতে পাচ্ছি বাঙ্গালীর সেই বোমার আওয়াজে প্রাচ্যের বহু দেশের টনক নড়ে যায়, আফ্রিকা কেঁপে ওঠে, এবং 'অহিফেন-সেবী' চীনেরও তন্দ্রা ছোটে। এদিকে রাশিয়ায় জগৎপ্রসিদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টা ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ বহু বিপ্লববাদী নেতা কারাগারে অবরুদ্ধ হন্। কিন্তু রুশবিপ্লববাদের সেইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আমাদের দেশের কন্‌গ্রেসের ছোট ছোট 'মণ্ডল' কমিটির মতো অসংখ্য ক্লাব এবং কমিটি রাশিয়ার বহু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদের বাইরের পরিচয় ছিল সমাজ-সেবা ও গ্রামোন্নয়ন, ভিতরের কাজ ছিল বিপ্লববাদের প্রচার এবং রিভলভার ও পিস্তল সংগ্রহ। এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল, "সোভিয়েট", অর্থাৎ ক্লাব। বাংলায় যাকে বলা হয় 'আড্ডা'। লেনিন ট্রটস্কি, কালিনিন প্রভৃতিরা ছিলেন সেই 'আড্ডাবাজ', এবং এ'দের সাকরেদ গোষ্ঠির মধ্যে ছিলেন বোধ হয় মলোটভ, কাগানোভিচ, ভরোসিলভ, ষ্টালিন ইত্যাদি কর্মীরা। তফাৎ আমাদের সঙ্গে শুধু এই, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পর গান্ধীজীর শিষ্যদের মধ্যে গুলী মারামারি হয়নি এবং ক্ষমতা লাভের জন্য দেশজোড়া গুণ্ডামিও চলেনি। আমাদের উপরতলায় কা'রো কা'রো মধ্যে মনোমালিন্য যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু সেটি এত সংযত, শান্ত এবং ভদ্র যে, দুনিয়ার কোথাও আমরা ধিকৃত বা হাস্যাস্পদ্ হয়ে উঠিনি।

লেনিনগ্রাডে এসে পৌঁছে চারিদিক তাকাচ্ছিলুম। আমরা পৃথিবীর উত্তরতম প্রান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। অক্টোবরের শেষ। কেন জানিনে মস্কোর মতো এখানে আজও বরফ পড়েনি। দূরে অতীতের এক অক্টোবরের ঠিক এই সপ্তাহে এবং ঠিক এইখানে রুশবিপ্লব সংঘটিত হয়! ইংরেজি পাঁজি উল্‌টিয়ে সেই তারিখটি দেওয়া হয় '৭ই নভেম্বর!' তখন এই নগরটি ছিল রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, নাম ছিল পেট্রোগ্রাড। পেট্রোগ্রাড নামটি দেওয়া হয়েছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র দশ বছরের জন্য। সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে শুনলুম, 'পিটার দি গ্রেটের' নামানুসারে এর নাম হয়নি। এক-জন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকের নামানুসারে এই নগরের নাম ছিল 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ!' ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর এই মহানগরের নামটি পুনরায় বদল করে নাম রাখা হয়, 'লেনিনগ্রাড'।

উত্তর মেরু লোকের যে গোলক, তার ধারেই পড়ে লেনিনগ্রাড। 'নেভা' নদীর দুই পারে এই শহর। কিন্তু এই খাঁটি ইউরোপীয় এবং শান্তিময় বিরাট শহরটির সর্বত্র জলাশয়মণ্ডিত। সেই কারণে ভ্রমণকালে প্রায় প্রতি পথেই একটি ক'রে সুন্দর সাঁকো অতিক্রম করতে হয়। সমগ্র নগরীর চারিদিকে একটি সুস্পষ্ট আভিজাত্যক প্রকাশ পাওয়া যায়, যেটি উদার গাম্ভীর্য এবং প্রশান্তিতে সমাসীন। জার আমলের প্রবল উৎপীড়ন এবং অকথ্য অনাচারের কাহিনী কানে শুনেছি এবং বইতে পড়েছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। চোখে যা দেখছি তা হল জার আমলের আশ্চর্য উন্নত রুচি, একেকটি কীর্তি-রচনায় সেই যুগের কালজয়ী প্রতিভা, সৌন্দর্যসৃষ্টির বিস্ময়কর শিল্পকলা বোধ। রাশিয়ায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ চারুশিল্প, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য

ও কাব্য,—একটি জাতির পক্ষে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তার আগাগোড়া জারের আমলের। সোভিয়েট আমলে এসেছে জাতীয় শিল্প-বিজ্ঞান এবং তার উন্নতি। দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট আমলে। জারের আমলে এই দেশব্যাপী বিপুল সমৃদ্ধি ছিলনা, কিন্তু রুচিবোধ এবং রসবোধ যেটি ছিল, ঠিক সেটি একালে নেই! আমি সর্বাপেক্ষা আনন্দ বোধ করছিলুম এইটি লক্ষ্য করে যে, জারের প্রতি অসীম ঘৃণা সত্ত্বেও জার আমলের প্রত্যেকটি কীর্তি অপরিসীম যত্নে অশেষ গৌরবের সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রক্ষা ক'রে আসছেন। জনৈক রুশবন্ধু বলেছিলেন, "আমাদের বিপ্লবে প্রকৃতপক্ষে পঁচিশ জনের বেশি লোকের মৃত্যু হয়নি; একটি-মাত্র গোলা ছোঁড়া হয়েছিল রাজপ্রাসাদের ওপর; এবং সারাদেশের তুচ্ছতম সামগ্রীটিও বিনষ্ট হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিস্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ পাদে রাশিয়ায় দ্বিতীয়বার গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সেটি পুনরায় দলিত ও মথিত হয়। তবে তা'র ফলাফল এই দাঁড়ায়, জার সিংহাসন ত্যাগ ক'রে 'একটারিনবার্গ' দুর্গে আশ্রয় নেন এবং 'জাতীয়তাবাদী নেতা' কেরেনস্কি রুশ-সাম্রাজ্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। আমাদের বাঙ্গলা দেশে সেই বছরে 'হোম রুল' আন্দোলনের কালে যেমন সহস্র প্রকার বিরোধের মধ্যে জাতীয়তাবাদী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ চক্রান্তে প'ড়ে বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি কেরেনস্কির অবস্থা ঘটে! বলশেভিক, মেনশেভিক, সোস্যাল রিভল্যুশনারিজ্ প্রভৃতি কোনও দলকে বাগ মানাতে তিনি অসমর্থ হন্। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ প্রান্ত। রুশসম্রাট তখন মিত্রশক্তির দলে। কিন্তু সেই অর্থ-হীন সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য রুশ সৈন্যদেরকে ডাক দেন্ রুশ-বিপ্লবের মন্ত্রগুরু লেনিন।—তখন কেরেনস্কির তাঁবে ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী ও সর্বাপেক্ষা নির্মম বৃহৎ কসাক সৈন্যদল। তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে। এই বিপর্যয় ও দুর্যোগের দিনগুলিতে লেনিনের রাজনীতিজ্ঞান, তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আত্মপ্রত্যয়, এবং অবিচল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। তিনি আকস্মিকভাবে সম্রাটের প্রাসাদ আক্রমণ করেন, এবং সেখান থেকে মিঃ কেরেনস্কি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হন্, বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি! তাঁর এই বিনা নোটিশে পলায়নের পরে কসাক সৈন্যরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং লেনিনের লক্ষ্যটি সাফল্যলাভ করে। অতঃপর সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার পরে সপরিবারে জারকে হত্যা করা হয় একটি পরোয়ানাবলে। তাঁদেরকে একে একে গুলী ক'রে একটারিনবার্গ দুর্গের পার্শ্ববর্তী জংগলে তাঁদের শবগুলিকে দাহ করা হয়। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, সম্রাট-গোষ্ঠির এই ভয়াবহ মৃত্যু, রুশসাম্রাজ্যের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিগণের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারলোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এবং নব-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চৌদ্দটি জাতি আপন-আপন দলবল, সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা-বাহিনী নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হোয়াইট গার্ডস', এবং জাতীয়তাবাদীদের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'রেড গার্ডস'। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রথম তিন বৎসরকাল সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মহাপ্রলয়ের ঝড় বইতে থাকে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, গৃহ-শত্রুর সর্বব্যাপী তান্ডব, অরাজকতা, অনিশ্চয়তা, মহামারি, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, জনসাধারণের পাশব প্রবৃত্তি, শৃংখলমুক্ত উন্মাদতা—এগুলি অবাধে চলতে থাকে। এই মহাপ্রলয়ের ফলে ৭০ লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকা প্রাণ হারায় এবং কোটি কোটি নরনারী ভিখারী ও সর্বহারাদলে পরিণত হয়। পরবর্তী আরও ৭ বছর অবধি সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্ত-র্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ছিল, কেননা ঘরের শত্রু বিভীষণ ছিল লক্ষ লক্ষ! এই অবস্থার অনেকটা সুরাহা যখন হয় সেই সময় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে লেনিন মারা যান্। মৃত্যুর ছয় বছর আগে কাপলান নামক একটি মেয়ের অতর্কিত গুলীতে তিনি আহত হয়েছিলেন। কাপলানের ফাঁসী হয়। গান্ধীজীর অপমৃত্যুতে সমগ্র ভারতে যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, তেমনি লেনিনের মৃত্যুতে তৎকালীন সোভিয়েট দেশগুলি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে!

আমরা 'হোটেল অ্যাসটারিয়া' নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকার দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঐ হোটেলটি বৈভবের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। জার্মান-শাসক হিটলার নাকি এই হোটেলের কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রকার সংবাদ পাঠান্ যে, লেনিনগ্রাড বিজয়ের পর এই হোটেলে তিনি এসে উঠবেন, এবং সেই কারণে তাঁর জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রস্তুত রাখা হয়!—এই সংবাদটি হিটলারের পরিহাসস্বরূপ ছিল না, কেননা তিনি আপন বিজয়যাত্রার সম্বন্ধে অনেকটা নেপোলিয়নের মতোই আস্থাবান ছিলেন! হিটলারের সৈন্যদল এই লেনিনগ্রাডকে তিরিশ মাস অর্থাৎ মোট নয়শত দিন প্রায় চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিল। সমুদ্রপথে উত্তরদিকে একটি সঙ্কীর্ণ পথ বিপদমুক্ত ছিল মাত্র। সেই পথটিই শুধু ছিল লেনিনগ্রাডের 'প্রাণসূত্র'। নগরের নাভিকেন্দ্র থেকে হিটলারের সৈন্যদল মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বেড়াজাল বিস্তার ক'রে বসেছিল। তিরিশ মাস ধ'রে এই নগরকে রক্ষা করার জন্য মোট ছয় লক্ষ সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের বলিদান ঘটে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ তিরিশ মাস কালের মধ্যে হিটলার বাহিনীর মেরুদণ্ডও ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসে। তুষারে, বরফে, অর্ধা-হারে, অনাশ্রয়ে, রোগে, যন্ত্রণায় এবং নৈরাশ্যে তারা ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয় লেনিনগ্রাড ও ষ্টালিনগ্রাডে! মস্কো নগরীর উপান্তে পৌঁছেও নাৎসীবাহিনী অবরোধ করে, কিন্তু এখানেও তাদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়। রুশ লেখক লুকনিৎস্কি আমাকে সেই রণক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে নানাবিধ ঘট-নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন্।

আমরা রুশ সম্রাটের রাজপ্রাসাদ 'উইনটার প্যালেসে' এসে উপস্থিত হলুম। এই রাজপ্রাসাদ 'হারমিটেজ' নামেও প্রসিদ্ধ। এই বিশাল এবং প্রায় আদি-অন্তহীন প্রাসাদটি অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের কালে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যিনি নির্মাণ করেন তিনি একজন ইতালীয় স্থাপত্যশিল্পী, নাম মিঃ রাসট্রেলি। লেনিনগ্রাডের বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কীর্তি এবং মস্কোর অনেকগুলি —ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শিল্পীগণের সার্থক সৃষ্টি। মস্কো এবং লেনিনগ্রাডের অগণিত সংখ্যক শ্বেত পাথরের কাজে এবং বিভিন্ন চিত্রশালায় ফরাসী এবং ইতালিয়ানের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকলার সৌন্দর্যমণ্ডিত শ্রীর কাছে সোভিয়েট আমলের মোটা হাতের আঙ্গুল,—আমার

ধারণা,—আজও এসে পৌঁছয়নি আমাদের সামনে এই বৃহৎ 'উইনটার প্যালেসের' সঙ্গে সেই সেকালের পিটার-দি-গ্রেট,—যিনি নিজের হাতে নিজের জন্য মস্ত এক জোড়া চামড়ার জুতো প্রস্তুত করেছিলেন,—এবং ক্যাথরিন-দি-গ্রেট ও রুশসম্রাট আলেকজান্দারের নাম সংযুক্ত। সোভিয়েট আমলের আগে বিগত ২০০ শত বছর অবধি 'লেনিনগ্রাড' রাশিয়ার রাজধানী ছিল।

উইনটার প্যালেসের ঠিক সামনে নেভা নদীটির ধারে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রুশ-জাহাজ 'অরোরা' সুসজ্জিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই জাহাজটি এখন প্রদর্শনী-রূপে ব্যবহার করা হয়। এইটির থেকে একটিমাত্র গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছিল প্রাসাদের অভ্যন্তরে, এবং তাতেই কাজ চলে যায়! উভয়ের দূরত্ব হয়ত পঞ্চাশ গজের সামান্য কিছু বেশি। সকল দেশেরই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তর থেকে মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্গতিজনিত ঘৃণা ও অসন্তোষ যদি নির্ভুল সত্যরূপ না নেয়, সেখানে বিপ্লব সার্থক হয় না! রাশিয়ায় এটি সত্য ছিল, ফ্রান্সে এটি একদা নির্ভুলভাবে ছিল। ইউরোপের নানা দেশে গভর্ণমেণ্টের ভাঙাগড়া হয়ত যখন তখন চলতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন রুশসাম্রাজ্যের মতো সেসব দেশে সর্বব্যাপী দুর্গতি নেই বলেই দেশজোড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় কোনও কালে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সম্ভব নয়,—কেননা সেখানে প্রায় প্রতি নরনারী সচ্ছল অর্থ-নীতিক জীবনযাপন করে! শুনেছি সেখানে সাধারণভাবে যে-ব্যক্তি 'বেকার',—সে ঠিক বাঙালী বেকার নয়, কারণ সোস্যাল এবং লেবার ইনস্যুরেন্স থেকে সে-ব্যক্তি যে পরিমাণ ভাতা পায়, সেটি বাঙালী ডেপুটি মিনিষ্টার অপেক্ষা কম নয়! পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে আমেরিকার জীবনযাত্রার মানরূপে সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল, এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অন্নাভাবের কালে ইংল্যাণ্ডে যখন খাদ্য-সংকট দেখা দিয়েছিল, তখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল আপন দেশের অন্ন সংস্থানের জন্যএকবার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমেরিকান শহরের হোটেলে মাত্র আড়াই টাকায় যে শ্রেষ্ঠ মধ্যাহ্নভোজন করা যায়, এটি লক্ষ্য ক'রে তাঁর জিভে জল এসেছিল! "His mouth watered when he looked through the eating houses." (Reuter) অর্থাৎ আমেরিকার জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন যত সমৃদ্ধই হোক, সেখানে আহার্য সামগ্রী কোথাও উচ্চমূল্য বা দুষ্প্রাপ্য হয়নি, কিংবা ব্যবসায়িক চক্রান্তের দ্বারা উৎকৃষ্ট ঘিয়ের বাজার বন্ধ ক'রে বনস্পতি ঘি-এর ওপর উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করেনি! আমেরিকায় বেকার আছে অনেক, কিন্তু অর্থনীতিক দুর্দশা কোথাও নেই। মাঝে মাঝে যে ধূমায়িত অসন্তোষের কথা কানে আসে, সেটির উৎপত্তি হল অতিরিক্ত বিলাস-বৈভবের সাময়িক অভাব থেকে! লক্ষ লক্ষ আমেরিকান 'বেকার' নিজ নিজ মোটর গাড়ি নিয়ে এ-হোটেল থেকে ও-হোটেলে আমোদ ক'রে বেড়ায়, এই সংবাদগুলি সোভিয়েট সংবাদপত্রে ছাপা হয় কিনা, আমি জানিনে। রুশীয় ভাষা আমার জানা নেই।

'উইনটার প্যালেসের' মধ্যে বিশালতার যে-মহিমা, যে-ব্যাপকতা, এবং সুশ্বেত-প্রস্তরলোকের চারিদিকে ভাস্কর্যের যে অপরূপ অভিব্যক্তি, সেটি যে কোনও পর্যটককে কিছুকালের জন্য অভিভূত করে। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কোন্ দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকব! এই প্রাসাদেরই একটি অংশের নাম 'হার-মিটেজ'।

উইনটার প্যালেসের মধ্যে মোট ২৫ কিলোমিটার অর্থাৎ কমবেশি প্রায় ১৫ মাইল হাঁটতে পারলে তবে আগাগোড়া এই বৃহৎ চিত্রশালা দেখা যায়। আমাদেরকে বলা হল, এই প্রাসাদের ভিতরকার লাউঞ্জ, করিডর, লবী, সিঁড়িপথ ইত্যাদি বাদ দিলে মোট দেড় হাজারেরও বেশি এক-একটি সুপরিসর কক্ষ,—এবং তাদের মধ্যে চারশত কক্ষের প্রত্যেকটিতে এক-একটি বৃহৎ চিত্রশালা, এবং রাজবৈভবে পরিপূর্ণ। আমাদের অনেকের এই বিশ্বাস দাঁড়াল, প্রতিদিন এই চিত্রশালায় অন্তত আট ঘণ্টা সময় কাটালে তবে মোটামুটি বছরখানেক লাগে প্রতিটি চিত্র ও লক্ষ্যবস্তু খুঁটিয়ে দেখার জন্য। আমাদের হাতে সময় মাত্র চার ঘণ্টা! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু,—যিনি এখন কলিকাতা মিউজিয়মের স্থাপত্য-বিভাগের ডাইরেক্টর—তাঁর মুখে শুনেছিলুম, তিনি উড়িষ্যার কনার্কের সূর্য-মন্দিরটির বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সেখানে চার মাস একাদিক্রমে বাস করেছিলেন! চার ঘণ্টায় আমরা এই 'হার-মিটেজের' চিত্রশালা দেখে নেবো, এটি হাস্যকর। ফলে, এই দাঁড়াল,—ওই চার ঘণ্টা কেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং আত্ম-বিস্মৃত অবস্থায় শ্রীমতী নাটাশা এবং

লিডিয়ার সঙ্গে এক স্বপ্নলোক থেকে অন্য রূপলোকে নির্বোধ 'নিশি-পাওয়া' ব্যক্তির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সবগুলো যেন দ্রুত সরে যেতে লাগল। আমি এই প্রথম লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির দুখানি মূল চিত্র, পিকাসোর থান পঞ্চাশেক, রুবেন্সের কুড়ি বাইশখানা এবং রেমব্রান্টেরও থান পঁচিশেক দেখলুম। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে পারি, এই হারমিটেজে না এলে 'আমার এ জন্মের তীর্থদর্শন বাকি থেকে যেতো।'

এখানে আমার সেদিনকার ডায়েরী থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করে দিই:

"But here are, they say, the biggest collections of paintings and portraits, and other art-objects. We go from one hall of marbles to another, as if, from one fairly land to the other, and visit the dreamlands of the artists of all ages....Hall afer hall full of rare paintings, portraits, statues and art-collections from Italy, Greece, France, England, Germany, Rumania and other countries, in thousands and thousands, — and we sweepingly look at them, a very small part of the whole. We do not remember how we spent the 4 hours inside some of the halls. We cannot recollect what really we have seen, or which way we proceeded through and how we crossed from one floor to another....How many crores of rupees worth of art-collections there are, we cannot imagine....Ultimately when we were all exhausted, tired and became hungry, we were asked to enter a specially protected inner chamber which has its door of iron, guarded by armed sentries.."

শোনা যায় ইউরোপের 'লুভার'-চিত্রশালার পর হারমিটেজ হ'ল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ।

আজ সকাল থেকে পায়ের আঙ্গুলের কড়ার জন্য বিশেষভাবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিলুম। গত এক মাস ধ'রে জুতোটা কষ্ট দিচ্ছে! তাসকন্দ রওনা হবার আগের দিন এই নতুন জুতো জোড়া কেনবার সময় একথা মনে ছিল না, শীতপ্রধান দেশে মোটা মোজা পরতে আমি বাধ্য,—না পরলে ঠাণ্ডায় কষ্ট এবং ভদ্রসমাজে নিন্দা! বলা বাহুল্য, এই নিন্দাটা কি প্রকার, সেটি জানার জন্য আমি মস্কোতে অনেকবার বিনা মোজায় নাগরা জুতো পরেছি। একমাত্র শ্রীমতী লিডিয়া ছাড়া আর কেউ এর সমালোচনা করেননি! তাঁর কেবলই ভয় পাছে কোনও ভারতীয় সামাজিক বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠেন!

আমার ক্লান্ত এবং খঞ্জগতি বোধ হয় শ্রীমতী প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন। এবার কাছে এসে একবার পায়ের দিকে চেয়ে বললেন, কষ্ট হচ্ছে খুব? ওটা নাই পরে আসতেন? একটু আস্তে চলুন—আমি সঙ্গেই আছি—

হাসিমুখে বললুম, তা'তে কষ্ট কমবে না, বরং কুণ্ঠাই বাড়বে—!

কী দরকার ছিল ওই ছাই জুতোয়... এত কষ্ট হত না!

জুতো এবং ফোস্কা সত্যই বিশেষ কষ্ট দিচ্ছিল এবং অনেক সময়ে অশোভন-ভাবে আমাকে থমকিয়ে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের সহানুভূতিশীল কণ্ঠ-স্বর সম্পর্কে পুরুষের কান বড় সচেতন। এই নারী বিদেশিনী, খাস ইউরোপীয়, আপাদমস্তক কমিউনিষ্ট ছাঁচে গড়া,—সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে বিশ্ব-পৃথিবীর সমস্ত দেশ এ'র নিকট অনুকম্পার বস্তু এবং আপন অভিমত সম্বন্ধে ইনি তিলমাত্র আপোষরফা করতে কখনও প্রস্তুত নন্। কিন্তু হঠাৎ এ'র কণ্ঠস্বরে কেমন যেন খট্‌কা লাগল। এই নারীর ছাঁচ যেন ভিন্নপ্রকার। আমার পা দুখানার অপরিসীম যন্ত্রণা এবং ক্লেশ-বিকৃত চেহারাটার প্রতি এই প্রকার বিষণ্ণ ও ব্যথিত কণ্ঠের সমবেদনা হয়ত তখন দরকার ছিল!

মুখে বললুম, আপনি এগোন্, আমি আস্তে আস্তে হাঁটি।

শ্রীমতী আমার কথা শুনলেন না। আমি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিলুম। উনি সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। পিঁয়াজের খোসা একটির পর একটি ছাড়ালে তার ভিতরে শাঁস-বিন্দু পাওয়া যায় কিনা ভাবছিলুম!

সশস্ত্র প্রহরী একটি ছাড়পত্র নিয়ে যখন আমাদেরকে একটি গোপন কক্ষের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিল, আমরা তখন একটি আশ্চর্য পৃথিবীর মধ্যে ঢুকলুম। বিশাল এক কক্ষ, কিন্তু তার চারিদিকে শত শত বৎসরের সঞ্চিত হীরা মুক্তা স্বর্ণ রত্ন মণিমাণিক্যের দ্যুতি-ঝলসিত যক্ষপুরীর দিকে চেয়ে আমরা কয়েকজন ভারতীয় যেন অনেকটা দিশাহারা হয়ে গেলুম।

পৃথিবী কত বড় এখনও ভালো ক'রে জানিনে, কিন্তু এখানে শুনলাম, এত বড় রত্নাগার নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও বর্তমানে নেই। বিগত তিন হাজার বছর ধ'রে এই রত্নভাণ্ডার এক-কাল থেকে অন্য কালে পরিপুষ্ট হয়েছে। অগণিত সংখ্যক সিন্দুক ও বাক্স হীরা-জহরতে বোঝাই, রাজ-পোষাক আগাগোড়া সোনা ও হীরায় মোড়া। আসা-সোঁটা, মুকুট, রাজদণ্ড, পরিধেয়াদি—সব জহরাদিতে পরিপূর্ণ। বড় বড় হীরা ও আসল মুক্তার মালা সর্বত্র শোভা পাচ্ছে। যতগুলি জার ও জারিনা এতাবৎ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সমস্ত অলংকারাদি। তুরস্কের কবেকার এক সুলতান জারকে উপহার দিয়েছিলেন একখানা শাল, সেটিতে প্রায় একশ'টি হীরা বসানো,—এবং তাদের প্রত্যেকটির আকার প্রায় আমাদের 'নয়া পয়সার' মতো। সম্রাজ্ঞীর সাজ, রাজার বহির্বাস, ঘোড়ার পিঠের সাজ, অন্যান্য আসবাবসজ্জা, ব্যবহার্য নানা সামগ্রী—সমস্তগুলি থেকে সংখ্যাতীত হীরকের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চারিদিকে শত-সহস্রবিধ লক্ষ্যবস্তু—প্রত্যেকটিই আপন আপন হীরকের কাহিনী বলবার জন্য ঝলমল করছে!

গজনীর মাহমুদ বুঝি সতেরোবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধনরত্নভাণ্ডার লুট করেছিলেন! ভারতের বাজারে তখন নাকি মোহর ছাড়া মুদ্রা ছিল না! তিনি একবার সোমনাথের মন্দির লুট ক'রে যখন ধীরে সুস্থে চ'লে যান, তখন সেই লুণ্ঠিত রত্নসম্ভার বহন করার জন্য ৪০০০ সংখ্যক উট দরকার হয়েছিল! সেটি বোধ হয় দশম শতাব্দির শেষ দিকে। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে ক্লাইভের লুট-পাটের পর ইংরেজ জাতির একটা বড় অংশ ধনবান হয়ে উঠল, তখন থেকে 'হাউস অফ লর্ডস'-এর জন্ম হল কিনা, অতটা ইতিহাস আমি জানিনে। তবে ক্লাইভ সাহেব হয়ে উঠলেন 'লর্ড', এবং এক শ্রেণীর ইংরেজ ধনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ন্যাবব।'

'হারমিটেজ' থেকে ফিরবার সময় আমার এক বন্ধু কানে কানে শুধু বললেন, "একমাত্র এই রত্নাগারে যে-পরিমাণ টাকার সামগ্রী যখের ধনের মতো সংরক্ষিত রয়েছে, তাতে ভারতের মোট ২৪টি 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক' যোজনার খরচ উঠে যায়!"

কথাটার মধ্যে বোধ হয় সূক্ষ্ম একটা দৈন্যের ইঙ্গিত ছিল, সেই জন্য ওটায় কান দিইনি। তবে পরবর্তীকালে

এই সংবাদটি সংগ্রহ করেছিলুম, সমগ্র প্রাচ্যালোকে সর্বাধিক সংখ্যক হীরকের খনি একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই নাকি বর্তমান, যেমন বর্তমান তার সর্বাধিক পরিমাণ অরণ্য ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ! সোভিয়েট ইউনিয়নের মেয়েদের বিশেষ প্রিয় হল, বড় হীরের আংটি! কেউ কেউ একই আংটিতে দুটি হীরা বসায়, কেউ বা তিনটি। গলায় ঝোলায় আসল মুক্তোর মালা। হাতে চুড়ি বা বালা বিশেষ কেউ পরেনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মেয়েরা হাতে বালা দিয়ে জানিয়ে দেয়, আমরা কাজ করিনে, সেবা করি।" সোভিয়েট মেয়েরা দুই হাত শূন্য ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে, আমরা কেউ সেবা করিনে, কাজ করি! আমাদের প্রকৃতির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষ বর্তমান।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সোনার অলঙ্কারের ব্যবহার একেবারেই কম।

লেনিনগ্রাডকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর একাদশ শ্রেষ্ঠ শহর! এখানে কমিউনিষ্ট সমাজের উগ্র প্রচারের ঢক্কা-নিনাদিত রূপটি নেই। চারিদিকের সৌন্দর্যে যেন একটি সুকুমার পেলবতা, অনাহত শান্তি। নদীর ওপারে পিটর ও পল দুর্গ,—ওটি একদা বিপ্লব-বাদীগণের মৃত্যুলোক ছিল। আমাদের চোখ ছাড়া পেয়েছে বনে, বাগানে, গির্জা ও অট্টালিকার অলিন্দে, শ্বেত পারাবত-দলের চত্বরে। চোখের অপরিসীম তৃপ্তি ঘটছে বড় বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় মনীষীর প্রস্তরমূর্তিগুলি দেখে। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম আমরা এসেছি এমন একটি সুন্দর জগতে, যেটি রসবোধ, সুরুচি, শালীনতা, আভিজাত্য এবং উচ্চ সংস্কৃতির একটি মনোমুগ্ধকর পরিচয় বহন করে। আমার নিজের চোখের পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বস্তি এই ষ্ট্যালিনের কোনও মূর্তি, ছবি, বিজ্ঞাপনী—এগুলি কথায় কথায় খামোকা চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না! দিল্লী-কলকাতার পথ-ঘাটের প্রতি বাঁকে যদি কথায়-কথায় দেখতুম গান্ধী-নেহরুর পাথরের মূর্তি একের পর এক এখানে-ওখানে বসানো, এবং বশম্বদ হয়ে নেহরু বসে রয়েছেন গান্ধীজির কোলের কাছে,—তাহলে আমি স্থায়ীভাবেই মণি-কর্ণিকার ঘাটের ধারে গিয়ে আশ্রয় নিতুম। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই রুচি-বিকারের আতিশয্যটাই পীড়া দেয় সবচেয়ে বেশি। এত বেশি 'পুতুল-পুজো' একটু গায়ে লাগে! এত বেশি লোক-দেখানো অনুরাগের মধ্যে জনসম্মতি আছে কিনা বা ফাঁকি আছে কিনা, এটি যে কোনও পর্যটকের মনে আসে! আরেকটি লোক-দেখানো প্রচার-কার্য অত্যন্ত স্থূলভাবে দেখা যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে। সেটি হল, চীন সম্পর্কে। বোধ হয় মস্কোর প্রতি সংবাদপত্রেই কথায়-কথায় প্রকাশিত হয়, চীনের সঙ্গে তাঁদের 'চিরন্তন ও চিরস্থায়ী' বন্ধুত্ব! সোভিয়েট ইউনিয়নের বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর কয় মাস! কিন্তু আমাদের বয়স তিন হাজারেরও বেশি। আমরা যখন একদা মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়ে মঙ্গোলিয়ার দিকে 'ভিক্ষু' পাঠিয়েছিলুম, ইন্দো-চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে ধর্মসমাজ স্থাপন ক'রে ফিরে এলুম—তখন আমরাও ভেবেছিলুম, তাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব বুঝি নিত্য-স্থায়ী। কিন্তু দেখা গেল, দু'হাজার বছরের বেশির বন্ধুত্বেও ফাটল ধরে! সোভিয়েট ইউনিয়নের এই ছেলে-মানুষী বিজ্ঞাপন-প্রচার লক্ষ্য ক'রে মনে হত, যখন এত চিৎকার, তখন এর মধ্যেকার ফাঁকিও একদিন ধরা পড়তে পারে। আজ চীন-ভারত বন্ধুত্ব বিপন্ন, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি বিপন্ন চীন-সোভিয়েটের 'চিরন্তনকালের' বন্ধুত্ব! সেটি কি প্রকার চেহারা নিচ্ছে ধীরে ধীরে,—সে-আলোচনা পরে করব। রাজনীতিক বন্ধুত্বের চিরস্থায়ীত্বে আজ পৃথিবীর কেউ আর বিশ্বাস করে না!

কতকাল আগে জানিনে, কিন্তু কোনও এককালে লেনিনগ্রাড বুঝি ছিল
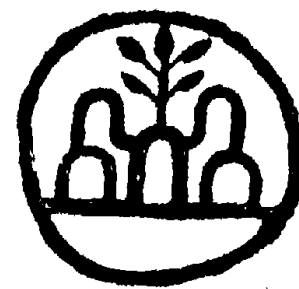
একটা মস্ত জলাভূমি। একদিকে বাল্‌টিক সমুদ্র ফিনল্যান্ড উপসাগরের খাঁড়ি দিয়ে এই জলাভূমিতে জল ঢুকিয়ে দিত, এবং অন্যদিকে 'লেক লাডোগা' সেই জল ধরে নিয়ে ছোট-খাটো সমুদ্র ব'নে যেত। এই জল ও স্থল-ভূভাগ মিলিয়ে যে আদিঅন্তহীন তুষারলোক উত্তর মেরুবলয়ের সঙ্গে মিলে থাকত, সেটি বিগলিত হত না নবেম্বর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত! আমরা ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে সন্ধ্যার সময় কঠিন ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, সমুদ্র জমে গিয়ে কঠিন বরফে পরিণত এবং একখানি জাহাজ মাইল দুই দূরে বরফে আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের অসাধ্যসাধক বিজ্ঞানীরা একখানি আণবিক শক্তিশেলযুক্ত জাহাজ নির্মাণ করেছেন। সেটির দ্বারা কঠিন নিরেট বরফ-সমুদ্রে যথাযোগ্য ফাটল ধরিয়ে জাহাজ চলাচলের কাজ চলবে। পৃথিবীর এই প্রথম 'এটমিক আইস-ব্রেকার' জাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে 'লেনিন।' নামটি মানানসই হয়েছে।

লেনিনগ্রাডে আমাদের মাত্র তিন-দিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা কেন করা হল, এর কারণ খুঁজে পাইনি। শ্রীমতী নাটাশার কাছে এর সদুত্তর ছিল না। শ্রীমতী লিডিয়াকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। লেনিনগ্রাডের স্বভাব একটু ভিন্ন রকমের। এখানকার অধিবাসীদের চাপা কৌতুক-পরিহাসবোধ কিছু বেশি। রাজধানী মস্কো যেন একটা বিরাট বাজার, কিন্তু লেনিনগ্রাড হল গৃহস্থা-শ্রম, অভিজাতপল্লী! মস্কোতে সকল কাজ সারো, লেনিনগ্রাডে এসে বিশ্রাম নাও! মাথার ঘাম পায়ে ফেলো মস্কোতে, লেনিনগ্রাডে এসে কপালের ঘাম মোছ! লেনিনগ্রাডের হাওয়া মস্কোর আব-হাওয়ার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মেলেনা।

সেই এককালের বন-বাদাড় আর জলাভূমি একদা যখন নগরে পরিণত হল তখন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক পিটারের নামে এটি 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' নামাঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু নামটি দেন পিটার-দি-গ্রেট,—যিনি এই নগরটি সেই জলা-ভূমির উপরে নির্মাণ করেন! পিটারের একটি অশ্বারোহী ব্রোঞ্জমূর্তি—যেটি সাপে জড়ানো,—সেটি বিশেষ আকর্ষ-ণীয়। এটি নির্মাণ করেন দুজন ফরাসী ভাস্কর। যে কয়টি মনোজ্ঞ গির্জা চোখে পড়ে তাদের মধ্যে 'সেন্ট আইজাক' এবং 'কাজান' গির্জা সর্বা-পেক্ষা প্রসিদ্ধ। এটির চেহারা অনেকটা কলকাতার ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়লের মতো। এটি নির্মাণ করা হয় উনিশ শতাব্দির প্রারম্ভে। এটি এখন ঐতিহাসিক যাদুঘরে পরিণত। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নের ধর্মমন্দিরের সংখ্যা অগণিত। গির্জা, সিনাগগ, মসজিদ, বৌদ্ধবিহার এবং অধুনাতন-কালে আবিষ্কৃত হিন্দুর পূজামন্ডপ ও অগ্নিমন্দির,—এগুলি সর্বত্র সযত্নে রক্ষিত আছে বটে, তবে এদের অনেক-গুলি এখন ধর্মসম্বন্ধীয় যাদুঘরে পরিণত হয়ে রয়েছে। কাজান ক্যাথি-ড্রালও তাই।

প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরটিও অবাক বিস্ময় আনে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি অতিকায় ঐরাবতের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আরল সমুদ্রতীরে—সেটি রয়েছে। এককালের অতিকায় জন্তু, অদ্ভুত ধরণের প্রাণী ও মানুষ, ভয়াবহ সরীসৃপ,—এদের খুঁজে পাওয়া যেত মধ্য-এশিয়ায়, এবং ককেসাস, প্রাচীন আর্মেনিয়া ও বৈকাল হ্রদের আনাচে-কানাচে, অথবা মঙ্গোলিয়া ও তাকলামাকানের ওদিকে। একদা পিটার-দি-গ্রেট এগুলি দেখে আকৃষ্ট হন। পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এই 'প্রাকৃতিক' যাদুঘরটি তাঁরই সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দির প্রথম বছরে তুষার-সমাকীর্ণ সাইবেরিয়ার 'তাইগা' অঞ্চলে একটি অতিকায় দানবাকৃতি জন্তুর অক্ষত ও তুষার সমাধিস্থ সম্পূর্ণ দেহটাকে খুঁজে পায় এক ভল্লুক-শিকারী! সেই ব্যক্তি এই জন্তুর একটি দাঁত কেটে নিয়ে দূরে এক গ্রামের হাটে যখন বিনিময়-মূল্যে তামাক কিনতে আসে, তখন লোক-জানাজানি হয়। ফলে 'যক্ষতোষক' বা 'যোকুটস্ক' রাজ্যের তাতার বংশীয় আমীর মহাশয় এটির খবর পেয়ে ছোটাছুটি করেন। অতঃপর বরফ কেটে যে বিরাট দেহটি টেনে বার করা হয়,—দশ হাজার বছর পরেও সেই শবদেহটির ওজন দাঁড়ায় প্রায় একশ' চল্লিশ মণের মতো। এই যাদুঘরে সেই বিশাল জন্তুটি জোড়া-তাড়া অবস্থায় রয়েছে।

আমরা লেনিনগ্রাডে আপাতত কোন্ কমিটি বা ইউনিয়নের অতিথি, সেটি সঠিক আমার জানা ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট মাকড়সার জালের শত-শত সূত্রের অন্যতম সূত্রো হল, সোভি-য়েট লেখক-সংঘ! এই লেখক-সংঘের আতিথেয়তা অকৃপণ সৌজন্যে ভরা। সন্ধ্যার পরে ভোজনের আসরে বসে এই প্রথম জানলুম, আমরা লেনিনগ্রাড লেখক-সংঘের অতিথি!

ঐশ্বর্যসম্পদ পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ 'অ্যাসটরিয়া' হোটেলের নীচের তলাকার ডাইনিং হলের একধারে আমাদের ছয়জন ভারতীয়ের মধ্যে বসলেন হাস্যরসিকা এবং বয়োধর্মিণী শ্রীমতী নাটাশা এবং সোভিয়েট-প্রাণা তেজস্বিনী শ্রীমতী লিডিয়া! লিডিয়া বসেছেন আমার ডান দিকে। কারণ তাঁর ধারণা খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে আমি ঈষৎ উদাসীন,—তিনি সেগুলি গুছিয়ে দেবার চেষ্টা পান। তাঁর সর্বদা ভয় পাছে আমার জামায় আহার্য সামগ্রীর দাগ লেগে পোষাক নষ্ট হয়। তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। এই টেবিল থেকে কিছু দূরে অন্য একটি টেবিলে বসেছেন জনচারেক ভারতীয়,—বোধ হয় কমিউনিষ্ট—তাঁদের এক ব্যক্তির সঙ্গে মস্কোতেই আমার আলাপ হয়েছে। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ভবানী সেন। শুনেছিলুম তিনি ভাল অঙ্ক জানেন! সেই অঙ্ক সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে মিলছে কি না, সে খবর আমি পাইনি। কিন্তু তাঁর বাইরের চেহারাটি বিশেষ শান্ত এবং অমায়িক সৌজন্যে পরিপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, তাঁর ভিতরে কিছু পদার্থ আছে বলেই বাইরের পালিশটি একটু মোটে। তারা বোধ করি কোনও কৃষি ও শিল্প-সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। তা হবে।

আমাদের টেবলে এসে বসেছেন লেখক-সংঘের পক্ষ থেকে একজন সুশ্রী যুবক-কবি, একজন তরুণী কবি এবং তৃতীয়জনও একজন নব্য বয়সের লেখক। লেনিনগ্রাডে প্রবীণ লেখক-লেখিকা আর কে কে আছেন, অথবা তাঁরা সকলে রাজধানী মস্কোতে গিয়ে স্পষ্টত কারণে ডেরা নিয়েছেন কিনা—সেটি সঠিক নির্ণয় করতে এখনও পারছিনে। তবে হয়ত এই ধরণের লেখকরা আমাদের দেশের মতন এখানেও মফঃস্বলের মাসিক বা সাপ্তাহিকের কারখানায় কেউ কেউ তৈরি হয়! তারপর একদিন তারা আসে শহরে। সকলের আগে তারা চায় একটু যশ,—এবং সেই যশের দু' একটি তরঙ্গ যদি স্বগ্রামের ঘাটে এসে লাগে, তবেই কিছু তৃপ্তি! যশের পর কিছু অর্থ। তারপর কিছু প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর কিছু প্রতিপত্তি। এমনি ক'রেই বোধ হয়

একদিন এ'দেরও 'আঙ্গুলে ফুলে কলা-গাছ' হয়,—কে জানে!

মেয়েমহলে কোন কোনও ভারতীয় বন্ধুর ব্যবহারিক দৈন্য লক্ষ্য ক'রে আমি মধ্যে মাঝে একটু-আধটু বিরক্ত বোধ করতুম এটি তাঁরা জানতেন এবং সেজন্য আমাদের মধ্যে অতিশয় সংযত ও ভদ্র কমিউনিস্ট নেতা শ্রীযুক্ত সাজ্জাদ জহীরের উপস্থিতি কামনা করেছিলুম। তাঁর ন্যায় সদাচারী, সংস্কৃতিবান, মিষ্ট-ভাষী ও মধুর প্রকৃতি ব্যক্তি ভারতীয় কমিউনিস্ট দলে আর কতজন আছেন, আমার খুঁজে দেখতে ইচ্ছা করে! তিনি স্যার ওয়াজির হাসানের পুত্র বংশানুক্রমিক ধনী, উত্তরপ্রদেশের মস্ত আলী জহীরের ভ্রাতা, প্রাক্তন জমীদার সুপণ্ডিত এবং আভিজাত্যের ঐতিহ্য বাহক। একবার জহীর আমাকে হাসি
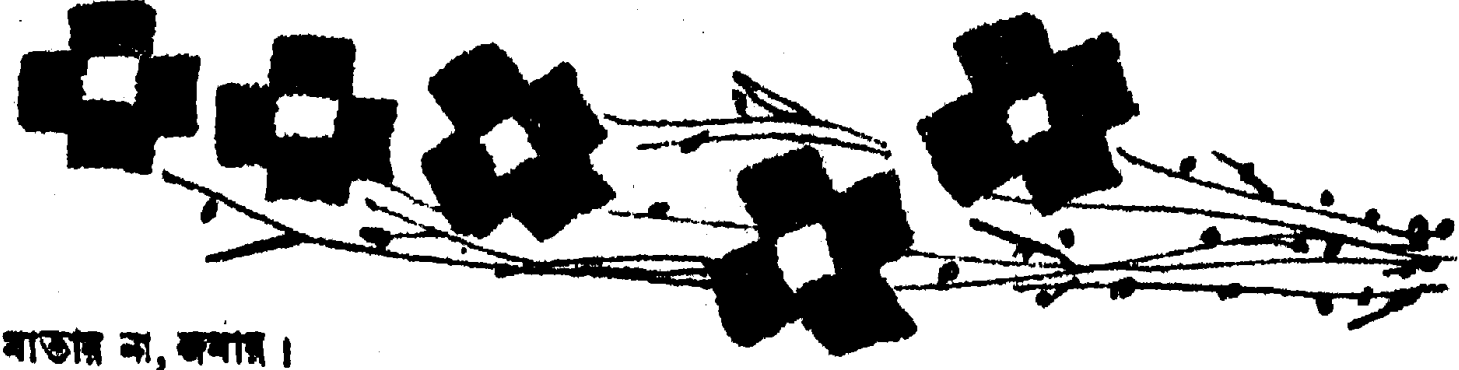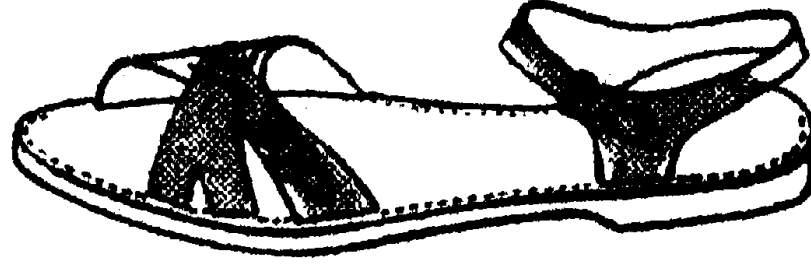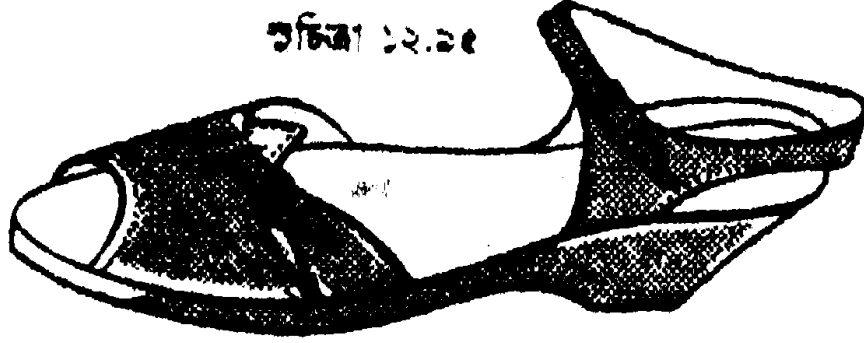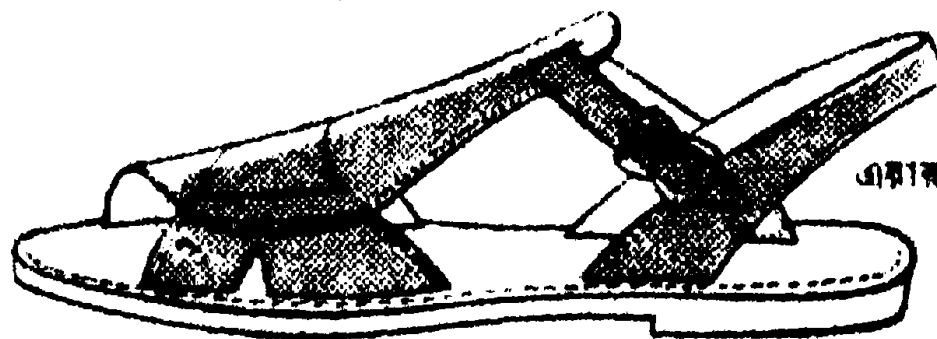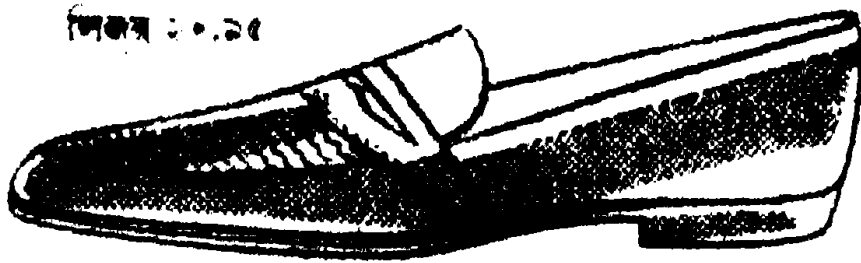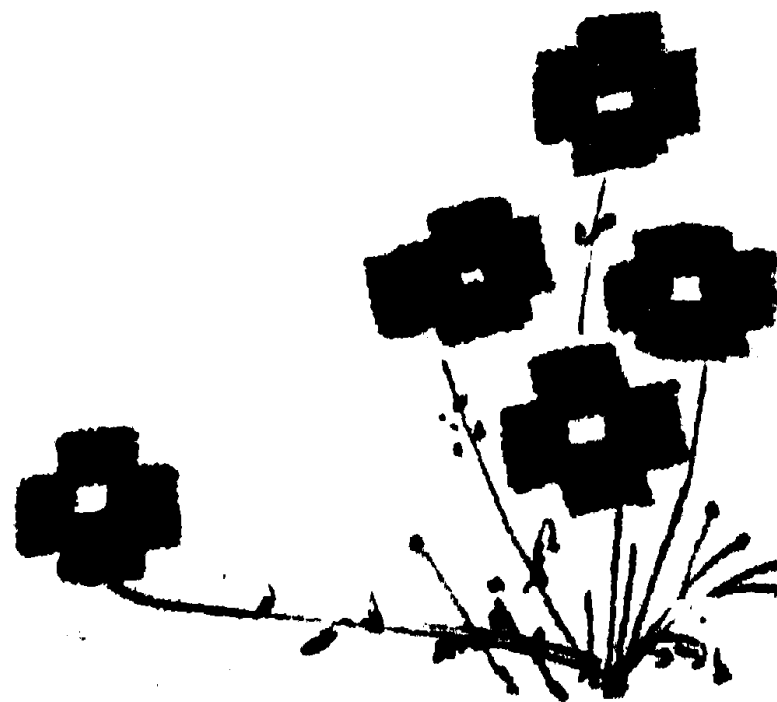
মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁ, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আমিই একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া, নৈলে পাকিস্তানের জেলে পাঁচ বছর ধরে নির্জন 'সেল'-এ কেন থাকতে যাব বলুন?' হাসিমুখে তিনি বলতেন, "সবাই জানে আমি উচ্ছন্নে গেছি!"

জহীর আমাদের সঙ্গে নেই সেজন্য অসুবিধা বোধ করছিলুম।

তিনজন নবাগত লেখক-লেখিকার সান্নিধ্য লাভ ক'রে আমরা আনন্দিত হয়ে দোভাষীদের সাহায্যে গল্পগুজব করছিলুম। যুবকটির প্রদীপ্ত শ্রী, স্বাস্থ্য এবং আলাপের মধ্যে বিনয়-নম্রতা আমাদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু ছিল। তরুণী কবি-মেয়েটিও ভারি সুশ্রী এবং সংযতপ্রকৃতি। তৃতীয় যুবকটি নাটাশার কাছাকাছি বসেছেন এবং সর্দার শেখোনের হাসি-পরিহাসে এরই মধ্যে তিনি মশগুল হয়েছেন! শুনেছি লেনিনগ্রাডের ছেলে-মেয়েরা রসবোধ কা'কে বলে জানে। লোকমুখে শোনা ছিল, তারা নাকি কমিউনিজমকে ঠাট্টাবিদ্রূপ বা তামাশায় অনেক সময় নাজেহাল করে। ঠিক বলতে পারিনে, মস্কোকে রাজধানী করার জন্য লেনিনগ্রাডের মনে চাপা অসন্তোষ আছে কি না! শোনা কথার মধ্যে মিছে কথা থাকে প্রচুর।

আহারাদির মাঝখানে নবাগতা সেই লাজনম্রা তরুণী কবি একখানি সাময়িক পত্রিকা বার করলেন। তাঁর একটি কবিতা কিছুকাল আগে ছাপা হয়েছে উক্ত সাময়িক কাগজটিতে। কাগজটির সাইজ 'অমৃত'র মতো। উক্ত কবিতাটি বোধ করি গদ্য কবিতা,—জায়গা নিয়েছে পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার মতো। বোধ হয় আরও বেশি। কবিতাটি পাঠ ক'রে তিনি বিশেষভাবে আমাকে এবং আমার বামপার্শ্ববর্তী পাঠান-কবি শ্রীযুক্ত তাবানকে আনন্দ দিতে চান। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালুম।

কবিতা অতি দীর্ঘ হলে শ্রোতা এবং পাঠকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় কিনা স্পষ্ট জানিনে। কিন্তু যখন শুনলুম, এ কবিতাটির বিষয়বস্তু হল 'ভারতবর্ষ' তখন একটু সজাগ হলুম। লেনিনগ্রাডের একটি মেয়ে লিখেছে ভারতবর্ষের উপর কবিতা? সন্দেহ নেই, এটি আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের কারণ। তাসকন্দের মহিলা কবি শ্রীমতী জুলফিয়া ভারতের উপর যে কয়টি সুন্দর কবিতা তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, সেগুলিতে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান এবং হৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে! এ কবিতাটি একটু অন্যরকম। এর বিষয়বস্তু হল, 'ভারতের শোচনীয় দুর্ভিক্ষ!'

দুর্ভিক্ষ! ভারতের?—প্রশ্ন করলুম, আপনি কি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বাঙলা দেশের সম্বন্ধে লিখেছেন? আপনি কি ভারতে কখনও গিয়েছিলেন?

লাজুককণ্ঠে তরুণী কবি জবাব দিলেন, না, আমি লিখেছি ১৯৪৭-এর কাহিনীটি এই কবিতায়!—এই ব'লে তিনি কবিতাটি পাঠ আরম্ভ করলেন এবং আমার পার্শ্ববর্তিনী লিডিয়া মুখে মুখে প্রতি ছত্র অনুবাদ করে দিতে লাগলেন। ওপাশে নাটাশারা হাসি-পরিহাসে মশগুল ছিলেন।

কবিতাটির বিষয়বস্তু বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটা! ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত অন্নের জন্য হাহাকার করছে! কেউ দিচ্ছে না তাকে খাদ্যশস্য। দয়া, স্নেহ বা মমতা কোথাও নেই। এমন দিনে পরিপূর্ণ এক জাহাজ খাদ্যশস্য নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক নাবিক বোম্বাইয়ের ঘাটে গিয়ে অবতীর্ণ হলেন! চারিদিকের নিরন্ন, উপবাসী, ছিন্নজীর্ণবাস, ক্ষুধার্ত জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোভিয়েট খাদ্য-জাহাজের সেই দয়ার্দ্র নাবিক! দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং ক্ষীণপ্রায় ভারতীয় সেই ভিখারীদলের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল! ত্রাণ-কর্তা এসেছেন আমাদের জীবনদান করার জন্য! দুই হাত তুলে সেই বিরাট ক্ষুধিত জনসাধারণ আশীর্বাদ করতে লাগল!

কমিউনিষ্ট পাঠান-কবি যিনি দিল্লীর 'মক্তবা জামিয়ার' ম্যানেজার এবং সুপণ্ডিত, সেই মিঃ তাবান মদের গেলাসটি নামিয়ে আমাকে বললেন, দেখছেন, কী চমৎকার রচনাশৈলী, কেমন নতুন ধরণের আঙ্গিক?

কবিতা পাঠের মাঝখানে আমি প্রশ্ন করলুম, সোভিয়েট ইউনিয়ন ওই গম কি দান করেছিল, না ধার দিয়েছিল?

হঠাৎ ওঁরা চুপ ক'রে গেলেন। আমি আবার প্রশ্ন করলুম, আপনারা কি জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে নিঃস্বার্থভাবে ভারতের কোনও উপকার করেননি? আপনারা কি জানেন ষ্টালিনের জীবিতকালে ভারতবর্ষ তাঁর হাত থেকে কোনও 'দান' নেয়নি? তা হলে শুনুন, ১৯৪৭ সালে আমি বোম্বাইতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' উপস্থিত ছিলুম এবং আপনার ওই কাব্যবর্ণনার সঙ্গে বোম্বাইয়ের তৎকালীন জীবনযাত্রার এতটুকুও মিল নেই! ক্ষমা করবেন, কবিতাটার মধ্যে ঐতিহাসিক সততা খুঁজে পাচ্ছিনে।

তাবান একটু থতিয়ে বললেন, আগে সব কবিতাটা শুনুন—?

আমি হাসলুম,—কবিতার মূলে ভিত্তি যেখানে সত্য নয়, সেখানে অন্যান্য 'সেন্টিমেন্টও' হাস্যকর। এ কবিতাটি সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষেও সম্মানজনক হয়নি, কারণ তাঁদের পররাষ্ট্রনীতিতে কোথাও দাতা ও গ্রহিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত নয়! খোঁজ নিয়ে দেখুন, ভারতবর্ষ কি প্রকারে সেই সোভিয়েট গমের দেনা শোধ করেছিল!

তরুণী কবির সুন্দর ও রক্তিম মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে তাবান আমাকে বললেন, দেখুন, আপনি নিজে কবিতা লেখেন না, কিন্তু আমি লিখি! এ কবিতাটির জন্ম হয়েছে একটি মহৎ অনুপ্রেরণা এবং বিশ্ববন্ধুত্বের পরি-কল্পনা থেকে—আপনি একটু ধৈর্য ধ'রে শুনুন—!

আমি আবার হাসলুম। বললুম, দেখুন, আমি বয়সে বোধ হয় আপনাদের সকলের চেয়ে একটু বড়ই হবো। আমি রবীন্দ্র-নাথের জন্মভূমি কলকাতা থেকে আসছি। কবিতা কা'কে বলে একটু বুঝি। সে যাক্, তাহলে ঐতিহাসিক সত্য শুনুন! বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোক যখন না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মরছিল, সেই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির অন্যতম সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পার্শিয়ান উপ-সাগরের ভিতর দিয়ে, যতদূর মনে পড়ে, হাজার হাজার টন ভারতীয় খাদ্যশস্য এবং কানপুর থেকে লক্ষ লক্ষ জোড়া জুতো আপনাদের এখানে এসে পৌঁছত কিনা, আপনারা একটু খোঁজ নিলে খুশী হতুম!

শ্রীমতী লিডিয়া পাশ থেকে বললেন, জুতো এখনও আসে!

আমি বললুম,—হেসেই বললুম, কিন্তু এসব নিয়ে কোনও ভারতীয় কমিউনিষ্ট-কবিও একছত্র কবিতা লিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি এই প্রকার অসম্মানজনক সমবেদনা প্রকাশ করেননি! ভারতের রুচি একটু অন্যরকম!

তর্কবিতর্কের মধ্যে কবিতাটা আর পড়া হয়ে উঠল না। মনে মনে তবু আমার একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, নিজের দেশ সম্বন্ধে কোথাও কোনও প্রকার গর্ব প্রকাশ করব না! আমি শুধু দেখতে ও জানতে এসেছি। যদি কিছু শিক্ষালাভ করে যাই, বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু এই ভোজনের আসরে সেই প্রতিজ্ঞাটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গেই সেই যুবক কবিটিকে ব'লে ফেললুম, দেখুন, হাতী পাঁকে পড়লে অন্যান্য জন্তুরা মনে করে, এবার ওটার সংশিক্ষা হোক! কিন্তু সেই হাতী সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক! এটি মনে রাখা দরকার, ভারত চিরদিন সম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ,—কোনও যুগে তার অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটেনি, অথবা কোনও দিন তার দারিদ্র্য বা অভাব নেই! শুধু এক এক যুগে বাইরের থেকে দস্যু-দানব-তস্করের দল ভারতে এসে লুটপাট করে, মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, গায়ের জোরে ভোগদখল করতে থাকে! মাঝে মাঝে সেই কারণে ভারতের দুর্গতি

দেখা দেয়। কিন্তু আজ আমি আপনাদের এই কবিতাটি শুনে একটি বিশেষ কারণে দুঃখবোধ করছি এই, আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য বোধ হয় এই ধরণেরই চিত্তবিকার এবং প্রচারকার্যে ভরা! আমি আপনাদের সাহিত্যে বিশুদ্ধ চিন্তা এবং রসানন্দ পরিবেষণ কামনা করি! আপনারা পুশকিন-লারমেনটভ-টলস্টয়-গোর্কি-মায়াকোভস্কি-শেকভের যোগ্য উত্তরাধিকারী হোন্—!

তাবান রুষ্টকণ্ঠে শুধু বললেন, সমস্ত কবিতাটা না শুনে আপনার এই ধরণের মন্তব্য সমীচীন হয়নি—এটা অনেকটা অসামাজিক—!

আমি হাসিমুখে বললুম, এই অসামাজিক চেহারা নিয়ে আমি আবার এঁদের দেশে আসব, বলে গেলুম, মিস্টার তাবান! সোভিয়েট সমাজকে ভারতীয় কমিউনিস্টরা অনেকেই চেনে না! তারা হয়ত এখানে এসে কোনও গোপন আলাপ-আলোচনা ক'রে যায়, কিন্তু এখান থেকে ভালবাসা নিয়েও যায় না, ওখান থেকে ভালবাসা নিয়েও আসে না!

এই ঘটনার নয়মাস পরে মস্কোর লেখক-সঙ্ঘ আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে পুনরায় সোভিয়েট ইউনিয়নে নিয়ে গিয়ে আমার ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন!

আমরা যাচ্ছিলুম থিয়েটারে। গাড়িতে ওঠার আগে শ্রীমতী লিডিয়া অনুযোগ জানিয়ে বললেন, যত সব আজে-বাজে কথা! মাঝ থেকে আপনার মুখে কিছু উঠল না! ফিরবেন ত' সেই রাত বারোটায়!

বললুম, খাওয়ায় ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিল!

শ্রীমতী নাটাশা এবার আমার দিকে চোখ টিপে হেসে বললেন, you became a little hot to-day, isn't it?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শ্রীমতী লিডিয়া। হৈচৈ ক'রে তিনি বললেন, no, but I think, he is always very cold.

ওদের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি প'ড়ে গেল!

ভারতীয় দলের মধ্যে শ্রীমতী লিডিয়া বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। লিডিয়ার সেবা যত্ন, ছুটোছুটি, ফাই-ফরমাস খাটবার আগ্রহ, অক্লান্ত-ভাবে সাহায্য দেবার তৎপরতা, এবং সর্বোপরি মিষ্ট ব্যবহার ও হাসি-পরিহাস,—এগুলির মধ্যে ভারতীয়রা ভারতীয় নারীপ্রকৃতির আভাস পেয়েছিলেন। বোধ হয় পৃথিবীর সব দেশের মেয়ের মধ্যেই একপ্রকার গুণপনার জন্য পুরুষেরা তাদেরকে তারিফ করে। আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছিলুম, শ্রীমতী নাটাশা লিডিয়ার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন ও উদার নন। কেন নন্ আমরা জানিনে। নাটাশা একটু সৌখীন, একটু আয়েসী, একটু গা-বাঁচানো,—সেইজন্য পরিশ্রমের ভাগটা লিডিয়ার ওপর বেশি পড়ে। অনাবশ্যক নানা জটিল কাজে লিডিয়াকে ব্যস্ত রেখে নাটাশা আমাদের নিয়ে বেরিয়ে যান এবং গাড়ির মধ্যে বসেই অনুপস্থিত ব্যক্তির অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য পরিহাস করেন! এই মনোভাবটিই যেন অনেকটা প্রকাশ পায়, নাটাশা আমাদের 'বন্ধু' এবং লিডিয়া শুধু পরিচারিকা। অনেক সময় সকলের আড়ালে গিয়ে নাটাশা কি যেন দু' এক কথা শ্রীমতী লিডিয়াকে শুনিয়ে দেন, যেটি আমাদের চোখ এড়ায় না! আড়াল থেকে লিডিয়া বেরিয়ে এলে দেখা যায়, তাঁর মুখভাবটি ম্লান, চোখে হয়ত বাষ্পাভাস। অতঃপর রাজিন্দর সিং বেদী তাঁর মধুর এবং স্বচ্ছ পরিহাসের দ্বারা লিডিয়াকে সহজ ক'রে তোলেন। পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজের মধ্যে নারীজাতির সেই চিরন্তন ঈর্ষা-বিদ্বেষের কৌতুকের খেলা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ আছে কিনা, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও ঔৎসুক্য নেই! কিন্তু নাটাশার আচরণগুলি আমাদের চোখে মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে কিনা, এটি তলিয়ে দেখার অবকাশ নাটাশা পাচ্ছিলেন না। তিনি আমাদের পরি-চালিকা এবং অন্যজন পরিচারিকা,—এটি প্রমাণিত থাকলেই তিনি তুষ্ট! এটি দেখে খুব হাসতুম যে, নাটাশার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং মিষ্ট-মধুর চাতুরীর সঙ্গে লিডিয়া পেরে উঠছেন না! নাটাশা হলেন সোভিয়েট লেখক-সঙ্ঘের প্রতি-নিধিস্বরূপা দোভাষিণী, লিডিয়া বাইরের মেয়ে! কমিটি বা ইউনিয়নে কাজ করা একটি বিশেষ সামাজিক পরিচয়।

লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিদ্যাবিভাগের ভারতীয় শাখার উদ্যোগে ভারতীয় লেখকগণকে একটি অভ্যর্থনা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার মনে আবার সেই প্রশ্ন এল, কে আমরা? আমরা কী লিখি, কেউ জানে না! এখানে আমাদের কারো কোনও স্পষ্ট পরিচয় নেই! তা হলে এ অভ্যর্থনা কাকে দেওয়া হচ্ছে? মিথ্যার ওপর কেন

দাঁড়াবে এই গৌরব? এ যে বড় অর্থহীন!

লেনিনগ্রাডের পথ পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। ডানদিকে প'ড়ে রইল সেই নীলাভ সবুজ ঘন নিরেট সম্রাটের প্রাসাদ 'উইন্‌টার প্যালেস' তথা 'হারমিটেজ'। গাড়ি চলল দূরে থেকে দূরে একটি পর একটি সাঁকো পেরিয়ে। সমগ্র লেনিনগ্রাডে অগণিত জলপ্রণালী ও নদীর শাখাপ্রশাখার উপরে মোট ৪০০ সাঁকো আছে। এতদিন ধরে এত শহর পেরিয়ে এলুম, কিন্তু কোথাও দেখতে পাইনে নরনারীর বেহায়াপনা, দেখতে পাইনে কোথাও যৌনসংকেত। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে কোথাও একটি প্রকাশ্য চুম্বন-আলিঙ্গন নেই, অশ্লীল সিনেমা বিজ্ঞাপন, অশ্লীল বাক্য বা আচরণ, প্রকাশ্য পথে কোথাও ইতর আলাপ, কোনও দুরন্ত জনতার নোংরা উল্লাস বা গালিগালাজ, কোথাও কদর্যের সমাবেশ, কোথাও প্রবল প্রগলভতার অশোভন প্রকাশ, কোথাও গদগদভঙ্গীর বিগলিত রূপ,—না, কোনটাই কোথাও নেই! অনেক সময় মনে হয়েছে এরা পাথর, বরফ, এরা যেন সদ্য আবিষ্কৃত কঠিন একটা বিচিত্র ধাতু,—নতুন সভ্যতার গবেষণাগারে যেন এই ধাতুকে নিয়ে ভয়ানক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে! ভবিষ্যৎ কালে এই ধাতুর দ্বারা কোন্ অসাধ্য সাধন করা হবে, সেটি অনিশ্চিত। এই ধাতু দিয়ে গড়া 'স্পুট্‌নিক' আর 'লুনিক' চলে গেছে কোন্ মহাবিশ্বের শূন্যলোকে। এই ধাতু ছুটবে চাঁদে, মঙ্গলে, শুক্রে, ধ্রুবে, চন্দ্রে এবং সূর্যলোকে। জানিনে দূর কালের মানব সভ্যতার বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই ধাতু কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে! সোভিয়েট ইউনিয়নের কীর্তিকলাপের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের পক্ষে অন্যতম সন্ত্রাসের কারণ। এদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সকল আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন ভয় পাই!

বিশ্ববিদ্যালয়টি জার আমলের পুরোনো বৃহৎ একটি বাড়ি। তার নানা সিঁড়ি, নানা অলিগলি। ভিতরে শত শত ছাত্রছাত্রীর আনাগোনা,—একপক্ষ অন্যপক্ষ সম্বন্ধে সচেতন নয়। মেয়ে বলে বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু—এমন ভাব কারও চোখে দেখছিনে! পুরুষ বলে সমীহ নেই মেয়ে পক্ষে। উভয়পক্ষই সহজ।

আমরা নানান্ বিভাগ মাড়িয়ে যে কক্ষটিতে এলুম, সেখানে সকল বয়সের ছাত্রছাত্রীরা একত্র জড়ো হয়েছে। একজন তামিল মহিলা এখানে শিক্ষকতা করেন। হিন্দীর সুবিধা আছে। বাঙলা পড়াবার নানা অসুবিধা,—শিক্ষক নেই। পাঁচ ছয়টি ছাত্রছাত্রী বাঙলা পড়ে। বঙ্কিমী সাধু বাঙলার সঙ্গে এখনকার বাঙলার মিল ঘটছে না। চলতি ভাষার বাঙলা এখানে অপরিচিত,—পড়াটা কঠিন! কারণ এর ব্যাকরণ, গঠন, শব্দ, প্রয়োগ, রচনারীতি—কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। ওরা সাধু বা চলতি—কোন্ ভাষাটা পড়ছে ওরা জানে না, যেটা পড়ছে সেটার চলন নেই! দেখতে দেখতে চার পাঁচটি ছাত্রছাত্রী আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটি মেয়ের নাম, ইরা সোয়েতোভিদোভা, আরেকটি মেয়ের নাম, লেনা স্মিরনোভা। ওদের সকল প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ছিল না। ওরা দু'একজন উপযুক্ত বাঙলা শিক্ষক চায়। আমি যেন তেমন শিক্ষকের দু' একটি নাম কর্তৃপক্ষের কাছে বলে যাই! পরবর্তীকালে এই দুটি ছাত্রী আমার কাছে বসে ঘণ্টা দুই বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তে"র পাঠ নিয়েছিল। কলকাতায় ফিরে এদেরই একজনের বাঙলা ভাষায় চিঠি পাই। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বাঙলা হস্তাক্ষরের বিস্ময়কর অনুকরণ লক্ষ্য করি।

এই কক্ষের দেওয়ালে তিনখানি ছবি ঝুলছে,—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেহরু! এই তিনজনের ছবি আরও কয়েকটি শহরের কোন কোনও প্রতিষ্ঠান-কক্ষে দেখে এসেছি। কোনও প্রসিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিষ্ট নেতার ছবি কোথাও দেখিনি! ডাঃ মুলুকরাজ আনন্দের একটি ছবি দেখেছিলুম মস্কোর গোর্কি মিউজিয়মে। তিনি সেখানে এটি উপহার দিয়েছেন।

বাঙলা ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আমাকে বাঙলায় কয়েকটি কথা বলতে হল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বোধ হয় সুদূর তাসকন্দের থেকে কোনও প্রকারে শুনে থাকবে, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করি,—সুতরাং সকলের পক্ষ থেকেই এবার অনুরোধ এল, একটি আবৃত্তি শোনাবার। আমি রাজি হলুম। অতঃপর সভাস্থ সকলের বোধগম্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" কবিতাটি রচনার কালে বাঙলাদেশের রাজনীতিক জীবন কি প্রকার উৎপীড়িত ছিল, বাঙলার বিপ্লববাদের তদানীন্তন অবস্থায় ইংরেজ শাসকদের অনাচারের চেহারা কিরূপ ছিল, এবং অন্ধকার রাত্রে হিজলীর বন্দীশালায় আবদ্ধ অবস্থায় বাঙালী রাজবন্দীগণের উপর কি প্রকারে অতর্কিতভাবে গুলীচালনা করা হয়েছিল,—এইসব নিয়ে আগে একটি বিষণ্ণ বক্তৃতা করলুম! কিন্তু আমার মনে ছিল, অদূরে নেভা নদীর অপর পারে 'পিটার ও পল' নামক অতি কুখ্যাত দুর্গ—যেখানকার কঠিন ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে জার আমলে শত শত বিপ্লবী একটি মহৎ আদর্শরক্ষার জন্য ভয়াবহ অনাচার এবং উৎপীড়নের মধ্যে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করেছে! বোধ হয় আমার কণ্ঠে সেদিনের কিছু উত্তাপ এবং কিছু বেদনা-যন্ত্রণার স্পর্শ লেগে থাকবে, তাই মহাকবির শেষ কয়েক ছত্র বাণী যেন রুদ্ধ কান্নার মতো বিদীর্ণ হল :

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে,
বাঁশী সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
ঢেকেছে আমার ভুবন
দুঃস্বপনের তলে।
তাইত তোমায় শুধাই অশ্রুজলে,
"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছে ভালো?"

কবিতাটি আবৃত্তি করার কালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নাস্তিক্যবাদের কথা আমার মনে ছিল না! কিন্তু 'পিটার ও পল' দুর্গের গুহান্ধকারের মধ্যে যে হিমবিক্ষত মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী ওই গুহাছিদ্রপথ দিয়ে মাঝে মাঝে বক্রদৃষ্টিতে তাকাত তাদের মাতৃভূমির "চিরসারথীর রথচক্রের" দিকে, আমার চোখেও হয়ত তাদের কিছু আভা পড়েছিল! সেইজন্য, কবিতাটি পাঠ করার পর সহসা যখন ওই নিস্তব্ধ জনতার মধ্যে প্রথমেই চোখ পড়ল নাটাশার দিকে,—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, নাটাশার দুই চক্ষু দিয়ে দরদরিয়ে অশ্রু নেমে এসেছে!

সামনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটির দিকে আরেকবার তাকালুম! সমস্ত কক্ষটি বেদনার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে মহাকবির বাণীতে। বেরিয়ে আসবার সময় শ্রীমতী নাটাশা যখন আমার হাত ধরলেন, দেখি তখনও তাঁর দুই চোখে জল! সেই অশ্রুর অর্ঘ্য মহাকবির উদ্দেশে নিবেদিত!

পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটি দেশের বিপ্লব বোধ করি সর্বপ্রধান। কিন্তু আমেরিকার 'ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্স' অপেক্ষা ফরাসী বিপ্লব রাশিয়ার পক্ষে কাজে লেগেছিল বেশি। একটা যেন অন্যটার পরিপূরক। লেনিনের প্রিয় ছিল তিনটি দেশ। ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ড। প্রথমটির মন্ত্র, দ্বিতীয়টির পাণ্ডিত্য এবং তৃতীয়টির সংস্কৃতি,—এ তিনি হজম করেছিলেন। কার্ল মার্কস সম্ভবত ছিলেন জার্মান ইহুদী, কিন্তু তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। ইংরেজ তার ইতিহাসে দুইজন মনীষীকে আমল দেয়নি। একজন কার্ল মার্কস, অন্যজন হ্যাভেলক এলিস। হ্যাভেলক এলিস মারা যাবার পর ইংরেজ জাতি শুনল, তিনি ৪০ বছর ধ'রে ইংল্যাণ্ডেই বাস করছিলেন! কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রথম ইংল্যাণ্ডে ছাপা হয় কিনা আমি জানিনে। কিন্তু তাঁর এই 'আজগুবী' থিয়োরী নিয়ে পরবর্তীকালে কেউ প্র্যাকটিস করবে,—এটি আগেভাগে জানলে ইংরেজ হয়ত অন্য ব্যবস্থা করত!

রুশবিপ্লবের কেন্দ্র হল লেনিনগ্রাড।

কিন্তু রুশবিপ্লবের সংখ্যা একটি নয়। কোনটির নাম 'ডিসেম্ব্রিষ্ট' কোনটির নাম ১৯০৫, কোনটির 'ফেব্রুয়ারী' এবং সর্বশেষেরটির নাম '৭ই নবেম্বর।' এই শেষবারের বিপ্লবকালে যথাসময়ে লেনিন সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিনা, আমি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে আজও জানতে পারিনি। তিনি এর আগে পলাতক অবস্থায় ফিনল্যান্ডে আত্মগোপন ক'রে-ছিলেন, এবং তাঁর 'মুন্ডের' উপর কেরেনস্কি গভর্ণমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা ক'রে রেখে ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা চলে, লেনিন এবং কেরেনস্কি একই তাতার গ্রামের ছেলে, এবং কেরেনস্কির পিতা লেনিনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। কেউ বলে, তিনি বিপ্লবের কিছুদিন আগে লেনিনগ্রাডের এক বস্তিতে একটি স্ত্রী-লোকের আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন; কেউ বলে বিপ্লবের আগের দিন তিনি এসে উপস্থিত হন্, কেউ বলে তিনি ছদ্মবেশে সকল কর্মের মধ্যেই ছিলেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে,—এবং তার একটি ছবিও আছে; আবার কেউ বা বলে, তিনি বিপ্লবের একমাস পরে ঝড়-ঝাপটা শেষ হয়ে গেলে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন্!

আমরা 'স্মল্নি'র বৃহৎ প্রাসাদ-শ্রেণীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলুম। এই স্মল্নিই ছিল '৭ই নবেম্বরের' সাফল্য-মন্ডিত রুশবিপ্লবের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে লক্ষ্য করছি, যে-ব্যক্তি এক যুগে পূজ্য, অন্য যুগে সে ত্যাজ্য! কাল যে ব্যক্তি ছিল ঘৃণ্য, আজ সে বরেণ্য। নূতনতর ইতিহাসে যে-ব্যক্তিকে মাত্র সেদিন বলা হয়েছে, জাতির গৌরব,—আজ তাকে বলা হচ্ছে মানব জাতির শত্রু! কাল যে-ব্যক্তি সব সমক্ষে দাঁড়িয়ে জাতির হাত থেকে সংবর্ধনা লাভ করেছিল, আজ সে অন্ধকারে তলিয়ে গেল—খোঁজ নিচ্ছে না কেউ! যার জীবনী পাঠ ক'রে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাল, যে-ইতিহাস পাঠ ক'রে তারা মানুষ হল, যে-পররাষ্ট্রকে পরমাত্মীয় জেনে তারা ভালবাসল—আজ সকালে উঠে সেই সব নিরীহ সোভিয়েট বালক বালিকার দল এইটি দেখে শিউরে উঠল যে সব আগাগোড়া মিথ্যা! সেই শ্রদ্ধেয় নেতা দেশের ঘোর শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়! সেই ইতিহাস আগাগোড়া অসত্য কাহিনী দিয়ে লেখা, এবং সেই বিশেষ-বিশেষ পররাষ্ট্র তাদের বন্ধু নয়! সোভিয়েট ইউনিয়নে কথায়-কথায় এক একখানা গ্রন্থ কোটি কোটি সংখ্যায় ছাপা হয়, যে কোনও ব্যক্তির নামে এক একটি নগর নামাঙ্কিত হয়, একই ব্যক্তির নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে, বিশেষ একটি চিন্তাধারায় কোটি কোটি নর-নারীর জীবনকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কোনও এক বিশেষ গ্রন্থের কোটি কোটি সংখ্যক কাপি রাতারাতি বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এক ইতিহাসকে চাপা দিয়ে ভিন্ন ধরণের ইতিহাসে বাজার-ছাওয়া! দেখা গেল, জীবনী ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা এক রাত্রে গিয়েছে বদলে, এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকা থেকে এক রাত্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বই প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়েছে! দেখা গেল, নগরের বা জনপদের নাম, সেনাপতির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম—সমস্তগুলো মুছে অন্যান্য নাম বসাবার জন্য দেশব্যাপী একটা তোড়জোড় প'ড়ে গেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪৫ বৎসরের নির্ভুল ইতিহাস আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। লেনিনের জীবনীর টুকরো পেয়েছি অনেকগুলি, কিন্তু সেগুলি সোভিয়েট রঙে রঙীন! বিপ্লবের পূর্ব-বর্তী সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি রিপাবলিকের প্রাচীন ইতিহাস নেই। ইংরেজ লেখক 'সিডনি ওয়েব' ছাড়া অপর কোনও সোভিয়েট লেখক রুশবিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তরকালের প্রকৃত ও নির্ভর-যোগ্য ইতিহাস রচনা করেননি। লিয়োঁ ট্রট্স্কীর "History of the Russian Revolution" সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ষ্টালিন তাঁর জীবনী রচনা করিয়েছিলেন অন্য এক লেখককে দিয়ে। সেটি আগাগোড়া মিথ্যা কাহিনীতে ভরা ব'লে বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত যতগুলি গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করেছি তার প্রত্যেকখানি ষ্টালিনের মৃত্যুর পর ছাপা! ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত কোনও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এখন আর সোভিয়েট বাজারে নেই। ষ্টালিনের আমলে প্রকাশিত বিশেষ শ্রেণীর কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, সমাজবিষয়ক গ্রন্থ, রাজনীতিক প্রবন্ধ সংকলন, পার্টির দৈনন্দিন কাহিনী, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বা হত্যা হানা-হানির রেকর্ড, পাগলা গারদ বা 'লেবার ক্যাম্পে'র তথ্য, রাজনীতিক বন্দীদের বিবরণ,—ইত্যাদি, অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। সোভিয়েট ইউনিয়নে গোপনীয়তারক্ষার চেষ্টা বড় বেশী। সেই জন্য ভয় করে, এ সমাজ হয়ত জীর্ণ হতে থাকবে কালক্রমে। পচন ধরলেই গ্যাস জন্মায় ভিতরে ভিতরে। সেই গ্যাস একদিন বিদারণশক্তি লাভ করে। বর্তমান ষ্ট্যালিনোচ্ছেদের (de-Stalinisation) যুগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে ভারতের মনে একটি ভীতি বর্তমান। যেদিন রুশসাম্রাজ্য ভাঙলো, সেদিন ভারতের মন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। যেদিন জার-সম্রাটকে সপরিবারে রাত্রির অন্ধকারে হত্যা করা হল, সেইদিন প্রথম দেখা গেল ভারতীয় মনের আড়ষ্টতা। পরবর্তী পাঁচ বছর সোভিয়েট ইউ-নিয়নে অরাজকতা, প্রলয়-তান্ডব, মহা-মারী, দুর্ভিক্ষ, কোটি কোটি নরনারী ও বালক-বালিকার বীভৎস এবং উদ্দাম পাশব প্রবৃত্তির শৃঙ্খলাবিহীন প্রকাশ দেখে ভারত শিউরে উঠল। তার উপরে ষ্টালিন এসে নামিয়ে দিলেন লৌহ-যবনিকা এবং ট্রটস্কী পিছলে বেরিয়ে এসে প্রায় বারো বছর ধ'রে ষ্টালিন সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এর মধ্যেই উন্মুখ ভারতবর্ষ ষ্টালিনের স্বৈরাচারী শাসন এবং নির্বিচার হত্যাকান্ডের কাহিনী যখন কান পেতে শুনছে, তখন 'রয়টার' আপন সুযোগ মতো ষ্টালিনের আচরণের সঙ্গে সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার 'সাংঘাতিক' চেহারাটা জুড়ে দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাতে লাগল। এর উপরে এসে দাঁড়াল কমিউনিজমের অন্তর্গত নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ এবং সেই গালভরা শব্দটি—'ডায়ালেক-টিক মেটিরিয়ালিজম্।' কিন্তু ভারত-বর্ষের মনকে প্রভাবিত করতে লাগল 'রয়টার', বিভিন্ন ইউরোপীয় ও আমে-রিকান কাগজ-পত্র, ভারতের ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এবং রোমান ক্যাথলিক জগতের পুরোহিত গোষ্ঠি। সবাই মিলে ভারতের কানে কানে বলতে লাগল, সোভিয়েট ইউনিয়নে ধর্ম নেই—যেখানে যত ধর্ম-মন্দির ছিল তারা সব ধূলিসাৎ করেছে। ঈশ্বর নেই এবং কেউ ঈশ্বরের নাম করলে শাস্তি পায়! সে দেশে সমাজ নেই, নারীর সতীত্ব নেই, সন্তান-দের পিতৃ-পরিচয় নেই। সেখানে সব প্রলেটেরিয়েট, সর্বহারা চাষী-মজুর, তাদের গৃহ-সংসার নেই,—পথে পথে মেয়ে-পুরুষ খেয়ে বেড়ায়, জন্তুর মতো জীবন-যাপন করে, যৌনজীবনে কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে না—এবং রাত্রি-কালে যেখানে সেখানে দল বেঁধে ঘুমোয়। ভারতবর্ষের কান যখন ভারী হয়ে উঠেছে তখন একদিকে দেখা গেল, ষ্টালিন আমলের লৌহ-যবনিকা,—অন্য দিকে ইংরেজ আমলের ছাড়পত্রের নিষিদ্ধকরণ। রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সর্বপ্রকার যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভক্তিবাদী জ্ঞানবাদী আস্তিক্যবাদী এবং সমাজধর্মবাদী ভারতের চোখের উপরে দাঁড়িয়ে রইল সোভিয়েট ইউনিয়ন বিরাটকায় এক সর্বনাশা বিভীষিকার মতো!

আমার মতো যারা অর্বাচীন পর্যটক, যাদের চোখে রং নেই, যারা রাজনীতির ধার ধারে না, যারা দলগত অভিমত নিয়ে কোথাও যায় না, যাদের কাছে সর্বপ্রকার সুবিধাবাদ বিরক্তিকর, যারা সরকারী আনুকূল্যের তোয়াক্কা রাখে না, তারা আসে এখানে শাদা চোখ নিয়ে! তারা এসে দেখে, যা শুনে এসেছে এতকাল তার অনেক মিথ্যে। আমি এসে দেখছি সেই সুপ্রাচীন

সমাজমন তেমনি রক্ষণশীল,—'দেব-দ্বিজ-ব্রাহ্মণের' প্রতি সেই অবিচল অনুরাগ, একটি ধর্ম-মন্দির কোথাও বিনষ্ট হয়নি—সেই একই জনসাধারণ চলেছে গির্জায় আর মসজিদের সার্ভিসে, সেই একই 'হাঁচি-কাসি-টিকটিকি ষষ্ঠি-শেতলা-মনসার' আদিম কুসংস্কার, ঈশ্বরের প্রতি সেই মানৎ, 'খৃষ্টমাস ফাদারের' সেই আরাধনা, প্রতি মসজিদে সেই আজান, প্রতি সিনাগগে সেই আরতি। বিপ্লব-পূজারীর দেশে এসে দেখছি বিপ্লবকে ওরা পরম প্রীতির সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে আছে 'বুড়ি' ছোঁওয়ার মতো! ওরা থেমে গেছে ওইখানে, আর দৌড়তে চায় না। বিপ্লব ছাড়িয়ে আর কোনও বড় চিন্তার দিকে ওদের মন এগোয়নি। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সাধনার জোরে জাগ্রতা দক্ষিণেশ্বরীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ওরা সেই একই দিশাহারা দুঃখের সাধনায় জড়িয়ে ধরেছে লেনিনকে—সেই জন্য তাঁর মৃতদেহটাকেও নষ্ট হতে দেয়নি ৩৮ বছরে। ওরা কিচ্ছু ভাঙেনি, কোনটাকে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করেনি। ঘর, সংসার, সমাজ, পিতৃপরিচয়, সম্পত্তির মালিকানা, বিবাহ, বাৎসল্য, নারীর সেই সম্ভ্রম, বৈবাহিক আনুগত্য এবং সততা, সাংস্কৃতিক সৌজন্য ও শালীনতা—যেমন ভারতে, তেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে! ঘর ভাঙলে তেমনি করে মেয়েরা কাঁদে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সংশয়াচ্ছন্ন হলে তেমনি দিশাহারা হতে হয়, বিধবার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ঘটলে পাগলিনী তেমনিই হাহাকার করে। কিন্তু ওদের সার্থক বিপ্লবের পর নতুন কথা আর ওরা শুনতে চায় না কারো মুখে, নতুন দর্শন ওদের দু-চোখের বিষ, মানুষের উড্ডীন কল্পনায় আর ওদের বিশ্বাস নেই, কারও ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তার অভিব্যক্তিতে ওরা আর তুষ্ট হয় না। ওরা একই কাঠামোয় বেঁধেছে একমুখী চিন্তা,—সেটি ওদের প্রাণপণ তপস্যা!

'স্মল্‌নির' গেটের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে কয়েকটি চক্রাকার প্রাঙ্গণ এবং তার কেন্দ্রে লেনিনের এক বিরাট জোরালো প্রস্তরমূর্তি। এটি এখন পার্টির কর্ম-কেন্দ্র। জার আমলে এটি ছিল রাজপুরুষ-পরিবারের কন্যা বিদ্যালয়। এই অট্টালিকার মধ্যে ১৯৩৪-এর ৬ই ডিসেম্বর লেনিনগ্রাড সোভিয়েটের কর্তা কিরভকে হত্যা করে জনৈক ছাত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাশিয়াব্যাপী ধরপাকড় আরম্ভ হয়। অনেকে বলে এটি ষ্টালিনের পূর্ব-পরিকল্পিত। এই উপলক্ষ্যটি নাকি তাঁরই সৃষ্টি। তিনি তাঁর কোনও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবিত ও সক্রিয় রাখতে চান না! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার নিরপরাধ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ষ্টালিন 'লিকুইডেট' করেন। এর পর ৫।৬ বছর অবধি রাশিয়ার অন্ধকার যুগ, যেটার নাম বলিদানের যুগ! ললাটে রক্ততিলকের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণচক্ষু এক কাপালিক, হাতে তার রক্তমাখা খড়্গ, সামনে যূপকাষ্ঠ। সেই অমান্ধকারে মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেক জন—সে হল কোতোয়াল।

প্রাসাদের মধ্যে মিলিটারি দু-একজনের আনাগোনা দেখছি। কিন্তু প্রতি কক্ষই লোহার সিন্দুকের মতো নিরেটভাবে বন্ধ। শুনলুম প্রতি কক্ষই জনপূর্ণ, কিন্তু বাহির থেকে সব নিঃসাড়। সোভিয়েট ইউনিয়নের রেওয়াজ হল এই, কর্মরত কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর আপিসে প্রবেশ নিষেধ। দেখাশোনা করতে হ'লে তিনি বাইরে এসে লাউঞ্জে বসবেন—সেখানে তাঁর সহকর্মী হয়ত থাকবেন দু-একজন।

লেনিনের ঘরটি অত্যন্তই শাদাসিধে এবং গরীব। এই ঘরটির থেকেই তিনি প্রথম বাণী প্রচার করেন বিশ্বের উদ্দেশে,—রাশিয়া যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। রাশিয়া সকলের বন্ধু হয়ে থাকতে চায়। আমরা দেশ গঠন করতে চাই। কোনও দেশ বা জাতির সঙ্গে আমরা মনোমালিন্য চাইনে।—সোভিয়েট ইউনিয়ন তার জন্মকাল থেকে যেমন একদিকে শান্তি, মৈত্রী এবং নিরস্ত্রীকরণের বাণী প্রচার করছে অন্য দিকে তেমান 'ক্যাপিটালিস্ট' সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার ক'রে আসছে। তাদের চোখে আজও সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেনি।

লেনিনের ঘরটি দু-ভাগে ভাগ করা। পুরনো ছোট আলমারি আর টেবল, অল্প-স্বল্প সামগ্রী, স্বামী-স্ত্রীর দুটি সামান্য দরিদ্র বিছানা, এটা ওটা—মানুষের জীবন-যাত্রার পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনের আসবাবপত্র। এধারে পুরনো দলিলপত্রাদি, কয়েকটি সেকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ফটো, সংবাদপত্রের কাটিং এবং অন্যান্য টুকিটাকি বস্তু সযত্নে রক্ষিত। টেবলের উপর দোয়াত-কলম, লেখার সরঞ্জাম এবং তাঁর সেই টেলিফোন যন্ত্রটি। আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু হল লেনিনের একটি মূল্যবান ঘোষণাপত্র! এই ঘোষণাপত্রটি বিপ্লবসাফল্যের অব্যবহিত পরে ভারতবাসীগণের উদ্দেশে প্রচার করা হয়! ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে আপন শক্তিবলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতালাভ করার জন্য ভারতবাসীগণকে তিনি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে চান, ভারতের সেই পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় তিনি রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি একটি অভিনন্দনসূচক বিশেষ ঘোষণাবাণীও প্রচার করেন।

পরবর্তীকালে ছোট এক টুকরো ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছিলুম। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে উত্তর আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সৈন্যদল ১৯১৭ অথবা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গোপনে আমুদরিয়া নদী পেরিয়ে মধ্য-এশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। সেনা-নায়ক ছিলেন জাতিতে মুসলমান। তিনি বহু দুর্যোগ এবং দুর্গতির মধ্যে অসীম সাহস এবং পৌরুষের সঙ্গে সদলবলে 'রেডগার্ডদের' পক্ষ নিয়ে 'হোয়াইট' গার্ডসদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। বোধহয় জনতিরিশেক সশস্ত্র সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁদের পরিণাম কি হয়েছিল জানিনে, কিন্তু তাঁদের সেই গৌরবের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও এখানে স্মরণ করা হয়। রুশবিপ্লবের পর ইউরোপ এবং আমেরিকার মোট চৌদ্দটি জাতি যেমন 'হোয়াইট গার্ডস' নাম নিয়ে নাবালক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিপক্ষে সোভিয়েট ভূমিতে দাঁড়িয়েই সশস্ত্র শত্রুতা আরম্ভ করে, তেমনি পৃথিবীর বহু জাতির স্বেচ্ছাসেবকরাও চারিদিক থেকে এসে ওই সোভিয়েট ভূমিতে দাঁড়িয়েই 'নাবালকটিকে' আপন আপন বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক শত্রু ছিল তার আপন ঘরে। তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ। রুশ-বিপ্লবে রক্তপাত ঘটেনি, কিন্তু বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের মাটি রক্তে ভিজে উঠেছিল! যেমন ভারত বিভাগের কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে রক্ত পড়েছিল অনেক। আজ পূর্ব পাঞ্জাব শস্য ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ! রক্ত বোধ হয় মাটির উর্বরাশক্তি আনে!

ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আলোকোজ্জ্বল খাস ইউরোপীয় মহানগর লেনিনগ্রাডের দিকে চেয়েছিলুম। লেনিনগ্রাডের অধিকাংশই প্রতীচ্য, মস্কোর অনেকাংশই প্রাচ্য। লেনিনগ্রাড প্রচুর মার খেয়েছে হিটলারের হাতে, কিন্তু জার-সম্রাটদের কৌতূহলোদ্দীপক রসালাপে তার অরুচি বা নিরানন্দ নেই। মস্কো মার খেয়েছে কম, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অনেক বেশি—কিন্তু জার-সম্রাটের কাহিনী তার কাছে অরুচিকর! পনেরোটি জাতির স্বাধীন রিপাবলিককে মস্কো বেঁধে রেখেছে একই অবিচ্ছেদ্য এবং কঠিন যোগসূত্রে, কিন্তু যে-ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক জার-সম্রাটদেরকে সে গালি দেয়, সেই প্রকার ভাষায় আমরা ইংরেজকেও কোন দিন কটূক্তি করিনি! রুশ-বিপ্লব হ'ল ফরাসী বিপ্লবের সন্তান! কিন্তু ফরাসীরা তাদের বিপ্লবের থেকে শুধু পেয়েছিল স্লোগান, রাশিয়া তার বিপ্লবের আগে পেয়েছিল ফরাসীদের মন্ত্র! মস্কোয় 'ডেলী ওয়ার্কার' অপেক্ষা 'লা হিউম্যানাইট' বিক্রি বেশি। (ক্রমশঃ)

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিলীপ এসে অবধি 'কাঠ-কামানে' কাজ করছিল। একখণ্ড তক্তার উপর রাঁদা চালাতে দিয়েছিলেন কাঠ-মাষ্টার। প্রথম দিন চালিয়েই হাতে ফোসকা পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ে কাউকে জানাল না। খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তাই নিয়েই কোন রকমে ক'দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ফোসকাগুলো গলে যখন ঘা হয়ে গেল, তখন আর পারল না। ওখানে যে 'ষ্টার বয়' ছিল সে দেখতে পেয়ে কাঠ-মাষ্টারের নজরে আনতেই তিনি মুখ ভেংচে উঠলেন, 'ননীর পুতুল! বলিসনি কেন, ফোসকা পড়েছে? যা, হাসপাতালে যা।'

'হাসপাতাল' শুনে চমকে উঠল দিলীপ। তার ধারণা, সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। তার বাবাও আসেননি। তাদের বস্তির লোকেরাও ভীষণ ভয় করত হাসপাতালকে। কারো কলেরা বা বসন্ত হলে বাড়ির লোকেরা চেপে যেত, পাছে হাসপাতালে যেতে হয়। মাঝে মাঝে যখন খুব রোগ ব্যামো দেখা দিত, কোথা থেকে একটা অদ্ভুত চেহারার মোটরগাড়ি এসে লাগত সামনেকার সেই ঝাঁকড়া আমগাছটার নীচে। জনকয়েক লোক নেমে গিয়ে গলির ভিতর এ-ঘর ও-ঘর থেকে জোর করে রুগীগুলোকে বের করে গাড়িতে পুরে নিয়ে যেত। পাড়া মাথায় করে ভেঙে পড়ত মেয়েদের কান্নার রোল। এসব দৃশ্য সে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। তাকেও সেই হাসপাতালে যেতে হবে শুনে অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠল। মাথা নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি যাবো না। আমার ব্যথা সেরে গ্যাছে।

—দূর বোকা! সব্বাই সেখানে যেতে পারলে বেঁচে যায়, আর তুই বলছিস 'যাবো না'! ভয়টা কী? চল—' বলে 'ষ্টার' তার হাত ধরে নিয়ে চলল।

ডাক্তার তখনো আসেননি। কম্পাউণ্ডার বসে কি লিখছিলেন। দিলীপকে তারই সামনে হাজির করা হল। তিনি সেই মোটা খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'কী হয়েছে?' জবাব দিল ষ্টার, 'ফোসকা গলে ঘা হয়েছে।' 'কাঠকামান?' লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন কম্পাউণ্ডার। 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি নাম ধরে হাঁক দিলেন এবং একজন বড় গোছের ছেলে এসে দাঁড়াতেই বিড় বিড় করে কি সব নির্দেশ দিলেন। মনে হল ইংরেজি কথা, বোধহয় কোনো ওষুধের নাম। ছেলেটা দিলীপের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল এবং ঘায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি?' দিলীপ কী বলবে ভেবে পেল না। সে তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। খানিকটা মলম লাগিয়ে তার উপর তুলো দিয়ে চটপট ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। দিলীপ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, কী দেখছিস হাঁ করে? ব্যথা আছে?' দিলীপের মনে হল, তার অর্ধেক যন্ত্রণা তখনই চলে গেছে। মাথা নেড়ে জানাল, না। ছেলেটি বলল, কাল ঠিক এই সময়ে আসবি। ব্যাণ্ডেজ বদলে দেবো।

কম্পাউণ্ডার যেখানে কাজ করছিলেন, তার নাম 'ডিসপেনসারী।' ঘর ভর্তি তাক, তার উপরে ঠাসা নানা আকারের শিশি-বোতল। কিসের একটা কড়া গন্ধ আসছিল সেই ছোট্ট গুদাম মত কামরাটার ভিতর থেকে। তার পাশের ঘরখানা অনেক বড়। সেটা হল 'ওয়ার্ড'—ঐ ষ্টার ছেলেটিই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। 'চল না? দেখবি।' বলে সেখানেও নিয়ে গেল। পাশাপাশি কয়েকখানা লোহার খাট, তার উপরে লাল কম্বল মোড়া বিছানা। বেশীর ভাগ খালি। দু'-তিনটিতে কারা সব শুয়ে আছে। ওদের অসুখ। তিন চারটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারই একজনকে ধমকে উঠল 'ষ্টার', এই জগা, তুই এখানে কী করছিস? দাঁড়া এখনই চীফ অফিসারকে বলে দিচ্ছি।

—বারে, আমি খালি খালি এসেছি নাকি? নাকী সুরে প্রতিবাদ জানাল জগমোহন।

—না, না; কে বললে খালি খালি! ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে, কি বলিস?

—'কামড়াচ্ছেই তো'—রীতিমত দৃঢ় উত্তর। মুখেও গাম্ভীর্যের অভাব নেই। শুধু ঠোঁটের কোণে লেগে রইল এক টুকরা দুষ্টুমি জড়ানো হাসির আভাস, যার অর্থ সুস্পষ্ট।

—তুই কেন এসেছিস? তোর আবার কী হল?—এ প্রশ্নের লক্ষ্য আরেকজন। উত্তরে সে গলাটাকে যদ্দুর সম্ভব মিহি ও করুণ করে বলল, বড্ড মাথা ধরেছে।

এতবড় একটা কঠিন অসুখের খবর পেয়েও 'ষ্টার' কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না, বরং হো হো করে হেসে উঠল।

মাথাধরা ও পেট কামড়ানো—এ দুটোই এখানকার ক্রনিক ব্যাধি। রোগীর পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা—বাইরে কোনো লক্ষণ নেই, রোগ পরীক্ষার সাধারণ যন্ত্র দিয়ে ধরা যাবে না, সুতরাং 'নেই' বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এর জন্যে দুটি বাঁধা মুষ্টিযোগ ঠিক করে রেখেছেন ডাক্তারবাবু, প্রচলিত নিদান শাস্ত্রে যার উল্লেখ নেই। দুটোই ও'র পেটেন্ট। পেট কামড়ানো কেস-এ ব্যবস্থা হল স্রেফ জল সাবু, আর মাথা ধরায় ক্যাষ্টর অয়েল। ওষুধ প্রয়োগ করায় আগেই

বেশীর ভাগ রুগী চম্পট দেয়। তবু একটা রাত, (কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী) 'অবজারভেশনে' থাকা যায়। ঐটুকুই লাভ।

হাসপাতাল সম্বন্ধে দিলীপের পুরনো ধারণা বদলে গেল। ভয় পাবার মত তেমন কিছু তো নেই এখানে। বুঝতে পারল না, তবে বস্তির লোক-গুলো অত ভয় করত কেন। কেমন করে বুঝবে? অ্যাম্বুলেন্সে বন্ধ করে তাদের যেখানে নিয়ে ফেলা হত, সেই সব বৃহৎ বৃহৎ 'আরোগ্য নিকেতনের' আসল রূপ তো সে কখনো দেখেনি। বড় হয়ে হয়তো দেখে থাকবে।

হাতের ঘা ক'দিনেই সেরে গেল। তার পরেও সে কাঠ কামানেই রইল, কিন্তু ছুতোরের হাতিয়ার ছেড়ে বদলি হল রংপালিসের ঘষামাজায়। তাও নামে মাত্র। শুধু সে নয়, সকলেই প্রায় তাই। সাহেব যতক্ষণ না ঘুরে যান, তত-ক্ষণ টুকটাক, খুটখাট। কেউ দুটো পেরেক ঠুকছে, কেউ একটু করাত চালাচ্ছে। সেই কোন মান্ধাতার আমল থেকে তৈরী হয়ে পড়ে আছে খানকয়েক মামুলী আসবাব—একখানা ক্যাম্প চেয়ার, দুটো টুল, একটি আলনা, আর গুটি-কয়েক খেলনা। সেইগুলো রোজ ঝেড়ে-ঝুড়ে লাইন করে সাজিয়ে রাখে 'ষ্টোর'। সাহেব চলে গেলেই আবার এলোমেলো করে সরিয়ে রেখে দেয়, যন্ত্রপাতি গুণে গুণে বাক্সে তোলে, তাতে তালা লাগিয়ে চাবিটা দিয়ে দেয় মাষ্টারের হাতে। তিনি বাড়ি চলে যান। ছেলেরাও যে-যার বেরিয়ে পড়ে ওয়ার্ক-শপ ছেড়ে।

এই হল মর্ণিং শিফ্‌ট, অর্থাৎ প্রাতঃকালীন কর্মসূচী। পরের পর্ব শুরু হবে দেড়টার পর। মাষ্টার আবার আসেন, এবং আসতেই 'ষ্টোর বয়' কার-খানার কোণে গুটিয়ে রাখা কম্বলটা মেঝের উপর বিছিয়ে দেয়। তিনি শুয়ে পড়েন, এবং যতক্ষণ তাঁর নাসিকাগর্জন স্পষ্ট না হয়ে ওঠে, ছেলেরা এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করে। তার পরেই ওয়ার্কশপ ফাঁকা। কে কোথায় যায়, কেউ খোঁজ রাখে না। কেউ কেউ চলে যায় একদম গেটের বাইরে, কোনো মাষ্টার বা কেরাণীবাবুর বাসায়। সেখানে জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, ছেলে-পিলে রাখে, রাত্রের রান্নাবান্নার যোগাড়-যন্ত্র করে রেখে দেয়। ঐ সময়টা উপরওয়ালাদের মাধ্যাহ্নিক বিরতি। গেট-কীপারের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, চীফ্ অফিসারের দ্বিতীয় দফা ডিউটি কিংবা ডেপুটি সুপারের বৈকালিক আফিস শুরু হবার আগেই সব আবার যথাস্থানে ফিরে আসে।

এই নিষিদ্ধ গোপন কাজগুলোর জাত ও প্রকৃতি যাই হোক, বেশীর ভাগ ছেলের এতে আপত্তি নেই, বরং আকর্ষণ আছে। এই সময়টির জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। মা, বাপ, ভাই, বোন নিয়ে যে-জীবন, তার স্বাদ অনেকেই পায়নি। অথচ এই সেই বয়স, যখন তার জন্যে সকলেরই মনে মনে তৃষ্ণা জাগে। তাই যতটুকু পায়, তারই লোভ এদের প্রতিদিন বাইরে টেনে নিয়ে আসে —ছক-কাটা রুটিনের মমতাহীন ঘূর্ণী থেকে গার্হস্থ্য-জীবনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। হয়তো সেখানে আসলের চেয়ে মেকীর ভাগ বেশী; স্নেহের সঙ্গে স্বার্থ-বুদ্ধির খাদ, অনুগ্রহের মধ্যে অবজ্ঞার গন্ধ। তবু, এখানে আসবার আগে তা-ই বা ক'জন পেয়েছে? খুঁজলে দেখা যাবে, দু'চারজন বাদ দিলে সবাই হয়তো কেশব সিকদার কিংবা তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর দল।

ওয়ার্কশপ থেকে সকলে চলে গেলেও দিলীপ একা বসে থাকত। অন্য ছেলেগুলো টানাটানি করলেও যেত না। স্কুল লাইব্রেরী থেকে একটা করে বই নিয়ে আসত। আশুবাবু বেছে দিতেন। নানা ধরণের বই—গল্প, ভ্রমণ, মহা-পুরুষদের জীবনচিত্র, দেশ-বিদেশের ইতিকথা, নতুন নতুন আবিষ্কারের কাহিনী। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেত। জানতেও পারত না কখন চলে গেছেন কাঠমাষ্টার। ওয়ার্কশপ বন্ধ করতে এসে পেটি অফিসার ডেকে তুলে দিত। তখন হয়তো জোর ফুটবল চলছে বর্ষটালের মাঠে। খেলছে চৌদ্দ জন, দুদিক থেকে গলা ফাটাচ্ছে চার-চৌদ্দং ছাপ্পান্ন।

কাঠকামান থেকে বেরিয়ে দেবদারু গাছের লাইন বাঁয়ে রেখে পশ্চিমদিকে এগোলেই প্রথমে পড়ে স্কুলবাড়ি। তার পরেই খান-দুই কামরা নিয়ে দিলীপের রহস্য জগৎ। জানালার ঠিক ধারেই একটা অদ্ভুত যন্ত্র। সামনে দাঁড়িয়ে একটি বড় ছেলে পা দিয়ে নীচের দিকে কোথায় দোলা দেয় অমনি ঘটর ঘটর করে চলতে থাকে লোহার ডান্ডাগুলো, একটা ছোটখাটো দৈত্য যেন হাড়গোড় নেড়ে জেগে ওঠে। ছেলেটি পা চালাতে থাকে আর ডান হাত দিয়ে ক্ষিপ্র-গতিতে টেনে নেয় বড় বড় কাগজের সীট। সেগুলো এক সেকেন্ড আগে ছিল সাদা যখন বেরিয়ে আসে আগাগোড়া লেখায় ভর্তি!

আসতে যেতে জানালার ধারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখত দিলীপ। নিশ্চয়ই কোনো যাদু আছে ঐ ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রটা আর তার ঐ এক-টানা ঘট ঘট আওয়াজের মধ্যে। দেখত আর ভাবত কবে সে ঐ ছেলেটার মত বড় হবে, ঐখানে দাঁড়িয়ে অমনি করে অনায়াসে চালাবে ঐ অদ্ভুত কলটাকে। শুধু কি ঐ একটা? ওর চেয়েও কিম্ভূত কিমাকার কালো কালো আরো কত-গুলো যন্ত্র সারি সারি সাজান ছিল দেয়ালের ধারে। তাছাড়া ছিল এক সার বড় বড় কাঠের ডালা, তার মধ্যে এক-রাশ ছোট ছোট লোহার টুকরো। বাহাদুর বলেছিল, লোহা নয়, সীসা; ওগুলো সব অক্ষর যার নাম টাইপ। দু-তিনটি ছেলে খড়ম পায়ে ঐ ডালার সামনে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে তুলে তুলে ঐ টাইপগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলত ছোট এক খন্ড পেতলের তক্তার উপর।

ওরা খড়ম পরে আছে কেন? জানতে চেয়েছিল দিলীপ। বাহাদুর বলেছিল, সীসাতে একরকম বিষ আছে। পায়ে ঘা হতে পারে কিনা তাই।

—হাত দিয়ে ঘাঁটছে যে?

—হাতেও একটা কিছু পরা উচিত। এখানে সে সব নেই। কী করবে, খালি হাতেই কাজ করতে হয়।

বাহাদুরের কাছেই শোনা, এর নাম প্রেস—ছাপাখানা। কোন কোন অফিসের কি সব কাগজপত্র ছাপা হয়। সেই এখানকার ষ্টোর। সব কিছুর তদারক করে, নতুন ছেলেদের শেখায়, আবার দরকার মত কলও চালায়। প্রেস এর সব কাজ সে শিখে নিয়েছে। প্রেসমাষ্টার খুব ভালবাসেন তাকে। দুচোখে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় নিয়ে দিলীপ চেয়ে দেখত এই ছোট-চোখ চ্যাপ্টা-নাক হাসি-হাসি মুখ শান্ত ছেলেটির দিকে। তাকে সবাই কেমন তাচ্ছিল্য করে বলত বাহাদুর, দিলীপ বলত বাহাদুর-দা। বাহাদুর ভরসা দিয়েছিল আর একটু বড় হলেই সে সাহেবকে বলে দিলীপকে প্রেসেও নিয়ে আসবে এবং নিজের হাতে যত্ন করে সব কাজ শিখিয়ে দেবে। সেই

শুভদিনের অপেক্ষায় সে বসে বসে দিন গুণছিল।

সেদিনটিও যে তার জন্যে এত কাছে এসে অপেক্ষা করছে, দিলীপ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ডেপুটিবাবু যখন ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিলেন, কাল থেকে তিন ঘণ্টা করে তাকে প্রেস-এর কাজ শিখতে হবে, সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। তার সংগে আর একটি ছেলে এল দার্জিকামান থেকে। তার নাম মকবুল, খোকার চেয়ে কয়েক বছরের বড়, ফর্সা রং, স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। প্রেসমাস্টার বাহাদুরকে ডেকে ওদের কম্পোজ শেখাতে বলে দিলেন আর বললেন মন দিয়ে পড়াশুনা করতে। তা না হলে কাজ শিখতে পারবে না, শিখেও কোন লাভ হবে না। এটা শুধু হাতের কাজ নয়, তার সংগে মাথারও।

মকবুল খানিকটা উপরের দিকে পড়ে, মোটামুটি ইংরাজী জানে। তাকে দেওয়া হল ইংরাজী হরফ, আর খোকাকে বাংলা। খোকার ঝোঁক মেসিনের দিকে। বাহাদুরকে একান্তে পেয়ে চুপিচুপি বলল, ওখানে কবে যাবো বাহাদুর দা?

সে হেসে ফেলল, দাঁড়াও, ঠ্যাংদুটো আরেকটু লম্বা হোক, তবে তো।

মকবুলের সংগে দিলীপের জানা-শুনো ছিল, মিশবার সুযোগ হয়নি। তবে প্রথম থেকেই ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে। এবারে আরো ভালো লাগল এবং দুদিনেই ভাব জমে উঠল। মকবুল ওকে বলত, বড় ছেলেগুলোর সংগে কথখনো মিশবি না।

—কেন? জানতে চাইত দিলীপ।

—ওরা ভালো না।

দিলীপ ঠিক ধরতে না পেরে তাকিয়ে আছে দেখে বলত, আর একটু বড় হ, তখন বুঝবি।

বুঝতে অবশ্য বেশী দেরি হয়নি। কয়েকজন বড় ছেলে—বিশেষ করে সতীশ এবং সিরাজুল যেসব বিশ্রী কথা বলত, গায়ে পড়ে যে-ভাবে ভাব করতে আসত, দুপুরবেলা কিংবা সন্ধ্যার পর ফাঁক পেলেই আড়ালে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, তার থেকে সমস্ত দলটার উপরেই তার কেমন বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল। মকবুলের মত সেও ওদের এড়িয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু, দেখে অবাক হয়ে গেল, একদল ছোট ছেলে, তার মধ্যে কেশোও ছিল, ঐ ছেলেগুলোর ভীষণ নেওটা। ওদের সংগে ঘোরে, দুপুরের দিকে যখন অফিসাররা কেউ থাকেন না, ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের হাত ধরে কোথায় কোথায় চলে যায়। বড়দের মধ্যে অনেকে ছিল 'ষ্টার বয়'। তারা যে বাড়তি খাবার পেত ডিম, মাছ, মাংস, তার খানিকটা করে ভাগ এই পেটোয়া ছোট ছেলে-গুলোকেও খেতে দেখেছে দিলীপ। তাকেও কোনো কোনো 'ষ্টার' সাধাসাধি করত, কিন্তু সে রাজী হয়নি।

বড়দের মধ্যে একজন ছিল সর্বদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। সে বাহাদুর। ছোটদের, বিশেষ করে দিলীপকে সে খুব ভাল-বাসত, কাছে বসিয়ে কত কথা বলত, কিন্তু কোনোদিন অন্যায়ভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। তারও একটা জিনিস দিলীপ পছন্দ করত না—দুপুরবেলা গেটের বাইরে চলে যাওয়া।

আর যারা যেত, তারা যে এ-বাসায় ও-বাসায় কাজ করতে যায়, সেকথা কারো অজানা ছিল না। দিলীপও জানত। যাবার সময় তাদের কারো হাতে থাকত নতুন বাঁধা ঝাঁটা, কারো হাতে লোহা-কামানে তৈরী একটা অ্যালুমিনিয়ামের মগ, কিংবা গুদাম থেকে খানিকটা ফিনাইল বা ঐ জাতীয় ঘর-সংসারের টুকিটাকি দরকারী জিনিস। তারা যখন বেরোত, প্রায়ই দল বেঁধে। এবং সংগে থাকত পেটী অফিসার। বাহাদুর যেত আলাদা এবং একা। মাঝে মাঝে লুকিয়ে নিয়ে যেত একটা সেদ্ধ ডিম, কিংবা দু-টুকরো মাংস—ষ্টার হিসেবে তার যে খাবার, কিংবা হাসপাতাল থেকে চেয়ে আনা একটু চিনি, চা বা দু-এক স্লাইস পাউরুটি। কখনো কখনো ওর হাতে থাকত ছোটদের পড়বার মত কোনো বই, একটা খাতা বা পেনসিল। সবটাই হত গোপনে; শুধু দিলীপের কাছে লুকোবার চেষ্টা করত না। কিন্তু কোথায় যায়, কার জন্য নিয়ে যায় ঐ জিনিসগুলো, সেটা কোনোদিন বলেনি, দিলীপও করবো করবো করে জিজ্ঞেস করেনি। একদিন বলে ফেলল, দুপুরে বেলা তুমি কোথায় যাও, বাহাদুর-দা?

—যাই এক জায়গায়। একজনকে দেখতে।

—কে সে?

বাহাদুরের মুখে একটা ম্লান ছায়া ভেসে উঠল। দূরে মাটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, তোকে একদিন বলবো। কিন্তু দেখিস, আর কেউ যেন জানতে না পারে।

—আমি কাউকে বলবো না।

—আমি জানি। সেই জন্যেই তো তোকে আমি সব বলতে পারি। কদিন যাক; তার পরে। কেমন?

দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

মকবুলের সংগে যখন আরো ভাব হল, একদিন নিজের কথা—নিজের কথা মানেই মায়ের কথা—বলতে বলতে

...আর বললেন মন দিয়ে পড়াশুনা করতে...

দিলীপ হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তোমার মা আছেন?

—আছে।

—চিঠি লেখেন তোমাকে?

—মা লিখতে জানে না।

—বাড়ির কোনো চিঠি পাও না?

—বাবা লেখে মাঝে মাঝে। আমি তার একটারও জবাব দিইনি।

—কেন? বিস্মিত হল দিলীপ।

—কী হবে চিঠি লিখে? এই বেশ আছি।

দিলীপ বুঝতে পারল না কী বলতে চায় মকবুল, তবু চুপ করে রইল। তার বাবাকে সে দেখেনি বললেই হয়। তবু কেমন করে যেন মনে হয়, তিনি যদি থাকতেন, আজ তাকে এখানে আসতে হত না। যার বাপ আছে তার আর ভাবনা কি? কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে কি এও কেশবের মত? বাবা থাকতেও নেই?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি মনে করে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই তুমি জেলে এলে কেমন করে?

মকবুলের চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সেই মুহূর্তে এরই সংগে জড়িত কোনো প্রসঙ্গ বোধহয় ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে, ঐ প্রশ্নটা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। দিলীপ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝতে পারল না এতে রেগে যাবার কী আছে। একথা তো তাকেও কতজনে জিজ্ঞাসা করেছে, অনেকে আবার নিজে থেকে বলে গেছে তার কাছে।

মকবুল তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, মনে মনে লজ্জিত হয়েছে বন্ধুর কাছে এই আকস্মিক ভাবান্তরের প্রকাশ হয়ে পড়ায়। মৃদু হেসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, চল, খেলতে যাই।

দিলীপ নিঃশব্দে পাশে পাশে চলল। কিছুক্ষণ পরে তেমনি কাঁধে হাত রেখেই বলল মকবুল, কেমন করে জেলে এলাম জানতে চাইছিলি? সে সব কথা তোকে বলা যায় না ভাই।

—কেন?

—তুই বুঝবি না।

—বুঝবোনা কেন?

—তুই যে বড্ড ছেলে মানুষ।

কথাটা দিলীপের পছন্দ হল না! এমন কি ছেলেমানুষ সে? আর মকবুলই বা এমন কি বড়! খানিকটা অভিমান হল বন্ধুর উপর। তাই অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল।

দিন কয়েক পরে প্রেসে ছুটি হবার পর মকবুল তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি বলল, জানিস, বাহাদুরের নামে 'রিপোর্ট' হবে।

দিলীপ যেন আকাশ থেকে পড়ল বাহাদুর এমন কী করতে পারে যার জন্যে 'রিপোর্ট' হবে! বলল, কেন?

—ব্যাণ্ড মাষ্টারের বাড়িতে কী সব মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাপার। ওখানে ও যায়তো প্রায়ই। মাষ্টারের বৌ গিয়ে বলে দিয়েছে চীফ অফিসারের কাছে। তাতে আর মাষ্টারে কথা হচ্ছিল; আমি হঠাৎ গিয়ে শুনে ফেলেছি। এখনো কেউ কিছু জানে না।

দিলীপ কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কী করেছিল বাহাদুর?

—মাষ্টারের একটা মেয়ে আছে না? তার সংগে নাকি,- থাক্, ওসব কথা তোকে শুনতে নেই।

দিলীপের মাথার ভিতরটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। বাহাদুর তো তেমন ছেলে নয়। কোনো রকম মন্দ কাজ সে করতে পারে, এ যে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। মকবুল একমনে কী ভাবছিল। খানিক্ষণ পরে আবার শোনা গেল তার কথা। আর কাউকে নয়, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমনি ভাবে বলল, বাহাদুরের কোন দোষ নেই; নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটা মিথ্যে করে লাগিয়েছে ওর নামে। ওরা সব পারে।

বলতে বলতে যেন কতদূরে চলে গেল মকবুল, তারপর হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। চোখদুটো থেকে একরাশ আগুন ঠিকরে এল। দিলীপের দিকে ফিরে বলল, জানিস? আমার নামে সে-ও এমনি বদনাম দিয়েছিল। আমি নাকি জোর করে অত্যাচার করেছি। মিথ্যা কথা। সে-ই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মটর ক্ষেতের মধ্যে। আমার চেয়ে সে দু বছরের বড়। আমি তো ইচ্ছে করে যাইনি বাপজান আমার কথা বিশ্বেস করল না, জুতো দিয়ে মারল আমাকে। তারপর সেই অতো রাত্তিরে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

মকবুলের দু চোখ জলে ভরে উঠল, আর সেই দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দিলীপ। স্পষ্ট কিছুই বুঝল না, কিন্তু কিছু না জেনেও একটা দৃঢ় প্রত্যয় হল তার মনে—মকবুল কোনো দোষ করেনি। কে একটা মেয়ে তার নামে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, আর তার বাবা তাকে জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। সব বাপই বোধহয় এমনি। কে জানে, হয়তো তার বাবাও ঠিক এই করতেন। ছোট হলেও, সেই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর উপর কেমন একটা অস্পষ্ট ক্ষোভ আর অভিমানে তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। সংসারে সবাই নিষ্ঠুর; কোথাও যেন দয়ামায়া ভালবাসা এ সব কিছু নেই। (ক্রমশঃ)

বাংলা বইয়ের সেকাল ও একাল

দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
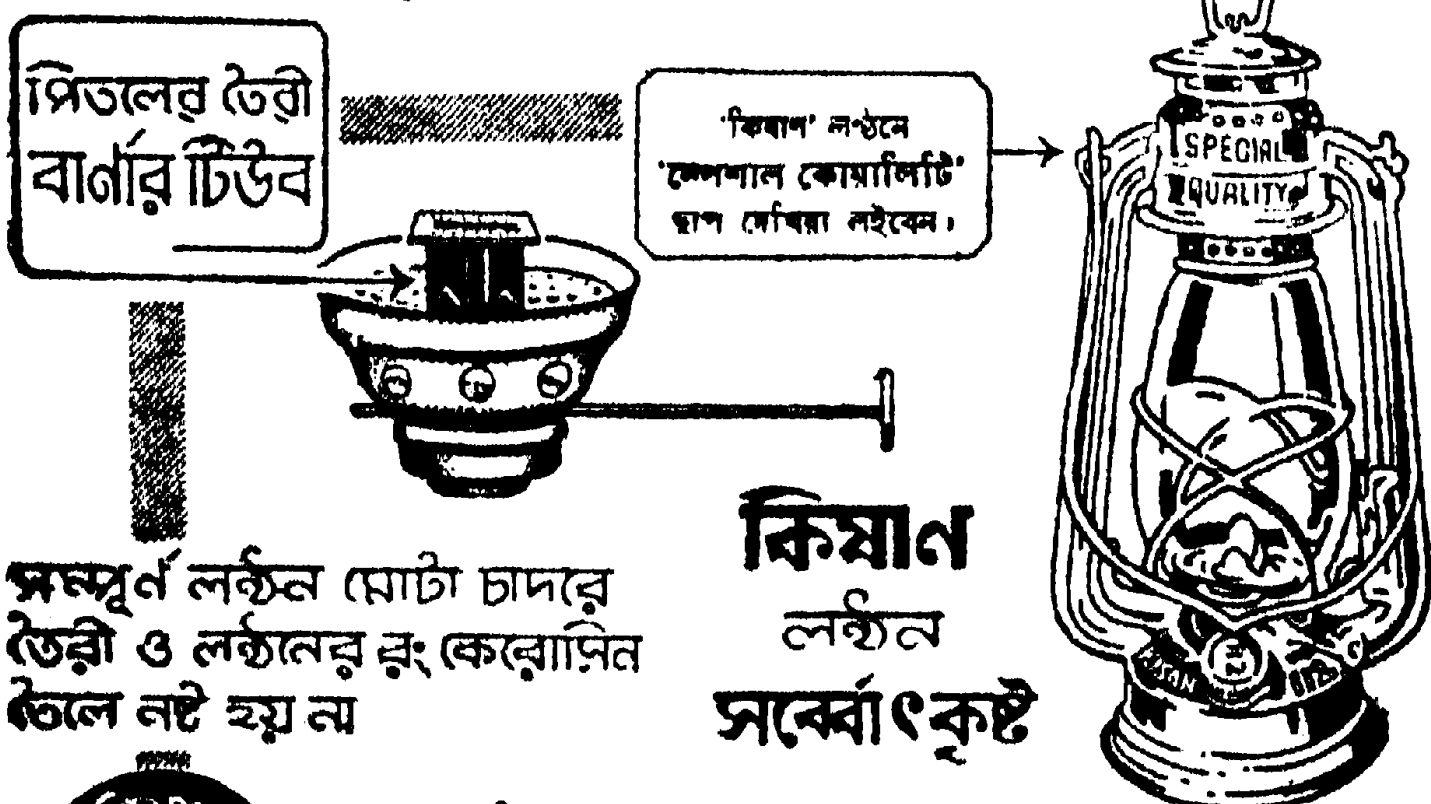
বাংলা বইয়ের ইতিহাস গল্পের মতই রোমাঞ্চকর। অথচ বাংলা বইয়ের পূর্ণ সংবাদ বোধহয় এখনো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা বই ছিল হাতে-লেখা পুঁথি। পুঁথির মধ্যে অনেক সম্পদ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক ঐশ্বর্য ছাড়া পুঁথির নিজস্ব আর কোন বিশেষ ইতিহাস নেই। থাকলেও আমাদের আজ তা জানবার সুযোগ কোথায়। কত পুঁথি অযত্ন অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরকালের কোন কবিযশপ্রার্থী লিপিকারের অসাধুতায় মূল লেখক গেছেন হারিয়ে। পুঁথিশালায় বিগত যুগের মূক সাক্ষী হয়ে শুধু পড়ে আছে পুঁথিগুলি।

কিন্তু একদিন দুজন মানুষের মিলিত চেষ্টার ফলে নিজস্ব ইতিহাসের সম্পদে বিশিষ্ট হয়ে উঠল বাংলা বই। স্মরণীয় ১৭৭৮ সালে স্যার চার্লস উইলকিন্স এবং শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার বাংলা হরফে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করলেন। একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হলো। আজ আমরা কল্পনাও করতে পারব না যে, সেদিন বাংলা দেশের মানুষের মন কী বিপুল আনন্দে মেতে উঠেছিল যেদিন তারা প্রথম হাতে পেল ছাপান বাংলা বই। আজ কোন কৌতূহলী পাঠক শ্রীরামপুর মিশন থেকে পাদ্রী সাহেবদের উদ্যোগে ছাপা প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হাতে নিয়ে ছাপা এবং গ্রন্থনের সৌন্দর্যের অভাবে আদৌ তৃপ্তি পাবেন না। তথাপি বিদেশীর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং উদ্যোগে মুদ্রিত এই বই চিরদিন আমাদের কাছে গৌরবের সামগ্রী হয়ে থাকবে।

ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পর অতি দ্রুত বাঙালী সমাজ গ্রন্থ-সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এর আগে বাঙালীর জীবনে কাব্য-সাহিত্যের কোন সমাদর যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার প্রসার ছিল সীমিত। নিজের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত সঙ্গী করে বই পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পূর্বে নিশ্চয়ই তার সুযোগ ছিল না। হাতে-লেখা পুঁথির প্রচার তার কি এমন বেশী হতে পারে! উনিশ শতকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ যখন আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিতে শুরু করল তখন প্রতিটি মানুষ নিজের মনের চাহিদা মিটাতে তৎপর হয়ে উঠে। দেশজুড়ে চলেছে তখন শিক্ষাপ্রসারের অক্লান্ত চেষ্টা। মানুষ আপনা থেকেই উন্মুখ হয়ে থাকবে তার নির্জন অবসরের নিটোল মুহূর্তটিতে বইয়ের জন্য। ছাপাখানা চালু হওয়ার পর বাঙালী পাঠক যে কি অদম্য আগ্রহে ছাপা বইকে স্বাগত জানাচ্ছে তার জীবন্ত এক সাক্ষ্য সে-কালের প্রখ্যাত পত্রিকা "সমাচার দর্পণ"-এর একটি উদ্ধৃতিঃ—"গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক জায়গায় নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।"—২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮১৯।

গত শতাব্দীর এই পাঠকদের মধ্যে সমাজের পিছনের সারির মানুষের সংখ্যা অনেক। একদিকে ইংরেজ আমলে হঠাৎ-বড়লোক বাঙালীদের যেমন বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করা একটা ধনেদীপনার স্মারক হিসাবে আদৃত হত, অপরদিকে তেমনি সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী মনের আকাঙ্ক্ষায় সে-যুগে বাংলা বইয়ের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার মত বইয়ের গুণগ্রাহিতা এবং অর্থানুকূল্যে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করা উনিশ শতকের বাঙালী ধনীরা অনেকেই বিশেষ একটা কর্তব্য বলে মনে করতেন। শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর "সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ" নামক বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। সে সময়ের ইংরেজদের মধ্যে কেউকেউ নানা কারণে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে বই লিখেছিলেন। তাঁদের লেখা কোন কোন বইয়ের দাম আজকের দিনের টাকার হিসাবেও এত বেশী যে আজো সে-সবের ক্রেতার সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। ১৮৩৪ সালে লণ্ডন সহরে স্যার গ্রেবস হৌটন বাংলা ও ইংরেজীতে নূতন' এক অভিধান ছাপলেন। তার মূল্য ৮০ টাকারও বেশী। ডক্টর উইলসন 'এক দিকে সংস্কৃত ও অপর দিকে ইংরেজী' অভিধান লিখলেন। এগারশ' ষোল পৃষ্ঠা। মূল্য ইংরেজী কাগজে একশত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা। সন ১৮১৯ খৃঃ। ডক্টর উইলিয়াম কেরীর বাংলা-ইংরাজী অভিধান ২০৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১০৲ টাকা। সন ১৮২৫ খৃঃ।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে যে স্ফীত অঙ্কের এইসব বইয়ের গ্রাহক কারা ছিলেন। সাধারণ অথবা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষে সেদিনও যেমন আজো তেমনি বইয়ের এই দাম ভয়াবহ। তথাপি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় গ্রাহকের অভাব হয়ত ছিল না। এবং অনুমান করি ধনী বাঙালীর লাইব্রেরীর শোভাবর্ধনের জন্য হলেও ঐসব চড়া দামের বই কেনা হত। ১৪ই জুন, ১৮২৫ তারিখের সমাচার দর্পণে ডক্টর কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—'গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে।"

ধনী-নির্ধন বাঙালী পাঠকের সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় বইয়ের বিক্রী এমনিভাবে যখন বেড়ে চলল তখন বইয়ের ব্যবসার দিকে কারুর কারুর নজর পড়ল। ক্রমে সৃষ্টি হল পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলা পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন। ছাপা, বইয়ের সমাদর বেশি। অথচ উল্লেখযোগ্য লেখক কৈ? তার উপর অর্থের প্রলোভনে কোন কোন নীতিহীন ব্যবসায়ী কুরুচি-সম্পন্ন বই ছেপে প্রকাশ করতে থাকে। এতে দুঃখিত হয়ে কোন এক অজ্ঞাত-নামা পাঠক ছদ্মনামের আড়ালে থেকে ১৮২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠায় তাঁর মর্মবেদনা লিখে রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে সহরে বাবুর দল আদিরসাত্মক বই পছন্দ করে। তাই এইসব ইতর রুচির বইয়ের এত বিক্রী। অথচ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবিক্রীত হয়ে পড়ে থাকছে। পত্রকারের খেদোক্তির মধ্যে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও সে-সময়ের বাংলা বইয়ের বাজার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

সে-যুগে অন্যান্য সব জিনিষেরই দাম যখন আজকের তুলনায় এত কম তখন বইয়ের দাম এমন অস্বাভাবিক স্ফীত কেন? এর সম্ভাব্য উত্তর মনে হয় ছাপাখানার উন্নতি না হওয়ায় ছাপা খরচ অনেক পড়ে যেত। ধনী অথবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া স্বল্পবিত্ত মানুষের পক্ষে ছাপা খরচ বহন করা সম্ভব ছিল না। তাই সমাজের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষও যখন বই প্রকাশ করতেন তখন তাঁদের অনেককেই বইয়ের ছাপা খরচের কথা ভাবতে হত। ডক্টর উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরী এবং রামকমল সেনের 'কমবেশি হাজার পৃষ্ঠার ইংরেজী-বাংলা অভিধান' শ্রীরামপুরে

প্রেসে ছাপা হওয়ার সময় ঘোষণা করতে হয়েছিল—"যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকের লইতে সত্তর টাকা লাগিবেক" (১৮২৯, সমাচার দর্পণ)। ধর্মপ্রবণ দেশে টাকার অভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপাতে না পেরে ১৮২৭ সনে ১৭ই মার্চ সমাচার দর্পণের মাধ্যমে কলকাতার আমড়াতলার শ্রীবেণীমাধব দত্ত "পুণ্যচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা" করছেন।

ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পর অতি দ্রুত আমাদের দেশে মুদ্রণব্যবস্থার উন্নতি হতে থাকে। বইয়ের মধ্যে ছবি ছাপান শুরু হয় ১৮২১ নাগাদ। রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন 'মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সম্বাদযুক্ত ভগবদগীতা' বাংলায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে 'বৃষবক্তু নারদ গোস্বামিকে যোগ কহিতেছেন এবং মেনকার ক্রোড়দেশাবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন'—এই দুখানি ছবি ছাপা আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম যুগের ছাপা বাংলা বই মোটামুটি এই কয় শ্রেণীর—(ক) ধর্মগ্রন্থ, (খ) ধর্মীয় আচার-আচরণমূলক গ্রন্থ, (গ) প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের অনুবাদ অথবা ছায়াবলম্বনে রচিত গ্রন্থ, (ঘ) শিক্ষামূলক—ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যই তখন আধুনিক যুগের নতুন প্রভাতে সবেমাত্র পা-পা করে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন যুগন্ধর প্রতিভার তখনো আবির্ভাব হয় নাই। কাজেই সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টির বই তখন কোথায় পাওয়া যাবে? তবু ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে ভুলভ্রান্তি, আত্মপ্রচার আর অর্থলোভ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কল্লোলিত হয়ে উঠেছে বাঙালী পাঠক সমাজ। অনুমতি না নিয়ে একের বই অপরে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হচ্ছে। বইয়ের মধ্যে অপরের লেখা চুরি করে নিজের নামে প্রকাশ করবার কৌশল আয়ত্ত হচ্ছে; আর তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিবাদ এবং আইনের ভয় দেখানো সুরু হয়েছে। ১৮২৯ সালের ১৫ই আগস্ট দেবীচরণ পরামাণিক তাঁর "চন্দ্রকান্ত" নামক পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করবার জন্য মথুরামোহন মিত্রকে 'সমাচার দর্পণ' মারফৎ হুমকি দিচ্ছেন—"যদ্যপি তিনি ঐ......পুস্তক পুনর্বার ছাপা করেন তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ে যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন......।" লেখাচুরির জন্য সে-যুগের স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উপদেশ কৌমুদী অথবা প্রদানপুরঃসর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের লেখক কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে 'দর্পণ'মারফৎ এক চিঠি লেখেন—"আমি স্বল্পসাধ্য দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদগুণবর্ণনা পূর্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্নভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে ২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবর মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন......আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদয় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নূতন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক।" 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সে-সময়ের কোন লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লেখকের বিনা অনুমতিতে বইয়ের পুনর্মুদ্রণ অথবা লেখা চুরি করা ঘৃণিত কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই হীন কাজ এবং তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালীর পুস্তক-সচেতনার প্রমাণ পাওয়া যায় না কি?

সে-সময়ের বাঙালী পাঠকের (সংখ্যা সীমাবদ্ধ হলেও) ভালো বইয়ের জন্য কী উদগ্র আগ্রহ! কী বিপুল উচ্ছ্বাসে ভালো বই প্রকাশ হওয়া মাত্র তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে! সে-সময়ের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীর অত্যধিক অর্থলোলুপতার নিন্দা করে লেখাকে 'মিশন'-এর পর্যায়ে উন্নীত করে যত প্রশংসাই করা হক না কেন পাঠকের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে বইয়ের ব্যবসাও তত পুষ্ট হয়ে উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্য যখন সৃষ্টিসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তখন বাঙালী সমাজে পাঠকের সংখ্যা অনেক। যদিও শ্রীমধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' মুদ্রিত হয়েছিল পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থসাহায্যে তবু বাংলা উপন্যাসের বিক্রী সে-যুগে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমধুসূদনের মেঘনাদবধ ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। রাজা দিগম্বর মিত্র মেঘনাদবধের ১ম সংস্করণের প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। মুদ্রক সংস্থার নাম উল্লিখিত থাকলেও মূল্যের উল্লেখ নেই। কাব্য-সাহিত্যের ব্যবসায়িক মূল্য সেদিন ছিল না। গল্পকথার চাহিদা কিন্তু বিপুল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র ২য় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে—"ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষরূপে পর্যবসিত হয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বিক্রী আজকের দিনেও নিশ্চিতরূপে লোভনীয়। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তালিকা হতে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় দুর্গেশনন্দিনী ১২৫০০, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ প্রত্যেকটি ৭০০০, আনন্দমঠ মৃণালিনী প্রত্যেকটি ৬০০০, দেবীচৌধুরাণী, রজনী প্রত্যেকটি ৫০০০, কৃষ্ণকান্তের উইল ৪০০০ খণ্ড বিক্রী হয়। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর স্বাগত সম্বর্ধনা যে কী বিপুল হয়েছিল তা বোঝা যায় এই বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদগুলি লক্ষ্য করলে। তাঁর জীবিতকালেই দুর্গেশনন্দিনীর ১৩টি সংস্করণ হয় ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জে, এফ, ব্রাউন, বি, সি, এস, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক এই বই রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত হয় এবং থ্যাকার্স স্পিংক এন্ড কোং তা প্রকাশ করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র মুখার্জি 'দি চিফটেনস্ ডটার' নামে এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে কে কৃষ্ণ দুর্গেশনন্দিনীর হিন্দুস্থানী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বেনারস থেকে জি সিংহ হিন্দী এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর থেকে অন্য কেউ কানাড়ী অনুবাদ করেন।

সব চাইতে আনন্দের বিষয় এই যে, ঊনিশ শতকের ধনিক-প্রধান কলকাতার সমাজেও বাঙালী সাহিত্যিক পেয়েছেন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। ১৮৩৯ সালে গ্রান্ট সাহেব "পূর্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক" যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে সমাজের অন্যান্য কীর্তিমানদের সঙ্গে স্থান লাভ করেছেন 'বঙ্গ ভাষার গ্রন্থকর্তা শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্তী।"

অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা বই আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে তাতে আর্থিক দিক থেকে আশার লক্ষণ দেখা যায়। বাংলা বইয়ের ব্যবসার জগত নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চপল শৌখীনতার পর ক্রমে আজ সংঘবদ্ধ হতে চলেছে। মুদ্রণ-সৌষ্ঠব, প্রচ্ছদ-পারিপাট্য এবং বিজ্ঞাপনের নিপুণ ব্যবস্থা বাংলা বইয়ের আকর্ষণ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি করেছে। কিছুকাল আগেও বাংলা বইয়ের এ-সব দিকে প্রকাশক বা পাঠক আদৌ নজর দিতেন না। আজ বাংলা বইয়ের অঙ্গসজ্জা এবং বিক্রীর পরিমাণ অবশ্যই লোভনীয়। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বাড়ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্ততঃ আজকের জগতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ এবং জ্ঞান-বিতরণের যতো সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার যে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হচ্ছে না এটা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ জীবজগতের লড়াই ॥

কলকাতা রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াই নিশ্চই অনেকে দেখেছেন। পর্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে দুই বলদর্পী জীব ঠোকাঠুকি করছে, ট্রাম-বাস বন্ধ, চারদিক থেকে উৎসাহী দর্শকদের হাততালি—এ দৃশ্য কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে প্রায় রোজই দেখতে পাওয়া যায়। এই ষাঁড়ের লড়াইতেও একটি বিষয়ে লক্ষ্য করবার মতো। যে ষাঁড় অনায়াসেই একটি শিঙ-এর গুঁতোয় বাঘকে পর্যন্ত কাবু করতে পারে সে কিন্তু নিজের স্বজাতির সঙ্গে লড়াই করবার সময়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে শিঙ ব্যবহার করে থাকে। ষাঁড়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো ষাঁড় আহত হয়েছে এমন আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তারা শুধু শিঙে শিঙ বাজায় আর শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলা-ঠেলি করে। শেষ পর্যন্ত যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তার হার। এ-ব্যাপারেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হার স্বীকার করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার পরে বিজয়ী ষাঁড় কখনো তাড়া করে না। এই ষাঁড়ের লড়াই দেখে নিশ্চই মনে হতে পারে ভারতীয় কুস্তিতে যেমন কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, এক্ষেত্রেও যেন তাই। কিন্তু স্পেনে এখনো যারা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু একে-বারেই ভিন্ন। মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ে ষাঁড় সুযোগ পেলেই শিঙের গুঁতোয় মানুষকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, একই প্রজাতির মেরুদণ্ডী জীবরা যখন পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে তখন তা যেন অনেকটা টুর্নামেন্টের মতো হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরস্পরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কখনো লড়াই করে না। তাদের এই লড়াই পরস্পরের শক্তি-পরীক্ষা মাত্র। যে কোনো একজন হার স্বীকার করা মাত্রই লড়াই শেষ।

অথচ লড়াই না করেও এই মেরুদণ্ডী জীবরা থাকতে পারে না। দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে কি শুরু হয়ে গেল গুঁতোগুঁতি আর ঠেলাঠেলি। মাছ থেকে মানুষ পযন্ত সকল মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যেই এটি একটি সাধারণ লক্ষণ। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, মেরুদণ্ডী জীব মাত্রেই মারমুখী।

এমনিতে মনে হতে পারে, মারামারি হওয়াটাই স্বাভাবিক। একই প্রজাতির জীব একই ধরণের খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, একই ধরণের উপকরণ দিয়ে বাসা তৈরি করে, একই ধরনের পরিবেশ পছন্দ করে। কাজেই, জোর যার মুলুক তার—এই নীতির জয়জয়কার অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, মনে হতে পারে, বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই মেরুদণ্ডী জীবরা মারমুখী হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই হচ্ছে রীতি।

কিন্তু এই যুক্তি পুরোপুরি প্রয়োগ করতে বাধা আছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতিই যদি হবে পরস্পরকে ঘায়েল করে চলা তাহলে মারামারির ফল সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত হতে দেখা যেত। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অপরজন কিছুতেই থামত না।

কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের বিপরীত। একই প্রজাতির জীবরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে বটে, কিন্তু এই মারামারির শেষ ফল একজনের প্রাণসংহার নয়। যদি তাই হত তাহলে জীবজগতের অস্তিত্বই হয়তো এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। জীবজগত রয়েছে, আমরা রয়েছি (যদিও আমরা মানুষরা এমন পরমাণু বোমা তৈরি করেছি যা কোটি কোটি বছরের মারামারির পরেও টিকে থাকা জীবজগতকে এক লহমায় মধ্যে ধ্বংস করতে পারে). এ থেকেই প্রমাণ হয় যে জীবজগতের মারামারিটা অনেকটা যেন নিয়মপালনের ব্যাপার। এই মারামারিতে বিজিত পক্ষই যে দুর্বল পক্ষ তা সব সময়ে নাও হতে পারে। কিন্তু বিজিতকে বিজয়ীর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে, একই প্রজাতির জীবরা মারামারি করে বলেই আরো বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে এটি নিশ্চই জরুরি প্রয়োজন।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে একই প্রজাতির জীবদের মধ্যে লড়াই বা মারামারি হওয়াটা অনেকটা যেন নিয়ম-রক্ষার ব্যাপার, যাকে বলা যেতে পারে রিচুয়াল। জীবজগতের লড়াইয়ের কায়দাকানুন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার পরেই বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

'কায়দাকানুন' কথাটায় আপত্তি উঠতে পারে। বলা যেতে পারে মানুষ কায়দা-কানুন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, অতএব মানুষের লড়াইয়ে কায়দাকানুন থাকতে পারে। কিন্তু দুটি হিংস্র সাপ যখন লড়াই শুরু করে তখন তাদের লড়াইয়ে কায়দা বদিও থাকে, কানুন থাকতেই পারে না। হিংস্র সাপ একে অপরকে যেমনভাবে পারবে ঘায়েল করতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য এর বিপরীত। বিশেষ করে হিংস্র জীবদের লড়াই দেখলে সত্যি সত্যিই মনে হয়, তারা যেন অনেকখানি বাঁচিয়ে চলছে। তাদের লড়াইয়ের যেন কতকগুলো অলিখিত রীতিনীতি ও বিধিবিধান আছে। এমন কি বাধানিষেধও আছে। মুষ্টিযোদ্ধারা যেমন কখনো কোমরবন্ধনীর নিচে আঘাত করে না, তেমনি এরাও কতকগুলি আইন মেনে চলে।

তাই বলে যেন মনে না করা হয় যে জীবজগতের লড়াইটা সার্কাস-পার্টির সঙের লড়াইয়ের মতো লোকদেখানো। দুটি সাপ যখন লড়াই করে তখন মরীয়া হয়েই লড়াই করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে লড়াই করবার সময়ে কেউ কাউকে কামড়ায় না। আবার হার স্বীকার করার বা জয় ঘোষণা করারও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা আছে। এই ভঙ্গিমা প্রদর্শিত হবার পরেই লড়াই শেষ।

সাধারণত দেখা যায় যে-সব জীবের শরীরে মারাত্মক রকমের অস্ত্রসজ্জা নেই তারাই সবচেয়ে মরীয়া হয়ে লড়াই করে। যে-সব জীবের শরীরে অস্ত্রসজ্জা এমনই যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে খুন বা মারাত্মক রকমের জখম করতে পারে—সেইসব জীব পলায়নেও খুবই সক্ষম। ফলে বিজিত পক্ষ ঠিক সময়টিতে শরীর বাঁচিয়ে পলায়ন করতে পারে। আর বিজয়ী সাধারণত বীরের ধর্ম মেনে চলে এবং পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত থাকে।

অনেক সময়ে পলায়নের প্রয়োজন হয় না, শুধু একটি ভঙ্গিমাই যথেষ্ট। কুকুর ও নেকড়েরা সাধারণত লড়াই শুরু করে কামড়াকামড়ি করে। কিন্তু কোনো একপক্ষ যেই মুহূর্তে তার নরম গলাটা প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে বাড়িয়ে দেয় বা চিত হয়ে শুয়ে নরম পেটটা মেলে ধরে তখন প্রতিদ্বন্দ্বী এই ভঙ্গিমাকেই হার-স্বীকার বলে ধরে নেয় এবং গলায় বা পেটে কামড় দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। অনেক সময়ে মনিবের কড়া ধমকে পোষা কুকুরকেও এই একই ভঙ্গিমার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। আগেকার কালে মানুষ যখন যুদ্ধ করতে গিয়ে হাতাহাতি লড়াই করত তখনো পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী পদতলে আশ্রয় নিলে তাকে বধ করা বীরের ধর্ম বিবেচিত হত না। আজকালকার মানুষ দূরসন্ধানী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে। কাজেই পদতলে আশ্রয় নিয়ে করুণা ভিক্ষা করার ভঙ্গিমা করা এখন আর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে হার-স্বীকারের ভঙ্গিমা করা বা পলায়ন করার প্রয়োজন জীবজগতের

বৃহত্তর অংশের ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এরা লড়াই করে অনেকটা যেন আপোষে। শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করা বা এমনি ধরণের খুবই নিরীহ গোছের পদ্ধতিতে পরস্পরের শক্তির পরিমাপ করাটাই এদের কাছে লড়াই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার গায়ে গা ঠেকাবারও প্রয়োজন হয় না। দূরে থেকে তাল ঠুকে বা হুংকার ছেড়েই লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যায়। অবশ্য, প্রায় সব লড়াইয়েরই প্রাথমিক পর্বে এই তালঠোকা বা হুংকার ছাড়ার ব্যাপারটা থাকে।

জীব-জগতের টিপিক্যাল লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের ইগুয়ানার (গোসাপ জাতীয় সরীসৃপ বিশেষ) লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। ইগুয়ানা দেখতে অনেকটা বড়ো আকারের টিক-টিকির মতো, পিঠের ওপরে এক সার কাঁটা আর চারটি পায়ে বড়ো বড়ো নখ।
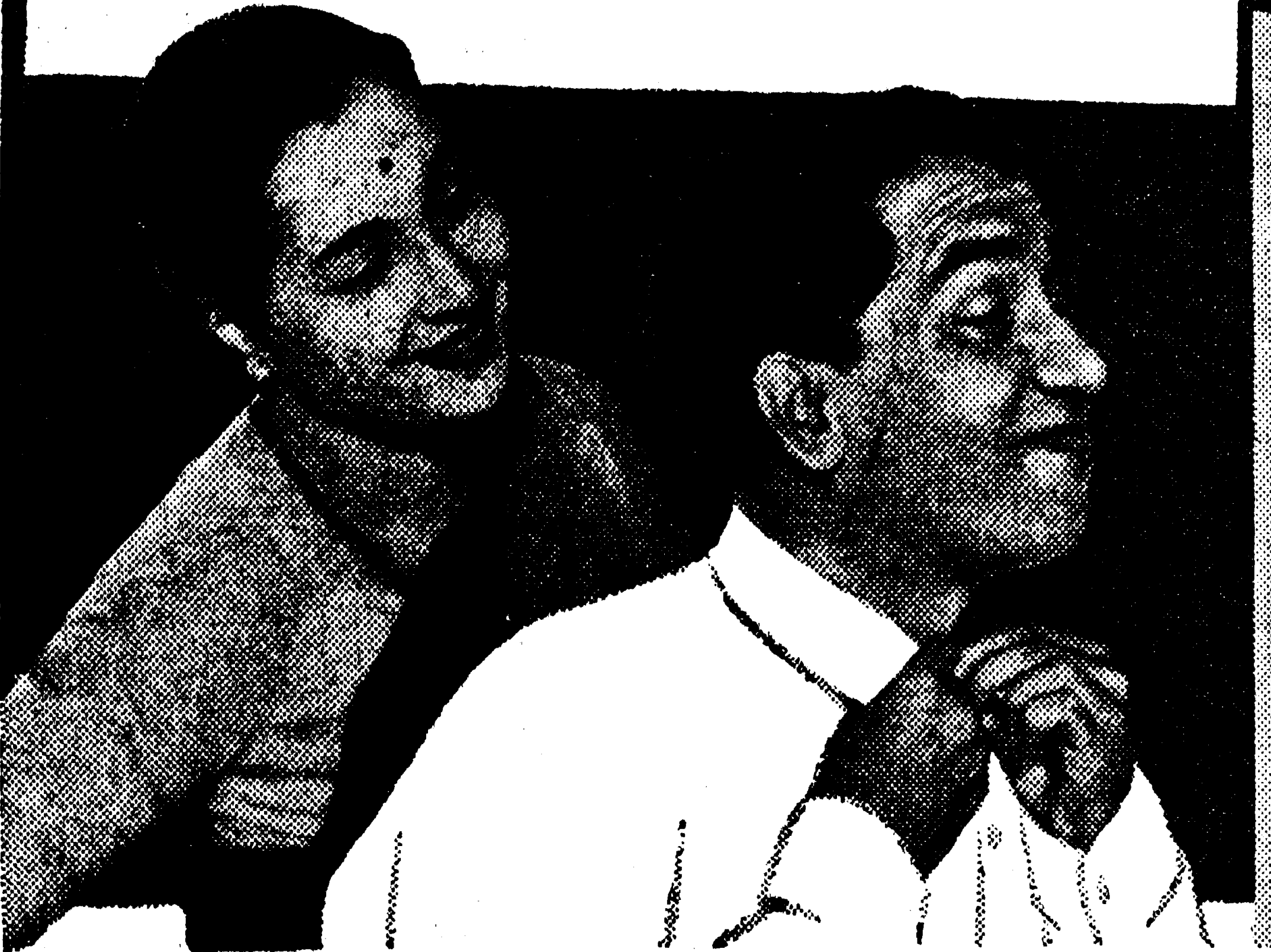
এদের লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্বে অবশ্যই থাকে পরস্পরের প্রতি আস্ফালন। কিন্তু তারপরে সত্যিকারের লড়াইয়ের সময়ে এরা পিঠের কাঁটাও ব্যবহার করে না, পায়ের নখও নয়। এদের কপাল থাকে পুরু আর শক্ত আঁশে ঢাকা; সেই কপালে কপাল ঠেকিয়ে এরা পরস্পরকে ঠেলতে শুরু করে। যে-পক্ষ বুঝতে পারে যে তার আর জেতার আশা নেই, সে অমনি পেট থেবড়িয়ে মাটিতে গা এলিয়ে দেয়। অন্যপক্ষ এই ভঙ্গিমাকেই পরাজয়ের নিদর্শন হিসেবে মেনে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

র‍্যাটল্ সাপ লড়াই করে বড়ো বিচিত্র ধরণে। কেউ কাউকে কামড়ায় না। মাথার দিকে শরীরের এক-তৃতীয়াংশ শূন্যে উঁচিয়ে এরা পাশা-পাশি চলতে শুরু করে আর মাথা দিয়ে মাথা ঠেলতে থাকে। যে অপরের মাথাটাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারবে তারই জিত।

হরিণের লড়াইও কম বিচিত্র নয়। গোড়ার দিকে তারা শিঙ উঁচিয়ে পাশা-পাশি মার্চ করে চলে আর একে অপরকে আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারপরে আচমকা তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে আর মাথা নাবিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে যায়। শিঙের সংগে শিঙের হয় ঠোকাঠুকি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যতোক্ষণ দুজনে পাশা-পাশি মার্চ করে চলে ততোক্ষণ কেউ কাউকে আক্রমণ করে না।

ছাগলের ও ভেড়ার লড়াইয়েও এমনি শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি। এ'বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের ধারণা, শিঙের ব্যবহার শুধু কপালের সংগে কপাল ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। আসল লড়াইটা হচ্ছে ঠেলাঠেলি।

ইঁদুরে লড়াইয়ে প্রথম পর্বে হয় ঠেলাঠেলি। তারপরে কামড়া-কামড়ি। সাধারণত যে পক্ষ প্রথম চিত হয় তারই হার।

হালে আমলে একমাত্র মানুষের বেলাতেই এসে দেখা যাচ্ছে, একই প্রজাতির জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সংগে মানুষের লড়াইয়ে রীতিনীতি বা নিয়ম-কানুন নেই। মানুষের লড়াইটা কোনো ক্রমেই নিয়মরক্ষার ব্যাপার নয়, টুর্নামেন্ট তো নয়-ই। কারণ দেখা যাচ্ছে, মানুষ লড়াই করে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কে প্রতিদ্বন্দ্বী বা কে প্রতিদ্বন্দ্বী নয় সে-বাছবিচার তার নেই, দূরে থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে সে যে বাণ বর্ষণ করে তা সরাসরি মৃত্যুবাণ। মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হতে পারে, জীবজগতে মানুষ একটি ব্যতি-ক্রম হতে চলেছে।

তবে আশার কথা এই যে জীব-জগতে মানুষই একমাত্র জীব যে নিজেকে বদলাতে পারে ও পরিবেশকে বদলাতে পারে। কাজেই ভরসা রাখা চলে যে, মানুষই একদিন এমন ইতিহাস সৃষ্টি করবে যে মানুষের সংগে মানুষের লড়াইটা হয়ে উঠবে একেবারেই অতীতের ব্যাপার। গোটা পৃথিবীর মনুষ্যই হয়ে উঠবে একই পরিবারবদ্ধ।

বীরভূমের আলকাপ

ধ্রুব পাণ্ডা

আমাদের লোকউৎসব, লোকগাথা, গ্রাম্য ছেলেভুলানো ছড়া, সামাজিক ব্রত-প্রথা ও পার্বণ-পালাগানের মূল্য দেশবাসীর কাছে আদৌ তুচ্ছ নয়। এই লোকসংস্কৃতি থেকে মানুষের জাতি ধর্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এবং সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনে বর্তমান সভ্যতা ও কৃষ্টিধারার গতি-নির্ধারণ খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। এজন্য এগুলি Enthrology বা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নৃতাত্ত্বিক-গণের সিদ্ধান্ত এই যে, লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত নৃত্য, উৎসব, গাথা বা লোকাচার কেবলমাত্র আনন্দবিধানের জন্য নয়, জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে আদিম মানুষের আদিম মনের উদ্ভাবিত কর্মের বিচিত্র প্রচেষ্টা ও প্রকাশ। কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে জেগে উঠেছে ব্যষ্টির বদলে গোষ্ঠীচেতনা, আধুনিক-কালের Community life বা সাম্প্রদায়িক জীবন। এই গোষ্ঠীচেতনার সহায়তায় আদিম সমাজে উদ্ভূত হয়েছে তুক্‌তাক্‌ মন্ত্রতন্ত্র, লৌকিক পূজাআর্চা, আউল-বাউল-কর্তাভজার দল, সমবেত নাচ-গান এবং তার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রেরণা।

পল্লী বাংলার এমনি একটি স্বতঃ-উৎসারিত লোকউৎসব 'নবান্ন'। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কিষাণ-কিষাণীরা কঠোর শ্রমের ফসল ফলানোর পর, 'ধান কাটার গান'

"আঙ্গনেতে আঁটি ধান
ঝাড়বা যখন দিনমান
কুলার বাতাস দিয়া হামি
ধান ঝাড়ুম না।"

গাইতে গাইতে সোনার ধানে গোলা ভরে তুলে। মনেপ্রাণে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। 'তুষ-তুষলী' ব্রতে আছে যেন ওদের হৃষ্ট মনের কথা:—

"তুষ-তুষলী তুমি কে
তোমার পূজা করে যে,
ধনে ধানে বাড়ন্ত
সুখে থাকে আদি অন্ত।।"

মনের গভীর আনন্দ প্রকাশের জন্য উদ্ভাবন করল অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম-পদ্ধতি যা পরবর্তীকালে নব নব লোকউৎসবরূপে পরিচিত হল। 'নবান্ন' উৎসব উপলক্ষে এইভাবে সৃষ্ট হয়েছে 'আলকাপ'।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের লৌকিক উৎসবের প্রচলন আছে। বীরভূমে সাধারণ 'যাত্রা' ছাড়া নানা রকমের ছোট ছোট পালাগান নানা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন তরজা, পাঁচালী, ভাদুগান, টুসুগান, লুটো বা লেটো, মনসামঙ্গল, রামায়ণগান, সত্য-পীর, আলকাপ, কবিগান, বাউলগান ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদেও আলকাপ প্রচ-লিত আছে। আলকাপ কতকটা লুটো ধরণের পালাগান—কমিক ও ছড়াপ্রধান। 'আলকাপ' কথাটি প্রাদেশিক। মনে হয় মূল শব্দ এটি নয় বা কি ছিল জানা যায়নি। আরবী শব্দ 'আওল' মানে সর্বোৎকৃষ্ট, প্রথম শ্রেণীর। প্রাদেশিক শব্দ 'আওল'-এর অর্থ এলোমেলো এবং 'কাপ' ('কপট' শব্দজ)—কৌতুকজনক বিষয়। সম্ভবত 'আউলকাপ'-এর অপ-ভ্রংশ 'আলকাপ' শব্দ গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় 'এলোমেলো কৌতুক, সঙ, রঙ্গ' ইত্যাদি। আলকাপ আরবী শব্দানুযায়ী 'আওলকাপ' হলে সর্বোৎকৃষ্ট কৌতুকনাট্য বলেও একে বলা যায় না। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যদিও এর মূল্য যথেষ্ট।

এই পালাগানে দুটো দল থাকে। সপক্ষ দল ও বিপক্ষ দল। উভয় দলে প্রায় দশ বারোজন লোক থাকে। কৌতুক অভিনয় ও নাচ-গানের দ্বারা যে দল ভাল করবে তাদের জিত হয়। সাধারণ উৎসব ছাড়া 'নবান্ন' উপলক্ষে বেশি অনুষ্ঠিত হয়। ডোম, হাড়ি, মুচি, মুসলমান, বাগদি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জাতে এই পালাগান গেয়ে থাকে। পালা আরম্ভের আগে সবাই বিশেষতঃ যারা অভিনয় করবে, এসে গোল হয়ে আসরে বসে সেজেগুজেই। গানের বা বাজনার দল তো আসরে অন্যান্য যাত্রাদলের মত আগে থেকে থাকেই। তারপর পালা আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে যাত্রাতে কনসার্ট বাজানর মত এদের একজন মেয়ে-বেশী নাচিয়ে নাচ আরম্ভ করে বাজনার তালে তালে। গান তখন হয় না। বাজনার দলে যন্ত্রের মধ্যে থাকে, তবলা বাঁয়া, বড় খঞ্জনী, হারমোনিয়ম ও ঢোল। সাধারণত দুনী কাহারবা ও দাদ্‌রা তালে পালার নাচগান হয়। পূর্বোক্ত মেয়েটি নাচ শেষ করে বসলে পালা আরম্ভ হয়। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একক নৃত্য মাঝে মাঝে থাকে; ছড়াও থাকে পাঁচালীর সুরে। পালাতে বাই বা নাচিয়ে থাকে ২।৩ জন। অভিনয়াংশে কেউ শাশুড়ী সাজে, কেউ সাজে বউ, ছেলে, মোড়ল ইত্যাদি। দলে মেয়ে থাকে না, ছেলেরা মেয়ের ভূমিকা করে। নাচিয়েরা প্রথমত গান গেয়ে ঢিমে লয়ে নাচের ভঙ্গীতে গানের ভাব প্রকাশ করে। তারপর দুয়ারীরা (যারা একসঙ্গে জোরে একই গানের কলি পুনরাবৃত্তি করে) দ্রুত লয়ে গানটা যখন ধরে তখন নাচিয়ে সেই গানের ছন্দে ছন্দে নাচতে আরম্ভ করে। পালায় যে 'মোড়ল' সাজে তার স্ত্রীকে বলে 'মোল্লান'। যাকে কেন্দ্র করে পালাগান অগ্রসর হয় সেই কমিক ভূমিকাটি দলের বিশেষ একজন রচনা করে। তার সঙ্গী সাথীরা যথা বাবা মা শাশুড়ী বৌ ইত্যাদি তার কমিকের ভাবটাকে বাড়াবার জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যায়। আলকাপ পালা-অভিনয় কমিক ও হাস্যরসের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। সাধারণ গ্রাম্য লোকেরা এই আনন্দে সারা রাত মেতে থাকতে পারে। এই অভিনয়ে কথাবার্তা সাধারণত দুই অর্থে ব্যবহার করতে দেখি। এই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সহজ পল্লীবাসীদের উপস্থিত বুদ্ধি, নিজস্ব রচিত গান ও সুর এবং দর্শক-শ্রোতার মনে আনন্দ দেবার কায়দা-কৌশল বুঝতে পারা যায়। এখন সিনেমা-রেডিওর গান শুনে শুনে অনেকে এই সকল সুর নিজেদের রচিত গানে বসিয়ে এক অদ্ভুত খিচুড়ি তৈরি করে। আর একটি আনন্দের বিষয় যে, প্রধানত মুসলমানেরা মিলে অভিনয় করলেও উভয় দল (হিন্দু ও মুসলমান) অতি খুশি মনে শোনে। যখন আসর সরগরম হয়ে উঠে গানে নৃত্যে কমিকে, তখন শ্রোতাদের কেউ একজন "আল্লা হো" বললেই সবাই ঐ বলে সোল্লাসে হাঁকে। আবার মাঝে মাঝে সমস্বরে "হরিবোল" ধ্বনিও শোনা যায়। এই জগতের চিরন্তন আনন্দটুকু সুখ-দুঃখের মধ্যেও পল্লীর লোকে নানাভাবে নানা রকমে আহরণ করে।

'আলকাপ' পালাগানের কিছুটা নমুনা এখানে দেখানো হচ্ছে। তার থেকে মোটামুটি এই পালাগানের ধরণ বোঝা যাবে।

প্রথম, মোড়ল উঠলো। নাচতে লাগলো। নাচার পর মাণিককে ডাকলো বার বার। মোড়ল মাণিকের বাবা। মোড়লের কথায় মাণিক উঠলো না।

পরে তার মা ডাকতে লাগলো। ডাকার সঙ্গেই মাণিক উঠলো।

মোড়ল বলছে (স্ত্রীকে)—ছেলেটা তুমিই নষ্ট করলে। লেখাপড়া শিখলো না, কিছু না।

মা—আমি মেয়েমানুষ, তা আমি কেমন করে জানবো? আমি খাওয়াবার-দাওয়াবার মালিক। তারপর,—ছেলে কি করে না করে, আমি জানি না।

মোড়ল—দ্যাখ্ মাণিক, পড়তে যাবি কিনা বল?

মাণিক—আমি যে একদিন পড়েছিলাম, সেই যে মা আমাকে তেঁতুল পাড়তে পাঠিয়েছিল। আমি তেঁতুল গাছ থেকে দুম্ করে পড়লাম। বাবা, তখনি তো আমি পড়েছিলাম। পড়া আমার শেষ হয়েছে।

মোড়ল—না বাবা সে পড়া নয়, পাঠশালায় যেতে হবে।

মাণিক—(গান ধরল) বেশ মুখভঙ্গি করে কান্নার সুরে বিনীতভাবে :

বাবা গো,—

'তোমার পায়ে ধরি পড়তে যাব না,
ঘরের কড়ি পরকে দিয়ে
কাঁচা-কঞ্চির মার খাব না।
আঁচলেতে দে মা মুড়ি
কাঁকে দে গোবরের ঝুড়ি
মাঠে খেলব কড়ি কড়ি
পোরাব মনের বাসনা।'

বাবা—পড়বি না তো চাকরী করগে—তা না হলে আমাদের সংসার চলবে কি করে?

মাণিক—এ সংসার আমি যদি চালিয়ে দিতে পারি? (এই বলে মাণিক ঘরের মা-বাবা ইত্যাদি সকলকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে।)

বাবা—একি রে! একি রে! এ তুই কি করছিস।

মাণিক—দাঁড়াও আমি সংসার "চালিয়ে" দিচ্ছি। (অর্থাৎ সংসার ঘর থেকে অন্যত্র "চালিত" হয়ে গেল)।

বাবা—ওরে তা নয়, তুই খাবি কোথা থেকে?

মাণিক—আমাদের তো জমি আছে, আমি এক কোণে বসবো, তুমি এককোণে বসবে, মা আর এক কোণে বসবে। সবাই মিলে একধার থেকে খেতে লাগবো।

বাবা—না রে, এমন করে খাওয়া হয় না। তোকে চাকরী করতে যেতে হবে।

মাণিক—তাহলে যদি 'নিতান্তপর' আমাকে যেতেই হয়, তবে আমি ঘরের লোক গুনবো।

মা—আমি আছি, তোর বাবা আছে, আর তুই আছিস—মাত্র তিনজন লোক আছে, তার তুই কি গুনবি।

মাণিক—না, আমি গুনবো। ব'লে,—বাবা আছে, মা আছে, আমি আছি, আর আমার বেলায় ফাঁকি? আমার আর একটা কই? আমি একা কেন একটা পেটে খাটতে যাব?

মা—আচ্ছা, তুই কি চাস বল দেখি।

মাণিক—না গো, এই,—এত বড়!

(এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, কমিক অভিনয়ে হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত এত বেশী থাকে যে কথার সাহায্য অল্প নিলেও কমিক অভিনেতার আসল বক্তব্যের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। মাণিক তার বাবা-মাকে বোঝাতে পারছে না যে সে একটি সুন্দর বৌ চায়। কিন্তু ঐ একটু কথা আকার-ইসারা ও অঙ্গ-ভঙ্গীর আশ্রয়ে ঠিক ভিতরের কথাটি বলে দেয়। দর্শক শ্রোতা হেসে হেসে লুটোপুটি খায়)।

মাণিক—আমি এত বড় হলাম, তোমাদের কি আন্দাজ নাই?

মা—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। বলেই মাণিকের বাবাকে বললো,—ওগো, মাণিকের একটি বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে দিলে ও সব কাজ করবে।

বাবা—না, না, ক্ষেপী, বিয়ে দিলে ও কোন কাজই করবে না।

মা—হ্যাঁ, ও ঠিকই করবে।

বাবা—দ্যাখো, বিয়ে আমি দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ওকে কাজে পাঠাতে হবে।

মা—তাহলে তুমি বউ আনতে যাও।

বাবা—বেশ তাহলে আমি যাচ্ছি।

(বউ আনতে মোড়ল চলে গেল হবু বেয়াই-এর বাড়ী)।

বাবা—(গান ধরল)—

আমি এলাম তাড়াতাড়ি
বেহাই তোমার বাড়ী
বেহাই আছ কিনা বাড়ীতে।

হবু বেয়াই (গান ধরে)—

এস বেহাই বস খাটে
পা ধোও গড়ের ঘাটে,
বাড়ীতে কে কেমন আছে?

কউ—চললাম শ্বশুরে ঘরে
ভগবান যা করে
হায় বিধির ঘটনা।

বরের উদ্দেশ্যে নূতন বউকে লক্ষ্য করে গান গাইতে লাগল নাচিয়ে। নাচিয়ে এক এক কলি গাইবার পর দুয়ারীরা উৎস্যাহের সঙ্গে সজোরে গান ধরে। ক্রমশ তাল মধ্য থেকে দ্রুতগতি হয়

নাচিয়ের গান—

দাদরা—

পরাণ বন্ধু, একবার আসিয়া
সোনার চাঁদমুখ যাও দেখিয়া হে।

ঝাঁপতাল—

দেশের লোকে ময়না পোষে
পিঞ্জরায় ভরিয়া রাখে
তেমনি বধুরে সোনার যৌবন

দাদরা—

যাও হে বাঁধিয়া। সোনার চাঁদমুখ...হে।

ঝাঁপতাল—

কোন রমণীর ফাঁদে পড়ে
গেলে বঁধু আমায় ভুলে
দেশ-বিদেশে ঘুরে মরি

দাদরা—তোমার লাগিয়া। সোনার চাঁদমুখ...হে।

নিম্নোক্ত আর একটি গানের ভাষা উপরের গানের থেকে পৃথক ও আধুনিক। সুরেও আধুনিকতা আছে।

কাহারবা।

মোর স্বপনে কার বাজল বাঁশি গো—
মন-প্রাণ আমারে চায়,
আলোতে ঝলমল শিশিরে টলমল
আনন্দে কেবা নেচে যায়
মন-প্রাণ আমারে চায়।
মাতা-পিতা জড়সড়
অঙ্গ তার ভয়ে মর
মন-প্রাণ আমারে চায়।

অভিনয়ের মাঝে মাঝে থাকে ছড়া। পাঁচালীতে বা কবিগানে যেমন ঢোল, কাঁশি নিয়ে টাক ডুমাডুম করতে করতে ছড়া কাটা হয়, এ তা নয়। তবলচি আসরে বসে তবলা বাজায়। আর যে ছড়া কাটবে সে আসরের মাঝে উঠে দাঁড়ায় ও তালি দিয়ে দিয়ে ছড়া গায়। কবিগান বা পাঁচালীর এক ধরণের সুরের মত এ সকল ছড়ায়ও তেমনি সুর থাকে।

ছড়া

ওহে ভোলা, ভুল তুমি করেছ মূলে
ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি জানে সকলে
এক, এসো এসো একবার ধর্মকথা বলি
দুই বলে ধুতুরে তুই উল্টে যাবে কলি
তিন বলে তিনটি লয়ে কি করবি এখন?
চার বলে চতুর্ভেদী কি কি নাম ধরে
পাঁচ বলে পঞ্চনারী শুয়ে ছিল ঘরে।
ছয় বলে ছয়টি রিপু আসা-যাওয়া করে
সাত বলে সাতটি লয়ে লাগাইলিরে লাটা
আট বলে অষ্টবসু জন্ম হল কোথা
নয় বলে নবগ্রহ কি কি নাম ধরে
দশ বলে দশের মাঝে বলে জানাও আমারে
এগার বলে এ-সব কথা বলো না রে আর
তেরো বলে তাই নারে করতে এলি গান
চৌদ্দ বলে চামচিকেতে পেতে ছিল ফাঁদ
পনেরো বলে দ্যাখ ভাই ভোলা পুরাণে
খুলে দ্যাখ
ওহে ভোলা ভুল তুমি করেছ মূলে।
ইত্যাদি *

---

* আলকাপের সংলাপ ও গান সংগ্রহের জন্য বীরভূমবাসী শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅভিরাম দাসের নিকট কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।
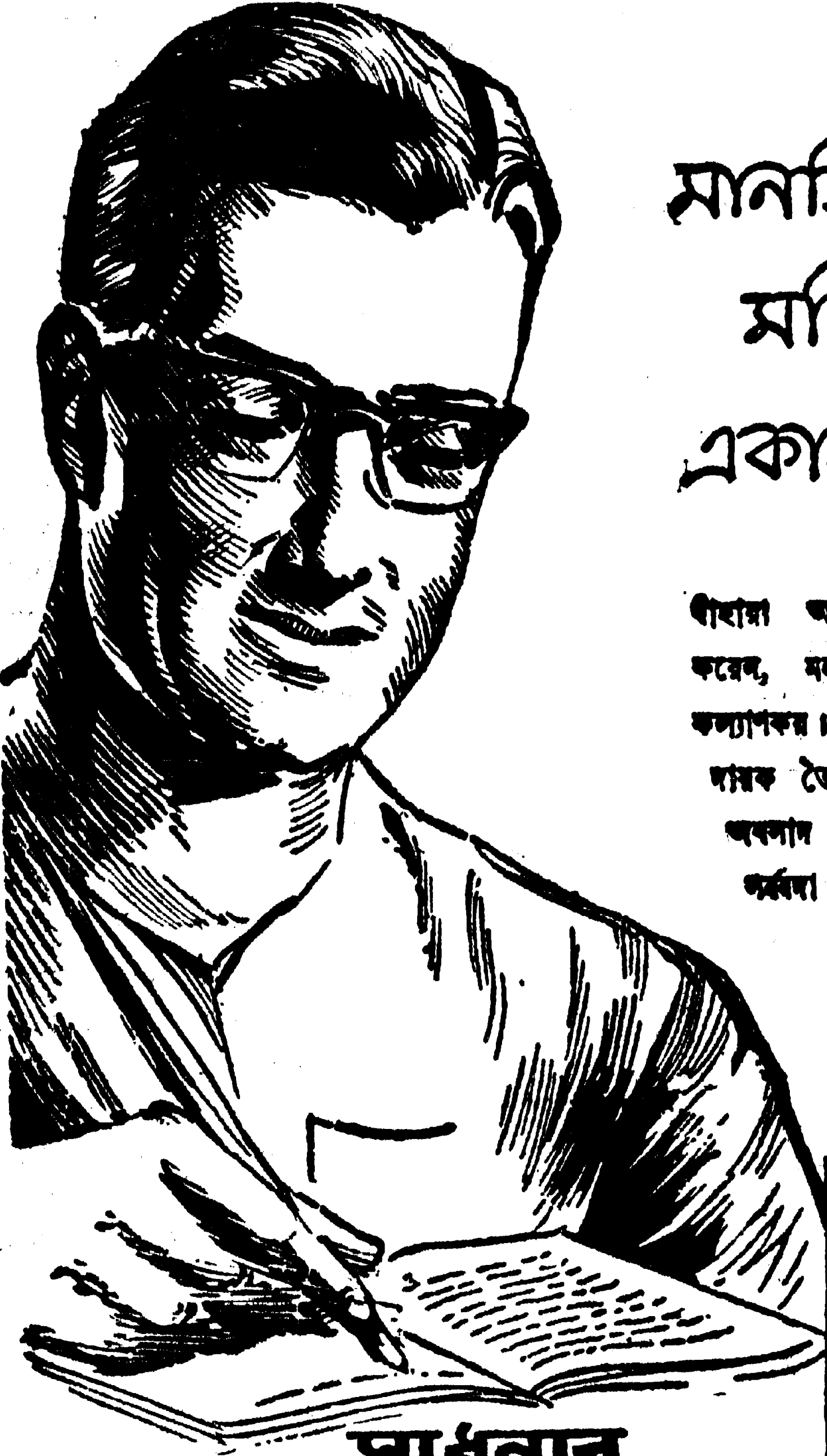
বিদেশী গল্প

অতিথি

আলবেয়ের কামু

স্কুলমাষ্টার দেখল দুটো লোক তারই দিকে আসছে। একজন ঘোড়ায় চড়ে, তার পিছনে একজন আসছে হেঁটে হেঁটে। স্কুলটা পাহাড়ের গায়। স্কুল-বাড়িতে আসতে গেলে চড়াইটা পার হতে হয়। চড়াইটা উঠেছে অকস্মাৎ খুব সোজা হয়ে। ওরা কিছুতেই সেই সোজা চড়াইটা ডিঙোতে পারছে না। উঠতে গিয়ে দম বেরিয়ে আসছে তাদের। পাথর, তুষার আর অধিত্যকার বিপুল জনহীনতা ঠেলে তারা খুব সামান্য পথ পার হতে পেরেছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার হোঁচট খাবার শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। তবু স্কুলমাষ্টার ভাবল ঘোড়ার ফোঁস ফোঁস করা নিঃশ্বাস তার গায়ের খুব কাছেই। ওই দুজনের মধ্যে একজন অন্ততঃ এই অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত। আজ ক'দিন ধরে তুষার পড়ছে। ময়লা সাদাটে তুষারের মধ্যে পথরেখা ডুবে গেছে। তবু লোকটা যেন শিকারীর মত পথের গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসছে। স্কুলমাষ্টার ভাবল এই গতিতে ওরা যদি হাঁটে তবে এখানে পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগবে। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। সোয়েটার আনতে ঘরে গেল সে।

শীতে জমাট বেঁধে আছে ফাঁকা স্কুল-ঘর। তিনদিন আগে বোর্ডে আঁকা হয়েছিল ফ্রান্সের মোহনামুখী চারটে নদী চার রংয়ের চকখড়িতে। আজো সেই নদীগুলি মোহানার দিকে প্রবাহিত। এখন অকটোবরের মাঝামাঝি। মাস কয়েক খরা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কোন পূর্বাভাষ না দিয়ে তুষার পড়তে শুরু করেছে। স্কুলের ছাত্র মাত্র কুড়িজন। অধিত্যকায় ছড়ানো ছিটানো গ্রামের বাসিন্দা তারা সবাই। তুষার মাথায় করে ছাত্ররা ক'দিন স্কুলে আসছে না। আকাশ পরিস্কার হলে তারা আবার আসবে। ক্লাশ-ঘরের পাশের ঘরে থাকে ডারু। জানালা খুললেই পুবের দিক চোখে পড়ে। ঘরটাকে একটু গরম করার জন্য ডারু চুলো জ্বাললো। দক্ষিণমুখী জানালা খুললে দেখা যায় ঢালু মালভূমি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নজরে পড়ে সার সার টকটকে লাল পাহাড়। ওখান থেকে মরুভূমি পর্যন্ত শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই।

গা একটু গরম হয়েছে। যে জানালা থেকে লোক দুটোকে আসতে দেখেছিল ডারু আবার সেই জানালার কাছে গেল। ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় তারা এতক্ষণ চড়াই পার হয়েছে। আকাশও খুব অন্ধকার নয়। কাল রাত থেকে তুষারপাত বন্ধ। মেঘ কেটে গেছে। তবু ভোরের ময়লা আলো এখনও অনুজ্জ্বল।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। তবু মনে হয় এই সবে মাত্র সকাল হয়েছে। গত তিন দিন ধরে ছেদহীন অন্ধকারের মধ্যে পুরু তুষার পড়েছে ত পড়েছেই। আর মাঝে মাঝে এসেছে হাওয়ার ঝাপটা, ক্লাশঘরের দরজার পাল্লা কাতরে উঠেছে বারবার। তার চেয়ে আজকের আকাশ তবু অনেক ভাল। এ ক'দিন ডারু তার ঘরেই সমস্ত সময় কাটিয়েছে।
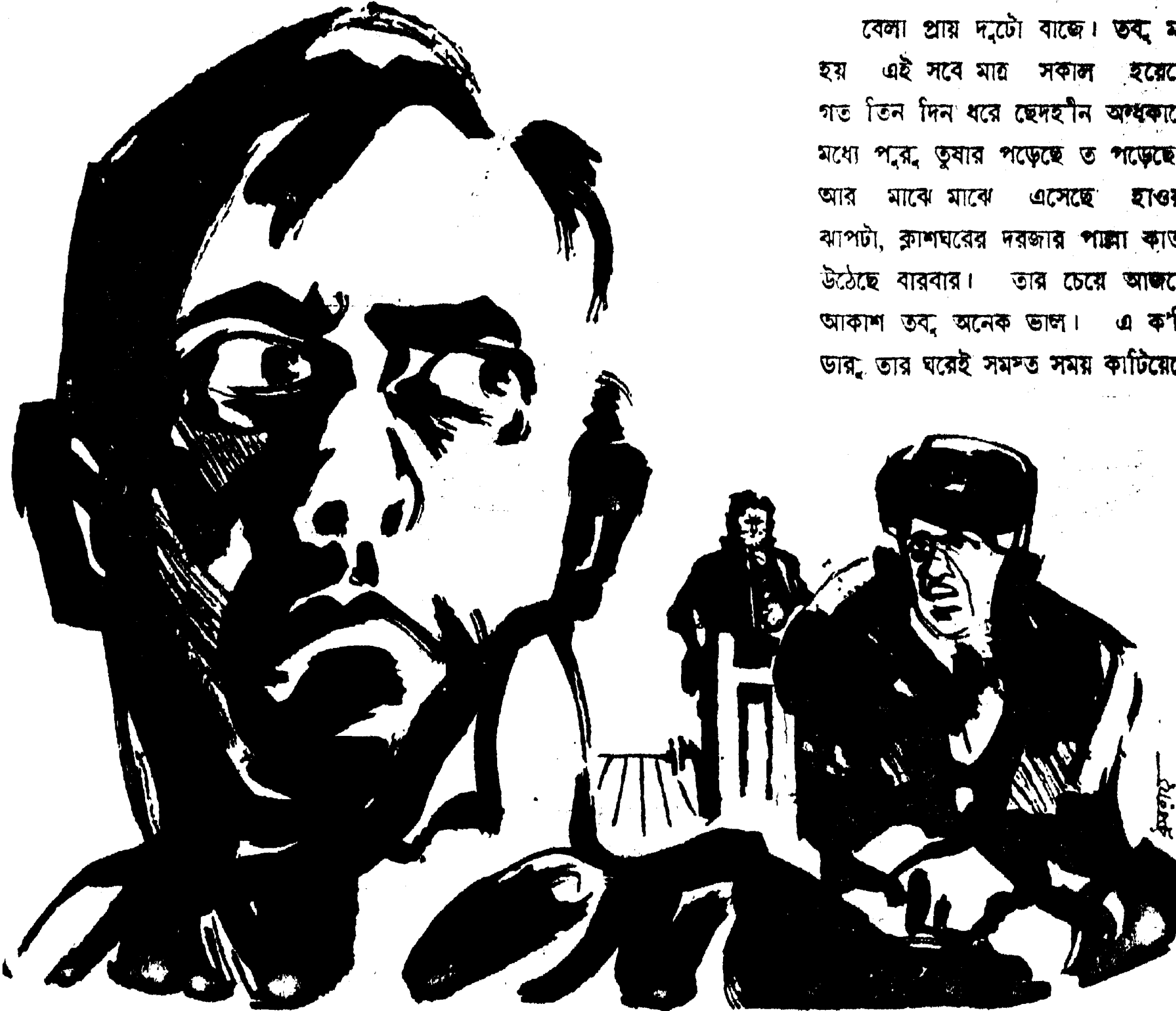
মাঝে মাঝে গিয়েছে ভাঁড়ারে, মুরগীর বাচ্চাকে খাবার দিতে হয়ত, হয়ত বা নিজের জন্য কয়লা আনতে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তুষারপাত আরম্ভ হবার মাত্র দু'দিন আগে উত্তর দিকের নিকটতম গ্রাম তাদাজিদ থেকে রেশনের গাড়ী এসে তাকে খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছে। আবার দু'দিন পরে আসবে রেশনের গাড়ী। কিন্তু গাড়ী যদি নাও পৌঁছায়, ক্ষতি নেই। অবরোধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রসদ আছে তার। স্কুলবাড়িতে মজুত করা আছে বস্তা বস্তা গম। কর্তৃপক্ষ গমের বস্তা এখানে গাদা করে রেখেছে। অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের পরিবার-বর্গকে এই গম দিয়ে সাহায্য করা হবে। সব পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ভীষণ দারিদ্র্য। ডারু প্রতিদিন ছাত্রদের রেশন দিয়েছে। তুষারপাতের দিনকটা তারা কেউ আসতে পারেনি। ডারু জানে এ-কটা দিন তাদের দানাও জোটেনি। আজ হয়ত ছাত্রের বাবা কিংবা বড় ভাই রেশনের জন্য এখানে আসবে। ডারু তাদের রেশন দেবে। নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত চালু থাকবে এই ব্যবস্থা। এখন ফ্রান্স থেকে জাহাজ জাহাজ গম আসছে। দুঃসময়ের দিন শেষ হয়ে এলো। তা হোক। কিন্তু সেই দুঃসহ দিন মনে জেগে থাকবে। সেই অনাহার-ক্লিষ্ট দরিদ্র মুখগুলি সূর্যের আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাসের পর মাস অধিত্যকা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, মাটি ঝলসে ঝলসে কুকড়ে আসছে একটু একটু করে, পায়ের চাপে পাথরগুলো বালির মত ঝরে যাচ্ছে। এই দৃশ্য ভোলা অসম্ভব। হাজার হাজার ভেড়া মারা গেছে। এখানে ওখানে হয়ত মারা গেছে মানুষও।

এই দারিদ্র্যের মাঝখানে সে যেন প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচেছে। এই পান্ডব-বর্জিত দেশের একটা স্কুলবাড়িতে সন্ন্যাসীর মতন জীবনযাত্রাও বিলাসিতা বলে মনে হয়। কলিটানা ঘরের দেওয়াল, ছোট কৌচ, রং না করা তাক, কুয়া আর সাপ্তাহিক রেশন ও জল এই সামান্য উপকরণ পেয়ে নিজেকে বিরাট বিত্তবান বলে মনে হয়েছে. কোন ইংগিত বা বৃষ্টির পূর্বাভাষ না দিয়েই এল এই তুষারপাত। এ অঞ্চলের ধারাই বেয়াড়া, এখানে বাঁচা বড় কষ্টকর। জীবন বড়ই নিরানন্দ, লোকজন যা আছে, তারাও উদাসীন, তবু ডারুর জন্ম হয়েছে এখানে। এই অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র ডারু নিজেকে নির্বাসিত মনে করে।

স্কুলের বারান্দার উপর দাঁড়াল ডারু। লোকদুটো এতক্ষণে ঢালুর মাঝামাঝি এসেছে। তাদের চেনা যায়। ঘোড়ায় চড়ে আসছে বালদুচি। বাল-দুচি পুরানো সেপাই। বহুকালের পরিচিত। সে একজন আরব দেশের অধিবাসীর হাত দুটো দড়ি দিয়ে পিচমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসছে। দড়ির একদিক বালদুচির হাতে আর তার পিছনে মাথা নিচু করে করে আসছে লোকটি। তার গায়ে ফিকে রংয়ের বিরাট জোব্বা, পায়ে পুরু ও কর্কশ পশমের মোজা ও চটি। মাথায় ছোট একটা টুপি। বালদুচি নমস্কার করল ডারুকে। ডারু যেন তা লক্ষ্যই করল না। সে যেন ওই আরবটির বেশ-ভূষা দেখতেই মসগুল। তারা এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটাকে সামলাতে হচ্ছে বারবার। কারণ, বালদুচি চায় না লোকটার আঘাত লাগুক।

নিকটে আসতেই চিৎকার করে উঠল বালদুচি, "এল আমুর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার পথ আসতেই লাগলো পাকা একটি ঘন্টা।" উত্তর দিল না ডারু। মোটা সোয়েটার পরে স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে তাকে। ওরা এগিয়ে আসছে। ডারু চুপ করে ওদের দেখছে। আরবটি একটি বারের জন্য মাথা তোলেনি। বারান্দার উপর উঠে আসতেই ডারু বল্লে, 'ব্যাপার কি! ঘরে এসে হাত সেঁকে নাও।" হাতের দড়িটা হাতে রেখে ঘোড়া থেকে নামতে খুব কসরত করতে হল বালদুচিকে। খাড়া খাড়া গোঁফের নিচে ঝিলকে উঠল বালদুচির হাসি। রোদে-পোড়া কপালের তলায় গর্তে-ডোবা দুটি চোখ আর বলিরেখাময় মুখ নিয়ে খুব দৃঢ় ও মনোযোগী দেখাচ্ছে তাকে। ঘোড়ার রাশ ধরে টেনে গোয়ালে রাখতে গেল ডারু। ফিরে এসে দেখল যে লোকদুটো ততক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্কুলে। ডারু তাদের নিজের ঘরে ডেকে এনে বল্লে, "ক্লাশ-ঘরে উনুনে আগুনের ব্যবস্থা করছি। তা হলে আর কষ্ট হবে না।" সে ক্লাশ-ঘরের উনুন ধরাবার জন্য চলে গেল। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল হাতের দড়ি ছেড়ে দিয়ে বালদুচি তার কৌচের উপর বসে। আরবটি উনুনের পাশে বসে আছে। দড়িবাঁধা হাত, মাথার টুপিটা একটু পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া। আরবটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ ডারুর খেয়াল হ'ল আরবটির ঠোঁট দুটি পুরু, মসৃণ; অনেকটা নিগ্রোদের মত। তবু খাড়া তার নাক, কালো চোখ দুটো জ্বলছে। টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া বলেই আরবের উদ্ধত কপালটা নজরে পড়ল। ঠাণ্ডার ভেতর দিয়ে এসেছে বলে তার মুখটা খুব বিবর্ণ ও বুড়োটে দেখাচ্ছে। কিন্তু বন্দী আরবটি সেই জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সোজাসুজি ডারুর মুখের দিকে তাকাল। মনে হল তার মুখের মধ্যে রয়েছে চঞ্চলতা এবং বিদ্রোহের ভঙ্গি আছে। স্কুলমাস্টার বল্লে, "ও ঘরে যাও। তোমার জন্য একটু চা তৈরী করি।" বালদুচি বল্লে. 'চমৎকার, কি আমার চাকরি! ছাড়তে পারলেই বাঁচি।' আরবী ভাষায় বন্দীকে বল্লে, "এস।" বন্দী বাঁধা কব্জিদুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্লাশ-ঘরের দিকে চলে গেল।

চায়ের সংগে একটা চেয়ার নিয়ে ক্লাশ-ঘরে ফিরে এলো ডারু। বালদুচি কিন্তু বসে আছে ছাত্রদের ডেস্কের উপর আর মাস্টারমশায়ের পড়াবার জায়গায় বসে উনুনের দিকে মুখ করে আছে বন্দী। বন্দীর দিকে চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিতে গিয়ে সঙ্কুচিত হল ডারু। ওর হাত দুটি বাঁধা। "দড়ি বোধহয় এখন খুলে দেওয়া যেতে পারে।"

বালদুচি বল্লে, "নিশ্চয়ই। আনবার সময় হাতে দড়ি বাঁধতে হয়েছিল।" এই বলে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু ডারু চায়ের গ্লাসটা নিচে নামিয়ে বন্দীর পাশে হাটু-গেড়ে বসে দড়ি খুলতে আরম্ভ করলো। নির্বাক বন্দী তার জ্বলন্ত দুটি চোখ দিয়ে দেখতে থাকল। দড়ি খোলার পর কব্জির ফোলা অংশ একটু ঘসে নিয়ে সে চায়ের গ্লাসটা হাতে করে তপ্ত পানীয়ের মধ্যে দুটি ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে চুমুক দিল।

ডারু বল্লে, "ভাল, কোথায় যাবে?" চায়ের গ্লাশ থেকে মুখ সরিয়ে বালদুচি বল্লে, "এখানে আসার জনাই এসেছি।"

"অদ্ভুত লোক। এখানেই কি রাত কাটাবে?"

"না, আমি এল আমুরে এখুনি ফিরে যাবো। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই লোকটিকে নিয়ে যেতে হবে

তিনগুইট-এর থানায়। এর তলব পড়েছে সেখানে। তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে।"

ডারুর মুখের দিকে চেয়ে বন্ধুর মত হেসে কথাগুলি বল্লে বালদুচি। স্কুল-মাস্টার বল্লে, "কি ব্যাপার! আমাকে ঠ্যাকাবে নাকি?"

"না, বাছা। এই-ই হুকুম।"

"হুকুম? আমি......" ঢোক গিললো ডারু। বুড়ো কর্সিকান সেপাইকে আঘাত দিতে তার মমতা হল। "মানে, এত আমার কাজ নয়।"

"কি? কি বল্লে? যুদ্ধের সময় মানুষকে সব রকম কাজই করতে হয়।"

"তা হলে আগে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক তারপর করব।"

মাথা নাড়ল বালদুচি।

"ভাল কথা। কিন্তু হুকুম দেওয়া হয়েছে। অবস্থা ক্রমশই পাকিয়ে উঠছে। দেখে অন্ততঃ তাই-ই মনে হয়। শোনা যাচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যেই এরা বিদ্রোহ করবে। সৈন্য তলব করাও হয়ে গেছে।"

কিন্তু ডারু অবিচল।

বালদুচি বল্লে, "কথা শোন বাপু। জানই ত তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। এল আমুরে আমরা মাত্র বারোজন আছি। বিরাট অঞ্চল পাহারা দেবার জন্য মাত্র বারোজন সেপাই। তাই বুঝতেই পারছ আমাকে এখুনি ফিরতে হবে। এই লোকটাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমার এখুনি ফিরে যাবার কথা, কিন্তু এখানে ত আর একে রাখা যাবে না। ওর গ্রামের লোক এর মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তাই তোমাকে কাল বেলাবেলির মধ্যে তিনগুইটে রেখে আসতে হবে। তোমার মত গাট্টা-গোট্টা লোক কুড়ি কিলোমিটার পথ যেতে গলে যাবে না। তারপর তোমার সব কাজ চুকে যাবে। তুমি আবার ছাত্রদের নিয়ে মাস্টারি করো।"

দেওয়ালের অন্য দিকে ঘোড়া ডাকছে, মাটিতে পা দাপছে। শব্দ আসছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে ডারু। এবার সত্যি সত্যিই আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। তুষার-ঢাকা অধিত্যকার ওপর ঝিকিয়ে উঠছে আলো। সব তুষার গলে গেলে সূর্য আবার অধিকার করবে এই পাথুরে প্রান্তর; আবার পুড়িয়ে দেবে তাকে। তাই এখন কয়েক দিন ধরে অপরিবর্তনীয় আকাশ উজাড় করে ঢেলে দেবে মানুষের সব চিহ্ন-মোছা এই বিস্তীর্ণ বিশালতার ওপর শুকনো আলো।

বালদুচির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ডারু বল্লে, "কিন্তু লোকটা আদপে কি করেছিল?" বালদুচির উত্তর দেবার আগেই সে জিজ্ঞাসা করলে, "ও কি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে?"

"না; একবর্ণও না। আমরা কয়েক মাস ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু গ্রামের লোকজন ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। ও ভাইপোকে খুন করেছে।"

"ও কি আমাদের বিরুদ্ধে?"

"আমার মনে হয় না, কিন্তু কিছুই জোর করে বলা যায় না।"

"ও কেন খুন করল?"

"পারিবারিক বিবাদ। আমার ত তাই-ই মনে হয়। একজন বোধহয় গম ধার করেছিল। তাই-ই হবে বোধহয়। ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট নয়। যাই হোক লোকটা খাঁড়া দিয়ে তার ভাইপোকে জবাই করেছে ভেড়া জবাই করার মত।"

বালদুচি জবাই করার ভঙ্গিতে হাতটা তার নিজের গলার কাছে নিয়ে আসতেই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বন্দী। আরবটির ওপর অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ডারু;—ক্ষিপ্ত হল জঘন্য হিংসায় পরিপূর্ণ সমস্ত মানুষের উপর আর মানুষের ক্লান্তিহীন ঘৃণা এবং রক্তলোলুপতার ওপর।

উনুনের ওপর কেটলিতে চা ফুটছে। ডারু আর একবার চা ঢেলে দিল বালদুচিকে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বন্দীকেও আর একবার চা ঢেলে দিল।। ব্যগ্র ভাবে চায়ে চুমুক দিল বন্দী। চা খেতে হাত তুলেছিল সে। জোব্বাটা ফাঁক হয়ে গেল। ডারুর নজরে পড়ল বন্দীর পেশী-বহুল বুক। বালদুচি বল্লে, "ধন্যবাদ। আমি চল্লাম।"

পকেট থেকে ছোট দড়ি বার করে আরবটির দিকে এগিয়ে গেল সে। রুক্ষ গলায় ডারু জিজ্ঞেস করল, "কি করছ?"

হকচকিয়ে গিয়ে বালদুচি দড়িটা দেখাল। "দরকার নেই।"

সসংকোচে সেপাইটি বল্লে, "এটা অবশ্য তোমার ব্যাপার। যা বোঝ কর। অস্ত্রপাতি আছে ত?"

"আমার শটগান আছে।"

"কোথায়?"

"বাক্সে।"

"বিছানার কাছে রাখা দরকার।"

"কেন! আমি কিসের জন্য ভয় করব?"

"তোমার মাথা খারাপ। সত্যি যদি বিদ্রোহ হয়, কেউ নিরাপদে থাকবে না। আমাদের সকলেরই এক দশা হবে।"

"আমি আত্মরক্ষা করব। এখানে আসতে দেরী লাগবে ওদের। ওরা আমার নজর এড়িয়ে আসবে কি করে?"

কথা শুনে হেসে উঠল বালদুচি। তার সাদা দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বল্লে,

"আসতে দেরী হবে না? বেশ, আমারও তাই মনে হয়েছিল। তোমার মাথা খারাপ। আমার ছেলের মত তুমিও পাগল। তাই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।"

কথা বলতে বলতে রিভলভারটা খুলে ডেস্কের ওপর রেখে দিল বালদুচি।

"এটা রেখে দাও। এখান থেকে এল আমুরে যাবার জন্য দুটো অস্ত্রের দরকার হবে না!"

টেবিলের কালো পালিসের ওপর রিভলবারটা ঝকঝক করে উঠল। বালদুচি নিকটে আসতেই চামড়া আর ঘোড়ার গন্ধ নাকে এল ডারুর।

হঠাৎ বলে উঠল ডারু, "শোন বালদুচি, আমার বড্ড বিরক্তি লাগছে। তুমি এই লোকটাকে কেন এখানে আনলে? আমি কিছুতেই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসব না। ও কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না। দরকার হলে বরং লড়াই করব।"

মুখোমুখি দাঁড়াল বালদুচি, খুব কঠিনভাবে তাকিয়ে থাকল।

"তুমি একটা আহাম্মুক। এ সব আমারও ভাল লাগে না। এত কাল পরেও তুমি একটা লোকের হাতে দড়ি পরাতে গিয়ে আংকে ওঠ। সবচেয়ে বড় কথা লজ্জা পাও। হ্যাঃ, লজ্জাই পাও, কিন্তু তাই বলে তুমি চাও ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে?"

"আমি কিছুতেই ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেবো না;" ডারু আবার বলে উঠল।

"এ হুকুম, বাছা। আমি হুকুমটাকে আর একবার বল্লাম।"

"ভাল কথা, আমার কথাও ওদের

শুনিয়ে দিও। আমি কিছুতেই লোকটাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারবো না।"

বালদুচি খুব চিন্তা করছে। একবার আরবটির দিকে আর ডারুর দিকে তাকাল সে। তারপর স্থির কণ্ঠে বল্লে—

"না, আমি ওদের কাছে গিয়ে কিছুতেই বলব না। তুমি যদি আমাদের ত্যাগ করতে চাও, কর। আমি তোমাকে কড়া কথা শোনাতে পারব না। বন্দীকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য হুকুম পেয়েছি আমি। হুকুম তামিল করছি। তুমি এই কাগজে দয়া করে সই করে দাও।"

"কোন দরকার নেই। তুমি ওকে আমার হেফাজতে রেখে গেছ—একথা আমি কিছুতেই অস্বীকার করব না।"

"আমার সঙ্গে খিটিমিটি করো না। আমি জানি তুমি সত্যি কথা বলবে। তুমি এই অঞ্চলের লোক ; মানুষের মত মানুষ। কিন্তু যা আইন তাই তো করতে হবে। তুমি সই কর।"

ডেস্ক খুলে ডারু ছোট্ট চৌকো লাল কালির দোয়াত আর "সার্জেন্ট মেজর" মার্কা কলম বার করল। স্কুলের কাজ করার সময় ডারু এই কলম ব্যবহার করে থাকে। ডারু সই করল। খুব যত্ন করে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বালদুচি।

ডারু বল্লে, "চল, তোমাকে কিছু-দূর এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"না", উত্তর দিল বালদুচি। "থাক, আর ভদ্রতার দরকার নেই। অপমান যা হবার তাত হয়েছে।"

উঠে দাঁড়াল বালদুচি। আরবটির দিকে একবার, আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, "তা হলে যাই"। হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে। পায়ে পায়ে তুষার জড়িয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালের অন্য পারে ঘোড়ার চাঞ্চল্য ভেসে এল। ভয় পেয়ে পাখা সাপটে ডাকল মোরগ। একটু পরে ঘোড়ার রাশ হাতে করে জানালার কাছে বালদুচিকে আবার দেখা গেল। একবারও ফিরে না তাকিয়ে ঘোড়া টানতে টানতে চড়াই-এর দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ ভেসে এল। ডারু এগিয়ে গেল বন্দীর দিকে। কিন্তু ওরও কোন উত্তেজনা নেই। তবু ডারুর দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নামাল না একবারও। আরবী ভাষায় ডারু বল্লে, "বস, আসছি।" শোবার ঘরে এল ডারু। দরজা পার হতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ভাবল একটু, তারপর রিভল-বারটি তুলে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেল্ল। পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা শোবার ঘরে এল সে।

কোচের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। আকাশটা ক্রমশই

তার উপর ঝ্ঁকে পড়ছে। স্তব্ধতার দিকে কান পাতল। যুদ্ধের পর সে যখন এখানে এল, তখন এই স্তব্ধতাই তাকে পীড়িত করেছে। পাহাড়ের তলায়, যেখানে মরুভূমি আর উঁচু মালভূমি ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে একটা ছোট শহরে বদলী হতে চেয়েছিল সে। শহরের পাথরে প্রাচীর, উত্তর দিকটা কালো ও সবুজ, দক্ষিণ দিকটা লালচে, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের গাছ। সেই প্রাচীর যেন শেষহীন গ্রীষ্মের সীমান্ত। কিন্তু সেখানে বদলী হতে পারেনি সে। বরং তাকে আরও উত্তরে খাস মালভূমির দিকে পাঠানোর প্রস্তাব করা হল। প্রথম প্রথম এই নিঃসাড় স্তব্ধতা আর রাশ রাশ পাথরের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়েছিল তার। মাঝে মাঝে পোড়া মাটি নজরে পড়ে। মনে হয় হাল চালানো হয়েছে বুঝি। চাষ আবাদ হবে। কিন্তু তা না। মাটি খোঁড়া হয়েছে সত্যি। তবে চাষ-আবাদের জন্য নয়। মাটি খুঁড়ে পাথর বার করা হয়েছে। এই পাথরে মজবুত বাড়ী তৈরী করা যায়। তাই হাল দেওয়া হয়েছে শুধু পাথর আবাদ করার জন্য। এখানে ওখানে খানায় খোদলে পাতলা মাটির আস্তরণ কেঁকে নিয়ে গ্রামের লোক তাদের ছোট সব্জি-বাগান লাগায়। এই হল এই অঞ্চলের চেহারা। নগ্ন পাহাড় আর পাথর দিয়ে এর চার-ভাগের তিন ভাগ গড়া। শহর গড়ে উঠেছে, বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, তারপর ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ এসেছে, পর-স্পরকে ভালবেসেছে অথবা টুঁটি টিপে ধরেছে পরস্পরের। তারপর মারা গেছে। কিন্তু এই মরুভূমিতে সে কিংবা তার অতিথি কেউ-ই কিছু নয়। কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তবু একথাও ঠিক যে, এই মরুভূমির অন্য পারে তারা কেউ-ই বাঁচতে পারে না। ডারু একথা মর্মে মর্মে বোঝে।

কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডারু। পাশের ক্লাশ-ঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই। পালিয়ে গেছে বন্দী—আরব। শুধু এই কথা ভেবেই বিশুদ্ধ আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল। এবার সে একা। আর তাকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। কিন্তু পালিয়ে যায়নি বন্দী। সে শুধু উনুন আর ডেস্কের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। খোলা চোখ ছাদের দিকে নিবদ্ধ। এই অবস্থায় তার পুরু ঠোঁটটা সবচেয়ে বিশিষ্ট দেখাচ্ছে। মনে হয় সে যেন ঠোঁট উল্টে আছে। ডারু বল্লে, "এস।" উঠে দাঁড়াল আরব। ডারুর পিছনে এল। শোবার ঘরে জানলার ধারে একটা টেবলের কাছের চেয়ারে বসতে ইংগিত করল স্কুল-মাষ্টার। ডারুর ওপর থেকে চোখ না তুলেই চেয়ারে বসে পড়ল বন্দী।

"খিদে পেয়েছে?"

"হ্যাঁ", উত্তর দিল বন্দী।

দু-জনের মত খাবারের ব্যবস্থা করল ডারু। ময়দা আর তেল দিয়ে তৈরী হবে কেক। ছোট্ট ষ্টোভটি জ্বালালো। কেকটাকে ষ্টোভের ওপর চড়িয়ে ভাঁড়ারে গেল মাখন, ডিম, খেজুর আর জমাট দুধ আনতে। কেক তৈরী হল। জানলার ওপর ঠাণ্ডা করার জন্য রেখে দিল কেক। জমাট দুধে কিছুটা জল ঢেলে ফুটিয়ে নিল। কয়েকটা ডিম ভেংগে অমলেট করতে থাকল ডারু। খাবার তৈরী করার সময় নড়া-চড়া করতেই ডানদিকের পকেটে রাখা রিভলবারটা বার বার ধাক্কা খাচ্ছিল শরীরে। ষ্টোভ থেকে পাত্রটা নামিয়ে রেখে ক্লাশ-ঘরের ভিতরে গিয়ে রিভলবারটা ড্রয়ারে রেখে এল ডারু। রাত্রি নেমে আসছে। আলো জ্বালিয়ে বন্দীকে খেতে দিল ডারু। "খাও", সে বল্লে। এক টুকরো কেক তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে থমকে গেল আরব।

"আপনি খাবেন না?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"খেয়ে নাও। তারপর আমি খাব।"

পুরু ঠোঁটটা আবার একটু ফাঁক হল। একটু ইতস্ততঃ করে খুব দৃঢ় ভাবে কেকে কামড় বসিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ হবার পর বন্দী জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই আমার বিচার করবেন বুঝি?"

"না। তুমি শুধু কাল অবধি আমার কাছে থাকবে।"

"আপনি আমার সংগে খেলেন কেন?"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

আর কথা বল্লে না বন্দী। ডারু বাইরে গেল। ভাঁড়ার থেকে একটি আরামপ্রদ চেয়ার এনে টেবল আর ষ্টোভের মাঝখানে, ঠিক বিছানার কাছে রাখল। স্যুটকেসের ওপর স্তূপ করা কাগজপত্র নামিয়ে দুটো কম্বল বার করে চেয়ারের ওপর ভাল করে বিছিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। বিছানার ওপর বসে পড়ল সে। মনে হল সবই ব্যর্থ। আর ত করণীয় কিছু নেই। হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। কোন কিছু নেই যা আবার গুছিয়ে রাখা যায়। লোকটার দিকে আর একবার তাকাতেই হয়। সুতরাং আর একবার তাকাল ডারু। কল্পনা করে নেবে যে বন্দীর মুখটা রাগে ফেটে পড়ছে। কিন্তু তাও করা গেল না। নজরে পড়ল বন্দীর কালো উজ্জ্বল চোখ আর পশুদের মুখ। আর ত কিছু নেই সেখানে।

"তুমি কেন খুন করলে?" নিজের বিরূপ কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হল।

চোখ ফিরিয়ে নিল বন্দী।

"সে পালিয়ে গেল। আমিও তার পিছু পিছু ধাওয়া করলাম।"

বন্দী ডারুর দিকে আবার ফিরে তাকাল। তার চোখে বেদনার গাঢ় ছায়া। "আমাকে নিয়ে কি করবে ওরা?"

"ভয় লাগছে?"

কাঠ হয়ে চোখ সরিয়ে নিল আরব।

"দুঃখ হচ্ছে?"

হাঁ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বন্দী। বোঝাই যাচ্ছে কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারিনি আরব। বিরক্তি বাড়তে থাকল ডারুর। সংগে সংগে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকল সে। দুটো বিছানার ফাঁকে তার বিরাট দেহ সম্পর্কে অকস্মাৎ সে খুব বেশী সচেতন হয়ে উঠল।

অধৈর্য হয়ে বলে, "ওটা তোমার বিছানা। শুয়ে পড়।"

এক চুল নড়ল না আরব। ডারুকে ডেকে আবার বল্লে, "বল্লেন, না, ওরা আমার কি করবে?"

স্কুলমাষ্টার ওর দিকে ফিরে তাকাল।

"কালকেও কি সিপাই আসবে?"

"জানি না।"

"আপনিও কি আমাদের সংগে যাবেন?"

"জানি না। কেন?"

বিছানার ওপর উঠে বসল বন্দী। জানলার দিকে পা করে কম্বলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ইলেকট্রিক বাল্বের

থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে তার চোখে। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল সে।

বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে ডারু, "কেন?"

ধাঁধানো আলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকল বন্দী। চেষ্টা করল যেন চোখ দুটো পিট পিট না করে।

"আমাদের সঙ্গে আসুন", সে বললে।

মাঝরাত অবধিও ডারুর চোখে ঘুম এল না। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে শুতে গিয়েছে ডারু; এই-ই তার অভ্যাস। কিন্তু যখনই তার মনে পড়ল যে তার গায়ে কিছু নেই, তখন অস্বস্তি হতে থাকলো। মনে হল বন্দী এখুনি তাকে আঘাত করতে পারে। মনে হল উঠে জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে থাকা ভাল। তারপরই মনে হল এসব ছেলেমানুষী। সে বালক নয়। যদি আরব তাকে সত্যিই আক্রমণ করে তবে দুই হাতে পিষে ফেলার মত শক্তি আছে তার। বিছানা থেকেই আরবকে লক্ষ্য করতে থাকল ডারু। লোকটি ঠিক আগের মতই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আলোর জন্য চোখ দুটো বন্ধ। আলো নিভিয়ে দিল ডারু। মনে হল অকস্মাৎ অন্ধকার দলা পাকিয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে জানালার কাছে রাত্রি প্রাণ পেতে আরম্ভ করেছে। নড়ে চড়ে উঠছে নক্ষত্রহীন আকাশ। লোকটি অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার চোখ দুটি খোলা। স্কুলের ওপর দিয়ে মৃদু বাতাস বইছে। বোধ হয় এই বাতাসে মেঘ কেটে যাবে। কাল সূর্য উঠবে।

রাতের দিকে বাতাসের গতি বাড়ল। মোরগ মুরগীরা বিচলিত হয়ে পাখা ঝাপটিয়েছিল কিছুক্ষণ। আরব ডারুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকল। ডারুর মনে হল আরবটি গোঙাচ্ছে। তাই অতিথির নিঃশ্বাস পতন শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকল সে। না, ভারী ও স্বাভাবিক-ভাবেই বন্দীর নিঃশ্বাস বইছে। খুব কাছে প্রবাহিত এই নিঃশ্বাসের ওঠা নামার শব্দ শুনতে শুনতে ভাবনায় জড়িয়ে পড়ল ডারু। ঘুম এল না মোটে। এই ঘরে সে প্রায় একটা বছর একলা কাটিয়েছে। একলা থাকা এখন তার অভ্যাস। হঠাৎ অন্য একটি লোকের উপস্থিতি তাকে বিব্রত করে তুলেছে। এই উপস্থিতি তার ওপর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন চাপিয়ে দিয়েছে, আতিথেয়তার প্রতি সচেতন করে তুলেছে। ডারু জানে এই বন্ধনগুলি, স্বীকারও করে নিতে পারে। কিন্তু আজকের এই বিশেষ অবস্থায় সে এই সব বন্ধন স্বীকার করতে চায় না। যে লোকগুলো একই ঘরের মধ্যে দিন কাটায়, বন্দী হোক অথবা হোক সৈনিক, তাদের মধ্যে এক ধরণের মৈত্রী গড়ে ওঠে। প্রতি রাত্রে জামা কাপড়ের সঙ্গে তারা নিজেদের ধর্মটাকে খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর বিরোধ ও বিবাদের ওপারে গিয়ে ক্লান্তি ও স্বপ্নের প্রাচীন সাম্রাজ্যে পরস্পরকে তারা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠল ডারু। না, এই সব ভাবনা আর নয়। এবার ঘুম, ঘুমের খুব দরকার।

একটু পরে এপাশ ওপাশ করল বন্দী। ডারু তখনও জেগে। বন্দী যখন আর একবার নড়ল, সতর্ক হয়ে উঠল ডারু। দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসল বন্দী। নিশি পাওয়ারা ঠিক এই ভাবেই ওঠে। বিছানায় সোজা হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। ডারুর দিকে একবারও ঘাড় ফেরাল না। ও যেন বসে বসেই বুঝতে চায় ডারু জেগে আছে কি না। ডারু কোন সাড়া দিল না। একবার মনে হল রিভলবারটা ড্রয়ারের মধ্যে আছে। মনে হল এই বারই বন্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু সে তা করল না। শুধু শুয়ে শুয়ে বন্দীকে লক্ষ্য করতে থাকল। আগের মত অতি সতর্ক হয়ে মাটিতে পা রাখল আরব। একটু থামল। তারপর মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর একটু হলেই ডারু চিৎকার করে উঠত। কিন্তু বন্দী ততক্ষণে পা টিপেটিপে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। ঘরের শেষ প্রান্তে ভাঁড়ারের দিকে যাবার দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন শব্দ না করে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেল সে। হাট-আলগা হয়ে থাকল দরজা। বিছানা না ছেড়ে ডারু ভাবল, "ও পালিয়ে যাচ্ছে। ভালই হল।" মুরগীগুলো পাখা ঝাড়ছে। বন্দী এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাল-ভূমি অবধি গিয়েছে। একটু পরে জলের শব্দ হল। ডারু বুঝতেই পারল না কোথা থেকে আসছে এই জলের শব্দ। তার কিছুক্ষণ পরেই বন্দীকে আবার দরজার কাছে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে এসে অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে। তারপর ডারু পিঠ ফিরিয়ে শুতেই ঘুম ধরে এল। তবুও ঘুমের অতল থেকে তার কানে বাজতে থাকল অতি-সতর্ক পদধ্বনি। ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে উঠল ডারু, "স্বপ্ন দেখছি, এ স্বপ্ন।" কিন্তু ঘুম ভাঙল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আকাশ পরিষ্কার। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কম্বলের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে বন্দী তখনও ঘুমাচ্ছে হাঁ করে। সে যেন ঘুমের মধ্যে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। গায়ে ঠেলা দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসল বন্দী। বিস্ফারিত চোখ দুটো ডারুর ওপর নিবদ্ধ। সে যেন ইতিপূর্বে কখনও ডারুকে দেখেনি। তার চোখে ওপছানো ভয় দেখে কয়েক পা পিছিয়ে এসে স্কুল-মাস্টার বল্লে, "ভয় কি! এই ত আমি। তোমার খিদে পেয়েছে।" মাথা নেড়ে বন্দী বল্লে, হ্যাঁ। তার মুখ ততক্ষণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু দৃষ্টি তখনও ফাঁকা ও নিষ্প্রভ।

দুজনে বিছানায় বসে কফির সঙ্গে কেক খেয়ে নিল। তারপর ডারু বন্দীকে বাথরুম দেখিয়ে দিল। ঘরে ফিরে এসে ডারু বিছানা পরিপাটি করে তুলে ঘর পরিষ্কার করল। ক্লাশ ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দার দিকে একবার গেল। নীল আকাশে সূর্য উঠেছে। উজ্জ্বল কোমল আলোয় উদ্ভাসিত জনহীন অধিত্যকা। পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কোথাও কোথাও বরফ গলছে। এখুনি হয়ত সব তুষার গলে যাবে। পাথর দেখা যাবে আবার। অধিত্যকার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ডারু তাকিয়ে থাকলো বিপুলে প্রসারিত শূন্যতার দিকে। বালদুচির কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল। সে বালদুচিকে এমনভাবে বিদায় দিয়েছে যেন সে কোনক্রমে ওদের সঙ্গে জড়িত হতে চায় না। যাবার সময় বালদুচি যে কথাগুলো বলেছিল এখনও কানে বাজছে সে কথার রেশ। আর তখুনি ডারুর মনে হল সে বড় একা, এখুনি সে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিক থেকে বন্দীর কাশির শব্দ কানে এল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডারু সেই কাশির শব্দ শুনতে বাধ্য হল। আর তাই নিজের ওপর রাগ বেড়ে গেল। একটা পাথর কুড়িয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা সাঁই সাঁই শব্দ করে তুষারের মধ্যে ডুবে গেল। ওই

লোকটার নির্বোধ অপরাধ তার কাছে জঘন্য লাগছে সত্যি; কিন্তু তাই বলে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ভীষণ অপমানের কথা। শুধু এই সম্ভাবনার কথা ভাবতেই লজ্জায় মিলিয়ে গেল ডারু। সে অভিশাপ দিল তার স্বজাতিকে। কারণ তারাই এই লোকটাকে তার কাছে পাঠিয়েছে। সে অভিশাপ দিল বন্দী আরবকে। কারণ সে নির্বোধ খুন করতে পারে কিন্তু পালিয়ে যাবার মত তার ক্ষমতা নেই। বারান্দাটা ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতে-করতে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল ডারু। তারপর ঘরে চলে এল।

সিমেন্টের মেঝের ওপর বসে দুই আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছে আরব। তার দিকে তাকিয়ে ডারু বল্লে, "এস।" বন্দীর আগে আগে ঘরের মধ্যে এসে সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট চাপিয়ে বাইরে যাবার জুতো পরে নিল ডারু। বন্দীও টুপি আর চটি পরে নিল। ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকল ডারু। তারা এল ক্লাশ-ঘরে। বাইরে যাবার পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে ডারু বল্লে, "যাও।" বন্দী নড়ল না। ডারু বল্লে, "আমি যাচ্ছি।" বন্দী বাইরে এল। ঘরে ফিরে ডারু খাবারের একটা প্যাকেট তৈরী করে নিল। ক্লাশ-ঘরে পার হবার সময় ডেস্কের কাছে এসে একটু দুর্বল হয়ে পড়ল ডারু। কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর চৌকাঠ পার হয়ে দরজায় তালা দিল। "এই দিকে", বল্লে ডারু। ওরা পুবের দিকে এগুতে থাকল। অল্প একটু যেতেই ডারু যেন শুনতে পেল তার পিছনে অস্পষ্ট পদশব্দ। থামল ডারু। স্কুল-বাড়ি একবার ভাল করে পরীক্ষা করে নিল। না, কোথাও কেউ নেই। চেয়ে থাকল আরব। কিন্তু সে কিছু বুঝেছে বলে মনে হল না। ডারু বল্লে, "এস।"

এক ঘণ্টা হাঁটার পর চুনো-পাহাড়ের খাড়া চূড়ার ধারে তারা জিরিয়ে নিল। খুব তাড়াতাড়ি তুষার গলে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন অধিত্যকা শুকিয়ে আসছে। বাতাসের মত অনুরণিত হচ্ছে যেন। আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। পায়ের তলায় মাটি বেজে উঠছে। মাঝে মাঝে এক একটা পাখির আনন্দিত চিৎকার সামনের দিগন্ত ফালা ফালা করছে। সকালের হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল। এই অতি পরিচিত বিস্তীর্ণতায় বিপুল আনন্দে অভিভূত হল ডারু। এখন গাঢ় নীল আকাশের নিচে সমস্ত পরিসর সম্পূর্ণ হলদে। আরও এক ঘণ্টা হাঁটার পর তারা দক্ষিণের দিকে মোড় নিল। এই অতি পরিচিত বিস্তীর্ণতায় তারা এসে দাঁড়াল সমতল পথের ওপর। এখান থেকে অধিত্যকা পুব দিকে আরও ঢালু হয়ে সমতলের সংগে মিশেছে। দক্ষিণ দিকে দেখা যায় কিছু পাহাড়, তাই এখনকার নিঃসর্গ কেমন অবাধ্য বেয়াড়া বলে মনে হয়।

দুই দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ডারু। দিগন্তের আকাশ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কোথাও মানুষের চিহ্ন-মাত্র নেই। বন্দীর দিকে তাকিয়ে দেখলে ডারু। তার চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। খাবারের প্যাকেটটা বন্দীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ডারু বল্লে, "ধর। রুটি, খেজুর, চিনি আছে। দিন দু'য়েক চলে যাবে। আর এই নাও এক হাজার ফ্রাঙ্ক।" বন্দী আরব খাবারের প্যাকেট আর টাকা বুকের কাছে ধরে রাখল। ও যেন বুঝতেই পারছে না এসব দিয়ে সে কি করবে। পুবের দিকে হাত বাড়িয়ে স্কুলমাস্টার বল্লে, "ওই দিকে তিনঘণ্টা। ওখানে পুলিশ-ফাঁড়ি। তারা তোমাকে ধরতে চায়।" খাবারের প্যাকেট আর টাকা বুকের কাছে ধরে পুবের দিকে তাকাল বন্দী। ডারু যেন জোর করে তার হাত ধরে দক্ষিণের দিকে ঠেলে দিল। ঠিক তাদের পায়ের নিচেই পায়ে চলা পথ। ডারু বল্লে, "ওই পায়ে পায়ে চলে চলে পথ পড়ে গেছে। এই পথ ধরে দিনভর হেঁটে গেলে সমতল ভূমির যাযাবরদের দেখা যাবে। তারা তাদের আইনকানুন অনু-সারে তোমাকে আশ্রয় দেবে।" বন্দী আরব ডারুর দিকে ভীত চোখে তাকাল। ডারু বল্লে, "কথা শোন। ভয় কিসের? আমি চল্লাম।" এই বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে স্কুলের দিকে কিছুদূর এগিয়ে আবার পিছনে ফিরে তাকাল। আরবটি ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আবার এগিয়ে গেল ডারু স্কুলের দিকে। ঠাণ্ডা মাটির ওপর নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট পরে আবার পিছনে তাকাল ডারু। আরবটি তখনও পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ডারুর গলায় কান্না যেন দলা পাকিয়ে উঠছে। অর্থ-হীনভাবে সে একবার আরবটির দিকে হাত নেড়ে হেঁটে গেল বেশ দ্রুতভাবেই। তার একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল পাহাড়ের ওপর আর কেউ নেই।

ডারু বেশ দ্বিধাদীর্ণ। সূর্য এখন আকাশের মাঝামাঝি। সামনের দিকে হাঁটতে থাকল স্কুলমাস্টার। প্রথমে বেশ দ্বিধার সংগে। পরে আর দ্বিধা থাকল না। দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেল সে। ছোট পাহাড়ের কাছে আসতেই দেখল ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে জবজব করছে। খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ে চড়তে থাকল। চূড়ার কাছে এসে হাঁফিয়ে পড়ল ডারু। দক্ষিণ দিকের পাহাড়টা নীল আকাশের গায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুবদিক থেকে ভেসে আসছে বাষ্পার্দ্র উষ্ণতা। ওই আচ্ছন্নতার মধ্যে ডারু তার বন্দীকে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

একটু পরে ক্লাশ-ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডারু দেখছিল সমস্ত উপ-ত্যকা পরিচ্ছন্ন রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু মন তার অন্য কোথাও। তার পিছনে ব্ল্যাক বোর্ডে আঁকা ফরাসী দেশের নদীর বাঁকের মুখে বেঢপ অক্ষরে লেখা ঃ "তুমি আমাদের একজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছ। এই অপ-রাধের দাম দিতে হবে।" ডারু লেখা-গুলো এইমাত্র পড়েছে। একবার আকাশের দিকে একবার উপত্যকার দিকে সে তাকাল। আর তারও ওপারে অদৃশ্য প্রান্তর সমুদ্রের কিনার অবধি এগিয়ে গেছে। এই বিরাট নিসর্গ বড় ভাল লাগে ডারুর। কিন্তু এই নিসর্গেও সে কত নিঃসঙ্গ।

অনুবাদ ঃ রাম বসু

কামু ইতিমধ্যে এই দেশে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ১৯১৩ সালে আলজেরিয়ায় কামুর জন্ম হয়। ইনিও জীবনে নানা প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে ইনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁকেও অস্তিত্ববাদী দর্শনের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকার করা হয়। ১৯৫৭ সালে এঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ১৯৬০ সালে একটি মোটর দুর্ঘটনায় এঁর মৃত্যু হয়।

অনুবাদক।

সংবাদ বিচিত্রা

॥ ইউরোপের সব চাইতে উঁচু বুরুজ ॥

প্যারিসের আইফেল বুরুজ দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে য়ুরোপের সবচাইতে উঁচু বুরুজ বলে পরিচিত ছিলো। কিন্তু মাত্র বছরখানেক আগে ষ্টকহলমের ৩২০ মিটার উঁচু সুইডিশ টেলিভেশন বুরুজ আইফেল বুরুজকে উচ্চতায় পরাস্ত করে। তবে সুইডিশ টেলিভেশন বুরুজের গৌরবও বেশী দিন টিকবে না। দক্ষিণ জার্মাণীর মিউনিকে শীগ্‌গির ইয়ুরোপের সব চাইতে উঁচু বুরুজ নির্মাণ করা হবে। এ বুরুজটি সুইডিশ টেলিভিশন বুরুজের চাইতে পাঁচ মিটার অধিক উঁচু করে নির্মাণ করা হবে। বুরুজের ভেতর ছয় তলার একটা কাঁচনির্মিত মঞ্চ থাকবে এবং মঞ্চের রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য জায়গা থেকে চার পাশের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা সম্ভব হবে। মিউনিকের পুলিশ কর্তৃপক্ষ বুরুজের সবচাইতে উঁচু মঞ্চ থেকে মিউনিকের সমস্ত ট্রাফিক অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তিনটি আধুনিক লিফট দর্শকগণকে মাটি থেকে মঞ্চে নিয়ে যাবে এবং এই মঞ্চে সবসমেত পাঁচশো দর্শকের জায়গা থাকবে। জানা গেছে যে, মিউনিকের এই টেলিভিশন বুরুজ নির্মাণ করতে প্রায় এক কোটি মার্ক ব্যয় হবে। অনেকেই এই বুরুজ নির্মাণের কাজে অর্থ নিয়োগ করতে রাজী হয়েছেন। কারণ এই ধরণের পুঁজি নিয়োগ একটা মস্তবড়ো লাভজনক ব্যাপার। স্টুটগার্টের টেলিভিশন বুরুজ মাত্র ২১১ মিটার উঁচু এবং এখানে মাত্র ১৩০ জন দর্শকের স্থান সংকুলান হয়। কিন্তু এই বুরুজ নির্মাণ করতে যে টাকা খরচ হয়েছে বছর দুয়েকের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ উঠে গেছে। নির্মাণ-কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে, মিউনিকের টেলিভিশন বুরুজের বেলায় এটা আরও অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে।

।। বিদেশিনী ।।

৯৭ বৎসর বয়স্কা একজন পোলিশ মহিলা বহুবৎসর যাবৎ ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা। ইংল্যাণ্ডে তিনিই সর্বাধিক বয়স্ক পোলিশ। তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালই আছে। কানে শুনতে বা চোখে দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। এ-উৎসাহী মহিলা জীবনে কোন দিন প্লেনে যাতায়াত করেন নি। দৈনন্দিনজীবনে যেখানে ইংরিজিভাষীদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয় সেখানে দীর্ঘকাল বাস করেও আজ পর্যন্ত তিনি একটি ইংরিজি শব্দ শেখেন নি।

॥ টেলিফোনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির উপশম ॥

দুবছর হলো হামবুর্গে একটা বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। টেলিফোনের সাহায্যে মানুষের মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ। শুধু হামবুর্গেই নয়। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরেও এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৬০-৬১ সালে সমবেত ৭০০০ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নারী-পুরুষ টেলিফোনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। এদের সকলেই নানা রকম মানসিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য কলহ অথবা সাধারণ হতাশায় ভুগছে। হামবুর্গের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন নারী-পুরুষ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। এঁদের অধিকাংশই হলেন চিকিৎসক, আইন বিশেষজ্ঞ আর ধর্মশাস্ত্রবিদ।
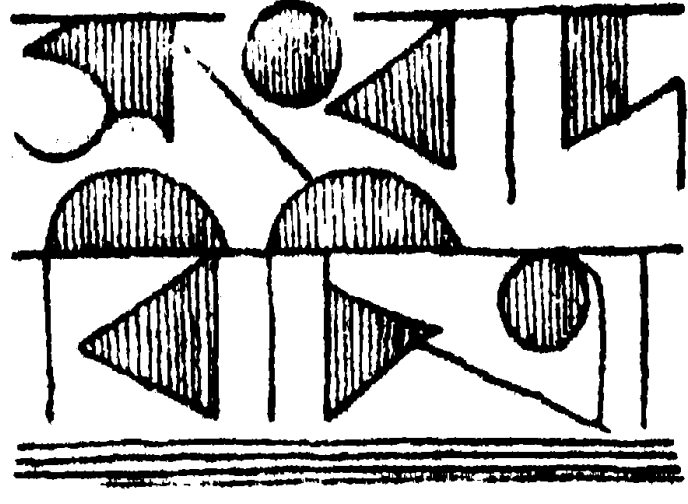
॥ য়ুরোপের বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু ॥

বৃটেনের ফোর্থ নদীর ওপর যে নতুন ঝুলন্ত ফোর্থ রোড ব্রীজ নির্মিত হচ্ছে তার জন্য ইঞ্জিনীয়ারগণ ৪০,০০০ মাইল দীর্ঘ তার দ্বারা বয়ন কার্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

সেতুটি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ১৬,০০০,০০০ পাউন্ড হতে ১৭,০০০,০০০ পাউন্ড। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মতে এটি ব্রিটেনের বৃহত্তম ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা। সেতুটি নির্মিত হলে এডিনবরা ও উত্তর স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে স্থলপথে প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

বয়নকার্য সম্পূর্ণ হতে ইঞ্জিনীয়ারগণের প্রায় দুইমাস সময় লাগবে, অবশ্য যদি আবহাওয়া ভাল থাকে। এই পথ-সেতুটি হবে য়ুরোপের এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু। ১৯৫৮ সালের শরৎকালে এসম্পর্কে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেতুটি ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সাধারণের ব্যবহারের জন্য খোলা সম্ভব হবে।

॥ বিনা পেট্রোলে আগামী দিনের গাড়ী ॥

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় য়ুরোপের একটি সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্ষুদ্র গবেষণাগারে এমন একটি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে যা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভবত আনবিক শক্তি অপেক্ষা অধিক বিপ্লব আনবে।

এই দুটি গবেষণাগারে যে অভিনব শক্তি সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে তার নাম জুস্টি গ্যাস পদার্থ এবং তার উৎসের নীতি খুবই সরল। এটি মধ্যবর্তী তাপশক্তিতে পরিবর্তিত না করে রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তির সরাসরি ব্যবহার। ব্রুনসভিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুস্টি বিশেষরূপে নির্মিত সচ্ছিদ্র ইলেকট্রোডের মাধ্যমে সংমিশ্রিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি মারফৎ এই "পরশ পাথর" আবিষ্কার করেছেন। তরল পটেশিয়াম দ্রবনকে ইলেকট্রোলাইটরূপে ব্যবহার করা হয়; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়নগুলি মিলনে সৃষ্ট জলে একটি ধনাত্মক ও অপর একটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীত-ধর্মী দুটি ইলেকট্রডকে তড়িৎ সঞ্চারিত করা হয়; ফলে কোন শক্তি অপচয় না করে এদুটি ব্যাটারীর মত কাজ করে চলে। যতক্ষণ দুটি সচ্ছিদ্র ইলেকট্রোডের একটিতে হাইড্রোজেন ও অপরটিতে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সবসময় এই ব্যাটারী কাজ করবে ও তড়িৎশক্তি সরবরাহ করতে থাকবে।

পর পর অনেকগুলি এ ধরণের ব্যাটারী সাজিয়ে, যাকে জ্বালানী পদার্থ বলা হয়, উৎপন্ন বিরাট শক্তিশালী তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক মোটর চালানো হয়। বর্তমানের ইন্টার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিনের ৩০ শতাংশ শক্তি ব্যবহার করা যায়, সেই তুলনায় নূতন শক্তির ৮০ ভাগ ব্যবহার করা যায়। এটিই এই নূতন শক্তির সুবিধা এবং এই শক্তির উৎস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সর্বত্র সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়; তাই এই 'বাস্তব জ্বালানি' পেট্রল ও ডিজেল অপেক্ষা অনেক সস্তা।

ভবিষ্যতের এই নূতন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন। এখন পৃথিবীর সর্বত্র টেকনিক্যাল উন্নতির সাহায্যে এই শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্‌ট্রোলাইট রূপে জোরালো সক্রিয় জ্বালানী মেথনেল ও ইথার ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এই দুটি থেকে অসংখ্য হাইড্রোজেন অনু নির্গত হয়ে বিক্রিয়াকে যথেষ্ট বেগবান ক'রে তুলে বিক্রিয়াজনিত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্থান সংকুলান ও হাল্কা শক্তির উৎস হিসাবে জুস্টি গ্যাস পদার্থ মহাজাগতিক রকেটযান, জাহাজ ও স্থলযানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন এই শক্তি দিয়ে মোটর গাড়ী চলবে তখন, মোটর গাড়ীর পেট্রল ট্যাঙ্কের জায়গায় থাকবে জ্বালানি পদার্থ ভর্তি হাল্কা ধাতুতে মোড়া দুটি গ্যাস সিলিণ্ডার। বাজে যন্ত্র, ক্লাচ, গীয়ার, একজস্ট, শব্দ, ধোঁয়া সেদিন থাকবে না। গাড়ী হাল্কা হবে, কম খরচে চলবে। তবে বিজ্ঞানের সাফল্যের পূর্বে আরও কয়েক বছর ধৈর্য ধরতে হবে বৈকি!

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকলো সেই পথেই। কৃষ্ণার বাবা প্রচুর সমারোহে মেয়ের বিয়ে দিলেন জামাইকে আগে থেকে বাড়ীতে এনে, বলতে গেলে আটকে রেখে। এবং ফুলশয্যার পরদিনই নিজে সঙ্গে করে দমদমে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে এলেন দার্জিলিঙের উদ্দেশে।

আদরে আর আবেষ্টনে, ঘটনার স্রোতে আর উৎসবের স্রোতে নিরুপায় ইন্দ্রনীল যেন বন্যাতাড়িতের মতই ভেসে গেল। তার বিয়েয় তার মা-ভাইয়ের কোন ভূমিকা রইল না।

কিন্তু একেবারেই কি ভূমিকা রইল না?

ভূমিকা রইল শ্রোতার, ভূমিকা রইল দর্শকের। পাড়ার মধ্যে সানাই বাজল তিন দিন ধরে। তার সুর ভেসে বেড়াতে লাগল বাতাসে বাতাসে। শুনলেন সুচিন্তা, শুনল নিরুপম।

প্যান্ডেল বাঁধা থাকল পাঁচ দিন ধরে, পাড়ার মাঝখানে। জানলা থেকেই চোখে পড়ে, না দেখে উপায় নেই, দেখলেন সুচিন্তা, দেখল নিরুপম।

অবশ্য বিয়ের আরও একটা জিনিস দেখল নিরুপম। হয়তো বা দেখেছিলেন সুচিন্তাও, তবে জিনিসটার দাবীদার বলতে নিরুপমের নামটাই ধরা যায়।

প্রতিবেশী হিসেবে কৃষ্ণার বাবা অনুপম কুটিরের বড় ছেলের নামে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। নিরুপম দেখল টেবিলে পড়ে আছে। সেই মূল্যবান কাগজে ছাপা সুদৃশ্য পত্রখানার দিকে নিরুপম তাকিয়ে থেকেছিল অনেকক্ষণ, হাতে করে তুলে নিতে ভুলে গিয়ে।

মায়ে-ছেলেয় বাড়ীর আর একটা ছেলের এই আশ্চর্য বিয়েকে কেন্দ্র করে কুশাগ্র আলোচনাও হয়নি। নিরঞ্জনের অপসরণে তবুও সামান্যতম সোরগোল উঠেছিল; ইন্দ্রনীল যেন নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল অনুপম কুটিরের আওতা থেকে।

শুধু সানাইয়ের শব্দে সুশোভন ব্যাকুল হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'বিয়ে-বাড়ীর সুর কোথা থেকে আসছে সুচিন্তা?'

সুচিন্তা আস্তে বললেন, 'পাড়ায় বিয়ে হচ্ছে সুশোভন।'

'কোথায়? কোন্ বাড়ীতে? চল না সুচিন্তা সেই বিয়ের বরকনেকে দেখে আসি।'

'বাঃ আমরা কি করে যাবো সুশোভন, আমরা কি ওদের চিনি?'

'চেন না? পাড়ার লোককে চেন না তোমরা?'

'তা' সবাইকে চিনে রাখা যায়?'

'কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় তো এমন ছিল না সুচিন্তা। পাড়ার সকলকে আমরা চিনতাম।'

'আমাদের ছেলেবেলাটা অনেকদিন চলে গেছে সুশোভন,' একটা অবোধ পাগলকে উপলক্ষ করে বুঝি নিজেকেই বললেন সুচিন্তা, 'আমাদের সব বেলাই চলে গেছে। এদের এখানে আমরা অচেনা। আমরাও কাউকে চিনি না।'

সুশোভন এ কথার উত্তরে যান না, বলেন, 'বিয়ে-বাড়ীর এই সুর শুনলে আমার বড় কষ্ট হয় সুচিন্তা! মনে হয় কে যেন কাকে ছেড়ে চিরকালের মত চলে যাচ্ছে। তোমার এ রকম মনে হয় না সুচিন্তা? তোমার মনে কষ্ট হয় না?'

সুচিন্তা সহসা খুব জোর গলায় বলে ওঠেন, 'কেন, কষ্ট হবে কেন? বিয়ে তো আহ্লাদের জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব আহ্লাদের জিনিস।'

দিন-রাত্রির লুকোচুরি খেলার মাঝখান দিয়ে কেটে গেল কটা দিন। অনুপম কুটিরের বাতাসে স্তিমিত নিস্তরঙ্গতা। এ বাড়ীতেই যে মাঝখানে কিছুদিন বাতাস উতরোল হয়েছিল, গানের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল তার স্তরে স্তরে, দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল অনেক কথা আর অনেক হাসি, সে আর এখন মনে পড়ে না।

অনুপম কুটিরের ছেলেগুলোকে চুরি করে নিয়ে পালাবার জন্যে যেন কোন মায়াবিনী যাদুকরী একটা ঝড় তুলেছিল, থেমে গেছে সে ঝড়।

কিন্তু একেবারেই কি থেমে গেছে?

মাঝে মাঝে কোথাও কোনখানে কি ওঠে না?

নির্বোধ এক পাগলের অদ্ভুত খামখেয়ালে! হয়তো ওঠে। আবার আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সংসারের বহির্দৃশ্যটা নিশ্চুপ।

হঠাৎ সুশোভন তুললেন কথাটা।

'সুচিন্তা তোমার সেই অনেকগুলো

ছেলেকে আর দেখতে পাই না কেন? কোথায় তারা গেল বল তো?'

সুচিন্তা এক মুহূর্তে সেই উত্তর-প্রত্যাশী মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারা বিদেশে চলে গেছে।'

'কেন?' সুশোভন বিরক্ত হলেন, 'সব্বাই মিলে বিলেত যাবা'র কী দরকার ছিল? এই নীতাই সব্বাইকে—'

'বিলেতে নয় সুশোভন, বিদেশে। ছেলেরা বিদেশে যায় না? তুমিও তো গিয়েছিলে দিল্লীতে।'

'হ্যাঁ আমিও তো গিয়েছিলাম দিল্লীতে। কিন্তু কেন গিয়েছিলাম বল তো?'

'বাঃ কেন আবার? চাকরী করতে।'

'চাকরী!' ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবতে থাকেন সুশোভন।

সুচিন্তা জোর দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ চাকরী! মস্ত মোটা মাইনের চাকরী। চমৎকার সুন্দর সেই অফিস-বাড়ীতে চকচকে টেবিল নিয়ে বসে কাজ করতে তুমি,' কল্পনাকে বিস্তৃত করতে থাকেন সুচিন্তা, 'ভাল ভাল পোযাক পরতে। লোকে তোমায় বলতো মুখার্জি সাহেব—'

সুশোভন মাথা নেড়ে বলেন, 'মনে পড়ছে না সুচিন্তা। তুমি আমায় দেখিয়ে দেবে?'

'দেখিয়ে দেব? কী দেখিয়ে দেব?'

'ওই যে চকচকে টেবিল, সুন্দর বাড়ী আর মুখার্জি সাহেবটাকে।'

সুচিন্তা হেসে ফেলে বলেন, 'কি করে দেখিয়ে দেব? আমি কি দিল্লী যেতে পারি?'

সুশোভন চঞ্চল আবেগের ভঙ্গীতে ব'লে ওঠেন, 'কেন পারে না সুচিন্তা? তুমি তো জানো তুমি দিল্লীতে গেলে কত ভাল লাগে আমার?'

'ভাল লাগে! কই এ কথা তো কোন-দিন বলনি সুশোভন। কখনো তো ডাকনি 'সুচিন্তা তুমি দিল্লী এস। তুমি এলে আমার দিল্লী ভাল লাগে।'

সুশোভন হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যান। ভয়ার্ত ভঙ্গীতে বলেন, 'ও রকম করে কথা বোলো না সুচিন্তা, আমার ভয় করছে।'

'ভয় করছে। কেন ভয় করছে কেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করে।' সহসা পুরনো ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে ওঠেন সুশোভন, 'বুঝতে পার না কালো কালো মেঘের মতন কী যেন মাথার মধ্যে ছুটোছুটি করে।'

'আচ্ছা আচ্ছা বলবে না।'

'বলবে না কেন? দিল্লীর কথা বলবে। ভাল দিল্লীর কথা বলবে। যে দিল্লীতে সেই আমরা কুতুবের নীচে বসে থাকি।'

'আমরা কারা সুশোভন?'

সুশোভন যেন চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেয়ে যান। থমকে থেমে থাকেন একটু, তারপর ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন, 'আমরা আবার কারা? আমরা। তুমিও সব ভুলে যাচ্ছ আজকাল সুচিন্তা।'

সুচিন্তা অকারণে খানিকটা হেসে ওঠে বলেন, 'কে বললে ভুলে যাই? এই তো মনে রয়েছে—তোমার ওষুধ খাবার সময় হলো।'

'আবার ওষুধ! ওই তোমার বড় দোষ সুচিন্তা। ওষুধ খেতে আমার বিশ্রী লাগে। ওষুধগুলো কেন যে নীতা সেই বিলেতে নিয়ে গেল না।'

'নীতা যখন নিয়েই যায়নি তখন খেয়ে ফেল।' বলে ওষুধের শিশি আর জলের পাত্রটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন সুচিন্তা।

সুশোভন সেটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমার খালি ওষুধ আর ওষুধ! ছেলেগুলো কোথায় চলে গেল খুঁজবে তো আগে!'

সুচিন্তা খুব একটা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'কেন, খোঁজবার কি দরকার? তুমি তো ওদের ভালবাস না।'

'ভালবাসি না? কে বললে ভালবাসি না? নিশ্চয় ভালবাসি', সুশোভন পর্দায় পর্দায় চড়ে ওঠেন, 'ওরা বুঝি তোমায় তাই লাগিয়েছে?'

'ওরা কেন লাগাবে। তুমিই তো ওদের দেখে ভয় পাও। ওরা যখন থাকে না স্বস্তিতে থাকো—'

সুশোভন কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'না না ওরা থাকবে। ওরা না থাকলে যে তোমার কান্না পাবে।'

'কে বলেছে কান্না পাবে? কই, কোন-দিন কি কাঁদতে দেখেছ আমায়?'

সুশোভন কয়েক গজ পায়চারি করে নিয়ে কাছে এসে বলেন, 'কি করে দেখব? তুমি তো রাত্তিরে কাঁদো। আমি কি তোমায় রাত্তিরে দেখতে পাই?'

সুচিন্তার অবিচলিত থাকার চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়। কণ্ঠে বিচলিত সুরের আভাস। 'দেখতে পাও না তো—রাত্তিরে আমি কাঁদি, এ কথা তবে কি করে জানলে?'

সুশোভন আবার সেই রকম দ্রুত খানিকটা পায়চারি করে এসে বলেন, 'জানবো না? তুমি কাঁদবে আর আমি জানবো না? সেই যখন তুমি কোথায় যেন থাকতে, আমি দিল্লীতে। দেখতাম নীতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে জানলায় দাঁড়াতাম, আর দেখতে পেতাম তুমি কাঁদছ।'

সুচিন্তা আরও আস্তে বলেন, 'কোথায় বসে কাঁদতাম আমি?'

'বসে? বসে তো নয়। দাঁড়িয়ে যে। অনেক দূরে কোনখানে যেন একটা জানলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে, আকাশ

থেকে চাঁদের আলো এসে তোমার মুখে পড়ত, আর সেই আলোতে আমি দেখতে পেতাম তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা মুক্তোর মত জল। বল সত্যি কি না?'

সুচিন্তা বলেন, 'সে সুচিন্তা তো মরে গেছে সুশোভন!'

'না না!' সুশোভন চেঁচিয়ে ওঠেন, 'মিছিমিছি মরার কথা বলে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ তুমি আমায়। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ সুচিন্তা।'

সুচিন্তা বলেন, 'কেমন-ই তো আমি হয়ে গিয়েছিলাম সুশোভন। পৃথিবীতে যে 'হাসি' আর 'কান্না' বলে দুটো জিনিস আছে সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

হ্যাঁ সত্যিই তাই বৈকি।

আবেগের তীব্র যন্ত্রণায় যে কাঁদতে হয় এ কথাটা কি মনে ছিল সুচিন্তার? সুস্থ মস্তিষ্কতার পরিচয় দিতে কত কী-ই যে ভুলতে হয় মানুষকে। 'আমি সুস্থ, আমি স্বাভাবিক,' এইটুকু জাহির করতে কত না দায় পোহানোর দায়।

কিন্তু পাগলের কোন দায় নেই।

তাই সে যা ভোলে তা ভোলেই। যা ভোলে না, তাকে চাপা দেবার তিলমাত্র চেষ্টা করে না। আর বোধকরি কোনও একটা কথা যদি তার মাথায় ঢুকে পড়ে তো সহজে আর বেরোতে চায় না, অবিরতই সেখানে পাক খেতে থাকে।

তাই যে সুশোভন ঘুমের ওষুধের প্রভাবে সারারাত প্রায় অচেতন হয়ে ঘুমোন, তিনি কেমন করে মাঝরাত্তিরে উঠে অমন পা টিপে টিপে একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে এসে ঢোকেন!

অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু তেমন তীক্ষ্ন দৃষ্টি যদি কাছাকাছি কোথাও থাকতো তো দেখতে পেত সুশোভনের চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল, মুখ কী যেন এক সাফল্যের আভায় উদ্ভাসিত।

সুচিন্তার ঘরও অন্ধকার।

আর এই ছোট ঘরটায় বেড্-সুইচও নেই। তাই সহসা আলো জ্বালা গেল না। সহসা কিছু দেখতেও পেলেন না সুচিন্তা। শুধু কপালে, গালে একটা ভারী হাতের স্পর্শ পেলেন! সেই হাত যেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করতে চাইছে সুচিন্তার গালের ওপর মুক্তোর মত জলের ফোঁটা লেগে আছে কি না।

'কে, কে! কী কী! কী হয়েছে?' স্পর্শটাকে ঠেলে দিয়ে, গায়ে কাপড় টেনে ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বাললেন সুচিন্তা! দেখলেন বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পাগলটা অদ্ভুত একটা কৌতুকের হাসি মুখে মেখে।

হঠাৎ মনে হল সুচিন্তার, সুচিন্তার ঘুমের অবসরে কেউ যদি সুচিন্তাকে খুন করতে আসত, তার নিঃশব্দ ভঙ্গীটা বোধকরি এমনিই হত। চাপা তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এভাবে উঠে এসেছ যে? হয়েছে কী?'

পাগল ফিস ফিস করে বলে, 'ধরে ফেলতে এসেছিলাম তোমায়। দেখতে এসেছিলাম কাঁদছ কি না।'

'ছি ছি! ঘুম ভেঙে এভাবে চলে আসতে আছে? যাও নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে। ঘুমিয়ে পড়গে।'

পাগল এ কথায় কর্ণপাত করে না।

নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরিয়ে রেখে বলে, 'কেমন ধরে ফেললাম তাতো বলছ না? বড্ড যে চালাকি হচ্ছিল কাঁদ না বলে। এই যে দেখলাম গাল ভিজে, মুখ ভিজে।'

'আচ্ছা আচ্ছা মুছে ফেলছি। তুমি চলো সুশোভন, চলো তোমায় শুইয়ে দিয়ে আসি।'

সুশোভন এদিক ওদিক চেয়ে বসবার কোন জায়গা দেখতে না পেয়েই বোধকরি পরম নিশ্চিন্তভাবে বিছানাটায়ই একধারে গুছিয়ে বসে পড়ে বলেন, 'এখন আমার ঘুম পাচ্ছে না সুচিন্তা। এখানে বসতে ইচ্ছে করছে। বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার ইচ্ছে করছে না, আমার ঘুম পাচ্ছে—' সুচিন্তা পাগলকে শাসন করতে ঈষৎ কঠিন সুরে বলেন, 'ঘুমের বিঘ্ন হলে আমার শরীর খারাপ হয়। ওঠ, নিজের জায়গায় শোবে চল।'

'না সুচিন্তা—' সুশোভন শিশুর

সেই হাত যেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করতে চাইছে......।

আবদারের ভঙ্গীতে বলেন, 'না না! তুমি আজ ঘুমোতে পাবে না। দেখ না কত মজার মজার গল্প বলবো তোমায়।'

'সুশোভন তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ওঠ চল। শোনো, রাত্তিরবেলা এমন করে আসতে নেই, গল্প করতে নেই বুঝলে?'

'নেই?'

'না না! ওঠ, শীগ্‌গির চল নিজের বিছানায়। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে আমার।'

সুশোভন আস্তে আস্তে উঠে পড়েন।

ম্লানভাবে বলেন, 'কিন্তু আগে তো তোমার এত ঘুম পেতো না সুচিন্তা? যখন জানলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে, তখন তো কত রাত কেটে যেত, ঘুমুতে না তো?'

'এখন আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে যে।'

'শরীর খারাপ হয়ে গেছে!' সুশোভন চমকে উঠে বলনে, 'তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে—আর যত ওষুধ সব আমাকেই খাওয়ায়। ইস্ এই তো তুমি রোগা হয়ে গেছো।'

একান্ত স্নেহে সুচিন্তার গালের উপর হাত বুলিয়ে রোগত্বটা পরীক্ষা করে নেয় কান্ডজ্ঞানহীন পাগলটা।
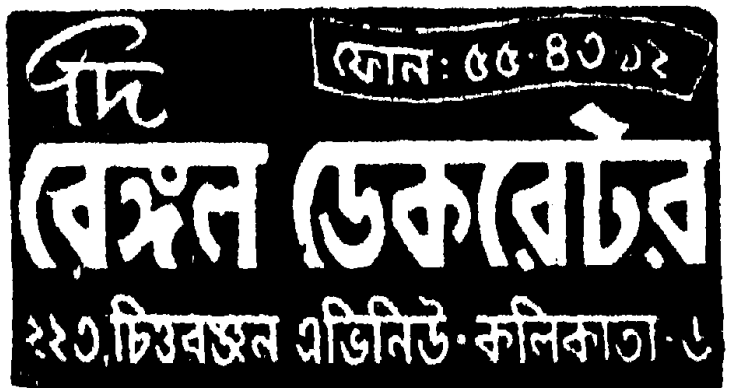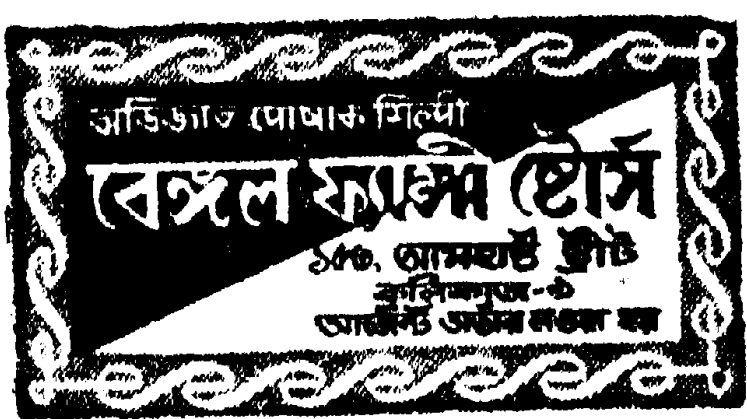
'সুশোভন!' সুচিন্তা হতাশ ভাবে বলেন, 'মাঝে মাঝে তো মনে হয় তুমি বুঝি সেরে উঠছ! তবে আবার—'

'সেরে ওঠা মানে কি সুচিন্তা?' পাগল বিরক্ত স্বরে বলে, 'আমার কিছু অসুখ করেছিল না কি? তোমরাই শুধু পাগলের মত খালি খালি ওষুধ খাওয়াও আমায়। আর খাব না। এই তো আজ খাইনি—' বাহাদুরী আর কৌতুকে উদ্ভাসিত মুখে কথা শেষ করেন সুশোভন, 'রাত্তিরে ঘুমোবার আগে তুমি যে ট্যাবলেটটা দিলে, আমি চালাকী করে মুখে ভরে রেখে তোমার অজানতে এক সময় ফেলে দিলাম।'

'ফেলে দিলে!'

'দেবই তো! তুমি খালি আমায় ওষুধ খাওয়াবে কেন?'

সুচিন্তা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওই উদ্ভাসিত মুখের দিকে। ওষুধটা পেটে যায়নি। তাই বোধকরি এই অনিদ্রা, এই স্নায়ু-চাঞ্চল্য। সম্প্রতিকার ওই নতুন ওষুধটাই ঘুম পাড়িয়ে পাড়িয়ে পাগলের চঞ্চল স্নায়ুকে সুস্থির করে আনবার সাধনা করছে। ওষুধটাকে নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গেলে সুফল আসবেই, এই হচ্ছে ডাক্তারের অভিমত। সুশোভন আজ ওষুধ খাননি, ফেলে দিয়েছেন। সুচিন্তার আরও অবহিত হওয়া উচিত ছিল।

'সুশোভন! আর কোনদিন এরকম কোর না।'

'কি রকম করব না?' [illegible]

'এই ওষুধ ফেলে দেওয়া, রাত্রে না ঘুমিয়ে এখানে এসে আমার ঘুম ভাঙানো—'

'তুমি রাগ করছ সুচিন্তা?' সুশোভনের মুখে অপরাধীর আর্ত ভঙ্গী।

সুচিন্তা বোধকরি পাগলকে নিবৃত্ত করতেই বলতে যাচ্ছিলেন 'হ্যাঁ রাগ করছি—' কিন্তু পারলেন না। ওই বোধহীন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতি ধিক্কারে অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়ে উঠল।

নিজেকে সামান্য একটু অস্বস্তির আঘাত থেকে বাঁচাতে ওই অবোধ বিশ্বস্ত প্রাণটুকুতে আঘাত হানবেন সুচিন্তা? সুচিন্তা এত স্বার্থপর?

'রাগ করবো কেন?' হেসে উঠলেন সুচিন্তা, 'আমার যে ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। চলো, তোমায় শুইয়ে দিয়ে এসে অনেক ঘুমোই।'

'কেন আমাকে শুইয়ে দিয়ে এসে কেন?' সুশোভন দৃপ্তস্বরে বলেন, 'আমি কি কচি ছেলে? তার চাইতে তুমিই বরং শুয়ে পড় সুচিন্তা, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। খুব ভাল ঘুম আসবে।'

'খুব ভাল ঘুম আসবে? খু-ব ভাল ঘুম?' হঠাৎ এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কন সুচিন্তা, 'যে ঘুম আর কখনো ভাঙবে না? পারো সুশোভন, তেমন ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো? গ্যারান্টি দাও সেই ঘুম এনে দেবে আমার জন্যে, তা'হলে তোমার কোলে মাথা রেখে শুই।'

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না সুচিন্তা। অমন করে কথা বোলো না তুমি।'

'বলব না! তাই বটে। কিন্তু মুস্কিল কি জানো, কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমার ঘুম আসে না।'

'ঘুম আসে না।'

'না।'

'আশ্চর্য! আর আমার কি মনে হয় জানো সুচিন্তা? তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে খুব আরামে ঘুমিয়ে পড়তে পারি আমি। কিন্তু তুমি তো কই তা দাও না।'

'আচ্ছা দেব! অন্য একদিন দেব। আজ অমনি শোবে চল সুশোভন।

'অন্যদিন কেন আজই।' হঠাৎ একটা একগুঁয়ে জেদের ভঙ্গীতে আবার ঝুপ করে বিছানায় বসে পড়েন সুশোভন, আর রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে নিজস্ব পদ্ধতিতে অনেকক্ষণ ধরে হাহা করে হেসে নিয়ে বলে ওঠেন, 'নড়াও তো দেখি? দেখি কেমন তোমার গায়ের জোর?'

'না, গায়ের জোর সুচিন্তার বেশী নেই। কোনকালেই ছিল না। কিন্তু

মনের জোর? সেটা বোধকরি গায়ের জোরের বিপরীতেই চলে। সকলের ক্ষেত্রে কি না কে জানে, কিন্তু সুচিন্তার ক্ষেত্রে সেটা সত্য। অপরিসীম মনের জোর না থাকলে পাগলের বেদম হাসির শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে উঠে আসা 'বড়ছেলের' বিস্ময়াহত দৃষ্টির সামনে অত সহজ হয়ে বসে থাকতে পারলেন কি করে সুচিন্তা।

আর শুধুই তো বসে থাকা নয়, মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়েও দিতে হয়েছে একগুঁয়ে পাগল মানুষটার।

মা, নিরুপম কিছু বলেনি।

শুধু উঠে এসে একবার দরজার বাইরে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একবার বললেও হয়তো ঠিক বলা হয় না, বলা চলে একমুহূর্ত। পরক্ষণেই নিঃশব্দে সরে গেল সেই ছায়া। সুচিন্তা চোখ তুলে দেখেছিলেন, চোখের পলক না ফেলতে ছায়ার মিলিয়ে যাওয়াও দেখলেন।

কিন্তু নিরুপম কি এতটুকু প্রশ্ন করতে পারত না? সামান্যতম একটু বিস্ময় প্রশ্ন। মায়ের উপর এটুকু দয়া করা কি একেবারেই অসম্ভব ছিল?

সুচিন্তার বড়ছেলে তো উদার মহৎ মার্জিত। তাদের বাড়ীতে এসে পড়া, ঘাড়েপড়া পাগলটার জন্যে তো অনেক করে সে। নিরুপমের উপর বাপের ভার দিয়ে রেখে নাকি নীতার মত বুদ্ধিমতী মেয়েও নিশ্চিন্ত। জানে পাগলটার উপর করুণা আছে সুচিন্তার বড়ছেলের।

আশ্চর্য এককণাও করুণা নেই তার শুধু নিজের মার উপর।

নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন সুচিন্তা, তুচ্ছতম একটু প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তো মহৎ হয়ে উঠতে পারতো নিরুপম, পারতো সুন্দর হয়ে উঠতে। 'কি হল, ব্যাপার কি?' শুধু এইটুকু।

কিন্তু মানুষের মন বড় দীন, বড় কৃপণ!

ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি মুঠোর মধ্যে থাকতেও দৈন্যটাই পরম আদরে বেছে নেয় সে!

স্তব্ধ হয়ে বসে বাকী রাতটা শুধু মানুষের এই ইচ্ছাকৃত দৈন্যের রহস্যটাই ভাবতে থাকলেন সুচিন্তা।

রাত্রের ঘুমের বিঘ্নর প্রতিক্রিয়ায় অনেক বেলা অবধি ঘুমোলেন সুশোভন। আলো জ্বলেছিল সেই বাকী সারারাত। ভোরবেলা নিভিয়ে দিয়ে চলে এলেন সুচিন্তা। চলে এলেন একেবারে স্নানের ঘরে। অনেক অনেকক্ষণ ধরে স্নান করতে লাগলেন। সুচিন্তার ঘরের দরজার আধসরান পর্দাটা যেমন ছিল তেমনিই থাকল।

ঝি লক্ষ্মীর মা যথারীতি ন্যাতা-বালতি নিয়ে ঘর বারান্দা মুছতে এসে সেই আধসরানো পর্দার পাশ দিয়ে ছোট্ট ঘরটার সরু খাটের বিছানায় একটা ওজনে ভারী বড়সড় মানুষকে পড়ে ঘুমতে দেখে 'থতিয়ে' গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর তার মুখে ছুরির আগার মত ঝিকঝিকে আর সূক্ষ্ম একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। আর... তারপর যথারীতি হাত চলতে লাগল ঘসঘস শব্দে।

সুবল চায়ের জল নিয়ে দোতলায় উঠল, ট্রেটা টেবিলে নামাল, কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে টেবিলটা মুছল, তারপর ঘরে দাঁড়াতেই পাথর হয়ে গেল।

পাথর হবারই কথা।

কোন পরিকল্পিত ঘর বদলাবদলি নয়, রাত্রে পাগলাবাবুর শোবার পরও সুবল সে ঘরে খাবার-জল রেখে গেছে, মশারী গুঁজে দিয়ে গিয়েছে।

না সুবলের মুখে হাসির ঝিলিক খেলল না। কালো মুখটা তার আরও কালো হয়ে উঠল আর মুখের পেশী-গুলো কোন এক কল্পিত সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠল।

অনুপম কুটির ছাড়াও অনেক বাড়ী আছে কলকাতা শহরে। তা যদি না থাকে 'দেশ' বলে একটা জায়গা আছে সুবলের।

ইন্দ্রনীলের চা করতে হয় না আর। করতে হয় না নিরঞ্জনেরও। শুধু নিরুপম। এ সময় সে তো রোজই খবরের কাগজখানা হাতে করে বারান্দার কোণে পাতা ওই একক চেয়ারটায় বসে থাকে। কিন্তু আজ সে চেয়ার শূন্য পড়ে।

সুবল কালো কয়লার মত কঠিন-মুখে ইন্দ্রনীল আর নিরঞ্জনের খালি ঘর দুটো পার হয়ে নিরুপমের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়েই থাকল কিছুক্ষণ।

দেখল সে ঘরটাও খালি।

অবাক হয়ে দেখল বিছানার চাদর-খানা কুঁচকে বাঁকা হয়ে বিছানা থেকে ঝুলে মাটিতে লুটোচ্ছে। ইন্দ্রনীল থাকতে তার ঘরের দশাটা সাধারণতঃ এই রকমই ছিল, কিন্তু নিরুপমের ঘরে এমন কুদৃশ্য সুবল অন্ততঃ দেখেনি কখনো। ঘুম থেকে উঠে বিছানা ঝেড়ে, ঘরের সামান্যতম অগোছালো অবস্থা-টুকুও গুছিয়ে তবে ঘর থেকে বেরোয় নিরুপম।

তাহলে নিরুপমও চলে গেল।

অন্ততঃ সুবল তাই ভাবল।

হঠাৎ ক্রুর একটা ভঙ্গী ফুটে উঠল সুবলের মুখে। সে পর পর তিনটে ঘরের সব জানলা দরজাগুলো খুলে দিল আর তাদের সামনের দরজার পর্দা সরিয়ে দুটো কপাটই দু-হাট করে রেখে নীচে নেমে গেল দ্রুতপায়ে।

পাশাপাশি তিনখানা শূন্য ঘর একটা দুঃশোর মত হাঁ হাঁ করতে লাগল, আর প্রথম সকালের লাজুক রোদ যেন জানলা দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে এসে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল সেই দৃশ্য। (ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ মুঘল মিনিয়েচার চিত্রকলা ॥

মুঘল চিত্রকলার কিছু কিছু নিদর্শন ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে হয়তো অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সংগ্রহশালার বাইরে কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির পারিবারিক সংগ্রহে মুঘল চিত্রকলার যে-সব সম্পদ সংরক্ষিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে খুব কম লোকের। কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে মুঘল চিত্রকলার অনেকগুলি দুর্লভ সম্পদ দর্শনের সেই সুযোগ করে দিয়েছেন সম্প্রতি। এর জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে যে ৮০ খানি চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলি মুঘল মিনিয়েচার চিত্রের অন্তর্গত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই চিত্রকলার জন্ম এবং বিকাশের ধারা অব্যাহত ছিল।

মহানুভব সম্রাট আকবর ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির দরদী বন্ধু। তিনি ভারতের তৎকালীন প্রায় সকল শিল্পকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর দরবারে। গুজরাট ও রাজপুতনার শিল্পীরাও ছিলেন আমন্ত্রিতের দলে। আকবরের এই দরবারে রাজস্থানী ও পারস্যশৈলীর সংমিশ্রনে গড়ে ওঠে মুঘল চিত্রের বৈশিষ্ট্যময় ধারা। মিনিয়েচার চিত্রগুলি ছিল সেই যুগের মুঘল সম্রাট, মুঘল দরবার ও অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গ পরিচয় বহনকারী সূক্ষ্ম রেখা আর রংয়ের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক শিল্পরূপ, যা গুজরাটি বা রাজস্থানী শৈলী থেকে সত্যিই পৃথক। রাজস্থানী চিত্র-শৈলীর মুখাবয়বের আইডিয়ালাইজড টাইপ-এর একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তির জায়গায় মুঘল চিত্র-শৈলী আমাদের স্বাতন্ত্র্যধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্ত মুখাবয়বের সন্ধান দিতে সক্ষম হল। মুঘল মিনিয়েচার চিত্রেও এই শিল্প-দৃষ্টি ও নিপুণ কলা-কৌশল নিষ্ঠা ও সততা সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে।
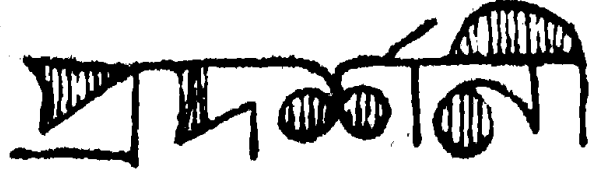
সম্রাট আকবরের পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে মুঘল চিত্রকলার গৌরবময় যুগ রূপে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর সময়েই রেখার সৌন্দর্যে, কমনীয় বর্ণ-প্রলেপনে মুঘল চিত্রকলা আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন, পশুপক্ষী প্রীতি, শিকার-প্রীতি সব কিছুকে ভিত্তি করেই শিল্পীরা সৃষ্টি করেন অসংখ্য মিনিয়েচার চিত্র। তাঁর সময় সবচেয়ে বড় শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ মনসুর।

শাহজাহানের সময় আমরা স্থাপত্য শিল্পের যে উন্নত রূপ দেখেছি, চিত্রকলায় কিন্তু তেমন উন্নততর রূপের সন্ধান পাইনি। যদিও ঐ সময়কার মুঘল চিত্রের রং, রেখা, অলংকৃত রূপ— সব দিকেই শিল্পীদের প্রখর দৃষ্টির পরিচয় মিলবে,—তবু চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাসে একটু অনমনীয় কর্কশতাও পরিলক্ষিত হবে। শাহজাহানের সময় প্রতিকৃতি, দরবার-দৃশ্য ও অজস্র দরবেশের চিত্র অংকিত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের আমলে তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মুঘল চিত্রের ঐতিহ্য ম্লান হয়ে গেল। দরবার আর চিত্র-শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হল না। ফলে বিভিন্ন শিল্পী পাটনা, লক্ষ্ণৌ, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিজাত

মা ও ছেলে

সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দিল্লীতে শুধু শিল্প-চর্চা অব্যাহত রইল হারেমের মধ্যে। অন্ততঃ হারেমের দৃশ্যাবলীই শিল্পীরা মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মুঘল চিত্রকলায় এইভাবে ধ্বনিত হল অবক্ষয়ের সুর। পরে এই ধারাকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি।

এই ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে আমরা অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রদর্শিত মুঘল চিত্রকলা বিচার করে দেখতে পারি। বারাণসীর বিখ্যাত শাহ পরিবারের শ্রীসীতারাম শাহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট-পরিবারের পলাতক যুবরাজ জাহান্দার শাহের নিকট থেকে যে বিপুল সংখ্যক মুঘল চিত্রকলা হস্তগত করেন তার থেকে লেডি রাণু মুখার্জি বাছাই করে এই মিনিয়েচার চিত্রগুলি প্রদর্শনের জন্য নিয়ে এসেছেন কলকাতায়।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে দুই শতাব্দী ব্যাপী অঙ্কিত মুঘল চিত্রের নিদর্শন স্থান পেয়েছে। সবগুলি যে প্রতিনিধিত্বমূলক এমন কথা বলা যায় না। আকবরের আমলের চিত্রের মধ্যে 'হস্তীর অশ্ব আক্রমণ' (২৫), 'ম্যাডোনা ও শিশু' (৪০), 'সিংহ শিকার' (৪৫), 'হস্তীশিকার' (৫৮) প্রভৃতি চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। এইসব চিত্রে পারস্য ও চৈনিক চিত্র-রীতির স্পষ্ট প্রভাব আছে। একটিতে ইউরোপীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা গেল (৪০)। পারস্য প্রভাব ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৮, ৩৭, ৪১, ৭০ নম্বর চিত্রেও পরিস্ফুট।

জাহাঙ্গীরের আমলের যে চিত্রগুলি এখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলির কয়েকখানি সত্যি প্রতিনিধিত্বমূলক। এর মধ্যে 'জাহাঙ্গীরের দরবার' (১১), 'একজন নারী' (৩৪), 'কবীর সাহেব' (৩৭), 'রাজা মান সিং' (৩৯), 'জাহাঙ্গীরের শিকার-তাঁবু' (৪৭) ও 'রথ' (৭২) খুবই উল্লেখযোগ্য রচনা।

শাহজাহানের সময়কার 'নৌকা-বিহার' (৫০), 'ইউরোপীয় দূতাবাস' (৫১), 'দরবার-দৃশ্য' (৫৯), 'দারাশিকোর বিবাহ-শোভাযাত্রা' (৬৩) প্রভৃতি চিত্রগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ মুঘল জীবনধারা অপূর্ব সুষমায় বিধৃত করেছেন দরবারের শিল্পীদল।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে মুঘল চিত্রের যে অবক্ষয় রূপ ফুটে ওঠে তার অনেকগুলি নিদর্শন আছে এই প্রদর্শনীতে। পাটনা কলমের 'মীর কাশিম' (৫), লক্ষ্ণৌ কলমের 'হিন্দু রাজা' (৬), 'নবাব এনায়াতুল্লাহর দরবার' (৮) ও দিল্লী কলমের 'প্রসাধনরতা রাণী চন্দ্রাবতী' (১৩) প্রভৃতি চিত্রগুলি এরি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জোছনারাতের প্রেম

প্রদর্শিত ৮০ খানি চিত্রের মধ্যে মাত্র ২২ জন শিল্পীর নাম উদ্ধার করা গেছে। এ-ছাড়া কতকগুলি চিত্র কখন কোন সম্রাট-পরিবার বা ব্যক্তির কাছে ছিল তারও সীলমোহর অঙ্কিত আছে চিত্রের গায়। সব দিক বিচার করেই বলা যায়, এই প্রদর্শনীর আয়োজন ইদানীংকালের স্মরণীয় ঘটনা। ঐতিহাসিক মুঘল যুগের কলা-নৈপুণ্য আর তার অন্তরঙ্গ পরিচয় এমন করে আর কোথায় পাবো আমরা?

প্রদর্শনীটি গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে সকলের জন্য খোলা ছিল। আমরা এই প্রদর্শনীটি দেখে খুশি হয়েছি।
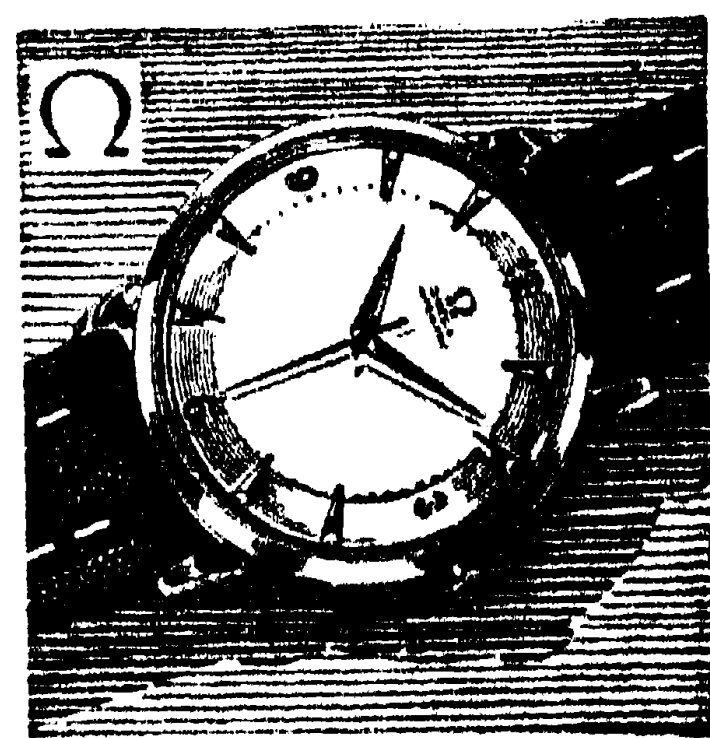
ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

স্বার্থবাহ

জার্মান কবিতা :

।। তন্ময়তা ও প্রাচুর্য ।।

যদিও এ-যুগের একজন মনস্বী, সর্বজনস্বীকৃত কবি-সমালোচক জগৎ-রাজ্য বন্টন ক'রে দিয়েছেন তা'র মাত্র দুই ন্যায্য অংশীদার, ইংরাজ সেক্সপীয়র ও ইতালীয় দান্তের মধ্যে এবং জানিয়েছেন যে উক্ত সম্পত্তির কোনও তৃতীয় ভাগীদার নেই, তবু এ মীমাংসাকে সন্তোষজনক করতে তৃতীয় একজনের দাবী পেশ করার প্রলোভন অনাতিবিদগ্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই অশোভন নয়। জার্মান গোয়্‌তের পক্ষে ওকালতি করার জন্য উদগ্রীব হওয়া এক্ষেত্রে অনেক প্রত্যয়ীর কাছেও অপ্রেয় বিবেচিত হবে না বোধহয়। য়ুরোপীয় কৃষ্টির শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কদাচ অবিবেচক, এর্নস্ত রোবের্ত কুর্তিয়ুস যখন গোয়্‌তে প্রসঙ্গে বলেন যে যে-য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বীর্যবান হোমর, তা'র শেষ বিশ্বজনীন সেবক গোয়্‌তে, তখন মনে হয় খৃষ্টীয় জগৎ-সম্পত্তির তৃতীয় দাবিদার সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন একটি বক্তব্য উচ্চারিত হ'ল। আরও আশ্বস্ত বোধ করা যায় প্রখ্যাত 'ফা উ স্ত'-অনুবাদক, উনিশশতকী মার্কিণ, বেয়র্ড টেলরের 'আন গোয়্‌তে' শীর্ষক প্রশস্তিতেও অনুরূপ বক্তব্যের আওয়াজ পেয়ে : 'তুমি (গোয়্‌তে) সেই সহস্রস্বর বীণায় নূতন ঝঙ্কার তুলেছিলে যা একদা সেক্সপীয়রের, একদা হোমারের আয়ত্তে ছিল।' দান্তে, সেক্সপীয়র ও গোয়্‌তে : য়ুরোপীয় চৈতন্যের রাজ্য ভোগদখলের বাঁটোয়ারায় এই তিনটি নামের সমাবেশ শুধু ন্যায্য নয়, ঐতিহাসিক অর্থেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মধ্যযুগ ও তারপর রেনেসাঁস-পর্যায় পার হ'য়ে এসে মানসিকতার যে-উর্দ্ধতন, সেই 'আধুনিকের' পত্তনিতে গোয়্‌তের বীতনিদ্র সাধনা তাঁকে 'তৃতীয়' এক অনন্যতায় ভাস্বর করে নিঃসন্দেহে। এবং সেই সাধনা ছিল এতো গভীর, তীব্র ও উচ্চাঙ্গ যে এখন, শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে, আধুনিক জার্মান কবিতার রূপরেখা নিরূপণে গোয়্‌তের ও তার সমকালীন জার্মান কাব্যের কীর্তিকলাপ নিয়তগ্রাহ্য, মূল্যবান এক অবতরণিকা হিসাবে উপস্থিত হয়। জার্মান রোমান্টিকতার ফলপ্রসূ আদান্ত যেমন এই অবতরণিকার অন্তর্ভুক্ত, তেমন রোমান্টিকতার পরবর্তী বৃহত্তর ও জটিলতর জার্মান কাব্যচর্চার আধুনিককালীন পরিপ্রেক্ষিতও এর কাছে অন্বয় যাচ্ঞা করে। গেয়র্গে, রিল্‌কে, হফমানস্তাল, বেন ও ব্রেখতের অবদানে যে-আধুনিক জার্মান কাব্যের সমৃদ্ধি, তা'র বিকাশের কার্যকরী উপকরণ ও ধর্ম ঐ গোয়্‌তীয় যুগ থেকে এতো স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়েছে, এমন দীর্ঘায়ু এক পথনির্দেশে ও সঙ্গত আবেগে সে-যুগ এ যুগকে চিহ্নিত করেছে, যে রোমান্টিকতার উক্ত মুখবন্ধ বাদ দিয়ে জার্মান কাব্যের বর্তমান অধ্যায়ে প্রবেশ ভ্রান্তিকর, যদি-না দুঃসাধ্য। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল ধ'রে ব্যায়িত গোয়্‌তের একার সৃষ্টিশীলতা, এবং তাঁর সমকালীনদের ও উত্তরপুরুষদের কার্যকারিতায় অতিক্রান্ত আরও এক অর্ধ-শতাব্দী, এই দুইয়ে মিলে যে-সফলতম কবিতার শতাব্দী, তা' আধুনিক জার্মান কবিতার প্রত্যক্ষ ভিত্তিভূমি ত' বটেই, কাঠামোরও অব্যর্থ কিছুটা।
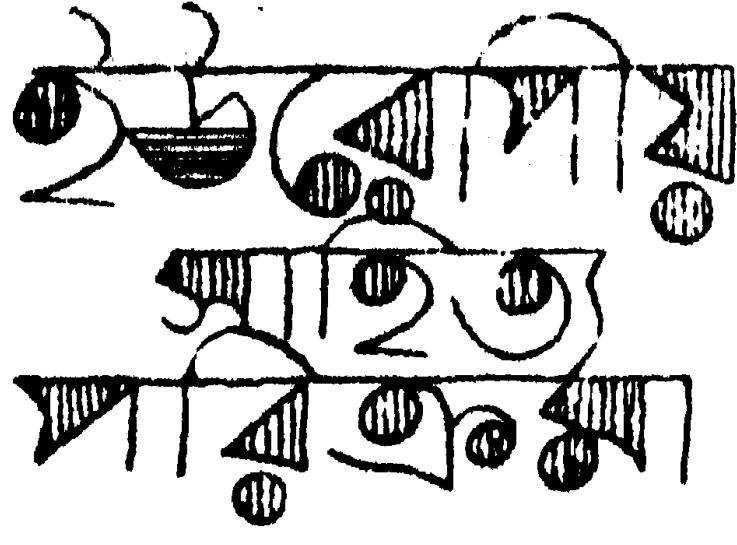
যে-দেশে ত্রয়োদশ শতকে প্রেমের-গায়েন (মিনেসিঙর) কবিদের একজন, রাইনমার ফন হাগেনাউ, ঈগল ও বাজ-পাখীর মতো সাহসিক নভশ্চর রূপে দেখেন কবিকে এবং আরেকজন, ভালতর, স্পষ্টতঃ তাঁর মোক্ষের সন্ধান পা'ন 'ঈশ্বরের কৃপা আর আমার রমনীর প্রেমে', সে-দেশে কবি ও কবিত্বের মর্যাদা নিশ্চয়ই গুরু ও নির্বিরোধ। প্রেম, প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের অনুসন্ধান ও আরাধনায় গোড়া থেকেই জার্মান কবিরা যে-ভাবে সচেষ্ট তা'তে তাঁদের উপজীবিকার গুরুত্ব যেমন জাতীয় জীবনে সমর্থিত, তেমনি আরাধ্যের নিশ্চিত মহত্ত্বও তাঁদের সাধনাকে মহান পরিচালনা ও অগ্রগতি শেখায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে গোয়্‌তে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তাই জার্মান কবিতার কোনও দুর্দশা বা অধোগতি তাঁকে চিরাচরিত 'উন্নয়ন-কার্যে' নিযুক্ত করল না, বরং এক অলোকসাধারণ পথিককে তাঁর যাত্রাপথের অশেষ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সুস্থভাবে অবহিত ক'রে দিল। 'আউফক্লেয়ারুঙ' বা 'নবজাগরণের' ছোঁয়াচে ইতিমধ্যে জার্মানীতে কবিতার বিবিধ অভ্যুত্থান সূচিত হয়েছে প্রতিভাধর ক্লপস্তকের ঔদার্যকামী কাব্যচর্চায়, বুয়েগর্‌র ও হের্দরের সঙ্কলনে লোকগাথার নবজীবনলাভে। নিছক ঈশ্বরপ্রীতির ও গ্রীক কবি আনক্রেয়নের আদর্শে রচিত সুরাসাকীর কাব্যে জার্মান কবিদের যে-কণ্টদায়ক, সাময়িক আকর্ষণ কিছুকাল ধ'রে উঁকি মেরেছিল, তা'র আবহাওয়া ক্লপস্তক ও লোকগাথার পর আর টিকে ছিল না। তাই গোয়্‌তে কবিতাকে বন্দী বা ক্ষিন্ন দেখে উদ্যোগী কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না-হয়ে, অপেক্ষাকৃত মৃদু ও স্বচ্ছন্দ প্রেরণা নিয়েই জার্মান কবিত্বের দায়ভাগ গ্রহণ করেছিলেন। একাই একশ' যদি বা গোয়্‌তে নিঃসন্দেহে ছিলেন, তবু গোয়্‌তীয় সাধনায় ব্রবাহুল্যেরাও প্রত্যক্ষ যোগ্যতায় দাবী করলেন গোয়্‌তের সহচারিত্ব। গের্মনীয় কাব্যের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে, যখন গোয়্‌তের আশেপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্রমান্বয়ে হোয়্‌ল্দেরলিন আইখেনদর্ফ, হাইনে, মোয়্‌রিকে, লেনাউ, ব্রেনতানো ও অন্যান্যেরা। আর এঁদের মতোই এক সময়ে ছিলেন বন্ধু ও উজ্জ্বলতম সহচর, শিলর, যাঁকে যাত্রার মধ্যপথে হারিয়েছিলেন গোয়্‌তে।

উনবিংশ শতকে গোয়্‌তীয় বিশ্বে জার্মান কবিতার পরিক্রমণ সুসম্পন্ন। রীতি, নীতি, সামর্থ্য ও উৎসাহের বিচিত্র প্রয়োগে অভূতপূর্ব এই সুফলা যাত্রা য়ুরোপীয় কাব্যেতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে এ-যাত্রার অভিজ্ঞতায় ও ফলে যে-সকল তত্ত্ব ও উপকরণের সন্ধান সুলভ হয়েছিল, তা'দের অনেক কিছুই নানাভাবে বিংশ শতাব্দীর জার্মান কাব্যাভিকীর্ষায়, জ্ঞাতার্থে ও অজ্ঞাতে, ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃত রোম্যান্টিকতায় কাব্যের যে প্রাথমিক মুক্তি তা'র বৃত্তান্ত স্বকীয় গৌরবেই মুগ্ধকর। পরন্তু এই মুক্তির ইতিবৃত্তে জার্মান কবিদের বিশিষ্ট অবদান এভাবে ঘনীভূত হয়েছে থেকে-থেকে, যে বাচনিক প্রক্রিয়ায় একজন হোয়্‌ল্দেরলিন, ক্লাসিকল চিন্তাবেশে একজন শিলর, গীতিময়তায় একজন আইখেনদর্ফ, হৃদয়ভাঙানিতে একজন হাইনে, মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াসে একজন মোয়্‌রিকে 'যুগের হাওয়ার' বাহিরে এসে পৃথক অনুধাবন দাবী করেন অনায়াসে। আর

'ফাউস্তের' কবি তাঁর কল্পনার ধারে ও ভারে পশ্চিম য়ুরোপের বুদ্ধি-অনুভবের সমগ্রে চিরকালই দাগ কাটেন।

'ফাউস্তে' বহুধা-সমন্বিত গোয়েতীয় উপলব্ধি ও বিশ্ববীক্ষার নিঃশঙ্ক অভিব্যক্তিতে পৌঁছান গোয়েতের চিত্তস্থৈর্যেও সময়সাপেক্ষ ছিল। চিন্তার জগতে যে-অস্থিরতা ও আবেগ নিয়ে ভ্রাম্যমান গোয়েতে প্রথম যৌবনে ক্লাসিকল ধ্বংসাবশেষ দেখতে-দেখতে হা-ঘরে, উন্মন, তাতে সম্ভোগের শান্তি নেই এতোটুকু। শান্তি নেই সুস্থ সেই ঘরণীর আহ্বানে যে বলে,—

আমার সোয়ামী এখনি
ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরবে।
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
আমাদের ঘরে রাত্তিরে থাও।
('দের ভান্দের' : পথিক)

শান্তি দেয় না স্বর্গ-নিষ্ক্রান্ত সেই বরদাতা 'তুমি'—

তুমি, দ্যুলোক দিয়েছে বাস্তু যা'রে,
যে করো শমিত সর্ব দুঃখ ও যন্ত্রণা,
দ্বিগুণ দুর্ভোগ যা'র, তা'রে
এনে দাও দ্বিগুণ সান্ত্বনা—
('ভান্দেরেস' নাখ্‌টলিদ' : পথিকের নৈশগীত)

এই অশান্তিকে সম্বল ক'রে বাঁচার শপথও যেমন গোয়েতের ছিল না, তেমনি এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য নান্দনিক, ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক সত্যের হদিশ পেয়ে, কোনও কায়েমী স্বস্তি লাভ করার জন্য ব্যতিব্যস্তও হয়ে ওঠেননি গোয়েতে। হা-ঘরে হলেও পথিক উদভ্রান্ত হয় না, চাষী বউ-এর নিমন্ত্রণ করুণভাবে ফিরিয়ে দিয়ে সে কুমা-র পথে চলে যায়, যদিও ঘর-ফেরার এক ক্লান্তিকর স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ ক'রে। ঐ পথিকের সঙ্গে গোয়েতেও যেন ভিনদেশী হলেন, শান্তির সন্ধানে ক্লাসিকল রোমক রাজ্যে। হোরাতিয়ুস ও প্রোপেরতিয়ুসের দেশে বীরত্ব, নিসর্গ, প্রেম ও রতির অনুধ্যানে তীব্র ও সত্বর গোয়েতে যে-কান্ত সুখের দিশা পেলেন, তা তাঁর 'রোয়্‌মিশে এলেগিন' (রোমীয় বিষাদগাথা)-এর কুড়িটি দীর্ঘ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রাণবন্ত তবু অচপল লাতিন কাব্যের জলবায়ুতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের এক অনলস প্রয়াস 'রোয়্‌মিশে এলেগিন'-এর ছত্রে ছত্রে। রোমান্টিক উৎকণ্ঠায় ছেদ টানল গোয়েতের স্মৃতি-পথে উদিত সেই আদি বীর-যুগ (heroischen Zeit), যখন দেবদেবীরাও রতিলীলায় লিপ্ত হতেন। রোমক অস্তিত্বের ধ্বংসস্তূপ থেকে রক্তের মতো উৎঘাটিত করলেন গোয়েতে সেই হৃদিনী 'আমর' বা 'রতিকে', আর তাকে বিজয়িনী দেখলেন মানুষিক জীবনের সামগ্রিক বিস্তারে। চিত্ত-প্রশান্তির এমতো আহরণে যদিবা গোয়েতে প্রথমতঃ রোমান্টিক ও অপসারী, তবু যে-বিশ্লেষণ ও সাযুজ্য তাঁর এই নান্দনিক প্রবাসযাত্রারও কবিত্বকে বলিষ্ঠ রাখে, তার সুর আধুনিক ও সরাসরি জিজ্ঞাসায় স্তম্ভিত করেন গোয়েতে :

ব্যক্ত হও, শিলাদল!
আমাতে সবাক্ হও সোন্নত প্রাসাদ!
পথঘাট, বলো একটি কথা!
প্রকাশিত নও তুমি পরমপরেশ?
('রোয়্‌মিশে এলেগিন ১')

মনন ও আবেগের অপূর্ব সংশ্লেষ ঘটিয়ে গোয়েতে উপলব্ধি করেন যে অতীত আর বর্তমান উভয়েই তাঁর সঙ্গে চমৎকার আলাপ করে যতক্ষণ তিনি এই ক্লাসিকল জমির ওপর দাঁড়িয়ে। রোমান্টিক উদভ্রান্তির অবিশ্বস্ত ভূমি ত্যাগ ক'রে গোয়েতে এইভাবে ক্লাসিকল ধামসহলে ভদ্রাসন পাতালেন, আর তা শুধু, পরিশেষে, প্রেমেরই জয়গান করতে! একমাত্র প্রতিভার নিয়মবশেই সম্ভব হ'ল রোমান্টিক-ক্লাসিকের দ্বন্দ্ব গা-সওয়া ক'রে গোয়েতের পক্ষে অজস্র প্রেমের, নিছক প্রেমের, কবিতা রচনা করা, যার অধিকাংশ এখন শুবের্ত ও হুগো ভোলফ মারফত, গানে রূপান্তরিত।

কিন্তু মানসিকের যে চাপ একজন সিসৃক্ষু গোয়েতে সহ্য করেন তাতে ছোটোখাটো আত্মিক মীমাংসাগুলি দ্বন্দ্বে পুনরাবৃত্ত হয়, পরিচিত জগতের সংজ্ঞা ওলট-পালট চেনে, জীবনরহস্যের সমাধান গাণিতিক সমাপ্তি কখনই পায় না। উদ্বেগ ও ব্যথার টান অনষ্ট থাকে কবির সত্তায়। রোমক 'রতির' মন্ত্রপাঠে তাই গোয়েতের চিত্তগৃহে যে-স্বস্ত্যয়ন সংঘটিত হ'ল, তাও পূর্ণ শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। গোয়েতের মর-অস্তিত্ব বুদ্ধি-বিবেক ও শিল্পীর বিহ্বলতায় সমানে সেই অশান্তির জের টানতে থাকল, যা'র প্রশমন সম্ভব কেবল শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমেই। 'ভিলহেলম মাইস্তসের শিক্ষানবিসি' নামক উপন্যাসের একটি গানে যে অপার্থিব ব্যথার উল্লেখ :

কামনা জেনেছে যে শুধু সে-ই
জানে কী আমি স'ই!

সেই কবিজনোচিত বেদনাবোধ মানুষিক গোয়েতেতে যেন কখনই অনু-

পস্থিত থাকেনি ও বেমানান হয়নি। এই কামনা থেকে বঞ্চিত হ'লে, গোয়্তে দেখান, মানুষ কতো যান্ত্রিক ও অলৌকিক হয়ে ফাউস্তের প্রমাদে ধরা পড়ে।

এই কামনার বোধই শুধু নয়, সংজ্ঞাও মহাজ্ঞানী গোয়তের কাছে জানা ছিল। কবি ও দ্রষ্টারূপে তিনি যুগপৎ এই কামনার শিকার ও ব্যাখ্যাতা। মানুষের এই কামনার স্বয়ংক্রিয় বিশ্ব-যে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অপরিত্যাজ্য নিয়ামক-রূপে হাজির রেখেছে, মরতা ও চৈতন্যের নিয়ন্ত্রণে সর্ববিধ মানবিক উৎপত্তি ও বিপত্তিকে ন্যস্ত ক'রে গোয়তে অরফিয় প্রজ্ঞার পুনর্লিখনে তাই বলেন:

তোমাকে হতেই হবে এই মতো,
নিজেকে পালাবে কোন ছলে!
এই মতো বলেছিল সিবিল ও
দৈবজ্ঞের দল পুরাকালে।
('উরভোর্তে অরফিন': দাইমন
অরফিয় কথামৃত: নিয়তি)

প্রকৃষ্ট অর্থে জ্ঞান গোয়তের কবিতায় এইভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। মনস্বী জীবনচর্যা, বিদ্যাবত্তা ও অবিশ্রাম শিল্পকর্মের সন্তান গোয়তের ভাবসমৃদ্ধ কাব্য। বাচনে গোয়তে, কতকটা লোকগাথার দৃষ্টান্তে, যে অতিযর্ক স্বচ্ছতা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে তাঁর ছান্দসিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই অকপট আত্মিক স্বর যার জার্মান নাম 'জেলেনস্তিমুঙ'। এই স্বর কাব্যের নন্দনলোকে হয়ত নৈতিকের অপছন্দ আওয়াজ কদাচ বা তুলেছে, তবু এই স্বরেই সম্ভব ছিল গোয়তের মহাকাব্য, 'ফাউস্ত' রচনা করা। কাব্যামোদীকে তুষ্ট রাখার মতো বিবিধ বৈচিত্র্য 'ফাউস্তের' ছন্দে, আখ্যান ও দৃশ্য পরিকল্পনায় অবশ্যই আছে, তবু ভাবনার যে গুরুত্বে ফাউস্তের কাব্যরূপ স্থিত, তা'র ভাষায় সেই আত্মিক স্বর, যা'তে অভ্যন্তরীণ এক প্রচণ্ডতায় কথা মাত্রেই অভিব্যক্তি, শব্দ মাত্রেই কোনও বাচনিক বিস্তৃতি। সচেতনতা, বুদ্ধি, অনুভবের গাঢ়ত্ব—সর্বোপরি, বোধ, ফাউস্তের ভাষণে। প্রকৃতিকে পরাস্ত করার ব্যর্থ যাদু যখন ফাউস্তের করায়ত্ত, তখন উপলব্ধির সঞ্চারে শিহরিত সেই উন্মার্গগামী বলে:

হায়, মানুষে যে নহে কিছু নির্দোষ,
এখন বুঝেছি আমি! তুমি দাও
এই বিহ্বলতা,
যা আমায় নিয়ত নিকটে নেয়
দেবতার,—
আর ঐ সহকর্মী, যা'রে বিনা
এখন পারি না আর,
যদি বা সে ঘৃণাময়, নিস্তেজ, আমায়
আমারই সমক্ষে করে কলঙ্কিত,
করে নস্যাৎ,
একটি ফুৎকার দিয়ে, তোমার
সকল আশীর্বাদ।*

গোয়তীয় চরিত্র সর্বতোভাবে জার্মান রোমান্টিকতার নয় এবং স্বাভাবিকভাবেই। ঐ রোমান্টিকতার স্বরূপ যে কী তা বেশ কিছুটা ধরা পড়েছে উনবিংশ শতাব্দীর একটি জার্মান উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-চরিত্রে। কবি এদুয়ার্দ মোয়রিকে রচিত 'মালের নলতেন' নামক উপন্যাসে নায়ক হেনির শোকার্ত ও বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করতে দিয়েছিলেন সে তা'র কেশরাশি অবিন্যাস্ত দিয়েছিল সে তা'র কেশরাশি অবিন্যাস্ত ক'রে দিতে, আর বাসনা-বিমোহিত হয়ে শুনেছিল সেই শতস্বর ঝড় (lauschtemit Wollust dem hundertstimmigen winde) অনুরূপ কোনও ঝড়ে মাথা পেতে আলোড়ন কুড়ানো এবং সেই অভিজ্ঞতায় কামদের স্বাদ পাওয়া (প্রসঙ্গতঃ, এই রোমান্টিকতা 'ঝড়-ঝাপটা' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল কোনও এক পর্যায়ে) এক হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর বেশ ক'জন জার্মান কবির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং গোয়তেও এই ঝড়-ঝাপটায় কতকটা অস্থির, এলোমেলো। মোয়রিকে নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁর কাব্যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবহাওয়ার শিহরণে বেপথু না হলেও অনাহত থাকেননি। আর, হাইনে ত' প্রায় অলজ্জভাবেই অন্ধকার সেই ঝড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন যা যৌবনের একটি তুলনাও।

এই ঝোড়ো হাওয়ার শিরশির (ফরাসী সমালোচনায় ফ্রিজ') সর্বদেশেই রোমান্টিক কাব্যের একটি লক্ষণ। কারণ, রোমান্টিকের মৌলিক একটি রোগ নিশ্চয়ই ব্যাকুলতা। জার্মান রোমান্টিক কবিরা সেই ব্যাকুলতায়-আকুলতায় ও চঞ্চলতায় অন্য রোমান্টিকদের মতো ভুগলেও, যে-একটি মহা সদ্গুণের ধারক থেকেছিলেন এবং ঠিক যে-কারণে তাঁরা অনেকদূর পর্যন্ত প্রভাবশীল, সেই সদ্গুণের নাম 'বোধ ভাষ্য'। উনবিংশ শতকের ইংরাজ বা ফরাসী কবিদের জার্মান সমকালীনরা এই ব্যাপারে অপরিপক্ব ও বেসামাল প্রমাণিত ক'রে রোমান্টিকতার প্রতিশ্রুতিকে অনেক দূরপ্রসারী ও স্থায়ী এক কাব্যিক আদেশরূপে প্রতীয়মান করেন। বিস্ময় সামান্যই হয় যখন দেখা যায় পঞ্চদশ শতকী এক গের্মনীয় কবিচিত্ত এই অপরাজেয় 'বোধভাষ্যির' দাবীতে তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজছেন: 'আমি বোধভাষ্য নিয়ে (বুদ্ধিশুদ্ধি? ('mit Sinnen') বেঁচেছি, বলেছিলেন উল্রিখ ফন হুতেন। এই অনাবিল ও প্রত্যক্ষ বোধের অঙ্গীকার জার্মান রোমান্টিকদের কাব্যকে স্থানকালের গণ্ডির বাইরে আনে।

গোয়তের চেয়ে আরো জটিল ও জোরালভাবে ক্লাসিকল পন্থায় আকৃষ্ট শিলর রোমান্টিক উদ্বেগে আটক

*Faust I. Teil, Wald und Hoehle.

নিঃসংশয়ে, তবু উপলব্ধিতে সঙ্গতির অভাব নেই কখনও। তাঁর বন্ধুবর গোয়তের 'জ্ঞান' শিলরে কী সুডোল আবেগে প্রবাহিত ঃ

কামনা উড্ডীন হয়,
প্রেম রাখে সুনিশ্চিত স্থিতি;
কুসুমের ধ্রুব লয়,
ফল পা'বে অব্যর্থ আকৃতি।
('দাস লীদ ফন দের গ্লোকে' ঃ ঘণ্টার গান)

ক্লাসিকল নিসর্গে কোনও 'আমর' বা 'রতির' লালনে শিলর অবশ্য নিজেকে কখনও ব্যস্ত করতে চাননি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই শান্ত, অতীত নিসর্গের বোধটুকু বিচ্ছিন্ন বর্তমানে চারিত ক'রে দেওয়া। তাই দেখি শিলর প'ড়ে থাকেন জ্ঞাতসারেই সেই টলেমীয় বিশ্বে, যেখানে পৃথিবীর চক্রবাল বেয়ে সূর্যের রথ ওঠে, ডুবে যায় ঃ

ডুবে যাক, রক্তিম ঈশ্বর,—
তৃষ্ণা পায় প্রান্তরের
শান্তিময় শিশিরের লাগি:
দুর্বলতা ধরে মানবেরে;
ঘোটকেরা ক্লান্ত দৃষ্ট হয়,—
রথখানি এবে ডুবে যাক!

রোমান্টিক আবেশে শিলরের সূর্য-দেবতা, প্রেমিক আপোল্লো ফইবুসকেও শ্রান্ত হ'তে হয়। ক্লাসিকল অন্তর্মুখিতা শিলরীয় রসায়নে বোধহয় সবচেয়ে অটুট রোমান্টিকতায় দানা বাঁধে। 'দি ক্রানিখে দেস ইবিকুস' নামক কবিতায় গ্রীক কবি ইবিকসের হত্যাকাণ্ডের কাহিনীতে শিলরের আকর্ষণ প্রথমতঃ অবশ্যই তার রূপকথাশোভন অভিনবত্বের কারণেই, তবু এরই মাধ্যমে ক্লাসিকল 'নেমেসিস' বা 'প্রতিশোধ' তত্ত্বও তাঁর কাব্যে অনুসৃত হয়। অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হ'ন পথিক ইবিকস, কিন্তু তবু এ নরহত্যা কা'রও দৃষ্টিগোচর অবশ্যই ঃ

তা'রা কি দস্যুর দলে
ও'কে ছিঁড়ল যা'রা?
হলো পূর্ণমনস্কাম
লুক্কায়িত বৈরীর অসূয়া?
সেই সূর্যে জ্ঞাত এই
দুর্ধর পাপের কিনারা
তমসার বিশ্বে যা'র
আজো ছোটে আলোর সাঁজোয়া।
('দি ক্রানিখে দেস ইবিকুস ঃ ইবিকসের বকগুলি)

সূর্য, সৌরদেবতা হেলিঅস, রোমান্টিক শিলরের অনাত্মীয় ন'ন!

এইভাবে জার্মান রোমান্টিকতা আগাগোড়া যে-একটি অনুগ্র স্বভাবে লগ্ন থেকেছে, তা-ই—যা অবশ্য রোমান্টিকই, এবং ক্লাসিকল নয়,—আমাদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান কবিতার অন্যতম প্রধান আবেদন এবং তা-ই তা'র সৃষ্টি-মূল্যকে সময়ের কারাকক্ষে না-রেখে যুগান্তরে গ্রাহ্য ক'রে তোলে। কাব্য, বোধ ও সৃষ্টির এই স্বাভাবিকে, যা প্রশংসা তন্ময়তা লাভ করেছিল, তা'র পরিণতি কবিতার প্রাচুর্যে, বিচিত্রতায়, প্রাণে ও সারবত্তায়।—মরমী হোয়েল্দেরলিন নিজের অজান্তে সওয়ার হয়েছেন 'গানের উন্নত, উড্ডীন প্রভাতী মেঘের' ওপর, সন্দেহ শুধু ঃ

পূত পন্থা সে কি এবংবিধ?
হে ঐশ্বর্যময়ী দিশা,
করো না'ক প্রবঞ্চিত মোরে!

আত্ম-নির্ণয়ে ব্যাকুল হোয়েল্দেরলিন টের পা'ন জ্ঞানের স্বৈরাচার, যা ঈশ্বরকে লোপাট করে কেবল সত্তার সর্বনাশ সাধনে—তাঁর এম্পিদক্লিস ফাউস্তের মতো এক অতি-মানুষিক তাড়নায় হেঁকে ওঠে ঃ

দাসীত্বে পেয়েছি আমি
প্রভু-খুঁজে-ফেরা প্রকৃতিকে,
তা'র যদি থাকে গৌরব, তা আমারই।

হোয়েল্দেরলিনের বিবেকে এই দুর্বিনীতের শাস্তি সুচিহ্নিত ঃ উদভ্রান্ত, বিম্বান এম্পিদক্লিস নির্বাসিতের যন্ত্রনায় অবশেষে জানে ঃ

একা হওয়া, দেবগণের বিহনে,
সে-ই মৃত্যু।

গোয়তে ও শিলরের মতো হোয়েল্দেরলিনের কবিতায়ও সেই সকল জিজ্ঞাসা, যাদের অপলাপ নেই মানুষের বিস্ময়-বোধ যতদিন আছে; সেই সকল সত্যের-ঢাকা-খোলার জন্য ঝাঁপ, যা'রা কালের ধাক্কায় পঙ্গু হয় না, আর, সেই অতীত-উদ্ধারের হৃদয়-বিদারক আর্তি।—

তবু, বন্ধু! আমরা এসেছি বড় পরে।
সত্য, আছেন দেবতারা,
কিন্তু তা' মাথার উপরে
কোনও অপর জগতে।

তথায় অশ্রান্ত কর্মে রত তাঁরা
এবং আমরা বাঁচিছি
কি-না এই নিয়ে স্বল্পই চিন্তিত
মনে হয়;
স্বর্গস্থেরা এমনি রেহাই দে'ন
আমাদের।
দুর্বল আধারে তবে অসম্ভব
তাঁদের ধারণ সর্বদা,
কখনও কখনও শুধু
মানুষে বিধৃত হয় ঐশ্বরিক ভূমা।
অতঃপর তাঁদের স্বপ্নে জীবনের সার।

কতো পরে হোয়েল্দেরলিনের কথারা আবার, শুধু ভঙ্গী আর ঝঙ্কারের ভিন্নতায়, বিংশশতকী রিলকেতে ফিরে আসবে আরেক বাঙ্ময় ধ্রুবতায় পৌঁছতে!

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়

তারাপদ রায়

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আমি একজন বাঁধা খদ্দের। অবশ্য এতে আমার আপত্তি বা অসম্মানের কিছুই নেই। এই ভোজনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 'ভজগোবিন্দ জীবিত থাকলে যে কোনো উৎসাহী তাঁর কাছ থেকে এই হোটেলের প্রাক্তন গ্রাহকদের একটি বিস্তৃত তালিকা শুনতে পারতেন। যাঁদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত খ্যাতনামা এখন। একসঙ্গে রাজভবনের কোনো ভোজসভাতেই বোধ-হয় এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তির দর্শন অসম্ভব। 'ভজগোবিন্দবাবুর তালিকায় পূর্ণ আস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যেতো অন্ততঃ দুজন পদ্মশ্রী, এক ডজন এম-এল-এ; এম-পি এবং ততোধিক সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং চিত্রতারকা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এখানে বসে কিছু না কিছু গলাধঃকরণ করেছেন। ভজগোবিন্দবাবু মধ্যে মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখাতেন, 'ঐ চেয়ারটায় বসতেন ভুতোবাবু—আহা চিংড়ি মাছ দিয়ে নটে চচ্চড়ি তিনি কি যে ভালোবাসতেন।' অনুসন্ধান করলেই জানা যেতো ভুতোবাবু কোনো কেউ কেটা নন, বর্তমানে যাঁর ছবি ঘরে-ঘরে পর্দায়-পর্দায় সেই বিখ্যাত চিত্রতারকার পরিত্যক্ত নাম ওটা।

যা হোক, ভজগোবিন্দ ভোজনালয় আপনিও নিশ্চয় দেখেছেন। হাজরার মোড়ে সেই বিস্তৃত সাইন-বোর্ড—হলুদ পটভূমিকায় নীল কালিতে লেখা গোটা গোটা বাংলা হরফে হোটেলের নাম। নামের দুপাশে দুটি ছবি—একদিকে ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত ত্রিশূল হাতে মহাদেব এবং অপরদিকে চেয়ারে আসীন খালি গায়ে হোটেলের মালিক ভজগোবিন্দ-বাবুর আনুমানিক প্রতিকৃতি। অবশ্য এসবই বছর পনেরো আগের কথা। যখন সাইনবোর্ডটি প্রথম আঁকা হয়েছিলো সেই সময়কার। সাইন-বোর্ডটির একটি ইতিহাস আছে; জনশ্রুতি কোনো এক সাইন-বোর্ড লিখিয়েকে দিয়ে একমাস বিনা-মূল্যে খেতে দেওয়ার চুক্তিতে এই সাইন-বোর্ডটি আঁকানো হয়। কিন্তু ভজগোবিন্দ-বাবু দিন পনেরো পরে অনুভব করেন যে, হিসেবের তৌলে তিনি কিছু ঠকেছেন এবং ফলত আর্টিস্টের ডালে ভাতের ফ্যান এবং ঝোলের মাছটি ক্রমশঃ সংকুচিত হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু ভজগোবিন্দবাবু হিসাবে ভুল করে-ছিলেন, কেন না তাঁর দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়ে শুধুমাত্র তাঁর প্রতিকৃতিটি ব্যতীত আর সবই আঁকা প্রায় শেষ হয়েছিলো। সুতরাং খাদ্যাভাবে শিল্পীর স্নায়বিক এবং শারীরিক দৌর্বল্যের প্রকোপ ভজগোবিন্দবাবুর প্রতিকৃতিতে প্রতি-ফলিত হয়েছিলো। তদুপরি পরবর্তী-কালে রৌদ্র-বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে সাইনবোর্ডের লালরঙটুকু সর্বাগ্রে মুছে যাওয়ায় (ভজগোবিন্দবাবুর চেয়ার লালরঙে আঁকা ছিলো) একটি বিচিত্র দৈহিক ভঙ্গি উক্ত প্রতিকৃতিকে জন-সাধারণের অবশ্যদ্রষ্টব্যে পরিণত করে-ছিলো। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই একদা উক্ত প্রতিকৃতিই আমাকে ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ে আকৃষ্ট করে এনেছিলো। তদবধি এর বন্ধনে আমি বন্ধ, বিপরীত ফুটপাথের নিউ গ্র্যান্ড হোটেলের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে

কটি চিরস্থায়ী গ্রাহক ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আওতায় রয়েছে আমি তাদের অন্যতম।

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সেই সাইন-বোর্ড আজ আর নেই। নয়া পয়সা হওয়ার পরে ভজগোবিন্দবাবু ভেবেছিলেন যে, সাইন-বোর্ডের নীচে যেখানে 'পাইস হোটেল' লেখা আছে সেখানে 'নয়া পয়সা হোটেল' লিখে দেবেন এই ভেবে সাইন-বোর্ডটা নামিয়ে আনেন। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে অবশেষে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং নয়া পয়সার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে পাইস হোটেলের ঐতিহ্য নষ্ট না করাই স্থির করেন।

মধ্যে কয়েকদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। অনেক রাত্রিতে বাসায় ফিরে এসেছি। এমন সময় দরজায় ধাক্কাধাক্কি এবং কান্নার চীৎকারে ঘুম ভেঙে দরজা খুলে বেরোলাম। বাইরে দেখি ভজগোবিন্দবাবুর বড়ছেলে নবলাল দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আর দু'একজন। আমি বেরুনো-মাত্র নবলাল বললে, 'বাবু, সর্বনাশ হয়েছে। বাবা, আমার বাবা আজ তিনদিন...' এই বলে ফোঁপাতে লাগলো। আমি কিছুটা অনুমান করলাম, ভজগোবিন্দবাবুর বয়স হয়েছিলো। আমি সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হোলো? লোকটি যা জানালো তার সারাংশ ভজগোবিন্দবাবু আজ তিনদিন হলো মরে গেছেন। আমি বেশ অবাক হলাম। আমি ভজগোবিন্দবাবুর হোটেলের গ্রাহক, কিন্তু শুধুমাত্র সেই সূত্রেই ভজগোবিন্দবাবুর মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁর ছেলে মধ্যরাত্রিতে আমার উপর হামলা করে শোকপ্রকাশ করবে, এটা বিশেষ সুবিধের মনে হলো না। তবু ভদ্রতার খাতিরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, 'তা বাবার বয়স হয়েছিল, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে?' ইত্যাদি নানা ধরণের কথা বলতে লাগলাম। নবলালবাবুর কান্না থামলো না, 'কিন্তু বাবা তো আরো একমাস আগেও মরতে পারতেন, এখন আমরা একেবারে ডুবে গেলাম। আর, আর ঐ শয়তান, ঐ বলাই দাস......।'

বলাই দাস—ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সনাতন প্রতিদ্বন্দ্বী নিউগ্র্যান্ডের মালিকের নাম। ভজগোবিন্দবাবু একমাস আগে মারা গেলেই বা কি সুবিধা আর বলাই দাসই বা এই শোকের মধ্যে আসে কেন; সমস্ত বিষয়টি বিশেষ জটিল হয়ে উঠলো আমার কাছে। সারাদিন ক্লান্তির পর বর্ষণমুখর এক শ্রাবণের মধ্যরজনীতে হোটেলমালিকের তিনদিন পূর্বে মৃত্যুর জন্যে যেটুকু দুঃখিত হওয়া উচিত; যে-টুকু শোকান্বিত হওয়া উচিত—তার চেয়ে অনেক বেশী শোক এবং দুঃখ পেতে হলো। অনেক পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে নির্বিকার থেকেছি, এটাকে তার প্রায়শ্চিত্ত বলে ধরে নিলাম।

এইবার নবলাল আমাকে পায়ে জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু বাঁচান।' আমি প্রায় পড়ে যেতে যেতে আচমকা এই ধাক্কা সামলে নিলাম। নবলাল তখন বলছে, 'আমাদের হোটেলে আপনাকে খেতে হবে।' তা তো খাই, সে তো নবলাল না বললেও খাই, কিন্তু ব্যাপারটা কি? শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে নাকি, তিনদিনে শ্রাদ্ধ, কি জানি—আর এভাবে নিমন্ত্রণ আমার জ্ঞাতসারে কোথাও কখনো দেখিনি।

খটকাটা লেগেই রয়েছে। অবশেষে যা বোঝা গেলো—এখন চারদিকে ভীষণ কলেরা। কর্পোরেশন বলছে মহামারী। এর মধ্যে ভজগোবিন্দবাবু মারা গেছেন। বলাই দাস চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে যে ভজগোবিন্দবাবুর কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। হোটেলের মালিক যে সবচেয়ে ভালো খাদ্যদ্রব্যগুলি নিজে খায় সেই যদি কলেরায় মরে, তাহলে অন্য লোকে আসবে কোন্ ভরসায়। বাঁধা খদ্দের আজ দুদিন একজনও আসছে না, উটকো ছুটকো এক আধটা আসে আর সব সময় হোটেল ফাঁকা।

নবলাল আবার আমার পা জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, বাবা এমনি এখনি মরে গেছে, তার কিছু হয়নি,' ফোঁপাতে লাগলো, 'আপনি আমাদের হোটেলে খাবেন, এক পয়সা দিতে লাগবে না। যা খেতে চান তাই রান্না করবো। শুধু দুবেলা রাস্তার ধারের ঐ জানালার পাশের সিটটায় বসে খাবেন।' এ পাড়ায় আমি পুরোনো লোক। সুতরাং আমি যদি ভোজনালয়ে নিয়মিত খেতে থাকি, তাহলে আস্তে আস্তে অনেকেই আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, নবলাল কেঁদে কেটে জানালো।

—জানি না, ভজগোবিন্দ সত্যই কলেরায় মরেছেন কিনা, সেটা তো বলাই দাসের অপপ্রচার নাও হতে পারে, হয়তো সত্যিই তাই; কিছু আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তাতে আমার কি? জীবনে এই প্রথমবার মরাল কারেজ, সংসাহসের অভাব হলো না আমার। কোনো ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই এই অভূতপূর্ব আত্মবিসর্জনের কাহিনীর কোনো স্থান নেই, কোনো তুলনাও নেই—একথা জেনেও আমি নবলালকে কথা দিলাম। সেই কথা এখনো রেখেছি। আর সংসাহস থাকলে যে কোনো কাজেই কোনো ক্ষতি হয় না তার প্রমাণ আমি এখনো জীবিত। এবং ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের কোনো আসনই কোনো মুহূর্তে ফাঁকা যাচ্ছে না। হাজরার মোড়ে নতুন সাইন-বোর্ড লাগানো হয়েছে, তাতে কব্জিতে ঘড়ি-আঁকা একটি হাতের তর্জনী নির্দেশ রয়েছে, 'আসুন পাইস হোটেল ভিতরে'।

যে কোনোদিন সময় করে চলে আসবেন।
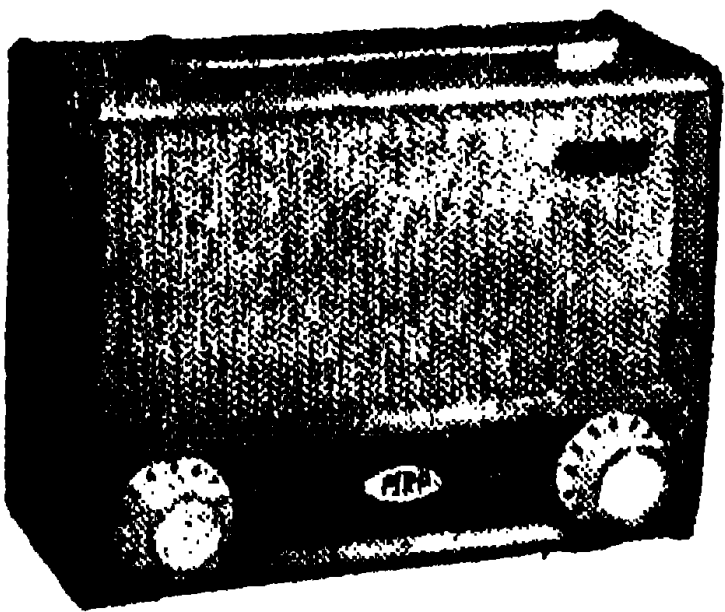
॥ সাধারণ নির্বাচন ॥

প্রজাতন্ত্রী ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়েছে। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার ২৮৫৫টি আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ১২,৬২৫ জন প্রার্থী। এই হিসাবের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ধরা হয়নি তার নির্বাচন ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। ঐ রাজ্যের বিধানসভার আসন সংখ্যা ৭৫। উড়িষ্যা ও কেরালার আসন সংখ্যাও বাদ গেছে এই হিসাব থেকে, কারণ কিছুকাল আগে ঐ দুটি রাজ্যের বিধানসভায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন হয়ে গেছে। জম্মু ও কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও কেরালা সমেত ভারতের সব কটি রাজ্যে বিধানসভার মোট আসন ৩১৯৬।

২৮৫৫টি বিধানসভার আসনের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা হল ২৮৩৬, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১,০৭০, জনসঙ্ঘের ১,০৬৫, স্বতন্ত্র দলের ১,০৩১, কমিউনিষ্ট দলের ৮৩০, সমাজতন্ত্রী দলের ৫৭৯, রিপাবলিকান দলের ১৮২, হিন্দুমহাসভার ১৮২, ডি-এম-কে দলের ১৪২, কৃষক শ্রমিক দলের ৭৯, অকালী দলের ৪৬, ফরোয়ার্ড ব্লকের ৪০ ও নির্দলীয় ৪,১৬৯। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এ পর্যন্ত ১৩ জন কংগ্রেস প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

লোকসভার ৪৯৮টি আসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন প্রায় ১৯০০ জন প্রার্থী। এর মধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা ৪৭৩, জনসঙ্ঘের ১৭৯, স্বতন্ত্র দলের ১৬৪, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১৫৭, কমিউনিষ্ট দলের ১২৬, সমাজতন্ত্রী দলের ১০২, রিপাব্লিকান দলের ৬৫, হিন্দুমহাসভার ৪১, রামরাজ্য পরিষদের ৩৮, নির্দলীয় ও অন্যান্য দলের ৪১৩। মুশ্লিম লীগ কেরালা থেকে তিনজন ও মাদ্রাজ থেকে দুইজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। লোকসভাতেও এ পর্যন্ত কংগ্রেসের তিনজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

সারাভারতে নির্বাচনের জন্য লাগবে ৪০ কোটি ব্যালটপত্র, ৭০০ টন কাগজ, ৪ লক্ষ শিশি কালি। নির্বাচনের জন্য সরকারের মোট ব্যয় হবে কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

॥ ঢাকায় খণ্ড বিপ্লব ॥
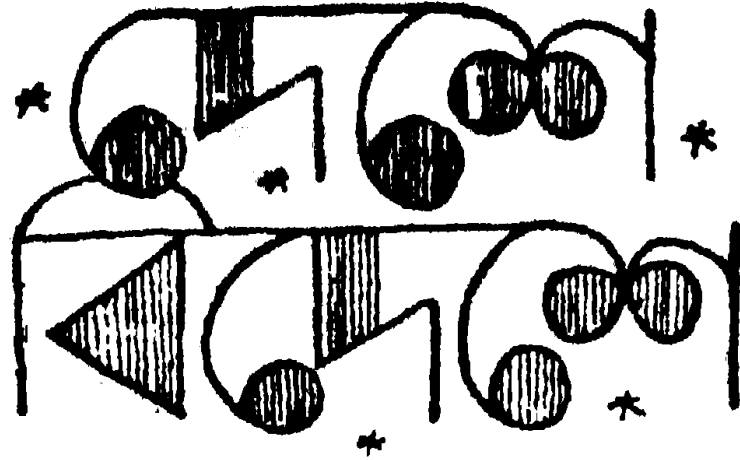
পূর্ব পাকিস্থানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরাবর্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আয়ুবশাহীর জবরদস্তির বিরুদ্ধে সারা পূর্ব পাকিস্থান জুড়ে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই অভ্যুত্থান সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যায় যে এমন ঘটনা পাকিস্থানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ভারতের আগষ্ট আন্দোলনের সংগেই শুধু তার তুলনা চলে। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সেদিন এমনি করেই সারা ভারতের মানুষ বিদেশী সরকারের নিষ্ঠুর নির্যাতনকে উপেক্ষা করে গর্জন করে উঠেছিল। তবুও, জনাব সুরাবর্দীর বিপুল জনপ্রিয়তার প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েই একথা বলা যায় যে, এই বিক্ষোভের কারণ শুধু এক শক্তিশালী জনপ্রিয় নেতার আকস্মিক গ্রেপ্তারই নয়। বহুদিন ধরে পূর্ব পাকিস্থানে যে বিক্ষোভের বারুদ জমে উঠেছিল, এই গ্রেপ্তার তাতে শুধু স্ফুলিংগ সংযোগ করেছে মাত্র।

পূর্ব পাকিস্থান আজ পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র পাকিস্থানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৮০ ভাগ উপার্জন করে পূর্ব পাকিস্থান কিন্তু তার সিংহভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্থান। কলকারখানার অধিকাংশই গড়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্থানে। একারণে পশ্চিম পাকিস্থানে যেখানে মাথাপিছু আয় বছরে ৩২০ টাকা সেখানে পূর্ব পাকিস্থানের বছরে মাথাপিছু আয় মাত্র ২১৫ টাকা। পাকিস্থানের প্রথম শ্রেণীর ৮০০ জন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৫০ জন পূর্ব পাকিস্থানী। পাকিস্থানের ৮ই ডিভিসন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মাত্র ২টি ব্যাটেলিয়ন এবং তাও হয়েছে পূর্ব পাকিস্থানীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে।

এ অবস্থায় বিপ্লবের দেশ পূর্ববঙ্গে শেষ পর্যন্ত যে এমনি করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এতদিন যে জ্বলেনি সেইটাই ছিল আশ্চর্যের কথা। এ সম্পর্কে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিলাতের প্রখ্যাত পত্রিকা 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' যে মন্তব্য লিখিত হয়েছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গার্ডিয়ানে' বলা হয়—

Bengalees are famous for being politically minded to the point of turbulence, and for a long time one of the wonders of the martial law regime was that East Pakistan took it so quietly.

দেশে বিদেশে

॥ নেপালে বিদ্রোহ ॥

নেপালের দেশভক্ত বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ক্রমেই সাংঘাতিক ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ নেপালের ভরতপুর এলাকায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বহু স্থানেই বিদ্রোহীদের সংগে সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের গেরিলা তৎপরতার ফলে নেপাল সরকারের পক্ষে ঘটনাস্থলে সব সময় সৈন্য উপস্থিত করাও সম্ভব হচ্ছে না। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ তুলসী গিরি অবশ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, বিদ্রোহী নেপালীদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন যে, বিদ্রোহীরা দুদিনের জন্যে মারি ও একদিনের জন্যে ভরতপুর দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন করে তাদের হাত থেকে ঐ স্থান দুটি আবার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগে আগে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নেপালের বর্তমান শাসকবর্গ যেভাবে তাচ্ছিল্যকর উক্তি করতেন ডঃ গিরির কণ্ঠে এবার আর সে সুর শোনা যায়নি। অপর পক্ষে নেপালী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে যে, প্রবল পীড়ন ও বাধা সত্ত্বেও স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে নেপালী দেশভক্তদের অভ্যুত্থান ক্রমেই দুর্নিবার হয়ে উঠছে।

॥ পাওয়ার্সের মুক্তি ॥

দশ বছরের জন্য কারারুদ্ধ কুখ্যাত মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ইউ-টু'রের পরিচালক ফ্রান্সিস পাওয়ার্স আকস্মিকভাবে সোভিয়েট কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ১৯৬০ সালে ১লা মে তারিখে রাশিয়ার আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাওয়ার্সের বিমানকে ভূপাতিত করা হয় এবং তারপর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তাঁকে দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঘটনাটি সেদিন এমনই আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, সেই সময় প্যারী নগরীতে আহূত শীর্ষ সম্মেলনও তার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।

মার্কিণ সোভিয়েট সম্পর্ক বর্তমানে খুব ভাল নয়। এ অবস্থায় পাওয়ার্সের হঠাৎ মুক্তি খুবই আশার কথা। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একজন রুশ গোয়েন্দাকেও মুক্তি দিয়েছেন এবং বার্লিনে উভয়পক্ষের সীমান্তবর্তী এক সেতুর উপর গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছে। কূটনীতিক মহলের ধারণা, এই বন্দী বিনিময় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির শুভ লক্ষণ।

ঘটনা-প্রবাহ
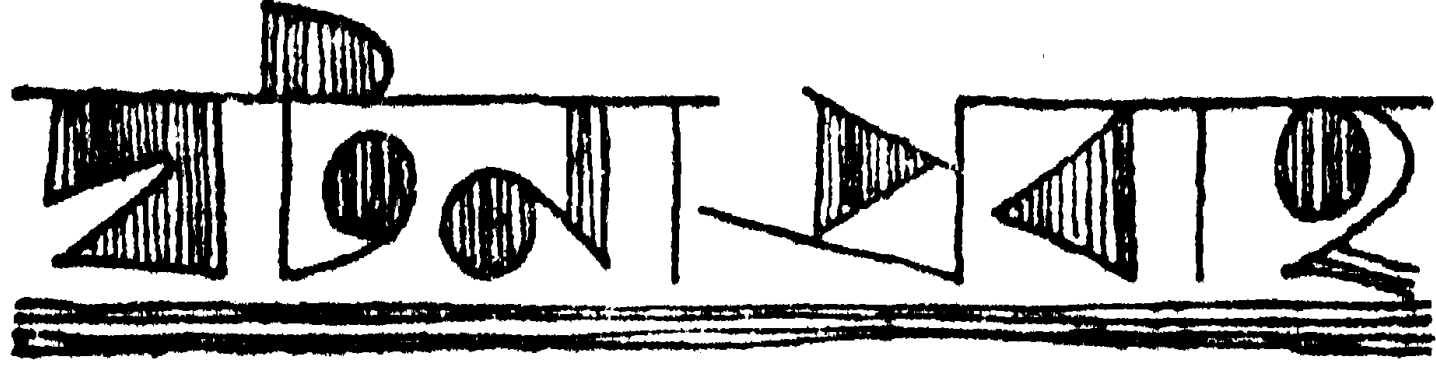
॥ ঘরে ॥

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : মণিপুরের তামেনলং মহকুমায় দুইমাসব্যাপী কারফিউ জারী—সশস্ত্র নাগা বিদ্রোহীদের অব্যাহত উপদ্রবের জের।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের (পশ্চিমবঙ্গ) সপ্তাহব্যাপী প্রচার অভিযান সুরু—শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : 'শিখদের (পাঞ্জাব) বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ নাই'—ভারত সরকার কর্তৃক দাশ কমিশনের রিপোর্ট গৃহীত।

ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর চলাচল বৃদ্ধির সংবাদ।

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : ভারতের প্রথম জৈব-রসায়ন ও এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন—যাদবপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে জব্বলপুরে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

সৌলমারী আশ্রমে (শিলিগুড়ির প্রায় ১ শত মাইল দূরবর্তী) আত্মগোপনকারী সন্ন্যাসী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিয়া গুজব রটনা।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের (৬২) তিরোধান।

নির্বাচনী উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে ছোটখাট সংঘর্ষ—প্রবল উত্তেজনার দরুণ মজঃফরপুর জেলায় ১৪৪ ধারা জারী—সর্বত্র সশস্ত্র পুলিশের টহল।

১২ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : ৪০ কোটি মানুষের দারিদ্র ও মুক্তির জন্য কঠোর শ্রম ও সমবায়মূলক উদ্যমের আহ্বান—নানদেদ-এর (মহারাষ্ট্র) জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

বেগমপুর ষ্টেশনে (হুগলী জেলাস্থিত) বিক্ষুব্ধ যাত্রীদল কর্তৃক লোকাল ট্রেণ আটক—হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল ট্রেণ চলাচল ব্যাহত।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ১৮-জাতি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবসহ শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) নিকট ক্রুশ্চেভের লিপি।

কংগ্রেস হইতে এ যাবত ৫৬৭ জন কর্মী বহিষ্কৃত—নির্বাচনে সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধিতার জের।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের যাত্রা সুরু—ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী জয়নগরে বিদায় সম্বর্ধনা : দলীয় নেতা—মেজর জন ডায়াস।

॥ বাইরে ॥

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুলিশের স্থলে সৈন্য মোতায়েন—মেসিনগান ও ষ্টেনগান লইয়া রাস্তায় রাস্তায় টহল—ঢাকার বিক্ষোভ অভিযান পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারিত।

আণবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে জেনেভায় ১৮ জাতি পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকের প্রস্তাব—রাশিয়ার নিকট বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লিপি।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : ঢাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (পূর্ববঙ্গ) মিঃ আতাউর রহমান গ্রেপ্তার—সমগ্র পূর্ববঙ্গে গোয়েন্দা ও সামরিক গুপ্তচরদের তৎপরতা—উত্তরবঙ্গে ছাত্র বিক্ষোভ দমনে সৈন্য প্রেরণ।

প্যারিসে পুলিশের সহিত বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে ৮ জন নিহত—সন্ত্রাসবাদী 'নেপাল সৈন্য সংস্থা'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সহস্র সহস্র নরনারীর যোগদান।

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : রাশিয়ায় আটক মার্কিণ ইউ-২ বিমানের চালক ফ্রান্সিস পাওয়ার্স-এর মুক্তিলাভ—বার্লিনে সোভিয়েট-মার্কিণ বন্দী বিনিময়।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ—পল্লী অঞ্চলে বিক্ষোভের প্রসার—ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী নানাস্থানে সামরিক ছাউনি স্থাপন।

দঃ নেপালের ভরতপুর এলাকায় সরকার বিরোধী বিদ্রোহ—স্থানে স্থানে বিদ্রোহী দল ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : কুমিল্লা ও সুদূর শ্রীহট্ট পর্যন্ত ঢাকার ছাত্র বিক্ষোভের বিস্তৃতি—খুলনাতেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের শোভাযাত্রা—নোয়াখালিতে প্যাসেঞ্জার ট্রেণের উপর আক্রমণ।

১২ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে জেনেভায় ভারত সমেত ১৮টি রাষ্ট্রের শীর্ষ বৈঠকে নূতন প্রস্তাব—ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাবের উত্তরে ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক ম্যাকমিলান ও কেনেডির নিকট লিপি প্রেরণ।

উত্তর ইউরোপে তুষারপাত ও প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব—বিভিন্ন স্থানে রেল, বিমান ও জাহাজ চলাচল বিপর্যস্ত।

নিরাপত্তা আইনে করাচীতে আটক মিঃ সুরাবর্দীর 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর আবেদনের শুনানী ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য প্রিন্সত্রয়ের সম্মেলন (শীর্ষ) অনুষ্ঠানের অনুরোধ—ভিয়েন্তিয়েনের দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না ফৌমার (নিরপেক্ষ নেতা) তারবার্তা।

পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর মন্ত্রিসভা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন—নয়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে অষ্টাদশ রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সোভিয়েট প্রস্তাব কেনেডি (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক অগ্রাহ্য—বৃটেন কর্তৃকও সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে (পূর্ববঙ্গ) আবার হাঙ্গামা—বিভিন্ন স্থানে প্রবল ছাত্র-বিক্ষোভ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ জনগণেশের কৌতুক ॥

অনেকে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, ১৯৬২-র নির্বাচন শেষ পর্যন্ত কেঁচে যাবে। এই কেঁচে যাওয়ার জন্য ভরসা ছিল অষ্টগ্রহ সম্মেলন। শেষ পর্যন্ত অষ্টগ্রহের আকর্ষণে ভারতবর্ষের নির্বাচন দ্বন্দ্ব বন্ধ করা সম্ভব হল না। বাঁধা কার্যক্রম অনুসারেই সর্বত্র ভোটাভুটি শুরু হয়ে গেছে।

ভোটেরও সাহিত্য আছে। "ভোট-রঙ্গ" নামে একখানি পত্রিকা একদা বাংলা দেশে বেশ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেছিল। তাতে থাকত ছড়া, টিপ্পনি, গালি-গালাজ ইত্যাদি। ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বিভিন্ন প্রার্থীর জীবনের গোপন সংবাদ পরিবেশিত হত। তখনকার কালের 'পয়সা সাপ্তাহিক'গুলি এই রকম চানাচুরের মত মুখরোচক সংবাদাদিতে পরিপূর্ণ থাকায় বেশ কাটতি হত। এই সব ছোঁয়াচ দায়িত্বশীল পত্র-পত্রিকাতেও যে লাগত না তা নয়, 'নন্দী-ভৃঙ্গী' রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ব্যঙ্গকাব্য সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হওয়ায় সর্বজনের কাছে আকর্ষণীয় হত। নাট্যকার অমৃতলাল বসু একটি প্রহসন নাটক 'দ্বন্দ্বে মাতরম' (১৯২৬) রচনা করেন। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের পট-ভূমিকায় রচিত নাটকে ভোট ভণ্ডুলের কথা আছে। সম্ভবতঃ M L C কথাটিকে তিনিই 'মালসী' করেছিলেন।

তখনকার কালে যে সব পত্রিকা কোন বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থন করতেন তাঁরা সহযোগী অপরাপর বিরোধী পত্রিকার সঙ্গে লড়াই-এ অবতীর্ণ হতেন। এর একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন পরশুরাম। ধূমকেতু-পত্রিকাকে আক্রমণ করে অপর পক্ষ বলছে—'তৎত্বমসি ধূমকেতো।'

আধুনিক যুগে সেই সব কাঁচা খেউড় অন্তর্হিত। শালীনতার সঙ্গে সেই কালের অমার্জিত রসিকতা লুপ্ত হয়েছে বটে, তবে এখন যে নীতি চালু হয়েছে তা প্রায় পিছন থেকে ছোরা মারার সামিল। এই ধরণের আক্রমণ সর্বপ্রথম শুরু হয় দেশবন্ধুর Forward দৈনিক পত্রে। সেই কালে ফজলুল হকের একখানি পত্রের ফটোষ্টাট প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল "Bluff, Bait, Bribery—Which?" ফলে সেদিনই ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার পতন হয়।

ভোটের সাহিত্য অন্য জিনিস, রঙদার, জ্বালাময় এবং অম্লমধুর। বর্তমান কালে এই ভোটরঙ্গের অনেকখানি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন কার্টুন-শিল্পীরা। যোগ্য অযোগ্য উভয় শ্রেণীর কার্টুনে শহর বোঝাই। পোষ্টার লেখার অনুশীলনের ফলে নাকি অনেক নিষ্কর্মা বালকের হাতের লেখা পরিষ্কার হয়েছে এবং বানান জ্ঞান নির্ভুল হয়েছে। আমাদের দেশে নির্বাচনী সাহিত্য বর্তমানে শুধু সংবাদপত্রেই সীমাবদ্ধ, কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে তার এখনও যথাযোগ্য আসন লাভ সম্ভব হয়নি।

ইংলণ্ডের নির্বাচনে গতবার মোট ভোটার সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটির মত, ভারতবর্ষের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি অনুসারে ভোটদাতার সংখ্যা একুশ কোটি। এদের ভাষা বিভিন্ন, ধর্ম বিভিন্ন এবং অনেক অঞ্চল দুর্গম এবং শ্বাপদসঙ্কুল। অধিকাংশ মানুষ আবার উপযুক্তভাবে শিক্ষা লাভ করেনি। এই বিরাট অঞ্চলের অসংখ্য মানুষকে গণতন্ত্রের পথে চালিত হওয়ার যে সুবিধা দান করা হয়েছে, এশিয়ার ভূখণ্ডে তার আর কোন তুলনা নেই। পাশাপাশি রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত নির্বাচন ব্যবস্থা করতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনও বালাই সেখানে নেই। নিরাপত্তা আইনে বন্দীর পক্ষে 'হেবিয়াস কর্পাস' দাবী করা পর্যন্ত চলবে না, হাইকোর্ট সেখানে সাক্ষীগোপাল মাত্র। লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিকপত্র Times এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন—**"It might be argued that the five year festival of garland giving, factional manoeuvaring and petition writing can only last so long as 'Panditji' lasts at the top. Yet those who spurn democracy as unsuited to Asian conditions will point to the time it took to mature in Europe."**

গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভূমিকা তাই বিস্ময়কর এবং এশিয়া ভূখণ্ডের মানুষের কাছে আদর্শস্থল। দারিদ্র্য, বেকারী, হাহাকার দূর হয়নি সত্য কথা। কিন্তু সেই কারণে রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষমতা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে রাখার কোন অজুহাত নেই। ভারতবর্ষ সে কথা বুঝেছে, এবং সেই মহৎ দায়িত্বপালনে ভারতের এই সাহসিক প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। তাই ভারতের এই নির্বাচন মহাযজ্ঞে সমগ্র বিশ্বের মানুষের আগ্রহ।

তাই বলে সাধারণ নির্বাচন নিছক গদ্যময় গুরুগম্ভীর ঘটনামাত্র নয়। ১৯৬২-র নির্বাচনের ঘূর্ণাবর্তে যাঁরা মেতে আছেন তাঁরা তাঁদের সম্ভাব্য জয়-পরাজয়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকুন। ১৯৫৭-র নির্বাচনের কথা স্মরণ করা যাক। শুধু যে ভারতীয় নরনারীই এই নির্বাচনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলেন তা নয়, বুনো জন্তুরাও তাঁদের নৈশবিহার কালে নির্বাচন কেন্দ্রে এসে হানা দিয়েছিলেন এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকেও।

মধ্যপ্রদেশের এক নির্বাচন কেন্দ্রে এক শার্দুল পুঙ্গব এসে গর্জন শুরু করেছিলেন, কার পক্ষে যে তিনি আবেদন করছিলেন কে জানে, ভোটদাতারা কিন্তু বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিলেন। পরে জানা গেল সেই চিতা-বাঘটির জন্য অন্ততঃ অর্ধেক ভোটদাতা নির্বাচন কেন্দ্রে হাজির হতে পারেননি।

এই মধ্যপ্রদেশেই আর একটি কেন্দ্রে দিন-দুপুরে এই ব্যাঘ্র নির্বাচনের পূর্ব-রজনীতেই এসে হাজির এবং একজন কর্মীকে কাঁধে নিয়ে পলায়নের উপক্রম করে। স্পষ্টতঃই নির্বাচন ভণ্ডুল করাই তার উদ্দেশ্য ছিল।

বন্য জন্তুর অন্য ভূমিকাও আছে। উত্তরপ্রদেশের জনৈক প্রার্থীর প্রতীক ছিল 'উদাত্ত সিংহ।' তাঁর নির্বাচনী প্রতিনিধিরা একটি গ্রামে গিয়েছেন নির্বাচনী প্রচারে, কাঁধে সেই 'সিংহের' প্রতীক। এমনই কাণ্ড, সেই রাতেই নেকড়ে বাঘের আক্রমণে এক দল গ্রাম্য ছাগল বিপর্যস্ত হয়। ফলে গ্রামবাসীরা স্থির করল এই 'সিংহ' চিহ্ন অত্যন্ত অশুভ এবং বলাবাহুল্য ভোট পাওয়া গেল না।

এইবারের নির্বাচন সংগ্রাম যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিতে লড়া হচ্ছে গত নির্বাচনও প্রায় সেই পট-ভূমিকাতেই লড়া হয়েছে। আগে আগে যে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে এই যাত্রায় যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, তা বলা যায় না। ১৯৫৭-এ একজন ভোটার ব্যালট বক্সে ভোটদানের পূর্বে তার সামনে আসন করে বসে রীতিমত প্রার্থনা করেছিলেন। কোন কোন জায়গায় ব্যালট বক্সে সিন্দুর কুমকুম, পত্র-পুষ্প ইত্যাদি দান করা হয়।

অনেক ব্যালট বাক্স উন্মোচন করে পাওয়া গেছে, (১) কোন প্রার্থী-বিশেষের সাফল্য সম্পর্কে শুভেচ্ছা,

কিংবা যথেচ্ছ গালাগাল, (২) ফটোচিত্র এমন কি হলিউডের জনৈক তারকার ছবি, (৩) রৌপ্যমুদ্রা এবং (৪) কারেন্সি নোট।

ইলেকসন কমিশন বলেছেন কোন রকমের টাকাকড়ি পেলে তা সরকারী ধনভান্ডারে জমা পড়বে।

কোন কোন ভোটদাতা আবার সদাশয়। মহীশূরে, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যার ভোটদাতারা সবকটি প্রার্থীর নামেই চিহ্ন দিয়ে ভোট দিয়েছেন। কাউকেই তাঁরা চটাতে চান না। ব্যালটপত্র ছিঁড়ে কটি বাক্সতে একটু একটু অংশ দান করে কর্তব্য পালন করেন।

এক বৃদ্ধা নির্বাচন কেন্দ্রে এসে বলে যে, নেহরুজীকে দেখতে চাই, তবেই ভোট দেব। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ঠান্ডা করতে হয়।

ইলেকসন কমিশন আর একটি মজার কথা জানিয়েছেন। একজন ভোটদাতা তদানীন্তন ইলেকসন কমিশনার শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ছাড়া আর কাউকে ভোট দিতে নারাজ।

প্রতীকেরও আবার একটা ভূমিকা আছে। একজন ভোটার এসে মহীশূরের এক কেন্দ্রের নির্বাচন অধিকর্তাকে বললেন যে, তাঁর জীবনে 'মই' এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। জীবিকা অর্জনের সহায়ক, অতএব সে 'মই' মার্কা বাক্সেই ভোট দেবে। সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। এদিকে ভোট দিতে হবে লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে, 'মই' ছিল বিধানসভার প্রার্থীর প্রতীক। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়।

উত্তরপ্রদেশের কিছুসংখ্যক মাঝি ভোটকেন্দ্রে এসে দেখে ভোটদানকেন্দ্রের ব্যালট বাক্সে একটিও 'নৌকা' প্রতীক চিহ্ন নেই, তারা বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়েই চলে গেল।

রাজস্থানে একজন হাজির হয়ে নির্বাচন-অধিকর্তাকে বলে যে, তার স্ত্রী ভোটার নয়, তবু তার জননীর ভোটটি তিনিই ব্যবহার করবেন। কেন না জননী অসুস্থ এবং স্ত্রী সংসার চালায়। অতএব ভোটদানের অধিকার তার। অনেক করেও তাঁকে সেদিন বোঝানো যায়নি।

সর্বশেষ আর একটি কৌতুককর কথার উল্লেখ করা যাক। অনেকেই জানেন যে, তাঁর জেতবার আশা নেই, তবু তিনি একজন প্রবল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাধারণে তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। কিন্তু লোকটি হেরে গেলেও লাভবান হন। উত্তরপ্রদেশের একজন আবেদন-লেখক ২৫০্ টাকা মাত্র ব্যয় করে যে প্রচার লাভ করলেন তার মূল্য অনেক বেশী।

জনগণেশের জয় হোক।

নতুন বই

লগ্ন-শুভ— (উপন্যাস) প্রবোধকুমার সান্যাল। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম—৩·৫০

ভুলটা হয়েছিল গোড়াতেই। দাম্পত্যজীবনে চিড় খাওয়ার ফলে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে সরমা দেবী ও নরেশচন্দ্র যে ভুল করে ভেবেছিলেন এখানেই এর শেষ —কার্যত তা' হোল না। ভবিষ্যৎ বংশধরকেও তিলে তিলে সেই ভুলের মাশুল শোধ করতে হলো। বাপের আওতায় লালিত হয়ে সোমেন্দ্র শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মেধা, বিদ্যাবত্তা এবং এমনি ব্যক্তিত্ব নিয়ে মানুষ হয়ে উঠলো যে, সরমা দেবী তার কাছে নাম মাত্র জননী হয়ে রইলেন।

ছেলেকে নিজের কাছে কাড়বার জন্যে মিলিকে সরমাদেবী ব্যবহার করেছিলেন দাবার ঘুঁটির মত। তাঁর হিসেবমতই সোমেন্দ্র মিলির প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু নরেশচন্দ্র সরমাদেবীর ওপরে টেক্কা দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়ে চারুলতার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। নরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে লড়াই করার মত প্রতিপক্ষবিহীন হয়ে সরমাদেবীও চারুলতার দিকেই ঝুঁকলেন। সোমেন্দ্র বিবাহিতা স্ত্রী চারুলতাকে ত্যাগ করে মিলির দিকেই ধাবিত হলো। ফুলশয্যার রাতে সোমেনের মুখে সবকিছু শুনে ঋজুব্যক্তিত্বসম্পন্না চারুবালা হাসিমুখেই সরে দাঁড়ালো। ভাঙা হৃদয় নিয়ে সে বসে রইলো না, সংসারে তার অনেক কাজ। লগ্ন-শুভ উপন্যাসে নৈরাশ্য-বেদনা ও মহান আত্মত্যাগের মাধুর্যে এই ত্রিভুজ প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠেছে।

চারুবালার জন্যেই যদিও সোমেন ও মিলির গোপন বিবাহ সম্ভব হলো, কিন্তু সরমাদেবীর ক্রুর চক্রান্তে তাদের জীবনে আবার ট্রাজেডি ঘনিয়ে এলো। বিয়ের সময় পিতার মতের বিরুদ্ধে যেতে না পারার জন্যে সোমেন যে পাপ করেছিল, সন্তান প্রসবান্তে ও হাসপাতালে মিলির মৃত্যুতেও তার প্রায়শ্চিত্ত হলো না। সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধির জন্য সোমেনের কারাবরণের প্রয়োজন ছিল। শেষে মিলির ছেলেকে নিয়ে চারুবালা ও সোমেনের মিলনে উপন্যাসের শুভ-সমাপ্তি ঘটেছে।

বর্ণনাচাতুর্যে ও লিপিকৌশলে প্রবোধকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানিও উপভোগ্য। আসর জাঁকিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর মত মিহি ও মোটা সুতোয় তিনি মনোজ্ঞ কাহিনীর জাল বুনেছেন। এই দিক থেকে দেখলে শরৎচন্দ্রের আমলের তিনিই শেষ প্রতিনিধি, যিনি কাহিনী দিয়ে পাঠককে অভিভূত করে টেনে রাখতে পারেন। তাঁর চরিত্রেরা সদা সঞ্চরণশীল, হয়ত একটু কম ভাবে এবং তাই ভাবায়ও কম। জীবনের জটিলতামুক্ত কাহিনী সহজ ছন্দে এগিয়ে চলে।

এই গ্রন্থের দাদুর স্মিত উজ্জ্বল চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ঘটনা-অঘটন সবই তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

সরমা ও চারুবালা এই কাহিনীর দুই কোটিতে দীপ্যমান দুটি নারী চরিত্র। সরমা যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্য-পীড়নে প্রতিহিংসাপরায়ণা, ধূমায়িত শিখা আর মর্যাদাময়ী চারুবালা যেন শ্রাবণের বিদ্যুৎবতী মেঘ। যদিও চারুবালা চরিত্রে যে-নূতনত্ব আভাসিত, উপন্যাসের সহজ পরিণতিতে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। তবু লগ্ন-শুভ উপন্যাসের সমস্যায় বৈচিত্র্যের আস্বাদ আছে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুরুচিপূর্ণ।

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী— (গল্প) শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এ।৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ২-৫০ নঃ পঃ।

চারিটি স্বতন্ত্র গল্পের সংকলন হলেও তাদের নায়ক বিজন। নায়ক বিজন এ যুগের মানুষ। জীবনের বিবিধ ছন্দ চারিটি গল্পের মধ্যদিয়ে বিজন চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনটা হঠাৎ গড়ে ওঠে না। কৈশোর আর যৌবনের ছাপ থেকে যায় তার ওপর। অভিজ্ঞতার পরতে পরতে অনুভূতির সচেতনতায় গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ জীবন। কিন্তু এ জীবনে 'জ্ঞান নেই বলে প্রেম নেই, বন্ধুতা নেই... পরস্পরকে যৌনপ্রহার করে বেঁচে থাকতে

চাই...মারা যাব অতর্কিতে আততায়ী মৃত্যুর হাতে"। বিজনের জীবনের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে আধুনিক সভ্য আর রুচিশীল জীবনের যুবসম্প্রদায়ের পক্ষে তা একান্ত সত্য। বিজনের নিঃসঙ্গ নিরালম্ব অনুভূতিপ্রবণ জীবন থেকে এ সত্যও ফুটে ওঠে, বেঁচে থাকতে হলে যে সুস্থতার প্রয়োজন সে সুস্থতা একালের 'শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসহীনতা'র মাঝখানে হারিয়ে গেছে, যে সংগ্রামের প্রয়োজন তার জন্য শক্তি হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। কিন্তু মানুষ মাত্রেই বাঁচতে চায় আর সে জন্য তার আকুলতার অন্ত নেই।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, আধুনিক বর্ণনাভঙ্গীমার মাধ্যমে। কাহিনী গ্রন্থনার এ অভিনবত্ব সর্বত্র সমভাবে বর্তমান হলেও 'মীরাবাঈ' গল্পটি কিছুটা পুরনো বলেই মনে হয়েছে। এ গল্পটির কাহিনী অন্যগুলির সঙ্গে সমভাবে তাল রাখতে পারেনি। 'বিজনের রক্তমাংস', 'দশ বছর পরে একদিন', 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্প তিনটি উল্লেখযোগ্য। শেষ গল্পটি এ যুগের একটি অন্যতম ছোট গল্প। এ ধরণের গল্পসৃষ্টিতে যে মৌলিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তা লেখকের আছে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় যে একজন সুদক্ষ কথাশিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা রাখেন তার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার দায়িত্ব তাঁর। গদ্যের ভাষা অতিরিক্ত মাত্রায় কাব্যধর্মী হলে তার মাধুর্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়, এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বড় শিল্পী হতে গেলে শিল্পীক সংযমের প্রয়োজন। আর সে সংযমের অভাব এ গ্রন্থের কোথাও কোথাও রয়েছে।

এইসব আলো প্রেম—(উ প ন্যা স) **শ্রীঅসিত গুপ্ত। এম, সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা—১২। দাম ৪·০০ ন, প।**

সুরের আগুন—(উপন্যাস) **শ্রীগোলাম কুদ্দুস। মুকুন্দ পাবলিশার্স; ৪৮নং, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৪। দাম ৪·৭৫ ন, প।**

'এই সব আলো প্রেমে'র লেখক বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একেবারে নতুন নন। ইতিপূর্বে তাঁর উপন্যাস ও কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁর রচনায় যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছিল এখানে তার পরিপূর্ণ সার্থকতা না ঘটলেও মোটামুটি স্বাভাবিক রূপটি পাওয়া যাবে।

মানুষটি সংগীতকে ভালবাসে, সে জীবনকে ভালবাসে। কিন্তু এ কথা সে জানে জীবনটা 'প্লেটোনিক লাভে'র ব্যাপার নয়। এখানে সংগ্রাম আছে—নানাবিধ পরিবেশের মধ্য থেকে সংগ্রাম করে গড়ে উঠতে হয়। ভালবাসা নাম করে অনেক ব্যাভিচারের সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তি আর বিচারের মানদণ্ডে সব কিছুকে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু সে অসুস্থ নয়। সে স্বাভাবিক। একটি যুবকের চিন্তাজগতে অনেক কিছু বস্তুর আবির্ভাব ঘটতে পারে যাকে অস্বাভাবিক মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সত্য। নায়ক 'আমি'। তার জীবনের এক একটি মুহূর্তে বহু মানুষ এসেছে মধুর ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। তাই চলে গেছে মা, বাবা, ললিতা বউ, মীনাক্ষী। কিন্তু ঐ তো স্বাভাবিক ছিল। ঐ ভুলটাই স্বাভাবিক। এ-ই জীবন। তা না হলে মুহূর্তের আবেশকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে একদিন 'আমি' হারিয়ে যেত। শেষ মুহূর্তে সরস্বতীকে পেয়েও কিন্তু তার মনে হয় এও হারিয়ে যেতে পারে।

উপন্যাসটিতে একজন আধুনিক শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার অভিনবত্ব ও নায়কের সূক্ষ্ম মনবিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের দুর্লভ ক্ষমতার পরিচায়ক। বিশেষ করে নায়কের মনের বিশ্লেষণের অপূর্বতা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। তাই ঘটনাপ্রবাহে যে বিচিত্র জীবন ঘুরে-ফিরে এসেছে বারে বারে তার মধ্যে লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় সুস্পষ্ট। তারা কৃত্রিমতার আড়ালে পড়ে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের কাব্যধর্মী চেতনা। রচনাকে তা মধুর করে তুলেছে। ভাষা স্বাভাবিক হওয়ায় কাহিনী এতটা সার্থক হতে পেরেছে। প্রতিশ্রুতিবান এই

লেখকের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। কে মল্লিক সুরসাধক। সুরকেই সে জীবন দিয়ে ভালবেসেছে। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার এই জীবন গড়ে ওঠে। ভারতীয় সংগীতের তীর্থ-ক্ষেত্রে সে ছুটে গেছে আরাধনার জন্য। বহু সাধনার পর এসেছে সার্থকতা। নামের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অর্থ আর আনুষঙ্গিক। বিষয়-সম্পত্তি গড়তে গেছে। সেখানে তার সংগীত-প্রেমিক মন সংগীতের মধ্যেই শান্তি খুঁজে পেয়েছে।

মোটামুটিভাবে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। ভাষা সহজ ও সুন্দর। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে চরিত্রগুলি চিত্রিত। কাহিনীর মধ্যে বাঙলার চিত্র ফুটে উঠেছে যেমন তেমনি একটি বাঙালী শিল্পীমনকে পাওয়া যায় রচনায় মধ্যে। ঔপন্যাসিকের এ বৈশিষ্ট্যটিই গ্রন্থটির আকর্ষণ।

মিস বোসের কাহিনী— (উপন্যাস) —বাণী রায়। প্রকাশক গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

বাণী রায় প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। এক নেতার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে মিস বোসকে অপযশের কালিমা মাখতে হয়। ফলে তিনি তাঁর জীবনের শূন্য সিংহাসনের উপযুক্ত পুরুষ আর খুঁজে পেলেন না। উচ্চ পর্যায়ের প্রথম প্রেমিকের শূন্য আসনে নিম্নশ্রেণীর প্রেমিককে বসাতে মন চায় না। প্রথম যৌবনের মাদক স্মৃতি-প্রান্তে হোঁচট খেয়ে রইলেন মিস বোস। ম্রিয়মানা, ভগ্ন আশার প্রতিমা মিস বোস। কাঙালের মতো যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ঈর্ষা করেন সুন্দরী তরুণীদের। জগৎকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। তারপর একদিন অনঙ্গ এল মিস বোসের জীবনে নতুন স্বপ্ন নিয়ে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। একজন পঙ্গু, অপরে আটান্ন। কিন্তু দুজনেই একা, দুজনের শূন্য হৃদয় ভরে ওঠে। অনঙ্গ তাই তরুণের মত দুষ্ট হয়ে ওঠে আর মিস বোস আহ্লাদে খুকীপনা সুরু করলেন, এই হোল মিস বোসের কাহিনী। পাইকা অক্ষরে ছাপা একশ সাড়ে তিন পৃষ্ঠার উপন্যাস। মুদ্রণ-পরিপাট্য প্রশংসনীয়।

চপক-সংহিতা— (সরস প্রবন্ধ)— কালিদাস রায়। আনন্দ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সদ্য প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ 'চালচিত্রের' সমালোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। 'চপক-সংহিতা' তাঁর দ্বিতীয় সরস প্রবন্ধ সংকলন। মধুর ভঙ্গীতে প্রবীণ কবি কয়েকটি লঘু প্রবন্ধের মধ্যে অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রাপ্ত কিছু বিচিত্র তথ্য পরিবেশন করেছেন। জীবনের তিক্ত, তীক্ষ্ণ, রূঢ়, রুক্ষ রূপ তাঁর মনে যেভাবে দাগ কেটেছে এই সব রচনায় তা প্রতিফলিত। সামাজিক পট-পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে নবীনাদর্শের যে মৌল পার্থক্য আছে পুরাতনের পক্ষে তা সর্বদা নির্বিচারে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তার ফলে দুটি বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে একটা সংঘাত বাধে। বহুদর্শী লেখকের রচনায় সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রাণরসে উজ্জ্বল সজীব রেখাচিত্রে রূপায়িত কথোপকথনের আঙ্গিকে রচিত সতেরটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রচনা-গুলির মধ্যে 'বইয়ের আদর', 'ছাপার ভুল', 'সাহিত্যিকের বিড়ম্বনা', 'কবির বিবাহ', 'মোটর', 'অবসরের বিড়ম্বনা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'গানের ভুল' প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখককে সেকস-পীয়রের সেই অতি প্রচলিত উক্তি 'নামে কি আসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাকো'—ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি মনোরম, তবে প্রচ্ছদটি তেমন মনোরম নয়।

সাহিত্যচিন্তা— (প্রবন্ধ)—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক— শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

বিভিন্ন মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদকদের তাগিদে রচিত পনেরটি প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ। লেখক কৃতী অধ্যাপক এবং সাহিত্য সমালোচক। তাঁর আলোচনা-গ্রন্থ সোনার তরী, বলাকা, পূরবী এবং মহুয়া সমালোচক-দের প্রশংসাধন্য। এই প্রবন্ধগুলি অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারের। লেখকের বিচিত্র চিন্তার প্রতিফলন। এই গ্রন্থের প্রবন্ধা-বলীর মধ্যে কবিতার শব্দশিল্প, কবিতার সমর্থনে, কবিতার আঙ্গিকের মূল্য। আধুনিক কবিতা, কবিতার পাঠাগার এবং তরুণ কবিদের আসরে প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যে বক্তব্য আছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যে সহাবস্থান নীতি ও সাহিত্য ও স্বাধীনতা প্রবন্ধ দুটি বিশেষ মূল্য-বান। ছাপা পরিষ্কার।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

প্রবন্ধ-পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্র দত্ত ও ও শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ; ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলি—৫ হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বাঙলা ভাষায় কেবলমাত্র প্রবন্ধ পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। আলোচ্য পত্রিকাটি সেক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গভীর মননশীল রচনা প্রকাশে এর একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যায় তাঁদের সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন শ্রীরথীন্দ্র-নাথ রায় (ঘরে বাইরে), শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় (আদিবাসী সমাজ-জীবনের স্বরূপ), শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (ভক্তিরস-রাজ ত্যাগরাজ), শ্রীসুভাষ সরকার (কাব্য নাট্য ও 'চার চোখ'), শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ (রবীন্দ্রোত্তর নাটক ঃ ভূমিকা), শ্রীগিরি-শংকর (রক্তকরবীর শিল্পরূপ), শ্রীঅশোক মুস্তাফি (একজন বিস্মৃত চিন্তানায়ক ও স্ত্রী স্বাধীনতা), শ্রীবিশ্বপ্রিয় মুখো-পাধ্যায় (বিজ্ঞান শিক্ষক ও রবীন্দ্রনাথ) এবং শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রুষ ভারতী—সম্পাদক শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৭৭ ধর্মতলা স্ট্রীট; কলি-কাতা—১৩ হ'তে প্রকাশিত। দাম ৭৫ ন, প,

ভারত সোবিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সোবিয়েৎ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেফ সংবর্ধনা, বেজনেফের ভাষণ, ব্রেজনেফ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী, মেজর য়ুরি গাগারিন সংবর্ধনা, মেজর গাগারিনের ভাষণ, মহাশূন্যাভিযানের রোজনামচা সংকলিত হয়েছে। ভান্দা ভাসিলেভস্কার সহযাত্রী নামক একটি গল্প অনুবাদ করেছেন শ্রীসুধাংশু অধিকারী। তা ছাড়া লিখেছেন ডি, ওয়াই মার্তিনভ; নরহরি কবিরাজ, দিলীপ সেনগুপ্ত, নিকোলাই তিখোনভ, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, আদিত্য-প্রসাদ সিংহ, চিত্তসুন্দর ভট্টাচার্য প্রভৃতি। পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

ভ্রম সংশোধন—২৭শে পৌষ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের একটি উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হয়েছিল "সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটি-তেই কথা-সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি..." ইত্যাদি। অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পত্রযোগে প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, "তাঁর সাতখানি উপন্যাস ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রায় সবগুলির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত"। এই তথ্যটুকু আমাদের সম্যক জানা না থাকায় অজ্ঞানতাবশতঃ যে ত্রুটিপূর্ণ ভ্রমাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তজ্জন্য আমরা দুঃখিত এবং লজ্জিত।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

মঞ্চাভিনেতা ও দর্শক :

একদা কোনো চলচ্চিত্র-পরিচালক বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কোনো খ্যাতনাম্নী অবসর-প্রাপ্তা অভিনেত্রীকে একটি বর্ষীয়সী নারীচরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরে অভিনেত্রীটি পরিচালকের এই অনুরোধ রক্ষায় তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে কারণস্বরূপ বলেছিলেন, "বার্ধক্যের আক্রমণে কাবু হয়ে পড়বার আগেই সুনাম থাকতে থাকতেই সাধারণ মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আজ ঐ সুনামের স্মৃতিটুকু অবলম্বন করেই বেঁচে আছি। আপনার ছবিতে নেমে আমার সেই সুনামটুকু হারাবার সম্ভাবনার সামনে দাঁড়াতে রাজী নই।" পরিচালক যখন উৎসাহভরে বলেছিলেন, "জানেন তো, মেরী ড্রেসলার কি রকম বেশী বয়সে ফিল্মে নেমে কি ভীষণ নাম করেছেন; আপনিও এই ফিল্মের মাধ্যমে এই সুন্দর ভূমিকাটিতে অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চয়ই খুব নাম করবেন", তখনও অভিনেত্রীটি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, "ভূমিকাটি সত্যিই লোভনীয় এবং এর জন্যে যে-পারিশ্রমিক দেবেন বলছেন, সে তো আরও বেশী লোভনীয়। তবুও মেরী ড্রেসলার যা পেরেছেন, আমিও যে তা' পারব, এমন কথা কে বললে? তা' ছাড়া মেরী ড্রেস-লারের মঞ্চখ্যাতি ছিল কিনা জানি না; যদি বলেন ছিল, তা'হলে বলব, সুনাম হারাবার ঝুঁকি নিয়েই তিনি ফিল্মে নেমেছেন। মাপ করবেন, আমি ও-রকম ঝুঁকি কিছুতেই নিতে পারব না।" একটু থেমে তিনি বললেন, "শুনেছি, আমাদের মঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী, সর্বজন-স্নেহধন্যা অমুক ফিল্মে নাকি কমিক পার্ট ক'রে নাম করেছেন? বুঝুন তো অবস্থা! মঞ্চে উনি কি করতেন, আর ফিল্মে কি করছেন? আমি ত' এ জিনিষ ভাবতেই পারিনা।" কাজেই পরিচালককে তাঁর কাছ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়েই ফিরতে হয়েছিল।

ওপরের ঘটনা থেকে যে-জিনিষটা সবচেয়ে বেশী প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে, বার্ধক্যপীড়িত হবার আগেই অভি-নেত্রীটির সাধারণ মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ। অমৃতলাল লিখেছেন, "দেহপট সনে নট সকলি হারায়।" কিন্তু আমরা দেখেছি, দেহপট হারাবার আগেই বহু নট তাঁদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। দেহ থেকে যৌবনের দীপ্তি যেমনই চলে যায়, জরা যেমনই ধীরে ধীরে দেহকে আক্রমণ করতে থাকে, অমনি মঞ্চনটের নাট-নৈপুণ্যের জলুসও কমতে থাকে একটু একটু ক'রে। আমরা দেখেছি, গিরিশপুত্র, পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) যুবা বয়সে যে অমিতবিক্রমে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম, শিবাজী প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় ক'রে প্রেক্ষা-গৃহকে মাতিয়ে কাঁপিয়ে তুলতেন, বার্ধক্যে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করবার সময় মন্ত্রশক্তি বা পোষ্যপুত্র নাটকে রমাবল্লভ বা শ্যামাকান্তের ভূমিকায় প্রতিভার দ্যুতির সম্যক পরিচয় দিলেও যৌবনের সেই উন্মাদনা লক্ষিত হয়নি। "জনা" নাটকে প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি ত' প্রায় উপহসিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সাপ্তাহিক "নাচঘরে"র কার্টুন চিত্রের পরিচয়লিপি "ওগো মোর স্থবির প্রবীর, আমি তব কায়িকা নায়িকা" আজও আমাদের স্মরণে আছে। ঠিক সমানভাবেই শিশিরকুমারের নটজীবনে জনপ্রিয়তা হ্রাসের বিষয় উল্লেখ করা যায়। মনোমোহন নাট্যমন্দির বা কর্ণ-ওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানে "শ্রী") 'সীতা', 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'ষোড়শী', 'শেষরক্ষা', 'দিগ্বিজয়ী', 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি অভিনয়ে তাঁর নাট্যনৈপুণ্যে যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, জীবনের অপরাহ্নবেলায় শ্রীরঙ্গমে 'জীবনরঙ্গ', 'মহাপ্রস্থান', 'তখতে তাউস' প্রভৃতি নাটকে তাকে কি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে দেখা যায়নি? যে-শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শককে একদিন মুগ্ধবিস্ময়ে হতবাক ক'রে রাখত, সেই শিশিরকুমারকেই কি মঞ্চ থেকে সমা-

সুশীল মজুমদার পরিচালিত দে প্রোডাকসন্স-এর মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'সঞ্চারিণী' চিত্রে কণিকা মজুমদার

মার্ক রবসনের গান্ধী-চিত্রে ('নাইন আওয়ার্স টু রাম') গডসে ও মহাত্মা গান্ধীরূপে (বাম থেকে দক্ষিণে) জার্মান শিল্পী হর্স্ট বুশোলজ ও জে এস কাশ্যপ।

লোচক দর্শকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়নি? কি অভিনেতা, কি অভিনেত্রী, কুশলী নটনটী খ্যাতির শিখরে ততদিনই সমাসীন থাকেন, যতদিন জরার আক্রমণে তাঁদের স্বাভাবিক নাট্যনৈপুণ্য ব্যাহত না হয়। আর মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ত' কথাই নেই। মানুষের স্মৃতিপটে তাঁদের ছবি মলিন থেকে মলিনতর হ'তে হ'তে একদিন একেবারেই মুছে যায়। আমরা দেখেছি, যে-বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হয়েছিলেন, সেই বিনোদিনী মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পরে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখছে না। মনোমোহন থিয়েটারের প্রখ্যাত নট হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আর্ট থিয়েটারের নটকুলশিরোমণি তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি নটকে মঞ্চত্যাগের পর শহরের ট্রামে বাসে, হাটে বাজারে জনতার মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেছি; কেউ তাঁদের চিনতে পেরে সম্মানের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা নজরে পড়েনি। এবং পরবর্তী জীবনে কর্মহীন ও অর্থহীন হওয়ার দরুণ কোন শক্তিমান নটকে যেমন দেখেছি, সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, তেমনই দেখেছি একদা জনপ্রিয় নটীকে উত্তর কলকাতায় গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটের নিকটে ভিক্ষাবৃত্তি করতে। মনে হয়েছে, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ! একদিন যারা তাদের অভিনয়ের দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ দিয়েছিল, তাদেরই তারা পরবর্তীকালে এমন অনায়াসে ভুলে যেতে পারল যে, সমাজের আবর্জনা স্তূপে তাদের দূরে ঠেলে দিতেও তাদের বাধলনা? জানি, 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ', কিন্তু কালের অমোঘ প্রভাবে এমন নিষ্ঠুর পটপরিবর্তন মানুষের সভ্যতাকে উপহসিতই করে। যখন দেখি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম অজস্র প্রশংসাসূচক বিশেষণে বিশেষিত হয়ে গৌরবের আসনলাভ করেছে, তারাই ক্ষুধান্নের জন্যে সভা মানুষের দরজায় নতমস্তকে হাত পেতে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে, তখন আমাদের সভ্যতাভিমানকে শত ধিক্ দিতেই ইচ্ছা করে।

রূপকারের "কালের যাত্রা" :

শরৎচন্দ্রের ৫৭ বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নাটিকাটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে এই কয়টি কথা লেখেন, "রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল, মহাকালের রথ অচল। মানব-সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। এই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি প'ড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" প্রশ্ন জাগে, কার শক্তিতে এই সাংসারিক রথ চলছে, কে চালায় এই রথ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রাজশক্তি বা দৈবশক্তি যখন অচল, রথকে সচল করতে পারে না, তখন প্রয়োজন শূদ্রশক্তির; শূদ্রশক্তির দ্বারাই কালের রথ আবার সচল হয়ে উঠবে।

এই ইঙ্গিতধর্মী রূপক নাটিকাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন রূপকার নাট্য-সম্প্রদায়। খালেদ চৌধুরী পরিকল্পিত প্রতীক মন্দির এবং অদৃশ্য রথের বৃহদাকার রজ্জু এই রূপক নাটিকা অভিনয়ের অত্যন্ত সুষ্ঠু আঙ্গিক রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সবিতাব্রত দত্তের সুস্থ নির্দেশনা। তিনি রবীন্দ্র-নাটিকার একটি পংক্তিও অদল-বদল না ক'রে মাত্র কিছু সংযোজনের দ্বারা নাটিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে। তাই দেখি মূল-রচনার কথা আরম্ভের আগে মন্দিরের পুরোহিত আপ্রাণ চেষ্টাতেও অনড় রথ-রজ্জুকে বিন্দুমাত্র সরাতে ব্যর্থ হয়ে এলিয়ে পড়লেন এবং তাঁর এই ব্যর্থতার কাহিনী গোপনে জানা হয়ে রইল এক গ্রামবাসীর। এ-ছাড়া তিনি তাঁর নিজের দ্বারা অভিনীত কবির মুখে কয়েকটি অত্যন্ত সুনির্বাচিত গান যোজনা করেছেন। এর ফলে দর্শক-মন আরও নাড়া পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সোজা করে তার মনে এসে পৌঁছেছে। এর অভিনয় এমন একটি সুরে বাঁধা হয়েছে যে, কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দলচ্যুত ক'রে বিশেষ প্রশংসা করার উপায় নেই। নাগরিক, সৈনিক, ধনপতি মন্ত্রী, পুরোহিত, কবি, সন্ন্যাসী, চর, রথের মেলার মেয়েরা—সকলেই নিজ

নিজ অংশে ছন্দ বজায় রেখে অভিনয় ক'রে একটি সমগ্র রসমূর্তিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। অবশ্য কবিকণ্ঠনিঃসৃত গানগুলি তাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এই রসমূর্তিকে দর্শকপ্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

ইঙ্গিতধর্মী রূপক নাটিকার এমন সার্থক অভিনয় ক্বচিৎ দেখা যায়।

"কালের যাত্রা" বা "রথের রশি"র অভিনয়সূচীসম্বলিত যে নাতিবৃহৎ পত্রিকাটি রূপকার গোষ্ঠীর হয়ে দিলীপ চৌধুরী প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন সার্থক রচনা-সমৃদ্ধ হয়ে তা নাট্যরস-পিপাসুর কাছে একটি মূল্যবান সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে।

অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্সের 'আগুন' চিত্রে সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি ও নির্মলকুমার।

চিত্র সমালোচনা

সূর্যস্নান : চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন; ১২,৭৫৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অজয়-কুমার; চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই; সংগীত-পরিচালনা : ভি বালসারা; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সতোন চট্টো-পাধ্যায়; সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যো-পাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ : কার্তিক বসু; রূপায়ণ : তৃপ্তি মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা, সীতা মুখো-পাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অমর গঙ্গো-পাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, খগেন পাঠক প্রভৃতি। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।
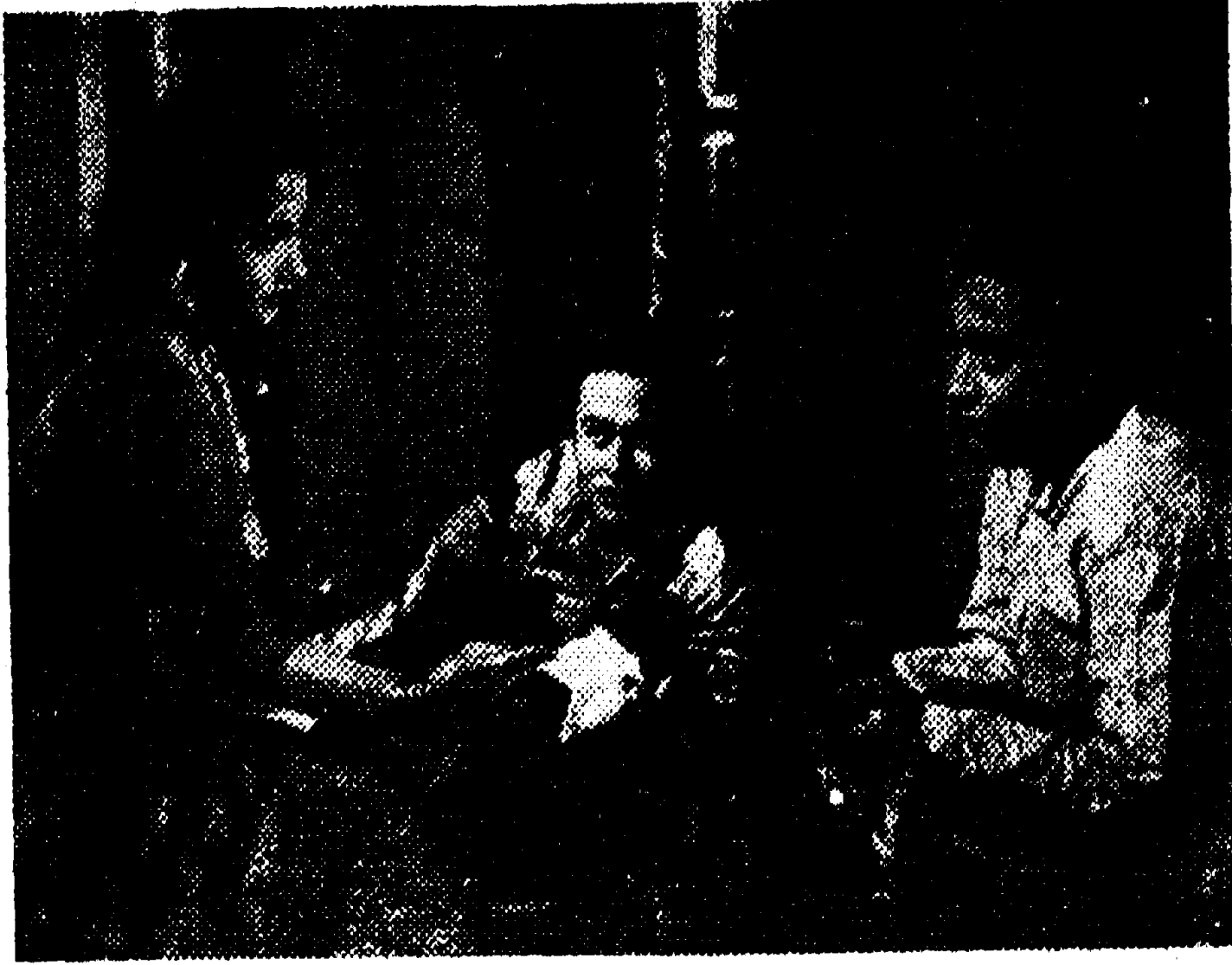
"সূর্যস্নান" নামটির মধ্যে একটি মহৎ কাহিনীর প্রতিশ্রুতি আছে। টলস্টয় লিখিত অবিনশ্বর উপন্যাস "রেজারেক-সান"-এ একটি কালজয়ী শিল্প-সৃষ্টির অমোঘ স্বাক্ষর প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত হয়ে যে-আত্মগোপনকারী লেখক চলচ্চিত্রের প্রয়োজন মেটাতে "সূর্যস্নান" গল্পটি লিখেছেন, তিনি মাত্র ব্যর্থতারই স্বাক্ষর রেখেছেন এর পত্রে পত্রে। কবি লিখেছেন, "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে। তব রোষ তারে যেন তৃণসম দহে।" কলকাতা হাইকোর্টের সুখ্যাত বিচার-পতির সুযোগ্য ব্যারিস্টার-পুত্র জয়ন্ত সেন তার নিজের জন্যে রাখা ব্যাচিলার্স ফ্ল্যাটে তার বন্ধু প্রকাশের বস্তির গরীব ভাড়াটে হাবুল সরকারের সৎ-মেয়ে বাসন্তীকে নিয়ে এসে 'এলোমেলো ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে' মুহূর্তের আবেগে প্রকৃতি-তাড়িত হয়ে যে-অন্যায়টি ঘটিয়ে বসল, সেটি পর দিন সকালে তার একমাত্র বন্ধু প্রকাশের কাছেও প্রকাশ না করার কোন্ সাধু যুক্তি থাকতে পারে? ধনী কন্যা সুরূপা শকুন্তলাকে যখন সে কোন দিন মুখ ফুটে ভাল-বাসা'র কথা বলেনি, তখন তাকে অম্লান-বদনে উপেক্ষা ক'রে বাসন্তীকে বধূত্বে বরণ করার পথে বাধা ছিল কোথায়? যদি বলা হয়, বাধা ছিল তার নিজেরই দুর্বল মনে, যে-দুর্বল মন তাকে নারী-দেহ-সম্ভোগের প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে পারেনি, যে-দুর্বল মন বাসন্তী থেকে রূপে-ঐশ্বর্যে শকুন্তলা তার কাছে ঢের বেশী কাম্য ব'লে জানিয়ে দিয়ে-ছিল, তাহ'লে বলব, এমন দুর্বলমন-বিশিষ্ট জয়ন্তকে গল্পের নায়করূপে উপস্থাপিত না ক'রে একটি ভিলেন বা শয়তানরূপে চিত্রিত করলে লেখক অন্ততঃ নিজের প্রতি ঢের বেশী সুবিচার করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত সেনকে বিচারক সাজবার প্রহসন থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। গল্পের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে, জয়ন্ত একটি অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের লোক। এবং প্রকাশ যখন তাকে বলে, পরস্পরকে ভালোবাসার জোরে সে আর বাসন্তী বিবাহিত হ'তে চায়, তখন জয়ন্তর স্বস্তির নিশ্বাস-ফেলা ব্যবহার দেখে লোকের সন্দেহ থাকে না যে, জয়ন্ত একটি খাঁটি শয়তান, যাকে ইংরেজীতে বলতে পারা যায়, **a smiling damned villain.** অন্যায়কারী জয়ন্ত, আর অন্যায় সহ্য-

'বধূ' চিত্রে অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ।

ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনালের 'স্পার্টাকাস' চিত্রে কার্ক ডগলাস ও লরেন্স অলিভার।

কারিণী বাসন্তী—দু'টি চরিত্রই অত্যন্ত ব্যর্থভাবে চিত্রিত হয়েছে লেখকের দ্বারা।

এর পরেও কথা আছে। "সরকার বনাম বাসন্তী" মামলার বিচার্য বিষয় ছিল, বাসন্তী তার সদ্যোজাত অবৈধ সন্তানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে কিনা? সন্তানটির নিতান্ত আকস্মিকভাবে অপঘাত-মৃত্যু ঘটেছে, এ-সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সে-সব প্রমাণকে আদালতে উপস্থিত করা হয়নি এবং সেই কারণে জুরীদের রায়ে বাসন্তী সন্তান-হত্যার অপরাধে অপরাধী। বিচারকের পদে ইস্তফা দেবার পর বাসন্তীর অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব সম্পর্কে জয়ন্তর স্বীকারোক্তির সঙ্গে হত্যার প্রশ্নঘটিত মামলার সম্বন্ধ কি? প্রকৃত তথ্য গোপনের অপরাধে জয়ন্তর শাস্তির জন্যে অন্য মামলা হওয়া সম্ভব, কিন্তু হত্যাপরাধ স্খলন হয়ে বাসন্তীর মুক্তি পায় কোন্ আইন বলে? গল্পের প্রতি স্তরে অসংখ্য দুর্বলতার আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তা আমাদের আলোচনাকে অনাবশ্যক-ভাবে দীর্ঘায়িত করবে।

ছবিতে কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেছে। চিত্রগ্রহণে আলোছায়ার সুষ্ঠু সমন্বয়বিধানে চিত্রশিল্পী দেওজীভাই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সন্তান-হত্যা মামলার রায় মুলতুবী রেখে জয়ন্ত যেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে অক্ষম হয়ে অব্যবস্থিতচিত্তে গাড়ী চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে বাঁকাভাবে রাস্তা-বাড়ীঘরের দৃশ্য জয়ন্তর অস্থিরতাকে প্রকাশ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অবশ্য কলকাতা হাইকোর্টের কোন বিচারপতি নিজেই মোটর চালান কিনা, তা আমাদের জানা নেই। শব্দধারণের কাজও প্রায় নিখুঁত; যদিও গঙ্গাবক্ষে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃষ্টির চেষ্টা যেমন অকারণ, তেমনই ব্যর্থ। কার্তিক বসু শিল্পনির্দেশের দায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেননি। গল্পের মেজাজ অনুযায়ী আবহ-সংগীত রচনায় অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ভি বালসারা।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাসন্তীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। ঝড়ের রাতে অপরাধ সংঘটনের পর থেকে তাঁর মানসিক অন্তর্জ্বালাকে তিনি বিচিত্রভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর চলনে, বলনে, চাউনিতে, ঠোঁট-মুখের অভিব্যক্তিতে। এত সহজ অভি-ব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এ'র পরেই নাম করতে হয় প্রকাশের ভূমিকাভিনয়কারী সবিতাব্রত দত্তর। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর গৃহীত চরিত্রটি রূপদান করেছেন। বাসন্তী ও প্রকাশের মধ্যে প্রেম সঞ্চাত হবার তেমন কোন দৃষ্টগ্রাহ্য নিদর্শন না দেখিয়েই তাঁর মুখ দিয়ে যে-ভাবে জয়ন্তের কাছে বাসন্তীকে বিবাহের প্রস্তাব করানো হয়েছে, তা অত্যন্ত হাস্যকর। এবং এই হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে সবিতাব্রত কিছুমাত্র দায়ী নন। হোটেলে ফ্লার্ট-গার্লের ছোট্ট ভূমিকায় মিতা চট্টোপাধ্যায়ের রূপসজ্জা ও অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নায়ক জয়ন্তের ব্যর্থ-চরিত্রে শম্ভু মিত্র অত্যন্ত কৃত্রিম ভঙ্গীতে অভিনয় করে চরিত্রটির ব্যর্থতাকে আরও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। পাহাড়ী সান্যালের মিঃ সেন, ছবি বিশ্বাসের জগদীশবাবু, লিলি চক্রবর্তীর শকুন্তলা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের হাবুলে, অপর্ণার হাবুলের স্ত্রী, অমর গাঙ্গুলীর সরকারী কৌঁসুলী—প্রভৃতি ভূমিকা চরিত্রানুগ হয়েছে।

ছবির একটিমাত্র গান, রবীন্দ্রনাথ-রচিত "সর্ব খর্বতাকে দহে তব ক্রোধদাহ" এককভাবে গেয়েছেন রীণা চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিবিধ সংবাদ

শৌণিক-মিত্র গোষ্ঠীর নাট্যানুষ্ঠান ঃ

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা শৌণিক-মিত্র গোষ্ঠী গেল ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শিয়ালদহ ক্রেম রাউন ইনস্টিটিউটে দু'টি একাঙ্কিকার অভিনয় করেছিলেন—"এক অধ্যায়" এবং "পকেট-মার"। দুখানি বই-ই অমর গঙ্গো-

'সূর্যস্নান' চিত্রে শম্ভু মিত্র, আরতি দাস ও লিলি চক্রবর্তী।

পাধ্যায়ের রচনা। প্রথমখানিতে কয়লা-খনির খাদে বিপদের আশংকা জেনেও কয়েকজন কুলী নামানোর ফলে তাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে খনির ম্যানেজার শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে শ্রমিকদের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ দেখানো হয়েছে। এবং দ্বিতীয়খানিতে দেখানো হয়েছে, কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ধর্মঘট চলবার সময়ে কয়েকজন শ্রমিকের ক্ষুধার তাড়নায় মালিক পক্ষের কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা এবং ওরই মধ্যে একজন শ্রমিকের পকেটমার বৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও বিপন্ন শ্রমিক-ভাইদের উদ্ধার করার মহৎ প্রচেষ্টা। একাঙ্কিকা হিসেবে নিশ্চয়ই 'পকেটমার' 'এক অধ্যায়' থেকে বলিষ্ঠতা ও সম্পূর্ণতা দাবী করে। উভয় নাটিকাতেই গোষ্ঠীর অভিনেতারা অসামান্য নাট্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

বংগীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা :

একদা বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা (**Bengal Film Journalist Association**) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলিকে পুরস্কৃত ক'রে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবৎ এই সংস্থাটি একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি আবার যেন এই সংস্থাটিতে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার সিটি আপিসে গেল ১০ই এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত দু'টি অধিবেশন মারফৎ জানা গেছে যে, এ'রা ১৯৬১ সালে কলকাতায় প্রদর্শিত হিন্দী, বাঙলা ও ইংরেজী চলচ্চিত্রগুলিকে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পুরস্কৃত করবেন। সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে একটি অ্যাড-হক কমিটিও গঠিত হয়েছে।

জীবন্ত পুতুলচিত্র :

সম্প্রতি লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে পরীক্ষামূলকভাবে একটি জীবন্ত পুতুলচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। অজয় চক্রবর্তী দ্বারা ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরায় তোলা এই কুড়িমিনিটস্থায়ী ছবিটির মাধ্যমে মানুষের হাসিকান্না, আনন্দউল্লাস পুতুলকে আশ্রয় ক'রে রূপায়িত হয়েছে। ছবিটির নাম—"নামে মুন্নে সিতারে"। প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই।

ষ্টারে নতুন নাটক "শেষাগ্নি :

"শ্রেয়সী"র সাফল্যময় প্রদর্শনীর পর ষ্টার থিয়েটার যে নতুন নাটকটিকে নাট্যরসিক দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে মঞ্চস্থ করছেন, তার নামকরণ হয়েছে—"শেষাগ্নি"। শক্তিপদ রাজগুরু রচিত "শেষনাগ" উপন্যাস অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকের কাহিনী প্রধানতঃ বর্তমান যুগকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ষ্টারের খ্যাতনামা অভিনেতৃ সঙ্ঘের যে-সব নতুন শিল্পী যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে বাসবী নন্দী, আশীষকুমার, বীরেশ্বর সেন ও সাধনা রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত স্বয়ং এবং এর কলা-কৌশল ও আঙ্গিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অনিল বসু। আশা করা যায়, "শেষাগ্নি" মার্চ মাসের প্রথমেই মঞ্চস্থ হবে।

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত অধিবেশন ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ ১৯৬২ পর্যন্ত মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করবেন।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

জব্বলপুরে বিংশতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠানে জয়লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। সার্ভিসেস দল গত দশ বছর ধরে তাদের অটুট প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে।

আলোচ্য বছরে সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ ক'রে ১৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। রৌপ্য-পদক পেয়েছে ১৩টি এবং ব্রোঞ্জ ৮টি। যোগদানকারী কোন দল এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণ, রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ পদক লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ২য় স্থান অধিকারী মহারাষ্ট্রের পদক সংখ্যা মোট ৯ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ২)।

বালক বিভাগেও সার্ভিসেস দল প্রথম স্থান লাভ করেছে মোট ১১টা পদক পেয়ে (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। তবে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বাংলা থেকে খুব উঁচুতে উঠতে পারেনি। বাংলার মোট পদক সংখ্যা ১০ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। মহীশূর ৩টে স্বর্ণপদক পেয়েছে, অন্য কোন পদক পায়নি।

মহিলা এবং বালিকা বিভাগের পদক প্রাপ্তির তালিকায় সর্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেছে মহারাষ্ট্র—মহিলা বিভাগে ৪টি এবং বালিকা বিভাগে ৬টি। মহিলা বিভাগে সর্বাধিক পদক লাভ করেছে বাংলা ৭টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং মহীশূর ৭টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪)। মহারাষ্ট্রের মোট পদক ৬ (স্বর্ণ ৪ ও ব্রোঞ্জ ২)।

বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র মোট পদক পেয়েছে ৯ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)। বালিকা বিভাগের মোট ১০টি স্বর্ণপদক পেয়েছে—মহারাষ্ট্র ৬ এবং মহীশূর ৪।

পুরুষ বিভাগে পদ্মশ্রী মিলখা সিং এবার পাঞ্জাব দলের পক্ষ থেকে ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন; কিন্তু পায়ের মাংসপেশীর টান ধরায় তিনি প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ন।

এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেজ এবং বালক বিভাগে মহীশূরের কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা।

ক্রিস্টিন ফোরেজ বালিকা বিভাগের ১০টি অনুষ্ঠানেই যোগদান ক'রে ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান, ২টি অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান এবং ১টি অনুষ্ঠানে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে তার সহযোগিতায় মহারাষ্ট্র প্রথম স্থান পায়। তাছাড়া ফোরেজ সটপুটে নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে।

বালক বিভাগে কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা তিনটি অনুষ্ঠানে—হাইজাম্প, লং জাম্প এবং হপ্-স্টেপ-জাম্পে প্রথম স্থান লাভ ক'রে প্রতিটি অনুষ্ঠানে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করে।

বালিকাদের হাইজাম্প ফাইনালে ক্রিস্টিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র)ঃ ক্রিস্টিন প্রথম স্থান লাভ করেন।

বালিকা বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় দুজন—মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেজ এবং মহীশূরের শীলা পল। মোট ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ফোরেজ ৬ এবং শীলা পল ৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। ফোরেজ ৯টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে এই ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে—৮০ মিটার হার্ডলস, হাইজাম্প, সটপুট, ডিসকাস এবং জ্যাভেলিন থ্রো বিভাগে। তাছাড়া দ্বিতীয় স্থান পায় ৫০ মিটার দৌড়ে এবং লংজাম্পে এবং তৃতীয় স্থান ১০০ মিটার দৌড়ে।

মহীশূরের শীলা পল প্রথম স্থান লাভ করে এই ৪টি অনুষ্ঠানে—৫০ মিটার, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে এবং লংজাম্পে। ৮০ মিটার হার্ডলসে দ্বিতীয় স্থান পায়। প্রধানতঃ এই দুজনের সাফল্যের দরুণই বালিকা বিভাগ মহারাষ্ট্র প্রথম এবং মহীশূর দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

এ্যাথলেটিকসে বাংলা দেশ পুরুষ বিভাগে কোন পদকই অর্জন করতে পারেনি। মহিলা বিভাগে বাংলা ১টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক; বালক বিভাগে ২টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক এবং বালিকা বিভাগে ১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

মহিলা বিভাগে বাংলার মৌরিন হকিন্স ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এ্যান রিচসন সটপুটে ২য় এবং জ্যাভেলিন থ্রোতে ৩য় স্থান পান। হাইজাম্পে গিলিনায় ব্রাউটন প্রথম স্থান লাভ করেন। বাঙ্গালী মহিলা তৃপ্তি মুখার্জি ৪০০ মিটার দৌড়ে ৩য় স্থান পান।

বালক বিভাগের ১০০ মিটার দৌড়ে বি ফোর্ড এবং ২০০ মিটার দৌড়ে সমীর চ্যাটার্জি প্রথম স্থান লাভ করে। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে পোলভল্টে আর বসু দ্বিতীয় স্থান, ১০০ মিটার দৌড়ে এস সরকার তৃতীয় স্থান, ১১০ মিটার হার্ডলসে এস দস্তিদার দ্বিতীয় স্থান, লংজাম্পে এস ধর দ্বিতীয় এবং হপ্-স্টেপ জাম্পে তপন ঘোষ ৩য় স্থান পায়। বালিকা বিভাগে বাংলার একমাত্র সফলা

৮০ মিটার হার্ডলসে জয়া ভাটচার্যের ৩য় স্থান লাভ।

॥ ভারতবর্ষ বনাম ত্রিনিদাদ ॥

ভারতবর্ষ : ৩৬৬ রান (মঞ্জরেকার ৬৬, উমরীগড় ৬৪, কণ্ট্রাক্টর ৬২, সরদেশাই ৫০ এবং দুরানী ৪৬। রডরিগস ৬৭ রানে ৪, সি সিং ৭৫ রানে ৩ এবং রবার্টসন ৭৮ রানে ২ উইকেট) **ও ১৬৩ রান** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সরদেশাই ৭৩ নট-আউট)

ত্রিনিদাদ : ২৪৬ রান (রডরিগস ৭৭, ডেভিস ৫৭ এবং ফোরলোঞ্জ ৫৫ রান। বোরদে ৮৩ রানে ৪, উমরীগড় ৩৫ রানে ৩ উইকেট) **ও ১৪৭ রান** (৪ উইকেটে। রবিনসন ৮০। দুরানী ৫৩ রানে ৪ উইকেট)

ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেন শহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ত্রিনিদাদ দলের চারদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। বৃষ্টির জলে ৫২ মিনিট সময় ধুয়ে যায়। ৪ ঘণ্টা ৮ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ৪ উইকেট খুইয়ে ২০৪ রান করে।

ভারতবর্ষ টসে জয়লাভ করে কিন্তু খেলার সূচনা শুভ হয়নি। কোন রান হওয়ার আগেই জয়সীমা আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ৫০ (১ উইকেটে)। কণ্ট্রাক্টর ২৭ এবং মঞ্জরেকার ২২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। দলের ১০৭ রানের মাথায় অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর নিজস্ব ৬২ রান ক'রে রান-আউট হ'ন। তিনি প্রায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল-ছাত্র চার্লি ডেভিসের হাতের চিপে তাঁর উইকেট ভেঙ্গে যায়। কণ্ট্রাক্টর তাঁর ৬২ রানে ৮টা বাউন্ডারী মারেন। কণ্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকারের ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ১০৭ রান ওঠে। দলের ১৪৬ রানের মাথায় মঞ্জরেকার এবং ১৪৯ রানের মাথায় পতৌদির নবাব আউট হ'ন। মঞ্জরেকার তিন ঘণ্টা খেলে ৬৬ রান করেন, বাউন্ডারী মারেন ৫টা।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে রান দাঁড়ায় ২০৪, ৪টে উইকেট পড়ে। বোরদে ৩৪ এবং উমরীগড় ২২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। এই দিন ৫ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং উমরীগড় ৫৯ মিনিটের খেলায় ৫৫ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনেও খেলা আরম্ভের সময় আকাশ মেঘে আকুল ক'রে ছিল। আগের দিন রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি পড়ায় মাঠ বেশ ভিজে ছিল। দলের ২০৬ রানে বোরদে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় ২৮৭ (৫ উইকেটে)। উইকেটে ছিলেন উমরীগড় (৬২ রান) এবং সরদেশাই (৪৩ রান)। লাঞ্চের পর দলের ভাঙ্গন সুরু হয়। সরদেশাই ৮৭ মিনিট খেলে আউট হ'ন নিজস্ব ৫০ রানে, বাউন্ডারী ৭টা। উমরীগড় ৬৬ রান ক'রে আউট হ'ন ১৭০ মিনিট খেলে। ৮টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী মারেন। উমরীগড় এবং সরদেশাইয়ের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৮৯ রান ওঠে। দুরানী অসুস্থ অবস্থায় ৪৬ রান করেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে দুরানী এবং নাদকার্নী ৫০ মিনিটের খেলায় ৬৫ রান তুলে দেন। লাঞ্চের পর রডরিগস ২টো এবং চরণ সিং দলের শেষ তিনজন খেলোয়াড়—দুরানী, নাদকার্নী এবং রঞ্জনেকে আউট করেন ২·৩ ওভার বল ক'রে মাত্র ৩ রান দিয়ে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৬৪ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে পূর্ব দিনের ২০৪ রানের সঙ্গে (৪ উইকেটে) ১৬২ রান যোগ হয়, ৬টা উইকেটের বিনিময়ে। ৩৬৬ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিন ত্রিনিদাদ ২টো উইকেট খুইয়ে ৬৬ রান করে। মাত্র ৩ রানের মধ্যে ২টো উইকেট পড়ে যায়।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ত্রিনিদাদ দলের রান দাঁড়ায় ১২২ (৩ উইকেটে)। চা-পানের পর তারা ৫২ মিনিট খেলে প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে শেষ হয়। তরুণ খেলোয়াড় ডেভিস এবং কারু দলের ৩ রানের মধ্যে ২টো উইকেট পড়া সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেন; তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা দলের ১০৭ রান তুলে দেন। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং খুব উন্নত পর্যায়ের হয়নি।

ভারতবর্ষ ১২০ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই দিনের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ২৮ রান করে।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ ১৬৩ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ লাঞ্চের পরও ৪০ মিনিট খেলেছিল। দলের সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেন সারদেশাই। তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে দুরানী (৩), উমরিগড় (৪) এবং বোরদে (৪) অল্প রানের মধ্যে আউট হয়ে যা'ন। সরদেশাই ৭৩ এবং মঞ্জরেকার ২৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ত্রিনিদাদ দল ১৫৮ মিনিট খেলার সময় হাতে নিয়ে এবং ভারতবর্ষের থেকে ২৮৩ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই সময়ের মধ্যে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৪ রান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রিনিদাদ দলের ৪ উইকেট পড়ে ১৪৭ রান ওঠে। দলের সর্বোচ্চ ৮০ রান করেন রবিনসন—তাঁর এই ৮০ রানই দুই দলের সর্বোচ্চ রান। ত্রিনিদাদ দলের প্রথম উইকেটের জুটি রবিনসন এবং ডেভিস ১০০ মিনিটের খেলায় ১২০ রান করেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

১ম টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২০৩ রান (রুসী সুর্তি ৫৭, সেলিম দুরানী ৫৬। সোবার্স ২৮ রানে ৩, স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩, হল ৩৮ রানে ২ এবং ওয়াটসন ২০ রানে ১ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১৪৮ (৬ উইকেটে। হান্ট ৫৮ এবং সোবার্স ৪০। দুরানী ৩৪ রানে ৩, উমরিগড় ৩৫ রানে ১, দেশাই ৩০ রানে ১, বোরদে ৪৩ রানে ১)।

১ম দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—১১৩ (৬ উইকেটে)। সেলিম দুরানী ২২ এবং রুসী সুর্তি ১০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস—১৪৮ রান (৬ উইকেটে)। সলোমন ৪ রান ক'রে নট আউট আছেন।

ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী পোর্ট অব স্পেন শহরের বিখ্যাত কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে সুরু হয়েছে। খেলা আরম্ভের আগের দু' দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। খেলার আগের দিন রাত্রে কয়েক পশলা বৃষ্টিও পড়ে। এমন কি খেলার দিন, খেলা আরম্ভের নির্দিষ্ট সময় থেকে ৪৫ মিনিট আগেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ সকালের খেলার ২৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়।

টস করার সময় মাঠে ৭০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর ভাগ্যবান পুরুষ—টসে জয়লাভ করলেন। উপর্যুপরি পাঁচটি টেস্ট খেলায় তিনি টসে জয়লাভ করলেন। এর মধ্যে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে উপর্যুপরি চারটি টেস্টের খেলায়। আহত থাকায় জয়সীমা এবং পতৌদির নবাব দলভুক্ত হননি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে দল গঠন করতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। শেষ পর্যন্ত গারফিল্ড সোবার্সও দলভুক্ত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে দলের যথেষ্ট

দূরশ্চিন্তা ছিল। সোবার্স অস্ট্রেলিয়া থেকে বিমানে উড়ে খেলা আরম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের চার ঘণ্টা আগে পোর্ট অব স্পেনে পৌঁছে যান। খেলা আরম্ভের ১১ ঘণ্টা আগে পৌঁছবার কথা ছিল। অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড প্রতিযোগিতায় সোবার্স সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ মরশুমে খেলেছিলেন এবং শীল্ডের শেষ খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫১ রান করেন দলের ৪৫১ রানের মধ্যে এবং ৭২ রানে ৬টা উইকেট পান। এ বছর অস্ট্রেলিয়াতে তাঁর এই ২৫১ রানই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। এই খেলার শেষে স্বদেশের পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলার জন্যে সোবার্স ত্রিনিদাদ অভিমুখে বিশেষ ব্যবস্থায় বিমানে যাত্রা করেন।

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনাতেই বিপর্যয় দেখা দেয়। দলের মাত্র ৭ রানের মাথায় মেহেরা কোন রান না করেই হলের বলে আউট হন। এর পর দ্বিতীয় উইকেটের জুটি কন্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন কিন্তু হলের বলেই কন্ট্রাক্টর ১০ রান ক'রে দলের ৩২ রানের মাথায় আউট হন। ৩য় ওভারে হলের সট পীচ বল কন্ট্রাক্টরের মাথায় লাগে। আরও একবার হল তাঁর বাম্পার ছাড়েন কন্ট্রাক্টরকে লক্ষ্য করে। আঘাত থেকে মুখ বাঁচাতে গিয়ে কন্ট্রাক্টর ব্যাট দিয়ে মুখ বাঁচাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে বলটা ব্যাটে লেগে সেকেণ্ড শ্লিপে 'ক্যাচ' তুলে। সোবার্স এই সোজা ক্যাচ ধরতে পারেননি। এক ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের ৩৮ রান ওঠে (২ উইকেটে)। লাঞ্চের সময় এই রান ৪৯ রানে দাঁড়ায়, ৪টে উইকেট পড়ে। মেহেরা, কন্ট্রাক্টর, মঞ্জরেকার এবং উম্রিগড় আউট হয়ে যান। উইকেটে ছিলেন সারদেশাই (৯ রান) এবং বোরদে (০)।

লাঞ্চের নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগে বৃষ্টি নামে। ফলে খেলোয়াড়রা মাথা বাঁচাতে মাঠ ছেড়ে দৌড় দেন। লাঞ্চের পর খেলার সূচনাতেই সোবার্স বোরদের সহজ ক্যাচ হাত থেকে ফেলে দেন। বোরদের তখন রানের ঘর শূন্য। লাঞ্চের পর যখন ৪৮ মিনিট খেলা হয়েছে তখন খুব জোর বৃষ্টি নেমে মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই সময় দলের রান ছিল ৮৯, ৬টা উইকেট পড়ে। ফার্স্ট বোলারদের ৩২ ওভার বলে ভারতবর্ষের প্রথম সারির ৬ জন ব্যাটসম্যান আউট হন, ১৫৫ মিনিটের খেলায়। ভারতবর্ষের ১০০ রান পূর্ণ হ'তে ১৭৪ মিনিট সময় লাগে। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, স্কোর বোর্ডে ভারতবর্ষের রান সংখ্যা ১১৩, ৬টা উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট থাকেন সেলিম দূরানী এবং রুসী সুর্তি যথাক্রমে ২২ রান এবং ১০ রান ক'রে।

দ্বিতীয় দিনে খেলার অবস্থা অন্য রকম দাঁড়ায়। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে ১১৩ রান ছিল। প্রথম দিনের নট আউট খেলোয়াড় সেলিম দূরানী এবং রুসী সুর্তি দৃঢ়তার সঙ্গে ১২০ মিনিট খেলে ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮১ রান তুলে দেন। লাঞ্চের কিছু আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে দলের বাকি ৪ উইকেটে পূর্ব দিনের ১১৩ রানের সঙ্গে ৯০ রান যোগ হয় ১০৭ মিনিটের খেলায়। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পেস বোলাররা তেমন কিছু খেলা দেখাতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৩ ওভার বল দেয়, তার মধ্যে পেস বোলাররা দেয় ১১ ওভার বল।

প্রথম দিনে দলের দারুণ শোচনীয় অবস্থায় দূরানী এবং সুর্তি ৭ম উইকেটে জুটি বাঁধেন। সেই সময় দলের রান ছিল ৮৯, ৬টা উইকেট পড়ে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকেট-রক্ষক হেনড্রিকস আঙ্গুলে আঘাত লাগায় দ্বিতীয় দিনের খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর স্থানে কমি স্মিথ উইকেট-রক্ষার কাজ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এই দিন সুনাম অনুযায়ী ফিল্ডিং করতে পারেনি। রুসী সুর্তির ক্যাচ তিনবার ছাড়ান পায়—দু'বার হল এবং একবার স্টেয়ার্সের বলে। ৭২ মিনিটের খেলায় ৭ম উইকেটের জুটি দূরানী এবং সুর্তি দলের ৫০ রান পূর্ণ করেন। গিবসের বলে সুর্তি লেট-কাট মেরে দু' রান করলে দলের ১৫০ রান পূর্ণ হয় ২৪৫ মিনিটের খেলায়। এর পর সোবার্সকে বল করতে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৫৪ ওভার বল খেলা হয়, ফাস্ট বোলাররা ৫০ ওভার বল দেয়। দলের ১৭০ রানের মাথায় দূরানী সোবার্সের বলে ড্রাইভ ক'রে সোবার্সের হাতেই নীচু ক্যাচ দিয়ে আউট হ'ন। ১৩৮ মিনিট খেলে দূরানী ৫৬ রান করেন, বাউণ্ডারী মারেন ৮টা। ৮ম উইকেটে নাদকার্ণী খেলতে নামেন। কিন্তু বেশী সময় খেলতে পারলেন না। মাত্র ২ রান করে রান-আউট হলেন। কানহাই সোজা উইকেটে বল মেরে তাঁকে রান-আউট করেন। শেষ খেলোয়াড় নামেন দেশাই। দলের ২০৩ রানের মাথায় সোবার্সের বলে সুর্তি ষ্ট্যাম্পড আউট হলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ৩২১ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের এই ২০৩ রান ওঠে। সুর্তি ১৪৯ মিনিট খেলে তাঁর ৫৭ রান করেন —দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান। বাউণ্ডারী মারেন ৫টা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন গারফিল্ড সোবার্স। ২৮ রানে ২টো উইকেট এবং ৩টে ক্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে ৬ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ব্যাট ক'রে ২৫১ রান করা এবং সেই সঙ্গে বোলিং এবং সেই খেলার পরই দীর্ঘ পথ বিমানে ভ্রমণ ক'রে মাত্র চার ঘণ্টার বিশ্রাম নিয়ে তাঁকে এই টেস্ট খেলায় যোগ দিতে হয়।

লাঞ্চের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র এক ওভার খেলে এবং দলের কোন রান ওঠে নি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৪৮ রানের (৬ উইকেটে) মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেছেন হাণ্ট। তারপরই উল্লেখযোগ্য সোবার্সের ৪০ রান। সেলিম দূরানী ৩৪ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছেন। একটা ক'রে উইকেট পেয়েছেন দেশাই, উম্রিগড় এবং বোরদে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ ওভারে দূরানীর বলে স্টেয়ার্স আউট হন। বোরদে তাঁর ক্যাচ চমৎকারভাবে ধরে ফেলেন।

সেলিম দূরানীর বলে ওরেল (০), হাণ্ট (৫৮) এবং স্টেয়ার্স (৪) আউট হ'ন। দূরানী এই তিনজনকে আউট করেন ৪·৪ ওভার (৩টে মেডেন) বলে মাত্র ৫ রান দিয়ে।

কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের ২৫ হাজার দর্শক ভারতবর্ষের খেলায় আজ হতবাক হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলারদের বল দৃঢ়তার সঙ্গে আজ ১০৭ মিনিট খেলে বাকি ৪ উইকেটে ৯০ রান সংগ্রহ করেছে এবং ভারতবর্ষের স্পিন বোলাররা বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিং শক্তিকে খর্ব করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬ জন খেলোয়াড় বিদায় নিয়েছেন। এ'দের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় হাণ্ট, কানহাই, সোবার্স এবং ওরেল। ৬টা উইকেট পড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান দাঁড়িয়েছে ১৪৮। নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে সলোমন ৪ রান করে নট-আউট আছেন। খেলার মোড় ঘুরে গেছে এবং এই পরিবর্তন কেউ কল্পনা করেন নি, এমন কি ভারতবর্ষের অতি বড় অন্ধ সমর্থকও।

১৯-২-৬২

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্প্রতি প্রকাশিত

সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞরূপে পুরস্কারপ্রাপ্ত

রবীন্দ্রজীবনী'-কার

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

রবি-কথা ৩·৫০

[রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা রেখাঙ্কনে বহুলাংশে কবির নিজের কথায় বিবৃত]

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

কবি প্রণাম ৫·০০

[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কবিতা-সংকলন]

নবেন্দু ঘোষের গল্পগ্রন্থ **পাপুই দ্বীপের কাহিনী** ৩·৩০

[এই গ্রন্থখানি কাকভুশণ্ডিকথা, অরণ্য, সঞ্জয় উবাচ প্রভৃতি গল্পে সমৃদ্ধ]

আমাদের প্রকাশনার উপহারযোগ্য উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মৌসুমী ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
হিয়ে হিয় রাখনু ৩·০০

'বনফুল'-এর
জলতরঙ্গ ৪·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৬·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
অনুষ্টুপ ছন্দ ৪·০০

প্রবোধ সান্যালের
ইস্পাতের ফলা ৩·৫০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চতুষ্কোণ ৩·২৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কাঞ্চন-মূল্য ৫·৫০

চিত্রিতা দেবীর
দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এক ছিল কন্যা ৬·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর
মেঘপাহাড় ৩·০০

বাণী রায়ের
আরো কথা বলো ২·৭৫

অজিতকৃষ্ণ বসুর
সানাই ২·৫০

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সোহে স্কোয়ার ২.৫০

দীপক চৌধুরীর
নীলে সোনায় বর্সাতি ৩.৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবকন্যা ৪·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নীল রাত্রি ৩·৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি ৫·৫০

স্মরণীয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

উপহারযোগ্য কবিতাগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কখনো মেঘ ৪·০০
[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন পারিপাট্যে সমুজ্জ্বল]
সাগর থেকে ফেরা ৩·০০
প্রথমা ২·৫০ **সম্রাট** ২·০০
ফেরারী ফৌজ ২·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ ২·০০

মোহিতলাল মজুমদারের
সুনির্বাচিত কবিতা ৪·৫০

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের
কবি-চিত্ত ৫·০০

'বনফুল'-এর
নূতন বাঁকে ২·৫০

দেবেশ দাশের
সুদূরে বাঁশরী ২·৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪·০০

গল্পগ্রন্থ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিলো ৩·২৫

নবেন্দু ঘোষের
পঞ্চম রাগ ৩·২৫

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পুতুল ও প্রতিমা ৩·২৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মালাচন্দন ২·৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪-[illegible] গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক 'অমৃতের' স্বত্বাধিকারীবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিতব্য।

ফর্ম—৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১/ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনের সময়ক্রম — সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার।
নাগরিকত্ব...ভারতীয়
ঠিকানা...১১/ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার
নাগরিকত্ব...ভারতীয়
ঠিকানা — ১১/ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।
নাগরিকত্ব......ভারতীয়
ঠিকানা—১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, ১৭১-এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬; প্রাণতোষ ঘটক, ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা—২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব 'মিত্র ও ঘোষ', ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব 'মিত্র ও ঘোষ', ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; বিশু মুখোপাধ্যায়, ৮/বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা—৬; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ১৬, অভয় বিদ্যালংকার রোড, কলিকাতা—৩৪; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ১৭/বি, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪; অমৃতবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

আমি, শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ/শ্রীসুপ্রিয় সরকার

তাং ২৭।২।৬২

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 2nd March, 1962.
40 Naya Paise.

বাঙ্গালাদেশের নির্বাচনে কোনো পাহাড়ী ধ্বস্ নামেনি। কিংবা, যাঁরা "উঠুক তুফান ছুটুক বাতাস" বলে চিৎকার তুলেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন যে, ব্যালটের বাক্স থেকে চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়া বেরোয়নি! এই মুহূর্তে অমৃতের সম্পাদকীয় ছাপতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত ঘোষিত ১০৭টি আসনে কংগ্রেস ৬৫টি লাভ করেছেন এবং সমর্থিত স্বতন্ত্রসহ সংযুক্ত বামপন্থীরা ৩০টি। অর্থাৎ বিধানসভার মোট আসনের এই আড়াই ভাগ ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৭ সালের আনুপাতিক হারের একটুও পরিবর্তন ঘটেনি।

কিন্তু ফলাফলের চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, রাজনীতির কতকগুলি লক্ষণ ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন এবং একটি সুসংবদ্ধ সর্বভারতীয় দলের শৃঙ্খলাপরায়ণ শাসন থেকে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হবে না, এগুলি যেমন প্রভূত আশার লক্ষণ, তেমনি অন্যদিকে এই নির্বাচনের ফলাফল থেকেই কংগ্রেসের সম্মুখে চিন্তনীয় সমস্যাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সমস্যাগুলি বিজয়ের আনন্দে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

প্রথমত লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেসের নিজস্ব আসন বহু ক্ষেত্রে হস্তচ্যুত হয়েছে, এখন পর্যন্ত সেরূপ আসনের সংখ্যা ১৬টি। অন্যদিকে ভোটের গতি বা প্রবাহ কংগ্রেসের অনুকূলে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সাধারণভাবে জনমত কংগ্রেসের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও ১৬টি আসন তাঁরা হারিয়েছেন। এই পরাজয়ের কারণ কোথায়? পরাজিত কংগ্রেসপ্রার্থীরা নিজেদের এলাকার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেননি, অথবা বিগত ৫ বৎসরে তাঁরা স্বীয় আচরণের দ্বারা জনসাধারণকে সন্দিগ্ধ বা বিক্ষুব্ধ করেছেন যার ফলে কংগ্রেসী আসন বিরুদ্ধদলের হাতে গেছে। অথবা আরও একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায়—কংগ্রেসের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বের জন্য নিজেদের ঘাঁটি পরহস্তগত হয়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে এই দুইটি উপসর্গের যে কোনো একটি, অথবা দুইটি উপসর্গই একত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে কংগ্রেসের হস্তচ্যুত এলাকাগুলিতে—নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদে, উত্তরবঙ্গে এবং বাঁকুড়ায়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই এলাকাগুলিই ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের সবচেয়ে নিরাপদ ঘাঁটি ছিল। এই সব এলাকায় আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে জিলা-কংগ্রেসের সভাপতিরা পরাজিত হয়েছেন—বীরভূমে, মুর্শিদাবাদে এবং ২৪-পরগণায়। অথচ পরাজিত জিলা-সভাপতিরা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতির একান্ত অনুগ্রহ ও প্রীতিভাজন।

সুতরাং কংগ্রেসকে যেমন প্রত্যেকটি হস্তচ্যুত আসনের প্রার্থী এবং তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে নির্বাচনোত্তর সমীক্ষা বা তদন্ত করে দেখতে হবে যে, পরাজয়ের আসল কারণ কোথায়, তেমনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে অতঃপর সতর্ক হতে হবে তাঁর সেনাপতি নির্বাচনে। কংগ্রেসের জিলা স্তরে আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার একমাত্র কারণ মনোনয়নপত্রলাভের লোভ এবং না পাওয়ার ক্ষোভ, এই সহজ সান্ত্বনা যেন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ লাভ না করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ আরও গভীর এবং সেই কারণগুলির মূলোচ্ছেদ শক্ত হাতে করা দরকার। কারণ কংগ্রেস দলের পক্ষে একথা গভীর পরিতাপের যে, সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী হাওয়া কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এর ষোল আনা ফসল ঘরে তুলতে পারেননি।

একথাও যে কোনো চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকের চোখে পড়তে বাধ্য যে, গভর্ণমেণ্ট হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নিজেকে যতটা জনপ্রিয় বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন, দল হিসাবে প্রদেশ কংগ্রেস ততটা জনপ্রিয় প্রমাণিত হননি। প্রেস্টিজ ফাইট বা মর্যাদার যুদ্ধে মন্ত্রীরা নিরাপদে জয়ী হয়েছেন, কিন্তু জিলা-কংগ্রেসের সভাপতিরা অনেকেই ধরাশায়ী, অন্যেরা কায়ক্লেশে উত্তীর্ণ।

কিন্তু একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৫৭-৬২ সালের মধ্যে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি জনসাধারণ সমর্থন করেছে। শুধু নিস্পৃহ সমর্থন নয়, বিকল্প সরকারের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিপুলতর সংখ্যায় এসে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, বুদ্ধিজীবীদের স্বাভাবিক অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্ট স্বীয় অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি, তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি জনসাধারণের সংশয়গ্রস্ততা, যা গত ৫ বৎসরে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা যাচ্ছে, কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই সুযোগ নিয়েছেন, নিজেদের জনপ্রিয়তা বা শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি।

কবিতা
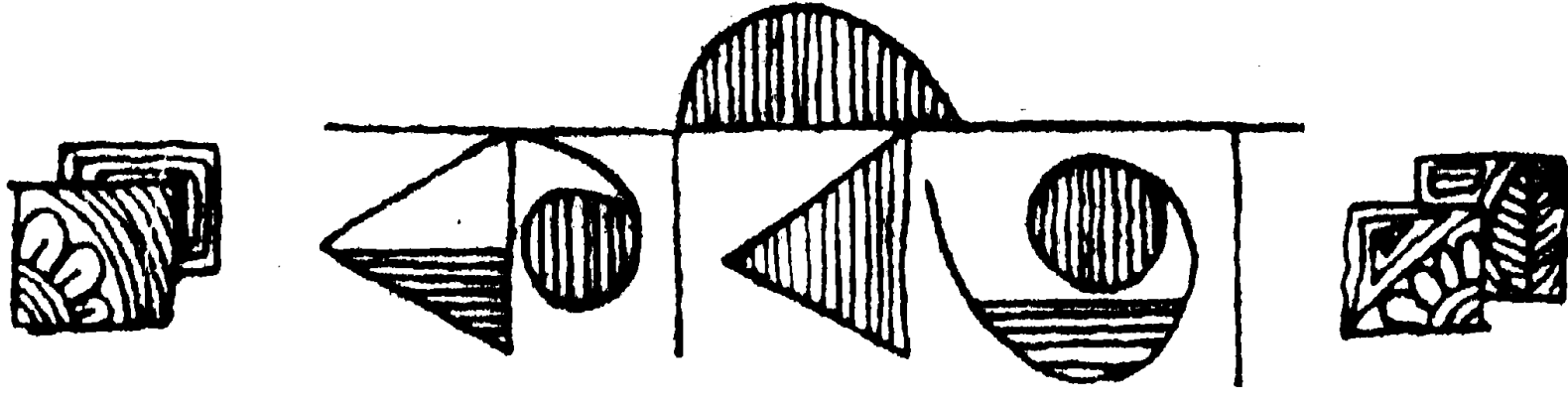
অনেক পায়ের দাগ

মনীশ ঘটক

মনের মধ্যে গড়েছি দেউল গভীর সংগোপনে
শুচি স্নান করে পবিত্র হয়ে সুশুভ্র সযতনে।
ধ্যানের নেত্রে পরমারাধ্যে কল্পনা বেদী 'পরে
বসিয়েছি পূজা হোমাগ্নি জেলে অটুট নিষ্ঠাভরে।
দেবতার কারাগারের দুয়ারে অদৃশ্য মসীলেখে
'প্রবেশ নিষেধ অনধিকারীর' দর্পে দিয়েছি এ'কে।

সচকিতচিত সদাশঙ্কিত কলুষপরশ ভীত,
কোন্ ফাঁকে হায় প্রমত্ত বায় পশেছে অতর্কিত।
ভেঙেছে দেয়াল করিনি খেয়াল—বিশ্বের ধূলোরাশি
সেবা নির্মল মর্মরতল দেখি যে ফেলেছে গ্রাসি।
উদ্বেগভীরু বুক দুরু দুরু অশুচি স্পর্শ ত্রাসে,
রুদ্ধনয়নে স্বস্তিবচন উচ্চারি ত্রাণ আশে।
দেবতা আমার নহেন একাকী কে জানিত তাহা আগে
ধূলাময় বেদী ভরে গেছে দেখি অনেক পায়ের দাগে॥

*
* *
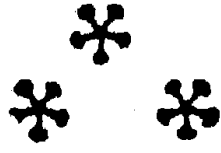
বেলা প'ড়ে এলো

সিদ্ধেশ্বর সেন

চারদিক থেকে কারা হিমকুয়াশার স্বর
গলায় জড়িয়ে নিয়ে আসে
কম্ফাটার ও স্কার্ফের ভেতরের গলনালী বেয়ে
অবিশ্বাস্য কাশে

নগরীর দেওয়ালে লাগে ছিটে, নগরীর
দেওয়াল নোংরা, ছিটে

বিপন্ন স্মৃতির কৃশ কার্তিকের শিশিরের ঘাস—
ট্রামের লাইনের রিপিটে

চারদিকে কারা চাপা হিমকুয়াশার স্বর
অবদমনের ঝোঁকে, হাসে
ওদের মাথার মধ্যে বাঁচবার ভয়ানক পোকা
একটা ফুসফুস, জল ভাসে
কেউ টাইপিস্ট বা কে মনোনীতা করণিক সেজে, ভাবে, বাঁচা
ক্যান্সার হাসপাতালের আশপাশে

জীবনের মানে তারা নক্ষত্র উঠলে অন্ধকারে
বুঝে ফেলে ভীষণ একলা
এক নির্বাচিত নয়, পালা বদলিয়ে তারা বাঁচবার কীট
হ'য়ে বাঁচে, হরিশ—
পার্কের দুইবেলা॥

শৈশবযাত্রা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অবিরত তোকে স্মরি যাত্রা মোর প্রতিকূল স্রোতে
শৈশব দূরের দ্বীপ! বহু পথ হয়ে যাই পার—
সুন্দর তরণী ভাসে, মাস্তুলের ভিড় জমে পোতে
রাত্রির উন্মাদ টানে মনে হয়, আমার উদ্ধার
অনায়াস লভ্য বুঝি। পণ্যা নারী, মাতাল, লম্পট
স্বর্গীয় আঁধারে জ্বলে, শ্বেতরম্য প্রাসাদের সারি
জলে প্রতিকৃতি দেখে, কারা যেন মৃত্যুর শকট
বাহিয়া উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্রমাগত......প্রচ্ছায়া আমারই!

অবিরত জলরাশি ধেয়ে আসে, কাঁপায় তরণী......
মুহূর্তের আলিঙ্গনে আর্তনাদ জানায় সত্রাসে ঃ
কোথায় সবুজ দ্বীপ? অপেক্ষিত শবপ্রাবরণী
মুহূর্ত বিলম্ব হলে ছিঁড়ে যাবে সমুদ্র-বাতাসে
সযত্নে খাটানো পাল। আবর্তের অসহ দুর্বার
আক্রমণে পণ্ড হবে আয়োজন শৈশবযাত্রার।

দুর্ব দষ্টঃ

জৈমিনি
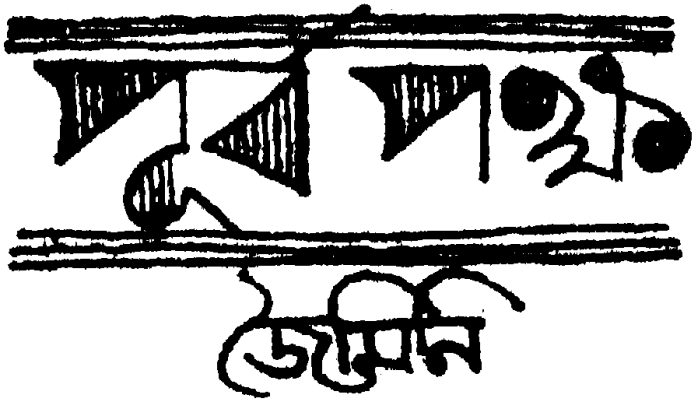
'আপ উঠিয়ে', 'আপ উঠিয়ে' ব্যাপারটা যতো কৌতুকজনকই হোক, ভদ্রতা জিনিসটা যে একেবারেই উপহাসের বিষয় নয়, আমাদের আচার-আচরণ দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। আতিশয্য সমস্ত ব্যাপারেই বর্জনীয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা যদি বেণীর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও কেটে দিতে চাই তবে সেটা একটু বেশী দেওয়া হবে না কি? অন্তত, ভদ্রতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বাদ দিতে গিয়ে আমাদের ঝোঁকটা যে পড়ে সেইদিকেই তাতে আর দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আমি জানি, বর্তমান নাগরিক জীবন আমাদের সর্বব্যাপারে এমন তটস্থ করে রেখেছে যে, আমরা সকলেই এক-একটি স্নায়ু-বিকারের রোগী হ'য়ে উঠেছি। তবু 'স্নায়ু' জিনিসটার স্বভাবই এই যে, যতো রাশ আলগা করা যায়, ততোই যায় বেড়ে। 'নিউরসিস'কে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রধান উপায় হল, সে বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ওঠা।

সচেতন প্রয়াসে আমরা অনেক সময়েই ছোটোখাটো 'নিউরসিস'কে কাটিয়ে উঠতে পারি। এ প্রায় পরীক্ষিত সত্য। বাস্-এ বা ট্রামে আমরা কতো সহজে মেজাজ খারাপ করে বসি তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। কনডাকটার ভাড়া চাইল। আপনি একটি সিকি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডালহৌসী'। বাস তখন চৌরঙ্গী দিয়ে ছুটেছে। কনডাকটার আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে উঠেছেন?' বাস, আপনার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল, তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে আপনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সামনেই তো উঠলাম, দেখতে পান নি?' সেও পিছ-পা হবে কেন? তৈরী জবাব দিল, 'কি জানি, কতো লোক উঠছে, মনে থাকে না!' ইতিমধ্যে দু'চারজন যাত্রী এদিকে কৌতূহলী হ'য়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। হয়তো তার মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। কাজেই আপনি কন্‌ডাকটারের বাক-বৈভবে ঈষৎ কোণঠাসা এবং অপমানিত বোধ করলেন, চাপা গর্জনে তরপে উঠলেন, 'তা মনে থাকবে কেন? ঈডিয়ট কোথাকার!' ছিটকে তার প্রত্যুত্তর এল, 'মুখ সামলে কথা বলবেন।' বাস্-এর সবগুলি মুখ এদিকে ঘুরে গেল। নাটকের ক্লাইমাক্স, এবং সামনে আয়না থাকলে সকলে দেখতে পেতেন আপনার মুখখানি ভিলেনের মতো বীভৎস!

এমনি প্রায় সর্বত্র। অথচ এর কোনো মানে হয় না। সামান্য একটু ভদ্রতাবোধ থাকলে এর প্রায় শতকরা নিরানব্বুই ভাগই এড়ানো যায় অতি সহজে।

আসল কথা তাহলে ঐ ভদ্রতাবোধ। 'স্নায়ু'র ব্যাপার ছেড়ে দিলেও, কিংবা 'স্নায়ু'র ব্যাপারটা বাদ না দিয়েও বলা যায়, সৌজন্য যাঁর চরিত্রগত স্বভাব তাঁর পক্ষে চটপট মেজাজ খারাপ করা তো বটেই, অন্য মানুষের মনে কোনোরকম কারণেই আঘাত দেওয়া প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কারণ সৌজন্যের মূলকথা হল, আত্মসম্মানবোধ। নিজের সম্মানের বিষয়ে যিনি সচেতন, অন্যের আত্ম-সম্মানেও তিনি সহসা হস্তক্ষেপ করেন না। এবং আমরা যারা অতি সহজেই অন্যের প্রতি অসৌজন্য দেখাই, বুঝতে হবে তাদের নিজেরও কোনো আত্মসম্মান-বোধ নেই।

এই আত্মসম্মান-বোধের অভাবে

মানুষকে কি রকম স্বার্থপর করে তোলে তার নমুনা পথে-ঘাটে ছড়ানো দেখতে পাবেন। একটু আগে বাস্-এর কথা হচ্ছিল। সেই প্রসংগে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। তখন আপিসের সময় নয়, কিন্তু বাস্-এ ভিড় ছিল। লেডীজ সীট সবগুলিই ভর্তি। দুজন তরুণীর সংগে তিন-চারজন যুবক উঠল। তাদের বয়স সকলেরই কলেজে পড়ার মতো, অন্তত উচ্ছল হাসি ও উচ্চকিত বাক্য-বিনিময়ে মনে হ'ল সহ-পাঠী-পাঠিনী হওয়া বিচিত্র নয়। তরুণীদ্বয়কে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার পাশে-বসা ভদ্রলোকটির নামবার জায়গা এসে গিয়েছিল, তিনি নেমে গেলেন। ঠেলাঠেলি করে মেয়ে দুটির কাছে এগিয়ে এসে যুবকেরা গল্প-গুজব শুরু করে দিল। বাস চলতে আরম্ভ করল। কয়েক স্টপ পরে মেয়ে দুটি নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সংগী ছেলেদের মধ্যে দুজন ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ল খালি সীটে। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার হাতে ছিল বেশ বড় আকারের একটি বইয়ের প্যাকেট। চলন্ত বাস্-এ প্যাকেট নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে সীটে-বসা একটি যুবকের মাথার উপর বোধকরি আমার হাতটা লেগে থাকবে, তৎক্ষণাৎ সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মাথার উপর হাত তুলে টেরি সামলাতে সামলাতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'ঠিক করে দাঁড়ান দাদা!'

মনে করেছিলাম উত্তর দেব না। কিন্তু তার পাশের সংগীটি টিপ্পনী কাটল, 'দাদার বোধহয় পায়ের ওপর কন্‌ট্রোল নেই!'

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। ফলে জবাব দিতে হল। বললাম, 'দেখুন, আপনারা যেখানে বসে আছেন সেখানে আমিই বসেছিলাম। আপনাদের সংগে যে মেয়েরা উঠেছিলেন তাঁদেরই জন্যে সীট ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁরা উঠে যেতে আপনারা হুড়মুড় করে বসে পড়লেন, আমার কথা আপনাদের মনে পড়ল না। এখন আবার এইসব বলছেন?'

কিন্তু তারা কেউ লজ্জিত হল না। বরং আমাকেই নির্বোধ প্রতিপন্ন করে একজন বলল, 'রিসার্ভ সীট নাকি আপনার? ভদ্রতা শেখাতে এসেছেন?'

না, আসিনি, মনে মনে বললাম, ভদ্রতা যার নেই তাকে শেখানো যায় না। এবং যায় না বলেই ভদ্রস্বভাবের মানুষদের আমরা মিন্‌মিনে, ভীরু, বোকা এবং অপদার্থ জ্ঞানে উপহাস করি। কিন্তু সকলেই যদি দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ নিতে উদ্যোগী হতেন তাতেই কি সংসারটা খুব সুখের জায়গা হ'য়ে উঠত!

পরস্পরের প্রতি সৌজন্য, নারীর প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা, বৃদ্ধের প্রতি বিনয় এগুলি অবশ্যই উপহাসের বিষয় নয়—উপহাস যখন করি তখন বুঝতে হবে আমাদের আত্মিক দীনতা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

বিশেষ করে ধিক্কার জাগে যখন দেখি বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উদাসীনতা। সংসারে শিশু যেমন আমাদের অপরিসীম মমতা দাবী করে, বৃদ্ধরাও তেমনি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার অধিকারী। যে জগৎ-টাকে আমরা আমাদের একচ্ছত্র আধি-পত্যের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছি, সেই জগতের যাবতীয় বন্দোবস্তই করে গেছেন আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষের মানুষেরা। আজ তাঁরা অক্ষম, অশক্ত, কিন্তু তাঁরা না থাকলে সংসারটাকে ঠিক যেমনভাবে আমরা পেয়েছি তেমন করে তো পেতাম না! এজন্যে তাঁরা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পা'রেন। তাছাড়া তাঁদের বর্তমান অবস্থা তো আমাদেরও ভবিষ্যতের দিশারী! এজন্যেও মহাকালের দরবারে আমাদের বিনীত হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হই কি! হই না। ট্রামে-বাসে এবং ট্রেনে অজস্র বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কাতরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যুবক-যুবতীরা আসন ছেড়ে দিয়েছেন এমন ঘটনা বিরল।

যুবকের সংগে 'যুবতী' কথাটা সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি। আমি অনেক বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করেছি, একজন বৃদ্ধ অতিথি এলে গৃহস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু তাঁর তরুণী স্ত্রী পায়ের উপর পা তুলে যেমন সোফায় বসেছিলেন তেমনি বসে থেকেই নমস্কার জানালেন।

নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এটা ঠিক ভদ্রতা নয়। 'লেডীজ ফার্স্ট' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, তা আমি জানি। সেটা পুরুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুরুষেরা আগে মেয়েদের পথ করে দেবেন। কিন্তু মেয়েদেরও নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে, অন্তত বৃদ্ধদের বেলায় তো বটেই। সে কর্তব্য পালন না করলে মেয়ে বা পুরুষ এ সংজ্ঞা বাদ দিয়ে নিছক মানুষ হিসাবেই তো তাঁরা ছোট হয়ে যান!

সত্যি কথা বলতে গেলে বলা যায়, আমাদের জীবনে সৌজন্যের স্থান এত সংকুচিত যে অসৌজন্যকেই আমরা যেন মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। এবং নিজেরাও যেমন সারাজীবন কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সামনে এগোতে চেয়ে হাস্যাস্পদ হচ্ছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অনবরত স্মার্ট হ'তে উপদেশ দিয়ে সেই কনুইবাজির দিকেই লেলিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু একটু চোখ মেললেই আমরা দেখতে পেতাম, যে-জাত সত্যিই বড় হ'য়ে ওঠে তার প্রতিটি ব্যক্তিরই চরিত্রগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়—ভদ্রতা। এবং ঠিক ঐ সামান্য একটু জায়গাতেই মানুষের সংগে ইতরপ্রাণীর পার্থক্য!

বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্প প্রত্যয়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

॥ এক ॥

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয়ের অকৃত্রিম সাক্ষ্য বীরাঙ্গনা কাব্য; অন্ততঃ তাঁর সুপরিণত কবি-মানসের সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ বিস্তারে এই কাব্যগ্রন্থ নানা দিক থেকেই তাৎপর্যময় একথা উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কাব্য-গ্রন্থ রচনার পূর্বেই প্রায় একই সময়ে মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হওয়ায় মধুসূদনের কাব্যপ্রবাহের দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠক-সমাজের সচেতনা স্পষ্টতর উপলব্ধিতে ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছিল। একথা যেমন সত্য যে মেঘনাদবধ রচনা হবার আগে বাংলা সাহিত্যে বীররসের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ব্যাপার বলেই পরিগণিত হতো অন্যদিকে তেমনি মেঘনাদবধের বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও বীররসের জের টেনে কাব্য রচনার মোহ যে মধুসূদনের মতো অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান কবি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন ব্রজাঙ্গনা কাব্যই তার প্রমাণ। মেঘনাদ-বধের পাশাপাশি বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম পুনরাবৃত্তি হবে এই ধারণা থেকেই ব্রজাঙ্গনায় গীতিকাব্যের গভীর উৎসকে উন্মোচিত করবার জন্যে মধুসূদন তৎপর হয়েছিলেন • •। কিন্তু ব্রজাঙ্গনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গীতিকাব্যনির্ঝর আশানু-রূপ অন্তরঙ্গতায় উৎসারিত হতে পারেনি। বীররস থেকে শান্তরসের দিকে যাত্রা তাঁর পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয়নি। মেঘনাদবধের রণদামামার গম্ভীর আওয়াজ ব্রজাঙ্গনা কাব্যের শ্রুতিমধুর বংশীধ্বনির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে মধুসূদনের পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভব হলেও উল্লিখিত কবিদের মতো গীতিকাব্যের কোমল রসের গভীরে তলিয়ে যাওয়া তাঁর মতো পাশ্চাত্য ভাব-ধারায় গভীরতর ভাবে অনুপ্রাণিত সচেতন কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষা-গত দুর্বলতা এবং ভাবগত অসম্পূর্ণতা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ, বিষয়োচিত ভাষাবিন্যাস

তখন পর্যন্ত যেন অধিকতর এবং গভীরতর পরীক্ষার মুখাপেক্ষী এবং বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ ভাব-বৈচিত্র্য ব্রজাঙ্গনায় শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদ-বধের অপ্রত্যাশিত সাফল্য সত্ত্বেও এই ধরণের আরও রচনা পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় রোমান্টিকতা ও গীতিকাব্যের অবাক প্রান্তরে প্রায় একই সময়ে বিচরণ করবার অধীরতা থেকেই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লেখা সম্ভব হলেও এবং শূন্য বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাধিকার বিরহ বর্ণনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাধুর্যরসের অভাব না ঘটলেও সমগ্রভাবে এই আদিরসপ্রধান কাব্যের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এইরূপ অবস্থায় বীরাঙ্গনা কাব্যই বরং মধুসূদনের বহু-মুখী প্রতিভার অনন্য নিদর্শন এবং যদিও মেঘনাদবধের অভূতপূর্ব সাফল্যই এখন-কার দিনেও মধুসূদন-প্রতিভার সর্ব-শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপেই পরিগণিত তথাপি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিত না হলে মধু-সূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সম্পর্কে বিবেচক পাঠকসমাজের যথোচিত ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হতে পারতো কিনা সন্দেহ।

॥ দুই ॥

সুতরাং বীরাঙ্গনা কাব্যের যথোচিত আলোচনা সচেতন পাঠকমাত্রেরই অভিপ্রেত এবং সেকালের এই একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থে নবজাগরণের যুগের মননসাধনার যে-অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত তার তুলনা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অনুসন্ধানের চেষ্টাই বোধহয় বাতুলতা। বস্তুতঃ বীরাঙ্গনা কাব্যের সার্থকতা তার সামগ্রিক ব্যঞ্জনায়, তার অন্তর্নিহিত শিল্প-সম্ভাবনায়। এবং এই গ্রন্থের বহিরঙ্গ-পরিকল্পনা যদিও ইউরোপীয় ধ্রুব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুগামী তথাপি ভাবনায় ও চরিত্র-চিত্রণে এই পত্রকাব্যগুচ্ছের অধিকাংশই ভারতীয় বিচারবোধ, সংস্কার ও সংশয়ের অধিকতর সন্নিকটবর্তী। সুতরাং যাদের ধারণা মধু-সূদন চিন্তায় ও আচরণে য়ুরোপীয় অনুকরণপ্রিয়তার বলিমাত্র তাদের চোখের সামনে বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যের প্রায় সব-গুলি সর্গই ভিন্নতর ব্যাপক অভিজ্ঞতার
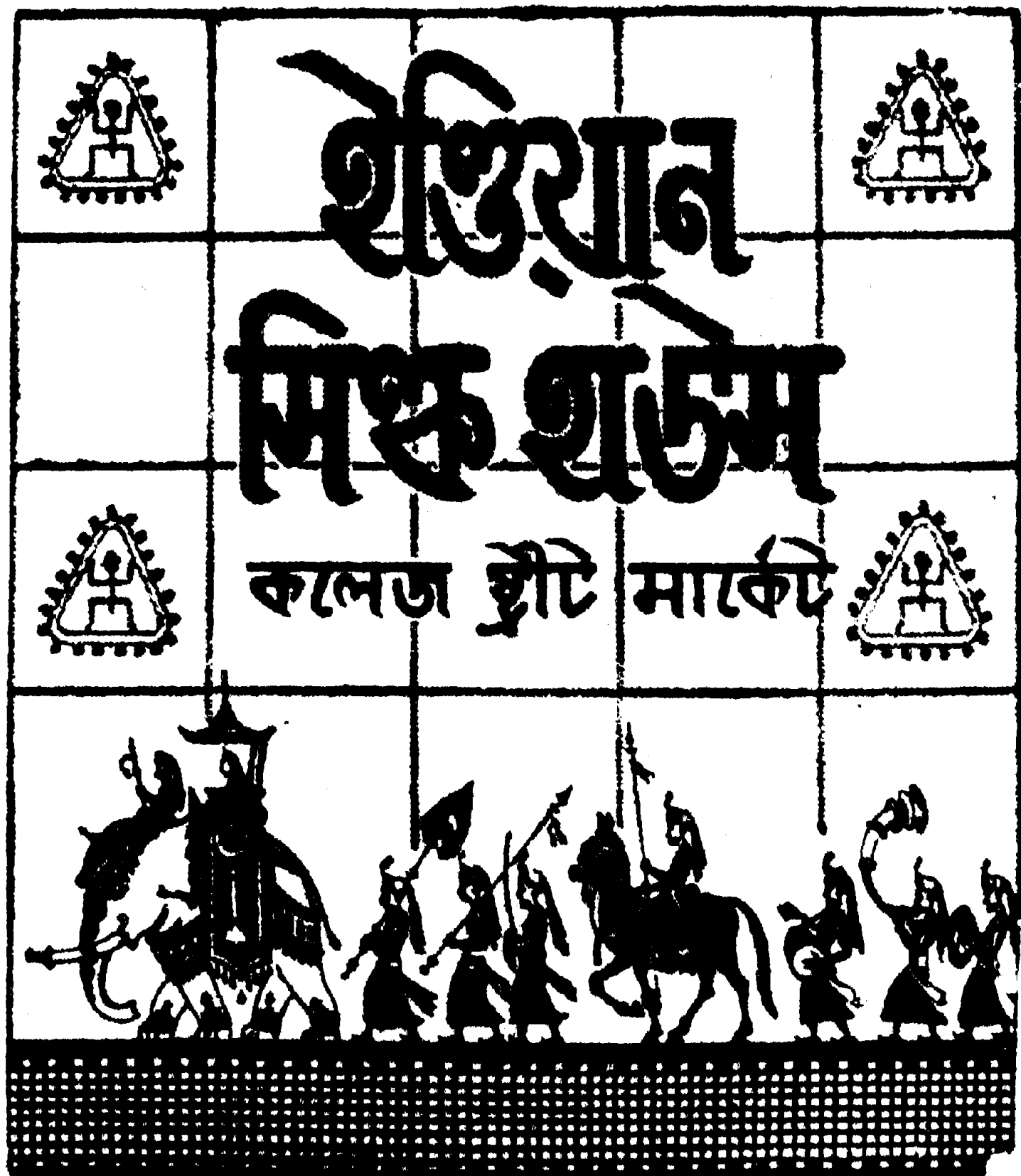
স্বাদ বহন করে আনবে। প্রসংগত স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরেই মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছিলেন এবং এই পত্রগুচ্ছ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন পত্রকাব্যের ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন এবং তারা, দ্রৌপদী, জাহ্নবী, জনা, উর্বশীর চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে নারীহৃদয়ের যে দুজ্ঞেয় রহস্যজাত বিচিত্র ভাবাবেগকে উন্মোচিত করেন তার সার্থক উত্তরাধিকার অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, গান্ধারী, চিত্রাঙ্গদা এবং অনুরূপ চরিত্র-চিত্রণের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ পেয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন যে প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নৈতিক আদর্শের সমালোচনার পক্ষপাতী এবং সহোদরের প্রতি অনুরাগিনী ক্যানেস কিংবা সপত্নী-পুত্রের প্রেমে নিমজ্জিত ফিড্রা চরিত্র-সৃষ্টির অনুসরণে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্য রচনার জন্যে যোগীন্দ্রনাথের মতো সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনীকারও যখন গভীর অতৃপ্তি অনুভব করেন তখন এ ব্যাপারে মধুসূদনের স্বপক্ষে কিছু বলার থাকতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। অন্ততঃ এখনকার দিনে অনুরূপ কবি-কল্পনায় সুরুচির বিকৃতি কিংবা গাম্ভীর্যের অবমাননার তর্ক বোধ হয় অবান্তর। মধুসূদন গোড়া থেকেই মহাকাব্য কিংবা পত্রকাব্য রচনার ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের চরিত্রগুলিকে আপন কবিস্বভাব ও কবিকল্পনার জারকরসে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির করে গড়েছিলেন। ছন্দ মিল গুণে কবিতারচনা যে কারণে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল ঠিক সেই কারণেই এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে কোনো গতানুগতিক সংজ্ঞা আরোপ খুব সম্ভব তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল। এবং এই কারণেই রাবণ, মেঘনাদ বা শূর্পণখা সম্পর্কে মধুসূদনের আরোপিত গুণাবলীর ব্যাখ্যায় দীর্ঘকালের সংস্কার ও অভ্যাসজর্জরিত পাঠকসমাজ চমৎকৃত ও বিস্মিত এবং রাম-লক্ষ্মণ অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় অপ্রীতিকর কিন্তু অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

॥ তিন ॥

ওভিদের পত্রাবলীর সংগে বীরাঙ্গনার রূপকল্পের সাদৃশ্য যতোটা, স্বাতন্ত্র্য সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী। চরিত্র-চিত্রণে ভাষা-বিন্যাসে, ঘটনা সংস্থাপনে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ওভিদের বীরপত্রাবলী পাঠে পত্রকাব্যে কবি-কল্পনার সার্থক বিস্তৃতি যে সম্ভব একথা মধুসূদনের মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে বীরাঙ্গনা পত্রগুচ্ছকে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক বলা যেতে পারে। যদিও ওভিদের আদর্শে পরিকল্পিত একুশটি পত্রকাব্যের স্থলে প্রস্তাবিত গ্রন্থের মাত্র এগারোটি পত্রকাব্যই শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের অবিস্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষ্য তথাপি এই এগারোটি পত্রকাব্যেই নবজাগৃতির যুগের বাঙালীর মননসাধনার অমূল্য সম্পদ সংগৃহীত।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বর্ণিত নায়িকারা পৌরাণিক কালের নারী। কিন্তু অনুভবে, উন্মোচনে, অভিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিতে এই চরিত্রগুলো নবজাগৃতি যুগের প্রাণোন্মাদনার প্রতীক। এই দিক থেকে মধুসূদনের স্বকালের প্রতি পক্ষপাত যতটা সেকালের প্রতি আনুগত্য ততটা নয়। বীরাঙ্গনার নায়িকারা মধুসূদনের মনোজগতের দুর্মর আলোকধারায় সম্পূর্ণরূপেই নতুন করে জন্মেছে। মধুসূদন রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার সংগে অত্যন্ত নিবিড় ভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর নিজের কবিস্বভাব অনুযায়ী তিনি নায়িকা নির্বাচনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল যুগোপযোগী কাব্যসৃষ্টি, পৌরাণিক ঘটনাবলীর পদানুবাদ নয়। ফলে, 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্যে একদিকে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশলের দৃষ্টান্ত অন্যদিকে তেমনি মূল থেকে (সোমদেব ও তারাদেবীর কাহিনীর) বিচ্যুতিরও সার্থক উদাহরণ। মধুসূদনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ব্যতিক্রম, স্খলন নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে—পটভূমিকার ব্যাপ্তিতে, দৃশ্যের রমণীয়তায় এবং নাটকীয় আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চারণে—মধুসূদন অনন্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শকুন্তলা, তারা, ভানুমতী, উর্বশী এবং জনা—এই চরিত্রগুলো স্পষ্টতঃই পরস্পরের থেকে বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র এবং জনা বা ভানুমতী যে-অর্থে বীরাঙ্গনা শকুন্তলা কিংবা তারাদেবী যে অনুরূপ অর্থে বীরাঙ্গনা নয় তা বলাই বাহুল্য। জনা পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর; ভানুমতী স্বামীর অধঃপতনে অমংগল আশংকায় পীড়িতা। পক্ষান্তরে শকুন্তলার আচরণে তপোবন-সুলভ নির্মল ভাবাবেগ লক্ষণীয় এবং তারাদেবী স্পষ্টতই নিজের নির্বন্ধ প্রেমের গভীর আর্তিতে স্পন্দিত। সুতরাং প্রচলিত অর্থে বীরাঙ্গনা নয়, বিশিষ্ট নায়িকার অর্থেই এই ধরণের চরিত্রগুলোকে বীরাঙ্গণা বলা যেতে পারে। পত্রাকার কাব্যে বর্ণিত নারীহৃদয়ের আলেখ্য একদিকে যেমন পৌরাণিক কালের ঘটনাসংস্থানের নৈপুণ্যে, দৃশ্যসজ্জার নিখুঁত প্রতিচিত্রণে, পরিবেশ এবং পরিমন্ডলের প্রতিভাসে পাঠকমনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে থাকে অন্যদিকে তেমনি পুরুষের প্রভাব থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে সার্থক। প্রকৃত প্রস্তাবে, পৌরাণিক যুগের নারীসমাজের অভিজাত, শিক্ষিত অংশের ধ্যানধারণা, চিন্তা ও কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একালের পাঠকসমাজ অনুমান করতে পারেন মাত্র যেহেতু ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধকালের সংগে একালের ব্যবধান বিস্তর। পক্ষান্তরে মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে চরিত্রগুলোর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের নবজাগৃতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। 'সোমের প্রতি তারা' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। মধুসূদন এরূপক্ষেত্রে স্বকালের চিন্তা ও ভাবনার প্রভাবেই জনা কিংবা তারার চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর ক'রে তুলতে পেরেছেন বলা যেতে পারে। নীচের স্তবকগুলো থেকে—

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

* * *

কলংকী শশাংক, তোমা বলে সর্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিণী কিংকরী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।

এসো, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
('সোমের প্রতি তারা')

হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,-হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি প্রভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

• • •

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
('নীলধ্বজের প্রতি জনা')

অন্তত দুটি বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ, তারাদেবীর নারীহৃদয়ে প্রেমের যে আলোড়ন প্রত্যক্ষ করা যায় নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সঙ্গেই কোথায় যেন তার গভীরতর মিল অনুভূত হবে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক অর্থে তারাদেবীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে ঠিক বৈধ বলা না গেলেও এই দ্বিচারিণী যে গভীর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার জন্যেই সর্বকালের কাব্যপাঠকের সমবেদনা ও শুভেচ্ছায় সে-চরিত্র অভিষিক্ত। এই দিক থেকে মধুসূদনের পত্রকাব্যের কোনো কোনো চরিত্র নিঃসন্দেহেই সেক্সপীয়রের ট্রাজিক চরিত্রের অনুগামী এবং সে-কারণেই নবজাগৃতির (the renaissance) গভীরতর মানবিক আবেদনে বিকীর্ণ। আর্নল্ড বেনেট একদা যে হৃদয়াবেগের ব্যাখ্যা করেছেন ('Literature does not begin till emotion has began'.) তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বলা যায় মধুসূদন থেকেই শুরু। রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির সারাৎসার (essence) মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে সর্বদাই গভীর ব্যাপ্তি এনেছিল মিলটনের প্রতি প্রবল পক্ষপাতই তার প্রমাণ। অর্থাৎ, আদর্শের দিক থেকে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ওভিদ্ তাঁর ধ্রুবসাহিত্যজনিত চেতনাকে অনুরঞ্জিত করলেও চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়র এবং মিলটনের অনুসরণই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেঘনাদবধেই মধুসূদনের চরিত্রচিত্রণ স্পষ্টতা এবং ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পাত্রপাত্রীর উক্তি এবং পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে কবিকল্পনার সার্থক ব্যাপ্তি কাব্যপাঠককে আকর্ষণ করে। এই মহাকাব্যের প্রধান অবলম্বন যদিও সমগ্রভাবে বীররস, তবু, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সর্গে কোমল ও শান্তরসের অনুরণনও দৃষ্টিগোচর হবে। বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেল মধুসূদনের রসবোধ অধিকতর পূর্ণতা লাভ করেছে, অমিতাক্ষর ছন্দের ওপর দখলও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন চরিত্রচিত্রণে অধিকতর উৎকর্ষতা লক্ষ্যণীয় এবং নারীচরিত্রের বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্য আশ্চর্য সুষমায় উন্মোচিত অন্য দিকে তেমনি রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির অনুগামী রসের ক্ষেত্রও বহুবিস্তৃত। পত্রকাব্যের স্বল্প পরিসরে এক-একটি নারীচরিত্র এক-একটি মানবিক আবেদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্বেলিত। প্রেমে, শপথে, অঙ্গীকারে, ঘৃণায়, আর্তিতে, উদ্বেগে, পূর্ণতায় বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত পাঠকমনে গভীরভাবেই রেখাপাত করে।

।। চার ।।

মধুসূদনের কবিতায় গোড়া থেকেই নাটকীয় উপাদানের আধিক্য এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নাটকীয় উপাদান তাঁর কাব্যরচনায় অতিরিক্ত আস্বাদ বহন ক'রে এনেছে। মেঘনাদবধে বীররসের ব্যাপ্তির সঙ্গে নাটকীয় উপাদানেরও প্রচুর সমাবেশ ঘটলেও বীরাঙ্গনা কাব্যে পৌঁছে এই নাটকীয় লিপিকুশলতা যেন অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। 'সোমের প্রতি তারা' 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা' 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' ইত্যাদি পত্রকাব্য প্রসংগত উল্লেখ্য। নিম্নলিখিত পংক্তিবিন্যাসে নাটকীয় উপাদান এবং অমিতাক্ষর ছন্দের অনুরণন যে-কোনো সজাগ পাঠকমনকে নাড়া দিয়ে থাকেঃ

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
(সোমের প্রতি তারা)

ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ প্রাণেশ্বর। অম্লানবদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজটে শিরঃ, ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে!
(লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা)

শুধু প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী নারীর প্রণয়-নিবেদনের মধ্যেই নয়, অন্যত্র বিদ্রূপে, ক্ষোভে, উদ্বেগেও এই নাটকীয়তা বিমূর্ত। নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তিতে,
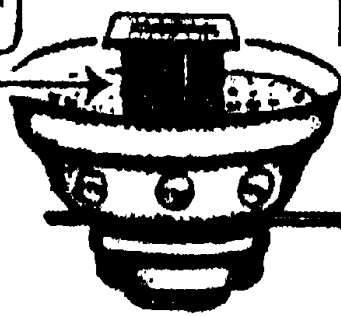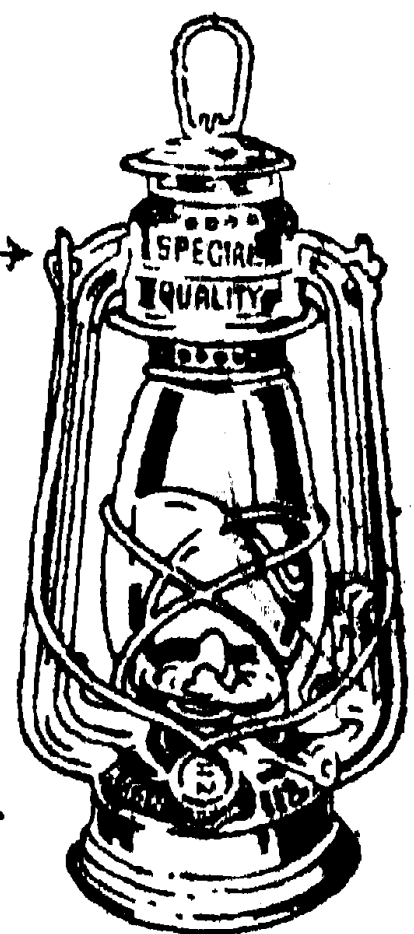
দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা এবং দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর আবেদনে এই ক্ষোভ, উদ্বেগ ও বিদ্রূপের বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনায় নাটক রচনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তার ফলেই সম্ভবত পত্রকাব্যরচনায় ক্ষেত্রেও এই নাটকীয় সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। জীবন এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় ঘনিষ্ঠ হলেই নাটকীয় আবেগ সার্থকতা লাভ করে। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ভাষা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের মুখাপেক্ষী এবং তৎকালীন প্রাকৃত ভাষার অবস্থা সম্ভবত এরূপ ছিল না যার থেকে সৎসাহিত্য-রচনার অনুপ্রেরণা পাওয়া যেতো। সুতরাং সাহিত্যের ভাষাগঠন ও ভাষা-বিন্যাসের প্রাথমিক কৃতিত্বও মধুসূদনের প্রাপ্য এবং যদিও বর্তমান কালের কবিতার ভাষার সঙ্গে মধুসূদনের সৃষ্ট ভাষার ব্যবধান দুস্তর তথাপি বাংলা সাহিত্যের সেই নব-উন্মেষের যুগে বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের প্রবর্তন এবং নাটকীয় আবেগ সৃষ্টির ব্যাপকতর সাফল্য লাভের জন্যেই মধুসূদন একালের নমস্য।

ভাষা সংগঠনে মধুসূদনের কবিতা পুঁথিগত অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই সমকালীন জীবনের বোধ ও ব্যক্তির মধ্যে, গভীরতর অনুভূতিগুলোর মধ্যে, সঞ্চারিত হয়েছিল। মেঘনাদবধ থেকে বীরাঙ্গনাকাব্যে উত্তরণের মধ্যেই তার নিভৃত প্রমাণ উপস্থিত। মেঘনাদবধের বিরাট সাফল্য এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সে-কাব্যের ভাষায় কোনো কোনো অংশে ভাষাবিন্যাসের দুর্বলতা লক্ষণীয়। ঘটনাসংস্থাপনের বৈচিত্র্যে, বীররসের আধিক্যে এবং সর্বোপরি অদ্ভুতপূর্ব নাটকীয় আবেগ সৃষ্টিতে ভাষাগত এই দুর্বলতা অনেক পরিমাণেই প্রচ্ছন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনায় মধুসূদন এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর অবচেতন মনে সম্ভবত এই বোধ জেগেছিল যে ভাষাকে ক্রমশই জীবনমুখী ক'রে সংগঠিত করার প্রয়োজন এবং বীরাঙ্গনার ভাষায় সম্ভবত সে-কারণেই প্রাকৃত ভাষার উপকরণ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য, মধুসূদন প্রবর্তিত কাব্যে ভাষা একান্তভাবেই তাঁর অননুকরণীয় প্রতিভাসৃষ্টি এবং সে-ভাষার প্রকৃতি এরূপ স্বতন্ত্র ছিল যে পরবর্তী কালে সে-ভাষায় কাব্য রচনার উদ্যোগ আর সফল হয়নি। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভাষাকে পরবর্তী কালে অধিকতর জীবনানুগ করলেও মধুসূদনের ব্যাপক সাফল্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের আয়ত্তাধীন হয়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে ভাষায় ও ভাবানুষঙ্গে মধুসূদন সেকালের সংশয়াচ্ছন্ন আকাশে বজ্রের মতোই অকৃপণ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিস্ময়কররূপে একক। ছন্দোমুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাধিক; কিন্তু মধুসূদন এই পথে অগ্রণীর সম্মানের অধিকারী।

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সুদৃঢ় কবিকল্পনার উপরে সংস্থাপিত ও বদ্ধমূল ছিল বলেই মধ্যযুগীয় কবিতার কলাকৌশলকে সম্পূর্ণ বর্জন করেও তিনি অতুলনীয় সাফল্যের অধিকারী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় বলেছেন : "মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হ'লে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয় স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ঔদাসীন্য দেখাননি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তার চোখে অচল ঠেকেছিলো, এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে।..." সুধীন্দ্রনাথের এই উক্তি অংশত সত্য যেহেতু মধুসূদনের কাব্যের ভাষা তৎকালীন সমাজের মানুষের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে পারেনি। কিন্তু মধুসূদন আপন প্রতিভা-বলেই নতুন যে কাব্যভাষার সৃষ্টি করে-ছিলেন এবং যে-ভাষায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের মত সৎসাহিত্য সম্ভব হয়েছিল তার সাহিত্যিক গুরুত্ব এরূপ উক্তিতে হ্রাস পায় না। "...মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই, ঝিমিয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই।..." সুধীন্দ্রনাথের একই নিবন্ধের ("ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ") এই পরবর্তী উক্তি বরং সৎপাঠকের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এরূপ অবস্থায় মধুসূদন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক মূল্য-বিচার ('সাহিত্যচর্চা') সর্বাংশে গ্রাহ্য কিনা সন্দেহ। "মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো যাদুমন্ত্র।" এছাড়া অন্য গুণাবলী তিনি মধুসূদনের সাহিত্যে খুঁজে পাননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যগ্রন্থের সমগ্রতার অনুধাবন যদিও সহজসাধ্য নয় তবু সাধারণ কাব্যপাঠক সে-গ্রন্থের চিত্তহারী পদবিন্যাস ও ভাষালাবণ্য সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পান। এবং যে-পাঠক সতর্কতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের পক্ষপাতী মধুসূদনের কবিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবার মতো প্রচুর উপাদান তিনি আবিষ্কার করবেন। এখনকার দিনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পূর্তির পর মাইকেল প্রবর্তিত ভাষা ও ছন্দে নানা বিচ্যুতি আবিষ্কার সম্ভব; কিন্তু মধুসূদন যে-কালে প্রথম মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন তখনকার বাংলা সাহিত্যের গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট অবস্থার কথা মনে রাখলে মধুসূদনের অবদান সম্পর্কে সংশয় থাকে না।*

---

* "তিলোত্তমা'র সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা'র আরম্ভ। তারপরে 'মেঘনাদবধ' আর 'কৃষ্ণকুমারী' প্রায় একসঙ্গে লেখা চলিল। 'মেঘনাদবধ' শেষ না হইতেই 'বীরাঙ্গনা'।"

(মাইকেল মধুসূদন : প্রমথনাথ বিশী। পৃঃ ৫০, ২য় সংস্করণ।)

"মেঘনাদবধের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। শর্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমাসম্ভব রচনা করিয়া, তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ ও গাম্ভীর্য এবং গ্রন্থোল্লিখিত চরিত্রসমূহের পূর্ণতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে, তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাঙ্গনা এই চারিখানি গ্রন্থ এই সময়ের অন্তর্গত।... ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী এবং মেঘনাদবধ এই তিনখানি গ্রন্থ মধুসূদন প্রায় একই সঙ্গে আরব্ধ এবং প্রায় একই সঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত। যোগীন্দ্রনাথ বসু। প্রথম সংস্করণ।)

"মধুসূদন তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে 'মেঘনাদ বধের পর বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র হইবে; গীতি-কবিতারও দিকে আমার প্রবণতা আছে, আমি সেই দিকে চেষ্টা করিব।' মধুসূদনের সেই প্রবণতার ফল তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য।"

(ঐ পৃঃ ৩৯৫)

সুতরাং বলা যেতে পারে একই সময়ে আরম্ভ করলেও মেঘনাদ বধ রচনার কাজই তুলনায় অধিকতর অগ্রসর হয়েছিল। বিষয়-বস্তু ও ভাবের দিক থেকে সমস্ত কাব্যই যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে-কারণেই গোড়া থেকেই মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যকে গীতি-কাব্যের আদর্শে রচনা করতে শুরু করেন।

মাতাহারি

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

নির্মলের হাতে হাতকড়া পড়ল হেমন্তের এক সোনালি সন্ধ্যায়। নিছক প্রেম করতে গিয়েই এই বিপদ সে ডেকে আনল।

নির্মলের বয়স তখন বছর ত্রিশেক। মহাযুদ্ধ শেষ হবার দু-চারদিন আগেই জন্মেছিল, তাই বয়সের কথা উঠলে সগর্বে মন্তব্য করে : আমি কি আর আজকের লোক হে, বিছানায় পড়ে না থাকলে ভিক্টোরিয়া ক্রশ নিতুম। যুদ্ধের পরে পাওয়া পীস মেডেলটা এখনও আলমারিতে তোলা আছে।

এটা বয়সের ধর্ম। এ বয়সে সব যুবকই বয়স বাড়িয়ে আনন্দ পায়। সত্যিই যখন বয়স বাড়বে, তখন আর এ কাজ করবে না।

নির্মলের পিতার পয়সা আছে। বাণিজ্যে নেমে লক্ষ্মীকে তিনি সিন্দুকে আটকেছেন। নির্মলের শৈশবেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করেননি। বিবাহে নির্মলেরও রুচি নেই। এটা বোধহয় যুগের হাওয়ায়। সারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে যাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে ভাল করে দেখে শুনে বাজিয়ে নেওয়া দরকার। এই বাজিয়ে নেবার নামে যথেচ্ছাচারও হয়তো চলে। শুভানু-ধ্যায়ী বন্ধুরা যখন ঘরে লক্ষ্মী আনবার পরামর্শ দেন, নির্মলের বাবা বলেন : তাকে তো সিন্দুকে বন্দী করেছি।

লেখাপড়া শিখে নির্মল চাকরিতে ঢোকেনি, বাপের ইচ্ছায় বাপের ব্যবসায়েই কতকটা দায়িত্বহীনভাবে কিছু দেখাশোনা করছিল। আরও সব কর্মচারীর মতো মোটা মাইনে পায়, ছুটি নেয় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। ঘোড়-দৌড়ের মাঠে জাঁকিয়ে বসে, ক্লাব ও জুয়োর আড্ডায় তার জুড়ি মেলে না। বন্ধুরা হিরো বলে, আর তন্বী শ্যামারা তাকে অতিরিক্ত সঙ্গ দিয়ে দলের আর দশটা তরুণকে ঈর্ষায় কাতর করে।

কলকাতার এই নির্মলকে সেদিন দার্জিলিঙের বার্চ হিলে দেখা গেল। গম্ভীর মুখ, পাইপের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার, একটা বেঞ্চিতে একা বসে বোধহয় আকাশ পাতাল ভাবছে। সামনে ছেলেমেয়েদের খেলায় বিশ্রাম নেই। কেউ সি-স'র উপর চেপে ঢেঁকি-ঢেঁকি খেলছে, কেউ দোলনায় দুলছে বিপর্যস্তভাবে, কেউবা মই বেয়ে উপরে উঠে সড় সড় করে নেমে আসছে বিপুল বেগে। নির্মলের মুখ ছিল এই খেলার দিকে, কিন্তু দৃষ্টিটা আত্মস্থ, বেশ চিন্তাগ্রস্থ। নির্মল জানত না যে এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। টের পেলে নিশ্চয়ই সে উঠে যেত।

ওধারের বেঞ্চে বসে যে বুড়ো ভদ্রলোক নির্মলকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ঠিক শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ। মাথার চুল ও দাড়ি অকালপক্ক না হলে বয়স তাঁর ষাটের কম বলা উচিত হবে না। পাশের মেয়েটি কিন্তু সুদর্শনা। বৃদ্ধের নাৎনি বলে সন্দেহ হলেও মেয়ে বলেই মানতে হয়েছে। দশজনের শ্রবণ বাঁচিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁরা গভীর আলোচনা কর-ছিলেন।

বৃদ্ধ এক সময় নির্মলের কাছে উঠে এলেন। বেঞ্চের একটা ধারে বসে একটুখানি কাশলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হল। নির্মল চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। চিন্তার জগৎ থেকে সে বাস্তবে ফিরে এসেছে।

বৃদ্ধ বললেন : আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো!

বিরক্ত!

বিরক্তই তো, একা বসে আপনি হয়তো কত কি ভাবছিলেন—

নির্মলের দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হল, বলল : কে বলল আমি কত কি ভাবছি?

বৃদ্ধ হেসে বললেন : আমরা যে রোজ আপনাকে লক্ষ্য করছি।

রোজ?

কোন অপরিচিত লোকের এই অহেতুক কৌতূহল নির্মল সৌজন্যহীন অভদ্রতা মনে করে। একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়েই সে থেমে গেল।

বৃদ্ধ বললেন : মায়ার ধারণা আপনি বাঙালী নন। আর আমি ?

বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বলেই তাঁর মেয়েকে ডাকলেন।

মায়া এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শাড়ির আঁচলখানা সামনের দিকে টেনে এগিয়ে এল। বুড়ো বললেন : কার কথা ঠিক হল এইবারে দেখ। ভদ্রলোক একেবারে খাঁটি বাঙালী। গায়ে পড়ে কথা কইছি বলে রাগ করছেন।

দু-হাত জুড়ে মায়া নমস্কার করল : রাগ করবার কথাই যে।

কেন?

আপনি হয়তো কোন গুরুতর সমস্যার কথা ভাবছেন—

সেই এক কথা। নির্মল বাধা দিয়ে বলল : একা বসে হাসতে শুরু করলে কি আপনারা পাগল ভাববেন না?

মায়া নির্মলের পাশেই বসেছিল। পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। বলল : সে আরও কৌতুকের হত।

এই হাসিতে নির্মলের উষ্মা অনেকটা নেমে গেছে। তা লক্ষ্য করে বুড়ো বললেন : আপনার চোখে মুখে দার্শনিকের মতো গাম্ভীর্য, তাই দেখেই আমরা আলাপে ভয় পেয়েছি।

মায়া বলল : বাবাকে আমিই সাহস দিয়েছি। বাবার চেহারাই বা দার্শনিকের মতো নয় কিসে!

এবারে নির্মলও হাসল।

বেলাশেষের এই সোনালি রোদে বুঝি একটু নেশা আছে। মেঘে যেটুকু জল ছিল, তা ঝরে গেছে। এখন শুধু নির্জলা রোদ। পাহাড়ি পরিবেশে এই উত্তাপেই তো নেশা ঘনায়।

মায়ার বাবা বললেন : এত মানুষ থাকতে বসে বসে আপনাকে কেন লক্ষ্য করেছি তার কারণ বলি। আপনি আমাদের পাশের হোটেলেই আছেন, আর বেরোন প্রায় আমাদের সঙ্গেই। কোন দিন আগে, কোন দিন পেছনে। কোন সঙ্গী নেই, কথাও বলেন না কারও সঙ্গে।

মায়া বলে উঠল : কথা না বলে আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারিনে।

গভীর বিস্ময়ে নির্মল বলল : আমি আপনাদের একদিনও লক্ষ্য করিনি।

করেছি আমি।

হাসতে হাসতে বুড়ো বললেন : মেয়ে আমার—

নির্মল কথাটা শেষ করল : ভাল গোয়েন্দা হতে পারতেন।

মায়া যেন চমকে উঠল, তারপরেই সহজ হয়ে বলল : কোন কাজ আছে কি আপনার খোঁজে, কোন ডাকাতি বা খুনের তদন্ত?

এবারে নির্মল চমকাল, একান্ত অনামনস্কভাবে বলল : না না, এ আমার ঠাট্টার কথা।

বৃদ্ধের দৃষ্টিটা যে শ্যেনের মতো, নির্মল তা লক্ষ্য করেনি।

বাড়ি ফেরার পথে তাদের পরিচয় হল। মায়ার বাবা বিপিনবাবু উত্তর-বঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। সরকার উকিলদের অবসর নিতে বাধ্য করেন না, তাই তিনি এখনও কাজ করছেন। বক্তৃতার ক্ষমতা ফুরিয়েছে বলে এখন শুধু পরামর্শ দেন। চারিদিকের চা-বাগানগুলো চলছে বলে তিনিও চলছেন, নইলে বিপদে পড়তে হত।

নির্মল আশ্চর্য হচ্ছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে কি নিজের অসচ্ছলতার কথা এমন অকপটে বলা যায়! অপরিচিতের কাছেই বুঝি যায়।

বিপিনবাবু তাঁর মেয়ের কথাও বললেন। মায়া তাঁর একমাত্র সন্তান নয়, তাঁর শেষ সন্তান। আর সব ছেলে-মেয়েরা বিয়ে-থা করে ঘোরতর সংসারী হয়েছে। বাপের শেষজীবনে এ মেয়ে ছাড়ছে না, ছায়ার মতো সর্বত্র ঘুরছে। মৃত্যুর আগে কি মায়াকে পাত্রস্থ করতে পারবেন না?

বিপিনবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল।

নির্মল অভিভূত হল। আত্মদানে যে নারী মহিমময়ী, নির্মল বুঝি তারই একজনকে নিজের নিকটে দেখছে। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মায়ার দিকে তাকাল। কৃত্রিম সজ্জায় এই মেয়েটি নিজেকে উৎকৃষ্ট করে তোলেনি। সায়াহ্নের সুন্দর আকাশের মতোই রূপে রঙে রঞ্জিত হয়ে আছে। মায়াকে নির্মল শ্রদ্ধা করতে শিখল।

দুপুরের আহারের পর নির্মল তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে গভীর মনোযোগে পড়েছে দৈনিক সংবাদপত্র। কাগজখানা কখন তার হাত থেকে পড়ে গেছে খেয়াল করেনি, দুরন্ত ভাবনায় সে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। চোখের সামনে ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার উদার বিস্তার। কিন্তু এখন তার চোখের সামনে সংবাদপত্রের শিরোনামাই জ্বল-জ্বল করছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনোজ মিত্রের হত্যার তদন্ত। তাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল শৈশব থেকে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কলকাতায় ফিরে আর তাকে দেখতে পাবে না।

এই সম্পর্কে পুলিশ তাদের 'অপদার্থ সঙ্ঘের' জনকয়েক 'অপদার্থ'কে গ্রেপ্তার করেছে। মনোজের সঙ্গে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ ছিল। এবং তাদের তর্ক এক একদিন খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হত। সঙ্ঘে ইদানীং মদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়ে সভ্যও এসেছিল, তৈরি হয়নি কেবল কড়াকড়ি বা বাঁধাবাঁধি আইন। এই সঙ্ঘকে তাই যথেচ্ছাচারের অবাধ প্রশ্রয় দিতে হয়েছে।

মনোজের মৃতদেহ একদিন সকালে সঙ্ঘের একটা ঘরে আবিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি যে, রাতের এই ঘটনাটা সকল সভ্যেরই অজ্ঞাত ছিল। সন্দেহ হয়েছে যে, রাতে যারা এসেছে ও এ দৃশ্য দেখেছে, তারা অন্ধকারেই গা-ঢাকা দিয়েছে, প্রথম দর্শক হিসেবে পুলিশে সংবাদ দিতে কেউই সাহসী হয়নি।

পুলিশ নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, খুনটা প্রথম রাতে হয়নি। কেননা, সন্ধ্যাবেলায় 'অপদার্থ'রা যে আসা-যাওয়া পান-বিলাস সবই করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা যে মনোজ গভীর রাতে এসে আত্মহত্যা করেছে। করে থাকলে পুলিশ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। মনোজ মরেছে কপালে আঘাত পেয়ে। একটা খালি বোতল মেঝেয় পাওয়া গেছে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বোতলের আঘাতেই যে মৃত্যুটা হয়েছে, পুলিশের তাই অনুমান। কিন্তু আঘাতটা করেছে কে?

পুলিশ নাকি নির্মলের বাড়িও চড়াও করে। কিন্তু এই ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলাতেই সে দার্জিলিও বেড়াতে গেছে জেনে পুলিশ কতকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

মামলা এখন পুরোদমে চলছে। 'অপদার্থ সঙ্ঘের' 'অপদার্থ'রা একে

এসে সকলেই জবানবন্দী দিয়ে যাচ্ছে, আর পুলিশের হাজতে বন্দী হয়ে সঙ্ঘের দারোয়ান ও বারের বেয়ারারা অবিশ্রাম মার খাচ্ছে। নির্মলের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না বলে সে দার্জিলিঙে পড়ে আছে, আর প্রচুর কৌতূহল নিয়ে মামলার বিবরণ পড়ছে।

এই নির্বান্ধব একঘেয়ে জীবনে নির্মল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে রঙীন হাল্কা সন্ধ্যাগুলি তাকে এতদিন মাতাল করেছে, তার নেশা এখনও তার রক্তে লেগে আছে, এখানেও তাকে চুম্বকের মতো টানছে। তারপরেই হচ্ছে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা, নানা আশংকায় তার সবল স্নায়ুগুলো জড়ের মতো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দেহটা চাংগা হয়ে উঠতে না উঠতেই--একটা পুঞ্জিত গ্লানির ভারে মনটা মিইয়ে যাচ্ছে। নির্মল ডাক্তার দেখাচ্ছে, টনিক খাচ্ছে, আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত অসম্ভব আজগুবি কথা ভাবছে।

খোলা জানালা দিয়ে নির্মল বাইরে চেয়ে ছিল। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে রোদ্রকে ঢেকে দিল, একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল, অতর্কিতে দেহটা উঠল থরথর করে কেঁপে।

এক সময় মায়া এসে যে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নির্মল তা লক্ষ্য করেনি। তার কথা শুনে আর একবার চমকে উঠল। মায়া প্রশ্ন করেছিল : কী হল, অমন চমকে উঠলেন যে?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মুখে তার কথা যোগাল না।

মায়া বলল : স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

নির্মল হয়তো স্বপ্নই দেখছিল, তার প্রিয়তম বন্ধু মনোজের হত্যার দুঃস্বপ্ন। মানুষ খুন হতে সে কখনও দেখেনি। খুন হবার পরেও না। শুধু কাগজে পড়েছে, আর গল্প শুনেছে। কিন্তু এখন সে চোখ বুজলেই রক্ত দেখতে পায়। দেখে, তাদের সঙ্ঘের একটা ঘরে মনোজ লুটিয়ে পড়ে আছে, মাথার খুলিটা ভেঙেগ মগজ গড়িয়ে পড়ছে সাদা আর গোলাপী রঙের। আর রক্ত। অন্যমনস্ক হলেই নির্মল চমকে ওঠে।

মায়া তখনও তার উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু নির্মলের কথা সব এলোমেলো হয়ে গেল : স্বপ্ন! হ্যাঁ, না, স্বপ্ন কেন দেখব!

মায়া নাছোড়বান্দা, বলল : বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে, ডেকে আপনার সাড়া পেলাম না। ভাবলাম অবেলায় ঘুমোচ্ছেন, জাগিয়ে দেব। কিন্তু আপনি জেগেই ছিলেন। খুব অন্যমনস্ক।

নির্মলকে এ কথা স্বীকার করতে হল, কিন্তু কথা না বলে সে শুধু মাথা নাড়ল।

মায়া এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে বসল, হাসতে হাসতে বলল : আমার

চেহারাটাই বোধহয় পেত্নীর মতো; তাই ছায়া দেখেই চমকে উঠেছিলেন।

মায়ার হাসিটা নির্মলের ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে হল বলে, প্রশংসা শোনার বাসনা মেয়েদের সনাতন।

কিন্তু এখনও সে সহজ হতে পারেনি, এখনও তার মনে চলেছে দুরন্ত চিন্তার প্রতিক্রিয়া। সুযোগ পেয়েও সে সহজ হতে পারল না। নিঃশব্দে সে হাসল, প্রাণহীন শুষ্ক হাসি।

মায়া মেঝের দিকে চেয়ে, খবরের কাগজটা দেখে নিয়েছিল। খোলা পাতার উপরেই মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। নির্মলকেও দেখল মনস্তাত্ত্বিকের অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি দিয়ে। লোকটার আচরণ সত্যিই অদ্ভুত, তা না হলে এমন গম্ভীর হয়ে থাকতে কেন ভালবাসবে!

মায়া মেঝের কাগজখানা তুলে পাট করে রাখল। তারপর ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল : এবারে বেড়াতে বেরবেন তো, না এমনি করে ঘরে বসেই বিকেলটা কাটাবেন?

নির্মল তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল : সত্যিই খুব দেরি হয়ে গেছে।

দেরি এমন আর কী হয়েছে! কিন্তু আপনি তো এখনও চা খাননি।

চা!

মায়া হেসে বলল : বেয়ারা চা নিয়ে ফিরে গেছে। আমার মতো বেহায়া নয় তো, সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকবার সাহস পায়নি।

মায়া বোধহয় বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল। তার দরকার হল না। বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে সে নিজেই ভিতরে এল।

চা খেয়ে পথে বেরতে তাদের বেশি দেরি হল না। নির্মল বলল : আজকাল আপনার বাবা আসেন না তো?

মায়া হেসে বলল : তাঁকে তাসে পেয়েছে ভূতে পাবার মতন। হোটেলের ঘরেই দিনরাত জাঁকিয়ে আছেন। তাসের সংগে যত পয়সা পড়ছে, নেশাও তত ঘনিয়ে উঠছে।

নির্মল যেন আঁৎকে উঠল। তারাও যখন 'অপদার্থ সংঘ' খুলেছিল, তখন চা আর তাস দিয়ে সংঘের উদ্বোধন হয়। তারপর এল পাশা আর লেমনেড। সকলের শেষে মদ আর মেয়ে। জুয়ার আড্ডা সরগরম হল। মাতলামি থিতিয়ে উঠল ভিতরে ও বাইরে। সুযোগ বুঝে বাজে মেয়েরা এল রোজগারের লোভে। এই অতীতটাকে নির্মল ভয় পায়। ও সব বাদ দিতে পারলে মনোজ মিত্রকে নিশ্চয়ই হারাতে হত না।

নির্মলের এই চমকানিটা মায়া লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু এই নির্বিকার লোকটাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে আর লাভ কি। শুধু সময় নষ্ট করা বইতো নয়।

চলতে চলতে মায়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছেন?

অন্যমনস্কভাবে নির্মল বলল : স্বাস্থ্য যে মানুষের কত বড় সম্পদ!

মায়া এ কথার সূত্র খুঁজে পেল না। বলল : হঠাৎ এ কথা কেন?

এই কথাই যে এখন বার বার মনে হয়। আয়নায় আমার নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠি। এত খারাপ স্বাস্থ্য আমার কোন দিন ছিল না। এখন যেন একখানা কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছি।

মায়া এ সবই লক্ষ্য করেছে। কারণও জানতে চেয়েছে অনেকবার অনেক ভাবে। কিন্তু উত্তর পায়নি। এবারে আর প্রশ্ন করে নির্মলকে বাধা দিল না। বরং নীরব থেকে তাকে বলবার সুযোগ দিল।

নির্মল আজ প্রগল্‌ভ হল, বলল : আমি এমন ছিলুম না মায়া দেবী। 'অপদার্থ সংঘে' আমার চেয়ে বড় অপদার্থ আর ছিল না। কতগুলো অলস বিলাসী ধনী 'অপদার্থকে' নিয়ে যখন এই সংঘটা গড়ে তুলি, তখন এর ভবিষ্যৎটা দেখতে পাইনি। পরিণতিটা যে এমন ভয়াবহ হবে, তারও দুঃস্বপ্ন দেখিনি। সেদিন উচ্ছৃংখল যথেচ্ছাচারকে নির্ভীক পৌরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছি, সামাজিক নীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কুসংস্কার বলে বেপরোয়া নিন্দা করেছি। পিতা পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন, নির্বিকার চিত্তে অর্থ জুগিয়েছেন অকুণ্ঠ হাতে।

একটু থেমে বলল : ঘরে আর কেউ ছিল না যে বাধা দিতে পারত। মাকে হারিয়েছিলুম জ্ঞান হবার আগেই। জননীর শাসনে স্নেহে প্রহারে ও প্রশ্রয়ে আর দশটা শিশুর চরিত্র যেভাবে গড়ে ওঠে আমার বেলায় তা হল না। যে আদর্শ অলক্ষ্যে থেকে অনাচারকে একটা আতংক দিয়ে ঘিরে রাখে, সে আদর্শ আমার জীবনে প্রতিফলিত হল না। বাবা যখন বিয়ে করতে বললেন, আমি তখন নারীর বাইরের রূপ দেখে চিনে ফেলেছি। জীবনের সংগী করে নেবার মতো কোন প্রলোভন তার মধ্যে খুঁজে পাইনি।

আজ তারা জলা পাহাড়ের পথ ধরেছিল। সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার গভীর হয়নি। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে থাকলেও মায়া আজ বসবার প্রয়োজন বোধ করল। রাস্তার ধারে একটা টিনের চালা দেখে বলল : আসুন না, বেঞ্চিতে একটু বসা যাক।

নির্মল দাঁড়িয়ে পড়ল, তার ধ্যান যেন ভেঙে গেছে। বলল : আমি অত্যন্ত দুঃখিত মায়া দেবী—

মায়া দেবী নয়, শুধু মায়া।

নির্মল হাসল, বলল : অন্যমনস্কভাবে অনেক দূরে চলে এসেছি, অন্ধকারে আর এগোন উচিত হবে না।

কিন্তু মায়া তখুনি ফিরতে রাজী হল না, বলল : একটু জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।

মায়াকে অনুসরণ করে নির্মল এসে বেঞ্চিতে বসল, কিন্তু কথা কইল না।

কিন্তু মায়া আজ সব কথা শুনতে চায়, বলল : তারপর?

নির্মল তার গল্পের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, বলল : কী তারপর?

আপনি বিয়ে করতে রাজী হলেন না।

নির্মল ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : আমার অত্যাচারের জীবন আজ শেষ হয়ে গেছে। আজ ভাবি, আমিও তো খুন হতে পারতুম মনোজের হাতে! অপ্রকৃতিস্থের—

সমস্ত স্নায়ু একত্র করে মায়া শক্ত হয়ে বসল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নির্মল থেমে গেল।

মায়া বলল : অপ্রকৃতিস্থের—

কথাটা নির্মল শেষ করল না। তবু মায়াকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল : মনোজের প্রতিজ্ঞা ছিল, পাল্লা দিয়ে মদ গিলে আমি কোন দিন তাকে হারাতে পারিনি। তার চেয়ে কম মদ খেয়ে আমি তার চেয়ে অনেক বেশি মাতাল হয়েছি।

নির্মল উঠে দাঁড়াল, বলল : চলুন, এবারে ফেরা যাক।

দিন কয়েক পরের কথা।

আকাশে আজ মেঘের আড়ম্বর। দুপুরের রোদ নিবে যেতেই শিরশির করে উঠল মায়ার সারা দেহ। পাহাড়ের নিচে থেকে মেঘ উঠছে অবিরত। বন্ধুরা জানালা বন্ধ করে দিলেন, মাফলার দিয়ে ঢাকলেন কানদুটো। লাল নীল ছাতা হাতে মেমসাহেবরা বেরিয়ে এলেন নির্জন রাস্তার উপরে। মায়ার মনটাও দুলে উঠল। কেন সেই জানে। শ্যাওলা রঙের একখানা শাড়ির উপর তার পাশুটে ক্লোক চড়িয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঠেলে উঠল পাশের হোটেলটায়।

দরজার সার্সিতে টোকা দিয়ে নির্মলের সাড়া পাওয়া গেল না। পর্দা সরিয়ে মায়া ঘরে ঢুকে পড়ল। নির্মল ঘুমোচ্ছিল। তার বুকের উপর খবরের কাগজটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মায়া নির্মলকে জাগাল না, কেমন একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাল ঘুমন্ত মানুষটার দিকে। ক্রূর ও হিংস্র দৃষ্টি। বুঝি এবারে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বে। নির্মলের ডান হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা ছিল, মায়া তা মুক্ত করে নিল।

সেই মামলা। মায়ার কী মনে এল, যোঝা শক্ত। ঘরের কোণের আরাম-চৌকিটায় বসে কাগজখানা পড়তে লাগল। কে এক গণেশ হালদার তার জবানবন্দীতে নির্মলের নামেরও উল্লেখ করেছে। বলেছে, ঝড় জল উপেক্ষা করেও যারা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত আসত, তারা দুজনেই সেদিন অনুপস্থিত ছিল। নির্মল বসু আর মনোজ মিত্র। নির্মল বসুর দার্জিলিঙ যাবার প্রয়োজনের কথা কারও জানা ছিল না। মনোজ মিত্র হয়তো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে এ খবর রাখত ও সন্ধেবেলায় তাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

কাগজখানা সরিয়ে রেখে মায়া ভাবতে লাগল। এইবার হয়তো নির্মলের ডাক পড়বে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে পুলিশ ও আদালতের সামনে দাঁড়াতে হবে। খুনের মামলায় সামান্য খবর বলে সাধারণে যা উপেক্ষা করে, পুলিশের তদন্তের জন্য সেইটেই হয়তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এক সময় মেঘের আড়াল থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—উড়োজাহাজের পাখার শব্দ। এই বাদলার দিনে কার শখ হল ওড়বার, এই ভেবে মায়া আশ্চর্য হল। জগতে পয়সাওয়ালা পাগলের তো অভাব নেই!

মায়া জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘে মেঘে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো আজ আড়াল হয়ে গেছে। উড়োজাহাজও দেখা যাচ্ছে না। কাচের জানালা খুলে দিতেই অনেকক্ষণের অবরুদ্ধ মেঘ দুরন্তভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল। শির-শিরে ঠাণ্ডা ধোঁয়ার মতো ভিজে মেঘ। মায়া তাড়াতাড়ি আবার জানালাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে মায়া বসে নেই, হয়তো কিছু ভাবছে। একসময় ব্যস্ত-ভাবে উঠে গেল ঘরের আর একটা কোণায়। সেখানে নির্মলের সুটকেশ আর হোল্ডল গোটানো আছে—। তৎপর হাতে মায়া সেই সুটকেশের লেবেল পরীক্ষা করল। তারপর হোল্ডলটা নেড়ে-চেড়ে সেটার লেবেলও বার করল। আনন্দে ও গর্বে মায়ার দুচোখ উঠল জ্বলে। তারপরেই চমকে উঠল নির্মলের চীৎকারে।

নির্মল ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠবার মতো। তার দেহটাও কেঁপে উঠেছিল থরথর করে। মায়া ছুটে এসে দেখল, বিন্দু বিন্দু ঘামে তার কপাল ভিজে গেছে, উত্তেজনার শ্রান্তিতে সে তখনও বেশ হাঁপাচ্ছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে মায়া বেরিয়ে গেল, একটা বেয়ারাকে কফির ফরমায়েস করে নির্মলের কাছে এসে বসল। কম্বলে তার পাদুটো ঢেকে দিয়ে নিজের ডান হাতটা রাখল তার কোলের উপর।

বাহিরে তখন শিপশিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, তার ছিটে এসে পড়ছে কাচের জানালার উপর। নির্মল শুয়ে শুয়ে তাই দেখতে লাগল।

এক সময় মায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : তোমার ঘরের দরজাটাই শুধু খুলে রেখেছ নির্মলবাবু, মনেরটা কি কোনদিন খুলবে না?

নির্মলের গম্ভীর দৃষ্টি স্থির হল মায়ার ম্লান মুখের উপর। মেয়েদের মন নিয়ে নির্মল ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু এ কথা কোনদিন ভাবেনি। এ রকম প্রশ্নের জবাব তাকে কারও কাছে দিতে হয়নি। নির্মল বিচলিত হল।

হোটেলের বেয়ারা এই সময় কফির ট্রে না আনলে নির্মলকে আরও বেশি পীড়িত হতে হত। মায়া তাকে অব্যা-হতি দিল। এক পেয়ালা কফি ঢেলে বলল : এই নাও।

অনেকক্ষণ পরে মায়া আবার কথা কইল, বলল : আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

কেন?

কলকাতা থেকে জরুরি তার এসেছে। দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, মায়া তা বলল না। নির্মলও জানতে চাইল না। দিদি আর একবার মায়াকে ডেকে-ছিলেন। ভাল পাত্র আছে, তারা দেখবে। এবারেও বোধ হয় তাই। কিংবা অন্য কিছু।

মায়া বলল : পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যেতে আমার আজকাল ভয় করে। শকরিগলি ঘাট হয়ে ঘুরে যেতে কষ্টের সীমা নেই।

নির্মল বলল : প্লেনে যাচ্ছ না কেন?

মায়া খুশিতে ঝলসে উঠল : ঠিক বলেছ, প্লেনের কথা আমার মনেই ছিল না।

ভারত বিভক্ত হবার পর নতুন বিমানঘাঁটি খোলা হয়েছে বাগডোগরায়। পাকিস্তানের ভিতর দিয়েও যাতায়াত তখনও নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু যাঁরা ভয় পান, তাঁরা বিমানে উড়ে আসছেন। তারপর মোটরে উঠছেন দার্জিলিঙে।

কিন্তু টিকিট পেতে অসুবিধা নেই তো?

নির্মল বলল : কলকাতায় শুনেছি অসুবিধে হয় না।

তবে হয়তো ফিরেও আসতে পারব।

বলে আর এক পেয়ালা কফি ঢালল। নিজে নিল, নির্মলকেও দিল। তারপর বলল : আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ, কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

নির্মল এবারে স্বীকার করল, বলল : হ্যাঁ।

মায়া তার চোখের দিকে চেয়ে আছে। তাই দেখে নির্মল বলল : সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম।

মায়া আরও বেশি জানতে চায়, বলল : তুমি বড়ই চাপা স্বভাবের।

নির্মল হেসে বলল : অসুস্থ কিনা, কথা কইতে ভয় পাই।

কেন?

কী বলতে কী বলে ফেলব—শেষে হয়তো অসুখটাই বেড়ে যাবে।

মায়া হাসল।

লজ্জা পেয়ে নির্মল বলল : স্বপ্নে আজ মনোজকে দেখছিলুম। সে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বলছে, একা মদ খেতে আর ভাল লাগছে না। আমাকে কাছে পেতে চায়, যেমন আগে ছিলুম।

মায়া নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। আর নির্মলের চোখদুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল, পাথরের চোখের মতন দৃষ্টি-হীন স্থির। তবু মায়া কথা কইল না।

নির্মল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বলল : আমি পাগল হয়ে যাব মায়া, আমি আর সইতে পাচ্ছি না। চোখ বুজলেই আমি একটা কাঠের খুঁটি দেখতে পাই, সাদা আর কালোয় ডোরা-কাটা তার রঙ, একটা বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়িটা মজবুত কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ একটা বিভীষিকা মায়া, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এর কিছুক্ষণ পরেই নির্মলের হাতে হাতকড়া পড়ল।

দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার জন্য দার্জিলিঙ এসেছিলুম। হোটেলের ম্যানেজার তাঁর মোটা খাতায় নাম ঠিকানা লিখেই সন্তুষ্ট হলেন না। নানা অদ্ভুত অহেতুক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। শেষ পর্যন্ত আমার সুটকেশ হোল্ডল ও তার লেবেলগুলো পর্যন্ত পরীক্ষা করে বেয়ারাকে ভিতরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

বিকেলে যখন বের হচ্ছি, ভদ্রলোক নমস্কার করে এগিয়ে এলেন, বললেন : আমাকে তখন নিশ্চয়ই অভদ্র ভাবছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ সব ঠেকে শিখেছি। এই তো সেদিন নির্মলবাবু নামে এক ভালমানুষ ভদ্রলোক এসে এই হোটেলেই উঠেছিলেন। কে জানত, লোকটা খুনের আসামী। যে ঘরে আপনি উঠলেন, সেই ঘর থেকেই তো কাল বিকেলবেলায় গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বলতেই চাইছিলেন, বললেন : মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা কাগজে পড়েননি কি?

পড়েছি বৈকি।

ভদ্রলোক বললেন : যে রাতে খুনটা হয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যে থেকেই নির্মলবাবু অনুপস্থিত। খবর রটেছিল যে, ভদ্রলোক খুনের আগেই দার্জিলিং মেলে চেপে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু আসলে তা আসেনি। এসেছিল প্লেনে পরদিন ভোরবেলায়। খুনটা অবশ্য করব বলে করেনি। মদো মাতালের কারবার, রক্ত দেখে নেশা ছুটে গেল।

প্রশ্ন করলুম : ধরা পড়ল কী করে?

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন : মাতাহারি মশাই, মাতাহারি। বিদেশেই মেয়ে-গোয়েন্দার কথা শুনেছিলুম, এবারে নিজের দেশেই প্রত্যক্ষ করলুম।

বাগানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন : বসুন না, গল্পটা গোড়া থেকেই শুরু করি। ওরে, ও মহাবীর, চা আন, আর কিছু—

উপরের সমস্ত গল্পটা তাঁর কাছেই শোনা। সবটাই বিশ্বাস করতে বললেন। খবরের কাগজে না পড়া পর্যন্ত বলতে পারিনে, কতটা রঙ ফলিয়েছিল।

স্বপ্ন! হ্যাঁ না, স্বপ্ন কেন দেখব!

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

।। চোদ্দ ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর মেরুবলয়ের কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিনগ্রাড অঞ্চলে সূর্যের উদয়াস্ত একটু বিচিত্র। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে ১৯।২০ ঘন্টা দিবালোক থাকে। এখান থেকে বিমান আনাগোনা করে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু লেনিনগ্রাড থেকে 'মার্মানস্ক' হল উত্তরমুখী গতি, বিমান অনেক উচুঁতে উঠলে অনেক সময় মেরুকেন্দ্রের বিচিত্রবর্ণ অরোরার কম্পন চোখে পড়ে। মেঘ আছে দূরে দূরে, কিন্তু আমরা সেই মেঘখণ্ডের বিস্তৃত আকার দেখছিনে, দেখতে পাচ্ছি লম্বা একটি সুতো। শাদা থান কাপড়খানা হাওয়ায় ভাসছে, আমরা দেখছি তার পাড়টুকু! পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের উত্তর ধারে এলে চোখের মণিতে বোধকরি একটা গোলযোগ ঘটে। এই দৃষ্টিবিভ্রম নাকি স্বাভাবিক।

উত্তর মেরুর অনাবিষ্কৃত এবং অগম্যলোকের দিকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকেননি। সেইজন্য লেনিনগ্রাড থেকে উত্তর-পশ্চিমে একটি রেলপথ যেমন গেছে ফিনল্যাণ্ডে, তেমনি পূর্বোত্তরপথে একটি গেছে মেরুবলয় ভেদ করে কারেলিয়ান্ হয়ে তুষারলোক 'কোলা' উপদ্বীপে। এই বৃহৎ তুষারসমাকীর্ণ ভূভাগের প্রধান নগরী হল 'মার্মানস্ক'। এই মার্মানস্ক 'বেরেন্টস' নামক বরফ সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। উত্তর মেরুমহাসাগরের দক্ষিণ ক্রোড়ে কয়েকটি সাগরের উপর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের একচেটিয়া অধিকার। যেমন বেরেন্টস্, হোয়াইট, কারা, লাপটেভ এবং সাইবেরিয় সমুদ্র। এই সকল সমুদ্রগুলি দ্বীপ, উপদ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদিতে ভরা। এই সমস্ত স্থল ও জলভাগে কোটি কোটি বর্গমাইলের মধ্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞান-গবেষণা এক একটি বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক গবেষণাগার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে পৃথিবীর বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এক একটি চমক এক একটি তরঙ্গের মতো ছুটে আসছে। 'ফ্রাঞ্জ জোসেফ' দ্বীপপুঞ্জে, 'নভায়া জেমলিয়া' দ্বীপে, 'সেভারনয়া জেমলিয়ায়', 'ফাদিয়েভ', 'নভয়া শিবিরে' কিংবা যমল, তৈমির, চুকট্‌কা, কামস্কাটটা, বা শাখালিন প্রভৃতি দ্বীপ এবং উপদ্বীপে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বসে বসে শুধু তুষারের হাওয়া খাচ্ছেন না—এটি আজ স্পষ্ট। একশ মেগাটন বোমা কোথায় ফাটানো হচ্ছে, 'স্পুটনিক-লুনিক-ভস্টক' প্রভৃতি কাজাখস্তান থেকে ওড়ানো হচ্ছে কিনা, এটির সন্ধান করা আমার কাজ নয়। কিন্তু আজকের উত্তর মেরুসাগর-লোক আর সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার মতো অনধিগম্য নেই—এটি সুস্পষ্ট। এই ভয়াবহ বরফসমাচ্ছন্ন প্রাণীচেতনাচিহ্ন-হীন মেরুলোকে যে-সোভিয়েট সমাজ এসে বসেছে, তার অতিমানবিক বিজ্ঞান-গবেষণার প্রয়াস মানব ইতিহাসের কোন্ নূতন পরিচ্ছেদটির উদ্বোধন করবে, সেটি অভাবনীয়। আণবিক ও পরমাণবিক বা অম্লজান শক্তির কথাই আমরা শুনেছি। কিন্তু সেই শক্তির চরম পরিণতির কীর্তি ঠিক কেমন এবং কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটি আজ কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। শুধু বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মেরুলোকের সেই তোরণদ্বার হল এই লেনিনগ্রাড। আমেরিকার বিজ্ঞানোন্নয়ন বিগত দেড়শ' বছর ধ'রে যেমন পৃথিবী-বাসীর কাছে এনেছে আনন্দ, সোভিয়েটের বিজ্ঞানোন্নয়ন তেমনি এনেছে কেমন একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক। এই আতঙ্ক বৃহত্তর মানবসংসারের উপর ফেলেছে একটা বিশাল ছায়া। আমেরিকা কখনও যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধে মরেনি! কিন্তু রাশিয়া গিয়েছে বার বার মৃত্যুর মধ্যে। কখনও রক্তে ভেসেছে, কখনও উপোসে মরেছে, কখনও সর্বহারা হয়েছে, কখনও বা দুঃখ-দুর্দশার কঠিন আঘাতে মুখ-থুবড়ে পড়েছে। আপন প্রাণের মধ্যে তার কান্না জমা আছে বহুকালের। সেইজন্য সে যখন শান্তি চায়, নিরস্ত্রীকরণ চায়,—সেটি একান্ত আন্তরিক। কিন্তু যুদ্ধে সে যদি নামতে বাধ্য হয়, তবে সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে হবে শেষ মরণরণ! উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর তুষার সমুদ্র শুধু সেদিন থেকে হয়ত একাকার হয়ে থাকবে! বোধহয় তারই নাম মহা-প্রলয়! সোভিয়েট বিজ্ঞান একদিকে যেমন বসেছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সাধনায়, অন্য-দিকে সেই সাধনার বিঘ্ন ঘটার ভয়ে তেমনি বসেছে সর্বনাশা মারণাস্ত্র রচনায়। সে এখন আত্মরক্ষার সমস্যায় নিরত, আক্রমণের সন্ধানে রত নয়! সমস্ত পূর্ব ইউরোপে সে বেড়াবাঁধার চেষ্টা পেয়েছে আত্মরক্ষার বহিঃসীমাকে নিরাপদ রাখার জন্য,—আমরা যেমন বাড়ির বাইরে বাগানের ওপারে পাঁচিল গেঁথে তুলি! ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে অসন্তুষ্ট হাঙ্গারী ওই পাঁচিল টপ্‌কে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সেই 'নির্বোধ নাবালককে' ধ'রে গলা টিপে থাপ্পড় কসিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছেন! ছেলেটার মনে রাগ থাকলেও এখন শান্ত হয়ে আছে! বাইরের পৃথিবীর ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন মেগাটন বোমা তৈরিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু নিজের ঘরের জন্য সামান্য একটি লিফ্‌ট্ তৈরিতে সে এখনও সিদ্ধহস্ত হয়নি! ভাল একটি আলমারি, ভাল একটি তালাচাবি বা রান্না-ভাঁড়ারের ভাল আসবাবসজ্জা চট করে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের কোথাও চোখে পড়ে না। জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ওদের নেই।

লেনিনগ্রাডে আমরা এক মধ্যবিত্ত ঘরে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম। এই বিশাল নগরের মনোরম পটভূমিতে এবাড়ির চেহারাটা বাইরে থেকে বেমানান। নতুন দিল্লীর রাষ্ট্রপতিভবনের কাছে সেক্রে-টেরিয়াটের প্রাসাদ কিংবা লোক-সভার চিত্তাকর্ষক গোল-প্রাসাদটি মানায়, —কিন্তু তাদের গায়ে-গায়ে বিনয়নগরের ফ্ল্যাটবাড়ি অশোভন! এটি শোভনরুচির প্রশ্ন। কিন্তু সেই রুচি সোভিয়েট ইউ-নিয়নে মার খেয়েছে অনেকবার। এ বাড়িটি তেমনি সুবৃহৎ একটা যেন ইমারতের স্তূপ,—যেমন নিরেট, তেমনি অবকাশ-

বিহীন। বোম্বাই শহরে এককালে 'বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই ধরণের কতকগুলি বৃহৎ ইমারত তৈরি হয়েছিল,—তার একেকটি খোপে একেকটি ঝাড়ুদার-পরিবার। সেগুলো যেন কাজসারা দায়-সারা জনকল্যাণকর্ম, তারা যেন ধনাঢ্য বোম্বাইয়ের উচ্ছিষ্টলাভের জন্য দাসানুদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এখানেও অনেকটা তাই। হয়ত কিছু উন্নত, কিন্তু এরাও যেন পেয়ে গেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় ধনী-শ্রেষ্ঠর উচ্ছিষ্টভাগ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা স্বল্পবিত্ত যে কর্মী, তার ঠাঁই ক্রেমলিন প্রাসাদে কেন হয়নি—এ প্রশ্ন রেখে এসেছি!

একটি ছোট ফ্ল্যাটে এক গৃহস্থের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম। তিনটি মাঝারি ঘর পাশাপাশি। এপাশে দুটি ছোট রান্না-ভাঁড়ার, ওপাশে বাথরুম। সমস্তটাই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে। গৃহনির্মাতা ইঞ্জিনিয়ারের ভাষায় যাকে বলা হয়, ওয়ার্কিং স্পেস, রিলিফ, রিসেপ্‌শন্—সেগুলির পরিমাণ যৎকিঞ্চিৎ। যিনি গৃহস্থের কর্তা, তাঁর স্বাস্থ্য যে পরিমাণ ভাল, মাথায় সেই পরিমাণ টাক। বয়স বছর পঞ্চাশ। অতি অমায়িক এবং হাসিখুশী। তাঁর স্ত্রী অতটা স্বাস্থ্যবতী নন্, কিন্তু মিষ্টভাষিণী। ঘরে একটি মাত্র বছর পনেরো বয়সের ফুটফুটে মেয়ে, একটি তার পিসতুতো ভাই, এবং মেয়েটির বুড়ি দিদিমা। এ'রা জাতিতে রুশ, অর্থাৎ খাঁটি গাওয়া ঘি,—তলার দিকে বনস্পতির ভেজাল নেই! আমি সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হলুম এ'দের অভ্যর্থনার চেহারা দেখে। প্রবাসী নিকটাত্মীয়েরা যেন আপন ঘরে ফিরে এল! আজ তোমরা এসে পৌঁছবে তাই ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি! উনি বাজার করে দিয়েছেন ঠিক সময়, আমি নিজে রান্না করেছি তোমাদের পছন্দমতন। মেয়েকে ইস্কুলে যেতে দিইনি! ওঁর ভাগ্নেটির আবার সামনে এক্জামিন্! মা কোথা গেলে? এসো এদিকে,—দেখোসে কা'রা এসেছে! উনি যে আবার একটু সেকেলে মানুষ, লোক দেখলে আজও একটু আড়ালে সরে যান্। কি আশ্চর্য, বসো তোমরা, সেই কন্দুর থেকে এলে? হাত ধুয়ে একেবারে বসবে? বেশ ত, এসো—আমি হাতে জল দিচ্ছি! ভয় নেই, এখানে গরম জলের পাইপ আছে। আমরা গ্যাসে রান্না করি। কই, আরেকজনকে যে দেখছিনে। যশপাল বুঝি পরে আসছেন? মিস্টার শেখোন, দেখুনত কার্পেটখানা। হ্যাঁ, ওখানা পার্সিয়ান। আপনারা আসবেন আজ, তাই ঘরের দেওয়ালে সব কার্পেট টাঙিয়েছি! আসুন, একেবারে টেবিলে বসি সবাই মিলে। মা, এসো। মিলি, বোস না তুই ও'র পাশে?

অবশ্য মেয়েটির নাম 'মিলি' নয়। কিন্তু অনেকটা এই প্রকার। ভদ্রলোক আমাদের সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বলিষ্ঠ দুই বাহুতে। আমরা তাঁর ঘরের লোক। বললেন, হ্যাঁ, ফ্লাটটা একটু ছোট। ওঘরে থাকেন আমার শাশুড়ী আর মেয়ে, এই ঘরে থাকি আমরা দুজন। আর ওই যে ছোট ঘরটি, ওটিতে আমার ভাগ্নে। চলুন না একদিন আমাদের বাগানবাড়িতে,—থাকবেন দিন দুই আমার 'দাচায়'।

আমি দু'পা এগিয়ে তাঁর শাশুড়ীকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে এলুম এবং সেই লজ্জাশীলা বৃদ্ধাকে বাঁদিকে বসিয়ে তাঁর বিনীত আড়ষ্টতাকে ওরই মধ্যে একটু সহজ করে দেবার চেষ্টা পেলুম। এমন নম্রস্বভাবা বৃদ্ধাও সচরাচর কম চোখে পড়ে। শ্রীমতী লিডিয়া হাসিমুখে বসলেন আমার ডানদিকে। মিলি বিশেষ কুণ্ঠিত লজ্জায় একটু সময়ের জন্য তাঁর পাশে বসে আবার যেন কোথায় গা-ঢাকা দিল। ভারি লাজুক মেয়ে। এটি সব সময়েই লক্ষ্য করে এসেছি, বয়স্ক ব্যক্তিদের ডিনারের টেবলে যখন মদ্যের ব্যবহার চলতে থাকে, তরুণ এবং কিশোর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা আড়ালে আশেপাশে সরে যায়। মদ্য এবং মদ্যপ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রদ্ধা কম, অথচ এ দেশের কঠিন ঠান্ডার মধ্যে দু-তিন মিনিটে শরীরে কিছু উত্তাপ সঞ্চার করার জন্য নাগরিকদের অধিকাংশই অল্পবিস্তর 'ভোদ্‌কা' পান ক'রে থাকেন। এটির প্রভাবে নাকি বাক্যালাপগুলি প্রাণবন্ত হয়। যাঁরা 'ভদ্র-শ্রেণীর' সোভিয়েট নাগরিক, তাঁদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও সিগারেট খান কিনা সন্দেহ। আমার ধারণা, ক্যান্সার রোগের আশঙ্কার থেকে এবম্বিধ সংযমের উৎপত্তি। সুস্থ থাকা এবং সুস্থ রাখার আপ্রাণ আয়োজন এদেশে সর্বত্র। জীবন-বৈরাগ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিভঙ্গ, অসময়ে স্নানাহার, যেমন তেমন খেয়ে পেট ভরানো, পেটে কিল মেরে টাকা জমানো,—এগুলি ওদের কাছে স্বপ্নবৎ। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর খরচ লাগে না, মেয়ের বিয়ের আর্থিক দুর্ভাবনা নেই, ভবিষ্যতের জন্য কোনও প্রকার সংস্থানের কথা ওঠে না, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন্ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, ছেলেমেয়েদের বেকার ব'সে থাকার চিন্তাই নেই! এই সব 'অবশ্যম্ভাবী' সুবিধার ফলে আয় এবং ব্যয়ের প্রণালী সমান হয়ে থাকে। সামান্য অসুখের জন্য কেউ হাসপাতালে গেছে, এবং দিন পনেরো পরে দেহের ওজন বাড়িয়ে হাসিমুখে সে ঘরে ফিরেছে, এমন বহুলোক আমার চোখে পড়ত। এমন কোন কোনও মেয়ে-পুরুষ চোখে পড়েছে যাঁরা বিশেষ বিশেষ অসুখের অছিলায় হাসপাতালের সুখ-সাচ্ছল্যের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আমার ঈষৎ হজমের গোল-যোগের জন্য বার বার আমাকে হাস-পাতালে রাখার জন্য প্রস্তাব এসেছে। অন্যদিকে সেদিন আরেকটি বস্তুর প্রতি আমার চোখ পড়েছিল। ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমরা ফিরছিলুম! পথের পাশে একটি নোটিস বোর্ডে কাগজমারা। তা'তে কর্মীদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে। দেড়শ' ইঞ্জিনিয়ার, একশ' কেরানী, আড়াইশ' লোহাকাটা মিস্ত্রি, পঞ্চাশজন জাহাজের কারিগর ইত্যাদি দরকার। কিন্তু একজনও সেই নোটিস পড়ছে না দেখে আমি প্রশ্ন করলুম, এবং জবাব পেলুম, লেনিনগ্রাডে কেউ বেকার নেই! এমন লক্ষ্য করেছি, মাসে দু'তিনবার ক'রে সোভিয়েটের অনেক লোক চাকরি বদ্‌লে বেড়ায়—যখন যেটা খুশি! একজনে দুটো চাকরি করে, এমন অনেক আছে। চাকরি পড়ে রয়েছে চারদিকে, অথচ মানুষের সংখ্যা কম—সোভিয়েট ইউ-নিয়নে এই সমস্যাটি আসন্ন। চাকরি মানুষকে খুঁজছে! লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা এখন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

স্বামী ও স্ত্রী। এ'রা দুজন একই লোহাগালাই-পিটাইয়ের কারখানায় কাজ করেন। স্বামী পান্ ১৬০০ রুবল, স্ত্রী পান্ ১৩০০। স্ত্রীর চাকরি তাঁর স্বামী অপেক্ষা অল্পকালের, তাই বেতন কিছু কম। বৃদ্ধা পেন্সন্ পান্ ৬০০ রুবল। পেনসনের টাকা তাঁর হাতে এসে পৌঁছয় প্রতি মাসের ১লা তারিখে। কথায় কথায় তাঁর বেঁচে থাকার সার্টিফিকেটের জন্য ওপাড়ার সেই বদমেজাজী গেজেটেড্ অফিসারের কাছে উমেদারি করতে হয় না! পেন্সনের টাকায় একটি মানুষের সর্ব-প্রকার খরচ যাতে চলে, সেই পরিমাণ 'টাকা' দেওয়া হয়। পেন্সনভোগীর মৃত্যু ঘটলে ডাক্তার, হাসপাতাল, শ্মশান এবং পেন্সন বিভাগ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যোগসূত্রবদ্ধ হয়ে যান্। মৃতদেহ শ্মশানে যায় সরকারি ব্যবস্থায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোটারের তালিকা, পরি-

সংখ্যান ও আদমসুমারী সেটি টুকে নেন্। আজকাল সোভিয়েট দেশে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বেশি। সত্তর বছরের এদিকে কেউ মারা গেলে সেটি অকাল-মৃত্যু! অকালমৃত্যুর সংখ্যা বড়ই কম। আমি দিন দুই মস্কোর শ্মশানে গিয়েছি, একটির বেশি শবদেহ দেখিনি। ওদের শ্মশানটি শহরের মাঝখানে। পাঁচিলঘেরা যেন মস্ত আপিসবাড়ি। মড়ার কাঁথা কাড়াকাড়ির জন্য কোথাও 'মুর্দোফরাস' বসে নেই। শবদাহ হয় গ্যাস-চেম্বারে বা ইলেকট্রিকে। বিধবা কেউ সেখানে বসে কপাল চাপড়ে কাঁদে না! আমি বহু বিধবা দেখেছি যাঁরা সংযতপ্রকৃতি এবং স্বভাবশান্ত, বয়স তাঁদের কম। কিন্তু তাঁরা আর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবেন না। বহু পুরুষ এবং নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তাঁরা আপন আপন যৌনজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রয়েছেন। সংখ্যাতীত কুমারী মেয়ে রয়েছে, বয়স পেরিয়ে গেছে পঁচিশ-তিরিশ-পঁয়ত্রিশ,—তাঁদের বিবাহ হয়নি। যৌন-চরিত্রের স্খলন বহু আছে বহু মেয়ে-পুরুষের জীবনে, এবং এগুলি জানবার জন্য আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু এটি স্পষ্ট ক'রে দেখেছি, স্খলিত-চরিত্র মেয়ে বা পুরুষ 'রক্ষণশীল' সোভিয়েট সমাজে অতিশয় অনাদৃত। কেউ তাদের ছায়া মাড়াতে চায় না। ওদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হল নিরাপদ সচ্ছল পারিবারিক জীবন। অসচ্চরিত্র বা লম্পট মেয়ে বা পুরুষ যে 'অভিশপ্ত' এবং 'একঘরে' হয়ে থাকে—সোভিয়েট দেশে না এলে আমি বিশ্বাস করতুম না! মেয়েদের পক্ষে বেশ্যা-বৃত্তি এখানে শুধু আইনের দ্বারাই নিষিদ্ধ নয়, স্খলিতচরিত্রা নারী এদেশে অতিশয় ঘৃণ্য, এবং তার পক্ষে সামাজিক জীবন বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। মেয়েদের পক্ষে দুটি গালাগালি সোভিয়েট ইউনিয়নে মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা সে-মেয়ে অপমানিত বোধ করে, যদি কেউ তাকে বলে মিথ্যা-বাদী বা বেশ্যা! মস্কোর সরকারী মহলের জনৈক উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারী একটি রুশ মেয়েকে কোনও একটি কটূক্তি করার ফলে তাঁর কী দশা হয়েছিল সেটি আড়াল থেকে শুনেছিলুম। দোভাষীর সাহায্যে সে মেয়েটিকে যখন প্রশ্ন করলুম, তোমার এত বেশি ক্রুদ্ধ উত্তেজনার কারণ কি?—মেয়েটি সর্পিনীর মতো রুদ্ধ আক্রোশে জবাব দিল, লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, এমন পাষণ্ড!—আমি যখন বললুম, কিন্তু উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি! ও'র মুখের ওপর এমন—

মেয়েটি তাচ্ছল্যভরে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি একজন সোভিয়েট নাগরিক! অপমান বরদাস্ত করিনে!

তার দর্পিত পদক্ষেপের দিকে চেয়ে রইলুম। মেয়েটি রেশমের কারখানায় কাজ করে।

আহারাদির আয়োজনে কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। যেখানেই ভোজের আমন্ত্রণ, সেখানেই দুই প্রস্ত খাওয়া। আইস-ক্রিম এক প্রকার সর্বত্রই। আহারাদি সমাপ্ত হবার পর আসে বিস্কুট, চকোলেট, বাদাম, আপেল, কফি ইত্যাদি। ওরই এক ফাঁকে বৃদ্ধার বয়সটি জানলুম, চুয়াত্তর! প্রশ্ন করলুম, যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?—এবার তিনি সহজ কণ্ঠে বললেন, আর কোথায় যাব, এই আমার দেশ!

আপনার স্বামী কতদিন মারা গেছেন?

বৃদ্ধা একটু বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, লেনিনগ্রাডের যুদ্ধেই তিনি মারা যান্।

এবার আমি শ্রীমতী লিডিয়াকে অনুরোধ করলুম, দোভাষণটি নির্ভুল হলে ভারি খুশী হব!

ওধারে শ্রীমতী নাটাশার দলে আহারাদির মধ্যে আমোদ-আহ্লাদের হুজুগ চলছিল। এধারে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে চাপা ক্রোধে ধমক দিলেন, আপনার সন্দেহবাতিক রাখুন। আমি সোভিয়েট মেয়ে! নিন্, ও'কে যা খুশি জিজ্ঞেসা করুন! সব কথায় আপনার খোঁচা!

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, ওই মেয়েটি ছাড়া আমার আর সব ছেলেমেয়ে যুদ্ধের সময় মারা গেছে। আমার স্বামী মৃত্যু পর্যন্ত খেতে পাননি! তিরিশ মাস আমাদের অন্ন জোটেনি! জার্মানরা আমাদের ঘিরেছিল!

বললুম, তিরিশ মাস কেউ না খেয়ে থাকতে পারে না। আপনারা কি করতেন?

বৃদ্ধা তাঁর নম্র দৃষ্টিতে লিডিয়ার দিকে তাকিয়ে কি যেন মৃদুস্বরে বললেন। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, আপনি এসব শুনতে চান্, কিন্তু উনি সেই ভয়ানক দিনের কথা বলতে গিয়ে হয়ত কেঁদেই ফেলবেন। ও'র স্বামীকে উনি কোনমতেই বাঁচাতে পারেননি!

বৃদ্ধা বললেন, তিরিশ মাস অবরোধের প্রথম কয়েকদিন কোনরকমে চালানো গিয়েছিল। ঘরে কেউ খাবার জিনিস পুঁজি ক'রে রাখে না। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের স্বভাবও যায় বদলে। বোমা যত পড়ে, লোক তত মরে, মানুষও তত জন্তু বনে যায়। যারা পারল তারা বাজার থেকে সব খাবার জিনিস কিনে ঘরে জমালো। কিন্তু সে আর কদিন? তারপর আরম্ভ হল এক বেলা পেট ভরানো! তারপর ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে খাইয়ে নিজেদের না খাওয়া তারপর থেকে ভেঙে গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক! যে যেমন পায় খায় শুধু প্রাণধারণের জন্য যুদ্ধ! তখন জার্মান বোমা মাথায় পড়লে বোধ হয় দুঃখ পেতুম না। আমরা সুবিধে পেলেই হামাগুড়ি দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তুম—

হামাগ্নড়ি? মানে?

দাঁড়াতে পারতুম না যে! অমনি ক'রে যেতুম কোথাও যদি ঘাস দেখতে পেতুম! আমরা একা নই,—দলে দলে, যে যেমন পারে। না খেয়ে মরে গেল একে একে, কিন্তু কান্না আর আসে না চোখে! ঘরে কোথাও একটি কাগজের টুকরো রইল না, সব পেটে গেল! তারপর সবাই কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর—এসব ধরতে লাগল কেন, বুঝতেই পারছেন।

কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধা চুপ ক'রে গেলেন। ফিরে দেখি লিডিয়ার হাতে রুমাল। এবার তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, আমি আর অনুবাদ করতে পারব না, ক্ষমা করুন।

অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধা পুনরায় বললেন, বোধ হয় এই সময়টায় আমার স্বামীর অন্তিম এসে উপস্থিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় তখন উপবাসী পাগলের দল মরা জন্তুর পচা হাড়-চামড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। খেতে না পেলে মানুষ কী না করে? হাজার হাজার ছোট ছেলেমেয়ে মরছে যেখানে সেখানে—কিন্তু কেউ তাদের ফেলবার নেই। একটা বাড়িতে চার হাজার শিশুকে রেখে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছিল,—একটা বোমায় সেই বাড়ি ধূলিসাৎ হয়।

প্রশ্ন করলুম, ছেলেমেয়েরা?

বৃদ্ধা বললেন, না, একটিও বাঁচেনি!

আপনার স্বামীর কি অবস্থা ঘটল?

তখন শীতকাল, বরফে সব ডোবা! —বৃদ্ধা বললেন, ও'র মাথার বোধ হয় একটু দোষ হয়েছিল! আমরা দুজনেই আর উঠতে পারতুম না। উনি মাঝে মাঝে এক পাটি জুতোর চামড়া চিবোবার চেষ্টা করতেন। জুতো অনেকেই খেয়ে ফেলত! আমাকে উনি নাড়া দিয়ে ডেকে বললেন, শুনছি গভর্ণমেণ্ট খাবার এনে বিলি করছে! তুমি একটু জল আনতে পার, গলাটা আগে থেকে ভিজিয়ে রাখি? উনি খাবারের স্বপ্ন দেখছিলেন এ আমি জানতুম, কিন্তু ও'র তেষ্টাটুকু সত্যি ছিল!

আমি তখন আর হামাগুড়ি দিতে পারতুম না। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হাঁটতুম।—বৃদ্ধা বললেন, যেমন সরীসৃপেরা এগোয়।

আমি লিডিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। তিনি ভিজা চোখে বললেন, "yes, it was so, moving on the belly . . . . . . like a reptile!" সাপ যেমন এগোয়! কিন্তু মনে রাখবেন, উনি একা নন্... শত শত ...

বৃদ্ধা বললেন, দাঁতে একটা বাটি কামড়ে ধ'রে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে—হ্যাঁ, শুয়ে শুয়েই নামলুম নেভা নদীতে! ভাবলুম ও'কে না দিয়ে আমি জল খাব না! কিন্তু জলটুকু আনতে আমার একটু দেরিই হয়েছিল! এসে দেখি উনি বেঁচে নেই!......মানুষ খেতে পেলে কান্নার শক্তিও পায়! সেদিন আমি কাঁদতে পারিনি! বরং স্বস্তি পেয়েছিলুম!

এতক্ষণ পরে বৃদ্ধার চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল গড়িয়ে এল। শ্রীমতী লিডিয়ার ঘন রক্তিম এবং আবেগপ্রবণ চোখ দুটোর চেহারাও আগে আমার জানা ছিল না।

আহারাদির মাঝপথে সেদিন আসন ছেড়ে উঠে শ্রীমতী নাটাশা এবং ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী সকলকে আনন্দ দেবার জন্য মনোরম ভঙ্গীতে যখন নৃত্য আরম্ভ করলেন, অধ্যাপক শেখোন তখন মহারঙ্গে বিশেষ ভঙ্গীতে করতালি দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার চোখ দুটো ঘুরছিল এই ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে। চারিদিকে সুন্দর ছবি, কারপেট ও মূল্যবান সব গৃহসজ্জা। এ'দের অবস্থা ভাল। শীঘ্রই একখানা গাড়ি কিনতে পারেন। এ'দের ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে রেডিয়ো, একটি টেলিভিশন, টেলিফোন, গ্যাস, ইলেকট্রিক এবং তিনটি ঘরের যাবতীয় কাঠের আসবাবসজ্জা,—সমস্তসমেত এই ফ্ল্যাটের ভাড়া মোট ৯৭ রুবল পড়ে।

প্রশ্ন করলুম, রেডিয়ো-টেলিভিশন দুটি কি ভাড়া করা?

না, ও দুটি আমাদের কেনা। রেডিয়োর দাম খুব সামান্য। টেলিভিশন যন্ত্রটি প্রায় আড়াই হাজার রুবল পড়ে।

আপনাদের সংসার-খরচ কত?

বউটি হেসেই অস্থির। শ্রীমতী লিডিয়া আমার অভব্য প্রশ্নগুলির জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। আমাকে কথায়-কথায় তাঁর শাসন শুনতে হয়। এবার তিনি সত্যই চটে গেলেন। তাঁর ধারণা, শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের মুখের ওপর এ-সব প্রশ্ন করা সংস্কৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। মুখে শুধু বললেন, "You're very obstinate!"

বউটি অতি ভদ্র। হাসিমুখে বললেন, কি জানি, আমাদের খরচ বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে যায়! ওই ধরুন না, মাথাপিছু গড়পড়তা দৈনিক ১০ রুবল ক'রে পড়ে। তবে কি জানেন, সবাই একসঙ্গে থাকলে একটু সুরাহাও হয়। আমার মা 'যুদ্ধের পেনসন' পান মাসে ৬০০ রুবল। উনি আসছে এপ্রিল মাসে নিজের জন্য একটি ফ্ল্যাট পাবেন। তার ভাড়া সবসুদ্ধ দিতে হবে ১০।১২ রুবল।

আপনাদের ঝি-চাকর আছে?

হ্যাঁ, ঠিকে ঝি। তার মাইনে দেড়শ' রুবল আর জলখাবার। ঘণ্টা দুই কাজ ক'রে চলে যায়। যখন কামাই করে, তখন অন্য লোক দেয়।

আপনারা টাকা জমান?

হ্যাঁ,—সবাই ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। সুদও পাই।—বউটি হাসলেন।

এবার আমি সাহস ক'রে বললুম, আপনার একটি চোখে ক্ষত দেখছি কেন? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন রান্নাবান্না নিয়ে?

সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল এটিকে পরিহাস মনে করে। শ্রীমতী লিডিয়া আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, "Ah, terrible! Terrible man you are!"

নাটাশা বললেন, ও'র কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। উনি ত' সন্দেহ করতেই পারেন। অন্যায় কিসের?

চারিদিকের হাস্যোল্লাসের মাঝখানে লিডিয়া বললেন, না, এ ভয়ানক অন্যায়। এ-সব কথা ভীষণ আপত্তিজনক। উনি আমাদের বাঁদর বানাতে চান! মনে রাখবেন, আমরা সোভিয়েট নাগরিক। আমরা হয়ত ঝগড়া করি বাড়ির মধ্যে কখনো কখনো, কিন্তু খামচা-খামচি করিনে!

শান্তভাবে প্রশ্ন করলুম, আপনাদের দেশে কি বাঁদর আছে? কই, দেখিনি ত?

গর্বিতা ও তেজোদ্দীপ্তা শ্রীমতী লিডিয়া এবার উঠে দাঁড়িয়ে আপন দেশের বনজঙ্গল স্মরণ ক'রে সদম্ভে সত্যভাষণ করলেন, "yes, there are!"

সবাই আবার কলরোলে হেসে উঠল। অতঃপর হৈ-চৈ থামবার পর বউটি বললেন, আজ সকালে কারখানায় একটু অন্যমনস্ক ছিলুম। হঠাৎ লোহা-

গালাইয়ের একটা ফিনকি ছিটকে চোখে লাগে। ডাক্তার এবং ওষুধ আমাদের হাতের কাছেই থাকে।

সেদিন ফিরবার পথে আমাকে একটু আড়ালে পেয়ে শ্রীমতী লিডিয়া খোঁটা দিয়ে বললেন, terrible person! I can't imagine. আপনার সকল সন্দেহ ঘুচিয়ে তবে আমি ছাড়ব!

নাটাশার কান খাড়া থাকে লিডিয়ার দিকে। নাটাশা সহাস্যে আমাকে বললেন, এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছেন আপনি! সাবধান, লিডিয়া আপনাকে না কমিউনিস্ট বানিয়ে ছাড়ে!

শ্রীমতী লিডিয়ার মনে এবম্প্রকার কোনও দূরভিসন্ধি নেই বলেই বোধ হয় তিনি আবার দম্ভে ফেটে উঠলেন। জোর দিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "No, n-never! He belongs to a capitalist country! We'll co-exist together!'

আজ রাত্রেই আমরা লেনিনগ্রাড থেকে চলে যাব।

সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ইংরেজপ্রমুখ কয়েকটি নৌশক্তির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে এইটি স্থির হয়েছিল, সোভিয়েট রাষ্ট্র যেন কোনওকালে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য করার সুবিধা না পায়। সেই কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাল্টিক সমুদ্রের পথ এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বসফোরাস' ও দার্দানেলিস প্রণালী দুটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ছিল। বাল্টিক সাগরের দায়িত্ব নিয়েছিল ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং তিনটি বাল্টিক রাজ্য—এসটোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া। এদিকে তুরস্কের সাহায্যে বসফোরাস ও দার্দানেলিসের পথও ইংরেজ কর্তৃক বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। সুদূর প্রাচ্যের সমুদ্র প্রশাসন করছিল জাপান এবং ইংরেজ। সেকালের মানচিত্র খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ জোড়া ইংরেজের 'লাইফ-লাইন' অর্থাৎ প্রাণসূত্র। সেই প্রাণসূত্র-পথের কয়েকটি নাম শুধু এখানে উল্লেখ ক'রে রাখি। যেমন, জিব্রাল্টার, মালটা, সুয়েজ, এডেন, বাহেরিন, করাচী, বোম্বাই, কলম্বো, কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং ও সাংহাই। এগুলি সম্পূর্ণ তার নিজের সম্পত্তি—এগুলি তার প্রাণ! আজ এদের চার-পাঁচটি ছাড়া আর সব বেহাত হয়ে গেছে। সে যাই হোক, এককালে তিনটি বাল্টিক রাজ্য, অর্থাৎ এসটোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এরা ছিল জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে। বিপ্লবের পর এরা রুশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'স্বাধীন' জীবনযাপন করে। এরা কতকটা মিশ্রিতবর্ণ, কিন্তু অধিকাংশ রুশ। বিগত বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হিটলার ও স্টালিনের মধ্যে যে 'ইতিহাস-কুখ্যাত এবং অদূরদর্শী' অনাক্রমণ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তার একমাত্র 'শুভ' ফল হল এই, সেই চুক্তির অবকাশের মধ্যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে একটি 'রেফারেণ্ডামের' সাহায্যে তিনটি বাল্টিক রাজ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই 'রেফারেণ্ডামের' চেহারাটি আসামের অন্তর্গত 'সিলেটের রেফারেণ্ডামের' মতো অসাধু এবং মুখ্যমন্ত্রী বরদোলাই-কৃত অদূরদর্শিতার মতো চেহারা নিয়েছিল কিনা আমি জানিনে। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য এবং বিশেষ কয়েকজন নেতার স্বার্থপরতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যেমন মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়া নামক জেলাগুলি আসতে পারেনি,—তেমনি ঘটতে দেওয়া হয়নি সোভিয়েট ইউনিয়নে! সেখানে যদি কোনও প্রশাসনিক কারচুপি করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটি স্বীকার্য। কেন না, ঘরের লোক ঘরেই ফিরেছে! এই 'রেফারেণ্ডাম' হিটলারের উন্মত্ত ক্রোধের অন্যতম কারণ।

সে যাই হোক, এই তিনটি বাল্টিক রাজ্য সোভিয়েট ইউনিয়নে আসবার পর থেকে তাঁরা বালটিক সমুদ্র, ডেনমার্ক পেরিয়ে উত্তর সমুদ্র, এবং ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উপর অধিকারলাভ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের এলোমেলো ঘরকন্না গুছিয়ে তোলবার আগে জলপথ নিয়ে তেমন বিবাদ-বিতর্ক করেননি। আত্মশক্তি আহরণ করা ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। হিটলারের পরাজয়ের পর বার্লিন সম্মেলনের বিশেষ চুক্তির ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন আরেকটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মালিক হল। সেটির নাম অধুনা কালিনিনগ্রাড, প্রাক্তন রুদেনিরা—এই অঞ্চলটি পোল্যাণ্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই চারটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত অতি নিরাপদ ও নিরুপিতস্থিত বন্দরগুলি পাওয়ার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র ইদানীং নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। এই বন্দরপ্রদেশগুলি শীতকালে তুষার-সমাকীর্ণ হয় না এবং এরা শীতাতপের অতিশয়তাবর্জিত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা চলে, আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন ইউরোপ ও এশিয়ার ১৮।১৯টি দেশের রাষ্ট্রসীমানার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এতকাল ধরে শুনে এসেছি, গিলগিট অঞ্চলে ভারতের সঙ্গে তার সীমানা হল প্রায় দুশ' মাইলের মতো। এটি এখন তাজিকিস্তান তথা দক্ষিণ পামীরের অন্তর্গত। ভারতের এই অনধ্যুষিত অঞ্চলটি এখন পাকিস্তানের জবরদখলের মধ্যে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের কোনও এক স্থলে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান গলা উঁচু ক'রে চীনকে ইশারায় কাছে ডাকছেন! চীন একটু ঘাড় তুলে দেখছেন, পাকিস্তানের বাঁ-হাতে লুকানো আমেরিকান অস্ত্রে মরচে ধরেছে কিনা! সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি বইতে দেখছি, ভারতের সঙ্গে তা'র সীমানা কোথাও নেই।

বালটিক রাষ্ট্র তিনটির প্রধান নগরগুলি হল তালিন, রিগা ও ভিলনিয়াস। এ তিনটি রাষ্ট্রে মানুষের খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম বলেই এর জনবিরলতা প্রথম চোখে পড়ে। অনন্ত আগাছার প্রান্তর, বালুর ঢিবি, মাঝে মাঝে ওক, বার্চ ও পাইনের অরণ্য, প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্যভূমি, অন্তহীন নাবাল জলাভূমি এবং গোচারণের অবারিত ক্ষেত্র। এই তিনটি রাজ্যে পশুপালনের অপরিসীম সুবিধা থাকার জন্য এখানে দুগ্ধ, মাখন, মাংস এবং অন্যান্য সামগ্রীসহ নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব অঞ্চলে নানা স্থানে মেসিনের জন্য নানাবিধ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন এরা উন্নতিশীল রাষ্ট্র।

লিথুয়ানিয়া কিন্তু অন্য দুটি রাজ্যের ব্যতিক্রম। এখানে অপেক্ষাকৃত খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য। এখানে এবং বিশেষ ক'রে লাটভিয়ায় মাছ ধরার বৃহৎ কর্মব্যস্ততা দেখতে পাওয়া যায়। এ তিনটি রাজ্যের জনসাধারণ পরস্পর মিশ্রিত। এসটনিয়ার অধিবাসীগণকে বলা হয় 'এস্থ' এবং লাটভিয়ানকে 'লেটস'—কিন্তু আসলে এরা পোল, ইহুদি, রুশ—ইত্যাদি মেলানো। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও রিপাবলিকে জাতি বা জাতীয়তা বা জাতি-স্বাতন্ত্র্যের উপর কোনও জোর দেওয়া হয় না। সব নদী যেমন সাগরে মিলে গিয়ে জলের স্বাদ হয় লোনা, তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সব জাতি

মিলেছে এক জনসমুদ্রে,—যেটার স্বাদ হল কমিউনিজম! পৃথিবীর কোনও দেশ এমন 'একঘরে' নয়, এমনভাবে কোনও রাষ্ট্রের ভাগ্যে এমন সর্বব্যাপী 'জাতি-চ্যুতি' ঘটেনি! সোভিয়েট শিশুর সামনে ইতিহাসের যে পাঠ্যতালিকাটি ধরা হয়, সেটি কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দির সোভিয়েট ইতিহাস! লেনিনের অভ্যুত্থান হল তার প্রথম পাঠ। রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সোভিয়েট শিশুর কাছে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ওটা যাদের দরকার তারা গিয়ে বসুক লেনিন লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক গবেষণাগারে। সোভিয়েট ছাত্রর কাছে কমিউনিস্ট সমাজের জন্ম-বৃত্তান্তই বড়, পুরনো কালের দিকে তা'র চোখ না পড়লেও চলবে। ইতিহাসের ছাত্র ছাত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নে কম। আমি নিজে ওদেশে স্লাভি-তাতারের আদি ইতিহাস খুঁজে পাইনি। আধুনিক, বর্ত-মান, নূতন এবং বৈপ্লবিক—এই কয়েকটি শব্দের অতিশয় ব্যবহার অনেক সময়ে মনকে পীড়িত করে। বাপের পরিচয় নিতে গেলে ছেলের কীর্তি সর্বাগ্রে শুনতে হবে, এটি যেন কেমন-কেমন! ওরা জন্মবৃত্তান্ত অপেক্ষা কর্মবৃত্তান্তের বেশি অনুরক্ত, জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান শুনতে চায় বেশি, এবং জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণের মনীষা অপেক্ষা যৌবনের জড়-কীর্তি ওদের কাছে বেশি প্রিয়। ওরা কেবল 'কাঁচা মাটির' তাল চায়, তাতে ছাঁচে পুতুলগড়ার সুবিধা! বোরিস পাস্টেরনাককে ওরা বরদাস্ত করল না, কিন্তু তরুণ অস্ট্রভস্কিকে মাথায় তুলে নাচল! 'ডাঃ জিভাগো' ছাপা হল না, কিন্তু 'হাউ দি স্টীল ওয়াজ টেম্পার্ড' এক কোটি কুড়ি লাখ বিক্রি হয়ে গেল!

উরল পর্বতের পশ্চিম পার হল হোয়াইট রাশিয়া এবং তার পূর্বদিক সাইবেরিয়া। উরলের দক্ষিণ ক্রোড়ভূমিতে যেখানে হোয়াইট রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার সংযোগ-স্থল সেটি আমাদের ভ্রমণকালে কিছু দেখে এসেছি। উরল পর্বতশ্রেণী যথেষ্ট উঁচু নয়। একদিকে যেমন এটি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রাচীরের কাজ ক'রে এসেছে, তেমনি এই পর্বতশ্রেণীর গর্ভস্থিত অন্তহীন বিভিন্ন খনিজ সম্পদ চিরদিন ধ'রে রাশিয়াকে বিত্তশালী করে রেখেছে। উরলের পশ্চিমে যে অংশটা হোয়াইট রাশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল—সেখানকার হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। উরলের পূর্বপারে যেমন 'অব'-নদী চলে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে মেরুসাগরের দিকে, তেমনি উরলের পশ্চিম পর্বতের থেকে উদ্ভূত হয়ে 'পেচোরা' নামক এক বিশাল নদী অগণিত শাখা-প্রশাখা নিয়ে আদি-অন্ত-হীন মহারণ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ওই একই উত্তর মেরু-সাগরে। এই বিরাট ভূভাগের নিবিড় অরণ্যভূমিতে কোনও প্রকার চাষ-আবাদ নেই, এবং 'তুন্দ্রা বলয়ের' নীচে এটি আগাগোড়া অধিকাংশকাল তুষারাকীর্ণ থাকে। সম্রাটের আমলে এই ভূভাগে স্বভাব-দুর্বৃত্ত এবং রাজনীতিক অপরাধীদেরকে সাইবেরিয়ার বদলে পাঠানো হতো। এই অঞ্চলে 'পেচোরা' নদীর একটি শাখার নাম 'উস্সা'। এটি পার্বত্য এবং বন্য নদী। এই বৃহৎ বন্যভূমি চিরদিন ব্যাঘ্র, শ্বেত-ভল্লুক ও অন্যান্য অতি হিংস্র জানোয়ারের অবাধ লীলাক্ষেত্র এবং শিকারীগণের পক্ষে দুঃসাহসিক অভিযানভূমি। 'উস্সা' নদীর আশেপাশে যে ব্যাঘ্রগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের নাম 'উস্সারি' বা 'উস্সুরি'। কিছুকাল পূর্বে মিঃ খ্রুশ্চভ এই নামাঙ্কিত দুটি বাঘ উপহার দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে। শ্রীযুক্ত নেহরু খ্রুশ্চভকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ভারতীয় হস্তী। ব্যাঘ্র হল হিংসার প্রতীক, হাতী ঐশ্বর্য ও সম্পদের বাহন। আমরা অনেককেই হস্তীদান করি এই শুভেচ্ছা নিয়ে—"তোমাদের দেশ সম্পদে পূর্ণ থাক্!"

অপর জাতির সম্পদের চেহারা দেখে যতখানি খুশী হওয়া উচিত আমি তত-খানিই হচ্ছি। কিন্তু সেই সম্পদের বর্ণনা আমার ডায়েরীতে নেই। আমি রিপোর্টার নই। এ রচনা সোভিয়েট সম্পদের পরি-চয়পত্র নয়। আমি ভারতীয় কোনও রাজনীতিক দলের কেউ নই, কিন্তু বামে-দক্ষিণে বহু ব্যক্তি আমার প্রীতিভাজন। ভারতীয় কংগ্রেসের ছিটে-ফোঁটা প্রসাদ পাবার লোভে যাঁরা পোষা মেনি-বিড়ালের মতো পায়ে-পায়ে ঘোরেন, আমি তাঁদের কেউ নই। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের সর্ব-মানবিক লোক-কল্যাণের আদর্শে আমি চিরদিন অনুপ্রাণিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণকালে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি, বিনা রক্তপাতে, বিনা বিপ্লবে, বিনা হিংসা ও হানাহানিতে বিগত পনেরো বৎসর কালের মধ্যে ভারতে যে বিপুল পরিমাণ সংগঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পৃথিবীর আধুনিক ইতি-হাসে এক পশ্চিম জার্মানী ছাড়া সেটি অন্যত্র দুর্লভ! জনৈক রুশ বন্ধুর সঙ্গে মস্কোতে এই নিয়ে আলাপ চলছিল। ভদ্রলোক বললেন, "ভেবে দেখুন, আমরা সময় পেলুম কোথায়? ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহিঃশত্রু, অন্ত-র্দ্বন্দ্ব, গৃহবিরোধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, এবং জাতীয় পরিকল্পনার অভাব! ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর একটু অবকাশ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত স্বদেশরক্ষার যুদ্ধে আমরা সর্ব-স্বান্ত। যা গড়েছিলুম, তার অধিকাংশ চুরমার হয়ে গেল! ৮ কোটি লোক হিটলারের হাতে বন্দী ছিল তিন বছর। তার পর থেকে আবার ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেওয়া চলছে। আমাদের এই 'মহাদেশ' গ'ড়ে তোলবার জন্য মোট ২২ বছর নিশ্চিন্ত সময় হাতে পেয়েছি!"

ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, "এমন ইতিহাস কোথাও শুনেছেন, আমরা যখন আমাদের রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করার সময় পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছিলুম, তখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর চোদ্দটি রাষ্ট্র গায়ের জোরে আমাদের ঘরে ঢুকে সব তছনছ করছিল? এমন দেশ আজ পৃথিবীতে কোথাও আছে শুনেছেন, যে-দেশ মোট আঠারো-উনিশটি পররাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন? শুধু ভাবুন ত, আমাদের রাষ্ট্রসীমানারক্ষার কী বৃহৎ দায়িত্ব? আজ আমাদের সর্বা-পেক্ষা প্রধান দুটি কাজ সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথমটি হল, কায়মনোবাক্যে সর্বান্তঃ-করণে একাগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা চাই অনাহত শান্তি বিরাজ করুক সমস্ত পৃথিবীতে! সেই কারণে শান্তিপ্রচারের সর্ববৃহৎ প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি আমাদের দেশে! দ্বিতীয়টি হল, আমরা আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং প্রতিভা প্রয়োগ ক'রে এমন মারণাস্ত্র প্রস্তুত করতে চাই যেটির ধ্বংসশক্তি মানব ইতিহাসের কোনও পর্যায়ে শোনা যায়নি এবং যাবেও না।"

আপনারা কি ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ-গুলিকে ওই মারণাস্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চান্?

"একেবারেই না!"—ভদ্রলোক বললেন, "আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে এবার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই! আপনাকে বলে রাখি, কখনও আমরা যুদ্ধ বাধাব না,—যুদ্ধ আমাদের কাছে

সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য, সর্বাপেক্ষা আতঙ্ক-জনক, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শত্রু,—কিন্তু সেই যুদ্ধ আবার এসে যদি আমাদের টুঁটি টিপে ধরতে চায়, আমরা এমন সর্বনাশা আঘাত হানব যার জন্য বিংশ শতকের মানবসভ্যতা ভয়ে কেঁপে উঠবে! সেই হবে আমাদের আত্মরক্ষার সর্বশেষ সংগ্রাম!"

তারপর?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, "তার-পর? তারপর দেখবেন, আমাদের এই সোস্যালিস্ট গভর্ণমেন্টের অনুকরণে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে নতুন মানব-বংশের অভ্যুত্থান! প্রত্যেকটি তাসের ঘর ভেঙে পড়েছে সর্বত্র! তার বদলে একটির পর একটি সোস্যালিস্ট সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে!"

পুরনো উপকথার সেই দানবের সামনে ক্ষুদ্র 'হারকিউলিসের' মতো আমি মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিলুম। এবার একটু সাহস ক'রে প্রশ্ন করলুম, আপনি কি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী—এ'দেরকে ধূলিসাৎ করার নক্সা আঁকছেন?

মিসেস রুজভেল্ট সম্প্রতি সোভিয়েট দেশ পরিভ্রমণ ক'রে গিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, রুশেরা নাকি প্রাণ খুলে হাসে না! ওরা কেমন যেন একটু গোমড়ামুখো! কিন্তু আমার প্রশ্নে এই ইংরেজি-জানা রুশ ভদ্রলোক স্বচ্ছ সুন্দর হাসি হাসলেন। বললেন, "আপনি আমাদের দেশের যে কোনও গ্রামে ও শহরে যে-কোনও ব্যক্তির কাছে যান, যে-কোনও ঘরে গিয়ে ঢুকে এই প্রশ্নটি করুন—দেখবেন, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মান জাতির প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আমাদের! যাদের নাম করলেন তাঁরা কেউ আমাদের যন্ত্রগুরু, কেউ মন্ত্রগুরু, কেউ শিক্ষা-গুরু, কেউ বা কর্মগুরু!"

আমি এবার যেন ভয়ে ভয়ে কেঁদে উঠলুম! বললুম, ও'দের নিকেশ করবার পর আমাদের রাখবেন ত?

ভদ্রলোক আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে দুই বলিষ্ঠ বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা চিরদিন আপনাদের বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী থাকতে চাই।'

আমি বললুম, তবে কেন আপনাদের পাড়ার লোক আমাদের হিমালয়ের উপর উঠে ছুঁচোবাজি খেলে ভয় দেখাচ্ছে? আমাদের ঘর-দোরে জামা-কাপড়ে যদি আগুন লেগে যায়? কিছু বলতে পারেন না আপনারা?

আমার করুণ কণ্ঠ শুনে ভদ্রলোক মনে করলেন, আমি বুঝি ভয়ানক পরি-হাস করছি! তিনি ওই কঠিন আলি-ঙ্গনের মধ্যেই আবার মধুর হাসি হেসে উঠলেন।

আমি লোহভীম নই! কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সত্যই অন্ধ ছিলেন!

উত্তর মেরুবলয়ের মধ্যে পেচোরার তুষার নদী ও জনশূন্য প্রান্তরের পশ্চিমে দেখতে পাওয়া যায় 'মেজেন' ও 'দিভিনা' নদীর দিগন্তজোড়া সমভূমি। এই দুটি বৃহৎ নদী উত্তরে প্রবাহিত হয়ে শ্বেতসাগরে পড়েছে। 'দিভিনা'র মোহানায় রাশিয়ার প্রসিদ্ধ 'কাষ্ঠ-শহর আর্কাঞ্জেলস্ক'। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের প্রধান কাজ হল, রাশিয়ার সুবৃহৎ বন-সম্পদকে কাজে লাগানো। শেগুন, ওক, বার্চ ইত্যাদি কাঠের বড় বড় কল-কারখানা এই মেরুনগরকে চিরদিন বিত্তশালী ক'রে রেখেছে। সম্প্রতি 'আর্কাঞ্জেল' নগরী হয়ে উঠেছে মেরুলোকের একটি প্রধান তোরণদ্বার এবং মেরু-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু সোভিয়েট দেশের অরণ্য-ভূমি ওখানেই শেষ হয়নি। পূর্বপথ চলে গিয়েছে উরল পেরিয়ে 'তুন্দ্রা ও তাইগা' রেখা নিয়ে সুদূরে সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্যে। পশ্চিমে সেই বিশাল অরণ্য-লোক 'কোলা', 'কারেলিয়ান' ও লেনিন-গ্রাড হয়ে বাল্টিক ইউনিয়ন এবং বেলো-রাশিয়া পেরিয়ে উক্রাইনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই অরণ্যসীমানার দৈর্ঘ্য চার থেকে পাঁচ হাজার মাইল! সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভের সম্পদের সঠিক পরিমাণ কি প্রকার, সেটি সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এখনও জানতে পারেনি! ওরা 'কাস্তে আর হাতুড়ি' দিয়ে বিংশ শতাব্দীটা চালিয়ে নেবে! একবিংশ শতাব্দীতে ওদের ফ্ল্যাগে হয়ত আর দুটো হাতিয়ার আঁকা হবে। একটি হবে গাঁইতি, অন্যটি কোদাল! সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভান্দিককার মহাদেশাংশ এখনও খুঁড়ে দেখা হয়নি। সেই বিশাল ভূ-খণ্ডের মাটির নীচে 'মোহরের ঘড়ার' সংখ্যা কত কেউ জানে না! বিড়াল আপন ভাগ্যের জোরে পেয়ে গেছে জ্যান্ত একটা মাছ,—সেটা সে নিরিবিলিতে ব'সে 'উপভোগ' করতে চায়,—অশান্তি চায় না!

বাল্টিক রাজ্যগুলির পশ্চিমে এবং পোল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে একটি ক্ষুদ্রকায় সোভিয়েট রিপাবলিক একপ্রকার গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ওটা যেন আপন মনে নিরিবিলিতে ব'সে বাল্টিক সমুদ্রের ঢেউ গুনছে। ওটির নাম কালিনিনগ্রাড। এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। যেমন আমাদের দেশে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল মণিপুর বা আগরতলা। লেনিন, কালিনিন, ভর-শিলভ, ষ্টালিন এবং হয়ত বা আরও দু-একজনের নামের সঙ্গে 'গ্রাড' শব্দটি যুক্ত করে এক-একটি সুবৃহৎ নগর পুনঃ-নির্মাণ করা হয়েছে। তফাৎ এই শুধু, লেনিনের মৃত্যুর পর দেশবাসীর স্বতঃ-উৎসারিত অনুরাগ পেট্রোগ্রাডের নামটি বদলিয়ে লেনিনের নামাঙ্কিত কর-ছিল। কিন্তু বাকি তিনজন বোধ করি নিজেদের সম্বন্ধে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ অনুরাগের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। সেই কারণে সম্ভবত ইতিহাস থেকে মুছে যাবার আশঙ্কায় আপন আপন জীবনীকালের মধ্যেই একেকটি শহরের সঙ্গে নিজ নিজ নাম যুক্ত করেছেন! তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন, সম্প্রতি সেইটিই আরম্ভ করেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে যে-নগরটি আত্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেই 'ষ্টালিনগ্রাড' নামটি কেটে দিয়ে তার বদলে ভলগা-তীরবর্তী নগরটির নূতন নাম করা হয়েছে, 'ভলোগোরড'। এটি ভাল কি মন্দ হয়েছে সেটি আমার বলবার অধিকার নেই। কিন্তু বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল ধরে সমগ্র পৃথিবীতে ষ্টালিনের ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে যে ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে এসেছে, আধুনিক সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সেই আগাগোড়া প্রমাণাসিদ্ধ ধিক্কার নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে ষ্টালিনের নামটিকে এবার নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলেন। আজ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ইউরোপ, ইংল্যান্ড বা আমেরিকা ষ্টালিন সম্বন্ধে কোনওদিন ভুল করেননি; এবং এটিও বুঝতে পারি, সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরীহ ও ভদ্রজীবন কি প্রকার বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল অতিবাহিত করেছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রথম প্রবেশকালে ষ্টালিন-রাজত্ব সম্বন্ধে যে ভয় ও ভাবনা নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটি যে ভিত্তিহীন নয়, সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসের ২২তম

অধিবেশন তার প্রমাণ। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনীতির ক্ষেত্রে এত বড় ডিগবাজির উদাহরণ আর কোথাও নেই। ইউরোপের সর্বশেষ দানব হিটলারের অপমৃত্যুতে গণতন্ত্রী জগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু সেখানে তিনি মৃত্যুর পর আপন জাতির নিকট অপমানিত হননি! অথচ 'হিটলার-বিজয়ী' জেনারালিসিমো যোসেফ স্টালিন সোভিয়েট জাতিগুলির হাত থেকে যে অপমান এবং কলঙ্কের বোঝা নিয়ে গেলেন,—সভ্যতার ইতিহাসে এর উদাহরণ বিরল।

উত্তরাপথের ভ্রমণ শেষ ক'রে আবার মস্কোয় ফিরে এলুম। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে। বোধকরি চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর এক সপ্তাহকাল বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু পাসপোর্টে লিখিত সেই তারিখও শেষ হয়ে এল। আর মাত্র তিনদিন বাকি। ভারতীয়রা পাঁচ-সাতজন ছাড়া আর সবাই এক এক দলে চলে গেছেন। শেষ দলটির সংগে আমাকেও যেতে হবে। আমরা প্রথম এসে 'লেখক-সঙ্ঘের' অতিথি ছিলুম। গত সপ্তাহটা ছিলুম 'আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটির' অতিথি। এখন আমি কা'র নিমক খাচ্ছি, আমি জানিনে। সম্ভবত আবার লেখক-সংঘই আমা'দর দায়িত্ব নিয়েছেন। যাঁদের নুন খাচ্ছি, তাঁদের গুণগান করতে আমি বাধ্য কিনা, সেটি শোনবার জন্য এখানে-ওখানে কান পেতে ছিলুম। একটা সন্দেহ এখনও এড়াতে পারিনি—এখানে এসে অনেকে নাকি 'ইনজেকশন' নিয়ে যায়! কিন্তু আমি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ তনয়,—পাঁচ হাজার বছর ধরে আমার শিরার রক্ত বিষে জরো-জরো! বাইরের বিষ আর ধরবে না।

হঠাৎ সেদিন প্রাতরাশের টেবলের সামনে এক বাংগালী ভদ্রলোককে দেখে উৎসাহিত হলুম। তিনি ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনার জন্য এসেছেন। তাঁর নাম শিশিরকুমার বসু। আমার নামটির সংগে তিনি পরিচিত থাকার জন্য কাছে এসে বসলেন। কমিউনিস্ট দেশের সংগে তাঁর পরিচয় একেবারেই নেই। তাঁর নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলাপ ঘনিষ্ঠ হল। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়ার সামনে ব'সে তাঁর বোধগম্য ভাষাই ব্যবহার করছিলুম। অতঃপর শেষের দিকে শ্রীমতী খুশী হয়ে বললেন, ভারতীয়ের মুখে এমন বর্ণনা এর আগে শুনিনি! সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন পরিচয় আপনার মুখে শুনলুম।

এই দিনটির দু' বছর পরে বোম্বাই সাহিত্য সম্মেলনে একদিন বসেছিলুম, হঠাৎ পিছন থেকে এসে শিশির বসু মহাশয় আমাকে তুলে নিয়ে বোম্বাই শহর থেকে একুশ মাইল দূরবর্তী 'ভিক্রোলি' নামক একটি ছোট শহরে যান। সেখানে গিয়ে দেখি এই অমায়িক ভদ্রলোকটির আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে এক বিশাল পার্বত্য জলাশয়ের চারিপাশে অধুনা-প্রসিদ্ধ সুবিশাল 'বোম্বাই টেকনোলজিকাল ইনস্টিট্যুটটি' গ'ড়ে উঠছে। এটি খড়্গপুর প্রমুখ ভারতের চারটি ইনস্টিট্যুটের অন্যতম। এর জন্য তখন পর্যন্ত খরচ পড়েছে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো। কিন্তু তার মধ্যে সাড়ে আট কোটি টাকারও বেশী দিয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। শ্রীযুক্ত শিশির বসু মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, অর্থাৎ ডাইরেক্টর। সেদিন শিশিরবাবু তাঁর ছেঁড়া জামা ও ছেঁড়া জুতো-মোজা নিয়ে আমাকে আগাগোড়া সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিভাবান ও করিৎকর্মা বাংগালীর গৌরবময় কীর্তিকলাপ দেখে আমি সেদিন মুগ্ধ মনে ফিরে এসেছিলুম!

শিশিরবাবুর সংগে গল্প-গুজব করার পর প্রাতঃরাশের টেবিল ছেড়ে যখন উঠলুম, তখন শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, চলুন আর দেরি নয়।

আমি সেদিন সকালে জগৎপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক আন্তন চেকভের বৃদ্ধা স্ত্রীর সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলুম।

বাইরে শীতার্ত দিন। আকাশ মেঘলা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আমি গায়ে চড়িয়ে নিলুম শ্রীমান ননী ভৌমিকের কাছে ধারকরা ওভারকোটটি। এটির নীচে আমার গরম কোট, তার নীচে বন্ধুবর বিনয় রায়ের ফুলহাতা সোয়েটার, তার নীচে আমার সুতি শার্ট, তার নীচে, ফুলহাতা গেঞ্জি! গেঞ্জির নীচে যেটির নাম গাত্রচর্ম, সেটিতে শীতের কাঁটা দিচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। আমার মাথায় ছিল একটি টুপি। সেটি মাথায় দেওয়া এবং মাথা থেকে নামানোর মাঝখানে বহুবার হারাতে বসেছিল। কিন্তু সদাসতর্ক দোভাষিণীর খরদৃষ্টির জন্য তেমন ঘটনা ঘটেনি।

ট্যাক্সির মধ্যে বসে এক সময় লিডিয়া বললেন, ৩রা তারিখে আপনার যাওয়া হতে পারে না!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম কেন?

আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না!—লিডিয়া চুপ ক'রে গেলেন।

ভয়ে আমার গায়ের মধ্যে আবার যেন শীত ক'রে উঠল! ক্ষীণকণ্ঠে আমি বললুম, দেখুন, আমার খুব ছোটবেলায় আমার বন্ধু বড়লোক সুবোধ যখন ইস্কুল থেকে ফিরে লুচি আর হালুয়া ছড়াছড়ি ক'রে খেত, আমি সেদিন সময় মতো চারটি মুড়ি-মুড়কিও পেতুম না! সেটা অবশ্য রুশ বিপ্লবের কয়েক বছর আগে! আমার বিশ্বাস, আমি তখন থেকেই 'কমিউনিস্ট'। এটা শুনলে কি আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন?

লিডিয়া বললেন, না।

অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে এক সময় প্রশ্ন করলুম, এখানে প্রত্যেক দোভাষীই কি পুলিশের লোক?

শ্রীমতী জবাব দিলেন, আপনার কথার বাঁকগুলি অতিশয় আপত্তিজনক। আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা যখন আনন্দ করছি, আপনি তখন কথায় কথায় আমাদের খোঁচা দিচ্ছেন! আমরা কমিউনিস্ট মনে রাখবেন। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। আমরা কায়মনোবাক্যে অতিথিদের সেবা করি। আপনি শুনলে খুশী হবেন, এ বছর মোট ছয় লক্ষ বিদেশী সোভিয়েট ইউনিয়নে এসেছেন! তার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ' হলেন আমেরিকান। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান অগণিত। আপনি বোধ হয় এখনও খোঁজ করেননি, মিঃ খ্রুশ্চভের আমল আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে গৌরবের আমল! গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় ঘুরে জিজ্ঞেস করুন গে, এদেশে কী গভীর শ্রদ্ধা ভারতের প্রতি এবং আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি!

মিষ্টকণ্ঠে বলুম, কিন্তু মিঃ নেহরু ত কমিউনিস্ট নন?

শুভ্রবঙ্কিমবর্ণা মেমসাহেব এবার অনুগ্রহপূর্বক হাসলেন। বললেন, এই কথাটি আপনার চাতুরিতে ভরা! মিঃ নেহরু আমাদের পরম বন্ধু, কেন না

উনি শান্তির অগ্রদূত! আপনি বোধহয় খবর রাখেননি, ১৯৫৫ সালে ছয় লক্ষ সোভিয়েট নর-নারী ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে নেহরুকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছিল!

এবার যেন একটু সাহস পেয়ে বললুম, সেদিন কে কে ফুলের তোড়া কেনেনি, আপনারা কি তাদের নাম টুকে রেখেছিলেন?

শ্রীমতী লিডিয়া চলন্ত গাড়ির মধ্যে একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর হেসে উঠে বললেন, "ah, what a naughty friend you are." কথাটা শুনে রাখুন। অনেকেই আসে, হৈ-চৈ আমোদ আহ্লাদ ক'রে বাড়ি ফিরে যায়। আপনি একটু অন্যরকম,—সকলেই আপনাকে ভিন্ন চক্ষে দেখেন! আপনি বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়েছেন এখানে। আপনাকে এখন আমরা যেতে দেবো না! আপনার যাবার আলোচনাই ওঠেনি!

মস্কোর একটি রাজপথের এক কোণে একটি গলির কোণে এসে গাড়ি থামল। যেমন বহুক্ষেত্রেই দেখেছি, আধুনিক রাজপথের চাকচিক্যময় ও শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকার ঠিক পাশে অথবা পিছনে—প্রাচীন মস্কোর পুরনো বস্তি-বাসিন্দা চোখে পড়ে। পুরাকালের বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে নানা জঞ্জাল, নালা নর্দমা চাপা দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে নীচের তলাটা পরিত্যক্ত, নড়বড়ে পুরনো কাঠের সিঁড়ি কোথাও, কোথাও বা গৃহস্থের বাস সামনের দিককার ঝুপসি ঘরদোর ছাড়িয়ে দূরে অন্দরমহলের দিকে। এমনি একটি সাবেক কালের বড় বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় আমরা উঠে গেলুম। ইলেকট্রিকের বোতাম টিপবার পর এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন, এবং শ্রীমতী লিডিয়া তাঁর সঙ্গে রুশ ভাষায় মিনিটখানেকের জন্য যে আলাপটুকু করলেন, তার মধ্যে মাত্র তিনটি শব্দ বহুবার নানা জায়গায় শোনার ফলে আমার বোধগম্য হল। সেগুলি হচ্ছে, "ইন্দিস্কা পিসাটিয়েল সানিয়াল!" অর্থাৎ ভারতীয় লেখক সান্যাল! অনেক সময় "পিসাটিয়েল" উচ্চারণটির মধ্যে "পিশাচ" শব্দটি কানে এসে ঠেকত এবং নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা একটু গুলিয়ে যেত!

একটি অতি সুসজ্জিত ঘরে এসে আমরা বসলুম। এটি পরলোকগত পরম রসস্রষ্টা আন্তন চেকভের মস্কো বাসকালীন বৈঠকখানা ছিল। আমার তরুণ বয়সের সাহিত্যধর্মের মধ্যে চেকভকে অন্যতম গুরুস্থানীয় বলে মনে করতুম, এবং 'কন্টিনেন্টাল' সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের দিকপালগণকে সর্বাগ্রগণ্য বলে বিশ্বাস করতুম। আন্তন চেকভ এবং ফরাসী প্রতিভা মোপাসাঁর মধ্যে কে বড় এবং আঙ্গিক বিবেচনার দিক থেকে কে প্রধান, সেটি আজও বিচার করি।

ঘরের মধ্যে একটি বড় জানলা রাস্তার দিকে খোলা। তারই পাশের দেওয়ালে একখানি নাতিবৃহৎ চেকভের ছবি টাঙানো। চেকভ মারা গিয়েছেন যক্ষ্মারোগে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে। কিন্তু তাঁর দাড়ি দেখে মনে হয় বয়স যেন কিছু বেশি। ঘরের ভিতরটিতে মেহগনি কাঠের আসবাব সর্বত্র, মেঝের উপর মূল্যবান একখানি কার্পেট। উঁচু দেরাজের উপর সোনালি বর্ণের একটি ঘড়ি, পিছনে একটি প্রশস্ত আয়না। চীনা কাঁচের পুতুল এবং অন্যান্য 'কিউরিয়ো'গুলি পরিপাটি করে সাজানো। প্রত্যেকটি কেদারা মোটা কালো গদিতে আঁটা। এখানে ওখানে বই কাগজের বাণ্ডিল সুবিন্যস্ত করে রাখা। অন্য দেওয়ালগুলিতে বড় বড় রুশ কবি, ঔপন্যাসিক এবং মনীষীগণের ছবি ঝুলছে। আসবাবপত্র কোনটির মধ্যে সোভিয়েট ডিজাইনের কোনও সুলভ সামগ্রী নেই। প্রত্যেকটিই যেন সুপ্রাচীন রুশীয় আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছে। জানলা-দরজার সুন্দর লেসযুক্ত পর্দাগুলিও যেন একালের নয়। চেকভের নিজ হস্তের সংগৃহীত এইসব মূল্যবান গৃহসজ্জাগুলির দিকে আত্মবিস্মৃতভাবে চেয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার চোখের সামনে থেকে কে যেন "সাম্প্রতের আবরণটি" সরিয়ে নিয়েছিল। আমি স্তব্ধ, মুগ্ধ এবং সমাধিস্থভাবে বসেছিলুম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার পিছনের দরজাটি খুলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে যে পক্ককেশিনী বৃদ্ধা [illegible]ত ও সংযত হাস্যে ভিতরে এসে প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখামাত্রই আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম। অদ্যাবধি সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন প্রশান্ত, বলিষ্ঠ এবং রাজকীয় আভিজাত্যপূর্ণ বৃদ্ধা মহিলাকে আমি দেখিনি! চওড়া চোয়াল, আকর্ণবিশ্রান্ত শান্ত চক্ষু, বিস্তৃত বক্ষ, লেসযুক্ত কালো মখমলের গাউন, সুন্দর শাদা চুলের রাশি, পাকা হাত দুখানার বড় বড় আঙুল,—তাঁর সেই রাজ-মহিমান্বিত আবির্ভাবের দিকে তাকিয়ে আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জননীর দেহচ্ছায়া সরে যেতে লাগল! আমি স[illegible] ভারতীয় ভঙ্গীতে নতজানু হয়ে তাঁর জানু স্পর্শ ক'রে অভিবাদন জানালুম। তিনি হাসিমুখে আমার চিবুক ধরে তুলে সামনে বসালেন।

মাদাম চেকভ ওরফে শ্রীযুক্তা আল্‌গা কেনিপার রুশ ছাড়া অপর কোনও ভাষা জানেন না। সুতরাং শ্রীমতী লিডিয়া রইলেন মাঝখানে। আমি বললুম, আজ আমি পরম গৌরব বোধ করছি আপনার দর্শনলাভ ক'রে। আজকের এই দিনটি আমার স্বপ্নের অতীত ছিল! ভারতের আন্তরিক শ্রদ্ধা আপনাকে জানাতে এসেছি!

মাদাম বললেন, সুদূর ভারত আমাদের কাছেও আনন্দ-কল্পনার জগৎ। তুমি এসেছ সেই দেশ থেকে তার মধুর আচরণ সঙ্গে নিয়ে। তোমাকে আশীর্বাদ করি!

আমি বললুম, আপনার নব্বই বছর বয়স হয়েছে এটি মনেই হয় না!

মাদাম হাসিমুখে আমাকে শুধরে দিয়ে বললেন, ওর পরে আরও দশদিন যোগ কর। আমি আর লেনিন মোটামুটি এক বয়সী। এখন দিন গুনছি!

প্রশ্ন করলুম, বর্তমান কাল আপনার কেমন লাগছে?

তিনি আমার দিকে একবার

তাকালেন। পরে বললেন, এই ত বেশ, হাসিমুখেই বিদায় নিয়ে যেতে পারব!

লিডিয়া এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি আর একটু গলা তুলে কথা বলুন। উনি কানে একটু কম শোনেন। আপনার গলার আওয়াজটি শুনে ও'র ভালো লেগেছে!

আমি যেন মহাপ্রাচীনের আশ্রয়ের নীচে জায়গা পেয়েছিলুম। পুরাকালের রুশীয় সভ্যতা, অভিজাতির অতীত ঐতিহ্য, সম্রাটের আমলের সেই বর্ণাঢ্য আভিজাত্য,—একে একে আমি যেন এই বৃদ্ধার মুখশ্রীতে সেকালের স্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছিলুম। আমার জীবনে কোনও বৃদ্ধার কাছে বসে এমন আত্ম-বিলুপ্তি ঘটেনি! এক সময় একটি প্রশ্ন ক'রে বসলুম, আপনার সামনে বসে যদি আপনাদের অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য উৎসুক হই, সে কি অন্যায় হবে?

বৃদ্ধা হাসলেন। বললেন, কী সুন্দর ছবি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের! বড় যত্নে পড়েছিলুম তাঁর বই। কী মহৎ কবি! কী বিরাট লেখক! তিনি এখানে এসেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তাঁকে দেখিনি। সেই মহাকবির দেশ থেকে তুমি আজ এসেছ এক তরুণ বালক!—হ্যাঁ, এই প্রথম, প্রথম বৈকি—একজন ভারতীয়কে দেখলুম! সেকালে আমেরিকায় কোনও ভারতীয়কে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বড় আনন্দ, তোমাকে দেখতে পেলুম!

আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন কবে?

কবে?—মাদাম হাসলেন,—সে অনেক কাল আগে। বোধ হয় সত্তর বছরের কাছাকাছি! তখন আমার বয়স বড় অল্প! ওদের স্টেজে নাচতে গিয়েছিলুম! আমাকে যখন তখন গান গাইতেও বলা হত। একালে যাদের এখানে দেখছ, তারা তখন অনেকেই জন্মায়নি!

একটু থেমে মাদাম আবার বললেন, আমার স্বামী আমার নাচগান খুব পছন্দ করতেন। ও'র জন্যেই ত আমি এসব করতুম। ও'র যত তামাশা আর পরিহাস ছিল আমার সঙ্গে। আমি আমেরিকায় গিয়ে অনেকগুলি নাটকের হিরোয়িন সেজে অভিনয় করেছি, কিছু হাত-তালিও পেয়েছিলুম! তারপর চেকভ আর আমি নামলুম এক মস্ত কাজ নিয়ে। তুমি আর্ট থিয়েটারে গিয়েছ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ওইটি আমরা গড়েছিলুম এককালে। আমাদের পরম বন্ধু বিখ্যাত অভিনেতা ষ্টানিসলাভস্কি আর আমরা দুজন লেগে গেলুম কোমর বেঁধে। সবাইকে নেমতন্ন করলুম, জার সম্রাটের দলবলকেও বাদ দিইনি। বড় বড় মনীষী তখনও সবাই বেঁচে। সেই বছর চেকভ লিখলেন 'সী-গাল'—সেই নাটক নিয়ে আর্ট থিয়েটারের যাত্রা শুরু! ষাট বছর আগে আমি নেমেছিলুম সেদিন তার প্রধানা অভিনেত্রীরূপে। চেকভ যখন হাততালি দিলেন, আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলুম। তুমি সেই 'সী-গাল'-এর ছবিটি কার্টেনে দেখেছ ত?

হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। আপনার স্বামীর 'চেরী অর্চার্ড' নাটকটি দেখে সকলের মতন আমিও অভিভূত হয়েছিলুম!

মাদাম এবার উজ্জ্বল মুখে হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, রাশিয়ানরা অভিনয়কলা ভালই বোঝে। কি জানো, প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিভা'র সঙ্গে চেকভও রাশিয়ার খুব প্রিয়। তুমি রুশ ভাষায় আমাদের 'ক্লাসিক'স'গুলি পড়তে পারনি, সেটি দুঃখের কথা। তাঁদের সকলের বই আগের চেয়ে এখন অনেক বিক্রি বেড়েছে! আমার ঠিক মনে পড়ছে না, আমাদের রুশভাষা বাদ দিয়ে চেকভের বই বোধ হয় পৃথিবীর ৭০।৮০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

আমি তাঁকে সংবাদ দিলুম, ভারতের প্রায় পনেরোটি ভাষায় চেকভের গল্পের বই বেরিয়েছে, এবং লেনিনের মৃত্যুর পরের বছরে আমি নিজে চেকভের দুটি গল্প ইংরেজি থেকে অনুবাদ করি।

বৃদ্ধা সানন্দে বললেন, এসব আমি জানতুম না!

আমি পনেরো মিনিটের জন্য গিয়েছিলুম, কিন্তু নানা কথায় আধ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেছে। মাদাম কি যেন বললেন, লিডিয়া সেটি অনুবাদ ক'রে দিয়ে জানালেন, ও'র ইচ্ছে আপনি এখানে আহারাদি ক'রে যান। উনি বলছেন, আপনি খুব 'ইনটরেস্টিং' মানুষ!

হাসিমুখে বললুম, ও'কে বলুন, এখানে অতিভোজনের ফলে আজ একাদশী করতে বাধ্য হয়েছি!

মাদামও হাসলেন। আমি এক সময় পুনরায় নমস্কার জানিয়ে সেদিনের মতো উঠে দাঁড়ালুম। কালো টুপিটি মাথায় তুলে মাদাম চেকভ হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

এই দিনটির সাড়ে তিনমাস পরে শ্রীযুক্তা অল্‌গা কেনিপারের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি যে ছোট প্রবন্ধটি লিখি, তার মধ্যে দুটি ছত্র এই প্রকার ছিল: "খররৌদ্রের তাপে চারিদিকের বিশুষ্ক প্রান্তর যখন তৃষ্ণায় ধু ধু করছে, সেই সময় পরিশ্রান্ত এক পথিক খুঁজে পেয়েছিল একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়াতল। পথিক সেই সুশীতল ছায়ার নীচে বসে কপালের ঘাম মুছেছিল।"

এই প্রবন্ধটি "মস্কো নিউজ" নামক সাপ্তাহিক কাগজে প্রকাশিত হয়।

পথে আসতে আসতে শ্রীমতী লিডিয়া প্রশ্ন করলেন, অলেসিয়াকে সেই সেদিন আপনার কেমন লেগেছিল?

হাসিমুখে জবাব দিলুম, মাত্র একটি রাত্রে মেয়েছেলেকে কি চেনা সহজ? অলেসিয়া বড্ড বেশি সুশ্রী, তাই ভয় করে।

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন এবং রাগ করে বললেন, মনে রাখবেন এ জীবনে অন্য কারও কাছে অলেসিয়া এমন ক'রে নিজের কাহিনী বলেনি—যেমন বলেছে আপনাকে! এবার আপনি তার অনুরোধ রাখুন।

কি অনুরোধ?

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লিডিয়া একটি চিঠি বার ক'রে পড়লেন। সেটি লিডিয়াকে লেখা একটি অনুরোধপত্র। 'শান্তি' বিষয়ে আমি যেন অলেসিয়ার সম্পাদিত 'হোল্ ওয়ার্ল্ড্' কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার পরিশ্রম বিনামূল্যে নয়! কাগজটি প্রকাশিত হয় 'কিয়েভ শহর' থেকে।

শ্রীমতী অলেসিয়া হলেন উক্রাইন শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, এবং সেখানকার রাইটার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

এক সময় হাসিমুখে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, অলেসিয়াকে খুব ভাল লাগে আমার। সমস্ত রাত জেগে অলেসিয়া আপনাকে চোখের জল নিয়ে আগাগোড়া আত্মকাহিনী ব'লে গেল বটে, —কিন্তু একটি ছোট্ট বিষয় আপনার কাছে মুখ খুলে বলতে পারল না! সোভিয়েট মেয়ে কেমন বুদ্ধিমতী, দেখলেন ত?

আমি বললুম, মেয়ে আর সোভিয়েট মেয়ের মধ্যে তফাৎটা কি?

সোভিয়েট মেয়ে শুধু মেয়ে নয়, জেনে রাখুন। চলুন, পরে বলব।

(ক্রমশঃ)

উইলিয়ম কেরী ও বাংলার বিজ্ঞান-চর্চা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে স্বদেশের ও বিদেশের অনেকেই এই অসাধারণ কর্মী ও মহৎ সাহিত্যসেবকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান নিয়েও অনেক আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে এই প্রতিভাবান পুরুষ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি। অথচ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র করে, উইলিয়ম কেরী তাঁদেরই একজন।

আজ থেকে দেড় শতাধিক বৎসর আগেকার কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কয়েকজন ইউরোপীয় ধর্মযাজকের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন হ'ল। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), ফেলিকস্ কেরী (১৭৮৬-১৮২২), জন লোসন (১৭৮৭-১৮২০), রবার্ট মে (১৭৮৯-১৮১৮), জন পিয়ার্সন (১৭৯০-১৮৩১), উইলিয়ম ইয়েট্স্ (১৭৯২-১৮৪৫) উইলিয়ম হপ্‌কিন্স পিয়ার্স (১৭৯৪-১৮৭৭) ও জন ম্যাকের (১৭৯৭-১৮৪৫) নাম। উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র উইলিয়াম কেরী ছাড়া অপরাপর সকলেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলায় উইলিয়ম কেরীর কোনো বিজ্ঞানের বই নেই, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে কেরীর কথা বিস্মৃত হবার এটা হয়তো একটা কারণ। কিন্তু এই কারণকে বড় করে দেখলে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে অনেকের নামই তো বাদ দিতে হয়। এমন কি শ্রীচৈতন্যও ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যান। কারণ, চৈতন্য নিজে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য রচনা করেননি। অথচ আজ থেকে তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে তাঁর লোকোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব প্রাণবন্যা এসেছিল, সে কাহিনী সাহিত্যরসিক ও ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন তিনজন মনীষী আছেন যাঁরা নিজেরা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা না করেও এদেশের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ'রা হলেন উইলিয়ম কেরী, ডাঃ মহেন্দ্র-লাল সরকার ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পরিচয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি পত্রিকায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা ছাড়া অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি সত্য; কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে তিনি যে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন সেজন্য তিনি সমগ্র জাতির নমস্য। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার চেয়ে তার মূল্য বেশী ছাড়া কম নয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরীও একই পথের পথিক। বাংলায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করলেও তিনি কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেননি। অথচ এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ও বহু লেখককে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। তাই বলছিলাম, কেরী বিজ্ঞানের কোনো বই লেখেননি—এই বাহ্যিক কারণকে বড় করে দেখলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে তাঁর অব-দানের কথা কোনোদিনই নির্ণীত হবে না। বস্তুতঃ নিজে কোনো বিজ্ঞানের বই না লিখলেও বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন তা' তখনকার যুগের পরি-প্রেক্ষিতে অতুলনীয়। তা' ছাড়া এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারেও কেরীর বিরাট অবদান রয়েছে। সেই অবদানের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করে তাঁর কর্ম-জীবনের সঙ্গে বাংলার বিজ্ঞান-চর্চার যোগসূত্রের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করলেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে কেরীর অবদান নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে।

কেরী ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কর্ণধার। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আসেন। মিশনের কাজে তাঁর দু'জন প্রধান সহযোগী ছিলেন মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। তাঁরা এদেশে এলেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ত্রয়ীর নাম অবিস্মরণীয়। এ'দের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উইলিয়ম কেরীর আক-র্ষণই ছিল সবচেয়ে বেশী। জ্ঞানানু-শীলন ও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন না, তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন তাঁদেরও নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' রচনার পশ্চাতে উইলিয়ম কেরীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরীর। ফেলিক্স্ কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা দুরূহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির হলেও এখানে অস্থিবিজ্ঞান ও শারীর-বৃত্ত নিয়ে যা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তা' একবাক্যে অভি-নন্দনের যোগ্য। 'বিদ্যাহারাবলী—ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র বিষয়বস্তু পঞ্চম সংস্করণ 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল। এই অনুবাদে উইলিয়ম কেরী ফেলিক্সকে অশেষ সাহায্য করেন। বস্তুতঃ কেরীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও সস্নেহ আনুকূল্য না থাকলে ফেলিক্সের মতো খামখেয়ালী প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিরাট গ্রন্থ রচনা করা হয়তো সম্ভবপর হ'ত না।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার আদি পর্বের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পদার্থ-বিদ্যাসার' (১৮২৪) এবং 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩৩) রচনার পশ্চাতেও উইলিয়ম কেরীর যথেষ্ট অবদান ছিল। এই দু'টি গ্রন্থের লেখক উইলিয়ম ইয়েট্স্ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অনুপ্রেরণা কেরীর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া বাংলায় প্রথম রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ

'কিমিয়াবিদ্যার সার' (১৮৩৪) রচনায়ও কেরী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'কিমিয়াবিদ্যার সার' ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেসে। দু'ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থে রাসায়নিক শক্তি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীরামপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক জন ম্যাক। 'কিমিয়াবিদ্যার সার' রচনার সময়ে বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষার অভাবে লেখককে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময়ে কেরী ও মার্শম্যানের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত করা হয়তো ম্যাকের পক্ষে সম্ভবপর হত না। গ্রন্থটির ভূমিকায় জন ম্যাক উইলিয়ম কেরীর কাছে তাঁর ঋণের কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন,

"In issuing this little work there are two persons whom I cannot refrain from associating with its production. The first is my venerable friend Dr. Carey, from whom I derived the greatest assistance and encouragement in my earlier attempts at Chemical translation, and whose ardent sympathy I have always enjoyed in every liberal and useful pursuit."

অর্থাৎ "এই সামান্য গ্রন্থটি প্রকাশকালে গ্রন্থটি রচনার সঙ্গে জড়িত দু'জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে পারছি না। এ'দের প্রথম জন হলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডঃ কেরী। তাঁর কাছ থেকে আমি আমার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রাথমিক অনুবাদের প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সাহায্য ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, এবং সব সময়েই প্রতিটি প্রগতিধর্মী ও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় আমি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি পেয়েছি।"

বাংলা দেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। কেরী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। শৈশবকাল থেকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের প্রতি কেরীর যে কৌতূহল ছিল পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেই কৌতূহলই যে আরও পল্লবিত হয়ে উঠল, এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন 'মসীনাবাদ' নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটি তিসি বা মসীনার চাষ সম্বন্ধে লেখা। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই প্রকাশিত হ'ল জে. মার্শম্যানের 'ক্ষেত্র বাগান বিবরণ'—১ম (১৮৩১) ও ২য় (১৮৩৬) খন্ড। এছাড়া সোসাইটির মুখপত্র 'ট্রানসাকসানস্ ও জার্ণাল' থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদের জন্যে একটি অনুবাদ-সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়ম কেরী। 'ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামক সাময়িক-গ্রন্থটির বিভিন্ন সংখ্যা (১৮৫৩-১৮৫৬) এই সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। এতে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে সহজ ও জনপ্রিয় আলোচনা স্থান পেত। পুস্তক প্রকাশ করা ছাড়াও এদেশে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি নানাপ্রকার চেষ্টা করে। কৃষি-প্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার কাজে এই সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

অতএব, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলা দেশে বিজ্ঞানের প্রসারে এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বড় হবার পর যখন সব কিছু বুঝতে শিখেছে, জীবনের এই দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে দিলীপের অনেক বার মনে হয়েছে, এই যে এক একটি ছোট ছেলে সংসারের সহজ ও সাধারণ পথ ছেড়ে বিপথে নেমে পড়ে, সৎ, ন্যায় ও সুন্দরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে, তার মূলে রয়েছে এমনি কোনো অপ্রত্যাশিত আঘাত; যাকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিংবা বিশ্বাস করে, তার কাছ থেকে কোনো নির্মম আচরণ। দীর্ঘ ছ বছর কাল এই বর্স্টাল স্কুলে তাকে কাটাতে হয়েছিল। সম এবং অসমবয়সী অনেক ছেলের সঙ্গে সে মিশেছে। কত বিচিত্র তাদের কাহিনী। কত জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থা-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ঐখানে এসে তারা দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু একটি জায়গায় প্রায় সকলেই এক। সেখানে রয়েছে আপনজনের কোনো অবহেলা, অনাদর কিংবা অবিচার, কারো কারো বেলায় তার চেয়ে কঠোরতর কোনো লাঞ্ছনা বা অত্যাচার।

ছোটখাটো 'অপরাধ' করবার প্রবণতা শিশুমনের স্বাভাবিক ধর্ম। তাদের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় এমন কতকগুলো বিষয় থাকে, যাকে বলা যেতে পারে 'অন্যায়' বা 'অনুচিত'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো তাদের কাছে নিছক আমোদ বা 'স্পোর্ট'। কোথাও কোথাও তার পিছনে থাকে লোভ, বাহাদুরি, কিংবা বন্ধু মহলে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। একে যদি 'অপরাধ' বলা যায়, তাকে রোধ করবার একমাত্র অস্ত্র ক্ষমা ও স্নেহের শাসন। সে শাসন যখন মাত্রা হারিয়ে ফেলে, অথবা নির্যাতন কিংবা প্রতিহিংসার রূপ নেয়, তখন ঐ শিশুসুলভ 'অপরাধ'গুলোই সত্যিকার অপরাধের পথ ধরে, যার নাম 'ক্রাইম্'। ফুলের বুকে যদি কীট এসে বাসা বাঁধে, বুঝতে হবে সে দোষ ফুলের নয়, দোষ রয়েছে, যে গাছে সে ফুটল তারই কোনোখানে। একটি নির্মল শিশু কিংবা একটি নিষ্পাপ কিশোর যে পাপের ছাপ কপালে নিয়ে বর্স্টালে এসে দাঁড়ায়, সে পাপ তার নয়, তার বাপমায়ের কিংবা কোনো নিকট আত্মীয় বা অভিভাবকের। অভিভাবক যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও খুঁজলে দেখা যাবে, সে পাপ আপনা থেকে জন্মায়নি, তার শিকড় রয়েছে, যে পরিবেশে তার জন্ম, যেখানে সে বেড়ে উঠেছে, তারই পাঁকের তলায়।

বর্স্টালের 'খুদে ক্রিমিন্যাল'গুলোই এই পরম সত্যের জীবন্ত সাক্ষী।

ঘোষসাহেবের একটা দিনের গুটিকয়েক কথা দিলীপ কোনোদিন ভুলতে পারেনি। সেদিন তার পনর বছরের কিশোর মন নিয়ে তার সবটুকু মানে হয়তো বুঝতে শেখেনি। বুঝেছিল অনেক পরে।

সাহেবই ডেকে পাঠিয়েছিলেন কী কাজে। খুব সম্ভব প্রেস-সংক্রান্ত কোনো জরুরী নির্দেশ বা ঐ জাতীয় কিছু। তখন সে প্রেস-মাষ্টারের ডান হাত এবং অনেক ব্যাপারে ডেপুটিবাবু কিংবা সাহেবের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ রাখতে হয়। দুপার একটি ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে আফিসের দরজার পাশে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ কানে গেল, তিনি বলছেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমি স্পষ্ট কথার লোক। ছেলে আপনাদের নিজে থেকে বিগড়ে যায়নি। আপনারাই পথ দেখিয়েছেন।

—আমরা পথ দেখিয়েছি! আপনি বলছেন কি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক।

—হ্যা, আপনারা।

ভদ্রলোকের মুখে আর কথা সরেনি; বোধহয় অতি বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেব বলেছিলেন, আপনাদের সন্ধ্যেবেলার প্রোগ্রামটা একবার মনে করুন। প্রায় প্রত্যহ দুজনে মিলে, মাপ করবেন, একটু বিশেষ সাজগোজ করে বেরিয়ে যাওয়া। কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন বা পার্টি, ক্লাব কিংবা হোটেলে। ওকে বলতেন, আমরা একটু ঘুরে আসছি। তুই বসে বসে পড়। মাঝে মাঝে ও জানতে চাইত, কোথায় যাচ্ছ তোমরা, আপনারা ধমকে উঠতেন, তা দিয়ে তোর কাজ কী? দরকারে বেরুচ্ছি। ও কিন্তু জানত সে দরকারটা হচ্ছে গান, বাজনা, স্ফূর্তি, আমোদ, পান, ভোজন। আপনি যখন থাকতেন না আপনার পকেট হাতড়ে দেখত, পেয়ে যেত হোটেলের বিল, কিংবা সিনেমার টিকিটের আধখানা। ফিরে এসে, কী দেখলেন কোথায় গিয়েছিলেন তা নিয়ে খোসগল্প জুড়ে দিতেন দুজনে মিলে। পাশের ঘরে শুয়ে মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে সব শুনত। আপনারা মনে করতেন খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ভুল। ঘুমোয়নি; ঘুম আসত না ওর। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করত. আর শুনলে অবাক হবেন, মনে মনে প্ল্যান করত কী করে এর শোধ নেবে।

—শোধ নেবে মানে? কিসের শোধ? রীতিমত উষ্মার সুরে বলে উঠেছিলেন ভদ্রলোক।

—আপনাদের অবহেলার। ভুলে যাচ্ছেন ও আপনাদের একমাত্র সন্তান।

—আপনি ভুল করছেন। আমরা তো ওকে একদিনের তরেও অবহেলা বা অনাদর করিনি।

সাহেব হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন, সে কথার কোনো জবাব দেননি। তারপর বলেছিলেন, আপনার পকেট থেকে যখন দু একটা টাকা চুরি যেতে শুরু হল, আপনারা প্রথমে সন্দেহ করলেন চাকরটাকে। মারধোরও করলেন খানিকটা, কিন্তু চুরি বেড়ে চলল এবং ছড়িয়ে পড়ল মানি ব্যাগ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগে। তারপর একদিন চাকরটাই বলে দিল, চোর কে। খোকা অস্বীকার করতে পারত, বেশীরভাগ ছেলে তাই করে। কিন্তু ও করেনি। কতো ভাল ছেলে আপনাদের! তবু আপনি তাকে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন।

—কী করবো! আমার ছেলে চোর, এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনি।

—জানি। কিন্তু কেন চুরি করছে, জানতে চাননি, ভেবেও দেখেননি। শুধু টাকা পয়সা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছিলেন। কিন্তু তখন সে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। নতুন ছবি আসা মাত্র না দেখলে ভাত হজম হয় না, যেমন আপনাদেরও হত না। মাঝেমাঝে দু-একজন বন্ধু-বান্ধব মিলে চীনে হোটেলে জাঁকিয়ে না বসলেই বা চলে কেমন করে? তাই নিজের বাড়ির বাক্সে যখন তালা পড়ল, পরের বাড়ির তালা ভেঙে সাইকেল নিয়ে সরে পড়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল; বলুন?,

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ও বুঝি এ সব কথাই বলেছে আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ও কিছুই বলেনি। দুটো একটা প্রশ্ন করে, বাকীটুকু ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি নিজেই অনুমান করে নিয়েছি। এতো শুধু আপনার ঘরের কথা নয়, এখানে যারা আছে তাদের অনেকের পেছনেই রয়েছে ঐ এক ইতিহাস। একটু এদিক আর ওদিক! দেখে দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। হয়তো কিছু বাড়িয়ে বলেছি, কিংবা—

—না, কিছু বাড়িয়ে বলেননি আপনি', বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু তার থেকে এতবড় সর্বনাশ হবে, একবারও কি ভাবতে পেরেছিলাম?'

ভারী করুণ শোনালো ভদ্রমহিলার কথাগুলো। ঘরের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল। কিছুক্ষণ কারো কোনো কথা শোনা গেল না।

তারপর ভদ্রলোক বললেন, যা হয়ে গেছে তার তো আর প্রতিকার নেই। এখন কি করে ছেলেটাকে আমরা ফিরে পেতে পারি, সেইটুকু আপনাকে করে দিতে হবে, মিষ্টার ঘোষ। আমি একাই আসছিলাম, কিন্তু ও'কে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।...বলে, স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলেন।

মিষ্টার ঘোষ ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এর আগেও যেন আপনি এসেছিলেন একবার।

—একবার নয়, দু-দুবার এসে ফিরে গেছি। উনি জানেন না। কিন্তু একটিবার চোখের দেখাও দেয়নি হতভাগা।

বলতে বলতে মুখ নিচু করে আঁচলে চোখ মুছলেন। ভদ্রলোক অনুনয়ের সুরে বললেন, আপনি চেষ্টা করলে দুমিনিটের জন্যে হয়তো একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন। আপনার কথা সে নিশ্চয়ই অমান্য করবে না।

—তা করবে না। তবে, সেটা আমি চাই না মিষ্টার ব্যানার্জি। এদের মনের ওপর কোনো জোর খাটানো বা চাপ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। নিজে থেকে যদ্দিন না আসে, আপনাদেরও অপেক্ষা করতে বলবো।

মৃদু হেসে যোগ করলেন, বয়সটাই যে অদ্ভুত। প্রথমে উগ্র অভিমান, তারপরে আসে লজ্জা। শ্রীমানের বোধহয় সেই স্টেজ চলছে। থাক কিছুদিন নিজের মনে। লজ্জাবতী লতা যেমন ছুঁলেই কুঁকড়ে যায়, এরা আবার তার ওপরেও এককাঠি।

বলে আর একদফা ছাদ ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন লেফটেনাণ্ট ঘোষ।

ও'দের কথাবার্তায় ছেলেটার নামের উল্লেখ না থাকলেও দিলীপ আন্দাজ করতে পেরেছিল। শচীন ব্যানার্জি, ইনডাসট্রিয়াল বয়। মাস দু-এক আগের আমদানী।

সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে শচীন এবং আরো অনেকের সঙ্গে নিজেকে সেদিন সে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সহজে কোনো মিল খুঁজে পায়নি। সে যেন সবার থেকে আলাদা। সাহেবের কথাগুলোও একটি একটি করে ভেবে দেখেছিল। তার জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায়? বাবাকে সে পায়নি। তার সমস্ত শৈশব জুড়ে আছে শুধু মা। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ তন্ন তন্ন করেও তো কণামাত্র অবহেলা বা অনাদর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবটুকু ভরে আছে অপরিসীম স্নেহ। শুধু একটি দিনের সেই একটি মাত্র রূঢ় কথা, একটি মাত্র আঘাত। কিন্তু কত দুঃখ, কত বড় লাঞ্ছনায় মা সেদিন হাত তুলেছিল তার গায়ে, মুখ ফুটে বলেছিল সেই দুটি মর্মান্তিক কথা, দিলীপের চেয়ে কে বেশী জানে? সেদিন সে জ্ঞান তার ছিল না। হয়তো তার জন্যে দায়ী মায়ের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ-যত্নময় কোমলরূপ, চোখ ফুটবার পর থেকে অত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও মুহূর্তের তরে যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাঝেমাঝে একটু যদি কঠোর হত মা, কিংবা একটু কম ভালবাসত তাকে, সেদিনকার আঘাতটা বোধহয় অতখানি তীব্র হয়ে বাজত না। ভালবাসা যেখানে যত গভীর, অভিমানটাও সেখানে তত বেশী উগ্র।

পরবর্তীকালে দুনিয়াটাকে যখন সে আরো স্পষ্ট করে চিনতে শিখেছে, যখন বুঝতে পেরেছে, জীবন-প্রত্যূষে যে মসিরেখা তার ললাটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, সংসারের কাছে সেইটাই তার পরিচয়, তখনো মাঝে মাঝে ঘোষ-সাহেবের নানাদিনের নানা কথা তার মনে আন্দোলিত হত। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করত, তার কপালের উপর এই যে পাপচিহ্ন তার জন্যে তার শিশুমন যদি দায়ী হয়ে না থাকে, তবে কে দায়ী? এ কার পাপ? উত্তর পায়নি।

এই প্রসঙ্গে একদিন, সেই ছেলে-

বেলায় মায়ের মুখে শোনা কয়েকটি কথা তার মনে পড়েছিল।

যা মা বলেছিলেন, সেদিন তার পুরো-পুরি অর্থবোধ হয়নি। কিন্তু কথা গুলোর একটা ক্ষীণ রেশ বোধহয় লুকিয়ে ছিল মনের কোনো কোণে। অনেকদিন পরে সেইটুকুই হঠাৎ ভেসে উঠেছিল চেতনার মধ্যে। মা বলে-ছিলেন, খোকা তুই যখন বড় হবি, একটা কথা কোনোদিন ভুলিস না। লোভের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। লোভই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়, অন্যায়ের দিকে টানে। যেটুকু তোর পাওনা, তাই নিয়ে খুশী থাকিস, তার বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাসনে। আমি যখন থাকবো না, আমার এই কথাটা মনে রাখিস, বাবা।

যে কোনো কারণেই হোক, মায়ের মনটা সেদিন ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পর একা একা অন্ধকার বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। ঘরের মধ্যে রেড়ির তেলের প্রদীপের নীচে দিলীপ বসে পড়ছিল, কিন্তু বই-এর পাতায় মন দিতে পারছিল না। মায়ের ম্লান মুখখানা বার বার ভেসে উঠছিল থেকে থেকে ঝাপসা হয়ে যাওয়া অক্ষর-গুলোর উপর। তারপর আর থাকতে না পেরে তার পাশটিতে এসে বসে পড়েছিল। মা তার দিকে তাকায়নি, বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে থেমে থেমে ঐ কটি কথা বলে গিয়েছিল। দিলীপের ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে, তোমার কী হয়েছে, মা? পারেনি। কেমন একটা ভয়-জড়িত-সংকোচ যেন তার গলাটা আটকে ধরেছিল। মায়ের আঁচলের একটা ধার চেপে ধরে নিঃশব্দে বসে ছিল তার গা ঘেঁসে।

সেইখানে বসেই মা আরো কত কী সব বলে গিয়েছিল সেদিন। তার সব-খানি তার মনে নেই। যেটুকু আছে তাও অস্পষ্ট। তার বেশীরভাগই যেন মায়ের নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। সে ছিল শুধু উপলক্ষ্য। অনেক কথার মধ্যে মা বলেছিল, তিনি তো চাননি। বারবার বলেছিলেন, 'এটা অন্যায়, এ আমি পারবো না। আমারই জিদ তাকে টেনে নামিয়েছিল। জিদ নয়, পাপ। শেষ পর্যন্ত আমার সেই পাপের ছোঁয়া তিনিও এড়াতে পারলেন না। সারাজীবনে যাঁর এতটুকু ময়লা কোথায় লাগেনি, শুধু নিষ্পাপ মানুষ যাবার সময় একটা কালো দাগ নিয়ে গেলেন! কিন্তু সে কালি আমি তোর গায়ে লাগতে দিইনি, খোকা। সে নোট আমি ছুঁইনি। হাস-পাতালের চিঠিটাও তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

—কোন্ নোট, মা?

—বড় হ; তারপর একদিন বলবো।

সে বলা আর হয়নি। সেই নোট এবং রহস্যময় ইতিহাস দিলীপের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। মায়ের মুখে সেদিন যা দেখেছিল, যা শুনেছিল, বড় হবার পর তার থেকে একটা ধারণাই শুধু গড়ে উঠেছিল তার মনে—ঐ নোট তাদের জন্যে কেবল অকল্যাণ বয়ে আনেনি, ওর মধ্যে জড়িয়ে আছে তার বাবার জীবনের কোনো মসিচিহ্ন। তবে কি ঐখানেই রয়েছে তার প্রশ্নের উত্তর? জ্ঞান হবার আগেই যে কালো রেখা কপালে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটা কি তার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার? জন্মার্জিত অভিশাপ? তাই বা কেমন করে হবে? যিনি আজন্ম-শুভ্র, আজীবন শুদ্ধাচারী, তাঁর এই মুহূর্ত-লব্ধ কালিমা-স্পর্শ কি এত গভীর যে সন্তানের ললাটেও তার ছাপ থেকে যাবে? সেই অভিশপ্ত অর্থ তো তারা ভোগ করেনি। স্পর্শ পর্যন্ত করেনি মা। তার নিজের জীবনের কোনো-খানেও সে-টাকার ছোঁয়াচ লাগেনি। তবে? এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। হতে পারে, পাপ অবিনশ্বর, তাকে মুছে ফেলা যায় না। নোট ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু তার মধ্যে অলক্ষ্যে জড়িয়ে আছে যে অন্যায় লিপ্সা, তার কখনো ধ্বংস নেই। তার সংক্রমণ এড়ানো যায় না। অকস্মাৎ একদিন কোনো অনুকূল আবহাওয়ার স্পর্শ লেগে একটি শিশুমনের মধ্যে যখন সে ফুটে বেরোয়, সৎ এবং সভ্য জগৎ সেই অবোধ ও অপোগণ্ড মানুষটার উপরেই চাপিয়ে দেয় সকল দায়। সারা-জীবন ধরে তাকেই তার দণ্ড দিতে হয়। কেউ জানতে চায় না, তার মধ্যে কোথা থেকে এল এই কালব্যাধি, প্রভাতের অস্ফুট কলিকায় একটা বিষাক্ত কীট হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল কেমন করে?

বর্স্টাল স্কুল থেকে মুক্তি পাবার অনেক দিন পরেও পেছনের দিকে তাকিয়ে দিলীপের মন মাঝেমাঝে এই সমাধানহীন প্রশ্নজালে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। (ক্রমশ)

"তোমার কী হয়েছে মা?"

মতামত

॥ আধুনিক চিত্রকলা ও পূর্বপক্ষ ॥

(১)

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যা অমৃতে জৈমিনির আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কীয় বক্তব্যটি দুঃসাহসিক হলেও সমর্থনীয়। গত ছ'মাসে আমি সম্ভবতঃ কুড়িটি চিত্র-প্রদর্শনী দেখেছি এবং আধুনিক চিত্রধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি। আধুনিক তরুণ চিত্রকরদের সম্বন্ধে আমার যাবতীয় ঔৎসুক্য, চিত্র-প্রদর্শনীগুলো দেখবার পর একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রদর্শনীতে একই ধরনের অঙ্কন-বিকৃতি (distortion-এর বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক পেলাম না) রঙের ব্যবহার এবং দৃশ্যনির্বাচন চোখে পড়ল। আমি সন্দেহ করি যে, distortion ছাড়া আজকের তরুণ শিল্পীরা ছবি আঁকতে পারেন না। Drawing-এর শিক্ষা শিল্পীর প্রাথমিক গুণ। এবং এই Drawing-এর যথাযথ শিক্ষা থাকলেই distortion-এর দিকে শিল্পী যেতে পারেন। ব্যাকরণগত শব্দের ওপরেই যাঁর দখল নেই, তিনি স্বভাবতঃই ব্যাকরণ-বহির্ভূত শব্দনির্মাণের অধিকারী নন। জেমস জয়েসের অনেক অদ্ভুত নতুন শব্দকে আমরা মেনে না নিলেও সম্মান করতে পারি, কিন্তু শিশুর স্বকল্পিত শব্দমালাগুলো নিছক মা'-মাসী ছাড়া আর কারো মনে ছাড়পত্র পাবে না নিশ্চয়ই। Drawing-এ আধুনিক তরুণ চিত্রকরদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবের ফলে distortion-এরও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে না প্রদর্শনীগুলোতে। যে আঙ্গিক ইয়োরোপের শিল্পীরা অনেকদিন হল পরিত্যাগ করেছেন, আমাদের শিল্পীরা আজো সেই আঙ্গিকের রঙেই তুলি ডুবিয়ে আছেন! ফলে তাঁদের ছবি না হচ্ছে কলাশ্রিত না হচ্ছে দেশাশ্রিত। বাংলা সাহিত্যে, বাংলা লোকশিল্পে, এমনকি বাংলার বস্ত্রশিল্পেও দেশকে চেনা যায়, কিন্তু আধুনিক চিত্রে যেন শিল্পীরা সমবেতভাবে দেশকে নির্বাসিত করেছেন। আজকের শিল্পীরা রঙের ব্যবহারেও বিদেশ-বর্ণে বন্দী। রঙের ব্যবহারে সূর্যের অর্থাৎ আলোর ভূমিকাকে এ'রা প্রায় অনেকেই অস্বীকার করে ছবি আঁকেন। ইয়োরোপের আকাশের আলো আর আমাদের প্রকৃতি-কিরণ এক না। ইংল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ-এর রঙ যে-আলোয় নিয়ন্ত্রিত হবে, আমাদের সূর্য করোজ্জ্বল দিন সেই রঙে উজ্জ্বল হবে না। তাছাড়া আলোর ভাঙ্গনও দুদেশের পৃথিবীতে দুরকম। কিন্তু এদেশের শিল্পীরা এ-সমস্ত তথ্যের ওপর কখনই নির্ভর করে রঙ ব্যবহার করেন না। "যদ্দৃষ্টং তৎ আঁকিতং" এই হচ্ছে আধুনিক অনুকারী শিল্পীগোষ্ঠীর মূলমন্ত্র।
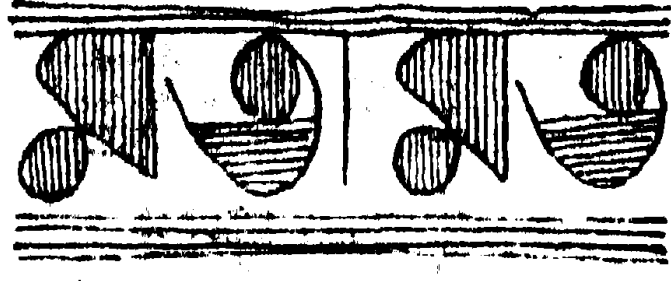
শিল্পীর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য তার কল্পনাশক্তি। সেদিক দিয়ে যে আমাদের শিল্পীরা কি নিদারুণ দরিদ্র তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এ'দের দৃশ্য-নির্বাচন দেখলে। আমি গত প্রদর্শনী-গুলিতে সব মিলিয়ে অন্ততঃ কুড়িটা স্টিল দেখেছি যার বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি টেবিলে কয়েকটি আপেল, এক-থোকা আঙুর আর পেছনে একটা বিশেষ ধরনের বোতল (সম্ভবতঃ মদের!)। রঙের ব্যবহারে অঙ্কনরীতিতে সবকটা স্টিলই যেন একটি অন্যগুলির ফোটো-গ্রাফ। জানি না এই এক দৃশ্য শিল্পীরা কোন ভাগ্যবানের বাড়িতে দেখেন প্রত্যহ যে তাঁদের এই বিষয়বস্তুটি এত প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া জাহাজঘাটার একই দৃশ্য, সেই ছাদের ওপর থেকে ধোঁয়াটে শহর দেখা (ধোঁয়াটে হবেই কারণ লণ্ডন ধোঁয়াটে!)। ন্যুডের নামে অবয়বহীন মাংসপিণ্ডের "ম্যাসিভ" চিত্র-প্রকাশ হাল আমলের প্রদর্শনীগুলির ব্যাধিবিশেষ।

এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল এই প্রদর্শনীগুলির যথাযথ সমালোচনা হয় না। অবশ্য না হওয়ার কারণও হয়ত আছে। যে দেশে তরুণ শিল্পীদেরই উপযুক্ত চিত্রশিক্ষা নেই, সে দেশের চিত্রসমালোচকদের কাছ থেকে উপযুক্ত সমালোচনা আশা করা অন্যায়। এবং চিত্রসমালোচকবৃন্দ যেহেতু প্রায়শঃই ব্যক্তিগত পরিচয়কে মানদণ্ড করে সমালোচনা করেন, খাঁটি সমালোচনা তাঁদের কাছে প্রায় বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

চিত্রপ্রদর্শনীগুলির একটি হাস্যকর দ্রষ্টব্য হল ক্যাটালগে লিখিত ছবির দাম! প্রমাণ সাইজের যে কোনো ছবির দামই একশ টাকার ওপরে। বেশী দাম লেখাটা যেন চিত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে জড়িত! ছবিগুলির দাম বেশী হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি চিত্ররসিক বাঙালী কখনো ছবি কিনতে পারেন না। যাঁরা দু'চারখানা কেনেন তাঁদের চিত্র-ধারণা সাগরপার থেকে আমদানী করা। ফলে তাঁদের সন্তোষার্থে আজকের চিত্রকল'ও কখনই ছবি হয় না, প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রদর্শনীর দেয়ালে ঝোলে।

ইতি—

—বারীন ঘোষ, যতীন দাস রোড।

(২)

সম্পাদক, 'অমৃত'

সমীপেষু—

'অমৃত' পত্রিকার 'পূর্বপক্ষ'-র প্রখ্যাত লেখক শ্রীজৈমিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কলা-সমালোচকদের বেশ এক হাত নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগের অনেকখানিই স্বীকার করে নিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত অজস্র চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে কলা-সমালোচকেরা যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে এক শিল্পী থেকে অন্য শিল্পীর গুণগত পার্থক্য বুঝে নেওয়া সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, শিল্পীর সৃষ্টিকলা সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, আলোচ্য শিল্পীরা সবাই বুঝি এক দরের। শ্রীজৈমিনী এই ধরণের সমালোচনার বিপক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করে সঙ্গত কাজই করেছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে শ্রীজৈমিনীর জ্ঞাতার্থে কয়েকটি বক্তব্য আছে। সম্প্রতি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পীর দর্শন কি তিনি পেয়েছেন? বোধহয় না। এই যখন অবস্থা তখন মাঝারি বা তার থেকে কম প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকেরাই তো আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের প্রবহমানতাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এ-কথা আশা করি তিনি স্বীকার করবেন। এই মাঝারিদের যখন মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করে সমালোচকদের অগ্রসর হতে হয়, তখন তৃতীয় সারির শিল্পী-সাহিত্যিককেও তাঁরা আর উপেক্ষা করতে পারেন না। আর, বাংলার উপেক্ষিত শিল্পী-সমাজকে কলা-সমালোচকেরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করেন। প্রধানতঃ এই দুটি কারণেই মাঝের এবং তৃতীয় সারির শিল্পীদের তাঁরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে বসিয়ে যে সমালোচনা লেখেন তাতে পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বাংলার শিল্পী-সমাজ ও দর্শকের বর্তমান চেতনা-স্তরে সমালোচকের পক্ষে এর বেশি বাড়াবাড়ি না করাই ভাল।

একটা কথা অবশ্য ঠিক। আধুনিকতা বা বিমূর্ত শিল্পকলার নামে তরুণ শিল্পীরা যা-খুশি-তাই যখন সৃষ্টি করেন তখন সমালোচনার খড়্গ সেই অসুস্থতাকে দ্বিখণ্ডিত করে যদি সত্যিকার পথের সন্ধান না দিতে পারে তবে কি হবে 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি'-র সমালোচনায়? এ-দিকে জৈমিনী কলা-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি—পীযূষ দাশ, কলিকাতা।

বিজ্ঞানের গল্প

অয়স্কান্ত

॥ প্রকৃতির বর্ণলিপি ॥

আপনাকে যদি চুল কাটবার জন্যে কোনো সেলুনে যেতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি কোনো ওষুধের দোকানে ঢুকবেন না। কেন? না, দোকানের বাইরে সাইনবোর্ডের লেখা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন, এই দোকানটি ওষুধ বিক্রি করবার জন্যে চুল কাটবার জন্যে নয়। তেমনি আপনার পকেটে যদি রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বরটি থাকে তাহলে সেই বিশেষ বাড়িটি আপনি অনায়াসেই খুঁজে বার করতে পারেন। কলকাতাতে অবশ্য কোনো কোনো রাস্তায় বাড়ির নম্বর এখনো খুবই ওলোট-পালোট—তাহলেও খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসে ইন্দিরা শুধু এইটুকু জানত যে, তার জ্ঞাতিখুড়ো কলকাতায় থাকেন। এই জানাটুকু যথেষ্ট ছিল না। মহেশপুর গ্রাম হলে হয়তো ব্যাপারটা অসাধ্য হত না, কিন্তু কলকাতায় ইন্দিরার জ্ঞাতিখুড়োকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাঠক হিসেবে আমরা অবশ্য তাতে লাভবানই হয়েছি, কারণ ইন্দিরার জ্ঞাতিখুড়োকে খুঁজে পাওয়া গেলে ইন্দিরা উপন্যাসটি মাঠে মারা যেত।

যাই হোক, আসল কথাটা এই যে, আমাদের চলাফেরাটা কখনো ঠিকানা বিহীন নয়। আর এই ঠিকানা আসলে কী? বিশেষ একটি বর্ণলিপি মাত্র—কয়েকটি স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ অর্থসূচক একটি সমাবেশ। এই বর্ণলিপি যদি আয়ত্ত থাকে তাহলে আস্তো একটি মহাভারতও অনায়াসে পড়ে ফেলা যায় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রই অনধিগম্য থাকে না। আজকের দিনে যাঁরা পৃথিবীর দিগ্‌গজ পন্ডিত, তাঁদেরও একেবারে গোড়ার ধাপে বর্ণপরিচয় নিয়ে বসতে হয়েছে।

কিন্তু সাদা কাগজের ওপরে কালো কালির আঁচড়ে যে বর্ণলিপি ফুটে ওঠে, তা ছাড়াও আরো এক ধরণের বর্ণলিপি আছে যা প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষের জানা দরকার। এটি হচ্ছে প্রকৃতির বর্ণলিপি। এই বর্ণলিপিতে অক্ষরের সংখ্যা একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। আকাশের প্রত্যেকটি তারা হচ্ছে একটি অক্ষর। রাস্তার প্রত্যেকটি নুড়ি। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ।

প্রকৃতির বর্ণমালায় যার হাতেখড়ি হয়নি তার কাছে আকাশের প্রত্যেকটি তারাই একই রকম মনে হবে। কিন্তু জ্যোতির্বিদকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, প্রত্যেকটি তারার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। প্রত্যেকটি তারার আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর বর্ণমালার বিশেষ বিশেষ অক্ষরের সমাবেশে যেমন বর্ণলিপি, তেমনি আকাশের বিশেষ বিশেষ তারা মিলে তারামন্ডল।
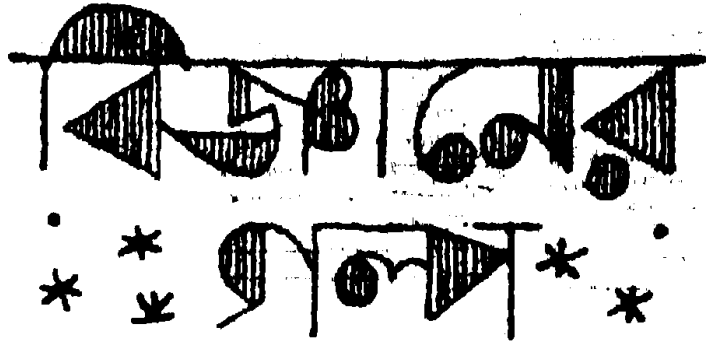
সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময়ে নাবিকরা এই আকাশের বর্ণলিপি থেকে দিগ্‌-নির্ণয় করে। শুধু আজকের দিনে নয়, বরাবরই। অবশ্যই নাবিকরা কম্পাস-যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কম্পাস না থাকলে আকাশের এই বর্ণলিপিই একমাত্র পথের হদিশ।

আকাশের মেঘও এমনি আরেক ধরণের বর্ণমালা। এই বর্ণমালার অক্ষরেও আকাশে বিচিত্র সব লিপি ফুটে ওঠে। এই লিপি যাঁরা পাঠ করতে পারেন তাঁদের পক্ষে আবহাওয়ার হদিশ বাতলানো কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আকাশের মেঘ কখনো পেঁজা তুলোর মতো কখনো জমাট অন্ধকারের মতো, কখনো ছোপ ছোপ রঙের মতো। এই মেঘের দিকে তাকিয়েই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে দিতে পারেন, ঝড় হবে, না, বৃষ্টি। কখনো কখনো দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় একরাশ মেঘ কামারশালের নেহাইয়ের মতো ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ বৈমানিকরা এই মেঘ থেকে দূরে সরে থাকেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, প্রচন্ড একটা ঝড়ের তাড়নাতেই মেঘের এমনি চেহারা হতে পারে।

আকাশের বর্ণলিপি আরো অনেক আছে। পাখির ঝাঁক যখন বিশেষ একটি জ্যামিতিক বিন্যাস বজায় রেখে এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যায় তখন তার মধ্যে থাকে একদেশের শীত ও অপর-দেশের বসন্তের খবর। এই উড়ন্ত পাখির ঝাঁককে পর্যবেক্ষণ করেই কত বিজ্ঞানী সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃতির বর্ণলিপি শুধু আকাশেই নয়, পায়ের তলায় মাটিতেও। কিন্তু এই বর্ণলিপি আয়ত্ত করতে হলেও অনেক অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন চাই।

মনে করা যাক, কোনো এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চুনাপাথরের একটা স্তর পাওয়া গেল। অনভিজ্ঞের কাছে ব্যাপারটার কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু যিনি এই বর্ণলিপি পাঠ করতে জানেন তাঁর কাছে এই চুনাপাথর আশ্চর্য এক ইতিহাস মেলে ধরবে। এই চুনা-পাথর তৈরি হয়েছে ক্ষুদে ক্ষুদে সামুদ্রিক ঝিনুক থেকে। তার মানে যেখানে এখন এই চুনাপাথরের স্তরটি পাওয়া যাচ্ছে সেখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিশ্চয়ই সমুদ্র ছিল।

কোনো গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল মস্ত একটি গ্রানাইট পাথরের চাঁই। হয়তো গ্রানাইট বলে আর চেনা যাচ্ছে না। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে রয়েছে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে গ্রানাইট পাথরের চাঁই কোত্থেকে এল? প্রকৃতির বর্ণলিপি যাঁরা পাঠ করতে জানেন তাঁরা এ-প্রশ্নের জবাব বলতে পারবেন। এই গ্রানাইট পাথর এসেছে হিমবাহের সঙ্গে যখন এই অরণ্যের চিহ্ন-মাত্র ছিল না আর একটা হিমযুগ চয়-

দিকে সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়ে জাঁকিয়ে বসছিল।

এমনি ধরণের বর্ণলিপি পৃথিবীর মাটির প্রত্যেকটি স্তরে লেখা হয়ে আছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বছরের ইতিহাস পাঠ করা যেতে পারে এই বর্ণলিপিতে। বিজ্ঞানীরা এই বর্ণলিপি থেকেই প্রাগৈতিহাসিক কালের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন।

॥ বেড়ালের প্রাণ ॥

বেড়ালের নাকি ন'টি প্রাণ। কথাটার মানে একটা মানে এই করা যায় যে, বেড়ালের শরীরে ন' রকমের বিভিন্ন আয়োজন আছে যা বেড়ালকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের দেশে বেড়ালকে আমরা বলি বাঘের মাসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেড়ালকে আমরা খুব যে সমীহ করে চলি তা নয়। আর বাঘের মাসীটিও ইঁদুর বা পাখির ছানা শিকারে যতোই পটু হোক অন্তত মানুষের ওপরে কখনো বিক্রম দেখাতে আসে না। অবশ্যই যদি না নিতান্তই কোণঠাসা হয়। তবে সরাসরি বিক্রম না দেখালেও মানুষের সামান্যতম অন্যমনস্কতার সুযোগে পাতের মুড়ো বা বাটির দুধ অনায়াসে উদরসাৎ করতে পারে। কমলাকান্তের বেড়ালটি আবার আরো এক কাঠি ওপরে। লাঠির তাড়া খেয়েও বিজ্ঞের মতো যুক্তিজাল বিস্তার করে উদ্যত লাঠিকে নিরস্ত করেছিল।

যাই হোক, বেড়ালের ন'টি প্রাণের কথায় আসা যাক।

প্রথম কথা এই যে, বেড়ালকে যতো উঁচু থেকে যেভাবেই ফেলা যাক না কেন, বেড়াল সবসময়ে তার পায়ের ওপর পড়ে। গাছের মগডাল থেকে মাটিতে পড়লে একজন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে যাবে, হয়তো প্রাণের আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে. কিন্তু বেড়াল সম্ভবত বেঁচে যাবে। মাটিতে পড়বার সময় সবচেয়ে আগে মাটি ছোঁবে তার পা চারটি আর মনে হবে যেন চারটি তুলো-লাগানো স্প্রিং সেই প্রচন্ড পতনের বেগকে আলগোছে থামিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য, বেড়ালের মতো পা মাটির দিকে রেখে পড়তে পারার ক্ষমতা সব মেরুদন্ডী জীবেরই অল্পবিস্তর আছে, তবে বেড়ালের মতো এমন নির্ভুল অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। শুধু চোখের নয়, ক্যামেরার সাক্ষ্যেও দেখা গিয়েছে যে, মাটিতে পড়বার সময়ে শরীরকে ঠিকমতো ব্যালান্স করার ব্যাপারে বেড়ালের কোনো সময়েই কোনো ভুলচুক হয় না। এই হচ্ছে বেড়ালের এক নম্বর প্রাণ।

বেড়ালের দু' নম্বর প্রাণটি রয়েছে তার গোঁফে। এই গোঁফও বেড়ালের এক-চেটিয়া নয়। মানুষের তো আছেই, অন্য প্রায় সমস্ত জীবেরই আছে। এমন কি যে তিমিমাছের গায়ে এমনিতে লোমের কোনো বালাই নেই সেই তিমিমাছেরও ওপরের ঠোঁটে কয়েক গাছি গোঁফ রয়েছে। কিন্তু বেড়ালের গোঁফের মতো এমন স্পর্শপ্রবণ গোঁফ অন্য কোনো জীবের মুখমন্ডলে নেই। মানুষের গোঁফ তো নিতান্তই একটা বাহারের ব্যাপার, অধিকাংশ মানুষই বাজে জিনিসের মতো তার মূলোৎপাটন করে—কিন্তু এমন কি বাঘের গোঁফকেও বেড়ালের গোঁফের কাছে হার মানতে হবে। অন্ধকারে চলাফেরা করবার সময়েও বেড়ালের গোঁফের সঙ্গে যদি কোনো জিনিসের সামান্যতম ছোঁয়াও লাগে, বেড়াল সঙ্গে সঙ্গে তা টের পায় এবং সাবধান হয়ে যেতে পারে।

বেড়ালের তিন নম্বর প্রাণ হচ্ছে তার ঘ্রাণশক্তি, আর চার নম্বর তার শ্রবণশক্তি। এই দুটি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করার কিছু নেই। কুকুর ও অন্যান্য অনেক জীবের ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেড়ালের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়।

পাঁচ নম্বর—বেড়ালের দৃষ্টি। কথায় বলে, বেড়াল অন্ধকারেও দেখতে পায়। কথাটা এভাবে বলা ঠিক নয়। অন্ধকারে কোনো জীবই দেখতে পায় না। কিন্তু বেড়াল যতোখানি দেখতে পায় এমন আর অন্য কোনো জীব নয়। সকলেই জানেন যে, বেড়ালের চোখের মণি ছোট-বড়ো হতে পারে। ভরা দুপুরে মণি দুটো হয়ে ওঠে পিনের মাথার মতো দুটি বিন্দু আর সন্ধ্যার পরেই হয়ে ওঠে প্রায় একটা নয়া-পয়সার মতো গোল ও বড়ো। চোখের মণি এভাবে বড়ো হয়ে যাবার দরুণ খুব আবছা আলোতেও বেড়াল দেখতে পায়।

ছ' নম্বর—আস্তানা চিনে ফিরে আসার ক্ষমতা। বাড়ির পোষা বেড়ালের পক্ষে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু বুনো বেড়ালও বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে কখনো হারিয়ে যায় না। এমন কি বেড়ালকে ট্রেণে চাপিয়ে অনেক দূরের এলাকায় এনে ছেড়ে দিয়েও দেখা গিয়েছে যে রাস্তা চিনে ফিরে যেতে বেড়ালের খুব বেশী অসুবিধে হয় না।

এ ছাড়াও আরো তিনটি প্রাণ আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে কোণঠাসা হলে বেড়াল গায়ের লোম খাড়া করে শরীরটাকে অনেকখানি ফুলোতে পারে। বেড়ালের এই রাগের মূর্তি দেখে অনেক পরাক্রমশালী জানোয়ারও পালিয়ে যায়। এমন কি অনেক মানুষও বেড়ালের এই মূর্তিকে ভয় পায়।

তাহলেও বেড়ালের আরো দুটো প্রাণ থেকে যায়। বেড়ালের ক্ষিপ্রতা, বেড়ালের বাৎসল্য ইত্যাদি অনেক কিছুর উল্লেখ করে এই শূন্য স্থান দুটিকে পূরণ করা চলে। কিন্তু তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এতক্ষণের আলোচনায় এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, বেড়ালের ন'টি প্রাণের কল্পনা নিতান্তই একটা কুসংস্কার। অন্যান্য জীবের মতো বেড়ালের শরীরেও কতকগুলি স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জা আছে কিন্তু তার মানে এই নয় বেড়াল বার বার আটবার মরবার পরেও বেঁচে ওঠে। বেড়াল সম্পর্কে কুসংস্কার আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে বেশী। বেড়াল নাকি ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপরে চেপে বসে ফুসফুস থেকে বাতাস টেনে নেয়, কালো বেড়াল নাকি অমঙ্গলের লক্ষণ, ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুষি বেড়ালকে ভালোবাসে না এমন মানুষ সম্ভবত নেই।

আর্নেস্ট লুবিৎস

প্রভাতকুমার দত্ত

ফিল্ম কমেডির স্রষ্টা হিসাবে চার্লি চ্যাপলিনের খ্যাতির সমপর্যায়-ভুক্ত আরেকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন জার্মান চিত্রপরিচালক আর্নেস্ট লুবিৎস। বর্তমান শতকের তিরিশের যুগে ফিল্ম মহলে 'Lubistch Touch' কথাটির খুব প্রচলন ছিল। এই কথাটির মধ্যে লুবিৎসের বিস্ময়কর প্রতিভার আসল তাৎপর্য নিহিত। লুবিৎসের প্রতিভা তিরিশের যুগের ফিল্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলেও বর্তমানের ষষ্ঠ দশকেও সে প্রতিভার গুরুত্ব স্মরণীয়। ফিল্ম টেকনিকের বিবর্তনে গ্রিফিথ আইজেনস্টাইনের মত লুবিৎসও উজ্জ্বল তারকা। লুবিৎস থেকে আজকের চিত্রপরিচালকদেরও বহু জিনিস শিক্ষা নেওয়ার আছে। হলিউডে চার্লি চ্যাপলিনের ভাস্বর প্রতিভা যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল সেই অবস্থায় লুবিৎস ঐ হলিউডেই নিজস্ব স্বকীয়তায় ফিল্ম পরিচালক হিসাবে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। এটা কম কথা নয়।

১৯২২ সালে লুবিৎস হলিউডে আসেন। তাঁর পিতৃভূমি জার্মানী। হলিউডে আসার আগে জার্মানীতে তিনি দীর্ঘ তের বছর সিনেমার কাজ করেছেন। ছোট বয়স থেকেই লুবিৎসের সিনেমার অভিনেতা হবার বিশেষ শখ ছিল। আঠারো বছরের সময়ই সুদার-ম্যান, শ ও ওয়াইল্ডের নাটকের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাবার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবসা ছিল। অভিনয়প্রীতির জন্য পৈতৃক ব্যবসার দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন বায়োস্কোপে কাজ করেছেন। এখানে তাঁর কাজ চন্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত। কখনও অভিনয় করতেন, কখনও সেট ঘাড়ে করে বইতেন আবার কখনও তাঁকে দেখা যেত ক্যামেরার সাজসরঞ্জাম এদিক-ওদিক করতে। প্রথম মহাযুদ্ধের মুখে তিনি ছিলেন বার্লিনের রাইন-হার্ড কোম্পানীর অভিনেতা। এই সময়ে তিনি 'সমুরাস' নামে একটি ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতরণ করেন। ছবিটি খুবই সাফল্য লাভ করে। লুবিৎস এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতা থেকে অভিনেতা-পরিচালকের পদে উন্নীত হন। প্রথম তিনি তোলেন দুটি দু' রীলারের কমেডি। এরপর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় কয়েকটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিচার ফিল্ম। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। আমেরিকায় লুবিৎসের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর চারটি ছবি আমদানী করা হয়। এই ছবিগুলি দেখে আমেরিকাবাসীরা শুধু চমকিত হননি তাঁরা লুবিৎসের প্রতিভার স্বকীয়ত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা থেকে হলিউডের ফিল্ম ব্যবসার একটা বৈশিষ্ট্য হোল যে, সে সব সময়েই উঠতি প্রতিভাকে নিজের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। জার্মানীতে সাফল্যের সাথে সাথেই লুবিৎসকে হলিউড টেনে নেন। সেটা হচ্ছে ১৯২২ সাল। গোড়াতেই আমরা একথা বলেছি।

লুবিৎসের ছবি তোলার স্টাইল ও কারিগরী ব্যবস্থা ছিল তাঁর একান্ত স্বকীয়। হাসা-কৌতুকমূলক 'ইমেজ' সৃষ্টি তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। দ্রুত প্রকাশমান চতুর প্লট-বিস্তার তাঁর ছবির অন্যতম গুণ। অভিনেতাদের কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার আছে ততটুকু বার করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লুবিৎসের। জাতিতে তিনি জার্মান—হলিউডের বিদেশী পরিবেশে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর অনুভূতি আর দেখার শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তাঁকে সব সময়ই দৃষ্টি রাখতে হত আমেরিকান দর্শকদের কিভাবে প্রভাবিত করা যায়। তাঁর নিজস্ব সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ ছিল এবং বিদেশে কাজ করায় সেটা আরো সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করেছিল। লুবিৎসের তোলা কমেডিগুলিকে সাধারণত Comedy of Manners বলা হয়ে থাকে। হলিউডে এসে লুবিৎস অনেকটা চ্যাপলিনের দেখাদেখি কমেডি সৃষ্টিতেই হাত দেন। Comedy of Manners-এ সম্বংশীয় তথা-কথিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। হাসা, কৌতুক ও শ্লেষের পরি-প্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর মানুষের মানস-প্রবণতার অদ্ভুতত্বকে ফুটিয়ে তোলাই Comedy of Manners-এর উদ্দেশ্য। লুবিৎসের wit ও humour -বোধ একান্ত ভাবে ইউরোপীয়। আমেরিকান সিনেমা-দর্শকদের কাছে জিনিসটা নতুন ও মনোমুগ্ধকর। ইউরোপীয় wit ও humour-এর চতুর প্রয়োগের জন্যই আমেরিকায় লুবিৎস এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

তৎকালীন হলিউডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড একটি Costume Drama পরিচালনা করার জন্য লুবিৎসকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলেন। নাটকটির নাম হচ্ছে Rosita। লুবিৎস Rosita-র মূল ভূমিকায় মেরী পিকফোর্ডকে পরিচালনা করেন বটে কিন্তু ছবিটি শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সাফল্য অর্জন না করতে পারলে পরিচালককে বিশেষ বিপদে পড়তে হয়। এই অসাফল্যের খবর বড় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। যে পরিচালক সবেমাত্র হলিউডে কাজ আরম্ভ করেছেন (অর্থাৎ লুবিৎস) তাঁর মেরী পিকফোর্ডকে নিয়ে এই অসাফল্যের পরিণাম ভয়াবহ বৈকি। তাই লুবিৎস ঠিক করলেন এরপর থেকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অভিনেতাদের নিয়ে ছবি তুলবেন এবং জার্মানীতে ইতিমধ্যে যে নাটকগুলিতে হাত দিয়েছিলেন সেগুলি নিয়েই কাজ চালাবেন। যতক্ষণ না তিনি হলিউডে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছেন ততদিন এইভাবে চলবে। লুবিৎসের পক্ষে এটা খুবই যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। তাঁর উপস্থিতবুদ্ধি ও বিচারশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়। এই সময়ে লুবিৎস গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর ছবি তোলা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। ছবির বিষয়ের দিক থেকে তিনি আদর্শ হিসাবে চ্যাপলিন, ডি মিল প্রভৃতিকেই গ্রহণ করেন। অবশ্য এথেকে পাঠকেরা ভাববেন না যে, লুবিৎস দ্বিতীয়

শ্রেণীর প্রতিভা ছিলেন এবং কেবল চ্যাপলিন-ডি মিলের অনুকরণ করেছিলেন। আমেরিকান দর্শকেরা তখন যে জিনিস চাইতেন লুবিৎস শুধুমাত্র তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিদেশী নতুন হলিউডে এসে এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

এই সময়ে লুবিৎসের তোলা ছবিগুলির মধ্যে The Marriage Circle ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটিতে রাণী ক্যাথারিনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রাণী ক্যাথারিন নানা পুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে নিজের উচ্চ পদের দায়িত্বকে ভুলে থাকতে চান। লুবিৎস এই কাহিনীর চিত্রগত রূপায়ণে যৌন বিষয়, রাজনৈতিক চাল, রাজসভার ভব্যতা প্রভৃতির উপর অনবদ্য শ্লেষোক্তি করেছেন। The Marriage Circle-র একটা বিশেষ দৃশ্যের কথা আমরা এখানে বলছি যা থেকে পাঠকেরা লুবিৎস টেকনিকের বৈশিষ্ট্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট এক দল লোকের সামনে বিপন্ন। অবস্থা এমনই সঙ্গীন যে, ছবির দর্শকেরা সবাই মুহূর্তে গুণেছেন এই বুঝি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি তাঁর জামার তলা থেকে রিভলবার বার করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যা বার করলেন তা বন্দুক নয় চেক বই। লুবিৎসের প্রতি ছবিতেই এ ধরণের সূক্ষ্ম শিল্পসুষমামণ্ডিত প্যাঁচ লক্ষ্য করা যায়। লুবিৎস চলচ্চিত্রের ভাষার আরেকটি দিকে এই সময়ে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে ফাঁকা স্থানের বিরাটত্বকে ফুটিয়ে তোলা। তাঁর অনেক ছবিতে বিরাট উঁচু দরজা, বহুদূরে প্রশস্ত সিঁড়ি, লম্বা ঝোলানো পর্দা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এগুলির সট্ নেওয়া হয়েছে খুব উপর থেকে ঝোলানো ক্যামেরার সাহায্যে। দর্শকের মনে ফাঁকা শূন্য স্থানের বিরাটত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলে পরিচালক দর্শকদের টেনে রাখতে তো পেরেছেনই তাছাড়া তাঁর কমেডিগুলিও অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। 'সেন্টিমেন্ট' জিনিসটাকে নিয়ে প্রত্যেক চিত্রপরিচালককেই কারবার করতে হয়। তবে লুবিৎস তাঁর ছবিতে জোলো সেন্টিমেন্টকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। তাকে সব সময়ই রং ঔজ্জ্বল্য ও বুদ্ধিদীপ্ততায় মণ্ডিত করেছেন। এটাই তাঁর স্বকীয়ত্ব। The Patriot নামে একটি ছবি তোলার পর লুবিৎসের নির্বাক ছবি তোলার পর্ব শেষ হয়। এরপর সবাক যুগ।

চলচ্চিত্রে সবাক যুগ আরম্ভ হয় ১৯৩০ সাল বরাবর। নির্বাক ও সবাক ছবি তোলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। নির্বাক ছবির টেকনিক সবাক ছবিতে একেবারে অচল। লুবিৎস এতদিন নির্বাক ছবি তুলে স্ব-পরিকল্পিত এক বিশিষ্ট চিত্র-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সবাক চিত্র এসে আগেকার চিত্র-পদ্ধতির আদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। লুবিৎস অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। অপরে শব্দকে চলচ্চিত্রে কিভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখার জন্য তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। কয়েক বছর কোন ছবি তুললেন না। নির্বাক-সবাক যুগের সন্ধিক্ষণে এই সমস্যা শুধু লুবিৎস কেন হলিউডের অনেকের কাছেই দেখা দিয়েছিল। নির্বাক ছবির রাজা চার্লি চ্যাপলিনও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শব্দ এসে নির্বাক যুগের পরিচালকদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিল। এই চ্যালেঞ্জ যাঁরা ঠিকমত গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী কালে তাঁরা সার্থক ছবি তুলেছিলেন। চ্যাপলিন ও লুবিৎস দুজনেই সবাক চিত্রের সার্থক স্রষ্টা। লুবিৎস যে কিছুদিন চুপচাপ দিন গুণেছিলেন সে শুধু চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য।

লুবিৎস প্রথমে যে তিনটি সবাক ছবি তোলেন সেগুলি সবই সঙ্গীত-মুখর। সবাক চিত্রে লুবিৎসের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে যে, তিনি সর্বপ্রথম ক্যামেরাকে শব্দনিরোধক ঘরের বন্দী-দশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোফোনকে সচল করে তুলেছিলেন। সবাক চিত্রের প্রথম দিকে পরিচালকেরা ক্যামেরায় ছবি আর শব্দযন্ত্রে শব্দ পূর্বাপর এক সঙ্গে গ্রহণ করতেন। ফলে ক্যামেরাকে ইচ্ছামত নড়ানো যেত না, তাকে শব্দনিরোধক ঘরে আবদ্ধ রাখা হত। কিন্তু এতে ছবির গতি ও আবেদন শ্লথ হয়ে পড়ে। সারা ছবিই 'ডায়লগে' ঠাসা হয়ে যায়। শ্রোতাদের চক্ষু ও কর্ণের সমান পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় না। তাই লুবিৎস ক্যামেরাকে মুক্তি দিলেন। তিনি অনুসরণ করলেন Blending অর্থাৎ মিশ্রণের নীতি। অর্থাৎ ক্যামেরা তার প্রয়োজন মত ছবি তুলে যাবে শব্দকে আলাদাভাবে ধরে পরে ছবির সঙ্গে sound image মিলিয়ে দেওয়া হবে। যেমন লুবিৎসের Monte Carlo ছবির একটা দৃষ্টান্ত। এ ছবিতে পরিচালক দ্রুত ধাবমান ট্রেণের চাকার শব্দ-ছন্দকে আলাদা ধরে রেখে একটি গানের সঙ্গীত সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর The Smiling Lieutenant ছবির অনেক স্থানেই বিনা মাইক্রোফোনে কাজ এগিয়েছে। এখানে প্রতিটি দরজা খোলা, লম্বা নেমে যাওয়া প্রশস্ত সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতিটি ভঙ্গীর সঙ্গে এমন একটি শব্দক্রম পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, তা দর্শকের মনে শিল্প-রসের অনির্বচনীয় স্বাদ এনে দিয়েছে। লুবিৎস ক্যামেরাকে গতিময় করে তুলেছিলেন বলেই তাঁর ছবির ইমেজ ডায়লগ এবং গান অদ্ভুত এক প্রবহমানতা লাভ করেছিল। এতে দর্শকের চক্ষু-কর্ণ দুয়েরই পরিতৃপ্তি হয়েছিল: যখনকার কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময়ে লুবিৎসের এই নতুন টেকনিকটি চলচ্চিত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। লুবিৎসের এই টেকনিক অনেকটা স্টেজ অপেরার সঙ্গে তুলনীয়।

লুবিৎস সাউণ্ড ক্যামেরাকে শুধু সঙ্গীতমূলক কমেডির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেননি যথার্থ গাম্ভীর্য বা গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের উপরও ছবি তুলেছিলেন। তাঁর নিদর্শন হোল ১৯৩২ সালে তোলা The Broken Lullaby ছবি। এখানে লুবিৎস কয়েকটি অপূর্ব সুপরিকল্পিত সটের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী বিষয়বস্তুকে মনোজ্ঞভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। Broken Lullaby গল্প গড়ে উঠেছে বিচিত্র এক মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে। একজন ফরাসী সৈনিক—তার মন অত্যন্ত অনুভব-কাতর। যুদ্ধের সময় সে একজন তরুণ জার্মানকে গুলীবিদ্ধ করে মেরেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বহুদিন পরেও সে সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। গির্জায় একজন পাদ্রী তাকে বোঝায় যে যুদ্ধে শত্রুকে মেরে সে কর্তব্য কাজ করেছে, অন্যায় কিছু করেনি। পাদ্রীর এই বিষয়টি দিয়ে লুবিৎস দর্শকের হাস্যোদ্রেক ঘটিয়ে তাঁদের ফিল্মের সঙ্গে একাত্মতা

অনুভবের সুযোগ করে দিয়েছেন। পাদ্রীর সান্ত্বনাদানে অবশ্য ফরাসী সৈনিকটি মোটেই আশ্বস্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে যে, মৃত জার্মানটির পরিবারে গিয়ে সে তার দোষ স্বীকার করবে। কিন্তু সেখানে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় এই জন্য যে তাঁরা মনে করেন যে, সে তাঁদের মৃত পুত্রের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এবং তাঁদের কন্যার রূপমুগ্ধ। এই বিরাট মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন বা দ্বন্দ্ব Broken Lullaby ছবির আসল বৈশিষ্ট্য।

এখন এই ছবির কয়েকটি 'সটের' বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। শান্তি-চুক্তি দিবসের দৃশ্য এখানে তোলা হয়েছে এক-পা-বিশিষ্ট একটি সৈনিকের পায়ের ফাঁকের মধ্য দিয়ে। ছবির গোড়াতে এক জায়গায় দেখানো হয়েছে একজন পাদ্রী শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভজনালয়ের দরদালানে হাঁটু ভেঙে প্রার্থনারত অফিসার ও তাঁদের চকচকে পোষাক ও তরবারির উপর দিয়ে। এখানে লুবিৎস অপূর্ব এক Irony সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া আছে বৃদ্ধ কয়েকজন জার্মানের উপস্থিতি—এক বাগানে বিয়ার পার্টির দৃশ্যে। ক্যামেরা যখন প্রত্যেক জার্মানের মুখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন যেন প্রত্যেকটি মুখই তাঁদের অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শেষ দৃশ্য, যেখানে ক্যামেরা ভায়োলিন বাদ্যরত বালক, অপেক্ষমান একটি যুবতী এবং বৃদ্ধ এক দম্পতির উপর দিয়ে ক্রমান্বয়ে সরে যাচ্ছে, সেটি অপূর্ব ভাবময়। ভজনালয়ের দৃশ্যে লুবিৎস প্রথমে পাদ্রী ও অফিসারদের ছবি তুলেছেন পরে শব্দ জুড়েছেন। এর ফলে তিনি যে শুধু ক্যামেরার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তাই নয় শিল্পসুষমাময় সৃষ্টির উপযোগী মালমসলাগুলিকেও উপযুক্তভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'Lubitsch touch'—শ্লেষ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির অনবদ্য সংমিশ্রণে যা গড়ে উঠেছে তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় The Broken Lullaby ছবিতে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য ছবিটি বিশেষ আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। উদ্দেশ্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তির জন্য Broken Lullaby সত্যই মহৎ সৃষ্টি।

১৯৩২ সালে One Hour With You ছবিতে লুবিৎস আরেকটু নতুন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতে তিনি সংলাপকে Couplet-এর আকার দেন। অর্থাৎ অনেকটা সেই আগেকার মতই—সঙ্গীত ও গল্পের একত্র সংমিশ্রণ। এখানে ছন্দপ্রধান সংলাপ ছবির স্বচ্ছ গতিধারার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছিল এবং এর মধ্যে একটা সজীবতা ও সুখকর দোলার ভাব ছিল। এক প্রেম নিবেদনের দৃশ্যে লুবিৎস মূলে অভিনেতা সেভালিয়রকে তার বক্তব্য সোজাসুজি দর্শকের সামনে পেশ করতে বলেছিলেন। দর্শককে এভাবে সোজাসুজি সম্বোধন করায় ছবিটিকে তাঁদের সহজে গ্রহণ করার সুবিধা হয়েছিল। এই সময়ে লুবিৎসের মধ্যে তাঁর টেকনিককে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। Broken Lullaby-র পর তিনি 'সিরিয়াস' বিষয় নিয়ে আর কোন ছবি তোলেননি। যা তুলেছেন সেগুলিকে আমরা ড্রয়িং-রুম কমেডি বলতে পারি। হাল্কা বিষয় তবে লুবিৎসীয় বুদ্ধিদীপ্ততা ও শ্লেষ মেশানো ছবি। পরিচালক ক্যামেরাকে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়ের ছন্দ, বক্তব্যের সূক্ষ্মতর মোচড়, দ্বৈত অর্থ—প্রভৃতি বিষয়কে ধরে রাখার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এতে ছবির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। একটা জিনিসকে যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মতর রূপ দিলে সহজেই জিনিসটার প্রাণময়তা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে লুবিৎস সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিবাহ সমস্যার উপর কয়েকটি ছবি তোলেন। সেগুলি হচ্ছে Desire, Design for living, Bluebeard's Eight Wife ইত্যাদি। আমরা শেষোক্ত চিত্রটির একটি দৃশ্য এখানে উল্লেখ করছি। এতে বিখ্যাত গ্যারি কুপার ও ক্লডেট কোলবার্ট অভিনয় করেছিলেন। একটা দৃশ্যে দেখা গেল গ্যারি কুপার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে হোটেলে ক্লডেটের ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। কুপারের ঘরে ঢোকা এবং সজোরে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত দেখিয়ে দৃশ্যটি 'ডিসলভ' করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নাইট ক্লাবে অদ্ভুত রোম্যান্টিক ভঙ্গীতে কুপার-কোলবার্ট নৃত্যরত। এখন পরিচালক হোটেলের ঘরে কি ঘটেছিল তা কিছুই দেখালেন না। সে বিষয়ে চিন্তার ভার লুবিৎস সম্পূর্ণভাবে দর্শকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। দরজা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য 'ডিসলভ' করে নাইট ক্লাবের দৃশ্যে চলে আসার টেকনিকটা একটা Trick বা চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়। চিত্রে এ জিনিসের বেশী প্রশ্রয় দিলে বিপদ স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ লুবিৎসের শেষ ছবিগুলিতে এরই প্রাধান্য বিশেষ চোখে পড়ে। এরই জন্য শেষের দিকে হলিউডের ফিল্ম জগতে লুবিৎসের প্রতিপত্তি কমে যায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৭ সালে।

শেষ জীবনের বিচ্যুতি সত্ত্বেও লুবিৎস চলচ্চিত্রের মহৎ স্রষ্টা। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা যে, তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমের অভূতপূর্ব শিল্প-সার্থকতার সম্ভাবনা বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর ছিল এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মন। পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি, শ্লেষ আর রসিকতার সচতুর প্রয়োগই তাঁর ফিল্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। লুবিৎসের ছবি থেকে এ বিষয়ে আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। লুবিৎস একটি ছবিতে বোঝাতে চান যে, একটি লোকের তাঁর স্ত্রীকে আর ভাল লাগছে না, তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা একেবারেই বিষিয়ে উঠেছে। স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে এই বিরক্তির ভাবটা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নীচে নামছেন। লিফটে প্রবেশের সময় স্বামী ভদ্রলোকের মাথায় টুপি ছিল। কয়েকতলা নীচে লিফটটি থামলো এবং এক সুন্দরী যুবতী ভিতরে এলেন। তাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ভদ্রলোক টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন। আরেকটি ছবিতে লুবিৎস ঘোড়দৌড়ের মাঠের উত্তেজনাভরা দৃশ্য দেখিয়েছেন। মাঠে জমায়েত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা-শোনা আলাপের ব্যাপারটা তিনি উচ্চস্বরের কথা না দিয়ে, চাহনি, চোখ নামানো, মৃদু হাসি, ফিসফিসানি ইত্যাদির সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। এই দৃশ্যটি অদ্ভুত উৎরেছে। চিত্র-পরিচালক লুবিৎসের মহৎ প্রতিভার পরিচয় এই সমস্ত ছোট্ট মুহূর্ত-গুলিতেই পাওয়া যায়।
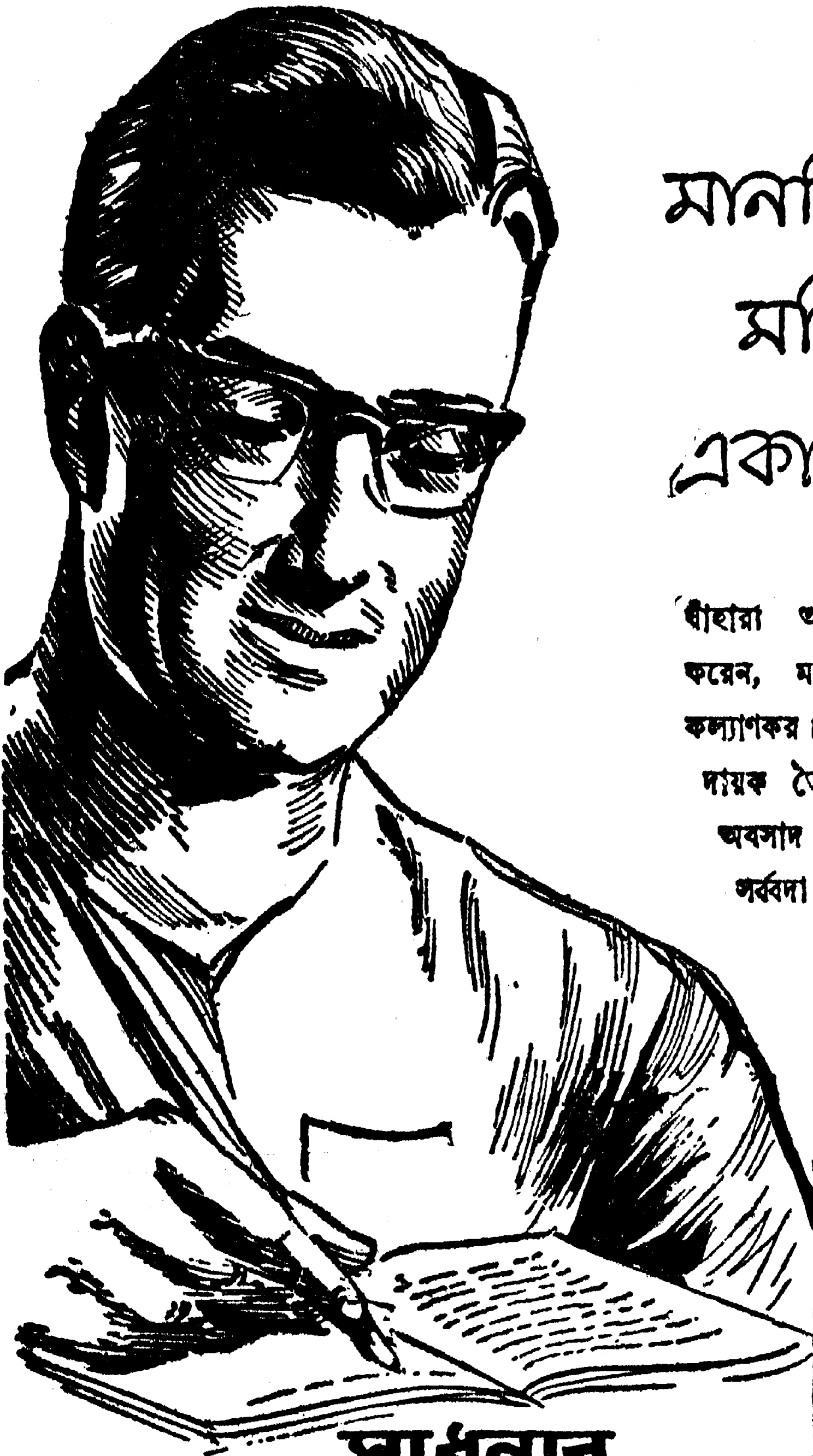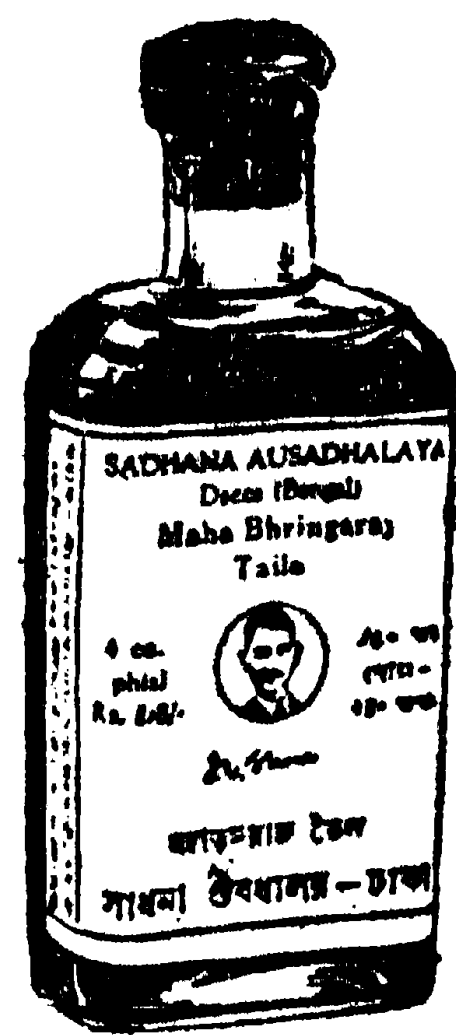
গুণ্ডা হাতী

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১)

বহুদিন আগেকার কথা, ষাট বৎসরের কিছু উপর। ছুটিতে বাবা আমাদের দেশে (বাঁকুড়া) নিয়ে গেছেন। বাঁকুড়া জেলা তখনও শাল, পিয়াশাল, পলাশ, কেঁদ ইত্যাদির ঘন জঙ্গলে ভরা। আবার বাঁকুড়া জেলার গায়ে-লাগা মানভূম, সিংভূম এবং মেদিনীপুরের অঞ্চলগুলিতেও ঘন জঙ্গল ছিল। আরও দূরে ছিল ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচির জঙ্গল এবং মানভূম-সিংভূমের গায়ে উড়িষ্যা ময়ূরভঞ্জের পাহাড় ও বন-জঙ্গল। বলা বাহুল্য এই সকল আদিম-কালের বনজঙ্গল ছিল বন্য পশুর লীলাভূমি. এখানে স্বাধীনভাবে দুরন্ত শাল জঙ্গলে বিচরণ তো করতোই, উপরন্তু ছিল অসংখ্য ভাল্লুক, চিতা, হরিণ, গৌর (বাইসন) এবং বহু হস্তী-যূথ।

বুনো হাতীর দল বড় গ্রাম বা শহরের কাছে সহজে যাওয়া আসা করে না, এবং তখনও করতো না। তবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ক্ষেত নষ্ট বা ফল-বাগানের গাছপালা ফলমূল—বিশেষে কলাগাছ—লুটপাট লণ্ডভণ্ড প্রায়ই করতো। চাষীরা ঢোলকাঁসি পিটিয়ে আগুন জেলে, বা বড় গাদা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে হয়ত তাড়াবার চেষ্টা করতো। হাতী তাড়াবার জন্যে জঙ্গলের সাঁওতাল আজও বিষম শক্তিশালী ধনুকে "কাঁড়" চালায় এবং তখনকার দিনে গ্রামের লোকে তাদের ধান দিয়ে, পয়সা দিয়ে, এই রকম কাজে লাগাতো। এই 'কাঁড়ের' ফলা পান-দেওয়া ইস্পাতের তৈরী এবং কি জোরে বনের সাঁওতাল তাকে চালায়, তার পরিচয় আমার এক যুবক আত্মীয় সম্প্রতি পেয়েছিলেন। তিনি গত বৎসর বিশেষ কাজে পুরুলিয়ায় কয়েকবার যাতায়াত করেন এবং সেই যাতায়াত নিজের চালানো সিট্রোয়েন গাড়ীতেই করেছিলেন।

একবার ফিরবার পথে দেরী হওয়ায় একটা ঘন জঙ্গল পার হতে হয় অন্ধকার রাত্রে। জঙ্গলের পথে হর্ণ বাজিয়ে দ্রুত চলবার সময় এক সাঁওতাল গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে হয়। সাঁওতালেরা মাঝরাত্রের পর গাড়ীর হর্ণ ও তার এঞ্জিনের ডগ্ ডগ্ গুম্ গুম্ আওয়াজ দূরে থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে শুনে বোধহয় ভাবে যে হাতীর দল গ্রামের দিকে আসছে। তারা মাদল বাজিয়ে এবং পরে শব্দ লক্ষ্য করে "কাঁড়" চালাতে আরম্ভ করে। গাড়ীর লোহার গায়ে ও ছাদে জোরে কড়াং কড়াং আওয়াজ দু-তিনবার হওয়ায় ঐ আত্মীয়টির খেয়াল হয় যে "কাঁড়" চালানো হচ্ছে। তাতে তিনি spot light গ্রামের দিকে দিয়ে চীৎকার করে বলেন "বন্ধ কর, গোলী চালায়
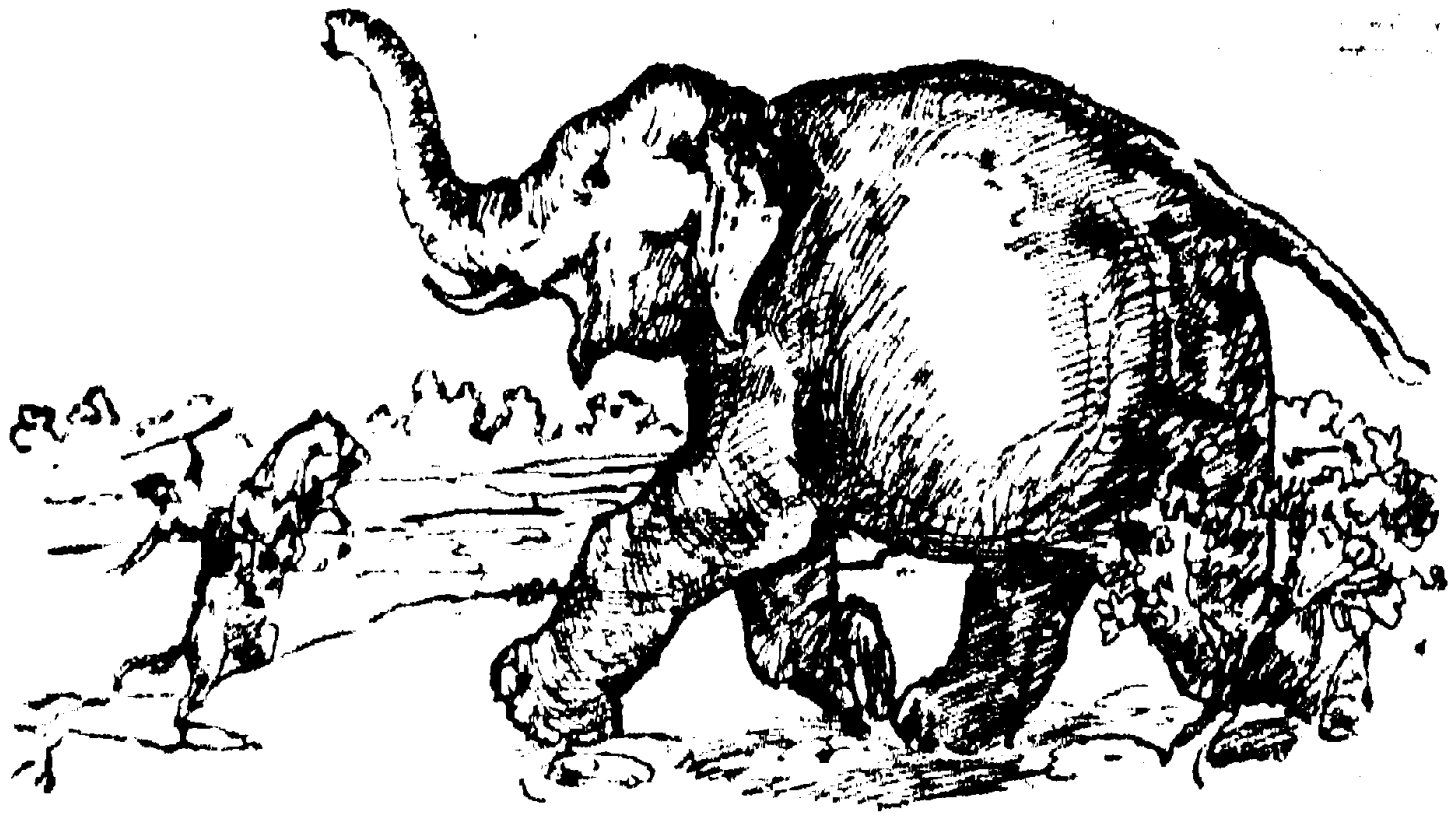
গা।" তাতে কাঁড় চালানো বন্ধ হয়। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, সামনের এক মাড্‌গাডে একটা কাঁড়ের ভারী ফলা গিঁথে রয়েছে। ফলাটা মাডগার্ডের পুরু লোহার চাদর এপার ওপার ফুঁড়ে ঢুকে গেছে যদিও সেটা অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ দূরে থেকে ছোঁড়া হয়েছিল!

বুনো হাতী অন্য বন্য পশুর মতই মানুষকে ভয় করে—বরঞ্চ একটু বেশী রকম—এবং এইটাই জঙ্গলের এলাকার বাসিন্দা মানুষের প্রধান সহায়। মানুষের সাড়া-শব্দ বা গন্ধ পেলেই হাতী চেষ্টা করে সেখান থেকে সরে পড়তে। তবে আচমকা সামনে পড়লে বুনো হাতী তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং তখন খুব ভাল শিকারীও ভাল, ভারী রাইফল হাতে না হলে, চম্পট দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদি না বড় গাছে উঠে পড়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে এক একটা পুরুষ-হাতী দল থেকে ছুটকে বেরিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে। এই রকম হাতী যদি গ্রামাঞ্চলে এসে ঘুরতে আরম্ভ করে তার অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে যে, তার সামনে সাধারণ নিরস্ত্র গ্রামের লোক কত অসহায়। তখন সে মানুষের ভয় হারিয়ে অতি ভয়ঙ্কর জীব হয়ে দাঁড়ায়—কতকটা মানুষখেকো বাঘেরই মত। এই রকম হাতী গুণ্ডা হাতী (Rogue Elephant) নামে পরিচিত। সাধারণভাবে হাতী-শিকার আজকাল নিষিদ্ধ কিন্তু এ রকম হাতী মানুষের ক্ষতি ও মানুষকে মারার পর গুণ্ডা নামে বিজ্ঞাপিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে মারবার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। অবশ্য সকল পুরুষ-হাতীই মাঝে মাঝে "মস্ত"—অর্থাৎ মত্ত অবস্থায় আসে এবং তখন সেও মানুষের ভয় হারিয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে পোষা হাতীর কানের উপরের ফুটা থেকে একটা তীব্র গন্ধের স্রাব হচ্ছে দেখলেই মাহুত তাকে শক্ত শিকল দিয়ে মজবুত খোঁটা বা গাছের সঙ্গে বাঁধে। স্রাব বন্ধ হলেই হাতী ফের আগেকার মত শান্ত ও আজ্ঞাবহ হয়। বুনো পুরুষ-হাতীরও ঐ রকম মস্ত অবস্থা আসে কিন্তু তাও সাময়িক এবং ঐ কারণে সে গুণ্ডা হাতীর মত কখ্যাত ও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় না। অবশ্য পোষা হাতীও কচিৎ কদাচিৎ দারুণ সংহারমূর্তি ধরে এবং দীর্ঘকাল মানুষ মেরে ধনসম্পদ ক্ষতি করে ফেরে যতদিন না শিকারীর হাতে বা ফাঁদে পড়ে তার নিজেরও জীবন শেষ হয়। মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলা অঞ্চলে এক স্থানীয় জমিদারের হাতী এইভাবে

ক্ষেপে গিয়ে "মানুষখেকো হাতী" নাম পায় এবং কয়েক মাস ধরে বহু নিরীহ চাষী ও কাঠুরে মেরে অনেক ক্ষেত নষ্ট করে সমস্ত তল্লাট আতঙ্কিত করে শেষে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের রাইফেলের গুলীতে নিহত হয়।

কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কোনো বুনো হাতী নিজের দল থেকে বিতাড়িত হলে পরে অনেক সময় এই রকম গুণ্ডা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের ভয় তার কমে গেলে তখন সে সংহার মূর্তি ধরে। আগেকার দিনে এরকম হাতী জঙ্গল অঞ্চলের কাছের শহরেও ঢুকে লোক মেরেছে এবং মানুষের অন্য অনেক ক্ষতিও করেছে।

যখনকার কথা প্রথমেই বলেছি—অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে—এই রকম একটা হাতী বাঁকুড়া শহরে ঢোকে। সে সময় আমরা এলাহাবাদের স্কুলে পড়ি। শহর তখন ছোট, রেল লাইন বাঁকুড়া জেলায় তখনও হয়নি এবং সারা জেলায় যাওয়া-আসা, মালপত্র আনা-দেওয়া সব কিছুই গরু-মহিষের বা ঘোড়ার গাড়ি, কিংবা জনমানুষের পায়ের উপর নির্ভর করত। এই হাতীটা লোক চলাচল, এমন কিছু গাড়ীর চলাচল বন্ধ করে, প্রথমে শহরের আশেপাশে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারপর একদিন শোনা গেলো যে সেটা শহরে ঢুকেছে। তার বর্ণনা তখন যা শুনেছিলাম তা এখন লিখলে লোকে হাসবে। তবে এটা ঠিক যে, সেটা বিরাট আকারের দেঁতেল—অর্থাৎ পুরুষ-হাতী।

গুণ্ডা হাতী শহরে ঢুকেছে এ খবরটা জেলা স্কুলে পেঁছায় একটু বেলায়। খবর পাবামাত্রই মাষ্টারেরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ছুটি দিতে বলেন এবং হেড মাষ্টার তাতে রাজী হওয়ায় সকলেই বাড়ীমুখে পলায়ন দেন। ছেলেদের মধ্যে যারা ছোট ছিল তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ী যায়, কিন্তু যারা একটু বড় তাদের মধ্যে দু-চারজন "পাগলা হাতী" দেখার লোভ না সামলাতে পেরে একটু এদিক ওদিকে যায়।

এদেরই মধ্যে দু-তিনজন জেলা কোর্টের কম্পাউণ্ডের কাছে ঐ গুণ্ডা হাতীর সামনে পড়ে, তখন কোর্টের বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। কোর্টের জজ-হাকিম, উকীল-মোক্তার, আসামী-ফরিয়াদি সকলেই বাইরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে কাঁপছিলেন। ছেলেরা খোলা বারান্দায় কোন আশ্রয় না পেয়ে তিনজন তিন দিকে ছুটে যায়। এর মধ্যে একজন—তার নাম আমার মনে নেই কিন্তু তার ছোট ভাই লক্ষ্মীকান্ত আমাদের বয়সী ছিল মনে আছে—ছুটে যায় ট্রেজারীর দিকে, যেখানে বন্দুকধারী পুলিশ সান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতীটা তাকেই তাড়া করে যাওয়ায় সেই সান্ত্রী ট্রেজারীর মোটা লোহার গরাদ দেওয়া ফটক বন্ধ করে, বীর পুরুষের মত রামনাম জপ করতে থাকেন। যদি তিনি দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজ করে হাতীটাকে আটকিয়ে ফটকটা অল্পক্ষণ খুলতেন তবে ঐ অসহায় বালক রক্ষা পেয়ে যেতো।

ফটক বন্ধ হতে দেখে সে যখন অন্য দিকে ছুটবার চেষ্টা করছে, সেই সময় হাতীটা তাকে ধরে এবং শুঁড় দিয়ে উপরে তুলে এক আছাড়ে ভয়ার্ত বালকের চীৎকার চিরদিনের মত থামিয়ে দেয়। তারপর তাকে পায়ে থেঁৎলে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে হাতীটা অন্য দিকে যায়। আদালত-সুদ্ধ লোকের চীৎকার-চেঁচামেচিতে সে ভ্রূক্ষেপও করেনি। সমস্ত ঘটনাই কোর্টের দোতালার ছাদ থেকে বহু লোকে দেখে।

সান্ত্রী মহাশয় তাঁর বীরত্বের জন্য কি পেয়েছিলেন জানি না, আমরা তখন ছেলেমানুষ এবং তখন ইংরাজ রাজত্বের দিন। আজকের দিন হলে হয়ত খবরের কাগজের তীব্র মন্তব্যের ফলে তাকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হোতো। আবার ঐরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মধ্যেও তার "অহিংস নীতি অটল থাকার জন্য তাকে "পদ্মশ্রী" জাতীয় কিছু দেওয়াও তেমন আশ্চর্য ছিল না। আমাদের কর্ণধারদের বিচার-বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম!

হাতীটা সারা দিন শহরের বাইরে ঘুরে, লোকজনের কাজকর্ম বন্ধ করিয়ে, গাছপালা, ফলমূলের বাগান-ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে এক বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে।

পরের দিন হাতীর দুর্বুদ্ধি ঘনায় এবং সে, বোধহয় পোষা হাতীর গন্ধ পেয়ে বাঁকুড়া শহরের বাইরে লোক-পুরের নীলকুঠীর এলাকায় ঢুকে সেখানের বাগানপাট নষ্ট করে সেখানের লোকজনকে তেড়ে যায়। দুই নীলকর সাহেব ভারী বন্দুক রাইফেল নিয়ে তার উপরে গুলী চালায়। রাইফেলের গুলী খেয়ে হাতীর আক্কেল হয় এবং সে পালা-বার পথ দেখে, কিন্তু তখন দিনের আলো, আর চতুর্দিকে খোলা ডাঙ্গা জমি। উপরন্তু ঐ দুই সাহেবের মধ্যে একজন--নাম বোধহয় ডানকান—শিকারে অভ্যস্ত ছিল এবং তার কাছে শক্তিশালী রাইফেল ছিল। ঐ গুণ্ডা হাতীর প্রকাণ্ড দুই দাঁত দেখে তারও রোখ চাপে হাতী মেরে সেই দাঁত জোড়া ট্রফিরূপে জোগাড় করতে। কাজেই দুই সাহেবে মিলে লোকলস্কর ও হাতী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, হাতীর পিছনে ধাওয়া করে। তখন দিনের আলোয় চতুর্দিক উজ্জ্বল।

সাহেবেরা বন্দুক নিয়ে গুণ্ডা হাতীর পিছু নিয়েছে—এই খবর ছড়িয়ে যেতে সেখানের লোকজনেরও সাহস হয় এবং হাতীটা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে লোকে সেই উঁচু নীচু ডাঙ্গা জমি থেকে দেখে চীৎকার করে জানাতে থাকে। কাজেই দুই সাহেব ঘোড়ায় চড়ে হাতীটার কাছে খুবই শিগ্গীর পেঁছে যায়। হাতী তখন দ্রুত পালিয়ে নদীর দিকে (দ্বারকেশ্বর) চলেছে, তার ওপারে পলাশ, শাল, পিয়াশাল ও জঙ্গলী কুলগাছের ঝোপে ভরা ঘন জঙ্গল। সাহেবেরা ঘোড়া ছুটিয়ে

এগিয়ে গিয়ে তার পথ আটকায়। তারপর ডানকান হাতীর পথে, নদীতে নামবার রাস্তায় ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায়। গুন্ডা হাতীটা নদীর দিকে যেতে এই দুই সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়ায় তারপর, পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায়, যেদিকে অন্য সাহেবটি ঘোড়ার উপর বসে বন্দুক তোলার চেষ্টা করছিল সে দিকের নদীর পাড়ে উঠবার চেষ্টা করে।

অন্য সাহেবের ঘোড়া ভড়কিয়ে লাফাতে আরম্ভ করে এবং সাহেবও হাতী এগিয়ে আসছে দেখে বেসামাল হয়ে হাতীর উপর গুলী চালায়। হাতীর গায়ে গুলী লাগে কিন্তু কোনও সাংঘাতিক জায়গায় না লাগায় হাতীটা বিশেষ ঘায়েল হ'ল না। গুলী-লাগা মাত্রই হাতী কান-ফাটানি চীৎকার করে শুঁড় গুটিয়ে সাহেবের দিকে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে যায়। এদিকে বন্দুকের গর্জন আর হাতীর ভীষণ চীৎকার এই সবে সেই সাহেবের ঘোড়া বিষম লম্প-ঝম্প করে সেই সাহেবকে ফেলে দেয়। সাহেবের কপাল ভাল ছিল যে, সে হাতীর দিকে না পড়ে নদীর পাড় গড়িয়ে অন্য দিকে পড়ে। সাহেবের ঘোড়া ছুটে পালায়। ইতিমধ্যে নীলকুঠীর দুটো হাতীর পিঠে চড়ে লোক-জনও এসে পড়ে এবং সাহেবের অবস্থা দেখে তারাও চীৎকার চেঁচামেচি করে, হাতী চালিয়ে দ্রুত সেদিকে আসে। বুনো হাতীটা সেই চীৎকার শুনে আবার দাঁড়িয়ে যায় এবং সেই সুযোগে সাহেবও আবার নদীর পাড়ে উঠে তার বন্দুকটা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। নীলকুঠীর হাতী দুটোর মধ্যে যেটা শিকারে অভ্যস্ত তার উপর নীলকুঠীর এক গোমস্তা ছিলেন, তিনি বিলক্ষণ সাহসী। তিনি মাহুতকে বলেন সেই হাতীটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাতে সাহেব হাতীর পিঠে বা পিছনে আশ্রয় পায়। তাঁর চোখের সামনেই এই সব ঘটে এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, সাহেব তার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে প্রস্তুত হতে হতেই গুন্ডাটা তাঁর উপরে এসে পড়বে এবং সে অবস্থায় তাকে গুলী মেরে ফেলা সে সাহেবের সাধ্যের অতীত। তাঁর আদেশে লোকজন চীৎকার করায় এবং হাতী দুটোও দ্রুত এগিয়ে আসায় গুন্ডা হাতী ক্ষণেকের জন্য থামে। নইলে আহত গুন্ডা হাতী কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাহেবের নাগাল পেতো এবং তারপর তাকে শেষ করতে মিনিট খানেকও লাগতো কিনা সন্দেহ।

ইতিমধ্যে ঘোড়া চঞ্চল হয়ে উঠছে দেখে ডানকান সাহেব তার দোনলা ভারী রাইফেল নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে নদীর নীচু ও ঢালু পথের পাশের উঁচু পাড় বেয়ে দ্রুত উঠে দেখে অন্য সাহেবকে ফেলে দিয়ে তার ঘোড়া পালিয়েছে এবং আহত বুনো হাতী সাহেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডানকান ছুটে সেদিকে গিয়ে হাতীর বিশ-পঁচিশ গজের মধ্যে যখন পৌঁছেছে তখন গুন্ডা হাতী ওর দিকে পিছন ফিরে নীলকুঠীর হাতীগুলোর দিকে দেখছে। সে অবস্থায় তার উপর গুলী চলানো বৃথা জেনে সে সতর্কভাবে রাইফেল ধরে, একটা উঁচু ঢিপির দিকে এগিয়ে উঠে হাতীর দিকে লক্ষ্য করে দাঁড়ায়। এদিকে হাতীটা নীলকুঠীর হাতীগুলো তখনো অল্প দূরে আছে দেখে বোধহয় তার আততায়ীর দিকে ফিরে সেদিকে দেখে।

ফিরে দেখবার মুখে তার মাথার পাশের দিকটা এক মুহূর্তের জন্য ডানকানের লক্ষ্যের মধ্যে আসে এবং এবং সেই ক্ষণেই, নিমেষের মধ্যে ডানকান রাইফেল চালায়। অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারীর ভারী এক্সপ্রেস রাইফেলের গুলী অত কাছের থেকে লেগে হাতীর মাথার খুলীতে যেখানে কানের ফুকর আছে তার কাছের পাৎলা হাড় ফুঁড়ে বিষম জখম করে। গুলী খেয়ে হাতী পড়ে যায় এবং সেই সুযোগে ডানকান আবার গুলী ভরে নিয়ে আরো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। গুন্ডা হাতী ধড়মড় করে উঠে ডানকানের দিকে ফিরে শুঁড় গুটিয়ে একটা চীৎকার করে তেড়ে আসে। ডানকান প্রস্তুতই ছিল এবং স্থির লক্ষ্য করে গুলী চালায়। সাংঘাতিক গুলীর মার খেয়ে হাতী আবার পড়ে যায় এবং আর এক গুলীতে এই গুন্ডা হাতীর ধ্বংসলীলা শেষ করে তাকে নিষ্পন্দ করে ফেলে।

এই হাতীর দাঁতদুটো নীলকুঠীর বৈঠক কামরার দরজার দুই পাশের দেওয়ালে লাগানো থাকত। আমরা সেটা দেখি কিছুদিন পরে। তারপর সে নীলকুঠী বিক্রি হয়ে যায় এবং সেই কুখ্যাত হাতীর শেষচিহ্নও ওখান থেকে সরে যায়। আমরা ঘটনার সময় বাঁকুড়ায় ছিলাম। এই কারণেই সে কথা আজও মনে পড়ে।

বুনো হাতী গুন্ডা হয় কেন? এ বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কোনও পুরুষ-হাতী যদি কোনও কারণে তার নিজের হস্তীযূথ থেকে বিতাড়িত হয় তবে সে ঐভাবে ভয়ঙ্কর সংহার মূর্তি ধরে এবং সমস্ত তল্লাটের লোকের ক্ষতি ও প্রাণনাশ করার চেষ্টায় ঘোরে। বিখ্যাত শিকারী ও হস্তীতত্ত্ববিদ স্যান্ডারসন অবশ্য এই মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ প্রকৃতির হাতীর বিষয়ে সবিশেষ খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, সে নিকটস্থ ঘন জঙ্গলের কোনও হস্তীযূথের অধিপতি এবং নিজে ক্ষমতায় মত্ত হয়ে এ প্রকার ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। কিন্তু ফ্লেচার নামক আর একজন বিশেষজ্ঞ শিকারী এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করে বলেন যে, স্যান্ডারসনের মত ভুল ধারণার উপর স্থাপিত। হস্তীযূথপতি অনেক সময় দল ছেড়ে দূরে চলে যায় খাদ্যের সন্ধানে বা অন্য কোনও কারণে, এবং দলের বাইরে থাকার সময় কখনো কখনো ক্ষেত-খামার নষ্ট করার সময় বা অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ মানুষ দেখে তাকে ঘায়েল করে। কিন্তু গুন্ডার মত ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত সে কখনও হয় না—হয় যে হাতী যূথভ্রষ্ট বা বিতাড়িত।

বিদেশী গল্প

বাহির ও অন্তর

হেরম্যান হেস

একটা লোক ছিল। নাম তার ফেডেরিক। ফেডেরিক তার সমস্ত জীবন নিয়োজিত করেছিল বুদ্ধি-চর্চায়। জ্ঞানের পরিধি তার বিরাট। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানকে সে সমান মূল্য দিত না। যে কোন ধরণের চিন্তা তার কাছে বরণীয় নয়। এক বিশেষ ধরণের ভাবনার প্রতি দেখা যেত তার পক্ষপাত এবং সেই ভাবনা ছাড়া অন্য যে কোন ধরণের চিন্তার প্রতি ছিল তার সুস্পষ্ট বিরূপতা ও ঘৃণা। যুক্তি-বিজ্ঞানকে সে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। চিন্তার পদ্ধতি হিসাবে যুক্তিবাদ নির্ভরযোগ্য এবং একেই সে বলত "বিজ্ঞান"।

কথায় কথায় বলত, "দুয়ে দুয়ে চার হয়। এই আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয় এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই মানুষকে সব চিন্তা-ভাবনা গড়ে তুলতে হবে।"

কিন্তু এ ছাড়াও যে মানুষের অন্য চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারে সে বিষয়ে ফেডেরিক একেবারে অচেতন নয়। তা বলে সেই সব ভাবনাকে কিছুতেই "বিজ্ঞানের" পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই ও ধরণের চিন্তাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারত না। নাস্তিক হয়েও ধর্ম সম্পর্কে ফেডেরিক অসহিষ্ণু নয়। সে ভাবত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যোগসাজস আছে বলেই ধর্ম গড়ে উঠতে পেরেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান অঙ্গীভূত করে নিয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়, মানুষের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য। কিন্তু একটা অঞ্চলের দিকে বিজ্ঞান কখন হাত বাড়ায়নি; সে অঞ্চলটি হল : মানুষের আত্মা। কালক্রমে এই অঞ্চলকে ধর্মের হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রথাগত নিয়ম হয়ে দাঁড়াল এবং বিজ্ঞানও ধর্মের আজ-গুবি জল্পনা-কল্পনাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সহ্য করে যেত। সুতরাং ফেডেরিকও ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু। কিন্তু যাকে সে কুসংস্কার বলে মনে করত,

তার প্রতি ছিল গভীর বিরক্তি ও ঘৃণা। অমার্জিত ও অসংস্কৃত মানুষ মরমীয়াবাদকে স্বীকার করতে পারে, জাদুবিদ্যার প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উদ্ভবের পর এই ধরণের দ্ব্যর্থক ও অকেজো হাতিয়ার ব্যবহার করা একেবারেই ছেলেমানুষী।

এই সে ভাবত আর এই-ই সে বলত। কুসংস্কারের রেশ দেখামাত্র চটে আগুন হত ফেডেরিক; মনে হত সে যেন হঠাৎ অশুচি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু যারা শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার রীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ, যারা তার নিজের লোক, তাদের মধ্যে কুসংস্কারের ছোঁয়া দেখামাত্র ক্রোধে ফেটে পড়ত সে। অতি সম্প্রতি আর এক ধরণের কথা শোনা যাচ্ছে। বহু জ্ঞানী-গুণী ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিবান কখন কখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন কিম্বা প্রকাশ্যেও বলেছেন যে, "বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতি"কে একেবারে অভ্রান্ত, কালোত্তীর্ণ আদিষ্ট, অনাক্রম্য ও রহস্য-স্বরূপ বলে ভাবা বোধহয় অনুচিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য চিন্তাপদ্ধতির অন্যতম; এও পরিবর্তন ও বিনাশের অতীত নয়। এই হাস্যকর ধারণাই কিন্তু সব চেয়ে বেশী ব্যথা দিত ফেডেরিককে। তবু এই ধ্বংসাত্মক, অশ্রদ্ধেয় ও বিষবৎ ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে; ফেডেরিকও এ কথা অস্বীকার করতে পারে না। ক্ষুধা, যুদ্ধ ও বিপ্লব বিশ্বব্যাপী যে সংকট এনেছে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এখানে ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এই সব ধারণা। সাদা দেওয়ালের ওপর সাদা ভৌতিক হাতে লেখা এ যেন একটি সাবধান বাণী।

কিন্তু ফেডেরিক জানতো যে, এই ধরণের চিন্তা কোন কোন মহলে ঠাঁই পাচ্ছে এবং সে জন্য সে দুঃখ পেত। আর যত সে দুঃখ পেত তত বেশি উগ্র হয়ে উঠত। বিশেষ করে যারা এই ধরণের চিন্তাকে গোপনে গোপনে মনে ঠাঁই দেয় বলে ফেডেরিক মনে করত, তাদের ওপরই সে চালাত প্রচন্ড আক্রমণ। এই নতুন ধারণা যদি সত্যিই প্রচলিত হয়, মানুষ যদি সত্যিই এই মতবাদকে স্বীকার করে নেয়; তবে একথা ঠিক যে, মানুষের সমগ্র আত্মিক মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে আসবে বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এ পর্যন্ত খুব কম শিক্ষিত ব্যক্তিই এই নতুন মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবস্থা এখনও অত ভয়াবহ হয়নি। কোথাও কোথাও কয়েকজন ব্যক্তি এই নতুন মতবাদে দীক্ষিত হয়েছে সত্যি; কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই ধারণা বড় জোর কয়েকজন অদ্ভুত চরিত্রের লোক বা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষের একটা বিন্দু, এই ধারণার সামান্যতম স্ফুরণ, এখানে হয়ত দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবেই। অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যদি এই নতুন মতবাদ একবার শিকড় গাড়তে পারে, তবে তার শেষ যে কোথায় হবে কিছুতেই বলা যায় না। ওদের মধ্যে এখনই দেখতে পাওয়া যায় নানা ধরণের রহস্যবাদ ও গুরুবাদ। এই সব ধারণায় পৃথিবী আজ পূর্ণ। প্রত্যেক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় মরমীয়াবাদ, রহস্যবাদ ও আধ্যাত্মিকতা। এই ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞান, অনেকটা যেন ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য এই মুহূর্তে সংগ্রাম করতে নারাজ।

একদিন ফেডেরিক তার বন্ধুর বাড়ি গেল। এই বন্ধুটির সঙ্গে সে বহু বছর পড়াশুনা করেছে। অনেক দিন এই বন্ধুটির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বন্ধুর বাড়ির সিঁড়িতে ওঠবার সময় ফেডেরিক চিন্তা করতে চেষ্টা করল কখন ও কবে তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে। অন্য বিষয়ে তার স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, এই সামান্য বিষয়টি কিন্তু ফেডেরিক কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না। এ জন্য নিজের অজান্তেই নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠল ফেডেরিক। বন্ধুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল।

বন্ধু আরভিনের সঙ্গে বাক্যালাপ হবার আগেই ফেডেরিক লক্ষ্য করল তার বন্ধুর সদাশয় মুখে ধৈর্যশীল হাসির রেখা। ফেডেরিকের মনে হল যে বন্ধুর মুখে এমন হাসি সে আগে কোনদিন লক্ষ্য করেনি। বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ফেডেরিক এই হাসির মধ্যে খুঁজে পেল প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বা শত্রুতা। আর এই হাসি দেখা মাত্রই ফেডেরিকের মনে পড়ল আরভিনের সঙ্গে আগের সাক্ষাৎকার,—যা মনে করার জন্য সে এতক্ষণ বৃথা পরিশ্রম করেছে। মনে হল গতবার আরভিনের সঙ্গে ঝগড়া করে সে বাড়ি যায়নি সত্যি। কিন্তু খুব প্রসন্ন হয়েও ফিরতে পারেনি। মনের মধ্যে গোপন বিরোধ ও অসন্তোষ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল তখন। কারণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সে আরভিনের কাছ থেকে খুব অল্প সমর্থনই তখন পেয়েছিল।

আশ্চর্য, সমস্ত ব্যাপারটা সে কি করে একেবারে ভুলে যেতে পারল? সে ত সব সময়ই জানতো এই অসন্তোষ আছে বলেই সে এত দিন বন্ধুর কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। এই-ই একমাত্র কারণ। যদিও না-দেখা করার পিছনে বহু ছল-ছুতা সে ইদানীং আবিষ্কার করেছে।

যখন দু'জন মুখোমুখি দাঁড়াল, তখন ফেডেরিকের মনে হল যে, গত দিনের সামান্য ফাটল আজ অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তেই তার মনে হল যে দু'জনের মধ্যে যেন একটা কিছু এখন নেই যা আগে ছিল। মনে হল আর নেই সেই একই উৎস থেকে গড়ে ওঠা ঐক্য, নেই পরস্পরকে বোঝার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা। এর বদলে দেখা দিয়েছে দুজনের মাঝখানে একটা বিরাট ফাঁক। তবুও তারা পরস্পরকে প্রীতি-বিনিময় করল; আবহাওয়ার কথা ও পরিচিত লোকদের প্রসঙ্গ নিয়ে নানা কথাই বলে গেল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ফেডেরিক অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, সে তার বন্ধুকে বুঝতে পারছে না, তার বন্ধুও তাকে বোঝে না, প্রত্যেকটি কথাই অর্থহীন, আর ওদের মধ্যে প্রকৃত আলাপের কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই। তার ওপর আরভিনের মুখে লেগে আছে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি এবং এই হাসিকে ফেডেরিক প্রায় ঘৃণা করতে আরম্ভ করছে।

এই ক্লান্তিকর আলাপের সামান্য বিরতিতে ফেডেরিক বন্ধুর বহুবার দেখা স্টুডিয়োকে আর একবার ভাল করে দেখে নিল। দেওয়ালের ওপর পিন দিয়ে আটকানো এক চিলতে কাগজ দেখে ফেডেরিকের মনে পড়ল তাদের ছাত্র-জীবনের কথা। সেই সময় এই-ই ছিল আরভিনের অভ্যাস। কোন কবির কোন লাইন বা কোন চিন্তানায়কের কোন উক্তি নিজের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখার জন্য সে কাগজে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখত। ফেডেরিক কাগজটা পড়ার জন্য এগিয়ে গেল।

গোটা গোটা অক্ষরে আরভিন লিখে রেখেছে: "বাহির কিছুই নয়, ভিতরও কিছুই নয়; যাহাই বাহির তাহাই ভিতর।"

ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে এক মুহূর্ত থ' হয়ে দাঁড়াল ফেডেরিক। তাই ত। সে যে

আশঙ্কা করেছে, এবার সেই আশঙ্কাই সামনে হাজির। অন্য সময় হলে সে এই কাগজের টুকরোটাকে অবহেলা করতে পারত, বন্ধুর একটা খেয়াল হিসাবে সহ্য করতে পারত, মানুষের চরিত্রের নির্দোষ দুর্বলতা বলে স্বীকার করে নিতে পারত, একে মেনে নিত বন্ধুর তুচ্ছ উচ্ছ্বাস বলে। কিন্তু এখন তা কিছুতেই ভাবা যায় না। মনে হল শুধু-মাত্র কাব্যিক ভাবালুতা প্রকাশ করার জন্য এই লাইন কটি লেখা হয়নি অথবা এত বছর পরে আবার যৌবনের অভ্যাসে ফিরে যাবার দুর্বুদ্ধিতাও পেয়ে বসেনি তাকে। ওই কাগজে লেখা আছে তার বন্ধুর বর্তমান চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই হল মরমীয়াবাদ। আরভিন বিশ্বাসঘাতক!

আস্তে আস্তে ফেডেরিক আরভিনের দিকে মুখ ফেরাল। তার মুখে হাসি লেগেই আছে।

"আমাকে এর মানে বুঝিয়ে দাও," ফেডেরিকের কণ্ঠে দাবী।

"তুমি কি এই প্রবাদ কোথাও পড়নি?"

চিৎকার করে উঠল ফেডেরিক, "আলবৎ পড়েছি। নিশ্চয়ই আমি জানি। এই হল রহস্যবাদ, মরমীয়াবাদ। এই কথাগুলোয় খুব কবিত্ব থাকতে পারে; থাক। কিন্তু আমাকে এই প্রবাদের মানে বলতেই হবে। এটাই বা তোমার দেওয়ালে কেন ঝুলছে!"

"উত্তম প্রস্তাব। শোন। সত্যে পৌঁছাবার পথ হিসাবে আমি সম্প্রতি যে মতে বিশ্বাসী হয়েছি তার-ই মুখবন্ধ হল এই প্রবাদ। এই পথে আমি শান্তিও পেয়েছি।"

রাগ চাপতে থাকল ফেডেরিক। সে বললে, "সত্যে পৌঁছাবার নোতুন পথ? এমন কোন বস্তু আছে নাকি? নাম কি?"

"এমন নোতুন কিছু নয়। তবে আমার কাছে নোতুন। আসলে পথ অতি প্রাচীন ও সম্মানীয়। তার নাম হল জাদুবিদ্যা।"

চরম কথা বলা হয়ে গেছে। এই অকপট স্বীকারোক্তিতে বিস্মিত ও অভিভূত হল ফেডেরিক। সর্বাঙ্গ শিহরিত হল। মনে হল তার বন্ধুর মধ্যেই রয়েছে তার চরমতম শত্রু। সেই শত্রু তার সামনেই দাঁড়িয়ে। সে বুঝতে পারল না সে কাঁদবে না রাগবে। অপূরণীয় ক্ষতি-বোধ তাকে আচ্ছন্ন করল। বহুক্ষণ সে চুপ করে থাকল।

"তা হলে তুমি জাদুকর হবে?" কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফোটাতে চেষ্টা করল সে।

অনায়াসে উত্তর দিল আরভিন, "তাই-ই—"

ঘরময় স্তব্ধতা; পাশের ঘরের ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফেডেরিক বললে, "তা হলে বুঝে নিতে হবে যে তুমি বিজ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিলে এবং সেই সঙ্গে আমার সঙ্গেও।"

আরভিন উত্তর দিল, "আমার অবশ্য

তা মনে হয় না। কিন্তু যদি সত্যিই তা হয়, তবে আমি নিরুপায়।"

ফেটে পড়ল ফেডেরিক; "তবে তুমি নিরুপায়? এই ছেলেমানুষী, জাদুর প্রতি এই জঘন্য বিশ্বাসের মোহ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পার না? আমার সম্মান যদি বাঁচাতে চাও তবে তোমাকে এই-ই করতে হবে।"

আরভিন অল্প হাসল। কিন্তু তাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে না।

"তুমি এমনভাবে কথাগুলো বললে যেন ইচ্ছা করেই আমি এই পথ বেছে নিয়েছি। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, ফেডেরিক। আমার কাছে গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। আমি জাদুবিদ্যাকে পছন্দ করিনি, বরং জাদু-বিদ্যাই আমাকে বরণ করেছে।" খুব ধীরভাবে এই কথাগুলো বললে আরভিন। কিন্তু ফেডেরিকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে এই কণ্ঠের মৃদুতা ধ্বনিত হতে থাকল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেডেরিক। উঠে দাঁড়িয়ে খুব ক্লান্ত স্বরে বললে, "তা হলে চলি।" যাবার সময় হাতটাও বাড়িয়ে দিল না বন্ধুর দিকে।

চিৎকার করলে আরভিন, "না, কখনই না। তুমি এমনভাবে যেতে পারবে না। মনে কর আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুশয্যায়; তখন যেমন ভাবে বিদায় নিতে হয়, এস আমরা ঠিক সেই-ভাবে বিদায় নেই।"

"কিন্তু আরভিন দু' জনের কে মারা যাচ্ছে?"

"আজকে বোধহয় আমি, বন্ধু। যে নব-জন্ম পেতে ইচ্ছুক, তাকে ত মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকতে হবে।"

ফেডেরিক আর একবার কাগজটার কাছে গিয়ে ভিতর বাহির সম্পর্কিত প্রবাদটা ভাল করে পড়ে নিল।

শেষে বললে, "ভাল। তোমার কথাই ঠিক। যাবার সময় রাগ-ঝাল করে লাভ নেই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। মনে করে নিলাম আমাদের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু যাবার আগে আমি তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ করব।"

"ভাল কথা। বল কি করব?"

"আমার প্রশ্ন যা ছিল, তাই-ই আমার অনুরোধ। এই প্রবাদটির মানে আমাকে বুঝিয়ে দাও। তুমি যা জান তাই বল।"

একটু চিন্তা করে আরভিন বললে, "কিছুই ভিতরে নয়, কিছুই বাহিরে নয়। এই কথার ধর্মীয় ব্যাখ্যা তুমি জান। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি যেমন জড়ে তেমনি আত্মায়। প্রতি অণুই স্বর্গীয়। কারণ তিনি বিশ্বব্যাপ্ত। আগে এই ধরনের ধ্যান-ধারণার নাম দেওয়া হত প্যানথেইজম। এখন যদি এই কথার কোন দার্শনিক অর্থ চাও তবে শোন ঃ আমাদের সমস্ত চিন্তার জগতে 'ভিতর' আর 'বাইরের' মধ্যে একটা বিচ্ছেদ এসে গেছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের কোন প্রয়োজন নেই। যে জায়গাটুকু আমরা আত্মার ক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছি, তার থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে থাকতে পারে আমাদের আত্মা এবং সেই ক্ষেত্রের সীমান্ত পার হয়ে বহুদূরে এগিয়েও যেতে পারে। এই বৈপরীত্য নিয়েই আমাদের দুনিয়া গড়া হয়েছে। কিন্তু এই দুই বিপরীতের ওপারে আর এক ধরনের জ্ঞানের সূচনা।...... কিন্তু বন্ধু, স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, যেহেতু আমাদের চিন্তার মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে, সেহেতু তোমার ও আমার বোধগম্য কোন স্বার্থ-হীন শব্দ এখন আমাদের অনায়ত্ত। এক একটা কথার হাজার রকমের মানে হয়। এবং এখানেই তোমার ভয়ের সূত্রপাত— এখানেই জাদুর আরম্ভ।"

আরভিন ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে দেওয়ালের সেল্ফ থেকে মাটির ছোট একটি মূর্তি পেড়ে ফেডেরিকের হাতে দিয়ে বললে ঃ "এই নাও বিদায় নেবার আগে আমার শেষ উপহার। এখন যে মূর্তি আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম সে যদি তোমার বাইরে না থেকে তোমার ভিতরে আসে তুমি আবার আমার কাছে এস। কিন্তু এখন যেমন এই মূর্তি তোমার বাইরে আছে চিরকাল যদি সে এইভাবেই তোমার বাইরে থাকে তবে এই বিদায় হল আমাদের শেষ বিদায়।"

আরও কিছু বলার ছিল ফেডেরিকের। কিন্তু আরভিন তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে এমন ভাবে বিদায় জানাল যে তার-পর আর কথা বলা চলে না।

ফিরে গেল ফেডেরিক। সিঁড়ি দিয়ে নামল। অথচ আগে এই সিঁড়ি দিয়ে সদম্ভ বিজয়ের সঙ্গে কতবার নেমেছে। মাটির ছোট মূর্তিটা হাতে নিয়ে বিব্রত ও ব্যথিত ভাবে ফেডেরিক বাড়ি ফিরে এল। বাড়ির সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। যে হাতে মাটির মূর্তিটা ধরে আছে সেই হাতের মুঠোটা খুব শক্ত করে পাকাল আর মনে হল সে যেন এখুনি এই আজগুবি মূর্তিটাকে মাটিতে আছড়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। কিন্তু সে এ-সব কিছুই করল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এর আগে সে কখনও এমন পরস্পর-বিরোধী আবেগে পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হয়নি।

বন্ধুর উপহারটি রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকল সে। শেষে মূর্তিটিকে রাখল তার বুক-কেসের ওপরে। কিছু-কাল অবধি মূর্তিটি ওখানেই থাকল।

দিন যায়। ফেডেরিক মাঝে মাঝে মূর্তিটির দিকে তাকায়, ভাবে এই মূর্তির কি মানে, কোথায় বা এই মূর্তি তৈরী হয়েছিল। এ একটা মানুষের মূর্তি হবে হয়ত, হয়ত হবে কোন দেবতার। পোড়া মাটির এই মূর্তির ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে গেছে। রোমীয় দেবতা জানুসের মত এর দুটি মুখ। কিন্তু গঠনের স্থূলতা বড়ই চোখে লাগে, কোথাও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাই এই মূর্তি কিছুতেই গ্রীক কিম্বা রোমান ভাস্করের হাতের কাজ নয়। বরং মনে হয় আফ্রিকা কিম্বা প্রশান্ত মহাসাগরের কোন আদিম অনগ্রসর কারিগরের হাতের

কাজ। দুটো মুখই এক রকম দেখতে। একটু উদাসীন, মুখ খুলে অলসভাবে হাসছে। আর এই ভুতুড়ে নির্বোধ হাসি তাকে আরও বেশি কুৎসিত করে তুলেছে।

ফেডেরিক কিছুতেই এই মূর্তিটাকে সহ্য করতে পারল না। দেখা মাত্রই তার বিরক্তি আসে, বিচলিত বোধ করে। মূর্তিটা তার জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। পরের দিন ফেডেরিক সেই মূর্তিকে উনুনের ওপর রেখে এল। তারও কিছু দিন পরে রাখল জিনিষপত্র রাখবার তাকে। কিন্তু বারবার ফেডেরিকের দৃষ্টির সামনে মূর্তিটি ভেসে উঠতে থাকে, তার সেই ঠাণ্ডা নির্বোধ হাসি যেন ফেডেরিকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে সে আবার মূর্তিটাকে সরিয়ে রাখল পাশের ছোট ঘরে। এ ঘরে থাকে ইতালির কতকগুলি ফটোগ্রাফ আর কতকগুলি টুকিটাকি জিনিষপত্র। স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে সে এগুলি পেয়েছে এবং এ দিকে বড় একটা ফিরেও তাকায় না। আজকাল আসা-যাওয়ার পথে মূর্তিটির দিকে তার নজর পড়ে, কিন্তু ভাল করে সে দেখে না। হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়। এখানে থেকেও কিন্তু মূর্তিটা তাকে হানা দেয় যদিও এ কথা সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে নারাজ।

এই খোলামকুচি, এই দু'মুখো অপ-দেবতার সঙ্গে, তার জীবনে এল বিরক্তি ও যন্ত্রণা।

ফেডেরিক আজকাল মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্য বাইরে বেড়াতে যায়। কারণ সে সব সময় অস্থিরতা বোধ করে। মনে হয় কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এবারও বাইরে গিয়েছিল ফেডেরিক। কয়েক মাস পরে ফিরে এল। পাশের ছোট ঘর দিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল, ঝি এল, না-পড়া চিঠিগুলি দেখল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বড় অস্থিরতা বোধ করছিল সে। যেন কিছু একটা করতে তার ভুল হয়ে গেছে। কোন বই ভাল লাগে না, কোন চেয়ারে বসে আরাম পাওয়া যায় না। কারণ কি? ভাবতে লাগলো ফেডেরিক। কোথাও কি যেন ভুল হয়ে গেছে? ভাবতে ভাবতে তার খেয়াল হল যে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসছে। সে আবার পাশের ঘরে গেল এবং নিজের অজান্তেই [illegible]ট মূর্তিটাকে খুঁজতে থাকল।

মূর্তিটাকে না দেখতে পেয়ে ভয় পেল ফেডেরিক। মূর্তিটা নেই। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি তবে উড়ে গেল? এ-ও কি কোন জাদুমন্ত্র?

নিজের দুর্বলতায় হেসে উঠল ফেডেরিক। সমস্ত ঘর তছনছ করে দেখল। কোথাও পাওয়া গেল না। ঝিকে ডাকল। লজ্জিত হয়ে ঝি স্বীকার করল যে একদিন ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে মূর্তিটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।

"কিন্তু টুকরো অংশগুলো কোথায়?"

সেগুলোও নেই। এই ছোট মূর্তিটাকে ঝি কতদিন নিজের হাতে ধরেছে। তখন একে ফাঁপা মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে মূর্তিটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল। আবার জোড়া লাগান যায় কি না দেখতে দোকানে গিয়ে-ছিল। হেসে উঠেছিল দোকানদার। তাই সে টুকরোগুলো অবধি ফেলে দিয়েছে।

ঝিকে যেতে বলে হাসতে থাকলো ফেডেরিক। ভালই হয়েছে। তার খারাপ লাগছে না। বিরক্তি আর থাকবে না। এবার সে শান্তি পাবে। যদি সে প্রথমদিন মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলতে পারত! অন-র্থক কত কষ্টই না সে ভোগ করেছে। কত অলস, উদাসীন, অদ্ভুত, বিচিত্র শয়তানির দৃষ্টি নিয়ে মূর্তিটা তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এখন সে আর নেই। এখন সে অন্তত নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে যে সেই এই মূর্তিটাকে, এই মাটির দেবতাকে ভয় করত; সত্যিই ভয় করত। এই মূর্তিটা তার কাছে যাবতীয় কুশ্রীতা ও বিরূপতার প্রতীক। যাকে সে অন্যায়, গর্হিত ও কুসংস্কার বলে মনে করে, তারই প্রতীক এই মূর্তি, আত্মা ও চেতনাকে যে ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে, তারই প্রতীক এই মূর্তি। একদিন মাটির গর্ভে ভূমিকম্পের আলোড়নে, পৃথিবীর সংস্কৃতির আসন্ন ধ্বংসের মুখে শোনা যেত এই অপ-দেবতার আদিম ক্রোধের গর্জন। এই মূর্তিটাই ছিনিয়ে নিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে: শুধু মাত্র ছিনিয়ে নেয়নি, সেই বন্ধুকেই করে তুলেছে [illegible] শত্রু। এখন সেই আপদ আর নেই। গিয়েছে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। ভালই হয়েছে। তবু সবচেয়ে ভাল হত সে যদি নিজের হাতে আছড়াতে পারত তাকে।

এই ভেবে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কিন্তু এ-ও যেন এক অভিশাপ। এতদিন দেখে দেখে হাস্যকর মূর্তিটা তার চোখে সয়ে গিয়েছিল, অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। খুব বিরক্তিও লাগতো না। মূর্তিটা তার গুরুত্ব হারাচ্ছিল আস্তে আস্তে। কিন্তু এখন আবার সেই মূর্তিটার অনুপস্থিতি তার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যত বার সে ঘর দিয়ে যায়, ততবারই মনে পড়ে ক্ষতি হয়েছে কিছু; চোখ পাতলেই নজরে পড়ে সেই ফাঁকা জায়গা। এখানেই সে ছিল, আজ নেই। আর এই শূন্যতা তার সমস্ত ঘরে এক বিচিত্র নোতুনত্ব ছড়াল।

দিনগুলো খারাপ ভাবে কাটতে লাগলো; রাত্রি ত আরও খারাপ। পাশের ঘরে যাওয়া মাত্রই তার মনে হয় সেই মূর্তিটার কথা, সেই দু'-মুখো দেবতা, যে আজ আর নেই অথচ তার সব চিন্তাই ত তাকে নিয়ে। এই যন্ত্রণাদায়ক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার নেই। পাশের ঘরের টেবল থেকে একটা শূন্যতা ও রিক্ততা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এই শূন্যতার আভা পড়েছে তার নিজের অন্তরে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সব। ধীরে ধীরে সেই আভা তাকে ঢেকে ফেলছে। তার বুক ভরে উঠল অদ্ভুত শূন্যতায়।

বহুবার মূর্তিটার অবয়ব কল্পনা করার চেষ্টা করল সে। নিজেকে বোঝাতে চাইল কি বিকট ও বর্বর দেখতে ছিল তাকে। তার জন্য শোক করা অন্যায়। চোখের সামনে সে যেন দেখতে পেল সব কুশ্রীতা নিয়ে দু'মুখো মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেল তার সুচতুর হাসি। ঘৃণা ও বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে ফেডেরিক লক্ষ্য করল সে নিজেই সেই মূর্তিটার হাসি নকল করছে। নোতুন প্রশ্ন এল মনে— দুটো মুখ কি সত্যিই একই রকম দেখতে ছিল? কারিগরের অপটুত্বের এবং রং চটে যাওয়ার জন্য একটা মুখের ব্যঞ্জনা অন্য-মুখ থেকে একটু আলাদা হয়ে ওঠেনি? একটু অদ্ভুত? অনেকটা স্ফিংক্সের মত? আর তার রঙটাই বা কি বিচিত্র! রঙটা ছিল সবুজ, নীল এবং ধূসর এবং কিছুটা লাল; আর তার ঔজ্জ্বল্য জানালার গরাদে ঠিকরে পড়ত, সকালের শিশির-ভেজা ফুটপাতে ঠিকরে পড়ত।

রাতেও এই নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল ফেডেরিক। মনে হল "ঔজ্জ্বল্য" কথাটা ব্যবহার করা যায় না। এর অর্থ ও ধ্বনি কেমন যেন বিদেশী-বিদেশী। ঠিক প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এখন শব্দগুলোকে যদি উলটে-পালটে সাজানো যায়? যদি

ওকে করা যায় "ল্যাজবুঊ"? কি অর্থ দাঁড়াবে তার? কোন অর্থ আছে কি? ধ্বনিটা আরও বিশ্রী! সে অনেকক্ষণ ধরে এই কথাই ভাবল। এ যেন এক অভিশাপ। এই মূর্তিটার যাবতীয় অনুষঙ্গ তাকে পীড়িত করছে। তার আরভিন, তার প্রাক্তন বন্ধু আরভিন, এই মূর্তিটা দেবার সময় কি বিচিত্র ভাবে হেসেছিল। সেই হাসি কত গূঢ়, কত বিচিত্র ও শত্রুতায় কতখানি পূর্ণ!

এই চিন্তার দুরন্ত গতি রোধ করার জন্য নিজের সঙ্গে লড়াই চালাল ফেডেরিক। কিন্তু প্রতিবার সে হেরে গেল। সে বিপদটাকে দেখতে পাচ্ছে। না, সে কিছুতেই পাগল হবে না। হঠাৎ মনে হল এই-ই বোধহয় জাদু। আরভিন এই মূর্তির সাহায্য নিয়ে জাদুমন্ত্রে বশ করেছে তাকে। সে বোধহয় সম্মোহিত। যুক্তি ও বিজ্ঞানের পূজারী, তাকে, অন্ধকার শক্তির পাদমূলে বলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাই-ই যদি হয় তবে এ কথা সে কি করে স্বীকার করবে যে, জাদুবিদ্যা বলে সত্য কিছু আছে, কি করে স্বীকার করবে সম্মোহনকে?

না, এই সব স্বীকার করার আগেই তার মৃত্যু হোক!

একজন ডাক্তার প্রতিদিন স্নান করা ও ভ্রমণের বিধান দিল। কখন কখন আনন্দ করার জন্য সরাইখানায় যেত ফেডেরিক। কিন্তু তাতেও কোন সুফল হল না। সে আরভিনের মুণ্ডপাত করল, ধিক্কার দিল নিজেকে।

আজকাল সে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায়। ঘুম আসে না। বিছানায় আই-ঢাই করে। সে রাতেও তাই হল। শরীর খুব খারাপ লাগতে লাগলো। নিজে কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সে। সান্ত্বনা খুঁজল। উচ্চারণ করতে চাইলো সুন্দর, সহজ, অকপট, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ বাক্য, "দূরে দূরে চর"। কিন্তু কিছুতেই মনে এল না। হাল্কাভাবে শব্দ ও বাক্যাংশ নিয়ে নাড়া-চাড়া করল। শেষকালে তার ঠোঁটে শব্দ গঠিত হল, একাধিক বার ঘুরতে থাকল। কিন্তু তার অর্থ তখনও তার কাছে ঝাপসা। সেই বাক্য বহুবার নিজের মনে আবৃত্তি করল সে। এই বাক্যই তার ভিতরে জন্ম নিয়েছে। নিজেকে ভোলাবার জন্যই সে কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করতে থাকলো, মনে হল এই বাক্যের পথ-রেখা ধরে নরকের পাশ দিয়ে ঘুমের দিকে চলে যাবে সে।

অকস্মাৎ জোরে জোরে আবৃত্তি করতে থাকলো কথাগুলি আর সেই শব্দে যেন বিদ্ধ হল তার চেতনা। ঠিক, সে বলতে পেরেছে: "এখন তুমি আমার ভিতরে।" চকিতে সমস্ত অর্থ পরিষ্কার হল। সে বুঝলো যে তার কথা মাটির মূর্তিটির প্রতি নিবেদিত। মনে হল যে ভবিষ্যতবাণী আরভিন করেছিল তা আজ এই গভীর রাত্রে সফল হয়েছে। যে মাটির মূর্তিটাকে একদিন প্রচণ্ড ঘৃণায় নিজের মুঠোর মধ্যে ধরেছিল আজ সেই মূর্তি তার বাইরে নেই; সেই মূর্তি ঠাঁই করে নিয়েছে তার অন্তরে। "যাহাই বাহিরে তাহাই ভিতরে।"

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সে। বরফ ও আগুনে যুগপৎ আলোড়িত। কথাগুলি মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। নক্ষত্রগুলি নির্বাক তাকিয়ে আছে তার দিকে। গায়ে জামা চাপিয়ে আলো জেলে সে মাঝরাতেই ছুটলো আরভিনের বাড়ি। আরভিনের স্টুডিয়োতে তখনও আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। মনে হয় এ বাড়ির সমস্ত কিছু তার জন্যই অপেক্ষা করছে। খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙতে থাকলো সে। টলতে টলতে আরভিনের ঘরে ঢুকে টেবিল ধরে কোনক্রমে সে নিজেকে সামলে নিল। মৃদু আলোর নিচে বসে আছে আরভিন, তার মুখে চিন্তামগ্ন হাসি।

সহাস্যে উঠে দাঁড়াল আরভিন, "তুমি এলে। খুব ভাল।"

মৃদু কণ্ঠে ফেডেরিক বললে, "আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে নাকি?"

"তুমি এখান থেকে যাবার পর প্রতিদিনই ভেবেছি তুমি আসবে। আমি যা বলেছিলাম তাই-ই হয়েছে, না?"

"তাই-ই হয়েছে। মূর্তিটা আমার ভিতরে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

"আমার কথা শুনবে?"

"জানি না, তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। তোমার এই জাদুবিদ্যা বুঝিয়ে দাও। বল কি করে এই মূর্তি আবার আমার বাইরে আসবে?"

বন্ধুর কাঁধের ওপর হাত রাখল আরভিন। তাকে চেয়ারে বসিয়ে হাসতে হাসতে ভাই-এর মতন বললে আরভিন:

"ওই মূর্তি আবার তোমার বাইরে আসবে। আমাকে বিশ্বাস করো। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। এখন তুমি শুধুমাত্র মূর্তিটিকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ। এবার তোমাকে ভালবাসতে হবে। ও এখন তোমার ভিতরে, কিন্তু মৃত। ও এখনও তোমাকে ভূতের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে জাগাও, ওর সঙ্গে কথা বল, ওকে ভালবাস। কারণ ওই মূর্তি যে তুমি নিজেই। তুমি আর ওকে ভয় করো না, ঘৃণা করো না, যন্ত্রণা দিয়ো না। আহা, তুমি বেচারাকে কত কষ্টই দিয়েছ! কিন্তু ওই মূর্তি আর তুমি অভিন্ন যে! দ্যাখো তুমি নিজেকে কত কষ্টই না দিয়েছ।

ফেডেরিক জিজ্ঞাসা করল, "এই কি জাদুবিদ্যার পথ!" ফেডেরিক চেয়ারের ভিতরে ঢুকে গেছে; সে যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছে।

আরভিন বললে, "এই-ই সেই পথ। তুমি ইতিমধ্যে বড় জটিল পথ বেছে নিয়েছ। তুমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছ যে 'বাহির' 'ভিতর'ও হতে পারে। তুমি দুটি বিপরীতের সীমানা পার হতে পেরেছ। এই অভিজ্ঞতা তোমার কাছে নরক বলে মনে হয়েছে। এখন বন্ধু, তোমাকে বুঝতে হবে এই অভিজ্ঞতা আবার স্বর্গীয়। সেই আনন্দে তোমাকে যেতে হবে। এর নাম জাদু। এই 'ভিতর' আর 'বাহির'-এর ধারণাকে ওলট-পালট করে দিতে হবে। তবে তোমার মত জোর-জবরদস্তি করে নয়, যন্ত্রণার পথ বেয়ে নয়। এই পরিবর্তন হবে আপনা-আপনি, খুব স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। তোমার সমস্ত অতীত আর তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তোমার মধ্যেই নিহিত। এখনও অবধি তুমি 'বাহিরে'র দাস হয়ে আছ। তোমাকে তার প্রভু হতে হবে। এই-ই হল জাদুবিদ্যার পথ।"

অনুবাদ: রাম বসু

'বেট জেনারেশনের' আদর্শপুরুষ হলেন হেরম্যান হেস। ১৮৭৭ সালে সর্যাবিয়ায় (Sawbia) হেসের জন্ম হয়। জীবনে ইনি বহুপ্রকার জীবিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে এঁর প্রথম উপন্যাস Peter Lamenzind প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে ইনি ভারত ভ্রমণ করেন এবং ১৯২১ সালে 'সিদ্ধার্থ' প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এঁর জীবন-মানসে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মৃত্যু ও পরাজিত জার্মাণীর সমস্যা নিয়ে রচিত হয় বিখ্যাত উপন্যাস Demian (১৯১৯)। ১৯৪৭ সালে ইনি নোবেল পুরস্কার পান।

অনুবাদক

সাহিত্য সমাচার

বিশ শতকের পোলিশ চিত্রকলার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন তাদেউৎস ম্যাকোস্কি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পোল্যাণ্ডের চিন্তালোকে যে যুগান্তর আসে তাতে ম্যাকোস্কির অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিত্রকলায় গীতি-কবিতার অপরূপ লাবণ্য আর মানুষের বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'স্মৃতিচিত্রণ' প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে "Everything is a delusion and only the charm of simple things helps to forget That is where I find beauty" এই সুন্দর সরলতা, কাব্য আর বিষণ্ণতায় পূর্ণ। তাঁর মৌলিক সৌন্দর্য চিন্তা হোল সহরতলী, অসুখী মানব-শিশু, নৈসর্গিক চিত্র আর পাখিদের কথা। আধুনিক পোলিশ সাহিত্যিকদের ওপর ম্যাকোস্কির প্রভাব অসামান্য। তাঁর চিত্রাবলী অবলম্বনে কবিরা কবিতা লিখেছেন। প্রদর্শনীতে তাঁর প্রদর্শিত চিত্র হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছে। এই "স্মৃতি-চিত্রণ" নামক গ্রন্থ উদ্ধারের কাহিনী আরও বিচিত্র। জাওরস্কা নামক একজন চিত্র-সমালোচক যখন প্যারিসের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে এটি উদ্ধার করলেন তখন নব উদ্দীপনার সঞ্চার হল শিল্প-রসিকদের মনে। "স্মৃতি-চিত্রন" পোল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়ে রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ম্যাকোস্কি ১৯৩৫ সালে মারা যান।

* * *

'স্যাটারডে রিভ্যু' পত্রিকা বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্রগুলির ৪৭ জন পুস্তক সমালোচককে একটি উল্লেখযোগ্য বিচারের ভার দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী কতকগুলি বই (উপন্যাস ও উপন্যাস-নয়) নির্বাচন করতে অনুরোধ করেন। 'মার্ক স্কোরার রচিত সিনক্লেয়ার লুইস: এ্যান অ্যামেরিকান লাইফ' নামক গ্রন্থটি সবথেকে বেশী ১৮টি ভোট পায়। 'ব্যবিট', 'মেইন স্ট্রীট', 'ডডসওয়ার্থ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এই কথাশিল্পী তাঁর মূল্যবান সাহিত্য-কৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলাকে নিপুণতার সঙ্গে জে. ডি. সেলিংগার তাঁর 'ফ্রেনি অ্যান্ড জোনি' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত এ গ্রন্থটি মোট ১২ জনের সমর্থন লাভ করতে পেরেছে। নয়জন সমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত কারসন ম্যাককুলার্সের 'ক্লক উইদাউট হ্যান্ড' গ্রন্থে মানব-সম্পর্কের মর্মান্তিক বিচ্ছেদ, জটিলতা এবং আসন্ন মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া প্রকৃত শিল্প-ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'দি মেম্বার অব দি ওয়েডিং' গ্রন্থ রচনার নয় বৎসর পর প্রকাশিত এর কাহিনী দক্ষিণাঞ্চলের একটি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ডব্লু এ সোয়ানবার্গ রচিত 'সিটি-জেন হার্স্ট: এ বায়োগ্রাফি অব উইলিয়ম র‍্যানডলফ হার্স্ট'; সি. জে. ফার্গ সম্পাদিত 'লেটার্স' অব এইচ. এল. মেনকেন' (১৯৫৬ সালে পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সমালোচক ও প্রবন্ধকারের হাজার চিঠির সংকলন); এবং ম্যাকিনলে ক্যানটরের 'স্পিরিট লেক' (১৮৫০ সালে শত্রুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংগ্রামশীল পূর্বাঞ্চল ত্যাগকারী নরনারীর দল এবং মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ভীষণ নির্জনতার অপূর্ব আলেখ্য)—এই তিনটি গ্রন্থ সাতটি করে ভোট লাভ করেছে।

উইল এবং এরিয়েল ডুরান্টের ২৬ বৎসর পূর্বে আরব্ধ 'দি স্টোরি অব সিভিলিজেশন' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড 'The Age of Reason Begins: A History of European civilization in the period of Shakespeare, Bacon, Montaigne, Rembrant, Galilio and Descartis: 1558-1648'. প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকগণ গ্রন্থটি রচনায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনন-শক্তি ও সুষ্ঠু বিচার ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমাগ্রসরমানতার একটি পূর্ণাঙ্গ, সার্থক এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যাবে এখানে।

মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী অব-লম্বনে আরভিং স্টোন রচিত উপন্যাস 'দি এগোনি অ্যান্ড দি একস্ট্যাসি' এবং দক্ষিণ আমেরিকার জীবন অবলম্বনে হার্পার লি রচিত উপন্যাস "টু কিল এ মকিং বার্ড" গত বছরের অধিক বিক্রিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস।

বিখ্যাত মার্কিন মনীষিদের চিঠি-পত্রের সংকলন সম্পাদনা করেছেন চার্লস ও এলেনর হার্ড। গ্রন্থটির নাম 'এ ট্রেজারি অব গ্রেট অ্যামেরিকান লেটার্স'। ব্যক্তিগত পত্রগুলির মধ্য থেকে মূল্যবান পত্রগুলিকেই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাঁদের চিঠি স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন জর্জ ওয়াশিংটন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন, ওয়াশিংটন আরভিং, আবরাহাম লিংকন, টমাস এ এডিসন, সেরউড অ্যাণ্ডারসন এবং উইল রোজার্স।

* * *

জার্মান পণ্ডিত রুডলফ হেগেল-স্টেঞ্জ কবি, প্রবন্ধকার এবং গল্পকার হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর ব্যবহৃত রূপক ও অলংকারমণ্ডিত ভাষা রাইনার মারিয়া রিলকেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বুক অব আওয়ার্স' এবং 'দুনও এলিজিস' শুধু সমাদর লাভ করেনি; এ কালের তরুণ জার্মান কবিরা কাব্যসাধনার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। রুডলফ কবিতাকে একদিকে যেমন ছন্দ, তাল, লয় ও ধ্বনি সুষমামণ্ডিত করেছেন তেমনি কঠোর কাব্যাঙ্গের মধ্যে এক অসাধারণ গতি-প্রবাহের সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি এক-বার সতর্ক করে বলেছিলেন, "The ice on which we are dancing is finely polished, but thin, we must watch out that not too many asses try to go on it". রুডলফের যৌবন অতিবাহিত হয় হার্জ পর্বতমালায়, যেখানে ১৯১২ সালে নরদাউসেন নামে একটি ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। 'ফ্যাকালটি অফ আর্টসে' অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি বলকান ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৯৪৪ খৃঃ ইটালিতে রচিত 'ভেনিসিয়ান ক্রিড' সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্থান সূচিত করে। উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হিসাবে চারি-দিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 'ব্যালাড অব দি বেরিড লাইফ' রচনার জন্য ১৯৫২ সালে জার্মান সমালোচকদের পুরস্কার লাভ করেন। গদ্য রচনায়ও তিনি সার্থক। আমেরিকা পরিদর্শনের স্মৃতি নিয়ে রচনা 'হাউ ডু য়ু লাইক অ্যামেরিকা' ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ন্যায়দর্শী নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। রুডলফ প্রথম উপন্যাস 'প্লেবল অব দি গডস' রচনা করে প্রকাশকদের পুরস্কার লাভ করেন। এই কাহিনীতে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের মধ্য দিয়ে রুডলফ আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন। রাজকুমারের রোমাঞ্চকর জীবন-কথা, প্রেম, হেলেনকে অপহরণ, ট্রয়ের অবরোধ চিত্রিত করেন সুললিত বর্ণনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। অখণ্ডনীয় ও চিরন্তন জীবন-সত্যকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নাটকীয় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন—যা কোন যুগের মধ্যে বিধৃত নয়—চিরকালের সত্য। রুডলফ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান কথা-শিল্পী হয়েও আমাদের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নন।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুচিন্তা স্নান সেরে এসে ধবধবে শাদা ব্লাউস আর থানের উপর তেমনি শাদা পাতলা একখানা চাদর জড়িয়ে এসে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, দেখলেন তখনও সরু বিছানায় বড় শরীরটা নিয়ে শিশুর মত অঘোরে ঘুমোচ্ছেন সুশোভন। ফিরে এসে চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। দেখলেন সুবল যথারীতি চা দিয়ে গেছে, কিন্তু নিরুপম যথারীতি কোণের চেয়ারটায় বসে নেই। ঘুরে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সুবলের তৈরি সেই দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন।

কিন্তু দৃশ্যটা কি সুবলের তৈরি?

না কি সুচিন্তারই। সুবল শুধু ক্রূর হাসি হেসে সেটা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে গেল।

তা'হলে নিরুপমও চলে গেল?

সুবলের মতই ভাবলেন সুচিন্তা। ভাবলেন কখন গেল? মাঝরাত্রেই?

নিরঞ্জনের চলে যাওয়ার পর তার সেই শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল সুচিন্তার। হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু আজ এই সারি সারি তিনখানা খালি ঘরের অদ্ভুত শূন্যতার দিকে একেবারে শুকনো চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন সুচিন্তা পাথরের মত। দীর্ঘশ্বাস তো দূরের কথা বোধ করি নিশ্বাস ফেলতেই ভুলে গেলেন।

কিন্তু সুচিন্তার বড়ছেলে চলে যায়নি।

সুচিন্তার বড়ছেলে তাদের সংসারের রাঁধুনির মেয়ের কাছে সত্যবন্দী। ভোর-বেলা বেরিয়ে অনেকক্ষণ এখান সেখানে ঘুরে পথে পথে বেড়িয়ে তারপর ডাক্তার পালিতের সময় অনুযায়ী তাঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, 'তাই নাকি?'

বললেন, 'এরকম আশা করিনি।'

বললেন 'তাই তো। তাহলে আর দু'একটা সিটিং দরকার।'

সেখান থেকে কলেজ চলে গেল নিরুপম অস্নাত অভুক্ত। ফিরলো বিকেলবেলায়।

বাড়ী ঢুকেই প্রথমটা মনে হ'ল মাও হয়তো সারাদিন উপবাসী আছেন। পরক্ষণেই ইচ্ছে করে মনটাকে বিরুদ্ধ করে তুলল। ভাবল তা কেন, পাগলের খেয়ালে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়তো তার সঙ্গে এক টেবিলে বসেই খেয়েছেন হেসে হেসে আর গল্প করে করে।

সুবল তাকিয়ে দেখল বড়দাদাবাবু বাড়ী ঢুকল। বুকের থেকে একটা পাথর নামল তার। হয়তো বা একটু লজ্জিতও হল। কি জানি বা কোন কাজে গিয়েছিল। আর কি জানি বা সত্যিই আজ সুচিন্তার অক্ষিধে ছিল। নইলে কই দুটো দুটো ছেলে তো বাড়ী থেকে ফাঁকা হয়ে গেল, সুচিন্তাকে তো কোন দিন খাওয়া-শোওয়ায় ব্যতিক্রম করতে দেখেনি সুবল।

সুচিন্তা একটা বই কোলে করে বসেছিলেন।

'নিরুপম বিনা ভূমিকায় বলল, ডাক্তার পালিত বলেছেন আরও দু' একটা সিটিং দরকার।'

উত্তর দিতে দেরী হল সুচিন্তার। হয়তো এই আকস্মিক কথাটা অনুধাবন করতে দেরী হল। দেরী করেও উত্তর দিলেন সংক্ষিপ্ত।

নিরুপম চলে যাচ্ছিল।

হয়তো চলেই যেত। হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠল, 'আমি ভাবছি ওঁকে হস-পিটালে দেবারই ব্যবস্থা করবো।'

এবার আর সুচিন্তার উত্তর দিতে দেরী হ'ল না।

স্বাভাবিক সময়ের মধ্যেই বললেন, আর স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'তা হয় না।'

'তা হয় না? দেবার মত অবস্থা পড়লেও হয় না?'

বড় বেশী উত্তেজনার সময় কি মানুষ বড় বেশী শান্ত ভাব দেখায়? তাই নিরুপমের কথা এত ঠান্ডা, সুর এত শান্ত।

সুচিন্তা সেই ঠান্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও তেমনি ভাবে বললেন, 'না। অন্তত নীতা ফেরার আগে ওকে আমি কিছুতেই কাছছাড়া করতে পারি না!

নিরুপম একবার এই দুঃসহ স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'তা'

হলে বুঝতে হবে আমিও বাড়ীতে না থাকি—এইটাই তুমি চাও।'

সুচিন্তা চমকালেন না।

হয়তো এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন তিনি। হয়তো বা এতদিন ধরে পৃথিবীর সমস্ত প্রশ্নের জন্যেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন নিজেকে।

তাই না চমকে বললেন, 'আমার চাওয়া না চাওয়ার ওপরেই কি সব নির্ভর করছে?'

'কিছুটা করছে বৈকি।'

সুচিন্তা এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'বিবেক আর বিবেচনার ধারা সকলের সমান নয় নিরু।'

অনুপম কুটিরের চিরশান্ত বড়-ছেলের মনের মধ্যেও কি কথার ঝড় উঠেছে? নিজেকে শান্ত রাখা ক্রমশঃই শক্ত হচ্ছে তার? তাই কথার পিঠে যবনিকাপাত না করে কথা চালিয়ে যায় সে!

'সমান হওয়াই উচিত মা। সেটাই স্বাভাবিক। রোগীর প্রতি সহানুভূতিটা ভাল জিনিস, কিন্তু পাগলকে প্রশ্রয় দেওয়াটা সঙ্গতও নয় শোভনও নয়। আমার মতে শোভনতাই হচ্ছে মানুষের শেষ কথা।'

'শেষ কথা কি অত সহজে বলে শেষ করা যায় নিরু?' সুচিন্তা অবিচলিত-ভাবেই বলেন, 'আর মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব একটা মত থাকে। শোভনতার মাপকাঠিও সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়।'

নিরুপম কি আর কথা চালাত? না থেমে যেত? একসঙ্গে এত কথা কবে কয়েছে নিরুপম?

তবু আরও কিছু হয়তো বলতো সে। বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু ঈশ্বর জানেন নিরুপমের ভগবান কি সুচিন্তার ভগবান কে এসে কাকে রক্ষা করলেন, সুবল এসে জানাল একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

আবার আকস্মিক টেলিগ্রাম!

আবার কোনও দুঃসংবাদ না কি?

না দুঃসংবাদ নয়, পরম সুসংবাদ। অন্ততঃ সাংসারিক রীতিতে তাই বলে। 'বিয়ে' খবরটাই সুখবর।

নিরুপমকেই জানিয়েছে নীতা দীর্ঘ টেলিগ্রামে। সাগরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তার। জানিয়েছে সাগরের বিবাহিতা স্ত্রী, এই পরিচয়টা সম্পূর্ণ পাকা না হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছিল নীতাকে, সাগরের সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে কোন অধিকারও পাচ্ছিল না। কাজে কাজেই—রেজেষ্ট্রিটা করে নিতে হ'ল।

'...আমার মতে শোভনতাই মানুষের শেষ কথা।'

আবেগের বিয়ে নয়, প্রয়োজনের বিয়ে।

অধীরতার বিয়ে নয়, বিবেচনার বিয়ে।

সেই কথাই জানিয়ে দুজনের জন্যে নিরুপমের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছে নীতা, আর বলেছে 'এ খবর বাবাকে জানানো অর্থহীন, পিসিমাকে জানানোর সাহস নেই, তাই আপনাকেই জানালাম, আমার জন্যে ও'দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন বড়দা।'

সবশেষে জানিয়েছে নীতা, সাগরকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরবার চেষ্টা করছে সে। শিশির নামক সেই বন্ধু থাকবে সঙ্গে, ভাবনার কিছু নেই। প্রথমটা দিল্লীতেই নামতে হবে, সাগরের নানাবিধ ব্যাপার নিয়ে, তারপর চিন্তা করে স্থির করতে হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছকটা কি রকম হবে। অবশ্য সেই জীবনের সবক্ষেত্রে নীতা তার ভাগ্য-লব্ধ বড়ভাইয়ের স্নেহ আর সাহায্যের আশা রাখে।

লেখাগুলোর দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ভাবতে থাকে নিরুপম, এত শক্তি মানুষের কোথায় সঞ্চিত থাকে? যে শক্তিতে নীতার মত একটা কম-বয়সী মেয়ে আদরে আবদারে লালিত, সুখী মেয়ে, অন্ধ স্বামী আর পাগল বাপ, এই দুই দুর্বহ বোঝার ভারে ভেঙে না পড়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের সুশৃঙ্খল সুষ্ঠু ছক আঁকবার কল্পনা করতে পারে! এ শক্তি কে জোগায়?

নিরুপমের কি ভবিষ্যতের কোন ছক আছে? কোনদিন ছিল? আজকের

রাত আর আগামীর কাল, এ-ছাড়া এর থেকে দূরপ্রসারী কোন চিন্তাই কি করেছে কোনদিন? শুধু শান্তভাবে দিন যাপন করে যাওয়া ছাড়া জীবনের আর কোন ছক্ ছিল না নিরুপমের।

ভাগ্যের প্রতিকূলতাই কি মানুষকে শক্তি অর্জনের প্রেরণা দেয়? নিরুপমের জীবনেরও তো প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে, কই নিরুপম তো তাকে সুস্থ চিত্তে মেনে নিয়ে জীবনের নতুন ছক্ আঁকবার চেষ্টা করতে পারছে না। পারছে না সেই শক্তি অর্জন করতে, যে শক্তিতে সুচিন্তাকে স্নেহ আর সহানুভূতির চক্ষে দেখা যায়, সুশোভনকে নিকট-আত্মীয় বলে স্বীকার করা যায়।

ভালবাসলে আর ভালবাসা পেলেই কি সন্ধান পাওয়া যায় আপন হৃদয়ের গহন গভীরে কোথায় সঞ্চিত আছে অফুরন্ত শক্তির উৎস!

কিন্তু ভালবাসবে আর ভালবাসা পাবে এমন সৌভাগ্য সংসারে ক'জনের আসে? হয়তো জীবনে কখনোই সেই অলোক-সামান্যের দেখা মেলে না। হয়তো দেখা মিললেও নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ আসে না। হয়তো বা সমস্ত সুযোগের লগ্ন এসেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় দ্বিধা আর কুণ্ঠার বিড়ম্বনায়। তাই মানুষের চেহারা এমন জীর্ণ বিবর্ণ ক্লিষ্ট।

সহসা সুচিন্তার কথাই মনে পড়ে গেল নিরুপমের।

এখনকার সুচিন্তা নয়। অনুপম মিত্তিরের সংসার-পরিচালনার যন্ত্র সুচিন্তার কথা। নির্জীব নিশ্চুপ বিবর্ণ সুচিন্তা। সেখানে মাকে কোনদিন কারো কথার প্রতিবাদ করতে দেখেনি নিরুপম। দেখেনি সংসারের কোথাও নিজের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে। খুব স্পষ্ট মনে আছে নিরুপমের তার দাদামশাই মারা যাবার দিনের ঘটনাটা।

সকালবেলা খবর এসেছিল অসুখ বেশী বাড়াবাড়ি, সুচিন্তা সংবাদদাতার সঙ্গেই চলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অনুপম মাথা চুলকে বললেন, 'বিকেলের দিকে গেলে হয় না? আমি যে আবার আজ কজনকে নেমন্তন্ন করে রেখেছি। এ মোহড়াটা মিটিয়ে বিকেলের দিকে গেলে'—সুচিন্তা নীরবে যাত্রার আয়োজন স্থগিত রেখে রান্নার আয়োজনে লাগলেন। বললেন না, 'তা হয় না।'

ঘন্টাকয়েক পরে খবর এল রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

নিরুপমের হঠাৎ মনে হল, মায়ের এই নীরব বশ্যতাকে সে চিরদিনই অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখেছে, মাকে কোনদিন বুঝতে চেষ্টা করেনি। অথচ একটু ইচ্ছে করলেই মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করা যায়। আর সেই চেষ্টার মধ্যেই মানুষের মানবিকতা, মানুষের মহত্ত্ব।

জানে, তবু বুঝতে চায় না এই এক আশ্চর্য রহস্য মানুষের।

মহত্ত্বকে সে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু মহৎ হবার মোহ তার নেই। যেন 'কী গরজ মহৎ হবার! কী এসে যায় মহৎ না হলে।'

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে সুশোভনের কাছে গেল নিরুপম। যেখানে সুশোভন একা বসেছিলেন পাগলের চাঞ্চল্য পরিহার করে। সকাল থেকে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে আছেন সুশোভন। যে রকমটা তাঁকে দেখা যায় না। অন্যদিন কিছু না করেন তো ঘরে বসে উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করেন।

আজ ঘুম ভেঙে পর্যন্ত যেন নীরব চিন্তামগ্ন।

কে জানে কেন।

নতুন পরিবেশে ঘুম ভেঙে হতচকিত হয়ে, না রাত্রের পাগলামী মনে পড়ে? পাগলামীটা 'পাগলামী' এ বোধ কি হঠাৎ জন্মেছে বোধহীন পাগলের?

নিরুপম টেলিগ্রামখানা সামনে ধরে বলল—'পড়ুন'।

'পড়ব। আমি পড়ব।' সুশোভন নিরুপমের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কী-এ?'

'দেখতে পাচ্ছেন না টেলিগ্রাম। চেনেন না?'

'দেখতে পাচ্ছি তো। টেলিগ্রাম চিনব না? তুমি আমায় কি ভাব বল তো?'

'কিছুই ভাবি না। পড়ুন, পড়ে বুঝতে চেষ্টা করুন।

'কেন, কী দরকার?' সুশোভন একগুঁয়ের ভঙ্গীতে বলেন 'আমি কেন বুঝতে যাব? কার টেলিগ্রাম তার ঠিক নেই।'

'কার জানেন? আপনার মেয়ে নীতার।'

'আমার মেয়ে নীতার। টেলিগ্রাম করেছে সে?'

'হ্যাঁ। পড়ে দেখুন কি লিখেছে।'

'আমি পড়ব?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান সুশোভন।

বড় অসহায় লাগে প্রশ্নটা।

নিরুপম নরম স্নেহের গলায় দৃঢ়ভাবে বলে, 'কেন পড়বেন না? পড়তে জানেন না আপনি?

'জানতাম তো।'

'এখনো জানেন। পড়ুন।'

সুশোভন প্রথম ছত্রটা বিড়বিড় করে পড়ে কাগজখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগছে না? কিন্তু খুব ভাল লাগার কথাই তো রয়েছে এতে। নীতার বিয়ের কথা রয়েছে। বিয়ে হয়ে গেছে! আপনার মেয়ে নীতার।'

'নীতার। আমার মেয়ে নীতার! বিয়ে হয়ে গেছে।' হঠাৎ সুশোভন নিরুপমের রোগাটে কাঁধদুটো সজোরে চেপে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠেন, 'মিথ্যে কথা!'

'আমি বলছি মিথ্যা কথা নয়। সত্যিই বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বললে শুনবো আমি?' এতক্ষণের চুপচাপ সুশোভন সহসা চীৎকার করে ওঠেন, 'বিয়ে হয়ে গেছে তো, বিয়ের বাঁশী বাজলো কই?'

না, নীতার বিয়েতে বিয়ের বাঁশী বাজেনি। কিন্তু ওদের তো বেজেছিল। কৃষ্ণা আর ইন্দ্রনীলের। বাঁশী বাজনাদারদের অনেক টাকা মজুরী দিয়ে তিন দিন ধরে বাজিয়েছিলেন কৃষ্ণার বাপ। তবু সে বাঁশীর সুর মিলোতে না মিলোতে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে থাকে। মধুচন্দ্রের অবকাশেই ঘটে।

কথায় কথায় যখন তখনই ওদের পরস্পরের প্রতি বাচনভঙ্গীতে মধুরসের চাইতে লঙ্কার ঝাঁজটারই আধিক্য দেখা দেয়। অবশ্য এটা মনে করবার হেতু নেই, ওই লঙ্কার ঝাজের মধ্যে বিচ্ছেদের সঙ্কেত। বরং হয়তো বা ওটা প্রেমের বন্ধনের পাকা গিঁট। শুধু

'অপরিচয় পরিণয়ে' যেটা কিছুদিনের পরে এসে দেখা দেয়, 'প্রণয় পরিণয়ে' সেটা মধুচন্দ্রের মধ্যেই উঁকি মারে। বোধকরি সেটাই স্বাভাবিক। পূর্বরাগের পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে, নব অনুরাগের ব্রীড়া-রক্তিম মাধুরীও অন্তর্নিহিত, এতদূরে পৌঁছে, যদি বিয়েটা ঘটে, তাহলে 'বর-কনে'র পক্ষে নিত্যদিনের 'স্বামী-স্ত্রীর' পর্যায়ে এসে নামতে ক'দিনই বা লাগবে?

বিরোধ বাধে দু'জনের ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়ে।

কৃষ্ণার বাবা মেয়েজামাইয়ের জন্যে এক মাসের মত হোটেল বুক করে রেখেছিলেন। নব-মিলনের পানসিতে চড়ে তারা সে মাসটাকে প্রায় কাবার করে এনেছে। এখন কৃষ্ণা হঠাৎ সুর তুলেছে সে কলকাতায় ফিরে বরের বাড়ীতেই থাকবে, ইন্দ্রনীলকে 'ঘরজামাই'গিরি করতে দেবে না।

ইন্দ্রনীল বলে, 'সে অসম্ভব।'

কৃষ্ণা ঝঙ্কার তোলে, 'অসম্ভব কেন, তাই শুনি?'

ইন্দ্রনীল কোনরকম যুক্তির মধ্যে না গিয়ে বলে, 'অসম্ভব বলেই অসম্ভব। ওর মধ্যে কেন নেই।'

'বিয়ে হয়ে মেয়েরাই শ্বশুরবাড়ী যায়, ছেলেরা নয়।'

'আমার ভাগ্যে তো সবই উল্টো। কনের বাড়ীতে সাতদিন ধর্ণা দিয়ে বসে থেকে বিয়ে করে কোন বর?'

'সে আলাদা কথা—' কৃষ্ণা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'সে ব্যবস্থায় আমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু এখন আমার জীবন আমার নিজের। আমার ইচ্ছে—'

ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে বলে, 'তোমার ইচ্ছেয় আমাকে নিয়ে বাঁদর নাচ নাচাতে পারো, কোন বাধা পাবে না। কিন্তু আমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী ঢুকতে চেও না, এই অনুরোধ।'

'তোমার অনুরোধ শুনছে কে? বন্ধুদের কাছে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না যদি তোমায় নিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়ী বসে থাকি।'

ইন্দ্রনীল হেসে বলে, 'যাক তবু একটা কারণ আবিষ্কার করা গেল। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, হঠাৎ শ্বশুরবাড়ীর জন্যে উতলা কেন। হিন্দু কুলনারীর হাওয়া গায়ে লাগল নাকি। কিন্তু কৃষ্ণা, বন্ধুদের কাছে যে লজ্জার শেষ থাকবে না, এ-বোধটা বুঝি আগে ছিল না? নচেৎ এই সুন্দর স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থাটি তো, বিয়ের আগে থেকেই হয়েছিল। তখন তো কই আপত্তি শুনিনি।'

কৃষ্ণা বলে, 'আহা তখন আপত্তি করে বিয়েটা পণ্ড করি আর কি! এমন বোকা আমি নই। মনে জানতাম তখন বাবার সব ব্যবস্থা মেনে না নিলে, বিয়ে খতম!'

'ভাবছি খতম হলেই বা এসে যেত কি।'

'আমার এসে যেত!' কৃষ্ণা মুচকি হেসে বলে, 'নাচাবার জন্যে একটা বাঁদরের ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'জগতে বাঁদর কি এতই দুর্লভ?'

'নিশ্চয়! দুর্লভ না হলে আমার বন্ধুগুলো সব আইবুড়ি হতভাগিনী হয়ে বসে আছে কেন! আমার ওপর তো ওদের দস্তুরমত হিংসে। বলে, 'তুই কি লাকি!' আসল কথা আজকাল তো আর কারুর মা-বাবা মেয়েদের বিয়ের কথা ভাবে না।'

'ভাবে না?'

'খুব কম। বেশীরভাগ মা-বাবাই ভাবে, এত ঝঞ্ঝাটে বাবার দরকার কি আমাদের। ও কাউকে জোটাতে পারে, হবে, না হলে নাই বা হ'ল। খরচ বাঁচল, ঝঞ্ঝাট বাঁচল।' অতএব—'

'তা' জোটাতে বা পারে না কেন সবাই?'

'আহা!' কৃষ্ণা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'সবাই আমার মত বুদ্ধিমতী কিনা!'

'বাস্তবিক! কিন্তু আপাততঃ তোমার বুদ্ধিটা আদৌ কার্যকরী হবে না। আমাদের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে গিয়ে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে বলে, 'তোমার পক্ষে হতে পারে আমার পক্ষে হবে না। কেন ওবাড়ীতে কি আমার ভাগ নেই?'

'তোমার ভাগ!' ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে তাকায়।

কৃষ্ণা মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'আকাশ থেকে পড়ছ যে। তোমার বাবার বাড়ী, তোমরা তিন ভাই। তিন ভাগের এক ভাগ তো তোমার। আর তোমার মানেই আমার। দাবীর সঙ্গেই আমি সেখানে গিয়ে বাস করতে পারি।'

ইন্দ্রনীল অতঃপর জানায় কৃষ্ণার ইচ্ছে হয় সে দাবী খাটাতে যাক, ইন্দ্রনীল তার মধ্যে নেই।

কৃষ্ণা বলে, 'ঠিক আছে আমিই দেখব।' আর মনে মনে তিক্ত হাসি হেসে ভাবে, তোমার বাধাটা যে কোথায় তা তো আর আমার বুঝতে বাকী নেই। পাছে তোমার মার কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই তো। তা'—ও বাধা আমি আর বেশীদিন থাকতে দেব নাকি। এক ধার থেকে সব সাফ করে ফেলব না?

আসল কথা কৃষ্ণার মা কৃষ্ণার মন্ত্রণাদাতা সহায়। পাড়ার মধ্যে থেকে মেয়ের শাশুড়ী যে একটা পাগল নিয়ে 'পাগল' হয়ে বসে থাকবেন, এ তিনি বরদাস্ত করতে রাজী নন। স্পষ্টই বলে দিয়েছেন মেয়েকে, 'রোস না, বিয়েটা একবার হতে দে না, তারপর দেখছি।'

কাজে কাজেই যখন তখনই কৃষ্ণা ওই কথা তোলে। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে মদির-বিহ্বল নববিবাহিতার ভূমিকাও বাদ যায় না। আদরে সোহাগে প্রণয়ে আর প্রগল্‌ভতায় ইন্দ্রনীলকে মুক করে ফেলতেও দেরী হয় না তার।

এইভাবেই কলকাতায় ফেরার দিন এসে যায়।

কিন্তু কোন্ কলকাতায় ফিরবে ইন্দ্রনীল?

যে কলকাতায় এক অবিবেচক অবোধ পাগল তাদের সমস্ত সুখ-শান্তি হরণ করে বসে আছে!

(ক্রমশঃ)
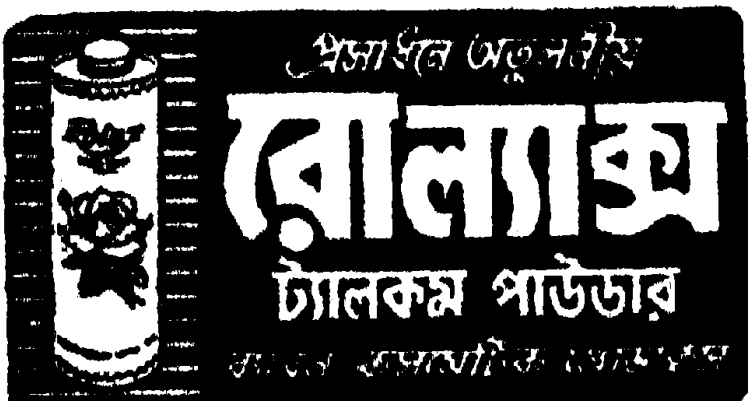
প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ তিনজন তরুণ শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী ॥
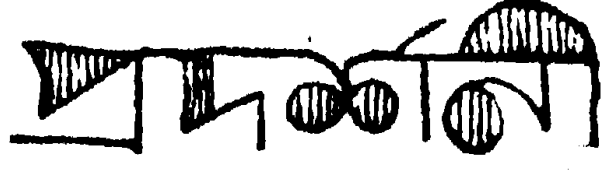
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি। হায়দ্রাবাদের মহিলা শিল্পী শ্রীমতী জেহরা রহমাতুল্লা কুড়িখানি চিত্র নিয়ে তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে। সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠীর শ্রীবিজন চৌধুরী দশখানি চিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে এবং শ্রীবারীন রায় বাইশখানি চিত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-ভবনের প্রদর্শনী-কক্ষ।

আলোচ্য তিনজন শিল্পীই তরুণ এবং আধুনিক চিত্র-রীতির পক্ষপাতী। এই তিনজনের মধ্যে শ্রীমতী জেহরা রহমাতুল্লা ইতালীতে গিয়েছিলেন শিল্প-শিক্ষার জন্য। ইতালীতে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী অ্যান্টেনিও করপোরো-র কাছে শিল্পশিক্ষার পাঠ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী রহমাতুল্লা বেশ পরিণত শিল্পী। তাঁর কল্পনা এবং চিত্র-শৈলী আধুনিক হলেও উন্মার্গগামী নয়। ক্যানভাসে মোটা জমিন সৃষ্টি করে শুধু মোটা কালো রঙের রেখায় তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর এক একটি কল্পনা। এই রেখার টানে ছন্দ ফুটে উঠেছে, ভাবও পরিস্ফুট হয়েছে। তাই তাঁর ছবি শুধু চোখ টানে না মনও টানে। অন্ততঃ তাঁর 'প্রার্থনা', 'মমতা', 'ঘুড়ির সঙ্গে বালক', 'গাগরী ভরণে' কিংবা 'শ্রান্ত' ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই উপরোক্ত কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। তেল-রঙে তাঁর দক্ষতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কলকাতায় এইটিই ছিল তাঁর একক প্রথম প্রদর্শনী।

শ্রীমতী রহমাতুল্লার মত শিল্পী শ্রীবিজন চৌধুরীও প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী। ইনি বিদেশে না গেলেও আঙ্গিক-প্রকরণে ঠিক দেশীয় রীতির ধার ধারেন না। সম্প্রতি ইনি শিল্পী নীরোদ মজুমদারের কাছে নাকি শিল্প-শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বিজনবাবুর বিষয়বস্তু নির্বাচন। কালীঘাট-মন্দিরকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত এই দশখানি চিত্রে তিনি আমাদের চিরপুরাতন বিষয়কে নতুন করে তুলে ধরার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। শিল্পীর চোখ দিয়ে আমরা 'নববর্ষ', 'নকুলেশ্বরতলা', 'শান্তিজল', 'নববধূর সিঁদুর পরা'-র দৃশ্যের সঙ্গে 'চড়কের আনন্দ' পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেখেছি। 'ফুলবিক্রেতার হাতে ১০৮টি ফুল' দিয়ে গাঁথা মালাও লক্ষ্য করেছি।

নকুলেশ্বরতলা

শিল্পী : বিজন চৌধুরী

মোটকথা, সব চিত্রগুলির মধ্যে আমাদের বাঙালী মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এই সব চিত্রাঙ্কনে তাঁর হলুদ, নীল আর লাল রঙের ব্যবহার ও হেলানো রেখায় চিত্রের সামগ্রিক ছন্দ-সুষমা তুলে ধরার কৌশল সত্যি প্রশংসার যোগ্য। 'নববর্ষ' (৫) চিত্রে আবার হেলানো ও বক্রাকৃতি রেখার সমন্বয় সাধন করেছেন শিল্পী। এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আরো সুন্দরতর শিল্প-সৃষ্টিই আমাদের কাম্য। আমরা সেই দায়িত্ব পালনের জন্য বিজনবাবুকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

শিল্পী বারীন রায়ের চিত্র আরো দু'একটি প্রদর্শনীতে পূর্বে আমাদের দেখা ছিল। একসঙ্গে এতগুলি চিত্র দেখে তাঁর শিল্প-প্রবণতা হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধে হল। বারীনবাবু এখনো কোনো বিশ্বাসের উপর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। ফলে কি বক্তব্যে কি প্রকরণে নতুনতর কোনো আস্বাদ তাঁর প্রদর্শনী-দর্শনে পেলাম না। অধিকাংশ তরুণ শিল্পীর সম্মুখে একই সমস্যা। তাঁরা কি আধুনিক চিত্র-রীতি মানে জ্যামিতিক প্যাটার্ন কিংবা চ্যাপ্টা রঙ প্রয়োগ বুঝবেন, না অন্য কোথাও সন্ধান করবেন আধুনিক চিত্র-রীতির অর্থ! এঁদের অনেকগুলি প্রদর্শনী দেখার পরে আজ সঙ্গতভাবেই এ-প্রশ্ন করা যায়।

কথাগুলো বারীনবাবুর চিত্র-প্রসঙ্গে এলেও এ-প্রশ্ন আমার প্রায় সমস্ত তরুণ শিল্পীদের কাছে। আশা করি তাঁরা এই প্রশ্নটি একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করবেন। বারীনবাবুর প্রদর্শনীতে এ-সব সত্ত্বেও কয়েকখানি ভাল ছবি ছিল। তাঁর কম্পোজিশান ও রঙ প্রয়োগের দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'বালক এবং ফুল' (৬), 'তিনজন' (৭), 'নিজের জগৎ' (১৩), 'লাল পাখি' (১৪) এবং 'সাদা বাড়ি' (১৫) চিত্রগুলি দেখে বারীন রায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়।

আমরা এই তিনজন তরুণ শিল্পীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। আশা করি তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকলার সম্মান বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হবেন।

পরমায়ু

কণাদ চৌধুরী

মানুষের মনে অন্নচিন্তার পরেই সম্ভবতঃ পরমায়ুচিন্তার স্থান। 'দেখুন ত কতদিন বাঁচবো'—বলে জীবনে একটিবার হাত বাড়াননি এমন লোক ভূভারতে আছে কিনা সন্দেহ। পরমায়ু সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। আমাদের বিশ্বাস প্রাচীন কালের লোকদের পরমায়ু আমাদের চেয়ে বেশী ছিল এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুর হার কমেছে। ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। প্রাচীনকালের পৃথিবীতে জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল কঠোর এবং প্রকৃতিও ছিল মানুষের প্রতিকূলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় প্রকৃতির হাতের পুতুল ছিলেন বলতে গেলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কেবল অসহায় শিশুরাই না, শক্ত সমর্থ পুরুষরাও করাল প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতে করতেই বিনষ্ট হত। বার্ধক্যে পৌঁছনোর সুযোগই ঘটত না সেকালের লোকের। এমন কি আদিম যুগের আদিবাসীদের মধ্যে ৬০ বছরের একটি লোককেও খুঁজলে পাওয়া যেত না। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক যুগেও বয়সী লোক বিরল।

যাই হোক বেঁচে থাকার ইচ্ছের মানুষের আজন্ম অধিকার। তাই বেশীদিন বাঁচার উপায় অন্বেষণে মানুষের গবেষণার অন্ত নেই আজকে। এই গবেষণারই একটা অঙ্গ হল পরমায়ুকে মাপা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের মেয়াদ অতীতের বিভিন্ন পর্যায়ে কতখানি ছিল তার একটা হিসেব-নিকেশ নেয়া। রোমান যুগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তখনকার আমলে একটি নবজাত শিশুর সম্ভাব্য পরমায়ু ২০-২৫ এর মধ্যে ধরা হত। রোমান সাম্রাজ্যের গোড়ার বছরগুলোতে খুব বেশী ৬০ বছরের লোক পাওয়া যেত না কারণ সেকালে ৬০ বছরের বৃদ্ধদের টাইবার নদীতে ফেলে দেয়া হ'ত। মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের প্রথমে আয়ুষ্কাল বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দুর্ভিক্ষ এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের কুজ্ঝটিকায় মৃত্যুর নখর আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। উক্ত সময়ে ইউরোপে গড় আয়ু ছিল মাত্র ত্রিশ বছর। মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইউরোপে আয়ুষ্কাল দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নিয়মিত আদমসুমারী আরম্ভ হওয়ার ফলে মৃত্যুর হার, মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক জানা সম্ভব হয়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে গত ত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে ঃ

	১৯৩০—৩৫ গড় পরমায়ু স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়ে	১৯৫০—৫৬	
		স্ত্রী	পুরুষ
ফ্রান্স	৫৬·৭	৭১·২	৬৫·০
ইটালী	৫৪·৯	৬৭·৩	৬৩·৮
সুইডেন	৬৪·৩	৭৩·৪	৭০·৫
পোলাণ্ড	৪৯·৮	৬৭·৮	৬১·৮
হাঙ্গারী	৪৯·৮	৬৮·৭	৬৪·৭
স্পেন	—	৬৩·৫০	৫৮·৭৪
কানাডা	—	৭০·৮৩	৬৬·৩৩
ভারতবর্ষ (স্ত্রী)	২৬·৫৬	৩১·৬৬	৩২·৪৫
(পুরুষ)	২৬·৯১		

ভারতবর্ষের পরমায়ুর গড়টির দিকে তাকালে মনে হয় ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য মৃতের দেশ। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রতিটি লোকের আয়ু অর্ধেকেরো কম। আরো একটি ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। প্রতীচ্যের সব দেশেই মেয়েদের পরমায়ু পুরুষদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ শোকের ভার মেয়েদেরি ওদেশে বেশী বইবার কথা। কিন্তু শিশু-মৃত্যুর হারে আমাদের মায়েদেরই কাঁদতে হয় বেশী। আসলে একটি দেশের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল নির্ভর করে সে দেশের শিশু-মৃত্যুর হারের ওপর। শিশু-মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়, ব্রহ্মদেশ প্রথম, এবং তৃতীয় হল মেক্সিকো। শিশু-মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম সুইডেনে, তাই সে দেশের স্ত্রী পুরুষের আয়ুষ্কালও অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু ষাট বছরের বুড়ো লোকদের সংখ্যা বৃটেনেই বেশী, তারপরেই যথাক্রমে সুইডেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং পোলাণ্ডের স্থান। আবার ১৯৫৫ সালের একটি হিসেবে কমবয়সী লোকদের হার পোলাণ্ডেই সবচেয়ে বেশী। কুড়ি বছরের কম যাদের বয়েস, পোলাণ্ডে তাদের হার শতকরা ৩৯·৫৩ সুইডেনে শতকরা ২৯·১ এবং ইংলণ্ডে ২৮·৪।

মৃত্যুর রাজপথ হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি, এবং যুদ্ধ এবং দুর্ঘটনাকে মৃত্যুর গলি বলা যেতে পারে। এই রাজপথ এবং গলি দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মৃত্যু এসে মানুষকে ডেকে নিয়ে যায়। অবশ্য দুর্ভিক্ষের হাতেও পরলোকের দুন্দুভি বাজতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে ছাড়া ইয়োরোপের কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ আজকে বিশেষ কোন সমস্যা নয়। তবে ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রভাবে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। হয়ত আর বছর দশেকের মধ্যে আমরা থালায় 'ব্যালেন্স ডায়েট' নিয়ে খেতে বসতে পারবো।

এই 'ব্যালেন্স ডায়েট' অর্থাৎ সমতাপূর্ণ আহার্য আয়ুবৃদ্ধির পরম সহায়ক। আমাদের দেশের মৃত্যুর হার বেশী এর প্রধান কারণ সমতাপূর্ণ আহার্য আজো আমাদের কাছে স্বপ্নের সামগ্রী। বর্তমান বাজার দরে প্রতিদিনের ব্যালেন্স ডায়েটের মূল্য প্রায় তিন টাকার কাছে। কজন লোক প্রতিদিন আয়ু-দেবতাকে তিন টাকা প্রণামী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন সন্দেহের বিষয়। নিউট্রিশ্যান এডভাইজারী কমিটি স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় আহার্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এই তালিকানুযায়ী যে সব পুরুষ সাধারণ পরিশ্রম করেন তাঁদের প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালোরির খাদ্য, সাধারণ পরিশ্রমী মহিলাদের জন্য প্রয়োজন ২৫০০ ক্যালোরির খাদ্যদ্রব্য। অথচ সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে আমরা দেড় হাজার থেকে দু'হাজার জোগাড় করতে গিয়েই জীবন-যৌবনের সূর্যাস্ত ডেকে আনি অকালবোধনে।

কিন্তু যতই হোক, যাই হোক, পরমায়ুচিন্তা মানুষের যাবার নয়। পৃথিবীর ছয়টি ঋতু মানুষের কাছে কখনো পুরোনো হয় না। বিকেলের পার্কে বসে যে অশীতিবর্ষ লোকটি বসন্তের মৃদু হাওয়ায় স্বাস্থ্য খুঁজছেন, সন্ধ্যা হলে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে পার্ক থেকে বেরুবার সময় তাঁর সঙ্গে মাত্র একটিই চিন্তার জপমালা দুলতে থাকে ঃ "হে ঈশ্বর, কালকে যেন ঠিক পার্কে আসতে পারি।"

মিথ্যাচারিণী

*

মনোবীণা রায়

আরম্ভ ত ভালই হয়েছিল কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস আর অত শক্ত গাঁথুনিটা এমন করে ছোট একটি ঘটনার আঘাতেই ঢিলে হয়ে যাবে একথা কি অনু একদিনও কল্পনা করেছিল? মানুষ যে কত মিথ্যে বলতে পারে, কত শঠ হতে পারে সে শিক্ষা ওর মা-বাবা দেননি। তাই সত্যি যখন সংসারের আসল রূপটা ও দেখল তখন পদে পদে ঘা খেয়ে ওর মনের কিনার ওলট-পালট হয়ে গেলো। আর কেবলই পরলোকবাসী মা-বাবার উদ্দেশ্যে নালিশ জানাতে লাগল—একথা তোমরা আমায় আগে বলোনি কেন? এত মিথ্যের মধ্যে মানুষ বাস করে একথা কেন আমাকে তোমরা বুঝিয়ে দাওনি! কিন্তু সে কথা যাঁরা শুনে ওকে সান্ত্বনা দিতেন তাঁরা কোথায়! জগৎকে যে সুন্দর করে দেখতে শিখেছিল, পরম করুণাময় ভগবানকে তাঁর অসীম দয়ার জন্যে যে বার বার করে কৃতজ্ঞতা জানাতে শিখে-ছিল—এতদিন পর মনে হল ভগবানের সে রূপটাও ভুল আর মিথ্যে দিয়ে তৈরী। অন্য সকলের মিথ্যে সইতে তবু পারত; কিন্তু যেদিন অনু আবিষ্কার করল, যার সঙ্গে আমরণ সুখ-দুঃখের সম্পর্ক পাতিয়েছে সে লোকটিও নানাভাবে অনুকে প্রতারণা করে চলেছে, সেদিন ওর অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রাখা জীর্ণ বিশ্বাসের ইমারতটুকু হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কায় ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—আবার বিশেষও। কারণ মিথ্যে ছোট হোক বড় হোক—সে মিথ্যেই। এবং ছোট ছোট মিথ্যের জাল বুনেই এক বিরাট প্রবঞ্চনা খাড়া হয়ে ওঠে।

সেদিন ধোপাবাড়ী কাপড় দিতে গিয়ে রোজকার অভ্যাসমত অনু অজয়ের সব পকেটগুলো হাতড়ে দেখে নিচ্ছিল কিছু আছে কিনা। ছোট একটুকরো কাগজ ছাড়া কিছু পেলো না। কাগজটা দরকারী কিনা দেখতে গিয়েই অনু হঠাৎ যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। কাগজটা সামান্য একটি ক্যাশমেমো। কত ক্যাশমেমোই ত পকেটে পায় অনু। কিন্তু এটা একটা বিশেষ অশুভ ইঙ্গিতের মত ওর চোখের সামনে যেন দুলতে লাগল। আশ্চর্য! একটা নাইট ড্রেস কিনেছে অজয়—লেডিজ নাইট ড্রেস। দাম চল্লিশ টাকা। কিন্তু আজ পর্যন্ত অনু ত কখনো নাইট ড্রেস পরেনি। আর কিনেই যদি থাকে অজয় ত সেটা গেল কোথায়? চৌরঙ্গীর এক বড় ফ্যাশনেবল দোকানের ক্যাশমেমো এটা। কিন্তু অজয় ত কোনও দিন অনুকে ওসব দোকানে নিয়ে যায়নি—কিছু কিনেও দেয়নি ওখান থেকে। তবু কিন্তু অনুর মনে হল হয়ত কোনও সহজ সমাধান হবে এর। মিছিমিছি একটা ক্যাশমেমো নিয়ে এত বিচলিত হবার কোনও মানে হয় না।

অজয় বাড়ী এলে অনু অপেক্ষা করল সুযোগ বুঝে কথাটা পাড়বার জন্যে। খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে যখন অজয় খবরের কাগজ নিয়ে বসল তখন অনু কথাটা জিজ্ঞেস করল। সহজ সুরেই প্রশ্ন করল—

'তুমি নাইট ড্রেস কার জন্যে কিনেছ?"

—প্রশ্নটা অজয়কে এমন করে চমকে দেবে তা কিন্তু অনু ভাবেনি। ওর চমকানি দেখেই অনুর ছোট্ট সন্দেহটা হঠাৎ কালো হয়ে মনের কোণ কানাচ এক মুহূর্তে ঢেকে ফেলল।

এক মুহূর্তে কিন্তু অজয় সামলে নিল নিজেকে। যারা সারাক্ষণ মিথ্যে কথা বলে তাদের মিথ্যে দিয়ে মিথ্যে ঢাকতে-৬
অসুবিধা হয় না। য়ে।

অবাক হবার ভংগিতে অজয়

উ'চু করে জিজ্ঞেস করল—"নাইট ড্রেস? কোন নাইট ড্রেসের কথা বলছ তুমি?"

'কোন নাইট ড্রেস তা আমি জানব কি করে? চোখে ত দেখিনি। তোমার পকেটে ক্যাশমেমো দেখলাম তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

"আমার পকেটে? কী আশ্চর্য!" তারপরেই হঠাৎ মনে পড়ল অজয়ের। "ও হো—তাই বলো। সেদিন অমিত ওর মেম বউয়ের জন্যে কিছু জামা-কাপড় কিনতে গিয়েছিল—ওরই ক্যাশমেমো নিশ্চয়ই।"

কিন্তু এত সহজ উত্তরটা অনুর কাছে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মনে হল না। ওর মনে যে সকলকে বিশ্বাস করার বোকামিটা অনেক আগে থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল এটা তারই ফল। সুতরাং অনু আবার প্রশ্ন করল—

"অমিতের বউয়ের জামার ক্যাশমেমো তোমার পকেটে কেন?"

বিরক্তিতে অজয়ের ভুরুটা কুঁচকে গেল। মেয়েমানুষরা এত জেরাও করতে পারে। তবু উত্তর দিতেই হবে।

একটু অসহিষ্ণুভাবেই অজয় উত্তর দিল—"কি আশ্চর্য! তুমি কি বলতে চাও বল ত? সেদিন অমিতের কাছে টাকা ছিল না, আমিই টাকাটা দিয়েছিলাম। তাই ক্যাশমেমো আমার পকেটেই ছিল। কোথায় রেখেছে ক্যাশমেমোটা? দাও আমাকে, টাকাটা আদায় করে নিতে হবে।"

হয়ত এর পরে সন্দেহ থাকত না অনুর। কিন্তু অজয়ের অতিমাত্রায় চঞ্চল হওয়া এবং অত করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা যেন অনুকে নিশ্চিত করে জানিয়ে দিল এটা সত্যি নয়। সুতরাং অনু জীবনে প্রথম মিথ্যে কথা বলল—

"ক্যাশমেমোটা ফেলে দিয়েছি।"

—কেন যে ওই কাগজটুকু অনুর মনের শান্তি কেড়ে নিল, তার বিচার করা মুস্কিল। তবে কদিন অহরহ নানা সন্দেহে জর্জরিত হয়ে অনু হঠাৎ ঠিক করল —এটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করলে ওর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। অজয়কে না জানিয়ে তাই অনু একদিন দুপুরবেলা হাজির হল অমিতের বাড়ী। তার মেম বৌ মিলড্রিয়া ওকে খুশী হয়ে উঠল। বেচারী এদেশে এখনও বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কাউকে নেই। অনু একথা সেকথার পর উঠল চৌরঙ্গীর বিশেষ দোকানটির কথা পাড়ল। মিলড্রিয়া এখানে জামা-কাপড় কোথায় কেনে, পছন্দমত জিনিস পাচ্ছে কিনা এবং চৌরঙ্গীতে ওর জানা একটি বিশেষ দোকানে যাবতীয় বিদেশী জামা-কাপড় পাওয়া যায় ইত্যাদি বলে অপেক্ষা করল মিলড্রিয়ার উত্তরের জন্য।

কিন্তু মিলড্রিয়া একেবারেই ওকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলো—যখন বলল যে, এখন পর্যন্ত ওর এদেশে জামা-কাপড় কেনবার দরকারই হয়নি, কারণ বিলেত থেকেই সব কিছু ও নিয়ে এসেছে। এরপর নাইট ড্রেসের কথা আর অনু তোলে কি করে! তবু একবার বলল যে, 'অমিতবাবু—একদিন আমাদের বলেছিলেন আপনার নাকি একটা ভাল নাইট ড্রেস দরকার।"

সঙ্গে সঙ্গে মিলড্রিয়ার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি খেলে গেল। 'হাউ নটি অফ হিম! আমার তিনটে নাইট ড্রেস ও লণ্ডন থেকে কিনে দিয়েছে। আমাকে বদলে বদলে পরতে হয়। আবার আপনাকে বলেছে আমার নাইট ড্রেস দরকার! দাঁড়ান আজ দেখাচ্ছি মজা ওকে।'

কি সর্বনাশ! মিথ্যে কথার এত বিপদ তা কি অনু ভেবেছিল? এখন যদি মিলড্রিয়া সত্যি অমিতকে বলে দেয়—অনু একথা বলেছে ত অমিত অনুকে কি ভাববে! ছি-ছি কী বিশ্রী অবস্থা হল এখন। তাই অনু মিলড্রিয়াকে অনেক করে অনুরোধ করল—যে একথা যেন সে অমিতকে কিছুতেই না বলে। ওটা হয়ত বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ঠাট্টা করেই বলেছিল—অনুরই সে কথা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত হয়নি ইত্যাদি।

বাড়ী চলে এল অনু। কিন্তু ফিরে এল মনের ওপর এক জগদ্দল পাথর চাপিয়ে। অজয় আগাগোড়া বানিয়ে বলেছে। এই রকম সন্দেহই ওর হচ্ছিল। অথচ আশ্চর্য এতদিন দুনিয়ার সবাইকে ঠিকমত চিনেও ও নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এক নিশ্চিন্ত বিশ্বাস পোষণ করে বসেছিল। সেইজন্যেই ওর মনের মধ্যে বিশ্বাস করবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেবল চাইছিল, অজয় যে সত্যি বলেছে এটা প্রমাণ হলেই ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মা-বাবা মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন—বিশ্বাসের মর্যাদা নাকি খারাপ লোকেরাও দেয়। অনু এতদিনে বুঝল, যে ওর মা-বাবা চিরকাল ওকে ভুল শিক্ষাই দিয়েছেন। নয়ত তাঁরা যে যুগে বাস করে গেছেন সেটা এখনকার থেকে আলাদা ছিল এবং লোকগুলোও বোধহয় অন্যরকম ছিল। অনু যে এতদিন ধরে অজয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে তার কি মর্যাদা অজয় দিল! অনুর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকাতে ত একটুও বাধেনি অজয়ের? কিন্তু নাইট ড্রেস দিয়ে অজয় কি করে? কাকে দিয়েছে ওটি? শাড়ী ত অনেককেই দেওয়া যায়—কিন্তু নাইট ড্রেস? অনু যদি ক্যাশমেমোতে দেখতো অজয় চল্লিশ টাকার শাড়ী কিনেছে—তাহলে কি এত অশান্তি হোত ওর? অজয়কে আর ত অনু বিশ্বাস করতে পারে না। আর বিশ্বাসই যদি না রইল ত কিসের জোরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটিকে থাকবে।

অজয় রাত্রে ফিরলে অনু আর সহজ স্বাভাবিকভাবে সেদিন কথাও বলতে পারল না। কেবল মনে হতে লাগল অজয়কে এতদিন ধরে ও চিনতে পারেনি। সংসার পর্যন্ত ওর কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। আর দু-তিন দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার মানল অনু। এর একটা পুরোপুরি মীমাংসা না হলে অনুর আর কোন উপায় নেই।

ভগবানে বিশ্বাসী আর মানুষের সততায় বিশ্বাসী অনু অবিশ্বাসের জ্বালায় জ্বলে একদিন দুপুরে চলল চৌরঙ্গীর উদ্দেশ্যে। ক্যাশমেমোতেই নাম ঠিকানা আছে। কাজেই দোকানটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। দোকানে একদিকে যাবতীয় মহিলাদের সাজ-সরঞ্জাম কাপড়-চোপড় সাজানো। সেখানে এক শ্বেতাঙ্গিণী মহিলা চার্জে রয়েছেন। দেখে খানিকটা স্বস্তি পেল অনু। পুরুষের কাছে নানা প্রশ্ন করা যতটা অশোভন ও অসুবিধাজনক, এক্ষেত্রে সেটা সহজ হবে।

মহিলা অনুকে দেখেই অভিবাদন করলেন। এই করেই ওর জীবন কেটেছে। খদ্দেরকে খুশী করাই ওর কাজ। সেটাই জিনিস বিক্রীর মূলধন। কি বলবে, কি ভাবে কথা আরম্ভ করবে অনু ভেবে অসহায় বোধ করল। কিন্তু তবু সাহস করে এগিয়ে গেলো। সোজাসুজি ক্যাশমেমোটা ধরে বলল।

"এই জামাটা আমার এক বন্ধু কিনেছে এখান থেকে। ঠিক তার জোড়া আমার একটা চাই।"

মহিলা কাগজটি নিয়ে দেখে একটু

চিন্তা করলেন। তারপরেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ও—হ্যাঁ—এই ত কদিন হল আমিই এটা বিক্রী করেছি। মিঃ দাশগুপ্ত তার স্ত্রীর জন্যে কিনলেন। মিঃ দাশগুপ্ত ত আমাদের পুরনো customer—নতুন বিয়ে করেছেন বললেন। সেই মেয়েটি বুঝি আপনার বন্ধু! কী চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ওঃ ওই রকম ফিগার হলে তবে তাদের পোষাক পরিয়ে সুখ।" —মহিলা অনর্গল বকে চললেন—"দেখেছি দাঁড়ান—আর একটাই ওর জোড়া জামা আছে— এ দুটো সম্প্রতি লণ্ডন থেকে এসেছিল।"

মহিলা ব্যস্ত হয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন জামা আনতে। অনু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। হৃদপিণ্ডটা এমন জোরে লাফাচ্ছে যে সেটির শব্দ অনু নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ে যাবে এবার—। মাথাটা যেন কি রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটা চেয়ারে অনু বসে পড়ল তাড়াতাড়ি, বসে প্রাণপণে মনটাকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল। মহিলা একটা বাক্স হাতে বেরিয়ে এলেন। "এই যে এনেছি। আপনার বন্ধু কি যেন নাম? আইরিন না? হ্যাঁ আইরিন ত—কারণ ভদ্রলোক ওকে ওই নামেই ডাকছিলেন—দেখুন আমার কী রকম মনে থাকে। আমার একবার কোনও customerকে জিনিস দিলে তাকে আর ভুলি না। এইজন্যে একবার আমার কাছে কেউ জিনিস কিনলে অন্য কোথাও আর যেতেই চায় না। হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম —ও মনে পড়েছে, আপনার বন্ধু আইরিন ও তার স্বামী আরও জামার অর্ডার দিয়ে গেছে —একটা ইভনিং ড্রেস আর দুটো ব্লাউজ আর স্কার্ট।"

এতক্ষণে স্বর খুঁজে পেলো অনু। ক্ষীণ গলায় বলল—"আইরিন আমাকে আপনার কথা বলেছে। ওই ত আমাকে ক্যাশমেমোটা দিলো। ওরা যেন কোথায় নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে। সে বাড়ীটার আবার ঠিকানা আমাকে এখনও দেয়নি। বোধহয় এর মধ্যে ওরা সে বাড়ীতে চলেও গেছে। আপনাকে কি জামা ডেলিভারীর জন্যে কোনও ঠিকানা দিয়ে গেছে—না এখানেই আসবে বলেছে?"—আশ্চর্য হল অনু নিজেই বানিয়ে মিথ্যে কথা বলা কত সহজ জেনে। একবার গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছে এখন আর পেছুনো চলে না। মহিলা অনুর জন্যে ক্যাশমেমো লিখতে লিখতেই বললেন—

"হ্যাঁ ঠিকানা দিয়ে গেছে বইকি। অর্ডার দিলে আমাদের কিছু অগ্রিম টাকা ও ঠিকানা রাখতেই হয়। তবে বাড়ী বদলানোর কথা ত কিছু বললো না ওরা? নিশ্চয়ই এই ঠিকানায়ই জিনিস দিতে হবে। আপনি ঠিকানাটা চান? পুরনো ঠিকানা ত আপনি জানেনই—"

তাড়াতাড়ি অনু বললো—"দেখি ঠিকানাটা। পুরনো বাড়ীর ঠিকানা কিনা দেখলেই বুঝবো।" অকারণে চল্লিশ টাকা খরচ করে জামাটা কিনতে হলো অনুকে—না নিয়ে উপায় কি। মহিলা আবার ভিতরে গিয়ে অর্ডার-এর খাতা বের করে ঠিকানা খুঁজতে লাগলেন।

"এই যে পেয়েছি। —ক্যামাক স্ট্রীট। দোতলায় দুই নম্বর ফ্ল্যাট।"

অনু বলল, "হ্যাঁ এই ত পুরনো ঠিকানাই। আচ্ছা চলি আজ, নমস্কার।"

ঠিকানাটা মুখস্ত করে নিল অনু। বেরিয়েই একটা পেন্সিল কিনে ক্যাশমেমোর পিছনে ঠিকানাটা টুকে নিল। তারপর চলল ক্যামাক স্ট্রীটে। মাথায় যেন ভূত চেপেছে। যা করছে তার বিরুদ্ধে যাবার ওর ক্ষমতা নেই। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব যেন ওকে টেনে নিয়ে চলেছে নিজের চরম পরিণতির দিকে।

এবারও ঠিকানা খুঁজতে হল না। দরজায় টোকা দিতেই এক বর্ষীয়সী এ্যাংলো মহিলা বেরিয়ে প্রশ্ন করল, "কাকে চাই?"

এতক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে অনু। খুব স্থির গলায়ই বলল—"আইরিনকে—"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলো মহিলা অনুকে। অপ্রসন্ন গলায় উত্তর দিলো—

'এখন আইরিনকে পাবেন কী করে? সে ত এখন অফিসে আছে! বিকেল বেলা আসবেন।"

মরিয়া হয়ে অনু বলল—"মিঃ দাশগুপ্ত আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন বলেছিলেন না—সেইজন্যে—"

বাধা দিয়ে মহিলা বললেন—"মিঃ দাশগুপ্তর আগামীকাল আসবার কথা। আর আপনার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

আবার সন্দিগ্ধ চোখে দেখলো মহিলা অনুকে। তারপরেই অত্যন্ত অসহিষ্ণু গলায় বলল—"দেখুন মিঃ দাশগুপ্ত সব এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিজেই করে। যদি মিঃ দাশগুপ্ত কোনও চিঠি দিয়ে থাকে ত সেটা দিন।"

গম্ভীর হয়ে অনু বলল,—"চিঠি তিনি দেননি। তবে আমাকে আপনার বিশ্বাস না হলে আমার কিছু বলার নেই।" বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলো অনু। যা জানার ছিল তা ত জানা হয়েই গেল। আর কি! এবার কী করা যায়। অজয় যে আইরিন নামে এক এ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক পাতিয়াছে সে ত বোঝাই গেল। আর রহস্য কিছু নেই। সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার অনুর নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে। সর্বগ্রাসী একটা আগুন যেন অনুকে পুড়িয়ে ফেলছে তার লেলিহান শিখা দিয়ে।

কোথায় একটু শান্তি! একটু ছায়া? একটু আড়াল—যেখানে অনু নিজেকে লুকিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারবে? গঙ্গা—ওই ত! কিছু দূরে গেলেই ভাগীরথী বয়ে চলেছে। একবার ঝাঁপ দিলেই সব শান্তি। ছিঃ ছিঃ, এ কি ভাবছে অনু! ওর যে দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কী হবে? দুশ্চরিত্র বাপের হাতে তাদের ফেলে পালাবে অনু নিজেকে বাঁচাতে? এখন যে বেঁচে থাকাটাই অনুর মৃত্যুর সমান। আর মরে যাওয়াটাই বাঁচা। কিন্তু সে ত কাপুরুষের কাজ।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। অভ্যাসমত অনু কখন ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে তাও মনে নেই। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে অনু নামল গাড়ী থেকে। ছেলেমেয়ে ছুটে এল। তারা স্কুল থেকে ফিরেছে একটু আগে। কী ভাগ্যি ঝিকে বলে গিয়েছিল ওদের খাইয়ে দিতে। কী অসহনীয় ক্লান্তি—অথচ আবার অনুকে রোজকার মত সংসার করতে হবে। কি নিদারুণ পরিহাস চলেছে ওর জীবন নিয়ে! কাজে লাগল অনু রোজকার অভ্যাসমত। অথচ মনে হল কাজ করছে শুধু ওর হাত পা। মনটা ওর আয়ত্তের বাইরে।

অজয় ফিরল অফিস থেকে। অনু একবারও তাকে কোন প্রশ্ন করল না। ঝগড়া করল না। ওর কথা বলার আর প্রবৃত্তি ছিল না। কাজকর্ম শেষ করে অনু ছেলেমেয়ের খাটে শুয়ে পড়ল না খেয়ে। অজয়ের এমনিতেই খেয়াল কম। অনু খেল না কি খেল, সে খোঁজ নেবার কথা ওর মনেই হল না।

পরদিন যথারীতি দিন আরম্ভ হল। সন্ধ্যে হল। দিন ত আর কারো জন্যে বসে থাকে না। সারাদিন অনুর নিজের কর্তব্য স্থির করতে লাগল। যতদিন কিছু জানত না ততদিন এক রকম ছিল। এখন সব জেনে সে আর অনু কিছুতেই অজয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কিন্তু কে আছে ওর নিজের যে ওকে আশ্রয় দেবে! এঘর ওঘর অনু ঘুরে দেখল। কত গভীর মমতা দিয়ে সংসার আরম্ভ করেছিল। ঘরের মধ্যে কোথায় কী দরকার, কোন ঘরের সঙ্গে কোন পর্দা মানায়, বাচ্চাদের ঘরে কী রকম আসবাব থাকবে সব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা! কত মায়া—কত বন্ধন দিয়ে গড়া একটা পরিপূর্ণ সংসার শুধু একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কী রকম মিথ্যে হয়ে গেল। সংসার ত শুধু বাড়ী ইঁট কাঠ নয়; দুটি মানুষ পরস্পরের ভালবাসা একনিষ্ঠতা আর সাহচর্য দিয়ে ইঁট কাঠ পাথরে প্রাণ সঞ্চার করে। নতুন জীবন সৃষ্টি করে। সেখানে সে সম্পর্ক মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কিছুরই তো মূল্য নেই। জানলার বাইরে নিজের হাতে লাগান চাঁপা গাছটির দিকে তাকিয়ে অনুর মন সবুজ ছায়ায় ঘেরা সেই ছোট্ট অখ্যাত পশ্চিমের একটি শহরে ফিরে গেল। যেখানে তার কুড়ি বছর কেটেছে। বাবা ডাক্তারী করতেন। কিন্তু তাঁর জীবিকা উপার্জনের চেয়ে লোকসেবার উদ্দেশ্যই বড় ছিল সেখানে। কাজেই যে পরিমাণ ভক্ত তাঁর জুটল সেই পরিমাণেই পকেটে শূন্যতা জমল। মৃত্যুর সময়ে উত্তরাধিকার-সূত্রে খালি কয়েকখানি বই দিয়ে গেলেন অনুকে। ডাক্তারী বই—দর্শনশাস্ত্র আর একটি গীতা। এই তাঁর মহামূল্য সম্পত্তিরূপে দান করলেন অনুকে। বাবা বলতেন, "অনু অমৃত লাভ যাতে নেই তা নিরর্থক। মৈত্রেয়ী সেই কথাই যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন। কথাটা বড় মূল্যবান, মনে রাখিস।" লোকে যে ওঁর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করে এটা উনি কখনো মানতেন না। কেউ, অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকই চিকিৎসা করিয়ে ফী না দিলে উনি বলতেন, "আচ্ছা, ওরা বড় গরীব, পয়সা দেবে কোত্থেকে!" মা বলতেন, "অন্য ডাক্তার ডাকলে ত ফী দিতেই হোত!" তাতে উনি বিজ্ঞের মত মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলতেন—"সেই জন্যেই ত অন্য ডাক্তার ওরা ডাকে না। ডাকলে কি সুচিকিৎসা হোত। বেঘোরে ছেলেটি মরত।"—ইত্যাদি।

কদিন বুকের ভেতরটা জ্বলে গেলেও অনুর কান্না পায়নি। আজ মা-বাবার কথা মনে হতেই চোখ দিয়ে হুহু করে জল নেমে এল। এবং এক মুহূর্তেই ও মন স্থির করে ফেলল যে সেই অখ্যাত শহরেই ফিরে যাবে। বাবার ভক্তরা ত আছেই, তারা অনুকে থাকবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবে। এবং সকলেই চেনা থাকায় অসুবিধা হবারও কারণ নেই। বাচ্চা দুটোকে নিজের মত করে মানুষ করতেই হবে। এ অশান্তির সংসারে অবিশ্বাসের আর মিথ্যের মধ্যে ওদের কোন আদর্শই ত দেওয়া যাবে না।

রাত্রে একটু বেশী দেরী করেই অজয় ফিরল। আজ একটু বেশী খুশী খুশী ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অনুর মনে পড়ল গতকাল শুনেছিল আজই অজয়ের আইরিনের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কাটিয়েছে অজয়। জীবনটাকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেছে সে, অনুকে ঠকানোতে ওর একটুও আত্মগ্লানি নেই। সবই বুঝলো অনু, তবু কিছু বলল না। বলবার দরকার ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন অজয় অফিসে চলে গেলে নিজের যৎসামান্য গহনা ও অল্প জমানো টাকা নিয়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে গেল অনু। নিজের গড়া সংসার ছেড়ে সেই ছোট বেলাকার চেনা শহরের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় অজয়কে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল।

"তোমার সঙ্গিনী জুটেছে। সুতরাং আমার থাকার প্রয়োজন দেখি না। তোমার রেঁধে দেবার জন্যে লোক রেখে নিও। ছেলে-মেয়ের ভার আমিই নিলাম। আমাকে খোঁজার চেষ্টা করো না। কারণ আমি আর ফিরব না। ইতি—

তারপরে কি ভেবে তলায় লিখল—

পুঃ আমার জন্যে ভেবো না। আমিও আমার সঙ্গী পেয়েছি।"

সঙ্গী বলতে বাবার বই কখানা। কিন্তু অনু ইচ্ছে করেই সেটার আর ব্যাখ্যা দিল না। যা ইচ্ছে ভাবুক অজয়।

• • •

অজয় বাড়ী এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরদিনই পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে অজয় দাশগুপ্তর স্ত্রী সঙ্গী জুটিয়ে পালিয়েছে। সঙ্গে কয়েক হাজার টাকা এবং বহু গহনাপত্র নিয়ে গেছে।

পাড়ার মেয়েরা বলল—"আমরা তখনই জানতাম ও গভীর জলের মাছ। এরকম যে একটা কেলেংকারী করবে তা আমরা আগেই জানতাম। আহা এমন স্বামী—।"

ভদ্রলোকরা বললেন—"মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই!" বলে মেয়েমানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবে তাঁরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন।

অজয় বলল, "দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। বিদায় হয়েছে বেশ হয়েছে। উঃ, এতদিন কি মিথ্যাচারিতাই করেছে আমার সঙ্গে।"

কিন্তু তবু যেন মনে জোর পায় না। কী যেন এক নিদারুণ হতাশা আর গ্লানি জেগে ওঠে মনে। শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে কোথায় কোনো জোর পাওয়া যায় না। কেবল মনে হতে থাকে সে হেরে গেছে, অনু ওকে হারিয়ে দিয়ে গেছে।

গৃহকোণ
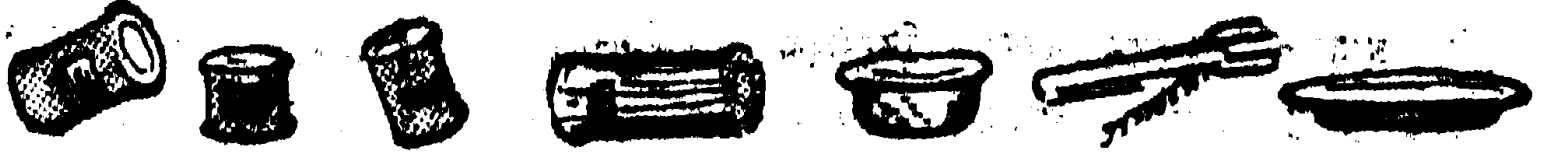
সমস্যা ও সমাধান

বেলা দে

দেশের বর্তমান সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বর্তমান যুগ তার অতীতের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়েছে। এই যে রূপান্তর এ কেবল বাইরের জগতেই ঘটেনি, আমাদের মানসিক ক্ষেত্রে ও সাংসারিক জীবনেও এর ছোঁয়াচ লেগেছে। কয়েক বছর আগেও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার এমন কি অল্প-আয়ের মানুষও বেশ শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করেছে। জিনিসপত্র সবই ছিল অল্প দামের, খাওয়া-পরার দুঃখও ছিল না। কাজেই দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস বেশ সহজেই ঘরে আনা যেতো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; সহজ সরল জীবনযাপনের পরিবর্তে এসেছে জটিলতা ও কৃত্রিমতা; যার ফলে আজকের সংসার নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সংসারতরণীর কর্ণধার, মেয়েরা এতে বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়ছেন। খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে লোকজন-সমস্যাও বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এখন এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। বিলাতের ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ হাউস ওয়ার্কার্স (Institute of House Workers) অন্ততঃ লোকজনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে বেশ এগিয়ে গেছেন।

একটিও লোকের প্রয়োজন নেই আমাদের দেশে এমন গৃহস্থ মধ্যবিত্ত পরিবার অল্পই আছে। কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যাদের পূর্বে পাঁচজন লোক ছিল এখন হয়তো একটিতে ঠেকেছে। আর বাকীদের হয়তো একটিও নেই। সকাল থেকে উঠে বাড়ীর মেয়ে-বৌয়েরা বাসনমাজা, মশলাবাটা, কাপড়-কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, রান্নাকরা সবই করছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের হানিও হচ্ছে। অথচ আগে যে লোকটি পাঁচ টাকায় হাসিমুখে কাজ করেছে, আজ সে পঁচিশ টাকা না হলে কাজ করতে চায় না। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই লোকজনরা বাড়ীর কাজকর্ম ছেড়ে ফ্যাক্টরী বা মিলে কাজ নিয়েছে। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, আমাদেরও যেমন খাওয়া-পরায় খরচ বেড়েছে তাহাদেরও তো তাই। কাজেই বেশী আয় না হলে তারাই বা সংসার চালাবে কি করে?

আমার মনে হয় যাঁরা বেশী টাকায় বেশী লোকজন রাখেন, তাঁদের লোকজনের কাজকর্ম অল্প এবং কাজকর্ম ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। এইসব লোকজনেরা বেশ কিছুটা অবসর পায় একথা অস্বীকার করা যায় না, কাজেই সেই অবসরটুকু তারা যদি প্রতিবেশীর গৃহে বাসনমাজা বা কাপড়কাচার অথবা ঘরদোর পরিষ্কার করে আসার কাজ নেয় তাহলে উভয়পক্ষেরই সুবিধা হবে।

তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কাজকর্মের পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার। প্রথমতঃ পরিবারটি ছোট হলেই ভাল হয়। কারণ এমন সংসার আছে যেখানে কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য বাড়ীর গৃহিণী একা আছেন কিন্তু পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। এমন সংসারে হয়তো দু'শো পান সাজতে হয়, কুটনো কোটা, রান্নাকরা সবই গৃহিণীকে একাই করতে হয়। তারপর অসুখবিসুখ আছে, শিশু-পরিচর্যা আছে। আমার মনে হয় এই ধরনের কাজগুলো অনায়াসেই সংক্ষেপ করা যায়। যেমন, পান খাওয়াটা কমানো যেতে পারে। বাসনগুলো কাঁশা পেতলের না হয়ে হালকা বাসনপত্র হলে নিজেরাই সোডা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে পারা যায়। ঘুঁটে-কয়লার ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে ইলেকট্রিকের উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিদিন মশলা না বেটে গুঁড়ো মশলার ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া বাড়ীর অন্যান্য কাজকর্ম এমন হওয়া উচিত যাতে লোকজন একটি থাকলেও তার মন বসে এবং কিছুটা অবসর সে পায়।

অনেকে আছেন নিজেরা তো কোনো কাজে হাত দেবেন না উপরন্তু লোকজন যে থাকবে সর্বদা তাদের কাজের খুঁত ধরে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেন। কিন্তু যদি কাজের ধারা এবং নিয়মানুবর্তিতা মনিব এবং লোক-জন উভয়ের মধ্যে জানা থাকে তাহলে কারুরই কিছু বলার থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি থাকা ভালো—সেটি হচ্ছে বিদেশের মত আমাদের দেশেও 'Institute of House Workers' গঠন করার প্রয়োজন হয়েছে। যদি উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় এই ধরনের একটি করে ইনস্টিটিউট থাকে এবং সেই সমস্ত কেন্দ্রে লোকজনকে নানারকম গৃহস্থালীর কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে খুব ভাল হয়। কারণ গৃহস্থালীর কাজও যে শিক্ষনীয় বিষয় সেটি আজকের দিনে সকলকেই জানতে হবে। এইসঙ্গে ইনস্টিটিউট তাদের মাহিনার হারও ঠিক করে দেবেন। যাঁদের চাকর বা রাঁধবার লোক যা-ই দরকার হোক না কেন, সরাসরি তাঁরা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে পারবেন। এতে উপযুক্ত মাহিনায় উপযুক্ত লোক সহজেই পাওয়া যাবে। এমন কি এরা বিশ্বাসীও হবে সন্দেহ নেই। এইভাবে অন্ততঃ লোকজন-সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারবে।

এমন অনেক সংসারে দেখেছি, অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা মেয়ে অবস্থা ভাল নয় বলে লেখাপড়া বা কোনো কাজ শেখার সুযোগ পায়নি। কিন্তু তাদেরও যদি এই ইন্‌স্টিটিউট্‌-এ পাঠিয়ে ঘর-সংসারের কাজকর্ম ভালোভাবে শিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তারাও বেশ দু'পয়সা আয় করতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকায় প্রায় প্রতি ঘরেই লোকজনের অভাব দেখা যায়। তাই বলে এমন নয় যে গৃহকর্ত্রী একেবারে কাজে সাহায্য পান না। দরকার মত সপ্তাহে দু'একদিন গৃহিণীর কাজের সাহায্য করবার লোকের অভাব হয় না। এমন কি স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কোনো আমোদ-প্রমোদ বা নিমন্ত্রণে বার হলে বাড়ীর আলো জ্বালাবার বা ছোট শিশুকে দেখাশুনা করবার জন্যও লোক পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে সকল কাজে অন্যায় করতে হয় না অথচ নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে আর নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় তেমন কাজ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও গ্রহণ করতে পারেন। পরমুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ভালো। অবস্থার বিপাকে পড়ে এবং অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার দিন আজ আর নেই। সন্ধানী ও জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে আজ মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ "অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি

নিত্য বিরাজ করে।"

॥ অভিনন্দন ॥

মহাকাশ জয়ের ইতিহাসে ২০শে ফেব্রুয়ারী আর একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। দুঃসাহসী মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল জন এইচ গ্লেন মহাশূন্যে সাড়ে চার ঘন্টাকাল অবস্থান করে তিনবার পৃথিবী পরিক্রমার শেষে নিরাপদে মর্ত্যে ফিরে এসেছেন ঐদিন। মহাশূন্যের প্রথম যাত্রী তিনি নন, তাঁর আগে গত বছর ১২ই এপ্রিল ও ৬ই আগষ্ট একইভাবে মহাশূন্যে মর্ত্য পরিক্রমা করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মেজর গাগারিন ও টিটভ। টিটভ আরও বেশীক্ষণ ছিলেন মহাশূন্যে, পঁচিশ ঘন্টায় সতরবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন তিনি। তবুও গ্লেনের কৃতিত্ব তাতে ম্লান হয়নি এবং অমেয় শক্তি ও ঐশ্বর্যের দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সাফল্যের ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে মহাকাশ জয়ের অভিযানে দুই দেশ যেন হাত-মিলিয়ে চলে পরস্পরের সংগে। যদি সর্বত্রই এই সহযোগিতা সম্ভব হয় তবে পৃথিবীর গ্রহ-বিজয়ের সাধনা যে এই দশকেই সফল হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষের সংগে আমরাও তাই আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই কর্ণেল গ্লেনকে। অনতিবিলম্বে আরও উজ্জ্বল সাফল্যে ম্লান হয়ে যাক তাঁর বিশে ফেব্রুয়ারীর গৌরবময় অভিযান।
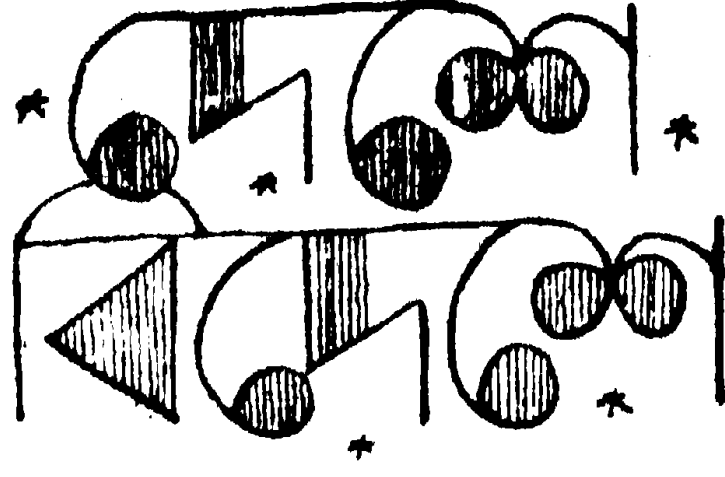
দেশে বিদেশে

মহাকাশ যাত্রার পূর্বক্ষণে কর্ণেল গ্লেন

॥ বৃটিশ গায়েনা ॥

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমান্তে অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে তিরাশী হাজার বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট বৃটিশ উপনিবেশ গায়েনা ভারত থেকে প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় উপনিবেশ। কারণ '৫৮ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, বৃটিশ গায়েনার সাড়ে পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন লক্ষই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। জনশূন্য এই উপনিবেশটিতে আখ, ধান, কফি ও কোকো চাষের উদ্দেশ্যে বৃটিশ বণিক উপনিবেশীরা একদিন ভারত সরকারের সংগে ব্যবস্থা করে এই দেশ থেকে কয়েক হাজার শ্রমিককে ওখানে নিয়ে যান, উত্তরকালে তাদেরই বংশ বৃদ্ধি হয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ গায়েনার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদি জগনও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বৃটিশ গায়েনাতেও স্বাধিকারের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে এবং সেই দাবীর অনিবার্য ফলস্বরূপ গায়েনা ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলে। ১৯৬১ সালে গায়েনায় সর্বশেষ যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় তাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া, আর সকল দপ্তরের পরিচালন ব্যবস্থা গায়েনাবাসীদের হাতে অর্পণের ব্যবস্থা হয়। এবং এই নতুন সংবিধান অনুসারে ৩৫ আসনবিশিষ্ট গায়েনার ব্যবস্থা পরিষদের যে নির্বাচন হয় তাতে প্রগতিশীল ডঃ ছেদি জগনের পিপলস প্রগ্রেসিভ দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে এবং ডঃ জগনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

ডঃ জগন প্রগতিপন্থী ও সমাজবাদী, এ কারণে তাঁর এই বিপুল সাফল্য স্বার্থান্বেষী বৃটিশ উপনিবেশী ও গায়েনার প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীদের কাছে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। গায়েনা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করলে তার খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে এই তাদের আশংকা। এ কারণে ডঃ জগনের বিরুদ্ধে আজ গায়েনার দুই দক্ষিণপন্থী দল ইউনাইটেড ফোর্স ও পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস এক সাংঘাতিক আন্দোলন শুরু করেছে এবং সেই আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছে বৃটেনের বণিক স্বার্থ। গায়েনার রাজধানী জর্জটাউনে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সরকার-বিরোধী

বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করামাত্রই বৃটিশ সরকার গায়েনায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন এবং গায়েনার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও এখন বিবেচনা করা হবে না একথা তাঁরা জানিয়েছেন। অবস্থা দেখে মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীদের বণিক স্বার্থ ও স্থানীয় কায়েমী স্বার্থের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে বৃটিশ গায়েনার পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা আপাততঃ বেশ কিছুকালের জন্য পেছিয়ে গেল।

॥ আলজিরিয়া ॥

উত্তর আফ্রিকার শেষ পরাধীন আরব রাষ্ট্র আলজিরিয়ার মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী সুইজারল্যান্ডের কোন একস্থানে সম্প্রতি ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি সফল আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং আগামী রবিবারেই হয়ত উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে আলজিরিয়ায় পূর্ণ অস্ত্র-সংবরণ ঘোষিত হয়। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে আবার যাতে প্রবল বিক্ষোভ মাথা তুলতে না পারে তার জন্যে প্রেসিডেন্ট দ্যগল প্যারিসে ৪৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিরা আলোচনার শেষে ফ্রান্সের সর্বশেষ প্রস্তাব নিয়ে আলজিরিয়ায় ফিরে এসেছেন এবং তারপরেই অস্থায়ী সরকারের পূর্ণ বৈঠক শুরু হয়েছে। অস্থায়ী সরকারের অনুমোদনলাভ করলে মীমাংসা প্রস্তাবটিকে অস্থায়ী সরকারের ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট "পার্লামেন্টে" পেশ করা হবে এবং তাঁদের অনুমোদনই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বলে মনে করা হবে।

কিন্তু আলজিরিয়ার স্বাধীনতার পথে যারা প্রকৃত অন্তরায়, কলোন নামক সেই শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহতই রয়েছে এবং মূলে ফ্রান্সেই তাদের গুপ্ত সংগঠন ও-এ-এসের কার্যকলাপ সাংঘাতিক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কয়েক পুরুষ যাবৎ আলজিরিয়ায় অবস্থানকারী ফরাসী কলোনের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ এবং তারা কোন অবস্থাতেই ফ্রান্সের আলজিরিয়া ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে প্রস্তুত নয়। মুখ্যতঃ এদের দাবীতেই ফ্রান্স এতকাল ধরে সুসমৃদ্ধ আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে গত সাত বছরে আলজিরিয়ার উভয়পক্ষে দশ লক্ষেরও বেশী মানুষ হতাহত হয়েছে এবং এই রক্তক্ষয়ী প্রচন্ড সংঘর্ষের ফলে আলজিরিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশেরই রাজনৈতিক জীবন অনিশ্চিত ও অসহনীয় অবস্থায় বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মুখ্যতঃ আলজিরিয়ার প্রশ্নেই যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে প্রায় দু'ডজন মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে যার ফলে ফ্রান্সের সম্মান স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল দ্যগল যে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আলজিরিয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থীদের বেপরোয়া কার্যকলাপ দমনের জন্য এমনই একজন শক্তিমান মানুষের আজ ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে থাকার প্রয়োজন ছিল। সারা পৃথিবীর শান্তি ও মুক্তিকামী মানুষের একান্ত ইচ্ছা, তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রয়াস পূর্ণ সাফল্য অর্জন করুক। আলজিরিয়ার অগণ্য মুক্তি যোদ্ধার অকৃপণ জীবনদান সার্থক হোক।

॥ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অবলুপ্তি ॥

ক্যারেবিয়ান সাগরে অবস্থিত বারবাডোজ, জামাইকা, লীওয়ার্ড উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এই কটি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী গঠিত হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশন। ঐ যুক্তরাষ্ট্রের স্থলভূমির সম্মিলিত আয়তন ৭,৯৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের পিতৃপুরুষ আফ্রিকা-আগত নিগ্রো। ভৌগোলিক পরিচয়ে বৃটিশ গায়েনা ও বৃটিশ হণ্ডুরাস ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রস্তাবিত ফেডারেশনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বছর ৩১শে মে তারিখে এই প্রস্তাবিত ফেডারেশনটির স্বাধীনতা অর্জনের কথা। কিন্তু তার আগেই দ্বীপগুলির অন্তর্বিরোধ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, বৃটিশ সরকারকে শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হয়েছে। দ্বীপগুলির অন্তর্বিরোধের প্রধান কারণ হল পারস্পরিক দূরত্ব। ক্যারেবিয়ান সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী দ্বীপগুলির অবস্থিতিই প্রায় ছয়শত মাইল বিস্তৃত সমুদ্রের উপরে। কিন্তু জামাইকার অবস্থিতি নিকটতম দ্বীপ থেকেও অন্ততঃ হাজার মাইল দূরে। সমুদ্রপথের এই দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করে এই দ্বীপকটির মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব ঘটনা। এ ছাড়াও আছে জন-সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তারতম্যের প্রশ্ন। সমগ্র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অর্ধেকেরও বেশী লোক বাস করে জামাইকায়, প্রায় ১৬ লক্ষ। অথচ প্রস্তাবিত ফেডারেশনের সংসদের ৪৫টি আসনের মধ্যে জামাইকার জন্য নির্দিষ্ট আসন মাত্র ১৭টি। জামাইকার একক কর্তৃত্বের আশঙ্কায় এর বেশী আসন অন্যান্য দ্বীপগুলি জামাইকাকে দিতে রাজী নয়, আবার জামাইকাও সংখ্যালঘুর কর্তৃত্ব স্থায়ীভাবে মেনে নিতে সম্মত নয়। জামাইকার শিথিল কেন্দ্রীয় শাসনের প্রস্তাবও অন্যান্য দ্বীপগুলি গ্রহণে সম্মত হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারেও অন্যান্য দ্বীপগুলি জামাইকার তুলনায় দীন। সুতরাং স্বাধীন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে জামাইকা অন্যান্য দ্বীপগুলির অধিবাসীদের শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হবে —এ আশঙ্কাও জামাইকার ছিল। একারণে জামাইকার পক্ষ থেকেই প্রথমে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠে এবং পরে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোও ফেডারেশন গঠনে অসম্মত হয়। একারণে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হয়েছে। ত্রিনিদাদ ও লীওয়ার্ড উইণ্ডওয়ার্ড নতুন করে এক ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেছে, বর্তমানে সে প্রস্তাব বৃটিশ সরকারের বিবেচনাধীন। আগামী ৬ই আগষ্ট জামাইকার স্বাধীনতার দিনস্থির হয়েছে।

॥ আদমের বংশধর ॥

আজ পর্যন্ত কত মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন 'পপুলার রিলায়েন্স ব্যুরো'। তাঁদের হিসাবমতে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার সাত শত কোটি মানুষের জন্ম হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় তিনশত কোটি, যা আসৃষ্টি ভূমিষ্ঠ ও মৃত পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার চার শতাংশ মাত্র।

ঘটনাপ্রবাহ
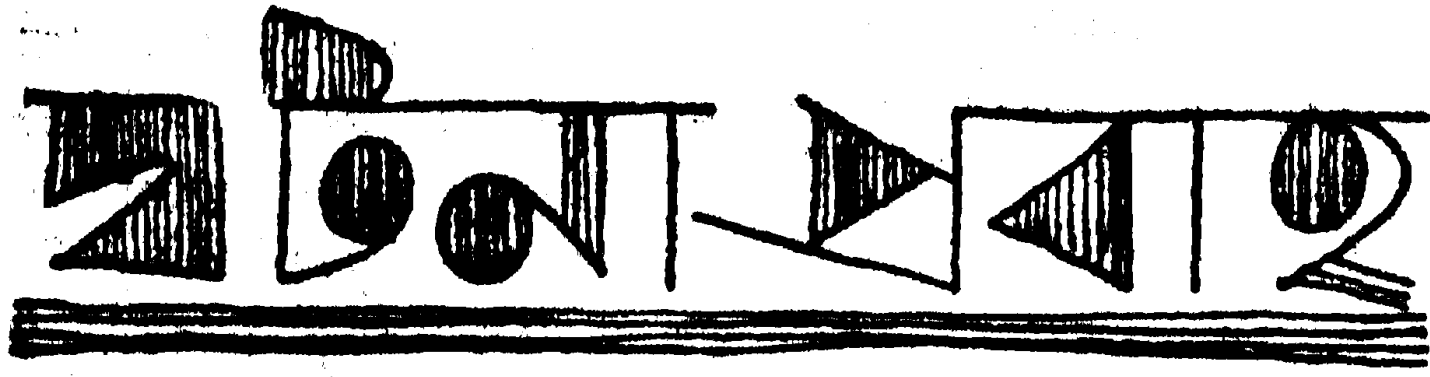
॥ ঘরে ॥

১৫ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (৮৬) জীবনাবসান।

চীন ও পাকিস্তানকে ভারত হইতে অবিলম্বে হাত গুটাইতে হইবে'—এলাহাবাদে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন : নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সুরু—প্রথম দিনে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি লোকসভা ও ৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে (মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্র ও কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ২৪-পরগণার হাবড়া কেন্দ্র সমেত) ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন : নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি লোকসভা কেন্দ্রে ও ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ।

মধ্যপ্রদেশের পিপলানীতে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানায় ধর্মঘট ও হাঙ্গামা—কারখানা এলাকায় কারফিউ জারী—ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন : 'বিক্ষুব্ধ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রচার অভিযান অব্যাহতভাবে চলিবে'—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত।

'মুসলিম মুক্তি ফৌজ' কর্তৃক মাদ্রাজ থানা লুঠ—'দিল্লীতে মুসলিম পতাকা উড়াইব' বলিয়া আস্ফালন—ঘটনা সম্পর্কে মাদ্রাজ পুলিশপ্রধানের (শ্রী এস বালকৃষ্ণ শেঠী) বিবৃতি।

সাধারণ নির্বাচনের তৃতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গে ৯টি লোকসভা ও ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাধা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন : জলপাইগুড়ি সংলগ্ন পাক্ সীমান্তে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি।

নির্বাচনের চতুর্থ দিনে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন : পশ্চিম বিহারে সাড়ে পাঁচ সের ওজনের শিলা বর্ষণের সংবাদ—শত শত গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত ও বহু গবাদির মৃত্যু।

সাধারণ নির্বাচনের পঞ্চম দিবসে পশ্চিমবঙ্গে ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ও ১১টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

২১শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন : রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ সম্মেলনে (জেনেভা) শ্রীনেহরু (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) সম্মত—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের লিপির জবাব প্রেরণ।

নির্বাচনের ৬ষ্ঠ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৭টি লোকসভা কেন্দ্রে ও ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাধা।

॥ বাইরে ॥

১৫ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : উভয় বঙ্গের মধ্যে যাতায়াত নিষিদ্ধকরণের জন্য পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের তোড়জোড়।

কাশ্মীর প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদে প্যাঁচখেলার জন্য করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক্ নেতাদের বৈঠক ও সলাপরামর্শ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন : বৃটিশ গায়না গভর্ণর কর্তৃক জর্জ টাউনে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা। প্রকাশ সরকারের সাহায্যার্থে বৃটেন হইতে সৈন্য প্রেরণ।

বার্লিন বিমান করিডরে সোভিয়েট বিমানের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ—রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের কঠোর সতর্কবাণী।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন : সমগ্র উত্তর ইউরোপে দুই দিবসব্যাপী প্রচণ্ড ঝড় ও প্লাবন—জার্মাণীর ক্ষতি অপূরণীয়; বৃটেনে ১১ জনের প্রাণহানি।

জর্জ টাউনে ব্যবসাকেন্দ্রগুলি অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত—আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য বৃটিশ বাহিনীর অবতরণ—নিউ আমষ্টারডামে ধর্মঘটের প্রসার।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন : বার্লিন বিমান করিডরের ঘটনাবলী সম্পর্কে পশ্চিমী প্রতিবাদ সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক অগ্রাহ্য।

চীনের আকাশ-সীমা ভারতীয় বিমান কর্তৃক লঙ্ঘনের অভিযোগ—ভারতের নিকট চীন সরকারের প্রতিবাদলিপি।

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে লণ্ডনে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের নাগরিকদের (বেশিরভাগই ছাত্র) প্রচণ্ড বিক্ষোভ—পাকিস্থানে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন : আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের সহিত ফরাসী সরকারের মতৈক্য ও চুক্তি অনুষ্ঠানের সংবাদ—সপ্ত বর্ষব্যাপী আলজিরীয় সংগ্রাম অবসান—প্রাথমিক আলোচনা সমাপ্ত।

মণ্টেগোমারি সেণ্ট্রাল জেলে (পশ্চিম পাকিস্থান) দাঙ্গাকারী বন্দীদের উপর রক্ষীদের গুলীবর্ষণ—এক হাজার কয়েদীর প্রাচীর ডিঙাইয়া পলায়নের চেষ্টা।

আণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে অস্ত্রধারী রাষ্ট্রসমূহের বৈঠক দাবী—ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) প্রস্তাবের জবাবে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের পাল্টা প্রস্তাব।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন : পৃথিবীর কক্ষপথে আকাশে আমেরিকার মানুষ (মহাকাশচারী জন গ্লেন) প্রেরণ—ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

দূরপ্রাচ্যে বৃটেনের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ড গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত।

২১শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন : মহাশূন্য হইতে প্লেনের নিরাপদ অবতরণ—মার্কিণ সাফল্যে সারা বিশ্বে আনন্দোচ্ছ্বাস — প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নিকট ক্রুশ্চেভের অভিনন্দন।

ঢাকা সমেত পূর্ব পাকিস্থানের সর্বত্র 'শহীদ দিবস' উদযাপিত—দশ বৎসর পূর্বেকার ভাষা আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ বিবেকবাণী ॥

পশ্চিম জগতে সৌভাগ্যক্রমে দুজন দার্শনিক আজো জীবিত যাঁদের চিন্তা-ভাবনা মর্তের মানুষের জীবনসমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আধুনিক কালের মানুষের জীবনে যে অভিশাপ নেমে এসেছে, যে বিপর্যয়ের সামনে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে এঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন, এঁদের একজন বার্ট্রাণ্ড রাসেল, অপর ব্যক্তি জ্যাঁ পল সারত্রে। সমগ্র মানবজাতির আসন্ন ধ্বংস এবং অবলুপ্তির নিশ্চিত সঙ্কট থেকে ত্রাণ করার জন্য উভয়েই সচেষ্ট।

ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অবশ্য উভয়ের মানসিকতার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান। দৃষ্টিভঙ্গীতেও আছে সুদীর্ঘ ব্যবধান। তবে, যে-কোনো দর্শনই নিরর্থক যদি তা সমকালীন রাজনীতির সংস্পর্শমুক্ত থাকে, এই নীতিতে উভয়েই বিশ্বাসী।

রাসেল শুধু যে একজন প্রখ্যাত দার্শনিক তাই নন, এক হিসাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কয়েক বছর আগে রাসেল স্বয়ং তাঁর শোক-বিজ্ঞপ্তি রচনা করে রেখেছিলেন, আজো তিনি মর্তধামে বিরাজমান, এই সৌভাগ্যের অধিকারী পৃথিবীর সকল মানুষ। নিজের সম্পর্কে রাসেলের এই ভবিষ্যৎ-বাণী বিফল হওয়ায় সারা পৃথিবী খুশী। বর্তমান জগতে বার্ট্রাণ্ড রাসেলদের সংখ্যা খুব বেশী নেই, অথচ প্রয়োজন এমনই বহু মহাজনের। জওহরলাল নেহরু তাই বলেছেন যে, এই মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করি।

নব্বুই বছরেও রাসেল সজীব, সবল, সপ্রতিভ এবং সক্রিয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর এই মনীষী আজো আশাবাদী। পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী সংগ্রামে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য যেভাবে শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করেছেন তা চিন্তাশীল জনসমাজের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল একদা বলেছিলেন যে সকল প্রকার উৎকট গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমিও ভীষণ রকমের গোঁড়া। এদিকে বয়স নব্বুই অতিক্রম করার মতো হলেও মানসিকতার দিক থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এমন এক বিচিত্রমনের অধিকারী যার বয়স বাড়ে না। চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর ভীমরথী ধরেনি। তাই তিনি যা লেখেন তা কৌতূহলোদ্দীপক, হৃদয়গ্রাহী এবং পাঠক চিত্তে চিন্তা জাগায়।

ভিক্টোরীয় যুগে রাসেলের জন্ম, তাই মনে হতে পারে যে জীবনকে তিনি পরিপূর্ণভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে দেখেছেন, উপভোগ করেছেন, তাই জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু বলার আর তাঁর নেই। সে ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। এলিয়টের কথায় তিনি জীবনের সবদিক দেখেছেন,, (the horror, the boredom, and the glory of life) এবং আজো তাঁর বিশ্বাস যে এবং সেই বিশ্বাস আন্তরিক, যে আমরা যদি কিঞ্চিৎ বিচার এবং বিবেচনা সহকারে বিচরণ করি তাহলে আমাদের জীবন অভূতপূর্ব আনন্দ ও গৌরবের অধিকারী হবে। আলবেয়ার কামুর মতো জীবন তাঁর কাছে absurd নয়। সারত্রের বিশ্বাস অনুসারে জীবনটা একটা অর্থহীন দুঃস্বপ্নও নয়। রাসেলের কাছে জীবন এক বিরাট বাস্তব, সে জীবনকে অঞ্জলি-ভরে পান করতে হবে, গণ্ডূষমাত্র গ্রহণ করলেই চলবে না।

মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মানুষ স্বয়ং। ভয়, আতঙ্ক, গোঁড়ামি, মতাভিমান, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি মনোবৃত্তি মানুষের জীবনে অভিশাপ, একবার যদি কোনো রকমে তাদের নির্মূল করা যায় তাহলে মানব জীবনে আসবে শুভবুদ্ধি, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান, আর এই পৃথিবীটা বাস করার পক্ষে অনেক মনোরম এবং মধুর হয়ে উঠবে। রাসেলের মতে বিজ্ঞান মানব জীবনের পরম আশীর্বাদ আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞান যে মানব জীবনের সর্বনাশা অভিশাপ সেই বিষয়েও তিনি সচেতন।

"Has Man A Future?" এই নামে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি যুগপৎ দুশিলিং ছপেন্স মূল্যে পেঙ্গুইন সিরিজে এবং এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইনের সাধারণ সংস্করণ দশ শিলিং ছপেন্সের সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি তাঁর "Commonsense and Nuclear Warfare" নামক গ্রন্থটির পরিশিষ্ট। এই গ্রন্থটি রচনা করার কারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিশ্বাস করেন যে মানুষ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এতবড়ো বিপদ মানব জীবনে আর কখনো ঘনিয়ে আসেনি। বেদনাবিহ্বল চিত্তে রাসেল বিশ্বাস করেন যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে অশুভ পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যে কালো ছায়া ইতিমধ্যেই গগনে গগনে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আকস্মিকভাবে বা সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফলে যে কোনো মুহূর্তে বিরাট দানবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, তখন আর তাকে বাধা দেওয়ার উপযুক্ত কোনো শক্তিই থাকবে না। রাসেল বলছেন যে, আমরা যদি ঝুলির ভেতরকার এই কালো বিড়ালটিকে একবার বেরিয়ে আসার সুযোগ দান করি তাহলে মানব সমাজের অবলুপ্তি কপালে করাঘাত হেনে হাত-পা ছড়িয়ে শোকপ্রকাশের জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। যদি মুষ্টিমেয় দুচারজন আণবিক যুদ্ধের আওতা থেকে কোনো রকমে চামড়া বাঁচিয়ে বেঁচে থাকে তাহলেও এই পৃথিবীটা তাদের পক্ষে আর বাসযোগ্য থাকবে না।

মুষলং কুলনাশনং —এই আণবিক মুষল দিয়ে নিজেদের কুলনাশ করে লাভ কি? এই যুদ্ধ কি নিবারণ করা সম্ভব নয়? বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে এই প্রশ্নের জবাব আছে। যুদ্ধহীন পৃথিবীকে অতি সহজেই একদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হবে। রাসেল বলছেন যে বিজ্ঞান এবং কারুশিল্পের সাহায্যেই এই অবস্থা সম্ভবপর হবে। জীববিদ্যানুসারে মানুষ সব রকম প্রাণীর সাম্প্রতিকতম সংস্করণ। বিবর্তনী ধারায় মানব জীবনের এখনও শৈশবকাল চলেছে। যাঁরা দুঃখবাদী তাঁরা রাসেলের এই উক্তি কল্পনাবিলাসীর উদ্ভট চিন্তা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাসেলের সুগভীর বিশ্বাস এবং উৎকণ্ঠাকে কেউ বিদ্রূপ করে নস্যাৎ করতে পারবেন না। মানব জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি সুগভীর বিশ্বাসই এক হিসাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রাণোচ্ছলতার উৎস।

রাসেলের যুক্তির সঙ্গে মিশেছে তাঁর অপরূপ 'লজিক' স্বচ্ছতা এবং যথার্থতা, তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না, পৃথিবীর দুর্গতির এই যে সমাধানের ইঙ্গিত রাসেল করেছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য। দানবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতার

বিরুদ্ধে তিনি অতিশয় তীব্র এবং তিক্ত উক্তি করেছেন। বর্তমান পৃথিবীকে যাঁরা বিপর্যয়ের মুখে টেনে আনতে চান, যাঁরা বর্তমান পৃথিবীকে সশঙ্কিত করে রেখেছেন, যাঁরা আতঙ্কসৃষ্টিকারী তাঁদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নির্ভীক এবং সাহসিক। তাঁর স্পষ্ট উক্তি তাঁর স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আর সেই সঙ্গে দেশবিদেশের হাজার হাজার চিন্তাশীল মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে।

এই গ্রন্থে তিনি অতি সহজ ভাষায় এবং সরল ভঙ্গীতে বিভিন্ন যুগের মানব সমাজের ইতিহাস বিধৃত করেছেন, তাদের উৎপত্তি বিকাশ এবং প্রগতির কথা বলেছেন, তারপর অস্ত্রব্যবহার, আধুনিক সংগ্রামের অস্ত্র এবং অতীতে যে সব বর্বরবৃন্দ যুদ্ধ সংঘটন করেছেন তাঁদের কথা বলেছেন। যাঁরা এখনও যুদ্ধে বিশ্বাসী এবং যুদ্ধই যাঁদের ধ্যান জ্ঞান তাঁদের তিনি তিরস্কার করেছেন। যেসব যুদ্ধবাজ নেতারা ভণ্ডামি এবং ন্যাকামির দ্বারা যুদ্ধের গুরুত্বটা সাধারণের কাছে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, আচারে আচরণে যুদ্ধবিলাসী এবং প্রকাশ্যে অন্যকথা বলে আসল বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, তাঁদের তিনি তিরস্কার করেছেন কঠোর ভাষায়। তাঁদের মুখোস খুলে দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, অবিবেচক রাজনৈতিক নেতাদের কর্মে বৈজ্ঞানিকদের কোনো সমর্থন নেই। রাজনীতির জঘন্য অপরাধ-প্রবণতায় বৈজ্ঞানিকদের আত্মিক সমর্থন নেই। এই গ্রন্থের প্রকাশ তাই অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে।

মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপযোগী বহুবিধ ঘটনা এখনও ঘটা সম্ভব। ভবিষ্যতে ঘটবে যদি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। কিছুকাল আগে আলডাস হাক্সলীও অনুরূপ মতের সমর্থনে এই জাতীয় কথাই বলেছেন। দুঃখের বিষয় রাসেল বা হাক্সলী বর্তমান কালের রাষ্ট্রপ্রধান নন, তাঁদের হাতে নেই ভুবনের ভার, তাঁদের হাতে কোনোদিন সে দায়িত্ব আসবেও না, কিন্তু যাঁদের হাতে সেই ভার, তাঁরা কি কোনোদিন এই সব যুক্তি এবং উক্তিতে কর্ণপাত করবেন, এখনও হয়ত সময় আছে।

রাসেলের যাঁরা প্রবল সমালোচক, তাঁরাও এই গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাবেন। এ এক মহামনীষীর কণ্ঠস্বর, এমন এক কঠিন-নীরস এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেও রাসেলীয় সরস রসিকতা অনুপস্থিত নেই।

বিশ্বভুবনের মানুষের ভবিষ্যৎ সত্যই কি অন্ধকারময়?

নতুন বই

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ— (দিব্য-জীবন)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক : গ্রন্থম। ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম সাড়ে আট টাকা।

অচিন্ত্যকুমার কবি, গল্প-লেখক, সার্থক উপন্যাস রচয়িতা। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গল্পের রচয়িতা, তেমনই বাংলাদেশের ইদানীংকালের দিব্যজীবনী-রচয়িতা হিসাবেও তিনি অগ্রণী লেখক। তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমা-প্রকৃতি সারদামণি', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী আধুনিক কালের বিস্ময়কর জীবনী-সাহিত্য। বাঙালী পাঠকের কাছে অচিন্ত্যকুমারের আগে আর কেউ এমনভাবে দিব্যজীবন-কথার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেননি। এ কথা স্বীকার্য। অচিন্ত্যকুমারের দিব্যজীবন সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ'। মহাপ্রভুর পুণ্যজীবনকথা অতি সুন্দর ভঙ্গীতে কথকতার আঙ্গিকে অচিন্ত্যকুমার পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, এবং অমিয়নিমাইচরিত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীকে ভিত্তি করে অচিন্ত্যকুমার কাহিনীকারের মত মহাপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে তত্ত্বের চেয়ে তথ্যের মূল্য অনেক। তত্ত্বের কঙ্কর-কঠিন পথ অতিক্রম করে তথ্যাবিষ্কারের ধৈর্য সাধারণ পাঠকের নেই,—তাই অতি সুললিত ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ জীবলীলার ব্যাখ্যা করেছেন। "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।" গৌরকৃপার বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অনুসন্ধান করতে হয় না, বিনানুসন্ধানে তা ফলান্বিত হয়। "শ্রীরাধার ভাবে এবে গোর অবতার। হরেকৃষ্ণ নাম গোর করিলা প্রচার। বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। যেই গোর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।" জগন্নাথ গৌরাঙ্গদেবের জীবনের বিচিত্র কথা এই "অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গের" একমাত্র উপজীব্য নয়, সেই সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বকথাও সাধারণের পক্ষে বোধগম্য করে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করা হয়েছে। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের জীবনে যে অপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কারণ সত্যোপলব্ধি। সত্যসন্ধ শ্রীচৈতন্য এক অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। রসস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সংযোগ শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রকাশিত। আরাধ্য দেবতার বিরহে তিনি ভাবমগ্ন। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্যের শরীরে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক প্রভৃতি বিকার লক্ষণ দেখা যেত, এই ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি। ঈশ্বরের সঙ্গে মানব-সম্বন্ধের জ্ঞানই সকল ধর্মের ভিত্তি, ঈশ্বরসম্ভোগ কল্পনা নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ সংযোগ বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনে এই সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। আজ বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট, যে সামাজিক বিকার সুস্থ সমাজব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার উপক্রম করেছে, সেই বিকৃতি থেকে নিষ্কৃতির পথ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, তাই আজ তাঁর দিব্যজীবনের কথা সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করার মূল্য অসীম। অচিন্ত্যকুমার মহাপ্রভুর পুণ্য-জীবনী রচনা করে ধন্য হয়েছেন। এই প্রথম খণ্ডে নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে কেশবভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং কেশবভারতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামকরণ পর্ব পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায়।

গ্রন্থটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং মুখপত্র হিসাবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত জননীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যের বিদায় গ্রহণ চিত্রটি বহু বর্ণে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্র এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

ফেরারী ফৌজ (নাটক) উৎপল দত্ত। প্রকাশক—গ্রন্থম্। ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২-৫০ নয়া পয়সা।

উৎপল দত্ত একালের একজন সুদক্ষ অভিনেতা। অতি অল্পকালে স্বকীয় অভিনয়-বৈশিষ্ট্যে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তা অচিন্তনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র অভিনয়-ক্ষমতা নয়, সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা আছে তার পরিচয় ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। 'অমৃতের' পৃষ্ঠায়

প্রকাশিত তাঁর 'চায়ের ধোঁয়া'র সঙ্গে সকলেই পরিচিত। 'ফেরারী ফৌজ' নামক উৎপল দত্তের নাটকটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, ঠিক যে ধরণের কাহিনী এই নাটকটির উপজীব্য বোধকরি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তার আর তুলনা নেই। ইতিপূর্বে তাঁর অন্যান্য নাটকও যথেষ্ট মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছে, নাট্যকার হিসাবেও উৎপল দত্ত যথেষ্ট স্বীকৃতিলাভ করেছেন। কিন্তু 'ফেরারী ফৌজে'র বক্তব্য বিভিন্ন। লেখক ভূমিকায় বলেছেন—'তিরিশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্বে বাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এই নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—' লেখক সেই গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান করে গেছেন 'ফেরারী ফৌজ' তাঁদের ইতিহাস। মুকুন্দ দাসের গান একদিন পল্লী অঞ্চলের কৃষক-মজুরকে মাতিয়ে তুলেছিল আর সেদিন হিতেনদের মত অনেক মীরজাফরকে পেটের দায়ে অনেক কিছু করতে হয়েছে। অশোকের মত ছেলেদের নির্যাতনের দৃশ্যে শচীর মত মেয়েরা সেদিন সত্যই কেঁদে উঠেছে। "একি! অবস্থা করেছে তোমার? তোমাকে এমনভাবে মেরেছে। তোমার মুখটা কি ছুরি দিয়ে খুবলে নিয়েছে ওরা?"—এই কথা বলে। হিতেনের মত নর-পিশাচরা বলেছে—'দেশপ্রেম জিনিসটা একটা স্নায়বিক রোগ'—ভুল বোঝাবুঝি, তার বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন অনেকগুলি প্রাণকে বলিদান দিতে হয়েছে। তবু শান্তি রায়দের মৃত্যু নেই, তাঁরা মরণ-সাগরপারে অমর। অশোকরাও আমাদের betray করেনি। নাট্যকার উৎপল দত্তকে ধন্যবাদ এমন একটি চমৎকার নাটক তিনি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিতে পেরেছেন বলে।

পদ্মগন্ধা— (উ প ন্যা স)—**শ্রীসুখময় গুপ্ত। দাম ৬·৫০।**

রাত জাগার কাহিনী— (গল্প)—**শ্রীসুখময় গুপ্ত। দাম ২·৫০। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা— ১২।**

'পদ্মগন্ধা' একখানি বৃহদায়তনের উপন্যাস। কাহিনী নিতান্ত সাধারণ। যে কোন রকমের কাহিনী বিস্তৃত আকারে লিখে গেলেই সার্থক সৃষ্টি হয় না। লেখকের সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। 'রাত জাগার কাহিনী' নিতান্ত সাধারণ স্তরের রচনা হলেও হাস্যরসাত্ম প্রেমধর্মী কাহিনীর জন্য সামান্য মাত্রায় সফলতা লাভ করেছে। সার্থক শিল্পী হওয়ার জন্য লেখককে আরও পরিশ্রম করতে হবে।

লিপিবিবেক— (প্রবন্ধ)—**শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড; ১নং শংকর ঘোষ লেন; কলিকাতা-৬। দাম ছয় টাকা।**

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক। বিবিধ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রয়েছে তার সুস্পষ্ট পরিচয়। এ গ্রন্থে বিবিধ ধরণের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই স্বতন্ত্র বিষয়নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সাতাশটি প্রবন্ধ 'লিপি বিবেকে' স্থান পেয়েছে। প্রথম তেরটি প্রবন্ধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আর এগুলি থেকে যথেষ্ট শিক্ষার রয়েছে। শিক্ষিত হয়েও অনেকে শব্দ ব্যবহারে যে কত মারাত্মক ভুল করতে পারেন তার পরিচয় প্রবন্ধকার কয়েকটি আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। অপর প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সাহিত্যভিত্তিক। এগুলি সম্পর্কে প্রবন্ধকারের বক্তব্য হচ্ছে "সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের কথা স্বতন্ত্র, এক কালের সীমান্ত পার হইয়া তাহারা অনায়াসেই কালান্তর প্রবেশ করিতে পারে সে জন্য কেহ তাহাদের কাছে পাসপোর্ট দাবি করে না।"

আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার একটি মূল্যবান সম্পদ। এতগুলি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ একত্র করে প্রকাশ করায় লেখক ও প্রকাশক উভয়ই ধন্যবাদার্হ।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

ব্রিটেনের চিত্র—সেন্ট্রাল অফিস অফ ইনফরমেশন, লণ্ডন কর্তৃক পরিকল্পিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

ব্রিটেন আয়তনে খুব বড় নয়। সেখানকার অধিবাসীদের জীবনধারা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ছবির দ্বারা তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার যে শিল্প ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে এর মধ্য থেকে। আধুনিক সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সে যে সমান তালে চলছে, তা চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

ভারতীয় চিত্রের বৈদেশিক বাজার:

"ফার ইস্ট ফিল্ম নিউজ" নামে জাপানী চলচ্চিত্রশিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত মাসিকপত্রের সম্পাদক মিঃ গ্লেন, এফ্, আয়ারটন সম্প্রতি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র সমালোচক সমিতির (Film Critics Club) সভ্যদের সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে তিনি ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলেছেন, তা ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি জাপানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বিশ্বের প্রতিটি অগ্রগামী দেশই বিদেশের বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশীর ভাগ ছবিরই দু'টি সংস্করণ তৈরী করে: এক, নিজের দেশের বাজারের জন্যে; দুই, স্বদেশবহির্ভূত অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে। কিন্তু ভারতীয় প্রযোজকেরা এই প্রথায় ছবি তৈরী করেন না জেনে তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়েছেন। মিঃ আয়ারটনের মতে বিদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা অনায়াসেই বাড়তে পারে, যদি ভারতীয় ছবির বৈদেশিক সংস্করণ সম্বন্ধে ভারতের সেন্সারবোর্ড অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন এবং ভারত সরকার তাঁদের রাষ্ট্রদূতাবাস-গুলির মারফত নিয়মিত ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই দু'টি মতই পূর্ণমাত্রায় সমর্থনযোগ্য। ভারতীয় সমাজের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে-সেন্সরকোড (সেন্সর সংক্রান্ত নিয়মাবলী) রচিত হয়েছে, বিদেশে প্রদর্শনের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত ছবিগুলির ওপর সেই কোডের কঠোর প্রয়োগকে কিছুটা শিথিল করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'রে আমরা যখন দেখতে পাই, বোম্বে বা মাদ্রাজে তৈরী ছবির ওপর পূর্বাঞ্চলীয় সেন্সরবোর্ডের কঠোরতা প্রযুক্ত হয় না। অবশ্য এই শিথিল করার ব্যাপারটাকে তাই ব'লে এমন একটা দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে না, যাতে মনে হ'তে পারে, ছবির পাত্রপাত্রীরা অভারতীয় বা কোনো ঘটনা ভারতসমাজ বহির্ভূত।

মিঃ আয়ারটনের দ্বিতীয় মত যে অত্যন্ত সুচিন্তিত, তা ভারত সরকার

অমল দত্ত পরিচালিত 'মেঘলা আকাশ' চিত্রের নায়িকা শম্পা।

সম্প্রতি যে অভিমত গ্রহণ করেছেন ব'লে শোনা যাচ্ছে, তা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যোন্নয়ন সংসদের ১৭ই জানুয়ারীর অধিবেশনে গৃহীত মতামতের ওপর নির্ভর করে ভারত সরকার নাকি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সহ-যোগিতায় বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলির মারফত নির্বাচিত ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থা করবেন সম্ভাব্য ক্রেতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য। বর্তমানে স্থির হয়েছে যে, বিদেশের বাজারকে চারটি মণ্ডলে বিভক্ত ক'রে প্রতিটি মণ্ডলের জন্যে তিনখানি ক'রে সর্বসাকুল্যে মোট বারোখানি ছবি প্রতি বছর নির্বাচিত হবে। চারটি মণ্ডল হচ্ছে: (১) মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা; (২) যুক্তরাজ্য (ইউ-কে), ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও চীন; (৩) দূরপ্রাচ্য এবং (৪) স্পেন ও ল্যাটিন আমেরিকা।

আশা করা যাচ্ছে, ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া মোট কুড়িখানি ছবি নির্বাচন ক'রে দেবেন এবং তার থেকে সরকার দ্বারা চূড়ান্তভাবে বারোখানি ছবি নির্বাচিত হবে। সরকার আশা করছেন যে, প্রযোজক বা পরিবেশকরা বিনামূল্যে তাঁদের নির্বাচিত ছবির একটি ক'রে প্রিণ্ট এবং প্রচারসামগ্রী সরকারের হাতে দেবেন। পরিবর্তে এই প্রিণ্টের ওপর কোনো রকম এক্সাইজ ডিউটি লাগবে না; উপরন্তু বিদেশে পাঠানোর খরচ এবং প্রদর্শনীর ব্যয়ভারও সরকার বহন করবেন।

ভারতে বছরে গড়পড়তা অন্ততঃ আড়াইশোখানি ছবি তৈরী হচ্ছে। তার মধ্যে বারোখানিকে নির্বাচন করার অর্থ শতকরা ৫ খানি ছবিকে বিদেশে প্রদর্শনযোগ্য ব'লে বেছে নেওয়া।

[illegible] [illegible] '[illegible]' চিত্রের নায়িকা কণিকা মজুমদার

অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং ততোধিক দুরূহ হিসেব। এ-ছাড়া বৈদেশিক বাজারের দ্বিতীয় মণ্ডলটি, যার মধ্যে মার্কিন রাজ্য থেকে শুরু ক'রে সোবিয়েত দেশ, চীন, জাপান পর্যন্ত আছে, অত্যন্ত ব্যাপক এবং বৃহৎ নয় কি? তার ওপর ইংলণ্ড বা আমেরিকার পছন্দ এবং চীন বা রাশিয়ার পছন্দের মধ্যে অত্যন্ত দূরে ব্যবধান যদিই বা না থাকে, অন্ততঃ বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম দেশ দুটি গণতান্ত্রিক এবং দ্বিতীয় দেশ দুটি কম্যুনিস্ট বা সাম্যবাদী। রাষ্ট্র, সমাজ, দর্শন—সব বিষয়েই এদের দৃষ্টিভঙ্গীর এতই পার্থক্য যে, শিল্প-রীতি বা রসজ্ঞান সম্পর্কে তারা একমত হবে এ-কথা চিন্তাতেও আসে না। অবশ্য ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে আমাদের মতামত দেবার যোগ্যতা নেই। অতএব তাঁরা যে কি যুক্তিতে এইভাবে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজারকে চারটি মণ্ডলে ভাগ করেছেন, তা তাঁরাই জানেন।

আমরা জানি, ভারতীয় ছবি দেখবার জন্যে বিদেশীদের মনে প্রচুর আগ্রহ আছে। নেহরু-গান্ধীর ভারতবর্ষ, রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথের ভা র ত ব র্ষ কে দেখবার, জানবার, বোঝবার জন্যে চল-চ্চিত্রের চেয়ে বলিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম আজও সৃষ্টি হয়নি। এই অতি-সত্য কথাটি স্মরণে রেখে আমাদের চিত্র-প্রযোজক-দেরও যেমন উচিত ছবির মধ্যে খাঁটি ভারতের আকৃতি-প্রকৃতি ও মানসকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা, তেমনি আমাদের সরকারেরও উচিত, প্রকৃত ভারতীয় ছবিগুলিকে বিদেশে বহুল প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে দেশের শিল্পকে উন্নত করতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের পথ প্রশস্ততর করা।

চিত্র সমালোচনা

ভগিনী নিবেদিতা : অরোরার শ্রদ্ধাঞ্জলি; ১৪,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : বিজয় বসু; চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : অনিল বাগচী; চিত্র-গ্রহণ : বিজয় ঘোষ; বহির্ভারতীয় দৃশ্য-গ্রহণ : জন্. সি. টেলর; শব্দধারণ : সমর বসু; সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়নে : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা দেবী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, অমরেশ দাস, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শিশির মিত্র, ঠাকুরদাস মিত্র, দ্বিজু ভাওয়াল, মমতাজ আহমেদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনায় গেল ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বি আর ফিল্মসের 'ধর্মপুত্র' চিত্রে শশি কাপুর।

"মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্-কে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে উৎসর্গ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন তাঁকে 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেছিলেন, সেই পুণ্য দিন থেকে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর জীবনপ্রদীপ না নেভা পর্যন্ত এই মহীয়সী নারী তাঁর দ্বিতীয় পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষের জন্যে কি অজস্র ভালোবাসার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত ক'রে গেছেন, ভারতীয়দের—বিশেষ ক'রে আজকের বাঙালীকে তারই সন্ধান দেবার জন্যেই যেন অরোরা বাঙলার চিত্রজগতকে 'ভগিনী নিবেদিতা'-রূপ শ্রদ্ধাঞ্জলিটি উপহার দিয়েছেন।

নিবেদিতার জীবনের প্রতিটি ঘটনা একটি চিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত করা যেমন সম্ভবও নয়, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও নয়। জীবনীকার একান্তভাবে সত্যানিষ্ঠ হয়ে যে-ভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে কোনও জীবনীকে সমগ্রতা দিতে চেষ্টা করেন, জীবনী-নাটক বা জীবনী-চিত্র-নাট্যলেখক সেই পন্থা অবলম্বন করলে তিনি মঞ্চ-নাটক বা চিত্র-নাটক গ'ড়ে তুলতে পারবেন না, দর্শক মঞ্চে বা পর্দায় যা দেখবে, তা হবে ঘটনাপঞ্জী, নাট্য-বিভূতিবিহীন ও ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে বা একান্তই অক্ষম। তাই জীবনী-মঞ্চনাট্যকার বা চিত্রনাট্যকার জীবনী থেকে মাত্র সেইসব ঘটনাকে বেছে নেন, যেগুলির সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নাট্যরসজারিত করলে একটি অখণ্ড নাট্যপ্রতিমা গড়া সম্ভব হয়। "ভগিনী নিবেদিতা"র চিত্রনাট্যকার

এন, সি, এ, প্রোডাকসনের সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে অরুণ মুখার্জী ও হরিধন মুখার্জী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও ভারতগতপ্রাণা নিবেদিতা চরিত্রকে একটি অখণ্ড নাট্য-মূর্তিরূপে গড়বারই চেষ্টা করেছেন এবং বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছেন। তার শৈশবের সত্য-অনুসন্ধিৎসা থেকে শুরু ক'রে তার পরদুঃখকাতরতা, অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, স্বামিজীকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বন্ধু-পথপ্রদর্শক-গুরুরূপে বরণ ক'রে ভারতকে নিজের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেওয়া এবং মাত্র ধর্মের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিপীড়িত পরাধীন জাতির জ্বালাকে নিজেরই জ্বালা-জ্ঞানে বিপ্লবের তিমিররাত্রিতে নিজেকে অম্লান দীপশিখার মত জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া—এই সমস্তের ভিতর দিয়ে নিবেদিতার মানসনাটাকে দর্শকসমক্ষে অত্যান্ত নিষ্ঠার সংগে এমন-ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে, যা তন্ময়চিত্তে দেখতে দেখতে একান্ত অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সংগে মহৎ কিছু গড়বার চেষ্টা করলে উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিদ্ধি যে অনিবার্য, তার জ্বলন্ত প্রমাণ—অরোরার "ভগিনী নিবেদিতা"। এবং এই অত্যন্ত সার্থক চিত্র নির্মাণের গৌরব চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং পরিচালক বিজয় বসুর সংগে এই চিত্র-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরই সমবেতভাবে প্রাপ্য।

ছবির নাম-ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন বললে যথেষ্ট হবে না; তিনি এই চরিত্রটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন—She has lived the role. এ-রকম অনুপ্রাণিত অভিনয় আমরা সম্প্রতিকালে দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছি না। মাধুর্যময় ঋজু কণ্ঠ যে গৃহীত চরিত্রকে এমন অপরূপভাবে দর্শকসমক্ষে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের মত বিকশিত করতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সমস্ত ছবিটিতে এই চরিত্রখানিকে ঘিরে বহু স্মরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে; তবু ওরই মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে শ্রীমায়ের সংগে নিবেদিতার সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অমরেশ দাস। স্বামিজীরূপে তাঁকে মানিয়েছে চমৎকার এবং সমগ্র অভিনয়ের ভিতর দিয়ে বিবেকানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি মূর্তও ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিবেকানন্দকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; তাই তাঁর চাউনিতে বিদ্যুৎ ছিল কিনা জানি না। কিন্তু অমরেশ দাসের চোখের সংগে স্বামিজীর যে-সব প্রচলিত ছবি আছে, সেই ছবির চোখের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর অভিনয়কে আর একটু দীপ্ত ক'রে তুলতে পারলে সম্ভবতঃ চরিত্রচিত্রণটি ত্রুটিহীন হ'ত। এই দুটি প্রধান চরিত্র বাদে ছবিটিতে বহু ছোট-বড় চরিত্র ভীড় ক'রে রয়েছে, নিবেদিতার কর্মজীবনের সংগে যাদের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা, প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। মনে হয়েছে, একটি মহৎ জীবনীচিত্রে অভিনয়ের গুরু দায়িত্বের কথা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সংগে অনুধাবন করেছেন। এমন কি, নৌকার মাঝি পর্যন্ত সে-কথা ভোলবার সুযোগ পায়নি।

ছবিটির অসামান্যতা উপলব্ধি করাবার জন্যে এর সংগীতাংশ প্রভৃত দায়িত্ব পালন করেছে। এ-বিষয়ে সংগীত-পরিচালক অনিল বাগচীর সংগে ডঃ গোবিন্দগোপাল, নির্মলা মিশ্র প্রমুখ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরা অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার অধিকারী। আবহ-সংগীতের প্রয়োগ বহু জায়গায় ঘটনোপযোগী হ'লেও কয়েকস্থানে অত্যন্ত হ্রস্ব বলে বোধ হয়েছে। মনে হয়, এ-ব্যাপারে যেমন, তেমনই ছবির উত্তরাংশে দৃশ্যপটের ব্যাপারেও যে-কার্পণ্য লক্ষ্য করা গেছে, তা ছবিখানিকে আঙ্গিকের দিক দিয়ে কিছুটা দীন ক'রে ফেলেছে। আলোক-চিত্রের কাজও সব জায়গায় সমান নৈপুণ্য প্রদর্শন করেনি। এই সামান্য ত্রুটী সত্ত্বেও "ভগিনী নিবেদিতা" বাঙলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় নিবেদন বলেই পরিগণিত হবে।

সপ্তর্ষিণী : দে প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১১,৫৯২ ফুট দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : নারায়ণ গংগোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য; পরিচালনা : সুশীল মজুমদার; সংগীত-পরিচালনা : কালিপদ সেন; রবীন্দ্র-সংগীত-তত্ত্বাবধান : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়; গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্র-

গ্রহণ ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ ঃ সুশীল সরকার; শব্দ-পুনর্যোজন ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশ ঃ সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায় ও গঙ্গাধর নস্কর; রূপায়ণ ঃ কণিকা মজুমদার, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, বসন্ত চৌধুরী, শোভেন লাহিড়ী, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, হীরালাল, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি। মুভিমায়া (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২৩-এ ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

সঞ্চারিণী কথাটির একটি প্রসিদ্ধ বাক্যাংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় যে-স্বপ্নময় রোমাণ্ডের সৃষ্টি করে, আলোচ্য "সঞ্চারিণী"-চিত্রের কাহিনীটিতে সেই অতি প্রত্যাশিত বস্তুটির একান্তই অভাব। কাশীর সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষক সান্যাল মশায়ের আদরিণী কন্যা গার্গী শুধু তার পিতারই মতো সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিনী নয়, সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর কন্ঠের ও একটি পরিচ্ছন্ন সুরুচিসম্পন্ন মনের অধিকারিণী। এ হেন কন্যার যখন নিতান্ত দৈব বিড়ম্বনায় (তা'ছাড়া আর কি!) এমন একজন ধনীর সঙ্গে বিবাহ হ'ল, যে বাল্যে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে পিতার প্রতিষ্ঠিত লোহ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ ক'রে বন্ধুমহলে 'লৌহ-দানব' খ্যাতিলাভ করেছে, এবং যার সংস্কারাচ্ছন্ন ভোঁতা মন গৃহস্থ ঘরের বয়স্থা মেয়েদের লেখাপড়া বা গানবাজনা পছন্দ করে না, তখনই আশা করা গিয়েছিল, আদর্শের সংঘাতের মাধ্যমে একটি চিরন্তন নাটক অনিশ্চিত পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু গল্প সে-পথে গেল না; কারণ গার্গীর বিদ্রোহী অন্তর স্বামীর ঘর করতে আসার সময়ে তার পিতা যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই স্মরণ করে সান্ত্বনা খোঁজে এবং স্বামীর হাতের লাঞ্ছনার শেষ করবার জন্যে নিজেকে অজ্ঞ নিরক্ষরারূপে চালিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কাজেই গল্প এবার নতুন খাদে বইতে শুরু করল। গার্গী ও দীনেশের পুত্র-সন্তান হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উকীল বন্ধু মন্মথ দাশগুপ্তের জন্মাল কন্যাসন্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তাদের জন্ম এবং ঐ যুদ্ধের অন্তে তারা কৈশোরে পৌঁছল। দুজনের মধ্যে আছে মনের মিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান তাদেরই করায়ত্ত। যথারীতি এরা প্রেমের

অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে রঞ্জনা ব্যানার্জি

পরিণতি হিসেবে পরস্পরে বিবাহিত হ'তে চায় এবং যথারীতি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে তারা প্রথমে গুরুজনের মত পায় না ও পরে গার্গীপুত্র শুভোর অ্যাক্সিডেন্টের পর সকল সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে গল্পের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি মৃত্যু ঘটে গেছে—সান্যালমশাই, দীনেশের মা এবং পরে দীনেশ নিজে পরপারে প্রস্থান ক'রে গল্পকে সহজ হ'তে সাহায্য করেছেন।

একমাত্র বিকাশ রায় অভিনীত মন্মথ চরিত্রটির (সুলতা জন্মাবার আগে পর্যন্ত) সরস কথাবার্তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা মনে দাগ কাটতে পারে। তাই আজকের দিনে এ-ধরণের গল্পের চিত্ররূপ দেওয়ার সার্থকতা কি, তা বুঝে ওঠা শক্ত। অনূঢ়া কন্যা হ'তে শুরু ক'রে বিধবা প্রৌঢ়া মাতা পর্যন্ত গার্গী চরিত্রটিকে অগ্রসর হ'তে হয়েছে এবং এই একটি মাত্র কারণে ছবির নাম 'সঞ্চারিণী' হয়েছে মনে করলে অন্যায় হবে না।

অভিনয়াংশে কণিকা মজুমদার তাঁর গৃহীত চরিত্রটিকে মর্যাদা দিতে পেরেছেন। অত্যন্ত সংযত, শান্ত এবং সংবেদনশীল তাঁর অভিনয়। 'লৌহ-দানব' দীনেশের ভূমিকায় একটি নয়নগ্রাহ্য গুম্ফ-পরিহিত বসন্ত চৌধুরীকে প্রথম দর্শনে দানব-ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব'লেই মনে হয়েছে এবং তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে স্থূলমনা দীনেশকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শুভো এবং সুলতা—এই

দুই চরিত্রে শোভন লাহিড়ী থেকে লাল চক্রবর্তী অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছেন। শোভেন লাহিড়ীর কয়েকটি ক্লোজ-আপ সুন্দরতরভাবে উপস্থাপিত করার অবকাশ ছিল। মন্মথ উকীলের ভূমিকায় বিকাশ রায় বাচনে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে এবং মেক্-আপে একটি নতুন ধরণের উপভোগ্য চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। পাহাড়ী সান্যালের আত্মভোলা, স্থিত-সমাহিত মাস্টার চরিত্র ও ছায়া দেবীর অন্নপূর্ণা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত বসু এবং প্রীতি মজুমদার।

চিত্রগ্রহণের কাজে বিমল মুখোপাধ্যায় মোটামুটি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাশ্মীর বহির্দৃশ্যাবলী সুন্দরভাবে গৃহীত। শব্দগ্রহণে একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। শিল্পনির্দেশে সুনীতি মিত্র বিভিন্ন পরিবেশের বৈচিত্র্য রক্ষা করেছেন সুষ্ঠুভাবে। ছবিতে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলি ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। একখানি মাত্র কীর্তনগানের রচনা, সুরযোজনা ও কণ্ঠদান সুন্দর হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

ত্রুটী স্বীকার :

গেল সংখ্যায় 'সূর্যস্নান'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ন্যায়দণ্ড" কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতিতে অনবধানতা-বশতঃ কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল বলে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত। সঠিক উদ্ধৃতি হচ্ছে :

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥"

বিশ্বরূপায় "সেতু" :

গেল ২৫-এ ফেব্রুয়ারীর ৩টার অভিনয়ে "সেতু" নাটক বিশ্বরূপার "ক্ষুধা" নাটক একটানা চলার যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, তাকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এটি হয়েছে "সেতু"-র ৫৭৪-তম অভিনয়।

শিল্পভারতী প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি :

বনফুলের একটি জনপ্রিয় গল্প অবলম্বনে শিল্পভারতী প্রোডাকসন্স যে-নতুন ছবির কাজে ব্রতী হয়েছেন, তার শুভমুহূর্ত উৎসব সম্পন্ন হয়েছে গেল ২২-এ ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাব-রেটরীতে হেমন্তকুমারের কয়েকখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিখানির

'সারাজাহা হামারা' চিত্রে শ্যামা

পরিবেশনসত্ব নিয়েছেন সিনে ফিলমস্ প্রাইভেট লিমিটেড।

শিশু নৃত্যনাট্য "ফুলপরী"

গেল শ্রীপঞ্চমীর সন্ধ্যায় নন্দলাল বসু লেনস্থ শ্রীনিতাইচরণ সেনের গৃহ-প্রাঙ্গনে একটি সারস্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন যুগান্তরের "স্বপনবুড়ো"—অখিল নিয়োগী। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল "সব-পেয়েছির আসর"-এর মেয়েদের দ্বারা নৃত্যনাট্য "ফুলপরী"র সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়।

• • •

আগামী সপ্তাহে কলকাতায় 'ধূল কা ফুল'-খ্যাত যশচোপরা পরিচালিত বি আর ফিল্মসের 'ধর্মপুত্র' চিত্রটি কলকাতায় মুক্তিলাভ করছে। আচার্য চতুর্সেন শাস্ত্রী রচিত মনস্তত্ত্বমূলক এই কাহিনীতে রূপদান করেছেন মালা সিনহা, শশী কাপুর, রহমান, মনোমোহন কৃষ্ণ, ইন্দ্রাণী মুখার্জি ও নিরূপা রায়।

* * *

গান্ধীকে অবলম্বন করে মার্ক রবসন যে চিত্রটি তুলেছেন তাতে জে এস কাশ্যপ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ভারতীয় শিল্পী অভিনয় করছেন তাঁরা হচ্ছেন অচলা সচদেব, এস এন ত্রিপাঠী, জয়রাজ, ডেভিড এব্রাহাম, কোশী পাণ্ডোলী, ইয়াকুব। এই সঙ্গে একটি চরিত্রে আছেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ।

ভিন দেশী ছবি

॥ চিত্রগ্রীব ॥

হলিউডে চিত্রপরিচালকদের স্বাধীনতা—

পৃথিবীর সব দেশেই চিত্রপরি-চালককে প্রযোজকের তর্জনী-শাসন মেনে চলতে হয়। কারণ চিত্রনির্মাণ একমাত্র প্রযোজকের অর্থানুকূল্যেই হওয়া সম্ভব। এবং হলিউডেও যথা-রীতি প্রযোজক-প্রতাপ কম না। কিন্তু সম্প্রতি বরফ গলতে সুরু হয়েছে পরি-চালকদের স্বপক্ষে।

কাহিনীকার-পরিচালক শ্রী রিচার্ড ব্রুকস কলাম্বিয়ার হয়ে অনেকগুলি ছবি তুলবেন এই মর্মে একটি চুক্তি সই করেছেন। চুক্তিটি হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট কাহিনী নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই। পরে ব্রুকস তাঁর প্রথম ছবির জন্যে জোসেফ কনরাডের "লর্ড জিম্" উপন্যাসটিকে নির্বাচিত করেছেন। কলাম্বিয়া-ব্রুকসের চুক্তি-নামাটিকে প্রায় একটা "ম্যাগনাকার্টাই" বলা যেতে পারে। এই চুক্তিবলে ব্রুকস তাঁর নতুন ছবি নির্মাণে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পেয়েছেন। যথা, এই চিত্রের চিত্রনাট্যের একটা শব্দও কলাম্বিয়ার কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হবে না, ছবিটি সম্পূর্ণ শেষ না হলে এক ফুটও প্রযো-জকপক্ষকে দেখাতে বাধ্য থাকবেন না ব্রুকস। অথচ ছবিটির পেছনে বিপুল

অঙ্কের (কুড়ি লক্ষ ডলার) ঝুঁকি নিতে হবে কলাম্বিয়াকে। অনেক সময় ছবি নির্মিত হবার পর প্রযোজকের ইচ্ছানুযায়ী কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হয় কিন্তু ব্রুকস-এর বেলায় স্থির হয়েছে, চূড়ান্তভাবে বাদ দেয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই। এমন কি প্রযোজকপক্ষ যদি ছবির কোনো অংশ বাদও দেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তা পুনর্সংযোজিত করতে পারেন। কলাম্বিয়াকে ব্রুকস-এর যাবতীয় সর্ত মানতে হয়েছে, কারণ হলিউডে কাহিনীকার-পরিচালকদের জয়-জয়াকার চলছে বর্তমানে। হলিউডে খুব কম সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর কাহিনীকার-পরিচালক আছেন। কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের ছবিই বক্স অফিসধন্য ত বটেই ছবি হিসেবেও অসাধারণ। যথা :

জন হাস্টন লিখিত এবং পরিচালিত	"দি মালটিজ ফ্যালকন"
	"ট্রেজার অফ দি সিয়েরা ম্যাডরে"
	"আফ্রিকান কুইন"
জোসেফ ম্যাকিউইকস ,, ,,	"এ লেটার টু থ্রি ওয়াইভস"
	"অল এ্যাবাউট ইভ"
বিলিওয়াইলডার ,, ,,	"সাম লাইক ইট হট"
	"দি এ্যাপার্টমেন্ট"
	"ওয়ান, টু, থ্রি"
জুলেস দেশিন ,, ,,	"রিফিফি"
	"নেভার অন সেন্ড"
জর্জ সেটন ,, ,,	"মিরাকল অন থার্টিফোর্থ স্ট্রিট"
	"কান্ট্রি গার্ল"
রবার্ট রোসেন ,, ,,	"দি হাস্টলার"

শেষোক্ত ছবিটি ১৯৬১ সালের অস্কার পুরস্কারের অন্যতম প্রতিযোগী। আমেরিকার দর্শকরাও, যে সমস্ত পরিচালক নিজের ছবির কাহিনী নিজেরাই লিখেছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই বেশী উৎসুক। এমন কি ইউরোপেও কাহিনীকার-পরিচালক ফেলিসী এবং ইনগেমার বার্গম্যানের অবিসংবাদী আধিপত্য।

তবে কলাম্বিয়ার সংগে সর্তাকীর্ণ চুক্তি করার একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল রিচার্ড ব্রুকস-এর। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মেট্রোর হয়ে "এলমার গ্যান্ট্রি" তোলার কথা ছিল। কিন্তু মেট্রোর শেষ পর্যন্ত গল্পটি পছন্দ হয়নি। ফলে ব্রুকস মেট্রোর সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। "ইউনাইটেড আর্টিস্টস" প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকদের চিত্র নির্মাণে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারে একটা সুনাম ছিল। 'ইউনাইটেড আর্টিস্টস' ব্রুকসকে প্রস্তাব দিলেন 'এলমার গ্যান্ট্রি' তাঁদের হয়ে তুলবার জন্যে। ব্রুকস ছবিটি তুললেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের পতাকায়।

ছবিটির জন্যে ব্রুকস কাহিনীকার হিসেবে অস্কার পেলেন এবং এই একই ছবিতে অভিনয় করে বার্ট ল্যাংকেস্টার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার এবং শার্লি জোনস অভিনেত্রীর অস্কার লাভ করেন। ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাণের জন্যেও 'এলমার গ্যান্ট্রি' নির্বাচিত হয়। এবং সেই থেকে রিচার্ড ব্রুকস স্থির করেছেন যে, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না পেলে কারুর হয়ে ছবি তুলবেন না।

হলিউডে আজকাল কাহিনীকার-পরিচালকের বাণিজ্যিক মূল্য ক্রমশই বাড়ছে। এবং চিত্র নির্মাণের স্বাধীনতাও তাঁরা শুধুমাত্র পরিচালকদের চেয়ে বেশীই পাচ্ছেন। ফলে হলিউডে যাঁরা শুধু ছবির জন্যেই গল্প লিখে থাকেন তাঁরা ক্রমেই চিত্র-পরিচালনার দিকে ঝুঁকছেন।

* * *

অথ অস্কার কথা

হলিউডের চলচ্চিত্র জগতে অস্কারের সম্মান অনন্য। অস্কারের স্বর্ণদীপ্ত মূর্তিটির জন্যে তাই হলিউডের লালসার অন্ত নেই। কারণ কোনো ছবির পক্ষে অস্কার পাওয়া মানেই বক্স অফিস মারফৎ উপরি প্রায় ষাট লক্ষ টাকার মতন উপার্জন। এবং তাছাড়া অমের সম্মানের গৌরবটা ত' আছেই। লাভ শুধু প্রযোজক পক্ষেরই না, অস্কারলব্ধ চিত্রের পরিচালক, অভিনেতা, কাহিনীকার, ক্যামেরাম্যান প্রমুখ সকলেই নতুন লাভের অংশীদার হন—নতুন নতুন কন্ট্রাক্টে উপার্জনের পথ আরো কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং অস্কার বিচারের কিছুদিন আগে থেকেই হলিউডের বিভিন্ন চলচ্চিত্র-শিবিরে সাজো সাজো রব পড়ে যায় এবং স্বপক্ষে বিপক্ষে সমস্ত রকমের প্রচারযন্ত্রই অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নাটকেরই প্রায় ছোটখাটো একটি সংস্করণ অভিনীত হয় লস এঞ্জেলেস-এর রঙ্গমঞ্চে।

হলিউডে এবারো তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না যথারীতি। ইতিমধ্যেই 'আকাডেমি অফ মোশান পিকচার্স, আর্টস এ্যান্ড সায়েন্স'এর সভ্যদের কাছে নির্বাচনের ব্যালটপত্র চলে গেছে। আগামী ৯ই এপ্রিল অস্কার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু অস্কার পুরস্কারের জন্যে হলিউড মাথা কুটলেও
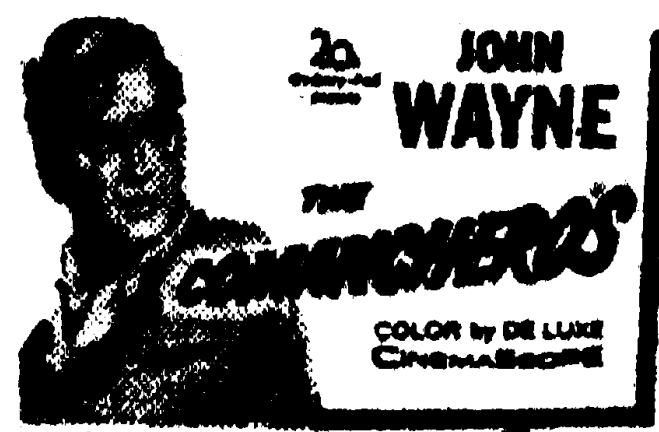
কোনো কোনো মহলে এই পুরস্কারের যাথার্থ্য নিয়ে সন্দেহ এবং কানাঘুষা কম নেই। সব সময়েই কি উপযুক্ত ছবি পুরস্কৃত হয়? বিচারকরা কি প্রকৃতই নিরপেক্ষ এবং সমস্ত দড়ি টানাটানির ঊর্ধ্বে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে নির্বাচকদের এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে আগে জানা দরকার।

"আকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্ট এ্যান্ড সায়েন্স"এর সভ্যসংখ্যা খুব বেশী না। আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতের কিছু 'আলোকপ্রাপ্ত বিস্বৎ-কুল' আকাডেমির সভ্য। নিয়মানুসারে আকাডেমির ২৩০০ সভ্য চিত্র নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। কিন্তু বর্তমান বৎসরে সম্ভবতঃ ২০০০-এর বেশী ভোট পড়বে না। নির্বাচন মণ্ডলীর এই সংখ্যাল্পতাই হলিউডের চিত্র-জগতে মূল অসন্তোষের কারণ এবং এই অসন্তোষের কারণটি একান্তই যুক্তি-যুক্ত। নিখিল আমেরিকার অভিনেতা সংঘের ১৪০০০ সভ্যদের মধ্যে মাত্র ৫০২ জন আকাডেমির সভ্য। চিত্র-কাহিনীকার সংঘের ১১০০ জনের মধ্যে আকাডেমির সভ্যপদ-অধিকারী মাত্র ২১০ জন। ৮৫০ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত পরিচালক সংঘের মাত্র ১৩৭ জন পরিচালকের সভ্যপদ আছে আকা-ডেমিতে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যন্ত্রকুশলীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব আকাডেমিতে নেই।

অস্কার নির্বাচন প্রক্রিয়াটি একটু জটিল। শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনয়, শ্রেষ্ঠ কাহিনী প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগের জন্যে পাঁচটি ছবি, পাঁচজন অভিনেতা, পাঁচজন কাহিনীকার প্রাথমিক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। এরপর আসল অস্কারের জন্যে নির্বাচন হয় পাঁচটি ছবি, পাঁচজন পরিচালক, পাঁচজন অভিনেতা, পাঁচজন কাহিনীকার অর্থাৎ প্রতিটি বিভাগের পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে। কিন্তু আকাডেমির সমস্ত সভ্যই সবক'টি বিভাগে ভোট দিতে পারেন না। সমস্ত সভ্য ভোট দিতে পারেন শুধু একটি মাত্র বিভাগে—শ্রেষ্ঠ ছবি মনোনয়নে। অন্যান্য বিভাগীয় (কাহিনী, অভিনয়, পরিচালনা ইত্যাদি) নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ সভ্যরাই শুধু মাত্র ভোট-দানের অধিকারী। এই নির্বাচন প্রথায় খুব কম ভোট পেয়েই একটি ছবি, কি একজন পরিচালক নির্বাচিত হয়ে যেতে পারেন। ২০০০ সভ্যদের যদি পাঁচটি ছবি বাছতে হয় তাহলে মাত্র ৪০০টি ভোটের জোরেই একটি ছবি অস্কারের জন্যে মনোনয়ন লাভ করতে পারে। আবার যেহেতু মাত্র ১৩৭ জন 'ভোটার' মারফৎ পাঁচজন পরিচালক নির্বাচিত হন, অতএব মাত্র ২৮টি সভ্যের সমর্থনেই পরিচালক অস্কারের প্রবে-শিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাত্র ১০০ ভোটে অভিনেতা ৫০-এরও কম ভোটে কাহিনীকার নির্বাচনের পালা সাঙ্গ হয়।

মুভি-টক'এর 'শিউলি বাড়ী' চিত্রে উত্তমকুমার

এবং ভোটরঙ্গের সংখ্যাগুলো কখনই জনসমক্ষে প্রচার করা হয় না, আকাডেমির পক্ষ থেকে। এই অহেতুক গোপনীয়তা অনেক সন্দেহের উৎস। হলিউডের কোনো কোনো মহলের ধারণা নির্বাচনের ভোট সংখ্যা প্রকাশ করলে বক্স অফিসের থলিটা ফুটো হতে ত' পারেই, অস্কার মূর্তির দিব্য স্বর্ণজ্যোতিটাও নিভে যেতে পারে অকস্মাৎ। আকাডেমির পক্ষে ভোট সংখ্যা প্রকাশের একমাত্র বাধা সম্ভবতঃ সভ্য সংখ্যার স্বল্পতা। হলিউডের প্রতিটি মহলের সমবেত প্রার্থনা আকা-ডেমির সভ্যসংখ্যা যাতে বাড়ানো হয়। অবশ্য সভ্যসংখ্যা আগের চেয়েও অনেক বেড়েছে। টেলিভিশনের পরাক্রমের ফলে সিনেমা শিল্প কিছুটা সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও গত দশ বছরে আকাডেমির সভ্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবুও যেখানে 'পাবলিসিটি এজেন্ট', 'বিজনেস এগজেকিউটিভ'রাও আকা-ডেমির সভ্য পদের অধিকারী, সেখানে সিনেমা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকদের অ-সভ্য করে রাখা নিঃসন্দেহে অসমীচীন।

এই প্রসঙ্গে এবারের অস্কারের প্রতিযোগী হিসেবে রবার্ট রোসেন-এর পরিচালিত 'দি হাস্টলার' ছবিটির নাম করা যেতে পারে। হলিউডে জোর গুজব যে এবারের অস্কারের আশীর্বাদ এই ছবিটির ওপরেই হয়ত বর্ষিত হবে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১ম টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২০৩ রান (রুসী সূর্তি ৫৭, সেলিম দুরাণী ৫৬। সোবার্স ২৮ রানে ৩, স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩, হল ৩৮ রানে ২ এবং ওয়াটসন ২০ রানে ২ উইকেট)।

ও ৯৮ **রান** (বোরদে ২৭ এবং উমরীগড় ২৩। হল ১১ রানে ৩, সোবার্স ২২ রানে ৪ এবং গিবস ১৬ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৮৯ **রান** (হেনড্রিকস ৬৪, হান্ট ৫৮, সলোমন ৪৩, সোবার্স ৪০ এবং হল নটআউট ৩৭। দুরানী ৮২ রানে ৪, দেশাই ৪৬ রানে ২, উমরীগড় ৭৭ রানে ২ এবং বোরদে ৬৫ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৫ **রান** (কোন উইকেট না পড়ে। হান্ট নট আউট ১০ এবং স্মিথ নট আউট ৫)।

১ম দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—১১৩ (৬ উইকেটে)। সেলিম দুরানী ২২ এবং রুসী সূর্তি ১০ রান করে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস—১৪৮ রান (৬ উইকেটে)। সলোমন ৪ রান করে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৮৯ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস —৪৯ রান (৪ উইকেটে)। উমরীগড় এবং বোরদে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৯৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস—১৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেন সহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিগত ১৬টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই ৬ষ্ঠ জয় এবং ১০টি খেলা ড্র। ভারতবর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে এ পর্যন্ত ১২টি টেস্ট খেলা হয়েছে —ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ (ইংলণ্ড, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে), হার ৩ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১) এবং খেলা ড্র ৬। বেশীরভাগ টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে এই মাঠে। গতবার ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ২টো টেস্ট খেলাই ড্র যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্বদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ পর্যন্ত ৩৮টা টেস্ট খেলেছে; খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২ হার ৯ এবং খেলা ড্র ১৭। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সমস্ত টেস্ট খেলা ধরলে হিসাব দাঁড়ায়—মোট খেলা ৯০, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ২৭, হার ৩২ এবং খেলা ড্র ৩১। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্বদেশে ৮টা টেস্ট সিরিজ খেলেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৪, ড্র ২ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে) এবং হার ২ (অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯৫৪-৫৫ এবং ইংলণ্ডের কাছে ১৯৫৯-৬০ সালে)।

ওয়েসলে হল

আলোচ্য কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের প্রথম টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনের লাঞ্চের আগেই শেষ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৯৮ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ মাত্র ১২ রানের ব্যবধানে এগিয়ে ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তখন জয়লাভের জন্য ১৩ রানের প্রয়োজন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের ৩৩ মিনিট আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং সাত মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে প্রয়োজনের থেকে দু'রান বেশী ক'রে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হয়। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে, রাণ দাঁড়ায় ১১৩। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় দুর্গতির মূলে ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার হল, ওয়াটসন এবং স্টেয়ার্সের মারাত্মক বোলিং। প্রথম দিনের তুলনায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় দিনে অনেক ভাল খেলে। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৪টি উইকেটে ৯০ রান ওঠে ১০৭ মিনিটের খেলায়। প্রথম দিনের খেলা দেখে লোকের ধারণা হয়েছিল দ্বিতীয় দিন কম সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাবে এবং সেই হিসাবে রানও কম উঠবে। লোকের এ ধারণা ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দেয়; তাছাড়া এই দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬ জন খেলোয়াড়কে আউট ক'রে বোলিংয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। এক কথায় দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ নিজের পক্ষে খেলার মোড় ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

তৃতীয় দিনে ২২০০০ হাজার দর্শকের সমাবেশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৭ম উইকেটের জুড়ি সলোমন এবং ভাঙ্গা আঙ্গুল নিয়ে উইকেট-রক্ষক হেনড্রিকস খেলতে নামেন। দলের রান তখন ১৪৮ (৬ উইকেটে)। সলোমনের রান ৪; তিনি দ্বিতীয় দিনের নট্-আউট খেলোয়াড়।

গারফিল্ড সোবার্স

হেনড্রিক্‌স এই দিন প্রথম ব্যাট করতে নামেন। আঙ্গুল ভাঙ্গার দরুণ এই খেলায় হেনড্রিকস আর যোগদান করবেন না বলে খবর ছিল।

দলের ১৮৭ রানের মাথায় বৃষ্টি নামায় ২২ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। এই সময় ৭ম উইকেটের জুটিতে ৫২ মিনিটের খেলায় ৩১ রান ওঠে। ২৮৫ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২০৩ রান ছাড়িয়ে যায়। দলের ২০৮ রানের মাথায় দেশাই নতুন বল নিয়ে বোলিং আরম্ভ করেন। খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া গেল। দলের ২১২ রানের মাথায় দেশাইয়ের বলে সলোমন নিজস্ব ৪৩ রান ক'রে উইকেট-রক্ষক ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিলেন। সলোমন ১০৪ মিনিট খেলে তাঁর ৪৩ রানের মধ্যে ৫টা বাউণ্ডারী করেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে ৮১ মিনিটের খেলায় সলোমন এবং হেনড্রিকস দলের ৬৪ রান তুলে দেন।

এর পর খেলতে আসেন গিবস। কিন্তু তিনি কোন রান না করেই দলের ২১৭ রানের মাথায় উমরীগড়ের বল দুরানীর হাতে তুলে দিয়ে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের স্কোর দাঁড়ায় ২৩৩ (৮ উইকেটে)। উইকেটে তখন ৯ম উইকেটের জুটি হেনড্রিকস (৪১ রান) এবং হল (৫ রান)।

এই ৯ম উইকেটের জুটিতে হেনড্রিকস এবং হল দৃঢ়তার সঙ্গে পিটিয়ে খেলে যান। দলের ২৮৭ রানের মাথায় এই জুটি ভেঙ্গে দেন বোরদে, হেনড্রিকসকে আউট ক'রে। হেনড্রিকস ১৬০ মিনিট খেলে তাঁর ৬৪ রান করেন, বাউণ্ডারী করেন ৮টা। তাঁর এই ৬৪ রানই দুই দলের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ৯ম উইকেটের জুটিতে হেনড্রিকস এবং হল ৭৩ মিনিট খেলে দলের ৭০ রান তুলে দেন। হলের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় ওয়াটসন খেলতে নামেন। কিন্তু খালি হাতেই তাঁকে ফিরে যেতে হয়, দলের ২৮৯ রানের মাথায় দুরানীর বলে ওয়াটসন কণ্ট্রাক্টরের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। হল ৩৭ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। প্রধানতঃ সলোমন, হেনড্রিকস এবং হলের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ১৮৭ মিনিট স্থায়ী থাকে এবং এই সময়ে ৪ উইকেট খুইয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪১ রান সংগ্রহ ক'রে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৮৬ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়।

চা-পানের বিরতির ২০ মিনিট আগে বৃষ্টি নামে; খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে প্যাভেলিয়নে আশ্রয় নেন। এই সময় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ৬, ২৫ মিনিটের খেলায় এবং এই ৬ রানই করেন কণ্ট্রাক্টর। মেহেরার রানের ঘর তখনও খালি। চা-পানের পরবর্তী খেলায় ভারতবর্ষের ভাঙ্গন ধরে। চা-পানের পর খেলা আরম্ভ করেন হল এবং তার প্রথম বলেই কণ্ট্রাক্টর আউট হন। মঞ্জরেকার খেলতে নামেন এবং হলের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বল খেলতে গিয়ে নিজেই নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলে আউট হন। সারদেশাই মঞ্জরেকারের শূন্য স্থানে খেলতে নামেন। তিনি হলের তৃতীয় বলে ২ রান করে হলের 'হ্যাট-ট্রিক' প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু চতুর্থ বলে তাঁকে খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। অনেকের মতে সারদেশাই নাকি বল স্পর্শ করেন নি। বলটা তাঁর লেগ-ষ্টাম্পের অনেক বাইরে ছিল এবং তিনি বলটা খেলেছিলেন, কিন্তু স্পর্শ করতে পারেন নি। বলটা উইকেট-রক্ষকের হাতে গিয়ে পড়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা একযোগে আবেদন করেন এবং আম্পায়ার এই আবেদনে সাড়া দেন। সারদেশাই বিস্মিত হয়ে উইকেট ছেড়ে চলে যান। একই ওভারে হল চারটে বলে তিনটে উইকেট পান মাত্র ২ রান দিয়ে। তাঁর প্রথম বলে কণ্ট্রাক্টর, দ্বিতীয় বলে মঞ্জরেকার এবং চতুর্থ বলে সারদেশাই আউট হ'ন। দলের ৮ রানে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। মেহেরার সঙ্গে উমরীগড় খেলতে নামেন। তখনও মেহেরা রান করেননি। দলের ৩৫ রানের মাথায় মেহেরা ৮ রান ক'রে আউট হন। মেহেরা ৬৮ মিনিট খেলে এই ৮ রান করেছিলেন। উমরীগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন বোরদে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৫ মিনিট আগে উপযুক্ত আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪১, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট-আউট থাকেন উমরীগড় এবং বোরদে।

চতুর্থ দিনের খেলায় ২০,০০০ হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ওরেল খেলার সূচনা করেন। প্রথম টেস্টে তাঁর এই প্রথম বোলিং। খেলা সবে ১০ মিনিট হয়েছে এমন সময় দলের ৫৬ রানের মাথায় উমরীগড় ২৩ রান ক'রে সোবার্সের বলে আউট হলেন। হেনড্রিকসের বদলী খেলোয়াড় রড্রিগসের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন।

বোরদের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটে খেলতে নামেন দুরানী। দলের ৭০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেটের পতন হয়—দুরানী সোবার্সের বলে খোঁচা মেরে বল তুলে দেন; ফাইন-লেগে ওরেলের হাতে বলটা ধরা পড়ে। সুর্তি খেলতে নামেন; কিন্তু দলের ঐ ৭০ রানের মাথায় সোবার্সের বলেই বদলী খেলোয়াড়ের হাতে ধরা পড়ে বিদায় নেন। সুর্তি তিনটে বল ঠেকিয়ে চতুর্থ বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে খোঁচা মেরে 'ক্যাচ' তুলেন। ৭০ রানে ভারতবর্ষের ৭টা উইকেটের পতন। তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৮৯ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১৬ রান পিছনে। ৮ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং নাদকার্নী যখন দলের ভাঙ্গন কিছুটা সময় রোধ করেছেন এমন সময় দলের ৯১ রানের মাথায় বোরদে নিজস্ব ২৭ রান ক'রে সোবার্সের বলে বোল্ড-আউট হ'ন। দলের ৯৬ রানে ইঞ্জিনিয়ার এবং ৯৮ রানে সর্বশেষ খেলোয়াড় দেশাই আউট হ'ন। নাদকার্নী ১২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

মাত্র ৯৮ রানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। এই ৯৮ রানই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড ১২৪ রান (কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯)। বিগত ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ছিল ১২৯ (বার্বাদোজ)। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় এই নিয়ে ভারতবর্ষ ৭ বার একশত রানের কম রানে আউট হল—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৪ বার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২ বার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ বার। ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৫৮ রান—ইংলণ্ড (ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২) এবং অস্ট্রেলিয়ার (ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮) বিপক্ষে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৮ বার একশত রানের কমে আউট হয়েছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৩ বার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ বার, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ বার ক'রে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৭৬ রান—পাকিস্তানের বিপক্ষে (ঢাকা, ১৯৫৮-৫৯)।

খেলার তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ যেমন ফাস্ট বোলারদের বলে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি করেছিল চতুর্থ দিনে স্পিন

বোলারদের কাছে। চতুর্থ দিনে ফাস্ট বোলারদের বিশ্রাম দিয়ে ওরেল স্পিন বোলারদের হাতে আক্রমণের ভার দেন। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায় ৪৯ রানে। সোবার্স ২২ রানে ৪টে এবং গিবস ১৬ রানে ২টো উইকেট পান। সোবার্স তাঁর ২য় ওভারে উমরীগড়, ষষ্ঠ ওভারে সেলিম দুরানী এবং রুসী সুর্তি এবং ৮ম ওভারে বোরদের উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে লাঞ্চ সময়ের ৩৩ মিনিট আগে। জয়লাভের জন্যে তাদের মাত্র ১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। হাণ্ট এবং স্মিথ লাঞ্চের বিরতির ২৫ মিনিট আগে ১৫ রান তুলে দিলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী হয়। পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনের লাঞ্চের আগেই শেষ হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ এই চার দিনের খেলায় আবার ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়।

॥ রঞ্জি ট্রফি ॥

সেমি-ফাইনাল

বাংলা ঃ ২৯২ রান (শ্যাম মিত্র ১১৭, প্রকাশ ভাণ্ডারী ৫৮ এবং পি সি পোদ্দার ৪৬)

ও ২৯১ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। প্রকাশ ভাণ্ডারী নট-আউট ১১১, শ্যাম মিত্র নট-আউট ৭৯ এবং পংকজ রায় ৪৭)

রাজস্থান ঃ ৩৯২ (সূর্যবীর সিং ১২৬, হনুমন্ত সিং ৫৯, অর্জুন নাইডু ৪৬, সি যোশী ৫২। সুশীল কাপুর ১০৬ রানে ৬টা উইকেট)

ও ১৯৫ রান (৫ উইকেটে। রুংটা ৯৭, মানকড় ৪১, সূর্যবীর সিং নট-আউট ২৬। ভাণ্ডারী ৬৬ রানে ৫ উইকেট)

উদয়পুরে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ৫ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে।

রাজস্থান দলের অধিনায়ক টসে জয়লাভ ক'রে বাংলাকে প্রথম ব্যাট করতে দেন।

বাংলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দশ মিনিটের মধ্যে বাংলার অধিনায়ক পংকজ রায় এবং তাঁর প্রথম উইকেটের জুটি দেবীন্দর সিং দলের কোন রাণ হওয়ার আগেই আউট হয়ে যান। তৃতীয় উইকেটের জুটি পোদ্দার এবং কেনী দলের এই ভাঙ্গন সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করেন—৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ৩১ রাণ ওঠে। এর পর ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পোদ্দার এবং শ্যাম মিত্র ১৩৫ মিনিটের খেলায় ১১২ রান তুলে দেন। দলের ১৪৩ রানের মাথায় পোদ্দার ৪৬ রান করে আউট হ'ন। প্রথম দিনের খেলায় বাংলা ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৫৪ রান করে। মিত্র ১০১ এবং অম্বর রায় ৩ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। সুন্দরম ৫৪ রানে ৩ এবং যোশী ৬১ রানে ২টো উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৯২ রানে শেষ হয়। শ্যাম মিত্র ১১৭ রান করেন।

রাজস্থান এই দিন ২২৯ রান তুলে দেয়, উইকেট পড়ে ৪টে।

তৃতীয় দিনে চা-পানের বিরতির কিছু আগে ৩৯২ রানে রাজস্থানের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে রাজস্থান ১০০ রানে অগ্রগামী হয়। বাংলা ২টো উইকেটের বিনিময়ে এই দিন ৬৭ রান করে।

রাজস্থান দলের সূর্যবীর ২১০ মিনিট খেলে ১২৬ রান করেন, বাউণ্ডারী করেন ১৩টা। ভিনু মানকড় নিজস্ব ২৮ রানে রান-আউট হ'ন। ৭ম উইকেটের জুটিতে নাইডু এবং যোশী দলের ৯২ রান তুলে দেন। বাংলার সুশীল কাপুর ১০৬ রানে ৬টা উইকেট পান।

খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষ দিনে বাংলা ২৯১ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন খেলায় জয়লাভের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পংকজ রায় এবং শ্যাম মিত্র দ্রুতগতিতে রান করেন। তাঁরা ৫০ মিনিটে দলের ৭০ রান তুলে দেন। দলের অধিনায়ক পংকজ রায় নিজস্ব ৪৭ রান ক'রে দলের ১২৮ রানের মাথায় আউট হ'ন। এর পর ৪র্থ উইকেটের জুটি শ্যাম মিত্র এবং প্রকাশ ভাণ্ডারী দলের ১৬৩ রান তুলে দিয়ে অপরাজেয় থাকেন। ভাণ্ডারী ৩৯ মিনিটে ৫০ রান এবং এক ঘণ্টার খেলায় তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। শ্যাম মিত্র ৭৯ রান এবং প্রকাশ ভাণ্ডারী ১১১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার ফলে রাজস্থান দলের জয়লাভের জন্যে ১৯২ রানের প্রয়োজন হয়। তখন খেলা ভাঙ্গতে ২১০ মিনিট সময় বাকি ছিল। রাজস্থান দলের অধিনায়ক রাংটা দলের এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেন এবং তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে রাজস্থান ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৫ রান করে। বাংলার প্রকাশ ভাণ্ডারী মাত্র ১৬ রানে এই ৩টে উইকেট পান। কিন্তু খেলার এই মোড় ঘুরিয়ে দেন দলের অধিনায়ক কিশন রুংটা। তিনি ৯৭ রান ক'রে আউট হ'ন। জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে রাজস্থান দলের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। ৫ উইকেটে শেষ পর্যন্ত দলের ১৯৫ রান দাঁড়ায়। প্রকাশ ভাণ্ডারী দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পান।

দিল্লী ঃ ১৪৯ রান (পাই ৫৮ রানে ৫ উইঃ) ও ২৬৭ রান (সুদ ৬৮। বালু গুপ্তে ১১১ রানে ৮ উইকেট)

বোম্বাই ঃ ২৯০ রান (হরদীকার ৮৯ এবং তামানে ৫১। সীতারাম ৬৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৩৮ রান (৪ উইকেটে। এম এল আপ্তে ৪৯ এবং আমরোলীওয়ালা ৬৭)

গত বছরের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দল অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দিল্লী দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনেই দিল্লীর প্রথম ইনিংস ১৪৯ রানে সমাপ্ত হয়, লাঞ্চের পর ৫৫ মিনিট খেলার পর। বাকি সময়ে বোম্বাই ৪ উইকেটে ১১৭ রান করে।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ২৯০ রানে শেষ হলে বোম্বাই ১৪১ রানে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনে দিল্লীর ৫টা উইকেট পড়ে ৯১১ রান দাঁড়ায়।

খেলার তৃতীয় দিনে দিল্লীর দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৭ রানে শেষ হয়। খেলার জয়লাভের জন্যে তখন বোম্বাই দলের ১২৭ রানের প্রয়োজন হয়। এই দিন ২ উইকেটে বোম্বাই দল ১১৬ রান করে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১ রান তুলতে বোম্বাই দল চতুর্থ দিনে ব্যাট ধরে এবং ১৫ মিনিটের কম সময়ের খেলায় এই ১১ রান তুলে দেয়। আকাশ লালের বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ওয়াদেকার বোম্বাই দলের জয় ঘোষণা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর পরও বোম্বাই খেলে যায়। ১৩৮ রানে (৪ উইকেট) তারা ব্যাট ছাড়ে।

॥ জাতীয় লন টেনিস ॥

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় রয় এমারসন পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব লাভ করেছেন। ডাবলসের সেমি-ফাইনালে তাঁর জুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল 'ওয়াক-ওভার' পান। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী রমানাথন কৃষ্ণান নরেশকুমারকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যান। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে রয় এমারসন ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এমারসন স্ট্রেট সেটে কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। এক বছরের মধ্যে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে এমারসনের কাছে দু'বার পরাজিত হ'লেন। প্রথম পরাজিত হ'ন ক'লকাতায় এশিয়ান লন টেনিস

প্রতিযোগিতার ফাইনালে। গত বছর উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে রয় এমারসনকে যে পরাজিত ক'রেছিলেন এমারসন তারই প্রতিশোধ নিলেন এই বছরের দু'টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে। গত এক বছরের মধ্যে এমারসনের খেলা প্রভূত উন্নত হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় তাঁকে আগামীকালের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার যোগ্য অধিকারী বলা যায়।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

মহিলাদের সিংগলস : মিস লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৩ সেটে মিস ম্যাডোনা সাক্‌টকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জি (ভারতবর্ষ) ৬-৩, ৬-২, ১-৬, ৬-৩ সেটে জ্যাভানোভিক এবং পিলিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিংগলস : রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণনকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মিস ম্যাডোনা সাক্‌ট এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩ সেটে মিয়াগি (জাপান) এবং মিসেস পি এন আমেদকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিংগলস : বিনয় দেওয়ান (দিল্লী) ৩-৬, ৬-৩, ৬-১ সেটে এস এস মিশ্রকে (হায়দ্রাবাদ) পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট

তারিখ : মার্চ—৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২

কিংস্টোন—সাবিনা পার্ক

জামাইকা দ্বীপের রাজধানী কিংস্টোন শহরের সাবিনা পার্ক মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আগামী ৭ই মার্চ থেকে শুরু হবে। কিংস্টোনে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ৩রা এপ্রিল, ১৯৩০ সালে ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংগে। এ পর্যন্ত কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংগে বিভিন্ন দেশের ১০টি টেস্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয় ৪, হার ৩ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২) এবং খেলা ড্র ৩। কিংস্টোনে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি হয়েছে :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৭৯০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৮৪৯ রান—ইংলণ্ড, ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ইংলণ্ডের এই ৮৪৯ রান—এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১৩৯ রান, ইংলণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৩-৫৪

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ১০৩ রান, ইংলণ্ড, ১৯৩৪-৩৫

সেঞ্চুরী (৩৩)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১৪ (ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৫, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ১৯ (ইংলণ্ড ৭, অস্ট্রেলিয়া ৭, ভারতবর্ষ ৩ এবং পাকিস্তান ২)

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৩৬৫ নট-আউট —গারফিল্ড সোবার্স, পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮।

গারফিল্ড সোবার্সের এই নট-আউট ৩৬৫ রান—এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : এ স্যাণ্ডহ্যাম (ইংলণ্ড), ১৯৩০

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১৫৫ ও ১১০—ক্লাইড ওয়ালকট, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৪-৫৫

একটি টেস্ট ম্যাচে দলগত মোট সর্বাধিক রান : ১১২১ রান—ইংলণ্ড (৮৪৯ ও ২৭২—৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। ১৯৩০ সালে কিংস্টোনের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ইংলণ্ড এই ১১২১ রান (১৯ উইকেটে) ক'রে যে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী : ৫টি—অস্ট্রেলিয়া (হার্ভে ২০৪, আর্চার ১২৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বেনো ১২১ এবং মিলার ১০৯)। ১৯৫৫ সালে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এই ৫টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী ক'রে যে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী : ৩টি (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ এবং ওয়ালকট ১১৮)। ১৯৫৩ সালে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ৩টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে প্রথম।

একটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী এবং ৮টি উইকেট : ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার ১০৯ রান এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৮টি উইকেট নিয়ে এই বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচী পত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th March, 1962
40 Naya Paise

আলোচনায় কোনো ফল নেই তবু কথা বলতে হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রসঙ্গের তালিকা সুদীর্ঘ। শিক্ষা-সমস্যাও তার মধ্যে একটি। পুরনো ব্যাধির মতো এ ব্যাপারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণাই আমাদের প্রায় গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। এবং এ নিয়ে কাতরোক্তি করলেও বোধকরি কারো সহানুভূতি জাগে না। কিন্তু তবু কথা বলতে হয়, কারণ সমস্যাটা এতই জরুরী যে, নীরব থাকা অসম্ভব।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হ'য়েছে। তাতে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এক বেদনা-দায়ক পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া গেল যাতে বিচলিত বোধ না করে উপায় নেই। উক্ত পরিসংখ্যান বিভাগের পক্ষ থেকে ডক্টর পি. কে. বসু কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্তই অসন্তোষজনক। পড়াশোনা, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, ল্যাবরেটারী এবং কারিগরী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য। কাজেই বছরের পর বছর পরীক্ষা-পাশের হার কেন এমন শোচনীয় অবস্থায় র'য়ে গেছে তার কিছুটা হদিশ পাওয়া গেল এই রিপোর্ট থেকে।

বিশদ আলোচনায় না গিয়েও পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে কয়েকটি তথ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি এখানে। শতকরা দশটির বেশী ছেলেদের বিদ্যালয়ে এবং ত্রিশটির বেশী মেয়েদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে আলাদা কোনো ল্যাবরেটারীর ব্যবস্থা নেই। শতকরা প্রায় চল্লিশটি বিদ্যালয়ে কারিগরী ট্রেনিং-এর জন্যে কোনো আলাদা জায়গা নেই। এবং কোনো কোনো বিদ্যালয়ে কোনো কারিগরী শিক্ষকও নেই। যে-সব বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানেও ছাত্রদের কোনো বিষয়-নির্বাচনের স্বাধীনতা নেই, কারণ বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই মাত্র একটি অল্প-ব্যয়সাধ্য বিষয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শোভাবর্ধন করা হ'য়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষার দিকে আগ্রহ সর্বজন-বিদিত। কলকাতার ছাত্রদের শতকরা ৪১ জন এবং চব্বিশ পরগণায় শতকরা ৪২ জন ছাত্র বিজ্ঞান পড়ে। কিন্তু ল্যাবরেটারীর এমন দুরবস্থা যে তারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে কতটা প্রস্তুত হতে পারছে তা সন্দেহের বিষয়। আর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা এমনই অবহেলিত যে কলকাতার শতকরা ৫ জন এবং চব্বিশ পরগণার মাত্র ১ জন ছাত্র সে শিক্ষার সুযোগ পায়।

রিপোর্টে গ্রন্থাগার, পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবের বিষয়েও মন্তব্য করা হ'য়েছে। কিন্তু অন্ধকার যেখানে সর্বব্যাপী, সেখানে ইতস্তত আলোকপাত বা দফাওয়ারী আলো-চনায় খুব বেশী লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সমীক্ষা গ্রহণ করা হ'য়েছে মাত্র কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণা জেলার বিদ্যালয়গুলিতে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই অঞ্চলটিতেই যে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সব থেকে বেশী তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগপ্রাপ্ত এলাকাতেই শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন চমৎকার আভ্যন্তরীণ চিত্র উদ্ঘাটিত হ'য়েছে যে এই রাজ্যের পশ্চাদ্পদ অঞ্চলগুলির কথা চিন্তা করলে শিহরিত হতে হয়।

বাস্তবিক, মধ্যশিক্ষা কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের ফলে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটেছে, অচিরেই সে বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। নয়তো এই বিকলাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর আমরা যে পরিমাণে অর্ধ-শিক্ষিত, অসহায় ছাত্রদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঠেলে পাঠাচ্ছি তাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের নিদারুণ প্রতিফল পেতে হবে। কারণ, মৌখিকভাবে হলেও, সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ হল তার শিশু এবং বালক-বালিকাবৃন্দ। তাদের 'মানুষ' করে তোলার পথে আমরা যদি গাফিলতি করি তবে তা নিয়তির নির্মম পরিহাসে আমাদের সমগ্র জাতিকেই নিয়ে যাবে ধ্বংসের কিনারে।

কবিতা
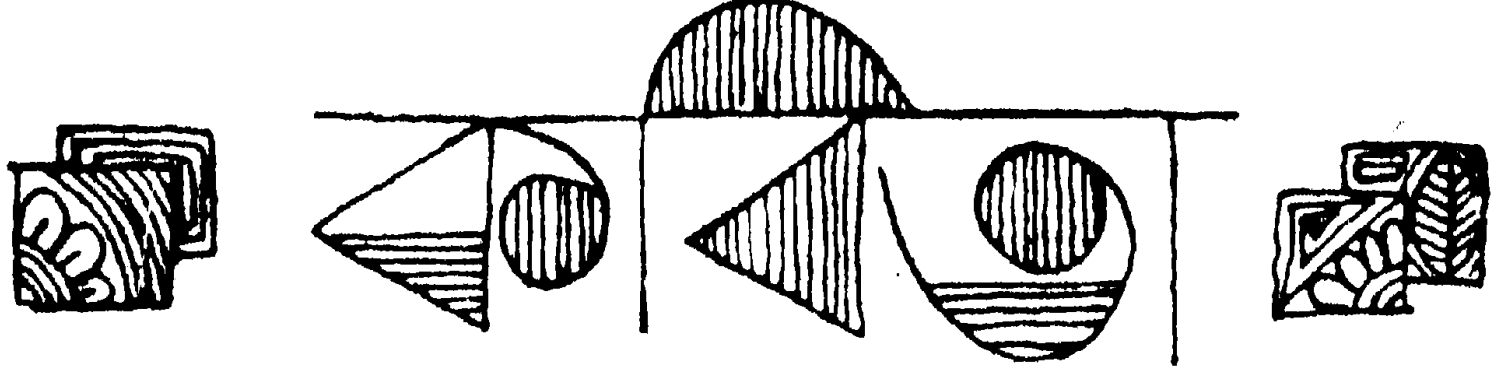
মায়াবী নিকেতন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াবী নিকেতনে
তবু কী যাবি তুই?
নিবি কী বুকে তার
পাথর বাহবারে!

যে মেয়ে মন কাড়ে
মন্ত্র জানে সে;
কঠিন হিয়া তার
কঠিন চেনা তা'রে!

অবোধ নোস্ তুই
তবু রে ঝাঁপ দিবি
মরণে? চেতনার
রক্তে ভ'রে দিবি
পাষাণ প্রতিমাকে?

মাথার চুল পেকে
গিয়েছে, হায়, তোর!
হৃদয়ে তবু তোর
এ কোন তোলপাড়!!

* *

প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে

আশিস সান্যাল

ক্রমশঃ হারিয়ে যাবো নিষ্ঠুর প্রবাহে। হায়, কোনোদিন আর
তোমাকে হবে না বলা হে আমার প্রিয়তম নন্দিত মোহিনী
বুকে যে রেখেছি ভাষা অতি সংগোপনে।

জানি, মেঘের দুপুরে
যে কথা ছড়াতে চাই দুই হাতে আজো দীপ্ত পথের মন্দিরে
সে আর হবে না বলা। ঘনীভূত শ্রাবণের সহস্র সংগীতে
যেমন জলের ধারা বেগবান পরিপ্লাবী নদীর শরীরে
ঝরে যাবো নিরুচ্চার। হে গহন প্রতিবেশী দৈবত রমণী
তোমাকে হবে না বলা সেই ভাষা সংগোপনে
রেখেছি গভীরে।

প্রতি অঙ্গে তীব্র বিষ। কে আমাকে ভাসিয়েছো
নিমগ্ন ভেলায়?
ভেসে যাবো শব্দহীন নিষ্ঠুর প্রবাহে। হায়, কোনোদিন আর
সম্পন্ন হৃদয় থেকে রূপবান প্রত্যয়ের ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ে
দেবো না সম্পূর্ণ প্রীতি। অবেলার অন্ধকারে শুধু নির্বিকার
অভিশাপ চূর্ণ করে সময়ের মতো একা দূর থেকে দূরে
ভেসে যাবো অবিরাম; হে আমার নির্বাসিতা পবিত্র মহিমা।

অন্তর্জলি

পরিমল চক্রবর্তী

দ্যাখো হে বিষণ্ণ ছবি, হে হৃদয়, দুই চোখ মেলে।
যন্ত্রণার অন্তরীপে আমি আজ বন্দী হয়ে আছি;
আরো কতোকাল বলো, অনুভবে দীপ্তশিখা জেবলে
আমাকেও বাঁচতে হ'বে উল্লঙ্গ মৃত্যুর কাছাকাছি?

আমি তো চাইনি আয়ু পদ্মপত্রে যেন স্থির জল
অস্থির মুহূর্তে খোঁজে, অবশেষে ঝরে পড়ে যায়
সহসা মৃত্যুর লগ্নে; আজ শুধু শেষের সম্বল
কবিতা এবং গান, যা লিখেছি স্মৃতির পাতায়।

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে বিষাদ, সেই অনুভব
যার স্পর্শে সব কিছু সোনা হয়; সেই অভিজ্ঞান—
যার তাপে দগ্ধ হয় শারীরিক সম্পন্ন বিভব;
আমাকে শিখিয়ে দাও সেই ধ্রুব আলোর বিজ্ঞান।

না হ'লে কী ক'রে বাঁচি শোকদগ্ধ এই পৃথিবীর
চেনা মাটি আকড়ে ধরে! জীবনের শান্ত পদাবলী
শুনে শুনে পার হ'বো না হ'লে কী ক'রে মরণের
দরজার চারকাঠ! আমি যে এখনো সুনিবিড়
সেই স্বপ্নে বেঁচে আছি; পাড়ি দিয়ে স্মৃতিদহনের
যমুনা-মেঘনা-গঙ্গা খুঁজে পাই স্থির অন্তর্জলি।

দূরবীন

জৈমিনি
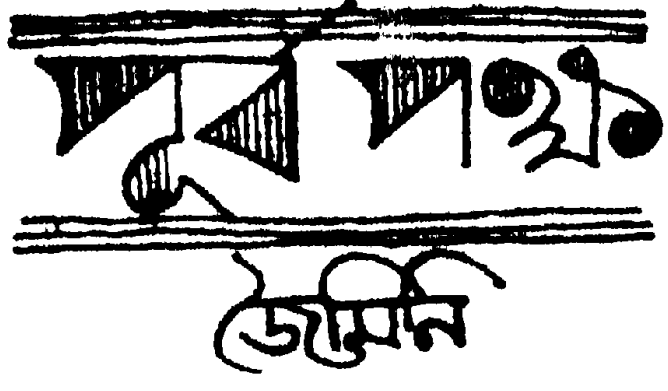
একখানি চিঠি পেয়েছি। নিচে হুবহু ছেপে দিলাম। এ চিঠির বক্তব্য বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই, শুধু এর লেখকের বিষয়ে এইটুকুই জানাতে পারি যে, ইনি আমার আশৈশব বন্ধু এবং ইদানীং একটি বড় সদাগরী অফিসের মেজো অফিসার। ছাত্রজীবন থেকেই এঁর কালচারের দিকে ঝোঁক ছিল এবং বন্ধুমহলে ইনি ইন্টেলেক্‌চুয়াল বলে খাতির পেতেন।

ভাই জৈমিনি, তুমি এখনো সাহিত্য নিয়ে আছ জেনে ভারি মজা লাগল। মনটা এখনো বিশের কোঠায় আটকে রেখেছ দেখছি। স্বর্গরাজ্যে উর্বশী ছিলেন অনন্তযৌবনা, আর এই মাটির পৃথিবীতে তুমি। কিছুতেই বয়স বাড়তে দিলে না। সন্দেহ হয়, তুমি বোধ করি সশরীরেই স্বর্গলাভ করেছ। না হলে তোমার বুকের মধ্যে চিৎকার শুনতে পাইনে কেন? জীবনটা যে হিড়্হিড় করে তোমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কি তুমি সচেতন নও! নাকি সবটাই তোমার সাজানো? বুঝতে পারিনে। কিন্তু তোমার এই সুবোধ বালকের মতো গোবেচারী ভাব যে আমার দুচোক্ষের বিষ তা আমি অকপটেই স্বীকার করছি। তোমাকে আমি আঘাত করতে চাই, জাগিয়ে তুলতে চাই। দোহাই তোমার, এবার একটু সাবালক হও।

সেদিন পিকনিকে যাবার কথা বললাম, তুমি রাজি হলে না। উল্টে আমাকেই তুমি বললে ছেলেমানুষ। কেন বল তো? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে মাঝে মাঝে আমাদের শহরের বাইরে যাওয়া দরকার, ওয়াইল্ড হওয়া দরকার? পোষমানা ভদ্রজীবনে তুমি এতোই অভ্যস্ত যে তার ব্যতিক্রম কল্পনা করলেই তোমার হোঁচোট ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যাওয়া, একটু প্রাকৃত-জনের সংস্পর্শে আসা, একে আমি কিছুতেই ছেলেমানুষি মনে করতে পারিনে।

আমি জানি, তুমি এক্ষুনি সোমেন-বিভূতিদের কথা বলবে, লিলি-নন্দা এদের কথা উল্লেখ করে বাঁকা হাসি

হাসবে। সোমেনরা যে কিছুটা ব্রুড্ তা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু গাদোর মধ্যে ঝাল-নুনের মতো আউটিঙের দলেও দু-একটি মশলাদার লোক না হলে চলবে কী করে? আর ঐ মেয়েরা! দেখ, তোমাদের ঘোমটা-টানা লক্ষ্মীঠাকুরুণদের আমি বাড়িতে বসে সাতবার নমস্কার জানাব, কিন্তু বাইরে? নৈব নৈব চ। আমরা যে বেঁচে আছি এটা বোঝবার জন্যেই লিলি-নন্দা ধরনের মেয়েদের দরকার। কী ব্রিলিয়ান্ট, কম্প্যানী! ওরা সামনে থাকলে খঞ্জ লঙ্ঘয়েৎ গিরি। ওরা দলে না থাকা আর গুড়ে দিয়ে চা তৈরি করে খাওয়া একই জাতের জিনিস। অ্যাব্-সোলিউট্লি বোদা, টেস্ট্লেস্!

বিশেষ করে লিলি। একটু বেশী হাসে, বেশী কথা বলে, কিন্তু জমাতে পারে দারুণ। আর এমন বেপরোয়া! জানো, সেদিন পিকনিকে গিয়ে ও পেয়ারা গাছে উঠে এমন করে দোল খাচ্ছিল যে সকলেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলুম। ওর যে বয়স হয়েছে, শরীর ভারী হয়ে গেছে, সে যেন ওর খেয়ালই নেই। গাছের ডালে দুলতে দুলতে ও গান ধরল, কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু কী বলব, মনে হচ্ছিল যেন আস্ত একখানা হিন্দী ছবি দেখছি।

তারপর সন্ধ্যে হয়ে আসতে, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। লোকে ওকে শ্যালো বলুক, বেহায়া বলুক, কিন্তু ও যে কত বড় একজন রোমান্টিক মেয়ে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেলুম সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতেই। বাগানবাড়িটার চারদিকে অজস্র ঝোপ-ঝাড় ছিল সে তো বুঝতেই পারছ। সন্ধ্যের সময়ে দলে দলে শেয়াল ডেকে উঠল সেখান থেকে। আর লিলি, বললে বিশ্বাস করবে না, পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে অবিকল প্রতি-ধ্বনি তুলল শেয়ালের ডাকের। ওর ঐ ঊর্ধ্বমুখী ডাকে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠেছিল সেদিন। পারলে আমরা সকলেই শেয়াল হয়ে ওর ডাকের সাড়া দিতুম। সামান্য একটা শেয়ালের ডাকে যে এমন একটা আবহ রচনা করা যায়, কোনোদিন ভেবে দেখেছ তুমি? যাই বল তোমরা, লিলিকে আমি একজন বড় আর্টিস্ট বলে স্বীকার করবই। সে শিল্পী, মানব-হৃদয়ের শিল্পী। আর এ কথা আমি তাকে জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো, পিংকু মিত্তিরটাও রাতারাতি ইনটেলেকচুয়াল হয়ে উঠেছে। শুনলাম নাকি সেও খুব সমজদার হয়ে উঠেছে লিলির ট্যালেন্টের। এ সব ভড়ং আমার দুচোক্ষের বিষ। দেব একদিন এমন এক্সপোজ করে ওর বউয়ের সামনে, বুঝবে তখন ঠেলা।

বুঝতে পারছি, তুমি এতে বাধা দিতে চাইছ। তোমার ভয়, পাছে পিংকুও আমার বউয়ের কাছে লাগিয়ে দেয়। না, সে আশংকা নেই। ওদিকে আমি আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছি।

বুলা জানে আমি কী প্রকৃতির মানুষ। স্বামী হিসেবে আমি কিছুই লুকোইনি তার কাছ থেকে। তুমি তো জানো আমি মাঝে মাঝে 'বার'-এ যাই। বুলাকে আমি গোপন করে যাইনে। কারণ সে জানে, কিছুতেই আমার এসে যায় না। কিছুই আমার অন্তর স্পর্শ করে না। আমি বার-এ যাই, ড্রিংক করি, রেস খেলি, হারি—কিন্তু ভিতরটা আমার শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। কিছুই আমাকে বাঁধতে পারে না, তৃপ্তি দেয় না। কোনো মেয়ে যদি আমাকে তৃপ্তি দিত, বুলা বোধহয় বেঁচে যেত। আমাকে নিয়ে তার কীষে ভয়, সে যদি তুমি জানতে! বলতে কি, আমার সম্বন্ধে বুলার এই ভয়টুকুই যা আমার সঞ্চয়। আর কোথাও কিছু অবলম্বন পাইনে।

কিন্তু তাই বলে যদি তুমি মনে কর আমি হেরে গেছি তাহলে ভুল করবে। আমি হারিনি, লড়াই করে যাচ্ছি। আমি শেষ না দেখে ছাড়ব না।

ভাই জৈমিনি, কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি মদ খাওয়ার বিষয়ে দিব্যি একটা রম্য-রচনা ফেঁদেছিলে। তাতে ইনিয়ে-বিনিয়ে বাঙালী যুবকদের মদ্যাসক্তির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে। তোমার ঐ শৈশব-সারল্যে আমি হেসেছিলুম। তোমার মতো ওয়ান্ডারফুল ফুল আমি জীবনে দেখিনি!

মদ খাওয়াটা অন্যায় কীসে? অন্যায় বলে তারা, যারা পায় না। আর এক-দল আছেন, যাঁরা জন্ম-জ্যাঠামশাই। উপদেশ দেওয়াই তাঁদের পেশা। এঁদের মতে চললে সংসারটা ঋষির আশ্রম হয়ে যেত। কিন্তু গত চার হাজার বছরেও যখন তা হয়নি, তখন ও-নিয়ে ভাবনা করাটাকে নিছক পণ্ডশ্রমই মনে করি আমি। যার খুশি খাবে। পেলেও খাবে, না-পেলেও খাবে। একবার বোম্বাই শহরে ঘুরে এলেই বুঝতে পারবে 'না-পেলে' কেমন করে খায় খানেওয়ালারা।

যাক এসব কথা। আমি নিজের হয়ে কিছু সাফাই গাইছি নে। সে দর-কার আমার নেই। কারণ আমার বিবেক অত্যন্ত পরিষ্কার। শুধু দুঃখ হয় তোমার এবং তোমাদের জন্যে। উপকথা-বর্ণিত সেই বিশেষ জীবটির মতো নাগালের বাইরে সমস্ত আঙুরই তোমাদের কাছে টক হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক তুমি কী হারাইতেছ তা তুমি জানো না।

একটা কক্টেল পার্টি আছে পরশু। আসবে? লিলিও আসবে, আলাপ করিয়ে দেব। আর আসবে লিজা, আমার 'নিউ ফাইণ্ড'। বিলিতি সুরে বাংলা গান গাইবে সে, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তুমি হাসছ, না? ওহে বোকারাম, জীবনটা যে পার হয়ে যাচ্ছে সেটা খেয়াল আছে? এন্জয় কর, ধরো জীবনটাকে, তার শাঁস শুষে নাও। কুইক্, কুইক্, কুইক্.........!

ভালোবাসা জানাই। ইতি তোমাদের রাহুল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

অনেকের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সমসাময়িক দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হয়েও কেউ কারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেননি কেন?

স্বামীজী কবিগুরুর চেয়ে বয়সে প্রায় এক বছর নয় মাসের ছোট। রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। আর স্বামীজী জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬৯ সালের ২১শে পৌষ সিমুলিয়ার দত্তবাড়ীতে। সিমুলিয়া ও জোড়াসাঁকো দুটি পাড়া কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের মহান পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। জোড়াসাঁকোয় আদি ব্রাহ্মসমাজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যও হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ ছাত্র-জীবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রায়ই আসতেন। উপাসনাতে যোগ দিতেন। ধর্মোপদেশ ও প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনতেন। নিজেও তিনি একজন সঙ্গীতানুরাগী সুগায়ক ছিলেন। প্রেম-ভক্তিমূলক ব্রাহ্ম-সঙ্গীতগুলি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করতো। হিন্দুধর্মের গতানুগতিকতাকে তিনি সত্যপথ বলে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করছিলেন। সত্য-সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। প্রতিমাপূজার সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ একটু সংশয় দেখা দিয়েছিল এই সময়।

এটা কিছু আশ্চর্য নয়। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথম ইংরিজী-শিক্ষিত তরুণ বাঙালীদের মধ্যে ডিরোজিয়োর প্রভাব তখন পূর্ণমাত্রায় কাজ করছিল। আচার-আচরণের গোঁড়ামিতে ভরা হিঁদুয়ানির প্রতি তাঁদের একটা অশ্রদ্ধা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি একটা বিমুখতাও দেখা দিয়েছিল। অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু-সমাজের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম সেই সময় দেশবাসীদের বিধর্মী হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছিল।
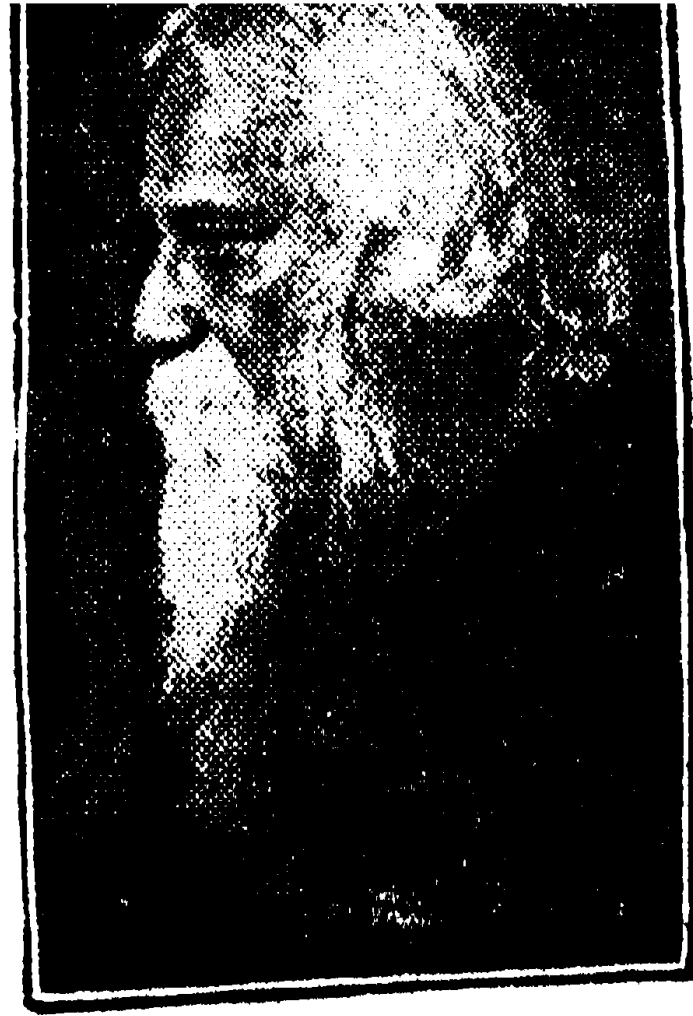
ওদিকে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভবতারিণী দেবীর পূজারী সিদ্ধ-সাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম-প্রভাব সেই সময় বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের হিন্দুধর্মের প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট করছিল। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ যদি দৈবক্রমে এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা না পেতেন, তাহলে হয়ত তাঁকে আমরা একজন ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক আচার্যরূপেই দেখতে পেতুম। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ রূপে নয়।

স্বামীজী যখন দেহরক্ষা করেন তাঁর বয়স তখনও চল্লিশ পূর্ণ হয়নি, আর
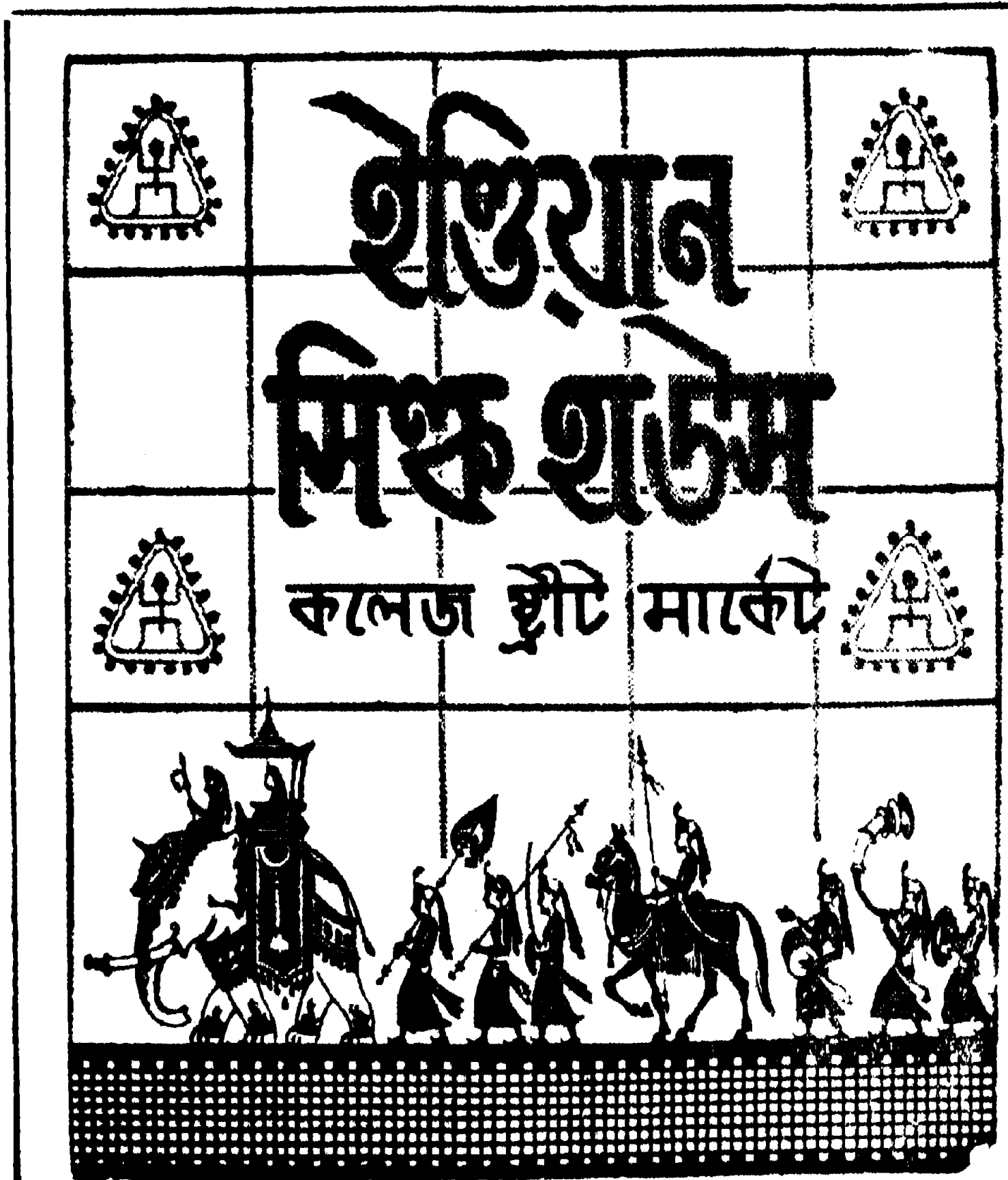
কবিগুরু তখন বিয়াল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি তখন সারা বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর স্বামীজীর যশোভাতি তখন আসমুদ্রহিমাচল উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের বাইরেও নানা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। অথচ, আশ্চর্য হ'তে হয় এই কথা ভেবে যে, ভারত-আকাশের এই দুই প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক ছিলেন যেন পরস্পরের অপরিচিত। অথচ এ'দের চিন্তা ও কর্ম প্রায় একই পথ ধরে চলেছিল বরাবর।

এই দুই সমসাময়িক মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও মনের গতি অনুসরণ করলে দেখা যায়, এ'রা উভয়েই একই লক্ষ্যের অভিমুখী। এই দুটি মহাজীবন যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই, দুটি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর মতো একই সময়ে পাশাপাশি প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল একই অখণ্ড সঙ্গীতের কলধ্বনি তুলে। এ'দের পবিত্র প্রাণ-তরঙ্গের উজ্জীবন-শক্তির স্পর্শ পেয়ে ভারতভূমির শুষ্ক মৃত্তিকা সরস হয়ে উঠেছিল। নীরস তরুলতা হয়ে উঠেছিল মুকুলিত ও মঞ্জরিত। বালুকাস্তূপ এই প্রান্তরে সবুজ তৃণ উদ্গত হয়েছিল।

শতবর্ষ আগে ভারতবর্ষ ছিল বিদেশীদের পদানত। তার এই পরাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। বারে বারে সে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং নিজেদের একতার অভাবে, দেশপ্রেমের অবর্তমানে, গৃহবিবাদ, জ্ঞাতি-শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আক্রমণকারীদের কাছে শুধু বার বার পরাজয় মেনে নিয়েই নিষ্কৃতি পায়নি, দীর্ঘকাল দাসত্বস্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছিল। শক, হুন, তাতার, পাঠান, মোগল ছাড়াও চীন ও ব্রহ্মের সীমান্তবর্তী পার্বত্য দস্যুদের অত্যাচার এবং পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও সর্বশেষ ইংরেজের ভারতবর্ষে অবাধে প্রবেশ ও নানা প্রদেশ অধিকার আমাদের দেশের অতি কলংকময় ইতিহাস।

অমিততেজা স্বামী বিবেকানন্দ ও বহুমুখী প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য আবির্ভাব যদিও এই পরপদানত অধঃপতিত ভারতবর্ষেই সম্ভব হয়েছিল, তবু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এর পশ্চাতে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি [illegible] বাংলার [illegible] কঠোর সাধনা ছিল। ইংরেজের দোর্দণ্ড-প্রতাপে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ভারতবাসীরা তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের লৌহ-শৃংখলে বাঁধা পড়ে তাদের ভাষা শিখে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সৌকর্য সাধনেই নিযুক্ত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের এই পরাধীন অবস্থা বোধকরি বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। দীর্ঘকালের অনুষ্ঠিত বিবিধ অন্যায়, অনাচার ও মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য এ শাস্তির আমাদের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত যত না হয়েছি, উপকৃত হয়েছি তারচেয়ে বেশি। বহুজাতি, বহুধর্ম, বহুপ্রদেশ ও বহুভাষায় বিভক্ত এদেশ ইংরেজের দোর্দণ্ড-প্রতাপে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত এক হয়ে গিয়েছিল, ইংরেজ কিন্তু এটা চায়নি। তার রাজনীতি ছিল বিভেদমূলক। কিন্তু শাসনের সুবিধার জন্য সে ইংরাজী ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলবার অভিপ্রায়ে সর্বভারতে ইংরিজী শিক্ষার প্রবর্তন করায় আমরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাই। এর ফলে আমাদের বুদ্ধি, দৃষ্টি ও চিন্তার সম্যক উৎকর্ষলাভ ঘটেছিল। আমাদের দেশের শোচনীয় অবস্থা সম্যক অনুধাবন করতে পেরে আমরা সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতপথিক মনীষীদের কৃপায় স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেছিলেম। মানুষ সচেতন না হলে তো আপন অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। সে চৈতন্য এনে দেয় শিক্ষা!

'সিপাহী-বিদ্রোহ' নামে অখ্যাত— ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ আমাদের যে মুক্তি এনে দিতে পারেনি, বরং সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করে নির্বীর্যের পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্ব-পরিচয় ঘটার ফলে অন্তরের মধ্যে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি কামনার আলোড়ন ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমাদের চিন্তায় ভাবনায় এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল সেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকেই। বাংলা দেশের শিক্ষিত মনীষী, কবি, চিন্তাশীল সাহিত্যসাধকেরা গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনের চেষ্টা শুরু করেন। এই সময় নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় প্রবর্তিত 'হিন্দুমেলা' শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনে দেশপ্রেমের যে বীজ সেদিন পারিবারিক আবহাওয়ায় উপ্ত হয়েছিল এই মেলার ক্ষেত্রেই তার প্রথম অংকুরের পরিচয় পাই আমরা। দেশের এই নবজাগরণের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেদিন কিশোর নরেন্দ্রনাথ। উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনিও এই দেশাত্মবোধে কিশোর বয়স থেকেই। এই দুই মহাপুরুষের বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় দুজনেই অনেকটা প্রায় একই ধাতু দিয়ে গড়া। উভয়েই একই আদর্শের অভিমুখী। অথচ এ'রা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে একত্রে চলেননি কোনোদিন। চিন্তায় ও ভাবনায়, আদর্শে ও কর্মে ঐক্য থাকলেও এ'দের উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীকে মনে হয় যেন পিনাকপাণি রুদ্রভৈরব আপন প্রচণ্ড বীর্যের দ্বারা এদেশের নির্বীর্যদের জাগ্রত করে তোলবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন; আর কবিগুরু যেন শান্তম, সুন্দরম, অনন্তমের মন্ত্রে দীক্ষিত এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানব-প্রেমের ব্রতচারী পথিক, দেখা দিয়েছিলেন ভারতাত্মা ও ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্তধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলবার জন্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতই মন্ত্রগুরু স্বামীজীরও ধ্যানের বস্তু ছিল, নিজের অক্ষয় স্বর্গকামনা নয়, মানব জন্ম থেকে নিজের মুক্তি নয়, স্বদেশের মুক্তি—জননী জন্মভূমির দাসত্বের বন্ধন মোচন। এই অধঃপতিত জাতকে আবার মানুষ করে গড়ে তুলে তার পূর্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। শুধু ধর্মে নয়,—কর্মে, জ্ঞানে, ভক্তি ও প্রেমে। কালের প্রভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে দেখে বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ সেদিন গর্জন করে ডাক দিয়েছিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত" —ওঠো, জাগো, যা শ্রেষ্ঠ তাই পাবার চেষ্টা করো। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, যারা দুর্বল তারা আত্মচেতনা লাভ করতে পারেনা।" সমস্ত জাতটাকে জেগে উঠতে হবে, বজ্রকঠ হতে হবে। তাই ভারতবাসীর

মনুষ্যত্ববোধকে নানাভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মুক্তি-কামনাই ছিল তাঁর ধ্যানের বস্তু ও সাধনার অবলম্বন। অধঃপতিত এই জাতিকে আবার মানুষ করে তুলে তার পূর্ব-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ক্ষীণ ধর্মবিশ্বাসকে তার সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। স্বামীজী চেয়েছিলেন আমাদের ভুলে যাওয়া সেই বৈদিক আর্য ধর্ম ও সভ্যতাকে ভারতে আবার ফিরিয়ে আনতে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন উচ্চস্তরের বৈদান্তিক। বৈরাগ্যকে মুক্তি-সাধনার উপায় বলে বিশ্বাস করতেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু অন্তর তাঁর সর্বদাই ছিল ইষ্ট-দর্শনাভিলাষী। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' তাঁর সাধনার মন্ত্র। আচার্য শংকরের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বলেছেন—এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি মহা-মায়ার মায়া। রিপু জয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জপ তপ ধ্যান যোগ ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই তাঁর ধর্মসাধনা ও তপশ্চর্যার লক্ষ্য।

স্বামীজী বেশ জোরের সংগেই বলে-গেছেন, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। বলে গেছেন, আমাদের প্রধান প্রাণশক্তিই হল আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি প্রধান শক্তিপ্রবাহ আছে। ভারতের সেই শক্তিপ্রবাহ হল তার ধর্ম। এই ধর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী বলতেন, "একে তোমরা বলিষ্ঠ করে তোলো। তাহলেই দেখবে দুধারের জলস্রোত তার সংগে সংগে ঠিক এগিয়ে চলবে।......ত্যাগই সেই নিশান, ভারতের জয়পতাকা।......এই পতাকাদণ্ড যেন হস্তচ্যুত হয় না কখনো। উঁচু করে তুলে ধরে থাকো ... এই ত্যাগই ভারতবর্ষকে অতীত যুগে জয় করেছিল। একে আবার ভারতবর্ষকে জয় করতে হবে। আজও এই ত্যাগ এই বৈরাগ্যই ভারতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়ে আছে।"

ভারতের এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বিবেকবাণীকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন খুবই। বলেছেন, "শুনিয়াছি তারই লাগি, রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়-বিরাগি পথের ভিক্ষুক।" কিন্তু জাতীয় উন্নতি তথা আধ্যাত্মিক প্রগতিলাভের পক্ষে এইটিকেই একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে পারেননি। এইখানেই এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারা ও আদর্শের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। কবি বলতেন, "জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে ভগবানই আমাদের সকলকে নিকটে টানিতেছেন। আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা—ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে আমি মুগ্ধ। সেই মোহই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" তাই উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।..............."

কবি জগতকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চাননি। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দকে তিনি মিথ্যা মোহ বলে স্বীকার করেননি। সমগ্র সৃষ্টিকেই তিনি বিশ্ব-রূপের প্রকাশ বলে মেনেছিলেন—

"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তারই মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

কবি তাঁর আত্মপরিচয়ের মধ্যে বলেছেন, "তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনও অধিকার নেই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ নিয়ে কোনো তর্ক উঠলে আমি নিরুত্তর হয়ে থাকবো।" আর এক জায়গায় বলেছেন, "ঠিক যাকে সাধারণে 'ধর্ম' বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়-রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারিনে।" বলেছেন তিনি, "নিজের সংগে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্ত-ভাবে আকর্ষণ করেছে।" বিশ্বনাথের বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের কোনও পৃথক অস্তিত্ব আছে এ তিনি অনুভব করেননি। মানুষকে তিনি কোনোকালেই সৃষ্টিছাড়া কোনও জীব বলে মনে করতে পারেননি। তাইতো প্রসন্নচিত্তে বলেছেন—

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল,
কিছুতেই নাই ভাবনা।"

মানুষের স্বাতন্ত্র্যগর্ব তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করে সারা সৃষ্টির সংগে নিজের একাত্মতাই অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের সংগে নিজের কোনো বিচ্ছেদ তিনি স্বীকার করেননি। বরং স্বর্গ, মর্ত্য, পৃথিবীর মধ্যে এক অখণ্ড, অনন্ত প্রাণ-সত্তাকে তিনি শুধু অনুভবই করেননি, তার সংগে নিজের একাত্মতাও নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলেন। তাইতো এমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো—
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

কবির এই বিশ্বাশ্লিষ্ট আত্মদর্শনে স্বামীজী কিন্তু সায় দিতে পারেননি। তিনি একজায়গায় সুস্পষ্টই বলেছেন, "যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরন্তন কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতা-তন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন। একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন।" স্বামীজীর এ অভিযোগ তদানিন্তন অনেক উচ্চ-শিক্ষিতের বিরুদ্ধেই আনা চলে।

গুরুদেবের বিরুদ্ধেও স্বামীজীর আক্ষেপ ছিল এইখানে। তিনি তাই উচ্চ-কণ্ঠে বলে গেছেন—"ভারতের কর্তব্য হল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখে চলা। তার বিশেষ নীতি ও আদর্শ হল—'ধর্ম'। সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি হল তার অপ্রধান কর্তব্য। রাজনৈতিক প্রাধান্য বা সাময়িক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কোনওদিনই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিলনা।"

স্বামীজী বলতেন, "কোনও মানুষ বা কোনো জাতিই অপরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারেনা। ভারতের দুর্ভাগ্য সেই-দিনই নির্ণয় হয়ে গিয়েছিল যেদিন সে তার মাতৃভাষায় "ম্লেচ্ছ" শব্দটি উদ্ভাবন করে এবং অপরাপর জাতির সংগে আপন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে।"

একথা আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনেছি।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে
তাহাদের সবার সমান
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছো যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে
তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে
তাহাদের সবার সমান।"

স্বামীজী বলে গেছেন, ভারতবর্ষের মুক্তি নির্ভর করে ব্যক্তির শক্তির উপর

এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মধ্যে ভাগবত শক্তির উপলব্ধির উপর। 'তোমরা এই মর্মবাণীটি সর্বদা স্মরণ রেখো যে, জনসাধারণের উন্নতিবিধান করতে হবে তার ধর্মবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ভুল না যে তোমার জাতি বাস করছে পর্ণকুটীরে। কেউই তাদের জন্য কখনো কিছু করেনি।"

তবে তাদের আপন করলে কেমন করে? কী দিয়ে জয় করবে তাদের মন। স্বামীজী বলেছেন, "প্রেমই অর্জন করবে সেই জয়।"

কবিগুরুও এই মানবপ্রেমের উদ্গাতা। মানুষের উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে ছিল তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয়। তিনিও ওই একই পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন বারংবার। মানবধর্মই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি বলতেন, "এই মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন। আমাদের অন্তরস্থ সেই সুপ্ত মানবাত্মাকে জাগ্রত করতে পারলেই আমরা দিব্যজীবন লাভ করতে পারবো। স্রষ্টার সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে পারবো।" স্বামীজীও এই একই কথা বলে গেছেন বার বার—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

ভগবানকে ডেকে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন—"প্রভু! তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম বন্ধু, তুমিই সমস্ত শক্তির মূল। তুমি অগণন ভুবনের ভার বহন করছো, হে প্রভু! আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করবার শক্তি আমাকে দাও।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। শক্তির প্রার্থনা এভাবে করেননি। কারণ, তাঁকে আমরা বলতে শুনেছি, "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" কবিগুরু স্বীকার করে গেছেন,

"স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অখণ্ড মঙ্গল
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে—"

সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আস্তিক্যবোধ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতই স্বামীজী একান্ত সচেতন হলেও তাঁর মনে ধর্ম সম্পর্কে কোনও অন্ধ গোঁড়ামি স্থান পায়নি। দীন, দরিদ্র, দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীদের পক্ষ নিয়ে তিনি তিরস্কারের সুরে বলেছেন—"ক্ষুধার্ত মানুষদের ধর্মকথা বলা বা তাদের দর্শন শাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র......যারা অন্নের জন্য লালায়িত, অনাহারের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা না করে যদি ধর্ম শিক্ষা দিতে যাওয়া হয়, তবে খাদ্যের বদলে তাদের প্রস্তর খণ্ড মাত্র দেওয়া হবে। তাতে কোনও ফল হবে না।"

স্বামীজী তাই সবাইকে ডাক দিয়ে কাজে নামতে বলে গেছেন। বলেছেন, "বড়লোক, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে তাতে কিছুই যায় আসে না। এঁরা হচ্ছেন শুধু শোভামাত্র। দেশের বাহার বলতে পারো। কোটী কোটী গরীব নীচ যারা গতর খাটিয়ে খায়, তারাই হল দেশের প্রাণ। সংখ্যায় কিছুই যায় আসেনা। ধনে বা দারিদ্র্যেও যায় আসে না, কায়মনোবাক্যে যদি জাতটা এক হয়, একমুঠো লোকই পৃথিবী উলটে দিতে পারে এ বিশ্বাস তোমরা ভুলো না। বাধা যতই আসবে ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? বাধাই তো সিদ্ধির পূর্বলক্ষণ। বাধা যেখানে নেই সেখানে সিদ্ধি দুর্লভ!" সাধারণ মানুষের উপর স্বামীজীর এই প্রচণ্ড আশা ও বিশ্বাস থেকে বোঝা যায় তিনি কতবড় গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজসেবী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই একই চিন্তাধারার সন্ধান পাই। তিনিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন অবহেলিত জনসাধারণই দেশের ভিত্তি ও জাতির মেরুদণ্ড। এরা না-জাগলে দেশ অগ্রসর হতে পারে না।

........ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে
লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী,
স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি,
যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—"
...এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।
ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র
দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত
সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি
তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

তিনি বলেছেন, "দেশের দুর্গতির প্রধান কারণ—গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে। শিক্ষিত লোকেরা পল্লীবিমুখ।" তিনি মনে করতেন "সরকার পরিচালিত কোনও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা তাদের সাহায্যপুষ্ট কোনও সংঘ বা সমিতির দ্বারা একাজ সফল হওয়া সম্ভব নয়।" কবির ধারণা ছিল "বাইরে থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা হল সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা। যে মূল থেকে তার সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে সে হচ্ছে—প্রতিহত চিন্তাধারার পঙ্গুতা। মানুষের চিত্ত যেখানেই সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থ আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে। ... মানুষের মনের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি না জ্বালাইতে পারিলে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া টানাটানি করিলে সে নড়িবে না। আবার সেই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহারিক জগতের বিজ্ঞানকে তাহার সহায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দুইটি যুগপৎ চলিলেই মানুষের মন মুক্ত ও দেহ সবল হইবে।" কবি বিশ্বাস করতেন, "মানুষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়।"

আমরা স্বামীজীর মুখেও এই কথাই শুনেছি। তিনিও বলেছেন, "তোমরা বীর হও। দুর্বলতা দূর করো। নিজের ওপর বিশ্বাস আনো। নিজের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। মানুষ হও। দেশের মধ্যে দেশবাসীর মধ্যেই তোমার ভগবান আছেন। দেশকে ভালবাসো। দেশের সেবা করো।" তিনি বিশ্বাস করতেন "বাংলার যুবকদের অস্থি দিয়ে যে বজ্র নির্মাণ হবে তাই থেকেই ভারতের অধীনতা ঘুচে যাবে।" তিনি বলতেন "শক্তি ফক্তি কি কেউ দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে। সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই লেগে যা না। দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য একটুকু ভাবলে

হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা। ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগই সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় সে নিযুক্ত হয়।"

জাতিভেদ, ধর্মভেদ, ভিন্ন আচার-আচরণ জনিত কর্মভেদ, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে যতটা পর করে ও তফাৎ করে রেখেছিল, ভাষাভেদ, আহার্যভেদ, পরিচ্ছদভেদ ও বর্ণভেদ তাদের মধ্যে ততটা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুই যুগন্ধর মহাপুরুষই বলেছেন 'এহ বাহ্য'। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের ভাবগত, আর উচ্চ আদর্শগত এবং হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগত যে বিপুল ঐক্য রয়েছে সেখানে সব মানুষই এক বা অদ্বৈত। এইখানে মনুষ্যত্বের এই মহান অধিকারে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই উচ্চ আসনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, তথাপি এঁরা যে কেন পরস্পরের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ছিলেন এটা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ও বিস্ময়কর মনে হয়।

তবে, আমরা যদি কেউ এই দুই কালজয়ী মহাপুরুষের আদর্শ ও চরিত্র নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা ও চিন্তা করে দেখি তবে, কোনও গভীর গবেষণা ও একাগ্র অনুশীলন না করেও আমরা অনায়াসে বুঝতে পারবো যে বহুবিষয়ে এঁদের উভয়ের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও এক বিষয়ে এঁদের দুজনের মধ্যে বিপুল প্রভেদ রয়ে গেছে। সেটা দেশাত্মবোধ নিয়ে নয়, জাতিভেদ নিয়ে নয়, বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে নয়, ধর্মবিশ্বাস ও কর্মের অনৈক্য নিয়ে নয়। সে প্রভেদ হল, আগে যা বলেছি সেই উভয়ের অনুসৃত সাধন পথের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-দেবতার আরাধনার স্বারা যে চিন্ময় ভাবগত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন স্বামীজীর পথ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাবের ঐক্য থাকলেও এঁরা পাশাপাশি অগ্রসর হননি। শ্রীগুরুর কৃপায় স্বামীজী ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে কৃচ্ছ্র সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এইখানেই প্রধানতঃ দেখি উভয়ের মধ্যে একটা তত্ত্বগত না হলেও পদ্ধতিগত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও কুণ্ঠা ছিল যা এঁদের উভয়কে পরস্পরের অন্ত-রঙ্গ করে তুলতে পারেনি।

যাই হোক, স্বামীজী কখনও রবীন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলেছিলেন কিনা তা জানতে পারিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজীর সম্বন্ধে একাধিকবার কিছু কিছু বলেছিলেন সে পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর দেহ-রক্ষার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন—"অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকা-নন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারত-বর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চির-কালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর একান্ত কামনা ও প্রার্থনা ছিল—"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, জোলা, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে; বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানার কামারশালা থেকে, কুমোরের ঘর থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছে। নীরবে সয়েছে। তার ফলে ওদের মধ্যে জন্মেছে সহিষ্ণুতা। নিয়ত দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধ-খানা রুটি পেলে ত্রিভুবনে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। এদের আছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা পৃথিবীর কোথাও নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এমন মুখটি চুপ করে দিনে রাতে খাটা, কার্যকালে এরা সিংহবিক্রম। এদেরই মধ্যে তোমার আমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত জেগে উঠবে।"

আজ ভারতবর্ষের চারিদিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি—সেই গণজাগরণ শুরু হয়ে গেছে। দীন দুঃখী দরিদ্র অব-হেলিত ছিল যারা তাদের জন্য গান্ধীবাদী গ্রামোদ্যোগ আর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা এই দুই আন্দোলন যে চলেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "একথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, যে এককালে আমাদের জীবনযাত্রার যে রকম স্বল্পোপ-করণ ছিল তেমনি যদি আবার হ'তে পারি, তাহলে নাকি দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। অর্থাৎ, তার মানে দাঁড়ায় —সম্পূর্ণ অধঃপতন হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু, তাকে তো পরিত্রাণ বলে না।"

সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, "ধনকে খর্ব করলেও যেমন অর্থসমস্যার সমাধান হবে না, তেমনি ধনকে বলপূর্বক হরণ করলেও নয়। এমন কি ধনকে বদান্যতা যোগে দান করলেও নয়। এর উপায়—ধনকে উৎপন্ন করবার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মনের মধ্যে জাগরুক করা। অর্থাৎ ধন-সাম্যের জন্য সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।" তিনি বলেছেন, "একথা আমি বিশ্বাস করিনি, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হ'তে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্যের প্রকাশ নানা আকারের হতেই হবে।"

স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শেষ-জীবনে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন "আধুনিককালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎবাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের লোককে ডেকে, বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তি, দরিদ্রের মধ্যেই দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা সেদিন যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনও দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়। ভয় হয়, পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসনে সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়। কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।"

দেশের জনসাধারণের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজী উভয়েই একই পথের পথিক ছিলেন। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আশ্রমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য ও চিন্তার সামঞ্জস্য ছিল। রবীন্দ্র-নাথ চেয়েছিলেন "ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র যোগ করিয়া দাও।" স্বামীজীরও উপদেশ "ওঠো, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, মানুষ হও। যে ধর্ম মানুষ করে সেই ধর্ম আমাদের চাই। যে শিক্ষা সর্ব-প্রকারে মানুষ তৈরি করে সেই শিক্ষাই আমাদের চাই।"

মতামত
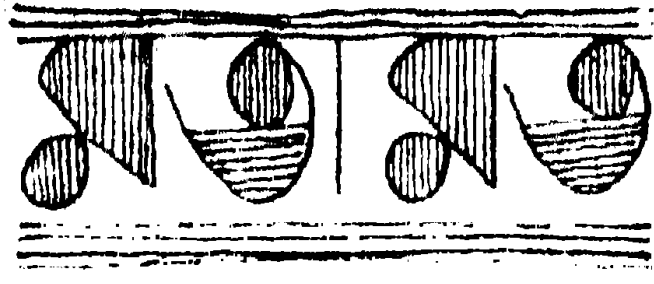
॥ আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যা অমৃতে শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে জৈমিনির মত সমর্থন করে যে পত্র দিয়েছেন আমি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আমি চিত্রসমালোচক নই। আমি ছবি দেখি, দেখতে ভালবাসি। আমার চোখ শিক্ষিত নয়। তাই সমালোচকের দৃষ্টিতে এবং টেকনিক্যাল শব্দপ্রয়োগে আমার বক্তব্য ভারাক্রান্ত হবে না। নিতান্ত সাধারণ মানুষের খোলা চোখ ও মন দিয়ে আমিও কয়েকটি প্রদর্শনী দেখেছি। এবং বলতে লজ্জা নেই ছবি দেখে বিরক্ত ত হই-ই নি, বরং মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি যে যখন শিল্প ও শিল্পীরা দেশে অবহেলিত, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের সামাজিক মূল্য অস্বীকৃত, বঞ্চনা যখন তাদের বিধিলিপি, ঠিক তখনও প্রাণের অমোঘ তাগিদে তাঁরা রঙ ও তুলি নিয়ে মগ্ন। বৈশ্য সভ্যতার প্রতি দারুণ অবজ্ঞা পোষণ করে তাঁদের নিঃশব্দ বিদ্রোহ মানবতার জয় ঘোষণা। শ্রীযুক্ত ঘোষ যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সমস্যাটা বিচার করতেন তবে ক্যাটালগে লিখিত ছবির দাম হাস্যকর বলে মনে হত না। কারণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চিত্র-রসিকেরা যদি সত্যিই ছবি কিনতে চাইতেন তবে অন্য খরচা একটু কমিয়ে ছবি সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে একেবারে অসাধ্য হত না। তা তাঁরা করেন না। অবশ্য না কেনার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য যুক্তি আছে। কিন্তু শিল্পীরা ত বছরে একবার মাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন ক্রেতার দর্শন পান। তাই উচ্চমূল্যে ছবি বিক্রি করার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য। কম দামে বেশি জিনিস বিক্রি করা যায়। ব্যবসায় রীতিতে তাকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু জিনিস যখন কম বিক্রি হবে তখন বেশি দাম না করে উপায় কি! তাই ক্যাটালগে উল্লিখিত দাম দেখে আমার হাসি আসে নি একবারও। বরং দুঃখ পেয়েছি। দুঃখ পেয়েছি এই ভেবে যে জীবনের ওপর অর্থনীতির কি মারাত্মক কর্তৃত্ব! শিল্পীরা, বিদ্রোহীরা, আস্তে আস্তে কি করে শিল্পে অনভিজ্ঞ বিত্তবানদের দানের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছেন। বোধহয় এইভাবে প্রশ্নটিকে বিচার করলে শিল্পী এবং রসিক-সমাজ উভয়েই উপকৃত হবেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ যেন এই ধারণা পোষণ করেন যে যেহেতু আধুনিক চিত্র-শিল্পীরা ড্রয়িং বর্জন করেছেন তাই তাদের ছবি আদৌ শিল্পের পর্যায়ে যায় না। এখানে অবশ্য তিনি কোন শিল্পীর নাম করেন নি। তাই মনে হয় তাঁর এই মন্তব্য সমগ্র আধুনিক চিত্রশিল্পীর প্রতি। আমিও কোন শিল্পীর নাম করতে চাই না। কারণ তাতে তর্ক বিস্তৃত হতে পারে, যদিও সৎ আলোচনার জন্য তা অপরিহার্য বলে বোধ করি। কিন্তু আমি প্রশ্ন করছি যে সমস্ত আধুনিক চিত্র-শিল্পীরাই কি ড্রইং বর্জন করেছেন? এই-ই কি আধুনিক চিত্রশিল্পের তর্কাতীত বৈশিষ্ট্য? আমি এখুনি বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর নাম করতে পারি যাঁরা পুরাতন প্রথায় ড্রইং চর্চা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তাঁরা ড্রইং আঁকছেন। কিন্তু ছবি আঁকছেন কি না সন্দেহ। অথচ এমন ছবিও আছে ব্যাকরণগত ভুল নিয়ে, ড্রইং-এর ত্রুটি নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের সম্মানে ভূষিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত ঘোষ ড্রইং-এর নোতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভাবের কথা বলেছেন। হয়ত বিশুদ্ধ ড্রইং-এর কথা বলছেন না। যদি তাই-ই হয়, তবু আমি এই অভিযোগ স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত। কারণ আমার মনে হয়েছে আধুনিক তরুণ চিত্রশিল্পীরা ছবির টোন-এর ওপর যত জোর দেন তত জোর আর কোথাও পড়ে না। শ্রীযুক্ত ঘোষ আরও অভিযোগ করেছেন যে আধুনিক শিল্পীরা দেশকে নির্বাসিত করেছেন। সমস্ত অভিযোগের মধ্যে এই অভিযোগটাই মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমার বিশ্বাস এবং আশা করি বহু পাঠকই একমত হবেন যে দেশের গভীরে শিকড় চালাতে না পারলে কোন শিল্পই শিল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই শিল্পকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হতেই হবে। কিন্তু প্রশ্নটি জটিল। কি আমার দেশ, কি-ই তার ঐতিহ্য? এই ঐতিহ্যের নাম করে পট-পটুয়াদের অনুকারক হব? তাতেই কি পাওয়া যাবে দেশের আত্মার সন্ধান? না আমার দেশ আছে ছবিতে আলোর ভূমিকা প্রকাশ করায়? কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশ্বাস করেন যে আমাদের আলো সূর্য ইত্যাদি থাকলে ইয়োরোপের মলিন অন্ধকার আকাশ থেকে মুক্তি পাব। আমি তা মনে করি না। প্রশ্নটি রঙ বা ভঙ্গির নয়। প্রশ্নটি অন্তরের। ভারতের শিল্পধারায় এক বিশেষ ধরণের ঈসথেটিকস গড়ে উঠেছে, জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করার এক বিশেষ ধরণের মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছে যা ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র। আর আমরা ইয়োরোপীয় ভাবনায় শিক্ষিত। এই দুই বৈপরীত্যে এক দারুণ সংকট এসেছে শিল্পীর মনে। কয়েকটি প্রদর্শনী থেকে আমার অন্তত এই ধারণা হয়েছে। আজকে শিল্পীরা পথ খুঁজছেন, দেশের আত্মার পথ, যা জীবন্ত, বিকাশমান, জটিল ও ক্রমবর্ধমান। তাই তাঁরা সহজেই পটের ঢঙে ফিরতে নারাজ; অতীতের ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম। আবার ঢালাও পশ্চিমী হতেও দ্বিধান্বিত। তাঁরা সন্ধানী। শ্রীযুক্ত ঘোষ আধুনিক শিল্পীদের সেই সন্ধানের সাধনাকে দেখতে পান নি। এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ঐতিহ্যের প্রশ্নটি বড়ই জটিল। তবে আমি শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আমাদের দেশে কি সাহিত্যে কি শিল্পে সৎ ও শিক্ষিত সমালোচনার বড় অভাব। সমালোচনার উদ্দেশ্য দলভারী করা কিম্বা কোন্দল করা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। এখনও পাঠক ও দর্শকেরা নিজেদের বিচারপদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছেন না বলেই অসাধু লোকেরা আজও কুলগুরু।

ইতি—
হরিদাস রায়, কলকাতা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নাচের পুতুল

'ঐ লোকটাকে চিনিস?'

'কোন লোকটা?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রামেন্দ্র।

'ঐ যে রে—' অমূল্য তর্জনী তুলল।

'যে লোকটা জ্যোতিষীকে হাত দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ—' নিজেই কেমন যেন ধারণা করতে পারছে না। অমূল্য আবার একটু দেখল খুঁটিয়ে : 'হ্যাঁ, ও-ই তো।'

হেঁজি-পেঁজির বেশি তো কিছু মনে হচ্ছে না। সাদামাঠা জামাজুতো, হয়তো বা একটু ছেঁড়া-খোঁড়ারই গা ঘেঁষে। চুল উসকো-খুসকো, দু একদিনের দাড়ি গোঁফও বুঝি জমে রয়েছে মুখে। তেমন কিছু সবিশেষ বলে তো ঠাহর হচ্ছে না একনজরে।

'কে?' অমূল্যর মুখের দিকে তাকাল রামেন্দ্র।

'না, তুই কী করে চিনবি?' এক পা এগিয়ে এল অমূল্য। 'তুই চলে যাবার পর ও এসেছিল। শালা, হারামজাদা—'

'সে কি রে! গালাগাল দিচ্ছিস কাকে?'

'ঐ গুখোরটাকে।' অমূল্য তড়পে উঠল : 'শালা আমাকে কম জ্বালিয়েছে? কত ক্ষতি করেছে?'

'কে ও?' কৌতূহলে তীক্ষ্ন হল রামেন্দ্র।

'মিস্টার ব্রজলাল সান্যাল।'

নামের কোন জায়গাটায় জোর চট করে বুঝে নিল রামেন্দ্র। 'মিস্টার—মিস্টার কেন?'

'ওরে বাবা, সাহেব যে। শ্রী কিম্বা বাবু বলো না, খেপে যাবে।'

'বলিস কী!' রামেন্দ্র হেসে উঠল : 'সাহেবের সা-ও তো নেই কোথাও।'

'কিন্তু শালার শা ঠিক আছে।'

আরো উচ্চে রোল তুলল রামেন্দ্র। 'করে কী লোকটা?'

'এককালে তো রাধাকৃষ্ণ করত, এখন আর কী করবে, এখন ট্যাঁ ট্যাঁ করে।'

হঠাৎ গম্ভীর হল অমূল্য। 'রাজসাহীর ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিল।'

'সে কী রে?'

'হ্যাঁ, তাই। কোনো দাগ-চিহ্নও নেই বুঝি চেহারায়।' যেন ধর্ম দেখছে এমনি চাপা আক্রোশের সুরে অমূল্য বললে, 'পাকিস্থান অপ্‌ট করেছিল শুনেছি। পাকিস্থান ফাঁকিস্থান হয়ে গিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়েছে ঘাড়ে ধরে।'

'সত্যি?' একটু বুঝি বা সহানুভূতির সুর আনল রামেন্দ্র। 'তা ওখানে ও করছে কী?'

'মুণ্ড করছে।' সবজান্তার মতই বললে অমূল্য। 'হাত দেখাচ্ছে কোথাও একটা কাজ-কাম জোটে কিনা। চোরের মন কেবল বোঁচকার দিকে—'

বলতে না বলতেই শুনতে পেল জ্যোতিষীর সঙ্গে ব্রজলালের কী মতান্তর ঘটেছে। মতান্তর হতেই বচসা। আর

বচসার সমাধান না হতেই অর্ধপথে পালাল ব্রজলাল।

'এখনো মেজাজ আছে ষোল আনা।' ধিক্কারের মতন করে বললে অমূল্য।

পা চালিয়ে দুজনে জ্যোতিষীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে?'

'ভদ্রলোক কি পাগল?' জ্যোতিষী তাকাল হতভম্বের মত।

'কেন, কী বলে?'

'হাতটা কোলের সামনে মেলে দিয়েই জিগগেস করলে, অসুখটা সারবে?' জ্যোতিষীর মনে ক্রুদ্ধ বিরক্তি : 'অসুখটা কার তা তো অন্তত বলবে। তবে না বলতে পারি—'

'আপনি কী বললেন?'

'বললাম, অসুখটা কার?' শুনেই ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, কার অসুখ তাই বলুন না হাত দেখে। আচ্ছা মশাই, তা কি কখনো বলা যায়? কার অসুখ আগে শুনি, তারপর রেখাবিচার করে বলে দিই সারবে কিনা। আমি তো কী অসুখ জানতে চাইনি, কার অসুখ জানতে চেয়েছি। তাইতেই মাথা-গরম।'

'বা, রেখাবিচার করে আপনারই তো বলে দেওয়া উচিত কার অসুখ।' রামেন্দু ব্রজলালের পক্ষ নিতে চাইল। 'নইলে আপনি কেমন জ্যোতিষী?'

'কার অসুখ তার জন্যে আবার জ্যোতিষ লাগে নাকি?' অমূল্য উপহাস করে উঠল : 'যে মূর্তিমান এসেছিল তারই অসুখ। দেখলেন না চেহারাটা?' গাল-গলার মাংস কেমন ঝুলে পড়েছে। আর অসুখটা তো চোখ বুজেই বলে দিতে পারি। ব্লাডপ্রেসার, হাঁপানি, ডায়-বেটিস—'

'তা বিচারকালে সব বেরুত।' জ্যোতিষী বললে শান্ত হবার চেষ্টায় : 'কিন্তু গোড়াতেই যদি কেউ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, গাল দিয়ে ফেলে—'

'গালাগালও করেছে নাকি? সব সেরকমই আছে দেখছি, বদলায়নি স্বভাব।' অমূল্য চিন্তিত মুখে বললে, 'জমক গেলেও ঠমক যায়নি।'

'আমিও বলে দিয়েছি, এই কচু সারবে। কিচ্ছুতে সারবে না।' জ্যোতিষী প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গিতে বললে।

'নিশ্চয় শুনতে পায়নি।' রামেন্দু বললে, 'শুনতে পেলে ঠেঙা নিয়ে তেড়ে আসত।'

'রাখো!' গর্জে উঠল অমূল্য। 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।'

'এখন শুধু বাঁদরের দাঁতখিঁচুনি।' হাঁটিতে-হাঁটিতে এগুলো দুজনে।

রামেন্দু জিগগেস করলে, 'ভদ্রলোকের উপর তুই এত চটা কেন?'

'শালা আমাকে কঠিন ফাঁদে ফেলে-ছিল একদিন। তেমনি দেখ না কেমন হাল হয়েছে।' রসিয়ে-রসিয়ে বললে অমূল্য। 'উবু হয়ে বসে রাস্তার গণৎকারকে হাত দেখাচ্ছে। মাদুলি নিচ্ছে অসুখের। খুব হয়েছে। ঠিক হয়েছে।'

'কিন্তু, কেন, কী হয়েছিল?'

সদরালা গুণেন চাটুজ্জের বদলি হয়ে এল ব্রজলাল। ব্রজলাল নাম শুনলেই ধারণা হয় ফোঁটা-তিলক কেটে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে বসেছে। কিন্তু এ ব্রজলাল দুঃসহ সাহেব। পোশাকে-আশাকে ছুরির মত ধারালো। মুখে গম্ভীর পাইপ। টাস-টাস ইংরিজি।

কোর্টের কালো কোট পরেই বাড়ি থেকে সটান আসে না। কালো কোট কোর্টেই থাকে। অতিরিক্ত কোট চড়িয়ে এসে এজলাসে ওঠবার আগে কালোতে বদলে নেয়। ব্যান্ড শুধু কোর্টের সময়টুকু। বাকিটা নেকটাই। এ সব ফুটানিকে মফঃস্বলে কে প্রশ্রয় দেয়?' কে অত চকচকে ঝকঝকে থাকতে আয়াস করে? বিকেলে সাহেবদের ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলবারই বা দরকার কী! নাম তো এদিকে ব্রজলাল।

অহংকারে মটমট করছে।

কটা ডিক্রি সই করাতে এসেছিল অমূল্য।

এক নজর দেখেই ব্রজলাল বললে, 'ডিক্রিতে আমার নামের আগে বাবু লিখেছেন কেন?'

প্রথমটা অমূল্য বিনয় করেই বললে, 'তবে কী লিখব?'

'মিস্টার লিখবেন।'

কানে যেন গলানো সিসে ঢালা হল। অমূল্য বললে, 'এ যাবৎ সবজজ কোর্টের ডিক্রিতে বাবুই লিখে এসেছি। শুধু জজ—এডিশনাল জজের বেলায়ই মিস্টারের ব্যবহার।'

'তর্ক করবেন না। এ ব্যক্তিগত রুচির কথা।' দৃপ্ত মুখ দেয়ালের দিকেই নিবদ্ধ রাখল ব্রজলাল। 'আমি যদি আমার সান্যালকে স্যানিয়াল করি তাই মানতে হবে দুনিয়াকে।'

'আর সব সবজজবাবুরা যদি বাবু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, আপনিই বা কেন—'

কথাটা শেষ হতে দিল না। ফেটে পড়ল ব্রজলাল : 'তারা সব সবোজজো, জবোথবো, তারা সাবজজ নয়। তাদের মধ্যে শুধু ও-কার, ভুঁড়ির ওকার। তাদের মধ্যে হসন্ত নেই, স্মার্টনেস্-এর হসন্ত। সুতরাং তাদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। যা বলছি শুনবেন। মিস্টার লিখবেন।'

'তা হলে একটা স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়ে দিন। লিখে দিন অর্ডার-বুকে।'

কথার আসল মানে কথায় নয়, কথার সুরে। পাইপের ডাঁটটা নির্মম দাঁতে চেপে ধরল ব্রজলাল। 'আমি মুখে যা বলছি তাই আমার স্ট্যান্ডিং অর্ডার। আপনি সাব-অর্ডিনেট ক্লার্ক, অধীনস্থ কর্মচারী, আমার মৌখিক কথাই আপনার বেদ-বাক্য।'

অমূল্য মুখে আর কিছু বলেনি বটে, কিন্তু তার হাব-ভাব-ভঙ্গি, এমনকি ভঙ্গির ছায়াটুকু পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছে এ সাহেব নয় এ খানসামা।

সেই থেকে ব্রজলালও রুক্ষ।

কড়া চোখে ইনস্পেকশন শুরু করল ব্রজলাল। অমূল্যর সেরেস্তার আলমারির মাথায় পাওয়া গেল কতগুলো মামলার পুরোনো রেকর্ড, সাত-আট মাস আগে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও যাদের ডিক্রি এখনো লেখা হয়নি। না, কতক বুঝি হয়েছে লেখা। আরো একটু তলিয়ে দেখল ব্রজলাল। মনে হল ডিক্রিতে পূর্ব-বর্তী হাকিমের, গুণেন চাটুজ্জের, যে সই করা হয়েছে সেটা জাল, অমূল্যর নিজের হাতের তৈরি।

ব্রজলাল কৈফিয়ৎ চাইল।

'এত সব ডিক্রি ড্র-আপ করেননি কেন?'

মুখে যা এল তাই বললে অমূল্য। বললে, 'বাড়িতে ছেলেটার অসুখ—'

ব্রজলাল কথাটা গায়েও মাখল না। 'ছেলের অসুখে জগৎ-সংসার চলতে পারে, আপনি কোর্টে আসতে পারেন, খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে পারেন, আর সময়-মত ডিক্রি কটাই লিখতে পারেন না?'

অমূল্য চুপ করে রইল।

'আর এসব কী করেছেন?' ব্রজলাল কঠিনতর হল। 'ও ডিক্রিগুলিতে

হাকিমের সই বলে যে হিজিবিজি আঁচড় টানা হয়েছে এ কার হাতের?'

'সমস্ত আগের হাকিমের।'

'আমার প্রিডিসেসরের? মানে গগেনবাবুর?'

'হ্যাঁ, স্যার, মিস্টার চ্যাটার্জি'র।'

'মানে গগেনবাবুর?' ফেটে পড়ল ব্রজলাল: 'মিথ্যে কথা। সমস্ত আপনার হাতের। আপনি গগেনবাবুর সই জাল করেছেন।'

'আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন—' এর বেশি কিছু বলতে পারল না অমূল্য।

আমলাদের মধ্যে যারা গগেনবাবুর আমলে কাজ করেছে, যারা তাঁর সই চেনে, সবাইকে এনে দেখাল ব্রজলাল।

কাক হয়ে কাকের মাংস খাওয়া যায় না, হাঁ-না কিছুই কবুল না করে আমলারা চুপ করে রইল।

শুধু নিভৃতে সেরেস্তাদার এল দেখা করতে।

'সমস্ত জাল, স্যার। নিখুঁত জাল।'

'তা বুঝতে এক্সপার্ট লাগে না, খালি-চোখেই বোঝা যায়।'

'ডিক্রির নকলের জন্যে যখন দরখাস্ত পড়ে,' বললে সেরেস্তাদার, 'তখনই ডিক্রিটা ড্র-আপ করে আর হাকিমের সইটা নিজেই বসায় কায়দা করে। আঁচড় কেটে-কেটে রপ্ত করে নিয়েছে সই।'

'টু-পাইস আছে নিশ্চয়ই।'

এর আর কী উত্তর দেবে, শৈশবসরল মুখে হাসল সেরেস্তাদার। বললে, 'এর চেয়ে আরো মারাত্মক জিনিস আছে। দখলের পরোয়ানা। সেখানেও জালিয়াতি।'

'আমি প্রসিডিং করব।' পাইপের গহ্বরে জ্বলন্ত কাঠি গুঁজল ব্রজলাল। 'যদি দস্তখৎ অস্বীকার করে, সাক্ষী মানব গগেনবাবুকে। এক্সপার্ট ডাকাব।'

অমূল্যর বিরুদ্ধে প্রসিডিং করল ব্রজলাল।

অমূল্য প্রথমে সর্ষেফুল দেখল। পরে দেখল ঢালা অন্ধকার।

এ প্রায় কাক মারতে কামান পাতা। বাড়াবাড়ি মনে হল অমূল্যর। ড্র-আপ করতে দেরি হয়েছে বলে কটা ডিক্রি আর 'রিট' যথাসময়ে গগেনবাবুকে দিয়ে সই করানো হয়নি। যদি সেগুলো এখন নিয়ে যেত ব্রজলালের কাছে, ব্রজলালকেই

আজকের তারিখ দিয়ে সই করে দিতে হত। বড়জোর দেরি করার গাফিলতির জন্যে গালাগাল করত। তার বেশি নয়। সই করার পরিশ্রম ব্রজলালকেই ভুগতে হত অকারণে। গণেনবাবুর সই নিজে করে দিয়ে অমূল্য বরং ব্রজলালের উপকার করেছে, তার শ্রম লাঘব করেছে। আর টু পাইস? যেখানে সর্বাঙ্গে ঘা, সেখানে ওষুধ লাগাবে কোথায়!' আদালতে হাসলেও মুক্তো, কাঁদলেও হীরে।

শো-কজ-এর উত্তরে অমূল্য নট-গিলটি প্লিড করল। বলল, কথিত দস্তখৎ স্বয়ং মিস্টার গণেন চ্যাটার্জির করা।

দোষ স্বীকার করলে বরং শাস্তির ভার কমে। কিন্তু অমূল্য সত্যের ধার দিয়েও গেল না। বললে, হ্যাঁ, প্রমাণ ধরো।

তা না করে আর উপায় কী।

গণেনকে সমন পাঠাল ব্রজলাল। তাছাড়া একজন হস্তলিপিবিশারদকেও তলব করল।

কেউ-কেউ বললে, এত জবরদস্ত না হলেও চলত।

'বা, ওতে আমার কী করণীয় আছে?' নির্লিপ্ত মুখে বললে ব্রজলাল। 'এ বিচারের ডাক।'

অন্ধকারে তবু আশার পাড় বুনল অমূল্য। ভাবল, গণেনবাবু এলে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে তাঁকে দিয়ে বলাবে, ঠিক মনে করতে পারছি না এ আমার সই কিনা। আর হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট? সে ঢোঁক গিলতেও এক্সপার্ট। এ সই অমূল্যর হাতের নয় সরাসরি এ বলতে না পারলেও কান চুলকে এ কোন না বলতে পারবে, এ জটিল হিজিবিজি, পাঠোদ্ধারের বাইরে। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ। আর সেই অবকাশেই পাশ কাটানো।

গণেন এক ডাকে বললে, এ সব সই মোর নয়। তবে—

আর বিশেষজ্ঞ যা বললে তা ভয়াবহ। বললে, ডাকবাংলোতে অমূল্য গিয়েছিল দেখা করতে। ঘুষ দিতে চেয়েছিল। যেন বলি ও সব সই গণেনবাবুর। অতদূর না যাই যেন অন্তত বলি, আঁকিবুঁকি লেখা, বৈজ্ঞানিক নির্ণয় অসম্ভব। এও বলা যায় ও ও বলা যায়।

'ঘুষ দিতে চেয়েছিল!' মূল কাণ্ডের থেকে আরেকটা শাখা বার করল ব্রজলাল। 'সেটা পরে হবে। কিন্তু বিরোধীয় সই-গুলো সম্পর্কে আপনার মত কী!'

'নির্জলা অমূল্যর রচনা।'

এ সময় আরেকটা কাণ্ড ঘটল। ইংরেজ জজ ছুটি নেওয়ার দরুণ রিক্ত সিংহাসনে প্রমোশন পেয়ে উঠে বসল ব্রজলাল। এতদিন খাস কামরায় খালি মেঝের উপর পা রাখছিল, এবার পা রাখল কার্পেটের উপর।

অমূল্য শুধু অন্ধকার দেখল না দেখল বিভীষিকা।

সাবজজ থাকলে শুধু দোষীই সাব্যস্ত করতে পারত, শাস্তি দিতে পারত না। ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিঙে শাস্তি দেবার মালিক স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট জজ।

কী ভাগ্যের পরিহাস, ব্রজলালই কিনা এখন হর্তাকর্তাবিধাতা। হাতে মাথা কাটবার অধিকারী।

কেউ বললে, 'সোজাসুজি হাতে-পায়ে গিয়ে ধরো। শত হলেও মানুষ তো। একেবারে তো পাষাণ হয়ে যায়নি।'

'এবার আর ছেলের কথা না বলে স্ত্রীর কথা বোলো। সাহেবদের দয়ামায়া স্ত্রীতে'—পরামর্শ দিল আর কেউ।

সেরেস্তাদারকে নিয়ে খাসকামরায় দেখা করতে এল অমূল্য। হাতজোড় করে নিরুপায় মুখে বললে, 'যা অপরাধ করবার তো করেছি। শাস্তিটা যদি একটু কম-সম করে দেন—'

গুম হয়ে বসে রইল ব্রজলাল।

'ছেলেটার খুব অসুখ। যদি তেমন কঠিন কিছু শাস্তি হয় ছেলেটার চিকিৎসার ব্যাঘাত হয়, পড়াশোনায় বাধা পড়ে, তা হলে মরে যাব হুজুর—'

ক্ষুদ্র একটু ভ্রূকুঞ্চনও হল না ব্রজলালের। পাছে ওরা বেশিক্ষণ থাকে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদুনি গায়, চেয়ার থেকে উঠে পড়ল ঝটকা মেরে।

হাতে মাথাটা কাটল না বটে কিন্তু একটা কান কেটে দিল। চাকরিতে নামিয়ে দিল নিচে। কমিয়ে দিল মাইনে।

'শালা, হারামজাদা—' অর্ডার শুনে বলে উঠল অমূল্য। 'নিজে প্রমোশন পেয়েছে কিনা তাই অন্যকে নামিয়ে দিতে বড়ো সুখ! পাজী, স্কাউন্ড্রেল—'

আহাহা দেখ, ভাগ্য কত দূরে নামিয়ে দিয়েছে।

রামেন্দুকে বিদায় দিয়ে ট্রাম ধরবে অমূল্য, দেখল স্টপে ব্রজলাল দাঁড়িয়ে।

কই রে তোর গাউন কই, তোর কোট-প্যান্ট, তোর ব্যান্ড-টাই? কই রে তোর সেই ব্রজবুলি, সেই চিবোনো ইংরিজি, দাঁতে কামড়ানো পাইপ? হ্যালো মিস্টার স্যানিয়েল, কাছে গিয়ে ডেকে উঠব নাকি মুখ বাড়িয়ে? কিম্বা বক দেখাব? ও কী আর করতে পারে আমার? কলা দেখিয়ে যদি ওকে জয়-জগন্নাথ দেখারও নিমন্ত্রণ করি, ও কিছু বলতে পারে না। মাথা কাটার আর ওর হাত কই, কই প্রসিডিঙ করার ক্ষমতা? সম্পদ যৌবন কায়া শরতের মেঘচ্ছায়া। সব উড়ে গিয়েছে এক ফুঁয়ে। যাত্রা দলের সখী সাজ ফেলে দিয়ে যে চোয়াড়ে ছিল সেই চোয়াড়ে হয়েছে।

ঠিক হয়েছে।

অসুখ তো অন্তত হয়েছে। যার জন্যে হাত দেখাতে হচ্ছে জ্যোতিষীকে। আত্মবল না গেলে কি আর কেউ জ্যোতিষীকে হাত দেখায়?

আরো হওয়া উচিত। আরো।

যে দাগ একবার দিয়ে দিয়েছে ব্রজলাল তা আর মোছেনি জীবন থেকে। কটা করে টাকা প্রতিমাসে কম পড়েছে।

কি হে, দাগ পড়েনি তোমার? গা থেকে প্রসাধন তুলে নেওয়ার দাগ!'

আরো পড়া উচিত।

একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গুটিগুটি সেকেন্ড ক্লাশে উঠল ব্রজলাল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না অমূল্য।

এমন নয় যে, ফার্স্ট ক্লাশে খুব ভিড়, তাই সেকেন্ড ক্লাশে উঠেছে। এমন নয় যে, ট্রামটা হঠাৎ ছেড়ে দিল, ফার্স্ট ক্লাশটা নাগালে না আসতে ধরে ফেলেছে সেকেন্ড ক্লাশ। না, তা নয়, ধীরে-সুস্থে মনঃস্থির করেই উঠেছে।

ট্রাম চলতে শুরু করে দিয়েছে, অমূল্যও সেকেন্ড ক্লাশেই উঠল। আর খাড়া পিঠ বেঞ্চিতে বসল ব্রজলালের মুখোমুখি।

জীবনে এ এক অভিনব উপভোগ।

দস্তুরমত হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসা যায় এখন। সিগারেট খাওয়া বারণ, নইলে একটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া দেওয়া যেত উপহার। কি হে, পাইপ কোথায়? না কি এখন বিড়ি ধরেছ? ধূমপানের প্রসঙ্গে করা যেত প্রশ্ন কটা।

ব্রজলালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অমূল্য।

'চিনতে পাচ্ছেন স্যার?'

এতটুকু চমকাল না ব্রজলাল। বললে,

'পাচ্ছি। রাজসাহীর সেই অমূল্য পাল না?'

কী আশ্চর্য, চিনতে পেরেছে অথচ এতটুকু কুণ্ঠিত হচ্ছে না। জানলা দিয়ে চোখ ফিরিয়ে থাকছে না। এইখানে নামব বলে যাচ্ছে না পালিয়ে। পরিপূর্ণ সমর্পণে নির্লিপ্ত চোখে দেখছে সমস্ত কিছু। দেখছে বুঝি শুধু নিজেকে বাদ দিয়ে।

'আপনার ছেলেটি কেমন আছে?' ব্রজলালই জিগগেস করল।

তাও ভোলেনি দেখছি। প্রচ্ছন্নে একটু প্রসন্ন না হয়ে পারল না অমূল্য। বললে, 'ভালো আছে। শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিঙে এবার শেষ বছর।'

'বা, খুব আনন্দের কথা। বেরুতেই একটা চাকরি পেয়ে যাবে নিশ্চয়। আপনার কষ্ট দূর করবে।' ব্রজলাল একটু বুঝি বা অন্যমনস্ক হল। 'ভগবান একদিক থেকে যেমন নেন আবার অন্য দিক থেকে পূরণ করে দেন।'

তা হলে ব্রজলালকেও পূরণ করে দিয়েছে?

সন্দিগ্ধ মুখে অমূল্য জিগগেস করল, 'এ অঞ্চলে কী মনে করে? কোনো চাকরি টাকরি করছেন নাকি?'

'না ভাই, চাকরি কোথায়! এই গভর্ণমেন্টের ঘরে কয়েকটা টাকা পাওনা ছিল তারই আদায়ের তদবিরে এসেছিলাম।'

'পেলেন?'

যেমন সমানে সমানে কথা হয় তেমনি সমতলস্বরে বললে ব্রজলাল, 'কই আর পেলাম! টাকাটা স্যাংশন হয়ে আছে অনেক দিন, কিন্তু ফাইল 'মুভ' করছে না। এতদিন শুনেছি—'বাউয়েলস মুভ' করেনা, এখন শুনছি ফাইলের 'মুভমেণ্ট' নেই।' যেন কতদিনকার পুরোনো পরিচিত বন্ধু এমনি স্বচ্ছতায় হাসল ব্রজলাল। 'তা আপনি এদিকে?'

'হাইকোর্টে নথি বোঝাতে এসেছিলাম।'

'নথি বোঝাতে?' ভাষা যেন সব নতুন শুনছে ব্রজলাল।

'মানে নথির কোন ফাইলে কোন কাগজ আছে তা বাবুদের চাক্ষুষ বুঝিয়ে দিতে।'

'হ্যাঁ, উপরের লোক নিজের থেকে কিছুই বুঝতে চায় না। যত উপরে তত উদাসীন।'

হঠাৎ আবার মনোযোগী হল ব্রজলাল: 'তা আপনি এখন কোথায়?'

'সেই সাবজজ কোর্টে।'

'যাকে যেখানে রেখেছেন। নাটকে রাজার পার্টও আছে, চাকরের পার্টও আছে। শুধু পার্টটুকু করে যাওয়া। আর যে ভালো অভিনেতা সে রাজার পার্টও যেমন নিখুঁত করে, চাকরের পার্টও তেমনি। কী বলেন?' বন্ধুর মত তাকাল ব্রজলাল: 'তা কোর্টে কোন সেরেস্তায়? ড্রাই না, ওয়েট?'

হো-হো করে হেসে উঠল অমূল্য। বললে, 'ওয়েট। এক্সিকিউশান সেরেস্তায়।'

'বা, বেশ, ভালো কথা। তা দেখুন,' ব্রজলাল সচকিত হয়ে গলা কমাল: 'আমার একটা এক্সিকিউশান কেস আছে। টাইটেল এক্সিকিউশান।'

'বলেন কী! আমাদের কোর্টে?'

'হ্যাঁ, হয়তো বা আপনারই সেরেস্তায়।'

আর-গুণে নেই তো ছারগুণে আছে। তার মানে, বিনে পয়সায় তদবির সারবে। কোনো একটা অন্যায় সুবিধে পায় কিনা তারই ফিকির নেবে। এদিকে ভগ্ন-রুগ্ন সর্বস্বান্ত চেহারা করেছে, অথচ ডিক্রিজারি চালাচ্ছে। স্বত্বের ডিক্রিজারি। ধাপ্পাবাজ, শয়তান। শুধু ঘুঘু নয়, হস্তেল ঘুঘু।

এতক্ষণে বোঝা গেছে। দাঁড়াও, শিক্ষা দেব। তাই ভেবে অমূল্য বললে, 'নম্বরটা বলুন।'

ব্রজলাল নম্বর বললে। কাগজে টুকে নিল অমূল্য।

আরো নিশ্চিত হবার চেষ্টায় জিগগেস করলে, 'জাজমেণ্ট-ডেটর কে?'

'আর কে! আমি।' বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলল না ব্রজলাল। নিরুত্তেজ কণ্ঠেই বললে।

'আপনি! আপনি ডিক্রিদার নন?' প্রায় বসে পড়ল অমূল্য।

'না। আমি দায়িক, দেনদার। আমার বিরুদ্ধেই ডিক্রিজারি।'

'উচ্ছেদের মামলা?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'বলেন কী!' হতভম্বের মত চেহারা করল অমূল্য: 'এও হয় নাকি?'

'হয়। সব হয়। আর সবই মেনে নিতে হয়।'

'কিন্তু, কিন্তু উচ্ছেদের গ্রাউণ্ড কী?'

'আর কী! ডিফল্ট। পর-পর দুমাস দিতে পারিনি ভাড়া।'

'দিতেই পারেননি?' অবিশ্বাস্য মনে হল অমূল্যর।

'দিতে পারিনি মানে চুক্তির দিনটা

ফসকে গিয়েছে। দু দুবারই ফসকে গিয়েছে। তা ওরকম যায়। মাঝে মাঝে মাথার ঠিক থাকে না।' চোখ বুজেই আবার চোখ মেলল ব্রজলাল। 'অন্ধকার ঝড়ের মধ্যে মাঠে পড়লে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়।'

কোনো একটা ছলনা বা চাতুরীর কাহিনী অনুক্ত থাকছে এমনি মনে হচ্ছে অমূল্যের। ঠিক মত জেরা করলে ঠিক বেরিয়ে যাবে কাপটা।

'ডিক্রি হয়েছে কবে?'

'এই তো গত মাসে। রুজু হতে না হতেই ডিক্রি।'

'সে কী? লড়েননি মামলা?'

'না, লড়ে কী হবে? কত শত্রুর সঙ্গে কত দিকে আর লড়ব। বিচারে যা আছে তাই হবে।'

'সে কী? আপিলও করেননি?'

'কেউ শোনে না আপিল।' ব্রজলাল হাসল : 'সব আবেদন নামঞ্জুর। উচ্ছেদের মামলায় আপিল নেই।'

'কী যে বলেন! একটা উচ্ছেদের মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি পেতে বাড়িওয়ালার কম-সে-কম ছ বচ্ছর। সেখানে আপনি পত্রপাঠ ছেড়ে দেবেন?'

'কোনো কোনো উচ্ছেদ বুঝি পত্রপাঠেই। তেমন যদি বিচার হয় কী করা যাবে বলুন।'

'কিসের বিচার? কার বিচার?' ঝাঁজিয়ে উঠল অমূল্য।

'কিন্তু সাধ্য নেই বিচার-ঘরে বসে আপনি এ প্রশ্ন তোলেন। কেননা আপনি জানেন আসল বিচারক এজলাসে নয়, আসল বিচারক নেপথ্যে। তাকে দেখা যায় না আর তার আসল নামও অদৃষ্ট।'

তত্ত্ব কথা ছেড়ে অমূল্য বাস্তবে এল। বললে, 'ডিক্রিজারিটা ঠেকাতে চান নাকি?'

'ঠেকাব আমার এমন মুখ কই?'

'কেন, বকেয়া বাড়ি ভাড়া সব জমা দিয়ে দিন, দেখি কেমন ডিক্রিজারি না খারিজ হয়।' ব্রজলালের চোখের মধ্যে তাকাল অমূল্য, পারল তাকাতে। বললে, 'কত ভাড়া?'

'একশো টাকা।'

'মোটে?'

'হ্যাঁ, দুখানা মাত্র তো ঘর। আমরা স্বামী-স্ত্রী, আর আমাদের ছেলে। দুখানা ঘরে আমাদের দিব্যি কুলিয়ে যায়।'

'শুধু দুখানা ঘর!' অনুচ্চারিত নিশ্চয়ই কোনো শাঠ্য আছে সেটা আবিষ্কার করবার লোভে আরো একটু খোঁচা মারল অমূল্য : 'এখানে আছেন কতদিন?'

'এই বছরখানেক। আগে বরাবর কলকাতার বাইরে বিজন-পল্লী রিফিউজি কলোনীতে ছিলাম।' একটু বুঝি বা ক্লান্ত শোনাচ্ছে ব্রজলালকে : 'ছেলেটার একটু চাকরি হল, সাধ হল ভব্যতায় আবার উঠে আসে। তারই জন্যে এই ঘর, পাকা ঘর, এই ঘর থেকে ফের আরম্ভ।' ম্লান হাসল ব্রজলাল : 'আবার আশা নিয়ে পাশা খেলা।'

'বকেয়া বাকি ভাড়া বেশি হবে বলে তো মনে হয় না।' অমূল্য বললে, 'তা হলেই তো চুকে যায়।'

'কিন্তু তার কি আর দরকার আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। উচ্ছেদটা তো ঠেকাতে হবে।'

'একটু সময় পাওয়া যায় না?'

'আপনি যাবেন একদিন কোর্টে।' লম্বা চালে বলতে লাগল অমূল্য। 'সেরেস্তায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি নথিটা দেখে রাখব।' দেখি কী করতে পারি। ওকালতনামা ও পিটিশনের খরচা নিয়ে যাবেন।' বলতে কী যে ভালো লাগছে অমূল্যর : 'দরকার হলে একজন উকিল ঠিক করে দেব। প্রাক্তন এক বিচারপতির মামলা, বিনা ফিতে পাওয়া যাবে উকিল।'

'আমাকে চিনবে না কেউ। আমি তো ও কোর্টে বসিনি কোনোদিন।'

'আমি আপনাকে চিনিয়ে দেব।'

'না, না, তার দরকার নেই। বলবেন আমার এক পূর্বপরিচিত বন্ধু, ব্রজবাবু। যখন যেমন তখন তেমন।' উঠে পড়ল ব্রজলাল। বললে, 'আমি এইখানে নামব। আচ্ছা আসি। নমস্কার।'

আকাশের দেবতারা সব দেখ, শাস্তা বাবু হয়েছে। অমানীকে মান দিচ্ছে, নমস্কার জানাচ্ছে। ভাই-মশাই বলছে। এ তোমাদেরই দেখবার মত।

ঠিক হয়েছে—উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

আরো হবে। আরো মানে। রাজ্য সাজা বার করে দেবে।

নিজের মনেই হেসে উঠল অমূল্য।

আপিসে অমূল্যর টেবিলের সামনে ভূতের মতন এসে দাঁড়াল ব্রজলাল।

সামনে অনেক কাজ নিয়ে বসেছে, চেয়ার ছেড়ে উঠল না অমূল্য। চাপরাশিকে বললে, এঁকে একটা কিছু এগিয়ে দে বসতে। ইনি এক প্রাক্তন জেলা জজ।'

একটা টুল এনে দিলেই হত, চাপরাশি একেবারে চেয়ার বাগিয়ে ধরল।

ব্রজলাল বসল না। বললে, 'আমি একজন সাধারণ মক্কেল। তার বেশি আর আমার পরিচয় নেই। তারপর'—অমূল্যর দিকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল ব্রজলাল।

এত বড় উপভোগ্য দৃশ্য বুঝি আর হতে নেই পৃথিবীতে।
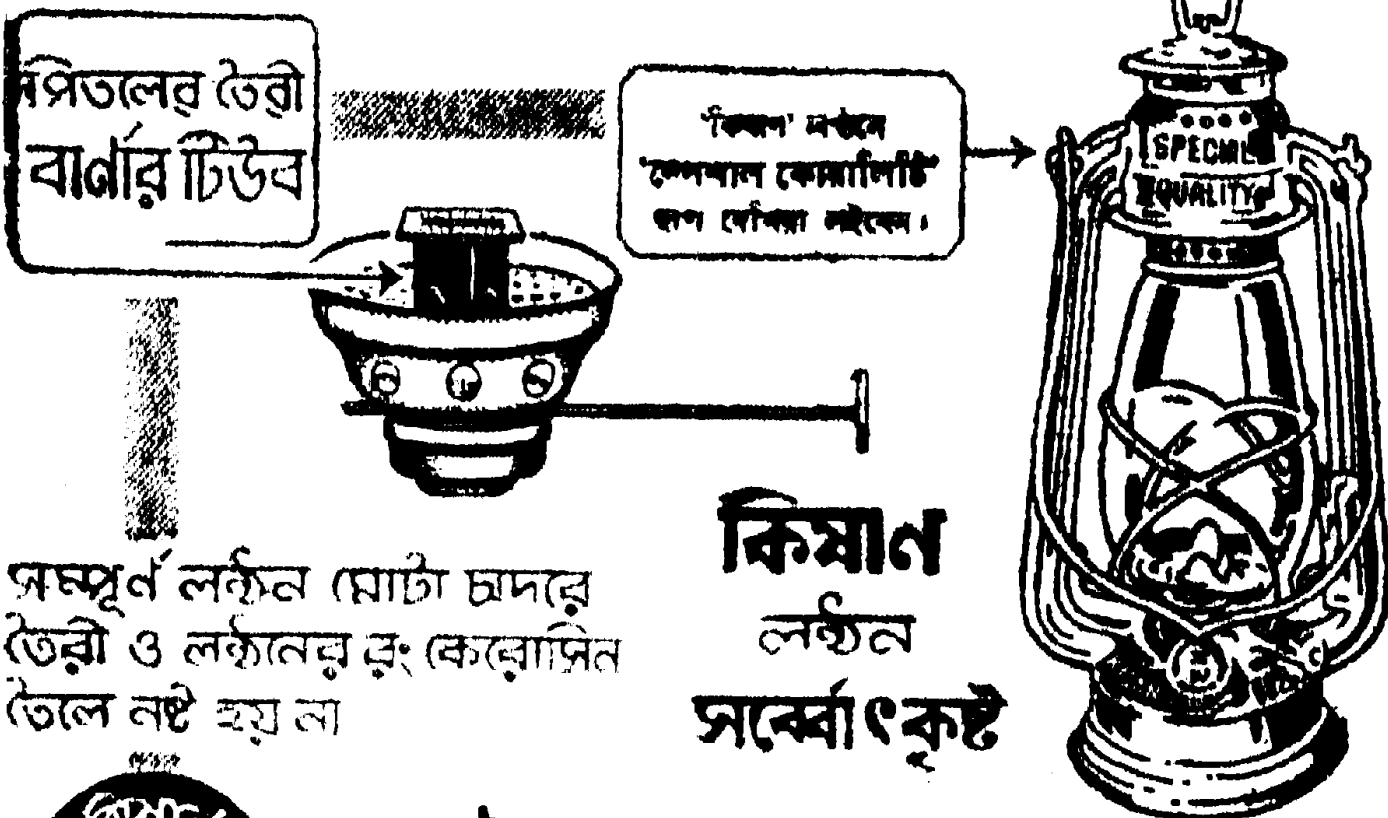
'টাকা এনেছেন?' হাত পাতল অমূল্য।

'কত টাকা?'

'চারশো। এটা জমা দিয়ে দিলেই আপাতত ঠেকানো যায় উচ্ছেদ। আমি নথি দেখে রেখেছি। আর দেখুন সেই মর্মে হাকিমের অর্ডার।'

'আমি বলছিলাম কি, যদি কিছু সময় পাওয়া যেত।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ব্রজলাল। 'এত টাকা দেবার এখন সংগতি নেই।'

'টাকা না দিলে উচ্ছেদ অবধারিত। কেক খাবেনও, আবার পকেটে করে নিয়ে যাবেন সেটি হবে না।' কী অদ্ভুত ভালো লাগছে এমনি করে বলতে', শাসন করতে! অমূল্য মুখিয়ে উঠল: 'সময় যে চাইছেন কত দিনের?'

'এই মাসখানেক।'

'মাসখানেকের মধ্যে টাকা আনবেন কোত্থেকে?'

'ছেলের ইনসিওরেন্স আফিস থেকে।'

'সময় যে দেবে হাকিম, এমন মনে হয় না। তবু দেখি চেষ্টা করে। পিটিশনের খরচা রেখে যান। উকিল-ফি না হয় দেবেন না, কিন্তু।' কী চমৎকার হাসল অমূল্য: 'আমলার তহরিটা তো দেবেন।'

'দেখছি।' চারদিক তাকিয়ে গলা খাটো করল ব্রজলাল। বললে, 'যার জন্যে আপনার কাছে এসেছিলাম। একটু শুধু দয়ার জন্যে।'

'কিসের দয়া?'

'দয়া করে দখলের পরোয়ানাটা যেন আজ-কালের মধ্যেই ইস্যু করে দেবেন না।'

যেমন দ্রুত চলে গেল ব্রজলাল, অমূল্যের মনে হল টাকা আনতে গেল। কিন্তু কোথায় টাকা!

দয়াও টাকার দামে কিনতে হয়। টাকা নেই তো দয়াও নেই।

ডিক্রিদারের লোক দাঁড়াল অমূল্যের গা ঘেঁষে। ভারী হাতে তদবির করল। অমূল্য দখলের পরোয়ানা দিল ইস্যু করে।

ডিক্রিদারের লোক বললে, 'কালই যেন নায়েব নাজির বেরোয় দেখবেন।'

'হ্যাঁ, আর্জেন্ট করে দিয়েছি। এখন নেজারতে, নাজিরখানায় গিয়ে যথাযোগ্য তদবির করুন। ঠিক বেরুবে পরোয়ানা।'

যা বেটা উচ্ছেদ হয়ে। যা বিচাবে আছে তাই এখন হতে দে। আউট হয়ে যা। আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা নিমিত্তমাত্র। নাচের পুতুল।

হাসল [illegible]। 'সাহেব আবার [illegible] করে? কিন্তু সেখানে [illegible]'

'সেখানে দখল জারি হচ্ছে। বাবুর সব জিনিসপত্র বার করে দিচ্ছে রাস্তায়।'

'তাই তো দেবে।'

একটা ইলেকট্রিক ফ্যান ঝুলছিল

'আমরা নিমিত্তমাত্র। নাচের পুতুল।'

নাজিরখানার পিওন অবিনাশ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

অমূল্যকে বললে, 'আপনি শিগগির একবার চলুন।'

'কোথায়?'

'সেই আপনার জজসাহেব ব্রজলাল-বাবুর বাসায়।'

এক ঘরে। ডিক্রিদারের লোক সে-ফ্যান মিস্ত্রি ডাকিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঘর খালি, খোলসা করে দিতে হবে।' নির্মম হবার মধ্যেও এক দুরন্ত আনন্দ আছে। প্রথম কাছারির সেই প্রথম সিগারেট খাওয়ার মধ্যে সেই আনন্দের স্বাদগন্ধ অনুভব করল অমূল্য। বললে, 'ভেকেণ্ট পজেশনের পরোয়ানা।'

'কিন্তু সেই ফ্যানের নিচে বাবার ছেলে শুয়ে।' প্রায় হাহাকার করে উঠল অবিনাশ।

'ছেলে শুয়ে মানে? একজন না একজন তো শোবেই ফ্যানের নিচে। হয়তো সেইটেই ছেলের ঘর।' কী একটু সন্দেহ হতে অমূল্য ভুরু কুঁচকোলো: 'কত বড় ছেলে?'

'প্রকাণ্ড ছেলে। ত্রিশ-বত্রিশ হবে মনে হয়। আর সেই একমাত্র ছেলে।'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে তার?'

'অনেক দিন থেকেই নাকি ভুগছিল। আজ সকালবেলা মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

পৃথিবীর সমস্ত বিষয় ব্যাপারই অমূল্য একটা মামলার চেহারায় দেখে এসেছে। রুজু, নিষ্পত্তি, ডিক্রি, আপিল, সেকেণ্ড আপিল, ছানি বা রিভিউর চোখে। এখন মনে হল, আর রিভিউ নেই, রিম্যাণ্ড নেই, সমস্ত আপিলের দরজা বন্ধ। নজির নেই, সাক্ষী নেই, সওয়াল-জবাব নেই, শুধু এক শূন্য মন্ডাংগনে এক একাকী অন্ধ বিচারক।

'আমরা পরোয়ানা নিয়ে পৌঁছুবার কিছু আগেই মারা গেছে।' বললে অবিনাশ।

'তারপরেও জারি হচ্ছে পরোয়ানা?' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অমূল্য। 'নায়েবনাজিরবাবু করছেন কী?'

'নায়েব নাজিরবাবু দেরি করতে চাচ্ছেন, ডিক্রিদারের লোকেরাও থতমত খাচ্ছে কিন্তু ব্রজবাবু নিজেই উদ্যোগ করে বার করে দিচ্ছেন জিনিসপত্র।' বলতে বলতে কাঁপছে যেন অবিনাশ। 'পরোয়ানা দেখে বললেন, হ্যাঁ, বিচারে যা আছে তা করতে হবে বৈকি। বিচারই নির্ভীক, নিরপেক্ষ। নিজেই খবর দিচ্ছেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে। একটু কাঁদতে পর্যন্ত পাচ্ছেন না।'

'কাঁদতে পর্যন্ত পাচ্ছেন না?' টুঁটি টিপে ধরা একটা উদ্গত কান্নার মত শোনাল অমূল্যকে।

'দু একজন পাড়াপড়শি ছাড়া লোকজন কেউ নেই। আমরা উৎপাতের মত চড়াও হয়েছি বলে, আত্মীয়স্বজনরা যারা এখানে আছে, তাদেরকে খবর দিতে পাচ্ছেন না। শ্মশানে কে নিয়ে যাবে, কী ভাবে নিয়ে যাবে, কখন নিয়ে যাবে, কিছুরই দিশপাশ নেই। ব্রজবাবু পরোয়ানা হাতে নিয়ে শুধু বলছেন, বিচার আগে, বিচার আগে, তারপরে আর সব। নায়েবনাজিরবাবুকে বলছেন, 'হাত লাগান দয়া করে। আগে ফার্ণিচার ফ্যান বাক্স সুটকেস বাসনকোসন বার করে দিই, তারপরে খোকাকে বার করে দেব। একসংগেই ঘর খালি করে বেরিয়ে যাব আমরা।' অবিনাশের চোখের দুই বুড়ো কোটরে জল চকচক করে উঠল।

'কী আশ্চর্য,' অস্থিরের মত বললে অমূল্য, 'নায়েবনাজিরবাবু চলে আসছে না কেন?'

'জজবাবুই আসতে দিচ্ছেন না। বলছেন, যতক্ষণ 'রিট' চালু আছে, 'রিকল্ড' হচ্ছে না, ততক্ষণ আপনার কর্তব্য করে যাবেন। বিচারের ভার দারুণ ভার, তার দাবি সকলের আগে। তার কাছে শোক নেই স্নেহ নেই আলসা-আরাম নেই। এমন ধরণের কথা কত কি বলছেন। এমন আশ্চর্য, চশমার কাঁচ পর্যন্ত মুছছেন না একবারও। নায়েব-নাজিরবাবু বা যদি গড়িমসি করছেন, ধরছেন ডিক্রিদারের লোককে। বলছেন, পরোয়ানা 'রিকল্ড' না হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার কাজ করে যান। বিচারের মান রাখুন।'

'আপনি ছুটে আবার যান সেখানে। নায়েবনাজিরবাবুকে বলুন, পরোয়ানা রিকল্ড হয়েছে। মুলতুবি হয়েছে ডিক্রি-জারি। আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে যাচ্ছি। ততক্ষণ যেন সব স্থগিত থাকে। অন্তত একটু কাঁদবার জন্যে স্থগিত থাকে।'

একটা উদার দুর্মদ দৈত্য হঠাৎ অমূল্যকে ভর করল, পেয়ে বসল। এক খাবলা দিয়ে চারশো-পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করলে। চালান করে জমা করে দিল মুহূর্তে। খসখস করে নিজেই অর্ডার লিখল। খাস কামরায় গিয়ে সই করিয়ে নিল হাকিমকে দিয়ে।

এতক্ষণ একটা ঝড়ের মত ছুটোছুটি করেছে অমূল্য, ঝড়ের মত কথা বলেছে, ঝড়ের মতই কুড়িয়ে নিয়েছে লোকজন।

তারপর নিজেই নথি নিয়ে লোকজন নিয়ে ছুটল অকুস্থলে।

নায়েবনাজিরকে দেখাল অর্ডার। দেখাল ডিক্রিদারকে।

'কই আমি দেখি।' এতক্ষণে চশমার কাঁচ মুছল ব্রজলাল।

এর পর আর কথা কী! নায়েব-নাজির নিবৃত্ত। ডিক্রিদার নিবৃত্ত। নিবৃত্ত ব্রজলাল সান্যাল।

বিমূঢ়ের মত মুখ করে ব্রজলাল বললে, 'কিন্তু এতগুলো টাকা জমা দিল কে?'

'দেখছেন না অর্ডার-সিট।' ব্রজলালের মনোযোগ আকর্ষণ করল অমূল্য, 'জাজমেন্টডেটর ডিপজিটস—স্বয়ং দেনদারই জমা দিয়েছেন। বিচারের ঐ ভাষা। আর তাকে আমরা মান্য করে চলছি বলেই সংসার চলছে। হ্যাঁ স্যার,' গলার স্বর আপনা থেকেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল: 'আপনিও তো শ্মশানে যাবেন?'

'হ্যাঁ, এই ছার যাবেন শ্মশানে। আমি ছাড়া ওর যে আর কেউ নেই।'

শ্মশানে সব শেষ হয়ে যাবার পর ব্রজলাল অমূল্যকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

স্বরে অন্তরঙ্গতার নির্যাস ঢেলে অমূল্য বললে, 'চলুন, ঘরে ফিরে চলুন।'

নিজেই খানিক সামলে উঠল ব্রজলাল। বললে, 'হ্যাঁ, ঘরে ফিরে যাব বৈকি। ঘরের উচ্ছেদ তুমি যে রদ করে দিয়েছ। ভগবানের উচ্ছেদই বুঝি কেউ পারে না রদ করতে। তাই আবার ঘরেই ফিরে যেতে হয়। শোকের পর ভাত খেয়ে ঘুমুতে হয় অঘোরে।'

'হাঁ, এখনো অনেক কাজ বাকি।

'অনেক কাজ। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণই নাচা।' অমূল্যর কাঁধের উপরে হাত, কয়েক পা হাঁটল ব্রজলাল। একটু বা থামল কিনা বোঝা গেল না। বললে, 'বিচারে আমিই এখন খোকার ওয়ারিশ। খোকার ইনসিওরেন্সের টাকা কটা এখন যে আমাকেই তদবির করে বার করে নিতে হবে।' না, হাসি নয়, কাঁদছেই ব্রজলাল। আর বলছে, 'কান্নায় কি আর টাকা ভাসিয়ে দেওয়া চলে?'

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পনেরো ।।

আমাদের কয়েকজনের মস্কোয় বসবাসকালীন রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক বোরিস পাস্টেরনাক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসখানির নাম "ডাক্তার জিভাগো"। কিছুকাল আগে পাস্টেরনাক এই বইখানি "নোভিমির" নামক একখানি মস্কোর সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান। প্রকাশ, সেই কাগজের কর্তৃপক্ষ প্রথমে বইটি ছাপতে রাজি হন। পরে বলেন, কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে এবং আর কয়েকটি স্থলে কাটাকুটি ক'রে দিলে বইটি ছাপা সম্ভব হবে। কেননা বইটি ভাল। পাস্টেরনাক এ প্রস্তাবে রাজি হননি, এবং বইটি তিনি ফেরৎ নেন। এই গ্রন্থে রুশবিপ্লবকালের এবং বিপ্লবোত্তর রুশজীবনের অনেকগুলি ছবি বর্তমান,—যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবকালের চূড়ান্ত গৌরব বহন করে না। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত অনুযায়ী এই বইখানি সম্ভবত "রিভিসনিজমের" অভিযোগে পরিপূর্ণ। তাঁদের মনোভাব হল, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না। বর্তমানের দেশজোড়া উন্নতি এবং ভবিষ্যতের উন্নততর সম্ভাবনা এই নিয়ে বই লেখ—যত পার লেখ! যত টাকা চাও দেবো, যত ইচ্ছা সুখ সম্ভোগ যশ প্রতিষ্ঠা যা চাও—আপত্তি করব না। সোভিয়েট জীবনের মধ্যে সাহিত্যের প্রভাবে যেন নৈরাশ্যের স্পর্শ না আসে। সাহিত্যে কেঁদো না, কবিতায় হা-হুতোশ করো না! প্রেমের গল্প রচনাকালে ব্যর্থ প্রণয়ের ট্রাজেডিতে সাহিত্য ভরে তুল না। গল্প উপন্যাস যদি লেখো, প্রাচীনকে প্রাধান্য দিয়ো না, দুঃখবাদকে নিয়ে অশ্রুবিলাস করো না। আমরা কমিউনিষ্ট সোসায়েটি গড়তে চলেছি, মানুষের উন্নতি করতে বসেছি, দেশের বৃহত্তর জীবনের বস্তুতান্ত্রিক গঠনের কাজে লেগেছি,—এইসব কর্মে কবি ও কাহিনীকারগণ তোমাদের সাহিত্যপ্রচার দিয়ে সাহায্য করো। মার্কসিজম-লেনিনিজম তোমার সাহিত্যের মূলকেন্দ্র হোক। চল্লিশ বছর আগে নিজেদের মধ্যে কি কি কাণ্ড ঘটে গেছে, কে কা'কে মেরেছে, কার বদলে কে মার খেয়েছে, বিপ্লব কি প্রকারে পরিচালিত হলে ভাল হত,—এসব পুরনো কথা আর তুল না! সামনে এগিয়ে চল, পিছন দিকে চেয়ো না।

কিন্তু পাস্টেরনাকের সেই প্রাচীন মনে গভীর ক্ষত, ক্ষয় ও ক্ষতির দাগ ছিল। তিনি বোধকরি আশা করেছিলেন, ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে এই বইটি তিনি প্রকাশ করবেন। তিনি টলষ্টয়ের শিষ্য, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং মানুষের বিবেকসত্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই কারণে ষ্টালিনের আমলে সর্বব্যাপী আতঙ্কের মাঝখানে নিঃশব্দে বসে তিনি কিছু কিছু মৌলিক কবিতা রচনা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কবিতা এবং এটা-ওটা টুকিটাকি অনুবাদের কাজ নিয়ে চুপ করেছিলেন। তাঁর স্বাজাত্যবোধ এবং দেশানুরাগ সুবিদিত। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে চিরায়ত সাহিত্যের বিচারে তাঁর কবিখ্যাতি প্রচুর।

তিনি তাঁর "ডাক্তার জিভাগো" উপন্যাসটি কবে লিখেছিলেন এবং এ বইখানি কবে কিভাবে ইতালীয় প্রকাশকের হাতে গিয়ে পড়ল সেটি আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু জানতে পারলুম, তিনি সরল বিশ্বাসের সঙ্গে এবইটি ইতালীয় প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর একবারও মনে হয়নি, তাঁর এ বই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন ঝড়ের ঝাপটা আনবে, অথবা এরজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করবেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি, তাঁর এবইটি নিয়ে ইউরোপ বা আমেরিকার রাজনীতিকরা এমনভাবে সোভিয়েট বিরোধী প্রচারকার্য ক'রে বেড়াবেন। পাস্টেরনাকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নকে শুধু কলঙ্কিত করার জন্যই এই নোবেল পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে! এই পুরস্কার ঘোষণার পর পাস্টেরনাক মিঃ খ্রুশ্চভকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। মিঃ খ্রুশ্চভ সম্ভবত সেই পত্রের এইরূপ জবাব দেন, আপনার গ্রন্থের মূলনীতির সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র একমত নন। কিন্তু এই পুরস্কার আপনি নিজে গিয়ে গ্রহণ করতে পারেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। আমার মতো আপনারও জন্মভূমি রাশিয়া, আপনিও তার অন্যতম নাগরিক। আপনি আধুনিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ, এমন কোনও অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে নেই!

এই পত্র পাবার পর পাস্টেরনাক নোবেল পুরস্কারটি প্রত্যাখান করেন। কিন্তু মস্কো লেখক-সংঘ একটি বিশেষ অধিবেশনে পাস্টেরনাকের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব আনেন, এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে তিনি লেখক-সংঘ থেকে বহিস্কৃত হন! এই সময়ে কি একটা উপলক্ষ্যে মিঃ খ্রুশ্চভ পুনরায় বলেন, কবি পাস্টেরনাকের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। তিনি কিছু না করলেও তাঁর বেশ চলে যাবে! এমন কি তিনি যদি দেশ ছেড়েও কোথাও চলে যেতে চান, কেউ তাঁকে বাধা দেবেন না।—কিন্তু পাস্টেরনাক কোথাও যাননি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম, কবি পাস্টেরনাকের নামটি কেবলমাত্র লেখক-সংঘের খাতায় তালিকাভুক্তই ছিল। লেখক-সংঘের বর্তমান কর্ণধারগণ সম্বন্ধে তাঁর একেবারেই কোনও আস্থা ছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে। তাঁর অতি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ কয়েকজন কবি ও গ্রন্থকার ষ্টালিন আমলের নানাবিধ যন্ত্রণা ও শাসন বরদাস্ত করতে না পেরে নানা উপায়ে আত্মনাশ করেন! বিগত পঁচিশ বছর ধরে পাস্টেরনাকের জীবনাদর্শ অত্যন্ত পীড়িত, বিষময় ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। এই দেশপ্রাণ, মানবতার মুক্তিপূজারী, উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা এবং সর্বপ্রিয় সাহিত্যকর্মীর মৃত্যু ঘটে ৩০শে মে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে। যতদূর শুনেছিলুম, পাস্টেরনাক কমিউনিজমের ভিতরকার নিরীশ্বরবাদ পছন্দ করতেন না, এবং

সোভিয়েট সাহিত্যাদর্শের বিশেষ বিরোধী ছিলেন।

দোভাষিণীদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিদুষী এবং ইংরেজি সাহিত্যে যিনি পারদর্শিনী, সেই শ্রীমতী অকসানা ক্রুগারস্কায়া— যিনি ক্রেমলিনে মিঃ খ্রুশ্চভের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বাক্যগুলি আমাদের নিকট ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, তিনি মস্কোর লেখক-সঙ্ঘের বেতনভোগী মহিলা। তাঁর মুখে শুনেছি, "পাস্টেরনাক আজও অতিশয় জনপ্রিয়। এসব ঘটনা ঘটবার পরেও তাঁর বই প্রচুর বিক্রি হয়। তাঁর ন্যায় শক্তিশালী কবির সংখ্যা রাশিয়ায় খুব কম। আমরা সকলেই তাঁর অনুরাগী।"

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার ভ্রমণ-কালে কবি পাস্টেরনাক সুস্থ শরীরেই জীবিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কোনও রচনা তখনও পড়িনি বলেই তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল না। মস্কো থেকে মাইল কুড়ি দূরে 'পেরেডেলকিনো' নামক লেখক-নগরটিতে কবি পাস্টেরনাক একখানি বৃহৎ বনময় বাগানবাড়ির মালিক। উপার্জন তাঁর প্রচুর। তাঁরই বাগানবাড়ির কাছাকাছি আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু পাভেল লুকনিৎস্কি ও মালৎজেভের দু'খানি উদ্যানভবনে আমরা মধ্যেমাঝে আমোদ করতে যেতুম। বোরিস পাস্টেরনাক তখনও স্বগৌরবে জীবিত রয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান প্রভৃতি সাংবাদিকেরা পাস্টেরনাকের সঙ্গে তাঁদের নানাসময়ের সাক্ষাৎকারের বিবরণ-গুলি বিকৃতভাবে প্রকাশ করার ফলে পাস্টেরনাক অতিশয় বিব্রত ও দুঃখিত হন, এবং বাইরের সঙ্গে নিজের বাড়ির টেলিফোনের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেন। এমনি একটা সময়ে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আমি পাস্টের-নাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করি। কিন্তু অকসানা আমাকে বললেন, "পাস্টেরনাকের বাড়িতে হঠাৎ আপনি গিয়ে দাঁড়ালে আপনার অভ্যর্থনাটা 'অনিশ্চিত' হতে পারে, কারণ তিনি আজকাল বাইরের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে আড়ষ্টবোধ করেন। আমাদের সঙ্গে ইদানীং তাঁর যোগাযোগ নেই।"

শ্রীমতী অকসানার কৈফিয়তে সেদিন আমি সন্তুষ্ট হইনি। কিছুদিন পরে শুনেছিলুম, ত্রিলোচন ত্রিপাঠী নামক একজন ভারতীয় লেখক বোরিস পাস্টের-নাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একটি মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশ করেন। শ্রীমতী লিডিয়ার মতো খাজা কমিউনিষ্ট মেয়েও আমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কেননা আমি পাস্টেরনাকের বাগানের সীমানা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে সেদিন বসেছিলুম। কিন্তু তিনি লেখক-সঙ্ঘের নিযুক্ত লোক নন্ বলেই সুযোগ ও সাহস পেলেন না!

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মিঃ খ্রুশ্চভের আমলে কমিউনিষ্ট পার্টির পুরনো ইমারত ভাঙতে আরম্ভ করেছে! ক্ষমা, দয়া, বিবেচনা, উদারতা—এগুলি ষ্টালিন আমলে বহুলাংশে নিষিদ্ধ ছিল। মিঃ খ্রুশ্চভ এসে একে একে দরজা খুলে দিচ্ছেন। ষ্টালিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন তিনি। নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনছেন ষ্টালিনের পুরণো সতীর্থগণকে, যাঁরা এককালের দেশকর্মী, যাঁরা সমগ্র জাতির শুভানুধ্যায়ী, যাঁরা জীবনপণ ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছিলেন! তাঁদের মধ্যে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং যাঁরা আজও জীবিত, তাঁদেরকে নানান্ দেশ-কর্মে নিযুক্ত করা হচ্ছে। মস্কোতে বসে মিঃ খ্রুশ্চভের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার চেহারা দেখে এটার প্রমাণ পাচ্ছিলুম, ষ্টালিনের সর্বপ্রকার নৃশংসতার অপকর্মে যাঁরা অতি ঘনিষ্ট দোসর ছিলেন, এবং যাঁরা ষ্টালিনের রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে একটির পর একটি কাগজে বিনা দ্বিধায় দস্তখৎ করেছিলেন,—তাঁদের হিসাব-নিকাশের দিন খুব সম্ভব এগিয়ে এসেছে! যে দেশের লোক বছরের পর বছর ধ'রে একটি শবদেহকে অবিকল অবস্থায় সাজিয়ে রাখতে জানে, তারা যে-কোনও সমাধিস্থ শবদেহকেই মাটি খুঁড়ে তুলে প্রতিশোধও তুলতে পারে! সোভিয়েট ইউনিয়নে মৃত্যুর পরেও কেউ নিরাপদ নয়! পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ক্ষমা নেই!

রেড স্কোয়ারের পাশ দিয়ে প্রশস্ত একটি রাজপথ চলে গিয়েছে 'পুশকিন্-স্কায়া ষ্ট্রীটের' দিকে। একদিন সেই পথেরই কাছাকাছি ডানদিকে যে বৃহৎ একটি জনবহুল অট্টালিকার গেটের মধ্যে ঢুকলুম, সেটির নাম 'গুম'। গুম-অর্থে বড়বাজার। সেটি আমাদের কলকাতার 'হগ-মার্কেট'। সেখানে শত শত 'ডিপার্ট-মেন্টাল ষ্টোর' কিন্তু বিক্রেতাগণের মধ্যে শতকরা আশীজনই মেয়ে। একটি ভালো ফুলহাতা সোয়েটার ৪০০ রুবল, একটি নেকটাই ৭ রুবল, মেয়েছেলের পায়ের সাধারণ একজোড়া ভদ্র জুতো ৩৫০, পুরুষের ৩০০, একটি সস্তা ওভারকোট ৫০০, একটু ভদ্র ১১০০। শ্রেষ্ঠ একটি ওভারকোট অথবা মেয়েদের ফারকোট ২৫০০ রুবল। মধ্যএশিয়া তুলোর চাষের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এখানে একটি সুতী শার্ট শুনলুম ১১০ রুবল। সরকারী বিনিময় হারে আমাদের ছয় টাকায় ওদের পাঁচ রুবল। সেই হিসাবে মস্কোয় একমণ সাধারণ চাউলের দাম পড়ে ৪০০্ টাকার কিছু বেশী। এক সের আপেলের দাম অবশ্য ৬।৭ টাকা, কিন্তু মস্কোর বাজারে ভাল এক সের আঙুরের দাম পড়ে ৩২্।৩৩্ টাকা। দুধ সস্তা,—এক পোয়া আন্দাজ ৷৷৹ আনা। অথচ আগাগোড়া ঘুরে সেদিন সমস্ত বাজারটায় দেখে এলুম, প্রতিটি দোকানে কাতারে কাতারে খরিদ্দারের ভিড়। দুর্ভিক্ষের কালে কলকাতায় চাউলের দোকানগুলি যেরূপ জনপূর্ণ থাকত, এখানকার প্রতি দোকান সেইরূপ। এদের ক্রয়শক্তি দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন। পছন্দসই সামগ্রীটিই আসল কথা, টাকার পরিমাণের কথা ওঠে না। প্রতি মেয়ে-পুরুষ তার ছোট ব্যাগ বা পকেট থেকে যে পরিমাণ লেনিন-মার্কা একশ' রুবলের নোটের গোছা কথায়-কথায় বার করে, সেটি লক্ষ্য করে অনেক সময় আমার ভাবান্তর ঘটেছে। এই সূত্রে বলা ভাল গত এক মাসে হিজিবিজি প্রবন্ধাদি লিখে আমিও সাত হাজার রুবলের কিছু বেশি উপার্জন করেছি। এখনও নানা লোকের ফরমাস মেটাতে বাকি আছে। আমিও মাঝে মাঝে আমার ক্রয়শক্তির পরীক্ষা চালাচ্ছিলুম!

সম্প্রতি একটি বিবাহ অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলুম। আগেকার কালে বিবাহ অথবা বিবাহবিচ্ছেদ ধর্মমন্দিরের সম্মতি ব্যতিরেকে হবার জো ছিল না। সেই ধর্ম-মন্দিরের যিনি যাজক, তিনি অনুষ্ঠানাদি-সহ বিবাহটি রেজেষ্টারী করে নিতেন। এখন রেজেষ্টারী আছে, ধর্মমন্দিরও আছে—কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ নেই। বিবাহ এখন অতি সহজ। আগের দিন সন্ধ্যাকালে যে-যুবকটি কর্মস্থল থেকে ফিরে তার নিজের ঘরটিতে ঢুকল, পরের দিন সকালে পাশের ঘরের লোক দেখতে পেল, সেই ঘরটির থেকেই বেরিয়ে এল হাসামুখী একটি মেয়ে! গতরাত্রে এঘরের যুবকটি যে বিবাহ করেছে, পাশের ঘরের লোক সেটি শোনেনি। এটি

দেখতে পেয়েছি, রুশ ছেলেমেয়েরা বিবাহ করতে পারলে ভারি খুশী। ওরা চায় শান্তিপূর্ণ ঘরসংসার এবং পরিবার। ছেলে অথবা মেয়ে একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই বিবাহ করতে উৎসুক। সুখের ঘর হবে, সাচ্ছল্যে থাকা যাবে, একটি বা দুটি সন্তান থাকবে,—ব্যস, ভবিষ্যতের ভাবনা স্টেটের উপর! একা থাকার যন্ত্রণা অনেক। নিজস্ব একটি ঘর পাওয়া দুষ্কর,—পাঁচজনে মিলে হয়ত একটিমাত্র ঘর, দশজনে মিলে একটি রান্নার কুটুরি, পনেরোজন মিলে একটি ক্ষুদ্র স্নানাগার, বিশজন মিলে হয়ত হট্টগোল! কিন্তু বিবাহ করলে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় একটি এক-কামরা ফ্ল্যাট, একটি রান্না ভাঁড়ারের কুটুরি, একটি স্নানাগার। তখন মোটামুটি স্বাধীনতা। ইদানীং প্রতি পরিবারে সন্তানসংখ্যা কম। তার প্রধান কারণ সম্ভবত দুটি। প্রথম—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জন করতে হয়; দ্বিতীয়—বসবাস এবং আশ্রয়ের অপ্রতুলতা। এ দুটির যে কোনও একটি কারণ যেখানে সমস্যাকীর্ণ,—মেয়েরা সেখানে সন্তানধারণ করতে চায় না! জন্মরোধ এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ-অপসারণ—এ দুটি কাজের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক কানাকানি বা অসম্মান নেই। স্ত্রীলোকরা প্রায়ই সহবাসের অব্যবহিত পরে এক প্রকার তরল ঔষধ ব্যবহার করে, আর নয়ত অসুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সোজা চলে যায় হাসপাতালে। সেখানে অস্ত্রোপচার করার পূর্বে ডাক্তার দু-চারটি সমাজ ও জৈবনীতির কথা বলেন। মেয়েটি যদি তার হিতোপদেশ না শোনে, তবে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে সে থেকে যায়! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি জোর দেওয়া হয় এবং সেখানে ভ্রূণ-অপসারণ আইনসিদ্ধ!

মস্কো এবং অন্যান্য শহরে যথাসম্ভব খোঁজখবর করে দেখেছি, বেশ্যাবৃত্তি ঘৃণ্য এবং ব্যাভিচার অতিশয় নিন্দিত। বারম্বার একই মেয়ে বিবাহবিচ্ছেদ সইবে, কিন্তু উভয়পক্ষের ব্যভিচার কেউ কোনমতেই সইবে না! ওরা সন্দেহ নিয়ে ঘর করবে না, সন্দেহজনক হয়ে উঠলে ঝগড়া করবে না, এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত হলে বরদাস্তও করবে না। ওরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে ঘর করতে চায়। একটি বিষয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলুম। একজন স্ত্রী এসে যদি তার স্বামীকে ডেকে হঠাৎ বলে, দেখো, আমার এই দ্বিতীয় সন্তানটি তোমার নয়, অমুকের—তাহলে স্বামী ছুটে গিয়ে ছুরি-কাটারি খোঁজে না! বরং এইটি বলে, তুমি অমুককে বিবাহ করতে চাও আমাকে ছেড়ে?—মেয়েটি যদি বলে, হ্যাঁ,—তাহলে স্বামী তার পুনর্বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেয়! কিন্তু মেয়েটি যদি তার অপরাধ স্বীকার করে বা ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে বহুক্ষেত্রেই স্বামীটি সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার ক'রে নেয়!

একবার একটি মজলিশে উপস্থিত

ছিলুম। সেখানে পনেরো ষোলজন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেটি বিশেষ শিক্ষিত ও ভদ্র নরনারীর আসর। সবাই মিলে গল্পগুজব এবং আমোদ-আহ্লাদ করার পর যখন ফিরে আসি, তখন জানতে পারলুম, উক্ত আসরে দুতিনটি মহিলার প্রাক্তন স্বামীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, এবং ওইখানেই অমুক ভদ্রলোকটির প্রাক্তন এবং বর্তমান মিলিয়ে তিনজন স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। হয়ত এমন ঘটনা পৃথিবীর বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেদিন সেই মজলিশে সকলের মাঝখানে পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার সদ্ভাব, আন্তরিক সৌজন্য-বিনিময়, মধুর হাসি-পরিহাস এবং সাবলীল বন্ধুত্বভাবটি দেখেছিলুম সেটি স্মরণীয়। সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যের বিষয়টি ছিল এই, একজন নিঃসন্তান মহিলা তাঁর প্রাক্তন স্বামীর বর্তমান স্ত্রীর গর্ভজাত একটি সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য সাদরে গ্রহণ করেছেন! সোভিয়েট ইউনিয়নের অপর একটি নাম 'শিশুদলের আনন্দলোক'! এটি আমি বিশ্বাস করেছি। বালক-বালিকা ও শিশুজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রতিপালন ও সমাদর-ব্যবস্থার যে সর্বব্যাপী আয়োজন দেখেছি, সেটি সত্যই অবিস্মরণীয়। শিশু, স্ত্রীলোক এবং গরু—এই তিন প্রাণী-দলের স্বাস্থ্য যে-দেশে উত্তম, সে-দেশের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই!

সেদিন আমরা এলুম সেই বাড়িতে যেখানে টলস্টয় সপরিবারে বাস করতেন। বাড়ির সামনে একটি অত্যন্ত প্রাচীন আমলের পাথর-বাঁধানো পথ—তার উপর দিয়ে চলেছে সেকেলে ধরণের ময়লা যেমন-তেমন ট্রামগাড়ি, অদূরে ইঁটবারকরা পুরানো আমলের মস্ত এক কারখানা বাড়ি—তার না আছে ছিরি, না ছাঁদ,—সেই পথের ধারেই একটি ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি থেকে নামলুম। ডানহাতি মস্ত এক মাঠের মতো,—সেখানে ঝোপ-ঝাড়, কয়েকটি গাছপালা, আশেপাশে সব ঝুপসি, ওপাশে কাদের যেন আধমরা বাগান। আমরা ঢুকলুম বাঁহাতি এক বারান্দার পাশ দিয়ে। মেরামতের অভাবে পুরনো বারান্দার একটা অংশ ভেঙে ঝুলছে। পরে আমরা শুনলুম, টলস্টয়ের মৃত্যুর পর থেকে এই বাড়িটির পূর্বাবস্থা অবিকলভাবে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

এই উদ্যানভবনটি এখন যে শ্রীহীন বড় রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে, সেটি বর্তমানে টলস্টয়ের নামাঙ্কিত। একদা মোট বিঘাদশেক বাগানসমেত এই বাড়িটি টলস্টয় নিজের নামে কেনেন। তখন তাঁর বয়স ৫৩, সেটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ। সেই বছর তিনি সপরিবারে মস্কোয় আসেন তাঁদের গ্রাম থেকে। টলস্টয়রা ছিলেন সেকালের মস্ত জমিদার, প্রাচীন আমলের আভিজাত্যে তিনি মানুষ। তাঁর উপাধি ছিল 'কাউন্ট'—আমাদের দেশের মহারাজা অমুকের মতো! তাঁর জীবনের ৫০ বছর কেটেছে বিলাস আর সম্ভোগের মধ্যে। অভিজাত নরনারী সমাজের ভিতরে থেকে নৃত্য-গীত-বাদ্য-মদ্য এবং আলস্য-লালস-রসরঙ্গের মধ্যে-চরিত্র-শৈথিল্য নিয়ে তিনি তাঁর সমগ্র তারুণ্য এবং যৌবনকাল আত্মহারা তন্দ্রায় অতিবাহিত করেছেন!

টলস্টয় প্রথম মস্কোতে আসেন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, তখন তাঁর ৯ বছর বয়স। তার পরে এসেছেন কয়েকবার, থেকেছেন নানা জায়গায়। তিনি যৌবনকালের একটা সময় 'ক্রাইমিয়ান ওয়ার' উপলক্ষ্যে 'সেবাস্তপল' নগরীর বীরত্ব-ব্যঞ্জক প্রতিরক্ষার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সেই যুদ্ধ থেকে তিনি বীরের সম্মান নিয়ে ফিরে আসেন। যেদিন তিনি সপরিবারে মস্কোর বাড়িতে এসে উঠলেন সেদিন তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। 'আনা কারেনিনা, ওয়ার এণ্ড পীস, সেবাস্তপলের গল্প' এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থ ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে। এই বাড়িটিতে টলস্টয় ১৯ বছর অবধি প্রতি শীতকালের মাসগুলিতে বাস করতেন। তাঁর জন্মস্থান হল মস্কো থেকে ১২০ মাইল দূরে 'যসনায়া পলিয়ানা' নামক গ্রামে। বিরাশী বছর বয়সে টলস্টয়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর জীবনের মতো এমন কর্মবহুল, দ্বন্দ্ব-দোলায়িত, সমস্যাসমাকীর্ণ এবং এমন পরস্পরবিরোধী রসাশ্রিত জীবন বোধ করি অপর কোনও রুশ প্রতিভার ছিল না। যে-ব্যক্তি আপন পরিবারবর্গের নিকট নিন্দিত, কলঙ্কিত, উপেক্ষিত এবং অতি কঠোর সমালোচনা, বিদ্রূপ ও অনাদরের লক্ষ্য ছিল,—সেই ব্যক্তি আপন দেশ, জাতি, সমাজ ও বৃহত্তর মানব সভ্যতার বিচারে কেমন ক'রে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইল,—এটি ভেবে অনেক সময় অবাক হতে হয়। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি পারিবারিক অশান্তির মধ্যে বাস করেন, এবং স্ত্রীর নিকট তিনি অশ্রদ্ধা ও সন্দেহের পাত্র হয়ে থাকেন। ভারতবর্ষ তাঁকে 'ঋষি' টলস্টয় ব'লে যখন শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, টলস্টয় তখন তাঁর স্ত্রীর ঘৃণা বহন করে চলেছেন! জনৈক রুশ জীবনীকার বলছেন,—"His domestic relations were difficult and strained....The last 30 years of his life abounded in painful clashes between the writer and his family, the majority of whom did not share his views."

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, "It is very difficult for me with my family because I cannot share their feelings. All their joys, examinations, social successes, music, furniture, purchases — all these things I consider to be their misfortune and harmful for them, and I do not know how to tell them. I can and do say so, but no one understands what I say".

টলস্টয় যখন মস্কোয় এসে বাড়ি কিনে বসবাস আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর আটটি সন্তান। সেরগি, তাতিয়ানা, ইলিয়া, লিয়ো, মেরিয়া, আন্দ্রে, মিখাইল এবং আলেক্সি। অর্থাৎ পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ে। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল নাদেজদা রুপসকায়া। স্বামী স্বেচ্ছাচারী, আটটি নাবালক ছেলেমেয়ে, বাড়িটি যথেষ্ট বড় নয়, অবারিত বাইরের লোকের আনাগোনা আর খানাপিনা, বাড়িতে থানা-পুলিশ আর গোয়েন্দার উৎপাত, ছেলে-মেয়েরা কেউ উপযুক্ত লেখাপড়া শিখছে না, চারিদিকে অগোছালো গৃহস্থালী, এলোপাতাড়ি ঘর-কন্নার খরচ, শ্বশুর-বাড়ির অমন অট্টালিকা আর বনবাগান ছেড়ে আসা, শহরের হট্টগোলের মধ্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ, বড় মেয়েটার ঘরে নানান্ লোকের অসংযত আড্ডাবাজি, মেয়ের বাপের সংসার-বৈরাগ্য ও বহির্মুখী মন এবং এই সমস্ত অশান্তি ছেড়ে দিলেও স্বামীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে,—হুঁ,—নাদেজদা অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং ঘৃণায় ও অপমানে তাঁর সর্বশরীর কিলবিল ক'রে উঠত! মস্কোয় তখনও ইলেকট্রিকের প্রচলন হয়নি, শহর তখন প্রাচীন ও জরাজীর্ণ,—সুতরাং নীচের তলায় শোবার ঘরটিতে কেরোসিনের আলোটা জেলে এবং ঘরের কোণে কাঠের আগুন রেখে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নাদেজদা ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে স্বামীকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করতেন! অতঃপর সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে কি প্রকার নাটকীয় দৃশ্য সংঘটিত হত, সেটি বাইরের লোক টের পেত না বটে, তবে দিনমানে নাদেজদা অনেকের সামনে

স্বামীকে ছেড়ে কথা কইতেন না! নাদেজদা সেদিন বোধ করি অনুমান করতে পারেননি, পৃথিবীর সকল দেশের অগণিত নরনারী পরবর্তীকালে তাঁর এই শাদামাটা নীচের তলাকার স্বল্প-পরিসর শয়ন-কক্ষটিকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মনে ক'রে ঘাসের জুতো পায়ে প'রে প্রণাম জানিয়ে যেতে পারে! সেই বিছানা, সেই সামান্য কখানা বই, সেই কেরোসিনের সেজবাতি, ছোট আলমারি, মোমবাতিটা, প্লেট-চামচ-ডিস, চেয়ার-টেবিল-সোফা,—প্রতিটি সামান্য সাধারণ সামগ্রী,—সেই সব অবিকলভাবে সাজানো! রবীন্দ্রনাথ তাঁর মস্কোযাত্রায় এ ঘরটিতে এসেছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু একটি কবিতার চরণে তিনি আগেই লিখে গেছেন, "তোমার চরণস্পর্শে বিশ্ব-ধূলি মলিনতা যায় ভুলি পলকে পলকে,—মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।... তুমি তাই পবিত্র সদাই!"

আমরা নীচে এবং উপরে প্রশস্ত এবং সংকীর্ণ নানা কক্ষে ও করিডরে চলাফেরা করছিলুম। এ বাড়ির পৃথক দোভাষিণীরা আছেন, টলস্টয়ের সমগ্র জীবনেতিহাসটি যাঁদের কণ্ঠস্থ। আমাদের পিছনে-পিছনে রয়েছে গার্ড—যেমন থাকে সব যাদুঘর এবং চিত্রশালায় বা সংরক্ষণ-কক্ষে।—কোনও সামগ্রী স্পর্শ করা এখানে বিধি নয়।

এ বাড়ির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে টলস্টয়ের বৈঠকখানা, তাঁর লেখাপড়ার ঘর, তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা তাতিয়ানার বিশ্রম্ভালাপের ঘর এবং তাঁর সাত বছরের যে ছেলেটি দুরারোগ্য রোগে মারা যায়, সেই খরধারবুদ্ধি এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তানটির লেখাপড়া ও খেলনার সরঞ্জামগুলি যে-ঘরটিতে রক্ষিত, সেই ঘরটি। বস্তুত, সেদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তিকে দেখিনি যিনি তাঁর ভাবাবেগ সংবরণ করতে পেরেছেন! টলস্টয় দাবা খেলতে ভালবাসতেন, সেই দাবার ছকটির উপর তাঁর শেষ খেলার ঘুঁটিগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো। এটি তাঁর বিশ্রম্ভালাপের সুপরিসর কক্ষ. মেঝের উপর পুরু এবং ছবিআঁকা কার্পেটটি পাতা। এ ঘরে এলে বুঝতে পারা যায়, সম্রাটের আমলের কাউণ্টের ঘরে ঢুকেছি! প্রত্যেকটি সুন্দর ডিজাইনের চেয়ারে নধর রঙগীন মখমল আঁটা। ওখানে বসতেন টুর্গেনিভ, এখানায় লেনিন, ওধারে গোর্কি আর শেকভ, ওপাশে লার্মেণ্টভ, তরুণ মায়াকোভস্কি আর পাস্টেরনাক, পিসেমস্কি, স্টানিসলাভস্কি, লিওনিড আন্দ্রিয়েভ, মাক্সিম সিবিরিয়াক ইত্যাদি। জনৈক রুশ লেখক বলছেন,—"For many years Tolstoi's house was a centre of universal attention. Social leaders and scholars, men of letters and students, the peasants of distant regions came to see the great writer there".

টলস্টয়ের বড় মেয়ে ছিলেন শিল্পী ও কাব্যরসিকা। তাঁর সখ ছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভের সমস্ত শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের 'অটোগ্রাফ' সংগ্রহ করা। সেই সুন্দর খাতাখানি আজও সকলকে খুলে দেখানো হয়। তাতিয়ানা ছিলেন পরমা সুন্দরী এবং নৃত্য ও গীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী। সম্রাটের পারিষদ-বর্গের সমাজেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর ছিল। পিতা টলস্টয় যখন আপন প্রাণের গভীর তলদেশের আত্মিক সমস্যাক্রমে দিশাহারা হয়ে মহৎ একটি আদর্শের সন্ধান করছেন, জননী নাদেজদা যখন সন্তানদলের ভবিষ্যৎ হিতাহিত চিন্তায় অসীম বিড়ম্বনার ভিতরে দিনযাপন করছেন, অন্যান্য ভাইবোনেরা চারিদিকে যখন স্বেচ্ছাচারের রাজ্যপাট বসিয়ে হৈ-হট্টগোলে উন্মত্ত, তখন জ্যেষ্ঠকন্যা শ্রীমতী তাতিয়ানা রুশজাতির তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, সাহিত্যোৎসাহী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক ও গায়িকা, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, —এ'দের মাঝখানে ব'সে "প্রসাধনসাধনে চতুরা, জানে সে ঢালিতে সুরা বসনের ভূষণভঙ্গীতে!"

তাতিয়ানার সর্বপ্রকার আচরণে অভিজাত রুশসমাজের বিলাস-ব্যসন, রুচি-প্রকৃতি, রসবোধ, আনন্দোচ্ছলতা, পরম রমণীয়রূপে প্রস্ফুটিত হতো!

টলস্টয়ের লেখাপড়ার ঘরটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর পড়াশুনার টেবিলটি। এটি তিনদিকে বারান্দার মতো রেলিং ঘেরা। উৎকৃষ্ট আখরোট কাঠের তৈরি সেই আমলের। যতদূর মনে পড়ছে এই বৃহৎ সবুজ কাপড়-ঢাকা টেবলের দুদিকে দুইটি দেরাজ। টলস্টয় বা লেনিনের আমলে ফাউণ্টেন পেন-এর প্রচলন হয়নি, তাই সর্বত্রই দোয়াত আর কলম! টেবলের উপর মোমবাতির শেজ। টলস্টয়ের ব্যবহৃত ব্লটিং পেপার, একটি

পেন্সিল, দোয়াত-দান, পেন্সিল-কাটা ছুরি, কাগজ-চাপা, একটি চাবি,—এটা-ওটা, টুকিটাকি! এই টেবলে বসে টলস্টয় একে একে মোট ৯০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটু রোমাঞ্চ আসে সর্বশরীরে যখন শুনি এই ডেস্কে বসেই লেখা হয়েছিল "Ressurrection, Kreutzer Sonata, The Death of Ivan Ilyich, Master and Man, The Living Corpse, What is Art? Reply to Synod! ইত্যাদি।। টেবলটির কাছে চেয়ার-খানা অপেক্ষাকৃত নীচু, কেননা তিনি কাগজপত্রের উপর সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে কাজ করতেন। পড়াশুনার সময় তিনি চশমা ব্যবহার করতেন না। জীবনে যিনি সর্বাপেক্ষা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর কাছের দৃষ্টি ছিল ঝাপসা! অর্থাৎ তাঁর চোখের চশমা ছিল 'শর্ট্-সাইট'-এর। ডেস্কের ধারেই বাগানের দুটি জানলা। টলস্টয় সর্বাপেক্ষা মনোযোগের সঙ্গে এই টেবলে কাজ করতেন সকালের দিকে। কেউ তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাত না। লেখার পর তিনি কাটাকুটি করতেন বিশেষ পরিশ্রমে। তাঁর বিশ্বাস, লেখা যত কাটা যায় তত সুন্দর হয়! একটি দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উঁচুতে পড়বার বা লেখবার একটি ব্যবস্থা রয়েছে। ব'সে ব'সে কোমরে ব্যথা ধরলে এখানে দাঁড়িয়ে লেখবার সুবিধা ছিল। "রেসারেকশন" রচনাকালে এটির বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। "রেসারেকশনের" প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'কোনি' কাহিনী। মাঝে মাঝে অন্যান্য কাজ ক'রে 'রেসারেকশন' বইটি লিখে শেষ করতে তাঁর দশ বছর সময় লেগেছিল। এই গ্রন্থের পান্ডুলিপির ৫১৬২ পৃষ্ঠা এবং এ বইয়ের ১৫০০ শত পৃষ্ঠা প্রুফ এখানে অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

টলস্টয় অনেক রকম কাজে রস খুঁজে পেতেন। যেমন জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটা, মাটি খোঁড়া, জল তোলা, জুতো তৈরি, বরফ কাটা, মোজার কলে চাকরি করা, চাষীর সঙ্গে লাঙ্গল টানা ইত্যাদি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালে তিনি রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, এবং দুর্ভিক্ষের উপর তাঁর রচনাটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশের সম্মতি দিতে নারাজ হন। তাঁর বহুপ্রকার রচনাপ্রকাশের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের সেন্সর বিভাগ ও পুলিশ বহু বছর থেকে বিরোধিতা করছিলেন! টলস্টয়ের আমলে মস্কোবাসীর জীবন ছিল অতি দুর্গত।

রাশিয়ার ধর্মমন্দিরগুলি রুশসম্রাটের স্বৈরাচারের তাঁবেদার ছিল, এবং টলস্টয় নির্মমভাবে ঈশ্বরের এই প্রতিভূ 'গির্জা'-সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা টলস্টয়কে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ থেকে বিতাড়িত করেন এবং তার জন্য দেশের সর্বত্র টলস্টয়ের পক্ষ নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলে। লেনিন লিখেছিলেন, "বেশ, খুব ভাল। কিন্তু এই আচরণের কৈফিয়ৎ তোলা রইল! জনসাধারণ যেদিন গভর্ণমেন্টের আচরণের বিচার করতে বসবে, সেদিন এর হিসাব-নিকাশ হবে বৈকি।"

লেনিনের বিপ্লবের পর এর হিসাব-নিকাশ করতে দেরি হয়নি!

আগাগোড়া সমস্ত বাড়িটি খুঁটিয়ে দেখে যখন বেরিয়ে এলুম, তখন আমার সঙ্গীরা বললেন, আমাদের সকলের হয়ে 'ভিজিটার্স বুক'-এ আপনিই কিছু লিখে দেবেন।—এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। তাঁরা কোথায় যেন সার্কাস দেখতে যাবেন!

কিছু লিখবার আগে আমার সামনে আনা হ'ল কয়েকখানি মূল চিঠিপত্র! দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী ও টলস্টয়ের মধ্যে যে কয়খানি পত্র-বিনিময় হয়েছিল, এগুলি সেই! আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির ধার ক্ষয়ে গেছে বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যে-শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রীতির পরিচয় রয়েছে, সেগুলি আমি মুগ্ধ মনে পাঠ করেছিলুম। গান্ধীজী টলস্টয়কে শিক্ষকের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

আমি খাতায় লিখতে বসলুম বটে, কিন্তু আবেগবিহ্বলতায় আমার হাত কাঁপছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীমতী লিডিয়া। তিনি বোধ করি আমার মানসিক অবস্থা বুঝেই আমার পিঠের উপর দু'-একবার হাত চাপড়ালেন ধীরে ধীরে। লেখাটি যখন শেষ করে উঠলুম, তিনি সেটি সযত্নে পাঠ করলেন। পরে বললেন, কোনও ভারতীয় এমন ক'রে আর কোনও দিন এ খাতায় লেখেননি!

ফটক পেরিয়ে চ'লে আসার আগে লিডিয়া রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন!

এই দিনটির ঠিক সাড়ে দশ মাস পরে একদিন প্রাতরাশের পর বিদুষী দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানা একখানি সুন্দর মোটর এনে বললেন, চলুন যাই—টলস্টয়ের জন্মভূমি, আদি বাসস্থান এবং যেখানটিতে তাঁর দেহ-সমাধিস্থল—সেই 'যশনায়া পলিয়ানা' ঘুরে আসি। মোট দশ থেকে বারো ঘণ্টা লাগবে!

শ্রীমতী লিডিয়াও এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে কিছু আহার্য সামগ্রী নেওয়া হল।

গ্রীষ্মকাল চলে গেছে। এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্রের কাল। মস্কোর আবহ অনিশ্চিত। কদিন ধরেই মেঘ আর অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছিল। রৌদ্র দেখছি আজ। মোটা মোটা ওভারকোট এবং সোয়েটার আমাদের গায়ে। হাত-পা কনকন করছে মস্কোর বাইরে এসে। কিন্তু এটি নাকি শরৎকাল! সকলের গায়ে এগুলি শরত-ঋতুর ওভারকোট! এবার গাছের পাতা ঝরে যাবার দিন আসন্ন, ঠান্ডায় তারা দিনে দিনে শীর্ণ হচ্ছে! মাঠে এবং ময়দানে, বনে-অরণ্যে, গ্রামের পর গ্রামে হরিৎ, রক্তনীল এবং রক্তিম আভা ছড়িয়ে রয়েছে দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ায়, পপলার এবং ওয়ালনাটে, চেরী-বার্চ, ওক, শেগুন-চেনার প্রভৃতির বনে-বনে। এ যেন কোন্ এক নির্জন পৃথক পৃথিবী,—দিগন্তের পর দিগন্ত অন্তহীন অরণ্যবহুল সমতল। এমন মৃন্ময়, সুশ্যাম ও বিশাল শাল্মলীর শোভা কতবার দেখে এসেছি শীতের দিনে মধ্যভারতে, বিন্ধ্যপ্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশের পথে পথে।

বাঁধানো সুন্দর পথ। সোভিয়েট আমলে দেশের প্রত্যেকটি রাজপথকে প্রশস্ততর করা হয়েছে। কিন্তু এই 'মহাদেশ' যে পরিমাণ বৃহৎ, ঠিক সেই পরিমাণে লোকসংখ্যা কম। লোকসংখ্যার স্বল্পতার জন্য কর্মসমস্যা অনেক বেশি। দেশজোড়া বৃহৎ কর্মযজ্ঞ, বৃহত্তর সংগঠন ও নবনির্মাণ,—কিন্তু সে-তুলনায় মানুষ নেই! সুতরাং শুধুমাত্র পুরুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা কেমন করে শুধু ঘর-কন্না নিয়ে থাকবে? বাইরে থেকে তাই ডাক দিয়ে যাচ্ছে, চলে এসো, ছুটে এসো, ছিঁড়ে এসো! সময় বড় কম। হোটেল খোলা আছে, মেয়েপুরুষ সেখানে যা খুশি খাও! 'ক্রেশ' (creche) খোলা আছে, শিশুদেরকে সেখানে নির্ভাবনায় জমা দাও! কিন্তু ব'সে থেকো না, আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়ো না, ব্যক্তিগত কারণের অছিলায় দেশকর্মকে এড়িয়ে যেয়ো না। সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা একে একে ক'রে দিচ্ছি,—এসো, মাঠে নামো, কারখানায় ঢোকো, খনির তলায় নেমে যাও,—যাও সমুদ্রে, অরণ্যে, সাইবেরিয়ায়, তুন্দ্রায় ও তাইগায়, মরুভূমিতে, কামস্কাটকায়, নভায়া জেমলিয়ায়। এখনও ভালো কথায় বলছি, সাবধান, কথায় অবাধ্য হলে জোর ক'রে কাজ

আদায় করব! যা চাও, একে একে সব দেবো! বিশ্বাস কর, সমস্ত দেশের সম্পদ তোমাদেরই! বংশ-পরম্পরায় তোমাদের! এসো,—মেয়েপুরুষ, ইতরভদ্র, নীচু-উ'চু—সবাই একসঙ্গে সকল কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও! মনে রেখ, "আরাম হারাম হ্যায়!"

আমাদের সমস্যার সঙ্গে ওদের মিল কম। ওদের দেশে মেয়েপুরুষ বালক-বালিকা মিলিয়ে যে জনসংখ্যা, আমাদের দেশে কেবলমাত্র পুরুষের সংখ্যা তাই! ওদের চারজন লোকে ইলেকট্রিক যন্ত্রের দ্বারা একশ' গজ রাস্তা এক রাত্রে কাটে, আমাদের দেশে সে-যন্ত্র এলে পুরুষ-সমাজে বেকার-সংখ্যা বাড়ে। ওরা সর্বপ্রকার যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগের দ্বারা একটি ছোটখাটো নগর নির্মাণ করে ছয় মাসে,—সেখানে অল্প লোকের দ্বারা বেশি কাজ মেলে। কিন্তু আমাদের সমস্যা বেশি লোককে কাজ দেওয়া! ওদের দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেই বললেই হয়, কিন্তু আমরা কথায় কথায় বন্যায় ভেসে যাই! ওদের শীতপ্রধান দেশে দশ ঘণ্টা পরিশ্রমেও মেয়েপুরুষ কাবু হয় না, ওদের দেশে আজ ট্র্যাকটর ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু আমাদের চাষ ট্র্যাকটরপ্রধান হয়ে উঠলে কোটি কোটি চাষী বেকার হয়ে ঘুরবে। নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

একশ' কুড়ি মাইল পথ। মোটরে মোটামুটি চার ঘণ্টা লাগে। মস্কো থেকে আমরা দক্ষিণ সমতল ধরে যাচ্ছি। মস্কোর চারিদিক জুড়ে যেমন বহু শত গগনচুম্বী 'ক্রেন' শত শত বৃহৎ ইমারত নির্মাণের কাজে রত, বাইরে এলে সেটি কম চোখে পড়ে। গ্রামে গ্রামে ছবির মতো কাঠের রং-করা বাড়িঘর,—চালাঘর চোখে পড়ে না। দুধারের পার্শ্বপথগুলি অধিকাংশই কাঁচা, এবং সেই পথ ধরে গ্রামের ভিতরে যাওয়াটা যথেষ্ট সুগম নয়। সেখানে অভাব-অনটন, অসুবিধা এবং দুর্যোগ চতুর্দিকেই ছড়ানো আছে,—কিন্তু অবস্থার উন্নতি করার জন্য যে অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টা, সেটি চিত্তাকর্ষক। সমগ্র জাতি যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছে, এমনতরো উদ্দীপনার ভাব। হাজার হাজার গ্রামে জলাভাব, লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়াভাব, বিবিধ প্রকার বস্ত্র, জুতা, এবং বিভিন্ন প্রকার আবশ্যিক সামগ্রীর অভাব,—কিন্তু এ সমস্ত অভাব ঘোচাবার জন্য যে সমস্ত দৃশ্যমান সংগ্রাম দিনের পর দিন পরম আগ্রহে লক্ষ্য করেছি, সেটি আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু যারা কথায় কথায় সোভিয়েট ইউনিয়নকে একুশ কোটি নরনারীর স্বর্গ-রাজ্য বলে প্রচারকার্য করে, তারা প্রকৃত সোভিয়েট ইউনিয়নের খবর পায়নি, আর নয়ত তারা দুর্ভাগ্যক্রমে দুচারটি শহর-সহ 'ক্রেমলীন প্রাসাদগুলি' দেখে বাড়ি ফিরে গেছে! পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রচারপত্রগুলি স্পষ্টত কারণে অতিশয়োক্তিতে ভরা—সেখানে সোভিয়েট-ইংল্যান্ড-আমেরিকার মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য কম,—সেগুলির দ্বারা রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের কাজ হয়ত চলে, কিন্তু সত্য নিরূপণের পক্ষে সেই সকল সম্প্রদায়ের প্রচারপত্র যথেষ্ট বলে মনে করিনে!

প্রচারকার্যের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি, কথায় কথায় আমেরিকার সঙ্গে তার তুলনা! রাশিয়ার বিপুল সাহিত্যসম্ভার নেই আমেরিকায়, কিন্তু আমেরিকার বিপুল বৈজ্ঞানিক সাফল্য নেই রাশিয়ায়! জীবনযাত্রার সর্বব্যাপী মানোন্নয়নকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমেরিকা আড়াইশ' বছর সময় পেয়ে এসেছে, সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়ন মাত্র পেয়েছে আর ক' বছর? সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন কেবলমাত্র তার বৈঠকখানাটি সাজিয়ে বসেছে, আমেরিকা তার অনেক আগে সুসজ্জিত করে রেখেছে তার শোবার ঘর থেকে স্নানাগারটি পর্যন্ত! সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন বলে আমরা তিন বছরে আমেরিকা অপেক্ষা অমুক সামগ্রী পাঁচগুণ বেশি উৎপন্ন করেছি, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে আমেরিকা মাত্র তিনগুণ বেশি উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে,—অতএব আমরা তাদের অপেক্ষা অনেক বেশি যোগ্য; তখন আমি নিজে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে যাই! হিসেব খতিয়ে দেখি, সোভিয়েট ইউনিয়ন তিন বছরে পাঁচগুণ উৎপন্ন বাড়িয়ে যেখানে এক মণ মাংস পেয়েছে, আমেরিকা সেখানে মাত্র তিনগুণ বাড়িয়ে পেয়েছে দেড় মণ মাংস!

প্রচারকার্যের নির্ভুল হিসেব কোনও দেশে মেলে না! শুধু দেখি, আমার

মতো অর্বাচীন ব্যক্তির চোখের সামনে পড়ে থাকে মস্ত এক গোলকধাঁধা!

কিন্তু একটি কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মবহুল আয়ুষ্কাল বছর পঁচিশেকের বেশি নয়। বাকি কুড়িটি বছর গিয়েছে অন্তর্বিরোধে, যুদ্ধে, মড়কে, মন্বন্তরে এবং ভিতরে ও বাহিরে বহিঃশত্রুর জগৎ-জোড়া বিরূপতায়। তার আপন বেষ্টনীর বাইরে পৃথিবী ছিল তার প্রতি নিষ্ঠুর এবং অবিবেচক। কিন্তু এই সমস্ত প্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপন 'মহাদেশকে' এই অল্পকালের মধ্যে সে যে সজ্জায় সাজিয়েছে, যে আভরণে সে ভূষিত করেছে, যে সম্ভাবনা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের পথ সে সমগ্র জগতের সামনে মেলে ধরেছে, সেটাকে শুধু দুটো মৌখিক সুখ্যাতি ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না,—কেননা সর্বাপেক্ষা দুঃস্থ এবং সর্বাপেক্ষা আশাহত একটা বিরাট মানবমণ্ডলী যেখানে আপন পরম মূল্য খুঁজে পেয়েছে, সেখানে একটি অভিনব সভ্যতার উদ্বোধন ঘটেছে, একথা মানতেই হবে! প্রাচ্যলোকেই একদা সর্বব্যাপী করুণার বীজমন্ত্র সঙ্গে নিয়ে সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্য এবং দুর্গতির মধ্যে খৃষ্টান সভ্যতার জন্ম হয়েছিল কোন্ অখ্যাত বেথলেহেমের এক আস্তাবলের পাশে,—কিন্তু আপন রক্তক্ষরণের দ্বারা সে শুচিতা এনেছিল পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগে! কমিউনিজমের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নেরও কোথাও সেই 'করুণাধারের' অপমৃত্যু ঘটেনি! যারা ক্রেমলিনের ভিতরকার প্রাসাদগুলির অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেছে, তা'রা জানে, নাস্তিকাবাদের গর্বে গর্বিত মিঃ খ্রুশ্চভ প্রতিদিন প্রতি সময়ে যে সকল কক্ষ-কক্ষান্তরে সকল কাজের সঙ্গে ছুটোছুটি করেন, সেই কক্ষগুলির দেওয়াল ও ছাদের সীলিংগুলি যীশুখৃষ্ট ও বাইবেলের সমস্ত কাহিনীগুলি সহ অপরূপ চিত্রণে শোভামণ্ডিত হয়ে রয়েছে! ওদের দেশে এখন 'কমিউনিজম' দল বা রাজনীতি কোনটাই নয়, ওটা ওদের ধর্ম, তার ধর্মগুরু হলেন লেনিন—কেননা তিনিই ওই ধর্মের প্রবর্তক, এবং তাঁরই পূজা চলে ওদের ঘরে বাইরে! ওইটেই ওদের 'নিত্যকর্মপদ্ধতি'! ওরা এখন বিশ্বাস করে, খৃষ্টমতবাদের পরিপূরক হল কমিউনিজ্‌! কেননা, ওরা বলে, কমিউনিজম হল "greatest good of the greatest number".

প্রাচীন মধ্যরাশিয়ার টুলা শহর পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। 'উপা' নামক নদীতীরবর্তী এই শহরটি এককালে অস্ত্রশস্ত্র ও চর্মসামগ্রী নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনও আছে। ২৫০ বছর আগে পীটার দি গ্রেট জনৈক ইংরাজ ব্যবসায়ীর সাহায্যে এখানে একটি অস্ত্রনির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি আজও আছে। এই শহর আজও ধাতব বাসন এবং আদারসযুক্ত রুটি প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ যেন লাহোর শহরের একটা অংশ। পুরনো পল্লী, ভিতরে ভিতরে খোয়াভাঙা পথ, এখানে ওখানে বিপণি বেসাতি, মাঝে মাঝে মাথা তুলছে বড় বড় ইমারত, নতুন নতুন রাস্তা, গরীব গৃহস্থ-পল্লী রয়েছে আশে-পাশে, লরী-বোঝাই সব্জিসম্ভার এসে দাঁড়িয়েছে পথের ধারে, পাশ দিয়ে সাইকেল চ'ড়ে বোঁ ক'রে ছুটে যাচ্ছে এক যুবক, শিশুছেলে ধুলোর মধ্যে খেলায় মেতেছে, দোকানে কাজ করছে মোটে রংয়ের মেয়ে,—সমস্তটা জড়িয়ে প্রাচ্যলোকের গন্ধ! এ ছবি আমার চিরদিনের চেনা।

হঠাৎ পিছন পথে দূর থেকে হুইস্‌ল্ বাজল! আমাদের গাড়িখানা থেমে গেল। একটু হাসলেন আমাদের বলিষ্ঠকায় ভদ্র ড্রাইভার। ব্যাপার কি? দেখতে দেখতে একজন মিলিচ্‌ম্যান্ অর্থাৎ পুলিশ অর্থাৎ ট্রাফিক কনস্টেবল আমাদের গাড়ির সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। আমাদের ড্রাইভার সেইপ্রকার মিষ্টহাস্যেই পকেট থেকে তিনটি রুবল বার করে কনস্টেবলের হাতে দিয়ে একটি রসিদ নিলেন! জরিমানা দেওয়া এবং নেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই হাসিমুখ দেখে আমি তৃতীয় পুরুষও হেসে বললুম, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। দুটি মহিলাকে দুপাশে নিয়ে বাগানবাড়ি বেড়াতে গেলে এদেশে কি ঘুষ দিতে হয়?

ভীষণ হেসে উঠলেন দুটি মহিলা! শ্রীমতী অকসানা বললেন, বুঝেছি, অনেকক্ষণ চা খাননি তাই আপনার রাগ! দাঁড়ান দিচ্ছি—

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, তুমি জান না অকসানা, ওঁর অমনি সব বাঁকা-বাঁকা কথার ঠোনা! গা জ্বালা করে কথা শুনলে!

অকসানা খুব হাসলেন। বললেন, না, 'এ সত্যি নয়।—শুনুন, আমাদের ড্রাইভার অন্য একখানা গাড়িকে পাশে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, তাই জরিমানা!

বললুম, কিন্তু পুলিশ ছিল অনেক দূরে, নম্বরও দেখেনি! আমাদের ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে পালাতে পারত!

লিডিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন,—Strange you are! This is Soviet Union, dear friend!

হাসিমুখে অকসানা বললেন, না, এখানে কেউ পালায় না। অবশ্য এখানে পথের শাসন খুব বেশি। পথের উপরে সিগারেটের কুচি, দেশলাইয়ের খালি বাক্স, কিংবা ধরুন কাগজের নুটি—এসব ফেলতে দেখলে পাঁচ রুবল জরিমানা হয়!

প্রশ্ন করলুম, মস্কোতে মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ কি রকম?

অকসানা বললেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে শুনিনি! হয়ে যায় এক-আধটা মধ্যে মাঝে!

তখন ড্রাইভারকে ঠেঙিয়ে মারে না? গাড়ি পোড়ায় না রাস্তার লোক?

শ্রীমতী লিডিয়া অধিকতর উত্তেজিত হলেন। বললেন—no accident is wilfully done, mind you, Sir! Everybody knows it!

হাসিমুখে অকসানা বললেন, নিজের গাড়িতে ড্রাইভার সেই আহত কিংবা মৃত ব্যক্তিকে তুলে নেয়! সবাই এসে সাহায্য করে। এইটিই এখানে নিয়ম।

এর পর দু'একটি সাঁকো এবং সমৃদ্ধ জনপদ ও সুন্দর তরঙ্গায়িত পথ পেরিয়ে একটি অধিত্যকাভূমির পাশে এসে এক নিরিবিলি অঞ্চলে নামলুম। এটি টলস্টয় বংশের আদি বাসস্থান। এটির নাম 'য়শনায়া পলিয়ানা'।

'আউট হাউসের' সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এই মিউজিয়মের ডাইরেক্টর সাহেব। বয়সে প্রবীণ, নম্র এবং বিনীত, টলস্টয়ের বিশেষ অনুরাগী। অমায়িক সৌজন্যের দ্বারা তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে থেকে এই এস্টেটের বিরাটত্ব অনুমান করা যায় না। আমরা দু-একটি ঘরের ভিতর দিয়ে বাগানের ধারে টলস্টয়ের বসত-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিকে বৃহৎ বৃক্ষাদিময় ছায়াঢাকা বন-বাগান। এখানে-ওখানে মালীরা কাজ করছে, জল আনছে, চালাঘরগুলি দেখাশুনা করছে। ডাইরেক্টর বললেন, যা কিছু দেখছেন বা দেখবেন, পঞ্চাশ বছর ধরে সমস্তই অক্ষুন্ন এবং অক্ষত আছে! কোনও সামগ্রী কোথাও

থেকে নড়েনি। আসুন, আগে আপনারা একটু জলযোগ ক'রে নিন।

অদূরে প্রবেশপথের দুপাশে দুটি গোল-গম্বুজওয়ালা পাহারাদারের ঘর। তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে বিশাল বনময় একটি মনোহর জগৎ! সমস্ত চেহারাটাই যেন টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের বিশালতার সঙ্গে মেল'নো। তিনি মস্কোয় থাকতেন শীতের কয় মাস,—বরফ গলতে আরম্ভ করলেই তিনি পল্লী-প্রকৃতির আকর্ষণে এখানে চলে আসতেন। এই ব্যবস্থা ছিল প্রতি বছর। তাঁর স্বাস্থ্যশ্রী এবং দৈহিক শক্তি ছিল অপরিসীম। এই একশ' কুড়ি মাইল পথ তিনি বহুবার পায়ে হেঁটে এসেছেন! পথের দুপাশে চাষীদের ঘরে রাত কাটাতেন। সাহিত্যের জগতে এত বড় 'দানব' আর কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। সামনে দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ বৃক্ষ-জটলার তলা দিয়ে সুপ্রশস্ত পথ বহুদূরে চলে গেছে। এধারে পুষ্পোদ্যান, ওধারে পশুপক্ষী পালনের ঘর, আস্তাবল,—এবং বড় বড় গাছপালা যা কিছু দেখছি, সমস্তই টলস্টয়ের নিজের হাতে পোঁতা। তাঁর সন্তানসংখ্যা মোট তেরোটি! পাঁচটি মারা যাবার পর ছিল আটটি। এখন একটিও নেই। বড় ছেলে সেগি ৮৫ বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন! ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনিও মারা যান। এখনও জীবিত আছেন একটি পৌত্র, তিনি বর্তমানে মস্কোর অধ্যাপক। টলস্টয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ৪৮ বছর ধ'রে ঘর করেছিলেন। তাঁর এই 'এস্টেট' প্রায় এক হাজার বিঘা জমির ওপর। এরই এক প্রান্তে অরণ্যভূমির সংলগ্ন একটি টিলা পাহাড় চোখে পড়ছে। এই এস্টেটে বসেই তিনি একদা 'আনা কারেনিনা' রচনা করেছিলেন। টলস্টয়ের জীবিতকালেই তাঁকে দর্শন করার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ থেকে অভ্যাগতরা এখানে আসতেন। এখানকার আশপাশে কয়েকটি গ্রাম টলস্টয়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তিনি সেখানে অবৈতনিক পাঠশালা বসিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন, তাদের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেন, রোগভোগে ঔষধপত্র এবং খাদ্যসামগ্রী পাঠাতেন।

বড় জমিদারবাড়ির ভিতর-মহলের সম্পদ ও বৈভবের চেহারা বোধহয় সর্বত্রই এক। এই সমস্ত বিলাস-বৈভবসজ্জা ও ভোগের সহস্রবিধ উপকরণ ছেড়ে গিয়ে মস্কোর বাড়ির নীচেরতলার ঘরখানা শুধু তাঁর স্ত্রীর কেন—জগতের কোনও স্ত্রীরই ভাল লাগার কথা নয়! সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিসম্বাদের অন্যতম কারণটি বুঝি বৈ কি। ভোগবিলাসী পুরুষ সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এর উদাহরণ ভারতের মতো অনেক দেশেই হয়ত আছে। কিন্তু সেই পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রীও সব ছেড়ে ভৈরবী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এমনটি শোনা যায় কম। মেয়েরা সন্তানকে ফেলে পালাতে সহজে চায় না, কিন্তু পুরুষ এক সময় সন্তানকেও স্বীকার করে না। মহৎ শিল্পীর চরিত্রের সঙ্গে যে বহুপ্রকার খেয়াল-খুশির দুরন্তপনা অনেক সময় জড়িয়ে থাকে, এবং সে যে একইকালে মহানুভবতায়, ক্ষুদ্রতায়, উদারতায়, হিংসায়, বেদনায়, কামনায়, ভালবাসায়, কপটতায়, দুঃখে ও বেদনায়, ত্যাগে ও সম্ভোগে, ঘৃণায় ও মমতায়—সে যে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতে পারে,—এই বিবেচনার অবকাশ ও ধৈর্য যদি টলস্টয়ের স্ত্রী খুঁজে না পেয়ে থাকেন, সেটি তাঁর অন্যায় নয়! মহৎ শিল্পী হলেন পরম রসস্রষ্টা,—তাঁর পথ এবং মত, জাত এবং ধাত সমস্তই সাধারণের বাইরে। শিল্পী-স্বামীকে স্ত্রীও চেনে না, শিল্পী-স্ত্রীকে স্বামীও জানে না! দুটি দেহ থাকে এক বিছানায়, কিন্তু দুটি মন দুই আকাশে বিবাগী ভ্রমরের মতো অজানার অন্বেষণে ঘোরে। আত্মার গভীর সেই অতৃপ্তি টলস্টয়কে পেয়ে বসেছিল তাঁর প্রবীণ বয়সে। স্ত্রী, সন্তান, সংসার, সম্ভোগ, সম্পদ্ কোনও কিছুতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। সেইজন্য সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করেছিল দুখানি গ্রন্থ তাঁর প্রৌঢ় জীবনে। সে দুখানি বই সামনেই সাজানো রয়েছে। পেন্সিলের দাগ দিয়ে-দিয়ে এ দুখানি বই আগাগোড়া তিনি সযত্নে পাঠ করেছিলেন। প্রথম বইখানি: "গৌতম বুদ্ধ, তাঁর জীবন, প্রচার, এবং ভিক্ষু সঙ্ঘ।" এই বইখানি জার্মান ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন স্বর্গত অল্ডেনবার্গ। এক এক জায়গায় দাগ কেটে টলস্টয় আবার তার পাশে নম্বর টুকেছেন! অপর বইখানির ইংরেজি নাম: "দক্ষিণ আফ্রিকায় জনৈক ভারতীয় দেশপ্রেমিক।" এ বইখানি রচনা করেছেন Joseph J Doke, Baptist Minister, Johannesburg, with an introduction by Lord Ampthill, G.C.S.I., G.C.I.E., K.C. Published by the London Indian Chronicle, 164, High Road, London.

বইখানি ইংরেজি, এবং মলাটের উপর গান্ধীজির একখানি ছবি! এই দুখানি বইয়ের কাছাকাছিই রয়েছে একখানি 'পবিত্র কোরান'। টলস্টয়কে চিনতে দেরি হয় না!

যে প্রশস্ত কালোবর্ণ গদিআঁটা সোফার উপর টলস্টয় 'ভূমিষ্ঠ' হয়েছিলেন সেটি সামনেই রয়েছে। আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হল, সোভিয়েট আমলে কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরই মোট ৮১টি ভাষায় টলস্টয়ের ৯০ খানি গ্রন্থের সবসুদ্ধ ৮ কোটি ৬০ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে! টলস্টয় নিজ মাতৃভাষা ছাড়া ১৩টি ইউরোপীয় ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারতেন! ডিকেন্স-এর বই তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু সঙ্গীত ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাঁর ড্রয়িংরুমে দুটি মূল্যবান পিয়ানো রয়েছে। কোথায় ভোজের বা নাচের আসর, কোথায় নিভৃত নিকেতনের "পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কন, ভগ্ন প্রাসাদের কোনে, মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে, কাঁদায় রে নিশার গগন।"—তাও এ অট্টালিকার ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। তাঁর সাহিত্যসাধনার কক্ষটিতে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কে পি এস মেনন একখানি বড় গান্ধীজির ছবি সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন!

একদিকে তদানীন্তন রুশ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম, জমিদারগোষ্ঠির বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা, দেশকল্যাণ-কর্মপথে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, সমাজজীবনের অশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞান, রক্ষণশীলতা, গির্জাধর্ম, ইত্যাদির বিপক্ষে তাঁর নিষ্ঠুর আক্রমণ,—এবং এদেরই সঙ্গে তাঁর পারিবারিক জীবনের ভয়াবহ অশান্তি ও গৃহকলহ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর মানসিক আতঙ্ক, তাঁর কণ্টকাকীর্ণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা,—এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষ যেন বনস্পতির মতো আপন শাখাপ্রশাখায়, পত্রে-পল্লবে, শিরা-উপশিরায় সবগুলিকে ধারণ করেছিলেন!

এখানে নানা কক্ষে প্রমাণ রয়েছে, ভারতকে উত্তমরূপে জানবার জন্য টলস্টয়ের ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর। ভারতের বেদ বেদান্ত উপনিষদ্, ভারতের সমাজ-জীবন, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভারতের জ্ঞান ও দর্শন, এগুলি বিশেষভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত বলেই তিনি বহু বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পত্রবিনিময় করতেন। একবার একজন

রুশ মহিলা, শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা করসিনি ভারতের বহু অঞ্চল ভ্রমণ করে ফিরে যান আপন দেশে। সেটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ, টলষ্টয়ের মৃত্যুর পূর্ব বৎসর। টলষ্টয় সেই মহিলাকে আমন্ত্রণ করে 'যশনায়া পলিয়ানায়' নিয়ে আসেন এবং তাঁর মুখে ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী শোনবার আগে টলষ্টয় আশপাশের গ্রামের যেখানে যত বালক-বালিকা ছিল, তাদেরকে ডেকে এনে সেই মস্ত আসরে জড়ো করেন। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা যখন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন, এবং ভারতবর্ষে তোলা তাঁর ছবিগুলি ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে পর্দার উপর প্রতিফলিত ক'রে একটির পর একটি দেখাতে থাকেন, তখন টলষ্টয় প্রমুখ সেই সংখ্যাতীত বালকবালিকা মুগ্ধ বিস্ময়ে এক অপরূপ আশ্চর্য পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে! একদা রুশসাম্রাজ্যের অগণিত অধিবাসী ভারতবর্ষকে জানবার জন্য কিরূপ উদ্‌গ্রীব ছিল, তার পরিচয় যেমন সযত্নে রক্ষিত আছে বহু যাদুঘরে, তেমনি এই টলষ্টয়ের বসতবাড়িতেও সেগুলি যেন চারিদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট আমলে সেই পরিচয়কে সুনিবিড় ক'রে তোলবার একটি সর্বব্যাপী আয়োজন চলছে। পশ্চিমকে আমরা জানি বহুকাল থেকে। তাদের নাড়িনক্ষত্র জানি, হাঁচি কাসি চিনি,—বোধ হয় তাদের সঙ্গে আত্মিক যোগটাও ঘনিষ্ঠতর। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-নীতি, ধর্ম, রাষ্ট্রদর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃতি,—এদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের প্রচুর। ইংরেজ, আমেরিকান, রুশ,—এই তিন ব্যক্তি আজও যদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমরা হয়ত ইংরেজ-আমেরিকান দুটির সঙ্গেই বেশি গল্প করি! কিন্তু এটি দেখতে পাচ্ছি সেই প্রাচীন রুশসাম্রাজ্য, যেটি আজকের দিনে নাম পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন—(যাকে বলা হচ্ছে "ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক", এবং যার মূল নাম হল, "সোইউজ্ সোভেট-সকিখ্ সোৎসিয়ালিসটিচেসকিখ্ রেস-পুবলিক্" রুশভাষায় ইংরেজি "S" অক্ষরটি "C"-রূপে ব্যবহার করা হয়, এবং "P" অক্ষরটি "R" হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র পতাকায় "CCCP" এই ক'টি অক্ষর "কাস্তে-হাতুড়ির" সঙ্গে মিলিয়ে থাকে), এবং যেটি এককালে ছিল "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এম্‌পায়ার" যেটির বর্তমান নাম "ইণ্ডিয়ান সভারেন্ ডিমক্রাটিক রিপাবলিক"—সেই দুই বৃহৎ প্রাচ্য-ভূখণ্ড আজও পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত এবং অপরিচিত! উভয় রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধিগণের মধ্যে আদানপ্রদান ও আনাগোনার দ্বারা যে-সংযোগটি সম্ভব হয়, তার ফলে একজন কেনে জুতো, অন্যজন কেনে তেল; একজন পাঠায় পশম কিংবা চা, অন্যজন পাঠায় মেসিন কিংবা পাইপ। সংস্কৃতির দিক থেকে একপক্ষ পাঠায় সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে, অন্যপক্ষ পাঠায় হয়ত বা একদল নাচিয়ে-গাইয়ে। উজবেক কবি শ্রীমতী জুলফিয়া, এবং উক্রাইনের নাট্যকার মিন্‌কো ও কবি গ্রেগরী প্রমুখ দুচারজন সাহিত্যকর্মী অতি অল্পকালের জন্য ভারতে এসেছিলেন, এটি উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বছর আগে দুজন বাঙালী বিপ্লববাদী লেনিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা দুজনেই কৃতবিদ্য লেখক। একজন মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এবং অন্যজন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এম-এন-রায় মহাশয় আমাকে তাঁর জীবনের নানাবিধ ঘটনাবলীর একটি মোটামুটি তালিকা, তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপন্থার একটি ইতিহাস এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ আমার কাছে গচ্ছিত করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমি তাঁর একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নের ফলে সেটি আর হয়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য তাঁর সেই জীবনের বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর প্রতি কিছু অনুরক্ত ছিলুম। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষা আমার নিকট শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। ছোটবেলায় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের রাজনীতিক ও বৈপ্লবিক কার্যাবলী এবং রুশসাম্রাজ্যে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান বৃত্তান্ত আমাদের অনেকের পক্ষে গভীর ঔৎসুক্যের কারণ ঘটিয়েছিল!

টলষ্টয়ের বাড়ির উপরতলা থেকে নামবার সময় দেখি, একখানা ছবিতে তিনি দুটি বলদের সাহায্যে লাঙলের দ্বারা একটি মাঠে চাষের কাজে রত! ডাইরেক্টর সাহেব বললেন, ওই ক্ষেতটুকু ছিল এক অতি বৃদ্ধা বিধবা চাষী স্ত্রীলোকের। দুনিয়ায় তার কেউ ছিল না। কিন্তু ওই জমিটুকু চাষ না করলে তার শেষ জীবনে অন্নবস্ত্রও জুটবে না! কাউন্ট লিও টলষ্টয় বৃদ্ধার সেই জীবন-মরণ সমস্যা বিবেচনা করে এবং আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের ব্যঙ্গবিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে নিয়মিতভাবে ওই বৃদ্ধার জমিটুকুতে কাজ করতেন!

বেলা পড়ে এল। এবার বিদায় নিতে হবে। বার্চ, ওক, চেরী, ওয়ালনাট এবং পপলারের ঘন অরণ্যজটলার মধ্যে দিনান্তের রক্তিম সূর্যের রঙ্গীন বর্ণমালা ঝিলমিল করছিল। ঋষি টলষ্টয়ের সমাধিস্থলটি দর্শন করে যাবার জন্য আমরা তিনজন সেই বাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হাঁটতে এসে থমকে দাঁড়ালুম একটি ছায়াচ্ছন্ন বীথির প্রান্তে। পাশেই একটি বনময় জলধারা প্রবাহিত। গাছে গাছে নতুন-কালের পাখীরা দিনান্তের কাকলী কলরবে মুখর হয়েছিল। ঝিল্লীরব শুনছি আশেপাশে। আমরা তিনজনে স্তব্ধ, চরাচর চারিদিকে নীরব! আমি ভাবছিলুম টলষ্টয়ের সেই সুন্দর ছোট গল্পটি,—ভূ-সম্পত্তির লোভে একটি মানুষ সারাদিন ধরে ছুটতে ছুটতে জমি অধিকার করল অনেকখানি। কিন্তু অপরিসীম ক্লান্তিতে সন্ধ্যাবেলায় যেখানে পড়ে সে মারা গেল, সেই জায়গাটুকুর পরিমাপ হল মাত্র সাড়ে তিন হাত।

টলষ্টয় বলে গিয়েছিলেন, এই বীথিকার ঠিক এই সংযোগস্থলে মর্মরিত

জলাশয়টির ঠিক ধারে,—যেখানে মাঝে মাঝে শরতের সোনার বর্ণ পতঙ্গের গুঞ্জনগান গুনগুনিয়ে যায়—ঠিক সেইখানে কোমল মৃত্তিকার একটু ভিতরে যেন তাঁর দেহটিকে রাখা হয়! তাই হয়েছে। তাঁর নিষেধ ছিল, কোনও প্রকার সমাধি মন্দির না ওঠে তাঁর দেহের উপর। মৃত্তিকাই হবে তাঁর আস্তরণ, শ্বেততুষার হবে তাঁর আবরণ! তাই হয়েছে। শুধু তাঁর মৃত্তিকার চারিপাশে রয়েছে কয়েকটি নামহারা অরণ্যপুষ্প! এটি যেন যুগান্তের বরণমাল্য!

মহিলা দুটি স্তব্ধ, অকম্প। শ্রীমতী লিডিয়ার দুটি চোখ বেয়ে জল নেমেছে!

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে সন্ধ্যার দিকে একটি পারিবারিক বচসা বাধে এবং সেটি মনোমালিন্যের আকার নেয়। টলষ্টয়ের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন বৃদ্ধ ডাঃ মাকোভিৎস্কি। তিনি টলষ্টয়ের বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন। টলষ্টয় সেই রাত্রেই নিঃশব্দে মস্কোর বাড়ি ছেড়ে মাকোভিৎস্কিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে চলে যান্। যাবার আগে তাঁর ঘরেতেই স্ত্রীর জন্য কয়েকছত্র চিঠি রেখে যান্। সেই চিঠির বক্তব্য, "আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেন কোনও প্রকার চেষ্টা করা না হয়!" সেই রাত্রে ঘন অন্ধকার আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হচ্ছিল। তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়নি!

মধ্যরাশিয়ায় কোথায় যেন তাঁর এক বৃদ্ধা ভগ্নী মরণোন্মুখ হয়েছিলেন। টলষ্টয় তাঁকে দেখতে যান সেখানে 'শামার্দিন' নামক এক নার্সারিতে। সেই ভগ্নীর অবস্থার কি পরিণাম দাঁড়াল জানিনে, কিন্তু টলষ্টয় সেখান থেকে ফিরবার পথে ২রা নবেম্বর তারিখে ট্রেণের একখানি অতিদরিদ্র তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বোধকরি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন, এবং মাকোভিৎস্কি তাঁকে ধরাধরি ক'রে পল্লীগ্রামের যে-ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে নামাতে বাধ্য হন তার নাম "অস্টাপভো"। এই ষ্টেশনের ক্ষুদ্র যাত্রীশালার মেঝের উপর ৮২ বছরের বৃদ্ধ 'পশুরাজকে' শুইয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মাকোভিৎস্কি তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেননি। পরবর্তী ৭ই নবেম্বর তারিখে টলষ্টয়ের মৃত্যু ঘটে! সোভিয়েট আমলে এই ষ্টেশনটির নামকরণ করা হয়, "লিও টলষ্টয়"। এর চারিদিকে চাষীগ্রাম। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল হতভাগ্য, দরিদ্র, পরপদদলিত চাষীসমাজ। তার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যারা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিল হাজারে হাজারে এবং লাখে লাখে, তারা সেই চিরকালের হতভাগ্য, চিরবঞ্চিত সর্বহারার দল!

এই দিনটির সাত বছর পরে মস্কোর তিথি অনুসারে ঠিক ৭ই নবেম্বর তারিখে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বলশেভিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়, এবং লেনিন ক্ষমতালাভ করেন!

সেদিন ফিরে এসে অনেকরাত্রে 'উক্রাইনা' হোটেলের নিচের তলায় বসে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন,—am a non-believer! কিন্তু আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

তাঁকে যখন জানালুম, এ ধরণের প্রশ্ন আমার মনে ওঠে না, এবং প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যেই ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার কথা তুললেন, তা হলে পূজা কি, নৈবেদ্য কী? পরম লক্ষ্য কী?

এ সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে, এটি তাঁকে আমি স্পষ্টই জানালুম। কিন্তু অপরাহ্নকালে টলষ্টয়ের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে এক সময় সহসা তাঁর চোখে জল দেখেছিলুম—বোধ হয় সেইটির সূত্র ধরেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মহৎপ্রাণের জন্য কান্না আসে, কেন বলুন ত?

রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার কয়েকছত্র অনুবাদ ক'রে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা পেলুম, চোখের জলই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পূজা!

But what about the offerings to your god?

জবাব দিলুম, জানিনে। তবে অনেকে বলে, হৃদয় হল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য!

And you told me, knowledge is supreme in human life?

এই গোঁড়া কমিউনিষ্ট নারীর দিকে চেয়ে বললুম, কি বলেছিলুম আমার মনে নেই। কথার ফাঁসে আমি পড়তে চাইনে। তবে শুনেছি এ Knowledge অন্য। সব টেকনোলজির বাইরে! সোভিয়েট শাস্ত্রে এগুলো বোধ হয় নেই!

You are always very rude! Please do tell me, what is that thing!

বললুম, ম্যাডাম, অধ্যাত্ম চর্চার জন্য আপনাদের দেশে আসিনি। ওটা আমার জানাও নেই! তবে ওটা thing নয়, বোধ হয় কিছু একটা feeling। অনেকে বলে, realisation!

You mean, that is beyond the dialectic materialism?

আমি জানিনে।

শ্রীমতী এবার বোধ হয় একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অনুযোগ জানিয়ে ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, আপনি কোনও প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে চান না। কিন্তু একটা জটিল সংশয় তুলে রেখে যান্। সোভিয়েট নাগরিক কোনও বস্তুর সম্বন্ধে সংশয় পছন্দ করে না। সত্য আমাদের সামনে নির্ভুল স্পষ্ট হোক এই আমরা চাই।—Do you think you like the role of a snake-charmer?

রাত একটা বাজতে চলল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাসলুম। বললুম, আমার ঘাড়ে নালিশ নাই চাপালেন! আমার ধারণা, সোভিয়েট মেয়েরা সাপ নয়!

You think, or you believe?

দুজনেই হেসে উঠে বিদায় নিলুম। অতঃপর একদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে খোঁটা দিয়ে বলেছিলেন, You do not know how your expressions affect me and where they strike. But I hold you responsible for many of my sleepless nights!

(ক্রমশঃ)

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিদিন সকালবেলা প্রেস খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহাদুর এসে পড়ে। অন্য সকলের কাজ শুরু হবার আগে তাকে অনেক কিছু করতে হয়—প্রেস-মাস্টারের টেবিলটা ঝেড়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, সেদিনকার 'জব'গুলোর লিস্টিকরা, কাকে কি 'টাস্ক' দিতে হবে ঠিক করা, কোন 'ম্যাটারটা' মেসিনে চড়াতে হবে, কোন অর্ডারটা আগে 'কম্পোজে' যাবে, কোন কোন 'প্রুফ'গুলো দেখা হয়নি—ইত্যাদি। প্রায় সবই প্রেস-মাস্টারের কাজ; তারই করবার কথা, কিন্তু বিনোদবাবু প্রতিটি খুঁটিনাটি বাহাদুরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন। এ সব বিষয়ে সেও রীতিমত ওয়াকিফহাল। আফিসের বাবুরা তা জানেন। সাহেবেরও অজানা নেই। তাই অনেক সময় প্রেস সম্পর্কে হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে তাঁর কাছেও বাহাদুরের ডাক পড়ে।

আজ বাহাদুর অনুপস্থিত। ব্যাপারটা কারোই নজর এড়াবার কথা নয়। ছেলেমহলে এই নিয়ে কানাঘুষা শুরু হল, যদিও কি ঘটেছে, তার সঠিক খবর কারো জানা নেই। কিছুক্ষণ পরে বিনোদবাবু এলেন; অন্যদিন এর আগেই এসে পড়েন। আজকের এই দেরি এবং তার মুখের ঐ থমথমে ভাব—দুটোর সঙ্গেই যে বাহাদুরের যোগ আছে, বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। দিলীপকে তিনি একটু বিশেষ সুনজরে দেখেন। ছেলেরা তা জানত। তাই তাদের মধ্যে যারা একটু বেশী উৎসাহী, মাস্টারের কাছ থেকে রহস্যটা ভেদ করবার জন্যে ওকেই এসে চেপে ধরল। ওর নিজের আগ্রহও কম ছিল না। আস্তে আস্তে বিনোদবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এবং তিনি চোখ তুলতেই জিজ্ঞাসা করল, বাহাদুরদা আসেনি কেন, স্যর?

—সে আসবে না, গম্ভীর ভাবে বললেন বিনোদবাবু।

—আসবে না! কেন?

—তাকে বাইরের 'বাগান দফায়' 'পাশ' করা হয়েছে। যাও, কাজ করোগে। যেটা না পারবে আমাকে দেখিয়ে নিও।

কথাটা সকলেরই কানে গেল, এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় থ' হয়ে বসে রইল। সেই মুহূর্তে কাজ করবার মত মনের অবস্থা কারোই ছিল না। দিলীপও ফিরে এসে বসল তার ছোট্ট টুলটার উপর। জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল কেন তাকে বাগানে যেতে হয়েছে, কিন্তু মাস্টারের কথা শুনে বুঝল তিনি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চান না।

ব্যান্ড-মাস্টারের মেয়ের বয়স চৌদ্দ-পনর। তার কাছে একটি কুড়ি-একুশ বছরের বর্স্টাল বয়'-এর গোপন আনা-গোনা! আইন ভঙ্গের প্রশ্ন তো রয়েছেই, তাছাড়া নৈতিক দিক থেকে এটা আরো গুরুতর। যে-প্রশাসনিক শৈথিল্য এর জন্যে দায়ী তার গুরুত্বও কম নয়। আইন অনুযায়ী চলতে গেলে, অর্থাৎ যাকে বলে 'অফিসিয়াল অ্যাকসন' নিতে হলে জল অনেক দূর গড়াবে, এবং এ-ব্যাপারে সাক্ষাৎ ভাবে যারা জড়িত, তারা ছাড়াও আরো অনেকে জড়িয়ে পড়বে। দুর্নামের পাল্লা হেড-আফিস পর্যন্ত ধাওয়া না করে ছাড়বে না। তার জেরও সহজে মিটবার নয়। সব দিক বিবেচনা করে এবং হয়তো ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তৃমহলে ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই সিদ্ধান্ত হল। কাজ ও স্বভাবের গুণে বাহাদুর সকলেরই প্রিয়পাত্র। তার উপরে গেটী অফিসার-মহলে তার প্রচুর প্রভাব। দ্বিপ্রাহরিক বিরামের ফাঁকে গেটকীপারের সাহায্যে কিংবা তার চোখে ধুলো দিয়ে আবার পাছে সে গেট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ব্যান্ড-মাস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়, তাই ডেপুটি সুপার তাকে বাইরের বাগানে অর্থাৎ জেলের পেছনে বেশ খানিকটা দূরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বাগানে যারা কাজ করে, মাঝখানে খাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রায় সারা দিনটা তাদের সেখানেই কাটাতে হয়। তার উপরে বাগানী সিপাইটিও বেশ কড়া। বিশেষ করে বাহাদুরের বেলায় রীতিমত হুঁশিয়ার থাকবার জন্যে ডেপুটিবাবু তাকে গোপন নির্দেশ দিলেন।

পরোক্ষভাবে বাহাদুরের খানিকটা শাস্তিও হল। সে শুধু 'স্টার' নয়, 'স্পেশাল স্টার'; লেখাপড়া জানে; প্রেসের কাজে যে সম্মান ছিল, বাগানে তা নেই; জেলের মধ্যে যে অবাধ গতি-বিধির অধিকার ছিল, বাইরে গিয়ে তার অনেকখানি খর্ব হল। ছেলেদের চোখে সে বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গেল।

খাবার 'ফাইলে' বাহাদুরের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হতেই দিলীপ সঙ্গেসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। কেমন একটা লজ্জা ও সংকোচ যেন তার মাথাটাকে নুইয়ে দিল। তার সঙ্গে কিসের খানিকটা অভিমান। এই পাহাড়ী ছেলেটাকে সে এরই মধ্যে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছিল। তার কোনো বড় ভাই নেই। যদি থাকত তাকেও হয়তো এই চোখেই দেখত। এ কী করেছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই পর্যন্ত জানে, কাজটা ভাল নয়।

ভাল, মন্দ যাই হোক, সকলের আগে তারই কি জানবার অধিকার ছিল না? কিন্তু বাহাদুর তাকে কিছুই বলেনি। এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

খাবার পর, ভিড়ের হাত এড়িয়ে দেবদারু বীথিকার ধার দিয়ে দিলীপ বিষণ্ণ মনে একা একা একটু ফাঁকার দিকে যাচ্ছিল; পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। বাহাদুর এগিয়ে এসে ওর পিঠের উপর হাত রেখে মৃদু হেসে বলল, কি রে? আমার ওপর রাগ করেছিস?

দিলীপ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'তোমার নামে ওরা কী সব যা-তা বলছে, বাহাদুরদা।' বলতে বলতে চোখদুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল। সেটা লুকোবার জন্যে মাথা নীচু করে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বাহাদুরের মুখের উপর থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ম্লান ছায়া। দূরে মাঠের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, বলুক গে। তুই কোনো জবাব করিসনে। একটু ফুরসৎ পেলেই সব তোকে জানাবো।

গেটের পাশ থেকে বাগানী সিপাই-এর হাঁক-ডাক শোনা গেল—'এই, কোথায় গেলি রে তোরা?' বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, এখন চলি। কেমন?

বাগানে তখন পুরো মরশুম চলছে। 'দফা' নিয়ে ফিরতে রোজই দেরি হয় বাগানীর। ঐদিন এল প্রায় সন্ধ্যার মুখে। অন্য সব ছেলেরা তার আগেই খেয়ে নিয়েছে। ব্যারাকের সামনে খোলা মাঠে "সিনেমা" অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ দেখানো হবে। সকলের মুখেই উত্তেজনা। সেই কিম্ভূত যন্ত্রটা এসে গেছে। ছোট-বড় সবাই সেখানে ভিড় জমিয়ে কলরব করছে। আর কোনো দিকে কারো নজর নেই। পেটী অফিসাররাও ওদের সামলাতে ব্যস্ত। বাগানের ছেলেরা কোনো রকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে নিয়ে ছুটে এসে দলে ভিড়ে গেল। দিলীপের চোখদুটো বাহাদুরকে খুঁজছিল, ইচ্ছা ছিল তার কাছে গিয়ে বসবে, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। তারপর ছবি শুরু হতেই আর কিছু মনে রইল না। বাহাদুর তো তুচ্ছ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রইল শুধু একখানা সাদা রং-এর পরদা এবং তার উপরে একটি রূপকথার চলমান জগৎ। বসন্তের টিকা না নিলে কী বিপদ ঘটে, কুইনাইন না খেলে একটা ছোট্ট মশা কী কাণ্ড বাধায়—এই সব দরকারী তথ্য নিয়ে ছবি। পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক লম্বা লাঠির ছুঁচলো ডগা দিয়ে সেইগুলোই দেখাচ্ছিলেন এবং সেই সঙ্গে চলেছিল তার অনর্গল বক্তৃতা। দিলীপের কানে তার একটি বর্ণও যায়নি। মুগ্ধ চক্ষু মেলে সে শুধু দেখছিল; তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল ঐ দ্রুত অপসৃয়মান ছবিগুলোর মধ্যে। কে জানত এত বিস্ময়ও ছিল পৃথিবীতে!

এক সময়ে সব শেষ হয়ে গেল। পেছনে দাঁড় করানো যাদুযন্ত্রটা এতক্ষণ ধরে যে একটানা শব্দ করে চলেছিল, সেটা হঠাৎ থেমে গেল, ভদ্রলোক তার বক্তৃতা থামিয়ে লাঠি নিয়ে সরে গেলেন। দিলীপ তখনো সেই রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করছে। সহসা যেন কোন রূঢ় আঘাতে স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠল। ভারী রাগ হল ঐ ভদ্রলোকের উপর। এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন, আর একটু দেখাতে পারলেন না!

সকলের মুখেই 'সিনেমা'র তারিফ, কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস। তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে চীফ অফিসারের হাঁক-ডাক। সবাই গিয়ে এবার লাইন করে দাঁড়াতে হবে ব্যারাকের সামনে। সেখানে এক-দুই-তিন করে 'গুণতি' মেলানো হবে। তারপর যে যার ঘরে ঢুকে যাবে। ঠিক সংখ্যাটা যতক্ষণ না মেলে, কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা কাটে না, বিশেষ করে যেদিন সিনেমা দেখানো হয়। গেট খোলা থাকে, 'স্টাফ'-এর ছেলেমেয়েরা অবাধে আসতে পায়, তাদের বন্ধুরাও ভিড় করে। সাহেবের হুকুম আছে। ডেপুটি সুপার আইনের দিক থেকে আপত্তি করেছিলেন, 'সিকিউরিটি'র দোহাই দিয়েছিলেন। কোনোটাই টেঁকেনি। সাহেব তাঁর সেই বরাবরকার হাল্কা হাসিটা দিয়েই সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'আপনার আমার ছেলেগুলোর পকেটে মা হয় কিঞ্চিৎ রেস্ত আছে, মাঝে মাঝে দু-একটা আসল সিনেমা দেখতে পায়। কিন্তু ওরা?—বলে, সেই বেঁটে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরেছিলেন এক পাল ছেলেমেয়ের দিকে, 'সিনেমার'-গন্ধ পেয়ে যারা ছুটে এসেছে তারই কর্মীদের কোয়ার্টারস থেকে। 'ওদের তো এইটুকুই সম্বল।' হঠাৎ কি মনে করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এখানকার সিনেমার সবচেয়ে কমদামী টিকেটগুলো কত করে জানেন?'

—বোধ হয় পাঁচ আনা।

—তার মানে, ভর গোষ্ঠীর এক দিনের বাজার খরচ।

ডেপুটি বলেছিলেন, আর কিছু নয়, ভিড়ের মধ্যে দুটো-একটা যদি ভেগে যায়, এই ভাবনা।

—ভাবনা ওদেরও আছে। ভেগে যাবে কোথায়? খাবে কী?

এইখানে বোধ হয় একটু ভুল করেছিলেন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আহার ও আশ্রয়ের ভাবনাই মানুষের মনের প্রায় সবখানি জুড়ে থাকে, সন্দেহ নেই; তবু তার বাইরেও এমন কিছু আছে, কোনো অন্তর্নিহিত তাড়না, যার আকস্মিক আবির্ভাব ঐ দুটো প্রবল চিন্তাকে এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন সে সব কিছু ভুলে অজানা অনিশ্চিতের গর্ভে ঝাঁপ দেয়, একবারও ভাবে না, কী খাবো কিংবা কোথায় যাবো।

এমনি একটা বিরল অভিজ্ঞতা যে ঐ দিনই তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি। 'সিনেমা শো' ভেঙে যাবার পর মাঠ যখন ফাঁকা হয়ে গেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলেন। সন্তোষবাবুও ছিলেন তার পাশে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল চীফ অফিসার। বাইরের লোক দেখে একবার একটু ইতস্ততঃ করল। ডেপুটি জিজ্ঞাসা করলেন, ও দিকে সব ঠিক আছে তো?

—না সার। শুষ্ক মুখে জবাব দিল চীফ অফিসার।

—না মানে!

—একটা কম পড়ছে। বাহাদুরকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডেপুটির মুখে আর কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চীফের রিপোর্ট সাহেবের কানে গিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে 'সে কি!' বলে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন, সেদিকে চেয়ে ডেপুটি সুপার যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—'অ্যালার্ম!'

গ্রীন হাউসের ছেলেরা সবে কম্বলগুলো খুলে বিছানা পাতবার আয়োজন করছে, গেটের পেটা ঘণ্টায় ঢন ঢন আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়াল। যারা বেশী দিন ধরে আছে, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাগলা ঘণ্টি!' স্টাফ হাঁক দিল,

'জোড়ায় জোড়ায় বসে পড়।' দিলীপ 'পাগলা ঘণ্টির' নাম শুনেছে, কিন্তু সেই ভয়াবহ বস্তুটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তার বুকের ভিতরটা অজান্তে কেঁপে উঠল। ততক্ষণে অনেকেই গিয়ে এক সারিতে দুজন-দুজন করে বসে পড়েছে হল-এর সামনেটায়। সেও তাদের দেখাদেখি একজনের পাশে গিয়ে বসল। একটু পরেই সহকারী চীফ অফিসার নোট বই আর পেন্সিল নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল এবং দো, চার, ছয়...বলে জোরে জোরে গণনা শুরু করল। সংখ্যাটা যখন খাতায় টুকে নিচ্ছে, লাইনের মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠল 'কে ভাগল ?'

'উস্‌মে তোমহারা কোন্ কাম হ্যায় ?' চোখ পাকিয়ে, মুখ ভেংচে জবাব দিল সহকারী চীফ, এবং সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

কিন্তু খবর চাপা রইল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শুরু হল চাপা গলার গুঞ্জরণ। অনেকের মুখেই গভীর বিস্ময়। বাহাদুরের পক্ষে এ যেন একেবারে অসম্ভব। দু-একজন বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জানাল, এ তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল। কেউ কেউ এই সুযোগে দিলীপকে খানিকটা খোঁচা দিয়ে গেল—"কিরে, তোর সঙ্গে এত ভাব; আর শেষটায় তোকে ফেলেই চলে গেল!" দিলীপ সাড়া দিল না। কথা বলবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

পরদিন কানাঘুষার ভিতর দিয়ে আরেকটা আরো সাংঘাতিক খবর তার কানে এসে পৌঁছল—ব্যান্ড-মাস্টারের মেয়েকেও গত রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে-না। বাহাদুরই যে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বড় ছেলেগুলোর মধ্যে একটা দল বাহাদুরকে দেখতে পারত না। তারা রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠল। সিরাজুল আর সতীশ এই নিয়ে নানা কুৎসিত কথা রটিয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল দিলীপ, মকবুল এবং আরো কয়েকটি ছোট ছেলে, বাহাদুর যাদের বিশেষভাবে ভালবাসত এবং ওদের সংস্রব থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করত। দিলীপ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সতীশদের সব কথার মানে না বুঝলেও এটুকু বুঝবার বয়স তার হয়েছিল যে, এই মেয়েঘটিত ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ, এবং পালানোর চেয়েও অনেক বেশী গর্হিত কাজ করে গেছে বাহাদুর। তার সেই দুপুরবেলা বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, গোপনে কাগজ, পেন্সিল, খাবার যোগানো, ব্যান্ড-মাস্টারের বাড়ির দিকে তার গভীর আকর্ষণ, যে অজ্ঞাত কারণে তাকে হঠাৎ প্রেস থেকে বাগানে চালান দিলেন ডেপুটিবাবু—সবটাই একটা নিখুঁত রূপ নিয়ে দেখা দিল দিলীপের মনে। বাহাদুর যে বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত তার কাছে সব চেপে রেখেছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই এই, যে সেটা বলবার মত নয়। ঐ মেয়েটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, তার স্পষ্ট ধারণা না হলেও, সেটা যে মন্দ, এ বিষয়ে দিলীপের মনে আর সন্দেহ রইল না। অথচ এই বাহাদুরকে সে কত উপরে আসন দিয়েছিল। সেখান থেকে আরেকজনের এই অপ্রত্যাশিত পতনের আঘাত আজ যেন তারই বুকে এসে বাজল। এর মধ্যে যে লজ্জা জড়িয়ে আছে, সেও তার অংশীদার। এমন করে তার সব স্বপ্ন যে ভেঙে দিয়ে গেল, সেই পাহাড়ী ছেলেটার উপর দারুণ অভিমানে সমস্ত মন ভরে উঠল।

মকবুলের সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, এ আমি জানতাম। ঐ ডাইনীটাই ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। ঐ তো ওদের কাজ। এমন ভাব করবে যেন কত ভালবাসে তোকে, তারপর কায়দা পেলেই ঘাড় মটকাবে।

বলতে বলতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যেন কোন্ অতীত দিনের কোনো প্রত্যক্ষ দৃশ্যাবলীর মধ্যে। তারপর হঠাৎ বিজ্ঞের মত রায় দিয়েছিল, অতটুকু ছেলের কাছে যা শুধু আশ্চর্য নয়, একান্ত অপ্রত্যাশিত—'জানিস ? মেয়ে জাতটাই বেইমান। ওদের কখনো বিশ্বাস করিস না।'

জীবনে ঠেকে শেখার চেয়ে বড় পাঠ আর কিছু নেই। অর্বাচীনকে সে রাতারাতি প্রবীণ বানিয়ে তোলে, বালকের মুখে যোগায় বৃদ্ধের বুলি।

বিচারক যখন কোনো অপরাধীকে কারাদণ্ড দেন, সেই সঙ্গে সেই দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করবার ভার ন্যস্ত করেন কারাগারের অধ্যক্ষের উপর। You are required to execute the sentence according to law. বর্স্টাল স্কুল, স্কুল হলেও কারাগার। এখানকার অধিবাসীরা দণ্ডিত বন্দী। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ নিয়ে তারা আসে, তার থেকে যতটুকু মাফ প্রত্যেকের প্রাপ্য, বাদ দিয়ে, বাকী সময়টা তাদের ঐ বন্দীশালায় আটকে রাখার দায়িত্ব ওখানকার কর্তৃপক্ষের। সেটা লঙ্ঘন করা অপরাধ। নির্দিষ্ট কাল পার হবার আগে যদি কেউ পালিয়ে যায়, তার জন্যে সেই বন্দী যেমন দণ্ডনীয়, তেমনি তার নিরাপত্তার জন্যে যারা দায়ী, তাদেরও শাস্তি পেতে হয়। সুপারের কাজ হল সেই দায়িত্ব স্থির করা। তার আগে এই পলায়নের প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করতে হবে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, এবং কারাবিভাগের দপ্তরে।

খানিকক্ষণ ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর সেই রাত্রেই সুপার তাঁর নিজের আফিসে বসে সেই রিপোর্টের খসড়া তৈরি করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ডেপুটি সন্তোষবাবু। দুজনের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। ছেলেটা শুধু পালিয়ে যায়নি, তাদেরই অধীনস্থ কোনো কর্মীর কোয়ার্টার্স থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়েছে। 'এসকেপ'-এর সঙ্গে অ্যাবডাকশন। পলায়নের সঙ্গে নারীহরণ। বর্স্টালের মুখে একরাশ কালি লেপে দিয়ে গেছে। সুপারের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঐ 'বুরবক' ব্যান্ড-মাস্টারের উপর। এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল লোকটা ? ওর বৌটাই বা কেমনধারা মানুষ ? মা হয়ে বয়স্থা মেয়েকে একা ঘরে রেখে সিনেমা দেখতে এল বর্স্টালের মাঠে।

দরজার বাইরে শোনা গেল বিনীত গম্ভীর স্বর—একবার আসতে পারি, স্যর ? ব্যান্ড-মাস্টার বীরবাহাদুর। ও আবার কী চায় ? সাহেব বললেন, 'এসো।' বীরবাহাদুর ঘরে ঢুকে মিলিটারী কায়দায় সেলুট করে দাঁড়াল। সাহেবের কণ্ঠে ফেটে পড়ল তাঁর মুহূর্ত পূর্বের রোষ—অ্যাদ্দিন কী করছিলে ? আজ এসেছ মেয়ে-চুরির নালিশ করতে।

—নালিস করতে আসিনি, স্যর!

—তবে কী জন্যে এসেছ ?

—বলতে এসেছি, আমার কোনো নালিস নেই। মেহেরবাণী করে আমার মেয়েকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

—তা কী করে হবে ? ঝাঁজিয়ে উঠলেন সন্তোষবাবু। এত বড় একটা ব্যাপার আমরা চেপে যেতে পারি না। ঘটনাটা ঘটেছে বর্স্টাল স্কুলের হাতার মধ্যে।

বীরবাহাদুর কোনো জবাব দিল না, যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো। সাহেবের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। সুপার কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে ধীর স্বরে বললেন, তুমি আলাদা ভাবে পুলিশ-কেস করতে চাও ?

—জী না; পুলিশে আমি যাবো না।

—কিন্তু তোমার স্ত্রী যে বিশেষ করে বলে গেলেন ডেপুটিবাবুর কাছে—

—মেয়েলোকের কথা ধরবেন না, স্যর। সে যা-ই বলুক, আমি বলছি, আমার মেয়ের ভালমন্দ, মান ইজ্জৎ আমি বুঝবো। তা নিয়ে সরকারের কিছু করবার নেই। দয়া করে আমার পারিবারিক ব্যাপারে আপনারা হাত দেবেন না।

সুরটা অনুনয়ের হলেও, তার মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়তার আভাস। ডেপুটিবাবু

আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন, সাহেব হাত তুলে বাধা দিলেন। এ স্বর তিনি চেনেন। অনেক দিন ঘর করেছেন এই অন্তরে বাহিরে জটিলতাহীন ফৌজী জাতটার সংগে। ভালভাবেই জানেন, এদের মনে কোনো বাঁক নেই, সে চলে সরল রেখার সোজা পথ ধরে। এরা যা বোঝে, একবারেই বোঝে, তার-পর অন্য কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

ঘোষসাহেব আর একবার তাঁর ব্যাণ্ড-মাস্টারের মুখের দিকে তাকালেন; পেশী ও রেখায় একটা সংকল্পের ছাপ ছাড়া আর কিছু পড়তে পারলেন না। তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ইতিহাস আছে, যা সে ব্যক্ত করতে চায় না। আর কোনো প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও।' ডেপুটিবাবুর দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'শেষের লাইনকটা বাদ দিয়ে খালি এসকেপ রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন।'

দুজনের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া

বর্স্টাল স্কুলের যান্ত্রিক জীবন-ধারায় যে-টুকু উচ্ছলতা ছিল, এই আক-স্মিক দুর্ঘটনা তার প্রায় সবখানিই যেন একদিনে শুষে নিয়ে গেছে। আফিসে, ব্যারাকে, ওয়ার্কশপে এমন কি খেলার মাঠেও কেমন একটা থমথমে ভাব। যে-যার রুটিন বাঁধা কাজগুলো একটার পর একটা প্রায় নিঃশব্দে করে যাচ্ছে; কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। বাহাদুরের উপর যারা নানা কারণে বিরূপ ছিল এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তারাও যেন হঠাৎ চুপসে গেছে।

স্কুল হিসাবে শিক্ষাবিভাগ বর্স্টালকে প্রাইমারী বা প্রাথমিক স্কুলের পর্যায়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু আর একদিক দিয়ে তার মান ছিল হাইস্কুলের। উপযুক্ত বিবেচিত হলে এখানকার ছেলেদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার অনুমতি ছিল। দীর্ঘ দিন সেটা সম্ভব হয়নি। তেমন ছেলে পাওয়া যায়নি। দিলীপকে যদি ঠিক মত তৈরী করা যায়, সে হয়তো একদিন, এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে-ছেন, তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, এমনি একটা আশা অধ্যক্ষের মনে জেগে থাকবে। তাই তার পড়াশুনোর জন্যে কতগুলো আলাদা বন্দোবস্ত করে দিয়ে-ছিলেন। আশুবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, এ কাজটি আপনাকেই করতে হবে। পুরো ছ বছর সময় পাচ্ছেন; পারবেন না?

আশুবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিলেন, ঠিক বলতে পারছি না স্যার। তবে না-পারবার কোনো কারণ দেখি না। ছেলেটির মেধা আছে, পড়-বার ও শিখবার আগ্রহ আছে, আর আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না।

"তাহলেই হল"—যেন শুধু আশ্বস্ত নয়, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, এমনি সুরে বলেছিলেন ঘোষসাহেব।

তারপর থেকে আশুবাবুর কাজ বেড়ে গিয়েছিল। স্কুলের রুটিন মত ক্লাস নেবার পর, অন্য ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে তিনি দিলীপকে নিয়ে তার 'স্পেশাল ক্লাস' শুরু করতেন। ওরই মধ্যে এক ঘন্টা ছিল হেডমাস্টারের ইংরেজি ক্লাস।

(—ক্রমশঃ)

ধূর্জটিপ্রসাদ

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

১৯১২, গ্রীষ্মকাল, দুপুর। ইণ্টারমিডিএট পাশ করে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ অপেক্ষায় দিনযাপন করছি। ওপরের পড়ার ঘরে একটি কটেজ পিয়ানো থাকত। সেটি বাজিয়ে দাদা,—ডাঃ পশুপতি (তখনও ছাত্রাবস্থা) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সহযোগে 'ভরাবাদর, মাহভাদর'—গান অভ্যাসের দুঃসাধ্য সাধন করছেন। এমন সময় 'বড়দা আছ, গিরিজা আছ—' ডাক দিয়ে ওপরে উঠে এলেন বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ। সঙ্গে ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুঠাম দীর্ঘগড়ন কান্তিময় এক যুবক: আমাদেরই সমবয়সী। ইনি ধূর্জটিপ্রসাদ। সত্যেন্দ্রর অনুরোধে দাদা "সে কোন বনের হরিণ", "আজি কোন নব চঞ্চল ছন্দে মোর বীণা—", "তুমি যে সুরের আগুন—" ইত্যাদি একেবারে নতুন আনকোরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন। পাল্টা ধূর্জটিপ্রসাদ গান করলেন হিন্দী গান, রাগপ্রধান ওস্তাদি ঢঙে। পিয়ানোর হিন্দী গান জমল না, ধূর্জটিপ্রসাদ বল্লেন সারেঙ্গীর সঙ্গত চাই। পিয়ানো বন্ধ হোল; আরম্ভ হোল খেলার কথা; কলেজ, প্রফেসার, সাহিত্য প্রসঙ্গ। সে সময়কার ধূর্জটিপ্রসাদকে যিনি না দেখেছেন তিনি কল্পনা করতে পারবেন না তাঁর প্রশস্তবক্ষ ডমরুকটি সুপুরুষ চেহারা।

আলাপ জমে উঠল; মুগ্ধ হলুম তাঁর সঙ্গীত, সাহিত্য ও খেলার খবরের ওপর দখল দেখে। গানে আমাদের বহর ছিল সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপি মারফৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গীতসূত্রসার পর্যন্ত। ধূর্জটির ছিল গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর ও লক্ষ্ণৌ বেনারসের ওস্তাদের গানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। সাহিত্যে ছিল আমাদের দৌড় বঙ্কিম, রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভাত মুখুজ্যে ডিঙিয়ে টলস্টয়ের আনা ক্যারেনিনা, রেজারেক্সন ও গল্প, ভিক্টর হুগোর ল্যে মিজেরাবল, বার্ণাড শ, মেটারলিঙ্ক পর্যন্ত। ধূর্জটিপ্রসাদ উত্থাপন করলেন টুর্গেনিভ গোর্কি ডস্টভয়েস্কি আনাতোল ফ্রাঁসের কথা। কিছুদিন আগে পড়েছিলাম মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত হরদয়ালের লেখা প্রবন্ধে' কার্লমার্ক্সের কথা। ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে শুনলাম কার্লমার্ক্সের 'দি ক্যাপিটাল' তিনি পড়েছেন। শুনে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলাম, কেন না হরদয়ালের লেখাতেই ছিল কার্লমার্ক্সের বই দুনিয়ার অতি অল্প লোকেই বুঝতে ও হজম করতে পেরেছে। সেদিনের আড্ডা ভঙ্গ হোল রাত্রি আটটায়।

জ্ঞানার্জনের এই অতিবিস্তৃত সীমানা ধূর্জটিপ্রসাদের আজীবন উপাস্য ছিল। আজ, সদ্য পরলোকগত তাঁর কথা ভাবতে বসে মনে পড়ছে, আচার্য হরিনাথ দে'র তিরোধানে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা দুটি পংক্তি,—

> যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব,
> শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা,
> যাচ্ছে পুড়ে নূতন করে
> সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা!

আজকের দিনে বাস্তবিকই ধূর্জটিপ্রসাদের মতো পড়াশুনোকরা লোক আমাদের মধ্যে বিরল। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর পঠন ও চর্চার বিষয়ের পরিধি ছিল কত ব্যাপক, কত বিস্তীর্ণ। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিবিড় অনুরাগ ও জ্ঞান বিস্ময় জাগিয়ে তুলতো। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞান-পরিবেশন এ দুয়ের সমন্বয়-সাধন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত অধ্যয়ন-বিলাসী ও জ্ঞানতপস্বী। ছাত্রজীবন থেকে সুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিরলস অধ্যয়ন করে গেছেন। দুরারোগ্য রোগে অবিরাম নিদারুণ দুঃসহ অবস্থায় কাটাতে হয়েছে একাদিক্রমে তাঁকে শেষের কয়েক মাস। মৃত্যুর সাত-আটদিন পূর্বে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলে বলেছেন—'আর চলবে না।—, যাহোক তোমার লেখা* পড়লাম—আর, পুলিনের বই আজও কিনে আনিয়েছি** পড়ছি—বড় ভাল হয়েছে বোলো তাকে—'। এক চামচ জল গ্রহণ করতে পারেন না, তখনও পড়ার বিরাম নেই। এর একদিন দুদিন পরেই তাঁর বাক্-রোধ হয়েছিল। তাঁর নিরলস অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানের আংশিক পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর লেখা গুটি-কয়েক বই-এর পাতায়। এই রচনাগুলি থেকে অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিমাপ করা চলে না। কারণ তিনি যত বড়ো বিদগ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায় তেমন প্রতিফলিত হয়নি। এক্ষেত্রে সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা ছিলেন অনেক বড়।

এই অধ্যয়ন-স্পৃহা ও তথ্যসংগ্রহ তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, যেকোন উৎকৃষ্ট বই বাজারে উঠলেই—ইংরাজীতে হোক বা বাংলায়, তা তিনি কিনতেন ও আদ্যোপান্ত পাঠ করতেন। সর্বাধুনিক বই এত অল্পই ছিল যা ধূর্জটিপ্রসাদের অপঠিত থাকত। বহুমূল্য আর্টের বই সংগ্রহই তাঁর হবে কয়েক শত; সমগ্র বই-এর সংগ্রহ হবে সাত আট হাজার।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলেন তিনি সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি সারা ভারতে ব্যপ্ত ছিল; অসামান্যতা জ্ঞাপক খ্যাতি। ডি-পি অক্ষরদ্বয় (D P) ছিল সিদ্ধ-পরিচয়। শাস্ত্রে বলে গুরুর পরিচয়। ছাত্রে। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন সিদ্ধগুরু। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য ছাত্র অসংখ্য, প্রায় হাজারের কোঠায়।

কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের পাণ্ডিত্য তথাকথিত অধ্যাপকের সীমায়িত পাণ্ডিত্যে আবদ্ধ ছিল না। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর কোনো অভিমানও ছিল না, যদিও কেউ কেউ তাঁর লেখায় সে অভি-মান আছে বলে মনে করেন। আসলে ধূর্জটিপ্রসাদের পদচারণের ক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হলে একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন। এরই অভাবে অনেকে তাঁর রচনার মধ্যে সর্বাঙ্গের বাক্যবিস্তার দেখতে পান।

---

*'কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা'—পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৬৮।

** পুলিন সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখা হাটের লোকের জন্য নয়; বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকেরই জন্য।

তাঁর রচনার পরিমাপ করা আমার কাজ নয়, উদ্দেশ্যও নয়। তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কথায় ফুটিয়ে তোলাও সহজসাধ্য নয়। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মনীষার, বুদ্ধির সঙ্গে প্রকাশ-ক্ষমতার, জ্ঞানের সঙ্গে বিতরণের, সমালোচনার সঙ্গে সহানুভূতির, অধ্যয়নের সঙ্গে বিনয়ের এমন আশ্চর্য মিলন আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর পূর্বসূরী হিসাবে নাম করা যেতে পারে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর ও অতুল গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের। চৌধুরী মহাশয়ের বিখ্যাত 'সবুজ পত্র' মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'সবুজপত্রের' অন্যতম গণনীয় লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরবর্তী কালে প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র "উত্তরা" পত্রিকার তিনি বরণীয় লেখক হন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়ও একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের স্থানাধিকার করেন।

এই 'পরিচয়' পত্রিকার যুগেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' এই উপন্যাসত্রয়ী প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস জগতে এই উপন্যাস-ত্রয়ী ও এদের লেখার রীতি একেবারে অভিনব সৃষ্টি। এই উপন্যাস তিনটি সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—'পোলিটিক্যাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নর-নারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত। বাংলা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও নূতন বটে।' ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে তীক্ষ্ণ মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে।' মননক্রিয়ার পশ্চাদপ্রক্ষেপ, জটিলতা ও অন্তর্মুখীতা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'তে প্রথম বিকাশ লাভ করে। 'অন্তঃশীলা'র মননক্রিয়া কিছুটা সমশ্রেণীর হলেও 'রজনী'র মননক্রিয়ার সমজাতীয় নয়; বেশ আলাদা। এ-মননক্রিয়া একেবারে নতুন রীতির, নতুন ছাঁদের; মানব-মনের প্রকৃত সত্তার,—সমতলীয় নয়,—গোলকীয় প্রতিরূপ। নিশ্চয়ই অন্তঃশীলার টেক্‌নিক ধূর্জটিপ্রসাদের অমূল্য দান,—যার জন্য বাংলা উপন্যাস চিরযুগ তাঁর কাছে ঋণী রইল। তাঁর অন্যতম বই 'রিয়ালিস্ট' হল গল্প-সমষ্টি; প্রমথ চৌধুরীর উদ্ভাবিত গল্পলেখার নতুন রীতির প্রভাব এতে সুস্পষ্ট। আঙ্গিক হিসাবে ক্ষিপ্রতা ও বিদ্রূপ 'রিয়ালিস্ট'কে বাংলা ছোট-গল্পের আসরে পুরোভাগে স্থান দেবে। 'আমরা ও তাঁহারা' বইতে আছে সুরের ও সঙ্গীতের কথা, সাহিত্যের কথা, দেশের ও বিপ্লবের কথা সম্বন্ধে আলোচনা; দু'পক্ষের কথোপকথনের টেক্‌নিকে লিখিত। 'মনে এলো' anecdotes, বলার সরসতা ও ক্ষিপ্রতায় উজ্জ্বল; সমসাময়িক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার,—যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা হয়েছিল, তাঁদের বিষয়ে running commetary ইতিহাসের দরবারে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নেবে। 'অমৃতে' প্রকাশিত 'ঝিলিমিলি'-ও এই জাতের রচনা। এ ধরনের লেখায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

যাঁরা সঙ্গীতরসের রসিক 'সুর ও সঙ্গতি' তাঁদের সুগভীর চিন্তা, বিচার ও আলোচনার অপূর্ব খোরাক জোগাবে। এই বইটি মারফৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্ম-লেখনী-ধারণের অসামান্য অধিকার ও গৌরব লাভ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। এতে একদিকে যেমন কবিগুরু কর্তৃক ধূর্জটিপ্রসাদকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমজদারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ধূর্জটিপ্রসাদ কর্তৃক কবিগুরুকে বাংলা গানের স্বরূপ ও অভিযান সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে প্রবৃত্ত করান হয়েছে। বাংলা গানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কবিগুরুর এ লেখা অমূল্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্পদ, প্রেরণা ও ঐতিহ্য বহন ক'রে বাংলা গান তার বাহুল্য ও অসঙ্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। বাংলা গান 'বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর' মূর্তি; যথা কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যেন এক পাঁচ-তলা মহল, যার স্থাপত্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যুগ্ম-লেখনীতে এই উভয়বিধ সঙ্গীতের প্রতিভা অপরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত রবীন্দ্র-স্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের আর একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বই, Tagore, a study; কবিগুরুর মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই লেখা। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন সমালোচনা আর কারোর দ্বারা সম্ভব হয়নি। দুঃখের বিষয় বইটি অপ্রাপ্য ও তার দ্বিতীয় প্রকাশন হয়নি।

কিন্তু তাঁর রচনার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ছিল সমধিক উজ্জ্বল। তাঁর মতো সদালাপী লোক সচরাচর দেখা যায় না। যে কোন বিষয়ের আলোচনা—তা সাহিত্য হোক, অর্থনীতি কি সমাজ-নীতি হোক, অথবা সঙ্গীত বা চিত্রশিল্প হোক—তিনি তাতে নিমগ্ন হতে পারতেন ও এমন সরস করে তুলতে পারতেন তাঁর কথোপকথন যে শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়াপ্লুত হয়ে পড়ত। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন অধ্যাপনা করতেন তখন ছাত্র, সুহৃদ, জনসাধারণ ও রাজকর্মচারী তাঁর পড়ার ঘরে সদাসর্বদা আসতেন তাঁর সরস মূল্যবান কথা শোনবার জন্য; তাঁর পরামর্শ ও প্রেরণা পাবার জন্য। লক্ষ্ণৌ-এ তিনি ছিলেন একটা institution। একাই একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ!

ছাত্র-ভাগ্যের মত তাঁর বন্ধু-ভাগ্যও ছিল অপরিসীম। ভারতে তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী লোক কমই ছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিল না। তরুণ লেখক ও সাহিত্যিকবৃন্দের প্রেরণা ও উৎসাহদাতা হিসাবে তিনি ছিলেন অগ্রণী। আজকের দিনের অনেক নাম-জাদা কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত-শিল্পী তাঁর প্রশংসা ও উৎসাহ-বাণী পেয়ে ধন্য হয়েছেন। 'অন্তঃশীলা' ও তাঁর অন্যান্য লেখার টেক্‌নিক্ও কেউ কেউ অনুকরণ করেছেন। তাঁর প্রভাব স্পষ্টই চোখে পড়ে আজকাল।

বস্তুত ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞানের ও মানবতার এমন এক পল্লবিত তরুর স্বরূপ বড় একটা দেখা যায় না। এমন কি বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণারও সংবাদ রাখতে বিরত হতেন না। জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা তাঁর চরিত্রের ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিনয় সরকার প্রমুখ যে কয়জন স্বীয় অধিকার বলে সর্বজ্ঞতার গৌরব অর্জন করেছিলেন, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরই,—বোধ হয়,—শেষ প্রতিনিধি।

বিজ্ঞানের গল্প

অয়স্কান্ত
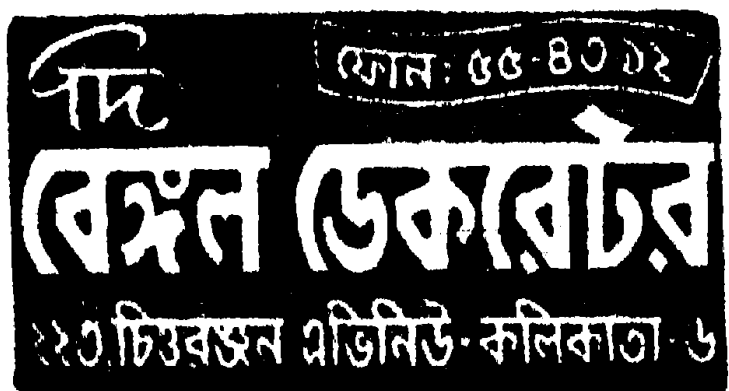
॥ চাকার গান ॥

রেলগাড়ির চাকা কত কী বলে! যা ভাবা যায় তাই বলে। আর সব কথাই বলে গানের সুরে। এমন আশ্চর্য গান আর কোথাও শোনা যায় না। রেলগাড়ির চাকার গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েননি এমন মানুষ আমাদের মধ্যে খুবই কম।

কান পেতে থাকলে শোনা যাবে রেলগাড়ির চাকা বলছে, 'ঘুমোও! ঘুমোও!' আবার গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছলে এই চাকাই আবার গান গেয়ে ওঠে, 'জাগো! জাগো!'

রেলগাড়ির চাকা আরো কত কী বলে! রেলগাড়ির চাকা বলে, 'আমি ঘুরছি তাই তোমাদের আর লম্বা রাস্তা পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হচ্ছে না। আমি ঘুরছি তাই তোমরা নিশ্চিন্ত আরামে প্রান্তর পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে পর্বত ফুঁড়ে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছে যাচ্ছ।'

রেলগাড়ির চাকা বলে না এমন কথা নেই। রেলের লাইনদুটো যেন আশ্চর্য এক বাদ্যযন্ত্রের চাবি। রেলগাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করলেই এই চাবিতে আশ্চর্য এক ছোঁয়া লাগে।

অথচ চাকা আমাদের কাছে এক অতি মামুলি জিনিস। চাকায় চেপে ঘুরে বেড়ানোতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে এ-সম্পর্কে ভাববার কিছু আছে তা আমরা ভাবিই না। বরং আমাদের নজর এখন রকেটের দিকে, যা চাকা ছাড়াই মহাশূন্যে ছুট দেয়। এমন কি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গত শিল্পমেলার চাঞ্চল্যকর খবর ছিল এমন একটি মোটরগাড়ি যা মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে থেকে চাকার সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা করে।

আমরা এখন ভাবতেই পারি না যে এমন সময়ও ছিল যখন চাকা কেউ দেখেনি বা চাকার কথা কেউ শোনেওনি। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হলে তখন পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতে হত। খুব ভাগ্যবানরা যেতেন ঘোড়ার পিঠে চেপে। ভারী মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হত গায়ের জোরের ওপরে। আর জমি সমতল হলে ব্যবহার করা হত কুকুরটানা স্লেজগাড়ি। অবশ্য স্লেজগাড়িকে গাড়ি বলা ভুল, কারণ এই গাড়ির কোনো চাকা ছিল না। একটা বড়ো পাটাতনের সঙ্গে দড়িজাতীয় কিছু বেঁধে কুকুর দিয়ে টানা—এই হচ্ছে স্লেজ।
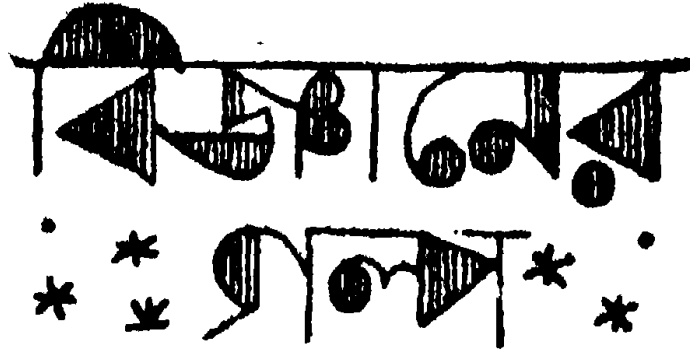
কিন্তু এ-অবস্থা খুব বেশিদিন চলেনি। কিছুকালের মধ্যেই স্লেজ চাকা-যুক্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ৩৫০০ সালের মধ্যে।

চাকা যে কতবড়ো আবিষ্কার তা এই রকেটের যুগে আমাদের পক্ষে হয়তো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে একথাটি আমাদের জেনে রাখা দরকার যে এই অতি সামান্য আবিষ্কারের মধ্যেই আধুনিক যন্ত্রযুগের সূত্রপাত। একটি স্লেজ চাকাযুক্ত হয়েছিল বলেই হালের চমকপ্রদ রেলগাড়ি ও মোটর যুগে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। এমন কি একথাও বলা চলে যে আমাদের যা-কিছু উন্নতি সবই যেন চাকায় ভর দিয়ে। চাকায় ভর দিয়েই প্রস্তরযুগ ব্রোঞ্জযুগে পৌঁছেছে, ব্রোঞ্জযুগ লৌহযুগে। এত সরল একটি আবিষ্কার এত জটিল সব কান্ডকারখানা ঘটিয়েছে ভাবলেও অবাক হতে হয়।

চাকার আবিষ্কার সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে চাকা অবশ্যই হত কাঠের। এবং কাঠের চাকার কোনো চিহ্ন থাকাই এত হাজার বছর পরে এখন আর সম্ভব নয়। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক কালে তৈরি সত্যিকারের একটি চাকাও চোখে দেখা যায়নি। তবে সুখের বিষয়, সত্যি-কারের চাকা না থাকলেও চাকাওলা গাড়ির ছবি থেকে গিয়েছে। এই ছবি দেখেই বিজ্ঞানীরা চাকা সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন।

সুমেরীয় ছবিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালেই চাকাওলা গাড়ির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় ও সিরিয়ায় নানান ধরনের চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল। কোনোটায় মাল নিয়ে যাওয়া হত, কোনোটায় যাত্রী, কোনোটা যুদ্ধরথ। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে চাকাওলা গাড়ির প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। তুর্কীস্তানেও প্রায় একই সময়ে। ক্রিট ও এশিয়া মাইনরে চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হতে আরো শ-পাঁচেক বছর সময় লেগেছিল। আর মিশরীয়দের সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৫০ সালের আগে চাকাওলা গাড়ি ব্যবহার করেনি।

তবে একেবারে গোড়ার দিকে চাকা বলতে যে পদার্থটিকে বোঝানো হত তা আজকের দিনে হাস্যকর মনে হবে। নিতান্তই জোড়াতালি দেওয়া একটা ব্যাপার। গোটা চাকাটি হত একটি নিরেট বস্তু—রিম বা স্পোকের বালাই ছিল না। তিন খন্ড কাঠ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হত চাকাটি, সেটিকে বাঁধা হত চামড়া দিয়ে আর আষ্টেপৃষ্ঠে লাগানো হত তামার পেরেক। চাকাটি ঘুরবার সময় ঘুরত অক্ষদন্ড বা ধুরা সমেত। অক্ষদন্ডটিকে চামড়ার ফিতে দিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। সিন্ধু, সার্দিনিয়া ও তুরস্ক অঞ্চলের গ্রামে এখনো পর্যন্ত এভাবেই গোরুর গাড়ির চাকা লাগানো হয়।

প্রাচীন সুমেরীয় যুদ্ধরথ

॥ কুমোরের চাকা ॥

চাকার আবিষ্কার মানুষের জীবনে অন্য একদিকেও বড়ো রকমের পরিবর্তন

এসেছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ সালের আগে পর্যন্ত মাটির পাত্র তৈরি হত শুধু দুটি হাতের সাহায্যে। এমন কি আজকের দিনেও দেখা যায় যে মাটির পাত্র তৈরি করাটা মেয়েদের অবসর সময়ের একটা ঘরোয়া কাজ। এবং শুধু হাতেই তা তৈরি হচ্ছে। ফলে একটি পাত্র তৈরি হতে সময় লাগছে কয়েক দিন।

কিন্তু চাকার ব্যবহার শুরু হবার পর এই মাটির পাত্র তৈরি করাটাই হয়ে উঠল রীতিমতো একটি উৎপাদন-শিল্প। একটি চাকাকে যদি মাটির সঙ্গে সমতল অবস্থায় রেখে ঘোরানো যায় আর চাকার কেন্দ্রস্থলে একতাল কাদামাটিও যদি ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে—তবে কুমোরের পক্ষে পাত্র তৈরি করার ব্যাপারটি খুবই সহজ হয়ে যায়। যেখানে একটি কলসী তৈরি করতে কয়েক দিন লাগার কথা সেখানে একতাল ঘুরন্ত কাদামাটি থেকে শুধু আঙুলে চেপে ধরার কায়দায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাত্রটি তৈরি হতে পারত। আর ঘুরন্ত কাদামাটির তাল থেকে তৈরি হওয়া পাত্রটির গড়নও হত অনেক বেশি নিটোল।

মাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে চাকার ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল সেদিনটিকেই বলা চলে যন্ত্রশিল্পের জন্মদিন। চাকা মানুষের তৈরী প্রথম যন্ত্র। যা ছিল মেয়েদের অবসর সময়ের কাজ, চাকার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ একটি শিল্প। একদল পুরুষের পুরো সময়ের জীবিকা। হালের আদিবাসীদের দিকে তাকালেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। মাটির পাত্র তৈরি করাটা যতোক্ষণ একটা ঘরোয়া কাজ ততোক্ষণ তা মেয়েদের হাতে, যখনই যন্ত্র-শিল্প তখন পুরুষদের হাতে।

গাড়ির চাকা আর কুমোরের চাকা কিন্তু সব জায়গায় একই সময়ে ঘুরতে শুরু করেনি। যেমন, মিশরে গাড়ির চাকার অনেক আগেই কুমোরের চাকা। এ থেকে বিজ্ঞানীরা এ-সিদ্ধান্ত কিন্তু করেননি যে গাড়ির চাকা ও কুমোরের চাকা একেবারে পৃথক দুটি আবিষ্কার। তবে এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কতখানি তাও এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

॥ স্পোক ও রিম ॥

সুমেরীয় যুদ্ধরথের যে-ছবিটি এই-সঙ্গে ছাপা হয়েছে, তার চাকার দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এ-ধরনের চাকার স্থায়িত্ব খুব বেশি নয়। নিরেট একটি কাঠের চাকা খুব সহজেই ভেঙে ও ক্ষয়ে যেতে পারে। কাজেই গোড়া থেকেই একটা চেষ্টা ছিল কি-ভাবে চাকাকে আরো মজবুত করে তোলা যায়। এই উদ্দেশ্যে চাকার বেড়কে ঘিরে একটা তামার পাত (তখনো লোহার আবিষ্কার হয়নি) মুড়ে দেওয়া হত। তামার পাতটিকে আটকানো হত তামার পেরেক দিয়ে। ফলে চাকা হয়ে যেত খুবই ভারী। তখন চাকাকে হালকা করবার জন্যে চাকার নিরেট অংশে মাঝে মাঝে গর্ত করে দেওয়া হত। এই ব্যাপারটারই পরিণতি স্পোক ও রিম সমন্বিত চাকা। আধুনিক চাকা আজকের চেহারায় পৌঁছতে অনেক রকমফের পার হয়ে এসেছে।

গুণ্ডা হাতী

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

।। দুই ।।

ফ্লেচার বলেন যে, গুণ্ডা হাতীর প্রকৃতিই হিংস্র এবং সাধারণ হিসাবে সে মানুষ বা মানুষের প্রতিপালিত জীব দেখলেই আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কোনও সভ্য হাতীও তার সংগী হতে চায় না বরঞ্চ সে নিজে অন্য পুরুষ হাতী দেখলেই তাকে ঘয়েল করার চেষ্টা করে এবং সেই কারণে যূথের অন্যসব দাঁতাল হাতী একজোট হয়ে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

বনজংগলের আদিবাসীরা বুনো হাতীকে বাঘ ভাল্লুক বা গৌর (বাইসন) থেকে বেশী ভয় করে চলে, এবং বুনো হাতীর আক্রমণে অনেক জংগলের লোক কাঠ কাটতে বা বনের ফলমূল তুলতে গিয়ে প্রাণ হারায়। এই কারণে বোধহয় স্যাণ্ডারসনের মত বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে গুণ্ডা হাতী নিজদল থেকে বিতাড়িত হাতী নয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে সেও এক যূথপতি। ফ্লেচার কিন্তু এ বিষয়ের—অর্থাৎ বুনো হাতী মানুষকে ওরকম দেখা-দেখি হলেই আক্রমণ করে কেন—অন্য কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেন যে হাতীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি খুব ভাল নয়, শুধু তার ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ প্রখর। এই কারণে অনেক সময় খুব কাছে না আসা পর্যন্ত হাতী মানুষের খোঁজ পায় না। এবং এরকম হলে হাতী আচমকা আক্রমণ করে। ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

একবার তিনি এক জংগলে শিকার করার সময় দেখেন যে ঐ অঞ্চলের রাজার কয়েকটি হাতীকে তাদের মাহুতের দল খাওয়াবার ও খোরাক সংগ্রহ করার জন্য ঐ বনের মধ্যে এনেছে এবং ঐগুলোর মাহুতেরা সবেমাত্র হাতীর কাঁধ থেকে নেমে তাদের পায়ে শিকল চড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে। একটা বিশাল দাঁতাল যখন পিছন ফিরে নিকটের এক গাছের গায়ের থেকে পরগাছা লতা ছিঁড়ে নামাচ্ছে, সেই সময় সাহেব তার দশ-পনেরো গজের মধ্যে এসে তার সুগঠিত দেহ দেখতে দাঁড়ালেন। হাতী সংগে সংগে হঠাৎ ঘুরে কান খাড়া করে, শুঁড় তুলে তেড়ে আসার মত করায় সাহেব তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে ভেবে আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল তুলতে তার মাহুত তাঁকে বলে যে, হাতীর রাগ অন্য এক পানিয়া মাহুতের উপর। এই বলে সে সেই লোকটাকে দেখালো। সাহেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে হাতীর সেই শত্রু প্রায় তিনশো গজ দূরে যাচ্ছে তবে হাওয়া সেদিক থেকে বইছে। দেখা গেলো হাতী সত্য সত্যই তাকে লক্ষ্য করে রাগ দেখাচ্ছে। যদিও সে অত দূরে। অত লোকজনের মধ্যে, হাওয়া প্রায় নিস্তব্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে অতদূরের শত্রুর গন্ধ ঠিক পৃথক করে চিনে সেদিকে তেড়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

বনের অন্য জীবজন্তুর অন্ততঃ দুটো ইন্দ্রিয় সতেজ হয়, যেমন বাঘের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু শ্রবণ ও দৃষ্টি খুবই প্রখর। ভালুকের দৃষ্টি-শক্তি ভাল নয় কিন্তু কান ও নাক বেশ সতেজ। এই কারণে বনের অন্য পশু অতি সহজেই মানুষকে এড়িয়ে চলতে পারে। অন্যদিকে মানুষকে যথেষ্ট ভয় করা সত্ত্বেও তার গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত হাতী টেরই পায় না যে কাছের জংগলে মানুষ রয়েছে। সেই কারণে, হাতী যদি বাতাসের সংগে অর্থাৎ বাতাস যে মুখে বইছে সেইদিকে চলে তবে অত্যন্ত কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত বা সামনা-সামনি না হওয়া পর্যন্ত হাতীর খেয়ালই হয় না যে সে মানুষের অত কাছে এসেছে। আর ঐভাবে আচমকা মানুষের মুখোমুখী হলে দাঁতাল হাতী বা বাচ্ছা-সুদ্ধ মাদী হাতী, সংগে সংগে মানুষকে আক্রমণ করে, আত্মরক্ষার জন্য বা ভয়-ভড়কানোর প্রতিক্রিয়ায়। অন্যথায়, অর্থাৎ বিপরীত হাওয়ার মুখে চলে, হাতী কি হাতীর দল যদি মানুষের গন্ধ পায় তবে সে নিঃশব্দে সরে পড়ার চেষ্টা করে, যদি না সে গুণ্ডা হাতী হয়। ফ্লেচারের মতে জংগলে সাধারণ হাতী মানুষ আক্রমণ করার কারণ ঐরকম আচমকা দেখা হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যদিকে গুণ্ডা হাতীর কথা সম্পূর্ণ আলাদা।

গুণ্ডা হাতী ক্রমাগত জঙ্গলের মধ্যের বা আশেপাশের ছোট গ্রামের ক্ষেতে ঢুকে দরিদ্র চাষীর ফসল লুট করে খায় ও নষ্ট করে। নিরস্ত্র চাষী প্রাণভয়ে পালানো ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করতে না পারায় গুণ্ডা হাতীর মানুষের ভয় একেবারে যায় এবং সেই কারণে সে মানুষ দেখলেই সংহার মূর্তি ধরে, এমনকি জঙ্গলে বা গ্রামাঞ্চলে যদি কোনও মানুষের সন্ধান সে পায় তবে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তাকে শেষ করার চেষ্টাই সে করে থাকে। ফ্লেচারের মতে সাধারণ বন্য দাঁতাল ও গুণ্ডা হাতীতে প্রভেদ এইখানেই দেখা যায়।

ফ্লেচারের মতে হিংস্র ও ঝগড়াটে পুরুষ হাতীকে দলের অন্যেরা একজোট হয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে সে নির্বাসিত অবস্থায় "গুণ্ডা" হয়ে মানুষের শত্রুতা করে। এইরকম হাতী যদি পুনর্বার কোনও দলে জুটে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে সে দলের যূথপতি এবং অন্য পুরুষ হাতী তাকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। নিজ অভিজ্ঞতার থেকে ফ্লেচার এইরূপ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

ফ্লেচার নীলগিরির ওয়াইনাদ অঞ্চলে চা ও কফির বাগান করতেন। ঐ পাহাড়ী এলাকার সর্বত্রই তখন ঘন জঙ্গল ছিল এবং সেই পাহাড় ও উপত্যকার বন-জঙ্গলে হাতী, বাইসন; শম্বর, হরিণ এবং সেই সঙ্গে বাঘ ভালুক ও চিতা, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো। জঙ্গলের ভিতরে নায়েক ও কুরুম্বা জাতের আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম ছিল। এই আদিবাসীরাই ছিল ফ্লেচারের শিকার-সফরের সঙ্গী এবং বুনো জন্তুর পায়ের দাগ বা অন্য চিহ্ন ধরে খোঁজ করার কাজে এরা ছিল অসাধারণ দক্ষ।

যে উপত্যকায় ফ্লেচারের বাগান, তারই নীচের দিকে নায়েকদের একটি ছোট গ্রাম ছিল। ছয় সাতটি কুঁড়ে ঘরে ছয় সাতটি পরিবার, স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-পিলে নিয়ে সেই গ্রামে বাস করতো। এদের মোড়ল ছিল কুরিয়া নামে এক বুড়ো এবং এই "গাঁইবুড়ো" এবং তার গাঁয়ের লোকে বুনো জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার সঠিক খবর দিয়ে সাহেবকে সদাসর্বদাই "ওয়াকিবহাল" করে রাখায় সাহেব এদের নিজের লোক ভাবতেন।

একদিন সাহেবের খাস শিকারী, "চিক-মাল্লু" এসে জানালো যে কুরিয়ার গ্রামের তিনজন পুরুষ জঙ্গলে ফলমূল খোঁজার সময় একটা গুণ্ডা হাতী তাদের আক্রমণ করে। একজনকে তো সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে দলে-থেৎলে শেষ করে, অন্য আর একজনকে গাছে উঠবার সময় শুঁড় দিয়ে ধরে, টেনে আছড়ে মারে। তৃতীয়জন কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এই খবরটা দিয়েছে।

খবর পেয়ে সাহেব পরের দিন সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যার মুখে নায়েকদের গাঁয়ে পৌঁছে দেখলেন যে গাঁসুদ্ধ সবাই বড় বড় গাছে আশ্রয় নিয়েছে। সাহেবকে দেখে তারা খবর দিল যে হাতীটা আগের রাত্রে গাঁয়ের ভিতর ঢুকে বিষম উৎপাত করে গিয়েছে।

গুণ্ডার সন্ধানে খোঁজকার শিকারী-দের নানাদিকে পাঠানো হোলো। দুইদিন পরে প্রায় তিন মাইল দূরের ঘন জঙ্গলে তার খোঁজ পাওয়া গেল। সেইখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একটা ছোট নদীর দুই পাশের জলা জমির উপর নিবিড় ঝোপঝাপেভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে হাতীটা ঢুকেছে। জায়গাটা প্রায় পনেরো কুড়ি বিঘার মতন এবং তার ভিতরে সাত-আট ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। সে জঙ্গলে ঢুকলে একপা দূরের কিছু দেখা যায় না, কাজেই সেই অবস্থায় গুণ্ডা হাতীর খোঁজে এগোনো অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাতী হামলা করলে সে ঘাড়ের উপর এসে পড়ার আগে তার কোনোও নিশানা পাওয়া ঐরকম জঙ্গলে অসম্ভব। অন্যদিকে ঐ জঙ্গলে এগোলে ঘাসপাতা ঝোপঝাড় ভেঙ্গে সরানোর সময় হাতী সঠিক জানতে পারবে যে শিকারীরা কোন দিক দিয়ে এসে কতদূর পৌঁছেছে। সে ইচ্ছামত সরেও পড়তে পারবে বা হঠাৎ চড়াও করতেও পারবে।

খোঁজকারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোলো যে সাহেব ঐ নাবাল জলা-জমিটার নীচের মুখের দিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াবেন আর ঐ খোঁজকার শিকারীর দল জঙ্গল দাবড়ে হাতীটাকে সেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। বাতাসের গতি দেখে অতি সন্তর্পণে জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে সাহেব নীচের মুখে পৌঁছলেন। সেখানে খানিকটা জমি একটা বড় উঁচু ঢিপির মত, এবং একটা বড় গাছও সেখানে আছে। ঢিপির উপর দাঁড়ালে সমস্ত নাবাল জমির এলাকা উপর থেকে দেখা যায়। তার ওপারে সাহেবের লোকজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে দেখা গেল। হাত তুলে ইঙ্গিত করা মাত্রই তারা চীৎকার করে ঢিল পাথর ছুঁড়ে হাতীকে তাড়া দিল। কিন্তু ফল হোলো বিপরীত। সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই এক ঝোপের মধ্য থেকে এক ভীষণ চীৎকার শোনা গেল এবং দেখা গেলো যে, সেই ঝোপঝাড় ভেঙ্গে, ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করে হাতীটা তার প্রকাণ্ড দেহ প্রবলবেগে চালিয়ে, সেই খোঁজকারদের লক্ষ্য করে তেড়ে যাচ্ছে। সাহেব তো গাঁ-গাঁ করে চেঁচিয়ে তাদের পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বললেন এবং তারাও নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

হাতীটা ঘনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে খোঁজকারদের না পেয়ে সোজা হনহন্ করে চললো পাহাড়ের কাঁধের উপরের দিকে। মাইল খানেক দূরে সে ছোট নদীটা পার করে, পাহাড়ের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে চলে গেল। সাহেবের দল যখন সেখানে পৌঁছলো তখন সে অদৃশ্য। দিন দুই খোঁজ করার পর জানা গেলো যে সে পাশের জঙ্গলে ঐ অঞ্চলের রাজার এলাকায় ঢুকেছে। সেখানে সাহেবের শিকারের অধিকার নেই, কাজেই সে যাত্রা তাকে ছেড়ে দিতে হোলো।

মাস খানেক পরে একদিন সেই জঙ্গলে ভরা উপত্যকায় শিকারের খোঁজে গিয়ে বিকালের দিকে সেই জঙ্গলের পথে এক দাঁতাল হাতী দেখা গেল। হাতীটার বাঁদিকের দাঁতটা ছোট কিন্তু ডানদিকেরটা প্রকাণ্ড এবং বেশ সুগঠিত। হাতীটা প্রায় দুশ গজ দূরে একটা গাছের ডালপালা টেনে ভেঙ্গে খাচ্ছিলো। দাঁত দেখে দূর থেকেই সেই গুণ্ডা হাতী বলে তাকে চেনা গেল। সাহেবের হাতে ভারী দোনলা এক্সপ্রেস রাইফল্ ছিল, আর পিছনে সঙ্গের লোকজনের কাছে আরো ভারী বন্দুক ছিল, তাই সাহেব সেইখানেই, হাতীর উপর নজর রেখে, সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষায় বসে রইলেন। হঠাৎ হাতীটা কানখাড়া করে সাহেবের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। সাহেবও স্পষ্ট শুনতে পেলেন যে তাঁর সঙ্গীরা মনের আনন্দে চেঁচিয়ে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে। বুঝা গেল যে, হাতীটা তাদের গলার আওয়াজ পেয়ে সেদিকে ফিরেছে। সাধারণত সঙ্গের ঐ খোঁজকারের দল

জঙ্গলে প্রায় নিঃশব্দেই চলতো কিন্তু সেদিন তাদের কিরকম ভুল হয়ে যায়।

আগেরবার ঐ গুণ্ডা হাতী লোক-জনের কথাবার্তা ও চেঁচামেচি শুনে সেইদিকেই তেড়ে গিয়েছিল। এবারও যদি ফের সেই মত করে, এই ভেবে সাহেব আস্তে আস্তে তাঁর রাইফেলের ঘোড়া দুটো তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন, যাতে খুব কাছ থেকে ঐ দোনলার দুই গুলী হাতীর কানের মধ্যে চালিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু গুণ্ডা হাতী বিষম চালাক, সে কি মনে করে অন্যদিকে ফিরে দ্রুত সরে পড়ল।

এর পরের বারের দেখায় হাতীটা প্রায় চিরদিনের জন্যে সাহেবের শিকার-যাত্রা শেষ করে দিয়েছিল। সেবার সাহেব সারা সকাল শিকারের খোঁজে শ্রান্ত হয়ে স্থির করেন যে জঙ্গলের ভিতরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরের এক ফরেষ্ট বাংলোতে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোর থেকে শিকারের খোঁজ করবেন। সেইজন্যে লোক পাঠিয়ে সাহেব তাঁর সইসকে একটা ঘোড়া আনতে বলেন। সইস একলা জঙ্গলে চলতে ভয় পাওয়ায় অন্য যারা সাহেবের সাথী তাদের জন্যে অপেক্ষা করে, বেলাশেষে সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলে ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়, তাও বিনা লণ্ঠন বা বাতি নিয়ে। তাই সঙ্গীদের মশাল জ্বালিয়ে নিতে বলে সাহেব ঘোড়ায় চড়ে চল্লেন ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলের দিকে। সবার আগে সঙ্গের শিকারীদের সর্দার, চিক্-মারা, এক প্রকাণ্ড মশাল জ্বালিয়ে চললো, তার পিছনে ঘোড়ায় চড়ে সাহেব এবং তাঁর পিছনে এক-একজন করে আরও ছয়-সাতজন।

হঠাৎ পথের মোড় ঘুরতেই দেখা গেল ঠিক সামনেই এক প্রকাণ্ড দাঁতাল পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা দাঁত ছোট আর অন্যটা বড় দেখে চিনতে কারও দেরী হোলো না যে, এই সেই গুণ্ডা। চিক-মারা 'আনে' (হাতী) বলে চেঁচিয়ে, মশাল ফেলে দিয়ে দিলো জঙ্গলে ডুব। চতুর্দিক অন্ধকার এবং কয়েক হাত তফাতে ঐ ভয়ানক জীব। সাহেব তো হতভম্ব। হাতীটার গম্ভীর ঘড় ঘড় শব্দ ক্রমেই জোর হচ্ছে যখন, সাহেবের ঘোড়া ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি ভড়্কে গিয়ে একেবারে ঘুরে উল্টো দিকে ছুট না দিতো, তবে সেই বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। ঘোড়া তো সেই অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের পথে ছুটে বেশ খানিক যাবার পর একটা ছোট নদীর সাঁকোর মুখে দাঁড়ালো। অল্প পরেই সাহেবের লোকজনও সব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পোঁছালো। একটু স্থির হয়ে দেখে-শুনে বোঝা গেলো যে, হাতীটা পিছু নেয়নি। তখন ফরেষ্ট বাংলোয় যাবার পরামর্শ আরম্ভ হোলো। সে-রাত্রে দুর্ভোগ অনেক ছিল। বাংলো পৌঁছাবার সোজা পথে যমদূত, অন্য পথে যা ছিল সেটা পাহাড়ী খাড়া পথ, তা-ও ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। সারা রাত সেই জঙ্গল টাঙ্গী ও দায়ের কোপে কেটে পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে চলতে হোলো। সাত-আট ঘণ্টা চলার পর ভোর পাঁচটায় গন্তব্যস্থলে সবাই পোঁছালো।

তারপর সেই গুণ্ডার আর খোঁজ-খবর নেই। প্রায় তিন মাস পরে আবার হঠাৎ তার দেখা পাওয়া গেল এবং এই দেখাই শেষ দেখা।

মাস তিনেক পরে সাহেব পাহাড়-তলীর নীচে এক সপ্তাহের জন্যে শিকারের ব্যবস্থা করেন। সকালের দিকে লোকজন, তাঁবু, বড় বন্দুক, রাইফেল ও থাকা-খাওয়ার অন্য সব সরঞ্জাম পাঠিয়ে, বিকালের একটু আগে শুধু চিক্-মারাকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব হাঁটা পথে তাঁবু ও ছাউনির পথে রওনা দিলেন। পথে যদি বনমোরগ পাওয়া যায় এই ভেবে সঙ্গে শুধু একটা সাধারণ হাল্কা বন্দুক ছিল। প্রায় দশ মাইল পথ চলার পর, যখন ছাউনি আর মাইল তিন-চার মাত্র, তখন এক জঙ্গলী হাতীচলা পথের মোড়ের থেকে শোনা গেল যে, কিছু উপরের ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে কি এক তুমুল গোলমালের শব্দ আসছে। ভীষণ গর্জন, কর্কশ চীৎকার এবং হাতীর হাঁকডাকে জঙ্গল যেন কাঁপছে এবং সেই সঙ্গে প্রবল জোরে লাঠিতে লাঠি মারার মত শব্দ। বুঝতে দেরী হোলো না যে, দাঁতালে দাঁতালে যুদ্ধ চলেছে।

চিক্-মারা মোটেই সেদিকে এগোতে রাজী ছিল না কিন্তু সাহেব যখন এগোলেন, সে-ও সঙ্গে চললো। হাওয়ার গতিমুখ ভাল করে দেখে, তার বিপরীত দিক ধরে দুজনে সেই পাহাড়ী পথে চললেন। কাছাকাছি এসে অতি সন্তর্পণে জঙ্গলের ভিতর আর একটু যেতেই দেখা গেলো যে, নীচের এক ছোট খোলা জায়গায় দানবের যুদ্ধ চলেছে।

সে এক সারা জীবন মনে রাখার মত দৃশ্য। যোদ্ধাদের মধ্যে একদিকে সেই পরিচিত পুরানো গুণ্ডা, তার বাঁদিকের ছোট দাঁত দেখতেই দূরে থেকে তাকে চেনা গেল। অন্য দিকে দুটি দাঁতাল, তার মধ্যে একটি ছিল প্রকাণ্ড বড় হাতী এবং তার দাঁতজোড়াও অতি সুন্দর ও লম্বা, অন্যটি তার চেয়ে অনেক ছোট। এই অসম যুদ্ধে গুণ্ডার হার নিশ্চিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রবল যুদ্ধ চালিয়েছে বুঝা গেল, কেননা তার বিপক্ষের দুই হাতীরই গায়ে রক্তেভরা ক্ষতচিহ্ন দূরে থেকেই দেখা যায়। গুণ্ডার অবস্থা খুবই সাংঘাতিক কাহিল দেখা গেল, তার সমস্ত দেহে, অসংখ্য ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্তের স্রোত। দেখা গেল যে, ছোট হাতীটি সামনা-সামনি গুণ্ডাকে আক্রমণ করছে। সে যেমন ঘুরছে বা পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে, ছোট হাতীটাও সেই মত ঘুরেফিরে সোজা লড়াই চালাচ্ছে। অন্য হাতীটা গুণ্ডার পাশ থেকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে এবং সেই সঙ্গে দাঁত চালিয়ে তাকে বিষমভাবে ঘায়েল করছে। এই প্রচণ্ড ধাক্কায় গুণ্ডা এক-একবারে অনেকটা হটে যাচ্ছে কিন্তু ছোট হাতী তার সম্মুখেই যাচ্ছে। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়ও এই যুদ্ধে একেবারে ভেঙ্গে ছিঁড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই রকম বিষম লড়াইয়ের পর দুই পক্ষ যেন কি একটা ইঙ্গিতে পৃথক হয়ে গেল এবং গুণ্ডা হাতী পাহাড়ের নীচের দিকে পালিয়ে গেল। তার বিপক্ষের দুই হাতী কিন্তু তার পিছু না নিয়ে, ফিরে চড়াইয়ের পথ ধরে উল্টোদিকে গেল। বুঝা গেল যে, তাদের দল সেই দিকে আছে।

গুণ্ডা হাতীর পিছনে একটু দূরে গিয়ে দেখা গেল যে, চতুর্দিকে রক্তের দাগ। বেলা পড়ে এসেছিল, তাই সাহেব তাঁবুর দিকে চললেন।

পরের দিন ভোরেই সেই গুণ্ডা হাতীর রক্তচিহ্ন ধরে সাহেবের দল একটি ছোট নদীর কাছে পোঁছাল। আহত হাতী নদীর পাড় ধরে আধ মাইল মত গিয়ে যেখানে জল কম, সেখানে পার হয়েছে দেখে আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল, সে ডান পাশে শুয়ে শুঁড় লম্বা করে ছড়িয়ে, মরে পড়ে আছে। অতটা দূর সে এলো কি করে

তাই আশ্চর্য, কেননা তার সারা দেহ গভীর ক্ষতে ভর্তি।

যুদ্ধটা কিসের কারণে ঘটেছিল, সেটা জানবার জন্যে সাহেব দলের অন্য কয়জন খোঁজকারকে সেই অন্য দুই যোদ্ধা এবং তাদের হস্তীযূথের খোঁজে লাগিয়ে নিজে দু'-তিনজনকে নিয়ে গুণ্ডার পিছনে গিয়েছিলেন। ছাউনিতে ফিরে আসতে সেই অন্যরা জানালো যে, সেই অন্য দুই হাতী তাদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং দলটা ছাউনি থেকে মাইল দুই দূরে আছে। তবে হাতীর ভয়ে তারা আরো কাছে গিয়ে সেই দুই যোদ্ধার খোঁজ নিতে পারেনি যে, তাদের অবস্থা কি।

পরের দিন সাহেব নিজেই সেই খোঁজ নিতে খুব সকালেই কয়েকজন লোক নিয়ে বেরোলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই সারি ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ের মধ্যে এক উপত্যকায় দলটি দেখা গেল। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আঠারটা ছোট-বড় হাতী সেখানে রয়েছে, দেখা গেল, তার মধ্যে বাচ্ছা ও মাদী হাতীই বেশী, বড় দাঁতাল মাত্র দুটো, তা-ও সেই দুই যোদ্ধা নয়। অকারণে এতদূরে আসা হয়েছে ভেবে সাহেব দলটাকে আর একবার ভালো করে দেখে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় এক খোঁজকার সাহেবকে চুপি চুপি বললে, "ঐ একটা প্রকাণ্ড হাতী দূরে একলা দাঁড়িয়ে আছে।" হাতীটা পিছন ফিরে ছিল, সুতরাং অতি সন্তর্পণে এগিয়ে তার বেশ কাছে এসে দেখা গেল যে, সে সেই মহাকায় যোদ্ধা, যে গুণ্ডাকে তার অন্তিম যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে জখম করে। বুঝা গেল যে, এই দল দখল নিয়ে যুদ্ধ এবং দলপতি একজন সহায়ক নিয়ে গুণ্ডাকে মেরে তাড়িয়েছে।

ফ্লেচারের অভিজ্ঞতা কিছু অসাধারণ নয় মনে হয়। বছর পঁচিশ আগে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ঐ রকম গুণ্ডা হাতী উপদ্রব করে। তারপর এক রাত্রে সেই তল্লাট ঝাঁপিয়ে, অন্য একটা হাতীর সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরদিন সকালে সেই 'লড়াকু' হাতীর খোঁজে বেরিয়ে, শিকারীরা প্রথমে একটা মরা হাতী দেখে যার একটাও গজদন্ত নেই। আরও বেশ কিছুদূরে গিয়ে জঙ্গলের কাছে আর একটা মরা হাতী দেখা যায়। এটা অতি প্রকাণ্ড এবং প্রথম নজরে মনে হয় যে, তার চারটা দাঁত!

ভাল করে দেখায় বুঝা গেল যে, দুটো বৃহৎ দাঁত ঐ হাতীর নিজের। অন্য যে দুটো তার গলার নীচে ফুঁড়ে বসেছে, সে দুটো অন্য হাতীটার। সে গভীরভাবে দাঁত বসিয়ে তারপর মরণ খোঁচা খেয়ে পড়ে যায় এবং সেই সময় ঐ দুটো ভেঙ্গে গিয়ে এই হাতীর গায়েই গেঁথে থাকে। ঐ লড়াইয়ে দলপতি শত্রুকে মেরে নিজেও মরে।

এই খবর অনেক দৈনিকে ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়।

বিদেশী গল্প

লুইজি পিরানদেল্লো

যুদ্ধ
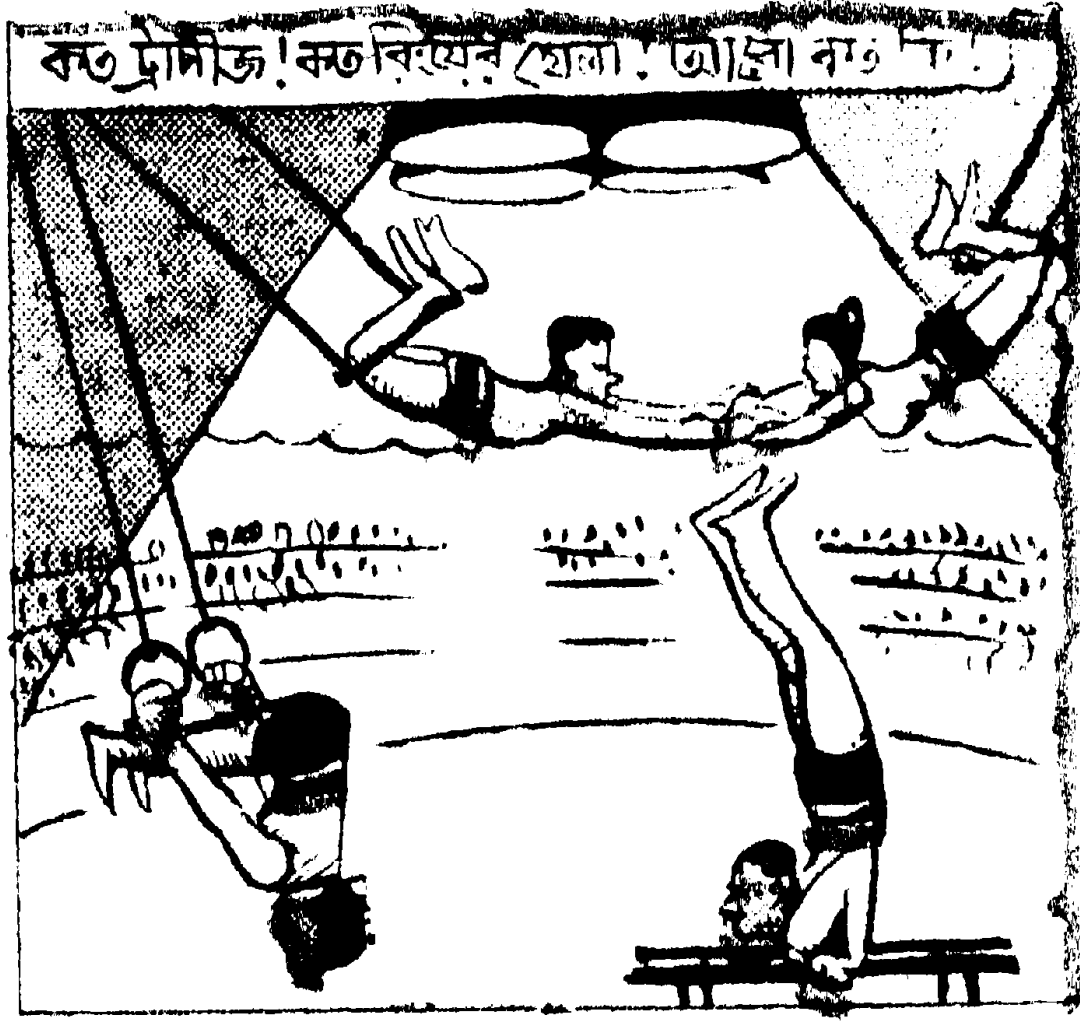
রাতের এক্সপ্রেসে যে যাত্রীরা রোম ত্যাগ করেছিল তারা শেষে ফেব্রিয়ানো স্টেশনে এসে ঠেকল। এখানেই তারা ভোর অবধি থাকবে। এখান থেকে তারা ধরবে লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেনটা বড়ই সেকেলে ধরনের। এই ট্রেন ধরে তারা যাবে মেন-লাইনের সুলমনায়।

ফেব্রিয়ানো স্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় বসে আছে পাঁচজন যাত্রী। এরা সারা রাত এই কামরায় কাটিয়েছে। ভোরের দিকে এল স্থূলাকৃতি একটি মহিলা যাত্রী। তার সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত। মনে হয় শোক-প্রকাশের সময় এখনও পার হয়নি। কোন দিকে না চেয়ে মহিলাটি সোজা সিটে গিয়ে বসল। পিছনে তার স্বামী। ভদ্রলোককে দেখতে ছোটখাট, রোগা, দুর্বল। মুখটা ফ্যাকাসে। চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। তাকে একটু লাজুক বলে মনে হয়। ব্যবহারে জড়তা প্রকাশ পাচ্ছে। শোকচিহ্ন আছে ভদ্রলোকের অঙ্গে। ভদ্রলোকটি হাঁফাচ্ছে।

যাত্রীরা ভদ্রলোকের স্ত্রীর জন্য বসবার জায়গা করে দিয়েছে। তাই ভদ্রলোকটি যাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেও একটা সিটে বসে পড়ল। তারপর স্ত্রীর দিকে একটু সরে তার কোটের কলারটি ঠিক করে দিতে দিতে বললে, "এখন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর খুবই নম্র।

স্বামীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভদ্রমহিলা আবার তার কোটের কলারটি টেনে মাথার দিকে তুলে দিল। মনে হল ওই কোটের কলারের মধ্যে সে মুখ ডুবিয়ে থাকতে চায়। যাত্রীদের কাছ থেকে মুখ লুকাবার জন্য ভদ্রমহিলার এই প্রচেষ্টা।

বিষণ্ণ হাসিতে মুখ ভরে গেল স্বামীটির। খুবই মৃদু কণ্ঠে বললে, "জঘন্য দুনিয়া।"

স্বামীটির মনে হল সব ঘটনা যাত্রীদের কাছে খুলে বলা দরকার। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, যাত্রীদের সহানুভূতিই তার স্ত্রীর প্রাপ্য। ভদ্রলোকটি বললে যে, তাদের একমাত্র ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে। ছেলেটির বয়সও বেশি হয়নি, মাত্র বছর কুড়ি। ছেলেটিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে স্বামী-স্ত্রী। ছেলেটি রোমে গেল লেখাপড়া করতে। স্বামী-স্ত্রীও সুলমনার ঘর-সংসার ত্যাগ করে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল রোমে। যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধে যোগ দিতে হল ছেলেটিকে। কিন্তু তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল যে, ছেলেকে ছ' মাস যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে না। কিন্তু হঠাৎ টেলিগ্রাম এল। দিন তিনেকের মধ্যেই ছেলেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। তার পেয়ে যেন তারা এক-

বার তাদের ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসে।

বিরাট কোটের তলায় খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল মহিলাটি। তার বিপুল শরীর মাঝে মাঝে কুঁচকে যাচ্ছিল। মহিলাটির মনে হল যে স্বামীর এত কথা, এত বিবরণ নিরর্থক। সহানুভূতির উদ্রেক করার জন্য তার স্বামী যদি এত কথা বলে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে। কারো মনে এক কণাও করুণা জমেনি। ভদ্রমহিলার মনে হল সমস্ত যাত্রীদের ইতিহাস হয়ত তাদের মতনই করুণ। বিরাট কোটের তলায় মাঝে মাঝে বুনো জন্তুর মত ফুলে উঠছিল ভদ্রমহিলাটি। স্বামীর কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল একজন যাত্রী। সে বললে :

"আপনার ছেলে মাত্র এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে। এত দেরীতে! আপনি ত ভাগ্যবান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আর, যে দিন যুদ্ধ বাঁধলো ঠিক সেই দিনই লড়াইতে পাঠানো হল আমার ছেলেকে। এরই মধ্যে দু'-দুবার সে জখম হয়ে ফিরে এসেছে। সেরে উঠতে না উঠতেই আবার পাঠান হল তাকে।"

আর একটি যাত্রী বললে, "আমার কাহিনী শুনবেন মশাই? আমার দুই ছেলে আর তিনটে ভাই-পো। তাদের সবাইকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে যুদ্ধে।"

সাহস করে বলে ফেললো স্বামীটি, "হতে পারে। কিন্তু এ যে আমাদের একমাত্র ছেলে। এই ছেলে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই যে!"

"কিন্তু থাকলেও একই ব্যাপার হত। আবার একটি মাত্র ছেলে থাকার বিপদ অনেক। ছেলেটি বাবা-মার বেশি আদর পেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। ধরুন, আপনার যদি কয়েকটি ছেলে থাকত তবে আপনি কি তার মধ্যে একটি ছেলেকে অন্য সকলের চেয়েও ভালবাসতেন? তা সম্ভব নয়। পিতৃস্নেহের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার কোন ব্যাপারই নেই। বাপের ভালবাসা ত আর রুটি নয় যে তাকে সমান করে ভাগ করে দেবেন। ভালবাসার মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার কোন কথাই নেই। বাপের ভালবাসা একটি ছেলের জন্যে যেমন, দশটি ছেলের জন্যেও তেমন। এমন কথা কি বলা যায় যে দুটি ছেলের জন্যে যে কষ্ট তার অর্ধেক হবে একটি ছেলের জন্য........"

লজ্জিত স্বামীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কথাটা ঠিকই। তবু আমি একটা কথা বলি। অবশ্য আমার কথায় কেউ কিছু মনে করবেন না। আমি কাউকে লক্ষ্য করে বলছি না। কিন্তু ধরুন, আপনার দুটি ছেলে। দুটি ছেলেই যুদ্ধে গেল। ধরুন, তার মধ্যে একজন আর ফিরে এল না। তবু আপনার আর একটি ছেলে ত থাকল। সেই আপনাকে কিছু সান্ত্বনা ত দিতে পারবে।...... আর বার একটিও রইল না তার......"

উত্তেজিত হয়ে উঠল যাত্রীটি। রেগে বললে, "ঠিক। তার তবু একটি ছেলে রইল। সেই-ই তার সান্ত্বনা। কিন্তু একমাত্র পুত্র মারা গেলে পুত্র-প্রাণ ভদ্রলোকটি ত আত্মহত্যা করে ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এখন বলুন এই দুটির মধ্যে কোনটে খারাপ? আমার অবস্থা আপনার চেয়ে খারাপ। তাই না?"

আর একটি যাত্রী বলে উঠল, "যত বাজে কথা!" যাত্রীটি মোটা। মুখটা লাল। রক্তজবা চোখ দুটি ঠেলে বেরুচ্ছে যেন।

যাত্রীটি হাঁফাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটছিল যেন। তার প্রাণশক্তির প্রাবল্য দুর্বল শরীর বেঁধে রাখতে পারছিল না। যেন সেই চঞ্চলতা চোখ দিয়ে ঠিকরে বার হতে চাইছে।

ওর সামনের পাটির দুটি দাঁত নেই। লোকে পাছে সেটি লক্ষ্য করে তাই একটা হাত মুখের ওপর চাপা দিয়ে যাত্রীটি আবার বলে উঠল, "যত সব বাজে কথা! এ সব কথার কোন মানে হয়? আপনারা কি বলতে চান যে শুধুমাত্র আমাদের সুবিধের জন্য আমরা সন্তানের জন্ম দেই?"

অন্য যাত্রীটিকে বড় অসহায় মনে হল। যে যাত্রীর দুটি ছেলে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধে গিয়েছে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বললে, "ঠিক। ঠিক বলেছেন মশাই। আমাদের সন্তান ত আমাদের নয়। তারা যে সমগ্র দেশের!"

প্রতিবাদ করে মোটা যাত্রীটি বললে, মিছে কথা। আমরা যখন সন্তানের জন্ম দেই, তখন কি একবারও স্বদেশের কথা আসে? সন্তান জন্মায় যেহেতু তাদের জন্মাতেই হয়। এই পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্তান আমাদের জীবনটাই আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এটাই হল খাঁটি কথা। বলা ভাল আমরাই আমাদের সন্তানদের। কিন্তু আমাদের সন্তানরা কখনই আমাদের নয়। কুড়ি বছর বয়সে ওরা যা করে, কুড়ি বছর বয়সে আমরাও ঠিক তাই করতাম। ভেবে দেখুন, ঠিক তাই-ই করতাম। আমাদেরও বাবা ছিল, মা ছিল। কিন্তু এখানেই ত শেষ নয়। ঐ বয়সে আমাদের আরও কিছু থাকত। থাকত আমাদের বান্ধবী, সিগারেটের নেশা। ঐ বয়সে থাকত জীবনের ওপর কত আকর্ষণ, কত মোহ, বন্ধন...... এবং স্বদেশ। ঠিকই, স্বদেশ থাকতই। দেশের ডাক এলে বাবা-মার হাজার নিষেধ উপেক্ষা করে আমরা নিশ্চয়ই দেশের ডাকে সাড়া দিতাম। কুড়ি বছর বয়সে এ কাজ আমরা করতাম। কিন্তু আজ আমাদের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। এই পরিণত বয়সে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা অনেক পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সন্তানের প্রতি আমাদের স্নেহ। এখন যদি হুকুম হয় যে, আমাদের সন্তানদের যুদ্ধে যেতে হবে না। তাদের জায়গায় আমাদের গেলে চলবে। আমরা কিন্তু সবাই সানন্দে ছেলের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো। তাই না?"

গাড়ির কামরায় অখণ্ড স্তব্ধতা। সমস্ত যাত্রী মাথা নেড়ে মোটা যাত্রীর কথায় সায় দিল।

মোটা যাত্রীটি আবার আরম্ভ করল, "তাই কুড়ি বছর বয়সে আমাদের সন্তান-সন্ততি যে আবেগে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেই আবেগ ও আদর্শকে সম্মান করতে হবে বৈকি! এই বয়সে তারা স্বদেশের কথা ভাববে। এই ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য গোল্লায়-যাওয়া ছেলেরা দেশের কথা ভাবে না। ভাল ছেলেরাই ভাবে। আমি সেই ভাল ছেলে-দের কথা বলছি। সেই সব ছেলেরা তাদের বাবা-মাকে সত্যিই ভালবাসে। কিন্তু তাদের কাছে বাবা-মায়ের ভালবাসার চেয়েও বড় স্বদেশের প্রতি ভালবাসা। এই ত খুব স্বাভাবিক। আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আমরা বুড়ো। আমরা অসমর্থ হয়ে গেছি। তাদের চোখে আমরা অথর্ব। আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারি না। তাই আমরা আছি ঘর আগলাবার জন্য। স্বদেশ অনেকটা রুটির মত। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রুটি। খিদে পেলে আমরা রুটি খাই, প্রাণধারণ করি। স্বদেশও আমাদের সেই নিত্য-প্রয়োজনীয় রুটি। তাই স্বদেশকেও রক্ষা করতে হবে। আমাদের সন্তানরা ছুটে গেল আমাদের সেই স্বদেশকেই রক্ষা করতে। তাই তারা চায় না তাদের বাবা-

মায়ের অশ্রু ও উদ্বেগ। তারা গিয়েছে কুড়ি বছরের স্ব-ধর্মের ডাকে। যদি তারা না ফিরে আসে, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যুও সুখের। তারা আনন্দিত হয়ে পরপারে চলে যাবে। অবশ্য এই ভাবে বোধ করতে পারে একমাত্র ভাল ছেলেরাই। আমি সেই ভাল ছেলেদের কথাই বলছি। ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মারা যাবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা ত জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই দেখল। জীবনের যে অন্ধকার দিক আছে, জীবনে যে ক্লান্তি ক্ষয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা আছে, জীবনে যে মোহভঙ্গের অবসাদ আছে, তারা সেই সব অন্ধকার রূপগুলো না দেখেই চলে যাচ্ছে। এ কত বড় ভাগ্য। এর চেয়ে আর কত বড় ভাগ্য আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য চাইতে পারি? তাই আমাদের চোখ মুছতে হবে। আর কান্না নয়। আমাদের হাসতে হবে।......... যেমন আমি হাসছি।...... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে।...... যেমন আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। মারা যাবার ঠিক আগে আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার কাছে এই বলে পাঠাল যে সে মারা যাচ্ছে। তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। এই মৃত্যুই সে চেয়েছিল। এ যে তার মহৎ মৃত্যু। তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কোন শোকচিহ্নও ধারণ করিনি।......"

এই বলে সে তার হালকা-রঙের কোটটা ফাঁক করল তার কথার যথার্থতা প্রমাণ করতে। সামনের পাটির দুটি হারানো দাঁতের ওপর ঠোঁটটা ঝুলছে। চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে, তারা দুটি স্থির। কিছুক্ষণ পরে সেই মোটা যাত্রীটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল। মনে হল এই হাসিটি যদি কান্না হত তবে বোধহয় সবচেয়ে ভাল হত।

অন্য যাত্রীরা সায় দিয়ে বললে, "ঠিক কথা। আপনি ঠিকই বলেছেন।......"

বিরাট কোটের তলায় স্থূলাকৃতি মহিলাটিকে বাণ্ডিলের মত বেঢপ দেখাচ্ছে। কিন্তু সে মন দিয়ে মোটা যাত্রীর কথাগুলি শুনছে। আজ তিন মাস ধ'রে সে খুব আগ্রহের সঙ্গে এই সব আলাপ-আলোচনা শুনে এসেছে। সে শুনেছে তার স্বামীর কথা, বন্ধু-বান্ধবের কথা। তার ভেতর সে পেতে চেয়েছে সান্ত্বনা। এই সব কথার ভেতর সে পেতে চেয়েছে এমন কোন বাণী যা তাকে রক্ষা করতে পারে, যা তার দুঃখকে লাঘব করতে পারে। সে খুঁজেছে এই সব কথার মধ্যে এমন একটা পথ যাতে মা তার একমাত্র পুত্রকে বিপজ্জনক জীবন কিংবা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও নির্লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু এত কথার মধ্যে সে কিছুই পায়নি। কোন সান্ত্বনাই মেলে নি। তাই তার দুঃখ আরও বেড়ে গিয়েছে। কারণ সে বুঝেছে যে তার দুঃখ, তার মন কেউ বোঝে না। কেউ নেই যে তার দুঃখের ভার নিতে পারে।

কিন্তু মোটা যাত্রীর কথায় সে বিস্মিত হল। সে অভিভূত হল তার আলাপে। মহিলাটির মনে হল তাকে কেউ বোঝেনি, কেউ তার দুঃখের অংশীদার হতে পারেনি; তার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। দায়ী সে একমাত্র নিজেই। কারণ সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে বাবা ও মাকে যে আবেগের উচ্চতায় উঠতে হয়; শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে নয়, সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও যেমন ভাবে অশ্রু সম্বরণ করে নির্লিপ্ত হতে হয়; সে সেই আবেগের উচ্চতায় উঠতে পারেনি এবং অর্জনও করতে পারেনি সেই নির্লিপ্ত।

ওদিকে মোটা যাত্রীটি সহ-যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছে। সে বলছে কি করে তার ছেলে দেশের জন্যে, রাজার জন্যে কোন খেদ না নিয়ে, আনন্দিত চিত্তে মৃত্যুর দিকে চলে গেল। মোটা যাত্রীটি দিচ্ছে তার ছেলের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ। মহিলাটি মাথা তুলে কোণের দিকে সরে গিয়ে অধীর আগ্রহে সমস্ত বিবরণ শুনতে লাগলো। শুনতে শুনতে তার মনে হল সে যেন এক বিচিত্র পৃথিবীতে অকস্মাৎ পা দিয়েছে। এমন জগৎ যে থাকতে পারে সে কথা একবারও সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সহযাত্রীরা সমস্বরে বীর পিতাকে অভিনন্দিত করছে। সব কথা কানে আসছে মহিলাটির। তার খুব ভাল লাগছে। সত্যিই, মোটা যাত্রীটি তার দুঃখ অবিচলভাবে সহ্য করছে!

হঠাৎ মহিলাটি মোটা যাত্রীটির দিকে মুখ ফেরাল। সে যেন এতক্ষণ কোন কথা শোনেনি। স্বপ্নোত্থিতের মত জিজ্ঞাসা করল;

"তাহলে......... আপনার ছেলেটি কি সত্যিই মারা গেছে?"

প্রত্যেকটি যাত্রীর চোখ মহিলাটির মুখে নিবদ্ধ। মোটা যাত্রীর বড় বড় ঠেলে-বার-হয়ে-আসা অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটিও গভীরভাবে এসে পড়ল মহিলাটির মুখে। মোটা যাত্রীটি যেন মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে। কিছুক্ষণ গেল। কোন উত্তর নেই। কোন কথা বার হল না মুখ থেকে। মনে হল ভদ্রমহিলার অবিশ্বাস্য রকমের বোকা ও সরল প্রশ্নে মোটা যাত্রীটি চকিতে এইমাত্র সত্য-সত্যই উপলব্ধি করল যে, তার ছেলে মারা গিয়েছে, চিরকালের জন্য মারা গিয়েছে, আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তার মুখ কুঁকড়ে গেল। বিকৃত হল। তাড়াতাড়ি বুকপকেট থেকে রুমাল টেনে বার করে মুখে চাপা দিয়ে সমস্ত যাত্রীদের বিস্মিত করে মোটা যাত্রীটি বুক-ভাঙা অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ডুকরে উঠল। অনুবাদ: রাম বসু

কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোট-গল্প-লেখক পিরানদেল্লো ১৮৬৭ সালে সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিন রোমে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৯ সালে এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালের পর থেকে ইনি পরিপূর্ণভাবে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রোমে ইনি নিজেই একটি নাট্যকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তাঁর দল নিয়ে সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেন। অচিরেই তাঁর নাটক প্রশংসিত ও নিন্দিত হতে থাকে। ১৯৩৪ সালে এঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

—অনুবাদক

সংবাদ বিচিত্রা

।। স্বয়ংক্রিয় কলের মানুষ ।।

সামান্য কয়েকদিন আগে কাসেলের প্রধান মেয়র ডক্টর লাউরিৎসেন একটা স্বয়ংক্রিয় কলের মানুষের হাত থেকে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া গ্রহণ করেছেন। কাসেলে অনুষ্ঠিত ষোড়শ আবিষ্কার ও অভিনব বস্তুর প্রদর্শনী উপলক্ষে এই ঘটনা ঘটে।

তিন হাজারেরও বেশী নারী পুরুষ আপন আপন বুদ্ধি আর খেয়াল খুশি অনুসারে নতুন নতুন জিনিষপত্র আবিষ্কার করেছে। জনৈক পাদ্রী এমন এক ধরণের আসবাবপত্র আবিষ্কার করেছেন যে, যেগুলোর দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। একজন জার্মাণ গৃহিণীর পেঁয়াজ কাটতে বড়ো কষ্ট হতো। পেঁয়াজ কাটবার সময় তার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তো। এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ভদ্রমহিলা এক ধরণের চশমা আবিষ্কার করেছেন। এই চশমা পরে পেঁয়াজ কাটলে পেঁয়াজের ঝাল লেগে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে না। প্রদর্শনীর মাত্র ২৬ গ্রাম ভারি একটি রেডিও হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটাই হলো পৃথিবীর সব চাইতে ছোট রেডিও এবং ফ্রাংকফুর্টের একজন হেয়ার-ড্রেসার এই রেডিওটা-আবিষ্কার করেছেন। একজন জার্মাণ মহিলা তাঁর স্বামীর নাকডাকার জ্বালায় শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন না। তাই স্বামীর নাকডাকা বন্ধ করার জন্যে তিনি এক প্রকার ব্যাণ্ডেজ আবিষ্কার করেছেন। প্রদর্শনীর সেক্রেটারি মাক্স গের্স্টনার আজ প্রায় ১৪ মাস ধরে একই ব্লেড দিয়ে দাঁড়ি কামাচ্ছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এতোদিন পরেও ব্লেডটার ধার কিছু মাত্র কমেনি। শুধু তাই নয়, কাসেলের কোনো ভদ্রলোকের কাছে ব্লেডটা বিক্রি করা যায় কিনা মাক্স গের্স্টনার তা একবার ভাল করে ভেবে দেখছেন

।। বিপদের মুখোমুখি সারাজীবন ।।

ওয়াল্টার মাৎর্জ হলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনি তাজা বারুদ ও বোমা নিষ্ক্রিয় করার পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং বোমা অপসারণ ও নিষ্ক্রিয়করণ দলের দলপতি হন। দলের প্রতিজ্ঞা ছিল যুদ্ধের শেষে তারা আর কোনরকম বোমা বারুদ স্পর্শ করবে না। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। হামবুর্গে যুদ্ধের পর অজান্তে বোমা নিয়ে খেলা করায় চল্লিশটি শিশুর প্রাণ যায়। মাৎর্জ তখন হামবুর্গ বোমা অপসরণ দল গড়ে তোলেন। তারপর থেকে মাৎর্জ ও তার দল লরিভর্তি তাজা বোমা ও বারুদ বোমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দেয়। তারা ভেবেছিল ১৯৪৫ সালে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের কাজ শেষ হবে, কিন্তু তা হয়নি। সেদিন থেকে ষোল বছর বাদে ১৯৬২ সালে মাৎর্জ অবসর গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে পর্যন্তও তিনি ৪৮০০ বার নিজের জীবন বিপন্ন করে ৪৮০০টি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করেছেন। কিন্তু তাঁর দলের কাজ আজও শেষ হয়নি। দেখা গেছে লোকে কামানের গোলাদিয়ে সিঁড়ি তৈরী করেছে কিম্বা ঘরবাড়ীর ছাদের করোগেটের টিন অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট্ গোলা চাপা দিয়ে আটকে রেখেছে; এই তো সেদিনও হামবুর্গ বন্দরের এক কোণে বেশ কয়েকটা তাজা বোমা ও বারুদ পাওয়া গেছে। এবং এই সবই এখনও নিষ্ক্রিয় করতে হবে। মাৎর্জের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল টাইম ফিউজগুলি। এইগুলি নিষ্ক্রিয় করা খুব জটিল কেন না এগুলি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ফিউজের সংখ্যা প্রায় ৪০০। স্রেফ আন্দাজের উপর নির্ভর করে এগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় করার সময় বহুবার ফিউজ ছুটে গেছে এবং মাৎর্জ ও তাঁর লোকেরা কোনক্রমে প্রাণে বেঁচেছেন। বোমা ও ফিউজ সম্বন্ধে মাৎর্জের অসাধারণ জ্ঞানের জন্য একমাত্র কানে কম শোনা ছাড়া আর তার কোন ক্ষতি হয়নি। মাৎর্জ জীবিত বটে কিন্তু হামবুর্গের বুকে ১,৩৭২ জন মৃত্যুর নাম লেখা যে স্মৃতিস্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয় এই কাজটি কত বিপজ্জনক।
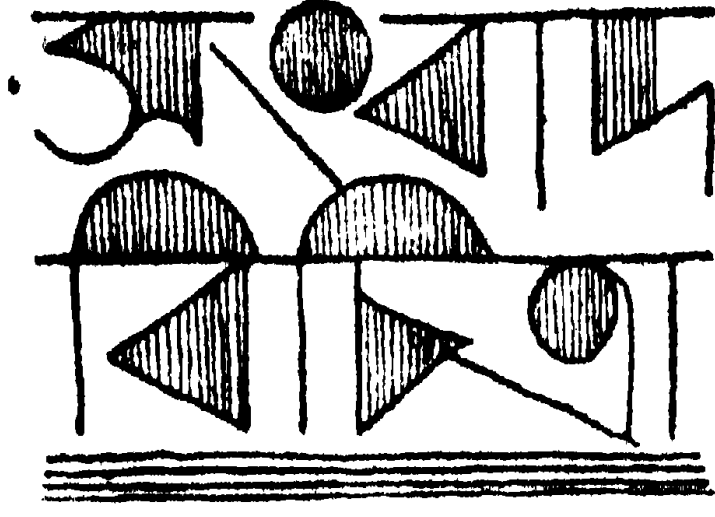
ওয়াল্টার মাৎর্জ একটি বোমার ফিউজ নিষ্ক্রিয় করছেন।

।। লবণ জল থেকে পানীয় জল ।।

সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানডিয়েগো শহরটিতে সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিদিন এই প্রকার দশ লক্ষ গ্যালন জল এখানে সরবরাহ করা হবে।

আমেরিকার আভ্যন্তরীণ দপ্তর এ ধরণের তৃতীয় কারখানাটি শীঘ্রই চালু করবেন—এটি স্যানডিয়েগোর সন্নিকটস্থ পয়েণ্ট লোমাতে অবস্থিত।

প্রথম কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে টেক্সাসের ফ্রিপোর্টে। এখানে প্রতিদিন সমুদ্রের লবণাক্ত জল হতে দশ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল তৈরী করা হচ্ছে। দ্বিতীয় কারখানাটি রয়েছে দক্ষিণ ডাকোটার ওয়েবসটারে। এখানে ঐ প্রকার আড়াই লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

পয়েণ্ট লোমার কারখানাটি আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন নির্মাণ করছেন। স্যান ডিয়েগোর অধিবাসিগণ মোট যে পরিমাণ জল ব্যবহার করে থাকেন তার এক তৃতীয়াংশ এই কারখানা হতে সরবরাহ করা হবে। এই সকল কারখানায় সমুদ্রের জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে আর তাকে শীতলীকৃত করে জলোপযোগী করা হয়। এই জলের শতকরা ৯৯·৯৯৫ ভাগ বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ বিভাগ গ্যারাণ্টি দিয়েছেন। পয়েণ্ট লোমার কারখানায় উন্নততর পদ্ধতিতেই পানীয় জল উৎপাদন ও পরিশ্রুত করা হবে।

যৌবন সমীপে অকাল বসন্ত

কনাদ চৌধুরী
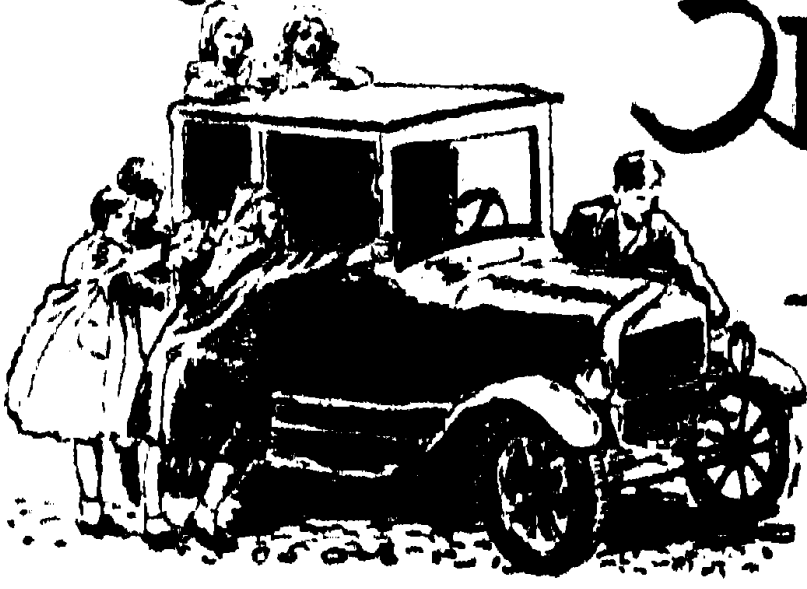
মাত্র বারো-তেরোটা বসন্ত পেরোলেই আমেরিকার ছেলেমেয়েরা আজকে যৌবনের সিংহদ্বারে পেণছে যায়। কিন্তু জীবনপ্রভাতের শিশির শুকোতে না শুকোতেই যৌবনের এই অকালবোধন যজ্ঞের মধ্যে একটা সর্বনাশের ইঙ্গিত পেয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। এবং আমেরিকার বাপ-মা'রাও তাঁদের সন্তানদের অকালবোধন নিয়ে কম চিন্তিত না। ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত একেবারে ভিন্ন। আমেরিকা নতুন দেশ। কালাশ্রিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্ষীণই বলা যেতে পারে। এমনকি বলা যায় মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ থেকে হঠাৎ দেশটা এক লাফে অলডাস হাক্সলির "দি ব্রেভ নিউ ওয়ারল্ডে" উপনীত হয়েছে। একদিকে পিউরিটান নীতিবোধ অন্যদিকে সিনেমা-রক এণ্ড রোল-চাচা-টুইস্ট-বিটনিক, এই দুই দিগন্তের দোলাচলে নতুন আমেরিকার নতুন কৈশোর স্পন্দিত।

আমেরিকার সমাজজীবনের সবচেয়ে উল্লেখ্য সমস্যা হল তার দীর্ঘস্থায়ী ক্রান্তিকাল। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন দেশ ক্রান্তিকালের দোলনায় দুলছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বহির্বিশ্ব রাজনীতির সংঘাতে সে সর্বদাই বিবর্তিত। তার ওপর আছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। কৃত্রিম গ্রহের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাজ্য নিয়তই অস্থির। ঠিক এই দোলাচলভূমিতে জন্ম নিচ্ছে আজকের আমেরিকার দিশেহারা কৈশোর।

তবে আধুনিক মার্কিন দেশের অকালবোধন সমস্যা আবর্তিত হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে। স্কুলের একটি মেয়ের সত্যিকারের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে ছেলেমহলে তার রমণীয় প্রতিপত্তির ওপরে। ছেলেদের বেলাতেও ওই একই নিয়ম। অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই কিশোরী মেয়েরা পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা, থিয়েটার, নাচের আসর, কিংবা নেহাতই সান্ধ্যবিহারে যায়। এই 'বিহার' ওদেশে একটি বিশেষ কৈশোরিক অধিকার। আমেরিকান অভিধানে এই অধিকারের প্রতিশব্দ "ডেটিং"। ডেটিংএর পসার না থাকলে যে কোনো কিশোরীকেই সমাজের অচল আধুলি হিসেবে গণ্য করা হয়। হাইস্কুলের মেধাবিনী ছাত্রীরা পর্যন্ত তাদের মেধার পরিচয় দিতে ভয় পায়, পাছে সহপাঠী ছাত্ররা তাকে 'ভালো মেয়ে' বলে এড়িয়ে চলে। ছেলেদের মুখেও সেই একই জাতীয় সংগীত "ভালো ছেলে নইকো মোরা, ভালো ছেলে নই।"

অদ্ভুত শোনালেও, আমেরিকার দশ বছর বয়স থেকেই মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে 'ডেট' পেতে আরম্ভ করে। ডেটিংএর প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েরা সাধারণতঃ সিনেমায়, স্কেটিংএ অথবা টেবিল-টেনিসের আসরে যায়। প্রথম পুরুষস্পর্শের সন্ধ্যায় সে সাড়া দিলেও ডেটিংএর কিছু নিজস্ব নিয়মকানুন তাকে মানতে হয়। যেমন প্রথম এবং দ্বিতীয় ডেটিংএ কোনো মেয়েই তার সহচরের ওষ্ঠবন্ধা হবে না। কারণ একেবারে প্রথম দিনের ঘনিষ্ঠতায় তার 'নারীমহিমা'র হানি হতে পারে। অভিভাবকরা কামনা করেন তাঁদের মেয়েরা যেন একই ছেলের প্রতি আসক্তা না হয়ে বিভিন্ন ছেলের সঙ্গে ডেটিং করে। তাঁদের ধারণা, ছেলেচেনা চোখ না থাকলে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পতিনির্বাচনে পারদর্শিনী হবে না তাঁদের মেয়ে। বিয়ের কনেকে যেমন সযত্নে সাজানো হয় বিবাহবাসরে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমেরিকান মা-ও তেমনি মেয়েকে সাজান তার সান্ধ্যবিহারের দিনে। পোষাকনির্বাচন নিয়ে মা মেয়েতে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধে। মেয়ে চায় তাকে যাতে একটু বয়সিনী দেখায়, (কারণ তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ!), কিন্তু জননী চায় পোষাক-পরিচ্ছদে কন্যার কৈশোর যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু যথারীতি মেয়েকেই জিততে দিতে হয়। কাজেই অঙ্গে যৌবন আসুক না আসুক, অঙ্গাভরণে যৌবনের সূর্যোদয় ঘটে। ষোলতে পড়লেই মেয়েরা 'গোয়িং স্টেডি'র একনিষ্ঠ রাজপথে এসে ওঠে। এই পর্যায়ে, সে বহু থেকে একের সঙ্গিনী। 'গোয়িং স্টেডি'তে ডেটিংএর প্রণয় পরিণতি। এই পরিণতি তাকে অনেকটা স্বাধীনতা দেয়। অর্থাৎ শনিবারের রাত্রির প্রায় অনেকখানিই তার অধিকারে আসে। এই সময় থেকে সে তার পরিমণ্ডলে আলোচনার সম্মানযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পত্রিকার 'গসিপ কলমে' গোয়িং স্টেডি জুটিদের নিয়ে বিশদ আলোচনা চলে। কোন জুটি বিচ্ছিন্ন হবার মুখে, কোন্ জুটি তখনো 'ঘনীভূত' প্রভৃতি খবর কেবল ছাত্রছাত্রীরাই পড়ে না, অভিভাবকরাও এই ধরণের খবর সাগ্রহে পড়েন। কারণ এই ধরণের পত্রিকা থেকেই নিজের ছেলেমেয়েদের গতিবিধির খবর পান তাঁরা। 'গোয়িং স্টেডি' জুটিকে দেখলেই চেনা যায়। একই বৃন্তে দুটি ফুল হয়ে এরা ঘোরে। পোষাকে পরিচ্ছদে জুটির দুজনেই প্রায় একই রকম। একই 'লকারে' এদের বই থাকে। ক্লাসে এদের আসনও পাশাপাশি। এমনকি প্যারোক্সাইড দিয়ে চুলের রঙও পর্যন্ত সমতা আনা হয়। কখনো কখনো দুজনের মধ্যে "বন্ধুত্বের" অঙ্গুরী বিনিময়ও ঘটে। স্মৃতিচিহ্ন উপহারের প্রেরণায় একবার একটি কিশোর তার সহচরীর বাহুতে নিজের নামের আদ্যাক্ষর গভীর করে ছুরি দিয়ে খোদাই করেছিল।

কিন্তু সকলেই ঠিক একমেবাদ্বিতীয়মের শেকলটা পরতে চায় না। বিশেষতঃ বাপ-মাদের প্রেরণায় বিশেষ কোথাও নিবেদিত না হয়ে সর্বপক্ষে সমান মন দেয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের যে মেয়েটি 'মুক্ত' থাকতে চায়, তার সহচর-

যৌবন নৃত্য

সংখ্যা চার থেকে পঞ্চাশ। তবে 'মুক্ত-কন্যাদের 'বন্ধুদের' গড়-সংখ্যা হল দশজন। 'মুক্তপুরুষ'রা এদিক দিয়ে কিন্তু ভাগ্যবন্ত! তাদের বান্ধবীদের গড়-সংখ্যা বেশী, পনেরোজন।

আমেরিকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু চলতি হাওয়ার পন্থী হয়েই শুধু যৌবনের হাতে বড় মাপের রাখী পরায় না। ব্যক্তিগতভাবেও তারা বিশ্বাস করে যে তাদের আদরের যৌবন একেবারে অকালবোধনের আগন্তুক না। কিশোর-কিশোরীরা বড়দের যেন কোনো রকমে 'ক্ষমা ঘেন্না' করে মেনে নেয় এবং তাদের মতাদর্শকে তাচ্ছিল্যের তাকে অতীতের সামগ্রী হিসেবে তুলে রাখে। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্যে ছেলেদের কিছু মূল্যও দিতে হয়। প্রথমেই তাদের স্বাবলম্বী হতে হয় ছোটবেলা থেকেই। অনেক ছেলেই ২৪ থেকে ৮০ ডলার উপার্জন করে মাসে। কিশোরীরা 'শিশু প্রহরা' (baby sitting) দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ সেন্ট পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। ছেলেদের প্রিয় পেশা-গুলির মধ্যে খবরের কাগজ ফেরি, গ্যারেজের মিস্ত্রীগিরি, কারখানার প্যাকিজিংএর কাজ প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়াও অনেক ছুটকো কাজের সন্ধান রাখে তারা, যেমন ডাকবাক্স রঙ করা, প্রতিবেশীদের গ্যারেজ পরিষ্কার করা, আবর্জনা বিক্রি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উপার্জনের সমস্ত অর্থই ছেলেদের ব্যয় হয় ডেটিংএর স্বার্থে। স্কুলের একটি ছেলেকে ছুটির পরে মজুরের মত খাটতে হয় একটা নিজস্ব গাড়ি কেনার জন্যে। কারণ গাড়ি না থাকলে প্রিয় বান্ধবীর মন অন্যের দিকে ধাবিত হতেও পারেই, ডেটিংএর প্রয়োজনেও গাড়ি একটি একান্তই আবশ্যিক উপকরণ। গাড়ি কেনার জন্যে তেরো বছর বয়েস থেকেই তারা টাকা জমাতে আরম্ভ করে। আমেরিকার কৈশোরদর্শনে যানহীন যৌবনযাত্রা নুনহীন ব্যঞ্জনের মতই স্বাদহীন। মধ্যরাত্রির চড়ুইভাতি ও লেকের ধারে নিভৃত জ্যোৎস্না-জটলায় যাওয়ার একমাত্র সেতু, নতুন মডেলের একটি গাড়ি। আমেরিকার গাড়ির লাইসেন্সও দেয়া হয় উদার হাতে। সেখানে এগারো বছরের একটি ছেলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করতে পারে। কিন্তু এই গাড়ির ছড়াছড়ি অন্য এক ধরণের সমস্যায় ফেলেছে যুক্তরাজ্যের পথ-পুলিশদের। কিশোর চালকরা অল্পগতিতে তৃপ্ত না। যে গতিতে তারা কৈশোর অতিক্রম করে পথকে পেরোয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে। ফলে জনবহুল রাজপথেও ঘণ্টায় ১৪০ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে ইঞ্জিন ফেটে অনেক আমেরিকান কিশোর সত্যিকারের যৌবনকে অতিক্রম না করতে পেরে নিহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই গাড়ি-সমস্যার তাগিদে আমেরিকার ২৫০০ স্কুলকে ড্রাইভিং শিক্ষার ক্লাস খুলতে হয়েছে। বাবারাও ছেলেদের গাড়ি কিনতে উৎসাহ দেন, কারণ বাড়ির গাড়ির পরমায়ুটাকে কমতে দিতে তাঁরা স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক।

আমেরিকার ব্যাপক যৌবনবন্দনার কারণ সম্ভবতঃ এই যে নিজেদের যৌবনকে আজকের প্রাপ্তবয়স্কারা বিশেষ ধরে রাখতে পারেননি। হয়ত তাই উত্তরসূরীদের আজকে জাগানো হচ্ছে যৌবনযামিনী না যেতেই। এর ফল কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। কুয়াশাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে হাঁটতে হতে পারে আজ থেকে কুড়ি বছরের পরের যুক্ত-রাষ্ট্রের নাগরিকদের। যৌবন যাদের কৈশোরেই করায়ত্ত, যৌবনের সমীপে পৌঁছে বার্ধক্যের বারাণসীতে নির্বাসিত হয়ে যেতে পারে।

কিশোরী ক্লাবে জনৈকা নতুন সভ্যার শপথ-গ্রহণ

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্রনীলের অভিযোগ মিথ্যা বলা যায় না। ওদের সুখ-শান্তি হরণ করছে বৈকি পাগলটা। অথচ নিজের তার সুখের অবধি নেই। খায় ঘুমোয় কথা কয় আর যখন-তখন খোলা গলায় কবিতা আবৃত্তি করে।

দ্রুত পায়চারি করতে করতে কবিতা বলা সুশোভনের একটা বিশেষ ভঙ্গী। আজও সেই ভঙ্গীতে উচ্চ থেকে উচ্চ-গ্রামে সুর তুলে আবৃত্তি করছিলেন—

—'বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর
ঝংকার ঝঞ্জনা,
তোলো উচ্চ সুর।
হৃদয় নির্দয়াঘাতে ঝর্ঝরিয়া
ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন
ঊর্ধ্ববেগে—
অনন্ত আকাশে—
উড়ে যাক্, দূরে যাক—বিবর্ণ
বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

'বিপুল নিশ্বাসে—বিপুল নিশ্বাসে—' দ্রুত পায়চারি থামিয়ে সহসা কপালে হাত ঘসলেন সুশোভন। বোবা চোখে দেওয়ালের দিকে তাকালেন। মনে আনতে পারলেন না পরবর্তী লাইনটা কি?

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, 'সুচিন্তা! সুচিন্তা।'

সুচিন্তা কাজ ফেলে এসে দাঁড়ালেন।

সুশোভন ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, 'তার-পর কি, সুচিন্তা?'

সুচিন্তা হেসে ফেলে বললেন, "কার পর?"

.'আঃ কার পর বুঝতে পারছ না?' সুশোভন অস্থিরভাবে বলেন, 'ওই যেটা আমি বলছিলাম! কি যেন বলছিলাম! ওই যে—হ্যাঁ হ্যাঁ 'বিপুল নিশ্বাসে, বিপুল নিশ্বাসে। কিন্তু তার পর?'

'বিপুল নিশ্বাসে?'

সুচিন্তা অবাক হলেন, 'বুঝতে পারছি না তো?'

'বুঝতে পারছ না? চমৎকার! দিনাজ-পুরের বাড়ীর ছাতে আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ করতাম. আর তুমি হাঁ করে শুনতে না? এখনও বল কিছুই বুঝতে পারছ না! কিছুই মনে পড়ছে না।'

সুচিন্তা বিপন্নভাবে বলেন, 'না না, সে সব তো মনে পড়ছে, কিন্তু কিসে থেকে যেন মুখস্থ করতে—'

'কিসে থেকে আবার! ক্লাশে ফার্স্ট হয়েছি বলে বাংলার মাষ্টারমশাই যে বইটা আলাদা করে নিজে থেকে উপহার দিলেন—'

সুচিন্তা বলেন, 'তাই বল। চয়নিকা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চয়নিকা। কিন্তু তুমিও তো আমার কাছ থেকে শুনে শুনে কত মুখস্থ করে ফেলেছিলে. তবে বলতে পারছ না কেন তার পরটা কি। 'সেই যে উড়ে যাব দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা'—

সুচিন্তা আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন, 'আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে—'

'দ্যাটস রাইট!' চেঁচিয়ে উঠলেন সুশোভন, 'ঠিক বলেছ।. ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া মত্ত হাহারবে।

ঝঞ্জার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর নৃত্য হোক তবে।'

সুশোভন আবার দ্রুত পায়চারি শুরু করে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকেন,

'ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের
আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়।
ধূলি সম তৃণ সম, পুরাতন
বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।'

সুচিন্তা তখন কি কাজ করতে করতে চলে এসেছেন, ভুলে যান, ভুলে যান এক পরিণত বয়স্কা বিধবা মূর্তির সামনে, এক উদভ্রান্তচিত্ত প্রৌঢ় পাগল সকালের রোদ্দুরের আলোয় ভরা ঘরে এই ঝঙ্কার তুলেছে। দেখতে পান আলসে-ভাঙা একটা পুরনো বাড়ীর ছাতে পড়ন্ত বিকেলে একটা কিশোরী মেয়ের 'হাঁ' করে চেয়ে থাকার সামনে একটি সুকুমার কিশোর একমাথা ঝাঁকড়া-চুল দুলিয়ে এলোমেলো পায়ে ঘুরতে ঘুরতে আবৃত্তি করে চলেছে—

'হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন
পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে
স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।'

দেখাতে পান সেই কম্পিত ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য দেখা চির-

চেনা ছেলেটার মুখ যেন এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরতাল্ক চন্দনপুলির ভক্ত, গাছে চড়ে ফল ফুল পাড়ায় ওস্তাদ ছেলেটা যেন এক না-বোঝা জগতের হঠাৎ আলোয় অন্য আর একজন হয়ে উঠেছে। তাই প্রথম দিকের মৃদু ভীরু কণ্ঠ তার ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠে বলছে—

'হে দুর্দম হে নিশ্চিত হে নূতন,
নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ
করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল।
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি
বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে।
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ
প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।'

লুপ্ত হয়ে যায় সংসারের কাজ আর কাজের সংসার। লুপ্ত হয়ে যায় দিন রাত্রি সকাল সন্ধ্যার জ্ঞান, শুধু চেতনার মধ্যে ঝংকৃত হতে থাকে,

'তারপর ফেলে দাও, চূর্ণ করো
যাহা ইচ্ছা তব
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ করো হৃত পত্র চ্যুত
পুষ্পদল,
ছিন্ন ভিন্ন পাখা।
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন
তব দস্যুতার—
লুণ্ঠনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত
তমিস্র সেই,
বিস্মৃতির দেশ।
নবাঙ্কুর ইক্ষু বনে—'

'মা।'

ডাক শুনে চমকে পিছনে তাকালেন সুচিন্তা।

না, অন্য কেউ নয়। চাকর সুবল। পিছন থেকে ডাকছে সমীহ সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে। যা তার নীতি। যা অনুপম কুটিরের রীতি।

আলসে-ভাঙা শ্যাওলা-ধরা ছাত থেকে নেমে এলেন সুচিন্তা। নেমে এলেন দোতলার ঘরের মোজেক-করা মেজেয়। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী চাই?'

সুবল মাথা নীচু করে বলল, 'নীচের তলায় ছোটদা এসেছে ছোটবৌদিকে নিয়ে—

ছোটদা এসেছে ছোটবৌদিকে নিয়ে!

এ কোন ভাষা!

সুচিন্তা কি সত্যিই চেতনার জগতে ফিরে এসেছেন, না কল্পনার এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে আছড়ে এসে পড়লেন?

স্পষ্ট শুনতে পাওয়া কথা। তবু বুঝি নিঃসন্দেহ হতে হয়, 'কে এসেছে নীচে?'

'ছোটদা আর ছোটবৌদি। ইয়ে ওই যে ওই দিকের সামনের বাড়ীর মেয়ে।'

সুচিন্তা বাধা দেন। 'জানি। জিগ্যেস করগে আমায় কিছু বলতে চায়?'

'আজ্ঞে, উপরতলায় আসছে, তাই খবর দিতে বলল ছোটদা।'

'খবর দেবার কি আছে? আসতে বল।' বলে সুচিন্তা দেয়ালের কাছে রাখা নীচু মোড়াটা টেনে নিয়ে বসলেন।

এই ব্যাঘাতে সুশোভনের আবৃত্তি থামল।

কাছে এসে বললেন, 'ঘর থেকে চলে এলে যে? বসে পড়লে যে? চয়নিকা তোমার ভাল লাগে না?'

'লাগে বৈকি! ওমা সে কী! ভাল লাগবে না? বসলাম পা ব্যথা করছে বলে।'

'পা ব্যথা করছে!'

সুশোভন ঈষৎ ব্যাকুলভাবে বলেন, 'কেন, পা ব্যথা করছে কেন? খুব হেঁটেছ বুঝি?'

'না, হাঁটব কেন? কোথায় হাঁটব? তুমি একটু শান্ত হয়ে বস তো!'

'বসব? শান্ত হ'য়ে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি ওরা এসে পড়বে।'

'ওরা? ওরা কারা সুচিন্তা?'

'ওরা? ওরা—ওই যে আসছে। আমার ছোট ছেলে আর তার বৌ।'

ওরা এল।

ইন্দ্রনীল আর নব-পরিণীতা বধূ কৃষ্ণা।

যে বৌকে সুচিন্তা আগে দেখেছেন। যে শাশুড়ীকে কৃষ্ণা আগে দেখেছে। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কেউ কোনদিন বলেছে?

না—তা বলেনি।

আজ মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণা কথা বলবে বলে।

ইন্দ্রনীল দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। সত্যিই কাঁচপোকা তেলাপোকার নীতিতে কৃষ্ণা তাকে টেনে এনেছে, না ইন্দ্রনীলেরই ভিতরের প্রবল ইচ্ছা তাকে টানছিল অনুপম কুটিরের দিকে? শুধু নিজের মনের কাছেও সেটা স্বীকার করতে নারাজ বলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গী দেখিয়ে কৃষ্ণার পিছু পিছু নিজের বাড়ীতে এসে ঢুকেছে সে?

সালংকারা সুসজ্জিতা কৃষ্ণা নীচু হয়ে সুচিন্তাকে নমস্কার করল, আর একবার বাঁকা কটাক্ষে তাকিয়ে দেখল সেই মানুষটার দিকে। যে মানুষটা সুচিন্তার পিছন দিকের ঘরের দরজায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

না, বৌ-মুখ দেখতে সুচিন্তা তাড়াতাড়ি সোনা খুঁজতে বাক্স-আলমারী খুলতে উঠলেন না! শুধু বৌয়ের মাথায় একটু মৃদু করস্পর্শ দিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন, 'একজন গুরুজনকে প্রণাম করবার সময় সামনে আর কোন গুরুজন উপস্থিত থাকলে তাঁকেও প্রণাম করতে হয় বৌমা।'

কৃষ্ণা তার এক হাতের মোটা বালাটা আর এক হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলল, 'আর গুরুজন কে?'

সুচিন্তা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন, 'সুশোভন, এদিকে একটু সরে এসো তো। বৌমা প্রণাম করবে। দেখতে পাচ্ছ না তোমায়।'

'বৌমা' শব্দটা বোধগম্য না হলেও 'এদিকে এস' কথাটা বুঝতে পারলেন সুশোভন, এগিয়ে এলেন।

কিন্তু কৃষ্ণা এ পরিস্থিতি গায়ে মাখল না। বরং সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্ন করল, 'উনি কে?'

সুচিন্তা এবার ছেলের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে প্রায় হেসে উঠে বললেন, 'বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, কার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, এসব কথা যে বাসরঘরেই বৌকে শিখিয়ে আনতে হয় রে ইন্দ্র, তুই এই এক মাস ধরে কি তবে করলি?'

বলা বাহুল্য ইন্দ্রনীল নির্বাক।

উত্তর দিল কৃষ্ণাই।

বলল, 'বাড়ীতে আমার দুই ভাসুর আর আপনি ছাড়া আর তো কারও থাকবার কথা নয় মা। শুনেছি আর এদের কেউ নেই।'

সুচিন্তা সহসা রীতিমত খোলা গলায় হেসে উঠে বললেন, 'শোনা কথা যে কত সময় কত ভুলই হয় বৌমা। আমিও তো শুনেছিলাম ইন্দ্র বড় ঘরে

—কিন্তু থাক সে কথা। সুশোভন, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো।'

সুশোভন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়েন।

কৃষ্ণা সুচিন্তার অর্ধসমাপ্ত কথার অপমান গায়ে না মেখে এবার বলে, 'আপনি তো কই আমাদের একটু বসতে বললেন না।'

সুচিন্তা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'এই দেখ কান্ড! তোমাদের আবার বসবো কি? নিজেদের ঘর নিজেদের জায়গা, বসতে বলবার অপেক্ষা রাখবে না কি তোমরা? কিরে ইন্দ্র, তোকে আবার 'আসুন বসুন' ব'লে আপ্যায়ন করতে হবে না কি?'

ছেলেদের মধ্যে এক ইন্দ্রনীলকেই সুচিন্তা মাঝে মাঝে 'তুই' বলতেন, কিন্তু মায়ের এমন পরিহাস তরল কৌতুক-কণ্ঠ কবে শুনেছে ইন্দ্রনীল? ঠিক এই ধরনটার জন্যে কি সে প্রস্তুত ছিল?

একটু যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে।

কাজেই কথা কৃষ্ণাই বলে।

'তবু আপনিই যখন বাড়ীর বড়, আপনার একটা অনুমতি চাই বৈকি। আর নিজে থেকে যখন আপনি বলবেন না, তখন আমাকেই বলতে হচ্ছে, কাল থেকে এখানে এসে থাকবো আমরা।'

সুচিন্তা স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাকেই উদ্দেশ করে ফের হেসে উঠে বলেন, 'বিয়ে হলে বৌকে লোকে গহনা-টহনা উপহার দেয় শুনেছি, তা' তুই বুঝি পয়সার অভাবে অন্য জিনিসের বদলে নিজের বাকশক্তিটাই বৌকে উপহার দিয়ে বসে আছিস ইন্দ্র? তোর কথাগুলোও এবার থেকে ওর কাছ থেকেই শুনতে হবে!'

ইন্দ্রর ফর্সা মুখটা এবার লাল হয়ে ওঠে।

তবু মুখ তুলে বলে, 'না, আমিই বলছি, কাল হোক পর্শু হোক কি দু-পাঁচ দিন পরেই হোক, এখানে আসবো আমরা, থাকতেই আসবো। শুধু বাড়ীটা আমাদের থাকবার উপযুক্ত করতে হবে।

সুচিন্তা বলেন, 'সে উপযুক্তটা কি, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না ইন্দ্র? তোমার ঘর যেমন ছিল তেমনিই আছে, ইচ্ছেমত সাজিয়ে গুছিয়ে তুমিই নেবে।

'সাজানো গোছানোর কথা হচ্ছে না—' ইন্দ্রনীল অসহিষ্ণু ভাবে বলে, 'স্বাভাবিক অবস্থার কথা হচ্ছে। নীতার খবর আমি শুনেছি, খুব শীগগিরই সে দেশে ফিরে আসছে, ওদের দিল্লীর বাড়ীতেই উঠছে। এবার অনায়াসেই ও'কে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।'

'ও'কে' শব্দটা বলার সংগে সংগে সুশোভনের ঘরের দিকে ইংগিত করে বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলে ইন্দ্রনীল।

সুচিন্তা কষ্টে কিনা, অথবা কত-কষ্টে, তা' ঠিক বোঝা যায় না, তবে আত্ম-সংবরণ করেন। করে সহজ গলাতেই বলেন, 'মানুষ তো আর বাক্স বিছানা বাসনপত্র নয় ইন্দ্র, যে তাকে সরিয়ে নড়িয়ে ঘরের জায়গা বার করা যায়? তার অংক আলাদা।'

ইন্দ্র ভাবে খুব বোকামী হয়েছে তার একেবারে বৌকে সংগে নিয়ে এবাড়ী ঢোকা। আগে একা নিজে এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল। তবু সুচিন্তার এই স্পষ্ট দুঃসাহস তাকে প্রায় হতবাক করে ফেলছে।

কৃষ্ণার সামনে সুশোভন সম্পর্কে এত স্পষ্ট আর প্রখর হবেন সুচিন্তা, এটা ইন্দ্রনীলের ধারণা ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণাকে না আনলে তার বক্তব্য তো অনুচ্চারিতই থাকতো। ইন্দ্র-নীল কি পারতো মায়ের সংগে এত কথা চালাতে। যদিও কৃষ্ণার চটপটে কথায় অস্বস্তি একটু হচ্ছে তার, তবু মনে করছে কৃষ্ণার আগ্রহে আর চেষ্টায় যদি এবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থাটা হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। সত্যি, পুরুষ হ'য়ে পাড়ার মধ্যে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করার মত লজ্জা আর কি আছে? যতই কৃষ্ণার মা বলুন, 'তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে' তবু মন সায় দেয় না। আর কৃষ্ণারও তো বিষম জেদ চেপেছে অনুপম কুটিরে বাস করবার।

জেদের পিছনে যে মনোভাবই কাজ করুক, জেদটা ইন্দ্রনীলের অনুকূলে।

কিন্তু জেদের সংগে সংগে যে তার কঠোর শর্তটা সব বানচাল করে দিচ্ছে।

সুশোভন থাকতে কৃষ্ণা এ বাড়ীতে বাস করতে আসবে না!

কৃষ্ণার মাও বলেছেন, 'না বাপু না। আমার ওই সবেধন নীলমণি একটা মাত্তর মেয়েকে আমি 'পাগল ছাগলের' বাড়ীতে পাঠাতে পারব না। তাঁকে আগে বিদায় কর, তবে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা মুখে এনো।'

ইন্দ্রনীল অবশ্য সে কথার উত্তরে বলেছিল, 'নিয়ে যাবার কথা মুখে আমি আনিনি। আপনার সবেধন নীলমণিই যাবার জন্যে অস্থির।'

কৃষ্ণার মা বিরস মুখে বলেছিলেন, 'তা' অস্থির হবে বৈকি। কথাতেই আছে মেয়েসন্তান নিষ্পরের মাটিতে গড়া। গোত্রান্তর করার সংগে সংগেই অন্তরের বন্ধন আপনি কেটে যায়। তবে পরে পস্তাতে হবে তাকে, এ তো দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

মেয়ের কাছে অবশ্য নিভৃতে অন্য কথা বলেন তিনি। বলেন, 'শাশুড়ীর স্বভাব ভাল নয়' এর চাইতে ঘেন্নার কথা আর কী আছে? যেমন করে পারিস একেবারে শেকড় উপড়ে ফেলগে যা। আর কোথাও জায়গা নেই? থাকুন না গিয়ে তিনি সেখানে। এতখানি বয়েস হয়েছে, বড় বড় ছেলেরা! একটু লজ্জা-শরমও নেই ছিঃ। আর তোকেও বলি, বেছে বেছে বিয়ে করবার আর ঘর পেলি না? দেখে-ছিলি তো আগে ওদের রকম সকম।'

কৃষ্ণা বেজার মুখে বলেছিল, 'আগে অত কি করে জানবো? নীতাদির বাবা, অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছেন চিকিৎসা করাতে, এই জানতাম।'

'তা' সেই নীতাদিটি ওদের কে, কার সংগে কার কী সম্পর্ক, সে কথা কোন দিন ভেবেছিলি?'

'অত কে ভাবতে গেছে? কেউ না কেউ হবেই তাই জানা। বলতো তো পিসিমা।'

'তোমার মত বিশ্ববোকা আর ভূভারতে কে আছে? আর ওই তোমার নীতাদিটি? সোজা চালাক নয়। একটা ছুতো করে দিব্যি কেটে পড়ল পাগল ব্যাপটাকে এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে। যাক, তুমি যদি না পারো, আমাকেই চেষ্টা করতে হবে। পাড়ায় তো মুখ দেখাতে পারছি না। শুনছি না কি পোষা কুকুরের মত সকালে লেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় পোষা পাগলটাকে, নেহাৎ চেন ধরে নয় এই পর্যন্ত। ছি ছি।'

মেয়ের সংগে কথার ব্যাপারে রসনাকে যে কিছু সংযত করা শোভন, রাগের চোটে সে আর মনে থাকে না কৃষ্ণার মার। কৃষ্ণাও নির্বিবাদে শুনে যায়, এবং অতঃপর স্থির সংকল্প করে ইন্দ্রনীলকে ধরে-বেঁধে এসে হাজির হয়েছে।

সুচিন্তা মানুষকে বাক্স বিছানার সংগে তুলনা করে আলাদা অংকর হিসেব দেখাতে কৃষ্ণা আরক্ত মুখে বলে ওঠে, 'তা'হলে বুঝতে হবে আপনি চান না যে আমরা এখানে এসে থাকি?'

সুচিন্তা এবার ছেলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বৌয়ের দিকেই তাকিয়ে বলেন, 'তোমরা যদি ভুল বুঝতে চাও, আমার আর করবার কি আছে বল? শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তোমরা তোমাদের ঘরে এসে থাকতে ইচ্ছে করছ

শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে বললে মিথ্যে বলা হবে না।'

কৃষ্ণা জেদের সুরে বলে, 'সত্যি বললেই বা বুঝবো কি করে বলুন? আমার মা বলেছেন বাড়ীতে কোনও বাইরের লোক থাকলে আমাকে পাঠাবেন না—'

'তোমার মা কী বলেছেন না বলেছেন তা' শোনবার দরকার আমার নেই বৌমা', সুচিন্তা নিষ্কম্প দৃষ্টিতে বলেন, 'যারা সত্যি বাইরের লোক, তাদের কথায় কান দিতে পারি এত সময়ও আমার নেই।'

সহসা ইন্দ্রনীল বলে ওঠে, 'তার মানে আমরা থাকি বা না থাকি তোমার কিছুই এসে যায় না। তা' দেখলাম তো মেজদার ব্যাপারে—'

সুচিন্তা মৃদু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'আর কারো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই ইন্দ্র, তোমার নিজের কথাই বল।'

'আমার আর কথা কি!' ইন্দ্রজিত ঠোঁট কামড়ে বলে, 'উনি চিরদিন এ বাড়ীতে থেকে যাবেন এমন ধারণা ছিল না বলেই, যা স্বাভাবিক তাই বলতে এসে-ছিলাম, কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়—'

'চিরকালের হিসেব এত চট করে করতে বসা ঠিক নয় ইন্দ্র, তবে একটা অসহায় মানুষের উপস্থিতিকে যদি তোমরা ইচ্ছে করে সমস্যার কোঠায় তোলো, তাহলে সে সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়।'

কৃষ্ণা বোধ করি নিজের মার কাছে মুখরক্ষার কথা চিন্তা করেই মোক্ষম কামড়টা দিয়ে বসে। বলে, 'এবাড়ীর ওপর তা'হলে আপনার ছেলেদের কোন অধিকার নেই?'

সুচিন্তার মনে হয় পায়ের তলার মেজেটা সরে যাচ্ছে, তিনি কোন গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছেন। একসঙ্গে এত কথা তিনি কবে বলেছেন? আর এই কি তাঁর প্রতিপক্ষ? ওই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করছেন তিনি?

কিন্তু উপায় কি? ধৃষ্টের ধৃষ্টতা কে রোধ করতে পারে?

আর ধৃষ্টের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখেই বা কে চলতে পারে?

তাই সমস্ত মুখটা সুচিন্তার কঠিন পাথরের মত হয়ে ওঠে।

সেই পাথুরে মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, 'অধিকার দু' রকম আছে বৌমা! মানুষের আইনে অধিকার আছে বৈকি, ষোল আনা অধিকার-ই আছে। তবে যদি আদালতের আইন হাতড়াতে চাও তো বলতেই হয় অধিকার নেই। কারণ বাড়ীর মালিক হিসেবে নাম আছে আমার।

চমকে ওঠে ইন্দ্রনীল। কই একথা তো তার জানা ছিল না।

ছাইয়ের মত মুখটা হয়ে যায় কৃষ্ণার। কই একথা তো বলেনি ইন্দ্রনীল।

'ঠিক আছে। এটা জানতাম না।' বলে ইন্দ্রনীল তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে নামে না। সিঁড়ির নীচে, তবু সুচিন্তা সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওরা সুচিন্তাকে কি বলে গেল, সুচিন্তা কি বললেন ওদের, সে কথা মনে পড়ছে না সুচিন্তার, সুচিন্তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির উপর যেন একটা জরির আঁচল এসে পড়ে সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে।

ওই আঁচলায় বিদ্যুতের চকিত দীপ্তি! আগুনের স্থির দাহ! সুচিন্তা 'শক' খেয়েছেন। সুচিন্তা পড়ে যাচ্ছেন!

"চিরকালের হিসেব অত চট করে করতে বসা ঠিক না......"

নামে না বোধ করি শেষ হুলটুকু বিঁধিয়ে যাবে বলে। এই কথাটা বলে সিঁড়ির দিকে এগোয় সে, 'হ্যাঁ জানা থাকলে আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসতাম না। বাড়ী যখন আপনার নামে, তখন অবশ্যই যাকে ইচ্ছে রাখতে পারেন, যাকে ইচ্ছে তাড়িয়ে দিতে পারেন।'

সুচিন্তার ছোট ছেলের বৌয়ের শাড়ীর জরি-ঢালা আঁচলটা মিলিয়ে যায়

কিন্তু যদি ওই জরির আঁচলাটা সুচিন্তাকে পুড়িয়ে দেবার মতলব নিয়ে না আসতো! যদি শুধু অনুপম কুটিরের ছোট ছেলে অনুপম কুটিরে এসে দাঁড়াতো?

সুচিন্তা কি তার চলে যাবার সময় অনুপম কুটিরের গাম্ভীর্যের প্রাচীর ভেঙে ছুটে গিয়ে আটকাতেন তাকে? বলতেন, 'যাবি? কই যা দিকিন? দেখি কেমন পারিস!'

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ চিত্রকলার দুটি প্রদর্শনী ॥

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কলকাতায় দুটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন শিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষাল ও শ্রীসমর ভৌমিক। শিল্পী শ্রীসত্যেন

শিল্পী ঃ সত্যেন ঘোষাল

ঘোষালের প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করা হয় পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে এবং ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী শ্রীসময় ভৌমিকের প্রদর্শনীটি। বলা বাহুল্য, এ-বছরের অজস্র চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে এই প্রদর্শনী দুটি কলারসিকদের মনকে নানা কারণে আকর্ষণ করেছে।

এ-বছরের প্রদর্শনীগুলির মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন অধিকাংশ শিল্পীর রচনায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এক ক্লান্তিকর একঘেয়েমীর পুনরাবৃত্তি। বিমূর্ত শিল্পের নামে প্রায় অধিকাংশ শিল্পীই শিল্পের ব্যাকরণবর্জিত জ্যামিতিক প্যাটার্ণ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে চিত্র-রচনা করে আমাদের মনে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিলেন। এবং আরো একটি বস্তুকে প্রায় অধিকাংশ শিল্পীই পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সেটি হল, ভারতীয় চিত্র-কলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে চিত্র-সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হওয়া। আলোচ্য প্রদর্শনী দুটি সেদিক থেকে আমাদের ক্ষোভকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করেছে।

॥ শিল্পী সত্যেন ঘোষালের প্রদর্শনী ॥

শিল্পী সত্যেন ঘোষাল আর্টিস্ট্রি হাউসে যে ২৭ খানি চিত্র নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন তা দেখে তথাকথিত বিমূর্ত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। আধুনিক ধারার এই চিত্র-রচনার পশ্চাতে শিল্পী ঘোষালের যে-মন দীর্ঘকাল কাজ করেছে, এই ধারায় উত্তরণের পথে তাঁকে যে ধাপগুলি অতিক্রম করতে হয়েছে, তারও কিছু নিদর্শন দিয়ে তিনি সজ্জিত করেছিলেন অন্য একটি ঘর। এই ঘরের প্রতিকৃতি ও নিঃসর্গ চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর ভারতীয় মনকে অনুভব করা যায়।

আশায় আশায় শিল্পী ঃ সমর ভৌমিক

পরবর্তী কালে এই ভারতীয় মন নতুন উপাদান সংগ্রহ করেছে ইউরোপের আধুনিক চিত্র-কলার রীতি-নীতি থেকে। ফলে, তাঁর প্রদর্শিত ২৭ খানি চিত্র আধুনিক হয়েও ভারতীয়। তাঁর চিত্র-সংস্থাপন, ছন্দিত রেখা, উজ্জ্বল বর্ণপ্রয়োগ ও সর্ববিষয়ে সুন্দর পরিমিতিবোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যেমন আধুনিক এবং সচেতন, আঙ্গিকেও ঠিক তেমনি তিনি দক্ষ ও বোধগম্য। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত রচনা দর্শনান্তে আমরা যেমন বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারি, তেমনি বাস্তবের ঊর্ধ্বে বাস্তবোত্তর শিল্প-কল্পনায় আমাদের মনকেও পারি প্রসারিত করে দিতে। এই যাঁর শিল্প-সাধনার ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে তিনি শক্তিমান শিল্পী। শিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষালের মধ্যে আমরা এই শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে সত্যি খুশী।

এই প্রদর্শনীর 'ডে-ড্রিমস' (১) চিত্রে নারী যেখানে তার স্বপ্নের জাল বুনছে সেখানে শিল্পী রেখা আর রঙের প্রাণবন্ত রূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'লাভ এণ্ড কনফ্লিক্ট (৮) চিত্রের চমৎকার কম্পোজিশান, 'মেমোরিস অফ ইয়ুথ' (১১) চিত্রে সুখ-স্মৃতি, 'মেমোরিস' (১৮) চিত্রের সুচিন্তিত সূক্ষ্ম রেখা-বিন্যাস,—সত্যি মনে রাখার মত। এ-ছাড়া তাঁর জ্যামিতিক প্যাটার্ণে রচিত 'টয়লেট' (১৩), 'লাইফ এণ্ড ডেথ' (২৪) এর কালো পশ্চাৎপটে ধূসর,

জীবন-মৃত্যু শিল্পী ঃ সত্যেন ঘোষাল

সবুজ আর হলুদের ব্যঞ্জনাময় বর্ণ, 'ভিক্টরী' (২৬) চিত্রে জয়ের উল্লাসে মাথা উঁচু করা মানুষের কল্পনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য চিত্র।

সত্যেনবাবুর এই আধুনিকতা আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি। শিল্পী হিসাবে তাঁর বলার মত বক্তব্য আছে, আর আছে সেই বক্তব্যকে শিল্পের ভাষায় তুলে ধরার ক্ষমতা। সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাবো বলে প্রত্যাশা করি। সরকারী চারু ও কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সংগে তিনি যেন আমাদের কথাও মনে রাখেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি।

॥ শিল্পী সমর ভৌমিকের প্রদর্শনী ॥

বহুদিন পরে খাঁটি ভারতীয় চিত্র-রীতির সংগে আমাদের পরিচয় ঘটলো শিল্পী শ্রীসমর ভৌমিকের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে। পূর্বেই বলেছি ইদানীং তরুণ শিল্পীরা এ-পথ প্রায় বর্জন করেছেন। সমরবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের সেই চিরপরিচিত রূপকে নতুন করে আস্বাদন করালেন।

শিল্পী সমর ভৌমিকের এই প্রদর্শনীতে মোট চিত্র ছিল ৩২ খানি।

বাজারের পথে — শিল্পী : সমর ভৌমিক

এর কয়েকখানিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। 'যৌবনে রবীন্দ্রনাথ' (১৮) প্রতিকৃতি চিত্রখানি অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একখানি চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনি মুঘল রাজপুত চিত্রকলার অনুসরণে রচিত 'ধ্যানস্থ' (৪) ও 'উত্তর মেঘ' (৬) চিত্র দুখানি সূক্ষ্ম রেখা ও মনোরম রঙে আমাদের মুগ্ধ করেছে। 'কবরে' (১৭) চিত্রখানিতে মুঘল মিনিয়েচার চিত্রের সৌন্দর্য বিধৃত হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে শ্রীসমর ভৌমিক বর্তমান বিমূর্ত চিত্রকলার গড্ডালিকা স্রোত থেকে আত্মরক্ষা করায় আমরা আনন্দিত।

চৈনিক শিল্পরীতিতে সিল্কের উপর রচিত তাঁর 'হুউ-য়েন-সাঙ' (৫) ও 'মণি-কর্ণিকা' (২৮) সুন্দর রেখা আর রঙে এই প্রদর্শনীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনারূপে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'সহানুভূতি' (১৩) সোজা বলিষ্ঠ রেখার লৌকিক শিল্প-স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। গ্রাফিক চিত্রকলার মধ্যে 'জাহাজঘাটা' (২৩) আমাদের ভাল লেগেছে। নিঃসর্গ চিত্রের মধ্যে 'নদীর গতিপথ' (২৯) ও 'পাহাড়' (৩০) উৎকৃষ্ট রচনা। 'বাজারের পথে' (৩১) ওয়াশ পদ্ধতির একটি চমৎকার নিদর্শন।

শিল্পী সমর ভৌমিকের অধিকাংশই টেম্পারার কাজ। এই মাধ্যমে শিল্পীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। এই প্রদর্শনীতে কয়েকখানি মামুলী ধরণের চিত্রও আছে। আশাকরি এই তরুণ শিল্পী ভারতীয় চিত্র-কলার সুমহান ঐতিহ্যের সংগে তাঁর নূতন চিন্তাভাবনা সংযোগ করে ভবিষ্যতে আমাদের আরো সুন্দর চিত্র উপহার দেবেন। আমরা শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

আকৃতি

কৃষ্ণা দাস
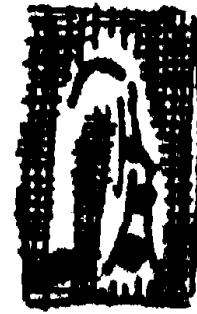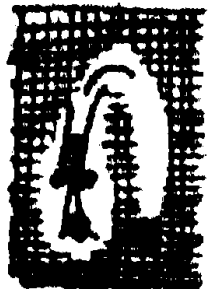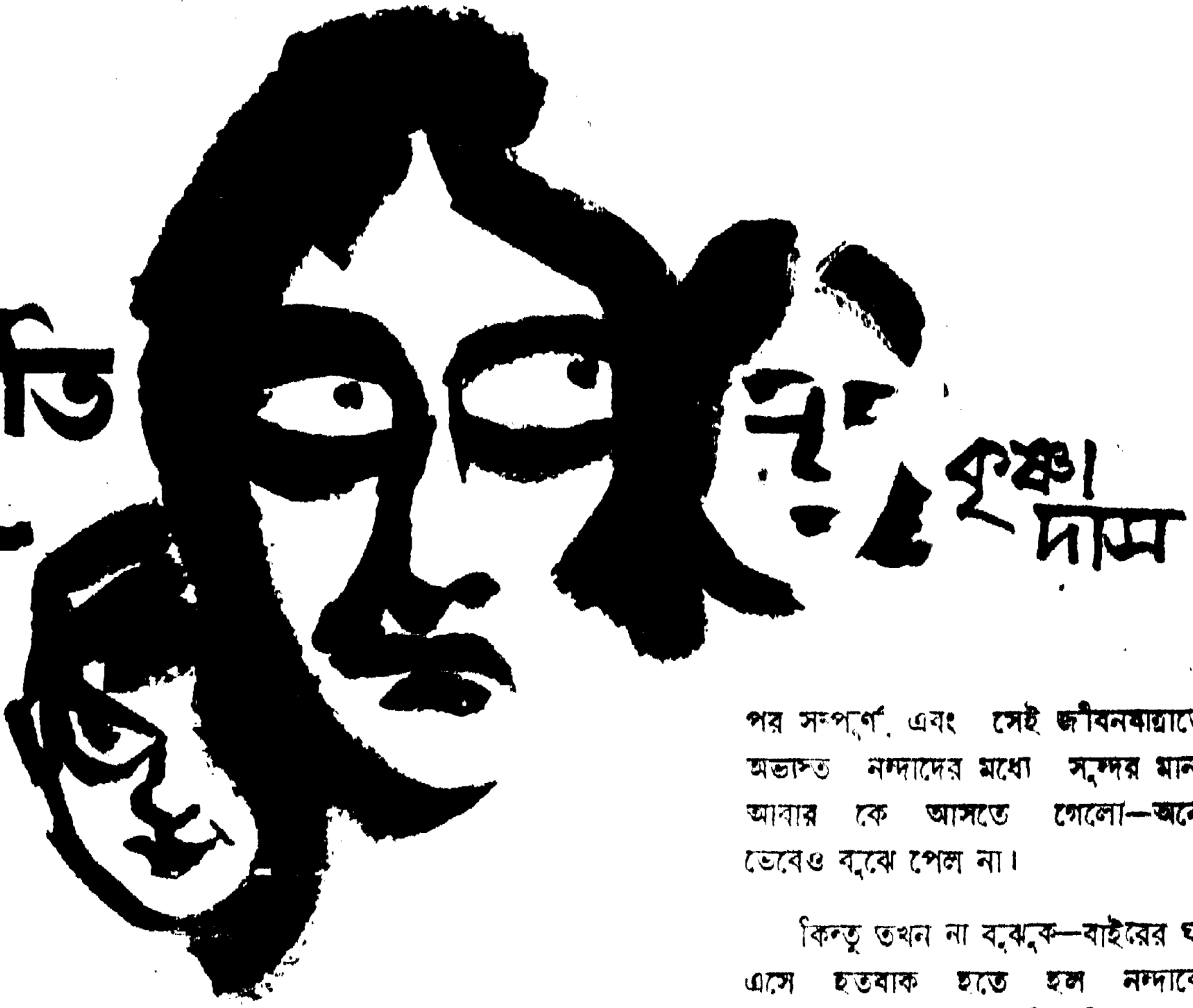
আনন্দ রুনু দুজনেই বাড়ী ছিল না। সাধারণতঃ স্কুলের ছুটি কিংবা শনি-রবির বন্ধ থাকলে ওরা মামাবাড়ী বেড়াতে যায়—কালও গিয়েছে!

কিন্তু ওরা বাড়ী না থাকলে নন্দার হয় সব চাইতে বড় মুস্কিল। মনে হয় হাতে যেন কোন কাজ নেই। একটা কাজ দশবার গুছিয়ে সেরে, সারা বাড়ীর তদারকী করে, বাতগ্রস্ত শাশুড়ীর হাত-পায়ের গিঁটে বাতের মালিশ লাগিয়েও প্রচুর অবসরের যেন কুল-কিনারা পায় না।

আজও ঠিক সেই অবস্থায় পড়েছিল। হাতে কাজ-কর্ম না থাকায় ভাবছিল ছেলেমেয়ে দুটোকে আর এভাবে কোথাও পাঠাবে না! পাঠান উচিত নয়,—ওরা থাকলে বুঝতে পারে না—কিন্তু না থাকলে মর্মে মর্মে টের পায়—ঐ ক্ষুদ্র শিশু দুটি ছাড়া নন্দার জীবন আজ অচল। শুধু কর্মহীনতার জনাই নয়—মনে হয় সমস্ত কিছুর জন্য, এমন কি পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম—তার জন্যও অচল!—মনে হয়।

আর এই ধরনের একটা নিঃসঙ্গ মনোবৃত্তি নিয়ে আজও নন্দা দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় পুরোন ঝি নেত্য এসে ডাকলো—বৌদি শোন, তোমায় কে একজন ডাকছে।

—আমায়? কেউ আসার নামে চকিত হল নন্দা! কোন একটা চেনা-জানা মানুষ এলে মুখের দুটো কথা বলা যায়। সাগ্রহে বললো—কে রে? কে এসেছে?

—কি জানি বাপু। কোনদিন তো দেখিনি এর আগে। খুব লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারার মানুষ, তুমি এস না, বাইরের ঘরে বসতে দিয়েছি!

লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারা শুনে ভাবতে হল নন্দাকে। কে হতে পারে মানুষটা? বাপেরবাড়ীর কেউ? মতি মামা, হরি দাদা কি কালু জ্যাঠা? এদের সবাইকেই সুন্দর দেখতে! কিন্তু এরা হলে তো নেত্যর না চেনার কিছু নয়।

চিন্তিত নন্দা বললো—আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি মায়ের কাছে যাও! উনি ডাকছিলেন একটু আগে—দেখ কি বলছেন। আমি যাচ্ছি—

শাশুড়ীকে দেখা-শোনার কথা জানিয়ে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল নন্দা। নিচের তলায় কেউ নেই! চিরদিনের নির্জন বাড়ী অবনীশের মৃত্যুর পর সে নির্জনতা আরও বেড়েছে। অবিশ্যি পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বলতে যা কিছু, অবনীশ বেঁচে থাকতেই কমতে শুরু করেছিল—মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ, এবং সেই জীবনযাত্রাতেই অভ্যস্ত নন্দাদের মধ্যে সুন্দর মানুষ আবার কে আসতে গেলো—অনেক ভেবেও বুঝে পেল না।

কিন্তু তখন না বুঝুক—বাইরের ঘরে এসে হতবাক হতে হল নন্দাকে। বাপেরবাড়ী শ্বশুরবাড়ী মিলিয়ে সমস্ত নামের তালিকার মধ্যে যার নাম মুহূর্তের জন্য মনে পড়েনি—এ সেই লোক!

বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড আবেগে সমস্ত শরীরটা যেন ঝাঁকি দিয়ে উঠলো নন্দার! মাথার ঘোমটা খসে গিয়েছে। আগন্তুক মানুষটি এতক্ষণ দেয়ালের ছবিগুলো দেখছিল, পায়ের শব্দ পেতে প্রসন্ন হেসে সামনে এসে দাঁড়াল!—চিনতে পারনি তো?

—চিনতে তো পারার কথা নয়। কিন্তু তুমি কি করে এলে?

—যেমন করে আসে। অশোক শান্ত ভাবে হাসলো। বললো—অনেক দিন ধরে তোমার কাছে আসতে চেয়েছি, কিন্তু একটা সংকোচ,—তুমি কিছু ভাবতে পার—এই সব ভেবে আমি আসতে গিয়েও আসতে পারিনি! তুমি ভাল আছ?

—চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে দেখলো গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় সামনে দাঁড়ান মানুষটির দিকে মাথা তুলে তাকাবার অবধি ক্ষমতা নেই। বুঝলো এতদিন ধরে যার ছবি মনের মধ্যে মুছে গিয়েছে বলে জানতো—দীর্ঘদিন পর দেখছে সে ছবি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজেকে সংযত করে সহজ হয়ে

দাঁড়াল নন্দা। জানতে চাইলো,—তুমি কেমন আছ?

—আমারও চলে যাচ্ছে!

—চলে যাচ্ছে না ছাই! অশোকের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সস্নেহে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলো নন্দা! বললো—আগের চাইতে তুমি কত রোগা হয়ে গিয়েছ।

অশোক হেসে ফেললো। বললো—রোগা হব না, চিরদিন মোটা থাকবো। বয়েস হচ্ছে না!

কথাবার্তা, চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর সবটুকুই সেই আগের মত শান্ত স্নেহশীতল—একদিন যা হৃদয়ের দুকূল উজাড় করে ধরেছিল! অশোক আবার বললো—আমি একটা কথা বলবো?

—বল।

—তুমি কিন্তু ঠিক সেই আগের মত সুন্দর আছ।

এক ঝলক উষ্ণ রক্ত সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করলো নন্দা। বললো—কি যে বল তার ঠিক নেই, যত রাজ্যের বাজে কথা। এস, বাড়ীর মধ্যে এস? কতদিন পর দেখলাম তোমায়—অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যাও।

অশোককে ঘরে বসিয়ে চায়ের যোগাড় করতে যেতে হল। রান্নাঘরে নেতা খুব দ্রুতহাতে কাজ করে বেড়াচ্ছে—নন্দাকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসতে দেখে বললো,—লোকটা কে গা বৌদি?

বিব্রত হল নন্দা—বাপের বাড়ীর লোক।

—বাপের বাড়ীর লোক? কৈ বাপু, কোনদিন তো দেখিনে।

এবার ধমক দিল নন্দা—তুমি অনেককেই দেখনি। আমার বাপের বাড়ীর কতজনকে তুমি চেন, জান? তা ছাড়া উনি কখনও আসেননি! ছোটবেলায় উনি আমায় পড়িয়েছেন!

—মাষ্টার! নেতাকালীর চোখে এতক্ষণে সন্দেহের ছায়া ঝিকমিকিয়ে উঠলো!—তাই বল, ঐ জন্যে তোমাকে কখনও দেখিনে।

দাসীর দুঃসাহসে সমস্ত শরীরটা জ্বলে উঠলো নন্দার। বললো—তুমি কাকে দেখেছ না দেখেছ সে হিসেব দিতে হবে না। তুমি এখন বাইরে যাও—যা কাজকর্ম আছে দেখে-শুনে করগে, যাও—

কিন্তু নেত্যকালীকে ধমকে সরালেও মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বিচিত্র দুর্বলতা অস্থির ভারাক্রান্ত করে তুলতে লাগলো। কিশোরীর সলজ্জ কুণ্ঠা নন্দার মনের আগল-ছাড়া রাশকে বার বার টেনে ধরতে চায়? আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বারো বছর আগের সমস্ত জীবনটা যেন ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

চায়ের জল কেটলীর মধ্যে ফুটে শুকোতে লাগলো। একটা মুক্ত বেদনার সঙ্গে সেই শেষদিনের কথাটি মনে পড়ছে। সেই শেষ দেখা হয়েছিল—অশোক দেখেনি। দোতলার বারান্দা থেকে নন্দা দেখেছিল! আহত হৃদয় অশোক চলে যাচ্ছে। যেতে গিয়ে একবার শুধু পিছন ফিরে তাকিয়েছিল! রাতের ঘন অন্ধকার, নন্দাকে দেখতে পেয়েছিল কি পায়নি—নন্দা আজও জানে না, শুধু এটুকু জেনেছে—সেই বিনা কারণে ভালবাসার অপমান ঘটাতে দুটো জীবন কি নিদারুণভাবেই না রিক্ত হয়ে গেল।

বাবা মনোমোহন ঘোষাল,—জমিদারী ছিল না, কিন্তু এককালে ছিল এই অসার দম্ভে ধরাখানাকে সরার চাইতে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন! তাঁর বিচারে যে মানুষের পয়সা আছে, সেই শুধু মনুষ্য পংক্তিতে স্থান পেয়েছে—বাকি সবাই অপাংক্তেয় জঞ্জাল ছাড়া কিছু নয়! শুধু এই নয়, আরও আছে, কি ঘরে, কি বাইরে—নিজের অভিমত, নিজের রুচি অরুচি ছাড়া আর কারো কোন ইচ্ছে অনিচ্ছা চাওয়া পাওয়ার উপর পক্ষপাত দেখাননি! কখনও নয়—

আর সেই ইচ্ছের খেয়ালেই নন্দার জন্য তিনি কিছু শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। নন্দা স্কুলে পড়েছিল। কিছুদিন কলেজেও! এবং কলেজে ঢোকার সময় কি করুণা যে তাঁর হয়েছিল—সে তিনিই জানেন, নন্দা দেখলো তার জন্য এক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে। অবিশ্যি তার জন্য দূরে যেতে হয়নি। হাতের গোড়ায় অশোক ছিল। দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলে—বনেদীবাড়ীর চিকে ঢাকা আবরণের মধ্যে মনোমোহন ঘোষালের কন্যা নন্দা ঘোষালের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এল।

কিন্তু বাবা ভুল করলেন সেইখানে! তিনি জানতেন তাঁর মেয়ে তাঁর মতই সংসারের সমস্ত কিছু অর্থের দেনা-পাওনায় বুঝে-পড়ে নেবে। কিন্তু মেয়ের হিসেবের ভুল প্রথম দেখাতে শুরু হয়েছিল—সুন্দর বলিষ্ঠ অশোক—বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র অশোক—তার পয়সা আছে কি নেই জানে না, জানতে চায়নি, তবু টের পেয়েছে পাঠ্যবস্তুর অন্তরালে আরও একটি মুগ্ধ জগত কখন যেন ধীরে ধীরে উন্মেলিত হয়ে গিয়েছে। এবং শুধু তাই নয়—সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা অবধি স্থির।

কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিলেও বাবার চোখে পারেনি! তাঁর অতিসজাগ দৃষ্টির সামনে সবটুকুই একদিন ধরা পড়ে গেল,—যার বিচারে অশোক নির্বাসিত হতে বাধ্য হল—নন্দারও প্রায় তাই! বছর ঘোরার আগেই কুলে-শীলে প্রতিপত্তিতে সমকক্ষ অবনীশের ঘর আলো করতে চলে এসেছে নন্দা!

কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র পরিহাস, —স্বামী, তার সংসার—সেটুকু নিয়েও তো নন্দা তার জীবন স্বচ্ছন্দে চালাতে পারতো?—কিন্তু পারেনি। মেয়েকে যোগ্য পাত্রে সমর্পন করে হাঁপ ছাড়ার আগেই ফুলের মধ্যে সাপ দেখা দিয়েছিল। বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে অবনীশকে মদ্যপান করতে দেখেছে নন্দা। নন্দার দোষ নেই, ও যোগ্য সহধর্মিণী হবার চেষ্টা করেছে—অবনীশকে ভালবাসতে চেয়েছে, তার সন্তানের জননী হয়েছে—চেষ্টা করে করে বাইরের যা কিছু আছে তার সবটুকুই দিয়েছে বা করেছে। শুধু মন দিতে পারেনি।

আর প্রেম প্রীতি ভালবাসা বলতে হৃদয়ের যে সকল মাধুর্য আছে—তার কোন কিছুই বোধকরি হাতে করে দেবার বস্তুও নয়। যে নেয়, সে নেয় নিজের অধিকারে। নিজের ক্ষমতাতেই নেয়। তাই অশোক যা নিতে পেরেছিল—অবনীশ তা পারেনি! আর তারই যন্ত্রণায় সারাটা জীবন নন্দাকে দ্বিচারিণীর ভূমিকায় কাটাতে হল।

চা তৈরী করতে বসে অতীত ভবিষ্যত বর্তমান তালগোল পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু নন্দা সবলে নিজেকে চেপে চা নিয়ে উপরে চলে এল! দেখলো অশোক অপেক্ষা করে বসে আছে! ওকে

দেখে উঠে দাঁড়াল। বললো—অসময়ে এসে তোমায় বিব্রত করলুম বোধহয়?

—না না, কি যে বল—হাতের জিনিসগুলো টেবলের উপর ধরে রাখলো নন্দা। বললো—বোস, বসে খেতে খেতে গল্প কর।

—আমি তো বসবো কিন্তু তোমার কৈ?

অশোক চায়ের কাপের দিকে আঙ্গুল দেখাতে নন্দা হেসে ফেললো। বললো—আমি খাই নে!

—কেন? আগে তো বহুবার খেতে জানতাম!

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হল! বললো—আগে যাকে চিনতে সে মানুষ কি আর বেঁচে আছে! সামনে যে নন্দা দাঁড়িয়ে আছে সেটা নিতান্তই তার শুকনো দেহটা—আগের নন্দার স্মৃতি চিহ্ন পরিচয় কিছুই সেখানে নেই!

অশোকের স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে এল। ওর মুখের দিকে চেয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নন্দার কানে গেল উপর থেকে শাশুড়ী ডাকছেন—বৌমা, বৌমা—

বৃদ্ধা শাশুড়ী, তার উপর একমাত্র সন্তান হারিয়ে রোগে-শোকে জীর্ণ,—মনের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা বিরক্তি ঘনালেও উঠতে হল নন্দাকে। বললে—তুমি একটু বসো তো, আমি আসছি। শাশুড়ী কেন ডাকছেন দেখে আসছি।

নন্দা উপরে উঠে এল। শাশুড়ী ঘরেই ছিলেন। ঘরেই থাকেন অবিশ্যি—ছেলে যেতে বাইরের সঙ্গে সমস্ত পরিচয় তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন. নন্দা আসতে ওর দিকে চাইলেন। বললেন—বৌমা?

—কি দরকার বলুন।

—কে এসেছে যেন শুনলাম—নেত্য বলছিল, তোমার বাপেরবাড়ীর চেনা-জানা নাকি—তা ছেলেটি কে?

শাশুড়ী উপরের ঘরে বসেবসে সংসারের যাবতীয় কিছু খোঁজখবর তদারকী করেন বটে কিন্তু সামান্য একটা মানুষ আসার খোঁজ যে এতখানি গভীরভাবে নেবেন নন্দা ভাবতেও পারেনি। সূক্ষ্ম একটা অপমানবোধ ওকে ভারাক্রান্ত করলো। বললো—ঠিক চেনা জানাও. উনি নন—আপনি তো জানেন, আমি কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম। সে সময় উনি পড়িয়েছিলেন।

স্নেহশীল শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো। একটু নিঃস্তব্ধ থেকে বললেন—বৌমা, আমার অবন দুবছর আগেও ছিল—

—মা! গলা দিয়ে হঠাৎ একটি আর্তনাদের মত স্বর বেরোল। যে কথা মনে আসেনি সে কথা এরা ভাবে কি করে? লজ্জা পাওয়ার জায়গায় বিস্মিত হয়ে বললো নন্দা,—এ আপনি কি বলছেন মা?

অবনীশের মা শান্তভাবে ঘাড় নাড়লেন। বললেন,—বৌমা, মানুষের জীবন কোথা দিয়ে যায় আমি জানি। তোমায় এ কথা বলতে হল সে আমার দুর্ভাগ্য!

—কিন্তু একথা বলতে হয়ই বা কেন? সমস্ত মুখখানা রাগে অপমানে কালো হয়ে উঠেছে নন্দার। বললো—আমি তো কচি খুকি নই। এইকি আপনি বলতে চান—দু'দণ্ডর জন্যে যে এসেছে তাকে আমি চলে যেতে বলবো! বলুন, বলবো?

অবনীশের মা কিছু বললেন না, নন্দাও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না। বাইরে চলে এল,—বাইরে এসে দেখলো মাথা দিয়ে ঘাড়ের শিরা দিয়ে সমস্তটাই কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। মানুষ এত সামান্য কারণেও এত ছোট কথা ভাবতে পারে? নন্দা যদি অন্যায় করবো বলে মনেই করে শাশুড়ী উপদেশ দিয়ে তাকে রোধ করতে পারবেন?

নিচে চলে এল নন্দা। দেখলো অশোক কিছু খায়নি। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছে! হঠাৎ একটা অপরাধ আর স্নেহের মিশ্রণে মনটা ভরে উঠলো! বললো—কি আশ্চর্য, তুমি না খেয়ে বসে আছ?

—তুমি চলে গেলে.

—আমার খুব অন্যায়। অতিথি নারায়ণ—তাঁর মর্যাদা রাখতে পারিনি। কি করবো শাশুড়ী ডাকলেন যেতে হল! এইবার তুমি খাও, তার আগে আর এক কাপ চা করে দি, এটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?

—না না,—অশোক বাধা দিল—যা আছে, আমি তাই খাব, তুমি বসো!

নন্দা বসলো। দেখলো অশোকের চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখের উপর, মাথার চুল পাতলা, তার মধ্যে স্পষ্ট সাদা রেখার হিজিবিজি। নন্দা বললো,—তোমার কথা এবার বল, সেই থেকে শুনবো শুনবো করছি, শোনা হচ্ছে না।

—কি আর শুনবে! অশোক হাসলো—আমার নিজস্ব কোন কথা নেই।

—নেই কেন, তোমার ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে—

—বৌ। অশোক এবার জোরে হাসলো,—ঘর সংসারের কথা দিয়ে বৌ-এর কথা জানতে চাইছো—বুঝেছি—! কিন্তু বৌ কোথায় যে ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে আসবে?

কথা বলার ধরণ দেখে আরক্ত হল নন্দা। শুধু তাই নয়—আকস্মিক একটি রোমাঞ্চে সমস্ত মন বিচিত্র এক পুলকে ছেয়েও গেল। কিন্তু ভিতরের ভাব বাইরে প্রকাশ করতে দিল না। গম্ভীর হয়ে বললো—বৌ কোথায় মানে? বাংলা দেশে মেয়ের অভাব হয়েছে নাকি? আমি তো জানি ওটাই সবচাইতে সুলভ বস্তু? কেন, বৌ আননি কেন? এ তোমার খুব অন্যায়?

—অন্যায় হলে আর কি করবো—একদিন একটা দুর্লভ বস্তু পেতে গিয়েও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল,—তার কথা ভেবেই সময় কেটে গেল। অশোক হাসলো—তা ছাড়া একজনের ছবি যদি মনের সমস্ত দিক নিজের ক্ষমতায় বন্ধ করে রাখে আর একজনকে সেখানে ঢুকতে দিই কি করে?

—বারে! কৃত্রিম বিরক্ত দেখাল নন্দা। বললো—তাই বলে তুমি সারা জীবন এইভাবে কাটাবে নাকি? এ কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

—তাহলে সেই উচিতের ভার তুমি নাও—কি নেবে? একদিন তো নেবার কথা ছিল!

সমস্ত শরীরটা গভীর উত্তেজনায় শিরশিরিয়ে উঠলো নন্দার। কিন্তু মুখে বললো—ছি ছি কি যে বল! কি—

কথা কটা বলে নন্দা সামনে বসে থাকতে পারলো না, বাইরে বেরিয়ে এল। শুধু তাই নয়—একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের সঙ্গে পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিতের বোঝা পড়াও করে নেয়। বারবার মনে হল মানুষের জীবন তো এতটুকু গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখার জিনিস নয়। তা ছাড়াও অবনীশের নয়—স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় যার দান মনের মধ্যে

চির জাগরূক থেকেছে সে অশোক। সুতরাং অশোকের কথা—

হঠাৎ ও পাশের বারান্দায় নন্দার দৃষ্টিটা আটকে গেল। দেখলো যে নেত্য এতক্ষণ বিছানাপত্র রোদে দিচ্ছিল—সে ছড়ানো বিছানা বালিশের মধ্যে হাতে একটা কিছু নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে! জিনিসটা একভাবে দেখছে এবং ভাবছে।

কৌতূহলী নন্দা আস্তে পায়ে এ পাশের ঘরে চলে এল। নেত্য কিছু পড়তে পারে না। কিন্তু তবু ওর ধরন দেখে অবাক হতে হয়। নন্দা জানতে চাইলে—ওটা কি নেত্য? কি দেখছো তুমি?

—দেখতো বৌদি—সরে এল নেত্য,—দাদাবাবুর হাতের লেখা মনে হচ্ছে। বিছানাপত্তর রোদে দিচ্ছি, তোশকের তলায় এটা পেলুম।

কাগজের একটা টুকরো। হাত পেতে নিতে হল নন্দাকে। কিন্তু আশ্চর্য, হাতে নিয়ে ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেল। নন্দাকে লেখা অবনীশের একখানা চিঠি! একবার লক্ষ্ণৌ গিয়েছিল, সেখান থেকেই লিখেছে—ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ের কথা লিখে শেষে নন্দার কথা জানতে চেয়েছে! "—এখানে আসার সময়, তোমার শরীর খারাপ দেখে এসেছিলুম, জ্বরও ছিল। এসে অবধি সেই কথা ভাবছি। শরীরের উপর নজর রেখ।"

চোখের সামনে হঠাৎ একটা অন্ধকারের যবনিকা নেমে এল যেন। নেত্য জিজ্ঞাসা করছে—হাঁ বৌদি, ওটা দাদাবাবুর হাতের লেখা, না গো?

—হাঁ! শান্তভাবে মাথা নাড়লো নন্দা।—সেবার লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই লিখেছেন। কিন্তু এতদিন পর ও চিঠি বিছানার মধ্যে এল কি করে?

—তাই ভাব বৌদি! কথাটা বলতে বলতে নেত্যর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠলো! বললো—কাগজখানা হাতে পেয়েই বুঝেছি ও দাদাবাবুর হাতের লেখা! কি কাণ্ড দেখ—মানুষটা কোথায় চলে গেছে, কিন্তু তার হাতের লেখাটা—নেত্য সব কথাগুলো শেষ করতে পারলো না। গলার স্বর শেষের দিকে সম্পূর্ণ চেপে গেল।

একটা ভাবাক্রান্ত মন নিয়ে এপাশের ঘরে চলে এল নন্দা। দেখলো অশোকের খাওয়া হয়ে গেছে। ওকে ঢুকতে দেখে বললো—এবার আমি উঠি?

—এর মধ্যেই যাবে? নন্দার সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে মনে হল অশোক আরও কিছুক্ষণ থাকুক। বললো—এখনই যাবে কেন, এইতো এলে?

—তাহলে থাকি?

—থাকবেই তো। সহজভাবে কথাটা বলতে গিয়েও হঠাৎ লজ্জায় পড়ে গেল নন্দা! তাড়াতাড়ি নিজের দুর্বলতা ঢাকতে বললো—তা ছাড়া কি একটুখানি জলের মত চা খেলে—বসো, দুপুরবেলা এসেছ, অতিথিসৎকার না করিয়েই ছাড়বো বুঝি?

—সত্যি ছাড়বে না? তাহলে তো বসতেই হয়। অশোক নন্দার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো। বললো—গৃহস্বামিণীর আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ তাঁর বধূকে এই অপরাধে ঠেঙাবেন না তো?

নন্দাও হেসে ফেললো! ঘরের সব কথা বাইরে বলা যায় না। বললো—তা কেন! আমার শাশুড়ীও গেরস্ত মানুষ, দুপুরবেলা বাড়ীতে মানুষ এলে তাকে না খাইয়ে ছাড়েন না। তিনি আসতে পারেননি—তাঁর ইচ্ছে আমি তোমায় জানালুম।

কিন্তু নিতান্তই সহজভাবে যে কথাটি অশোককে বললো—সেই মিথ্যা কথার গুরুত্বে নিজেই ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো নন্দা। কেন তার এমন মতিবুদ্ধি এল? কেন সে অশোককে যেতে না দিয়ে মিথ্যে আড়ম্বর করে খাওয়ার কথা জানালো। শাশুড়ী কি ভাববেন? এবং তার জন্য যে কথা কাটাকাটি বা সন্দেহজনক উক্তি হবে—সেটা তো বাঞ্ছনীয় ছিল না।

তাছাড়া অতিথিনারায়ণের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। নন্দা যা করছে সে নিতান্তই পৌরাণিক যুগের অতিথি-পরিচর্যা নয়। মনের যে বিচিত্র লোভ সেখানে মিশেছে—সেটা নিজেরও না বোঝার মধ্যে নেই। নন্দা এমন লোভী হল কেন?

খাওয়া সেরেই অশোক বললো,—এবার তাহলে যাওয়া যাক?

—তোমার খালি যাই যাই! কথাটা বলেই নন্দা অন্যদিকে চাইলো।—কতকাল পরে এলে কোন গল্পই তো শোনা হল না।

—আরও গল্প শোনা?

—নয় কেন?

—বেশী প্রশ্রয় দিলে যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলি।

—যাও! অশোকের মুখের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে হেসে ফেললো নন্দা!—বুড়ো হয়ে গেলুম, তার আবার বাড়াবাড়ি, তোমার যত রাজ্যের খালি বাজে কথা।

—বুড়ো মানুষেরা একটু বাজে কথাই বলে।

—যে বলে সে বলে—তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই নে। নন্দা অশোকের কথায় আমল দিল না। বললো—ঘরে গিয়ে বসো গে, আমি আসছি। আর কিছু না হোক ব্রাহ্মণভোজন করালুম—তাকে দক্ষিণা দিতেও তো হয়। সবকিছুতে তাড়া করলে চলবে কেন?

অশোককে ঘরে বসিয়ে আবার এপাশে চলে এল নন্দা। নিস্তব্ধ নির্জন
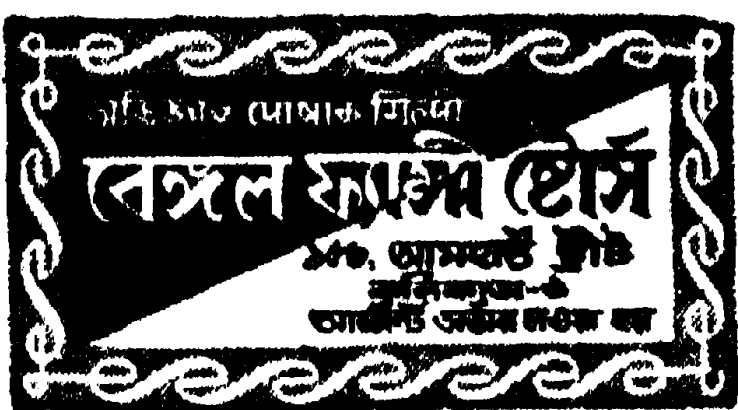
বাড়ী—উপরের ঘরে শাশুড়ী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন,—নিচে নেতার কাজের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভিতর ভিতর একটা বিচিত্র সূক্ষ্ম পাপবোধ কেবল যেন সারা মনটাকে অসাড় করে আনলো। কাজটা ভাল হল না, অশোককে চলে যেতে দিলেই হত!

অশোক ঘরের মধ্যে বসে রইলো, চিন্তিত নন্দা শিথিল পায়ে উপরে উঠে এল। অনেকক্ষণ শাশুড়ীর দেখা-শোনা করেনি। বৃদ্ধ মানুষটি! শোকেতাপে জীর্ণ হয়ে আছেন! এবং শুধু তাই নয়, তখনকার যে কথার জন্য শাশুড়ীর উপর একটি তিক্ত বিরক্তিতে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—সেই মনই স্নেহে ভালবাসায় কোমল হয়ে উঠলো! বুড়ো মানুষ, একমাত্র শুভানুধ্যায়ী—তাঁর কথা অমান্য করে নন্দা অন্যায় করেছে।

অনুতপ্ত মন নিয়ে উপরে এসে নন্দা দেখলো শাশুড়ী ঘুমিয়েছেন। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাঁকে দেখলো। দেখতে দেখতে অবনীশের মুখখানা আবার ভাবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আশ্চর্য, যতবার ভাবে—ততবারই কেমন যেন ছবিখানা হারিয়ে হারিয়ে যায়—অস্পষ্ট হয়ে যায়—এবং সেইভাবে কিছুতেই মুখখানা সম্পূর্ণ মনে করতে পারলো না।

এবং সেই চিন্তাধারার সঙ্গে মনে হল নন্দা কিছু অন্যায় করছে না। কি করেছে সে? অশোক তার জীবনকে সর্বপ্রথম প্রেমের সুধায় ভরিয়ে তুলেছিল।—সেই অশোক আজ বহুদিন পর এসেছে—তার সঙ্গে মুখের দুটো কথা মাত্র—কি এমন অন্যায়ের কাজ? তা ছাড়া নন্দা কিছু কিশোরী বালিকাও নয় যে এত ভাবতে হবে।

সুদৃঢ় পায়ে নন্দা আবার নিচে নেমে এল। তারপর একসময় পায়ে পায়ে অশোকের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অশোক ডাকলো—এসো, আমায় থাকতে বলে, তুমি শুধুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ—বেশ।

—পালাব কেন? এই তো এলাম।

—কৈ! বিদ্যুৎ চমকের মত একআধ বার আসছো আর চলে যাচ্ছ, একে আসা বলে?

নন্দা এ কথার জবাব দিল না। দরজার কাছে সমান হয়ে দাঁড়াল। অশোক বললো—ব্রাহ্মণ তো ভোজন করালে, তার কিন্তু একটা দাবী আছে।

—কি?

—সেই থেকে দেখছি, কি একটা ময়লা বিশ্রী শাড়ী পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।

—তাহলে? নন্দা নিজের মলিন কালোপাড় শাড়ীর দিকে চাইলো। শেষে হেসে ফেললো—আমি সাজবো নাকি?

অশোক ঘাড় নাড়লো—আমার ইচ্ছে ততখানিই, তবে ততটা না হলেও কিছুটা বাঞ্ছনীয়।

সামান্যতেই ফুরিয়ে যায় না। তুমি আমার অনুরোধ রাখ, তা ছাড়া—

—কি তাছাড়া—

অশোক একটু ইতঃস্তত করলো। বললো—তোমার এ জীবনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।—তাই এ অনুরোধ, তা ছাড়া তুমি আমায় দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলে—এ ব্রাহ্মণ ঐটুকু ছাড়া আর কোন দক্ষিণা চায় না।

কথা কাটাকাটি না করে এ পাশের ঘরে চলে এল নন্দা। আলমারীর পাল্লা খুলে কি শাড়ী পরবে বুঝে পেল না।

বেশী প্রশ্রয় দিলে যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলি

ছেলেমানুষের মত আবদার। বহুদিন আগেকার ঘটনাগুলো ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে! সমস্ত মন অব্যক্ত এক ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠলো নন্দার। বিষণ্নভাবে হাসলো। বললো—এই জন্যে বুঝি তোমায় থাকতে বলেছি? পাগল কোথাকার। যা হয় না—

—কি হয় না! অশোক গলার উপর জোর দিল! বললো—মানুষের জীবন এত

অশোকের অনুরোধ মত যে কাপড়খানাই পরতে যায় তার সঙ্গে অবনীশের সাহচর্য জড়িয়ে রয়েছে যেন। অবনীশের মৃত্যুর পর—ভাল শাড়ী কেনাও হয়নি, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সুতরাং তার দেওয়া জিনিসই পরতে হয়। এবং সে জিনিস পরতে গেলে তার সাহচর্য আপনিই মনে আসে। কোন শাড়ী পরে বেড়াতে গেছে, সিনেমা গেছে, কি উপহার পেয়েছে—কি বসেছে উঠেছে—প্রত্যেকটির

সঙ্গে একটা মানুষের উপস্থিতি আশ্চর্য-ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক ফুল দিয়ে সতিা দুজনের পুজো করা যায় না। সাধারণ একটা ভাল শাড়ী জামা পরে এ পাশের ঘরে চা এল নন্দা। অশোকের দিকে তাকিয়ে বললো—হয়েছে?

না।

নন্দা খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলো। বললো—তাহলে বোঝা যাচ্ছে যা ফুরিয়ে যায় তাকে টেনে বাড়ান হাস্যকর।

—কিন্তু ফুরিয়ে যাবে কেন? অশোকের স্বর এবার আহত শোনাল। বললো—ফুরিয়ে তো তুমি যাওনি নন্দা। তুমি আছ, আমিও আছি। আমি নিশ্চয়ই জানি একদিন তোমার ঐ দেহ মন সত্ত্বা তুমি আমাকেই দিয়েছিলে, আমি অক্ষম ছিলাম,—তাই নিতে পারিনি। সে দোষ আমার, তোমার নয়।

অশোকের গভীর সুরে বলা কথা-গুলোয় মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠলো যেন। কিন্তু যে কথা ভুলে যাবার জন্য আজ এতগুলো বছর নিরন্তর চেষ্টা করে আসছে—তাকে স্মরণ করিয়ে লাভ কি?

নন্দা সহজ গলায় বললো—ও কথা বলে আর কি হবে! যা হারিয়ে গেছে ফুরিয়ে গেছে—তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। তার চাইতে তুমি বরং তোমার কথা বল।

অশোক হেসে বললো—বললাম তো, আমার নিজস্ব কোন কথা নেই।

—সেটা মিথ্যে কথা! একটা জীবন, সেখানে কোন কথা থাকবে না—এ হয় না। নন্দা অশোকের দিকে তাকাল—কিন্তু তোমার এ ভাবে থাকা উচিত হয়নি। তুমি কেন একজনের জন্যে সর্বস্ব ছাড়বে? সে তো তোমায় কিছু দেয়নি!

—নিশ্চয়ই! দিয়েছে বৈকি? অশোক সস্নেহ গাঢ় সুরে কথাগুলো বললো। বললো—যে কিছু ছাড়ে সে অনেকখানি পেয়েই ছাড়ে। তবে যে দেয় সে তো জানতে পারে না কি দিলাম—যে পায় সে জানে কি পেল সে।

অশোকের প্রত্যেকটি কথা আবেগে আবেশে নন্দাকে অস্থির করে তুললো। নিচু মুখে রুদ্ধ স্বরে কোনমতে বললো—না, ওকথা তুমি বলো না। আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, আমি তোমায় কিছু দিই নি।

—দিয়েছ, তবে জানতে পারনি। কিন্তু নন্দা—অশোকের মনে হল সামনে বসা মেয়েটির দুটো গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অশোক তাড়াতাড়ি নন্দার মুখখানা উঁচু করে ধরেছে, তুমি কাঁদছো? নন্দা—

যেখানে যেটুকু বাধা ছিল অপসারিত হয়ে গেল। নন্দা নিজেকে ধরে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। ওর কম্পিত দেহকে সাগ্রহে ধরে ফেললো অশোক—নন্দা!

—আমি আর পারি নে!

—আমার কাছে যাবে নন্দা? আমার সমস্ত কিছু তোমার জন্যে শূন্য পড়ে রয়েছে। একদিন পাঁচজনের ভুলে দুটো জীবন দুদিকে ছিটকে গিয়েছিল—আজ যদি আমরাই আবার এক হই?

নন্দার চোখের সামনে থেকে সব কিছুই যেন বিস্মৃতির পটভূমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিথিল গলায় বললো—তা কি হয়?

—নিশ্চয়ই হয়! সামাজিক মানুষ যখন হয়েছি বাধা তখন আছেই, কিন্তু তাই বলে তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে না? তুমি শুধু একবার অনুমতি দাও।

বুকের মধ্যে কোথায় এ জলের উৎস ছিল, নন্দা কোনদিন জানতে পারেনি। রুদ্ধ গলায় বললো—আমি কিছু জানিনে, তুমি যা হয় কর। আমায় শুধু নতুন করে বাঁচতে দাও—!

—ঠিক আছে! আমার এইটুকু হলেই চলবে!

এরপর কতক্ষণ সময় কেটেছে খেয়াল নেই। একটা মুগ্ধ আচ্ছন্ন ভাব সাময়িক-ভাবে সব কিছুকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। বাস্তব জগত, তার নিষ্ঠুর সত্য, দৈনন্দিনের তিক্ত যন্ত্রণা সব কিছু অপসারিত হয়ে গিয়ে সেখানে জেগে উঠেছে একটি সংসার। একটি সুন্দর এবং চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত নতুন জীবন, নন্দা ডুবে গিয়েছিল সেই স্বপ্নে,—হঠাৎ কানে গেল কে ডাকছে—মা, ও মা।

নজরটা এমনিতেই আছড়ে পড়লো দরজার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ বছরের ছেলে আনন্দ, আট বছরের মেয়ে রনু। একটা তীব্র হিমপ্রবাহে সমস্ত শরীরটা অসার হয়ে গেল নন্দার। বললো—তোরা? এর মধ্যেই চলে এলি?

—বারে আমাদের তো এখনই আসার কথা!

বিস্মিত আনন্দ কথাগুলো বলতে বলতে অশোকের দিকে চাইছিল! রনু কথা বলেনি সমস্তটুকুই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। জানতে চাইলো—তুমি কোথায় যাচ্ছ মা।

কোথায় যাব — মেয়ের মুখের দিকে সলজ্জভাবে চাইতে না পেরে নন্দা নিজের দিকে চাইলো! নিজের দিকে তাকিয়ে চাবুক খাওয়া প্রাণীর মত কেঁপে উঠেছে নন্দা। প্রতীক্ষারত স্নেহময়ী মা নয়, সর্বশরীরে অভিসারিকার চিহ্ন নিয়ে লাস্যময়ী নারী। নিজেকে কোথায় গোপন করবে দিশে পেল না নন্দা। শুকনো হেসে বললো—পাগলের মত কি যে বলিস তোরা! কৈ কোথায় যাব? আমি কি কোথাও যাই?

—তবে যে তুমি সেজেছো!

নন্দা আরও জোরে হাসতে চেষ্টা করলো। বললো—ওরে বাবা, সাজবো কেন? ধোপাবাড়ী কাপড় দেব বলে একখানা ফর্সা শাড়ী পরেছি। আর এই তোদের এক মামাবাবু, তোদের দেখবেন বলে সেই থেকে বসে আছেন। বলেছেন—আনন্দ, রনু কত বড় হল, কেমন লেখা-পড়া শিখছে দেখতে ইচ্ছে করে—! —তা, এইবার তুমি যাচ্ছ, না অশোক? হ্যাঁ, সন্ধেও হয়ে আসছে। অতটা যেতে হবে, রাস্তাও তো কম নয়—! আনন্দ রনু তোমাদের মামাবাবুকে প্রণাম কর বাবা!

॥ ভাগ্যবান ॥

পূর্বের দুই সাধারণ নির্বাচনের মত এবারের নির্বাচনেও দেশবাসী সারা-ভারতের শাসনদায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে তুলে দিয়েছেন। এটা অবশ্যই শুধু কংগ্রেসের সৌভাগ্যের কথা নয়, সুকৃতির দাবীও নিশ্চয়ই আছে এই জাতীয় সমর্থনের পিছনে। কিন্তু ভাগ্যের আশীর্বাদও কি কিছু কম আছে তার? বোম্বাইর একটি বিধানসভার আসনে কংগ্রেস ও পি-এস-পি দলের প্রার্থী দুজনেই ভোট পেয়েছিলেন সমান সমান, ১২,৬৪৪টি করে। সুতরাং উভয় প্রার্থীই রাজী হলেন লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য-নির্ধারণে। ভাগ্য নির্ধারিত হল, ভাগ্যদেবী বরমাল্য পরিয়ে দিলেন কংগ্রেস প্রার্থীর গলে।

॥ বিপর্যয় ॥

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য দিক হল সর্বভারতীয় রথী মহা-রথীদের ভাগ্য বিপর্যয়। একমাত্র কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীনেহরু ছাড়া আর কোন দলের নেতাই এবারের নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। কমিউনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে, প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঅশোক মেহতা, জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীবাজপেয়ী, স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীরঙ্গ, সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীলোহিয়া, নির্দলীয় নেতা শ্রীকৃপালনী সকলেই এবার জনগণেশের কোপদৃষ্টিতে ধরাশায়ী হয়েছেন।

॥ অভিনন্দন ॥

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবার পশ্চিমবঙ্গের দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। একটি গ্রাম বাঙলার প্রতীক কেন্দ্র শালতোড়া, অপরটি বাঙলার প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতার সবচেয়ে কর্মচঞ্চল অংশ চৌরঙ্গী। দুই জায়গাতেই তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। সার্থকনামা পুরুষ তিনি। বাঙলা দেশের জনমতের রায় অনুসারে আগামী পাঁচ বছরের জন্যেও বিধানচন্দ্র বিধানসভার চন্দ্র হয়ে থাকবেন।

॥ সাক্ষাতে সম্মতি ॥

পাকিস্থানের জঙ্গী প্রধান আয়ুব খান জানিয়েছেন, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারত সফরে যেতে তাঁর কোন আপত্তি নেই যদি অবশ্য তাতে কোন কাজ হয়। বলা বাহুল্য, এই 'যদি'টুকুই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা এমনকি একমাত্র কথা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আয়ুবের জঙ্গীশাহীর এখন খুব কোণঠাসা অবস্থা। শহীদ সুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করে আয়ুব শুধু পূর্ববর্গকেই

দেশে বিদেশে
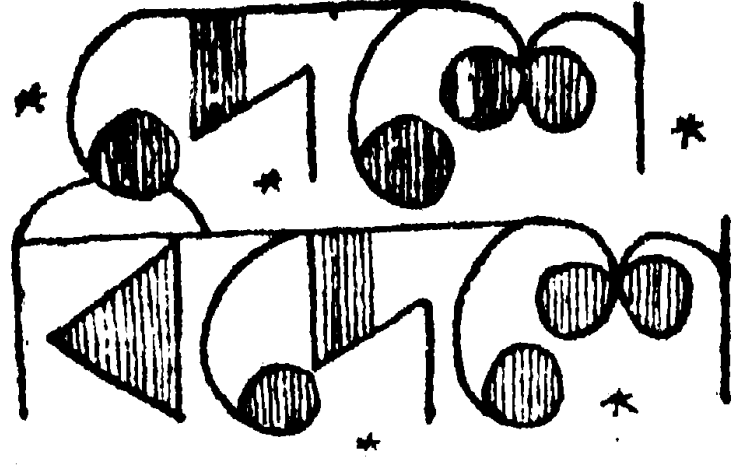
বিক্ষুব্ধ করেননি, বিক্ষোভের ঢেউ এখন সারা পাকিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-দেশান্তরেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় পাকিস্থানের প্রধান ভরসা আমে-রিকাও আজ তার প্রতি বিরূপ। এ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ-কারের আবেদন আয়ুবের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা অবশ্যই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আয়ুব কোন্ ফলের প্রত্যাশী তা স্পষ্ট না করে বলাতে এ সাক্ষাৎকারের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চয়তা প্রকাশ করা অতিবড় আশা-বাদীর পক্ষেও সম্ভব হবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের যা মনোভাব ও অনুসৃত নীতি সে সম্পর্কে আয়ুবের মতামত সাক্ষাতের পূর্বেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় কতকগুলি বাক্যব্যয় শুধু অকারণই হবে না, ভারতের ভবিষ্যৎ মর্যাদার পক্ষেও তা হবে বিশেষ ক্ষতিকর। ভারতের অনমনীয় জেদের জন্যে জনাব আয়ুবকে শূন্যহাতে ফিরে যেতে হল এ জাতীয় একটা মিথ্যা প্রচার ভারতের আন্ত-র্জাতিক মর্যাদার পক্ষে অবশ্যই বিশেষ ক্ষতিকর হবে এবং আয়ুবের পক্ষেও পাকিস্থানের বর্তমান বিক্ষোভকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও ভিন্নমুখী করা সম্ভব হবে। এ কারণে আয়ুবের সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ গ্রহণের ব্যাপারটাকে বিশেষ উৎসাহজনক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ভারতের পক্ষ থেকে আজ এ ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হওয়া উচিত। সাক্ষাৎকারের পূর্বে ভারতের জানা দরকার, কাশ্মীর সম্পর্কে তার নীতি ও মনোভাব সম্পর্কে আয়ুবের বক্তব্য কি
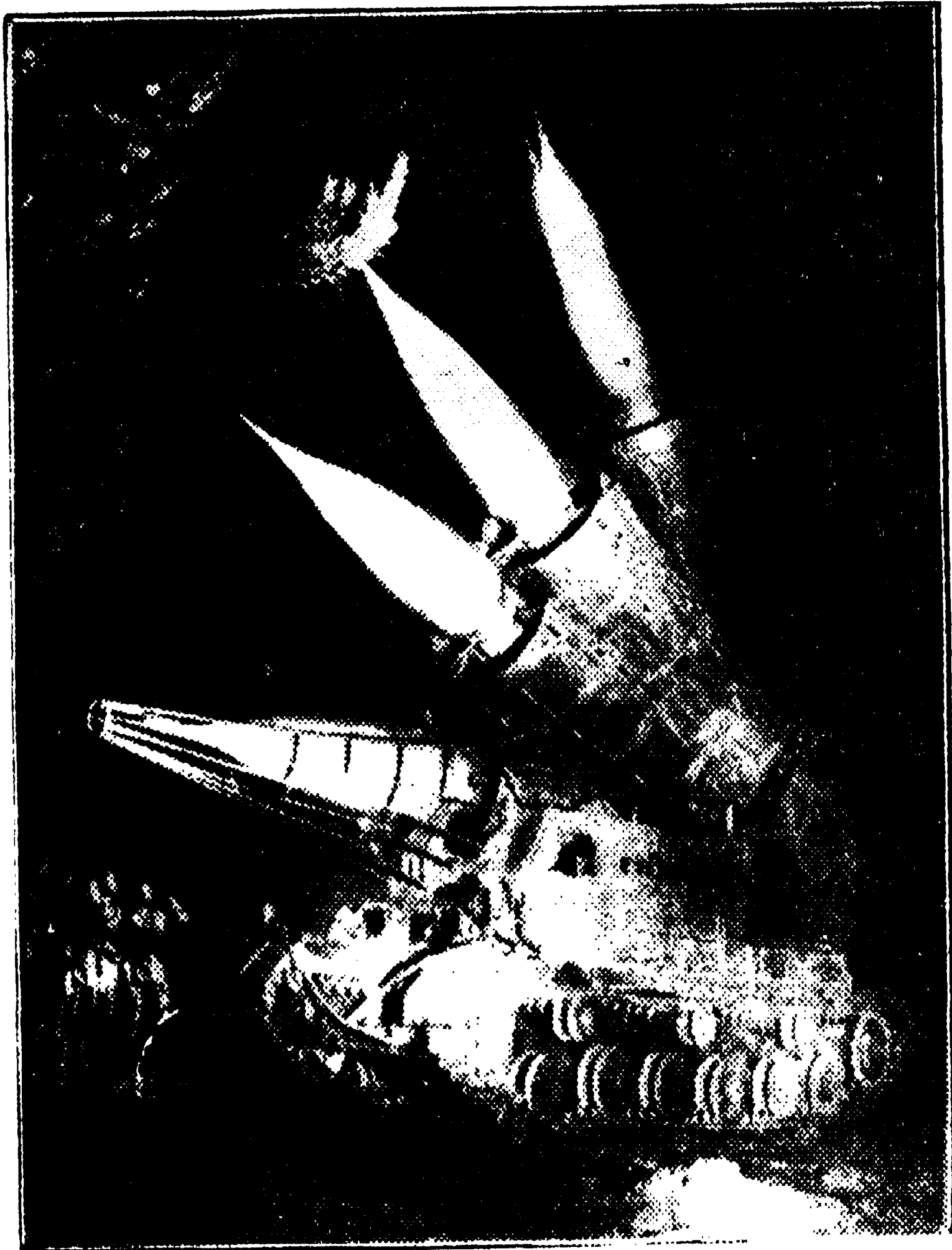
সম্প্রতি মস্কোর সন্নিকটে রুশ সৈন্যবাহিনীর যে মহড়া হয়, তাহাতে 'রকেট সংযোজিত ট্যাংক' সর্বপ্রথম দেখা যায়। রকেটটি ট্যাঙ্কের কামানের স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাকে উৎক্ষেপণের অবস্থায় আনা হইয়াছে।

এবং বিশেষ কোন ফলের প্রত্যাশী হয়ে তিনি ভারতে আসতে চান।

॥ বর্মায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ॥

পাঁচটি প্রাদেশিক বিভাগ—শান, কাচিন, কারেন, কায়া ও চিন এই নিয়ে ইউনিয়ন অফ বর্মা গঠিত। কিন্তু যেটুকু প্রাদেশিক স্বাধিকার বর্মার বর্তমান সংবিধানে স্বীকৃত আছে তা বোধহয় বর্মার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতীয়তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। একারণে বর্মার ঐ পাঁচটি জাতীয়তার প্রতিনিধিরা রেঙ্গুনের এক আলোচনা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে বর্মায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্বাধীনতার পর গত তের বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন বর্মা রাজ্যের স্বার্থে অন্যান্য প্রদেশগুলির স্বার্থ ও অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বর্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও বর্মার অন্যান্য জাতীয়তাগুলির অভিযোগসমূহের সঙ্গে মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম বর্মার রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গৃহীত হওয়াতেও বিভিন্ন জাতীয়তার মনে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় বর্মার সংবিধানে অনতিবিলম্বেই কিছু কিছু পরিবর্তনসাধিত হবে বলে মনে হয়। তবে বর্মার মত একটি ছোট ও দরিদ্র দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। কারণ তার ফলে বর্মায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও পাঁচটি রাজ্য সরকার গঠন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গঠিত হবে পাঁচটি রাজ্য বিধানসভা ও কেন্দ্রের সংসদের দুইটি কক্ষ। এতে শাসনের ব্যয় ত বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবেই বর্মায় জাতীয় ঐক্যের অগ্রগতিও এর ফলে বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে।

॥ অপসারণ ॥

সিংহলের গভর্ণর জেনারেল স্যার অলিভার গুনতিলক অপসারিত হয়েছেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিংহলী রাষ্ট্রদূত শ্রীডবলিউ গোপল্লভ। স্যার গুনতিলকের এই অপসৃতির কারণ সিংহলের সাম্প্রতিক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাঁর সন্দেহজনক কার্যকলাপ, সামরিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা নাকি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছে যে, এই সামরিক অভ্যুত্থানের কথা স্যার গুনতিলকের অজানা ছিল না।

॥ বিপন্ন আয়ুবশাহী ॥

ভয় ভেঙ্গে গেছে সারা পাকিস্তানের। যাকে দুর্জয় নিষ্ঠুর ভেবে এতদিন শঙ্কিত হয়ে ছিল পাকিস্তান আজ তার বিরুদ্ধে হঠাৎ বেপরোয়া প্রতিবাদ জানিয়ে দেখল সে অন্যায় আরও ভীরু, রুখে দাঁড়াতেই গুটিয়ে নিয়েছে সে তার উদ্যত ফণা। আয়ুবশাহী আজ মুমূর্ষু, পাকিস্তানের কোন তরুণপ্রাণ তাকে ভয় করে না। সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ আজ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নেই, পশ্চিম পাকিস্তানেও সকল প্রান্তে উঠেছে আজ তীব্র প্রতিবাদের ঝড়। সকলেরই দাবী, অবিলম্বে অবসান ঘটুক এই ঘৃণিত শাসনের, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালিত হল পূর্ববঙ্গে, দশ বছর আগে হারিয়ে-যাওয়া দশটি তরুণ প্রাণের গৌরবময় স্মৃতিকে স্মরণ করে, মাতৃভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠায় হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন যাঁরা। ঐ দিনই পূর্ববঙ্গবাসীরা দাবী তুলেছেন, পূর্ববঙ্গে আবার গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবর্তিত করতে হবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। একজন ক্ষমতালোভী সৈনিকের ইচ্ছাই যে পাকিস্তানের জনমত নয় তা অগণ্য নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে সারা পাকিস্তানে। আজ পাকিস্তান পেরিয়ে সুদূর লণ্ডনেও পৌঁচেছে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানবাসীদের তীব্র বিক্ষোভ। লণ্ডন-প্রবাসী কয়েক সহস্র পাকিস্তানী শোভাযাত্রা করে পাক দূতাবাসে উপস্থিত হয়ে দাবী জানিয়ে এসেছেন, অবিলম্বে পাকিস্তানে প্রবর্তিত করতে হবে পূর্ণ গণতন্ত্রী শাসন। আয়ুবের দুর্ভাগ্য, তাঁর বন্দুকবাজী ও সামরিক শাসন লণ্ডনে চলে না, তাই মুখ বুজেই সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে এই ভয়ংকর তিরস্কার। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা যদি বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে বুনিয়াদী ধাপ্পা হয় তবে তা যে পাকিস্তানবাসীরা গ্রহণে সম্মত হবেন না, এ আশা করি গণতন্ত্রের শত্রু আয়ুব এতদিনে বুঝতে পেরেছেন।

॥ বর্মার নতুন খবর ॥

বর্মার পূর্ববর্তী সংবাদ এখন পুরাতন। গত ১লা মার্চ ঐদেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান নেতা জেনারেল নে উইন মধ্যরাত্রে অতর্কিতে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ বর্মার ৪৬ জন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ককে গ্রেপ্তার করে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। এখন বর্মা সামরিক শাসনাধীন।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২২শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : সাধারণ নির্বাচনের সপ্তম দিবসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৪৬টি বিধানসভা-কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন।

সুরঙ্গপথে হুগলী নদী (গঙ্গা) পারাপারের নূতন ব্যবস্থার সুপারিশ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট কলিকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থার রিপোর্ট পেশ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উপদেষ্টা মিঃ চেষ্টার বোলজের দীর্ঘ আলোচনা।

নির্বাচনের অষ্টম দিনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট গৃহীত।

এপ্রিলের (১৯৬২) প্রথম পাদে দিল্লীতে সর্ব ভারতীয় নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসের অনুষ্ঠান—১২ই মার্চ ভারতের সর্বত্র 'নিরস্ত্রীকরণ দিবস' পালন—সারা ভারত শান্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : ভারতের আসাম মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, কেরল (কেবলমাত্র লোকসভা নির্বাচন) ও কেন্দ্র-শাসিত দিল্লী রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ—আসামে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সুরু।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সমাপ্তি দিবসে কলিকাতার ২৬টি বিধানসভা ও ৪টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং হাওড়ায় নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সমাধা—ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা আরম্ভ—প্রথমদিনে ভোট গণনায় কংগ্রেস অগ্রগামী—শালতোড়া কেন্দ্র (বাঁকুড়া) হইতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত—বিহার আসাম ও অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদেরও (কংগ্রেস) নির্বাচনে জয়লাভ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৪ই ফাল্গুন : চৌরঙ্গী কেন্দ্র (কলিকাতা) হইতেও ডাঃ রায় (মুখ্যমন্ত্রী) ভোটাধিক্যে বিধানসভায় নির্বাচিত—নির্বাচনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (আরামবাগ কেন্দ্র), শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (হাবড়া কেন্দ্র) প্রমুখ পাঁচজন মন্ত্রীরও এইদিনে সাফল্য লাভ—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের অগ্রগতি অব্যাহত।

মাদ্রাজ, রাজস্থান, গুজরাট ও পাঞ্জাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণের (কংগ্রেস) নির্বাচনে জয়লাভ—মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজুর পরাজয়বরণ—পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা।

পাঞ্জাবের তারণ তোরণ ভোটগণনা কেন্দ্রে অকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং গ্রেপ্তার—যান চলাচলে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ও শ্রমমন্ত্রী আবদাস সাত্তারের পরাজয়—অপর ৪ জন মন্ত্রী (কংগ্রেস) ভোটাধিক্যে নির্বাচিত।

অন্ধ্র, আসাম, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যেও কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন—কাশ্মীর বিধানসভায় জাতীয় সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

কংগ্রেসের প্রতি জনগণের নৈতিক সমর্থনে ডাঃ রায়ের (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) অভিনন্দন—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি মাতৃভূমির সেবায় নিয়োগ করার সংকল্প ঘোষণা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৬ই ফাল্গুন : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ—তিনজন উপমন্ত্রীর সাফল্য ও দুইজন মন্ত্রীসহ স্পীকার শ্রীবঙ্কিম করের পরাজয় বরণ—প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) লোকসভায় নির্বাচিত।

নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ। মহীশূর রাজ্যেও কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

॥ বাইরে ॥

২২শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : সোভিয়েট প্রস্তাবিত মহাকাশজয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় আমেরিকা সম্মত—মার্কিণ সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যম—সাংবাদিক বৈঠকে (ওয়াশিংটন) প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ঘোষণা।

পশ্চিম নেপালের কৈলাবাস সহরে নেপালী বিদ্রোহীদের হানা (২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা) পুলিশের সহিত ৪ ঘণ্টাকাল লড়াই : একজন বিদ্রোহী নিহত ও ৪ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : শীর্ষ পর্যায়ে অষ্টাদশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ক্রুশ্চেভের দুঃখ প্রকাশ—প্রেসিডেণ্ট কেনেডি (আমেরিকা) ও ম্যাকমিলানের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) নিকট সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর লিপি।

একজন জেনারেল সহ ৭৫ জন তুর্কী অফিসার গ্রেপ্তার—তুরস্কে শেষ পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যম বানচাল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের শীর্ষ-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কর্তৃক পুনরায় অগ্রাহ্য—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ প্রস্তাবের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠকের পাল্টা প্রস্তাব।

নেপালে বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানে সরকারী প্রস্তুতি।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সৈন্য সমাবেশের আয়োজন—প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণোর আদেশনামা জারী।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : 'কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনার্থ বাস্তব ফললাভ হইলে ভারতে যাইতে রাজী'—সাংবাদিকদের নিকট পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : স্যার অলিভার গুণতিলকের স্থলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিংহলী রাষ্ট্রদূত উইউ গোপালাবা সিংহলের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : সায়গনে রাজপ্রাসাদের উপর জঙ্গী-বিমানের আক্রমণ—প্রেসিডেণ্ট দিয়েমের (দক্ষিণ ভিয়েৎনাম) প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৬ই ফাল্গুন : আলজিরীয় বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ (পার্লামেণ্ট) কর্তৃক ফ্রান্স-আলজিরীয় আলোচনার (আলজিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি সংক্রান্ত) ফলাফল অনুমোদন—দ্য গল সরকারের (ফ্রান্স) সহিত আরও আলোচনা চালাইবার নির্দেশ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ অলৌকিক রচনা ॥

আপনার অর্থ-সামর্থ্য থাকতে পারে, গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ সব কিছুই আপনার করায়ত্ত হতে পারে অর্থের বিনিময়ে, কিন্তু লেখক হওয়া সহজ নয়। পত্র-পত্রিকায় যেসব রচনাদি প্রকাশিত হয়, বা সভাগৃহে বা বক্তৃতামঞ্চে যা পাঠ করা হয়, তা সর্বদাই যে লেখক-বিশেষ বা বক্তা-বিশেষের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত তা নাও হতে পারে, অর্থের বিনিময়ে সেই রচনা কোনো শক্তিমান লেখকের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের জানা এমন একজন লেখক ছিলেন। যিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি বাজেট বক্তৃতা অতি অল্প সময়ে লিখে দিয়েছিলেন। যিনি সেই বক্তৃতা দান করেছিলেন প্রশংসা অবশ্য তিনিই পেয়েছিলেন। আর যিনি লিখেছিলেন তিনি পেয়েছিলেন টাকা। অনেক 'আত্মজীবনী', উপন্যাস, ছোট-গল্প, নাটক এবং ধর্মগ্রন্থ এই জাতীয় ভূত-লেখক বা Ghost-writer-এর দ্বারা লিখিত। বাংলাদেশের নোটবই বা পাঠ্য পুস্তকের রাজত্বে প্রায় আগা-গোড়াই এই ভৌতিক খেলা চলে আসছে। বিখ্যাত অধ্যাপক বা প্রধান শিক্ষকের নাম থাকে টাইটেল পেজে, সেই গ্রন্থ কিন্তু হয়ত কোনও দরিদ্র ছাত্র কিংবা অখ্যাত শিক্ষকের ভূত-রচনা। এসব কথা অনেকেই জানেন। যাঁরা জানেন না তাঁরা সবকিছুই খাঁটি বলে গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং যিনি লিখতে পারেন না অথচ লেখা কিনতে পারেন, এবং যিনি লিখতে পারেন কিন্তু অভাবগ্রস্ত, এই দুই শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে, সংযোগে ও সহ-যোগিতার ফলেই ভূত-লেখকরা সমৃদ্ধি লাভ করে থাকেন।

শুধু যে সভাপতির অভিভাষণ বা আত্ম-জীবনী প্রভৃতির এঁরা লেখক তা নয়, প্রেমপত্র পর্যন্ত এঁদের দিয়ে লেখান হয়ে থাকে। জীবনের বহু বিচিত্র মুহূর্তের কথাও এই ভূত-লেখকদের লেখনী-প্রসূত। অনেক ভূত-লেখক রচিত রচনা সার্থক সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে ভূত লেখকরা চিরদিনই যবনিকার অন্তরালে থেকে যান, নাম, গোত্র, পরিচয়হীন। ইদানীংকালে ছদ্মনামধারী লেখকের সংখ্যা অনেক। কিন্তু কৌতূহলী পাঠক অতি সহজেই তাঁদের আসল নামের সন্ধান পেয়ে থাকেন। ভূত-লেখকরা কিন্তু চিরদিনই অজ্ঞাত এবং অখ্যাত থেকে যান, লোক-লোচনের সামনে আসার কোনো সুযোগই তাঁদের নেই।

সম্প্রতি কিন্তু এমন একটি ভৌতিক রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে যা অভূতপূর্ব, সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় ভৌতিক রচনার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ আর এক ধারার ভূতগত লেখা। অর্থাৎ আসল ভূতের লেখা। জলজ্যান্ত ভূতেরা এখন নাটক নিয়েই পড়েছেন। পরে হয়ত সাহিত্যের অন্য বিভাগেও তাঁদের আবির্ভাব ঘটবে। ক্যানাডার জনৈক মহিলা (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসিনী), বার্ণার্ড শ এবং আন্তন চেকভের ভূতযোনির দ্বারা লিখিত সতেরখানি নাটকের লেখিকা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। মনে হয়, এই দুজন লেখক 'স্বভাব যায় না মলে' এই নীতিতে বিশ্বাসী এবং পৃথিবীর মায়া কাটালেও সাহিত্যিক নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু এত দেশে এত রকমের লেখক-লেখিকা থাকা সত্ত্বেও এই ক্যানাডা-নন্দিনীরই অদৃষ্টে এই ভাগ্যোদয় কেন ঘটল এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই মহিলাটির গৃহে চক্র বা Seance বসে। সেইকালে বার্ণার্ডশ'র আত্মাকে আহ্বান জানানো হয়। এই আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কিছু গোপন পদ্ধতি আছে। আর অ্যারট সেন্ট লরেন্সের সেই বদ-মেজাজী ভদ্রলোকটি অবলীলাক্রমে তাঁর নতুন নাটকের একটি অংক বলে যান। বার্ণার্ডশ ইংরাজী ভাষার লেখক ছিলেন, তাঁর ইংরাজী রচনা গ্রহণ করা হয়ত এই মহিলাটির পক্ষে সহজ, কিন্তু আন্তন চেকভের রাশিয়ান ভাষার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা করা হয় কে জানে? হয়ত চেকভ এবং বার্ণার্ড শ' ওপারে গিয়ে বেশ

বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন এবং চেকভের রুশ-ভাষার নাটক বার্ণার্ড শ' ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিচ্ছেন আর মহিলাটিও দ্রুত-লিখন পদ্ধতির দ্বারা তা লিখে নিচ্ছেন। বার্ণার্ড শ'র রুশভাষা জ্ঞান সম্পর্কেও সন্দেহ করা যেতে পারে, তিনি রুশ ভাষা জানতেন না। হয়ত ওপারে গিয়ে শিখে নিয়েছেন, আর যেন তেন প্রকারের অনুবাদ করলেও কে ধরতে পারবে, কারণ মূল নাটকটি ত আর কারো হাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

কৌতূহল বড় বদ জিনিষ। তাই এই কৌতূহল মনে জাগে যে বার্ণার্ডশ' কত দ্রুত বলে যেতে পারেন কে জানে, আর এই মহিলাটিই বা কত তাড়াতাড়ি তা লিখে নিতে পারেন। বার্ণার্ড শ' অতিশয় দ্রুতগতিতেই চিন্তা করতে পারবেন। তিনি স্বয়ং এক নিজস্ব সর্ট-হ্যাণ্ড পদ্ধতি শিখেছিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারিকেও সেই পদ্ধতি শিখিয়ে-ছিলেন। মর্ত্যবাসী হিসাবে বার্ণার্ড শ' কখনই কোনো লেখা ডিকটেশন দিয়ে লেখান নি, তবে মর্তকায়া ত্যাগ করার পর হয়ত নতুন শক্তির অধিকারী হয়েছেন। শারীরিক বিকৃতি নাকি মৃত্যুর পর দেহ থেকে মুছে যায়। অনেক কুরূপ মানুষকে মৃত্যুর পর মনোহর কান্তি নিয়ে মর্তলোকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। যাঁরা প্রেত-চর্চা করেন একথা তাঁদের। বার্ণার্ড শ'র ক্ষেত্রেও এমন একটা কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। অবশ্য Pygmalion নাটকের মার্কিণ রূপান্তর My Fair Lady-র অসীম জনপ্রিয়তাই নাকি এইসব ভৌতিক নাটকের আসল প্রেরণা এই কথাও কেউ কেউ বলছেন।

যাই হোক, এসব আনন্দ সংবাদ সন্দেহ নেই। স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। একদিন হয়ত সত্যই সশরীরে স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া সম্ভব হবে। বার্ণার্ড শ' এবং চেকভ ছাড়াও যেসব সাহিত্যিকরা এঁদের আগে ও পরে স্বর্গলোকে গিয়েছেন, বা প্রায় প্রতিদিনই যাচ্ছেন, তাঁদের রচনাদি আমরা অনুরূপ লেখক বা লেখিকার মাধ্যমে পাচ্ছি না কেন? এর জবাব এই যে, অনুশীলন করলেই হয়ত তা একদিন সত্যই সম্ভব হবে। না পাওয়ার কারণ যথেষ্ট অনুশীলনের অভাব।

১৯৪৯-এর এক সন্ধ্যায় কবি অজিতকুমার দত্তের বাসভবনে অচিন্ত্য-কুমার, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমবেত হয়ে-ছিলেন। সেইদিন এমন একটি Seance বা চক্রে বসা হয়েছিল। অনেকেই সেই আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"অনেকদিন সংগ পরশ হারা হয়ে আছি কে দেয় সঙ্গসুখ কবি বিনা"। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'ওখানে কি করেন আপনি?' উত্তর এল—'অনির্বচনীয়ের ধ্যান করি।' অনুরোধের খাতিরে তিনি কয়েক লাইন কবিতাও লিখে দিয়েছেন। সেইদিন তিনি প্রবোধকুমারকে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। প্রবোধকুমার সার্থক আবৃত্তি-কার। তাঁর আবৃত্তি শেষে কবি বলে উঠলেন—"চমৎকার, আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।" অনেক রাত্রি অবধি সেইদিন এই চক্রটি সক্রিয় ছিল। অনেক কথাই সেদিন শোনা গিয়েছিল, যার ব্যাখ্যা চলে না। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই লিখিত হল।

তাই মনে হয়, আমরা যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এইসব অলৌকিক রহস্যের বিচার করতে পারি না বলেই তা যে অর্থহীন একথা মনে করা ভুল। যদি মিডিয়াম বা মাধ্যম শক্তিশালী হয় তাহলেই এইসব শুদ্ধ আত্মার আবির্ভাব সম্ভব হয়।

এমনই কোনও শক্তিধর মিডিয়াম যদি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী দের প্রতি সন্ধ্যায় আহ্বান করে কিছু কিছু লিখিয়ে নিতে পারেন, তাহলে তার মূল্য কম হবে না। কিংবা এক একটি যুগ ধরে, সেই সেই যুগের চিন্তানায়কদের অনুরোধ করে যদি কিছু লেখান যায়, মন্দ হয় না। তবে কপি-রাইট আইনে এই জাতীয় রচনায় আইনগত অধিকার কার?

মনে হয় এই জগতের কোথায় কি আছে, যার রহস্য আমরা জানি না। ক্যানাডীয় মহিলার অনুলিখিত নাটক আমরা পড়িনি, যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যগুণ এবং লিপি-কুশলতার পরিচয় পেয়েছেন।

পরলোকের কথা অতিশয় বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। বিশ্বাস করি না এই কথা বলাও যেমন সহজ তেমনই বিশ্বাস

কবির এই কথাটি উচ্চারণ করাও সহজ। বেতারের যেমন গ্রাহক যন্ত্র আছে এবং প্রেরক যন্ত্র আছে, তেমনই লৌকিক জগতের সঙ্গে অ-লৌকিক জগতেরও যে যোগসূত্র আছে তা এইভাবে কিছু কিছু ধরা পড়ে। এর মধ্যে অবশ্যই অনেক জুয়াচুরি, ভণ্ডামি প্রভৃতি আছে একথাও যেমন স্বীকার্য, তেমনই এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে চক্রে বসেছেন, সেই চক্রে মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছেন এর উল্লেখ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত তাঁর চিঠিপত্রে আছে।

Telepathy বা পরচিত্ত-জ্ঞান সম্পর্কে যদি বিশদ গবেষণা করা যায় তাহলে এই আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলীর একটা রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়। যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেখানে অচল সেইখানে এমন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড যে কিভাবে সম্ভব তা ভেবে পাওয়া যায় না। Mr. John Langdon-Devis নামক জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক রচিত সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে এই তত্ত্বের উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন—"Let me say at once that in so far as these faculties exist — telepathy, clairvoyance, precognition and other stranger things still —they are not abnormal, supernormal or supernatural.' তাঁর মতে আমরা বুঝি না বলেই যে এ বস্তু অস্বাভাবিক, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত এই ধারণার কোনো হেতু নেই। যা "extra-sensory perception" তার উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্লেষণের দ্বারাই এই বিস্ময়কর ঘটনাবলীর যথাযথ অর্থ করা সম্ভব উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যের দ্বারা নয়।

নতুন বই

বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা—

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু। নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। দাম : আট টাকা।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, এবং আধুনিক কবিতার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সম্প্রতি 'বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা' এবং ইতিপূর্বে কালিদাস-রচিত 'মেঘদূতে'র একটি কাব্যানুবাদ প্রকাশ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, কেবল স্বকীয় রচনার দ্বারাই নয়, অনুবাদের ভিতর দিয়েও স্বদেশ এবং বিদেশের কালজয়ী কাব্যসাহিত্যকে আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করে তিনি আমাদের চিৎপ্রকর্ষ ঘটাতে সক্ষম।

অনুবাদ চিরদিনই সাহিত্যোন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। জীবন্ত প্রাণীদেহ যেমন বাহির থেকে খাদ্য আহরণ ক'রে পুষ্টিলাভ করে, যেকোন জীবিত সাহিত্যই সেইরকম নিজের আয়ত্তের মধ্যে অন্যান্য সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং রসের উপাদান সংগ্রহ করে। বাংলা সাহিত্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কৃত্তিবাস-আলাওলের সময় থেকে সংস্কৃত এবং আরবীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রচুর ফসল তুলে দিয়ে গেছে। ইংরেজ আগমনের পর ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য অজস্র অনুবাদ এবং ভাবানুবাদের ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। এ প্রসঙ্গে, প্রাথমিক প্রয়োজনে রচিত হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; এবং অনুবাদের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে স্মরণীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। মধুসূদন দত্ত নিজে কোনো অনুবাদ না করলেও তাঁর কাব্যে ইউরোপীয়-প্রভাব এখন আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না; এবং তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দও যে একটি যুগান্তকারী 'অনুবাদ' এ সত্য প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরে পুনরুক্তি-দোষে বিরক্তিকর মনে হবে, কিন্তু প্রভাব এবং প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা ছেড়ে দিলেও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, অন্তত একটি ইংরেজী কবিতার তিনি সত্যিই অনুবাদ করেছিলেন যা আদর্শ বলে বিবেচিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কাব্যসাহিত্য থেকেই রত্নকণা আহরণ করে বাঙালী-পাঠককে উপহার দিয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীবিষ্ণু দে'র নাম কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তাঁর আধুনিক সহযোগীবৃন্দের থেকে একটি ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবুর অনুবাদ গ্রন্থ দু'খানির পার্থক্য লক্ষণীয়। সে হ'ল অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং টীকা। বাস্তবিক এমন যত্ন ও নিষ্ঠা-সহকারে তিনি অনূদিত কবিদের বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন যে সংস্কৃত এবং ফরাসী সাহিত্যে যাঁদের দখল নেই তাঁরাও কালিদাস এবং বোদলেয়ারকে কবিদের স্ব-স্ব পটভূমিতে বিচার করে প্রকৃত রসাস্বাদনে তৃপ্ত হ'তে পারবেন।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থ 'বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা' আরো একটি জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করবে বলে আমার বিশ্বাস। এতদিন ইতস্তত অনুবাদ সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যই ছিল আমাদের প্রধান প্রেরণা-স্থল। বোদলেয়ারের এই প্রতিনিধি-স্থানীয় অনুবাদ-গ্রন্থের আগমনে ইউরোপীয় ভাবজগতের সর্বাধিক জীবন্ত এবং প্রাগ্রসর অংশ হিসেবে স্বীকৃত ফরাসী সাহিত্যের দরজাও খুলে গেল আমাদের চোখের সামনে। এতে একদিকে যেমন ইউরোপকেও আমরা পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি করতে পারব, অন্যদিকে আধুনিক বাংলা কবিতাকেও তেমনি সংবেদনশীল চিত্তে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

গ্রন্থের ভূমিকাটি খুবই সুলিখিত এবং টীকাগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যে অদীক্ষিত পাঠকের পরম সহায়ক। তাছাড়া এতে আছে, কালপঞ্জি ও বোদলেয়ারের জীবনীপঞ্জি এবং কবি ও তাঁর মানসীদের কয়েকটি রেখাচিত্র ও ফোটোগ্রাফ। কবিতাগুলির অনুবাদের সময় বুদ্ধদেববাবু তাঁর পরিণত কবি-জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ঢেলে দিয়েছেন, এবং অনুবাদ এক-এক সময় এত সার্থক হয়েছে যে সমস্ত অন্তরাত্মা

তাতে সায় দিয়ে ওঠে। যেমন 'স্তোত্র' নামক কবিতাটি—

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে।

কেমনে, অম্লেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের গহ্বরে আমার।

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে,
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বইটির মুদ্রণ এবং গ্রন্থন পারিপাট্য অত্যন্তই তৃপ্তিকর।

আশ্রয় (উপন্যাস) জরাসন্ধ। প্রকাশক বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'জরাসন্ধ' বাংলা সাহিত্যের স্বনাম-ধন্য জনপ্রিয় লেখক। যে অল্পসংখ্যক লেখক প্রথম গ্রন্থ থেকেই বাংলা সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন 'জরাসন্ধ' তাঁদের অন্যতম। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যিক শক্তিমত্তা ও লিপিকুশলতার আশ্চর্য কৃতিত্বেই তিনি আজ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর কারাগারের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রসারশীল পটভূমিকায় এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দান করেছে। পরিণত মানসের পরিচয় 'জরাসন্ধে'র কাহিনীতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে আছে সংযম এবং শালীনতা। এই পরিমিতিবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য।

'আশ্রয়' জরাসন্ধের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখকের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট ভঙ্গীর আশানুরূপ পরিচয় না থাকলেও বৈচিত্র্য এবং বলিষ্ঠতার পরিপূর্ণ ছাপ বর্তমান। শুভেন্দু আর এষার জীবনের রোদন-ভরা ব্যর্থতার ইতিহাস 'আশ্রয়'। কয়লা-খনির মালিক সোমনাথের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান শুভেন্দুর লেখাপড়ার ব্যবস্থা তিন য়ুরোপীয় ভঙ্গীর স্কুলে। এই-ভাবে বাড়ি থেকে দূরে সাংসারিক প্রীতি ও স্নেহবঞ্চিত শুভেন্দু বড় হয়েছে। ধনী-সন্তান শুভেন্দু শেষ পর্যন্ত সিনেমার তারকা এষাকে বিবাহ করে বসল, ফলে সোমনাথ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলেন। শুভেন্দুর বৈমাত্রেয় ভাই দিব্যেন্দু ব্যাধি-জীর্ণ শরীর নিয়ে সোমনাথের কাছেই থাকত, সোমনাথের ম্যানেজার প্রশান্ত এক সূত্রে শুভেন্দুকে জানিয়ে দেয় যে, সোমনাথ তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা স্থির করেছেন। সোমনাথের কাছে একদিন শুভেন্দুর স্ত্রী এষা দেখা করতে এল, শুভেন্দুর সে খবর জানা ছিল না। সোমনাথ জানলেন এষা তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীর দৌহিত্রী। তিনি এক পুরাতন প্রেমের সূত্রে এষার প্রতি স্নেহময় হলেন। শুভেন্দু পিতার কাছে না এসে অন্যত্র চাকরী নিল। দিব্যেন্দু অসুস্থ হওয়ায় কলকাতায় এষার সঙ্গে চিকিৎসা-সূত্রে তাকে আনা হল। সেই সময় অতিরিক্ত মর্ফিয়া দিয়ে দিব্যেন্দুকে হত্যা করা হয়, প্রশান্তের পরামর্শেই। ফলে শুভেন্দুর হল কারাদণ্ড। দীর্ঘ-কাল কারাবাসের পর ফিরে এসে শুভেন্দু দেখল এষা তখন দিব্যেন্দুর স্মৃতি বুকে নিয়ে বসে আছে। ফলে শুভেন্দু আবার কারাবরণ করল, আশ্রয় তার সেইখানেই, সেখানেই শান্তি। ভাগ্যবিড়ম্বিত শুভেন্দুর জীবনে নির্জন কারাগারই হল শান্তির নীড়। সংক্ষেপে এই হল কাহিনী, সুখপাঠ্য এবং সরল কাহিনী, তবে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতায় 'জরাসন্ধে'র এই উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুরুচিসংগত।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

যষ্টি-মধু—সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। কুমারেশ ঘোষ কর্তৃক ৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত।

'যষ্টি মধু'র এটি দশমবর্ষ দশম সংখ্যা। অজস্র কার্টুন আর নানাবিধ হাস্যরসাত্মক রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এসংখ্যায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশনের কতকগুলি অভিভাষণের অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমানের ভারতীয় চলচ্চিত্র :

কথা উঠেছে, বর্তমানের ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে তেমন 'ভারতীয়ত্ব' নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ ক'রে হিন্দী ছবি সম্বন্ধে এই কথা উঠলেও আমাদের ঘরের বাংলা ছবিও এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আগাগোড়া একখানি ছবি দেখে তার ভারতীয় ভাষায় রচিত সংলাপ এবং কিছু ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া ছবির গল্প বা চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও ভারতীয়ত্বের নামগন্ধ আবিষ্কার করা যায় না, এই সুস্পষ্ট অভিমত এসেছে বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

কিন্তু সত্যিকারের "ভারতীয়ত্ব" বলতে আজকের দিনে কোন্ বিশেষ জীবনধারাকে বোঝায়, তা' আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আজকের এই চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সাধারণ ভারতীয়ত্বের কোনো লঘিষ্ঠ সাধারণ হর নির্ণয় করা সম্ভব কি? কে বলে দেবে, "মিস ইণ্ডিয়া সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যে মেয়েটি তার পরনের শাড়ীর খাঁজে খাঁজে উদ্ধত যৌবনকে রেখায়িত ক'রে বিচারকদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাচ্ছে, সেই খাঁটি ভারতীয়, না নাগপুরের পার্বত্য-অঞ্চলে আজও যে আদিবাসী রমণী দেহের উপরের ভাগ অনাবৃত রেখে অসংকোচে চলাফেরা করছে, সে-ই আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয়? যে-নারী স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আজও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করছে, সে-ই ভারতীয়, না যে অন্যায় অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য না ক'রে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে আদালতের স্বারস্থ হচ্ছে, সেই ভারতীয়? সনাতন ভারতীয় প্রথায় আজ কোন্ জিনিসটি চালু রয়েছে, কেউ বলতে পারেন কি? শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না; হিন্দুদের মধ্যে পর্দা এবং মুসলমানদের মধ্যে বোরখা প্রচলিত ছিল; বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে 'কালাপানি' পার হওয়া নিষিদ্ধ ছিল; পুরুষের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; নারী রজস্বলা হবার পূর্বেই বিবাহিতা হওয়া আবশ্যিক ছিল; বর্ণ-হিন্দুদের পক্ষে বৃথা মাংসভক্ষণ অনাচার বলে গণ্য হ'ত; বিবাহের পূর্বে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার দূরের কথা, চোখের দেখা পর্যন্ত ঘটত না। —এই রকম হাজারো নিয়ম এবং নিষেধের ফিরিস্তি দেওয়া যায় আগেকার ভারতীয় সমাজগুলির, যা আজকের দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অচল হয়ে গিয়েছে। আজ অর্থনৈতিক চাপে পড়ে বহু মেয়েকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে উপার্জনের তাগিদে; ঐ একই কারণে আজ বিবাহের বয়স ১২-১৮ থেকে ২২-২৮ বা তার চেয়েও বেশীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; সরকার একদিকে পুরুষের একাধিক বিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করেছেন, অপর দিকে বিবাহ-বন্ধনকে শিথিল করেছেন 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' আইন পাশ করে; আজ বিজ্ঞানের কৃপায় ২৪,০০০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট পৃথিবী সংকুচিত হয়ে একটি টেনিসবলের রূপ ধারণ করেছে দূরত্ব ও সময়ের হিসাবে; ফলে মারাঠি মেয়ের মার্কিন স্বামী বা বাঙালী ছেলের জার্মান স্ত্রী হওয়াটা কারুরই চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে না; শ্বশুরবাড়ীতে আজ আর অবগুণ্ঠনাবৃত বধূ মৃদু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় না, আজ তার স্থান সেই বাড়ীর মেয়ে, তার ননদেরই মত—সে শ্বশুরকে বাবা, ভাসুরকে দাদা বলে ডেকে দূরত্বের ব্যবধানকে লোপ ক'রে দেয়; আবার কখনও বা নিজের স্বামীটিকে স্থানচ্যুত ক'রে একটি নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে আসে 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান'-এর জিগিরসম্ভূত ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং তারই পরে দ্বিধা-বিভক্ত ভারতে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। স্বাধীন ভারতে কয়েকটি পাঁচ-সালা পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপ বহু বিদেশী নানা কার্যব্যপদেশে যেমন ভারতের গ্রাম-পরিবেশে আস্তানা গেড়েছেন, তেমনই নানারকম বিনিময় পরিকল্পনানুসারে ভারতীয়রা শিক্ষা বা

রাজেন তরফদার পরিচালিত 'অগ্নিশিখা' চিত্রের একটি দৃশ্য

কর্মস্থলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘন-ঘন যাতায়াত করছেন। বিস্তৃত ভারত-বর্ষের বহুতর জাতি তাদের আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতাকে ক্রমেই হারিয়ে ফেলে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ অবস্থায় ভারতের "ভারতীয়ত্ব" ক্রমেই মাত্র কথার কথাতেই পর্যবসিত হ'তে চলেছে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। অথবা এই অবস্থায় পরিণত হওয়াই ভারতের "ভারতীয়ত্ব"। কারণ, যুগে যুগে ভারতবর্ষ গ্রীক প্রভৃতি যে-সব জাতিরই সংস্পর্শে এসেছে, তাদের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, খাদ্য, ভাষা অর্থাৎ সমগ্র সভ্যতাকেই আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে যা উপহার এনেছে, সবই মিলেমিশে এক হয়ে গেছে—কিছুই ভারত ফিরিয়ে দেয়নি; তাই ভারতের শোণিতে প্রতিনিয়তই বিচিত্র সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

আজ বিজ্ঞানের যুগসন্ধিক্ষণে স্বাধীন ভারত তার সমস্ত দেশবাসীকে নিয়ে এক নূতন জাতিতে পরিণত হ'তে চলেছে; ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে এখনও রূপান্তর চলেছে, রূপের পরিণতিতে এসে পৌঁছোয়নি। তাই আজ কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে, কি চিত্র-কলায়, কি চলচ্চিত্রে—কোন্‌টা ভারতীয় এবং কোন্‌টা ভারতীয় নয়, এ-কথা সঠিকভাবে বলা শুধু যে অত্যন্ত দুরূহ, তাই নয়; এ-কথা বলবার চেষ্টা করা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র।

'উত্তরায়নে'র একটি দ্বৈত ভূমিকায় উত্তমকুমার

চিত্র সমালোচনা

ধর্মপুত্র (হিন্দী): বি, আর, ফিল্মস্‌-এর নিবেদন; ১৩,৮৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনীঃ আচার্য চতুর্সেন শাস্ত্রী; প্রযোজনা : বি, আর, চোপরা; পরিচালনা : যশ চোপরা; সঙ্গীত-পরিচালনা : এন, দত্ত; গীত-রচনা : শাহির; চিত্রগ্রহণ : ধরম চোপরা; শব্দধারণ : ওয়ালিকার; সম্পাদনা : প্রাণ মেহরা; শিল্পনির্দেশ : সন্ত সিং; সঙ্গীত-গ্রহণ : কৌশিক; রূপায়ণ : নিরূপা রায়, মালা সিংহ, রেহমান, শশী কাপুর, মনমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি। ইস্টার্ণ সার্কিট-এর পরিবেশনায় গেল ২রা মার্চ থেকে 'প্যারাডাইস, দর্পণা, কৃষ্ণা, কালিকা, মেনকা ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ধর্মপুত্রের কাহিনী আরম্ভ ১৯২৫ সালে, আর শেষ ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময়ে। কাহিনীর মূল বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং প্রাণোন্মাদী সংলাপ ও গানের সাহায্যে ছবির ঘটনার ভিতর দিয়ে তাকে দর্শকহৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। "ধর্ম তোমার নিজের জিনিস; তুমি যেভাবে ইচ্ছে ঈশ্বরকে ডাকতে পার; কিন্তু দেশ তোমার এক, একই মায়ের সন্তান তুমি"—কাহিনীকার এই কথা বলেছেন ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে। এবং এই কথা বলবার জন্যে এমন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করেছেন, এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সংলাপ চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান সকল দর্শকই তার তারিফ করেছেন অজস্র প্রশংসা ও করতালিসহযোগে। নবাব সাহেবের কন্যা বানুর অবৈধ সন্তান প্রতিপালিত হয় তাঁরই বন্ধুপুত্র ডাক্তার অমৃত রায়ের পুত্ররূপে। পরে সেই অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা জাবেদের সঙ্গেই যখন বানুর বিবাহ হয়, তখন বানু তার সন্তানকে ফিরে পেতে চায়; কিন্তু অত্যন্ত দুঃসময়ে বংশের সম্মান-রক্ষা ক'রে যে-ছেলেকে ডাঃ অমৃত নিজের সন্তান ব'লে পালন করছেন, তাঁর কাছ থেকে সেই ছেলেকে ফিরিয়ে আনা যায় না, জাবেদের এই কথা বানু বুঝল। কিছু দিন বাদে ডাঃ অমৃতের যখন দুই যমজ ছেলেমেয়ে জন্মাল, তখন দৈব-দুর্ঘটনায় বানুর গর্ভস্থ সন্তানই যে শুধু নষ্ট হ'ল, তাই নয়, তার আর কোনোদিন সন্তানসম্ভবা হবার সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হিন্দুস্থানের আজাদীর জন্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব নিয়ে নবাব সাহেব প্রাণ দিলেন পুলিসের গুলিতে: হাতে তাঁর উঁচু ক'রে ধরা ভারতের জাতীয় পতাকা। নবাব সাহেব আর ডাঃ অমৃতের বাড়ী পাশাপাশি—দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান ঘোচাবার জন্যে দুই বাড়ীর ছাদের মধ্যে পথ তৈরি ক'রে

'ঝুলো' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে বৈজয়ন্তীমালা ও সুনীল দত্ত

'শান্তি' চিত্রে অর্পণা দেবী ও সন্ধ্যা রায়

দেওয়া হয়েছে। এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। ডাঃ অমৃতের পালিত পুত্র দিলীপ এখন ঘোরতর হিন্দু—পূজা, অর্চনা, লেখাপড়া নিয়ে সে থাকে; ধর্মহীন আধুনিকতায় তার গা জ্বালা করে: অথচ ডাঃ অমৃতের যমজ দুই ছেলে মেয়ে ঠিক তাই—তারা সহজ স্বচ্ছন্দ আধুনিক জীবনই যাপন করে হেসেখেলে; ধর্মের অহেতুক কাঠিন্য তাদের সহ্য হয় না। বানুর পরামর্শে ডাঃ অমৃতের মেয়ে দিলীপের সংগে যখন মীনা নামে তার এক বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন কিন্তু দিলীপের কাঠিন্যের আবরণ ক্ষণতরে সরে যায়। ঠিক এই সময় সারা ভারতে জ্বলে ওঠে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষানল। দিলীপ এই ধর্মোন্মত্ততায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং দুদিন আগেও যাদের অত্যন্ত আপনার মনে করত,—এবং সত্যিই যারা তার আপনার লোক—সেই বানুদের বাড়ী চড়াও হ'ল। ডাঃ অমৃত ও তাঁর স্ত্রীকেই সে চিরকাল জেনে এসেছে তার বাপ-মা ব'লে। সেই বাপ-মা যখন তাকে এই দুষ্কার্যে বাধা দিলেন, তখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই সে চেষ্টা করল বানুর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করতে। এর পর বিচিত্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে যখন সে রবীন্দ্রনাথের গোরার মতই নিজের সত্য পরিচয় জানতে পারল, তখন সে ক্ষোভে, দুঃখে নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইল। তখন সে তার সহকর্মীদের কাছে মুহূর্তে হয়ে দাঁড়াল শত্রু। এই শত্রুভাবাপন্ন সহকর্মীদের সামনে যখন সে বলিস্বরূপ মাথা পেতে দাঁড়াল, তখন তার আসল মা বানু এল তাকে বর্মের মত রক্ষা করতে। অবশ্য সময়মত সঙ্গীনধারী সেপাহীর দল এসে পড়ায় সকল দিক রক্ষা হ'ল এবং ভারত-বিভাগের মধ্যে দিয়ে গল্পেরও ঘটল সমাপ্তি।

ছবিটিতে হিন্দু-মুসলমানের দাংগা ও ভারত-বিভাগের দৃশ্যে বহুবার নেহরু, গান্ধী, প্যাটেল প্রভৃতি বরণীয় জননেতাদের দেখানো হয়েছে এবং দেশত্যাগের দৃশ্যও অত্যন্ত বিরাটভাবে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মান্ধতার ফলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই ক'রে চিরকালের মত শত্রু হয়ে যাওয়া যে-কি মর্মন্তুদ ট্রাজেডী, তা এই ছবিখানি অত্যন্ত পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করেছে। ধরম চোপরার চিত্রগ্রহণের কাজ সর্বত্রই একটি উচ্চমান বজায় রাখতে পেরেছে। ছবিতে দেশাত্মবোধক এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক যে-কয়টি গান আছে, তার প্রত্যেকটিই রচনা, সুর ও গাওয়ার গুণে হৃদয়গ্রাহী। এ ছাড়া প্রেম-সংগীতের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে গাওয়া "ভুল সকতা হায় ভলা কোন য়ই প্যারী আঁখে" গানখানির জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নবাব সাহেবের ভূমিকায় রেহমান। তাঁর চলন, বলন, অংগভংগী উচ্চাংগের নাট্যনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ডাক্তার অমৃত রায়ের স্ত্রীর ভূমিকায় নিরুপা রায় অত্যন্ত দরদের সংগে অভিনয় ক'রে দর্শক-সহানুভূতি লাভ করেছেন। মালা সিংহকে প্রেমিকারূপে চমৎকার মানিয়েছে; এখানে তাঁর অভিব্যক্তিও সুন্দর। কিন্তু যুবক দিলীপের মা হিসেবে তাঁকে যেমন খুব মানায়নি, তেমনি সেখানে মাতৃসুলভ ভাবভংগীরও কিছু অভাব ঘটেছে। তবে একেবারে শেষের উত্তেজনাকর অংশে তিনি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়ে বানুর মাতৃহৃদয়কে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন। দিলীপের ভূমিকায় শশী কাপুর চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। ডাঃ অমৃতের ভূমিকায় মন-

বি আর ফিল্মসের হিন্দীচিত্র 'ধর্মপুত্রে' মালা সিন্‌হা।

মোহন কৃষ্ণও তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মধুর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের শুভউদ্দেশ্য প্রণোদিত ছবি হিসেবে "ধর্মপুত্র" সার্থকতা লাভ করেছে।

বিবিধ সংবাদ

"শিউলি বাড়ী" ও "শাস্তি" :

মুভিটেক লিমিটেডের নতুন ছবি "শিউলি বাড়ী" খুব শিগ্‌গিরই শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করবে। সুবোধ ঘোষের "নাগলতা" অবলম্বনে ছবিখানির জন্যে চিত্রনাট্য লিখেছেন তপন সিংহ এবং এর পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু। এই ছবিতে প্রধান নারী-চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় এর সংগীত-পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অপরাপর চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, রঞ্জনা, দিলীপ রায়, গীতালী রায়, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি। ছবিখানির পরিবেশনার ভার পেয়েছেন প্রভাত পিকচার্স।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় অভিনীত এবং নরেন্দ্র মিত্র লিখিত "ভুবন ডাক্তার" অবলম্বনে রচিত "শাস্তি" ছবিখানি সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় শিগ্‌গিরই মুক্তি পাচ্ছে। ছবিখানির প্রযোজনা, পরিচালনা, সংগীত পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে চিত্রশোভনা লিঃ, দয়াভাই, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও সুধীশ ঘটক।

"ইম্‌পা"-য় ভাঙন :

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি বিমল রায় সমেত ন'জন কর্মকর্তা অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন স্বার্থান্বেষী সদস্যের কার্যে বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেছেন। অবশ্য মিঃ রুংটা প্রমুখ অপরাপর সদস্য শ্রীরায়ের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে একটি প্রকাণ্ড জবাবও দাখিল করেছেন। ভারতীয় চিত্রজগতে যখন সংহতির একান্ত আবশ্যকতা তখন "ইম্‌পা"র এই ভাঙন অত্যন্ত দুঃখজনক।

স্টারে "শেষাগ্নি" :

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত "শেষাগ্নি"র শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল, গেল কাল, বৃহস্পতিবার, ৮ই মার্চ। নাট্যরূপদাতা শ্রীগুপ্ত স্বয়ং এর পরিচালক এবং এতে আত্মপ্রকাশ করেছেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, অনুপকুমার, বীরেশ্বর সেন, শ্যাম লাহা,

অগ্রগামী পরিচালিত 'কান্না' ও 'নিশীথে' চিত্রে নন্দিতা বসু

প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, সাধনা রায়-চৌধুরী, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, আশা প্রভৃতি নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী। এবং এ'দের সংগে সম্ভবতঃ প্রথম মঞ্চাবতরণ করছেন বাসবী নন্দী।

সাদার্ণ স্কুল অব মিউজিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান :

গেল ৩রা মার্চ, শনিবার, চৌরঙ্গী ওয়াই, এম, সি এ, হলে জোসেফ নস্কর পরিচালিত সাদার্ণ স্কুল অব মিউজিক-এর ১৯তম বার্ষিক যন্ত্রসংগীত অনুষ্ঠান হয়ে গেল। শ্রীনস্কর তাঁর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মোজার্ট, কার্মিক, হাইডন্‌স্‌, ক্যামার, ব্রাহ্‌ম প্রভৃতি রচিত বিখ্যাত সংগীতালেখ্যগুলি গীটার বা বেহালা সহযোগে পরিবেশন করলেন। এই সঙ্গে তাঁর নিজের কতকগুলি রচনাও পরিবেশিত হ'ল। এর মধ্যে রচনা হিসেবে "ইন্ডিয়ান ক্যাডেট", "ডল্‌স্‌ ওয়েডিং মার্চ" এবং "সারং" অত্যন্ত প্রশংসা দাবী করতে পারে। গীটার বাজনায় অমলেন্দু নস্কর, আহমেদ নাসের, এলা মুখোপাধ্যায়, আরতি লাহিড়ী এবং বেহালা বাজনায় তপন নস্কর উচ্চাংগের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।
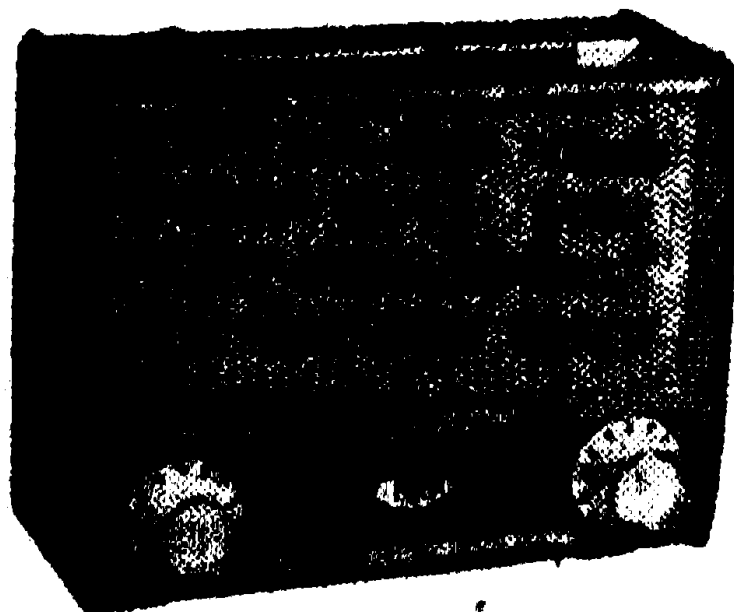
খেলাধুলা

দর্শক

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর

ভারতবর্ষ : ৩৩৩ রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মঞ্জরেকার ৮৬, সারদেশাই ৫৮, সুর্তি নট আউট ৫৪, কণ্ট্রাক্টর ৪৬ এবং কুন্দরাম ৪৪)

জামাইকা কোল্টস : ১৩৯ রাণ (মিচেল ৩৮ এবং হেয়ারউড ২৮। দেশাই ৩১ রাণে ৭ উইকেট এবং বোরদে ৩৯ রাণে ২ উইকেট)

ও ১২৭ রাণ (৬ উইকেটে। মিচেল ৪৯ এবং জনস্টোন ৩১। পতৌদি ১৩ রাণে ৩)

সাবিনা পার্কে ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম জামাইকা কোল্টস দলের দু'দিনের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলায় ভারতীয় দলের এগারজনই ছিলেন টেস্ট খেলোয়াড়।

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে এবং ৮ উইকেটে ৩৩৩ রাণ তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। জামাইকা কোল্টস দল প্রথম দিন ৩৬ মিনিটের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ৩৫ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ২½ ঘণ্টা আগে জামাইকা কোল্টস দলের প্রথম ইনিংস ১৩৯ রাণে শেষ হলে তারা ১৯৪ রাণে পিছিয়ে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়।

জামাইকা কোল্টস দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় রমাকান্ত দেশাই ৭টা উইকেট পান—১৭ ওভার, ৫ মেডেন, ৩১ রাণ।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জামাইকা কোল্টস দলের মাত্র ১ রাণের মাথায় ১ম উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে জনষ্টোন এবং মিচেল দলের পতন রোধ ক'রে ৯১ রাণ তুলে দেন। মিচেল উভয় ইনিংসেই নিজ দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ে দেখা গেল জামাইকা কোল্টস দলের ৬ উইকেট পড়ে ১২৭ রাণ উঠেছে।

ভারতবর্ষ : ৪৩৪ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কণ্ট্রাক্টর ১৩৯, পতৌদির নবাব ৮৪, উমরীগড় ৬৭, মেহেরা ৪৩ এবং জয়সীমা ৪১। ভ্যালেনটাইন ১০৬ রাণে ২, ওরেল ৩৭ রাণে ২ এবং লেভী ১৩২ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৯৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুর্তি নট আউট ৫৪, বোরদে ৪০ এবং জয়সীমা ৩১। লেভী ৩৯ রানে ২ এবং ভ্যালেনটাইন ৫১ রানে ২ উইকেট)

জামাইকা : ৩৬১ রান (ম্যাকমরিস ১৫৪, গ্রিফিথ ৮২ এবং জোসেফ ৩১। প্রসন্ন ১১৮ রানে ৪ এবং বোরদে ৯৫ রানে ৪ উইকেট)

ও ১২৯ রান (৪ উইকেটে। ওরেল নট আউট ৫৬ এবং জোসেফ ৪৬। সুর্তি ৩৩ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের এই পঞ্চম খেলাটি ড্র গেছে। এই পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতীয় দলের হার ১ (১ম টেস্ট) এবং খেলা ড্র ৪। অর্থাৎ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

কিংস্টোনের মেলবোর্ণ পার্কে শক্তি-শালী জামাইকা একাদশ দলের বিপক্ষে চার দিনের খেলায় ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করে এবং প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ৩২২ রাণ করে। ৮১ মিনিটের খেলায় দলের ১ম উইকেটে ৬৯ রাণ উঠলে পর জয়সীমা ৪১ রাণ ক'রে আউট হ'ন। জয়সীমা দু'বার আউট হওয়ার থেকে ছাড়ান পেলেও তাঁর খেলা আগের থেকে অনেক ভাল হয়। জয়সীমা তাঁর ৪১ রাণে ৩টে বাউণ্ডারী করেন। দলের ১১৩ রাণের মাথায় দলের ২য় উইকেট (মেহেরা) পড়ে যায়। মেহেরা ১২৫ মিনিট খেলে ৪৩ রাণ করে রাণ আউট হ'ন। ৩য় উইকেটে জুটি বাঁধেন কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে পতৌদির নবাব। ১৪৫ মিনিটের খেলায় ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৭১ রাণ ওঠে। চা-পানের সময় দলের রাণ ছিল, ২০১, ২ উইকেট পড়ে। ৩য় উইকেট পড়ে যায় দলের ২৮৪ রাণের মাথায়। পতৌদি তাঁর ৮৪ রাণে আউট হ'ন, বাউণ্ডারী করেন ১৪টা। কণ্ট্রাক্টর ২১০ মিনিটের খেলায় ১৩৯ রাণ করেন, বাউণ্ডারী ১৯টা। এবারের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৫ম উইকেটের জুটি উমরীগড় (৫ রাণ) এবং সারদেশাই (শূন্য রাণ) এইদিন নট-আউট থাকেন।

উইকেট ব্যাটসম্যানদের সহায়ক ছিল। জামাইকা দলের ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট গলতি ধরা পড়ে। এর জন্যে জয়সীমা, কণ্ট্রাক্টর এবং পতৌদির নবাব লাভবান হ'ন।

দ্বিতীয় দিনে সারদেশাই ৫০
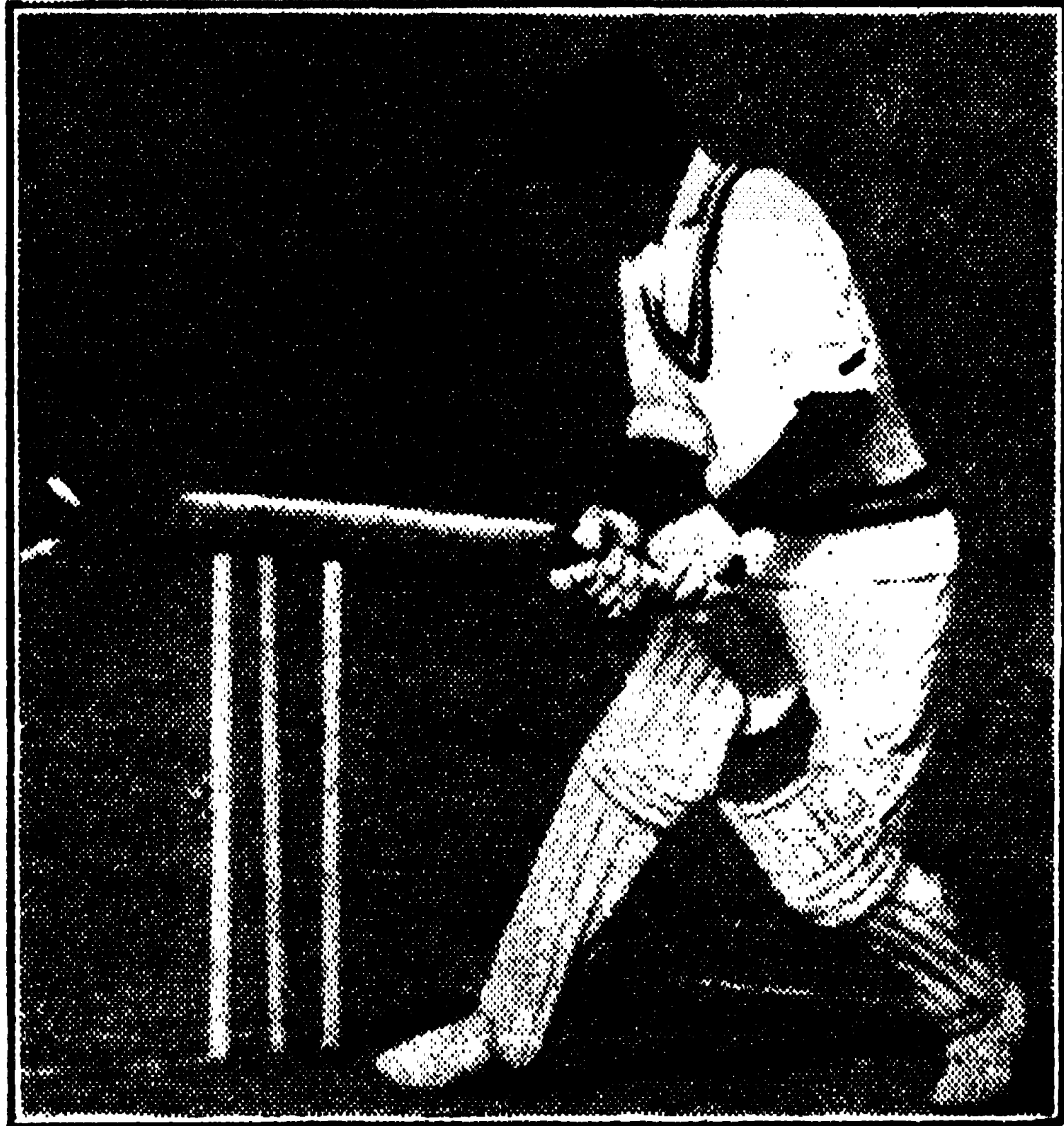
আউট: কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান বিজয় মেহরা স্টেয়ার্সে'র বলে আউট হয়েছেন।

মিনিটের খেলায় ২৮ রাণ ক'রে অসুস্থতার কারণে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর বোরদে (২ রাণ) এবং সুর্তি (৪ রাণ) খুব কম রাণ করে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ৪০৯, ৬টা উইকেট পড়ে। দলের ৪২৭ রাণের মাথায় উমরীগড় তাঁর ৬৭ রাণ ক'রে ওরেলের বলে বোল্ড আউট হন। তিনি ১৩২ মিনিটের খেলায় ৬৭ রাণ এবং তার মধ্যে ৬টা বাউণ্ডারী করেন। লাঞ্চের পর ভারতীয় দল ২৫ মিনিট খেলে এবং ৭ উইকেটে ৪৩৪ রাণ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নাদকার্ণী ১০ এবং কুন্দরাম ৪ রাণ ক'রে নটআউট থাকেন। ৪১৫ মিনিটের খেলায় ভারতীয় দলের এই ৪৩৪ রাণ ওঠে।

জামাইকা একাদশ দল এই দিনের খেলায় ১ উইকেটে ১৪৯ রাণ করে। ওপনিং খেলোয়াড়দ্বয় গ্রিফিথ এবং ম্যাকমরিস পিটিয়ে খেলে ৯৩ মিনিটে ১০০ রাণ তুলে দেন। ১ম উইকেটের জুটিতে গ্রিফিথ এবং ম্যাকমরিস ১৪৮ রাণ করেন। গ্রিফিথ ৮২ রাণ ক'রে প্রসন্নর বলে জয়সীমার হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। ১৪৭ মিনিটের খেলায় তিনি তাঁর ৮২ রাণে ১২টা বাউন্ডারী করেন। ইস্টোন ম্যাকমরিস (৬১ রাণ) এবং ডোনাল্ড মিলার (০ রাণ) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে জামাইকা দলের নট আউট খেলোয়াড় ম্যাকমরিস এবং মিলার খেলতে নামেন। দলের রান তখন ১৪৯ (১ উইকেট পড়ে)। দ্বিতীয় দিনের তুলনায় এইদিন দুজন খেলোয়াড়ই রান তুলতে বেশ অসুবিধা বোধ করেছিলেন। ৩৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ২১ রান ওঠে। দলের ২১১ রানের মাথায় মিলার তাঁর ২৩ রান ক'রে আউট হ'ন উমরীগড়ের বলে। ২য় উইকেটের জুটিতে ম্যাকমরিস এবং মিলার দলের ৬৩ রান তুলে দেন, ৮৭ মিনিটের খেলায়। জোসেফস খেলতে নামেন।

লাঞ্চের সময় রান ছিল ২১১, ২ উইকেট পড়ে। ম্যাকমরিসের ৯৭ রান।

লাঞ্চের পরই নাদকার্নীর বলে ৩ রান করে ম্যাকমরিস তাঁর শতরাণ পূর্ণ করেন, ২৫০ মিনিটের খেলায়। তাঁর এই শত রানে ১১টা বাউন্ডারী ছিল। লাঞ্চের পরের ৪৫ মিনিটের খেলায় জামাইকা দলের রান দাঁড়ায় ২৫৬ (২ উইকেট)। তখন ম্যাকমরিসের ১১২ রান এবং জোসেফসের ২৮ রান। দলের ২৯৫ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়, জোসেফস ৩১ রান করে আউট হ'ন। ৩য় উইকেটের জুটিতে ম্যাকমরিস এবং জোসেফস দলের ৮৪ রান তুলে দেন।

চা-পানের সময় জামাইকা দলের রান দাঁড়ায় ৩১৯ (৩ উইকেট পড়ে)। চা-পানের পরই দলের ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। চা-পানের পরবর্তী ৫৭ মিনিটের খেলায় মাত্র ৪২ রান যোগ হয় বাকি ৭টা উইকেট পড়ে।

চা-পানের পর খেলা আরম্ভ হয় এবং কোন রান হওয়ার আগেই দলের ৩১৯ রানের মাথায় ওপনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকমরিস বোরদের বল লাফিয়ে পিটতে গিয়ে বোল্ড আউট হন। ম্যাকমরিস ৩৭০ মিনিট খেলে ১৫৪ রান করেন। ওরেলের সংগে ৫ম উইকেটে জুটি বাঁধেন মিচেল। মিচেল ২ রান করলেন; দলের রান দাঁড়াল ৩২১। এই ৩২১ রানের মাথায় প্রসন্নের বল ড্রাইভ ক'রে ওরেল বলটা এক্সট্রাকভারে জয়সীমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েই সাত তাড়াতাড়ি একটা রানের জন্যে দৌড় দিলেন। কিন্তু তাঁর জুড়ি মিচেল এক রান করা অসম্ভব বুঝে নিজের উইকেট ছাড়লেন না। তখন ওরেল নিজের উইকেটের দিকে 'পড়ি-মরি' ক'রে দৌড়লেন; কিন্তু জয়সীমা ওরেলের উইকেট তাক্ ক'রে বল মেরে ওরেলকে রান-আউট করলেন। দলের এই ৩২১ রানের মাথায় আরও দুটো উইকেট পড়ে যায়; ৩২১ রানের মাথায় মোট ৩টে উইকেট পড়ে—৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট। জামাইকা দলের প্রথম ইনিংস ৩৬১ রানে শেষ হয়। প্যারিশ ১৫ রান করে নট আউট থেকে যান। ৩য় দিনের খেলার এক সময়ে দেখা যায় বোরদে ৪টে উইকেট নিয়েছেন ৮.৪ ওভার বল ক'রে মাত্র ১৬ রান দিয়ে। প্রসন্ন এই দিন ৩টে উইকেট পান—মোট উইকেট পান ৪টে।

ভারতীয় দল ৭৩ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না পড়ে এইদিন দলের ২ রান ওঠে।

চতুর্থ দিনের লাঞ্চের সময় দেখা গেল ভারতবর্ষের রান ৯৮, ৩ উইকেট পড়ে। দলের ৮১ রানের মাথায় কণ্ট্রাক্টর (৩য় উইকেট) আউট হন। এই সময় ভারতবর্ষ মাত্র ১৭১ রানে অগ্রগামী ছিল এবং ব্যাট করার মত সক্ষম ছিলেন মাত্র ৪ জন। বোরদে এবং নাদকার্নী দলের এই ভাঙ্গন কিছু সময়ের জন্যে প্রতিরোধ করেন। দলের ১০১ রানের মাথায় নাদকার্নী মাত্র ৭ রান ক'রে আউট হন। বোরদের সঙ্গে খেলতে নামেন ন্যাটা খেলোয়াড় সুর্তি। এই ৫ম উইকেটের জুটিই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। ৫ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং সুর্তি ৬০ মিনিটের খেলায় দলের ৭৪ রান তুলে দেন। দলের ১৭৫ রানের মাথায় বোরদে ৪০ রান করে আউট হন। ৬ষ্ঠ উইকেটে সুর্তির সংগে কুন্দরাম খেলতে নামেন। দলের ১৯৩ রানের মাথায় কণ্ট্রাক্টর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সুর্তি ৫৪ রান এবং কুন্দরাম ৭ রান করে নট আউট থাকেন। জামাইকা দলের ফিল্ডিং শেষ দিন মোটেই ভাল হয়নি। এই ফিল্ডিং-এর দোষে ভারতবর্ষ রান করার যথেষ্ট সুবিধা পায়।

দলের ১৯৩ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর মাত্র ২ ঘণ্টার মত খেলার সময় ছিল। এই ২ ঘণ্টার সময়ে জামাইকা দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৬৭ রান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। জামাইকা এই সময়ে ৪ উইকেট খুইয়ে ১২৯ রান করে। সুর্তি ৩৩ রানে ২টো উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরী-জুটি গ্রিফিথ এবং ম্যাকমরিসকে সুর্তি আউট করেন। ম্যাকমরিস প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৫৪) করেছিলেন কিন্তু ২য় ইনিংসে শূন্য ক'রে আউট হন। দলের ২৬ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় জোসেফের সংগে দলের অধিনায়ক ওরেল খেলতে নামেন এবং এই ৪র্থ উইকেটের জুটি দলের ১০৩ রান তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করে। জোসেফ ৪৬ রান ক'রে আউট হন। ওরেল ৫৬ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

কিংস্টোনের টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯২৯-৩০ সালের টেস্ট সিরিজের ৪র্থ টেস্ট খেলা কিংস্টোনে আরম্ভ হয় ১৯৩০ সালের ৩রা এপ্রিল। এই ৪র্থ টেস্ট খেলাই কিংস্টোনের মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। এই ৪র্থ বা শেষ খেলাটি নানা দিক থেকে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলা ড্র যায়। ২য় টেস্টে ইংল্যান্ড এবং ৩য় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়লাভ করায় খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। কিংস্টোনের ৪র্থ বা শেষ টেস্ট খেলা তখন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। স্থির হয়, জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিংস্টোনের ৪র্থ টেস্ট খেলা চালু থাকবে; অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই খেলা শেষ হবে না। কিন্তু এই খেলায় শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ইংল্যান্ড দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিশেষ তাগিদ থাকায় ৯ দিন খেলার পর খেলাটি অমীমাংসিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। একটানা ৯ দিন খেলা হয়নি; ৩রা এপ্রিল থেকে ৫ই পর্যন্ত খেলা, ৬ই এপ্রিল বিশ্রাম, আবার ৭ই থেকে ১২ই

এপ্রিল—একটানা ৬ দিন খেলা। দীর্ঘতম টেস্ট ক্রিকেট খেলা হিসাবে এই খেলাটি রেকর্ড * সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৮৪৯ রান তুলে। ফলে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়।

ইংল্যান্ডের এই বিরাট ৮৪৯ রানের প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৮৬ রান করে। ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসে ২৭২ (৯ উইকেটে) রানের মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। খেলার ৯ম দিনে দেখা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলায় ৪০৮ রান করেছে ৫টা উইকেট খুইয়ে। ইংল্যান্ডের এ স্যান্ডহ্যাম প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রান ক'রে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলি ২ ইনিংসে ২২৩ রান ক'রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। এ সব রেকর্ড অবশ্য পরবর্তীকালে ভেঙ্গে গেছে।

কিংস্টোনের মাটিতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা, ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট খেলা। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ৮২ রানে জয়লাভ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৩৫৭ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন দলের প্রথম ইনিংসের ৭৫৮ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেন—হার্ভে ২০৪, আর্চার ১২৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বেনো ১২১ এবং মিলার ১০৯। টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসের খেলায় এক দলের পক্ষে পাঁচটি সেঞ্চুরী এই প্রথম এবং অস্ট্রেলিয়ার এই বিশ্ব রেকর্ড আজও কোন দল ভাঙ্গতে পারেনি বা অস্ট্রেলিয়ার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের এই ৭৫৮ রান (৮ উইকেটে) আবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলায় রেকর্ড হয়—এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হিসাবে। এই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকট উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৫৫ ও ১১০ রান) ক'রে একটা টেস্ট সিরিজে দু'বার টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার যে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো ৭৮ মিনিটে শতরান পূর্ণ ক'রে আধুনিক সময়ের টেস্ট খেলার ইতিহাসে অল্প সময়ের মধ্যে সেঞ্চুরী করার রেকর্ড করেন। উইকেট-কিপিংয়ে বিশ্ব রেকর্ডের সমমর্যাদা লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার জি আর ল্যাংলী। ল্যাংলী প্রথম ইনিংসে ৫ জন (সকলেই 'কট') এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ জনকে (সকলেই 'কট') আউট ক'রে একটি টেস্ট খেলায় মোট ৮ জনকে (সকলেই 'কট') আউট করার গৌরব লাভ করেন।

দুই দলের তিনটি ইনিংসে মোট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টা (অস্ট্রেলিয়া ৫ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২)—একটা খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব রেকর্ড।

প্রথমবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে (১৯৫২-৫৩) ভারতবর্ষ কিংস্টোনের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা ড্র করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬ রানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি সেঞ্চুরী—ওরেল ২৩৭, ওয়ালকট ১১৮ এবং উইকস ১০৯ রান। স্বদেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই প্রথম এক ইনিংসের খেলায় ৩টি সেঞ্চুরী করার রেকর্ড করে। তাছাড়া তাদের এই ৫৭৬ রান ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এই রেকর্ড অবশ্য পরবর্তীকালের টেস্ট খেলায় মুছে গেছে।

কিংস্টোনের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা—ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট (১৯৫৭-৫৮)। এই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস ও ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে শুধু পরাজিত করেনি কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করে—তার মধ্যে একটি বিশ্ব রেকর্ড। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৩২৮ রানের প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে ৭৯০ রান ক'রে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৭৯০ রান (৩ উইকেটে) এক ইনিংসের দলগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে আজও রেকর্ড। এই খেলাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ন্যাটা খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স নট আউট ৩৬৫ রান ক'রে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেন। ১৯৩৮ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের লেন হাটন প্রতিষ্ঠিত ৩৬৪ রানের বিশ্ব রেকর্ড ম্লান হয়ে গিয়ে সোবার্সের রেকর্ড আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭৯০ রানের মধ্যে হাণ্টের ২৬০ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাণ্ট এবং সোবার্স ২য় উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রান করেন; মাত্র ৬ রানের জন্যে তাঁরা ২য় উইকেট-জুটির ৪৫১ রানের বিশ্ব রেকর্ড (পন্সফোর্ড এবং ব্র্যাডম্যান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ওভাল, ১৯৩৪) অতিক্রম করতে পারেননি। হাণ্ট ২৬০ রান ক'রে রান-আউট হন এবং সোবার্স ৩৬৫ রান করে নট আউট থাকেন।

কিংস্টোনে অনুষ্ঠিত বিগত ১০টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৪ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১) হার ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২) এবং ড্র ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১)।

কিংস্টোনের টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯২৯-৩০ : ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র।

১৯৩৪-৩৫ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪র্থ টেস্ট খেলায় এক ইনিংস এবং ১৬১ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

১৯৪৭-৪৮ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪র্থ টেস্ট খেলায় ১০ উইকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

১৯৫২-৫৩ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের ৫ম টেস্ট খেলা ড্র।

১৯৫৩-৫৪ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টেস্ট খেলায় ১৪০ রানে এবং ইংল্যান্ড ৫ম টেস্ট খেলায় ৯ উইকেটে জয়লাভ করে।

১৯৫৪-৫৫ : অস্ট্রেলিয়া ১ম টেস্ট খেলায় ৯ উইকেটে এবং ৫ম টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ৮২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে।

১৯৫৭-৫৮ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় টেস্ট খেলায় এক ইনিংস এবং ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

১৯৫৯-৬০ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ডের ৩য় টেস্ট খেলা ড্র।

॥ অর্জুন পুরস্কার ॥

ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে ভারত সরকার প্রদত্ত ১৯৬১ সালের 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে এবং ১৯৬১ সালে মালয়ের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৬১ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করে।

---

* বর্তমানে দীর্ঘতম টেস্ট খেলার রেকর্ড—১০ দিন (ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ডারবান, ১৯৩৮-৩৯)

† বর্তমানে দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড—৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ওভাল ১৯৩৮।

।। ভ্রম-সংশোধন ।।

গত ৪৩শ সংখ্যা 'অমৃতের' ৩২৫ পৃষ্ঠায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা লিমিটেড' স্থলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড' পড়তে হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র

সূচী পত্র

অমৃত

Cooch Behar

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২রা চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th March, 1962
40 Naya Paise.

তৃতীয় নির্বাচনের উত্তেজনা শান্ত হ'য়ে এসেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে। এখন গতদিনের জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে সামনে তাকানোর পালা।

সংখ্যাতত্ত্বের জটিল গোলকধাঁধায় না ঢুকেও একটা কথা আমরা সহজেই স্বীকার করে নিতে পারি যে, দেশের জনসাধারণ কংগ্রেসকেই ক্ষমতার আসনে বসার অধিকার দিয়েছেন। সম্ভবত, দেশগঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'য়ে পূর্ণতা লাভ করুক এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন ভোটদাতাদের গরিষ্ঠাংশ। মন্ত্রীমণ্ডলীকে সচেষ্ট হ'তে হবে যাতে জনসাধারণের এই ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাঁরা দেশলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেন।

আমরা জানি, এ কর্তব্য বড় সহজ নয়। স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের নানাদিকেই গঠনকর্ম শুরু হ'য়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি বহুবিধ সমস্যায় পীড়িত রাজ্যে এ ব্যাপারে চমকপ্রদ সাফল্যের আশা করা অসঙ্গত। কিন্তু মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ এতই ভারাক্রান্ত যে, বারেবারেই তারা প্রতিকারের আশায় উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

গত নির্বাচনে ভোটদাতারা যে যথেষ্ট বেশী সংখ্যায় ভোট দিতে এসেছিলেন তার একটা কারণ বোধহয় সেইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ যে-একটিমাত্র উপায়ে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই ভোটদানের পবিত্র অধিকার বর্ধিত সংখ্যায় প্রয়োগ করে দেশকে দ্রুততর গতিতে বিপন্মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার সপক্ষেই রায় দিয়েছেন তাঁরা। নতুন মন্ত্রীমণ্ডলীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট ধীরতার সঙ্গে বিচার করে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

এ রাজ্যের অধিবাসীরা যেসব মৌল সমস্যায় বিব্রত তার পুনরুক্তি আমাদের অভিপ্রেত নয়। খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই করণীয় আছে অনেক কিছুই। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই—তা হল বেকার-সমস্যা।

বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের দ্বিতীয় বৎসর শুরু হ'য়েছে। পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কাজ পাওয়ার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেলেও তাতে এ রাজ্যের অধিবাসীদের বেকার-সমস্যার সমাধান হয়নি। তার একটা প্রধান কারণ, সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যবহির্ভূত প্রার্থীদের নিয়োগ। ইতিমধ্যে অবশ্য সরকারী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'য়েছে, এবং কর্মলাভের ক্ষেত্রে এ রাজ্যের অধিবাসীদের অগ্রাধিকারও ঘোষিত হ'য়েছে। কিন্তু কার্যকালে এই নীতি কতদূর পালিত হয়, সেইটেই বিবেচ্য।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা শহর যে অধিকতর পরিমাণে অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ, এ দুর্নাম সকলেরই মনে বেদনা সঞ্চার করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো জনভারগ্রস্ত রাজ্যে যদি শিক্ষিত এবং নিরক্ষর এই উভয়বিধ বেকারের সংখ্যাই জ্যামিতিক অনুপাতে বেড়ে চলে তবে শুধু উপদেশ বা বিদ্রূপের দ্বারা সে অসন্তোষ প্রশমিত করা যাবে কিনা সন্দেহ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁদের ঘোষিত নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে এ ব্যাপারে সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

তাছাড়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে তো বটেই, গঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-মণ্ডলী যে বিরোধী দলগুলির যথেষ্ট সমর্থন লাভ করবেন এটাও খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অন্যান্য বহু ব্যাপারে মতের অমিল আছে বটে, কিন্তু এই রাজ্যের সমস্ত দলই দেশোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার কার্যকারিতার বিষয়ে একমত। ভারতের অনেকগুলি রাজ্যেই কিন্তু নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি তেমন অনুকূল নয়। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, জাতিগত গোঁড়ামি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অনেক রাজ্যেই। প্রতিক্রিয়ার এই বহুমুখী আক্রমণ দুশ্চিন্তা-জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ এই উদ্বেগজনক সমস্যা থেকে মুক্ত। প্রতিক্রিয়াশীল কোনো শক্তিই এখানে জনসমর্থন পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সুস্থ, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে পরিকল্পনামূলক গঠনকর্মের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। কাজেই দেশবাসীর এই অকৃপণ সহযোগিতায় শক্তিশালী হ'য়ে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীও যে অবিচলিত পদক্ষেপে এক সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত হবে না।

কবিতা
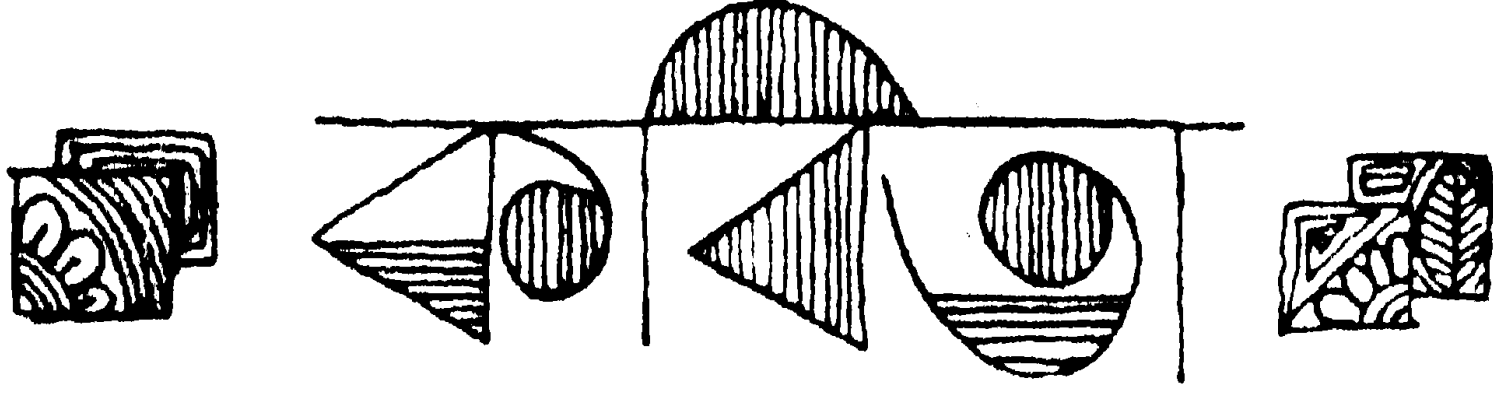
নারী, তুমি উন্মোচিত হও

রাম বসু

যেহেতু হে প্রেম তুমি আর আমি
(নারী, তুমি আলোকিত হও)
যেহেতু হে প্রেম আমি আর তুমি
পরিণত বাসনায় এক বিন্দু হিরণ্ময় অশ্রু;
আত্মার বিপন্ন গর্বে শেষ অঙ্কে আমরা যেহেতু
ভগ্ন সিংহাসনে স্থির, বেলে-পাহাড়ের প্রাক-সন্ধ্যা;
দুরাশার দুগ্ধ-নদীর কিনারে খুঁজছি এখনো
একটি সম্পূর্ণ আমাদের
ঝিনুকের মধ্যে যা এখনো
সমুদ্রের অবিরল উপাসক মন্ত্র পাঠে মুগ্ধ ঃ
প্রেম, পল্লবিত হে বৃক্ষ আমার
দুটি বাহু দিয়ে কাল মাপা ছাড়া গতি নেই আর
এবং সর্বাঙ্গে ধরা ঢেউ নুন রৌদ্রের দহন
যেন অন্ধ হয়ে গেলে
দৃষ্টি হয় গোলাপের চেয়েও নিবিড়
সমস্ত চন্দন বন পুড়ে গেলে আকাঙ্ক্ষার জ্বরে
যেন আর্দ্র নীরবতা হয়ে যায় সুগন্ধি-সরনী

কেউ ত জানে না সত্য কি করে জন্মায়
উপমার বাঁকে দৃশ্য অদৃশ্যের মুখ দ্যাখে কেন
কেন বা তোমার স্পর্শে আমি হই গোধূলির নদী।

নারী, তুমি উন্মোচিত হও॥

লুণ্ঠিত বকুল......

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

লালিত সর্পের শিশু অন্তর্দাহে দুঃখে প্রতিদিন
বিষাক্ত ছুরিকা ঐ প্রেমহীন ঘাতকের ভূমিকা-স্বরূপে—
সমস্ত আকাশ ঢেকে কালো মেঘ কালো-পাখা শ্যেন,
সিন্ধুচিল

সময় হৃদয়ে ঘন নীরবতা মৌন অন্ধকূপে........

জলশূন্য ঘট, পাত্র......পূর্ণকলসের সেই প্রতীকী রমণী
মরে গেছে লাস-কাটা-ঘরে, নামহীন মরুভূমি
অগণ্য ব্যর্থতাসহ কুরূপ উটের মত হেঁটে চলে যায়......
ব্যক্তি ডুবে গেল, তাকে চোরাবালি ঘিরে ধরলো প্রায়;

পাগল হাওয়ায় বাজে ঝোড়ো গান...রাস্তার মাতাল কুকুরটা
বৃষ্টি দেখে থমকে যায়, আর সেই দোকানীর ফুল
যখন সৌগন্ধ্য তার বয়ে আনে সে-মুহূর্তে লুণ্ঠিত বকুল
ধুলোর সাম্রাজ্যে যেন আলো হতে চায় হতে দীপ্ত
রাজেন্দ্রানী—

দুঃখের গভীর ইচ্ছা অতৃপ্তির ছায়া কোন মুকুরের মুখে
নিজের উজ্জ্বল ছবি চিনে নিতে পারে তবু ব্যক্তির
নিবিড়তর সুখে॥

*
* *
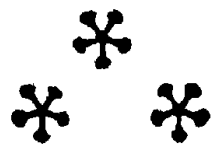
বসন্ত তোমায় ডাকি

কুমকুম দে

আমার সমস্ত মন ভরে গেছে রিক্ত বেদনায়
ঝড়ের থাবার নিচে নুয়ে পড়া গাছটার মত—
বিধ্বস্ত, বিশীর্ণ, জীর্ণ বিদলিত লতায় পাতায়
বসন্ত, তোমায় আমি ডাকি অবিরত!

গোপন কান্নার মত স্তব্ধ সেই প্রতীক্ষা আমার
প্রতিহত হয়ে গেছে অনিরুদ্ধ ঋতুর এ ঝড়ে
তোমার আসার চিহ্ন মুছে গেছে। তবু বারেবার
বসন্ত, তোমায় ডাকি। শীতার্ত এ প্রচণ্ড প্রহরে॥

দূর দর্শন

জৈমিনি
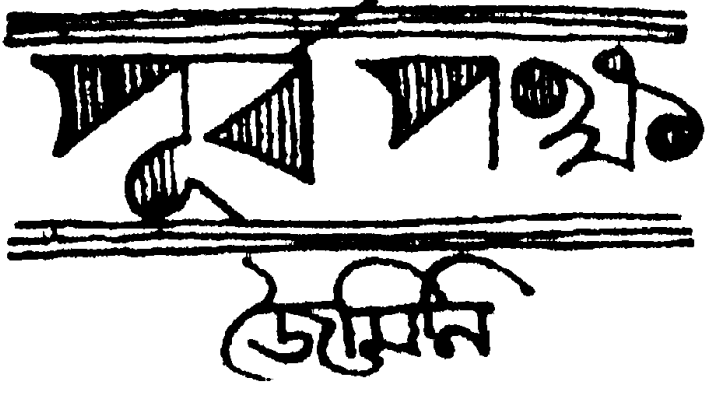
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ......

এই রবীন্দ্র-সংগীতটি কতোবার গাইতে শুনেছি আমরা। কিন্তু এর নিহিতার্থ যে খুব একটা হৃদয়ংগম করেছি এমন মনে হয় না।

গানটি বৃক্ষবন্দনায় রচিত। অথচ. সারা পশ্চিমবংগে তো বটেই, বিশেষ করে এই কলকাতা শহরের গাছগুলোর কথা ভাবুন, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে চোখবাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হবে আপনার।

ইডেন গার্ডেন ছত্রভংগ হ'য়ে গেছে, কার্জন পার্ক হ'য়েছে দ্বিখণ্ডিত, কিন্তু তাতে দুঃখিত হলেও শোক-প্রকাশ করিনি। ইদানীং কয়েক বছর ধরে পথ-পার্শ্বের বড় বড় গাছগুলো যেভাবে দাঁতালো করাত্তের টানে ধরাশায়ী হ'চ্ছে তাতে বিচলিত না হওয়া অসম্ভব।

আমি জানি, গাছও বুড়ো হয়, তাদের অসুখ করে এবং মারা যায়। কিন্তু একটি রাস্তায় পর-পর কয়েকটি গাছ যখন ভবলীলা সংবরণ করে তখন আশংকা হয়, কোথায় যেন একটা অশুভ প্রভাব সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। হয়তো সেটা এপিডেমিক, কিংবা আর কিছু, আমি জানিনে। কিন্তু দুষ্টলোকে বলে, গাছের এই দলবদ্ধ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাদের হত্যা করা হয়। বলা বাহুল্য প্রথমে আমি এ সব কথায় কান দিইনি। কারণ আমি বুঝতে পারিনি, সংসারে এত রকম কাজ থাকতে হঠাৎ এই গাছ-মারার 'হবি' পেয়ে বসবে কেন মানুষকে? কিন্তু পরে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, মরা হাতী লাখ টাকার মতো মরা গাছেরও দাম অনেক। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা তা জানেন এবং জানেন বলেই গাছগুলো মরে গেলে তাঁরা যথেষ্ট অর্থব্যয় করে সেগুলো কেটে নিয়ে গুদামে তোলেন।

এবং তাঁরা গুদাম-জাত করবেন বলেই অনেক ক্ষেত্রে গাছগুলোর মৃত্যু ঘটে। শিকড়ে ঠিক কী দেওয়া হয় এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলেন তুঁতে, কেউ সংশোধন ক'রে বলেন কারবাইড। যাই হোক কিছু একটা দেওয়া হয়, এবং দেখতে দেখতে কয়েকটি বিশাল সবুজ-পত্র গাছ ক্ষয়রোগীর মতো শুকিয়ে যেতে থাকে। তারপর তাদের পাতা খসে, ছাল ফাটে, ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে তারা পথ-চারীর বিস্ময় এবং আতঙ্ক উৎপাদন করতে থাকে। এবং পরিশেষে আসে সেই

শববাহকের দল, করাতে-কুড়ুলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় একটা গোটা শতাব্দীর স্মৃতি।

আমি বৃক্ষবিশারদ নই। নগর-পরিকল্পনার বিষয়েও আমার ধারণা খুবই ভাসা-ভাসা। কেউ যদি বলেন, বুড়ো গাছকে মেরে ফেলা হয় এই জন্যে যে না-মারলে তারা যে-কোনো দিন উপড়ে পড়ে মানুষ মারবে, আমি তার জবাব দিতে পারব না।

তবে একটি কথা আমি বলব, এবং তা সাধারণ একজন পথচারীর ধারণা থেকে। যতো গাছ মরে যাচ্ছে, ততো গাছ কি লাগানো হচ্ছে? না, হচ্ছে না। সাধারণ দৃষ্টিতে কলকাতা যে ক্রমে বৃক্ষ-বিরল হ'য়ে উঠছে এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমার আপত্তি সেইখানে।

উপরের ঐ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছত্রগুলি পরীক্ষা করুন, দেখবেন এক মহান বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে এর আড়ালে। গাছ 'মরু-বিজয়' করে, গাছপালা না থাকলে মাটি ক্রমে মরুভূমি হয়ে যায়। গাছের ঝরাপাতা, মরা শিকড় মাটিতে বালির ভাগ কমিয়ে তাকে শস্যপ্রসবিনী করে, তার অজস্র জীবন্ত-শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থেকে বৃষ্টিজলের হাত থেকে ভূমিক্ষয় নিবারণ করে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টির দিনে রসের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নিজের শিকড়ের চারিপাশে বৃষ্টি-জলের সঞ্চয় ধরে রেখে মাটিকে সরস করে। তাছাড়া গাছপালার জন্যে হাওয়া স্নিগ্ধ থাকে, এবং বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, গাছের সবুজ আকর্ষণে মেঘগুলোও বৃষ্টিপাত ঘটায় বেশী পরিমাণে।

কাজেই এ হেন 'মরুবিজয়ী' গাছ যে প্রকৃতই মানব-বন্ধু তা আশাকরি তর্ক করে বোঝাতে হবে না।

দিল্লি অঞ্চলে নির্বিচারে বৃক্ষহত্যা করার ফলে কী ভাবে রাজস্থানী মরুভূমি আমাদের রাজধানী শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল, সে তথ্য আশাকরি সকলেই জানেন। তারপর পরম যত্নে শুরু হ'য়েছে গাছ লাগানোর পালা।

আমাদের এখানেও আবহাওয়া গত কয়েক বছর ধরে কী রকম উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো শুষ্ক এবং উষ্ণ হ'য়ে উঠছে তা আশাকরি কাউকে বলে দিতে হবে না। জানি, এখানে 'বন-মহোৎসব' নামে একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান কিছু-কাল ধরে প্রচলিত হ'য়েছে। কিন্তু তার ফলে বৃক্ষসম্পদ কী পরিমাণে বেড়েছে সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তাছাড়া, এই আনুষ্ঠানিক কর্তব্য বাদ দিলেও, সারা বছরই এক্ষেত্রে করণীয় থেকে যায় অনেক কিছু।

বৃক্ষরোপণ একদা পুণ্য-কর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে। আগেকার রাজা-বাদশারাও রাস্তার ধারে গাছ লাগাতেন পথিকের সুবিধার জন্যে। শান্তিনিকেতনের দিগন্ত-জোড়া মাঠের মধ্যে আগে যেখানে একটি ছাতিম গাছ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তাল-কুঞ্জ ছাড়া আর কিছুই প্রায় ছিল না, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বছরের পর বছর ধরে অপার মমতায় একটি ছায়াময় উপবন গড়ে তুলেছেন সে দৃষ্টান্তও চোখের সামনেই রয়েছে। কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও কলকাতা ঊষর হ'য়ে উঠছে। যেখানে একটি গাছ মারা যায় বা কাটা হয় সেখানে নতুন গাছ পোঁতা হয় না কেন সে এক বিস্ময়!

এ দায়িত্ব কার আমি জানিনে। সম্ভবত কর্পোরেশানই এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী। তা যদি হয় তবে আমি মুখ বন্ধ করলাম। কারণ পানীয় জল, অচল ড্রেন, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি প্রাণঘাতী সমস্যা নিয়ে ঐ অতিকায় প্রতিষ্ঠানটি এমনোই আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে তাকে গাছের কথা বলা আর 'গাছে তুলে মই টান দেওয়া' প্রায় একই রকম রসিকতা হবে।

কাজেই নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই বোধহয় আমাদের করার নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং এক-একটি মরা গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার পর সেই অপরিচিত শূন্যতার আকাশের দিকে চেয়ে প্রিয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করা! এই আমাদের নিয়তি!
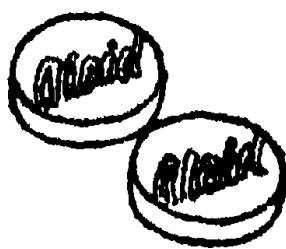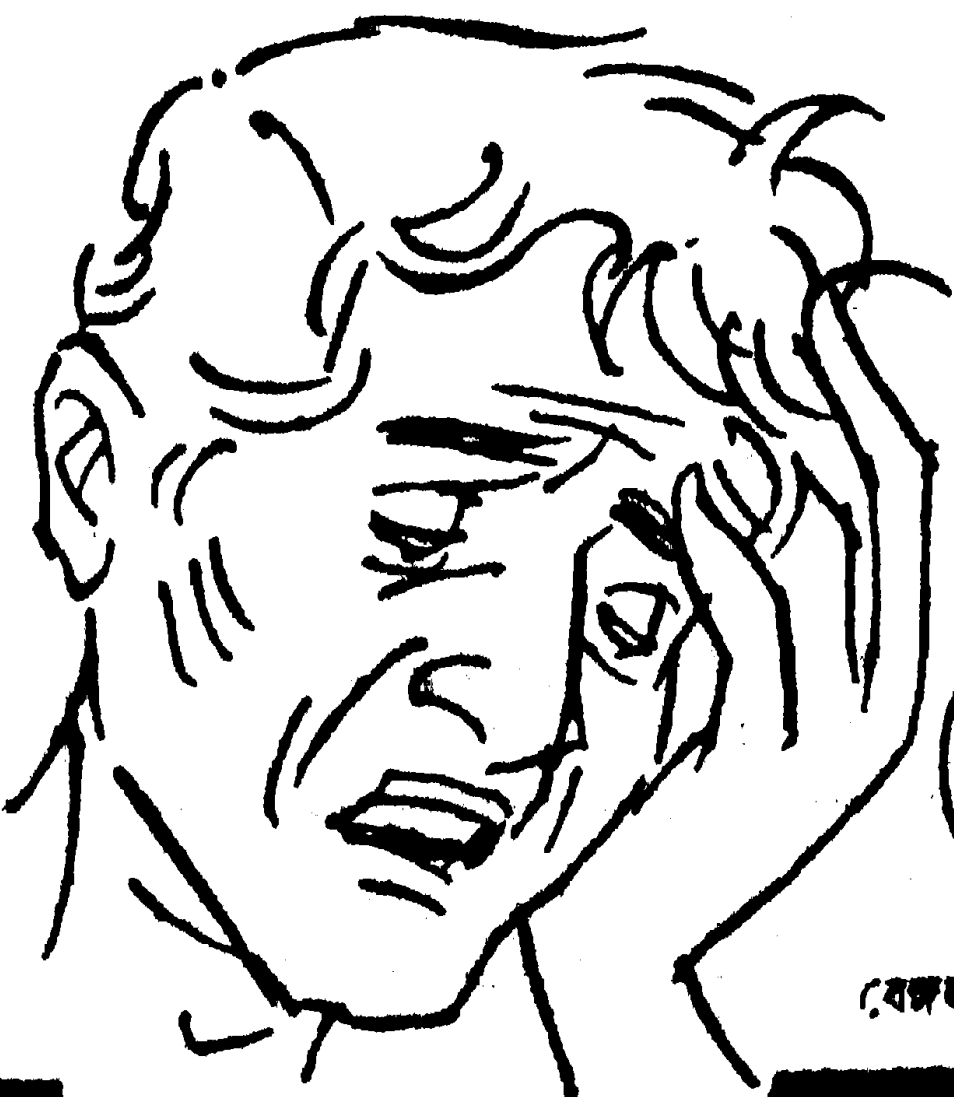
জার্মান কবি গ্যেটে

প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্য-শিরোমণি গোটে। শেক্সপীয়র সমগ্র ইংরেজ জাতির গৌরব; তেমনই জার্মান দেশের গৌরব গোটে। শেক্সপীয়রের সমগ্র গরিমা তাঁর সাহিত্য-কৃতির ভিত্তিতে, মানুষ হিসাবে সে তুলনায় তিনি নিষ্প্রভ। কিন্তু গোটের ব্যক্তিত্ব-গরিমা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার চেয়েও বড়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা যদি বিভিন্ন বিদ্যানুশীলনে দিকে দিকে প্রবাহিত না হত, তিনি যদি শুধু কাব্যরচনায় একনিষ্ঠভাবে তাঁর সমগ্র সাধনা নিয়োজিত করতেন তবে কবি হিসাবে ইওরোপের বিদ্বজ্জন-সমাজে হোমার এবং শেক্সপীয়রের পরেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হতে পারত। কিন্তু তাঁর কবিকৃতিত্বে তাঁর স্থান-নির্দেশ হয় দান্তে এবং মিল্‌টনের পরে; যদিও অনেকের মতে কাব্য-প্রতিভায় তিনি উচ্চতর স্থানের অধিকারী। গোটের "ফাউস্ট" এক অপূর্ব সৃষ্টি; তথাপি দান্তের ডিভাইনা কমিডিয়া (Divina Comedia) বা মিল্‌টনের প্যারাডাইজ লস্ট (Paradise Lost) কাব্যের সহিত তার তুলনা হয় না। তথাপি গোটেকে বলা হয় জার্মানীর শেক্সপীয়র; গোটে শুধু জার্মানীর গৌরব নন, ইওরোপের অমর কবি-সমাজেও তাঁর আসন অবিসংবাদিত।

গোটে জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪৯ সনের ২৮শে আগস্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যেমন লণ্ডন, সেই আমলে ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল তেমনই জার্মানীর গৌরবস্থল। নগরটি ছিল প্রাণচঞ্চলতায় মুখর। যেমন পাশ্চাত্য দেশের তেমনই প্রাচ্য দেশেরও বণিকেরা তাঁদের বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের ব্যবসায়ক্ষেত্রে এসে দেখা দিতেন। গোটের পিতা ছিলেন একজন সম্পন্ন নাগরিক, শিল্পে-সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। ধী-শক্তির গভীরতা এবং শালীনতাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। গোটের মা ছিলেন সদানন্দ প্রকৃতির মহিলা। গল্প বলতে তিনি ভালবাসতেন। জগতের প্রতি এবং মানব সমাজের প্রতি তাঁর ছিল উদার দৃষ্টি। গোটের জীবনে এ সকলের প্রভাব খড় সামান্য ছিল না।

গোটের বাল্যশিক্ষার ভিত্তি ছিল বেশ সুসংগঠিত; শুধু গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা নয়। তিনি ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয়ান ভাষায়ও শিক্ষালাভ করে-ছিলেন। এই সকল ভাষার মাধ্যমে ইওরোপের সাহিত্য ও চিন্তাজগতের দ্বার তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

নারীর যৌবন-লাবণ্য ও সৌন্দর্য-আকর্ষণের মোহ ব্যাপারে গোটের চিত্তে একটি নিদারুণ দুর্বলতা ছিল। জীবনে বহুবার নারীর মোহ-আকর্ষণের ফলে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। তাঁর এই সকল মোহমুগ্ধতার কাহিনী প্রকাশ করতেও তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। তাঁর বয়স যখন পনেরো বৎসরও পূর্ণ হয়নি এমন সময়ে একটি বালিকার সহিত তাঁর প্রণয়-সম্পর্ক ঘটে; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রণয়ের ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করবার উপায় ছিল না। প্রণয়ে ব্যর্থতার ফলে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই বালিকাটির নাম ছিল গ্রেচেন (Gretchen); গ্রেচেনের স্মৃতি কবির চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যেও স্থানলাভ করেছিল।

গোটে সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর পিতা তাঁকে আইন অধ্যয়ন করবার জন্য লাইপজীগ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও আইনের চেয়েও কাব্যের প্রতি তিনি সমধিক মনোনিবেশ করেন। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর চিত্তের সকল অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা সকলই সঙ্গীতে রূপান্তরিত করতে অনুশীলন আরম্ভ করেন; তাঁর কবি-জীবনের অঙ্কুরোদ্গম এইভাবেই আরম্ভ হয় বলা চলে।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে লিখিত তাঁর প্রথম কবিতা যীশুখৃষ্টের নরকে অবতরণ Thoughts on Jesus Christs Descent into Hell) একটি ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ কবিতা বটে, কিন্তু এর মধ্যেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। দু' বৎসর পরে তাঁর প্রথম নাটক রচিত হয় "প্রেমিকের খেয়াল" (The Lover's Whim)। এই নাটকের ভিত্তি তাঁর নিজ জীবনেরই কোনও একটা প্রণয়-কাহিনী। এর পরে রচিত হয় তিন অঙ্কের একটি নাটক "The Accomplice". এই নাটকখানা মলিয়েরের (Moliere) এবং কর্ণাইলের
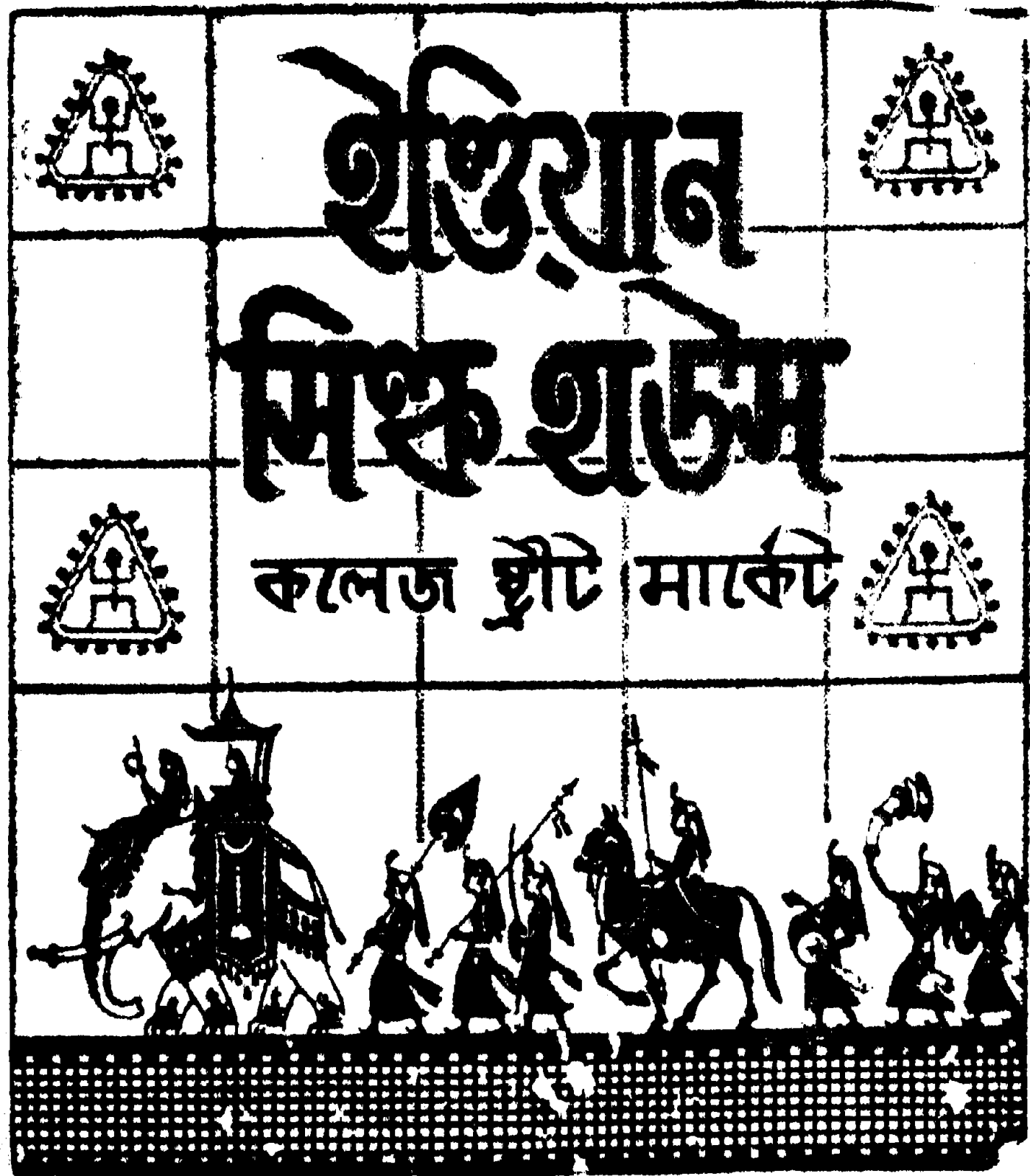
(Corneille) নাট্যসাহিত্য-পাঠের পরিণতিতে সৃষ্ট। এর পরে গোটে শেক্সপীয়র, লেসিং, হার্ডারের নাট্য-সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি চিত্র-শিল্পেরও অনুশীলন করেন।

১৭৬৮ সালে ঘটে গোটের জীবনের আর একটি প্রণয় ঘটনা। এই সময়ে জীবনযাপনের অমিতাচারে তিনি আবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের বাড়ীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাড়ীর আবহাওয়ায় এবং অনেকটা তাঁর ভগ্নী কর্ণেলিয়ার প্রভাবে তিনি অবিলম্বে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের সামাজিক জীবনে তাঁর মর্যাদা লাভ হতে লাগল। দেহসৌন্দর্যে তিনি ছিলেন অ্যাপোলো (Apollo), প্রাণশক্তিতে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ, তাঁর বাকবিভূতিও ছিল অসাধারণ। সুতরাং নারীর চিত্তে মোহ উৎপাদনের পক্ষে কিছুরই অভাব তাঁর ছিল না। অপর পক্ষে তাঁর চিত্ত ছিল ভাবাবেগের মোহে বিমুগ্ধ, সেখানে ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তাও স্থান পেত না। একজন সমালোচক নারীর প্রতি মোহমুগ্ধতার সম্পর্কে গোটেকে তুলনা করেছেন টিশিয়ান (Tition) অঙ্কিত আরিয়েডনি'র (Ariadne) পশ্চাদ্ধাবিত ব্যাকাসের (Bacchus) সঙ্গে।

১৭৬৯ সালে গোটে স্ট্রাসবুর্গে যান আইন অধ্যয়ন করবার জন্য; এখানেও আইনের চেয়ে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল সমধিক। এই সময়েও তাঁর জীবনে ভোগস্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল; তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশিত হয়েছে এই সময়কার একটি কবিতায়—"যারা জীবনে এসে ভালবাসল না, তাদের পৃথিবীতে না আসাই উচিত ছিল"। স্ট্রাসবুর্গেরই প্রত্যন্ত প্রদেশে সেসেনহাইম (Sesenheim) গ্রামে সরল ধর্মযাজকের কন্যা ফ্রেডেরিকা (Frederika) সৌন্দর্য-লাবণ্যময়ী যুবতী; গোটে মুগ্ধ হলেন। অপর পক্ষে গোটেও ছিলেন সুপুরুষ। ফ্রেডেরিকার পক্ষে তাঁর আকর্ষণও দুর্বার হয়ে উঠল। গোটের প্রণয়ের আবেগে ফ্রেডেরিকা পুলকিত এবং মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিতও বোধ করলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের এত ভাবাবেগ এবং আন্তরিকতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রণয় পরিণতি লাভ করল না, সার্থক হতে পারল না। যেমন আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তেমনই এই ক্ষেত্রেও কবি তাঁর প্রণয়ে নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন না। হয়তো আরও কারণ ছিল। গোটে ছিলেন পিতার উপর নির্ভরশীল। পিতা এই বিবাহে সম্মতি দিতেন না নিঃসন্দেহ; অপর পক্ষে এই গ্রাম্য বালিকা স্ট্রাসবুর্গের অভিজাত সমাজে স্বকীয় মর্যাদা হয়তো পেতেন না। গোটে কারও নিকট নিজের অপরাধ-স্খলনের জন্য নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য কোনও প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেননি; কিন্তু নিজের ব্যবহারের সংকোচে ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন; যুবতী কোনও অভিযোগ বাক্য উচ্চারণ করলেন না। যখন তাঁর সূর্য অস্তমিত হল, তখন কবি তাঁর জন্য যে ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছেন, ফ্রেডেরিকা তাঁর দয়িতের স্মৃতির চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সেই জগতে বার হয়ে পড়লেন এবং এই অভিযানে তিনি ছিলেন একক। পরবর্তীকালে যাঁরা ফ্রেডেরিকার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসতেন, তাঁদের তিনি বলতেন, যে-হৃদয় গোটের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে তার আর কারও প্রাপ্য হতে পারে না।

ফ্রেডেরিকার প্রণয় কবির চিত্তেও গভীর রেখাপাত করেছিল নিঃসন্দেহ। তিনি আত্মজীবনীতে এই বালিকার প্রতি তাঁর হৃদয়ের প্রণয়মুগ্ধতার কাহিনী অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাষায় লিখে রেখে গেছেন; এবং এই ভাবাবেগের ফলে রচিত হয়েছে জগতের সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। একজন সমালোচক বলেছেন যে এই কবিতাগুলি এমনই সূক্ষ্ম সুকুমার রচনা যে অনুবাদে তার মর্যাদা রক্ষা হতে পারে না; অনুবাদে এগুলির প্রকাশ হবে যেন অপটু হাতে ধরার চেষ্টায় বালকের মুঠিতে লাঞ্ছিত ছিন্নপক্ষ প্রজাপতি।

গীতিকাব্য-রচয়িতা হিসাবেও গোটের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অনেকের মতে গোটে সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য-রচয়িতা। তাঁর এই সকল কবিতা কল্পনার নবীনত্বে এবং শিল্পচাতুর্যে অনেকটা ইংরেজ কবি শেলী এবং টেনিসনের সমানধর্মী; সত্যের দীপ্তিতে এবং ভাবের স্বতঃস্ফূর্ততায় মনে হয় যেন সদ্য কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, যেমন হয় ফুল থেকে সৌরভের উদ্গম। এই সকল গীতিকবিতার মাধ্যমে জার্মান ভাষাও যেন অসামান্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে; ধর্মব্যাখ্যাতা মার্টিন লুথার জার্মান ভাষাকে বিশেষভাবে ভাবপ্রকাশক্ষম করে তুলেছিলেন। গোটে সেই ভাষাকে আরও পূর্ণতর পরিণতি দান করলেন। তাঁর প্রতিভাপ্রসাদে এই ভাষার অভূতপূর্ব রূপায়ণ ঘটল। জার্মান ভাষার কলাকৌশল-চাতুর্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর জেলে (Fisherman) কবিতাটি। অনুবাদে অবশ্য ভাষার কারুকার্যের কোনও পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু কবিতার মর্মকথাটিই ব্যক্ত করা যেতে পারে। যেমন—

> কলকল সংগীতে তরতর বেগে বয়ে চলেছে স্ফীত জলরাশি; জেলে বসে আছে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আন্দোলিত ফাতনার দিকে। জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠল এবং তার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে এল নারী। সংগীতের ধ্বনিতে সে শুধাল—"মানুষের বুদ্ধিচতুরতায় প্রলুব্ধ করে আমার মৎস্যকুলকে কেন তুমি নিয়ে আসছ বাইরের এই মৃত্যুরাজ্যে? স্বচ্ছ জলতলে তারা কি সুখে আছে—যদি তুমি দেখতে পেতে তা হলে তুমিও চিরকালের জন্য ঐ স্বচ্ছ জলতলেই গিয়ে থাকতে কামনা করতে। আকাশের সূর্য-চন্দ্রও কি সাগরজলে ডুব দিয়ে আবার দ্বিগুণ মোহমূর্তিতে দেখা দেয় না? তোমার নিজের মূর্তিও কি স্বচ্ছ জলতলে প্রতি-বিম্বিত হয় না?" জলরাশি স্ফীত হয়ে জেলের চরণ স্পর্শ করল, তার চিত্তে পুলক-শিহরণ বয়ে গেল, যেমন হয় প্রণয়ীযুগলের ওষ্ঠাধারের সম্মিলনে। তার সংগীতের মোহ ছিল দুর্বার। সে-ই জেলেকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেল অতলে, আর তাকে দেখা গেল না।

১৭৭৩ সালে প্রকাশিত হয় গোটের প্রথম বিশিষ্ট নাটক Goetz Von Berlichingen with the Iron Hand. ষোড়শ শতাব্দীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর গোয়েট্‌সেকে (Goetz) নিয়ে এই নাট্যরচনা। শেক্সপীয়রের আদর্শে এই নাট্যরচনায় তৎকালে প্রচলিত নাট্যকাব্যের নীতিশৃঙ্খল লঙ্ঘিত হয়। এই নাটকে শেক্সপীয়রের নাটকেরই মত পাত্রপাত্রীগণ চরিত্র-চিত্রণে সজীব মানুষরূপে দেখা দিয়েছে। ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয় The Sorrows of Werther —

একটি ভাবোচ্ছ্বাসময় কাহিনী। একটি আবেগপ্রধান যুবক বন্ধুপত্নীর প্রতি প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়ে প্রণয়ের সার্থকতা অসম্ভব বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করে। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন অস্বীকার করেও মানুষের মনোবৃত্তির স্বাধীনতার চিত্র হিসাবে এই কাহিনী সেই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

গ্যেটের প্রতিভার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে হ্বাইমারের তরুণ ডিউক Duke Carl August of Sax Weimar) তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরবর্তীকালে গ্যেটের প্রতিভা-দৌলতে এই হ্বাইমার জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। এই সপ্তবিংশ বর্ষীয় যুবকের ব্যক্তিত্ব-প্রতিভায় হ্বাইমারে যেন সাড়া পড়ে গেল। গ্যেটেকে ছাড়া ডিউকের যেন একদণ্ডও চলে না। ডিউকপত্নী তাঁর বাগ্‌বিভূতিতে মুগ্ধ। কেউ কেউ গ্যেটেকে অভিহিত করতেন দেবতার মত মানুষ বলে। প্রথম দশ বৎসরে হ্বাইমারে এসে গ্যেটে বিশেষ সাহিত্য-কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। অধিকাংশ সময়ই কেটে যেত আমোদ-উৎসবে। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক অভিনীত হত, তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করতেন। অভিনয়েও অংশ-গ্রহণ করতেন। এই সময়ে হ্বাইমারে একজন ব্যারনেট-পত্নী ছিলেন। শারলোত্তে (Baroness Charlotte Von Stein). সুন্দরী, বিদুষী উদার-ভাবাপন্না এই মহিলা গ্যেটের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন; দুঃখে সান্ত্বনা দান করে, অসঙ্গত কর্মচেষ্টায় তিরস্কার করে, তাঁর শ্রমের অপনোদন চেষ্টা করে তিনি গ্যেটের জীবনে প্রভূত অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, যার ফলে কবির আধ্যাত্মিক জীবন কতকটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

১৭৮৬ সালে গ্যেটে হ্বাইমারের সংসর্গ ছেড়ে দু' বৎসর ইতালীতে গিয়ে ছিলেন। এই ইটালী পর্যটন এবং সেখানে অবস্থান তাঁর জীবনে যেন এক নতুন জগতের আস্বাদ এনে দিল। এই পুণ্যভূমিতে যে জীবনরসধারা অভিব্যক্ত হয়েছিল, যার কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সাধনা প্রকাশ পেয়েছিল ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অপূর্ব দীপ্তিতে, গ্যেটের মত রসজ্ঞ শিল্পীর চিত্ত যেন চমৎকৃত হল সেই জগতের মধ্যে এসে পড়ে। গ্যেটে গিয়ে দেখলেন সেই পবিত্র স্থান যেখানে দান্তের দৃষ্টি-সম্মুখে এসে প্রথমবার আবির্ভূত হয়েছিলেন বিয়াত্রিচে, গিয়ে দেখলেন সেই সমাধি যেখানে মাইকেল এঞ্জেলো চিরনিদ্রায় সমাহিত, দেখতে পেলেন র‍্যাফেলের অমর তুলিকায় অঙ্কিত সুরম্য চিত্রাবলী। তখন তাঁর মনে হল যেন সেইকালের সকল অমর শিল্পীবৃন্দ এখনও তাঁর চারদিকে বর্তমান। এই সময়ের স্মৃতিতে তিনি লিখেছিলেন, "যেন এক নতুন জগৎ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয়ে চলেছে আমার সম্মুখে, যা আমি জানতাম তাও যেন এই প্রথম আমার অধিগত হচ্ছে।" এ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিতে ছিল একমাত্র জার্মানীর ভাবজগৎ এবং জার্মান পরি-

বেশ, এখন তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল ক্লাসিক চেতনা এবং ক্লাসিক দৃষ্টি।

ইটালীর প্রভাবে তাঁর প্রথম রচনা ইফিজিনিয়া (Iphigenia)। এটি আগে ছিল একটি গদ্য রচনা। ইটালীর সৌন্দর্যময় পরিবেশে তিনি এটিকে রূপায়িত করলেন সুরম্য নাট্যকাব্যে। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের (Euripedis) কাহিনীতে ইফিজিনিয়া একজন প্রাচীন দেবপূজারিণী। গ্যেটে তাঁকে রূপান্তরিত করেন লাবণ্যময়ী পবিত্রতার আধার এক খৃষ্টান কন্যারূপে, যাঁর ধর্মচেতনা সেই গ্রীক কবির যুগের চেয়ে আরও অনেক অগ্রসর।

এই সময়ের আর একটি সার্থক রচনা টরকোয়াটো টাসো (Torquato Tasso)। এই নাটকখানার আখ্যায়িকা ইফিজিনিয়ার চেয়ে পরবর্তী যুগের। ঘটনাস্থল প্রাচীন গ্রীস নয়, বর্তমান ইটালী। ইটালীয় কবি টাসো (Tasso) যখন ফেরারী ডিউকের প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে ডিউকের ভগ্নীর প্রতি তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়; এই ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক রচিত। এই দু'খানা নাটকই ভাষার সুমঞ্জস প্রবাহে, ভাবের উৎকর্ষে, চরিত্রচিত্রণে, কবিত্ব-মাধুর্যে সার্থক রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। এই দু'খানা নাটকের মধ্যে ক্লাসিক ভাবাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

শেক্সপীয়রের মতো গ্যেটেরও চিত্তের অনুভূতি-প্রবণতা ছিল অগাধ। জগতে এমন কিছু ছিল না যা তাঁর চিত্তে এসে স্পন্দন না জাগাত এবং তাঁর চিত্তকে সমৃদ্ধ না করে যেত। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকল মানুষ, মানুষের সমাজ, নির্জনতা ও বহির্জগৎ, গ্রন্থজগৎ এবং মানুষের জীবনধারা, প্রাচীন জগৎ, আধুনিক যুগ, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান—সকলই তাঁর চিত্তকে স্পন্দিত করত, তাঁর প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করত এবং তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করত। তার উপরে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং সীমাহীন প্রকাশক্ষমতা।

মানব জীবনের সকল প্রকার ভাব ও সকল প্রকার পরিস্থিতি গ্যেটের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মানুষের জীবনপ্রণালী ছিল তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও মননের বিষয় এবং মানুষের জীবন-ধারার উপরে তাঁর মত আর কেউ এমন শুদ্ধ ও দীপ্ত আলোকসম্পাত করতে পারেননি। তাঁর মননশক্তির প্রগাঢ়তা প্রসঙ্গে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন যে গ্যেটে যদি তাঁর ধীশক্তির সহিত আধ্যাত্মিক বৃত্তিরও অনুশীলন করতেন তবে তিনি হয়ত জগতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একজন গুরুস্থানীয় পুরুষ বলে গণ্য হতে পারতেন।

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও কেউ গ্যেটের সমকক্ষ নেই। আবার শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং প্রশান্ত বিচারক্ষমতার তুলনা হয় না। ম্যাথু আর্নল্ডের মত বহুশ্রুত সমালোচক গ্যেটে সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেছেন, "বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক।"

অন্যদিকে, কেবল শিল্পসম্পর্কিতই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট বিদ্যাবত্তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত সকলই তাঁর অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বিষয় ছিল। জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ক্রমাভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠা করে বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) অমর হয়ে রয়েছেন, গ্যেটেকেই তারও পথপ্রদর্শক বলা চলে। গ্যেটে যদি বিশিষ্টভাবে বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করতেন তবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবেও অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

সর্বোপরি গ্যেটে ছিলেন কবি। তাঁর সকল কাব্যকৃতির পরিচয় এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "ফাউস্ট" (Faust)। এই নাট্য-কাব্যের পরি-কল্পনায় কবির মন বহু বৎসর ব্যাপৃত ছিল। তিনি কাব্য লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৭৭৩ সালে, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯০ সালে; সমগ্র কাব্য সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হয় ১৮০৬ সালে। কাব্যের বিষয় এত ব্যাপক যে অভিনয়ের পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়; নাট্য-কাব্য হলেও অভিনয়ের চেয়ে বরং এটি অধ্যয়নের বিষয়। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে আছে দ্বৈতভাব; তার শুভবুদ্ধি তাকে প্রেরণা দেয় যা কিছু চরম কল্যাণকর তারই অনুশীলন ও সাধনার জন্যে, অপর পক্ষে তার মধ্যেই আছে দুষ্প্রবৃত্তির বীজ, যা ভোগ-বাসনার মাধ্যমে তাকে প্রলুব্ধ করে ধ্বংসের পথে। মানুষের চিত্তের এই দুর্বলতাই কাব্য-সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে "শয়তানের" (Satan) পরিকল্পনায়। 'ফাউস্ট' কাব্যে নায়ক ফাউস্ট এবং শয়তান-রূপী মেফিস্টোফিলিসের (Mephistopheles) দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে মানব জীবনের বা মানবাত্মার কাব্যই রচিত হয়েছে বলা চলে।

কাব্যের প্রথমেই আছে প্রস্তাবনা, যেমন দেখা যায় প্রাচীন গ্রীক কাব্যে এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে। প্রস্তাবনাতে আছে নাট্যমঞ্চের অধিকারী, কবি এবং বিদূষকের ভূমিকা। ঠিক তারপরেই আর একটি প্রস্তাবনা আছে—স্বর্গরাজ্যে দেবতারা সকলে এসে ভগবানের স্তুতি-বন্দনা করছেন এমন সময় মেফিস্টো-ফিলিস জানালেন যে এখানে স্বর্গরাজ্যে সকলে সফলতার তৃপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, তার চিত্তবৃত্তির পরিণতিতে সে একটি ব্যর্থসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে মেফিস্টোফিলিস বললে যে সে ফাউস্টকে দেখেছে। ফাউস্ট জ্ঞানে গুণে পৃথিবীকে

কতকটা সমৃদ্ধ করেছে বটে, কিন্তু তার দূরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নেই। সেজন্যই সে চিরন্তনভাবেই অসুখী, সে ভাগ্যহত। তার নিজের প্রার্থনা অনুসারেই মেফিস্টোফিলিসকে অনুমতি দেওয়া হল সে ফাউস্টকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

তারপরে মূল কাব্যের আরম্ভ। ফাউস্ট অসামান্য ধীশক্তির অধিকারী, সার্থকভাবে জ্ঞানের অনুশীলন করেছে, সাধনা করেছে, কিন্তু জ্ঞানের সাধনায় সুখের সন্ধান তো পেল না। তখন তার সংকল্প হল সে আত্মহত্যা করবে। তার ফলে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্মক হয়ে সকল প্রকার মৌলিক পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংস্পর্শে এসে হয়ত সে সুখের সন্ধান পেতে পারবে। কিন্তু যখন সে বিষপানে উদ্যত ঠিক সেই মুহূর্তে ঈস্টার উৎসবের সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল, তার স্মৃতিতে এনে দিল তার কিশোর বয়সের কাহিনী যখন ভগবানের কথা এবং স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর সংস্পর্শের কথা কাল্পনিক বলে মনে হত না। ফাউস্ট দেখতে পেল, উৎসবের শোভাযাত্রায় চলেছে শুধু তরুণ তরুণী নয়, তার মধ্যে আছে সকল শ্রেণীর লোক, ব্যবসায়ী এবং সৈনিক পর্যন্ত। এরা সকলেই তো সুখী। বিশ্বজগতের চিন্তায় তারা ভারাক্রান্ত নয়, পৃথিবীর দুর্ভাবনায় তাদের সুখ-শান্তি তো বিঘ্নিত হয় না—বর্তমানক্ষণের আনন্দে তারা মুগ্ধ। অপর পক্ষে সে নিজে জ্ঞানের সাধনা করে কি ফল লাভ করল? সে কি আবার নবযৌবন লাভ করে, যৌবনের প্রেমের জীবন লাভ করে সুখের আস্বাদ লাভ করতে পারে না?

ফাউস্টের এরূপ মানসিক দ্বন্দ্বের সময়ে মেফিস্টোফিলিস এসে দেখা দিল। মেফিস্টোফিলিস তাকে আশ্বাস দিল সে ফাউস্টকে দেবে যৌবন, যৌবনের সুখ-সম্পদ এবং যৌবনের আনন্দানুভূতির মোহমাদকতা। ফাউস্ট এ সকলই গ্রহণ করল এবং এর মূল্যস্বরূপ সে মেফিস্টোফিলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করল। মেফিস্টোফিলিস ফাউস্টের আত্মার উপর অধিকার বিস্তার করল এবং তার প্রলোভন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আরম্ভ করল। মোহ-মাদকতার প্রধান উপায় সুরা এবং নারী। ফাউস্টের মত প্রকৃতির লোক তুচ্ছ সুরার মোহে প্রলুব্ধ হল না; দ্বিতীয় চেষ্টায় এল সৌন্দর্যের প্রতীক যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিতা নারী।

মেফিস্টোফিলিসেরই চক্রান্তে ফাউস্টের জীবনে এসে দেখা দিল মার্গারেট। সদ্য দেবমন্দির থেকে প্রত্যাগতা মার্গারেটের চোখে অপূর্ব সৌন্দর্যের পুণ্যজ্যোতি, তার নিষ্কলুষ জীবনের সরলতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দীপ্তিতে অপূর্ব মাধুর্য। ফাউস্টের মধ্যেও গুণগরিমার অভাব ছিল না; মার্গারেট তার সরল প্রাণের আবেগে ফাউস্টকে অকৃত্রিমভাবে এবং প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসল এবং সম্পূর্ণভাবে তার নিকট আত্মসমর্পণ করল। ফাউস্টের চিত্ত বীতস্পৃহ ছিল না; তার উপরে ছিল মেফিস্টোফিলিসের প্রভাব; ফাউস্টের প্রেমের প্রভাবে মার্গারেটের জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু মার্গারেটের চিত্তে ছিল ভগবদ্ভক্তি। সে তার প্রেমাস্পদকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ভগবান বিশ্বাস কর না?

ফাউস্ট বলল, ভগবান? আমি শুধু জানি আমি তোমাকে ভালবাসি; আমাদের পরস্পরের হৃদয়ের কথা জানি, আমাদের হৃদয়ের আনন্দানুভূতি, আমাদের প্রেম, এই তো জানি, একেই ভগবান সংজ্ঞাও দিতে পার।

মেফিস্টোফিলিসের পরিকল্পনার পরিণতিতে ফাউস্টের প্রেমের আবেগে মার্গারেটের জীবন নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল। মার্গারেট জানতে পারল মেফিস্টোফিলিসের পাপচক্রান্তে সে নিজেই হয়েছে তার মা, ভাই এবং সন্তানেরও মৃত্যুর কারণ বা নিমিত্তভাগী। তথাপি মার্গারেট বরং মৃত্যুবরণ করল তথাপি মেফিস্টোফিলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হল না। মেফিস্টোফিলিস ঘোষণা করল—"মার্গারেটের উপযুক্ত দণ্ডাদেশ হল।" দৈববাণী হল—"মার্গারেটের লাভ হল মুক্তি।" কাব্যের এইখানেই প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি। ফাউস্ট এবং মেফিস্টোফিলিস অদৃশ্য হল যেন অন্ধকার এসে তাদের গ্রাস করে ফেলল।

প্রথম খণ্ডে দানবরূপী মেফিস্টোফিলিসের নিকট ফাউস্টের আত্মসমর্পণ; দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্টের মুক্তিসাধনায় শুধু মেফিস্টোফিলিসের বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, নিজের অন্তরের মোহ-দুর্বলতা থেকেও মুক্তি। মুক্তির উপায় স্বরূপে কয়েকটি স্তরপর্যায়ে দেখান হয়েছে প্রকৃতির সুস্থতা-বিধায়ক প্রভাব, রাষ্ট্রসেবার কাজে শীলতার অনুশীলন, সৌন্দর্যের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধিসাধন, প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত, জনসেবার দ্বারা স্বার্থ-প্রবৃত্তির বিলোপসাধন।

ফাউস্ট নিদ্রাবসানে দেখল সে এক পুষ্পোদ্যানে শায়িত। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির সৌন্দর্য তার চিত্তেরও স্নিগ্ধতা সম্পাদন করল। তার অন্তরে জেগে উঠল পূর্ণতর জীবনের জন্য সাধনার সংকল্প।

পরবর্তী চিত্রে দেখা গেল ফাউস্ট মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে এসেছে জার্মান সম্রাটের রাজসভায়। রাজ্যের সকল দিকে দুরবস্থা—দারিদ্র্য, অরাজকতা, নীতিধর্ম লঙ্ঘিত, সৈন্যগণের মধ্যে

বিদ্রোহের পূর্বাভাস। মেফিস্টোফিলিসের দানবীয় শক্তির সাহায্যে ফাউস্ট নতুন অর্থনীতির ব্যবস্থা পত্তন করে দেশের দারিদ্র্যের প্রতিবিধান ব্যবস্থা করল। সেনাগণের এবং সকলের প্রাপ্য টাকা শোধ করাতে অসন্তোষ-অরাজকতা অপসৃত হল, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনরুজ্জীবিত হল, সমগ্র দেশে শান্তির বিধান হল।

সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে এলেন প্রাচীন গ্রীক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-প্রতিমা হেলেন। তাঁর কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে ফাউস্টকে তুলে বসালেন তাঁরই পাশে অপার্থিব জগতের আধিপত্যে। সৌন্দর্যের সঙ্গে হল কল্যাণবুদ্ধির সমন্বয়।

তারপরে এল যুদ্ধের দৃশ্য। দেশের স্বার্থের জন্য সৈনিকের মৃত্যুবরণ, চিত্ত-শুদ্ধির উপায়।

সর্বশেষে ফাউস্টকে সম্রাট দিলেন সমুদ্রের বেলাভূমির একাধিপত্য। ফাউস্ট বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং নিরলস কর্ম-সাধনার ফলে সমুদ্রের গ্রাস থেকে দেশ উদ্ধার করলেন, সহস্র সহস্র লোকের বসতি স্থাপিত হল। সাধনার শেষে ফাউস্ট হয়ে দাঁড়াল একজন স্রষ্টা ও জনগণের উদ্ধারকর্তা।

কর্মাবসানে তার জীবনেরও অবসান হল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা দানবের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করল। মেফিস্টোফিলিসের দূতেরা চেষ্টা করে-ছিল ফাউস্টের মুক্ত আত্মাকে ধরে আনবার জন্য, কিন্তু দেবদূতগণের নিকট তাদের পরাজিত হতে হল।

সর্বশেষ অঙ্কে দেখা গেল স্বর্গ-রাজ্যে ফাউস্টের জন্য অপেক্ষা করে আছে মার্গারেট; প্রেমময়ী মার্গারেটের সুখ পরিপূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ ফাউস্টের উদ্ধারসাধন না হয়। তাই ফাউস্টের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় দেখা গেল মার্গারেটকে, যেমন দান্তের স্বর্গরাজ্যে বিয়াত্রিচে।

ফাউস্ট এক অনন্যসাধারণ কাব্য। নাটকাকারে রচিত হলেও একে রূপক কাব্যও বলা চলে; রূপক বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার কাব্য বা মানবের জীবনদর্শন। গ্যেটের নিজের স্বীকারোক্তিতেই আছে যে তিনিও ফাউস্টের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণ-পরিতৃপ্তি পাননি। জীবনের বহু ক্ষেত্রে জীবনসম্ভোগ করতে গিয়ে পরিণামে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন। ফাউস্টও জ্ঞান-সাধনায় বা জীবন-সম্ভোগেও সুখের তৃপ্তিস্বাদ পেল না। ফাউস্ট দুরাকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত, কিন্তু এই অতৃপ্তি যে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট বিধাতারই বিধান—Divine discontent! আত্মার মধ্যে যে ভগবৎ প্রেরণা তাতো ভোগসুখে তৃপ্ত হবার নয়। ফাউস্টের আত্মা ভগবদভিমুখে দিকনির্দেশ পেল না, সেজন্য তাকে সংসারের ভোগসুখে তৃপ্তিকামনা খুঁজতে হল; এবং সে দানবের নিকট আত্মসমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত হল না। কিন্তু মানবাত্মার মধ্যে আছে ভগবৎ প্রেরণা, সেজন্য শত প্রকার প্রলোভনে সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকলেও মূলে সৎপ্রেরণা একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। সেজনাই মার্গারেটের প্রেমে আনন্দ-রসানুভূতির যে আস্বাদ সে পেয়েছিল তাকে ব্রহ্মা-স্বাদসহোদর বলা চলে। সাধনার অবসানে স্বর্গরাজ্যে তারই জন্য মার্গারেটের অপেক্ষা অতিসুন্দর কল্পনা, সেখানে দান্তের বিয়াত্রিচের ন্যায় মার্গারেটই তার দয়িতের পথপ্রদর্শক। নারীকে দেখান হয়েছে স্বার্থবুদ্ধিহীনতা ও ক্ষমা-পরায়ণতার প্রতীকরূপে এবং প্রেমেরও চরম প্রকাশ মূর্তিতে। নারী তার দয়িতের সকল অক্ষমতা বা অন্যায় ক্ষমা করতে সদা প্রস্তুত, তার দয়িত যতক্ষণ তার সঙ্গে এসে সকল সুখের অংশ গ্রহণ না করতে পারে ততক্ষণ তার নিজের সুখভোগেরও পূর্ণ পরিতৃপ্তিসাধন হতে পারে না। তাই গ্রন্থেরও পরি-সমাপ্তি ঘটেছে দুটি ছত্রে এসে যার কোনো তুলনা হয় না—নারী-আত্মা আমাদের নিয়ে চলেছে চিরন্তনকালের জন্য উর্ধাভিমুখে :

The Woman-Soul leadeth us upward and on.

গ্যেটের সর্বতোমুখী প্রতিভা এক চরম বিস্ময়ের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনি শুধু সমস্ত ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি আত্মস্থ করেই তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষার কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করে তাঁর নিজের রসানুভূতিতে জরিত করে নিয়েছেন। যে যুগে ভিন্ন দেশ ও জাতি অপরাপর দেশ ও জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির রসাস্বাদনের পথে এক বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসংস্কৃতির সূচনা করছিল তখন গ্যেটে সেই সময়কার সমগ্র জগতকে যেন ধারণ করেছিলেন; সত্য সত্যই তিনি ছিলেন একজন যুগন্ধর পুরুষ, যেমন ছিলেন সক্রেতিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, যেমন ছিলেন মধ্যযুগের রোজার বেকন এবং লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci), যেমন ছিলেন বর্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ।

ঠাকুমার ঝুলি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত বুড়ীটা মরল।

বাড়ির সামনের দুটো মহলে ছোটা-ছুটি পড়ে গেল। নতুন বয়সের ছেলে-মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে একজন আর একজনকে খবর দিলে, বুড়ী সত্যি সত্যি টেঁসে গেছে। বাড়ির একটি ছেলে ডাক্তারি পড়ে। পড়াশুনা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। পিসতুতো বোনের মুখে জবলজবলে উত্তেজনা দেখেও তার সংশয় গেল না। জিজ্ঞাসা করল, অক্সিজেনের নল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বুড়ী এতক্ষণে স্বর্গের অক্সিজেন টানছে!

ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছে?

পিসতুতো বোন অতশত জানে না। সেও আর একজনের মুখে শুনেই দৌড়ে এসেছে। তাই জোর দিয়ে বলতে হল, হ্যাঁঃ, সার্টিফিকেট লেখা না হলে যেন বুড়ী আবার নড়েচড়ে উঠে বসবে!

নাতির ঘরের দুই ছেলে এক মেয়ে আর নাতনীর ঘরের দুই মেয়ে শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে দোতলার এক মহলে হানা দিয়ে দুচোখ টান করে দেখেছে, বুড়ীটার আর নড়েচড়ে উঠে বসার সম্ভাবনা নেই বটে। অনেক-বার তারা এই মৃত্যু দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। ডাক্তারের বাঁচাবার গুরুগম্ভীর তোড়জোড় দেখে মনে মনে মুখ বেঁকিয়েছে। ঘরে ফিরে বারবার বুড়ীটাকে জীবনের দরজায় উপস্থিত দেখে মৃত্যুর ওপর তাদের আস্থা যেতে বসেছিল।

বুড়ীটা অকৃতজ্ঞও ছিল। যমের এক-একটা হ্যাঁচকা টানের ধকল সামলে উঠে খনখনে গলায় অজানা অচেনা কারো চতুর্দশ পুরুষের উদ্দেশে প্রায়-অশ্লীল কটুকাটব্য করেছে, ডাক্তারের উদ্দেশে গালিগালাজ করেছে, আর নাতি নাতবউ নাতনীকে রসনার ঝাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। এমন কি উঠতে-বসতে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যমের পিণ্ডের উদ্দেশেও সম্মার্জনী ছুঁড়েছে। আর, সব শেষে ঘরের আর এক ততোধিক স্থবির বৃদ্ধকে যেন নখ-দন্ত মেলে ফালা ফালা করে দিতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য, নখ-দন্ত নেই—বিদারণ কার্যটিও রসনার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সেই বাণী আর সেই বচনের বেশির ভাগ দাস-দাসীদেরই শুনতে হয়। কারণ যার উদ্দেশে বলা তার কানের ওপর দখল একরকম গেছেই।

এই মহলটা বলতে গেলে একটি পরিচারক আর একটি পরিচারিকার হেপাজতে। নাতি নাতনী বা নাতবউ দিনের মধ্যে এক আধবার খোঁজখবর করে যায়। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত এলে সামনের দরজাটা বন্ধ থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে বুড়ীর কণ্ঠস্বর এধারে পৌঁছয় না। পৌঁছলে সকলের কান-মাথা কাটা যায়। কারণ সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো মহিলার কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ অশ্রাব্য সেকেলে গালাগাল একালের কানে গলানো সীসের মত লাগে। নাতির ঘরের ছেলেদুটো ভুলেও এ মহলের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। কখনো সখনো বুড়ীর চোখ কপালে উঠেছে শুনলে দেখতে আসে। কিন্তু এমনি চোখ উল্টে অনেক-

বার যমকে কলা দেখাতে দেখে হাল ছেড়ে এখন তাও দেখতে আসে না বড়। নাতির মেয়ে আর নাতনীর মেয়েদুটো মাঝেসাজে উঁকিঝুঁকি দেয়। এসে নিজের নিজের নাম বলতে হয়, নইলে বুড়ী সঠিক ঠাওর করতে পারে না কে এলো। নাম ভাঁড়িয়ে মেয়েরা ফষ্টিনষ্টি করে অনেক সময়। আর একজনের নাম বলে দেয়।

কে রে কুমি এলি?

নাতনীর ঘরের বড় মেয়ে কমলা। ইস্কুল টপকে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তলায় তলায় রসের কথা শোনার দিকে ঝোঁক। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে-ই বেশি আসে। কলেজে-পড়া মেয়ে—নাম-বিকৃতির দরুন ছ' আঙুলে পর্যন্ত জিভ ভেঙিয়েও কোনো সুফল পায়নি। বুড়ী কুমি ছাড়া আর কিছু বলবেই না। কমলা নামোচ্চারণের একটু বাধাও অবশ্য আছে। বুড়ী নিজেই গল্প করেছিল। বলেছিল, মিনসেটা তো সেই বয়েস-কাল থেকেই কত জ্বালিয়েছে ঠিক নেই, ভিটকিলেমি করে কতবার চোখ কপালে তুলেছে—সত্যি সত্যি যমে নজর দিল ভেবে বুড়ীর এক-একবার ভয় ধরেছে। তাই সোয়ামীর কল্যাণে ওই নামের ফলটি বাবা বিশ্বনাথের চরণে উৎসর্গ করেছিল একবার। প্রাণে অর্ধভোজন হয়, কিন্তু বুড়ীর সেকেলে সংস্কারে নামেও সিকি ভোজন-টোজন হয়ে যায় বোধহয়, সেই জন্যই নাম বর্জন।

না, আমি নমি এলাম।

গলায় স্বর একটু এদিক ওদিক করে দিলেই বুড়ীর ভুল।

আয় নমি আয়, বোস্। কুমিটা আজকাল হাড়বজ্জাত হয়েছে, এদিকে আর আসেই না—মন্দা কলেজে হুট-হাটিয়ে পড়তে যায়, মা-টা তো নিজের দেমাকে জ্বলছে সারাক্ষণ, ডবকা ছুঁড়ী ওদিকে কার সঙ্গে রস করে বেড়াচ্ছে কে জানে—

হ্যাঁ রে বুড়ী-থুত্থুড়ি, করছে রস—নাম-ভাঁড়ানোর কৌতুক মাথায় ওঠে কমলার, তোমার খ্যাংড়া-কাঠি বুড়োর সঙ্গে দিনরাত রস করে বেড়াচ্ছে দেখতে পাও না!

বুড়ী নিজের ভুল বুঝতে পারে, দন্তশূন্য মুখ-গহ্বর হাসিতে ভরে ওঠে।—অ, তুই কুমি—তোরই তবু যা একটু টান আছে, মাঝে মধ্যে আসিস, আর কেউ তো ইদিক ভুলেও মাড়ায় না। আয় বোস্—

তার বচন শোনার জন্যেই মেয়েরা মাঝে মধ্যে উসকে দেয় তাকে, জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীর কেমন গো?

বুড়ীর মুখে বিমর্ষ ছায়া পড়ে তক্ষুনি; হালছাড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আর শরীর—কালামুখোর একবার দেখা পেলে মুখে নুড়ো জেলে দিতাম, আঁশবঁটিটায় বিষ ঝেড়ে দিতাম—শেকর কাটার জন্য কাঁচি হাতে যত-সব অকালের ঘরের আনাচ-কানাচে ছোঁক-ছোঁকিয়ে বেড়াচ্ছে—ইদিক ঘেঁষার নাম নেই!

কালা-মুখো ব্যক্তিটি স্বয়ং যম। বুড়ীর প্রতি দেবতাটির এই অনাসক্তির অভিযোগ মেয়েরা জন্মাবধি শুনে আসছে। বুড়ীর খেদ পুরোপুরি শুনতে হলে এবারে কোন্ কথা বলতে হবে তাও তারা ভালই জানে। মুখ মচকে যমের হয়ে সওয়াল করে তারা, কালা-মুখো তোমার দিকে ঘেঁষবে কেন শুনি—দুশ্চরিত্রার মত এই বয়সেও একটা পুরুষমানুষ আঁকড়ে পড়ে আছ, বলতে লজ্জা করে না! শতেক বছর পুরিয়ে আক্কেল দিয়ে তবে যদি যম তাকায় তোমার দিকে।

বুড়ীর গলা খনখনিয়ে ওঠে, কি বললি লা আবাগীর বেটীরা, আমি ওই আদিখ্যেতা মিনসেকে আঁকড়ে আছি না ওই হাড়-হাবাতে বুড়ো লজ্জার মাথা খেয়ে আমার আঁচল ধরে বসে আছে, আঁ?

মেয়েরা সায় দিলেও সেই বাঁকা সুরই ধরবে, বলবে, তা হলেও শুধুমুদু যমকে খোঁটা দাও কেন, যমেরও তো দয়ামায়া আছে, তোমাকে নিলে বুড়োটার কি দশা হবে, তোমার শোকে বুড়োটা যে কেঁদে কেঁদে মরবে।

তাই বল, তাই বল্। বুড়ীর অসহায় খেদ প্রায় কান্নার মত শোনায়, তার পরেই পাশের ঘরের বুড়োর উদ্দেশে রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে, সেই তাপে নিষ্প্রভ চোখদুটো আরো শাদাটে দেখায়।—তাই বল্ তোরা, ওই জন্যেই যমের অরুচি, সাত যুগ ধরে গায়ে লেপটে থেকেও হাড়হদ্দ বুড়োর রস যায় না,—কোথায় নিজের হাতে কপালে সিঁদুর লেপে বিদেয় দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে পর-কালের চিন্তা করবে দুদণ্ড, তা না কিছু হল তো ডাক ডাক্তার, ডাক বদ্যি—যেন কোন্ ষোল বছরের রসবতী চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছে। আগুনে আগুনে—রসের নোলায় আগুন জেলে দিতে হয়।

বুড়ীর এই রাজ্যছাড়া খেদ আর উত্তাপের কারণ ছেলেমেয়েরা বা তাদের বাপমায়েরা ছেড়ে বাড়ির দাসী-চাকরেরাও জানে। কারণ, বুড়ীর কোঁচকানো কপালের আর কেশ-শূন্য সিঁথির ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর। ওগুলো শেষ পর্যন্ত টিকবে কি টিকবে না ভিতরে ভিতরে বুড়ীর সেই স্বপ্ন—সেই ত্রাসও। একের পর এক ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে তার কেমন ধারণা হয়েছে, আশৈশবের ওই সঙ্গীটিই নিতান্ত অবুঝ আর নিতান্ত স্বার্থপরের মত মায়ার আকর্ষণে তার উজ্জ্বল যাত্রাপথটি আগলে বসে আছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়েই বহুদিন ধরে একটা বড় রকমের রেষারিষি চলেছে দুজনার মধ্যে—কে আগে যাবে। বুড়ীর কিছু হলে বুড়ো প্রকাশ্যেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর, বুড়োর কিছু হলে বা হবার সম্ভাবনা দেখলে বুড়ী তেতে ওঠে। অসুস্থতার কথাটা বুড়োর সর্বাগ্রে আবার তাকেই জানানো চাই। শোনামাত্র খনখনিয়ে উঠবেই বুড়ী, আমাকে কেন—তোমার তুকপুকে শোনার জন্য চেরটা কাল আমি বসে থাকব নাকি? যারা থেকে চিকিচ্ছে-বদ্যি করাবে তাদের ডেকে বললেই হয়!

অর্থাৎ বুড়ীর অগ্রগমন অনিবার্য, এ-সব ভাঁওতায় ভয় পাবার পাত্রী নয় সে। ভয় পাক না পাক, মেজাজ সারাক্ষণ চড়ে থাকে সেদিন। নাতি নাত-বৌ নাতনীকে ডেকে গালাগালি করে, দাসী চাকরের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করে, মেয়ে-গুলোকেও রেহাই দেয় না। বুড়ীর বিবেচনায়, সে আর নেই এটাই ধরে নেওয়া সকলের কর্তব্য। সেরকম ধরে নিলে তার সিঁদুরকপালে পাড়ি দেওয়াটা কিঞ্চিৎ সহজ হতে পারে বলে বিশ্বাস।

ধরে নিক না নিক বুড়োর আগেই গেল বটে বুড়ী।

দল বেঁধে দেখতে এসে ছেলেমেয়ে-গুলো হকচকিয়ে গেল কেমন। বহু আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কোলে শয়ান বৃদ্ধাটিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তারা। সুন্দরও নয় কুৎসিতও নয়, অথচ কি এক মহিমা যেন ঘিরে আছে তাকে। হঠাৎ বুড়োর দিকে চোখ পড়তে বেশ থতমতই খেয়ে গেল তারা। শ্যামসমান এই মৃত্যুর

ভজনা তারা এত শুনেছে যে যথার্থই একদিন তার পদার্পণ ঘটলে সাত যুগের সঙ্গী জীর্ণতর বৃদ্ধটির মুখ-খানা দেখতে কেমন হবে ভাবার অবকাশ হয়নি।......শিরদাঁড়া দুমড়ে সামনে বসে আছে, বলিরেখায় হিজিবিজি মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, বিবর্ণ ঘোলাটে দুই চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সরবে শোক করছে না কেউ, চোখের জলও বন্ধ হয়েছে। অথচ ঘরের বাতাসে একটা কান্না থিতিয়ে আছে। সবাই যেন এতদিনে নতুন করে বুড়োটাকে দেখছে। আর বুড়োটা বুড়ীকে দেখছে। এক অতিবৃদ্ধ কাল-বটের দুটো কান্ডর একটা ভেঙে সামনে পড়ে আছে, বোবার মত অপরটি তাই দেখছে। অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে কটি অন্তত এই দেখাটা বেশিক্ষণ বরদাস্ত

করতে পারল না। তারা শোকাচ্ছন্ন নয়, কিন্তু বিচ্ছিরি রকমের অদ্ভুত লাগছিল তাদের।

সামনে থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এলো তারা।

• • •

জীবনের যে শিখাটি নিবল, সেটি একটানা ছিয়াশী বছর জ্বলেছিল। আর কালের বুকে যে বিদায়ী শিখাটি ধুকে-পুকিয়ে কাঁপছে এখনো তার বয়েস তিরেনব্বুই। কিন্তু বাড়ির সকলের কাছেও তিরেনব্বুইয়ের আগে ওই ছিয়াশীর মহাযাত্রাই সুবাঞ্ছিত ছিল। সেই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম হয়নি, তাই অনুভূতির রাজ্যে তেমন বড় রকমের কোন আলোড়নেরও কারণ ঘটেনি। তবু বুকের কাছাকাছি কি একটা অজ্ঞাত আবেগের ছোঁয়ায় ভারী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে নাতনী বিমলা। সেটা শোক নয় ঠিক। বুড়ী যত বুড়ীই হোক এই চির-বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে শোক করা স্বাভাবিক। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেও সেটা অস্বাভাবিক হত না। চিৎকার করে না হোক, ঠাকুমা শেষনিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা কেঁদেছেও। ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ বুড়ীর নাতবউ সুরুচিও কেঁদেছে। কিন্তু বিমলার এই অনুভূতিটা ঠিক শোকের অনুভূতি নয়। কি যে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। ঠাকুমার শয্যা ছুঁয়ে সে-ই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মেয়ে কমলা, অমলা বা ভাইপো-ভাইঝিদের বোবা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েও সে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। তারা মৃতাকে দেখছিল, আর বিমলার মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে ওরা তাকেও দেখছিল। ওরা চলে যেতে একটু স্বস্তি বোধ করেছে। আরো স্বস্তি বোধ করল দাদুর কথায় সুরুচি উঠে যেতে। দাদু বিড়বিড় করে বলেছে, সঙ্গে কি যাবে দিয়ে দাও—সবই দিয়ে দাও।

বিমলার মনে হয়েছে, এক সাগর পরিমাণ অভিমান তার থেকেও বড় এক কান্নার স্তব্ধতায় থমকে আছে। দাদুর দিকে সহজ দুই চোখ মেলেও কেন তাকাতে পারছে না বিমলা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। দাদা অনুপম ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে। সে এলেও বিমলার একটু ভালো লাগত হয়ত, তাকে শয্যায় বসিয়ে বা দাদুর কাছে থাকতে বলে সে কিছুক্ষণের জন্যে এই পরিবেশ ছেড়ে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারত। কিন্তু তারও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। যোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত বোধহয়। মৃত্যুকে পুরোপুরি বিদায় দিতে সময় লাগে, ব্যবস্থা লাগে।

বউদি এঘর-ওঘর করে টুকিটাকি জিনিসগুলো হাতের কাছে দিয়ে যাচ্ছে। কিছু করতে হবে খেয়াল হতে বিমলা সে-গুলো শয্যায় বিন্যস্ত করে রাখতে গেল। কিন্তু হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে কেন বুঝতে পারছে না, লোকান্তরিতার জড় বস্তুগুলোর স্পর্শ সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দেবার মত এমন জীবন্ত লাগছে কেন বুঝছে না। এমন কখনো হয়নি। বিমলা আড়ে আড়ে দাদুকে দেখছে এক-একবার। কিন্তু এই দেখাটা নিজের গোচরে নয়। আর দেখছে চির নীরবতার কোলে শয়ান ছিয়াশী বছরের জীর্ণ বিকলপ্রায় নারীদেহের কাঠামোটাকে। অথচ কি দেখছে হুঁশ নেই—ঠাকুমাকে দেখছে কি মৃতা দেখছে কি কপাল আর মাথার জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখছে বিমলা নিজেও জানে না। বিমলার চোখদুটো অদূরের ওই ঘাড়-পিঠ দুমড়ানো বৃদ্ধটির দিকেই ঘুরেছে আবার। মৃত্যুর এধারে থেকে কি এক মহা সংগতির যোগ যেন জীবনের ওই তটে এসে থেমে আছে। উঠতে-বসতে যে অসহায় জীবন ওদের সকলেরই করুণার পাত্র—তার।

নিজের অগোচরে বিমলা তাই দেখছে। এই বিয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যা কোনদিন সে দেখেনি। আজও মনে-প্রাণে এই দেখাটাকে বাতিলই করে দিতে চাইছে। কিন্তু একটা অজ্ঞাত অনুভূত উপলব্ধি যেন তার শ্বাস-যন্ত্রটার ওপর চেপে বসছে।

বিধাতা আজকের এই নাটকের উপাদান রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন বোধ করি প্রায় দুই যুগ আগে।

বংশের কৃতী পুরুষ বলতে বিমলা আর অনুপমের বাবা—মস্ত চাকুরে ছিল তার সময়ের। এই তিন মহল বাড়ি পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, নিজের উপার্জনে করে গেছে। অনুপম বিমলার থেকে তিন বছরের বড়, কিন্তু বাপের আদর আর প্রশ্রয় বিমলা যত পেয়েছে ছেলে ততো নয়। ঠাকুমা বলত, বাপ-সোহাগী মেয়ে। বলত, তুই আসার পর থেকেই তোর বাপ কাজে কর্মে কেম্পতির মুখ দেখেছে, তাই এত আদর তোর। এই আদর নিয়ে দাদার সঙ্গে বিমলা দস্তুর মত কাড়াকাড়ি রেষারেষি করত, আর তার প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্বের দরুন ডগমগিয়ে বেড়াতো।

বাবা বিয়ের আগেও তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি, বিয়ের পরেও না। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায়নি, জামাই ঘরে এনেছে। বলা বাহুল্য, ছেলেটি বিত্তশালী ঘরের নয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে বি-এ পাস করেছিল। সামান্য চাকরি করত, দাদাদের সংসারে থাকত। ভারী কমনীয় সুশ্রী চেহারাটি, শুধু এই গুণেই বাবার চোখে পড়েছিল বোধহয়।

বিয়ের সময় বিমলা আই-এ পড়ে। তার মতামতের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, আর বাবা ভালো করল কি মন্দ করল সে ভাবনাও মনে আসেনি। শুভদৃষ্টির সময় মুখখানা দেখে বিমলা মনে মনে খুশি হয়েছিল, ভালো লাগতে এক মুহূর্তও লাগেনি। রূপসী বিমলাও কম নয়, আজ এই বিয়াল্লিশেও শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি সহকর্মী অধ্যাপকদের অনেকের তার প্রতি এক ধরনের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারে। বিমলা সেটা অন্যায় বা অশোভন মনে করে না—যে অর্ঘ্যে কামনার নগ্নতা নেই, তাতে অশুচিতাও কিছু নেই। আগের সেই বয়সে ঠাকুমা চোখ রাঙিয়ে বলত, ওই বুড়ো মিনসের কাছে যাবিনি খবরদার, তোকে দেখলে যে আমারই চটকাতে ইচ্ছে করে লা! জামাই দেখে ঠাকুমা আনন্দে আটখানা, বিয়ের রাতেই কানে মুখ লাগিয়ে বলেছিল, দেখলে যে চোখ ফেরানো যায় না লো, আমার কাছে একটু-আধটু আসতে-টাসতে দিস—রংটা একটু মাজা বলেই কেষ্ট ঠাকুরের মত রূপে যেন আরো খুলেছে। তারপর জামাইয়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে, তোমার রাধিকে দেখে নাও গো—না না ও ছুঁড়ীকে নয়, এই আমাকে—ও ছুঁড়ী তো কুব্জা, রূপসী সেজে মায়ায় বশ করে তোমাকে মজাতে বসেছে।

আরো অনেক কথা বলত ঠাকুমা, যা শুনলে কানে আঙুল দিয়ে পালাতে হত। কিন্তু জামাইয়ের রঙ আর রূপের কদর পরবর্তী অধস্তনদের চোখে খুব বেশিদিন টিকল না। বাবা কিছু একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করেই জামাই গড়তে মনোযোগী হয়েছিল। চাকরি ছেড়ে আরো পড়াশুনা করতে বলেছিল, এটা ওটা পরীক্ষা দিতে বলেছিল, এমন কি নিজের খরচে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিল।

জামাই শ্বশুরের মুখের ওপর হাঁ না কিছুই বলত না। মনে মনে শ্বশুরকে ভয়ই করত। ভয় বলতে গেলে সে এ-বাড়ির প্রায় সকলকেই করত। সে-যে বে-খাপ্পা একটা লোক এখানে আছে তা নিজেই উপলব্ধি করত। দাদাদের সংসারে আশ্রিতের মত ছিল, এখানেও তাই। কিন্তু সেই পরিবেশ তার পরিচিত ছিল. এটি তাও না।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যেতেও অস্বীকার করায় বাবা চটেছিল, বিমলাও খুশি হয়নি। বাবা আর দাদা একটা অকর্মণ্য লোককে মুখ বুজে বরদাস্ত করতে পেরেছিল, কিন্তু বিমলা তা পারেনি। আরো পারেনি দাদার বিয়ের পরে। বাবা বি-এ পাস-করা বউ এনেছিল, বিমলা হঠাৎ যেন তার কাছেই কেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল। সুরুচি কোনদিন কোনরকম কটাক্ষ করেনি, আজও এই ননদিনীটিকে মনে মনে সে বিলক্ষণ সমীহই করে, কিন্তু দাদার বড় চাকরি শিক্ষা দীক্ষা সবই বউদির যেন একারই গর্বের কারণ। নিজের অগোচরে ক্রমশ বিমলার মেজাজ চড়েছে, এক দুর্বোধ্য বিরূপতায় ভিতরটা ভরে উঠেছে। দাদার পাশাপাশি ঘরের এই লোকটা গ্রাম্য পুরুতের ছেলের মত দুবেলা সন্ধ্যাআহ্নিক করে, গায়ত্রী জপ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মের বই পড়ে। লুকিয়ে পড়ে বিমলার ভয়ে। মাঝে মধ্যে এক-আধ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়—কোথায় যায় বিমলা জানে। কোথায় কোনো সাধুসজ্জনের আবির্ভাবের খবর পেলে নিঃশব্দে চোরের মতই পালিয়ে যাবে, তারপর একবেলা বা একদিন বা দুদিন বাদে আবার চোরের মতই ফিরে আসবে। সন্ধ্যাআহ্নিক দেখে বিমলা গোড়ায় গোড়ায় অনেক ঠাট্টাঠিসারা করেছে, অনেক রাগ অভিমানও করেছে। এমন কি অপমানকর উক্তিও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেক সময়। কিন্তু বোবার শত্রুতা কত আর করাতে পারে?

তবু বাবা যতদিন ছিল একরকম চলে যাচ্ছিল। বুড়ো-বুড়ীর চোখের সামনে বাবা-মা দুজনেই পর পর চোখ বুজল। তারা ছেলে ছেলের বউ হারালো, কিন্তু বিমলা কতখানি হারালো তা আর কারো পক্ষে অনুমান করাও শক্ত। বাড়ির আধখানা আর নগদ টাকার আধা-আধি বাবা বিমলার নামে লিখে দিয়ে গেছে। পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর ছেলেমেয়ের সমান দাবির যুগ নয় সেটা। ফলে এই প্রাপ্তিটুকুও বুকের ওপর করুণার বোঝার মত চেপে বসেছিল বিমলার। বাবা যেন দাদার প্রাপ্তির আধা-আধি ছিনিয়ে তাকে দিয়ে গেছে। শিক্ষিত মার্জিত দাদা-বউদির এ নিয়ে প্রকাশ্য অভিযোগ অন্তত কিছু ছিল না। বরং এক ধরনের উদার বিবেচনায় বাবার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তারা। কিন্তু এই নিরাপত্তার ফলে নিরুপায় আক্রোশে বিমলা নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

বাবা মা গত হবার পরেও ঘরের লোকটার একটুও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে সে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্ক্রিয়তার স্রোতে আরো গা ভাসিয়েছে। উঠতে-বসতে বিমলা জ্বলে উঠেছে। গলা ছেড়ে ঝগড়া বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু অল্প কথায় যা বলত, গায়ে কেটে কেটে বসার কথা। কিন্তু একটু চক্ষুলজ্জা একটু আত্মসম্মানবোধও যদি থাকত। শ্বশুরের দয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর এই গঞ্জনাটুকুও যেন প্রাপ্য ধরে নিয়েছে—তার বেশি কিছু না। বাড়ি থেকে উধাও হওয়াটা ক্রমশ বাড়তে লাগল, অফিস কামাই করে এক-একবার চার পাঁচ দিনের জন্যে ডুব। গোড়ায় গোড়ায় দাদা খোঁজ-খবর করত, বউদিও ভাবনাচিন্তা করাটা কর্তব্য ভাবত. আর রাগের মাথায় বিমলা এক-এক সময় তাদেরই ধমকে উঠত, দোহাই তোমাদের, আমাকে পাগল করে দিতে না চাও তো তার জন্যে আর তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

লোকটা ফিরত যখন বিতৃষ্ণায় আর তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে হত না বিমলার। সেই অবনত মূর্তি, অবনত মুখ—শত অপরাধের বোঝা যেন মাথায়। বিমলার মনে হত, এমন মেরুদণ্ডহীন মানুষ আর দেখেনি। কখনো জ্বলন্ত চোখে চেয়েই থাকত শুধু, কখনো বলত, ফিরলে কেন, যেখানে ছিলে থেকে গেলেই তো হত। অথবা বলত, এখানে তোমার ধর্মকর্মের অসুবিধে হচ্ছে, আর কোথাও ব্যবস্থা করতে পারো না?

বিমলার ধারণা, ব্যবস্থা আর কোথাও করেই নিত, বার বার ফিরে আসে শুধু আর এক বিপরীত আকর্ষণে। সেই আকর্ষণ বিমলা নিজে। এই মানুষের মধ্যেই সময় সময় প্রবল আসক্তি দেখেছে, চোখের কোণে নিবিড় তৃষ্ণা দেখেছে। কিন্তু বিমলার সেটা কাপুরুষের আসক্তি মনে হয়েছে, সেই নীরব তৃষ্ণার মুহূর্তে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে একটুও বাধেনি। বিমলা করবেই বা কি, বড় মেয়ে কমলার বয়েস তখন আট, অমলার চার—এমন হবে জানলে এই মেয়ে দুটোই আসতে পেত কিনা সন্দেহ। এই দুটোকেই মানুষ করার ভাবনায় চোখে ঘুম নেই তার। প্রশ্রয় পেলে দায়িত্বজ্ঞান-হীন কাপুরুষের মত আরো বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জপতপে বসবে, স্বর্গের সিঁড়ির লোভে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াবে। যে জোরে বিমলা লোকটাকে আরো খানিকটা অন্তত কাছে টেনে নিয়ে আসতে পারত, সেই জোরের ওপর তার এতটুকু লোভের আঁচও অসহ্য লাগত। এই নির্মম

বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সামান্য আপসের ইঙ্গিতও সহ্য হত না।

কিন্তু এইভাবে দিন চলার মিয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল।

একবার কমলা অমলা দুটো মেয়েরই ডিফথিরিয়া হল হঠাৎ। একজন সারার আগেই আর একজনের। বাড়িতে ত্রাস দেখা দিল। দাদা তার ছেলেপুলে শ্বশুরবাড়ি সরিয়ে দিল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্রের যাবতীয় ব্যবস্থাও সেই করল। সেই একবার মাত্র ঘরের লোকটাকে কটা দিন অফিস ভুলে আর পুজো-আর্চা বাতিল করে ঘরের কর্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল। দাদা সব ব্যবস্থা করলেও ব্যস্ত মানুষ, সব সময় তার বাড়ি বসে থাকা সম্ভব নয়। বার বার ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করা, ওষুধ আনা, শুশ্রূষা করার জন্য অষ্টপ্রহর লোক দরকার। এ-লোকটা নির্বিবাদে কটা দিন করেও ছিল। কিন্তু তারপরেই বিমলা স্তব্ধ একেবারে।

ছোট মেয়েটার তখনো বিপদ কাটেনি। বড় মেয়েটা তখনো পথ্য করেনি। এরই মধ্যে লোকটা একেবারে সাত দিনের জন্যে নিখোঁজ। সব দায়িত্ব নিয়ে দাদা এগিয়ে না এলে ছোট মেয়েটার চোখ বোজাও বিচিত্র ছিল না।

যেমন ফেরে তেমনি ফিরেছিল আবার একদিন। দাদা বউদি এবারে আর চুপ করে থাকেনি। দাদা মৃদু-কঠিন ভর্ৎসনাই করেছে, বউদিও এবারে মিষ্টি অনুযোগ করেনি খুব। কিন্তু তাদের কিছু বলার দরকার ছিল না আর।

ঠিক তার পরদিনই বিমলা যেন চির-দিনের মত প্রস্তুত হয়েই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল শোনো, তুমি আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে নাও। তুমি কাছে না থাকলে যে-দুটো এসেছে তাদের মানুষ করার ভাবনা হয়ত আমি ভাবতে পারব, নয়তো যা ওদের অদৃষ্টে আছে তাই হবে। কিন্তু এ-ভাবে তুমি কাছে থাকলে সে চেষ্টাও করা যাবে না, কোনদিন ওরা দায়িত্ব বুঝতে শিখবে না, আর কিছুদিন গেলে ওরাও তোমাকে অসম্মান করতে শুরু করবে। তাতে তোমার থেকেও ওদের বেশি ক্ষতি। আজ অসুখে মরছিল, অমানুষ হয়ে সেই সবাই মরবে শেষে।

পরদিন থেকে আর তাকে কেউ দেখেনি।

দিন দশেক বাদে দাদার হুঁশ হয়েছিল। তার আগে অবশ্য বউদির বক্রোক্তি কানে এসেছিল বিমলার। বউদি অসহিষ্ণু মন্তব্য করেছিল, এই মানুষের ঘর করা কেন—এলে এবারে ঠিক বলব আমি। বিমলা চুপ করে ছিল, কারণ লোকটা ক'দিনের জন্যে গেছে সে সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় নয় তখনো। আরো পাঁচ-সাত দিন বাদে দাদা অফিসে খোঁজ নিয়ে এসে বলল, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। অফিসের প্রাপ্যগন্ডা বিমলার নামে পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে গেছে।

বউদি ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে এসেছিল। অনেক জেরা করেও ফল হয়নি। বিমলা শুধু বলেছিল, তোমাদের খোঁজ করার দরকার নেই। বললেও খোঁজাখুঁজি চলছিল জানে। অনেকদিন পর্যন্ত চলেছে। বিমলা এই প্রথম বোধহয় নিজের অগোচরে একটু মর্যাদা দিতে পেরেছিল লোকটাকে। আর দুর্বিষহ হলেও, নিভৃত সংগোপনে আশা করছিল, এই মর্যাদার সান্ত্বনাটুকুও অন্তত থাকে যেন। না, সেই অবনত মূর্তি আর অবনত চোখ আর সে দেখতে চায় না। ফেরেই যদি, করুণার আর অবহেলার পাত্র হয়ে যেন না ফেরে।

পরদিন থেকে আর তাকে কেউ দেখেনি।

সংবাদটা ঘুরে-ফিরে ঠাকুমার কানেও পৌঁছুল। বুড়ী অতশত খুঁটিনাটি কিছু জানে না, নাত-জামাই গা-ঢাকা দিয়েছে এটুকুই খবর তার কাছে। কিন্তু একটুকুও চিন্তিত বা উতলা হতে দেখা গেল না তাকে। বরং একালের বউয়ের

আঁচল-ধরা পুরুষের মধ্যে সে-কালের পরিচিত পুরুষ-প্রবৃত্তি আবিষ্কার করল বুড়ী। হেসে নাতবউয়ের সামনেই নাতনীকে খোঁটা দিল, ছোঁড়া গেরো খুলে পালায়, তুই কেমন বড় রূপসী লো! পরক্ষণেই নিজেই বিস্মিত, ভালো-মুখো ছেলের পেটে পেটে এত! কোথায় কোন্ ভৈরবী-টৈরবীর পিছু নিয়েছে দ্যাখ্ গে যা, নইলে এই বয়সে এত ধর্মে রস কেন।

বুড়ীর কোঁচকানো মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন ছিল না, বরং ভালো-মুখো ছেলেটার মধ্যে প্রশ্রয় পাবার মতই একটু পুরুষোচিত লক্ষণ দেখেছিল যেন। বিমলাকে কাছে টেনে খাটো গলায় তরল আশ্বাস দিতে চেষ্টা করেছিল, কিছু ভাবিস না, যে ঘাটেই জল খেয়ে বেড়াক, নাকে দড়িটা এখানেই বাঁধা, ঘুরে-ফিরে এখানেই এসে হত্যে দিয়ে পড়তে হবে। এই হত্যে দেওয়ার নজির বুড়ীর স্মৃতির সম্পদ যেন। বলত, আজ তোদের দাদুকে এমনি জবুথবু ভালোমানুষ দেখছিস—এ রকম ছিল নাকি! কম হাড় জ্বালিয়েছে! পোষা ডাইনী ছিল একটা, কুলখাগী মেয়েমানুষ—বুঝলি? জিগ্গেস করে দেখগে যা, আর আমিও সেই বামনী ছিলাম, গঙ্গাচান না করে এলে কাছে ঘেঁষতে দিতাম না, ফিরেও তাকাতাম না। তাকাব কেন লা, আমার কপালে সাবিত্রী কৌটোর সিঁদুর—সোহাগ করে নিজেই নিজের বশ-বাণ হাতে তুলে দিয়েছিল, আমার ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কি!

নাতনী আর নাতবউ এ গল্প অনেকবার শুনেছে। বুড়ী সেদিনও বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিমলা বুড়ীকে সেদিন মনে মনে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেছে।

একে একে এরপর অনেকগুলো দিন চলে যেতে বুড়ীরও কেমন খটকা বেঁধেছে। ব্যাপারটা যেন ঠিক তাদের কালের নয়। নাতবউকে ডেকে চুপি চুপি প্রায়ই খবর নিয়েছে ভালো-মুখো ছেলের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল কিনা। আবার মেজাজ চড়লে ভালো-মুখো ছেলের উদ্দেশ্যেই গলা ছেড়ে গাল পেড়েছে।

শীর্ণ দুই হাতে বিমলাকেও এরপর চড়াও করেছিল একদিন। কোলের কাছে টেনে বসিয়েছিল। কানে মুখ লাগিয়ে বলেছে, তোর ভাবনাটা কি, বশ-বাণ হাতে জানিস না।

তারপর আঁচলের আড়াল থেকে সেই বশ-বাণ বার করেছে। সাবিত্রী সিঁদুর-কৌটো। রঙ-করা কাঠের কৌটোর ওপর সাবিত্রী লেখা। আগে এই সিঁদুর-কৌটো নিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছে নাতনী নাতবউ। দাদুর নতুন বয়সের প্রণয়োপহার। দাদু কাশীধামে বেড়াতে গিয়েছিল একবার, সেখান থেকে এনে দিয়েছিল। এই সাবিত্রী কৌটোর সিঁদুরের জোরেই দাদুকে ঠাকুমা কতবার যমের মুখ থেকে আর কতরকমের অনাচার অঘটন থেকে নির্বিঘ্নে ফেরাতে পেরেছে ঠিক নেই। ঠাকুমার সে-সব গর্বের কাহিনী বিমলা আর সুরুচি অজস্রবার শুনেছে।

ধরে-বেঁধে সেদিন বিমলাকে কাছে বসিয়ে ঠাকুমা বলেছিল, এই কৌটোর সিঁদুর একবার কপালে পর, সিঁথিতে দে—ভালো-মুখো ছেলের পায়ে বেড়ি পড়বে দেখিস'খন, কোনো অকল্যাণ ঘেঁষবে না।

বিমলা এত ক্রুদ্ধ আর কখনো হয়নি বোধহয়। রাগে মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হয়নি। বুড়ীকে ঠেলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। বেশ দিনকতক আর কাছে আসেনি পর্যন্ত, মেয়েদুটোকেও আসতে দেয়নি। বিমলা জানে আবেদনটা বুড়ী বউদির মারফতও করেছে, কিন্তু বউদি তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি—

দিন গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে। কিন্তু বিমলার এতটুকু খেদ এতটুকু পরিতাপ দেখেনি কেউ। তার চলন-বলন আরো ধীর-স্থির হয়েছে। সমস্ত মুখে এক অনমনীয় সংকল্পের ছাপ এঁটে বসেছে।

একে একে আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে, এম-এ পাস করেছে। মেয়ে-কলেজের শিক্ষয়িত্রী এখন। কপালের সিঁদুরের টিপ সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন, কাছের থেকে লক্ষ্য করলে ঝাঁকড়া চুলের সিঁথির ফাঁকে সূক্ষ্ম শিখার মত একটুখানি সিঁদুর-রেখা চোখে পড়ে। বউদি সুরুচির ধারণা, ওটুকু শুধু পুরুষের সজাগ দৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। নইলে ওটুকুও ঘুচত।

দাদুও উঠে গেছে। নাতবউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও টুকিটাকি এটা-ওটা এনে দিচ্ছে বিমলার হাতে। বিড়-বিড় করে বলছে, সব দিয়ে দে—। হরি-ছাপের নামাবলী এনে দিয়েছে, জপের মালা দিয়েছে, এমন কি লাল কাপড়ে বাঁধানো হাত-পাখাটাও এনে দিয়েছে। বৈদ্যুতিক হাওয়া বরদাস্ত হত না ঠাকুমার, গরমে শিথিল হাতে ওটাই নড়ত। নিষ্প্রভ চোখে দাদু এ-ঘর ও-ঘরের আনাচ-কানাচ দেখছে—আর কি দেবে। এত কালের সঙ্গিনীর প্রতি অভিমানে তার গলা পর্যন্ত বুজে আছে, কাছে এসেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকছে।

বউদি চাদর দোসুতি জামাকাপড় যা দিয়ে যাচ্ছে, আড়ষ্ট হাতে বিমলা সেগুলো তবু শয্যার চারদিকে গুছিয়ে রাখছিল, কিন্তু দাদুর দেওয়া এই-সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিসগুলোর স্পর্শ বিচিত্র লাগছে তার। অস্বাভাবিক উষ্ণ, অস্বাভাবিক জীবন্ত লাগছে। জীবনের এই আঁচের সঙ্গে কত কালের কোন্ সত্তার যোগ যেন। কি এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বিমলার। মৃত্যুর প্রলেপ-মাখানো এই সমাহিত সামঞ্জস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিক তত বড়ই একটা অসংগতি-বোধ নিজের অন্তস্থল ভেদ করে গুমরে উঠতে চাইছে।

ওধারের ঘরে দিদিমার কাঠের সিন্দুক খুলে বসেছে বউদি। দাদুর কথায় দেখতে গেছে মহাযাত্রিনীর সঙ্গে দেবার মত আর কি আছে। ঘাড় গুঁজে দাদু আবার এগিয়ে এলো, বিমলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এটাও দিয়ে দে।

জিনিসটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত বিষম একটা ঝাঁকুনি খেল। সমস্ত সত্তা, সমগ্র অস্তিত্ব, সর্বাঙ্গের অণু-পরমাণু নাড়িয়ে দেবার মতই প্রচন্ড ঝাঁকুনি। তারপরেই আড়ষ্ট কাঠ একেবারে।

দিদিমার সাবিত্রী সিঁদুর-কৌটো।

কৌটো হাতে দিয়ে দাদু চলে গেল। বিমলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, নিস্পন্দ, চিত্রার্পিত। এরই তলায় তলায় কিছু একটা বিচিত্র কান্ড ঘটে যাচ্ছে। কি ঘটছে বিমলা জানে না, কি করছে সে, তাও না।

কতক্ষণ গেছে হুঁশ নেই। বউদি সুরুচি ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বিমলা তাকে দেখেছে কিনা সন্দেহ। দাদা অনুপম ফিরে এসেছে, হতচকিত বিস্ময়ে নির্বাক সেও। বিমলা তাকেও দেখেছে কিনা সন্দেহ। দরজার ওধারে বিভ্রান্ত মূর্তির মত ছেলেমেয়েগুলো ভিড় করে আছে। বিমলা তাদেরও লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ।

বিমলার একটা হাত সিঁদুরে লালে লাল। সেই হাত নিজের শাড়িতে ঘষেছে কখন, শাড়িতে চাপটা চাপটা সিঁদুর। সেই হাত নিজের মুখে লেগেছে কখন, মুখে গালে সিঁদুর লেগে আছে। আর সেই হাত নিজের কপালে লেপেছে কখন, সমস্ত কপাল সিঁদুরে মাখামাখি।

অন্য হাতের চেতনাশূন্য শক্ত মুঠিতে কৌটোটা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা।

॥ আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপে

মহাশয়,

আমি সাধুবাদ জানাতে চাই 'জৈমিনি'কে, যাকে বলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে। তথাকথিত আধুনিক চিত্রশিল্প সম্পর্কে তিনি একেবারে স্পষ্ট খোলাখুলি এমন কতকগুলি রূঢ় সত্য কথা বলেছেন যার জন্য ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। সবচেয়ে আমাদের আকর্ষিত করে চিত্রসমালোচক আখ্যায় ভূষিত আজকাল যে এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের আসরে আগমন হয়েছে, তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে এ'র নির্ভিক সত্যভাষণ; ইনি ঢাল দিয়ে এ'দের না ঢেকে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং দুটো হাত থাকলেই যে চিত্রকর হওয়া যায় না, তেমনি লেখনী ধারণ করার শক্তি থাকলেই যে সুযোগ্য সমালোচক হওয়া যায় না সেই কথা ঘোষণা করে এবং তথাকথিত "শিল্প-সমালোচকরা যা বলেন এবং লেখেন সেইটেই হল সবচেয়ে মজার ব্যাপার" এই আশ্চর্য-রহস্য উন্মোচিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন, বলে আমি কর-কম্পন করতে চাই এ'র সঙ্গে।

আমরা যারা দুটি চক্ষু দিয়ে বিশ্বের কিছুটা সৌন্দর্য-আহরিত করতে চেষ্টা করেছি, তারা অন্যদের রসগ্রাহী

মতামত
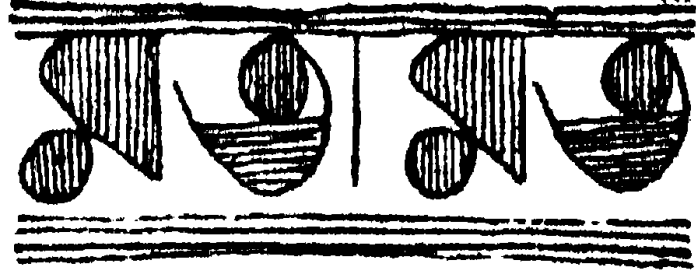
চিত্রের কাছে পৌঁছে দেবার লোভও সম্বরণ করতে পারি না। কারণ art is not only creation but also communication. তাই আমরা চিত্র-প্রদর্শনী করতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াতে উৎসাহী হই। এখানে লোকসানের ভয়টাই বেশী; তার কারণ এখনও এদেশে ছবি কেনাটা বোধ-হয় মূঢ়তারই পরিচায়ক মনে করেন ধুরন্ধর ব্যক্তির'। ছবি আবার কেন কিনব? বড়জোর দয়া করে দেখতে পারি, এমনই মনোভাব নিয়ে কিছু আপ্‌টুডেট বুদ্ধি-জীবীরা ভ্রমণে বার হন সন্ধ্যার ক্ষণিক অবসরে চিত্র-প্রদর্শনীতে। এ'দের দল নিজেরা ছবি বোঝেন না কিন্তু! এ'দের বুঝিয়ে দিতে হয়, এবং এ'রা সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রের চিত্রসমালোচক কি বলছেন কোন কোন ছবির উল্লেখ করেছেন, ক্যাটালগ দেখে তাই মেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ'দেরই জন্যে দরকার চিত্র-সমালোচকদের। আমরা যারা ছবি আঁকি, আমাদের জন্যে নয়। ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে সেতুবন্ধন করবার জন্যেই এবং প্রচার ও বিজ্ঞপ্তির জন্য দ্বারস্থ হতে হয় চিত্র-সমালোচকদের, অম্লান-বদনে গিলতে হয় এ'দের মতামত, সহ্য করতে হয় এ'দের ওস্তাদী। এটা আত্ম-সম্মানজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই নিতান্ত অপমানজনক। ফটো-গ্রাফী উদ্ভাবিত হবার পর থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সাররিয়ালিসট আর্ট-এর নামে যে অদ্ভুত খামখেয়ালীপনা শিল্প বলে চলছে, তারও প্রশস্তি-রচনা করছেন অদ্ভুত সখ্যতায় এইসব শিল্প-সমালোচক; ভাগ্যান্বেষী শিল্পী ও স্বার্থপর লেখকের একটা দুরভিসন্ধিযুক্ত আঁতাতের ফলেই যে এটা সম্ভব হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। সুযোগসন্ধানীরা চিত্রকর সেজে হাত বাড়িয়েছেন হঠাৎ-সমালোচকের দিকে। মজাটা হল এই যে দুর্বোধ্য অথবা সত্যিই অবোধ্য একটা কিছু ক'রে তাঁরা ব্যাখ্যা দিতে সুবিধা দিচ্ছেন চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী লেখকদের—যাঁদের পেশা কাগজের জন্য রিপোর্ট সংগ্রহ করা, শিল্পের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ তাঁদের আছে কি-না সন্দেহ। রং তুলির ধার ধারেন না এ'দের অনেকেই। কি দিয়ে ছবি আঁকতে হয়, Creative process টা যে কি, তার প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতাই নেই এ'দের অধিকাংশ ব্যক্তির। অতএব নীলবর্ণ ক্যানভাস অথবা ছুরির খোঁচা কন্টকিত একখণ্ড সাদা দেয়ালের মতো বক্তব্যহীন চতুষ্কোণ একটা কিছুর ব্যাখ্যা দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এ'রা; সেই ব্যাখ্যাগুলিও অধিকতর চমকপ্রদ বলেই
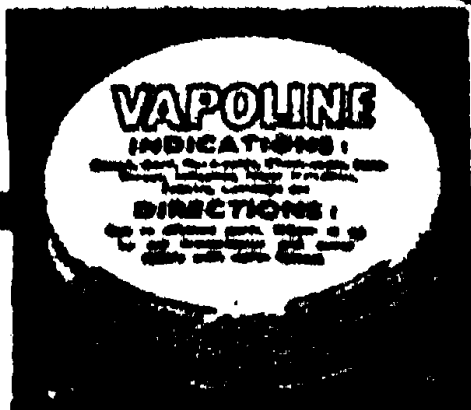
পরিবেশিত হয় এইজন্য, যে এ'রা সত্যিই শিল্পকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতার অধিকারী নন। অতএব ভাসা-ভাসা একটা কিছু বিভ্রমসৃষ্টিকারী চটকদার কথার সঙ্গে পশ্চিমী কলা-সমালোচকদের অভিমতের উদ্ধৃতি দিলেই হল! সাধারণ পাঠক তাতে সহজেই ঘাবড়ে যেতে পারেন।

এই অশুভ আঁতাতের, এই ভিসাস সার্কেলের, বদল হওয়া যে নিতান্তই দরকার, এই বিষয়ে জৈমিনী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আবার তাঁকে সাধুবাদ জানাই। না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে সকল সত্যিকারের শিল্পীদেরই। ইতি—দিলীপ রায়, কলিকাতা-২৯।

॥ 'আলকাপ' প্রসঙ্গে ॥

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, 'অমৃত' সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

৪২শ সংখ্যা 'অমৃতে' শ্রীধ্রুব পাণ্ডার 'বীরভূমের আলকাপ' রচনাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। বাংলার গ্রামীন লোকনাট্যচর্চায় আঞ্চলিক অবদান হিসেবে 'আলকাপের' মূল্য তিনি কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি ত্রুটি নজরে পড়েছে বলে এই চিঠির অবতারণা।

প্রথমতঃ নবান্ন উৎসব উপলক্ষে 'আলকাপ' সৃষ্টি হওয়া। 'আলকাপ' খুব পুরনো যুগের নয়। তাছাড়া নবান্ন উৎসব উপলক্ষেও এর সৃষ্টি নয়। পালায়-পার্বণে বা উৎসব উপলক্ষে লোকসমাজে 'সঙ' অভিনীত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই একটা উন্নত ও স্থায়ী রূপ 'আলকাপ'। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'আলকাপ' গানের সঙ্গে প্রায় ছ'বছরের বেশী সময় ধরে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাতে যা বুঝেছি, এ পালাগান এসেছে পদ্মাপারের উত্তরবঙ্গ থেকে এবং এ হিসেবে শ্রীপাণ্ডার মতঃ আলকাপ অর্থাৎ 'আওল' (বা আওলা) বা এলোমেলো কৌতুকনাট্য, যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়। 'আওলা' (এলোমেলো অর্থে) শব্দের প্রচলন পদ্মাপারের বলে জানি। তবে আলকাপের ওস্তাদেরা এর অন্য অর্থ করে থাকেন। 'আল' অর্থে তাঁরা বলেন, মৌমাছির হুল এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে আলকাপ ব্যঙ্গধর্মী নাট্যকলা। এবিষয়ে শ্রীপাণ্ডা বরং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসটি পড়তে পারেন।—যাতে উত্তর-বঙ্গের আলকাপকে পটভূমিকা তথা বিষয়বস্তু করা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে আলকাপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আলকাপ নিছক কৌতুকনাট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গনাট্য। 'বৈতালিকে' পুরনো দিনের আলকাপের যে রূপ পাচ্ছি, তা 'বিদ্রোহী'র, কতকটা বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন এক ধরণের সামাজিক আন্দোলনের শিল্পরূপ। আর ব্যক্তিগত-ভাবে আমার অভিজ্ঞতা একে সমর্থন করে। আলকাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঘরকন্না-সমাজ সংসারের (এবং যুগেরও) প্রচলিত রূপকে ব্যঙ্গের আঘাতে স্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়াস। শ্রীপাণ্ডা যে-দলের গান শুনেছেন, সম্ভবতঃ সেটি বা সেগুলি কোন প্রতিনিধিমূলক দল নয়। আলকাপের নাট্যরীতি বা আঙ্গিক সত্যি বস্তুবাদী এবং বৈপ্লবিক। কেননা কোন লিখিত নাটিকা নেই; ঘটনাটি প্রত্যেক অভিনেতার জানা থাকে মাত্র। ফলে পরস্পরের ক্ষমতা অনুযায়ী টিমওয়ার্কের গুণে এর রূপ বিচিত্র ধরণের হয়ে থাকে। গুণাগুণ নির্ভর করে অভিনেতার মেধা ও অভিনয়ক্ষমতার উপর। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি যে সমাজতত্ত্বের অনেক বিচিত্র সত্য ও তাৎপর্য আলকাপের নাট্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট পরিসর না থাকায় সে-আলোচনা করতে পারছিনে। তৃতীয়তঃ যে কোন কাপ বা নাটিকায় মোড়ল থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নাটকের চরিত্র, নানাধরণের হয়ে থাকে। 'অমৃতে' যে কাপটি উধৃত হয়েছে, আমার মতে, ওটিতে আলকাপের 'কাপের' রীতি-প্রকৃতি আদৌ ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। আদতে কোন কাপই লেখার গণ্ডীতে বাঁধা যায় না। ঘটনা নিছক উপলক্ষ্য মাত্র। রূপ পায় অভিনেতাদের ক্ষমতামতো। আলকাপের ছড়াগুলিতে ও সমাজবোধ ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ছড়ানো। দেশের সমসাময়িক সমস্ত সমস্যাই আলকাপে প্রতিফলিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অভিনেতাদের মূল যিনি—যাঁকে 'সঙদার' 'সঙাল' বা কাপ বলা হয়, তাঁর মেধা ও অভিনয়ক্ষমতার উপরই আলকাপের ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্যরস, এককথায় রূপের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে।

আলকাপ মূলতঃ উত্তরবঙ্গের ... এদেশে অর্থাৎ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে একে ছ্যাঁচড়াও বলা হয়। উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ মালদহের আলকাপ বিখ্যাত। মালদহের রহিমপুর নিবাসী কোন এক নাপিত 'বোনা কানা' তাঁকেই আলকাপ ওয়ালারা আলকাপের জনক বলে থাকেন। ক'বছর আগে বীরভূম মুর্শিদাবাদের প্রতিটি গ্রামে দুটি-একটি করে আলকাপ দলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পালা-পার্বণে উৎসবে 'যাত্রার' বদলে 'আলকাপের' রেওয়াজ চালু হয়েছিল। নানা কারণে ইদানীং আলকাপের প্রাচুর্য আর নেই। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা।

স্বল্প-পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়। শ্রীপাণ্ডাকে অনুরোধ জানাচ্ছি এবিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আলকাপ দুটো দলে মিলে হয়—শ্রীপাণ্ডার এ ধারণাও ভুল, তা শুধু 'বৈতালিক' উপন্যাসে যে প্রথম যুগের আলকাপ দেখতে পাচ্ছি, তাতেই বোঝা যাবে। এখনো মালদহ দল বা এদেশের অনেক খ্যাতনামা দলগুলোও একা একা গেয়ে থকে। আমার অভিজ্ঞতাও তাই। ভাল দলের গান লোকে একদলেই শুনতে চায় সাধারণতঃ।

পরিশেষে জানাই, আমার ধারণা আলকাপ যেন লোকসমাজের এক ধরণের মানসমুকুর—যাতে প্রতিফলিত হয় কেবল তার আদত রূপ, স্ববিরোধী হাস্যকর এবং যৌকীদ্ব দিয়ে ভরা আচরণের সত্য প্রতিমূর্তি। আর এরই ফলে আলকাপের জনপ্রিয়তা যত আত্যন্তিক, একে নোংরা বলে ঘৃণা করে নিন্দাবাদেও তত পঞ্চ গ্রামীন লোকসমাজ। ইতি—

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
মুর্শিদাবাদ।

সাহিত্য সমাচার

প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষাসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীকে সাহিত্য আকাদামির পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে মোট ১৩টি গ্রন্থের গ্রন্থকার পুরস্কৃত হয়েছেন। আকাদামির একটি কার্যনির্বাহক সমিতি বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলির উৎকর্ষের ওপর ভিত্তি করেই এই পুরস্কার দান করে থাকেন। আকাদামির সভাপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' এবার আকাদমি পুরস্কার লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খ্যাতিমান অধ্যাপক প্রবন্ধকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং শিশু-সাহিত্য রচয়িতা হিসাবেও প্রখ্যাত। বাঙলা দেশের মানুষের চোখে তাঁর পরিচয় মনীষী-পণ্ডিত হিসাবে। পূর্ববাঙলার সন্তান এই মানুষটি ছাত্রাবস্থা হতে অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার দ্বারা নিজেকে গড়ে তোলেন। তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে আসছেন এবং Obscure religious cult in Bengali Literature এর জন্য পি-এইচ-ডি এবং An Introduction to Tantrik Buddhism এর জন্য পি-আর-এস-গৌরব লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ডঃ দাশগুপ্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে আছে, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে', 'বৌদ্ধ-ধর্ম ও চর্যাগীতি', 'ত্রয়ী', 'শিল্পলিপি', 'নিরীক্ষা', 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ'। 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস', 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' Aspects of Indian Religious thought 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক' 'সাহিত্যের স্বরূপ' 'উপমা কালিদাসস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধধর্মী গ্রন্থ; 'জংলা মাঠের ফসল' নামক উপন্যাস; 'নিশা ঠাকুরের কচড়া', 'এপারে ওপারে', 'সীতা' ও 'দিনান্তের আগুন', 'রাজকন্যার ঝাঁসি' প্রভৃতি কবিতার ও নাটকের বই। 'শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে', 'ছুটির দিনে মেয়ের গল্প' প্রভৃতি ছোটদের বই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। শীঘ্রই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থটির নাম, 'টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ'।

অন্যান্য যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন,— শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য— 'ইয়ারুইঙ্গম' (অসমীয়া); শ্রীরামসিংজী রাথোড়— কাহ্নান সংস্কৃতি দর্শন' (গুজরাটী); শ্রীভগবতীচরণ বর্মা—'ভুলে বিশরে চিত্র' (হিন্দী); শ্রীএ আর কৃষ্ণশাস্ত্রী—'বাঙ্গালী কাদম্বরীকার বঙ্কিমচন্দ্র' (কানাড়ী); শ্রীরহমন রাহী— 'নৌরোজ-এ-সবা' (কাশ্মিরী); শ্রীডি এন গোখলে—'ডঃ কেতকার' (মারাঠী); পরলোকগত পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র—'অর্ধশতাব্দীর উড়িষ্যা তানহিরে মো স্থান' (ওড়িয়া); শ্রীনানক
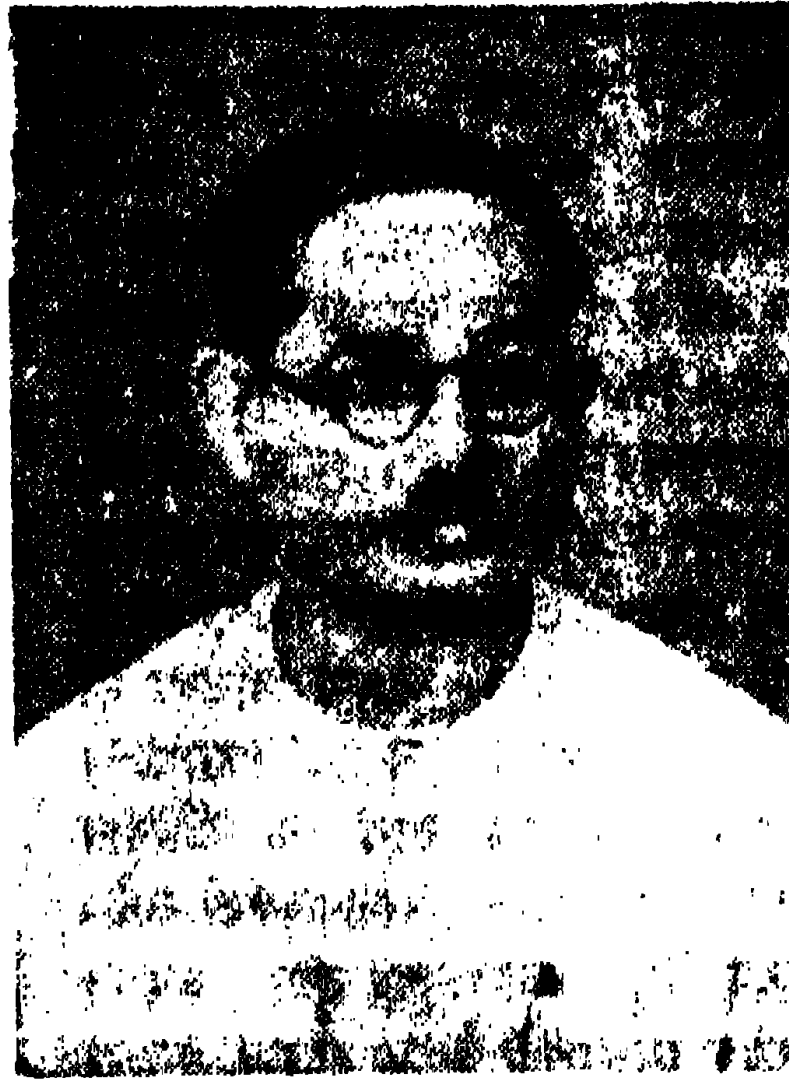
ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত

সিং—'ইক মিয়ান দো তালওয়ারান' (পাঞ্জাবী); মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা চতুর্বেদী—'বৈদিক বিজ্ঞান অউর ভারতীয় সংস্কৃতি' (সংস্কৃত); শ্রীএম বরদারাজন—'আগল ভিলাক্কু' (তামিল); শ্রীবলন্ত রাপু রজনীকান্ত রাও—'আন্ধ্রেরা ভাগ্যোথাকর ডারিএমু' (তেলেগু); শ্রীইমতিয়াজ আলি আর্সি—'দেওয়ান-ই-গালিব' (উর্দু)।

এই শুভ মুহূর্তে আমরা এঁদের সকলের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। তাঁরা আরও দীর্ঘদিন সাহিত্যের সেবা করুন, দেশের জাতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন, এই প্রার্থনাই করব।

আগামী ৩১শে মার্চ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রত্যেক বিজেতাকে পুরস্কারসহ পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক দেবেন।

* * *

অমর রুশ কথাশিল্পী পুশকিনের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান বৎসরে লেনিনগ্রাডে তাঁর ১২৫তম মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করছেন রুশ জনগণ। এই মহান কথাশিল্পীর তিরোভাব-মুহূর্তে সমগ্র জাতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

ভলতেয়ার প্রসঙ্গে পুশকিন বলেছিলেন যে এই মহান শিল্পীর লেখনী উত্তরকালের সাধকদের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ রেখে গেছে। একথা পুশকিনের সৃষ্টি সম্পর্কেও সত্য। একালের ইতিহাসের পাতায় পুশকিনকে আমরা অতীতের মানব বলতে পারি না। তাঁর লেখনী ভাবীকালের মানুষের জন্য অক্ষয় চিরন্তন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে গেছে, সত্যের শাশ্বত রূপাংকন করে গেছে।

• • •

'আকাদমি অব সাইন্সেস অব দি ইউ, এস, এস, আরে'র রুশ সাহিত্য বিভাগে পুশকিন সম্পর্কিত বহু তথ্য আছে। পুশকিনের স্মৃতিবিজড়িত লেনিনগ্রাডে এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠক, শিল্পী নাট্যপ্রযোজক, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং ছাত্র প্রত্যেকের পক্ষেই এটি একটি দর্শনযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। এখানে এমন একটি তালিকা আছে যার থেকে পুশকিনের জীবিতকালে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিবরণ পাওয়া যাবে। ১৮৮০ সাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত পুশকিন সম্পর্কে আলোচিত রুশ ও অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রাদির নানাবিধ কাটিং সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। এমনকি প্রায় এক-শতাধিক ভাষায় অনূদিত পুশকিনের বিভিন্ন গ্রন্থের নমুনা আছে।

• • •

জাপানী ভাষায় অনূদিত 'দি ক্যাপটেনস ডটার' গ্রন্থটি অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। কারণ সমগ্র গ্রন্থটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময় জাপানী পদ্ধতিতে চিত্রিত। ইথিয়োপিয়ান ও আইসল্যান্ডিক অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদও রয়েছে। পুশকিনের বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও আছে। এগুলি মহামূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি। পুশকিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের যে সমস্ত বই এখানে রয়েছে তার অধিকাংশে আছে তাঁর দেওয়া ফুটনোট। রুশ ও বিদেশী গবেষকদের নানাবিধ কার্যে সংগৃহীত দ্রব্যাদি এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ষোল ॥

'সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন' পৃথিবীর বহু দেশের লেখক-লেখিকাকে আমন্ত্রণ ক'রে তাঁদের দেশে নিয়ে যান্। ও'রা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য অতিথির সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করেন। আহারাদি, ভ্রমণ, বসবাস, যানবাহন, এমন কি সিগারেটটিও ও'রা যুগিয়ে দেন্। এ ছাড়া অতিথির পক্ষে যেটি প্রথম প্রয়োজন,—সেই দোভাষী একজন সদাসর্বদা মোতায়েন থাকে। অতিথিমাত্রই ওদেশে নারায়ণ, শালগ্রাম,—তাঁর গলায় সোনার পৈতা! তাঁর পূজা না ক'রে কেউ জল খাবে না। তাঁকে দর্শন ক'রে যাবে সবাই, নৈবেদ্য উপচার দেবে বহু লোক বা সংস্থা। তাঁর নাম ছাপা হবে নিমন্ত্রিতের তালিকায়। নবাগতের আসরে তাঁর প্রচুর অভ্যর্থনা। তাঁর ছবি ছাপা হবে কাগজে। তাঁর ইণ্টারভ্যু নিতে আসবে সাংবাদিক। তিনি একদিনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠবেন!

যিনি অতিথি নন্ তিনি শালগ্রামও নন্, তিনি শুধু পাথরের নুড়ি! তিনি পর্যটক মাত্র। তিনি ছড়িয়ে-গড়িয়ে বেড়ান পথে পথে। তিনি নিজের দায়িত্ব নিজে নেন্ এবং অবিলম্বেই বুঝতে পারেন, জীবনযাত্রা কি প্রকার ব্যয়বহুল। আমি নিজে মোট পাঁচ দিনের জন্য শালগ্রাম থেকে এই প্রকার 'নুড়িতে' পরিণত হয়েছিলুম। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল থাকায় এবং একটি দোভাষিণীর সহযোগিতা পাওয়ায় আমার পথ দুর্গম হয়নি। পর পর দুই বছরই সোভিয়েট লেখক সংঘের কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি বিশেষ যত্নশীল এবং সহৃদয় ছিলেন। সামাজিক জীবনে তাঁদের সৌজন্য এবং অমায়িকতা বিশেষ স্মরণীয়। দ্বিতীয় বছরে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজ অর্থব্যয়ে মস্কো রওনা হই।

সোভিয়েট লেখক সংঘের কর্মধারা আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করি। সরকারি আপিসের মতোই তাঁদের কর্মব্যবস্থা, এবং নানা বিভাগে সেই কর্ম-প্রণালী বিভক্ত। পৃথিবীর বহু দেশের বহু ভাষাভাষীদের সঙ্গে এ'দের যোগাযোগ। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এমন কি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও এ'রা সংযোগ রক্ষা করেন। সংখ্যাতীত ভাষার সঙ্গে এই সাহিত্যিক যোগাযোগ থাকার জন্য দোভাষীর সংখ্যাও এ'দের প্রচুর। গ্রীক, হেব্রু, চীন, জাপান, তুর্ক, ইতালীয়ান, বিভিন্ন আফ্রিকান ও মিসরী, —এসব ভাষা-জানা লোক এই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। ভারতবর্ষের আছে তামিল ও হিন্দি—অর্থাৎ একটি উত্তরের, অপরটি দক্ষিণের। জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে এ'দের নিকট 'রাইটার্স ডেলিগেশন' আসে, এবং এ'দেরই তত্ত্বাবধানে আতিথ্য গ্রহণ করে। এ'দের পছন্দমতো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ রুশভাষায় অনুবাদ করা হয়, কিন্তু তার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে লেখককে রয়েলটি দেওয়া হয় না। কেননা এ'রা 'জেনেভা কপিরাইট কন্ভেনসনের' অন্যতম দরখাস্তকারী নন্। সম্প্রতি সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের চেষ্টায় মস্কো আপিসেরই পাশে একটি বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে, যেটির নাম হল 'রাইটার্স ক্লাব'। এর পুরনো অংশটা যথারীতি জার আমলের জনৈক ধনীর সম্পত্তি। এই সুদৃশ্য অট্টালিকার মধ্যে মস্ত বড় আপিস, নাচগানের হল, সিনেমা ও নাট্যমঞ্চ, মস্ত ভোজনাগার, গল্পগুজবের জন্য লাউঞ্জ, বহু লেখকের পক্ষে সপরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা,—এগুলি একে একে দেখে চমৎকৃত হতে হয়। লেখক সংঘ এই অট্টালিকার জন্য এক কোটি রুবলেরও বেশি খরচ করেছেন।

সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের যাঁরা সভ্য তাঁরা হলেন, "men of letters—prose writers, poets, play - wrights, scenario-writers, critics and translators—who by their creative endeavours are taking an active part in building Communist Society may be members of the Union of Soviet writers."

লেখক বা লেখিকারা সাধারণত কি লিখছেন, কি লিখবেন, অথবা তাঁদের কিরূপ লেখা উচিত, এটি নিয়মিত পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা এই সঙ্ঘের অন্যতম কর্তব্য। সেইজন্য প্রত্যেক সভ্যের উপর এইরূপ নির্দেশ আছে, "to take part personally in all cases **when his creative work is discussed in bodies of the Writers' Union and also in cases when action is taken concerning his activities or behaviour..**"

লেখক সঙ্ঘের সভ্য হতে গেলে আগে একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করতে হয়!

সোভিয়েট লেখক সমাজের তৃতীয় কন্গ্রেসের অধিবেশন বসে সুপ্রীম সোভিয়েট পার্লামেণ্টের হলে। সেটি ক্রেমলিনের অভ্যন্তরভাগে। সেখানে বিগত ২৩শে মে, ১৯৫৯ সালে যে "Charter of the Union of Soviet Writers" অনুমোদিত হয়, সেইটি আমি এই সূত্রে ব্যবহার করছি। তারই কয়েক ছত্র এখানে আমি পুনরায় উদ্ধৃত করি, কেননা সোভিয়েট সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রকৃত স্বরূপটি এতে আমাদের জানবার সুবিধা হবে: "Soviet literature's role in the bringing about of social changes and as an educative force is enhanced immesurably in the new historical conditions, in the period of comprehensive building of Communism in the U. S. S. R. Its lofty mission is to fecilitate the shaping of the man of Communist Society, to reveal in the best possible artistic form life's truth, the advance towards Communism—the main content of our epoch — and the grandeur and beauty of the Communist ideals which are being translated into reality by the Soviet people under the leadership of the Communist Party."

"......and also of world literature in all the wealth and diversity of national forms creatively mastering M a r x i s m - Leninism which endows the artist with the ability to see life's truth in all its complexity and profundity. Soviet Writers are guided by the Leninist party spirit, which constitutes the

highest form of art's kinship with the people."

"The tasks of the Union are: consistent ideological struggle for the principles of Socialist realism, against all types and forms of bourgeois influence, including revisionism as the chief danger to the development of literature and literary theory — and against dogmatism, sectarianism and vulgarisation ......"

"চার্টার" শব্দটির বঙ্গার্থ ঠিক কি প্রকার হয় আমার অজ্ঞাত। নিয়মাবলী, সনন্দ, শাসননীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা-পত্র,—কোন্‌টা বলব বুঝিনে। তবে আমার মতো যারা বিস্তৃতভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করেছে, তারা বলবে, চার্টার শব্দটির বঙ্গার্থ, শাসননামা! এই চার্টারের প্রায় প্রতি ছত্রের প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহারের অন্তরালে একটি বিশেষ নির্দেশ এবং প্রচ্ছন্ন শাসন ও তিরস্কার নিহিত রয়েছে, এটি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সোভিয়েট লেখক এরই প্রভাবে 'আজন্ম' মানুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ করবেন, এরই ভাবনায় ভাবিত হয়ে লিখতে বসবেন, এবং এরই হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে তিনি 'স্বাভাবিক' পরিণতি লাভ করবেন! সোভিয়েট লেখকদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরও বেশি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না। তার ফলে রুশ সাহিত্যের বাইরে তাঁদের গতিবিধিও কম। কিন্তু ইংরেজি বা ফরাসী বা জর্মাণ যারা যৎকিঞ্চিৎ জানেন, তাঁদের পক্ষে অসুবিধা এই—বাইরে থেকে বই, ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র সোভিয়েট ইউ-নিয়নে আসে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীতে কোথাও সোভিয়েট সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, এটি তাঁদের পক্ষে জানার সুযোগ কম। বড় বড় লাই-ব্রেরীতে যদি বাইরে থেকে বই আসে, তবে তাদের থেকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়, কোন্‌ কোন্‌ বই সোভিয়েট নাগ-রিকের পক্ষে পাঠ্য। সেই সকল পাঠ্য বইগুলির তালিকাই যথাসময়ে পাঠকদের সামনে পেশ করা হয়।

'সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের' শাসন-নামার সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির অবি-চ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গী যোগ বর্তমান। রাষ্ট্র, পার্টি এবং লেখক সঙ্ঘ সেখানে পরিপূর্ণভাবে একাকার। 'মার্কসিজম-লেনিনিজম' নামক বিদ্যুৎশক্তির জোরে যে বিরাট যন্ত্রের চাকাটা ঘুরছে, লেখকরা হলেন তার 'নাট্‌-বল্টু'। এই যন্ত্রের কাজ হল, নিখুঁৎ কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টি করা। এবম্বিধ সমাজ—যেখানে মানুষের সর্বপ্রকার ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরা-পত্তা-উন্নততর জীবন-ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবেই প্রতিশ্রুত—সেই সমাজ-সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজনীয় সাহিত্য সৃষ্টি! মানুষকে বিশেষ একটি নীতির প্রভাবে গ'ড়ে তোলবার যে 'মহৎ' দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালনের কাজে প্রধান উপকরণ হল, সাহিত্য। নৈলে সাহিত্যের দাম কত-টুকু? সাহিত্য আলস্য বা বিলাসের সৌখীন সামগ্রী নয়! সাহিত্য জীবনেরই একটা অঙ্গ, প্রয়োজনেরই একটা উপাদান, —অন্ন, বস্ত্র এবং শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যেরও পরম ইউটিলিটি! সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্য হল 'সোসালিস্ট রিয়-লিজমের' একটি প্রধান উপকরণ।

ছয়টি পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের শেষ দিকে এবং সপ্তবার্ষিক যোজনার প্রথম বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি উপ-স্থিত ছিলুম। 'সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ' এই যোজনাগুলির সঙ্গে বিজড়িত। তাঁদের শাসনাধীন বিশিষ্ট লেখকরা কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশক্রমে এমন সাহিত্য রচনা করেন যেগুলি যোজনা-সাফল্যের কাজে লাগে। বলা বাহুল্য, লেখক সঙ্ঘ কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি অঙ্গ। একটি অন্যটির থেকে পৃথক নয়। যোজনার কর্মপ্রণালী অনুযায়ী যেখানে যত কাজ চলছে, সর্বত্র লেখকরা যাতায়াত করবেন—এটি লেখক সঙ্ঘের নির্দেশ। প্রত্যেক রিপাবলিকের লেখকরা প্রত্যেক রিপাবলিকের 'যোজনার' সঙ্গে নিজে-দেরকে যুক্ত করেন। এর ফলে এই হয়, লেখকদের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। লেখকরা এক 'সমাজ' থেকে ভিন্ন সমাজে, এক 'রাষ্ট্র' থেকে অন্য রাষ্ট্রে, এক 'সম্প্রদায়ের' থেকে অন্য সম্প্রদায়ে,—অর্থাৎ সোভিয়েট দেশ-গুলির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে চলাফেরা করার সুবিধা পান। তাঁদের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যয়ভার বহন করেন লেখক সঙ্ঘ। এমনি করে পনেরোটি রিপাবলিকে তাঁরা অবারিত ভাবে ঘুরে বেড়ান। কোথাও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার কাজ চলছে, সেখানে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে গেলেন! এমনি করে তিনি খনিতে গিয়ে ঢুকলেন, নয়ত গেলেন জাহাজ নির্মাণের কারখানায়, আর নয়ত কলেক-টিভ ফার্মে। কোনও লেখক গেলেন মরুভূমিতে, কেউ পামীরে, কেউ মেরু-সাগরের প্রান্তে, কেউ কামস্কাটকা কিংবা শাখালিনে! সকল জায়গা থেকে চলিত জীবনের ছবি তুলে আনা, নতুন ভাষ্য তুলে ধরা, নতুন উৎসাহের কথা বলা, নবতন অধ্যবসায় ও কর্মশক্তিকে অনু-প্রাণিত করা! নৈরাশ্য, হতাশা, দুঃখ, ব্যর্থতা বা বেদনাবোধ,—এগুলি সোভি-য়েট সাহিত্যে থাকার উপায় নেই,—কারণ এগুলি জীবনের আকাশে উড্ডীন মেঘ-ছায়ার মতো! সূর্যালোক হল সত্য, মার্কসিজম-লেনিনিজম সত্য, এবং সোসা-লিস্ট রিয়লিজম সত্য! অন্য সত্য নেই, কারণ—থাকতে পারে না। সোভিয়েট সাহিত্য জমিদারকে কখনও 'সহৃদয়' চরিত্র বলেনি, ধর্মযাজককে কখনও সংপ্রকৃতি বলেনি, বেশ্যাকে কখনও মধুর-চরিত্রা বলেনি, এবং লম্পট কখনও তার গল্পের 'হিরো' হয়নি। যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে নিজের 'অপরাধের' প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সে জাতে উঠেছে! সোভিয়েট কাব্যে বেদনা বা কান্নার শব্দ শোনা যায় না! কান্না মানেই দুঃখ, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, অনাচার, ব্যর্থতা, বেকারবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, দারিদ্র্য এবং শূন্যতাবোধ। কবিতায় কান্না এবং উপন্যাসে বিয়োগান্ত পরিচ্ছেদ,—এগুলি জন্মায় ক্যাপিটালিস্ট সমাজে, যেখানে শুধু রচনার কৌশলে এগুলি মনোহর এবং বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পক্ষে চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে! সাহিত্যে যৌন-আবেদন এবং অশ্রু বা নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসকে 'এক্সপ্লইট্‌' করে ক্যাপিটালিস্ট দেশের প্রকাশকরা ধনী হয়। বঞ্চিত এবং বুভুক্ষিত সমাজ কান্নার জন্য প্রস্তুত থাকে বলেই 'কাঁদুনে' সাহিত্যের ওপর তাদের ঝোঁক। বুর্জোয়া লেখকরা এই নৈরাশ্য এবং দুঃখবাদকে ভাঙ্গিয়ে ক'রে খায়! দেশ যত বেশি অনগ্রসর তার সাহিত্যে তত বেশি কান্না! দেশ যত বেশি নৈরাশ্যে ভরা, তার কাব্য তত বেশি প্রণয়াশ্রুজড়িত। সোভিয়েট কাব্যে অশ্রু কম, এবং সোভিয়েট উপন্যাসে বিচ্ছেদ-বিয়োগের সুর আরও কম। সোভিয়েট গল্পে বিদ্বেষপরায়ণ 'প্রেমিককে' সমাজ-শত্রু, এবং কোনও 'নায়ক' তার কর্মস্থলের চারিদিকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখেশুনে যদি কেবল নৈরাশ্যের কথা বলতে থাকে তবে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ধরে নেওয়া হয়! সোভিয়েট উপন্যাসে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কারবার, স্বামীকে লুকিয়ে স্ত্রীর পক্ষে অভিসারে যাওয়া, কুমারী মেয়েকে অগাধ জলে ভাসিয়ে পালানো, ভালবাসা নিয়ে অস্বাস্থ্যকর বিতর্ক বা কান্নাকাটি, বেকার অবস্থার পরিচয়, লম্পট পুরুষ বা মেয়ের প্রতি

স্নেহপ্রকাশ, জনগণকে বাদ দিয়ে একজনের প্রচারকার্য—এগুলি অশুদ্ধ চিন্তার পরিচয়! ওরা চাইছে সবল, সুস্থ, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রফুল্ল এবং উন্নতিশীল সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শুনতে। ওদের দেশের কলেকটিভ ফার্মের চাষীরা যদি উদ্দীপনার অভাবে উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করতে কোথাও পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে ঔপন্যাসিকদের ওপর অনেকটা দোষ চাপে! দেশের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে লেখকের দায়িত্ব জড়ানো।

সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের এই চার্টার বা শাসননামা মেনে নেননি, এমন একজন লেখককেও আমি দেখিনি! এই শাসননামা স্বীকার ক'রে নিয়ে কবি পাস্টেরনাকও ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর অবধি লেখক সঙ্ঘের সভ্যতালিকাভুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর দেয় চাঁদাও দিতেন! শাসননামাটি মেনে না নিলে কোনও সাহিত্যকর্মীর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও বাস করা দুঃসাধ্য। তাঁর লেখা ছাপা হবে না কোনও কাগজে মতবিরোধের জন্য। তাঁর বই—যেটিতে তাঁর নিজস্ব বা স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত অথবা যেটি চার্টারবিরোধী,—সে-বই প্রকাশিত হবে না! তাঁকে কেউ সাহিত্যকর্মী বলে স্বীকার করবেন না। তিনি তাঁর অসুবিধার কথা কোথাও প্রকাশ করার সুবিধা পাবেন না। তিনি নিজের বই বা কাগজ প্রকাশ করবেন—এমন কোনও সুযোগও তাঁর থাকবে না। ওদিকে আবার তিনি যদি সমর্থ ব্যক্তি হয়েও ইচ্ছাপূর্বক 'বেকার' থাকতে চান্ অথবা অপরের খরচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চান তবে সেটি বেআইনী হবে! সুতরাং 'নিষ্ফল' সাহিত্যচর্চা ছেড়ে তাঁর পক্ষে ভিন্ন কর্মে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই কর্মকেন্দ্রে গিয়ে যদি তিনি চার্টারবিরোধী প্রচারকার্য করবার চেষ্টা পান্ তাহলে তাঁর কপালে 'লেবার ক্যাম্প'! যতদূর শুনেছি, এই লেবার ক্যাম্প অতি কঠোর কারাগারের শাসন-ব্যবস্থার সমতুল্য। ষ্টালিন-আমলের লেবার ক্যাম্প বা 'ফোর্সড্ লেবারের' অনুকরণে সম্ভবত হিটলার তাঁর 'কন্সেনট্রেশন্ ক্যাম্পের' পরিকল্পনাটি নিয়েছিলেন।

মস্কো থেকে কুড়ি মাইল দূরে 'পেরেডেলকিনো'। এটিকে বলা হয় লেখক-উপনিবেশ। কিন্তু প্রশস্ত পথ থেকে গাড়ি যখন বাঁদিকে বাঁক নিল, দেখি আমরা এক বৃহৎ অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছি। চারিদিকে বার্চ এবং পাইনের ঘন জটলার ফাঁকে ফাঁকে বেশিদূরে কোথাও কিছু দেখা যায় না। তখন অপরাহ্নকাল।

সরু পথ তরঙ্গায়িত। ছোটনাগপুরের বনে বনে যাঁরা শিকারের অন্বেষণে ঘুরেছেন, যাঁরা দার্জিলিংয়ের দক্ষিণে শেবক-এর সুন্দর মসৃণ এবং সংকীর্ণ বনপথে পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরা বুঝবেন কোথায় এলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বৃহৎ বনস্পতি দলের আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়লুম,—যেখানে উইলো, পপলার,

ওক আর পাইনের তলায় তলায় থমথম করছে নির্জনতা। বহু শত বর্গমাইল-ব্যাপী এমন একটি প্রাকৃতিক শোভা-সমৃদ্ধ অরণ্যভূমি সাহিত্যকর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে. এটি সুখের বিষয়। এরই মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় বাগানবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে লেখকদের নিজেদের খরচে। জঙ্গল জটলার ফাঁকে ফাঁকে সে বাড়িগুলি ঠাহর করা কঠিন, তবে মাঝে মাঝে পাঁচিল দেখে অনুমান করে নেওয়া যায়।

'পেরেডেল্‌কিনো'র লেখকরা অনেকটা 'আদুরে ছেলের' মতো। তাদের অভাব কিছু নেই। যার সামান্য শক্তিও আছে, সেও রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়। রাষ্ট্রের হাত থেকে বিনামূল্যে প্রায় চার বিঘা জমি, অকৃপণ ঋণদান, এবং সেই ঋণ পরিশোধের উপায়স্বরূপ গ্রন্থপ্রচারের সহায়তা। 'পেরেডেল্‌কিনোর' প্রত্যেক লেখকের একখানা বা দু'খানা মোটরগাড়ি, বাড়িতে টেলিফোন, ইলেকট্রিক, টেলি-ভিশন,গ্যাস, কলের জল, এবং রসদাদি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা। এক একজনের নামে প্রচুর টাকা স্টেট ব্যাঙ্কে খাটে। লক্ষ লক্ষ টাকা অকেজো হয়ে ব্যাঙ্কে প'ড়ে আছে যেসব লেখকের একাউন্টে, তাঁরা অনেক সময়ে তার খবরও পান না। পাখির পেট ভরা থাকলে তার কণ্ঠের গান মিষ্ট হয় কিনা অতটা ভেবে দেখিনি! 'পেরে-ডেল্‌কিনো' সৃষ্টি হবার পর রুশরস-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিলাভ করেছে কিনা, রুশভাষা না জানার জন্য আমি বলতে পারিনে। তবে ভারতীয় একজন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বন্ধু কিছুকাল আগে আমাকে বলেছিলেন, আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য খুব গৌরবজনক হয়ে ওঠেনি। শ্রীমতী অকসানা একদিন আমাকে বলেছিলেন, বেশ ত, সমগ্র সোভিয়েট আমলে যদি একজনও 'মিখাইল সলোকভ' হয়ে থাকেন, তবে সেইটিই কি যথেষ্ট নয়?

সেটি যথেষ্ট কিনা আমি ভেবে দেখিনি। চূড়ান্ত সম্ভোগের আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা অবারিত থাকলে নাকি সাহিত্যস্রষ্টার মন ভ্রষ্টনীতি হয়, এ ধরণের কথা এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়ায় শুনেছি।

এই 'পেরেডেল্‌কিনোর' উপান্তে একদা হিটলারের নাৎসীবাহিনী এসে হানা দিয়েছিল. তার আনুপূর্বিক কাহিনী এখানে বসেই শুনেছিলুম। চারিদিকের ঘন অরণ্যের ছমছমে নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই উপনিবেশটি আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। ভিতরে ভিতরে দুই তিনটি ডিপার্টমেন্টাল দোকান এবং খাদ্যবিক্রেতাদের সুদৃশ্য স্টল। আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, তার তিন-চারখানা বাগানবাড়ির পরেই পাস্টেরনাকের 'দাচা'। তখন মাত্র সপ্তাহ-খানেক আগে তাঁর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির ঘোষণাটি আমরা শুনেছি, এবং সেই ঘোষণা শোনামাত্র তাঁকে সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত করার আয়োজন চলছিল।

আজ যাঁর কাছে আমাদের আহারের নিমন্ত্রণ, তিনি একজন নামকরা ঔপন্যা-সিক, সাংবাদিক এবং প্রবন্ধকার। এঁর নাম পাভেল্‌ লুকনিৎস্কি এবং এঁর বয়স প্রায় ষাট। ঘরে স্ত্রী আছেন, তাঁর নাম ভেরা, এবং একটি বছর আস্টেকের বালক-পুত্র—তার নাম সেরিওজা। বালকের বয়সের তুলনায় পিতামাতার বয়স কিছু বেশি। অভ্যর্থনার মধ্যে সমাদর এবং আন্তরিকতা এত প্রচুর ছিল যে, একবারও মনে হয়নি আমরা 'পরের' বাড়িতে এসেছি! শ্রীমতী নাটাশা এবং লিডিয়া ছাড়া আমরা ভারতীয় মোট ছয়জন। আমরা যখন ভিতরে ঢুকলুম, তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে।

ছোট্ট একটি বাংলো। পাশাপাশি দুটি ঘর, একটি রিসেপ্‌সন্‌ ঘর, করিডর, রান্নাভাঁড়ার, বাথ, একটি ডাইনিং ঘর,—উঠোনের ওদিকে গরু রাখার চালা, এবং বাগানের দিকে একটি ঝি-চাকরদের যেমন তেমন স্নানাদির ব্যবস্থা। আমাদের সকলের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা এমন প্রচুরভাবে করা হয়েছিল যে, ভোজন-রসিকমাত্রেই পুলকিত হবেন! কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীমতী লিডিয়া একসময় চোখের ইশারায় আমাকে জানালেন, এগুলির মধ্যে বহু সামগ্রী আমার পক্ষে খাওয়া চলবে না! পুরুষের আহার সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের এই অহেতুক কর্তৃত্ব নিজের দেশ হলে বরদাস্ত করতুম না! কিন্তু তাঁর ইশারা যখন বাঙ্ময় হতে থাকল তখন আর সবাই হৈ চৈ ক'রে তাঁকে নানাবিধ তামাশায় ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন! শ্রীমতী ভেরা নিজের হাতে প্রায় কুড়ি রকমের আমিষ-নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন।

পাভেল লুকনিৎস্কিকে প্রথম দেখি তাসকন্দে। তখন সদাসর্বদা তাঁর পিঠে ঝোলানো থাকত একটি ক্যামেরা। অত্যন্ত সরল এবং নিরীহ ক্যামেরাম্যান মনে ক'রে বহু সময় তাঁকে এড়িয়ে চলে গেছি, কেননা এমন ব্যক্তি সেখানে ছিল শত শত। কিন্তু আজ তিনি আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামনে এসেছেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি তিনি বলেন, এবং তাতেই কাজ চলে যায়। সম্প্রতি এই লেখকের 'নিশো' নামক উপন্যাসটি বাংলায় প্রকা-শিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে ইংরেজি ভিন্ন পাঁচ সাতটি ভাষায় তাঁর বই বেরিয়েছে। আমি দু'বছরে দুজন লেখককে ঘনিষ্টভাবে দেখেছি। তাঁরা হলেন মালৎজেভ এবং লুকনিৎস্কি। এঁদের সঙ্গে ঘুরেছি, এঁদের রান্না-ভাঁড়ারে ঢুকে উৎপাত করেছি অনেকদিন, শোবার ঘর-গোছানোর মাঝখানে বসে মাসিক আয়ব্যয়ের হিসেব কষেছি, এবং অতীত-ভবিষ্যতের আলাপ-আলোচনা করেছি। মালৎজেভ একদিন লিডিয়াকে আমার সামনে বললেন, ওঁকে আগে ভাবতুম কুটুম্ব, এখন্‌ দেখছি ঘরের লোক! উনি শোবার ঘরের খাটের তলা থেকে বাক্সপ্যাটরা টেনে খুলে বসেন, উনি না পারেন কি?

ঘন্টাচারেক ধ'রে আজ আমাদের আহারাদির পাট চলছিল। শ্রীমতী ভেরা ওই সময়টুকুর মধ্যেই লিডিয়ার মারফৎ আমার নানাবিধ আজগুবী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়া, অতিশয় বলশালিনী,—যাকে বলে 'স্লোবাস্ট',—বড় বড় চোখ, এবং আগাগোড়া গোলাপী-রক্তিম প্রসাধন। এ বাড়িতে ঢোকবার সময় মনে হয়েছিল, লুকনিৎস্কির চেয়ে তিনি অন্তত পঁচিশ বছরের ছোট। এখন ঠাউরে দেখে মনে হচ্ছে, না, বছর দশ বারোর ছোট হতে পারেন! প্রসাধনের মূল উদ্দেশ্য তাঁর ব্যর্থ হয়নি।

আমার প্রশ্নগুলি যে কোনও গৃহ-স্থের পক্ষে শ্রুতিকটু। যেমন রাত্রে কে আগে ঘুমোয়, গরুর খাদ্য কে কিনে আনে, ছেলেটি কাকে বেশি পছন্দ করে, দুজনের দুখানা গাড়ির পেট্রল একজনে কেনে কিনা, আহার্যসামগ্রী কার রুচি অনুসারে প্রস্তুত হয়, ঘরদোর কে পরি-ষ্কার করে, দৈনিক বাজার কে করে, খরচ-পত্র নিয়ে কথায়-কথায় বিতর্ক বাধে কিনা, হঠাৎ এ বাড়িতে কেউ এসে পড়লে কে আগে দুঃখিত হয়, ধোবার হিসেব কে টোকে, বাড়িতে ঘুঁটে দেওয়া হয় কিনা. ব্যাঙ্কে টাকা কা'র নামে থাকে, ইত্যাদি—।

শ্রীমতী লিডিয়ার ধারণা, আমার এইসব 'ইতর' প্রশ্নে এবাড়ির গৃহিণী মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, কিন্তু ঘটল তার বিপরীত। ভোজনের আসরের প্রবল হৈ-চৈ থেকে এক একবার আমরা তিনজন

সরে গিয়ে এই গৃহস্থের সম্পূর্ণ ঘরোয়া জীবনের বহুবিধ আলোচনার মধ্যে মিলে যাচ্ছিলুম। প্রসাধন এবং পোষাকের অন্তরালে যে দুটি বিদেশিনী মহিলাকে দেখছি, তাঁরা কেবল বাঙলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর যে কোনও দেশের ছোট পিসি, মেজ মাসি বা রাঙা বৌদির' সমতুল্য! আমরা আমাদের তিনজনের পারিবারিক জীবনের বিবিধ খুটিনাটির মধ্যে চ'লে গিয়েছিলুম! ফলে, সেদিন রাত্রির আকাশের বিদেশী তারা, অন্ধকারের ঝাউ, দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের বনানীকে মনে হয়নি এরা অপরিচিত বা অনাত্মীয়। এইটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঠেকত, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের পারিবারিক জীবনের দরজা অবারিতভাবে খোলা,—সেখানে আন্তরিক আত্মীয়তা ঘনিয়ে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ওরা বৈঠকখানা থেকে ডেকে শোবার ঘরে বা রান্নাঘরে নিয়ে আসে! বিছানায় গড়িয়ে গল্প করে, আলমারিটা খুলে দেয়, আমার জামাটা নিয়ে সযত্নে হুকে টাঙিয়ে রাখে, নানাবিধ সুবিধে অসুবিধের কথা বলে, আত্মীয়স্বজনের কাহিনী ফেঁদে বসে! ঠিক এমনি ভাবেই এক নাট্যকার মিঃ ভিনিকভ একদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সেবাড়িতে গিয়ে যখন তাঁদের রান্নাঘরে বসে ভিনিকভের মর্মাশাশুড়ী, স্থূলকায়া স্ত্রী, শ্রীমতী লিডিয়া, ভিনিকভ এবং আমি —এই পাঁচজনে রান্নাবান্না ও কুটনোকাটনার কাজ নিয়ে মেতে উঠলুম,—তখন পরদেশী অতিথিকে নিয়ে না ছিল হুজুগ, না বা অভ্যর্থনার অতিশয্যতা। উভয়ের সম্পর্কের মাঝখানে কমিউনিজম বা গণতন্ত্রের কোনটাই ছিল না, ছিল নিছক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ঘরোয়া উৎসব। বিস্ময়ের কথা এই, শ্রীমতী লিডিয়া এবং আমি উভয়েই তাঁদের বাড়িতে সম্পূর্ণ নবাগত এবং অপরিচিত। লক্ষ্য করেছি আমাকে পরিচিত করতে গিয়ে লিডিয়াও বহু পরিবারে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন! সে যাই হোক, লিডিয়ার সর্বপ্রকার চোখ রাঙানো সত্ত্বেও শ্রীমতী ভেরা আমার কৌতূহলী প্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথভাবে সহাস্যেই দিয়েছিলেন। পরের বৎসর লুকোনিৎস্কি যখন আমাকে ও লিডিয়াকে তাঁর এই 'দাচায়' দুপুর বেলা খাবার জন্য পুনরায় নিয়ে আসেন, শ্রীমতী ভেরা প্রস্তাব করেন,—তিনিই তাঁর গাড়িতে আমাদের দুজনকে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন। এই দম্পতির অমায়িক সৌজন্য ও মিষ্টি ব্যবহার আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হয়েছিল।

আজ নাটাশার পোষাকে কিছু বৈচিত্র্য ছিল। আমাদের ভারতীয়দের ছয়জনের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাঁর চুল অল্পাধিকতর পাকেনি! কিন্তু এখানে এসে সেই গ্রীক ভদ্রলোকটির কথা বার বার মনে পড়ছিল,"What's in age? Its desire which counts" সর্দার শেখোনের চুলের সঙ্গে বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্টভাবে পেকেছে কিনা, সেটি নাটাশার প্রতি তাঁর আচরণের দিকে যিনি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলেন—তিনি শ্রীমতী লিডিয়া! কিন্তু আনন্দ-কলরবের এমন অবাধ চেহারা স্বয়ং অতিথিসেবকেরই ভাল লাগছিল!

পুরুষের প্রকৃতি বোধ করি নাটাশার নখদর্পণে। তিনি চতুরা, কটাক্ষবতী, রসোচ্ছলা, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নর্মসহচরী'! পুরুষের সুরার পাত্রটি কেমন ক'রে ভরে দিতে হয়, আংটির হীরকদ্যুতির সঙ্গে আঁখিতারকার ঝলসিত বিদ্যুতের ব্যবহার কি প্রকারে করতে হয়, চাপা কণ্ঠে কী কথা গোপনে বললে পুরুষের বক্ষরক্তধারা নেচে ওঠে এবং সর্বপ্রকার তন্ময়তার মধ্যেও প্রত্যেকের প্রতি তাঁর সচেতন চোখ ও কান কেমন খোলা থাকে,—আমিও তাঁর এগুলি হাসিমুখে লক্ষ্য করছিলুম! তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট মনোযোগ আছে কিনা এটি তাঁর পক্ষে মাঝে মাঝে জানারও দরকার ছিল। যাই হোক, এক সময় তিনি উঠলেন, এবং বন্ধুদের হাত ধ'রে নৃত্য ও গীত সুরু করলেন। ওরই মধ্যে সহসা একবার লক্ষ্য করলুম, তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন! কেন করছেন জানিনে! বোধ হয় তাঁর এটি জানার দরকার ছিল, আমার নির্বাক ও নির্বোধ চোখ দুটোর মধ্যে কোনও মোহাচ্ছন্নতা আছে কিনা। তাঁকে দেখে আমার তরুণ বয়সে-দেখা একখানা সিনেমার ছবি মনে পড়ে যেত। ছবিটির নাম ছিল, 'মাতাহরি'।

আহারাদির মাঝখানে এক সময় লুকোনিৎস্কি আমার পাশে বসলেন এবং অন্যপাশে ব'সে চাপা গজর্নের সঙ্গে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এবার উঠুন, আর আপনার খেয়ে কাজ নেই!—বলতে বলতে তিনি নিজেই দু'তিনখানা প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

অধীর আনন্দের মধ্যেও লুকোনিৎস্কি কি যেন বিড়বিড় করতে-করতে চোখের জল ফেলছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর ষাট বছর বয়সের পক্ষে যেন এই আনন্দপানের মাত্রা ঈষৎ বেশি হয়েছিল। তিনি সহসা এক সময় আমার গলা জড়িয়ে চুম্বন ক'রে আপন ভাষায় কি যেন বলছিলেন। সেইটি শুনে লিডিয়া বললেন, বেশ ত, এঁকে নিয়ে ঘরে চলুন, ইনি মন দিয়ে শুনবেন।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই লিডিয়া পুনরায় বললেন, লুকোনিৎস্কি যা কখনও করেননি, আজ তাই করবেন। ও'র ঘরে চলুন, উনি ও'র জীবনের কিছু কিছু কথা আপনাকে বলবেন। আপনাকে উনি বড় ভালোবেসেছেন!

শ্রীমতী নাটাশার নৃত্যগীতের অবারিত ক্ষেত্রটি পাবার জন্য শ্রীযুক্ত শেখোন, তাবান, বেদী, যশপাল এবং চৌহান গেলেন ভেরার শয়নকক্ষে, এবং আমরা তিনজনে এলুম লুকোনিৎস্কির ঘরটিতে। ঘরটি বড় নয়। মাঝারি ধরণের তিনটি গ্লাসআলমারি,—বইপত্রে ঠাসা। মেঝের উপর কার্পেট পাতা, সেখানে খান তিনেক গদিআঁটা চেয়ার। এপাশে একটি এলোমেলো বিছানা। দেওয়ালে দু'তিনখানি বড় বড় স্বর্গত রুশ লেখকের ছবি। কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে ওখানে। একধারে সেরিওজার কয়েকটি খেলনা গোছানো।

পাশের ঘরটি উল্লাসে আনন্দে পরিপূর্ণ! কিন্তু এঘরে লুকোনিৎস্কি তাঁর চোখের জল মুছে একটি আলমারি খুললেন, এবং ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বলতে লাগলেন, যুদ্ধকালীন লেনিনগ্রাডের সঙ্গে বিজড়িত তাঁর নিজ জীবনের কথা। আলমারির ভিতর থেকে একে একে তিনি বার করলেন প্রায় ৭০ খানা ডায়েরী। লেনিনগ্রাড নগর জার্মান সৈন্যদলের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ ত্রিশটি মাস। লুকোনিৎস্কি সেই সময়ে কর্মসূত্রে লেনিনগ্রাডে ছিলেন। তিনি পালাতে পারতেন কোনমতে,—সন্দেহ নেই, কিন্তু চতুর্দিকব্যাপী অপমৃত্যুর মাঝখান থেকে পালিয়ে তিনি আত্মরক্ষা করতে চাননি! এই ডায়েরীগুলিতে তিনি সেই ত্রিশমাসের প্রতিদিনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পেন্সিলের দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন! মাঝখানে প্রশ্ন করে বসলুম, পেন্সিলে লিখতে গেলেন কেন? তিনি বললেন, কলমের কালি পাব কোথায়? আমার বাসা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তখন

বোমাবর্ষণে। নালা-নর্দমায় পড়ে থাকি। কখনও ইঁটকাঠের স্তূপের মধ্যে লুকোই। মাঠে প'ড়ে থাকি রাত্রে, বরফে চাপা পড়ি! আবার প্রশ্ন করলুম, আহারাদি? তিনি জবাব দিলেন, নেই, কিছু নেই! মাঠের ঘাস, মরা জন্তুর শব, জুতোর চামড়া, জঞ্জালের ময়লা কাগজ, সুতী জামাকাপড়,—যা কিছু ছিল লেনিনগ্রাডে সব খেয়ে শেষ করা হয়েছিল। একটি মস্ত ইস্কুলবাড়িতে চারহাজার শিশু-বালক-বালিকাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। একটিমাত্র জার্মান বোমার আঘাতে বাড়িটি উড়ে যায়! সেই চার-হাজার শিশুর শবদেহগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি! দুর্ভিক্ষ আর দুর্গতির মধ্যে মৃত্যু দেখছিলুম হাজার হাজার মানুষের।

আপনি বাঁচলেন কেমন করে?

জানিনে। আমার মতন হাজার হাজার মেয়েপুরুষ উপুড় হয়ে শুয়ে এখানে ওখানে নড়ে বেড়াত। আমার অসুবিধে ছিল এই, আমার শরীরের একটা দিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল! একদিন আর ক্যামেরাটা খুলতে পারলুম না। ডায়েরীতে তখন একেকটি শব্দ বসানো কঠিন মনে হচ্ছিল! একদিন আমি আমার শেষ সম্বল দুটি মোমবাতি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ডায়েরী শেষ হবার আগেই আমার মৃত্যু ঘনাচ্ছিল!

লুকোনিংস্কি একবার কতক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। কিন্তু যখন ফিরে এলেন, আমার সন্দেহ হল, তিনি তাঁর আবেগবিহ্বলতা সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সম্ভবত আরেকপাত্র পান করে জলঝরা চক্ষু নিয়েই ফিরলেন! শ্রীমতী লিডিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে করুণ চক্ষে এটি লক্ষ্য করছিলেন।

পাশের ঘরে নাটাশাদের নৃত্যগীতের আসর যখন এক একবার উল্লাসে উত-রোল হচ্ছিল,—লুকোনিংস্কি তখন আমার গলাটা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! তিনি মাতাল হননি, কিন্তু মদ্য-প্রভাবে তাঁর আবেগবিহ্বল মানবতার সত্যস্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছিল! তাঁর বেদনা এই, সেদিনকার লেনিনগ্রাডের মাত্র একটি নিরুপায় জীবনকেও তিনি বাঁচাতে পারেননি! হাজার হাজার মরছিল শুধু বোমায়, হাজার হাজার মরছিল উপবাসে! সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু পাশে শুয়ে সেদিন ককিয়ে কেঁদে মরেছে এক আঁজলা জল খেতে না পেয়ে, আর আজ আমি পেট ভরে খাচ্ছি,—এই বেদনায়!

লুকোনিংস্কি বলতে লাগলেন, প্রত্যেকটি জীবন্ত জন্তুকে সেদিন খেয়ে শেষ করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি মৃত শব, প্রত্যেকটি কংকাল, গলিত যে কোনও দেহ, নরম যে কোনও বস্তু! তারপর আরম্ভ হয়ে গেল শিশুর শবদেহ, তারপর মৃত গলিত যে কোনও মানুষের! কী করবে বলুন? উত্তাপ, মাংস, মদ, জ্বালানি, কাঁচা বা পাকা কিছু ভোজ্য, পানীয় জল, আলো জ্বালার ব্যবস্থা,—কোথাও কিছু নেই। যারা কিলবিল করছিল তারা মানুষ নয়, মানবেতর, তারা জন্তু, তারা আদিম আরণ্যক,—সভ্যতার সংবাদ তারা ভুলে গেছে! আমার এই সবগুলি ডায়েরীতে আছে, বর্বরের অনাচারের তাড়নায় মানুষের সেই ক্রমিক অধোগতির ইতিহাস! এগুলি সেই প্রতি ঘন্টার, প্রতি রাত্রির, প্রতি বোমাবর্ষণের, প্রতি সিগনাল ক্লিয়ারের! আজ তাই সোভিয়েট ইউনিয়নের সকলের বড় আতঙ্ক, পাছে আবার কোথাও কারও ভুলে যুদ্ধ বাধে! আপনি বিশ্বাস করুন, কোটি কোটি মানুষের ভয়াবহ দুর্গতির ইতিহাস আমাদের বুকের মধ্যে রক্তের অক্ষরে লেখা! যুদ্ধ আর আমরা চাইনে, চাইনে, —এই রাত্রিকালে আপনার কাছে শপথ করে বলছি, আমাদের কুড়ি কোটি নর-নারীর একজনও কেউ যুদ্ধ চায় না!

তিনি আমার বাহুর মধ্যে যখন আবদ্ধ হলেন, শ্রীমতী লিডিয়া তখন চোখের জল মুছছিলেন। এক সময় লুকোনিংস্কিকে প্রশ্ন করলুম, আপনার পক্ষাঘাত রোগ কেমন করে সারল?

লুকোনিংস্কি বললেন, পামীরের পাহাড়ে এই রোগ সারাবার হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ম আছে। সেখানে বহুদিন থাকার পর আমার রোগ সারে। সেখানেই আমি 'নিশো' বইটি লিখি। ফিরে এসে আমার বহু দুর্দিনের বন্ধু শ্রীমতী ভেরাকে বিবাহ করি। সেরিওজা আমার সকল দুঃখের সার্থক সান্ত্বনা!

লুকোনিংস্কির অনেক চোখের জল সেদিন আমার গলার কাছে পড়েছিল। যুদ্ধকালের এমন ভয়াবহ চিত্র তিনি আমার সামনে ধরেছিলেন যে, সেটি যেন আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বইল। সেই রাত্রে বনজঙ্গল পেরোবার সময় কেমন একটা বোবা ভয়ার্ত অন্ধকার আমার পিছু নিয়েছিল। দ্বিতীয় গাড়িখানায় ড্রাইভার ছাড়া আমরা মাত্র দুজন। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়া আমারই মতো নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে সমস্ত পথটা এক পাশে বসে রইলেন।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে বসে টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা" উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখছিলুম। একে একে দেখলুম অনেকগুলি। 'ক্রেমলিন ক্লক, চেরী অর্চার্ড', উইনটার টেলস, মেরী স্টুয়ার্ট' এবং আধুনিক কয়েকটি,—প্রত্যেকটি অনবদ্য। আজকের 'আনা কারেনিনা' নিয়ে বোধ করি ১২ খানি রুশ নাটক, ৮টি ব্যালে, ৫টি অপেরা এবং ২টি সার্কাস—এই দেখা হল! নাটক শুধু দেখছিনে, দেখছি প্রেক্ষাগৃহের রসবোধ, দেখতে পাচ্ছি রুশজাতির প্রকৃতি। "আনা কারেনিনা'-র গল্পটি সাহিত্যজগতে অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই নাটক কলকাতার মতো সর্ব-রসগ্রাহী এবং ভারতাগ্রগণ্য উচ্চশিক্ষিত শহরের মঞ্চে অভিনীত হতে থাকলে ইঁট-পাটকেল ছুড়ে মঞ্চের দফারফা হতো! পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মেয়ে 'অসতী আনা কারেনিনার' প্রাণ-সমস্যাটা বোঝে এবং বিচার করে, কিন্তু ভারতীয় পুরুষ এটি বরদাস্ত করে না! এর প্রধান কারণ নারীর জননীরূপে ভারতীয় পুরুষের চোখে নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ। কোনও চিত্রে বা মঞ্চে সতী জননী যদি কাঁদে, ভারত কাঁদে তার সঙ্গে! কলকাতার সিনেমাগৃহে অনেক সময় পুরুষ যখন কাঁদে, মেয়ে কাঁদে না; স্বামী ছাড়া অপর প্রণয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপারে মেয়ের চোখে যখন জল আসে, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে 'বাচ্চুরা' তখন শিস দিয়ে ওঠে! তারা নাটকের ভালমন্দ বিচার করে না, এবং অভ্যস্ত চিন্তাধারা ও সংস্কারের বাইরে যেতেও চায় না। আমাদের সমাজ-মনের উপর পুরুষের শাসননীতি আজও প্রখর। মেয়ে সেখানে ভয়ভীরু।

'আনা কারেনিনা' রচনাকালে টলস্টয় স্বপ্নেও ভাবেননি, এ-বইয়ের ছবি কখনও হবে, অথবা এ-বই কখনও নাটকাকারে মঞ্চস্থ হবে। সেই কারণে সোভিয়েট মঞ্চের সামনে বসে যখন এই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাট্যরূপটি অবাক বিস্ময়ে দেখছিলুম, তখন মনে হচ্ছিল ওই বৃহৎ উপন্যাসটি আরেকবার

আনুপূর্বিক প্রতি ছত্র পাঠ করে যাচ্ছি! এই কৃতিত্ব পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে, খবর পাইনি। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক-সাধারণ নিশ্চল, উৎসুক এবং নির্বাক। গল্পের মাঝখানে প্রসূতি সদনে 'আনার' স্বামী এবং উভয়ের সাক্ষাৎ এবং সেখানে স্বামী স্বীকার করে নিচ্ছেন সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব! দৃশ্যটি কঠিন, এবং প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ। কিন্তু সমস্যাটা ওরা জানে, জীবনের স্খলন-ত্রুটিবিচ্যুতি ওরা স্বীকার করে নেয়! ভুলমাত্রই জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অংগ, ওরা জানে। ওদেশে অল্পবয়স্কা শুদ্ধাচারিণী বিধবারা পুনর্বিবাহ করেনি অথবা করবার সুবিধা পায়নি, এমন উদাহরণ প্রচুর। তারা মনোমতো চাকরি করে, নিজের হাতে রাঁধে বাড়ে, নিজের ছোট ফ্ল্যাটটিতে জীবন কাটায়। কিন্তু দৈবাৎ কখনও যদি তারা সন্তান-সম্ভবা হয়,—তারা নদীতে ঝাঁপ দিতে ছোটে না, কেরোসিন তেল খুঁজতে বেরোয় না, বিষ কেনে না, গলায় দড়ি দেয় না, গোপনে ভ্রূণহত্যার জন্য ডাক্তারকে ঘুষ খাওয়ায় না, অথবা কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে ঘরভাড়া করে না। কুমারী কোনও মেয়ে অসুবিধায় পড়লে তাকে কলঙ্কিত করার জন্য সামাজিক আয়োজন নেই, নিন্দা ও কানাকানির ঝড় বয় না,—বরং তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্যে করা হয়! তার জন্য হাসপাতাল খোলা আছে বিনামূল্যে, সেখানে সন্তান ও প্রসূতির সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করে ষ্টেট। অথবা সে-মেয়েটি যদি গর্ভধারণে অনিচ্ছুক থাকে তবে অস্ত্রোপচার করে দেওয়া হয়! তার পথ থাকে অবারিত। সে সকল অবস্থাতেই সম্মানিত নাগরিক! শুধু তাই নয়, সেই মেয়ের পূর্বইতিহাসের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ছেলে এগিয়ে আসে মেয়েটিকে বিবাহ করতে! ওরা জানে, এইসব নিয়েই জীবন। কিন্তু টলষ্টয়ের যুগে এবম্প্রকার সমাজদর্শন ছিল না, তাই ওরা এত আগ্রহে 'আনা কারেনিনা' দেখে শিক্ষালাভ করে! ওরা যে এই নাটকের শেষ দৃশ্যে এমন করে কাঁদে, তার প্রধান কারণ—একদিকে রসবোধ, অন্যদিকে আনার জন্য বেদনাবোধ! অসামান্য রূপরাশি নিয়ে 'আনা' যখন ট্রেনের তলায় পড়ে মরে, ওরা তখন হায় হায় করে ভাবে, আনা এ-যুগে জন্মালে তার এমন প্রাণসমস্যা দেখা দিত না,—সে হ'ত গৌরবান্বিতা সোভিয়েট নাগরিক!

বস্তুত, একালের সোভিয়েট সাহিত্যের যে-রস তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্যের মিল নেই! প্রথমত 'পাখির' পায়ে সুতো বাঁধা,—সেই সুতো হল রাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সমাজের আদর্শানুগত্য। সামনের দিগন্তের ডাকে সেই পাখি উড়ুক কতক দূর, কিন্তু বহুদূর নয়! সৃষ্টিধর্মী যে বিবেক, তার মূলমন্ত্র হল, মনোভাবনার অনাবিল স্বাধীনতা। সেখানে পাখির পাখার মধ্যে 'পর' বাঁধা থাকলে সৃষ্টির অপমৃত্যু! চিত্তের কুণ্ঠিত প্রকাশ মানে উচ্চাংগ সাহিত্যের সর্বনাশ! সম্ভবত প্রকাশের এই কুণ্ঠা আছে বলেই টলষ্টয়ের মতো জগৎজোড়া সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে কেউ সোভিয়েট আমলে আজও জন্মগ্রহণ করেনি! ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা, ঈর্ষা, নীচতা, চক্রান্ত, নৈরাশ্য, চিত্তদাহ, বিয়োগ-বিচ্ছেদ, স্নেহাশ্রু, নরনারীর অপূর্ণ কামনা-বাসনা, দয়া, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও হিংসা, ঘৃণা ও লালসা—ইত্যাদি এরাই রস-সাহিত্যের উপাদান, অর্থাৎ পুঁজি। কিন্তু উপরোক্ত ষোল-আঠারোটি মনোভাবকে যদি রস-সাহিত্যের থেকে ছুটি দেওয়া হয়, তাহলে গল্প-উপন্যাসে থাকে কি? সেই নিবিড় বিচ্ছেদের বেদনাশ্রু, যেটি মানব-বংশপরম্পরায় জনকদুহিতা সীতার চোখে মুক্তার মতো টলটল করে,—সোভিয়েট সাহিত্যের ভাষ্য হল, সেই শ্রীমতী সীতা যে কোনও ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে পারতেন এবং যে কোনও সময়ে শ্রীরামের মতো অযোগ্য স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উঠতে পারত! কেননা সোভিয়েট তথা কমিউনিষ্ট সমাজ অতিশয় উদার এবং বিবেচনাশীল.—সুতরাং সেখানে কেন থাকবে নৈরাশ্যের কান্নাকাটি? কমিউনিষ্ট সমাজে ঈর্ষা, নীচতা, হিংসা, ঘৃণা, বিয়োগান্ত চোখের জল, ভালবাসার জন্য কাতরোক্তি, লালসার লোলরূপ, পাপীর জন্য বেদনাবোধ—এগুলি কেন থাকবে? এসব সমস্যার সমাধান আছে, প্রতিকার আছে এবং এদের মীমাংসাও আছে। সুতরাং আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য হয়ে উঠেছে বীর্য ও তেজোব্যঞ্জক, বিবেচনা ও পরামর্শ-প্রধান,—কিন্তু রসের নিবিড়তা সেখানে আছে কিনা আমার জানা নেই। সোভিয়েট সাহিত্যে অশ্লীলতা, ইতরবৃত্তি, মনো-স্তত্ত্বের জটিল সমস্যা, অলীক দিবা-স্বপ্নের অর্থশূন্যে নিঃশ্বাস, চরিত্রের বিভিন্ন বিকার—এগুলি কম। কিন্তু অযোগ্যকে যোগ্য করে তোল, ভীরুকে সাহসী করো, দুর্গতকে তুলে আনো, প্রতিক্রিয়াশীলকে নিপাতে পাঠাও, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি বিদ্রূপবাণ হানো, শক্তিমানকে জায়গা ছেড়ে দাও, দেশ-প্রেমিকের খোঁজে বেরোও, প্রতিভাকে আবিষ্কার করো, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস আনো,—এগুলি সোভিয়েট সাহিত্যের মূল নীতি! যা প্রাণ চায় তাই লিখো না, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখো! কেননা তোমার হাতে কমিউনিষ্ট সমাজ-গঠনের দায়িত্ব রয়েছে! তোমার মনে বেদনা, নৈরাশ্য, শূন্যতা—এসব যদি থাকে তার প্রতিকার ক'রে নাও! কিন্তু সুন্দর রচনাভঙ্গীর দ্বারা সেই গ্যাস দেশের মনের উপর ছাড়িও না! সেটা অপরাধ। ওই গ্যাসের প্রভাবে দেশের যৌবনকে বিষাক্ত করো না,—সেটা দেশদ্রোহিতা! সোভিয়েট সমাজসৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কোথাও অন্যায় বা অনাচার ঘটে গিয়ে থাকে, তার খোঁটা আজ দিয়ো না, পুরনো কথা তুলো না, পিছনের দিকে চেয়ো না, ইতিহাসের চুলচেরা বিচার করতে বসো না, —সেটা পুরনো কাসন্দি, সেটার নাম 'রিভিসনিজম', সেটায় লাভ কিছু নেই, অথচ সেটায় শত্রু হাসানো হবে! কমিউ-নিষ্ট সমাজ শুধু এগিয়ে চলুক, পৃথি-বীতে নতুন জাতি সৃষ্টি করুক। তারা যেন মাঝপথে থমকিয়ে পিছনের পথের দিকে চেয়ে আত্মবিচার না করে! গতি মানেই অগ্রগতি, গতিহীনতা অপমৃত্যু!

স্বচক্ষে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু সজ্ঞানে অনুভব করতুম, সোভিয়েট ইউ-নিয়নের অদৃশ্যলোক লক্ষ লক্ষ ময়দানবে পরিপূর্ণ—যাদের করালচক্ষুর ইংগিতে রাতারাতি উঠে দাঁড়াচ্ছে নিরীশ্বরবাদী বিরাট এক জড়সভ্যতা,—এবং যেখানকার কোটি কোটি নরনারীর দানবীয় অধ্য-বসায় ও আশ্চর্য নির্মাণকৌশল আমাকে বিস্মিত অভিভূত এবং হতবুদ্ধি ক'রে রেখেছিল অনেকদিন। ওদের সাহিত্যও এই দেশজোড়া জীবনের নবনির্মাণবাদেরই পরিপূরক। যারা এককালে ছিল সর্ব-হারা, অন্যকালে গিয়ে তারা হচ্ছে সর্বস্ব-বান। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের সঙ্গে আজও ওদের লড়াই চলছে বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের ঘরেই সৃষ্টি করতে বসেছে লক্ষ লক্ষ ধনাঢ্য। কেউ ঠকিয়ে, বা বঞ্চিত ক'রে বা শোষণ ক'রে ভাগ্য ফেরাচ্ছে না, কিন্তু আশ্চর্য এক অংকের দ্বারা প্রতি ব্যক্তি সঞ্চয় করছে ধনসম্পদ! নামছে না কেউ, উঠছে সবাই একসঙ্গে! আগে তুলেছে ব্যক্তিকে, তারপর গোষ্ঠীকে, এখন গোষ্ঠী তুলতে বসেছে ইউনিয়নের সকল জাতিকে! এর সীমা ও শেষ কোথায়, ওরা

কি জানে? আমরাই কি জানি? ওরা বলছে, সপ্ত-বার্ষিক যোজনার নিশ্চিত সাফল্যের 'পর ওরা দৌড়বে ১৯৮০ পর্যন্ত! তারপর রইল সৌরবিশ্বের সূর্য-চন্দ্র-ভেনাস-জুপিটর-স্যাটার্ন! পঁচিশ বছর আগেও কেউ ওদেরকে মানুষ মনে করেনি—যখন ওরা 'অতিমানব' সৃষ্টির গোপন গবেষণাগারে একমনে কাজ করছিল! তারপর হঠাৎ ফিরে দেখল, আমেরিকার দুটো আণবিক বোমায় জাপানের দুটো শহর উড়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ওরা নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকল বিজ্ঞান গবেষণাগারের রহস্যরন্ধ্রে। অতঃপর কয়েক বছর বাদে হঠাৎ বেরিয়ে এল হাসিমুখে। বলল, হ্যাঁ, এবার আমরাও পেয়েছি! আর ভয় পাইনে!

আজ ওরা সেই এটমের নতুন হাতিয়ারের বলে চাঁদে রেখে এল জবরদখলের নোটিশ, তার উলটো পিঠের ছবি নিয়ে এল, সূর্যের দিকে খবর পাঠাল, মহাকাশ জয় ক'রে আসবার সময় দূরের থেকে 'ক্ষুদ্র' পৃথিবীটির ভাবভঙ্গীটি দেখে এল! ওরা একদিকে পৃথিবীর উপনিবেশবাদকে গালি দিচ্ছে, অন্যদিকে ভিন্ন গ্রহে-উপগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের সক্রিয় চিন্তা করছে! এককালে সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতার দিকে তাকিয়ে ওরা ভয়ে কাঁপত, আজ সমগ্র পৃথিবী ওদের শত্রুতার ভয়ে কাঁপছে! আজ মস্কোতে ব'সে দশ হাজার মাইল দূরবর্তী 'কিউবা'কে ওরা রক্ষা ক'রে চলেছে কেবল বুদ্ধি ও জ্ঞানের বলে নয়, বিজ্ঞানের আস্ফালনে, আণবিক শক্তির সাফল্যে! ওদের সামনে গিয়ে মিষ্টমুখে আন্তরিক সারল্য এবং বন্ধুতার সঙ্গে কথা বলো, দেখবে ওদের চেয়ে নিকটবন্ধু তোমার আর কেউ নেই! তোমার সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদে ওরা বুক দিয়ে এসে পড়বে এবং যে কোনও ত্যাগস্বীকার করবে তোমার জন্য! কিন্তু যদি কোথাও তোমার ছলচাতুরী প্রকাশ পায়, যদি তোমার পকেটে লুকানো ছুরির ফলা ওদের চোখে পড়ে, তুমি যদি 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম' হও,—তবে ওদের চেয়ে ভয়ংকর আর কেউ নেই! ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ওরা গিয়েছিল একাগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে, এবং ইউ-২ প্লেন-ঘটিত ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্স-এর আচরণের ইতিহাস ভুলতেও চেয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিনাসর্তে ক্ষমা চাননি বলেই ওরা সেই সম্মেলনকে তুচ্ছ ক'রে চলে এসেছে! ওদের স্বভাব-সরলতার সঙ্গে দুটি বস্তু অঙ্গাঙ্গী জড়ানো। একটি তার কোমল করুণা, অন্যটি কঠোর কাঠিন্য! ওরা যখন পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে, তখন ওদের চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই—এ যেমন সত্য, তেমনি যুদ্ধ যদি বাধে তবে ওদের চেয়ে হিংস্র আর কেউ থাকবে না,—এও তেমনি সত্য! ইংরেজ এই কথাটি মনে-প্রাণে বুঝেছে বলেই ইংল্যান্ড থেকে জনসাধারণের একটা বড় অংশ আজ এই ধুয়ো তুলেছে, "Better 'red' than 'dead'!"

প্রত্যহ প্রভাতের মতো আজও টেলিফোন বাজল:

"Its Lydia speaking. Good morning, Mr. Sanyal, when you're coming down? No, no, it must be 8-30. There are heavy engagements for you. Come straight to the breakfast table. I'll be there. Please hurry up."

এ মহিলার বহু সদ্গুণ আছে। শুধু একটি দোষ,—দ্রুততা! ছুটি দিতে চান না, এবং নিঃশ্বাস ফেলতে দেন না। পাছে কোনও দ্রষ্টব্য না দেখি, পাছে কোনটা এড়িয়ে যাই,—এই ও'র ভয়। ও'র ইচ্ছা আমি স্বাধীনভাবে ঘুরি, বাজার-হাটের মধ্যে হারিয়ে যাই, কোনও রেস্তরাঁয় বসে একবেলা কাটাই, একজিবিশনে ঢুকে ঘুরে বেড়াই, মেট্রোর সুড়ঙ্গলোকে আনাগোনা করি, গৃহস্থ-পরিবারের ঘরে গিয়ে দু-দন্ড বসি, পাঁচজনের সঙ্গে গল্প-গুজব করি। ও'র বিশ্বাস, ভারতীয় দলের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি!

সকালের দিকে ভারতীয় লেখকগণকে সম্মানিত করার জন্য একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মস্কোর একটি প্রশস্ত রাজপথের ধারে প্রকান্ড এক বাড়ির দোতলার একটি কক্ষে আমাদের আনা হ'ল। এটি বৃহৎ মার্বেল হল্, চারিদিক সুদৃশ্য। দেখতে পাচ্ছি এটি পুরনো আমলের মস্ত অট্টালিকা। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু সুন্দর, শোভন এবং সুরুচিসম্মত, তার অধিকাংশই জার আমলের। এই বাড়িটি সাহিত্যগুরু টলস্টয়ের নামে উৎসর্গ করা। এখানে টলস্টয় প্রায়ই এসে সম্মানিত লেখক, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হতেন। এই বাড়িটির সঙ্গে বহু প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত।

সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যে দুজন রথী অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা দুজনেই বর্তমানে 'পৃথিবীনিন্দিত' বলেই সুপ্রসিদ্ধ। এ'রাই বিশেষ একটি জরুরী প্রস্তাবের বলে সম্প্রতি কবি বোরিস পাস্টেরনাককে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করেছেন! এ'দের একজন হলেন ঔপন্যাসিক এবং লেখক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, নাম বোরিস পলেভয়। অন্যজন হলেন কবি এবং সেক্রেটারী, নাম আলেক্সি সুরকভ। প্রথম জন অতিশয় অমায়িক, সপ্রতিভ, মিষ্টভাষী এবং বিনীত। দ্বিতীয় জন বাকচতুর, সরস, হাস্যরসিক, উগ্রতান্ত্রিক এবং জবরদস্ত। কোমল এবং কঠোর দুইজন বসেছেন পাশাপাশি। দুইজনে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেন না। এদেশে লেখক সঙ্ঘের যাঁরা অধিনায়ক তাঁরা সুপ্রীম সোভিয়েটের যে কোনও মন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন। এই দুইজন খ্যাতনামা সাহিত্যকর্মীর সম্বন্ধে এর আগে কিছু কিছু সংবাদ আমার জানা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক ও প্রাক্তন কমিউনিষ্ট মিঃ হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর "নেকেড গড" নামক গ্রন্থে পলেভয় সম্বন্ধে যেমন প্রচুর আলোচনা আছে, তেমনি বহু আমেরিকান, বৃটিশ, জার্মান ও ইতালীয়ান সাময়িক পত্রেও সুরকভ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে থাকে। "Problem of Communism" নামক সাময়িক পত্রটির পাতাও আমি প্রায়ই ওলটাই। কিন্তু ফাস্ট-এর বইটি প'ড়ে প্রথম ফাস্ট-কেই জেনেছিলুম,—সরল মানে নির্বোধ! আর্থার কোয়েৎস্লারের কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই মনোযোগ সহকারে পড়েছিলুম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এমন উন্মার্গগামী, ভ্রান্তচেতন এবং প্রত্যাশাবাদী লেখক খুঁজে পাওয়া ভার! রচনাশিল্পের আশ্চর্য দক্ষতায় এবং বিচারবুদ্ধির শোচনীয় অক্ষমতায় তাঁর অনেকগুলি বই পরিপূর্ণ। আমি সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হয়েছিলুম যুগোশ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিলোভান ডিজিলাস কর্তৃক লিখিত "The New Class" এবং পলাতক উক্রাইনিয়ান কমিউনিষ্ট তথা পদস্থ সোভিয়েট কর্মচারী ভিক্টর ক্রাভচেনকো-লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "I chose Freedom"—এই দুখানি বই পাঠ করে। ডিজিলাস বর্ণনা করেছেন কমিউনিষ্ট সমাজের উদ্দেশ্যে, প্রকৃতি ও মনোধর্ম, এবং ক্রাভচেনকো বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজ জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের ষ্টালিন যুগ! আজ মিঃ খ্রুশ্চভ এবং সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁদের সর্বপ্রকার কার্যাবলীর দ্বারা সেই হতভাগ্য ক্রাভচেনকোর প্রতিটি বাক্য সমর্থন ও প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছেন! সে যাই হোক, আমি সর্বাপেক্ষা উপকৃত বোধ করি ইংরেজ লেখক ও লেখিকা সিডনি এণ্ড বিয়াট্রিস ওয়েব-এর "Soviet Communism: A New Civilisation" নামক বৃহৎ গ্রন্থখানি পাঠ করে।

কয়েকজন বিশিষ্ট এবং খ্যাতনামা সোভিয়েট লেখক এই অভ্যর্থনার আসরে উপস্থিত ছিলেন। কেউ তাঁদের কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ বা প্রবন্ধকার। এ'রা সাহিত্যনায়ক, চিন্তানিয়ামক, এ'রাই সোভিয়েট সাহিত্যের শিক্ষক। এ'দের পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ ভিন্ন সোভিয়েট ইউনিয়নে বসে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব নয়। এ'দের স্বীকৃতি না থাকলে সাহিত্যে স্বীকৃতি নেই! এ'রা সাহিত্যের নীতি নির্ধারণ করেন এবং সুপ্রীম সোভিয়েট এ'দের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে নেন। এ'দের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর লেখকের সাহিত্য-সাধনার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল লেখক মিলে একটি কনগ্রেস বসে,—সেই কনগ্রেসের অধিবেশন স্থল হল সুপ্রীম সোভিয়েটের পার্লামেন্ট ভবন। এই কনগ্রেসের জন্য বহু লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে লেখকরা আসেন আমন্ত্রিত হয়ে,—তাঁদের অধিকাংশই বামপন্থী লেখক। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও বাক্যবাগীশ এবং ইংরেজি-লেখক ডাঃ মুলুকরাজ আনন্দ্ প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই যোগদান করতে আসেন। তিনি বাম কি দক্ষিণ আজও আমি স্পষ্ট বুঝিনি! তবে ভারতীয় কোনও ভাষায় তিনি বিশেষ কিছু লেখেন না, এটি জানা আছে। তিনি খ্যাতিমান, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বক্তা হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বেশি! সোভিয়েট ইউনিয়নে দুইজন ভারতীয় লেখকেরই নাম ইতস্তত শোনা যায়,—যাঁদের রচনা ভারতে সুপরিচিত নয়! একজন ভবানী ভট্টাচার্য, অন্যজন ডাঃ আনন্দ্।

বক্তৃতা ও ভাষণের মধ্যে বোরিস পলেভয়ের বিনীত মিষ্ট কথাগুলি যেমন ভাল লাগল, তেমনি আলেক্সি সুরকভের উদ্ধত পরিহাস-কৌতুক এবং ধারাল বাকপটুতায় আমরা আনন্দ পেলুম! আমাদের মধ্যে বেদী, চৌহান, শেখোন, তাবান সবাই কিছু কিছু বললেন। শ্রীযুক্ত জহীর তাঁর ভাষণে হঠাৎ আমার প্রতি এমন শ্রদ্ধাপরবশ হলেন যে, আমার পক্ষে চুপ ক'রে থাকাটা এবার বেমানান লাগল। এখানে লক্ষ্য করে দেখেছি, জহীর সম্বন্ধে আন্তরিক একটি শ্রদ্ধানুরাগ সর্বত্র বর্তমান। আমার বিশ্বাস, আমরা যতগুলি লোক ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলুম, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইজন ব্যক্তি সকলের প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন ডাঃ সুনীতিকুমার, অন্যজন এই জহীর।

আমার বক্তব্য ছিল সামান্যই। অভ্যর্থনা সভা হল পারস্পরিক সৌজন্য-প্রকাশের ক্ষেত্র, এটিকে সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র বলা চলবে না। আপনারা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমরাও আপনাদের কাছে তাই। এটা শুধু দেখাসাক্ষাৎ, জানাশোনা নয়। আসল মানুষ আমরা সবাই লুকিয়ে আছি সৌজন্যের অন্তরালে। তারা সত্য চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলে আমাদের উভয়ের মনোভাব বা মুখভাব ঠিক কি প্রকার দাঁড়াবে জানিনে। আমরা কেউ কারো লেখা পড়িনি, কেউ কারোকে চিনিনে! কে কি লেখে কেউ জানিনে; কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনাদের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের দোভাষী এবং দোভাষিণীদের উদ্দেশ্যে। তাঁদের যত্ন আগ্রহ অধ্যবসায় পরিশ্রম এবং আত্মবিস্মৃত সেবাপরায়ণতার গুণে আপনাদের এই সুন্দর দেশের বহু অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। যাঁদের কাছে আমরা উদার আতিথ্যলাভ করেছি, এবং যাঁরা আমাদের যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষেত্র অবারিত রেখে আপনাদের দেশবাসীর জীবনধারাকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই!

ভারতবর্ষে ফিরে যাবার পর বোরিস পলেভয় এবং সুরকভ আমাকে কয়েকখানি পত্র ও অভিনন্দনজ্ঞাপক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। পরের বছরে ও'রাই আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসেন। ও'দের আতিথেয়তা এবং আপ্যায়ন আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মিঃ সুরকভের মধ্যে কিছু রূঢ় নাটকীয়তা আছে। আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্য তিনি যখন তাঁর মাতৃভাষায় একপ্রকার য়্যাকসেন্ট দিয়ে ঈষৎ ঘুষি পাকিয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেন, তখন তিনি একটিবারও সন্দেহ করেন না—একজন নিরীহ ভারতবাসী তার অমায়িক দুটি ভাবাহীন চক্ষু তাঁর দিকে তুলে মনে মনে রসভোগ করছে! শ্রীযুক্ত সুরকভ এখন "ফরেন কমিশন অফ রাইটার্স" বিভাগের চেয়ারম্যান, এবং সেক্রেটারী হলেন পলেভয়। এই বিভাগের যিনি ভাইস-চেয়ারম্যান, তিনি মহিলা। তাঁর নাম শ্রীযুক্তা হেলেন রমানোভা। ইনি একদা ভারতীয় কবি-সম্মেলনের অধিবেশনে আমার পাশে বসে মুখর গল্প-গুজবে ও হাসি-পরিহাসে মশগুল ছিলেন। সেদিন 'পুতুলটিকে' দেখে খুশী হয়েছিলুম।

কিন্তু কয়েকদিন পরে সেই পুতুলটি প্রতিমা হয়ে উঠল। সেদিন তাঁর পরিমণ্ডলে যখন চালচিত্রটি দেখতে পেলুম, তখন একটু থতিয়েই গিয়েছিলুম। শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে গিয়েছিলুম গোর্কি ষ্ট্রীট থেকে বেঁকে ভরোভস্কি ষ্ট্রীটে সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের হেড আপিসে। মস্ত গোলাকার বাগান-বাড়ি, মাঝখানে মহামতি টলষ্টয়ের একটি প্রস্তরমূর্তি। বাড়িটি আগেকার আমলের। দেখে মনে হয়, আগেকার কালে রাজপরিষদের কোনও নোবল-এর বাড়ি। এখন সেকালের সেই নোবল বা কুলাক বা জারের খয়ের-খাঁ-পরিষদ্,—তাঁরা যে কোথায়, তা কেউই জানে না। সম্ভবত তারা ঝাড়ে-বংশে 'লিকুইডেটেড' হয়ে গেছে! ধনরত্ন-সম্ভার নিয়ে দেশ ছেড়ে যারা পালাতে পেরেছিল তারা আর ফিরে আসেনি! সেই সুবৃহৎ গোষ্ঠীর সংখ্যাতীত স্থাবর সম্পত্তি পরবর্তীকালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। সুতরাং ক্ষমতালাভের পর গুছিয়ে বসবার সময় তাঁরা বিনামূল্যে 'সাজানো ঘর এবং পাতা উনুন' পেয়ে যান্। এ বাড়িটি সম্ভবত তাদেরই অন্যতম।

লেখক সঙ্ঘের দপ্তরটি অনেকটা একান্তে। ভিতরটি সুপ্রশস্ত নয়। দরজায় ঢুকে এদিক ওদিক ফিরতে গেলে একটু হোঁচট খেতে হয়। ছোট একটি ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে কাগজপত্র ও ও চিঠির ঝাঁপি নিয়ে একটি মেয়ে টেবলে বসে কাজ করছে। অন্যদিকে দোতলায় ওঠবার একটি কাঠের সিঁড়ি। নীচের-

তলায় অভ্যাগতদের আনাগোনা, ওঘরে পরামর্শকক্ষ, ডানপাশের বড় ঘরে ইস্টরেন্টো। সুতরাং ওই ঘরটিতেই আমি ঢুকলুম। সেখানে শ্রীযুক্তা হেলেন রমানোভা অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত সমাদরসহকারে তিনি অভ্যর্থনা করলেন। বেলা তখন ১১টা।

কবি-সম্মেলনের সেই মস্ত ভোজনাদির আসরে অগণিত নরনারীর আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এবং রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মার্বেল হলের ভিতরে আমার চোখে যে মোহাচ্ছন্নতা ছিল, আজকের এই রূঢ় স্পষ্ট দিবালোকে সেটি নেই। মহিলার চুলে পাক ধরেছে, বড় বড় চক্ষু, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, এবং যে-দৃশ্যটি এই দেশে দুর্লভ,—সেটি তাঁর দেহের একটি সুশ্রী কৃশতা! কিন্তু তাঁর ধারালো দৃষ্টির সঙ্গে মুখের মিষ্ট হাসির কোথায় যেন একটু গরমিল আছে লক্ষ্য করে আমি একটু আকৃষ্ট হলুম। যে-মহিলাকে সেই রাত্রে হাস্য-পরিহাসে মুখর হতে দেখেছিলুম, ইনি তিনি নন। ইনি ভাইস-চেয়ারম্যান! পৃথিবীব্যাপী বামপন্থী লেখক সম্প্রদায়ের ইনি অন্যতম বিবেক রক্ষিকা। আমি সহাস্যে করমর্দন ক'রে আনন্দে গদগদ হয়ে বললুম, না, আপনাকে চিনিনে!

আমি চিনি। সেই যে সেই রাত্রে,—শ্রীমতী রমানোভা কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

আমিও খুব হাসলুম। বললুম, যেখানেই যাচ্ছি, দামী সিল্কের পর্দা দেখছি! লৌহ-যবনিকা কোথায়-কোথায় আছে, একটু খোঁজখবর দিন্।

আমি কেন দেবো, আপনি খুঁজে বার করুন!

যদি যেখানে খুশি যাই?

আপনার খুশি!—মহিলা আবার হেসে উঠলেন।

একটা স্বস্তির কথা ছিল। মহিলা সুন্দর ইংরেজি বলেন। সুতরাং আমার পাশে বসে শ্রীমতী লিডিয়াও হাসিমুখে যোগ দিতে লাগলেন। এক সময় রমানোভা বললেন, কই, সেদিন আপনি গেলেন না যে, 'যশনায়া পলিয়ানাতে'?

বললুম, অতিভোজনের ফলে পেটের অসুখ করেছিল!

বেশ, এ যাত্রায় তাহলে হ'ল না। আসছে বছর আমিই আপনাকে সেখানে ঘুরিয়ে আনব! এবার বলুন কেমন লাগছে আপনার? কেমন দেখছেন সব?—তিনি উৎসুক হলেন।

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, উনি নানাবিধ 'প্রেজুডিস' নিয়ে এখানে এসেছেন!

সত্যি?—উজ্জ্বল চক্ষে রমানোভা বললেন, বলুন না, একটু, কী প্রেজুডিস?

হাসিমুখে এবার বললুম, শাদা চামড়া কালো চামড়াকে ঘেন্না করে এইটি বিশ্বাস করতুম। আপনারা বিশ্বাসঘাতক!

আমরা সকলেই উচ্চরোলে হেসে উঠলুম।

নানাবিধ আলাপচারণের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে যখন অন্যদিকে মুখ ফেরাচ্ছিলুম অথবা মুখ নীচু করছিলুম, সেই ক্ষণকালীন অবসরটুকুর মধ্যে রমানোভা যেন বিদ্যুৎগতিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। মৌখিক ভাষণ অপেক্ষা আমার মুখভাবটি তিনি লক্ষ্য করতে চান্। বাক্য নয়, প্রকাশভঙ্গী! আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, পদার্থ আমার কতটুকু, কি প্রকার চিন্তার ছাপ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, আমি ঠিক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, আমার মনের সঙ্গে মুখের মিল ঘটছে কিনা, কেমন চোখে দেখছি ও'দের দেশকে,—এগুলি বোধহয় তাঁর পক্ষে জানা দরকার!

এক সময় রমানোভার প্রশ্নের উত্তরে বললুম, হ্যাঁ, একটি বিষয়ে বেশ স্পষ্টই জেনেছি। আমাদের দুই দেশই পরস্পরের কাছে অজানা! আপনারা অনেক ভুল শুনেছেন, এবং আমরা অনেক মিথ্যে শুনেছি। আপনাদের সম্বন্ধে নির্ভুল ছবি ভারতবাসীর সামনে বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীর সামনে নেই!

শ্রীযুক্তা রমানোভার বোধ করি এমনি একটা ধারণা ছিল, ভারতে দুই-তিনটি রাজনীতিক দল আছে, এবং ভারতীয় যাঁরা এদেশে আসেন তাঁরা কোন না কোনও দলের অনুপন্থী। এ সংবাদ সম্ভবত তাঁর জানা ছিল না, ভারতের অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী কোনও রাজনীতিক দলভুক্ত নয়, এবং ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যে দলটি বর্তমান, অর্থাৎ বৃহত্তর জনসাধারণ, তারা কোনও রাজনীতিক দলের ক্রীতদাস নয়! আমার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের কারণ ছিল এই, মস্কোতে ব'সে রুশ নাগরিকের মুখ থেকে শুনেছিলুম, ভারতের প্রত্যেকটি "অন্ধকার নিঃসঙ্গ কারাগারে হাজার হাজার নির্যাতিত 'কমিউনিস্ট' রোগে, উপবাসে ও উৎপীড়নে শুধু মৃত্যুর দিন গুণছে!" আমি যখন বললুম, এ সংবাদ মিথ্যা,—তখন দু একজনের মুখে চোখে আমার প্রতি অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। এটি তাঁদের বোঝানো কঠিন, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বর্তমান ভারত গভর্ণমেন্ট—যার আমলে ভারতের কোনও কারাগারে রাজনীতিক বন্দীদের উপর উৎপীড়ন নেই! বুঝতে পারা যায়, জার আমলের ভূত ওদেরকে আজও পেয়ে বসে আছে! মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের মধ্যে বসেই অনুভব করতুম, ভারত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে রুশীয় কানকে বিষাক্ত করার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থা আছে। যারা ভারতে সামাজিক অপরাধে অপরাধী, ভারত গভর্ণমেন্ট নাকি তাদেরকে 'কমিউনিস্ট' মনে করেন। এ ধরণের নোংরা প্রচারকার্য ওখানে চলে। আমি দুঃখ পেয়েছিলুম এইজন্য যে, ভারতীয় কমিউনিস্ট কেউ এটির প্রতিবাদ জানাননি। তৎকালীন কেরালার কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্টের পক্ষের কোন কোনও ইংরেজি সাময়িক পত্র ওখানে হাতে-হাতে ঘুরতে আমি দেখেছি, কিন্তু ভারতীয় নির্দলীয় কোনও সংবাদপত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে পৌঁছয় না, এটি দুঃখের কথা। এর ফলে কমিউনিস্ট কাগজগুলির ভাষ্যগুলিকেই ও'রা 'বেদবাক্য' বলে মেনে নেন্।

ভারত গভর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র বিভাগের স্বাভাবিক ঔদার্যের সঙ্গে একটি অযোগ্যতা ইউরোপের অনেক দূতাবাসের মতো এখানেও প্রকট। অর্থাৎ তাঁরা 'সত্যমেব জয়তে'—এই মন্ত্রের বাইরে অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন! সত্যপ্রচারের ব্যবস্থা দুর্বল হলে অসত্যের ষড়যন্ত্র যে প্রশ্রয় পায়, এটি তাঁদের অনুমান করা কর্তব্য!

রাজনীতি আমার পেশা নয়, এবং আপন জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এখান থেকে বৈপ্লবিক রাজনীতির সস্তা মন্ত্র কানে তুলে নিয়ে যাবার জন্যও আসিনি! কিন্তু মাঝে মাঝে দু'একটি আজগুবী কথা কানে এলে বিরক্ত হই।

(ক্রমশঃ)

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র শতবর্ষ

নিখিল সেন

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। অর্থাৎ ঠিক একশ' বছর পূর্বে। অবশ্য, খণ্ড খণ্ড আকারে এই নকশাগুলি 'আশমানস্থ' রাম প্রেসে মুদ্রিত হয়ে '৮৪নং, হুঁকো রাম বসু ইষ্ট্রীট' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বেজায় সস্তা দরে—পয়সায় দুখানা করে। "শ্রীঃ তালা হুল ব্লার্ক-ইয়ার" কর্তৃক এই প্রবন্ধ-পরিকল্পনাগুলি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় দুই ভাগে।

প্রথম ভাগের বিষয়-সূচী ছিল ঃ

চড়ক, বারোইয়ারি, হুজুক, ছেলে-ধরা, প্রতাপচাঁদ, মহাপুরুষ, লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা, কৃশ্চানি হুজুগ, মিউটিনি, মরাফেরা, আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা, নানা সাহেব, সাতপেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া, লক্ষ্ণৌয়ের বাদসা, শিব-কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুঁচোর ছেলে বুঁচো, জাস্টিস্ ওয়েলস্, টেকচাঁদের পিসি, পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ, রামপ্রসাদ রায়, রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুজরুকি, হোসেন খাঁ, ভূতনাবানো, নাক কাটা বঙ্ক, বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার, স্নানযাত্রা—এমনই ২৮টি প্রকরণ। আর দ্বিতীয় ভাগে ঃ রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে– এই চারিটি প্রকরণ।

নিশাচারী হুতোম-এর জবানিতে কলকাতা শহরের এই নকশাগুলি ঠিকই যেন "ইয়ে রাজ-বাড়ীকি নক্শা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।"

সমাজের গলদ দেখিয়ে এমনিধারা লেখনী ধারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রও করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) কিংবা তারও পূর্বে শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা ওরফে ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'-এ (১৮২৩) এমনই 'স্যাটায়ার' বা ব্যঙ্গ-চিত্র চিত্রিত আছে। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনার পথ-প্রদর্শক কালী-প্রসন্ন সিংহ নন। 'নববাবু বিলাস'-এর নায়ক বা 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা হুতোম বিরচিত 'ঠনঠনের হঠাৎ অবতার' বাবু পদ্মলোচন দত্ত অনেকটা যেন এক সূত্রে গাঁথা। বিশেষ তারতম্য চোখে পড়ে না। আখ্যানবস্তু ও রচনাবিন্যাসের দিক থেকেও অনেকটা তারা সগোত্রীয় বলা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ টেকচাঁদ ঠাকুরের

কালীপ্রসন্ন সিংহ

আদর্শেই প্রথম অনুপ্রাণিত হয়ে কল-কাতার কথাভাষায় তাঁর হুতোম-এর নকশাগুলি চিত্রিত করেছিলেন বাংলা গদ্যের সংস্কার মুক্তির উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শব্দের চাপে বাংলা গদ্য যখন পিষ্ট হতে চলেছিল, তখন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণ গুরুভার সমাসবদ্ধ পদ ও যৌগিক বাক্য-প্রয়োগের কবল থেকে তাকে রক্ষা করে অনেকটা ইংরেজী গদ্যের ধাঁচে ঢালতে সচেষ্ট হন। রূপ দেন অপেক্ষাকৃত সহজ সাবলীল সুললিত রচনার মারফৎ।

গম্ভীর ঢিমে তালে চলা এই সংস্কৃতাশ্রিত গদ্যরীতিতে লঘু দ্রুত ও স্বচ্ছল রচনারীতির প্রথম প্রবর্তন করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। "শব পোড়া মরা দাহ"-র মিশ্র ভাষায় রচিত তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনবত্ব নিয়ে এল। সাধু ও চলতি ভাষায় গুরু-চণ্ডালী দোষে দুষ্ট হলেও আলালী ভাষায় দেখা যায় ঃ "সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, ভাষালংকারের বিরলতা, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বাহুল্য, ইডিয়ম্ ও প্রবাদ-বাক্যের বহুল প্রয়োগ—এই গদ্য-রীতিকে কাদম্বরীর গুরুভার ভাষা থেকে অনেক অগ্রসর ভাষারীতি বলা যায়।" ('বাংলা সাহিত্যের গদ্য'—ডঃ সুকুমার সেন।)

প্যারীচাঁদের আলালী-ভাষা পুরো-পুরি কথ্য ভাষায় রচিত নয়। তাঁর ক্রিয়াপদগুলি সাধু ও চলতি ভাষারই সংমিশ্রণ।

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কিন্তু আগা-গোড়াই চলতি ভাষায় রচিত। শুধু তাই নয়, শতবর্ষ আগে কলকাতার যে 'কলকোয়েল' বা চলতি ভাষা চালু ছিল, হুতোমী ভাষা যেন তারই পুরো প্রটোটাইপ্। আঠার শতকের গোড়ার দিকে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিরিঙ্গী আমলাদের দেশীয় কথ্য-ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে কলিকাতা-শ্রীরামপুর-সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কথ্য-ভাষা উইলিয়ম কেরী সাহেব তাঁর 'ডায়েলগ্স' বা কথোপকথনে প্রথম সংকলিত করেছিলেন, টেকচাঁদের হাতেই বুঝি তা নবজন্মগ্রহণ করে। বাংলায় ইডিয়ম্ বা ফ্রেজ আয়ত্ত করতেও বইখানির দান কম নয়। শুধু গণ্য-মান্য বা 'বাবু' সম্প্রদায়ের আলেখ্যই এই নকশাগুলিতে ধরা পড়েনি, সমাজের নীচের তলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, তাদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের সুন্দর চিত্রও হুবহু ধরা দিয়েছে হুতোমের নিখুঁত নকশা-গুলিতে। এই নকশাগুলির মারফৎ কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী মানসেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে করিয়ে দেয় চার্লস ডিকেন্স-এর 'স্কেসেস্ বাই বজ্' (Sketches by Boz)-এর কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য হুতোমকে তার রুচি-অরুচির বাদ-বিচারে ঠুকতে ইতস্ততঃ করেননি। 'বঙ্গ-দর্শন'-এ হুতোমী ভাষাকে তিনি দরিদ্র, নিস্তেজ, বাঁধনহীন এবং অসুন্দর অশ্লীল বলে

অভিব্যক্ত করেছেন। সমাজের নগ্ন কালো রূপে কলকাতার নকশাগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল বলে অনেক নিন্দাবাদও জুটেছিল বেচারী হুতোমের কপালে। তবু কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় :

"হুতোম প্যাঁচার নকশা হচ্ছে তখনকার সমাজের আগা-গোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সেকালের কলিকাতা শহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।......"

হুতোমের নকশার দু'-একটি নমুনা দেওয়া যাক এখানে :

"আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন; সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তর বদ্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসা হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সন্তেন—কালভৈরবের স্তব পাঠ—তুকতাক্—সাফরিদ— নারাণ— বালওড়—বাসী—শোপুর—নলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গায় চম্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হল্লো—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।......
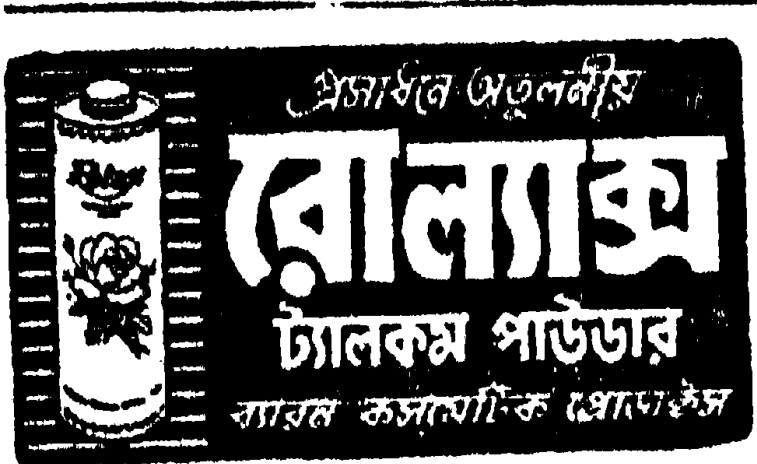
আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই।......

রোজার সঙ্গে দুটি চেলা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও "কাল ও কৃশ্চানীর" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আনতে রাজি হলেন—চেলারা খাবার-দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বসলেন, দরজায় হুড়কো পড়লো—আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো: রোজা কোষাকুশি ও আসনি নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকতে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!...

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো; গোহাড়, ঢিল, ইট ও জুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে যেন কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি দু-চির হয়ে ভেঙ্গে গ্যালো—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন!

আমরা ছেলেবেলা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়দের দলের দু-এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই। ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্তা অন্ধকারেও জোড়হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডান্ট ওয়েলসের মত যা ধরেন, তার সমুলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালারা অনেক সাধ্যসাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎ-কিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগলেম!

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্টা ফলারের হাপুর হাপুর শব্দ থামতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উঁকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উঁকির চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়ল—বমি! হুড়হুড় করে বমি। গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কলেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপাচারে টারটামেটিক্ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গ্যালো!......"

এমনি ধারা নানা নকশায় বুজরুকি, ভাড়ামি আর ভন্ডামির মুখোশ খসিয়ে দেওয়া হয়েছে 'শ্রী হুতোম প্যাঁচা কর্তৃক'। 'হুতোম' ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খৃঃ) তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-য় উনবিংশ শতকের কল্‌কাতা শহরেরই এক বাস্তব রূপ প্রতিফলিত করেছেন পাকা আলোকশিল্পীর মত। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভুঁইফোড় যে 'বাবু'-সম্প্রদায় কলকাতায় গজিয়ে ওঠে এবং যাদের অনেকেই 'স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার...
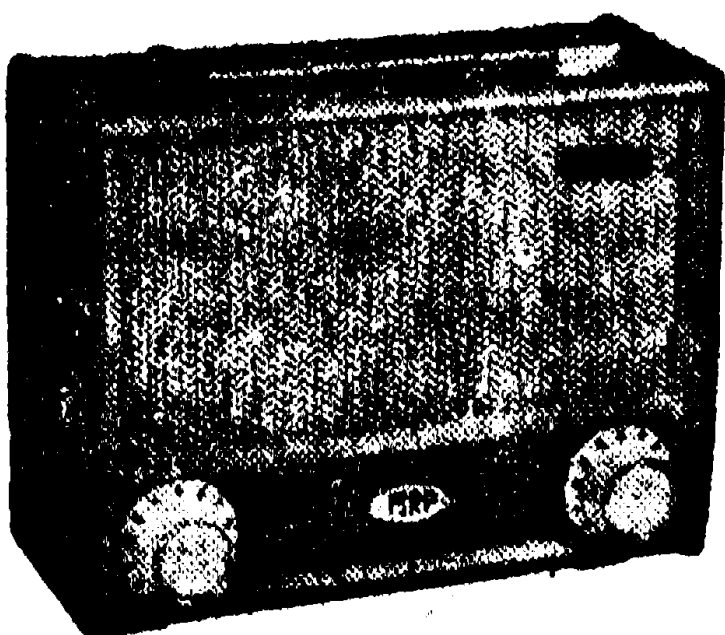
কিম্বা রাজের, সাজের, কাঠের, ইটের সর্দারি, চৌকিদারী, জুয়াচুরী, পোদ্দারী" ইত্যাদি করে সহসা বিস্তর বিত্তশালী হয়ে ওঠে, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কলকাতার এই 'বাবু' সম্প্রদায় ও কালচারের ব্যঙ্গচিত্র—'স্যাটায়ার'। একশ' বছর আগেকার কলকাতা আর তার আশে-পাশের সামাজিক গলদের চিত্র এঁকেছিলেন তিনি নিপুণ হস্তে; কোন রঙ ফলাতে যাননি। একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই তাই তাঁর নকশার দ্বিতীয় সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকায় বলে গেছেন ঃ

"......হুতোমের নকশা বঙ্গ-সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো।"

......পূর্বের বড়-মানুষেরা এখনকার বড়-মানুষদের মত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি (—) ছিল, (এখনও অনেকের আছে)। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু-তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হোত না। তেল মাখতেও ঝাড়া চার-ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল-মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখাতে বসতেন, সেই সময় বিষয়কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সহি ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে-বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো বাপান্ত কল্লেও বকসিস পেতো; কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ী ঢুকতে পেতো না; তার বেলা ন্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব-কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপীমোহন দেব গুপীমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো।......

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমুজ্জ্বল এই চিত্রগুলি ইংরেজ কথাশিল্পী চার্লস্ ডিকেন্সের Sketches by Boz-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' থেকে উদ্ধৃত

শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বাদ-বিচারে কালীপ্রসন্ন সিংহকে অভিযুক্ত করা হলেও, এটা বিবেচনা করে দেখা অনুচিত হবে না যে, হুতোম প্যাঁচার নকশা' যখন রচিত হয় তখন কালী-প্রসন্নের বয়স কতই বা ছিল? (মাত্র ৩০ বৎসর কাল ত তিনি বেঁচে ছিলেন। অথচ এই স্বল্প কালের মধ্যে নকশা ছাড়া তিন-চারখানা নাটক, আঠার-পর্ব মহাভারতের গদ্যানুবাদ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুশীলনের কি অসাধ্য সাধনই না করে গেছেন।) সুতরাং যৌবনসুলভ কিছু চপলতা কিংবা বাড়াবাড়ি যদি কোথাও ঘটে থাকে তাঁর রচনায় তবে তা ক্ষমা। হুতোম প্রবর্তিত গদ্য স্টাইলের সুন্দর সাবলীল রূপান্তর হল "বীরবলী" রীতি বা ঢঙ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মার্জিত, স্বচ্ছ ক্ষুরধার লেখনীতেই হুতোমী ভাষার সার্থক রসোত্তীর্ণ পরিণতি বলা যায়। আর এখানেই শেষ নয়। হালের 'বেলা লেতার' বা রম্য রচনায় হুতোমী গদ্য-শিল্পের ধারা বুঝি আজও অব্যাহত রয়েছে।

কাজেই দেখা যায়, একশ' বছরের আগে জন্মেও অসীম প্রতিভা-দীপ্ত এই প্রগতিশীল কথাশিল্পী একশ' বছর পরের বাস্তবধর্মী মন নিয়ে একদা বুঝি লেখনী ধারণ করেছিলেন।

নিকট অতীত মধুর স্মৃতি

কণাদ চৌধুরী

Pen is nughtier than sword এই ইংরেজী প্রবাদটি তৃতীয় নির্বাচন মারফৎ যেভাবে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। সভা-সমিতি, পথ-নাটক, স্লাইড এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আনাগোনা ছাড়াও এবারের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে পোষ্টারের ভূমিকা ছিল অনন্য। এই সেদিন পর্যন্ত রাস্তায় বেরিয়ে আপনি যদি বাগবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে এক মাইল রাস্তার ধারের সমস্ত পোষ্টার পড়তে পড়তে হাঁটতেন ঠিক একটি আড়াইশ পাতার উপন্যাস পাঠের শ্রম হত আপনার। না, উপন্যাস বলাটা ভুল হল, নাটক বলাই উচিত। কারণ, উপন্যাসে পাতায় পাতায় নাটকীয় উপাদান থাকে না, কিন্তু নির্বাচনের রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি পোষ্টারই একেকটি নাটকীয় চরিত্র। কদিন আগে পর্যন্ত সমস্ত কলকাতা পোষ্টারের শেকলে বন্দী ছিল। 'ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন"এর সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতাটির চূড়ান্ত ব্যবহার ঘটেছিল কলকাতায় পোষ্টারের বিস্তীর্ণ কাগজে। এবং এই পোষ্টার-পর্বের পেছনে আয়োজন-অনুষ্ঠান ছিল কম না। প্রায় প্রতিটি বড় রাস্তায় নির্বাচন দিনের প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই বিভিন্ন পার্টির নির্বাচনী অফিস খোলা হয়েছিল। এই অফিসগুলিকে একেকটি পোষ্টারের কারখানা বলা যেতে পারে। চাটাই, আঠা, তুলি, রঙ-এ ভর্তি ছোট অফিসঘরে প্রায়ই দেখা যেত যুবকেরা ঘাড় নীচু করে একমনে নির্বাচনের আয়ুধ-লিপিকা তৈরী করছে। এ কাজে এতটুকু শ্রমকাতরতা ছিল না কোনো মহলে। সকালে বাজারে যাওয়ার রাস্তায় ছেলেদের পোষ্টার-ঘরে কাজ করতে দেখেছি, রাত্রির সিনেমা শো দেখে ফেরার সময়েও দেখেছি একশ পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে মসীলিপিকে অসি-ধারার মত কিংবা তার চেয়েও তীক্ষ্ন করছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে এসেছে পোষ্টার প্রতি-যোগিতাও তত তীব্র হয়েছে। কেউ হয়ত কোত্থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল,—মোড়ে ওরা যে একটা পোষ্টার মেরেছে ছড়া আর ছবি দিয়ে...ইস্ প্রেষ্টিজ গেল......কথাটা শেষ হতে না হতেই মুখ্য পোষ্টার-শিল্পী বেরিয়ে গেল মোড়ের দিকে সম্ভ্রমহানিকর পোষ্টারটি দেখতে এবং সে ফিরতেই পাল্টা পোষ্টা-রের খসড়া তৈরী আরম্ভ হল। এবারের পোষ্টার-প্রস্তুতিতে শুধু শিল্পীরাই না, পাড়ার কবিদের যথাশক্তি কবিত্ব নিয়োগ করতে হয়েছে। কারণ ছড়াযুক্ত পোষ্টার এবারের নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত বেশী পাঠক আকর্ষণ করেছে। শুধু কবিত্ব-শক্তিই না, অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও ক্ষিপ্র প্রমাণ দিতে হয়েছে পোষ্টার-লেখকদের। পরিসংখ্যানের লড়াইতেও যুযুধান পক্ষ-গুলি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে। কিন্তু এই উত্তেজক প্রতিযোগিতার মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবক, পোষ্টার এবং নির্বাচনী অফিসগুলির সহঅবস্থান-নীতি প্রশংসার একটি উজ্জ্বল বিষয়। একই জানালার একই শিকে দড়ি বেঁধে দুই বিরোধী পক্ষের ছেলেরা পোষ্টার ঝুলিয়েছে। বাতাসের দৌরাত্ম্যে একের পোষ্টার উল্টে অপর পক্ষের ঘাড়ে পড়েছে, সেগুলোকে আবার ঠিক করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু অসহিষ্ণু

কেউ তাকায় না আজকে। রাত্রে পান খেলে পরদিন সকালে যেটুকু লাল দাগ লেগে থাকে ঠোঁটের কোণে, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পর পথিক-মনে সেটুকু দাগও রাখতে পারেনি প্রাচীর-লিপিকাসমূহ। বাক-বিতণ্ডা, কুৎসা-বিদ্রূপের সমস্ত বিষ ছড়াবার আর কোনো ক্ষমতা নেই এদের, এরা নিজেরাই এখন নীলকণ্ঠ। এখন বিজিত বিজেতা, এমনকি জামানৎ যাঁদের বাজেয়াপ্ত তাঁদের নির্বাচনী পোস্টার-গুলিও মূল্যমানে সমান।

কিন্তু এই মন্দা মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে। ১৯৬৭ সালে আবার কলকাতা প্রাচীরপত্রে কল্লোলিনী হবে, ১৯৬৭ সাল অনেক দূরের বছর। ততদিন পর্যন্ত কলকাতা গণতন্ত্রের বিছানায় শুয়ে ঘুমোবে। আরো হয়ত অনেককেই ঘুমাতে হবে। এবারের পোস্টারগুলি যাঁদের আনন্দ দিয়েছে তাঁরা সকলেই কি আগামী নির্বাচনের পোস্টারগুলির পাঠক হতে পারবেন? পরমায়ু কি এতই করুণাঘন?

হাতে কোনো পক্ষের পত্রিকাই ছেঁড়া হয়নি কোথাও। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। নির্বাচনের দিন তিনেক আগে রাত্রি বারোটার পর একদল ছেলে মই দিয়ে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারছিল। অপর পক্ষের স্বেচ্ছা-সেবকদেরও পোস্টার মারার কথা ছিল, কিন্তু মইটি তখনও এসে পৌঁছোয়নি।

—আরে, ওদের কাছে চা না, ওদের হয়ে গেলে আমাদের যেন দেয়—!

—ওরা......দেবে ত?

সংশয়ী প্রশ্নকর্তাকে ধমক খেতে শুনলাম।

—ওরা দেবে ত মানে? ওদের আঠা ফুরিয়ে যেতে আমরা দেইনি কাল ওদের। যা যা চা গিয়ে। আমার নাম করে বলিস......।

অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি সত্যি। ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ কলিকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলে।

কিন্তু এত উদ্যোগ এত আয়োজন আজকে এর কোন মূল্য নেই। ২৫ তারিখের পরের দিনই প্রমেথিউস কলিকাতা তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে। কাগজ-কুড়িয়ে ছেলেরা প্রাচীর পত্রের শবদেহগুলি বহন করে নিয়ে গেছে উপরি উপার্জনের আশায়। আঠার প্রাচুর্যে যে সমস্ত প্রাচীর-পত্র এখনও প্রাচীরলগ্ন হয়ে আছে তাদের দিকে আর

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ একটি রোগের লক্ষণ ॥

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪০ সালে মার্কিন দেশে। জনসন নামে এক কোটি-পতি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে হাজির হয়েছিলেন। ডাক্তাররা একবাক্যে রায় দিলেন যে জনসনের শরীরে কোনো রোগ নেই। তাঁর শরীরের সবকটি প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন। তবুও ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন যে জনসন যেন কিছুদিনের জন্যে হাওয়া-বদল করে আসেন। জনসনের টাকার অভাব নেই, তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

সমুদ্রের ধারে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি জায়গায় হাওয়া-বদলের তোড়জোড় চলেছে, এমন সময়ে একটি কাণ্ড ঘটল। শেয়ারের বাজারে একটি ভুল চালের জন্যে জনসন রাতারাতি দেউলিয়া হয়ে গেলেন। ব্যাঙ্কের পুঁজি শূন্যের অঙ্কে নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সুস্থ সবল জনসনের শরীরটাও যেন ভেঙে পড়ল একেবারে। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে হলেই তাঁর হাঁপ ধরে যায়। সারা শরীরে কেমন একটা জ্বালা বোধ করেন। তৃষ্ণায় সব সময়েই গলা শুকিয়ে থাকে।

জনসন আবার এলেন তাঁর ডাক্তারদের কাছে। যে-ডাক্তাররা দুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন যে জনসনের শরীরে কোনো রোগ নেই, তাঁরাই এবার একবাক্যে ঘোষণা করলেন যে জনসনের ডায়াবেটিস হয়েছে। অথচ সকলেই জানেন যে ডায়াবেটিস রাতারাতি হবার মতো রোগ নয়, দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে শরীরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে জন-সনের দেউলিয়া হবার সঙ্গে তাঁর শরীরের এই রোগের কোনো সম্পর্ক আছে?

বিষয়টিকে বুঝতে হলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা তুলতে হবে।

॥ দুই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ॥

আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। এই পাখির ঝাঁককে দেখতে হলে আমি মাথা উঁচু করে তাকাব। গাছের ফলটিকে দেখে আমার ভালো লেগেছে। আমি ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে ফলটিকে ছুঁতে পারি।

মাথা উঁচু করে দেখা বা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া—এগুলো আমার ইচ্ছাধীন কার্য-কলাপ। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সেই বিশেষ অংশের দ্বারা এই সব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় যার নাম সেরিব্রাল কর-টেক্স্‌ বা গুরুমস্তিষ্ক।

কিন্তু আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে এমন অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে যা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যকৃৎ বা পাক-স্থলী বা অন্ত্র বা বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বা এমনি ধরনের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গই কোনো না কোনো দায়িত্ব পালন করে, অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই সমস্ত প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-শীলতা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা এই ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে ভেজেটেটিভ বা অন্য-নিরপেক্ষ স্নায়ু-তন্ত্র।

কিছুকাল আগেও মনে করা হত যে এই দুই ধরনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ভেজেটেটিভ স্নায়ুতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি ব্যাপার। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হল যে মানুষের স্নায়ুমণ্ডল দুভাগে বিভক্ত। একভাগ উচ্চ মনন-ক্রিয়ার জন্যে—যেমন, চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্যকলাপ ইত্যাদি। অপর ভাগ স্বয়ংক্রিয় জৈবক্রিয়ার জন্যে। প্রথমটির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্ক। দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র সাব-কর্টিকাল রিজিয়ন বা নিম্নমস্তিষ্ক। আর সত্যিকারের শারীরসংস্থান পরীক্ষা করতে গিয়েও দেখা গেল যে উচ্চ ও নিম্ন মস্তিষ্ক পরস্পর-সম্পর্কহীন।

এ-অবস্থায় উপরোক্ত জনসন নামক ভদ্রলোকটি কি করে যে রাতারাতি ডায়া-বেটিস রোগ বাধিয়ে বসলেন তার কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল না।

॥ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ॥

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ছিল অন্যরকম। যার মেজাজ খিটখিটে তার গায়ের চামড়াতেও যেন সেই লক্ষণটি ফুটে ওঠে। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে খিটখিটে মেজাজের লোকই সবচেয়ে বেশী চর্মরোগগ্রস্ত হয়। আরো দৃষ্টান্ত আছে। হাসপাতালে দুজন রোগীর একই রোগ হয়েছে, দুজনের রোগের একই ধরনের জটিলতা। এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে, যে-রোগী হাসি-খুশি থাকতে পারে, রোগকে যে বিশেষ আমল দেয় না, সে-ই আগে রোগমুক্ত হয়। আর যে-রোগীর সারাদিনটি কাটে প্যান-প্যান করে, রোগকে যে বাড়িয়ে দেখতে চায়, রোগও তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

যে-কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে যে তাঁর রোগীদের মধ্যে কয়েকজন অন্ততঃ আছেই যাদের রোগ শরীরের নয়, মনের। অর্থাৎ রোগী নিজেই ভাবতে শুরু করে যে তার অমুক রোগটি হয়েছে। জেরোম কে জেরোমের 'থ্রি মেন ইন এ বোট' উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্ব-কল্পিত রোগের দৃষ্টান্ত নতুন করে বলতে হবে না। রোগের কল্পনাই কোনো কোনো লোকের শরীর একেবারে ভেঙে দেয়।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা সাধারণত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে রোগের লক্ষণ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে। সাধারণত দেখা যায়, এই সময়ে ছাত্ররাও কল্পনা করতে শুরু করে যে তার নিজেরও অমুক অমুক রোগ হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এই সব রোগের নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর রোগ'।

সুপরিচিত সোভিয়েট লেখক বোরিস পলেভয় একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লিখেছেন যার নাম 'এ স্টোরি অ্যাবাউট এ রিয়েল ম্যান', একটি সাচ্চা মানুষের গল্প। এই উপন্যাসের নায়ক মেরেজিয়েভের সঙ্গে এখনো মস্কো এরোড্রোমে সাক্ষাৎ হতে পারে। যুদ্ধের সময়ে একটি বিমান-দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর দুটি পা-ই কেটে ফেলতে হয়েছিল। তিনি হয়ে গিয়ে-

ছিলেন অথর্ব। কিন্তু নিতান্তই মনের জোরে তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম পা নিয়েই তিনি আবার ফাইটার প্লেন চালিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে আজ আর কিছুতেই বোঝা যায় না যে তাঁর শরীরে গুরুতর রকমের অঙ্গহানি ঘটেছে।

এ ধরনের দৃষ্টান্ত গল্পে-উপন্যাসে আরো অজস্র আছে। বাস্তব জীবনে তো আছেই। হালে যে যন্ত্রণাহীন প্রসবের কথা শোনা যাচ্ছে তাও এ-ব্যাপারেরই একটি দৃষ্টান্ত। ওষুধ বা অপারেশনের সাহায্যে নয়, প্রসূতির মনকে প্রস্তুত করে তুলেই এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটানো হয়ে থাকে।

এই দৃষ্টান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একটি কথাই বেরিয়ে আসে। গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা সকলেই জানি যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাভলভের গবেষণা এই সম্পর্কটিকে একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার নাম কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্ বা শর্তাধীন পরাবর্ত।

॥ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর ভারতভ্রমণ ॥

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন নামে যে ওষুধটি যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তার আবিষ্কারকের নাম ডাঃ সেলম্যান এ ওয়াক্‌স্‌ম্যান। এই আবিষ্কারের জন্যে ১৯৫২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি মার্কিন দেশের নাগরিক এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৩ বছর। আগামী ২১শে মার্চ আঠারো দিনের জন্যে তিনি ভারতে আসছেন এবং প্রথম পাঁচটি দিন তিনি কাটাবেন কলকাতায়।

ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান নিজস্ব ক্ষেত্রে একজন কৃতী ব্যক্তি। তিনি প্রায় ৪০০টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছেন এবং ১৮টি বই লিখেছেন। তিয়াত্তর বছর বয়সেও তিনি গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, বই লিখছেন ও শিক্ষকতা করছেন।

যে বিশেষ উপলক্ষে ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান ভারতে আসছেন তা ভারতের পক্ষে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগামী ২৯শে মার্চ পিম্প্রির স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানার উদ্বোধন হবে। তিনি এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

॥ ভারতের স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানা ॥

ভারতের স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানাটি নির্মিত হয়েছে পুনা থেকে দশ মাইল দূরে, পিম্প্রিতে। নির্মাণকার্যের উদ্যোক্তা হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ লিঃ। এটি একটি সরকারী মালিকানার প্রতিষ্ঠান। এই নির্মাণকার্যে সহায়তা করেছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম ইণ্টারন্যাশনাল। মোট ব্যয় ৪৫ লক্ষ ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী-আমদানী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পিম্প্রির কারখানায় গোড়ার দিকে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন উৎপাদিত হবে বছরে ৪৫,০০০ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ ভারতের মোট প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক। এক বছরের মধ্যেই এই কারখানার উৎপাদন দ্বিগুণ হবে।

॥ টিকার আবিষ্কারক ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার ॥

আজকাল যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের জন্যেও টিকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আর স্ট্রেপটোমাইসিনের কল্যাণে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসাও অনেকখানি সরলীকৃত। যক্ষ্মার মতো রোগও এখন আর কিছুমাত্র ভয়ের ব্যাপার নয়। আর বসন্ত বা কলেরা বা প্লেগ ইত্যাদি রোগকে তো চিরকালের মতো বিদায় নিতে হয়েছে (আমাদের দেশে অবশ্য নয়)।

কিন্তু শুনলে আঁতকে উঠতে হবে যে আঠারো শতকের ইউরোপেও ছয় কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল শুধু বসন্তরোগে। এই মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৯৬ সালে। আবিষ্কারক একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী, নাম ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার।

১৭৪৯ সালের ১৭ই মে তারিখে ইংলণ্ডের গ্লুসেস্টশায়ারের এক অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। লেখাপড়া শুরু হয়েছিল স্থানীয় বিদ্যালয়ে। একুশ বছর পরে লণ্ডনের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে তৎকালীন একজন বিখ্যাত সার্জনের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলেন।

পুরোপুরি ডাক্তার হবার পরে গুরুর পরামর্শে তিনি আবার গ্রামেই ফিরে এলেন পশার জমাবার জন্যে। তখনো এত সব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। চিকিৎসার জন্যে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হত স্থানীয় গাছগাছড়ার ওপরে। টোটকা ওষুধের প্রচলনও যথেষ্টই ছিল। এই অবস্থায় রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাঃ জেনার কতকগুলো ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন।

একটি ব্যাপার হচ্ছে এই যে কোনো কোনো রোগ মানুষের জীবনে একবারই মাত্র হয়। যেমন, বিশেষ এক ধরনের হাম বা বসন্ত ইত্যাদি। এসব রোগ থেকে একবার যদি কেউ আরোগ্য লাভ করতে পারে তবে সারা জীবনে তার আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিশেষ করে বসন্তরোগ সম্পর্কে আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। গোরুদের মধ্যে একধরনের বসন্তরোগ হয় যাকে বলা যেতে পারে গো-বসন্ত। গোরুর সংস্পর্শে এসে অনেক সময়ে মানুষের এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগটি তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু তারপরে আর এই মানুষটির কখনোই বসন্তরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

ডাঃ জেনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান ধরনের বসন্তরোগীকে পরীক্ষা করলেন। দুটি বাচ্চার শরীরে এই রোগের রস প্রবিষ্ট করিয়ে তার ফলাফলও প্রত্যক্ষ করলেন। এইভাবে সাতশটি রোগী নিয়ে বিভিন্নভাবে নাড়াচাড়া করার পরে ১৭৯৬ সালে ঘোষণা করলেন বসন্তরোগের টিকাদানের পদ্ধতি। এই ঘোষণা সারা পৃথিবীতে তুমুল সোরগোল জাগিয়ে তুলল। ডাঃ জেনার তার টিকাদানের পদ্ধতির যথার্থতা ও কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন।

বসন্তরোগের টিকার দাগ আমাদের সবার হাতেই খুঁজলে পাওয়া যাবে। এই দাগটি অতি সামান্য। কিন্তু এই দাগটির ইতিহাস অনুসরণ করলে বহু মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মদান ও বহু বিজ্ঞানীর নিঃস্বার্থ গবেষণার ইতিবৃত্তের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। আর এই বহুজনের মধ্যেও ডাঃ জেনার তাঁর একক কৃতিত্বে সর্বাগ্রগণ্য।

মসিরেখা

জরাসন্ধ
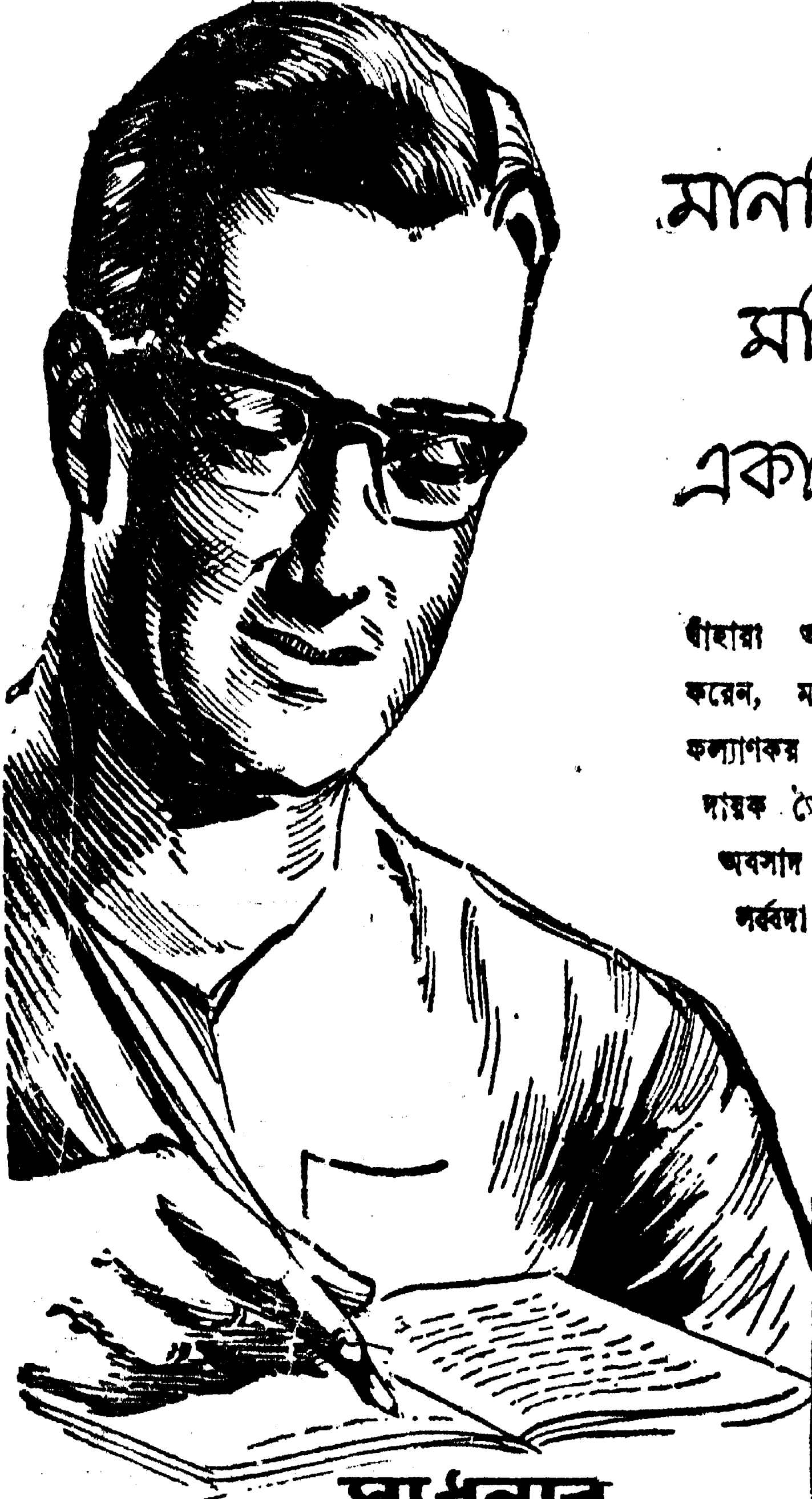
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাহাদুর চলে যাবার পাঁচ-ছ দিন পর শূন্য স্কুল-বাড়ির কোণের দিকের একটা ঘরে দিলীপ আশুবাবুর কাছে বসে পড়ছিল। সেদিনকার মত কাজ শেষ হলে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই তিনি বললেন, তোমার একখানা চিঠি আছে।

—আমার চিঠি! বিস্ময়াবিষ্ট সুরে এই দুটি কথা যেন অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

হ্যাঁ; এই নাও।

দিলীপ হাত বাড়াতে গিয়েও পারল না, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্টারমশাই-এর মুখের পানে। এখানে অনেকের নামে চিঠি আসে, তাদের মা-বাবা-ভাই-বোনেদের কাছ থেকে। তার কোনোদিন আসে না। কে লিখবে? কে আছে তার? যে ছিল, একটি মাত্র মানুষ যে লিখতে পারত, সে হয়তো আজও পথে পথে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে কি এতদিন পরে—? আশুবাবুর গলা শোনা গেল। বোধ হয় ওর অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করে বললেন, বাহাদুর লিখেছে।

'বাহাদুরদা!' অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে খাম খোলা খামখানা যেন ছিনিয়ে নিল দিলীপ। ভাঁজ খুলেই পড়তে শুরু করল।

ভাই দিলীপ,

ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তোকে একদিন বলবো। তার আর সময় হল না।

বুঝতে পারছি, ওখানে সকলেই আমাকে ছিঃ ছিঃ করছে। তুইও খুব দুঃখ পেয়েছিস। ওরা নিশ্চয়ই বলছে, আমি একটা মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছি। কিন্তু কেউ জানে না, ও আমার মায়ের পেটের বোন। ওকে বাঁচাবার জন্যেই, শুধু নিন্দা নয়, এত বড় একটা অপরাধের বোঝা আমাকে মাথায় তুলতে হল। পালানো ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

শুনে তুই অবাক হচ্ছিস নিশ্চয়ই—ব্যান্ড-মাস্টার আমার বাবা, আমাদের মা নেই। এই বোনটাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কয়েক বছর পরে হঠাৎ বাবা আবার বিয়ে করে বসল। আমাদেরও দুঃখের দিন শুরু হল। তারপর কি করে আমি জেলে গেলাম, সে সব কথা এখন থাক।

রনমায়াকে ওরা পেট ভরে খেতে দিত না। যখন তখন মার-ধোর করত। মাঝে মাঝে লুকিয়ে একবারটি দেখে আসা ছাড়া আমার করবার কিছু ছিল না। তাও বন্ধ হয়ে গেল। সে সব তো তুই জানিস।

সেদিন হঠাৎ জানতে পেলাম, আমার সৎ-মা ওকে বিয়ে দেবার নাম করে বিক্রী করে দিচ্ছে তার এক মাতাল বদমাস আত্মীয়ের কাছে, আর বাবা সব জেনেও চুপ করে আছে। তারপর আর স্থির থাকতে পারিনি।

ওকে নিয়ে কোথায় কি অবস্থায় আছি, সে কথা তোকে জানাতে পারবো না। ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি ফিরে গিয়ে ধরা দেবো। দোষ করেছি, তার শাস্তি অবশ্যই নিতে হবে।

কত কথা বলবার রইল। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, সেদিন জানাবো।

স্কুলের ঠিকানায় লিখলে আমার চিঠি ও'রা তোকে না-ও দিতে পারেন। তাই মাস্টারমশাই-এর নামে পাঠালাম। তিনি আমাদের দুজনকেই ভালবাসেন। তাঁর হাতে যদি পৌঁছয়, তুই নিশ্চয়ই পাবি।

ও'কে আমার প্রণাম দিস।

বাহাদুরদা।

আশুবাবু নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন। ঐ সঙ্গে দু-লাইন তাঁকেও লিখেছে বাহাদুর—দয়া করে চিঠিখানা দিলীপকে দেবেন; আর সেটা যদি সম্ভব না হয়, যেটুকু তাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন, জানালে কৃতজ্ঞ হব।

দিলীপ পড়া শেষ করেই বলল, আপনি পড়েছেন, স্যর?

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, তোমার চিঠি; আমি কেন পড়বো? কী লিখেছে?

—পড়ে দেখুন। আমি জানি, বাহাদুর কোনো দোষ করতে পারে না। এখনই গিয়ে সবাইকে এ চিঠি দেখাবো।

আশুবাবু লাইনকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সাহেবকে দেখাতে পার।

—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি।

ছুটে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ছেলেদের নামে যে-সব চিঠি আসে, প্রথমে আফিসে খোলা হয়। একজন কেরানীবাবু সেগুলো পড়ে দেখেন; তারপর মস্ত বড় একটা 'সিল' মেরে সাহেবের সই নিয়ে যার চিঠি তাকে ডেকে পাঠিয়ে বিলি করেন। এ নিয়ম সে জানে। কিন্তু এখানে তার কোনোটাই হয়নি। সাহেব যদি রেগে যান?

আশুবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কী হল? দিলীপ ভয়ে ভয়ে

চোখ তুলল। যে-কথাটা মনে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না। চিঠিখানা শুধু একবার উল্টে দেখল। তার থেকেই তিনি অনুমান করে নিলেন, এই মুখ-গুলোর প্রতিটি রেখা, চোখের প্রতিটি ভাষা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আশ্বাসের সুরে বললেন, সাহেব যদি জিজ্ঞেস করেন কোত্থেকে পেলে এই চিঠি, কেমন করে পেলে, সত্যি কথাই বলো। তাতে তোমার কোনো ভয় নেই।

দিলীপের সমস্ত মুখখানা খুশীর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বইগুলো টেবিলের উপর ফেলে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এর আগে সাহেবের কাছে সে নিজে থেকে কখনো কোনো ব্যাপার নিয়ে যায়নি। এই বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে ঘিরে তার প্রথম দিনের সেই ভয় তখনো সব-খানি কাটেনি। সেই মুহূর্তে কে তার মনে এই দুর্জয় সাহস এনে দিল, সে নিজেই জানে না। উর্ধ্বশ্বাসে মাঠ পার হয়ে সুপারের আফিসের সামনে পৌঁছতেই, গেটকীপার হেঁকে উঠল, কী চাই? তার আগেই সে পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সাহেব চোখ তুলে চাইতেই এগিয়ে গিয়ে বলল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে, স্যার।

ঘোষসাহেবের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে! কোথায়?

দিলীপ চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখল। তুলে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখে বললেন, তোমার চিঠি!

—হ্যাঁ, স্যার।

—কে দিলে তোমাকে?

—মাস্টারমশাই দিয়েছেন। তাঁর নামে এসেছে কিনা?

—কোন্ মাস্টারমশাই?

—আশুবাবু—স্যার।

চিঠি পড়তে পড়তে সুপারের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। বাঁ হাতে 'কলিং বেলটা' বাজিয়ে দিলেন এবং গেটকীপার এসে দাঁড়াতেই বললেন আশুবাবু।

আশুবাবু জানতেন তাঁর ডাক পড়বে। দিলীপের পিছন পিছন গেটে এসে ও-দিকের আফিসে অপেক্ষা কর-ছিলেন। সাহেবের ঘরে পা দিতেই তিনি দিলীপকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। চিঠিটা আমার কাছে রইল। পরে পাঠিয়ে দেবো।

আশুবাবুর দিকে ফিরে বললেন, এ যে দেখছি রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার। আপনি জানতেন কিছু?

আশুবাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না। কলিং বেল'-এ আর একবার আঘাত পড়ল। ব্যান্ড-মাস্টারের জরুরী তলব।

বীরবাহাদুর কদিনের ছুটি নিয়ে-ছিল, কিন্তু বাসা থেকে বেরোত না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ধীরভাবে এসে দাঁড়াল টেবিলের ওপারটায়। তার সেই চিরাভ্যস্ত মিলিটারী কুর্ণিশের কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না, কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গিটা আজ যেন তেমন ঋজু নয়, মাথাটা নুয়ে পড়ছে বুকের উপর। মুখ দেখে এদের মনের খবর পাওয়া বড় কঠিন, কিন্তু এই মুহূর্তে যে একটি বিষণ্ণ-গম্ভীর ছায়া সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। সাহেব ক্ষণকাল নিবিষ্ট মনে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, গোটাকয়েক কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, বীরবাহাদুর। আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

—বলুন স্যার, তেমনি নীচের দিকে চেয়েই উত্তর দিল ব্যান্ড-মাস্টার।

—ঐ ছেলেটা তোমার কে হয়?

বীরবাহাদুর জিজ্ঞাসা করতে পারত কোন্ ছেলেটা, অনাবশ্যক বলেই করল না। সোজাসুজি জবাব দিল, আমার ছেলে।

দুজনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকা-লেন। এমন দ্বিধাহীন দ্রুত উত্তর বোধ-হয় আশা করেননি। সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন শোনা গেল, সে কথা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন?

বীরবাহাদুর সাড়া দিল না, মাথাও তুলল না, যেমন ছিল তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সুপার তিক্ত স্বরে বললেন, জেলখাটা ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছিল বুঝি?

বীরবাহাদুর মাথা তুলে তাকাল। শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি মনিব। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না। যদিও ছেলে আমার চুরি ডাকাতি করে জেলে আসেনি। যে জন্যে এসেছিল, তার জন্যে আমিই অনেকখানি দায়ী, তবু দশজনে আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওটা ব্যান্ড-মাস্টারের ছেলে, ভাবতেই মনটা কেমন ছোট হয়ে যেত। বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

—আশ্চর্য! ক্ষুব্ধ কিন্তু নিম্ন-স্বরে যেন আপন মনে বললেন সুপার। বীরবাহাদুর সেদিকে কান দিল না, ধীরে ধীরে আগেকার সূত্র ধরে বলল, কিন্তু তারপর যে-লজ্জা আমাকে সে দিয়ে গেল, তার কাছে এই জেলে-আসাটা কিছুই নয়। আজ আর আমি মাথা তুলতে পারছি না, সাহেব।

—পালিয়ে গেছে বলে?

—না, স্যার, শুধু পালিয়ে গেছে বলে নয়।

—তবে? নিজের বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে; তার মধ্যে লজ্জার কী আছে?

—কেন নিয়ে গেছে, তা তো আপনারা জানেন না, স্যার। বাপের হাত থেকে

ছোট বোনটাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি সেই বাপ—সে-লজ্জা আমি ঢাকবো কী দিয়ে!

সাহেব এবং আশুবাবু—দুজনেরই মনে পড়ল দিলীপকে লেখা বাহাদুরের চিঠির সেই কটি লাইন। বলবার মত কিছু খুঁজে পেলেন না। ফৌজ থেকে অপসারিত এই অসহায়, নিরুপায়, ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যান্ড-মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বীরবাহাদুর তার সেই ফৌজী ভঙ্গিতে দু-কদম সামনে এগিয়ে গেল। বুক পকেট থেকে বের করল একখানা চার ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অর্ধসীট, দুহাতে ভাঁজ খুলে সোজা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে ফিরে এল তার আগেকার জায়গায়। তারপর সোজা হয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল। সুপার এক নজরে সেই কাগজখানা দেখে নিয়েই বিস্ময়ের সুরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ!

—হ্যাঁ, সাহেব। অনেকবার ভেবেছি, ছাড়ব; পারিনি। পনর বছর ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বুকটা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। বুড়ো বয়সে কোথায় যাবো, কী খাবো—এই ছিল ভাবনা। কিন্তু আজ আর তা ভাবলে চলে না। ...আর একটা আরজি আছে স্যর, দরখাস্তটা মঞ্জুর হতে যদি কদিন সময় লাগে, মেহেরবাণী করে তদ্দিন আমার ছুটিটা বাড়িয়ে দেবেন।

কয়েক মুহূর্ত ছেদ পড়ল। তারপর আবার শোনা গেল তার মৃদু গম্ভীর স্বর—না জেনে অনেক কসুর হয়তো করেছি আপনার কাছে, অনেক গাফিলতি দেখিয়েছি, তার জন্যে মাপ করবেন।

শেষ দিকে গলাটা একটু ভারী হয়ে উঠল। আশুবাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। সাহেব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খট্ করে জুতোর শব্দ কানে যেতেই চোখ তুলে দেখলেন, অ্যাবাউট্ টার্ন করে বীর বাহাদুর বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাস তিনেক পরে দিলীপ একদিন শুনল, বাহাদুর ধরা পড়েছে। ধরা দেবার জন্যে সে নিজেই আসছিল বর্স্টাল স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে। গঙ্গা পার হয়ে এপারে আসতেই একজন পুলিশের হেড কনস্টেবল চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে। থানা থেকে সেন্ট্রাল জেলে। খবর পেয়ে সাহেব তাকে বর্স্টালে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বর্স্টাল স্কুলস্ অ্যাক্ট্-এর ধারা উল্লেখ করে এস্. ডি. ও-কে লিখেছিলেন, এখান থেকে কোনো ছেলে যদি পালিয়ে যায়, পুলিশের কাজ হল সেই পলাতক 'ইনমেট'কে অ্যারেস্ট্ করে স্কুল-হেফাজতে পৌঁছে দেওয়া। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা বা না করা—সেটা স্থির করবেন বর্স্টালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

পুলিশের তরফে সে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি না থাকলেও এস. ডি. ও. রাজী হননি। উত্তরে জানিয়েছিলেন, আসামী যে শুধু ল-ফুল কাস্টডি থেকে পালিয়ে গেছে, তাই নয় নারীহরণের মত জঘন্য অপরাধের দায়ে সে অভিযুক্ত। বিচার-সাপেক্ষে জেল-হাজতই তার উপযুক্ত স্থান। তার হয়ে বর্স্টাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওকালতি করছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর।

শেষের দিকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে যোগ করেছিলেন, সেন্টিমেন্ট্ জিনিসটা ভাল; কিন্তু তার অপপ্রয়োগ বা অতি-প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই জাতীয় ভাবপ্রবণতা একান্ত অবাঞ্ছনীয়।

চিঠি পেয়েই ঘোষ সাহেব ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের বৈঠকখানায় ধাওয়া করেছিলেন এবং আসল ঘটনাটাও খুলে বলেছিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি। প্রশাসনিক ব্যাপারে এস. ডি. ও. কালেক্টরের অধীন হলেও একজন ফার্স্ট ক্লাস্ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর এলাকার বাইরে। সেখানে তিনি হাত দিতে পারেন না। এর পরে নিষ্ফল ক্ষোভ বুকে চেপে চুপ করে যাওয়া ছাড়া অধ্যক্ষসাহেবের আর কোনো পথ রইল না।

।। সাত ।।

বস্তির অলিতে-গলিতে যে হরেক-রকম মানুষের বাস, তার মধ্যে একজাত ভারবাহী জীব আছে, যার নাম 'ওয়ালা'। আগর-ওয়ালা, ঝুনঝুন-ওয়ালা নয় (তাঁরা থাকেন বড়বাজারের প্রাসাদচূড়ায়), মুড়িওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ডালওয়ালা, পাঁপড়ওয়ালার দল। তাদের কর্মক্ষেত্র শহর, আস্তানা শহরতলী। ওখানকার রাস্তায় সারাদিন টহল দিয়ে আর গলা ফাটিয়ে এখানকার গলিতে এসে খোলার ঘরে রাত কাটানো। এছাড়া আর দুজন ওয়ালা আছে; বস্তির বাসিন্দা না হলেও বস্তি-বাসীর বুকের উপর তাদের দিবারাত্রির আসন। তারা হল—পাহারা-ওয়ালা আর বাড়িওয়ালা; পুলিশ ও মালিক; শান্তিরক্ষক ও আশ্রয়দাতা। কিন্তু সেই রক্ষণ ও আশ্রয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, তাদের নাগাল থেকে কী করে দূরে থাকা যায় এখানকার ছেলে-বুড়ো তাই ভেবেই অস্থির।

বস্তি থেকে একটা ছোট ছেলে দিন-দুপুরে উধাও হয়ে গেল,—গরিব ব্রাহ্মণ-বিধবার একমাত্র ছেলে—এ নিয়ে আশেপাশের লোকগুলো একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল, একথা বলা চলে না। রাস্তায়, পার্কে, হাসপাতালে, ভিখারীদের আড্ডায় এবং আরো অনেক সন্দেহজনক জায়গায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজির পালা বেশ কিছুদিন ধরে চালিয়ে, এটা যে ছেলেধরার কীর্তি, এই ধারণাটাই শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তর হল। একটা জায়গা তারা সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটি পুলিশ-থানা। 'ডায়েরী করার' প্রস্তাবটা কারো কারো মুখে শোনা গেলেও সাধারণভাবে সমর্থন পায়নি। বিদেশী শাসকের পুলিশ। তাকে পীড়নের যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনোরূপে তখনো এরা দেখতে শেখেনি। সাধ করে তার কবলে কে পড়ে? কোথা থেকে কী সূত্র ধরে কোন ফ্যাসাদ এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না।

সুবিপুল শোকের মধ্যে এক ধরণের বৈরাগ্য আছে। মন সব কিছুতে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। নির্মলার তখন সেই অবস্থা। সারাজীবন ধরে একটার পর একটা আঘাত তাকে সইতে হয়েছে। বারবার পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করেনি। এবারে যখন চরম আঘাত এসে পৌঁছল, আর উঠতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, করবার আর কিছু নেই। যে তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ মানুষকে চুপ করে থাকতে দেয় না, ঠেলে তুলে দেয়, সেটা তার চলে গিয়েছিল। দেহের কোনো অঙ্গে ক্রমাগতঃ ঘা দিতে থাকলে কিছুক্ষণ পরে সেখানটা অসাড় হয়ে যায়। দেহের অন্তরে যে মন, তার বেলাতেও তাই। নির্মলার মনে সেদিন কোনো সাড় ছিল না।

খোকা চলে যাবার পর কিছু-দিন সে ঘর ছেড়ে একবারও বাইরে যায়নি। রান্নাঘরের দরজা খোলেনি। বিজুর মা আসতেন, জোর জুলুম করে দুটো খাইয়ে যেতেন। অন্যান্য বাড়ির মেয়েরাও কেউ কেউ এবেলা ওবেলা ঘুরে যেত। নানা কথা বলে সাহস সান্ত্বনা দিত। হায়, ছেলেটা বড় মুষড়ে পড়েছিল। তার মাও এসে দাঁড়িয়েছে কবার, কিন্তু কি বলবে, কি করবে ভেবে পায়নি। এতটা যে গড়াবে কেমন করে জানবে সে? এ কেমন ধারা ছেলে। মা একটু গায় হাত তুলেছে বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবে! তার ছেলেকে তো সে দুবেলা দূর দূর করছে, কখনো বা মেরে আধমরা করে দিচ্ছে। খানিকক্ষণ কান্নাকাটি চেঁচামিচি করে ঘণ্টাখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তারপর আবার যে কে সেই। দুপাক ঘুরে এসেই বলবে, 'মা, ভাত দাও।' এ ছেলে গেল কোথায়।

যে যা বলত, নির্মলার কাজ ছিল শুধু নিঃশব্দে শুনে যাওয়া। ভালো কথায় সায় দিত না, মন্দ কথারও প্রতিবাদ করত না। বেশীরভাগ সময় চুপ করে শুয়ে থাকত।

তারপর একদিন আবার তাকে উঠতে হল। বিজুর মার সংসারে বোঝা বাড়িয়ে আর কতদিন চলে? এমনিতেই তাদের

ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। যে রান্নাঘরের পাট চুকে গেছে বলে ধরে নিয়েছিল, আবার গিয়ে বসতে হল তার উনুনের ধারে। যাহোক দুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে না দিয়েও পারল না। দেহ যতক্ষণ আছে, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যেতে হবে। এরই নাম প্রাণ-ধারণের দায়। ধড়ে প্রাণ থাকতে তার হাত থেকে কারো রেহাই নেই।

ঘরে বসে থাকলেও চলে না। পুঁজি-পাটা বলতে যৎসামান্য যা কিছু ছিল সব দুদিনেই শেষ হয়ে গেল। এবার নতুন করে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হবে। আবার সেই দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া—ওগো ঝি রাখবে তোমরা? এত-দিন খোকা ছিল। তার জন্যে সব দীনতা সে সয়ে নিয়েছে। উঞ্ছবৃত্তির হীনতা গায়ে মাখেনি। আশা ছিল, কদিন আর? খোকা বড় হলে আর তাকে পরের দুয়ারে ঘুরতে হবে না। আজ সে আশা নির্মূল হয়ে গেছে। তবু তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঔদ্ধত্যের, অবজ্ঞার কাছে, হাত পেতে নিতে হবে তাচ্ছিল্যের অন্ন, শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে! এর চেয়ে বড় গ্লানি আর কী আছে?

বিজুর মা প্রায়ই এসে পীড়াপীড়ি করতেন, একটা কিছু কর। হাত পা কোলে করে কদ্দিন আর বসে থাকবি? ছেলে তো নয়, পেটের শত্তুর। তার জন্যে ভেবে ভেবে শরীরপাত করে কী লাভটা হবে শুনি। বাঁচতে হবে তো?

—বেঁচেই বা আমার কী লাভ হবে দিদি?

—মরণ কি চাইলেই আসে রে? আমাদের যে কাছিমের প্রাণ।

সেই পুরনো সান্ত্বনা। নির্মলা আর কথা বাড়াল না, চুপ করে রইল। সেদিন যেন একটা অন্য সুর শোনা গেল বিজুর মার মুখে। বললেন, আমার বড় ছেলেটাকে তুই দেখিসনি। সাত বছরে পড়তেই কী যে কাল রোগ ধরল! হাত-পাগুলো কাঠি, পেটটা ঢাকের মত। ডাক্তার বলল, বেশী করে ফলের রস আর ছানা খেতে দিন। কোথায় পাবো? দুবেলা দুটো ডাল-ভাত জোটাতে পারি না। পুরো একটা বছর ভুগে ভুগে যেদিন চলে গেল, কি মনে হয়েছিল জানিস? মনে হয়েছিল, ছেলে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। রাত পোহালে তার ভাবনা আর ভাবতে হবে না।

বলতে বলতে, দীর্ঘদিন পিছনে ফেলে আসা সেই রাত্রিটির মধ্যেই যেন তলিয়ে গেলেন বিজুর মা। কিছুক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নির্মলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, তোর সে সান্ত্বনা নেই। তোর ছেলে তো মুক্তি দিয়ে যায়নি। যতদিন বাঁচবি, তোকে যে তারই জন্যে তৈরী হয়ে বসে থাকতে হবে।

নির্মলা চমকে উঠল। এ যেন তারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। আশা অবিনশ্বর। তার মৃত্যু নেই। অন্ধকার প্রান্তরে একটি দূরাগত ক্ষীণ দীপশিখার মত কদিন আগেই সে ধীরে ধীরে নির্মলার বুকের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। বিজুর মার শেষ কথাটি যেন সেই সলতেটাকে একটুখানি উসকে দিয়ে গেল। তাকে বাঁচতে হবে। খোকা ফিরে আসুক আর না-ই আসুক, তারই জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

বাইরের দরজার ঝাঁপটা ভেজানো ছিল। তার উপরে কার হাতের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অচেনা গলার
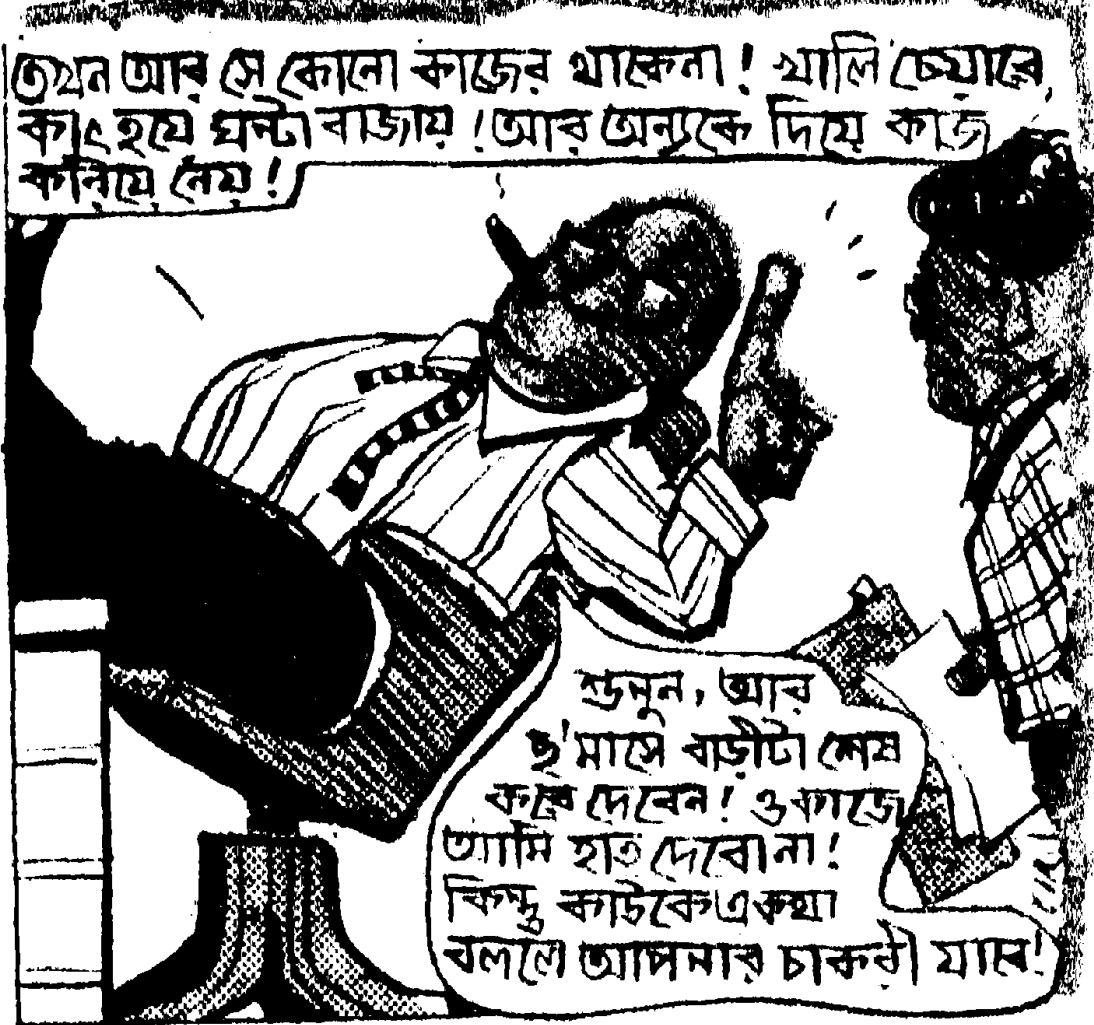
হাঁক—'চিঠি আছে'। ধড়মড় করে উঠে বসল নির্মলা। লুটিয়ে পড়া আঁচলখানা কোনরকমে গায়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে গেল দোরগোড়ায়। নিশ্চয়ই খোকার চিঠি! সে ছাড়া আর কে আছে তার? কে পাঠাবে চিঠি! বিজুর মাও ব্যস্তভাবে তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে একটানে দরজা খুলে পিওনের হাত থেকে চিঠিখানা যেন কেড়ে নিয়েছে নির্মলা। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চিঠি নয়, কোণের দিকে সুতো দিয়ে গাঁথা দুখানা ছাপানো কাগজ। 'বাকী ভাড়ার নালিস করেছে বাড়ি-ওয়ালা' গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল আদালতের পিওন, 'এটা সেই পরোয়ানা। আপনারই নাম তো নির্মলা ভট্টাচার্য? নিন, সই করুন।'

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভিতর থেকে একটা দোয়াত বের করে, কলমের ডগাটা তার মধ্যে ডুবিয়ে বাড়িয়ে ধরল নির্মলার দিকে।

তিন মাসের ভাড়া দেওয়া হয়নি। বাড়িওয়ালার সরকার গত মাসেই শাসিয়ে গেছে, নালিস করবে। নির্মলার খেয়াল ছিল না। ভুলে গিয়েছিল, পৃথিবী বসে নেই। সে যখন তার নিজের দুঃখের কোটরে চোখ বুজে পড়ে আছে, বাইরের দুনিয়া তার সেই পুরনো পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। সে অমোঘ নীতির একচুল পরিবর্তন হয়নি। তোমার দুর্ভাগ্য একান্তভাবে তোমার। সেদিকে তাকিয়ে সংসার তার দাবি ছাড়বে কেন?

বিজুর মা জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা বাকী?

—'ছটাকা!' কাগজ দুখানার দিকে চোখ রেখেই বলল নির্মলা।

অঙ্কটা শুনে আর দ্বিতীয় কথা নয়, শুধু একটা ভীতিমূলক শব্দ বেরিয়ে এল বিজুর মার গলা থেকে। এর পরের পর্বগুলো দুজনের কারোই অজানা নেই। বস্তির ঘরে ঘরে অহরহ সে দৃশ্য ঘটছে। টাকা দিতে না পারলে ঐ পিওন আবার আসবে এবং সেবারে তার হাতে থাকবে মালক্রোকের পরোয়ানা। মাঝখানে দিন কয়েকের বিরতি, তারপর পেয়াদা এসে টেনে বার করবে 'অস্থাবর' বলতে যা কিছু আছে তোমার ঘরে—ভাতের হাঁড়ি, জলের গেলাস, ডালের বাটি। ছ'মাসের শিশুর দুধের ঝিনুকটাও বাদ যাবে না। তাতেও যদি পাওনা আদায় না হয়, লাঠি হাতে দর্শন দেবে বাড়িওয়ালার ভোজপুরী দারোয়ান। বাকী সম্বল যেটুকু পড়েছিল—বাক্স, পেটরা, কাঁথা, কম্বল সব চলে যাবে রাস্তায়। তার সঙ্গে ভাড়াটেকেও যেতে হবে, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। একটাবেলা না পেরোতেই সেই ঘরে আবার দেখা দেবে নতুন মুখ, শুরু হবে নতুন ঘরকন্না।

বস্তিজীবনের দুদিকে এই দুই-ওয়ালা—পাহারাওয়ালা আর বাড়িওয়ালা। একজনের হাত থেকে রক্ষা পেলেও, আর একজনের কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। নির্মলার ভাগ্যাকাশে উভয়ের সমবেত আবির্ভাব। প্রথম জন কেড়ে নিয়েছে তার ছেলে এবার দ্বিতীয় এসে হাত বাড়াল তার মাথা গুজবার আশ্রয়টুকুর দিকে।

কদিন আগে হলেও নিজেকে সে এই ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিত। মনে মনে বলত, যা হয় হোক, করবার আর কিছু নেই। কিন্তু আজ মনে হল এই বাসাটুকু তার যেমন করে হোক, বাঁচিয়ে রাখতে হবে; সেইসঙ্গে নিজেকেও। এবার থেকে শুরু হবে তার অন্তহীন প্রতীক্ষা। কিন্তু এই আসন্ন সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? এতগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে?

হঠাৎ মনে পড়ল, তার পুরনো মনিব বাড়িতে মাইনে বাবদ কিছু পাওনা রয়ে গেছে। চার টাকার মত হবে। আপাততঃ তাই দিয়েই হয়তো বাড়িওয়ালাকে ঠেকানো যেতে পারে। তারপর বলে কয়ে ঐ কাজটাই যদি আবার পাওয়া যায়, বাকী দুটো টাকা আগাম চেয়ে নেবে।

সুনীল গুপ্ত

"বাঁচতে হবে তো?"

'আগাম' কথাটা মনে আসতেই নির্মলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। আরেকজনের মুখে এই শব্দটা শুনেই সেদিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, জিহ্বারও কোনো অর্গল ছিল না। মূঢ়ের মত চিৎকার করে বলেছিল, আগাম বলে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করে না? তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছিলেন। আগাম চাইতে যাননি, তারই অন্যায় জিদের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর চিরজীবনের আদর্শ। অদৃষ্টের কী পরিহাস! আজ সে নিজেই চলেছে মনিবের কাছে আগাম চাইতে!

(ক্রমশঃ)

বার্লিন থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস থেকে বার্লিনে সরাসরি কোনো বিমান যায় না। পশ্চিম জার্মানীর কোনো না কোনো বিমান বন্দরে সে আসবেই। আর আসা মানেই আধ ঘন্টা কি এক ঘন্টার ধাক্কা। কথা ছিল পশ্চিম জার্মানীর 'লুফ্‌ট্‌ হান্‌সা' কোম্পানীর সুপার কনস্টেলেশন প্লেনে চেপে ফ্রাংকফুর্ট পৌঁছন। সেখান থেকে আরেক কোম্পানীর প্লেনে চেপে পশ্চিম বার্লিন। প্যারিসের ওর্লি বিমান বন্দরে গিয়ে শুনি 'লুফ্‌ট্‌ হান্‌সা' কোম্পানীর বিমান মেরামত হচ্ছে। সেদিন প্রচন্ড তুষারপাতে বিমান অবতরণ পথ জমে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর লুফ্‌ট্‌ হান্‌সার এক কর্মচারি এসে বললেন, আপনাদের জন্য রয়েল এয়ার মরক্কোর একটি বিমান প্রস্তুত। এখনই যদি যেতে চান তো উঠে পড়ুন। আমরা বললাম, তাই সই।

রয়েল এয়ার মরক্কোর বিমানটি ফরাসী নির্মিত 'কারাভেল' বিমান। ফরাসীদের তৈরী 'কারাভেল' বিমানে চড়ে আরাম আছে। এরা যে এত ভাল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান নির্মাণ করতে পারে, আমার তা জানা ছিল না। 'কারাভেল' বিমান জেটচালিত। প্লেনে উঠতে নামতে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন। প্যারিস-ফ্রাংকফুর্ট পৌঁছতে সাধারণ বিমানে যে সময় লাগে কারাভেলে লাগে তার অর্ধেক সময়। বিমানের সিটে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময় কানে এলো এয়ার হোস্টেসের স্বর, তিনি বলছেন, আমরা ফ্রাংকফুর্ট এসে গেছি। এবার কোমরে বেল্ট বাঁধুন। আমি ভাবলাম, কলকাতা থেকে হাওড়া পৌঁছতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে ফ্রাংকফুর্ট। তাজ্জব ব্যাপার বৈকি।

পশ্চিম জার্মানীর কোনো বিমানের পূর্ব জার্মানীর আকাশ-সীমা পেরোবার উপায় নেই। তাই পশ্চিম বার্লিন পৌঁছতে হলে বিদেশী বিমান কোম্পানীর স্মরণাপন্ন হতে হয়। ফ্রাংকফুর্টে পৌঁছে প্যান আমেরিকান বিমানে চাপতে হল। অবশ্য একটিমাত্র বিমান প্যারিস থেকে সরাসরি বার্লিনে পৌঁছয়। তাও আবার সপ্তাহে দুদিন এবং পূর্ব বার্লিনে। পোলিশ বিমান কোম্পানী 'লট'এর 'ইলুশিন' বিমানে। প্যারিস থেকে বার্লিনে সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায়। সময় লাগে বিশ ঘন্টা। আর বিমানে মাত্র তিন ঘন্টা।

পশ্চিম বার্লিনের 'টেম্‌পলহফ' বিমান বন্দরটি শহরের বুকে। সাধারণতঃ অমনটা দেখা যায় না। বার্লিনে তার ব্যাতিক্রম। টেম্‌পলহফ বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি অল্প তুষারপাত শুরু হয়েছে। সে অতি নগণ্য। হোটেলে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফরাসী সাংবাদিকের একদলের সঙ্গে বেরিয়েছি রাত্রির বার্লিন দেখতে। যা ঠান্ডা হাওয়া, তাতে হাড় কাঁপুনি শুরু। রাত সাড়ে বারোটার সময় অঝোরে তুষারপাত শুরু হল। আমরা তখন দুর্গা নাম জপ করতে করতে হোটেলের দিকে ছুটছি। একে ঠান্ডা হাওয়া, তার ওপর তুষারপাতের ছাট্। বুঝতেই পারছেন কি রকম নারকিয় কান্ড।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি রাস্তাঘাটে কে যেন সাদা কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে। সাদা কার্পেটের বুকে আমরা জুতোর ছাপ মেরে চললাম বার্লিনের স্থায়ী প্রদর্শনশালা এক্‌জিবিশন হলের দিকে। এই কনকনে শীতকালে প্রতি বছরে হয়ে থাকে বার্লিনে 'গ্রুন ভোকে' বা শ্যামল সপ্তাহের উদ্বোধন। শস্য-শ্যামলা সপ্তাহকে বলা উচিত কৃষি সপ্তাহ। বছর পঁয়ত্রিশ ধরে বার্লিনে নিয়মিত এই প্রদর্শনী হয়ে আসছে। বার্লিনের কৃষি সপ্তাহ উদ্বোধন করলেন বার্লিনের শাসনকর্তা ও পৌর সভাপতি হার উইলি ব্রান্ড। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি হার লুব্‌কে। বক্তৃতা দিলেন পশ্চিম জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী অধ্যাপক হলষ্টাইন ও কৃষি মন্ত্রী হার শোয়ার্জ।

বার্লিনের পৌরপ্রধান হার উইলি ব্রান্ড বার্লিনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতি লুব্‌কে-কে আহ্বান জানালেন সভাপতির ভাষণ দিতে। পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রপতির বার্লিন পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম বার্লিন এখন ছোট দ্বিপের মতন। পূর্ব জার্মানীর মাঝখানে তার অবস্থান সমস্যা সৃষ্টি করেছে। চারধারে তার বিদেশী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। বার্লিনবাসীদের নৈতিক উৎসাহ দেওয়াই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। বার্লিনবাসীদের এখন দুর্যোগের দিন চলেছে।

সব বক্তাই বার্লিনের সমস্যা পর্যালোচনা করলেন। তাঁরা সবাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, তারা কোনো মতে পশ্চিম বার্লিনকে পরিত্যাগ করবে না। যে কোনোভাবেই হোক তারা বার্লিনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বক্তাদের বক্তৃতার আগে ও পরে আবহসঙ্গীত পরিবেশন করল বার্লিনের সিম্‌ফনি অর্কেষ্ট্রা দল। জার্মানদের ধারাই অন্যরকমের। আমাদের মতন এঁরা আবহসঙ্গীত দিয়ে সরকারি সভার উদ্বোধন করে থাকে। যা বৃটেনে বা ফ্রান্সে দেখা যায় না। তবে রক্ষে যে, এরা আমাদের মতন একটা হারমোনিয়াম নিয়ে হেঁড়েগলায় আগন্তুকদের কর্ণপটাহে হাতুড়ি পেটায় না। এদের আবহসঙ্গীত অর্কেষ্ট্রা বাদনে সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এরা সবাই পেশাদার বাজিয়ে। বেছে বেছে বাজনা বাজিয়ে মনোরঞ্জন করে। আমাদের মতন কোনো অপেশাদার বা কোনো কর্মকর্তার কন্যার সুখ্যাতি প্রচারের উদ্দেশে এরা শ্রোতৃবৃন্দকে কষ্ট দেয় না। নামকরা পেশাদার অর্কেষ্ট্রা বাদকের দলকে এরা দস্তুরমতন চড়া হারে রূপচাঁদ দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ফলে আবহসঙ্গীত পীড়াদায়ক না হয়ে, হয়ে ওঠে সুমধুর। উদ্বোধনের আগে ও পরে বার্লিনের সিমফনি অর্কেষ্ট্রা দল বাজাল ফোনডেবার

ও স্ট্রাউস-এর দুইটি সংগীত। জার্মান সংগীতপ্রীতি ও চর্চা জগৎবিখ্যাত। এক-কালে এই বার্লিন শহরে চলত সংগীত চর্চা। জার্মানরা গণ্ডায় গণ্ডায় বিশ্ব-বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার সৃষ্টি করেছে। এখনও বার্লিনের পথেঘাটে পায়চারি করলে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, দেখা যাবে ছোট ছেলেমেয়ের দল রাস্তার ধারে বসে হয় গাইছে নয়তো বাজাচ্ছে। এত রাজ-নৈতিক ঝড়ঝঞ্জা বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জার্মান জাত সংগীত-চর্চা ভোলেনি। বিখ্যাত জার্মান সংগীতজ্ঞদের বাড়ীঘর-গুলো এখন প্রায় জাতীয় প্রদর্শনশালা গোছের। কি পূর্ব, কি পশ্চিম জার্মানী, যেখানেই যান না কেন, কোন শহরে কোন জার্মান সংগীতজ্ঞ হয়ত কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, সেই বাড়ীঘরগুলো এখন মিউজিয়ম। আমি বছর কয়েক আগে পূর্ব জার্মানীতে বিটোফেন হুনাগনার ও বাখ্-এর মিউজিয়ম পরিদর্শন করে দেখেছি, সেখানে শুধু সংগীতজ্ঞদের ব্যবহৃত বাজনার যন্ত্রাদি নয়, যতরকমের বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে তারই প্রদর্শনী। আর সেখানে জনসাধারণ দলে দলে ভীড় করে দেখছে। আমাদের দেশে বোধহয় ওই ধরণের মিউজিয়ম একটাও নেই। শুধু এখানে প্রদর্শনী নয়, সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে, সেগুলো কেমন বাজে, তার উদাহরণ ব্যাখ্যা করে দেখায় কর্মকর্তারা। এর ফলে বেরসিকরাও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। জার্মানীতে সংগীতজ্ঞদের বাড়ী-ঘর ও মিউজিয়ম জনসাধারণের কাছে তীর্থস্থান গোছের। জার্মানরা শুধু সংগীতের চর্চা করেই খালাস নয়, এরা সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের খাতির-যত্ন ও শ্রদ্ধা করে থাকে।

বার্লিনের কৃষি সপ্তাহ যেখানে চলছে, তার হলগুলোর সংখ্যা একটা বা দুটো নয়, গোটা দশেক। এক একটা হলের পরিধি আধ মাইল জুড়ে। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছে। প্রতিটি দেশ বিরাট জায়গা জুড়ে তাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি শুধু প্রদর্শনই করছে না, কিছু কিছু জিনিস বিক্রিও করছে। বিভিন্ন দেশের দোকানে তাদের দেশের আঞ্চলিক পোষাক পরে মেয়েরা জিনিসপত্র বেচছে দেখলাম। জার্মানীর এক এক অঞ্চলের এক এক রকমের পোষাক। সেই পোষাক পরে ছেলে-মেয়ের দল তাদের অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ খাবার বেচছে। মূল হলঘরের একধারে দেশ-বিদেশের নাচিয়েদলের গ্রাম্য নাচ হচ্ছিল। সেখানে বেজায় ভিড়।

কৃষি সপ্তাহে শুধু কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হচ্ছে না, কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় যত ধরণের যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, সার, বীজ তারই প্রদর্শনী। নতুন ধরণের ট্রাক্টর, সার, খেতে জল দেবার নতুন পদ্ধতি, সবই দেখান হচ্ছে। আমাদের মতন কৃষিপ্রধান দেশে এই ধরণের প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনেক বেশী।

কৃষি প্রদর্শনীর বিশেষত্ব হল এই ঠাণ্ডায়, যেখানে তুষারপাত হচ্ছে প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে বিরাট হলঘরের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিরাট বাগান তৈরী। বাগানে যে কত ধরণের ফুল গাছ ওরা লাগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই শীত-কালে যেসব ফুল দেখা যায় না, এরা তার চারা এনে প্রদর্শনী করছে। এই কৃত্রিম বাগানে ছোটখাট বোটানিকেল গার্ডেন তৈরী করেছে কর্মকর্তারা। এর ফলে বাগান বা ফুল-বিলাসিরা যেমন দেখে তৃপ্তি পাবেন, তেমনি উৎসুক উদ্ভিদ-বিদ্যার ছাত্ররা নতুন নতুন জিনিস দেখে হবে সন্তুষ্ট। শুধু কি বাগান, বাগানের মাঝে ফোয়ারার জল, তারপরে খেলছে বৈদ্যুতিক আলো। বার্লিনের শস্য-শ্যামল সপ্তাহ দেখে আরাম আছে।

১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসের আগে যে বার্লিনকে দেখেছি, সে বার্লিনের সে রূপ নেই। এখন সে অন্য বার্লিন। ১৯৬১ সালের ১৩ই আগষ্টের পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের বিচ্ছেদ ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। পশ্চিম বার্লিনের চারধারে এখন হয় কাটা তারের বেড়া নয়তো ইট দিয়ে গাঁথা পাঁচিল। এপাড়া

শ্যামল সপ্তাহের পুষ্প প্রদর্শনী বিভাগের দৃশ্য।

থেকে ওপাড়ায় যাবার জো নেই। এমন কি এপাড়ার বাড়ীর জানলা দিয়ে ওপাড়ায় উঁকি মারার উপায় নেই। ওপাড়ার অর্থাৎ পূর্ব বার্লিনের যেসব বাড়ী-ঘর পাঁচিলের ধারে পড়েছে, তার দরজা জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মুখ দেখা-দেখি নেই। এরই নাম রাজনৈতিক পরিণতি। আগে পশ্চিম বার্লিনের রাস্তায় পূর্ব বার্লিনের লোক-জনদের দেখতাম। তারা আসত বেড়াতে। পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীরা যেত পূর্ব বার্লিনে আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা-শোনা করতে। এখন আর সে উপায় নেই। সুড়ঙ্গপথের 'ইউ বান' রেল পশ্চিম বার্লিনে বিচরণ করে, পূর্ব বার্লিনে তার প্রবেশ নিষেধ। সার্কুলার রেলপথ 'এস বান্' চলছে বটে কিন্তু পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীরা তাতে চড়ে না। তারা ওটাকে বয়কট করেছে। পশ্চিম বার্লিনে এবার যত বাস দেখলাম তত আগে দেখিনি। এসব নতুন বাস এসেছে পশ্চিম জার্মানী থেকে।

বার্লিনবাসীরা পূর্ব বা পশ্চিম বার্লিনে নির্বিঘ্নে যাতায়াত না করতে পারলেও বিদেশীরা কিন্তু অনায়াসে চলা-ফেরা করতে পারে। কেবলমাত্র যা দরকার, তা হল পাসপোর্ট। পশ্চিম বার্লিনের কখ্খ্াসের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারি পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের পুলিশ, তার ওপর রয়েছে মার্কিন ও রুশ সৈনিকরা। সবাই দেখলাম তৈরী। হুকুম হলেই গুলী ছুঁড়বে। এইপথ দিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে দুই বার্লিনে যতায়াত করা যায় সহজে।

পশ্চিম বার্লিনের কারা-প্রাচীরের ধারে কৌতূহলি জনতার দল দাঁড়িয়ে যেন ওপাড়ার সার্কাস দেখছে। আগে পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক আসত কাজ করতে। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। তারা এখন আর আসে না। তার ওপর অনেক দোকানদার তার ব্যবসা বন্ধ রেখে পশ্চিম জার্মানীতে চলে গেছে। পশ্চিম বার্লিনে আজ লোকাভাব। পশ্চিম বার্লিনের রসদ জোগায় পশ্চিম জার্মানীর রেল ও জল-পথে। এই পথ বন্ধ হলে পশ্চিম বার্লিন পূর্ব জার্মান সরকারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। যা চাইছে পূর্ব জার্মান সরকার। পশ্চিম বার্লিনে যাতে লোকজন এবং বিশেষ করে যুবক-যুবতির দল বাস করে তার জন্যে পশ্চিম বার্লিন সরকার নতুন ঘোষণায় জানিয়েছে যে, যারা নতুন বিয়ে করবে, সেই সব নব-দম্পতিদের আগাম তিন হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে। দশ বছরে সে টাকা শোধ দেওয়া যাবে। এইভাবে সুযোগ সুবিধায় লোভ দেখিয়ে পশ্চিম বার্লিনের জনসাধারণকে রাখা হচ্ছে।

পশ্চিম বার্লিনের অপেরা হাউস 'ডয়সে অপের বার্লিন' একেবারে নতুন। এই মাস তিনেক হল তার উদ্বোধন হয়েছে। এ একেবারে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক আর্টের নিদর্শন। অপেরা হাউসটি একেবারে অতি আধুনিক, যেন জাহাজ। তবে বসবার জায়গা যেমন আরামদায়ক তেমনি যেখান থেকে বসে দেখুন না কেন পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য। পূর্ব বার্লিনে একটা অপেরা হাউস আছে সেটা নির্মিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে। পশ্চিম বার্লিনের অপেরাতে দেখলাম 'আল্‌ক্‌মেন'। 'আল্‌ক্‌মেন' অপেরা নাটকের বিষয়বস্তু হল পৌরাণিক ও আধুনিক। গ্রীক্ দেব 'জুপিটার'-এর সবর্তমানে তার স্ত্রী 'আল্‌ক্‌মেন' আরেকজনের সাথে প্রেম করেছে। অবশ্য তার প্রেমিকের চেহারা জুপিটারের মতনই দেখতে। তেমনি তার ঝি তার স্বামীর সবর্তমানে তারই মতন দেখতে আরেকজনের সাথে প্রেম করেছে। জুপিটার ও তার চাকর এসে দেখে ব্যাপার অন্য রকমের। তারপর যা হয়, সেই চিরাচরিত লড়াই ও পরে বিবাদের নিষ্পত্তি।

নারী চরিত্র যে বিচিত্র, তারই বিশ্লেষণ করেছে এই অপেরায়।

বিদেশী গল্প—

হ্যালডর ল্যাকসনেস

লিলি নেবুচেদানজারসনের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত গল্প

আমার গল্পের নায়কের এই অদ্ভুত নাম দেওয়ার অবশ্য কারণ আছে। মনে হয় এই নামের জন্যই অনেক পাঠক গল্পটার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং কেউ কেউ ভাবতেও পারেন, "বাঃ, মজার গল্প ত।" তা ভিন্ন আমি শুধুমাত্র এন, এন, বলে চালাতে পারতাম। কবর দেবার সময় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মৃত লোকের নামের দরকার হয়। এই গল্পের নায়ক মারা গেলে অনুষ্ঠান হয়েছিল সত্যি; কিন্তু তখন তার নামের প্রয়োজন হয়নি। সত্যি কথা বলতে আপত্তি নেই। আমি সম্ভবতঃ এই লোকটার নাম সঠিক জানতাম না অথবা জানলেও ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে গল্পের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আপনারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে আমার গল্পের নায়কের নামের ওপরেও আর একটা নাম আছে। এবং গল্পের জন্য নায়কের নামের চেয়েও ওই নামটি কিন্তু আরও বেশি দরকারী। এ কথা গল্প শেষ করার পর আপনারাও স্বীকার করবেন।

গল্পটা বেশ বড়, খুবই বড়। গল্পটা ভাবার সময় আমি নিজেই এর দৈর্ঘ্যের কথা চিন্তা করে পিছিয়ে এসেছি কয়েকবার।...... কিন্তু গল্পটার সূত্রপাত হয়েছিল একটা ছোট্ট সুর নিয়ে। গোটা সংগীত নয়, বরং সংগীতের শেষাংশের সুরটা নিয়ে এই গল্পের জন্ম। অপর অংশটি খুব বড়। এত বড় যে কোন পরি-ণত শিল্পীর রচিত সিম্ফনির শেষের ভাগ বলে চালানো যায়। সংগীত-শিল্প সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু। তাই এই সুরটা তুলে আমি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম। আমার বন্ধুটি খুব বড় সংগীত রচয়িতা হবার আশা রাখেন।

বলেছিলাম, ক্ষমতাবান সে যেন এই সুরটা ব্যবহার করে।

কিন্তু সে কথা যাক। এবার আমি গল্পে চলে আসি।

ছাত্র-জীবনে আমি রেইকজাভিকের (Reykjavik) একটা বাড়ির নিচের তলায় থাকতাম। নিচের তালা না বলে একটা গর্ত বলা ভাল। পাতলা একটা কাঠের পার্টিশন তুলে বাড়ির চুলো থেকে আমার ঘরের পার্থক্য বজায় ছিল। শীতের সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে, বেশ একটু রাত হলে সংগীতের সুরটা ওই ঘর থেকে ভেসে আসে। গায়কের গলাটা মোটা-মোটা, ভাঙা-ভাঙা।

এই গলায় সে গান গাইত। গান শেষ হলেও আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে গানটা সত্যিই শেষ হয়েছে। মনে হত গায়ক ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারেনি। মনে হত গায়ক বুঝি গানের সঙ্গে মারা গেছে। দিনের পর দিন যায়। ওই গানটার সামান্য অংশটা ছাড়া আমি গায়ক সম্পর্কে আর কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে অন্য সুরের টুং-টাং আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। এই আওয়াজটা খুবই অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হত সংগীতকার এই টুং-টাং আওয়াজ থেকে একটা নতুন সুর সৃষ্টি করতে চান। এ হবে একেবারে নতুন সুর। মাঝে মাঝে থাকবে দীর্ঘ বিরতি। সে যাই হোক, আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, সুরটা সংগীতকারের বুকের ভেতর জেগে আছে। গায়কের গলা মোটা, ভাঙা। সুর খেলে না ঠিক মত। তাই বুকের মধ্যে যে সুরটা গুণ গুণ করতো তাকে ঠিকমত গলায় তোলা যেত না। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আগের সংগীতের শেষ অংশটাও বাজত। এ সুর না বাজিয়ে সে থাকতে পারত না। আর এই শুনলেই আমার মনে হত যে এর মধ্যে বিরাট সিম্ফনির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই শীতের প্রতি রাত্রে অদ্ভুত স্তব্ধতায় আমাকে গান শোনাত সংগীতকার। শেষকালে গায়ক সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখি এ গায়কটি আর কেউ নয়: এ বাড়ির চুলোগুলি যে পরিষ্কার করে সেই-ই। মাঝ রাতে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি পাশের ঘরে লোকটার কাছে গেলাম। তখন চুলোতে আগুন ধরানো হয়ে গেছে। চুলোর মুখটা আধ-খোলা। অন্ধকারে আগুনের লালচে আলো এসে পড়ছে। আর চুলোর ঠিক সামনে বসে আছে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন। এই-ই আমার সেই গানের গায়ক। কিন্তু অন্ধকারে সে এমন ভাবে বসেছিল যে আমি তাকে প্রথমে দেখতেই পাইনি।

আমি বললাম, "নমস্কার"।

অন্ধকার থেকে মোটা ভাঙা গলায় উত্তর এল, "নমস্কার।"

আমি বললাম, "এখানে বেশ গরম দেখছি।"

সে উত্তর দিল, "আমি চললাম।"

"এটা ত তোমার ঘর।"

সে উত্তর দিল, "না।"

"না? কিন্তু কত সন্ধ্যায় আমি তোমাকে এই ঘরে বসে গান গাইতে শুনেছি।"

অপরাধীর মত লোকটি উত্তর দিল, "আমি চললাম।" লোকটি সত্যিই উঠে দাঁড়াল।

"না, না, তুমি আমার জন্য যাচ্ছ। যেও না। আমি তোমাকে বহুদিন গান গাইতে শুনেছি। তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

সে বললে, "আমি গান গাইনি।"

প্রতিবাদ করে বললাম, "আমি তোমাকেই গান গাইতে শুনেছি।"

সে বললে, "না। আমি কোনদিন গান গাইনি; গাইতে পারি না।"

"কিন্তু আমি তোমার গানের সুরটা ইতিমধ্যেই তুলেছি। জানো।"

নিজের মনে কতকগুলো কথা বিড় বিড় করে বলতে বলতে দরজা দিয়ে চট্ করে সরে পড়তে চেষ্টা করল লোকটা।

আমি বললাম, "আমি এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম। বরং আমিই চলে যাচ্ছি।"

"আমার ঘুম পেয়েছে" এই বলে লোকটি চলে গেল।

সমুদ্রের ধারে একদিন একটা পিয়ানোর বাক্স নজরে পড়ল। তখন তুষার পড়ছে ঘন হয়ে। শুনলাম এই বাক্সের ভিতর থাকে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন। মনে হল, সে এই পিয়ানোর বাক্সে থাকে বলেই গানের প্রতি এসেছে এত বড় আকর্ষণ।

প্রায় হপ্তা খানেক তার আর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না।

কিন্তু ইতিমধ্যে ও হয়ত আমার কথা একেবারে ভুলে গেছে। তাই সে আবার গান গাইতে আরম্ভ করল। সেই একই সুর আর সেই একই ভাবে শেষ হওয়া। আমি আবার ওর কাছে গেলাম।

বললাম, "নমস্কার।"

সে উত্তর দিল, "নমস্কার।"

"তুমি গান গাইছ?" আমি বললাম।

সে উত্তর দিল, "না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সুর তুমি কোথায় শিখেছ?"

"সুর? সুর কোথায় দেখলেন? মোটেই সুর নয়।"

"কিন্তু বরাবরই একই গান গাও।"

"আমি গান গাই না। আমি গাইতে পারি না।"

"গুণ গুণ কর ত?"

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "একদিন গান গাইতে খুব ইচ্ছে করত। কিন্তু সে ত বহুযুগ আগের কথা। আজকাল ও সব কথা ভাবি-ই না একেবারে। চুলো জেলে দিয়ে ঠিকমত কয়লা ঢেলে এখানে কিছু-ক্ষণ বসে থাকি। এ ছাড়া আর কিছুই করি না। আচ্ছা, এবার আসি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

"পশ্চিমে।"

"পশ্চিমে কোথায়?"

"ওলাকস্ভিগ।"

"জায়গাটা কি ভাল?"

"সমুদ্র বড় অশান্ত। অন্য জায়গায় যেমন, এখানেও তেমন।"

"পশ্চিমে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে বুঝি?"

"কেউ নেই। সবাই মারা গেছে।"

"তুমি কি কাজ করতে সেখানে?"

"কি করতাম? তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে। কখন সাগরে গিয়েছি। কখন মাঠে খেটেছি। যখন যেমন কাজ জুটেছে তখন তাই-ই করেছি।"

"এখানে এলে কেন?"

অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিল না সে। শেষকালে বললে, "পশ্চিমের সঙ্গে আমার

পাট বহুকাল আগেই চুকেছে। পশ্চিমের সঙ্গে পাট চুকে গেছে।"

আমি বললাম, "এই শহরে এসে ভাল করেছ। খুব ভাল করেছ। আমার কি মনে হয় জানো? এই শহরটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা।"

চুলোর সামনে একটা বাক্সের ওপর বহুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সে। এবার এই ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। অল্প আলো ঘরটাতে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকটার জুতো ছেঁড়া। পায়ের আঙুল কটা বেরিয়ে এসেছে। সে একমনে ছেঁড়া জুতো দেখছিল।

একটু পরে বললে, "এই শহরে এসে প্রথম রাতটা কাটিয়েছিলাম কবরখানায়।"

ওকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্য আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, "তাই নাকি? রাত কাটিয়েছিলে? বহু লোক অবশ্য বহু রাত ও জায়গায় কাটাবে।"

সে বললে, "ঠিক।"

ওর গাল বেশ ভারী ভারী। লালচে দাড়ি। দীর্ঘদিন দাড়িটার কোন যত্নও নেওয়া হয়নি।

আমি বললাম, "তোমার জুতোর অবস্থা ত খুব কাহিল।"

"ওর জন্যে কি হয়েছে! বছর দুয়েক চল্লা। কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ভাপ্টাসমারির কাছে। কেউ ভুলে ফেলে গিয়েছিল বোধ হয়।"

চুলোর পিছনে একটা পেরেকে ওর টুপিটা ঝুলছিল। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা পেড়ে নিল। সাধারণত ব্যবসাদাররা এই ধরনের টুপি পরে থাকে। কিন্তু একটু পুরানো হলে ফেলে দেয়। পুরানো হলে এ সব টুপির পাশ থেকে সুতো উঠতে থাকে। কখন কখন বাচ্চারা টুপির ঠিক মাঝখানটায় ফুটো করে দেয়।

আমি বললাম, "টুপিটা একটু দেখবো?"

টুপির মাঝখানে ফুটো। বড় ফুটো। বাচ্চাদের হাত গলে যেতে পারে।

টুপিটা উঁচু করে ফুটোর মাঝখানে চোখ রেখে ছাদ দেখতে দেখতে আমি বললাম, "টুপিটাও যে বাহা-বাহা।— টুপিটা খুব সৌখিন ছিল এককালে।"

আমি টুপিটা ফিরিয়ে দিলাম। দেখলাম ও ঠিক আমার মতই টুপির ফুটো দিয়ে ছাদ দেখছে।

একটু রাগত কণ্ঠে বললে, "টুপির ফুটো দিয়ে সবাই কি আর ভগবানের দর্শন পায়?" লক্ষ্য করলাম, ওর মুখে মাত্র একটা দাঁত আছে।

দেখতে দেখতে বসন্তকাল এল। খুব সুন্দর কাল। এই সময় জানালার ফাঁক দিয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব মজা। নিতান্ত নগণ্য তুচ্ছ জিনিসগুলো মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ভাল লাগে। আর পরীক্ষা সামনে থাকলে ত আর কথাই নেই। তখন ত এগুলো দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। রাস্তায় যে-সব ছোট-খাট ঘটনা ঘটে তার গুরুত্ব ও অর্থ যেন ঠিক সময়ই পরিষ্কার বোঝা যায়।

একদিন এ বাড়ীর মাঝের তলার এক কামরায় নতুন পরিবার এসে ঢুকলো। কারা আসছে বা যাচ্ছে তা নিয়ে আমি মোটেই বিব্রত হই না। কিন্তু কোনক্রমে এই নতুন পরিবারটি আসার খবর পেলাম। এরা স্বামী-স্ত্রী আর তাদের একটা মেয়ে। দেখে মনে হয় মেয়েটির বয়স বছর আটেকের বেশি নয়। নাম তার লিলি। মেয়েটিকে দেখে আমি আঁচ করলাম যে ওর বাবা মা ঠিক শহুরে নয়। কারণ মেয়েটির মাথায় বিনুনী, পায়ে পশমের সুন্দর মোজা। আমার জানালার ঠিক ধারেই উঠোনের ওপর আরও কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে লিলিও খেলছিল। মেয়েটির মা তার ঘরের জানালা থেকে বার বার ঝুঁকে পড়ে মেয়েকে ডেকে নানান আদেশ উপদেশ দিচ্ছিল। বুঝলাম মা মেয়েটিকে খুব ভালবাসে।

"রাস্তায় গাড়ি আছে, দেখো। মাতাল আসছে, ঘরে এস খুকু। কুকুর, কুকুর, খুকী সরে যা। লিলি, লিলি, পুলিশ আসছে কিন্তু!"

জানালা দিয়ে মা এই উপদেশ দিচ্ছে। অথচ এ শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ঘেরা-উঠোন। পুরানো পাথর দিয়ে পাঁচিল তোলা। রাস্তার ও দিকে কাঁচা সবজির বাগান। সে দিকটাও ঘেরা। আর রাস্তাটা খুব নির্জন বলতে হবে। পাঁচিলের ওপর বসে বসন্তের রোদ পোয়াতে পোয়াতে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন উঠোনে ছেলে-মেয়েদের দৌড়া-দৌড়ি দেখছে। বিশৃঙ্খল দাড়ি থাকা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল যে, সেও খেলা দেখতে মশগুল। সারাদিন হুড়োহুড়ির পর ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খিদেও পেয়েছে তাদের। কেউ কেউ তাই বাড়ি ফিরে গেল। লিলি একা একাই উঠোনে খেলায় মত্ত। সেই সময় নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন ডাকল, "লিলি, লিলি।"

লিলি এমন ভাব দেখাল যেন ডাকটা সে শুনতেই পায়নি, যেন খেলায় এত ব্যস্ত যে অন্য কোন দিকে নজর দেবার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন তাই আবার ডাকল "লিলি, লিলি।"

এবারও সে না-শোনার ভান করল। কিন্তু মা নিকটে আছে কি-না দেখতে একবার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে নিল। মা তার নিকটে নেই। এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত।

পাঁচিলের ওপর বসে থেকেই বললে, "আমার মিষ্টি খুকী লিলি, কি আজ নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসনের সঙ্গে একটা কথাও বলবে না?" এবার সে পকেট থেকে কাগজের একটা ঠোঙা বার করল। এই ঠোঙাটাকে এতক্ষণ কত গোপনে না সে রেখেছিল। ঠোঙা দেখা মাত্র মেয়েটি রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল। তবু তার মুখে সংশয়ের ছায়া। হাতদুটো পিছনে বাঁধা। একবার কাগজের ঠোঙার দিকে তাকাল লিলি। আবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঘরের জানালার দিকেও চাইল। কাগজের ঠোঙায় কিসমিস আছে। কিন্তু তবু লিলি এমন ভাবে তাকাল যেন সে কিসমিস দেখে একেবারে অবাক হয়নি এবং এগুলোর জন্য তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে দুজনেই পাঁচিলের ওপর বসে কিসমিস খাচ্ছে। লিলি অনেকগুলো মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে সে একটা-দুটো দাঁতে কাটছে। পাঁচিলের ওপর বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে কিসমিস খেতে খেতে লিলি ওর এলোমেলো দাড়িটার দিকে মাঝে মাঝে ভীষণ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তারপর লিলি পাঁচিল থেকে নেমে ওর সামনেই খেলা করতে লাগলো। মা ডাকলো তাকে। খেতে যেতে হবে। কিন্তু কিছু দেরী করেই গেল লিলি। কাগজের ঠোঙায় তখনও কিছু ছিল।

এইভাবে বসন্ত কাটল। নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন সম্পর্কে আর কোন ভয় বা সংশয় নেই লিলির। এখন তাকে আসতে দেখতেই সে নিজেই দৌড়ে তার কাছে যায়, পকেটের মধ্যে হাত পুরে কিসমিসের ঠোঙা টেনে বার করে। আমি

অনেকদিন সন্ধ্যার সময়ও ওদের দুজনকে পাঁচিলের ওপর বসে থাকতে দেখেছি। দেখেছি লিলি ওর কথা খুবই সাগ্রহে শুনছে। আমার তাই মনে হয়েছিল ও নিশ্চয়ই লিলিকে গল্প শোনাচ্ছে।

মেয়েটির সঙ্গে এত ভাব দেখে আমি একদিন সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা বোধহয় তোমার আত্মীয়।"

ও উত্তর দিলে, "ওরাও যে পশ্চিমের লোক।"

"তা হলে ওদের বাড়ির খবর তোমার কিছু জানা আছে নিশ্চয়ই।"

"মানে,—আমি জানি।—আমি লিলির কথা বলতে পারি।"

লোকটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। বেশ একটু অদ্ভুত চরিত্রের লোক বলেই মনে হল। কিন্তু ওই অবধি। ওর বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। আমি ওর কথা কেনই বা ভাবতে যাবো শুধুশুধু। আমার সঙ্গে ওর ত কোন সম্পর্কই নেই। চিন্তা করার বিষয়েরও অভাব নেই। এমন কি আমি যদি কোনদিন ধরতেও পারতাম যে লিলি আর তার বাবা মা পূবের লোক, পশ্চিমের নয়, আমি কোনদিন এই মিথ্যের জন্য লোকটিকে দোষারোপ করতাম না।

একদিন আমি ওদের গল্প শুনতে পেলাম : তখন সে বিশ বছরের যোয়ান। মেয়েটি তার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট হতে পারে। ওদের মধ্যে ভালবাসা হল। ও বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। রীতি অনুসারে বলেছিল যে সে তার জন্যে স্নাউটে নতন ঘর তুলে দেবে। ঘরের সামনে থাকবে শাক সবজির বাগান। সে সময় সে গ্ডেমুন্ডারদের 'হোপ' জাহাজে শেয়ারে মাছধরার কারবার করত। দু'চার টাকা রোজগারও বাড়ল। কিন্তু সে কিছুতেই গান গাইতে পারত না। কিছুতেই না। সে মেয়েটারও নাম ছিল লিলি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "তারপর?"

আড়িপেতে শোনার মত অবসর নেই। আমি ভেবেছিলাম যে পশ্চিমের কোন অতি-পুরানো গল্প সে এখন লিলিকে শোনাচ্ছে।

আবার শীত এলো। আমিও উত্তর থেকে ফিরে এলাম। একদিন রাস্তার ধারে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল কিছুদূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। যতক্ষণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ততক্ষণ সে দূরে দূরে ছিল। একা হতেই সে আমার কাছে এল। বিনা দ্বিধায় আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লে, "আমি নেবুচেদান-জার নেবুচেদানজারসন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খবর?"

সে উত্তর দিল, "কিছু না।"

"আমাকে কি কিছু বলবে?"

"না। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাবলাম দেখি আপনি আমায় চিনতে পারেন কি-না।"

"কি আশ্চর্য! কেন চিনবো না? আর সবচেয়ে বড় কথা আমি তোমার গান এখনও ভুলিনি। যাকগে, তোমার শিশু-বান্ধবীর কী খবর?"

"বুড়ো বয়সের পেনসন ছিল আমার মাত্র ত্রিশ ক্রাউন। কিন্তু সেটাও হারালাম।"

"কেন, কি করে?"

"আর বলেন কেন! জোসেফ, ওই যে সেই লোকটা, এখন সেই জোসেফ লাগাল যে আমি পেনসনের পয়সা দিয়ে কিসমিস্ খাচ্ছি। ব্যাস্ আর যাই কোথা! আইনের ব্যাপার আপনি ত কিছু কিছু বোঝেন।"

"এই জোফসটিকে ঠিক চিনতে পারছিনে।"

"জোসেফ আমার এক রকমের আত্মীয়। মাঝে মাঝে মাছ কি এটা ওটা সে আমাকে দিত।"

"তা দেখো। তুমি এক কাজ কর। তুমি মেয়রের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা বল। আমার সময় নেই। সময় থাকলে আমি তোমার সঙ্গে যেতাম।"

"এতে কি আর কিছু হবে? কিছুই হবে না। ওর চেয়ে শীতের সময় যদি কোথাও ঘরটর পাই, তাই চেষ্টা করাই ভাল।"

"ঘর?"

'হ্যা, গত বছরের মত একটা ঘর।"

"কেন গত বছরের মত তুমি কি এ বছরও চুলোগুলোর তদারক করবে না?"

"না। ও বাড়ির সঙ্গে আমার সব চুকেবুকে গেছে, ও বাড়ির পালা শেষ হয়ে গেছে।"

"কি করে ?"

"এমনিই চুকে গেল।"

"তা হলে যাই।"

"আচ্ছা। আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

সে টুপি তুলে নমস্কার করলে।

বহু বছর আর তার কোন খোঁজ খবর পাইনি। ওর কথা আর মনেও হয়নি। তখন আমি ডাক্তারি পড়ি। এক-দিন চাদর ঢাকা এক লাশ এল মর্গে। দেখি, এ সেই গায়ক। এখন সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবু তাকে দেখা-মাত্রই চিনতে পারলাম। তখন আমি ঠিক তার-ই জন্য বিশেষভাবে

বিচালত হইনি। সমাজ সংসার ছাড়া বাউণ্ডুলে লোকের মৃত্যুর জন্য যতটা সমবেদনা থাকা দরকার, আমার মনে হয়, সে সময় ওর প্রতি আমার সেই রকমের মনোভাব ছিল। তাকে কবর দেবার সময় প্রথমবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এই লোকটার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সঙ্গতি রয়েছে। এই হচ্ছে একটা লোক যার কাছ থেকে সমাজ সংসার কোন কিছু আশা করেনি। পিয়ানোর বাক্সের মধ্যে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করা হল। কেউ ওর নাম জানতো না। কেউ জানতো না কোন অঞ্চল থেকেই বা সে এই শহরে এসেছে। তার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ-ই। এমন কি ডিসেকশন টেবিলে ওর শরীরে যখন আমি ছুরি চালাচ্ছিলাম তখন একবারের জন্যও আমার মনে হয়নি যে ও গান গাইত। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত। খুব জোর করে বলতে পারি যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ওর দেহটাকে চিরে চিরে দেখেছি, দেহের ভিতরের অংশগুলো অতি সাবধানে পরীক্ষ করেছি। আমি জোর করে বলতে পারি মরার পর ওর দেহের অভ্যান্তর এত যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে ওর জীবদ্দশায় ওর বাইরের দিকে কেউ ওতটা যত্নের সঙ্গে তাকায়নি।

এসব কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। ডাক্তারি বিদ্যার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি বহুকাল। এখন আমি অন্য বিষয় চর্চা করি। কিন্তু এতদিন পরে যখন এ প্রসঙ্গ উঠেছে তখন আমার স্বীকার করা উচিত যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নাম করে ওর ক্ষেত্রে সামান্য শঠতা করা হয়েছে। ওর হাড়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ওর অস্থি-গুলোকে দিয়ে ছাত্রদের পড়ান হচ্ছে। আমি সেই কলেজটির নাম অবশ্য করব না। আর মাংসগুলো অবশ্য ডাক্তারি বিজ্ঞানের কাজে লাগেনি। আমি একটা বৈজ্ঞানিক গোপন কথা ও একটা বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত আজ ফাঁস করে দিলাম। আমরা ওর জন্য আনা কফিনে শবের বদলে পাথরের নুড়ি ভরে দিয়েছিলাম। কতকগুলি ডাক্তারি-পড়া ছাত্র এই কাজের ভার নিয়েছিল। আর আমরা অবশিষ্ট, ডাক্তার-ছাত্ররা, সেই কফিনের পিছনে পিছনে গেলাম। উদ্দেশ্য আমাদের সোজা,—যেন কবর দেবার আগে কফিন খুলে কেউ না দেখে। আমরা সবাই কফিন ঘাড়ে করে চার্চে গেলাম এবং তারপর গেলাম কবরখানায়।

গোটা দিন কি বিচিত্র শ্লেষাত্মক। বড়দিনের মাত্র দুদিন বাকি। সূর্য ওঠার আগেই কবর দেবার পর্ব শেষ করার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে সেদিন সমস্ত চার্চকে কালো ফিতে দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। শহরের এক গন্যমান্য ভদ্রলোক মারা গেছেন। তাকে কবর দেওয়া হবে। তার-ই সম্মানের জন্য এই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। চার্চের কর্মকর্তাদের ধৃষ্টতার জন্যই নেবুচেদানজার নেবুচেদানজার-সনকে কোনক্রমে পুঁতে দেওয়া হল। কারণ চার্চের কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়ে দিল যে সে রাতেই যদি আমরা তাকে কবরস্থ করতে পারি, ভাল। তা ভিন্ন উপায় নেই। কবর দেওয়াই হবে না।

বাতাস বইছে। তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। আমরা সেই দুর্যোগের মধ্যেই কফিন ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে চল্লাম। আমাদের মনে একটা ভয় ছিল। কবর দেবার সেই শোকচ্ছন্ন ক্ষণে যখন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সব রীতি ও অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় যদি কফিনের তলা ভেঙ্গে পাথরের নুড়ি-গুলো চার্চের চাতালের ওপর ঝরঝর করে ছড়িয়ে পড়ে তবে আর কোন উপায় থাকবে না। মাঝ পথ যেতে না যেতে কফিনের তলা মচমচ করে উঠল। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে এল। সর্বনাশ হল আর কি। যে ছেলেটা কফিনের মধ্যে পাথরের নুড়ি ভর্তি করেছিল সেই উল্লুককে ডেকে ধমকে দিতে ইচ্ছে হল। তার ওপর কি ভারী হয়ে উঠেছে কফিন। কোমর বেঁকে যাচ্ছে। আমরা সবাই গীর্জায় বসবার ঘেরা আসনের ওপর বসে পড়লাম। লোকে দেখলে ভাবত আমরা মৃতের আত্মীয়স্বজন হব। শোকের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা এক অজ্ঞাতকুলশীলের ভোগে এল। এই জন্য পাদ্রীকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। ভগবান করুন এইসব কথা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির কেউ না জানতে পারে! পাদ্রী তাই খুব তাড়াতাড়ি তার অনুষ্ঠান শেষ করে দিলেন। হপ্তাখানেক আগে শহরের এক গরীব বুড়ী মারা গিয়েছিল। তার কবর দেবার সময় একটা প্রার্থনা তৈরী করেছিল পাদ্রী। সেই প্রার্থনাটি এর বেলায়ও আবৃত্তি করা হল। বুড়ীর বেলায় পাদ্রীকে লিখতে হয়েছিল 'আমাদের প্রিয় ভগিনী' আর এর বেলায় বলতে হবে 'আমাদের প্রিয় ভ্রাতা'। এই অদল-বদলের জন্য পাদ্রীকে বেশ বিব্রত হতে হল। একবার ও বলেই ফেললো, "আমাদের এই বিগত ভগিনীর জন্য তার স্বামী ও পুত্র পৃথিবীর অনাপার থেকে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।" পাদ্রীর এই প্রার্থনা শুনে আমি অবাক। মনে হল কেউ যদি এই আবোল-তাবোল কথাগুলো শোনে সে কি ভাববে? কিন্তু এই অনুষ্ঠানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। আর দূরে বসে আছে এক বুড়ী। তাকেও কালা বলে মনে হল। মনে হয় কবর দেবার ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই। তুষারপাত থেকে বাঁচবার জন্য চার্চে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই আমার ভয় অমূলক।

এবার কফিন নিয়ে কবরখানার দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের পিছনে বিধর্মীর দল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওই বুড়ীও বা আসছে কেন? নীল জামা আর শাল মুড়ি দেওয়া বুড়ীর মুখে হাজার হাজার ভাঁজ। কুঁচকে গিয়েছে কোথাও কোথাও। মনটা কেমন করে উঠল। আমি আর অন্য দুজন সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করতে থাকলাম। কি জানি, বুড়ী কবর দেবার সময়টাতে কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসে যদি! কবরে মাটি চাপা না দেওয়া অবধি আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল। আমার সঙ্গী দুজন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অকারণ ঘুরে বেড়াতে পারল না। কবরখানার নিকটেই 'কাফে উপাসালা।' সঙ্গী দুজন কফিখানায় বসল। থাকলাম একা আমি। আমাকেই দেখতে হচ্ছে সমস্ত কান্ড। আমি, বুড়ী, পাদ্রী আর তার সাহায্যকারী, আমরা এই চারজন কফিনের পিছনে পিছনে যাচ্ছি। পাদ্রী আর তার সাহায্যকারীর মাথায় সিল্কের টুপি।

কবরে মাটি দেবার পর পাদ্রী ও তার সঙ্গী চলে গেল। থাকলাম বুড়ী আর আমি। বুড়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে তুষার-ঝড় দেখছে। কবরখানার গেটের কাছে আমি বুড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বুড়ী আর আসে না। তাই বাধ্য হয়ে আবার কবরের দিকে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কিসের জন্য দেরী করছ বুড়ী-মা?

ভয় পেয়ে বুড়ী আমার দিকে তাকাল। আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বুড়ীর মুখটা ব্যাথায় কুঁকড়ে গেল। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। মুখের একটা পাশ হাঁ হয়ে গেল। দেখলাম বুড়ীর একটাও দাঁত নেই। চোখ দুটো লাল টকটকে। জলে ভর্তি। বুড়ো লোকেরা যখন কাঁদে তখন তাদের খুব খারাপ দেখায়। এ বিষয়ে আমি আগে লিখেছি।

আমি বললাম, "কেঁদো না বুড়ী-মা। ভগবান ওকে নিয়েছেন।"

জামার খুট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বুড়ী বললে, "ঠিক কথা।"

বুড়ী কবরের কাছে ঘুরঘুর করুক—এ আমার অভিপ্রেত নয়। তাই বললাম, "ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও।"

আমরা একসঙ্গে কবরখানা পার হলাম। আমি বললাম, "তুমি ওর আত্মীয়?"

সে উত্তর দিল, "আমি পশ্চিমের লোক।"

"তুমি কি ওলফস্ভিগ থেকে আসছ?"

"হ্যা"।

"তা হলে তুমি ওকে নিশ্চিত জানো।"

"হ্যা। আমরা সমবয়সী। তারপর বিয়ে হল। চলে গেলাম দক্ষিণে। সেখানে চল্লিশ বছর কেটে গেছে।"

"তোমার নাম কি বুড়ী-মা?"

"জিলি।"

"স্বামী বেঁচে আছে?"

"না। অনেক আগেই গত।"

"ছেলে-পিলে কটি?"

"তেরোটি।" বুড়ীর কন্ঠে এমন একটা উদাসীনতা ছিল যে আমার তখুনি মনে হল বুড়ীর নাতিনাতনীর সংখ্যা হয়ত ষাট পেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম, "বিশ্ব সংসারে কত আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটে। ও বড় নিঃসঙ্গ ছিল।"

বুড়ী আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এল। আশাই করিনি বুড়ী আমার কথার উত্তর দেবে। আবার ঝড় দেখা দিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি ওকে এড়াতে চাইলাম। টুপিটা খুলে আমি বললাম, "আচ্ছা চল্লি বুড়ী-মা।"

সুন্দর ও বুড়ো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে বুঝেছিল বিশ্ব সংসারে একমাত্র একলা আমি তার দুঃখের অংশীদার। স্থিরভাবে বললে, "আমিও যে সারা জীবন নিঃসঙ্গ ছিলাম।"

সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তার। দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো। জামায় চোখ চেপে বুড়ী মুখ ফেরাল।

নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসনের কথাটা খুবই সত্যি। সে মাত্র একটা রাত কবরখানায় কাটিয়েছিল। আর এখানেই আমার গল্পের শেষ। অনুবাদঃ রাম বসু।

হ্যালডর ল্যাক্সনেশ আইসল্যাণ্ডের রেইকজাভিকে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০২ সালে। ল্যাক্সনেশ প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং পরিবারের ইচ্ছা ছিল তাকে সঙ্গীতকার হিসাবে গড়ে তোলায়। কিন্তু ষোল বছর বয়সে ইনি পিয়ানো শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে আরম্ভ করেন। তার উপন্যাস স্বদেশ-বিদেশে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে এবং ১৯৫৬ সালে **Islandsklukken** নামক তিন খণ্ডের ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য একে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুবাদক।

কলকাতার শিল্প মেলা

বজ্র সেন

রবীন্দ্র সরোবরের প্রান্তে ইলেকট্রিক বাল্বের থোকা থোকা নকল ফলের রোশানাইয়ে ফলন্ত কয়েকটি গাছ উজ্জ্বল স্বর্ণালীর ইন্দ্রজাল রচনা করেছে মণ্ডপটির চারধারে,—চিনতে ভুল হয় না শিল্পমেলাকে। দূরে থেকেই চেনা যায় জ্বলন্ত নিয়ন-চক্ষু জায়াণ্ট হুইল—মেরী-গো-রাউণ্ড, আলোক-মালার চক্র শিশু ও কিশোরদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে উৎসবের। ফটক দিয়ে ঢুকেই ডানহাতে ফুচ্‌কার দোকান; তেতুঁলজলে ভর্তি ফুলকো গোল গোল ফুচ্‌কার প্রাণহরা স্বাদ, বলিহারি দিল্লীকা চাট্‌, চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আড্ডা মারার মত রেস্তোরাঁ। আলোয় আলোয় রঙীন ফোয়ারার ফুলঝুরি, ছেলে-পিলেদের মনঃকাড়া ম্যাজিক, সাইকেল-চড়া, দু'এক বাজি বন্দুক-ছোঁড়া নির্দোষ জুয়া—মেলা! সত্যিই জম-জমাট মেলা!! মুখ্য অভিপ্রায় হয়তো পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা, সকলকে এই ফাঁকে একটু শিখিয়ে নেওয়া; কিন্তু তা' নেহাৎ গুরুমশাইয়ের মত নয়, বন্ধুর মত মনোভাব নিয়ে। এ ধরণের উৎসবের সঙ্গে আমাদের সায় আছে, মেলার সমস্ত উদ্দেশ্যকে এ উপায়েই সহজ ও হৃদয়গ্রাহ্য করে তোলা যায়।

কলকাতা শিল্পমেলা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে। সেই সাফল্যসমৃদ্ধ শিল্পমেলা দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বছর। জনপ্রিয়তার জন্যে শিল্পমেলাকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি অবধি রাখার আয়োজন হয়েছে। এই বৎসর বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসমৃদ্ধির ভাবনা যাঁর আজীবনের শিরঃপীড়াস্বরূপ ছিল, তাঁরই সশ্রদ্ধ স্মৃতির উদ্দেশে এই শিল্পমেলা নিবেদিত। বহুসংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বলে, পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অগ্রগামী শিল্পকেন্দ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছোটোখাটো কুটির-শিল্প ও নাতিবৃহৎ শিল্পের ক্রমবিকাশের পরিচয় দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মাঝে মাঝে এরকম শিল্পমেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রাদেশিক সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিকাশের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য কোন্‌ কোন্‌ সুবিধা দিয়ে সরকারী তরফ থেকে সাহায্য করা হচ্ছে ও ভবিষ্যতে সাহায্য করা যেতে পারে—সে সমস্ত প্রশ্নেরও জবাব মিলতে পারে এই প্রদর্শনীগুলি খুঁটিয়ে দেখলে।

তাই এ-প্রদর্শনীর মারফৎ যেমন ছোটো-বড়ো-মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বোধ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কারুজীবী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতার মধ্যে আদান-প্রদান সুগম ও সহজ হয়ে ওঠে, তেমনি যাঁরা এ-ধরণের ব্যবসা শুরু করতে চান তাঁরাও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হতে পারেন। কাজে নামার আগে সরকারী তরফ থেকে কীভাবে সাহায্য পাওয়া সম্ভব—বিভিন্ন শিল্পসংস্থার প্যাভেলিয়ান দেখলে তাও সহজবোধ্য হবে।

প্রদর্শনীতে ঔষধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় রসায়নজাত দ্রব্য এবং শৌখিন দ্রব্য-সামগ্রীর স্টলগুলি, বেঙ্গল কেমিকেল, ক্যালকাটা কেমিকেল, টমকো এবং নতুনদের মধ্যে মীরা কেমিকেলের মত প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। জেসপ কোম্পানীর যন্ত্রপাতি, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উষা মেসিন, পাখা, ইণ্ডিয়া সাইকেল ইণ্ডাস্ট্রির সাইকেল, ফিলিপ্‌স্‌-এর রেডিও ও কিরণ ল্যাম্পের দেশী-বিদেশী স্টলগুলি পাশাপাশি সহাবস্থান করছে।

এছাড়াও কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং ও নাগ এণ্টারপ্রাইজের ভারী শিল্পজাত যন্ত্রপাতি, 'কলিঙ্গে'র টিউব, মেসার্স কার্টার-পুলার কোম্পানীর ট্রাক্টর, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকারের আসল নীলাম্বরী শাড়ী ও ঢাকাই মসলিনের নমুনা, গ্রামোদ্যোগ ভবনের কুটির-শিল্প, বাঁকুড়ার ঘোড়া ও পোড়ামাটির পুতুলের এমন অপরূপ

ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি অডিটোরিয়ামে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন, জগদীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্য ডকুমেন্টারী আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিবর্তন-মূলক একটি ডকুমেন্টারী ছায়াচিত্রও মেলার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে দেখানো হয়েছে। জাতীয় নাট্যশালা যাঁর আজীবনের স্বপ্ন ছিল সেই নাট্যগতপ্রাণ শিশিরকুমারের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত 'শ্রীরঙ্গম' নামে একটি অভিনয়মঞ্চ নির্মিত হয়েছে এখানে। এই মঞ্চে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য থেকে উদীয়মান নাট্যসংস্থার অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছে ও হবে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, আর্ট সেন্টার অব দি ওরিয়েন্টের 'দাদুর দস্তানা', স্বপনবুড়ো পরিচালিত পাততাড়ির 'ফুলপরী', থিয়েটার কর্ণারের 'এমনও দিন আসতে পারে' এবং স্বাল্দিক-এর নাম এ উপলক্ষে মনে পড়ে।

মেলার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পুতুল-নাচ। জয়নগরের স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ হালদারের টকি পুতুল নাচ পার্টির 'হরিশ্চন্দ্র' পালা আমাদের অভিভূত করেছে। পুতুলের সাহায্যে সম্পূর্ণ একটি পালা অভিনয়, এবং সেই অভিনয়কেও এঁরা উপযুক্ত দৃশ্যসজ্জা নাটকীয় নৈপুণ্য এবং পরিবেশের উপযোগী নাচে ও গানে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে মৃত রোহিতাশ্বকে কাঁধে নিয়ে শোকার্তা শৈব্যার প্রবেশ—শুধু পুতুলের সাহায্যে সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাবর্জিত এই অভিনয়-সাফল্য দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। মেলায় আরো নতুন নতুন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণ অপেরা পার্টি, নট্ট কোম্পানী প্রভৃতির যাত্রাভিনয় এবং 'টেলিভিশন শো' নবতম সংযোজন।

সর্বশেষে উল্লেখ করি যে, শিশুদের উপযোগী নানান আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে মেলার কর্তৃপক্ষ দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। রঙীন ফোয়ারার চারধারে, সবুজ ঘাসের উপরে শিশুদের হৈ-হল্লা না থাকলে উৎসব জমে না! ছেলেদের জন্যে নাগর-দোলা, সাইকেল চড়া, ম্যাজিক ও 'মিনিয়েচর জু' স্থাপনের জন্য শিল্পমেলা সফল হয়েছে। মেলা, মার্চ মাসের মাঝামাঝি কাল অবধি থাকবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে নিয়ন-চক্ষু জায়ান্ট হুইলের ঘর্ঘর শব্দে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হতে থাক।

সমন্বয়সাধন ইতোপূর্বে কোনো মেলায় হয়েছে বলে মনে হয় না।

ক্রেতাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ঘর-সাজানোর শৌখীন দ্রব্যাদি, ঘোড়া-পুতুল প্রভৃতিই তাঁরা কেনা-কাটা করছেন, কেউ কিনছেন শাড়ী কেউবা বড়জোর বেঙ্গল এনামেলের হাল্কা বাসন-পত্র কিনছেন। ফিলিপ্সের দোকানেও ভিড় হচ্ছে রুচিসম্মত গৃহের মডেল দেখবার জন্যে। ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতির স্টলের প্রতি অনেকেই সম্ভ্রম-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন। ঐ সব জিনিসের কেনা-কাটার প্রশস্ত ক্ষেত্রেও এটা অবশ্য নয়। তার চেয়ে হাল্কা টয়লেট বাক্স সংগ্রহ করা অনেক যুক্তিযুক্ত।

মহিলারা অগ্রণী হয়ে এখানে অনেক স্টল দখল করেছেন সেটা সুখের বিষয়। কেউ দিয়েছেন উদ্বাস্তু মহিলাদের হাতে-তৈরী পোশাক-আশাকের দোকান, কেউ চামড়ার ও সিল্কের তৈরী হাতব্যাগ, কেউবা খাবারের দোকান, কেউ আর কিছু।

ওয়াই-ডাব্লু-সি-এ, সুদক্ষিণা, সরোজ-নলিনী নারী কল্যাণ সমিতি, ভারতীয় নারী মঙ্গল সমিতি, শ্রীনিকেতন সকলেই নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন। এই দেখে আশ্বস্ত হওয়া যায় যে জাতীয় অর্থনীতিতে মেয়েরাও নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

এই মেলার সংস্কৃতি শাখাটি খুবই সমৃদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞানাচার্য সমাজসেবী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনায়ন পুতুল ও চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ রূপায়ণ করায় মেলাটি বৈশিষ্টপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর মানব-প্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়ে ত্যাগব্রতের পরিবর্তে সেবাধর্মে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করে গেছেন—তার পরিচয় এই জীবনায়নে পরিস্ফুট হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা ও স্বদেশবাসীর সেবাধর্মেদীক্ষিত জীবনীও চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে রূপায়িত করা হয়েছে। বিজ্ঞানাচার্যের কর্মবহুল জীবনের মূল ঘটনাগুলির পরিচয়, উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাংলার দেশপ্রেমিক সমস্ত মনীষীদের আবক্ষ প্রতিকৃতি এই মণ্ডপের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাছাড়া গত একশো বছরে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কয়েকটি পরিচিতি চিত্র ও লিখনের মাধ্যমে ও একটি অঙ্কিত বৃহৎ মানচিত্রে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলও দেখা যাবে। দুটি শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উপায়ই সুষ্ঠু ও রুচিসম্মত।

মাটির পুতুলের সাহায্যে কৃষ্ণলীলা আরো একটি দ্রষ্টব্য।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'সজনের শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা, আমাকে খবর হয় টানাটানির বেলা!' একমুখ বিদ্রুপের হাসি নিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে দাওরের ঘরে এসে হানা দেন মায়ালতা।

কলকাতায় এসে পর্যন্ত মায়ালতা অশনে-বসনে চলনে-বলনে অনেক শহুরে হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ছড়া কাটতে, প্রবাদবচন আওড়াতে, তিনি পুরোপুরি তাঁর গ্রাম্য পিসশাশুড়ীর সুযোগ্য ছাত্রী।

সুমোহনের শোনা অভ্যাস আছে, তাই অগ্রাহ্যভরে বলে ওঠে, 'হঠাৎ আবার কার কি খুঁৎ খুঁজে পেলে?'

'খুঁৎ?'

'ওই আর কি দোষ কি দুর্বলতা। নইলে ছড়া কাটতে বসবে কেন।'

'হুঁ আমার ছড়া কাটাটাই যত নিন্দের। কারণ সে যে আমি। জগতে যে যা করুক নিন্দে নেই! বলি তোমাদের স্বাধীনা বিদ্যেবতী মেয়ের খবর শুনেছ? বর নিয়ে দেশে ফিরছে। কলকাতায় নয় দিল্লীর বাড়ীতে। এখন আদর অভ্যর্থনা করে জামাইকে আকাশ থেকে নামাতে, বাড়ীঘর গুছিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সংসার পেতে দিতে ডাক পড়েছে সজনের শাকের!'

'ধেত্তারি। তোমার সজনের শাকটা কি, তাইতো বুঝছি না।'

আহা কিছুই জানো না? পিসিমার বাকচাতুরী শোনোনি কখনো. পাড়াগাঁয়ে জন্মাওনি কখনো?' মায়ালতা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'এইগুলো দেখতে পারি না। জন্মকর্ম যেখানে হ'ল তার সব ভুলে গিয়ে—'

সুমোহন ঠোঁট কুঁচকে হাসে, 'তা তুমিও তো অনেক কিছু ভুলেছ!'

'ভুলেছি? আমি ভুলেছি? কি ভুলেছি শুনি?'

'কেন মোচা কুটতে, কচুর শাক রাঁধতে, মেথির গুঁড়ো দেওয়া চিতল মাছের 'ভাপাসিদ্ধ' বানাতে—'

'ভুলবো আবার কেন! ভুলিনি কিছুই।' মায়ালতা সতাচ্ছিল্যে বলেন, 'ভূতের বেগার আর খাটব না বলে ছেড়ে দিয়েছি। কী দায় আমার দশ ঘণ্টা রান্নাঘরে পড়ে থেকে?'

'তা' সত্যি! ততক্ষণ বরং হাতে বটুয়া ঝুলিয়ে পাড়া-বেড়াতে বেরোলে দেশের দশের উপকার!'

'কী বললে ছোটঠাকুরপো! আমি রাতদিন পাড়া বেড়িয়ে বেড়াই? তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে—তোমার বৌ-ই সংসার মাথায় করে রেখেছে। কেমন?'

'সর্বনাশ! তুমি আবার আমার কথার মধ্যে থেকে মানে আবিষ্কার করতে বসছ! তার চেয়ে বরং তোমার ওই সজনের শাকের মানেটাই বলে যাও। এত ঘটা করে যখন আন্দোলনে বেরিয়েছ, অবশ্যই ব্যাপারটা গুরুতর!'

'তোমার কাছে আবার গুরুতর! স্বয়ং গুরুই তোমার কাছে লঘু! সজনের শাক হচ্ছে এই, তোমরা বুঝলে? কোনও ব্যাপারে জ্যাঠাখুড়োর মান্য রাখলেন না মেয়ে, বিয়ে করে বসলেন আপনি আপনি, এখন অসুবিধের সময় জ্যাঠাকাকা! লেখা হয়েছে 'আপনারা যদি কেউ আসতে পারেন খুব উপকার হয়। একা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে অসুবিধেয় পড়বে—আর তা'ও বলি! ইচ্ছে করে নিজের আখেরটা নিজে হাতে এমন করে খোয়ালি কি বলে? কারুর একটা পরামর্শ পর্যন্ত না নিয়ে! একেই বলে নিজের বুদ্ধিতে ফকির হবো, তো পরের বুদ্ধিতে রাজা হবে না। তোর এত রূপগুণ, এত বিদ্যেবুদ্ধি, বাপের এত টাকা, তুই কোন দুঃখে একটা অন্ধকে—'

সুমোহন বাধা দিয়ে বলে, 'থাকনা ওসব কথা! চিঠিটা কাকে লিখেছে? তোমাকে?'

'আমাকে! হুঃ। আমায় চিঠি দেবে! কত মান্য দিচ্ছে আমায় জেঠি বলে! চিঠি দিয়েছে আপন লোককেই। জ্যাঠাকে। অবিশ্যি তার মধ্যে তোমারও একটুকরো ছিল, তা আমি অতশত দেখিনি। তোমার দাদার ভেবেই খাম ছিঁড়ে পড়ে ফেললাম। তোমারটুকুতে অবিশ্যি বিশেষ কিছু নেই—'

সুমোহন আবার বাধা দেয়। 'বৌদি, আবার তুমি পরের চিঠি খুলে পড়েছ? জানো এ অপরাধের বার্তা তোমাদের ছোটবৌয়ের কানে গেলে, ফাঁসি হয়ে যেতে পারে তোমার!'

'ছোটবৌয়ের কাছে তো আমি অহোরাত্রই ফাঁসির আসামী!' মায়ালতা

মুখ বাঁকান, 'এখনো অত সাহেব হয়ে উঠিনি ছোটঠাকুরপো যে নিজের স্বামীর নামের চিঠি ও খাম না খুলে রেখে দেব। আর সমস্ত দিন কৌতূহল চেপে হাঁপিয়ে মরবো। অবিশ্যি তোমার চিঠিতে আমার অধিকার নেই। কিন্তু চোখ তো আর মনের শাসন মানে না। রেখে দিতে দিতেই পড়া হয়ে যায়। এই নাও।' চিঠিটা বাড়িয়ে দেন মায়ালতা, 'নাও এখন কে দিল্লীতে যাবে যাও জামাই বরণ করতে!'

'আমার দ্বারা ওসব হবে টবে না।' বলে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে ফেলে দেয় সুমোহন।

'হবে না তা' জানি। সংসারের সকল কর্তব্যের দায় তো ওই বুড়োর! কিন্তু এও বলি ছোটঠাকুরপো, রাতদিন তো বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছ, একটু উপকারেও লাগতে ইচ্ছে করে না?'

'নেভার! 'একটু' উপকারে লেগে কোন মহৎ গৌরব?'

'তা' সবাই বুঝি সব কিছু করে খালি গৌরবের তালে?'

'তবে আবার কি?'

'আর এই যে আমি জীবনভোর তোমাদের সংসারে বেগার খেটে মলাম? কোন গৌরব পেলাম তার থেকে শুনি? অপযশ আর অগৌরবই তো জীবনের সঞ্চয়।'

'ওটাও এক ধরণের দামী সঞ্চয় বৌদি! এই যে রাতদিন বড়গলায় বলে বেড়াতে পাচ্ছ 'সারা জীবন বেগার খেটে মলাম'—এটাই কি কম লাভ?'

নিত্য নিয়মে কথার পিঠে কথা কেটে কথা ক্রমশঃ কলহে পরিণত হয়। মায়ালতা রাগ করে উঠে যান। আর ছেলেদের কাছে গিয়ে তাদের কাকার নিন্দে করতে থাকেন। ছেলেরা নিত্য নিয়মে বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুমিও যেমন, তাই এখনো আবার যেচে যেচে সেধে সেধে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাও।'

'যেচে সেধে আবার কি!' মায়ালতা অসন্তুষ্টচিত্তে আত্মদোষ স্খালন করতে বসেন। তারপর সুবিমল এলে চিঠি দেখিয়ে কথা পাড়েন, 'যাকনা, ছোটবৌকে নিয়েই ছোটঠাকুরপো কিছুদিন দিল্লী ঘুরে আসুক না।' একমুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার বলেন, 'আর ঘুরে আসাই বা কেন, রাজধানী জায়গা, চেষ্টা-বেষ্টা করে যেমন-তেমন একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে সেখানে থেকে যেতেই বা বাধা কি ছোটঠাকুরপোর? ভাইঝির একটা অভিভাবকও হবে। তা'ছাড়া—মেজ-ঠাকুরপোও কিছু চিরদিন সুচিন্তার বাড়ীর প্রজা হয়ে থাকবে না। মেয়ে এলে যাবে তো দিল্লী? ছোটবৌ সেখানে থাকলে দেখাশোনা তদারকী—'

সুবিমল এতক্ষণ স্ত্রীর আনন্দো-দ্ভাসিত মুখের দিকে এক লক্ষ্যে তাকিয়ে সবটা বলে যেতে দিচ্ছিলেন। শেষটায় বাধা দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'জগৎ-সংসারের সমস্ত মানুষ-গুলো যদি তোমার হিসেবের অঙ্কে চলাফেরা করতো, সংসারে সমস্যা বলে আর কিছু থাকতো না তাহলে। আহা—সমস্যার কী সুন্দর আর কী নির্ভুল সমাধান!'

মায়ালতা যথারীতি রেগে উঠে বললেন, 'ভুলটাই বা কি হল বোঝাও আমায়? ছোটঠাকুরপোর এখানে কী রাজ-কার্য আছে? এক দাদার অন্ন ধ্বংসাচ্ছে, না হয় আর এক দাদার অন্ন ধ্বংসাবে। ছোটবৌ এক ভাসুরের সেবা-যত্ন করে সুয়ো হচ্ছে, না হয় আর এক ভাসুরের কাছে সুয়ো হবে, হিসেবে দোষ কোথায়? বরং সে বেচারা পাগল-ছাগল হয়ে গেছে—'

'থামো চুপ করো।' বলে কথা থামাতে চেষ্টা করেন সুবিমল, কিন্তু মায়ালতা জীবনেও এত সহজে থামেননি থামলেনও না। বললেন, 'ধমকে চুপ করিয়েই তো রাখলে চিরদিন। দু'দিন একটু গা হালকা করে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো, এত সুখ কি আমার হবে? কেন, ছোটকর্তা দিল্লী গিয়ে থাকলে কি হয়? তা' তো হবে না। তিনি একেবারে ঝাড়া জবাব দিয়ে বসে আছেন, তাঁর দ্বারা এসব হবে না।'

সুবিমল বলেন, 'তার সঙ্গে তা'হলে অলরেডি কথা হয়ে গেছে তোমার। ভাল ভাল।'

'অন্যায় হয়েছে।' মায়ালতা ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বলেন, 'মাঝে মাঝে ভুলক্রমে মনে করে বসি কিনা আমি বুঝি বাড়ীর গিন্নী। যাক আর তোমাদের কথায় আমি নেই; যা ইচ্ছে করগে।'

রীতিমাফিক উঠে যান মায়ালতা।

সুবিমল ডেকে পাঠান সুমোহনকে, এবং বিনা ভূমিকায় বলেন, নীতার চিঠিটা পড়েছ বোধহয়? তারিখ হিসেবে কালই রওনা দেওয়া দরকার। আমার তো এখন না মরলে কলকাতা ছাড়বার জো নেই, কাজেই তুমিই প্রস্তুত হও।'

আপত্তির কোন ফাঁক রাখলেন না সুবিমল।

'যাবে দিল্লী?'

সুমোহন স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করে।

অশোকা মুখ তুলে বলে, 'আমি?'

'তাই বলছি। মনে হচ্ছে দূরে ছাই একবার সাধুভাষায় কি বলে যেন, ভাগ্যান্বেষণে না কি। তাই গেলে হয়। আমার মত মহাপুরুষেরও হঠাৎ যেন আরাম-কণ্টকী ধরছে।'

অশোকা ঈষৎ হেসে বলে, 'লক্ষণ ভাল নয়।'

'তাই দেখছি। চলো না চলেই যাই!'

সুমোহন এ ধরণের কথা কখনো বলে না। অশোকা হয়তো একটু অবাক হয়। বলে, 'আমি কোথায় যাবো?'

'কেন দিল্লীতে।'

'নীতার বাড়ী!'

'বাড়ীটা নীতার নয়, মেজদার।'

'তিনি আর তো সেখানে থাকেন না।'

'আমরা গিয়ে থাকলে, তিনি থাকতে পারেন। অথাৎ তুমি নীতার সাহায্যে লাগলে—'

অশোকা মৃদু হাস্যে বলে, 'বুদ্ধিটা বা ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ তোমার মৌলিক বলে মনে হচ্ছে না তো—'

'কেন এটুকু বুদ্ধিও আমার থাকতে নেই?'

নেই একথা কে বলেছে?'

সুমোহন উঠে বসে বলে, 'সত্যি আর এ জীবনটা ভাল লাগছে না।'

অশোকা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'এ লক্ষণটা শুভ কি অশুভ তাই ভাবছি।'

'মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, তুমি যদি এমন বরফ শীতল না হতে, হয়তো আমি এমন দারুভূতো জগন্নাথ হ'তাম না।'

'ওই ভাবেই লোকে আত্মসান্ত্বনা খোঁজে।'

'তা হবে।' বলে একটু পরে বলে

সুমোহন 'যাক আমায় কাল যেতে হচ্ছে জানো আশাকাঁর।'

অশোকা ঘাড় নেড়ে জানায় জানে।

'সকালে একবার সুচিন্তা দেবীর বাড়ী যাবো ভাবছি।'

অশোকা উত্তর দেয় না।

সুমোহন আবার বলে, 'কই কিছু বললে না?'

'বলবার কিছু আছে, বুঝতে পারিনি।'

'ধরো বলতে পারতে, 'আমিও যাবো।'

'কী জন্যে?'

'এমনি। তুমি তো সুচিন্তাকে খুব ভক্তি করো।'

'ভক্তি করি একথা তোমায় কে বললো?'

'এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আছে।'

'তা' হলে এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও থাকা উচিত, বারে বারে যাওয়াটা শোভন কিনা।'

'বাঃ, এর আবার অশোভন কি? সেখানে আমাদের নিজের লোক রয়েছে—'

'মানে যে নিজের লোক তোমাদের সঙ্গ পরিহার করতেই ওই নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন।'

'ওটা তোমার ভুল ধারণা। আশ্রয় নেবার কারণ অন্য।'

'অন্যের কাজের কারণ আবিষ্কার করতে বসলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। বরং কাল যদি যাও তো মেজদার 'স্যাণ্ডো' 'গুণ্ডা'কে নিয়ে যেও, উনি সেদিন ওদের জন্যে চঞ্চল হয়েছিলেন।'

স্বভাব-বহির্ভূত অনেক বেশী কথা বলে অশোকা।

বলে, হয়তো আজ সুমোহনের মানসিক আলোড়ন ওকেও নাড়া দিয়েছে বলে। কত কত দিন আগে কবে যেন অশোকাই না বলেছিল, 'চলো না আমরা কোথাও চলে যাই।'

হ্যাঁ, একদিন এই দুর্বলতা প্রকাশ করে বসেছিল অশোকা। কিন্তু সুমোহন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে কথা। বলেছিল 'ক্ষেপিনি তো!' বলেছিল 'সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।' একথাও বলেছিল, 'তার মনে এই চাও তুমি, আমার হালটা হাড়ির হাল হোক। স্ত্রীপুত্রের দায় গলায় ঝুলিয়ে অন্নের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াই। হুঃ! ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে—বুঝলে? কেন বড়-গিন্নীর তাঁবে থাকতে আর বুঝি মন সরছে না? নিজের সংসারে গিন্নী হয়ে বসতে বাসনা।'

তারপর আর কোন দিন অশোকা কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেনি।

আজ সুমোহন প্রকাশ করল।

কিন্তু অশোকা হেসে তাকে নস্যাৎ করল না। বরং সুমোহন শেষ আর একবার যখন বলল, 'দেখ তোমার ওই সংস্কৃতের মাস্টারমশাইয়ের মত তেলা-গোলা গম্ভীর মুখখানা সর্বদা চোখের সামনে দেখা এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে কিছুদিন আর দেখতে পাব না মনে করে পৃথিবীটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। তখন নরম গলায় বলল, 'কতদিন আর?'

'কে বলতে পারে কতদিন!' সুমোহন ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, 'ভাবছি আমার দ্বারা 'উপার্জন' নামক তুচ্ছ কাজটা আদৌ অসম্ভব কিনা, সত্যিই একবার পরীক্ষা করে দেখবো।'

একথায় অশোকা হেসে ওঠে।

হেসে বলে, 'বেশ তো যদি দেখ অসম্ভব হচ্ছে না, তখন খবর দিও উপার্জনে ভাগ বসাতে যাবো।'

'মোটকথা কাল আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?'

'কি যে বল! মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যেতে আছে?'

সুমোহন হঠাৎ ভারী গম্ভীর হয়ে যায়।

অন্যের কাজের কারণ আবিষ্কার করতে বসলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী

আর শুয়ে পড়ে পা নাচায় না। চুপচাপ বসে থাকে দেয়ালের দিকে চেয়ে।

তারপর সুচিন্তার বাড়ী যাবার তোড়জোড় করে। মূল খবর তো ওইখানেই।

ওদিকে সেদিন এ বাড়ীতে এসেছেন কৃষ্ণার মা আর বড় মাসী।

মাসী দ'দে মেয়ে, আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এসেছেন, কিন্তু প্রথমটা থতমত খেলেন সুচিন্তার শান্ত নম্র আর বিনীত মূর্তি দেখে। বোনের কাছে পাওয়া রিপোর্ট থেকে তাঁর ধারণা অন্য রকম ছিল। তবু সুচিন্তা যখন নমস্কার করে বসতে অনুরোধ করলেন, তখন হুলে একটু না ফুটিয়ে ছাড়লেন না তিনি। বললেন, 'বেয়ানের তো শুনেছি বাড়ীতে মানুষজন এলে 'এসো বোসো' করবার অভ্যেস নেই।'

সুচিন্তা মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'শোনা কথায় কি বিশ্বাস করতে আছে? কত ভুল খবর কানে এসে ঢেকে। পাড়া-পড়শীর কাজই তো নিন্দে রটিয়ে বেড়ানো।'

কৃষ্ণার মার আর যতই বুদ্ধি থাক, সূক্ষ্ম পরিহাস বোঝার মত বুদ্ধিটার অভাব, তাই তিনি রেগে উঠে বলেন, 'পাড়া-পড়শীর সময় এত সস্তা নয় যে অকারণ আপনার নিন্দে করে বেড়াবে। আজ দেখছি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। নইলে নিজের ছেলে বৌ তো এসে ধুলো পায়ে ফিরে গেছে।'

সুচিন্তার মুখ থেকে সেই কৌতুকের হাসিটুকু অন্তর্হিত হয়, তিনি মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'ছেলে বৌ তো কুটুম নয় ভাই, ঘরের লোক। তারা যদি ভুল করে নিজেদের কুটুম বলে মনে করে, সেটা ভুলই।'

মাসী ছোটবোনের অনুরোধে হাল ধরতে এসেছেন, কাজেই ডিউটি পালন করতে হালটা ধরেন। বলেন, 'তা নতুন বৌ তো এসেই আপনার ঘরে হাঁড়ি নেড়ে ভাত বেড়ে খাবে না বেয়ান, নতুন বৌ কুটুমেরই সামিল। তা' ছাড়া বৌ বরণ করে ঘরে তোলারও তো একটা রীতি আমাদের বাঙালী বাড়ীতে আছে। বেয়ানের বুঝি সেটা জানা নেই?'

সুচিন্তা সহসা হেসে উঠলেন। বললেন, 'এখনো ওসব সেকেলে রীতি-নীতি আপনি মনে রেখেছেন? আশ্চর্য তো!'

মাসী ভারী মুখে বলেন, 'তা' আমরা তো আপনার মতন এতটা আধুনিক হতে পারিনি বেয়ান। যেকালে জন্মেছি সেই কালের মতনই আছি।'

সুচিন্তা বলেন, 'কী মুস্কিল, 'আছি' বললেই কি থাকা যায়, না থাকতে পাওয়া যায়? 'কাল' যে নিজের বেগে ছুটছে, তার সঙ্গে তাল রাখতে হবে তো?'

'জানি না ভাই ওসব সাধুভাষা। আমরা 'কাল'ও বুঝি না, 'তাল'ও বুঝি না, বুঝি শুধু চাল। চালচলনটা মানুষের মত হওয়া দরকার। এই যে আপনি কোথাকার কে এক পরের জন্যে ঘর ভাসাচ্ছেন, এটা কি মানুষ মনিষ্যির?'

সুচিন্তা একবার বোধকরি ভাবেন আর কথা বলবেন না, আর কথা বাড়াবেন না, কিন্তু দু' দুটো মানুষের সামনে চুপ করে বসে থাকাও যেমন শক্ত, সামনে থেকে উঠে যাওয়াও তেমনি শক্ত। তাই তেমনি হাসিমুখে বলেন, 'আপন পরের' ব্যাখ্যা বড় গোলমেলে দিদি, ওটা আবার সত্যি পরকে আদপেই বোঝানো যায় না।'

'ওঃ! তা বটে। তা' হলে লোকনিন্দে আপনার কাছে কিছুই নয়?'

'কিছুই নয় একথা কি করে বলি বলুন?' সুচিন্তা বলেন, অনেক কিছুই। কিন্তু জগতে আরও তো কিছু থাকতে পারে?

'সেই কিছুটা আমাদের পক্ষে বোঝা বড় শক্ত বেয়ান। লোকনিন্দেয় স্বয়ং রামচন্দ্র টলেছিলেন। অবিশ্যি আপনার রুচি-প্রবৃত্তিতে যা আসবে, তা আপনি করবেন। তবে আমরা মেয়ে দিয়েছি, তাই—'

সুচিন্তা বাধা দিলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এইখানটায় একটু ভুল করছেন। মেয়ে দেননি আপনারা।'

'তা' দিলেই বা নিচ্ছে কে?' কৃষ্ণার মা সকোপে বলেন, 'আমার যেমন বুদ্ধি, তাই আবার আসি অপমান হতে। মেয়েও যে আমার তেমনি, আমার যথাসর্বস্বই তার, তিনতলা বাড়ী হাঁ হাঁ করছে, তবু কিনা 'বিয়ে হয়েছে শ্বশুরবাড়ী থাকবো।' ওই মেয়ের জন্যেই সবদিক দিয়ে মুখ যা হেঁট হবার তা' হল। চল দিদি চল।'

সুচিন্তা বলেন, 'কুটুমকে আদর আপ্যায়ন করি, এ ভাগ্য হ'ল না। উঠে যেতে চাইলে একথা বলতে সাহস হবে না, 'বসুন, একটু চা খান।' মুখ হেঁট যা হবার ছেলেমেয়ের দ্বারাই হয় একথা সত্যি। নইলে আপনাদের—কিন্তু যাক সে কথা। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, বানানো কথা নয়, সত্যি কথাই, আমার ইন্দ্রর বৌ যে শ্বশুরবাড়ী থাকতে চায় এ শুনে প্রাণ থেকেই আনন্দ হচ্ছে। তার জন্যে তার ঘর সব সময় খোলা থাকবে।'

মাসী বিষতিক্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'দোরগোড়ায় পাহাড় বসিয়ে রেখে দোর খুলে রাখায় আর লাভ কি বলুন? বাড়ীতে এক পাগল পোষা, এখানে থাকবে কি করে সে?'

'তা' হলে আর কি উপায়?'

মাসী বলেন, 'তা' বুঝেছি। নিরুপায়। কৃষ্ণা যা বলেছে, ঠিকই বলেছে, কিছুই বাড়ায়নি। দেখছি আপনার সমস্ত পৃথিবী একদিকে, আর ওই পাগল একদিকে। আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

সুচিন্তা হেসে বলেন, 'আমিও।'

'কি বললেন?'

'কিছু না!'

'তাহলে বুঝলাম ওটিকে আপনি ত্যাগ করতে পারবেন না? সবাই যায় যাক!' মাসী উঠে দাঁড়ান।

সুচিন্তাও উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ওইটুকুর জন্যে সব যদি সত্যিই যায়, জানবো আমার দুর্ভাগ্য। সেই রাজার গল্পটা জানেন তো? ধর্মের দায়ে অলক্ষ্মী কিনে, বেচারার কী দুর্ভাগ্য। অলক্ষ্মীর দায়ে যশ মান ভাগ্য একে একে সবাই ত্যাগ করতে চায়—'

'বেয়ান দেখছি অনেক জানেন!' মাসী একটু লঙ্কার স্বাদ হাসি হেসে

বলেন, 'তবে সেকালের দৃষ্টান্ত যদি দেখাতে এলেন তো, বলি 'ধর্মের দায়ে' কেনা বলেই, যারা ত্যাগ করেছিল, আবার একে একে সবাই ফিরে এল। এখানে তো সে দায় দেখছি না।'

সুচিন্তা হাসেন, 'সবাই কি সব কিছু দেখতে পায় বেয়ান, হয়তো আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন না আমি তা' পাচ্ছি।'

'বেয়ানের দেখছি দিব্যদৃষ্টি আছে। আচ্ছা নমস্কার। আপনার কাছে এসে অনেক জ্ঞান পেলাম।' বলে বেয়ানদ্বয় সিঁড়ি-মুখো হন। আর সংগে সংগে সামনে বাধা পান। দুটি হৃষ্টপুষ্ট ছোট ছেলে দুমদাম করতে করতে সিঁড়িতে উঠছে। তার পিছনে একটি সুকান্তি ভদ্রলোক।

কে এরা। এদের বাড়ীতে তো শুনি সাতজন্মে কোন আত্মীয়কুটুম আসে না! কৌতূহলের কাছে অহংকার পরাস্ত মানে। মাসী ছোটছেলেটির হাত ধরেন। 'কি খোকা, তোমার নাম কি'

বলা বাহুল্য খোকার পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ প্রীতিপদ হয় না। হ'বার কথাও নয়। সে প্রায় ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গোমড়া মুখে বলে, 'শানু মুখার্জি। বলত না—যদি পিছনে বাবা না থাকতেন।

এই গিন্নীগুলো যেন ওর দু' চক্ষের বিষ। শুধু শুধু কথা কইবার কী দরকার ছিল ওর! চেনে না কিছু না।

কিন্তু ওর মনের মধ্যে থেকে গিন্নী-দের কানে তো কথাটা এসে পৌঁছয় না। তাই মোটা গিন্নীটি সুমোহনকে না দেখার ভানে আবার প্রশ্ন করেন, 'তুমি এদের কে হও?'

'জানি না।'

ইতাবসরে অন্য ছেলেটি পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি উঠে দোতলায় চলে আসে, এবং সুমোহন ছেলেকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—'শানু, ও কি রকম কথা? বল ঠিক করে।'

শানু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি জানি, আমি এদের কে হই?'

'ও হো হো তা'ও তো বটে,' সুমোহন মৃদু হেসে বলে, 'প্রশ্নটা গোল-মেলে লেগেছে। এখানে তুমি কার কাছে এসেছ সেটাই বল।'

'কার কাছে আবার—মেজজেঠাবাবুর কাছে, কে না জানে।'

জ্যাঠাবাবু।

রহস্যের সূত্র বুঝি খুঁজে পান বড়-মাসী, তাই নিজেরা সামান্য একটু এক পাশ হয়ে সুমোহনকে পথ ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গী করে বলেন, 'ও বুঝেছি। সেই যাঁর মাথার অসুখ, তিনি তো?'

'অসুখ।'

শানু মুখার্জি যার ভাল নাম, আর ডাক নাম নাকি 'ষণ্ডা গুণ্ডা ডাকাত' ইত্যাদি, সে হঠাৎ নিজের মাথাটাতেই একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'ধোৎ। মাথায় আবার অসুখ হয় নাকি? অসুখ তো গায়ে হয়।' বলেই সহসা ছিটকে এ'দের কবলমুক্ত হয়ে পালায়।

কিন্তু এ'রা সহজে এহেন রহস্যের মাঝখান থেকে সরে যেতে রাজী হল না। তাই কণ্ঠস্বরে ভব্যতার মৃদুতা এনে বলেন, 'আপনার ছেলে বোধহয়?'

'আর কি—তা'ছাড়া।'

'যাঁর অসুখ, আপনি তাঁর ভাই বুঝি?'

'হ্যাঁ'।

'তা' আপনারা কোথায় থাকেন?'

সুমোহন ভিতরে অবাক হলেও সৌজন্যের সংগে বলে, 'আজ্ঞে শ্যাম-বাজারের দিকে।'

'ও। তা' আপনাদের বাড়ীতে বোধ-হয় জায়গার অনটন?'

'কী বলছেন!'

'না বলছি উনি তো বোধহয় আপনার দাদা। আর আপনারা দেখছি মুখার্জি। আর এ বাড়ীর এরা তো মিত্তির, মানে আমাদের কুটুম্ব কিনা, জানি সব। এ'রা তা'হলে কি? বাড়ীওলা?'

সুমোহন গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর সৌজন্যে বলে, 'আপনারা এ'দের কুটুম্ব বললেন, অথচ এ'দের বিষয় কিছু জানেন না?'

'না, তেমন জানি না। ভেবেছিলাম তিন কুলে কেউ নেই অসহায় পাগল মানুষটাকে দয়াধর্মের খাতিরে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছে। ওমা! কে জানে এমন সব ভাই রয়েছেন। তাই বলি তবে বোধহয় ভাড়াটে।'

'না ইনি, মানে বাড়ীর মালিক ভদ্র-মহিলা একেবারে আমাদের আত্মীয়ের মতই—'

'তা' বুঝেছি।' মাসী কণ্ঠে মধু ঢেলে বলেন, 'নইলে আর পাগল ভাইকে এ'র কাছে ফেলে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্দে আছেন আপনারা। তবে মুস্কিল কি এদের ঘরের বৌ ঘর করতে আসতে পারছে না পাগলের ভয়ে। আমাদেরই মেয়ে, আমরা এ'র ছেলের শাশুড়ী আর মাসশাশুড়ী।' বলে সুমোহনকে 'থ' করে দাঁড় করিয়ে রেখে দুই ভগিনী নীচে নেমে যান।

কিছুক্ষণ ও'দের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সুমোহন উঠে এসেই দেখে ঘরের মধ্যে মহোল্লাসধ্বনি। ছেলেরা কলকাকলী শুরু করে দিয়েছে আর সুশোভন মহা স্ফূর্তিতে হৈ হৈ করছেন 'গুণ্ডা ষণ্ডা ডাকাত বিচ্ছু, বিল্টু বিবু, শানু শান্টু! কী? মনে নেই? সব কিছু মনে নেই? আবার বলে কিনা ওদের নাম মনে আছে?' ওদের নাম মনে থাকবে না? বলে কি!' (ক্রমশঃ)

॥ অম্বিকা চক্রবর্তী ॥

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম দুঃসাহসী নায়ক বীরবিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবনান্ত হ'ল। আঘাত বা বিপর্যয় কিছু নতুন ঘটনা ছিল না তাঁর জীবনে, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই রেখেছিলেন তিনি সারাজীবন। শত্রুর কঠিন আঘাতের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিল তাঁর সর্বদেহে। তাই এই অপঘাত মৃত্যুই বোধহয় তাঁর ক্ষেত্রে জীবনের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। সূর্য সেনের বিশ্বস্ত সহকর্মীর লোমহর্ষক জীবননাটকের শেষ যবনিকাপাত হ'ল সূর্য সেনেরই নামাঙ্কিত পথে। তবুও এ মৃত্যুর দুঃখ অসহনীয় হবে তাঁর অগণ্য অনুরাগীর কাছে যাঁরা সকল অবস্থাতেই শ্রদ্ধা করেছিলেন, প্রাণভরে ভাল বেসেছিলেন এই সর্বত্যাগী মানুষটিকে।

॥ অভিনন্দন ॥

ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস'। টাসের মতে ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে, নির্বাচক-মণ্ডলীর বিরাট অংশ শ্রীনেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের শান্তি মৈত্রী ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির সমর্থক। কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সাফল্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জাতির দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সফল সংগ্রামের ফল। কমিউনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

দেশে বিদেশে
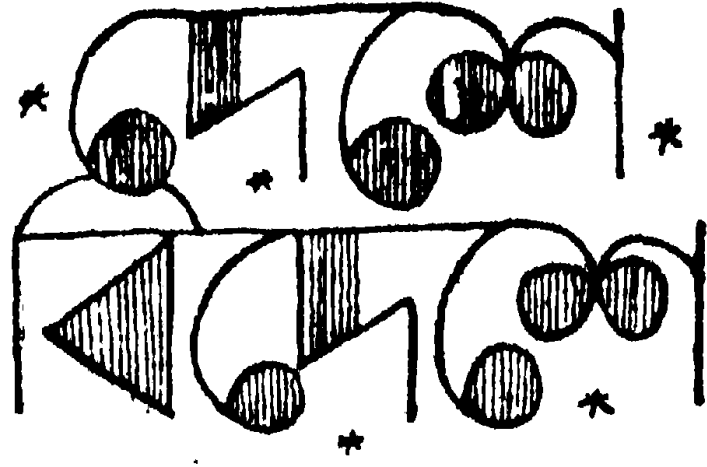
তাঁর এই সাফল্যকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনন্দিত করেছেন রাশিয়ার সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী মঃ জুকভ।

॥ ৩৭০০০ ॥

নির্বাচনে সরকারী ব্যয় পূরণের জন্য কিছু সদাশয় ব্যক্তি বরাবরই পাওয়া যায়। এবার যেন পশ্চিমবঙ্গে তাদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভার নির্বাচনে যে ৯৬০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন তার মধ্যে শতকরা ৩৯ জন প্রার্থী প্রদত্তভোটের এক-ষষ্ঠাংশ সংগ্রহ করতে না পারাতে তাঁদের জামানতের টাকা হারিয়েছেন। জামানতের টাকার পরিমাণ ২৫০ টাকা, সুতরাং ৩৭৪ জন পরাজিত প্রার্থীর সরকারী তহবিলে সর্বসাকুল্য দানের পরিমাণ ৯৪০০০ টাকা।

জামানত-বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা পি-এস-পি দলেই সর্বাধিক, ৪১। জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের ১৯, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ৯, সমাজতন্ত্রী দলের ৭, আর-এস-পি ও লোকসেবক সঙ্ঘের ৩, এস-ইউ-সি দলের ২। কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যেও জামানত জব্দ হয়েছে দুজনের। বাকি ২৪৩ জন নির্দলীয়।

॥ গোয়া, দমন, দিউ ॥

গোয়া দমন দিউর 'ডি ফ্যাক্টো' ভারতভুক্তি এতদিনে 'ডি জুরি' করা হল। গত ৫ই মার্চ এক অর্ডিনান্স জারী করে রাষ্ট্রপতি ঐ তিনটি প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, এবং ভারতের অভ্যন্তরে আপাতত তাদের প্রশাসনিক মর্যাদা হয়েছে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতির সমরূপ। নতুন সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হলে রাষ্ট্রপতির এই অর্ডিনান্স আইনের মর্যাদা পাবে।

॥ পাক সংবিধান ॥

প্রস্তাবিত পাক সংবিধানে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছে পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ। কারণ পাকিস্থানের বর্তমান জঙ্গী শাসকদের মতে দেশের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের যোগ্যতা তাদের নেই। জঙ্গীশাসকরা স্থির করেছেন, পাকিস্থানের উভয় অংশ হতে সমান-ভাগে তাঁরা আশী হাজার "মৌলিক গণতান্ত্রিক" ছেঁকে বার করবেন এবং তাঁদের হাতেই তুলে দেবেন পাকিস্থানের বিভিন্ন আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন-দায়িত্ব। কোন্ গুণের জোরে পাকিস্থানের একজন নাগরিক "মৌলিক গণতান্ত্রিক" হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করবেন এবং কোন পদ্ধতিতেই বা পাকিস্থানের ভাগ্যনিয়ন্তারা দশ কোটি মানুষের মধ্যে থেকে ছেঁকে বার করবেন ঐ আশী হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে তা এখনও জানা যায়নি। তবে এটুকু বোঝা গেছে যে, এই বাছাইর ব্যাপারেও সাধারণ মানুষের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হবে না। পাকিস্থানের সামরিক কর্তৃপক্ষই স্থির করে দেবেন, কোন কোন অনুগত নাগরিকের পিঠে মৌলিক গণতান্ত্রিকের ছাপ মারা হবে। গোড়াতেই পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকদের এই সতর্ক দৃষ্টি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের অপ্রিয়তা সম্বন্ধে তারা কতখানি সচেতন এবং এমন কোন ঝুঁকিই তারা শাসন-সংস্কারের মধ্যে নিতে চান না যার সুযোগে জনসাধারণ তাদের উৎখাত করে দিতে পারে।

স্থির হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পাকিস্থানের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। কেন্দ্রের জন্যে থাকবে একটি জাতীয় সংসদ এবং উভয় অংশের জন্যে পৃথক দুটি বিধানসভা। পাকিস্থানের রাজধানী হবে রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্তী নির্মীয়মান সহর ইসলামাবাদ, কিন্তু তার জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। পাকিস্থানের এই ব্যবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়া হলেও তার পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে কেপটাউনে। তবে পাকিস্থানের এই অনুকৃতি উদ্দেশ্যহীন নয়, পূর্ববঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনতাকে খুশি করার তাগিদ পাক শাসকরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এই একই কারণে বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় চাকুরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদ, এবং রাজ্য দুটিতে গভর্ণর ও প্রেসিডেন্ট-

অনুমোদিত মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। জাতীয় সংসদ বা রাজ্যবিধানসভা দুটির মন্ত্রিসভা গঠনের বা তাদের কাজের কোন সমালোচনা করার অধিকার থাকবে না। আইনবিভাগগুলির একমাত্র কাজ হবে আইনপ্রণয়ন, কিন্তু সে অধিকারেও প্রেসিডেন্ট যে-কোন মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন তার 'ভেটো' শক্তির জোরে। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কোন তালিকা ঘোষণা করা হয়নি, উপরন্তু বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা চলবে না। কারণ রাষ্ট্রপতি আইনের ঊর্ধ্বে। সুতরাং, সংবিধানের নামে ইনিয়ে-বিনিয়ে কতগুলি কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট নামধারী একটি মানুষই পাকিস্থানের ভাগ্যবিধাতা হয়ে রইলেন এবং সে মানুষটিও আপাতত অপরিবর্তিত থাকলেন তিন বছরের জন্যে। কারণ দু'বছর আগে বিপ্লবী পরিষদ নাকি পাঁচ বছরের জন্যে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন জনাব আয়ুব খাঁকে।

॥ বর্মায় জঙ্গী শাসন ॥

বর্মার অন্তর্গত কয়েকটি জাতীয়তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর ফলে গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট এবং তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ গতবারেই কিছুটা জানানো হয়েছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বর্মার সামরিক শাসকরাও নিজেদের অভ্যুত্থানের সমর্থনে সেই কথাই বলেছেন। গত ৭ই মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করে বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম নেতা ব্রিগেডিয়ার আউঙগি বলেছেন, নিছক ক্ষমতার লোভে তাঁরা বর্মার শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বিপর্যয়কর হয়ে উঠতেই তাঁরা নিরুপায় হয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। নইলে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অনাস্থা নেই। বর্মার প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী উনু ও অন্যান্য ৪৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ আনা হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল নে উইন পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী উ নু সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল লোক, বর্মার বর্তমান বিপর্যয়কর সংকটগুলির সমাধানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিভিন্ন রাজ্যের ফেডারেশনের দাবী যদি স্বীকার করা হ'ত তবে বর্মার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

উ নুর অনুগামীরা ছাড়া আর সকল দলই জেনারেল নে উইনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়েছেন, কমিউনিস্ট প্রভাবিত দল ও সংগঠনগুলিও এ-ব্যাপারে কোন দ্বিধা প্রকাশ করেননি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, রাত্রির অন্ধকারে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা দখল না করে জেনারেল নে উইন যদি দিনের বেলায় উ নু সরকারকে নোটিশ দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইতেন তবে তাতেও কোন অসুবিধা হ'ত না। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বর্মার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপজাতির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে নিরুপায় হয়ে উ নু নিজেই একবার জেনারেল নে উইনের হাতে বর্মার শাসনদায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। বছর দেড়েকের চেষ্টায় মোটামুটিভাবে বর্মাকে শান্ত করে এবং গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নে উইনও সেদিন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এবারের প্রত্যাবর্তন বোধহয় স্বল্পস্থায়ী হবে না, যদিও তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনে তাঁরা আস্থা হারাননি।

॥ নেপালে স্বৈরশাসন ॥

নেপালের স্বৈরশাসনের রূপ ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গত ৫ই মার্চ এক ঘোষণা জারী করে নেপাল সরকার আত্মগোপনকারী ৭৫ জন দেশনেতাকে একুশদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকীও ঐ ঘোষণায় ছিল। কিন্তু স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত কোন দেশপ্রেমিকই সে হুমকিতে ভীত না হওয়ায় সরকার ইতিমধ্যেই তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আরম্ভ করেছেন। ভারতে অবস্থানকারী পদচ্যুত কৈরালা মন্ত্রিসভার উপ-প্রধানমন্ত্রী সুবর্ণ সমশেরের যাবতীয় সম্পত্তি সরকার দখল করে নিয়েছেন, কিন্তু সুবর্ণ তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়নি। তিনি বলেছেন, সব কিছু বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তিনি নেপালের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। তবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে তিনি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেন না, কারণ তিনি জানেন সকলের সব হৃত সম্পদই আবার তাঁরা ফিরে পাবেন। এবং সে ফিরে পাওয়ার দিনও খুব দূরে নয়।

॥ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশন গঠনের পূর্ব প্রয়াস ব্যর্থ হলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামে একটি ক্ষুদ্রতর দ্বীপরাজ্য গঠনের উদ্যম এখনও অব্যাহত রয়েছে। জামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো পূর্ব প্রস্তাবিত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হতে না চাওয়াতে তাদের বাদ দিয়েই নূতন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাজ্য গঠন করা হচ্ছে। সম্প্রতি বারবাডোজ, সেন্ট কিটস-নেভিস, এন্টিগুয়া, মন্টসেরাট, ডোমিনিকা, সেন্ট-লুসিয়া, সেন্টভিনসেন্ট ও গ্রেনাডা—পূর্ব ক্যারিবিয়ান সাগরের ছোট-বড় এই আটটি দ্বীপের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়ে গেছে, এবং তাঁরা স্থির করেছেন নবগঠিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কমনওয়েলথের অভ্যন্তরেই একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে অবস্থান করবে।

বারবাডোজে থাকবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রধান শাসক গভর্ণর-জেনারেলের বাসস্থান এবং প্রত্যেকটি দ্বীপে থাকবেন তাঁর অধীনস্থ একজন কমিশনার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিজস্ব সুপ্রীম কোর্ট থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং তার কেন্দ্রীয় সংসদ হবে হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভ ও সেনেট নামধারী দুই কক্ষবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দ্বীপের জন্য মৌলিক প্রতিনিধি থাকবেন একজন, তারপর প্রতি পঞ্চাশ হাজার লোকপিছু তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা একজন করে বাড়বে।

॥ ভেজাল ॥

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ গত ৫ই মার্চ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে রিপোর্ট পাঠকালে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর রাশিয়ায় খাঁটি রুটির বদলে ভেজাল রুটি সরবরাহ করা হ'ত, আর ১৯৫২ সালে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে মালেনকোভ গম সমস্যার সমাধানের যে দাবী করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার সমতালে অগ্রসর হয়নি বলে রাশিয়ায় এখন রীতিমত খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। একারণে মঃ ক্রুশ্চেভ দলের কাছে ভুয়া পরিসংখ্যানের সাহায্যে খাদ্যসমস্যা সমাধানের মিথ্যা প্রচারনা না করে কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন দুই তিনগুণ বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘটনা-প্রবাহ
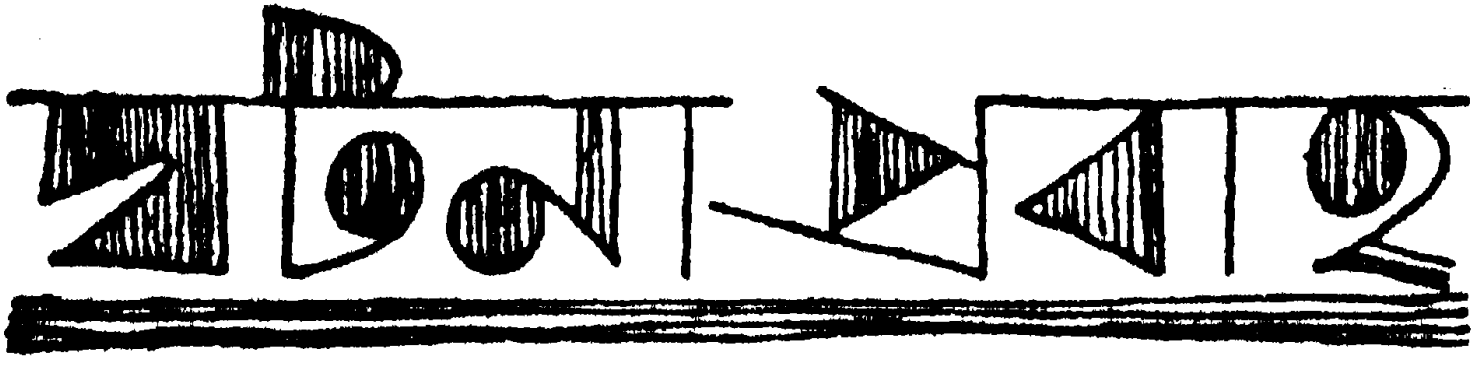
॥ ঘরে ॥

১লা মার্চ—১৭ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষিত—বিধানসভায় (২৫২ আসনযুক্ত) কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি : কংগ্রেস—১৫৭, কম্যুনিষ্ট—৫০, অন্যান্যরা—৪৫।

লোকসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও পুনরায় দেশশাসনের অধিকার লাভ—রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত সকল রাজ্যেই বিধানসভায় কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

উত্তর বোম্বাই লোকসভা আসনে রেকর্ড ভোট পাইয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন নির্বাচিত—মর্যাদার লড়াই-এ নির্দলীয় প্রার্থী আচার্য জে, বি, কৃপালনীর পরাজয় বরণ।

২রা মার্চ—১৮ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গ হইতে লোকসভায় ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ২২টি আসন অধিকার—মর্যাদার লড়াই-এ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের জয়লাভ—বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস মহলে মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড়—ত্রিপুরা রাজ্য হইতে লোকসভার দুইটি আসনই কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক অধিকার।

৩রা মার্চ—১৯শে ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিজয়োৎসব—ময়দানে (কলিকাতা) বিরাট জনসভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কর্তৃক দেশবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন—বামপন্থী জোটের বিকল্প সরকার গঠনের ধ্বনির সমালোচনা।

৪ঠা মার্চ—২০শে ফাল্গুন : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মায়ের নামে দীঘায় 'অঘোরকামিনী' স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ—শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

বিক্ষোভকারীদের প্রস্তরের আঘাতে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীথানু পিল্লাই আহত—ত্রিচুড়ে সরকারী অতিথি ভবনের সম্মুখে ঘটনা।

৫ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : কেন্দ্রীয় শাসনাধীন গোয়া, দমন ও দিউ'র প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরণের পদত্যাগ ও পুনর্নির্বাচন দাবী—বিভিন্ন বিরোধী দলের বৈঠকে ১৮ই মার্চ 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত।

৬ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন : ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা বীর বিপ্লবী শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তীর (৭২) জীবনাবসান।

'শিল্পে সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক' প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীর উক্তি—শিল্প জাতীয়করণের উপর গুরুত্ব আরোপ।

৭ই মার্চ— ২৩শে ফাল্গুন : শ্রীবিনোদানন্দ ঝা সর্বসম্মতিক্রমে বিহার কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত—শ্রীঅতুল্য ঘোষের (কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড মনোনীত প্রতিনিধি) সংকট সমাধান চেষ্টা সফল—উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামের কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হিসাবে যথাক্রমে শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত, সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণ ও শ্রী বি, পি, চালিহা নির্বাচিত।

॥ বাইরে ॥

১লা মার্চ—১৭ই ফাল্গুন : প্রেসিডেন্ট আয়ুব কর্তৃক পাকিস্তানের নূতন সংবিধান ঘোষণা—পাকিস্তানে এক কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেণ্ট ও প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীন সরকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা।

২রা মার্চ—১৮ই ফাল্গুন : ব্রহ্মে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক শাসনক্ষমতা দখল—প্রধানমন্ত্রী উ নু সমেত নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত।

বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষার জন্য আমেরিকার প্রস্তুতি—রাশিয়া চুক্তিতে না আসিলে এপ্রিল মাসেই (১৯৬২) পরীক্ষা শুরু—টেলিভিশন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।

৩রা মার্চ—১৯শে ফাল্গুন : দক্ষিণ নেপালের বীরগঞ্জে সান্ধ্য আইন জারী—বিদ্রোহীদের আক্রমণের জের—কাঠমাণ্ডুর আকাশে অজ্ঞাত পরিচয় বিমানের আনাগোনা।

রুশ নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য ক্রুশ্চেভ (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক বেতারে শ্রীনেহরুকে (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪ঠা মার্চ—২০শে ফাল্গুন : বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ব্রহ্মের পার্লামেণ্ট বাতিল—রাজনৈতিক নেতাদের সহিত পরিষদ চেয়ারম্যান নে উইনের দীর্ঘ বৈঠক।

নেপালে ৭৬ জন নেতার বাড়ী অবরোধ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—নির্দেশদান সত্ত্বেও ভারত হইতে নেপালে প্রত্যাবর্তন না করার জের।

৫ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে জেনেভা সম্মেলন আরম্ভে রাশিয়ার সম্মতি—বৃটেন ও আমেরিকার নিকট শীর্ষ সম্মেলনের দাবী ত্যাগ করিয়া ক্রুশ্চেভের পত্র প্রেরণ।

ক্যামেরুণে শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় বৈমানিকসহ ১১৯ জন আরোহী নিহত।

আলজিরিয়ার সর্বত্র ইউরোপীয় সন্ত্রাসবাদীদের অবাধ দৌরাত্ম্য—বহু লোক হতাহত।

৬ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন : নূতন ধরণের অস্ত্রাদি উন্নয়নে রাশিয়া আবার পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইবে—প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী—আমেরিকার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরারম্ভের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া।

৭ই মার্চ—২৩শে ফাল্গুন : 'ব্রহ্মে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের জন্যই ক্ষমতা দখল করা হইয়াছে' —বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ হইতে ঘোষণা।

ফ্রান্স-আলজিরীয় শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে আরম্ভ।

মধ্য ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট গেরিলা বাহিনী কর্তৃক একটি জেলা দখল।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ তিব্বতী সাধু ॥

যখন মনে হয় একেবারে জনতার ভিড়ে এসে পড়েছি তখন কিছুসংখ্যক মানুষ আপন মনের মাধুরী রচনা করে তার ভেতরই আত্মগোপন করেন। তখন বহির্জগতের কোনো ধ্বনি, কোনো ঘটনা বা উত্তেজনিত সংঘাত বা কোনো রকম বাহ্যিক মনোভঙ্গীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যেটুকুর সঙ্গে তার সংযোগ বা যার সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে থাকে সে তার নিজের মন, নিজস্ব ভাব ও ভাবনা। কবিদের পক্ষেই এই মানসিক পরিস্থিতি ঘটা সম্ভব। ইদানীন্তনের চাপ তাঁদের সহ্য হয় না, চিরন্তনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাঁরা আপনার মাঝে আপনহারা হয়ে থাকেন, কিংবা নিজের হাতেগড়া অতীতের স্বর্গধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

যারা বলে জীবনের সূচনা আগামীকালে, তাদের মুখের পানে তাঁরা করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। আর এমন সুরে কথা বলেন যেন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তারই আগের দিনটিতে।

কবি হিসাবে উইলিয়াম বাটলার ইএটস্ এই অতীতের আলিঙ্গন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেননি। যে-অতীত তিনি দেখেছেন, যার মধ্যে বাস করেছেন, আর যে-অতীতের পরিচিত মূল্যবোধ তাঁর কাছে প্রিয়, তিনি তার ভেতরই ডুবে ছিলেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ সঞ্চয়ন Essays and Introductions নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে সমালোচক হিসাবেও ইএটস্ মানসিকতার ক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হতে পারেননি। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে থেমে গেছেন।

ইএটসের এই প্রবন্ধাবলী তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনার ফসল। একদা উৎসাহী তরুণ লেখক হিসাবে যিনি উইলিয়ম ব্লেক কেন বিমূর্তনকে (abstract) ঘৃণা করতেন সেই কথা উঁচুগলায় বলেছেন, পরিণত বয়সে তিনিই আবার বয়সসুলভ তিক্ততা মিশিয়ে অতি আতিশয্যময় উক্তি এবং শব্দের দ্বারা বিমূর্তন বিষয়ে আপন প্রীতি ও অনুরক্তির কথা প্রচার করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই বক্তব্যের বাঁকা দিকটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ব্লেকের দান্তে সম্পর্কিত বিষয়ে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধের পরিশিষ্টাংশে ইএটস্ বলেছেন :—
"Now in reading it I am ashamed when I come upon such words as 'Corporeal reason' 'Corporeal law' and think how I must have wasted the keenness of my youthful senses." —এ এক ব্যর্থ অনুতাপ। ব্যর্থতারও। কোন্ কবি অপচয় বা Waste এড়িয়ে যেতে পেরেছেন? মানুষের প্রাণশক্তি চেতনাকে কখনও নিঃসঙ্গ থাকতে দেয় না।

এই প্রবন্ধগুলিতে যে একটিমাত্র সংযোগসূত্র ঐক্যবন্ধ করতে সাহায্য করেছে তা এই অপচয়ের চেতনা। ধাবমান চেতনা আর প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষার মাঝে যে ছায়া, যে-ছায়া দেহগত প্রেম এবং অধ্যাত্ম প্রেমের মাঝে, সুন্দরের জগৎ আর সত্যের জগতের মাঝে, বিশেষ এবং অশেষের মধ্যে, সেই ছায়াই এই ঐক্যসূত্র। তরুণ বয়সেও তিনি এ-বিষয়ে সচেতন, চিত্রে প্রতীকবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :
"the mind's eye soon comes to see a capricious and variable world, which the will cannot shape or change, though it can call it up and banish it again." —পৃথিবীকে তিনি কিছুতেই যা তাঁর মতে সার্থক সেই বিগ্রহে রূপায়িত করতে পারেননি। অথচ মন থেকে যা তাঁর মতে অসার্থক তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যা সার্থক বলে মনে হয়েছে তার প্রতীক দিয়ে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় এবং অলীক চিন্তা। ইএটস্-এর মতে—
"is thought about perfection and the way to perfection; and symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection."

বাইরের তমসাচ্ছন্ন জগৎ কিন্তু এই স্বপ্নলোকের ওপর ছায়াপাত করে। কবি স্বপন-পসারি, মৃতের আত্মার সঙ্গেও তাঁর আলাপচারি চলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই জাতীয় এক অলৌকিক অনুষ্ঠান করা চলে না। যে জগৎ মূল্যবোধ দিয়ে গড়া তাকে হিসেব-নিকেশ করতে হয় তথ্য দিয়ে গঠিত জগতের সঙ্গে। যে-নারী তাঁর কাছে সার্থকতার প্রতীক সে বিবাহ করে বসে এক সাধারণ সৈনিককে। আয়ার্লণ্ড এখন স্বাধীন দেশ কিন্তু তাঁর স্বপ্নদিয়েগড়া দেশের সঙ্গে তার মিল অতি অল্প। তাঁর আশা যে বর্তমানকে সোনার অতীতের কোনো মূর্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে। এই স্বপ্ন তাঁকে কর্মের জগতে টেনে আনে। রাজনীতিতে একটা নতুন ধরনের খাদ মিশিয়ে তা গাঁজিয়ে তুলবেন। নতুন রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য তিনি সচেষ্ট। শেলীর মত তিনিও শুনতে পান—
"If ye know these things happy are ye if ye do them." কিন্তু কর্ম তাঁকে কোনো পথনির্দেশ করতে পারে না, ফলে আবার ফিরতে হয় স্বপ্নের জগতে। স্বপ্ন এবং বাস্তব ও বাস্তব এবং স্বপ্নের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে ইএটস্ একটা শান্তির নীড় খুঁজে পান না। একমাত্র অভবা আত্মা ছাড়া কেই বা তা পায়?

স্বপ্ন এবং কর্ম দুই-ই আকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। কবির মন জনতার প্রতি; সংবাদপত্রের প্রতি, যার প্রাণে গান নেই সেই বর্বরের প্রতি, শিল্পগত সমাজের ফলে যে বিভীষিকার উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি ঘৃণা এবং তিক্ততায় ভরপুর। ১৯০৭-এ কবি বলছেন—
"I dreamed of enlarging Irish hate, till we had come to hate with a passion of patriotism what Morris and Ruskin hated." এ তিনি লিখেছেন কবিতা এবং ঐতিহ্য সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে। যন্ত্রযুগের প্রতি এই ঘৃণা জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ১৯৩৭-এ তাঁর গ্রন্থাবলীর ওপর যে-ভূমিকা লিখেছিলেন ইএটস্ তাতেও এই ঘৃণার চিহ্ন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :
"When I stand upon o'connel Bridge in the half-light and notice that discordant architecture, all those electric signs, where modern heterogeneity has taken physical form, a vague hatred comes up out of my own dark and I am certain that wherever in Europe there are minds strong enough to lead others the same vague hatred arises." ইএটসের সঙ্গে তর্কের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ যুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি লিখছেন না। এ তিনি শিরায়, শোণিতে উপলব্ধি করেছেন, সেই তাঁর শেষ কথা। তিনিই ত' একদা লিখেছিলেন :—

"Guard me from those thoughts men think
In the mind alone
He that sings a lasting song
Thinks in the marrow-bone?"

অনেকগুলি প্রবন্ধে এই একই কথা তাঁর বক্তব্য, কিন্তু অস্থি-মজ্জায় (marrow-bone) যখন তিনি চিন্তা করেন তখন ইএটসের কবি-সত্তা এতই প্রবল যে পৃথিবীকে ঘৃণা করা যায় না। তিনি জানেন যে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে মানুষ অলঙ্কারের সাহায্য নেয় আর কলহ যখন অন্তরের সঙ্গে তখন প্রয়োজন কবিতার। ইএটসের এই দ্বন্দ্বের অনেকখানি তাঁর নিজেরই সঙ্গে আবার তেমনই দ্বন্দ্ব বহির্জগতের সঙ্গে। তাই যে ভূমিকাটিতে তিনি তাঁর মনের গহন থেকে ঘৃণার উৎপত্তির কথা লিখছেন, তার মধ্যেই বলছেন :
"I am like the Tibetan Monk who dreams at his initiation that he himself is eater and eaten. This is Irish hatred and solitude, the hatred of human life that

made Swift write **Gulliver** and the epitaph upon his tomb ('fierce indignation will no more lacerate his heart') that can still wag us between extremes and doubt our sanity."

ইএটস্ আপন মনকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন—'আমি শুধু আমারই রূপান্তর ঘটাতে চাই, পৃথিবীর রূপান্তর আমার কাম্য নয়।' এই কারণেই তিনি সিনজের অনুরক্ত, পথের বৃদ্ধ ভিখারী দুর্দশা আর জীবনের কুশ্রীতা নিয়ে অনুশোচনা করছে, কিংবা বৃদ্ধা আরান রমণী তার নিমজ্জিত পুত্র-সন্তানটির জন্য বিলাপ করছে, বা যে তরুণী বধূটি বৃদ্ধ স্বামীকে বিবাহ করে বসেছে তাদের কথাই সিনজ লিখেছেন। কোনো কিছুর রূপান্তর ঘটানোর বাসনা তাঁর নেই, কারো সংস্কার নয়, খোলা জানালার সুমুখ দিয়ে চলেছে জীবনের অন্তহীন মিছিল, উত্তাপ আর উত্তেজনায় সরব তাদের কণ্ঠ।

যে-পৃথিবীর মানুষ বাণীহীন হয়েছে, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, সেই পৃথিবীকে উদ্ধার করতে ইএটস্ কৃতসংকল্প। নতুন নাটক এবং নতুন কাব্যের মাধ্যমেঃ "I want to write in whatever language comes most naturally when we soliloquize, as I do all day long, upon the events of our own lives or of any life where we can see ourselves for the moment." এর পরই ইএটস্ বলেছেন, সারা জীবন ধরে আমি চোখে ধরা পদ-প্রকরণ বর্জন করার প্রয়াস করে যা শুধু কানে লাগে এমন শব্দ-বিন্যাসের চেষ্টা করেছি। শুধু বাক্যের দ্বারা পৃথিবীর নাড়ির গতি পরিবর্তন করা যায়। ইএটস্ জানেন যে জীবনের জন্য তাঁর গভীর আবেগ এবং 'সুষুপ্তি' এবং "তুরীয়" অবস্থার জন্য তাঁর জীবন-ব্যাপী আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে আবেগের বহ্নি নির্বাপিত করতে পারেনি। বৃথাই তিনি নৈর্বর্তিক ধেয়ানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কবিকৃতিকে ব্যক্তিগত আবেগ-বহির্ভূত করার তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো কবির কি এত-খানি নৈর্বর্তিক হওয়া সম্ভব। তাঁর এই প্রবন্ধাবলীতে ব্যক্তিগত আবেগ আছে বলেই তার আবেদন আছে। এই লেখক কখনো পৃথিবীর সঙ্গে কলহরত আবার পর মুহূর্তেই তার সংঘর্ষ লাগছে আপন মনের সঙ্গে। ইএটসের কবি-মানসে স্বপ্ন এবং সত্য এমনই অঙ্গাঙ্গী মিশে আছে যে একের থেকে অপরকে বেছে নেওয়া কঠিন :

"And yet, and yet
Is this my dream or truth?"

উইলিয়ম বাটলার ইএটস্ নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। *

---

* **W. B. YEATS:** ESSAYS AND **INTRODUCTIONS** (Macmillan: 36s).

নতুন বই

তিন প্রহর— (উপন্যাস) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ—৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩-২৫ ন. প।

খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুনাতম উপন্যাস হল 'তিন প্রহর'। নির্মল চৌধুরী নামে এক অকৃতদার, অকৃতার্থ জমিদার-পুত্র তার প্রৌঢ় বয়সের রোগজর্জর রাত্রিতে পিতৃ-পিতামহের শূন্য প্রাসাদে বসে গত জীবনের কাহিনী চিন্তা করছেন—এই হল উপন্যাসটির রচনারীতির ছক। একটি রাত্রির তিনটি প্রহরে উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনী বিস্তার করার অসুবিধা আছে যথেষ্ট। প্রথমতঃ এতে বারে বারে ফ্লাশ-ব্যাক করার ফলে রসাভাস ঘটে; দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র এক-জনের জবানীতে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় বলে তারা জীবন্ত হয়ে উঠতে চায় না; এবং তৃতীয়ত, নায়কের চরিত্র-বিষয়ে অন্যান্য চরিত্রের মানস-প্রতিক্রিয়া সুপরিস্ফুট না হওয়ায় সেই মূল চরিত্রটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বলতে বাধা নেই, নারায়ণবাবু এই প্রতি-বন্ধকগুলি অনায়াসেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। বর্তমান ও অতীত, এবং চিন্তাভাবনা ও ঘটনা-সংঘটনের মধ্যে এমন একটা মাত্রা বজায় রেখেছেন তিনি যাতে বহুস্বর বাদ্যযন্ত্রের মতো একটা স্বরসমন্বয় বেজে উঠেছে উপন্যাসখানির মধ্যে।

'তিন প্রহরে'র চরিত্রগুলি লেখকের অসামান্য সৃষ্টি। কিশোর বয়সে থিয়েটারের মোহে পড়ে কাহিনীর নায়ক নির্মল কী করে ঘটনার অনিবার্য পরি-ণতিতে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, তার রূপায়ণ যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। আর কলকাতার স্টেজের নায়িকা ঊষারাণী এবং কাশীর বাইজি সরস্বতী তাদের বিশিষ্ট ধরনের একনিষ্ঠতায় তো স্থায়ী আসন পেয়ে যায় পাঠক-চিত্তে। ছোট্ট একটি পার্শ্ব-চরিত্র হলেও স্টেজের একস্ট্রা চন্দন নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত, এবং জবরদস্ত গুণ্ডা জগৎ পালও লেখকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়।

নারায়ণবাবুর ভাষা অত্যন্তই হৃদয়-গ্রাহী। অল্প কথায় এমন নিপুণ বর্ণনা দিতে পারেন তিনি যে তা গীতিকবিতার মতো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। বইখানির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন সুরুচিসম্পন্ন।

মঞ্চকন্যা—(উপন্যাস) ধনঞ্জয় বৈরাগী। গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—সাত টাকা।

বর্তমানে পুরনো মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে নব-নাট্যান্দোলনকারীদের একটি প্রতি-যোগিতা চলেছে। সে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই 'মঞ্চকন্যা'র কাহিনী-বিন্যাস। নাট্যকার সুরজিৎ শুধু নাটককে ভাল-বাসে না। নাট্যালয়ও তার প্রাণের বস্তু। দুটি জিনিসেরই উন্নতি সাধন করা তার লক্ষ্য। পুরনো রঙ্গালয়ের কর্তাব্যক্তিরা আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের ইচ্ছামত অভিনয় করায় বা করে। সেখানেই সংঘাত বাধে সুরজিতের সঙ্গে। ওদিকে নবনাট্যান্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় নানা কারণে। সুরজিৎ, অলক, সুবোধ হাজরা, কুন্তল এদের মত মানুষ প্রতি যুগেই জন্ম নেয় নতুনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর অহংকারহীনা অভিনেত্রী সুচরিতার মত অভিনেতা-অভিনেত্রী তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পুরনো মঞ্চের আভ্য-ন্তরীণ যে রূপটা ধনঞ্জয় বৈরাগী তুলে ধরেছেন তা বিস্ময়কর লাগবে অনেকেরই কাছে। পুরনো পচ-ধরা রাজত্বটাকে কিভাবে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে নানা উপায়ে, তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যে সব নরনারী সার্থক শিল্পী হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঞ্চে যায়, তাদের শেষ পরিণতি কি? সার্থক আর অসার্থক উভয় ধরনের শিল্পীদের বিয়ো-গান্তক পরিণতি লেখকের সহানুভূতি-শীল লেখনীস্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে।

নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বৈরাগী যে উপন্যাস রচনায়ও সিদ্ধহস্ত, তার পরিচয় বহুদিন পূর্বেই আমরা পেয়েছি। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবধর্মী ঘটনার ওপর কাহিনী-বিন্যাস ও সার্থক নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি। এই বৃহদায়তনের উপন্যাসটিতে অধিক চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীকে অতিরিক্ত মাত্রায় জটিল করে তোলেননি। চরিত্রগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অল্প চরিত্রের মাধ্যমে বিরাট যুগ-

জিজ্ঞাসার যে সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেছেন তা তাঁর সার্থক শিল্পীক্ষমতার পরিচায়ক। গ্রন্থের প্রচ্ছদটি মনোরম।

পিপাসা— (উপন্যাস) চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক—শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা —৫। দাম সাড়ে তিন টাকা।

সমাজকে অস্বীকার করে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারণ মানুষের প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি। আর যারা সমাজকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকতে চেয়েছে অবৈধ উপায়ে, তাদের পরিণতি ভয়াবহ। 'পিপাসা' গ্রন্থের নায়িকা বেলা। নায়ক একজন নয়, অনেক। অথবা নায়ক নেই। বেলা গ্রাম থেকে অপহৃত হয়ে এল পশ্চিমের শহরে। শ্রীমান সত্য তাকে মহাসংকটের সামনে ফেলে পালিয়ে গেল বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। বেলা বেঁচে থাকতে চাইল। নিজের বড় ভাই তাকে অসৎ পথে যেতে প্ররোচিত করেছে। সে ঐ জীবনকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হওয়ার সংগে সংগে সমাজের যাবতীয় বন্ধন অস্বীকার করে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। প্রভাতকে বিয়ে করে সুখী হতে পারল না। বেলার মৃত্যু-কামনা প্রভাতের আত্মহত্যার পথকে ত্বরান্বিত করল। সুগত বিয়ে করল বেলাকে রোগের জন্য—ভালবাসার জন্য নয়। তাই বেলাকে আত্মহত্যা করতে হল। বেলার ছোটবেলার বন্ধু দেবনাথ অধিকাংশ ঘটনার পাশে তার দুর্ভেদ্য রক্ষণশীল মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।—তার উদারতা হয়ত বেলাকে শুধু নয়, সমাজের অসুখী নারীদের আত্ম-উদ্ধারের পথকে মুক্ত করে দিয়ে সমাজ-জীবনকে আরও নির্মল করে তুলতে পারে।

শ্রীযুক্ত ঘোষের এ কাহিনী নতুন না হলেও সৎ শিল্পী-স্বভাবের গুণে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রের উত্থান-পতন, নাটকীয়তা কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু লেখকের দিক থেকে বলা যায়, জীবনকে উপলব্ধি করার জন্যেই এই জটিলতা। এবং কিছু অংশে তা সার্থকও হয়েছে। দেবনাথ ও সুগতের চরিত্র অবশ্য আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কোথাও কোথাও অতি দীর্ঘ সংলাপ কাহিনীর মধ্যে একঘেয়েমি এনেছে। কিন্তু লেখকের মন যে জীবন-মুখী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা— (বিচিত্র প্রবন্ধ) ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত। প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। কলিকাতা —১৩। দাম পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে,—তার মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন : "মানসীতে প্রকাশের পূর্বে 'অভয়ের কথা' এক এক টুকরা আমার পার্সীবাগানের বাসায় পড়া হইত। সন্ধ্যার পর এজন্য ছোট মজলিস বসিত। কি যে আনন্দের তুফান উঠিত, যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন সাক্ষ্য দিবেন। যে-বহ্নি এতকাল ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আমাদের চোখ ঝলসিয়া গেল।" এই হল অভয়ের কথার পূর্ব পরিচয়। রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বেদান্ত হজম করেছিলেন 'অভয়ের কথা' তার পরিচয়। এমনই এই গ্রন্থ যে মোহিতলাল মজুমদারের মত সমালোচক ভূমিকাসূত্রে বলেছেন—'এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলাইবে না, তবে যে সাহস করিয়াছি, তাহার কারণ, ইহার বিষয় অতি উচ্চ তত্ত্বকথা হইলেও, ব্যাখ্যান ও রচনাভঙ্গীতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবীতে পৌঁছিয়াছে।' ১৩২১ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তার আগে 'মানসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পণ্ডিতজনের প্রশংসা লাভ করে। তত্ত্বকথা অপেক্ষা জীবন ও জগতের রহস্য এই গ্রন্থে বিধৃত। জ্ঞান ও প্রেম এই গ্রন্থে আছে আর আছে নিখিল মানব-প্রাণের চিরন্তন আকৃতি—এই গ্রন্থকে গভীর ছন্দে রূপায়িত করেছে। এই অপরূপ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ১৩২১-এ বঙ্গ-সাহিত্যে কি বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে 'অভয়ের কথা' তার দৃষ্টান্ত। এমন একখানি ধ্রুপদী সাহিত্য প্রকাশ করে প্রকাশক সৎসাহসের পরিচয় দান করেছেন সন্দেহ নেই।

উত্তর তরঙ্গের নায়ক— (কবিতা) দিলীপকুমার সেন। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি, রাণীশঙ্করী লেন, কলিকাতা—২৬। দাম দু' টাকা।

সাম্প্রতিককালে অনেকগুলি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রকাশিত চিন্তা-চেতনার বৈচিত্র্য বাঙলা কাব্য-

সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেকখানি সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'উত্তর তরঙ্গের নায়ক' সেক্ষেত্রে অনুল্লেখযোগ্য নয়। তরুণ কবিদের মধ্যে যে কয়েকজন কিছুটা স্বাতন্ত্র-চিহ্নিত, শ্রীসেন তাঁদেরই একজন। প্রকরণ-নৈপুণ্যে, চিত্রকল্পে এবং প্রতীকের ব্যবহারে সৎ কবিচিত্তের পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি নবতর ব্যাখ্যায় সজীবতা লাভ করেছে এবং এই গ্রন্থ পাঠ করবার সময় যে পরিমণ্ডলে পাঠক উপস্থিত হয় তা ক্ষমতাশালী কবির দ্বারাই সৃষ্টি করা সম্ভব। কাব্য-গ্রন্থটির সংলগ্ন 'শ্বেত আকন্দ' একটি কাব্যনাট্য, যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমকালীন জীবনের নিরাশা নিরানন্দময় অস্তিত্বের মূলে যে অবিশ্বাস ও সংশয়, যা প্রতি মুহূর্তে নরকে নির্বাসিত করে তা কবিমনের গভীরে আন্তরিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কাব্যনাট্যে তারই জিজ্ঞাসার ও উত্তরের ইঙ্গিত বর্তমান। সার্থক প্রতীকধর্মী কাব্যনাট্য রচনার প্রয়াস হিসাবে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আয়তন ছোট হলেও কিছু অংশ অভিনয়যোগ্য। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

পথ অন্তহীন— (উপন্যাস) অমিয়া চক্রবর্তী। প্রকাশক : সান্যাল এণ্ড কোং। ৮৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। দাম—২-৫০ নয়া পয়সা।

গতানুগতিক ভঙ্গীতে রচিত উপন্যাস। শৈশবে যে রনজু একদিন চুল ধরে টেনে রসিকতার চেষ্টা করেছিল নায়িকা লীলা অবশেষে একদিন রনজুদার সঙ্গেই অনির্দিষ্ট দুর্গম পথে যাত্রা করে। তবে রচনার মধ্যে যথেষ্ট সংযম এবং কৃতিত্বের পরিচয় আছে। গল্পটি সুখপাঠ্য। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান (অভিধান) যতীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক : ক্যালকাটা টেক্সট বুক সোসাইটি, ১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দশ টাকা।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অভিধান প্রকাশিত হচ্ছে—এ এক সুলক্ষণ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির বা বৈদেশিক ভাষার ভাবগত অর্থ প্রকাশ করতে হবে, তাই পরিভাষা রচনা করা একটি দুরূহ কর্ম এবং তার অসীম গুরুত্ব। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সূত্রে পরিভাষা কমিটি গড়ে উঠেছে এবং তাঁরা কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ রচনা করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অবশ্য হাস্যকর হয়েছে যেমন 'কেরাণী'কে করণিক করা হয়েছে। এমন ধরনের শব্দরচনা করা কর্তব্য যা সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। পরিভাষা প্রণয়ন প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজন সমতারক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় একরকম পরিভাষা প্রণয়ন করবেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আর একপ্রকার এবং রাইটার্স বিল্ডিং অন্যপ্রকার। এই অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। উদ্দেশ্য যেখানে এক সেখানে সহজেই একটা সমসূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ দত্ত দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে 'অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান' প্রণয়ন করেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটিতে পারিভাষিক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করায় মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান প্রথম প্রচেষ্টা। জ্ঞানান্বেষীর কাছে এই গ্রন্থটি যে এক মূল্যবান সম্পদ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

দর্শক—নব বাংলা নাট্য পরিষদ পরিচালিত—সম্পাদক : রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বিশেষ সংখ্যা : ২৫ নঃ পঃ।

'দর্শকে'র আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অল্পকয়েক দিনের মধ্যে গভীর মননধর্মী বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত হয়ে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিল্প বা সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। 'দর্শক' সে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

এই সংখ্যায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সম্পর্কিত সচিত্র আলোচনা খুবই মূল্যবান। অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এর থেকে। 'সৌন্দর্য ও বর্বরতা' নামক আলোচনায় সেকাল ও একালে সৌন্দর্যের ওপর অত্যাচারের তথ্যভিত্তিক আলোচনা শিল্প-রসিক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আরও অনেকগুলি মূল্যবান আলোচনা সংকলিত হওয়ায় এই বিশেষ সংখ্যাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক-কালের কয়েকজন দেশী বিদেশী শিল্পীর শিল্প নিদর্শনও তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক কবিতা—সম্পাদনায় : রেখা দত্ত। আধুনিক কবিতা কার্যালয় : পোল্টাল কলোনী, কলিকাতা-৩২। দাম ৭৫ নঃ পঃ।

সাম্প্রতিককালের কবিদের বিভিন্ন কবিতার সংকলন। প্রফুল্লকুমার দত্তের 'বাংলা কবিতায় আধুনিকতা' শীর্ষক আলোচনা আরও দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল। অতিসংক্ষিপ্ততা দোষে লেখাটি সম্পূর্ণতালাভ করতে পারেনি। সাম্প্রতিক কালের প্রবীন ও নবীন মিলিয়ে বিশজনেরও বেশী কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। আধুনিক চেক সাহিত্যিক ক্যারেল হাইনেক ম্যাখ্যার 'মে' নামক কাব্যগ্রন্থের সুন্দর মর্মানুবাদ করেছেন শিবপ্রসাদ বিশ্বাস। সম্পাদনায় দায়িত্বশীল হলে ভবিষ্যতে পত্রিকাটি আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে কাব্যরসিকদের কাছে।

নবজাতক—সম্পাদক : সুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি; ৪৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—২৫ নঃ পঃ।

জরাসন্ধ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সত্যব্রত মৈত্র, তন্ময় বাগচী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা সংকলন করা হয়েছে ছোটদের উপযোগী করে।

সৈকত—সম্পাদক : অরবিন্দ কর। শিলিগুড়ি হতে প্রকাশিত। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

শিলিগুড়ি হতে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সংবাদ, মহিলামহল প্রভৃতি অনেককিছুই স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি ভাল হয়নি। অন্যান্য রচনা সাধারণস্তরের। অঙ্গসজ্জায় ও সম্পাদনায় সম্পাদককে আরও অবহিত হতে হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

দলিল-চিত্র কথা :

চলচ্চিত্র প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় ঃ

(১) কোনো ঘটনার রেকর্ড বা নথি রাখবার জন্যে;

(২) কোনো ঘটনা বা বিষয়কে সৃষ্টি-ধর্মিতার সাহায্যে নবরূপ দানের জন্যে এবং

(৩) কাহিনী -চিত্র নির্মাণের জন্যে।

দলিলচিত্র কথাটা সাধারণভাবে প্রথম দুটি উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ঘোড়দৌড়, ফুটবল খেলা, টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ, জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা, উইম্বেলডনে টেনিস খেলা, অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বা ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ভারতভ্রমণ কিম্বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সৈন্য-দের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি ঘটনার চাল-চ্চিত্রিক রেকর্ডকে যদিও আমরা সংবাদ-চিত্র নামে অভিহিত করি, তবু-ও ও এক দিক দিয়ে দলিলচিত্রের পর্যায়ভুক্ত। যে ইংরেজী কথার বাংলা হচ্ছে, দলিল-চিত্র, সেই ডকুমেন্টারী কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন জন গ্রীয়ারসন এবং তিনিও এটি পান ফরাসী ভাষা থেকে। ফরাসীরা তাদের দেশে জনপ্রিয় ভ্রমণচিত্র সম্পর্কে 'ডকুমেন্টেয়র' কথাটি ব্যবহার করত। ১৯২০-দশকের শেষভাগে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি নির্মিত ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন এই ডকুমেন্টারী শব্দটি প্রথম চালু করেন।

১৯১৩ সালে প্রস্তুত হার্বার্ট পন্টিং-এর 'উইথ স্কট ইন দি অ্যান্টার্টিক' থেকে সুরু করে ১৯২৫ সালে সোড্‌স্যাক এবং কুপার নির্মিত 'গ্র্যাস' এবং ১৯২৭ সালে ডব্লু রুট্‌ম্যান নির্মিত 'বার্লিন' পর্যন্ত বহু বিষয় ও ঘটনা নিয়ে বহু দলিল-চিত্রই তৈরী হয়েছে; কিন্তু ১৯২২ সালে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির 'নানুক অব দি নর্থ' নামে এস্কিমো-জীবন নিয়ে নির্মিত ছবি যখন সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করল, তখনই একটি দলিল-চিত্র যে কি অপরূপভাবে সৃষ্টিধর্মী হতে পারে, তা লোকে বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। ফ্ল্যাহার্টি মাত্র এস্কিমোদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধকে দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতিকে মানুষের নিজের কাজে লাগাবার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ওপরই সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করছে। এই ছবি দেখে পল রোথা মন্তব্য করেছেন, "ছবিখানি জীবন্ত দৃশ্য তোলার ব্যাপারে একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা করেছে।" জন গ্রীয়ারসন বলেছেন "সাধারণ অনুভূতির স্পন্দনকে এমনই দরদের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে যে, হলিউডের কৃত্রিম দৃশ্যপটের ভিতর থেকে আজ পর্যন্ত এতখানি প্রাণস্পর্শী নাটক সৃষ্ট হয়নি।" "রবার্ট ফ্ল্যাহার্টিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাস্তবের চিত্রায়ণে সৃষ্টিধর্মিতার প্রয়োগ করেন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ককে তিনি প্রকাশ করেছেন সুষমাময় কাব্যের ভঙ্গীতে।

ফ্ল্যাহার্টিকে বাদ দিলে কিন্তু দলিল-চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ইংলণ্ডের দলিল-চিত্র পরি-চালকেরা। এঁদের মধ্যে প্রথমেই আসেন জন গ্রীয়ারসন। হেরিং মাছধরা জেলে-দের জীবনী নিয়ে রচিত "ড্রিফটার্স" ছবি তিনি তৈরী করেন ১৯২৯ সালে। যদিও তিনি এই ছবিতে রুশ চলচ্চিত্ররীতির বহুল প্রয়োগ করেন, অবুও যেভাবে তিনি এই ছবির মাধ্যমে সমাজসেবাপরায়ণ একটি সম্প্রদায়কে সাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। গ্রীয়ারসনের নেতৃত্বে এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড যেসব দলিল-চিত্র নির্মাণ করেছেন তাদের মধ্যে কান্ট্রি

'শান্তি' চিত্রে নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

কাম্‌স্‌ টু টাউন" (বেসিল রাইট ১৯৩১-৩২) "ওর হিল অ্যান্ড ভেল" (বেসিল রাইট ১৯৩২), "উইণ্ডমিল ইন বারবাডোজ" (বেসিল রাইট ১৯৩৩) "কার্গো ফ্রম জামাইকা" (বেসিল রাইট ১৯৩৩) "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বৃটেন" (গ্রীয়ারসন ও ফ্লাহার্টি; ১৯৩৩), "গ্র্যাণ্টন ট্রলার" (এডগার অ্যানষ্টি ১৯৩৪) এবং "এরো এঞ্জিন" (আর্থার এল্টন ১৯৩৪)—এই ছবি ক'খানির নাম উল্লেখযোগ্য।

দলিল-চিত্র নির্মাণে ইংলণ্ডের এই সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানও বিস্তৃত জনসংযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই কাজে ব্রতী হন। বর্মা অয়েল কোম্পানীর শেল ফিল্ম ইউনিট, সিলোন টি প্রোপাগাণ্ডা বোর্ড, দি ট্রাভেল এ্যাসোসিয়েশন, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম এই সম্পর্কে করা যেতে পারে। এই সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগও নিজেদের পক্ষ থেকে ছবি করাতে সুরু করনে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে "কন্টাক্ট" (পল রোথা ১৯৩২), "সং অব সিলোন" (বেসিল রাইট, ১৯৩৫), "হাউসিং প্রবলেম" (আর্থার এলটন ও এডগার অ্যানষ্টি, ১৯৩৫), "ওয়ার্কার্স এণ্ড জবস্‌" (আর্থার এলটন, ১৯৩৫), "এনাফ টু ইট" (এডগার অ্যানষ্টি, ১৯৩৬), "দি স্মোক মেনাস" (জন টেলর, ১৯৩৭), "টো ডে উই লিভ" (রুবি, আই গ্রীয়ারসন, ১৯৩৭), "দি লণ্ডনার্স" (জন টেলর, ১৯৩৮), "ফোর ফেসেস" (আলেকজাণ্ডার শ; ১৯৩৮), "ওয়েল্থ অব এ নেশন" (ডোনাল্ড আলেকজাণ্ডার, ১৯৩৮) প্রভৃতি খ্যাতিমান দলিল-চিত্রের জন্ম হয়।

এই সময়ে গোমে বৃটিশ ইনষ্ট্রাকশানাল কোম্পানী ব্রুশ উলফ্‌, পার্সি-স্মিথ ও মেরী ফিল্ডের নেতৃত্বে যে সব দলিল-চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "দি মাইন" (জে বি হোমস্‌, ১৯৩৫), "চিলড্রেন অব দি ফিউচার" (ডোনাল্ড টেলর, ১৯৩৫), "দি ফেস অব বৃটেন" (পল রোথা ১৯৩৫), "শিপ ইয়ার্ড" (পল রোথা ১৯৩৫), "দি গ্যাপ" (ডোনাল্ড কার্টার ১৯৩৭), "দিস ওয়াজ ইংল্যাণ্ড" (মেরী ফিল্ড ১৯৩৮), এবং "দে মেড দি ল্যাণ্ড" (মেরী ফিল্ড, ১৯৩৮)।

১৯৩৩ সালে এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড ভেঙ্গে যাবার পর জন গ্রীয়ারসন জি পি ও ফিল্ম ইউনিটে যোগ দেন প্রধান প্রযোজকরূপে। এই ইউনিটের আমন্ত্রণে ১৯৩৬ সালে ক্যাভালক্যাণ্টি এর অন্যতম প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই ইউনিট যে-সব উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরী করেছিল, তাদের নাম—"আণ্ডার দি সিটি" (আর্থার এলটনও আলেকজাণ্ডার শ, ১৯৩৪), "ওয়েদার ফোরকাষ্ট" (এভেলিন স্পাইস, ১৯৩৪), "এয়ার মেল" (আর্থার এলটন ও আলেকজাণ্ডার শ, ১৯৩৫), "কোলফেস" (গ্রীয়ারসন ক্যাভালক্যাণ্টি, ও অডেন, ১৯৩৫), "নাইট মেল" (ওয়া, রাইট ও ক্যাভালক্যাণ্টি, ১৯৩৬), "উই লিভ ইন টু ওয়ার্লডস" (ক্যাভালক্যাণ্টি ১৯৩৭) এবং নর্থ সী (হ্যারি ওয়াট, ১৯৩৮)।

এইভাবে যে তিনশো দলিল-চিত্র যুদ্ধপূর্ব যুগে তৈরী হয়েছিল, তার উপকরণও যেমন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়, তেমনই তাদের প্রকাশভঙ্গীও ছিল বিচিত্র। "সং অব সিলোন"-এ ছিল ক্যাবিয়াক সুষমা, "সীপইয়ার্ড"-এ ছিল প্রচণ্ড গতিশীল ইমপ্রেশনিজম, "হাউজিং প্রবলেম"-এ বাস্তব সমাজ-চেতনা এবং "ফেস অব ব্রিটেন"-এ বিশাল পরিধিবিশিষ্ট মূল্যায়ন।

এর পর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন ইংলণ্ড সরকার যুদ্ধ-প্রচার কার্যের জন্যে "তথ্য বিভাগ"-কে ঢেলে সাজলেন এবং জি, পি, ও-ফিল্ম ইউনিটের সহায়তায় তৈরী হ'ল "দি ফার্স্ট ডেজ", "স্কোয়াড্রন ৯২" প্রভৃতি ছবি। বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি প্রদর্শনীর প্রথম পাঁচ মিনিট প্রতি চিত্রগৃহে "প্রচার-চিত্র" দেখানো হ'তে লাগল। এ ছাড়া পঞ্চাশটি প্রদর্শনী-গাড়ী ক'রে শহরে বা গ্রামে বিনামূল্যে জনতাকে প্রচার-চিত্র দেখানো হ'তে লাগল। এর প্রত্যক্ষ ফল হ'ল এই যে, সাধারণ লোক চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত হ'তে লাগল। লোকের জ্ঞানের পিপাসা বেড়ে গেল; মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর কোথায় কি আছে, বিভিন্ন দেশবাসীর জীবনযাত্রা কি প্রণালীতে নির্বাহিত হয়, এই সব জিনিষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যে চলচ্চিত্রের দ্বারস্থ হ'তে লাগল। যুদ্ধ থেমে গেলেও তথ্য ও প্রচার বিভাগের কাজ থামল না। সংবাদ-চিত্র ও দলিল-চিত্র সমাজ-জীবনে তাদের স্থান কায়েমী ক'রে মাত্র টি'কেই রইল না, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে থাকল।

ইংলণ্ডের বাইরে রাশিয়াতে কাহিনী-চিত্রই দলিল-চিত্রের রূপ গ্রহণ করেছিল। পুডভকিনের "মাদার", "স্টর্ম ওভার এশিয়া" বা আইসেনস্টিনের "ব্যাটলসীপ পোটেমকিন" হচ্ছে আসলে শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র, যে-সংগ্রাম ও-দেশের জন-সাধারণের জীবনে প্রত্যক্ষ বস্তু। তাই সমাজ-চেতনাসমন্বিত বাস্তবতা রাশিয়ার কাহিনী-চিত্রেও রূপায়িত হওয়া সহজ হয়েছিল। এবং কাহিনী-চিত্রগুলি দলিল-চিত্রের মর্যাদা পেয়েছিল। ইংলণ্ড ও রাশিয়া ছাড়া ইয়োরোপের কোথাও দলিল-চিত্র নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। ফ্রান্সে যে-ক'টি দলিল-চিত্র সৃষ্ট হয়েছিল, তার জনক হচ্ছে ওখানকার "আভাঁগার্ড" আন্দোলন এবং অনবদ্য দলিল-চিত্রস্রষ্টা ক্যাভালক্যাণ্টি যে শেষ পর্যন্ত গ্রীয়ারসনের আহ্বানে ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডে চলে গিয়েছিলেন, সে খবর আগেই বলা হয়েছে। হল্যাণ্ডের জরিস আইভেন কয়েকটি সার্থক দলিলচিত্র করবার পরই রাশিয়ায় চ'লে গিয়েছিলেন রাশিয়ান যুবলীগের হয়ে "কোমসোমোল" ছবি করবার জন্যে। তিনি পরে আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ের সহযোগিতায় স্পেনদেশে তুলেছিলেন "স্প্যানিশ আর্থ"। ১৯৩২ সালে বুনুয়েল স্পেনের অর্ধসভ্য জাতি হার্ডেনোদের দুঃখ ও অন্ধকারময় জীবন-যাত্রা নিয়ে "ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড" নামে একটি অনবদ্য দলিল-চিত্র তুলেছিলেন।

আমেরিকার প্রথম উল্লেখযোগ্য দলিল-চিত্র নির্মিত হয় ১৯৩৬ সালে; রুজভেল্ট সরকারের পুনর্বাসন পদ্ধতির ওপর পারে লোরেঞ্জ তৈরী করেন "দি প্লাউ থ্যাট ব্রোক দি প্লেনস্‌"। কৃষি-নিরাপত্তা দপ্তরের হয়ে লোরেঞ্জ "দি রিভার" নামে যে দলিল-চিত্র প্রস্তুত করেন, সেটি আমেরিকায় নির্মিত দলিল-চিত্রগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৯৩৫ সাল থেকে আমেরিকা সমকালীন বিষয় নিয়ে "মার্চ অব টাইম' সিরিজ শুরু করে। এবং এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে কানাডা শুরু করে "কানাডা ক্যারিজ অন" ও ইংলণ্ড করে "দি মডার্ণ এজ।" অপূর্ব জীবন্ত চলচ্চিত্রায়ণ, অত্যন্ত সুন্দর নাটকীয়তাপূর্ণ নেপথ্য বিবৃতি এবং সম্পাদকীয় চাতুর্যের দ্বারা লব্ধ অসামান্য গতিশীলতা এই সিরিজভুক্ত ছবিগুলির প্রাণ। পল স্ট্র্যাণ্ড মেক্সিকোতে ধীবরজীবনের ওপর তৈরী করেছিলেন "দি ওয়েভ" (১৯৩৫), রাল্‌ফ স্টিনার ও উইলার্ড ভ্যান ডাইক সম্মিলিতভাবে নাগরিক জীবনে সামাজিক সুখসুবিধার প্রয়োজনীয়তাকে উপলক্ষ্য করে নির্মাণ করেছিলেন "দি সিটী" (১৯৩৯)। ভ্যান

ডাইক "চিলড্রেন মাস্ট লার্ণ" (১৯৪১) এবং "ভ্যালি টাউন" (১৯৪১) নামেও দুখানি সুন্দর দলিল-চিত্র তৈরী করেছিলেন।

জন গ্রীয়ারসন ১৯৩৯ সালে কানাডা সরকারের ন্যাশানাল ফিল্ম বোর্ডের সর্বময় কর্তার পদ গ্রহণ করেন এবং আইভেন্স, স্টুয়ার্ট লেগ ও রেমন্ড স্পটিশউডের সহযোগিতায় "কানাডা ক্যারিজ অন" এবং "ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন" নামে দু'টি সিরিজের মাধ্যমে বহু দলিল-চিত্র নির্মাণ করেন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড, ইটালী, এমন কি প্রাচ্যে জাপান, চীন ও ভারতেও দলিল-চিত্র প্রস্তুত হ'তে সুরু করেছে যুদ্ধপূর্ব সময় থেকেই। দলিলচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ পৃথিবীর সকল জাতির সকল লোকই সম্পূর্ণ সজাগ। ফিল্ম হচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যম। দলিল-চিত্রের সাহায্যে আমরা যেমন আমাদের জাতীয় সভ্যতাকে অপর দেশের সামনে উপস্থাপিত করতে পারি, ঠিক তেমনই অপরাপর দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারি ঐ সব দেশে তৈরী দলিল-চিত্র দর্শনের ফলে।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের "জনক" :

গেল রবিবার, ১১ই মার্চ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বঙ্গীয় নাট্য সংসদের সভ্যরা সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রচিত নতুন নাটক "জনক"-কে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

সুইডিস লেখক অগাস্ট স্ট্রীনবার্গের ১৮৮৮ সালের রচনা "ফাডরেন"-এর বাঙলা রূপান্তর করেছেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী "জনক" নামে। নরনারীর সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। নারী একাধারে কন্যা, জায়া, জননী; পুরুষও একাধারে সন্তান, স্বামী ও পিতা। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ও নারী কখনও পরস্পরকে ভালবাসে, কখনও একজন নিজেকে অসহায় জ্ঞানে অপরের পক্ষপুটে আশ্রয় নেয়; আবার কখনও অধিকার প্রতিষ্ঠার উন্মত্ততায় এক অপরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে নিপীড়িত করতে চায়—নিজের বিষে সে খালি নিজেই জর্জরিত হয় না, তার চারপাশের আবহাওয়াকেও বিষাক্ত করে তোলে।

যুদ্ধাহত স্বয়ম্ভুকে লতা শুশ্রূষা করেছিল মায়ের ভালোবাসা দিয়ে। কিন্তু স্বয়ম্ভু তার সেবায় সুস্থ হয়ে উঠে প্রতিদানে লতাকে দিল প্রেমের ডালি, এবং সুন্দরী যুবতী লতাকে করল তার জীবনের সহধর্মিণী। নাটকের সূত্রপাত এর অনেক পরে। তখন লতা-স্বয়ম্ভুর কন্যা সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার জন্যে তৈরী। যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতা দেখাবার জন্যে স্বয়ম্ভু ভিক্টোরিয়া ক্রশ দ্বারা সম্মানিত। উল্কার মধ্যে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সে অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে পত্রিকায় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছে। এমন সময় সংঘাত বাধল কন্যা সীতার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা উপলক্ষ্যে। পিতা চায় মেয়ে উচ্চ শিক্ষিতা হোক্, মা চায় মেয়ে বিবাহ করে সংসারী হোক; কারণ ইতিমধ্যে মেয়ে চিত্রবিদ্যা শিখতে গিয়ে শিক্ষকের প্রণয়ভাজন হয়েছে। এই মতবিরোধের যে কি বিপর্যয়কারী পরিণতি সম্ভব, স্ট্রীনবার্গকে অনুসরণ করে "জনক"-এর নাট্যকার তাই দেখাতে চেয়েছেন। "কোনো পিতাই বলতে পারে না, সে যাকে সন্তান মনে করছে, সে তারই ঔরসজাত কিনা", এই ফ্রয়েডী-মতের ওপর নির্ভর করে নাটকের ঘটেছে বিস্তার, পুঞ্জীভূত হয়েছে ট্রাজিডী, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হিমশীতল হাত এসে স্বয়ম্ভুকে দিয়েছে চরম সান্ত্বনা।

মনস্তত্ত্বপ্রধান নাটকটিকে একটি মাত্র ঘটনাস্থলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যেমন, ঠিক সমানভাবেই তিনি বাঙলা রূপায়ণে বৈদেশিক ঘ্রাণটিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে

ভূপেন সান্যাল ও এস. গুহঠাকুরতা পরিচালিত 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ' চিত্রে শংকর ও শম্পা। রেনেসাঁ ফিল্মস পরিবেশিত চিত্রে এই সম্ভাবনাপূর্ণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুজন চিত্র-জগতে নতুন

পারেননি। দু' চারটি শব্দ পরিবর্তন-সাপেক্ষ হ'লেও মোটের ওপর নাটকের ভাষা এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, মনেই হয় না নাটকটি কোনো বিদেশী ভাষা থেকে তর্জমা করা হয়েছে। নাট্যকার সোমেন্দ্রচন্দ্র এর জন্যে আমাদের উচ্চ প্রশংসার অধিকারী।

অভিনয়ে ক্যাপ্টেন স্বয়ম্ভূ ভট্টাচার্যের ভূমিকায় সোমেন্দ্রচন্দ্র অসামান্য নাট-নিপুণতার পরিচয় দিয়েন। তিনি যে ধীরে ধীরে একটি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর ক্রমবিবর্তনশীল অভিনয়ের মাধ্যমে। লতার ভূমিকায় মিনতি গুপ্তা তাঁর চরিত্র প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সংযত অভিনয়ের ভিতর দিয়ে; তাঁর পরিমিতি-বোধ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। এ ছাড়া সুস্থির, ডাক্তার সেন, নকুল, শিবু এবং সীতার ভূমিকায় যথাক্রমে অদিৎ কুণ্ডু, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত, চিনু গোস্বামী ও শিপ্রা নিয়োগী স্ব স্ব ভূমিকানুযায়ী যথাযথ অভিনয় করেছেন।

দৃশ্যপরিকল্পনা ও আলোকসম্পাতে অমর ঘোষের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

চিত্রশোভনার "শাস্তি" : আজ শুক্রবার, ১৬ই মার্চ সিনে ফিল্মসের পরিবেশনায় চিত্রশোভনা প্রযোজিত এবং দয়াভাই পরিচালিত "শাস্তি" চিত্রের উদ্বোধন হচ্ছে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা এবং অপরাপর ছবিঘরে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত এই কাহিনীটির রূপায়ণে আছেন সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী, মালবিকা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, কালী সরকার, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এবং এর চিত্রগ্রহণ করেছেন সুধীশ ঘটক।

মুভিটেক প্রাইভেট লিমিটেডের "শিউলি-বাড়ি" :

সুবোধ ঘোষের "নাগলতা" অবলম্বনে তপন সিংহ কর্তৃক চিত্রনাট্যাকারে গ্রথিত এবং পীযূষ বসু পরিচালিত "শিউলি-বাড়ি" প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে খুব শিগ্‌গিরই। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অরুন্ধতী, রঞ্জনা, গীতালি রায়, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, দিলীপ রায়, তরুণকুমার এবং বীরেশ্বর সেন। চিত্রগ্রহণ করেছেন দীনেন গুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। ছবির সুরকার হিসেবে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

পরলোকে কাজরী গুহ :

চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী কাজরী গুহ মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্বামী ডাঃ রনেন সরকার অকল্যান্ড নার্সিং হোমের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী। এইখানেই একটি অস্ত্রোপচারের পর সহসা শ্রীমতী গুহের অবস্থার অবনতি ঘটায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কলকাতার চলচ্চিত্র সমালোচকদের রায় :

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি ১৯৬১ সালে মুক্তি-প্রাপ্ত দেশী-বিদেশী ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের রায় ঘোষণা করেছেন। এঁদের মতে সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্সের "তিন কন্যা" শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং এর পর গুণানুসারে আছে—"গঙ্গা-যমুনা" (হি), "পুনশ্চ", "মধ্যরাতের তারা", "সপ্তপদী", "কানুন" (হি), "চার দিওয়ারী" (হি), "উসনে কহাথা" (হি), "জিস দেশমে গঙ্গা বহতী হৈ" (হি) ও "স্বয়ম্বরা"।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন সত্যজিৎ রায় (বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে) নীতীন বসু (হিন্দী) এবং উইলিয়াম ওয়াইলার ('বেন-হুর'—বিদেশী ছবি)।

বিদেশী ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দশটি বলে বিবেচিত হয়েছে : বেন-হুর

দি অ্যাপার্টমেন্ট, কানাল, গার্ল সীক্‌স ফাদার, দি মিলিয়নিয়রেস, অন দি বীচ, সাউথ প্যাসিফিক, পেপে, দি সিংগার নট দি সংগ এবং এলমার গ্যান্ট্রি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীরূপে সম্মানিত হয়েছেন—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন (বাংলা সপ্তপদী), দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা (হিন্দী গঙ্গা-যমুনা), চার্লটন হেস্টন (বেন-হুর) এবং শার্লে ম্যাকলেন (দি অ্যাপার্টমেন্ট)।

এছাড়া সুর রচনায়—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (স্বরলিপি) ও রবিশংকর (সন্ধ্যারাগ)—বাংলা; নৌশাদ (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; গীতি-রচনায়ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (স্বরলিপি)—বাংলা; শাকীল বাদায়ুনি (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; সংলাপ রচনায় ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ (স্বয়ংবরা)—বাংলা; বাজাহত মির্জা (গঙ্গা-যমুনা), রাজেন্দ্রকৃষ্ণ (ছায়া) ও এস খলিল (উসনে কহা থা)—হিন্দী; চিত্রগ্রহণে ঃ অজয় কর ও দীনেন গুপ্ত (সপ্তপদী ও সন্ধ্যারাগ)—বাংলা; বাবাসাহেব (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; শব্দধারণে ঃ বাণী দত্ত (স্বরলিপি)—বাংলা; ধরমসে (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী।

* * *

গেল ৩রা মার্চের সাধারণ সভায় নির্বাচিত বি এফ জে এ-র কার্যনির্বাহক সমিতিতে আছেন ঃ সর্বশ্রী তুষারকান্তি ঘোষ (সভাপতি), মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (সহ-সভাপতি), বাগীশ্বরী ঝা ও সেবাব্রত গুপ্ত (যুগ্ম-সম্পাদক), গিরীন্দ্র সিংহ (কোষাধ্যক্ষ) এবং নির্মলকুমার ঘোষ, বি সি আগরওয়ালা, মহেন্দ্র সরকার, পঙ্কজ দত্ত, এ এস মালিহাবাদী, কল্পতরু সেনগুপ্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, রণধীর সাহিত্যালংকার, এ এম কুমার ও ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

* * *

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ঃ

পোলিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সাফল্যজনক আয়োজনের পর সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা তাঁদের সভ্য এবং বিশেষ আমন্ত্রিতদের জন্যে কয়েকটি চেকোশ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই ২রা মার্চ তাঁরা দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গনে ১৯৫৭ সালে ভেনিস ফেস্টিভ্যালে সমালোচকদের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি জিরি ওয়েসের "উলফ্‌ ট্র্যাপ" এবং গেল ৮ই মার্চ লোটাস সিনেমায় জোরোস্লাভ মার্চ পরিচালিত মোরাভিয়ান রোমান্টিক কমেডি "ইট ওয়াজ নট ওয়েডিং ইয়েট" নামে একটি রঙগীন চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও দুটি বিখ্যাত ছবি ভং ফাউস্ট-এর কমেডি অবলম্বনে গঠিত "আউট অব বীচ অব ডেভিল" এবং ওটাকার ভার্ভা পরিচালিত সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "এগেনস্ট অল"—খুব শিগ্‌গিরই দেখানো হবে।

* * *

রূপালী পিকচার্সের "মহামানবের তীরে" ঃ

বর্তমান সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে রচিত বিমলেন্দু ঘোষের "মহামানবের তীরে" কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন রূপালী পিকচার্স নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান। ছবিটির পরিচালনা করবেন "চিত্রভানু" নামে একটি কলাকুশলী-গোষ্ঠী এবং এতে সুরারোপ করবেন হৃদয় কুশারী।

* * *

দশরূপকের "উর্বশী নিরুদ্দেশ" ঃ

আসচে রবিবার, ১৮ই মার্চ বেলা ১০৷৷টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দশরূপক নাট্যগোষ্ঠী মন্মথ রায় রচিত অভিনব নাটক "উর্বশী নিরুদ্দেশ" অভিনয় করছেন। আশা করি, এই অভিনয়েও দশরূপকের ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট

ভারতবর্ষ : ৩৯৫ **রান** (বোরদে ৯৩, নাদকার্ণী নট আউট ৭৮, ইঞ্জিনীয়ার ৫৩, উমরিগড় ৫০; সোবার্স ৭৫ রানে ৪, হল ৭৯ রাণে ৩, গিবস ৬৯ রানে ২ এবং স্টেয়ার্স ৭৬ রানে ১ উইকেট)।

ও ২১৮ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৪০, নাদকার্ণী ৩৫ এবং উমরীগড় ৩২। হল ৪৯ রানে ৬, গিবস ৪৪ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪১ রানে ১ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৩১ **রাণ** (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১২৫, মেনডোনকা ৭৮, ওরেল ৫৮ এবং স্টেয়ার্স নট আউট ৩৫। প্রসন্ন ১২২ রাণে ৩, দুরাণী ১৭৩ রাণে ২, দেশাই ৮৪ রাণে ১ এবং নাদকার্ণী ৫৭ রাণে ১ উইকেট)।

১ম দিন (৭ই মার্চ) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—২৪০ রান, ৭ উইকেট পড়ে। নাদকার্ণী ২২ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬ রান ক'রে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের সময়ের স্কোর—৮৯ রান, ৪ উইকেট পড়ে। উমরিগড় ৫ রান এবং বোরদে কোন রান না ক'রে উইকেটে নট আউট ছিলেন। চা-পানের সময়ের স্কোর—২০৮ রান, ৫ উইকেট পড়ে; উইকেটে ছিলেন বোরদে এবং দুরানী।

২য় দিন (৮ই মার্চ) : লাঞ্চের ১০ মিনিট পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৯৫ রানে সমাপ্ত হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—১৫৭ রান, ১ উইকেট পড়ে। ম্যাকমরিস ৬৬ এবং কানহাই ৭৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (৯ই মার্চ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—৩৯৮, ৫ উইকেটে। সোবার্স ৬৩ এবং ওরেল ৪৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের সময়ের স্কোর—২৬২, ১ উইকেটে। ম্যাকমরিস ১১১ ও কানহাই ১৩৪ রান ক'রে নট আউট ছিলেন। চা-পানের সময়ের স্কোর—৩২৯, ৫ উইকেটে।

৪র্থ দিন (১০ই মার্চ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬৩১ রাণে (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। লাঞ্চের সময়ের স্কোর : ৫১২ (৬ উইকেটে)—সোবার্স ১১৭ এবং মেনডোনকা ৩৬ রাণ করে নট আউট ছিলেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস : ৮৩ রাণ (৩ উইকেটে)—নাদকার্ণী ৯ এবং উম্রিগড় ১২ রাণ করে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন (১২ই মার্চ) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৮ রানে সমাপ্ত।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৮ রানে জয়লাভ করেছে। প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষকে ১০ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজিত করে। এখনও বাকি আছে তিনটি টেস্ট খেলা। টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২—০ খেলায় এগিয়ে রইলো।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে জামাইকা দ্বীপ আকারে বড়। কিন্তু জামাইকার রাজধানী কিংসটনের 'সাবিনা পার্ক' ক্রিকেট মাঠ পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের থেকে আকারে অনেক ছোট। মাত্র হাজার বার লোকের বসবার মত স্থান আছে এই মাঠে। সাবিনা পার্ক মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় টসের বাজিতে ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে হারিয়ে দিয়ে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ নেন। এই নিয়ে কন্ট্রাক্টর উপর্যুপরি ৭টা টেস্ট খেলায় টসে জয়ী হলেন—১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শেষ ৪টে টেস্ট এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজের ১ম ও ২ টেস্ট।

মাত্র কুড়ি মিনিট খেলা হয়েছে, দলের রান ১৪। এই অবস্থায় অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর মাত্র ১ রান করে আউট হলেন। এই ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। দলের ৪৪ রানে জয়সীমা, ৭৯ রাণে মঞ্জরেকার এবং লাঞ্চের তিন মিনিট আগে ৮৯ রানের মাথায় সুর্তি বিদায় নিলেন। লাঞ্চের আগে আর কোন রান হ'ল না। লাঞ্চের সময়ের স্কোর ৪ উইকেট পড়ে ৮৯ রান। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন ৫ম উইকেটের জুটি উমরিগড় (৫ রান) এবং বোরদে (০)। এই ৫ম উইকেটের জুটিই দলের প্রাথমিক ভাঙ্গন রোধ ক'রে দলের ৯৮ রান তুলে দেয়। ১২৭ মিনিটের খেলায় দলের ১০০ রান দাঁড়ায়। উমরিগড় দলের ১৮৩ রানে আউট হ'ন। তাঁর এই আউট হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। স্কোর-বোর্ডে তাঁর নামের পাশে দেওয়া হয় 'কট'। অথচ তিনি বলই স্পর্শ করেননি। পরে আম্পায়ার কোলী ভ্রম-সংশোধন করেন—তখন দাঁড়ায় উমরিগড় 'এল-বি-ডবলিউ' হয়ে আউট হয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে লোকের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।

প্রথম দিনের ১২৭ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ১০০ রান এবং ২৩৪ মিনিটের খেলায় ২০০ রান পূর্ণ হয়। চা-পানের বিরতির সময় দলের রান দাঁড়ায় ২০৮, ৫টা উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন অপরাজিত ছিলেন বোরদে এবং দুরানী। দলের ২৩৪ রানের মাথায় আম্পায়ার ডেভিসের সিদ্ধান্তে দুরানী 'এল-বি-ডবলিউ' আউট হ'ন। আউটের জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষ থেকে আবেদন ওঠে। আম্পায়ার ডেভিস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আউটের নির্দেশ দেননি। তিনি প্রথমে ইতস্তত ক'রে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফেলেন, তারপর পকেট থেকে হাত বের করে আউটের সঙ্কেত হিসাবে আঙ্গুল তুলেন। দুরানী সম্পূর্ণভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনবার পিছন ফিরে তাকিয়ে যান। এই সিদ্ধান্তে শুধু তিনি কেন বহু লোকই খুশি হ'তে পারেননি। বোরদে এবং দুরানীর ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৪৫ মিনিটের খেলায় দলের ৫১ রান ওঠে। বোরদের সঙ্গে খেলতে নামেন নাদকার্ণী। বোরদের দুর্ভাগ্য, তিনি সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করতে পারলেন না, মাত্র ৭ রানের জন্যে। ১৯৫৯ সালে এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষেই দিল্লীর ৫ম টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে বোরদেকে আর একবার দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়; ৯৬ রান ক'রে নিজেই নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলে আউট হ'ন। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি সেঞ্চুরী (১০৯) করেছিলেন। টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হ'ন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় আজও কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। শেষ কালে 'চার রান' এই দুর্লভ সম্মান থেকে বোরদেকে বঞ্চিত করে। এবার তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে সাত রান। বোরদে ১৮৬ মিনিট খেলে তাঁর এই ৯৩ রান করেন, বাউণ্ডারী করেন ১৩টা। প্রধানতঃ তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যেই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রান সংখ্যা (৭ উইকেটে ২৬৩ রান) ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার অবস্থায় দাঁড়ায়। বোরদে যখন উমরিগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন তখন ভারতবর্ষের ৪টে উইকেট পড়ে মাত্র ৮৯ রান। বোরদে ৫ম উইকেটের জুটিতে উমরিগড়ের সঙ্গে

দলের ৯৪ রান, ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দুরানীর সঙ্গে ৫১ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে নাদকার্ণীর সঙ্গে দলের ২৯ রান তুলে দেন। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৮০, ৭ উইকেট পড়ে। নাদকার্ণী (২২) এবং ইঞ্জিনীয়ার (৬) নট আউট থাকেন।

সাবিনা পার্কের উইকেট ব্যাটসম্যানদের সহায়ক ছিল। প্রথম দিনের খেলায় ফাস্ট বোলার হল এবং স্টেয়ার্স মারমুখী বল দিতে কসুর করেননি। সুর্তি হলের বলে এবং জয়সীমা স্টেয়ার্সের বলে আঘাত পান। নাদকার্ণীকে লক্ষ্য করেও বাম্পার ছাড়া হয়। কিন্তু নাদকার্ণীকে বিচলিত করতে পারেনি।

প্রথম দিন ৯৮ ওভার খেলা হয়। এর মধ্যে হল এবং স্টেয়ার্স ৩৯ ওভার বল ক'রে ১২৪ রান দেন। এই থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে ফাস্ট বল এখন আর 'জুজু' নয়।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৩টে উইকেটে ১১৫ রান যোগ হয় পূর্ব দিনের ২৮০ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস লাঞ্চের পর ৮ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রথম দিনে ৫ম উইকেটের জুটি উমরীগড় এবং বোরদে ৯৪ রান তুলে ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় সেই ভূমিকায় দেখতে পেলাম ৮ম উইকেটের জুটি নাদকার্ণী এবং ইঞ্জিনীয়ারকে। এই জুটিও ৯৪ রান তুলে দলের রান সংখ্যা ভদ্রস্থ করেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটি নাদকার্ণী এবং ইঞ্জিনীয়ার ১০২ মিনিটের খেলায় ৯৪ রান তুলে দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁরা ৮ম উইকেটের জুটির রেকর্ড রান করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল ৭৪ রান (কৃপাল সিং এবং রামচাঁদ, মাদ্রাজ, ১৯৫৮)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্ট খেলায় নাদকার্ণী এবং ইঞ্জিনীয়ার ৮ম উইকেটের জুটিতে ১০১ রান ক'রে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

শেষ উইকেটে নাদকার্ণীর সঙ্গে খেলতে নামেন প্রসন্ন। এই ১০ম উইকেটের জুটিতে ৩৭ রান ওঠে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে এই রানও ভারতীয় দলের পক্ষে রেকর্ড হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১০ম উইকেটের জুটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রেকর্ড ২৭ রান (গডার্ড এবং ট্রিম, বোম্বাই, ৫ম টেস্ট, ১৯৪৮-৪৯)। নাদকার্ণী ১৯৫ মিনিটের খেলায় ৭৮ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। এই ৭৮ রানই তাঁর টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। তাঁর এই ৭৮ রানে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল।

KABI
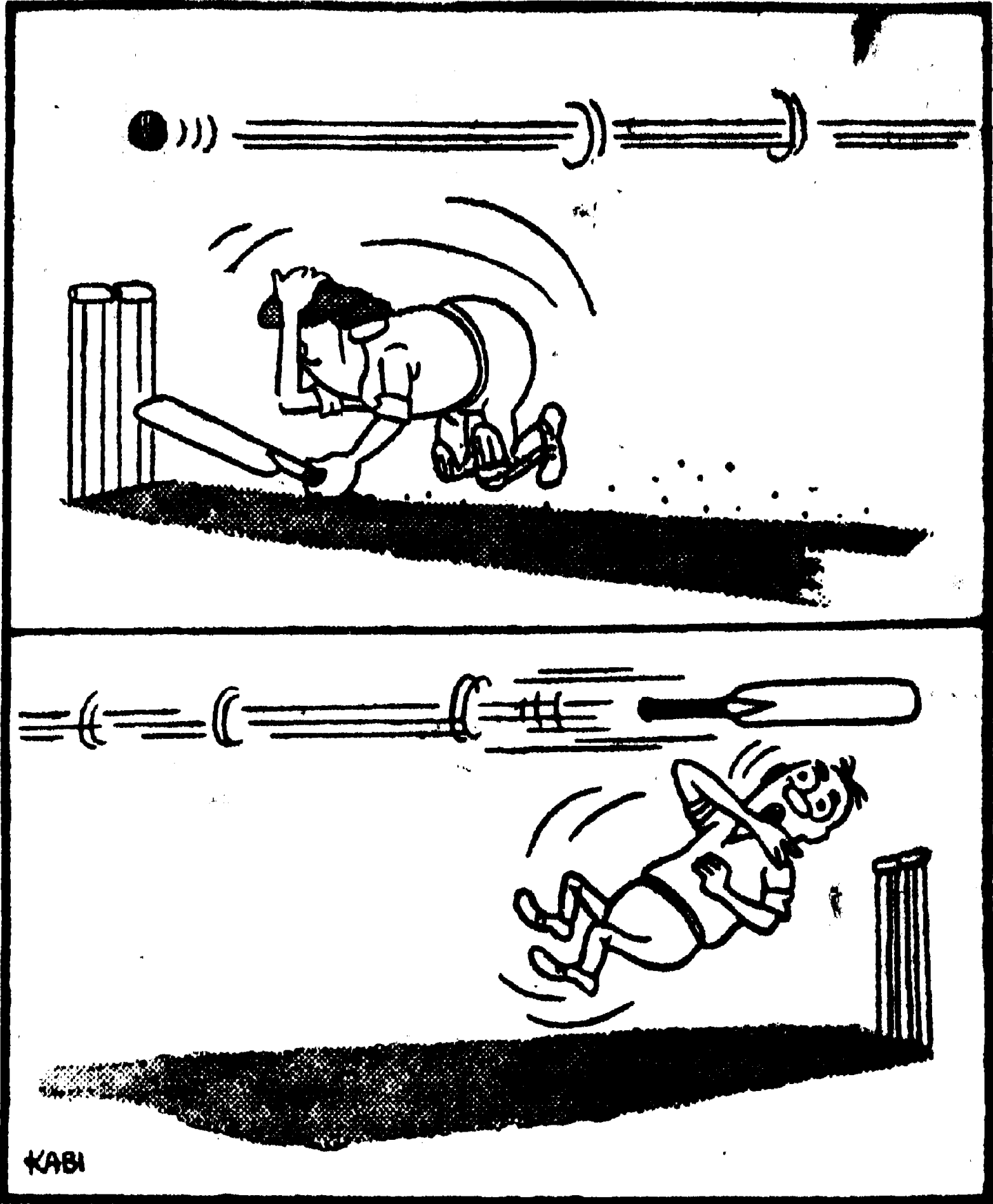
হলের বলঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে তিনজনকে আউট ক'রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে শততম উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি; তবে এই প্রথম ধাক্কা সামলাতে বেশী সময় লাগেনি। দলের ১৬ রানের মাথায় কনরাড হান্ট মাত্র ৯ রান করে দেশাইয়ের বলে ক্যাচ তুলে কন্ট্রাক্টরের হাতে ধরা দিয়ে বিদায় নেন। ম্যাকমরিসের সঙ্গে খেলতে নামেন কানহাই। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ১৫৭, ১ উইকেট পড়ে। ২য় উইকেটের জুটি ম্যাকমরিস ৬৬ এবং কানহাই ৭৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে দ্বিতীয় দিনের ১৫৭ রানের (১ উইকেটে) সঙ্গে ২৪১ রান যোগ করে। রান দাঁড়ায় ৩৯৮, ৫ উইকেট পড়ে। লাঞ্চের রান ছিল ২৬২, ১ উইকেটে (ম্যাকমরিস নট আউট ১১১ ও কানহাই নট আউট ১৩৪)। চা-পানের বিরতির সময়ের রান ৩২৯ (৫ উইকেটে)। এই দিন ভারতীয় দলের বোলিং ভাল হয়েছিল; কিন্তু ফিল্ডিংয়ের দোষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বেশী রান তুলেছে। ইঞ্জিনীয়ার সোবার্সের তোলা 'ক্যাচ' ধরতে পারেননি। এই সময় সোবার্সের রান ছিল মাত্র ২। অন্য দিকে কানহাই নিজস্ব ১১৩ রানের মাথায় সুর্তির বলে ক্যাচ তুলেন। মঞ্জরেকার পরিতাড়া ভাঙতে গিয়ে বল ফস্কান। এই তের (একশত তের) রানের গাঁট থেকে ছাড়ান পেয়ে কানহাই শেষ পর্যন্ত ১৩৮ রান ক'রে আউট হন। প্রথম দিন উমরিগড় এবং দুরানীর আউট সম্পর্কে আম্পায়ার কোলী এবং ডেভিস মারাত্মক রকম ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়ে ছাড়ান পেয়েছিলেন। কিন্তু এই দিন সাবিনা পার্কের দর্শকদের একাংশ শুধু মুখের শব্দে বিক্ষোভ জানায়নি, মাঠের মধ্যে হরির লুট দেয় এবং তা আমাদের দেশের হরির লুটের বাতাসা নয়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোতল! ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘরোয়া ব্যাপার। আম্পায়ার কোলীর ভুল সিদ্ধান্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জো সলোমন রান-আউট হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যে

সময়ে ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক ইঞ্জিনীয়ার হাত দিয়ে সলোমনের উইকেট ভেঙ্গে দেন, সে সময়ে তাঁর হাতে বল ছিল না। আম্পায়ারের আউট দেওয়ার সিদ্ধান্তে সারা মাঠ গর্জে উঠে। তারই ঠেলা সামলাতে পাঁচ মিনিট খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন অফ স্পিনার প্রসন্ন। তিনি কানহাই, ম্যাকমরিস এবং রডরিগসকে আউট করেন। মাত্র ৬ রান দিয়ে প্রসন্ন কানহাই এবং ম্যাকমরিসের উইকেট পান। দ্বিতীয় উইকেটের জুটি কানহাই এবং ম্যাকমরিস ভারতীয় দলের পক্ষে মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ান। এই জুটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দলের রেকর্ড ২৩৫ রান ওঠে। ২য় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ৯৭ রান (প্যারোদা এবং ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩)। লাঞ্চের পরবর্তী খেলা থেকে চা-পানের বিরতির মধ্যে অর্থাৎ ১২০ মিনিটের খেলায় এই দিন ৪টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬৭ রানে। ২২ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে—২য়, ৩য় এবং ৪র্থ উইকেট। দলের এই ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সোবার্স এবং অধিনায়ক ওরেল। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান দাঁড়ায় ৩৭৪, ৫ উইকেটে। উইকেটে নট আউট থাকেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সোবার্স (৬৩) এবং ওরেল (৪৩)। এই দিন ৬ষ্ঠ উইকেটের অপরাজিত জুটিতে দলের ৭৮ রান ওঠে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে দলের ৬৩১ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংস খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৬৩১ রানই স্বদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড—৫৭৬ রান (কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড : ৬৪৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), নিউ দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এই নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ বার এক ইনিংসে ৬০০ রান করলো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এক ইনিংসের খেলায় আজও ৬০০ অথবা ৫০০ রান তুলতে পারেনি। আলোচ্য কিংস্টনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৫৩ সালেও কিংস্টনের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ ও ওয়ালকট ১১৮) করেছিলেন।

গারফিল্ড সোবার্স ১৫৩ রান ক'রে দুরানীর বলে দেশাইয়ের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। সোবার্স তাঁর ১৫৩ রানে ১১টা বাউণ্ডারী এবং ৪টে ওভার-বাউণ্ডারী করেন। প্রসন্নের এক ওভারেই তিনি মারেন ৩টে ওভার-বাউণ্ডারী। সোবার্স নিজস্ব ২ এবং ২৮ রানে যা আউট হওয়ার থেকে রক্ষা পান। এই দুটি ঘটনা বাদ দিলে তাঁর খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছে এবং তাঁর খেলার জন্যেই দলের বিপুল সংখ্যক রান উঠেছে। তিনি ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ওরেলের সঙ্গে দলের ১১০ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় মেনডোনকার সঙ্গে দলের ১২৭ রান তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় গারফিল্ড সোবার্সের এই ১২শ সেঞ্চুরী, ভারতবর্ষের বিপক্ষে চতুর্থ সেঞ্চুরী। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় মেনডোনকা ৭৮ রান করে নাদকার্ণীর বলে আউট হন। ৮ম উইকেটের জুটি মেনডোনকা এবং স্টেয়ার্স দলের ৭৪ রান তুলেন।

চতুর্থ দিনের খেলায় পার্টনারসীপ রেকর্ড : ৭ম উইকেটে ১২৭ রাণ (সোবার্স এবং মেনডোনকা) ১০৮ মিনিটের খেলায়; পূর্ব রেকর্ড : ১১৮ রাণ—উইকস এবং ক্রিস্টিয়ানী, নিউ-দিল্লী, ১৯৪৮-৪৯। ৮ম উইকেটে ৭৪ রাণ (মেনডোনকা এবং স্টেয়ার্স) ৫২ মিনিটের খেলায়; পূর্ব রেকর্ড : ৭০ রাণ—সলোমন এবং এ্যাটকিনসন, নিউ-দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল চতুর্থ দিনের খেলায় তিনটি উইকেট নিয়ে টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে তাঁর একশত উইকেট পূর্ণ করেন। বর্তমানে হিসাব দাঁড়িয়েছে—মোট টেস্ট খেলা ২০ এবং ২২৮৯ রানে ১০৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় ভারতবর্ষ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। খেলায় আবার ফাস্ট বোলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের ৫০ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। হল ১০ ওভারে ৩২ রান দিয়ে এই ৩টে পান। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে স্কোর-বোর্ডে মুখ নীচু ক'রে ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়িয়ে থাকে—৮০ রান, ৩টে উইকেট পড়ে। ৪র্থ উইকেটের জুটি নাদকার্ণী (৯) এবং উমরিগড় (১২) নট আউট থাকেন।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৪র্থ উইকেটের জুটি নাদকার্ণী এবং উমরীগড় দলের ৬৬ রান তুলে দেন। লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ১৬২ রান, ৮ উইকেটে। ৯ম উইকেটের জুটি ইঞ্জিনীয়ার এবং দেশাই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের মুখ রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। ৯ম উইকেটের জুটিতে ৪৮ রান ওঠে। এই দিনও হল ৩টে উইকেট পান—মোট ৪৯ রানে ৬টা উইকেট। ২১৮ রানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৮ রানে জয়লাভ করে।

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
৯১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচী পত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd March, 1962
40 Naya Paise.

দোলযাত্রা ভারতের এক সুপ্রাচীন উৎসব। শীতের শেষে যখন বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে তখন প্রকৃতির সেই তারুণ্যের প্রভাব মানুষের হৃদয়কেও আলোড়িত ক'রে তোলে। প্রতিদিনের নীরস কর্মপ্রবাহের মধ্যে চলতে চলতে একদিন বাসন্তী-পূর্ণিমার আনন্দিত লগ্নে মানুষ তার চারপাশে চোখ মেলে তাকায়। গাছে গাছে নতুন পাতা, পাখিদের কল-কাকলী এবং এলোমেলো দক্ষিণা হাওয়ার চাঞ্চল্যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। তখন জীবনধারণের যেসব সংকীর্ণ বৃত্তে মানুষ নিজেকে আবদ্ধ রেখে দিনাতিপাত করে তার বাহিরে এক বৃহৎ অস্তিত্বের বিষয়ে সে সচেতন হ'য়ে ওঠে। এবং এই বিরাটত্বের অনুভূতি তাকে চির-পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীর সঙ্গেও এক নতুন মিলনে একাত্ম ক'রে তোলে।

দোলের দিনে তাই এত রঙের খেলা। এই আবীর-কুঙ্কুম তো কেবল বাহিরের আনন্দোচ্ছ্বাসের উপকরণ নয়, হৃদয়ের আবেগরঞ্জিত সৌহার্দ্যেরই প্রতীক। তাই এদিনে কোনো ভেদাভেদ থাকে না, উচ্চ-নীচ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই প্রীতি-সম্ভাষণ জানানো যায়, সকলের সঙ্গেই মিলিত হওয়া যায় বসন্তের আনন্দোৎসবে।

কিন্তু কেবল তাই নয়, দোলপূর্ণিমার পুণ্যতিথি আরও একটি বিশেষ কারণে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে বাঙালীর ইতিহাসে। এই দিনেই চার শ' বছর আগে বাংলার তদানীন্তন সাংস্কৃতিক মহাপীঠ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। বাংলার তখন দারুণ দুর্দিন, মুসলমান আগমনে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের ভিত্তিভূমি বিচলিত, অনাচার ও অবিচারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সমাজের সংগঠন। এমনি সময়ে বাংলার ভাগ্যালোকে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব, করুণা ও প্রীতির মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুললেন সমগ্র জাতিকে।

আজ বহু শতাব্দীর দূরত্ব থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে যখন তাঁর এই অলোকসামান্য কীর্তিকে বিচার করি, তখন হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় আমাদের মন আপনিই নত হ'য়ে আসে। বাহিরের আঘাতে যে সময় হিন্দু সমাজ তন্ত্র-ন্যায়-স্মৃতির সহস্র বন্ধনে নিজেকে কেবলই সংকুচিত করে নিচ্ছে, অনাচারের সামান্যতম আশঙ্কাতেই নির্মমভাবে পরিত্যাগ করছে অসহায় পর-পীড়িত নরনারীকে, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এসে দাঁড়ালেন মূর্তিমান অভয়বাণীর মতো। জাতি-বর্ণ-আচারের ভেদাভেদ লুপ্ত হ'য়ে গেল, যারা অন্ত্যজ এবং আশাহীন তারা উঠে দাঁড়াল, সকলেই এক উদার মানবিকতার তড়িৎস্পন্দনে অনুভব করল তারা মানুষ। আর এই অনুভূতির প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশে দেখা দিল এক নতুন চেতনা, যার ফলে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল বাঙালীর জাতিসত্তা। তারপর থেকে অনেক শক্তিধর মানুষ এসেছেন বাংলাদেশে, জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় বাঙালী আজ সমগ্র পৃথিবীতেই সুপরিচিত। কিন্তু সেই ছত্রভঙ্গ দুঃসময়ের ব্যাকুল প্রয়োজনের মুহূর্তে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের প্রসাদে যেভাবে সমস্ত দেশটিকে এক অখণ্ড প্রেমের মধ্যে ধারণ করেছিলেন তা অতুলনীয়।

দোলযাত্রার এই পুণ্যদিনে সেই দেশনন্দিত যুগাবতারের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম জানাই। এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান সন্ধিক্ষণে যখন ভাগ্যাহত পশ্চিমবঙ্গ আবার নব-নব গঠনকর্মের সাহায্যে এক উন্নতিশীল ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ, তখন আমাদের যাত্রাপথের পাথেয় হিসাবে প্রার্থনা করি তাঁরই পরম মমতাময় আশীর্বাদ।

কবিতা
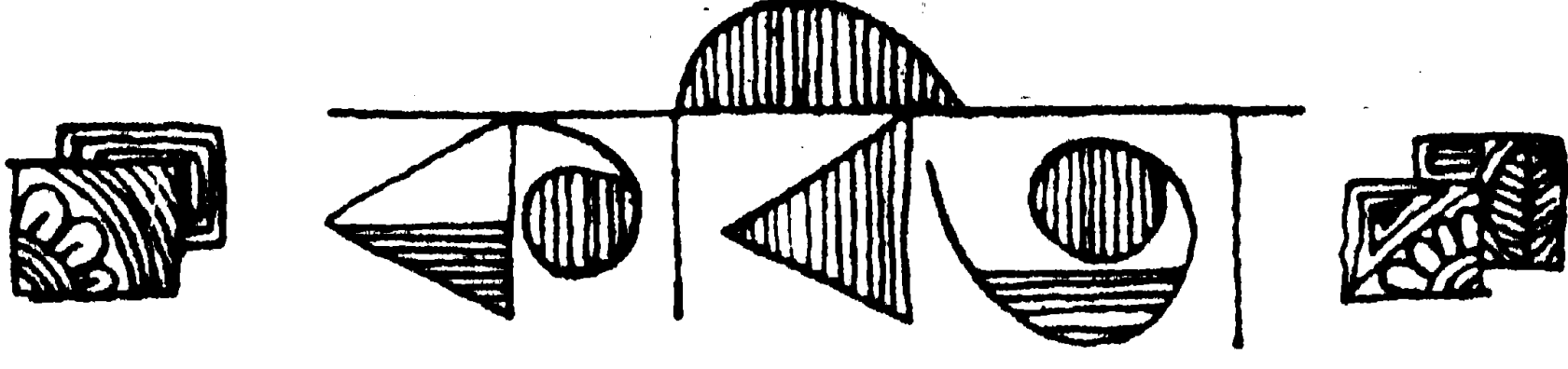
॥ চতুর্দশপদী ॥

বিষ্ণু দে

দেখেছি জলের রাগ, বেগের আগুনে মাটিলেপা
মাথা কোটে,
পাথরে বালিতে তোড়ে সে যে কী না করে!
ঘোঁট করে, ফোসে, ফোলে, নিজের ধর্মই ভোলে ক্ষ্যাপা,
কাদা ছাইভস্ম মাখে, নুড়ি ভাঙে ফুৎকারে শীকরে।

জলের অদ্ভুত রাগ, গদা হানে লৌহ ভীমসেন
আর হিড়িম্বানন্দন যেন, ভাঙে অন্ধকার বনে
উরু বা গর্দান,
কিংবা যেন নব্য মল্ল একাই খোঁজেন
ছায়ায় আপন শত্রু, যত ছায়া সরে তত মনে
রাগ হয়। দুস্থ চৈতন্যের রাগ,
যেমন হাওয়াই হাঁকে
হিরোশিমা সাহারায়—
কিম্বা আরো মোটা মেগাটনে
আর কোথাও জুজুমানা বোমা ফাটে।
কোয়েলের ক্ষিপ্র বাঁকে
ঘূর্ণির উলঙ্গ শক্তি, আপন শক্তির ঘোলা লোভে
দেখেছি নদীর প্রাণস্রোতের প্রতীক বুঝি ডোবে॥

*
* *

ছিন্নভিন্ন গান

মানস রায়চৌধুরী

শেষহীন হিংসা করি তোমাদের, যারা উচ্চারিত সুখে, রোগহীনতায়।
আমি রুগ্ন নই কিন্তু সুখী নই। আমি মেরুহীন গোলকের অস্থির ঘূর্ণনে
কখনো আনন্দ তবু আমাকে ডেকেছো হাত নেড়ে?
পাতা ঝরে গেছে, যায় সমস্ত শ্রমের বেলা পীত অপচয়ে
ধান, গম, নারকোলে অথবা প্রণয়বিদ্ধ ফাল্গুনের লালে
হাত রাখতে গিয়ে সব পুড়ে গেল। বুঝি
অঙ্গারে তুমুল হাসে নিয়তি আমার।

মৃত্যুকে দেখিনি আজো। মাঝেমাঝে ঘটনাচক্রের ঐকতানে
অছন্দ বিবাদী গলা বেজে ওঠে, ছিন্ন তারে শুধু ডিসকর্ড।
ধরো ধরো, ভয়াবহ ওই কলরোল ধায় আমার প্রিয়ার নির্বসন
ত্রিযামায় কিংবা ভোরে—জটিল আক্ষেপ যেন ভীষণ মূর্ছায়
চতুর্দিক ঝাপ্‌সা করে টেনে নেয় তাকে মহালুপ্তির গহ্বরে।

মৌলিক উৎকণ্ঠা এই। অসুখ অসুখ শব্দ রক্তময় ট্রামেবাসে লোকে
জনপদ দ্বিধান্বিত, বিস্ময়ে আমাকে দেখে ছিন্ন পাদুকায় ম্লান বসনে কিম্ভুৎ
আমি কি অনন্তকাল রাজপথে অন্তিমযাত্রার অনুগামী।

দূর দর্পণে

জৈমিনি
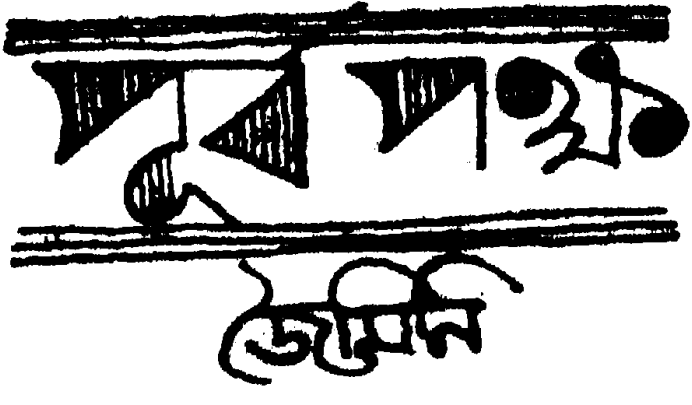
নিচের চিঠিখানি পরিচয়-পত্রের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া চিঠির ভিতরে যতোটুকু জানা যায়, তার বেশী আমি জানিও না লেখকের সম্বন্ধে। পাঠক নিজগুণে যা হয় বুঝে নেবেন।

প্রিয় জৈমিনি মহাশয়, বাংলা আমার ভালো আসে না। তবু বাংলাতেই লিখছি, কারণ রাহুল জানিয়েছে আপনি সাহিত্যিক। ইংরেজীতে আপনার মনে বিরূপ ভাব জাগতে পারে। সেজন্যে মাতৃভাষার স্মরণ নিলাম।

রাহুল আপনার বন্ধু। তার চিঠি আপনি 'অমৃতে' ছেপেছেন। কিন্তু ঐ চিঠি দেখে মনে হল সে আপনার বন্ধুর চেয়েও কিছু বেশী। অন্তত তার তাই হওয়ার ইচ্ছা—ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ভালো কথা। আমার তাতে কোন ঝগড়া ছিল না। কিন্তু ঐ চিঠিতে সে আমার নামও উল্লেখ করেছে, আমার ডাকনাম। তাইতেই কিছুটা অসুবিধে হয়েছে। নয়তো কে কাকে কী লিখল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না।

সত্যি বলতে কি, রাহুলের যে আমাকে পিঙকু মিত্তির বলে উল্লেখ করেছে এতে তার হীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। বিলেত যাবার আগে ও-নামটা আমার চালু ছিল বটে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর সকলেই আমাকে মিস্টার মিত্র বলে ডাকে। রাহুলেরও তাই উচিত ছিল। অন্তত আমার ভদ্র-নাম পিনাকীও সে বলতে পারত। তা না বলে সে যেভাবে আমার উল্লেখ করেছে তাতে তার অত্যন্ত মীননেস প্রকাশিত হয়েছে। এর পর আমি যদি বলি, সে আমার সম্বন্ধে ইনফিওরিটি কমপ্লেকসে ভুগছে, আশা করি সে আপনার 'বন্ধু' হলেও আপনি তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না।

কিন্তু, আচ্ছা রাহুল কি সত্যি আপনার বন্ধু? কিছু মনে করবেন না, ওর মতো একটা অন্তঃসারহীন মূর্খ যে আপনার বন্ধু হতে পারে, আমি ভাবতে পারিনে।

অন্য কথা ছেড়ে দিলাম, যে চিঠিখানি আপনি ছেপেছেন তার মধ্যেও যে সব উচ্চমার্গের বাগাড়ম্বর দেখতে পেলাম তাতে গা-জ্বালা করে। আমি হলপ করে বলতে পারি, যে সব কথা ও বলেছে তার মানে কী তাই ওর বোধগম্য নয়। মদ, রেস ইত্যাদি নিয়ে অনেক নাটুকেপনা করে ও বলেছে, কিছুতেই ওর কিছু এসে যায় না, কিছুই ওর অন্তর স্পর্শ করে না। কী ন্যায়ার দেখুন, দু-পেগ হুইস্কির লোভে বড়লোক বন্ধুদের বাড়িতে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, রেসের মাঠে দশ টাকা চোট খেলে ওর ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যায়, ও বলে কিনা কিছুই ওর অন্তর স্পর্শ করে না!

আসলে ও একটা হিপোক্রীট, এবং হ্যাংলা। ছেলেবেলায় কবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উপরে একটা ইস্কুলমার্কা প্রবন্ধ লিখেছিল, সেই থেকে ওর ধারণা হয়েছে ও মস্ত বড় একজন ইনটেলেকচুয়াল। কিন্তু তারপর কতো জল গঙ্গায়

বয়ে গেছে সে খেয়ালই ওর নেই। এখন ওর কাজ হল হাই সোসাইটির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার তলানী যা কিছু জোটে তাই রাস্তার ময়লা কাগজ কুড়োনো লোক-গুলোর মতো মনের মধ্যে বস্তাবন্দী করা। একেই বোধহয় সাধুভাষায় আপনারা বলেন পল্লবগ্রাহিতা। কিন্তু ওর ঐ সাজানো ময়ূরপুচ্ছগুলো এতোই নড়বড়ে যে চলতে গেলেই খসে খসে পড়ে।

ওর যে কিছু ভাল লাগবে না তাতে আর বিচিত্র কী! ও শুনেছে, ভালো না লাগাই এখন ইউরোপের চলতি হাওয়া। ও বোধ করি আরো অনেক কথা শুনেছে, যেমন ধরুন এগজিস্টানশিয়ালিজম। কিন্তু কথাটার মানে কী তাই বোধ হয় ও জানে না। তবে হ্যাঁ, বাংলাটা জানে। আগে বলত অস্তিত্ববাদ, কিন্তু যেই শুনল কবি অমিয় চক্রবর্তী কোথায় নাকি লিখেছেন অস্তীতিবাদ, ওমনি লুফে নিল কথাটা। এখন ও দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো বলে যাচ্ছে অস্তীতিবাদ, অস্তীতিবাদ। সাধে কি আর লিলি ওর কথা শুনলে এতো হাসে!

কিন্তু জানেন, ওটা এমন বোকা, লিলি যে হাসে তাও ও টের পায় না। ও মনে করে হাসিটা লিলির পুরস্কার। কোনটা পুরস্কার আর কোনটা তিরস্কার সে ভেদরেখাটাও লুপ্ত হয়ে গেছে ওর কাছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। রাহুলের বিষয়ে আমার সবচেয়ে বড় আপত্তি হল, ও একটা মানুষই নয়, ভুতুড়ে খোলসমাত্র। অস্তীতিবাদ নিয়ে ও এতো সোরগোল করে, কিন্তু ওর অস্তিত্বটাই ওর কাছে সবচেয়ে ফাঁকা ব্যাপার। একদিন ওর সংগে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছিল, দেখলাম কথায় কথায় সাংঘে কামু আওড়াতে লাগল, নিজে কিছুই বলতে পারল না। আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তোমার আঁগাজমা কী? ও এমন হাঁ করে চেয়ে রইল যে ওকে রাস্তার ধারের লেটার-বক্সের চেয়েও করুণ দেখাল। আঁগাজমা কথাটাই ও শোনে নি কোন দিন, সেটা যে ইংরেজী এনগেজমেন্টের ফরাসী সংস্করণ তাও ও জানে না।

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! ও ব্যক্তি, কিন্তু ওর কোন এনগেজমেন্ট নেই। অন্তত সে বিষয়ে ও সচেতন নয়। অথচ অস্তীতিবাদ আওড়ায়। আপনি যে ওর সংগে মেশেন কী করে সেই ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি!

অস্তীতিবাদ (বাংলাটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে!) আমিও মানি। আর মানি বলেই আমি আঁগাজমা খুঁজি। আমি জানি ব্যক্তি হিসেবে আমি একা, নিঃসংগ। কিন্তু আমি সমাজে বাস করি। কাজেই সমাজের সংগে আমার কতক-গুলো পয়েন্ট অব কনট্যাক্ট দরকার। সেইটেকেই বলি আমরা আঁগাজমা। রাহুল এ সব কিছু বোঝে না। অথচ বার-এ যায়, পিকনিক করে, মেয়েদের সংগে মেশে। কী মুর্খের মতো বেঁচে আছে ও, ভাবুন তো আপনি?

ও-সব ব্যাপার আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি কেন আছে। সেটা হল আমার আঁগাজমা, সমাজের সংগে পয়েন্ট অব কনট্যাক্ট। এই জানাটা যে কতোটা মনে জোর এনে দেয় তা যদি রাহুল জানত তবে আর সে এমন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াত না। আনন্দের লোভে হন্যে হয়ে উঠত না।

আপনি তো সাহিত্যিক, ওর চিঠি-খানা ভালো করে পড়লেই দেখবেন তার প্রত্যেকটি অক্ষরের আড়ালে ওর লালসা-কাঙাল চোখ দুটি চকচক করে উঠছে। কিন্তু যে লোক প্রকৃত ইনটেলেকচুয়াল তার এমন হবে কেন? হাই সোসাইটিতে ওঠা এত সহজ নয়। সেখানে আত্মাকে বিবিক্ত রাখতে হয়, সরিয়ে রাখতে হয়। তখন ফুর্তি আর ফুর্তি থাকে না—জীবনের সার কথা তখন হয়ে দাঁড়ায়—ঈট, ড্রিংক অ্যান্ড বি স্লুমি!

বাস্তবিক রাহুলের জন্যে আমার করুণা হয়। উচ্চ-বর্ণের অ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজে আসন পাওয়ার জন্যে কতোই না ঘুরপাক খেল ও। কিন্তু বোকাটা জানে না, সেটা এমন এক মিউজিক্যাল চেয়ার, যাতে স্থান সংগ্রহ করা সকলের বরাতে ঘটে না। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় হুল্লোড় করেও যে-মিড্ল ক্লাসের মানুষ ও, সেই মিড্ল ক্লাসেই পড়ে রইল, আমাদের কাছে পাত্তা পেল না। সিংহচর্মধারী গর্দভ আর কাকে বলে!

আজ আর বেশী নয়। এ চিঠি যদি ছাপেন, আমার কাছে দুখানা অফ-প্রিন্ট পাঠাবেন। রাহুল আর লিলিকে দেখাব। ওর একটু দুঃখ পাওয়া দরকার।

নমস্কারান্তে বিনীত
পিনাকী মিত্র।

॥ শ্রীশ্রী গৌরসুন্দর ও ভাবসাধনা ॥

॥ মনোরঞ্জন বসু ॥

ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। মহাপুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁরা নানা কথা বলেছেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা এমন সব আলোচনা করেছেন যা মানুষের মনে আজও জীবন্ত হয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করব এবং সেই সঙ্গে তাঁর দার্শনিক মতামত সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলব।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সাধনা মুখ্যতঃ ভাব-সাধনা। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অলৌকিক ঘটনাবলী অভিনব। আদি-মধ্য-অন্ত লীলায় তিনি নানাভাবে নানারূপে আমাদের অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন। মহাভাবকের প্রাকৃত, অ-প্রাকৃত বিচিত্র লীলার কথা যখন আমরা পাঠ করি বা শ্রবণ করি তখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আমাদের চিত্ত চলে যায় সেই এক অচিন্ত্য রহস্যালোকে যা হিসাবের বাইরে। তর্কে সে রহস্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, সে এক অদৃষ্ট জগৎ—ভাবের ধারায় সে জগতের রসোপলব্ধি হয়—সাধ্য-সাধন সেখানে এক হয়ে যায়।

যীশু খৃষ্টের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন তাঁর বৈষয়িক খতিয়ানের হিসাব নিষ্প্রয়োজন, সেইরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা বলতে গেলেও শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর কতখানি ব্যুৎপত্তি ছিল সে প্রশ্নও নিরর্থক। নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারধারায় তিনি পারদর্শী ছিলেন কিনা, ব্যাপ্তির কোন বাড়তি লক্ষণ তিনি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা, শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ-খণ্ডনের প্রচেষ্টা তাঁর ছিল কিনা—এ-সব প্রশ্ন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যভাব সম্পর্কে অবাস্তব ও অবান্তর বলেই মনে হয়। যিনি সম্প্রদায়গত হয়েও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে, স্বয়ং ব্রহ্ম-দর্শী, সাধ্য-সাধন যেখানে একত্রে মিলিত হয়েছে, অলৌকিক জীবনই যাঁর বাণী, তাঁর সম্পর্কে এ-সব প্রশ্ন তুলে তাঁর গৌরব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা বলে মনে হয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তখন কাশী-

ধামে। সনাতন গোস্বামীর মন্ত্র দীক্ষা সবে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি তাঁকে অধ্যাত্ম বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দেন ও পরমানন্দ নামে একজন সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া তাঁকে কীর্তন গান শোনান। 'কাশীর সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর বেদান্ত শ্রবণ ও আলোচনা সম্পর্কে অ-মনোযোগ এবং নাম-সংকীর্তনের উপর অধিক মনোযোগ লক্ষ্য করে প্রভু সম্পর্কে নানাপ্রকার নিন্দা করতে লাগল। প্রভুর ভক্তরা এসব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করতেন এবং প্রভুকে সব কথা নিবেদন করতেন। কিন্তু প্রভু শুনে কেবলমাত্র হাসতেন। একদিন একজন মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত মনে মনে ঠিক করলেন যে সন্ন্যাসীদের ও মহাপ্রভুকে তিনি একইসঙ্গে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করবেন এবং উভয়ের মিলন ঘটাবেন। তাঁর বিশ্বাস সন্ন্যাসীরা একবার দেখলে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর সম্পর্কে আর কোন অ-যথা কথা বলবে না। সেই-রূপেই ব্যবস্থা করা হ'ল। নির্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসীরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরও সেখানে এলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাসীরা যেস্থানে উপবেশন করলেন মহাপ্রভু সেখানে উপবেশন না করে হস্ত-পদ প্রক্ষালনস্থানে উপবেশন করে এক অলৌকিক শক্তি সৃষ্টি করলেন। সন্ন্যাসীগণ ঐ শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'তুমি ঐ অপবিত্র-স্থানে উপবেশন করেছ কেন?' উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, 'আমি হীন, আমি মূর্খ, আপনাদের সঙ্গে একত্রে বসবার যোগ্যতা আমার নেই।' প্রভুর দিব্যকান্তি দেখে ও সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনে সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর না কেন?' উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, 'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তা'হলে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন করতে পারি'। সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমার রূপ নয়ন-মনোহর, বাক্য শ্রবণ-সুখকর, তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার সব কথা বলতে পার।' প্রভু বললেন, বেদান্তের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর ভাল লাগে না। তিনি মনে করেন ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি, ব্রহ্মের শক্তিউদ্ভূত জগৎও তেমনি সত্য। প্রভু আরও বললেন, 'সামান্য-বুদ্ধি মানুষকে প্রতি পদেই ভুল-ভ্রান্তি করতে দেখা যায়। ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, (বিপ্রলিপ্সা) ও ইন্দ্রিয়-অপটুত্ব রূপ কোন না কোন একটি দোষ মানুষের আছে। সুতরাং সেই অলৌকিক, অচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্ম-বস্তুকে মানুষের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু সেইহেতু ব্রহ্মবস্তুর কোন প্রমাণ নাই এরূপও বলা যায় না। সকল বস্তুর প্রমাণ সমান হয় না—পরব্রহ্ম সর্বাশ্রয়, সর্বাচিন্ত্য, ও আশ্চর্য-স্বভাব বস্তু। তার প্রমাণও সেই-রূপ হওয়া উচিৎ'। 'সর্বপুরুষ পরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিদ জ্ঞানের নিদান বলে যাকে অ-প্রাকৃত বাক্য বলা হয়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই একমাত্র স্ব-প্রকাশ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ'। বেদব্যাসের ভাষ্যেও ঠিক এই ধরণের কথা বলা হয়েছে,— তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানু-মেয়মিতিচেদেবমপ্যানির্মোক্ষ প্রসঙ্গ'। তর্কের প্রতিষ্ঠা নেই বলে তর্ক-মূলক ব্রহ্ম কারণ-বাদের পরিবর্তে বেদ-মূলক ব্রহ্ম কারণবাদই আশ্রয় করা উচিত। এখানে বলা যেতে পারে যে যেরূপ তর্কের অ-প্রতিষ্ঠা না হয়, সেইরূপ তর্কই আশ্রয় করা উচিৎ, তাহলেও তর্কের অ-প্রতিষ্ঠা-রূপ দোষ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না: কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিতিকরণও তর্ক-সাপেক্ষ। অচিন্ত্য বিষয়সকলের উপর তর্ক প্রয়োগ উচিৎ নহে, যা প্রকৃতির অতীত তাই-ই অচিন্ত্য।

'ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ দ্বারা অসমোর্দ্ধ চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবান বোধিত হয়ে থাকেন'। পুরুষসূক্ত মন্ত্রে যে ত্রিপাদ বিভূতির উল্লেখ আছে, তাই শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি। যা ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন-কালীয় ভক্তগণ আবহমান ভক্তি-ভাবেও হৃদয়ে অভিন্নভাবে অনুভব করে এসেছেন, তা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় বলে কি অস্বীকার করা কি যুক্তিসংগত হতে পারে? দিবান্ধ পেচক সূর্যকে দর্শন করে না বলে সূর্যের অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত হবে? শ্রীভগবানের নিত্য-লোক-সকল, নিত্য পরিকরসকল, ও নিত্য লীলা প্রাকৃত মনে করা বা অস্বীকার করা অপরাধ।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করা, জীব ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন জ্ঞান করা, 'পরিণামবাদে দোষারোপপূর্বক বিবর্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করা, প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদনপূর্বক তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যসকলের মহাবাক্যত্ব প্রচার করা, জ্ঞান-বিশেষ রূপে ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকারপূর্বক জ্ঞানসামান্যের প্রাধান্য স্থাপন করা, ও প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের উল্লেখ না করে মোক্ষরূপ পুরুষার্থের উৎকর্ষ বর্ণনা করা কি দোষাবহ নয়? বস্তুতঃ বিশ্ব কি কাল্পনিক? জীবই কি ব্রহ্ম? ঐ ব্রহ্ম কি নির্গুণ? তাদৃশ ব্রহ্ম ভাবাপত্তিই কি জীবের পরম পুরুষার্থ? জ্ঞানই কি ঐ পুরুষার্থের সাধন? —না তা কখনও হতে পারে না। এই প্রতিক্ষণ অনুভূয়মান বিশ্বসংসারকে স্বপ্নবৎ, অলীক, মিথ্যা বলে ধারণা করব কি করে? শ্রুতি যার সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় নির্দেশ করছে, সূত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় বিচার করছে, ইতিহাস-পুরাণে যে সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় বর্ণিত হয়েছে তাকে কি কখনও অসৎ বা অবস্তু বলা যায়? সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম যার নিমিত্ত ও উপাদান, সেই বিশ্বসংসার কখনও অলীক হতে পারে না।

একই ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত ও উপা-দান উভয়ই। তা অসম্ভব নয়। ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিযোগ হেতু উভয়ই সম্ভব হয়ে থাকে। অপরিনাশিণী স্বরূপশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং পরিনাশিণী মায়া শক্তি দ্বারা সেই একই ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান কারণ হয়ে থাকে। ব্রহ্মের যুগপৎ কার্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত স্বরূপে অবস্থান আপাততঃ বিরুদ্ধবোধ হলেও, অচিন্ত্য শক্তিযোগ হেতু মায়াশক্তি দ্বারা কার্যাকারে পরিণাম ও স্বরূপশক্তি দ্বারা অপরিণত স্বরূপে অবস্থান সংগতই। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ। একদেশস্থিত অগ্নির প্রসারিণী জ্যোৎস্নার ন্যায় কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মের বৃত্তস্থানী প্রসারিণীশক্তিই জগৎ। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম-স্থিত পরিণাম-ভূত জগৎও সত্য।

এই মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। নিছক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা ও জটিল পরি-স্থিতির উদ্ভাবন করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মহাভাবকের কথা যেভাবে প্রচারিত হয়েছে তারই অতি সামান্যাংশ এখানে বলা হ'ল। আমরা পূর্বেই বলেছি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধ্যাত্ম সাধনা মুখ্যতঃ ভাব-সাধনা—যে ভাবের বন্যা একদিন সারা ভারতকে প্লাবিত করেছিল—ভক্ত হৃদয়ে সে ভাবের অনু-ভূতি আজও প্রাণবন্ত হয়ে আছে। বর্তমান সমস্যা-অধ্যুষিত সংসারে সেই ভাবের স্পর্শন আজ বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাবোপলব্ধির জন্য প্রথম দরকার চিত্তশুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। মানুষের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখীন করবার সাধনা ভাব-সাধনার প্রাথমিক উপাদান। ভক্তি-বেদ্য-প্রেমাধিক্য ভাব সাধনার সাধন জগতে অশেষ মঙ্গল করতে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।

আবরন

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

রাত তিনটেতেই জটাধর হালদারের মা ইন্দুমতীর ঘুম ভাঙে। তারপর আরো ঘণ্টাখানেক কোনোমতে পড়ে থাকেন বিছানায়। কান পেতে শোনেন বাইরের বড়ো কাঁঠাল গাছটায় প্যাঁচা ঝগড়া করছে, সারা রাত চেঁচিয়ে এতক্ষণে ঝিম-ধরা কুকুরগুলো ভাঙা গলায় খেউ খেউ করছে এখনো। তক্তপোষের নিচে সারি সারি হাঁড়ি-কলসীর ভেতরে নেংটি ইঁদুরের কুট্‌কাট্‌ আর আরশোলার ফরফরানি কানে আসে, বুড়ী বিড়বিড় করে বলেন, খেলে, মুখপোড়ারা ছিষ্টি-সংসার সব খেয়ে দিলে।

বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়, ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, জানলা দিয়ে শুকতারাটা একটা রুপোর ধুকধুকির মতো জ্বলতে থাকে। শেষরাতের গাড়ীটা গুম গুম করে দূরে চূর্ণী নদীর সাঁকো পার হচ্ছে—তার আওয়াজ পাওয়া যায়। তখন ইন্দুমতী বিছানা ছাড়েন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বৌয়ের ঘরে একবার কান পাতেন, ভেতর থেকে ঘুমন্ত বউয়ের নিঃশ্বাসের শব্দ আসে। সকালবেলায় মুখ দিয়ে দুর্গা নাম বেরোয় না—কেবল বলেন, হারামজাদী!

তারপর কুয়োতলায় গিয়ে নামেন। ফিরে বারান্দায় আসতে আরো প্রায় ঘণ্টা-খানেক কাটে। একটা কম্বলের আসন পেতে মালা জপ করতে করতে দেখেন, খিড়কি দরজার পাশে সজনে গাছদুটোর ওপর দিয়ে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। তখন বৌয়ের ঘরের দরজা খোলবার আওয়াজ পাওয়া যায়—ঘুম-জড়ানো চোখ মুছতে মুছতে তরলা বেরিয়ে আসে।

'কালী-তারা-মহাবিদ্যা-ষোড়শী-ভুব-নেশ্বরী'তে ছেদ পড়ে হঠাৎ। ইন্দুমতীর দুটো মাড়ির অবশিষ্ট দাঁতগুলোতে হঠাৎ কড়-কড় করে একটা হিংস্র বিদ্বেষ সাড়া দিয়ে ওঠে।

—নবাব-নন্দিনী গা তুললেন এত-ক্ষণে! আমার বরাতের জোর!

তরলা জবাব দেয় না। আজ দু বছর ধরে এ-সব তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সূর্য উঠবে, বেলা বাড়বে, সংসারের কাজ চলবে, ইন্দুমতীর মুখও চলতে থাকবে সেই সঙ্গে। কুৎসিত কটু গালিগালাজ। পানের থেকে চুণটি খসলে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করবেন, অকারণে ঝগড়া করতে থাকবেন বাতাসের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে তরলার বলতে ইচ্ছে করে : মা এবার নতুন কিছু বলুন—প্রত্যেকদিন একঘেয়ে গালাগাল শুনতে শুনতে কানের পোকা বেরিয়ে গেল যে!

জটাধর হালদারের সংসারের অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয়। আগে কিছু জমিদারী ছিল, এখন তিন শরিকে ভাগ হয়ে গিয়েও জমিজমা থেকে যা আসে তাতে সারাটা বছর মোটামুটি চলে যায়। তা ছাড়া মালদার ওদিকে গোটা দুই বড়ো বড়ো আমের বাগানও ভাগে পড়েছে, সে দুটো জমা দিয়েও বছরে হাজার বারোশো টাকা আসে। সবই আছে, কেবল জটাধর হালদারই নেই।

ইহলোকে নেই সে কথা বলা যায় না: কেবল কোথায় আছে সে-কথাটাই জোর করে বলা শক্ত। ঠিক দু বছর আগে কৃষ্ণনগরের কোনো কু-পল্লীতে একটা খুন করে ফেরার হয়েছে সে। পুলিশে এখনো তার সন্ধান পায়নি।

অল্প বয়সেই সম্পত্তি ভাগের একরাশ কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে জটাধর বখে গিয়েছিল। অন্য শরিকের দাদা-কাকারা বাধা দেয়নি, ভেবেছিল আর একটু উড়তে শিখুক জটাধর, আরো কাপ্তেন হোক—

তারপর। তারপর বাকী সম্পত্তিটা বেশ নির্বিবাদে তাদের মুঠোয় চলে আসবে।

ভয় পেয়ে ইন্দুমতী ছেলের বিয়ে দিলেন। খুঁজে পেতে আনলেন গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে তরলাকে। কিন্তু রাত-চোরা গোরুর ঘরের খড়-বিচুলিতে মন ভরে না। জটাধরের হাল-চাল এক বিন্দু বদলালো না—উল্‌টে তরলাকে মারধোর শুরু করে দিলে।

ততক্ষণ পর্যন্ত বৌয়ের সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল না ইন্দুমতীর। শান্ত নির্বিরোধ বৌটার ওপর ছেলের অত্যাচারে তাঁর চোখে জল আসত। সাধ্যমতো ছেলের হাত থেকে বৌকে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন, অনুতাপ করে বলতেন, আমারই ভুল হয়েছিল। ও বাঁদরের গলায় কি আর মুক্তোর হার মানায়!

কিন্তু চাকাটা হঠাৎ উল্‌টো দিকে ঘুরল। ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের সমস্ত লজ্জা, সব জ্বালা বিষ হয়ে ঝরে পড়ল বৌয়ের ওপরেই। সামনে জটাধর নেই বলেই তার অপরাধের পুরো বোঝাটা তিনি চাপিয়ে দিতে চাইলেন তরলার কাঁধে, নামাতে চাইলেন মনের ভার।

—সোনার সংসার ছিল আমার। এই বিষকন্যা ঘরে এসেই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে।

সত্যিই তো—বিষকন্যা ছাড়া কী আর! জটাধর বয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু বেপাড়ায় গিয়ে হঠাৎ একখানা ছোরা বের করে জলজ্যান্ত মানুষ খুন করে বসবে—একথা কে ভাবতে পেরেছিল! খবরটা পাওয়ার পরে তিনদিন ধরে গুম হয়ে বসে ছিলেন ইন্দুমতী। তারপরে তাঁর মুখ খুলল। রাক্ষুসী—সর্বনাশী—ডাইনি!

ভালো মানুষের মেয়ে হলে—মন ভালো হলে—গা-ভরা রূপ নিয়ে কি আর স্বামীকে বশ করতে পারত না? পুরুষজাত একটু উড়ু-উড়ু করেই, বার-টান তার বরাবরই থাকে; তাকে শিকলি দিয়ে বাঁধা, ঘরমুখো করা—এই তো বৌয়ের কাজ। কত উড়ো পায়রা বৌয়ের গুণে ঘরে ফিরে এসেছে, শিষ্ট-শান্ত ভালো-মানুষ হয়ে সংসার করছে, বছর বছর বৌকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছে। তরলাও কি পারত না? রূপে মুনির মন ভোলে, গুণে ডাকাত পর্যন্ত বশ হয়—আর তরলা বাঁধতে পারল না জটাধরকে? ইচ্ছে থাকলেই পারত। আসলে ডাইনিটা সংসারকে খেতেই এসেছে—তারই দোষে আজ তাঁর ছেলে এমন করে সর্বনাশের পথে নেমে গেল।

চিৎকার করে এসব কথা বলতে থাকেন ইন্দুমতী, তারপর হাউ হাউ শব্দে কান্না শুরু করে দেন। তরলা জবাব দেয় না। আশ্চর্য সহ্যশক্তি মেয়েটির। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা অবধি মাথা নীচু করে খাটে, ভেতরে এতটুকু অবসর যদি কখনো পায়—রান্নাঘরের বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সজনে গাছের মাথার ওপর দিয়ে চোখের শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে, কী যে ভাবে সেই-ই জানে।

আজ দু বছর ধরে এই ভাবেই চলছে।

ইন্দুমতী কখনো কখনো বলেন, দূর হয়ে যা—চিরকালের মতো। সরে যা আমার সামনে থেকে। তোকে আর আমি সইতে পারছি না। আমার ছেলেকে তুই খেয়েছিস, এবার আমাকে খাবি।

বৌ যায় না। গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের বাড়ী ফিরে কী দশা হবে সে-কথা তার অজানা নেই; তা ছাড়া ইন্দুমতীরই বা কী গতি হবে? আজ দু বছরের মধ্যে তিনি যেন দশ বছর বুড়িয়ে গেছেন, চলতে-ফিরতে মাথা কাঁপে, দু পা চলা-ফেরা করলে বুক ধরফড় করতে থাকে। কেবল গলার জোরটাই বেড়েছে, কিন্তু সে জোরে রান্না করে খাওয়া যায় না—এমন কি এক গ্লাশ জলও গড়িয়ে খাওয়া চলে না। বৌ সে কথা বোঝে—ইন্দুমতী যে বোঝেন না তা নয়।

সুতরাং এক রাশ হিংস্র বিদ্বেষ আর আশ্চর্য নীরব সহিষ্ণুতার একটা চুক্তি দুজনের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। আজ বৌ সামনে না থাকলে ইন্দুমতী দম ফেটে মরে যাবেন; আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর একটানা চিৎকার শুনতে না পেলে তরলার হয়তো মনে হবে পৃথিবীটা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে—সে স্তব্ধতা সহ্য করা যায় না।

সেদিনও ইন্দুমতীর তিনটের আগেই ঘুম ভাঙল। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। মনে হয়েছে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জটাধর, হাতে ছোরা, সারা গায়ে রক্তমাখা। চিৎকার করে যেন বলছে : বৌ কোথায়? এবার সেটাকে খুন করব।

ঘামে নেয়ে গেছেন ইন্দুমতী, এখনো ধড়-ফড় করছে বুকের ভেতর। কাঁপা হাতে টিপয়ের ওপর রাখা নিবু-নিবু লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিলেন, মরা লালচে আলোয় ঘর ভরে উঠল। যদিও স্বপ্ন দেখেছেন, তবু মনে হতে লাগল, এখনো কোনো ছায়ার আড়ালে ছোরা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জটাধর—একটা বিকট চিৎকার করে তাঁর সামনে যে-কোনো সময় লাফিয়ে পড়তে পারে।

লণ্ঠনের আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোষের তলায় ইঁদুরের খুট্‌-খুট্‌নি থেমে গেল, তাঁর পায়ের কাছে একটা অনধিকারী বেড়াল গুটি-শুটি মেরে

রাত্রিযাপন করছিল, জানলা গলিয়ে এক লাফে বাইরে উধাও হল সেটা। ইন্দ্মতী বালিশের তলা থেকে গীতা বের করলেন। সংস্কৃত অনেক কষ্টে ধরে ধরে পড়তে পারেন, গীতার অর্থ যে বোঝেন তা-ও নয়, তবু ওটা মাথার নীচে থাকলে কেমন যেন ভরসা পান।

সংস্কৃত শ্লোক ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্মতী গীতার বাংলা ব্যাখ্যা বানান করে করে পড়তে লাগলেন, 'সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হে কৌন্তেয়, তুমি একমাত্র আমারই উপাসনা কর। কোনো চিন্তা করিয়ো না, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।'

একটু একটু করে পড়তে লাগলেন, আর মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে জানলা দিয়ে দেখতে লাগলেন অন্ধকার রং বদলাচ্ছে কিনা। জটাধরের রক্তমাখা ভয়ংকর চেহারাটা এখনো যেন সামনে ভাসছে। লণ্ঠনের লাল আলোয় ঘরের কোনায় কোনায় যেখানে ছায়া জমেছে, সেদিকে এখনো ভালো করে চাইতেও সাহস পাচ্ছেন না ইন্দ্মতী। ঘরে থাকতে ভয় করছে, ঘরের বাইরে যেতেও পা উঠছে না।

এরই মধ্যে একবার অলিন্দদৃষ্টিতে তাকালেন বৌয়ের ঘরের দিকে। শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-বাণী একবারের জন্যে ভুলে গিয়ে হিংস্র স্বরে বললেন, হারামজাদী!

বাইরে কাকের প্রথম কোলাহল ফুটে উঠল, শোনা গেল পাখিদের কলধ্বনি। পশ্চিমের জানলা দিয়ে আকাশ ছাইয়ের রং ধরল। তখন লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে ইন্দ্মতী খাট থেকে নামলেন, দরজা খুলে ভোরের শিশিরে ভেজা হাওয়া শ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে টেনে নিলেন।

সদর দরজায় বাজের মতো শব্দ করে কড়া নড়ল সেই সময়। যেন ভেঙে ফেলতে চাইল একেবারে।

জটাধর? দারুণ ভয়ে ইন্দ্মতী আর্তনাদ করে উঠলেন একটা। আর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে তরলা বেরিয়ে এল।

—কী হয়েছে মা—কী হল?

দরজায় আবার বিকট শব্দে কড়া নড়ল।

ইন্দ্মতী বিবর্ণ হয়ে বসে পড়লেন বারান্দার ওপর। ফিস-ফিস করে বললেন, শুনছ না—কড়া নড়ছে?

—কড়া নড়ছে তো হয়েছে কী? আমি দেখছি কে এল—

আঁচল তুলে নিয়ে তরলা বারান্দা থেকে নেমে গেল। ইন্দ্মতী চিৎকার করে বলতে গেলেন, যেয়ো না—যেয়ো না, জটাধর এসেছে, তোমায় খুন করবে।—কিন্তু একটা শব্দও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। মাথাটা আরো বেশি করে কাঁপতে লাগল, আতঙ্কে পাথর হয়ে তিনি সদর দরজার দিকে চেয়ে রইলেন।

তরলা খিল খুলল। ছোরাটা এইবারে ঝলকে উঠবে, ইন্দ্মতী ভাবলেন। দেখলেন, সভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল তরলা, মাথার ঘোমটাটা বুক পর্যন্ত টেনে নামালো।

ভেতরে ঢুকলেন পুলিশের দারোগা। সঙ্গে জন তিনেক কনস্টেবল, তিন জন গ্রামের ভদ্রলোক।

—ভোরবেলায় বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করবেন না।—সংক্ষেপে মার্জনা-পর্ব সেরে নিয়ে জুতো মচমচিয়ে দারোগা ইন্দ্মতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন : আপনার ছেলে জটাধর কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল ইন্দ্মতীর। শুধু একবার মনে হল, পুলিশ কি স্বপ্নেরও খবর পায়?

ইন্দ্মতী দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, আমার ছেলে এখানে নেই।

—কোথায় আছে?

—জানি না।

—সে কবে এসেছিল এখানে?

—দু বছরের মধ্যে নয়।

—সত্যি বলছেন?—দারোগার গলার আওয়াজ চড়া হল : কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, কাল সন্ধ্যার পর জটাধরের মতো চেহারার একটা লোক চূর্ণীর খেয়া পার হয়ে এদিকে এসেছে।

ইন্দ্মতী এতক্ষণে শক্ত হয়ে উঠলেন।

—হতে পারে। কিন্তু জটাধর দু বছরের মধ্যে এ বাড়ীতে আসেনি। বিশ্বাস না হয়, খুঁজে দেখুন।

—তাই দেখব।—দারোগা পকেট থেকে একখানা হলদে কাগজ বের করলেন : এই সার্চ ওয়ারেন্ট। আর গ্রামের এঁরা সব সাক্ষী হয়ে এসেছেন।

—বেশ, করুন সার্চ।

দারোগা একবার ইন্দ্মতী আর একবার ঘোমটা-টানা তরলার দিকে চেয়ে
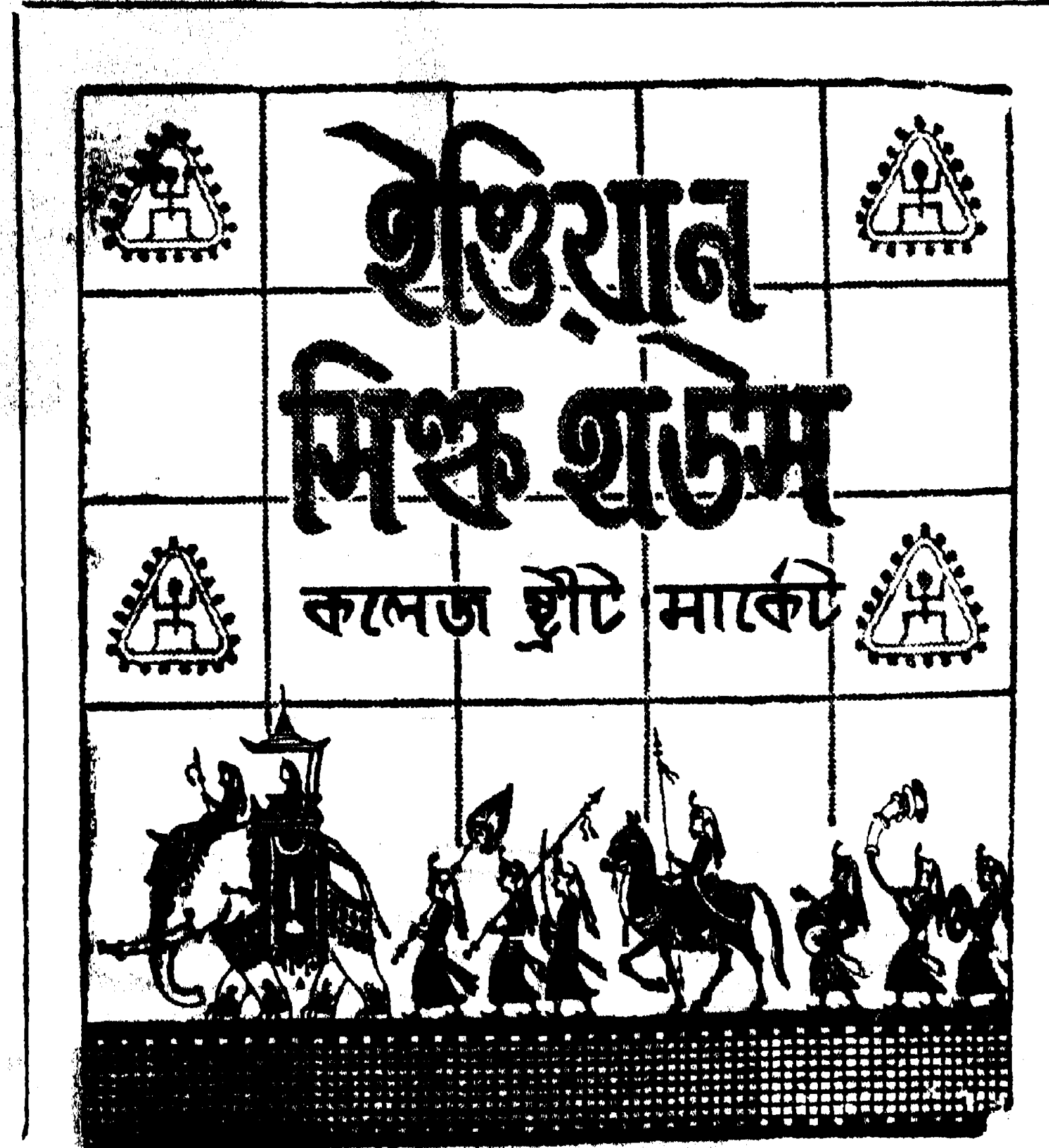
দেখলেন। তারপর বললেন, আপনারা দু'জনে ভেতরে যাবেন না, বাইরেই থাকুন।—সাক্ষীদের ডেকে বললেন, আসুন আপনারা।

খানা-তাল্লাস শুরু হল।

তক্তপোষের তলা থেকে হাঁড়ি বেরুল, কলসী বেরুল, ইঁদুর আর আরশোলা বেরুল, কেবল জটাধরকেই পাওয়া গেল না। তারপর শুরু হল বাক্স-প্যাঁটরা তচনচ করা—যদি তা থেকে জটাধরের কোনো নিশানা মেলে।

আর তখনই কেঁচো খুঁড়তে শাপ উঠল।

তরলার বাক্স থেকে বেরিয়ে এল খান তিনেক চিঠি। ফিকে নীল কাগজে লেখা—ঠিকানা নেই, তারিখ নেই। তলায় কেবল সই করা ঃ মধু।

চিঠিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়েই দারোগার ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল একটুখানি।

—এ চিঠি কে লিখেছে? আপনার ছেলে?

সাপের ছোবল পড়বার মতো চমকে উঠলেন ইন্দুমতী। জটাধর জীবনে কাউকে চিঠি লিখেছে বলে তাঁর মনে পড়ল না।

—আমার ছেলে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।—দারোগা একটু হাসলেন ঃ তবে আপনার ছেলের পক্ষে একটু বেশি কাবিক্য বলে মনে হচ্ছে। নামটাও জটাধর নয়—মধু। তিনটে চিঠিতেই কী আছে—জানেন? তোমার জন্যে আমি পাগল। তোমার কষ্ট আর সইতে পারছি না। এসো—পালাই। দু'জনে নতুন জীবন শুরু করব কোথাও গিয়ে।'—দারোগা আবার হাসলেন ঃ এ চিঠিতে আমার কোনো কাজ হবে না বোধ হচ্ছে। ওহে রামলাল, বৌমার বাক্সেই ওগুলো রেখে দাও।

সাক্ষী তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে একজন বললেন, মধু মানে—আমাদের বলাই হাজরার ছেলে নয়তো হে রাধাকান্ত? দিব্যি চেহারাখানা, ভালো থিয়েটার করে।

ইন্দুমতী আবার মিনিটখানেক আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, বাড়ী-হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরলা। নড়ছে না—যেন নিঃশ্বাসটুকুও পড়ছে না তার। সকালের লাল আলো পড়েছে তার গায়ে, মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে; ইন্দুমতীর মনে হল, জটাধর তাকে খুন করে পালিয়ে গেছে, তার সর্বাঙ্গে ও রোদ নয়, রক্ত!

আর তখনই, সমস্ত অশ্লীল কৌতুককে খান-খান করে দিয়ে, ইন্দুমতীর বিখ্যাত গলা খন-খন করে উঠল।

...তিন হাত পিছিয়ে গেল তরলা।

শুদ্ধ লোকের কুৎসিত কৌতূহলের দৃষ্টি এক সঙ্গে গিয়ে পড়েছে উঠোনের আর এক প্রান্তে। সেখানে সজনে গাছটায়

—কী সব যা-তা বলছ আমার সতী-লক্ষ্মী বৌমার নামে! মুখে পোকা পড়বে না তোমাদের? ও চিঠি আমারই ছেলে লিখেছে। তোমাদের ভয়ে ফেরার হয়েছে, নাম দিয়ে চিঠি লিখবে কোন্ সাহসে? নিজের বৌকে নিয়ে পালাতে চেয়েছে, তাতেই বা কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি? পারো তো তাকে ধরো গে, কিন্তু বৌয়ের নামে কুকথা বললে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেব!

সজনে গাছটার তলায় তরলা মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

রাশিয়ার ডায়েরী
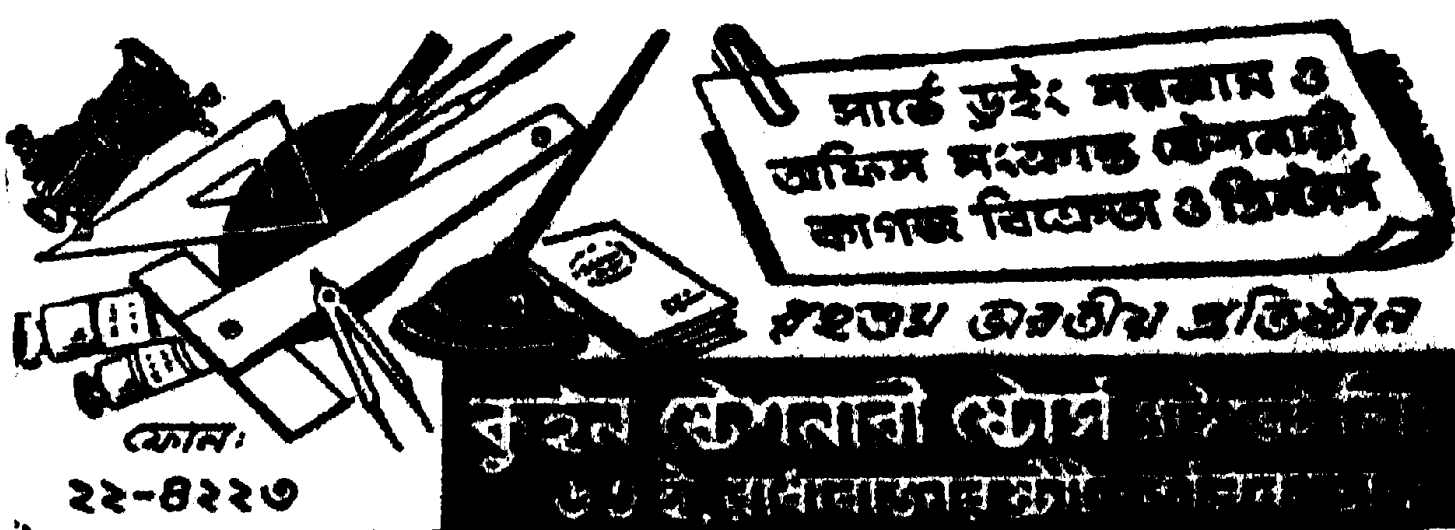
প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সতেরো ।।

মস্কো থেকে বিমানযোগে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে যখন উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ নগরের বিমানঘাঁটিতে এসে নামলুম, মস্কো টাইমে রাত তখন পৌনে দুটো। কলকাতায় বোধ হয় সকাল ছটা বাজে। মস্কো থেকে কিয়েভের দূরত্ব বোধ করি সাত-আটশ' মাইলের মধ্যে। সময় লাগল দেড়ঘন্টা। এবার আমার সঙ্গে এলেন শ্রীমতী অকসানা। এঁর কৃতিত্ব, বিদ্যানু-রাগ এবং যোগ্যতা দোভাষী-সমাজে এঁকে বিশিষ্ট আসন দিয়েছে। শ্রীমতী অকসানা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন দোভাষিণীরূপে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ তিনি ঘুরেছেন। কলকাতার গড়িয়াহাট রোড, ক্যানিং, বারুইপুর বা ডায়মন্ডহারবার তাঁর অজানা নয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভকে যে কথাগুলি আমি বলেছিলুম, এবং মিঃ খ্রুশ্চভ তার জবাবে তাঁর কলকাতার মধুর অভিজ্ঞতার যে পরিহাসসূচক বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলি যথাযথভাবে এবং অতি দ্রুততার সঙ্গে শ্রীমতী অকসানা উভয় পক্ষকে উভয় ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নামডাক প্রচুর। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ইংরেজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা—তাঁর বিশেষ প্রিয়। তাঁদের আদি বাড়ি হল আর্মেনিয়ায়। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তিনি বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা যান। অকসানার মাও নেই। এই মহিলা মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে বিধবা হন, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেননি, এবং তাঁর কোনও প্রণয়ীও নেই। কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে তিনি মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে বাস করেন ও রাইটার্স ইউনিয়নের কাজকর্ম এবং পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। তাঁর বয়স বছর বিয়াল্লিশ। ঈষৎ খর্বাকায় এবং চেহারাটি ছেলেমানুষের মতো। দুটি দুর্লভ বস্তু আছে তাঁর চেহারায়। ঘন কালো চুলের রাশি, এবং দুটি বড় বড় কালো চোখ। স্পষ্ট বোঝা যায়, এককালে তিনি আর্মেনিয় সুন্দরী ছিলেন। তিনি রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে মাসিক বেতন পান্ ২,৫০০ রুবল। ভারতীয় বিনিময় মুদ্রায় সেটি দাঁড়ায় ৩০০০্ টাকা। তাঁর কন্যাই তাঁর ঘরের কর্ত্রী। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠাবতী দোভাষিণী। পৃথিবীর বহু ভাষার বহু গ্রন্থে অকসানার কৃতিত্ব ও যোগ্যতার নানা উল্লেখ আছে। তাঁর বন্ধু-সমাজ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এবং তাঁর সম্পূর্ণ নাম অকসানা সিমেনভনা ক্রুগারসকায়া। তাঁর স্বামীর নাম ক্রুগারস্কি। পৃথিবীর সব দেশের মতোই সোভিয়েট ইউনিয়নেরও বিবাহিত নারী স্বামী ও শ্বশুরবংশের উপাধিতেই চলেন। সেখানে বিপ্লবের গন্ধও নেই!

অত রাত্রে কোনও ব্যক্তি বিমানঘাঁটিতে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারেন এটি ভাবিনি। কিন্তু দুইজন ব্যক্তি এগিয়ে এলেন এবং করমর্দন বা সৌজন্য-প্রকাশের বিন্দুমাত্র অবকাশ আমাকে না দিয়ে যেভাবে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, সেটির ভাষা নিতান্ত লৌকিকতা-পূর্ণ ছিল না,—তাতে অনুরাগ এবং আন্তরিক প্রীতির নিবিড় উত্তাপ ছিল। ইনি দশাশই, দীর্ঘাকার, গলার আওয়াজ মোটা, এবং মুখে মস্ত একজোড়া গোঁফ। ইনি উক্রাইনের প্রসিদ্ধ নাটাকার মিঃ মিন্‌কো। দ্বিতীয় ব্যক্তি সুদর্শন, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। নাম মিঃ প্লাটোকিন গ্রেগরি। গ্রেগরি কয়েকটি ইংরেজি শব্দ জানেন মাত্র। মিন্‌কো তাও না। এঁদের সর্ব-প্রকার আচরণের মধ্যে একটি মিষ্ট মধুর 'প্রাচীন' বন্ধুত্বের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল, এবং এটি উভয় পক্ষেরই দুর্ভাগ্য যে, আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝিনে!

মিন্‌কোর সমস্ত আচরণ, আলাপ, আত্মপ্রত্যয় এবং কেমন একটা বেপরোয়া ভঙ্গীর মধ্যে যে-ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটির বৈশিষ্ট্যে আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম যে, এক সময় অকসানাকে একপ্রকার আবেদনই জানালুম, কাল সকালে এঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে ত?

সকালে! আরে, এই ত' সকাল!—মিন্‌কো ঘনঘোষণে বললেন, বেশ জমিয়ে—আসুন, বসা যাক্। অন্তশত বুঝিনে মশাই, আপনাকে নিয়ে সোজা আমরা আনন্দ করতে চাই! ফেরবার তাড়া নেই ত? ব্যস, আর কিছু জানতে চাইনে। ও সব ব্যবস্থা আমরা ক'রে নেবো। অনেককাল পরে পাওয়া গেছে একজন ভারতীয় লেখককে। সহজে কি ছাড়ব মনে করছেন? আপনাদের বিমান তিন ঘন্টা লেট্, আর সেই তিন ঘন্টা আমরা দুই বন্ধু কাঁধে-কাঁধে মাথা রেখে ঢুল-ছিলুম!

তাঁর এই আল্‌গা ঘরোয়া কথাবার্তা-গুলি আমাকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে শ্রীমতী অকসানা এবং গ্রেগরি খুব হাস-ছিলেন। আমিও মশগুল হচ্ছিলুম।

আমাদের নিয়ে একখানি গাড়ি ছুট-শিল শহরের দিকে। মিন্‌কো আবার বললেন, আরে হ্যাঁ, মশাই। দেরি হচ্ছে হোক। বেশ ত, বাকি রাতটুকু এখানেই আনন্দ ক'রে কাটিয়ে যাই! এই ছোঁড়াটাকে বললুম, যা, মাল-টাল কোথায় পাস নিয়ে আয়! হতভাগাকে নড়ানো গেল না, মশাই? বলুন ত, কী দুরবস্থা—?

গাড়ির মধ্যে সবাই হেসে একেবারে লুটোপুটি। সোভিয়েট ইউনিয়নের চার-দিকে যে গাম্ভীর্য দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম,—মিন্‌কোর আবির্ভাবের ফলে সেই মেঘজাল কেটে গিয়ে আকাশ যেন রৌদ্রে ঝলমল ক'রে উঠল! বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তির সান্নিধ্য আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছিল! এঁর সম্পূর্ণ নাম হ'ল ভ্যাসিলি মিন্‌কো। সম্প্রতি বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে এঁর নাটক এখানকার প্রধান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। এঁর স্ত্রী সেই রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। তাঁর খ্যাতি প্রচুর।

শ্রীমতী অকসানা এবং বন্ধুরা সেই শেষরাত্রে আমাকে নিয়ে 'ইন্‌টুরিস্ট' হোটেলের দোতলার একটি ঘরে তুললেন। ঘরটি বড়, এবং সম্পদ্‌শালী হোটেলের নিয়মমাফিক বিবিধ মূল্যবান আসবাব-সজ্জায় আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'ইন্‌-

টুরিস্ট' হোটেলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিদেশী পর্যটকরা সাধারণত এখানেই ওঠেন এবং অজস্র রুবল ব্যয় ক'রে থাকেন। একজন ব্যক্তির পক্ষে ভদ্রভাবে থাকতে গেলে দৈনিক দেড়শত রুবলেরও বেশি পড়ে এখানে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের এটি একটি প্রধান উপায়।

পরদিন সকালে যথাসময়ে মিনকো এবং গ্রেগরি এসে উপস্থিত হলেন। অভ্যর্থনা জানালুম বটে বিশেষ সমারোহে এবং সমাদর সহকারে, কিন্তু সেটাও এক কৌতুকজনক পরিস্থিতি। কেননা উভয়ে উভয়ের কাছেই দুর্বোধ্য। তবু হাসি, আনন্দ, স্পর্শ, আলিঙ্গন—এদের নিজস্ব ভাষা আছে,—সেটি বুঝতে দোভাষীর দরকার হয় না! তাঁরা বৃহৎ একখানি গাড়ি এনেছেন। আমি যতদিন খুশি এই কিয়েভ শহর বা উক্রাইন রিপাবলিকের যে কোনও অঞ্চলে থাকব এবং ঘুরে বেড়াব। মিনকোর • রাজসিক ব্যক্তিত্ব লেখক-মহলে অতিশয় পরিচিত।

মিনকো তাঁর বিশাল বুকখানার ওপর হাত চাপড়ে বললেন, শুনে রাখুন মশাই, আপনাদের সেই 'স্বপ্নময় পরী-রাজ্যে' এই আমরা দুই পাষণ্ড—আমি আর গ্রেগরি প্রাণভরে ঘুরেছি! যা দেখেছি, তা জীবনে ভুলব না। সোনার দেশ, আনন্দের দেশ ভারত! কী আশ্চর্য মন্দির, কী সুন্দর স্থাপত্য, কী মধুর জনসাধারণ...আমাদের চিরজীবনের সার্থকতা!

কিছুকাল আগে ভ্যাসিলি মিনকো এবং স্লাটকিন গ্রেগরি এই দুজনে গিয়েছিলেন ভারতভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা গিয়ে পৌঁছন বোলপুর এবং শান্তি-নিকেতনে। সেই সঙ্গীতময় মহাকবি 'টেগোরের' কল্পরাজ্যে একজন বিশিষ্ট 'লেখক ও পণ্ডিতের' সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। বড় মধুর প্রকৃতির মানুষ তিনি। প্রশ্ন করলুম, কে তিনি? তাঁর নাম কি বলুন ত?

মিনকো এবং গ্রেগরি হাত নেড়ে মাথা চুলকিয়ে পকেট থেকে নোট বই বার ক'রে সেই ব্যক্তির নামোচ্চারণের চেষ্টা পেলেন। বললেন, "অদানু,—না, না,—আনাদ...আনদাস...ইনকার..."

একজন অপরজনের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতে গিয়ে যখন ঘরময় তুমুল হট্টগোল পাকিয়ে তুললেন, তখন আমাকে বলতেই হল, আপনারা কি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা বলছেন?

লাফিয়ে উঠলেন দুজনে জয়োল্লাসে। পরে বললেন, আপনি গিয়ে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা নমস্কার জানাবেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে "টেগোর" এবং ভারত সম্বন্ধে বহু শিক্ষালাভ করেছি। আমাদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আলোচনা-কালে তাঁরা জানালেন, চল্লিশ বছর আগে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "গার্ডেনার" নামক বইটি প্রথম উক্রাইনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেই বইটি পাঠ ক'রে উক্রাইনের সাহিত্যরসিকরা বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই ইংরেজি বইটি এসেছিল অনেক হাত ঘুরে। কেননা ভারতের বৃটিশ আমলে ভারতীয় সাহিত্যের বই এদেশে আসবার যো ছিল না। আমরা যে ভারতের সাহিত্যপাঠের জন্য কত ব্যাকুল, এটিও আপনাদের কাছে জানাতে পারতুম না! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই কিয়েভ শহরের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" অভিনীত হচ্ছিল!

মিনকো এবং গ্রেগরির মুখে চোখে গৌরবোজ্জ্বল শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে ভ্যাসিলি মিনকো একখানি সচিত্র ছোট বই সযত্নে লিখে প্রকাশ করেন। বইটি উক্রাইনীয়ান ভাষায় লেখা। নাম "নমস্তে ইণ্ডিয়া"। বইখানি তিনি আমাকে উপহার দেবার জন্য আজ এনেছেন। গ্রেগরি তাঁর একখানি কবিতার বই আমাকে উপহার দেবার সময় লিখে দিলেন, "দিল্লী দূরে নহে! আমি সেই গ্রন্থকার যিনি শোভাসমৃদ্ধ এবং জ্ঞান-বৃদ্ধ ভারতকে ভালবাসবার শিক্ষালাভ করেছেন।"

গ্রেগরির সুন্দর ও প্রসন্ন-স্মিত মুখখানির দিকে আমি একবার চেয়ে দেখলুম। এই সুদর্শন কবির বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, এবং বলোদ্দীপ্ত মিনকো বোধ করি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে এমন দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে খুঁজে পাব, এতটা আশা করিনি। করমর্দন করতে গেলে সোজা বুকে জড়িয়ে ধরে, এমন অভিজ্ঞতা সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র। সেই আলিঙ্গনের মধ্যে ঠাণ্ডা রাজনীতির বদলে ভালবাসার নিবিড় উত্তাপ অনুভব করতুম।

কিয়েভ নগরী বর্তমানে উৎকৃষ্ট একখানি ছবির মতো সুন্দর এবং মনোজ্ঞ। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এই সুশ্রী এবং সম্পদশালী নগরী অবস্থিত, এবং এরই নীচে দিয়ে পূর্ব ইউরোপের অন্যতম প্রধান নদী 'নীপার' নগরীটিকে বেষ্টন ক'রে বয়ে চলেছে। মেঘে রৌদ্রে ঠাণ্ডায় ভারি মনোরম লাগছিল।

উক্রাইনের সভ্যতা এবং জাতিয়তাবাদ ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই রাষ্ট্রের জাতীয়তা-বাদের যিনি প্রধান মন্ত্রগুরু, তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাসের পুত্র এবং নিজেও ক্রীতদাস। তাঁর নাম 'তারাস শেভচেনকো'। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কিয়েভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রীতদাসের মতোই বিনা শিক্ষায় মানুষ হতে থাকেন। কিন্তু চারিদিকের দেশ-জোড়া দুর্গতির চেহারা দেখে তাঁর মনে বেদনা ও যন্ত্রণা সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মানবতাবোধ কাব্যের আকারে প্রকাশ পায়। তাঁর কবিতা যেমন সমাদৃত হয়, তেমনি তাঁর আঁকা সুন্দর ছবিও প্রসিদ্ধি-লাভ করে। অতঃপর তরুণ বয়সে তিনি শিক্ষা-লাভের জন্য রাজধানী পিটার্স-বার্গে যান্ এবং সেখানে গ্রাজুয়েট হন্। এই সময় তাঁর কবিখ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং পাঠক-সাধারণের কাছে প্রচুর সমাদর লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সেই সকল রচনায় উত্তপ্ত স্বদেশানুরাগ এবং জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পাবার ফলে "হোথা বার বার বাদশাহজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।"—রাশিয়ার সম্রাট জার সামান্য একজন ক্রীতদাসের এই স্পর্ধিত স্বদেশপ্রেম বরদাস্ত করতে না পেরে শেভচেনকোকে সৈন্যদলে যোগদান করার জন্য কঠিন নির্দেশ দেন্। ইতিমধ্যে শেভচেনকো এতদূর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যে, দেশের জনগণ দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা চাঁদাস্বরূপ সংগ্রহ করে তাঁকে তাঁর মনিবের হাত থেকে 'ক্রয়' করেন,—কারণ তিনি ক্রীতদাস! সুতরাং এই সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নাগরিককে দুরন্ত করার একমাত্র উপায় ছিল, দেশরক্ষার অজুহাতে তাঁকে সৈন্যদলে নিয়ে আসা। কিন্তু সম্রাটের মতলব ছিল ভিন্নপ্রকার। তিনি শেভচেনকোকে সাইবেরিয়ার সমাজচ্যুত নির্জন তুষারপ্রান্তরে নানা অছিলায় প্রায় পনেরো বৎসরকাল আটক ক'রে রাখেন। এই বিপ্লববাদী কবির

বিরুদ্ধে জার আমলের পুলিশ একটি কৃত্রিম অপরাধের তালিকা সৃষ্টি করে। অতএব সৈন্য হিসাবে নয়, রাজবন্দী হিসাবেই শেভচেন্‌কো সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত থাকতে বাধ্য হন্‌। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন পুলিশ-পীড়নের ভয়ে জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে সাহস পায়নি। অতঃপর ৪৪ বৎসর বয়সে শেভচেন্‌কো পুনরায় পিটার্সবার্গে চলে যান্‌। তিন বৎসরকাল সেখানেই তিনি বাস করেন, এবং কিয়েভে নয়—পিটার্সবার্গেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

একটি বাগানের কোলে শেভচেন্‌কোর বিরাট প্রস্তরমূর্তি আজ একটি দ্রষ্টব্য সামগ্রী। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু সেটি এখন শেভচেন্‌কোর নামাঙ্কিত। এই রক্তবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের ছাত্র-সংখ্যা এখন ছয় হাজারেরও বেশি, এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৭ শতেরও ওপর। প্রকাণ্ড রাজপথ, একটি বৃহৎ উদ্যান, একটি যাদুঘর ও চিত্রশালা, একটি অপেরা হাউস, কাষ্পিয়ান সাগরের তীরে একটি বন্দর,—এ সমস্তর সঙ্গেই এখন শেভচেন্‌কোর অবিস্মরণীয় নামটি সংযুক্ত। এই ক্রীতদাস-কবিকে নিয়ে উক্রাইনের সাহিত্যে নানা কথা ও কাহিনী প্রচলিত। তিনি উক্রাইনীয় সাহিত্যের একজন দিকপাল এবং তাঁকে নিয়ে পর্যালোচনা-সাহিত্যে 'থেসিস' লেখা হয়। সম্প্রতি উক্রাইনের প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ইউজিন কিমগুক্‌ শেভচেন্‌কোর একখানি প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন। একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে ছোট একটি বাড়িতে যেখানে শেভচেন্‌কো স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, সেটি এখন জাতীয় মিউজিয়ম। শেভচেন্‌কোর সমগ্র জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাসের সমস্ত খুঁটিনাটি এই অতি সাধারণ "ক্রীতদাসের" স্বল্প-পরিসর বসতবাটিতে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই বাড়িটিতে ঘণ্টা দুই আমরা অতিবাহিত করলুম। এটি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে, পূর্ব ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথার যুগে শেভচেন্‌কো নিজে ক্রীতদাস হয়েও ক্রীতদাস জাতির মধ্যে প্রথম বৈপ্লবিক এবং স্বদেশানুরাগের প্রেরণা আনেন। এটি লক্ষ্য করার বিষয়, শেভচেন্‌কোর মৃত্যুর পর কিছুকালের মধ্যেই রুশ সাম্রাজ্য থেকে ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘটে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। "Slavery" বা "Slave trade" এবং "Serfdom"—এই দুইয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। প্রথমটি হল ক্রীতদাস কেনা-বেচার ব্যবসায়,—এবং সেই ব্যবসায়ে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের বাজারে মেয়ে বা পুরুষ কেনাবেচার মধ্যে লাভ-লোকসানের কথা থাকত। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় এই ব্যবসায় ছিল বহুবিস্তৃত। সকল দেশে এই দাস-প্রথা এখন নির্বিদ্ধ হলেও বেআইনী-ভাবে এবং সংগোপনে এই ব্যবসায় আজও চলে আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, পাকিস্তানে এবং 'ভারতবর্ষে'। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে একাধিক অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে 'বিকি' হয়েছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, এবং প্রাক্তন মেসোপোতেমিয়াতেও। মাত্র কিছুদিন আগে দন্ডকারণ্যের আশপাশ থেকে কিছু কিছু আদিবাসী মেয়েকে 'বিক্রি' করা হয়েছে পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের কোন কোনও রাজ্যে। ইংরেজ আমলে লাট-বেলাটরা হিমাচল রাজ্যের বাৎসরিক মেলায় 'আয়া'র খোঁজ করতে গিয়ে মেয়েছেলে কিনত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখনও মধ্যপ্রাচ্যে মেয়ে বিক্রি হয়। এখনও করাচী-লাহোরের লোকেরা পূর্ব-বঙ্গে গিয়ে বহু মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার আগে তাদের মা-বাপকে নাকি 'বকশিস' দিয়ে যায়। এগুলি অবশ্য ক্রীতদাসপ্রথার আধুনিক সংস্করণ!

রুশ সাম্রাজ্যে ছিল, "Serfdom"। তারা গৃহপালিত 'দাসানুদাস'। অমুক প্রিন্স বা জমিদারের রাজ্যে এতগুলি ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল এবং এতগুলি সার্ফ, অর্থাৎ নজরবন্দী দাসদাসী। এদের কোনও বেতন বা মাসোহারা ছিল না। এরা অপর কোথাও জীবিকা নেবার জন্য স'রে যেতে পারত না, এবং এদেরকে বেড়া ঘিরে রেখে গৃহপালিত অন্যান্য পশুর মতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। অসুখ বিসুখে এদের চিকিৎসা করার রীতি ছিল না। এরা কাপড় চোপড় পাবার অধিকারী ছিল না, তবে নিজেদের কাপড় বা কম্বল এরা বুনে নিতে পারত। এদের মালিক ছিল আমাদের দেশের প্রাক্তন সামন্ত নরপতিদের মতো। দেশের ভিতরে ভিতরে এদের নিয়ে কেনা বেচা চলত। একটি উৎকৃষ্ট গাভী বা বলবান ঘোড়ার দাম যখন ছিল ২৫০ রুবল, তখন একজন মেয়ে-সার্ফের দাম ছিল ১০০, এবং পুরুষ-সার্ফের দাম ১৫০ রুবল। এরা নিজেদের ফসল ফলিয়ে খেত এবং এদের দিয়ে রাষ্ট্র বা জমিদারীর সর্বপ্রকার "forced labour" করিয়ে নেওয়া যেত! এই 'সার্ফডমের' নতুন চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল হিটলারের আমলে "কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে" এবং স্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের "ফোর্সড্‌ লেবার ক্যাম্পে"। আজও সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও কোথাও এইপ্রকার ক্যাম্প আছে কিনা আমি খোঁজ পাইনি। নবনির্মাণরত কাজাখস্তান এবং সুদূর সাইবেরিয়ার কথা আমি শুনেছিলুম। কিন্তু বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি এবং মিঃ খ্রুশ্চেভের ডাক হ'ল উদার মানবতার ডাক। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও মানুষের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন চলছে, এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আমার কানে ওঠেনি। হর্মাকি আছে, শাসন ও শাস্তি আছে, কিন্তু "প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"—এমন উদাহরণ কোথাও আমার চোখে পড়েনি বা আমি কানে শুনিনি!

মস্কো শহর যেমন কঠিন কর্মব্রতী এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ী, কিয়েভ শহর তেমন নয়। এখানকার বাড়িঘর-দোরগুলি সর্বালঙ্কারে ভূষিত। মেয়ে-পুরুষের পরণে একই ডিজাইনের এমন সুশ্রী আলগা জ্যাকেট অন্য কোথাও দেখিনি। এগুলি অনেকটা ফুরফুরে পোষাক। গলায়, বুকে ও দুই হাতে রঙ্গীন পশমের কাজ। চাষী বা মজুরশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের যে কোনও মেয়ে-পুরুষ এই সুরুচি-সম্পন্ন ফুরফুরে মোটা সুতি বা রেশমী জামাটি পরে। এই জামার ডিজাইনটি নাকি হাঙ্গেরিয়ান। রাশিয়ান মেয়ে বা পুরুষের মুখশ্রী অপেক্ষা উক্রাইনীয় মুখশ্রী কিছু ধারালো, কিছু লাবণ্যময়। মস্কোর রাজপথের ঠিক মাঝখানে সুদূর দীর্ঘরেখায় 'পুষ্প-পথ' নেই, কিয়েভ শহরের বিস্তৃত রাজপথগুলির ঠিক মাঝখানে বহুবর্ণাঢ্য পুষ্পবীথিকা চলেছে, এবং তার দুই পাশ দিয়ে চলেছে অশ্রান্তভাবে যানবাহনাদি। কেউ ফুল ছেঁড়ে না, গাছ উপড়ে নিয়ে কেউ রাতারাতি পালায় না। বড় বড় গোলাপ আর ডালিয়া, বড় বড় সূর্যমুখী এবং নামহারা রঙীন ফুল—অজস্র ফুটে রয়েছে মাইলের পর

মাইল। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট দেশের বিশেষ কোথাও জমির এমন উর্বরতা, এবং ফলনের এমন অজস্রতা সহসা চোখে পড়ে না। এককালে বরিশাল জেলাকে যেমন বলা হত, "granery of Bengal". তেমনি উক্রাইন রাজ্য ছিল "granery of Europe" হিসাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক সেই প্রাচুর্যের ফলে রাজধানীতে যে বিপুল সম্পদের চিহ্ন ছড়ানো থাকে, এখানকার প্রতি প্রশস্ত রাজপথগুলিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। হিটলারের নাৎসী সৈন্য-বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ ক'রে প্রথম ভাগেই অধিকার করেছিল উক্রাইনের এই বৃহৎ প্রদেশটি ওই 'গ্র্যানারির' লোভে,—যার মোটামুটি আয়তন হল ফ্রান্সের সমতুল্য, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৬৪ বর্গমাইল, এবং যার লোকসংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি। পশ্চিম সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপ হিটলারের পদানত ছিল প্রায় তিন বছর, এবং কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরই ৮ কোটি নরনারী হিটলারের সৈনাদলের কাছে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল! উক্রাইনের জনসাধারণ চিরদিন আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদী এবং অতি প্রখরভাবে স্বদেশপ্রেমিক। ওদের প্রকৃতির মধ্যে বাঙ্গালীর ধাতু বর্তমান। ওরা বরাবর গানে, গল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে এবং বিভিন্ন শিল্পে দেশপ্রেমকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলে। হিটলারের অধিকারের কালে একজন প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত সিডর আর্তেমভিচ কউপাক অতি সংগোপনে সমগ্র উক্রাইনে একটি বিরাট 'গেরিলা-বাহিনী' গ'ড়ে তোলেন, এবং তারা নাৎসী সেনাবাহিনীকে প্রতি পদে বিপর্যস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চভ স্বয়ং উক্রাইনের অধিবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি একদিকে বিরাট এক গেরিলাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন, এবং অন্যদিকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে থাকেন। সম্ভবত যুদ্ধের কালেই তিনি ষ্টালিনের নানাবিধ স্বার্থান্বেষী আচরণ এবং দেশরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে বিরক্ত হতে আরম্ভ করেন। যতদূর বুঝতে পারা যায়, মিঃ ক্রুশ্চভ ষ্টালিনের চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না! একবার আমি এক রুশ বন্ধুকে বলি, সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটেছে ষ্টালিনের আমলে—একথা অস্বীকার করা চলে না! আপনাদের এই সব রকেট ওড়ানো, হাইড্রোজেন বোমা বা ব্যালিষ্টিক মিসলস্—এদের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা তিনিই রচনা করে গেছেন!

বন্ধুবর হাসলেন। বললেন, আমাদের পার্টি কি ঘাস খাচ্ছিল? পার্টির প্রোগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিভাগটি কারা দেখাশোনা করত?

তিনি কি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন না?

বন্ধুবর ইংরেজিতে বললেন, নামেমাত্র! তাঁর কুক্ষিগত ছিল জনকয়েক। তারা মিলিটারী আর পুলিশের কর্তা। আর জনপচিশেক ভদ্রলোক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন 'ইয়েস-মেন'! আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, নীচেরতলাকার বৃহৎ জনসাধারণ এবং দোতলার পার্টি,—এরাই নির্মাণ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন! তেতলার লোক বাস করেছে শুধু ক্রেমলিনে 'আইভরি টাওয়ারে',—নীচেরতলার সঙ্গে তাদের কায়িক কোনও যোগ ছিল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ষ্টালিন প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন, এবং সর্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। সমস্ত যুদ্ধের কালে কেউ তাঁর দেখা পায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী! একদা এই শ্রীমতী অকসানাই আমাকে বলেন, "It was not Stalin's victory, it was the victory of the Soviet people."

সেদিন মোটরে যাচ্ছিলুম দুজনে কোথায় যেন। আমি প্রশ্ন করেছিলুম, তাঁর মৃত্যুতে আপনারা দুঃখবোধ করেননি?

অকসানা জবাব দিয়েছিলেন, করেছিলুম বৈকি। কেঁদেও ছিলুম—। হাজার হোক, পুরনো লোক একজন চলে গেল! উনি বড্ড কানপাৎলা ছিলেন!

অকসানার ভাবখানা এই, উনি দুঃখ দিয়েও গেছেন অনেক, দুঃখ পেয়েও গেছেন কম নয়। শেষের দিকে ঘরের দেওয়ালের আশে-পাশে সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই তিনি ঠক ঠক ক'রে কাঁপতেন। কারোকে বিশ্বাস করবার সাহস পেতেন না, এবং কারও সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎও করতেন না!

হিটলারের সৈন্যবাহিনী এবং বোমাবর্ষণ অধিকাংশ কিয়েভ নগরীকে ধূলিসাৎ করে। অবশিষ্ট থাকে নগরের একটি ভাঙ্গা-চোরা স্বল্পাংশ কংকাল। সর্বব্যাপী সেই ভগ্নাবশেষ ছেড়ে জনসাধারণের একটি অংশ দেশগাঁয়ের দিকে পালায়, এবং অগণিত অধিবাসীর অপমৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের সময় কিয়েভ নগরীতে বাস করত ৮ লক্ষ নরনারী, নাৎসী সেনার আক্রমণ ও বোমাবর্ষণের ফলে দেড় লক্ষ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়। এখন এই বৃহৎ, সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে নবনির্মিত কিয়েভ নগরীতে ১২ লক্ষ লোকের বসবাস। এই পার্বত্য রমণীয় নগরীর বিশেষ বিশেষ 'বারান্দা' থেকে নীচের দিকে দূর-বিস্তার নীপার নদীর দুই পারের হরিৎ শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিয়েভের অন্য একটি নাম হল, 'গ্রীন সিটি', অর্থাৎ হরিৎনগর। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মাত্র দশ-এগারো বছরের মধ্যে এমন একটি বিরাট শহর সম্পূর্ণ নূতনভাবে নির্মাণ করা যায়, এটি বিস্ময়জনক। হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকার নবনির্মিত রূপের দিকে তাকিয়ে নূতন রাজপথে হাঁটা কিছু রোমাঞ্চকর বৈকি। অনেকগুলি প্রশস্ত চিক্কণ পথের এখনও নামকরণ করা হয়নি, আবার অনেকগুলির নাম রাখা হয়েছে লেনিন ষ্ট্রীট, শেভচেনকো ষ্ট্রীট, টলষ্টয়, পুশকিন ও গোর্কি ষ্ট্রীট ইত্যাদি। মস্কো অপেক্ষা কিয়েভের সৌন্দর্য, নির্মাণ-পদ্ধতি বা স্থাপত্যশিল্প অধিকতর মনোরম। এখানকার রুচি, সংস্কৃতি, গঠন-কৌশল ও প্রকাশভঙ্গী আগাগোড়া ললিতকলাসম্মত, এবং নগরের অট্টালিকা-শ্রেণীর 'ব্যাল্‌কনিগুলির' নয়নাভিরাম শোভা একমাত্র ভারতীয় এবং রাজস্থানী স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গেই তুলনীয়। মস্কোর বিচারশীল আড়ষ্টতা অপেক্ষা এখানকার শিল্পসম্মত সাবলীলতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নগরীর সর্বত্র পুষ্পশোভার দিকে তাকালে ইন্দ্রলোকের পারিজাত কাননের কল্পনা মনে মনে ভেসে বেড়ায়। জগদ্বিখ্যাত লেখক গোগল এবং বিশ্রুত শিল্পী রেপিন—এ'রা দুজন উক্রাইনের লোক। ডসটয়েভস্কি ছিলেন উক্রাইনের নিকট-আত্মীয়। শিল্পী রেপিন—যাঁর অনন্যসাধারণ চারুশিল্প লেনিনগ্রাড হারমিটেজের মহাসম্পদ, তিনি টলষ্টয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন!

উক্রাইনের প্রকৃত ও পুরাতন রাজধানী ছিল খারকভ নামক অপর একটি বৃহৎ নগরী। বিগত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে

সেই রাজধানী কিয়েভে স্থানান্তরিত হয়। রুশ বিপ্লবের পর দেশব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে উক্রাইন প্রদেশ অন্তত বার-তিরিশেক সোভিয়েট ইউনিয়নের দখল-বেদখল হয়। একদিকে উক্রাইনের প্রখর জাতীয়তাবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত, অন্যদিকে তদানীন্তন বহিঃশত্রুর আক্রমণ, হাঙ্গারী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের লোভ, এবং সর্বোপরি পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের অধিকারের প্রশ্ন! প্রধানমন্ত্রী লেনিনের জীবিতকালেই উক্রাইনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সমগ্র ইউরোপে যেটি সর্বাপেক্ষা উর্বর ফসলোৎপাদন ক্ষেত্র, সেই ভূভাগে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও জীবজন্তু অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। সেটি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। সেই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের মূলে কারণগুলির সঙ্গে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বাঙ্গলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণগুলি বহুলাংশে মিলে যায়। কিন্তু লেনিনের দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা যেমন উক্রাইনের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত ছিল, বাঙ্গলার অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িকতা তেমনি সেই দুর্ভিক্ষকালের মধ্যেই নূতন ফসলের পরিবর্তে সর্বনাশের বীজ বপন করতে থাকে! আজ উক্রাইন ধনে-সম্পদে গরিমায় প্রোজ্জ্বল, কিন্তু পূর্ববঙ্গ অনড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিয়েভ শহরে ৩ লক্ষ ইহুদীদের বসবাস ছিল। কিন্তু নাৎসী সৈন্যদল কিয়েভ শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই ১ লক্ষ ইহুদীকে ঘিরে হত্যা করে! নগরের মাঝখানের একটি খালের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ জড়ো করা হয়। এই জল-প্রণালী-পথটির নাম, 'বেবিয়ার'।

কিয়েভ শহরটি নবম শতাব্দীতে এক রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বংশের তিনটি রাজকুমারের মধ্যে যাঁর নাম ছিল 'কিয়াই', তাঁরই নামানুসারে নগরের নাম রাখা হয় কিয়েভ। 'কিভান রুশ' নামক এক উন্নত ও পরাক্রমশালী জাতি বহু শতাব্দী ধরে এখানে তাদের রাজধানী স্থাপন করে। তারপর এই নগর তাতার গোষ্ঠীর কবলিত হয়। সেদিনকার রুশ সাম্রাজ্যে অর্থাৎ আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নে খৃষ্টধর্ম কেমন করে প্রথম এই উক্রাইনে প্রবেশ করেছিল, সেই জন্ম কাহিনীটি বেশ কৌতুকপ্রদ।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যখন বাইজানটাইন্ সভ্যতা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং মধ্য এশিয়ার পথে বেশ অগ্রসরবাদী হয়ে উঠল, সেই সময় এই কিয়েভ নগরের সামন্ত নরপতি বেসিল ভ্যাডিমির একটু সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি তৎকালে 'পেগানিজম' অনুসরণ করতেন। কিন্তু পেগানিজমের মধ্যে মানবধর্ম থাকলেও নির্দিষ্ট কোনও ধর্মবিশ্বাস এর অঙ্গ নয়। সম্ভবত এই পেগানিজম থেকেই পরবর্তীকালে রুশীয় 'নিহিলিজম'-এর জন্ম হয়। রুশসাম্রাজ্য তথা বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচীন ঐতিহ্যে নাস্তিকাবাদ, নিরীশ্বরবাদ এবং সর্বধর্মবিরোধী ও সমাজচিত্তহীন মনোভাব কাজ করেছে অনেককাল থেকে। কিন্তু লেনিনের সর্বাপেক্ষা বাহাদুরী হল, সকল জাতি শ্রেণী সম্প্রদায় সভ্যতা ও ধর্মমতকে এক বিরাট অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এনে সমানাধিকারবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ বেরিং প্রণালী থেকে বুলগেরিয়ার পূর্বপ্রান্ত এবং বলটিক স্টেটস থেকে পামীরের শেষপ্রান্ত অবধি বিরাট ভূভাগকে সমস্বার্থ ভাবনার মধ্যে একত্রিত করার অর্থই হল, 'নবসভ্যতার' প্রবর্তন! সে যাই হোক, বেসিল-ভ্যাডিমির যদি সেই সময় বাইজানটাইন্ সভ্যতার আওতায় এসে ইহুদী বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন, তবে রুশ সাম্রাজ্যের পরবর্তী চেহারা দাঁড়াত অন্য প্রকার। কিন্তু যেহেতু পবিত্র কোরানে মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ, সেই কারণে তিনি গোঁড়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাজার হাজার নরনারীকে নীপারের কঠিন ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে স্নান করিয়ে শুচি-শুদ্ধ করে তোলেন। বেসিল-ভ্যাডিমির বোধ করি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। যদিও তিনি প্রচুর মদ্যপান করতেন এবং তদানীন্তন 'ভ্যাসিলকভ' নামক একটি জনপদে তাঁর ৮০০ সংখ্যক যুবতী স্ত্রী ছিল—তবুও তিনি বহু সংখ্যক গির্জা বা ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সোভিয়েট দেশগুলির প্রাক্তন ইতিহাসের মধ্যে হারেম, ক্রীতদাস, দাসরক্ষণ, বহুবিবাহ, ধর্মান্ধতা এবং নিরীশ্বরবাদ

সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের দেশের প্রাক্তন সামন্ত নৃপতির সঙ্গে ওদের গণগোত্রের বিশেষ অমিল নেই!

কিয়েভ নগরে সেই বেসিল-ভ্লাডিমির নামাঙ্কিত একটি রাজপথ রয়েছে। এখানে যতগুলি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ধর্মমন্দির চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে সেন্ট ভ্লাডিমির, সেন্ট এন্ডরুজ, সেন্ট সোফিয়া প্রভৃতি গির্জায় আজও প্রচুর নরনারী প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়। খৃষ্টধর্মের সর্বপ্রকার রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ যারা পালন করে থাকে, সমগ্র উক্রাইনে তাদের সংখ্যা প্রচুর। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ গির্জাই দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। সেগুলি আজও আছে অক্ষত অবস্থায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি পাঠাগার, যাদুঘর, চিত্রশালা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এখন পরিণত হয়েছে।

আমি সর্বাপেক্ষা অভিভূত হয়েছিলুম নূতন কিয়েভ নগরীর উপান্তে 'লাবরা' নামক একটি পুরনো পল্লীতে গিয়ে। এখানে একটি সাধু-মোহান্তের মঠের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এই সেদিন পর্যন্ত যার নাম ছিল 'পেচারস্কি মনাসট্রি'। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসী সৈন্যবাহিনী অকারণে এবং বিনা বিবেচনায় এই ইউরোপপ্রসিদ্ধ এবং বিবিধ রত্নরাজিমণ্ডিত বিরাট তীর্থমন্দিরটির অধিকাংশই ধ্বংস করে যায়। সেদিনকার উন্মত্ত বিদ্বেষ এবং পাশবিকতা বহন করে রয়েছে আজও এর চারিদিককার ধ্বংসস্তূপের জটলা। এই ধর্মমন্দিরটি সমস্ত ইউরোপের চোখে ঠিক আমাদের কাশীর বিশ্বনাথ, গয়ার গদাধর, বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পুরীর জগন্নাথ, বা দক্ষিণদেশের রামেশ্বরমের মতো ছিল। এই মণিমাণিক্যখচিত বহুবর্ণাঢ্য সুবিশাল ও সুউচ্চ তীর্থমন্দিরটি নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, এবং এটি তীর্থশ্রেষ্ঠ হিসাবে সর্বত্র সুবিদিত ছিল। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট ১৬টি 'পীঠ' বর্তমান,—আমাদের যেমন ৫১ পীঠ,—'লাবরার' 'পেচারস্কি' হল তাদেরই অন্যতম পুণ্যপীঠ। এই সুবৃহৎ ও সুমহান আয়তনের মধ্যে আজও তিন-চারটি কারুকার্যচিত্রিত দেওয়াল, কয়েকটি মণিরত্নখচিত খিলান, ভিতরের বেদীর সামান্য একটু অংশ, এবং বিরাট গম্বুজের কিয়ংপরিমাণ পার্শ্বদেশ আজও সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে যুদ্ধের সর্বব্যাপী বীভৎসতার সাক্ষ্য দিচ্ছে! আরেকবার আমি বিশ্বাস করলুম, বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আর কোনও জাতি বা দেশ এমন সর্বশূন্য হয়নি! 'লাবরার' চেহারা দেখে আমার মন হায় হায় করে উঠেছিল!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের আর্থিক ক্ষয় ও ক্ষতির একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। তাতে দেখা যায়, মোট ৬৭,৯০০ কোটি রুবল অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় ক্ষতির হিসাব দাঁড়ায় কমবেশী ৮০,০০০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকায় ভারতের ৮।১০টি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলে যেত। যাই হোক, যুদ্ধ শেষ হবার ছয় বৎসরের মধ্যে সুপ্রীম সোভিয়েট থেকে একটি আইন পাস করা হয়, তার নাম "Peace Defence Law". এই আইনটি পাস হয় ১২ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে। এটিতে বলা হয়, "যুদ্ধের প্রচারকার্য যে কোনও উপায় বা আকারেই হোক, উহা শান্তিকে বিঘ্নিত করে এবং নূতন যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি করে। এই প্রকার কার্য মানবসমাজের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ। যুদ্ধ-মনোভাবের প্রচারকার্যের অপরাধে যিনি অপরাধী হবেন, স্বভাব-দুর্বৃত্তের মতোই তিনি শাস্তি লাভ করবেন।" অতঃপর সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর বহু দেশে এক একটি শান্তি-কমিটি স্থাপনের জন্য আবেদন জানান, এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজেদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে 'শান্তি সম্মেলন' উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ রুবল খরচ করেন। তাঁদের বর্তমান জাতীয় স্লোগান হল, "মীর-দ্রুশবা"। অর্থাৎ 'শান্তি ও বন্ধুত্ব'। বড় বড় সোভিয়েট শহরের এক-একটি প্রধান চৌমাথায় এই দুটি শব্দ আলোকিত করে টাঙ্গানো থাকে। "মীর" নামক একটি রুশ ভাষার সাময়িকপত্রে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল!

কিয়েভ থেকে মাইল পাঁচিশেক দূরে সম্প্রতি একটি 'লেখক-উপনিবেশ' গড়ে তোলা হচ্ছে। একদিকে আরণ্য-প্রদেশ, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সুপ্রশস্ত জাতীয় রাজপথ পূর্ব ও পশ্চিমে। এই প্রশান্ত এবং নিরিবিলি পরিবেশের মধ্যে 'লেখক-উপনিবেশটি' গড়ে তোলবার সর্বপ্রকার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা সের্গেইভিচ ক্রুশ্চভ। তিনি উক্রাইনেরই লোক। নিজে একটি চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ডনবাস অঞ্চলের কয়লাখনিতে তিনি একদা মজুর ছিলেন। চারিদিকের ঝাউ, বার্চ এবং ওক গাছের জটলার আশেপাশে এখন পর্যন্ত মোট ২৬ খানা দোতলা বাগানবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই কয়েকজন লেখক সপরিবারে এই উপনিবেশে এসে বসবাস করছেন। আমাদের নাটাকার বন্ধু মিঃ মিনকো আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এখানে তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এই বাড়িগুলি তৈরীর জন্য সমস্ত টাকাকড়ি ষ্টেট থেকে অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের একাউন্টে। তাঁরা তাঁদের সুবিধামতো আপন আপন রয়েলটি থেকে এই দেনা শোধ করবেন,—এইটি আশা করা যায়।

আমি যখন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এবং আশেপাশে মোট কয়টি ডিপার্টমেন্টাল দোকান বাজার বসেছে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছি, তখন অদূরবর্তী একটি পুষ্পোদ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন শ্বেতশ্মশ্রুযুক্ত এবং চশমা-চোখে একজন শান্ত প্রকৃতি লেখক। এঁর নাম ইউজিন কিউইগুক। এঁর কথা আগেই বলেছি, এবং এঁকে দেখবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইনি এঁর সদ্যপ্রকাশিত বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ "শেভচেনকো, তাঁর জীবন ও সাহিত্য" এক কপি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতিসহকারে আমার হাতে দিলেন। পাতা উলটিয়ে লক্ষ্য করলুম, রুশ এবং উক্রাইনীয় লিপির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। অনেকগুলি উক্রাইনীয় অক্ষর রুশ অক্ষরের সঙ্গে মেলে না। পরে শুনেছিলুম, উক্রাইনের ভাষা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যেমন মৈথিলী হিন্দী। মিঃ ক্রুশ্চভের নিজস্ব ভাষা রুশ নয়। রুশ ভাষা উক্রাইনের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। এখানে এসে প্রথম শুনলুম, সোভিয়েট ইউনিয়নের পনেরোটি রিপাবলিক দেশে মোট ১০০টিরও বেশি ভাষা বর্তমান। কিন্তু ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নরনারীর মাতৃভাষা হল রাশিয়ান। রুশ-ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন আমলে বৃহত্তম নগর হল মোট দশটি, মাঝারি বড় শহর হল ১৫৬৯টি, এবং ছোট শহর ২৪২২টি। ছত্রিশ বছর আগে, অর্থাৎ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন বছর পূর্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাঝারি শহরের সংখ্যা ছিল ৭০৯, এবং ছোটর সংখ্যা ১২১৬। এই কালের মধ্যে বৃহত্তম নগরগুলির প্রত্যেকটি প্রায় পাঁচ গুণ প্রসার লাভ করেছে। যেমন আমাদের কলকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগর স্ফীতিলাভ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহত্তম নগরগুলি স্বভাবতঃই শিল্পপ্রধান,—যেমন মস্কো, লেনিনগ্রাড, বাকু, খারকভ, গোর্কি, তাসকন্দ, কুইবিশেভ, নভসিবারস্ক, সোয়ের্দলভস্ক এবং কিয়েভ। কিয়েভ হল সোভিয়েট ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী,—লেনিনগ্রাডের পরেই এর স্থান। রাষ্ট্রসংঘে উক্রাইন এবং বাইয়েলো-রাশিয়ার পৃথক ভোটাধিকার আছে। এই দুটি ভূভাগ পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকলেও এদের সঙ্গে রাশিয়ার একটি পুরাতন 'বন্ধুত্ব-চুক্তি' সূত্র অদ্যাবধি বর্তমান। এই দুই রিপাবলিকের প্রবল জাতীয়তাবাদ এবং প্রখর আত্মাভিমান ইউরোপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এসে এরা বিবিধ সমাজউন্নয়ন ও দেশগঠনকর্মে যথার্থ সম্মানলাভ করেছে।

কিয়েভ ছাড়াও উক্রাইনের প্রত্যেকটি বড় শহর নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাক্তন রাজধানী খারকভ খ্যাতিলাভ করেছে তার বিশাল ও প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য। স্তালিয়ানস্ক, জাডানভ, ক্রামাটরস্ক,—এরা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিপ্লবের পূর্বে জনৈক আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হিউ কুপার উক্রাইনে এসে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বৃহৎ নগর নির্মাণ করেন, তার নাম 'নেপ্রসট্রয়'। জনৈক স্কচ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হিউয়েস ডোনেৎস কয়লাখনি অঞ্চলে অপর একটি নগরীর পত্তন করেন। এক কালে সেই নগরীর নাম ছিল 'যাউজভকা'। কিন্তু পরবর্তীকালে স্টালিন সেই নগরীর নাম বদল ক'রে নূতন নাম রাখেন 'স্টালিনো'। কীর্তিনির্মাণের অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু নিজের হাতে কোনও কীর্তির উপর স্বাক্ষর করতে নেই। ওটি ছেড়ে দিতে হয় পরবর্তীকালের জনগণের ইচ্ছার উপরে। ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুরুচিসম্পন্ন। অজন্তা-এলোরা-তাজমহল-কুতবখাজুরাহো-কোনারক,—এবং অন্যান্য হাজার হাজার ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের গায়ে বা কোনও দলিলে সেই সব মহৎ শিল্পীর নাম কোথাও নেই। আমেরিকান বা স্কচ ইঞ্জিনীয়ারের সেই দুর্লভ সুরুচিবোধ ছিল। উক্রাইনের নীপার এবং বাগনদীর সংযোগস্থলে অপর একটি নগর 'নিকলায়েভ' অবস্থিত। লেনিনের সহকর্মী এবং লালফৌজের প্রতিষ্ঠাতা লিয়োঁ ট্রটস্কী, যাঁর প্রকৃত নাম 'ব্রনস্টিন' তিনি নিকলায়েভের একটি বিদ্যালয়ে ছোটবেলায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই নগরটি একটি জাহাজঘাটা। এখানে জাহাজনির্মাণের মস্ত কারখানা।

যে কয়টি অট্টালিকা নাৎসী সেনাদলের ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমাদের এই ইন্-টুরিস্ট হোটেলের বাড়িটি একটি, এবং অন্যটি হল প্রাক্তন রুশসম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয়ের প্রাসাদ। মিঃ খ্রুশ্চভের বিশেষ চেষ্টায় এই প্রাসাদটি দান করা হয়েছে উক্রাইনের লেখক ও সাংবাদিক সমাজকে। এই প্রাসাদটির মধ্যে বিচরণ ক'রে যে বিলাসবৈভব, অঙ্গসজ্জা এবং আসবাবপত্র দেখলুম, সেগুলি অবশ্য ভাইসরয়ের পরিবারের পক্ষেই মানানসই। এই প্রাসাদের বড় বড় সুসজ্জিত হল-এ লেখক-শিল্পী-গায়ক-সাংবাদিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিয়মিত সমবেত হন। উক্রাইন লেখক সঙ্ঘের সেক্রেটারী ভাসিলি কোজাচেন্‌কো আমাদের এদিক ওদিক দেখাতে লাগলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখক। মানুষটি নম্রভাষী।

স্বাধীনচেতা উক্রাইন বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিশেষ বিশেষ চুক্তিসর্তে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদান করে। স্পষ্টতঃ, এর প্রধান কারণ ছিল হিটলার এবং নাৎসীবাহিনীর দিগ্বিজয়জনিত আশঙ্কা। সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে উক্রাইনও কাঁপছিল। পূর্ব ইউরোপে উক্রাইনের উপর হিটলারের লোভ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। সেইজন্য আতঙ্কিত পশ্চিম উক্রাইন, বুকোভিনা এবং বেসারাবিয়ার একটি অংশ মিলিয়ে উক্রাইনের 'স্বাধীন' রিপাবলিক সৃষ্টি হল। হিটলারের পরাজয়ের পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে একটি 'বন্ধুত্ব-চুক্তির' বলে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলটি উক্রাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। উক্রাইনের রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে পূর্বকালের বঙ্গদেশের সঙ্গে অনেকটা মেলে। অর্থাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি এক এক যুগে এক একটি কামড় বসিয়ে 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' উক্রাইনের কয়েকটি অঞ্চল

দখল করেছিল। কেউ গ্রাস ক'রেছিল একটি জেলা, কেউ ডিভিসন, কেউ মহকুমা, কেউ বা পছন্দসই একটি অঞ্চল। কেউ কেউ নিয়েছে অঙ্গ, কেউ প্রত্যঙ্গ। কিন্তু হিটলার এসেছিল সর্বগ্রাস করতে! সে যাই হোক, সোভিয়েট আমলে উক্রাইন ফিরে পেয়েছে তার জবর-দখলকরা সম্পত্তি। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বঙ্গদেশ মার খেল সবচেয়ে বেশী, এবং ভূ-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে বঞ্চিত রইল তা'র চেয়েও বেশী। এটি ভাগ্যেরই বিদ্রূপ। কেননা,পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার এবং নীতিবিদ্ গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষুদ্র এবং হীনবল পশ্চিমবঙ্গ কেবলমাত্র জাতীয় সংহতিরক্ষার মহৎ শিক্ষার গুণে আপন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল,—এটিও দাঁড়িয়ে দেখলুম!

উক্রাইনের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের আরেকটি সৌজন্য প্রকাশ পেল এই সেদিন মাত্র—১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যেদিন ক্রাইমিয়াকে সংযুক্ত করা হল উক্রাইনের সঙ্গে।

ইউরোপের সর্বপ্রথম স্লাভরাষ্ট্র উক্রাইন আগে তাতার, পরে লিথুয়েনিয়া এবং অতঃপর বহুকাল অবধি পোল্যাণ্ডের অধীনে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রাশিয়ার সম্রাটের সাহায্যে উক্রাইন পোল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অন্যদিকে ক্রাইমিয়ার তাতার জাতি বারম্বার উক্রাইনের দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করার ফলে জনসাধারণ পর্যুদস্ত হতে থাকে। উক্রাইনের ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যত চিনি উৎপন্ন হয়, তার চার ভাগের তিন ভাগ একা উক্রাইন সরবরাহ করে। শুধু চিনি নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য, ধাতব সামগ্রী এবং কয়লা উক্রাইনই নিয়মিত যোগান দেয়। কার্পাথিয়ান পর্বতশ্রেণীর ধারে ধারে এত বড় সম্পদশালী ভূভাগ উক্রাইনের মতো দ্বিতীয় নেই। উক্রাইনের জনসাধারণ হাস্যরসিক, প্রমোদপ্রিয়, ভাবপ্রবণ, সাহিত্যোৎসাহী এবং শিল্প ও সংস্কৃতিবান। এই রাষ্ট্রে 'কলেকটিভ ফার্ম'-এর সংখ্যা ১৫,০০০-এরও বেশী, এবং এই রাষ্ট্রের নিজস্ব 'রক্তিম-নীলিমবর্ণ' জাতীয় পতাকা বর্তমান। পূর্ব ইউরোপের সর্বপ্রধান চারটি নদী—দানিউব, নীস্টার, বাগ ও নীপার তাদের অগণিত শাখানদী এবং উপনদী নিয়ে উক্রাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমের যে অঞ্চলটি রুদেনিয়া নামে এককালে চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত ছিল, সেটি এখন এসেছে উক্রাইনের মধ্যে। এটি এখন ট্রান্স-কার্পাথিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। এই ট্রান্স-কার্পাথিয়ার মস্ত নগর 'উজগোরদের' ভিতর দিয়ে সাধারণত চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীর 'জাতীয়' আন্দোলনকে 'সংযত' করার জন্য উজগোরদ নগরটি সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যবহার করেছিলেন কিনা, এ খবরটি পাইনি। কিন্তু এই খবরটি সহজেই পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিষ্ট রাষ্ট্র এই সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিগত ৪৫ বৎসর কাল ধরে আপন রাষ্ট্রসীমানা নির্ণয় ও প্রশাসনব্যবস্থায় যে-কলাকুশল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেটি ইতিহাসেও অনন্য! আজ তাঁরা আর 'রিভিসনিজ্‌ম্' বা ইতিহাস-বিশ্লেষণ চান না, 'পাকাচুলের' মুখ থেকে ভালমন্দ বিচার সহ্য করেন না, এবং এ নিয়ে কোথাও বিতর্ক দেখা দেয়, সেটাও তাঁদের মনঃপূত নয়। তাঁদের এই আচরণ ভাল কি মন্দ, সেটি তাঁদের ঘরের কথা,—অপরের নিন্দা-সুখ্যাতির দিকে তাকালে তাঁদের চলে না। কেননা সোসালিষ্ট রাষ্ট্রকে সুস্থায়ী ও দৃঢ় ক'রে তোলার কাজে তাঁরা জীবনমরণ পণ করেছেন। পাস্টেরনাকের 'রিভিসনিজমে' তাঁদের এখন প্রয়োজন নেই, উচ্চাঙ্গের রসসাহিত্য এখন তাঁদের কাজে লাগছে না, প্রতি মানুষের বিবেকসত্তার অখন্ড এবং অবারিত অভিব্যক্তি আপাতত ধামাচাপা থাক্, এবং নবগঠিত এই বিরাট সোসালিষ্ট ষ্টেটের চিন্তামানস কোনও প্রকার সাহিত্যের দ্বারা বিভ্রান্ত বা ভিন্নমুখী হয়, এটি তাঁরা বরদাস্ত করতে একেবারেই প্রস্তুত নন্। তাঁরা এখন মহৎ রসসাহিত্য চান না,—তাঁরা সেই প্রকার 'সাহিত্য' চান যেটি তাঁদের কমিউনিষ্ট সমাজকে নিখুঁৎভাবে গ'ড়ে তোলার উপকরণ হবে, যেটি প্রয়োজনে লাগবে! যেদেশে গোগল, পুশকিন, ডসটয়ভস্কি, টলষ্টয়, গোর্কি, শেকভ প্রভৃতির এমন সর্বব্যাপী নিত্য-পূজাপদ্ধতি,—সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট বা পার্টির লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত কর্মী উচ্চ রসসাহিত্যের যথার্থ মূল্য বোঝে না—এই আজগুবী ভাবনাটাও যুক্তিযুক্ত নয়! ওরা সব বোঝে, কিন্তু সব চিন্তা সরিয়ে রেখে সর্বাগ্রে ভাবে আপন রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কথা। নতুন রাষ্ট্রনির্মাণ ক'রে ওরা পৃথিবীর সর্বত্র পাঠিয়েছে একটা চ্যালেঞ্জ! অর্থাৎ 'আমাদের' এই সমাজনীতির ব্যবস্থা যদি কারও এখন ভাল লাগে তবে গ্রহণ করতে পার, ভাল যদি না লাগে পরোয়া নেই! কিন্তু 'আমাদের' সঙ্গে শত্রুতাসাধনে চেষ্টা আর করো না—সাবধান, এই দ্যাখো ১০০ মেগাটন বোমা!

ওরা শুধু যে পাস্টেরনাকের বইখানি বন্ধ করেছে তাই নয়, পৃথিবীর কোনও দেশ থেকে কোনও ভাষার অবাঞ্ছিত বই-কাগজও ওদের দেশে না ঢোকে, এই ব্যবস্থাও ওরা চালু রেখেছে। এরই অপর নাম 'আয়রণ কার্টেন'!

সোভিয়েট ইউনিয়নের রুশ ভাষায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বই মোট ৮ কোটি সংখ্যক ছাপা হয়েছে। যে যেমন পেরেছে কিনেছে। প্রত্যেক নগরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হয়েছে। নগরে নগরে শতবার্ষিকী কমিটি! ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে কোটি কোটি! প্রত্যেক রিপাবলিকের রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, গীত, জলসা, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র লেখক-সমাজ, পন্ডিত, মনীষী, এবং সর্বশ্রেণীর বিদ্বৎসমাজ সর্বত্র বক্তৃতা করেছেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে একখানি বৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থ রুশ ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে! এই রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত গভর্ণমেণ্ট মারফৎ জনকয়েক ভারতীয় লেখককেও আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, বিনা নিমন্ত্রণে ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকার কয়েকজন লেখককে পাঠানো হয়েছিল, অথচ ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশেষ বিভাগ এই আমন্ত্রণের উত্তরে আপন সৌজন্য রক্ষা করেননি! কিছুদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও ভারততত্ত্ববিদ্ মিঃ চেলিশেভ এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় এটি নিয়ে মৃদু গুঞ্জন করে যান্!

দেখতে দেখতে ৮ কোটি বই যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল, সে-দেশের গভর্ণমেণ্ট খুব নির্বোধ নয়! যারা নিজের দেশের পাস্টেরনাককে ডুবিয়ে পরের দেশের রবিঠাকুরকে তুলল, তাদের একটা নিজস্ব নীতি আছে বৈকি! কে না জানে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে মানবচিত্তের নির্মল ও স্বচ্ছন্দ মুক্তির একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি? কে না বোঝে, রবীন্দ্রসাহিত্য মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের যে-উৎপীড়ন—তার

ভয়হীন প্রতিবাদ? কে না পড়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্য করুণা, মমতা, সমবেদনা, ঔদার্য এবং ঈশ্বরবিশ্বাসে পরিপূর্ণ? সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে পাঠ করছে বেদ এবং উপনিষদের নিত্যকালজয়ী মহামন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা,—এটি কি রোমাঞ্চকর নয়? সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ ঈশ্বরবিদ্বেষী, এটি মস্ত ভুল! ওরা ধর্মবিদ্বেষী, এটি মিথ্যা! ওরা পুরনো ঈশ্বরবাদকে শোধন করতে বসেছে নতুন একটা জীবনের আসনে ব'সে। ধর্ম এবং ঈশ্বর পাছে ওদের রাষ্ট্রধর্ম ও জীবন-নীতিকে 'আফিফেন' সেবন করায়—এই ওদের ভয়। ওরা ঈশ্বরপ্রধান ধর্মকে তাড়ায়নি,—দেশজোড়া খৃষ্টমাস-উৎসব তার প্রমাণ,—যখন লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্টমাস-ফাদারকে নিয়ে মেতে ওঠে! ওরা তাড়িয়েছে গির্জাপ্রধান ধর্মকে,—যে-গির্জার অনুশাসন এবং চক্রান্ত ওদের সমাজজীবনে এনেছিল অবর্ণনীয় দুর্গতি! ওরা রবীন্দ্রনাথের ভিতরে খুঁজে পেয়েছে মানুষের বিশুদ্ধ চিত্তের সেই মহৎ ঈশ্বরভাবনা, সেই উদার জীবনধর্ম, সেই শুচিস্নিগ্ধ চিন্তার বৃহৎ পটভূমি, এবং সেই বিশ্বজয়ী নিবিড় আনন্দকল্পনা! ওরা ওদের প্রত্যেকের জীবনে এবার রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে গেছে সকলের বড় বন্ধু!

সেদিন রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ফিরে নীচের তলাকার ডাইনিং হলের মস্ত আসরে খেতে বসেছিলুম। নৈশ ভোজনে যারা আসে তারা শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিত। মেয়ে-পুরুষ চারিদিকের সেই বিশাল কক্ষে যেন ঝলমল করছিল। ওরা খায় বেশি, এই ধারণাটা দেখছি ভুল। আমরা খাই কত কম, এই প্রমাণটি পদে পদে মেলে! এখানে আমি একমাত্র প্রাচ্যদেশীয় লোক, সেজন্য আমার প্রতি অনেকের চোখ ছিল। শ্রীমতী অকসানা আজ একটি সুন্দর লতাপুষ্পশোভিত রেশমী গাউন পরেছিলেন। এক সময় যখন তিনি আমার টেবল থেকে উঠে হোটেলের হিসাবের খাতায় সই করতে গেলেন, সেই সময় ওধার থেকে একজন অতি সুশ্রী যুবক আমার সামনে এসে হাসিমুখে 'ক্ষমা করুন' বলে দাঁড়াল। সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারের ছেলে, সন্দেহ নেই। অতি বিনীত মিষ্ট কন্ঠে এবং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, যদি অনুমতি করেন ত আপনার 'মহিলাটিকে' নিয়ে আমি একটু নাচতে চাই!

রাত প্রায় বারোটা। হলের মধ্যে তখন জোড়ায়-জোড়ায় বল্-নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে। টেবলগুলির ফাঁকে ফাঁকে নাচ চলছিল এবং তারই তালে তালে প্লাটফর্মের উপরে ইউরোপীয় বাজনা বাজছিল।

যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে বললুম, ও'র সঙ্গে হঠাৎ নাচতে ইচ্ছে হল কেন?

ও'র মুখশ্রী এবং বিশেষ ক'রে চোখ দুটি বড় সুন্দর!

আমি বললুম, উনি আমার 'মহিলা' নন্। আমি ভারতীয়, এবং উনি একজন সোভিয়েট মহিলা। আমার অনুমতি না নিয়েই ও'র সঙ্গে আপনি নাচতে পারেন! আপনারা দুজনে নাচলে আমি খুশী হব।

কতক্ষণ পরে অকসানা ফিরে এসে আবার টেবলে বসলেন। তিনি বয়স্কা নারী, কিন্তু তম্বী। তাঁর দেহের তারুণ্য, মাথায় ঘন কালো কুঞ্চিত কেশরাশি এবং সুন্দর দুটি চক্ষুর বৃহৎ কৃষ্ণতারকা অনেক সময় ইরাণী বা কাশ্মিরী মেয়েকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আর্মেনিয়ার সুনাম রক্ষা করেছেন।

যুবকটি তার টেবল থেকে উঠে আবার এসে দাঁড়াল, এবং সবিনয়ে তার প্রস্তাব অকসানার কাছে নিবেদন করল। অকসানা একটু হাসলেন তার দিকে চেয়ে। পরে বললেন, "Thank you very much. But 'am afraid, I am too old to dance with you, my dear boy."

কথাটি তিনি রুশ ভাষায় বলেছিলেন। যুবকটি ম্লান মুখে ফিরে গেল।

শ্রীমতী অকসানা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটি বার ক'রে প্রায়ই লিপ্‌স্টিক বুলিয়ে নেন্ দুটি পাৎলা, ঠোঁটে, এবং সিগারেট খান্ অনেক সময়ে। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল। পোষাক পরিচ্ছদের বিলাসও তাঁর কম নয়। তিনি বিধবা। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাহাস্যে বললেন, আপনাকে বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। তবে আমার রুচির-প্রকৃতির সঙ্গে এসব মেলে না!

আমি তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করতুম।

শ্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে উক্রাইনের একটি পল্লীঅঞ্চলে। চারিদিকের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে বড় বড় এক একটি গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। কোথাও পাকা একতলা বা দোতলা বাড়ি, কোথাও বা পাকা একতলার মাথায় করোগেটের বড় বড় চালাঘর। এখন শরৎকাল। বহু ফসল উঠেছে মাঠে মাঠে। বিশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র একটি ঋতু-বৈচিত্র্য দেখি। একই সেপ্টেম্বর মাস—কিন্তু কোথাও বরফ পড়ছে, কোথাও বৃষ্টি, কোথাও গরমে পুড়ছে, কোথাও মধুর বসন্ত, এবং কোথাও বা বৃষ্টির কাল এখনও আসেনি। গ্রামের পর গ্রাম এবং মাঠের পর মাঠ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। যে-দেশের বিশালতার তুলনায় জনসংখ্যা একেবারেই কম, সেই দেশে চাষ-নিয়ন্ত্রণ বা জমি ও গ্রাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে চলবে কেন? আমাদের দেশে অধিক সংখ্যক লোকের তুলনায় জমি অল্প, ওখানে অধিক জমির তুলনায় অল্প লোক!

একটি 'কলেটিভ ফার্ম'-এর হেড আপিসে এসে নামলুম। এই ফার্মের নাম, "রেড রেড প্রডিউসার"। এখানকার কর্তা হলেন আইভান কাবানেংজ। তিনি মাঠ ময়দানের নানা জায়গা ঘুরে সমস্ত দেখাতে ও বোঝাতে লাগলেন। ইলেকট্রিক

মেসিনের সাহায্যে পর্বতপ্রমাণ এক একটি গমের স্তূপ ঝাড়াই, বাছাই, মাড়াই ও গুদামজাত হচ্ছে। লোকজন যারা আছে তারা যোগান দিচ্ছে, কিন্তু পরিশ্রম করছে মেসিন। এখানে কুয়া থেকে পানীয় জল তুলে সেটিকে শোধন ক'রে নেওয়া হয়। এক স্থলে গাভী ও বাছুরের পাল খোঁয়াড়ে আটকানো, তাদের স্বাস্থ্যশ্রী দেখে খুশী হলুম। এখানে স্কুল, ক্লাব, সিনেমা, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পার্টি অফিস,—সবই বর্তমান। শিশুদের স্বাস্থ্য দেখলে আনন্দ পাওয়া যায়। প্রত্যেকের গায়েই পোষাক, অনেকের খালি পা, অনেকে ধুলোমাখা। এই ফার্মে প্রায় ৩৭০০ লোকের বাস। আশেপাশে জলাশয় এবং সেখানে নানাবর্ণের হাজার হাজার হাঁস। মুরগির পেন, শুকরদের বড় বড় আধুনিক ডিজাইনের খোঁয়াড়, গরুর গোয়াল,—সমস্তগুলির ব্যবস্থা অতি উত্তম। হেড আপিসের বাঙ্গালাটিকে ঘিরে একটি জনপদ গড়ে উঠেছে।

মাঠের মধ্যে খাল কেটে আলু রাখা হচ্ছে উপরটায় ঘাস মাটি চাপা দিয়ে। একপাশে তিনটি বলিষ্ঠকায়া চাষী মেয়ে কয়েকটি বড় বড় ঘন দুধের বোতল, মাংস ও পাউরুটি নিয়ে টিফিন করতে বসেছে। ওদের আহার্য-পরিমাণ দেখলে গা ছমছম করে।

দুজন চাষী মহিলা আমাদের জন্য প্রচুর আহারের আয়োজন করেছিলেন। ওদের ঘরদোর যেমন তেমন। বাড়ির ছেলেরা মারা গিয়েছে বিগত বিশ্বযুদ্ধে। একটি বছর পনেরো বয়সের লাজুক মেয়ে আমার হাতে একটি সাবান দিয়ে তোয়ালে নিয়ে দাঁড়াল। এটি 'বাঙ্গালাদেশের' পল্লী-গ্রামের বাড়ির ছোট উঠোন। এখানে ওখানে দুচারটি ফুলের গাছ। ঘরের পাশে পাঁদাড়, সেটি জঞ্জাল ফেলার জায়গা। ওধারে গরু রাখার চালা। এধারে রান্না ভাঁড়ার। আমাদের জন্য ঘরের চেহারা ফিটফাট, নতুন পর্দা ঝুলছে। আমার দেশের সেই চিরকালের পরিচিত ঘরের সামনের আঙিনা, সেখানে দাঁড়িয়ে ছোট্ট, সাবানটি দিয়ে হাত ধুতে ধুতে ওই নত-মুখী ভদ্র মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের স্নানের ঘরটি কোথায়?

একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল হাসিমুখে। এ হোল মেয়েটির মামা। সে ইংরেজি জানে। সে জবাব দিল, বাথরুম আমাদের নেই!

নেই? তবে স্নান করো কোথায়?

যুবকটি বলল, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা বিল আছে, সেখানে আমরা স্নান ক'রে আসি। মেয়েরা জল তুলে আনে কুয়া থেকে!

কিন্তু স্নান ছাড়া আরও যে দু'একটা প্রকৃতির তাড়না আছে?

ছেলেটো খুব আমুদে, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে হেসে উঠল। আমি কিন্তু আশ-পাশে তাকিয়ে সন্তোষজনক জবাব পেলুম না। শুধু ভাবলুম হেড আপিস অঞ্চলে যদি এই অবস্থা আজও থাকে, তাহলে দূরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কি প্রকার?

একটি তেপায়া টুলের উপর জলের ছোট ট্যাঙ্কটি বসানো ছিল, এবং মেয়েটি তাই থেকে মগে ক'রে জল নিয়ে আমার হাতে যখন একটু একটু ক'রে ঢালতে লাগল, তখন একথা বুঝতে বাকি রইল না, এ অঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আজও করে উঠতে পারেননি! কিন্তু এখানে এই ভদ্র ও মিষ্টভাষী পরিবারটিকে দেখে সেদিন বড় আনন্দ পেয়েছিলুম। সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় চিত্রশালা দেখে খুশী হই বটে, কিন্তু একটি সজ্জন পরিবারের মধ্যে এসে তাদের সুখদুঃখের সংগে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান বোধ করি।

যুবকটির সাহায্যে এ মেয়েটিকে নানা প্রশ্ন করলুম। সে খুশী হয়ে জবাব দিচ্ছিল। সপ্তম বার্ষিক কোর্স শেষ ক'রে সে রেশমের কারখানায় কাজ করবে। তার বাবা নেই। সে এখানে মা ও দিদিমার কাছে থাকে। তার পায়ে জুতো নেই,—গ্রামের বহু মেয়েই জুতো পরে না। খালি পায়ে চলা আরাম। তারা নিজেরাই রান্নাবান্না, জলতোলা, ঘরের সকল কাজ-কর্ম, বাসন মাজা, সাবান কাচা,—সমস্তই করে। সে বিকালে চুল বাঁধে, ভাল পোষাক পরে। এ গ্রামের সবাই তাদের বন্ধু। মা ও দিদিমা পেন্সন পান্। তাদের নিজেদের গরু, হাঁস আর মুরগি আছে। তারা ভাত-রুটি দুই পছন্দ করে। এগ্রামে কা'রো বিশেষ অসুখ বিসুখ নেই। তাদের ইস্কুলে "ইন্দে"র নাম সে শুনেছে!

আহারাদির আয়োজন ছিল প্রচুর। আমরা ছিলুম জন ছয়েক। কিন্তু মহিলা দুটি পনেরো জনের খাদ্য ছয়জনকে খাওয়াবার চেষ্টা পাচ্ছিলেন। ওই যুবকটি একসময় কথা পাড়ল। বলল, আচ্ছা এটা কি হল বলুন ত? কেরালা থেকে জোর ক'রে কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করলেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট! আমরা দুঃখিত হয়েছিলুম!

মুখ তুলে হাসলুম,—আপনাদের দুঃখের কারণ?

যুবকটি বলল, হাজার হোক কমিউ-নিস্ট গভর্ণমেন্ট—!

কথাটা আমাকে পরিষ্কার করতেই হল। বললুম, কমিউনিস্টদের সংগোপন আবেদনের ফলেই ও'দের গভর্ণমেন্টকে ডিসমিস করতে হয়েছিল! নচেৎ নেহরু ও'দের সম্মানকে শেষ অবধি বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন!

কি রকম?—সকলেই যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন।

আমি সবিনয়ে বললুম, আপনাদের এই সুন্দর দেশ ভ্রমণ ক'রে আমি আনন্দ লাভ করতে এসেছি। রাজনীতি আমার পেশা নয়! এ সম্বন্ধে সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগে আপনারা খোঁজ নেবেন। আশা করি তাঁরা সত্য সংবাদ জানেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রশাসনিক বিদ্যা এখনও অর্জন করেননি, এবং তাঁদের দেশ-কর্মের নীতি এখনও স্পষ্ট হয়নি!

ছোকরার চোখে মুখে আরও কিছু উৎসুক প্রশ্ন এবং বিস্ময় ছিল, কিন্তু শ্রীমতী অকসানা তা'কে নিরস্ত ক'রে বললেন, আমার মনে হয়, ভিন্ন দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামানই ভাল!

ডাইরেক্টর এবং তাঁর সহকর্মীরা অকসানার আবেদনটি মেনে নিলেন। যুবকটি এক ফাঁকে শুধু আমাকে বল-লেন, আপনার কথায় অবাক হলুম। এসব আমরা কিছুই জানতুম না!

আমি বললুম, ভারতের প্রকৃত সংবাদ প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিক পান্ এইটিই আমার কামা।

সন্ধ্যার দিকে সেদিন আমরা কিয়েভে এসে আবার পৌঁছলুম।

গ্রেগরি প্লাটুকিন এসে নিয়ে গেলেন নাট্যকার বেসিলি মিনকোর বাড়ির দোতলায়। রাত আটটা তখনও বাজেনি। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস মিনকো, তাঁর দুই ননদ, দুই মহিলা কবি ও গল্পলেখিকা, অপর একজন অধ্যাপিকা এবং আমার সংগে শ্রীমতী অকসানা। পুরুষের মধ্যে মিনকো, গ্রেগরী এবং উক্রাইন রাইটার্স

ইউনিয়নের সেক্রেটারী বোরিস্কি কোজা-চেন্‌কোকে নিয়ে আমরা চারজন। মিন্‌কোর বৃদ্ধা জননী এবং দুটি বালক-বালিকা আড়ালে রইল। এটি মিন্‌কোর ফ্ল্যাট। বাড়িটি নতুন, এবং ফ্ল্যাটটি বেশ প্রশস্ত। ফ্ল্যাটভরা আসবাবপত্রের প্রত্যেকটি নতুন, আধুনিক এবং রুচি-সম্মত। বইপত্র চারদিকে ঠাসা। শুনলুম সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে ছোট বড় লাইব্রেরী একটি আছেই। চোখেও দেখেছি, লিফ্‌ট্-চালিকা মেয়ে উপর-নীচে করতে করতেও বই পড়ে!

মিন্‌কো আমার বাঁদিকে, মিসেস মিন্‌কো ডানপাশে। কিন্তু এই কদিনে মিন্‌কো আমার বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সরল ও সবল প্রকৃতির জন্য। এদেশে কেউ সোডার জল মিশিয়ে মদ্যপান করে না। আহারাদির মাঝখানে মিন্‌কোর পান-প্রাচুর্যের দিকে এক একবার ভীতচক্ষে যখন লক্ষ্য করছিলুম, তখন তিনি বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে একবার বললেন, ভয় পাবেন না, আমি জাত-কসাক! কসাকের নেশা হয় না!

চেয়ে দেখলুম তাঁর দিকে। টলস্টয়ের 'কসাক্‌স্' বইটি মনে পড়ে গেল। কসাকরা কখনও কোথাও বশ্যতা স্বীকার করেনি। পর্বতে, অরণ্যে, মরুভূভাগে, রণক্ষেত্রে, এবং সাংঘাতিক জীবনযাত্রায় তাঁরা অজেয়। রুশবিপ্লবের সেই ভয়াবহ তারিখ "২৫শে অক্টোবরে" এরা যদি পলাতক কেরেনস্কিকে একটি নাটকীয় মুহূর্তে পরিত্যাগ ক'রে লেনিনের পাশে এসে না দাঁড়াতো, তবে সেই বিপ্লবের সাফল্যলাভ কবে ঘটত কে জানে! আমি এই প্রথম দেখলুম একটি জাত-কসাকের চেহারা। দুর্ধর্ষ এবং বীর কসাক সম্বন্ধে মনে মনে যে-ধারণাটা এতকাল লালন করে এসেছি, মিন্‌কোর সমস্ত সরল আচরণ, স্পষ্ট ভাষণ, মধুর আপ্যায়ন, এবং সর্বোপরি তাঁর ভয়হীন স্বভাব-স্বচ্ছতা সেদিন আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়েছিল।

আমাদের নৈশভোজন চলেছিল পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি। শুধু ভোজন নয়, মন-জানাজানি, মানুষ চেনাচিনি। ওরই মধ্যে একবার গিয়ে ঢুকলুম তাঁদের রান্না-ঘরে এবং শয়নকক্ষে। বৃদ্ধা জননী ছেলের পাগলামির ভয়ে আড়ালে লুকিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে প্রচুর আমোদ করা গেল। মিন্‌কোর স্ত্রী এবং ভগ্নীরা হৈ-চৈ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। প্রায় তিনটি বেশ বড় বোতল র-মদ্য পানের পর রাত বারোটা নাগাদ মিন্‌কো একটু আত্মস্থ হয়েছেন! কোজাচেন্‌কো এবং গ্রেগরী বললেন, ওর সংগে আমরা কেউ পেরে উঠিনে! অকসানা হেসেই খুন।

মিন্‌কো আমাকে লক্ষ্য ক'রে ও'দেরকে বলছিলেন, ছেলেটা এল এত দূরে দেশ থেকে, চল্‌না ওকে নিয়ে দুচারদিন বাগান-টাগান কিংবা শিকার-টিকার করিগে! অকসানা, তোমাকে ভাল কথায় বলছি,—মস্কোর দিকে কেটে পড়ো! একে আমরা ছাড়ব না—!

উনি যে পরদেশী?

ধ্যেৎ তেরি! যে সত্যিকার বন্ধু সে পরদেশী হবে কেন? সে ঘরের, সে বুকের—!

সবাই প্রচুর পরিমাণে হাসছিল। মিন্‌কো আর একটি বোতল খুঁজ-ছিলেন, কিন্তু সেটি বোধ হয় তাঁর চোখের আড়ালে সরানো হয়েছিল!

রাত দেড়টা বেজে গেছে। অপরিমেয় আহার্য সামগ্রীর চক্রান্ত থেকে একসময় মুক্তি নিয়ে হাত ধুয়ে এলুম। বিগত ছয় ঘণ্টার মধ্যে কোনও সময় মনে হয়নি, এটি আমার নিজের বাড়ি নয়। আমার পক্ষে সমস্ত ফ্ল্যাটটি অবারিত ছিল। কিন্তু এখানেও জর্জিয়ার মতো সেই সামাজিক রীতিটি বর্তমান। যে-অভ্যাগতকে আপন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি মনে করা হয়, তিনি এ বাড়ির প্রত্যেক মহিলাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে বাধ্য!

শ্রীমতী অকসানা ভারত ভ্রমণ করেছেন বোধ হয় বার দুই। তিনি জানেন, ভারতে এ রীতি নেই। সুতরাং তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেই অস্থির। অবশেষে মিন্‌কোর স্নেহসিক্ত কঠোর শাসন ধ্বনিত হল, যাও বলছি—জানো, তুমি ঘরের লোক—!

মহিলারা কলকণ্ঠে হাসাহাসি কর-ছিলেন। বলা বাহুল্য আমাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল! বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধা জননী এবার এগিয়ে এসে নিজেই হাত বাড়িয়ে আমাকে নিয়ে শির-শ্চুম্বন করলেন। বয়স তাঁর অনেক। মিষ্ট ও শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি যাবে, মন ভাল ঠেকছে না। ভালয় ভালয় দেশে ফিরো, আমি আশীর্বাদ করি। মনে করে চিঠি দিয়ো, বাবা। এবার যখন আসবে আমাদের কাছে থেকো!

জননীর আশীর্বাদে নিরাপদেই ফিরেছিলুম! মিন্‌কোকে ভুলতে অনেক-দিন লেগেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক রিপাবলিকে রাইটার্স ইউনিয়ন যেমন এক একটি প্রবল পরাক্রমশালী দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, উক্রাইনেও তাই। সকল বিভাগের লেখক, কবি, নাট্যকার, প্রভৃতি মিলিয়ে এদের বর্তমান সভাসংখ্যা ৫৩০ জন। সমগ্র উক্রাইনে এ'দের দশটি শাখা আপিস, নিজস্ব শাসনতন্ত্র, নিজেদের বোর্ড, অর্থভাণ্ডার, ৬ খানা সাময়িক পত্র, একখানা গেজেট, একটি ক্লাব, সিনেমা হল, বড় একটি লাইব্রেরী, একটি ক্লাব ও ক্যান্‌টীন, নিয়মিত নির্বাচন, মস্ত আপিস। তাছাড়া প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, ইন্‌ফরমেশন অফিসার, কার্যনির্বাহক কমিটি। এ কমিটির প্রত্যেক ব্যক্তি উচ্চ বেতন পান। সর্বোপরি লেখকদের দখলে এই বিরাট রাজপ্রাসাদ! সে যাই হোক, প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী অলোদিয়া ক্রাভেংক আমার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি সম্প্রতি ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

'লেখক সংঘে'র পক্ষ থেকে আমাকে একটি সুদৃশ্য ও রঙীন সূচীশিল্প-সমন্বিত উক্রাইনীয় পোষাক উপহার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি মানিয়ে যেত শ্রীমতী অলেসিয়ার তনুলতায়। আমি এর যোগ্য নই।

স্টেট পার্বলিশিং হাউসে গিয়ে দুই ব্যক্তির সংগে গল্পে মেতে উঠেছিলুম। তাঁদের একজন হলেন চীফ এডিটর মিঃ রোমান চুমাক এবং অন্যজন পররাষ্ট্রীয় সাহিত্য-প্রকাশন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ নিকোলাই দিমিত্রেন্‌কো। এ'রাই উক্রাই-নীর সর্বপ্রকার সাহিত্যপ্রকাশের সর্বে-সর্বা। এ'রা যখন শুনলেন, ভারতবর্ষের যে কোনও লেখক কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও বিষয়ে যথেচ্ছ স্বাধীনতার সংগে লিখতে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারেন, তখন এ'দের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করলুম!

এই ঘরেই একটি অতি সুশ্রী মেয়ে ব'সে-ব'সে কাজ করছিল। মেয়েটি তরুণী কবি। এর মধ্যেই তা'র নাম-ডাক হয়েছে। ডাইরেক্টর মহাশয়ের নির্দেশে মেয়েটি একখানি সুশ্রী বহুবর্ণ মলাটের বই এনে আমাকে উপহার দিল। বইখানি উক্রাইন ভাষায় অনুবাদ করা "রামায়ণ"। লেখক নন্দলাল দত্ত! এর পরে মস্কোয় শিশু-সাহিত্য প্রকাশ ভবনে আরেকজন বাঙালী লেখকের একখানি গল্পের বই দেখেছিলুম। তাঁর নাম খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকেও নানা রূপ-কথার শিশুপাঠ্য বই রুশভাষায় বিশেষ শিশুপ্রিয়তা অর্জন করেছে! (ক্রমশঃ)

মতামত

॥ অভিমত ॥

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত'র আমি একজন অনুরাগী পাঠক। এর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ—যে গল্পগুলি প্রকাশ হয়, তাতে কাহিনী থাকে। সেগুলি আধুনিক রীতিদুষ্ট নয়। কয়েকটি বিশেষ ধ্বনি, ব্যঞ্জনা-মূর্ছনা ও অহেতুক ভাবালুতা চরিত্রগুলিকে ভারাক্রান্ত করে না। যদিও নতুন রীতির সব লেখাই যে এই দোষযুক্ত তা বলছি না, তবুও যে কোন কারণেই হোক না কেন এ রীতির পাঠক অত্যন্ত কম। দুর্বোধ্য বলেই শুধু নয়—সব প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা পাওয়া যায় না, এটিই বিশেষ কারণ। যাঁরা এই রীতিতে গল্প লেখেন, তাঁদের অভিমত, পর্বতকে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। অর্থাৎ পাঠককে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের কাছে। এককথায় পাঠক না বুঝলেও তাঁদের কিছু এসে যায় না। তাঁদের গোষ্ঠী বুঝলেই ফললাভ। এই স্রোতে অমৃত গা ভাসায় নি। সুতরাং পরিচালক গোষ্ঠীকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এবার অমৃত সম্বন্ধে আমার কিছু অভিমত ব্যক্ত করছি। প্রথম কথা অনুবাদ গল্প সম্পর্কে। বেশীর ভাগ অনুবাদ গল্পে আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। এর কারণ যে গল্পগুলি অনূদিত হয়, সেগুলির মূল লেখক বেশীর ভাগ প্রতিনিধি স্থানীয় নন। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে স্থান সংকুলানের জন্য হয়তো অনুবাদক সব সময় ইচ্ছা থাকলেও ভাল লেখা দিতে পারেন না। সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নমস্কারান্তে
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
কদমতলা, হাওড়া

[আমরা কিছুকাল আগে ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশী সাহিত্যের গল্প অনূদিত করে প্রকাশ করেছি। বর্তমানে বিদেশী সাহিত্যের গল্পানুবাদ প্রকাশ করছি। বিদেশী গল্পগুলি বেশীর ভাগই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের রচনা। তাঁদের সকলের রচনার ভালো ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া কঠিন, এবং মূলভাষা থেকে অনুবাদ করানো সময়সাপেক্ষ। সে জন্যে মোটামুটি পছন্দমত গল্প নিয়েই আমাদের খুশি থাকতে হয়েছে। যাই হোক, পাঠকের বক্তব্যটি বিবেচনাযোগ্য। তাঁকে এ জন্যে ধন্যবাদ জানাই। —সম্পাদক।]

॥ যৌবন সমীপে প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

৯ই মার্চ সংখ্যার অমৃত পত্রিকায় কণাদ চৌধুরী লিখিত যৌবন সমীপে অকাল বসন্ত আলোচনাটি পড়ে একটু শঙ্কিত হলাম। আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা যৌবন চেতনাকে যেভাবে স্বাগত জানাচ্ছে সেটি সভ্যতার পরিচায়ক না উচ্ছৃংখলতার পরিচায়ক স্বয়ং লেখকই সে প্রশ্ন তুলেছেন। সভ্যতা, সুরুচি, শালীনতার পাঠ ভারতবর্ষ অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিশ্চয়ই নিতে চাইবে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতারও বনেদী গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ধরা হয় কিনা সন্দেহ। অর্থপ্রাচুর্য জীবনযাপনের মান যেমন উন্নত করে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার যেমন সুযোগ এনে দেয়, পৃথিবীর চক্ষে ক্ষমতাবান শক্তিরূপে রাষ্ট্রকে যেমন সম্মানিত করে, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির দিকও রয়েছে। অর্থ-প্রাচুর্যে রাষ্ট্রে 'অলালের ঘরের দুলাল' (এবং দুলালীরও) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র আজ সেই সমস্যার সম্মুখীন। লেখক এবং জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি আমার নিবেদন এই জাতীয় আলোচনা লেখা বা প্রকাশনা থেকে তাঁরা বিরত থাকলেই বোধ হয় ভালো হয়। আমেরিকার সভ্যতার খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল যথেষ্টই রয়েছে। কিন্তু যে জাতীয় জীবনাদর্শের চিত্র এদেশের অপরিণত কিশোর-কিশোরীদের মাথা বিগড়ে দিতে পারে তার প্রচার বিষয়ে সংযত হওয়া প্রয়োজন মনে করি। লেখক তাঁর আলোচনায় 'দিশেহারা কৈশোরের' নিন্দাই করেছেন অবশ্য, তবু ধীরভাবে ভেবে দেখতে বলি, এ জাতীয় আলোচনা থেকে অনুন্নত নবগঠনমুখী ভারতের কিশোর-কিশোরীদের অকল্যাণের আশংকা রয়েছে কিনা। আমার বক্তব্যকে লেখক বা প্রকাশক ভুল বুঝবেন না, আশা করি।

নমস্কারান্তে
দীপালী সেন
সিউড়ি, বীরভূম

['অমৃতে' সমস্ত রকম জ্ঞাতব্য বিষয়ই ছাপা হয়। আমেরিকা একটি মহান দেশ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সু-উন্নত। কিন্তু সে সমাজেরও সমস্যা আছে। ভারতে রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত বিখ্যাত মার্কিনী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গলব্রেথ যাকে 'অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি' বলেছেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চেহারা কেমন দুশ্চিন্তাজনক হ'য়ে উঠেছে সেটাই আলোচ্য নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়। আমরাও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে দ্রুতগতিতে এগোতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার যে তাতে যেন সামাজিক বিকৃতি না আসে। সেই আশাতেই এ নিবন্ধ ছাপা হ'য়েছিল। আশা করি পত্রলেখিকাও আমাদের বক্তব্যকে ভুল বুঝবেন না। —সম্পাদক]

মসিরেখা

জরাসন্ধ
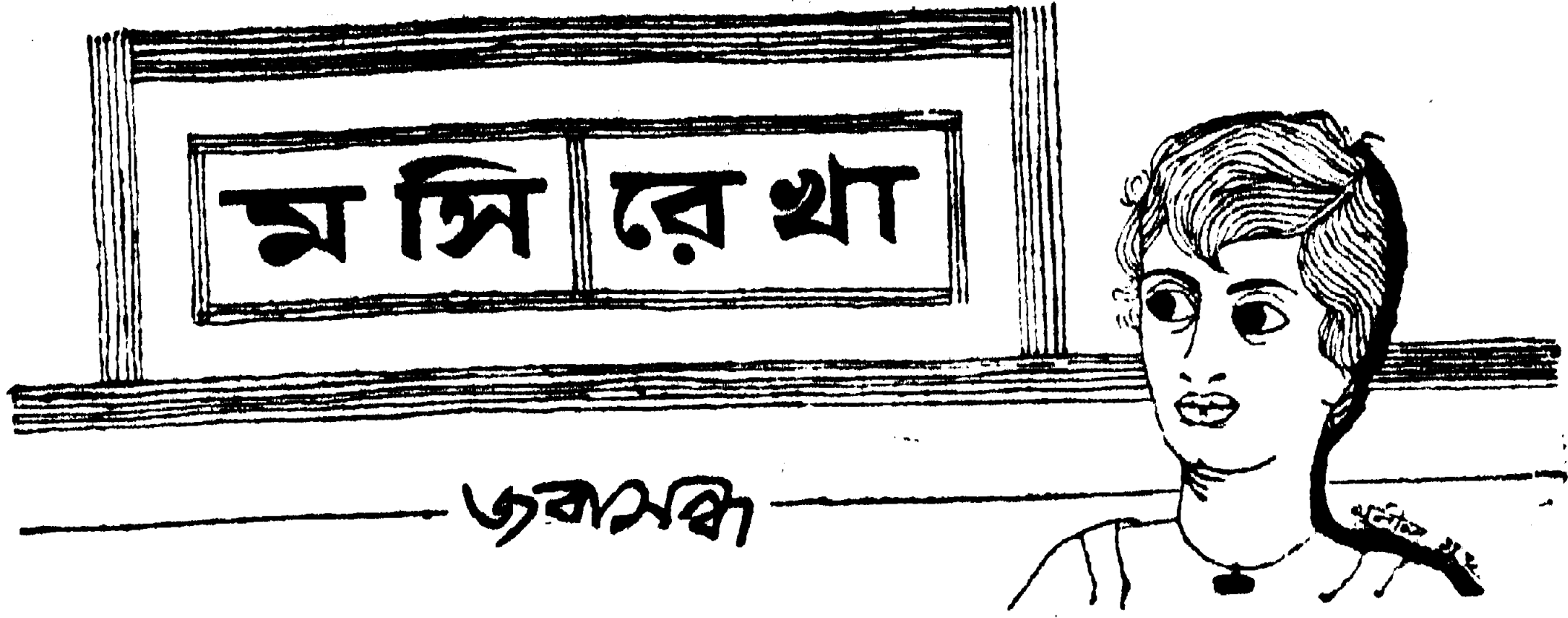
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিজুর মা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। নির্মলা তাড়াতাড়ি দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বাইরের ঝাঁপটা ভেজিয়ে রেখে তাঁকে গিয়ে বলল, ওদিকটায় একটু নজর রাখবেন দিদি। আমি চট করে একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাচ্ছিস এত বেলায়?

—দেখি, সেই টাকা কটা পাওয়া যায় কিনা।

—ও বেলায় যাস। এখন বেরোলে রান্না করবি কখন?

—না, দিদি, মনে যখন পড়ল, কাজটা সেরেই আসি।

বলতে বলতে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। বিজুর মা সেইদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, ক'দিন আগে এই টাকার কথা তিনিই ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। নির্মলা তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিয়েছিল, থাকগে, ওর জন্যে আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না।

বিজুর মার হাতে কোনো কাজ ছিল না। রান্নাবান্নার পাট অনেক আগেই সেরে ফেলেছেন। স্বামী খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়েছেন, ছেলে স্কুলে। নির্মলা যখন গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপরেও অনেকক্ষণ বাইরের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ফাঁকা রাস্তা। পুরুষেরা যে যার জীবিকার ধাঁধায় বেরিয়ে পড়েছে, মেয়েরা ভিতরে—কেউ বাকী রান্নাটা সেরে রাখছে, কেউ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে কচি ছেলের কান্না, আর মায়েদের চিৎকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কলের জল চলে গেছে; সেখানটাও জনহীন।

বিজুর মার হঠাৎ নজরে পড়ল, শহরের দিক থেকে দুজন পুলিশের লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা বোধ-হয় খুঁজছে। ওদের দেখেই দুচোখে বিরক্তি এবং তার সঙ্গে কিছু আশঙ্কাও ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সরে যাবেন এমন সময় একজন পুলিশ বলে উঠল, 'ওগো বাছা, শুনছ?' বিজুর মা বাধ্য হয়েই দাঁড়ালেন। লোকটি এগিয়ে এসে বলল, এখানে খোকার মা বলে কেউ থাকে?

বিজুর মার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পুলিশের লোক যখন খোঁজ করতে এসেছে, নিশ্চয়ই কোনো নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে হতভাগীর। কোনো রকম দ্বিধা না করে বলে ফেললেন, না; ওনামে এখানে কেউ থাকে না।

—আশে-পাশে কোনো বাড়িতে?

—কোথাও নেই।

—তোমরা এখানে ক'দিন আছ?

—পাঁচ ছ বছর হবে।

পুলিশ কনস্টেবল তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, তাহলে ঠিকই বলছে। এ বস্তিতে হবে না। ওদিকটায় চল।

দ্বিতীয় লোকটি এদিক ওদিক এক-বার দেখে নিয়ে বলল, আম গাছ আর জলের কল কিন্তু ঠিক মিলে যাচ্ছে।

প্রথম পুলিশটি হেসে উঠল—তা মন্দ বলনি। গোটা বেলেঘাটায় আম গাছও আর নেই, কলও এই একটি।

সঙ্গীটি বিরক্তির সুরে বলল, তা না হয় আছে, কিন্তু আর কত ঘুরবে বল দিকিন? সেই সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। চল এবার ফিরি। এরকম খোঁজার কোনো মানে হয় না।

পুলিশের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কিসব বলতে বলতে শহরের দিকে চলে গেল। বিজুর মা তার আগেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরা যে খোকার খবর নিয়ে আসতে পারে, এরকম কোনো সম্ভাবনা তাঁর একবারও মনে হয়নি। পুলিশ তার খোঁজে এসেছিল, শুনতে পেলে এই দুঃসময়ে নির্মলা পাছে আরো ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তাই এ ব্যাপারটা তার কাছে বেমালুম চেপে যাওয়াই স্থির করলেন।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়বার বেশ কিছুক্ষণ পরে ভীম নামে চাকরটি বিরক্ত মুখে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে খুলে দিল এবং নির্মলাকে দেখেই ঝাঁজিয়ে উঠল, কী চাই? পরক্ষণেই বিস্ময়ের সুরে বলল, খোকার মা! ঈস, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না। খুব অসুখ করেছিল বুঝি?

নির্মলা ম্লান হাসির সঙ্গে জবাব দিল, না তো। মা কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে। উঠতে সেই চারটে, নীচে নামতে পাঁচটা। তুমি কি আর কোথাও কাজ করছ?

—না।

—ভালোই হয়েছে তাহলে। তিনদিন হল বাসন মাজার লোক নেই। আমাকে বলছে খুঁজে আন। আমি কোথায় পাই, বল দেখি? তুমি যাবার পর তিন তিনটা নিয়ে এলাম। সব দুদিন চারদিন কাজ করেই পালিয়ে গ্যাছে। দিনরাত খিটখিট করলে টেঁকে। তোমার আমার কথা আলাদা। কেমন একটা মায়া পড়ে গ্যাছে। কি বল?

হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল, নির্মলা

এতক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতা থামিয়ে বলে উঠল, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসে বসো তাহলে। কাল থেকেই আসছ তো?

নির্মলা ঢুকতে ঢুকতে বলল, দেখি, ও'রা যদি বলেন......।

—বলবে না মানে? তোমার মত লোক পাবে কোথায়?

ওপর থেকে গৃহিণীর গলা শোনা গেল— কেরে? কার সঙ্গে বক বক করছিস? দুপুর বেলা দুমিনিট একটু চোখে বুজবো, তারও কি জো আছে? চব্বিশ ঘন্টা বাড়িতে যেন কাগ পড়ছে আর চিল উড়ছে।

ভীম এইসব মন্তব্য গায়ে না মেখে খুশী-ভরা দরাজ গলায় ঘোষণা করল, খোকার মা এসেছে, মা। গৃহিণী এবার আর বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বিশেষ উৎসাহও দেখালেন না। সংক্ষেপে বললেন, বসতে বল।

পাঁচটা নয়, তার অনেক আগেই আজ তাঁকে নীচে নামতে দেখা গেল। নেমেই অনুযোগের সুরে বললেন, ধন্যি মানুষ তুমি বাছা। সেই যে গেলে, তারপর এক-বার একটা খবরও কি নিতে নেই এখান-কার, লোকগুলো রইল না গেল? অ্যাদ্দিন কাজ করলে, এত করে খাওয়ালাম, দাওয়ালাম, কাপড় চোপড় দিলাম—

কথার মাঝখানেই ভীম অনেকটা যেন কৈফিয়তের মত বলে উঠল, ওর খুব শক্ত অসুখ করেছিল, মা। দেখুন না চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে।

—তুই থাম, বাপু, ধমকে উঠলেন গৃহিণী, অসুখ যেন আর কারো করে না। এই যে আমি তিন মাস ধরে অম্বলে ভুগছি, খবর রাখিস তোরা?

ভীম চুপ করে গেল। নির্মলা গোড়া-থেকেই নীরব ছিল। সে জানে এসব অভিযোগ শুধু শুনে যেতে হয়, উত্তরে কিছু বলতে নেই, বললে তার খণ্ডন হয় না, বরং অনাবশ্যক তিক্ততা বেড়ে চলে।

আরো কিছুক্ষণ সংসারের নানা আপদ-বিপদ ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটের একটানা বর্ণনা দিয়ে এবং তাঁকেই যে সব এক হাতে টানতে হচ্ছে, নৈলে কে কোথায় ভেসে যেত: ইত্যাদি তথ্য সগর্বে পরিবেশন করে গৃহিণী এতক্ষণে কাজের কথায় নেমে এলেন—তা, অ্যাদ্দিন পরে কী মনে করে?

এর পরেই টাকার কথাটা পাড়তে নির্মলার বড় লজ্জা হল। কিন্তু না বললেও চলে না। সুযোগ সুবিধামত আরেক দিন এসে বলবে, তারও উপায় নেই। ভাড়া না মেটালে যে কোনো মুহূর্তে তাকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই কয়েকবার ইতস্ততঃ করে, মাটির দিকে চেয়ে কোনরকমে বলে ফেলল, টাকা কটার বড় দরকার ছিল মা। বাড়িওয়ালা—

—ও, তাই বল। টাকার তাগাদায় এসেছ? আমি আরো ভাবছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর দু'চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। মাথার উপর আঁচলের কোণটা তুলে দিয়ে বললেন, আজ এত সকাল সকাল?

কর্তা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশী গলায় বললেন, কে এসেছে দ্যাখ।

তাঁর পিছনে নতুন আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই গৃহিণী কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মা! ওকে কোত্থেকে ধরে আনলে?

—ভুল করলে দিদি। আমিই বরং ও'কে ধরে নিয়ে এলাম। ও'র সেই

—ও, তাই বল। টাকার তাগাদায় এসেছ?

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই গৃহিণী চাকরটাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ্ তো কে?' ভীম গিয়ে কপাট খুলতেই কর্তাকে ঢুকতে দেখা গেল, ক্লাইভ স্ট্রীটের কোটর থেকে। যে তেপান্তরে এসে ডেরা বেঁধেছে—

নির্মলা অজানতে কখন মুখ তুলে তাকিয়েছিল। সেদিকে একবার চেয়েই

আগন্তুক সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। গৃহিণী তার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, ও কেউ না। আমাদের বাসনমাজার ঝি, খোকার মা। চল ঘরে চল।

বলে, বৈঠকখানার দিকে ইঙ্গিত করে নিজেই প্রথম পা বাড়ালেন, এবং চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে খোকার মার উদ্দেশে বললেন, তোমাকে খানিকক্ষণ বসতে হবে বাছা।

নির্মলা এক পলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। যে স্বর শুনে মাথা তুলেছিল, তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনুমানে যখন বুঝল ও'রা সকলেই ওদিকে এগিয়ে গেছেন, সেই মুহূর্তে কাউকে কিছু না বলে এবং কোনো দিকে না চেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। তখন শুধু একটি মাত্র চিন্তাই তাকে অধিকার করে বসেছিল—যত দ্রুত এবং যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে তাকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। কেন, এমন করে পালাবার কী অর্থ হতে পারে সেকথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে চা জলখাবারের ব্যবস্থা করবার জন্যে গৃহিণী যখন এদিকে আসবার প্রয়োজন হল, নির্মলাকে দেখতে না পেয়ে ভীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথায় গেল রে?

—কী জানি মা, আমি তো বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, নেই।

একটু আগে বড় মেয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে। বলল, কার কথা বলছ? খোকার মা?

ভীম বলল, হ্যাঁ, দিদিমণি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

—আমি যখন আসছিলাম, হঠাৎ দেখি ওধার দিয়ে যাচ্ছে। ডাকলাম; সাড়া দিল না। কিছু একটা ভাবছিল বোধহয়। শুনতে পায়নি। জোরে হে'টে চলে গেল।

—শুনতে ঠিকই পেয়েছে। পাঁচ মিনিট বসিয়ে রেখেছি বলে গোসা হয়েছে মহারাণীর।

—কী জন্যে এসেছিল?

—টাকা আদায় করতে, আর কী জন্যে?

—দিয়ে দিলেই পারতে। গরিব মানুষ। দরকারে না পড়লে আসত না।

গৃহিণী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, আমি কি বলেছি দেবো না? বিজন এল, তাই একটু বসতে বলেছিলাম। অপরাধের মধ্যে তো এই।

—কে এল? বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল মেয়ে।

—তোর বিজন-মামা। ও, তুই বুঝি এখনো দেখিসনি?

—না; কোথায়?

—ওপরে, আমার ঘরে।

মেয়ে ছুটতে ছুটতে সি'ড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ঠিক পাশেই কলতলায় কর্তা হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। খোকার মা সম্পর্কে এদের সব কথাই তাঁর কানে গিয়েছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। দোতলায় উঠবার আগে সি'ড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভীমকে শুধু ডেকে বললেন, তোর কাজ সারা হলে একবার ওপরে আসিস।

নির্মলার জীবনে বিজন ব্যানার্জি নামক ব্যক্তিটির যে ছায়া পড়েছিল, সেটা ঠিক চলতি মেঘের ছায়া নয়। কোলকাতার শহরে অবস্থাপন্ন ঘরের সাচ্ছন্দ্য-লালিত, আমুদে ও প্রিয়দর্শন, মেজদির এই

আদরে দেওরটিকে ঘিরে তার কুমারী মনে একদিন গভীর মোহসঞ্চার ঘটেছিল। ওদের দুজনের সম্পর্কে তার বাবা যে ইচ্ছা ও আশা পোষণ করতেন, এবং যা তিনি মেজোমেয়ের কাছে অপ্রকাশ রাখেননি, সেইটুকু আশ্রয় করে সে নিজের জন্যে একটি স্বপ্নলোক গড়ে তুলেছিল। তারপর সে স্বপ্ন যেদিন ভেঙে গেল, সেদিন, আঘাত যতই লাগুক, যা পায়নি, তার জন্যে হা' হুতাশ না করে, যা পেল, তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ঠিক সেই সময়ে ধূমকেতুর মত আবার যদি ঐ বিজন এসে না দাঁড়াত তার নতুন পথের দোর গোড়ায়, নির্মলা হয়তো সেই দূর গ্রামোপান্তে খড়োঘর আর ধানের গোলা ঘেরা দরিদ্র সেকেন্ড মাষ্টারের স্বাদগন্ধহীন স্বল্প-পরিসর সংসারের মধ্যেই নিরুদ্বেগে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার ভাগ্য-বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তাই তার বিবাহিত জীবন শুরু হতে না হতেই এক পরম সন্ধিক্ষণে বিজন ব্যানার্জির পুনরাবির্ভাব। কেবল মাত্র আবির্ভাবের আঘাতটাই হয়তো তেমন সুদূরপ্রসারী হত না। কিন্তু বিজন সেদিন সেই বিগত দিনের মতই নির্মলার একান্ত সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তার অন্তরের গোপন-লালিত ক্ষত স্থানটিকেও অকপটে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছিল। একদিন যাকে কামনা করেছিল, আজ সে অপ্রাপনীয়া জেনেও সেই ঈপ্সিত সম্পর্কের নিস্ফল দাবি শিথিল করতে চায়নি। নির্মলা সেটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া আর কীই বা তার করবার ছিল? সেকথা কি বিজন জানত না? জানত। কিন্তু জানা আর মানা তো এক জিনিস নয়। প্রাপ্যকে নতশিরে গ্রহণ করবার মত মনোবল সংসারে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। বিজনের তা ছিল না। হয়তো সে বয়স তার নয়, কিংবা সে চারিত্রিক দৃঢ়তা তার আয়ত্ত হয়নি। তাই যাবো যাবো করেও তার যাবার দিন কেবলই পিছিয়ে গেছে। চিরজীবনের তরে যাকে হারালাম, তাকে যতটুকু কাছে পাওয়া যায়—এই দুর্জয় মোহ সে ত্যাগ করতে পারেনি। তার হাসি-গল্প-আমোদ-তামাসার অন্তরালে ছিল লোভ। নির্মলার কাছে সেটা লুকনো ছিল না।

এমন সময়ে এল নরেন এবং তাকে নিয়েও শুরু হল নানা রকম ঠাট্টা-পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতার পালা। সেখানে প্রধান নায়কের অংশ নিল বিজন। কে জানে, সেটা কি শুধু নিরুদ্দেশ্য সরল কৌতুক না তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল কোনো হিংস্র আঘাত—চেয়ে দ্যাখ নির্মলা, কী তুমি পেতে পারতে আর কী পেয়েছ? আসলে যা-ই হোক, অন্য সকলে যেভাবেই নিক, নির্মলার কানে কিন্তু এই রূঢ় ইঙ্গিতটাই সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল। বিজনের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি হাসির আবরণ ভেদ করে অবজ্ঞা ও অপমানের বিষ মাখানো ধারালো তীর সোজা এসে বিঁধেছিল তার বুকে।

এ ইঙ্গিত তো নির্মলার কাছে নতুন নয়। মেজদির মুখে এবং অন্য কারো কারো চোখে এর সুস্পষ্ট আভাস সে আগেই পেয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঐ বিশেষ লোকটির অনেক তফাৎ। ঐ একটি মাত্র মানুষের কাছে সে হার মানতে পারে না। নিজের মনে যদি একে মিথ্যা বলে জানত, হয়তো এ আঘাত তার গায়ে লাগতনা। কিন্তু তখনো যে তার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে আছে না-পাওয়ার ক্ষোভ। কালক্রমে একদিন হয়তো সেটা নিভে যেত। কিন্তু তার আগেই, যাকে আশ্রয় করে সে জ্বালা, সেই এসে তাতে ইন্ধন যুগিয়ে বসল। তার মূর্খ, অর্ধসভ্য, দরিদ্র স্কুলমাষ্টার স্বামীর সম্বন্ধে সভ্য, সুশিক্ষিত বড়লোক বিজন ব্যানার্জির সেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি—'যে যা তাকে সেই-ভাবেই দেখা উচিত ছিল' নির্মলার মনে যে দাব-দাহের সৃষ্টি করেছিল, সে সেখানেই থেমে যায়নি, ছড়িয়ে পড়েছিল তার ছোট্ট শান্ত সংসারের বুকের উপর। সে যেন একটা উদ্ধত চ্যালেঞ্জ, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান। তারই প্রত্যুত্তরে শুরু হল তার জীবনব্যাপী নির্মম সংগ্রাম। সেখানে ঐ বিজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং তার বিরুদ্ধে নিজেকে ও নিজের স্বামীকে সে আগাগোড়া অস্ত্রের মত ব্যবহার করে গেছে। সর্বস্ব পণ করে, বহু দুঃখ বরণ করে গ্রাম্য জীবনের সেই দীনতার ভিতর থেকে স্বামীকে টেনে তুলে ঐ দাম্ভিক লোকটার সমস্তরে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার কিছুমাত্র স্বস্তি ছিল না। এ যেন এক সর্বনাশের খেলা, যেখানে হার মানুষকে নিরস্ত করে না, মাতিয়ে তোলে। তেমনি এক মত্ততার উন্মাদনা নির্মলার সমস্ত চেতনাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাকে ফিরে তাকাবার অবকাশ দেয়নি, একটির পর একটি দুঃখ দুর্দশার ভিতর দিয়ে শুধু অন্ধ বেগে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর একদিন অকস্মাৎ সে ধ্বংস-যজ্ঞের অবসান, এবং তার শেষ আহুতি তার হতভাগ্য স্বামী।

কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করাই বোধ হয় জীবনের ধর্ম। প্রত্যক্ষ সত্য হলেও তাকে চরম সত্য বলে মানুষ কোনোদিন মেনে নেয়নি। চির-আবহমান জীবন-ধারাকে সে ব্যাহত করেছে কিন্তু অবলুপ্ত করেনি। নির্মলার মত সর্বস্বহারা সামান্য নারীর ক্ষুদ্র জীবনেও মৃত্যু শেষ ছেদ টেনে দিতে পারল না। একটি অসহায় শিশুকে বুকে করে আবার শুরু হল তার যাত্রা। আবার সেই নিরলস সংগ্রাম, কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার লড়াই, অবিচ্ছিন্ন নৈরাশ্যের অন্ধকারে দূরাগত আশার সংকেত।

খোকাকে আশ্রয় করে নতুন করে বুক বেঁধেছিল নির্মলা। প্রচন্ড ঝড়ের তাড়নায় যে ভবিষ্যৎ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তারই ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে তুলেছিল স্বপ্নসৌধ। সেখানেও যখন আঘাত এসে পড়ল, নিরন্ধ্র অন্ধকার ছাড়া তার চোখের সুমুখে সেদিন আর কিছুই রইল না। তারপরেও তাকে উঠতে হল। খোকা তো তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে যায়নি। তাছাড়াও রয়ে গেছে মানুষের সেই চিরন্তন জীবনধারণের দায়। কিন্তু সে শুধু দায়, তার সঙ্গে একটুখানি ক্ষীণ প্রত্যাশা—খোকা যদি ফিরে আসে। যে সংগ্রাম দিয়ে তার জীবনারম্ভ, স্বামি-গৃহে প্রথম মিলনের মাধুর্যটুকু পর্যন্ত যার তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত। জয়ী হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, বিজন ব্যানার্জি। সে আজ কোথায়, কী করছে, কেমন আছে, নির্মলা জানে না। মাঝে মাঝে শুধু সেই শেষদিন-দেখা দম্ভারক্ত উদ্ধত মুখখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে জয়ের উল্লাস। নির্মলার বুকের ভিতরটা রী রী করে জ্বলে যায়। তীব্র কিন্তু চাপা আগুন; তার চারদিক ঘিরে পুঞ্জীভূত পরাজয়ের কালি। তারই ছাপ তার মুখময়। সে মুখ নিয়ে তার আপন-জনের কাছে যদিবা গিয়ে দাঁড়াতে পারত, সেই একজনের চোখে পড়তে পারে না। পাছে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কোনোদিন দেখা দেয় তাই বড়দি, মেজদির কাছ থেকেও তার এই অজ্ঞাতবাস। চরম দুঃখের দিনেও তাদের একটা খবর পর্যন্ত দেবার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু সংসারে দৈবের হাত কে এড়াতে পারে? সেই দুর্ঘটনাই ঘটল তার জীবনে। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সেই মানুষটির সঙ্গে। সেখানে কী তাদের পরিচয়? একজন সাদরে গৃহীত আত্মীয়, আরেকজন বিতাড়িত চাকরানী।

পুরনো মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্মলার মনে হল, পলকের তরে দেখা সেই দুটো চোখ যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। কী ছিল তার মধ্যে? বিস্ময়? না, তার সঙ্গে মেশানো কিছু অনুকম্পা? এর চেয়ে আক্রোশ, অবজ্ঞা কিংবা অপমানও ছিল অনেক বেশী সহনীয়।

(ক্রমশঃ)

হস্ত-কারিগরী সংস্থার নক্সা কেন্দ্র

নীহার রঞ্জন সেনগুপ্ত

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতালাভের পর নূতন ভারত সরকার দেশীয় (Cottage Industry) কুটিরশিল্পকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্যে বদ্ধপরিকর হন। এই কুটির-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই সর্ব-ভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থার সৃষ্টি। লুপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার কার্য-ই শুধু এই সংস্থার একমাত্র কার্যক্রম নয়,—প্রতি গ্রাম, প্রতি জনপদের প্রতিটি (Artisan) যাহাতে জীবনসংস্থানের প্রয়োজনে সুখ-সুবিধা-ভোগ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এই সংস্থার সর্বপ্রকারের উদ্যম ও দৃষ্টি। প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলির সৃষ্টির মূলেও এই সৎ অভিপ্রায়। দেশীয় কারিগরেরা যাহাতে এইসব নক্সা-কেন্দ্রগুলি হইতে গৃহ-অলংকরণ কার্যে উপযুক্ত তথা সুন্দর সুন্দর নক্সা পাইতে পারে; সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থা হইতে ইহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এইসব নক্সা সাহায্যের বিনিময়ে কোনরূপ মূল্য গ্রহণ চলিবে না। তবে নক্সাটি বাস্তবকার্যে রূপায়িত করার পর উক্ত নক্সাটিকে প্রান্তিক কেন্দ্রে (Zonal Design Centre) ফেরৎ দিতে হইবে,—যাহাতে ঐ একই নক্সাদ্বারা অপর কোন কারিগর ঐ একই প্রকারের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। একটি বিষয় এখনো বিবেচনাসাপেক্ষ,—সুবিধাভোগকারী ঐ একই প্রকারের নক্সা সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় নাই।

প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলিতে নিম্নলিখিত বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া নক্সা প্রস্তুত হয়, যথা : তামা, পিতল, কাঠ, বেত, পাথর, হাতির দাঁত, মোষের শিঙ, মাটি, কাগজের মণ্ড, তাঁতের কাপড়।

স্থানিক চলিত-হস্ত-জাত শিল্পকে (Traditional) কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলির নক্সা প্রস্তুত করার বিধি। অবশ্য নক্সা-শিল্পী (Designer) এই বিধিব্যবস্থাকে নানা-প্রকার নিরীক্ষণ-পরীক্ষণের মধ্যে একটি নূতনতর বস্তুর রূপদানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কারণ, বাজার-চলিত স্থানীয় 'ট্রাডিশনাল' বস্তুশিল্পগুলি দেখা যায়, হয় কোনটা অলংকরণের চাপে ভারাক্রান্ত, নয়তো কোনটা ব্যবহারের পক্ষে পীড়াদায়ক। এই অবস্থাকে একটা সুসমন্বয় বা সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা নক্সা-শিল্পীর হাতে। নক্সাশিল্পীর দৃষ্টি রাখিতে হয় :

(ক) ট্রাডিশনাল যে বস্তুশিল্পগুলি নিত্যকর্মে অত্যধিক চলিত, তাহার ফর্ম (Form) সহজ রাখিয়া ব্যবহারের পক্ষে সহজ উপায় বিধান।

(খ) আর যে বস্তুশিল্প গৃহকর্মে কমবেশী ব্যবহৃত (যেমন গহনা রাখিবার বাক্স, পাউডারের কৌটা, সিগারেটের বাক্স, সিন্দুর, কুমকুম রাখিবার আধার ইত্যাদি) তাহার গঠনব্যবস্থা সহজ রাখিয়া কম-বেশী নক্সা (লতা, ফুলপাতা, পাখী প্রভৃতি) উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া।

(গ) আর যে বস্তুশিল্পগুলি সৌখিন,—বসিবার ঘর প্রভৃতি সজ্জা-অলংকরণের পক্ষে অপরিহার্য, তাহার গঠনপ্রণালী সুচিন্তিতভাবে অত্যন্ত কারুকার্যপ্রধান হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

শুধু কাগজের উপর পূর্ণ নক্সা আঁকিয়া দেওয়াই নক্সা-শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব নয়,—তাহার দায়িত্ব আরো ব্যপক, তাহার দৃষ্টি হওয়া চাই আরো গভীর। কাগজে-অঙ্কিত নক্সাটির সঙ্গে বাস্তব-সৃষ্ট বস্তুটির হুবহু সঙ্গতি রহিল কিনা, এই দায়িত্ব নক্সা-শিল্পীর। এই কারণে কেন্দ্রীয় বেতনভুক কারিগরদের সঙ্গে থাকিয়া নক্সা-শিল্পীকে কাজ করিতে হয়। তাহাদের ত্রুটি সংশোধন

করিয়া দিতে হয়। সঙ্গতিরক্ষার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এই নূতন বস্তুটি সৃষ্ট যখন হইল, তখন "স্পেসিমেন" হিসেবে নক্সাকেন্দ্রে এটি রক্ষিত থাকিবে।

ধরা যাক্, এই নূতন 'স্পেসিমেন'—পিতলের একটি 'স্যুপ-বৌল' (Soup-Boul)। সংসারকার্যে এই 'স্যুপ-বৌলটি' নিত্যব্যবহার্য বস্তু। ইহা স্মরণ রাখিয়াই নক্সাশিল্পী কারিগরদের সহায়তায় যতটা সম্ভব সহজ 'ফর্মে' (এই ফর্ম অবশ্যই স্থানীয় বা Regional-Tradition-এর অঙ্গীভূত হওয়া চাই) আর ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন এই 'স্যুপ-বৌলকে' নক্সাকেন্দ্রের 'শোরুমে' বন্দী করিয়া রাখিলে চলিবে না,—বস্তুটিকে যথারীতি বাজারে প্রচলিত করিয়া সংসার কার্যের ব্যবহারে আনিতে হইবে। এই দায়িত্ব একমাত্র নক্সাকেন্দ্রের নয়,—যতটা সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থার।

নিয়মানুযায়ী আশে-পাশের গ্রাম ও শহরের যাবতীয় কারিগরদের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া পত্র দিয়া তাহাদের নক্সাকেন্দ্রে ডাকিয়া আনা হয়। 'স্যুপ বৌলটি' তাহাদের নিকট দিয়া বলা হয়, এই বস্তুটি বাজারে ছাড়িতে হইবে; কাজেই 'প্রোডাকশান' দরকার। এই 'প্রোডাকশানের' জন্যে বস্তুটি লইতে কে রাজী আছে?

কিন্তু আশ্চর্য এই, আমন্ত্রিত কারিগরদের মধ্যে নূতন বস্তুটি দেখিয়া মনে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কারণ, উহারা প্রথমতঃ বংশপরম্পরাগত বস্তুশিল্প তৈরীতে অভ্যস্ত এবং সিদ্ধহস্ত; দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত বস্তুশিল্পের বাজারে প্রচলনের চিন্তা করিতে হয় না,—উপরন্তু শিল্পপতিরা নিজ গরজেই সেগুলি শতকরা দরে খরিদ করিয়া লন। এমনিভাবেই দেশীয় কারিগরেরা অন্ন-সংস্থান করিয়া আসিতেছে।

নূতন বস্তুটির 'প্রোডাকশানের' ঝুঁকি তবে কে লইতে পারে?—পারে মাত্র তিনজন।

(এক) কারিগর-দ্বারা পরিচালিত কোন কো-অপারেটিভ সংস্থা;

(দুই) কোন শিল্পপতির ফার্ম;

(তিন) নয়তো সর্বভারতীয় হস্ত-কারিগরী সংস্থা। *

---

* ফটোগুলি বোম্বাই হস্ত-কারিগরী সংস্থার নক্সাকেন্দ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—
—লেখক।

দোলযাত্রা ও সেকালের লেখক

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দোলযাত্রা বাংলার একটি ধর্মীয় আনন্দের উৎস। দোলের দিনে সমস্ত বাঙালী আবীর-সম্ভাষণে স্বাগত জানায় বসন্তকে, রঙের আলতা আঁকে ফাল্গুন-চৈত্রের পায়ে। এই দিনে বাঙালী প্রায় রঙ-বন্দী হয়েই থাকে। বাংলাদেশের লেখকরাও এই বসন্ত-বন্দনা থেকে বাদ যান না। বৈষ্ণব কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার লেখককুল সকলেই তাঁদের সাহিত্যের উপচারে বসন্তের গান গেয়েছেন। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের বাসন্তিক পদগুলি আজো অম্লান :

"সখিরে বরষা বহিয়া গেল
বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী মাতা।"

ভারতে সর্বত্রই দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধাম হয়ে থাকে। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও উৎকলে হোলীর আমোদ কিছু বেশী হয়। দোলের দিন হিন্দু নরনারী আবীর-কুমকুম মেখে নানা রঙ্গ-কৌতুক করে থাকে। কেউ কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড় বা হোলিকা বধ করে এই উৎসব করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবনে পূর্ণিমার পূর্বদিন শ্রীকৃষ্ণ সারা রাত তুমুল যুদ্ধের পর মেড়াসুরকে বধ করে মহানন্দে পরদিন অতি প্রত্যুষে দোলক্রীড়া করেছিলেন।

দোলযাত্রা প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিত "আচার প্রবন্ধ" পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, বাঙলা ও উৎকলে দোল, অন্যান্য স্থানে হোলী উৎসব বলে প্রচলিত। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট, উৎকল ও মিথিলায় এই দিন মন্বাদি বলা হয়। মিথিলায় এই দিনকে কলিযুগান্তও বলে।

দোলযাত্রা প্রসঙ্গে Major C H Buck লিখিত "Faiths, Fairs and Festivals of India" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

"The name is a corruption of the Sanskrit word Holaka, meaning 'half-ripe corn', and seems to have originally been the Vasant-utsava, or Spring festival, when ceremonies were performed in honour of the crops and to ward off disease from the fields."

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় "পূজা-পার্বণ" গ্রন্থে দোলযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

"কেহ কেহ দোলযাত্রাকে বসন্তোৎসব মনে করিয়াছেন। কিন্তু বসন্তোৎসব নামে কোন উৎসব পাঁজিতে নাই, স্মৃতিতে নাই, পুরাণে নাই। পূর্বকালে মদনোৎসব হইত, বহু দিন অজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা নয়, চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী। দ্বিতীয়তঃ দোলযাত্রা একটি নয়, বৎসরে দুইটি। একটির নাম দোল, অপরটির নাম হিন্দোল চলিত ঝুলনযাত্রা। সূর্যরূপে বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলায় আরোহণ করেন।"

উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে—

"ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিলেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল ছয়-সাত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছি, ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় দোল দেখিয়াছি।"

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিত "স্কন্দপুরাণে" (উৎকল খণ্ড) উল্লেখ আছে—"ফাল্গুন মাসে ভগবানের দোলারোহণরূপ অত্যুত্তম উৎসব করিবে, ভগবান গোবিন্দ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থই দোলারোহণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।"

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য "পুরোহিত দর্পণ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে—"পূর্ণিমা থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত ছয়টি তিথিতেই দোল করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্ণিমার দোলই প্রশস্ত। সকল দোলেই পূর্বদিনের অধিবাসাদি অবিকল পূর্ণিমার দোলের ন্যায় করতে হয়। শালগ্রামেও যথাশক্তি এই প্রণালীতে দোল করা হয়ে থাকে।"

দোলমণ্ডপ নানা রকম ফুল ও ধ্বজা দিয়ে সাজানো হয়। তারপর সংকল্পান্তে গোবিন্দের ধ্যান, হোম ও পূজা হয়। দেবতার বিগ্রহ দোল-মঞ্চে রেখে পূজা করাই হলো দোলযাত্রা উৎসবের প্রধান কর্ম। দেব-মন্দিরে কিম্বা কোন কোন গৃহস্থের ঠাকুরবাড়ীতে বিগ্রহ দোলায় স্থাপন করে পূজা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা খুব বেশী দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোলযাত্রার দিনে আবীর ও রঙ নিয়ে হাসি-আনন্দ করাই চোখে পড়ে।

দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও কবিতা। সেকালের বিখ্যাত কবিওয়ালা রূপচাঁদ পক্ষীর দুইটি গানের কিয়দংশ উল্লেখ করলাম—

(১)

"হোলি খেলে শ্যাম তালে,
মিলে ব্রজগোপিনী।
মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে, কেড়ান্
ধা ধা, নি নি নি নি॥
লালে লাল বৃন্দাবন, লাল পশুপক্ষীগণ,
লাল যমুনা-জীবন,
লালে লাল রাধারাণী॥"
ইত্যাদি

(২)

"এসে ফাগুন কে দিন, আই সজনী।
পূর্ণমাসী শশী, ভই উজারা চাঁদনী॥
বলে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে ঘন,
গায়ে সব জন, বাহার সোহিনী॥
লালে লাল যমুনাতীর,
ওড়ে কুঙ্কুম আবীর,
জাবট ধীর সমীর, লাল ব্রজভামিনী॥"
ইত্যাদি

আমাদের দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধামের মত এক সময় জার্মানীতেও একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। আবেনাস্ (Joannes Boemus Aubanus) উল্লেখ করেছেন—সমস্ত জার্মানী পানভোজন ও রঙ্গরসে আত্মহারা হতো, ভাবতো যেন এমন দিন আর আসবে না। অধিবাসীরা মুখে মুখোস পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে সর্বাঙ্গে লাল ও কালো রঙে রঞ্জিত হয়ে উলঙ্গবৎ ছুটাছুটি করতো। নেওগর্গাস্ (Naogeorgus) য়ুরোপীয় কার্নিভাল (Carnival) নামক যে উৎসবের কথা লিখেছেন, তা পাঠ করলে ঠিক যেন ভারতের হোলির উৎসব বলে বোধ হয়।

দোল-পূর্ণিমার পুণ্যময়ী তিথি আমাদের কাছে আর একটি কারণে বিশেষ স্মরণীয় দিন। তার কারণ ৮৯২ সালে অথবা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই দিনটিও ছিল ফাল্গুন মাসের দোল-পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবীর দুলাল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই পুণ্যময়ী তিথিতে।

বিজ্ঞানের কথা
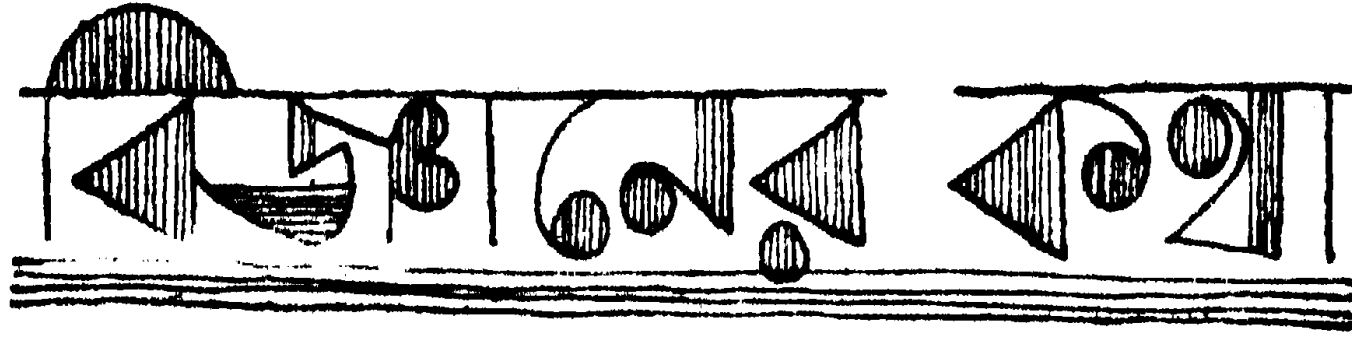
অয়স্কান্ত

॥ আমরা ঘুমোই কেন ॥

খুবই শক্ত প্রশ্ন। আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের হাজার রকমের জবাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো জবাবই সর্বজন-গ্রাহ্য হয়নি।

জীবনকে যদি একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে জীবনের যে-অংশ আমরা ঘুমিয়ে কাটাই সেই অংশকে তুলনা করা চলে ঘড়িকে দম দেওয়ার সময়ের সঙ্গে। ঘুম হচ্ছে জীবন-ঘড়ির দম। দম-দেওয়া ঘড়ির মতোই ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষ নতুন উৎসাহ নিয়ে সারা দিনের কাজকর্ম শুরু করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্নটা তবুও থেকে যাচ্ছে। আমরা ঘুমোই কেন? একেবারে না ঘুমিয়ে কি কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব?

অথচ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে আমরা যখন ঘুমোই তখনো কিন্তু আমাদের শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। যেমন, ঘুমের সময়েও আমাদের মেরুদণ্ডের স্নায়ুক্রিয়া বা সুষুম্নাকাণ্ড সজাগ থাকে। সজাগ থাকে আমাদের মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশও। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের এক-অংশের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, অপর অংশের নেই। অবিশ্রান্ত কর্মতৎপরতার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদপিণ্ড। আমরা যতোদিন বেঁচে থাকি ততোদিন এই প্রত্যঙ্গটি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নেয় না। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র সম্পর্কেও একই কথা। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, হৃদপিণ্ড বা ফুসফুসের মতো আমাদের মস্তিষ্কও কেন অবিরাম ক্রিয়াশীল থাকে না? কেন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়? অন্যদিকে, জন্তুজানোয়ারদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে অনেকেই পুরোপুরি ঘুমোয় না, এমন কি কোনো কোনো জন্তুজানোয়ারের বিশ্রাম পর্যন্ত দরকার হয় না।

ঠিক কোন্ অবস্থায় যে মানুষের ঘুম পায় তাও নির্দিষ্টভাবে ছক কেটে দেওয়া সম্ভব নয়। একই বই কারও চোখে ঘুম আনে, কারও চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে দেয়। শব্দ বা আওয়াজ হতে থাকলে সাধারণত কোনো মানুষেরই ঘুম আসে না। আবার বিশেষ ধরনের আওয়াজ না হলে ঘুমোতে পারেন না, এমন মানুষেরও অভাব নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ির একতলায় একটি ছাপাখানা আছে। ছাপাখানায় এমনই কাজের চাপ যে, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সারা রাত ধরে মেশিন চলে। একদিন কি কারণে রাত্রি-বেলা মেশিনগুলো বন্ধ ছিল। সেদিন আমার আত্মীয়দের বাড়ির কেউ-ই সারা-রাত ঘুমোতে পারেনি। এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত আরো অজস্র দেওয়া যেতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে নাড়া দিলে তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে যে ঘুমোয় তার ঘুম কিন্তু ট্রেন কোনো স্টেশনে থামা মাত্র ভেঙে যেতে পারে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে কি-পরিমাণ আয়োজন করতে হয়েছিল তা সবাই জানেন। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু আধুনিক এক কুম্ভকর্ণকে আমি জানি, সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ার ফলে সিগারেটের আগুনে মশারি পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পরেও তার ঘুম ভাঙেনি।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথাটা এই যে, কেন-যে মানুষ ঘুমোয় আর কেন-যে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়—তার কোনো ধরাবাঁধা কারণ নেই।

অনেকের মতে, ঘুম হচ্ছে মানুষের একটা অভ্যাস। ঠিক রাত্রিবেলাতেই মানুষের কেন ঘুম পাবে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। মানুষের আশৈশব অভ্যাস রাত্রিবেলায় ঘুমনো—তাই সে রাত্রি-বেলাতেই ঘুমোয়। কিন্তু এমন মানুষকেও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে যে সারাদিন ঘুমোয় আর সারারাত কারখানার নাইট-শিফটে কাজ করে। আর বেশ কিছুকাল ধরে যদি ব্যাপারটা চলে তাহলে ক্রমে সে এই চক্রেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

আবার অনেক সময়ে ঘুমের সঙ্গে অন্য কোনো জাগতিক ব্যাপারের এমন একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ঘটে যায়, যাকে পাভলভের ভাষায় বলা যেতে পারে 'কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' বা শর্তাধীন পরাবর্ত। যেমন, ঘুমপাড়ানী গান বা রাত্রির কোনো বিশেষ পোশাক ইত্যাদি। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি বিশেষ বালিশে মাথা না দিতে পারলে ঘুমোতে পারেন না তাহলে বলতে হবে বালিশটি তাঁর ক্ষেত্রে 'কণ্ডিশনড্ স্টিমুলাস' বা শর্তাধীন উদ্দীপক। পাভলভ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে, কণ্ডিশনড্ স্টিমুলাসের অভাবে তাঁর পরীক্ষাগারের কুকুর ঘুমোতে পারেনি।

কুকুর ও ঘোড়া মানুষের মতোই ঘুমোয় ও স্বপ্ন দেখে—একথাটি এখানে জেনে রাখা দরকার। কিন্তু এদের চেয়ে অনেক নিম্নতর স্তরের জীব গিনিপিগ—তার কিন্তু ঘুম প্রায় না-থাকার মতো। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, উন্নত ও জটিল স্নায়ুতন্ত্রবিশিষ্ট জীবরাই ঘুমপ্রবণ। অর্থাৎ ঘুম হচ্ছে একটা মাশুল যা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে বোঝার মতো টেনে চলতে হচ্ছে। আর এটা যে কত বড়ো বোঝা তা একটু হিসেব নিলেই বোঝা যাবে। মানুষের জীবনের তিন-ভাগের এক ভাগই কাটে ঘুমিয়ে।

তাহলে এবার ঘুম সম্পর্কে একটি তত্ত্বে পৌঁছনো যেতে পারে। ঘুম হচ্ছে একধরনের প্রতিষেধ বা বাধ বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইন্‌হিবিশন। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক।

পাভলভের কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্ সম্পর্কে আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। পাভলভের সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টটি নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। একটি কুকুরকে খাওয়াবার আগে ঘণ্টার শব্দ করা হত। এমনি কিছুদিন চলবার পরে দেখা গেল শুধু ঘণ্টার শব্দ হলেই খাবার না থাকা সত্ত্বেও কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝরছে। এক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দটি হচ্ছে কণ্ডিশনড্ স্টিমুলাস। আর মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্রিয়াশীলতার ফলে কুকুরের লালা ঝরছে, তাকে বলা হয় কণ্ডিশনড্ রিফ্লেকস।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে স্টিমুলাস যতো জোরালো হবে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতাও হবে ততো তীব্রতর। আমাদের অধিকাংশ বোধ ও অনুভূতির মাত্রা এই কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্-এর দ্বারাই নিরূপিত হয়ে থাকে। আবার স্টিমুলাস যদি একাধিক হয় ও প্রায় একই ধরনের হয়—তাহলে বিভিন্ন স্টিমুলাসের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারটি এসে পড়ে। কতখানি পার্থক্য করা হবে তাও নির্ভর করে কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্-এর ওপরে। যেমন, কুকুরকে খাওয়াবার সময়ে যদি সব সময়েই একটি বিশেষ ধরনের শব্দ করা হয় এবং কোনো সময়েই আরেকটি বিশেষ ধরনের শব্দ করা না হয়—তাহলে প্রথম শব্দটির ফলে রিফ্লেক্স্ তৈরি হবে, দ্বিতীয় শব্দটির ফলে বাহ্যত হবে না।

'বাহ্যত' বললাম এই কারণে যে দ্বিতীয় শব্দটির ফলে মস্তিষ্কে কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না তা ঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বাহ্যত ক্রিয়াহীন স্টিমুলাসও মস্তিষ্কে একটা অস্বীকৃতি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ দিকে চালিত হওয়া সম্পর্কে অনীহা। এই অবস্থাকেই বলা হল ইন্‌হিবিশন। ওপরের দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করে বলা যায়, বিশেষ এক ধরনের শব্দ মস্তিষ্কে এমন এক বিশেষ ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি করছে যার ফলে কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝরে। আবার অন্য এক বিশেষ ধরনের শব্দ কুকুরের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করছে ইন্‌হিবিশন। এই ইন্‌হিবিশন খুবই গভীর ও ব্যাপক হতে কোনো বাধা নেই। আবার মস্তিষ্কের দুই বিশেষ অংশের ইন্‌হিবিশন অনায়াসে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্‌হিবিশন হয় তীব্রতর। এইভাবে প্রতিক্রিয়াটির শুরু। এবং ক্রমে মস্তিষ্কের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশ ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে পড়ে। তখন আর সত্যিকারের কার্যকরী কণ্ডিশনড্ স্টিমুলাসও কোন কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্ তৈরি করতে পারে না। এই অবস্থারই নাম ঘুম।

তাহলে এককথায় বলা যেতে পারে, ঘুম হচ্ছে মস্তিষ্কের ইন্‌হিবিশন। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় গোটা মস্তিষ্কই ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে পড়ে। কারণ, পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সজাগ থাকে। উল্টো দিকে, একথাও আমরা বলতে পারি না যে, জাগ্রত অবস্থায় আমাদের গোটা মস্তিষ্কটিই সজাগ। তখনো মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশে ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হতে পারে। একটা খুবই সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমরা যখন সিনেমা দেখি তখন আমাদের মস্তিষ্কের যে-যে অংশ থেকে দেখা ও শোনার ব্যাপারদুটি নিয়ন্ত্রিত হয় তা খুবই সজাগ থাকে এবং ফলে প্রত্যেকটি স্টিমুলাস সেখানে যথোপযুক্ত রিফ্লেক্স্ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু সেই একই সময়ে আমাদের মস্তিষ্কের অন্য একটি অংশ—ধরা যাক আমাদের মস্তিষ্কের যে-বিশেষ অংশের ক্রিয়াশীলতার ফলে আমাদের মুখ থেকে লালা ঝরে সেই অংশটি—ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে যেতে পারে। তখন আর পাশের লোককে কুড়মুড় করে চানাচুর চিবোতে শুনলেও আমাদের মুখ থেকে লালা ঝরবে না। অবশ্যই এই ইন্‌হিবিশন খুবই ক্ষণস্থায়ী হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশে যে-যে কারণে ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই সেই কারণেই মানুষের ঘুম পায়। অর্থাৎ ইন্‌হিবিশনের অবস্থা আর ঘুম পাওয়ার অবস্থা মূলত এক। ইন্‌হিবিশনের অবস্থা যখন মস্তিষ্কের অধিকাংশ অংশ জুড়ে বসে তখনই মানুষ ঘুমোয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে তাকিয়ে এই তত্ত্বটিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাঁরা একই ধরনের কাজের মধ্যে থাকেন তাঁদের কাছে দিনযাপনের ব্যাপারটি হয়ে ওঠে নিতান্তই একঘেয়ে। এই একঘেয়েমি শেষ পর্যন্ত ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি করে থাকে। আবার এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যেই যদি কখনো কোনো উত্তেজনার ব্যাপার ঘটে যায় তাহলে ইন্‌হিবিশনের অবস্থা সৃষ্টি হতে বিলম্ব হতে পারে। আবার যাঁরা নানা বিচিত্র কাজের মধ্যে দিয়ে সারা দিনটা কাটান তাঁদের ক্ষেত্রে ইন্‌হিবিশন আসে মস্তিষ্কের নানা পৃথক পৃথক অংশের ইন্‌হিবিশন যুক্ত হয়ে। যে কথাটা আগেই বলেছি, গোটা মস্তিষ্কই একই সময়ে সজাগ হয় না বা একই সময়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। কমবেশি মাত্রার ইন্‌হিবিশন সব সময়েই থাকে। বৈচিত্র্যপূর্ণ দিনযাপনের মধ্যেও কম কম মাত্রার অনেকগুলো ইন্‌হিবিশন যুক্ত হয়ে বেশি মাত্রার ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার দিনযাপনের উত্তেজনা যদি একই ধরনের হয় তাহলে মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশই সক্রিয় থাকে। এবং এই একটানা সক্রিয়তাই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে ইন্‌হিবিশন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা জানি, কোনো একটি বিশেষ উত্তেজনা যদি একটানা চলতে থাকে তাহলে তা শেষ পর্যন্ত অবসাদ আনে।

সহজেই অনুমান করা চলে, ইন্‌হিবিশনে আচ্ছন্ন হবার প্রক্রিয়াটি আচমকা ঘটতে পারে না। অনেকগুলো পর্যায় পার হয়ে তবেই মস্তিষ্কের ইন্‌হিবিশনের সেই অবস্থা আসে যাকে বলা হয় ঘুম। এই কারণেই চোখ বুজলেই মানুষের ঘুম আসে না। একটি তন্দ্রার অবস্থা পার হয়ে তবেই মানুষকে ঘুমের অবস্থায় পৌঁছতে হয়।

* * *

একজন রুগী এসেছে ডাক্তারের কাছে। তার বক্তব্য ঃ আচমকা তার দুটি কানই কালা হয়ে গিয়েছে, কোনো শব্দই সে আর শুনতে পাচ্ছে না।

ডাক্তার তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তাঁরও ধারণা হল, রুগী সত্যিই কালা। শেষকালে তিনি রুগীকে বললেন, 'আপনার ডানহাতটা এই তামার পাতের সামনে রাখুন।' বলাতে কাজ হল না, লিখে জানাতে রুগী তার ডানহাত তামার পাতের ওপরে রাখল।

প্রথম কিছুক্ষণ ধরে একটি ইলেকট্রিক বেল বাজল। তারপরেই সুইচ টিপে সেই তামার পাতের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হল। চমকে উঠে আর 'উঃ' বলে চিৎকার করে রুগী হাত সরিয়ে নিল তার।

এমনি চলল বেশ কয়েকবার। প্রথমে ইলেকট্রিক বেল, তারপরে তামার পাতে বিদ্যুতের প্রবাহ। প্রতিবারেই রুগীর চমকে ওঠা ও অস্ফুট চিৎকার।

শেষকালে একবার যথারীতি ইলেকট্রিক বাজল কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তামার পাতে বিদ্যুতের প্রবাহ চালু করা হল না। কিন্তু দেখা গেল, রুগী এবারেও আগের মতোই চমকে উঠেছে ও অস্ফুট চিৎকার করেছে।

ডাক্তার হেসে বললেন, 'এই তো, আপনি ভালোই শুনছেন দেখছি।'

পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, রুগীর না-শোনাটা ইন্‌হিবিশন, শোনাটা কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স্।

।। চালকহীন ট্রেন ।।

মস্কোয় ভূগর্ভ রেলপথে চালকহীন ট্রেন গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করা গেছে। একটি ইলেকট্রনিক কম্প্যুটিং যন্ত্র এই ট্রেনটিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মস্কোর সুড়ঙ্গ রেলপথের প্রধান কর্মকর্তা আলেকজান্দার নোভোখাৎস্কি 'তাস'— প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, এই ট্রেনটি মালবাহী ছিল, কিন্তু যাত্রীবাহী ছিল না। মালের পরিমাণ এমন ছিল যাতে সমস্ত আসন যাত্রী ভর্তি থাকলে যে ওজন হত—সেই সমান ওজনের ট্রেনই ইনজিনকে টানতে হয়। ইলেকট্রনিক ড্রাইভারটি নিখুঁতভাবে ট্রেনটিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই পরীক্ষা সফল হবার পর আপাতত মস্কোর সুড়ঙ্গ রেলপথে মোট ৮৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২০ কিলোমিটার পথ এই ইলেকট্রনিক ড্রাইভার দ্বারা নিয়মিতভাবে চালনার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করা হবে।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে মস্কোর এই সুড়ঙ্গ রেলপথে দৈনিক মোট প্রায় ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। সমস্ত ট্রেনে যদি ইলেকট্রনিক ড্রাইভার চালিত ইনজিন যোগ করা হয় তা হলে আরো বেশী ট্রেন এই সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করতে পারবে এবং ট্রেনগুলিতে যাত্রীর ভীড় কম হবে। মস্কোর এই সুড়ঙ্গ রেলপথকে গত কয়েক বৎসরে বহুল পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। যেমনঃ সাব ষ্টেশনগুলিকে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে, মাত্র কয়েকটি ডেসপ্যাচারের সাহায্যে এই বৈদ্যুতিক রেলপথের সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় টিকিট বিক্রয় ও যাত্রীদের ওঠা-নামা (এসক্যালেটর) তো বহুদিন পূর্বেই চালু হয়েছে। এই স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে শতকরা ১৬ জন কর্মীর কাজ কমে গেছে এবং এরা সকলেই অন্য কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছে।

।। বিনা পেট্রোলে আগামী দিনের গাড়ী ।।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় য়ুরোপের একটি সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্ষুদ্র গবেষণাগারে এমন একটি জিনিস আবিস্কারের চেষ্টা চলেছে যা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভবত আনবিক শক্তি অপেক্ষা অধিক বিপ্লব আনবে। এই দুটি গবেষণাগারে যে বিষয়ে কাজ হচ্ছে তার নাম জুস্টি গ্যাস পদার্থ। ভবিষ্যতের শক্তির উৎস।

এই অভিনব শক্তির উৎসের নীতি খুবই সরল। এটি মধ্যবর্তী তাপশক্তিতে পরিবর্তিত না-করা রাসায়নিক বিক্রিয়া-

সংবাদ বিচিত্রা
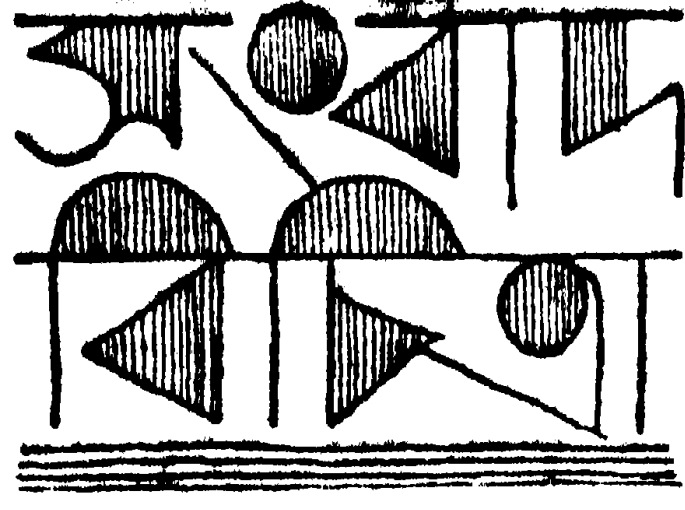
জনিত উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির সরাসরি ব্যবহার। ব্রুনসভিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুস্টি বিশেষরূপে নির্মিত সছিদ্র ইলেকট্রোডের মাধ্যমে সংমিশ্রিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি মারফৎ এই 'পরশ পাথর' আবিষ্কার করেছেন। তরল পটেশিয়াম দ্রবণকে ইলেকট্রো লাইটরূপে ব্যবহার করা হয়; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়নগুলির মিলনে সৃষ্টি হল সৃষ্ট জলে একটি ধনাত্মক ও অপর একটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীতধর্মী দুটি ইলেকট্রডকে তড়িৎসঞ্চারিত করা হয়; ফলে কোন শক্তি অপচয় না করে এ দুটি ব্যাটারীর মত কাজ করে চলে। যতক্ষণ দুটি সছিদ্র ইলেকট্রোডের একটিতে হাইড্রোজেন ও অপরটিতে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সব সময় এই ব্যাটারী কাজ করবে ও তড়িৎশক্তি সরবরাহ করতে থাকবে।

পর পর অনেকগুলি এ ধরণের ব্যাটারী সাজিয়ে, যাকে জ্বালানী পদার্থ বলা হয়, উৎপন্ন বিরাট শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর চালান হয়। বর্তমানের ইণ্টার্ণাল কম্বাশন ইঞ্জিনের ৩০ শতাংশ শক্তি ব্যবহার করা যায়; সেই তুলনায় নূতন শক্তির ৮০ ভাগ ব্যবহার করা যায়। এটিই এই নতুন শক্তির সুবিধা এবং শক্তির উৎস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সর্বত্র সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এই 'বাস্তব জ্বালানি' পেট্রল ও ডিজেল অয়েল অপেক্ষা অনেক সস্তা।

ভবিষ্যতের এই নতুন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন। এখন পৃথিবীর সর্বত্র টেকনিক্যাল উন্নতির সাহায্যে এই শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রোলাইটরূপে জোরালো সক্রিয় জ্বালানী সেথানল ও ইথার ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ এই দুটি থেকে অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু নির্গত হয়ে বিক্রিয়াকে যথেষ্ট বেগবান করে তুলে বিক্রিয়াজনিত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্থান সংকুলান ও হাল্কা শক্তির উৎস হিসাবে জুস্টি গ্যাস পদার্থ মহাজাগতিক রকেটযান, জাহাজ ও স্থলযানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন এই শক্তি দিয়ে মোটর গাড়ী চলবে তখন মোটর গাড়ীর পেট্রল ট্যাঙ্কের জায়গায় থাকবে জ্বালানি পদার্থ ভর্তি হাল্কা ধাতুতে মোড়া দুটি গ্যাস সিলেণ্ডার। বাজে যন্ত্র, ক্লাচ, গীয়ার, একজস্ট, শব্দ, ধোঁয়া সেদিন কিছুই থাকবে না। গাড়ী হাল্কা হবে, কম খরচে চলবে। তবে বিজ্ঞানের সাফল্যের পূর্বে আরও কয়েক বছর ধৈর্য ধরতে হবে বৈকি!

॥ ফুলের দ্বীপপুঞ্জ ॥

১৮৭৯ সালে সিলি দ্বীপপুঞ্জের সেণ্ট মেরীজ-এর একজন কৃষক স্ত্রীর কাছ থেকে একটি টুপির বাক্স ধার করেন এবং সেই বাক্সে মরসুমের গোড়ার দিকে উৎপন্ন ডাফোডিলের কয়েকটি গুচ্ছ প্যাক করে পাঠান লণ্ডনের বিরাট কভেণ্ট গার্ডেন মার্কেটে। যে ব্যবসায়ীর কাছে এই ফুল তিনি পাঠান সেই ব্যবসায়ীটি এই ফুলের জন্য তাঁকে দেন মাত্র ৭ শিলিং ৬ পেন্স (৫ টাকা)।

আজকাল অবশ্য নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত এই কয় মাস ধরে জাহাজ এবং বিমানে প্রচুর সিলি ফুল যাচ্ছে লণ্ডনে। দ্বীপপুঞ্জের চল্লিশটি দ্বীপের মধ্যে পাঁচটিতে বিশেষ করে প্রচুর ফুলের চাষ হচ্ছে—এই দ্বীপপুঞ্জটি ব্রিটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কর্ণওয়ালের ল্যাণ্ডস এণ্ডের উপকূল থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এই দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক কৃষক গড়পড়তা মরসুমে ৩,০০০ বাক্স ফুল জাহাজে করে পাঠাচ্ছে। একজন ভাল সংগ্রাহক এক ঘণ্টায় ১০০ গুচ্ছ ফুল (প্রতিটি গুচ্ছে বারোটি ফুল থাকে) অর্থাৎ প্রতি তিন সেকেণ্ডে একটি ফুল সংগ্রহ করতে পারে।

প্রতি বছর হাজারে হাজারে পর্যটক এই 'ফুলের দ্বীপপুঞ্জে' আসছেন ফুলের সমারোহ দেখবার জন্য। দ্বীপগুলি এই সময় তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে অভ্যর্থনা জানায় এই সব পর্যটকদের। একদল সন্ন্যাসী ১,০০০ বছরেরও বেশি আগে এই দ্বীপপুঞ্জে প্রথম ফুলের বাল্ব নিয়ে আসে। ট্রেসকো দ্বীপের অ্যাবী উদ্যানটি এখন সত্যিই দর্শনীয়, এখানে বিশ্বের প্রায় ৩,৫০০ রকমের ফুলের চাষ হচ্ছে।

দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি বৃহত্তম সেটিও ঘুরে আসতে একজনের এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এই বৃহত্তম দ্বীপটি হল সেণ্ট মেরীজ। এটি লম্বায় দু মাইলেরও কম। দ্বীপটি ক্ষুদ্র হলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা-ধরণের ফুল ও পাখির জন্য পর্যটকদের সকল সময় তা আকর্ষণ করে এসেছে।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

ঘাতক

বিদেশী গল্প

হেনরির হোটেলের দরজা ঠেলে দু'জন লোক ঢুকল। লোক দু'জন বসল সোজা কাউন্টারের কাছে।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের কি দেবো?"

দু'জনের মধ্যে একজন উত্তর দিল, "বলছি। কি খাবি রে এল?"

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কাউন্টারের কাছে বসে দু'জন লোক মেনু পড়ছে। কাউন্টারের অন্য ধারে বসে আছে নিক এডামস্। নিক খুব করে খুঁটিয়ে দেখছে লোক দু'জনকে। এদের আসার আগে নিক জর্জের সংগে কথা বলছিল।

"আপেলের সস আর আলু বাটার সংগে শুয়রের রোস্টই খাওয়া যাক," বলে উঠল প্রথম লোকটি।

"ওটা ত এখনও তৈরী হয়নি।"

"চুলোয় ছাই, তৈরী হয়নি ত কার্ডে লেখা আছে কিসের জন্য?"

জর্জ মোলায়েম সুরে বল্লে, "আজ্ঞে ওটা ডিনারের খাবার। ছটার সময় পাবেন।"

কাউন্টারের পিছনের ঘড়ির দিকে তাকাল জর্জ।

"এখন মাত্র পাঁচটা বাজে।"

দ্বিতীয় লোকটি উত্তর দিল, "চোখ খুলে দ্যাখো না। এখন তোমার ঘড়িতে পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট।"

"আমার ঘড়িটা কুড়ি মিনিট ফাস্ট।"

"ঘড়ির নিকুচি করেছে। কি আছে তাই বলুন।" বলে উঠল প্রথম লোকটি।

জর্জ উত্তর দিল, "বেশ ত। স্যানড়ুইচ খান না! কি স্যানড়ুইচ খাবেন বলুন? ডিম আর হ্যাম, না হয় ডিম আর বেকন-এর স্যানড়ুইচ দেবো? না হয় খান লিভার আর বেকন।"

"আলুবাটার সংগে মটরসুঁটি দেওয়া মোরগের মাংস এক প্লেট।"

"আজ্ঞে, ওটাও ত ডিনারের।"

"যা চাইবো তাই কি ডিনার? এই করেই কি দোকান চালাও নাকি ছোকরা?"

"খান ডিম আর হ্যাম, না হয় ডিম আর বেকনের স্যানড়ুইচ........."

এল হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, হ্যাম আর ডিম খাওয়াই যাক।" এল-এর মাথায় ডার্বি টুপি: গায়ে ওভার-কোট। ওভার কোটের বুকের বোতাম কটা আঁটা। তার মুখটা সাদা এবং ছোট্ট। ঠোঁট দুটি খুবই দৃঢ়। গলায় তার সিল্কের মাফলার, হাতে দস্তানা।

অন্য লোকটি বলে উঠল, "আমাকে বেকন আর ডিম-ই দিন।" এই লোকটি প্রায় এল-এর মতন লম্বা। ওরই মতন গড়ন। মুখ দুটি আলাদা। কিন্তু সাজ-গোজ হুবহু এক রকমের। দু'জনের গায়েই ওভারকোট। কিন্তু কোটটা গায়ে যেন মানায়নি। বড্ড ছোট: আঁট হয়। কাউন্টারের দিকে কুনুই দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল তারা।

এল জিজ্ঞাসা করল, "মদ পাওয়া যাবে?"

জর্জ উত্তর করল, "পাবেন। সিলভার বিয়ার, বেভো, জিনজার-এল......"

"আমি জিজ্ঞাসা করছি কিছু নেশা ধরাবার মদ পাওয়া যাবে কি না?"

"আজ্ঞে, ঐ যে বল্লাম"

অন্য লোকটি বললে, "ববাঃ, কি গরম এই শহরে!"

এল বললে, "রাত্রে কি হয় এখানে?"

বন্ধুটি উত্তর দিল, "ডিনার খেতে আসে লোকজন। রাজসিক ডিনার চলে।"

জর্জ বললে, "ঠিক বলেছেন।"

এল জর্জকে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক বলেছে না?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি ত বেশ মজার লোক হে!"

"নিশ্চয়ই," জর্জ উত্তর দিল।

অন্য লোকটি বল্লে, "মজার লোক? না তুমি একেবারেই মজার লোক নও। তাই না, এল?"

এল বললে, "ও বোকা।" নিকের দিকে তাকাল এল, জিজ্ঞাসা করল "কি নাম হে!'

এ্যাডামস্।"

"এও খুব ভাল ছোকরা। ম্যাকস, দেখ্ দেখ্ এ ছোকরাও খুব ভাল," এল বললে।

ম্যাকস উত্তর দিল, "এ শহরের সব লোকই ভাল।"

হ্যাম আর ডিম এবং বেকন আর ডিম দেবার জন্য কাউণ্টারের ওপর দুটো প্লেট রাখল জর্জ। আলুভাজা দেবার জন্য আর দুটি প্লেট রেখে জর্জ রান্না-ঘরের ছোট্ট দরজা বন্ধ করে দিল।

এল জিজ্ঞাসা করল, "কোনটা তোমার?"

"মনে নেই?"

"হ্যাম আর ডিম।"

ম্যাক্স বললে, "তুমি অতি সজ্জন হে।" সামনের দিকে আরও একটু ঝুঁকে ম্যাক্স হ্যাম আর ডিম খেতে আরম্ভ করল। ওরা দস্তানা না খুলেই খাচ্ছে। জর্জ মন দিয়ে ওদের খাওয়া দেখছে।

জর্জের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছ হে অমন করে?"

"কিছু না ত।"

"আ মলো যা। আমি দেখলাম তুমি তাকিয়ে আছ।'

এল বল্লে, "ও কিছু না ম্যাক্স। ছোকরা বেশ মজা পেয়েছে বোধ হয়।"

জর্জ হেসে উঠল।

ধমকে উঠল ম্যাক্স, "আর দাঁত বার করতে হবে না, বুঝলে ছোকরা, আর সাত পাটি দাঁত বার করতে হবে না।"

"বেশ," উত্তর দিল জর্জ।

ম্যাক্স এলকে বললে, "ঠিক বোঝে। সব ঠিক বুঝতে পারে। বুঝুকে।"

এল বললে, "দারুণ বোঝে।" ওরা আবার খাবার দিকে মন দিল।

এল ম্যাক্সকে জিজ্ঞাসা করল, "কাউণ্টারের ও দিকে ওই ছোকরার কি নাম যেন।"

ম্যাক্স নিককে বললে, "ও হে ছোকরা, তুমি এক কাজ কর দেখি। তুমি একবার এদিকে দেখে এসো না। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ভাব-সাব হোক।"

নিক জিজ্ঞাসা করল, "কেন? কি ব্যাপার!"

এল বললে, "কথা শোন। যা বলছি কর।" নিক কাউণ্টারের ও দিকে সরে গেল।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কি করতে চান?"

এল বললে, "চোপ্ রও। তোমার মাথাব্যথা কেন? রান্নাঘরে কে?"

"নিগ্রো"।

"মানে?"

"নিগ্রো, যে রান্না করে।"

"এখানে আসতে বল।"

"কেন? কি করতে চান?"

"এখানে আসতে বল।"

"এ কি মগের মল্লুক?"

ম্যাক্স উত্তর দিল, "কি মল্লুক তা আমরা ভাল জানি। কি, আমাদের বেয়াকুব বলে মনে হচ্ছে?"

এল বললে, "তুই থাম বেয়াকুব। ওই বাচ্ছাটার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করছিস কেন? এত বাজে বকিস।" তারপর জর্জের দিকে ফিরে বললে, "শোন বাচ্ছা, তোমার ওই রাঁধুনীকে একবার ডাক।"

"কিন্তু কেন? মতলবটা কি আগে শুনি।"

"মতলব আবার কি থাকবে? তুমি ত বুদ্ধিমান ছোকরা। মাথা খাটাও। আন্দাজ করো তোমার ওই নিগ্রো রাঁধুনীর সঙ্গে আমাদের কি কাজ থাকতে পারে।"

জর্জ কাউণ্টারের পাশ থেকে রান্না-ঘরের ছোট্ট দরজাটা খুলে ডাকল, "শ্যাম, চট্‌ করে শুনে যা ত।"

দরজা খুলে শ্যাম ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি?" কাউণ্টার থেকে দু'জন লোক শ্যামের ওপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলে।

এল বললে, "বেশ, বেশ। যেমন দাঁড়িয়ে আছ ঠিক তেমন দাঁড়িয়ে থাকো ত একটু।"

রান্নাঘরে কাজ করছিল শ্যাম। গায়ে তার সাদা তোয়ালে জড়ানো। শ্যাম দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আস্তে আস্তে বললে, "আজ্ঞে।" কাউণ্টারের পাশের টুল থেকে উঠে দাঁড়াল এল।

সে বললে, "আমি এই রাঁধুনী আর ওই সোনারচাঁদকে নিয়ে একবার রান্নাঘরে যাচ্ছি। যাও, রান্নাঘরে যাও শ্যাম। যাও, তুমিও যাও হে ছোকরা।" শ্যাম আর নিকের পিছু পিছু বেঁটে-খাটো লোক-টিও রান্নাঘরের দিকে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাউণ্টারে বসে থাকল ম্যাকস। আর তার সামনা-সামনি বসে আছে জর্জ। ম্যাক্স জর্জের দিকে তাকায়নি। কাউ-ণ্টারের পাশে বিরাট আয়না ঝোলানো। ম্যাক্সের চোখ সেই আয়নায়। হেনরি সেলোনের আয়না এখানে টাঙিয়েছে।

আয়নার দিকে তাকিয়েই ম্যাক্স বললে, "কি হল চাঁদ-বদন। মুখে রা নেই কেন?"

"আপনাদের মতলব কি?"

ম্যাক্স চিৎকার করে বললে, "শুনে-ছিস এল, এধারে চাঁদ-বদন যে আমাদের মতলব জানতে চায়।"

রান্নাঘর থেকে এল-এর উত্তর এল, "তা না হয় বলেই দে।"

"তোমার কি মনে হয় সোনার চাঁদ? আমরা কেন এসেছি?"

"বুঝতে পারছি না।"

"তবু, আন্দাজ করতে পারছ না?"

সমস্ত সময় ম্যাক্স আয়নার দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল।

"না, বলতে ভরসা পাচ্ছি নে।"

"শুনেছিস এল, "চাঁদ-বদন আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বলতে ভরসা পাচ্ছে না।"

রান্নাঘর থেকে এল উত্তর দিল, "আমি সব শুনতে পাচ্ছি।" রান্নাঘর থেকে ডিস-প্লেটগুলো কাউণ্টারে দেবার জন্য একটা ফুটো ছিল। রান্নাঘর থেকেই সে জর্জকে বললে, "আর একটু সরে দাঁড়াও হে চাঁদ-বদন। ঠিক, ম্যাক্সের একটু বাঁ দিক ঘেঁসে দাঁড়াও।" এল যেন ছবি তুলবে। তাই সে ফটোগ্রাফারদের মত দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

ম্যাক্স বললে, "যাক গে। কথা বল। বল ত দেখি বাছা, কি আমাদের মতলব? বলেই ফেল না।"

জর্জ নিরুত্তর।

"যাক গে। শোন আমিই বলছি। আমরা একজন লোককে খুন করবো বলে এসেছি। সুইডেনের একটা লোক। তুমি ত তাকে চেনো। ওল এণ্ডারসনকে চেন না? ইয়া লম্বা-চওড়া একটা লোক।"

"চিনি।"

"সে ত রোজ রাত্রে এখানে খায়। খায় না?"

"মাঝে মাঝে এখানে খায়।"

"রোজ ছ'টার সময় সে এখানে আসে। কেমন তাই না?"

"এলে ছ'টার মধ্যেই আসে।"

"আমরা সব খবরই রাখি। বুঝলে হে সোনার চাঁদ। যাকগে। অন্য কথা বল। সিনেমা-টিনেমা দেখ?"

"কচিৎ-কখন।"

"না না, আরও বেশি করে সিনেমা দেখ। তুমি কি ভাল ছেলে! সিনেমা খুব ভাল লাগবে তোমার।"

"কেন, ওল এণ্ডারসন কি করেছে? কিসের জন্য আপনারা ওকে খুন করতে চান? ও কি অন্যায় করেছে আপনাদের কাছে?"

"আমাদের কাছে কোন অন্যায় করার কোন সুযোগই সে পায়নি। সে আমাদের কখন দেখেওনি।"

"আর সে জীবনে মাত্র একবারই আমাদের দেখবে," রান্নাঘর থেকে বলে উঠল এল।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "তবে তাকে খুন করবেন কেন?"

"একজন বন্ধুর জন্যে আমাদের এ কাজ করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র একজন বন্ধুর উপকারের জন্যে; বুঝলে কি খোকা?"

"চুপ কর্‌ ম্যাক্স। তুই বড্ড বাজে বকিস," রান্নাঘর থেকে ধমকে উঠল এল।

"কি করব? খোকা-মণিকে শান্ত রাখতে হবে ত। সেই জন্যে বলছি। কি বল চাঁদ-বদন?"

"তুই বড় বাজে বকিস ম্যাক্স। দেখ ত রান্নাঘরে নিগ্রো আর আমার সোনা কেমন মজায় আছে। ওদের এমন ভাবে বেঁধে রেখেছি আহা! ওরা যেন মঠের মধ্যে দু'জন সন্ন্যাসিনী।"

"তুইও কি সেই মঠে আছিস নাকি রে?"

"কি জানি।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ তুই-ও সেই মঠে।"

জর্জ ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"কোন খদ্দের এলে বলবে আজকে রাঁধুনীর ছুটি। খাবার-দাবার নেই। যদি কেউ তাতেও না থামে, বলবে, যাও বাপু, নিজে রান্নাঘরে গিয়ে নিজের খাবার তৈরী করে নাও।"

"তা না হয় হল। কিন্তু আমাদের কি উপায় হবে?"

"কিছু বলা যায় না। এ সব ব্যাপারে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না।"

ঘড়ির দিকে তাকাল জর্জ। এখন ছ'টা বেজে পনেরো। রাস্তার দিকের দরজা খুলে গেল। রাস্তার সোয়ারী-মোটরের একজন ড্রাইভার এল।

ড্রাইভার বললে, "ওহে জর্জ, খিদে পেয়েছে। যা হয় কিছু দাও।"

জর্জ উত্তর দিল, "শ্যাম বাইরে গেছে।

আর আধ-ঘণ্টা খানেক বাদে ফিরবে বোধ হয়।"

ড্রাইভার বললে, "তা হলে অন্য দোকানে যাই।" জর্জ ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিট।

"চমৎকার," বলে উঠলো ম্যাক্স। "খাসা ছেলে তুমি।"

রান্নাঘর থেকে এল বললে, "তা ভিন্ন এখান থেকে ওর মাথা উড়িয়ে দিতাম না! না বলে উপায় ছিল।"

"না, তা না। এ বড় খাসা ছেলে। বড্ড ভাল। খুব মনে ধরেছে আমার।"

ছ'টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। জর্জ বললে, "মা ও আর আজকে আসবে না।'

আর কটি লোক এল। ওদের জন্যে হ্যাম আর ডিমের স্যান্ডউইচ তৈরী করার জন্য রান্নাঘরে এল জর্জ। লোক দুটি এখানে খাবে না; নিয়ে যাবে। রান্নাঘরে গিয়ে জর্জ দেখল এল ছোট দরজার পাশে একটা টুলের ওপর বসে আছে। ডার্বি-টুপি মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে। পাশে রয়েছে শটগান। নিক ও নিগ্রো আর এক পাশে। একজনের পিঠ আর একজনের পিঠের দিকে। প্রত্যেকের মুখ তোয়ালে দিয়ে বাঁধা। জর্জ নিজেই স্যান্ডউইচ তৈরী করে অয়েল পেপারে মুড়ে ব্যাগের মধ্যে ভর্তি করে লোক দুটিকে দিল। লোক দুটি দাম দিয়ে চলে গেল।

ম্যাক্স বললে, "সোনার চাঁদ ছেলে। তুমি রাঁধতেও পার! তোমার বৌ তোমার ওপর খুব খুশি হবে। বুঝলে!"

জর্জ বললে, "তা ওল এন্ডারসন আজকে আর আসছে না।"

ম্যাক্স বললে, "আরও মিনিট দশেক দেখি।"

ম্যাক্স আয়নার দিকে একবার, একবার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকলো। ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে। আরও পাঁচ মিনিট পার হল।

ম্যাক্স বললে, "চলে আয় এল। চল, চলে যাই। আজকে আর আসবে না।"

এই সময় আর একটা লোক এল। জর্জ বললে যে, রাঁধুনির অসুখ। আজ কোন খাবার নেই।

"তা আর একটা রাঁধুনীর ব্যবস্থা করলে ত পারতে। এই করে কি হোটেল চালাবে?" লোকটা বেরিয়ে গেল।

ম্যাক্স বললে, "আয় এল।"

"এই দুটি সোনার চাঁদ আর নিগ্রোর কি ব্যবস্থা করবি?"

"ঠিকই ত আছে।"

"ঠিক আছে?"

"আলবাৎ। এরা কি করবে?"

"কি জানি। মন সায় দিচ্ছে না। পথটা বড্ড পিছল। আর তুই বড় বাজে বকিস।"

"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কথা না বললে এরা যে ভয়ে সিটিয়ে থাকতো।"

"তবু তুই বড্ড বেশি কথা বলিস।' এল রান্নাঘরে থেকে বেরিয়ে এল। আঁট হয়ে আছে ওভারকোট। শটগানের মুখটা কোমরের কাছে দুলছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। দস্তানা পরা হাত দিয়েই ডার্বি টুপিটা আবার মাথায় ঠিক করে বসাল এল।

সে জর্জকে বললে, "তা হলে যাই সোনার চাঁদ। তোমার ভাগ্য খুব ভাল।"

ম্যাক্স বললে, "মাইরি, ঠিক বলেছিস। রেস খেলতে আরম্ভ কর হে চাঁদ।"

দরজা দিয়ে দু'জন লোক চলে গেল। জর্জ ওদের দেখতে থাকল জানালা দিয়ে। লাইট পোস্ট পার হয়ে ওরা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আঁটসাট ওভারকোট আর ডার্বি টুপিতে ওদের অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দরজা ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকল জর্জ। নিক আর রাঁধুনীর বাঁধন খুলে দিল সে।

হাউ মাউ করে উঠলো রাঁধুনী। "ওরে বাবা আর এক মিনিটও এখানে থাকছি নে। ওরে বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি"

উঠে দাঁড়াল নিক। জীবনে তার এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।

সে বললে, "কি ব্যাপার! এ সবের মানে কি?" বোঝা যায় এই ব্যাপারটায় খুব গর্ব বোধ করছে নিক।

জর্জ বললে, "ওরা ওল এন্ডারসনকে খুন করতে এসেছিল। এখানে খেতে এলেই ওরা এন্ডারসনকে গুলী করবে।"

"ওল এন্ডারসনকে?"

"হ্যাঁ"

গালাসি দুটোর ওপর বুড়ো আঙুল বোলাতে থাকল শ্যাম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা সব চলে গেছে?"

জর্জ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সবাই গেছে।"

শ্যাম বললে, "খুব খারাপ লাগছে। এত খারাপ লাগছে!"

জর্জ নিককে বললে, "শোন, তুমি বরং একবার ওল এন্ডারসনের কাছে যাও।"

"বেশ।"

শ্যাম বললে, "এ সব ব্যাপারে একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকুন। একেবারে মাথা গলাবেন না।"

জর্জ বলে উঠল, "তোর ভয় লাগে ত তুই যাস্‌নে।"

নিক জর্জকে বললে, "আমিই যাবো। সে থাকে কোথায়?"

মুখ ফিরিয়ে নিল শ্যাম।

সে বললে, "ওরা ফন্দি ফিকির সব জানে।"

জর্জ নিককে বললে, "এন্ডারসন থাকে হিশার বাড়ী।"

"আমি যাই।"

নিষ্পত্র গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় আলো গলে পড়ছে। নিক বড় রাস্তা ধরে একটা লাইট পোস্ট পার হল। অন্য আর একটা লাইট পোস্টের কাছে এসে নিক গলির দিকে বাঁক নিল। রাস্তার ওপর পর পর তিনটে বাড়ীই হিশার। তিনটেতেই ভাড়াটে থাকে। সিঁড়ির দু ধাপ উঠে কলিং বেল টিপল নিক। একজন মহিলা দরজা খুলে দিল।

"এ বাড়ীতে কি ওল এন্ডারসন থাকেন?"

"আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"যদি বাড়িতে থাকেন তবে একবার দেখা করব।"

নিক মহিলাটির সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে এলো বারান্দার শেষে। দরজার কড়া নাড়ল মহিলাটি।

"কে?"

মহিলাটি বললে, "আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান মিঃ এন্ডারসন।"

"এই যে আমি, নিক এ্যাডামস্‌।"

"ভেতরে এস।"

দরজা খুলে নিক ভিতরে গেল। জামাকাপড় পরেই বিছানায় শুয়ে আছে

ওল এণ্ডারসন। এণ্ডারসন আগে হেভিওয়েট চাম্পিয়ান ছিল। বিছানাটা তার দেহের অনুপাতে ছোট। দুটো বালিশের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে এণ্ডারসন। সে নিকের দিকে একবারও তাকালো না।

জিজ্ঞাসা করল এণ্ডারসন, "কি ব্যাপার?"

উত্তর দিল নিক, "আমি ছিলাম হেনরির হোটেলে। এমন সময় দুটো লোক এল। তারা আমাকে আর রাঁধুনীকে বেঁধে ফেলে। তারা বলে, তারা আপনাকে গুলী করবে।"

নিক যখন এই কথাগুলো বললে, তখন নিজের কানেও কথাগুলো বোকা বোকা শোনাল। উত্তর দিল না ওল এণ্ডারসন।

"ওরা আমাদের বেঁধে রান্নাঘরে ফেলে রেখে দিল। আপনি যখন ওই হোটেলে খেতে যাবেন, তখন ওরা আপনাকে গুলি করবে।"

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে থাকল এণ্ডারসন।

"জর্জ আমাকে এই খবরটা দিতে পাঠাল।"

উত্তর দিল এণ্ডারসন, "তা আর আমি কি করতে পারি?"

"ওদের কেমন দেখতে, তা-ও বলতে পারি।"

উত্তর দিল এণ্ডারসন, "না তা আর বলে কি লাভ? আমি শুনতেও চাই না।" দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল সে। "তুমি এই খবরটা দেবার জন্য এত দূরে এসেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।"

"না, না, ধন্যবাদের কি আছে!"

নিক বিছানার ওপর শায়িত বিরাট শরীরের দিকে তাকাল।

"আমি কি পুলিশে খবর দেবো?"

"না; পুলিশ কিছুই করতে পারবে না।"

"আমি কি করতে পারি, বলুন।"

"না, তুমি কিছুই করতে পারো পারো না।"

"তাহলে ব্যাপারটা একটা ধাপ্পা, তাই না?"

"না, ব্যাপারটা মোটেই ধাপ্পা নয়।"

ওল এণ্ডারসন দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছে যেন এণ্ডারসন। "কি ব্যাপার জানো? আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি।—যাবো? কি যাবো না? কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে পড়ে আছি।"

"আপনি কি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন না?"

"না। না। কত পালিয়ে বেড়ালাম। আর পালিয়ে বেড়াতে পারি না।"

সে দেওয়ালের দিকে তাকাল।

"আর কিছুই করার নেই।"

"কোন রকমে আর কোন কিছুই কি করা যায় না?"

আগের মতন নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল, "না। আর কিছু সম্ভব নয়। আমিই অন্যায় করেছি। এখন আর কিছু করা যায় না। আর কিছুক্ষণ পরে আমি বাইরে যাবো।"

"তাহলে আমি বরং জর্জকে এই খবরটা দিয়ে আসি।"

নিকের দিকে তাকাল না এণ্ডারসন, বললে, "যাও। এসেছিলে, তার জন্য ধন্যবাদ।"

চলে এল নিক। জামা-কাপড় পরা বিছানায় শায়িত এণ্ডারসনের দিকে আর একবার তাকাল সে। এণ্ডারসন দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সেই মহিলাটি বললে, "উনি আজ সারাদিন ঘরের বাইরে যাননি। মনে হয়, শরীরটা আজ ভাল নেই। আমি একবার বললাম: মিঃ এণ্ডারসন, বড় সুন্দর শীত পড়েছে। একবারটি অন্ততঃ ঘুরে আসুন। কিন্তু বেড়াতে যেতে ভাল লাগলো না ও'র।"

"না, ও'র বাইরে যেতে ভাল লাগছে না।"

মহিলাটি বললে, "ও'র শরীর খারাপ। আমারও মনটা ভাল লাগছে না তাই। কি সুন্দর মানুষ উনি। আগে ত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।"

"আমি জানি।"

"ও'র মুখের দিকে না তাকালে কিন্তু এ-কথা কিছুতেই বোঝা যায় না।" রাস্তার কাছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দু'জন। "উনি এত শান্ত, এত ভদ্র।"

নিক বললে, "তাহলে আমি যাই মিসেস্ হিশা।"

"আমি মিসেস্ হিশা নই। এই বাড়িটা মিসেস্ হিশার। আমি দেখাশোনা করি। আমার নাম মিসেস বেল।"

"তাহলে আসি মিসেস্ বেল।"

"আচ্ছা।"

অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে নিক আবার লাইট পোস্টের কাছে এল। তারপর বড় রাস্তা ধরে সে এল হেনরির হোটেলে। কাউন্টারের পিছনে ছিল জর্জ।

"ওদের সঙ্গে দেখা হল?"

নিক উত্তর দিল, "হ্যাঁ। ও ঘরে আছে। বাইরে আসবে না।"

নিকের গলার শব্দ পেয়েই রান্নাঘরের দরজা খুলে বাইরে এল স্যাম।

"আমি ও-সব কথায় কান দিবো না," —এই বলে আবার দরজা বন্ধ করে দিল স্যাম।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "সব বললে?"

"বললাম। যা জানি সব বলেছি। কিন্তু ও ত এ-সবই জানে।"

"ও কি করবে?"

"কিছুই না।"

"তাহলে ওকে যে খুন করবে।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"শিকাগোতে নিশ্চয়ই কোন কেলেঙ্কারি করে এসেছে লোকটা।"

"আমারও তাই ধারণা।"

"কি ভয়ানক কাণ্ড বল ত!"

"ভয়ানক না? ভয়ঙ্কর!"

ওরা আর কথা বললে না। একটা তোয়ালে নিয়ে কাউণ্টার মুছতে থাকল জর্জ।

নিক বললে, "আমি ভাবছি লোকটা কি কাজ করেছে, যার জন্য এরা গুলি করতে চায়?"

"কাউকে হয়ত ফাঁসিয়ে থাকবে। তাই এরা শোধ তুলতে এসেছে।"

নিক বললে, "আমি বাপু এই শহরে আর থাকছি না।"

উত্তর দিল জর্জ, "সেই ভাল। শহর ছাড়াই ভাল।"

"ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়। লোকটা ঘরে শুয়ে আছে। সব জেনেশুনেই শুয়ে আছে। জানে ঘরের বাইরে পা দিলেই তার কি হবে। ভাব ত ব্যাপারটা! ভাবলেই রক্ত হিম হয়ে আসে।"

জর্জ বললে, "কিছু না ভাবাই ত সবচেয়ে ভাল।"

অনুবাদক: রাম বসু

লেখকপরিচিতি

অমৃত: ১ম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

আগুন! আগুন!

অজিত সেন
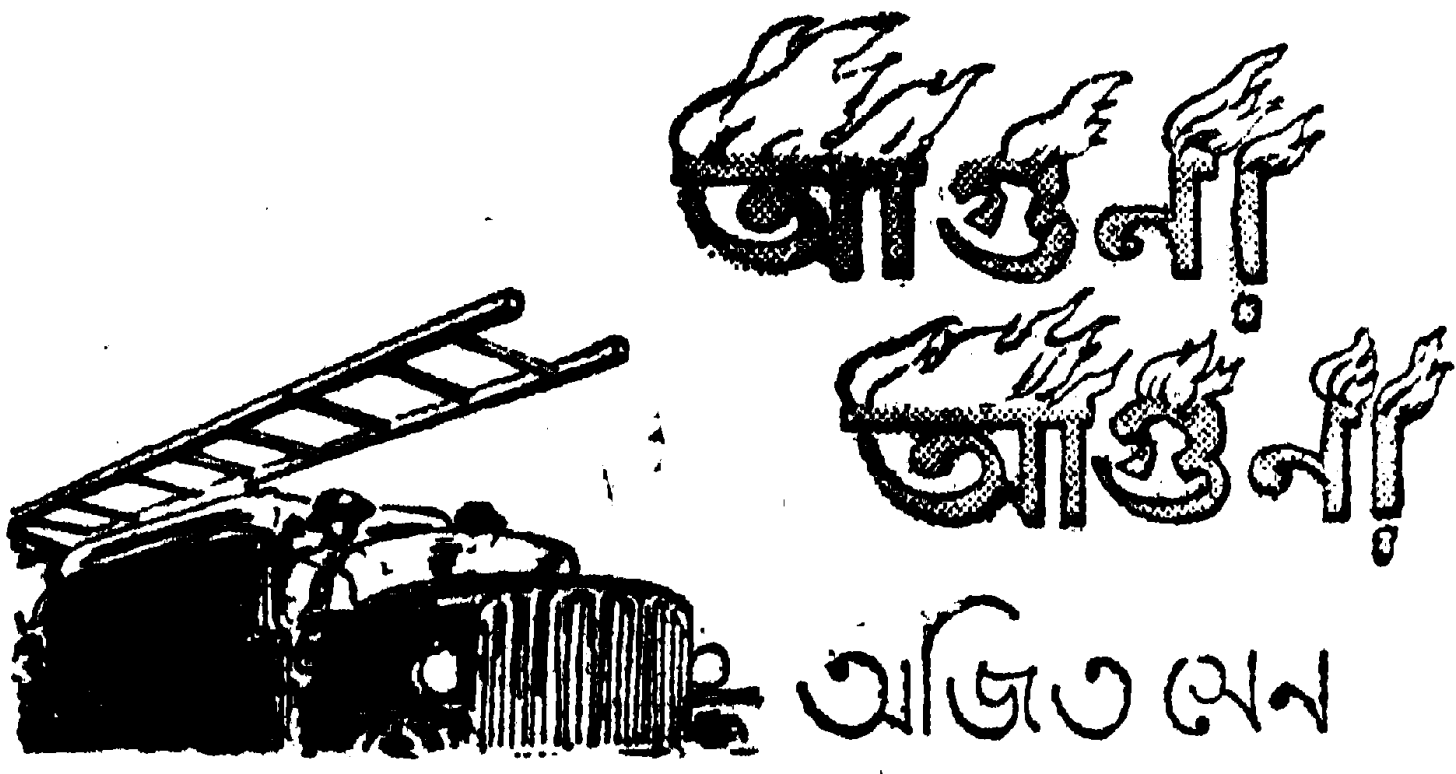
পাথরে পাথরে ঘষে মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালতে সক্ষম হলো, সেদিন থেকেই আগুন মানুষের পরম মিত্র। এই আগুন মানুষকে সভ্যতার ওপরের ধাপে উন্নীত করেছে। শিকার-লব্ধ কাঁচা মাংস ও বনের ফল-মূল ছেড়ে মানুষ শল্যপক্ক মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করে পরম তৃপ্তি পেলো, ক্রমে ভাত ফুটিয়ে খেতে শিখলো, শীতের রাত্রে আগুন জেলে হাত-পা সেঁকে বাঁচলো। অন্যান্য কাজেও আগুনকে ব্যবহার করে প্রকৃতির ওপরে বেশ খানিকটা প্রভুত্ব করলো। কিন্তু প্রকৃতির এই দুর্জয় শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিপর্যয়ও দেখা দিলো। প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিতে লাগলো, মানুষের একটু অসাবধানতা দেখা দিলে। প্রাকৃতিক দুর্জয় শক্তিগুলিকে মানুষ বশ করে কাজে লাগাতে গিয়েছে বটে কিন্তু একটু অসাবধান হলেই দুর্মদ তেজী ঘোড়ার মত অন্যমনস্ক সওয়ারকে তারা মাটিতেও ফেলে দেয়। তাই আগুনের হাতে অসাবধান মানুষ দগ্ধ হয়ে পুড়েও মরতে লাগলো। হিসেব করলে দেখা যাবে সভ্যতার শৈশব থেকেই আগুন মানুষের একই সংগে শত্রু ও মিত্র।

বর্ণাশ্রমে প্রকৃতিভেদে আগুনকে উনিশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ উনিশ দফা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায়। শহরে যত আগুন লাগে তার অধিকাংশই ঘটে গৃহস্থ-বাড়ীতে, দোকান-পাটে, ছোট-খাট ফ্যাক্টরীতে, গুদামে এবং পুজোর প্যাণ্ডেলে কিম্বা ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্টে। উপরোক্ত প্রকারে আগুন লাগার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বলন্ত চুল্লী, ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট। গুদামে আগুন লাগার কারণ রাসায়নিক দ্রব্য-জনিতও হতে পারে। বিশেষ করে পাটের গুদামে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য রাখার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের হেতু হয়, তা দেখা গিয়েছে। পাট, গন্ধক কি কাঠের গুদামে অনেক সময় অসাবধানে রক্ষিত মোমবাতি কিম্বা অন্যমনস্কভাবে নিক্ষিপ্ত সিগারেট বা বিড়ির টুকরো থেকে বহু অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শহর-তলীতে যে সব অগ্নিকাণ্ড হয় তার কবলে বহু পাটকল, সুতোকলকে ভস্মীভূত হতে দেখা যায়। পাট বা তুলোর গুদামও শহরতলীতে অনেক আছে এবং তারাও এই অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায় না। শহর-তলীতে আর এক ধরণের অগ্নিকাণ্ড সচরাচর দৃষ্ট হয়, তা' হচ্ছে কুটির বা খড়ের গাদায় অগ্নিসংযোগ। এ ধরণের আগুন অত্যন্ত বিপজ্জনক কেন না, তা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে পারে। তাছাড়া রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্রব্যের ফ্যাক্টরীতে বা রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটরে ও ট্রাম-বাস প্রভৃতি যানবাহনে আগুন লাগার কাহিনী তো অনেকেরই জানা আছে।

ইতিপূর্বে মোটামুটি জ্বলন্ত চুল্লী, জ্বলন্ত মোমবাতি, ইলেকট্রিক সর্ট সারকিট এবং অন্যমনস্ক হাতের নিক্ষিপ্ত বিড়ির টুকরো প্রভৃতি থেকে আগুন লাগার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু মফঃস্বলে বা শহর-তলীতে আরো এক ধরণের আগুন দেখা যায়—যা হয়তো রেলওয়ে ইঞ্জিনের উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত কয়লা বা উত্তপ্ত ছাই থেকে অনেক সময় ঘটে। ফ্যাক্টরীর ফার্ণেস থেকেও অনুরূপভাবে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এ-ছাড়া খনি-অঞ্চলে খনির মধ্যে আগুন লাগার দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। নদীবক্ষে জলের ওপরেও আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নদীর ওপরে পাট বা খড়-বোঝাই নৌকা বা জাহাজে আগুন লেগে বহু প্রাণ ও সম্পত্তি বিপন্ন হতে দেখা যায়। শহরে ও গ্রামে বহু পেট্রোল-ভল্ট আছে। সেখানেও কখনো কখনো আগুন লেগে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে।

অগ্নি-বিশেষজ্ঞরা আগুনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কার্বোনেশাস্ বা কার্বনঘটিত, ইলেকট্রিক ও কেমিক্যাল।

এই কার্বোনেশাস আগুনের মধ্যে যাবতীয় গৃহের অগ্নিকাণ্ড, চটকল, সুতোকল, পেট্রোল-ভল্ট প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাড়ীতে সামান্য আগুন লাগলে স্টিরাপ পাম্পের সাহায্যে জল দিয়ে সহজেই নিভানো যেতে পারে। জামা-কাপড়ে আগুন লাগলে ছুটোছুটি না করে কম্বল জড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর ফলপ্রদ উপায় অনেকেরই জানা আছে। এ-ছাড়া বহু বাড়ী, অফিস বা সিনেমা-হাউসে সোডা-এসিড এক্সটিংগুইসার বা বালি-ভর্তি বা ফোম-ভর্তি (foam) ফায়ার-কিং দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকে। সময়ে ঐগুলি খুব প্রয়োজনে লাগে। চটকলে আগুনের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল থাকায় নির্মাণের সময়েই মাথার ওপরে লম্বা পাইপের সাহায্যে ছোট ছোট স্প্রিংলার লাগানো হয়। ঐগুলির মধ্যে ছোট ছোট ভাল্ব আছে এবং জলপূর্ণ বৃহৎ পাইপের সংগে ঐগুলি সংযুক্ত। আগুন লাগার পরে বিশিষ্ট তাপমাত্রায় ঐ ভালবগুলি ফেটে আপনা থেকেই জল পড়তে থাকে এবং আগুনের সংগে প্রাথমিক যুদ্ধ চালায়। যে কোনো বাড়ী বা চটকলের বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডগুলিতে দমকলের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়ী বা যে কোনো জায়গায় যখন বৈদ্যুতিক কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তখন মেন-সুইচ বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ আগুনের মতই জল দিয়ে তাকে নেভানো যায়। কিন্তু মীটার-বোর্ডে আগুন লাগলে কার্বোন টেট্রা ক্লোরাইড বা কার্বনডাইঅক্সাইড ছাড়া নেভানোর উপায় নেই। জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলে শক্ খেয়ে অপমৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে বালি ছুঁড়েও অনেক সময় আগুন নেভানোর প্রাথমিক চেষ্টা করা যেতে পারে।

কেমিক্যালঘটিত আগুন বালি দিয়ে নেভানো যায়। কিন্তু পেট্রল বা তৈল-

জাতীয় অন্য কিছুতে আগুন লাগলে ফোম-কম্পাউণ্ড (foam compound) ছাড়া নেভানোর উপায় নেই। এই ফোম সোপেনাইন, ষাঁড়ের রক্ত ও এল্যুমিনিয়ম সালফেট প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত। তৈলাক্ত দ্রব্যের ওপরে সাদা ফেনার ফেনায়িত ধারা পতিত হয়ে অক্সিজেনের সংস্পর্শচ্যুত আগুনকে সহজেই নিভিয়ে ফেলে। আগুনে নেভাবার সমস্ত মাধ্যম বা দ্রব্যের উদ্দেশ্য বাতাসের অক্সিজেনকে জ্বলন্ত জিনিসের সংস্পর্শচ্যুত করা।

কোল্‌গ্যাসঘটিত আগুনে অধিকাংশ ঘটে গ্যাসপোস্টে, গ্যাসের কারখানায় এবং খনিতে। এ ধরণের ছোটখাট আগুনে কাদার তাল দিয়ে কোল্‌গ্যাস নির্গমনের পথ বন্ধ করে নিভিয়ে দেওয়া যায়।

উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ ধরণের আগুনে ছাড়া কল-কারখানার অধিকাংশ আগুনে নেভাতেই প্রবল ধারায় জলের প্রচুর সরবরাহের প্রয়োজন। লম্বা লম্বা হোস পাইপের সাহায্যে এই জল পাওয়া যায় রাস্তার হাইড্রেন্ট, পুকুর, খালবিল প্রভৃতি থেকে। তাছাড়া দমকলের গাড়ীতেও হাজার গ্যালন জলের ট্যাঙ্ক পরিবহণ করতে পারে। আগুনে নেভানো ছাড়াও নিমজ্জিত ব্যক্তি বা প্রাণীকে উদ্ধার করা, ইলেকট্রিক শক্-খাওয়া অচেতন ব্যক্তিকে, আটতলার সমান উঁচু টাওয়ার থেকে নামিয়ে বাঁচানো, ঝড়ে ভূপাতিত বৃক্ষ সরানো—সমস্ত কর্মকর্মেই দমকল বাহিনীকে সাড়া দিতে হয়। নদ্রোলিত একশো ফিট উঁচু মইয়ের সাহায্যের হাওড়ার ব্রিজ থেকে পাগলকে নামাতেও দমকল বাহিনীকেই খবর দিতে হয়। মেমসায়েবের আদুরে বেড়ালকে পাঁচতলা বাড়ীর উঁচু কার্নিশ থেকে নামিয়ে আনার মত কৌতুককর পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয় দমকল বাহিনীকে।

আগুনে লেগে আমাদের জাতীয় সম্পত্তির কী বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয় এবং দমকল বাহিনীর কর্মতৎপরতায় কী পরিমাণ ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান তালিকা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যাবে। বিগত তিন বৎসরের তালিকা অনুসরণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া গেছে।

বৎসর	মোট অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা	অগ্নিকাণ্ড সংশ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির পরিমাণ	অগ্নিকাণ্ড সংশ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ	অগ্নিকাণ্ড সংশ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির অবশিষ্ট পরিমাণ
১৯৫৮-৫৯	২,৬০৫	টাঃ ১,৭৪,৩১,৯৭৯	টাঃ ৪০,৫৮,৩৫১	টাঃ ১,৩৩,৭৩,৫৮৮
১৯৫৯-৬০	২,৮৮৫	টাঃ ১,৮১,৯৯,০৪০	টাঃ ৪১,১৬,৩৮১	টাঃ ১,৪০,৮২,৬৫৯
১৯৬০-৬১	৩,০৯২	টাঃ ১,৫৮,৪১,১২৪	টাঃ ২৫,৪১,২০৮	টাঃ ১,৩২,৯৯,৯১৬
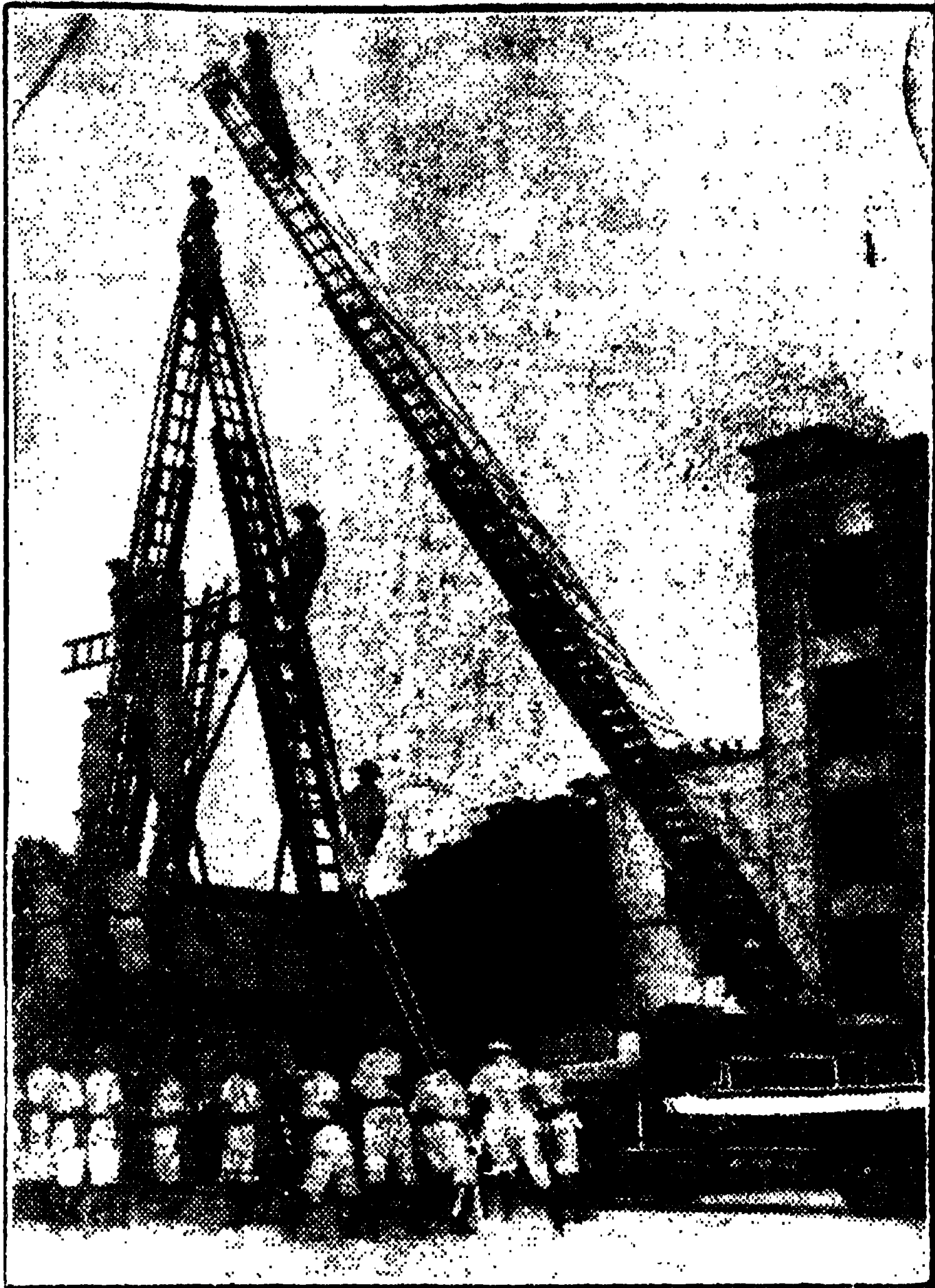
নূতন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে সম্মিলিত মহড়া

গত ১৯৬০-৬১ সালে দমকল বাহিনীকে ৩,০৯২টি ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। তার মধ্যে ৭০৩টি নিরর্থক এবং ৩১৩টি উদ্ধারকার্য সম্পাদন করার জন্যে। ৭০৩টি নিরর্থক ডাকের মধ্যে ৩০০টি সামান্যতম আগুন লাগার সম্ভাবনাতেই দমকলকে ডাকা হয়েছে। ২০০টির ওপর মিথ্যা ডাকে দমকল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাকা হয়েছে—যা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। গত বছরে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার জাতীয় সম্পত্তি দমকল বাহিনীর তৎপরতায় রক্ষা পেয়েছে। তালিকা থেকে দেখা যেতে পারে যে, জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ নিম্নগামী। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে অধিক সংখ্যক আগুন লেগেছে বাড়ীতে এবং তার কারণ জ্বলন্ত চুল্লী, জ্বলন্ত বাতি কিংবা বিড়ি-সিগারেটের টুকরো। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য সর্বাধিক আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের আগুনে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চটকল, সুতোকল ও কয়েকটি বড় বড় কারখানা।

গত ৫ই মার্চ থেকে ১১ই মার্চ অবধি জনসাধারণকে অগ্নির ক্ষতিকারক প্রভাব ও নির্বাপনের উপায় সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে অগ্নি-নিরোধ সপ্তাহ প্রতিপালন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ও

কলকাতা শহরে পোস্টার ও রাজপথে পথে পরিভ্রমণরত দমকল বাহিনীর যান-বাহন থেকে বক্তৃতার মারফৎ অগ্নি-নিরোধ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে। আকাশবাণী থেকে এ উপলক্ষ্যে অগ্নিবিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে দমকল বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এতদুপলক্ষে ৫ই, ৭ই ও ১০ই মার্চ তারিখে বিভিন্ন প্রকারে অগ্নি-কাণ্ড ও তার নির্বাপনের উপায় চিত্তাকর্ষক অভিনয়ের সাহায্যে দেখানো হয়।

সোডা-এসিড-এক্সটিংগুইসারনিঃসৃত জলধারায় কার্বোনেশাস্ গ্রুপের কাগজ, কাঠ ও খড়ের গাদায় আগুন নেভানোর পদ্ধতি দেখানো হয়—যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ফোম্-কম্পাউণ্ডের সাহায্যে তৈল ও তৈলজাতীয় রঙ বা বার্ণিশের অগ্নিকাণ্ড নির্বাপনের প্রক্রিয়াও দেখানো হয়।

শ্বাসরোধকারী প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে এ্যাসবেস্টাস্ স্যুট্ পরে ব্রিদিং এ্যাপারেটাসের সাহায্যে প্রবেশের ক্রীড়া-কৌশল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। জলের সাহায্যে আগুন নেভানোর বহু কৌশল দেখানো হয়। সাধারণ পাকাবাড়ীতে বা গুদামে সোজা জলের জেট্ (Jet) হোস্ পাইপের সাহায্যে নির্গত করে আগুন নেভানো সম্ভব। কিন্তু পাটগুদামে বিরাট অগ্নি-কাণ্ড হলে সিলিং-এ সারি সারি ফুটো করে হোস্ পাইপের মুখে রিভলভিং নজল (nozzle) লাগিয়ে আগুন নেভাতে হয়। এক একটি রিভলভিং নজল (nozzle) দশ ফুট ক্ষেত্র অবধি বিস্তৃত আগুন নেভাতে সক্ষম।

খড়ের চালে আগুন নেভাতেও রিভলভিং জেট্ ব্যবহার করা হয়। নাহলে সোজা জেট্-এর প্রবল আঘাতে খড়ের বাড়ী-ঘর ধূলিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা। তৈলজাতীয় দ্রব্যের অগ্নি-কাণ্ড নির্বাপনে ফগ্-নজল-এর ব্যবহারও দেখানো হয়েছিল। ফগ্-নজল থেকে উৎক্ষিপ্ত জলকণা চারিদিকে কুয়াশার সৃষ্টি করে। তার ফলে তৈল-জাতীয় পদার্থের ওপরে কুয়াশার আস্তরণ সৃষ্ট হওয়ায় অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং আগুন নিভে যায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খেলা দেখানো হয় একটি পাঁচতলা উঁচু টাওয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। টাওয়ারের অধিবাসীদের ভয়ার্ত চীৎকারের মধ্যে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে টেলিস্কোপিক ল্যাডার (বিশেষ ধরণের মই), একশো ফুট উঁচু মই এবং ঝুলন্ত রজ্জুর সাহায্যে টাওয়ারের অধি-বাসীদের নিরাপদে অনাহত অবস্থায় মাটিতে নামিয়ে আনা হয়। তারপরে চতুর্দিক থেকে সুকৌশলে হোস্ পাইপ-নির্গত জেট্ বা জলধারার সাহায্য দ্রুত অগ্নি নির্বাপন করা হয়।

উপরোক্ত অভিনয় থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় কীভাবে প্রকৃত অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করা হয় এবং মানুষের প্রাণ ও ধনসম্পদকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী বিপুল পরিমাণ চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আগুনের হাত থেকে বাঁচতে হলে ছোটো বড়ো কোনো আগুনকেই অবহেলা করা উচিত নয়। নিজে সেই আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে দমকল বাহিনীকে ডাকা বিধেয়।
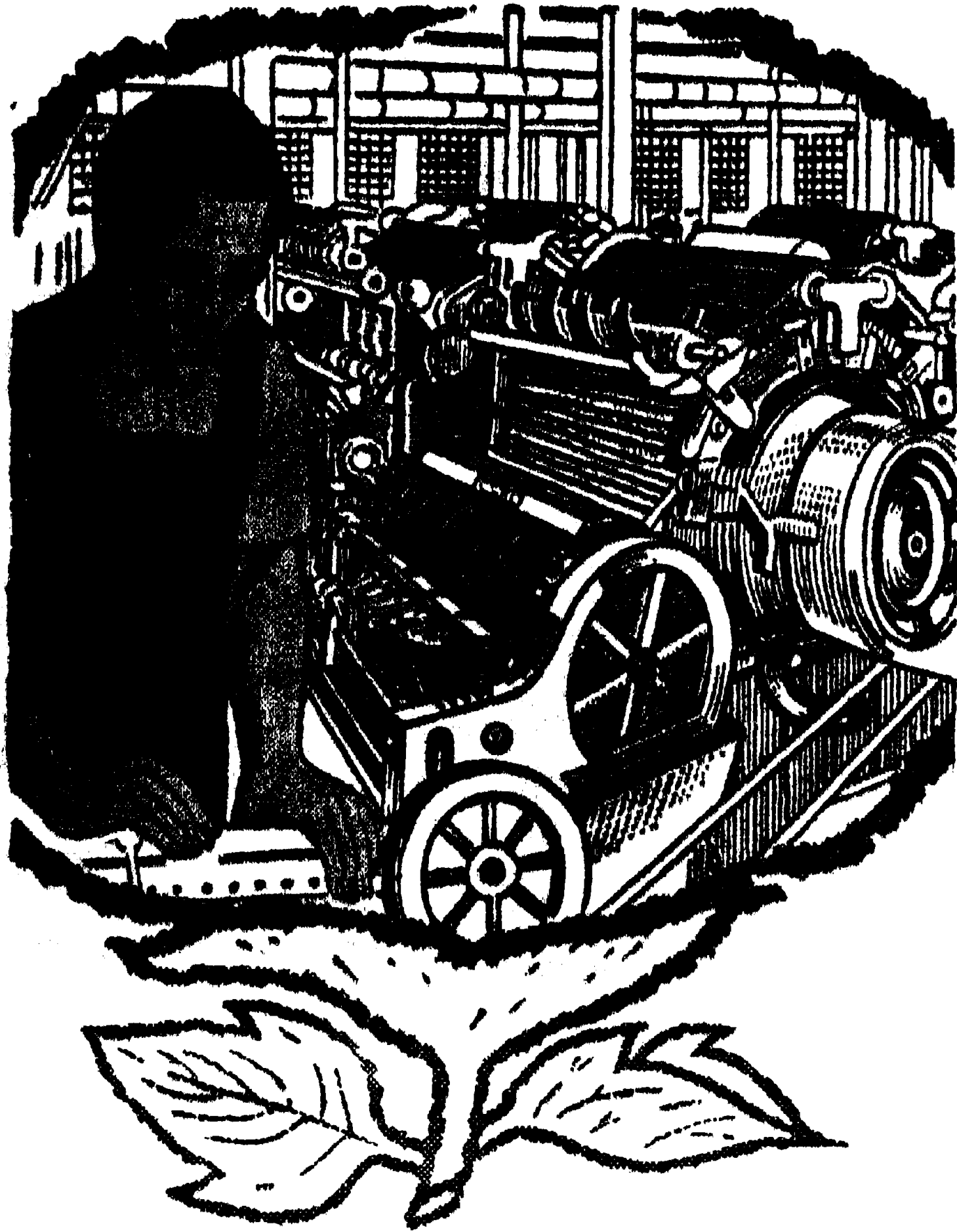
দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী
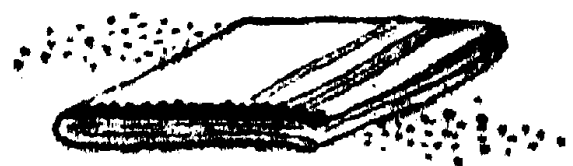
(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুয়াশার আচ্ছাদনে ঢাকা পৃথিবীতে কি সূর্যকর কিরণ এসে ধাক্কা মারে? বিদীর্ণ করে দেয় সেই ঝাপসা-ঝাপসা চাদরখানা? তাই হঠাৎ এক একটা বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে? স্পষ্ট চেহারা নিয়ে জেগে ওঠে গাছপালা রাস্তা বাড়ী।

ভ্রষ্টচৈতন্যের কুয়াশার চাদর বিদীর্ণ করে জেগে ওঠে চেতনার দীপ্তি?

সুমোহন চলে যাবার পর সুশোভন আর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পায়চারি করছেন না। জানলার কাছে চেয়ারটা টেনে চুপ করে বসে পথের লোক চলাচল দেখছেন।

সুচিন্তা শরবতের গ্লাসটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন, পিছন থেকে বললেন, 'কী অত দেখছ?'

সুশোভন মুখ ফিরিয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন, 'দেখ সুচিন্তা, কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন কিছু ভুল হয়েছে।'

'কোথায় আবার কি ভুল হলো?' বুকের ভিতর চমকে-ওঠা শঙ্কাকে সংযত রেখে সুচিন্তা বললেন, 'এই শরবতটা সময়ে খেতে ভুল হয়ে গেছে বটে। খেয়ে নাও।'

'থামো। রাখো ওসব। বলতো, ওই যারা চলে গেল ওরা আমার নিজের লোক না?'

সুচিন্তা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, 'নিজের লোক বৈকি। তোমার ভাই ভাইপো।'

'তবে? ওরা কেন চলে যাবে? তুমি ওদের চলে যেতে বলবে কেন?'

'আমি ওদের চলে যেতে বলেছি?'

সুচিন্তা অভিযোগের মত ক'রে বললেন।

সুশোভন বলেন, 'চলে যেতে বলনি। থাকতেও তো বললে না? ওরা আমার নিজের লোক।'

সুচিন্তার মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিদ্রোহের আলোড়ন জেগে ওঠে। বলে ওঠেন, 'ওরাই বা তোমার কাছে থাকতে চাইল কই? এত যদি নিজের লোক?'

'সেই তো! কি যে হ'ল, ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা সুচিন্তা, এ বাড়ীটা তো তোমার। এখানে ওরা থাকবে কেন? ওদের তো বাড়ী আছে। বড্ড ভাবনা হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে কোথায় যেন মস্ত কী একটা ভুল হচ্ছে।'

'অত ভাবতে হবে না তোমায়—' সুচিন্তা প্রায় ধমকে ওঠেন, 'ভাবতে গেলে কষ্ট হয় তোমার জান না? নাও শরবতটা খেয়ে নিয়ে বোসো। খবরের কাগজ পড়ি। আজ তো কাগজ পড়াই হ'ল না।'

সুশোভন শরবতের গ্লাসটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'থাক। কাগজ থাক। কষ্ট হয় বলে ভাবব না? ভেবে ঠিক করব না ভুলটা কোথায়?'

'ডাক্তারবাবু তোমায় ভাবতে বারণ করেছেন।'

'ডাক্তারের কথা আমি শুনবো না। ব্যস। আমি ভাববো।'

হ্যাঁ সুশোভন ভাববেন।

ভেবে ভেবে আবিষ্কার করবেন ভুলটা কোথায় ঘটছে।

ভাঁড়ারঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটা চিঠি পড়ছিল অশোকা।

মায়ালতা ঘরে ঢুকেই চোখে লালিত জ্বালা আর মুখে মধুর হাসি চেপে নিয়ে বলেন, 'ছোটঠাকুরপোর চিঠি এল বুঝি ছোটবৌ?'

অশোকা চিঠিটা থেকে চোখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ।'

'ভাইয়ের কাছে তো এই আজ সকালেই চিঠি এসেছে। আবার এবেলা! যাই বল ছোটবৌ তোমরা ভাই ডুবে ডুবে জল খাও। লোকদেখ্‌তো মনে হবে যেন দুজনে আদায় কাঁচকলায়, কিন্তু চোখের আড়ালে গিয়ে তো একেবারে বিরহ ধরছে না। সেই নতুন বিয়ের বয়েস মত চার পৃষ্ঠা চিঠি। তা' শুনি একটু কি লিখেছে।'

অশোকা আস্তে চিঠিখানা বড়জায়ের সামনে নামিয়ে দেয়।

মায়ালতা উদ্যত হাতখানা টেনে নিয়ে কষ্টে হেসে বলেন, 'ওমা, তোমাদের স্বামীস্ত্রীর প্রেমপত্র, ও আবার আমি পড়বো কি? মর্মার্থটা জানতে চাইছি।'

'মর্মার্থ আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।'

'বল কি ছোটবৌ? খুব বুঝি কাব্যি করেছে?'

'সে করবার ক্ষমতা থাকলে তো?' অশোকা মৃদু হেসে বলে, 'বলেছে দিন

তিনেকের মত সাগরময়ের জন্যে একজন নার্স ঠিক করে নীতা কলকাতায় আসছে ওর বাবাকে দেখতে, নীতা ফিরে যাবার সময় আমি যেন তার সঙ্গে দিল্লী যাই।'

'তার মানে? ছোটঠাকুরপো কি সত্যিই জামাই-বাড়ীতে বসবাস করবে ঠিক করেছে?'

'বাড়ীতে নয়, পাশের বাড়ীতে। সাগরময়ের সঙ্গে চেম্বারে বসতে একজন লোক তো সর্বদা থাকা দরকার—'

মায়ালতা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'চেম্বার! কেন সেই অন্ধ আবার ডাক্তারী করবে নাকি?'

'তাই তো লিখেছেন।'

'তবে আর কি, তুমি তা'হলে এবার বাক্সবিছানা গুছোতে বোসো। সাধে কি আর বলেছে অকৃতজ্ঞ পৃথিবী।'

মায়ালতা চোখের জল চাপতে চাপতে দুম দুম করে চলে যান।

আশ্চর্য মানুষের মন! অহরহ যাদের 'ভার' বলে মনে করেছেন মায়ালতা সারাক্ষণ যাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছেন, 'একটু সরেও না! সরলে হাত পা মেলে বাঁচি।' তাদের সরে যাবার সম্ভাবনার কথামাত্র শুনেই, মায়ালতার বুকের মধ্যে থেকে কান্না উথলে উঠছে।

মন কেমনে? অভিমানে? না তাঁর ওপর টেক্কা মেরে চলে যেতে চায় এই ঈর্ষায়? কিসে তা' মায়ালতা নিজেই জানেন না। শুধু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

কিন্তু মায়ালতার সেই চিরদিনের ভাগ্য।

এত যন্ত্রণার সমর্থন জোটে না স্বামী-পুত্রের কাছে। সুবিমল ব্যঙ্গ স্বরে বলেন, 'ভালই তো, এবার হাতপা মেলে বাঁচবে। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবে।'

ছেলেরা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, 'উনি চলে যাবেন বলে কান্না পেয়ে যাচ্ছে তোমার? বলিহারী মা। বুঝতে পারছি না কোনটা তোমার সত্যি, এতদিনের হাত-পা ছোঁড়া, না এখনকার অশ্রুবিসর্জন!'

মায়ালতা আবার চিরদিনের প্রতিপক্ষের উপর গিয়ে পড়েন, যথারীতি দেয়ালকে প্রতীক করে। 'উঃ একেই বলে দুনিয়া! এতদিনের এত কিছু সবই ভস্মে ঘী! কে কোথা থেকে 'তু' করে একটু ডেকেছে, অমনি সব বিস্মরণ হয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে পড়ে থাকতে গেলেন। এদিকে তো—বাবুর এত টনটনে মান, অথচ জামাইয়ের চাকরগিরি করতে মানে বাধবে না? মেয়েকেও বলিহারী, পাগল ছাগল বাপটা পড়ে রইল কার না কার কাছে, এখন আদর বাড়ল কাকার। কেন? না কাকাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হবে। কাকা জেঠা বলে কোন দিন জানল না, পুঁছল না—আর আজ—আমি হলে ছায়া মাড়াই না অমন মেয়ের।'

দেয়াল কথা বলে না।

"ছোটঠাকুরপোর চিঠি এল বুঝি ছোটবৌ?"

কথা বলে তারা, যা'রা চিরদিন কলকণ্ঠ।

কৃষ্ণা চিঠির মাধ্যমে বলে, 'আশ্চর্য নিশ্চিন্ততা তোমার নীতাদি। তোমার যে একটি বাবা আছেন, সেটা বোধকরি ভুলেই গেছ? আরও ভুলে গেছ, যাঁর ঘাড়ে তাঁকে চাপিয়ে রেখে দিয়েছ, সে ভদ্রমহিলার সংসার আছে, সমাজ আছে, ছেলেরা আছে। তিনি যদি ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, দোষ দিতে পারবে? দেশে তো ফিরেছ শুনেছি, বাবার কথা আদৌ ভাবছ না কেন?'

ভাষাটায় চালাকির খেলা আছে।

'তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন', একথা বলেনি কৃষ্ণা, 'যদি' দিয়ে সাফাই রেখেছে। ইন্দ্রনীলের অজানতে চিঠিটা লিখে পোষ্ট করে দেয় সে।

অনুপম কুটিরের আশা এখনও ছাড়েনি কৃষ্ণা। আসল কথা, মার সঙ্গে তার যেন আর কিছুতেই বনছে না, আর এদিকে বাপের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। 'তাঁদের যথাসর্বস্ব কৃষ্ণারই' একথা যতই তাঁরা মুখে জাহির করুন, যতক্ষণ তাঁরা জল-জ্যান্ত জীবিত, ততক্ষণ তো নয়?—ততক্ষণ তো এ সংসারে কৃষ্ণাদের পোষ্ট ঘরে থাকা মেয়ে আর ঘরজামাই।

তা'ছাড়া ওই কথা।

অসহ্য লাগছে মায়ের সদাসর্বদা আক্ষেপ এবং মেয়ের প্রতি দোষারোপ, আর বাবার তীক্ষ্ণ এক একটি ব্যঙ্গের হুল! তাঁদের মর্মজ্বালা, এইভাবেই প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা কৃষ্ণার কাছে ক্রমশঃ মর্মান্তিক হয়ে উঠছে।

সেদিন মা আর মাসীর সফরকাহিনী শুনে পর্যন্ত নীতাকে চিঠি লেখবার ফন্দিটা মাথায় ঢুকেছিল তার। সত্যিই তো লোকটার দু'দুটো ভাই, ভাজ আত্মীয়-স্বজন, মেয়ে-জামাই সব রয়েছে, তবু নিলজ্জের মত সুচিন্তা তাকে আগলে রাখবেন?

ওদিক থেকে যদি কোন সুরাহা হয়তো হোক না।

এখন অহরহ মনে হতে থাকে কৃষ্ণার, সেই তখন নির্বোধের মত অত উতলা না হলেই হতো। জগতে কত 'প্রথম প্রেম' ব্যর্থতার রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণারও না হয় যেত। এতদিনে তাহলে দিব্যি একখানি বাড়ী, গাড়ী আর মোটা আয়ে সমৃদ্ধ বরের গলায় মালা দিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন পেয়ে বাঁচতো!

মনে হতে থাকে, সাত জন্মে কেউ যেন প্রেমে পড়ে বিয়ে না করে। বড়জোর বিয়ের আগে একটু আধটু প্রেমের খেলা করা চলতে পারে, কিন্তু সেই পলকা সুতোর ভর দিয়ে ঝুলে পড়াটা বোকামির চরম। বিয়ে করতে হলে বেশ

শক্ত একগাছা 'কাছির' দরকার। যা দিয়ে জীবন-তরণীখানিকে বাঁধা যায়।

চিঠি পাঠিয়ে উত্তরের আশায় দিন-গুনতে থাকে কৃষ্ণা।

কিন্তু নীতা কি উত্তর দেবে?

দিলে কী উত্তর দেবে?

নীতাকে আর তার সেই অন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীকে দেখতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে নীতার এই বিয়েটা নিতান্তই নিরুপায়তার ফাঁসে ফাঁসি-লাগানো না, কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া প্রেমের সোনায় গড়া মালা স্বেচ্ছায় গলায় পরা? একবার দেখে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু যাবার কথা তুলতে সাহস হয় না। সাহস হয় না ইন্দ্রনীলকে নীতার কাছা-কাছি দেখবার। নীতাকে ঠিক ঈর্ষা হয়তো করে না কৃষ্ণা, কিন্তু ভয় করে।

এ চিঠি দিল্লীতে নীতার হাতে পড়ে, যখন নীতা সাগরময়ের জন্যে একজন নার্স ঠিক করে, আর তাকে ছোটকাকার কাছে জিম্মা দিয়ে কলকাতায় আসবার ব্যবস্থা করছে।

তাই চিঠির আর উত্তর দেওয়া হয় না। ভাবে নিজেই তো যাচ্ছি উত্তর হয়ে। কী আর উত্তর দেব। আর ভাবে, সত্যিই কি সুচিন্তা পিসিমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন?

নীতা কি তা'হলে ভুল দেখেছিল? ভুল ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল? কিন্তু তাই কি সম্ভব? তাহলে হয়তো বা এই স্বাভাবিক। নীতাও তবে কোনদিন ক্লান্ত হয়ে উঠবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে, সাগর-ময়ের অক্ষমতার ভার বইতে বইতে! শিউরে ওঠে নীতা, প্রাণপণে বলে, না না না।

ট্যাবলেটের শিশিটার ঢাকনি খুলে উপুড় করে ফেললেন সুচিন্তা, মাত্র আর একটা আছে। আজ পর্যন্ত চলবে। আবার আজই আনানো দরকার। আশা-তীত কাজ দিচ্ছে ওষুধটা।

হ্যাঁ আশাতীত, ধারণাতীত।

সুশোভন ক্রমশঃই যেন ঠিক হয়ে আসছেন। ডাক্তার পালিত বলছেন, নতুন এই ওষুধটা চিকিৎসা-জগতে সাড়া এনে দিয়েছে। বলেছেন নিয়মিত ব্যবহার করে চলতে।

ফুরিয়ে গেছে ওষুধটা।

আনিয়ে রাখতে হবে।

অতএব বলতে হবে নিরুপমকে।

নিরুপমকে। যে নিরুপমের সঙ্গে সেই রাত থেকে কোন কথা নেই সুচিন্তার। সেই যে রাত্রে সুচিন্তা সারা-রাত জেগে বসে শুধু মানুষের হৃদয়-দৈন্যের কথা ভেবেছেন।

আজকাল আর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয় না সুশোভনকে। বোধকরি রিপোর্ট দিতে হয় ডাক্তারের কাছে, আর সে রিপোর্ট নিরুপম নিজেই বুঝেসুঝে দিয়ে আসে, মাকে প্রশ্ন করে না। ঔষধপত্র? সেও সময় বুঝে কোন এক সময় এনে সুশোভনের টেবিলে রেখে যায়।

কিন্তু এবার আর রাখবে না। সুচিন্তা জানেন। এখনো ফুরোবার সময় হয়নি। বেশ কতকগুলো ট্যাবলেট সুশোভন সেদিন ফেলে দিয়েছিলেন রাগ করে।

বলেছিলেন 'খাবো না খাবো না। শুনবো না তোমার ওই লক্ষ্মীছাড়া ডাক্তারটার কথা। ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে ও আমাকে কী যেন করে দিয়েছে। মনে হয় আগে যেন কত আনন্দ ছিল আমার, কত ভাল লাগতো এই সকাল সন্ধে দুপুর বিকেল, কোথায় চলে গেল সেই আনন্দ আর ভাললাগা। এখন সব সময় যেন কী একটা কষ্ট হয়, ভয়ঙ্কর একটা ভুলের ভাবনা, অথচ ভুলটা কোথায় ঘটছে খুঁজে পাচ্ছি না, এসব করছে কে? ওই ডাক্তারটা তো? ওর ওষুধ আমি ফেলে দেব।'

সত্যি ফেলে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটা।

অনেক বুঝিয়ে আর ধমকে নিবৃত্ত করেছিলেন সুচিন্তা তাঁকে। কিন্তু যেগুলো গেল, সেগুলো তো গেলই। নিরুপম জানে না এই যাওয়ার কথা। ও আন্দাজমত সময়ে এনে কোন এক সময় টেবিলে রেখে যাবে।

সুচিন্তাকে কোনদিন জিগ্যেস করবে না, 'মা ওষুধটা কি ফুরিয়েছে?'

সেই প্রশ্নটুকু যদি সুচিন্তার মস্ত একটা দাহকে শান্তিজলে ঠাণ্ডা করে দেয়, তা হলেও না। স্পষ্ট বলে না, কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে, মায়ের সঙ্গে কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু সুচিন্তাকেই ছেলেকে ডেকে কথা বলতে হবে। ওষুধটা না আনালেই নয়। নতুন এই ওষুধটায় আশাতীত ফল পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিটা আলোর সামনে তুলে ধরলেন সুচিন্তা। না আর একটার বেশী নেই। নিরুপমকে বলতে হবে।

কিন্তু যদি না বলেন।

কী হয় যদি ওষুধটা আর না আসে। হঠাৎ নিতান্ত জড়বস্তু এই ওষুধটার উপর ভয়ানক একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করেন সুচিন্তা। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত যেন চিনচিন্ করে ওঠে সে জ্বালায়।

এইটা! এইটাই তবে একমাত্র কারণ, সুশোভনকে সেই ভয়াবহ অন্ধকারের গহ্বর থেকে টেনে তোলবার। সুচিন্তা কিছু নয়! কিছু নয় সুচিন্তার মান সম্ভ্রম জীবন, আর জীবনের শান্তি! নিজেকে ধ্বংস করে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে যে ফসল ফলালেন সুচিন্তা, সে ফসল ঘরে তুলে নিয়ে যাবে অন্য আর একজন।

কী হয় তবে, যদি সুচিন্তা আবার নিজে হাতে সে ফসল উড়িয়ে পুড়িয়ে ছত্রখান করে দেন?

না, মাথা হেঁট করে নিরুপমকে গিয়ে বলবেন না সুচিন্তা, 'ওষুধ চাই।'

ওর শান্ত হয়ে আসা স্নায়ুতে স্নায়ুতে আবার যদি বিশৃঙ্খলার চাঞ্চল্য দেখা দেয় তো দিক। সুচিন্তা নিষ্ঠুর উল্লাসে ফিরে ফিরতি পরীক্ষা শুরু করবেন সুচিন্তার প্রাণান্তকর দুরূহ সাধনা সত্যিই মূল্যহীন কি না। ফেলে দেবেন, এই শেষ ওষুধের মাত্রাটাও ফেলে দেবেন সুচিন্তা। দেখবেন দুরন্ত বুনো সাপটা বিষপাথরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল, না শান্ত হচ্ছিল—সাপুড়ের সুরে না বাঁশীতে।

খোলা শিশিটা জানলার বাইরে ধরে উপুড় করতে গেলেন সুচিন্তা. আর যেমন সহসা অদ্ভুত একটা ঈর্ষার জ্বালায় দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা চিন্চিন্ করে উঠেছিল, তেমনি সহসাই শিথিল হয়ে গেলেন। শান্ত হয়ে গেলেন। একটা অব্যক্ত ধিক্কারে 'ছি ছি' করে উঠে ভাবলেন, সর্বদা পাগলের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

নিরঞ্জন আর ইন্দ্রনীলের ঘর দুটো আর আজকাল খোলা থাকে না। সুবল

চলে যাওয়ার পর থেকে নতুন চাকর দিনে একবার ঝাড়ামোছা করে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয় যাতে ধুলো ঢুকে আর দু' বার না তার কাজ বাড়ায়। নিরুপমের ঘরে ঢুকতে গিয়ে এই কপাট-বন্ধ দরজা দুটো যেন নতুন করে দৃশ্যমান হয়ে উঠল সুচিন্তার ভাগ্যলিপির ইসারা বহন করে।

দুটো দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশের ওই আধভেজানো দরজাটাও হয়তো কোন দিন আস্তে আস্তে পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে।

তবু এখনো আধভেজানো আছে।

সাহস করে ঠেলে ঢুকতে পারলে ঢোকা যায় এখনো।

সুচিন্তা সাহস করলেন।

আস্তে আস্তে ঠেলে ঢুকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'নিরু আছো?'

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করবার চেষ্ট করেও গলাটা নিজের কানেই কেমন অস্বাভাবিক ঠেকলো সুচিন্তার। লজ্জা পাবার মত কাঁপা কাঁপা অস্বাভাবিক।

কিন্তু করবার কি আছে।

দেহযন্ত্রের সব কিছুকে কি সব সময় আপন আয়ত্তে রাখা যায়?

নিরুপম বই থেকে মুখ তুললো।

সুচিন্তার মনে হল এঘরে একটু বসেন।

কিন্তু নিরুপম তো বলবে না, 'একটু বোসো না মা।'

কোন দিনই বলে না, আর আজ বলবে? কিন্তু নাই বা বলল? নিজের ছেলের ঘরে, নিজেই যদি বসে পড়েন সুচিন্তা, বলার অপেক্ষা না রাখেন, ক্ষতি কি?

সুচিন্তা যেন মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বসে পড়লেন। বললেন, 'ওষুধটা আনতে হবে, ফুরিয়ে গেছে।'

নিরুপম এ প্রশ্ন করল না, 'সে কী এখুনি ফুরিয়ে গেল কেন?' বলল না 'এখুনি তো যাবার কথা নয়?' শুধু বলল 'আচ্ছা।'

ওর চোখে কোন প্রশ্ন ফুটে উঠল কি না সুচিন্তা টের পেলেন না।

কিন্তু সুচিন্তা চাইছিলেন প্রশ্ন ফুটে উঠুক। একটা কিছু বলুক ও।

সেই বলার পথ ধরেই সুচিন্তা কথা বলবেন। কাজের কথা নয়। দরকারি কথা নয়, শুধু কথা।

সারা জীবন কথা না কয়ে কয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন সুচিন্তা। যে সুচিন্তার ছেলেবেলায় বিশেষণ ছিল 'কথার ভটচায্।'

নিজের সমস্ত কথাকে 'সীল' করে ফেলেছিলেন সুচিন্তা ভাগ্যের উপর অভিমানে, জীবনের উপর অভিমানে।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে 'কে দিল সেই অভিমানের মূল্য, কে বুঝল সুচিন্তাকে?' তবে কেন সুচিন্তা এখনো চুপ করে থাকবেন? সুচিন্তা কথা বলবেন।

হয়তো বলবেন বলেই বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছেন। তাই বলেন, 'ওষুধ ফুরোলে আবার আনবার আগে ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে হয়?'

'রিপোর্ট প্রত্যেক সপ্তাহেই দিতে হয়।'

বইতে চোখ রেখেই বলে নিরুপম।

'কই কোন দিন তো কিছু জিগ্যেস কর না?'

'জিগ্যেস করবার কি আছে? দেখতেই তো পাওয়া যায়।'

এরপর আর কি বলবেন সুচিন্তা?

তবু বললেন, 'ওষুধটা তো এখুনি ফুরোবার কথা নয়; ফুরোল কেন সে কথা তো কই জিগ্যেস করলে না?'

'অত হিসেব করবার সময় কার আছে?' নিরুপম ফের বইতে ভাল করে চোখ ফেলে।

'তা বটে। তোমাদের সময় মূল্যবান।'

সুচিন্তা ছেলের মূল্যবান সময় আর নষ্ট না করে চলে আসেন।

ভাবলেন তিনি কি চেষ্টা করেননি কোন দিন?

বারে বারেই তো চেষ্টা করেছেন আলো জ্বালাতে। কিন্তু ভাগ্যের বঞ্চনায় সে আলো যদি জ্বলে না ওঠে, যদি 'নিভে যায় বারে বারে', তবে সুচিন্তা কি করবেন। নিজের সমস্ত কথা নিজের মধ্যেই বন্ধ রাখতে হবে সুচিন্তাকে। কেউ শুনবে না তাঁর কথা।

কিন্তু যদি কেউ শুনতে চায়? না, সেটা অপরাধ। সেটা নিন্দনীয়।

এ-ঘর আর ও-ঘর।

দুটি মাত্র ঘরে মানুষের পদধ্বনি আজও আছে, হয়তো আর থাকবে না। নিথর হয়ে যাবে অনুপম কুটির।

'ও-ঘরে' এসে বসলেন সুচিন্তা খবরের কাগজখানা হাতে করে। বসলেন চেয়ারটা টেনে।

'তুমি আমার এত কাছাকাছি বসছো কেন সুচিন্তা? এটা তো নিয়ম নয়।'

গম্ভীর ভাবে যেন জজের রায় দিলেন সুশোভন।

খবরের কাগজখানা হাত থেকে পড়ে গেল সুচিন্তার। ভয়ংকর একটা আহত বিস্ময়ে পাগলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বললেন, 'নিয়ম নয়। কে বললে নিয়ম নয়?'

'আমিই বলছি।' সুশোভন নিজের চেয়ারটাই একটু টেনে নিয়ে সুচিন্তার থেকে বেশ খানিকটা তফাতে সরে গিয়ে বলেন, 'আমরা এত বড় হয়েছি, আমাদের আবার বলবে কে?'

সুচিন্তা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া গলায় বলেন 'রোজই তো আমি এই চেয়ারটায় বসে কাগজ পড়ে শোনাই তোমায়।'

'আর বসবে না।'

আরও গম্ভীর হন সুশোভন।

'হ্যাঁ বসবো। রোজ বসবো।'

সুচিন্তা যেন লাঠির আগা ডুবিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান নদীর জল কতখানি গভীর। অথবা আদৌ সেটা জল কি রোদে চকচকে বালির আস্তরণ!

'হ্যাঁ বসবে? রোজ বসবে? সুচিন্তা তুমি পাগল না কি? দেখতে পাও না তোমার এই পাগলামীর জন্যে তোমার ছেলেরা সবাই রাগ করে করে চলে গেল।'

সুচিন্তা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলেন, 'আবার ও কথা বলছ?

সেদিন না তোমায় বললাম ওরা বিদেশে চাকরী করতে গেছে।'

'না, তুমি ভুল বলছ।' অবুঝ জেদের সঙ্গে বলেন সুশোভন, 'তোমার সেই ছোট ছেলেটি তো যায়নি। তাকে আমি দেখেছি। সেই যে সেদিন এল। আর তার বৌও এল। আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছি বলে রাগ করে চলে গেল তারপর।'

সুচিন্তা তেমনি ভাবেই তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশী কথা না তোমায় বলতে বারণ করেছি?'

এ কথায় পূর্ব স্বভাবমত রেগে উঠলেন না সুশোভন। বলে উঠলেন না, 'তোমার বারণ আমি শুনলে তো?' শুধু ম্লানভাবে বলেন, 'বেশী—বেশী কথাগুলো যে মাথার মধ্যে হুড়োহুড়ি করে। না বলে থাকবো কি করে? কত ভাবনা, কত কথা! ভেবে ভেবেই তো বুঝতে পারছি ভুলটা কোথায়।'

'বুঝতে পারছ? ধরে ফেলেছ ভুলটা কোথায়?'

সুচিন্তা পাথরের মত মুখে প্রশ্ন করেন।

সুশোভন আরও ম্লান মুখে বলেন, 'জানি তুমি রাগ করবে। কিন্তু রাগ করলে চলবে কেন সুচিন্তা? আমরা যে বড় হয়েছি, আমাদের তো সব বুঝতে হবে।' মুখটা গম্ভীর করেন সুশোভন।

হঠাৎ সুশোভনের সেই মুখটা যেন পেশী ঝুলে-পড়া এক বৃদ্ধের মুখের মত দেখতে লাগে। সুশোভনের যে বয়েস হয়েছে, মুখ দেখে কি কোনোদিন মনে পড়তো?

হাস্যোদ্ভাসিত সেই তাজা মুখখানা তাহলে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেললেন সুশোভন? এই পেশী ঝুলে পড়া শিথিল মুখটাকে গম্ভীর করে বসে কেবল তাহলে এখন ভাবতে থাকবেন তিনি, কি নিয়ম, আর কি নিয়ম নয়!

কিন্তু এই তো চেয়েছিল সবাই। চেয়েছিলেন সুচিন্তাও। এর সাধনাতেই তো সুচিন্তা বসে বসে তাঁর সর্বস্ব উৎসর্গ করছেন, জীবনের সবকিছু আহুতি দিচ্ছেন সেই সাধনার হোমকুণ্ডে।

তবে সুচিন্তা অমন নিথর হয়ে যাচ্ছেন কেন?

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কি কেউ সেই সিদ্ধির মূর্তি দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়?

সুচিন্তা কি সৃষ্টিছাড়া?

তা শুধু সুচিন্তা নয়, সংসারে এক-আধটা তেমন সৃষ্টিছাড়া মানুষও থাকে বৈ কি। নইলে অশোকা কেন বলে বসবে, 'দিল্লী যাবো? পাগলতো হইনি।' কিন্তু কেন বলল? এ সংসারে তো অশোকার অহরহ দম বন্ধ হয়ে ওঠে। সমস্ত প্রাণ এখান থেকে মুক্তির জন্য আছড়ে মরতে চায়।

সুবিমল এসে বললেন, 'দু' চারদিন ঘুরেই এসো না ছোট বৌমা। কখনো তো কোথাও যাওয়া হয় না।'

অশোকা মৃদু হেসে আস্তে বলল, 'সে যখন মেজদা ভাল ছিলেন, চারদিক ভাল ছিল, তখন যাওয়া হতো তো আলাদা কথা!'

সুবিমল একটু চুপকরে থেকে বললেন, 'কিন্তু মোহন মনে হয় ওখানেই সেট্‌ল করতে চায়। কলকাতায়তো এযাবৎ কিছু হলো না।'

'কোনখানেই কখনো কিছু হবে না বড়দা।' বলে মাথা নীচু করে হাসে অশোকা।

'আমার ভাইটাকে বাবু তুমি বড্ড বেশী হেনস্থা করো। এমনও তো হতে পারে, এখন ওর মধ্যে কোন চেষ্টা এসেছে।'

'এসে থাকে সে তো খুবই সুখের কথা বড়দা।'

'আমি ভাবছিলাম,' সুবিমল বলেন, 'তোমরা ওখানে থাকলে ভবিষ্যতে শোভনকে হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হ'ত না।'

'কিন্তু উনিতো এখানে বেশ ভালই আছেন।'

সুবিমল একটু হেসে বলেন, 'তা আছে। তবে 'ভাল থাকাটা'—সংসারের ন্যায়-নীতির অঙ্কে না মিললে, শেষ পর্যন্ত ফল ভাল হয় কিনা সেটাই আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। যাক, দেখা যাক।'

'কিন্তু আমাকে কি আপনি যেতে বলছেন?'

সুবিমল মৃদু হেসে বললেন, 'প্রশ্নটা বড় সাংঘাতিক করলে মা! তুমি চলে যাওয়া মানেই তো বাড়ীর আলো নিভে যাওয়া, গান থেমে যাওয়া, তবু স্বার্থ-বুদ্ধি ত্যাগ করেই বলছি, সংসারে বোধহয় মাঝে মাঝে ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এর থেকে কেন্দ্রবিশেষে আত্মবিশ্বাস আসে, আত্ম-অহমিকা ঘোচে, আর, একঘেয়ে পাকচক্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মনের উৎকর্ষ ঘটে। মোহনের চিঠি পড়ে, আমার এই ধারণাটা দৃঢ়ই হল।'

অশোকা চুপ করে থাকে।

অশোকা চুপ করে শুধু ভাবে।

সুমোহনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ দেখা দেবে, এমনও সম্ভব? তা' যদি হয়, তা' হলে বলতে হবে দিল্লীর বাতাসে যাদু আছে।

কিন্তু অশোকারও যেন এই এতদিন ধরে একত্রে থাকতে থাকতে সুমোহনের বাতাস লেগে গেছে, তাই ওর মনে হয়, 'থাক না, কি দরকার আর ব্যবস্থার পরিবর্তনে? চলে তো যাচ্ছে। ভাবে শুধু সুবিমলই যে তাকে ভালবাসেন, তা' নয়, মায়ালতাও তো কম ভালবাসেন না।

—হ্যাঁ অশোকার বিশ্বাস আছে মায়ালতা তাকে ভালবাসেন।

মায়ালতাকে অশোকা বোঝে।

বোঝে বলেই হয়তো জীবনের এতগুলো দিন এমনভাবে কাটিয়ে দিতে পারল সে। সংসারের এই বুদ্ধিহীন লোকগুলোই তো বুদ্ধিমান লোকেদের পায়ের বেড়ি।

সত্যিই যদি অশোকাকে চলে যেতে হয়, হয়তো মায়ালতার জন্যেই তার মন কেমন করবে বেশী। অপটু আর অসহিষ্ণু মানুষটা অসহায় হয়ে পড়ে কতটা কষ্ট পাবে, সে তো আর অশোকার অজানা নয়।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

সার্থবাহ

জার্মান কবিতা :

তন্ময়তা ও প্রাচুর্য (২)

শিলারের তারিফ পেলেও হোয়্‌দেরলিন গোয়্‌তের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠিতে ঠাঁই পাননি, যে-গোষ্ঠির সভ্য অবশ্য ছিলেন মাত্র দুইজন—গোয়্‌তে ও শিলার। তথাপি এই তিন কবিকেই, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার নানান প্রকট ভিন্নতা সত্ত্বেও, একটি বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাঁদের কাব্য-প্রকৃতির কোনও সম্ভাবের হেতুতে। সে-ভাব, শেষপর্যন্ত, গ্রহণের ও বিনতির, শমের ও প্রসন্নতার। কাব্য-চিকীর্ষার অমিত শক্তি এ'দের সদৈব সুশৃঙ্খল না-রাখলেও এবং কল্পনার অনাচারে বিপথে বা উন্মার্গে যাওয়ার সাক্ষ্য এ'দের মধ্যে নেহাত কদাচদৃষ্ট না-হলেও, এ'দের রোমান্টিকতা ধ্বংসাত্মক কোনও ব্যাহারকে চিত্তাকর্ষক ব'লে কাছে টেনে নেয়নি। প্রলয়কে বরণ করেনি। 'প্রতীচী-প্রাচ্য দীবান' ('ভেস্ত-ওয়স্ত-লিখের দিভান')—এ গোয়্‌তে প্রলয়-প্রলয় ক'রে হাহাকার ক'রে প্রাচীমুখে ধাবমান্‌ যদি বা শান্তির সন্ধানে, তবু পরিশেষে :

> ঈশ্বরের প্রাচী,
> ঈশ্বরের প্রতীচী;
> উত্তরের, দক্ষিণের দেশ যত
> তাঁর হস্তে শান্তিতে আশ্রিত।
>
> (তালিসমানে' : কবচ)

শিলরের 'ঘণ্টার গান' রূপক-ব্যবহারে অতি-রোমান্টিকতা দেখায় নিঃসন্দেহে। একটি ধাতব ঘণ্টা, কিন্তু কী সজ্জাগ করেছেন শিলর তা'কে। কবিতাটির শীর্ষফলকে, লাতিন বাণী 'ভিভস ভোকো। মর্তুঅস প্লাঙ্গো। ফুলগুরা ফ্রাঙ্গো' * বলে : 'আমি জীবিতদের ডাকি, মৃতদের জন্য শোক করি, বিদ্যুৎকে ভাঙ্গি'! 'নগণ্য পার্থিব জীবনের থেকে অনেক উঁচুতে, স্বর্গের সুনীল চত্বরে, বজ্রের প্রতিবেশী হয়ে, তারকাদের রাজ্যের কিনারায়' দুলবে ঐ ঘণ্টা। কিন্তু তবু এই অপরূপ, রোমান্টিক রূপক-ঘণ্টা, এর

ধাতু পর্যন্ত সংযম ও দাঢ্য—শান্ত এক নৈতিক, লাভ করে শিলরের হাতে :

> তবে ত' সেথায় কঠিনের সাথে কোমলতা,
> শক্তির সাথে মেশে এসে নম্রতা,—
> সেথা সঞ্জাত একটি মহৎ ধ্বনি।
>
> ('দাস লিদ ফন দের গ্লোকে' : ঘণ্টার গান)

হোয়্‌দেরলিনের কবিরা 'আত্মিক' (গাইস্তিগেন) যদি বা, তবু জাগতিক (ভেল্টলিখ)।

নৈরাজ্য নয়। এ'দের কবিতায় ধরা থাকে, শেষপর্যন্ত, প্রলয়ের অপর দিক—সৃষ্টি, স্থিতি ও শান্তির সনাতন বিশ্বরূপ, যাকে এক কথায় বলা যায় 'লিবেস-কসমস'। আধুনিক জার্মান কবিতা উক্ত ছবি বিস্মৃত হয় না একেবারে। কিন্তু বিংশশতকী সাহিত্যের অঙ্গনে পূর্ণতার স্থিরচিত্র অবশ্যই বিপর্যস্ত ও বেপথু। জ্ঞানকে বিশ্বাসের কাছে বিড়ম্বিত হতে হয়, বিশ্বাসকে সইতে হয় বোধের ঝক-মারি এবং প্রতিষ্ঠিত মূল্যদের প্রায় সবগুলিকেই নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করে আমাদের সর্বংসহা ও সর্বনাশী বিশশতক। তাই গোয়্‌তে-শিলর-হোয়্‌দেরলিনের সারগর্ভতাই এক হিসাবে তাঁদের কবিতাকে দূরস্থ ও নির্দিষ্ট অন্যরাজ্যরূপে দেখা'ল বিংশশতকী আধুনিকদের, যাঁদের কাছে পরবর্তী যুগের (জার্মান রোমান্টিক যুগেরই 'প্রতিবিহিতির' দ্বিতীয় অঙ্ক এই যুগ, যা'তে গোয়্‌তীয় স্থিরত্ব ও পূর্ণতা আক্রান্ত হ'ল রোমান্টিক আতিশয্যের দ্বারা) বিহ্বলতা ও অনিশ্চিতি মোটেই অনর্থক ঠেকল না।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জার্মান রোমান্টিকতা নেতিপ্রাধান্যে ভুগেছিল সম্যক্‌ভাবে। চিন্তার প্রেরণায় নয়, ইন্দ্রিয়গত কোনও আবেশেই এ-সময়ের কবিদের ধাতস্থ দেখা যায়। বস্তুতঃ যে-বিশেষ ছোপ গীতি-কবিতায় এ'রা ধরিয়েছিলেন তা' ভাবনার প্রতিযোগী অনুভূতিরই। এ'দের কবিতার স্বরূপ নিনীত করে তাই জার্মান 'গেফ্যুহ্‌লস-লিরিক' বা 'অনুভূতি-কাব্য'। ছন্দ, পরিবেশ, আবেগ, বাচন ও চিত্রকল্প—সব কিছুতেই 'গেফ্যুহ্‌লসলিরিক' পূর্ববর্তী কাব্যের প্রেক্ষিতে যেন বামপন্থার নির্দেশক।

নূতনতর কিছু উপলব্ধি, অধিকাংশেই বিষাদজনক ও নেতিবাচক, এই উগ্র রোমান্টিকতার আমলে এসেছিল। কল্পনার আদলও পাল্টে গিয়েছিল। লোকগাথার দৃষ্টান্তে রচিত একটি তৎকালীন বালাদের কাহিনীতে ছন্দগত বিষয়ের অবতারণা তাই কেমন মানানসই হয়ে ওঠে। ক্লেমেন্স ব্রেনতানোর কবিতায় কুহকিনী লোরেলাই মৃত্যু-ইচ্ছা পোষণ করে, অনুতাপ ও বিষাদে ভরা তার মন :

> আঁখিদুটি মোর অগ্নিশিখা
> বাহুলতা যেন যাদুকাঠি—
> ঠাঁই দি'ক মোরে অগ্নিশিখা!
> ভগ্ন ক'রে দাও যাদুকাঠি!......
>
> আর বেঁচে থাকা ঠিক নয়,
> আর কা'রে বাসি না'ক ভালো,
> দাও প্রভু, মৃত্যুর আশ্রয়......
>
> ('লোরেলাই')

দুঃখের সন্ততি ব'লে কবিতাকে স্পষ্ট চিনে নিলেন কেউ (য়ুস্তিনুস কেরনর : 'পোয়েসি'), দুঃখই শুধু সত্য, জানলেন কেউ বা (প্লাতেন : 'ভেনেদিক'৬); অপর কেউ তমিস্রায় লুপ্তি চাইলেন জীবন-যন্ত্রণার (লেনাউ : 'বিতে') এইমতো রোমান্টিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তাগুলির ব্যাপক ও ধারাল অভিব্যক্তি মিলল হাইনের কবিতায়—

> আমার দুস্তর দুঃখদের
> নিয়ে রচি ছোট ছোট গান
>
> ('লিরিশেস ইন্তেরমেদজো' ৩৬)

এই দুঃখবোধ, অনচ্ছ এবং হয়ত সর্বাংশে সকারণও নয়, রোমান্টিক কবিতাকে চিরকাল দানা বাঁধায়। হাইনের ক্ষেত্রে তাই এক প্রায়-প্রতীকী নিশ্চরতা এসে জুটেছিল অনুভবের বর্ণে :

> নির্জন, রাত্রিময় সমুদ্রে বসতি
> পেতেছে একটি যুবাজন, তা'র ঠাসা
> বিষাদে হৃদয় আর সন্দেহে মগজ,
> সে শুধায় ঊর্মিদের পান্ডু ওষ্ঠ নেড়ে
>
> ('দি নর্দসে' ৭—'ফ্রাগেন'-জিজ্ঞাসা)

এ যুবার প্রশ্নগুলি মর্মস্পর্শী : মানুষের অর্থ কী? কোথা থেকে এসেছে সে? যাবে কোথায়? আপাতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রশ্নগুলিতে তবু ঐ নিঃসঙ্গ সমুদ্দর্শী স্পষ্টতঃই ভাবাবেগে বিচলিত। শূন্য,

---

* চমৎকারী বাণী, তবু এর উৎস সত্যই অকিঞ্চিৎকর! 'জার্মান কবিতার অক্সফোর্ড সংকলনের' সম্পাদক ফীদলর-সাহেব জানিয়েছেন যে উক্ত লিপি আসলে শাউফহাউসেনের বিখ্যাত গীর্জা-ঘ'ড়তে খোদাই-করা! — Das Oxforder Buch Deutscher Dichtung, 1952. Anmerkungen, P. 588.

অন্ধকার সাগরে বিশৃঙ্খল ঊর্মিদের কাছে জবাব খ‍ুঁজছে যে, জ্ঞানের স্থিরত্বেও তার বিশ্বাস কম। সমস্ত আয়োজনটাই রোমান্টিক উৎকণ্ঠার এক মুখচ্ছবি। তাই, প্রশ্নগুলির উত্তর আসে না প্রকৃতির কাছ থেকে : কলস্বরে ছুটে চলে ঢেউ, হাওয়া বয়ে যায়, মেঘ ধায়, নক্ষত্রেরা জ্বলতে থাকে উদাসীন আর ঠান্ডা। অতএব অটুট থাকে ব্যথা ও উদ্বেগ; 'উত্তরের অপেক্ষায় যে-থাকে সে একটা পাগল'।

হাইনের 'জিজ্ঞাসা' ক্লাসিকল' প্রকৃতিকে দূরে, কৃপণ ও নির্লিপ্ত দেখতে পায়। জীবন-রহস্যের কিনারা করবে কে তবে? আরও অসহ এই নিঃসাড় নিয়তি, কারণ সমুদ্রচারী ঐ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটি যথেষ্ট-বয়স্ক কোনও অভিজ্ঞ, পরিপক্ক মানুষ নয়, সে এক যুবাজন। ('য়ুঙ লিঙ-মান')। রোমান্টিক যন্ত্রণা তা'রই প্রাপ্য এবং উপভোগ্যও বটে! অন্ততঃ হাইনের আন্তরিক আস্থা ছিল যৌবনের শক্তিতে ও বিহ্বলতায়। চাপল্য বা বিক্রম, দু'য়ের কোনওটি যদিও হাইনের কবিতায় (বা জীবনে) যৌবনদত্ত ব্যবহার হিসাবে পরিপুষ্ট হয়নি, তবু একথা-ঠিক-যে জার্মান রোমান্টিকতার সমগ্র গানটিতে অন্তরার মূর্তি যৌবনের রেখায় সম্পন্ন। বলাই বাহুল্য, যৌবনের বিস্ময়বোধ, হৃদ্যতা ও সাহস রোমান্টিক বেগবত্তার পিছনে শক্তি। হাইনেকে তা'ই দেখা যায় স্পষ্টভাবে যৌবনের স্থায়িত্ব কামনা করতে; বকবক্-করা বুড়ো ('আলতের পলতেরের') হ'তে একেবারেই প্রস্তুত ন'ন তিনি।* চোখের সামনে লেখক বা কবির রচনায় বার্ধক্যের সঞ্চার লক্ষ্য করা তাঁর কাছে দুঃখকর অভিজ্ঞতা, যদিও যৌবনের অপসরণ ঠেকাতে ক'জনই বা পারেন! হাইনের মতে, তা পেরেছিলেন যদি গোয়্তে, পারেননি শ্লেগেল, পেরেছিলেন যদি থামিসো, পারেননি তিক।

যৌবনের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, হতাশা, বিচার, বিভ্রম ইত্যাদি নানা আন্দোলনে প্রাণময় যে জার্মান রোমান্টিক কবিতা, তা' অনিবার্যভাবে প্রেমের অদ্বৈতে যথেষ্ট আস্থা রেখেছিল। হাইনে ও তাঁর সমসাময়িক, এদুয়ার্দ মোয়্রিকে এই প্রেমাশ্রিত কাব্যে বোধ, আঙ্গিক ও উপজীব্যের বিস্তর ঐশ্বর্য উন্মোচিত করলেন। একাধারে বিষণ্ণ, উদভ্রান্ত প্রেমাতুর ও বিদ্রূপপ্রবণ, হাইনে ('সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একজন প্রিয় পশ্চিমা, যাঁ'র কবিতা, শেক্সপীয়র-সনেটগুলির পর, বাঙ্গালী কবি সবচেয়ে বেশী অনুবাদ করেছিলেন) রোমান্টিকতার গোয়্তে-কথিত 'ব্যাধি'তে ভুগেছিলেন বেপরোয়া-ভাবে, আর স্বাস্থ্যের জন্য আকুল না-হলেও আরোগ্য ও আয়ুর কামনায় দিনপাত করেছিলেন প্রেমের বরাভয় ফিরে-ফিরে পেয়ে। হাইনের অশান্তি সমানে জটিল ও ক্ষুরধার। প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় যেমন ব্যগ্র ও অটল তিনি, তেমনই তা'র ফল তাঁকে বিপ্রলব্ধ করে, তা'র প্রাপ্তিযোগে তেমনি ব্যাহত তিনি। দেশত্যাগী তিনি, কিন্তু স্বদেশ : তা'র মাটি, গাছ, ফুল আর ভাষা তাঁর স্বপ্নের অমরা। আবার, তবু দেশপ্রেম বা ঐতিহ্য-প্রশস্তি তাঁর ধাতে একেবারেই সয় না। চাঁদ, সমুদ্র, রাত্রি, স্বপ্ন, কুমারী মেয়ে, আকাশ, মে-মাস, ঝড়, সূর্য—এসব শুধু তাঁর কাব্যের পুনরাবর্তিত উপাদান নয়, এদের অনেকেই তাঁর চিত্তলোকে প্রত্যক্ষে আহূত, উদ্দিষ্ট শ্রোতৃবর্গ। কিন্তু তবু এদের নিয়ে মিল গড়াও সম্ভব নয়, সন্তোষের কোনও আস্তানায় ওঠাও সম্ভব নয়। এরা আর হাইনে কেবল এক ফারাকের প্রতিচ্ছায়া। কেবল রোমান্টিকতার ধ্বনি, প্রতিধ্বনির জন্য কান পাতলে শোনা যাবে। অসার্থক ও মৎসরী হাইনে সন্দেহের ধ্রুবপদই গেয়েছেন। এখানেই হাইনে আধুনিকতা-সংক্রামিত; বাসন্ত বিষাদে-ভরা রোমান্টিক সৌন্দর্যের সঙ্গে, যেমন ভের্ণর হাইলমান বলেন, হাইনের কবিতায় মিশে যায় নূতন এক যুগের হতাশ সন্দিগ্ধতা। যে-হাইনে সমুদ্রকে 'সৌন্দর্যের মাতা', 'প্রেমের মাতামহী' (স্তুর্ম : ঝড়) বলেন, তাঁকেই লিখতে হয় :

আশা আর প্রেম! টুকরো টুকরো ভেঙ্গে
যায় সব!
আর আমি, যেন এক শবদেহ,
রাগতঃ সমুদ্র যা'রে ছুঁড়ে-ফেলেছিল,
শুয়ে থাকি বেলার উপর,
শূন্য, নগ্ন বেলার উপর।

('দি নর্দসে'—'দেরশিফব্রুথিগে' : নিমজ্জিত)

হাইনের নিটোল কাব্যিক অনুভবেও বিচক্ষণ আধুনিক সমালোচনা কৃত্রিমতার ছাপ দেখেছে এবং গোয়্তে-শিলর-হোয়্লদেরলিনের পর হাইনেকে শ্রেষ্ঠ উনিশশতকী জার্মান কবি বলতে জার্মান সমালোচকরা অনেকেই এখন সম্মত হন। যখন হাইনের পরিবর্তে এদুয়ার্দ মোয়্রিকেকে তাঁরা উক্ত মর্যাদা দে'ন, তখন অন্ততঃ এটুকু মানতে হয় যে আরেকজন নিঃসংশয়ে দক্ষ ও সর্বথা পঠিতব্য (এবং তদনুপাতে অবহেলিত) উনিশশতকী কবির সমাদর কালক্রমে সম্ভব হচ্ছে। আরও যে এই মোয়্রিকের কবিতার অর্থে, বুননে ও ঢঙে আধুনিক কবিতার অঙ্গীকার বিস্ময়করভাবে জাত। হৃদয়-তল্লাশে হাইনের মতোই অনলস, মোয়্রিকে যেন আরো নিবিড়। এবং সে-নিবিড়তার মূলে উনিশশতকী ভাবা-বেগের চেয়ে বেশী যেন বুদ্ধিবৃত্তি। মোয়্রিকের একটি কবিতা, 'কুমারীর প্রথম প্রেমগীতি' ('এর্স্টেস লিবেসলিদ আইনেস ম্যাদখেনস')-তে রূপক-ব্যবহার এমন সজীব ও সবুদ্ধি যে এ যুগের একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কবিতাটিকে অবচেতনের মনস্তত্ত্বে দস্তুরমতো শিক্ষিত মনে করেন। বস্তুতঃ নিছক হৃদয় থেকে মনে, হৃদয়-তল্লাশ থেকে মনস্তত্ত্বে, প্রবেশ করার ক্ষমতা মোয়্রিকের নিজস্ব। এছাড়া, অবশ্যই কাব্যের অন্যান্য ধর্ম, যাদু ও প্রসাদ মোয়্রিকের কবিতায় পর্যাপ্তভাবে বর্তমান। তাঁর উপন্যাস 'মালের নলতেন'-এর নায়ক হেনির মতো মোয়্রিকে রোমান্টিকতার ঝড়ো হাওয়ায় সর্বাঙ্গে শিহরিত, এবং, পরিশেষে, প্রেমের ছাউনিতে আশ্রিত; কিন্তু অভি-ব্যক্তিতে তিনি যে-প্রসর ও তীব্রতা আয়ত্ত করেছিলেন তা' যেন যুগ-শিক্ষার পরিসীমা ছাপিয়ে গেছিল। মোয়্রিকের আঁকা একটি চিত্রে হাস্যমুখে একটি লোক তা'র বুক-চিরে হৃদপিণ্ড দেখাচ্ছে : মনে হয় এইমতো জোরও তুখোড় আত্মবিদ্রূপ ও আন্তরিকতা একাধারে মোয়্রিকের কবিসত্তাকে ধারণ করেছিল। এবং এই জাতীয় বৈদগ্ধ্যেই আধুনিক মনে তাঁর প্রবেশ সহজসাধ্য। তাঁর 'পেরেগ্রিনা' শীর্ষক প্রেমের কবিতা থেকে একটি নিম্নোদ্ধৃত অংশে মোয়্রিকের অসামান্য কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

একদা পবিত্র এক প্রেমের চান্দ্র কুঞ্জবনে
এসে ঢুকেছিল একটি বিভ্রম।
বেপথুশরীর আমি চিনেছিলাম
বহু বরষের ছলনাকে।

আর, চোখে অশ্রু নিয়ে বীভৎস তবুও
সে মায়াকৃশাঙ্গী অনূঢ়াকে
তে'কে বলেছিলাম চ'লে যেতে
আমা থেকে দূরে।
হায়, তা'র উন্নত ললাট
নত হয়েছিল, সে-যে ভালবেসেছিল
আমাকেই:

---

* Buch der Lieder; Heinrich Heine, Wilhelm Goldmann Verlag, 1957. এই সংস্করণে সন্নিবেশিত 'Vorrede Zur Zweiten Auflage von Heinrich Heine, '1837'. দ্রষ্টব্য।

তবু সে গেছিল চলে মৌনের সাথে,
সোজা বাহিরের
শাদা বিশ্বলোকে।

('পেরোগ্রেনা' ৩)

মোর্যিকেতে জার্মান কবিতার পরিণতি প্রামাণিক এবং সে-পরিণতি প্রকৃতপক্ষে অতিক্রান্ত হয়েছিল বিংশশতকী স্তেফান গেয়র্গের প্রতিভাতেই। কিন্তু মোর্যিকে ও গেয়র্গের মাঝখানে বেশ কয়েকজন জার্মান কবির সার্থক অবস্থিতি। এঁদের মধ্যে মাইরর ও স্পিটেলরকে যদিবা কবি হিসাবে একটু বেশী মাত্রায় জ্ঞানপন্থী মনে হয়, মৌলিক গীতিকাব্যে একনিষ্ঠ তেওদর স্তর্মের কবিত্বে রোমান্টিকতার যাদু ঠুনকো নয়। আর স্তর্মের স্বপ্নের মতো পড়ে থাকা দ্বীপগুলির মায়া কাটিয়ে, আমরা আরো দুজন কবির রাজ্যে গিয়ে আটক হ'বই। ফ্রীদ্রিখ নীতশে ও আরনো হোলৎস। জার্মান কবিতায় দার্শনিক নীতশের অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। 'একে হোমো' (মানুষকে দেখো) কবিতায় আবেগান্বিত নীতশে হাইনের উত্তরপুরুষ, কিন্তু তাঁর আবেগের মর্ম যেন উন্নততর :

আলো সব কিছু যা আমি ধরি,
অঙ্গার সব যা ছেড়ে যাই
আমি শিখা অবিসংবাদী।

সরল, তবু আশ্চর্য সম্ভ্রম নীতশের জার্মানে। উপলব্ধির নিষ্ঠা, ধার ও উত্তাপ। 'আলসো স্প্রাখ ৎসরাতুস্ত্রা' (ৎসরাতুস্ত্রা এই মতো বলেছিলেন)-র উপসংহারে নীতশে বলেন :

"আমাকে গেয়ে শোনাও এখন সেই গান, যা'র নাম 'আরো একবার', যা'র অর্থ 'অনন্তে'—গাও, হে উন্নততর মানব, ৎসরাতুস্ত্রার গোল-হ'য়ে-গাওয়া গান!

হে মানব, করো অবধান!
কী বলে গভীর মধ্যরাত?
ঘুমিয়েছিলাম, আমি ঘুমিয়েছিলাম,
গভীর স্বপ্নে উঠেছি জেগে,
জীবন গভীর,
দিবস জানেনি তা'রে এমতো গভীর।
গভীর পরিতাপ তা'র,
আনন্দ—গভীর আরো হৃদ্‌যাতনার চেয়ে;
খেদ বলে : চ'লো! চ'লো!
তবু সর্ব আনন্দ কামনা করে অনন্তকে,
গভীর, গভীর অনন্তকে।

কবিতার রূপ বা ফর্মের সম্বন্ধে উনবিংশশতকী প্লাতেন ও নোভালিস অনুসন্ধিৎসু ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু আঙ্গিকগত কোনও প্রকট বৈচিত্র্যের তাঁরা সন্ধান করেননি। এ জাতীয় বৈচিত্র্য যাঁর কবিতায় প্রস্ফুট, তিনি আরনো হোলৎস (মৃত্যু ১৯২৯)। হোলৎস কবিতায় ছন্দ, মিল, অর্থালংকার, এমনকি ভাষিক সাংগত্য পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া অবিবেচনা মনে করেননি, কারণ, অনুভূতি বা ধারণাকে, তিনি মানতেন, সরাসরি উচ্চারণে রূপায়িত করা কেবল শব্দের দ্বারা সম্ভব, এবং সেই রূপায়ণই কবিতা। বাক্যের সম্পন্নতা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ব্যক্ত-করা। তাঁর কবিতাগুলিকে তিনি বলতেন 'মিতেলাখসেনভের্সে'। নীচের কবিতায় হোলৎসের সার্থকতা লক্ষ্য করুন :

বাহিরে বাদলঝাড়

একা-একা বাড়ীখানা,
একঘেয়ে,
জানালাতে
বৃষ্টি।

আমার পিছনে
টিকটিক,
ঘড়িটি,
আমার কপাল
শার্সিতে ঠেকিয়ে।

ফক্কা।

বিলকুল ভেঙেছে।
ধূসর আকাশ
ধূসর সাগর
এবং ধূসর
চিত্ত।

গোয়্যতের পর য়ুরোপীয়তায় লিপ্ত হয়েছিলেন স্তেফান গেয়র্গেই সবচেয়ে বেশী। এবং গোয়্যতীয় স্থৈর্য না-থাকলেও, গেয়র্গের দৃষ্টিভঙ্গী ও কাব্যিক অভ্যাসে গোয়্যতে-শোভন চিত্তময়তা, জিজ্ঞাসা ও প্রসারতার সাক্ষ্য মেলে। জার্মান কাব্যে গেয়র্গের যথার্থ অনুবাদ কী এবং কতোখানি তা' নির্ধারণ করা শক্ত দুইটি কারণে। প্রথমতঃ গেয়র্গের কাব্যে বিষয়বস্তু প্রায়ই চিন্তাকর্ষক নয় : তাঁর 'তৃতীয় মানবিকতা'র তত্ত্বে ও তাঁর ব্যক্তিক মীমাংসা-সম্ভোগের একঘেয়েমিতে বাঁধা প'ড়ে কবিতাগুলি কল্পনার গতিশীলতা যেন নষ্ট করেছে (এবং সেই কারণে গেয়র্গের কবিতাপাঠে পাঠকের ব্যগ্রতা কমে আসে)। দ্বিতীয়তঃ আরেকজন কবি, রাইনর মারিয়া রিলকে, গেয়র্গের প্রায় সমপর্যায়েই ভাববাদী, সমকালীন জার্মান কাব্যে এমন তীব্রতা ও গুরুত্বের স্বাদ এনেছিলেন তাঁর অজস্র গীতিকবিতা ও সনেটগুলির মারফত, যে গেয়র্গের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কেন স্বতঃই কম হয়, বিশেষতঃ ভিনদেশী পাঠকের, যে চমকপ্রদের সন্ধানেই কাব্য ঘাঁটে।

তাছাড়া, ক্ষীয়মাণ জার্মান আধ্যাত্মিক লোকে ও রাষ্ট্রে পয়গম্বরের ভূমিকা নেবার যে-তাড়না গেয়র্গে অনুভব করেছিলেন, তা' হয়ত কবিজনোচিত ছিল না। অহমিকা এবং তা থেকে অসুস্থ 'শক্তিবাদে' বিশ্বাস স্তেফান গেয়র্গেকে কী-ভাবে উন্মার্গগামী করেছিল তা'র এক চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন মার্কিণ সমালোচক, এরিক বেন্টলি তাঁর 'দি কাল্ট অভ দি সুপরম্যান' নামক গ্রন্থে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, আধুনিক জার্মান কবিদের মধ্যে গেয়র্গের স্থান খুব উঁচুতে। তাঁর কাব্যে ভাবনা ও বাচনের প্রশংসনীয় ঐক্য, তাঁর কাব্যিক পরিণতির ঐশ্বর্যময় ইতিবৃত্ত এবং তাঁর আবেগ ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা গেয়র্গেকে বিংশশতকী জার্মান কবিদের একজন অগ্রগণ্য প্রমাণ করে।

ফরাসী স্যাঁবলিজমের আওতা ধাতস্থ করেছিলেন গেয়র্গে। মালার্মেকে পুরোদস্তুর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাই গেয়র্গের পরিণত বয়সের একটি কবিতায় বোদলেয়রের সুস্পষ্ট অনুকরণ খুব আকস্মিক ঠেকে না :

আমি একটি ও আমি দুজন
আমি জনয়িতা ও গর্ভকোষ
আমি অস্ত্র ও অস্ত্রাধার
আমি নিহত ও আমি হনন।

কিন্তু এইমতো দ্বন্দ্বমূলক সংহতির আস্বাদ গেয়র্গের পক্ষে এক সময় খুবই দুর্লভ ছিল। বিভ্রান্ত হ'য়ে এক সময় তিনি, 'আলগাবাল' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা 'অ-প্রকৃতি' বা 'উনাতুর'-এর আলেয়ার পিছনে দৌড়েছিলেন আত্মহারা হয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে রফা করতে গেয়র্গের সময় লেগেছিল। আবার, যদি বা প্রকৃতিকে স্বীকার করলেন গেয়র্গে, শান্তির সন্ধানে তাঁকে প্রকৃতি ফেলে ছুটতে হ'ল আরেক সত্যের পিছনে। না প্রাকৃতিক না যান্ত্রিক, কোনও স্বর্গেই রসবাক না-ক'রে গেয়র্গে হাজির হলেন মরমিয়া নন্দনলোকে, যেখানে 'তুমি' ব'লে ডাকবার জন্য দ্বিতীয় কাউকে সর্বদা উপস্থিত করা যায়, তাকে প্রায় সবকিছুই শোনানো যায় এবং যেখানে প্রকৃতি বা মানুষ কেউই আত্মস্থ চিত্তের সম্ভ্রমকে বিব্রত করে না।

নান্দনিক থেকে তাত্ত্বিক ইঙ্গিতে জার্মান কবিতা অবশ্য ফিরে ফিরে পৌঁছেছে। কিন্তু গোয়্যতেতে বা হোয়েল্ডেরলিনে, কিম্বা, এমনকি, নীতশেতে গীতিকবিতার ছান্দসিক লক্ষ্য এবং কল্পনার সম্পদে আস্থা যতটা অটুট থাকে, গেয়র্গেতে মনে হয় তা-ও তত্ত্বে বা ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ মন্ত্রণায় রাহুগ্রস্থ। তবু, সৌন্দর্যের সাধক গেয়র্গে প্রাকৃতিকে আত্মস্থ গেয়র্গে, বা, যুগ বন্দনায় ধারাল, জিজ্ঞাসু গেয়র্গে কবিতে

অনবদ্য হয়ে ওঠেন। প্রজ্ঞাপারমিতা গেয়র্গে যখন বলেন : 'জীবন জাগ্রত হয় শুধু যাদুর ছোঁয়ায়' ('নুর দুর্খ দেন ৎসাউবর ব্লাইবৎ দাস লেবেন ভাখ'), তখন সে-যাদু সৃষ্টি রহস্যের মর্ম। পর্যবেক্ষণ নিঃসঙ্কোচে সঙ্গীতধর্মী হয় গেয়র্গের সেই বিখ্যাত কবিতায় যা'র প্রথম পংক্তি— 'দেখেছিলাম রূপালী চাতকদের উড়ে যেতে' ('ভাইসে শ্বালবেন জাহ্ ইখ ফ্লীগেন')। ব্যথার নির্বেগ, ঘরোয়া আচ্ছন্নতা প্রতীককে এসে ছোঁয় তা'কে আপন ক'রতে :

ঘরে এসেছিল পত্র আমার।
সমুদ্র বাতাস তা'র চুলে লেগে......
দৃষ্টি তখনি তা'র ভারী,
সেই রহস্যের বোধে যা আমি কখনও
জানব না;

আর কেমন যেন ঢাকা,—
যখন সে এলো বসন্ত থেকে আমাদের
শীতে।

বর্তমান শতাব্দীর তিনজন অগ্রগণ্য ইউরোপীয় কবির, বা, দুজনেরও যদি নাম করতে হয়, তাহলে রাইনর মারিয়া রিলকে নিশ্চিত একটি। (যতদূর মনে পড়ে, তিনজনের এমতো বাছাইয়ে টি. এস. এলিয়ট রিলকেকে গণনা করেছিলেন ডব্লু. বি. য়েটস ও নিজের সঙ্গে)। আধুনিক কবিতায় রিলকে এমন একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এবং সে-অধ্যায়ে এমনভাবে একক অথচ সম্পন্ন তিনি (আর এতো সার ও সচ্ছল সেই অধ্যায়) যে এ যুগের ইউরোপীয় কবিদের প্রধানতম হিসাবে তাঁকে গণ্য করাও বোধহয় নিছক পক্ষপাতিত্ব নয়। কারণ, বোধে ও অভিব্যক্তিতে যে-সংযোজনাগুলি রিলকীয় স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত, তা'রা সমানে স্থির ও বহু; এবং উপজীব্যের যে-ক্ষেত্র রিলকের কাব্যে আতত, তা' পরিমাপে, রূপে, নিসর্গে ও মাধুর্যে—স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে,—মহত্তম অর্থে ব্যাপক।

স্বল্প কথায় রিলকের কাব্য সম্বন্ধে কোনও বক্তব্যে পৌঁছান প্রায় অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে মাত্র দুএকটি ঐতিহাসিক-পন্থায়-উপনীত তথ্য বড়জোর আলোচিত হতে পারে। যুবক রিলকেকে যদিও আমরা দেখতে পাই তাঁর বান্ধবী, লৌ আন্দ্রেয়াস সালোমে (নীতশের জীবনে এক রঙ্গময়ী নারী) স্তেফান গেয়র্গের কবিতা-আবৃত্তি শুনতে নিয়ে যাচ্ছেন, তবু গেয়র্গের উদার ভ্রান্তি-বিলাস—'অপ্রকৃতি' রিলকেকে-যে আদপেই আকৃষ্ট করেনি তা সুনিশ্চিত। যে-বৎসর গেয়র্গের 'আত্মার কাল' নামক কাব্যগ্রন্থে মরমী গেয়র্গের নব-আবির্ভাব ঘটল, তা'র মাত্র দুই বৎসর পরেই রিলকে, তখন রুস দেশে প্রবাসী, লৌ-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির সেই অভূতপূর্ব কবিতা, যা পরে 'দাস স্তুন্দেনবুখ' কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল। রিলকের এই প্রাঞ্জল ধ্যান কবিতায় অদৃষ্টপূর্ব। একেবারে অকুণ্ঠ ও পূর্ণ বিবেক নিয়ে রিলকে যৌবনে যে-আত্মনির্ণয়ে পৌঁছলেন, তা 'গীতাঞ্জলি'র কবির পক্ষেও বয়ঃপ্রাপ্তি দাবী করেছিল, জার্মান কবিদের কথা বাদ দিলেও। (হোয়ল্দেরলিনের তরুণ বয়সের রচনা, তথাকথিত 'ত্যুবিঙেন স্তোত্রগুলি'তে অবশ্যই রিলকের মরমী শক্তি নেই)। সবচেয়ে বিস্ময়কর রিলকের 'ঈশ্বর', যিনি সহচারী, সহমর্মী, এমন কি, মানুষিক! 'স্তুন্দেনবুখের' কবিতায় মনোরম তবু অচপল এক ভাস্কর্যে ঈশ্বরের যে-প্রতিকৃতি নির্মিত হয়, তা দান্তের স্বয়ম্ভু ভগবান্, বা রবীন্দ্রনাথের 'জীবননাথ', বা সান হুয়ান দেলা ক্রুথের 'প্রেমময় বিধাতা' ('আল আমাদো') থেকে অন্যরূপ। উদ্বেগের বোঝা বইতেও ঈশ্বরকে রাজী করান রিলকে ('ইখ বিন, দু এয়াংস্তালখের......') ঈশ্বরকে ডাকেন 'প্রতিবেশী' ব'লে ('দু নাখবার গত্')। ভবিষ্যের রূপে, রাত-পোয়ানো মোরগের ডাকে, শিশিরে, পোতাশ্রয়ে, অর্ণবপোতে, মাতৃরূপে, আগন্তুককে ও মৃত্যুতে জন্ম-মরণের দ্বৈত পর্যায়ে ঈশ্বরকে টের পা'ন ('দু বিস্ত দি ৎসুকুনফত......')। বোধের তীব্রতা বচনে এমতো প্রতিবিম্ব পায়, যা'র তুলনা বা রূপান্তর অভাবনীয় :

দেবে নিভিয়ে দাও আমার চাউনি,
আমি তোমায় দেখতে পা'ব
করবে বন্ধ করো আমার কান,
আমি তোমায় শুনতে পা'ব
আর যদি না-ই থাকে পা,
পারব তোমার কাছে যেতে
('লোয়্শ মির দি আউগেন আউস...')

গেয়র্গের উল্টোপথে, বলা যায়, জ্ঞানের সঞ্চিত অমৃত বা গরলের ছিটে লেগে রিলকের ঈশ্বর-চিত্র কালক্রমে জীর্ণতা আহরণ করেছিল। ছবিটি নষ্ট না হ'লেও, ফ্রেমের কাঠে, কাঁচে, চিত্রপটের বুননে সংশয় ও অশান্তির আবছায়া নির্যাতন ফুটে উঠেছিল। 'স্তুনদেনবুখের' রিলকে তাঁর পরবর্তী 'বুখদের বিল্দের' কাব্যগ্রন্থে মরমিয়া তৃপ্তি হারিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। পরিবর্তে এসেছে বহিঃপ্রকৃতির ভূমায় তাঁর অভিজাত অন্তশ্চেতনাকে অবারিত রেখে, প্রাণের প্রাপ্য সর্ববিধ বোধগত রাহাজানি সহ্য করার আবেগ।—

জয়ে আর লাগে না বিস্ময়।
পরাজিত-হওয়ায় নিহিত বৃদ্ধি তা'র

'অন্তিম প্রস্তরে একটি মুখ বিজন-স্তব্ধতা যাতে প্রতিচ্ছবি ফেলে কোনও আন্তর সাম্যের'—প্যারিসে অবস্থানকালে লিখলেন রিলকে কয়েক বৎসর পরে। 'নয়ে গেদিখতে' নামক 'নূতন' কবিতার সঙ্কলনে রিলকেকে দেখা গেল যেন নূতন ক'রে জাগতিক, জঙ্গম ও বৈচিত্র্য-বিলাসী। নূতন কবিতা রচনায় স্থানও বর্ণময় কাপ্রি, প্যারিস বা নেপলস; এবং প্রসারিত কাব্যিক চিন্তায় আয়ত্তাধীন বিষয় ভেনাস, আর্তেমিস, অরফেয়ুস থেকে বুদ্ধ, দোন হুয়ান ও এলেওনোরা দুজে পর্যন্ত। 'নয়ে গেদিখতে'র কবিতাগুলিতে রিলকের কবি-চরিত্র স্পষ্ট হ'ল। স্পষ্ট হ'ল যে তিনি, দুস্তর ও তীব্র এক অন্তর্লোকের বাসিন্দা যদি বা, তবু এক শহুরে মানুষ, যা'র মধ্যে সমস্ত ভাবনার পরিণাম শতাব্দীর জটিল আঁচড়ে ফোটান। চিত্রকল্পে, ভাবসংগ্রহে, প্রতীক-পদ্ধতিতে ও বাচনে মরমী শুদ্ধতা থেকে রিলকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন বুদ্ধিজীবির জিজ্ঞাসু মানসিকতায়।

যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন এক মরমিয়া বিশ্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত রিলকে যে-ভাবে বহির্বিশ্বকে গ্রহণ করলেন, এবং তদবধি আমরণ যে-দোটানায় শ্রান্তিহীন হাতড়ে ফিরলেন কোনও অনাক্রমণীয় চিত্তশুদ্ধি ও শমের প্রতিমা, তা'র বৃত্তান্তেই রিলকের যুগ-বিধৃত কাব্যসম্বন্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান মহাকবিদের সেই 'আত্মিক স্বর' রিলকেরও অধিকারে। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বও যুগভেদে কেবল রঙ পাল্টেছে : রিলকেতেও দেবত্ব-পামরত্বে গরমিল—আরও স্পষ্টভাবে, স্রষ্টার বিধান ও সৃষ্টের প্রমাদে ফারাক,—অস্তিত্বের ভিত্তিকে প্রশ্নাধীন করে। সমন্বয়ের বিন্দুটি খুঁজতে গোয়্তের মতো রিলকেও দৃঢ়, এমন কি নবীর ঢঙে চূড়ান্ত। হোয়ল্দেরলিনের 'ঈশ্বর'কে আরো প্রত্যক্ষে সওয়াল করেন রিলকে ও আরো খতিয়ে দেখেন সৃষ্টির লাভলোকসান তত্ত্বটি। অতীতের চিত্তবিভ্রমগুলিই বুঝি কেবল হুঁসিয়ার রিলকেকে আতিথ্য দেয়নি! তাঁর বিখ্যাত 'দুইনিসের এলেগিন'-এ রিলকে অকপটে ব'লে দেন :

নয় অপ্সর, নয় মানুষেরা;
আর ইতিমধ্যে চতুর জন্তুদের চোখে-
পড়েছে যে
নই আমরা সবিশেষ নিরাপদে
ওয়াকিফ্হাল
এই পরিজ্ঞাত পৃথিবীতে।

দেবতা, মানুষ, এমনকি জন্তুও, আর পুরাতন ইন্দ্রজালের বেষ্টনীতে আটক থাকছে না। নিকষিত নৈঃসঙ্গ্য! 'রোয়্মিশে এলেগিনে'র গোয়্তে তাঁর প্রাচীন রোমের ধ্বংসস্তূপে এই নিরুপায় মানুষিক অস্তিত্বের ছায়াপাতও দেখতে পা'ননি।

সার্কাস প্রসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সুবৃহৎ তাঁবুর চক্রাকার আবেষ্টনীর মধ্যে বর্ণবহুল আলোক-উদ্ভাসিত, বাদ্য-মুখর আনন্দউচ্ছল পরিবেশে হুর-পরীদের মত সুন্দরী, দীপ্তবসনা, ক্ষিপ্র-গমনা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী, বৃকোদরের মত শক্তিধর পালোয়ান, তাকলাগানো যাদুকর ও কসরতকরদের চমকপ্রদ ও লোমহর্ষ ভেল্কি, পশু-পাখিদের অবিশ্বাস্য আচরণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ, দেখন-হাসি ভাঁড়দের উদ্ভট কাণ্ডকারখানার আজব দুনিয়া সার্কাস আজো পরিবারের সকলে মিলে অনাবিল আনন্দ-উপভোগের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।

চলন্ত শিবির-নগরী সার্কাস চক্র-বাহিত নিখুঁত ও বিরাট ব্যবস্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটি সার্কাস-প্রযোজনাই হচ্ছে এক অনিশ্চিত ঝুঁকি নেওয়া। ধরুন এক শহর থেকে শহরান্তরে একটি বৃহৎ, এমন কি নাতি-বৃহৎ সার্কাস দল চলেছে। তখন তার ব্যবস্থাপকদের প্রথমে ঠিক করতে হবে সেই গন্তব্য শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাট-ফর্ম তাদের বিচিত্র লট-বহর, জন্তু-জানোয়ার-হাতী-ঘোড়া - বাঘ - ভাল্লুক প্রভৃতি নামানোর উপযুক্ত কি না! তারপর ঠিক করতে হবে খেলা-দেখানোর তাঁবু পড়বে কোথায়।

প্রথমে, তা শহর থেকে দূরে হলে চলবে না, তার ওপর তার মাটি ঢালু কিম্বা ঢেউখেলানো, বেশি শক্ত, কিম্বা বেশি নরম,—কোনটা হলেই চলবে না। এর পর আছে সেই আজব উপনিবেশের হরেক রকম রান্নার জোগাড়, প্রভূত জলের ব্যবস্থা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও থানা পুলিশের সঙ্গে ট্যাক্স, শান্তি ও নিরাপত্তার দরদস্তুর ও ব্যবস্থাপনা। জীব-জন্তুদের সম্পর্কে সতর্কতা। খেলা আরম্ভ হলে তাঁবুর একটি ছোট্ট খুঁটি থেকে আরম্ভ করে দড়ির-খেলার প্রতিটি দড়ি সম্পর্কে হুঁসিয়ারী। একটি খণ্ডিত মুহূর্তের ভুলে একজন খেলোয়াড়ের জীবন সংশয় হবার সম্ভাবনা।

সার্কাসের নরনারী

সার্কাসের নরনারীদের জীবন যাযাবর। কিন্তু সাধারণ যাযাবরের মত তা বিশৃঙ্খল, নোংরা, কিম্বা ঢিলেঢালা অগোছালো নয়। ক্লান্তিহীন অনুশীলন ও পরিচর্যায় সতেজ ও সতর্ক। এতটুকু অনিয়ম, অসতর্কতা কিম্বা ত্রুটি-বিচ্যুতি, এমন কি মন খারাপ কি অসুস্থতার জন্যে হাজার-হাজার দর্শকের বহু প্রতীক্ষিত একটি খেলা নষ্ট, কিম্বা নিজের ও পরের জীবন সংশয় হতে পারে।

অথচ আজো যতদিন তাঁদের যৌবন ততদিনই তাঁদের জীবিকার নিশ্চয়তা। পরবর্তী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অনেক সময়েই অন্ধকার। একদিন তো ছিল যখন তাঁদের সার্কাস-জীবন বা শিক্ষা আরম্ভই হতো নিষ্করুণ শঙ্কা-ত্রাস ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে। শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রেমতারা' উপন্যাসটি লিখেছেন সেই করুণ কাহিণী অবলম্বনে। আর সমারসেট মমের একটি জগদ্বিখ্যাত ছোটগল্প হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সার্কাস খেলোয়াড়দের জীবনের মর্মান্তিক দিকটা নিয়ে।

সার্কাসের ভাঁড়

বিখ্যাত বৃটিশ সার্কাস পরিচালক বার্ণাম বলেছেন যে, সার্কাসের দুই প্রধান অবলম্বন। এক হাতি, দুই ভাঁড় বা ক্লাউন।

এই ক্লাউন বা বিদূষক হচ্ছেন সার্কাস নগরীর মহাশয় ব্যক্তি। রাজদরবার ও রঙ্গমঞ্চের পালা শেষ করে সার্কাসে

"হাতি যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে পিলসুজের ওপর নাচে......",

বৃটিশ সার্কাসের ভাঁড় ককো। জন্ম রাশিয়ায়; আসল নাম নিকোলাই পলিয়াকফ্।

তাঁদের আবির্ভাব ঘটে প্রায় শ'দুই বছর আগে।

এই আধখ্যাপা, খাপছাড়া, বিদঘুটে পোষাক পরা, অঘটন ও ফ্যাসাদ বাঁধাতে পারদর্শী, চির-উৎসাহী ও চির-ব্যর্থ, অসামঞ্জস্য ও অপকর্মের প্রতিমূর্তিদের দ্বারাই হয় সার্কাস কর্তৃপক্ষের প্রকৃত গণ-সংযোগ।

বিগত শতাব্দীতে রাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ সার্কাসের ভাঁড় সেরউডকে দেখে রয়াল বক্সে হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন। কেপটাউনে সুচায়স ব্রাদার্সদের দেখে হাসতে-হাসতে এক মহিলা শিরা ছিঁড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সেকালে ভাঁড়েরা প্রধানত হাস্যোদ্রেক করতেন সাজ-পোষাক ও আকার-আকৃতির দ্বারা। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের লক্ষ্য হলো আচরণ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারা হাসির তুফান জাগানো। যেমন অবিস্মরণীয় বৃটিশ ক্লাউন ককো পিয়ানো বাজাতে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল কিছুতেই জুৎ হচ্ছে না। চেয়ারটা পিয়ানো থেকে বড্ড দূরে। আমরা হলে চেয়ারটা সরিয়ে পিয়ানোর কাছে নিয়ে আনতাম। কিন্তু কোকো মাথাভারী আমলাতন্ত্রের বড়কর্তাদের মত সেই সামান্য কাজটা করতে একটা কাণ্ড-কারখানা বাঁধিয়ে দিলেন। হৈ-হুল্লোড় করে আরো সঙদের জড়ো করে পেল্লাই পিয়ানোটাই চেয়ারের কাছে সরিয়ে আনলেন। অথচ মজা এই যে দর্শকেরা যখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন, স্বয়ং কর্মকর্তা তখন মহা দার্শনিকের মত গুরুগম্ভীর।

একটা আপ্ত বাক্য প্রচলিত আছে যে, ভাঁড়েরা 'জন্মায়' কিন্তু তৈরী হয় না। কিন্তু উল্লেখ্য এমন একজন ভাঁড়ের কথাও মনে পড়ছে না যিনি প্রথম থেকেই সার্কাসের ভাঁড়ের জীবন শুরু করেন। প্রায় প্রত্যেকেই জীবনে বিরাট ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, সম্ভব ও অসম্ভব অবস্থার মধ্যে থেকে জীবন-সমীক্ষা করে কিম্বা কোন-কোন ক্ষেত্রে সার্কাসের সর্ব-বিদ্যা পারংগম হবার পর ভাঁড়ের পেশা অবলম্বন করেছেন।

বিখ্যাত ডাচ সার্কাস-ভাঁড় Olschorsky বারোটি ভাষা জানতেন। পত্নী ও কন্যা নিয়ে তিনি উত্তর মণ্ডলের চিরতুষারের দেশগুলি থেকে আরম্ভ করে চীন হয়ে আমেরিকা পৌঁছে সার্কাস ভাঁড়ের বৃত্তি গ্রহণ করেন। পথে তাঁর মেয়েটি মারা যায়, বারংবার তিনি নানা বিপদের সম্মুখীন হন, তবু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সেই পরিব্রাজকতায় তিনি অবিচলিত থাকেন।

প্যারিসের একদা-বিখ্যাত ইংরাজ-ভাঁড় Footit ও নিগ্রো ভাঁড় Chocolat-এর জীবন ও নানা অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতায় ছিল ঐশ্বর্যময়। অতএব দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাঁড়েরা আজন্ম ভাঁড় নন। তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ।

কিন্তু মুশকিল বেঁধেছে রাশিয়ায়।

'৫৮ সালে নভেম্বর মাসে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ মস্কো সার্কাসে যান। সার্কাসের আর সব খেলা তাঁর কেমন লেগেছিল তা জানা যায়নি, তবে প্রকাশ পায় যে, উক্ত সার্কাসের স্বনামধন্য ভাঁড় ও রাশিয়ার স্কুলের ছেলেমেয়েদের হীরো পেপভও তাঁকে হাসাতে পারেনি।

অতঃপর সোভিয়েট কালচার পত্রিকা লেখেন 'বর্তমানে রাজনৈতিক শিক্ষাহীন ভাঁড় আর ভালো ভাঁড় হতে পারে না।' সুতরাং ঐ বছরেরই ৪ঠা ডিসেম্বর মস্কোতে যখন নিখিল রাশিয়া ভাঁড় সম্মেলন হলো তখন তা হলো রুদ্ধদ্বার। চারদিন সেই সম্মেলনে আলোচনার পর রাশিয়ার ৫০০ ভাঁড় প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভাঁড়দের আরো সমাজ-সচেতন হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে আরো তীক্ষ্ণতর করে তুলতে হবে। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই আমরা রাশিয়া থেকে এই প্রশ্নের জবাব পাবো যে রাষ্ট্রনায়কদের হুকুমে ভাঁড় তৈরী হয় কিনা।

সার্কাসের জীব-জন্তু

জীবজন্তুদের খেলা হচ্ছে সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ। আপাত-আশ্চর্য মনে হলেও খাঁচায় জন্মানো ও বড় হওয়া জীব-জন্তুর চেয়ে জঙ্গলী জীব-জন্তু বিশেষ বাঘ-সিংহ-চিতাকে খেলা শেখানো সহজ ও নিরাপদ। তার কারণ জঙ্গলী জীব-জন্তুদের সঙ্গে মানুষের অপরিচয়ের দরুণ তারা মানুষকে ভয় করে এবং তাদের ভয়-দেখানো সহজ। কিন্তু জন্মবন্দী শ্বাপদেরা পরিচয়ের জন্যে মানুষের দুর্বলতা ও ভয়ের কথা জানে এবং তারা তার সুযোগ নেয়।

বাঘ-সিংহের চেয়ে নাকি ভালুকদের খেলা শেখানো শক্ত। তাদের মেজাজ আরো বেঠিক এবং মুখ দেখে তাদের মেজাজের আঁচ পাওয়া শক্ত।

সিংহদের শেখানো প্রথম শুরু করেন বার্লিনের এক সার্কাসে টমাস ব্যাটি নামে এক ইংরাজ। অনেকের তখন ধারণা ছিল তিনি প্রাচ্যদেশীয় কোন শিকড়-বাকড়ের ওষুধ ব্যবহার করে শ্বাপদদের শান্ত ও শিষ্ট করেন।

বর্তমানে কিন্তু সার্কাসে জীব-জন্তু ব্যবহার করার বিরুদ্ধেই ইউরোপে আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সুইডেনে তা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বৃটেনে আন্দোলনের আকারও প্রবল। আন্দোলনকারীদের যুক্তি অনুরূপ।

জয়াল অরণ্যে সেরকাসের গ্যালারীতে উপস্থিত হাজার হাজার জীবজন্তুদের মত্ত উল্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ-পৃষ্ট চাবুকের ভয়ে যদি কোন মানুষকে পশুর মত আচরণ করে 'খেলা' দেখাতে হতো তা হলে সেই মানুষের যে অবস্থা হতো,—অবোধ, অসহায়, প্রকৃতির দাস জন্তুজানোয়ারদের সার্কাসের 'খেলা' দেখাতে গেলে অবস্থা হয় তার চেয়ে অনেক মর্মান্তিক। —তার একমাত্র সম্ভবপর ব্যতিক্রম হতে পারে ঘোড়ারা। গতি ও ছন্দ তাদের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে।

কিন্তু ধরুন বাঘ। বাঘ মানুষ খাবে,—এটা প্রকৃতির বিধান। বাঘের দোষ নয়। অথচ সেই বাঘের মুখের মধ্যে যখন তরুণী সার্কাসবালা মাথা ভরে দিচ্ছে অথচ বাঘ পরমসহিষ্ণু বৈষ্ণবের মত শুধু ন্যাজটুকু নেড়ে যাচ্ছে তখন তা দেখে আমরা বহুবার উল্লাসে হাততালি দিয়েছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি যে, বাঘের প্রকৃতির, তার প্রতিটি রক্তকণার ধর্মে পরিবর্তন করতে তার ওপর কতখানি অত্যাচার করা হয়েছে?

হাতি যখন ব্যাণ্ডের তালে-তালে পিলসুজের ওপর নাচে তখন তো আমরা আনন্দে উথলে উঠি। কিন্তু একবারও কি হাতিটার মাথায় লম্বা-লম্বা, ফালি-ফালি দাগ লক্ষ্য করেছি? দেখেছি কি কখনো সেই নাচের মহড়ার সময় ট্রেণারের হাতে নিষ্ঠুর মার খেয়ে হাতীর খুদে-খুদে চোখদুটি জলে ভরে উঠতে?

বিখ্যাত সার্কাস ট্রেণার মিঃ আলফ্রেড কোর্ট 'ওয়াই সার্কাস অ্যানিমাল' নামে একটি বই লিখেছেন। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, একবার তাঁর শিক্ষাধীনে একটি বাঘ একটি মানুষকে হত্যা করে। তখন তিনি কি করলেন? —না, "এবার আমার পশু হবার পালা এলো" এবং আমি অতি ভয়ংকর ও হিংস্র পশুই হলাম।"

আর এক জায়গায় অনুরূপ বাহাদুরী করেই লিখেছেন, "পশুদের শিক্ষা দিতে হলে মিষ্টি ব্যবহার ও আদরের মতই প্রয়োজন কড়া চাবুক ও ডাণ্ডা।"

আরেকজন ট্রেণার লিখেছেন, "বেশ ভালো রকমের শিক্ষিত হাতী মানেই বেশ দাগা-হাতী। কারণ হাতীকে শিক্ষা দেবার একটি মাত্র উপায়ই আছে: "অঙ্কুশের যথেচ্ছ ব্যবহার।"

জীবজন্তুদের ওপর মানুষের নিষ্ঠুরতাটা বুমেরাংয়ের মত। তাদের প্রতি আমরা যতই নিষ্ঠুর হই, তার প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের সমাজজীবনকেও ততই নিষ্ঠুর করে তুলি।

দেশ-বিদেশের সার্কাস

পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত সার্কাস হচ্ছে জার্মানীর—ক্রোন, ফ্রাঙ্ক এ্যালতফ, ফিশ্চার, উইলিয়ামস ও হেগেনবেক প্রভৃতি। ফ্রান্সের,—ফেত্রে বোগলিয়', র‍্যানসে ও মেডরাণো। সুইডেনের সার্কাস স্কট। সুইজারল্যাণ্ডের গেব্রুডার নি (Gebruder Knic)। ইতালীর—টগনি। স্পেনের—সার্কাস কার্সেলিয়ার। উত্তর আমেরিকার—রিং লিং ও পোলাক্। আফ্রিকার—প্যাজেল। অস্ট্রেলিয়ার—রিথ। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত সার্কাস, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে মস্কো সার্কাস। বৃটেনের—বেট্রাম মিলসের অলিম্পিয়া এবং হ্যারিংগে।

উপরোক্ত সার্কাসগুলির বেশির ভাগই আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। ফলে তুলনামূলকভাবে তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি মনে হয়েছে তা হচ্ছে: ক্লাউনের উদ্ভট ভাঁড়ামি এবং রুদ্ধ-নিঃশ্বাস দড়ির খেলায় বৃটিশ সার্কাস-গুলি অতুলনীয়। রাশিয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের কসাকদলের তাক লাগানো ঘোড়ার খেলায়। রুশ সার্কাসের সঙ্গে থাকে আবার যাদুকরের দল। ফরাসী ভাঁড়দের চটুলতাও বেশ ভালো। স্প্যানিশদের পোষাক-পরিচ্ছদ জমকালো। জীবজন্তুর খেলায় জার্মানরা সেরা। তারাই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদের সার্কাসের খেলা শেখায় এবং আজো বিশিষ্ট 'ট্রেণাররা' আসে জার্মানী থেকেই।

কবিতা সিংহ

সেই সবুজ পাহাড় পেরিয়ে

জানলা খুললেই জানলা। আরতি এড়াবে কি করে? এড়াবার দরকারই বা কি? বেশ লাগে ভদ্রলোককে। আর ভদ্রলোকের মেয়েকে। গোলাপী পর্দা হাওয়ায় উড়লে যে নীল ডিসটেম্পার-করা ঘরের চিলতে দেখা যায়, তাই বা কি কম লোভনীয়!

আরতির জানলার পর্দায় অমন গোলাপী নেই। তার রং রক্তহীন, শাদা। হাসপাতালের মত ধোয়া, পাট-ভাঙা। তার ফাঁক দিয়ে আরতি অসময়ে চুরি করে দেখে, সময়ে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে দেখে। আরতি তোয়ালে নিয়ে মুখের জলের ফোঁটায় ফোঁটায় চাপল। আপনি জল শুষে নিল তোয়ালে। গোড়ালির ওপর ঘুরে গেল আরতি, ভদ্রলোকের ঘরে আলো জ্বলল বলে। বিছানায় এসে বসল, পায়ের তলার ধুলোর কণাগুলো ঝেড়ে। হাতদুটো মাথার তলায় রাখতেই সদাস্নাত শরীরের গন্ধ আসতে লাগলো আরতির নাকে। সেই গন্ধে ম' ম' আরতি খানিকক্ষণ গড়াল। তারপর বুকে বালিশ রেখে, ট্রেঞ্চে শোয়া সৈন্যের মত মাথাটা একটু একটু একটু উঁচু করে ঠিক চোখ পর্যন্ত জানালার উচ্চতায় রাখল। ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। টুপ করে ডুবে গেল আরতি। বালিশে নিজের চুলের গন্ধ পরের বলে মনে হল। আরতি উঠে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। দিয়ে আবার দেখতে লাগল। এবার বেশ নির্ভয়ে।

দেখবার অনেকগুলো রকম আছে আরতির। তারা চার-পাঁচজন আরতি। ক'জন ছোটো, আবছা, না-তৈরী। ক'জন বেশ তৈরী। যেমন, যে-আরতি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শান্তিনিকেতনে হোস্টেলে থাকত, সেই আরতি। তার রুম-মেট ছিল শ্রাবণী। বড়লোকের অপদার্থ একটা মেয়ে। সকালবেলা উঠে বিছানাটুকুও তুলত না। তুললেই কি তাকে মানাত? অমন চোখ যার, অমন আঙুল। শ্রাবণীকে চা তৈরী করে দিত আরতি ঘরে, স্টোভে। ডিম ভেজে দিত। আর বলত, বুঝলি শ্রাবণ, পরীক্ষাটা চুকে গেলেই টপ করে একটা—শ্রাবণী তখন থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত,—দূর, আমি ওসব বিয়ে-টিয়ের মধ্যে যাচ্ছিনে।

সেই শ্রাবণী আজ ডক্টরেট হয়ে ঘর করছে ডিব্রুগড়ে। আর সেই আরতির এখনো বিয়েই হল না। সেই লোভী আরতিটা।

ভদ্রলোকের ঘর। কতটুকু বা দেখা যায় এখান থেকে। জানলা, বারান্দা আর দরজা। ডবল বেড খাটের খানিকটা। তার উপর গোলাপী ফুলকাটা বেড-কভার। সামনে সোজাসুজি রেডিওগ্রামের উপর স্ফটিকের পুতুল। তার ওপাশে কি, আর দেখা যায় না। দেখতে ইচ্ছে করে। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ছাদে উঠলে হয়ত দেখা যায়। কিন্তু ছাদটা বাড়িঅলার। ওপরে হেড-মিস্ট্রেস সুষমাদি থাকেন, ও'র ঘরের বারান্দা থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে। কিন্তু উনিও এখানে নেই। কবে যে আসবেন? আর মিলু। ভদ্রলোকের মেয়ে। আরতিদের স্কুলেই পড়ে। যে-স্কুলে আরতি পড়ায়, সেই স্কুলে।

ছুটে ঘরে ঢুকলো মিনু। ওদের ঘরে। সুঠাম শাদা দুটি পা। নরম বাদামী কালো চুল। ঝিলিক দিয়ে গেল মাথায় সাটিনের 'বো', লাল ফ্রিল-দেয়া জামা। আরতির কখনো এমন মেয়ে হতে পারত কি? ছি, ছি। এ-সব কী ভাবছে। যাক, লোভী আরতিটা মিলিয়ে যাক্। আরতি তাকে শাসন করল, মুছে দিল।

আয়া এলো। সাতটা বেজেছে। ভদ্রলোক মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খেতে পাঠালেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আরতি চোক ফিরাল। যেন ভদ্রলোক তাকে দেখতে পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না যদিও জানে আরতি, তবু মনে হল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। তীক্ষ্ণ নাক, কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট, গেরুয়া রং। অবশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আরতি। কারণ, এখন ভদ্রলোকের পিঠে সব আলো, চুলে সব আলো। মুখে শুধু অন্ধকার, বুকে সব অন্ধকার জমেছে। ও'র স্ত্রী মা মারা গেছেন [illegible]।

আরতির ঘর যেন মৃত্যুর ঘর। সেখান থেকে এখন যে আরতি বন্ধ-ঠোঁটের আড়ালে কথা বলছে, সে যেন ও'রই স্ত্রী। ও'র স্ত্রীর যদি সত্তা থাকত, সে যেমন করে ও'র সঙ্গে কথা বলত, তেমনি করে।—তুমি কী। অমন করে দাঁড়িয়ে আছো অন্ধকারে? কেন, বেরিয়ে পড়না একটু। বন্ধু নেই তোমার? (এত বড়োরে তুমি। তবু বন্ধু নেই?) আছে। তারা সুখী, না? বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী? তোমায় তারা করুণা করে? দুঃখী ভাবে?—বেশত একলাই যাও না,......আমিত থাকি সব সময়, পাশে থাকি।

ঠিক এমনি সময় ভেসে ওঠে আর একটা আরতি, হিংসুটে আরতি, পঁচিশ বছরের নয়, সতের বছরের আরতি, তার বুক জ্বলে যায়। ও'র মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তার বিদেহী ভালোবাসার সঙ্গে সে যেন রক্তমাংসের সতীন হয়ে যায়। মনে মনে সে চেঁচায়, না, না, কেউ আপনার পাশে থাকে না। মরলে আবার মানুষকে মনে রাখতে হয় নাকি? স্মৃতিকে মুছে ফেলুন। না, না,—অমন করে আপনি হাঁটবেন না। কেন হাঁটেন? ঐ বারান্দার অন্ধকারে, একা? আপনি যখন সরু সরু শাদা-কালোয় স্ট্রাইপকাটা (এত সরু স্ট্রাইপ যে, দূর থেকে ছাই ছাই দেখায়) প্যান্টের দুপকেটে হাত রেখে, তার ওপর ঘোর বাদামী, কার হাতে যেন বোনা কার্ডিগানের ওপর মাথাটা ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটেন, মাথা নীচু করে জানালার ওপর বাদামী রঙের বুকে ফুল কেটে মোটা লেসের চওড়ায় তলায় আকর্ণবিস্তার চোখদুটি নামিয়ে হেঁটে যান, মনে হয় আপনি যেন শান্তাই তাকে অনুভব করতে করতে যাচ্ছেন। তাকে নয়, তার অভাবকে অনুভব করতে করতে যাচ্ছেন। আপনি তাকে ভুলে যান। সত্যি ভুলে যান। যাবেন, আমি জানি। কি করে? আপনি কেন কোনো জানালার দিকে তাকান না? তাকান, কিন্তু দেখেন না। আপনি যেদিক দিয়ে অফিস যান, ঠিক তার উল্টোদিক দিয়ে যে মেয়েটি আপনার মেয়ের স্কুলে পড়াতে যায়, জানেন না আপনি, তার নাম আরতি। তার আপনাকে ভালো লাগে। আপনার মেয়েকে ভালো লাগে। কেন জানেন না আপনি? কেন আপনাকে জানা যায় না?

—সুষমাদি, কাল দুপুরে রওনা হয়েছিলেন বুঝি? ট্রেন এত লেট করল?

— হ্যাঁ ভাই, দেখনা, সব কি অবস্থা যে হয়ে আছে ঘরটার। আবার সকালে স্কুল। মিহিদানা খাবে? খাও না, মিটসেফে রেখেছি,—হাতে যা ধুলো,—

—না, না, থাক না, বরং আমিই আপনাকে একটু সাহায্য করি, কোমরে আঁচল জড়িয়ে আরতি সুষমা সেনের দিকে তাকালো,—ঝাঁটা কৈ?...ওমা একি দক্ষিণের বারান্দায় জানলাটাই বন্ধ, খুলে দিই......

—হাঁ, হাঁ, খুলো না আরতি, পর্দা না দিয়ে ও জানলা আমি খুলছিনে।

—কেন সুষমাদি, কি হয়েছে? আরতির মুখের রঙে রক্ত রইল না।

—বিকাশ ঘোষ এসে উঠেছে এ-পাড়ায়, ওই পাশের বাড়িতে,

—ওঃ ওই নতুন ভাড়াটে পাশের বাড়ির। বাচ্চা মেয়ে নিয়ে উঠেছেন যে ভদ্রলোক, যাঁর নাকি স্ত্রী নেই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনীষা। হ্যাঁ, সে ত স্যুইসাইড করেছে। লাভ ম্যারেজে ঘেন্না,...হলুদ বেডকভারটা টান টান করতে করতে ঠোঁট বাঁকালেন সুষমা সেন। অনেকখানি। আরতি অবাক হয়ে তাঁর বেডকভার পাতা দেখল, জানালায় পর্দা দেয়া দেখল, ঘরের কোণে জলের-কুঁজোর পাশে মাকড়শার জাল দেখল, সুষমাদির আঁধার হয়ে আসা ঘরে সুইচ টিপে আলো জ্বালা দেখল।

আলো জ্বালতেই আরতি মুখ-রোচক প্রসঙ্গের সংবাদ সন্ধানে সবাক হল। জংধরা মেসিনে তেল পড়ার মত আটকে যাওয়া চিন্তা হঠাৎ কাজ শুরু করলো।

—সত্যি বাপু কিছু বোঝবার যো নেই।

—আরে আমরাই কি বুঝেছি? মনীষাই কি বুঝেছিল? তাহলে কি এই দাঁড়াত।—বিনুকে, মানে আমার রাঙাবুড়ো বোনকে, তখনি বলেছি, বিনু তোমার ওই রাঙামামুলো দেওর প্রেম করছে করুক, তুমি কিন্তু ওর মধ্যে থেক না। কথা কি শুনলো বিনু? বিনু কেন, যে যেখানে ছিল সবাই ওরা সব হেল্প না করলে মনীষাকে নিয়ে কি করে ও বর্ধমান পালালো...হ্যাঁ মিহি-দানাটা, দু প্লেট ভরে মিহিদানা আনলো আরতি। মিহিদানা খেতে সুষমাদির ঠোঁট তৈলাক্ত হবে। গল্পটা আরো ধারালো করে শুনবে আরতি।... লোকটার গল্প।

—বিয়ের পর থেকেই তুলকালাম ঝগড়া।

—কি নিয়ে সুষমাদি?

—কি নিয়ে নয় বলো, বাপরে, ফাটাফাটি ঝগড়া, তারপর বিকাশ বিলেতে গেল, ব্যস এখানে ফিরতেই ওই কাণ্ড, আমার ত মনে হয় ওই ছোঁড়াই ওকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, কাগজে কেমন বেরুলো, ভুলে মালিশের ওষুধ খাইয়া,......

আলমারীতে নতুন খবরের কাগজ পেতে ন্যাপথলিনের বল ছড়াতে ছড়াতে আরতি বলল, —নাকি?

—আবার জানো না, এ পাড়ায় এসে আমার কাছে এসেছিল,

—সেকি কথা ?

—হ্যাঁ বিশ্বাস করো। বলে কিনা আপনিত বৌদির দিদি, আপনি আমারও দিদি, আমার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিই আমি নিজেই। কিন্তু ফেরার সময় ঠিক আয়ার ওপর আমার বিশ্বাস হয় না, আপনি যদি,...ওর

মেয়েটা আমাদের নার্সারী সেকসনে পড়ে আর কি।

—হ্যাঁ আমিই ত পড়াই। ভালো নাম সুপ্রিয়া, ডাক নাম মিনু,...তা আপনি কি বললেন সুষমাদি—?

—বললাম ওসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর আমি মোটেই ওর দিদির বয়সী নই। তাছাড়া একলা থাকি, অমন যাতা অজুহাতে যখন-তখন...আর তাছাড়া কমবয়সী আয়াটা মেয়ে পৌঁছোবে না, আনবে না, ত করবেটা কি? শুনি,...

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আরতি সবটা মিহিদানা খেলো। তার পর উঠে পড়ে দড়াম করে দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিল।

—তবুও সুষমাদি দরজাটা একটু খুলি। কি আর হবে, কি আর করবে ওই, (ঢোঁক গিলল আরতি) বিশ্রী লোকটা।

আরতি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দোতলার ভদ্রলোকের পুরো ঘরটা আজ দেখতে পেলো। রেডিয়োগ্রামের পাশে আছে বুক-সেলফ, তার ওপাশে লাল কার্পেটের উপর এক প্রস্থ সোফা কৌচ। আর দেখা গেল বুককাটা জামা পরা এক মেমসাহেব, কাঁচের কাটগ্লাস, সোডার বোতল, অচেনা বলেই চেনা কালো বোতল। ভদ্রলোক সেটা মেম-সাহেবকে এগিয়ে দেবার সময় তিনি ও'র গ্রীবায় আলতো চুমু খেলেন। মিনু ছবির বই উল্টোচ্ছে কার্পেটে উপুড় হয়ে। আয়া ঘুরে গেল একবার, সত্যি বড় বেশী অল্পবয়সী। এতগুলো নতুন অভিজ্ঞতা একসঙ্গে হওয়ায় আরতি যেন নড়তে পারে না বারান্দা থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে আরতি তার বেঁটে ছাতাটা খুলল। সামনের অতি ছোট্ট মেয়েটাকে তার আয়া সাতরঙা ছাতাটা খুলে দিল। দারুণ দুপুরে। পথের তলায় ছায়ারা ছোট। জজ কোর্ট রোডের দু-পাশের বড় বড় মহীরুহের পাতাগুলো রোদ পড়ে উজ্জ্বল মরকত, ছায়ার অংশ নিকষ কালো। পাতাগুলি কল্যাণী। কিন্তু তাতে হাওয়ার যে শিশ্ তা উদাস, বেদে। আবেগের জন্য কান্না, আবেগের জন্য বিদ্বেষ, আবার আবেগের জন্য লজ্জা যেন রিলে রেস দিতে দিতে এগচ্ছে আরতির বুকের মধ্যে।

নার্সারি ক্লাশে আরতিই পড়ায়। জিজ্ঞেস করেছিল,

—তোমার নাম কি?

—সুপ্রিয়া ঘোষ—মাথা নীচু করে হলুদ আর লাল পুঁতি দিয়ে নকসা করতে লাগল মেয়েটি। শান্ত মেয়ে। মনে হয়েছিল আরতির। পরে মনে হওয়া কেটে গিয়েছিল। বাপের মত বহুরূপী মেয়ে সুপ্রিয়া।

না আরতি আর ঐ সাতরঙা ছাতার দিকে তাকাবে না।

মোড় বেঁকতেই পিছন ফিরল সুপ্রিয়া। ছুটতে ছুটতে আরতির কাছে এল।

—আমি জানি,...

—ওর রোদে-বসে-যাওয়া চোখ, তামা-তামা মুখ, ধুলো লাগানো নীল ওভারঅল, লাল বর্ডার দেয়া মোজার তলায় কালো ধুলোকাদা মাখা নটিবয় স্যুর দিকে তাকিয়ে আরতি বল্ল,

—কি জানো?

—বড় দিদিমণি দেখতে পাবেন বলে আপনি মোড় না বেঁকলে কথা বলেন না! আপনি তখন আমাকে চেনেনই না, আমি জানি মিছিমিছি, তবু কষ্ট হয়।

—তুমি বড্ড পাকা মেয়ে,

—হ্যাঁ, বাবাও তাই বলেন,

আরতি আয়ার দিকে তাকালো। আয়ার পীনোন্নত বুকে কাঠপলার মালায় সোনার দানাগুলো আগুনের মত জ্বলছে। আরতির মনে আগুন জ্বলে উঠল। সে এই কচি মুখ শিশুটাকে ব্যবহার করতে চাইল। আয়াকে বলল,—তুমি যাও, আমি মিনুকে নিয়ে যাচ্ছি।

আয়া হেসে এগিয়ে গেল। নাকের লাল নাকছাবি, নীল নাকছাবি দু আলোয় ঝিলিক দিল। আয়া ট্রাফিক সিগন্যাল জানে না। জানলে শুধু লাল পরত....

এবার আরতি আর সুপ্রিয়া একলা। এখন সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করা যায়.. মু-মু রাতে ও কার কাছে শোয়, মাঝরাতে কেঁদে উঠলে আয়া আসে কিনা? সেদিন যে মেম-সাহেব এসেছিল সে কে?... কিন্তু অনেকক্ষণ শ্রম সত্ত্বেও আরতি সুপ্রিয়াকে ব্যবহার করতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল,

—বাড়িতে বড় একা একা লাগে না?

—হ্যাঁ, বাবাটা দুষ্টু—

—কেন?

—নিজে বই নিয়ে বসে থাকে, খালি আপিস যায়, সন্ধ্যেবেলা খালি বেড়াতে যায়।

—না-না, তোমাকে বাবা কত ভালোবাসেন?

—সুপ্রিয়া পা দিয়ে একটা ঢিল ছুড়ল। তার উত্তর দিতে দেরি হল না।

—কই ভালোবাসে? একটুও ভালো-বাসে না।

আরতি ঢোঁক গিলল।—'বাবা তবে কাকে ভালোবাসেন?'

নিজেকে ছি-ছি করল আরতি। নিজেরই নিজেকে ঘেন্না হল।

—সব্বাইকে। আয়াকে বাবা একটুও বকে না। অন্ড্রে পিসি এলে শুধু সেই সুন্দর সুন্দর গ্লাসে শেরি খাওয়ায়। এমন কি সেদিন যে আপনি গিয়েছিলেন, বাবার সঙ্গে দেখা হবে গেল যেদিন, সেদিন আপনাকেও যেন ভালোবাসে ভালোবাসে বলে মনে হল!

—কেন মনে হল? মন্ত্রচালিতর মত বল্ল আরতি।

আপনাকে বাবা আমাকে দেরি করে আনার জন্য বকল না, কত গল্প করল, শরবৎ খাওয়ালো, আমাকে শুধু বকে,—

—কারণ তোমার বাবা তোমাকেই শুধু ভালোবাসেন!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুপ্রিয়াকে কোলে তুলে নিল আরতি, নতুন গুনতে শেখা কচি আঙুল গুনল সুপ্রিয়া, এক, দুই, তিন, চার, চারদিন হল,—

—কি চারদিন হ'ল?

—আপনি আমাকে কোলে নিলেন!

সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া, মিনু, মিনু......আরতি এত কেঁদে ফেলল যে, চোখের সানগ্লাস খুলে ফেলতে হল।

আরতি বিছানায় শুয়েছিল। তার স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে কদিন। ধুলোর চারপাশে মুক্তারস লাগিয়ে যা হয়—তাই। সব জেনে-শুনেও এ কি স্বপ্ন! ওঁর কথার ইন্দ্রজালে? কিসের জন্য আরতির দুর্বলতা? ও'র চোখ, চুল, মিনু, না রেডিয়োগ্রামের উপরের স্ফটিকের ঝাড়োরিনা?

আরতির বুক জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে!

—তুমি কিন্তু ভীষণ বাড়িয়ে তুলেছ আরতি,—

আরতি মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখের জলের পর্দার মধ্যে দিয়ে টলমল করতে দেখল সুষমা সেনের ছবি।

—প্রায়ই বিকাশের বাড়ি যাচ্ছ,—

আরতি বিছানায় উঠে বসল, বলল—

—সুপ্রিয়াদের বাড়ি যাচ্ছি,—

—আমি যে দেখেছি তোমায়। তোমার জানালা থেকেই, তুমি বিকাশের সঙ্গে গল্প করছিলে। সুপ্রিয়া ত ছিল না!

—ছিল, ও ওয়ার্ড-মেকিং খেলছিল।

—খুব সাবধান আরতি। যাকে আত্মীয়-স্বজনও বিশ্বাস করে না.... হ্যাঁ কি কি অত গল্প করছিলে বলোত? মনীষার কথা? ও বুঝি মিথ্যে মিথ্যে করে সব যা তা, না আরতি। তুমি জানো না, বিলেতে ও যে ল্যান্ডলেডির বাড়ি ছিল সেখানকার মেয়েটা এদেশে এসেছে, ওর কাছে আসে। আর কে একটা কাজিনের সঙ্গেও কি সব এ্যাফেয়ার,.........

—হ্যাঁ সেই কথাইত হচ্ছিল,—

—কি? কি?

—ওই যে লন্ডন টিউব ষ্টেশনে বরফের জন্য ট্রেণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্যাট্ বলে একটি মেয়ে ওঁর কাছে,—

—হ্যাঁ হ্যাঁ ওর কাছে,—

—সারারাত ছিল। সেই রাত্রির কথা বলছিলেন,—

—আর সেদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে?

—সে প্যারিসের গল্প,—

—ছিঃ ছিঃ, এসব কথা তোমরা বলা-কওয়া করো, লজ্জা করে না,

—না, কারণ এসব কথা উনি মনীষাকেও চিঠিতে লিখেছিলেন। গোপন করেননি তো,—

—মনীষা তাঁর স্ত্রী ছিল,—

—তিনি মনে করেছিলেন মনীষা তাঁর স্ত্রী ও বন্ধু দুই-ই ছিল,—

—ওঃ এই? আচ্ছা, আচ্ছা! তাহলে মনীষার কথা কিছু বলল না,—

—না, উনি এখন অন্ত্রের ছোট বোন প্যাট্ আসার জন্য ব্যস্ত। অন্ত্রে সাউথ ইন্ডিয়া গেছে, প্যাট্ ওঁর কাছে দিন-মাসেক থাকবে,.........

সমস্ত গা ঘৃণায় শিউরে উঠল সুষমা সেনের, —তুমি মরেছ, তুমি মরেছো আরতি,—

আরতি সুষমা সেনের পিঠ দেখলো। পিঠ ছোটো হয়ে দরজার ওপাশে চলে গেল।

—বিছানায় লুটিয়ে পড়ে প্রচুর হাসলো আরতি। হাসল। হেসে হেসেই বাতাসকে বলল,—মনীষা আত্মহত্যা করেছে। তাহলে কেন সবাই ওঁকে বলে উনি......হঠাৎ কড়িকাঠের দিকে চোখ পড়ল আরতির। বাঁকা হুক ঝুলছে। আরতির মুখ বীভৎস হয়ে গেল। চোখ বেরিয়ে পড়ল একটু। মনীষাকে তাহলে কি হত্যাই করা হয়েছিল?

—আমি এসব কথা কিছুই লুকোইনি, মনীষাকে জানিয়েছি, যতটা ঘটেছিল ততটা,—

উনি আরতিকেও জানিয়েছেন।

মনীষা কি বিশ্বাস করতে পারে একঘরে শুয়ে, এক রাত্রি কাটিয়েও বিকাশ, প্যাটের তার সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে জেনেও,.........

আরতিই কি বিশ্বাস করতে পারে একঘরে শুয়ে, এক রাত্রি কাটিয়েও বিকাশ প্যাটের তার সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে জেনেও,.........

আরতিকে কোন ঘরে ঠেলে দিল বিকাশের স্বীকারোক্তি। মনীষার সঙ্গে একঘরে। স্বীকারোক্তি প্রমাণ সাপেক্ষ। কে তা বিশ্বাস করে? বিশেষ করে যে ভালোবাসে। যার হারাই হারাই ভয় সর্বদা। মনীষা বিশ্বাস করেনি, আরতি বিশ্বাস করে না। তাহলে প্যাট্ আসছে কেন? শুধুই কি ভারত দেখতে? না সেই বরফ-ঝরা রাতে...........(আরতির বুকের ওপর মনীষার বুকের ভিতর বসা বিছেটা হুল বসাচ্ছে!) সেই বরফ-ঝরা রাত আরতির চোখের সামনে ফুটে উঠল। প্রস্থ পেল। তার পেছনে কত না-বলা ছায়া-ছায়া এপ্রিলের বিকেল, ট্রাফালগার স্কোয়ারের সন্ধ্যে (এসব আপনি আমাকে বলেননি বিকাশবাবু। আপনি একথা মনীষাকেও বলেননি বিকাশবাবু।) মনীষা বুঝেছিল। আমি বুঝেছি। প্যাট আসছে কেন? তার জন্য আপনার চিন্তা কিসের? তার বিছানার তলায় আপনি নরম পালকের লেপ রেখেছেন, তার বালিশের ওআড় দুবার পাল্টে এনেছেন নিউমার্কেট থেকে।

কেন কেন?

আরতি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বান্ধবী প্যাট্ আসছে কেন? উনি হেসে বলেছিলেন, —আমার আত্মীয়েরা, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়েরা বলে, আমার জন্য—

আরতির সামনের কাট্ গ্লাসের পাত্রে রাখা আইসক্রীম গরম ঠেকেছিল তখন।

ভয়। বিষম ভয়। ঈর্ষা বড় ঈর্ষা! আরতি মনীষাকে দেখতে পেয়েছে। ঈর্ষার রং সবুজ। তীব্র সবুজ। আহা ঈর্ষার সেই সবুজ পাহাড়। জেড্ পাথরে গড়া কোণা-উঁচু সবুজ পাহাড়। ঘষড়ে ঘষড়ে চূড়ায় উঠতে বুক কেটে যায়। বুক কেটে যায়। সত্যি এসব কথা বিকাশ ঘোষ আরতিকে কেন বললেন? মনীষাকে পাঠানো চিঠিগুলোর কার্বন কপি রাখলেন আরতির বুকে। আরতিরও বুক কেটে যায়। জেড্ পাথরের কোণা-উঁচু সবুজ পাহাড়। তার ধারালো শাণিত পাথরে পাথরে সোনালী বিন্দুতে বিন্দুতে আগুন জ্বলছে। অজস্র অগ্নিবিন্দু। আরতি আর ঈর্ষার সরীসৃপের মত পাহাড় বাইতে পারে না। পাহাড়ের ওপাশে তার সমস্ত উপশম। আরতি মনীষাকে দেখতে পায়। তার রক্ত তার ঈর্ষা। তার লাল, তার সবুজ আরতিকে জানালার কাছে নিয়ে যায়। সামনেই উনি, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দায়। পিছনের ঘরে মিলু খেলছে। অন্ধকারে ওঁর মুখ দেখা যায় না। কিন্তু আরতি জানে উনি আরতির দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি আরতিকে তা জানাতে চান। তাই ভঙ্গি বদলালেন।

আর, আরতি তাই দড়াম করে জানালা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করেই আরতি দুভাগ হয়ে গেল। তার এক-ভাগ শান্তিতে বলল, মহিমায় বলল,—আমার সুপ্রিয়া আছে, সংসার আছে, তুমি আছো। আর একভাগ সোজা চলে গেল ঠিক মনীষার মত একটা কাপ, একটা চামচ আর 'বিষ' লেখা একটা চোখের লোশানের কাছে। তার পর সে ফিরে তাকালো মনীষার দিকে। মনীষাকে বলল, —মনীষা, তোমার চেয়ে আমার সন্দেহ, আমার ঈর্ষা, আমার দুঃখ আরো বেশি। তুমি শুধু স্বামীর বান্ধবীদের ঈর্ষায় ভয়ে লুকিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলে। আর আমাকে তোমার স্বামীর বান্ধবী এবং প্রথম ভালোবেসে বিয়ে করা বৌ-এর ঈর্ষায় সারা জীবন জ্বরে থাকতে হবে। তবু এই জন্যেই আমায় বাঁচতে হবে, অন্ততঃ আমি, এই পৃথিবীতে একজনও থাকবো যে নিজেকে দিয়ে জানতে পেরেছে, বিকাশ তার বৌ-এর মৃত্যুর কারণ, সে তার বৌ-এর হত্যাকারী নয়।

॥ রাজস্থানী চিত্রকলা ॥

ঐতিহাসিক মুঘল চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর পর অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ এবার রাজস্থানী চিত্রকলার এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীটি ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে ৫ই মার্চ পর্যন্ত অগণিত দর্শককে শুধু আকর্ষণই করেনি, সত্যিকার আনন্দ প্রদানেও সক্ষম হয়েছে।

মুঘল চিত্রকলার ন্যায় রাজস্থানী চিত্রকলাও ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়। বিশেষ করে ১৯১৬ সালে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রের অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সার্থকভাবে আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে জাতীয়-চেতনা সম্প্রসারণের ফলে আমরা এই লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। যে-সব রাজ-পরিবার বা অভিজাত ব্যক্তির সংগ্রহে রাজস্থানী চিত্রকলা দীর্ঘকাল ধরে আত্মগোপন করেছিল, ক্রমান্বয়ে তা উদ্ধার করে জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়। তবু ১৯৪০ সালের আগে উত্তর ভারতের এমন অনেক স্থান ছিল যেখানকার চিত্রকলা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই অবগত হতে পারিনি। উত্তর ভারতের সেই অধুনা আবিষ্কৃত এবং শ্রীগোপীকৃষ্ণ কানোড়িয়া কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্থান ও মালওয়া অঞ্চলের চিত্রকলাই ছিল আলোচ্য প্রদর্শনীর প্রধানতম সম্পদ। অকুণ্ঠ চিত্তে বলবো : এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে অ্যাকাডেমী তার মহান দায়িত্ব পালনে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজস্থানী চিত্রকলার ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। প্রধানতঃ ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী কালের মধ্যে রাজস্থানী চিত্রকলা ওরছা (মালওয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত), অম্বর (রাজস্থানের পূর্ব প্রান্ত), বিকানীর, যোধপুর, কিষাণগড়, কোটা, মেবার, বুন্দি ও মালওয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই ধারার-ই অন্য এক বিবর্তিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কাংড়া তথা পাঞ্জাবের পাহাড়ী চিত্র-শৈলীর মধ্যে।

প্রদর্শনী
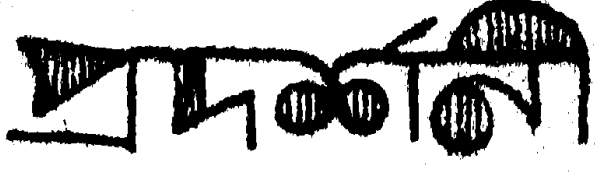
কলারসিক

রাজস্থানী চিত্রের বিষয়বস্তুতে ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রাধান্য ঘটলেও এর আঙ্গিক-প্রকরণে সমসাময়িক মুঘল চিত্রকলার প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রকলার উপরেও আমরা রাজস্থানী চিত্রকলাকে প্রভাব বিস্তার করতে দেখেছি।

প্রখ্যাত কলা-সমালোচক ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রকলার পার্থক্য নির্ণয় করে একদা যে-সব বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন রাজস্থানী চিত্রের বর্তমান আবিষ্কৃত রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সেই বক্তব্যের বহু অংশ নিঃসংশয়ে অনেকের পক্ষেই গ্রহণ করা বোধহয় সম্ভব হবে না। ডঃ কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মুঘল চিত্রকলার সঙ্গে রাজস্থানী চিত্রকলার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

'Mughal art is secular, intent upon the present moment, and profoundly interested in individuality. ....All its themes are worldy and though sheer intensity of observation—passionate delineation — sometimes raises individual works to the highest possible rank, yet the subject matter of Mughal art, as such, is of purely aristocratic interest.'

এই উক্তি মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে সর্বাংশে যেমন প্রযোজ্য নয়, তেমনি রাজস্থানী চিত্রকলার অনেক নিদর্শন সম্পর্কে এই উক্তি সার্থকভাবেই প্রয়োগ করা যায়। এই প্রদর্শনীতেই এমন অনেকগুলি চিত্র ছিল যা দিয়ে ডঃ কুমারস্বামীর উক্তি খণ্ডন করা যায়। প্রদর্শিত ৬৯, ৭০, ৭১ ও ৭২নং চিত্রের সর্বাঙ্গে মুঘল চিত্র-রীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই চিত্রগুলি ওরছা ও অম্বরের প্রাদেশিক রাজ-দরবার থেকে সংগৃহীত। এই দুই দরবারের
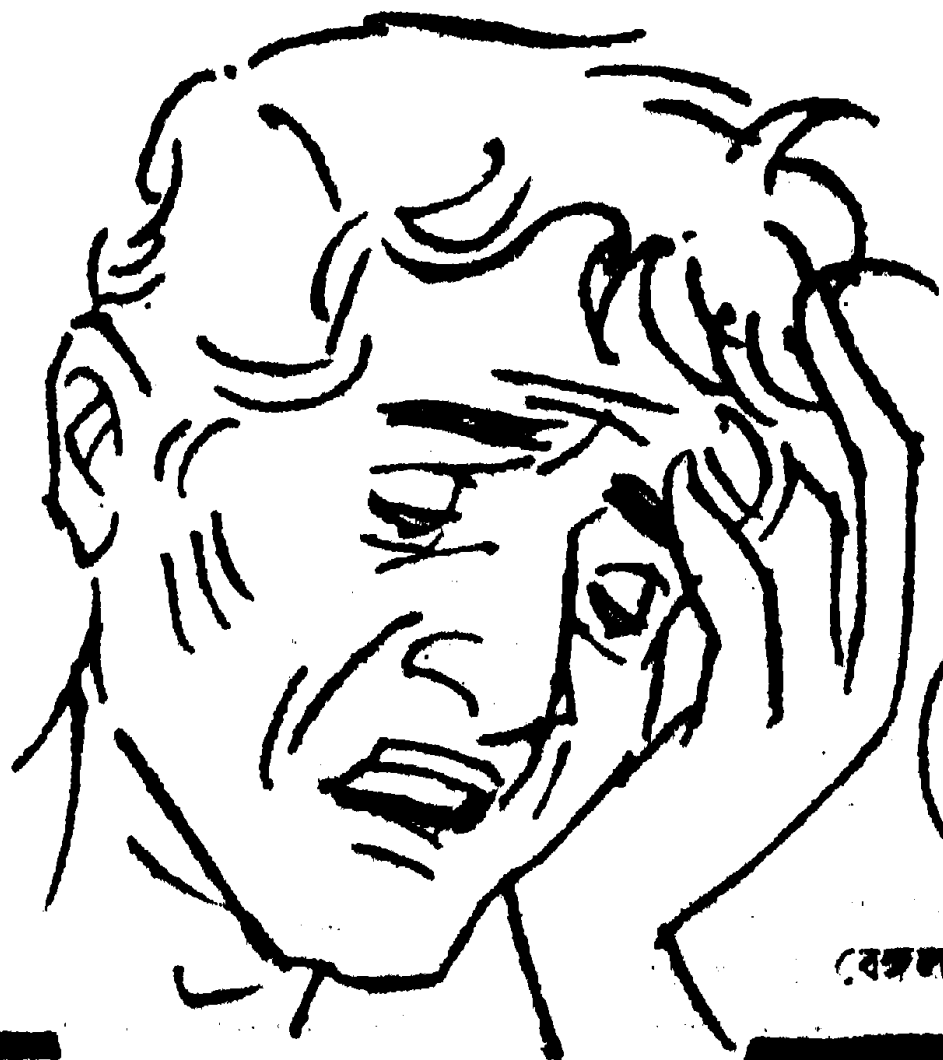
মেবারের ১৭২০ সালের একটি চিত্র

সঙ্গে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল-দরবারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে, এখানকার চিত্র-রীতিতে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব পড়েছে। এই চারখানি চিত্রের পার্থক্য শুধু এর বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ ভারতীয় কাব্যের রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীই এর মুখ্য বিষয়। মুঘল চিত্রকলায় যেমন পারসীশৈলীর অলঙ্কৃত সৌন্দর্য একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য, তেমনি রাজস্থানী চিত্রকলাও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এর ছন্দময় গীতি-কাব্য-ধর্মী অনবদ্য সুষমার জন্য। ডঃ কুমারস্বামীর বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর না হয়ে আমরা মোটামুটি উপরোক্ত পথে এই দুই চিত্র-রীতির পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে বিকানীর, যোধপুর, কিষাণগড় ও কোটা—এই চারটি রাজ্য থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু সংখ্যক চিত্র-দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল সকল দর্শকের। এর কয়েকখানি চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। পার্থক্য যা ছিল তা অতি সামান্য। যেমন, মুঘল সম্রাটদের প্রতিকৃতি সাধারণতঃ হস্তীপৃষ্ঠে কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায় শিল্পীরা চিত্রিত করতেন আর রাজস্থানী শিল্পীরা রাজপুত রাজাদের হস্তীর বদলে অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়ে মূলতঃ সেই একই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন (৬১, ৬২, ৬৩)। কিষাণগড়ের রাজা সবন্ত সিং তাঁর দরবারে একটি বিশিষ্ট ধারার চিত্র-রীতির উদ্ভাবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আঙ্গিকে অনেকখানি মুঘল প্রভাব থাকলেও বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। রাজা সবন্ত সিং নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করতেন আর তাঁর প্রেমিকা-কবি বানী-থানীকে মনে করতেন শ্রীরাধারূপে। ফলে, রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিজেদের উপর আরোপ করে তিনি শিল্পীদের নির্দেশ দিয়ে এমন সব চিত্র-রচনা করান যার মধ্যে রাজা সবন্ত সিং ও তাঁর প্রেমিকা-কবি বাণী-থানীর প্রেম-কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। কিষণগড়ের চিত্রকলায় তাই বঙ্কিম ভ্রূ-রেখা আর আয়ত চক্ষুর এক অপূর্ব সুষমা ফুটে

সুসজ্জিতা জয়পুর রমণী : ১৮৫০ সালের চিত্র

উঠেছে (৬৫,৬৬,৬৭)। কোটা থেকে সংগৃহীত চিত্রখানি (৬৮) রাজা রাম সিংহের 'সিংহ-শিকার' সেই একই মুঘল শিকার-চিত্রের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাহোক, রাজস্থানী চিত্রের সব চেয়ে ঐশ্বর্যময় অবদান পেয়েছি আমরা মেবার (উদয়পুর), বুন্দি ও মালওয়ার থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে। এই চিত্রগুলির মধ্যে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব প্রায় নেই বল্লেও চলে। কারণ, এই স্থানগুলির উপর দিল্লী-দরবার কোনো কালেই তেমন আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি। বরং মুঘল-সম্রাটদের সঙ্গে বৈরী মনোভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় মেবার এমন এক চিত্রকলা আমাদের উপহার দিয়েছে যার মধ্যে হিন্দী ও সংস্কৃত মহাকাব্যের ভাবধারাই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সব চিত্রের কোনোখানি রূপায়িত হয়েছে পঞ্চতন্ত্রের গল্প অবলম্বনে, কোনোখানি গ্রহণ করেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, আবার কোনখানিতে স্থান পেয়েছে ভারতীয় রাগ-রাগিণী তথা কাব্যের প্রতীকধর্মী বিমূর্ত চেতনার উজ্জ্বল উপকরণ। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ভারতীয় কবির 'আমরু শতক' কেশব দাসের 'রসিক প্রিয়া' সুরদাসের 'সুর-সাগর' আর ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে যে-সব প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলিই ছিল এই অঞ্চলের শিল্পী-মনের প্রেরণার উৎস।

এই সব কাব্যের এক একটি বিষয় বা চিত্রকল্প নিয়ে শিল্পী এমন সব চিত্র-রচনা করেছেন যার মধ্যে ভারতীয় জীবন-দর্শন অনবদ্য কাব্যিক সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চিত্রের পদ্ম, পুষ্পিত বৃক্ষ, পাখী, জীব-জন্তু, রঙ—মানব-প্রকৃতির বিশেষ বক্তব্যকে বিশেষ অর্থে বাঙ্ময় করার জন্য শিল্পী ব্যবহার করেছেন। রাজস্থানী শৈলীর মত এমন ব্যঞ্জনাময় চিত্র-শৈলী ভারতে আজ পর্যন্ত তাই দেখা যায়নি। ডঃ কুমারস্বামীর ভাষায় বলা যায় :

"What chinese art achieved for landscape is here accomplished for human love. The arms of lovers are about each other's necks, eye meets eye, the whispering Sakhis speak of nothing else but the course of Krishna's courtship, the very animals are spell-bound by the sound of Krishna's flute and the elements stand still to hear the ragas and raginis."

প্রদর্শনী কক্ষের ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮ নং চিত্রগুলি দেখার সময় উপরোক্ত কথাগুলিই বারংবার আমার মনে পড়েছে। রাগমালা সিরিজের এই চিত্রগুলি ছাড়াও আরও অনেক চিত্র ছিল যেগুলি দর্শন ক'রেও অনায়াসে বলা যায় :

"Rajput art 'creates a magic world where all man are heroic, all women are beautiful and passionate and shy, beasts both wild and tame are the friends of man, and trees and flowers are conscious of the footsteps of the bridegroom as he passes by"—Dr. Coomarswamy.

আমরা প্রদর্শিত ১২১ খানি চিত্র মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছি। আশা করি অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতেও এইভাবে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের ঐতিহ্যময় প্রদর্শনীর আয়োজন করে আমাদের ক্রমবর্ধমান শিল্প-জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

॥ স্বাগতম ॥

গত ১২ই মার্চ মার্কিন প্রেসিডেণ্টের পত্নী শ্রীমতী জ্যাকুলিন কেনেডি নয় দিনব্যাপী ভারত সফরের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে এসেছেন। ভারত ও আমেরিকার মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে কোটি কোটি আমেরিকাবাসীর অন্তরের শুভেচ্ছা নিয়ে তাঁর এই শুভাগমন। সুশ্রী, শিক্ষিতা ও আধুনিকা "আমেরিকার প্রথম মহিলা নাগরিক"—এই মহিলা নানাগুণে বিভূষিতা। সাংবাদিকতার ডিগ্রিধারী এই মহিলা রিপোর্টার হিসাবে কাজ করবার সময়ে শ্রীযুক্ত কেনেডির সঙ্গে পরিচিতা হন। শ্রীমতী কেনেডি চিত্রশিল্পানুরাগিনী। তিনি 'ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্টসে'র মাননীয়া সদস্যা। সেখানকার গ্যালারিতে তাঁর অংকিত চিত্র রয়েছে। তাছাড়া অশ্বচালনা ও সন্তরণপটিয়সী এই মহিলা ফরাসী ও স্প্যানিস ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।

শ্রীমতী কেনেডির অন্যতম গুণ হল তিনি সুগৃহিণী। বিরাট রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেও তিনি বাসগৃহের মধ্যে এক অরাজনৈতিক আবহাওয়া ও বিশুদ্ধতার সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রী ও জননীর কাজকেই তিনি নারীর প্রধান কর্তব্য মনে করেন। তাঁর ভারত সফর সুখকর, আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময় হোক এই কামনা করি।

ভারত সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপরত মাননীয়া শ্রীমতী কেনেডি।

দেশে বিদেশে
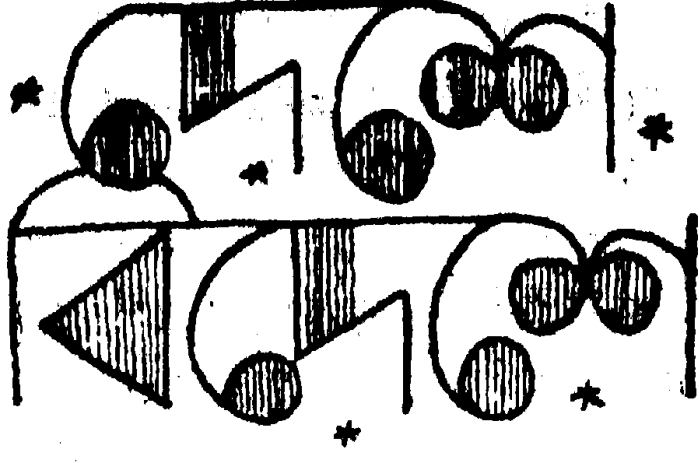
॥ উত্তর বিশ্লেষণ ॥

সারাভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে এবং অভাবিতপূর্ব কোন ঘটনাই তাতে ঘটেনি। কংগ্রেসই সকল রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসন-ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হয়েছে, দুটি অঙ্গরাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান ছাড়া বিরোধী শক্তি কোথাও তাদের ধারে-কাছে আসতে পারেনি। তবুও এ জয় কংগ্রেসকে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন অবকাশ দেয়নি, বিরোধী দলগুলিকে ত একেবারেই না।

সর্বভারতীয় দল হিসাবে এবারে কংগ্রেসের প্রভাব কমেছে। লোকসভার ৪৯৪টি নির্বাচনযোগ্য আসনের মধ্যে ৪৮৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁরা ৩৫৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন এবং প্রদত্ত ভোটের মধ্যে তাঁরা পেয়েছেন ৪,৪৮,৭০,২২৭টি অর্থাৎ ৪৫·২৪ ভাগ মাত্র। '৫৭ সালের নির্বাচনে তাঁরা পেয়েছিলেন প্রদত্ত ভোটের ৪৭·৮ শতাংশ। আসন সংখ্যাও তাঁদের কমেছে ১৮টি।

দ্বিতীয় বৃহত্তম দলরূপে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৩৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁদের জয়ের সংখ্যা ২৯। ভোট পেয়েছেন মোট ১,০৫,৮৬,৬০৩, অর্থাৎ সমগ্র প্রদত্ত ভোটের ১০·৬৭ শতাংশ। গতবার তাঁদের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৮·৯২ শতাংশ, এবং এ হিসাবে সর্বভারতীয় দলরূপে তাঁদের স্থান ছিল তৃতীয়। তবুও নির্বাচনের সামগ্রিক ফলে কমিউনিষ্ট দলের উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু ঘটেনি। পাঁচ বছরের চেষ্টায় সারা ভারতে যদি মাত্র ২টি আসন বেশী পাওয়া যায় তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের জন্য তাদের অন্তত এক শ' বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নির্বাচনে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছেন স্বতন্ত্র দল। সদ্য গঠিত এই রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলটি এইবারই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছেন এবং ভোট পেয়েছেন মোট ৮৪,৪৩,১৩৪টি, অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের ৮·৫০ শতাংশ। উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ স্বতন্ত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁদের আসনসংখ্যা আরও চারটি বেড়েছে এবং বিদর্ভের নেতা শ্রীআনেও স্বতন্ত্র দলে যোগ দেওয়ায় লোকসভায় ঐ দলের সদস্যসংখ্যা এখন ২৩। এ সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। এই দক্ষিণপন্থী দলটির বিশেষ সাফল্য, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছে। কংগ্রেসের সম্মুখে এখন প্রশ্ন, তাঁরা আরও দক্ষিণ-ঘেঁসা হয়ে বড়লোকদের মন যোগাবেন, না আরও বামপন্থী হয়ে জনসমর্থনের উপর নির্ভরশীল হবেন। বর্তমানে শেষোক্ত চিন্তাধারার দিকেই কংগ্রেসের ঝোঁক বেশী, একারণে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের সম্পর্ক হয়ত আরও বেশী নিকট হবে। এইবারেই কমিউনিষ্টরা বোম্বাই ও দিল্লীতে প্রকাশ্যে এবং বহুস্থানে অপ্রকাশ্যে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন, এরপর হয়ত সকল স্থানেই তাঁরা স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করবেন।

নির্বাচনে এবার সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের। গতবারের দ্বিতীয় বৃহত্তম সর্বভারতীয় দল পি-এস-পি এবার জনসমর্থনের বিচারে চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছেন এবং আসনের বিচারে তাঁদের স্থান পঞ্চম। ১৬৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁরা পেয়েছেন মাত্র ১২টি আসন। ভোট পেয়েছেন ৭০,২৯,১৬০, সমগ্র প্রদত্ত ভোটের যা ৭·০৮ শতাংশ, গত নির্বাচনে যে সংখ্যা ছিল ১০·৪১। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের এই বিপর্যয় সহজবোধ্য।

কংগ্রেসের বিরোধী গণতন্ত্রী দলরূপে যে ভূমিকা তার ছিল, তা আজ আর তার নেই। অন্তর্বিরোধ, দুর্বল নেতৃত্ব, সমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি ইত্যাদি কারণগুলি ছাড়াও কংগ্রেসের রাজনীতিক চরিত্র-বদলও তার বিপর্যয়ের অনিবার্য কারণ। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের যে তুলনা হত, ভারতের বর্তমান রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে তা অচল। কারণ কংগ্রেসই বর্তমানে চিন্তাধারায় ও রাজনীতিক কার্যকলাপে ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের অনুরূপ এবং এই কারণেই দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছে স্বতন্ত্র দল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ দক্ষিণপন্থীরাও হয়ত অনতিবিলম্বেই কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্র দলে যোগ দেবেন। এ অবস্থায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভানের অনুগামীদের মত বামপন্থী দলের ভূমিকা গ্রহণ করা মোটেই অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। অবশ্য প্রেষ্টিজ ও কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি এই জাতীয় একটা ঘটনার পথে যে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কংগ্রেসের বর্তমান ভূমিকায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা নেই। তাদের অধিকাংশ নেতাই এখন উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য কর্মীদের স্থানীয় প্রভাবও ক্রমেই কমে আসবে। শুধু তাদেরই নয়, কমিউনিষ্ট দলকেও ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে। শুধু আন্তর্জাতিক আনুগত্যের জন্যেই হয়ত তাদের শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না, যদিও তার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইংলণ্ডে কমিউনিষ্ট দল কয়েকবারই শ্রমিক দলের অভ্যন্তরে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী দল জনসংঘের সাফল্যও এ নির্বাচনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তদের আসন সংখ্যা লোকসভায় ৬ থেকে বেড়ে এবার ১৪ হয়েছে এবং তাঁরা ভোট পেয়েছেন ৬০,৬৬,৬৩৭টি যা প্রদত্ত ভোটের ৬·১১ শতাংশ। ভবিষ্যতে ঘটনা পরম্পরায় স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘের সম্পর্ক অনেক নিকট হবে এবং তাদের ঐক্যের মাধ্যমে একটি সর্বভারতীয় শক্তিশালী দক্ষিণপন্থী দল গড়ে উঠাও অসম্ভব নয়। যদি তা হয় তবে ভারতের রাজনীতি যে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী জটিলতামুক্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ দুই লক্ষ হতাহত ॥

ফ্রান্সের সামরিক দপ্তর থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে—১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত আলজিরিয়ার যুদ্ধে ১,৫৮,২৫০ জন প্রাণ হারিয়েছে। তার মধ্যে আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা ১,৪১,০০০ এবং ফরাসী সৈনিক ও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা ১৭,২৫০। এ ছাড়াও আহত হয়েছে ৫১,৮০০ জন ফরাসী সৈনিক। আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের আহতের সংখ্যা জানা যায়নি, তবে বলা হয়েছে এ পর্যন্ত সাত হাজার আহত আলজিরীয়কে ফরাসী হাসপাতালে শুশ্রূষা করা হয়েছে।

সাত বছরের সংগ্রামে দু' লক্ষেরও বেশী লোক হতাহত হওয়ার পর ফরাসী সরকার বোধহয় জীবনের এই অমের অপচয়ের অর্থহীনতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই এখন একটা মীমাংসায় আসার জন্যে তাঁদের খুবই আগ্রহ। কিন্তু আলজিরিয়া তাতে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। কারণ সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ফ্রান্স একদিন যে অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ তা তার নাগালের বাইরে। 'কলোন' নামে পরিচিত আলজিরিয়ার দশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী আজ আর কোন যুক্তিতেই ফরাসী সরকারের কথা শুনে চলতে রাজী নয়। একারণে ফ্রান্স সম্মত হলেও কলোনরা হয়ত কিছুতেই আলজিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব ঐ দেশের জাতীয়তাবাদীদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হবে না। ফলে এভিয়ান বৈঠকে আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের একটা আপোস হয়ে গেলেও আলজিরিয়ার অশান্তি হয়ত অব্যাহতই থাকবে। কলোনদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও-এ-এস বর্তমানে যেভাবে আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে এমন কি খোদ ফ্রান্সে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে মনে হয় না যে, ফরাসী সরকারের বর্তমান আপোসমুখী মনোভাব তাদের উপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। সুতরাং ফ্রান্স আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হ'লেই আলজিরিয়ায় শান্তি এসে যাবে একথা ভাবা বোধহয় ঠিক হবে না। কলোনদের দমনের আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই ফরাসী সরকারকে আলজিরিয়া সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রসর হতে হবে।

॥ মধ্য আফ্রিকায় সঙ্কট ॥

মধ্য আফ্রিকার বর্তমান সঙ্কটের সঙ্গে আলজিরিয়া সমস্যার অতি নিকট সম্পর্ক। উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃ-রাষ্ট্রকে আজ উপনিবেশীদের অন্যায় জেদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর যে-কোন ক্ষেত্রে মাতৃ-রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নতি-স্বীকারের অর্থ হবে অপরক্ষেত্রে উপনিবেশীদের অন্যায় জেদের কাছে হার মানা।

উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যান্ড এই নিয়ে ১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট বৃটিশ সরকার গঠন করেন মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন। এই যুক্তরাষ্ট্রটির আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৩ লক্ষ। এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ ও এশীয় উপনিবেশীর সংখ্যা আধ লক্ষ। বাকি সত্তর লক্ষ আফ্রিকার আদিবাসী। কিন্তু মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের শাসনব্যবস্থায় এই সত্তর লক্ষ মানুষের কোন স্থান নেই। মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নেরই অপর সংস্করণ। এ কারণে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা কোনদিনই এই ফেডারেশনের গঠন বা শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেনি এবং ফেডারেশনের অপর রাজ্য নিয়াসাল্যান্ড প্রথম থেকেই ফেডারেশন ত্যাগের দাবী জানিয়েছে। অন্য দুটি অঙ্গরাজ্যেও কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার দাবী প্রবল আকার ধারণ করে। বৃটিশ সরকারের কাছে সমগ্র মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশনের কৃষ্ণাঙ্গরা দাবী জানায়, হয় তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে নয়ত ফেডারেশন ভেঙে দিতে হবে। বৃটিশ সরকার বর্তমানে সেই দাবীতেই সাড়া দিয়া মধ্য আফ্রিকার শাসনতন্ত্রে কিছুটা অদল-বদলে অগ্রণী হয়েছেন। ফলে ঐ উপনিবেশটির শ্বেতাঙ্গ শাসকরা আলজিরিয়ার কলোনদের মত এখন মাতৃ-রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করেই মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের সমগ্র শাসনক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করতে উদ্যত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের শ্বেতাঙ্গ শাসকদের এই চক্রান্ত যদি বৃটিশ সরকারের কাছে কোন বাধা না পায়, তবে হয়ত অবিলম্বে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের প্রবল সংঘর্ষ দেখা দেবে। বৃটিশ সরকারের বর্তমান মনোভাব দেখে মনে হয়, মধ্য আফ্রিকার বর্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা স্যার রয় উইলেনস্কিকে খুব বেশী অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছা তাঁদের নেই। এ অবস্থায় মধ্য আফ্রিকাতেও যদি আলজিরিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

॥ সংশোধন ॥

জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার যে হিসাব গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তার শিরোনামায় অঙ্কের পরিমাণ ৩৯০০০ না হয়ে হবে ১৪,০০০।

ঘটনা-প্রবাহ
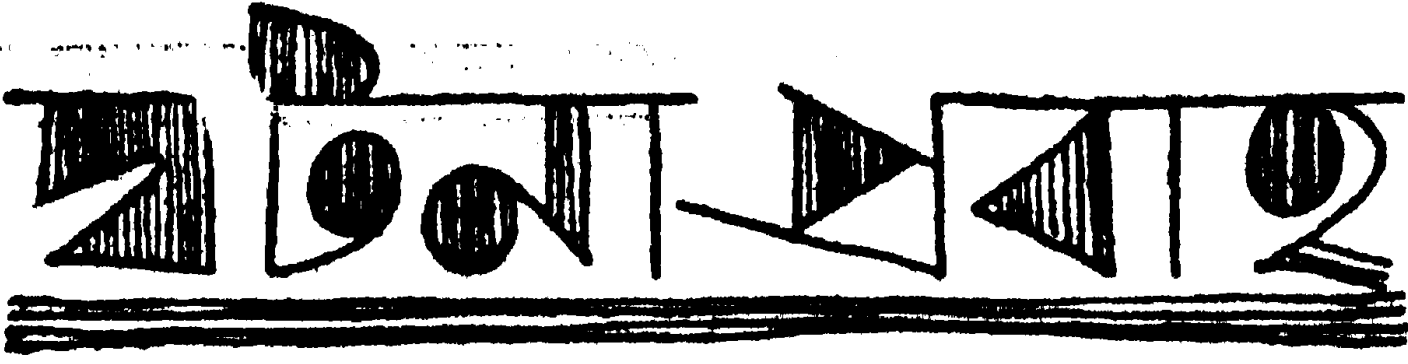
॥ ঘরে ॥

৮ই মার্চ—২৪শে ফাল্গুন : 'এক বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ৮৪০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে'—কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার নবম বার্ষিক রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ।

৯ই মার্চ—২৫শে ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দল কর্তৃক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী) সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় দলের নেতা নির্বাচিত।

শালতোড়া ও চৌরঙ্গী—দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়যুক্ত ডাঃ রায়ের শালতোড়া (বাঁকুড়া) কেন্দ্রের আসন হইতে পদত্যাগ।

১০ই মার্চ—২৬শে ফাল্গুন : মুখ্যমন্ত্রী সহ ১৬ জন সদস্য (পূর্ণমন্ত্রী) লইয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা। মন্ত্রিসভাভুক্ত সদস্যবৃন্দ—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীঈশ্বরদাস জালান, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, রায় হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীজগন্নাথ কোলে, শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য, শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীফজলুর রহমান, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, ডাঃ জীবনরতন ধর ও শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

অন্ধ্র প্রদেশের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডীর কংগ্রেস সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ।

'বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা অবাস্তব অথবা দোষের হয় নাই'—ময়দানের জনসভায় শ্রীজ্যোতি বসু (কম্যুনিস্ট) প্রমুখ সংযুক্ত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ।

১১ই মার্চ—২৭শে ফাল্গুন : রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার (ডাঃ রায়ের নেতৃত্বাধীন) সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

শ্রীজ্যোতি বসু পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কম্যুনিস্ট দলের নেতা নির্বাচিত।

১২ই মার্চ—২৮শে ফাল্গুন : তৃতীয় অর্থ কমিশনের (শ্রী এ কে চন্দের নেতৃত্বে গঠিত) সুপারিশসমূহ (সরকার অনুমোদিত) লোকসভায় পেশ—প্রত্যেক রাজ্যেরই অধিকতর আর্থিক সুবিধা লাভের ব্যবস্থা।

শ্রীকেশব বসু (কংগ্রেস) ভোটাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ নূতন বিধানসভার স্পীকার নির্বাচিত—ডেপুটি স্পীকার শ্রীআশুতোষ মল্লিক।

মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী জ্যাকেলিন কেনেডির দিল্লী উপস্থিতি—নয়দিবসব্যাপী ভারতসফর সুরু।

১৩ই মার্চ—২৯শে ফাল্গুন : ১৯৬২-৬৩ সালের রেলওয়ে বাজেটে (ভারত) ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত—লোকসভায় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বাজেট পেশ।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার ১১ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১০ জন উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণও সম্পন্ন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের আশা—বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ভাষণ।

১৪ই মার্চ—৩০শে ফাল্গুন : ভারতের ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে (অন্তর্বর্তী) ৬৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি—অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক লোকসভায় বাজেট পেশ।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে (১৯৬২-৬৩) ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি—নূতন বিধানসভায় ডাঃ রায় (মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী) কর্তৃক বাজেট উপস্থাপিত।

লোকসভায় গোয়া, দমন ও দিউ'র ভারতভুক্তি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত।

'তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে'—লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

৮ই মার্চ—২৪শে ফাল্গুন : এশিয়ার জন্য একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের দাবী—রাষ্ট্রসংঘের এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠকে রাশিয়ার প্রস্তাব।

৯ই মার্চ—২৫শে ফাল্গুন : রোডেশিয়া ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী স্যার ওয়েলেনস্কী কর্তৃক রোডেশিয়া পার্লামেন্ট বাতিল।

১০ই মার্চ—২৬শে ফাল্গুন : ব্রহ্মের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনের হস্তে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতা অর্পণ।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে সত্বর আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুষ্ঠানের জন্য জাপ প্রধানমন্ত্রী হেরোতো ইকেডার আবেদন—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের নিকট জরুরী লিপি।

১১ই মার্চ—২৭শে ফাল্গুন : 'বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের ফলে অর্থনৈতিক অরাজকতা দেখা দিবার কারণ নাই,—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ নিযুক্ত দশ জাতি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট।

১২ই মার্চ—২৮শে ফাল্গুন : জেনেভায় মঃ গ্রোমিকোর (রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের (লর্ড হোম ও ডীন রাস্ক) বৈঠক—নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক পরীক্ষা, বার্লিন প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা।

'পশ্চিমীরা রাজী থাকিলে রাশিয়াও অন্য দেশকে আণবিক অস্ত্র সরবরাহ না করিতে প্রস্তুত'—সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর উক্তি।

জেঃ নে উইন কর্তৃক ব্রহ্মের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ।

১৩ই মার্চ—২৯শে ফাল্গুন : আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহের একান্ত ভাব—যুব সমাজের অসন্তোষ চরম পর্যায়ে উপনীত (বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ)।

১৪ই মার্চ—৩০শে ফাল্গুন : জেনেভায় বহু প্রতীক্ষিত সপ্তদশ রাষ্ট্র (ভারত সমেত) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

'পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের জন্য কার্যকরী চুক্তি অনুষ্ঠান প্রয়োজন'—ওয়াশিংটনে সাংবাদিক বৈঠকে কেনেডির (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট) বিবৃতি—সফল মিলিলে শীর্ষ সম্মেলনে যাইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
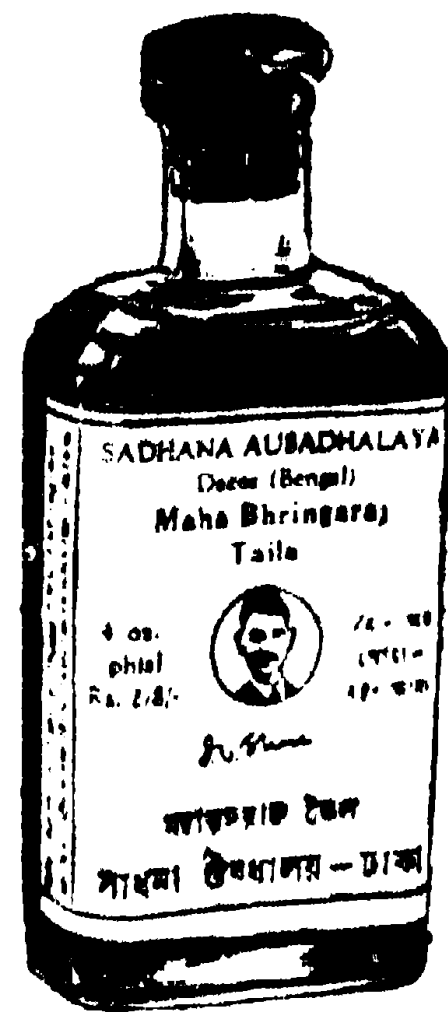
॥ ঘরের মানুষ টলস্টয় ॥

টলস্টয় তনয় সারজী টলস্টয় লিখিত পিতৃস্মৃতি Tolstoy Remembered by his Son, নামে ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মোরা বাডবার্গ এবং প্রকাশ করেছেন লন্ডনের ওয়াইডেন ফেলড্ এ্যান্ড নিকলসন কোম্পানী। এই গ্রন্থটির মূল্যে পঁচিশ শিলিং।

টলস্টয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সারজী টলস্টয় লিখিত এই স্মৃতিচিত্রণ টলস্টয় প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক মূল্যবান সংযোজন, জীবনেতিহাসের কাঠামোর ওপর এই সব মালমশলা একটা রক্তমাংসের মূর্তিগঠনে সহায়ক হবে।

টলস্টয়ের হিমালয়সদৃশ একগুঁয়েমি সংক্রান্ত যে ধারণা এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সারজী টলস্টয়ের এই স্মৃতিকথা তা মুছে দিতে পারবে না, তবে স্নেহময় পিতা হিসাবে তিনি তেমন কঠোর বা দুরধিগম্য ব্যক্তি ছিলেন না। টলস্টয়ের পুত্র টলস্টয়কে ভীতিমিশ্রিত ভালোবাসার চোখে দেখেছেন।

এই স্মৃতিচিত্র ইয়াসনায়া পলিয়ানা তালুকে কি পরিবেশের মধ্যে টলস্টয় দিনাতিপাত করেছেন তার এক নিখুঁত চিত্র রচনায় সহায়তা করবে। সেই পল্লী-অঞ্চলে বিচিত্র ভ্রাম্যমান মানুষের মিছিল, সেই সঙ্গে আছে সফরবিলাসী ভাল্লুকের ভীড়, আর আছে নানা রঙের ছিট-কাপড়ের ফেরিওয়ালা, জুতো বিক্রীওলা।

গোড়ায় গোড়ায় ইয়াসনায়া পলিয়ানায় আনন্দময় আবহাওয়ার আমেজ ছিল, কাজের সঙ্গে মিশিয়ে ছিল আনন্দ। বীজের মরশুমে টলস্টয় লিখেছেন "War and Peace", তখনও পর্যন্ত অধ্যাত্ম আবেগ তাঁকে দংশন করেনি। তিনি লিখছেন এই মহৎ উপন্যাস আর স্ত্রী সোফিয়া হাসিমুখে বারবার সেই উপন্যাসের পান্ডুলিপি কপি করে যাচ্ছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই উপন্যাস লেখা সুরু হয় টলস্টয় তার বিষয় বলেছিলেন—"অতীব অনুকূল পরিবেশ ও পাঁচ বছরের বিরামবিহীন পরিশ্রমের ফল।" তিনি নিজে এই উপন্যাসকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর সমালোচকরা বলেছেন :
"St. Peter at Rome is a trifle compared with Tolstoy's 'War and Peace'" — (আরনলড্ বেনেট)।

সামরার কাছাকাছি আর একটি তালুকের দিনগুলিও আনন্দময় ছিল। সেখানে স্তেপি অঞ্চলের উর্বর কালো-রঙের মাটি নানা জাতীয় গম, ওষধিলতা, যব প্রভৃতি প্রচুর ফলত আর মাথার উপর উড়ে বেড়াত বিরাট বাজ-পাখি আর ঈগলের ঝাঁক, বাতাসে প্রতি-ধ্বনিত হত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান।

এই অঞ্চলে শিকার করার সময় টলস্টয় যে আনন্দ এবং উদ্দাম উত্তেজনার স্পর্শ লাভ করেন তাতে তাঁর হৃদয় মন ভরপুর হয়ে ওঠে, তখনও তাঁর মানসিক প্রশান্তির জগতে বিকৃত সংশয় এবং উদ্বেগ এসে আবিলতা সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতি তার সব কটি মূর্তি নিয়েই টলস্টয়ের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তাঁর জীবনে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাঁর শিকারের অভিযানগুলি নিরর্থক হয়ে উঠত যদি তাঁর পিছনে পল্লীপ্রকৃতির এই শান্ত শ্যামলিমার প্রশান্ত প্রলেপ না থাকত। সারজী লিখেছেন :

"The solitary aspect of it appealed to him; he loved to feel himself a part of the countryside, loved the exhilaration of hunting that makes the sportman forget the petty trifles of life."

পল্লীদৃশ্যে টলস্টয়ের গভীর অনুরাগের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াসনায়া পলিয়ানা এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চল নিকলস্কয় টলস্টয়ের অন্তরকে সুধায় ভরিয়ে দিয়েছে। নিকলস্কয় গভীর খাদ এবং ঘন জঙ্গলের জন্য পরিচিত। এইখানের একটি 'ওয়াটার-মিল' (জলযন্ত্র) টলস্টয় তাঁর "Resurrection" উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন।

এই বিস্ময়কর চরিত্রের মানুষটির ব্যক্তিত্ব ঘর-সংসারের ব্যাপারে মাঝে মাঝে উৎপীড়িত হয়ে উঠত, ঘরের মানুষও তাঁকে নিয়ে বিব্রত হত, 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব' জাতীয় মনোভংগী ; যখন টলস্টয়কে আচ্ছন্ন করত তখন ঘরের মানুষ যেন তাঁর চোখ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হত। বাড়ির মানুষ তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর গায়ের গন্ধ, তাঁর তামাকের গন্ধ সব কিছুই তাদের কাছে মধুর মনে হত, তবু টলস্টয়ের পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসায় কোনো বহিরংগ প্রকাশ ছিল না। কাউকে চুমু খাওয়া বা আদর করা টলস্টয়ের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। সাধারণ নিরিখে তাঁকে স্নেহময় বলা যায় না।

সারজী টলস্টয় এই বিষয়ে লিখেছেন :

"We not only loved him, he occupied a great place in our lives, but we felt that he obliterated our personalities, so that some times we wanted to escape—He was not affectionate in the usual sense of the word; there was no kissing no presents, but we always felt he loved us and knew when he was satisfied with our behaviour. We liked Father's smell, the smell of his flannel blouse, healthy sweet and tobacco."

টলস্টয়ের তথাকথিত 'দীক্ষা'র (Conversion) কালের অনেক বছর আগে থেকেই স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে নৈতিক ও অধ্যাত্ম-জীবনের একটা সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। Anna Karenina রচনায় অনেক আগেই তাঁর বিশ্লেষণী হাতিয়ার তৈরী হয়ে ছিল, তার ফলে অনেক সময় তাঁর কর্মের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠত।

টলস্টয়ের জীবনের প্রথম দিককার রচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছাপ সুস্পষ্ট, নীতিবিদ নায়ক সর্বদাই টলস্টয়ের আপন আদর্শে গঠিত। Anna Karenina-র এই বিষয়ে আর এতটুকু সংশয় থাকে না। টলস্টয়ের পুত্রও সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেন যে 'লেভিনে'র চরিত্রটি, জীবন সম্পর্কে তার মনোভংগী, টলস্টয়ের নিজের ব্যক্তিজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোড়নেরই প্রতিচ্ছবি। অপর পক্ষে "War and Peace"-এ প্রিন্স এনড্রু এবং পীয়ার চরিত্রে টলস্টয়ের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়

পাওয়া যায়। পীয়্যের এবং লেভিন এই দুইটি চরিত্র একই জীবনের পুনরাবৃত্তি।

টলস্টয়ের ধর্মীয় সংশয় এবং ধারণা যে তাঁর সাহিত্যকর্মকে অনেকভাবে ব্যাহত করেছে সে কথা তুর্গেনিভ বলেছেন এবং তাঁর মন্তব্য যথাযথ। টলস্টয়ের বর্ণনা যখন বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত তখন সহসা তার সেই গতিপথে বাঁধ বেঁধে দেওয়ার মত দুর্পনেয় দার্শনিক মন্তব্য এসে জুড়ে বসেছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টলস্টয় সর্বপ্রথম অনুভব করতে সুরু করলেন যে, তিনি বিলাস এবং স্বার্থপরের জীবনযাপন করছেন। আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা তাঁর মনে একটা ভার হয়ে উঠল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই চিন্তা তাঁর সাহিত্যকর্মে এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটা অপরাধবোধ তাঁর মনকে আকুল করে তুলল। জীবনের একটা আধ্যাত্মিক বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করতে গিয়ে নদীর গতি স্তব্ধ হল। সার্জি এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"that initial pang of despair and disgust with unjust and fishly life."

গোঁড়া চার্চের মতবাদের মধ্যে টলস্টয় যে পথ খুঁজছিলেন তা না পেলেও সেন্ট-ম্যাথুর বাণী—"That ye resist not evil"--এর মধ্যে আপন মনোভংগীর প্রতিধ্বনি পেয়েছিলেন।

যে সব সামান্য সুখ ও সুবিধা তিনি এতকাল ভোগ করেছেন, এখন তিনি তা ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে সুরু করলেন। সার্জি লিখেছেন—"After the 'Crisis' father saw in the denial of everything he had previously loved and believed in the criterion of the rightness of his new opinions."

এই সময় টলস্টয়ের মনে একটা ধর্মীয় 'ম্যানিয়া' জেগে উঠেছিল, এবং ওই বিকার সম্পর্কেও টলস্টয়ের মনে সংশয় জেগেছে। কাউন্টেস টলস্টয় এই দ্বন্দ্বের এক নীরব দর্শক ছিলেন, অসহায় এবং সম্পূর্ণ অক্ষম। টলস্টয়ের স্ত্রী সোফিয়াকে এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। গোর্কীর গ্রন্থের চাইতেও সার্জীর Tolstoy Remembered তাই একখানি উল্লেখনীয় গ্রন্থ।

লেডী সিনথিয়া এ্যাসকুইথের Married to Tolstoy—নামক কিছুকাল আগে প্রকাশিত গ্রন্থটির সংগে সার্জীর পিতৃস্মৃতি পাঠ করলে টলস্টয় এবং ঘরের মানুষ টলস্টয় সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা গড়ে উঠবে টলস্টয় গবেষকদের মনে।

নতুন বই

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)—অমল হোম। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

যাঁরা রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্রজীবন ব্যাখ্যার দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অমল হোম তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত। দীর্ঘদিন রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করার ফলে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তি ও স্রষ্টা হিসাবে তিনি চিনেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

বহু রচনার প্রেক্ষিত ও প্রেরণা সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য তাঁর জানবার সৌভাগ্য হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রজীবন পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে 'জীবন-শিল্পী' নাম দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনকেই শিল্পীর একাগ্র মমতায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—ঐ নামকরণ থেকে তা প্রতিভাত হয়। সেই হিসাবে এই 'পুরুষোত্তম' নামটিও সার্থক। সুন্দরের ধ্যানব্রতী কবি বিচিত্রলীলায় কাব্যের নর্মবাঁশিতে যেমন সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তেমনি স্বদেশের অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে দেশ ও দশের সম্মানে অন্যায় ও অসত্যের অবিচল প্রতিবাদে মুখর হতেও দ্বিধা করেননি। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই এক রৌদ্রস্নাত চেতনার জাগরণ, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ আকাশ-চ্যুত আলোকের নির্ঝর।

গ্রন্থটি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সমাজসচেতন ছিলেন না, কয়েক বছর পূর্বে এরকম একটা অভিযোগের ঝড় বয়েছিল। প্রথম ভাগে গ্রন্থকার সেই অভিযোগ খণ্ডনকল্পে বিভিন্ন ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্র-মননের একটি যোগ্য প্রতিলিপি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। চিত্রা কাব্যের 'প্রেমের অভিষেকে'র আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন একটি দীন কেরানীও রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শ পেয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ পর্বও রবীন্দ্রনাথের সেই নির্ভীক মানসের পরিচয়ই বহন করে—অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যা নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছে। সম্প্রতি অবশ্য এ অভিযোগ আর ওঠে না। রবীন্দ্র-মানস সম্বন্ধে বহু বিনীত শ্রদ্ধাশীল সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পড়লেই সে কথা বোঝা যায়। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে লেখক তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অংশটি নতুন সংযোজিত হয়েছে।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়ায় যেমন রবীন্দ্র-পরিচিতি প্রসংগে বহু হাস্যকর ও ভ্রান্ত মন্তব্য করা হয়েছে, তেমনি স্বদেশেও বর্তমানে একদল সাম্প্রতিক সমালোচকের হাতে কবিকে এখনো নিগৃহীত হতে হচ্ছে। উপন্যাস ও কবিতার ক্ষেত্রে টলস্টয়, টমাস মান, এবং র‍্যাঁবো ও বোদলেয়র-এর সংগে তাঁর প্রতিতুলনা করে রবীন্দ্রনাথকে খাটো করার এই প্রচেষ্টাকে গ্রন্থকার নিন্দা করেছেন। সম্প্রতিকার এই ভ্রান্ত মূল্যায়নের বিরুদ্ধে গ্রন্থকার বহু তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন তার জন্য যথেষ্ট সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। তবে এই প্রসংগে তিনি বহু বিদেশী কবি, যেমন র‍্যাঁবো, রিলকে ও ইয়েটস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে মনোভঙ্গি অবলম্বন করেছেন তাতে ঐ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ের অভাব চোখে পড়েছে—এ কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। র‍্যাঁবো, রিলকে বা ইয়েটস—এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো বহু অসঙ্গতি আছে, তবে যুগের যে যন্ত্রণা ও জটিলতার মধ্যে তাঁদের জীবন কেটেছে, জীবন-মন্থিত সেই হলাহল পান করে তাঁদের কাব্যও যে নীলকণ্ঠ—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সর্বোপরি যে কোনো কবিরই ব্যক্তিগত জীবন যাই হোক না কেন কাব্য সর্বসময়েই Transcendental। কবিদের সমগ্র অস্তিত্বের যন্ত্রণা-বোধের কাব্যও যে তাই—একথা অস্বীকার করা যায় না।

তবু এই গ্রন্থ পাঠ করলে মনের মধ্যে বহু আলোচনা ওঠে এজন্যই এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ ও

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে যে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে তাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণই এর জনপ্রিয়তা সূচিত করে।

The Ritual Art of the Bratas of Bengal by Sudhansu Kumar Ray **প্রকাশক : ফার্মা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়। ৬-১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। দাম : ১৬৲ টাকা।**

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালার ব্রতকথা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি যে অনুসন্ধান ও আলোচনা শুরু করেন, তাঁদের কাজের ওপর ভিত্তি করে লেখক সেই পথে অগ্রসর হয়েছেন। ব্রত কি, ব্রতের অর্থ কি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ব্রতের আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলির তাৎপর্য নিয়ে নানাদিক থেকে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যে লেখক প্রাচীন ভারত, মিশর, সুমের প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বাংলার ব্রত বিচার করে দেখিয়েছেন। বাংলার ব্রতের আলপনার সংগে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা ও প্রাচীন মিশরের আলপনার সাদৃশ্য থেকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বাংলার পট ও মৃৎ-শিল্পের অনেকগুলি একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি এবং নক্সা সংযোজিত করে বইটির মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলার লোক-শিল্প ও লোক-সংস্কৃতির অনুরাগীদের কাছে বইটি প্রয়োজনীয় হবে।

আলিম্পন—(লোকশিল্প) প্রতিভা-বালা বর্ধন : লেখিকা কর্তৃক ৬৬বি আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫ থেকে প্রকাশিত : দাম দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটা বিশিষ্ট প্রকাশ আলপনা। আমাদের দেশজ লোকাচার ও ধর্মাচার থেকেই এর উৎপত্তি। মেয়েদের সংগেই এর বিশেষ সম্পর্ক। আলপনা অংকন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার হলেও এর মনোরম একটা শিল্পগত দিক রয়েছে। এই শিল্পগত রূপের জন্যই লোকাচার-ধর্মাচারকে ছাড়িয়ে আমাদের কাছে আলপনার আজ বিশেষ মূল্য রয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক শুধু অলংকরণ মূল্যের উপর গুরুত্ব দিলে আলপনার মর্যাদা আবার ক্ষুন্ন করা হয়। লেখিকা ত্রিপুরা জেলার বাসিন্দা। আলোচ্য বইতে তিনি বিভিন্ন পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত তেত্রিটি আলপনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা দেখে আনন্দিত হলাম যে এগুলি তিনি সম্পূর্ণ পরম্পরাগত রীতিতে এঁকেছেন। আধুনিকতার মোহবিকৃতির ছোঁয়াচ এতে লাগেনি। বাংলার মা-বোনেরা এই আসল নক্সাগুলি থেকে বিশেষ উপকৃত হবেন। শহর-বাসীর পক্ষে গৃহসজ্জার জন্যও এই নিখুঁত আলপনাগুলি অনুধাবনযোগ্য। আমরা আশা করবো লেখিকা ভবিষ্যতে আমাদের লোকাচারের সংগে যুক্ত যাবতীয় আলপনার একটা পূর্ণাংগ সংকলন প্রকাশ করবেন। তা না হলে আমাদের লোকশিল্পের একটা বিশিষ্ট দিক বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হবে। বইটির অংগসৌষ্ঠব মনোরম।

মহাবিশ্বের রহস্য—বি, ভি, লিয়া-পুনভ। অনুবাদ : প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম—৩৲ টাকা।

বিশ্বরহস্য এবং মহাশূন্যে ভ্রমণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই বইটিতে করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিওলকভস্কির মহাশূন্যে যাত্রার স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে বইটি লেখা। আজ পর্যন্ত এবিষয়ে মানুষ কতদূর অগ্রসর এবং অদূর ভবিষ্যতে কতদূর এগোতে পারবে সেই সম্ভাবনারই আলোচনা করা হয়েছে। সৌর-জগতে চলাফেরা করতে হলে কতরকম সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন তার বিশদ এবং মনোগ্রাহী আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক। এজন্যে যেমন আকাশ-যানের নির্মাণ-পদ্ধতি, শক্তি-রহস্য, ধাতুতত্ত্ব, ভূপদার্থবিদ্যা, প্রাণী-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করার প্রয়োজন হয়েছে তেমনি সেগুলি সর্বজনগ্রাহ্য করে বোঝানো হয়েছে। এইসব দুরূহ বিষয়গুলির অনুবাদ সুন্দর এবং সাবলীল। কোন-খানে কোন আড়ষ্টতা নেই। এজন্যে অনুবাদক ধন্যবাদের পাত্র। ছাপা বাঁধাই সুরুচিসম্মত। কেবল ভূমিকাকারের এইচ, জি, ওয়েলস প্রভৃতি লেখকদের সম্বন্ধে বক্তব্যের সংগে সকলে একমত নাও হতে পারেন।

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি (কবিতা)—তুষার চট্টোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১দি, রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা—২৬। পরিবেশক, সিগনেট বুক শপ। দাম দু-টাকা।

পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে তুষার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। বলিষ্ঠ জীবন-চেতনা আর সহজ সুরের অধিকারী এই কবি আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। জীবন-সম্পর্কীয় চেতনার ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁর কাব্যভাবনায় সুস্থ কবিমনের পরিচয় দিয়েছে।

বক্তব্যের ঋজুতা তুষারবাবুর কাব্য-ভাবনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সহজ-ভাবে সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্যকে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম। 'কম কথা বলে তিনি আলো জ্বালাতে জানেন।' অন্তরের সুতীব্র আবেগে যখন চিত্ত-যন্ত্রণা জটিলাবর্তে ঘূর্ণায়মান তখন তিনি সেই অ-স্বাভাবিক ভাবকে সংযত ও পরিশুদ্ধ বাক্‌ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

ছন্দের কবিতার সংগে কয়েকটি গদ্যকবিতাও এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। গদ্যকবিতার সহজ স্বাভাবিক রূপটা পরিস্ফুট। এই বিশেষ ধরনের কবিতা-রচনায় যে দুর্বলতার ছাপ রয়েছে তাকে খুব গভীর বলা না গেলেও ঐ দোষটি কাটিয়ে ওঠা উচিত। তুষারবাবু ক্ষমতাবান কবি। সুতরাং চেষ্টা করলে এ ত্রুটি তিনি দূর করতে পারবেন।

তুষারবাবুর কবিতায় সব থেকে বড় গুণ চিত্রকল্প। ঘরোয়া ছবিগুলি সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাঁর কাব্যগঠনে। এবং সেজন্য তাঁর কবিতা-গুলি যথেষ্ট আন্তরিক হ'য়ে ওঠে।

বইটির প্রচ্ছদ ও বাঁধাই অতি চমৎকার।

অনন্যা— (কবিতা সংকলন)। সন্তরায় প্রকাশনী, ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'ভগ্নদূত সাহিত্যিক গোষ্ঠী' কর্তৃক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তরুণ কবিদের কবিতার সংকলন। প্রায় শতাধিক কবিতা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে।

এই বৃহদায়তনের সংকলনটি হাতে নিয়ে কাব্যরসিক মাত্রেই হতাশ হবেন। এর মধ্যে 'ভাল' কবিতার সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশই অগভীর ভাব এবং নিতান্তই অর্থহীন শব্দময়তায় পূর্ণ। ছন্দের দিক থেকে বেশীর ভাগই দুর্বল। কবিতা লেখা সহজ কিন্তু ভাল কবিতা লেখা কঠিন—একথা আজকের তরুণ কবিদের স্মরণ রাখতে হবে। আরও স্মরণ রাখতে হবে যে ভাল কবিতা লিখতে হলে সুগঠিত মন সুগভীর জীবনদর্শন আর বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা-শক্তি প্রয়োজন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

শান্তিঃ চিত্র শোভনার নিবেদন; ১১,৭৬২ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনীঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র; আরূপণীঃ শাকুচ; পরিচালনাঃ দয়াভাই; সংগীত পরিচালনাঃ ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ; রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধানঃ অনাদি দস্তিদার ও মায়া সেন; গীত রচনাঃ শ্যামল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণঃ সুধীশ ঘটক; শব্দধারণঃ মৃণাল গুহঠাকুরতা ও সুজিত সরকার; সংগীত-গ্রহণঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনাঃ রবি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনাঃ সুকুমার সেনগুপ্ত; রূপায়নঃ সন্ধ্যা রায়, মালবিকা গুপ্তা, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, রেবা, আশা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য ইত্যাদি। সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৬ই মার্চ থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে আদর্শ ভেঙে যায় বারে বারে। আমাদের দেশের বিচিত্র অর্থনৈতিক কাঠামো চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত ভুবন মুখুজ্জ্যেকে অর্থের দায়ে নৈতিক পদস্খলনে বাধ্য করে। গ্রামে চিকিৎসার অভাবে লোক মারা যায়। কিন্তু গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতে গেলে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে না পেরে চিকিৎসকের প্রাণ যায়। আজকের সমাজ-জীবনে মানুষের মূল্য নিরূপিত হয় তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের মাপকাঠিতে; তাই গুণী ছেলের জীবন থেকে শহুরে বিদুষী দয়িতা স'রে যায় সভয়ে, যখন সে শোনে, তার প্রেমাস্পদের জীবনাদর্শে চৌদ্দতলা বাড়ী ও গোল্ডেন ক্যাডিলাকের স্বপ্নভরা ধনোপার্জনের কোনো স্থান নেই। তাই পাওনাদার হরিধন কুণ্ডুর হাত থেকে পৈতৃক ভদ্রাসনটিকে বাঁচাবার কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে সোনার ছেলে ভুবন ডাক্তারকে বিষের জ্বালায় সকল জ্বালা জুড়োবার পথ খুঁজতে হয় এবং নিজেরই চিকিৎসাধীন রোগিনীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হচ্ছে

দয়াভাই পরিচালিত সদ্যমুক্ত 'শান্তি' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

দেখেও নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকতে হয় ভদ্রাসন বাঁচাবার টাকা ঘুষের পথে এসে পৌঁছোনোর ফলে। এই হত্যাকার্যে পরোক্ষ সহায়তা করার দরুণ ভুবন ডাক্তার জেলে যায় সাত বছরের জন্যে।

জেল ফেরত ভুবন যখন সাত বছর পরে তার পোড়ো ভিটেতে ফিরে এল, তখন হয়েছে ছবির কাহিনী শুরু। গ্রামের লোক ছি-ছি ক'রে উঠল—খুনেটা কোন্ মুখে আবার গাঁয়ে বাস করতে এসেছে? মৃতা রোগিনীর প্রেমাস্পদ, ভুবনেরই বন্ধু লতিফ জ্বলে উঠল তাকে দেখে; নুরুকে মেরে আশ মেটেনি, ভুবন আরও খুন করতে চায় চিকিৎসার নাম ক'রে? পিতৃব্যতুল্য নন্দ ডাক্তারও এসে বলে—গ্রামে থাকা হবে না, ছি-ছি। খালি প্রতিবেশিনী সদু মাসীমা, আর কোলে পিঠে-মানুষ করা ভোলা দা' তার দিকে; তারা বলে—নিজের ভিটেতে সে থাকবে বৈকি; আর শুধু থাকবে কি, ডাক্তারীও করবে। আর সদু মাসীর মেয়ে নিমি বলে—ভুবনদা' কোনো অন্যায়ই করতে পারে না কখনও।

ভুবন ডাক্তার জেল থেকে ফিরে এসেছে নিজের পোড়ো ভিটেয় আবার ডাক্তারী করবার পণ নিয়ে; কিন্তু কেউ তাকে ডাকে না, কোনো রোগীই তার ছায়া মাড়ায় না। কারুর কঠিন রোগ হয়েছে শুনে ছুটে গেলেও বাধা পেয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়—দূর দূর ক'রে লোকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তবু সে গ্রামে থাকে; আবার গ্রামেই চিকিৎসা ক'রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার দুশ্চর

সাধনা তাকে পেয়ে বসেছে। নুরুর কবর তাকে বলেছে, সাত বছরের কারাবাসেই তার শাস্তির শেষ হয়নি; আপন-পর সকলের লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেও যেদিন সে নিজেকে ন্যায়নিষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেইদিন হবে তার কর্তব্যচ্যুতির অপরাধের শাস্তির সমাপ্তি। কিন্তু আমাদের মনে জাগে আরও প্রশ্ন। ভুবন ডাক্তারের এই যে শাস্তি, এই শাস্তি কি তার প্রাপ্য ছিল? আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক কাঠামোর কি এ-ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই? কবে সেদিন আসবে, যখন ভুবন ডাক্তারের মত যুবক গ্রামে চিকিৎসা করতে গিয়ে জীবনের উপযুক্ত রসদ থেকে বঞ্চিত হবে না? কবে মানুষ তার সদ্‌গুণ এবং অর্জিত বিদ্যার সম্যক অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে মানুষের সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে, বিচিত্র অর্থনীতির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবে না?

নরেন্দ্র মিত্র রচিত "ভুবন ডাক্তার" কাহিনীটির আরূপণী অর্থাৎ চিত্ররূপা-রোপ করেছেন "শাকুচ" ছদ্মনামে কুশলী গোষ্ঠী। যে-ভাবে জেল ফেরত ভুবন ডাক্তারকে দিয়ে ছবির আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে-ভাবে তার অতীত কাহিনীকে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে বিবৃত ক'রে আবার বর্তমানে ফিরে আসা হয়েছে, তাতে এই কুশলীগোষ্ঠী যথেষ্ট মনন-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কয়েকটি জায়গায় ছবিটির মধ্যে কিছু ভারসাম্যের অভাব বোধ হয়েছে। নিমির সঙ্গে ভুবনের বিবাহের কথা, নিমির বিষপান, ভুবনের নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা, নুরুর কাকা জনাই খাঁর কাছ থেকে ঘুষের টাকা নেবার সময়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়কে যেমন আরও বিস্তারিত করবার সুযোগ ছিল, তেমনই বিদুষী প্রীতির একখানি চিঠিকে প্রচুর সময় নিয়ে পড়া, নিমির জ্ঞানলাভের পর 'আমায় বাঁচালে কেন?' এই প্রশ্নের বারংবার আবৃত্তি, প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধনেরও সুযোগ ছিল। নিমির মুখে "মরি মরি পরেছে রাই" গানখানিও সুপ্রযুক্ত হয়নি।

"শাস্তি"'র বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে এর বাস্তবধর্মী দৃশ্য-সংস্থাপন ও চিত্রগ্রহণ।

'মেরি-সুহাগ' চিত্রে দক্ষিণ ভারতের খ্যাত-নামা নর্তকী গিরিজা

ছবিটি দেখে মনে হয়, যেন এর সমস্ত-টাতেই যথার্থ বাড়ীঘরদোরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কোনো কৃত্রিম দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়নি। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এমন সুস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ধরা দিতে খুব কম বাঙলা ছবিতেই দেখা গেছে। সূর্যালোক এবং ইলেকট্রিক আলোকের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে ক্যামেরার কাজ বহু জায়গাতেই একটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা দিয়েছে। বহির্দৃশ্য এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্য—উভয় ক্ষেত্রেই এই বাস্তবধর্মী চিত্রগ্রহণ রীতি ছবিটিকে রসোত্তীর্ণের পথে অনেক-খানি এগিয়ে দিয়েছে। চিত্রশিল্পী সুধীশ ঘটক এবং শিল্পনির্দেশক রবি চট্টোপাধ্যায় রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করবেন তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য। ঠিক সমান কথা কিন্তু শব্দধারণ সম্পর্কে বলা চলে না। এমন কি, সঙ্গীত গ্রহণের কাজেও উন্নতির অবকাশ ছিল। ছবিতে একমাত্র পুরুষকণ্ঠে গাওয়া গান, "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে"—এটিকে ছবির শেষের দিকে প্রসঙ্গ-সঙ্গীত রূপে (theme song) উপস্থাপিত করা হয়েছে—এই গানখানির উঁচু পর্দাগুলি আরও সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করলে গান-খানির ব্যঞ্জনা আরও গভীর হতে পারত এবং গায়ক সাগর সেনের প্রতি ঢের বেশী সুবিচার হ'ত। আলি আকবরের সুরারোপে কোনো নতুনত্ব পেলুম না, যদিও তাঁর রচিত আবহ-সঙ্গীত—বিশেষ ক'রে যে-সব জায়গায় সেতারের ব্যবহার হয়েছে—উচ্চ প্রশংসালাভের যোগ্য। কিন্তু এখানেও সংলাপের সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মিশ্রণে শব্দ পুনর্যোজনার কাজ আরও উন্নত ধরণের হওয়া সম্ভব ছিল। ছবির সম্পাদক তাঁর কাঁচির অধি-কতর ব্যবহারের দ্বারা ছবিকে ঢের বেশী গতিসম্পন্ন করতে পারতেন।

অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অত্যন্ত সংযত ভাবে

ভি এ পি প্রোডাক্‌সন্সের সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'কাজল' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী

চরিত্রটির ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্খাকে রূপদানে সমর্থ হয়েছেন। ছবিটিতে নায়িকা বলতে কেউ নেই। মালবিকা গুপ্ত অভিনীত প্রীতি এবং সন্ধ্যা রায় অভিনীত নির্মলা বা নিমি—দুই-ই পার্শ্বচরিত্র। আধুনিকা বিদুষী কন্যা প্রীতি মেডিক্যাল কলেজের ভালো ছেলে ভুবন মুখুজ্জেকে নিয়ে সমাজের 'উচ্চ বৃক্ষচূড়ে' বাসা বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল। এই স্বপ্নবিলাসিনীর ভূমিকাকে মালবিকা গুপ্ত তাঁর বাচনে, ভঙ্গীতে, বেশে এবং দেহসৌষ্ঠবে একটি অপরূপ শ্রীমন্ডিত করেছেন। সন্ধ্যা রায় গৃহীত নিমির ভূমিকাটি চরিত্ররূপে কোনো সম্পূর্ণতা পায়নি 'আরুপণী'র দোষে। তবু যেটুকু সুযোগ তিনি পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি। নায়কের মায়ের চরিত্রটি পদ্মা দেবীর অভিনয়গুণে আন্তরিকতার স্পর্শলাভ করেছে। সদু মাসিমা, হরিধন কুন্ডু, লতিফ, জনাই খাঁ, নন্দ ডাক্তার ও ভোলাদার ভূমিকায় যথাক্রমে অপর্ণা দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, সবিতাব্রত দত্ত, কালী সরকার, সন্তোষ সিংহ ও মণি শ্রীমাণি চিত্রবর্ণিত কাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। রায় বাহাদুরের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য যত না সফিস্টিকেটেড, তার চেয়ে বেশী রূঢ়। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

দয়াভাই পরিচালিত চিত্রশোভনার প্রথম প্রয়াস "শাস্তি" চিত্ররীতিতে নতুনত্বের আভাস দিয়েছে এবং এইখানেই এর সার্থকতা।

তপন সিংহ পরিচালিত তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র একটি দৃশ্যে চন্দন রায় ও লিলি চক্রবর্তী

(১) "ডাউন ট্রেন"-এর পঞ্চাশৎ অভিনয়-উৎসব :

চতুরঙ্গ সম্প্রদায়ের "ডাউন ট্রেণ" রসিকজন প্রশংসাধন্য একটি সুবিদিত নাটক। ১৯৫৮ সালের ২৮শে মার্চ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এর প্রথমাভিনয়ের পর থেকে এর জয়যাত্রা আজ ঐতিহাসিক খ্যাতিলাভ করেছে। বিশ্বরূপা প্রবর্তিত গিরিশ-নাট্য-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী হয়ে একদা 'ডাউন ট্রেণ' চারটি বিভাগীয় পুরস্কার সমেত গিরিশ পুরস্কার লাভ করেছিল এবং পরে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত 'গিরিশ থিয়েটার'এ কিছুদিন নিয়মিতভাবে অভিনীত হয়েছিল পরিবর্তিত রূপে। 'গিরিশ থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চতুরঙ্গ সম্প্রদায় আবার 'ডাউন ট্রেন'-এর অভিনয় শুরু করেন এবং গেল ১২ই মার্চ মিনার্ভা মঞ্চে তার পঞ্চাশৎ অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। অভিনয়ের আগে মঞ্চে পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং সভাপতিরূপে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু সম্প্রদায়কে তাঁদের অভাবিত সাফল্যের জন্যে অভিনন্দিত করেন। পরে সমবেত কণ্ঠে "ধ্বনিল আহ্বান" গানখানি গাওয়া হবার পরে "ডাউন ট্রেন"এর অভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনয়ে চতুরঙ্গের শিল্পীরা তাঁদের প্রাণঢালা অভিনয়ে সমবেত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। পরিচালক এবং প্রধান চরিত্র-অভিনেতা বরুণ দাশগুপ্ত প্রথম দিকটায় অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে অভিনয় করায় শোনবার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল; পরে অবশ্য তিনি এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। আমরা "চতুরঙ্গ" সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নূতন নাট্যাভিনয় প্রত্যাশা করছি।

নবনাট্যম্-এর নতুন নাটক "অবগুন্ঠন" :

সমর সেট মম্-এর বিখ্যাত উপন্যাস "পেন্টেড ভেল"-এর ছায়া অবলম্বনে সুনির্মল মজুমদার ও সুজন বিশ্বাস কর্তৃক রচিত এবং দেবব্রত সুর চৌধুরী পরিচালিত নবনাট্যম্ নাট্যসংস্থার নতুন নাটক "অবগুন্ঠন"-এর অভিনয় হয়ে গেল ১৩ই মার্চ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "নবগ্রাম সেবক সংঘ"-এর সাহায্যকল্পে।

সেক্সপীয়র বলেছেন, বাস্তব জীবনে এমন বহু ঘটনাই ঘটে যা নাটক-উপন্যাসের ঘটনাকে হার মানিয়ে দেয়। তাই সার্থক বৈজ্ঞানিক তুষারমৌলি সেনের স্ত্রী মল্লিকা ওরফে মলি সেনেরও যে পদস্খলন ঘটবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সেই মলি সেন যখন তার পরিচিত সমাজচ্যুত হয়ে এক নির্বান্ধব দেশে কলেরায় মহামারীর মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ নরনারীদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখে জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে, বুঝতে পারে যে, দৈহিক যৌনসম্ভোগেই সুখের চরম নয়, আর্তের সেবাতে আত্মত্যাগেই প্রকৃত সুখ, তখন দর্শকের সামনে ফুটে ওঠে মলি সেনের

বিচিত্র চরিত্রবৈভব, সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মলি সেনের দিকে।

কিন্তু নাট্যকাররা মলি সেনের প্রতি সুবিচার করেননি; প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক বিবর্তনকে গ্রহণযোগ্য করবার মত প্রস্তুতির আশ্রয় নেননি। ঘটনা এবং সংলাপ—এই উভয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে চরিত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি ঘটেছে আকস্মিকভাবে এবং সংলাপের সাহায্যে চরিত্রকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তাই নাটকের মধ্যে আকস্মিকতা যতখানি ফুটেছে, নাটকীয় সম্ভাব্যতা ততখানি ফুটে উঠতে পায়নি। সেই কারণে আমরা শোভনলালের সংগে বৈজ্ঞানিক-পত্নী মলি সেনের যৌন-সংসর্গকেও যেমন শোভন বলে মনে করতে পারিনি, তার মুখ থেকে স্বামীর কাছে ডাইভোর্সের (বিবাহ-বিচ্ছেদের) প্রস্তাবকেও তেমনই অশালীন ব'লে মনে করতে বাধ্য হয়েছি। আবার অরিন্দমের মুখ থেকে মলি সেনের চরিত্র বিশ্লেষণকেও যেমন সহজপাচ্য বলে বোধ হয়নি, করুণাময়ীর আশ্রম দেখে মলি সেনের মুখে সেবার কার্যে আত্মোৎসর্গ করবার ইচ্ছা প্রকাশকেও ভূতের মুখে রাম নাম বলে মনে হয়েছে। এবং সব শেষে তুষারমৌলির স্মৃতিস্তম্ভের সামনে মলির উচ্ছ্বাস আমাদের মনে বেচারার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করার চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা চূড়ান্ত ন্যাকামোর রূপ দিয়েছে। সমস্ত নাটকটাতেই বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশের একান্ত অভাব।

নাটকের দৃশ্যাবিন্যাসেও একাধিক ত্রুটী লক্ষ্য করা গেছে। একটি দৃশ্যকে কেমন কথার ওপর শেষ করতে হবে বা চরিত্রের কোন্ বিশেষ অভিব্যক্তির কিংবা নাটকীয় কোন্ ক্রিয়া (action)-র ওপর পর্দা ফেললে দর্শকের মনে একটি নাট্যকৌতূহল জাগাতে সমর্থ হবে, এসব তত্ত্ব নাট্যকারদ্বয় এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স কোথাও গড়ে উঠতে পায়নি। আমরা কতকগুলি ঘটনাকে ঘটে যেতে দেখলুম, কিন্তু তাদের সংগে কোথাও একাত্ম হতে পারলুম না।

মলি সেনের কঠিন চরিত্রটিতে রূপদান করেছেন মিতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালকের শিক্ষায় তিনি চরিত্রটিকে যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিকভাবে এবং অনায়াসে পরিবর্তনশীল নয়। বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক তুষারমৌলির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পরিচালক দেবব্রত সুরচৌধুরী স্বয়ং। তাঁর স্পষ্ট বাচন এবং সংযত সংবেদনশীল অভিনয় চরিত্রটিকে একটি সমগ্র রূপদানে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য ডিগালিপুরের একটি দৃশ্যে মলিকে সন্তানসম্ভবা জানবার পর তাঁর মণ্ডত্যাগের আগে ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে মলির প্রতি ধীর পদবিক্ষেপে ধাবমান হয়ে দর্শকের মনে সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটানো চরিত্রোচিত হয়েছে বলে মনে করতে পারছিনা। শোভনলালের ভূমিকায় নির্মল ভট্টাচার্যকে মানিয়েছিল চমৎকার, অভিনয়ও তিনি করেছেন চরিত্রোচিত। অরিন্দমের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন সতীপ্রসাদ বসু। করুণাময়ীর ভূমিকায় তারা ভাদুড়ী যথেষ্ট অনুশীলন করে অবতীর্ণ হননি ব'লে মনে হল। অপরাপর ভূমিকা চলনসই।

আলোক-সম্পাত এবং দৃশ্য-পরিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আবহ-সংগীত নাটকের প্রথম দিকে পাত্রপাত্রীর সংলাপের সংগে উচ্চ গ্রামে বেজে প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও পরের দিকে নাটকীয় ভাব প্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

রাতকুটুরী, সাপিনক, জনরব, বন্দিতা, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি বহু নাটকের সার্থক অভিনয়কারী সম্প্রদায় "নব নাট্যম্"-এর নবতম প্রচেষ্টা "অবগুণ্ঠন" নাটক এবং মণ্ডারোপ—উভয়দিক দিয়েই আরও বেশী সার্থক হয়ে উঠে আমাদের আনন্দ দেবে, এই আশাই আমরা করি।

বিবিধ সংবাদ

জর্জিয়ার নৃত্যগোষ্ঠী:

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জর্জিয়ার লোকনৃত্য-সম্প্রদায় ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আমাদের দেশে এসেছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দিল্লী ও আমেদাবাদে তাঁদের নৃত্য প্রদর্শনী শেষ ক'রে বর্তমানে বোম্বাই শহরে তাঁদের আসর বসিয়েছেন। তাঁদের সফরের সমাপ্তি
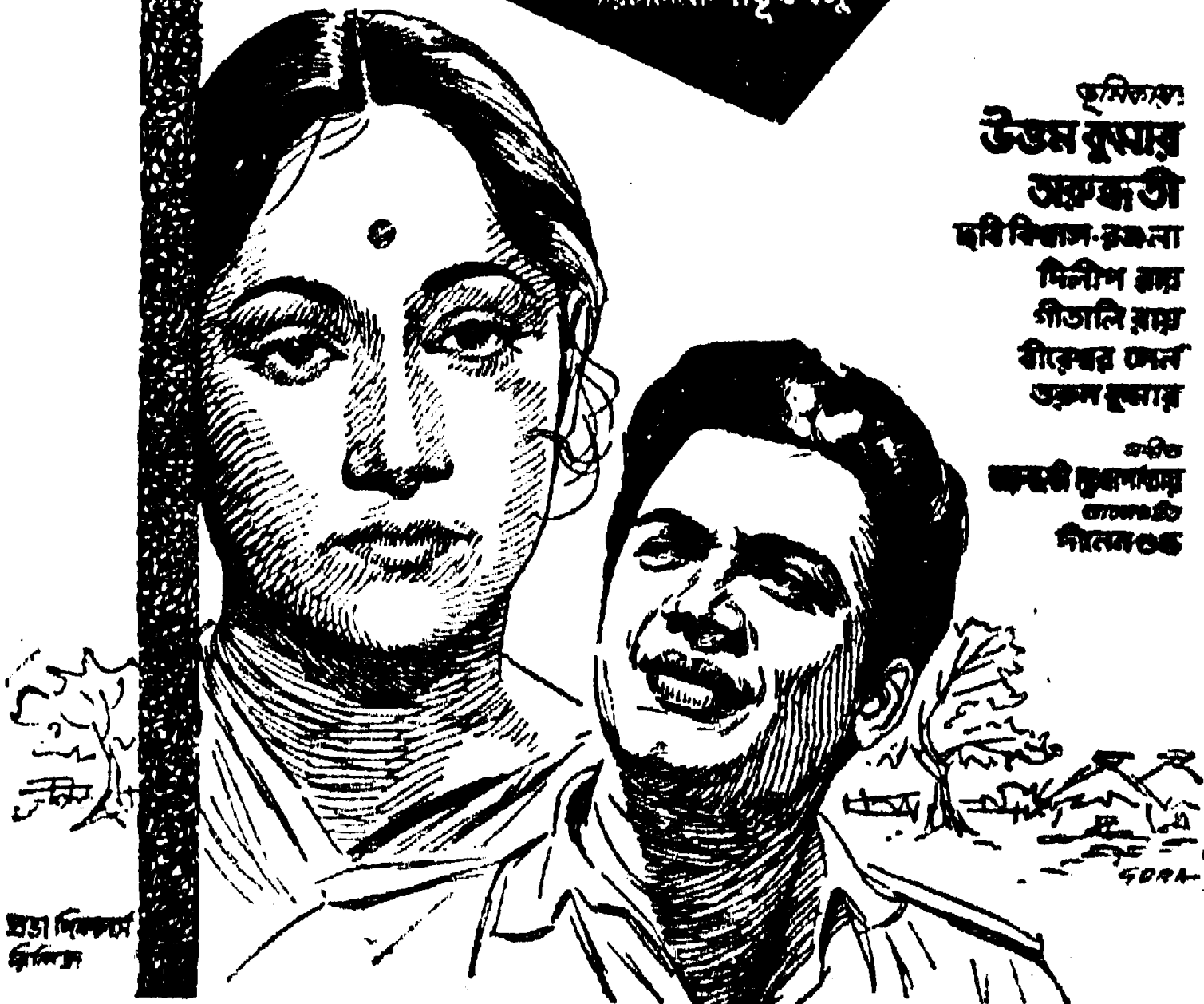
ঘটবে কলকাতার প্রদর্শনীর পর। এখানে ২৯-এ মার্চ থেকে শুরু ক'রে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন এ'দের আসর বসবে লোয়ার সার্কুলার রোডের নিজাম প্যালেস গ্রাউন্ডে। ভারত সরকারের পক্ষে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার জর্জিয়ার নৃত্যগোষ্ঠীর এই ভারত সফরের সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং কলকাতায় এ'দের আসর বসাতে এ'দের সংগে সহযোগিতা করছেন চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার।

ককেশাশ পর্বতচূড়ার দক্ষিণে এবং কৃষ্ণসাগরের পূর্বে অবস্থিত জর্জিয়া রাজ্যের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের লোকনৃত্যকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনই করেছে এই জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিবর্তন। জর্জিয়ান নৃত্যে মেয়েদের সুষম পেলব ভঙ্গিমার সংগে মিশেছে পুরুষদের শৌর্যবীর্যের প্রকাশক দুর্মদ নৃত্যভংগী—কোমলেকঠোরে এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ দর্শকমনে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

জর্জিয়ার লোকনৃত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এমনই বহুবিস্তৃত যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি যে-দেশেই তাঁরা গেছেন, সেদেশেই তারা অজস্র প্রশংসার জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতার নৃত্যরসিকরা এই অসামান্য নৃত্য-প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

মেন মাস্ক থিয়েটার :

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেন ইউনিভার্সিটির নাট্যশিক্ষা বিভাগ ১৯০৬ সালে "মেন মাস্ক থিয়েটার" নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন, যার কাজ হচ্ছে, ঐ বিভাগের ছাত্ররা নাট্যাভিনয় ব্যাপারে পুঁথিগত এবং ব্যবহারিকভাবে যে শিক্ষা লাভ করেছে, তারই নিদর্শন সাধারণের সামনে তুলে ধরা। জগতের বিভিন্ন জাতির সংগে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়ার মাধ্যমে মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে বিশেষ আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তারই অধীনে আমেরিকান ন্যাশনাল থিয়েটার অ্যান্ড অ্যাকাডেমীর সহযোগিতায় কুড়িজন সদস্যবিশিষ্ট এই "মেন মাস্ক থিয়েটার" সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন আমেরিকান সমাজ জীবনের প্রতীক পাঁচটি বিখ্যাত নাটকের অভিনয় মানসে। এ'রা মাদ্রাজে অভিনয় শেষ করে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন গেল ১৬ই মার্চ তারিখে এবং ১৯-এ থেকে ২২-এ পর্যন্ত চারদিন স্থানীয় হিন্দী হাই স্কুলে তাঁদের অভিনয়-আসর বসিয়েছিলেন। এ'দের অভিনীত নাটকগুলি হচ্ছে—ইউজিন ও'নীলের "আঃ, উইল্ডারনেস্", উইলিয়ম সেরোয়ানের "মাই হার্টস্ ইন দি হাইল্যান্ডস্" থর্ণটন ওয়াইল্ডারের "হ্যাপি জার্ণি", পল গ্রীণের "স্যাটার্ডে নাইট" এবং ডোর শ্যারির "সানরাইজ অ্যাট ক্যাম্পোবেলো"। ১১ থেকে শুরু ক'রে ৩৪ বছর বয়েসের শিল্পী সমন্বিত এই দলটিতে অধিকাংশেরই বয়স কিন্তু দুই-য়ের কোঠায় অর্থাৎ তরুণের দল। ১৭ই মার্চ ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের আমন্ত্রণে —এ'রাই এই নাট্যগোষ্ঠীর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থাপনা করেছেন—এ'দের সংগে মিলিত হয়ে দেখলাম, এ'দের চোখেমুখে

জর্জিয়ান লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য

ছাত্রসুলভ অনুসন্ধিৎসা, সারল্য ও প্রীতি ঝলমল করছে। এ'দের অভিনয় সম্বন্ধে অভিমত পরে প্রকাশিত হবে।

"অঘটন আজো ঘটে" :

গেল শনিবার, ১৭ই মার্চ থিয়েটার সেন্টারে মুখোস সম্প্রদায়ের ধর্মমূলক আধুনিক নাটক, দিলীপকুমার রায় লিখিত উপন্যাস অবলম্বনে ধনঞ্জয় বৈরাগী কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত "অঘটন আজো ঘটে"র মঞ্চাভিনয়ের শততম রজনী অনুষ্ঠিত হ'ল। যাঁরা প্রচণ্ড যুক্তিবাদী এবং দৈবশক্তিতে অবিশ্বাসী, তাঁদের কাছে হয়ত' এ-নাটকের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু যাঁরা তা' নন—এবং আজও পর্যন্ত এই 'নন'-এর দলই সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী, তাঁরা যে এই নাট্যাভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন, এ-বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

বংগীয় নাট্য সংসদের "পান্থশালা" :

আসছে ৮ই এপ্রিল (২৫-এ চৈত্র), সকাল ১০-৩০টায় নিউ এম্পায়ার রংগমঞ্চে বংগীয় নাট্য সংসদের সভ্য-সভ্যারা রমেন লাহিড়ী রচিত "পান্থশালা" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স :

নাট্যানুরাগী দর্শকবৃন্দের কাছে শিশির মল্লিক নামটি নিশ্চয়ই অপরিচিত নয়। পুরানো রঙমহল এবং সলিল মিত্রের আমলের নতুন স্টার রংগমঞ্চে অভিনীত বহু সাফল্যমণ্ডিত নাটকের যুগ্ম এবং একক প্রযোজকরূপে তাঁকে দেখতে পাওয়া গেছে বহু বছর। তিনি যে বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র জগতের সংগেও বিশেষভাবে জড়িত, যাঁরা ডি-লুক্স পিকচারের দীপচাঁদ কংকারিয়ার ব্যবসায়-জগতের সংগে পরিচিত, তাঁরা সেকথা ভালোভাবেই জানেন। চলচ্চিত্রের প্রযোজক হিসেবে তাঁকে আগে আমরা একাধিকবার দেখেছি। তাঁর প্রযোজিত, অপূর্বসাফল্যমণ্ডিত "কংকাল"-এর কথা কে না জানে? বর্তমানে বহুদিন বাদে তিনি আবার চিত্র প্রযোজনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বিশ্বনাথ রায় লিখিত "নতুন দিনের আলো"র কাহিনী অবলম্বনে যে-ছবির প্রযোজক হিসেবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তার পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, গীত রচনা, সংগীত-পরিচালনা, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে অগ্রদূত-গোষ্ঠী, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হেমন্তকুমার, সত্যেন রায়-চৌধুরী ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবিখানিতে অংশ গ্রহণ করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, জহর গাংগুলী প্রভৃতি। পরিবেশনসত্ব নিয়েছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

ভারতীয় সংগীত সম্মেলন :

আসছে ৩১-এ মার্চ ও ১লা এপ্রিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনের আসর বসছে আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাপিসের পাশে ১৮, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীটে। প্রথম দিনে আধুনিক সংগীতের অধিবেশনে, সর্বশ্রী মান্না দে, হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ,
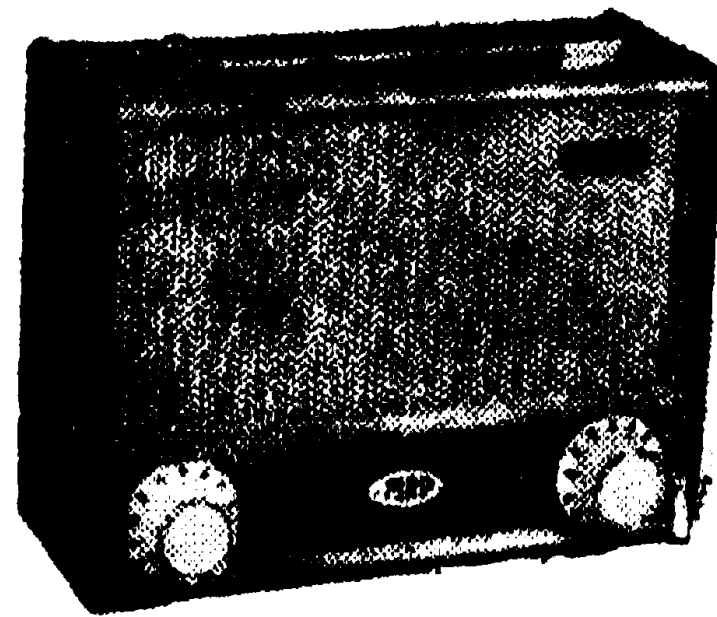
পঙ্কজ মল্লিক, নির্মলেন্দু চৌধুরী, উৎপলা, প্রতিমা, বাণসারা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দিনে মার্গ-সঙ্গীতে ভীমসেন যোশী, মুনাব্বর আলি খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলায়েত হোসেন খাঁ (সেতার), আলি হোসেন (সানাই) প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করবেন।

নাট্যম্ সম্প্রদায়ের "পথের ডাক" অভিনয়

'নাট্যম্' সম্প্রদায়ের প্রথম নিবেদন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সামাজিক নাটক "পথের ডাক" আগামী ২৮শে মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হবে। অভিনয়ের পুরোভাগে আছেন অতীন রায়চৌধুরী, রথীন চন্দ, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, মণি গাঙ্গুলী, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন সেন, তারা ভাদুড়ী, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা দে প্রভৃতি। অরুণ চ্যাটার্জী নাটকটি পরিচালনা করছেন।

তিন দেশী ছবি

একটি ফরাসী ছবি

আন্দ্রে কেয়েটে ফরাসী দেশের জনৈক যশস্বী পরিচালক। 'নিউ ওয়েভ' পরিচালকদের গোষ্ঠীভুক্ত না কেয়েটে, তাঁকে বরং রেনোয়ার উত্তরসূরীরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে "জাস্টিস ইজ ডান" (১৯৫৩) এবং "উই আর অল মারডারারস" (১৯৫৭) ছবি দুটি পরিচালনা করে সমাজসচেতন পরিচালক হিসেবে সমগ্র চিত্রজগতের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন তিনি। কোন কোন সমালোচক রেনোয়ার এবং মারসেল কার্নের সঙ্গে তাঁকে এক আসনে বসাতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি।

সম্প্রতি কেয়েটের একটি ছবি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। ছবিটির নাম—"Le Passage du Rhin" ইংরেজীতে নামকরণ হয়েছে "টুমরো ইজ মাই টার্ণ"। যুদ্ধকালীন সমাজের এক বিবর্ণ চেহারা উন্মোচিত করেছেন কেয়েটে তাঁর সাম্প্রতিক ছবিতে। যদিও রেনোয়ার ভুবন-বিদিত চিত্র "গ্র্যান্ড ইলিউশ্যান"-এর স্বাক্ষর আছে কেয়েটের ছবিতে, তথাপি তীর্যক ব্যঙ্গে আধুনিক মানুষের অসহায় একাকীত্ব তিনি একেবারে নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থিত করেছেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের দুজন সৈন্য 'টুমরো ইজ মাই টার্ণ" ছবির নায়ক। এই ফরাসী সৈন্যদের বন্দী করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে জার্মানীর একটা গ্রামে পাঠানো হয়। গ্রামে তাদের থাকতে দেওয়া হয় একটি ভদ্র পরিবারের তত্ত্বাবধানে। শার্লি যুদ্ধে যোগদান করার পূর্বে ছিল প্যারিসের কেকবিক্রেতা। তার সংকল্প, যুদ্ধ যতদিন না থামে সে জার্মান পরিবারটির সঙ্গেই শ্রমদান করে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু অপর বন্দীটির সংকল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সে ছিল সাংবাদিক। পৃথিবীকে আজীবন ধরে গ্রহণ করেছিল উদার চোখে। সে জার্মানী থেকে পালাল প্যারিসে। কিন্তু জার্মানকবলিত প্যারিস তাকে আরো নিরাশ করল। প্যারিসের লোকজন যেন তার বন্দীবাসের জার্মানদের চেয়েও অনেক নীচুমনের লোক। যে সংবাদপত্রে সে কাজ করত তার প্রকাশক ইতিমধ্যে জার্মানদের সহযোগী হয়ে উঠেছে। তার প্রণয়িনীও উক্ত প্রকাশকের রক্ষিতা। জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে বাঁচবার একটা আশ্রয় খুঁজলো। কিন্তু স্বদেশের পৃথিবী যেন ক্রমশঃই তার কাছে কুটিল এক গোলকধাঁধা। কেউ বিশ্বস্ত না, স্থৈর্যের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। অবশেষে তার মনে হল যে এর চেয়ে জার্মান বন্দীবাসে থাকাই তার পক্ষে যেন শ্রেয় ছিল।

বন্দী দুজনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন যথাক্রমে শার্লস আজনভুর এবং জর্জেস রিভেরে।

একটি বৃটিশ ছবি

বৃটেনের জ্যাক ক্লেটন "নিউ ওয়েভ" পরিচালক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত "রুম এ্যাট দি টপ" পরিচালনা করে ইংলন্ডের নবচিত্র আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। এর আগে তাঁর একটি ছবি "দি বিস্পোক ওভারকোট" (গোগলের অমর গল্প 'ওভারকোট' অবলম্বনে তোলা) যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু ক্লেটনের তৃতীয় ছবি "দি ইনোসেন্টস" তোলা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। উনবিংশ শতাব্দীর রোমানটিসিজম-এর দিকে ফিরেছেন ক্লেটন তাঁর বর্তমান ছবিতে। "দি ইনোসেন্টস"-এর কাহিনীর ভিত্তি হল হেনরি জেমস-এর বিখ্যাত উপন্যাস "দি টার্ণ অফ দি স্ক্রু।" কাহিনীটি নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর। এমন কি একমাত্র 'রেবেকা'-র সঙ্গেই এই ছবি তুলনীয়। রেবেকার সঙ্গে দি ইনোসেন্টস-এর একটা ক্ষীণ কাহিনীগত সাদৃশ্যও আছে।

মিস গিডেনস নাম্নী এক তরুণী গভরনেসের চাকরী নিলেন এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে। তাঁকে দুটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু চাকরীস্থলে গিয়ে গিডেনস দেখলেন যে সমগ্র প্রাসাদটি যেন একটি অশরীরি ভয়ে মুহ্যমান। এর আগের একজন পরিচারকের সঙ্গে মিস গিডেনস-এর পূর্ববার্তিনী গভরনেসের প্রণয় ছিল। কিন্তু পরিচারকটি গভরনেসের সঙ্গে কখনই সদয় ব্যবহার করেনি। পরিচারকটি একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় নিহত হয় এবং গভরনেস লেকের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। সেই থেকে সমগ্র প্রাসাদ এবং ছেলেমেয়ে দুটি যেন ভূতগ্রস্ত।

জ্যাক ক্লেটন ছবিটিতে অসাধারণ এক গথিক গাম্ভীর্য এনেছেন। একটা অশরীরি রোমাঞ্চ প্রাসাদে, নলখাগড়ায় ভরা পুকুরে—সমস্ত প্রকৃতিতেই যেন আটকে আছে। প্রকৃতিও অসীম রহস্যময়ী। রাত্রে ঝড় এসে জানালায় করাঘাত করে, ঘরের পাতলা পর্দাগুলো হঠাৎ হাওয়ায় ফেঁপে ফুলে ওঠে এবং এই আধিভৌতিক পরিবেশের মধ্যে মিস গিডেনস দুটি অশরীরি মূর্তি দেখেন গ্রামের চার্চের চূড়োয় এবং লেকের ধারে। মিস গিডেনস এই পরিবেশ থেকে ছেলে মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ডেবোরাকার অসামান্য অভিনয় করেছেন মিস গিডেনস-এর ভূমিকায়। তাঁর নিজের মতে এইটেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। "দি ইনোসেন্টস"-এর সঙ্গীত ছবিটির এক বিশেষ সম্পদ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জর্জেস অরিক। বাইরের শব্দ এবং ধ্বনির ব্যবহারে ছবির রোমাঞ্চকর আবহাওয়াটি চমৎকার ফুটিয়েছেন অরিক সঙ্গীত পরিচালনার মারফতে। —চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গ ॥

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট পর্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয়েছে। পাঁচ অঙ্ক নাটকের এখনও তিন অঙ্ক বাকি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পর পর দুটি টেস্ট খেলায় হার—শুদ্ধ ভাষায় শোচনীয় পরাজয় আর গ্রাম্য কথায় গো-হার। ভারতবর্ষকে হাঁড়ির হাল করে ছেড়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের মারমুখী বল। প্রথম টেস্টে হল পেয়েছেন ৪৯ রানে ৫টা উইকেট। দ্বিতীয় টেস্টে ১২৮ রানে ৯টা উইকেট—১ম ইনিংসে ৭৯ রানে ৩ এবং ২য় ইনিংসে ৪৯ রানে ৬টা উইকেট। প্রথম টেস্টে স্টেয়ার্স পান ৮৫ রানে ৪টে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১০১ রানে ১টা। ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফাস্ট বোলার ওয়াটসন এবং স্টেয়ার্সের বল খেলতে খুব অসুবিধা বোধ করেননি। প্রধানতঃ হলের বলেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী কাবু হয়েছেন এবং প্রধান ভয়ের কারণ তিনিই। দ্বিতীয় টেস্টের ১ম ইনিংসে ফাস্ট বোলাররা খুব বেশী প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি—হল ৭৯ রানে ৩ এবং স্টেয়ার্স ৭৬ রানে ১টা উইকেট। ফাস্ট বোলারদের ভাগে পড়ে ৪টে উইকেট, ১৫৫ রানে। এই হিসাব থেকে অনেকেরই ধারণা হয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বল সম্পর্কে ভারতীয় খেলোয়াড়দের এতদিনের 'জুজুর' ভয় কেটে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েসলি হল সহজে হাল ছাড়লেন না। প্রধানতঃ তাঁরই মারাত্মক বোলিংয়ে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস কম রানে শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শোচনীয়ভাবে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ সুনামের সঙ্গে খেলতে পারেনি। ভারতবর্ষ ক্রিকেট খেলার সর্ববিভাগে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—কোন কোন বিষয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফিল্ডিংয়ের দোষে এবং বোলার বদলীর নীতিগত ত্রুটিতে বোলাররা অকারণে মার খেয়েছেন। দল গঠনে ভারতবর্ষকে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়। অসুস্থতার দরুণ পতৌদির নবাব এবং সারদেশাইকে দলে পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলেও কয়েকজন খেলোয়াড় রদবদল করা হয়। ১ম টেস্টের আহত উইকেট-কীপার হেনড্রিকসের শূন্যস্থানে আইভর মেনডোনকা, ফাস্ট-বোলার চেস্টার ওয়াটসনের বদলে উইলী রডরিগস এবং কমি স্মিথের বদলে ইস্টন ম্যাকমরিস দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হন। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় চারটি ক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত দর্শকসাধারণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এ নিয়ে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে: সলোমনের আউটে বোতল নিক্ষেপ ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শনও হয়েছে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে হারাতে হয়েছে উমরীগড় এবং দুরাণীর উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের। খেলার পরিস্থিতি বিচার করলে ভারতবর্ষের ক্ষতির পরিমাণই বেশী। ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। কোথায় ৪ উইকেট পড়ে ৮৯ রাণ আর ৩৯৫ রাণে ইনিংস শেষ! শেষের ৩ উইকেটে দলের ১৩২ রাণ ওঠে। ভারতবর্ষের প্রথম সারির খেলোয়াড়রা বিগত দুটি টেস্ট খেলাতেই ব্যাটিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে শেষের দিকের খেলোয়াড়রা দলের মুখ রক্ষা করেছেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষ সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের হাতেই খেলা ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তখনও খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, মাত্র ৩ রাণে (৫ উইকেটে ৩৯৮ রাণ) এগিয়েছিল। সারা দিনের খেলায় ২৪১ রাণ, চারটে উইকেট খুইয়ে। তবুও ইঞ্জিনীয়ার সোবার্সের এবং মঞ্জরেকার কানহাইয়ের 'ক্যাচ' ফেলেছিলেন। খেলার গতি ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের পক্ষে সম্পূর্ণ ঘুরে যায় চতুর্থ দিনের খেলায়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক কন্ট্রাক্টরের ত্রুটিপূর্ণ খেলা এবং নীতির জন্যেই অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষকে বিরাট সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ফিল্ডিং সাজানো এবং বোলার পরিবর্তনের দোষেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা বিপুল সংখ্যক রাণ তুলতে সক্ষম হন। সোবার্স এবং মেনডোনকা স্পিন বোলারদের যথেষ্ট সমীহ ক'রে খেলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ভারতীয় ফাস্ট বল ছিল মুড়ি-মুড়কির সমান। দুরাণী এবং প্রসন্নের স্পিন বলে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রাণের গতি প্রায় থেমে গেছে এবং ব্যাটসম্যানরা আড়ষ্ট হয়ে খেলছেন ঠিক সেই সময়ে নতুন বল নেওয়াতে রাণের গতি বেড়ে যায়। ক্যাচ ফেলা কিম্বা ক্যাচ ধরতে না পারার হিড়িক দেখে বোলারদের ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা হয়। শেষ দিকে দুরাণী এবং প্রসন্ন ভাল রকমের বল ফেলতে পারেননি। ব্যাটসম্যানরা তখন মরিয়া হয়ে খেলেছেন। ২৬৩ রাণের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে আবার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দু' ঘণ্টার খেলায় ৩টে উইকেট খুইয়ে ৮৩ রাণ। আবার ফাস্ট বলের আতঙ্কে ব্যাটসম্যানরা কাবু হ'ন। হলের বলেই ৩ জন আউট।

শেষ দিনের খেলায় ভারতবর্ষ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেনি। সম্পূর্ণ পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে খেলেছে। অতি নির্ভরশীল খেলোয়াড় বোরদে এবং দুরাণী গোল্লা করেছেন। লাঞ্চের সময়ই ভারতবর্ষ ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন হয়—৮ উইকেটে পড়ে ১৬২ রাণ।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিনের খেলার সূচনা দেখে ভারতীয় সমর্থকেরা আশা করেছিলেন, ভারতবর্ষ হয়ত খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবে। চতুর্থ দিনের চতুর্থ উইকেটের নট আউট খেলোয়াড় উমরীগড় এবং নাদকার্ণী খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলেছিলেন। সাধারণত যে সব বলে অনায়াসে চার রান করা যায়, সে সব বলও তাঁরা ঠেকিয়ে যান। খেলায় কোন রকম ঝুঁকি নেন্‌নি। এতটা না করলে এই জুটিই ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের প্রয়োজনীয় ১৮ রান তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু এত করেও উমরীগড় ভুল করলেন। গিবসের বল না মেরে ঠেকা দিতে গিয়ে খোঁচা মেরে বল তুলে দেন—ক্যাচটা লুফেন সোবার্স। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৫ম দিনের খেলায় ৩৩ রান ওঠে—এই জুটিতে মোট ৬৬ রান। উমরীগড়ের বিদায় থেকেই দলের ভাঙ্গন সুরু হয় এবং ৮ম উইকেট পড়ে যায় দলের ১৫৭ রানের মাথায়। এর মধ্যে সোবার্সের বলে মঞ্জরেকারের এল-বি-ডবলউ আউট প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণায় আম্পায়ারের নির্ভুল সিদ্ধান্ত হয়নি। সোবার্সের এই বলটা লেগ ষ্টাম্পের অনেক বাইরে পিচ খেয়ে মঞ্জরেকারকে আঘাত করে। এইদিন পিচ স্পিন বোলারদের কিছুটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু এইদিনের উইকেটে খুব বেশী রান করার যে কোন সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়। ৯ম উইকেটের জুটি ইঞ্জিনীয়ার এবং দেশাই দলের ৪৮ রান তুলে দেন। আসল কথা, লড়াই করার মত ভারতীয় দলের শক্তি ছিল না। ভারতীয় দলের বোলিং স্থানীয় দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু বোলার একা খেলে কম রানের মধ্যে বিপক্ষ দলের পতন ঘটাতে পারে না। বোলারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ফিল্ডিং এবং মাঠে খেলোয়াড়

সাজানোর ওপর। খেলার এই দুটি বিষয়ে ভারতবর্ষ আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে খেলা হাত-ছাড়া করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে শক্তিশালী দল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই দলের ওয়েসলি হল যে বর্তমান সময়ের বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদা 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষ যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে এমন নিঃকৃষ্ট খেলার পরিচয় দিবে তা কেউ ধারণা করেন নি। সম্প্রতি ভারতবর্ষের অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর বলেছেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা যে, হলের বোলিং আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। তিনি স্বীকার করেছেন, দলের মাথার দিকের চারজন ব্যাটসম্যানের ব্যর্থতার জন্যেই ভারতবর্ষকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এই চারজনের মধ্যে তিনি নিজেকেও ধরেছেন।

১৯৫২-৫৩ সালের প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের পাঁচটা টেস্ট খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ কেবল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১৪২ রানে হার স্বীকার করেছিল। বাকি চারটে খেলা ড্র ছিল। কিন্তু এবারের সফরে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে সুনাম যথেষ্ট নষ্ট করেছে। এ পর্যন্ত সফরের ৬টা খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। ভারতবর্ষ প্রতিটি খেলায় টসে জয়লাভ করেছে। দলের পক্ষে কম ভাগ্যের কথা নয়! কারণ ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভের গুরুত্ব অনেক বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষ টসে জয়লাভের সৌভাগ্য লাভ করেও খেলায় সেই অনুপাতে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বরং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে টেস্ট খেলায়। এখনও তিনটে টেস্ট খেলা বাকি। ভারতবর্ষ যদি তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে তবেই পরবর্তী দুটি টেস্ট খেলার ওপর দর্শক সাধারণের আগ্রহ থাকবে। নতুবা ভারতীয় দলকে এই সফরে বেশী রকম আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। দুটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় ব্যর্থতার পর স্থানীয় দর্শক সাধারণের উপর প্রতিক্রিয়া কি রকম দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বারদোজের আসন্ন তৃতীয় টেস্ট খেলায়।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেস্ট

তারিখ : মার্চ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮

ব্রিজটাউন

ব্রিজটাউন বার্বাদোজ দ্বীপের রাজধানী। এই ব্রিজটাউনের মাটিতে ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যান্ডের যে টেস্ট খেলা শুরু হয় সেই খেলাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলা। সেই প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১২২ রান) করেন সি এ রোচ। এই খেলারই দ্বিতীয় ইনিংসে জর্জ হেডলি, যিনি পরবর্তীকালে 'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান' নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ১৭৬ রান করে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় জে বি হবসের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ১৫৯ রানের রেকর্ড ভেঙ্গে দেন।

ব্রিজটাউনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৫৭৯ রান (৯ উইকেটে) ক'রে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। এই ৫৭৯ রানই ব্রিজটাউনে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে হান্ট (১৪২ রান) এবং উইকস (১৯৭ রান) সেঞ্চুরী করেন। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৬ রান করে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের এই ১০৬ রানই ব্রিজটাউনের টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড। পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৬৫৭ রানে (৮ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের ওপনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ ব্যক্তিগত ৩৩৭ রান ক'রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। মাত্র ২৮ রানের জন্যে হানিফ মহম্মদ ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় লেন হাটনের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ড (এক ইনিংসের খেলায়) ভাঙ্গতে পারেননি। হানিফ মহম্মদের সেই ৩৩৭ রান ব্রিজটাউনের টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে আজও অক্ষুন্ন আছে। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—পাকিস্তানের এই প্রথম টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি—খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিশ্চিত জয়লাভ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বঞ্চিত করেন হানিফ মহম্মদ।

ব্রিজটাউনে বেশীর ভাগই টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্রিজটাউনে ৮টা টেস্ট খেলা হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের। খেলার ফলাফল : ড্র ৫, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ২ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮১ রানে, ১৯৫৩-৫৪ সাল এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৪২ রানে, ১৯৫২-৫৩ সাল) এবং হার ১ (ইংল্যান্ডের কাছে ৪ উইকেটে, ১৯৩৪-৩৫)।

ব্রিজটাউনে টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৫৭৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৬৬৮ রান—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১০২ রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৩৪-৩৫।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ১০৬ রান—পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১০ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ০)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৬ (ইংল্যান্ড ৩, অস্ট্রেলিয়া ২, পাকিস্তান ১ এবং ভারতবর্ষ ০)।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২২৬ রান—গারফিল্ড সোবার্স, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯-৬০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৩৩৭ রান—হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ১৯৫৭-৫৮।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত দুই এবং তিনশত রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২২৬ গারফিল্ড সোবার্স (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯-৬০); ২২০ ক্লাইড ওয়ালকট (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪); ২১৯ ডি এ্যাটকিনসন (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৪-৫৫)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৩৩৭ হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ১৯৫৭-৫৮)।

॥ অর্জুন পুরস্কার ॥

প্রতি বছর ভারতবর্ষের পবিত্র সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের গুণী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খেতাবে সম্মানিত করা হয়। এ পর্যন্ত কয়েকজন ক্রীড়াবিদও এইদিনের রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছেন। সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীতে যেমন বিশেষ রাষ্ট্রীয় খেতাব দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সে রকম বিশেষ ব্যবস্থা ক্রীড়ামহলে ছিল না। ১৯৬২ সালে অর্জুন পুরস্কারের প্রবর্তনে সে অভাব পূরণ হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলকে খেলাধুলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের কৃতী ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে ২০ জন ক্রীড়াবিদ কেন্দ্রীয় সরকার

কর্তৃক প্রবর্তিত অর্জুন পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। গত ১৪ই মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ১৯৬১ সালের জন্য নির্বাচিত সেরা ক্রীড়াবিদদের অর্জুন পুরস্কার প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণন, ক্রিকেট খেলোয়াড় সেলিম দুরাণী, দাবা খেলোয়াড় ম্যানুয়েল অ্যারণ এবং পোলো খেলোয়াড় মহারাজ প্রেম সিং উপস্থিত ছিলেন না।

এই বাৎসরিক 'অর্জুন' পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থায় আমাদের জাতীয় জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদগণের নাম :

ফুটবল : প্রদীপ ব্যানার্জি; ক্রিকেট—সেলিম দুরাণী; হকি—পৃথিপাল সিং; লন টেনিস—রমানাথন কৃষ্ণন; টেবল টেনিস—জয়ন্ত ভোরা; এ্যাথলেটিক্স—গুরবচন সিং; ব্যাডমিন্টন—নান্দু নাটেকার; বাস্কেটবল—সরাবজিৎ সিং; মহিলা হকি—এ্যান লামসডেন; জিমন্যাস্টিক— শ্যামলাল; মুষ্টিযুদ্ধ—এল 'বাডি' ডি'সুজা; ভারোত্তোলন—এ এন ঘোষ; সন্তরণ—জেম বজরংগী প্রসাদ; রাইফেল সুটিং—মহারাজা কারণী সিংজী; কুস্তি—হাবিলদার উদয়চাঁদ; ভলিবল—এ পালানিচামী; পোলো—মহারাজ প্রেম সিং; স্কোয়াস—ক্যাপ্টেন কে এস জৈন; গলফ—ক্যাপ্টেন পি জি শেঠী; দাবা—ম্যানুয়েল এ্যারন।

এ্যান লামসডেন

প্রদীপ ব্যানার্জি

সেলিম দুরাণী

নান্দু নাটেকার

গুরবচন সিং

পৃথিপাল সিং

রমানাথন কৃষ্ণন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 30th March, 1962.
40 Naya Paise.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষারই বাহন হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে পরামর্শ দান করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করেছেন যে, মাতৃভাষা যদি সমস্ত প্রকার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত না হয় তাহলে আমাদের জাতীয়-জীবনে চিন্তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে, অতএব অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

কথাটা নতুন কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথ একথা বহু বৎসর পূর্বেই আমাদের জানিয়ে গেছেন। স্যার আশুতোষ এ পথে অনেকদূর অগ্রসরও হ'য়েছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে কতদূর পর্যন্ত স্থান দেওয়া যায় তাই নিয়ে বহু দ্বিধা এবং মতভেদ দেখা দিতে শুরু করেছে। এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এমনই জটিল আকার ধারণ করেছে যে, বিদায়মুখী ইংরাজি ভাষাকেই যেন আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আঁকড়ে ধরতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছি।

এই অবস্থায় অধ্যাপক বসুর সুচিন্তিত মত যে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রের নৈরাজ্য দূর করতে অনেকখানি সাহায্য করবে তাতে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঘটনা অন্য পথে মোড় নিয়েছে।

সে যাই হোক, যাঁরা ইংরাজি ভাষাকে স্থিত-মর্যাদায় বহাল রাখতে চান, মাতৃভাষার দাবিকে তাঁরাও সরাসরি নাকচ করতে ভরসা পান না। একটি স্বাধীন, আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন জাতির সামনে কথা বলতে গেলে মাতৃভাষার বিষয়ে যতোখানি প্রশস্তিবাচন প্রয়োজনীয় তা তাঁরা সঠিকভাবেই উচ্চারণ করেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা একটি কূটতর্কের আশ্রয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, বাংলাভাষার বর্তমান অপরিণত অবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা, বিশেষকরে বিজ্ঞান-শিক্ষা কি তার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব? অধ্যাপক বসু বহুকাল আগেই নানা উপলক্ষে এবিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে, তা সম্ভব। আলোচ্য ভাষণে তিনি আরো এক ধাপ অগ্রসর হ'য়ে ঘোষণা করেছেন, এই অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থাটিকে গত এক শতাব্দী ধ'রে অস্বাভাবিক পথে চালিত ক'রে ইংরাজি ভাষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের গতি ত্বরান্বিত হ'তে পারেনি।

অথচ আশ্চর্য এই যে, এর বিপরীত কথাটাই আমরা এতদিন শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা ইংরাজি শিক্ষায় পারঙ্গম দিকপাল পণ্ডিত এবং ইংরাজের ইস্কুলেপড়া শিক্ষাব্রতীদের মুখে অক্লান্তভাবে উচ্চারিত হ'তে শুনেছি এদেশে ইংরাজি শিক্ষার কী ভগবদ-প্রেরিত মহিমা। এবং সব থেকে দুঃখের বিষয়, বহু সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় ভদ্রলোকও এই মত নির্বিচারে মেনে নিতে দ্বিধা করেন না।

ইংরাজি শিক্ষা এদেশে ইউরোপীয় চিন্তাজগতের যে নতুন অভিঘাতের দ্বারা আমাদের সচেতন করে তুলেছিল, তার কার্যকারিতাকে খাটো করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু দু-তিন দশক পার হ'তে না হতেই সে-শিক্ষাপদ্ধতি যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর গ'ড়ে তুলেছিল তাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হত তাহলে সারা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাও যেমন বেড়ে যেত, তেমনি উপস্থিত প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিও উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র ভাবসমূহকে ধারণ করার মতো ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে উঠত।

কিন্তু এতদিন তা সম্ভব হয়নি। এবং এই না-হওয়ার সমস্ত অক্ষমতাকে মাতৃভাষার উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা পরম বিজ্ঞের মতো ইংরাজি ভাষার অসাধারণ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার কথা বলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উৎসাহী হ'য়ে উঠি। একে ঠিক সুস্থ মনোভাব বলা যায় না। ইংরাজি শিক্ষা কেউ আইন ক'রে বন্ধ করে দিতে বলে না। জ্ঞানবিজ্ঞানে যাঁর প্রকৃত কৌতূহল তিনি আপন তাগিদেই ইংরাজি শিখবেন। এবং শুধু ইংরাজিই বা কেন, অন্যান্য বিদেশী ভাষাকেও তিনি আয়ত্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তাই বলে দেশসুদ্ধ মানুষকে ইংরাজি শিক্ষার মাশুল না দিলে শিক্ষার রাজ্যে অপাঙক্তেয় ক'রে রাখতে হবে এ জুলুম কিছুতেই সমর্থনীয় নয়।

সত্যি বলতে কি, এমনিতেই বহু দেরি হ'য়ে গেছে। এমন দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত বসুর আন্তরিক আবেদন সত্ত্বেও যদি প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্রতীগণ তাঁদের পুরনো যুক্তিগুলি আবার গুরুগম্ভীরভাবে আওড়াতে শুরু করেন তাহলে বুঝতে হবে দেশগঠনের কাজ ত্বরান্বিত হ'তে এখনো অনেক দেরি।

অথচ হাওয়ার গতি যেন সেইদিকেই প্রবাহিত!

কবিতা
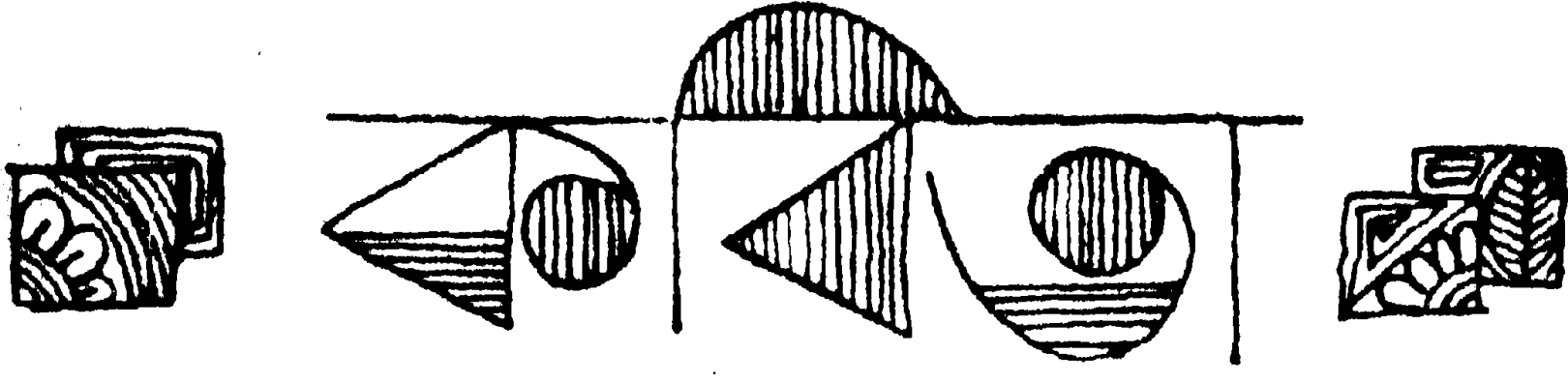
অনন্ত সাগরে ভেসে যায় আজি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত সাগরে ভেসে যায় আজি সকালে ভাসানো
তরী, হে আমার তরী। আমারে কে বিকাল বেলায়
বলে গেলো, ক্ষয়হীন নিবিড় সুষমা ঘরে আনো—
প্রান্তরে, তোমার এ কী বসে-থাকা স্মরণ-অতীত?
আমি কি তোমারই প্রতি ভাসিয়েছিলাম তরীখানি
হে নতুন জন্মভূমি, লক্ষ্যহারা কুটজ ফুলের
হে নতুন, দেশহীন, পারাবার প্রভৃতি সন্ধানী—?
আমার তরীর চেয়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক তরী আছে।

সমষ্টির কাছে আমি শূন্যহাতে কীভাবে দাঁড়াই?
নির্লিপ্তি তোমার সাজে; অতিরিক্ত দেহপরবশ
আমি কি তোমার চেয়ে কোনো বড়ো দেহতে মিলাবো?
অথবা কোথাও স্বেচ্ছাচার ব'লে সত্য কিছু নাই—
পরাধীন ভালোবাসা; এমন কি সাগরের জল
নিতেও না পারে এই তরীখানি, কিংবা নিতে পারে।

রহস্যের দিকে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

নৈঃশব্দ্যের বুকে, শোনো, ব্যাকুল তন্ময় সুর বাজে;
দ্যাখো, সে বিষণ্ণ সুর এই স্তব্ধ দিনের অন্তিমে
দৃশ্যের নিবিড়ে হয় সঞ্চারিত; দিগন্তে—পশ্চিমে
একটি পাটল মায়া সূর্যাস্তের স্মৃতি হয়ে রাজে।

কে যেন করুণ ছায়া ছড়ালো নীলাভ মুঠি হতে
চতুর্দিকে; আর এই প্রান্তরের নিঃসঙ্গ গভীরে—
এ নির্জনতায় এক ম্লান আলো ছায়ার শরীরে,
আকাঙ্ক্ষার মতো কাঁপে, কুয়াশার বিবর্ণ পরতে।

বুকের নিভৃতে কোন দুঃখের অদৃশ্য গুটি ফেটে
আমাকে কোমল, সূক্ষ্ম, বর্ণময় রেশমে জড়ায়;
হাওয়া বয়ে আনে মগ্ন, মৃদুগন্ধ, শীতল ক্লান্তিকে।

কুহক! কুহক! যেন চারিপাশে। আবিষ্ট সন্ধ্যায়,
কুয়াশা, আকাশময়, মন্থর ডানায় কেটে কেটে
তিনটি পাখি উড়ে যায় দিগন্তের রহস্যের দিকে।

* * *
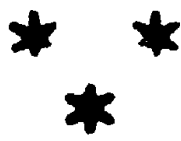
ঘরে ফেরার বেলা

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

অন্ধকারে ফিরলি ঘরে, আকুল চোখে কাঁদা
বন্ধ হ'ল, এখন হিম হিংস্র কোনো হাওয়া
ফিরিয়ে দিলে সবল হাতে: 'ক্ষিপ্র পায়ে যা
মায়ের হাতে স্বপ্নগুলি সাজিয়ে দিয়ে আয়।'

চক্ষে জ্বলে সর্বনাশের আকাশ-জোড়া আলো
দুলে উঠছে অশথ গাছের পায়ের নীচে মাটি
যেমন তুমি ঘর ভাঙলে মত্ত হাতের শিরা
রক্তে হবে শীতল লাল রঙিন পরিপাটি।

কেমন করে ফিরবি ঘরে, পিছন ফিরে দ্যাখ্
গুহার মত অন্ধকার অতীত দিন তোর।

দূর দাক্ষা

জৈমিনি
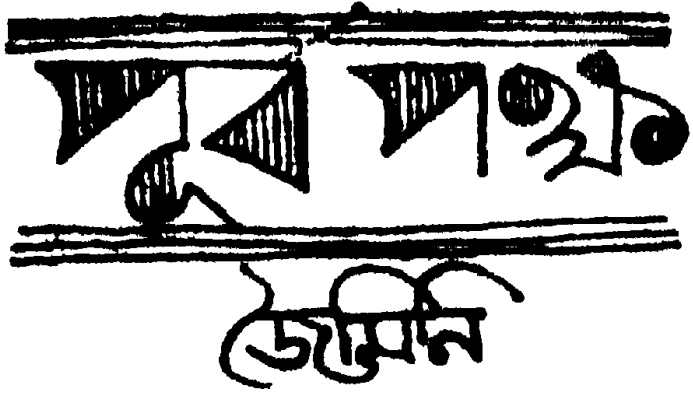
সেদিন আমাদের আড্ডায় কথা হচ্ছিল কুস্তি নিয়ে। সাধারণত এসব দৈহিক পরাক্রমের বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনে। রাজনীতি, ক্রিকেট, বাজার দর, সিনেমা ইত্যাদি নিরাপদ ব্যাপারের মধ্যেই নিজেদের নিবন্ধ রাখি। কিন্তু আমাদের আড্ডায় প্রাচীনতম সদস্য হরেনবাবু সম্প্রতি ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিলেন; সেদিন হঠাৎ তাঁকে আড্ডায় আবিষ্কার ক'রে তাঁর ঐ অদর্শনের কৈফিয়ৎ তলব করতেই কুস্তির কথা উঠে পড়ল।

না, হরেনবাবু নিজে কুস্তি করেন না। তিনি আমার-আপনার মতোই একজন জীর্ণদেহ বাঙ্গালী এবং কায়ক্লেশে আপিস আর টিউশানী ক'রে সংসার নির্বাহ করেন। তাঁর মুখে কুস্তি-প্রশস্তি শুনে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর তাজ্জব ব'নে গেলুম। অনুতোষ বয়সে অনেক কাঁচা, সে বলল, 'কিন্তু হরেনদা, এ বয়সে ও সব কসরৎ কি আর শরীরে সইবে?'

হরেনবাবু উচ্চহাস্য করে বললেন, 'আমি কি আর শরীর দিয়ে কুস্তি করছি? আমার কুস্তি মনে মনে। ওতে মন পুষ্ট হয়।'

বিজন এক কোণে ব'সে ছিল। সে আর্টিস্ট মানুষ, সর্বদাই যেন ক্লান্ত এবং উদাসীন। হরেনবাবুর কথায় সে প্রতিধ্বনি করল, 'মন পুষ্ট হয়?'

'নয়তো কী?'

'আমার মনে হয়, ওতে মন দুষ্ট হয়—কালিমালিপ্ত হয়।'

'একেবারে বাজে কথা। দুজন সুগঠিতদেহ পুরুষসিংহ পরস্পরের সঙ্গে লড়ছে, এতে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে না? তোমার কি মনে হয় বিজন যে আনন্দ কেবল পটে-আঁকা ছবিতে? বাস্তবে কোনো আনন্দ নেই।'

'হয়তো আছে।' বিজন মৃদুহাস্য সহকারে বলল, 'বিশেষ করে সে বাস্তবে যদি থাকে কিল-চড়, লাথি, চুল ওপড়ানো এবং মাথা ফাটিয়ে দেওয়া।'

হরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, আমি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'না হরেনবাবু, চেঁচালে চলবে না। বিষয়টা কী, তাই আগে বোঝা যাক। আসল কথা হল, আপনি বলছেন, কুস্তি দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে, আর তারই ফলে আমাদের মন পবিত্র হয়। কিন্তু বিজন বলছে, কুস্তির

আনন্দ পাশবিক, ওতে মন কলুষিত হয়। ব্যস, আপনি এক-এক করে উত্তর দিন।'

হরেনবাবু একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন, 'একেবারে সক্রেটীসের বিচার। কিন্তু হেমলক কই?'

আমি লজ্জিত হ'য়ে বাড়ির ভিতরে কফির জন্যে ফরমাস পাঠালাম।

হরেনবাবু বললেন, 'প্রথম কথা হল, বিজন ভায়া যে সব বর্ণনা দিল ফ্রি স্টাইল কুস্তিতে ওসব ব্যাপার তেমন কিছু হয় না, ওসব হল ক্যাচ-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান কুস্তির ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কুস্তিটা হয় দুজন সমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে। আমার মতো লোকের সঙ্গে একজন ভীম পালোয়ানের হয়না। কাজেই এর মধ্যে বীভৎসতা কিছুই থাকে না—থাকে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের প্রতিযোগিতা। তৃতীয়ত, এ ধরণের কুস্তি যেহেতু একটা স্পোর্ট সেইহেতু সব খেলাই যেমন মনকে পবিত্র করে কুস্তিও সেই রকমই করে। মন কলুষিত করার কোনো সম্ভাবনাই এতে নেই।'

অনুতোষ সায় দিয়ে বলে উঠল, আমারও তাই মনে হয়, হরেনদা। শক্তি-চর্চা না করেই বাঙালী ডুবতে বসেছে। শরীরটা এতো অবহেলার জিনিষ নয়, তাকে সুস্থ না রাখলে সেও আমাদের পদে পদে অপদস্থ করে ছাড়ে।' বিজন তার কথার কোনো জবাব দিল না। হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা হরেনদা, বীয়ার হাগ বা ভলুক আলিঙ্গন জিনিসটা কী রকম?'

'মাস্লেজাস? একজন মল্ল যখন আরেকজনকে বুকে জাপটে ধরে দুবাহুর চাপ দিতে থাকে তাকেই বলে বীয়ার হাগ। বাছাধনের আর তখন ট্যাঁ-ফো করার উপায় থাকে না।'

'ঠিকই তো। আর ঐ বস্টন ক্র্যাব, ওটা কী রকম প্যাঁচ?' নিরীহভাবে প্রশ্ন করল বিজন। কিন্তু তার আপাত নিরীহতার অন্তরালে আমি যেন ঝড়ের সংকেত অনুভব করলাম। হরেনবাবু এসব বোধহয় লক্ষ্য করলেন না। সোল্লাসে তিনি বলতে শুরু করলেন—

'বস্টন ক্র্যাব? একেবারে মোক্ষম প্যাঁচ। মানে ধর, তোমার প্রতিপক্ষকে তুমি উপুড় করে ফেলে দিয়েছ, তারপর তার পা দুখানি উঁচু করে তুলে চাপ দিচ্ছ। একটু নড়েছে কি শিরদাঁড়া ভেঙেগেছে। ঠিক যুযুৎসুর মতো। হার স্বীকার না ক'রে কোনো রাস্তা নেই।'

'অর্থাৎ, হয় হার স্বীকার, নয়তো হাড় ভাঙা। বেশ বেশ। আর ঐ এরোপ্লেন স্পিন, ওটা কী বস্তু?'

'খুবই সোজা। ধাঁ করে প্রতিপক্ষকে চিৎ করে দুহাতে মাথার উপর তুলে বোঁ-বোঁ ক'রে ঘোরানো। বেশী ছটফট করলেই পতন ও মূর্ছা।'

'শুধু কি তাই? রক্তবমন ও মৃত্যু, তাই বা বাদ থাকে কেন?' বিজন ফেটে পড়ল হঠাৎ, 'হরেনদা, আপনার উচিত তীর-ধনুক হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া এবং জীব-জন্তু মেরে তার কাঁচা মাংস খাওয়া। দেখবেন, সেও খুব উত্তম ধরনের একটা স্পোর্ট!'

'নাঃ, তা করব কেন?' হরেনবাবু জ্বলে উঠে বললেন, 'ঘরের মধ্যে বসে নন্দনতত্ত্ব আলোচনা করব আর ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাব!'

বিজন উত্তেজিতভাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'অর্ডার, অর্ডার! এ সব ব্যক্তিগত আক্রমণ চলবে না।' তাছাড়া, ভিতরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'আপাতত মুখকে ব্যাপৃত রাখার অন্য উপায় এসে গেছে। এখন পাঁচ মিনিটের জন্যে বিরতি।'

সকলেই যার-যার আলু ভাজার প্লেট এবং কফির কাপ তুলে নিলেন। ভৃত্য ট্রে নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, 'আসল কথা হল, রুচি। সকলের সব জিনিস ভালো লাগে না।'

'ওটা নতুন করে না বললেও চলে।' বিজন বলল, 'কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকলেরই ভালো লাগা উচিত—যেমন সূর্যোদয়, গান বা শিশুর মুখ। আবার অন্য কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকলেরই খারাপ লাগা উচিত—যেমন পচা ইঁদুর, বস্তীর ঝগড়া বা কুস্তি।'

'কখখনো নয়।' অনুতোষ বলে উঠল, 'বিজনবাবু আর্টিস্ট হয়ে কী করে যে কুস্তিকে পচা ইঁদুরের সঙ্গে এক ক্লাসে ফেললেন বুঝতে পারিনে। মল্লবীর যখন এসে সকলের সামনে দাঁড়ায় আমার তো দেবদূতের মতো মনে হয়। কী সুপার্ব ফর্ম থাকে এক-একজনের যদি একবার দেখতেন তো বুঝতেন।'

'ঠিক বলেছ।' হরেনবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'আমার তো নেশা ধরে গেছে। খবর পেলেই দেখতে যাই।'

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।' বিজন বিষণ্ণভাবে বলল, 'আপনার ভিতর যে জংলী মানুষটা লুকিয়ে আছে তারই খোরাক জোটাতে যান আপনি কুস্তি দেখতে। আসলে আপনি একটি স্যাডিস্ট, কাউকে পীড়ন করলে আনন্দ বোধ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তা হয়তো সম্ভব নয়। তাই আপনি বকলমে কাজ সারেন।'

হরেনবাবু এই আকস্মিক আক্রমণে কেমন থ' বনে গেলেন। উদভ্রান্তভাবে বলতে লাগলেন শুধু, 'বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা। আমি ভাবতেও পারিনে।'

'সে তো ঠিকই। ভাবলে আপনি লজ্জা পেতেন, যেতেন না।' বিজন বলল, 'সুন্দর সুগঠিত দেহ কার না ভালো লাগে? অনুতোষ ঠিকই বলেছে, এক-একজন মল্ল যেন ভাস্কর্যের প্রতীক। কিন্তু কথা কি জানেন, কুস্তির সময় তারা যে সব কান্ড করে, যেমন গরিলার মতো গর্জন করা, চুল ওপড়ানো, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া, এ সব শুধু দর্শকদেরই মনোরঞ্জনের জন্যে। এ সব বীভৎসতা না থাকলে এত লোক দেখতে যেতো না, পয়সা উঠত না। কাজেই এটা হলো ব্যবসাদারী। ব্যবসার জন্যেই তাদের পড়ে-পড়ে এমন মার খেতে হয়। কী করুণ ব্যাপার ভাবলেও আমার কষ্ট হয়। অথচ আমাদেরই আদিম নিষ্ঠুরতাকে খুশি করার জন্যে এত আয়োজন।......হয়তো এককালে আমরা নরবলি দিয়েও এমনি উল্লাস অনুভব করতুম।'

আড্ডার ভিতর একটা থমথমে আব-হাওয়া নেমে এল। আমি জোর করে হেসে বললাম, 'বিজন, তুমি তুলি ছেড়ে কলম ধর। আমার মনে হয় পৃথিবীতে তাহলে অচিরাৎ স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে।'

শুনে সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সেদিনের মতো আমাদের কথার কুস্তি সাঙ্গ হল।

ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধানে

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকালের দরবারে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলা কলকথায় ইংরাজী ১৮৬১ সাল এক পরমাশ্চর্য জন্মলগ্ন। কতো শিশু মায়ের কোল জুড়ে বসলো কিন্তু সেদিন কী কেউ কল্পনা করেছিল—এদেরই মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন, মতিলাল, মদনমোহন, ব্রহ্মবান্ধব, বিজয়রত্ন সপ্তর্ষিদের দল, অষ্টবসুদের সখা, ভাবগঙ্গার পুত্রেরা। বাংলার মননের ইতিহাসে এ এক বিরল ঋতুর পরিবর্তনের যুগ। সিপাহী বিদ্রোহ মোটে চার বছর আগের ঘটনা। ইংরাজ এসেছে, পশ্চিম থেকে এসেছে জোয়ার—তার দুর্বার স্রোত শুধু বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধ, সমাজসচেতনাতা নিয়েই ধাক্কা দিচ্ছে না, আনছে জীবনযাত্রার অভ্যস্ত উপকরণের বাইরের বহু জিনিষ, নূতন মূল্যায়ন, প্রশস্ততর দৃষ্টিও। শিক্ষার নূতন রীতিনীতি গৃহীত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাবালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পর্ব সামাজিক শান্ত জীবনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়েছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে তীব্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ও কেশব সেনের বাগ্মিতায় যার প্রতিপত্তি সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। ওদিকে আন্তর জীবনের আর এক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে—দক্ষিণপাণি দেবতার আবির্ভাবে। দেবী ভবতারিণী নামছেন আকাশ বেয়ে, মেঘাঙ্গী বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী। মাইকেল লিখছেন, বঙ্কিম আসছেন। বাংলা দেশে সমন্বয়ী সাধনার বীজচেতনায় বপন হচ্ছে। এই মিতালীর প্রথম সুর প্রথম প্রণয়পরশগুঞ্জন বাংলা দেশেই। কবি, সাধক, কর্মী জ্ঞানী সবাই "মুগ্ধনয়ান পেতে আছ কান গান বিরচিব বলে"। কিন্তু যে গান গাওয়া হলো, যে গীত রচিত হলো গৌড়জনের মধুপানের জন্য তা পশ্চিমী জারকরসে শোধিত হলেও ভারতীয় মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাকে 'রেনাসাস' বলি, 'রিফরমেশন' বলি, কাউন্টার রিফরমেশন' বলি, বা 'রিভাইভালিসম' বলি তাতে কিছু যায় আসে না।

শতবর্ষ আগের এমনি একটি দিনে (১২ই ফেব্রুয়ারী) হুগলী জেলার একটি গণ্ডগ্রামে আবির্ভূত হলেন এক বীর শিশু। সার্থক নামকরণ হলো—ভবানীচরণ—এ যেন নিয়তির নির্দেশ, জন্মাবধি মায়েরই পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীঅরবিন্দের কল্পনার ভবানী মন্দিরের একনিষ্ঠ সেবক হয়েছিলেন। পরের যুগে যে নাম তিনি গ্রহণ করলেন তাও অত্যন্ত অর্থবাহ। ব্রহ্মবান্ধব কাকে বলি আমরা—না যিনি ব্রহ্মের অর্থাৎ সর্বং খলু ইদংএর, আপামর সাধারণের, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত জগতের সুহৃদ বা মিত্র। সর্বভূতহিতায় সর্বজনসুখায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আর বান্ধব ত শুধু উৎসব বাসনের সঙ্গী নন, রাজদ্বারে শ্মশানেও যিনি পাশে দাঁড়ান, আশ্বাস দেন যিনি। জানি এখানি হয়তো সমালোচনা হবে যে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন গোঁড়া ন্যাশনালিষ্ট এবং সেকালে এঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজ-বিদ্বেষী। তাই যদি হয় তাহলে তিনি সকলের বান্ধব কোন ন্যায়সূত্রে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ চেতনায় মৈত্রীভাবনা ওতোপ্রোত ও তার রূপ বিভিন্ন। শত্রুভাবে ভজনারও কল্পনা আছে জগাদ্ধিতায়। দূরদৃষ্টিতে তিনি বহুপূর্বেই দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়াই ইংরেজের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকৃৎ পথ, বিশ্ববিধানে সেই ছিল অমোঘ নিয়ম।

ব্রহ্মবান্ধবের সম্বন্ধে যে উপমাটি মনে পড়ে সেটি হচ্ছে বেদের সেই প্রথম মন্ত্র, জাগরণের প্রথম ছন্দ—অগ্নিমীলে পুরোহিতং হোতারং রত্নধাতমম্—অগ্নি মানেই হচ্ছে অগ্রণী যিনি আগুয়ান, এগিয়ে যান। আগুন শুধু ত অরণিকাষ্ঠে ঘসে জ্বালানো অনলশিখা নয়—মানুষের মনের অভীপ্সা, জীবনের ঊর্ধ্বমুখী চেতনাও। আগুন পাবনও বটে—সে পুড়িয়ে দিয়ে কালো দাগই রেখে যায় না, অঙ্গারেই তার শেষ নয়, অনঙ্গ হয়েও সে বেঁচে থাকে প্রতিজ্ঞায়, তপস্যায়, আনন্দে, সেবায়, মাধুর্যে, জ্ঞানে স্বাধীনতায় স্বরাট বিরাট সম্রাট হয়ে—সেই আগুন আর তার প্রতীককেই আমরা নমস্কার করি—স্তব করি, 'ঈড় স্তুতো।' এই আগুন-ছোঁয়া মানুষই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। প্রথম জীবনে তিনি

ধরলেন কেশবচন্দ্রের শিষ্য হয়ে—কিন্তু মন ভরলোনা—The Quest eternal তাঁকে করলে প্রোটেস্টান্ট, পরে তিনি মেরীমাতার পূজারী রোম্যান ক্যাথলিক, আবার ঘুরে ফিরে বৈদান্তিক-অদ্বৈতবাদী। বাইরে ধর্মের খোলসে কি আসে যায়, আসলে তাঁর বৈদান্তিক-মন জীব শিবকে এক করে সোহং এর বাণী শুনলে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপনে, কেম্ব্রিজে গেলেন তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিতে, কিন্তু দেশের জন্য গভীর মমত্ববোধ থাকতে দিলে না ঐ সন্যাসীকে সাগরপারে, তিনি ফিরে এসে বার করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি তাঁর ভাষায় যে মদিররস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেলো বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন বৈদান্তিক সন্যাসীর এতো বড় প্রচন্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপ দিলেন তিনি।

এই মানুষটি কিরকম ছিলেন তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন। তাছাড়া সাময়িক পত্রিকায় তাঁর নিজের লেখা আছে, যা থেকে এই অগ্নিগর্ভ সন্যাসীর মনের বিপুল ব্যথার কিছুটা পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী, অধ্যাত্ম বিদ্যায় যাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি। শান্তি-নিকেতনে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসেবে আশ্রমের সংলগ্ন গ্রাম্যপথে পদচারণ করতে করতে কবির সঙ্গে আলোচনাকালে কত দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন তার সাক্ষীও স্বয়ং কবিগুরু।

নিজের কথা নিজেই বলেছেন। ঘর নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান পরিব্রাজক সন্যাসী—একদিন কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে গোয়া-লিয়রে গিছলেন দেশ স্বাধীন করবার কল্পনায় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার মতলব নিয়ে। আবার ইচ্ছা ছিল নর্মদার তীরে আশ্রম স্থাপন করে ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করবেন, কিন্তু একটি কথা শূলের মত বিঁধতো তাঁকে—ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু কবে—জ্বালা ধরিয়ে দিতো তাঁর মনে। তাই তাঁর মনে জেগে উঠলো স্বরাজগড় স্থাপনের প্রতিজ্ঞা—গোলামগড় নয়—তাই তিনি বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন বাজে তখন কি আর ভাবনা থাকে—সৌজন্য-ভদ্রতা কি আর রক্ষা করা যায়... যখন ভাই ঘরে আগুন লাগে তখন কি আর শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার সময় থাকে— তখন কেবল এলোমেলো চাল—কেবল রোল কেবল গোল। তখন আর পুকুরের জল—কি নর্দমার জল জ্ঞান থাকে না। কেবল ঢালো ঢালো নিবাও নিবাও। শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপতপ বাঁধন-ছাঁদিন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল-পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলামগড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজগড় গড়িতে—স্বরাজতন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান। ....আর সংশয় করিও না, সন্দেহ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।"

কিন্তু এই স্বরাজ অরবিন্দ রবীন্দ্র-নাথ ব্রহ্মবান্ধবের কাছে শুধু political emancipation নয়, আরো মহৎ আরো উদার, আরো বিরাট পরিকল্পনা। তাই ব্রহ্মবান্ধব বললেন, মানবসমাজ একটি রথ—বিশ্ব-রথী টানছেন ছোট্ট জগন্নাথকে দেখে বিশ্বনাথের ধ্যান করি, সংসাররথ ও কর্মচক্রের কথা ভাবি, ভাবি সেই বিশ্ব-রথের চালককে—দে দোল দে দোল। দেশকে তাঁরা দেখেছিলেন, মৃন্ময়ীরূপে নয়, চিন্ময়ী মা হিসাবে। চার অধ্যায়ের আভাসে ব্রহ্মবান্ধবের উল্লেখ অনেককেই এক-সময়ে কবির প্রতি বিরূপ করেছিল। বাদানুবাদ তর্কও হয়েছিল যথেষ্ট। অনেক কৈফিয়ৎও রবীন্দ্রনাথকে দিতে হয়েছিল, তারই এক জায়গায় কবি বলেন—যে একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন, যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। একথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বললেও একথা থেকে যায় যে প্রহর শেষের রাঙা আলোয় চৈত্র মাসে কিসের সর্বনাশ তিনি দেখেছিলেন। মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের দূরপ্রসারী দৃষ্টি ঠিকই ধরে-ছিল যে রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকী ভগীরথ তিনি ছিলেন না, তাই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে—রবিবাবু, আমার পতন হয়েছে। যাই হোক চার-অধ্যায় সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা আভাস ও তার কৈফিয়ৎ এর বাহ্য, আসলে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন—**He was a great soul.**

সাহিত্য-রস-রসিক ব্রহ্মবান্ধবের দুপাশে ভারতজীবনের দুই পথ-পরিচায়ককে দেখি—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। Sophia পত্রে (১৯০০ সাল ১লা সেপ্টেম্বর) তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে অভিনন্দন জানালেন—The world poet of Bengal. অপূর্ব ভাষায় চল্লিশ বছরের রবীন্দ্রনাথের যে ছবি আঁকলেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে অনবদ্য, শিল্পী মনের নিখুঁত অলংকরণের পরিচয়—কবি কি রকম—সদ্য বিকশিত চাঁপা ফুলের মত রং তাঁর, চিকন কালো অলকদাম পদ্মসদৃশ দুটি চোখ, চিত্রিত-বৎ ভ্রুযুগল, উন্নতনাসিকা, মরাল-গ্রীবা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীপ্তদীর্ঘদেহ-মহিমা যেন র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি—দেবদারু গাছের মত তার শিকড়গুলি চলে গেছে মাটির নীচে, অনেক অনেক দূরে—তার শীর্ষ-দেশ গগনচুম্বী যেন আকাশ বিদ্ধ করবে। আবার শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লিখলেন—এ হচ্চে মানস-সরোবরের অরবিন্দ—অমলশুভ্র অরবিন্দ, প্রস্ফুটিত শতদল—সাত্ত্বিকতর দিব্যশ্রী—বজ্রের মত বহির্গর্ভ, কমলপর্ণের ন্যায় কান্তপেলব, এ হেন জ্ঞানাঢ্য ও এমন ধ্যানসমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না।........যাঁর কাছে মরণকে মনে হইবে বসন্ত-বিলাস— কামান-বন্দুক জেল-কারাগার আইন-আদালত লাটবেলাট সব ফক্কিকার—ফিরিঙ্গির হুড়ুম দুড়ুম দুদিনেই অক্কা।"

সাহিত্যিক ব্রহ্মবান্ধবের সম্যক পরিচয় **Sophia, Twentieth Century** প্রভৃতি কাগজে ও "বিলাতযাত্রী সন্যাসীর চিঠি", "সমাজতত্ত্ব", "আমার ভারত উদ্ধার", "ব্রহ্মামৃত", "পালাপার্বণ" প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যাবে এবং "সন্ধ্যার" প্রতি ছত্রে ছত্রে। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় সুকুমার দত্তর "নবজীবন" এই সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন যার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ও ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহু গবেষণা করেছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যুতে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তার সম্যক বিচার হয়তো অপ্রকাশিত থেকে যাবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মনীষীর তিরোধান হয়। ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন যে, এ হচ্চে মায়ের দাবী—শ্রীঅরবিন্দের কথায় The Demand of the Mother—শুধু নবজাগরণ নয়, নব জন্মও। তাই তাঁর কাছে স্বাধীন ভারতবর্ষ কাঠ পাথর মাটি ছিল না। তার ধ্যানমূর্তি দেখে ছিলেন তিনি, ভাবৈকসিদ্ধিতে ভরপুর হয়ে মেতেছিলেন "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" —সে শুধু রাজনীতি নয়, পরি-পূর্ণ জীবনেরও নীতি। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, এমন কোন ব্রিটিশ জেল নেই যা আমাকে ধরে রাখতে পারে। পারেওনি, মৃত্যুর দুয়ার দিয়েই তিনি অমৃতত্বকে প্রমাণ করে গেলেন।

কনক কুঞ্জের রহস্য

পরিমল গোস্বামী

।। এক ।।

"শুনেছ, বাবা?"

"শুনেছি মা, শুনেছি। শারলক-হোমস অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তার মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তাই না?"

"না বাবা, তুমি কিছুই শোননি। আমি এখন পড়ছি—আইরীন অ্যাডলারের ঘরের মধ্যে ঘন ধোঁয়া এসে ঢুকেছে, বাইরে 'আগুন' 'আগুন' চিৎকার। শোননি?"

দিনেশ গাঙ্গুলি সত্যিই কিছু শোনেননি, শোনার ভান করছিলেন এতক্ষণ।

শারলক হোমস কে, তার বাড়ি কোথায়, অবস্থা কেমন, এসব কিছুই এতদিন তাঁর জানা ছিল না। তাঁর বি-এ পাস শারলক হোমস ভক্ত মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে এখন জানতে হচ্ছে। বাবা শারলক হোমস কে জানেন না, এ বড়ই লজ্জার কথা। তাই কণকপ্রভা তাঁকে মাঝে মাঝে এক একটা গল্প প'ড়ে শোনায় এবং ডিটেকটিভের অনুসন্ধানের বিশেষ কৌশলটি বুঝিয়ে দেয়। আপাতত সে পড়ছিল এ 'স্ক্যানডাল ইন বোহেমিয়া' নামক গল্পটি। কিন্তু স্ক্যানডালের কথা শুনে জমিদার দিনেশ গাঙ্গুলি গোড়ায় যতটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন, ততটা বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর নতুন তৈরি মস্ত বড় বাগান-বাড়িখানা এত দিন পরে আজ ভাড়া হয়ে যাবার কথা, তাঁর বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্মচারী কালীচরণ অনেকক্ষণ গেছেন দলিল সই করিয়ে অগ্রিম ছ মাসের ভাড়া আনতে, কিন্তু তাঁর আসতে দেরি দেখে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন, আর সেজন্য শারলক হোমস ক্রমেই মাথায় উঠছে, মাথার ভিতরে যেতে পারছে না।

এমন সময় সংবাদ এলো কালীচরণ এসে গিয়েছেন। দিনেশ গাঙ্গুলি খবর শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কনক-প্রভা দুঃখিত মনে বই বন্ধ করল।

দিনেশ গাঙ্গুলি তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে কালীচরণের কাছ থেকে নগদ বারো শ' টাকার বারোখানি নোট গুনে নিয়ে রসিদ বইখানা মিলিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো সন্দেহ করেনি তো?"

"না।"

"অন্য লোক শত্রুতা ক'রে কিছু লাগায়নি তো?"

"আজ্ঞে না, সময় পায়নি, যতীনবাবু আজই ভোরবেলা পৌঁছেছেন কি না।"

"ও'রা কবে আসছেন ও বাড়িতে?"

"যতীনবাবু বললেন মাস পয়লা একটু অসুবিধা হবে, কারণ তাঁর পরি-বার দুদিন আগেই এসে পড়ছেন। লখনৌ থেকে আসছেন, এখানে ওঠবার জায়গা নেই আর।"

"তুমি রাজি হয়েছ?"
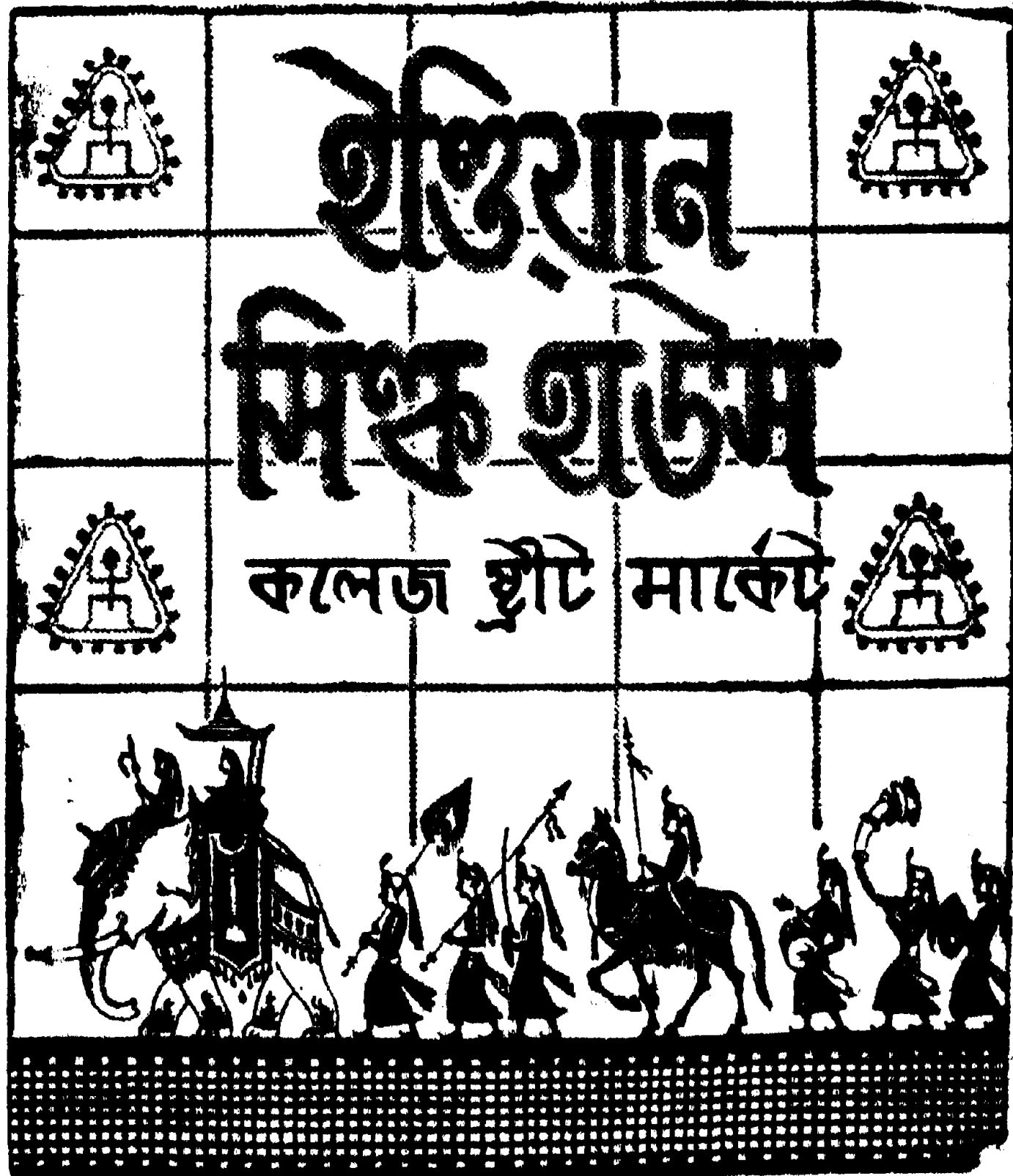
"বলেছি, তাই আসবেন।"

দিনেশ গাঙ্গুলি মনে মনে খুশি হলেন, বললেন, "তা হলে এসো এখন।"

"আর একটি কথা"—কালীচরণ অসঙ্কোচে বললেন, "যতীনবাবুকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তিনি দেখে বললেন, 'এতবড় বাড়ি তাঁরা লোক মাত্র চার পাঁচ জন, সাব-লেট করতে পারব তো'? আমি বললাম 'তা নিশ্চয়ই পারবেন'। তিনি বললেন 'তা হলে দলিলে একটুখানি লিখে দিয়ে যান।"

"তুমি দিলে?"

"জানি কি না, উনি তো দু'দিনেই বাড়ি ছাড়বেন, দুনিয়াও ছাড়তে পারেন, তাই দিলাম।"

"বেশ করেছ," বললেন দিনেশ গাঙ্গুলি, "যা করেছ সবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।"

দিনেশ গাঙ্গুলি কনককুঞ্জের ভবিষ্যৎ ভাবেন না, সব সময় এখন তার বর্তমান-টাই তাঁর লক্ষ্য। অতএব শুধু বারো শ' টাকার কথা ভাবলেন, আর একবার যতীন রায়ের ভবিষ্যৎটা ভাবলেন এবং মনে মনে হাসলেন।

তাঁর খুশি হবার কারণ—ঐ বাড়ি কেউ ভাড়া নেয় না। নিলে অন্তত আট শ' টাকা হ'ত আজকের দিনে। তাই বারো শ টাকাকে তিনি লটারিতে পাওয়া টাকার তুল্য মনে করলেন।

যতীনবাবু লখনো থেকে 'দু'শ টাকার মধ্যে নির্জন স্থানে বাড়ি চাই' বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দিনেশ গাঙ্গুলি টেলিগ্রাফ ক'রে বাড়ির অবস্থা এবং ছ মাসের ভাড়ার কথা জানিয়েছিলেন তাঁকে।

ও বাড়ি কেউ ভাড়া নেয় না, কারণ ওটি ভূতের বাড়ি। এর আগে পর পর দু'জন ভাড়াটে রাত্রে ভূত দেখে বিকট চিৎকার ক'রে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে শুধু ব'লে যেতে পেরেছেন, 'ভূত!' দু'জনেই একই কথা বলেছেন। তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে জড়িত স্বরে বলেছেন, 'সুন্দর চেহারা, কথা বলে অনেক কিন্তু তার কোনো মানে হয় না।'

কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে শহরে। রাত্রে কেউ এখন আর ও বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটে না, কি জানি যদি ঘাড় মটকায়।

শহর থেকে দূরে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে এই কনককুঞ্জ। দিনেশ গাঙ্গুলির একমাত্র সন্তান শ্রীমতী কনকপ্রভার নামে এই বাড়ি। এমন বাড়ি, অথচ ভূত।

ঢিল ছোঁড়ে না, দরজায় গুঁতো মারে না, শুধু সামনে এসে এলোমেলো কথা বলে, হাঁপায়, এবং মাঝে মাঝে বলে—'ওঠ এখান থেকে, এ বাড়ি আমার।'

ভূতের এটি একটি অতি জঘন্য মিথ্যা কথা। কারণ বাড়িটি সম্পূর্ণ নতুন এবং জমি কেনার দলিলে কোনো গোলমাল নেই। প্রথম ভাড়াটে মারা গেলে দিনেশ গাঙ্গুলি শুনেছিলেন, ভূত ওটিকে নিজের বাড়ি বলে দাবী করছে। সেজন্য তিনি ভূতকে দেখাবার জন্য বাড়ি-সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল কনককুঞ্জের একটি ঘরে টাঙিয়েও রেখেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। দ্বিতীয় ভাড়াটেকেও ভূত উচ্ছেদ করেছে, তাকেও মরতে হয়েছে। ভূত যে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারে তা ভেবে দিনেশ গাঙ্গুলি অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়েছেন। ঐ বাড়িটি এখন তাঁর কাছে প্রায় অভিশাপের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

দিনেশ গাঙ্গুলি ব্যবসায়ী। তিনি জেনেশুনে ভূতের বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন। ভূতের হাতে মৃত্যু জেনেও নতুন ভাড়াটেকে সেই মৃত্যুর মুখে পাঠাচ্ছেন সামান্য টাকার লোভে।

যতীন রায়ের এই বাড়িটি নেবার কারণ, তাঁর স্ত্রী উন্মাদ। সব সময় চেঁচান এবং তাঁর প্রত্যেকটি কণ্ঠনিঃসৃত শব্দই কর্ণভেদী। তাঁকে নিয়ে লোকালয়ে কোথাও শান্তিতে থাকবার উপায় নেই। প্রতিবেশীদের আপত্তি হয়। তাই যতীন-বাবু কলকাতার বাইরে একখানা নিরি-বিলি বাড়ি খুঁজছিলেন। লখনোতে মনোরমা দেবীকে নিয়ে টেকা অসম্ভব।

কিন্তু এটি যে ভূতের বাড়ি তা তিনি কি ক'রে জানবেন? যখন জানলেন, তখন ছ মাসের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে এবং এ বাড়িতে এসে ওঠা হয়েছে।

একজন লোক নতুন ভাড়াটে দেখে তাঁকে অযাচিত ভাবে জানিয়ে গেল কথাটা। "মশায় করেছেন কি? এমন বাড়ি ভাড়া নিলেন? এ যে ভূতের বাড়ি!"

যতীনবাবুর মুখে কথা নেই। অনেক ক্ষণ স্তম্ভিতবৎ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন "সত্যি বলছেন?"

লোকটি যত রকমে সম্ভব যতীন-বাবুর মনে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করল এবং যেটুকু বাকি রইল অন্য লোক পাঠিয়ে সেটুকু পূরণ করল।

যতীনবাবু বিপদ গনলেন, কিন্তু বাড়ির কাউকে কিছু জানালেন না। ভাব-লেন যদি মিথ্যা হয়, আগেই কেন সবাইকে ভয় পাওয়াই। কিন্তু লোক দুটি শপথ ক'রে বলে গেছে, তারাই এ বাড়ির দু'জন ভূতের-ভয়ে-মরা লোককে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে গেছে শ্মশানে, আরও যারা ঘাড় দিয়েছিল তাদেরও দরকার হ'লে পাঠাতে পারে।

যতীনবাবু বলেছিলেন, "না তা আর দরকার হবে না।"

।। দুই ।।

মনোরমার জন্য বরাবরই পৃথক ঘর, এখানেও সেই ব্যবস্থা হল। তবে এমন একটি ঘর নেওয়া হ'ল যার ঠিক সামনেই আর একখানা ঘর, যাতে রাত্রে ঐ ঘরে যতীনবাবু লুকিয়ে স্ত্রীকে পাহারা দিতে পারেন।

ছেলে জ্যোতিষ ও মেয়ে মিনু—তাদের প্রত্যেকের ঘর আলাদা এবং তাদের মায়ের ঘর থেকে অনেক দূরে। ছেলেটি সদ্য এম-এ পাস। তার একটি ভাল চাকরির চেষ্টা করতে হবে কলকাতায়, এবং মেয়েটিরও বিয়ের চেষ্টা। কলকাতা আসার এও অন্যতম উদ্দেশ্য।

রাত এগারোটায় যতীনবাবু এলেন তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে। সে ঘর অন্ধকার। বাইরে চারদিকেই অনেক ফাঁকা জমি, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অনেক গাছ লাগানো হয়েছে, সেগুলো বড় হয়নি এখনও। কিছু ফাঁকা, কিছু বাগান। তাই জায়গাটা বড়ই নির্জন বোধ হয়। ভূতের পক্ষে আদর্শ বাড়ি।

ভূত রাত বারোটায় আসে, তাই তিনি তার কিছু আগেই এসেছেন। তা ভিন্ন মনটাকেও তৈরি করতে হবে। সাহস এবং শক্তি দুই-ই তাঁর আছে, কিন্তু তবু ভূত তো, তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে তা তাঁর জানা নেই। ভূত সম্ভবত তাঁর স্ত্রীর ঘরেই আগে আসবে, কারণ ঐ ঘরটাতেই আলো জ্বলছে। তাঁর ঘরেও আসতে পারে, কিন্তু আলো থাকতে অন্ধকার তার পছন্দ হবে কি না কে জানে। শুধু মনের জোরে এতখানি ঝুঁকি নেওয়া।

রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়িটি দেখে নিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা কখন যে কেটে গেছে। শুভ সময় সমাগত। তার-

পর অনির্দিষ্ট অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। ভাবতেও সমস্ত গায়ে কাঁটা গজিয়ে যাচ্ছে।

গ্রীষ্মকাল। বাইরের আকাশে তখন ঝড়ের সঙ্কেত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর গুরু গুরু গর্জন। মেঘ ক্রমে ঘনিয়ে আসছে উত্তর-পশ্চিম আকাশে, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশ। ঐ পথেই হয়তো ভূতের অভিসার ঘটবে।

ঝড় উঠে এলো। আর তারই পাশাপাশি আরও একটা সোঁ সোঁ শব্দ। তীরের বেগে একটি ছায়া মূর্তি এসে নামল বারান্দায়। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্য দেখা গেল তাকে। সুন্দর চেহারা, যেন মেঘের একটি দূত। কিংবা যেন রোমক পুরাণের দেবতা মারকুরি। যতীনবাবুর নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। সে যে দিক থেকে এসেছে, সে দিকে সে ভীতভাবে একবার তাকাল, তারপর কি সব বলতে বলতে এগোতে লাগল ঘরের আলোর দিকে। কি বলছে বোঝা গেল না, কিন্তু সেগুলো সবই বাংলা কথা। যতীনবাবু বুঝলেন, বাঙালী ভূত।

ভূত এগিয়ে এলো মনোরমার ঘরের সামনে। যতীনবাবুর গা ঘামছে। ইতিমধ্যে বাইরে ঝড় উঠে এসেছে, বৃষ্টিও তার সঙ্গে। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে তাঁর পিঠে। কিন্তু এক সেন্টিমিটার নড়বার উপায় নেই, তাঁর সমস্ত শক্তি লুপ্ত। চোখ বুজে আছেন, আর কাঁপতে কাঁপতে চকিতে চোখ খুলে এক একবার ভূতকে দেখছেন। তিনি একটি অমোঘ অপরিহার্য পরিণামের অপেক্ষা করছেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে। মনে হচ্ছে যেন ভূত এইবার তার মারণক্রিয়া আরম্ভ করবে। কিছুই তো করবার নেই এখন, চেঁচাতে গেলে ভূত আরও ক্ষেপে যেতে পারে। আর চেঁচাতে চাইলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না। তিনি বোকার মতো চেয়ে রইলেন ভূতের দিকে।

এবং শুনতে পেলেন, ভূত আপন মনে বকে চলেছে 'ফ্রয়েড! ফ্রয়েড কি করবে? আর না?"—আপন মনেই বকতে বকতে হঠাৎ মনোরমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁর চিন্তাশক্তিও আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভিজে জামায় জমে বসে আছেন একই জায়গায়। মাঝে মাঝে চকিতে চোখ খুলছেন এবং ভূতের শেষ মারটির জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে শুনলেন ভূত চিৎকার ক'রে উঠল 'স্কিজোফ্রেনিয়া।' ঝড়ের শব্দের সঙ্গে সে চিৎকার মিশলে বীভৎস শোনাল।

যতীনবাবুর দৃষ্টি ঝাপসা। কি যে দেখছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

তবু অনুমানে বুঝতে পারলেন, ভূত মনোরমার সামনে গিয়ে বসল। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল ভূত 'স্কিজোফ্রেনিয়া!' ব'লে চিৎকার করছে। তাঁর কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল এতক্ষণে। তবে কি এটি কোনো ডাক্তারের ভূত? কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? কে যেন তাঁর সকল শক্তি হরণ ক'রে নিয়েছে। রাত একটা, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি, ভিতরে ভূত, আর পাগল স্ত্রী।

তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মনে ক্লান্ত আরও বেশি। আর কিছু ভাবতে পারছেন না। শুধু দেখছেন। দেখছেন ভূত মনোরমার সঙ্গে কথা বলছে।

মনোরমা। "তুমি কে? পৃথিবী কতটুকু?"

ভূত। "তিন হাজার ছেলে। সমস্ত গাছ। ভালবাসা মহৎ। সাইকোঅ্যানালিসিস।"

মনোরমা। "তুমি হাসতে পার?"

ভূত। "আকাশে শুধু তারা। জানি না। শুধু অপমান। অপমান। অপমান। সব কাটাকাটি। সাইকোঅ্যানালিসিস।"

এই জাতীয় আলাপ। বাইরেও ঝড়ের প্রলাপ।

ভূতের স্কিজোফ্রেনিয়া? মানে, সেও পাগল? এ কি রহস্য! দুজনের একই অসুখ, একই সব লক্ষণ। প্রথম রাত্রিটা তা হ'লে নিরাপদেই কাটল, তা হ'লে খুব অনিষ্ট বোধ হয় করবে না ভূত। কিন্তু এ সব কথা আপাতত কাউকে বলা হবে না।

বাইরের লোকেরা যতীনবাবুকে জীবন্ত দেখে অবাক হয়েছে এবং এসে নানা রকম জেরা করেছে কিন্তু যতীনবাবু বলেছেন, "কৈ ভূত তো দেখিনি।"

শুনে সবাই হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। বার বার লোক এসেছে জানতে, সবাই ভাবছে যতীনবাবু তাদের ঠকাচ্ছেন।

।। তিন ।।

এরপর থেকে প্রতি রাত্রেই ভূতের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। যতীনবাবু দিনে ঘুমোন, রাত্রে সেই ঘরটিতে গিয়ে পাহারা দেন। প্রতি রাত্রে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। ভূতের ইতিহাসে এমন কথাও শোনা যায় নি, ভূতেরও যে মাথা খারাপ হতে পারে এ কথাও তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এর পরিণাম না দেখে কাউকে কিছু বলবেন না। ছেলেমেয়েরাও এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারল না।

কিন্তু অদ্ভুত এক ব্যাপার। যত দিন যায় তত দেখেন মনোরমার মধ্যে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটছে এবং ভূতের মধ্যেও। সুতরাং ভূতকে আর শত্রুপক্ষ ভাবা বা তাকে কোনো বাধা দেওয়ার কথাই আর ওঠে না।

আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল ওদের দুজনের কথা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দুজনেরই কথার একটা মোটামুটি অর্থ হয়, দুজনেরই চোখের দৃষ্টি অনেকটা স্বাভাবিক, আগের মতো অতখানি উদাস নয়। তবু কোথায় যেন একটুখানি বাধা। ওদের মনের আকাশে সূর্য উঠেছে কিন্তু কুয়াসা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নি। মনে আশা জাগে।

যতীনবাবু একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন সেই অন্ধকার ঘরে ব'সে। তাঁর নিজের ঘাড় থেকেই যেন একটা ভূত নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এবং এখনও তিনি এ বিষয়ে কাউকে একটি কথা বললেন না। স্ত্রীকেও না। ঘটনা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ এক মাসের মাথায় আরও একটি প্রচণ্ড বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল।

সে দিন যতীনবাবু যথাসময়ে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে ভূতের অপেক্ষা করছিলেন। ভাবছিলেন আরও কয়েকদিন পরে ভূতকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং তার অভ্যর্থনার জন্য একটা গোপন অনুষ্ঠানও করবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। তার মতো বন্ধুকে তিনি ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, তাঁকে শেষ পর্যন্ত শালা বলতে হ'ল।

মনোরমা এখন দিনের বেলা স্বাভাবিকভাবে কাটান, কিন্তু কথা খুবই কম বলেন. মাত্র একটা কি

দ্রুটো। বড় অবসন্ন দেখায় তাঁকে। ঘুমোন খুব বেশি। রাত্রে ডেকে তুলে খাওয়াতে হয়। যতীনবাবুর ভয় হয় এমন অবস্থায় ভূতের সংগে বেশিক্ষণ থাকলে আবার অবস্থা খারাপের দিকে না যায়।

কিন্তু তাঁর ধারণা সত্য নয়।

মনোরমা তাঁর সেই নির্দিষ্ট ঘরটিতে ঘুমিয়ে ছিলেন, যতীনবাবু বিপরীত ঘরে যথারীতি পাহারা দিচ্ছিলেন। ভূত তার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পড়ল। আসবার সময় কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ হ'ল, রোজই হয়। মনোরমা সংগে সংগে জেগে উঠলেন। মনের সংগে মনের কিভাবে এই জাতীয় যোগাযোগ ঘটে যতীনবাবু ভাবতে লাগলেন। যে ঘুম সহজে ভাঙে না, গায়ে ধাকা মেরে ভাঙাতে হয়, সে ঘুম ভূতের আবির্ভাবে আপনা থেকেই

ভেঙে গেল। মনোরমা জেগে উঠেই ভূতকে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—'অবনী!' ভূত চেঁচিয়ে উঠল—'দিদি!'.

যতীনবাবু আবার স্তম্ভিত। তিনি দেখতে লাগলেন ওরা দুজনে দুজনকে এতদিন পরে চিনতে পারল, আজ যেন ওদের মাঝখানে যে একটি আড়াল ছিল সেটি ঘুচে গেছে। ওদের মধ্যে যে ভাই-বোনের সম্পর্ক তা যতীনবাবু জানতেন না, অবনী নামক ভূতের মানবিক রূপ তিনি আগে দেখেন নি, কারণ তাঁর বিয়ের আগেই অবনীর মৃত্যু হয়। যতীনবাবু বুঝতে পারলেন ওদের দুজনেরই মাথা আজ সম্পূর্ণ সুস্থ, মনের আকাশ থেকে কুয়াসা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে, সেখানে এখন নির্মল রোদের হাসি।

দুজনের উল্লাস চলল অনেকক্ষণ। কিন্তু মনোরমার মুখখানা হঠাৎ খুব বিষন্ন হয়ে উঠল। তাঁর চোখে জল। ভূতকে, মানে, অবনীকে বললেন, "কিন্তু তুই তো বেঁচে নেই।"

"তাতে আর কি হয়েছে দিদি। তুমি তো জান আমার মাথা খারাপ হওয়াতে আমি আত্মহত্যা করেছিলাম। অবশ্য ভূত হওয়ার পরেও সেটা বুঝতে পারিনি, আজ কদিন হ'ল একটু একটু মনে পড়ছে। কিন্তু এখন আমি কত ফ্রী। তা ছাড়া মাথাও তো ভাল হয়ে গেল।"

"কিন্তু তুই আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছিস এখন। ভূতেরাও কি বয়সে বাড়ে? বুড়ো হয়? এবং শেষে মারা যায়?"

"আমি তো সে সব জানি না। এত-দিন মাথা খারাপ ছিল, এখন সব জানতে পারব, এবং তোমাকে জানিয়ে যাব। কিন্তু ভূত হয়ে কি কম শান্তি পেয়েছি? আজ তেইশ চব্বিশ বছর ভূতের রাজ্যে কেবল ছুটে বেড়াচ্ছি। সব স্পষ্ট মনে পড়ে না, তবু বড় বড় কয়েকটা কথা মনে পড়ে। দিদি, তুমি শুনলে অবাক হবে ভূত সমাজেও অনেক পাগল আছে, কিন্তু আমার নতুন ধরনের পাগলামি দেখে এক বিজ্ঞানী ভূত আমাকে তাড়া ক'রে ফিরছেন এত-দিন ধরে। তাঁর নাম ফ্রয়েড। তিনি আমাকে দেখলেই বলেন 'তোমার সাইকোঅ্যানা-লিসিস করব, মনঃসমীক্ষা করব।' আমার তখন মাথা একেবারে খারাপ, তাই তাঁকে দেখলেই আমার খুব ভয় হ'ত, মনে হ'ত তিনি আমাকে ধ'রে বেঁধে চিকিৎসা চালাবেন আমার উপর। আজ এখন মনে হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল ছিল।' '

মনোরমা বললেন, "তাঁর তাড়ায় ছুটে এ বাড়িতে না এলে আমাদের তো দেখাই হত না।"

'সে কথা ঠিক। আমি প্রাণ ভয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতাম। অনেক বাড়িই পরীক্ষা করেছি। কিন্তু দেখি সব বাড়িতেই দু'একটা ক'রে ভূত আছে। যেটায় নেই সে বাড়ি আবার আমার পছন্দ নয়। অনেক ঘুরে এই বাড়িটা পেয়ে গেলাম, দেখলাম খালি আছে, মানে ভূত নেই। এটুকু জ্ঞান আমার ছিল যে পাগলের সঙ্গে অন্য ভূত থাকতে রাজি হবে না। মানুষ থাকলেও বড় অসুবিধা হয়। তাই এই বাড়িটা দখল করতে চেয়েছিলাম মানুষ তাড়িয়ে দিয়ে। সে জন্য তাদের বলতে হত, 'এ বাড়ি আমার।' কিন্তু দিদি, তোমাকে দেখে মাথা খারাপ অবস্থায় চিনতে না পারলেও ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।"

যতীনবাবু এর পর আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। যখন বুঝলেন আর কোনো ভয় নেই তখন অন্ধকার থেকে উৎসাহের সঙ্গে বেরিয়ে এসেই ভূতকে সম্বোধন করলেন "ওরে শালা ভূত, তুমি আমাদের উচ্ছেদ করতে এসে এখন ধরা প'ড়ে গিয়েছ" ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন। এতদিনের রুদ্ধ ভাবা-বেগ তিনি মুক্ত করলেন হো হো-র ভিতর দিয়ে।

তারপর চেয়ে দেখেন ভূত মিলিয়ে গেছে।

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বললেন, "তুমিই তো তাড়ালে গাল দিয়ে।"

"গাল দেব কেন, আমি তো শুধু সম্পর্কের উল্লেখ করেছি।"—বললেন অপ্রস্তুত যতীনবাবু।

এর পর থেকে দিন ভালই কাটতে লাগল। ভূত এখন আর নিয়মিত আসে না, মাঝে মাঝে আসে এবং পরিবারের সবাই মিলে একত্র ব'সে আলাপ করে। প্রথম দিকে যতীনবাবুর ছেলে এবং মেয়ে—জ্যোতিষ এবং বন্দনা—ভূত মামার সামনে আসতে রাজি হয়নি, কিন্তু পরি-বারের এতবড় উপকারী বন্ধু হিসাবে তাকে সবাই মিলে আদর আপ্যায়ন না করলে সে হবে কৃতঘ্নতা, তাই ভূত যখনই আসে (এবং রাত বারোটা না হ'লে আসে না), তখনই ছেলেমেয়েদেরও ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হয়।

ভূতরাজ্যের অনেক কথা জানা যায় তার কাছে থেকে। ফ্রয়েডের ভূত এখন আর তাকে চিকিৎসার জন্য তাড়া করে না, এখন ফ্রয়েড ভূতই অবনী-ভূতের মাথা কি ক'রে ভাল হ'ল তা জেরা ক'রে ক'রে জেনে নেন, এবং খাতায় নোট ক'রে রাখেন। বলেন, 'দুজন স্কিজোফ্রেনিয়ার রুগী একত্র মিলতেই দুজনেরই মাথা ভাল হ'ল, এ নিয়ে গবেষণা করলে ভূত-সমাজের মস্ত উপকার করা হবে। দুটি জগতের মধ্যে যোগসূত্রটি কি, সেটাও আবিষ্কার করা দরকার।'

যতীনবাবু এ সব শুনে ভাবতে থাকেন। এইভাবেই চলতে থাকে ও'দের নতুন পর্যায়ের জীবনধারা, পারিবারিক ভূতের সঙ্গে।

॥ চার ॥

"বাবা, তুমি সেই থেকে আজ পর্যন্ত বসলেই না গল্প শুনতে।

"তুমিই তো তাড়ালে গাল দিয়ে।"

তোমার কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বল।"

দিনেশ গাঙ্গুলি কনকপ্রভার কথায় একটু আরামই বোধ করলেন। মনের কথা এ রকম ভাবে মনে মনে রেখে তাঁর বড়ই অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছু অন্তত প্রকাশ করলে হয় তো মনটা হাল্কা হতেও পারে। বললেন, "এক প্রতারকের হাতে পড়েছি, মা।"

"সে আবার কি? সব খুলে বল।"

দিনেশ গাঙ্গুলি কনকপ্রভাকে সব কথাই খুলে বললেন। তাঁর ধারণা তাঁর ঐ ভাড়াটে যতীন রায় ভূতসিদ্ধ, সেই ও বাড়িতে ভূত পাঠিয়ে দুজন ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করেছে, এবং নিজে এসে দুজন উপ-ভাড়াটেকে সাবলেট ক'রে সুখে বাস করছে। কনককুঞ্জ খালি পড়ে ছিল বেশ ছিল, তাতে একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু এখন কোনো সান্ত্বনাই নেই। কনককুঞ্জের সেই দুর্দান্ত জোচ্চোর ভূতটা গেল কোথায়? জীবনে এতবড় ধাপ্পার সম্মুখীন তিনি কখনও হননি। তাঁর এখন ক্রমেই ধারণা হচ্ছে যতীনবাবু সমস্ত জেনেশুনে ও-বাড়ি নিয়েছে, সে ভূত বশ করার কৌশল জানে।

দিনেশ গাঙ্গুলি মেয়ের কাছে নিজের মনের কথা কিছুই গোপন করলেন না। এবং যতীন রায়ের নাম উল্লেখের সময় তাঁর প্রতি কোনো সম্মান দেখানো প্রয়োজন মনে করলেন না।

কনকপ্রভা কিন্তু সব শুনে খুব উল্লসিত হয়ে উঠল। "বাবা, তুমি আমার হাতে সব ছেড়ে দাও, এ রহস্য আমি ভেদ ক'রে দেব। আমি দেখাব আমার ডিটেকটিভ গল্প পড়া সার্থক হয়েছে। আমি তোমার বাড়ি ঠিক উদ্ধার ক'রে দেব, তুমি কিছু ভেবো না। এ কথা আগে বলতে হয়। ভূতের রহস্যও আমি ভেদ করে দেব।"

মেয়ের বুদ্ধির উপর দিনেশ গাঙ্গুলির খুব শ্রদ্ধা নেই। সে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, সে নিশ্চয় বড় গোয়েন্দাদের সমগোত্রের মনে করে নিজেকে। তবু তিনি বললেন, "আমি যখন বুঝতে পারছি না কিছু, তখন আর আপত্তি কি? এত গোয়েন্দা বই পড়েছিস, তুই হয় তো পারবি। পারলে বড় রকমের পুরস্কার দেব।"

বললেন বটে, কিন্তু তা নিতান্তই ঝোঁকের মাথায়। মেয়েদের বুদ্ধির উপর তাঁর কোনো দিনই ভরসা নেই। কনকপ্রভার বইপড়া বিদ্যা যতই থাক, হাতে-কলমে ও কি করবে? কিন্তু ধরেছে যখন তখন তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। বরং উৎসাহই দিলেন। এবং সেই সঙ্গে নিজে যথারীতি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। যতীন রায়কে উচ্ছেদ করা চাইই যেমন ক'রে হোক।

কিন্তু দিনেশ গাঙ্গুলির যত বুদ্ধিই থাক, একটি বিষয়ে তিনি ভুল করলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের মেয়ের বুদ্ধির উপরে ভরসা না ক'রে ভুল করলেন। অবশ্য এ ভুলের দরুন যে ক্ষতি হ'তে পারত, সে ক্ষতির হাত থেকে কনকপ্রভার বুদ্ধিই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

॥ পাঁচ ॥

ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত।

কনকপ্রভা যতীনবাবুর পরিবারের সঙ্গে কৌশলে পরিচিত হয়েছে, নিজের পরিচয়টি গোপন রেখে। রোজ যাচ্ছে সেখানে, এবং কোনো কথাই তার বাবাকে বলছে না এখন। এবং তিনিও মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

কনকপ্রভার ক্ষমতা আছে বটে। সে সামান্য কয়েক দিনের আলাপেই যতীন-বাবুদের আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছে। এইবার তার কথা বা'র করবার পালা।

সে প্রত্যেকটি ধাপ এগোয় আর একটু ক'রে ভেবে নেয় শার্লক হোমস হলে এ অবস্থায় কি করতেন। খুব দ্বিধার সঙ্গে অথচ অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সে। বাড়ি উদ্ধার তাকে করতেই হবে, এবং প্রমাণ ক'রে ছাড়বে যে উকিলের বুদ্ধির চেয়ে ডিটেকটিভের বুদ্ধি বেশি।

অল্পদিনের মধ্যেই সে ভূতের তথ্যও জেনে ফেলল এবং একদিন তার বাবার বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং কোনো বিপদ হবে না গ্যারান্টি দিয়ে কনককুঞ্জে রাত একটা পর্যন্ত রইল এবং অবনী-ভূতের সঙ্গে আলাপ করল। তার বাবাকে অবশ্য ভূতের কথা এখনও কিছু সে জানায়নি, জানাবার ইচ্ছাও তার হয়নি নানা কারণে, এবং সবগুলি কারণই বৈধ।

তার গাড়ি কনককুঞ্জ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তার অনুসন্ধান কাজ শেষ হ'লে সে একাই ফিরে আসে। বেশি রাত্রে অবশ্য সে একদিনই গিয়ে-ছিল সেখানে।

যতীনবাবুর কাছ থেকেই সে বেশির ভাগ তথ্য জেনেছে। ভূতের বিষয়ে যা কিছু আলাপ সবই তার যতীনবাবুর সঙ্গে। যতীনবাবুর পুত্র জ্যোতিষের সঙ্গেও সে বহু বিষয়ে আলাপ করেছে, তবে ভূতের বিষয়ে কম, ভবিষ্যতের বিষয়ে বেশি। কোন্ ডিটেকটিভ বড় তা নিয়ে তর্কও হয়েছে অনেক বার। শার্লক হোমস, পোয়ারো, ফাদার ব্রাউন, ডক্টর থর্নডাইক—এদের তুলনামূলক বিচার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কনক-প্রভা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য মেলালে তবে একটা আদর্শ ডিটেকটিভ তৈরি হ'তে পারে।

অর্থাৎ এ বিষয়ে সে জ্যোতিষের কাছে হার স্বীকার করল, এবং তার সাফল্যের মূলেও রয়েছে এই হার স্বীকারের ব্যাপারটি।

একটি মাস কেটে গেছে। কনকপ্রভার কর্মোদ্যম অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তার বাবাও ব'সে নেই।

এখন কনকপ্রভার সামনে দুটি পাখী, হাতে একটি মাত্র ঢিল। দুটি পাখী এক ঢিলে মারার বিদ্যাও তার অধিগত।

অবশেষে ঢিল নিক্ষিপ্ত হল।

তারপর একদিন যখন বাইরে থেকে এসেই দেখে তার বাবা উচ্ছেদের মামলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কনকপ্রভা ঠিক সেই মুহূর্তে তার বাবার দুখানা হাত ধ'রে বলল, "বাবা, তুমি করছ কি? তুমি মোকদ্দমা করতে চলেছ? না বাবা, এ সব কিছুই করতে হবে না, বাড়ি আমি উদ্ধার করেছি, সেখানে ভূতের চিহ্ন নেই আর, সব ব্যবস্থা পাকা, বাড়ির যাবতীয় ভাড়াটের টাকা এখন আমার। আমি এইমাত্র রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে ফিরছি। বলেছিলাম না, আমার হাতে সব ছাড়তে?"

ঠিক এই মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গিতে এক যুবক এসে দাঁড়াল সেখানে। কনক-প্রভা দিনেশ গাঙ্গুলিকে দেখিয়ে তাকে বলল, "ইনি আমার বাবা।"

যুবক দিনেশ গাঙ্গুলিকে প্রণাম করল।

দিনেশ গাঙ্গুলির মুখে কথা নেই। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না।

কনক বলল, ইনি তোমার কনক-কুঞ্জের ভাড়াটে যতীন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে—নাম জ্যোতিষনাথ রায়—বর্তমানে আমার স্বামী। এখন বুঝতে পারছ বাবা?"

দিনেশ গাঙ্গুলির দুখানা পা ১০১৬·০৫ কিলোগ্রাম ভারী বোধ হতে লাগল, আর জিভ ৩৭·৩২৪২ কিলো-গ্রাম। তিনি নড়তেও পারলেন না, একটি কথাও বলতে পারলেন না, গলা থেকে শুধু একটুখানি ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ বেরুলো। তাঁর পা দুখানা থর থর করে কাঁপছে।

কনকপ্রভা বলল, "বাবা সব বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবে—চল"—বলে তাঁর দুখানা হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলল ভিতরে। গিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছুটে গেল মাকে ডাকতে।

জ্যোতিষ নির্বোধের মতো সেই-খানেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আঠারো ।।

আকাশের বহু তারকা আজও দৃশ্যমান হয়নি এবং আলোয় এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই সব তারকাদলের খবর আগেই দিয়ে রেখেছেন। সোভিয়েট রিপাবলিক পূর্বে ছিল ষোলটি, এখন কারেলিয়-ফিনিস অঞ্চল খাসমহল রাশিয়ার মধ্যে আসার ফলে—পনেরোটি দাঁড়িয়েছে! একই রিপাবলিকের মধ্যে কয়েকক্ষেত্রে ভাগ আছে অনেক। সেগুলির কোথাও নাম হয়েছে 'অটোনমাস রিপাবলিক' কোথাও 'রিজিয়ন', কোথাও বা 'ন্যাশন্যাল এরিয়া'। এককালে খোদ রুশজাতি রাশিয়াতে ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু আজ রাশিয়ান ফেডারেটেড রিপাবলিকের 'রাষ্ট্রীয়' সীমানা পশ্চিমে, দক্ষিণে এবং দূরপ্রাচ্যের দিকে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বর্তমানে রুশ নাগরিকের সংখ্যা অপর জাতি অপেক্ষা বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়নের ৮৫ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি পৃথক, এবং ১০০টির বেশি পৃথক পৃথক ভাষা—এদের মধ্যে ৫২টি মাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু ওঁরা বলছেন, এখনও অগণিত উপজাতি ও বিভিন্নভাষী সম্প্রদায় চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, যারা 'ন্যাশন্যাল এরিয়ার' মধ্যে দানা বাঁধবে এবং ক্রমশ তাদেরকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। অর্থাৎ অদৃশ্য তারকার সংখ্যা এখনও অনেক। বহুলোকের ধারণা, পৃথিবীর এই বৃহত্তম ভূভাগকে প্রশাসনিক আয়ত্তের মধ্যে আনবার যে-মূল পরিকল্পনা,—মহামতি লেনিন সেটি আমেরিকান ব্যবস্থাপনা থেকে কতকটা গ্রহণ করেছিলেন! লেনিনের 'মাস্টার-প্ল্যানের' মধ্যে যে দূরদর্শিতা ছিল, সেটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং আঙ্কিক। তিনি এই শতাধিক 'অনৈক্যকে' একটি অতি সুদক্ষ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় যোগসূত্রে বেঁধে রাখার পন্থাটি রেখে গেছেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি 'নাগাল্যাণ্ড' সম্বন্ধে যে 'স্কটিস প্যাটার্ণটির' কথা শোনা যাচ্ছে, সেটি অনেকটা এই প্রকার।

ইউরোপীয় রাশিয়া অপেক্ষা এশিয়াটিক রাশিয়া অনেক বড়। এশিয়াটিক অংশটা পূর্ব ও পশ্চিমে—ওখটস্ক সাগর থেকে কাশ্যপ সাগর—এত বৃহৎ ও সর্বগ্রাসী যার পরিমাপ করা কঠিন। এই ভূভাগের যে-অঞ্চলটার নাম 'যাকুট,' সেটির মূল নাম 'যক্ষকূট' কিনা জানিনে, কিন্তু শুধুমাত্র এই দূরপ্রাচ্যের অঞ্চলটির আয়তন হল ১১ লক্ষ বর্গমাইল। এই 'যাকুট' অটোনমি ফেডারেটেড রাশিয়ার অন্তর্গত এবং এ-অঞ্চল স্বর্ণ ও হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ! এখানকার তুষারপথ দুস্তর, অতিশয় জনবিরল ও বসবাসহীন। যাকুটের মধ্যমলোক বিদীর্ণ করে বৈকাল-হ্রদ-উদ্ভূত 'লেনা' নদ চলে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে মেরুসাগরের দিকে। এই নদের উপকূলবর্তী যে প্রাচীন 'যাকুটস্ক' জনপদ ছিল, সেটি এখন আধুনিক নগর হয়ে উঠেছে, এবং যে বৃহৎ ভূভাগে মাত্র ৫ লক্ষ তুর্কীয় আদিম জাতি আজও বাস করে, তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়! প্রাচীন যাকুটস্কের উপান্তে একদা লেনিন তাঁর স্বল্পকালব্যাপী নির্বাসনকালে তাঁর সহকর্মচারিণী এবং সহনির্বাসিতা শ্রীমতী নাদেজদা ক্রুপস্কায়াকে বিবাহ করেন। জনশ্রুতি এই, সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থানকালীন বিপ্লব প্রচারকার্যের যুগে তাঁরা উভয়ে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে এই বিপ্লববাদিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা লেনিনের আদর্শ সহধর্মিণী হয়েছিলেন। তাঁদের সন্তানাদি ছিল না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষের বংশ প্রায়ই লোপ পায়! সে যাই হোক, সেকালের রুশসাম্রাজ্য ভাঙলো ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, এবং তার তোড়জোড় সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেল অল্পকালের মধ্যে। এই খণ্ডিত, পরস্পর অসম্পৃক্ত, বিক্ষিপ্ত— রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে বিরাট একটি নূতন এবং পৃথক 'জগতের' অতি বিচিত্র পরিকল্পনা রূপায়িত করার আনুপূর্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন লেনিন! বোধ হয় এইটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যই সে-কালের 'আইভান-দি-টেরিবল'-এর পর একালের ঐতিহাসিকরা 'স্টালিন-দি-রুথলেস'কে মনে রাখবে।

আমি যখনই কোনও সোভিয়েট বন্ধুর মুখের উপর তাঁদের দেশের সুখ্যাতি করতে গেছি, তাঁরা ঈষৎ নিরুৎসাহের সঙ্গে শুনেছেন। ভাবখানা এই, আপনার সুখ্যাতি আগাগোড়া মানতে পারছিনে, কেননা এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি। কথাটা মিথ্যে নয়। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি—এদেরকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখা সহজ। এসব দেশে যানবাহন-সুযোগ-সুবিধা অজস্র। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট বাসস্থান, অনায়াসলভ্য আহার্য—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম অংশে ভাল। কিন্তু যেটি পূর্বাংশ, যেটি বৃহত্তর—যেটির নাম প্রাচ্যখণ্ড, সেখানে আজও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ভূভাগে আদিমকালের যানবাহন ছাড়া অন্য গতি নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিছুকাল আগে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ বর্তমানে গরুর গাড়ির যুগ থেকে বাইসাইকেলের যুগে এসেছে! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ প্রাচ্য ভূভাগ ঘোড়া-টানা খোলাবাক্সর যুগ থেকে সাইকেলের যুগে এসে পৌঁছেছে কিনা, সেই খোঁজ হয়ত তিনি রাখেননি। সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েট লেখক মিঃ এন-এন-ব্যারানস্কি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেও যেটুকু বলেছেন, তাতে বুঝতে পারা যায়, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষা সোভিয়েট প্রাচ্যখণ্ডে যথেষ্ট উন্নত নয়! সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও বহু শহর আছে যেখানে হয়ত মোটর ট্রাক পৌঁছেছে, কিন্তু গাড়ির সংখ্যা একেবারেই কম। গরুর গাড়ি সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই। কিন্তু ঘোড়ার গাড়িরা দূরে থেকে দূরে মাঠের ধুলো উড়িয়ে চলেছে—এটি পরিচিত দৃশ্য। মস্কোর মতো বড় বড় শহরের আশেপাশে শহরতলীতে এমন বহু পথঘাট আছে যেখানে ধুলো এবং কাদা বাঁচাবার জন্য প্যান্ট এবং ঘাগরার ঝুলে দুই হাতে তুলে ধরে যেতে হয়,—জুতো জোড়াটার অবস্থা যাই হোক না কেন!

কিন্তু বিস্ময় লাগে এদের 'দানবীয়' অধ্যবসায় লক্ষ্য করে। দুর্গমকে সুগম

ক'রে তোলবার এমন সর্বব্যাপী চেষ্টা আর কোন্ দেশে আছে আমি জানিনে। প্রতিদিনের এমন অক্লান্ত সংগ্রাম, এমন অদম্য পরিশ্রম এবং অশ্রান্ত উদ্দীপনা— এমন ক'রে দেখতে বাকি ছিল বৈকি। সাইবেরিয়ার যে সকল বদনাম চিরদিন ধরে ছিল, সেগুলি আজ ঘুচতে বসেছে। আগামী পঁচিশ বছরের কাজের পর সাইবেরিয়া দ্বিতীয় ইউরোপ হয়ে উঠবে, এই কথাটি পশ্চিম ইউরোপেই শোনা যাচ্ছে। ভল্‌গা বা উরল নদের কথা এখন পুরনো। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে এখন অব, এনেসি, লেনা, ইর্তীশ, আলদান, আমুর, আঙ্গারা—এই সব নদী। পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে নদীকে ঘোরানো হচ্ছে; নদী ও খালকে মুচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অনুর্বর ও নির্জল ভূভাগে; হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী চিরস্থায়ী পাথরের 'চাটানযুক্ত' ভূভাগ থেকে পাথর এবং গ্লেসিয়ারের কঠিন দেহকে উপড়ে ফেলে মাটি বার করা হচ্ছে; কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি ক'রে মেঘদলের দিকে আমন্ত্রণ পাঠানো চলছে। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত বৃহৎ নদী—যেগুলি গঙ্গা-গোদাবরী-শতদ্রু-সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষাও বড়,—সেগুলিকে ধরে-বেঁধে আজ মোট ১১টি বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সাইবেরিয়া এখন আর সেই প্রাচীন সাইবেরিয়া নেই! সবগুলি একসঙ্গে ধরলে এখন মোট ৯০টি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র! বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেনিন-প্রবর্তিত যে গোয়েলরো' বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তার ফলে পাওয়া যায় মোট ৫০ কোটি কিলোয়াট শক্তি। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সেটি হয়ে ওঠে ৩২,০০০ কোটি, এবং সাইবেরিয় অঞ্চলেই সেটি দাঁড়ায় ১৫০০০ কোটি। ছোট এবং বড় নদী নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবাহিত হয় মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার জলধারা। এদের মধ্যে বৃহৎ নদীর সংখ্যা মোট ১৫০০। এগুলির অধিকাংশই প্রাচ্যখণ্ডে। বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীর যেখানে যত বাঁধ-নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সাইবেরিয়ার নবাবিষ্কৃত সুবৃহৎ ভূখণ্ড—এতে সন্দেহ নেই! আবিষ্কারের এখনও অনেক বাকি। কিন্তু আবিষ্কার যেটুকু হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র কয়লার হিসাব পাওয়া গেছে ১,৩০,০০০ কোটি টন। ষষ্ঠ-বার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু 'কুজনেৎস্ক' অববাহিকায় যে পরিমাণ সস্তা কয়লা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি বহন করার জন্য দরকার হয়েছে দৈনিক ৫৫ খানা রেলগাড়ি!

এগুলি অবিশ্বাস্য সত্য। কিন্তু এইগুলির জন্যই সম্ভবত সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীজোড়া সম্পূর্ণ শান্তি এবং সর্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ চাইছে। ওদের সময় নেই। যুদ্ধের কথা ওরা ভাবতেই চায় না। ওরা দেশের সকল অঞ্চলে গুপ্তগুহাপথে অপরিমেয় 'যখের ধনের' সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু সেসব ভোগ করার মতো জনসংখ্যা ওদের দেশে নেই। এই কারণেই একদিন এক রুশ বন্ধু হাসি মুখে আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের দেশে 'রেফুজি' পুনর্বাসন নিয়ে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে,—বেশ ত, দিন্ না আমাদের দেশে পাঁচ-দশ লাখ পরিবারকে পাঠিয়ে! বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে! সোসালিজমের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হল, রাষ্ট্র-সীমানার অবলুপ্তি!

কিন্তু জাতি-বৈশিষ্ট্য? কাল্‌চার? বিশেষ বিশেষ সভ্যতার ডিস্‌টিংকশন্?

বন্ধুটি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁ, সব নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একই বৃহৎ মানবপরিবার! প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই এক একটি অলংকার! সব 'অনৈক্য' এক একটি নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে মিলছে একই 'মহামানবের সাগরতীরে!' সোস্যালিজম্ বলছে সেই বিশাল মানবসংহতির কথা!

কথাটি শ্রুতিমধুর!

সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরে, দক্ষিণে এবং পূর্বে এমন অগণিত সংখ্যক ছোট বড় জনপদ রয়েছে,—যেগুলিতে পৌঁছবার জন্য কোনও পথঘাট বা 'এপ্রোচ' এখনও নেই। নেনেৎস, কোমি, ঘামালো, তাইমির্, চুকটস্ক, আমুর, কারা-কল্পক, কারাকুম ইত্যাদি ভূভাগে অসংখ্য নূতন জনপদ আগে থেকেই রয়েছে, অথবা নূতন করে সৃষ্টি হয়েছে, —কিন্তু সেসব অঞ্চলে চাকাযুক্ত গাড়ি আজও পৌঁছয়নি! মাঝখানে কোথাও দিকচিহ্নহীন তুষার ক্ষেত্র, দুর্ভেদ্য 'তুন্দ্রা'লোক, 'তাইগা'র গহন অরণ্যাণী, অনুর্বর ধূসর শস্যজলহীন এবং মানবশূন্য ও পশুকঙ্কালপরিকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কোথাও ভীষণ মরুলোক, দুস্তর নগ্নপাথরের পাহাড়, কোথাও ভ্রমিমু ভয়ঙ্করী প্রকৃতির বীভৎসা রূপ। সুতরাং এইসব জনপদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বিমানের সাহায্যে! উত্তরে সুমেরুলোক, পূর্বে কিউরাইল, সাখালিন, কামস্কাটকা, দক্ষিণে কাজাখস্তান পেরিয়ে মধ্যএশিয়ার নিচে পামীর, এবং পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের অপর প্রান্ত অবধি—এই সুবিস্তীর্ণ 'পৃথিবী' এখন বিমানের সাহায্যে করায়ত্ত। এইজন্য সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ বিমানপথের পরিমাণ ও সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। মালপত্র, ডাক ও প্যাসেঞ্জার বহনের অবিশ্রান্ত কাজে পৃথিবীর অপর কোনও দেশে এত অধিক সংখ্যক বিমান ব্যবহার করা হয় না। বিমান দুর্ঘটনা সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা কম বলে শুনেছি! চোখে দেখছি যে কোনও মাঠের কাদায়, ধুলোয়, পাথর-কাঁকরে, এবড়ো-খেবড়ো ময়দানে, অসমতল প্রান্তরে, জলাবিলের আশেপাশে—সোভিয়েট বিমান যখন-তখন নামাওঠা করছে!

'কোদ্রি' শব্দটির রুশ অর্থ আমার জানা নেই। কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে এলে ও-দুটি অক্ষরের অর্থ মিলতে দেরি হয় না। 'কো'-অক্ষরটির অর্থ পাহাড়। যেমন কো-মারী, বা মারী পাহাড়! 'অদ্রি'-র অর্থ সবাই জানে। যেমন, হিমাদ্রি। এই 'কোদ্রি' অঞ্চল নিয়েই পশ্চিম সোভিয়েটের একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যার নাম হল 'মল্‌দাভিয়ান রিপাবলিক'। এর একদিকে কার্পাথিয়ানের কোদ্রি, এবং অন্যদিকে বোলাইনিয়ার কোদ্রি-মালভূমি। ফলে গরম প্রচুর, এবং শীতের হাওয়া কম। মল্‌দাভিয়ার পশ্চিমে রুমানিয়া এবং পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে উক্রাইন। এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াটির দরুণ মল্‌দাভিয়ার ফসলাদির প্রাচুর্য প্রসিদ্ধ। মল্‌দাভিয়ার রাজধানী 'কিশিনেভ' যেন একটি বৃহৎ পটভূমিতে আঁকা মালভূমির উপরে অবস্থিত আধুনিক নগর। সমগ্র মল্‌দাভিয়ার মৃত্তিকার বর্ণ হল ঘন কৃষ্ণ। এই রাষ্ট্রের উত্তরে 'বেলৎসি ষ্টেপ' এবং দক্ষিণে 'বুদজাক ষ্টেপ,'—এ দুটি অঞ্চল শস্যরিক্ত এবং অনুর্বর। সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন বহু ভূভাগ আছে যাদের বহু নিম্নস্তর অবধি নিরস ধুলোকাঁকর ছাড়া মৃত্তিকার কোনও চিহ্ন নেই! প্রাণোচ্ছলতা ও দয়াহীনতা—এ দুটি যেন পাশাপাশি।

ইউনিয়নের পশ্চিমে উক্রাইনের পর বাইলো-রাশিয়ার ভূভাগের আয়তন

সর্বাপেক্ষা বেশি। এই বাইলো-রাশিয়া রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত নগরী 'ব্রেস্ট' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসী-বাহিনীর দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়। পোল্যান্ড তার আগেই হিটলারের পায়ের তলায় দলিত! ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন এবং ২২শে জুনের মাঝামাঝির মধ্যরাত্রে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন অতর্কিতে আক্রান্ত হয়, ব্রেস্ট দুর্গ এবং নগরীতে তখন নাচ, গান, ভোজ, আমোদ-আহ্লাদ এবং সামাজিকতা চলছিল। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর আগে জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি 'অনাক্রমণ ও বন্ধুত্ব' চুক্তি হয়েছিল, যেটির চেহারা ছিল 'খাঁড়া আর কুমড়ার' মধ্যেকার বন্ধুত্বের! ফলে, বিশ্ববাসীর মনে একটি চমক এবং ইউরোপ-আমেরিকায় একটি আতঙ্ক দেখা দেয়। কিন্তু এই সাময়িক বন্ধুত্ব-স্থাপনের সুযোগে, যতদূর মনে পড়ে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁদের রাষ্ট্রীয় সীমানাটিকে পোল্যান্ড এবং পূর্ব ইউরোপে কিছু কিছু প্রসারিত করতে থাকেন। সম্ভবতঃ এই কারণে অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ফললাভের উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'অন্যায়' অধিকার বিস্তারের আয়োজন দেখে হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন! সে যাই হোক, ব্রেস্ট দুর্গের সেনাবাহিনী এবং নগরের জনতা নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে যে জীবনপণ সংগ্রাম করতে করতে তলিয়ে যান, সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসটি সম্প্রতি রচনা করেছেন একজন রুশ লেখক মিঃ স্মিরনভ তাঁর "Heroes of the Brest Fortress" গ্রন্থে। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নামকরণ করেছেন "Great Patriotic War." সোভিয়েট জনগণের এই মরণপণ যুদ্ধকে দেশপ্রেমিকগণের উন্মত্ত সংগ্রাম ব'লে মিঃ স্মিরনভ যেভাবে মানুষের অতিমানবিক সংগ্রামের কাহিনীটিকে বর্ণনা করেছেন সেটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়েছে।

বাইলো-রাশিয়ার ভাগ্য বহুকাল থেকেই বিড়ম্বিত ছিল। ইতিহাসের এক এক পর্বে এই অরক্ষিত রাষ্ট্র বারম্বার মার খেয়ে এসেছে জার্মানী, সুইডেন, পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের হাতে। এছাড়া দক্ষিণ থেকে তরবারি হস্তে বার বার রক্তচক্ষে ছুটে এসেছে ক্রাইমিয়ার দস্যু তাতারের দল! তারা খান খান ক'রে কেটেছে দেশ, জাতি ও সমাজকে। রক্তে ভেসেছে দেশ, দুর্ভিক্ষে মরেছে অগণ্য, এবং তারই উপরে দাঁড়িয়ে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে নানা জাতি। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোল্যান্ড যখন দ্বিধাবিভক্ত হ'ল, বাইলো-রাশিয়া এসে ঢুকল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাইলো-রাশিয়ার পশ্চিম অংশ গিয়ে পড়ে আবার পোল্যান্ডের মধ্যে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে, অর্থাৎ হিটলারের কাছে পোল্যান্ডের পরাজয়ের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্ভবতঃ ঈষৎ অতর্কিত দ্রুতগতিতে বাইলো-রাশিয়ার পশ্চিম ভূভাগ নিজেদের অধিকারে টেনে নেন। সেই দুর্দিনের মধ্যে পোল্যান্ডের মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক-দিকে যেমন সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আপন রাষ্ট্রসীমানাকে সে সর্বাপেক্ষা মজবুত ক'রে তুলেছে! এটি স্পষ্ট, যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধের আশংকা বলবৎ থাকবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের চার-পাঁচটি রাষ্ট্রের উপর তার রাজনীতিক 'প্রভাব প্রভুত্ব' কোনমতেই ত্যাগ করবে না। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীর ব্যাপারে তার বদনাম রটেছে অনেক, কিন্তু আত্মরক্ষার মূল প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে সে পূর্ব ইউরোপের স্বকীয়তাবাদকে আর বিশ্বাস করবে না! 'আরশোলাকে' সে আর 'পাখি' হয়ে উড়তে দেবে না! সোভিয়েট ইউনিয়ন হ'ল 'ঘরপোড়া গরু', সিঁদুরে মেঘ দেখলেই সে ডরায়! সমস্ত ইউরোপের মধ্যে পশ্চিম জার্মানি হ'ল তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাসের ক্ষেত্র। ওখানে হিটলারের চিতাভস্মের অনু-পরমাণু ছড়িয়ে রয়েছে!

বালটিক ইউনিয়নের তিনটি রাষ্ট্র এস্টনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার তিনটি রাজধানী তালিনিন, রিগা ও ভিলনিয়াস; এ ছাড়া কালিনিনগ্রাড—বাইলো-রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক এবং পশ্চিমে তার দুটি প্রসিদ্ধ নগর ব্রেস্ট ও গ্রদনো; উক্রাইনের উজগোরদ, দ্রোগোবিচ লভো, লুটস্ক এবং রাজধানী কিয়েভ; এবং মলদাভিয়ার রাজধানী কিশিনেভ ও ইজমাইল,—এই সুবিশাল এক একটি নগর এবং এদের সবাইকে কেন্দ্র ক'রে বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সর্বপ্রকারে দুর্ভেদ্য ও অপরাজেয় ক'রে রেখেছে!

কিয়েভ থেকে সোজা দক্ষিণে রেলপথ চলে এসেছে উক্রাইনের শেষ প্রান্তে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে—সেখানে সর্বাপেক্ষা প্রধান বন্দর 'অডেসা'। এটি শুধু বন্দর নয়, এটি প্রখ্যাত শিল্পনগরী এবং সাহিত্য, ললিতকলা ও অন্যান্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। এককালে রুশ লেখকদের পক্ষে ছিল এই নগরী একটি প্রধান ও আনন্দলাভের ক্ষেত্র। শিল্পী, সংগীতবিদ, গায়ক, অভিনেতা, কবি ও উপন্যাসিক—এবং সকল সমাজের সৌখীন সম্প্রদায় এখানে এসে বাসা নিতেন। কলাবিদ্

মহলের কেউ অডেসায় না এলে এককালে সবাই তাকে জাতে ঠেলত। এখানে সমুদ্র-সৈকতের শোভা অতি মনোরম। এখানকার সাগরের উপকূলবর্তী রাজপথে অগণিত সংখ্যক পুরনো আমলের অট্টালিকা এককালে রাজারাজড়া এবং সম্রাটের পারিষদ, মহল ও ভূস্বামীদের সম্পত্তি ছিল। বিশেষ আইনের বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের হাত থেকে এগুলি দখল ক'রে নেন। এগুলি এখন জনসাধারণ হাওয়া-মহল স্বরূপ ব্যবহার করে। জনসাধারণ মানেই 'রবোচি,'—অর্থাৎ কর্মী। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি কর্মী বছরে একমাস করে বেতনসহ ছুটি পায়। সেই ছুটি নিয়ে তারা যে কোনও রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে,—যানবাহনের খরচ নেই। একমাসের মধ্যে ৬ দিন বাদ দিতে হয় যাতায়াতের এবং গোছগাছের জন্য। বাকি ২৪ দিন তারা যে রাজকীয় অবস্থার মধ্যে বাস করে সেটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মাথাপিছু খরচ পড়ে দৈনিক ৫০ রুবল। এর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ স্টেট থেকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১২০০ রুবলের মধ্যে ৮৪০ রুবল স্টেট দেন্। প্রতিদিন 'পূর্ণভোজ' ৪ বার, প্রত্যূষে কফি বা চা বিস্কুট। স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে হলে একটি পৃথক ঘর ও দুটি নিত্য ধোপদস্ত সুকোমল বিছানা। ঘরময় সুসজ্জিত আসবাবপত্র, একটি আধুনিক স্নানাগার, ঘরে রেডিয়ো, টেলিফোন ও টেলিভিশন, পাইপযোগে ঠাণ্ডা ও গরম জল, বিনা-মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রাদি, আমোদ-প্রমোদ ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা। অনেকে ছুটি জমিয়ে দুমাস বা তিনমাসের জন্যেও বিদেশে বেরিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে বা পুরুষ 'রবোচি' একাই হাওয়া বদলাতে যায়। মুচি, মেথর, কামার, ছুতোর, মজুর, মিস্ত্রি, জমাদার, চৌকিদার, হাড়ি-ডোম, বামুন-বোষ্টম,—এরা সবাই সুসজ্জিত চেহারা ও পোষাকে একাকার! নানা লোকের সঙ্গে নানা সময়ে আলাপ চলছে।—লেখাপড়া জানে সবাই। চেহারা ভদ্র, পোষাক পরিচ্ছন্ন, কথাবার্তা পালিশ করা,—আচরণ সামাজিক, ব্যবহারে বেশ সৌজন্য।—দু ঘণ্টা আলাপের পর যদি বুঝতে পারি এব্যক্তি কসাইখানার 'রবোচি' বা অমুক মেয়েটি ঝাড়ুদারনি,—তখন আর মনোবিকলনের কথা ওঠে না! শুধু মনে মনে একটু হতচকিত হতে হয়।

অডেসায় ছয় লক্ষ লোকের বাস। এখন অধিকাংশই উক্রাইনীয় ও রুশ, এবং অল্পাংশই ইহুদী। ইহুদীদের ইতিহাস হত্যাকাণ্ডেরই ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার-আমলে শত সহস্র ইহুদী মার খেয়ে মরে। 'হাওয়ার্ড ফাস্টের' কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ ইহুদী কবি সোভিয়েট আমলে ষ্টালিনের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে মরেছে, নয়ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। নাৎসী আমলে অডেসায় কত সংখ্যক ইহুদী হত্যা হয়েছে তার হিসাব পাইনি। কিন্তু এই অডেসা নগরী হিটলার-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে অপরাজেয় বীরত্বের সঙ্গে প্রায় আড়াই মাস লড়াই চালিয়ে "বীর নগরী"র সুনাম অর্জন করেছিল।

অডেসায় প্রতি বছরে দুই লক্ষ লোক হাওয়া বদলাতে আসে বাইরে থেকে। এখানে স্বাস্থ্যাবাস এবং বিশ্রামবাস মিলিয়ে একশতটি অট্টালিকা সকল সময় মজুত থাকে। এই শহরের অতি সুশ্রী যে-বৃহৎ ও প্রশস্ত পথটির নাম 'প্রিমর্স্কি বুলেভার', সেই পথের 'পোটেমকিন সোপানপথটি' নগরীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে বন্দরের প্রান্ত অবধি। এই সোপানপথেরই অদূরে অডেসা নগরীর প্রথম মেয়র রিচেলিউ-এর মনোরম প্রস্তরমূর্তি দণ্ডায়মান। কিছুদূরে রুশ কবি পুশকিনের প্রস্তর প্রতিমূর্তি। এই বন্দর নগরীতে এককালে বাস করে গেছেন পুশকিন, গোগল এবং গোর্কি,—রুশ সাহিত্যের তিনজন দিকপাল। এঁদের তিনজনের নামে অডেসার তিনটি বৃহৎ রাজপথ উৎসর্গ করা। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ শহরে ও জনপদে পুশকিন, টলস্টয় এবং বিশেষ করে গোর্কির নামে স্মৃতিফলক, স্তম্ভ, মূর্তি, লাইব্রেরী, থিয়েটার, অপেরা, সার্কাস, রাজপথ, স্বাস্থ্যাবাস, যাদুঘর, চিত্রশালা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এত বেশি সংখ্যক উৎসর্গীকৃত যে, পর্যটকের মনে সদাসর্বদা একটি বিস্ময় থেকে যায়। আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য জগতের প্রায় সর্বদেশেই নিন্দিত এবং বহুক্ষেত্রে ধিকৃত, কিন্তু আধুনিক সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রুশীয় ক্লাসিক সাহিত্যকে যে-সম্মান, সমাদর ও দেশজোড়া শ্রদ্ধা দিয়ে থাকেন, জগৎবাসীর পক্ষে সেটি চমকপ্রদ। কিন্তু শুধু রুশীয় বললে আমার ভুল ঘটবে। উক্রাইন, উজবেক, কাজাখ, তুর্কোমেন, আর্মেনিয় প্রভৃতি সকল রিপাবলিকের লেখকগণকেও তাঁরা প্রচুর পরিমাণে সমাদৃত করেছেন।

অডেসায় ইয়ং পায়োনীয়ার্স প্যালেস এবং সী-মেনস্ ক্লাব—এ দুটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে দেখার জিনিস। অডেসার আঞ্চলিক যাদুঘরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং বহুবিধ উপকরণাদি সংরক্ষিত রয়েছে। নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে অডেসার অধিবাসীরা যে বিক্রম ও বীরত্বের সঙ্গে আপন জন্মভূমিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, তার আনুপূর্বিক কাহিনীটি এই যাদুঘরে সযত্নে রাখা হয়েছে।

"অডেসা" শব্দটি গ্রীক 'অডিসাস' থেকে উদ্ভূত। ষোলশত বছর আগে গ্রীকরা এখানে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে তার নাম দেয় 'অডিসাস'। বহু শতাব্দী পরে তুরস্কের অধিকারকালে এই জনপদের আরেকটি নামকরণ করা হয়, "যেনিদুনিয়া"। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন-দি-গ্রেট "যেনিদুনিয়াকে" দুনিয়ার কোথাও তিষ্ঠতে দেননি! তিনি 'অডিসাস' শব্দটির উপর প্রসাধনসাধন ক'রে নতুন নামটি সমাদরে বসিয়ে দেন, "অডেসা"। আকারান্তে স্ত্রীলিঙ্গ। তুরস্কের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এখানে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করেন। অডেসার দুটি রূপ আছে। সোভিয়েট অডেসা এবং জার আমলের অডেসা। পুরনো অডেসা দরিদ্র এবং ঘিঞ্জি। নানা অঞ্চলে বস্তি। পথ-ঘাট এবং যানবাহনের চেহারা, পুরনো বাড়িঘরের অবস্থা—এগুলি অপরিচ্ছন্ন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি-রিপাবলিকের লোক কৃষ্ণসাগরের উপকূলকে অতিশয় পছন্দ করে। প্রতি বছরে দুই লক্ষেরও বেশি লোক আসে সমুদ্রতীরবর্তী অডেসায়। যারা আসে তাদের অধিকাংশই সমুদ্রের তীরভূমিস্থিত প্রত্যেকটি শহরে এক এক দফায় বেরিয়ে যায় জাহাজযোগে। 'চেঞ্জার্সদের' মুখে চোখে যে একটি স্বাভাবিক 'হ্যাংলামি' পুরী-গোপালপুর-ওয়ালটেয়ারে দেখা যায়, কৃষ্ণসাগরের

উপকূলেও তার ব্যতিক্রম নেই। তফাৎ শুধু এই, এটি ইউরোপীয় খণ্ড। এখানকার সমুদ্রতীরে ঘাগরা, গাউন বা প্যান্ট খুলতে বাধে না!

অডেসায় মোট সাতটি রঙ্গালয় বর্তমান। এই নগরীর অপেরা এবং ব্যালে চিরদিনই প্রসিদ্ধ। সোভিয়েট ইউনিয়নে যাঁদের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশি—সেই চেকভস্কি, রুবেলস্টিন, চালিয়াপিন বা সবিনভ,—তাঁদের ন্যায় সঙ্গীতকার, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতিরা এককালে এই রঙ্গালয়গুলিতেই দেশবাসীকে তাতিয়ে-মাতিয়ে গেছেন! সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ের বৃহৎ প্রাসাদ, তার বৈভবসজ্জা, তার বিশাল সৌন্দর্য এবং অলংকরণ—যে কোনও রাজপ্রাসাদের দৃশ্যের পাশাপাশি দাঁড়াতে সমর্থ! রঙ্গালয়ের প্রতি মোহ রুশ জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

অডেসায় যাদুঘরের সংখ্যা অনেকগুলি। যেটিতে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য শিল্পকলার নিদর্শন ও চিত্রাবলী সংগৃহীত রয়েছে, তাদের মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার সামগ্রীগুলি অতি যত্নে রক্ষিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু যাদুঘরে বহুকাল আগে থেকে ভারতের চারুশিল্প, সূচীশিল্প, রেশমবস্ত্রাদি-শিল্প এবং ললিতকলার বিভিন্ন নিদর্শন বিশেষ সমাদরের সঙ্গে রক্ষা করা আছে!

উক্রাইনের মূল ভূভাগ থেকে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপটি একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র-যোগে যেন কৃষ্ণসাগরের জলের উপরে ভাসছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর এই মনোরম উপদ্বীপটিকে এর পূর্ব-ব্যবস্থার থেকে সরিয়ে উক্রাইন রিপাবলিকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উক্রাইন থেকে দুইটি রেলপথ নেমে এসে পূর্ব ও পশ্চিমে ক্রাইমিয়ার দুটি প্রধান বন্দর 'কার্চ' এবং 'সেবাস্তপলে' মিলেছে। নাৎসীবাহিনীর অবরোধকালে দুই মাসে এই উপদ্বীপে প্রায় ৮০ হাজার ইহুদী, জিপসি এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতিসহ সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে হত্যা করা হয়। ক্রাইমিয়ার ইতিহাস রক্তাক্ত, প্রাচীন ও জটিল।

আড়াই হাজার বছর আগে এখানে যারা আদিবাসী ছিল, তাদেরকে বলা হত বুঝি 'সেলৎ'। ক্রাইমিয়া তখন 'তারিস' নামে পরিচিত। গ্রীকরা এখানে আসে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু সীজারের আমলে এই উপদ্বীপ রোমক প্রদেশ হয়ে ওঠে। 'জেনোয়ার' অধীনে ক্রাইমিয়া থাকে কমবেশি দুই শতাব্দী। এক হাজার বছর পরে এখানে আসে মুসলমান তাতার। তারা এখানে রাজধানী স্থাপন ক'রে নাম দেয়, 'বাচ্চিসরাই'। কিন্তু পরবর্তীকালে

তুর্কি'রা এসে তাতারদের খাঁ-বংশকে মারধর ক'রে তাড়িয়ে নিজেদের রাজ্যপাট বসায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে ক্রাইমিয়া রাশিয়ার অধীনে আসে। এই উপদ্বীপ নাৎসীবাহিনীর অধীনে ছিল প্রায় সাড়ে আট মাস। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ষ্টালিন এখানকার প্রায় ৪০ হাজার শাঁসালো গ্রীক অধিবাসীকে উচ্ছেদ ক'রে কি এক রহস্যজনক রাজনীতিক কারণে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ফোড়নের মতো ছড়িয়ে দেন্। বোধ হয় ভয় ছিল, গ্রীকরা দানা বাঁধলে পুরনো কথা উঠতে পারে! যেমন ভারতের 'ঝাড়খণ্ড' পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত জয়পাল সিং একবার রাগ ক'রে বলেছিলেন, "আমরাই এই ভারতের আদিবাসী! আর্যরাই বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে'। তারাই আমাদের দেশে ব'সে এতকাল ধ'রে অন্যায় প্রভুত্ব করছে!" এই কথাগুলির মধ্যে যুক্তি আছে বলেই আশঙ্কা আছে। ষ্টালিন একথাগুলি বুঝতেন।

বিশ্বযুদ্ধের পর ১৬।১৭ বৎসর-কালের মধ্যে ক্রাইমিয়া এখন আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে। ক্রাইমিয়ার উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য এখন প্রচুর। আঙ্গুর, লেবু, তামাক, লৌহ-সার, মাছ এবং লবণ তার প্রধান সামগ্রী। উৎকৃষ্ট মদের জন্য ক্রাইমিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্বদিকে প্রসারিত শাখা-উপদ্বীপ 'কার্চ' 'আজব' সাগরের মাছ নিয়ে কারবার করে। উত্তর ভূভাগে 'পেরেকপ' নামক ঘোলাটে সামুদ্রিক অঞ্চল লবণের জন্য বিখ্যাত। যেমন ভারতবর্ষের পশ্চিমে 'কাচ্ছ' অঞ্চল।

যুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নে চারটি নগর 'বীর নগরীর' সম্মান লাভ করে—লেনিনগ্রাড, ষ্টালিনগ্রাড, অডেসা এবং সেবাস্তপল্। এর মধ্যে সম্প্রতি একটি শহরের নাম বদল করা হয়েছে। বিগত নবেম্বর, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কমিউ-নিষ্ট পার্টির ২২শতম কন্‌গ্রেসে "ষ্টালিনোচ্ছেদ" (De-Stalinisation) প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর 'ষ্টালিনগ্রাড' নামটি মুছে দিয়ে "ভলগোরদ"—এই নামটি দেওয়া হয়। সেবাস্তপল্ নামটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ক্রাইমিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরনগরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে টলষ্টয় যোগদান করেছিলেন। সেবাস্তপল-এর নিকটবর্তী 'বালাক্লাভা' নামক জনপদে ইংরেজের "Charge of the Light Brigade" ইংরেজি সাহিত্যে প্রখ্যাত। প্রাচীন তাতারদের রাজধানী "বাচ্চিসরাই"-তে খান্‌দের রাজপ্রাসাদ ক্রাইমিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। সেই তাতার সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী বিরাট গোষ্ঠী আজও ক্রাইমিয়াতে বর্তমান।

শ্রীমতী অকসানা জেট বিমানযোগে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যে বিমানঘাঁটিতে এসে অবতীর্ণ হলেন, তার নাম 'সিম্‌ফেরোপল্'। এটি মস্ত শহর। কিন্তু এর বিমানঘাঁটি কাঁচা মাটি, ইঁট-পাটকেল ও ঘাসভরা মাঠ—যেখানে ফুটবল খেলা চলে। 'রান্‌ওয়ে' এখনও প্রস্তুত হয়নি, 'ষ্টীমরোলার' চলছে। অদূরে একটি জঙ্গলের আশেপাশে দু'একটি 'হেলিকপ্‌টার' ওঠানামা করছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত সেই প্রাচীন পৃথিবী,— যেন মধ্যভারতের একটি সুশ্যাম ধূলিধূসর অঞ্চল! এক একটি বিমান নামছে উঠছে,—আর ধুলোয় সব অন্ধকার! মনে পড়ে গেল কোচবিহার ও 'বাগডোগরার' বিমানঘাঁটি। মনে পড়ছে কাঠমাণ্ডুর বিমানঘাঁটি। তারা এমনি কাঁচা এবং অনুন্নত ছিল। আমি বসে রইলুম একস্থলে। বেলা দ্বিপ্রহর এখনও হয়নি। শীত নেই।

হঠাৎ আবিষ্কার করলুম পকেটে আমার 'পেলিকান্' কলমটি নেই,—পড়ে গেছে কোথাও! অকসানা সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জায়গায় ট্রাঙ্ক টেলিফোন করলেন। যদি সন্ধান মেলে, অবশ্যই ফেরৎ পাবো। সোসালিষ্ট্ দেশে লোভ নেই, অকসানা বললেন। সুতরাং হোটেলে, শহরের পথে, বিমানের মধ্যে, গাড়ির ভিতরে—যেখানেই সেটি খুঁজে পাওয়া যাক্, সোভিয়েট নাগরিক ওটা ফেরৎ দেবে! কলমটিতে আমার নাম লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে। 'পেলিকান্' সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই।

কলমটি ফেরৎ আসেনি! অতঃপর অকসানা আমাকে একটি কলম উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোভিয়েট কলম বড়ই অপদার্থ। ওটায় কাজ চালানো কঠিন ছিল।

'পল্' শব্দটি এ তল্লাটে প্রচলিত। ষ্টাভরোপল, সেবাস্তপল, নিকোপল, সিম্‌ফেরোপল্ ইত্যাদি। বিমানঘাঁটির সঙ্গে 'সিম্‌ফেরোপল' শহর একাকার। এই শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি রেলপথ চলে গেছে সেবাস্তপলে— একবারে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে; অন্যটি দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে ইয়াল্তায়,— এটিও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেছে। সিমফেরোপল থেকে ইয়াল্তা মোটরপথে কমবেশি ১০০ কিলোমিটার।

আমাদের সঙ্গে জুটে গেলেন এক আমেরিকান দম্পতি। স্বামীর বয়স আন্দাজ ৭০ এবং স্ত্রীর বয়স ৬০। নাম, ফ্রেড প্যাটারসন। তাঁদের বাড়ি আমে-রিকার অন্তর্গত জর্জিয়ার আট্‌লান্টায়। স্বামীটি "কেয়ার টেকার" ব্যবসায়ী। অর্থাৎ মৃতদেহ বহন করার জন্য যে কফিন্-বাক্স দরকার হয়, উনি আপন কারখানায় সেগুলি উৎপাদন করেন! এক সময় বৃদ্ধ আমাকে বললেন, এসব কারবারে আজকাল লাভ তেমন নেই! আমাদের ওদিকে লোকজন বিশেষ মরতে চায় না!—ভদ্রলোক তাঁর টুরিষ্ট-কন্-সেসনের সঙ্গে রুবল এবং ডলারের বিনিময় হার বুঝতে না পেরে অনেক সময়ে লোকসানের ভয়ে খুঁৎখুঁৎ করতেন, এবং অকসানা তাঁকে বিনিময় হার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা পেতেন। মিসেস প্যাটারসনের নিজেরও একটি পেন্সিলের কারখানা আছে। সেখানে কি প্রকার পেন্সিল প্রস্তুত হয়, তার নমুনাস্বরূপ তিনি একটি পেন্সিল আমাকে উপহার দিলেন। কলমের অভাবে পেন্সিলটি পেয়ে আমার নোট নেবার সুবিধা হয়ে গেল। চারিদিকের অকূল অপরিচয়ের মধ্যে ভারতীয় একজনকে পেয়ে এই আমেরিকান পর্যটক-দম্পতি অনেকটা যেন 'মনের মানুষ' খুঁজে পেলেন। আমরা একই হোটেলে থাকতুম এবং নীচের তলার ডাইনিং হল-এ এসে একই টেবলে বসতুম। ও'দের নিজস্ব দোভাষী না থাকার জন্য বিবিধ অসুবিধা ছিল। শ্রীমতী অকসানা আপন কর্তব্যবোধে ও'দেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা পেতেন। বিদায় নেবার দিন মিসেস প্যাটারসন আমাকে বলেছিলেন, অকসানার মতন মেয়েকে দেখে এদেশের মেয়ের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বদলে গেল!

প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষার পর একখানা বড় গাড়ি এল। এই গাড়িটি নিয়ে আমরা মাঠ, ময়দান, কলকারখানা, বড় বড় গমের গোলা, ধূলিধূসর পথঘাট, নতুন নগর নির্মাণের এলাকা, তৃষাদগ্ধ প্রান্তর এবং পাহাড়তলীর আশপাশ পেরিয়ে যেতে লাগলুম।

উত্তরে বাল্‌টিক সমুদ্র এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর—এই দুইয়ের মাঝখানে

কমবেশি এক হাজার মাইল জোড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম-প্রতি-রক্ষার যেন বিরাট এক দুর্ভেদ্য দেওয়াল দাঁড়িয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-সাগরের পশ্চিমে রুমানিয়া ও দক্ষিণে তুরস্ক। কাশ্যপ সমুদ্রে যেমন কেরোসিনের জাহাজ চলাচল করে 'বাকু' থেকে 'মাখাচকালা, অস্ত্রাখান ও গুরিয়েভ' এবং দক্ষিণে দুটি পারস্যবন্দর পাহলেভি ও বন্দরশেখে, তেমনি কৃষ্ণসাগরের নানা অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কার্চ উপদ্বীপের দুই পারে, মাছের জাহাজ আনাগোনা করে!

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয়া পরিব্যাপ্ত করে যে রসহীন জলহীন এবং মৃত্তিকাহীন কাঁকর-পাথর-বালু ও ধূলি-রুক্ষ ভূভাগ চলে এসেছে সুদূর পূর্ব-প্রাচ্যে, যেটাকে বলা হয় 'স্টেপ' (Steppe) বা 'ক্ষুধার্ত' স্টেপ—তার থেকে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপও রক্ষা পায়নি! পুরাকালে এই উপদ্বীপে বাস করত নানা সভ্যতালেশ-বর্জিত জাতি, তারপরে এখানে তাতাররা এসে অধিকার বিস্তার করে। সকল দলের মধ্যে লড়াই চলে বহুকাল। কিন্তু তাতার জাতি অবশেষে এখানে প্রাধান্য লাভ করে। তাতার রাজ্যপাটের পরে আসে তুর্কিরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ার জার তুর্কী দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ক্রাইমিয়া অধিকার করেন। অতঃপর সম্রাটের পারিষদবর্গ, রাজ-পুরুষগণ এবং জমিদার সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রাইমিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থানগুলিতে প্রাসাদ এবং অট্টালিকা নির্মাণ করতে থাকেন। এর প্রায় একশ' বছর পরে রুশ এবং উক্রাইনের জনসাধারণ এসে ক্রাই-মিয়ার নানা অঞ্চলে জনপদ গ'ড়ে তোলে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্রাইমিয়ার সংগ্রামে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহামতি টলস্টয় একজন সেনানায়ক হিসাবে যোগ-দান করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'টেলস্ অফ সেবাস্তপল' তার পরিচয়। ক্রাই-মিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ চিরকাল অনুর্বর রুক্ষ ময়দান এবং নিরস অনুচ্চ পাহাড়ের হাড়পাঁজরায় ঢাকা। কিন্তু দক্ষিণ ভূভাগে কৃষ্ণসাগরের আশেপাশে যে উপত্যকাগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলিতে জনপদ সৃষ্টি হয়েছে একটির পর একটি।

সোভিয়েট আমলে ক্রাইমিয়ার জমি-দার ও ধনীগোষ্ঠীকে বিতাড়িত ক'রে তাদের শত সহস্র অট্টালিকা ও প্রাসাদকে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সকল দেশ থেকে এখন সকল শ্রেণীর কর্মীরা এই সকল সানাটোরিয়ামে জল হওয়া বদলাতে আসে।

আঙুরের বৃহৎ ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছিল। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে উপত্যকা। এই পর্বত-শ্রেণীর নাম 'আলুস্তা'। মাঝে মাঝে পাহাড়ের এক একটি বাঁকে পাথরের বড় বড় পুতুল সাজানো, সেগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন। পাহাড়ের আশেপাশে অরণ্যের ছোপ। পথ কোথাও কোথাও সংকট-সংকুল। আমরা অপরাহ্ণকালে এক সময় কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী 'ইয়ালতা' শহরে এসে পৌঁছলুম,—যার সংকীর্ণ পরিসরের একপাশে পাহাড়, অন্যপাশে সমুদ্র। শহরটি দৈর্ঘ্যে কিছু বড়, প্রস্থে সামান্য।

আমাদের মোটর এসে থামল ইনটুরিস্ট হোটেলের সামনে। হোটেলের নাম, "অরিয়ানদা"। হোটেলের দোতলায় ২৪৩নং একটি ঘর আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। এত বড় হোটেলের পাশেই একটি গলি। মুখোমুখি একটি কয়লার ডিপো। সেখানকার চিমনী থেকে উঠছে কয়লার ধোঁয়া। তার পিছনে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী। হোটেলের পূর্বদিকে রাজপথ। তারপরেই দিগন্তজোড়া কৃষ্ণসাগর। এখানে এখন বসন্তকাল।

ইয়ালতার সাগরের তীরে 'মেরিন পার্কে'র পাথরে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ রয়েছে, "এখানে যত-গুলি প্রাসাদ, অট্টালিকা, উদ্যানবাটি প্রভৃতি আছে, যেগুলি একদা সম্রাট-গণের, রাজগোষ্ঠীর, ধনপতি দলের, জমি-দার সম্প্রদায়ের এবং রাজামহারাজা-দলের (Grand-Dukes) সম্পত্তি-রূপে পরিচিত ছিল, সেগুলি অতঃপর চাষী ও কর্মীগণ ব্যবহার করবেন।" —লেখাটার তলায় লেনিনের সই! তারিখ —ডিসেম্বর ২১, ১৯২০।

এইরূপ সুবৃহৎ সম্পত্তির সংখ্যা কেবলমাত্র ইয়ালতাতেই ১০০-র কিছু বেশি। কিন্তু আমার পক্ষে বিস্ময় এই যে, হাজার হাজার সুসজ্জিত নরনারী ও শিশুমহলকে সদাসর্বদা চোখের সামনে দেখছি, তারা খাস ইউরোপীয় ত' বটেই, তাদের আগাগোড়া সমস্ত চালচলন, কথালাপ, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার মান, শিক্ষাদীক্ষা,—সমস্তই সম্ভ্রান্ত চেহারায় নড়াচড়া করছে! এরা বুর্জোয়া,—যদি বুর্জোয়ার মানে কিছু থাকে! শ্রেষ্ঠ পোষাক, শ্রেষ্ঠ খাদ্যের জন্য বায়োন্মুখতা, শতকরা পঁচিশ জনের হাতে হীরের আংটি, চেহারায় লাবণ্য, সুরুচি ও শিক্ষার দীপ্তি, স্বাস্থ্যশ্রী দেখলে মন-কেমন করে ওঠে,—এরা চাষী-মজুর কোন্ কালে? চাষী ও মজুর বলতে যে দৃশ্যটা দেখা অভ্যাস, যেটা জানা বস্তু—সেটা চোখে পড়ছে না! চোখে যেটা পড়ছে সেটা ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ—যেটার চোখে মুখে ধনগৌরবের আভা দেখতে পাই। অকসানা এক সময় বললেন, এখানকার স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র হাজার পঁয়ত্রিশ। কিন্তু পথঘাটে কাতারে কাতারে যাদের দেখছেন তারা বাইরে থেকে এসেছে। তারা চেস্তার্স। বছরে তিন লক্ষ চেস্তার্স এখানে আসে। আমি যখন প্রশ্ন করলুম, এরা চাষী আর 'মজুর' কিনা, অকসানা বললেন, 'লেবার' বলে আমাদের কিছু নেই। সবাই ওয়ার্কার, 'কর্মী'। পার্টির লোক মানে, কর্মী,—তিনি দৈবাৎ মন্ত্রী হতে পারেন! মন্ত্রী হলেও কর্মী!

একদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণীর দেওয়াল এবং ঠিক তার নীচেই সমুদ্র—এই দুইয়ের মাঝখানে যেটুকু সামান্য ও দীর্ঘলম্বিত অধিত্যকার অবকাশ—সেইটুকুর মধ্যে ইয়ালতার সৈকত-শহর চার ভাগে বিভক্ত। 'আলুপ্কা, মিস্-হোর, সিমিজ্, এবং গুরেজুফ'। এখান-কার 'মাসান্দ্রা' নামক এক মহল্লায় যে উৎকৃষ্ট আঙুরের মদ তৈরী হয় সেটি প্রসিদ্ধ। এখানে এককালে কবি ও ঔপন্যাসিক, গায়ক ও অভিনেতা এবং অন্যান্য শিল্পকর্মীদের মস্ত আড্ডা ছিল। পুশকিন, লার্মেন্টভ, নেক্রাসভ, লেসিয়া, টলস্টয়, করোলেন্কো, চালিয়াপিন, গোর্কি, মায়াকভস্কি,—এবং যার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এই ইয়ালতা,—তিনি হলেন আন্তন চেকভ! এখান থেকে সামান্য দূরে সমুদ্রতটপ্রান্তবর্তী একটি পাহাড়ের মধ্যে অরণ্যবেষ্টিত 'তেসেলি' নামক অট্টালিকায় ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানকার 'কাংসিভেলী' নামক একটি গ্রামের কাছাকাছি যে স্বাস্থ্যা-বাসটি দেখতে পাওয়া যায়, তার নামটি যেন চেনা-চেনা,—"গুলোবভাই জালিব"।

স্থানীয় 'মিসহোর' এবং 'গাসপ্রা' নামক দুটি পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে টলস্টয় এবং গোর্কির নাম বিশেষভাবে সংযুক্ত। ও'রা দুইজন প্রায় একই কালে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইয়ালতায় আসেন। গোর্কি তখন হলেন যুবা, গরীব, বাউণ্ডুলে, জীবনদর্শী! কাউন্ট টলস্টয় বৃদ্ধ, অশান্ত, ধনাঢ্য, খৃষ্টানধর্মসমাজ-(Holy Synod)-বিতাড়িত, স্ত্রীপীড়িত এবং তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু। গোর্কি পায়ে হেঁটে ঘুরছেন দেশ দেশান্তর,—

গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,—এবং তাঁর চালচুলো নেই! অবশেষে দক্ষিণ উক্রাইন থেকে তিনি আবার পায়ে হেঁটে 'পেরেকপ'-এর ভিতর দিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রপথ ধরলেন। আগে গেলেন সেবাস্তপল, সেখান থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে শাখা-উপদ্বীপ 'কার্চে', তারপর কিছুদিন রইলেন সমুদ্রশহর মনোরম 'ফিয়োদোশিয়ায়'। এখানে ডকে কুলিগিরি করলেন তিনি কিছুদিন। অবশেষে 'মিসহোর' থেকে 'গ্রাসপ্রায়' এসে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার দরকার টলস্টয়ের সান্নিধ্য।" এই 'গ্রাসপ্রাতেই' টলস্টয় একটি বাড়ি নিয়ে তাঁর সেই আপন সুদূরে গ্রামের নাম অনুসারেই এটির নাম রেখেছিলেন, "যশনায়া পলিয়ানা সানাটোরিয়ম"। এই স্বাস্থ্যাবাসের প্রবেশপথে টলস্টয়ের প্রথম আগমনের তারিখ উৎকীর্ণ রয়েছে। এই বাগানবাড়ির বারান্দাটি ছিল সাহিত্যতীর্থ! সবাই এখানে এসে মজলিশ বসাতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিত্যকার অভ্যাগত তাঁরা হলেন, চেকভ, গোর্কি, করোলেনকো এবং কুপ্রিন। সেই আড্ডায় বুড়ো টলস্টয়কে ঘিরে বুবার দল 'পাঁক ঘাঁটতো' কম নয়, কিন্তু তার ফলে বৃহত্তর দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একটির পর একটি শতদল প্রস্ফুটিত হত! টলস্টয় তাঁর আলাপ বা বিশ্রম্ভালাপে ছিলেন চিরতরুণ। বন্ধুসমাজে তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য রাখতেন না।

'ইয়ালতা' শব্দটি গ্রীক 'ইয়ালিতা'। এই নগরীর থেকে বেরিয়ে 'আলুস্তা' পাহাড়ের আশে-পাশে অতি-প্রাচীন সাইথিয়ান যুগের রাজধানী 'নিয়াপলিস'-এর ভগ্নাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'কোসকা' পর্বতের অতি-নিভৃত সানুদেশে বনময় অঞ্চলে সুপ্রাচীন 'তৌরী' জাতির কয়েকটি শুষ্ক কংকাল এবং গুহাসমাধি পাওয়া গেছে। এ-ছাড়া কয়েকটি পাথরের আবাস এবং একটি ক্ষুদ্রাকার দুর্গ খুঁজে বার করা হয়েছে। এখানকার পাহাড়ের কোনটির নাম দেওয়া হয়েছে ঘোড়া, কোনটির বিড়াল, কোনটির বা নেকড়ে! একটি বিরাট পাহাড় প'ড়ে রয়েছে সমুদ্রগন্ডে, মাথাটি রয়েছে উঁচুতে। তার পাশে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যখন জগৎ-প্রসিদ্ধ 'ইয়ালতা কনফারেন্স' এখানে অনুষ্ঠিত হয়, তার আগেই নাৎসীবাহিনী এই নগরটিকে প্রায় ছারখার করে চলে গেছে! এই কনফারেন্সে যোগদান করেন আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, এখনও জীবিত—মিঃ চার্চিল, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ডিক্টেটর মিঃ স্টালিন। তাঁরা কোথায় এসে উঠেছিলেন এবং সম্মেলনের অধিবেশনটি কোথায় সেদিন বসে—সেটি আমার দেখা দরকার ছিল। অকসানা বললেন, এই সম্মেলন মোট ১৫ দিন ধ'রে চলে। তিনি আমাকে নিয়ে চললেন সর্বপ্রথমে চার্চিল সাহেবের 'বাসস্থানে'। ইয়ালতা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্র-সৈকতের সন্নিকটে একটি বনময় নিভৃত পাহাড়তলীর কাছে পাওয়া গেল প্রকান্ড রাজবাড়ির এক তোরণদ্বার। কিন্তু তারপরেই একটি গল্প আরম্ভ হল!

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর জনৈক রুশ রাজকুমার এই আলুপকা পর্বতের নীচে তাঁর প্রণয়িনীসহ বিচরণ করতে এসে এই অধিত্যকা প্রদেশটিকে পছন্দ করেন। তাঁর ধনাঢ্য পিতা তখন ইংল্যান্ডের রুশীয় রাজদূত, এবং বিশেষ জনপ্রিয়। রাজকুমারের নাম 'কাউন্ট ভরনৎজভ'। তিনি প্রথমেই ইংল্যান্ড থেকে ডেকে আনলেন এক বৃটিশ স্থাপত্যবিদ মিঃ এডওয়ার্ড ব্লোরকে এবং দেখিয়ে দিলেন, এখানকার ৩৫০ বিঘা ঢেউ-খেলানো পাহাড়তলীতে এমন এক প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে যার চেহারায় 'আন্তর্জাতিক' সংস্কৃতির ছাপ থাকবে। ইংরেজ, রুশ, গ্রীক, রোমক, মূর, ইতালিয়ান, জার্মাণ, ফরাসী,—কারও চিহ্ন বাদ যাবে না! বড় শক্ত কাজ—ভাবলেন মিঃ ব্লোর। কিন্তু লোক কই? পাথর কাটবে কে? পাহাড় সরাবে কারা? সমুদ্রকে সায়েস্তা রাখার লোক কই?—কুমার ভরনৎজভ একটু হাসলেন। সমগ্র রাশিয়ায় তাঁর বহুসংখ্যক এস্টেট, কে না জানে? তিনি সেই সব এস্টেট থেকে ৮০ হাজার 'দাসানুদাস' (serfs) বা ভূমিদাস আনালেন, কেননা তারা বিনা পারিশ্রমিক এবং বিনা খাই-খরচায় এখানে কাজ করবে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করতে লেগেছিল মোট ১৮ বছর। কিন্তু পাথর কাটা ও বহন করার কাজ যথেষ্ট 'হালকা কাজ' মনে করে তিনি প্রতি বছর ৬ হাজার দাসী 'কিনে' আনতেন। প্রাসাদের একদিকে সোপান-শ্রেণী এক এক পর্যায়ে নেমে গিয়েছে কৃষ্ণসাগরের ঘাটে,—মোট ৩টি স্তরের দুই দিকে ৬টি বিভিন্ন অভিব্যক্তির 'সিংহ' আসীন। প্রাসাদের তিন দিকে বিশাল মায়া-কাননে মোট ২০০ রকমের বৃক্ষ-চারা জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে আনা। ভূমধ্যসাগরের দুই-পারের দেশ থেকে এসেছে বিভিন্ন গাছ। মেক্সিকো, লেবানন, ইতালি, ইংল্যান্ড, স্পেন—কোনও দেশ বাদ যায়নি। এই প্রাসাদে প্রবেশ করার কালে মনে হল, তাজমহলের প্রথম গেটটির মধ্যে প্রবেশ করলুম, অথবা ঠিক যেন দিল্লী দুর্গের নহবৎখানার নীচেকার প্রবেশপথ! তারপরে আরম্ভ হল মূর-সভ্যতার নিদর্শন, এবং ক্লাসিক গ্রীক ভাস্কর্যকলার এক-একটি প্রতিমূর্তি। ইউরিপাইডিস, সক্রেটিস, এস্কুলাপিয়াস, ডিমসথেনিস ইত্যাদি। চারিদিক ঘিরে জগৎবরেণ্য প্রাচীন শিল্পীগণের আঁকা রঙীন চিত্রশালা, এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, নীচে থেকে উপর পর্যন্ত যে সকল বিলাস-বৈভবসজ্জা নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলুম,—সেগুলি যেন দিবাস্বপ্নের মতো একটা অবাস্তব রূপলোকের ছায়া ও কায়া। মাঝে মাঝে মিনারেট, খিলান ও পাথরের জাপরির দিকে চেয়ে এবং রেশমীশিল্পে বোনা তুর্ক-মূর্তি লক্ষ্য করে ভারতীয় স্থাপত্যের কথা ভাবছিলুম। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর "Crimean Etudes" নামক গ্রন্থে এই রাজবাড়ি এবং 'আলুপকা পার্ক' সম্বন্ধে বিশেষ মনোজ্ঞ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। রুশবরেণ্য কবি মায়াকভস্কি এখানে তাঁর "Krym" কাব্য রচনা করেন। এই প্রাসাদ এখন যাদুঘরে পরিণত। ওখান থেকে সেদিন বেরিয়ে এক ঘটি খাবার জল পেলে খুশী হতুম!

ফিরবার পথে একটি প্রাসাদ পাওয়া গেল, যেটি প্রায় সমুদ্রের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুদৃশ্য প্রাসাদটির নাম "স্নোয়ালোজ নেস্ট", অর্থাৎ পাখীর বাসা! কোন্ কোন্ পাখী কবে এখানে বাসা বেঁধেছিল, সেটি শোনবার জন্য সমুদ্রতটবর্তী এক বাগানের বারান্দা 'ক্যাপটেনস্ কর্ণারে' দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালুম। অতঃপর ওই ফিরবার পথেই পাওয়া গেল 'সিমিজ' প্রাসাদ—যেখানে ষ্টালিন ছিলেন কয়দিনের জন্য। ওটির চারদিকে এখন একটি জনপদ গড়ে উঠেছে। প্রাসাদটি এখন শিশুদের স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যিনি আজও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু, এবং যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বহু দুর্দিনের বহু দুর্দশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বহু উপকরণাদি সরবরাহ করেছিলেন, সেই পরলোকগত মহৎ-প্রাণ প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যে-প্রাসাদটিতে ১৫ দিন যাবৎ বাস করেছিলেন, সেটি সমুদ্র-সৈকতের ঠিক উপরে বিশাল বিস্তৃত 'লিভাডিয়া প্রাসাদ'। এটি আধুনিক-কালের, অর্থাৎ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের অতিপ্রিয় রাজবাড়ি। এর বহুব্যাপী বিস্তার, এর কাননকুঞ্জলোক, এর আহারাদির স্থান ও বৈভবসজ্জা,—সবই রাজকীয়। এরই ভিতরের বিরাট একটি কক্ষে সম্মেলন বসেছিল! এই প্রাসাদটি দুইতলা, এবং এটি সম্রাটের নিজস্ব প্রাসাদ ছিল বলেই সমুদ্রের দূর-দূরান্তর থেকে চোখে পড়ে! এখন এখানে ৭০০ স্বাস্থ্যকামী কর্মী নিয়মিত পালাক্রমে বসবাস করে। এই প্রাসাদের বাগানে কয়েকটি কলাগাছ ও ডুমুরগাছ দেখেছিলুম! রাঙ্গা রাঙ্গা ডুমুর দেখেছি বটে, কিন্তু কলাগাছে

'ক্যাঁদ' পড়তে ওরা কেউ কখনও দেখেনি!

একশ' বছর আগে ইয়ালতার যে চেহারা ছিল, সেটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 'দিঘা'র অনুরূপ। সমুদ্র আছে, স্বাস্থ্য আছে, সৌন্দর্য আছে—কিন্তু সুযোগ-সুবিধা নেই। না উপযুক্ত যানবাহন, না বসবাসের সুব্যবস্থা, না বা শহর-বাজারের উপকরণাদি। ইয়ালতার এই 'আদিম' অবস্থার প্রথম প্রতিকার হয় যখন রেলপথ নেমে আসে উক্রাইন থেকে সিমফেরোপলে, এবং সেখান থেকে 'আলুস্টা' নামক একটি গ্রামের গা ঘেঁষে প্রশস্ত পার্বত্য-পথে মোটর চ'লে আসে সোজা ইয়ালতায়,—আন্দাজ ৭০ মাইল পথ। সিমফেরোপল নগরটি এখন যানবাহনের প্রধান-কেন্দ্র। 'আলুস্টা' জনপদটি যেমন ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'বাইজানটাইন' সভ্যতার আমলে সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি তুর্কি আমলে ক্রাইমিয়ার রাজধানী সিমফেরোপল-এরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন এর তুর্কি নাম ছিল, 'আল-মেচেৎ'।

ইয়ালতার উন্নতি আরম্ভ হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে রেলপথ ও মোটরপথের কৃপায়। পরম্পরায় যখন শোনা গেল, ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ একটি স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রধান কেন্দ্র, তখন পিল পিল করে ছুটে এল রাজপুরুষ এবং ধনী ব্যবসায়ীরা। ফলে, যে সমস্ত জমির বিঘা-পিছু দাম ছিল দশ টাকা, রাতারাতি তার দর উঠে গেল হাজার টাকায়! জমি নিয়ে লোফালুফি, এবং ব্ল্যাক-মার্কেট চলল—যেমন বাঙলাদেশের পার্টিশনের কালে দক্ষিণ কলকাতার কোন কোনও 'ব্যাঙ্ক' জমি নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছিলেন, এবং 'পচা চিংড়ি' বিক্রি করেছিলেন 'তাজা রুই মাছের' দরে! তেমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রাক-সোভিয়েট যুগে রাশিয়ায় ছিল প্রচুর। আজ সোভিয়েট আমলে তাঁদের ভূ-সম্পত্তি কিছু নেই বটে, কিন্তু তাঁদের বংশাবলী হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি! তাঁরাই ভিন্ন নামে ও ভিন্ন 'ধর্মে' এখন অনেকাংশে দেশ-জোড়া কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী,—দেশকে তাঁরা নতুন করে নির্মাণ করেছেন আপন অধ্যবসায়, কর্মশক্তি ও প্রতিভার দ্বারা। কিন্তু তাঁরাই উচ্চবিত্ত, তাঁরাই শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, লেখক, ডাইরেক্টর, রাজনীতিবিদ, এবং নানা বিভাগের 'কর্মী'—যাঁদের লক্ষ লক্ষ 'টাকা' উপার্জন,—যে-টাকা সোভিয়েট ষ্টেট ব্যাঙ্কে মোটা সুদে খাটছে। তাঁরা যখন মস্কোর তুষারাচ্ছন্ন রাজপথ দিয়ে কাঁচ-বন্ধ মোটরের মধ্যে কোটের উপর ওভারকোট চাপিয়ে আরামে বসে চলে যান আপন আপন কর্মস্থলে, আমি তখন দেখি ওই রাজপথেই সাংঘাতিক ঠাণ্ডার

মধ্যে বৃদ্ধা ঝাড়ুদারনি কোদাল নিয়ে বরফ কেটে নর্দমা খুলে দিচ্ছে! সর্বাপেক্ষা নিম্ন-বেতনভোগী ওই বৃদ্ধার অতিমানবিক কষ্টসহিষ্ণুতার দিকে চেয়ে আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কতদিন! আমার কিশোরের আদর্শ গোর্কি অনেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে 'গোর্কি স্ট্রীটের' দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে!

ইয়ালতার সর্বপ্রধান আকর্ষণ আন্তন চেকভের বাসস্থান। তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। শেকভ নয়,—চেকভ, এখানে জানলুম। বিগত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটি বৃহৎ ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি স্থানীয় 'মেরিন পার্কে' এবং লেনিনের একটি বিশাল প্রতিমূর্তি নগরের মধ্যকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। চেকভ এখানে অসুস্থ দেহে পাঁচ বৎসরকাল বাস করেছিলেন। উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি নিজের চেষ্টায় দেশবাসীর কাছে চাঁদা তুলে ইয়ালতায় যে প্রথম যক্ষ্মা-হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন, সেটির উদ্বোধন করা হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, এবং তার নাম দেওয়া হয় "যাউজলার" (Yauzlar)। বর্তমানে এটি "চেকভ স্যানাটোরিয়াম" নামে পরিচিত। সমুদ্রোপকূলবর্তী 'মেরিন পার্কে' বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে চেকভের কাছাকাছি গোর্কির একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইয়ালতার প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়টির নাম 'চেকভ থিয়েটার'। 'চেকভ স্ট্রীটে' যেখানে গোর্কি কিছু দিন বসবাস করেছিলেন, সেই রাস্তায় একটি ইস্কুলের সঙ্গে চেকভের নাম জড়িত। এই নগরের নানা স্থানে নানা সময়ে চেকভ বাস করেছিলেন, সেজন্য নানা বাসস্থানের গায়ে আজও তাঁর নাম উৎকীর্ণ করা আছে। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জগতের নানা দেশ-দেশান্তর থেকে প্রতি বছরে কমবেশি ৮০ হাজার লোক চেকভের যাদুঘরটি দেখতে আসেন। রুশ লেখক সমাজে তিনি সর্বাপেক্ষা মিষ্টপ্রকৃতি ও ভদ্রচিত্ত বলে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমতী অকসানার সঙ্গে এক দিন সকালে চেকভের বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বড় রাস্তার পাশে এবং পাহাড়তলীর একটু নীচের দিকে চেকভের বাগানবাড়ি। এই বাগানটি বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ এবং টলস্টয় যা করেছিলেন তাঁর নিজের এস্টেট 'যশনায়া পলিয়ানায়', চেকভও তেমনি নিজের হাতে এই বাগানের প্রত্যেকটি গাছ একদা পুঁতেছিলেন। আজ এগুলি অনেক বড় হয়েছে। দুইশত রকমের গাছের মধ্যে ইউক্যালিপটাস, খেজুর, বিভিন্ন শ্রেণীর গোলাপ, এবং অতিশয় বিস্ময়কর,—ভারতীয় ম্যাগনোলিয়া! নিজের বাগানটি সৌন্দর্যমণ্ডিত করার পর চেকভ সানন্দে বলেছিলেন, "সবাই যদি নিজের-নিজের জায়গাটুকু এমনি করে সাজাত, পৃথিবী কী পরমাশ্চর্য হত!"—তাঁর বন্ধু গোর্কি এই কথা কয়টি গুছিয়ে তুলে রেখেছেন এখানে। এই বাগানেরই একটি নিভৃত কোণে একখানা অনাড়ম্বর বেঞ্চের নাম, 'গোর্কি বেঞ্চ'। নামটি দিয়েছিলেন চেকভ নিজে। এইটি ছিল দুই বন্ধুর নিরিবিলি বসবার আসন। এই অঞ্চলটির নাম 'আউটকা' এবং এখানে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চেকভ নিজে এই বাস্তু জমিটি ধারে খরিদ করেন। জমিটির পরিমাণ বিঘা-তিনেক। কিন্তু জমি ক্রয়ের মাত্র কয়েক দিন আগে চেকভের পিতা পাভেল ইয়েগোরোভিচ চেকভ হঠাৎ মারা যান। আন্তন পাভলোভিচ চেকভ স্থির করেন, তাঁর নিজের বাড়ি মস্কোর অন্তর্গত 'মেলিখোভো' ছেড়ে এই ইয়ালতায় বাড়িঘর বানিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করবেন। তাঁর সহোদরা মেরিয়া পাভলোভনা এসে উপস্থিত হলেন। এই মহিলা আজীবন এই বাড়িটিতে 'চেকভ মিউজিয়মের' অভিভাবকস্বরূপ বাস করে গেছেন। এই চেকভ মিউজিয়ম তাঁরই কীর্তি এবং চেকভ এই সম্পত্তিটি ভগ্নীকেই দান করে যান। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে এই মহিলার মৃত্যু হয়।

এই বাড়ির নক্সা প্রস্তুত করেন স্থাপত্যবিদ লিও শাপোভালভ। চেকভ নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর পছন্দ-মতো ভিতর মহলটি প্রস্তুত করান। আর্থিক অবস্থা কোনও কালেই তাঁর ভাল নয়। খ্যাতির অনুপাতে রোজগার নেই, কিন্তু বাড়ি তৈরীর সখ লেখকেরই বা থাকবে না কেন? নিজের পছন্দসই একখানি বাড়ি বানিয়ে তোলা মানে নিজের পছন্দসই একখানি সার্থক উপন্যাস রচনা করা! যে-আঙ্গিক চেতনায় একটি ছোটগল্পের নির্ভুল নির্মাণ-কৌশলকে প্রকাশ করা যায়, সেই একই চেতনা এবং একই প্রতিভা কাজ করে মাসগুহ রচনায়! এই বাড়িটিও তাই চেকভের বিবেচনায় একটি মনোরম ছোটগল্প! কিন্তু মাস-তিনেকের মধ্যে টাকার অভাবে জমিটিকে বন্ধক রেখে রাজমিস্ত্রি এবং মাল-মসলার দেনা শোধ করার পর দেখা গেল, আসল বাড়ির কাজ কেবল তখন সবেমাত্রই আরম্ভ হয়েছে। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি 'নিবা' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশকের নিকট এই প্রকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তাঁর সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের যা কিছু রচনা,—তাদের সর্বপ্রকার স্বত্ব এঁদের কাছে বিক্রী করে দিয়ে কিস্তিবন্দিতে তিনি মোট ৭৫ হাজার রুবল পাবেন! চেকভ মোট ৮ শত ছোট ও বড় গল্প বা উপন্যাস এবং ৫ খানা বড় নাটক লিখেছিলেন। 'নিবা' প্রকাশনার মালিক ছিলেন 'এডলফ্ মার্কস',—সম্ভবত তদানীন্তন একজন ইহুদী! তিনি প্রথম চোটেই খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ১ লক্ষ রুবল লাভ করেন। সে যাই হোক, সেই আমলে চেকভের মোট ২০ খণ্ড বইয়ের ৭ লক্ষ কাপি ছাপা হয়েছিল। বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েট যুগে মোট ৭২টি ভাষায় চেকভের গ্রন্থ ৫ কোটি ৫০ লক্ষ কাপি ছাপা হয়। অদ্যাবধি জগতের অন্যান্য প্রায় ৭০টি ভাষায় চেকভের গল্প ও নাট্যসাহিত্য অনুবাদ করা হয়েছে। আমি নিজে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চেকভের তিনটি ছোটগল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলুম!

চেকভের বাড়ীটির বর্ণ শাদা। তাঁর মৃত্যুকালে ভিতরের প্রত্যেকটি কক্ষ যেমন যেভাবে সাজানো ছিল, আজও অবিকল সেইভাবেই আছে। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী মেরিয়া পাভলোভনা অনেক অভাব-অভিযোগ-অসুবিধার মধ্যে এই সম্পত্তিটি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর একটি স্মৃতিকথায় বলে গেছেন, "I was greatly worried about the future of our Yalta home and at one time had to negotiate with the editorial offices of magazines and newspapers inviting them to help preserve this literary monument... After the October Revolution the situation changed fundamentally.... It was placed on a firm footing...." বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে এই মিউজিয়মটিকে নানা কারণে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি এবং এটি জার্মান সেনাদলের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এটিকে স্পর্শ করেনি! চেকভের বাড়িটি সওয়া দুই তলা, এবং অতি সুশ্রী। জার্মান অবরোধকালে মিউজিয়ামটি ছিল, এবং মেরিয়া দোতলায় বাস করতেন। তাঁর বয়স তখন ৮০ বছরের কাছাকাছি। প্রতি ঘরে চেকভের প্রতিটি ব্যবহৃত সামগ্রীর আশে-পাশে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। এই বাড়ির সঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির যোগ অনেকখানি। চেকভের সঙ্গে গোর্কির বন্ধুত্ব হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ইয়ালতায়, এবং সেই থেকে গোর্কি চেকভের প্রায় প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববাদী গোর্কি পলাতক অবস্থায় কিছুকালের জন্য চেকভের এই বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করেন।

চেকভ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী আজব সমুদ্রের তীরবর্তী 'টাগানরগ' নগরে। তিনি 'দাসানুদাস' (serf) বংশের সন্তান। তাঁর ঠাকুরদাদা ও বাবা অতিশয় বদমেজাজী, রুক্ষ-প্রকৃতি এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁদের উৎপীড়ন, অনাচার ও কুবাক্যে চেকভ পরিবারে নিত্য অশান্তি দেখা দিত। চেকভের পিতা তাঁর অনাচার ও দুর্ধর্ষ-প্রকৃতিতে

ঠাকুরদাদাকেও ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর ঠাকুরদাদার নাম ইয়েগোর মিখাইলোভিচ, এবং বাবার নাম পাভেল ইয়েগরোভিচ। চেকভের ঠাকুরদাদা ভূমি-দাস প্রথাকে অতিশয় ভালবাসতেন, কিন্তু নিজের 'দাসত্ব' থেকে মুক্তি চাইতেন। অবশেষে সুযোগ মিলল। তিনি তাঁর প্রভু-জমিদার মিঃ চার্টকভকে সর্বসাকুল্যে ৩৫০০ রুবল সেলামী দিয়ে নিজকে, স্ত্রীকে এবং তিনটি ছেলেকে 'ক্রয়' করলেন! বছর ১৩ বয়সের একটি মাত্র মেয়ে, অর্থাৎ চেকভের পিসিমা, পিছনে পড়ে রইল সামান্য টাকার অভাবে। কিন্তু মেয়েটির কান্নাকাটি দেখে দয়া-পরবশ হয়ে চার্টকভ মেয়েটাকেও মুক্তি দিলেন! অতঃপর সকলে স্থানত্যাগ করে চলে যান। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র চাষী পরিবার।

চেকভ তাঁর বাবার মফঃস্বল শহরের মুদিখানায় বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও এক বোন। অতি নম্রমধুর এবং ভদ্রস্বভাব চেকভ ২৪ বছর বয়সে চিকিৎসক হন। ইয়ালতায় তিনি নিজে যখন যক্ষ্মা-রোগে ভুগছেন, তখন দেশের বহু স্থান থেকে অসংখ্য যক্ষ্মারোগী তাঁর কাছে সাহায্য ও পরামর্শ চেয়ে পাঠাত! ইয়ালতায় যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পিছনে এইটিই ছিল প্রধান কারণ। তাঁর জীবন-সংগ্রাম অতিশয় কঠোর ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। যৌবনকালে তিনি বিবাহ করেননি। কিন্তু তাঁর বিবাহের ব্যাপারটি খুবই কৌতুকপ্রদ। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সাড়ে চার মাস আগে মস্কোতে আমি তাঁর সংগে দেখা করেছিলুম, একথা আগেই বলে এসেছি। এই মহিলার পিতৃদত্ত নাম হল, 'অলগা লিয়োনার-দোভনা কেনিপার'। শ্রীমতী অলগা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিলেন, এবং চেকভের নাটক 'সী-গাল' ও 'আঙ্কল বানিয়া' নিয়ে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকালে তিনিই এই দুই নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন! অতি অল্পকালের মধ্যে সেই থিয়েটার পার্টি বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীসহ ইয়ালতায় অসুস্থ চেকভকে তাঁর নিজের নাটকাভিনয় দেখাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সুন্দরী, মিষ্টভাষিণী ও মধুর-প্রকৃতি শ্রীমতী অলগা চেকভের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। স্বামী অপেক্ষা অলগা ৮ বছরের ছোট ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চেকভের মৃত্যুর পর এই সাধ্বী রমণী স্বামীর স্মৃতি বহন করে ৫৫ বৎসরকাল বৈধব্য জীবন যাপন করেছিলেন। আমি যেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম তখন তিনি সবেমাত্র ৯০ বৎসর পার হয়েছেন!

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে চেকভ তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অভিযান করে ইয়ালতা থেকে স্থলপথে ছয় হাজার মাইল পূর্ব-পথে শাখালিন দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর এই অভিযানপথে শত শত বৃহৎ নদী, মরুভূমি, সাইবেরিয়ার চির-তুষারাবৃত ভূভাগ, ভয়াবহ মরুভূমি, বন্য ও হিংস্র উপজাতি-অধ্যুষিত ভূভাগ, হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী অরণ্য ইত্যাদি পার হয়ে এবং আমুর নদ ও তাতার প্রণালী অতিক্রম করে ওখটস্ক সাগরবর্তী শাখালিন দ্বীপে পৌঁছতে হয়। রেলপথে, শালতি ও বার্জে, ঘোড়ার বা উটের পিঠে, পায়ে-হাঁটা-পথে—অতি-মানবিক পরিশ্রম করে তিনি সেই দ্বীপে পৌঁছেন! আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে আন্দামান দ্বীপ যে-কাজে লাগত, জার-সম্রাটদের আমলে রাজনীতিক ও সাধারণ দুশকয়েদীগণকে ঠিক সেই ভাবেই শাখা-লিনে নির্বাসন দেওয়া হত। আপন দেশ, জাতি ও জনজীবনকে উত্তমরূপে জানবার জন্য এই হৃদয়বান রুশ-অভিযাত্রী এইভাবে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। শাখালিন দ্বীপে কয়েদী সম্প্রদায়ের অতি বীভৎস জীবনযাত্রা দেখে তিনি স্তম্ভিত হন। তিনি তিন মাসকাল শাখালিনে ভ্রমণ করেন এবং কয়েদীগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা পান। তিনি তাঁর চোখের সামনে অসংখ্য কয়েদীর শোচনীয় মৃত্যু দেখে শিউরে ওঠেন। অবশেষে তিনি শাখালিনের আদম-সুমারী পরি-চালনা করে দশ হাজার কয়েদীর তালিকা ও 'কার্ড' প্রস্তুত করেন। চেকভ তাঁর শাখালিন দ্বীপ অভিযানের বিশদ বর্ণনা করেন তাঁর একখানি গ্রন্থে। গ্রন্থখানির নাম "Island of Sakhalin" ফিরবার পথে তিনি জাহাজযোগে দূরে ও দক্ষিণ প্রাচ্যের সমুদ্র হয়ে সিংহলের রাজধানী কলম্বোয় অবতরণ করেন এবং যে-চারটি 'পুতুল-ছাত্রী'—তার মধ্যে দুটি শাদা আইভরি নির্মিত—কিনে আনেন, সেগুলি আজও তাঁর দেরাজে সাজানো রয়েছে। তাঁর জীবনকালে ক্রাইমিয়ায় ইলেকট্রিক জ্বলেনি। তিনি মোমবাতির আলোয় কাজ করতেন। চেকভের সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয় মস্কোয়। তিনি এক জায়গায় কোনও কালে স্থির থাকেননি। কস্তুরী মৃগের মতো আপন গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি কেবলই জায়গা বদল করতেন। 'ত্রুবনায়া স্ট্রীট, নং ২৩—নামক মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে বসে তিনি প্রথম জীবনে যে রচনাটি লিখেছিলেন, "A letter to a learned neighbour"—সেইটি তাঁকে প্রথম খ্যাতি এনে দেয়।

বিবাহের তিন বছর পরে তিনি অন্যান্য বারের মতো এবারেও মস্কোয় যান। কিন্তু আর তিনি ইয়ালতায় ফেরেননি। তাঁর ডায়ার তারিখটি পুরনো পাঁজি অনুসারে ছিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। মস্কোয় গিয়ে তিনি পুনরায় শয্যাগত হন এবং রক্তবমি করতে থাকেন। অতঃপর জনৈক জার্মান চিকিৎসকের নির্দেশক্রমে তিনি সস্ত্রীক দক্ষিণ জার্মানীর 'বাদেনওয়েইলার' নামক 'স্বাস্থ্য-শহরে' যান, কিন্তু সেখানেও তাঁর রোগের উপশম হয় না। সুতরাং সেখান থেকে তিনি তাঁর পরম অনুরক্তা সহো-দরাকে লেখেন, ইয়ালতায় তিনি ফিরে আসতে চান। তিন দিন পরে এই চিঠি যখন শ্রীমতী মেরিয়ার হাতে এসে পৌঁছয় ঠিক সেই দিনই অর্থাৎ ২রা জুলাই, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশ-লেখক সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও ভদ্র-প্রকৃতি আন্তন পাভলোভিচ চেকভ 'বাদেনওয়েইলার' স্বাস্থ্যনিবাসে মারা যান। মৃত্যুশিয়রে তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীমতী অলগা কেনিপার উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনার ৫৫ বৎসর পরে শ্রীমতী অলগা তাঁর মস্কোর বাড়িতে বসে শ্রীমতী লিডিয়ার সাহায্যে আমার নিকট স্বামীর মৃত্যু-দিবসের ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন!

এখানে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি।—

আমার দ্বিতীয় দফায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে অর্থাৎ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় 'খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন' আরম্ভ হয়। এই আন্দো-লনের ফলে খাদ্যসমস্যার বিন্দুমাত্র প্রতিকার হয়নি, কিন্তু নানা-স্থলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলেছিল। এ সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক উদ্বেগ থাকার জন্য শ্রীমতী প্যাটারসন আমার হাতে ৪।৫টি আমেরিকান কাগজের কাটিং দিয়েছিলেন। সেগুলি পাঠ করে শ্রীমতী অকসানা ঈষৎ উত্তেজনার সংগে প্রশ্ন করলেন, কে এরা?

আমি বলি, এরা এক শ্রেণীর বামপন্থী, সরকার-বিরোধী!

Do you mean, they're communists?

আমি জানিনে।

অকসানা বার-দুই ভারত ভ্রমণ করে-ছেন। তিনি ভারতের রাজনীতিক সংবাদ রাখেন। একটু থেমে তিনি বললেন, They can never be communists, I tell you Mr. Sanyal; These people are bandits and marauders, and they are enemies of the people!

অতঃপর অকসানা আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, কমিউনিস্টরা কখনও জনসম্পত্তি ধ্বংস করে না! আমাদের বিপ্লবকালে আমরা জনসাধারণের সামান্য-তম সামগ্রীও নষ্ট হতে দিইনি!—We never destroy even a needle, nor we demolish even a cow-shed!

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে শ্রীমতী অকসানার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। —(ক্রমশঃ)

মতামত

'স্বামী-বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে

৪৪শ সংখ্যা (শুক্রবার ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬৮) অমৃতে শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'অনুসৃত সাধন-পথের প্রভেদ সত্ত্বেও' এই দুই বরণীয় মহাপুরুষের মধ্যে যে আদর্শ চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটা সুগভীর ঐক্য বিদ্যমান, উভয়ের রচনা ও বাণী থেকে বহু উদ্ধৃতির সাহায্যে লেখক তা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক স্বদেশ-প্রেম, মানব-প্রেম ইত্যাদি বহু বিষয়ে উভয়ের মতৈক্য সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে, তাঁদের জীবনাদর্শ এবং কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য যেখানে সর্বাধিক সেই বিষয়টি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এ'রা দু'-জনেই ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনাদর্শের উদ্গাতা, এবং আমেরিকা ও য়ুরোপে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধ্যাত্মিকতার— বেদান্তের অমৃত-বাণীর ব্যাখ্যাতা। 'ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি' রূপে পাশ্চাত্যে হয়েছিল উভয়ের প্রতিষ্ঠা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকা এবং য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বেদান্ত প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকেই পাশ্চাত্যবাসীদের উপনিষদের বাণী শোনাতে আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথ। Sadhana নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর হার্ভার্ড বক্তৃতামালা লিখিত হয় ১৯১২ খৃস্টাব্দে আরবানা, ইলিয়নস-এ অবস্থানকালে।
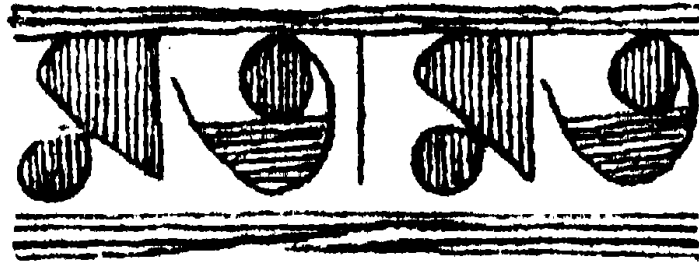
পরাধীন ভারতেরও যে সমস্ত পৃথিবীকে দেবার মত নিজস্ব সম্পদ আছে, শিক্ষা আছে—যে-শিক্ষাকে রোমাঁ রলাঁ বলেছেন—
Grandiose teaching of The East—তা বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসীকে প্রথম শোনান বিবেকানন্দ, তারপর রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাত্ম-সাধন-মার্গের পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের বাণী প্রচারক এই মহামানবদ্বয় পরস্পরের আত্মার আত্মীয়, এ'দের আত্মিক সম্পর্ক এই ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠতম—একটি মহাজীবন যেন আর একটি মহা-জীবনের পরিপূরক। পশ্চিমে ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচারে উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ বিবেকানন্দের দ্বারা আংশিকভাবেও প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা বা জবানিতে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যায় না। এই বিজিজ্ঞাসিতব্য বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতের শাশ্বত আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁর নিম্নোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :—

"As for Tagore, whose Goethe-like genius stands at the junction of all the rivers of India, it is permissible to presume that in him are united and harmonised the two currents of the Brahmo Samaj (transmitted to him by his father, the Maharshi) and of the new vedantism of Ramkrishna and Vivekananda. Rich in both, free in both he has serenely wedded the West and the East in his own spirit. From the social and national point of view his only public announcement of his ideas was, if I am not mistaken, about 1906 at the beginning of the Swadeshi movement, four years after Vivekananda's death. There is no doubt that the breath of such a forerunner must have played some part in his evolution". (**The Life of Vivekananda And The Universal Gospel — by Romain Rolland P.318-19, Foot Note**)।

রলাঁ এখানে যা বলেছেন তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ব্রাহ্মসমাজ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ এই দুটি ধারা এসে একীভূত এবং সমন্বিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এবং তিনি তাঁর নিজের আত্মার মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পুরোগামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশে অন্ততঃ আংশিকভাবেও সক্রিয় হয়েছিল।

এই উদ্ধৃতাংশে :
'his only public announcement of his ideas'
এই কথাগুলি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি "পূর্ব ও পশ্চিম" নামে "সমাজ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তারিখ সম্বন্ধে রলাঁ ভুল করেছেন। প্রবন্ধের নীচে লেখা আছে ১৩১৫—কাজেই ১৯০৬ সালে এটি রচিত হয় নি, হয়েছিল তারও বছর দুই পরে।

'সমাজ'-এ 'আচারের অত্যাচার,' 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রভৃতি আটটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলি ১২৯২ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে লিখিত। কয়েকটি প্রবন্ধেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা বলা হয়েছে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের পথিকৃৎদের মধ্যে অধুনাতনকালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়।" (সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃঃ ১২০—২১)

অতঃপর রানাডের বিষয় উল্লেখ করে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছেন, নরেন্দ্র দেব মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে (অমৃত পৃঃ ৪১৫) তা

উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্র রচনাবলীর ১২শ খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় এর সন্ধান পাবেন।

দেব মহাশয় স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দুটি সূত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শেষেরটি একটি পত্রাংশ। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৯[illegible], ৯ই এপ্রিল 'রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা' নামক গ্রন্থপ্রণেতা 'ডাঃ সরসীলাল সরকারের কোনো পত্রের উত্তরে অমিয় চক্রবর্তী যে পত্র দেন তার অনুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন।' (রবীন্দ্র-জীবনী— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭২)

স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কিন্তু শুধুমাত্র 'পূর্ব পশ্চিম' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এবং এই পত্রাংশটিতেই পর্যবসিত নয়। ১৯২৬ সালের ২৪শে এবং ২৫শে জুন সুইজারল্যাণ্ডের ভিলেন্যুভে (Villeneuve) এবং ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে (তারিখ অনুল্লিখিত) রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে কথালাপ হয়। শেষোক্ত দিন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ভারতে দেবতার উদ্দেশে জীববলির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমাদের ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ অনেকে ঐতিহ্যগত বলে এর সমর্থন করেন। রোলাঁ তখন খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও যে জীববলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেকথা বলেন। অতঃপর এঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় এবং যাতে প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের কথা এসে পড়ে সেই অংশটুকু : Alex Aronson & Krishna Kripalani সম্পাদিত **Rolland and Tagore** (P99 100) নামক বই থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হল :

Tagore:— "I have never been able **to love the God of the old Testament. He is the Lord with the rod**".

Rolland — "**But even in the** New **Testament the same motive occurs. Jesus is the lamb and the Lord sacrificed** for the sake of humanity. The **emphasis is** wrongly **placed, and the attitude is not spiritual in the large sense....Do you think that Vivekananda in India tried to check the abuses in this line?**"

Tagore:— "**So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life...: We must rise higher in our spiritual experience in the domain** where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried **to go beyond good and evil that he could** tolerate many religious **habits and customs** which **have nothing** spiritual about them...." **My** attitude towards **truth** is different. **Truth cannot afford** to be tolerant **where** it faces positive **evil,** it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossiblle...."

রবীন্দ্রনাথের শেষের কথাগুলি থেকে সত্যের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের আভাস পাওয়া যায়।

রোলাঁকে—

The Life of Vivekananda and the universal Gospel (Tr. from the original French by E. F. Malcolm—Smith M.A., Ph.D.) রচনায় প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছিলেনPrabuddha Bharat পত্রিকার তদানীন্তন প্রধান সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ। রোলাঁ তাঁর বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ফুটনোটে এঁর নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর নিকট এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্বন্ধে লেখেন :

"বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোনো বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরোধিতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে, তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"

(এই পত্রখানি 'কিশোর বাংলা' পৌষ, ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কোথাও কিছু বলেছিলেন কিনা তার সন্ধান আমরাও পাইনি। আমরা যতদূর জানি সমসাময়িক বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কারও সম্বন্ধে কোথাও তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু দেশ-বিদেশের সাময়িক পত্রাদিতে অনুসন্ধান করলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও উক্তির সন্ধান পাওয়া আশ্চর্য নয়। আপাততঃ যা পাওয়া গেছে, পরিমাণে স্বল্প হলেও তা বিশেষ মূল্যবান। তার থেকে জানা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের জন্যে যে স্বামীজী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেকথা রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন অর্ধ শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল পূর্বে। তাঁর উক্তি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক ভারতবর্ষে একটি প্রেরণাদায়ক বাণী-প্রচারক বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেন। স্বামীজীর দরিদ্রনারায়ণ সেবার বাণী যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সহায়ক এই সত্যটি তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন।

—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র,
কলিকাতা : ৬

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত
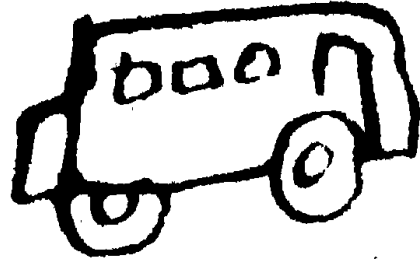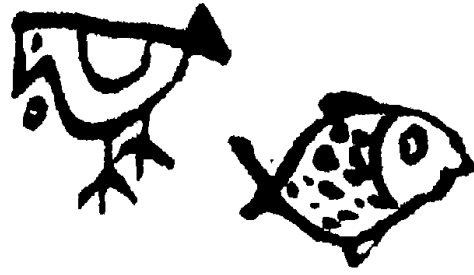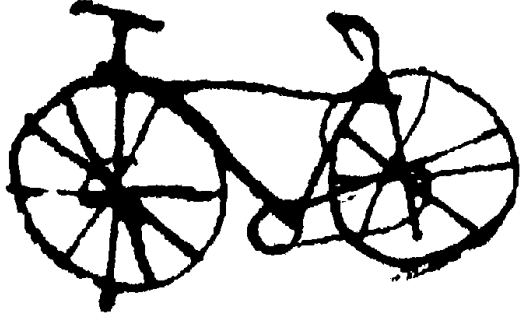
॥ বাস-টার্মিনাসের একটি কিশোর ॥

শহরের নানা অঞ্চলে ওকে দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে বাস-টার্মিনাসে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে। পরনে ছিটের শার্ট ও হাফপ্যান্ট। মাজা মাজা গায়ের রঙ। বাঁ বগলে ধূপকাঠির প্যাকেটের একটা বান্ডিল। ডান হাতে ধূপকাঠির একটি প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে অতি বিনীত ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

'এক প্যাকেট ধূপকাঠি নেবেন?'

গলার স্বর এখনো মিষ্টি ও কোমল। অর্থাৎ, এখনো সেই নিষ্পাপ কৈশোর যখন মায়ের আঁচল থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে এই বিপুল পৃথিবীর দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকার কথা। যখন এই পৃথিবীর রুক্ষ দিনগুলো থেকে ওকে আড়াল করবার জন্যে মাথার ওপরে থাকার কথা বটের মতো ছায়া মেলা মস্ত একটি নির্ভর। কুঁড়ির মতো ফুটন্ত সেই আশ্চর্য কৈশোর যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একজন মানুষের কাছে পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

'এক প্যাকেট ধূপকাঠি নেবেন?'

এবারে মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে, কৈশোর শুধু রয়েছে গলার স্বরে ও গায়ের চামড়ায়। চোখের দৃষ্টিতে নেই, কথা বলার সুরে নয়, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতেও নয়। চোখের দৃষ্টিতে মিনতি, কথা বলার সুরে আবেদন, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে ভিক্ষুকের প্রত্যাশা। কাঁচ একটি চারাগাছ যেন ছায়ার আশ্রয় হারিয়েছে। প্রচণ্ড তাপে একটু একটু করে পুড়ছে আর একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ব্যাকুল গ্রন্থি মেলে দিয়েও মাটির নিচে একবিন্দু রসের সন্ধান পায়নি।

'স্কুলের মাইনে দিতে পারিনি। নিন না এক প্যাকেট ধূপকাঠি!'

কথাগুলো অনেকটা কান্নার মতো বেরিয়ে আসে। এ কান্নার কোনো ভাষা নেই। আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামলে কখনো কখনো মনে হতে পারে, এমনি এক কান্নার শব্দ চরাচরকে ব্যাপ্ত করেছে। কান পেতে থাকলেও পৃথিবীর আরেকটি দিনের উচ্ছ্বসিত ঘোষণা শোনা যাবে না। ডবলডেকার বাসের থর-থর কাঁপুনিকেও এই কান্না তলিয়ে দিতে পারে।

'নিন না!'

কিন্তু আজকের দিনের মানুষ বুকে পাথর বেঁধে চলাফেরা করে। অনেক ঠকেছে সে, অনেক শুনেছে। আর তাই সে-পাথরটায় কান্নার দাগ পড়ে না।

'নেবেন?'

পাথরটা একটু নাড়া খায়। পাথর ঠেলে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে: 'কোন স্কুলে পড়ো তুমি?'

স্কুলের নাম বলে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বেরিয়ে আসে কোনো একটি স্কুলের কোনো একটি ক্লাশের বইয়ের তালিকা।

কিন্তু মানুষটি অনেক ঠকেছে। অনেক শুনেছে। তাই সে বলে, 'মাইনে দেবার রসিদ-বই আছে?'

প্রত্যাশায় উন্মুখ জবাব পাওয়া যায়: 'বাড়িতে আছে। বাবার কাছে।'

আরো একটি-দুটি প্রশ্ন ও তার জবাবের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে পুরো একটি কাহিনী। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাবা হয়তো চাকুরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। হয়তো অনেক চেষ্টা করেও কোনো চাকুরি যোগাড় করতে পারেননি। এক-কালের গৃহস্থঘরের বৌ ও পরবর্তী-কালের জননীকে হয়তো বাধ্য হয়েই বাসনমাজার কাজ নিতে হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে বাবা নিজেই এক-কালে শিক্ষক ছিলেন। উদ্বাস্তু জীবনে এখন হয়তো কোনো মাঝারি গোছের ব্যবসাদারের গদিতে নিতান্তই অল্প মাইনের খাতা-লিখিয়ে। শিক্ষক বাপের বড়ো ছেলের তাই লেখাপড়া শেখার জন্যে এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। কিংবা হয়তো এসব কিছুই নয়। এককালের মোটামুটি দু-বেলার দুটি অন্ন জোটা একটি পরি-বার হয়তো দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে

এমন একজনের আশ্রয় খুইয়েছে যিনি বিছানা নিলে এই সংসারটিও অচল। সেই ব্যাধির পূতিগন্ধ হয়তো কিশোরটির নিশ্বাসেও পাওয়া যেতে পারে। হাজার ধূপকাঠি জ্বালিয়েও তা চাপা দেওয়া যাবে না।

হয়তো তাও নয়। আধি নেই, ব্যাধি নেই, তবুও এই দেশের উৎকট রকমের স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর বর্তমান কালটাই একটি সংসারের টুঁটি টিপে ধরেছে। সেই মানুষটি হয়তো সুস্থ শরীরেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। সেই জননীটি হয়তো মুখ বুজেই সকালে বিকেলে বাসন মাজছে—তবুও পনেরো বছরের একটি কিশোরকে স্কুলের পরে খেলার মাঠে পাঠাবার সুযোগটি কিছুতেই তৈরি করা যাচ্ছে না।

এমনি আরো কত কি। কলকাতার রাস্তায় নিঃশ্বাসের মতো নিঃশব্দে ঝক-ঝকে মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। আবার সেই একই রাস্তায় ডবলডেকার বাস ঊর্ধ্বশ্বাস গতিকে সংযত করতে গিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজে ফেটে পড়তে চায়। তবুও তারই মধ্যে দিয়ে ট্রাম চলে নিতান্তই ধরাবাঁধা রাস্তায়। তার যতোটা না বেগ তার চেয়ে বেশি শব্দ। এখানেই শেষ নয়। এই সমস্ত যান্ত্রিক আয়োজনকে তাচ্ছিল্য করেই যেন পাশাপাশি চলে ঠেলাগাড়ি, রিকশা আর গোরুর গাড়ি। কলকাতার সরু রাস্তায় এই বিচিত্র ট্রাফিক পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে আর দাপাদাপি করছে। সব মানুষই এই পাগলা ষাঁড়কে সমীহ করে চলে। আর এই অবস্থায় আচমকা যদি একদিন দেখা যায় যে পনেরো বছরের একটি কিশোর খেলনা-গাড়িতে চেপে এই পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে তাহলে প্রথমটায় হাসি পাবে এবং সেই হাসিটাকে খানিকটা ভাবনা দিয়ে চাপা দিতে পারলে শিউরে উঠতে হবে।

বুকে পাথর দেওয়া মানুষটাও প্রথমে হয়তো হেসে উঠেছিল। তাই জিজ্ঞেস করে, 'কতদিন এ লাইনে আছ?'

'আজ্ঞে!'

'বলি, কতদিন আছ এ লাইনে?'

মানুষটা অনেক ঠকেছে। অনেক শুনেছে। তাই যখন চোখে পড়ে যে সেই মিনতিভরা চোখদুটোতে ফুটে উঠেছে কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি—তখন নিজের কৃতিত্বে নিজেই উল্লসিত হয়।

তাই আবারও বলে, 'তোমাকে না পরশু দেখেছিলাম গলায় কাছা ঝুলিয়ে ভিক্ষে করতে?'

'আজ্ঞে!'

'মনে নেই সেই যে রাসবিহারীর মোড়ে—মনে নেই? আমি তোমাকে দু-আনা পয়সা দিয়েছিলাম।'

এবারে স্পষ্ট জবাব শোনা যায়, 'না, আমি নই।'

'আলবৎ তুমি! আমি নিজের চোখে দেখলাম!'

এবারে আরো স্পষ্ট জবাব শোনা যায়, 'আপনি ভুল দেখেছেন।'

কিন্তু মানুষটা যতোই ঠকে থাকুক আর যতোই শুনে থাকুক, তাকেও এই দেশের উৎকট স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর বর্তমানেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে তারও মনে হয় যে বেঁচে থাকাটা নিতান্তই একটা খেলনা-গাড়িতে চেপে পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। আর তাই অনেক ঠকবার পরেও আর অনেক শুনবার পরেও তাকে অনেক কিছু বুঝতেও হচ্ছে।

> এবার থেকে 'ভবঘুরের খাতা' নামে একটি বিভাগ চালু করা হল। এক সপ্তাহ পর পর এই বিভাগে সহর কলকাতার বিচিত্র জীবনের রেখাচিত্র প্রকাশিত হবে।

তখন ধূপকাঠির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকে আর বলে, 'নাঃ, গন্ধ নেই একেবারে।'

উৎকণ্ঠিত প্রতিবাদ ওঠে, 'একটা জ্বালাব—দেখবেন?'

আশ্চর্য সাহস বলতে হবে। কল-কাতার প্রকাশ্য রাস্তায় ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রমাণ দিতে চায়!

'জ্বালাই?'

'না থাক।'

'নেবেন একটা প্যাকেট?'

এবারে যেন শুধুই মিনতি নয়, শুধুই আবেদন নয়, শুধুই ভিখিরির মতো প্রত্যাশা নয়। খানিকটা যেন দাবিও।

'নেবেন?'

বুকের পাথরে কান্নার দাগ পড়েনি। কারণ মানুষটা অনেক ঠকেছে। অনেক শুনেছে। কিন্তু এই মানুষটাকেও কারও না কারও কাছে কোনো না কোনো সময়ে দাবি নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ মানুষটা বেঁচে আছে।

তাই সে বলে, 'আমার তো ধূপকাঠির দরকার নেই।'

কথাগুলো ঘোষণার মতো শোনায় না। কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন।

'স্কুলের মাইনে দিতে পারিনি। নিন না একটা প্যাকেট!'

এই দেশের উৎকট স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর কালটাই যেন জবাবদিহি চাইছে। কান্না হলে বুকের ওপরে বাঁধা সেই পাথরটায় কোনো দাগ পড়ত না। যদি কান্না হত তাহলে অনেক ঠকে ও শুনে শেখা মানুষটা অনায়াসেই বলতে পারত, 'না, আমার দরকার নেই।' কিন্তু এবারে কান্না নয়—জবাবদিহি। কি আশ্চর্য যে সেই শক্ত আর নিরেট পাথরটা একটু একটু করে গলতে শুরু করল।

এক প্যাকেট ধূপকাঠির সমস্ত ধোঁয়াকে তালগোল পাকিয়ে যদি মহা-শূন্যে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তা কি একটি নীহারিকার জন্ম দিতে পারে? সেই নীহারিকা কি কোনো দিন হয়ে উঠবে একটি দেদীপ্যমান নক্ষত্র? এই হিসেব মানুষটির জানা নেই। তাই সে এতকথার পরেও প্রশ্ন করতে পারে, 'কত দাম এক প্যাকেটের?'

'দু আনা।'

স্কুলের মাইনের হিসেব মানুষটার জানা আছে। দু'আনাকে কত দিয়ে গুণ করলে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায় তা কষবার জন্যে খাতা-পেনসিলের দরকার হয়তো নাও হতে পারে। তবুও বাঁ বগলের বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত হিসেবই যেন গোলমাল হয়ে যায়।

সে বলে, 'ধূপকাঠির দরকার সতিাই আমার নেই। আমি বরং তোমাকে দু-আনা পয়সা দিচ্ছি। তুমি এমনি নাও।'

'না, আমার দরকার নেই।'

কান্না নয়, জবাবদিহি নয়, প্রচণ্ড একটা ধমকের মতো শোনায় কথাগুলো।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্মলা সেই যে এসে বারান্দার মেঝের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল, আর ওঠেনি। ভুলে গিয়েছিল, আজ তার রান্না হয়নি, খাওয়া হয়নি। অনাহারের জ্বালা আর কতটুকু? তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র দহনে তার সমস্ত অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। তাকে নিয়ে বারংবার এ কী পরিহাস করে চলেছেন ভাগ্যবিধাতা? পরাজয় মেনে নিয়েই তো সে এককোণে পড়েছিল, সকলের চোখের আড়ালে। সেটুকু স্বস্তিও তাঁর অসহ্য হল? সেখান থেকে টেনে বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেন গর্বোদ্ধত বিজেতার কৃপাদৃষ্টির হীনতার তলে। তবে কি বুঝতে হবে তার সংগ্রাম শেষ হয়নি? সেই ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ঐ দুর্বিষহ আঘাতের মাঝে? কিন্তু কী নিয়ে লড়বে সে? খোকা যে তার দুটো হাতই ভেঙে দিয়ে গেছে। কিংবা হয়তো তারই জন্যে আবার এই নতুন আহ্বান।

টিনের ঝাঁপে কার হাতের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই বিজুর মা। খোঁজ নিতে এসেছেন, খাওয়া হল কিনা, ওখানকার খবর কী? নির্মলা শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে সাড়া দিল, আসুন দিদি; খোলা আছে। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকল ভীম। নির্মলা তাড়াতাড়ি উঠে বসে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ফেলল। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'তুমি!' সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, দাঁড়াও, আলো জ্বালি।

ভীম এদিক ওদিক তাকিয়ে বারান্দার একপাশে বসল এবং নির্মলা আলো নিয়ে বেরিয়ে এলে বলল, অনেক দিন আগে একবারই এয়েছিলাম তোমার বাসায়। ভাবনা ছিল চিনে আসতে পারবো কিনা। দেখলাম ভুলিনি।

তা, তুমি হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে চলে এলে যে?

নির্মলা একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, গিন্নীমা ব্যস্ত রয়েছেন, দেখলাম। ভাবলাম আরেকদিন এলেই হবে।

—ব্যস্ত না আরো কিছু! গরিব লোককে খালি খালি ঘোরানো। থাক, টাকার জন্যে তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি নিয়ে এয়েছি।

—তুমি কেন আবার কষ্ট করতে গেলে? দ্যাখ দিকিন। ভীম ট্যাঁক থেকে নোটকখানা বের করতে করতে বলল, কষ্ট কিসের? একটু বেড়িয়ে গেলাম। এমনি তো বাসা থেকে বেরোবার যোটি নেই। চব্বিশ ঘণ্টা খালি খাটো। তুমি থাকতে তবু খানিকটা আজাড় ছিল।

নির্মলা চুপ করে শুনছিল। তারদিকে এক পলক তাকিয়ে ভীম অনুরোধের সুরে বলল, চলনা আবার?

—তোমরা বরং অন্য লোক খুঁজে নাও, ভীম।

—কেন, তোমার হাতে তো কাজ নেই বলছিলে?

নির্মলা জবাব দিল না। কেন যে ওখানে গিয়ে তার আর দাঁড়াবার উপায় নেই, সে কথা কাউকে বলা যায় না। ভীম তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝবার তার থেকেই বলল, গিন্নী একটু খিটখিটে করে। বাবু কিন্তু মানুষটা বড় ভালো। এই দ্যাখনা, যেই কানে গ্যাছে তুমি খালি হাতে ফিরে এয়েছ, ওপরে ডেকে নিয়ে টাকাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা ভীম, এখখুনি দিয়ে আয়।

নির্মলা বিস্মিত এবং খানিকটা লজ্জিত হল—বাবু পাঠিয়েছেন তোমাকে।

—তুমি ভাবছ গিন্নী পাঠিয়েছে? হুঁঃ! তুমিও যেমন। যাক; এবার আমি উঠি। কতো কাজ পড়ে আছে। বাড়িতে আবার নতুন কুটুম এয়েছে। যে-সে কুটুম্ব নয়, খোদ কত্তার বড় কুটুম্ব। তবু তো আপন নয়, শুনলাম। মাসতুতো না পিসতুতো কী একটা হবে।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল ভীমচন্দ্র। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমার কথাডা একবারটি ভেবে দেখো, খোকার মা।

ভীম চলে যাবার পরেও বাইরের দরজা খোলা ছিল। নির্মলা ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি। ভেবেছিল, এদিকটা একটু গুছিয়ে রেখে বিজুর মার কাছে যাবে। টাকা কিছুটা যোগাড় হয়েছে, এখবরটা দিয়ে আসা দরকার। নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

মিনিট কয়েক পরে হারিকেনটা হাতে করে উঠোনের মাঝামাঝি এসেই যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়াল। সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ। একটু যেন অনুজ্জ্বল, অবনত, সেই কন্ঠ, কিন্তু সেদিনের তুলনায় অনেক ধীর, অনেক গম্ভীর—'তুমি কি বাইরে যাচ্ছিলে?'

নির্মলা মুহূর্তে মধ্যে নিজেকে সংযমের আবরণে ঢেকে ফেলল। মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

—খুব জরুরী দরকার?

—না।......বলে ফিরে এল, এবং ঘরের ভেতর থেকে একখানা পিঁড়ি এনে পেতে দিল বারান্দার কোণে। বিজন তার উপর বসতে বসতে বলল, খুব অবাক হয়ে গ্যাছ, না? ভাবছ, বাড়ি চিনলাম কী করে।

নির্মলা জবাব দিল না, হাত কয়েক দূরে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন

নিজে থেকেই জানাল, চাকরটা আসছে শুনে ওর পেছু নিয়েছিলাম। ও অবিশ্যি জানে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসোনা?

নির্মলা বসল না, কোনো উত্তর করল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। বিজন কিছুক্ষণ উঠোনের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, ভাবছ, এতদিন পরে খোঁজ নেবার কী দরকার ছিল। কী করব, বল? খুঁজে পাবার মত কোনো সূত্রই তো রাখনি। আমি না হয় কেউ নয়। বৌদিকেও তো একখানা পোস্টকার্ড লিখে জানাতে পারতে, কোথায় আছ, কেমন আছ।

সহজভাবে বললেও কথাগুলোর মধ্যে অনুযোগের সুর অস্পষ্ট রইল না। কিন্তু নির্মলা নিরুত্তর। বিজনও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না, নিজের কথার সূত্র ধরেই বলে চলল, কোথাও কোনো খবর না পেয়ে তোমাদের দেশের বাড়িতেও আমাকে যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, দরজায় তালা, উঠোনে এক হাঁটু জঙ্গল। বছর কয়েক আগে তোমরা কোলকাতায় চলে এসেছ, এর বেশী আর কেউ কিছু বলতে পারল না।......কী হয়েছিল নরেনদার?

—অ্যাক্সিডেন্ট্।

—অ্যাক্সিডেন্ট! তারপর?

—হাসপাতালে গিয়ে আর দেখতে পাইনি।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর বিজনই আবার কথা বলল খোকা কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

—সে নেই।

কী বললে! আর্তকণ্ঠে যেন চেঁচিয়ে উঠল বিজন।

—বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর আসেনি।

—বলকি! কদিন হল?

—আজ সাত মাস দশদিন।

—খোঁজ করনি?

বলেই সংগে সংগে যোগ করল, তুমি আর কী খোঁজ করবে? কাকে দিয়েই বা করবে? বয়স কত ছেলের?

—দশ বছর।

আবার সেই দুঃসহ নীরবতা এবং এবারেও বিজনই সেটা ভংগ করল। ধীরে ধীরে যেন বহুদিনের ওপার থেকে ডাকল, নির্মলা।

—বলুন।

—তুমি আমার সংগে চল।

—কোথায়! বিস্ময়ে চোখ তুলল নির্মলা। স্বল্প আলোকেও সে বিস্ফারিত দৃষ্টির শিখা বিজনের নজর এড়াল না। বলল, না, না; আমার বাড়িতে নয়। সে কথা বলবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই; যদিও, নিশ্চয়ই জানো, যদি যেতে, তোমাকে মাথায় করে রাখতাম। বলছিলাম বৌদির কাছে চল। তোমার দিদি, মায়ের পেটের বোন; সেখানে যেতে তো কোনো বাধা নেই।

—আমি কোথাও যাবো না।

—যাবে না!

—না।

—কেন?

শুধু প্রশ্ন নয়, একটা রুদ্ধ বেদনার সুর ফুটে উঠল তার মধ্যে। নির্মলা জবাব দিল না। বিজন বলল, দেখা যদি না হত, সে কথা ছিল আলাদা; কিন্তু দেখবার পর তোমাকে একা এই অবস্থায় ফেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাবো, এই কি তুমি বলতে চাও?

—আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। দয়া করে এ নিয়ে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

—বেশ; করবো না। কিন্তু কিসের জন্যে তুমি নিজেকে এমন করে ক্ষয় করে চলেছ, কার ওপরে তোমার এ দুর্জয় অভিমান, তাও কি কখনো জানতে পারবো না?

—কারো ওপরে আমার কোনো অভিমান নেই।

বিজন আহত দৃষ্টিতে একবার সেই আনত মুখের দিকে তাকাল। হারিকেনের মৃদু আলোয় বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বুঝতে না পেরে একদিন যে আঘাত তোমাকে দিয়েছি, যত অপরাধ করেছি তোমার কাছে, তার কোনোটাকেই আমি ছোট করে দেখছি না। তবু বলবো, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে। আমার সেদিনকার সেই মনটাকে যদি—

—'ওসব কথা থাক', বাধা দিয়ে বলে উঠল নির্মলা।

—বেশ। কিন্তু আজকের এই কথাটা তোমাকে শুনতে হবে নির্মল। একটা কোনো ভার আমাকে দাও। বল, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি।

সেই পুরনো ডাক—'নির্মল', যা শুনলে একদিন তার বুকের ভিতরটা উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আজ সেখানে কোনো সাড়া নেই। তবু কী ছিল ঐ তিনটি অক্ষরের মধ্যে, একটা শ্লেষতিক্ত রূঢ় উত্তর মুখে এসেও আটকে গেল। তার বদলে বেরিয়ে এল শান্ত কিন্তু দৃঢ় কটি কথা—অনেক দিন আগে এই কথাটা আপনি আরেকবার জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম আজও তাই দেবো। আমার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যেমন আছি, তেমনি থাকতে দিন। আর—

হঠাৎ থেমে যেতেই বিজন সাগ্রহে বলে উঠল, বল। নির্মলা তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে যোগ করল, আর কোনোদিন আমার সামনে আসবেন না।

বিজনের মাথাটা নেমে এল বুকের উপর। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থেকে, একটি স্খলিত নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বুকে চেপে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। নির্মলা যেখানে ছিল সেখান থেকেই বলল, শুনুন।

বিজন ফিরে তাকাল।

—'দয়া করে মেজদি বা আর কাউকে আমার কোনো কথা জানাবেন না। আশা করি আমার এই শেষ অনুরোধটুকু রাখবেন।'

বলেই, বোধ হয় তার বহু-যত্ন-রক্ষিত দীর্ঘ সংযমের বাঁধটিকে আসন্ন ভাঙনের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে সবেগে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বিজনও মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিজুর মা সে রাত্রে আর সময় করে উঠতে পারেননি। পরদিন তার সংসারের সকাল বেলার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে এসে পড়লেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? টাকা পেয়েছিস?

—পেয়েছি; কিন্তু পুরোটা এখনো যোগাড় হয়নি।

আর কত চাই?

নির্মলা দুটো আঙুল তুলে দেখাল। বিজুর মা ম্লান মুখে বললেন, মাসের শেষ, আমারও হাতে কিছু নেই। ওঁকে বললাম, ওঁরও সেই অবস্থা।

—ছিঃ ছিঃ, এই নিয়ে আবার ওঁকেও বিরক্ত করতে গেছেন? এমনিতেই যা করছেন আপনারা—

—কী আর করছি বল? করবার সাধ্য থাকলে তো করবো?

'বাসায় কে আছ?' ভেজানো দরজার ওপার থেকে কার গলা শোনা গেল। বিজুর মা বললেন, তুই বস, আমি দেখি। ঝাঁপের কাছে এগিয়ে গিয়ে না খুলেই বললেন, কে গা?

—খোলো, বলছি।

ঝাঁপটা টানতেই একজন ফেরি-ওয়ালা গোছের লোক এগিয়ে এল। মাথায় মস্ত ঝুড়ি, তার উপরে গোটা দুই মুখবন্ধ টিন, তার পাশে সরাঢাকা মাটির হাঁড়ি ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে লোকটি বলল, তুমি—আপনি থাকেন এখানে?

ততক্ষণে নির্মলাও এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে দেখিয়ে বিজুর মা বললেন, না; ও থাকে। কেন?

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা?

—আমরা বামুন।

—পেন্নাম। কিন্তু দারোয়ানজী যে বললে একজন ঝি থাকে এ বাসায়! ভাড়া দিতে পারেনি বলে মাসের এই কড়া দিন পরেই উঠে যাচ্ছে। তাইতো দেখতে এনু। আমার একটা বাসা চাই কিনা? একখানা ঘর এট-টু রান্নার জায়গা হলেই চলবে। বোধ করি, ভুল করে অন্য বাসায় ঢুকেছি। বুড়ো মানুষ, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। আপনারা কিছু মনে করবেন না, মা।

মাথার বিড়েটা ঠিক করে নিয়ে ঝুড়িটা তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছনে এসে দাঁড়াল বাড়িওয়ালার দারোয়ান। তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, এই যে দারোয়ানজী দ্যাখতো কাণ্ড। ভুল করে কোথায় ঢুকতে কোথায় ঢুকে পড়েছি। ছিঃ ছিঃ।

—ভুল কেনো হোবে? এহি বাসা আছে।

—কিন্তু তুমি যে বললে, কে একজন ঝি নাকি থাকে সেখানে—

—হাঁ, হাঁ। পুছনা উস্‌কো, ঝি আছে না কী আছে।

চোখের ইঙ্গিতে নির্মলাকে দেখিয়ে দিল দারোয়ান। গোঁফের কোণে এক ঝলক মুচকি হাসিও দেখা দিল সেই সঙ্গে।

ঝাঁকাওয়ালা লোকটি বড় বড় চোখ করে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল নির্মলার দিকে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে যেন নিজের মনে বলল, বলছ কি তুমি! বামুনের মেয়ে, ঐ রকম লক্ষ্মী ঠাকুরের মত চেহারা—

তারপরেই মনস্থির করার ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না বাপু, এ বাসায় আমার দরকার নেই। বামুনের মেয়েকে ঘরছাড়া করতে পারবো না।
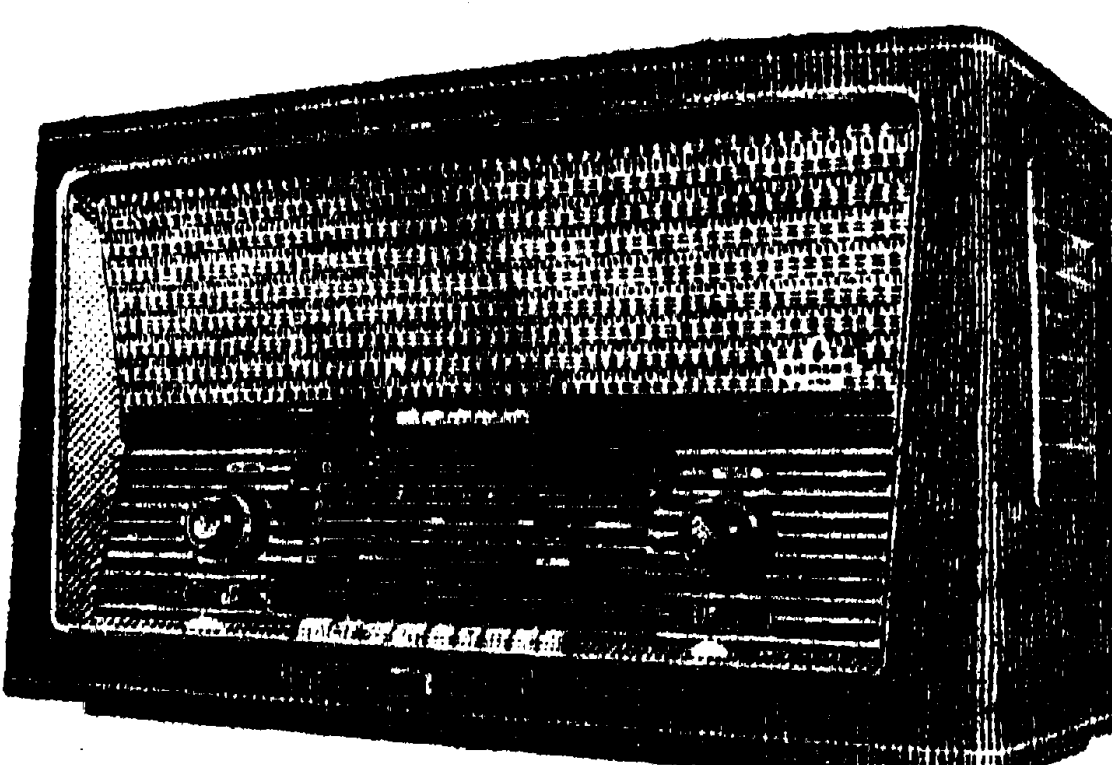
—ঠিক আছে। তুমি না লেবে তো দোসরা আসবে। ভাড়াটিয়াকা অভাব হোবে না।

এই বলেই দারোয়ান চলে যাচ্ছিল।

নির্মলা বলল, ঘর আমি ছাড়বো না। সরকার মশাইকে বলে দিও।

—ভাড়া? ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল দারোয়ান

—ভাড়া দিয়ে দেবো।

পুরো?

নির্মলা জবাব দেবার আগেই বিজুর মা অনুরোধের সুরে বললেন, পুরো কি আর পারে, বাবা? বিধবা মানুষ; সামান্য কিছু বাকী থাকবে। সেটা আসছে মাসে নিও।

বাকী থাকলে হোবে না। দোসরা ঘর দেখো...... বলতে বলতে দারোয়ান দাপটের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ফেরিওয়ালা লোকটি বলল, সব কসইএর দল, বুঝলে মা? দয়ামায়া বলতে কিছু নেই, কোথাও নেই।

বিজুর মার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে, যেন কত বড় অপরাধ করছে, এমনিভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মা ঠাকরুন?

—বল না, বাবা?

—কত টাকা হলে ওদের পুরো ভাড়াটা শোধ যায়?

—বেশী কিছু না, দুটো টাকা। কিন্তু সময় গড়িয়ে তাও অনেক হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতেই তো পারছ।

লোকটি মাথা নিচু করে কি ভাবল, দু-একবার ইতস্ততঃ করল, তারপর তেমনি কুণ্ঠার সুরে বলল, টাকাটা যদি আমি দিয়ে দি?

না, না; তা কি করে হবে? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল নির্মলা।

—এমনি তো দিচ্ছিনা মা, ধার দিচ্ছি। তোমার যখন সুবিধে হবে, শোধ করে দিও।

"ও'কে বললাম, ও'রও সেই অবস্থা"

—তাতে হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে।

—লাগলই বা। তোমার আশীর্বাদে সেজন্যে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

—তাছাড়া তোমাকে তো আমরা চিনি না। কোথায় কেমন করে—

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই এসে নিয়ে যাবো—বলে, আর কোনো ওজর আপত্তি তুলবার সুযোগ না দিয়েই ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো টাকা তুলে নিয়ে সসঙ্কোচে বাড়িয়ে ধরল বিজুর মার সামনে। তিনি টাকাটা নিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, বেঁচে থাকো, বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। গরিব বিধবার কত বড় উপকার যে করলে তুমি, সে শুধু আমরাই জানি।

—ও সব কথা বলো না, মা। কে কার উপকার করে? যা কিছু করবার ঐ একজনই করছে—বলে, আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

—তুমি কোথায় থাকো, বাবা? জানতে চাইলেন বিজুর মা।

—এই তো কাছেই, এখান থেকে আধ কোশটাক হবে। এই রকমই বস্তি। পাঁচ বছর আছি সেখানে। বেশ ছিলাম, মা। জমিদারের লোক এসে বলল, সব উঠে যাও।

—কেন?

—তাই দ্যাখো না? ওখানে নাকি লেক্ না কী হবে। বাবুরা 'বাইচ' খেলবে, সাঁতার কাটবে। তার জন্যে মর তোমরা। গরিবের ঠাঁই কোথাও নেই, মা। তাদের কথা কে ভাবে? যাই; আজ-কালের মধ্যেই যেখানে হোক একটা আস্তানা দেখতে হবে।

ঝুড়িটা মাথায় তুলতেই নির্মলা বলল, তোমার টাকা দুটো পেতে কিন্তু কদিন দেরি হবে। এ মাসে বোধ হয় পেরে উঠবো না।

তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। যেদিন পার দিও। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি, মা।

বিজুর মা বললেন, এসো। তোমার নামটা তো বললে না, বাবা?

—আমার নাম গোকুল, গোকুল দাস। আমরা হোলাম বাউরী।

—কী কর তুমি?

—যা দেখছেন; জিনিষ ফেরি করি। মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, যখন যেটা চলে। তোমাদের আশীর্বাদে তাতেই চলে যায়।

দিন পনর পরে বিকালের দিকে নির্মলা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বাইরে থেকে দরাজ গলার হাঁক শোনা গেল—মা ঠাকরুণ আছেন?

-কে?

-আজ্ঞে, আমি গোকুল।

নামটা শুনেই নির্মলার মুখ শুকিয়ে গেল। টাকা দুটোর জন্যে এ কদিন তার কিছুমাত্র স্বস্তি ছিল না। দিন কয়েক হ'ল কাজ অবশ্য একটা জুটেছে। মাইনে আগের মতই। কিন্তু সেটা হাতে আসতে এখনো প্রায় এক মাস। এদিকে ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। গোকুল যে এরই মধ্যে এসে পড়বে জানা ছিল না। থাকলেই বা কী করতে পারত? গিয়ে কী বলবে, একটা মাস কি করে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এই সব ভাবতে ভাবতে অপ্রসন্ন মুখে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপটা খুলে দিল। গোকুলের মাথায় আজ আর ঝুড়ি নেই। ভিতরে ঢুকে হাতজোড় করে প্রায় মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, এনু একবার খবর নিতে। আসবার কি আর যো আছে, মা? দুটি বেলা খালি চরকির মতো ঘোরা আর ঘোরা, তবে তো দুটো পয়সা আসে। না খাটলে ঘরে বসিয়ে কে খাওয়ায় বল? তার ওপরে আবার বাসা বদলির ঝামেলা। তোমার আশীর্বাদে ঘরখানা ভালোই পেয়েছি। সামনে এই রকম এটটু উঠোনও আছে। তা, তোমার সেই ভাড়ার গণ্ডগোল মিটে গ্যাছে তো? কসাই ব্যাটাদের পাওনা টাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ, সে সব মিটিয়ে দিয়েছি। তোমার টাকাটা কিন্তু আজ দিতে পাচ্ছি না, গোকুল।

—কী মুস্কিল! আমি কি টাকার তাগাদায় এসেছি? সে তুমি যেদিন খুশি দিও।

—বেশী দেরি হবে না। একটা নতুন কাজ পেয়েছি। প্রথম মাসের মাইনেটা পেলেই দিয়ে দেবো।

গোকুলের মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়ল কপালে দেখা দিল কুঞ্চন-রেখা। বলল, কী কাজ? যা করছিলে, তাই?

—তাছাড়া আর কী করবো, বল?

—না মা, ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও। বেরাম্মন, বামুনের মেয়ে, পরের এঁটো ঘাঁটা কি তোমার সাজে? ওতে যে আমাদেরও পাপ হয় মা?

নির্মলা বিস্মিত হল। যা শুনল, শুধু একটা মত নয়, এই নিতান্ত নিম্পর সামান্য-পরিচিত লোকটির কাছ থেকে এই গভীর আত্মীয়তার সুরে সে একেবারেই আশা করেনি। এরই মাধুর্য তাকে কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। গোকুল মুহূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে, মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল,-না মা, তোমাকে আর এই ছোট কাজ করতে আমি দেবো না। তুমি আজই গিয়ে সেখানে জবাব দিয়ে এসো।

নির্মলার ওষ্ঠ প্রান্তে ম্লান হাসি ফুটে উঠল—নিরুপায়ের করুণ হাসি। শান্তভাবেই বলল, তা না হয় দিলাম। তারপর?

—পরের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। 'মা' বলে যখন ডেকেছি, সে ভার আমার।

—তা কি হয় গোকুল? এই দুঃসময়ে যে উপকার তুমি করেছ, আমার চিরদিন মনে থাকবে। তার ওপরে—

—এই দ্যাখ, উব্‌গারটা আবার কী কোরলাম? ঐতো সামান্য দুটো টাকা। তাও ধার।

—টাকাটা সামান্য। কিন্তু তার পেছনে যা রয়েছে, মোটেই সামান্য নয়। তার ওপরে এই যে খোঁজ খবর নিচ্ছ, এও কি কম? এমনি মাঝে মাঝে এসে একবার করে দেখে যেও; তাহলেই হবে। যতদিন শক্তি সামর্থ্য আছে, নিজের পেটটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারবো। তার জন্যে যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয়, এইটুকুই আমার কামনা।

গোকুল দাঁতে জিব্ কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, হাত পাততে যাবে কোন্ দুঃখে? তাও আবার আমার মত ছোট জাতের কাছে। কিন্তু তোমার এই কাজটা আমার ভালো লাগে না মা। একলা মানুষ; দুবেলা তিনবেলা নয়, একবেলা দুটো নিরিমিষ্যি। তার জন্যে তোমাকে পরের বাড়ি বাসন মাজতে হবে, আমরা থাকতে? এডা কেমন ধারা কথা?

—আমার কপাল; তোমরা কি করবে? অন্য কাজ আমাকে দিচ্ছেই বা কে? জানাও তো নেই তেমন কিছু।

—কে বললে নেই? খাটতে যখন পেছপাও নও, এক সঙ্গে আহার আর দুখানা বস্তর, এ তুমি ঘরে বসেই যোগাড় করতে পার। এ টুকুর জন্যে তোমাকে পরের দোরে ঘুরতে হবে না।

—আমি তো বুঝতে পারছি না, ঘরে বসে কী আমি করতে পারি, আর সে সব ব্যবস্থাই বা কে করবে।

—আমি করবো। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি খালি একবার গিয়ে তোমার সেই বাসার কাজডা ছেড়ে দিয়ে এসো।

—এখনই ছেড়ে দেবো?

—হ্যাঁ, এখনই। আর সেখানে তোমায় যেতে দিচ্ছিনে।

নির্মলা তখনও একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে আরো খানিকটা জোর দিয়ে বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা। তুমি আমাকে চেন না। গোকুল বাউরী যে-সে পাত্তর নয়; যা ধরে তা না করে ছাড়ে না।...বলে, সগর্বে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ার দিকে নজর পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে, পরশু আবার আসবো। তুমি কালই গিয়ে ওখানকার সম্পক্ক চুকিয়ে দিয়ে এসো।

পরক্ষণেই বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল—খিলডা তুলে দাও, মা।

(ক্রমশঃ)

পোষাক বিলাসিনীদের স্বপ্নরাজ্য প্যারী

দিলীপ মালাকার

কথায় বলে পারীর ফ্যাশন। পারীর ফ্যাশন প্রবাদ বিশেষ। পারী শৌখিন জিনিসপত্রের কেন্দ্রস্থল। আবার ব্যবসা-কেন্দ্র তো বটেই। শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে শৌখিন পোষাক বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহিলা পোষাকের ফ্যাশন-কেন্দ্র পারী। পুরুষদের পোষাকের ফ্যাশন-কেন্দ্র লণ্ডন। পারীতে মহিলা-দের শৌখিন পোষাকের ডিজাইন প্রতি-দিনই বদলাচ্ছে। কোনো বছরে নামকরা শিল্পীদের আঁকা চিত্রপটের রং বা ভাঙ্গ নকল করে চলে হুজুক, কোনো বছরে বা চলতি নাচের নামকরণে। এবার যেমন হয়েছে 'টুইশ্‌ট্‌' নাচের নামে পোষাকের নাম।
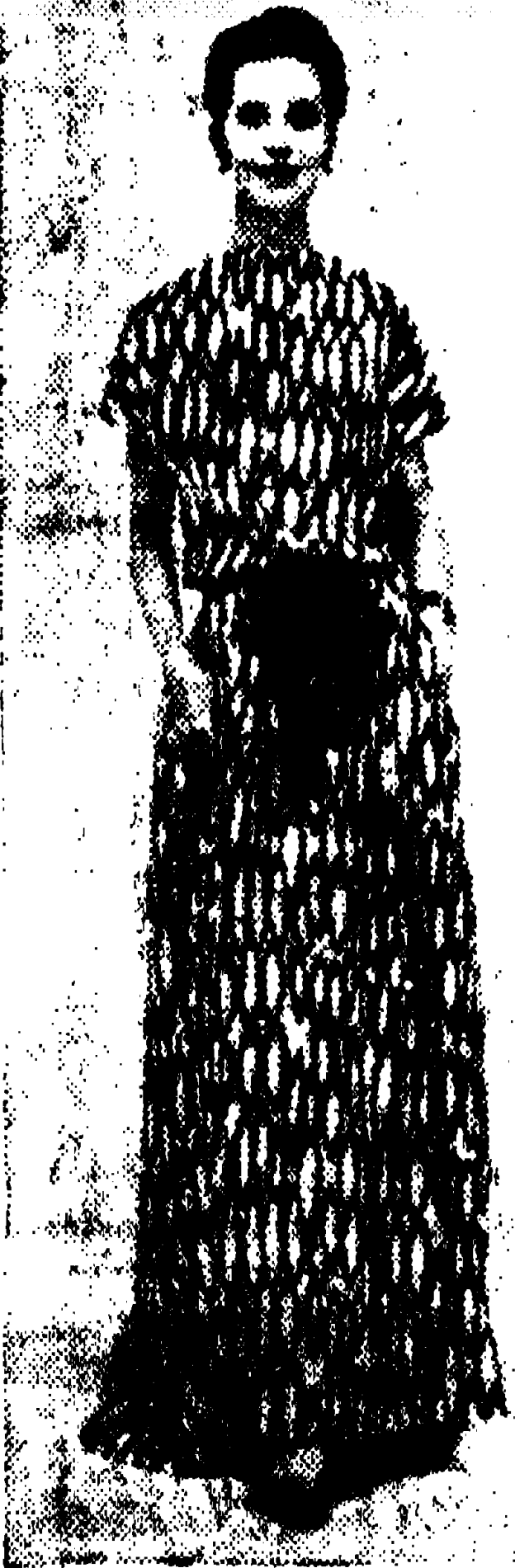
রিশির সান্ধ্যপোষাক

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়া-আফ্রিকায় যেখানেই ইউরোপীয় পোষাকের চলন, সেখানকার মহিলা-মহল সর্বদা পারীর মুখ চেয়ে থাকেন—কবে আবার পোষাকের পরিবর্তন হবে। সেই সঙ্গে পোষাকের ব্যবসায়ীরাও।

শৌখিন পোষাক আমাদের কাছে বিলাসিতা। কিন্তু ফরাসীদের মতে বিভিন্ন ধরণের শৌখিন পোষাকের ডিজাইন দেওয়া ও তৈরী করা ললিত-কলা শিল্পের একটা অঙ্গ বিশেষ। পারীর এই সব শৌখিন পোষাকের স্রষ্টাদের সম্মান কম নয়। এদের মতে বিভিন্ন ধরণের শৌখিন পোষাকের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নারীর সৌন্দর্য্যকে আরও ফুটিয়ে তোলা। তাদের মতে পোষাকের একঘেয়েমিতে নারীর সৌন্দর্য ফোটে না বরং তাদের মনে এনে দেয় নিরানন্দ। পারীতে পোষাকের দোকান ও দর্জির দোকানের অন্ত নেই। কিন্তু যে-সে, রামা-শামা এই সব শৌখিন পোষাক তৈরী করতে পারে না। পারীতে মাত্র পনরটি শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান আছে। তারাই মহিলা-জগতে পোষাকের ভাগ্যবিধাতা বিশেষ। তাদের পরি-কল্পনায় তিন মাস কি ছ' মাস অন্তর মহিলা-পোষাকের পরিবর্তন ও পরি-বর্ধন হচ্ছে। এই সমস্ত মহিলা-পোষাকের প্রতিষ্ঠানদের বলা হয়, 'ওত কুচুরিয়ে' অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের সীবন শিল্পালয়। এই সব সীবন শিল্পা-লয়ের মালিকরা প্রায় সকলেই ললিত-কলায় পারদর্শী। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর চিত্র থেকে ভাব নিয়ে অনেক সময়ে বিশেষ ধরণের পোষাক তৈরী হয়। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীরা যে ধরণের রং ব্যবহার করেছেন, 'ওত কুচুরেরা'ও সেই

স্যা লর' সান্ধ্যপোষাক

ধরণের রং ব্যবহার করে থাকেন পোষাকে। মহিলার দেহের আয়তন অনুসারে আবার বিভিন্ন ধরণের পোষাকের পরিকল্পনা করা হয়। এই সব শৌখিন পোষাকে শালীনতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। দেহকে অনাবৃত না রেখে নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিস্ফুটনই এদের শিল্পের সার্থকতা। শৌখিন পোষাকের ডিজাইন কখনই এক ধরণের হয় না, কখনো বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় পোষাকের অনুকরণে আধুনিক ইউরোপীয় পোষাক, কখনও বা ভারতীয় শাড়ির অনুকরণে বা ঘোমটার অনুকরণে পোষাকের চলন হয়। কিছুকাল আগে বাঙলা দেশের ধুতির অনুকরণে কয়েকটি পোষাক প্রদর্শিত হয়েছিল। আবার কখনো চীনাদের পোষাকের অনুকরণেও বহু শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান নতুন পোষাক তৈরী করে। গত বছরের প্রদর্শনীতে মেক্সিকোর আদিবাসীদের পোষাক প্রদর্শিত হয়েছে।

এই সমস্ত শৌখিন পোষাকের কাপড় ও শিল্পস্রষ্টাদের অর্ডার-

মাফিক তৈরী হয়ে থাকে। বড় বড় মিলে এই ধরণের কাপড় সাধারণতঃ তৈরী হয় না। ছোটখাট কাপড়ের কলেই শৌখিন পোষাকের কাপড় তৈরী হয়। এই সব বিশেষ ধরণের কাপড়ের ওপর সময়ে সময়ে হাতের কাজ থাকে।

শৌখিন পোষাকের মডেলদের বলা হয় 'মাইনকা'। বিভিন্ন মাইনকাদের দেহের ওপর পোষাকের মাপ-জোক চলে। অনেকটা চিত্রশিল্পীর মডেলের মতন এই সব মাইনকাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রদর্শনীতেও এই সব মাইনকারাই বিভিন্ন পোষাক পরে ক্রেতা-দের সামনে কয়েকবার ঘুরে যায়। অনেক সময়ে পোষাকের জনপ্রিয়তা মাইনকাদের দেহগুলির ওপর নির্ভর করে। এই সমস্ত মাইনকা এক একজন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ ফুট হওয়া চাই। অবশ্য মাপে খাটও হয় কখনো। ক্ষীণকটি অপরিহার্য। দেহের সমস্ত অঙ্গ সৌন্দর্য্যের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া চাই। মাইনকাদের মাসিক আয় আটশ থেকে দেড় হাজার টাকা। এদের মাইনকা না বলে মেনকা বলা উচিত।

শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান-গুলোতে বছরে দুবার করে প্রদর্শনী হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের পোষাকের জন্যে জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে আর শরৎ ও শীতকালের জন্যে জুলাইএর শেষ সপ্তাহে। এবছরের বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন পোষাকের নতুনত্ব হল আটসাট পোষাক যা পরে টুইশ্‌ট্‌ নাচ নাচা যায় সহজে। তবে এবছরে তেমন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেনি।

সংবাদপত্রে,: সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় বিশেষ সমালোচনা চলছে পোষাকের। প্রতি সংবাদপত্রের শৌখিন পোষাক-বিশেষজ্ঞরা এখন বিশেষ ব্যস্ত, আর এই সব সমালোচকদের সমালোচনার ওপর পোষাকের কাটতি নির্ভর করে। গোটা পনর সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকা তো শুধু এই শৌখিন পোষাককে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় একমাত্র পারীতে। অন্য দেশে তো আছেই। এই প্রদর্শনীকে বলে

পী লুরোশ এর পোষাক

"কালকাটিয়ের"। প্রথম একমাস শুধু সংবাদপত্র ও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দালালদের জন্যে পোষাকগুলি প্রদর্শিত হয়। তারপর অন্যান্য ক্রেতাদের জন্যে। [illegible] বিভিন্ন পোষাক প্রতিষ্ঠানের [illegible] এই সব পোষাকের মডেল কিনে নিয়ে যায়, তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্যে। এক একটি মডেলের দাম তিন থেকে ছ' হাজার টাকা।

আগে প্রদর্শনীর সাথে সাথেই সংবাদপত্রে মডেলের ছবি ছাপাতো, এখন সে নিয়ম বদলেছে। প্রদর্শনী হবার একমাস পরে সংবাদপত্রে মডেলের ছবি ছাপা হয়। কারণ, নইলে মডেলের ছবি দেখে ছোট-খাট দোকানদাররা মডেলের নকল পোষাক তৈরী করে সস্তা দামে বিক্রি করে, যার ফলে 'ওত কুচুরিয়ের' পোষাক অনেকে কিনতে চায় না। তাদের ব্যবসার স্বার্থেই এই নিয়ম করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সংগে পোষাকের ডিজাইনগুলোর জন্যে বিশেষ গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, বিভিন্ন দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চরেরা এই সব ডিজাইন চুরি করার জন্যে পারীতে ঘোরা-ফেরা করে। এই ধরণের কয়েকটি দুর্ঘটনা কিছুকাল আগে ঘটে গেছে এখানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত পোষাক-পত্রিকা পারীর কোনো এক বিখ্যাত পোষাক প্রতিষ্ঠানের বিনানুমতিতে কয়েকটি পোষাকের ডিজাইন প্রদর্শনীর আগেই প্রকাশ করে। এবং সেই ডিজাইন দেখে নিউইয়র্ক শহরের কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ পোষাক তাদের নিজেদের নামেই বাজারে চালু করে। আর একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন চুরি করে নিউইয়র্কে ছটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠান পোষাক তৈরী করায় মামলা চলেছিল ছ' মাস ধরে।

এখন প্রতি বছরে বিক্রির সুবিধার জন্য প্রদর্শনী উদ্বোধনের একমাস পর্যন্ত কোনো সংবাদপত্রেই ডিজাইনের ছবি বা বিশেষ সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে না। কারণ, সংবাদপত্রের সমালোচনা ক্রেতাদের মনের ওপর বিশেষ ক্রিয়া করে থাকে। তাতে নাকি পোষাক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ লোকসান হয়। পত্রিকায় বিভিন্ন পোষাকের প্রতিষ্ঠানের পোষাকের সমালোচনা নির্ভর করে পত্রিকার মালিকের অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর। বর্তমানে কয়েকটি কোটিপতি একাধারে পত্রিকার আংশিক মালিক, বিভিন্ন শিল্পের মালিক আর অন্যধারে শৌখিন পোষাক প্রতিষ্ঠানেরও মালিক। সুতরাং মালিকের স্বার্থেই পোষাকের সমালোচনা হয়ে থাকে। যে সব পোষাক প্রতিষ্ঠানের প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়ার সামর্থ নেই, তাদের পোষাক সম্বন্ধে পত্রিকায় বিশেষ তেমন সুখ্যাতি করে সমালোচনা বেরোয় না।

পারীর শৌখিন পোষাকের ব্যবসায়ে প্রতি বছরে দেড়শত কোটী টাকার লেন-দেন হয়ে থাকে। আর প্রায় পাঁচ লাখ লোক এই ব্যবসায়ে নানাভাবে জড়িয়ে আছে। এই ব্যবসা ফ্রান্সের একচেটে ব্যবসা। শৌখিন পোষাকের সংগে আসে এসেন্স—সুগন্ধি আতর ইত্যাদি দ্রব্য। জগৎবিখ্যাত এসেন্সগুলো এই সব শৌখিন পোষাক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি।

বিদেশী গল্প

রৌদ্রের নেশা

ইভান বুনিন

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তারা ডাইনিং রুমের ভ্যাপসা গরম আর চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে বাইরে এসে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। হাতের তালুর ওপর চিবুকটি রেখে চোখ বন্ধ করল মেয়েটি। এই তন্বীর প্রত্যেক ভঙ্গীতে স্নিগ্ধ সুষমা ফুটে ওঠে। সে তার স্বাভাবিক মধুর হাসিতে বিভোর হয়ে বল্লে :

"আমি একেবারে মাতাল হয়ে গেছি। আমি একেবারে বদ্ধ পাগল। তোমার বাড়ি কোথায়? কোথা থেকে আসছ? তিন ঘণ্টা আগে আমার ধারণাও ছিল না যে, পৃথিবীতে তুমি আছ। তুমি কোথা থেকে এই স্টীমারে উঠলে তাও আমি টের পাই নি। কোথা থেকে উঠলে? সামারা থেকে? যাকগে, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার মাথাটা ঘুরছে, না আমরাই ঘুরে যাচ্ছি?"

সামনে বিস্তৃত আলো, অন্ধকার। অন্ধকার থেকে বয়ে আসা মৃদু ও উষ্ণ বাতাস তাদের মুখের ওপর ভেঙে পড়ছে। একটা বৃত্ত তৈরী করে আলো তাদের পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। জলের বঙ্কিম রেখার ভিতর দিয়ে স্টীমারটা একটা ধাক্কা দিয়ে জাহাজ-ঘাটায় থামল।

লেফটেন্যাণ্ট মেয়েটির হাত তুলে নিল। দিল ওষ্ঠের স্পর্শ। সুগঠিত সুন্দর ছোট হাত, রৌদ্রের গন্ধ লেগে আছে। আর সে ভাবল এই পোষাকের তলায় যে শরীর লুকিয়ে রেখেছে মেয়েটি তা আরও কত সুন্দর ও দৃঢ়। সেখানে আরও গাঢ় রৌদ্রের গন্ধ। দক্ষিণের সমুদ্রের গরম বালির ওপর পুরো একটা মাস রৌদ্র-স্নান করে ফিরছে মেয়েটি। (আনাপা থেকে ফেরার পথে এই গল্পই করেছে সে।) এই কথা ভাবতে ভাবতে লেফটেন্যাণ্টের বুক শঙ্কা ও আনন্দে ভরে উঠল।

সে বল্লে, "চল নেমে পড়ি......"

মেয়েটি অবাক। জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়?"

"এখানে, এই জাহাজ-ঘাটে।"

"কেন?"

উত্তর দিল না লোকটি। মেয়েটি আবার তার হাতের তালুর ওপর উষ্ণ গাল রেখে বল্লে, "পাগল একটা......"

নিরস কণ্ঠে লোকটি আবার বললে, "চল। আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বললে, "তবে তাই হোক।"

স্টীমারটি জাহাজ-ঘাটায় সজোরে ধাক্কা খেল। এ-ও গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। স্টীমারের কাছি টানা হচ্ছে। স্টীমার একটু পিছিয়ে এল। জলকল্লোল হল স্পষ্টতর। ঘাট থেকে স্টীমার অবধি কাঠ পাতা হল। লেফটেন্যাণ্ট তার জিনিসপত্র ঠিক করে নিল।

একটু পরেই দেখা গেল তারা নিদ্রালু টিকিট-ঘরের পাশ দিয়ে পায়ের পাতা-ডোবা আধভিজে বালির ওপর দিয়ে ধুলোয় ধুসরিত একটা ঘোড়ার গাড়ির

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি যাচ্ছে ধুলোর নরম ঢালু পথের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে নজরে পড়ছে বাঁকানো ল্যাম্প-পোস্ট। কিন্তু এই পথের যেন শেষ হবে না। একটু পরে গাড়ি চড়াই-এর দিকে উঠতে লাগলো। পাথুরে পথের নুড়িতে গাড়ির চাকা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলছে। এখানেই বোধহয় এই শহরের বাজার। বাজার যদি নাও হয় তবে বাজারের মত কিছু হবে। তারপর এল সরকারী অফিস; তারপর গম্বুজ। গরমকালের রাত্রি নেমেছে মফঃস্বল শহরে। সেই রাত্রির উষ্ণতা ও গন্ধ পাচ্ছে ওরা। গাড়ি থামল একটা হোটেলের দরজায়। দরজায় আলো জ্বলছে। ওরা দেখতে পাচ্ছে সেই আলোর ওপারে কাঠের সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে লালচে সার্ট আর ফারকোট পরা দারোয়ান। দারোয়ানের ঢের বয়স হয়েছে। দাড়ি কামায়নি বহুদিন। গাড়ি থামতেই সে জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে এদের আগে আগে গেল। দারোয়ান ওদের নিয়ে এল বড় একটা ঘরে। ঘরটা বড়, কিন্তু আলো-বাতাস নেই। সারাদিন রোদের তাতে ঘরটা তখনও আগুন হয়ে আছে। জানালায় দেখা যাচ্ছে সাদা পর্দা আর দুটো নোতুন বাতি। ওরা ঘরের ভেতর পা দিতেই দারোয়ান ঘরের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। লেফটেন্যান্ট মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল প্রবল আবেগে। সাড়া দিল মেয়েটি। ওদের পরস্পরের ওষ্ঠ মিশে গেল নিরুদ্ধ কামনায়। আবেগের এই চূড়ান্ত মুহূর্ত তারা সারা জীবন মনে করে রেখেছে। সারা জীবনে আগে তীব্র অনুভব কখন আসে নি।

বেলা দশটা বেজে গেছে। অদ্ভুত সূর্য উঠেছে। গলে পড়ছে রোদ। গরম লাগছে বেশ। চারদিকে খুশি-খুশি ভাব। দূরে চার্চের ঘণ্টা বাজছে। বাজারে উঠেছে মৃদু গুঞ্জন। খড় আর আলকাতরার গন্ধ একসঙ্গে মিশে ঘোষিত হচ্ছে রাশিয়ার মফঃস্বল শহরের বৈশিষ্ট্য। এমন সময় 'নামহীন আগন্তুক', এই মহিলাটি, চলে গেল। ও নিজের নাম কখন বলে নি। নিজেকে বলেছে 'নামহীন আগন্তুক'। ঠাট্টা করেই বলেছে। কিন্তু এই ঠাট্টাই থেকে [illegible] সারা রাত্ত তাদের প্রায় ঘুম হয়নি; ভোরের দিকে চোখ বুজে এসেছিল। মেয়েটি হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে যখন বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল তখন মনে হল তার বয়স বড় জোর সতেরো। ওকে কি খুবই লজ্জিত দেখাচ্ছে? না, খুব বেশি নয়। বরং সে আগের মতই হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত। সে তার স্বভাবের স্বাভাবিকতায় প্রাণ-চঞ্চল। দাগ পড়েনি কোথাও।

আবার একসঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করতেই মেয়েটি বলে উঠল, "না, না, তা হয় না। না তুমি যেও পরের স্টীমারে। আমরা একসঙ্গে যাবো না। তা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি, শোন। তুমি যা আমাকে ভাব তা আমি একেবারেই নই। আমার জীবনে এমন ঘটনা আগে কখন ঘটেনি আর ভবিষ্যতে কোনদিনও ঘটবে না। এ যেন অকস্মাৎ গ্রহণ ঘনিয়ে এল......... কিংবা কি বলব আমাদের দুজনকেই কী একটা নেশায় পেয়েছিল...... এ যেন 'সান-স্ট্রোক'...... ।"

বাধ্য হয়ে রাজী হল লোকটি। স্টীমার ছাড়ার আগেই ওরা জাহাজ-ঘাটে পৌঁছল। লেফটেন্যান্ট তখনও খুশী, তখনও লঘু ও চঞ্চল। ডেকে বহু লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা চুমু খেল। অল্পক্ষণ পরেই স্টীমার ছেড়ে দিল। লাফিয়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট।

আগের মত খুশী ও হালকা মেজাজ নিয়ে সে ফিরে এল হোটেলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মধ্যে পালা-বদল আরম্ভ হয়েছে। সে যেন অন্য ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি যখন ছিল তখন ঘরটি দেখাচ্ছিল আরেক রকম। তার অস্তিত্বে এখনও ঘরটি পূর্ণ—আবার শূন্য। অদ্ভুত! মেয়েটি গায় মেখেছিল ওডিকোলন। এই গন্ধ ঘরে ভাসছে এখনও। সব চা খায় নি। কাপে কিছুটা পড়েছিল। চা-সুদ্ধ কাপও রয়েছে ট্রে'র ওপর। কিন্তু মেয়েটি আর নেই। আর্দ্র কোমলতায় লেফটেন্যান্টের বুক ভরে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকলো সে।

মনে হল তার চোখ জলে ভরে আসছে। তাই হেসে উঠে সে বললে, "কি অদ্ভুত ঘটনা! আমি তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি, শোন। তুমি আমাকে যা ভাব তা আমি একেবারেই নই। আর সে চলে গেছে, সেই অদ্ভুত রমণী!"

সেই বিছানা পাতা আছে। ও যেন বিছানার দিকে আর তাকাতে পারছে না। বিছানার পাশে পর্দাটা টেনে দিল। বাজারের গুঞ্জন, গাড়ির চাকার আওয়াজ কানে আসছিল। ও আর এ সব শুনতে চায় না। জানালাটা বন্ধ করে মোকাচ্ছা এলিয়ে দিল। ঠিকই, এখানেই পর্যান্ত হওয়া উচিত। মেয়েটি চলে গেছে। এতক্ষণ বহুদূর গিয়ে থাকবে হয়ত। হয়ত সে লাউঞ্জে বসে আছে কিংবা হয়ত দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। দেখছে তার চারপাশে বিপুল নদী রোদ্রে ঝিকিয়ে উঠছে; পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ, দূরে হলদে ঢালু তট, আর ভলগায় বিশাল বিস্তৃর্ণতায় জল আর আকাশের নিবিড় দিগন্ত। বিদায়, তা হলে চিরকালের মত বিদায়। আর কোথায় দেখা হতে পারে? সে সম্ভাবনা কোথায়? লোকটি ভাবল, "না আমি পারবো না। না আমি কিছুতেই সেই শহরে যেতে পারবো না, যেখানে সে, তার তিন বছরের মেয়ে, তার স্বামী আর পরিবার পরিজন নিয়ে আরও দশপাঁচটা গৃহস্থবধূর মত অতি সাধারণ জীবন কাটায়।" আবার একবার মনে হল মেয়েটি যে শহরে বাস করে সে যদি হত এক অদ্ভুত বিচিত্র শহর। একেবারে অতুলনীয়, অনন্য, অনবদ্য সেই শহর। পৃথিবীতে আর তার জুড়ি নেই। মনে হল, মেয়েটি যদি সেই বিচিত্র শহরে একা-একা থাকত, ভাবত তাদের দৈব-মিলনের কথা। আর এদের দেখা হত না কোনদিন, কোন দিন আর! না, এই অসম্ভব কথা সে কি করে ভাবছে! এই সব নিরর্থক, আজগুবি, অবাস্তব চিন্তার কোন মানে হয়! কিন্তু সে বিচিত্র যন্ত্রণায় কাতর। ভবিষ্যত মনে হয় নিষ্ফল অন্ধকার। এ কথা ভাবতেই ভয় আর হতাশায় তার দেহ মোচড় দিয়ে উঠল।

"কি আপদ!" এই ভেবে লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘরময় পায়চারি করতে থাকল। পর্দাটা ফাঁক করে বিছানাটা আর একবার দেখল। "...আমার কি হয়েছে? না, এই কি প্রথম আমি একজন মহিলার সঙ্গে......। তা নয়। তবে তার মধ্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে? সত্যি সত্যি কি হয়েছে আমার? মনে হয় এ যেন সান-স্ট্রোক! কিন্তু আসল কথা আমি কি করে সময় কাটাব। ওকে ছাড়া এই অপরিচিত শহরে কি করে কাটাব সমস্ত দিন?"

লোকটি ভাবতে থাকে। এখনও তার সব মনে পড়ে। খুঁটিনাটি বিবরণও বাদ যায় না। সে টের পায় মেয়েটির জামা-কাপড়ের গন্ধ, তার অটুট সুন্দর শরীর, তার কণ্ঠের প্রাণবন্ত স্বাভাবিক সুর। মনে পড়ল সেই রমণীর অপরূপ উচ্ছ্বাসময় নারীত্ব যা তাকে মাতিয়ে রেখেছিল। তবু আর এক সত্য আছে, আছে আর একটি অনুভব। মেয়েটি যতক্ষণ তার

কাছে ছিল ততক্ষণ সে টের পায় নি। সে বুঝতেও পারে নি তার মধ্যে অন্য এক বোধ এমন তীব্রভাবে কোনদিন কাজ করতে পারে। সে কল্পনাও আসেনি আগে। যখন এই দৈব-মিলনের প্রথম সূত্রপাত হয়; তখন সে ভেবেছিল একটা মজার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বেশ আনন্দের, স্ফূর্তির ব্যাপার! কিন্তু এ কী অনুভব তাকে গ্রাস করছে এখন! "সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমার এই যে আমি এই কথা আর কোনদিন তাকে শোনাতে পারব না", সে ভাবল। "কি করবো আমি এখন? তার স্মৃতি আর সেই স্মৃতির সান্ত্বনাহীন যন্ত্রণা নিয়ে আমি কি করে কাটাব সমস্ত দিন এই ভলগা-পারের পাণ্ডববর্জিত শহরে? অথচ এই ভলগার উপর দিয়েই সে লালচে রঙের একটা স্টীমারে চলে গেছে।"

এই চিন্তা থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হবে। মনকে ডোবাতে হবে অন্য কিছুর ভিতর। তাকে যেতে হবে অন্য কোথাও। খুব দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সে মাথায় টুপি পরে নিল, হাতে নিল ছড়ি। ফাঁকা বারান্দা দিয়ে জুতোর দ্রুত শব্দ তুলে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে দাঁড়াল হোটেলের দরজার সামনে। কিন্তু কোথায় যাবে? দরজার সামনেই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোচোয়ানের বয়স বেশী নয়। পরিপাটি বেশভূষা। সিগারেট টানতে টানতে সোয়ারীর জন্য অপেক্ষা করছে। ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। ও কি করে গাড়ির ওপর বসে ওমন নিরুদ্বেগ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সিগারেট খেতে পারে? বাজারের দিকে যেতে যেতে লোকটি ভাবল, "হয়ত এই শহরে একমাত্র আমিই অসুখী!"

বাজার ভেঙে এসেছে। লোকটা বাজারের ভিতর দিয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগলো। এলো গাড়িবোঝাই শশার নিকটে, পা দিয়ে পরখ করে দেখল গাদা-করা নতুন সার, হাঁড়ি-কলসির দোকানের পাশে এসে দাঁড়াল। খরিদ্দার ভেবে মেয়ে-দোকানীরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। হাঁড়ি-কলসি বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল, বললে, "এমন জিনিস আর কোথাও পাবে না।" বাজারটাকে কী অসহ্য রকমের স্থূল মনে হল তার! সে গেল গির্জার দিকে। প্রার্থনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও উচ্চ-কণ্ঠ সঙ্গীতের রেশ সুস্পষ্ট। নদীর পারে ইস্পাত-ধূসর পরিসরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় যে অনাদৃত বাগান ছিল, লোকটা সেই বাগানের ভিতর বারবার ঘুরতে লাগলো।... রোদ জ্বলছে যেন। জামার বোতাম আর কাঁধের ওপর সেনাপতির তকমাটা তেতে উঠেছে। কপালের ওপর টুপিটা এঁটে আছে আর তার চার পাশে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ পুড়ে যাচ্ছে। হোটেলে ফিরে খুবই আরাম বোধ করল সে। ঠাণ্ডা, নির্জন, প্রশস্ত খাবার-ঘরে ঢুকে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। খোলা জানালা দিয়ে আসছে গরম বাতাস। হোক গরম, তবু ত বাতাস। সে খাবার আনতে বলল।

সব কিছুই সুন্দর। প্রত্যেকটি বস্তু অপরিমিত আনন্দ আর বিপুল তৃপ্তিতে অভিষিক্ত হচ্ছে তার চার পাশে। এমন কি এই গরম, বাজারের গন্ধ, এই অদ্ভুত বিশ্রী মফঃস্বল শহর আর তারই হোটেল আনন্দে পরিপূর্ণ; তবু তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সে পর পর কয়েক গ্লাশ ভডকা খেল। খেতে খেতে মনে হল যদি কোন অলৌকিক যাদুমন্ত্রবলে তার সেই নাম-হীন আগন্তুক যদি আর একবার আসত, যদি সে শুধু আর একটা মাত্র দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারত, শুধু তার সঙ্গে থাকতে পারত যদি, প্রমাণ করতে পারত, তাকে বোঝাতে পারত যে সে তাকে কত গভীর ভালবাসে; তবে সে ঠিক তারপরের দিনই কোন খেদ না নিয়েই মরতে পারত। কিন্তু এ প্রমাণ করার কি দরকার? তাকে বোঝানোরও বা কি প্রয়োজন? সে জানে না কেন। কিন্তু বাঁচার চেয়েও তার প্রয়োজন যে আরও গভীর, সে এই কথা বুঝতে পেরেছে।

প্রথম গ্লাশ ভডকা ঢেলে নিয়ে সে নিজের মনেই বিড় বিড় করে উঠল, "আমার শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে।"

খাবারের ডিশ সরিয়ে দিল সামনে থেকে। দুধহীন কফি আনতে বলে সিগারেট ধরিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলো কি করে মুছে ফেলা যাবে এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রেম। কিন্তু মুছে দেওয়া অসম্ভব। এই বোঝা নামাবার নয়। হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে ছড়ি আর টুপি হাতে করে নিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে তৈরি করে নিল টেলিগ্রাফের বয়ান। সে লিখবে: "এখন থেকে আমরণকাল আমার জীবন তোমার হাতের মুঠোয়।" পোস্ট অফিসটা একটা পুরনো বাড়িতে। টেলিগ্রাফ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সে। মেয়েটি যে শহরে বাস করে তার নাম সে জানে। জানে মেয়েটির স্বামী আছে, আছে তার তিন বছরের কন্যা। কিন্তু নাম জানে না। স্টীমারে ডিনারের সময় আর হোটেলে সে বহুবার মেয়েটিকে তার নাম বলতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু সে একবারও বলেনি। প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কখন মৃদুকণ্ঠে বলেছে, "কেন তুমি আমার নাম জানতে চাইছ? ধর, আমি সেই রূপকথার রাজকন্যা। এই ভাল। তাই না?"

পোস্ট অফিসের গায়েই ফটোগ্রাফারের দোকান। সামনেই টানানো আছে একটা
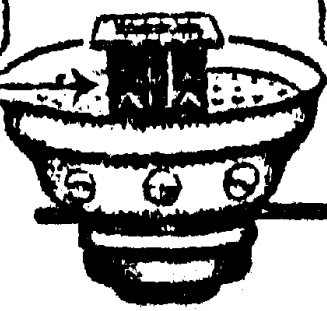
অফিসারের ছবি। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকল। অফিসারের কপালটা ছোট, বুক টান করা। অনেকগুলো পদক ঝুলছে। ...কিন্তু কী ভীষণ স্থূল, অর্থহীন, অবাবহ এই সব দৈনন্দিন জীবন আর জীবনের তুচ্ছতা যখন প্রাণযন্ত্রণায় কাতর —হ্যাঁ, সে এবার ঠিক বুঝতে পেরেছে।— যখন হৃদয় বেদনায় অভিভূত, যখন ভালবাসা প্রবল, আনন্দ যখন অপরিমিত! কী বা মূল্য আছে এই দৈনিক জীবনের তুচ্ছতায়?

তারপর চোখ গিয়ে পড়ল নববিবাহিত দম্পতির ছবির ওপর। বরের গায়ে কোট, গলায় সাদা টাই। ছাটা চুল। বৌএর হাত ধরে ঋজু ও আড়ষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ থামল একটা ছাত্রীর ছবির ওপর। কিন্তু অকস্মাৎ তীব্র হিংসায় তার বুক ভরে উঠল। যেসব লোক কখন যন্ত্রণা ভোগ করে নি, কখন কষ্ট পায় নি, তাদের প্রতি হিংসায় সে পূর্ণ হয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে আনল রাস্তায়।

"আমি কোথায় যাবো? কী করব আমি?"

জনহীন পথ। বাড়িগুলো সব এক রকম দেখতে। দোতলা। সাদা রঙের বাড়ি। মধ্যবিত্তদের আবাস। বড় বাগান। কিন্তু দেখে মনে হয় বাড়িতে জনপ্রাণী নেই। রাস্তায় ধুলোর সাদা কার্পেট পাতা। কিন্তু চারদিক আলোয় আলোয় অন্ধ। সূর্যালোকে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। আলো, আনন্দিত কামনার তীব্র আলো। কিন্তু এই সূর্যালোকও এখানে যেন একটু বেমানান। পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ বেঁকে গেছে। মনে হচ্ছে স্বচ্ছ ও কম্পিত আকাশের মধ্যে গিয়ে মিশেছে সেই পথটা। ঐ পথে আছে দক্ষিণের ইংগিত। ঐ পথের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল সেবেস্তাপোল...কারচ... আনাপার কথা। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে নিল সে। জ্বলন্ত রোদের জন্য সোজাসুজি তাকাতে পারছে না সে। তাই বাঁকা চোখে মাটির দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। হাঁটতে আরম্ভ করল। কিন্তু যেতে পারছে না। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছে। কোনক্রমে টলতে টলতে এগিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

হোটেলে ফিরে এসে মনে হল ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে সে চুরমার হয়ে গেছে। মনে হল সে যেন এখুনি সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছে। কোনক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে সে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। নির্জন প্রশস্ত ঘর। পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। মেয়েটির কোন চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এই ঘরে। কেবল পড়ে আছে তার একটা চুলের কাঁটা। বিছানার পাশের ছোট টেবিলের ওপর সে নিজেই রেখেছিল এই পিনটা। সে খুলে ফেললো সৈনিকের পোষাক। আয়নায় নিজেকে দেখল। সেনা বিভাগের অতি সাধারণ অফিসারের মুখের মত তার মুখ। রোদে পোড়া, কর্কশ। গোঁফের উজ্জ্বলতা নেই, রোদে ঝলসে গেছে। চোখের মণিতে নীল রঙের অস্পষ্ট আভাস। সেই মুখ এখন কি উদ্বিগ্ন, সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে কি এক ক্ষ্যাপামি। সে সোজা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ে জুতো আছে, তাই জুতো সমেত পা দুটো তুলে দিলো খাটের বাজুর ওপর। জানালা খোলা, কিন্তু পর্দা ফেলা আছে। মাঝে মাঝে ঘরে আসছে এক ঝলক বাতাস। সেই বাতাসের সংগে আসছে আগুনের হলকা, আসছে নির্জন ও নিঃশব্দ জগতের সংকেত। মাথার তলায় হাত দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। চোখ জলে ভরে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল সে। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই দেখল পর্দার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার আভায় অপরিমিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আকাশ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলাও কষ্টকর। ঘরটা উনুনের মত গরম। তার মনে পড়ল গত দিনের কথা, মনে এল আজকের সকালের কথা। কিন্তু সেও যেন দশ বছর আগের কথা।

সে। আস্তে আস্তে হাত মুখ ধুয়ে নিল। পর্দাটা তুলে দিয়ে বেল বাজালো। আনতে বললো চা আর বিল। খুবই সুস্থির ভাবে লেবু দিয়ে চা খেতে লাগলো লেফটেন্যান্ট। তারপর গাড়ি ডাকতে বললো। দারোয়ান তার সুটকেশ তুলে দিল গাড়িতে। গাড়িতে বসে দারোয়ানকে দিল পাঁচ রুবল বকশিস।

ঘোড়ার গাড়ির লাগামটা হাতে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে কোচোয়ান, "কাল রাত্রে আপনি আমার গাড়িতেই এসেছিলেন।"

গাড়ি যখন জাহাজঘাটে এল তখন ভলগার ওপর ঘনিয়ে আসছে গ্রীষ্মের নীলাভ সন্ধ্যা। নদীর আশে-পাশে ইতঃস্তত জ্বলছে বহুবর্ণের ছোট ছোট আলো। স্টীমারের মাস্তুলের ওপর ঝুলছে লণ্ঠন।

কোচোয়ান বললে, "আপনাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিয়েছি।"

তাকেও পাঁচ রুবল বকশিস দিয়ে টিকিট কেটে সে নেমে এল ঘাটে। স্টীমার এসেছে। গতরাত্রির মতই ধাক্কা খেল ঘাটে। মাথাটা একটু ঘুরে গেল। গতরাত্রির মতই স্টীমারের কাছি টানা হল। স্টীমারের ঘুরন্ত চাকার জন্য জল পাক খেতে থাকলো গতরাত্রির মতই। স্টীমারে অনেক লোক। সব কটা আলো জ্বলছে। রান্নাঘর থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে। এইবার সে যেন তৃপ্ত হয়ে উঠল, এইবার সে যেন বন্ধুত্ব খুঁজে পেল।

এক মিনিট পরেই স্টীমার ছেড়ে দিল। সেই একই পথ, একই নদী। মেয়েটি গিয়েছে সকালের স্টীমারে। সে যাচ্ছে এখন।

সূর্যাস্তের রঙ মিলিয়ে গেল। গভীর হল গ্রীষ্মের রাত্রি। বিস্তীর্ণ হয়েছে বিপুল অন্ধকার। সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দূরে ও নিকটে কাঁপছে আলোর ঘুমন্ত প্রতিবিম্ব। জল-কল্লোলে ভেঙে যাচ্ছে সেই আলোর মৃদু রেখাগুলি। ভেঙে ভেঙে জ্বলছে, চারপাশের আবিষ্ট অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে, দূরে, দূরে, বহু দূরে............।

ডেকে চেয়ার পেতে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তার বুকে পাথর জমে উঠেছে। মনে হচ্ছে তার বয়স আরও দশ বছর বেড়ে গেছে।

অনুবাদ : রাম বসু

ইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩) রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের মত রাশিয়ার জীবন ও নিসর্গে মুগ্ধ বুনিনের রচনায় পাওয়া যায় কবিতার ঐশ্বর্য। কিন্তু গোর্কির মত দ্রুত বিখ্যাত তিনি হন নি। গোর্কির সংগে বুনিনের বন্ধুত্ব ছিল। রুশ বিপ্লবের পর বুনিন প্যারিসে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে বুনিনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি সাম্যবাদীদের প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন নি কোনদিন। ১৯৫৬ সালের পর বুনিনের বহু গ্রন্থ রুশ দেশে পুনরায় প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। —অনুবাদক

নির্বাচনের প্রচার কৌশল

অতীন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন কয়েক সপ্তাহ হল শেষ হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে কন্যাকুমারিকা, এদিকে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সুবিস্তৃত আমাদের এই মাতৃভূমির প্রত্যেকটি গ্রাম জনপদ এই নির্বাচনের সময় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—পরিমাণে কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিন্তু এই বিশাল ভূখণ্ডের একজন মানুষও ছিল না যে এই নির্বাচনের কথা না জানতো, 'ভোট' বলে একটা জিনিস আছে তা না বুঝতো—যদিও নির্বাচন বা ভোটের তাৎপর্য সে সঠিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেনি। পুজো-উৎসব ইত্যাদির মধ্যে যেমন একটা উদ্দীপনার, হৈ-হুল্লোড়ের অনিবার্যতা আছে, সেই জিনিসটা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মন বুদ্ধি ও হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

লোকের মন বুদ্ধি ও হৃদয়কে স্পর্শ করার জন্য যে-সব দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। হ্যান্ডবিল, পোস্টার, হোর্ডিং, ব্যঙ্গচিত্র, বক্তৃতা ইত্যাদি তো ছিলই—এবার নতুন যোগ হয়েছে চলচ্চিত্র। সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস এবার একটি এক হাজার ফুটের চলচ্চিত্র পশ্চিম, মধ্য, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দেখিয়েছেন;—এই সবাক চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের দান, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর দেশগঠনে কংগ্রেসের ভূমিকা, বিভিন্ন বিরাট বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সাফল্যমণ্ডিত রূপায়ণ। এটি এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক ভাষায় ডাবিং করে নিয়ে তা লক্ষ লক্ষ লোককে খোলা ময়দানে দেখানো হয়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও এটি বিপুল জনসমাদর লাভ করে। একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এই ছবিটি আমার দেখবার সুযোগ হয়। শিল্পকলার বিচারে এতে আগাগোড়া একটি স্থূলতার প্রলেপ থাকলেও অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে এর আবেদন লক্ষ্য করার মত। ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুদ, ভিলাই, রৌরকেল্লা, বিশাখাপত্তন, দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি জায়গায় যে-সব বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, দেশে যে অগণিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে, অসংখ্য গ্রামে যে হাজার হাজার হাসপাতাল, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করা হয়েছে, বস্তি ভেঙে স্বাস্থ্যকর শ্রমিক-বাসস্থান নির্মিত হয়েছে—এসবের একটি সত্য ও সামগ্রিক পরিচয় এই ছবিতে যে আছে, তা অতি বড় নিন্দুককেও স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টির এই বিরাট যজ্ঞকে অস্বীকার করে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার উপায় তার নেই। এই সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নির্বাচনী বক্তৃতার টেপ্-রেকর্ডিংও এই সব জায়গায় শোনানো হয়েছে, তার ফলও অনিবার্যভাবে এই সব প্রচার যাঁরা করেছেন তাঁদের স্বপক্ষে গিয়েছে।

নির্বাচনে এবার প্রচার-মাধ্যম হিসাবে কত জিনিসের যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মধ্যপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনে একটি কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতীক ছিল হাতি। তিনি তিন মাস যাবৎ একটি আস্ত জ্যান্ত হাতিতে চড়ে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁর স্বপক্ষে প্রচার করেছেন, পাছে তাঁর প্রতীক লোকে ভুলে যায় সেই জন্যেই এত আয়োজন। উত্তরপ্রদেশের একজন প্রার্থীর প্রতীক ছিল সাইকেল, তিনি নির্বাচনে নিজে রাতদিন একটি সাইকেলে চড়ে প্রচার চালিয়েছেন, তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদেরও অন্য বাহন আশ্রয় করতে দেননি। একজন জনসঙ্ঘের প্রার্থী হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে এবং সিংহাসনের মত একটি ডুলিতে এক বিরাট প্রদীপ জ্বালিয়ে বাহকের কাঁধে চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। পক্ষান্তরে এক ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী স্থানীয় একটি সার্কাস থেকে দুটি সিংহ ভাড়া করে নিজের নির্বাচন এলাকায় ঘুরেছেন, অবশ্য সিংহ দুটি খাঁচায় বন্দী ছিল। লোকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসুক বা না আসুক সিংহ দেখতে যে ভিড় জমাতো সে খবর দিতে সংবাদদাতা ভুল করেননি। মহীশূরে দুটি দীর্ঘশৃঙ্গ মহীশূরী বলদ জনৈক কংগ্রেসপ্রার্থীর প্রতিটি নির্বাচন-সভায় হাজির থেকে বক্তার প্রতীক চিনিয়ে দিতে শ্রোতা ও দর্শকদের সাহায্য করত। বিহারে জনৈক নির্দলীয় প্রার্থীর প্রতীক ছিল ফুল। তিনি প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি করে গাঁদাফুল উপহার পাঠাতেন, ফুলের সঙ্গে তাঁর নামের কার্ড এবং কেন তিনি ফুল পাঠাচ্ছেন তা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আবেদনও আটকানো থাকতো। জয়পুরে এক প্রার্থী প্রকাশ্যস্থানে প্রায়োপবেশন করে শুয়েছিলেন, তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে না দিলে তিনি অন্নজল গ্রহণ করবেন না এই রকম ভয় দেখিয়ে। শেষে স্থানীয় মাতব্বরদের বহু আবেদন-নিবেদন, আশ্বাস ও স্তোকবাক্য তাঁকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনে।

এসব খবর এই তিন মাস যাবৎ যাঁরা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েছেন তাঁরা সবাই জানেন। এসব খবরের কতখানি সত্য, কতখানিই বা অতিরঞ্জিত, তা বিচার করার ভার পাঠকদের ওপর রইল। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। বাংলাদেশের প্রচারকার্য এই সব কৌশলের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম। এখানে তার কিছু পরিচয় দিই।

বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে এই তিন মাস যাবৎ আমি নিছক কৌতূহলবশতই নির্বাচন-কৌশল দেখবার জন্যে নানা প্রার্থীর সঙ্গে ঘুরেছি। গ্রাম শহর ইত্যাদিতে তাঁদের বক্তৃতা শুনেছি। এই-সব নির্বাচনী সভায় কত মজার মজার ঘটনা যে দেখেছি আর কত অদ্ভুত অদ্ভুত বক্তৃতা শুনেছি তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দেবার এখানে জায়গা নেই। তার থোড়া কয়েক পাঠককে উপহার দিতে চাই।

তার আগে বাংলাদেশে নির্বাচনী-প্রচার কি কি ধারায় চলেছে [illegible] বলে নেওয়া ভালো। বাংলাদেশে কংগ্রেস এবং বামপন্থী ছটি দলের জোট—এঁদের মধ্যেই নির্বাচন-দ্বন্দ্ব প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে প্রজা-সোস্যালিস্ট, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, হিন্দুমহাসভা দল এবং নির্দলীয়রা

ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারও প্রখর ও প্রবল ছিল কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের মধ্যে—বামপন্থীরা চান বিকল্প সরকার গঠন করতে, কংগ্রেস চান নিজেদের সরকার কায়েম রাখতে। দলীয় সরকার গঠন করা সম্বন্ধে অন্যান্য দলের কোন ইচ্ছা ছিল না, থাকলেও তাঁরা প্রকাশ্যে সে কথা বলেননি, আর নির্দলীয় প্রার্থীদের এত বড় বুকের পাটা হয়নি যে, নির্দলীয় সরকার গঠনের কথা বলবেন।

বিকল্প সরকার গঠন করার ধ্বনি (slogan) নিয়ে যে ছটি বামপন্থীদল একসূত্রে গাঁথা পড়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কম্যুনিস্ট, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বা আর-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-সি-পি-আই বা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বোলশেভিক পার্টি। বাংলাদেশে মুখ্য লড়াই হয়েছে এঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের। নির্বাচনী প্রচার-কৌশলও তীক্ষ্ম ও তীব্র ছিল এই দুই দলের।

আমি বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় ১৯৩৫ সালের পর থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটিই দেখেছি। এই সমস্ত নির্বাচন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, এবারকার অর্থাৎ ১৯৬২ সালের নির্বাচনে যত রকমের প্রচার-মাধ্যম নেওয়া হয়েছিল আগেকার কোন নির্বাচন সেদিক দিয়ে এর ধারে-কাছেও আসতে পারে না। বৃটিশ আমলের নির্বাচনে প্রধান ছিল হ্যান্ডবিল, শোভাযাত্রা, পোস্টার এবং বক্তৃতা। বিয়াল্লিশ সালের নির্বাচনে এর সঙ্গে যোগ হল নির্বাচনী গান এবং 'পোস্টার নাটক'। 'পোস্টার নাটক' জিনিসটি হচ্ছে বিনা সাজসরঞ্জামে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরেই রাজনৈতিক বিষয়-বস্তু নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটক। সাতান্ন সালে এ সবের সঙ্গে যোগ হল কার্টুন। আর এবার এসব ছাড়াও নতুন এল চলচ্চিত্র (অবশ্য বাংলাদেশে নয়)। বেতার-বক্তৃতার প্রস্তাবও উঠেছিল, কিন্তু সব দল তাতে রাজি না হওয়ায় সেটা আর এবার হল না। হয়ত সাতষট্টি সালে হবে।

নির্বাচনী-গান হিসাবে শুনেছি আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের সুরে গীত রাজনৈতিক গান এবং কোন কোন লোক-প্রসিদ্ধ রেকর্ডের গানের ব্যঙ্গ-অনুকৃতি বা Parody। এই লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, টুসু, কীর্তন, সারি, জারি, ঝমুর, পাঁচালি, কবিগান, তরজা সব আছে। উত্তরবাংলায় শুনেছি ভাওয়াইয়া, মুর্শিদাবাদে শুনেছি গম্ভীরা ও গাজনের গান। এসব গানই রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের কবিদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে নিজেদের শিল্পীদের দিয়েই গাইয়েছেন। কোন কোন গান রচনা হিসাবে অতি উচ্চ স্তরের—সেটাও লক্ষ্য করেছি। গানের ব্যাপারে বামপন্থীরা কংগ্রেসীদের টেক্কা দিলেও প্যারডি গানে কংগ্রেসীরাও কম যাননি। একটি গান শুনেছি রামপ্রসাদের রচনার প্যারডি—'আমায় দেমা মিনিস্টারী—আমি নিমকহারাম নই শংকরী' ইত্যাদি।

কংগ্রেসীদের আরেকটি প্যারডি শুনেছি চাকদহে—'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও চীনারা এসেছে দ্বারে, জ্যোতি বসু লয়ে পাঁচ ভাই দেখ অভিষেক করে তারে'। এ ছাড়াও প্যারডি শুনেছি এসব গানের—'দেশ দেশ নন্দিত করি', বল মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার সাধ না মিটিল, বড় আশা করে এসেছি, যেদিন সুনীল জলধি হইতে, আমার সোনার বাংলা, মুক্ত-বেণীর গঙ্গা যেথায়, ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে, আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে, ওগো তোরা কে যাবি পারে' ইত্যাদি বহু গানের। এগুলির কিছু কংগ্রেসের কিছু বামপন্থীদের রচনা। পাঠক লক্ষ্য করবেন এই গানগুলির আধার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল—সবাইকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এসব গানের অধিকাংশই নির্বাচনী সভা শুরু হবার আগে গাওয়া হ'ত। সভার শেষে (বিশেষ করে কংগ্রেসীদের নির্বাচনী-সভার) দেশাত্মবোধক বিখ্যাত বিখ্যাত গানের আয়োজন থাকত। অনেক নামকরা পেশাদার শিল্পী সেসব গানের আসরে অংশ নিয়েছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পীরা সক্রিয় ছিলেন বোম্বায়ে, মেননের পক্ষে। বামপন্থীদের সভার শেষে বেশির ভাগ দেখেছি পোস্টার নাটক। এগুলি সাধারণত আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মত অভিনীত হ'ত। এই নাটকগুলির বিশেষত্ব স্ত্রী-চরিত্রের অনুপস্থিতি। মঞ্চসজ্জাও করা হত না, এমনকি যবনিকাও ছিল না। এই রকম অনেক নাটক পরিবেশন করেছেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ, উৎপল দত্ত ও তাঁর সম্প্রদায় ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি যে ভালো তা বলি না, কিন্তু এদের মধ্যে কিছু কিছু নাটক যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ সংলাপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

সাহিত্যিকরা এই নির্বাচনে মোটামুটি নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। তবে চিত্রশিল্পীরা নিরপেক্ষ ছিলেন না। বিশেষ করে কার্টুন শিল্পীরা। কলিকাতা উত্তরের লোকসভা-নির্বাচনে শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীস্নেহাংশু আচার্যের (বামপন্থী সমর্থিত কম্যুনিস্ট প্রার্থী) পক্ষে যত কার্টুন রচিত হয়েছে ভারতের কোথাও তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসী, কম্যুনিস্ট দুই পক্ষেরই এত চমকপ্রদ, শিল্পগুণসমন্বিত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে উজ্জ্বল কার্টুন দেখেছি যে এই সব নাম-না-জানা শিল্পীদের ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারিনি। এই ধরনের কার্টুনগুলির প্রদর্শনী সারা কলকাতার লোকের কাছে বক্তৃতা বা বিবৃতির চেয়েও শতগুণে আকর্ষণীয় ছিল। বাগবাজারের একটি রাস্তায় প্রায় আধ মাইল লম্বা এই রকম ছবির প্রদর্শনী দেখেছি—সেখানে চমৎকার সহাবস্থান। রাস্তার এক ফুটপাথের দেওয়ালে কংগ্রেসীদের চিত্র, অন্য ফুটপাথের দেওয়ালে কম্যুনিস্টদের। কিন্তু কেউ কারুর ছবি ছিঁড়ে দেননি, বিকৃত করেননি। এই একটি রাস্তায় আমার নিজের হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ লোক দিন পনের এই প্রদর্শনী দেখেছেন, পৃথিবীর কোন চিত্র-প্রদর্শনীতে পনের দিনে এত ভিড় হয় না। এই কার্টুনগুলি বহু পত্র-পত্রিকা থেকে সযত্নে সংগৃহীত, পুনর্চিত্রিত এবং সুসজ্জিত আকারে প্রদর্শিত। অখ্যাত অজ্ঞাত বাঙালী শিল্পীরা কার্টুন রচনায় যে কতখানি দক্ষ এই ছবিগুলি তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তবে কার্টুন যতখানি কলকাতায় রচিত এবং প্রদর্শিত হয়েছে, মফঃস্বলে তা হয়নি। বোধ হয় নির্বাচনপ্রার্থীরা এ বিষয়ে সে রকম মনোযোগ এবার দেখাননি। একজন পর্যবেক্ষক ঠিকই বলেছেন, এবার নির্বাচনে কলকাতায় বক্তৃতার লড়াইয়ের চেয়ে কার্টুনের লড়াইই হয়েছে বেশি। এই কার্টুনগুলির ক্যাপশনও এ'দের প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সবশেষে বক্তৃতা। বক্তৃতার বিশদ বিবরণ দেব না, তবে আমার সংগ্রহে যে-সব বিচিত্র বক্তৃতার বিবরণ আছে তার কয়েকটি পাঠককে উপহার দেব। কান্দী অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা চীন সম্পর্কে দলীয় নীতি বিশ্লেষণ করার সময় বললেন, চীন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হবে না, কারণ চীন কোনদিন ভারত আক্রমণ করবে না। এই নেতাই কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় বললেন, না হয় তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম চীন ভারত আক্রমণ করেছে, কিন্তু ভারত সরকারের কামান, বন্দুক ছিল না? সৈন্য ছিল না? তারা

তখন কি করছিল?—তারা কেন চীনকে বাধা দেয়নি!—যেন, চীনের ভারত-ভূমি গ্রাস করার দায়িত্ব চীনের নয়, দোষ ভারত সরকারের, যেহেতু তারা বাধা দেয়নি। নৈহাটিতে এই দলেরই অন্য একজন নেতা বললেন, চীন ভারত আক্রমণ করে খুব ভুল করেছে। বরানগরে অন্য একজন বললেন, চীন ভারত আক্রমণ করেছে বলে কারো কারো ঘুম হয় না, কিন্তু পাকিস্তান যে বেরুবাড়ী নিয়ে নিল তখন তাঁরা কয় রাত্রি জেগে ছিলেন! একজন পুরাতন ইতিহাস উল্লেখ করে দেখিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশ চীন নিজের বলে দাবী করতে পারে! চীন যে তা করছে না, সেটাই চীনের মহত্ব। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এ'রা কেউই মূল প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, পরস্পরের প্রতি পাল্টা অভিযোগ মাত্রই করলেন।—একজন কংগ্রেসী নেতা বেহালায় বক্তৃতা করার সময় বললেন, একশো বছর আগে এই বেহালায় জঙ্গল ছিল, বাঘ-ভালুক ঘুরতো, রাস্তাঘাট ছিল না—আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেখুন সেখানে বিরাট পীচের রাস্তা হয়েছে, ইলেকট্রিক হয়েছে, যদু কলোনীতে কত বড় বড় লোক বাড়ী করেছে, রাস্তা দিয়ে স্টেট বাস চলছে, ইলেকট্রিক পাখার কত বড় কারখানা হয়েছে।—দুটো নির্বাচনে আপনারা কংগ্রেসকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচিত করেননি—সে কি আমরা এই সব উন্নতিমূলক কাজ করেছি বলে? কই কম্যুনিস্টরা তো এসব করতে পারেনি! বহরমপুর লোকসভার বামপন্থী প্রার্থীর বিরুদ্ধে জনৈক কংগ্রেসী নেতার উক্তি—আপনারা দেখুন অমুক বাবু কটা রাস্তা, কটা হাসপাতাল আর স্কুল করে দিয়েছেন—আর আমরা কি করেছি। তিনি ভারতের বাইরের ব্যাপার নিয়ে অন্য দেশে জেলে ছিলেন, তাঁর নিজের এলাকার জন্যে তিনি কি করলেন! বহরমপুরে বিধানসভার প্রার্থীর পক্ষে প্রচার—বিরোধী প্রার্থী এম-এ পাশ নন, আর কংগ্রেসী প্রার্থী এম-এ, বি-এল—দেখুন কার গুণ বেশি। যেন বামপন্থী প্রার্থী এম-এ পাশ হলে তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াতেন না। বেকার-সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জনৈক কংগ্রেসী নেতা কাটোয়ায় বলছেন—আমাদের দেশে আগে কিছু তৈরী হত না, এখন সব তৈরী হচ্ছে, ব্লেড তৈরী হচ্ছে, লোকে নিজে হাতে দাড়ি কামাচ্ছে, তাই নাপিতরা আজ বেকার, সেলাইয়ের কল তৈরী হচ্ছে, তাই দর্জিরা বেকার! আলিপুরদুয়ারে জনৈক কংগ্রেসী নেতা বলেছেন—বামপন্থীরা সরকার হাতে পেলে চা খাওয়া বন্ধ করে দেবে! বামপন্থী নেতা বলেছেন—আমাদের হাতে সরকার এলে দেখবে দেশের লোক যাতে আরও বেশি করে চা খেতে পারে।

কাঁদির ভাষায় একে বলে 'ব্যাল দিয়ে ব্যাল ভাঙা'—অর্থাৎ প্রশ্ন করলেই তার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করা। এতে ফলও হত দেখতাম। একজন প্রশ্ন করলেন মহেশতলায়, 'বিধান রায় বৌবাজার ছেড়ে চৌরঙ্গীতে গেলেন কেন?' বক্তা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন 'জ্যোতি বসু পাল্টা সরকার বানাতে চান, তিনি কেন চৌরঙ্গীতে বিধান রায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন না? তাহলে বাংলাদেশের কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিচার হয়ে যেত!' এই রকম বিচিত্র সব 'ব্যাল দিয়ে ব্যাল ভাঙা' পদ্ধতি আমি বাংলাদেশের বহু দলীয় নির্বাচনী সভায় শুনেছি।

তবে চরম শুনেছি বামপন্থী ফ্রন্টের এক বর্ষীয়ান নেতার মুখে বক্তৃতায়। তিনি বয়সের জন্যেই বোধ হয় লোকের নাম ইত্যাদি গোলমাল করে ফেলতেন। সাঁইথিয়ায় এক সভায় তিনি বলছেন—'এই যে বঙ্কিমচন্দ্র সেনের বাংলা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঘোষের বাংলা, জগদীশচন্দ্র রায়ের বাংলা......'। তাঁর মুখে শ্রীযুক্ত অশোক সেন হয়েছেন অশোক দত্ত, শ্রীস্নেহাংশু আচার্য প্রথমে প্রেমাংশু আচার্য, পরে প্রেমাংশু ভট্টাচার্য এবং সব শেষে প্রেমাংশু সেন ও অশোক ভট্টাচার্য! সুহাসিনী দেবী হয়েছেন সুপ্রসবিনী দেবী! 'জনগণমন' হয়েছে 'ঘনমনগণ'। উত্তর বড়তলায় এক বামপন্থী প্রার্থীর সমর্থনে এক সভায় তিনি বলছেন—'এই যে বামপন্থী প্রার্থীকে আমরা দাঁড় করিয়েছি, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করেছেন, তিনি মরেও অমর!...... তিনি গরীব, শীতে জামা-কাপড় নেই, তাঁকে শুধু ভোট দিলেই হবে না, চার আনা করে পয়সাও ভোটের বাক্সে দিতে হবে! তাঁর জয়ের জন্য হিন্দুদের মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করতে হবে, মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের নামে গির্জায় গির্জায় পুজো দিতে হবে!' কিন্তু লোকে যা বোঝার ঠিকই বুঝেছে।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবে মায়ালতার সতেজ এবং সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি শুনলে আর কারও পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, দূরে চলে গেলে অশোকার মায়ালতার জন্যে মন কেমন করবে।

মায়ালতা সেই অবধি যখন তখনই তারস্বরে, 'মানুষ জাতটা যে কতখানি নেমক-হারাম' তা' ব্যক্ত করছেন, এবং পরক্ষণে ঘোষণা করছেন 'রাজা নইলে রাজ্য চলে, আর উনি নইলে সংসার চলবে না! হুঃ। ঘরের অভাবে ছেলের বিয়ে দিতে পারছি না, এবার ছেলের বিয়ে দেব, দিয়ে মান-মর্যাদার ওপর থাকবো। এখনকার মত দাসী-বাঁদী হয়ে থাকতে হবে না।' তাছাড়া নীতার উদ্দেশে তিনি বলছেন না এমন কথা নেই।

মুখের আর বিশ্রাম নেই ভদ্রমহিলার।

বাক্যের যদি শক্তি থাকতো নীতা এতদিনে ভস্ম হয়ে যেত।

কিন্তু এ যুগে বাক্য শক্তিহীন, তাই নীতা ভস্ম হওয়া তো দূরের কথা, বরং আগের থেকে মোটা-সোটা বড়-সড় হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও কী করে বজায় রেখেছে নীতা তার মুখের দীপ্তি, স্বাস্থ্যের লাবণ্য!

হাওড়া স্টেশনে সহসা মুখোমুখি হয়ে এই প্রশ্নটাই প্রথম মনে এল কৃষ্ণার।

মুখোমুখি হওয়াটা অপ্রত্যাশিত। প্রায় গল্পের ঘটনা-চক্রের যোগাযোগের মত। নীতা দিল্লী থেকে এসে স্টেশনে নেমেছে, আর কৃষ্ণা ইন্দ্রনীলকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। এক-জনের গতিভঙ্গী দ্রুত চঞ্চল ব্যস্ত, আর একজনের শিথিল স্তিমিত বিলম্বিত।

তবু মুখোমুখি হয়ে গেল।

নীতা বলে উঠল, 'আরে, তুমি!'

কৃষ্ণা বলে উঠল, 'আরে, আপনি!'

তারপর দ্রুত লয়ে দু'জনের মধ্যে যে কথার আদান-প্রদান হলো তাতে এই প্রকাশ পেল, নীতা অবস্থা একটু সামলে নিয়েই এসেছে বাবাকে দেখতে। দু'তিন-দিনের বেশী থাকার জো নেই। হয়তো পর্শুই ফিরতে হবে। নীতার কাকা ওখানে গিয়েছেন, তাই আসা একটু সহজ হলো।

আর কৃষ্ণা?

সে এসেছিল ইন্দ্রনীলকে তুলে দিতে। বর্ধমান কলেজে একটা সামান্য মাইনের লেকচারারের কাজ জোগাড় করে ইন্দ্রনীল কৃষ্ণা এবং তার মার সহস্র নিষেধ অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

'কিন্তু নিষেধ কেন? একটা কিছু তো করবেই?' নীতা বলে, 'আর প্রথমেই খুব ভাল একটা হবেই, তার কোন মানে নেই। তবু শিক্ষার লাইন তো!'

কৃষ্ণা ঠোঁট উল্টে বলে, 'শিক্ষার লাইন! কিন্তু দু'জনে দু' জায়গায় পড়ে থাকারই বা কি মানে আছে? চেষ্টা করলে কি আর কলকাতায় ওই শিক্ষার লাইনে কিছু জুটতো না?'

'তা কেন জুটবে না?' নীতা সবিস্ময়ে বলে, 'কিন্তু কলকাতার বাইরে কেউ কিছু করবে না, সেটার মধ্যেও তো কোন যুক্তি নেই। দু'জনে দু' জায়গায় পড়ে থাকার অর্থ কি বলতো? তুমিও কিছু কাজকর্ম করছো নাকি?'

'মাথা খারাপ! দাসত্বের মধ্যে আমি নেই বাবা। কিন্তু ওর ওই সাধের বর্ধমানে তো আর আমি গিয়ে থাকতে পারব না।'

'তুমি গিয়ে থাকতে পারবে না?'

'কেটে দু'খানা করলেও না! একটা সভ্য শহর খুঁজে পেল না! এত রাগ হয়েছে আমার। ভেবেছিলাম স্টেশনেও আসব না, নেহাৎ জীবে দয়া হিসেবেই এলাম। শুনলে বিশ্বাস করবেন, আমার বাবা আশ্বাস দিয়েছিলেন কোন বন্ধুকে ধরে খুব ভালমত একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন, বাবু বললেন, 'ও কাজ আমার ভাল লাগবে না।'

বাবা বললেন, 'বেশ, বাইরে যেতে চাও তো বল, তাই পাঠাবার চেষ্টা করি।' শুনে কী মজাই লেগেছিল আমার। ভেবেছিলাম আমিও তা'হলে ছাড়ছি না। উঃ আমার দু'-তিনটে বন্ধু বিয়ে করেই কেমন বরের সঙ্গে বিলেত, আমেরিকার চলে গেল। তা তা'তেও বাবু বললেন, 'আপনার টাকায় বাইরে গিয়ে কৃতী হয়ে আসবো, এটা ঠিক মনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।' বিশ্বাস করছেন? ওঁর মনের সঙ্গে খাপ খেল কিনা ওই পচা দেশের পচা কাজটি। কী বলবো, আমি যে বাড়ীতে কী পোজিশনে আছি, ওঁর বুদ্ধিকে ছি ছি করছে সবাই! তা'ছাড়া

বিয়ে হয়েও বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা—'

কথাটা শেষ করতে গিয়ে থেমে যায় কৃষ্ণা। বোধহয় ভাবে নীতার মুখোমুখি বাপের বাড়ী পড়ে থাকার কারণটা বলা সমীচিন হবে কিনা। চিঠিতে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু মুখোমুখি!

নীতা অবশ্য ওই অসমাপ্ত কথা থেকেই প্রশ্নের উপাদান পায়। বিস্ময়ে বলে, 'বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা?'

'ওই আর কি! কেন আপনি আমার চিঠি পাননি?'

'হ্যাঁ পেয়েছিলাম।' নীতা মৃদু হাস্যে বলে, 'তবে আজো তোমার বাপের বাড়ী পড়ে থাকা, অথবা তার কারণ ঠিক ধরতে পারিনি। এখন অবশ্য পাচ্ছি।'

'পাচ্ছেন যখন, তখন আর বেশী কি বলবার আছে?'

নীতা সামান্য ক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তিত ভাবে বলে, 'কিন্তু আমি তো সমানেই শুনেছি বাবার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে! আচ্ছা উনি কি মানুষ দেখে অসহিষ্ণু হচ্ছেন?'

কৃষ্ণা একবার নিজস্ব ভঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'উনি কী হচ্ছেন না হচ্ছেন, তা' দেখবার অবকাশ আমার হয়নি নীতা-দি। কিন্তু অসহিষ্ণুতা তো অন্য পক্ষেও দেখা দিতে পারে? আর সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও যে আপনার নেই, তা নয়। আমার 'মা-বাপ' বলে একটা পক্ষ আছে, এবং তাঁদের মতামত বলেও একটা জিনিস আছে।'

কথা হচ্ছিল চলন্ত মোটরে।
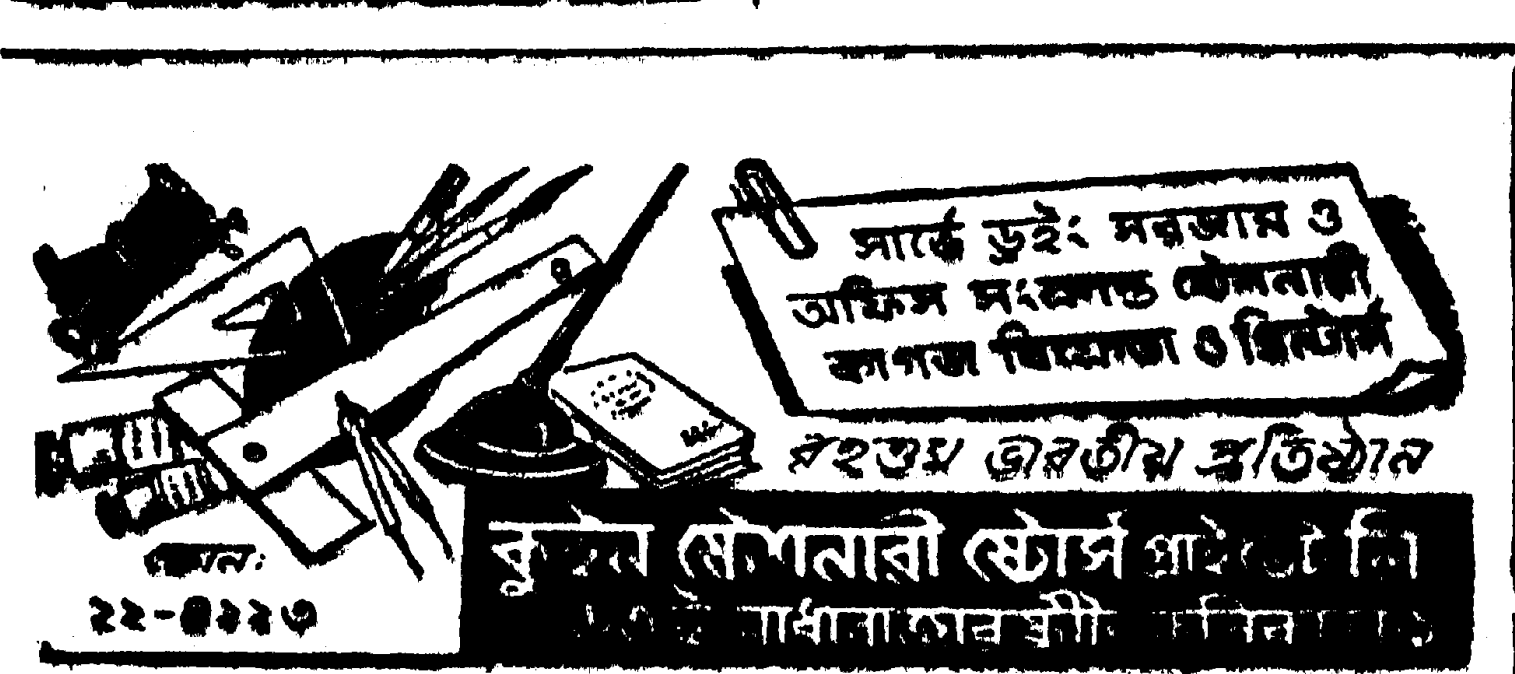
কৃষ্ণা যে গাড়ীতে এসেছিল, সেই গাড়ীতেই নীতাকে তুলে নিয়েছে। কৃষ্ণার বাবার গাড়ী দু'খানা, একটা তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের, অপরটা পরিবারের। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই।

নীতা বিষণ্ণভাবে বলে, 'তা সত্যি! দেখি কী অবস্থা!'

কৃষ্ণা বিদ্রুপে ঠোঁট কুঁচকে বলে, 'অবস্থা যাই হোক, ব্যবস্থা কিছু করতে পারবেন বলে, মনে হয় না।'

'তার মানে?'

'মানেটা গিয়ে দেখে বুঝবেন দিদি। আশ্চর্য হয়ে সরে আসা ছাড়া আমার আর কিছু করা সম্ভব হয়নি।'

নীতা চুপ করে যায়।

বাকী পথটা চুপ-চাপই কাটে।

ভারী চিন্তায় পড়ে যায় নীতা। ভাবে তবে কি এতদিন যা রিপোর্ট পেয়ে এসেছি, সব ভুল? নীতার দুশ্চিন্তা নিবারণ করতে নিরুপম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে এসেছে?

সুশোভন বেশী কিছু অস্বাভাবিকতা করছেন?

সুচিন্তা ভয়ঙ্কর একটা অসুবিধাকর অবস্থায় কাটাচ্ছেন?

নীতার স্বার্থবুদ্ধিই কি ওই শান্ত ভদ্র নির্লিপ্ত-স্বভাব মহিলাটির শান্তি কেড়ে নিয়েছে?

কিন্তু শুধুই কি নীতার স্বার্থ-বুদ্ধি? তার জন্যেই কি নীতা? আরও কিছু কি ছিল না নীতার সেদিনের সেই আয়োজনের মধ্যে? যেদিন নীতা প্রথম তার বাপকে নিয়ে অনুপম কুটিরের দরজায় এসে নেমেছিল।

সুশোভন পাগল, সুশোভন তো বার বার করেই বলেছিলেন নিজেকে, কিন্তু যে পাগল নয়; যার সব-কিছুই অব্যক্ত ছিল? সেই অব্যক্ত স্থিরতার মধ্যেও কি ব্যক্ত হয়ে ওঠেনি আজীবনের সঞ্চিত এক ঐশ্বর্যের ভান্ডারের আভাস? সেই ঐশ্বর্য কি তাকে শুধু বিধ্বস্তই করেছে? কোন উপায় খুঁজে দেয়নি?

দেখি, গিয়ে দেখি। কেমন আছেন সুশোভন।

বাবা, বাবা, তুমি কি আমায় চিনতে পারবে?

এখনো কি তুমি আমার নামটি মনে রেখেছ? বুঝতে পারছি না, এতদিন ধরে ওরা আমায় ঠকিয়ে এসেছে কি না। বাবা, তুমি যদি আমায় চিনতে না পারো? আমি কি সইতে পারবো সেই দুঃখভার?

অনুপম কুটিরের দরজার কাছে নীতাকে নামিয়ে দিল কৃষ্ণা।

'তুমিও নামো না।' একথা বলার সাহস হ'ল না নীতার, আর বোধকরি ইচ্ছেও হল না। একা গিয়ে দাঁড়াতে চায় সে বাবার সামনে। কে জানে, কেমন ভাবে তিনি গ্রহণ করেন অনেক দিনের অদেখা, হয়তো বা ভুলে-যাওয়া কন্যাকে।

কিন্তু সুশোভন কি ভুলে গেছেন? ভুলে গেছেন 'নীতা' বলে কেউ ছিল। না—না—আর সুশোভন ভুলে যাবেন কি করে? তিনি যে অবিরত ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ভুলটা কোথায়!

নীতার সমস্ত আশঙ্কা সমস্ত উদ্বেগ লুপ্ত করে দিয়ে সুশোভন মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তার মাথায় গালে হাত বুলোতে বুলোতে রুদ্ধকণ্ঠে বার-বার বলতে লাগলেন 'নীতা, নীতা! তুই এসেছিস। তুই এলি। এতদিন কেন আসিসনি।'

তারপর এক সময় সাগরের নামও উল্লেখ করলেন সুশোভন। বললেন, 'সাগর, সাগর বলে সেই ছেলেটি! তার সঙ্গে তোর কবে যেন একদিন বিয়ে হয়েছিল না? ওরাতো তাই বলল। তাকে আনলি না কেন?'

সুখে আনন্দে মনটা ভরে উঠতে চায় নীতার, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নীতা কি প্রতি-মুহূর্তে আশা করছিল, এইবার সুশোভন উৎফুল্ল আনন্দে চীৎকার করে উঠবেন, 'সুচিন্তা সুচিন্তা কোথায় আছ তুমি? কী বাজে বাজে কাজ করছো বসে বসে? দেখতে পাচ্ছ না কে এসেছে!'

না, সুশোভন চেঁচিয়ে উঠলেন না।

সুশোভন বুঝতে শিখেছেন, অমন করে চেঁচিয়ে ওঠাটা নিয়ম নয়। চেঁচিয়ে

এতবার জন্যে যে নিশ্চিন্ততার মধ্যে থাকা দরকার, তা আর নেই সুশোভনের। সুশোভন এখন অবিরত চিন্তা করছেন। আর সেই চিন্তার ভারে ভারেই বুঝি ভারী হয়ে উঠেছেন সুশোভন।

নীতাই জিগ্যেস করলো, 'সুচিন্তা পিসিমা কই?'

সুশোভন চিন্তিতভাবে বললেন, 'জানি না তো! কোথায় গেল।'

'তুমি জানো না?'

'আমি? আমি কি করে জানবো? ও কখন কি করছে, আমায় বলে!'

'কিন্তু বাড়ীটা এমন ফাঁকা লাগছে কেন? নীচে শুধু একটা নতুন চাকরকে দেখলাম। বলল 'সবাই ওপরে আছেন।'

সুশোভন গম্ভীর ভাবে বলেন, 'সবাই তো চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ! সুচিন্তার ছেলেরা চলে গেছে, রাগ করে।'

'রাগ করে? রাগ করে কেন?'

সুশোভন আরও গম্ভীর মুখে বলেন, 'রাগ করতে পারে। রাগ করা তাদের অন্যায় নয়।'

নীতাও যেন দেখতে চায় নদীতে কত জল। তাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'কিন্তু কেন বল তো বাবা? সুচিন্তা পিসিমা তো ছেলেদের বকেন না?'

'বকার কথা নয়, বকার কথা নয়।' সুশোভন মৃদু গলায় বলেন, 'অন্য কথা। আচ্ছা নীতা, সুচিন্তার বাড়ীতে আমি কেন বল তো চলে এলাম? কে আমাকে নিয়ে এল এখানে?'

সুশোভন যখন ভাবছেন 'এ বাড়ীতে আমি কবে এলাম,' তখন সুচিন্তা বাড়ীতেই ছিলেন।

ছাতে ছিলেন।

কবে যেন একদিন সুশোভন বলেছিলেন, 'তুমি তোমার ঠাকুমার মতন কাঁচা আমের আচার করতে পার না সুচিন্তা?' আজ তাই চেষ্টা করছেন সুচিন্তা পারেন কিনা।

কিন্তু কবে বলেছিলেন সুশোভন?

সে তো অনেক দিন আগে। তখন সুশোভন সংসারের নিয়ম-অনিয়ম ভাবতে শেখেননি। কিন্তু তখন তো কাঁচা আম ছিল না।

ছাত থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুচিন্তা।

'নীতা! নীতা এসে পড়েছ?'

'হ্যাঁ পিসিমা!' নীতা কাছে এসে প্রণাম করে।

সুচিন্তা আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, 'আসার আগে একটা খবর দিলে না কেন? নিজে তা হলে হয়তো স্টেশনে—'

'আর ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করল না। তা'ছাড়া শেষ পর্যন্তই ঠিক করে উঠতে পাচ্ছিলাম না আসতে পারবো কি না।'

'কেমন আছেন মামারমায়?'

নীতা মৃদুস্বরে বলে, 'এমনিতে তো ঠিকই আছে।' আর কিছু বলে না। যেটুকু বেঠিক সে সম্পর্কে কিছু বলে না। শুধু আরও নীচু গলায় বলে, 'বাবাকে তো খুবই ভাল দেখছি। এতটা তো আশাই করিনি।'

সুচিন্তা নির্লিপ্ত স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ অনেক উন্নতি হয়েছে। ডাক্তার পালিত প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন।'

'ডাক্তার পালিত!' নীতা কেমন এক বিষণ্ণ মধুর হেসে বলে, 'ক্রেডিটটা কি ডাক্তার পালিতের? আমার বাবার প্রশংসাটা তাঁরই প্রাপ্য? অসাধ্য সাধন তো আপনিই করলেন পিসিমা।'

সুচিন্তা হেসে উঠলেন না, রেগে উঠলেন না, আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলেন না। মৃদু প্রতিবাদের সহজ সুরে বললেন, 'পাগল মেয়ে! আমি আবার কতটুকু কি করলাম? এটুকু সেবা যে কোন সাধারণ নার্সেও করতে পারতো।'

'পশু যাবে তুমি? পশু? দিল্লী যাবে তো?' সুশোভন একটু থেমে বলেন, 'আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'

'তুমি যাবে!'

নীতা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। দেখে সুচিন্তার মুখের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের ঝাপসা হয়ে আসা আলোয় কি যেন একটা সেলাই করছেন সুচিন্তা বারান্দার কোণের দিকে পাতা বেতের মোড়াটায় বসে। মুখ নীচু, মাথার কাপড়টা যথাস্থানে সংরক্ষিত। বসার ভঙ্গীটা স্থির।

সুশোভনের এই ঘোষণায় সেই স্থিরতার কোন পরিবর্তন হল না।

নীতা ইতস্তত করে বলে, 'এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে যাবে বাবা?'

সুশোভনের হাতে একটা বই ছিল।

অনবরত সুশোভন তার প্রথম থেকে শেষ, আর শেষ থেকে প্রথম পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। ওই করেন। বই একটা হাতে চাই তাঁর আজকাল। হাতে রাখেন আর পাতা উল্টোন। তার লেখায় মনঃসংযোগ করতে পারেন, এতটা মানসিক স্থৈর্য আসেনি।

নীতার প্রশ্নে সুশোভন দু'তিনবার বইটার পাতাগুলো উল্টে গেলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি মানে কি নীতা?'

নীতা অপ্রতিভ মুখে বলে, 'তাড়াতাড়ি মানে মোটে তো হাতে আর একদিন সময়। তোমার কত গোছ-গাছ।'

'আমার আবার কী গোছগাছ!' সুশোভন ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি না নিয়ে গেলে আমাকে কে নিয়ে যাবে? আমি কি মনে করতে পারছি দিল্লীটা কোন্ দিকে?

'তবে?' নীতা উৎসাহের স্বরে বলে, 'তবে এখন তুমি কি করে যাবে বাবা? এখন থাক, আমি পরে আবার এসে নিয়ে যাব।'

'না পরে নয়, এখন।'

নীতা আর একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখে। সুচিন্তা সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কথার ছন্দাংশও ও'র কানে যাচ্ছে, এমন মনে হল না।

অতএব আর একটু গলা চড়ালো নীতা। 'তুমি এক্ষুণি যেতে চাইলে সুচিন্তা পিসিমা রাগ করবেন বাবা। তাই না পিসিমা?'

সুচিন্তা এবার এদিকে তাকল। আর নীতার চোখের ইসারার কৌশলকে আমল মাত্র না দিয়ে সহজভাবে বলেন, 'না, রাগ করবো কেন?'

'হ্যাঁ রাগ করবে কেন।' সুশোভন বইয়ের পাতাগুলো আবার ফরফর করে উল্টে বলেন, 'রাগ করবার কি আছে? এটা তো আমার বাড়ী নয়, এখানে তো আমার থাকবার কথা নয়।'

নীতা বাবার কাছে ঝুঁকে দৃঢ়স্বরে বলে, 'ও কথা—ও কথা বলতে হয় না বাবা! সুচিন্তা পিসিমার বাড়ী কি আমাদেরও বাড়ী নয়? সুচিন্তা পিসিমাতো আমাদের নিজের লোক।'

'না না! তুমি ভুল বলছ।' উত্তেজনায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান সুশোভন, বলেন, 'সুচিন্তা কি করে আমাদের নিজের লোক হবে? সুচিন্তা কি মুখার্জি?'

'মুখার্জি না হলেও নিজের লোক হয় বাবা।'

'না, হয় না!' সুশোভন দৃঢ় স্বরে বলেন 'ওসব তোমার চালাকী! তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না।'

'বাঃ, নিয়ে যাব না কেন? কিন্তু সুচিন্তা পিসিমা তো আর দিল্লী যাচ্ছেন না—' নীতা যেন বাপকে বিপদ সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিতে চায়, 'কে তোমাকে যত্ন করবে?'

'তুমি করবে।' সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'তুমি পার না? তুমি আমার মেয়ে।'

স্থির পাথরের পুতুলের মাথাটা এবার একটু ঝুঁকে পড়ে, বোধহয় আকাশের আলোটা আরো কমে এসেছে বলে। একটু আগে সেখানে যে বহুবিচিত্র বর্ণচ্ছটার সমাবেশ হয়েছিল, তা'র সব লুপ্ত হয়ে, একটা গভীর ছায়া নেমে আসছে।

নীতা শেষ চাল দেয়, 'তা' আমরা সবাই একসঙ্গে চলে গেলে পিসিমা কি করে থাকবেন? পিসিমার দুঃখ হবে না?'

নীতা খুব জোরে হেসে উঠে বলে, 'দুঃখ কি উচিত অনুচিত মেনে চলে বাবা?'

কিন্তু ওর হাসির রেশ ফুরোবার আগেই পাগল মানুষটা ওদের স্তব্ধ করে দিয়ে বলে, 'দুঃখ তা না চলতে পারে, মানুষকে উচিত অনুচিত মেনে চলতেই হয়।'

নীতা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে তাকিয়ে থাকে বাপের দিকে নয়, অদূরবর্তিনীর দিকে, অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের নীচে একটা মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে যে হাতের সেলাইটার উপর বৃথা চেষ্টার ভান ছেড়ে দিয়ে।

বুদ্ধিভ্রংশের ভ্রষ্টবুদ্ধি আবার ফিরে

"...তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না"

সেই আগের অভ্যাসে আগের ভঙ্গীতেই কথা বলে নীতা বাপের সঙ্গে।

সুশোভন কিন্তু মেয়ের এ চালেও মাৎ হন না; গম্ভীর স্বরে বলেন, 'দুঃখ হলে চলবে কেন? দুঃখ হওয়া উচিত নয়।'

এসেছে, ফিরে এসেছে উচিত-অনুচিত বোধ, এর চাইতে আনন্দের আর কি আছে? কি থাকতে পারে? তবু ভয়ংকর একটা ভয়ে যেন অসাড় হয়ে গেল নীতা।

বুদ্ধিভ্রংশের সেই হারিয়ে যাওয়া বুদ্ধি প্রথম ফিরে এল কি একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা হয়ে। যে ছুরি একটা নরম

হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে।

উঠে আলো জেলে দেয় নীতা।

সহসা ঘোষণা করে, 'আচ্ছা বাবা, তুমি তা'হলে বোসো, আমি একবার ও বাড়ির জ্যেঠিমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাল সময় হয় না হয়।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুশোভনও ব্যস্ত ভাবে বলেন, 'তুমি একলা যাবে না, আমিও যাবো।'

'তুমি? তুমি এখন আবার এই সন্ধ্যা-বেলা—আজ থাক বাবা, কাল বরং দিনের বেলা যেও।'

পাগলের একগুঁয়েমিটা যায়নি। সুশোভন বলেন, 'না এখনই যাবো। সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই? তুই কি বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবি নীতা? সন্ধ্যাবেলা তুই পারবি আর আমি পারবো না?'

নীতা হতাশ ভাবে বলে, 'থাক গে বাবা দুজনেই বরং কাল যাবো। আজ আর ইচ্ছে করছে না।'

'এক্ষুণি ইচ্ছে করছিল, এক্ষুণি করছে না? আশ্চর্য নীতা, আশ্চর্য। তোরা বলতিস আমার মাথায় গোলমাল, মাথার গোলমাল তোদেরই।'

নীতা আবার আশান্বিত হয়ে ওঠে কেন? পাগল বাপের সুস্থ মূর্তিটা কি ওকে বিচলিত করছিল? ও কি সে মূর্তি সাহস করে সহ্য করতে পারছিল না? তাই এই শিথিল কথা-গুলোর মধ্যে স্বস্তি পায়? সেই স্বস্তির সুখে হেসে বলে সে, কে কবে তোমায় ওকথা বলেছে বাবা? সুচিন্তা পিসিমা বুঝি?'

'সুচিন্তার কথা হচ্ছে না। তোমরাই বলেছ।'

'কই আমাদের তো মনে পড়ছে না?'

সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'মনে পড়ছে না? ভাল করে মনে করে দেখ।'

'বাস্ তো আর এক নতুন পাগলামী শুরু করেছেন বড়দা।'

নিরুপম এলে নীতা প্রথম এই কথাই বলে।

পাগলামী!

নিরুপমের মনের মধ্যে অনেকগুলো ভাব ছুটোছুটি করে ওঠে। কলে এসে কি তরী ডুবল? মেয়েকে দেখে অধিক আনন্দে অধীর হয়ে কি পুনরুদ্ধারিত চৈতন্য আবার হারালেন সুশোভন? পরক্ষণেই ভাবল, নীতা আরও কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। তা হোক, দেখতে নেই, 'বড়দা' হতে হলে অনেক বড় হওয়া দরকার।

কিন্তু নীতার স্বামী অন্ধ হয়ে গেছে। সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না নীতার এই লাবণ্যে ঝলমল হৃদয়-ঐশ্বর্যে দীপ্ত সুন্দর মুখ। আশ্চর্য তবু এই মুখ ঝলমলেই আছে, ঝলমলেই থাকবে।

নীতার কথার উত্তর ভুলে নিরুপম বলে, 'কখন এলে?' তার নিজের মুখটাও যে ঝলমলে হয়ে উঠল, সে নিজে টের পেল না।

'সেই কোনকালে। আপনার তো দেখাই নেই। কোথায় থাকেন সারাদিন?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এখানে সেখানে। তুমি একাই এলে?'

'দিল্লী থেকে একা। হাওড়া স্টেশন থেকে ছোটবাবুর বৌ গাড়ী চড়িয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'ছোটবাবুর বৌ!'

'কুকা কুকা! ইন্দুর বৌ।' হেসে ওঠে নীতা। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলে, 'ইন্দুনীল বর্ধমান কলেজে লেকচারারের কাজ নিয়ে চলে গেল, বৌ তাকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিল, জানেন না এসব?'

নিরুপম মাথা নাড়ে।

'মেজদাও তো চলে গেছেন। এরকম কেন হয়ে গেল বলুন তো? এরকম তো আমি ভাবিনি।'
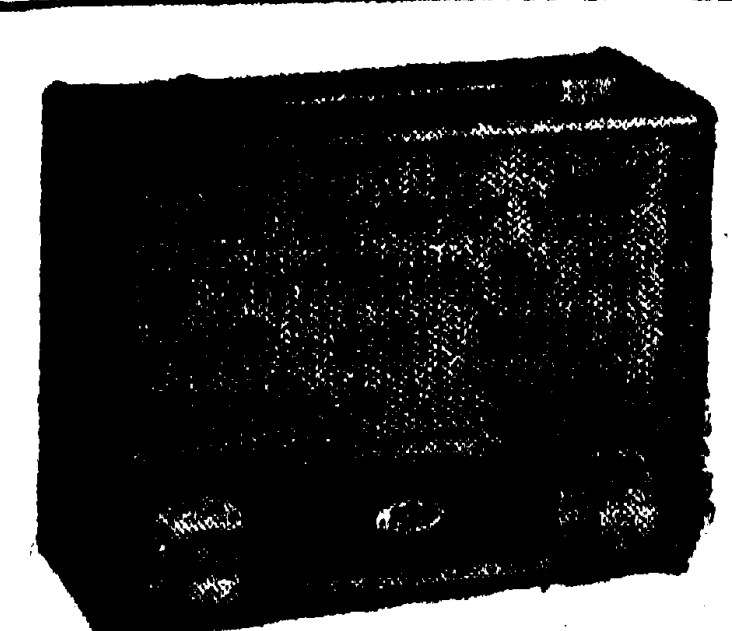
নিরুপম চুপ করে থাকে।

নীতা বিষণ্ণ মুখে বলে, 'আচ্ছা বড়দা, সত্যিই কি মানুষ এত দুর্বল জীব? সে ইচ্ছে করলে উদার হতে পারে না? মহৎ হতে পারে না? সুন্দর হতে পারে না? অন্যের প্রতি মমতাশীল হতে পারে না? পারে না, না? অথচ পারলে জীবনটা কত সহজ হতে পারে। আগে আমার কি মনে হোত জানেন? মানুষ বুঝি ইচ্ছে করলেই এসব পারে। এখন দেখছি তা পারা যায় না। সেই একটু ইচ্ছের বদলে আমরা ছোট হই সঙ্কীর্ণ হই নিষ্ঠুর হই, কৃপণ হই, হয়তো বা নোংরাও হই, আর জীবনকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলি। তবু ওই ইচ্ছেটুকু করি না।'

নিরুপম গম্ভীর হাস্যে বলে, 'দু'-একজনে ইচ্ছে করলে তো কাজ হবে না। একযোগে পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি মহাপুরুষ হয়ে ওঠে তবেই না।'

নীতা বলে, 'ওটা তো আপনার ঠাট্টার কথা। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোক তো একটা আস্ত জিনিস নয়? প্রত্যেকে তো আলাদা এক একটা ব্যক্তিমানুষ। কেবল-মাত্র নিজেকেই যদি ভাল করবার চেষ্টা করা যায়, কিছুই কি হয় না তাতে? শুধু নিজের ভালটি তো আমরা দেখতে ছাড়ি না? 'পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দুরবস্থায় পড়ে আছে, অতএব শুধু আমার অবস্থা ভাল করে আর কি হবে? একথা তো ভাবি না? আমার ছেলেটিকে ভাল করে পড়াতে চাই, আমার মেয়েটিকে ভাল বিয়ে দিতে চাই, আমার পরিজনকে ভাল খাওয়াতে পরাতে চাই, আমার বাড়ীটিকে ভাল সাজাতে গোছাতে চাই, এসব তো আমরা চাই? আর চাইবার সময় পৃথিবীর সব্বাইয়ের কথা ভাবতে বসি না? তবে না হয় মহৎ হবার ব্যাপারে কেবলমাত্র নিজের ওপর দিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেল?'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য সমাচার

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিদগ্ধজনের আলোচনা নিয়ে একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সোবিয়েত রাশিয়ায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইয়ে. পে. চেলীশেফ ও এন. এস. গোল্ডবের্গ। গোল্ডবের্গ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ভারতীয় আলোচকদের মধ্যে আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, গোপাল হালদার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ ও বিষ্ণু দে। এ'দের প্রত্যেকেরই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত স্মৃতিকথাধর্মী প্রবন্ধটি খুবই বৃহদায়তনের; রবীন্দ্র চিত্রকলার ওপর লিখেছেন বিষ্ণু দে; সংগীতের ওপর লিখেছেন শান্তিদেব ঘোষ; রবীন্দ্রপ্রভাব (সাহিত্যে ও জীবনে) সম্পর্কে লিখেছেন গোপাল হালদার; রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক ভারত সম্পর্কে লিখেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়।

মোট আটজন সোবিয়েত বিশেষজ্ঞের রচনা সংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন আ দে লিৎমান (রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মত); আ পে গ্লাত্যুক-দানিলচুক (রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি); আ আ গার্বভ্স্কি (রবীন্দ্রনাথে শেষ জীবনের গীতি কবিতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য); ই আ তভ্স্তিক ও আ ই চিচেরফ (১৯০৫-৮ সালের জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার প্রতিফলন); আ কা জেওফ (রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদৃষ্টি); ইয়ে এম বীকভা (ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ); এল এস গামাইউনফ (সোবিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথ) এবং ভে আ নভিকভা (সোবিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও সমালোচনা)। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া থেকে লিখেছেন যথাক্রমে দুশান জ্ভাবিটেল (স্বদেশী আন্দোলনের বিচারে রবীন্দ্রনাথ: ১৯০৫ সালের পর) ও ভে বেনেৎসিয়ানু (রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্রষ্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তন)। এল আ স্ত্রিজেভস্কায়া কৃত ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলীর নির্ঘণ্ট ও সোবিয়েত দেশের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলীর অনুবাদের তালিকা।

* * *

আগামী শরৎকালে জর্জ বার্ণার্ড শ রচিত এন্ড্রোকলস অ্যান্ড দি লায়ন নামক পুস্তকটি নতুন ৪০ অক্ষরের বর্ণমালায় মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। নতুন বৃটিশ বর্ণমালা রচনায় শ' জীবনের একটা বড় অংশ অতিবাহিত করে যান। তিনি মৃত্যুর পর এক বিরাট অর্থদান করে যান এ সম্পর্কে গবেষণার জন্য। গবেষণা পরিচালনায় এই উৎসর্গীকৃত অর্থ ব্যয়িত হয়। তাই এতদিনে ৪০ অক্ষরের বর্ণমালা রচনা সম্পূর্ণ হল।

শ'র এই পুস্তকটির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হবে। পুস্তকটির বামদিকের পৃষ্ঠাগুলি পুরো স্বাভাবিক বর্ণমালায় এবং ডানদিকের পৃষ্ঠাগুলি নতুন বর্ণমালায় মুদ্রিত হবে।

* * *

'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড' পত্রিকার স্বর্গত জোসেফ পুলিৎসার 'পুলিৎসার' পুরস্কারটির প্রবর্তয়িতা। মূলতঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার দান করা হলেও সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়। বর্তমানে আমেরিকান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পুলিৎসার পুরস্কার লাভ। ১৯৬১ সালে যে ১৪ জন পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ৫ জন লাভ করেন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য। এই পাঁচজনের মধ্যে আছেন হার্পার লী ও ফিলিস ম্যাকগিনলী নামে দুজন মহিলা।

হার্পারলীর পিতা এবং ভগিনী ছিলেন আইনজীবী। লীও আইন পড়েন। লেখক মাত্রেই আইন পড়বে—লী একথা বিশ্বাস করেন। বহু সাধনার ফলশ্রুতি নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'টু কিল এ মকিং বার্ড' যখন প্রকাশিত হল তখন বিদগ্ধজনের অকৃপণ অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করে। বছরের সেরা ও সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাসস্বরূপে খ্যাতি-লাভ করে। দুটি প্রবন্ধ আর তিনটি ছোটগল্প নিয়ে অতিদুঃসাহসভরে লী একদিন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কঠোর সাধনা আর গভীর জীবনদর্শন তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়েছে অল্পকালের মধ্যেই।

ফিলিস ম্যাকগিনলি সম্বন্ধে 'পাঞ্চ' পত্রিকার পিটার ডিকসন বলেছেন যে, 'জীবিত মার্কিণ কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ'। তাঁর রচিত কবিতার সুনির্বাচিত সংগ্রহ 'টাইমস থ্রী সিলেকটেড ভার্সেস ফ্রম থ্রী ডেকেডেস"এর জন্য পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেন। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাসমূহ অন্তরের অকৃত্রিম সহানুভূতির মধ্য দিয়ে লঘু ছন্দে প্রকাশ করেছেন ম্যাকগিনলি। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল-পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতা থেকে ৩০০টি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বার পর ত্রিশ বৎসর ধরে তাঁর কবিতার ক্রমউৎকর্ষমানতার একটি রূপ স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করা যায়। ম্যাকগিনলির 'মেরী ক্রিসমাস হ্যাপী নিউইয়ার', 'স্টোনস ফ্রম এ গ্লাস হাউস', 'এ শর্ট ওয়াক ফ্রম দি স্টেশন', 'দি প্রভিন্স অব দি হার্ট' প্রভৃতি গ্রন্থও সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করবার আগে আমেরিকান পোয়েট্রি সোসাইটির 'এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে' পুরস্কার লাভ করেন ম্যাকগিনলি।

* * *

এডিনবরার বার্ষিক সংগীত ও নাটকোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। এবারে উৎসবের সময় সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। উৎসবের ইতিহাসে এই প্রথম সাহিত্য স্বতন্ত্র কলা হিসাবে মর্যাদা লাভ করল। উৎসবে যোগদানের জন্য প্রায় ৫০ জন ঔপন্যাসিক আমন্ত্রিত হয়েছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতীয় লেখক কুশওয়ান্ত সিং। প্রায় ১১টি দেশ এই সাহিত্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবে। সম্মেলনে প্রধানত সমকালীন উপন্যাস সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

আমন্ত্রিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছেন নর্মান মেইলার ও উইলিয়াম ফকনার (যুক্তরাষ্ট্র), ইলিয়া এরেনবুর্গ (রাশিয়া), আইভো আন্দ্রিচ (যুগোশ্লাভিয়া), আলবের্তো মোরাভিয়া (ইতালী), ফ্রাঁসোয়া সা গাঁন, সীমন দ্য ব্যোভয়র ও জাঁ পল সার্ত্রে (ফ্রান্স) এবং গ্রাহাম গ্রীন, কিংসলি এমিস, আর্ল রাসেল ও সি. পি. স্নো (ব্রিটেন)। এ'দের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়িগণ হলেন উইলিয়াম ফকনার, আইভো আন্দ্রিচ, এবং আর্ল রাসেল।

* * *

জার্মানীর অধিবাসীদের পুস্তক প্রীতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। বেদসহ বহু সংস্কৃত পুস্তক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

গত বছর পশ্চিম জার্মাণীতে ২২,৫২৪টি নতুন বই প্রকাশিত হয়, তার পূর্ব বৎসর হয় ১৬,৫৩২টি। এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম চারটি পুস্তক প্রকাশক দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মাণীও সেগুলির মধ্যে অন্যতম দেশে পরিণত হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে শতকরা ২১-৭ ভাগ হল সাহিত্য, তার পর হল আইন ও প্রশাসন সম্পর্কিত পুস্তক, ধর্মীয় ইতিহাস, সভ্যতা, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক।

গত বছর অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা ১,৬০৫ থেকে বেড়ে ২,৬১৩তে দাঁড়ায় এবং এগুলির মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছিল সাহিত্য পুস্তকের অনুবাদ।

ছেলে

সুশীল সিংহ

দোকানে কোন হাতী ছিল না। খেলনা বলতে ছিল কিছু রং-করা কাঠের ঘোড়া। আর ন্যাকড়ার পুতুল। ন্যাকড়ার পুতুলে মন উঠল না। বাচ্চাছেলে নাড়াচাড়া করতে নষ্ট করে ফেলবে। কাঠের ঘোড়া কিনলেন তিনি। টফি। একটা নিকার-বোকার কিনতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সুরমা কি ভাববে ভেবে নিলেন না।

এককালে সুরমা ছাত্রী ছিল তাঁর। এই তিন বছর আগেও সে থাকত এই হস্টেলে। সেবার যখন সুরমার পানবসন্ত হলো। সুরমার অসুখের কথা উঠলেই সবাই শতমুখে স্নেহদির সেবার কথা বলে। সেবা স্নেহদির স্বভাবে আছে। বোধ হয় সে কথা মনে করেই সুরমা ছেলে কোলে দেখা করতে এসেছে। সে কথা থাক। ছাত্রীর দেড় বছরের ছেলেকে নিকার-বোকার কিনে দিলে কে কি ভাববে মনে করে স্নেহদি নিজের ইচ্ছাকে শামুকের মত নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলেন।

হাতে খেলনা নিয়ে ফিরে এলে সুরমা একবার গতানুগতিক আপত্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলো না। বাচ্চার হাতে খেলনা দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে গালের ওপর গাল চেপে ধরলেন স্নেহদি। এতক্ষণ ধরে হস্টেলের যে সব মেয়েরা তাকে কোলে নিয়ে ফিরছিল, তারা কেউ কেউ দেখল যে, বাচ্চাকে আদর করার বেলায় আইবুড়ো স্নেহদি যেন তাদের চেয়েও খুশী হয়ে গেছে।

সুরমাকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছে এগিয়ে এসে 'আবার আসিস' বলতে গিয়ে স্নেহদি খাপছাড়া ভাবে বললেন, হ্যাঁরে, ছেলেকে তোর হস্টেলে দিবি তো?

সুরমার তো প্রথমে হাসিই পেয়ে গেল। বলল, আগে বড়ো হোক।

—নিশ্চয়ই। ছেলে তো তোর বড় হবেই। কিন্তু শোন, ওকে যখন স্কুলে দিবি, দু-এক বছরের মধ্যেই ওকে হস্টেলে দিয়ে দিস। কেন জানিস?

এই গায়ে-পড়া পরামর্শে আর স্নেহদির কথা বলার ধরণে সুরমা অবাক হল। সে মনে মনে ভাবল, ছেলের স্বাদ জানে না স্নেহদি। যদি জানতো, তাহলে ঐ কথা বলতো না কখনো। কেউ কি সাধ করে ছোট ছেলেকে হস্টেলে দেয়? আশ্চর্য!

স্নেহদি নিজের মনে বলে চললেন, খুব ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে থাকলে, মার কাছ থেকে দূরে থাকলেই, ছেলেরা মাকে বুঝতে পারে। ছেলে মাকে বুঝবে, এটা খুব দরকার। আমি একটি মেয়েকে জানি, তার একমাত্র ছেলে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মার কাছে থেকে হস্টেলে গিয়েছিল। তারপর কি হলো জানিস? সে এক আশ্চর্য ট্র্যাজেডী—

সুরমা মাঝপথে বলে বসল, আমি আজ চলি স্নেহদি।

—আয়। আবার আসিস, এই বলে বাচ্চার গালে চুমো দিলেন স্নেহদি। সুরমা হাত বাড়িয়ে তার ছেলেকে কোলে নিল। রিক্সা করে কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর সুরমার খেয়াল হলো যে, আসার সময় সে স্নেহদিকে প্রণাম করে আসেনি। ভুল হয়ে গেছে।

।। ২ ।।

রোজকার মত আজও মিনা এলো সন্ধ্যার আগে। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী মিনার সঙ্গে স্নেহদির বিশেষ যোগাযোগের এক ছোট্ট ইতিহাস আছে।

—"আমি একটি মেয়েকে জানি, তার জীবনে আশ্চর্য এক ট্র্যাজেডী হয়েছে—" এই কথাই স্নেহদি বলেছিলেন মাস পাঁচেক আগে ফোর্থ ইয়ার সেমিনারে। আর এই পাঁচ মাসে মিনা যেন দিনে দিনে স্নেহদির ছায়া হয়ে উঠেছে। স্নেহদি সব ছাত্রীর সামনে বলেছিলেন, "দ্যাখো, মেয়েদের মাতৃরূপের কথাটা খুব ফলাও করে বলা হয় বটে, ওটা কিন্তু একটা সংস্কার।"

তিনি আরও বলেছিলেন—

সে দিনের ঘটনা একটু বিশদ করে বলতে হয়।

পাঁচ মাস আগে সেমিনারের সাহিত্যসভায় সেই কথাটা মিনা অত সহজে কি

করে বলতে পেরেছিল, তা তাঁর মন জানে। বেদনার থেকেই তো বোধের জন্ম। এ কথাটা মিনা এখন খুব ভালো বোঝে।

সেদিন সেমিনারে হেনা একটা প্রবন্ধ পড়ছিল। হেনা একটু বেশী পরিমাণে লেখে। প্রবন্ধই বেশী। বাইরের আকাশ নিভু নিভু। জানালা দিয়ে বেলাশেষের নারাঙ্গী রোদ্দুর এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়েছিল। মেয়েরা উসখুস করছিল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় ফিসফিস করছিল। আসলে হেনার প্রবন্ধে কারোই মন ছিল না। তাদের বসায়, চাহনিতে, ইসারায়, চুড়ির আওয়াজে—একটু খেয়াল করলেই সে অমনোযোগ দেখা যেত।

তবু খুব মন দিয়ে পড়ছিল হেনা। আর সমান মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন স্নেহদি। হাতের পাতার ওপর চিবুক রেখে সামান্য ঝুঁকে বসার ভঙ্গীতে এক মনে শুনছেন তিনি। চওড়া পাড় সাদা মেঝের তাঁতের শাড়ী স্নেহদির চার পাশে কেমন এক সাদা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। কানের পাশে চুলে কয়েকটি রুপালি রেখা যেন তাঁর বিশেষ প্রসাধনের মত ঝিকমিক করছে। স্নেহদিকে সাহিত্যের পরিবেশে এভাবে যখন মেয়েরা দেখে, তখন তাদের মনে হয় যদি একজন ভদ্রলোক—যার বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে, যিনি ঢিলে—হাতা পাঞ্জাবি পরেন, চুলে পাক ধরেছে, মাঝে মাঝে চুরুট খান যিনি, অনেক বই লিখে, অনেক অনেক নাম হয়েছে যাঁর—তিনি যদি স্নেহদির বর হতেন তাহলে কি সুন্দর হতো!

সত্যি, সাহিত্যের কথা উঠলেই স্নেহদি মানুষটাই যেন পাল্টে যায়। তখন তাঁকে এতো ভালো লাগে। না হলে, তাঁকে নিয়ে মেয়েদের—বিশেষতঃ হস্টেলের মেয়েদের—অস্বস্তিও অনেক। স্নেহদির বাতিক কি কম? হস্টেলের মেয়েদের যে-কোন সময় বারান্দায় দাঁড়ানো তিনি দেখতে পারেন না। যে-কোন মেয়ে দাঁড়ালেই স্নেহদি ডাকবেন—। মেয়েরা বলে, 'গলা তো নয়। আঁকশি।' মেয়েদের দুপুরে বেলায় জানালা খুলে পর্দা সরিয়ে রাখাও তিনি পছন্দ করেন না। গরম কালেও না। এমন কি রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দুপুরে মেয়েরা যদি আলুকাবলি, ফুচকা, চানাচুর আনিয়ে খায়, তাতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। কোন কোন প্রগলভ্‌ভা ছাত্রী নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করে, "নিজের চুলে পাক ধরেছে কিনা, তাই বাইরের জগতকে এত ভয়!"—

কিন্তু সাহিত্যের বেলায় এই মানুষই অন্য হয়ে যান। মেয়েরা তা দেখেছে, দেখে। আর মেয়েদের ওপর তাঁর জোরও সেইখানেই। কত যে পড়েন স্নেহদি! পাতার পর পাতা, বই-এর পর বই। দেশ, বিদেশ। অহরহ। বাব্বাঃ! যেন বই-এর মধ্যে ডুবে আছে। তিনি বলেন, "সাহিত্য ভালবাসলে গোটা পৃথিবীকে ভালবাসা যায়। মনের কাছে গোটা জগৎ, সব কিছু ধরা পড়ে।"

সেদিন সেমিনারে অবশেষে হেনা থেমেছিল। তার প্রবন্ধটা আকারে যেন "দুই বোন" উপন্যাসের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। মেয়েরা নড়ে বসল। হেনা স্নেহদির দিকে ও পরে তার সতীর্থদের দিকে, নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোর ভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে বসল। আর একটু যন্ত্রণা বাকি। এবার স্নেহদি সকলকে আহ্বান করলেন পঠিত রচনার বিষয়ে কিছু আলোচনার জন্যে। কিন্তু কেউ বড় একটা ওঠে না। তখন তিনি নিজেই—

সেমিনারের এক কোণে বসে নিজের মনে আকাশ দেখছিল মিনা। সে নিজেও জানত না যে, সে উঠে দাঁড়াবে। আহূত হওয়া মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অবাক করে বলল, "হেনার প্রবন্ধটা আমার ভালো লাগেনি। মেয়েরা দুই জাতের—মা আর প্রিয়া, এই ফরমুলার ওপর রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাস লিখেছেন, হেনা সেই এক কথাই বলেছে। কেবল মাতৃরূপের কথাটাই বারবার, বেশী করে বলেছে। আমি ভেবেছিলাম—"

—কি ভেবেছিলে?

কথার পিঠে কথা এগিয়ে দিতে দিতে মিনা যেন একটু হাঁপিয়ে উঠল। চার পাশে চাইল। তারপর বলল, মা আর প্রিয়া ছাড়াও মেয়েদের আর এক জাত আছে। মা আর প্রিয়া হবার বাসনা যাদের মধ্যে মাথা কোটে, অথচ যারা মা, প্রিয়া কিছুই নয়, তারাও তো মেয়ে। আমি......আমি...... আধুনিকাদের কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথ এদের দেখেননি।

এত গুছিয়ে যে বলতে পারবে তা মিনা জানত না। কিন্তু বলেই তার মনে হলো, সে ধরা পড়ে গেছে। সে বসে পড়ল। হেনার মুখ গম্ভীর। অন্য ছাত্রীরা বেশ হাসি-খুশী।

স্নেহদি চেয়েছিলেন মিনা আরো কিছু বলুক। কিন্তু আর কিছুতেই সে কিছু বলল না।

অতএব মিনার তোলা প্রসঙ্গ ধরে স্নেহদি একাই অনেক কথা বললেন।

সেদিন উপসংহারে তিনি যা বললেন তা শুনে ছাত্রীরা রীতিমত বিস্মিত হল। তিনি বললেন, দ্যাখো মেয়েদের মাতৃরূপের কথাটা খুব ফলাও করে বলা হয় বটে, ওটা কিন্তু একটা সংস্কার। মা হওয়াকে মেয়েরাই খুব বেশী বড়ো করে জাহির করে। কেন জান?

বলতে বলতে স্নেহদি তাঁর ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রীদের দিকে চাইলেন। সব কটি চোখ তখন তাঁর ওপর স্থির হয়ে আছে।

—কেননা অধিকাংশ মেয়েই মা হওয়ার বেশী কিছু হতে পারে না। অথচ মা হওয়ার পরও জীবনের অনেক বাকী থাকে। আমি একটি মেয়েকে জানি, তার জীবনে আশ্চর্য এক ট্র্যাজেডী হয়েছিল—

গল্পের আভাসে সেমিনার উৎসুক হয়ে উঠেছে। একজন বলেই ফেলল, কি ট্র্যাজেডী স্নেহদি?

—আজ থাক। সন্ধ্যা হয়ে এল।

এই বলে স্নেহদি আর দাঁড়ালেন না। সভা ভঙ্গ হল।

সভা ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু সেই থেকে মিনা রইল স্নেহদির পায়ে পায়ে। যেন ছায়া হয়ে উঠল সে। আর দেখতে দেখতে কেমন বদলে গেল সে। যে মিনার সাহিত্যে রুচি ছিল না, সে এখন কত বই পড়ে। শুধু পড়ে? অতি আধুনিক যে সব ছোটগল্প, যাতে ভঙ্গীর প্যাঁচগুলো বর্শার ফলার মতো বেঁধে বলে অনেকেই পড়তে চায় না, তা-ও যে বেশ রসিয়ে আস্বাদ করে।

স্নেহদি বলেছেন, এর পর আপনিই ওর ক্লাসিকে উৎসাহ আসবে। ক্লাসিক পড়লেই, পৃথিবী চিরকালের বন্ধু হয়ে যায়। সত্যি!

শুনে মিনার বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠেছে। কেউই দেখতে পায় না, তার মনোযোগের পাশাপাশি আছে সমান অমনোযোগ। সে যখন মনটা সব চেয়ে বেশী গুছিয়ে নিয়ে বসে, ঠিক তখনই মনের ভিতরে ভিতরে ফাঁস আলগা হয়ে যায় তার।

আসলে যন্ত্রণায় ঘূর্ণী। সকলের আড়ালে বুকের মধ্যে সেই ঘূর্ণীর চেনা

অনুভূতি খোঁজে গল্পের জগতে। মিনাকে তাই একটা পাখী মনে হয়।

কিন্তু কতদিন? কতদিন পারা যায় এমনিভাবে নিজের বুকে একা বয়ে বেড়াতে?

তাই আজ মিনা এসেছিল স্নেহদির কাছে নিজেকে মেলে দেবে বলে। এসে দেখল অন্ধকার ঘরে স্নেহদি একা বসে আছেন চুপ করে। মিনা আসতে বললেন, আজ সুরমা এসেছিল জানিস মিনা। ওর ছেলে দেখিয়ে নিয়ে গেল। ও, তুই তো আবার সুরমাকে চিনিস না। বোস, আমি আসছি। এই বলে স্নেহদি যেন একটা টান দিয়ে নিজেকে বাইরে নিয়ে গেলেন। ঘরের আলো জেলে দিলেন যাবার মুখে।

।। ৩ ।।

স্নেহদি তাঁর ঘরে ফিরে এসে দেখলেন ঘরখানা অন্ধকার।

—আলো নেভালি কেন? চুপ করে বসে আছিস যে—

কোন সাড়া দিল না মিনা।

পায়ে পায়ে কাছে এসে বললেন, কি হয়েছে রে?

অন্ধকার ঘরে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিনা।

আলো জ্বলল। ভেজা চোখে ঘরের দেওয়াল ঝাপসা ঠেকল মিনার কাছে।

—আমার মা নেই স্নেহদি।

—আগে তো কোনদিন বলিসনি।

—আমার মা অনেক দিন আগে চলে গেছেন। তখন আমি খুব ছোট। উনি আমার—

—তাতে কি হয়েছে? ছিঃ কাঁদতে নেই। আমি তো আছি।

এই বলে মিনার পিঠে হাত রাখলেন তিনি।

কী গভীর আশ্বাস সে স্পর্শে। চন্দনের মত শীতল সৌগন্ধী যেন মিনার সবটুকু ছুঁয়ে রইল। এই আশ্বাসের পথ চেয়েই তো সে বসে আছে।

স্নেহদির বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত কাঁদল মিনা। অনেকক্ষণ। চোখ মুছল তারপর।

—কি হয়েছে বলতো। কি চাই তোর? আমায় বল—

বলল মিনা।

যে স্নেহদি হস্টেলের মেয়েদের বারান্দায় দাঁড়ান পছন্দ করেন না, কেউ দাঁড়ালেই যাঁর গলা নাম ধরে পিছন থেকে আঁকশির মত এগিয়ে আসে, মেয়েদের যিনি সর্বক্ষণ দু'চোখ জেলে পাহারা দিচ্ছেন বলে মেয়েদের ধারণা, সেই তাঁকেই সব বলল মিনা। একটুও বাধল না তার। সব বলল। পুরো গল্পটা।

—হ্যাঁরে, ঠিক জানিস তো! নিজের মনকে ভুল বুঝিসনি তো? অনেক সময় কিন্তু তা-ও হয় বাপু।

মিনা উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

স্নেহদি কৌতুক করে বললেন, রামায়ণের মারীচের গল্পটা কিন্তু শুধু সীতা হরণের জন্যে নয়। ভালোবাসা অমনি সোনার হরিণ সেজে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতের মুঠোয় পাবার আগেই দেখা যায়, ওটা হরিণ নয়, রাক্ষস—।

—মানে?

—ওকি অমন চমকে উঠলি কেন?

—কই না!

—আমি একটি মেয়েকে জানি, একদিন তোর মত সেও—

—কি হয়েছে?

—না, তুই কেবলই চমকে উঠছিস। অবশ্য তোর গল্প আর সেই মেয়েটির গল্প একেবারে আলাদা। সে এক আশ্চর্য ট্র্যাজেডী—

বয়স বিস্মৃত হয়ে দুটি অনুভূতি ইচ্ছা কিংবা বাসনা যেন মানুষী রূপ ধরে স্নেহদির ঘরে বসে আছে।

তবু সেদিনও গল্পটা বলা হল না।

।। ৪ ।।

সাত দিন পরেই সে গল্প শুনল মিনা।

সে যে শুনতে পেল, তা কি শুধুই তার শোনার আগ্রহের জন্য? সেই পাঁচ-মাস আগে সেমিনারে, সুরমাকে গেটে এগিয়ে দিতে গিয়ে, আজ মিনার সামনে বসার আগে, আজও অন্ধকারে একা একা গল্পটা বলার জন্য স্নেহদি কি ছটফট করছিলেন না?

কে জানে! যাঁর চুলে দু'-এক গাছি রুপালি রেখাকে বিশেষ প্রসাধন বলে মনে হয়, তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায় না কিছুই।

স্নেহদি সে গল্প শোনালেন।

বললেন, খুব ছোট করে তোকে বলি। আমি একটি মেয়েকে জানি, ম্যাট্রিক পাশ করার পরই তার বিয়ে হল। তখন কত আর বয়স তার? সতেরো। বিয়ের বছর দেড় পরেই মেয়েটি মা হলো। কিন্তু তার ভাগ্য মন্দ। ছেলেটি তিন দিনের দিন মারা গেল। আবার সে মা হল। এবার মরা ছেলে। আবার মা হল। এবার বাঁচল। এই ছেলেটি যখন তিন বছরের তখন বিধবা হল মেয়েটি। তিন দিনের জ্বরে স্বামী চলে গেল তার।

ছেলে। একটা ছেলে ছাড়া তার পৃথিবীতে কিছুই রইল না তার। সন্ধ্যে বেলায় স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়ায়। ছবির কাঁচ মোছে। ছেলে ছবিতে বাবাকে দেখে। ক্রমে ক্রমে ছবির সামনে দাঁড়ালে চোখ ভিজে ওঠা ফুরোল তার। একটু একটু করে ছেলে বড় হয়। দিনের পর দিন যায়। রোজই সূর্য এক জায়গায় ওঠে। রোজই সূর্য এক জায়গায় নিভে যায়। ছেলে বড় হবে। অনেক বড় হবে। অনেক, অনেক বড় হবে। এ ছাড়া আর সামনে কিছু নেই। কিন্তু ছেলে বড় হবে শুধুমাত্র এই চিন্তায় একটি মেয়ের গোটা দিনের সমস্ত সময় কুলোবে কেন?

তারও কুলোল না। এতদিনে মেয়েটি পাড়া-বেড়াতে আরম্ভ করল। অন্যের খুঁৎ কাড়া স্বভাব হল তার। ভিতরে ভিতরে ভয়ানক হিংসুটে হয়ে উঠল সে। কেবল পরচর্চা তার মুখে।

ঠিক এই সময় তার জীবনে এলো সেই ভদ্রলোক। তিনি আগেও আসতেন। এসেছেন। আবার নতুন করে এলেন। সেই ভদ্রলোকের উৎসাহে, পরামর্শে আবার নতুন করে সুরু হল পড়া। পরীক্ষার প্রস্তুতি। একের পর এক। পাশের খবর। বছরের পর বছর। মেয়েটি এগিয়ে চলল। ছেলেও বড় হচ্ছে। একের পর এক ক্লাশে উঠছে সেও।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চমকে উঠল মেয়েটি। গা ধুয়ে সে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা থান, সাদা জামার দিকে চেয়ে হাত যেন ছটফট করে উঠল তার। তার একটুও ইচ্ছে হল না ওগুলো ছুঁতে। রং চাই তার। সাজতে মন চাইছে। এ যে কি ভীষণ যন্ত্রণা তা বুঝি বলে বোঝান যায় না। বিধবার থান, যা তার দাঁতে করে কুটি কুটি করে

ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাই টেনে নিল সে। কিন্তু সেদিন তার নিজের জনের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হল। হত-ভাগী টের পেল যে সে মরেছে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ পরপর কদিন বিকেলের দিকে তিনি আসতেন না। তখন মেয়েটির যেন অসম্ভব মনে হতো বেঁচে থাকা। ভীষণ কান্না পেত তার।

স্নেহদি রহস্য করে বললেন, মানে তোর যা হয়, তারও হতো। তবে তার অবস্থাটা তোর চেয়েও করুণ। তুই তবু তোর বন্ধু-দের—এই তো আমাকে তোর মনের কথা বলালি। সে বেচারা তা-ও পারতো না। তারপর একদিন তিনি আবার আসতেন। কিংবা তিনি আসার আগেই মেয়েটির ছেলে গিয়ে ডেকে আনত তাঁকে। বলতো, "মামা, বাবে আমাদের বাড়ী যাওনি কেন? চলো—"

এম-এ পাশ করলো মেয়েটি। পাশের খবর পেল যেদিন, সে রাত্রে নিজের ছেলেকে অনেক আদর করল সে। আর বিশ্বাস কর, ভীষণ স্বার্থপরের মত সে ভাবল এই ছেলে আছে বলেই ওই ভদ্রলোক সবার চোখের সামনে দিয়ে তাঁর বাড়ী এসেছেন। কোন কথা ওঠেনি। দু'হাতে সে আঁকড়ে ধরল ছেলেকে। শুধু স্বার্থে নয়। যতদিন সে বাঁচবে ততদিন সে তার ছেলেকে বুকের কাছে এমনি করে রাখতে চায়। ওই ভদ্রলোককে শুধু দু'চোখ ভরে দেখতে চায়। "ঠাকুর, আর কাউকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না", এই বলে সে কাঁদল। অনেকক্ষণ।

কিশোর ছেলে বলল, মা তুমি কাঁদছো কেন?

মা উত্তর দিল না।

—বাবার কথা তোমার মনে পড়ছে? না মা?

মা এবারও কোন উত্তর দিল না।

স্নেহদি বললেন, মেয়েটির কোন দোষ নেই। সে আগে মা হয়েছে। পরে প্রিয়া। সবই তার ভাগ্য। সে কি করবে? কোন উত্তর তার মুখে জোগাল না। এদিকে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতে থাকলেন। দু'জনের মধ্যে যেন এক অনুচ্চারিত, অদৃশ্য অথচ সব কিছুর বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

দু'বছর পরেই স্কুলের পড়া শেষ করলো ছেলে। তার ছবি নেওয়া হলো একটা। সবে যৌবনের ইসারা জেগেছে দৃষ্টিতে, নাসায়। কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ সারা মুখে জ্বল জ্বল করছে।

ছেলে ভর্তি হলো কলকাতার কলেজে। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে। এবার সে হস্টেলে থাকবে। তাকে হস্টেলে পাঠানো এক পর্ব। পনেরো দিন আগে থেকে জিনিস গুছোতে লাগল তার মা। পনেরো দিনে পনেরো-শো বারে পনেরো লক্ষ কথা বললো ছেলের সঙ্গে। তারপর ছেলেকে পৌঁছে দিতে সে-ও কলকাতায় এলো। সঙ্গে এলেন সেই ভদ্রলোক।

খাটে বিছানা পেতে, কোথায় ট্রাংক রাখবে, কোথায় বই, কোথায় কুঁজো, কোথায় রাতে জল ঢাকা গ্লাস এই সব ঠিক করে দিতে দিতে মেয়েটি তার ছেলের রুমমেটকে বারবার বলল, তোমরা দু'ভাই-এর মত থাকবে। কেমন?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন লাগাম ব্যালকনিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে বোধহয় চার পাশের পাড়া সম্পর্কে একটা ধারণা করছিলেন। পাশে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। ছেলেটির রুমমেট তখন জানতে চাইল ছেলেটির কাছে, উনি কে হন তোমার?

—মামা।

—নিজের মামা বুঝি?

—হ্যাঁ, ছেলেটি বলল।

সেদিন ছেলেকে হস্টেলে রেখে ফেরার সময় হস্টেল গেটের বাইরে পা দিতেই টপ্ টপ্ করে জল পড়ল মার চোখ দিয়ে। ছেলেটি তা জানল না।

পুজোর ছুটি তিন মাস পরেই। কোন্ ট্রেণে আসবে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ছেলে। মা এসেছে ষ্টেশনে। পাশে ভদ্রলোক। গাড়ী ঢুকছে। প্ল্যাটফর্মে সাড়া পড়েছে। ট্রেণের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছেলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একি, কাছাকাছি আসতেই সে ভেতরে ঢুকে গেল কেন? হাসল না পর্যন্ত। বাক্স আর বেডিং নামাচ্ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে খুব সহজ গলায় ছেলে শুধু বলল, ও, ষ্টেশনে এসেছো বুঝি?

রাতে অনেক পদ রান্না করল মা। ভদ্রলোকেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ছেলে এক-সঙ্গে খেতে বসল না। রুক্ষ স্বরে বলল, ক্ষিদে নেই আমার।

রাতে বাড়ী নির্জন হলে, ঝি ঘুমিয়ে পড়লে সে মাকে বলল, বাবার ছবিটা কোথায় গেল? সেটা কি হারিয়ে গেছে?

বাবার ছবি সামনেই ছিল। কাচের ওপর ধুলো জমেছিল। এইমাত্র।

পুজোর কটা দিনও ছেলে বাড়ী থাকল না। ফিরে গেল ফাঁকা হস্টেলে। এরপর সে ছুটিতে বাড়ী আসা কমিয়ে দিল। কমাতে কমাতে আসা বন্ধ করল সে।

—আর বাড়ীই এলো না ছেলেটি? কি হলো তার?

—সে অনার্স পেলো। এম-এস-সি পাশ করলো। তার পর মার সঙ্গে দেখা না করেই আরো পড়বে বলে চাকরী নিয়ে পশ্চিম জার্মাণী চলে গেল।

—আর সেই ভদ্রলোক?

—তিনি আসা বন্ধ করলেন।

—মেয়েটি?

—মেয়েটি সে শহর থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল। কাজ নিলে সে। ডুবে গেল বই-এর মধ্যে। শুধু বই। এখন সমস্যা কি হয়েছে জানিস মিনা, মেয়েটি ভীষণভাবে চিন্তা করছে যে সে পশ্চিম জার্মাণীতে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কিনা। রোজ কাগজে সে জার্মাণীর খবর খোঁজে। মাঝে মাঝে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। ভাবছে সেখানেই যাবে কিনা। ছেলের কাছে যেতে মার তো কোন লজ্জা নেই। আবার মেয়েটা ভাবছে—কি ভাবছে জানিস? ছেলেটিও তো পূর্ণ পুরুষ হবে। তখন হয়তো সে বুঝতে পারবে তার মাকে। তখন হয়তো—থাক্ গে। তোকে মোটা-মুটি খসড়া দিলাম। এই নিয়ে একটা গল্প খাড়া করিস তো। দেখবো তোর কেমন হাত হয়েছে।

—আচ্ছা স্নেহদি—

মিনাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই স্নেহদি বললেন, বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। সামনের ছুটিতেই তোকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমি দোব তোর বিয়ে। হলো তো?

এই বলে স্নেহদি এমন ভাবে হাসলেন যে মিনা আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ তো পেলই না বরং খানিকটা যেন লজ্জা পেল।

* * *

মিনার বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেছে। প্রথম দেড় বছর সে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিল স্নেহদির সঙ্গে। তারপর নানা ব্যাপারে আর হয়ে ওঠেনি।

তারপর সুরমার মতই ছেলে কোলে মিনা এসেছিল স্নেহদির সঙ্গে দেখা করতে। একজন অধ্যাপিকা বললেন, ওমা। তুমি জানো না? এইতো এক মাস হলো স্নেহদি পশ্চিম জার্মাণী গেছেন।

এই বলে তিনি মিনার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমো দিয়ে বাচ্চাটাকে আরো হাসাবার জন্যে পেটে নাক দিয়ে বলতে লাগলেন, ওরে বাপুরি, বাপুরি......ও বাবু, বাবু...... ও সোনা সোনা......... ও, মাণিক, মাণিক.........ও বাপি, বাপি............

বই রাখা ও বই রক্ষা

অশোক গুহ

বই আমরা কিনি, চেয়ে-চিন্তে আনি; কখনো বা জোর করে, এমন কি চুরি করেও যে না আনি এমন নয়। ফলে চুরি আর বই চুরিতে পাপ নেই—একথা বলে মনকে চোখও ঠারি, বোঝাই।

বই আনি, বই পড়ি, হয়তো বা মর্মও বুঝি। কিন্তু বইয়ের মর্যাদা আমরা বুঝি ক'জন। যেমন দাঁতের মর্যাদা বুঝিনে, তেমনি বইয়ের মর্যাদাও না। এখানে মর্যাদা অর্থে বই রাখা এবং বই রক্ষা দুই-ই বোঝায়। একখানা কি দুখানা বই প্রায় সব বাড়িতেই কেনা হয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই। প্রথমে তাদের প্রতি আনকোরা নতুনের যত্ন-আত্তি যে না হয় এমনও নয়, তারপরে দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে যায়। মলাট খুলে আসে, কর্তার বিড়ি বা সিগারেটের ছ্যাঁকায় এখানে ওখানে ছিদ্র-কলঙ্ক ধরে, গৃহিণীর মধ্যাহ্ন সুখনিদ্রার সাথী হয়ে মাথার তেল আর ঘামের ছাপের দাগও পাতায় পাতায় দেখা দেয়। আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দাগরাজি করতে ছাড়ে না। তারা পাতায় পাতায় নিজেদের বা মিতা-মিতানীদের নাম লিখে সদ্য-আয়ত্ত বিদ্যা ফলায়। তারপরে সে-বই এখান থেকে ওখানে, এ-কানাচ থেকে ও-কানাচে ঘোরাফেরা করে। এবং একদিন উইপোকা আরশোলা এবং ইঁদুরের খাদ্য হয়ে কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়।

এতো গেল এক-আধখানা বই আর অসাবধানী পরিবারের কথা। এরা বহু হলেও পুঁথি-বাই এদের সাময়িক। এরা নিয়ম নয়, এরা ব্যতিক্রম।

যাদের এ-বাই সাময়িক নয়, বরং স্থায়ী—তাদের কথাই বলা যাক। এদেশে পুঁথি-ক্রেতার সংখ্যা বহু নয় বলে প্রকাশক এবং লেখকেরা আক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু এদের সংখ্যা শতকরা হিসাবে অতি সামান্য হলেও কম নয়। এঁরা বই কেনেন, বই পড়েন, আবার এঁদের মধ্যে কেউ বা পড়ুন না পড়ুন, সংগ্রহ করাই তাঁদের বাতিক। তাই বই রাখা এবং রক্ষা, এই দুই ব্যাপারেই এঁরা অবহিত হতে চান। কেউ বা পারেন কেউ বা পারেন না।

বই যাঁরা রক্ষা করতে চান, তাঁরা কেউ বা সেগুলি তোরঙ্গজাত করে রাখেন। যখন দরকার হয়, তোরঙ্গ থেকে বের করে পড়েন। কেউ বা রাখেন আলমারিতে, কেউ বা খোলা তাকে। আবার কেউ বা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়েও রাখেন। বাক্সজাত, আলমারীজাত বই মানুষ-শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু খোলা তাকের আর ছড়ানো-ছিটানো বই-এর সেদিক থেকে নিরাপত্তা আদৌ নেই। সেগুলি পরিবারের মর্জি এবং অতিথিদের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে।

তবুও অনেকে মনে করেন, এতে বইয়ের আবহাওয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তোরঙ্গজাত করলে তা সম্ভব নয়। আলমারীজাত করলে তবু কাচের আবরণের ফাঁক দিয়ে আবহাওয়ার ঝিলিক সে মারতেও পারে।

তাই বই যাঁরা রাখেন, তাঁরা কাচের আলমারিকেই রক্ষার সেরা পদ্ধতি বলে মেনে নিয়েছেন। এ-পদ্ধতিতে গৃহিণীর গঞ্জনা সইতে হয় না, পারিবারিক মর্জির উপর ভরসা করতে হয় না; অতিথিদের পরস্বাপহরণের লোভকেও দমিয়ে দেওয়া হয়। আলমারি সেদিক দিয়ে পুঁথির সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

পুঁথি যখন ছিল মাটির ফলকে সীমাবদ্ধ, তখন তা রাখার সমস্যা ছিল না। আসুরবানিপাল তা তাঁর লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রেখেছিলেন থরে থরে। তারপরে মিশরে প্যাপিরাস আবিষ্কৃত হতে তারা তাতে আরক মাখিয়ে মমির সঙ্গে কবর-জাত করে রাখত পিরামিডের ভিতরে। হয়তো তাদের ঘট পটশার্ডের মধ্যেই রাখত। আর অন্য দেশে কাগজের প্রচলন হতে ঐ পদ্ধতিই চলে আসছিল। আমাদের দেশে হাঁড়ি বা প্যাটরা থেকে কত যে পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার খবর চন্দ্রকান্ত দে বা মুন্সী জসীম-উদ্দীন রাখেন; আর রাখতেন দীনেশ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইরা।

কিন্তু বাক্স-প্যাটরায় বা হাঁড়িতে রাখাটা রোমানরা সভ্য হতে তাদের বোধ হয় মনোপূতঃ হল না। তাই তারা বই রাখার জন্য তৈরি করলে সুদৃশ্য আলমারী। সে-আলমারী কাঠের। এইবার দেখতে-দেখতে কাঠের আলমারীর প্রচলন হল সারা পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে। আমরা তখনো হয়ত পুঁথি কাঠের পাটায় মুড়ে রাখছি। তার উপর কাপড় জড়িয়ে রাখছি। রাজা-বাদশারা হয়তো কাঠের আলমারীর নমুনা রোমানদের কাছ থেকে ধার করে নিজেদের গ্রন্থাগারে চালিয়ে-ছিলেন, কিন্তু আমরা জনগণ তার ধার ধারিনি। এমন কি ইউরোপেও তার বহুল প্রচলন মাত্র সেদিনের। সেদিনের বলতে অবশ্য দুশো-তিনশো বা তার বেশি বছরই বোঝায়। স্যামুয়েল পেপীস বই নিয়ে যে বিপদে পড়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন তাঁর রোজনামচায়—বই এত বেড়ে গেছে যে সেগুলি এখন গাদা হয়ে আমার চেয়ারগুলোর উপর পড়ে আছে। তাই তিনি নিজে এক কাঠের বড় বড় আলমারী তৈরি করিয়ে সে সমস্যার সমাধান করেন। আজও সেই আলমারী-গুলো ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানা-ডালেস কলেজে দেখা যায়। আলমারীর প্রচলন হলেও সেগুলি হয়ত বেঢপ, বেমানান ছিল, অনেক জায়গা জুড়ে থাকত; পুঁথি-সমস্যার সমাধান হোত না। এমন কি বিরাট গ্রন্থকীট যাঁরা আছেন, এখনো এ বিপদ তাঁদের রয়েই গেছে। রাশিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আইসেনসটাইনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আলমারীতে আলমারীতে তাঁর গৃহখানি এমন বোঝাই হয়ে গিয়ে ছিল যে, তিনি আর দরকার মতো কোন বই খুঁজে পেতেন না। তখন তারই দোসরা কপি কিনে আনতে দোকানে ছুটতেন। আর একজনের সম্পর্কে গল্প আছে—তিনি পুঁথিতে পুঁথিতে রুদ্ধশ্বাস গৃহে নিঃশ্বাস ছাড়বার ঠাঁইও পেতেন না। শেষে হোটেলে গিয়ে তাঁকে ঠাঁই নিতে হয়েছিল।

এই জাতের গ্রন্থকীটদের কাছে সমস্যা সমস্যাই থাকবে, তার নিরসন হবে না। কিন্তু এঁদের বাদ দিয়েই আমাদের কথা। তাই আজকাল ঘর বুঝে মাপ-মতো আলমারী তৈরির ঝোঁক ওদেশে

দেখা যাচ্ছে। বড় বাড়ির গ্রন্থাগারের বইয়ের আলমারী বা তাকের যা মাপ হবে, ছোট ফ্ল্যাট-বাড়ির তা হবে না। আবার কোন-কোন প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত বই যোগ্য তাক-সমেত দেবারও বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন। এইভাবেই পুঁথি রাখার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলছে।

সেদিন নিউইয়র্ক টাইমসের এক ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেখা গেল, এ নিয়ে বই যাঁরা রাখেন তাঁরা তো ভাবছেনই, সঙ্গে সঙ্গে ভাবছেন স্থপতিরা, ইঞ্জিনিয়ারেরা বাড়ি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে বুক-কেসেরও যাতে বন্দোবস্ত হয়, তা নিয়ে অনেক ঘাম ঝরাচ্ছেন। আমার দেশেও গৃহ-পরিকল্পনার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে, এখানেও সেকথা যদি আমাদের স্থপতিরা ভাবেন তো ভালই হয়।

পুঁথি রাখার সমস্যার পর পুঁথি রক্ষার কথা ভাবা দরকার।

পুঁথির অনেক শত্রু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়, সে শত্রুদল হচ্ছে রোদ, জল, ইঁদুর, উইপোকা আর সবচেয়ে বড় শত্রু পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। তিনি আরো কয়েকটি শত্রুর কথা হয়তো বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছে বন্ধু, গৃহাগত অতিথি, রাজনীতিক বিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতি।

পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র বইয়ের মর্ম না বুঝে সেগুলি হয় মুদির দোকানে ওজন দরে বিকিয়ে দেয়, নয়তো ম্যাকে-ঞ্জিলায়েলের সেলে চড়ায়। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই জ্ঞানী-গুণীরা তাঁদের সংরক্ষিত পুঁথি কোন বড় গ্রন্থাগারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দেন। কিন্তু বন্ধু শত্রু বা গৃহাগত অতিথির হাত থেকে তাঁরাও অব্যাহতি পান না। যদি বা অব্যাহতি পান, তিনি নির্বান্ধব, একঘরে হয়ে থাকেন। আবার রাজনৈতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াও মুশকিল। গত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বহু দেশের পুঁথি-বিলাসীরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তবে স্পেণ্ডার সাহেবকে এমনি একজন পুঁথি-বিলাসী অধ্যাপক বলেছিলেন—এখানে সস্তা সংস্করণের বই রাখি, দুর্লভ বইয়ের দিক মাড়াইনে। এগুলির উপরে মায়াও নেই। একবার যাবে তো আর-একবার হবে।

মানুষের শত্রুতার পরে আসে আর আর প্রাণীর শত্রুতার কথা। মানুষ শত্রুর কথা পণ্ডিতেরা তেমন করে বলেননি, মাঝে মাঝে দু-একজন দু-একটা মাত্র বচন ঝেড়েছেন। যেমন সেই সংস্কৃত প্রবচন—লেখনী, পুস্তিকা বামা পরহস্ত গতা গতা। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর বেলায় তাঁরা নিঃসংকোচেই বলে-ছেন। আর য়্যারিস্টটল-হোরেস থেকে প্লিনী, মায় ছোট প্লিনী অবধি কেউ বাদ যাননি। আবার রবার্ট বার্নস তো গ্রন্থকীটদের কাকুতি-মিনতি করেও পদ্যও লিখেছেন। অবশ্য, সে মিনতি তারা খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত শোনেনি, ভবিষ্যতেও শুনবে না। তাই পুঁথির সেরা দুশমন গ্রন্থকীটদের হাত থেকে বই রক্ষার নানা প্রচেষ্টা আগেও চলেছে এখনো চলছে, আগামীতেও চলবে। বাইরের শত্রু আরশোলা, ইঁদুর আর উই তো আছেই। এই দুশমনদের একদল আবার পুঁথির মধ্যেই জন্মায়। যেমন সিলভার ফিস, বীটল প্রভৃতি। অন্ধকারে এদের জন্ম আর বৃদ্ধি। এদের খাদ্য পুঁথির কাগজ, কাঠ বা চামড়া, কাপড় বা সিরিশ আঠা। বাংলা বইয়ের সংস্করণগুলি এদের কাটুনিতে কেটে যায়, একথা বীরবল পরিহাস করে বলেছেন বটে; কিন্তু গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের কাছে এরা পরিহাসের বিষয় নয়। তাই পুরানো যুগের রোমে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেডার তেলের প্রয়োজন হয়েছিল, আর এযুগে আমরা পাচ্ছি ন্যাপথলিন ও ডি ডি টি। আবার আমাদের সাবেককালের পণ্ডিতেরা পুঁথিতে কালজিরে ছড়িয়ে রাখতেন, কেউ বা নিম পাতা, তামাক পাতাও ব্যবহার করতেন। এযুগেও কেউ কেউ তা করে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ আর এক কবরেজী ডি ডি টির আবিষ্কার করেছেন। লবঙ্গ, দারুচিনি ও গোলমরীচের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে এই শত্রুনাশক ওষুধটি তৈরি এবং এটি যে বহু পরীক্ষিত এবং সুফল-প্রসূ তাও স্বীকৃত। এছাড়া, এই বিজ্ঞানের যুগে যে-কেউ মশকায় ধূম দেবার মতো ধূম দিয়েও শত্রুকুল ধ্বংস করতে পারেন, তবে যে ধূম ধূপের ধোঁয়া নয়, সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করতে হলে কার্বন ডায়কসাইড, ম্যাল-ডিহাইড কি থাইমলের স্মরণই নিতে হবে। আর তাতে হাতে হাতে ফল। এ সব নিয়ে বিশদভাবে লেখা কেতাবের পর কেতাব আর পত্রিকার পর পত্রিকা আছে। সে সব যাঁরা পড়তে চান, তাঁরা খুঁজে-পেতে এনে পড়বেন। যাঁদের সে সময় নেই, তাঁদের এটি পড়লেই হয়ত মোটামুটি কাজ দেবে। অতএব অতি বিস্তরেণ অলং।

অন্তঃসলীলা

ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সামান্য একটা শার্ট ইস্ত্রি করার ব্যাপার নিয়ে এতখানি গড়াবে কোন পক্ষই আশা করতে পারেনি বোধহয়।

মিলু ভাবতে পারেনি শুধুমাত্র একটা চাকরি করায় এতখানি দম্ভ হতে পারে মানুষের। উপায় করে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভরণপোষণ না করে কে? তার জন্যে কারণে অকারণে কথা শোনাতে হবে? কথায় কথায় নিজের প্রাধান্য প্রমাণ করতে হবে?

তাই আজ প্রকাশের মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছে মিলু। শুনিয়ে দিয়েছে ঐ সামান্য আয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চারজনের সংসার চলে না, চলতে পারে না। মেয়ের স্কুলের মাইনে আছে, ছেলের দুধ, প্রকাশের হাত-খরচা, দোকান, বাজার চলে না, চলে না।

কথাটা উঠেছে প্রকাশের একটা শার্ট ইস্ত্রি করার ব্যাপার নিয়ে। মিলু বলেছে আর পারি না বাব্বাঃ। সারাদিন কাজ কাজ আর কাজ। মেয়েকে সময়মত সাজিয়ে গুজিয়ে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসতে হবে। ঘন্টায় ঘন্টায় ছেলের দুধ বার্লি গরম করতে হবে। সংসারের যতো কাজ একার হাতে। তার ওপর—

প্রকাশ হেসে ফেলে—তার ওপর আমার শার্ট কেচে দেওয়া, শুকোতে দেওয়া, ইস্ত্রি করা, কত কাজ।

—কাজ বৈকি, কোলকাতার শহরে একটা জামাকাপড়ে চলে না।

—কি করা যাবে, একার আয়।

কথাটা খট্ করে লাগে কানে।

প্রকাশের মুখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করে—একার? আর কে আয় করবে বল।

—আমি তোমার কথা বলছি না। আজকাল স্বামী-স্ত্রী দুজনে উপায় না করলে—

—ঐ তোমার একটা দুঃখু। কথা কেড়ে নেয় মিলু। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলে কিন্তু আমার সময় কোথায় বল।

প্রকাশ নীচু গলায় বলে—সময়ও নেই, আর—

—আর স্কুল ফাইনাল পাশ করিনি। টাইপ জানি না। চাকরি করার গুণ নেই আমার, এই তো বলবে।

সে কথা বলছি না মিলু, একজনের আয়ে এর চেয়ে ভাল চলে না।

—কেন, তোমার চেয়ে আর কেউ কোথায়ও বেশি উপায় করে না?

এ কথার কোন জবাব নেই বলেই চোখ-কান লাল হয়ে উঠে প্রকাশের।

—থাক তোমাকে তাহলে আর কষ্ট করে—

—পারব না আমি। দুদিন বাদে বাদে কাচা ইস্ত্রি করা পারবোই তো না।

ধপাস করে উনোন থেকে ইস্ত্রিটা নামিয়ে রেখে আরো অনেক কথা শুনিয়ে যায় মিলু।

শুনিয়ে যায় যে এ সংসার সে বাপের বাড়ি থেকে মাথায় করে নিয়ে আসেনি। কতদিন বলেছে তিন গজ কাপড় কিনে আনলে নিজের হাতে সে জামা তৈরী করে দেবে—ইত্যাদি।

কথার সঙ্গে দ্রুতপদে হাতের কাজ সমাধা করতে থাকে মিলু।

প্রকাশ নরম গলায় বলতে চেষ্টা করে—জানি তোমার শাড়ি আমার শার্ট ছেলেমেয়ের জামাকাপড় অনেক কিছুই দরকার। বলছিলাম খরচা না কমাতে পারলে—

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মিলু—খরচা এর চেয়ে আর কমানো যায় না। আর বাড়াতে হবে।

—কিন্তু জান তো এ বাজারে চাকরিটা টিঁকিয়ে রাখাই দায়।

—কাজেই কতখানি তোমার ক্ষমতা, তাও একবার ভেবে দেখো।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না প্রকাশ।

—খরচা আরো কমানো যায়। একখানা ঘরেই তো আমাদের চলছে—অথচ ঐ ছোট ঘরখানা তুমি আটকে রেখেছ। কাউকে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবে না।

—দোবই তো না। আমার ঠাকুরের ঘর। আর ওতে কতই বা বাঁচবে?

এ কথার কোন সাড়া দেয় না প্রকাশ। ভাবে, এ ঘরখানা ছেড়ে দিলে মাসে অন্ততঃ দশটা টাকা বাঁচত।

মিলুর চোখে এতক্ষণে জল আসে—কোন কিছুর তো বাচ-বিচার নেই। একটা ঘরে তো আর ঠাকুর বসানো চলে না। পরণের কাপড়খানাকে একটু

গুছিয়ে পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মিলু।

প্রকাশ ঘড়ি দেখে। প্রায় চারটে বাজে। মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে গেল বোধ হয়।

আজ ইচ্ছে করেই আপিসে যায়নি প্রকাশ। একদিন বিশ্রাম নেবে বলে—ট্রামে বাসের ঝোলা থেকে একদিন নিস্তার পাবে বলে। কিন্তু......

মিলুর কাছে টাকাটাই যেন সবচেয়ে বড়। সব শান্তির মূলে। শুধু ঐ ঠাকুর আর ঠাকুরঘর। মিলুর ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম। এমন বয়স হয়নি যে ঠাকুরকে অমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে পুজো করতে হবে।

সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে ইস্ত্রিটা নিজের হাতে বসিয়ে দেয় প্রকাশ। কালো কয়লার লাল আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো আর লাল। মিলুও যেন এই দুই বিপরীতধর্মী গুণের সমন্বয়। একই সময়ে একদিকে অর্থের আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে মোক্ষের।

মোক্ষ কথাটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। বলা যাক ধর্মের। ধর্মের নামে এমন কান্ড ঘটতে আর কোথাও দেখেনি প্রকাশ। সারা দুপুরটা মিলু ঐ ঠাকুর ঘরে খিল দিয়ে কাটিয়ে দেয়। মেয়েটা স্কুলে যায়, প্রকাশ অফিসে বেরিয়ে যায় আর এ ঘরে তালা বন্ধ করে মিলু ও ঘরে চলে আসে। কোলের ছেলেটাকে বোধহয় পাশেই ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

তারপর শুরু হয় সাধনা না আরাধনা, না প্রার্থনা। ঠিক কোন্ শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হবে ভাবতে পারল না প্রকাশ। পুজো কিংবা আহ্নিক বলতে পারত। কিন্তু কোনদিন তো ফুল বা ফল বাজার থেকে আনতে বলেনি মিলু। আর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিরিবিলি হয়ে কে কবে আহ্নিকে বসেছে। যত অনাসৃষ্টি!

মাস দুয়েক হল এ বাতিকটা দেখা দিয়েছে। তার আগে এ ঘরখানা ছিল ঘুঁটে কাঠ ইত্যাদি কম-দামী জিনিসের স্টোর। বর্তমানে হয়েছে তীর্থক্ষেত্র।

প্রথমটায় প্রকাশের খুব ইচ্ছে হত জানতে কোন্ ঠাকুর কেন পুজো করে, গুরু কে?

মিলু বলত—সময়মত জানব।

কাজেই বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা করার গুরুত্বটা লাঘব করে নিতে পেরেছে প্রকাশ। ভেবেছে, এ একটা রোগ, নয়তো খেলা। একদিন সেরে যাবে, নয়তো শেষ হবে।

রোববার কিংবা ছুটির দিন ছেলে-মেয়ে দুটোকেই এ ঘরে বাপের পাশে শুইয়ে দেয়। প্রকাশের খবরের কাগজ পড়ার ব্যাঘাত ঘটে। আর নিশ্চিন্তে ও ঘরের দরজা বন্ধ করে মিলু। বেরোয় সেই সাড়ে তিন-চারটেয়। কলে জল আসার পর।

এ তো গল একদিক।

অন্যদিকে অর্থের লিপ্সা। বেশি টাকা ভাল খেতে পরতে কে না চায়! কিন্তু এ যেন সবার সব উদাহরণকে ছাপিয়ে উঠেছে। কোন যুক্তি তর্ক চলবে না।. বাঁচতে গেলে টাকা চাই আরো, আরো অনেক। এই তো মাস-তিনেক আগে আপিসের ক্রেডিট সোসাইটি থেকে শ' পাঁচেক টাকা ধার করে দিতে হয়েছে মিলুর হাতে। বানিয়ে বলতে হয়েছে ছ-সাত মাসের ওভারটাইমের টাকা এক-সঙ্গে পাওয়া গেছে। সেদিন কি আনন্দ মিলুর।

কত হিসেব হয়ে গেল কাপড় হবে জামা হবে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়ের কাপড়, একটা স্টোভ কিনতে হবে। ইচ্ছে ছিল নতুন ডিজাইনের এক-জোড়া কানপাশা গড়াবে। কিন্তু তা হবার জো নেই। পাশের বাড়ির বিড়ালটা রোজ চুরি করে মাছ খেয়ে যায়। একটা মিট-শেফ আগে দরকার। আর একটা ইলেক-ট্রিক ইস্ত্রি। অত জামাকাপড়। কত অসুবিধে হয় রোজ। কোনদিন হয়তো উনোনে আগুন থাকে না, আর থাকলেও একটা জামা ইস্ত্রি করতে তিনবার ওঠানো নামানো করতে হয়।

তা না হয় হল। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

কেনা হল না কেন, বা টাকাটা কোথায় রেখেছে, এসব প্রশ্ন করেনি প্রকাশ।

মিলুও উচ্চবাচ্য করেনি আর।

অতএব ঐ পরিচ্ছেদটার ঐখানেই সমাপ্তি ঘটেছে।

ইস্ত্রিটা অনেক সময় বসিয়েছে উনোনে। একটা পুরনো ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ধরে নামাল। এত গরম হয়েছে যে ন্যাকড়াটা পুড়ে গিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কি জ্বালাতন।

খেমে নেয়ে কোনরকমে শার্টের ওপর সন্তর্পণে ঘসতে থাকে প্রকাশ। ইস্ ঠিক বুকের সামনের দিকটায় এতটা পুড়ে গেল।

লজ্জা লজ্জা। মিলু এসে কি বলবে। মুচকি হাসবে নয়তো আড়-চোখে তাকাবে। আর আসার সময়ও তো হয়ে গেছে বুঝি।

ঘড়ি দেখেই আঁতকে ওঠে প্রকাশ। ছটা বাজে। স্কুল থেকে ফিরে আসতে তো এত সময় লাগার কথা নয়। মেয়েটাকে নিয়ে গেল কোথায় মিলু।

কিংবা এমনো তো হতে পারে—একটা ভয়ানক খারাপ কিছু ভেবে বসল প্রকাশ। মেয়েদের কিসে যে কি হয়ে যায় বলা দুষ্কর। তা নইলে দশ মিনিটের রাস্তা স্কুল থেকে নিয়ে আসতে এত সময় লাগবে কেন?

ঠিক সে সময় বছর খানেকের কোলের ছেলেটা ঘুম থেকে জেগে কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয় প্রকাশ।

কিন্তু এখুনি একবার স্কুলে যাওয়া দরকার যে। খবর নেওয়া দরকার মেয়েকে তার মা স্কুল থেকে নিয়ে গেছে কিনা এবং কখন।

আর তো বসে থাকা যায় না। সওয়া চারটে নাগাদ যে লোকের ফিরে আসার কথা—সে—

কড়া নাড়ার শব্দ। যাক্ বাঁচা গেছে। ঐ বুঝি মিলু এল। এক রকম ছুটে এসে দরজা খুলে দেয় প্রকাশ।

এক গাল হাসি নিয়ে প্রবেশ করে বন্ধু গজেন। মিলু নয়।

—কি রে তুই এ সময়ে বাড়িতে? আজ কাজে বেরোসনি?

জবাব দেয় না প্রকাশ। ঐ হাসিটাকে তো বরদাস্ত করতে পারেই না, বরং রাগ আছে।

এই তো কালই গজেন কথায় কথায় একটা খারাপ কথা বলেছে। বলেছে—কি রে তোর জামাটা ছেঁড়া কেন? তোর বউ তো আজকাল অনেক উপায় করছে।

প্রকাশ প্রশ্ন করেছিল—মানে?

—মানে সুদের ব্যবসা।

প্রথমটায় হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত গজেনের কথা বিশ্বাস করতে না পারলেও একটা দোন-মোনা ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

একটা খট্‌কা। সুদের ব্যবসা?

টাকা আছে কিন্তু মিলুর হাতে।

তবু এমন একটা নীচু কাজ করবে মিলু ভাবতে পারল না প্রকাশ। আবার কেনাকাটির অতসব পরিকল্পনা একটাও

কার্যকরী হল না, টাকাটা মিলু বেমালুম চেপে গেল—এও একটা প্রশ্ন।

গজেনের কথা মিথ্যা হোক্।

একান্তই যদি সত্য হয় তাহলে ওদের দাম্পত্যজীবনের বিষময় পরিণতির কথা ভেবে শিউরে ওঠে প্রকাশ। কাজেই আজকের কথাকাটাকাটির মধ্যেও ঐ নির্মম কথাটা শুনিয়ে দিতে পারেনি সে।

গজেনই প্রশ্ন করল আবার—কিরে, বৌদি কোথায়?

—ভাবছি, সেই যে মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গেছে—

—কোন ভাবনা নেই, হয়তো কোন আদায়-উসুল আছে। একবারে সেরে আসবে।

ওর মুখের দিকে শুধু স্পষ্ট একবার চাইল প্রকাশ।

গজেন বললে—দ্যাখ্ প্রকাশ, তুই যদি অফেন্স্ নিস্ তাহলে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু আমার একটা কর্তব্য আছে। কারণ সব বুদ্ধি-পরামর্শ—বলতে পারিস্ সমস্ত প্ল্যানটাই আমার।

অসম্ভব নয়। ভাবল প্রকাশ। ইদানীং গজেনের গতাগতি এ বাড়িতে বেড়েছে, মিলুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথার মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু এতদিন এ সবের তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি সে।

—মানে? জিজ্ঞাসা করল প্রকাশ।

—মানে আমি মনে করি এতে কোন দোষ নেই। বিজিনেস ইজ্ বিজিনেস্। একার আয়ে আজকের দিনে চলতে পারে না। এটা কথায় এবং কাজে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই—

—থাক্ ওসব আমি শুনতে চাইনি। প্ল্যানটা যখন তোর, আর আমাকে না জানিয়ে এতদিন যখন চলেছে, তখন—

—তুই দেখছি সত্যি রেগেছিস্। তাহলে আমরাই ভুল করছি। জামা-কাপড় বিছানা-বালিশের ঢাকনা করেই টাকাটা খরচ করা উচিত ছিল।

প্রকাশ মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল।

গজেন বললে—আমি ভেবেছিলাম সবই পরে করা যাবে। টাকাটাকে রোল করিয়ে নিলে মন্দ কি।

প্রকাশ ব্যঙ্গের সুরে বললে—তুই বিজিনেসম্যান, তোর মাথায় টাকা রোল করানোর চিন্তা আসাটাই খুব স্বাভাবিক।

—কিন্তু দূরদর্শিতা নেই। তোদের দাম্পত্যজীবনে এ নিয়ে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে, ভাবিনি। তাই সব ব্যবস্থা করে দেওয়া, মায় পার্টি পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া—

—ওসব আলোচনা থাক্।

এবার চুপ করল গজেন।

পকেট থেকে দেশলাই সিগারেট বের করে একটা ধরাল।

প্যাকেটটা এগিয়ে দিল প্রকাশের দিকে।

গজেন লক্ষ্য করল প্রকাশ গম্ভীরমুখে ছেলেকোলে পায়চারি করছে। সিগারেট দেশলাই ছুঁল না।

প্রকাশ তার অক্ষমতা, তার ক্ষুদ্রতা অনুভব করতে পারল। তারই স্ত্রী-পুত্র পোষণের জন্য এই বহুকথিত ঘৃণ্য কাজে সংসারের আয় বাড়ছে। এতে কিছু বলবার বা আপত্তি করার উপায় নেই। অথচ মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাবার সময় অভিভাবকের খাতায় ওরই নাম লেখাতে হয়েছে। সবার খাওয়া-পরার ভাবনা এতদিন ওকেই ভাবতে হয়েছে।

দায়িত্ব এতদিন ছিল একার। আজ দুজনার। এতদিন সে ছিল সর্বেসর্বা, আজ অংশীদার। হলে ভাল, না হলেও একরকম চলবে। প্রয়োজন কমেছে, গুরুত্ব কমেছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে—আচ্ছা গজেন, তোদের এই ব্যবসা কদ্দিন শুরু হয়েছে, আর কি রকম আয় হচ্ছে বলতে পারিস্?

—মাসখানেক। আর আয় প্রথম মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশি হবে না। তবে হ্যাঁ, চালাতে পারলে—

—ভবিষ্যৎ ভাল। বাক্যটা পূর্ণ করে প্রকাশ।

আবার নীরবতা।

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল।

কেঁদে উঠল বাচ্চাটা—মা-মা দাব।

গজেন বললে—আহা, কাঁদছে যে।

প্রকাশ মৃদু হাসল—মা এলেই হাসবে।

গজেন তুলে নিয়ে থামাতে চেষ্টা করে। কান্নার মাত্রা বেড়ে যায়।

সদর খোলা ছিল।

বাঁ হাতে মেয়ের হাত ধরে ডান হাতে একটা কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে এল মিলু।

প্যাকেটটা রাখল। ছেলেটাকে ধরল। কান্না থামল।

মেয়ে বলল—জান বাবা, আজ ইস্কুলে না—

—আমাকে নয়, তোমার মাকে বলো।

—বলেছি তো। জান বাবা, মা না তোমার জন্যে একটা শার্ট আর একটা কাপড় কিনেছে। আমাদের জন্য কিছু কেনেনি।

গজেন বললে—তাহলে বৌদি, বেশ দু'পয়সা হচ্ছে?

মিলু মুচকি হাসল।

—জানেন বৌদি, নতুন একটা পার্টি ঠিক হয়েছে। বেশ কাজ হবে। গজেন লক্ষ্য করল, প্রকাশ মুখ ঘুরিয়ে কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

গম্ভীরমুখে গজেন বললে—ও, প্রকাশ তো আবার এসব পছন্দ করে না। চলুন ঘরে গিয়েই বরং বিজিনেস্ টক্‌টা সেরে ফেলা যাক্।

মিলু জানাল—ঠাকুর ঘরে প্রবেশ নিষেধ, জানেন না?

—আমার ত নয়?

—আপনার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

আশ্চর্য। এর পরেও কি প্রকাশের থাকা উচিত এ সংসারে? কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে বসা ঠিক নয়। তাই বাধ্য হয়ে কাগজের ওপর সে আরো বেশি ঝুঁকে বসল।

মিলু গজেনকে বললে—চলুন, চুরি করে আমিও ভাল কাজে এগোতে পারছি না। কার কাছে ধরা পড়ে যাব!

—মানে?

—এই তো দেখুন না, আপনার বন্ধু বাড়িতে থাকলে কত সাবধানে কাজ করতে হয়। পাছে কোন শব্দ না হয়।

—বুঝেছি। কিন্তু, প্রকাশের দিকে আড়চোখে তাকাল গজেন।

—আসুন। মিলু পা বাড়াল।

মেয়ে বললে—ইস্ আমি বুঝি যাব না? তাহলে কাকু যাবে কেন?

সে কথা কেউ গ্রাহ্য করল না।

ওদের পেছনে মেয়েটিও গেল।

প্রকাশ মুখ তুলল।

তাহলে ও পবিত্র ঘরে প্রবেশের অধিকার সবার আছে। নেই শুধু প্রকাশের। সত্যি, অবাক করে দেবার মত চরিত্র মেয়েদের। বিশেষ করে মিলুর। এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বলেও কি কিছু থাকতে নেই?

নিশ্চল বসে থেকে এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারছে না প্রকাশ।

—বাবা বাবা, শীগগীর দেখবে এস। মেয়েটা দৌড়ে এল এ ঘরে।

গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করে প্রকাশ—কি হয়েছে রে?

—এসো না। মেয়েটা টানতে শুরু করেছে।

—কি হয়েছে বলবি তো? বিরক্তি প্রকাশ করল প্রকাশ।

কানে এল ছোটঘরে দুজনেই হাসছে ওরা। গজেনের গলা অপেক্ষাকৃত উঁচু পর্দায়।

বলছে—তাহলে বৌদি, আপনি বলেছেন ঠাকুর, আর আমি বলেছি সুদ—আসলে—

হাসির ভারে পরের কথাকটা চাপা পড়ে গেল।

মেয়েটা টেনে এনে পৌঁছে দিয়েছে ততক্ষণে।

আসলে—প্রকাশ দেখল—একটা সেলাই কল। আর নৈবেদ্যের মত তাকে ঘিরে রয়েছে নানারঙের শার্টিং। ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের কাটা কাপড়ের টুকরো।

প্রকাশ কী বলবে, ভেবে পেল না!

দেশে বিদেশে

॥ লোকান্তরে ॥

খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ২১শে মার্চ, মঙ্গলবার রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ শহরে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের ঘোষ অধ্যাপকরূপে প্রখ্যাত বিজ্ঞানসাধক ডঃ গুহ জৈব রসায়নের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে বহু মৌল গবেষণা করেছেন। ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্য গবেষণা বিভাগের উপদেষ্টারূপেও দেশের অকৃত্রিম সেবা করেছেন।

মাত্র আটান্ন বছর বয়সে এমন এক-জন প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনাবসান হল। দেশ ও জাতির এ ক্ষতি অপরিসীম। ডঃ গুহের সহধর্মিণী সুপরিচিতা সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী ফুলরেণু গুহকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

॥ যুদ্ধ-বিরতি ॥

ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সৈনিকদের গৌরবময় সংগ্রামের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রায় ষাটটি দেশ, কিন্তু আলজিরিয়ার মত মুক্তিমূল্য তাদের কাউকেই দিতে হয়নি। এই রকম নৃশংস নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে সাত বছর ধরে সংগ্রাম করার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না; যদিও স্বাধীনতার জন্যে এ-দেশের মানুষকেও যথেষ্ট দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। সাত বছরের সশস্ত্র সংগ্রামে কত প্রাণ উৎসর্জিত হয়েছে, তার কোন সঠিক হিসাব নেই। সরকারী হিসাবে হতাহতের সংখ্যা দুই লক্ষের মত হলেও, বে-সরকারী হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ এবং এই হিসাবকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, সরকারী সৈনিক ও বে-সরকারী সন্ত্রাসবাদী শ্বেতাঙ্গদের বেপরোয়া আক্রমণে অরণ্য-প্রান্তরে কত অজ্ঞাত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে, তা সরকারী কর্তৃপক্ষের জানা থাকার সম্ভাবনা কম। স্বাধীন আলজিরিয়ায় হয়ত নতুন করে তার ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব হবে এবং সেদিন পৃথিবী আর একবার চমকে উঠবে সাম্রাজ্যিক বর্বরতার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেয়ে।

আলজিরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে. এইবার অস্থায়ী সরকারের হাতে আল-জিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। তবে তার আগে ফ্রান্স-আলজিরিয়া চুক্তি ফ্রান্সের জনসাধারণের সমর্থিত কিনা, তা জানার জন্য আগামী ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সে গণভোট গৃহীত হবে। গণভোটে যদি সরকারী কার্যক্রম অনুমোদন লাভ করে, তবে আল-জিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব অচিরেই আল-জিরিয়াবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আলজিরিয়ার শান্তি তাতে সুনিশ্চিত হবে—এমন কথা বলা যায় না। কারণ, যে-কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ‘কলোন’ নামে পরিচিত আলজিরিয়ার দশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজ ফরাসী সরকার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে আলজিরিয়ার স্বাধীন-তার দাবী মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। এ-কারণে বেপরোয়া কলোনদের সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপ যুদ্ধবিরতির পরেও বন্ধ হয়নি। যুদ্ধবিরতির পরের দিনেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে সাতাত্তরজন আলজিরিয়াবাসীর প্রাণহানি হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ‘কলোন’রা পাল্টা সরকার কায়েম করে আলজিরিয়ার শাসন-ক্ষমতা জোর করে দখল করে নেওয়ার মতলব করছে—এমন সংবাদও ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। আর কলোনদের সংগঠন যে খুব দুর্বল নয়, তার পরিচয়ও পাওয়া গেছে যুদ্ধ-বিরতির প্রতিবাদে তাদের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের আশাতীত সাফল্যে। সুতরাং ফরাসী সরকার বিরোধ মীমাংসায় সম্মত হলেও, আলজিরিয়ার অশান্তি অবিলম্বে দূর হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত।
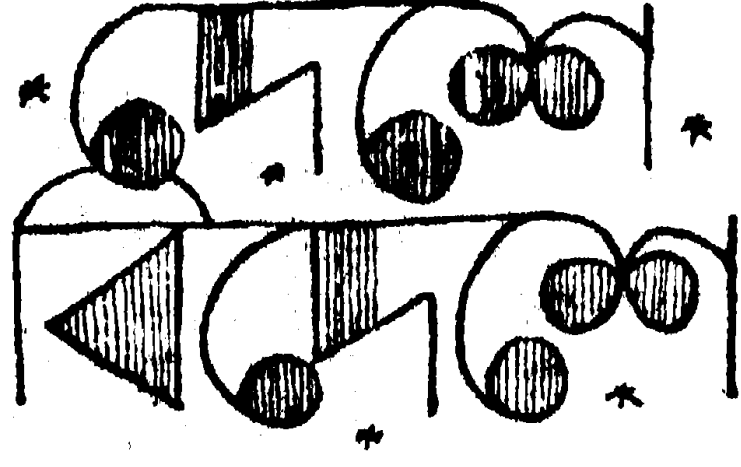
॥ নিরস্ত্রীকরণ ॥

রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তমত জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু হয়েছে। ১৮টি রাষ্ট্রের এই সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিল. কিন্তু ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে অসম্মত হওয়ায় ১৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছে। ক্রুশ্চেভ চেয়েছিলেন, এই সম্মেলনকে শীর্ষ-সম্মেলনে পরিণত করতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরোধিতায় সে-প্রস্তাব কার্যকর হওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের ইচ্ছামত বিভিন্ন রাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এসেছেন সম্মেলনে এবং ক্রুশ্চেভ তাতেই সম্মত হয়েছেন। কিন্তু ফ্রান্স যে গোঁ ধরেছিল, তা মানা হয়নি বলে ফ্রান্স সম্মেলন বর্জন করেছে। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, ১৮-রাষ্ট্র সম্মেলনের আগে পারমাণবিক শক্তি-সম্পন্ন চারটি রাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈঠক বসাতে হবে এবং তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তই অনুমোদন করাতে হবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে। ফ্রান্সের প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলে তা গ্রহণ করা হয়নি, আর ফ্রান্সও সেই ছুতোয় প্রত্যাখ্যান করেছে জেনেভা সম্মেলনের আমন্ত্রণ।

বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের এই সম্মেলন ত্যাগের ফলে সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কারণ, ক্রুশ্চেভ যা বলেছেন, পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করার অর্থ হবে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে অবাধে পরীক্ষাকার্য চালানোর সুযোগ দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন নিজেরা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ না করেও ফ্রান্সের পরীক্ষার মাধ্যমে তারা অব্যাহতভাবে নতুন নতুন পারমাণবিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। অথচ জেনেভা সম্মেলনে পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মত হলে তার আর এ-সুযোগ থাকবে না। সুতরাং জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত যদি ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক না হয়, তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে তা মানবে না, তা একরকম নির্ভয়েই বলা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাবকে অযৌক্তিক বলে মনে করারও কোন কারণ নেই। আজ যদি চেকোশ্লোভাকিয়া বা পোল্যান্ডের মত কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফ্রান্সের মত দায়িত্বহীন মনো-ভাবের পরিচয় দিত এবং তাদের হাতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকত, তবে পশ্চিমী শক্তিবর্গও সোভিয়েটের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে আন্তরিক বলে মনে করত না বা সম্মতিও জানাত না তাতে। তবুও জেনেভার নিরস্ত্রী-করণ সম্মেলন সম্পর্কে এখনই কোন নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। কারণ, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আছে আটটি জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যাদের উপেক্ষা করা কোন শিবিরের পক্ষেই সহজ হবে না। এ-ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্মেলন যদি সফল না হয়, তবুও কারও পক্ষেই এমন মনোভাব দেখানো সম্ভব হবে না, যাতে বিশ্ব-বাসীর মনে তাদের শান্তি-নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে।

॥ সিরিয়া-ইস্রায়েল সংঘর্ষ ॥

আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইস্রায়েলের বিরোধ বা ছোটখাট সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা নয়। সুযোগ পেলেই আরবরা আঘাত হানে ইস্রায়েলীদের, ইস্রায়েলী-রাও প্রতি-আঘাত হানতে কখনও দ্বিধা করে না। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে প্যালেস্টাইনের ওপর বৃটেনের ম্যান-

উদয়পুরের মহারাণার 'শিব নিবাস' দরবার-কক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কেনেডির পত্নী শ্রীমতী জন এফ কেনেডি (ডান দিকে), মহারাণা (মধ্যভাগে) এবং শ্রীমতী কেনেডির ভগ্নী প্রিন্সেস লী র‍্যাডজিউইল (বাম দিকে) মনোযোগ সহকারে কারুকার্যখচিত একটি ছুরিকা পর্যবেক্ষণ করছেন।

ব্যবস্থার অবসানের পর রাষ্ট্রসংঘের সিম্ধান্তক্রমে ২০ লক্ষ নর-নারী-অধ্যুষিত ৭,৯৯৩ বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট এই ইহুদী রাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার পরেই ইজিপ্ট, ইরাক, জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়া—এই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ, আরব রাজ্যে ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। কিন্তু নব-জাগ্রত ইহুদী জাতীয়তাকে পরাস্ত করা আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫০ সালে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা বলে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছে আরব ইস্রায়েলের মধ্যে, রাষ্ট্রসংঘের উপর অর্পিত হয়েছে মধ্যস্থতার দায়িত্ব। কিন্তু পূর্ণ শান্তি কোনদিনই স্থাপিত হয়নি বা আরব রাষ্ট্রগুলি মেনে নেয়নি এখনও ইস্রায়েলের রাষ্ট্রসত্তাকে। 'ষ্টেট অফ ওয়ারে'র অবসান হয়নি তাদের মধ্যে।

গত ১৭ই মার্চ, শনিবার গ্যালিলী সাগরের পূর্ব উপকূলে হঠাৎ একটা গুরুতর রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেল সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে। সিরিয়ার অভিযোগ অনুসারে ইস্রায়েলই সীমান্ত লংঘনের অপরাধে অপরাধী এবং এই মর্মে অভিযোগও উত্থাপন করেছে সে স্বস্তি পরিষদের কাছে। তবুও সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তের কমাণ্ডার দাবী জানিয়েছেন—স্থল ও আকাশপথে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা দুইশত ইস্রায়েলী সৈন্যকে হত্যা করেছেন। ইস্রায়েলও অনুরূপভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন ও অস্ত্র-সংবরণ চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে সিরিয়ার বিরুদ্ধে এবং এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের জন্য সে-ও স্বস্তি পরিষদকে অনুরোধ জানিয়েছে।

ওদিকে জর্ডন ও ইজিপ্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ইস্রায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা সর্বতোভাবে সিরিয়াকে সমর্থন করবে। জর্ডনের রাজা হুসেন জর্ডনস্থ সিরীয় রাষ্ট্রদূতকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সিরিয়ার ওপর যে-কোন আক্রমণকেই জর্ডন তার নিজের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে এবং তা প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ইজিপ্টও অনুরূপভাবে বলেছে যে, সিরিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি তার যে বিরোধই হয়ে থাক না কেন, ইস্রায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সে সর্বশক্তি দিয়ে সিরিয়াকে সাহায্য করবে।

॥ শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ॥

গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এই বছরের মার্চ পর্যন্ত চীন ও ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে যে সকল পত্রালোচনা হয়েছে সম্প্রতি, সেগুলি ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন। পত্রগুলির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় হল চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও চড়া সুরের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে চীন সরকার ভারতের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন, 'চীনা ও ভারতীয় জনসাধারণ পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবা-পন্ন, চীন ও ভারত এশিয়ার দুটি বৃহৎ প্রতিবেশী শক্তি।...যত দেরীতেই হউক না কেন; কোন দিন না কোন দিন চীন ও ভারতের সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতেই হইবে। তবে চীন ও ভারতের জনসাধারণের স্বার্থে এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির জন্য বিলম্বে সমাধান হওয়া অপেক্ষা শীঘ্র হওয়াই কাম্য।' ভারত সরকারও চীনের এই পত্রের উত্তরে গত ১৩ই মার্চ এক পত্রে বলেছেন, "আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে ভারত সকল সময়েই শান্তিনীতির অনুসারী। এই কারণেই চীনা সৈন্যবাহিনী বলপূর্বক ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করা সত্ত্বেও ভারত সরকার ধৈর্য হারান নাই। কিন্তু চীনা সৈন্য ভারতীয় এলাকা হইতে স্বেচ্ছায় চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ভারত সরকার চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিত রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।'

চীনের বর্তমানে যে আক্রমণাত্মক মনোভাব, যে কারণে তার নিকটতম ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধে নামতেও তার দ্বিধা নেই, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল একটি ভয়ংকর যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া। যা আজ ভারতের পক্ষে কখনোই নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং শান্তিপূর্ণ নীতি থেকে ভারতের এক্ষেত্রে কোনমতেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না। তবে ভারতের নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় থাকলেও চলবে না।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : পশ্চিম-বঙ্গের নূতন বিধানসভায় প্রবল হট্টগোল—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তপ্ত সূচনা।

নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব—মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য লোকসভায় বিরোধী সদস্যদের দাবী।

'নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে বহু প্রশ্নের মীমাংসা সহজতর হইবে'—রাজ্য-সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—জেনেভায় সপ্তদশ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের অগ্রগতিতে আশা।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : 'চীনা সৈন্য অপসারণ দ্বারাই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ভিত্তি রচনা সম্ভব'—চীনের নিকট ভারত সরকারের প্রস্তাব—রাজ্যসভায় চীন-ভারত পত্রাবলী উপস্থাপিত।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় বিশৃঙ্খলা—শিক্ষিতের হারের হিসাবে রাজ্যের ক্রমাবনতি—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে বিরোধীপক্ষের অভিযোগ।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্তৃক দেশগঠনের কাজে সঙ্গত আলোচনা ও সহযোগিতার আহ্বান—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তরদানকালে দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় রাজ্যপালকে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক রবীন্দ্রভারতী ভবনে সারা ভারত শিল্পী সম্মেলনের উদ্বোধন।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক কমিশনের কলিকাতায় উপ-স্থিতি—মহানগরীর মাস্টার প্ল্যানের রূপায়ণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনা।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর মুদালিয়র কমিটির গুরুত্ব আরোপ—লোকসভায় সরকারপক্ষ হইতে কমিটির সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ।

'সাম্প্রদায়িক দলসমূহ নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে'—রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি।

আলজিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতিতে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) আনন্দ প্রকাশ—আলজিরীয়দের অতুলনীয় সংগ্রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের (৫৮) লক্ষ্ণৌ-এ পরলোকগমন।

রাজ্যসভায় গোয়া, দমন ও দিউ'র ভারতভুক্তি সংক্রান্ত বিল গৃহীত।

'নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনার পাশাপাশি কাশ্মীর প্রশ্নে পাক্-ভারত দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হইতে পারে না'—পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর উক্তি।

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : নাগাভূমি সীমান্তে হাফলং-এর নিকট বিদ্রোহী নাগাদের অব্যাহত উৎপাত—আগুন লাগাইয়া ৬টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। (১৫ই মার্চের ঘটনা)।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় বিরাট মিছিল—দেশপ্রিয় পার্কে পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বিশাল সভার অনুষ্ঠান ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম আলোচনা।

॥ বাইরে ॥

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : জেনেভা বৈঠকের (সপ্তদশ রাষ্ট্র) সূচনাতেই রুশ-মার্কিণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব পেশ—চার বছরের মধ্যে তিন পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণে গ্রোমিকোর (রাশিয়া) দাবী : মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক কর্তৃক চার দফা পাল্টা প্রস্তাব।

নয়া পাক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে ঢাকায় আবার ছাত্র ধর্মঘট।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে ঘরোয়া বৈঠকে পরিণত করিতে শ্রীমেননের (ভারত) আহ্বান—বৃটেন ও আমেরিকাসহ ৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থন।

পশ্চিম নিউগিনির বিরোধ প্রসঙ্গে আমেরিকার মধ্যস্থতায় শীঘ্রই নেদার-ল্যান্ড-ইন্দোনেশীয় বৈঠকের ব্যবস্থা।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : গ্যালিলি সাগরতীরে ইস্রায়েলী ও সিরীয় সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে ৭ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ—উভয়-পক্ষেরই বহু হতাহত।

নির্জন দ্বীপে বন্দী কঙ্গোলী নেতা গিজেঙ্গার দেহে আর্সেনিক বিষ-প্রয়োগের সংবাদ—লুমুম্বার মত লুমুম্বা-পন্থী গিজেঙ্গাকেও হত্যা করার জঘন্য চক্রান্ত।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : আলজিরিয়ায় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান—ফরাসী-আলজিরীয় অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি সম্পাদিত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র নির্বা-চনের অনুষ্ঠান—প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ পুনরায় সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচন-প্রার্থী।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা পুনরারম্ভে রাশিয়ার সম্মতি—জেনেভায় সাংবাদিক বৈঠকে সোভিয়েট উপ-রাষ্ট্রমন্ত্রী জোরিণের ঘোষণা।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : ফরাসী-আলজিরীয় যুদ্ধ বিরতির চুক্তির ভিত্তিতে ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সে গণভোট গ্রহণ।

'ভারত সরকার নিরস্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণকে অবিচ্ছেদ্য মনে করেন'—জেনেভায় ১৭ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঘোষণা।

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : মহাকাশ গবেষণায় রুশ-মার্কিণ সহযোগিতা ব্যাপারে ক্রুশ্চেভের আগ্রহ—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট পত্র প্রেরণ।

জেনেভায় ত্রিশক্তি পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সূচনাতেই অচলাবস্থা।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর
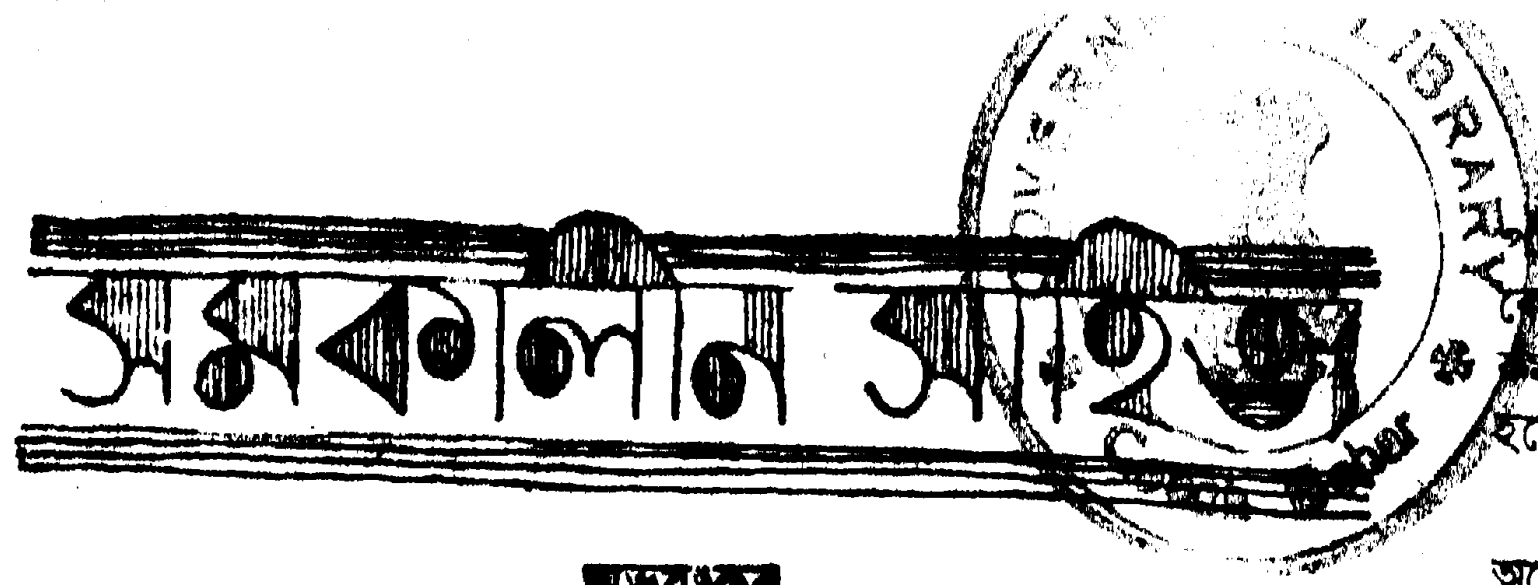
॥ ট্রাজেডির মৃত্যু ॥

সমালোচক সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে দুটি বিষয় সর্বাগ্রে বিচার্য। তিনি কি বলতে চান। এবং কিভাবে। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যদি আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলে সমালোচকের যিনি সমালোচক তাঁর কাজটা সহজ হয়ে যায়।

অনেক সময় বক্তব্য বিষয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়টির সম্পর্কে হয়ত তেমন কৌতূহল জাগে না যেমনটি পাওয়া যায় যুক্তির উপস্থাপনে, লেখকের বুদ্ধিমত্তা, লিপিচাতুর্য সেইখানেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

The Death of Tragedy গ্রন্থটি এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মিঃ জর্জ ষ্টাইনার অনেক কথায় এইটুকু বলতে চেয়েছেন যে নাটক এবং কবিতায় যে খাঁটি ট্রাজেডির পরিবেশন করা হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীতেই শেষ হয়েছে, ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে ঐকালে। তাঁর বক্তব্যটি কিছুতেই পাঠকচিত্তে কৌতূহল উদ্রেক করত না যদি না অতি মনোহর ভঙ্গীতে তিনি সেই বক্তব্য বিষয়টুকু পাঠকের কাছে নিবেদন করতেন।

এই উক্তির স্বপক্ষে মিঃ ষ্টাইনার তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। কর্নেইলের লঘু নাটকাবলী সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁত, এবং সেইসব নাটক যাঁদের পড়ার সুযোগ ঘটেনি তাঁদের কাছেও এর মূল্য অসীম।

উৎসাহভরে তিনি যে সব কথা বলেছেন তার ফলে অপরেও তার মত সমর্থন করবে, তাঁর অনুভূতির অংশভাগী হবে। ক্লিইস্ট এবং বাখ্নার সম্পর্কে তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হবে। বাইরণ, কীটস্ এবং শেলীর নাট্যভাবনা সম্পর্কে তাঁর উদ্ধৃতি বহু পাঠককে আবার পুরাতন বইএর পাতা ওলটাতে প্রলুব্ধ করবে। লেখকের পাওনা হিসাবে এটা কম কথা নয়।

একথা কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয় না যে আমাদের এই কাল, যে কাল হতাশা, বেদনা এবং বঞ্চনায় পরিপূর্ণ, সেই কালে ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু জর্জ ষ্টাইনারের The Death of Tragedy পাঠ করলে সেই ধারণা মনে জাগবে। তিনি শুধু এই নিদারুণ সত্যটি আমাদের শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি, কিভাবে তা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ দান করেছেন। ট্রাজেডির দুঃসময় চলছিল অনেককাল থেকেই। প্রাচ্য ধারণানুসারে অহং থেকে মুক্তি, খৃষ্টীয় অনুশাসনমতে প্রেমের পুনরুজ্জীবনদানকারী শক্তি, এবং মৃত্যুর পর অপার আনন্দ, মার্কসীয় ভাববাদ মতে পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব প্রভৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অনেক প্রাচীন বিশ্বাস এবং ধারণার আজ অবসান ঘটেছে। আধুনিককালের ঘৃণা আর শঙ্কা আমাদের ট্রাজেডির অভিমুখী না করে ট্রাজেডি সম্পর্কে নিরাসক্ত করে তুলছে। ষ্টাইনার বলছেন—

"Each day we sup our fill of horrors — in the Newspaper, on the Telivision Screen, on the Radio — and thus we grow insensible to fresh outrage. Compared with the realities of war and oppression that surround us, the gravest imaginings of the poets are diminished to a scale of private or artificial terror." —তাঁর এই গ্রন্থ এক হিসাবে ট্রাজেডির মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

ষ্টাইনার বর্ণিত এই নিদারুণ ঘটনার কথা পাঠ করলে চিত্ত হবে বিষাদমগন। আর কোনো নব-এণ্টিগোন, ইউরিডিস্ কিংবা হামলেট রঙ্গমঞ্চে দেখা যাবে না, নতুন কোনো বিয়োগান্ত নায়ককে দেখা যাবে না, অদৃশ্য দানবের তাড়নায় আকুল নায়কের স্বগতোক্তি শোনা যাবে না। ইদানীংকালে অবশ্য কয়েকটি নাটকের পরিসমাপ্তি বেদনাদায়ক, কিন্তু মিঃ ষ্টাইনার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যেন সেগুলিকে খাঁটি ট্রাজেডি মনে করে ভুল না করে বসি। খাঁটি ট্রাজেডিতে ক্ষতিপূরণের অবকাশ নেই, নেই এতটুকু বিচার-বিবেচনা। তার মধ্যে আছে শুধু অন্ধ প্রয়োজন আর 'Man's encounter with it shall rob him of his eyes'. আমাদের কারো কিছুই করার সুযোগ থাকবে না। "Tragic drama tells us that the spheres of reason, order and justice are terribly limited and that no progress in our science or technical resources will enlarge their relevance."

'অন্ধ নিয়তির' কবলে যে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সংকটত্রাণে ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। ইবসেনের নায়িকার বেদনার অবসান অতি সহজেই ঘটবে এদিনের উদার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে। আর্থার মিলারের নায়কের মানসিক ক্ষত অতি সহজেই নিরাময় হবে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়-বৃদ্ধিতে। ক্লিফোর্ড ওডেটের নায়কদের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় ক্লেশভোগের কোনও হেতু নেই, কারণ সেই সমাজের কর্মীদের বেতন উত্তম এবং বেকারী দূর হয়ে গেছে। নব স্বর্গরাজ্য রচিত হয়েছে।

মিঃ ষ্টাইনার 'ট্রাজেডি' বলতে গ্রীক অর্থে যে ট্রাজেডি বোঝায় সেই ট্রাজেডিই বোঝেন। শুধু মাত্র অন্ধ নিয়তির কবলিত মানবের যন্ত্রণাকে যদি প্রকৃত ট্রাজেডি মনে করা যায়, তাহলে মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে সংঘাতের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে কি আখ্যা দেওয়া যায়? যুক্তির দাবী এবং ভাবাবেগের দাবীর মধ্যে যে সংঘাত, রোমান্টিক আবেগ এবং দৈহিক প্রেমব্যাকুলতার মধ্যে যে সংঘাত, কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত, সে কি মানবজীবনে এক নিদারুণ ট্রাজেডি নয়? মিঃ ষ্টাইনার বলেছেন—'the evasion of tragedy is a constant practice in our own contemporary theatre'— আংশিকভাবে সত্য হলেও তিনি যখন একালের কোনো নাটককেই খাঁটি ট্রাজেডি হিসাবে গ্রহণ করতে চান না তখন তাঁর বক্তব্যের ধার অনেকখানি হ্রাস পায়। তিনি টেনেসি উইলিয়ামসকে উপেক্ষা করেন, আর্থার মিলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনুদার। এমনকি ইউজিন ও'নিলের Mourning Becomes Electra — সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেছেন—"as a case of adultery and murder in some provincial rat hole." গার্সিয়া লোরকা সম্পর্কে এতটুকু উল্লেখ নেই। আলবেয়ার কামুর নাটকের বিয়োগান্ত পরিবেশও তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। এন্টিগোনের কাহিনী নিয়ে আনোইল ট্রাজেডি রচনা করেছেন একথা তিনি স্বীকার করেছেন, তবে তাঁর অন্যান্য রচনার ট্রাজিক অর্থ তিনি উপেক্ষা করে গেছেন।

ষ্টাইনার ক্লডেলের রোমান ক্যাথলিক প্রচার-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বেশ সচ্ছন্দে লিখেছেন, তেমনই ভঙ্গীতে ব্রেখটের রচনায় পেয়েছেন মার্কসীয় দর্শনের সুর। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, যে লেখকের মতে সপ্তদশ শতাব্দীতেই ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে, তিনি কেন পরবর্তী যুগের নাটকাবলী আলোচনা-সূত্রে এমন ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রশ্নের জবাব ষ্টাইনারই অবশ্য দিয়েছেন, একালের নাটক যে খাঁটি ট্রাজেডি নয় সেই কথা প্রমাণ করার জন্যই তাঁকে অনেক যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করতে হয়েছে। এই বক্তব্য স্পষ্ট করার সহজ উপায় হল মারলোর "Dr. Faustus" এবং গ্যোতের "Faust" নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ। মারলোর ফাউস্টস্ বেদনার্ত চীৎকার সহকারে নরককুণ্ডে নিপতিত, আর গ্যোতের 'ফাউস্ট'কে সমবেতকণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীত সহকারে বরণ করা হয়। খাঁটি

ট্রাজেডি, যথা, হ্যামলেট, লীয়র, ঈডিপাস প্রভৃতির নিষ্কৃতি নেই। উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়াও যায় না।

ধ্রুপদী ভঙ্গীতে ফিরে যাওয়ার যে ইদানীন্তন ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশেষতঃ ফরাসী নাট্যকার—আনুইল, কাক্তু, গীদ, সারত্রে প্রভৃতির নাটকে গ্রীক নাটককেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার দিকে আগ্রহ দেখা যায়, তেমনই প্রবণতা আছে ইউজিন ও'নিল এবং এলিয়টে। ষ্টাইনারের যুক্তিতে—"Great Theatre is not conceived in imitation" — । কিন্তু সমালোচকদের মতে আনুইলের 'Antigone' সফোক্লেসের নাটকের চাইতেও উৎকৃষ্টতর। ভাষা সম্পর্কেও ষ্টাইনারের উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক, তাঁর মতে ট্রাজেডির কাব্যের সঙ্গীতঝঙ্কার থাকা চাই। যদি গীতিকবিতার মাধুরী না পাওয়া যায় তাহলে সঙ্গীতের অন্য কোনো রূপকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ষ্টাইনার বলেন যে, ভাগনারের 'Festipiel haus'-এ ট্রাজেডির নবজন্ম ঘটেছিল, কিন্তু সঙ্গীত-রচয়িতা ভাগনারকে তার জন্য নতুন শ্রোতা, নতুন আঙ্গিকের নাটক প্রভৃতি সৃষ্টি করতে হয়েছিল। শ্রোতাকে গড়ে নেওয়াটা একটা বৃহত্তর প্রশ্ন। ট্রাজেডির অবক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত আছে সপরিবারে চিত্তবিনোদনের জন্য থিয়েটারে যাওয়ার আধুনিক মনোবৃত্তি। গ্রীকরা যেতেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। সেক্সপীয়র ট্রাজেডি লিখেছেন মুখ্যতঃ এক উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে চেয়ে। সর্বশেষে ষ্টাইনার কিঞ্চিৎ স্বগতোক্তি করেছেন যে, হয়ত ট্রাজেডির নিছক অপমৃত্যু ঘটবে না, অন্য কোনো মাধ্যমে, অন্য কোনোখানে, অন্য কোনো মুহূর্তে হয়ত ট্রাজেডি সৃষ্টি হবে, তবে ষ্টেজে ট্রাজেডির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব নয়। অতঃপর ব্রেখ্টের 'Mother Courage সম্পর্কে বলেছেন:—

"I saw Helen Weigel act the scene with the East Berlin ensemble, though acting is a paltry word for the marvel of her incarnation. . . As the body was carried off, Wiegel looked the other way and tore her mouth wide open. The shape of the gestúre was that of the screaming horse in Picasso's Gueruica. The sound that came out was raw and terrible and beyond all description. But in fact there was no sound. Nothing. The sound was total silence. It was silence which screamed and screamed through the whole theatre so that the audience lowered its head as before a gust of wind."

লেখক ষ্টাইনার এইভাবে সমালোচক ষ্টাইনারের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এই অভিনয়ের দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বিচার করবেন ষ্টাইনারের উক্তির তীক্ষ্ণতা। যাঁরা দেখেননি এই কটি লাইন পাঠ করলেই মনে হবে ইষ্ট বার্লিনের রঙ্গমঞ্চের সামনে বসে আছি। চোখের ওপর একটা ছবি ভেসে ওঠে। এর নাম সমালোচনা। মিঃ ষ্টাইনারের অবশ্য এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য যে আধুনিক কালের ট্রাজেডি দর্শকের চোখে তাঁদের নিজস্ব কাল এবং পরিবেশের নিরিখেই ট্রাজেডি হিসাবে গৃহীত হবে। অতীতের ট্রাজেডি আধুনিককালের ট্রাজেডির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর হয়ে উঠবে। *

*THE DEATH OF TRAGEDY — By George Steiner :: Faber and Faber — 30 sh.)

নতুন বই

আদিম সমাজের ইতিহাস—(প্রবন্ধ) মনোরঞ্জন রায়। পরিবেশক—ন্যশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৫ টাকা।

আদিম সমাজের সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা ক্রমশই স্পষ্টতর হচ্ছে।

আদিম
সমাজের
ইতিহাস
মনোরঞ্জন রায়
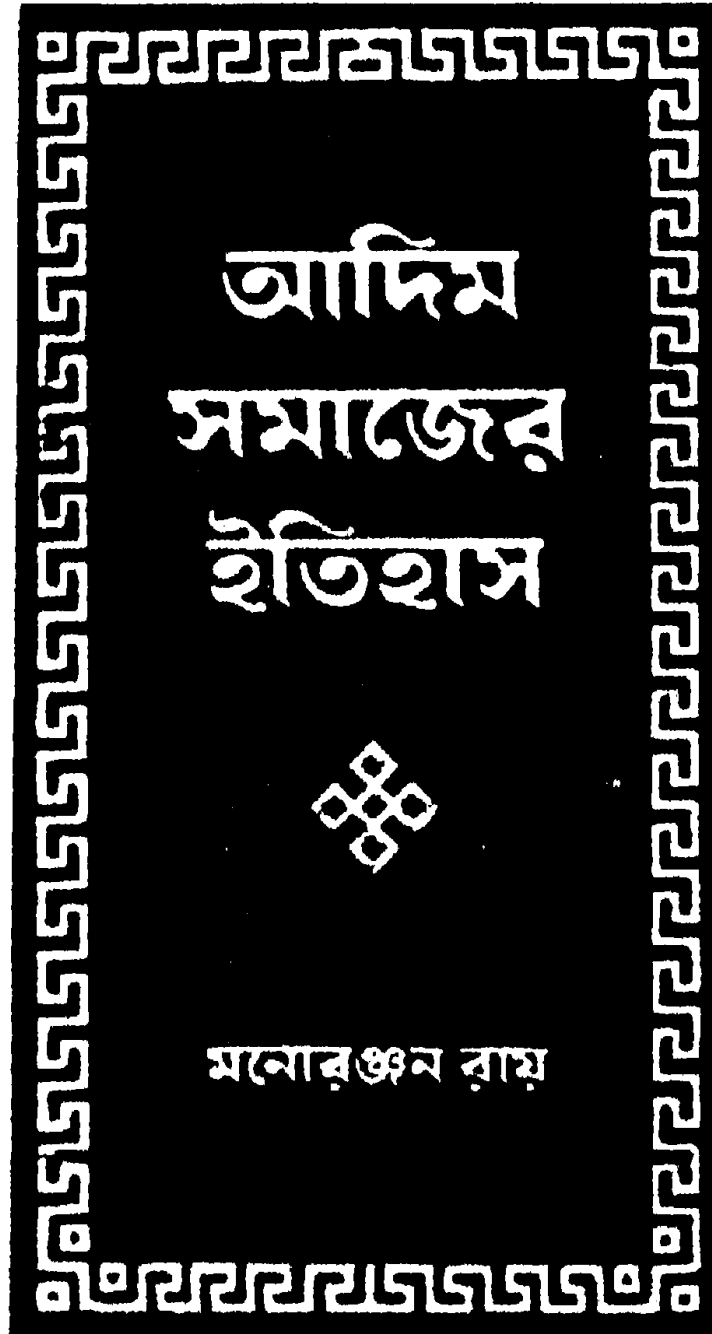
মর্গ্যান, এঙ্গেলস প্রমুখ মনীষীরা এ বিষয়ে যে চর্চা শুরু করেছিলেন ফ্রেজার, গর্ডন চাইল্ড প্রভৃতি এ-যুগের মনীষীদের হাতে সেই সাধনা আরো সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। গ্রন্থকার উপরোক্ত পুরাতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা অনুসরণ করে আদিম সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গোত্র-সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভাবধারা সম্বন্ধে সুচারু আলোচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন আদিম মানুষেরা নিজেদের টিকিয়ে রাখবার জন্যে সভ্যতার শৈশবে কী ভাবে গোত্র, পরিবার প্রথা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠান ও প্রকৃতির উপরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্য জাদু, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অলৌকিক উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। বর্তমান সভ্যতার রাষ্ট্রবন্ধ যে মানুষ বিজ্ঞানের যুক্তি ও আলোকে সবকিছু যাচাই করে গ্রহণ করে তার জীবনযাত্রার মধ্যেও এমন বহু অসংগতি চোখে পড়ে যার মধ্যে আদিম জীবনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার বর্তমান স্তরে মানুষ উন্নীত হয়েছে সে কথা অতীতের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়। পুরাতত্ত্বের এই চর্চার ফলে বিজ্ঞানের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে মানব-সমাজের বহু অসংগতি দূর হতে পারে, বহু অন্ধবিশ্বাস ও ধারণার নিরসন হতে পারে—যার অলৌকিক শিকড় এই সমাজের মাটিতে আজও বদ্ধমূল।

গ্রন্থকার সামাজিক সংগঠনের বিকাশ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস, মরগ্যান ও ফ্রেজারের ঋণ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁদের মতের পাশাপাশি গর্ডন চাইল্ডের মতামতের পার্থক্য আলোচনা করতে বিরত থেকেছেন যার ফলে গ্রন্থটি আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়নি।

আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে আদিম গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মর্গ্যান ও এঙ্গেলস অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। গর্ডন চাইল্ডের আধুনিকতম প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের কিছু কিছু তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখালে গ্রন্থটি আরো চিত্তাকর্ষক হত।

গ্রন্থকার 'ভাবধারা' পর্যায়ে জাদু ও ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনায় ফ্রয়েডের মন্ত্রশিষ্য ফ্রেজার অপেক্ষা যুক্তিনিষ্ঠ গর্ডন চাইল্ডের উপরে নির্ভর করে ভালোই করেছেন। ফ্রেজারের মতে জাদুবিশ্বাস বিজ্ঞানের সহোদর। কিন্তু গর্ডন চাইল্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য আছে। গর্ডন চাইল্ড জাদু ও ধর্মের অভিন্নহৃদয় আত্মীয়তায় বিশ্বাসী; বিজ্ঞানের উৎস স্বতন্ত্র।

চাইল্ড সে যুগের মানুষের তৈরী মৃণ্ময় পাত্রাদি নির্মাণের শিল্পদক্ষতা ও উপযোগিতা বিচার করে ঐ শিল্পকেই বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এই গ্রন্থ রচনায় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের নিদর্শন প্রচুর আছে। পরবর্তী সংস্করণে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগত নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে পুরাতত্ত্বজ্ঞ মনীষীদের

সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনা সংযোজিত হলে গ্রন্থটি আরো সুসম্পূর্ণ হবে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

পরিচয়—সম্পাদক গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম : এক টাকা।

'পরিচয়' পত্রিকার ঐতিহ্য সুবিদিত। বহুদিন ধরে বাঙলার পাঠক-সাধারণকে একটি রুচিশীল মনোরম পঠনীয় বিষয়বস্তু মাসের পর মাস দিয়ে এসেছে। কিন্তু 'পরিচয়' কিছুকাল ধরে তার পূর্বঐতিহ্য হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিক 'ফাল্গুন' সংখ্যাটি সে ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াস।

এ সংখ্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা রবীন্দ্রনাথ ও নন্দন তত্ত্ব (নীরেন্দ্রনাথ রায়); রবীন্দ্র ও বাঙলার ঐতিহ্য (গোপাল হালদার); আদর্শ ও বাস্তব (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়); আফ্রিকার নবজাগৃতির পটভূমিকা (অংশু দত্ত); আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ (অশোক রুদ্র)—এই কয়েকটি আলোচনা। অনেকদিন 'পরিচয়ে' এতগুলি মূল্যবান রচনা একসঙ্গে ছাপা হয়নি—কেবলমাত্র বিশেষ সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে। যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের গল্প 'শিকার কাহিনী' রয়েছে। কবিতা আছে পুশকিন, লেরমনতফ, মায়াকভস্কি ও সিদ্ধেশ্বর সেনের। অন্যান্য বিভাগীয় রচনা লিখেছেন, গোপাল হালদার, রবীন্দ্র মজুমদার, অমল দাশগুপ্ত, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণা হালদার, দেবেশ রায়, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জিষ্ণু দে, অরুণ দেব প্রভৃতি।

সম্প্রতি—সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮ কিরনলাল বর্মন রোড, সালখিয়া, হাওড়া। দাম ৬০ নঃ পঃ

বাঙলাদেশের মানুষ যে কতদূর সংস্কৃতিবান তার পরিচয় পাওয়া যাবে অসংখ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে। প্রতি বৎসর বহু নতুন ও পুরানো পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে।

আলোচ্য পত্রটি 'সিরিয়াস' ধরনের বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং এ ধরনের পত্রিকা আরও 'সিরিয়াস' রচনা নিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধটি এবং সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি কবিতা-গ্রন্থের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। কল্যাণ চৌধুরীকৃত জিম ফেল্ডম্যান ও অ্যালেন গ্যাটেনবার্গ সম্পাদিত 'বিট জেনারেশন এন্ড এ্যাংরি ইয়ং ম্যান' পুস্তকের ভূমিকার অনুবাদ 'বিট সম্প্রদায় ও ক্রুদ্ধ যুবাবৃন্দ' নামে রচনাটি অনেকেরই ভাল লাগবে। শেখর বসু ও স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এবং আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, গৌর পাল, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, দিলীপ সিংহ, পুষ্কর দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা আছে। কবিতা-নির্বাচনে সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব কঠোরভাবে পালন করবেন আশা করি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব মহোৎসব

শ্রীমনন

বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসবকে কেন্দ্র ক'রে গেল ২১এ, ২২এ ও ২৩এ মার্চ বাঙলার সংস্কৃতি কেন্দ্র এই শহর কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তা ধর্মপ্রাণ বাঙালীমাত্রকেই আবার নতুন ক'রে আশার বাণী শুনিয়ে নবভাবে সঞ্জীবিত করেছে।

গেল বুধবার, ২১-এ মার্চ উষাকালে মঙ্গলারাত্রিক শেষে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রাভিনয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (শচীমাতা), মনোজ বিশ্বাস (নিমাই) ও বীণা চক্রবর্তী (বিষ্ণুপ্রিয়া)

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত সুউচ্চ ও সুশোভিত মঞ্চের পশ্চিমে আর একটি বর্ণাঢ্য মঞ্চে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পূজা, হোম ও আরতি এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

ঐ দিন বেলা সাড়ে তিনটায় অগণিত ভক্ত সমাবেশে হরিনামমুখর যে বিচিত্র নগর-সংকীর্তন দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বেরিয়ে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা করে আবার দেশপ্রিয় পার্কে ফিরে আসে তার পুরোভাগে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদব্রজে পরিক্রমা করতে দেখা গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পীকার কেশবচন্দ্র বসু, মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, উপ-মন্ত্রী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, বিভা মিত্র এম-এল-এ, সুধারাণী দত্ত এম-এল-এ, অনিল মৈত্র এম-এল-এ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য বিধুভূষণ ঘোষ প্রভৃতি।

নগর-সংকীর্তন শেষে ঐ দিন সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে যে মহতী জনসভা হয়, তার সভাপতিরূপে ভাষণদান কালে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সমবেত লক্ষাধিক জনসমুদ্রের উদ্দেশে বলেন আজকের এই দুর্দশাগ্রস্ত বাঙলা দেশ যেন হরিনামের বাতা ভুলে না যায়।

সভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ ক'রে শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পুণ্যাদর্শ মানুষের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠবার জন্যে প্রার্থনা জানান। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর মহোৎসব কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ভক্ত, বক্তা, শিল্পী ও জন-সাধারণকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভার অন্যতম বক্তা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবকে বাঙলা দেশের গেল পাঁচশো বছরের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য দেবের আবি-র্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, নিপী-ড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যেই তাঁর ধরাধামে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন হয়েছিল। সভাতে পল্লী-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ ও শ্রীচিন্ময়ানন্দও মহাপ্রভুর দর্শন ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। সভার শেষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব মহোৎসব সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সভাস্থ অতিথিবৃন্দ, ভক্তজন ও সমবেত জন-সাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাশেষে কীর্তন ও ভজনানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ক'রে যে-সব শিল্পী অগণিত শ্রোতাকে আনন্দদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন : ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মাধবী ব্রহ্ম, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও রঞ্জেন সেন। এ'দের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন বিজয় সেনগুপ্ত (কলি-কাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে), কুমুদ ঘোষ, রাধাকান্ত নন্দী, শ্যাম মুখো-পাধ্যায়, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নিমাই ভট্টাচার্য।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার ২২-এ মার্চের অনুষ্ঠানে শ্রীরামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর "শ্রীশ্রীগৌর কথা" অগণিত ভক্তদের সামনে সেই মহতী জীবনের প্রকৃষ্ট রূপকে উদ্ঘাটিত করেছিল। এর পর শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবীর সুললিত কথকতা শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছিল। সতোশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত ভক্তি-কীর্তনের পর হাওড়া সমাজ অভিনয় করেন তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসৃষ্টি 'নদের নিমাই' (নদীয়ালীলা)।

শেষ দিনে, শুক্রবার ২৩-এ মার্চ প্রথমেই প্রসিদ্ধ বাউল পূর্ণ দাস শ্রীগৌরাঙ্গগীতি পরিবেশন করেন। এর পর অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীরাধরমণ কীর্তন সমাজের লীলাকীর্তন। এই সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ রচিত ও মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রযোজিত "শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস" লীলা-ভিনয়। শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সভাবৃন্দ কর্তৃক নিবেদিত এই লীলাভিনয়ে নাট্য-পরিচালক ছিলেন শ্রীমিহির গঙ্গো-পাধ্যায় এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীকমল দাসগুপ্ত। এই মধুর লীলাভি-নয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ ও আনন্দিত করেছিলেন সম্প্রদায়ের সকল শিল্পীই এবং তাঁদের মধ্যে বিশেষ ক'রে নাম করা যায় শচীমাতার ভূমিকায় মমতা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অসামান্য অনবদ্য অভিনয়ের কথা। এ'র পরই নাম করতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাইয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে বীণা চক্রবর্তী ও মনোজ বিশ্বাসের মনোজ্ঞ অভিনয়ের। এ ছাড়া দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন গৌরগোপাল (নিতাই), সুধীর মুস্তাফি (শ্রীবাস), সত্য রায় (ন্যায়রত্ন) ও প্রমোদ গুহ (বিদ্যা-বাগীশ)। মুকুন্দের ভূমিকায় নীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর মধুর গানে সমবেত শ্রোতৃদের মুগ্ধ করেছিলেন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

সমাজ দর্পণ ঃ

বহুকাল আগে একটা গান প্রচলিত ছিল, যার গোড়ার দুটো পংক্তি হচ্ছে ঃ "জগৎখানা নটবরের যেন নাট্য রঙ্গমঞ্চ। সে যে একা সেজে নানা সাজে ভাঙে গড়ে এ প্রপঞ্চ।।" গান হিসেবে যাই হোক না কেন, দার্শনিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে এই দুটি ছত্রে। মায়াময় সংসারের ভাঙাগড়া—সবই সেই নট-শ্রেষ্ঠ ভগবানের নাট্যাভিনয়, সেই এক নিজেকে বহুধা বিভক্ত ক'রে ভাঙাগড়ার নাটকাভিনয়ে মত্ত। আবার জগৎখানা একটি নাট্যমঞ্চ এবং আমরা মানুষ সেখানে অভিনেতা—একথা বলে গেছেন সেক্সপীয়র। কিন্তু এই অভিনয় জিনিসটা কি? "রূপং রূপং প্রতি-রূপঃ।" রূপেরই প্রতিরূপ। আরি-স্টোতলও একই কথা বলেছেন—আর্ট হচ্ছে সত্যের নকল (art is an imitation)। রঙ্গমঞ্চে আমরা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখি। তাই যেমন কথা আছে—"মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ-স্বরূপ", ঠিক তেমনই প্রবচন আছে.— "রঙ্গমঞ্চ সমাজের দর্পণস্বরূপ"। গোষ্পদে অনন্ত আকাশ যেমন প্রতি-বিম্বিত হয়, তেমনই রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় গোটা সমাজের চেহারা। সমাজের চেহারা বলতে মাত্র তার বাহ্যিক রূপটাই নয়, তার চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান, ধারণা সংবলিত গোটা মানসরূপটাও। মনে রাখতে হবে, দর্পণের একটা অর্থ যেমন মুকুর বা আয়না, তেমনি আর একটি অর্থ হচ্ছে— চক্ষু। এবং চক্ষু বলতে খালি চর্ম-চক্ষুই বোঝায় না, মনশ্চক্ষু বা জ্ঞান-চক্ষুও তার মধ্যে এসে পড়ে। তা ছাড়া মাত্র মুকুর বা আয়না অর্থে যে দর্পণ. তাই কি অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস? মানুষের মুখমণ্ডল থেকে শুরু ক'রে বিরাট বহিপ্রকৃতি, মায় সূর্যকে পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করবার যার ক্ষমতা, সে বস্তু কি তুচ্ছ? মনে করুন, দর্পণ আবিষ্কারের আগেকার যুগের কথা। নিজের মুখ দেখা থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কামানো, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসা, গালে রুজ পাউডার লেপা—সবই চিন্তার বাইরে। একখানি ছোট্ট দর্পণ তাঁর হাতে থাকলে কি স্নানরতা রাধাকে সখেদে বলতে হ'ত—ঢেউ দিও না জলে, ওগো প্রাণসখি; দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী?" "দশরূপক" নাট্যসম্প্রদায় তাঁদের সম্প্রতি-প্রকাশিত অভিনয়সূচী-পুস্তিকায় অযথাই সংশয় প্রকাশ ক'রে বলেছেন—"রঙ্গমঞ্চ সমাজের দর্পণ স্বরূপ" প্রবচনটি 'গভীর চিন্তাপ্রসূত নয়।' তাঁরা আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই কথাটার স্থূলে আক্ষরিক অর্থকে এড়িয়ে গিয়ে নিহিতার্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। ঠিক এই নিহিতার্থবোধ ছিল ব'লেই বাংলাদেশে নীলকরের অত্যাচারকে প্রতি-ফলিত ক'রে দীনবন্ধু যে লোকনাট্য লিখেছিলেন ,তার নাম দিয়েছিলেন— "নীলদর্পণ।"

মৃভীটেকের 'শিউলি বাড়ি'র নায়িকা চরিত্রে অরুন্ধতী মুখার্জি

চিত্র সমালোচনা

শিউলিবাড়ি ঃ মুভিটেক প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১১,৮৫৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ সুবোধ ঘোষ; চিত্রনাট্য ঃ তপন সিংহ; পরিচালনা ঃ পীযূষ বসু; সংগীত-পরিচালনা ঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ দীনেন গুপ্ত; শব্দধারণ ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল ও সুশীল সরকার (অন্তর্দৃশ্য), অবনী চট্টোপাধ্যায় (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীত-গ্রহণ ও পুনর্শব্দযোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা ঃ সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়; রূপায়ণ ঃ উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, বীরেশ্বর সেন, দিলীপ রায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, মনি শ্রীমানি, জয়নারায়ণ, ননী মজুমদার, চন্দন রায়, কালী চক্র-বর্তী, অমল চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চট্টো-পাধ্যায়, গীতালি রায়, রুবী বেরা, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, পিণ্টু প্রভৃতি। প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ২৩-এ মার্চ থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা' উপন্যাসের পটভূমিকা বহু-বিস্তৃত। রুদ্রবাবু এবং তার ঝিয়ের অবৈধ সন্তান বিজনবিহারী তার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর যখন নিজের জন্ম-পরিচয় জানতে পারা মাত্র পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণনগরের বাস ছেড়ে রাতের অন্ধকারে ভবিতব্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল, সেই সময় থেকে আর্থ কাটিংয়ের কন্ট্রাক্টর হয়ে 'মিট্টিসাহেব' নাম কেনবার মাঝে তাকে দশটি বছর ধ'রে যে-কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল, তার সাধনক্ষেত্র ছিল সুদূর রাজস্থানের চিতোরগড়, ঝান্সী, ঢোলপুর, জব্বলপুর, এবং সবশেষে উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে পালামৌ যাবার পথ। এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনের রূপই বা কি বিচিত্র ঃ উটওয়ালার চাকর, মেওয়া-ওয়ালার তয়খানায় মেওয়া চোলাই ক'রে মদ তৈরীর সাকরেদ, সাহেবের বেয়ারা,

রেলের লাইনম্যান, সার্ভে পার্টীর চেন-ম্যান। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানা না থাকলে "মিট্টিসাহেব" বিজনবিহারীর চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সম্ভব নয়, মাত্র তার শৈশবে বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়া বা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে একলা ট্রেনে চেপে মানকর গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে মেজদির শ্বশুরবাড়ী মাণিকপুরে যাওয়ার বৃত্তান্ত থেকে। মেজদির শ্বশুরবাড়ীর সরকারমশাই বটুকবাবুর মেয়ে কাজলীর সঙ্গে বিজনের যখন ভাব হয়েছিল, তখন তার নিজের বয়স পনেরো এবং কাজলীর বয়স দশ। সাত বছর পরে জব্বলপুরে রেলের লাইনম্যান থাকবার সময়ে লোকো শেডের গেটম্যান টহলদার সিংয়ের কাছ থেকে 'সাদি' করবার তাগিদে সে যখন আবার কাজলীকে দেখতে এসেছিল, তখন কাজলীর নববধূরূপে—মাত্র পনেরো দিন হ'ল তার বিয়ে হয়েছে। এবং তখন কথায় কথায় সেই সাত বছর আগের ডেঁপো মেয়েটা স্পষ্টই বলেছিল : 'তুমি হ্যাঁ বললে আমি না বলতাম না। কখ্খনো না। আমি যে সত্যিই ভেবে-ছিলাম, তুমি ঠিক সময়মত এসে পড়বে। না এসে পারবে না।' এই কথা মনের মধ্যে গাঁথা ছিল বলেই চীফ সার্ভেয়ারের চেনম্যান বিজনবিহারী মাটিকাটার ঠিকেদারী পেয়ে কলকাতা থেকে এক বছরের মেয়াদে কোদাল গাঁইতি ইত্যাদি ধারে পাবার বন্দোবস্ত করবার পর কাজলীর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বিধবা কাজলীকে দস্যুর মত লুট ক'রে আনতে পেরেছিল।

কিন্তু 'শিউলিবাড়ি' ছবিতে বিজন-বিহারীর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবনের যেমন কোনো উল্লেখ নেই, তেমনি নেই নব-বধূ কাজলীর সঙ্গে জব্বলপুরের লাইনম্যান বিজনের সাক্ষাতের দৃশ্য। তাই পথচলতি বালক বিজন থেকে মুণ্ডিত ভাষাভাষী মিট্টিসাহেব-বেশী বিজনকুমারে পরিবর্তন যেমন আক-স্মিক, তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হয়েছে এক যুগ অদর্শনের পর বিধবা কাজলীর অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক বিজনবিহারীর সঙ্গে চিরপরিচিতের মতো অন্তরঙ্গভাবে কথা বলা।

একটি স্থান-কালের দিক দিয়ে বিস্তৃত পরিসরের কাহিনীকে একটি সাড়িদীর্ঘ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে গেলে চিত্রনাট্যকারকে মোটামুটি গল্পটিকে একটি সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে আনতে গিয়ে 'কোন্‌টা রাখি, কোন্‌টা ছাড়ি'—গোছের যে-দ্বিধায় পড়তে হয়, তার হাত থেকে চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ মুক্তি পাননি। এবং ফলে একেবারে শেষের পর্যায়ে এসে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বিষোদ্গারী করালী-চরণের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত দৃশ্য-রচনায় বহু স্থানেই বহু ফাঁক লক্ষ্য করা গেছে।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা'কে একটি বিষয়ে 'শিউলিবাড়ি' চিত্র-কাহিনী অতিক্রম ক'রে গেছে। জন্মকে অতিক্রম ক'রে মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হ'ল তার কাজ—'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মম, কিন্তু পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর', সূতপুত্র কর্ণের এই বাণীকে মূর্ত করতে গিয়ে কাহিনীকার সুবোধ ঘোষ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, যেখানে তিনি বিজনবিহারী এবং নিরুপমাকে (কাজলীর পোশাকী নাম) অপমানিত জীবনের সমাপ্তি সাধনের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে ছবির কাহিনী মনুষ্যসমাজের বিবাহ-প্রথাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নরনারীর জন্মপরিচয়কে সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে একটি অত্যন্ত অনাবশ্যক জিজ্ঞাসা ব'লে প্রমাণ করবার দুরূহ সাধনা করেছে। এদিক দিয়ে শিউলিবাড়িকে পোলিশ-চিত্র 'অ্যাসেস অ্যাণ্ড ডায়া-মণ্ডস' (Ashes and Diamonds) থেকেও দুঃসাহসিক আখ্যা দেওয়া যায়। পুষ্কর দত্ত যখন নিজের কাকা করালীচরণকে নিজের হাতে টেনে হিঁচড়ে তুলে 'এখানে তোমার ঠাঁই নেই' বলে শিউলিবাড়ি থেকে রওনা করিয়ে দিল, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত 'শিউলি-বাড়ি' ছবি দৃশ্যের পর দৃশ্য দিয়ে যে-ভাবে যে-কথা বলেছে, সে-ভাবে সে-কথা বাংলা ছবি কেন, পৃথিবীর কোন্ দেশের ক'খানা ছবিতে শোনা গেছে, তা আমাদের জানা নেই। এবং এই যে বলা, তা এমনভাবে বলা যে, অন্তর মথিত হয়, হৃদয় স্তব্ধ হয়, চক্ষু আর্দ্র হয়, ছবির সঙ্গে একান্ত হয়ে মন সুন্দর বেদনায় অভিষিক্ত হয়।

ছবিতে বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্যের মিলন ঘটেছে বারে বারে। দিন-রাত্রি, আলো-আঁধারি, রোদ-বৃষ্টির খেলা—সমস্তই অতি বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়েছে দীনেন গুপ্তের ক্যামেরার সাহায্যে। শব্দধারণও যতদূর সম্ভব শ্রুতিগ্রাহ্য ; বিশেষ ক'রে বহির্দৃশ্যের এত ভালো শব্দগ্রহণ কচিৎ কানে আসে। শিল্পনির্দেশে যথেষ্ট বাস্তব-ধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিতে একটি মাত্র গান 'রাই জাগো' বারে বারে এসেছে যেন গল্পের মূল বাণী বহন ক'রে। এবং গানখানি বারবার শোনবার মতো। আবহসংগীতে অপূর্ব ভাবসৃষ্টি করেছেন আলি আকবর খাঁ তাঁর একক স্বরোদ বাদনে। অপরাপর জায়গায় আবহসংগীত অত্যন্ত সীমিত। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরি-চালনায় মৃদু সংগীতরচনায় পক্ক-পাতিত্ব দেখিয়েছেন।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় বিধবা কাজলী বা নিরুপমাবেশিনী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের। 'মাটিবাবু'র অন্তরকে জাগিয়ে রাখার কাজ, তার সঙ্গিনী নিরুর, এই সহজ কথাকে তিনি কোন সময়েই বিস্মৃত হননি। নায়ক-বেশে উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। জমিদার রুদ্রবাবুর চরিত্রকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন ছবি বিশ্বাস তাঁর সাবলীল অভিনয় দ্বারা। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুনন্দা (বা নন্দরাণী) সুন্দর ; বিশেষ ক'রে জন্ম-রহস্য জানবার পর তার

আবেগপূর্ণ অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অপরাপর চরিত্রে দিলীপ রায় (পটকের), বীরেশ্বর সেন (জমিদারবাবু), চন্দন রায় (কমল), তরুণকুমার (শিখ ব্যবসায়ী) প্রভৃতি কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন।

'শিউলিবাড়ী'র মত দুঃসাহসিক চিত্র উপহার দেবার জন্যে তরুণ পরিচালক পীযূষ বসু এবং প্রযোজক প্রবোধ মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাই।

'হিজ মাস্টারস ভয়েস' রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'

'মায়ার খেলা' মুখ্যতঃ শৃঙ্গার রসের নাটক। প্রেমিক জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ এই গীতি-নাটকের উপজীব্য। এর প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে কবিগুরুর হৃদয়রসে সিঞ্চিত অমিয়-মধুর বাণী, এর চরম পরিণতিতে নিয়তির নির্মম নির্দেশে কবির পরিণত বিবেচনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য ও তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই গীতি-নাট্যটি তাই বিশেষভাবে মনকে দোলা দেয়। এ নাটকের শিল্পী নির্বাচনে নিরতিশয় সাবধানতা অবলম্বন না করলে কেবল যে নাটকীয় রস ফুটিয়ে তোলা কঠিন তাই নয়, বিচ্ছিন্নভাবে কোন একক বা সমবেত সঙ্গীত সার্থক হলেও সমগ্র নাটকের একটি নিটোল পরিচ্ছন্ন রূপ পরিস্ফুট করাও দুরূহ। বলতে গেলে সমস্ত গীতি-নাটকটি মায়াকুমারীগণের সমবেত সঙ্গীতের পটভূমিতে বিধৃত। প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের পরিবর্তনশীল রসাভাস ফুটিয়ে তোলা সত্যই এক দুরূহ শিল্পকর্ম—বিশেষ করে নিয়ত গীতিস্রোতে সঞ্চারমান ঘটনাবলী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অপরিবর্তনীয় সুরসৌষ্ঠবে সুসমঞ্জস রাখা কুশলী কলাকারের পক্ষেও কষ্টসাধ্য কর্ম। সুখের বিষয় 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে পরিবেশিত 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটির সাফল্য এই সুকঠিন পরীক্ষার কষ্টি পাথরে সোনার আখরে জ্বলজ্বল করছে।

গত ষোলই মার্চ শুক্রবার কলকাতার লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে গ্রামোফোন কোম্পানী মায়ার খেলা রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার এক বিশেষ আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, শ্যামল মিত্র, সুমিত্রা সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সেন এবং শ্রীপর্ণা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর কয়েকজন সদস্য এবং সাংবাদিকগণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতরসিক অতিথিও উপস্থিত ছিলেন।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমদা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের অশোক, শ্যামল

তপন সিংহ পরিচালিত তারাশংকরের অমর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রায়িত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চিত্রে কালী ব্যানার্জি ও নিভাননী

রেকর্ডে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে টি কর্ড (কেন্দ্রস্থলে) ও রেকর্ডিং অধিকর্তা মিঃ পি কে সেন (পিছনের সারিতে সর্বদক্ষিণে)
(বাম হতে): শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা রায়, মিঃ জর্ড, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শ্রীপর্ণা ঘোষ, কৃষ্ণা সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসনের 'বধূ' চিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জি

মিত্রের অমর এবং মঞ্জু গুপ্তের শান্তা তাঁদের শিল্পী-জীবনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে। অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীরাও অতি সুন্দরভাবে তাঁদের নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; তাতে সমগ্র নাটকটি একটি স্ফটিকখণ্ডের মত নির্মল পরিচ্ছন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মায়ার খেলা গোটা নাটকটি একখানি মাত্র ৩৩⅓ আর পি এম, লং প্লেইং রেকর্ডে (EALP 1269) প্রকাশিত হয়েছে। এতেও নাটকটি উপভোগ করবার পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। তবে যারা সাধারণ রেকর্ডে পেতে চান তারাও যাতে প্রায় সমান সুবিধা ভোগ করতে পারেন, তারজন্যে একই সঙ্গে ছয়খানি ৭৮ আর পি এম রেকর্ডের অটো-কাপলিং সেট (P 11958-63) হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছে। এই সেট স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড প্লেয়ারে বাজাবার সুবিধা পাওয়া যায়। উভয়প্রকার সেটেই পরিচ্ছন্ন চিত্রসংযোজন গ্রামোফোন কোম্পানীর সুরুচির পরিচয় দেয়। আমরা 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিবিধ সংবাদ

দশরূপকের "উর্বশী নিরুদ্দেশ" :

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় লিখিত "উর্বশী নিরুদ্দেশ" নাটিকাটি একটি কল্পনামূলক রোমাঞ্চ নাটক, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ফ্যাণ্টাসি (fantasy)। কিন্তু নাটিকাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে কৃতি নাট্যকার পরেশ ধর এর মূল সুরটিকে ব্যাহত করেছেন, এ-কথা দুঃখের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে। বিশেষ ক'রে নির্ভয় ডাক্তারের সঙ্গে গৌতম-ভগ্নী কৃপার সম্পর্কটিকে এক তরফা প্রেম নিবেদনের অবতারণা ক'রে নাটকটিকে না কল্পনামূলক, না বাস্তব—একটি জগাখিচুড়ীতে পরিণত করেছেন। এতে মূল নাটকের সুর গেছে কেটে এবং নাটকটি হয়ে পড়েছে অবাস্তব।

তার ওপর এর প্রযোজনাও হয়েছে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এমন কি, মঞ্চ-পরিকল্পনায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য সুষ্ঠুভাবে দেখানো হয়নি চন্দ্রালোকের মায়া সৃষ্টি করতে না পারার জন্যে। যদিও নাট্যপ্রযোজনায় এই মঞ্চ-পরিকল্পনাটিই উল্লেখযোগ্য অবদান। সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে সাজসজ্জা। উর্বশীকে যে-সাজে প্রথম আবির্ভূত করানো হয়েছে, তা উর্বশী সম্বন্ধে হতাশারই সঞ্চার করে। উর্বশীর ভূমিকাভিনেত্রী রবি মিত্র সুরূপা গৃহস্থ ঘরনী সাজতে পারেন, কিন্তু উর্বশীরূপে একেবারেই অচল। উর্বশীর অভিনয়ও হতাশাব্যঞ্জক, তাঁর বাচন ঐ ভূমিকার অত্যন্ত অনুপযোগী। স্বর্গস্থ দেবতাদের যে-রূপসজ্জায় মঞ্চে আনা হয়েছে, তাও ফ্যাণ্টাসি-সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাঁদের মধ্যে তপন দাসের চিত্র সেনের ভূমিকাভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। আর আনন্দ দিয়েছে ভৃত্য শ্যামুর ভূমিকায় যতীন কর্মকারের অভিনয়। কৃপা-রূপিনী হিমানী গাঙ্গুলী তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ সত্ত্বেও অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে ভাস্করের ভূমিকায় তারক ধর ও গৌতমের ভূমিকায় পান্না চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

নাট্যকার সংঘের অনুষ্ঠান :

গেল বছর ৫ই মার্চ বাঙলার সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ-বছরের ২৪-এ মার্চ তাঁর বাৎসরিক কার্য উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর পুত্রদের দ্বারা। ঐ দিনই সন্ধ্যায় মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে নাট্যকার সংঘের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভায় শচীন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথম বছরের (১৯৬১ সালের) শচীন্দ্র নাট্যপুরস্কারটি ঘোষিত হয়। বর্তমান বাঙলার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ডাক্তার নীহার গুপ্তের বদান্যতায় এই পুরস্কারটি এবারে পেলেন বাঙলার জীবিত নাট্যকারদের মধ্যে প্রবীণতম, বর্তমানে বারাণসীবাসী শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। যে ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী হয়ে বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করে, সেই বছরই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে বাজীমাৎ করে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

এস ডি বনসালের 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও রঞ্জনা ব্যানার্জি

"বাজীরাও"। আমরা এই প্রবীণ নাট্যকারের সম্মানে আনন্দিত। আমরা তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও সক্রিয় লেখনীসহ দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

মণ্ডমুগ্ধের বার্ষিক পুরস্কার :

১৯৬১ সালে রচিত বা প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যে-নাটক প্রথম স্থান অধিকার করবে, তার নাট্যকারকে ১৯৬২ সালের ১০০০্ টাকা পুরস্কার দেবার জন্যে মণ্ডমুগ্ধের কর্তৃপক্ষ নাট্যকার সংঘকে ভারার্পণ করেছেন। কোন্ সূত্র অবলম্বন করলে বিচার সম্পর্কে একটি ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে আসা যায়, এ-সম্পর্কে মতামত দেবার জন্যে সংঘ কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে লিখিত প্রস্তাব ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে "সম্পাদক, নাট্যকার সংঘ, ৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯"—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মুখোশের উৎসব :

"অঘটন আজো ঘটে"র ১০০-রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার সাফল্যে "মুখোশ"-এর সভাবৃন্দ তাঁদের শুভানুধ্যায়ী অগণিত বন্ধুবান্ধবকে যে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন, তাতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। ঐ উৎসবমুখরিত সন্ধ্যায় আমরা সর্বান্তঃকরণে এই কামনা জানিয়েছিলুম যে, "মুখোশ"-এর দলগত সাফল্য যেন বৎসরে বহুবার ঐ-ধরণের সন্ধ্যাকে ফিরে ফিরে আনতে সমর্থ হয়।

বার্নপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়

গেল ২৩-এ মার্চ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বার্নপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্য বিভাগ কর্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত "সংক্রান্তি" নাটকটি সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই নাটকটিতে যাঁরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় অভিনয় করেন তাঁরা হচ্ছেন মলয় মুখোপাধ্যায় (রতন) এবং পরিচালক স্বয়ং (শুক্ক)। এ ছাড়া সুঅভিনয় করেছেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (চন্দ্রমাধব), বিনয় চট্টোপাধ্যায় (হর্ষনারায়ণ), প্রদীপ ঘোষ (সয়ারাম), জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (রমাই), দুলাল দত্ত (চরণ), তারা ভাদুড়ী (নিস্তারিণী), মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় (সীতা) ও স্বপ্না মিত্র (দুর্গা)।

জর্জিয়ান নৃত্য সংকলন :

এ-হপ্তার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জর্জিয়ান নৃত্য সংকলন ২৯-এ মার্চ থেকে আরম্ভ হয়ে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন প্রতি সন্ধ্যা সাতটার সময়ে নিজাম প্যালেসের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর

বার্বাদোজ : ৩১৪ রাণ (কিং ৮৯, হল ৮৮, স্মিথ ৬১। প্রসন্ন ১৫৮ রাণে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় একাদশ : ৮৬ রাণ (ইঞ্জিনীয়ার ৩৬ এবং জয়সীমা ৩৪; হল ৭ রাণে ২, সোবার্স ৮ রাণে ২ এবং গ্রিফিথ ৩০ রাণে ২ উইকেট। কন্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকার তাঁদের নিজস্ব ২ রাণের মাথায় গ্রিফিথের বলে আহত হয়ে প্রথম ইনিংসের খেলা থেকে বরাবরের মত অবসর গ্রহণ করেন।

ও ২১৩ রাণ (মঞ্জরেকার ১০০, সুর্তি ৩১ ও নাদকার্ণী ৩১। কন্ট্রাক্টর, উমরীগড় এবং প্রসন্ন খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন)।

বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে চারদিনের খেলায় ভারতীয় একাদশ দলের অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর টসে হেরে যান—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তাঁর এই প্রথম টসের হার। যাঁরা তুক-তাকে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন এই টসের হারই ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের শুভসূচনা। সফরের প্রথম খেলা থেকেই ভারতীয় দল উপর্যুপরি ৬টা খেলায় টসে জয়ী হয়েছিল কিন্তু কোন খেলায় জিততে পারেনি—ভারতবর্ষের হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভারতবর্ষ টসে হেরে গিয়েও খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি; উপরন্তু প্রথম ইনিংশের খেলায় কন্ট্রাক্টর গ্রিফিথের 'বাম্পার' বলে ঘায়েল হয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেলে ছিলেন।

বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল না হলেও তারা প্রথমদিকের ধাক্কা খুব সামলে নিয়েছিল। দলের ১২০ রাণের মধ্যে ৪টে উইকেট পড়ে যায়—৩৯ রাণে ১ম, ৯৮ রাণে ২য়, ১১৮ রাণে ৩য় এবং ১২০ রাণের মাথায় ৪র্থ উইকেট। এঁদের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড় রাণ-আউট হন। দলের এই বিপর্যয়ের মুখে ৫ম উইকেটের জুটি সোবার্স এবং এ্যাম্বর্ন কিং ৬৫ মিনিটের খেলায় দলের ৫৫ রাণ তুলে দেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কিং এবং হোয়াইট খুব তাড়াতাড়ি রাণ তুলেন—৪০ মিনিটে ৬৩ রাণ। এর পর প্রথম দিনের খেলায় ৬ উইকেট পড়ে বার্বাদোজ দলের ৩১৯ রাণ ওঠে। কিং (৮৭ রাণ) এবং ওয়েসলি হল (৪৬ রাণ) নট আউট থাকেন। ৭ম উইকেটের এই নট আউট জুটি এইদিন ৮১ রাণ তুলে দেন। এইদিনের খেলায় অনেকগুলি 'ক্যাচ' মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায়।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগেই বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংস ৩১৪ রাণে শেষ হয়। ভারতীয় দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ অনেক বেশী রাণ ওঠে; ৩০০ রাণের মধ্যেই বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে বলবার কিছু থাকতো না। দ্বিতীয় দিনে প্রসন্নের বলে ওয়েসলি হল দু'দুবার মঞ্জরেকারের হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৮৮ রাণ করে আউট হ'ন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই ৮৮ রাণই হলের পক্ষে সর্বোচ্চ রাণ। কিং এবং হলের ৭ম উইকেটের জুটিতে শেষ পর্যন্ত ৮৭ রাণ ওঠে।

লাঞ্চের কিছু আগে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দলের মাত্র ২ রাণের মাথায় সারদেশাই এবং সুর্তি গোল্লা করে খেলা থেকে বিদায় নেন। এরপর গ্রিফিথের বাম্পার বলে আহত হয়ে কন্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকার খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। গ্রিফিথ, হোয়াইট এবং রক—বিশেষ করে গ্রিফিথের বোলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয় দলের অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। গ্রিফিথের বাম্পার বলে মঞ্জরেকার কপাল-জোরে সামান্য রকম আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু কন্ট্রাক্টর গুরুতর রকমের আঘাত পেয়ে খুব জোর বেঁচে গেছেন। এই অবস্থায় দলের খেলোয়াড়দের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তারই পরিণতি দেখলাম—৮৬ রাণে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ, মাত্র আড়াই ঘণ্টার খেলায়। গ্রিফিথ, সোবার্স এবং হল দুটো ক'রে উইকেট পান। মঞ্জরেকার এবং কন্ট্রাক্টর সেই যে খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন আর খেলতে নামেন নি। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে জয়সীমা এবং ইঞ্জিনীয়ার ৫৭ মিনিটের খেলায় দলের ৬১ রাণ তুলে দেন।

ভারতীয় দল ৩০৮ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় দলের কন্ট্রাক্টর ছাড়া আরও দুজন—উমরীগড় এবং প্রসন্ন অসুস্থতা এবং চোট খাওয়ার দরুণ ব্যাট করতে নামেননি। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের ২টো উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৫৬ রাণ ওঠে।

একদিন বিশ্রামের পর তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনের ৫৬ রাণের সঙ্গে কোন রাণ যোগ হল না এদিকে দুজন খেলোয়াড়—সারদেশাই এবং পতৌদির নবাব আউট হলেন, গ্রিফিথের একই ওভারের বলে। লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ১২১ রাণ, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন মঞ্জরেকার (৩৫ রাণ) এবং নাদকার্ণী (২৯ রাণ)। ৫ম উইকেটে এই জুটি ৪০ মিনিটের খেলায় দলের ৬৫ রাণ তুলে দিয়ে লাঞ্চের সময় নট আউট থাকেন। দলের ১৩৬ রাণের মাথায় নাদকার্ণী ৩১ রাণ করে আউট হলে মঞ্জরেকার এবং নাদকার্ণীর ৫ম উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে ৯৫ মিনিটের খেলায় দলের ৮০ রাণ ওঠে। ৬ষ্ঠ উইকেট ১৬৩ এবং ৭ম উইকেট দলের ২১৩ রাণের মাথায় পড়ে যায়। ৭ম উইকেটে মঞ্জরেকারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন রঞ্জনে। রঞ্জনে আধ ঘণ্টা উইকেট কামড়ে থেকে মাত্র পাঁচ রাণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর এই খেলার দরুণই মঞ্জরেকার শত রাণ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৫০ রাণ ওঠে। রঞ্জনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। মঞ্জরেকার শত রাণ করে নট-আউট থাকেন। ভারতীয় দলকে এক ইনিংস এবং ৯৫ রাণে হার স্বীকার করতে হয়। দুই দলই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

এই খেলাটির প্রতি ভারতীয় দলের কোন আকর্ষণ ছিল না। দলের অধিনায়ক গুরুতরভাবে আহত এবং তাঁর উদ্বেগজনক অবস্থায় সমস্ত দলটি মুষড়ে পড়ে। খেলার আইন অনুযায়ী দায়ে পড়েই তাদের বাকি খেলাতে যোগ দিতে হয়েছিল।

॥ বাম্পার প্রসঙ্গ ॥

বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর গ্রিফিথের বাম্পার বলে গুরুতরভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। এই আঘাতের জের অনেকদূর গড়িয়েছিল। আঘাতের ফলে কন্ট্রাক্টরের দেহের বামদিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রাণরক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথায় দুটি জটিল অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এবং

সম্পাদক বিশ্বের খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের অনুরোধ জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের অনুরোধ ছিল— কন্ট্রাক্টরের আশু আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। এই থেকেই অবস্থার গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

বাম্পার বলে কন্ট্রাক্টরের গুরুতের জখম উপলক্ষ্য ক'রে ইতিমধ্যে বিলেতে বাম্পার বল অবৈধ হিসাবে ঘোষণার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। লণ্ডন ক্রিকেট সোসাইটির সভাপতি ডঃ ডবলাউ আর কক্সাট এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। বাম্পার বলে কন্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকারের আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ ক'রে তিনি এম-সি-সি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, বাম্পার বল সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, বাম্পার বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভীত করা অথবা আঘাত করা ছাড়া বোলারের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। ক্রিকেট খেলার স্বার্থে বাম্পার এই দিক থেকে খুবেই ক্ষতিকর। তাই তাঁর প্রস্তাব, আম্পায়ারের বিচারে বাম্পার বল ধার্য হ'লে বোলারের বিপক্ষ দলকে প্রতি বাম্পার বলে ৬ রাণ ক'রে খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে ব্যাটসম্যানের আহত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ডাঃ কক্শাটের এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে ব্যাটসম্যানদের আর 'বাপ্ বাপ্ ডাক' ছাড়তে হবে না। বাম্পার বল ঐ ডাকেই মাঠ-ছাড়া হবে। বাম্পার বলের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন বৃটেনের প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক পিটার উইলসন। তাঁর মতে, বাম্পার বলে আহত হওয়ার পর আহত খেলোয়াড়ের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করার প্রথা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং খেলোয়াড়-নির্বাচক সমিতির সভ্য সিরিল ওয়াসব্রুক বাম্পার বলের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, ফাস্ট বোলারের প্রধান অস্ত্রই হ'ল এই বাম্পার বল। বাম্পার বল ব্যাটসম্যানকে আতঙ্কিত করে এ কথা ওয়াসব্রুক বিশ্বাস করতে রাজী হননি। তাঁর মতে বাম্পার বল দেওয়ার অর্থ অন্য কিছু নয়, হুক ক'রে 'চার' অথবা 'ছয়' রাণ করার জন্যে ব্যাটস্ম্যানের প্রতি বোলারের চ্যালেঞ্জ।

ক্রিকেট খেলার পদ্ধতির ইতিহাসে দেখা যায়, বোলাররা যেমন একদিকে নতুন নতুন অস্ত্রে ব্যাটসম্যানদের আক্রমণ করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন অন্যদিকে ব্যাটসম্যানরাও তেমনি বোলারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপায়ও মাথা খেলিয়ে বের করেছেন। কিন্তু বাম্পার বল সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। এই বলের মুখে পড়ে অনেক প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানকে শারীরিক আঘাত পেতে হয়েছে। খেলায় আকস্মিক আঘাতের উপর কারও হাত নেই। কিন্তু বাম্পার বলের আঘাত আকস্মিক ঘটনা নয়। খেলোয়াড়দের এই আঘাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব কাজ নয়।

॥ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ॥

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত তিন বছরের বিজয়ী বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে গত বছরের রানার্স-আপ রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি চারবার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভ করেছে। এই নিয়ে বোম্বাই ১৩ বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভ করলো। আলোচ্য ফাইনাল খেলা নির্দিষ্ট পাঁচদিন পর্যন্ত গড়ায়নি। চতুর্থ দিনের লাঞ্চের পরবর্তী ৪৫ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৫৩৯ রানে শেষ হয় ৫০০ মিনিটের খেলায়। রাজস্থানের দুটো ইনিংস ২৯৮ মিনিট স্থায়ী ছিল, প্রথম ইনিংস ১৮৫ মিনিট এবং দ্বিতীয় ইনিংস ১১৩ মিনিট। বোম্বাই দলের ৫৩৯ রাণের মধ্যে অর্ধেকের বেশী রান তুলে দেন অজিত ওয়াদেকার (২৩৫ রান) এবং গুলাবরাই রামচাঁদ (১০০ রান)। এই দুজনের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ২৬৩ রান উঠে যায়। রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংসে বোম্বাই দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন বালু গুপ্তে (৩৫ রানে ৪ উইকেট) এবং সরদ দিওয়াদকার (৬৮ রানে ৫ উইকেট)। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পাই, রামচাঁদ, গুপ্তে এবং দিওয়াদকার —প্রত্যেকেই দুটো ক'রে উইকেট পান। দুটো ইনিংসের খেলায় বালু গুপ্তে ৬১ রানে ৬টা উইকেট পান। অপরদিকে দিওয়াদকার পান ৭টা উইকেট ৮৭ রানে।

বোম্বাই : ৫৩৯ রান (অজিত ওয়াদেকার ২৩৫, জি এস রামচাঁদ ১০০ এবং সরদ দিওয়াদকার ৪৪)

রাজস্থান : ১৫৭ রান (সূর্যবীর সিং ৩২। বালু গুপ্তে ৩৫ রানে ৪ এবং সরদ দিওয়াদকার ৬৮ রানে ৫ উইকেট) ও ৯৫ রান (সি জি যোশী ৪৪। পাই ৩১ রাণে ২, রামচাঁদ ১৬ রাণে ২, গুপ্তে ২৬ রাণে ২ এবং দিওয়াদকার ১৯ রাণে ২ উইকেট)।

রঞ্জি ট্রফির খেলায় বিশ্ব রেকর্ড

রঞ্জি ট্রফির খেলায় অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি আজও পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে অক্ষুন্ন আছে।

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রাণের রেকর্ড : ২৩৭৬ (৩৮ উইকেটে)—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা, ১৯৪৮।

পার্টনারশিপ রেকর্ড : ৫৭৭ রাণ (৪র্থ উইকেটের জুটিতে)—ভি এস হাজারে এবং গুল মহম্মদ, হোলকার দলের বিপক্ষে, বরোদা, ১৯৪৬-৪৭।

এই ৫৭৭ রাণ যে কোন উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ রাণ (২য় উইকেটের জুটিতে) —বি বি নিম্বলকার এবং কে ভি ভাণ্ডারকার (মহারাষ্ট্র), কাথিয়াড় দলের বিপক্ষে, পুণা, ১৯৪৮-৪৯।

এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৬টি—হোলকার; মহীশূর দলের বিপক্ষে, ১৯৪৫-৪৬।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৯টি—বোম্বাই (৫) বনাম মহারাষ্ট্র (৪), ১৯৪৮-৪৯।

॥ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

ভূপালের আইসবাগ ষ্টেডিয়ামে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালের (১৯৬২) দ্বিতীয় দিনে গত বছরের রাণার্স-আপ পাঞ্জাব দল ১—০ গোলে ভূপাল দলকে পরাজিত করে রঙ্গাস্বামী কাপ জয়লাভ করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত ছিল। গত বছরও ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে পাঞ্জাব গোলশূন্যভাবে রেলওয়ে দলের সঙ্গে খেলা ড্র করেছিল কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ০—১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। এই নিয়ে পাঞ্জাব ৮ বার ফাইনালে জয়লাভ করলো (১৯৩২, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১, ১৯৫৪, ১৯৬২)। প্রতিযোগিতার রাণার্স-আপ হয়েছে ৫ বার। অপরদিকে ভূপাল দল ফাইনালে জয়ী হয়েছে ২ বার (১৯৪৫ ও ১৯৪৮) এবং রাণার্স-আপ হয়েছে ২ বার।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ভূপাল প্রথম রাউণ্ড থেকেই খেলে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাঞ্জাব দল খেলেছিল কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে। ভূপাল এ বছরের রাণার্স-আপ হিসাবে মানাভাদার কাপ পেয়েছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ২৩টি দল যোগদান করে। শেষ সময়ে মহীশূর প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে। সরাসরি কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলেছিল চারটি দল—বোম্বাই, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ (গতবারের বিজয়ী), সার্ভিসেস এবং পাঞ্জাব (গতবারের রানার্স-আপ)। কোয়ার্টার-ফাইনালে ভূপাল ১—০ গোলে বোম্বাইকে, ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ ৩—০ গোলে মহাকোশলকে, সার্ভিসেস ২—০ গোলে দিল্লীকে এবং পাঞ্জাব ১—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনাল
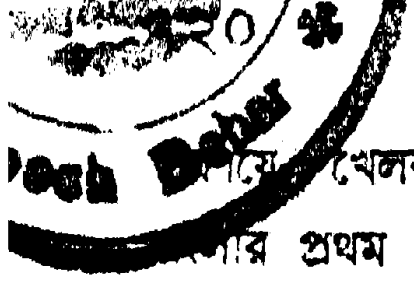
...খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ...ার প্রথম খেলা পড়েছিল দিল্লীর সঙ্গে ৪র্থ রাউণ্ডে। দিল্লী ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে ০—২ গোলে সার্ভিসেস দলের কাছে পরাজিত হয়। এবার প্রতিযোগিতায় মাত্র একটা হ্যাট-ট্রিক হয়েছে। মহাকোশল দলের কাশীপ্রসাদ ৪র্থ রাউণ্ডে উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে এই হ্যাট-ট্রিক করেন।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথমার্ধ

প্রথম রাউণ্ড : ভূপাল ৩ : উড়িষ্যা ০; মহাকোশল ৫ : আসাম ১

দ্বিতীয় রাউণ্ড : মহাকোশল ১, ৪ : রাজস্থান ১, ০;

তৃতীয় রাউণ্ড : ভূপাল ৪ : পাতিয়ালা ০; মহাকোশল ৪ : মহারাষ্ট্র ০

চতুর্থ রাউণ্ড : ভূপাল (ওয়াকওভার) : মহীশূর; মহাকোশল ৩ : উত্তর-প্রদেশ ১

কোয়ার্টার-ফাইনাল : ভূপাল ১ : বোম্বাই ০; ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ৩ : মহাকোশল ০

সেমি-ফাইনাল : ভূপাল ০, ১ : ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ০, ০

দ্বিতীয়ার্ধ

প্রথম রাউণ্ড : বিহার ৩ : কেরালা ০; মধ্যভারত ২ : অন্ধ্র ১

দ্বিতীয় রাউণ্ড : দিল্লী ৪ : বিহার ২; বিদর্ভ ০, ১ : মধ্যভারত ০, ০

তৃতীয় রাউণ্ড : দিল্লী ৩ : হায়দ্রাবাদ ০; বিদর্ভ ০, ০ ২ : গুজরাট ০, ০, ১

চতুর্থ রাউণ্ড : দিল্লী ১ : বাংলা ০; মাদ্রাজ ২ : বিদর্ভ ০

কোয়ার্টার-ফাইনাল : সার্ভিসেস ২ : দিল্লী ০; পাঞ্জাব ১ : মাদ্রাজ ০

সেমি-ফাইনাল : পাঞ্জাব ১, ৪ : সার্ভিসেস ১, ১

ফাইনাল

পাঞ্জাব ০, ১ : ভূপাল ০, ০

॥ চতুর্থ এশিয়ান গেমস ॥

আগামী আগষ্ট মাসে জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান গেমস আরম্ভ হবে। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে 'যোগ্যতার ন্যূনতম মান' নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই মান বিশ্ব অলিম্পিক মানের তুলনায় অনেক নীচু স্তরের। ভারতীয় অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি রাজা বালিন্দর সিং ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতার এই ন্যূনতম মাপকাঠি সম্পর্কে বলেছেন, বিগত টোকিও ক্রীড়ানুষ্ঠানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রীড়া-কুশলতা এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির বর্তমান ক্রীড়া-মানের উপর লক্ষ্য রেখে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য এই ন্যূনতম মান নির্ধারিত হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এই নির্ধারিত ক্রীড়ামান কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই উচ্চ স্তরের।

ইতিমধ্যে ৪৪ জন ক্রীড়াবিদকে (৩৫ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা) বাংগালোরের শিক্ষণ-শিবিরে মহড়া দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ৩৫ জন পুরুষ এ্যাথলিটের মধ্যে বাংলার কোন প্রতিনিধি স্থান পাননি। আমন্ত্রিত ৯ জন মহিলার মধ্যে বাংলার হকিন্স (১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়) এবং ব্রাউটন (হাইজাম্প) আছেন। এই ৪৪ জন এ্যাথলিটের থেকে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় দল গঠন করা হবে।

যোগ্যতার মান

বিষয়	পুরুষ	মহিলা
৮০ মিঃ হার্ডলস	—	১১·৬ সেঃ
১০০ মিঃ দৌড়	১০·৭ সেঃ	১২·৩ সেঃ
২০০ মিঃ দৌড়	২১·৫ সেঃ	২৬·১ সেঃ
৪০০ মিঃ দৌড়	৪৮·৫ সেঃ	
৮০০ মিঃ দৌড়	১ মিঃ ৫২·২ সেঃ	
১,৫০০ মিঃ	৩ মিঃ ৫৮·২ সেঃ	
৫,০০০ মিঃ	১৪ মিঃ ৪১ সেঃ	
১০,০০০ মিঃ	৩০ মিঃ ৪২ সেঃ	
৩০০০ মিঃ স্টিপলচেজ	৯ মিঃ ৩·৯ সেঃ	
১১০ মিঃ হার্ডলস	১৪·৫ সেঃ	
৪০০ মিঃ হার্ডলস	৫২·৮ সেঃ	
৪×১০০ মিঃ রিলে	৪১·৪ সেঃ	৪৯·০ সেঃ
৪×৪০০ মিঃ রিলে	৩ মিঃ ১৮·০ সেঃ	
ম্যারথন দৌড়	২ ঘঃ ২৭ মিঃ ২২ সেঃ	
হাই জাম্প	৬ ফুঃ ৬¾ ইঃ	৫ ফুঃ ১½ ইঃ
লং জাম্প	২৪ ফুঃ ৬¾ ইঃ	১৮ ফুঃ ৮¾ ইঃ
হপস্টেপ ও জাম্প	৫০ ফুঃ ৬½ ইঃ	
পোল ভল্ট	১৩ ফুঃ ৯¾ ইঃ	
শটপুট	৪৯ ফুঃ ৩¾ ইঃ	৪২ ফুঃ ১০½ ইঃ
ডিস্কাস নিক্ষেপ	১৫০ ফুঃ ১১½ ইঃ	১৪০ ফুঃ ৯ ইঃ
বর্শা নিক্ষেপ	২৩৩ ফুঃ ৩ ইঃ	১৫১ ফুঃ ১½ ইঃ
হাতুড়ি নিক্ষেপ	১৯৭ ফুঃ ০½ ইঃ	
ডেকাথলন	৫,৯৬৮ পয়েন্ট	

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 6th April 1962.
40 Naya Paise.

সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার-বিতরণ সভায় উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ সমবেত সর্বভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যে-সব অভিশাপে সমাজ-জীবন জর্জরিত, সেগুলি দূর করে এক সর্বাধিক সুন্দর সমাজ গ'ড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকগণ যেন মানুষের মনকে শিক্ষার আলোকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান কালের ভীতি, বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক মনোভাবের কথা উল্লেখ ক'রে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক ঐক্যসাধনের পথে সাহিত্যের বিশেষ কার্যকারিতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, এ যুগটা হল বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির যুগ, এবং একালে শিল্প-সাহিত্য কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। পারমাণবিক শক্তি এবং রকেট-বিদ্যার প্রসাদে মানুষ আজ একদিকে যেমন সমস্ত পৃথিবীকে করতলস্থিত আমলকীর মতো আয়ত্ত করে মহাকাশ-বিজয়ে উদ্যত, অন্যদিকে তেমনি এক সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতা-বোধ তার সৃষ্টি-প্রতিভাকে সঙ্কুচিত ক'রে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির সংকীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ করতে চাইছে। শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তি-মানুষের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ব্যক্তি বনবাসী নয়, সমাজবাসী। সমাজের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন করে কোনো সাহিত্যই দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে না, এবং সেই জন্যেই একাকীত্বের সাধনায় প্রাথমিক কিছু বিভূতি লাভ করলেও এ যুগের সাহিত্যকর্মে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। তাই সমগ্র মানবসমাজই আজ এক নিদারুণ স্ববিরোধিতার সম্মুখীন—তার একদিকে ভবিষ্যৎ জয়ের বিপুল সম্ভাবনা, অন্যদিকে গভীর হতাশার ঘূর্ণাবর্ত।

এই আপাত বৈষম্যকে অতিক্রম করতে না পারলে আমাদের অগ্রগতির সাধনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ ঠিকই বলেছেন, সকলের আগে দরকার মানুষের মনকে সুসংস্কৃত করে তোলা। বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার মানুষকে যতোই শক্তিশালী করুক, তার মানবিক মূল্যবোধগুলি যদি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়, তবে মানুষ এবং উচ্চতম পর্যায়ের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কের মধ্যে বোধ হয় কোনো পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু অসাধ্য-সাধনকারী একটি নিখুঁত যন্ত্র হওয়াই মানুষের পরম চরিতার্থতা নয়। তার মহত্তম গৌরব এই যে, সে যন্ত্র নয়, যন্ত্রের আবিষ্কারক ও স্রষ্টা, এবং তার যন্ত্র-সাধনার একাগ্র লক্ষ্যই হল মানবসমাজের উন্নতিবিধান।

বৈজ্ঞানিকগণ এ-যুগের ঋষিতুল্য ব্যক্তি, তাঁদের জ্ঞানসাধনায় আমরা গৌরবান্বিত। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিককেও এই বিরাট কর্মযজ্ঞে হাত মিলাতে হবে। মানব-মনের যে দুর্জ্ঞেয় অংশে সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির রসলোক অবস্থিত, তারই আনন্দধারায় মানুষের চিত্তকে মালিন্যমুক্ত ক'রে দিতে হবে তাঁদের। এ-যুগের ব্যথিত মানবাত্মা সেই শুশ্রূষাই দাবি করে তাঁদের কাছে।

বিশেষ করে আমাদের মতো একটি সদ্যস্বাধীনতা-প্রাপ্ত, গঠনশীল দেশে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সামাজিক মনোভাবের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থিত, এবং অনতিদূর অতীতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মিল অতি সামান্যই। দেশের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগের অভাবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা ও ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার প্রভাবে কেউ যদি ইয়োরোপীয় সমাজমানসের সমস্যাকে আমাদের সমস্যা বলে সাহিত্য-রূপায়িত করেন, তবে সে সাহিত্য কালক্রমে মূল-মূল্যহীন এবং অসার হ'তে বাধ্য। অন্যপক্ষে, কেউ যদি মনে করেন পূর্বাচার্যদের আচরিত শিল্পমাধ্যম ও বক্তব্যের পৌনঃপুনিক উপস্থাপনার জোরেই তাঁরা বর্তমান কালের পাঠকেও অভিভূত করতে পারবেন তবে তাঁরাও ভ্রান্তি-বিলাসের বিপাকে পড়বেন।

আসল কথা হল, বর্তমান সমাজজীবনের গভীরে একাত্ম হ'য়ে তার সমস্ত যন্ত্রণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা, এবং সেই পথে দেশের মানুষকে তাদের মানবিক মহত্ত্বের বিষয়ে সচেতন করে তোলা। সেই নবজাগরণের মহান ব্রতের বিষয়েই অবহিত হতে বলেছেন ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ। আশা করি আমাদের সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন।

আগামী সংখ্যা থেকে প্রথিতযশা কথাশিল্পী
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ধরণে লিখিত আকর্ষণীয় উপন্যাস
মেঘের উপর প্রাসাদ
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

কবিতা
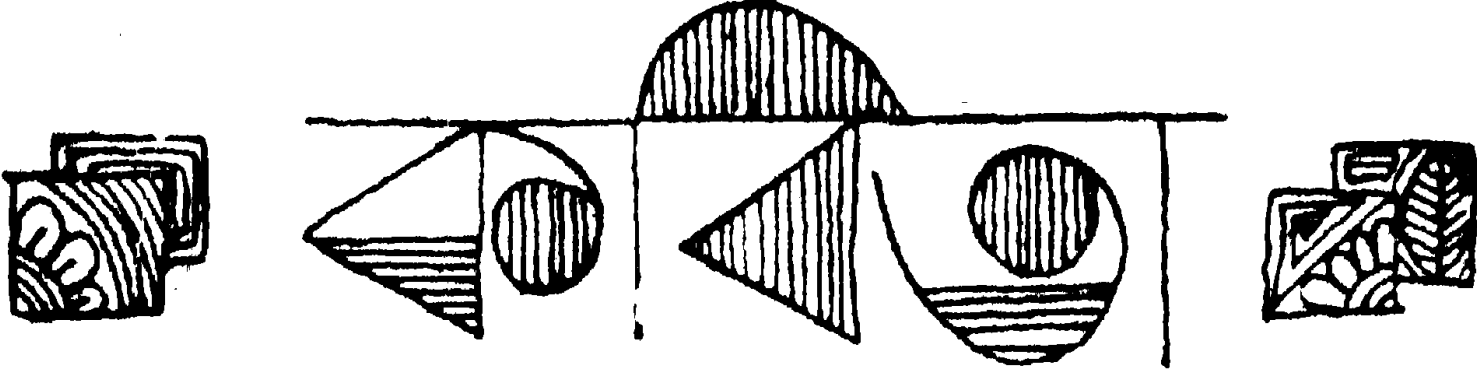
পদাবলী

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মধ্যরাত্রি গত। সবেমাত্র শেষট্রাম
দৃষ্টির সীমান্ত পার দুরন্ত গতিতে।
গর্বোদ্ধত মনুমেন্ট ময়দানে সদাব্যস্ত
মূক অভিনয়ে। ন্যায়াধীশ মহামান্য
ধর্মাধিকরণ আর অদূরে প্রবহমানা
গংগা পুণ্যতোয়া। পাপীরা নির্ভয়।

একরাশ অন্ধকার মুড়ি দিয়ে ক্লান্ত আমি
ঘুমন্ত যখন, তখনো ক্যালকাটা ক্লাবে
ঠুন ঠুন ঠোকাঠুকি গ্লাসে। হঠাৎ পি-জিতে
ভয়ংকর রোগী কোনো যন্ত্রণায় হাঁক ছাড়ে—
জীবনের সমাপ্তি হুংকার। পাশাপাশি
হাসিকান্না সম্ভোগের বেদনার বিচিত্র
সংসার! কে জানে কী কাণ্ড চলে এত রাত্রে
আলিপুর চিড়িয়াখানায়?

আত্মশুদ্ধি আত্ম-তিরস্কারে। শতাব্দীর
শরাঘাতে সে নীতি বাতিল। স্মৃতির চুমোয়
সুখ আশ্চর্য অপার। মুগ্ধ করে অতীতের
স্নিগ্ধ পদাবলী। উদ্‌ভ্রান্ত আমারে তাই
শুনি বারে বারে ডাকে যেন পদ্মা-ধলেশ্বরী।
বর্তমান প্রত্যক্ষত জ্ঞাত। ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার
সারাংশ নির্যাস—সবার হৃদয় হোক
আনন্দের প্রশান্ত সাগর।

*
* *
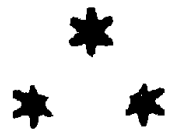
পশ্চাৎপট

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জানি অন্যতম দিন চলে গেছে। আমার শৈশবে—
মনে পড়ে জলাশয়, নির্বচন বৈশাখের মেঘ,
ছায়া...পাহাড়ে মন্দির; দূরের স্টীমারে যেন কবে
সফেন নদীর লাল খুলেছিলো বক্ষরেখা...দৃশ্যের আবেগ।

পুরানো মালার নৌকা, নৌকা ঢেউ, নদী জলমালা
ঘুমের ভিতরে যায়, জাগরণে যায় উড়োপাখি...
কোথা যাবো ও আমার নৌকা...নদী...যামিনীর জ্বালা!

শোভিত রৌদ্রের মধ্যে জেগে আছি পীত পুষ্পে বিরত জোনাকি।

দূর দৃষ্টি

জৈমিনি
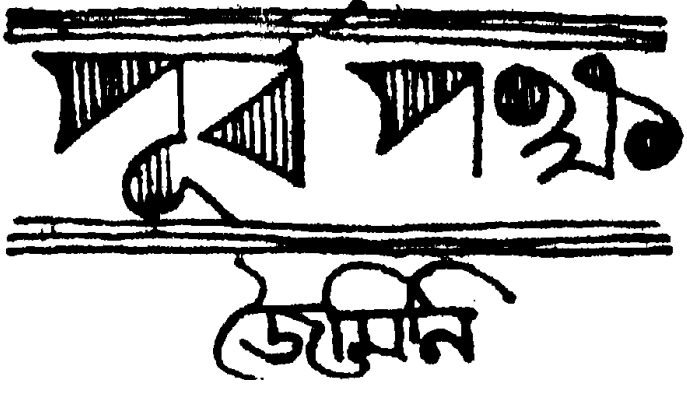
আমি বাঙালী। এই দেশের বাতাসে আমি প্রথম নিশ্বাস গ্রহণ করেছি। এর অন্নজলে পুষ্ট হ'য়েছে আমার দেহ, এর ভাষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে আমার মন। এদেশে জন্মলাভ করে আমি ধন্য।

এবং কেবল বাঙালী নয়, আমি হিন্দু। যে উদার বিশ্ববোধের ফলে হিন্দুধর্ম যুগে যুগে নানা বিপরীত ভাবধারাকে নিজের মধ্যে সংহত ক'রে ধর্মের সংহিতা-শাসিত গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবনচর্যার এক মহত্তম উপায় হ'য়ে উঠেছে, আমিও তার অংশীদার। এজন্যে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু সেইসঙ্গেই আমি অনুভব করি, এই মহান জীবন-যাপন-পদ্ধতি প্রবহমান রাখতে হলে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। অতীতে যেমন বহু পরাক্রান্ত সমস্যাকে সাহসের সঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এ ধর্ম তার জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে, বর্তমানেও তেমনি ছোটবড় সমস্ত সমস্যাকে অতিক্রম করেই আমাদের এগোতে হবে।

কিন্তু আমি ধর্মসংস্কারক নই। একজন সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালী ধর্ম-সম্বন্ধে যতোটুকু বোঝেন আমি তার চেয়ে একবর্ণও বেশী বুঝিনে। কাজেই, ধর্ম কী এবং কী নয়, সে সব উচ্চ-বিতর্কে আমি একান্তই অনধিকারী।

তবু আমার মতো মানুষেরও সমস্যা আছে। এবং আমি অনুমান করি, এ সমস্যা আমাদের অনেকেরই। ধর্মের সাধনতত্ত্বের দিকটা গোপন ও ব্যক্তিগত। কিন্তু তার একটা আচরণগত দিক আছে। সেটা প্রকাশ্য। আমরা সমাজের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই এই আচরণগত দিকের সঙ্গে সংপৃক্ত। এ সব ব্যাপার আমরা আলোচনা করলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা যায় না। বরং, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এ সব ব্যাপার চিরকালই আলোচনা করেছে এবং নিয়ত আলোচনার ভিতর দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করেছে, এইটে বলাই বোধহয় যুক্তিসংগত। সেই নজীরে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমিও একটি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। আমার

পাঠকবর্গের কাছ থেকে আমি উদারতা প্রার্থনা করি।

আমার বিষয়বস্তু, বল হরি... হরিবোল!

চমকে ওঠবার কারণ নেই। আমি মোটেই রসিকতা করছিনে, আমার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুতর।

মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঐ মিলিতকণ্ঠে উচ্চারিত হরিধ্বনি আমরা সকলেই শুনেছি। এবং মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে গেছি। চারিদিকের চলমান জীবনযাত্রার মধ্য থেকে একটি মানুষ চিরকালের জন্যে চলে গেল, এতে কার না দুঃখ হয়! কিন্তু সেইটুকুই কি সব? না, আমি তা বলতে পারব না। সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঐ উচ্চারিত হরিধ্বনির ফলে আমি যতো না অনুভব করেছি সদ্যমৃত ব্যক্তিটির জন্যে বেদনা, তার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেছি নিজের মৃত্যুর বিষয়ে আতঙ্ক।

বাস্তবিক, 'জন্মিলে মরিতে হবে' এ সত্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমাদের আজীবন প্রচেষ্টা হল সেই কঠোর সত্যটাকে ভুলে থাকা। আমাদের জীবিকা-নির্বাহের সহস্ররকম উদ্যোগ-আয়োজন থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র পসরা সবই জীবনের দিকে চালিত, জীবনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মৃত্যুর সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখাই আমাদের আজন্মলালিত আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে আচমকা হরিধ্বনি শুনলে বুকের মধ্যে একবার ধক্ করে ওঠে বইকি!

বরং একটু বেশীই চঞ্চল হ'য়ে উঠতে হয়, শব্দটা যদি শোনা যায় গভীর রাত্রে। এবং আপনি থাকেন একা। অপরিচিত মৃত ব্যক্তিটি তখন আর ঠিক যেন অপরিচিত থাকেন না। সুপরিচিত লক্ষণগুলির মধ্যে তাঁর বিদেহী আত্মা যেন অবয়ব লাভ করতে থাকেন। এবং যাঁকে জীবনে হয়তো কখনো দেখেননি, জীবদ্দশায় যিনি হয়তো ছিলেন অত্যন্তই একজন মানবহিতৈষী ব্যক্তি, তিনিই কিছুকালের জন্যে মানবশত্রু হিসাবে রূপায়িত হ'তে থাকেন আপনার মনের মধ্যে। যাঁরা সোৎসাহে হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে যান, মৃত ব্যক্তির সেই সব আত্মীয়বন্ধু একথা অনুমানও করতে পারেন না। পারলে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হতেন। এবং শোকপ্রকাশ বা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার অন্য উপায়ের কথা ভাবতেন।

কিন্তু এই ভয়াবহতাকে বাদ দিলেও ব্যাপারটার অন্য একটি দিক আছে, যা অত্যন্তই করুণ এবং হৃদয়হীন। কলকাতার মত জনবহুল শহরে মরণাপন্ন রোগীর অভাব নেই। যে বৃদ্ধ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শায়িত, কিন্তু যাঁর চেতনবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়নি, বাড়ীর পাশে অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর মনে, কেউ ভেবে দেখেছেন কি? কিংবা ভেবে দেখুন সেই রাত্রি-জাগরণক্লান্ত মায়ের কথা যিনি মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে বসে আচমকা শুনতে পান হরিধ্বনি! আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যে মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় উচ্চারিত হয় এই হরিধ্বনি, তাঁর কণ্ঠে ভাষা থাকলে তিনিও এতে আপত্তি জানাতেন। কিন্তু ভাষা যাদের কণ্ঠে জীবন্ত হ'য়ে আছে, মৃতদেহকে বহন করার সময় তাদের মন হয়তো হ'য়ে যায় মৃত, তাই তারা তা টের পায় না। এবং যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে যায় পর্যায়-ক্রমিক হরিধ্বনি। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

আমি তাই অনুরোধ জানাই, প্রত্যেকটি সৎ নাগরিককে এ বিষয়ে বিবেচনা করতে, এবং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে, যা প্রতিবেশীর বিষয়ে সহানুভূতিশীল এবং মানবিক। অভ্যাসের জড়তা কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না।

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালেও ছিল। সেই আলেকজান্ডারের সময় থেকেই কিংবা তারও আগে থেকে। মধ্যযুগে একটা ছেদ পড়ে যায়, কারণ স্থলপথ হয় বিপদসংকুল। জলপথের সন্ধান একান্ত আবশ্যক হয়। এই কাজটি ভারতের দিক থেকে না হয়ে ইউরোপের দিক থেকে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ ভারতকে বহু শতকের পর আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কারও করে। তার ধারণা ছিল ওটাই ভারতবর্ষ। ওখানকার আদিবাসীরাই ভারতীয়।

এদিক থেকে একটা পালটা আবিষ্কার বকেয়া ছিল। চার শতাব্দী পরে ভারতও করে জলপথে আবার নতুন করে ইউরোপ আবিষ্কার। রামমোহন রায় করেন ইংলণ্ডে পদার্পণ। তাঁর আগে আবু তালিব। সেই যে ইউরোপ আবিষ্কার সেটা শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয়। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা কেবল স্পেসের দিক থেকে নয়। টাইমের দিক থেকেও। ইউরোপ যখন জাহাজে করে ভারতে এলো, তখন এলো আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগে। আর ভারত যখন জাহাজে চড়ে ইউরোপে গেল তখন গেল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। রামমোহন রায় দেশে থাকতেই আধুনিক যুগের স্বরূপ দেখলেন। পশ্চিমকেও দেখতে পেলেন তার স্বস্থানে। কলকাতার ইংরেজকে দেখে ইউরোপের ইউরোপীয়কে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। রামমোহনের জীবনে এই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল।

একই কারণে মাইকেল মধুসূদনও যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন সেদেশে। এ ব্যাকুলতা ব্যাপকভাবে ছিল সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে। কিন্তু অতি অল্পক্ষেত্রেই তৃপ্ত হয়েছিল। যাঁরা ইউরোপে যেতে পারেননি তাঁরাও আধা বিলিতী শহর কলকাতায় বসে বিলাতের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। কিংবা বম্বেতে বসে। কিংবা মাদ্রাজে বসে। এগুলিও আধা বিলিতী শহর। বা সিকি বিলিতী শহর। এদের মধ্যে মাদ্রাজ যদিও জ্যেষ্ঠ তবু কলকাতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের। ইংরেজ আমলের আগে হাজার হাজার বছর কেটেছে, পৌরাণিক মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ ও কলিযুগের একাংশ। কিন্তু ভারতের রাজধানী এর আগে কখনো ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না। সমুদ্রের এক পারে লণ্ডন, আরেক পারে কলকাতা। মাঝখানে জাহাজ চলাচল। অবাধ যাতায়াত।

জাহাজ যখনি কলকাতায় ভিড়ত তখনি তার থেকে নামত আধুনিকতম বইপত্র, খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, সাজ-পোশাক, মনিহারি, অসংখ্য কৌতূহলপ্রদ সামগ্রী যা কস্মিন্‌ কালে ভারতে উৎপন্ন হয়নি বা হতো না। দেশ একটু একটু করে আধুনিক হয়ে উঠল এবং কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য। যেমন গথিক ধরনের গির্জায় বা কলোনিয়াল শৈলীর বাসভবনে। কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের জীবনধারা দুই খাতে প্রবাহিত

হলো। একটি আধা হিন্দু আধা মোগলাই। অপরটি তৎকালীন অর্থে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। লাট বেলাটরা যে ধারার বাহক। মধ্যবিত্ত বলে আস্ত একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এঁরা হাফ শহুরে, হাফ গ্রাম্য। পরিবার পড়ে থাকে গ্রামে। এঁরা রোজগার করেন শহরে। মনটা মধ্যযুগে, চোখ দুটো আধুনিক যুগে। বুঝতে পারেন না ব্যাপারখানা কী। কারা সব এসেছে, কেন এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, কী নিতে এসেছে। ওরা কি রাজা, না সওদাগর, না ধর্মপ্রচারক, না পণ্ডিত, না সৈনিক। সমুদ্রের ও-পারেও দেশ আছে? সে দেশও মাটির? গায়ের রং অমন কেন? ওরা কী ভাবে?

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো। ইংরেজীর মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হলো। নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার সূচনা হয়েছিল। বাংলা হরফে ছেপে বই বেরোল, পত্রিকা বেরোল। যারা ইংরেজী ভালো জানে না তারা বাংলা পড়ে জগতের সঙ্গে যুক্ত হলো। ভারতও সে জগতের অন্তর্গত। তার আগে ভারত সম্বন্ধেই বা কে কতটুকু জানত! এমন কি বাংলাদেশ সম্বন্ধেও জানবার উপায় ছিল না তেমন। ঐ লোকমুখে শোনা বা স্বচক্ষে দেখা। সংস্কৃত বা আরবী শিখে সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো না। ফারসী শিখে যা হতো তাও হাতে-লেখা ফারসী কেতাব পড়ে। সেও কতকালের পুরোনো। আধুনিক জগৎ তখনকার দিনের সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষার পরম বিদ্বানদেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। অথচ একটি সাধারণ ইংরেজেরও ছিল। মানুষমাত্রেরই প্রাণে জ্ঞানের জন্যে আকুলতা আছে। গাছের প্রাণে যেমন আছে আলোর জন্য আকুলতা। গাছকে যদি ঢেকে রাখা হয় তবে শুধু রস টেনে সে বাড়ে না। বেঁচে থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পায়নি বলে বাড়েনি। পণ্ডিতরাও মাথায় খাটো বহরে বড়। তাঁদের মনটা পৌরাণিক। তাঁরা যে কোন্ যুগে বাস করছেন তাই তাঁরা জানতেন না। শুধু জানতেন যে সেটা কলিযুগ। সুতরাং অবজ্ঞেয়। নেতৃত্ব অনায়াসেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে চলে গেল। এঁরাই হলেন সমাজের ভ্যানগার্ড।

কলকাতা ভারতের রাজধানী না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু বারো মাস তিন দিন চব্বিশ ঘণ্টা ভারতশাসনের কেন্দ্রস্থলে বাস করে শিক্ষিত মানুষ হলো ভারতমনস্ক। তার চেতনা যেমন একটা রেখা ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাতায়াত করতে থাকল তেমনি আর একটা রেখা ধরে ভারতবর্ষের বর্তমান থেকে সুদূরে অতীতে। সে অতীত পুরাণ পারাবারের ও-পারে উপনিষদ্ প্রান্তে অবস্থিত! যেমন সে পশ্চিম মহাসিন্ধুর ও-পারে ব্রিটেন দ্বীপে আবর্তিত। মাঝখানে ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কত না দেশ। শিক্ষিত মানুষের সেসবে আগ্রহ নেই। মাঝখানে তেমনি কত না পুরাণ, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য। শিক্ষিত মানুষের তাতেও রুচি নেই। মাঝখানকার দেশকাল লঙ্ঘন করে তার চেতনা গিয়ে উপনীত হয় একদিকে উপনিষদ্ প্রান্তে, অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রান্তে। রামমোহন রায় যেমন ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করেন তেমনি উপনিষদ্ পুনরাবিষ্কার করেন। যেমন স্পেস অতিক্রম করেন তেমনি টাইম অতিক্রম করেন। সেই সময় থেকে শিক্ষিত মানুষমাত্রেই স্পেস-টাইম সচেতন। দেশকাল সচেতন।

রামমোহন এর মধ্যে কোন স্বতোবিরোধ দেখতে পাননি। নিজের জীবনে ও মনে তিনি এক প্রকার সামঞ্জস্য ঘটান। ভারতবর্ষের রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন উভয়েরই তিনি সূত্রপাত করে যান। বাংলাদেশে ও তার বাইরে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সমাজ-সংস্কারের ধুম পড়ে যায়। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সাক্ষাৎভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এটা তাঁর সেই সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে ইউরোপকে ও আধুনিককে বর্জন করতে হবে, কেবল ভারতের "সনাতন"কে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই বিরোধ দেখা দিল। অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিরোধ থেকে নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বিরোধ। মনে হলো পশ্চিমের সূর্য যে আলো দিচ্ছে সেটা আলো নয়, আলেয়া। আটলান্টিকের পার থেকে যে হাওয়া আসছে সেটা বসন্তের হাওয়া নয়, বসন্তরোগের হাওয়া। পশ্চিমদিকের দোর-জানালা বন্ধ না করলে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সুরুচি ও সুনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ভারতের আত্মা হারিয়ে যাবে।

সেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীটারই এক ভাগ এই সময় হয়ে ওঠে রিয়ার-গার্ড। অপর ভাগটার হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায়। ভ্যানগার্ডের ভাগ্য নির্ভর করে ইংরেজের ঔদার্যের উপরে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসনের অংশ দেয়, শোষণ কমায়, তবেই জোর গলায় বলতে পারা যাবে যে ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসী, লিবারল মতবাদ, মানব প্রগতি ইত্যাদি কথার কথা নয়, কথা অনুসারে কাজও হচ্ছে, ইংলণ্ড এরই জন্যে ভারতে এসেছে ও ভারত এরই জন্যে ইউরোপ গেছে। ইউরোপ একটা নতুন যুগের প্রতীক। ভারতের যুগান্তর ও রূপান্তর তাকেই আশ্রয় করে হবে।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিজের ঘরেই সংকট ছায়া ফেলেছিল। অপরিমিত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধনবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত জনবৃদ্ধি হয়েছিল। জ্ঞান আর শক্তি আর ধন এক শিবিরে। জন অন্য শিবিরে। ডিসরেলি বলেছিলেন, ইংলণ্ড আসলে এক নেশন নয়, দুই নেশন। ধনীরা এক নেশন, দরিদ্ররা আরেক নেশন। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেকটি নেশন তলে তলে দুই নেশনে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমনি এক নেশনের সঙ্গে অপর নেশনের শক্তি-বৈষম্য ও ধন-বৈষম্য বেড়ে যায় শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতায়। ইংলণ্ড এগিয়ে গেলে জার্মানী রাগ করে, জার্মানী এগিয়ে গেলে ফ্রান্স ভয় পায়। রাশিয়া এগোতে চাইলে জার্মানী প্রমাদ গণে। ঘরে শূদ্র অভদ্র হয়ে উঠছে, বাইরে প্রতিবেশী রুদ্র হয়ে উঠছে। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও জল্পনা-কল্পনা চলছে। শতাব্দীর পূর্বাহ্ন যেমন আশান্বিত করেছিল, শতাব্দীর সায়াহ্ন তেমনি আশঙ্কিত করে।

সুতরাং ইউরোপ নিজেই নিজেকে নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় মনীষীরাই ইউরোপের কঠোরতর সমালোচক। রেনেসাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে যেমন একটা মানবিক ধারা ছিল তেমনি ছিল একটা ধার্মিক ধারা। ধার্মিকরা রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেননি, কারণ বিজ্ঞান এসে তাঁদের চিরাচরিত জগৎজিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন-চিন্তাকে তাঁরা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাঁরা

খড়্গহস্ত। অপর পক্ষে মানবিকরা কোনো প্রকার ডগমা কিংবা অথরিটি মানবার পাত্র নন। তার চেয়ে আগুনে পুড়বেন। কারাগারে পচবেন। ইউরোপীয় সভ্যতা রেনেসাঁসের প্রসাদেই আধুনিক সভ্যতা হয়েছে। রেনেসাঁস উল্টে দিলে তার আধুনিকতার স্রোত উজান বইবে। তাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগে। শিক্ষিত ইউরোপের যাঁরা ভ্যানগার্ড তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। অথচ ফরাসী বিপ্লব দেখে শিল্পবিপ্লব দেখে তাঁদেরি কতক হলেন ক্রমে রিয়ারগার্ড। ফিরে চল রেনেসাঁসের পূর্বে। রাফেলের পূর্বে। ধনতন্ত্রের পূর্বে। ইউরোপ যখন ছিল সুন্দর। মানুষ যখন ছিল পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। ইউরোপের রেনেসাঁসের আদি পুরুষরাও মধ্যযুগকে লঙ্ঘন করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর গ্রীক যুগে। খৃস্টানকে ডিঙিয়ে পেগান জীবনাদর্শে। গোড়ার দিকে তাঁরাও এর মধ্যে স্বতোবিরোধ লক্ষ্য করেননি। সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের কিছুকাল পরে যে রেফর্মেশন এলো আর তার প্রতিক্রিয়ায় যে কাউণ্টার রেফর্মেশন দেখা দিল সেটা ধর্ম ও সমাজঘটিত হলেও জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা ছিলেন প্রতিমাপূজার শত্রু। যীশুর জননী মেরীর মূর্তি তাঁরা সহ্য করবেন না। গির্জাকে মূর্তি দিয়ে তাঁরা সাজাবেন না। অথচ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করেই পরম সুন্দর হয়েছিল ইউরোপের মধ্যযুগের ভক্তিমার্গীয় আর্ট। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কাউণ্টার রেফর্মেশন নিছক প্রতিক্রিয়া নয়। পূর্ববর্তীরা যেমন প্রোটেস্টাণ্টরা তেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। পরে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা ধর্ম জিনিসটাকেই পরিহার করলেন। তাতে প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের উপর জয়ী হলেন না। জয়ী হলো সেকুলার মনোভাব।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্যানগার্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রিয়ারগার্ড রচনা করলেন তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর দোষারোপ তো করলেনই, ভ্যানগার্ডকেও অব্যাহতি দিলেন না। ধর্ম আর সমাজ নিয়ে গভীর মতবিরোধ। তেমনি জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েও। সাকারবাদ থেকে যে সৌন্দর্য সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিরাকারবাদ থেকে তার তুলনায় কতটুকু হয়েছে? কেন আমাদের পিতৃপিতামহের মন্দিরে যাব না? কেন বঞ্চিত হব সৌন্দর্য থেকে? আমরা কি বাইরের লোক যে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করে তৃপ্ত হব। আরো গভীরে যেতে হবে। নইলে আর একটা কোণার্ক আর একটি নটরাজ গড়তে পারব না। তেমনি সংস্কৃত কাব্যে নিমগ্ন হতে হবে। নইলে আর একখানি রামায়ণ বা মহাভারত হবে না। বর্জন যদি করতে হয়, ইউরোপকে কর, রেনেসাঁসকে কর, রেফর্মেশনকে কর, কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে নয়, বর্ণাশ্রমী সমাজকে নয়, মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে নয়, কারুশিল্পকে নয়। ইংরেজ আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, গ্রামসংগঠন ধ্বংস করেছে, সভ্যতার পায়ে কুড়ুল মেরেছে। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড তাতে সায় দিয়ে এবং পশ্চিমের অনুকরণে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন ঘটিয়ে এমন কী অর্জন করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হতে পারে! ইংরেজ তো মোয়া দিচ্ছে না। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলেও তো আত্মশক্তি চাই, তার উদ্বোধন চাই। সে কি শুধু কথায় হবে। তার জন্যে চাই বিপরীত মার্গ গ্রহণ। এ মার্গ বর্জন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতাকে সহর্ষে গ্রহণ করার, সেই সঙ্গে ভারতের উপনিষদ্‌যুগের সভ্যতাকে সযত্নে ফিরিয়ে আনার। এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে উভয় তটে অবাধে গমনাগমন করার। সে সময় নব্য-শিক্ষিতরা সকলেই একমত। দ্বিমত দেখা গেল শতাব্দীর শেষভাগে। পাশ্চাত্য তথা আধুনিককে গ্রহণ করতে দ্বিধাভাব এলো। অনেকের আত্মসম্মানে বাধল। একেবারে ইংরেজী বাদ দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিমুখ হলেন তাঁরা। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উত্তেজিত হলেন যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মতো পাঁতি দিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে কাজ নেই, তার বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়। বিজ্ঞানশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো না বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলেন। যুক্তিবাদ পিছু হটল। সামনে এলো অবতারবাদ, গুরুবাদ, সাকারবাদ। "আনন্দমঠ"। সন্ন্যাসীনেতৃত্ব। ব্রাহ্ম হলেন ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

শতাব্দীসায়াহ্নের প্রেরণা অবাধ গ্রহণের ও মিশ্রণের নয়। প্রধানত বর্জনের, সামান্য মিশ্রণের। চরমপন্থীরা তাতেও নারাজ। তাঁদের ভারত হবে ইউরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সঙ্গে আধুনিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারত। তাঁরা বর্জন করবেন ইউরোপকে তথা আধুনিককে। তাঁদের বর্জনশীলতা সেইখানেই থামবে না। উপনিষদেও তাঁদের কাজ নেই। গীতা, চণ্ডী, পুরাণ ও ব্রতকথা হলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। মেয়েদের যদি পড়াশুনা করতেই হয় তবে মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে যারা থাকবে তারা শিখবে ব্রতকথার মাধ্যমে। ভারতের স্বধর্ম বলতে তাঁরা বুঝবেন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। তার ঘাঁটি হচ্ছে গ্রামে ও মেয়েমহলে। এসব ঘাঁটিতে ইংরেজীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাংলা ঢুকতে পারে, কিন্তু সে বাংলা হবে পুরাতন সংস্কৃতির বাহন, আধুনিক সংস্কৃতির নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারবাহী নয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম একাকার হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর মধ্যে বর্জনের ভাবটাই প্রবলতর ছিল, গ্রহণের ভাবটা অতি ক্ষীণ। এবং চরমপন্থীরা যেমন আধুনিক ইউরোপকে বর্জন করলেন তেমনি উপনিষদের ভারতকে। তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য পৌরাণিক বর্ণাশ্রমী ভারতের প্রতি। বেদ তাঁদের নমস্য, কিন্তু স্মৃতি তাঁদের নিয়ামক। দর্শনে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কার্যত কালীপূজক। এটাও যে একপ্রকার বর্জন তা কেউ ভেবে দেখলেন না। সংরক্ষণ মানে শিকায় তুলে রাখা নয়। জীবনে প্রয়োগ করতে করতে চালু রাখা।

সুবিধামতো ভুলে যাওয়া হলো যে মুসলমান বলে আর একটি সম্প্রদায় আছে। তারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য থাকতে পারে। মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো কেউ জন্মাননি, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনও হয় এক পুরুষ বিলম্বে। রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন কোনোটাই ঠিকমতো স্টার্ট পায়নি সে সমাজে। পেতো আর কিছুদিন পরে। যদি না হিন্দু সমাজ বিপরীত মার্গ ধরত। মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড দেখল বিপরীত মার্গ নিলে মোগল ভারতে উপনীত হওয়া দুরাশা। পৌঁছবে হয়তো হিন্দু ভারতে। সে ভারত মুসলমানের জন্যে নয়। তার চেয়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানো শ্রেয়। রাজনীতি

ক্ষেত্রে একটা বাঁধা বখরা মেলার আশা আছে। একেবারে বঞ্চিত হবার ভয় নেই। মুসলমান সমাজেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত ভ্যানগার্ড মোটামুটি একমত। মোল্লা মৌলানাদের কথা আলাদা। তাঁদের চোখে সব কিছুই বর্জনীয়। যেমন আধুনিক ইউরোপ তেমনি উপনিষদের ভারত তেমনি আধুনিক ভারত। তাঁদের গ্রহণযোগ্য শুধু শরিয়তী রাষ্ট্র। তাঁদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, ইসলামের প্রতি। ইংরেজের হাত থেকে ভারত ফিরে পেলে তাঁরা দ্বিতীয় আওরংজেবকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষেক করতেন।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইউরোপ আবিষ্কার তথা আধুনিক আবিষ্কার এই দুই আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। দেখতে দেখতে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এলো। মনে হলো না যে একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যা আরো মূল্যবান। যার ক্ষতিপূরণ নেই। শতাব্দীর জমাখরচের হিসাব-নিকাশের সময় যখন এলো তখন দেশের চিন্তাশীলদের মধ্যেই মতভেদ লক্ষিত হলো। যাঁদের মধ্যে যুগ-চেতনা প্রখরতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন সেতুবন্ধ দিয়ে গমনাগমনের ফলে যা লাভ করা গেল তাকেই। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই। যাঁদের মধ্যে দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন যা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল বা লুট হয়ে গেল তাকেই। সেই বিচ্ছিন্ন আত্মগত ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে। মুসলমানরাও তাকে তেমন ছিন্নভিন্ন করেনি রেল স্টীমার কলকারখানা যেমন করেছে। এইসব কলকারখানা ইংলণ্ডে অবস্থিত ও এর লভ্যাংশ ইংরেজের ভোগে লাগে। ভারত শুধু কাঁচামাল যোগায় ও তৈরি মাল কিনতে বাধ্য হয়। তার চিরকালের কারুশিল্প বিনষ্ট হয়। দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর হয়। বৃহত্তর স্বার্থ বিপন্ন হয়। মনের অন্ধকার দূর হলে হবে কী, বাহির অন্ধকার। যার অতীত এত গৌরবময় তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন।

যুগদর্শী চিন্তানায়করা স্বীকার করতেন না যে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পশ্চিমের সঙ্গে তার আদান-প্রদান অনাবশ্যক। তাঁরা বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবটাকেই বড় করে দেখতেন ও তার জন্যে পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান না হলে ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে, বহু শতাব্দী পেছিয়ে থাকবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পশ্চিমের সাহায্য বিনা ভারতের ভিতর থেকেই আপনি উঠে আসবে এটা তাঁরা মেনে নিতে পারতেন না। ভারতকে একলা ছেড়ে দিলে সে যে ইউরোপের মতো জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আধুনিক হবে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। পরের কাছে শিখতেই যখন হবে তখন সম্বন্ধ একটা পাতাতে হবেই। তবে সেটা যে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ হবে এমন কোনো কথা নেই। সেটা হবে সমানে সমানে সম্বন্ধ। তার লক্ষণ ইউরোপে দেখা যাচ্ছে। ভারতেও দেখা যাবে। ভারতও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

অপর পক্ষে দেশভক্ত মনীষীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করলে তার স্বধর্ম রক্ষা করা যাবে না। পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবের কথা নয়। পার্থিব ভোগ-বিলাস যে চায় না তার ওসব নিয়ে হবে কী? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে ভারতেরই দ্বারস্থ হবে বিশ্ব। ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ যদি হারিয়ে যায় তবে বিজ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য তার কোন্ কাজে লাগবে? যা আছে তাকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সংরক্ষণ কর। যা নেই তার জন্যে উদ্বাহু হতে যেয়ো না। ভারতের যা আছে আর কারো তা নেই। দৃষ্টিকে দেশের উপর সন্নিবদ্ধ কর। দেশের বর্তমান থেকে যে রেখাটি ধরে দেশের অতীতে যাওয়া যায় সেই রেখাটি ধর। দেশ থেকে যে রেখাটা ধরে পশ্চিমে যাওয়া যায় সে রেখাটা ছাড়ো। আধুনিকতার মোহ কাটাও। আধুনিক তো চিরন্তন নয়। সেও পুরাতন হবে। দুদিনের দম্ভ দুদিন পরে বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত।" আধুনিক ইউরোপেরও আদি অবসান আছে। সনাতন হচ্ছে ভারত। তার নেই আদি অবসান। পরাধীনতা দূর করাই আপাতত একমাত্র কর্তব্য। স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্ন হবে কি না এখন থেকে ভাবতে হবে না। বাইরে থেকে বড় জোর বিজ্ঞানকে নিতে পারে। আর সব তার আছে।

সব মানুষের অগ্রগতির যদি একটাই পন্থা থাকে তবে মানতে হবে যে ইউরোপ এগিয়ে রয়েছে, ভারত পেছিয়ে রয়েছে, সঙ্গ রাখতে হলে পিছু নিতে হবে, ধরে ফেলতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাপান যা করতে চেষ্টা করেছে। স্বাধীন হয়ে থাকলে ভারতও বোধ হয় তাই করত। তা করলে কিন্তু স্বীকার করা হতো যে সব মানুষের জন্যে একই রাস্তা। সব মানুষের একটাই সভ্যতা। একটাই বিজ্ঞান। একটাই বিজ্ঞানদৃষ্ট রিয়ালিটি। একটাই ন্যায় অন্যায়বোধ। সাহিত্যে ও আর্টে একটাই বিশ্বজনীন বাণী। এইখানে দেখা দিল মতবিরোধ। আবিষ্কারের ঘোর কেটে গেছে। ইউরোপকে বা আধুনিককে দেখে পরম বিস্ময় জাগছে না। প্রতিদিন তার বর্বরতার সংবাদ চোখে পড়ছে. তার স্বার্থপরতার আঁচ গায়ে লাগছে। যেসব

কারণে গ্রীস রোম বিলীন হলো সেইসব কারণে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও অধঃপাতে যাবে। তা হলে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া কেন? পথ এক নয়, পথ একাধিক। ভারতের পথ আধ্যাত্মিকতার। ভারত সে পথ এগিয়ে রয়েছে, ইউরোপ রয়েছে পেছিয়ে। পাল্লা দিতে হয় ভারতের পিছু পিছু ইউরোপই দেবে।

পথ এক নয়, পথ দুই। ক্রমেই এ ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে। পরাধীনতার বেদনায় এ ধারণা জাত হলো বললে সবটা বলা হয় না। জাপান তো পরাধীন হয়নি। সেখানেও এর অনুরূপ দেখা গেল ওকাকুরার রচনায় ও কার্যকলাপে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্টের সংক্রমণ থেকে তিনি তাঁর দেশজ শিল্পাদর্শ সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি এসে জাপানের সৌন্দর্য নাশ করছে দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তিনি বুদ্ধের দেশের শরণ নেন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্যগত আদর্শে ভারত, চীন ও জাপান একপন্থী, কারণ সে আদর্শ প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, চিত্তের গভীরতর স্তরে তার ভিত্তি। প্রাচ্যের সৌন্দর্যসাধনা অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। এই কবি যে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন তা কবিও জানতেন না, ওকাকুরাও না। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কর্ণগোচর হবার অল্প দিন পরে ওকাকুরার দেহান্ত হয়। তাঁর দেশ তাঁর কথা শুনল না। ইউরোপের পথের পথিক হলো। সংসারের বিনিময়ে আত্মাকে হারালো। তাই তিনি ভগ্নহৃদয়ে অকালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মতোই জাপানকে সাবধান করে দেন। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে অপ্রিয় হন। ন্যাশনালিজম জাপানের বা ভারতের স্বধর্ম নয়। তবু উভয় দেশেই প্রবল। তাই এদেশেও তিনি অপ্রিয় হন।

এর মধ্যে একটু ভুল বোঝা ছিল। আধুনিক যুগে পড়বার আগে ইটালীও জাপানের ও ভারতের মতো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে ইউরোপও তাই। রেনেসাঁস না ঘটলে, পরে শিল্পবিপ্লব না ঘটলে সে বিশ্বাস এখনো তেমনি থাকত। প্রভেদটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানসাধনার। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। স্বধর্ম ও পরধর্ম এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে দেশানুসারী হবে?
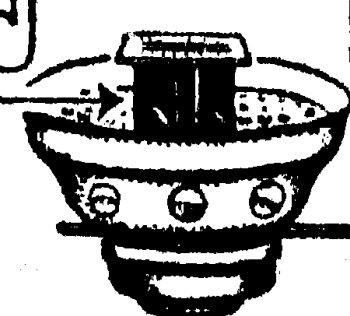
শুধু ভারতে নয় বা জাপানে নয় সব দেশেই দুটো বোঝাপড়া এক সঙ্গে চলেছিল। একটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। আর একটা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের। দৈনন্দিন জীবনে একটার থেকে আরেকটা পৃথক করা শক্ত। রেলগাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী, তার থেকে লোকে ধরে নিল ওটা বিদেশী বা পশ্চিমী। আসলে ওটা একেলে। দেড়শ' বছর আগে কোনো দেশেই ওর অস্তিত্ব ছিল না। বিলেতেও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি প্রথমে বিরাগ জাগিয়েছে। লোকে যন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। রেনেসাঁসের একাধিক কারণের একটা হলো মুদ্রযন্ত্র। সেটার উপরেও বহু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে করেছে ওটা নিছক মন্দ। "ভালো", "মন্দ" এই দুটি কথা নৈতিক বিচার থেকে ঐতিহাসিক বিচারে সম্প্রসারিত হলে কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বা অভিনবত্বই তার নাগাল এড়ায় না। আস্ত একটা যুগকেই "মন্দ" বলে সন্দেহ হয় ও সন্দেহ হলেই বিনা-বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। আদি কালের ইতিহাস আমরা জানিনে। জানলে হয়তো এটাও জানা যেতো যে সেকালের লোক গোরুর গাড়ীকেও "মন্দ" বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল।

"ভালো" আর "মন্দ", "শাদা" আর "কালো", "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম", "আধ্যাত্মিক" আর "জড়বাদী" এসব গণনা ইতিহাস ভূগোলের উপর বা দেশ-কালের উপর চাপালে তার পরিণাম হয় যা গ্রহণযোগ্য তার বহিষ্কার বা বর্জন; এবং যা পরিবর্তনযোগ্য বা পরিত্যাজ্য তার সংরক্ষণ। যে সব দেশ অতি পুরাতন বা দীর্ঘকাল হতে বিচ্ছিন্ন সে সব দেশে বহিরাগত ও নূতনের প্রতি একটা মারমুখো ভাব মজ্জাগত। সে-দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে যা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে যা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ডি চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের একটা মোহ আছে। তার সবটাই সুন্দর। যেটা যত প্রাচীন সেটা তত সুন্দর। সে কখনো মন্দ হতে পারে না, অপূর্ণ হতে পারে না। তাকে পরিবর্তন করতে হাত ওঠে না। মানুষের এই আসক্তি প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে নির্মম হস্তে ভালো মন্দ সব ভেঙে ফেলে। সব আবার গড়ে তোলে। তার স্বধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা নিত্য ভাঙা নিত্য গড়া। নিত্য মাজা নিত্য ঘষা। নিত্য ধরা নিত্য ছাড়া। তার মধ্যে একটা কন্টি-নিউইটি আছে। কিন্তু সেটা তার নিজের প্রবহমানতা। সেটুকু বাদ দিলে আর সব জিনিসের বেলা ডিসকন্টিনিউইটি। পূর্ণচ্ছেদ। কত সভ্যতা গেল আর এলো। এলো আর গেল। আধ্যাত্মিক

হলেও কি রক্ষা আছে, যদি না নিত্য ভাঙে নিত্য গড়ে? নিত্য মাজে নিত্য ঘষে। নিত্য ধরে নিত্য ছাড়ে। নিত্য-ভাবে নিত্য বিচার করে। নিত্য শোধরায় নিত্য বদলায়। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে ভারতও তাই করে এতকালে বেঁচে আছে। কিন্তু কোনো অবস্থায় আত্মাকে হারানো চলবে না। অস্মাকং সততং রক্ষেৎ।

ঊনবিংশ শতকের স্বর্ণলঙকায় বাস করেও রাস্কিন, এডওয়ার্ড, কার্পেণ্টার প্রভৃতি অনেক মনীষীর মনে সন্দেহ জেগেছে ইংলণ্ড ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথে। তেমনি বিশাল ও বলবান রুশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ভোগ করেও টলস্টয়ের সন্দেহ জেগেছে ততঃ কিম। এ'রা এক একজন এক একটা নির্ণয়ে উপনীত হয়ে এক একটা পথ নির্দেশ করেছেন। এমনি একটা পথ নির্দেশ করেন কার্ল মার্কস। সে পথ তাঁর নিজের দেশ নেয় না। নেয় তাঁর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দেশ। রাশিয়া। এতদিনে আরো অনেক দেশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে আছে চীন। সেই যার ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল নৈতিক। দেখা যাচ্ছে নৈতিক বা জড়বাদী, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণই এক্ষেত্রে খাটে না। ঐতিহাসিক ভবিতব্য বলে একটা তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষের মন অধিকার করেছে। স্বয়ং ইতিহাস নাকি একটা পথ নির্দেশ করেছে। সে পথ নাকি একটাই পথ। সব দেশের সব মানুষের জন্যে। কেউ যদি তা না মানে তবে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে। সেটাও নাকি ইতিহাসের নির্দেশ। ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে নেই। আছে নীতিশাস্ত্রে। নীতিসম্মত পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধী। সেই পথটাও শুধু একটি দেশের জন্যে নয়, সব দেশের জন্যে। কিন্তু কেউ যদি তা না মানে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। মহৎ দৃষ্টান্ত।

উপরে যে পথগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলো এক একটি দেশে নিবদ্ধ নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং জাপানের শুধু একটিমাত্র পথ বা ভারতের কেবল একটিমাত্র পন্থা এ ধরণের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায়ই শোনা যেতো। প্রায়ই অপর কোনো দেশের উপর নজর রেখে। দুটো দেশ যেন দুটো বিপরীত মেরু। আকাশ আর পাতাল যেমন বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে যায়। দেশ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বাঁটোয়ারা হয়নি। "শাদা" আর "কালো" গায়ের চামড়ায় থাকতে পারে, মনের বা চরিত্রের গঠনে নেই। "স্বধর্ম" আর পরধর্ম" ব্যক্তির জীবনে সত্য হতে পারে, জাতির জীবনে অযথা। "আধ্যাত্মিক" ও "জড়বাদী" এখন কোনো দেশেরই গায়ে বসে না।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রামমোহন-প্রবর্তিত নতুন ঐতিহ্যে মানুষ। যুগপৎ যুগসচেতন তথা দেশসচেতন। এর মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা অনুভব করেননি। অকুণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ হস্তে দেশের কাছ থেকে বাম হস্তে যুগের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্জনের কথা উঠলে দেশের দেবদেবী ও সাকার আরাধনা ত্যাগ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবিয়ানা পরিহার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ ওঠে। সেটাও একটা বাইরের ঢেউ। নেপোলিয়নের পায়ের তলায় জাতীয়তার ঢেউ ওঠে যে দেশেই তিনি যান। ইটালীতে জার্মানীতে রাশিয়ায়। তেমনি ওঠে ব্রিটানিয়ার পদতলে। গর্বিত গৌরবময় দেশ ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া। পরাজয়ের বা পরাধীনতার উত্তর দিল জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে। ভেবে দেখল না যে সেটাও হলো নেপোলিয়নেরই নৈতিক জয়। তেমনি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় জাতীয়তাবাদ। বৃটিশ শাসনের উত্তরে গর্বিত গৌরবময় দেশের পৌরুষের অঙ্গীকার। ইংরেজী শিক্ষাই ছিল তার মূলে। যদিও তার মন্ত্র লেখা হলো সংস্কৃতে তথা বাংলায়।

বিরোধ পরিহার করা গেল না। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল চাইলেই মিলবে স্বাধিকার। এমন ইংরেজও ছিলেন যাঁরা ভারতের পক্ষে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের হাতে কামধেনু পড়েছে। বশিষ্ঠকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়! দেশের মনোভাব দিন দিন বিরূপ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবিচলিত থাকতে পারেন না। একটু একটু করে দেশচেতনায় আচ্ছন্ন হন। দেশের অতীতের অভিমুখে যে রেখাটি গেছে সেই রেখা ধরে চলেন। পশ্চিমের অভিমুখী রেখাটি—আধুনিকের অভিমুখী রেখাটি—একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও গৌণ হয়ে যায়। অতীত বলতে দেশের লোক বোঝে পৌরাণিক অতীত। ছবি আঁকতে বসলে পুরাণ থেকেই শিল্পীরা সৃষ্টির প্রেরণা পায় বেশী। তা ছাড়া অত বড় একটা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে যাবেই বা কী করে? বেদ উপনিষদ যতখানি সুদূর রামায়ণ মহাভারত ততখানি নয়। রামায়ণ, মহাভারত যতটা সুদূর ভাগবত বা চণ্ডী ততটা নয়। মানুষ দেশকেও "দশপ্রহরণ-ধারিণী" দেবীমূর্তি বলে বন্দনা করতে ভালোবাসে। সে যে মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে হিন্দু-সমাজ থেকে যাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন, তাঁদেরি একজনকেই দেখা গেল বঙ্গ-মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। স্বদেশী আন্দোলন সাকারবাদী আন্দোলন হয়ে উঠল। মধ্যযুগ ফিরে এলো। আধুনিক যুগ হলো রাজনীতিনিবদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্র যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের উপায় পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বাদেশিক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ পৌরাণিক সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তাঁর কাছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। জাতীয়তাবাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন ডাকাতি সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মুক্তি আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিত্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ করলে স্বাধীনতা আসবে কোন্ মায়াবলে! রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর প্রোগ্রাম গঠন-কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বুনিয়াদ মজবুৎ করা। আবেদন আর নিবেদন নয়, বয়কট আর বোমা নয়, নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশজয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পুলিশের ভয়ে শান্তি-নিকেতনে গা ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগচেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়, আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায়

না। "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।"

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখে যাত্রী। বাইশ বছর বাদে। এবার ইউরোপকে—সেই সূত্রে বিশ্বকে—তাঁর কিছু দেবার ছিল। সে দেওয়া তাঁর দেশের হয়ে। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও অন্তঃসার। উপনিষদের তথা বাউল বৈষ্ণব কবিরপন্থের বাণী। পুরাণের নয়। এই বাইশ বছরে তাঁর নিজেরও উপলব্ধি জন্মেছিল। একজন আধুনিক কবি সাধকের। কিন্তু তিনি শুধু দিতে যাননি। নিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয়তার অভিমান তাঁকে উদাসীন বা অগ্রহিষ্ণু করেনি। দিতে হলে নিতে হয়। নিতে না পারলে দিতে পারা যায় না। আদান প্রদানেই তাঁর বিশ্বাস। "দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।" এই তাঁর আদর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো মেলা আর মেলানো। পরাধীনতা বা সাম্রাজ্যবাদ একে উলটে দিতে পারে না। তিনি কিপলিং নন যে বললেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। দুই কখনো মিলবে না।" তবে কিপলিং তার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দিয়েছিলেন যে, "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও যদি আসে তবু তারা মিলবে যখন দুই বলবান পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে।"

শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর "যাত্রার পূর্বপত্র" রচনা করেন। তাতে বলেন, "য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া আমরা যদি সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?"

"য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-

উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না? বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।"

এই রচনারই এক জায়গায় আছে, "আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। এ কথা শুনিলেই দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির—য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরেই কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে। আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।"

দেশে দেশে অমিল যেমন আছে মিলও তেমনি আছে। প্রথম পরিচয়ে অমিলটাই বেশী করে নজরে পড়ে, কিন্তু নিকট পরিচয়ে মিলটা আরো বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর অমিলের কথা অত বেশী শোনা যায় না, যত বেশী শোনা যায় মতবাদে অমিলের কথা। আমেরিকাতেও কমিউনিস্ট আছে, রাশিয়াতেও ডেমোক্রাট আছে। যে যার সুযোগের অপেক্ষায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ন্যাশনালিজম এখন আর উৎকট আত্মস্বার্থবাদ নয়। এক দেশ অপর দেশকে অনেক সময় বিনা শর্তে সাহায্য করছে। যেহেতু সে অবিকশিত। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছতে অনেক দিন লেগে গেল, অনেক সংঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হলো। সংঘাত ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা নেশনে নেশনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা কতকটা নেশনে নেশনে, কতকটা মতবাদে মতবাদে। এক দিক থেকে ওটা জার্মাণীর সঙ্গে তার উভয় পার্শ্বের প্রতিবেশীদের রণ। আরেক দিক থেকে ওটা নাৎসী ফ্যাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধমতবাদী কমিউনিস্ট তথা ডেমোক্রাটদের দ্বৈরথ। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। মতবাদগুলোরও আর সে ধার নেই। এখন আর সেগুলোকে থীসিস অ্যান্টি-থীসিসের মতো লাগে না। মনে হয় একটা আরেকটার বিপরীত নয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই ঘোড়া যেমন বাজী রেখে দৌড়ায়। একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে গিয়েই হারিয়ে দেবে, গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়। সেইজন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। পরমাণবিক বোমার ভয়ে নিবৃত্ত রয়েছে এটা অর্ধসত্য। নিবৃত্তি আসছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও পাবলিক সেকটর হয়েছে এবং বাড়তে লেগেছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে পিছুটান দেখা দিয়েছিল সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর মন্থর হয়। কেবল ধর্মমিশ্রিত রাজনীতিতেই একটা স্বপথে ফিরে চলার ধ্যান ছিল। চরকা খাদিকে যদি অর্থনীতি বলা হয় তবে অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে স্বদেশের চেয়ে স্বকালের দিকে টান বাড়ে। কখনো প্রকাশ্যভাবে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। ক্লাসিকাল সঙ্গীতে ও নৃত্যেও আধুনিক রুচি ও রং লাগে। আধুনিক না বলে পাশ্চাত্য বললেও ভুল হয় না। পশ্চিমের উপর বিরাগটা রাজনীতিনিপুণদের মধ্যেই প্রকট। সাধারণ লোক তো বিদেশী ফিল্ম বলতে অজ্ঞান। তেমনি বিলিতী খেলা দেখতে পাগল। বিরোধটা একদা মনে হয়েছিল সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার। পরে মনে হলো নেশনের সঙ্গে নেশনের। পরিশেষে বোঝা গেল পলিসির সঙ্গে পলিসির। ওরা যুদ্ধ চায়। আমরা যুদ্ধ চাইনে, যদি না সিদ্ধান্তটা নিজের দায়িত্বে নিতে দেওয়া হয়। এতদিনে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। এরই নাম স্বরাজের অন্তঃসার।

কিন্তু মানুষের জীবন থেকে ধর্মের অন্তঃসার বা নীতির অন্তঃসার যদি উবে যায় তা হলে অন্ধ জাতীয়তাবাদের মতো অন্ধ প্রগতিবাদও মানুষের দুর্গতির হেতু হবে। সে প্রগতি অধোগতি। তার থেকে উদ্ধার জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে হবে না। হবে কয়েকটি চিরন্তন সূত্রে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ফলে। সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায় অনাধুনিক হয়ে
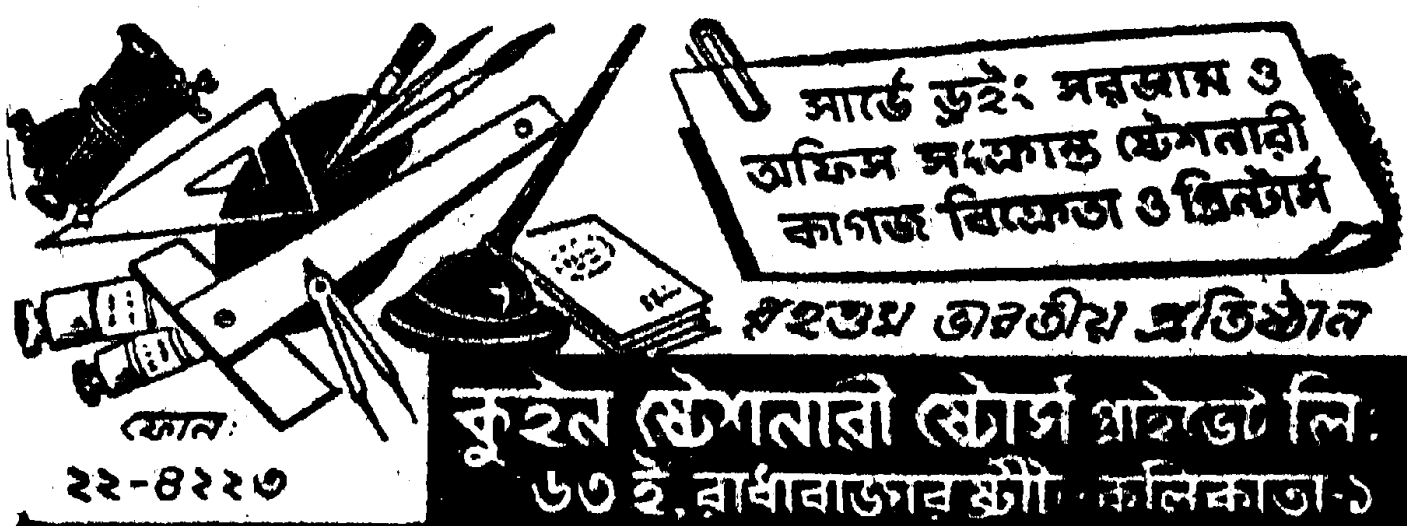
য়ায়নি। প্রগতির সঙ্গেও এদের অনাত্মীয়তা নেই। রেনেসাঁস শুধু এই কথাই বলার অধিকার দাবী করেছে যে প্রকৃতির তথা মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড় জটিল। বাবাজীরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেননি। আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাঁসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় তা হলে তারও শাঁস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণীসাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে, গতিই সব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে "সভ্যতার সংকট" লিখেছিলেন। 'পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট" লেখেননি। কারণ পূর্ব পশ্চিমের বিরোধ ততদিন তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এক কালে যেমন আমাদের রেল-স্টেশনগুলোতে হিন্দু জল ও মুসলমান জল ছিল, এখন নেই, তেমনি এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব পশ্চিমের ভেদ-বুদ্ধি ছিল, শেষে থাকে না। এর সূচনা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে "গোরা"তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, 'বিচার' নেই, ঘৃণা নেই। সে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবুদ্ধিকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সুচরিতা-রূপে। আরো পরে আরো পরিণত হয় তার অভেদবুদ্ধি।

"I have no hesitation in saying that those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity, who have the least feeling of enmity against aliens, and the sympathetic insight to place themselves in the position of others, will be the fittest to take their permanent place in the age that is lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminated. For this is the problem before us, and we have to prove our humanity by solving it through the help of our higher nature. The gigantic organiztions for hurting others and warding off the blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the contrary, by their crushing weight, their enormous cost and their deadening effect upon living humanity, they will seriously impede our freedom in the large life of a higher civilization." (*Nationalism in India*, lecture delivered in America in 1916, published in the book *Nationalism*).

"ঘরে বাইরে"র সমসাময়িক যে ইংরেজী বক্তৃতার থেকে উদ্ধার করা হলো তার শেষাংশের 'উচ্চতর সভ্যতা" ভারতীয় বা পাশ্চাত্য নয়, মানবিক। "আমরা" সেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষ। বক্তা ভারতীয়, শ্রোতা মার্কিন। আর যেসব মূলনীতির উল্লেখ করা হলো সেগুলি যে কোনো ধর্মশাস্ত্রের বা নীতি-শাস্ত্রের নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর। রবীন্দ্র-নাথ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের উদ্দেশেও বলেছেন, ১৯১৬ সালে যা বলেছেন তা আজকের উদ্দেশেও বলা। আজকের রাশিয়াকে আমেরিকাকে ইংলণ্ডকে ফ্রান্সকেও বলা। বেঁচে থাকলে কবিগুরু আবার সেইসব কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বর্জন তাকেই করতে হবে যা মূল-নীতিবিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়-হীন ও অসাড় করে, যা বৃহত্তর জীবনের মুক্তি ব্যাহত করে। তা পাশ্চাত্য বলে নয়, আধুনিক বলে নয়, পাশ্চাত্য বলেই বা আধুনিক বলেই কোনো জিনিস বর্জন করার কথা ওঠে না। কিন্তু কিছু গ্রহণ করব কি না সেটা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে। তার প্রাচীনত্বের উপরেও নয়। তার ভারতীয়ত্বের উপরেও নয়। তবে ভারত তার আত্মাকে হারাবে না, আত্মাকে দুর্বল হতে দেবে না, আত্মস্থ হবে।

পরাধীনতা থাকলেই তার গ্লানি থাকে। তার দরুণ জ্বালা থাকে। পরা-ধীনতা মন্দ। মন্দের অন্ত চাই। তার জন্যে সংগ্রাম করাই জগতের নিয়ম। কিন্তু পৃথিবীতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও থাকে। এমন কিছুও থাকে যা ভালোমন্দের দ্বারা বিশেষিত বা নিঃশেষিত নয়। সেইজন্যে মন্দকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে সমগ্র রিয়ালিটিকে অস্বী-কার করতে নেই! ভারত পরাধীন হলো, পতিত হলো নিরস্ত্র হলো, ভগ্নমনোবল হলো। চারিত্র্যভ্রষ্ট হলো কিন্তু এই সব নয়। ভারত একরাষ্ট্র হলো, বহির্জগৎ হতে অবিচ্ছিন্ন হলো, আধুনিক যুগে পদার্পণ করল, আলোকিত হলো, অগ্রসর হলো, বিকশিত হলো, নবজাত হলো, পুনঃসংস্কৃত হলো। ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সে চ্যালেঞ্জের উত্তরে ভারত তার আত্মাকে না হারিয়ে নির্মোকমুক্ত হলো, নবকলেবর ধারণ করল। পরাজয়-সত্ত্বেও সে অপরাজিত।

এত কিছু কি সম্ভব হতো যদি ইংরেজ শুধু শত্রুতা করত? রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাকে শত্রুজ্ঞান করেননি, যদিও তার দুষ্কৃতি সমর্থনও করেননি। তার কাছে আবেদন নিবেদনও করেননি। তাঁর দৃষ্টি ইংরেজকে ছাড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতি-হাসের উপর পড়েছিল। রোমান্টিসিজম ও লিবারল মতবাদের উপর পড়েছিল। তিনিও সেই মুক্ত স্রোতের মীন ছিলেন। বাংলার বদ্ধজলার মাছ হলে স্বাধীনভাবে বাড়তে ও সাঁতার কাটতে পারতেন না। ভারতের সরোবরের মৎস্য হলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হতো, বৃদ্ধি ব্যাহত হতো। এখন যে বহু শতাব্দীর পরে স্রোত ফিরে এসেছে এটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটানোর ফলে। স্বাধীনতা তাকে উদ্দাম করেছে। *

* শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

মতামত

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

একই কালে দুই কালজয়ী মহাপুরুষ স্বামীজী ও কবিগুরু একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েও যে পরস্পর কি ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। গত ৪৪ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' আলোচনা কালে এ বিষয়ে আলোকপাত করে একটা সংশয় দূর করেছেন। আমি তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন—'একটা তত্ত্বগত না হলেও পদ্ধতিগত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও কুণ্ঠা ছিল যা এ'দের উভয়কে পরস্পরের অন্তরঙ্গ করে তুলতে পারেনি।' আমার মনে হয় এ জায়গায় আর একটু পরিষ্কার করলে ভাল হয়।

একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কবি যাঁর ধর্ম আমার মনে হয় দ্বৈত বা অদ্বৈত নয় কিন্তু "That Light whose smile kindles the Universe" সেই উপলব্ধিকে ভাষায় রূপ দিয়ে ছন্দ-মধুর করে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করাই কবির ধর্ম। তাই তো রবীন্দ্রনাথ জগতের সৌন্দর্য আর প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্যে দিয়েই সেই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ দেখতে চান। তাঁর কাছে—

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ.........।"

তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কাব্যের মধ্যে দিয়ে।

"এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা......।"

কিন্তু বিবেকানন্দ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কর্মের মধ্যে দিয়ে, সেবার মধ্যে দিয়ে। এই সেবা ও কর্মের মধ্যে দিয়েই আসবে মিলন, ত্যাগ, ঐক্যবোধ। শুধু দেশকেই মুক্ত করা নয়, নিজেকেও মুক্ত করা সেই সঙ্গে।

"পাশমুক্ত সদা শিবঃ।"

তিনি বেদান্তকেশরী, তাঁর কাছে 'জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।' সবই মায়া।

সে সময়ে দেশেও শিক্ষিতের সংখ্যা নামমাত্র ছিল—বলা যায়। সুতরাং ঐ অবস্থায় সাহিত্য বা কাব্যের মধ্যে দিয়ে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার সার্থকতা হয়তো মেনে নিতে পারেননি স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষ একেই কল্পনাপ্রধান, তার ওপর কাব্য তাকে তার ডানায় বসিয়ে নিয়ে যায় আরও দূরের ভাবলোকে কর্ম যেখানে হয় ব্যাহত। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, শক্তি ও সত্তা তখন হারিয়েছে দেশবাসী। সব যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে দাসত্বের চাপে। তাই স্বামীজী গর্জন করে উঠলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।" ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মের রক্ষা এবং প্রচার ও নতুন ভারতের জাগরণ তখন একান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলতেন, "ধনী ও পণ্ডিত দেশের শোভামাত্র। দেশের বাহার বলতে পার।" তিনি তখন 'আপন প্রচণ্ড বীর্যের দ্বারা এদেশের নির্বীর্যদের জাগ্রত করে তোলবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।' তাছাড়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে যে অমৃতসাগরের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তার কাছে কাব্য ও কাব্য-প্রতিভা হয়তো ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কবির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোতে পারেননি।
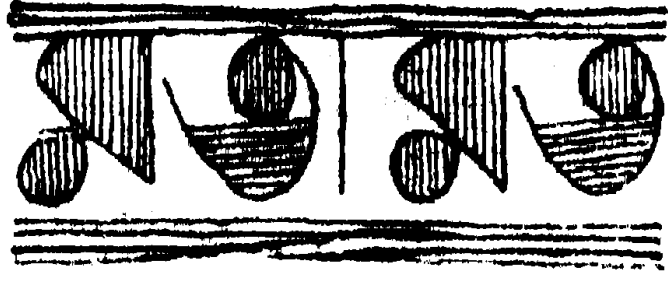
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিমনে বিবেকানন্দের উদ্দীপ্ত বাণীর যে প্রতিক্রিয়া হয়নি তাই বা বলি কেমন করে; কবিগুরুর কুণ্ঠা ও দ্বিধা ছিল। হয়তো কবিমনের কোনো কোমল স্তরে আঘাত লেগেছিল। সেই কোমল মীড়ের টানে দ্বন্দ্ব ছিল—একদিকে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অন্য দিকে অভিমানের। কারণ বিবেকানন্দের জীবিতকালে তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু লিখেছেন বলে জানি না। তবে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়ে লিখেছেন।

একথা হয়তো বলা চলতে পারে যে আরও পরিণত কালে স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে কবিগুরু বিবেকানন্দের হাত ধরে এগোতে পারতেন অনায়াসে। কারণ শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন..."তিনি এদেশের লোককে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তি আছে, দরিদ্রের মধ্যেই দেবতা তোমাদের সেবা চান...তাঁর বাণী যখনই মানুষকে সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে...।" একথা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের জীবিতকালে বলতে পারেননি।

এবিষয়ে আরও কেউ আলোকপাত করলে উপকৃত হব। **ইতি—কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোরক্ষপুর।**

॥ শিশু শিক্ষার তামাসা ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু—
মহাশয়—

আপনাদের গত ৯ই মার্চ সংখ্যার সম্পাদকীয়ে শিক্ষা বিষয়ে সময়োপযোগী মন্তব্যে বিশেষ আনন্দিত হলাম। বস্তুতঃ আপনাদের মত সংস্থাই হ'চ্ছে জনমতের ধারক ও বাহক। আপনাদের সমালোচনার মাধ্যমেই দেশের নীতি নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিস্ময়কর অযোগ্য শিক্ষকতার কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই। আশা-করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দু'বৎসর আগে আমার মেয়ে কলকাতায় এক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণীতে পড়ত। সে একদিন স্কুল থেকে কিছু রঙ্গীন সুতো, একটা সূচ ও এক টুকরা চট নিয়ে এসে বলল, কার্পেট বুনতে হ'বে। প্রশ্ন করে জানলাম সেলাইয়ের 'অ-আ'-টাও স্কুলে শেখায়নি। বছরের শেষ দিকে মেয়ে বলল দিদিমণি বলেছেন মা, দিদিকে দিয়ে যাহোক কিছু করে নিয়ে যেতে। তুমি কার্পেটটা তাড়াতাড়ি করে দাও আমাদের স্কুলে ইনস্পেকটর আসবে। একটা কিছু করে দিলাম বটে এবং স্কুলে ওদের সেলাইয়ে নামও হয়েছিল শুনেছি কিন্তু এই কি শিশুশিক্ষা পদ্ধতি!

বর্তমানে আমি ২৪-পরগণার একটি মহকুমা সহরে আছি। সেখানকার কয়টি ভয়াবহ নমুনা দিচ্ছি। নবম শ্রেণীর এক আত্মীয়-কন্যার কাছে জানলাম 'নটী' শব্দের অর্থ "যে সমস্ত মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।" আমার মেয়ের শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন কলকাতায় ১৩ তলা বাড়ী আছে। মেয়ে বললে আমেরিকাতে আরো অনেক বড় ১৫০ তলা বাড়ী আছে। শিক্ষিকা বললেন কেন বাজে কথা বলো! ১৫০ তলা বাড়ী কখনো হয়? তাহলে নীচের তলাগুলো মাটির তলায় বসে যাবে না? আরেকদিন মেয়ে বলছে বাদুড় ডিম পাড়ে না—ওদের বাচ্চা হয়। শিক্ষিকা বললেন—যাঃ তা কখনো হয়? বাদুড় তো পাখী—ওরাও ডিম পাড়ে। অন্য একদিন মেয়ে গৃহপালিত পাখীদের মধ্যে হাঁসের নাম বলে এক ধমক খেল। মেয়ের খাতায় ভুল অংক দেখে বললাম ক্লাশে সব দেখাওনা কেন? বললে দেখাতে চায় না শুধু করে নিয়ে যেতে বলে। আর পড়ার ব্যাপারে সব বাড়ী থেকে জেনে এসো—এটা তো এখন বলতে গেলে প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে।

তবুও দেখুন এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতেই সন্তানদের শিক্ষার ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে আছি তারা একদিন বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার হবে ও দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করবে। ইতি ভবদীয়া—জনৈকা **অভিভাবিকা প্রতিমা বসু, বারাসত।**

বৃষধর্মী

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যায় কম্বল পায়ের ওপর চাপিয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে ভাবছিলাম, ঠিক এই সময় সেই পাহাড়ী ছোট শহরটির মাইল দেড়েক বাইরে সেই নালার ধারে ছোট ভাঙা টিনের ঘরে বসে কাচা কাপড় ভাঁজ করতে করতে রাজলক্ষ্মী ধোপানী নিশ্চয়ই নিদারুণ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার কষ্টের কথা স্মরণ করে একটা মানসিক বিলাসে আরামে সিগারেট ধরালাম।।

রাজলক্ষ্মী ধোপানী, তবু ওর কথাটা ভুলতে পারিনি।

সেদিন সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে ওর ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যেমন ভয়াবহ, তেমনি বিস্ময়কর।

কয়েক মাস আগে সাঁওতাল পরগণার ছোট পাহাড়ঘেরা শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে মাসীমা, মাসতুতো বোন আর ছোট একটি মাসতুতো ভাই। পাথুরে রাস্তা নীচু হয়ে আবার পূর্বদিকে যেখানে চড়াই হয়ে উঠেছে, সেখানেই আমাদের বাসা। সামনে ছোট বাগানের এক কোণে মস্ত ইঁদারা। বাগানে কিছু বুনো ফুল-গাছ আর গোটা কতক মস্ত পাইন গাছ।

বিকেলে অল্প শীতে একটা চাদর-মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসতাম প্রায় রোজই। কুনো আরামপ্রিয় স্বভাব বরাবর। বেড়াতে বেরোলে পা-দুটো এত বেশী চলে যে, চোখের দেখাটা তেমন মন দিয়ে দেখা হয় না। তাই বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে নীরবে নিশ্চিন্তে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগত। তাতে যেটুকু দেখা হয়, মন দিয়ে, শুধু চোখ দিয়ে নয়।

চলতে চলতে দেখা আর স্থির হয়ে বসে দেখার ভেতর যে তফাত আছে, সেটা মাসতুতো বোন সন্ধ্যাকে কোনমতেই বোঝানো যেত না।

সন্ধ্যা বলতো—ও তোমার ছুতো। আসলে কুঁড়ে স্বভাব তোমার।

তা যদি হয়, তাই।

সন্ধ্যা আরও চটতো। —যদি-টদি নয়, যা বলচি ঠিক। তুমি আজ আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে দ্যাখো!

হেসে বলি,—কি করে দেখব? বাইরে বেরোলে দেখা আর হবে না। তোমরা যা বেড়াতে বেড়াতে দেখো, তা দেখো না, চোখ বোলাও।

তবে যা খুশি করো। আমরা একটু চোখ বুলিয়ে আসি চারদিকে। চলো মা।

মাসীমা ওদের নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান।

চুপ করে বসে থাকি চেয়ারটার ওপর। বাড়ির পশ্চিম দিকটা ফাঁকা। সামনে একটি টিলা। বেশ উঁচু। কিছুক্ষণ সবুজ আগাছায় ঘেরা পাথরের ঢিবিটি আমার দেখতে বেশ লাগে। সূর্যটা যখন পশ্চিমে হেলে পড়ে, একটা মস্ত ইস্পাতের কড়ার মত ঢিবিটা ঝকঝকিয়ে ওঠে। যেন নিজের ধারালো কাঠিন্যকে এই সময়টাই ঠিক-ঠিক প্রকাশ করতে পারে। চারদিকের লাল মাটি আর আগাছার ধূসরতার ভেতরে জীবন্ত জ্বলন্ত বাল্ব মনে হয় ওই পাথরের ঢিবিটাকে। এটা কবিত্ব কিনা জানিনে, তবে এটা আমার কাছে সে সময়ে সত্য বলে মনে হয়েছে।

—বাবু!

মুখ ফিরিয়ে তাকাই।

—আপ লোগকা কাপড়-উপোড় ধোবিখানামে যাবে?

একটা কাপড়ের বড় পোটলা হাতে সামনে এলো। ধোপানী। সুগঠিত দেহে যৌবনের কাঠিন্য ঠিক ওই পাথরের ঢিবির মত উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। পোটলাটি বারান্দায় ফেলে কপালের ওপর থেকে

চুল সরায়। ফিকে নীল পাড়-হীন একখানা পাতলা কাপড় পরনে, তলায় সায়া নেই। পশ্চিমের ঢলেপড়া সূর্যের আলোয় ওর লম্বা পা দুখানার আশ্চর্য গঠন স্পষ্ট চোখে পড়ে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, চোখ ফেরান যায় না। এই বিহারী ধোপানীর লম্বা মাংসল দেহখানি যে কোন বাঙালী মেয়ের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে।

আমার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে ফিক করে হেসে ফেলে।

আমাকে লজ্জা পেতে হয়। একটু কেসে বলি,—যাবে, কাপড় যাবে। মাঈজী বাড়ি নেই। একটু বোস, এখুনি হয়তো এসে পড়বে।

ধোপানী আর একবার হাসে। দাঁতগুলো ভাল নয়। অনেকটা মাড়ির নীচে ছোট ছোট দাঁত, দোক্তাপান্তায় দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কালো ছোপ। হাসলে কালচে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

হাতদুটো তুলে চোখের পাতাদুটো ঘসে। দোরে দোরে ঘুরে চোখে হয়তো জ্বালা ধরেছে। চোখে পড়ে হাতে উল্কি। নীল রঙের উল্কির নীচেই রুপোর ময়লা-জমা কয়েক গাছা চুড়ি।

চোখদুটো মোছবার সময় বুকের নীল কাপড়ের আঁচল খসে পড়তেই হাত নামিয়ে আঁচল পিঠের ওপর তুলে দিয়ে হাসে। হাসিটা মোটেই সাদা-সিদে নয়। যেন কিছু একটা বলতে চায়।

আমি প্রায় ঘেমে উঠি। পাহাড়ী বাঘিনীর সামনে পড়ে রীতিমত ভয় পেয়ে যাই।

ওর পরনের পাড়-হীন নীল কাপড়খানা বেশ দামী। নিশ্চয় কোন আধুনিকা হাওয়া-বদল-কারিণীর ধুতে-দেয়া কাপড় পরেছে ও। ভয়েলের এমন শাড়ি ও পাবে কোথায়।

নয়তো হাওয়া-বদল করতে এসে কোন বাবু ওকে দিয়ে গেছে কিনা কে জানে?

চোখদুটো খুব ডাগর নয়, বরং ছোট বলা চলে, কিন্তু ম্লান বিষণ্ণতায় ভরা। এমন যৌবনবতীর এমন বিষণ্ণ চোখ বড় বেমানান ঠেকে।

বিষণ্ণতার ভেতরে একটা হিংস্র লোভানী মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তাকানটা বড় অদ্ভুত। বিষণ্ণ অথচ সময়ে সময়ে হিংস্রতায় তীক্ষ্ণ।

এমন চোখ আমি অতি অল্প মেয়ের দেখেছি।

সিঁথিতে মেটে সিঁদুর। বিবাহিতা।

ও আবার তাকায়। —বাবুজী বাহার গিয়া নেহি। আপকা বেমারী হইয়েছে?

একটা অস্বস্তি বোধ করে হাই তুলে বলি—না। বেমারী কিছু হয়নি। এমনি বেরোইনি।

—এখানে সোবাই বাহার যায়। তোমার মোতো বাত হামি শুনিনি।

বলেই হেসে ফেলে।

তা আর কি করা যাবে! আমার কথাটা যদি ওর কাছে নতুন লাগে তা কি আর করা যাবে? বেরোতে ভাল না লাগলেও যে বেরোতে হবে এমন কোন কথা নেই।

একটু হেসে চুপ করে থাকি।

ও গা দোলাতে দোলাতে বলে,—আপনি কি পোড়েন?

ওর ভাঙা ভাঙা বাংলা শুনতে মন্দ লাগে না।

বলি,—হ্যাঁ, লেখাপড়া করি।

লেখা-পোড়া কোরেন। হামার ঠিক মালুম হইয়েছে।

ঠিক ধরে ফেলেছে। নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই গা দোলায় আর হাসে।

হাসিটা ওর ভাল লাগে না। প্রায় আধ ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। তা ছাড়া হাসিটার যেন অন্য অনেক মানে আছে, মনে হয়। হাসির পরিষ্কার মানেটা না বুঝলেও এটা বুঝি যে হাসির মানেটা খুব ভাল নয়।

একটা আন্দাজ করে নিই মনে মনে। মেয়েটা নিশ্চয়ই খারাপ। হাওয়া-বদলকারী বাবুদের ধরে কিছু পয়সা রোজগার যে করে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মেয়েটি নষ্ট ভেবে মনে মনে রীতিমত উৎসাহিত হই এটা ঠিকই, কিন্তু সাহস কম তাই ভয় করে। মধ্যবিত্ত ঘরের রোমাণ্টিক ছেলে। একটু আধটু প্রেম-ট্রেম করে থাকি। তাও জোলো-জোলো প্রেম। এই পর্যন্তই।

এমন একটি দুঃসাহসিক বিহারী মেয়ের সান্নিধ্যে এসে প্রথম ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাঙালী মেয়েগুলো নিতান্তই কোকিলের জাত। মিষ্টি বুলি বলে। চেপে ধরলেই ক্যাঁ ক্যাঁ ডাক ছাড়ে। এ মেয়েটিকে যেন অজগর বলে মনে হয়। ধরে গিলবে, শব্দ হবে না একটুও।

এমনি সব ভাবনা আসছিল মনে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম ভেতর ভেতর।

খুব সাহস করে আলাপ জমাবার মামুলী ফরমুলা অনুযায়ী বললুম,—তোমার নাম কি?

রাজলক্ষ্মী। খুব ভাল নাম। তোমি কি বোলেন?

ভালই। কোথায় থাকো?

কালীকাচ্ছা। এ শহর থেকে এক কোশ তফাতে। উই মানিয়া পাহাড় আছে, তোমি জানে?

ঘাড় নাড়ি। না জানলেও ঘাড় নাড়ি।

উ পাহাড় সে একদম বরাবর যানে পড়ে গা। তোবে একটা নালা দেখা যাবে। উধার হামার ঘর।

খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলি,—হুঁ।

আপলোগকা ঘর কাঁহা?

কলকাতায়।

কলকাত্তা। হামার একবার যেতে ইচ্ছা কোরে।

ও খুব হাসতে থাকে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে। বারান্দাটা বেশ অন্ধকার হয়ে আসে।

আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। অন্ধকার বারান্দায় এমন একটি যৌবনের এত কাছাকাছি বসে থাকা কখনো অভ্যেস নেই। ভয়টা সেই জন্যেই। তার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা উত্তেজনার আরামও পাচ্ছিলাম না এমন নয়। দুর্বল মনে সে উত্তেজনা ভয়ে ঢাকা পড়েছিলো।

সাহস নেই একেবারে। বলি,—অন্ধকার হয়ে এলো। তুমি না হয় কাল এসো।

না। হামি আজ কাপড় লিয়ে যাবে।

যেতে হবে অনেকটা।

ও কথা বলে আমার কাছে সরে আসে। অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিজের বুকের শব্দ নিজে

শুনতে পাই। কি চায় মেয়েমানুষটি। অন্ধকারে আমার এত কাছে আসতে চায় কেন?

আক্রমণের ভয়ে উঠে পড়ি চেয়ার থেকে। —কই ওরা তো এখনো আসছে না!

বলতে বলতে বারান্দার পশ্চিম কোণে চলি ওর কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। টেরিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখি রাজলক্ষ্মী চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়।

হঠাৎ বলে,—তবে হামি চলে যাব বাবুজী?

আমি কিছু বলবার আগেই গেটের সামনে জুতোর শব্দ পাই। মাসীমারা এসেছেন।

হাবুল আছিস?

বলি,—হ্যাঁ মাসীমা, আসুন।

মাসীমা, সন্ধ্যা ওরা সবাই এসে যেন কৈফিয়ত দেবার মত বলে ফেলি,—একটা ধোপানীকে বসিয়ে রেখেছি। জামা-কাপড়গুলো এত ময়লা হয়েছে। সব কাচতে দিয়ে দিন।

ভাল করেছিস।

মাসীমা, সন্ধ্যা ওরা সবাই এসে পড়াতে আগের স্বস্তি অনেকটা ফিরে পাই। রাজলক্ষ্মী আর একটা কথাও বলে না। কাপড় নিয়ে ঠিকানাটা বলে দিয়ে চলে যায়।

ও চলে যাবার পর আমার আফসোস আরম্ভ হয়।

পরদিন বিকেলেও বারান্দায় একা একা বসে আফসোস করছিলাম। এমন সুযোগ কি মানুষের জীবনে দুবার আসে। কলকাতার ছেলে—হাবুলচন্দ্র আমি। এমন সুযোগ হারিয়েছি শুনলে বন্ধুরাই বা বলবে কি? বেড়াতে এসে এমন একটা জীবন্ত রোমান্সের সুযোগ হারালাম!

এমনও তো হতে পারে যে রাজলক্ষ্মী হয়তো খারাপ নয়। প্রথম দর্শনেই আমার প্রেমে পড়েছে, তা যদি হয়ে থাকে, তবে ওকে এমনভাবে এড়িয়ে যাওয়াটা আমার অপরাধই হয়েছে।

আর কি ও ফিরে আসবে। এ কি বাঙালী মেয়ের ছাতে, বারান্দার প্রেম, না বড়জোর কলেজের কফি হাউসের প্রেম। রাজলক্ষ্মীর মনোভাব কত সহজ সতেজ। ওর মত এগিয়ে আসতে কটা মেয়ে পারত!

এমনি সব অদ্ভুত কল্পনা করে মনে মনে যত তৃপ্ত হচ্ছি, তত আফসোস করছি।

ঠিক এমনি সময়ে গেটে আবার রাজলক্ষ্মীকেই দেখলাম। সোজা বারান্দার দিকে আসছে।

আজ তো আমাদের এখান থেকে কাপড় নেবার কথা নয়, আজ আবার আসছে কেন?

মনে আবার সন্দেহ আর ভয় এসে দানা বাঁধে।

বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সোজা বারান্দার ওপর উঠে আসে রাজলক্ষ্মী।

তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফেরাই, যেন ওকে দেখতেই পাইনি।

এসে পোটলাটা নামিয়ে বসে পড়ে রাজলক্ষ্মী।

অগত্যা মুখ ফিরিয়ে ফ্যাকাশে একটু হেসে বলি,—কি ব্যাপার?

মাইজী, আজ দোঠো কাপড়া দেবে বোলেছিলো।

তাই নাকি?

তা হবে। কাপড়গুলো মাসীমা যখন ঘরে দিচ্ছিলেন, তখন আমি বারান্দার পশ্চিম কোণে এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। হয়তো মাসীমা আর দুখানা শাড়ি আজ দেবেন বলেছেন। কি দরকার ছিল বলবার? আর দুখানা শাড়ি না হয় কলকাতায় গিয়ে কাচিয়ে নেয়া যেত। মাসীমার যত কাণ্ড!

মাসীমার ওপর একটু রাগ হয়। উনি না বললে তো রাজলক্ষ্মী আবার আজ আসতো না। এসে আমাকে আবার এক অস্বস্তিতে ফেললে।

এইমাত্র ভাবছিলাম রাজলক্ষ্মী এলে কত ভাল হয়, কিন্তু আসামাত্র মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। ওর সতেজ ভঙ্গী, ওর ভীষণ যৌবন ভাবতে ভাল লাগছিল, উত্তেজনার আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সশরীরে এসে পড়াতে কেমন একটা ভয় অস্বস্তি পেয়ে বসল আমায়।

বাবুজী!

চমকে মুখ ফিরিয়ে বলি,—এ্যা, কিছু বলছ?

ও হাসে। বলে,—আপকা শাদী হয় নাই?

এবারে আমি একটু হাসি। না, আমাদের এত অল্প বয়েসে বিয়ে হয় না। তোমাদের বোধ হয়?

হ্যাঁ, হামার দশ বরষ হইল শাদী হইয়েছে।

দশ বছর! তোমার ছেলেপুলে কটি?

এতক্ষণে একটু স্বস্তি পাই। আলাপটাকে সাধারণ সাংসারিক দিকে ঘোরাতে পেরেছি। যদিও এ ধরনের আলাপ সম্পূর্ণ মেয়েলী। আমার কোনকালেই এ রকম আলাপে খুব উৎসাহ নেই। তবু ওর সঙ্গে একমাত্র সাংসারিক আলাপ করলে হয়তো বা

অবাঞ্ছিত আলাপ থেকে রেহাই পাব, এই জন্যে খুশী হই।

অবাঞ্ছিত কথাটা বোধ হয় একটু ভুল বললুম। মনে মনে ওর কথাবার্তাগুলো ভেবে খুশী হই, শুধু খুশী নয়, মনে মনে খুব কামনা করেছি, কল্পনা করেছি, ও এর চেয়েও বেশী জোরালো অভদ্র কথা বলছে, আমি মনে মনে শুনে উল্লসিত হচ্ছি। কিন্তু সামনে এলে কোন অভদ্র অশালীন ব্যবহার করে বসবে বা কথা বলে বসবে, এইটেই যেন আমি কোনমতে সহ্য করবার সাহস পাচ্ছি না।

নিজেই ভেবে অবাক হই, তবে কি আমি মনে মনে অভদ্র—বাইরে ভদ্র। শালীনতা, নীতিবোধ এগুলো অভ্যাস মাত্র, আসল স্বভাব কি তবে বন্য নীতির চেয়ে একটুও ওপরে নয়?

ভারী আশ্চর্য তো!

রাজলক্ষ্মীর আয়নায় নিজের একটা অন্যরূপ দর্শন হোল।

আমি কলকাতার হাবুলচন্দ্র। শিক্ষায় সভ্যতায় এই ছোটলোক ধোপানী মেয়েটার চেয়ে কত ওপরের তলায় বাস করি। কিন্তু মনে মনে আমি রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কত ওপরে বাস করি, সেটা দেখতে গিয়ে দৃষ্টিটা ঝাপসা ঠেকছে। ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

লেড়কা-উড়কা হামার নেই।

রাজলক্ষ্মী বলবার সময় মাথাটা একটু নীচু করে।

লজ্জায় নয় নিশ্চয়ই। লজ্জা পেতে রাজলক্ষ্মী জানে না। নিশ্চয়ই বিষণ্নতায় বা আক্ষেপে। ঠিক বুঝলাম না। কেন না পরক্ষণেই ও হেসে ফেললে—লেড়কা হামি চাই না। বহুৎ ভাল আছি।

একটু থেমে বলে,—লেড়কা হোলে কানা, বোবা হতে পারে তো?

আমি হেসে ফেলি,—তা কেন হবে? তোমার এমন চেহারা!

ফিক করে হেসে ফেলে রাজলক্ষ্মী,—সোন্দর! আপকা পছন্দ নেহি আছে। হামি সুন্দর নোহি।

ওর বিনয়ে উৎসাহিত হই।—তুমি ভুল বলছ। তোমার শরীরের ইয়ে মানে কি বলে ভেরী নাইস।

রাজলক্ষ্মী হেসে ওঠে। —নাইস।

ইংরেজি কথাটার মানে ও জানে না। তবে 'নাইস' মানে যে ভাল একটা কিছু, এটা বোঝে। অন্ধকারটা জমে আসছে। কালকের চেয়েও বেশী সময় কেটে গেছে। বাইরে এ দিকটায় রাস্তার আলো আজ জ্বলেনি কেন জানি না, তাতে অন্ধকারটা যেন আরও বেশী মনে হচ্ছে।

মাসীমারা আজ আসতে দেরী করছে কেন তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

রাজলক্ষ্মীর তো ভয় করবার কথা নয়! কালকেও তো ও একা একা গেছে!

আদমীর ভয় নেহি, বাংলা উই যে বোলে ভুত। ভুতের ভোয় কোরে।

ভুত কোথায়?

উ মাঠের উধার একটা কুঠি আছে। হামরা জানে, ভুত থাকে উধার।

আরে ধুস্!

বীরের মত উঠে পড়ি। যত সব কুসংস্কার। গেঁয়ো বলিষ্ঠ মেয়েটা

আপকা পছন্দ নেহি আছে। হামি সুন্দর নোহি

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ উঠে পড়ে। পোটলাটা হাতে তুলে নেয়। বাঁহাত কাঁধের ওপর।

বাবুজী।

তাকাই ওর দিকে।

হামাকে একটু উই মাঠের উধারে লিয়ে যাবে? একটু ভোয় করে।

কেন ভয় কি?

মানুষের ভয় করে না, অথচ প্রেতাত্মার ভয় করে। আশ্চর্য সংস্কার এদের। সাধে কি আর অশিক্ষিত গেঁয়ো বলে।

ওদের কুসংস্কারের অজ্ঞানতার কথা ভেবে মনে মনে একটা অনুকম্পা বোধ হয়।

ঠিক আছে। চলো।

বেরোই দুজনে। রাস্তাটা সত্যি আজ বড় বেশী অন্ধকার। ওর মুখটা

পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। নীরবে ও আমার পাশে পাশে চলছে। একটা কথাও বলছে না।

মাঠের ওপর উঠে পড়ি। নাঃ! অন্ধকারটা বড়ই বেশী। বুকটা কি একটু ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে। ধুস্! যত সব কুসংস্কার। রাবিশ চিন্তা।

মাঠের মাঝামাঝি চলে এসেছি। অন্ধকারটা ক্রমেই যেন চেপে ধরছে। একা একা ফিরব কি করে? বুকটার ভেতর কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে না? ধুস্। যত সব কুসংস্কার!

বাবুজী!

ফিসফিসিয়ে ওঠে কানের কাছে রাজলক্ষ্মী। বুকের নবোতে ঢোল বাজল যেন। দুরদুর করছে বুক।

উধার দেখো।

সটান লম্বা ভাঙা বাড়িটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজলক্ষ্মী।

রাম - রাম - রাম - রাম— সত্যিই একটা সাদা মত কি নড়ছে চড়ছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। রাম - রাম - ধুস যত সব - রাম-রাম—কুসংস্কার - রাম - রাম—যত বাজে - রাম - রাম—আজগুবি।

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ আমার হাতের ডানাটা ওর বুকে চেপে ধরেছে। —বাবুজী।

কই ওর গলার স্বরটা তো এবার ভয়ের নয়? রাম - রাম—কি ব্যাপার। ওর নরম বুকের চাপে - রাম - রাম কি গরম গা রাজলক্ষ্মীর! -রাম - রাম—

বাবুজী!

রাজলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে পড়েছে! কি আপদ! মাঠটা পেরোলে বাঁচি। রাম - রাম - ও যে ওর দেহটা আমার পিঠে চাপছে - রাম - রাম - বলা যায় না অপ-দেবতা-টেবতা-ধুস! রাম - রাম - রাম— যত সব কুসংস্কার— রাম - রাম—

ভাঙা হিন্দীতে রেগে বলে উঠি,— ঠাড়া রহা কাঁহে। বেগসে চলো। আরে!

রাজলক্ষ্মী ছাড়ে না। একি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। ও কি চায়! এই অন্ধকার মাঠে ও কিসের প্রত্যাশা করছে? ভাঙা বাড়িটায় নজর পড়ে। সাদা একটা কি নড়ছে। রাম - রাম— ধুত্তোর। বড্ড গরম লাগছে—রাজলক্ষ্মী করছে কি? একি! রাম - রাম!

ছোড় দেও। ছোড় দেও।

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় লাগাই। সোজা দৌড়।

হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে বাড়ির গেটের কাছে।

মামীমারা এসেছে। ঘরে আলো জ্বলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকা যাবে না। এ কথা কাউকে বলা যাবে না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জিরোতে থাকি। অনেকটা জিরিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাসি-হাসি মুখে ঘরে ঢুকব।

* * *

দিন দশেক কেটে গেছে। কদিন ধরে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশটা মেঘলা। সূর্যের দেখা নেই। আলোর দেখা নেই। একটু যেন শীতও পড়ছে। মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ঘরে বসে দিন কাটাই। সাইকেল-রিক্সা করে বাজার যাই। এ ছাড়া আর বাইরের দিকে পা বাড়াইনি।

কটা দিন বসে বসে ভেবেছি। ভেবেছি রাজলক্ষ্মীর কথা। সেদিনের ব্যাপারের মানেটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ভূত-টুত সব বাজে। ওটা রাজলক্ষ্মীর একটা ভাঁওতা। আসল উদ্দেশ্য রাজ-লক্ষ্মীর অনেক দেরীতে বুঝতে পেরে মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছি।

কোন সতেজ যৌবনের এর চেয়ে বলিষ্ঠ আহ্বান আর কি হতে পারে। অপূর্ব সাহস রাজলক্ষ্মীর। তেমনি বুদ্ধি! কেন যে আমি উদ্দেশ্যটা তখন ধরতে পারিনি। ভূত-টুত বাজে ঠিকই। যত সব কুসংস্কার।

কিন্তু তখন ওর অন্য উদ্দেশ্যটা কোন মতেই আমার মাথায় এলো না।

এমন সুযোগ কি জীবনে আর আসবে? এমন নিটোল যৌবন কি কখনো এত কাছে পাব?

বিয়ে হবে হয়তো এক রুগ্ন বি-এ, বি-টি মাস্টারনীর সঙ্গে। শিক্ষিত হাদুলচন্দ্র এক রুগ্ন সভ্য জোলো যৌবন নিয়ে জীবন কাটাবে!

অথবা কোন লাজুক রোমান্টিক মেয়ে এসে জুটবে জীবনের কোন কোন অধ্যায়ে। এমন বেপরোয়া যৌবন আর কি পাব? আফসোসে মৃতপ্রায় হয়ে রইলাম কদিন।

এদিকে যতই দিন যেতে লাগল মাসীমা ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। আজ বাদে কাল আমরা কলকাতায় রওনা হবো। ধোপানীর পাত্তা নেই। কাপড় কাচতে যে তেরো দিন লাগে এ তো কখনো শুনিনি বাপু! যা না হাবুল, ধোপানী-মাগীর বাড়ি একবার ঘুরে আয়। কাপড়গুলো শেষ অব্দি খোয়া যাবে?

যাচ্ছি-যাবো যাচ্ছি-যাবো করে দুদিন কাটালুম। আর তো কাটে না!

সত্যিই তো আমরা কাল রওনা হবো। আজ বিকেলে একবার যেতেই হয়।

মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছে। রাজ-লক্ষ্মীর স্বামী আছে নিশ্চয়ই। বেশ জোয়ান স্বামী। তাকে যদি আমার নামে কিছু বলে থাকে, তবে বিদেশ-বিভুঁয়ে বেদম মার খেতে হবে।
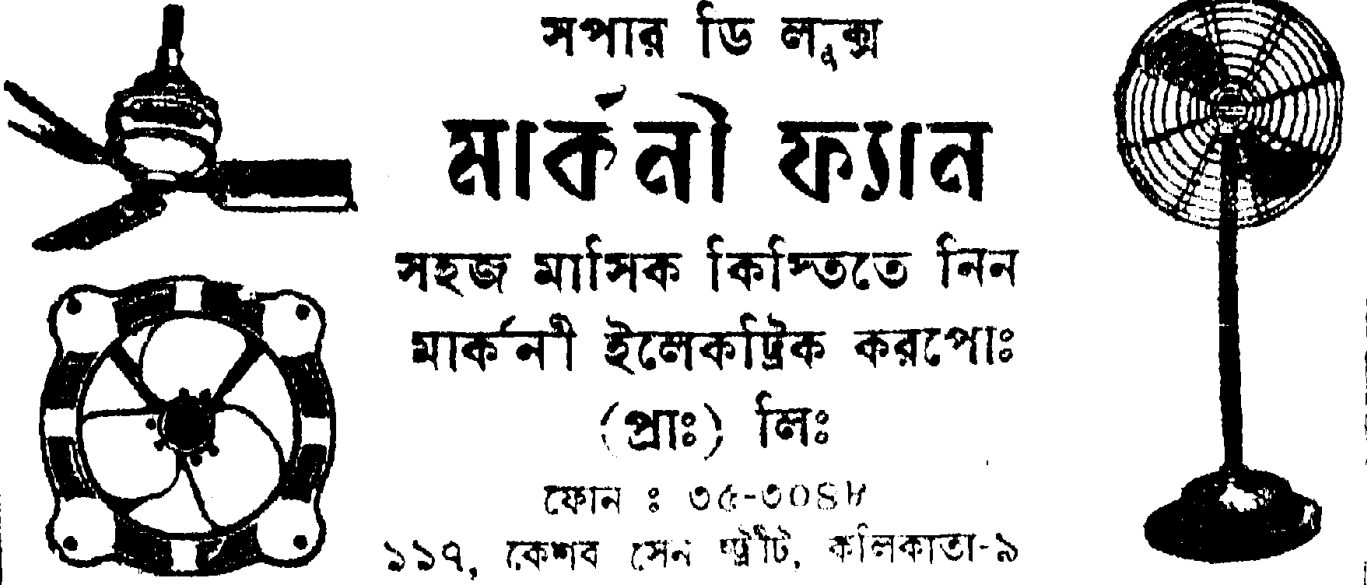
কি করা যায়! মাসীমা তো বাড়িতে তিষ্টোতে দিচ্ছেন না। যেতেই যখন

হবে। কপাল ঠুকে যাই। মার যদি খেতেই হয়, উপায় নেই।

ছোট মাসতুতো ভাইটাকে সংগে নিয়ে যাই। তবু একটু ভরসা।

বিকেলের দিকে ঠিকানাটা নিয়ে রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম।

প্রথমে রাস্তা অনেকটা সোজা, শহরের প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর শুরু হোল দুধারে জংগল আর পাথুরে উঁচু-নীচু পথ। চলছি তো চলছি। পথ আর ফুরোয় না।

সামনে অস্পষ্ট বিরাট পাহাড়টার দিকে সূর্য হেলে পড়েছে। রক্তিম সূর্য স্তিমিত হয়ে আসছে।

রিক্সাটা একটা সরু রাস্তার সামনে দাঁড়াল।

ইবার আপ খুঁজে লিবেন বাবু। গাড়ি আউর যাবে না। হামি এখানে আছি। ভাইটার হাত ধরে রিক্সা থেকে নেমে পড়ি। বছর আষ্টেক বয়েস ওর, খুব চটপটে ছেলে। ওরই ওপর ভরসা করে এগোতে থাকি। কালীগাছা পাড়া। খুঁজে বার করতে হবে রাজলক্ষ্মী ধোপানীর ডেরা।

এদিকটায় বস্তির মত সব ঘর। মাটির দেয়াল। ওপরে কোথায় টিন, কোথায় পুরোনো টালি।

আশে-পাশে রীতিমত জংগল। কি বিপদে যে পড়লাম আজ! এদিকে আবার অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিতে পথ পিছল—লাল মাটির এঁটেল কাদা আর জলে।

খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। একজন বললে, ওই নালাটা পার হয়ে রাজলক্ষ্মী ধোপানীর ঘর।

জংগলের জমিটা নীচু হয়ে একটা নালায় মিশেছে। নালার জল নোংরা, কিন্তু স্রোত রয়েছে। কে জানে কোন পাহাড়ী নদীর সংগে এর যোগাযোগ রয়েছে কিনা?

নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ভাইটাকে আগে নামিয়ে দিই। কে জানে নালাটার কোথায় কি আছে। ভাইটাকে বলতেই ও নেমে পড়ে। সোজা পার হয়ে যায় কিন্তু ওর হাফ প্যাণ্টটা ভিজে যায় অনেকটা। এ— কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে সন্তর্পণে নালাটা পার হয়েই একটা বাড়ির উঠোনে এসে পড়ি। পুরোনো ইঁটের দেয়াল। ধ্বসে-পড়া মাটির পলাস্তারা। ওপরে টিন। ঘরখানার বারান্দায় বসে এক জোয়ান বুড়ো বিহারী লোক লম্বা খাঁচের একটা বিড়ি টানছে।

জিজ্ঞেস করি—রাজলক্ষ্মী ধোপানীর বাড়ি এটা।

বুড়োর চোখদুটো বড় বড়, রাঙা। তাকানিটা অত্যন্ত রুক্ষ। ঘড়-ঘড়ে গলায় বলে,—কাঁহে? কি চাই?

আমাদের কাপড় নিয়ে এসেছে। আমরা কাল চলে যাব। তাই—

বুড়ো উঠে পড়ে—আসুন। ভিতরে আইয়ে। বিষ্টি জোন্যে যেতে পারে নেই। কসুর মাপ করবেন বাবু।

একটু সাহস হয় এবার।

ভেতরে ঢুকি। সর্বনাশ। এ যে অন্ধকার পুরী। একটা ফোকর পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। স্যাঁতসেঁতে একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

বাঁ দিকে একটা বাঁশের মাচার ওপর স্তূপাকার নোংরা কাপড়।

বুড়ো একটা অদ্ভুত ধরণের লম্বা ল্যাম্পো জ্বালায়। আলোর চেয়ে কেরোসিনের শীষের ধোঁয়া ওঠে বেশী।

বারান্দার এক কোণে একটা লোক গামছা পরে বসে রয়েছে।

লোকটার চোখদুটো আরও বড়—লাল। গালভর্তি দাঁড়ি। হাতদুটো কনুই থেকে উলটো দিকে বাঁকা। কেমন যেন জজবুথবু ধরণের লোকটা।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে অন্ধকার ঘর থেকে রাজলক্ষ্মী বেরোয়।

এই তো রাজলক্ষ্মী!

আমাকে দেখেই ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভীষণ অপ্রতিভ অপরাধীর মত তাকায়। নীরব নিস্তব্ধ। একটা কথাও বলে না।

একবারও 'বাবুজী' বলে ডাকে না। স্তম্ভিত থমথমে ভীত মুখখানা অপার কারুণ্যে ভরা।

মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে ওঠে।

ওকে উদ্দেশ্য করে বলি,—আমাদের কাপড়গুলো।

বুড়ো কটমট করে তাকায় রাজলক্ষ্মীর দিকে। যেন মেরে বসবে এখনি।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে আমাদের কাপড়গুলো এক-এক করে বার করে দেয়।

ইতিমধ্যে চোখে পড়ে বারান্দায় বসা লোকটা রাজলক্ষ্মীর শাড়িটা ধরে টানছে—আর মুখে একটা গোঁ—গোঁ আওয়াজ করছে।

এ্যাই শুয়ার!—জোয়ান বুড়ো একটা ধমক দেয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিনীত ভংগীতে বলে,—হামার ছেলে। কথা বলতে শুনতে পারে নাই। আউর এ হামার লেড়কার বহু।

রাজলক্ষ্মীর স্বামী এই কদর্য বোবা লোকটা।

লোকটা ওর বাবার কথা আন্দাজ করে আমার দিকে তাকিয়ে নোংরা লালচে বড় বড় দাঁত বার করে হাসে।—আঁ—আঁ—হেঁ—হোঁ—।

অস্পষ্ট শব্দ করে।

সমস্ত শরীরটা আমার গুলিয়ে ওঠে। বমি-বমি লাগে। কি জঘন্য! কি সাংঘাতিক!

রাজলক্ষ্মীর মাথাটা নীচু। তাকাতে পারছে না। মুখখানা ম্লান—অপার কারুণ্যে ভরা। মুখ নীচু করে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর যেন যৌবন নেই!

* * *

ভীষণ শীত পড়েছে কলকাতায়। সন্ধ্যাবেলায় কম্বলটা পায়ের ওপর চাপিয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভাবছিলাম। এই প্রচণ্ড শীতে কালী-মাখা কর্দমাক্ত নোংরা নালার ধারে সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় অন্ধকারে বসে বসে রাজলক্ষ্মী কাঁপছে নিশ্চয়। —আঁ—আঁ—হেঁ—হোঁ—অস্পষ্ট গোঙানীর মত আওয়াজ করছে বোবা জঘন্য লোকটা। শুধু যৌবন নয়—জীবনটাই ওই ঘরে কাটবে। আমরণ!

বেদনায় বুকটা টন-টন করে ওঠে। একটা নিষ্ঠুর আরামবোধ আমার সমস্ত মনটাকে ছেয়ে ফেলে। একটা সিগারেট ধরাই।

রাজলক্ষ্মীর কষ্টের কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে কম্বলের তলায় পা-দুটো গরম করে নিই। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাবর-কাটা গরুর চোখের মত আমার চোখদুটো আধ-বোঁজা হয়ে আসে। আহা রে, রাজলক্ষ্মীর কি কষ্ট!

ভেবে কি আরাম পাচ্ছি?

আশ্চর্য!

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ উনিশ ॥

মস্কো থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে। জল, কাদা, ডোবা ও নালা ডিঙিয়ে এক চাষী পরিবারের ছোট্ট কাঁচা পাকা একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালুম, শ্রীমতী লিডিয়া অনুযোগ করলেন, দেখুন দেখি আমার জুতো-মোজাটার কী দশা হল? সব আপনার জন্যে! আসুন—

একজন প্রৌঢ়া চাষী স্ত্রীলোক অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে আনলেন। চাষী হিসাবে অবস্থা ভাল বৈকি। ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন, খেলনা সাজানো, দুপাট্টা কাঁচের জানলার মাঝখানে ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য পেঁজা-তুলো ফেলে রাখার পরিচিত কৌশল, কোন কোন বসবার চেয়ারে গদি, ধবধবে বিছানা ও চাদর—বেশ ফিটফাট। ভিতরের ঘরের কোলে চলাফেরার জায়গা সঙ্কীর্ণ। ওরই মধ্যে কার্পেট পাতা, টেলিভিশন ও রেডিয়োর সেট। এখানে-ওখানে দেওয়ালে লেনিন ও অন্যান্য ছবি। ছোট ছোট ঘরদোর, তবে পরিপাটি। ঘরের ভিতরে বেশ দামী কাঠের আসবাবপত্র ও খাটবিছানা। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, কলেকটিভ ফার্ম-এর হেড আপিসের সংলগ্ন গৃহস্থগণের অবস্থা বেশ সচ্ছল। যারা দূরে অঞ্চলে বসবাস করে তাদের সুযোগসুবিধা এবং ঘরদোরের চেহারা স্বভাবতই সদরওলাদের অপেক্ষা কম। সেইজন্য বড় শহর এবং কলেকটিভ ফার্মের কৃষিপ্রশাসন-কেন্দ্রের কাছাকাছি বাস করার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

বাড়িটির ভিতরে একটি ঝুপসি কোণের মধ্যে একটি ধোবিখানা দেখছি। এটি কাপড়চোপড় সিদ্ধ করার দেশি-প্রথার ভাঁটি। ধোবা নামক আলাদা কোনও শ্রেণী নেই,—ওসব ব্যাপার নিজেদেরই সারতে হয়। গ্রামে মেথর, ঝাড়ুদার, ফরাস, কামার, কুমোর, মুচি, নাপিত, ফড়ে, গয়লা,—এসব বলতে কিছু বোঝায় না, সব নিজেরাই। ঝি-চাকর-রাঁধুনির নাম কেউ একালে শোনেনি। গ্রামের হাটতলায় মোটামুটি ঘরকন্নার জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার-সার্কাসের-দল গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটায়। ছোট ছেলেমেয়েদের নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। 'ইয়ং পায়োনীয়ার্সরা' ছুটিছাটার-কালে মেট্রনদের সঙ্গে একসঙ্গেকারসনে এসে থেকে যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তাদের বাড়ি, বাগান, তাঁবু, খেলার মাঠ, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ, সাঁতার—যা কিছু খরচ সব কর্তৃপক্ষের। এইভাবে তারা বৃহত্তর দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, পালন, এবং শিক্ষিত ক'রে তোলার ভার কর্তৃপক্ষের হাতে। পিতামাতা সেখানে মুখ্য নয়। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে যত্ন বেশি।

বৃদ্ধা চাষী স্ত্রীলোকটির আর্থিক অবস্থা ভাল। ছেলেমেয়েদের কথা তুলতেই লিডিয়া আমাকে ইশারা করলেন। ওই প্রশ্নটিতে বৃদ্ধার মন ব্যথায় টনটনিয়ে উঠতে পারে। কেননা বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে বৃদ্ধার দুটি ছেলেই প্রাণদান করেছে। আমি চুপ ক'রে গেলুম। মেয়ে দুটি এবং এই মহিলা স্টাইপেন্ড ও মাসোহারা পায়। মেয়ে দুটি এখনও ছাত্রী। এই প্রবীণা নারীর কাছে বসে যখন দেশের বিবিধ সাচ্ছল্যের বর্ণনা শুনছিলুম, তখন ভাবলুম বহিরাগত বিদেশীর কাছে নিজের দেশের অনুজ্জ্বল ছবি কেই বা না তুলে ধরতে চায়? আমরা যখন ভারতবর্ষের বারানসী তীর্থস্থানটি পর্যটকের সামনে তুলে ধরি, তখন কি দশাশ্বমেধ পোস্ট আফিসের সামনের চওড়া রাস্তাটার কথা বলি! কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটক ওখানে এসে দেখে যায় প্রতিদিনের একটা বীভৎসা দৃশ্য! অন্ধ, খঞ্জ, আতুর উলঙ্গ মুমূর্ষু, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং ভিখারীর মস্ত এক জনতা ওখানে দেখতে পাচ্ছি আজ চল্লিশ বছরেরও বেশি। সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, ওটা উত্তরপ্রদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 'দেশ!'

আশেপাশে একটা কোনো দারিদ্র্য-দশার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ,—এই দুটি মাত্র মন্তব্য ক'রে পালাবার জন্য আমি আসিনি! আমার মতো সামান্য ব্যক্তির মন্তব্য বা নিন্দা-সুখ্যাতি শোনার জন্য সোভিয়েট সরকারও বসে নেই! যারা প্রাণান্তকর অধ্যবসায়সহকারে শত শত বছরের অবর্ণনীয় দুর্গতির থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, আমার ন্যায় অজানা একজন বিদেশী পর্যটক যাবার আগে দুটো ফোড়ন কেটে যাব—আমি সে-অধিকার অর্জন করিনি। বরং আমি এই আশপাশে দুর্দশার চিহ্ন দেখে কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের একাত্মতা বোধ করছি! আমার কেমন যেন ভাল লাগছে চারিদিকের এই সরল স্বাভাবিক একটি সাজসজ্জাহীন চেহারা। এর মধ্যেও অসীম বৈচিত্র্যের আকর্ষণ রয়েছে, নচেৎ আমি আনন্দ পাচ্ছি কেমন ক'রে? ছোট বাগান, বন-বাঁদাড়, কাঁচামাটির পথ, গোয়ালে রয়েছে গরু, ঝোপঝাড়, আপেল গাছে এখনও ফল ধ'রে রয়েছে, উঠোনে বসে একটি মেয়ে বালতির জলে বালিশের ওয়াড়ে সাবান দিচ্ছে, পাশের বাগান থেকে কাদের বাড়ির বউ তার স্বামীকে পাঠাচ্ছে বাজারে, রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে দুটি মেষশাবক,—এত' সেই চিরকালের সব দেশের গ্রামের ছবি, এই ত' আনন্দ!

প্রবীণা মহিলাটি এদেশের ফসলের মাঠের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে প্রায় নবেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত একদিকে চাষ হয়, অন্য-দিকে ফসল ওঠে। বছরে একবার চাষ,—সেই জন্য কাজকর্মও তাড়াহুড়ো। বরফে ঢাকা পড়বার আগে মাঠের সমস্ত ফসল বোনা শেষ করতে হয়। তারপর আসে শীতকাল, তুষার জমতে জমতে অবশেষে কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে, বরফের নীচে মাটিতে একটি বায়ুহীন উষ্ণতা এবং গুমোটের সৃষ্টি হয় এবং জল চুঁইয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। সে-তুষার প্রান্তরের উপর শীতকালে ছেলেমেয়েরা 'স্কি' খেলে, ঠিক তারই নীচে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ফসলের অঙ্কুর মাথা তোলে। এর পর যত বরফ গলে, যত রৌদ্র বাড়ে, এবং গরম পড়ে,—ততই ফসল পাকতে থাকে। ওদের সর্বাপেক্ষা

স্যানদের মাস হল দুটি—জুন এবং জুলাই। অগাস্ট মাসও অনেকটা আনন্দদায়ক। গ্রীষ্ম ও বসন্ত হল জুলাই! ওদের জুলাই মাসে কখনও-কখনও আমাদের বৈশাখের মতো গরম পড়ে! ১৯৬০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে মস্কোতে ৯৫° ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রা উঠেছিল। কিন্তু গরমকালে বৃষ্টি হবামাত্র প্রচুর ঠাণ্ডা পড়ে। ফেডারেটেড রাশিয়ায় সারা শহরে বৃষ্টি পড়ে যখন তখন। কিন্তু বৃষ্টি ঘনীভূত হয় সেপ্টেম্বরে। শীতকালের পর ওরা বরফ থেকে পায় প্রচুর জল,—তা'তে ফসলের মাঠ হয় অতিশয় উর্বর। সেই কারণে যে-বছর বরফ পড়ে কম, সে-বছর ওদের ফসল এবং শাক-সব্জির বাজার মন্দা। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে ওদের প্রিয় সব্জি আলুর ফসল এইজন্য মার খেয়েছিল!

মধ্যাহ্নকালের কিছু বিলম্ব ছিল। শ্রীমতী লিডিয়া আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলেন মস্কোতে। একথা আমার মনে ছিল, কোন কোনও দেশের পর্যটক, প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূতাবাসের লোকদের নাকি মস্কো শহরের কুড়ি মাইলের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না! কিন্তু ভারতীয়রা এমন অবাধ এবং স্বচ্ছন্দগতি ছিলেন যে, এরকম কোন কথাই তাঁদের মাথায় আসেনি। আমার কথাই ধরি। আমি একা পথ চিনে চিনে যথেষ্ট ভ্রমণ করেছি, যে কোনও অঞ্চলে অবাধে গিয়েছি, একা বিশেষ বিশেষ নম্বরের বাসে যখন-তখন ছুটোছুটি করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে অহেতুক প্রশ্ন করেনি, বা অনুসরণ করছে এমন মনে হয়নি। বরং অসুবিধায় প'ড়ে যখন কারোকে কিছু প্রশ্ন করেছি তখনই দু-চারজন এগিয়ে এসে সাগ্রহে আকার ইঙ্গিতে পথনির্দেশ ক'রে দিয়েছে। তথাকথিত 'পুলিশ স্টেটে' এসেছি, কিন্তু কই, পুলিশ চোখে পড়ছে না ত? পথ-ঘাটে কচিৎ দেখি 'মিলিচম্যান'—তারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বহু বড় বড় রাস্তায় তাও নেই। তবে আমার দ্বিতীয় দফার ভ্রমণ-কালে অবশ্য দু'-একবার কেমন যেন একটু খট্‌কা লেগেছিল। সেটি আমি স্পষ্টই বলি। কোন কোনও দিন একবার অথবা দুবার আমার হোটেলের ঘরে হঠাৎ ফোন বেজে উঠত এবং আমাকে প্রশ্ন করা হত, অমুক ব্যক্তি আমার ঘরে উপস্থিত আছে কিনা। আমি যখন বলতুম, সেই অমুক ব্যক্তিকে আমি চিনিনে তখন ওদিক থেকে ফোন ছেড়ে দেওয়া হত! হঠাৎ হয়ত নারী-কণ্ঠের আওয়াজে আমাকে ডাকা হ'ল, এবং এমন দু-একটি কথা বলা হল যা অপরিচিত পুরুষকে কোনও দেশের মেয়েই বলে না! এসব শুনে আমার মনে পড়ত স্টালিন আমলের কুখ্যাত 'অগ্‌পু' বা 'এন-কে-ভি-ডি'র কথা। আমার পাপ-মন কাঁটা হয়ে উঠত, একা ঘরে গা ছমছম করত, এবং ঘরের মধ্যেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা অলীক দুর্ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসত! হয়ত রেডিয়ো-প্লাগ কিংবা কালো বর্ণে ভেন্টিলেটরের ফাঁকগুলি, যার স্থানীয় নাম 'ফর্তোশকা'—সেগুলির মধ্যে অদৃশ্যভাবে টেলিভিশন বা টেপ-রেকর্ডিং বা আর কিছু বৈজ্ঞানিক য়্যাপারেটাস আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে কিনা ভাবতুম। তখন ঘরের বিছানা, টেবিল, দেরাজ, টিপাই, টেবল-ল্যাম্প, এমন কি ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত আমার কাছে প্রেতকায় হয়ে উঠত! রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র মনে পড়ে' যেত, "যদি দশ দিক ভ'রে ওঠে দশটি সন্দেহে, তবে কোথা সুখ?"

বিদুষী দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানাকে আমি এই টেলিফোনের বৃত্তান্তটি বলতে বাধ্য হয়েছিলুম। আমার সন্দেহ, মাঝে মাঝে আমার সাড়া নেওয়া হচ্ছিল! শ্রীমতী অকসানা আমার কথায় হেসেছিলেন! কিন্তু ওটা আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

একটি সিনেমাচিত্রে গোর্কির বাল্য ও যৌবনকে কিছুকাল আগে চিত্রিত করা হয়েছিল। ওটি আমার পক্ষে দেখা দরকার, লিডিয়া জানতেন। সেইজন্য তিনি আমাকে নিয়ে এলেন একটি পুরনো আমলের বড় বাড়িতে। এই বাড়ির নীচের তলাকার একটি প্রেক্ষাগৃহে নানা ছবির প্রজেকশন দেখান হয়। কিন্তু আজ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ দর্শক নেই। ছবিটি রুশ ভাষায় বলা হচ্ছে, এবং এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে গোর্কির বাল্য ও কৈশোর, দ্বিতীয় খণ্ডে তারুণ্য ও যৌবন। মোট চার ঘণ্টায় দুখানি ছবি দেখান হচ্ছে। ডাইরেক্টর-মশায় আমাদের দুজনকে পিছন দিকের কুশনটিতে সমাদরসহকারে বসিয়ে মিনিট পাঁচেক আলাপ ক'রে বিদায় নিলেন, এবং তারপর ছবিটি আরম্ভ হ'লে শ্রীমতী লিডিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা সযত্নে অনুবাদ করে আমাকে বোঝাতে লাগলেন। গোর্কির শৈশব আরম্ভ তাঁর দিদিমা ও দাদামশাইয়ের কাছে। নোংরা, দরিদ্র ও হতভাগ্য জীবন। 'নিজনি-নভগোরদ' শহরের ময়লা বস্তি, চারিদিকে জীবনের অপচয়ের মাঝখানে দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্যের দুর্দশা, সামনে ও পিছনে নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকার,—গোর্কি তার মধ্যে মানুষ হচ্ছেন! মানুষ মানুষের প্রতি উৎপীড়ন করছে, প্রতারণা ও শোষণ করছে, অসাধু এবং তস্করের জটলা, নোংরা-হোটেল, অর্ধনগ্ন মাতাল স্ত্রীলোক পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যায়, অমানুষিক পরিশ্রম করেও পেটে অন্ন জোটে না,—বালক গোর্কি তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ায়! কত ছোট ছোট ঘটনা, মানবতার কত আবেদন, জীবনের কত অপমান, মনুষ্যত্বের কত অধঃপতন, অন্যায়-অবিচারের কত দম্ভ,—ওদেরই সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে ধূল্যবলুণ্ঠিত ছোট ছোট ভালবাসা আর করুণা, ছোট ছোট মমতার অমৃতবিন্দু। ছবিটি আশ্চর্য। আমি যেন ধীরে ধীরে এই জীবনীচিত্রটির মধ্যে অনেকটা নিজেরই ছায়া দেখতে-দেখতে তলিয়ে গেলুম! দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা, কৌতুক, পরিহাস এবং ভাগ্যের সেই সকল শোচনীয় বিড়ম্বনার মধ্যে এমন ক'রে বোধ হয় আর কোনও দিন ডুব দিইনি! বহুকাল পরে একটি ছবির সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে এমন এক রোমাঞ্চ-কম্পন এবং অনুপ্রেরণা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছিলুম যেটি আমার কাছে নতুন। ছবিটির সঙ্গে আমার এমন একটা হৃদয়াবেগ, মানস-নৈকট্য এবং আত্মীয়তা ঘটছিল,—যেটি আমাকে আগাগোড়া মুগ্ধ, অভিভূত ও সম্মোহিত ক'রে রেখে দিল সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা কাল। সোভিয়েট ইউনিয়নে সিনেমা ফিল্ম-শিল্পের এই বিস্ময়কর উন্নতি আমার জানা ছিল না। সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক খুঁটিনাটিসহ এমন একটি সার্থক ছবি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতুম না! আরেকটি যুদ্ধের ছবি 'ফেট অফ ম্যান' দেখে এমনিই অভিভূত হয়েছিলুম।

চার ঘণ্টা পরে গোর্কির সেই আশ্চর্য 'বাস্তব' জগৎ থেকে বেরিয়ে যখন সোভিয়েট জগতে অবতীর্ণ হলুম—তখন এটাকেই যেন সম্পূর্ণ 'অবাস্তব' মনে হতে লাগল! সেদিন অবেলায় হোটেলে ফিরে আহারের টেবলে বসে শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতে পারিনি!

ভারতীয়দলের অধিকাংশই একে একে দিল্লী রওনা হয়ে গেছে। প্রিয়বন্ধু ও

পণ্ডিত চৌহানকে গত পরশু মধ্যরাত্রে লিডিয়ার সঙ্গে গিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে এসেছি। তাঁর চলে যাবার পর অত্যন্ত খালি-খালি লাগছে। বেদী, তাবান ও ধনপাল এবং জহীর শুধু আছেন, আর আছেন অবশ্যম্ভাবী শেখোন। আমি কবে যাব, 'রাইটার্স' ইউনিয়ন থেকে তার সাড়া শব্দ এখনো পাইনি। এদিকে সারাদিনের মধ্যে দুই-তিনবার মস্কোয় তুষারপাত হচ্ছে। এটা নাকি হেমন্তকাল। রাস্তায় রাস্তায় তুলোর মতো তুষার উড়ছে ঝাপটা ঝড়ো হাওয়ায়। রাস্তার থেকে বড় বড় কোদাল দিয়ে বরফ সরানো হচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু না, এটা নাকি শীত-কাল নয়! শীতকাল আসবে ডিসেম্বরে। তার চেহারা কেমন জানিনে। তখন নিষ্পত্র গাছগুলি হবে শাদা, যানবাহন পথে আটকে যাবে, বাড়ি ঘর দেখা যাবে না, দরজা জানলা বরফে চাপা পড়বে, বরফের ঝড় বইবে ইত্যাদি।

শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে পথে বেরিয়ে নানা হোটেলে, বাগানে, বাজারে, এবং বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ঘোরাঘুরি করছিলুম। রাইটার্স ইউ-নিয়নের দোভাষীদের সাহায্যে যেমন এক-দিকে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করার সুযোগ পাই, শ্রীমতী লিডিয়ার কল্যাণে অন্যদিকে তেমনি পাই বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ ও কায়িক পরিচয়। স্টেট-বাসের ভিড়ের মধ্যে হ্যাণ্ডেল ধ'রে দাঁড়িয়ে যাবার সময় যে সাধারণ মেয়ে-পুরুষের জনতাটাকে দেখতে পাই, সেটা আমার লাভ! মস্কোয় হোটেলের নীচের তলাকার রেস্তোঁরায় যখন দুজনে 'সামসা' বা শিঙাড়া খেতে ঢুকি, তখন যে আন্তঃপ্রাদেশিক লোক-সমাজকে চোখের সামনে লক্ষ্য করি, সেটি আমার পক্ষে বিশেষ উৎসাহের বস্তু। এমন কতকগুলি পথ আমরা বেছে নিয়ে-ছিলুম যেগুলি মস্কোর সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এটি জানি ৮০০ বছরের এই প্রাচীন শহরের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ইতি-হাসের অনেক প্রবাহ। কিন্তু সেই পুরাকাল কোথাও ধ্বংসস্তূপের জটলা হয়ে নেই। একটি বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। মস্কোর নাড়ির মধ্যে বিপ্লবের চেতনা রয়েছে বহু শতাব্দী থেকে। প্রতি শতাব্দীতে জনসাধারণ বহুবার মাথা তুলতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে। ঝড় উঠেছে, আগুন জ্বলেছে, অসন্তুষ্ট জনতা মাথা ঠুকেছে ক্রেমলিনের রক্তিম দেওয়ালে, এবং ঝলসিত তরবারির থেকে তাজা রক্তের দাগ কখনও শুকোয়নি! প্রায় দেড়শ বছর আগে কবি পুশকিন সন্ধ্যাবেলা যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করতেন, সেই পথটির নাম এখন 'টিভর্স্‌কয় বুলেভার'। আধুনিক রাশি-য়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং অধুনা পরলোকগত পাস্টেরনাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মায়াকভস্কি— যিনি স্টালিনযুগের অসহনীয় যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্ম-নাশ করেছেন,—তাঁর নামের সঙ্গেও এই পথটি জড়িত! রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নির্দেশবলে যিনি বিশেষ একখানি গ্রন্থ রচনার অপরাধে ("Journey from Petersburg to Moscow") দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সেই "র‍্যাডিশচেভ" যে পথটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি এখন প্রসিদ্ধ। এটির পর দেখতে পেলুম "স্পাটাকভস্‌কায়া স্ট্রীট," যেখানে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বাস ক'রে ছিলেন 'করমুজিন'—সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The History of the Russian Empire" এর লেখক। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় জাতীয়তাবাদী কবি পুশকিনকে নির্বাসনভূমি থেকে ক্রেমলিনে আনা হয় জারসম্রাট প্রথম নিকলাইয়ের সামনে। অতঃপর মস্কোতে তিনি নজর-বন্দী থাকেন, এবং যে-বাড়িটিতে তিনি বাস করেন, সেই ছোট্ট পুরনো বাড়িটির সামনেকার পথটির নাম এখন 'কার্ল-মার্কস স্ট্রীট'। এখানকার বড় রাস্তা-গুলিকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় ডাকা হয়। যেমন "রুয়ে" —Rue Gorki, পেরুলেক, বুলেভার, প্রোজেখ, প্রয়েজদ্‌ ইত্যাদি। সম্রাট নিকলাইয়ের হাতে কঠোর শাস্তি লাভ ক'রে যে তরুণ বিপ্লববাদী কবি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কারাগারের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগে ভুগে মারা যান, তাঁর নাম ছিল পলেজায়েভ। তাঁর সঙ্গে 'স্পাস্‌কায়া' পথটি চিহ্নিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে টলস্টয়ের জন্মের প্রায় বছর পনেরো আগে রুশসাহিত্যে যে অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হয় তিনি ছিলেন ডসটয়ভস্কি, টুর্গেনিভ এবং টলস্টয় প্রভৃতির সাহিত্য-শিক্ষক। তাঁর নাম ছিল 'লারমনটভ'। তিনি অতি প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। তাঁর স্বদেশানুরাগযুক্ত কাব্য রচনার জন্য ২৬ বৎসর বয়সের মধ্যে দুইবার তিনি নির্বাসনদণ্ড লাভ করেন। তাঁর নামে পথ, উদ্যান এবং বাড়ি ইত্যাদি নামাঙ্কিত। রুশসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক টুর্গেনিভ তাঁর 'রুদিন' উপন্যাসে 'পকস্‌কি' নামক যে মণ্ডলীটির বর্ণনা করেছেন, সেটির মূলে স্থানটি হল "বল্‌-শয় পেরুলেক নম্বর ৮"। এ-ছাড়া আছেন তিউৎচেভ, চার্ণিশেভস্কি, বেলিনস্কি, বটকিন, আকাসভ, জাগস্কিন, স্চেপকিন ও গোগল। গোগল তাঁর "Dead Souls" রচনাকালে প্রফেসর পডোগিন-এর যে বাড়িতে বাস করেছিলেন সে-বাড়ির একটি অংশ আজও রয়েছে। সেখান থেকে কিছু দূরে রয়েছে গোগলের বিরাট প্রস্তরমূর্তি 'গোগলেভস্কি বুলেভারে'। গোগলের মৃত্যু ঘটে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। তারপর একে একে দেখে বেড়াচ্ছিলুম হারজেন, ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, গঞ্চারভ, নেক্রাসভ প্রভৃতির নামাঙ্কিত বিভিন্ন পথঘাট। সমগ্র প্রাচীন মস্কোয় ছড়িয়ে রয়েছে শেভচেনকো, অস্ত্রভস্কি, পিসেমস্কি, টলস্টয়, গোর্কি ও চেকভ। এ-ছাড়া স্মৃতিসৌধ, স্তম্ভ, মূর্তি, প্রাসাদ, উদ্যান, লাইব্রেরী, চিত্রশালা, যাদুঘর ইত্যাদি। হিসাব নিয়ে দেখেছি কেবলমাত্র মস্কো নগরীতেই রয়েছে ৮৭০টি স্থাপত্য-কীর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ, ১১৬ যাদুঘর এবং 'মেট্রোর' ভূ-গর্ভস্থ রেলপথ ও স্টেশন বাদ দিয়ে উপরিভাগে

মোট ১১টি রেল ষ্টেশন। 'মস্কো'—এই শব্দটি মূলতঃ ফিনিস ভাষায় মস্কোয়া থেকে এসেছে, এবং মস্কো নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার দোল-গোরুকি ছিলেন ইংরেজরাজ দ্বিতীয় হ্যারল্ডের কন্যা রাজকুমারী গাইথার গর্ভজাত সন্তান। দোল গোরুকির পিতা ছিলেন কিয়েভের সামন্তরাজ 'ভ্যাদিমির মনোমাখ'। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই, তাঁরা পুরনো ইতিহাসের ভিতর থেকে সোভিয়েট-ভূমি বহির্ভূত কোনও তথ্য কারোকে আর শোনাতে চান্ না! তাঁদের অতি প্রখর দেশপ্রেম ও 'জাতীয়তাবাদের' তলায় আগের আমলের তথ্যপূর্ণ ইতিহাসগুলি দিনে দিনে যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। এটি দেখতে পেয়েছি ক্রেমলিনসহ রাশিয়ার প্রায় সর্বত্রই—স্থাপত্য, ভাস্কার্য, চারু-শিল্প, নাট্যমঞ্চ, বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বহু চিত্রশালা ও যাদুঘর, এমন কি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান—জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বহু জাতির প্রত্যক্ষ অবদান, সহায়তা, সংগঠন এবং বহুপ্রকার কায়িক সংযোগ রয়ে গেছে অনেককাল থেকে,—কিন্তু সোভিয়েট আমলে তাদের উল্লেখ শোনা যায় না! ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ বা জার্মান—এদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-চিত্রশিল্প বা প্রদর্শনীয় সামগ্রী জার-সম্রাটদের আমলে যদি প্রস্তুত হয়ে না উঠত, তাহলে মস্কো বা লেনিনগ্রাডকে দরিদ্র মনে হত! ক্রেমলিনের ভিতরের অনেকাংশ, এবং বাইরের সুউচ্চ আরক্তিম প্রাকার—এগুলি ইতালীয় স্থাপত্যবিদের দ্বারা নির্মিত। একালে সোভিয়েট আমলেও নানা সংগঠনের কাজে ইংরেজ বা আমেরিকানদের যথেষ্ট হাত আছে।

পুরনো মস্কোর একটি অঞ্চলে,—এককালের একটি অতিশয় দরিদ্র বস্তি-পল্লীতে,—একদিন এসে পৌঁছলুম। সে-আমলের সেই দারিদ্র্য এখন আর নেই, সংস্কার এবং নবনির্মাণ ঘটে গিয়েছে অনেক,—কিন্তু রয়ে গেছে আশেপাশে প্রাচীনের স্বাক্ষর। সেই অঞ্চলেরই নির্লিপ্ত একটি অংশে একটি মস্ত গেটের মধ্যে প্রবেশ ক'রে যে কোর্টইয়ার্ড অর্থাৎ বড় উঠোনে এসে দাঁড়ালুম, তার ঠিক মাঝখানে বিরাট প্রস্তরমূর্তি রয়েছে যাঁর, তিনিই একদিন রুশসাহিত্যের ভিতর দিয়ে "উৎপীড়িত মানবাত্মার" বেদনা-মথিত কণ্ঠের বাণী বহন ক'রে এনেছিলেন,—তিনি ফিয়োডোর ডসটয়-ভস্কি! এবাড়িটি ২নং ডসটয়ভস্কি ষ্ট্রীট। বিগত শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই বাড়িরই যে-অংশটায় পথ-পরিত্যক্ত যে সকল রুগ্ন হতভাগ্যরা মৃত্যুর আগে হাসপাতালের নামে একটা আশ্রয় খুঁজে পেত, সেই মেরিনস্কি হাসপাতালের একটি ঘরে ডসটয়ভস্কির জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন এই হাসপাতালেরই এক স্বল্প-বিত্ত ডাক্তার, এবং বাড়িরই একটি অংশে তিনি বসবাস করতেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল কষ্টের, এবং ডসটয়ভস্কি যাদের চোখের সামনে অল্পে অল্পে বড় হতে থাকেন তাদের জীবন ধিকৃত, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ, মুমূর্ষু এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-গণের দ্বারা পরিত্যক্ত। সেই অন্ধকার হাসপাতালের নারকীয় অবস্থার মধ্যে মরণোন্মুখ 'প্রেতাচ্ছায়াদলের' বিকৃত কণ্ঠের প্রলাপ-জড়িত কান্না বালক ডসটয়ভস্কির মনে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে অসীম নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাবোধ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বেদনায় করুণায়, ভালবাসায় আলোড়িত হতেন। চারিদিকের অন্তহীন নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়াতেন প্রতিকার। তাঁর মনে অসন্তোষ এবং বিপ্লবের আগুন ধকধক ক'রে জ্বলত। এই বাড়িতে তিনি প্রথম ১৫ বছর অবধি এবং পরে আরও দু'বছর অতিবাহিত করেন। মস্কোর এই অঞ্চলের নাম তৎকালে ছিল, "God's House", এবং এখানে চোর, ডাকাত, খুনে, বেশ্যা, ভিখারী, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকত। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রথম বই "Poor people" প্রকাশ করেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, এবং বিশেষ জনপ্রিয় হন। অতঃপর তিনি তাঁর তরুণী 'সেক্রেটারী' (!)-কে বিবাহ করেন। এই মহিলা আপন সুদীর্ঘ জীবনকালে ডসটয়েভস্কির সমস্ত রচনা, এবং ১৮৪৬ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ অবধি লেখকজীবনের সর্বপ্রকার খুঁটিনাটি সামগ্রীর ৬০০০ দফার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ক'রে যান্। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই মহিলার মৃত্যু ঘটে।

ডসটয়ভস্কি বিপ্লববাদের মন্ত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং 'গুপ্তদলের' নানা অংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তৎকালীন জারের শাসন ছিল অতি কঠোর এবং নৃশংস। পূর্বোক্ত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একটি গুপ্তদলের রাজনৈতিক পরামর্শসভার অধিবেশন-কালে তিনি সবান্ধবে গ্রেপ্তার হন্, এবং পিটার্সবার্গের কুখ্যাত "পিটার এণ্ড পল" কারাদুর্গে ১১ মাস কাল তাঁকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, এবং সেই বন্দীদশার মধ্যেই তিনি তাঁর ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা লাভ করেন।

সম্ভবত উনিশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে অপর কোনও লেখক ডসটয়ভস্কির মতো এমনভাবে কায়িক উৎপীড়ন বরদাস্ত করেননি। সেই উৎপীড়ন ও যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি চিরকালের মুক্তি পেলেই হয়ত ভাল হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফাঁসী তাঁর হয়নি! পরবর্তীকালে যাঁকে লিখতে হবে "Crime and Punishment," "Brothers Karamasov," "Possessed" ইত্যাদি জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যাঁকে অন্ন-সংস্থানের জন্য সাপ্তাহিক কাগজের দরজায়-দরজায় ঘুরতে হবে, শুকনো বাসি রুটির ওপর কামড় দিতে গিয়ে যার চোখের নোনা জলে সেটি ভিজবে,—তাঁর ফাঁসী যাবার সৌভাগ্য হবে কেন? সম্ভবত রুশসম্রাটের দূরদৃষ্টি ছিল! কোনও এক কঠিন শীতার্ত প্রভাতে "পিটার এণ্ড পল" দুর্গের বধ্যভূমির সামনে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন ডসটয়ভস্কি তাঁর সহকর্মীদের একটির পর একটিকে 'গিলোটিনের' সাহায্যে মাথা-কেটে-নেওয়া রক্তাক্ত কবন্ধের চেহারায় দেখে 'সকৌতুকে' তাঁর নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই মুহূর্তে জারের পেয়াদা ছুটতে ছুটতে আসে একটি 'দুঃসংবাদ' নিয়ে,—ডসটয়ভস্কির উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে! কেননা মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণতরো শাস্তি হল সাইবেরিয়ার "তুষার-তুন্দ্রার" মধ্যে দশ বছরের জন্য পাঠিয়ে তিল তিল ক'রে তুষারক্ষতের দ্বারা পচিয়ে মারা। সুতরাং "পিটার ও পল" দুর্গবাসের কালে শ্রীমান ডসটয়ভস্কির সর্বাঙ্গে যে 'ডাণ্ডাবেড়ী' ছিল, বেটি পরে তিনি ঐ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে ঠিক সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় সাইবেরিয়ায়! প্রহার উৎপীড়ন অনাহার ও ব্যাধির ফলে তদানীন্তন সাইবেরিয়ায় স্বভাব দুর্বৃত্তরা' কেউ পাঁচ বছরের বেশী বাঁচেনি। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা কাল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় 'কাজ' করেও এই বিরাট সাহিত্যপ্রতিভা দশ বৎসর কাল 'ক্ষতবিক্ষত' অবস্থায় বেঁচে এক-দিন ছাড়া পেয়ে চলে আসেন!

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেননি, তখন সিপাহী বিদ্রোহের কাল। কিন্তু ডসটয়ভস্কি সাইবেরিয়া থেকে ছাড়া পেয়ে একদা অন্ধকার রাতে যেদিন এক জীর্ণবাস প্রেতচ্ছায়ার মতো তাঁর সহোদরা ইভানভার সামনে এসে দাঁড়ান, তখন সেই মহিলা সাশ্রুনেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি ছত্র উচ্চারণ করতে পারতেন :

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—"

"বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—"

নীচের তলাকার কয়েকটি ঘর আজ ডসটয়ভস্কির যাদুঘরে পরিণত। এই ঘরগুলির মধ্যে ডসটয়ভস্কির জীবনকালের সেই সব প্রত্যেকটি সামগ্রী, তাঁর সকল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ছাপা বই, কয়েকটি গ্রন্থের মূল পান্ডুলিপি, সোভিয়েট আমলের নূতন সংস্করণ, নানা চিত্র, ডসটয়ভস্কির মূর্তির সুন্দর কয়েকটি ছাঁচ, তাঁর ব্যবহৃত নানা খুঁটিনাটি জিনিসপত্র অতি যত্নে সংগৃহীত রয়েছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে "Crime and Punishment" নামক গ্রন্থের কাটাকুটি করা রুশভাষায় লেখা অতি বিবর্ণ পান্ডুলিপিখানির সামনে এসে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। আমার তরুণ বয়সে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ থেকে দুই তিনটি ছত্র আমার মুখস্থ ছিল—যেখানে "রাসকলনিকভ" তার বান্ধবী 'সোনিয়াকে' বলছে, "I did not bow down to you, personally, Sonia, but to the suffering humanity in your person."

"উৎপীড়িত মানবাত্মার" বন্ধন-জর্জরতা নিয়ে ডসটয়ভস্কি প্রথম যেদিন সাহিত্য রচনা করেন, তখন তরুণ জমিদার পুত্র টলস্টয় রাজকীয় বিলাস-বৈভবের মধ্যে প্রমোদ সাগরে ভাসমান এবং গোর্কি তখনও জন্মগ্রহণ করেননি!

ডসটয়ভস্কি কারগার থেকে ফিরে দুইবার দীর্ঘকালের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে এবং ১৮৬৮ সালে জার্মাণী ও সুইজারল্যান্ডে কিছুকাল বসবাস করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যতদূর শুনি, পিটার্সবার্গে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর একটি পৌত্র, আন্দ্রে ডসটয়ভস্কি এখন লেনিনগ্রাডের একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার। এই ব্যক্তি একটি ভূমিকর্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে কিছুকাল আগে পৃথিবীপ্রসিদ্ধ হন। রুশবিপ্লবের পর বৎসর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি বিশেষ সোভিয়েট আইনবলে ডসটয়ভস্কি ও টলস্টয়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া উক্রইন, সাইবেরিয়া ট্রান্সককেশিয়া প্রভৃতি ভূভাগে সর্বনাশা দুর্গতি, নৈরাশ্য, অপচয়, দুর্ভিক্ষ, পাশবতা ও জয়-পরাজয়ের মধ্যেও তদানীন্তন শীর্ণকায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিজদিগকে জনপ্রিয়তা করার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী ও প্রতিভাধরদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণরত হয়েছিলেন—এটি সুস্পষ্ট। মহামতি লেনিনের অপরাজেয় দূরদর্শিতা ছিল।

রুশবিপ্লবের পরে জারের পুলিশের পুরনো ভাঁড়ারে ডসটয়ভস্কির "Possessed" উপন্যাসের যে কয়টি 'পরিচ্ছেদ' লুক্কায়িত ছিল, সেগুলি আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ছাপা হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে দশটি খণ্ডে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে, এবং বিগত ১৯১৭ থেকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ অবধি সোভিয়েট ইউনিয়নের মোট ১৪টি ভাষায় ১৪৮ দফায় সবসুদ্ধ ৮,৫,৩৭০০০ সংখ্যক গ্রন্থাবলী বিক্রি করা হয়েছে। 'ডসটয়ভস্কি মিউজিয়ম' থেকে বেরিয়ে আসার সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুম তাঁর কোনও গ্রন্থ বাঙলাভাষায় ছাপা হয়ে থাকলে আমি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

মস্কোর অন্যতম আকর্ষণ "ইয়ং পাইয়োনীয়ার্স কোর"। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র 'লেনিন' শব্দটির মতো 'ইয়ং' শব্দটি সর্বত্র পূজ্য। ইয়ং মানে যারা পুরনো কাহিনী বা ইতিহাস ঘাটে না। ইয়ং তারাই যারা অন্ধ সততার সঙ্গে নির্দেশ মানে,—যারা কথায় কথায় বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে না। 'ইয়ং' শুধু তাদেরকেই বলা হবে, যারা বিশ্বাস করবে, এই ষড়ৈশ্বর্য ও মহাপুণ্যময় সোভিয়েট 'জগতের' বাইরে বৃহত্তর জগতের সকল দেশের সর্ববিধ সমাজব্যবস্থা অতি প্রাচীন এবং অন্ধকারময়। এই 'ইয়ং'দের কাছে একথা সত্য হয়ে ওঠে না যে জীবনের পক্ষে সর্বপ্রকার উন্নতিশীল বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে, জার্মাণীতে, ফ্রান্সে বা ইতালীতে! এদের এইভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে এরা ভবিষ্যৎকালের

উন্নততর কমিউনিস্ট সমাজের কর্ণধার-স্বরূপ হয়ে ওঠে। এরাই আগামী-যুগের সর্বার্থসাধক ও সাধিকা। কেবল মাত্র মস্কো নগরীতে এদের জন্য ৬৫ খানা প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং ২০০ 'মণ্ডলী' বর্তমান। কলকাতা শহরের রাজপথে দমকল ছুটলে যেমন অন্যান্য যানবাহন এবং পথচারীরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি 'ইয়ং পাইয়োনীয়ার্স' কোর-এর মিছিল চলতে থাকলে নগরে, জনপদে ও গ্রামে জনসাধারণ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এদের স্বাস্থ্যশ্রী, সৌন্দর্য, পোষাক, সানন্দ হাসি, কুচকাওয়াজ, পদক্ষেপ, সমস্ত-গুলি যেন একটি অভিজাত প্রকৃতি ও শোভন রুচির পরিচয় দিতে থাকে। এটি অনুভব করেছি, এদের সঙ্গে বৃহত্তর সাধারণের কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে! দেশের সব ছেলে-মেয়েই সোভিয়েট রাজার সন্তান, কিন্তু দুয়োরাণী অপেক্ষা সুয়োরাণীর ছেলে-মেয়েরা সমাদর পায় কিছু বেশী।

কয়েকটি 'হাউস অফ পাইয়োনীয়ার্সে' আমি ঘুরেছিলুম। একটিতে ছেলে-মেয়েরা 'কাজ' করে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কক্ষে এক একটি বিষয়ে শিক্ষা করা চলে। ছবি আঁকা, নাচ, গান, কাদামাটির পুতুল তৈরি, গল্প ও কবিতা লেখা, ছোট ছোট এইরোপ্লেন নির্মাণ, কামারশালা, ছুতোরের কাজ, রেডিয়ো ও টেলিভিশন চর্চাঘর, সিনেমাছবি তোলার যন্ত্রাদি, রেলগাড়ী চালানো, পদার্থ ও রসায়নের গবেষণা, জ্যোতির্তত্ত্ব, ব্যায়ামচর্চা, গৃহনির্মাণশিল্প, বিদ্যুৎযন্ত্রাদি পরি-চালনা, আবৃত্তি অনুশীলন, বক্তৃতা-শিল্প অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে ৬ বৎসর থেকে ১৮ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ঔৎসুক্য থাকে,—এই প্রতিষ্ঠান তাদের সর্বপ্রকার চর্চার ক্ষেত্র। এখানে বিনামূল্যে আহারাদির ব্যবস্থা শুধু নয়, সকল বিষয়ে সর্ব-প্রকার উপকরণাদি ও সামগ্রী সরবরাহের জন্য 'জনগণ' তথা পার্টি তথা গভর্ণ-মেণ্ট প্রতিনিয়ত অকাতরে লক্ষ লক্ষ রুবেল খরচ করেন! এখানে প্রত্যেক বালক-বালিকার মেধা ও প্রতিভাকে উন্মেষিত করা হয়! আমি 'গল্প-কবিতা-সাহিত্যের' ঘরে ঢুকে দেখি, ১৬।১৭ বছরের কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে হাতে কলম ও টেবলের উপর খাতা রেখে দেওয়াল, কড়িকাঠ ও জানলার বাইরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোভিয়েট সাহিত্য! কিন্তু সে যাই হোক, ইলেকট্রিকের সাহায্যে কক্ষসংরক্ষিত জলাধারে জাহাজ চলছে, রেলপথে একটি সম্পূর্ণ ট্রেণ ছুটছে, নদীর বাঁধ থেকে জল প্রবাহ নামছে, বিমানের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ট্র্যাক্টরে চাষ করছে, আগুনে লোহা-গালাই হচ্ছে, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাজ চলছে,—এক একটি বালক-বালিকাদের নির্মিত এই সব অসাধারণ কর্মপ্রতিভার চেহারা দেখে অভিভূত হতে হয়! প্রত্যেক কক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীর আলোক-চিত্র টাঙ্গানো এবং সেইগুলিই মডেল্। প্রতি কক্ষে শিক্ষক ও সহায়ক। বুঝতে পারা যায়, খেলা ও কৌতুকের ছলে শৈশব থেকেই শিক্ষা আরম্ভ! সর্বা-পেক্ষা আনন্দের বিষয় এই, কোনও শিশু, কিশোর বা তরুণ—এগুলিকে শিক্ষা মনে করছে না, এ সমস্তই যেন তাদের অবসর-বিনোদনের ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র! এই সকল ভবনে ঠাণ্ডার কালে কেন্দ্রীয় উত্তাপ সৃষ্টির এমন ব্যবস্থা আছে যাতে বালক-বালিকারা হাল্কা সুতী পোষাক পরে এই সব কাজ সম্পন্ন করতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেকটি "হাউস অফ পাইয়োনীয়াস" বালক-বালিকাদের এক একটি মস্ত আকর্ষণের কেন্দ্র! আমি ঈর্ষাকাতর মন নিয়ে এই শিশুতীর্থগুলি সানন্দে দেখে বেড়িয়েছি।

মস্কোর দেড় শতাধিক মিউজিয়-মের মধ্যে লেনিন মিউজিয়মটি সর্বা-পেক্ষা প্রশস্ত রাজপথের উপরে দাঁড়িয়ে। এটি 'ল্যাণ্ড মার্ক'। বহু পথ এখানে এসে মিলেছে। পাশ দিয়ে রেড স্কোয়ার ও ক্রেমলিনে যাবার পথ। ওপারে 'মস্কোয়া' হোটেল। অদূরে 'বলশয়' থিয়েটার। কিছু দূরে এগিয়ে গেলে 'হল্ অফ কলমস্'। আরেকটু অগ্রসর হতে থাকলে বৃহৎ অট্টালিকা-গুলিতে বিভাগীয় মন্ত্রণালয়। এই অঞ্চল আদি ও অকৃত্রিম জার আমলের অভিজাত মস্কো! এখানে এলে মস্কোর বিশালতা অনুমান করা যায়। বহু প্রশস্ত রাজপথ এই কেন্দ্র থেকে শাখা বিভক্ত হয়ে নানা দিকে চলে গেছে। লেনিন মিউজিয়মের বিরাট রক্তিম অট্টালিকার নীচে এসে অনেক-গুলি নম্বরের মোটরবাস দাঁড়ায়। শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এই মিউজিয়মে একদিন প্রবেশ করলেন।

লেনিনের প্রকৃত নাম 'লেনিন' নয়, যেমন গোর্কি 'গোর্কি' নয়। ট্রট্স্কির প্রকৃত নাম 'ট্রট্স্কি' নয়। প্রথমজনের নাম ভ্লাদিমির ইলিচ 'উলিয়ানভ', দ্বিতীয়জন ম্যাক্সিম 'পেসকভ', এবং তৃতীয়জন 'ব্রন্‌ষ্টিন।' লেনিনের পিতার নাম ইলিয়া নিকলায়েভিচ উলিয়ানভ, এবং মাতা জার্মান রক্তোদ্ভবা শ্রীমতী মেরিয়া আলেকজানদ্রোভনা বার্গ,—জনৈক ডাক্তারের কন্যা! ভল্গা নদীর তীরবর্তী সিমবার্স্ক্ নামক এক জন-পদে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। এটি তাতার অঞ্চল, এবং এক শ্রেণীর হূন-অধ্যুষিত। লেনিন তাতার পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর শিরায় হূন রক্ত ছিল কিনা, এটি গবেষণার বিষয়। লেনিন প্রথম বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য গ্রেপ্তার হন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর এক বৎসরের জন্য কারাবাস হয়। কিন্তু মুক্তি পাবা-মাত্র তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। সেই 'লেনা' নদতীরবর্তী যাকুটস্ক জনপদে থাকাকালীন তিনি 'লেনিন'—এই নামটি গ্রহণ করেন। অনেকে বলে, 'লেনা' থেকেই 'লেনিন' শব্দটি পাওয়া! যেমন গঙ্গা থেকে গাঙ্গেয়। সাইবেরিয়ায় তিনি তিন বছর নির্বাসনে ছিলেন। লেনিনকে একদা তাতার দেশের কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভিযোগে বিতাড়িত করা হয়েছিল! তিনি উচ্চ-শিক্ষিত পরিবারে মানুষ, এবং সেখানে বৈপ্লবিক হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বড় হন। বিপ্লববাদী কর্মতৎপরতার অভি-যোগে লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্দার ধরা পড়েন, এবং জারসম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দারের হুকুমে তাঁর ফাঁসী হয়! সম্ভবতঃ এই শোচনীয় ঘটনার ফলে লেনিন প্রতিশোধস্পৃহাপরায়ণ হয়ে ওঠেন! অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে তাতার-প্রকৃতি লেনিনের প্রতি-শোধস্পৃহা জড়িত ছিল কিনা একথা কেউ বলেনি। কার্ল মার্কসের যখন মৃত্যু হয়, লেনিনের বয়স তখন তেরো। তিনি মন্ত্র পেয়েছিলেন মার্কসের কাছে, এবং তাকে আকার দিয়েছিলেন আপন জীবনে! মার্কসের থিয়োরী, লেনিনের প্র্যাকটিস। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এত বড় ঘটনা কোথাও নেই যে, এক-জনের একটি অভিনব 'থিয়োরী' নিয়ে অন্য আর একজন পৃথিবীর বৃহত্তম

রাষ্ট্রটিকে এক হাতে ভাঙবে, এবং অন্য হাতে গড়বে! এটি সুস্পষ্ট যে, এই জড়বাদী 'অতি-মানবের' অভ্যুত্থানের ফলে বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর রাজনীতিক প্রকৃতির আমূলে পরিবর্তন ঘটেছে! লেনিন এনেছেন ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যসৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট আঙ্কিক পদ্ধতি, সভ্যতা-বিবর্তনের মধ্যে যেটি একেবারে নতুন,—এবং গান্ধী এনেছেন আত্মিক স্বাধীনতাসৃষ্টির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা। বলা বাহুল্য মানব-কল্যাণের জন্য দুজনেই কাজ করেছেন। কিন্তু লেনিনের এই আঙ্কিক পদ্ধতিটি মেনে নেবার আগে অগণিত লক্ষ নরনারী প্রাণবলি দিয়েছে, এবং সেখানে লেনিন কারোকে ক্ষমা করেননি। আপন মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বা একটি বিশেষ 'থিয়োরী'র সার্থক রূপায়নের জন্য গণমৃত্যু তাঁর কাছে সামান্য বস্তু ছিল! বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম তিন বৎসরকালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৭০ লক্ষ নরনারীর অকাল-মৃত্যু ঘটে। "It is reckoned that two and a half years of the civil war alone were responsible for the premature death of about seven millions of people." (Paul Haensel. 1930) কিন্তু দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেনিনের কূটনীতিক কলাকৌশল যদি বা বার বার পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "It was one of Lenin's firmly held principles that....once a revolution was started, to carry it through at all hazards to the bitter end. .... But so dire was the condition of the people, so implacable was the enmity of practically all the governments of the world, and so fierce and persistent were the attacks which the most powerful of them promoted and supported that the Soviet Government only just managed to survive."—Sydney Webb.

এই যাদুঘরটির মধ্যে লেনিনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং অন্যান্য ইতিহাস নানা চিত্রে ও বিবিধ দলিলপত্রের দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে। ওদের মধ্যে একটির সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। লণ্ডন নগরে লেনিন তাঁর সকল কমিউনিস্ট সহকর্মীগণকে নানা স্থান থেকে ডাক দিয়ে একটি জরুরী সম্মেলন আহ্বান করেছেন, এবং এই অধিবেশনের ব্যয়-স্বরূপ বিলাতের 'হাউস অফ লর্ডস'-এর একজন লর্ডের কাছ থেকে তিনি ১৫০০ পাউন্ড ধার করেছেন! সম্ভবতঃ সেদিনকার সেই লর্ড কল্পনাও করেননি যে, এই ব্যক্তির সাংঘাতিক প্রাণশক্তির আঘাতে রুশ-সাম্রাজ্য এবং জার সম্রাটের স্বেচ্ছাতন্ত্র অদূরবর্তী কালে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। যাই হোক, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর লেনিন এই ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ ক'রে দেন্। লেনিনের মৃত্যু ঘটে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে মস্কো থেকে মাইল পাঁচিশেক দূরে এক গ্রামে। যে-ট্রেনখানা সেই 'শোকযাত্রাকে' নিয়ে তুষারসমাকীর্ণ মস্কোতে এসে পৌঁছয়, সেই তারিখটি ছিল ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৪—সেই ট্রেনের ইঞ্জিনটিকে কেন্দ্রীয় যাদুঘরের অপর একটি অংশে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে!

মস্কো নগরে সর্বাপেক্ষা যে বৃহৎ চিত্রশালাটি জনপ্রিয়, আমার নব-নিযুক্তা দোভাষিণী শ্রীমতী মেরিয়ম সালগানিক একদিন সেখানে আমাকে এনে হাজির করলেন। তাঁর ইচ্ছা আমি দেখি মস্কোর বৈশিষ্ট্য ও বৈভব, মস্কোর যা কিছু মনোজ্ঞ এবং ঔৎসুক্যজনক। যেখানে এসে উপস্থিত হলুম সেটি জগৎপ্রসিদ্ধ 'ত্রেতিয়াকভ' চিত্রশালা। প্রকৃতপক্ষে লেনিনগ্রাডের উইন্‌টার প্যালেসের অন্তর্বর্তী 'হারমিটেজ' চিত্রশালা দেখার পর মনে করেছিলুম, ওর পর এদেশে চিত্রশালার শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথাও নেই। কিন্তু সেই ভুল 'ত্রেতিয়াকভ' চিত্রশালায় এসে ভাঙলো! জার সম্রাটের আমলের এটি অপর একটি সৌন্দর্যলোক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মস্কোর একজন বিশিষ্ট রাজকুমার ত্রেতিয়াকভ ছিলেন চারুশিল্পের বিশিষ্ট অনুরাগী। তিনি তাঁর অসীম অধ্যবসায় সহকারে এবং বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্বদেশ এবং বিদেশের অসংখ্য শিল্পীর আঁকা মনোরম চিত্র সংগ্রহ করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসরকালব্যাপী রাজকুমার ত্রেতিয়াকভ তাঁর এই নিজ শ্বেতমর্মর প্রাসাদে অপরিসীম উদ্যম ও প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বহু বর্ণাঢ্য এবং মনোহর চিত্র সম্মিলিত করে যে রূপস্বর্গ-স্রষ্টাস্বরূপ সমগ্র ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ হন, সেটি তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রুশ জাতির হাতে অকাতরে তুলে দেন। সোভিয়েট আমলে এটি রাষ্ট্রীয়করণ ক'রে নেওয়া হয়। রাজতন্ত্র, রাজা-রাজড়া বা জমিদারগোষ্ঠীর প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু ত্রেতিয়াকভ সম্বন্ধে সকলেরই একটি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছি।

এই প্রাসাদটিকে আগাগোড়া সংস্কার ক'রে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এখানে যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ তৈলচিত্র রাখা হয়েছে, সেগুলির নকল পৃথিবীর অন্য কোনও শিল্পাগারে নেই। মোটামুটি একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ অল্প-বিস্তর ৯০০ বৎসরের একটি চিত্রপ্রদর্শনী এখানে চারিদিকে যেন ঝলমল করছে। এই জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্রশালায় উনিশ শতাব্দীর রুশশিল্পী পেরভ, মাকোভস্কি, লেভিটান ও পোলেনভের ছবি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। জগৎবরেণ্য শিল্পী রেপিন ও সুরিকভের জন্য পৃথক কক্ষ নির্বাচন করা হয়েছে। ঘন্টা চারেক আমি অভিভূত হয়ে এগুলি দেখেছিলুম।

পুশকিন যাদুঘর এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির শিল্পশালা সমানই ঔৎসুক্যজনক। এই দুই যাদুঘরের প্রাচীনকালের গ্রীস, রোম, বাইজানটাইন, ব্যাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান, স্লাভ, তাতার, মঙ্গোল, ইরাণ, মধ্যপ্রাচ্যলোক, চীন, জাপান এবং ভারতীয় বহু শিল্পসামগ্রী পরম যত্নে সংগৃহীত রয়েছে। ভারতের রেশম ও পশমের নানা বস্ত্রাদি, কার্পেট, তালপাতার পুঁথি, কাঠের ও হাতীর দাঁতের সামগ্রী, মূর্তি, খেলনা—প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী বর্তমান।

শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মকেন্দ্রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁর কৃপায় দেশের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে পরিচয় ঘটত। ও'র সঙ্গে গোর্কি মিউজিয়মটি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। এটি সুবৃহৎ এক অট্টালিকার দোতলায় অবস্থিত। গোর্কি কেবল লেখক নন্, তিনি রুশ-বিপ্লবের অন্যতম মন্ত্রগুরু। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমাণ এবং পর্যটক। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন লেনিন, তিনি টলস্টয় প্রমুখ প্রবীণ এবং আধুনিক লেখকসমাজের বন্ধু। তিনি কুলীমজুর, দরিদ্র, হতভাগ্য, বেশ্যা, ঠগ্, এবং সমগ্র রাশিয়ার নিম্নতম ব্যক্তিগণের মানবতার গৌরব ও মহিমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে ব'সে তাঁর রচনা শুনতে আসতেন লেনিন, ষ্টালিন, ভরোশিলভ প্রভৃতি ব্যক্তিরা। লেনিনের ঠিক আগে তিনি রাশিয়ার বিপ্লবী

দলকে সর্বপ্রকারে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি কারাবাস করেছেন, অন্তরীণাবদ্ধ হয়েছেন এবং নজরবন্দী অবস্থায় থেকেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। পলাতক জীবনে পথে পথে তাঁর ছদ্মবেশে দিন কেটেছে। স্টেশনে তিনি ঘুমিয়েছেন, উপবাস করে কাটিয়েছেন। কারখানায়, স্টীমারে, দোকানে, হোটেলে, জাহাজঘাটায়, গুণ্ডার আড্ডায়, বস্তিতে, পতিতা পল্লীতে, দেশে-বিদেশে—তাঁর বিরাট ও রহস্যময় জীবন ছড়ানো। সাহিত্যে তিনি এনেছেন নতুন আঙ্গিক, নতুন সুর, নবচেতনা। টলস্টয়ের বাড়িতে তিনি নিয়মিত অভ্যাগত। টলস্টয়ের পর তাঁর সমকক্ষ লেখক রুশ-সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন প্রকার ছবি, দলিল, সংবাদপত্র, মূর্তি, গ্রন্থাদি নিয়ে বড় বড় কক্ষগুলি পরিপূর্ণ। গোর্কি মিউজিয়মের ডাইরেক্টর এবং দুইজন মহিলা বিশেষ পরিশ্রম করে এক একটি কক্ষের ইতিহাস বোঝাচ্ছিলেন।

দুটি কাহিনীর সাক্ষ্য এই মিউজিয়মে নেই। বিশ্বস্তসূত্রে আমার জানা ছিল, লেনিনের সঙ্গে গোর্কির প্রবল মতভেদ ঘটে বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম অবস্থাতেই। এই বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ ২১শে নভেম্বর তারিখে ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর নিজের কাগজ 'নভায়া জিজ্ন'-এ লেখেন :

"Blind fanatics and unscrupulous adventurers are rushing headlong toward "social revolution"—as a matter of fact it is the road to anarchy, the ruin of the proletariat and the Revolution.

"The working class cannot fail to realise that Lenin is experimenting with its blood, and trying to strain the revolutionery mood of the proletariat to the limit, to see what the outcome will be.

"The working class must not allow adventurers and madmen to thrust upon the proletariat the responsibility for the disgraceful, senseless, and bloody crimes for which not Lenin, but the proletariat will have to account."

বলা বাহুল্যে তৎকালীন অরাজকতার যুগে এবং লেনিনের অনমনীয় দৃঢ়তা ও কঠিন প্রতিজ্ঞার ফলে যে সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ঘটে এবং বলশেভিকরা যে সকল নির্দয় এবং নির্বিচার আচরণের পরিচয় দেন—গোর্কি সেগুলির বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা পান। কিন্তু দূরদর্শী এবং বুদ্ধিবাদী লেনিন অবশেষে গোর্কিকে তাঁর কর্মনীতি বুঝাতে সমর্থ হন, এবং অতঃপর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে ওঠে। দ্বিতীয়টি হল এই, লেনিনের মৃত্যুর পর যখন স্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, সেই সময় দশ বৎসরকাল গোর্কির সাড়াশব্দ পাওয়া যেত কম। রাষ্ট্রের উন্নতির প্রয়োজনে তৎকালে যে ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করা হ'ত, এবং উচ্চশিক্ষিত মহলের চিন্তাধারা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত, তার সঙ্গে গোর্কির সম্পূর্ণ সহযোগ ছিল কিনা, এটি বিবেচ্য। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ মস্কো গিয়েছিলেন, তখন জীবিত লেখকগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোর্কি, মায়াকভস্কি, পাস্টেরনাক প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা কেউ মহাকবির কাছে কেন এগিয়ে আসেননি, কেনই বা স্টালিনের সঙ্গে মহাকবির সাক্ষাৎকার ঘটেনি,—এগুলি আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নূতনকালের নবরুচির নৃত্যনাট্যের স্রষ্টা, তিনি নিজের বাড়িতে যে 'নাটমঞ্চ' সৃষ্টি করেছিলেন তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি! সেই রবীন্দ্রনাথ যখন মস্কোতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁর সামনে মস্কো আর্ট থিয়েটারের দেশপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা স্টানিসলাভস্কি অথবা দামচেন্‌কো,—এঁরা কেউ এগিয়ে আসেননি, এটি বিস্ময়জনক। আমার ধারণা, তাঁরা কেউ সাহস পাননি! আমার আরেকটি বিশ্বাস, স্টালিন আমলের কর্তৃপক্ষের নিকট রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে 'বাঞ্ছিত' অতিথি ছিলেন না! গোর্কির মৃত্যুর বছর দুই আগে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা কিরভকে হত্যা করা হয়। তার আগে এবং বিশেষ ক'রে তার পরে লেনিনের বহু সহকর্মী নেতা কারারুদ্ধ হন। উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী অগণিত সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নির্বিচারে হত্যা, উৎপীড়ন এবং নির্বাসন দেওয়া হয়। কিরভকে হত্যা করার মধ্যে স্টালিনের কোনও সূক্ষ্ম চক্রান্ত ছিল কিনা অথবা কিরভ-হত্যা উপলক্ষ্য করে প্রতিদ্বন্দ্বী-নিধনের বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল কিনা—এটিও আমার জানবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এটি বিশ্বাস করার বহু কারণ ঘটেছে যে, গোর্কির শেষ জীবন ছিল বেদনাময় ও নৈরাশ্য-পূর্ণ। দেশের চারিদিকে অন্তহীন অবিচার এবং মানবতার বীভৎস অবমাননা দেখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। মৃত্যুর আগে তিনি মৃত্যুই কামনা করেন, এবং তিনি যে 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' ও ভগ্নহৃদয়ে মারা যান, সেইটিই তাঁর অকাল-মৃত্যু! তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান ম্যাক্সিম পেসকভ (এটি গোর্কিরও প্রকৃত নাম) কিরূপ অবস্থায় মারা যান্ এ নিয়ে নানা গুজব আছে। সেটিও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু এই খবরটি আমি পেয়েছিলুম, বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ দেখার সময় ঠাণ্ডা লেগে নাকি প্রফেসর পেসকভের নিউমোনিয়া রোগ হয়। এই রোগে ১১ দিন ভুগে তিনি যখন মারা যান্ তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর। তাঁর স্ত্রী নাদেজদার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয়। পেসকভের মাত্র দুই কন্যা। বড় মেয়েটির নাম 'মার্ফা'—সে চিত্রশিল্পী এবং ইংরেজি জানে। ছোট মেয়ে 'দারিয়া' হল 'ভচতানংগভ' থিয়েটারের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী। নাদেজদা নিজেও একজন চিত্রশিল্পী। এই দুটি তরুণী-কন্যার সাগ্রহ আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। গোর্কির স্ত্রী, পুত্রবধূ ও নাৎনী দুটির সঙ্গে আমার দুই বৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য শ্রীমতী লিডিয়ার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা থেকে গেছে।

ধনকুবের আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপ থেকে যারা সোভিয়েট ইউনিয়নে ভ্রমণ করতে যায়, তাদের চোখে দেখা যায় সোভিয়েট রিপাবলিকগুলি মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ,—তবে উন্নতিশীল! তারা দেখে, জনসাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত শাদামাটা, বৈচিত্র্যহীন, এবং বৃহৎ একটা অংশ দুঃস্থ—যাদের বসবাস-ব্যবস্থাও বিশেষ দুর্গত। তারা জন্তুর মতো পরিশ্রম করে, এবং কায়ক্লেশে দিন কাটায়। সোভিয়েট নারীর বিলাসসজ্জা বা প্রসাধনাদি নেই, রঙ্গরসের অবসর নেই এবং সুখসম্ভোগে অবগাহন করার কোনও সুযোগ তারা পায় না।

এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে যারা যায়, যারা অনুন্নত জগতের অধিবাসী,—তাদের অন্য চোখ! তারা মধ্যবিত্তকে উচ্চবিত্ত মনে করে, স্বল্পবিত্তকে ভাবে স্বচ্ছল পরিবার,—কেননা তারা গিয়েছে দরিদ্রের

দেশ থেকে। মস্কো নগরের জনসাধারণের দিকে চেয়ে ভারতীয় আমি যদি বলি, তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল এবং পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সুশোভন, তখন আমার মনে রাখা দরকার যে, আমি আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড বা পশ্চিম জার্মানী দেখিনি! পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরী কলকাতার বহু অঞ্চল এবং শহরতলীর প্রায় সর্বত্র অতি বীভৎস এবং কদর্য নোংরায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি কলকাতার অধিবাসী হ'য়ে যদি ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস বা বন্ ইত্যাদি নগরগুলি দেখার আগেই হঠাৎ বলে বসি—মস্কো, লেনিনগ্রাড বা কিয়েভের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর পৃথিবীতে কোথাও নেই, তাহলে সেটি ভুল হবে! এইটুকু শুধু বলা চলে, কলকাতার পৌরসভার যাঁরা নির্বাচিত উপ-

দেষ্টা, বা পরামর্শদাতা—তাঁরা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ নগরে গিয়ে যদি নগর-রক্ষা, তার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ ক'রে আসেন, তাহলে কলকাতা বহু কচকচির হাত থেকে বাঁচে। প্রতি বছরে কলকাতার প্রত্যেক নবনির্বাচিত মেয়র বিদেশে আমন্ত্রিত হন শুনেছি। কিন্তু এবম্প্রকার ভ্রমণের ফলে যে-শিক্ষা ঘটে, তার কোনও সুফল নাগরিকরা কখনও পেয়েছেন ব'লে শুনিনি!
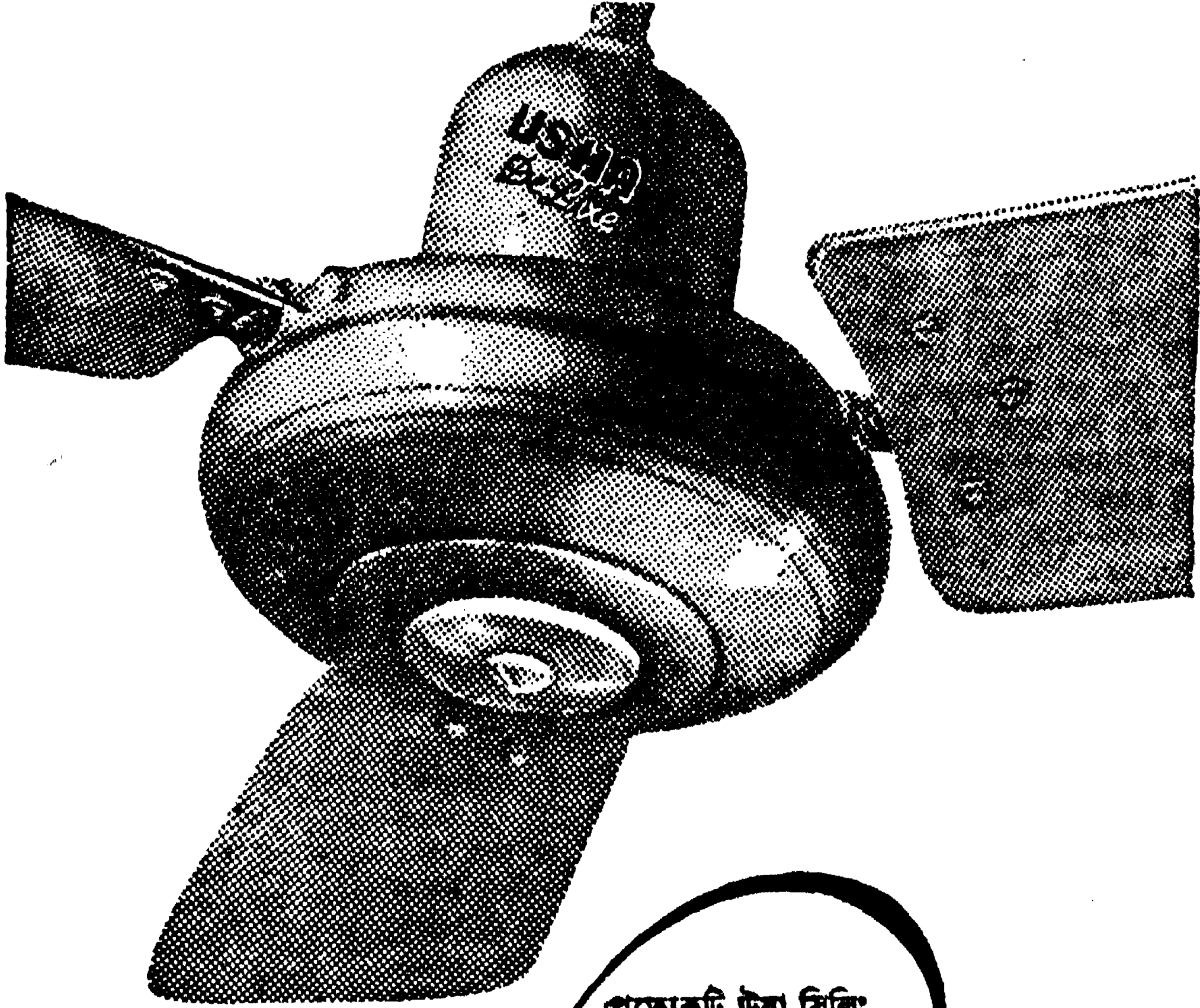
শ্রীমতী লিডিয়ার কৃপায় মস্কোর জনসাধারণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য তারা, যারা 'ডেলিগেশনের মেম্বার'। তারা সরকারি আতিথ্যের বাইরে আসতে পায় না, মোটরের ভিতর ছাড়া তাদের জগৎ নেই, দেশবাসীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে না। তারা অগণিত অভ্যর্থনা পায়, ভূরিভোজ পায় তার চেয়েও বেশি। তারপর কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কিছু হোটেলের চাকচিক্য, কিছু বা থিয়েটার, নাচগান, রঙ্গরস—এইগুলি দেখে তারা খুশী। অতঃপর বিদায় নেবার আগে কয়েকটি 'মেমেনটো' বা উপহার পাওয়া। যারা 'হোস্ট' বা অতিথিসেবক, তা'রা সস্তা সৌজন্যের মুখোস পরে রইল, আর যারা অভ্যাগত তারাও তাদের মুখোস পরে বাড়ি ফিরে গেল! বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রেরিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সম্ভবত একটিও পৃথিবীর কোনও দেশে গিয়ে আপন যোগ্যতা প্রমাণিত করেনি! বরং অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীতটি প্রমাণ ক'রে ফিরেছে। আমি অবশ্য নাচ-গান-সিনেমার কথা বাদ দিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেখানেও কিছুকাল আগে ডাঃ কেশকার তাঁর অজ্ঞতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্য কলকাতার একখানা খেলো ধরণের বৈষ্ণবভক্তিমূলক সিনেমা-ছবি পাঠিয়েছিলেন মস্কোর 'ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে'। সেই ছবিটি দেখে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা, ভারত-প্রেমিক রুশ নাগরিকরা, এবং অন্যান্য ভারতীয় সেখানে যাঁরা আছেন,—তাঁরা এই বাংলা ছবিটির 'আজগুবী' এবং 'অবাস্তব' চেহারা দেখে ধিক্কার দিয়েছিলেন! যাই হোক, সেই ছবিটি বার দুই দেখিয়ে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়! আমার বিশ্বাস, ডাঃ কেশকার 'উপরোধের দায়ে ঢেঁকি' গিলেছিলেন!

ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠছিলুম, ট্রলিবাস ধরছিলুম, ট্রামে উঠে বসছিলুম, এবং নিরুদ্দিষ্টভাবে যে কোনো পথে হাঁটছিলুম। হাঁটে বেশি মেয়ে-পুরুষ। পথে নেড়ি-কুকুর নেই, পথের মাঝখানে গরু দাঁড়িয়ে জঞ্জাল চিবোয় না, কাকের ভিড় নেই, কোনও আস্তাকুড়ে, মৌল অধিকারের নামে ফুটপাথে কেউ দোকান ফাঁদে না,—হল্লা করে কেউ দল বেঁধে ফুটপাথ অবরোধ করে না! ওদের ভঙ্গী, চেহারা, পোষাক, এবং আত্মগত গাম্ভীর্য—ওদের কর্মজীবনের গুরুত্বের পরিচয় দেয়। নগর-সম্প্রসারণের দিকে নতুন-নতুন অট্টালিকা, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত পথ-ঘাট, সুচিক্কণ যানবাহনাদি, বহুস্থলে ফুলের সম্ভার, পারস্পরিক সহমর্মিতা, একের সঙ্গে অন্যের বন্ধুতাযোগ, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি স্বতোৎসারিত দরদ, শিশুদলের প্রতি অতিশয় যত্ন—যেটি লক্ষ্য ক'রে মনে হয় জায়া অপেক্ষা জননীর প্রকাশ অনেক বেশি! কোথাও যৌবন-চাঞ্চল্য দেখছিনে, যৌন-চাপল্য দেহলীলার সঙ্গে কোথাও উচ্ছ্বসিত হচ্ছে না! এদেশে এলে মনে হয়, কামিনী তার মূলে প্রকৃতিকে ভুলে গেছে। সোভিয়েট কবিতা ও গল্পে সেই কামিনীর মৃত্যু হয়েছে; সেই চিরকালিনী কোনও শিল্পে, চিত্রে, সিনেমায়, রঙ্গমঞ্চে, প্রাচীরপত্রে, রেলস্টেশনে, জাহাজ-ঘাটায়, দোকানে, বাগানে, কারখানায়, আপিসে,—কোথাও সে নেই! পুরুষ এসে সামনে দাঁড়ালে, পাশে বসলে, নিঃসঙ্গলোকে কাছাকাছি থাকলে—কোনও মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথরিয়ে ওঠে না, চোখে বিদ্যুৎ খেলে না, দেহে তরঙ্গ দোলে না, দেহারণ্যের জটিল জটার ভিতর থেকে সেই আদিম অজগর কামসর্প ফণা তুলে মোচড় খায় না! কামিনী বোধ হয় মরে গেছে! কিন্তু তার চিতাভস্ম মেখে উঠে এসেছে 'সোভিয়েট নারী',—যার অপর নাম 'পুরুষ-মেয়ে'! সে পাহাড় কাটে নদী বাঁধে, মাঠ চষে, নগর বসায়, কারখানা চালায়, চাকা ঘোরায়, জাহাজ ভাসায়। সে শুধু মেয়ে নয়, কর্মী-মেয়ে, সৈনিক-মেয়ে, বরকন্দাজ-মেয়ে, প্রহরী-মেয়ে! এ মেয়ে অলঙ্কারে-প্রসাধনে ভোলে না, ঘরকন্নায় মিষ্টকথায় ভোলে না, প্রণয় নিবেদনে ভোলে না! এ মেয়ের হাতে দাও হাতিয়ার, পায়ে দাও জুতো, পরণে দাও ওভারকোট, মাংস আর রুটি দাও ভোজের থালায়, কাঁধের উপর তুলে দাও দেশ-গঠনের বোঝা! এ মেয়ের মন তবেই পাওয়া যায়! তারপর যেটা রইল সেটা কামিনী নয়, প্রণয়িনী নয়, মায়াবিনী মোহিনী নয়,—সে শুধু রইল জননী,—জীবজননের আধার মাত্র! কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আজ সেক্ষেত্রেও তা'রা সজাগ। সবাই জানে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন জনসংখ্যা-বৃদ্ধির। কিন্তু যে কোনও মেয়েকে প্রশ্ন করো, আজ জবাব পাবে,—একটি অথবা দুটির বেশি তাদের সন্তান নেই! প্রায় প্রতি পরিবারে মেয়ে-পুরুষ উপার্জন করে,—কিন্তু সন্তান ধারণ ও পালনের সময় তাদের নেই! বিবাহ এবং ভালবাসার ব্যাপারটাও যেন অনেকটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার সঙ্গে সমতুল্য। এটা যেন প্রাণের কথা নয়, প্রয়োজনের কথা! এ সম্বন্ধে জনৈকা রুশনারীর কয়েক ছত্র স্বীকারোক্তি তুলে দিই: টেলিফোনে পুরুষ প্রস্তাব করছে, "আপনাকে সেদিন অমুক জায়গায় দেখে আমার ভাল লেগেছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই!

এদিক থেকে মেয়ে জবাব দিল, "আমার মনোস্থির করার জন্য কিছু সময় দরকার!"

ছোকরা যদি পীড়াপীড়ি করে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এই জবাবটি সে পেতে পারে,—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না! আমি আরেকজনকে কথা দিয়েছি! তবে হ্যাঁ, মাসখানেক পরে আপনি একবার খোঁজ নিতে পারেন!"

কিছুকাল আগে জগৎপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ধর্মযাজক ডাঃ বিলি গ্রেহাম মাত্র পাঁচ দিনের জন্য মস্কো ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরে যান। তিনি রুশ তরুণ-তরুণীগণের আচার-আচরণ লক্ষ্য ক'রে মুগ্ধ হন। কলকাতার 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' সংবাদপত্রে খবরটি ছিল এই প্রকার:

"Dr. Billy Graham praised in Paris recently the "high standard of morality" of the Russians. He also said that during his short stay in Moscow he noticed that young people there were well disciplined and well behaved. "We went to a park," he said, "where thousands of young people were gathered. It was the week-end. They would hold hands, but were very disciplined. We saw nothing beyond that." It may be recalled here that Dr. Graham said in London a few days ago, "It looked as though your parks had been turned into bedrooms with people lying all over the place. I was so embarassed that I took my wife out of them." (22-6-59)

গ্রেহাম সাহেব কিছুদিন আগে দিল্লীতে ধর্মযাজক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন! কিন্তু সেদিন মস্কোর উপান্তে সেই অতি বৃহৎ ও ব্যাপক "শিল্প ও কৃষি" প্রদর্শনীর মধ্যে প্রবেশ করে হাজার হাজার নরনারীর সম্মেলনের মধ্যে চলাফেরা করার কালে ধর্মযাজকের কথাগুলি আমার মনে পড়ছিল। তাঁর এই পর্যবেক্ষণটি নির্ভুল, এ আমি মনে করিনে। কেন তাই বলি। আমাদের দেশে ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বহুক্ষেত্রে বিলাস, সম্ভোগ এবং অখণ্ড অবসরের মধ্যে মানুষ হয়। অন্নবস্ত্রের জন্য যেখানে সংগ্রাম নেই, সংস্থানের জন্য যেখানে দুর্ভাবনা নেই,—সেখানে আদিম দুটি ক্ষুধার দ্বিতীয়টি বোধ করি সহজেই পেয়ে বসে! প্রণয় সেখানে অন্যতম বিলাস। মান-অভিমান, হাসি-অশ্রু, চাঞ্চল্য-চপলতা, এবং 'বসনের ভূষণ-ভঙ্গীতে, অধরের আরক্ত ইঙ্গিতে',—শুধু থাকে অবসর বিনোদনেরই অভিব্যক্তি! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে দেখা যায়, মেয়েরা সারাদিন সংসার-কর্মে রত। তার হাতে পরিচর্যার ভার, অন্নব্যঞ্জন পরিবেশনের দায়িত্ব, সংসারকে সুশৃঙ্খল ও সচল রাখার কঠিন কর্মের নিত্য উদ্বেগ,—তার

অবসর-বিনোদনের সময় নেই! সোভিয়েট মেয়ের বৃহত্তর সংসার হল সোভিয়েট রাষ্ট্র, ওই বিরাট যন্ত্রের সঙ্গে পুরুষের মতো তারও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ওই নব-যুগসভ্যতার দানবাকার যন্ত্রের সঙ্গে তা'র নিত্যজীবন বাঁধা, সেখানে সে পুরুষের মতোই অহর্নিশি যোগান দিচ্ছে প্রাণান্তকর উপকরণ! চারিদিক থেকে সেখানে কঠিন ডাক দিচ্ছে "Young People"-কে 'কমসোমলকে'— যারা নব্য-কালের তরুণ তরুণী! ডাক দিয়ে বলছে, হাজার হাজার মাইল দূরে যাও! সুমেরু সাগরে, বেরিংয়ের তীরে, চুকটুকা উপদ্বীপে, কামস্কাটকায়, শাখালিনে, আমুরে, তাইমিরে অথবা কাজাখস্তান কিংবা বুরিয়াৎ-মঙ্গোলিয়ায়! সময় নেই, একেবারেই সময় নেই! কুড়ি কোটি নরনারীর মাত্র আশী কোটি হাত-পা! কিন্তু ৮৭ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ভূভাগের পক্ষে এই কয়টি হাত-পা কতটুকু? এই ত' কিছুকাল আগে একটি কাগজে দেখলুম, একটি যুবতী সোভিয়েট মেয়ে তার আত্মীয়-স্বজনকে দোহন ক'রে বছর দুই যাবৎ নিষ্কর্মা হয়ে প্রজাপতির মতো ফুরফুরিয়ে বেড়াচ্ছিল! ধরা পড়বার পর তার শাস্তি হল, ৫ বছরের জন্য 'লেবার ক্যাম্প'! সোভিয়েট ইউনিয়নের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই! উভয়ের শক্তি এক, উপার্জন এক, জীবন-যাত্রার ধারা এক, খাদ্য ও বসবাস একই ধরনের। লক্ষ লক্ষ মেয়ে আর পুরুষ সদা-সর্বদা একই কর্মে, একই যন্ত্রে, একই যজ্ঞে নিয়োজিত হচ্ছে! সেখানে ছুটি নেই, বিরতি নেই, রঙ্গরসের অবসর নেই! ডাঃ গ্রেহামের চোখ বোধ হয় এদিকে পড়েনি!

"শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী"টির উদ্বোধন করা হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। এটি স্থায়ী প্রদর্শনী। কিন্তু এটি একটি উপনগর কিনা সেটি ঠাহর করে দেখতে হয়। মোট প্রায় ১৭০০ বিঘা জমির উপর এই উপনগরকে নির্মাণ করা হয়েছে। এটির মধ্যে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০০-রও বেশি ইমারত গড়া হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে ১৫টি রিপাবলিকের প্রতীকস্বরূপ ১৫টি অতি বৃহৎ এবং অতি মনোরম অলংকারখচিত সুদৃশ্য প্রাসাদ দণ্ডায়মান। প্রত্যেকটি প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য এই, তা'রা প্রতিটি রিপাবলিকের নিজস্ব নির্মাণ-পদ্ধতি, স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, সংস্কৃতি এবং বিবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করছে! সমগ্র উপনগর এমন বিশেষ শ্রেণীসঙ্গতভাবে গঠিত, যার ঠিক কেন্দ্রটিতে এসে দাঁড়ালে পাওয়া যায় এক বিস্তৃত, চক্রাকার, এবং বাঁধনো সরোবর—এবং তার ভিতরে বৃহৎ এক চক্রে ১৫টি বিশাল স্বর্ণপ্রতিমা-মূর্তি! এদের ঠিক মাঝখানে মস্ত এক ফোয়ারা থেকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে রাশি রাশি শিকরকণাযুক্ত জল। চেয়ে দেখছি চারিদিকে বড় বড় হোটেল, রঙ্গালয়, নাট্যমঞ্চ, সিনেমা, উদ্ভিদ্ গবেষণাগার, পুষ্পোদ্যান, নানাবিধ কৌতুকের কেন্দ্র, বিশ্রামাগার, যন্ত্রবিজ্ঞানের কেন্দ্র, শিল্পোৎপাদনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বিজ্ঞানভবন, পশুপালনের শিক্ষাগার,—এবং সর্বোপরি সোভিয়েট আমলের সর্ববিধ কীর্তির আনুপূর্বিক ইতিহাস। এই বিশাল উপনগরীর সম্মুখ-দূরান্তে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ মস্কো থেকে বেরিয়ে দূর-দূরান্তর সমতল দেশের দিকে চলে গেছে, তার ঠিক সামনে এই প্রদর্শনীর মূলে পরিচয় স্বরূপ দুটি বিশালকায় নরনারীর সম্মিলিত প্রস্তর-মূর্তি মস্ত উঁচু বেদীর উপর দণ্ডায়মান! শুধু মূর্তি বললে ভুল হবে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক এই যুগলমূর্তিটি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই বিস্ময়কর ভাস্কর্য প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই নরনারীর যুগলমূর্তির মধ্যে আছে একটি উদ্দাম গতিবেগ, প্রচণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি, সোস্যালিস্ট সভ্যতার জয়যাত্রায় পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের দুর্দমনীয় এবং অপরাজেয় অধ্যবসায়! পুরুষের হাতে নবনির্মাণের প্রতীক-স্বরূপ হাতিয়ার, নারীর হাতে কাস্তে-কাটা ফসলের ঝুরি! দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা—সমস্ত অতিক্রম ক'রে চির-কালীন মানব-মানবীর দিগ্বিজয়-অভিযানের যে প্রবল সৌন্দর্যের মহিমা এই যুগলের প্রতি দেহরেখায় অভিব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটককে অভিভূত করতে সমর্থ। এই বিশাল মূর্তি ছায়ার মতো অনেকদিন আমার পিছু নিয়েছিল।

ছোট্ট একখানি ইলেকট্রিক ট্রেন এই প্রদর্শনীর চারিদিকে যাত্রীদের নিয়ে ঘোরে। এ যেন অনেকগুলি 'বোগিযুক্ত' একখানি রথ,—চেহারাটি ঝলমল করছে। এই বৃহৎ এক্‌জিবিশন খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দিন পনেরো লাগে। রেলগাড়িটি থাকার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে এই প্রদর্শনীটি দেখে নেওয়া চলে।

শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এলেন 'স্পুটনিক হলে'। এই বিশাল হলটির মধ্যে আণবিক কাজের যন্ত্রপাতি, বড় বড় বিচিত্র মেসিন, অদ্ভুত ধরণের বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতার উপকরণ রাখা হয়েছে। একটি রকেটের সামনে এসে দাঁড়ালুম। এই রকেটটি কিছুদিন আগে ৪০০ কিলোমিটার উঁচু শূন্যলোকে গিয়ে আবার অক্ষত অবস্থায় সকল যন্ত্রপাতি-সহ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে। এটি যেন লৌহনির্মিত অতিকায় এক সরীসৃপ। কামানের নলের মতো এর আকার, এবং আমাদের দেশের পৌষ-পার্বণের 'পুলিপিঠের' মতো এর গঠন, পেটের কাছটি মোটা। ভিতরে তুলো এবং কাপড়ের টুকরো রাশি রাশি। মানুষ অথবা অন্য জন্তুর পেট কাটলে যেমন নাড়ি-ভুঁড়ি-অন্ত্রতন্ত্রের বিভিন্ন রহস্য-কুণ্ডলী বেরিয়ে আসে, তেমনি এই রকেটের বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার ক্যাবিনগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন ও বিচিত্র যন্ত্রপাতি—যেগুলি আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে! সূর্যের দিকে পাঠাবার জন্য যে রকেটটি ছাড়বার কথা চলছে তার একটি ডিজাইন এখানে দেখানো হচ্ছে। জনৈক আণবিক বিজ্ঞানবিষয়ের অধ্যাপক ইংরেজিতে আগাগোড়া ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেবার জন্য ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তাঁর পক্ষে সবটা জলের মতো স্বচ্ছ। আমার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে এমন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আর কোনও বিষয় শুনিনি। আমার আগ্রহের সীমা ছিল না।

বোধহয় রুদ্ধশ্বাসেই শুনেছিলাম। অতঃপর আগাগোড়া বুঝে নিয়ে একসময় বাইরের হাওয়ায় এসে স্বস্তিলাভ করলুম! শ্রীমতী লিডিয়া প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ইউনিভারসিটিতে একদা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন?

বললুম, কস্মিন কালেও না!

তা হলে ওই অধ্যাপককে ওসব জটিল প্রশ্ন করছিলেন কেন?

লোকটা তোতাপাখির মতন মুখস্থ বলছে কিনা তাই জানবার চেষ্টায় ছিলুম!

শ্রীমতী প্রশ্ন করলেন, আপনি নিজে কিছু বুঝলেন?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, একবর্ণও না!

উচ্চকণ্ঠে লিডিয়া হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি ত সর্বনেশে লোক! টেরিবল্......টেরিবল্! চলুন, এবার ওই আর্মেনিয়ান্ হোটেলে,—আপনাকে মাছ-ভাত খাওয়াব! সত্যি বলতে কি, আমিও কিছু বুঝতে পারিনি।

এই দিনটির ঠিক দুই সপ্তাহ পরে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ তারিখে যেদিন উক্রাইন থেকে আকাশ-পথে পুনরায় মস্কোর বিমানঘাটিতে নামলুম, সেই দিন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে 'লুনিক' নামক একটি রকেট মহাকাশের দিকে ছোড়া হয়, এবং সেটি পরদিন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে ২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড বাদে চন্দ্রের থালার উপরে গিয়ে পড়ে! এই ঘটনায় সমগ্র পৃথিবীতে একটি সাড়া পড়ে যায়। এ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে একটি বিবৃতি নিয়ে 'প্রাভদা' সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল।

পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কসহ ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য মিঃ খুশ্চেভের নিকট অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ওয়েস্টার্ন প্রসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আপাত উল্লেখে খট্‌কা লাগবারই কথা।

বর্তমানে পাশ্চাত্য সিনেমায়, টেলিভিশনে ও সস্তা বইয়ের বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও চটকদার এবং আর্থিক সাফল্যের প্রায় সোনার কাঠি হচ্ছে 'ওয়েস্টনার,'—চলতি কথায় যাকে বলে 'কাউবয়' কাহিনী। অথচ তাই হচ্ছে এখানের শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী ধর্মনেতাদের প্রধানতম সমস্যা ও বিরক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে বিশাল, বন্ধুর, রুক্ষ, মাঝে মাঝে শুধু গ্রন্থিল বৃক্ষ কিম্বা ফণিমনসার ঝোপ-ঝাড়সম্বলিত বিরলবসতি অঞ্চলের নিষ্করুণ ও ভয়াল পটভূমিতে তেজীয়ান অশ্বারোহী, চোস্তের মত চোঙাট্রাউজার ও সার্ট-কুর্তা পরিহিত, মাথায় লম্বাটে টুপি ডাকাত দলের ট্রেণ কিম্বা ব্যাঙ্ক লুন্ঠন, গরুর পাল, গুপ্তধন, কিম্বা তৈল কূপের ভাগ কিম্বা বে-আইনী অধিকার নিয়ে খুন-রাহাজানি ও লুন্ঠন-ধর্ষণ, তারপর আচমকা ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের দমনকারী কোন বীরের আবির্ভাব হয়ে দুষ্টের খতম ও শিষ্টের ত্রাণ করে কাহিনীর অবসান।

প্রতিহিংসা-রিরংসা এবং লোভ ও শয়তানীর জন্যে মানুষ ও ঘোড়ার ঘূর্ণী জাগানো এই ছবিগুলি হলিউড ও বৃটিশ ফিল্ম কম্পানীগুলির দৌলতে আমাদের দেশেও অপরিচিত নয়। তাই তাদের মোদ্দা ধাঁচটা আমাদের জানা। নায়ক কর্তব্যনিষ্ঠ, কর্তৃত্বপরায়ণ, সুদর্শন পরিচ্ছন্নভাবে কামানো, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও কেতাদুরস্ত। নিখুঁৎ ঘোড়সোয়ার ও বন্দুকটি বাগিয়ে ধরার ক্যায়দা সহজাত। তুলনায় 'ভিলেন' বা দুষমণ হচ্ছে নোংরা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িগোফ, চাল-চলন কিম্বা বন্দুক বাহনে একটু ঢিলে-ঢালা।—সুতরাং তাদের দর্শনমাত্রই বোঝা যায় কার কি ভূমিকা।

ওয়েস্টনার ছবিগুলির অপরিহার্য সরঞ্জাম হচ্ছে বন্দুক। কাহিনীর সবাই,—এমন কি নাপিত ও দোকানদাররাও অবলীলাক্রমে বন্দুক ব্যবহার করে। বন্দুকের আওয়াজই হচ্ছে তার আবহসংগীত।

'গ্রেট ট্রেণ রবারি'র একটি দৃশ্য

তবে সুখের বিষয় অত বন্দুকে-বাজির তুলনায় খুন-জখম হয় কম। একটি উদাহরণযোগ্য ওয়েস্টনারে সর্বসমেত ১৪৯-বার গুলী চালানো হলো। কিন্তু কেউ মরলো না। একজন গুরুতরভাবে আরেকজন সামান্য জখম হলো।

ত্রাস ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয় আরো ভয়ঙ্কর কোন হিংস্রতার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। তখন নীরবতা ঘনিয়ে আসে, চরিত্রগুলি মন্থর ও নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলাফেরা করে। মনে হয় নায়কের এবার আর পরিত্রাণের উপায় নেই। এমন সময় চকিতে অশ্বখুরধ্বনি জেগে ওঠে। নায়কের অনুগামীরা ঝড়ের বেগে উপস্থিত হয়।—প্রত্যেক ছবিতে অনুরূপ একটি দৃশ্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যেকটি কাহিনীই অনুষ্ঠিত হয় উদার, রুক্ষ, রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে। ঘরের মধ্যে যে কটি ছবি তা হয় শেরিফের আফিসে, নয় কোনো ভাঁটিখানায়। অর্থাৎ নায়ক বা দুষমণ কেউ যে সাধারণ মানুষ, কিম্বা তাদের স্ত্রীপুত্র-কন্যা আছে,—এমন কোন ইঙ্গিত কদাচিৎও পাওয়া যায় না। সভ্য জগতের বাইরে সে যেন কোন এক বন্য-আইনের ভয়ঙ্কর জগৎ।

কাউবয়দের ইতিকথা

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে দারুণ মাংস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। টেকসাসের গোপালেরা সেই সুযোগ গ্রহণের জন্যে আড়াই লক্ষ লম্বা-শিং গরু নিয়ে উত্তরে কানসাসে রেল সংযোগের দিকে যাত্রা করলো।—এইভাবেই রেল লাইনের কাছে গড়ে উঠতে লাগলো এবিলেনে, ডজ্‌সিটি, উইচিটা এবং কানসাস প্রভৃতি গো-হাট সহর।

তখনকার দিনে ঐ গরু চালানী ব্যবসায়ে যারা এলো তারা ছিল পুরোনো গো-ব্যবসায়ী গৃহযুদ্ধের পুরোনো সেপাই-ম্যাক্সিকান কিম্বা নিগ্র বা রেড ইণ্ডিয়ান সঙ্কর কয়েকজন ইংরাজ। মোটের ওপর তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী এবং সৎপ্রকৃতির লোক। মাত্র মুষ্টিমেয় হয়তো বা ঠ্যাঙাড়ে, খুনে কিম্বা বন্দুকবাজ।

ইতিমধ্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে টেক্সাসে হলো দারুণ অনাবৃষ্টি— তারপর এলো ভয়ঙ্কর শীত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মাংসের দাম অকস্মাৎ একেবারে পড়ে গেল। হাজার হাজার গো-ব্যবসায়ী বা কাউবয়দের এলো চরম দুর্দিন।

তাদের মধ্যে অনেকে খুন, রাহাজানি ও ছিনতাইয়ের পথ ধরলো। বন্ধু বন্ধুকে

ওয়েট ইয়ার্প

খুন করলো, পারিবারিক কলহে বন্দুক আমদানী হলো, ব্যাঙ্ক ও রেল লুন্ঠন সুরু হলো।

সেই ভয়ংকর হিংস্রতার মধ্যে কয়েকজন ডাকাতের কুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। যেমন ঃ—

(১) ওয়েট ইয়ার্প ঃ—ঝুলন্ত গোঁফ এই দস্যু বহু বন্দুক লড়াইয়ের নায়ক।

ওয়াইল্ড বিল হিকক্

১৯২৯ সালে ৮০ বছর বয়সে সে মারা যায়। শেষ জীবনটা অবশ্য তার ছিল শান্তিপূর্ণ।

(২) ওয়াইল্ড বিল হিকক্ ঃ—কানাস নগরীর এই দুর্দান্ত 'মার্শাল' ছিলেন রীতিমত সুপুরুষ। কাঁধ পর্যন্ত তার কোঁকড়া বাদামী চুল লুটতো। তবে সে ছিল যেমন বেপরোয়া মদাপ তেমনি

জেসি জেমস

বদমেজাজী দাম্ভিক। বন্দুকের গুলীতে অন্তত ১০০টি লোক খুন করে। কিন্তু মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পেছন থেকে আরেকজন ঘাতকের গুলীতে তার প্রাণ যায়।

(৩) জেসি জেমস ঃ—পুরোনো বে-আইনী ফেরারীদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত। বহু বাটপারী ও ব্যাঙ্ক লুঠের নায়ক। তবে ট্রেণ ডাকাতিতেই সে ছিল বিশেষজ্ঞ।

(৪) জন ওয়েসলে হার্ডিন ঃ টেকসাসের এক পাদ্রীর ছেলে। প্রথম খুনের বউনি হয় ১৫ বছর বয়সে। পরবর্তী ৩ বছরে সেই খুনের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭-এ।

(৫) বিলি দি কিড্ ঃ নিউইয়র্ক বস্তীর এই বাচ্চা শয়তান সর্বসমেত ২১টি খুন করে। তার মধ্যে অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের ধরা হয় না। প্রত্যেকটি খুনেই সে করে অন্যায় যুদ্ধে।

(৬) বচ কাসিডি ঃ সর্বশেষ স্বনাম-ঘৃণ্য দস্যু। ১৯০১ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ও ট্রেণ লুঠে প্রভৃতি করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়।

এই দস্যু সর্দারদের মধ্যে আরেক-জনের নামও উল্লেখ করা দরকার—ব্ল্যাক বার্ট। উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় ট্রেণ লুঠের ব্যাপারে সে ছিল ওস্তাদ। সর্বসমেত ২৮ বার ট্রেণ লুঠ করে। কিন্তু অন্যথা ছায়া-ছবির নায়ক হবার মত অন্য কোন গুণ এই ধূর্ত শয়তানের ছিল না। রোগা-খর্বাকৃতি এই ডাকাত থলে কেটে কুর্তা তৈরী করতো। হাতে থাকত একটি সর্ট গান ও কুড়ুল। কখনো সে ঘোড়ায় চাপেনি এবং ডাকাতির সময় গুলী চালায়নি।

ওয়েস্টনারের জনপ্রিয়তার কারণ ও ফলাফল

উপরোক্ত দস্যুদের জীবনী, তদন্তহীন ঘটনাবলী ও সেই সঙ্গে বেপরোয়া কল্পনা মিশিয়ে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার গল্প রচনা হয়েছে। তবে তাদের মোদ্দা ধারাটা যে একই তা আগেই বলা হয়েছে।

প্রথম ওয়েণ্টনার ছবি তোলা হয় ১৯০৩ সালে, 'দি গ্রেট ট্রেণ রবারি' ছবিটি তৈরী করতে খরচ হয় ১৫০ পাউণ্ড, ১২ মিনিট মত সেটি দেখা যেত এবং সুটিংয়ে সময় লাগে ২ দিন। নায়কের ভূমিকায় ব্রঙ্কো বিলি এণ্ডারসন পারিশ্রমিক পান দৈনিক ১ পাউণ্ড ৫ শিলিং। কিন্তু আজকাল তৈরী হয় শত শত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম। টেলি-ভিশন ফিল্মের নায়ক জেমস আর্নেস পান বছরে ৩৫০,০০০ পাউণ্ড। 'ওয়াট ইয়ার্প' নামক ছবির নামভূমিকায় অভিনয় করে হিউ ও'ব্রায়ান পান বছরে ১০০,০০০ পাউণ্ড।
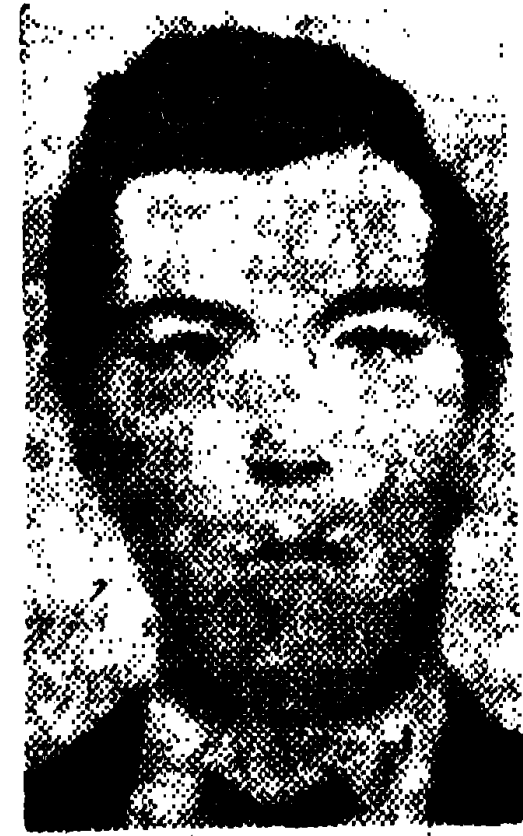
জন ওয়েসলে হার্ডিন

সত্যিকারের ডাকাত ইয়ার্প অত টাকার কথা জীবনে শোনেওনি।

প্রশ্ন হতে পারে কেন 'ওয়েন্টনার' ফিলমগুলির এই অবিশ্বাস্য চাহিদা? তার অসংখ্য ব্যাখ্যার মধ্যে দুটি রূঢ় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যাখ্যার উল্লেখ করলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে।

বিলি দি কিড

প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে যে নির্দয় ক্রূর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ প্রবৃত্তিগুলি ঘুমিয়ে থাকে তা এই ছবিগুলি দেখে জেগে ওঠে এবং নিষ্ক্রিয় বিকল্প চরিতার্থতা লাভ করে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার মতে প্রত্যেক মানুষের মনেই অশান্ত যাযাবর লুকিয়ে

বচ কাসিডি

আছে। রুদ্ধশ্বাস নাগরিক জীবনে যেখানে জানালার ধারে টবে একটি ক্যাকটাসের চারা দেখে মানুষ উদার প্রান্তরের স্বপ্ন দেখে সেখানে ঐ ছবি-গুলির আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে শিশুমনের ওপর ঐ মারাত্মক ছবিগুলির প্রভাব সম্পর্কে। বৃটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সরকারী উদ্যোগে তার ফলাফল নিয়ে গবেষণার জন্যে কমিটি বসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত কয়েকবার দেখেছি টেলিভিশনে ঐ ছবি দেখতে দেখতে শিশুরা আতংকে কেঁদে উঠেছে।

'ওয়েস্টনারের' পাক্ষিক সমর্থকেরা বলেন যে, ঐ ছবিগুলির মর্ম-নীতিই হচ্ছে অন্যায় ও অসৎ-এর ওপর ন্যায় ও সৎ-এর জয়। হিংসা যেটুকু তা হচ্ছে পৌরুষ, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্য-করণীয়। তাছাড়া দেখানো হয় আইন, সম্পত্তি অধিকার ও বিচারের জয়।

কথাটা কিন্তু আংশিক সত্য। কারণ আগেই বলেছি 'ওয়েস্টনারের' কাহিনী-গুলির সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন সম্পর্ক নেই। সে যেন পরিবার-পরিজনহীন সভ্যতার বাইরে কয়েকটি দুর্ধর্ষ মানুষের মারামারি হানাহানি।

তাছাড়া কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ন্যায়-রক্ষক নায়কই শেষ পর্যন্ত খুন করছেন বেশি। দুষমনদের পক্ষে কোন সহানুভূতি,—তারা কেনই বা দুষমন হলো, তাদের কোন হৃদয়-সংঘাত কিম্বা দ্বিধা কোন কিছুরই স্থান নেই। তারা যেন বায়না দিয়ে তৈরী আকাট দুষমন।

আরেকটি যুক্তি হচ্ছে শিশুমনের যে আক্রমণাত্মক ও হিংস্র দিকটি আছে এই জাতীয় ছবি দেখে তা বিকল্প পরিতৃপ্তি লাভ করে শ্রান্ত বা নিঃশেষ হয়ে যায়।

আমেরিকায় এই বিষয়ে কেফেউভার তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষী দিতে গিয়ে শ্রীমতী ম্যাককবে নামে এক বিশেষজ্ঞ বলেন,

"মূলত যুক্তিটা হচ্ছে অনুরূপ ঃ যদি কোন লোক তৃষ্ণার্ত হয় তা হলে এক গ্লাস জল খেলে বহুক্ষণ তার আর তৃষ্ণা লাগবে না। অনুরূপভাবেই, ঐ মতানুযায়ী একটি লোক যদি একবার ক্রুদ্ধ হয় কিম্বা বিক্ষুব্ধ হয় তা হলে যেহেতু সে তার মনের ক্ষোভ ও ক্রোধকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে তাই বহুক্ষণ সে ক্রুদ্ধ না হয়ে শান্তিতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিষ্ক্রিয়ভাবে টেলিভিশনে হানাহানি-খুনোখুনি দেখলে শিশুমনের আক্রমণাত্মক মনো-ভাবগুলি সত্যিই নির্গত হয়ে যায় কিনা? গেলেও কতক্ষণের জন্যে।

শ্রীমতী ম্যাককবের মতে যেহেতু ছবিগুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই তাই শিশুমনের ওপর তার কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। বরং সেই ক্রুদ্ধ, হিংস্র হানাহানি দেখে তার মনের অনেক ক্রূর প্রবৃত্তি জেগে ওঠারই কথা।

পাশ্চাত্যে এমন কি পৃথিবী জুড়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যে অপরাধ-প্রবণতা, হিংস্রতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে তার জন্যে অনেকেই 'ওয়েস্টনার' ছবির প্লাবনকে দায়ী করেন। কিন্তু মনে হয় সে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া।

মসিরেখা

জরাসন্ধ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যেমন বলে গিয়েছিল, একদিন পরে সকাল বেলা গোটা নয়েকের কাছাকাছি গোকুল আবার এসে উপস্থিত। মাথায় ঝুড়িটা আগের দিনের চেয়ে বড় এবং বেশ খানিকটা ভারী। দাওয়ার কোলে নামিয়ে রেখেই, মাথার উপর থেকে বিড়ে পাকানো গামছাখানা খুলে হাওয়া খেতে সুরু করল। সাড়া পেয়ে নির্মলা রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিস্ময়ের সুরে বলল, এ সব কী?

—'দাঁড়াও, বলছি,' মুখে সেই সদা-প্রসন্ন হাসি।

—ঈস্, কী রকম ঘেমে গ্যাছ! দাঁড়াও, আমি পাখা নিয়ে আসছি।

—শোনো একবার কথা! আমি কি তোমাদের মতো ভদ্দরনোক যে বসে বসে পাখার হাওয়া খাবো। এই আমাদের পাখা...বলে, ঘূর্ণমান ময়লা গামছাটা আরও জোরে চালিয়ে দিল। তারপরেই, যেন কোনো বড় রকমের সর্বনাশ ঘটেছে, এমনি ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, ওডা কী করছ! তোমার বাড়ি এসে ঐ পিঁড়ে পেতে বসবো আমি?

চিৎকার শুনে নির্মলা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবার হেসে ফেলল, কিসে বসবে তাহলে?

দাওয়ার সামনে খোলা উঠোনের উপর জাঁকিয়ে বসে গোকুল তখনই সে প্রশ্নের সমাধান করে দিল। মাথা দুলিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, এবার বুঝেছ? আমার বাবা কি বলত জানো? বলত, মাটিই খাঁটি, আর সব নকল।

খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে গোকুল এবার তার ঝুড়ির দিকে মন দিল। একটি একটি করে জিনিষগুলো নামিয়ে রাখতে লাগল—একটা মস্ত বড় কড়া, দুটো ধামা, একগোছ বাঁশের শলা, আরো কী সব টুকিটাকি। তারপর বেরোল একটা গুড়ের হাঁড়ি, দু'চারটে টিনের কৌটা এবং তার পাশ থেকে আর একটা ছোট ঝুড়িতে কিছু আতপ চাল, ডাল, তেল মসলা সৈন্ধব নুন আর কিছু তরি-তরকারী। উপরের জিনিষগুলো খালি করবার পর বেরিয়ে পড়ল প্রায় আধ ঝুড়ি ধান।

নির্মলা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, শুধু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল। নামানো শেষ হলে বলে উঠল, এ কী কাণ্ড করেছ! এ সব দিয়ে কী হবে?

—কোন্‌টা দিয়ে বল? এক এক করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—এত ধান কিসের?

—খৈয়ে ধান। খৈ ভাজাবে। এই যে কড়া দেখছ না?

নির্মলা হেসে উঠল, ওমা! খৈ ভাজবো কেমন করে!

—যেমন করে সব্বাই ভাজে।

—শিখেছি নাকি কোনোদিন?

—আমি শিখিয়ে দেবো।

—তুমি!

—পেত্যয় হচ্ছে না? ভাবছ ওডা মেয়েছেলের কাজ। তোমার গোকুল সব পারে, মা। আশেপাশের দশখানা ঘরে একবার জিজ্ঞেস করে এসো—কোন্ মেয়েছেলেডা আমার চেয়ে ভালো খৈ ভাজে।

নির্মলা বুঝতে পারল, না জেনে বড় কঠিন জায়গায় আঘাত করে বসেছে। তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, না, না, তোমার সঙ্গে তাদের তুলনা। কিন্তু আমি কি পারবো?

—খুব পারবে, খুশী হয়ে বলল গোকুল, একবারের বদলে দশবার দেখিয়ে দেবো। তার জন্যে কী?

—আচ্ছা, আর বাকী ওসব কি?

—শুধু খৈ ভাজলেই তো হবে না। তার থেকে তৈরী হবে মোয়া—যারে বলে জয়নগরের মোয়া। এই গুড় আর মসলা-পাতি—

হঠাৎ নির্মলার মুখের দিকে নজর পড়তেই মাঝপথে থেমে গিয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, কী হল, মা?

পরিবর্তনটা এমন আকস্মিক ও এত সুস্পষ্ট যে, কারো চোখেই এড়ায় না। মুহূর্তপূর্বে যে কৌতুক হাসির উজ্জ্বল রেখাগুলো নির্মলার চোখে-মুখে দেখা দিয়েছিল, চোখের নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে সবটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটি দূরাগত করুণ ছায়া। গোকুল আরেকবার তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করতেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ও কিছু না। হ্যাঁ, কী বলছিলে, বল।' গোকুল পাছে অন্য কিছু মনে করে কোনোরকম আঘাত পায়, এই ভেবে নির্মলা আবার যথাসাধ্য সহজ হবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুজনের মধ্যে আগেকার সেই সুরটুকু আর ফিরে এল না।

গোকুল যে-সব জিনিষের ফেরি করে, তার মধ্যে প্রধান পণ্য—জয়নগরের মোয়া। জয়নগর নামক জায়গাটি কোথায় সে জানে না। যেখানেই থাক, এই বেলে-ঘাটার বস্তির একখানা খোলার ঘরের মধ্যেই তার সবটুকু স্থান-মাহাত্ম্য এসে বাসা নিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় এ-বস্তুটির ভীষণ চাহিদা এবং সেটা ক্রমশঃ বাড়ের মুখে। নিয়মিত যোগান দেওয়া ওর একার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে

না। গ্রামের বাড়িতে দুটি ছেলে আর তাদের মা। সামান্য কিছু জমি-জিরেত আছে; সে-সব আগলাতে হয়। তাদের কাউকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই সে এমন একজন লোক খুঁজছিল, যে তাকে মোয়া তৈরীর কাজে সাহায্য করতে পারে। নির্মলাকে দেখে এবং ঘটনাচক্রে তার সব কথা জানবার পর, প্রথমে মনে হয়েছিল, এই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে তার জীবিকার হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার ভরণপোষণের ভার নিজের হাতে তুলে নেবে। কিন্তু যখন বুঝল, এ-মেয়ে নিজের পা ছাড়া কিছুতেই অন্য কিছুর উপর ভর করবে না, তখন সে স্থির করে ফেলল, একেই সে শিখিয়ে-পড়িয়ে তার ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেবে। নির্মলার উপরে প্রথম থেকেই যে মায়া পড়ে গিয়েছিল, তার সংগে যুক্ত হয়েছিল শ্রদ্ধা এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধ। তার থেকে এই মেয়েটির কর্মক্ষমতার উপরেও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। একে দিয়ে তার 'জয়-নগর' পরিকল্পনা সফল হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সহায়-সম্বলহীন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাটির আত্মসম্মানবোধ কতখানি সজাগ, সেটুকু বুঝতে গোকুলের দেরি হয়নি। এর মধ্যে কোনো সাহায্য বা অনুকম্পার গন্ধ পেলে পাছে সে পিছিয়ে যায়, তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে নিছক একটি যৌথ কারবারের প্রস্তাব হিসাবে হাজির করল। বোঝাতে চাইল, কোনো নিঃস্বার্থ পরোপকারের বাসনা নিয়ে সে আসেনি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসায় এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে নির্মলার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, সেইটুকুই তাকে দেওয়া হবে। তার বেশী আর কিছু নয়। নির্মলা অবশ্য শুধু সেইদিকটাই দেখল না। ব্যবসায়-বুদ্ধির অন্তরালে হৃদয় বলে আর একটি অদৃশ্য এবং দুর্লভ বস্তুও তার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কোনো কথা তুলল না। শুধু চাল, ডাল, সব্জি ইত্যাদির চুপড়িটা চোখের ইসারায় দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ওগুলোও কি মোয়া তৈরীর জন্যে?' ইঙ্গিতটা বুঝলেও গোকুলকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ হল না; যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমনিভাবে কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, এই দ্যাখ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। এ তল্লাটে কিছু পাওনা-আদায় আছে। সে-সব সেরে ঘরে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তারপর কি আর হাঁড়ি ঠেলতে ইচ্ছে করে?' বলে, যেন ভিক্ষা চাইছে এমনিভাবে হাত দুটি জোড় করে যোগ করল, 'এ-বেলাডা মায়ের হাতের দুটি পেসাদ পাবো।'

বলবার পর আর দাঁড়াল না। এক-রকম পালিয়ে যাবার মত দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল। দরজার পাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, বারোডার মধ্যেই এসে পড়বো।

সেই রাত্রে গোকুলের প্রস্তাবটা বিজুর মাকে জানাতেই তিনি সংগে সংগে মত দিলেন। বললেন, মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। ও তোকে ঠকাবে না। তুই আর দোমনা করিসনে। এতে ভালোই হবে। কিছু কিছু আমিও তোকে দেখিয়ে দিতে পারবো।

প্রথম দিকে নির্মলাকে যে মোয়াটা তৈরী করতে দেওয়া হল, সেটা মোট চাহিদার সামান্য অংশ। ক্রমে তার উৎসাহ বেড়ে গেল, জিনিষও ভাল হতে লাগল। সেই সংগে কাজের পরিমাণও বাড়ল। সমস্ত সকালটা যায় খৈ ভাজতে এবং সেগুলো বাছতে। দুপুরে বেলা নামমাত্র বিশ্রামটুকু সেরে নিয়েই মোয়ার কড়া নিয়ে বসতে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে, কখনো একটু রাতও হয়ে যায়।

গোকুল দুবেলা আসে; ওজন করে মাল দিয়ে যায়, হিসাব মত মোয়া বুঝে নেয়। সপ্তাহের শেষে নির্মলার পাওনা মিটিয়ে দেয়। নির্মলা মাঝে মাঝে বলে, এখন থাকনা তোমার কাছে। পালিয়ে তো আর যাচ্ছে না।

—পালিয়ে না যাই, মরে তো যেতে পারি।

নির্মলার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে ওঠে। বাইরে সে-ভাব গোপন রেখে হাল্কা সুরে বলে, ইস্, মরতে দিচ্ছে কে তোমাকে?' গোকুলের ভারী মজা লাগে। হাসতে হাসতে বলে, শোনো কথা! বুড়ো হয়েছি, এবার যেতে হবে না? এমনি-তেই কত পাপ করেছি তার ঠিক নেই। তার ওপরে আবার বামুনের কাছে দেনা রেখে মরবো? সব্বোনাশ!

যত দিন যেতে লাগল, গোকুল মাল তৈরীর কাজটা নিজের হাত থেকে ক্রমশঃ নির্মলার হাতে দিয়ে, শুধু যোগানের দিকে মন দিচ্ছিল। মাস কয়েক পরে একদিন এসে বলল, তোমার হাতে কি যাদু আছে মা? এরই মধ্যে আমার খদ্দেরগুলোকে ভাগিয়ে নিলে! এখন আর গোকুল খুড়োর জিনিষ কারো মুখে রোচে না। বলে কি জানো? সেই যে সেদিন দিয়ে গেলে, সেইরকমডা এনো।

নির্মলা মনে মনে গর্ববোধ করে, কিন্তু বাইরে প্রতিবাদ জানায়, এ তোমার

বানানো কথা, গোকুলকাকা। তোমার ধারে-কাছে ঘেঁষতেও আমার আরো এক যুগ লাগবে।

—না, মা। তোমার হাতখানি বড় মিষ্টি। ওর ছোঁয়া যাতে লাগে, তারই সোয়াদ বেড়ে যায়। রান্না খেয়েও দেখলাম কিনা? একেবারে অমৃত।

রোদের দিকে তাকিয়ে গোকুল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। ঝুড়িটা মাথায় তুলতে তুলতে বলল, বেলা হল, আসি। তোমার আবার রান্নাবান্না আছে তো।

বৃদ্ধের মনোগত ইচ্ছেটা নির্মলার কাছে গোপন রইল না। বলল, তোমাকে যে দুটো খেয়ে যেতে বলবো, আজ আর তার উপায় নেই। ওদিকের পাট বন্ধ।

—কেন? অবাক হয়ে তাকাল গোকুল।

—আজ আমার একাদশী।

—ও, বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কের মত বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

সেদিন বিকালেই গোকুল আবার এসে উপস্থিত। নির্মলা একটা কি সেলাই নিয়ে বসেছিল। মৃদু হেসে বলল, আজ তো আমার ছুটি, গোকুল-কাকা।

গোকুল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে একটা সরাঢাকা ছোট্ট নতুন হাঁড়ি বারান্দার উপর রেখে বলল, তুলে রাখো।

—কী ওটা?

—কিছু না, দুটো মোয়া। কাল সকালে চান করে উঠে মুখে ফেলে জল খেও।

—না, গোকুলকাকা। এটা তুমি নিয়ে যাও।

—আমি খালের ঘাট থেকে ডুব দিয়ে এসে শুদ্ধ কাপড়ে আলাদা বাসনে তোমার জন্যেই করেছি, মা।

—না, না, সেজন্যে নয়।

—তাহলে?

নির্মলা চুপ করে রইল। গোকুল বলল, পেরথম যেদিন এই মোয়ার কথা বলি, সেদিনও তোমার মুখখানা এমনি আঁধার হয়ে গিয়েছিল। নিচ্চই এটটা কোনো দুঃখু আছে তোমার মনে। ছেলের কাছেও কি সেডা বলা যায় না, মা?

—আমাকে তুমি মাপ করো, গোকুল-কাকা। ও-মোয়া আমি মুখে তুলতে পারবো না। আমার খোকা বড় ভালবাসত।

—তোমার খোকা!

—হ্যাঁ, একদিন বায়না ধরে বলল, দিতেই হবে কিনে। ঘরে একটি পয়সা নেই, কি দিয়ে কিনি? উলটে আরো বকেছিলাম। তারপর আর কোনোদিন চায়নি।

বলতে বলতে নির্মলার দুচোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এল জলধারা। গোকুল সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খোকার কথা এই প্রথম শুনল নির্মলার মুখে, চোখের জলও দেখল এই প্রথম। আর কোনো কথা না বলে হাঁড়িটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নতমুখে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ আট ॥

আশুতোষবাবুর চাকরির মেয়াদ শেষ হল। দীর্ঘ তিরিশ বছর একনাগাড়ে বন্টালে কাটাবার পর এবার তাঁর অবসরের পালা। যাবার আগে ছেলেরা তাদের 'সেকেণ্ড স্যার'কে বিদায় অভিনন্দন জানাতে চায়। হলঘরের কাঠের পার্টি[illegible] সকোলাহলে চেয়ার বেঞ্চি সাজাবার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে। সভা হবে। মাঝে মাঝে সুপার বা বাবু-দের কেউ যখন বদলি হয়ে যান, তখনো এই রকম সভার আয়োজন হয়ে থাকে।

নির্মলার দু' চোখ ছাপিয়ে............

আজকের ব্যাপারটা আরো বড়। বদলি নয়, বরাবরের মত বিদায় নিচ্ছেন মাষ্টার-মশাই। তাই অনুষ্ঠানটাও ব্যাপক। শুধু দুটো ফুলের মালা আর একটা তোড়া দিয়ে কাজ সারা নয়, তার সঙ্গে কলাগাছ ও দেবদারু পাতার গেট, রঙ্গীন কাগজের শিকল, দেয়ালের গায়ে মৌসুমী ফুল আর পাতায় জড়ানো বড় বড় রিঙ। ওদিকে আর একটা বিশেষ আয়োজন চলছে। বদলির বেলায় যা কখনো হয় না। একটি ছোটখাট বিদায় ভোজ। তাদের বড় আদরের 'সেকেন্ড-স্যর'কে ঘিরে বসে শেষবারের মত পায়েস খাওয়াবে ছেলের দল। 'ষ্টার বয়'রা তাদের মাসিক এক টাকা সরকারী রোজ-গার থেকে দরাজ হাতে চাঁদা দিয়েছে, অন্যান্য ছেলেরা, পালপার্বণে যাদের বাড়ি থেকে কিছু কিছু হাতখরচ আসে, তারাও কম দেয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কাজ যত তার অনেক বেশী কলরব।

সকলেই আছে, সকলেই কিছু না কিছু করছে, নেই শুধু একজন। এই অনুষ্ঠানের কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটি 'ষ্টার'এর হঠাৎ নজরে পড়তেই বলে উঠল, ওরে দিলীপ কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

তাইতোঃ—অনেকেই তাকিয়ে দেখল এদিক ওদিক। পাশ থেকে কে একজন ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করল, সে তো আর তোর আমার মত খারাপ ছেলে নয়; সে পড়ছে।

—যাঃ, আজকের দিনে পড়বে কিরে! অসুখটসুক করেনি তো?

কেশব একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে কলাগাছে দেবদারু পাতা জড়াচ্ছিল। বলল, সে এসব হৈচৈ ভালো-বাসে না। তাছাড়া আশুবাবু-স্যার চলে যাচ্ছেন!

অনেকেই সায় দিল। মাষ্টারমশাই যে সকলকেই ভালবাসতেন এবিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও দিলীপের উপর যে তাঁর একটি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল, এটা কারোই অজানা নয়। দিলীপও যে তাঁর প্রতি কতখানি অনুরক্ত তাও সবাই জানে। আর একটি ছেলেকে বলতে শোনা গেল, ওরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল। আসছে বছর পরীক্ষা।

সভারম্ভের আগে পর্যন্ত ছেলেদের যত কিছু হাঁকডাক, ছুটোছুটি, সেকেন্ড মাষ্টার মশাই ঘরে ঢুকবার পর তাঁর দিকে নজর পড়তেই সব যেন মন্ত্রবলে বন্ধ হয়ে গেল। সাহেব তখনো আসেননি। ডেপুটি সুপার সেই শূন্য আসনের ঠিক পাশটিতে আশুবাবুকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। কালও যিনি ছিলেন স্বতঃপ্রফুল্ল, সদাহাস্যময়, একটা রাত যেতেই কে যেন তাঁর মুখের উপর থেকে সব দীপ্তিরেখা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। গালদুটো ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে কালি, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, তার মধ্যে কেমন একটা অসহায় ব্যাকুলতা। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, সেকেন্ড স্যারকে যেন চেনা যায় না। দিলীপ বসেছিল একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে। ছেলেরা কেউ কেউ তাকে সামনের দিকে বসাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসাবে, সেইটাই তার স্থান। কিন্তু কিছুতেই তাকে টেনে আনা যায়নি। মাষ্টার মশাই-এর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সেই যে মাথাটা নুয়ে পড়েছিল আর চোখ তুলতে পারেনি।

মিনিট কয়েক পরেই সুপার এসে পড়লেন। একটি ছোট ছেলে তাঁকে এবং আশুবাবুকে নিজেদের বাগানের ফুল তুলে নিজের হাতে গাঁথা মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানাল। দু-তিনটি ছেলে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে বিদায়ী শিক্ষককে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তার মধ্যে ছন্দ মিল এবং ভাষার ত্রুটি যাই থাক, একটি গভীর আন্তরিকতার সুর সকলের অন্তরে গিয়ে পেঁছিল। হেড-মাষ্টার মশাই তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীর গুণাবলী বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন। ডেপুটিবাবুও কিছু বললেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা, দিলীপ কিছু বলুক। সেই তো বর্ষ্টাল স্কুলের উপযুক্ত প্রতিনিধি। অধ্যক্ষের অনুরোধে সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না। আশুবাবুকে যখন আহ্বান জানানো হল তিনি খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, তিরিশ বছর যারা আমাকে ঘিরে ছিল, তারা আমার কাছে নেই, অথচ আমি আছি, একথা এখনো আমি ভাবতে পারছি না। যে-কটা দিন বাঁচবো, তোমরা আমার সমস্ত মন, সমস্ত চেতনা জুড়ে থাকবে। আর আমি কিছু বলতে পারছি না।

সকলের শেষে ঘোষ সাহেব যে সামান্য কটি কথা যোগ করলেন, সেটা আশুবাবুরই প্রতিধ্বনি। বললেন, আশুবাবু বর্ষ্টাল স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, একথা প্রত্যক্ষ হলেও সত্য নয়। এটা উনি যেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না, আমরাও মেনে নিতে পারি না। এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আমাদের সকলেরই নানা রকম আকর্ষণ আছে, আছে ঘর-সংসার, আত্মীয়বান্ধব এবং তার সঙ্গে কত রকম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। ওঁ'র থাকবার মধ্যে শুধু এই স্কুল আর তার একপাল ছেলে। তার বাইরে ওঁ'র কোনো অস্তিত্ব নেই। ওঁকে আমরা কোনো-দিনই হারাবো না। যেখানেই থাকুন, এই ছেলেগুলোর মধ্যেই ওঁকে আমরা দেখতে পাবো।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত
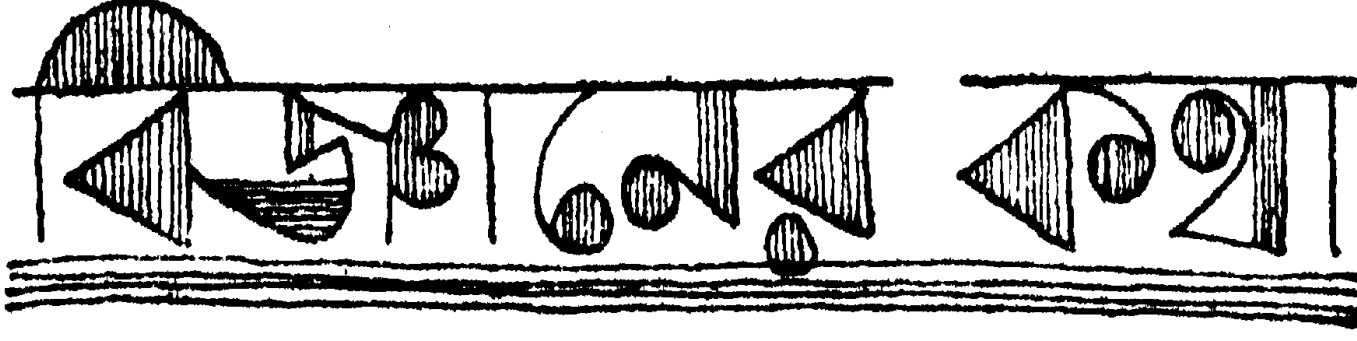
॥ পুরনো প্রশ্ন : নতুন পৃথিবী ॥

প্রশ্নটা পুরনো। খাদ্যের উৎপাদন কি পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? এমন দিন কি আসবে না যেদিন পৃথিবীর বিপুল-সংখ্যক মানুষের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন হবে খুবই কম এবং পৃথিবীতে স্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে? গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রশ্ন বার-বার উঠেছে। এবং এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মোটামুটি দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু আজকের পৃথিবীটা নতুন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি আজকের দিনে এতই দ্রুত যে পৃথিবীর সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই নতুন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এতকালের পুরনো প্রশ্নগুলোকেও আবার নতুন করে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খাদ্য-উৎপাদন ও জনসংখ্যার প্রশ্নটা খুবই পুরনো। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের যে-জবাব দিয়েছেন তা একেবারেই নতুন। আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে এই প্রশ্নটা নিয়ে ভাবিত হয়েছি। কাজেই হালের জবাবটাও আমাদের সকলেরই জানা দরকার।

॥ চাষযোগ্য জমি ॥

বর্তমানে পৃথিবীতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের মাত্র তিনভাগের একভাগ। পৃথিবীর মোট ভূখণ্ড হচ্ছে মোটামুটি ৩৩০০ কোটি একর। এই ৩৩০০ কোটি একর জমির মধ্যে বর্তমানে চাষ হচ্ছে প্রায় সাড়ে-তিনশো কোটি একর জমিতে। অর্থাৎ শতকরা মাত্র দশভাগে। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ হচ্ছে খাস-জমি। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগে রয়েছে বনজঙ্গল। আর বাকি ৪০ ভাগে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, শহর, গ্রাম, ইত্যাদি।

তবে পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশেই প্রতি বছরেই নতুন নতুন জমি চাষযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে প্রায় ৯০ কোটি একর জমিতে নতুন চাষ শুরু হয়েছে। অবশ্য ফসলের চাষ শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগে, বাকিটা খাস-জমি। মোট হিসেব নিলে দেখা যাবে যে বর্তমানে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ত্রিশভাগই আবাদী। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর মোট আবাদী জমির পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর ভূখণ্ডের বাকি সত্তরভাগ এখনো পর্যন্ত চাষের অযোগ্য। তার মানে কথাটা দাঁড়ায় এই যে আগামী বছরগুলিতে পৃথিবীর মোট আবাদী জমির পরিমাণ মোটামুটি এই একই থেকে যাবে। অন্যদিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়ে চলবে। এবং জনসংখ্যা যতোই বাড়বে ততোই মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণও কমবে। এমন কি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালের হিসেবেও দেখা যায় যে যে-হারে জনসংখ্যা বেড়েছে তার চেয়ে কম হারে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে। কয়েকটা অঙ্কের হিসেব তুলে ধরে ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

চাষযোগ্য জমির হিসেব (কোটি একরে)

	আবাদ	খাস-জমি
১৯৫১	৩২১	৫৭৩
১৯৫৯	৩৪৭	৬৩৫

পতিত জমির হিসেব (কোটি একরে)

	অনাবাদী	অরণ্য
১৯৫১	১৪১৬	৯৫৬
১৯৫৯	১৩৫৫	১০০৫

জনসংখ্যা

১৯৫১ সালে ২৪৩ কোটি
১৯৫৯ সালে ২৯৩ কোটি

অর্থাৎ আট বছরে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে ২৬ কোটি বা শতকরা

৮ ভাগ এবং জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ কোটি বা শতকরা ২০ ভাগ।

মাথাপিছু জমি (একরে)

	আবাদী	খাস-জমি	মোট
১৯৫১	১·৩২	২·৩৬	৩·৬৮
১৯৫৯	১·১৮	২·১৭	৩·৩৫

অর্থাৎ আট বছরে মাথাপিছু আবাদী জমি কমেছে ০·১৪ একর, খাস-জমি কমেছে ০·১৯ একর।

এই হিসেবগুলো খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার। চাষযোগ্য জমির হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালে আবাদী জমি ছিল ৩২১ কোটি একর। ১৯৫৯ সালে তা হয়েছে ৩৪৭ কোটি একর। অর্থাৎ ২৬ কোটি একর জমি এই আট বছরে নতুন করে আবাদী হয়েছে। শতকরা হিসেবে ৮ ভাগ বৃদ্ধি। অন্যদিকে ১৯৫১ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৪৩ কোটি। ১৯৫৯ সালে তা হয়েছে ২৯৩ কোটি। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ কোটি। শতকরা হিসেবে ২০ ভাগ বৃদ্ধি। অর্থাৎ যে-হারে আবাদ বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে জনসংখ্যা। তার ফল হয়েছে এই যে মাথা-পিছু জমির পরিমাণ আট বছরের মধ্যেই ০·১৪ একর হিসেবে কমে গিয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের চিত্রটি যদি এই হয় তবে ষাট দশকের চিত্রটি নিশ্চয়ই আরো অনেক অনুজ্জ্বল।

তবুও ষাট দশকের বিজ্ঞানীরা রীতিমতো সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করেছেন যে অন্তত আগামী চল্লিশ বছরে পৃথিবীতে খাদ্যের ঘাটতি পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। অবশ্যই কথাটার মানে এই নয় যে খাদ্য-উৎপাদনের জন্যে অতঃপর বিশেষ কোনো তৎপরতার প্রয়োজন নেই।

॥ দেশভেদে মাত্রাভেদ ॥

ব্যাপারটাকে তলিয়ে বুঝতে হলে আমাদের আর একবার কতকগুলো সংখ্যার হিসেবে যেতে হবে। আমরা জানি, একর পিছু ফলনের পরিমাণ সব-দেশে একই মাত্রার নয়। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের আসল রহস্য এইখানে। প্রথমে সংখ্যাগুলো কতকগুলো ছকের মধ্যে তুলে ধরা যাক।

আবাদী জমি (কোটি একরে)

	১৯৫১	১৯৫৯	বৃদ্ধি
এশিয়া	৮৫·৩	১০৭·৩	২২·০
ইউরোপ	৩৭·১	৩৮·১	১·০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৬·৩	১৮·০	১·৭
উত্তর আমেরিকা	৬১·০	৬৩·৮	২·৮
আফ্রিকা	৬০·০	৫৮·৩	১·৭
ওসীয়ানিয়া	৫·৯	৬·৯	১·০

জনসংখ্যা (কোটিতে)

	১৯৫১	১৯৫৯	বৃদ্ধি
এশিয়া	১২৮·৪	১৬৩·৭	৩৫·৩
ইউরোপ	৩৯·৬	৪২·১	২৫·০
দঃ আমেরিকা	১১·৩	১৩·৫	২·২
উঃ আমেরিকা	২২·১	২৬·০	৩·৯
আফ্রিকা	২০·২	২৪·৬	৪·৪
ওসীয়ানিয়া	১·৩৩	১·৫৪	০·২১

মাথাপিছু আবাদী জমি (একরে)

	১৯৫১	১৯৫৯	লাভ (+) বা ক্ষতি (—)
এশিয়া	০·৬৬	০·৬৬	—
ইউরোপ	০·৯৪	০·৯০	—০·০৪
দঃ আমেরিকা	১·৪৪	১·৩৩	—০·১১
উঃ আমেরিকা	২·৭৬	২·৪৫	—০·৩১
আফ্রিকা	২·৯৭	২·৩৭	—০·৬০
ওসীয়ানিয়া	৪·৪৪	৪·৪৮	+০·০৪

এই সংখ্যাগুলিও খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন। এশিয়ায় মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ০·৬৬ একর। ছকের এই বিশেষ স্তম্ভে তাকিয়ে দেখুন পৃথিবীর অন্য কোনো মহাদেশে মাথাপিছু একরের পরিমাণ এত কম নয়। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকায় মাথা-পিছু আবাদী জমির পরিমাণ ২·৪৫ একর। ওসীয়ানিয়ায় ৪·৪৮ একর। এই অঙ্কের হিসেবই ঘোষণা করছে যে এই দুটি মহাদেশে খাদ্যের ফলন উদ্বৃত্ত হবে। আফ্রিকার দিকে তাকালেও এই একই ঘোষণা পাওয়া যাচ্ছে। এই মহাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ ২·৩৭ একর। তবে আফ্রিকা সম্পর্কে বলার কথা এই যে এই মহা-দেশটিতে ফসলের ফলন খুব বেশি নয়। কেন বেশি নয় তা বোঝার জন্যে আমরা তাকাব ইউরোপের দিকে। ছক থেকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০·৯০ একর। কিন্তু এই মহাদেশটিতে কৃষিব্যবস্থা এতই উন্নত যে এই অল্প পরিমাণ জমিতেও উদ্বৃত্ত ফলন সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য মহাদেশকে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে তার হদিশ রয়েছে ইউরোপের কৃষিব্যবস্থায়।
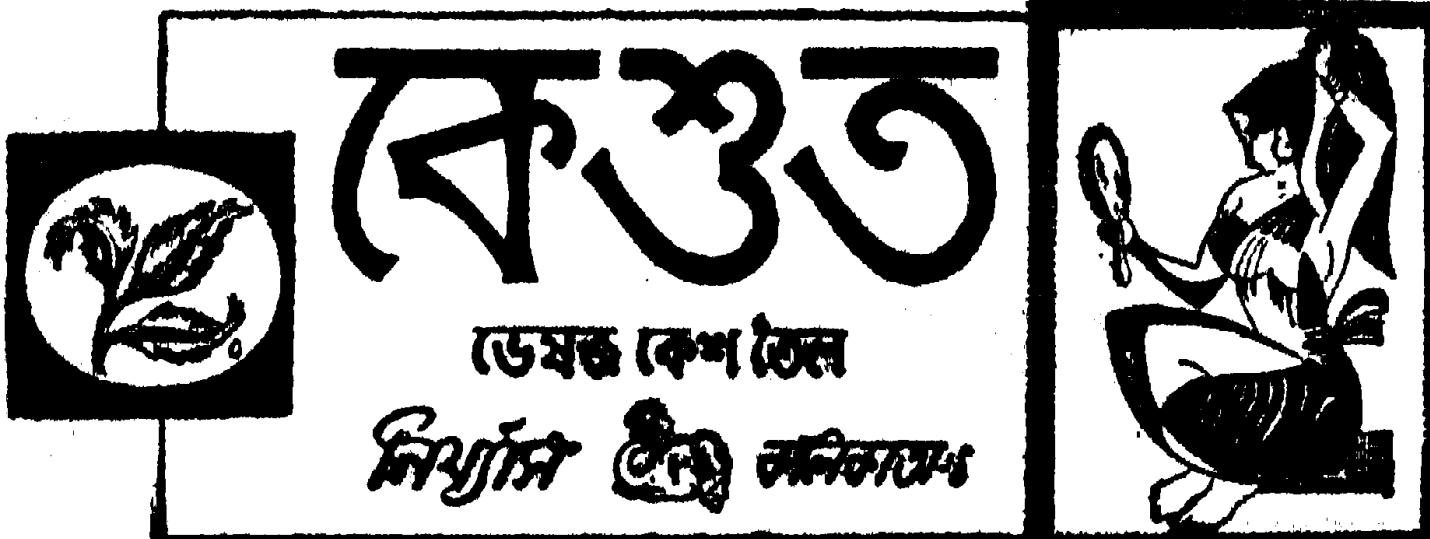
॥ যৌথ খামার ও যন্ত্রীকরণ ॥

ইউরোপের কৃষিব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে যৌথখামার ও যন্ত্রীকরণ। একা একা চাষ নয় বা মান্ধাতার আমলের লাঙল দিয়ে চাষ নয়—ট্রাক্টরের সাহায্য নিয়ে, কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার ও সাফল্যকে প্রয়োগ করে, বিপুল আকারে যৌথচাষ। অবশ্যই খুঁটিনাটি বিষয় আরো অনেক আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে এই পদ্ধতিগত পরিবর্তন। বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে যদি এই আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয় তাহলে আগামী চল্লিশ বছরে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব দেখা দেবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বিদেশী গল্প

তলোয়ারের আকৃতি

জর্জ লুইস বরজেস

লোকটার মুখের কাটা দাগ প্রায়-সম্পূর্ণ তোরণের মত। পাশুটে সেই দাগ থাকার জন্য মুখটা ভীষণ রুক্ষ দেখায়। রগ থেকে গালের হাড় অবধি বিস্তৃত সেই দাগ। এই দাগের জন্য লোকটার মুখ বিকৃত দেখায়। লোকটার সত্য নাম আমি বলব না, বলবার প্রয়োজন নেই। তাকুয়ারেম্বোর সকলেই তাকে কলোরেডো খামারের ইংরেজ বলে ডাকে। আমিও তাই বলব। লোকটার দুটো খামার, কলোরেডো আর কার-ডোসো। লোকটা খামার দুটোকে বিক্রি করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। আমাকে অনেকেই বলেছে যে, এই ইংরেজ অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কাজকর্ম করে। বলা ভাল, বিচিত্র তার রণ-কৌশল। কেউ আবার বলে রিয়ো গ্রান্ড দো সোল থেকে এসেছে এই ইংরেজ। জায়গাটা সীমান্ত প্রদেশে। কিন্তু সবাই বলে লোকটা ব্রেজিলের চোরা কারবারী। খামারের ওপর যত্নও বিশেষ নেই। মাঠময় আগাছা; পানীয় জলের উৎস শুকিয়ে কাঠ। এই সব অবহেলা তার নজরে পড়ত মাঝে মাঝে। তখন খামারের কুলিদের সংগে সমান-তালে পরিশ্রম করত সে। খামারের কুলিরা তাকে বদমেজাজের লোক হিসেবে জানত। কিন্তু তারা বলত, লোকটা রাগী হলেও সৎ, বিবেকবান। কুলিদের মতে লোকটা পাঁড়-মাতাল। বছরে প্রায় দু'বার সে ঘরের মধ্যে দিন দু' তিন নিজেকে বন্দী করে রাখত। কারো সংগে দেখা করত না, কথা বলত না। দিন দু' তিন পরে সে বাইরে আসত। তখন সে যেন অন্য মানুষ। কখন মনে হত সে যেন ঘুমের ঘোরের মধ্যে আছে। কখন মনে হত, সে যেন এইমাত্র বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল; এত ক্লান্ত, পাণ্ডুর, বিবর্ণ। আমার কখন কখন তাকে দেখাত আগের মত বদ-মেজাজী মালিক। লোকটাকে আজও আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তার শীতল চোখ দুটি, তার শরীরের কৃশতা তার ধূসর গোঁফ। কারো সংগে সে মিশত না। স্পেনীয় ভাষায় সে কথা বলত। কিন্তু সে ভাষাও সে জানত না। কথার মধ্যে ব্রেজিলীয় শব্দ ব্যবহার করত ভূরিভূরি। তার নামে চিঠিপত্র আসত না। কাচিৎ-কখন আসত ব্যবসার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি।

উত্তরদেশের বিভিন্ন জেলায় আমি তখন সফর করছি। এই সময় লোকটার সংগে আমার আলাপ। বর্ষাকাল। কারাগুয়াতা নদীতে বান ডেকেছে। যাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে আমাকে সেই রাতের জন্য কলোরেডো খামারের ইংরেজের কাছে আশ্রয় চাইতে হল। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেলে আমার তখন মনে হল এখানে আশ্রয়ের জন্য না এলেই ভাল হত। আমি তাই সেই ইংরেজটির মনের দুর্বলতম স্থানে আঘাত দিয়ে সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টা করলাম। এই রাত্রির জন্য আমাকে আশ্রয় দিয়ে সে যে আমাকে অনুগৃহীত করেছে এই কথা বোঝানোর জন্য আমি খুবই ব্যগ্র। আমি বললাম যে জাতি ইংলণ্ডের আত্মিক সম্পদ আহরণ করতে পেরেছে, সে জাতির বিনাশ হবে না কোন দিন। ইংরেজটি আমার কথায় তখুনি সায় দিল। তারপর মৃদু হেসে বললে যে, সে ইংরেজ নয়, আইরিশ। ডুনগারভান প্রদেশের বাসিন্দা সে। কথাটা বলার সংগে সংগে মুখে কুলুপ আঁটল। এ কথা বলা তার উচিত হয়নি। সে যেন একটা ভীষণ গোপনীয় খবর ফাঁস করে দিয়েছে।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার শেষ হয়ে গেলে আমরা আকাশের অবস্থা দেখার জন্য বাইরে এলাম। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণদিকের পাহাড়ের পিছনদিক থেকে ফুটে বেরুচ্ছে বিদ্যুতের ঝলকানি আর শোনা যাচ্ছে মেঘের ডাক। বুঝলাম আবার ঝড় উঠবে। আমরা খাবার ঘরে ফিরে এলাম। ঘরটা ছোট্ট, ঘিঞ্জি। কুলি এসে এক বোতল মদ টেবিলের ওপর রেখে গেল। আমরা কেউ কোন কথা বলিনি বহুক্ষণ। শুধু নিঃশব্দে মদ খেতে লাগলাম আমরা দুজন।

সময় কত খেয়াল নেই। মনে হল নেশা ধরেছে। আমি তখন ওর গালের

কাটা দাগটার কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। কিন্তু কেন? আজ আমার কিছু মনে নেই। কোন্ উৎসাহ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস বা বিরক্তির বশে আমি সেই প্রশ্ন করেছিলাম, তা আজ বলতে পারব না। কিন্তু আমার কথা ইংরেজটির কানে যেতেই তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। কিন্তু তা এক নিমেষের জন্য। মনে হল ইংরেজটি যেন এখুনি আমাকে ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে। একটু পরে স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললে, "আমি এই কাটা দাগের গল্প শোনাতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। আমার গল্প শোনার পর আমাকে লজ্জা বা অপমানের হাত থেকে রেহাই দিতে পারবেন না।"

আমি রাজী হলাম। ইংরেজী, স্পেনিস এবং মাঝে মাঝে পর্তুগীজ ভাষা মিশিয়ে এক বিচিত্র ঢঙে ইংরেজটি আমাকে এই গল্প শোনাল ঃ

সে হবে ১৯২২ সালের কথা। অথবা ১৯২২এর দু'এক বছর আগে পিছেও হতে পারে। আমি তখন থাকতাম কনট প্রদেশের একটা শহরে। আয়ার-ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য তখন আন্দোলন চলছে। বহুলোক যোগ দিয়েছে সেই আন্দোলনে। আমিও যোগ দিলাম। সেদিন যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ আজও বেঁচে আছে। কেউ কেউ নিরাপদ জীবনযাপন করছে। কেউ কেউ হয়ত এখনও বৃটিশের পতাকা কাঁধে নিয়ে সমুদ্র অথবা মরুভূমিতে আজও লড়াই করছে। কথাটা শুনে অবাক হতে পারেন। কিন্তু সত্যি। আর সেদিন যারা স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে-ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা মহৎ তারা মারা গেছে। ব্যারাকের উঠোনে তাদের সারবন্দী দাঁড় করিয়ে বুকের ওপর সকালবেলা গুলী চালিয়েছে আধ-ঘুমন্ত সৈন্যরা। আবার কেউ কেউ গৃহযুদ্ধের গোপন গুহায় অপরিচিত ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তারা কিন্তু সবচেয়ে হতভাগ্য নয়। আমরা ছিলাম রিপাবলিক্যান, ক্যাথলিক। আমার মনে হয় আমরা ছিলাম রোম্যাণ্টিক। আয়ারল্যাণ্ড আমাদের কাছে শুধুমাত্র অপাপবিদ্ধ ভবিষ্যত নয়। সে ছিল আমাদের কটু তিক্ত বর্তমান।......একটি সন্ধ্যার কথা আমি জীবনে ভুলব না। সেদিন মুনস্টার থেকে এল আমাদের পার্টির একজন সভ্য। তার নাম জন ভিনসেণ্ট মুন।

বয়স তার কুড়ি বছর হবে প্রায়। ছেলেটার গঠন ভালই, বড় কোমল। ওকে দেখা মাত্রই আমার মনে হল ওর চরিত্রে দৃঢ়তার বালাই নেই। তাই ওকে দেখে আমার খুবই অস্বস্তি লাগত। ছেলেটি খুবই পড়ুয়া। সাম্যবাদীদের সব বই ও খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে। পড়ার জন্য সে খুব গর্বও বোধ করে। সেই সব কেতাব তার কণ্ঠস্থ। যে কোন বিষয়ের আলাপ-আলোচনাকে সে দ্বন্দ্বমূলক বস্তু-বাদের দোহাই পেড়ে থামিয়ে দিতে পারে। মানুষ মানুষকে নানান কারণে ভালবাসতে পারে কিম্বা ঘৃণা করতে পারে। কারণগুলি বড় বিচিত্র, বড়ই বিভিন্ন। তাকে গণনা করা অসাধ্য। কিন্তু মুন সেই বহু বিচিত্র জটিল কারণের ধারে-কাছে ঘেঁসত না। তার কাছে মানুষের ইতিহাস বড় সোজা, খুব সরল। তার কাছে মানুষের ইতিহাস হল অর্থনৈতিক সংগ্রাম। সে খুব জোর গলায় বলত যে আমাদের বিপ্লব সফল হবেই, হতে বাধ্য। আমি উত্তরে বলতাম যে, ভদ্রলোকেরা একমাত্র ব্যর্থতার প্রতিই আকৃষ্ট।...রাত হল। আমরা কখন হলঘরে কখন সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তর্ক করেছি। তর্ক করতে করতে কখন আমরা আকাবাঁকা পথের দিকে পা বাড়িয়েছি। মুনের মতামত আমাকে বড় একটা বিচলিত করতে পারত না। কিন্তু আমি বিব্রত বোধ করতাম মুনের অনমনীয় কণ্ঠস্বরে। আমাদের এই নোতুন কমরেড মুন বড় একটা তর্ক করত না। সে শুধু অবজ্ঞার সঙ্গে এবং কিছুটা রাগতভাবে গোটা কতক আইন আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিত।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা রাস্তার শেষ ঘরটার কাছাকাছি এসেছি। এমন সময় গুলীর আওয়াজ কানে এল। আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। সামনে কারখানার ব্যারাক। দেওয়ালগুলো মোটা মোটা। ব্যারাকের জানলা ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি সেই ব্যারাকের গা ঘেঁসে এগিয়ে গেলাম। খোয়া-ওঠা রাস্তা। যেতে না যেতেই দেখি একজন সৈনিক। রাগে গণ গণ্ করছে সে। তার মাথার টুপিটাও যেন জ্বলছে। আমাদের দেখামাত্র সৈনিকটি চিৎকার করে আমাদের থামতে বলল। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কমরেডটি অনড়। জন ভিনসেণ্ট মুন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। আমি তাই আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সৈনিকটিকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে মুনের কাধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিলাম। আমার রাগ হয়ে গেল প্রচণ্ড। আমার পিছু পিছু আসার জন্য আমি হুকুম দিলাম। কিন্তু হাঁটতে অবধি পারছে না। ভয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে আছে। আমি তাই বাধ্য হয়েই তাকে আমার হাত ধরে আসতে বললাম। চারপাশে তখন গুলী-বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তার ভিতর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। কানের পাশ দিয়ে গুলীর শব্দ ছুটে যাচ্ছে। একটা গুলী এসে বিঁধল মুনের ডান কাঁধে। তবু আমরা পাইন বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে থাকলাম। মুন মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

১৯২২ সালের সেই শীতের রাত্রে আমি জেনারেল বার্কলের বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমি জীবনে এই জেনারেলকে দেখিনি। শুনেছিলাম জেনারেল বাড়ি নেই। কোন সরকারী কাজে গেছে বাংলাদেশে। সেখানেই আছে সে। বাগানবাড়ি খুব সাবেকি নয়। প্রায় শ'খানিক বছর আগে এই বাগানবাড়ি তৈরী হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়িটি পড়ো-পড়ো হয়ে গেছে। খুব অন্ধকার। চারিদিকে নানা গলির মত বারান্দা। ধাঁধা লাগে। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট হলঘর। এত হলঘরের যে কি প্রয়োজন থাকতে পারে, জানি না।

সমস্ত নিচের তলাটা জুড়ে ছিল মিউজিয়ম আর বিরাট লাইব্রেরী। বেশির ভাগ উনিশ শতকের ইতিহাসের বই। খুবই তর্ক-সঙ্কুল সেই সব গ্রন্থ। মতামতের সঙ্গে সায় দেওয়া মুর্সাকিল। দেওয়ালে টানানো ছিল নিশাপুরের খড়্গ। সেই খড়্গের অসমাপ্ত বৃত্তে তখনও যেন ঝড় আর যুদ্ধের উন্মত্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। বেশ মনে আছে আমরা পিছনের দরজা দিয়ে জেনারেলের বাগানবাড়িতে ঢুকেছিলাম। দেখলাম মুনের ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে মুন বললে যে আজ রাত্রের ঘটনা বড়ই উপভোগ্য। আমি নিজে মুনের প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম। তাকে দিলাম এক কাপ গরম চা। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখলাম মুনের আঘাত অতি সামান্য। কিন্তু হঠাৎ মুন পাগলের মত বলে উঠলো ঃ "কিন্তু আপনি অসম্ভব ঝুঁকি নিয়েছেন।" পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে পারছিল না মুন। কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

আমি ওকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করলাম। (গৃহযুদ্ধের সময় এমন ঘটনা

রোজ রোজই ঘটে। নিয়মমাফিক আমাদের এই সব কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমি ঠিক তাই-ই করলাম। তা ছাড়া একজন পার্টি সভ্য যদি জেলে যায় তবে আমাদের বিপ্লবও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।)

পরের দিন মুন প্রকৃতিস্থ হল। আমি একটা সিগারেট ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ও আমার কাছ থেকে সিগারেটটা নিল এবং আমাদের বৈপ্লবিক পার্টির আর্থিক সংগতি সম্পর্কে আমাকে বিশ্রী ভাবে জেরা করতে থাকল মুন। তার প্রশ্নগুলি অতি স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল। আমি মুনকে বলেছিলাম যে, আমাদের অবস্থা বিশেষ সংকটজনক। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলিনি। আমাদের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ তখন। ওই কটি গুলীর শব্দে সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশ বিচলিত হয়ে উঠল। আমি মুনকে বলেছিলাম যে আমাদের কোম্পানী আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ওভারকোট ও রিভলবার আনতে আমি আমার ঘরে গেলাম। ফিরে এসে দেখি মুন সোফায় পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মুনের ধারণা যে তার জ্বর হয়েছে। কাঁধের কাছে সে খুব যন্ত্রণা বোধ করছে।

তখন আমার মনে হল মুনের এই কাপুরুষতা কোনদিন ঘুচবে না। আমার নিজেরই খুব জড়তা বোধ হল। তবু আমি মুনকে সাবধানে থাকার জন্য অনুরোধ করে চলে এলাম। আমি এই ভয়বিহ্বল লোকটির জন্য লজ্জিত হয়েছিলাম। যে লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল জন ভিনসেণ্ট মুনের, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজে সেই লজ্জা পেলাম। যেন আমি নিজেই কাপুরুষ হয়ে গেছি, ও নয়। একটা মানুষের কাজের দায়ভাগ গ্রহণ করতে হয় সমস্ত মানুষকে। তাই কোথাও কোন অবাধ্যতা দেখা দিলে তা সংক্রমিত করবে সমগ্র মানবজাতিকে। তাই একজন ইহুদীকে ক্রুশবিদ্ধ করে মানুষজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব। সম্ভবত সোপেনহাওয়ারের কথাই ঠিক ঃ আমি আর আমি নই। আমি অন্যলোক হয়ে গেছি। প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর আছে মানুষজাতি। মনে হল ওই হতভাগ্য জন ভিনসেণ্ট মুনের সঙ্গে সেক্সপীয়রের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জেনারেলের সেই বিরাট বাগান-বাড়িতে আমরা ন' দিন কাটালাম। যুদ্ধের যন্ত্রণা ও গৌরবের কথা আমি কিছুই বলব না। আমি শুধুমাত্র কাটা দাগের গল্পটাই আপনাকে শোনাব। আমরা ন' দিন বাগানবাড়িতে ছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় এই ন' দিন যেন একটাই দিন। মাঝখানে কোন ছেদ নেই; বিরতি নেই। দশ দিনের দিন যেন বিরতি এসেছিল। দশ দিনের দিন যেন আরম্ভ হল দ্বিতীয় দিন। এই দিন এল আমাদের ইংরেজ সৈন্য। তারা এই বাড়ি দখল করে নিল। এলফিন শহরে আমাদের যোলোজনকে মেশিনগানের গুলীতে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা সেই হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তখন। খুব ভোরে আবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি বাগান-বাড়ির বাইরে আসতাম আর ফিরতাম রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি। ওপরের তলায় আমার সঙ্গী জন ভিনসেণ্ট মুন আমার জন্য অপেক্ষা করত। ও নিচে নামতই না। কারণ ও আহত। আমি চোখ বোজালেই ওর ছবি দেখতে পাই। দেখি ও যেন মড অথবা ক্লজউইজ-এর যুদ্ধের সম্পর্কিত একটা বই হাতে নিয়ে বসে আছে। এক রাতে ও আমাকে বললে, "গোলা-বন্দুক আমার খুব ভাল লাগে।" জন আমাদের পরিকল্পনা জানতে চাইত। আমি বলতাম। সে সব শুনে আমাদের পরিকল্পনার সমালোচনা করত, পরিবর্তন করতে বলত। সে অতি তীব্র ভাবে সমালোচনা করত আমাদের "করুণ আর্থিক সংগতির" জন্য আর বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠে ভবিষ্যতবাণী করে বলত যে আমাদের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এল বলে। দৈহিক শক্তিতে সে অক্ষম, সে কাপুরুষ। কিন্তু কাপুরুষ হবার জন্যও সে বিচলিত নয়। তার মানসিকতার প্রাচুর্য যেন সেই দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে। সে এই ভান করত সর্বদা। এই ভাবে দশ দিন কাটল।

দশ দিনের দিন শহরটা অধিকার করে নিল ইংরেজ সৈন্যরা। আমরা বলতাম তাদের ব্ল্যাক অ্যান্ড টেন। ঘোড়া-সওয়ার সৈন্যরা নির্বাক ভাবে শহরের অলিতে গলিতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ধোঁয়া আর ছাই উড়ছে। রাস্তার কোণে মানুষের একটা লাশ টানানো রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমি মোটেই বিচলিত হয়নি। মনে হল সৈন্যরা বন্দুক ছোঁড়া অনুশীলন করার সময় যে নিশানা টাঙিয়ে রাখে ওই লাশটি যেন তাই-ই...আমি ভোর বেলা বাড়ি ছেড়েছি। সে দিন ফিরলাম দুপুর বেলা। লাইব্রেরী ঘরে মুনের গলার আওয়াজ কানে এল। মুন কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ওর গলার স্বর থেকে মনে হল ও টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। আমার কানে এল ও আমার নাম বলছ তাকে। তারপর বলছে যে আমি আসব সন্ধ্যা সাতটার পরে। আমি যখন বাগান পার হতে যাবো তখুনি যেন আমাকে বন্দী করা হয়। মুন টেলিফোনে নির্দেশ দিচ্ছে। বুঝলাম আমার যুক্তিবাদী বন্ধু যুক্তিসংগত ভাবে আমাকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে। তারপর আমি শুনলাম মুন নিজের নিরাপত্তার জন্য গ্যারাণ্টি চাইছে।

এবার আমার গল্পটা একটু জড়িয়ে যাবে, খেই হারিয়ে যেতে পারে। আমার মনে আছে আমি সেই অন্ধকারে বিভীষিকাময় বারান্দা আর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে গুপ্তচরকে অনুসরণ করেছিলাম। ঘরের অন্ধি-সন্ধি আমার চেয়েও ভাল করে জানত মুন। সৈন্যরা এসে আমাকে বন্দী করার আগেই গুপ্তচরকে ধরতে হবে। গুপ্তচরটি কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল দু' একবার। শেষকালে জেনারেলের মিউজিয়ম থেকে একটা ছুরি তুলে নিলাম। ছুরিটা আধখানা চাঁদের মত। আমি সেই আধখানা চাঁদের মত ছুরি দিয়ে ওর মুখে রক্তের আধ-খানা চাঁদ এঁকে দিলাম। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু তবু আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বললাম।

এইবার ইংরেজটি থামল। দেখলাম ওর হাত কাঁপছে।

আমি বললাম, "আর মুনের কি হল?"

"সে জুডাসের মত বিশ্বাসঘাতকার পথে অর্থ নিয়ে ব্রেজিলে পালিয়ে গেল। বিকেল বেলা দেখল পার্কের মাঝখানে মাতাল সৈন্যরা গুলীবিদ্ধ করছে একটা নিশানা।

ভেবেছিলাম গল্পটা আরও চলবে। তাই আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ইংরেজটিও নির্বাক। তাই আমি তাকে গল্পটি শেষ করতে বললাম।

ওর মুখ থেকে একটা গোঙানির শব্দ বার হয়ে এল। তারপর খুব শান্ত মধুরভাবে সাদাটে মত স্থানটি দেখাল। একটু জড়িত কণ্ঠে বললে, "আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? দেখতে পাচ্ছেন না আমার মুখের ওপর আঁকা আছে সেই লজ্জা আর কলঙ্কের চিহ্ন। গল্পটা একটু ঘুরিয়ে বলতে হল। তা ভিন্ন আপনি হয়ত শুনতেন না গল্পটা।

যে লোকটা আমাকে আশ্রয় দিয়ে-ছিল, আমি সেই লোকটারই সর্বনাশ করেছি। আমার নাম জন ভিনসেণ্ট মুন। এইবার আমাকে ঘৃণা করুন।"

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কিংবদন্তীর মাছ
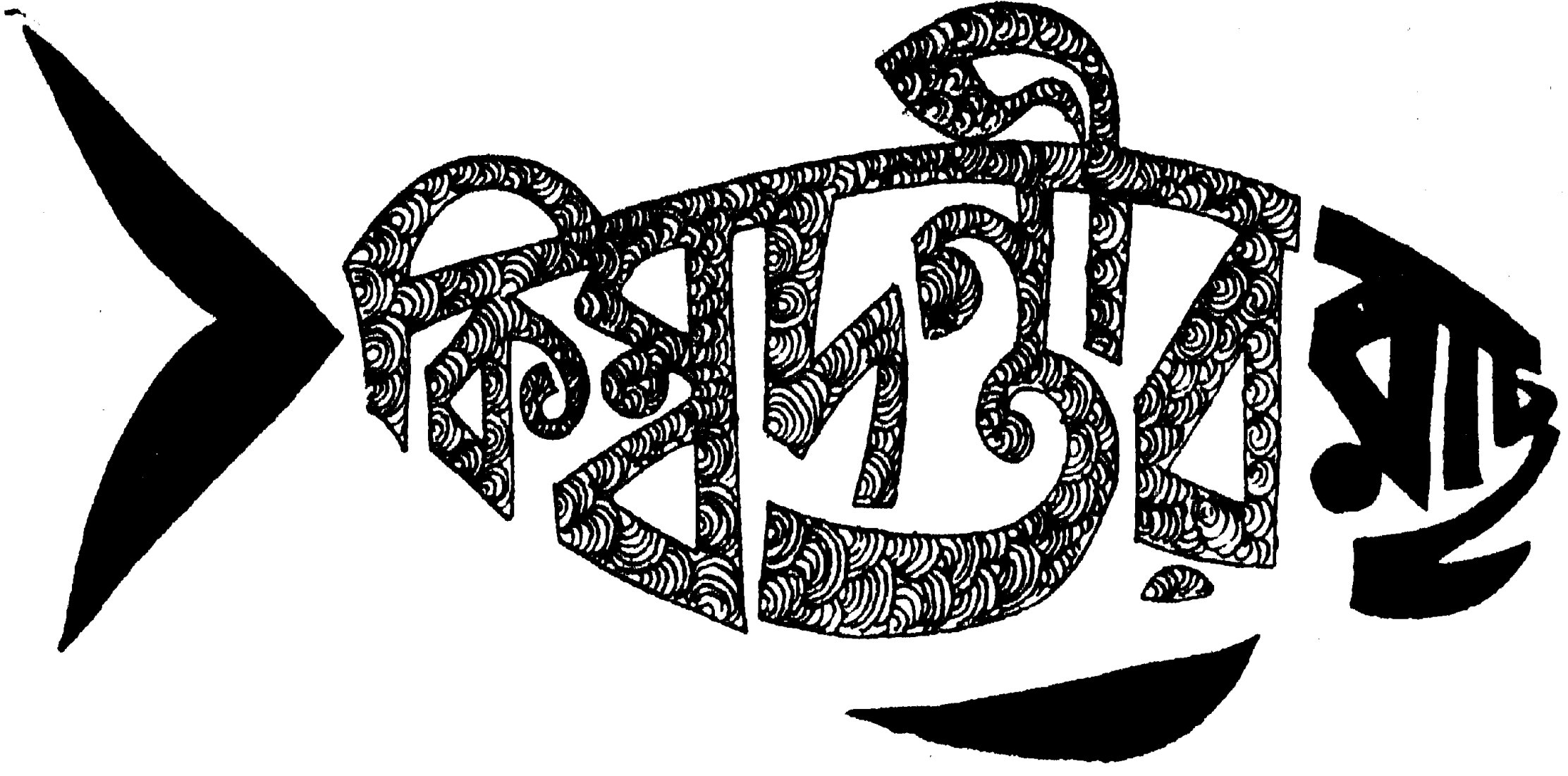
হরপ্পা ও মহেঞ্জদড়োর মৃৎপাত্রের গায়ে নানা ধরনের মাছ আর মাছ-ধরা জালের নক্সা কাটা দেখে পণ্ডিতদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে মাছের সৌন্দর্য সম্বন্ধেও মানুষ অবহিত ছিল। মানব-সভ্যতার শৈশব কাল থেকেই মৎস্যকুলের সঙ্গে মানুষের কেবল খাদ্য-খাদক সম্বন্ধই যে ছিল না—এমন প্রমাণ অজস্র। যুগ যুগ ধরে মাছের পাখার বিচিত্র বর্ণালী, স্বচ্ছ জলে তার লীলাময় স্বচ্ছন্দ গতির সঞ্চার শিল্পীর মনেও বহু প্রেরণা জুগিয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীও অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়ে সেই সফরকারী উপমা টেনেছেন, গণ্ডূষমাত্র জলেই যে ফরফর্ শব্দে বিচরণ করে। সদা-চঞ্চল সফরীর সঙ্গে লাস্যময়ী তরুণীর চপল চাহনির তুলনা করেছেন কবি। গৃহস্থ-বধূও সামাজিক শুভ ক্রিয়াকর্মাদিতে মৎস্যের মঙ্গল-চিহ্ন ব্যবহার করে এসেছে। মহেঞ্জদড়ো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত সূত্রাদি থেকে তখনকার কালের সামাজিক মানুষের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মৎস্য-কুলের যেগাযোগ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত মনোজ্ঞ তথ্য জানা যায়।

ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যে এ-সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে।

সপ্ত ঋষির (সেভেন প্যাট্রিয়াক) রাজত্বকালে মনু যখন মনুষ্যসমাজের আইন-প্রণয়নের কর্তা, তখন হয়গ্রীব নামে এক রাক্ষস কদাচারে বেদ-কে অপবিত্র করে। ব্রহ্মা তখন এক বিরাট প্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস করার আয়োজন করলেন—কেননা, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়েছিল। মহাপ্লাবনের প্রলয়ে কেউ জীবিত রইলো না। শুধু সাতজন ঋষি এবং মনু নেহাৎ পুণ্যবলে বেঁচে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে বিষ্ণু এমন সময় মৎস্য অবতারের রূপ ধরেছিলেন। বিষ্ণু ক্ষুদ্র সফরীর বেশে সপ্তর্ষিকুলের সত্যব্রতের কাছে প্রাণরক্ষার আবেদন জানালেন। সত্যব্রত মুনি সফরীকে এক জলাধারে রাখলেন। কিন্তু তখনই হলো আসল মুস্কিল। ক্ষুদ্র সফরী ক্রমে ক্রমে নিজ দেহের আয়তন বৃদ্ধি করতে লাগলো। ঋষিও তার শরীরের আকার অনুযায়ী ক্রমশঃ বৃহত্তর জলাধারে তাকে রেখে তার অসুবিধা দূর করতে লাগলেন। সর্বশেষে সেই মাছ এতই বৃহদাকার ধারণ করলো যে, তাকে সমুদ্রে স্থাপন করতে হলো। সমুদ্রে পড়েই সেই মাছ এক অতিকায় সোনালি মাছে রূপান্তরিত

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর মৃৎপাত্রের গায়ে নানা ধরণের মাছ আর মাছ-ধরা জালের নক্সা

হলো। তার শুঁড়ই হলো হাজার যোজন মাইল লম্বা। ঋষির কাছে মৎস্যরূপী ভগবান আসন্ন প্রলয়ের খবর দিলেন যা সাতদিনের মধ্যেই সংঘটিত হবে। ভগবান সেই ঋষিকে প্রত্যেক গাছের বীজ, প্রত্যেক ধরনের প্রাণীযুগল নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বাস করতে আদেশ দিলেন। একটি নৌকা ঋষিদের কাছে পাঠানো হলো। সেই বীজ ও প্রাণীদের নিয়ে ঋষিকুল নৌকার ভিতরে আশ্রয় নিলেন। মনু একটি বিশাল সাপ দিয়ে সেই অতিকায় সোনালি মাছের শিং নৌকার গলুইয়ের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে পুণ্যবান ঋষিকুল, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ মহাপ্রলয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল। এই কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত নোয়া-উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দেও মৎস্য অবতারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। অগ্নি ও মৎস্যপুরাণ এবং মহাভারতেও অনুরূপ কাহিনী পড়া যায়।

মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, নবনির্মিত দীঘি বা পুষ্করিণী খনন করিয়ে সেখানে মাছ বা কচ্ছপ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এতে জল নির্মল ও পবিত্র থাকে।

শঙ্কর সংহিতা থেকে জানা যায় যে, বেদব্যাসের ভ্রাতা পরাশরের অপ্রকৃতিস্থ ছয় পুত্র একটি পুষ্করিণীতে দড়ি দিয়ে মাছেদের বেঁধে, ও তাদের উপরে আরো নানা উৎপাত করে কৌতুক উপভোগ করতেন। ঋষি পরাশর এই দেখে একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শাপ দিলেন। এই শাপে তারা মাছের আকার প্রাপ্ত হয়ে দিনযাপন করতে লাগলো। পার্বতী তাদের এই শাপমোচন করেন। যখন একদিন কুমারকে বুকে করে তিনি স্তন্যপান করাচ্ছিলেন, তখন কয়েক ফোঁটা স্তন্যদুগ্ধ ঐ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ঋষিপুত্রেরা পুষ্করিণীর সেই দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করে মানুষের মূর্তি ফিরে পায়। এই গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, জলাশয় থেকে মৎস্যকুল নির্মূল করলে জল নোংরা ও অব্যবহার্য হয়ে উঠবে।

মাছেদের ঘর-কন্নাও খুব আকর্ষণীয়। বিষ্ণু পুরাণে ঋষি সৌভরীকে নিয়ে এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে যা খুবই কৌতুকপ্রদ। সৌভরী দ্বাদশবর্ষকাল জলের তলায় তপস্যা করেন। তপস্যাকালে মৎস্যরাজ সম্মতের অসংখ্য সন্তান-সন্ততি তাঁর ধারে কাছে খেলা করে বেড়াত। সেই দেখে ক্রমে ক্রমে ঋষির মনে মোহ জন্মালো। তিনি রাজা মান্ধাতার সমীপে গিয়ে গৃহস্থ হবার বাসনা জানালেন। মান্ধাতার কন্যারা তাঁকে বিয়ে করে ঘর-কন্না করতে সম্মত হলো। অনতিকাল পরেই পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্র-বধূ ও নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে মুনি ভাবলেন—"এ কী হলো? জলের তলায় অবস্থান কালে মাছেদের দেখেই আমার মনে মোহ উপস্থিত হয়েছিল, সেই পরিণামে আমার তপস্যায় বিঘ্ন হয়েছে। এখন আমি সম্পূর্ণ মায়াপাশে আবদ্ধ হয়েছি।"

গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর।' পুরাণে কর্ণে মকর-কুণ্ডল ভূষিত বিষ্ণু-মূর্তির বর্ণনা আছে। বিষ্ণু যখন মৎস্য অবতারের রূপ ধারণ করেছিলেন তখন সেই বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে তাঁর উত্তমাঙ্গের মূর্তি অর্ধ-মনুষ্য সদৃশ; অধমাঙ্গের আকৃতি মৎস্যের ন্যায়। শিল্প-

সাহিত্যে মৎস্যকন্যাদের আকৃতির বর্ণনাও অনুরূপ।

মীনের মত চক্ষু সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। তাই পার্বতীর চক্ষুর সৌন্দর্যের জন্য তাঁর আরেকটা নাম মীনাক্ষী। মাদুরা পাণ্ড্যরাজাদের স্মারক-চিহ্ন ও মুদ্রাদিতে মাছের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। দেবী মীনাক্ষী ছিলেন তাঁদের আরাধ্যা দেবী। বিজয়নগর রাজ্যের মুদ্রাতেও মৎস্য এবং বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পুডোকোট্টার গুহাভ্যন্তরে মন্দিরের গাত্রের ফ্রেস্কো পেন্টিং-এ মাছের অনেক চিত্র আছে।

নৈষধের গ্রন্থে মাছের মত বিচিত্র জীবদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জলের মধ্যে সঞ্চরমান এই বিচিত্র জীবেরা পরস্পরকে ভক্ষণ করে জীবন যাপন করে। ছোট মাছকে বড় মাছ খেয়ে ফেলে। বড় মাছকে তিমিমাছ গিলে খায়। তিমিকে আবার তিমিঙ্গিল ভক্ষণ করে। তিমিঙ্গিলকেও গিলে খায় আবার এক বিশাল হাঙর, কৌতুক করে তাকে বলা যেতে পারে তিমিঙ্গিল-গিল। মাৎস্যন্যায় শব্দটিও মাছেদের বিচিত্র জীবযাত্রা থেকেই উদ্ভূত। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যাবে একটি ছোট মাছ মনুর কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। স্বগোত্রীয় বৃহতের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সে বলছে—"হে প্রভু! তোমার মত পুণ্যবান ব্যতীত আমার মত ক্ষুদ্রের স্বার্থরক্ষা কে-ই বা করবে। জগতে বৃহৎ ক্ষুদ্রের উপর সদাই অত্যাচার করে। মৎস্যকুলের বৃহতেরা ক্ষুদ্রকে আত্মসাৎ করে জগতের এই নিয়ম পালন করে চলে। তোমার মত মহৎ ও পুণ্যবানেরই আমার মতো দুর্বল ও ক্ষুদ্রের জীবন রক্ষা করার যোগ্যতা আছে।"

তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, দেবতাদের যজ্ঞের সময় একবার যজ্ঞের সমিধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করার ভার পড়েছিল অগ্নিদেবের উপরে। তিনি ও তাঁর দুই ভাই মিলে এই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অগ্নিদেবের দুই ভ্রাতা এই ভার বহন করে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। অগ্নিদেব প্রাণের ভয়ে দেখলেন, এই ক্ষীণ শরীরে একা কাজ করতে গেলে মৃত্যু অবধারিত। জলের তলায় অগ্নিদেব আত্মগোপন করলেন। তখন একটি মাছ অগ্নির অনুসন্ধানরত দেবতাদের কাছে লুকিয়ে থাকার গোপন খবরটি ফাঁস করে দিলো। অগ্নিদেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাদের শাপ দিলেন, "হে মৎস্যকুল! তোমরা যেমন দেবতাদের কাছে আমায় ধরিয়ে দিয়েছ তার ফলস্বরূপ আমি শাপ দিচ্ছি যে, ধীবরেরা জাল ফেলে তোমাদের জল থেকে ডাঙায় তুলে নিধন করবে এবং রসনার প্রয়োজনে যখন তখন তোমাদের সকলে শিকার করবে।"

হিরণ্য নামে এক অসুর স্কন্দের সেনাপতি বীরবাহুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মাছের রূপ ধারণ করে জলের তলায় লুকিয়েছিল—পুরাণে এ গল্প প্রচলিত আছে। তিমিধ্বজ নামে খ্যাত মৎস্যরূপী আর এক অসুরকে রাজা দশরথের সাহায্যে ইন্দ্র পরাস্ত করেন। গণেশপুরাণ থেকে জানা যায় যে, বিশাল হাঙররূপী মৎস্যাসুরকে গজানন পরাজিত করে তাকে বিশেষ নিগ্রহ করেন।

পুরাণে মৎস্যদেশের উল্লেখ আছে। আসলে বিরাট রাজ্যকেই মৎস্যদেশ হিসেবে অভিহিত করা হত। পাণ্ডবেরা যমুনার তীরবর্তী রোহিতক ও সুরসেনদের রাজ্য পার হয়ে এই বিরাট দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বিরাট রাজ্যের রাজধানী বৈরাট, জয়পুর রাজ্যের উত্তরে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পাঞ্চাল রাজ্যে পাঞ্চাল-দুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে মৎস্য-যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল তীরন্দাজদের শর-সন্ধানের নৈপুণ্য পরীক্ষা করার জন্যে। এই কাহিনী অনেকেরই জানা যে নীচে অবস্থিত তৈল-পাত্রে মাছের ছায়া দেখে

লুকিয়ে থাকার গোপন কথাটি ফাঁস করে দিল

একটি খাড়াই স্তম্ভের উপরে বেঁধে-রাখা মাছের চোখ বিঁধে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন।

পৌরাণিক সাহিত্যে সৎ ব্যক্তির সঙ্গেও মাছের তুলনা করা হয়েছে—যে অপরের কোনো অনিষ্ট কখনো চিন্তা করে না।

বৃহদারণ্য উপনিষদে এক স্থলে জীবাত্মার সঙ্গে মাছের উপমা করে বলা হয়েছে যে, 'বৃহৎ মাছ যেমন নদীর দুই তীরেই পরিক্রমা করে বেড়ায় তেমনি জীবও ঘুম ও জাগরণ এই দুই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে।

কাজেই দেখা যায় যে, আদিকাল থেকে মাছ শুধু মানুষের রসনার তৃপ্তি সাধন করেই আসেনি—তার চিন্তা-জগতেও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য-শিল্প ও দর্শনও মৎস্যকুলের কাছে অনেক ঋণী। আজকের দিনেও প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও মঙ্গল-কর্মাদির প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎস অনুসন্ধান করে জানা যেতে পারে মৎস্যকুলের কাছে মানুষের এই ঋণ কেবলমাত্র কিম্বদন্তী নয়।

॥ নতুন গতিসম্পন্ন জেট বিমান ॥

খ্যাতনামা সোভিয়েত যাত্রীবাহী-বিমান ডিজাইনার ভ্লাদিমির মিয়াসিশ-চেফের তথ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৯৭০ সালের পূর্বেই সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা এমন দ্রুতগামী যাত্রীবাহী জেট বিমান নির্মাণ করতে সমর্থ হবেন যা দু-হাজার কিলোমিটার বেগে অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুতবেগে যাবে। আরো জানা গেছে ১৯৮০ সাল নাগাদ ঘণ্টায় তিন হাজার কিলোমিটার বেগে গামী ও অন্তত ২৫০জন যাত্রীবাহী বিমান নির্মিত হবে। এসব বিমানে দৈনিক ১,০০,০০০ যাত্রী বহন করা সম্ভব হবে।

মিয়াসিশচেফ ও তাঁর সহকর্মীরা এমন একটি যাত্রীবাহী বিমান-ডিজাইন করার কাজে রত আছেন যা খাড়াভাবে মাটি থেকে আকাশে উড়তে পারবে, শব্দতরঙ্গের চেয়ে দ্রুতগতি অর্জন করবার কালে 'শক' প্রতিরোধ করতে পুরোপুরিভাবে সমর্থ হবে এবং ৩০ কিলোমিটারেরও বেশি উচ্চতা দিয়ে উড়ে যেতে সমর্থ হবে। এই নতুন ধরণের বিমান ১০০ জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম হবে।

॥ মরুভূমির বুকে ফলের উদ্যান ॥

মরুভূমি ও চিরন্তন অনাবৃষ্টির দরুণ লতা-গুল্মহীন ধূ-ধূ প্রান্তরে শস্য-শ্যামলিমায় ভরিয়ে তোলা মানুষের চিরকালের স্বপ্ন। সেকালে মানুষের জন্য খাল কেটে কুয়া খুঁড়ে সেচের ব্যবস্থা করে মরুভূমিতে শস্য ফলিয়েছে। আজ সেই কাজে এগিয়ে এসেছে ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও প্রকৃত-বিজ্ঞানী। নতুন কারিগরি জ্ঞান, নতুন কৃত্রিম পদার্থের সাহায্যে তারা বৃষ্টির জল সংগ্রহ করেছে। মাটির নীচে জল মজুত করেছে। প্রাকৃতিক মরূদ্যান তৈরী প্রাকৃতিক আশ্চর্য কিন্তু মানুষের তৈরী মরূদ্যান আজ বহু মরুভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

আধুনিক জমি পুনরুদ্ধারকারী-দের মধ্যে হাইড বার্ডম্যান নামে একজন জার্মাণ রাসায়নিককে পথিকৃত বলা যায়। এক অভিনব পন্থায় তিনি জলহীন মরুভূমির জমিকে উর্বরা করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিম জার্মাণীর ছোট একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার বার্ডম্যান এমন একটি কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত করেছেন যেটি শুষ্ক বালুময় জমিতে দুঃসহ তাপের মধ্যেও কয়েক সপ্তাহ জল ধারণ করে রাখতে সক্ষম। আর এই কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থের উপর, স্বাভাবিক মাটির মতই লতা-গুল্মে, এমনকি গাছপালা পর্যন্ত চমৎকার জন্মায় ও বাড়তে থাকে।

সংবাদ বার্তা
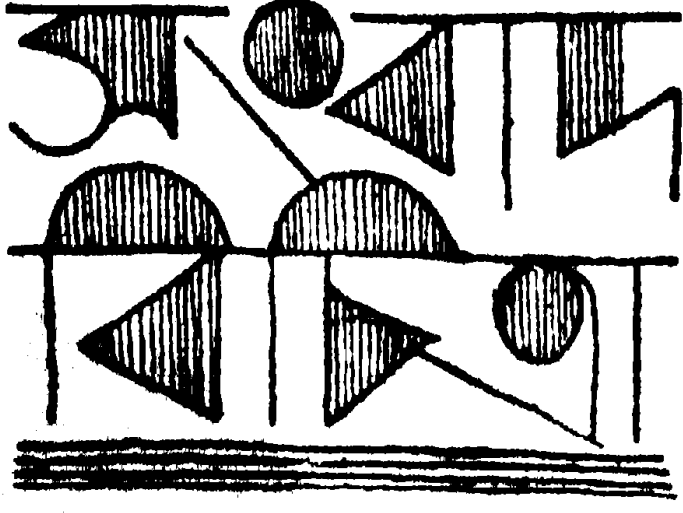
বার্ডম্যান ১৯৫৩ সাল থেকে দীর্ঘ কাল ধৈর্যের সঙ্গে নানারকম প্লাস্টিকের ফেনার ওপর দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লতা-পাতা লাগিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। চার বছর অবিরাম পরীক্ষার পর তিনি সেই বিশেষ কৃত্রিম ফেনাটি পেলেন যার ওপর স্বাভাবিক জমির মত সবরকম লতা-পাতা বাঁচে। অগ্নিনির্বাপক পাইপের মত জিনিস দিয়ে এই তরল ফেনা জমির ওপর ছিটিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে জিনিসটি কঠিন সচ্ছিদ্র শোষণক্ষম ফেনার গদিতে পরিণত হয় এবং তলার মাটি তার থেকে জলীয় ভাগ টেনে নিতে পারে না।

কয়েকজন জার্মাণ বিশেষজ্ঞ সৌদি আরবের এর-রিজাদ নামক স্থানে তপ্ত মরুভূমির বুকে এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ঐ ফেনা ছিটিয়ে দেবার কয়েক মিনিট বাদে প্রতি দশ বর্গ ফুট স্থানে ১½ গ্যালন মাপে জল ঢেলে চলে যায়। তিন সপ্তাহ পরে এসে তারা দেখে যে তখনও প্রতি দশ বর্গফুটে আধ গ্যালন মাপক জল রয়েছে। মরুভূমিতে যেখানে ১১৫ ডিগ্রি তাপ ওঠে যেখানে সূর্যের তেজে জল সংগে সংগে বাষ্প হয়ে যায় কিংবা জমি শুষে নেয়, সেখানে এই ঘটনা নিতান্তই আশ্চর্য।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মরুভূমির বুকে আজ ২০০০টি কমলা লেবু ও লেবু গাছ লাগান হয়েছে। পাঁচটি ছাড়া আর সব গাছ বেঁচে আছে ও বড় হচ্ছে। তাই আশা করা যায় পত্র-পুষ্প তৃণের শস্য-শ্যামলিমায় মরুভূমির রূপান্তর ঘটাবার মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন এবার সত্যই বোধহয় বাস্তব রূপে পরিগ্রহ করবে।

॥ বিড়ালের আঁকা ছবি ॥

মানুষে ছবি আঁকে। উপযুক্ত শিক্ষা দিলে অন্য কয়েকটি প্রাণী মানুষের মত আচরণ করতে পারে সত্য, কিন্তু বিড়ালের পক্ষে ছবি আঁকার মত শক্ত কাজ করা সম্ভব তা এতদিনে জানা গেল। গত বছর লণ্ডনে তার অঙ্কিত একটি একক-প্রদর্শনী হয়ে গেছে। সেটি গুণীজনের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

বিড়ালটির নাম টিপসি। জীবনে সে মোট ২৫টি ছবি এঁকেছে। আঁকার পদ্ধতিটিও খুবই আশ্চর্য। টেবিলের ওপরে একটি পেন্সিল ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। আর টিপসি ঐ পেন্সিলটি ধরে ছবি আঁকতো। টিপসি গত ১২ই মার্চ মারা গেছে। তার এই বিয়োগান্ত পরিণতি খুবই দুঃখজনক। টিপসি তারই এক স্বজাতীয়কে তাড়া করে রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া কালে গাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়।

টিপসির আঁকা 'ঘোড়সওয়ারের' ছবি। ডানদিকে টিপসি আর বাঁ-দিকে ছবিটি রয়েছে।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'সে এক্সপেরিমেণ্ট তো তুমিই করছ.' নিরুপম মৃদু হেসে বলে, 'রেজাল্ট দেখে না হয় বিবেচনা করে উৎসাহিত হওয়া যাবে। কিন্তু নতুন পাগলামীর কথা কি বলছিলে?'

'একে তুমি নতুন আর এক পাগলামী বলছ কেন?'—

নিরুপম নয়, প্রশ্ন করলেন নিরুপমের মা। বললেন, 'এইটাই তো আশা করছিলাম আমরা। এই তো আশ্বাস দিচ্ছিলেন ডাক্তার।'

'তা' বটে!' নীতা আস্তে আস্তে বলে, 'তবু কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

সুচিন্তা সহজভাবে বলেন, 'হচ্ছে না, তার কারণ অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখছ তুমি।'

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যার সেই স্তব্ধতার পর থেকেই আশ্চর্য রকম সহজ হয়ে গেছেন সুচিন্তা। হয়তো রাত্রির অন্ধকারের নিভৃত প্রার্থনায় অর্জন করেছেন এই সহজ হবার শক্তি। হয়তো বার বার বলেছেন, সুশোভন সেরে উঠুক, স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, এই তো চেয়েছি এতদিন ধরে।

হয়তো ভেবেছেন, পৃথিবী অকৃতজ্ঞ, পৃথিবী নিষ্ঠুর, এমন কথা ভেবে বিচলিত হচ্ছি কেন আমি? তার নিষ্ঠুরতার মধ্যেই তো কল্যাণ হাতের স্পর্শ, তার অকৃতজ্ঞতাই তো মুক্তির বাহক।

তাই নীতা যখন এসে বলল, 'বাবাকে আপনি ঠেকান পিসিমা! আবার এই এক নতুন পাগলামী নিয়ে ভীষণ অস্থিরতা করছেন!'—তখন সুচিন্তা সহজভাবে বললেন, 'একে তুমি পাগলামী বলছ কেন? এই তো আশা করছিলাম আমরা।'

সত্যিই তো, এই তো আশা করবার কথা।

নীতা কি এই আশা নিয়েই তার বাবাকে নিয়ে একদিন অনুপম কুটিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়নি?—

তবু নীতা ভাবছে, 'কিন্তু এতটাই কি আশা করেছিলাম আমি?'

ভাবনায় বাধা পড়ল।

সুশোভন এসে সুচিন্তার দিকে তাকিয়েও না দেখে ব্যস্তভাবে বললেন, 'আজ না আমাদের ওবাড়ী যাবার কথা ছিল নীতু?

'হ্যাঁ, এই তো যাবো।' নীতা বলে, 'আচ্ছা পিসিমা, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।'

সুচিন্তার উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিয়ে ওঠেন সুশোভন। গম্ভীর অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'সুচিন্তা কেন ওখানে যাবে? সুচিন্তার যাবার কী দরকার? সুচিন্তা তো ওদের আত্মীয় নয়।'

লাল হয়ে ওঠে নীতা, অপ্রতিভ মুখে তাকিয়ে দেখে সুচিন্তার দিকে। কিন্তু না, সেখানে কোন বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে না। নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছেন সুচিন্তা। কিন্তু নীতা হঠাৎ ঝেঁজে ওঠে, চটে ওঠে। বলে ওঠে, 'আমরাও তো সুচিন্তা পিসিমার আত্মীয় নই বাবা! তবু—'

সুশোভন বাধা দেন, আরো গম্ভীর মুখে বলেন, 'আত্মীয় নয়, সে কথা তুমি আমায় শেখাবে? আমি জানি না? না জানলে চলে যেতে চাইছি কেন? পরের বাড়ী থাকতে নেই বলেই না।'

'আঃ বাবা, কী বলছ সব?'

'ঠিকই বলছি—।' সুশোভন উত্তেজিত মুখে আরো কী একটা বলতে যান, কিন্তু ওদের দু'জনকে অবাক করে দিয়ে সুচিন্তা সশব্দে হেসে উঠে বলেন, 'এই শুরু হল বাপ-বেটির ঝগড়া! নাও বাপু, কোথায় তোমাদের সেই পরমাত্মীয়রা আছেন, একলা একলাই দেখগে যাও। আমার আর গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু রাতের খাওয়াটা খেয়ে টেয়ে ফিরবে না তো? যেমন অসময়ে যাচ্ছো!'

নীতা স্বল্পবাক্ সুচিন্তার এই প্রগল্ভতা দেখে একটু অবাক হয় বৈ কি, তবু তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, সে কী! খেয়ে আসবো কি?'

ওর কথা শেষ না হতেই সুশোভন ভুরু কুঁচকে বলেন, 'তা' ওরা যদি খেতে বলে খেতেই হবে। ওদের কথা না শুনে সুচিন্তার কথা শুনলে ওরা নিন্দে করবে না?'

'তা' বটে, তোমার যে আবার আজকাল লোকনিন্দের জ্ঞান টনটনে হয়েছে। কিন্তু না বাপু না। খেয়ে-টেয়ে এসো না। কাল তোমরা চলে যাবে বলে আমি আজ ভাল ভাল রান্না করিয়েছি।' বলে হাসিমুখেই চলে যান সুচিন্তা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীতা সেই চলে যাওয়ার দিকে। তবে কি কাল সে

যা দেখেছিল তা' ভুল? কৃষ্ণার চিঠির সেই কথাই সত্যি? সুশোভনের দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন সুচিন্তা? তৃষিত হয়ে উঠেছেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়? তাই সাধারণ সৌজন্যে 'থাক না আর দুটো দিন, থাকো না আর ক'টা দিন,'—এটুকু বলবার ইচ্ছেও খুঁজে পাচ্ছেন না? আর মুক্তির আশায় হালকা হয়ে উঠেছেন। প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছেন?

নইলে নীতা তো সুযোগ দিচ্ছিল।

হিসেব মিলোতে কষ্ট হচ্ছে নীতার। ধারণা করেনি 'চলে যাওয়াটা'—এত সহজ হবে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! কোথাও কোন বেদনা বাজবে না? কোথাও কোন বাধা—'না না না' বলে আর্তনাদ করে উঠবে না? বাতাস লাগা বাসি ফুলের মত নিঃশব্দে গাছ থেকে ঝরে পড়বে নীতার অনেক ভাবনা আর কল্পনা দিয়ে গড়া একটী অনৈসর্গিক ফুল!

তা'হলে সুশোভনের সবটাই পাগলামী?

ঠকাতে চাইছেন সুচিন্তা। মানী শিশুরা যেমন মার খেয়ে মাকে ঠকাতে চায় 'লাগেনি, কিছু লাগেনি!' বলে।

'লেগেছে' স্বীকার করলেই তো ধূলিসাৎ হ'ল সমস্ত অহংকার।

না, ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি অহংকার।

উত্তীর্ণ হয়েছেন সুচিন্তা। অন্তত আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কেমন লেখা হবে শেষ পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রখানা! সে পড়া কি তৈরি আছে সুচিন্তার?

ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ স্থাণুর মত বসে রইলেন সুচিন্তা। বসে বসে বোধ হয় হিসেব কসতে লাগলেন আরও কতক্ষণ তাঁকে এমন বর্মাবৃত হয়ে থাকতে হবে। এখনই যে সমস্ত দেহমন উন্মুখ হয়ে চাইছে একটু শান্ত বিশ্রাম। চাইছে একখানি নিভৃত নির্জন কোণ, যেখানে নিজেকে শিথিল করে বিছিয়ে দেওয়া যায়। নামিয়ে রাখা যায় বর্ম-চর্ম। লাভ-লোকসান, দেওয়া-পাওয়া, ভাগ্য-ভগবান, সব কিছুর চিন্তাবিহীন, মৃত্যুর মত মধুর মনোহর সেই বিশ্রামটুকু ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই সুচিন্তার।

কিন্তু এখুনি নয়, এখনো অনেকগুলো ঘণ্টা বাকী। অনেকগুলো দিন আগে যে গাড়ীখানা অনুপম কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ীখানা আবার যখন অনুপম কুটিরের দরজা থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে অনুপম কুটিরের সামনের রাস্তা থেকে, ধূলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার চাকার দাগ, তখন সুচিন্তার ছুটি।

চাকার সেই দাগ কোথাও কোনখানে গভীর বিদারণ রেখা রেখে গেল কিনা, সে হিসেব কষা হাস্যকর। পৃথিবী যৌবনের, পৃথিবী নতুনের। জীর্ণ বার্ধক্য যদি সে পৃথিবীর জীবনের আসরের এক কোণে এসে দাঁড়াতে চায়, যদি বলে এ আনন্দ-যজ্ঞে যে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, একবাক্যে ছিছি করে উঠবে সবাই, হেসে উঠবে একযোগে। বলবে 'কী লোভী, কী খেলো! জান না পৃথিবীর একটা 'বিস্মৃতির ঘর' আছে? সেখানে আশ্রয় নাওগে তুমি, সেই তোমার জায়গা। আমরা তোমাকে ভুলে যেতে চাই, ভুলে থাকতে চাই। তুমি যদি সামনের লাইনে এসে দাঁড়াতে চাও, সেটা হবে পৃথিবীর ছন্দপতন।'

সুচিন্তা মন্ত্র-জপার মত করে বলতে লাগলেন, 'তাই হোক—তাই হোক।

'আজ না আমাদের ওবাড়ী যাবার কথা ছিল নীতু?'

নীতা তো বাবার অকৃতজ্ঞতায় লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'বাবাকে আপনি চেনেন না পিসিমা—! এ ও'র আর এক নতুন পাগলামী।'

কিন্তু সুচিন্তা সে সুযোগ হাতে তুলে নিলেন না। বরং উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সে কী। পাগলামী কেন? এই তো আমরা আশা করছিলাম।'

সুচিন্তার সবটাই করুণা?

তাই সুশোভন চলে যাবেন বলে ভাল ভাল রান্না করিয়ে সে কথা ঘোষণা করে বলতে পারছেন সুচিন্তা! সহজেই বলতে পারছেন! কিন্তু তাই কি? দীর্ঘকাল ধরে নীতা কেবল ভুল দেখে এল? না, না, তা' অসম্ভব। পৃথিবীর কাছে বড্ড বেশী ঠকে গেছেন বলেই হয়তো, পৃথিবীকে

আমার জন্যে থাক সেই বিস্মৃতির তমসা। পৃথিবী ভুলে যাক আমাকে। ছুটি হোক আমার। আমার এই জীবন-যজ্ঞের হোমানলে কী আহুতি দিলাম সে কথা ভেবে ছোট হ'ব না। ওই হোমানলের ভস্মটীকাটুকুই রইল আমার জমার খাতায়।'

গত কয়েকটা দিন যে সুশোভনের প্রতি ভয়ংকর একটা অভিমানে নির্বাক হয়ে থেকেছিলেন, তা মনে পড়ে লজ্জিত হলেন সুচিন্তা। আর একবার মন্ত্র জপলেন, 'ও সহজ হয়ে উঠুক, সুস্থ হয়ে উঠুক, নিজের কেন্দ্রে, নিজের আত্মীয়দের কাছে ফিরে যাক। শেষ পরীক্ষার সেই প্রশ্ন-পত্রটা যেন আমার কাছে কঠিন হয়ে না ওঠে, যেন নির্ভুল সমাধানে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারি আমি।'

কিন্তু কোনটা নির্ভুল? সুচিন্তা কি তা নিশ্চিত জানেন? এখনো যে কোথায় যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ভয়ানক একটা ভয়, সেখানে চোখ ফেলতে সাহস হচ্ছে না।

কিছুদিন থেকে সুশোভন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, একটু বা অপ্রসন্ন। কিন্তু আজ ওবাড়ী থেকে ফিরলেন একেবারে হৈ হৈ করতে করতে। মনে হল যেন সেই পুরনো খুশী ফিরে পেয়েছেন।

হাঁক পাড়লেন, 'সুচিন্তা, সুচিন্তা! সব ঠিক করে এলাম। একেবারে টিকিট কেনার ব্যবস্থা পর্যন্ত কমপ্লীট। নীতা ভেবেছিল আমাকে দিল্লী নিয়ে যাবে না, ভুলিয়ে ফেলে রেখে চলে যাবে। বুঝে ফেলেছিলাম আমি নীতার মতলব। তাই তো ওবাড়ীতে গেলাম। ওখানে আমার দাদা রয়েছে। সে সব করে দেবে।...... কী সুচিন্তা, তুমি এমন চুপ করে রইলে যে? আর সব কারা যাবে আমার সঙ্গে, সে কথা জিগ্যেস করলে না?'

সুচিন্তা হেসে উঠে বললেন, 'জিগ্যেস করবার অবকাশ দিচ্ছ কই? রেলগাড়ীর মত কথা চালিয়ে যাচ্ছ—'

'রেলগাড়ী, রেলগাড়ী!' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন সুশোভন, বললেন, "কত দিন যে রেলগাড়ী চড়িনি। সেই স্টেশন, সেই প্লাটফর্ম, সেই জানলা দিয়ে ধুলোর ঝড় আসা! আঃ, ভেবে এত ভাল লাগছে! ওদের সঙ্গে আমারও আহ্লাদে লাফাতে ইচ্ছে করছিল।'

সুচিন্তা অবাক হয়ে বলেন, 'ওদের সঙ্গে! কাদের সঙ্গে?'

'আরে তাইতো! তোমায় তো বলাই হয়নি এখনো। স্যান্ডো গুন্ডা যাচ্ছে যে আমার সঙ্গে। ওর বোনেরা যাবে না, ওদের ইস্কুল। ওদের মা যাবে। সেই যে লক্ষ্মী ছোট বৌমা!'

সুচিন্তা নীতার দিকে এক নজর একটু কৌতুকের দৃষ্টি ফেলে মুখ গম্ভীর করে বলেন, 'আর আমি যদি তোমায় যেতে না দিই?'

'যেতে দেবে না? তুমি আমায় যেতে দেবে না?'

'তাইতো ভাবছি। যাবার সময় আটকে ফেলব।'

সুশোভনের ভুরু কুঁচকে ওঠে, সহসাই আবার উচ্ছলতা ত্যাগ করে গম্ভীর হয়ে যান তিনি। ভারী গলায় বলেন, 'ছেলেমানুষী কোর না।' বলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যান।

আর বোধকরি এক মুহূর্ত পরেই ঘর থেকে সুচিন্তার খোলা গলার হাসি শুনতে পান, 'থাক বাবা, কাজ

নেই ক্ষ্যাপাকে ক্ষেপিয়ে। নীতা, খেতে দিই এখন? রাত তো অনেক হল।'

ভুরু কোঁচকালেন সুশোভন। সুচিন্তা এত হাসছে মানে? সুচিন্তা কবে এত হাসে?

তারপর, রাত যখন আরও অনেক হল, যখন অনুপম কুটিরের সমস্ত আলো নিভে গেল, তখন অনুপম কুটিরের বাতাস অন্ধকারে জেগে থাকা মানুষের নিশ্বাসে মর্মরিয়ে উঠল।

অনুপম কুটিরের বড় ছেলে অবাক হয়ে ভাবল, অসহনীয় অবস্থা তো অবসান হচ্ছে, তবে স্বস্তির নিশ্বাসে হালকা হয়ে উঠতে পারছি না কেন? ভাবল, ওই অসহনীয় অবস্থাটা বিদায় হবার সঙ্গে সঙ্গে আরও কি যেন বিদায় নিচ্ছে। কোথায় যেন একটা সেতু ভেঙে পড়ছে। সমস্তটা কেমন যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছে। আর হঠাৎ এক সময় অবাক হয়ে ভাবে, কিন্তু এত অসহনীয়ই বা ভেবেছিলাম কেন? হয়তো এমনিই হয়, সান্নিধ্যের ধূলি-মালিন্যে যে ক্ষমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্তে কোথা থেকে এসে দাঁড়ায় সেই ক্ষমা। তখন সমস্ত প্রাণ 'হায় হায়' করে ওঠে। বলে 'অতটা রূঢ় বুঝি না হলেও চলতো! আর একটু ভাল ব্যবহার করলেও হতো!'

অনেক অনেক মাইল দূরে অনুপম কুটিরের মেজছেলেও এই রাত্রে জেগে উঠে, তার সদ্যবিবাহিতা অবাঙালী বধূর নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ভাবছিল, 'এটা কী করলাম! এর কি সত্যিই দরকার ছিল? পৃথিবী যদি তার নিজের ছন্দে চলে, তাতে আমার অসহিষ্ণু হবার মানে কি? আমার ছন্দ এলোমেলো করে কী লাভ হ'ল আমার?'

অনুপম কুটিরের ছোট ছেলে জেগে ওঠেনি।

সে ঘুমোচ্ছে।

অনভ্যস্ত কর্মভারে ক্লান্ত দেহটাকে স্বল্প পরিসর শয্যায় বিছিয়ে ঘুমের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে সে। হয়তো এই কর্মের ক্লান্তির মধ্যে থেকেই একদিন সুখী হবে সে। সুখী হবার উপাদান তার মধ্যে আছে।

কিন্তু তাতে কি কিছু বদলাবে অনুপম কুটিরের জীবন? তার মূল্য তো নিরূপণ হয়ে গেছে। এখন বাকী জীবন সেই মূল্যহীনতার বোঝা বয়ে বেঁচে থাকা। না, সস্তা উপন্যাসের নায়িকার মত মৃত্যুকে ডেকে এনে সে বোঝা তা'র নৌকোয় তুলে দেবেন না সুচিন্তা। শুধু এখন থেকে জীবন আর মৃত্যু এ-দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

চিরশান্ত অনুপম কুটির মাঝখানের এই কতগুলো দিনের উত্তাল ঝড় ভুলে আবার শান্ত হয়ে যাবে, স্তব্ধ হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

শহরের থাবা ক্রমশঃ আরও কঠিন মুঠোয় চেপে ধরবে এই শহরতলীর হৃৎপিণ্ড! যেখানে যত সবুজের ইসারা এখনো বাতাসে ঝিলমিলিয়ে প্রাণের সাড়া তুলছে, শহর তাদের উপড়ে ফেলবে নির্মম কাঠিন্য। পুকুর-ভরাট-করা নরম মাটির বুক ফুটো করে বিঁধবে লোহার শূল। গাঁইতি আর শাবল, কোদাল আর কর্ণিকের ধাতব শব্দে বাতাস মুখরিত করে তুলে, তুলবে বিরাট বিরাট প্রাসাদ। তার মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যাবে অনুপম কুটির। যারা নতুন আসবে, যারা এই রাস্তায় হাঁটবে চলবে, ভীড় করবে, গাড়ী ছোটাবে, তারা কোন দিন জানতেও পারবে না ওই রং মুছে যাওয়া নেম-প্লেট লাগানো বাড়ীটার দরজায়, একদিন একখানা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল! সে তাতে ভরে এনেছিল অনেক রঙের চাতুরী, অনেক আলোর আলপনা। তারপর আবার একদিন সব রং আর সব আলো মুছে দিয়ে চলে গিয়েছিল, গৃহস্থের সর্বস্ব হরণ করে!

না, নতুন যারা আসবে, তারা আজকের এই মর্মরিত রাত্রিকে নিয়ে গল্প করবে না। হয়তো কোনদিন কেউ কাউকে বলবে, 'ওই রং-জ্বলা দোতলা বাড়ীটায় কারা থাকে রে ?' হয়তো সে তার উত্তরে ঠোঁট উল্টে বলবে, 'কে জানে! একটা বিধবা বুড়ি আর একটা টাকমাথা ছেলেকে তো দেখি শুধু।'

কিন্তু সে তো পরে।

আজকের রাত নিশ্বাসে মর্মরিত।

আজ ঘুমের ওষুধে কাজ হয়নি, সারা ঘর পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন সুস্থ হয়ে ওঠা সুশোভন। এখন ভাববার ক্ষমতা হয়েছে তাঁর, ভালমন্দ ভাববার। তাই ভাবছেন সুচিন্তার বুদ্ধিটা বড় কম। লোকে কি মনে করবে, একথা ভাবে না। আমার কাছে বসে, আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা কয়। আবার—বলছে আমায় যেতে দেবে না, যাবার সময় আটকাবে! ছি ছি সে কী বিশ্রী হবে! বারণ করে দিতে হবে ওকে। বলতে হবে 'সুচিন্তা আমারও কি ইচ্ছে করে না তোমার কাছে বসি, তোমার হাতে হাত রাখি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো হল না। বুঝতে হবে না ওটা নিয়ম নয়?'

আর নীতা?

নীতাও জেগে আছে বৈকি, কিন্তু সে তো অনুপম কুটিরে নয়। হাজার মাইল দূরে চলে গেছে নীতা। এক-জোড়া ঘুমন্ত চোখের উপর বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর মৌন প্রশ্নে ব্যাকুল হয়ে বলছে, তুমি বলেছ 'আমার চোখ দিয়েই তুমি দেখবে। কিন্তু জীবনের সব কর্তব্য পালন করে, আমার চোখ দুটি অহরহ তোমায় দিয়ে রাখতে পারবো তো?

তারপর, অনেকক্ষণের পর, ফিরে এল সে অনুপম কুটিরে, দেখল সুশোভন পায়চারী করছেন।

বলল, 'বাবা, জল খাবে?'

'না থাক।'

'বাবা, ঘুম আসছে না?'

'আসবে।'

'কই তুমি তো ঘুরছো! তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে জেগে বসে গল্প করি না?'

'সবাই মিলে মানে কি নীতা?' ভুরু কোঁচকান সুশোভন।

'কেন আমি, তুমি, সুচিন্তা পিসিমা। ডেকে আনবো পিসিমাকে?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন সুশোভন। তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলেন, 'আগে তো তুমি এমন অসভ্য ছিলে না নীতা!'

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলারসিক

॥ দুইটি চিত্র-প্রদর্শনী ॥

মার্চের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় দুটি চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একটি দিল্লীর ললিতকলা অ্যাকাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের চিত্রকলার জাতীয় প্রদর্শনী; অন্যটি আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী কর্তৃক আয়োজিত শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর একক প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনীই নানা কারণে কলকাতার কলারসিক মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল কিন্তু আবার বহুবিধ কারণেই প্রদর্শনী দুটি দেখার পর অনেক দর্শকই যে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন, সে কথাও আমাদের অবিদিত নেই।

।। ললিতকলা অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনী ।।

ললিতকলা অ্যাকাডেমী জাতীয় শিল্পকলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, প্রতিভাবান নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার এবং তাঁর সৃষ্টি-কর্মকে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তারই অংশ হিসাবে সর্বভারতীয় শিল্পীদের সৃষ্টি-কর্ম শুধু দিল্লীতে প্রদর্শন না করে এবার ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রধানতম শহরগুলিতে প্রদর্শনের জন্য নিয়ে এসেছেন। কলকাতার মানুষ তাই অনেক আশা নিয়ে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে চিত্রকলার জাতীয় 'প্রদর্শনী' দেখতে ভিড় করেছিলেন। সর্বভারতীয় চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি বুঝবার জন্য এই প্রদর্শনী অনেকখানি সাহায্য করেছে।

এই প্রদর্শনীতে শতাধিক শিল্পীর প্রায় দেড়শতাধিক চিত্রকলা, গ্রাফিক চিত্র এবং প্রায় তিরিশটি ভাস্কর্যের নিদর্শন উপস্থিত ছিল। প্রতিযোগী হিসাবে যোগ দেননি এমন কিছু সংখ্যক প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পীরও চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শনে সজ্জিত ছিল এই প্রদর্শনী। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও একটা কথা অনায়াসে বলা যায়ঃ চিত্রকলার এই জাতীয় প্রদর্শনী ভারতীয় জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার নবজাগৃতির বিশেষ কোনো বাণীই বহন করে আনেনি। কলকাতায় আমরা সারা বছর ধরে আধুনিক শিল্পকলার যে বিমূর্ত বিচিত্র বস্তু দর্শন করে প্রায় ক্লান্ত, এ-যেন তারি উন্নত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুন্নতও বটে) এক সংস্করণ। কিছু ব্যতিক্রম যে আছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে কখনো জাতীয় চরিত্র অনুধাবন করা যায় না। ইউরোপীয় চিত্রকলার সর্বগ্রাসী আঙ্গিক দক্ষতার কাছে আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের এই অকারণ নতি স্বীকার ললিতকলা অ্যাকাডেমী আয়োজিত প্রদর্শনী দেখে পুনর্বার বিস্ময়ের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করলাম।
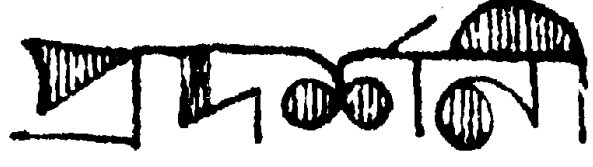
এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে শিল্পী অরুণ বসুর পুরস্কার-প্রাপ্ত চিত্র 'এ ম্যান এন্ড ওয়াল পেন্টিং' (১৩), শ্যামল দত্ত রায়ের জলরঙে অঙ্কিত 'ফিশিং' (২৬), রাজেন মেহরা'র নিঃসর্গ চিত্র 'গার্ডেন সিন' (৪২), এম. রেড্ডিপ্পা নাইডুর 'স্নেক উইথ অ্যানিম্যাল' (৪৫), বিনোদী প্যাটেলের 'হি সেলস এগাস' (৫৬), এস. কে. রাজাভেলুর 'মাদার এন্ড চাইল্ড' (৬৪), দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'ল্যান্ডস্কেপ' (৬৫), হিম্মত সাহার 'মাই পেল জিরো' (৭০), শেখ গুলাম মোহম্মদের 'চেঞ্জ' (৭৬) প্রভৃতি চিত্র অনেকেরই ভাল লাগতে পারে।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে এন. এস. বেন্দ্রের 'জার্নি' (৯১) এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র। শিল্পী সতীশ গুজরালের কাঠের গুঁড়ো ও মোমে নির্মিত জমিনের উপর 'প্রিজনার' (১০০) চিত্রখানি নতুনত্ব সৃষ্টির দিক দিয়ে অনেকের ভাল লাগতে পারে। তবে এই জাতীয় কাজে মেক্সিকোর শিল্পীদের দ্বারাই তিনি বোধ হয় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শিল্পী কে. কে হেব্বারের 'এ সংগ ইন ইয়েলো'-র (১০১) ছন্দিত বর্ণাঢ্য রূপ ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্ততঃ ভাল লেগেছে। এ-ছাড়া কে, এস, কুলকার্নি, রামকিঙ্কর, ভবেশ সান্যাল, অবনী সেন, পরিতোষ সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের রচনাগুলি তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান না হলেও সামগ্রিক বিচারে মন্দ নয়।

গ্রাফিক চিত্রকলায় শিল্পী সোমনাথ হোড় তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই প্রদর্শনীর 'ফিশ্যারম্যানস নেট' (১৭১) ও 'বার্থ অফ এ হোয়াইট রোজ' (১৭২) এচিং-এর দুটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। জয়ন্ত পারিখের কাঠখোদাই 'ওয়েটিং ফর কার্ট'-ও একটি সুন্দর রচনা। এ-ছাড়া শ্রীমতী উষা পশাবিচারের এচিং ও এন. কৃষ্ণ রেড্ডীর এনগ্রেভিং ও এচিং-এর কাজ যথেষ্ট পরিণত বলে মনে হয়।

ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যেও কয়েকটি সুন্দর কাজ লক্ষ্য করেছি। তবে অধিকাংশ ভাস্কর্য-শিল্পী যেভাবে বিমূর্ত ধারার দিকে ধাবিত হয়েছেন

যাত্রা (৯১) শিল্পী—এ, এন, বান্দ্রে।

তাতে মনে হয় অদূরে ভবিষ্যতে শিল্পের এই শাখাতেও হয়তো এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।

যাহোক, ললিতকলা অ্যাকাডেমী যদি সত্যিকার জাতীয় শিল্পকলা সৃষ্টির দিকে ভারতীয় শিল্পীগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তবে আমরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হবো। এবং বলা বাহুল্য, জাতীয় ঐতিহ্য বর্জন করে সে-শিল্প-ধারা কোনদিনই গড়ে উঠবে না, এ-কথাটাও তাঁরা যেন স্মরণে রাখেন। আলোচ্য প্রদর্শনীতে এই বস্তুর অভাব ঘটায় আমাদের মত অনেক দর্শক-ই হতাশ মনে ফিরে এসেছেন।

। শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর প্রদর্শনী।

পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী আয়োজিত শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর একক প্রদর্শনীও অনেক আশা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। কারণ, বেশ কিছুকাল আগে শ্রীমতী রায় চৌধুরী কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের তাঁর প্রতিভার দানে মুগ্ধ করেছিলেন। শিল্প-শিক্ষার জন্য প্যারিসের দুটি বিখ্যাত স্টুডিওতেও তিনি কাটিয়ে এসেছেন অনেক দিন। দেশে ফিরে আসার পর সম্ভবতঃ এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। ফলে, আমরা তাঁর কাছে নতুনতর শিল্প-সম্পদ প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে ইতঃপূর্বে দু'জন তরুণ শিল্পী শ্রীপ্রকাশ কর্মকার ও শ্রীবিজন চৌধুরীর প্রদর্শনী দর্শনের পর শ্রীমতী রায় চৌধুরীর প্রদর্শনী দেখতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে এর সার্থকতা নিয়ে। শিল্পী শ্রীকর্মকার ও শ্রীচৌধুরীর মত শ্রীমতী রায় চৌধুরীও বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন পৌরাণিক বা লৌকিক কাহিনী থেকে। এবং এই বিষয়বস্তুর রূপায়ণ-কলায় শ্রীকর্মকারের মত না হলেও শ্রীচৌধুরীর মতই শ্রীমতী রায় চৌধুরী প্রায় একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মত একজন প্রতিভাময়ী শিল্পীর নিকট থেকে আমরা অন্যতর কিছুর প্রত্যাশায় ছিলাম। জানিনে, এই ধ্যান-ধারণার পশ্চাতে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের কোনো প্রভাব কাজ করেছে কি না। কোনো শিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিল্পী যদি সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিজস্ব ধারায় তাকে রূপদান করতে ইতস্ততঃ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পারি না। আর ঠিক এখানেই রয়েছে শ্রীমতী রায় চৌধুরীর দুর্বলতা।

যাহোক, যে আটখানি চিত্র নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে তার প্রতিটি চিত্র শ্রীমতী রায় চৌধুরীর নিপুণ চিত্র-সংস্থাপনের স্বাক্ষর বহন করলেও উপরোক্ত কারণে মনের উপর খুব বেশী দাগ কাটে না। তাছাড়া শ্রীমতী রায় চৌধুরীর পৌরাণিক বিষয়-বস্তু নতুন মূল্যবোধেও আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাঁর 'দুর্গা' (১) সেই চিরাচরিত দুর্গারই মতন। তবে চিত্র-সংস্থাপনে, রং প্রয়োগে এবং হেলানো রেখার প্রচ্ছন্ন জ্যামিতিক ভঙ্গীতে তিনি যে পারদর্শিনী, এ-কথা স্বীকার্য। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তার 'পিয়েটা' (২) চিত্রখানি। এখানে ক্রুশবিদ্ধ মৃত খৃষ্টের প্রতি দুই জননীর আর্তি বলিষ্ঠ রেখায় আর রঙে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে তাঁর 'নতুন ধান' (৭), গীতা-পাঠ (৬) ও 'রক্তবীজ বধ' (৩) কম্পোজিশানের দিক থেকে মন্দ নয়।

আমরা আশা করি শ্রীমতী রায় চৌধুরী নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে তাকে মূর্ত করার জন্য তাঁর সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হবেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

॥ আর্টস এন্ড প্রিন্টস্ গ্যালারীর প্রদর্শনী ॥

শীতের মরশুমে কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শনীর যে জোয়ার এসেছিল এখন, গ্রীষ্মের এই দাবদাহে, তাতে ভাটার টান শুরু হয়েছে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কলকাতার প্রধানতম প্রদর্শনী কক্ষগুলি প্রায় নীরব। কিন্তু কলকাতার স্থায়ী আর্ট গ্যালারীগুলি তাদের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছেন। ফলে, দর্শকেরা অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন কিংবা আর্টিস্ট্রি হাউসে কোনো চিত্র-প্রদর্শনীর সন্ধান না পেলে অন্ততঃ এই সব আর্ট গ্যালারীতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের শিল্প-ক্ষুধা নিবৃত্ত করে আসতে পারেন।

মার্চের শেষ সপ্তাহে পার্ক ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শিল্পী শ্রীমতী টর্পাস ক্লার্ক-এর এক চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন কলকাতাস্থ বৃটিশ হাই-কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী বিলপ। প্রদর্শনীটি আগামী ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী টর্পাস ক্লার্ক-এর ২৭ খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। বিদেশিনী এই শিল্পের কোনো চিত্র এর আগে আমরা আর দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী।

শ্রীমতী ক্লার্ক শিল্প-কলা বিদ্যালয়ে খুব বেশিদিন শিল্প-শিক্ষার সুযোগ পাননি। তিনি তাঁর অবকাশে নিজে বসেই মূলতঃ চিত্র-রচনার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্রের কম্পোজিশান, রঙ প্রয়োগের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টই মনে হবে তিনি অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিতা; বরং বলা যায় তিনি একটু বেশি মাত্রায় অ্যাকাডেমিকধর্মী।

যাহোক, আলোচ্য চিত্রগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) প্রতিকৃতি চিত্র, (২) নিঃসর্গ চিত্র, (৩) স্থির চিত্র। প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে শিল্পীর দক্ষতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বিশেষ করে 'শ্রমিক' (৬), 'হলুদ জামা' (১২) ও 'উড়িষ্যার মানুষ' (২১) তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈল-রঙের চমৎকার মাধ্যমে এই প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে ধরা দিয়েছে।

নিঃসর্গ চিত্রগুলি আমার মনকে খুব বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি। শ্রীমতী ক্লার্ক গ্রাম-বাংলার নিঃসর্গ নির্বাচন করায় আমি খুশি কিন্তু এগুলিতে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলাম না। সবুজ, হলুদ আর লাল রঙ মিলে-মিশে অপরূপ কোনো রূপের দুয়ার এখানে দর্শকের জন্য উদ্ঘাটিত করে দেয়নি। বরং তাঁর 'কাশ্মীরে সূর্যাস্ত' কিম্বা 'প্রিয় পাহাড়' (৯ ও ৮) বাংলার নিঃসর্গ চিত্রনের তুলনায় মনোরম। এখানে বর্ণ-প্রলেপনে আলো-ছায়ার খেলাকে অনেক নৈপুণ্যে বিধৃত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। কম্পোজিশানও সুন্দর।

স্থির চিত্রের মধ্যে এই প্রদর্শনীতে অধিকাংশই ছিল ফুলের স্টাডি। ফুলের স্টাডিতে শিল্পীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। তবে নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে দেখার চেষ্টা করা হয়নি। 'লালফুল' (১৪) নামক চিত্রখানিতে তিনি পুরু জমিন সৃষ্টি করে যেভাবে তা চিত্রিত করেছেন, কিংবা 'বাঁশের অর্কিড' স্টাডিতে চমৎকার বেগুনী রঙ প্রয়োগের যে দক্ষতা দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা' প্রশংসার যোগ্য।

আমরা আশা করি শিল্পী শ্রীমতী ক্লার্ক এই অ্যাকাডেমিক চিত্র-রচনার সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের ঘটনা নিয়েও শিল্প-রচনায় অতঃপর উৎসাহ বোধ করবেন।

* * *

এই সপ্তাহে থিয়েটার রোডের অশোকা আর্ট গ্যালারীতে শিল্পী লক্ষ্মণ পাইরের চিত্র-কর্মের একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। 'অমৃত' পাঠকদের কাছে তার আলোচনা আমরা আগামী সপ্তাহে পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

দুর্গাদাস ভট্ট

বহিরঙ্গ

আমাদের শহরে তখন কলকাতার "ড্যামচিপ"-বাবুরা এসে ভিড় করতে শুরু করেছেন। সেখানকার বাতাসে আসল যুদ্ধের দামামা বাজছে। এ. আর. পি. ব্ল্যাক আউট. সাইরেন, ওসব না দেখেও তাদের কথা এত শুনেছি. যে শুনে শুনে দেখা হয়ে গেছে। এমন কি আমাদের লালবাগের বাড়ীর মালিকদেরও তখন পায়াভারি। ছোট ঘুপসি ঘর. টালির চালা থেকে শুরু করে একতলা, দুতলা— প্রতিটি ঘরেই অঢেল ভাড়াটে আসতে শুরু করেছে। লোকজনে একেবারে ভরে গেছে মহকুমা শহরটি। বাজারে কিছু পাবার জো নেই। মাছ. মাংস, শাক-শব্জী. যা পাচ্ছেন কলকাতার বাবুরা "ড্যামচিপ" বলে থলেয় পুরেছেন।

আরো অনেকের মত নবাগতের দলে মিশে রুপাদিরাও এলেন। স্থান করে নিলেন আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতে। শহুরে লোক তাঁরা। চেহারা, সাজপোষাক ঝকঝকে. তকতকে। কাজেই আমরা দূরে থেকে দেখছিলাম। কাছে ঘেঁষতে সাহস হ'চ্ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই অপরিচয়ের সুক্ষ্ম পর্দাটা বেশীক্ষণ টিকল না। ছোট ভাই সোমনকে সঙ্গে করে রুপাদি আমাদের বাড়ীতে এলেন।

ছোড়দি তখন কুয়োতলায় একগাদা এঁটো বাসনকোসন ছড়িয়ে ছাই দিয়ে মাজছিল. বাড়ীর ঝি কি কারণে যেন কামাই করেছিল সেদিন। কোন রকম ভূমিকা না করে একটা ভাঙ্গা থান ইঁট টেনে নিয়ে ছোড়দির গা ঘেঁষে বসলেন রুপাদি। বললেন, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম ভাই। আমি রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে রুপাদিকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হ্যাঁ সুন্দর বটে রুপাদি। বোধহয় মার মত সুন্দর। কিম্বা অত সুন্দর না হলেও মেজকাকিমার মতন তো বটেই। তবে বয়স অনেক কম। এদিকে ছোড়দির তখন কাহিল অবস্থা। ছাইমাখা হাতখানা জল ঢেলে ধুয়ে বলছে. 'ও কি. ওখানে বসলেন কেন? আপনার শাড়ীটা—'

'আরে তাতে কি হয়েছে! কাছাকাছি না বসলে আলাপ জমে না।'

এইভাবে শুরু। রুপাদির ঘন ঘন যাতায়াত বাড়ীর সকলেরই নজরে এল। বিশেষ করে মেজদার। আমি ভাবলাম মেজদারও যা চমৎকার চেহারা তাতে আর আশ্চর্যের কি. তখন বয়স ছিল অল্প। আমার বন্ধু ঘেঁটুর সঙ্গে সেদিন রামচন্দ্রের ধনুক নিয়ে তর্ক হ'ল। আমি বললাম—রামচন্দ্রের ধনুক ছিল বাঁশের। ঘেঁটু বলল—না সেটা ছিল সোনার তৈরী।

এই তর্কের একটা জুতসই জবাব পাবার জন্যে মেজদার ঘরে গেলাম। মেজদা চাপা গলায় রুপাদির সঙ্গে গল্প করছিল। গাল দুটো লাল টুকটুকে করছে রুপাদির। কি কারণে লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়েছে। আমাকে সেখানে দেখেই মেজদা চেঁচিয়ে বলল—'ভরাদুপুরে খেলা করে বেড়ানো হচ্ছে।' আমি বললাম—'না মেজদা, খেলছি না। একটা কথা'—'কোন কথা নয়, যাও ওপরের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়গে যাও।'

আমি আর একটুও না দাঁড়িয়ে চলে এলাম। কিন্তু কিছুতেই পড়াশুনো করা এবং ঘুমিয়ে পড়ার সম্পর্ক খুঁজে পেলাম না।

মেজদার গ্রামোফোন আর রেকর্ডের বাক্সে কারুর হাত দেবার হুকুম ছিল না। আমার মনে আছে আমাদের বাড়ীতে প্রথম যেদিন রেকর্ডের গান বাজল আমি একেবারে

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখে ছোড়দা বলেছিল, 'ভোম্বল, অমন বোকার মত ভ্যাব ভ্যাব করে কি তাকিয়ে দেখছিস। এই গ্রামোফোন বাক্সটার মধ্যে একটা মানুষ আছে বুঝেছিস; তার মুখ থেকেই গান বেরোয়।'

কথাটা কিন্তু আমার মনে ধরেনি। সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ সুযোগ পেলাম। সবাই একেবারে চুপচাপ, বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে রেকর্ডের বাক্সটা খুলে ফেললাম। তারপর একখানা রেকর্ড বার করে হাত বোলাচ্ছি, ঠিক সেই সময় ঘরের অপর প্রান্তের একটি দরজা দড়াম করে খুলে গেল। যেন লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেজদা। প্রথমেই ছোঁ মেরে আমার হাতের রেকর্ডটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর আমার ডানগালে লাগালেন ভারি ওজনের একটি চড়। মাথাটা ঘুরে গেল আমার। তারপর কি হ'ল কিছুই মনে রইল না।

অথচ একদিন জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, পাশের বাড়ীর কুর্চি গাছটা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। ঝাউ গাছটা হাওয়া লেগে দুলছে। রূপাদি মেজদার বাক্স থেকে খানদশেক রেকর্ড বার করে নিয়ে টিপি টিপি এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে। তারপর দরজাটা খুলে সামনের ছোটমাঠটা পেরিয়ে নিজেদের বাসার দিকে ফিরলেন। কুর্চিতলায় ওদের দুজনে দেখা। রেকর্ড-কটি বুকের ওপর ধরে কেমন যেন উদ্ধত ভঙ্গিতে রূপাদি হাসলেন। তারপর চোখের ইঙ্গিতে বললেন—নিয়ে চললাম রেকর্ডগুলি, নিজেদের গ্রামো-ফোনে বাজাবো। মেজদা ঘাড় নাড়লেন। আশ্চর্য! এর বেলা মেজদার আপত্তি নেই, যত দোষ আমার বেলায়।

ঠিক পরের দিন বাড়ীতে একটা গানের আসর বসল। বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাবপত্র বার করে ফেলে সতরঞ্চি আর গালচে পাতা হল। যে ঝাড়-লণ্ঠনটি সারা বছর শুধু শুধুই ঝোলে আজ সেটাকে পরিষ্কার করে বড় বড় মোমবাতি জেলে দেওয়া হল। বাবার একজন বাল্য-বন্ধু এবং নামজাদা কবি সুরজিৎবাবু সেদিন কবিতা পড়ে শোনাবেন। সেই প্রসঙ্গে সেজদি ও ছোড়দির মাস্টার রেখে শেখা গান আমরা সবাই শুনব। আমি পড়ব রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। বাবা একজন বিদেশী সাহিত্যিক সম্পর্কে বলবেন। জ্যাঠামশাই প্রধান অতিথি সুরজিৎবাবুর কবিতার ওপর আলোচনা করবেন। আর সব শেষে রূপাদি নাচবেন। সঙ্গে গান গাইবেন রূপাদিরই ছোট বোন মন্দিরাদি।

সব কর্মসূচিই ঠিকমত এগুচ্ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছে। কে যেন বলছে—রূপা নাচবে না, তার শরীর খারাপ। অথচ এত সাজগোজ করল। ছোড়দি অবাক। মন্দিরাদি ওর কানে কানে কি একটা বলতেই, ছোড়দি বললে—তাইত রে মেজ-দাকে তো কই দেখছি না। নাচের আসরে তাহলে আজ রূপাদিকে দেখতে পাব না। মনে মনে বেজায় আফসোস হ'ল। কিছু-ক্ষণ আগে দোতলার ঘরে, যেখানে দিদিদের সব প্রসাধনের জিনিস থাকে —সেখানে ড্রেসিংটেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে রূপাদিকে সাজগোজ করতে দেখেছি। দেশলাই কাঠির পেছন দিয়ে কাজললতার কাজল নিল রূপাদি। টানা ভ্রু দুটি আরো টেনে দিল। তারপর মুখ ফেরালো। আমি তাকিয়ে দেখলাম ঠিক রাণীর মত দেখাচ্ছে রূপাদিকে। কপালের মাঝ থেকে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দুদিকে গাল অবধি নেমেছে, শ্বেতপাথরের মত ঘাড়, গলা ঘিরে সাদা টগরের গোড়ের মালা বুক ছাড়িয়ে উরু অবধি নামানো। নিটোল স্বাস্থ্য কানায় কানায় ভরা। তাই ধূপছায়া শাড়িখানা আরো সুন্দর মানিয়েছে। আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল যেন চোখ দিয়ে আরতি করল রূপাদি। বলল—ভোম্বল, কাছে আয়! কাছে যেতেই বলল—চোখ বোঁজ! চোখ বুঁজলাম। —হাঁ কর। এই মরেছে হাঁ করতে বলছে কেন রূপাদি, তবু ভয়ে ভয়ে হাঁ করলাম। মুখের মধ্যে শক্ত শক্ত কি যেন পুরে দিল। বেশ ভুরভুরে গন্ধ। জিভ দিয়ে চেটে বুঝলাম লজেন্স। দুবার চুষে নিয়ে চোখ খুললাম। রূপাদি তখন মিটমিট করে হাসছে।

কিন্তু রূপাদি কেন নাচবে না? আমার মনে হ'ল গোটা আসরটাই যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোথা থেকে যেন এক ঝলক ঝড়ো হাওয়া উঠে এসে সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে। ভাবলাম আমি নিজে গিয়ে অনুরোধ করি রূপাদিকে। চুপি চুপি এগুলামও। আমাদের বাড়ীর একতলার এবং দোতলার প্রতিটি ঘর আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম। না, সে কোথাও নেই। এবার রূপাদিদের বাসাটা খুঁজে দেখতে হয়। কুর্চি আর মাধবী-লতার জটলা পেছনে রেখে ওদের বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিলাম। বেশ একটু ছাত পার হয়ে তবে ওদের শোবার ঘর। সে ঘরেও রূপাদি নেই। তবে সে কোথায়? রাত হ'লেও অন্ধকার নেই। দুধসাদা জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে ছাতিম গাছটায় বোধ হয় ফুল ফুটেছে নইলে এমন নেশা-ধরানো গন্ধ আসবে কিসের? ওদের চিলেকোঠার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় রেশমী শাড়ির খসখস আওয়াজ পেলাম। তবে কি চিলে-কোঠার ওদিকটায় বসে আছে রূপাদি।

ঠিক তাই। চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপাদি। ভঙ্গিটা কেমন যেন উদাস। গলার মালা ছিঁড়ে গিয়ে ধুলোয় লুটোচ্ছে। আমি যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল নেই। এবার আমি দেখলাম রূপাদির টানা টানা দুচোখ থেকে যেন দুটি সোনালী নদী নিটোল গালের ওপর এসে নেমেছে। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে যেন ফুঁপিয়ে উঠছে রূপাদি।

ভেতরটা কেমন যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠল আমার। এক লহমায় যেন বুঝে ফেললাম এ ব্যাপারটার জন্য মেজদাই দায়ী। সে থাকলে কেউ যদি আনন্দ পায় তো, থাকতে বাধা কোথায় তার? এমন করে কি কাউকে দুঃখ দিতে হয়?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রূপাদিকে দেখলাম। তার এই তন্ময় মুহূর্তটা ভেঙে দিতে ইচ্ছা করল না। একটু যেন লজ্জাও করল। নিজের মনকে নেড়ে-চেড়ে দেখছে রূপাদি, ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে—হয়ত কত দুঃখের স্মৃতি উথলপাথাল হয়ে উঠেছে। এখন নিঃসঙ্গতাই তার সঙ্গী। আমাকে যেদিন বাবা বকেছিলেন, আমি ওই ফরাসডাঙার মাঠে গিয়ে একটা চালতে গাছের ওপর উঠে বসেছিলাম। একলা থাকতে ইচ্ছে করছিল। মনটাকে যেন কোলের ওপর রেখে আলগা করে হাত বুলোচ্ছিলাম। সেদিন আমার চোখ দিয়েও জল পড়ছিল, রূপাদির মতোই।

চুপিচুপিই ফিরে এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। সেখানে তখন দারুণ উত্তেজনা। জনকয় পুলিশ সঙ্গে করে একজন অফিসার এসেছেন। বাবা এবং

জ্যাঠামশাইকে বলছেন—তাঁকে বাইরে আসতে বলুন, ওয়ারেণ্ট আছে।

ওয়ারেণ্ট মানে সেদিন বুঝতাম না। যেমন বুঝতাম না, কি করে বড়দা-মেজদাদের দল শুধু আন্দোলন করে এত বড় ইংরেজ সরকারকে ভারত ছাড়ার কথা বলছে। বলছে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। মোটকথা সেদিন বড়দা এবং মেজদা যে বাড়ীতে ছিল না এ কথাটা পুলিশকে বিশ্বাস করানো গেল না। টুপিআঁটা বিরাট চেহারার অফিসারটি বললেন—তা হলে আমরা বাড়ী সার্চ করব। সার্চের কথা শুনে জ্যেঠামশাই আর বাবা ভীষণ রেগে গেলেন।

কিন্তু তাতে কিছু আটকাল না। নিরাপত্তা আইনে বড়দার জেল হ'য়ে গেল। মেজদার নামেও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল—কিন্তু দিন তিনেক গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর সে এসে জানালো যে তার নামে এখনো ওয়ারেণ্ট বেরোয়নি, তবে বেরিয়েছে বলে সবাই মনে করেছিল। বড়দার হঠাৎ জেলে যাওয়ায় মা একেবারে ভেঙে পড়লেন। যখন শুনলেন মেজদারও জেল হ'তে পারে বললেন—ওগো ওকে তোমরা দূরে দেশে পাঠিয়ে দাও যাতে পুলিশে খুঁজে না পায়।

কথাটা শুনে বাবা হাসলেন। পুলিশের নাগাল থেকে পালিয়ে যাওয়া কি অতই সহজ!

তবু কিছু চেষ্টা ক'রে সুদূর পশ্চিম থেকে একজন আত্মীয়ের সাড়া পাওয়া গেল। তাঁর ব্যবসায়ে একজন লোক দরকার তাই মেজদাকে পত্রপাঠ সেখানে গিয়ে পোঁছতে লিখলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিকঠাক। আমি রূপাদির মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। এইসব ঘটনার পর মাত্র একবার তাঁকে জানলায় দেখেছিলাম। রুক্ষ মুখ। শুষ্ক চুল। হাত নেড়ে আমায় যেন ডাকলেন। আমি একছুটে একেবারে কাছটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে রূপাদি আলমারি খুললেন। মুখের ওপর খানিকটা সুগন্ধ এসে ঝাপটা মারল। একটা কাগজের মোড়ক থেকে লজেন্স নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি বললাম, 'লজেন্স ভাল লাগছে না।'

'কেনরে? মন খারাপ?'

আমার মুখটা নরম গালের ওপর চেপে ধরলেন রূপাদি। ভাসা ভাসা চোখ দুটি আমার চোখের ওপর রেখে বললেন, তোর মেজদা কোথায় চাকরি করতে যাচ্ছে রে ভোম্বল?'

চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপাদি

গলার কাছে কিছুটা দলাপাকান বাতাস আটকেছে, খানিকটা দম নিয়ে বললাম, 'জায়গাটার নাম তো জানিনে রূপাদি। মেজদাকে জিগ্যেস করে আসব?'

'দূরে বোকা। ও তাহলে কি ভাববে বল্ ত?'

'কি আবার ভাববে? বলব মেজদা রূপাদি বলছে......' ফোলা ফোলা হাত দিয়ে আমার মুখখানা চেপে ধরলেন রূপাদি। কথা বলতে দিলেন না। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলাম চোখের ভাষা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে রূপাদির। টানা টানা নিঃশ্বাস পড়ছে। গালের ওপর চাপা উত্তেজনা। আস্তে করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমারই বা কিসের এত দায়।"

এমনি করে আরো দুটো দিন বয়ে গেল। দিন রাতের পল প্রহরকে পেছনে রেখে এমন একটা দিন এগিয়ে এল যেদিন মেজদা তার কর্মস্থলের দিকে পা বাড়াবে। শেষ রাত থেকে মা কাঁদছেন। কাকিমা কাঁদছেন। জ্যেঠিমার মত শক্ত মানুষটিও চোখের জল মুছছেন। যেন দুটি দুর্ঘটনা পর পর ঘটে যেতে চলেছে। বাবা বললেন, 'তোমরা কী বল ত। বাড়ীর একটি ছেলে তার ভবিষ্যৎ শুরু করতে চলেছে, তোমরা কোথায় আশীর্বাদ করবে, ওকে সাহস দেবে, তা না.........!'

এবার যেন একটু বুক বাঁধলেন সবাই। সত্যিই তো দুঃখের তিমিরেই তো মঙ্গল আলোক জ্বলছে। সাময়িক দুঃখকষ্টকে এত বড় করে দেখলে তো চলবে না। তাই ট্রেনের সময় যখন প্রায় সমাগত—রিক্সায় চাপতে যাচ্ছে মেজদা, একে একে সকলে এসে দাঁড়ালেন। মা মেজদার কড়ে আঙুলটি দাঁত দিয়ে অল্প চাপ দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। যেন কোন অমঙ্গল তাকে স্পর্শ না করে। কাকিমা এগিয়ে এসে ওর মাথাটি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সাবধানে যাস, বুঝলি।' জেঠিমা বললেন, 'পোঁছে চিঠি দিবি।' বাবা বললেন, 'আর দেরী নয়, ট্রেন ফেল হ'য়ে যেতে পারে।'

আমরা সকলেই গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এলো না শুধু একজন। আমি বার বার কুর্চি গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের ছাতের দিকে তাকালাম। কেউ নেই। শুধু একবার যেন মনে হ'ল কে একজন ছুটে দিয়ে ছাত থেকে ঘরের

দিকে গেল। আমার মনে হ'ল ও রূপাদি ছাড়া আর কেউ নয়।

মেজদার রিক্সাটা যখন ভজুয়ার তেলেভাজার দোকানের পাশ দিয়ে মিউনিসিপালিটির তৈরী সাঁকোর ওপর উঠল—আমিও রাস্তা ঘুরে রূপাদিদের বাড়ীর দিকে পা চালালাম। সিঁড়ি আর ছাতের ওপর দিয়ে ওদের ঘরের মধ্যে পেঁাছলাম। সামনেই রূপাদি। জানলায় দাঁড়ানো অবস্থায় নয়। ঠিক হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর কি যেন একটা দেখছে। কি দেখছে রূপাদি! ডেঁয়ো পিঁপড়ের লড়াই নাকি? না তো? গোটা কয়েক ফটো পর পর সাজানো। সবগুলিই পুরুষ মানুষের ছবি, তার মধ্যে মেজদার ছবিও আছে। তন্ময় চোখে অঢেল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। গালে ঠোঁটে, কপালে কি সব অচেনা রঙ। আমি যে তার পাশটিতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে, রূপাদির খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখ পড়তেই কেমন যেন চমকে উঠল রূপাদি। টানা ভ্রূজোড়া কোঁচকালো, 'ভোম্বল, তুমি কতক্ষণ?'

'এই তো এলাম।'

রূপাদির গলার আওয়াজ কেমন যেন রাগ রাগ।

'আমায় ডাকোনি কেন?'

গোলাপী ঠোঁট কেঁপে উঠছে। রূপাদির।

'আমি আমি তো......।'

তোরা সবাই সমান।'

রীতিমত চিৎকার করে ধমকে উঠল রূপাদি। আমি বুঝলাম নিজের অজান্তেই আমার চোখে জল এসেছে। গলার মধ্যে কি যেন কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আমাকে দুটো বাহু মেলে টেনে নিলেন রূপাদি। আমার মাথার চুলের মধ্যে ওর সরু সরু আঙুলগুলো চালাতে চালাতে বললেন, 'তুই রাগ করিসনে ভোম্বল। আমি......আমি আজ......।' টপ করে কপালের ওপর চোখের জল পড়তেই বুঝলাম উনি কাঁদছেন। সারা শরীর কাঁপতে লাগল রূপাদির। কিছুক্ষণ আমাকে ধরে থাকার পর যেন সামলাতে পারলেন না। বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বালিশে ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়লেন। থাক-থাক এলো চুল সারা পিঠখানার ওপর ছড়িয়ে পড়ে একটা আশ্চর্য ধরণের বিষণ্ণ পরিবেশ তৈরী করল। আমি তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। রূপাদির কান্না আর বাঁধভাঙা বন্যার মত ভেঙে-পড়া তনুদেহ আমার সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। শুনতে পাচ্ছি কেমন যেন চাপা একটা গুঞ্জন উঠছে। এ গুঞ্জন কান্নার।

আমার ভাবনার কোন এক গোপন স্তরে সেই কান্নার রেশ বোধহয় কোন দিনই ম্লান হয়নি। নইলে দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছর পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই যখন রূপাদিকে দেখলাম, ঠিক তখন সেই কান্নাঘেরা মুহূর্তটা আমার এত করে মনে পড়ল কেন। খোলা জানলার পাশে বসে বোধহয় চুল শুকোচ্ছিলেন রূপাদি। কলকাতার সেই ঘন বসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। বড্ড উল্টো-পাল্টা নম্বর এদিকে। তিনের পর সাতাশের সি। কিছুতেই ঠিক বাড়ীটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার দরকার উনত্রিশ নম্বর বাড়ী।

একখানা পুরনো ধরণের বাড়ীর দরজায় আলকাতরা দিয়ে উনত্রিশ লেখা আছে মনে হ'ল। শেকল ধরে নাড়লাম। উত্তর নেই। ওপর দিকে তাকাতেই রূপাদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ওপরের ঘরের জানলার পাশে চুল এলো করে বসেছিলেন রূপাদি।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। মনের মধ্যে কারা যেন সব উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বেশ মোটা হয়েছেন রূপাদি। অল্প বয়সের সেই সুঠাম তন্বী নয়। আজ রীতিমত মহিলা। তবু চিবুকের সেই নরম খাঁজটি আজও অটুট। ভ্রূ কুঁচকে তাকানোর সেই চেনা ভঙিটাও অটুট। সংশয়ে দুলে বললাম, 'রূপাদি না!'

'আরে ভোম্বল। আমি ঠিক ধরেছি—!' হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এসে দরজাটা খুলে দিলেন রূপাদি, হাতে টান দিয়ে বললেন, 'ওপরে চল।'

রাস্তার ওপরে রূপাদির এ ধরণের নিঃসংকোচ ব্যবহারে আমি নিজেই যেন লজ্জা পাচ্ছিলাম। হাজার হোক এখন আমি ছোট নই, রীতিমত ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র। কাঁচ গোঁফজোড়া নিয়মিত ঠিকঠাক করছি। লুকিয়ে সিগারেটও খাচ্ছি।

চুপচাপ দোতলায় উঠে এলাম। সিঁড়িটা যেন কেমনধারা। দুজনে পাশাপাশি ওঠা যায় না। ধাপগুলোও উঁচু উঁচু ঘরের সামনে ছোট একটা বারান্দা মতন, সেখানে দাঁড়ালে ভেতর দিকের একটা রোয়াক চোখে পড়ে। আলো বাতাসও কম।

শুধু রূপাদির ঘরখানা রাস্তার ওপর। চমৎকার করে সাজানো গোছানো। দরজায় আকাশ রঙের পর্দা।

এককোণে একখানা ডবল বেড খাট। সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। আর এককোণে ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, স্টিল ট্রাংক। তোরঙ্গ বাক্স সব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। মোটকথা সব কিছুর ওপরে একটা সুস্থ সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন।

আমাকে বিছানায় বসতে বলে ছোট একটা গদিআঁটা টুলের ওপর রূপাদি বসলেন। তারপর কত যে কথা বলে গেলেন, তার ঠিক নেই। বার বার লালবাগের সেই ফেলে-আসা দিনগুলো সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন লালবাগ তার রক্তের লালে মিশে গেছে। কিন্তু যে কথাটা আমি শুনতে চাইছিলাম সেটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন রূপাদি। কিছুতেই মেজদার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না। অন্তত একটিবারও তিনি মেজদাকে স্মরণ করুন। কেমন আছে সে? কি করছে সে? এ প্রশ্নটা রূপাদির মনে একটিবারের জন্যেও দুলে উঠছে না কেন?

কিন্তু না। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেওয়ার পর, চা ও জলখাবার শেষ করার পরও সে প্রসঙ্গ এল না। আমি বললাম, 'আজ উঠি রূপাদি।'

আমার মুখের ওপর কি একটা কুহক মন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন রূপাদি। এ দৃষ্টি তো আমি ও'র চোখে কোন দিন দেখিনি।

কালো কুচকুচে মণি দুটোর মধ্যে এক মায়াবী আলো জ্বলছে। বললেন, 'তুই তো ভারি সুন্দর হ'য়ে উঠেছিস ভোম্বল!'

রূপের প্রশংসায় শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও মন গলে। কিন্তু আমার মনে হল এ ঠিক রূপকে চোখে দেখা নয়, অনুভব করা নয়, এ আরো, আরো কিছু।

চমকে তাকালাম রূপাদির মুখ ও দেহের দিকে। এ যেন এক ভেঙেপড়া মন্দির। এককালে যার গায়ে অজস্র সৌন্দর্যের অলংকরণ শোভা পেত। এখন সে সব কিছুই নেই। আছে শুধু একটা মোটাসোটা অস্তিত্ব। টয়লেট ঘসে ঘসে মুখের স্বাভাবিক কোমলতা ক্ষয়ে গেছে। ঠোঁটে নেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের শ্রী, গালের কৃত্রিম রঙের ছোপ যেন বড় বেশী স্পষ্ট।

ও'র চোখের কোলে ক্লান্তির দিকে চোখ পড়ার পর মুখ নামিয়ে নিলাম। ও'র চোখের ভাষা একেবারে পাল্টে গেছে এবার। একটা দুঃসহ লজ্জা দেহটিকে পাকে পাকে জড়াচ্ছে। অঢেল গ্লানিতে সারা মুখ ছেয়ে গেছে। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

আমি আর কথা বললাম না। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে নামলাম। কিন্তু আমার মনে মন্দির দেখে আসার শান্তি পেলাম না। পেলাম না সেই পবিত্রতা।

দুই পৃথিবীর সেতু

পার্ল বাক

কণাদ চৌধুরী

ইংলণ্ডের রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর প্রায়শ্চিত্ত আমেরিকার পার্ল বাক। কিপলিং-এর সেই অমানুষিক মন্ত্র ঃ The East is East and the West is West, and the twin shall never meet. এর উজ্জ্বল প্রতিবাদ পার্ল বাকের প্রথম উপন্যাস "ইষ্ট উইন্ড ঃ ওয়েষ্ট উইন্ড"। শুধু তাঁর প্রথম উপন্যাসেই নয়, তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনায় বাক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, এই দুই সহোদর সভ্যতার সেতুবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। বাকের বাবা মা ছিলেন প্রেস-বিটারিয়ান মিশনারী। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল চিয়াংকিয়াং-এর চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাকও বেড়ে উঠেছিলেন চীনের মহান প্রাচীরের মধ্যে। ইংরেজীর আগে তিনি চীনে ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর শৈশবসংগীরা সকলেই ছিল চীনা। চীনা রীতিনীতি, সংস্কার তাঁর জীবন-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে গিয়েছিল। ইংরেজীতে লেখার সময়ও চীনে ভাষা আজো তাঁর চিন্তার বাহন। এবং বলা যায় বাকের উপন্যাসগুলি তাঁর চিন্তাধারার ইংরেজী অনুবাদ মাত্র।

পার্ল বাকের সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ হয়েছিল তিনজনের প্রভাবে। জনৈকা চীনা-সেবিকা ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাব। মহিলাটি তাঁকে নিয়ে যেতেন বৌদ্ধ ও তাও ধর্মতত্ত্বের আশ্চর্য কাহিনীর অলৌকিক জগতে। ভ্রমণবিলাসী বাবা শোনাতেন দুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী এবং মার ছায়ায় বসে বাক শুনতেন সঙ্গীতের কথা। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের স্রোতে বাক তাঁর সাহিত্যকে পেয়েছিলেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় আসেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। ১৯১৪ সালে স্নাতক হয়ে আবার ফিরে যান চীনে। তিন বছর পরে কৃষি মিশনারী ডাঃ লোসিং বাককে বিয়ে করে উত্তর চীনের একটি ছোট্ট শহরে এলেন। এবং এই শহরটিকেই বাক অমর করেছেন তাঁর বিশ্ববন্দিত উপন্যাস "গুড আর্থ"-এ। "গুড আর্থ" প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। এই উপন্যাস বাককে দুটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং অসামান্য যশ উপহার দিয়েছিল। ২১ মাস যাবৎ "গুড আর্থ" ছিল ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ। "দি এক্সাইল" এবং "দি ফাইটিং এঞ্জেল" লিখেছিলেন বাক তাঁর বাবা-মার জীবনী-গ্রন্থ রূপে। পরে এই দুটো গ্রন্থ "দি স্পিরিট এন্ড দি ফ্লেশ" নামে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। নোবেল আকাদমি পার্ল বাক সম্পর্কে তাঁদের বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এই জীবনী-গ্রন্থ দুটির ভিত্তিতে। উপন্যাস, অনু-বাদ গ্রন্থ এবং জীবনী মিলিয়ে বাকের গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশটিরও বেশী। জাপানের পটভূমিকায় রচিত তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ "এ ব্রিজ ফর ক্রশিং" গত ২রা এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। কোরিয়ার পটভূমিতে তিনি একটি নতুন উপন্যাস লিখেছেন ইদানীং। বাক শুধু প্রাচ্যের পটভূমিকাতেই উপন্যাস লেখেন নি। আমেরিকার প্রচার-পাগল সভ্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করে একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছিলেন "দি আদার গডস' নামে।

বাকের কর্মপরিধি শুধু সাহিত্যেই সীমিত নয়। চীনে থাকাকালীন নানকিং এবং চুংইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর ইংরেজীর অধ্যাপনা করেছেন, মিশনারীর কাজও করেছিলেন কিছু দিনের জন্যে, এশীয় ছেলেমেয়েদের জন্যে আমেরিকায় ১৯৪৯ সালে 'ওয়েলকাম হাউস' নামে একটা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন পার্ল বাক। দু'বছর আগে হাওয়ার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গান্ধী-বক্তৃতামালায় অংশ-গ্রহণ করেছিলেন বাক। 'পার্ল বাক' নামে পরিচিতা হলেও শ্রীমতী পার্ল-এর বর্তমান নাম পার্ল ওয়ালশ। ডাঃ লোসিং বাকের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয় ১৯৩৪ সালে। তার পরের বছর তিনি বিয়ে করেন তাঁর প্রকাশন সংস্থার প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড জে ওয়ালশকে। এদিক দিয়ে আগাথা ক্রিষ্টির সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আগাথাও তাঁর মত প্রথম স্বামীর পদবীতে আজো অভিষিক্তা।

॥ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্নে জেনেভায় ১৭-রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষাবন্ধের চুক্তি সব পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশে ঠিক-মত পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শকদল মোতায়েন রাখার যে প্রস্তাব করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের মতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরীক্ষণ-যন্ত্র বর্তমানে এত শক্তিশালী যে কোন দেশের পক্ষেই এখন গোপন পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং স্থায়ীভাবে অপর রাষ্ট্রে পরিদর্শকদল মোতায়েন রাখার কোনই দরকার নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন একথাও বলেছে যে ভিন্ন রাষ্ট্রে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শক দলের প্রস্তাব করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এযুক্তি ঠিক যে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে রাশিয়া ও আমেরিকার নিরীক্ষণযন্ত্র বর্তমানে এত শক্তিশালী ও উন্নত যে কোন রাষ্ট্রে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হলে তা অবশ্যই ধরা পড়বে, এবং এভাবে বিচার করলে পরিদর্শক দল উপস্থিত থাকার প্রয়োজন সত্যই থাকে না। কিন্তু যন্ত্রে যা ধরা পড়বে তা যে সব সময় সত্য বলে স্বীকৃত হবে তার নিশ্চয়তা কি? যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রে হয়ত ধরা পড়ল যে, রাশিয়ায় একটি প্রচণ্ডশক্তির পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু রাশিয়া যদি তা না স্বীকার করে তখন তা প্রমাণের উপায় কি হবে? অথবা যুক্তরাষ্ট্র যদি তার নব উদ্ভাবিত কোন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য অজুহাত হিসাবে বলে যে, তার নিরীক্ষণযন্ত্রে রাশিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে, তাকেই বা অস্বীকার করা যাবে কেমন করে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন চারটি দেশেই যদি চার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল উপস্থিত থাকেন তবে এ ধরণের মিথ্যা প্রচার চালানোর কোনই সুযোগ থাকবে না। এ অবস্থায় পরিদর্শকদলের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য বলেই মনে হয়। রাশিয়ার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব না হলেও অনুরূপ কোন প্রস্তাবে একমত হতে হবে। অন্যথায় তার নিরস্ত্রীকরণের

দেশে বিদেশে
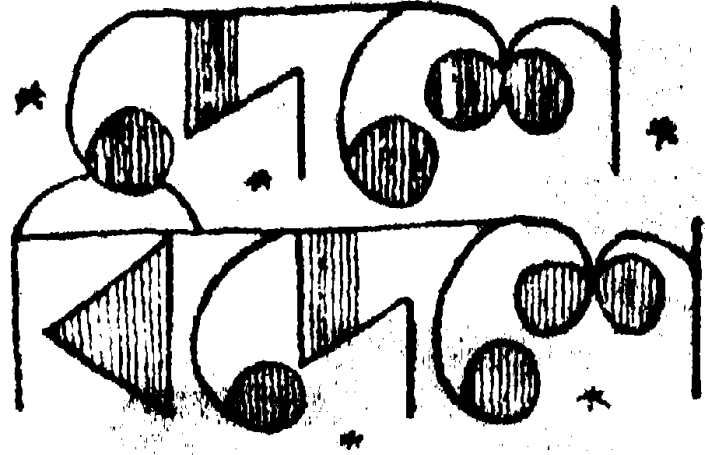
ব্যাপারে আগ্রহের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনেকের পক্ষেই প্রশ্ন তোলা সম্ভব হবে।

॥ সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ॥

সিরিয়ায় স্বল্পস্থায়ী অসামরিক শাসন অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তর্হিত হল। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলেই ১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়ার পুনর্জন্ম হয় এবং সামরিক শাসনেই ছিল সে, গত বছর ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তারপর ডঃ মারুফ দাওয়ালিবির নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার পক্ষে তিন মাসের বেশী ক্ষমতাসীন থাকা সম্ভব হল না।

সিরিয়ার স্বল্পস্থায়ী অসামরিক শাসনব্যবস্থা কাউকেই খুশি করতে পারেনি। গঠনের এক মাসের মধ্যেই দাওয়ালিবি মন্ত্রিসভাকে জাতীয়করণ আইন বাতিল করতে গিয়ে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালে ঐ জাতীয়করণ আইন গৃহীত হয়েছিল। সিরিয়ার সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদে যখন জাতীয়করণ বিলটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় তখন ছাত্র ও শ্রমিকগণ দামাস্কাসের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছিল। ভূমি সংস্কার ও শ্রমিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি সৈন্যবাহিনীকেও ক্রমে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সকল বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ফলেই ডাঃ দাওয়ালিবির নরম দক্ষিণপন্থী মন্ত্রিসভার পক্ষে ঠিক থাকা সম্ভব হল না। সদ্য ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সমরনায়করা পদচ্যুত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তোষণনীতির অভিযোগ এনেছেন এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে পার্লামেন্ট ও গণপরিষদকেও বাতিল করে দিয়েছেন। মিশর ও ইরাকের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলাও সিরিয়ার বর্তমান জঙ্গী-শাসনের অন্যতম মৌলনীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

॥ বিক্ষুব্ধ আর্জেন্টিনা ॥

১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের ফলে আর্জেন্টিনার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তারপর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ঐ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশটিতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় আজ পর্যন্ত তা শান্ত হয়নি। সম্প্রতি আবার এক ভয়ংকর রকমের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রন্ডিজি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পেরণ আর্জেন্টিনার অধিবাসীদের কাছে, বিশেষ করে শ্রমিক সমাজের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। কারণ তাঁর ন' বছরের শাসনকালে শ্রমিকদের আয়বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৭ শতাংশ এবং সারা দেশের লোক পেয়েছিল সস্তায় চিকিৎসার সুযোগ ও বার্ধক্য পেন্সনের সুবিধা। তার ওপর তাঁর সহধর্মিনী ইভা পেরনের জনপ্রিয়তা ছিল সীমাহীন। কিন্তু ইভার মৃত্যুর পর কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থার রদবদল করতে গিয়ে পেরণ ক্যাথলিকদের বিরাগভাজন হন এবং প্রধানত সেই কারণেই তাঁকে শেষপর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হতে হয়। আর্জেন্টিনায়ও সেইদিন থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অশান্তি স্থায়ী ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

পেরনের পদচ্যুতির পর সৈন্যদলের সমর্থনে প্রথমে প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল লোনার্ডি তার কয়েক মাস পরে হন পেড্রো এরামবুরু। কিন্তু তাদের কার্যক্রম আর্জেন্টিনাবাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি, একারণে ১৯৫৮ সালে সাংবিধানের ব্যবস্থানুসারে আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হয় তখন মুখ্যত পেরনপন্থীদের সহায়তায় আর্তুরো ফ্রন্ডিজি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তারপর এবারের অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভা ও গভর্ণরপদের নির্বাচনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নির্বাচনেই পেরনপন্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। পেরনের এই পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা আর্জেন্টিনার গোঁড়া ক্যাথলিক সমাজ ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আর্জেন্টিনা জুড়ে সৈন্যবাহিনী ও পেরন-বিরোধী ক্যাথলিকদের দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ফ্রন্ডিজি প্রথমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিদ্রোহদমনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। গত ২৮শে মার্চ সৈন্যবাহিনীর প্রবল চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর্জেন্টিনায় যদি শেষপর্যন্ত সামরিক শাসনই কায়েম হয়

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকবৃন্দ

৩১শে মার্চ নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরুর অসুস্থতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণান ভারতীয় ভাষায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য উপরোক্ত সাহিত্যিকদের ১৯৬১ সালের সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কার প্রত্যেক বৎসর বিতরণ করা হয়। ডান দিক হইতে, প্রথম সারিতে—শ্রীভগবতীচরণ বর্মা (হিন্দী), ডাঃ এম বরদারাজন (তামিল), শ্রীগিরিধর শর্মা চতুর্বেদী (সংস্কৃত গবেষণা) দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীইমতিয়াজ আলি আর্শি (উর্দু), পরলোকগত পন্ডিত গোদাবরী মিশ্র (উড়িষ্যা), শ্রী এস নানক সিং (পাঞ্জাবী), তৃতীয় সারিতে—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (বাংলা), শ্রী বি রজনীকান্ত রাও (তেলেগু), শ্রীরামসিংজী রাথোদ (গুজরাটী)

তবে তার ফল আর্জেণ্টিনার পক্ষে খুবই মারাত্মক হবে। কারণ, লাতিন আমেরিকা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান অনুসৃত নীতি হল, কোন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান হলেই সেখানে যাবতীয় সাহায্য বন্ধ করা।

॥ পাক বিপাক ॥

পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ ও তার দুই বিধানসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ ও পদ্ধতি ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে ২৮শে এপ্রিল ও প্রাদেশিক বিধানসভা দুটির নির্বাচন হবে ৬ই মে। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ১৫০-৭৫ জন পূর্ব পাকিস্থানের ও ৭৫ জন পশ্চিম পাকিস্থানের। নির্বাচনের দুই প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যারা সমানভাগে কেন্দ্রীয় সংসদের আরও ছয়জন মহিলা সদস্যাকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিরও সদস্যসংখ্যা হবে ১৫০। জাতীয় সংসদ ও বিধানসভায় সদস্যদের নির্বাচিত করবেন, সারা পাকিস্থানের প্রায় দশ কোটি মানুষের মধ্যে হ'তে ছেঁকে বার করা আশী হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী। নির্বাচন ব্যবস্থাকে এইভাবে মুঠোর মধ্যে পুরেও আয়ুব-শাহীর পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই স্থির হয়েছে, প্রত্যেক নির্বাচকের কাছে তাঁর ফটো সম্বলিত একটি কার্ড পাঠানো হবে, যাতে কোনভাবে তাদের চিনতে অসুবিধা না হয়। ভোট দেওয়ার আগে তাদের একবার শপথ বাক্যও পাঠ করিয়ে নেওয়া হবে। এত আটঘাট বেঁধে যে নির্বাচন হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য কতটুকু তা বুঝতে পাকিস্তানের অধিবাসীদের, বিশেষকরে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের কোন অসুবিধা হয়নি। একারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করে যেদিন থেকে আয়ুব সরকার নতুন সংবিধানকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়েছেন, সেদিন থেকেই সামরিক শাসন উপেক্ষা করে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে এক প্রবল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীদের দাবী—(১) অবিলম্বে সুরাবর্দীকে মুক্তি দিতে হবে, (২) প্রস্তাবিত সংবিধান প্রত্যাহার করতে হবে এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পাকিস্থানে পুনঃ প্রবর্তিত করতে হবে। প্রথমে পীড়ন করে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের সাময়িকভাবে বিরত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন তাতেও থামেনি এবং স্কুল কলেজ খোলার সঙ্গে আবার ব্যাপকভাবে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। দলে দলে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঢাকায়, রাজসাহীতে, পাবনায়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থামেনি। এরপর আয়ুব খাঁকে হয় আরও নিষ্ঠুর হতে হবে নয়ত নতি স্বীকার করতে হবে সাময়িকভাবে। শোনা গেছে, সুরাবর্দীকে আপাতত মুক্তি দিয়ে নতি স্বীকার করার কথাও মনে এসেছে আয়ুবশাহীর। কিন্তু যে ব্যবস্থাই তাঁরা করুন না কেন, পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে যে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না একথাটা যত তাড়াতাড়ি তাঁরা বুঝবেন পাকিস্থানের পক্ষে সেটা ততই মঙ্গলের কারণ হবে।

॥ ইকুয়েডরে বিদ্রোহ ॥

দক্ষিণ আমেরিকার আরও একটি দেশ থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ এসেছে। ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, দক্ষিণ ইকুয়েডরে সৈনারা বিদ্রোহ করেছে এবং ইতিমধ্যেই তাদের হাতে কয়েকটি শহরের অধিকার চলে গেছে। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, আরব রাষ্ট্রগুলির মত লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতেও কোথাও আর গণতান্ত্রিক শাসন অবশিষ্ট থাকবে না।

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : 'চীন-ভারত বিরোধে সালিশী অসম্ভব না হইলেও বিষয়টি এখন চিন্তার বাহিরে'—নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের উপর্যুপরি চতুর্থবার রণজি ট্রফি লাভের কৃতিত্ব।

২৩শে মার্চ—৯ই চৈত্র : 'রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করাই সরকারী নীতি'—বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্তৃক শিল্পনীতি বিশ্লেষণ।

তিব্বত সম্পর্কে নূতন চুক্তির প্রশ্ন বিষয়ে চীন সরকার কর্তৃক ভারতকে নূতন নোট প্রেরণ—প্রশ্নটি বিবেচনাধীন আছে বলিয়া লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রয়োজন'— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিমত প্রকাশ।

৯ ঘণ্টা শিফ্‌ট করিয়া শ্রমিকদের জন্য সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের ব্যবস্থা—কেরলের রাজ্যপাল শ্রীশ্রী ভি ভি গিরির সুপারিশ।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : 'উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষার বর্তমান স্থান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে' — বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের দাবী—উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক অধ্যাপক সত্যেন বসুর অভিমতের বিরোধিতা।

পণ্ডিচেরী রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি অনুমোদনের জন্য ফরাসী পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপনের সংবাদ।

উ থাণ্টের (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল) নিকট সহস্রাধিক গোয়ানের স্মারকলিপি প্রেরণ—পর্তুগীজ কবল হইতে মুক্তিলাভে আনন্দ প্রকাশ।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : ভারতকে আরও প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে ভারত-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাক সরকার কর্তৃক বে-আইনীভাবে কর্ণফুলি পরিকল্পনা সুরু—পাকিস্থানের নিকট ভারত সরকারের প্রতিবাদ—ভারতীয় সীমান্তের তিনশত গজের মধ্যে পাকিস্থানীদের পরিখা খননের বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৯-৬০ সালের অডিট রিপোর্ট পেশ—সরকারী অর্থের যথেচ্ছ অপচয় সম্পর্কে মন্তব্য।

কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি ও পরিবহণের অভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধাসৃষ্টি—কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডির ভাষণ।

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : হিলি সীমান্তে সশস্ত্র পাক হানা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার কর্তৃক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন—বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা।

পাট সমেত সকল কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্যে বহাল রাখার প্রশ্ন—সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের উক্তি।

॥ বাইরে ॥

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান বিচ্ছিন্ন হইলে সমগ্র পাকিস্থানেরই অবলুপ্তির কারণ হইবে'—'পাকিস্থান দিবস' উপলক্ষে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সতর্কবাণী।

২৩শে মার্চ—৯ই চৈত্র : নয়া শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন বিস্তার—কুষ্ঠিয়ায় ছাত্রবিদ্রোহ দমনে লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—সর্বত্র ব্যাপক ধরপাকড়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (জেনেভা) আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি প্রসঙ্গে আবার রাস্ক-গ্রোমিকো (মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বাক্‌-সংঘর্ষ।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : ঢাকায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদলের উপর পুনরায় লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—বহু ছাত্র গ্রেপ্তার।

আলজিয়ার্সে ফরাসী বাহিনীর প্রতি গুপ্ত সামরিক বাহিনীর ইতস্ততঃ গুলীবর্ষণ — বাব-এল-উদে গুপ্ত বাহিনীর ঘাটি সৈন্যদল কর্তৃক পরিবেষ্টিত।

পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বৃটেনে পার্লামেণ্ট স্কোয়ারে সহস্রাধিক নরনারীর বিক্ষোভ।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : ঢাকায় এই পর্যন্ত দুইশত ছাত্র গ্রেপ্তার—পাক শাসনতন্ত্র-বিরোধী (আয়ুব খাঁ প্রবর্তিত) বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : আলজিরিয়ার গুপ্ত সামরিক সংস্থার নেতা জেনারেল এডমণ্ড পুহো ধৃত—ফ্রান্সের একমাত্র জীবিত মার্শাল আলফোঁজ জুই স্বগৃহে আটক।

জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক পুনরারম্ভ।

নেপালী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারী ফৌজের অভিযান—৪ জন বিদ্রোহী নিহত হওয়ার সংবাদ।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : আমেরিকা আণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভ করিলে রাশিয়াও পরীক্ষা চালাইবে—রাষ্ট্রসংঘ বেতারে গ্রোমিকোর ঘোষণা। বিক্ষোভকারীদের উপর সৈন্যদের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে আলজিয়ার্সে সাধারণ ধর্মঘট।

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : সিরিয়ায় পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান—জঙ্গী পরিষদ কর্তৃক শাসনক্ষমতা দখল—প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগ—পার্লামেণ্ট বাতিল।

পদত্যাগের জন্য আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেণ্ট ফ্রণ্ডিজির প্রতি সশস্ত্র-বাহিনীগুলির চরমপত্র।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে ছাত্রবিক্ষোভ অব্যাহত।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর
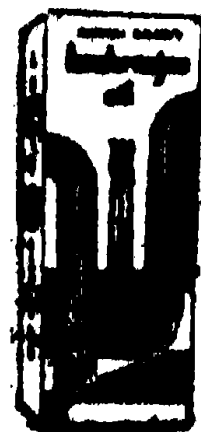
॥ বাঙালী ভদ্রলোক ও ইংরাজের মত ইংরাজী ॥

সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রতি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বাঙলা ভাষার সমর্থনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উক্তির নিন্দা এবং ইংরাজীর সমর্থনে বিজয়লক্ষ্মীর বক্তব্যের প্রশংসা করে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে, আরো হয়ত হবে। এ হল পূর্ব-ভারতের দৃশ্য। ওদিকে উত্তর ভারতের সংবাদপত্রে আর একজাতের উক্তিতে ভীষণ বিতন্ডা সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলেও আরেকজন বাঙালী ভদ্রলোক।

কিছুকাল আগে ইংরাজী ভাষায় খ্যাতিবান লেখক খুসোবন্ত সিং একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন— In my opinion, no Indian living or dead, has written the English language as well as Nirad Chaudhuri. As a matter of fact there are few English writers who have the same mastery over their mother tongue shown by this 'Bengali Bhadralog' in the two books he has written — আর এই বঙ্গসন্তান যদি আর কিছু নাও লেখেন তাহলেও ইংরাজী সাহিত্যের লেখক হিসাবে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। এইটুকু পাঠ করে নিশ্চয়ই বাঙালী মাত্রের বুকটা আহ্লাদে ফেটে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁরা যদি এই বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনাশক্তির secretটা জানতে পারেন তাহলে বোধকরি চোখ কপালে তুলবেন।

একটু পরিষ্কার করেই ঘটনাটি বলা যাক। সম্প্রতি দিল্লীতে এক ইংলিশ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মিঃ নীরদ চৌধুরী, তিনি ইংরাজী-প্রেমিক এবং ইংরাজী অন্য অনেক সদ্গুণেরও প্রেমিক। তাঁর মতে "all that good and living within us was made, shaped, and quickened by the same British rule—" ইত্যাদি। এই উক্তি তাঁর Autobiography of an Unknown Indian নামক বিখ্যাত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে। মিঃ চৌধুরীর বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং সরল। তিনি ভারতীয়দের ইংরাজী রচনার গলদ কোথায় তার মূল আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে যদি প্রাত্যহিক পথ্য হিসাবে roast beef এবং yorkshire pudding না ভক্ষণ করা যায় তাহলে কোনোদিনই কোনো ভারতীয়ের লেখনীতে ইংরাজী বোল একেবারে খাঁটি ইংরাজের মত খাসা হবে না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ভোজ্যবস্তুর এমন নিবিড় আত্মীয়তার কথা বাল্যকালে এক মাষ্টার-মশাই-এর মুখে শুনেছি। অন্যভাবে, তিনি বলতেন—"সুরেন বন্দ্যো যা ইংরাজী লেখেন সে যেন একেবারে ফুলকো লুচি।"— ফুলকো লুচি দেখলেই আমার আজো সুরেন বন্দ্যোর ইংরাজীর কথা মনে পড়ে। এখন থেকে ভালো ইংরাজী দেখলেই roast beef এবং yorkshire pudding-এর কথা মনে হবে দেখছি।

'ইণ্ডো-আংলীয়ান' সাহিত্য নামধেয় বস্তুটি এখন বিলুপ্তির পথে। অধ্যাপক কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার একদা এই অভিধাটি চালু করলেও এখন ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকের অধিকতর স্পষ্ট নামকরণ তিনি করেছেন। মিঃ ই. এম. ফরেষ্টার একদা ভারতীয় লেখকদের এই ইংরাজী ভাষায় রচনাকর্মের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এই জাতীয় প্রশংসায় ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকদের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা জানার উপায় নেই। ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় লেখক নতুন নয়, বাঙালী লেখকলেখিকাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, তরু দত্ত, অরু দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন ঘোষ ও সরোজিনী নাইডু, রবি দত্ত, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়, বর্তমান কালের ভবানী ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীন ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরদ চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই roast beef এবং yorkshire pudding পথ্য হিসাবে গ্রহণ করে তবে ইংরাজী লিখেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে তাঁদের ইংরাজী রচনা ডি. এল. রিচার্ডসন, এডমন্ড গস, জর্জ বার্ণার্ড শ, এজরা পাউন্ড, ইএটস্, ই. এম. ফরেষ্টার প্রভৃতি অসংখ্য ইংরাজী ভাষার লেখক ও সমালোচকবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন গৌরদাস বসাককে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য : "endeavour to impress on him (মধুসূদন দত্ত) the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is that he might employ his time to better advantage than in writing English Poetry".—এই উক্তির অর্থ মধুসূদন বুঝেছিলেন এবং ১৮৬৫-র ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গৌরদাসকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—মাতৃভাষায় লিখলেই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত না হয়ে একটা চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। মাইকেলের ক্ষেত্রে যা সত্য, নিঃসন্দেহে অপরের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। তাই roast beef খেয়ে এবং না খেয়ে যে সব ভারতীয় লেখক ইংরাজী ভাষায় লিখেছেন—তাঁরা একজনও চিরস্থায়ী নাম রেখে যেতে পারেননি।

মিঃ চৌধুরীর এই উক্তিটির নানা দিক আছে, বড়ই জটিল কথা, এর আবার রাজনৈতিক দিকটাও চিন্তা করা প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন এই যে-সব খাঁটি ইংরেজ লেখক স্বদেশ ছেড়ে অন্যত্র বাস করেন এবং সম্ভবতঃ বিদেশী পথ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের ইংরাজী কি 'জলীয়' হয়ে পড়ে। হিন্দি শিক্ষার যে আন্দোলন এখন এদেশে চালু, তার সঙ্গে যদি উত্তর-ভারতীয় ডাল, রোটি, পরোটা, কাবাব প্রভৃতি খাদ্য দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতীয়দের গ্রহণ করতে হয় তাহলে পাকস্থলী ও গৃহস্থালী উভয় অঞ্চলেই বিপ্লব শুরু হবে।

জর্জ বার্নার্ড শ নামক জনৈক আইরিশ ভদ্রলোক অনেকদিন ইংলণ্ডে বাস করে ইংরাজী ভাষায় উত্তম নাটক এবং প্রবন্ধাবলী রচনা করে পরলোকগমন করেছেন ছিয়ানব্বই বছর বয়সে। তিনি সারা জীবনে নিরামিষভোজী ছিলেন এবং কদাপি মদ্যস্পর্শও করেননি। তাঁর লিখিত ইংরাজীর নিন্দা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। বিদেশী হয়েও জোসেফ কোনরাদ যে ইংরাজী ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন তা নিশ্চয়ই ইংরাজের মত ইংরাজী নয়।

ইংরাজীতে লিখতে বসলেই ঠিক খাঁটি কুলীন ইংরাজের মতই তা লিখতে হবে এমন কোনো যুক্তি নেই। কেনই বা সেই চেষ্টা করবেন সেই লেখক? তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী এবং পদ্ধতি সহযোগেই সাহিত্যসৃষ্টি করবেন। বাঙালী লেখক যদি লেখেন "If Krishna keeps who can kill" কিংবা "How many tims Nera goes under a bael tree?" তাহলে ত্রুটী কোথায়। এই জাতীয় উক্তি বাংলা দেশের প্রখ্যাত দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয়তে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে।

মিঃ আর্থার কোয়েস্টলার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত The Lotus And The Robot গ্রন্থে (এই গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করার কথা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন), জাপানীদের ইংরাজী জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত নির্বোধের মত উক্তি করেছেন জাপানীরা যে রকম একগুঁয়েমিসহকারে

নিজেদের ভাষা আঁকড়ে পড়ে থাকে তা তাঁর পক্ষে উষ্মার কারণ হয়েছে। একদা য়ুরোপীয় ভ্রমণকাহিনী-লেখকরা ভারতীয়, চীনা এবং জাপানীদের মুখে ইংরাজী কিভাবে বিকৃত হয়ে উচ্চারিত এবং লিখিত হয় তার নমুনা দিতেন। এখন অবশ্য সে রেওয়াজ উঠে গেছে। কোয়েষ্টলার বলেছেন, জাপানীরা ইংরাজী কেতায় চিন্তা করতে পারে না, তাই তাদের ইংরাজী অশুদ্ধ এবং অক্ষম। মিঃ কোয়েষ্টলার অতঃপর ইংরাজী ভাষার এক জাপানী অধ্যাপককে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করেছেন, অধ্যাপক ভদ্রলোকের ইংরাজী অবশ্য অতিশয় জাপানীমার্কা। মিঃ কোয়েষ্টলার শেষ পর্যন্ত হতাশভরে বলেছেন যে—জাপান এশিয়া ভূখণ্ডের সবচেয়ে পশ্চিমঘেঁষা দেশ হলেও—তাঁরা "drastically cut off from verbal commerce with the West."

মিঃ কোয়েষ্টলার অবশ্য বলেননি বা যুক্তি প্রদর্শন করে বোঝাতে পারেননি যে জাপানীরা কেন ইংরাজী শিখবে, কিংবা মিঃ কোয়েষ্টলার জাপানী ভাষা শিক্ষা করবেন কিনা।

ইংরাজের মত ইংরাজী লেখার প্রতি অত্যাধিক আগ্রহের বিচিত্র পরিণতি ঘটা সম্ভব। ঈশ্বর করুন ভারতীয় লেখকরা যেন ইংরাজের মত চিন্তা করতে শুরু না করেন, যেন তাঁরা মনে প্রাণে ভারতীয়ই থাকেন। Roast beef এবং yorkshire pudding বিলাতেও ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠবে, কারণ আন্তর্জাতিক খানা পরিবেশনের দারুণ প্রতিযোগিতা বর্তমান ইংলণ্ডে এখন চালু হয়েছে। ইংরেজরা মুখ বদলাতে শুরু করেছেন, ফলে তাঁদের ইংরাজীও হয়ত ক্রমশ জলবৎ তরল হয়ে উঠবে।

মিঃ নীরোদ চৌধুরী অবশ্য বলেছেন ভারতীয় লেখকরা তাঁদের বিষয়-বস্তুটা যেন খাঁটি ভারতীয় রাখেন। এই উক্তিটাও অবশ্য মিঃ চৌধুরীর মৌলিক উক্তি নয়। তবে এই উক্তিতে প্রমাণ যে মিঃ চৌধুরীর পাকস্থলী যেখানেই থাকুক, তাঁর হৃদয়টা হয়ত এখনও ভারতীয় আছে। তবে 'ষ্টেক' এবং 'কিডনী-পাই' আহার্য হিসাবে গ্রহণ করলে যদি ইংরাজের মত ইংরাজী লেখা যায়, অনেকে হয়ত মিঃ নীরদ চৌধুরীর 'প্রেসক্রিপসন' গ্রহণ করবেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় উত্তম ইংরাজী শিক্ষার উপায় হিসাবে ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু পথ্যের কথা ভাবেননি। নেহাৎ পুঁইশাক এবং কুচো চিংড়ির ষ্টেজে এখনও পড়ে থাকার জন্য বাঙালী ভদ্রলোকদের ইংরাজীর উন্নতি নেই। Timeless England-এর প্রিয় লেখক মিঃ নীরদ চৌধুরীকে তাই কে একজন সার্টিফিকেট দিয়েছেন—"Everyone is pleased to have met you, especially as you fell in with all our habit and customs as if you had been among us for years".

মিঃ চৌধুরী এই সার্টিফিকেটটি সযত্নে তাঁর "A Passage To England" গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন।

॥ পি, ই, এন্-এর বার্ষিক সভা ॥

গত ১লা এপ্রিল বালীগঞ্জের এক মনোজ্ঞ পরিবেশে পি, ই, এন্-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিবেশন বসেছিল। এই উপলক্ষে পি, ই, এন্-এর নিয়মিত সদস্য ছাড়াও বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি উক্ত সংস্থার বিদায়ী সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সমবেত হ'য়েছিলেন। সুধীর বাবুর প্রস্তাবানুসারে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সর্বসম্মতিক্রমে পি, ই, এন্-এর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পি, ই, এন্-এর জন্যে যথাশক্তি সাহায্য করার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ পদে পুনর্নির্বাচিত হন শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। এ'রা ছাড়া সভায় উপস্থিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, লীলা মজুমদার, পুলিনবিহারী সেন, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিশু মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রতিভা বসু, হিরণকুমার সান্যাল, সুমথনাথ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু, মণীন্দ্র রায় এবং আরো অনেকে। সভার শেষে একটি সু-পরিকল্পিত নৈশভোজে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আপ্যায়িত করা হয়।

নতুন বই

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং—

(গল্প-সংগ্রহ) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে ময়ূখ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪-০০।

'কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং'...... এই অসমাপ্ত বাক্যের আকর্ষণীয় নামধেয় গ্রন্থটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। হাল্কা ছাঁদের এই প্রথম গল্পটির নামেই বইখানির নামকরণ হয়েছে। গল্পের আসল মজাটা সৃষ্টি হয়েছে নাতনীর বিবাহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিভ্রমে। কিন্তু এই বিভ্রমের মধ্যে থেকেই পাত্রের সন্ধান মিলেছে এবং গল্পের পরিণতি সার্থকতায় উপনীত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'দুঃসাহসী'-তে হাস্যরসের খোরাক আছে প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্নভাবে বললাম এই কারণে যে, আপাতদৃষ্টিতে এই হাসি ধরা না পড়লেও এর মধ্যে ফল্গুধারার মত দরদের একটি হাস্যরস প্রবহমান দেখা যায়। মেয়েরা দুঃসাহসী ছেলে পছন্দ করে বলে স্কুল - ফাইন্যাল - পরীক্ষার্থী একটি মেয়েকে নিয়ে, বিনা টিকিটে রেলযাত্রা করে নায়ক ধরা পড়ে এবং মোবাইল বিচারালয়ের বিচারকের হাতে এসে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু পরিশেষে বিচারকের অনুকম্পা প্রকাশ পায়। ফাইনের টাকা নিজের পকেট থেকে বার করে, প্রেমিক বিচারক দুই তরুণ-তরুণীর মিলনেচ্ছাকে পূর্ণ করার সুযোগ দেন। নায়ক হিমানীর কথায় এবং গাড়ির জানালা থেকে মেয়েটির উত্তেজিত মুখ ও দরদ-ভরা দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিভূত করে।

তৃতীয় 'কল্পনা চায় রূপ' গল্পটি দ্বিতীয় 'দুঃসাহসী' গল্পেরই সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট পরিপূর্ণতায় সহায়ক। গল্পলেখক 'দুঃসাহসী' গল্পে যে ভুল করেছেন নায়ক হিমানীর চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে এবং নায়িকা দীপ্তির ভাবভঙ্গী সম্পর্কে একটি চিঠির সাহায্যে সেই ভুলটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং হিমানীর আসল নাম যে হিমানীশ এবং দীপ্তির আসল নাম যে সুলতা তা প্রকাশ পেয়েছে সুলতা কর্তৃক লেখককে লিখিত চিঠিতে। এই কাহিনীর কল্পনার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া হাল্কা ছাঁদের উপভোগ্য গল্প লেখার কুশলী লেখক বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য এখানেই মাধুর্যে মুখর। পরবর্তী গল্প 'মেঘকুন্তলের ঘরের কেচ্ছা' অপেক্ষাকৃত আরও রসঘন। মাষ্টারমশায়ের মেয়ে মিতুর বিয়ের জন্যে গোবরের অক্ষয়ের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। 'ভালবাসা

একটি আর্ট' আর একটি মজার গল্প। বিয়ের ঘটনা নিয়ে, ভালবাসার নানা নটঘটি নিয়ে লাগসই বহু কথা আছে এই গল্পে। দ্বিজেন এই গল্পের নায়ক। সে গ্রামের সুবা অর্থাৎ সুবর্ণা থেকে শহরের সরমা, মৃণাল প্রভৃতিতে জাম্প দিতে থাকে। এক্ষেত্রে লেখকের কথায়, "দ্বিজেন এদিকে ক্রমাগত নিত্য-নতুনের মধ্যে দিয়ে ভালবাসাটাকে রীতিমত একটা আর্টের পর্যায়ে তুলে ধরেছে।" অতঃপর লেখক এই আর্টের বিশ্লেষণ করেও বলেছেন, "বিশেষ করে যে ভালবাসা আর্টের স্তরে উঠে গেছে তার একটি শক্তি হচ্ছে, সে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মগোপন দুটোতেই সমর্থ।" মনস্তত্ত্বের দিক থেকে 'ভালবাসা একটি আর্ট' নামক গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি। এই গল্পের মিলনাত্মক পরিণতিতে বিভূতিবাবু যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, ভালবাসার ক্ষেত্রে দক্ষ আর্টিস্ট দ্বিজেনের চেয়েও তাঁকে আমরা তারিফ করি।

প্রথম দিকের এই গল্পগুলি ছাড়াও, 'সত্যিই বাঘ এসেছিল', 'গোবর্ধন দারোগা বনাম রাখোমণি দাসী' 'দেবস্থান', 'কাশ্যপ গোত্র সিংহ রাশি', 'স্বয়ংবৃতা', 'সংক্রামক', 'বাস্তববাদী', 'বৈদিক ও গান্ধর্ব', 'ভাষা ও ভালবাসা' এবং 'দুটি দিনের ইতিবৃত্ত' নামক প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই বিভূতিবাবুর অভিনব কাহিনী-কল্পনা ও গল্পগ্রন্থনের নিজস্ব ভংগী পাঠক মাত্রেরই উপভোগের কারণ হবে। কয়েকটি গল্পের মধ্যে বর্তমান সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনা ও ব্যক্তির চালচলনের উপরেও যথাসম্ভব গল্পের শুচিতা রক্ষা করে তীর্যক দৃষ্টি হেনেছেন গ্রন্থকার।

রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্য পরিক্রমা— (প্রবন্ধ)। খগেন্দ্রনাথ মিত্র। নবারুণ প্রকাশনী। সি৫১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিঃ-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো শিশু-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের প্রাচীন রূপকথা ও ছড়া-জাতীয় রচনাগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেদের জন্য' লেখাগুলিকেই প্রথম সার্থক শিশু-সাহিত্য বলতে হয়। কারণ তার আগে যা রচিত হ'য়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল শিশু-শিক্ষা, সাহিত্য রচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্যজীবনে 'ছেলেদের জন্য' যা লিখেছেন তার পরিমাণ বড় কম নয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেই সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। এই গ্রন্থে একটি সুলিখিত ভূমিকা ছাড়াও যে অধ্যায়গুলি আলোচিত হ'য়েছে তার সূচীপত্র হল—সূচনা, শিশু ও শিশু ভোলানাথ, ছড়ার ছবি ও গল্প-সল্প, ছড়া ও খাপছাড়া, সে, নাটিকা, আত্মচরিত এবং রবীন্দ্রনাথ ও লেভ তলস্তয়ের শিশুসাহিত্য। আলোচনা প্রসংগে খগেন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ শিশু-সাহিত্যিক বলেই কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়েছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য কি 'ছেলেখেলা' না গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এর উত্তরে তিনি বলেন—পরিণত বয়সে কঠোর মানসিক শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি হাল্কা ধরণের শিশু-সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু প্রথম বয়সের অনেক রচনা বিশেষ করে 'শিশু' বইটির কবিতাগুলি উচ্চতর সাহিত্যের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থেকেই জন্মলাভ করেছে। আরেকটি প্রশ্ন : 'শিশু'র সব কবিতাই কি শিশু সাহিত্য হিসাবে সার্থক? এর উত্তরে লেখক বলেছেন—শিশুর অনেক কবিতা উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিক দিয়ে ঠিক শিশু-সাহিত্য নয়, তবে অতুলনীয় শিশু সম্বন্ধীয় কবিতা। লেখকের এ মন্তব্য মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিয়ে বিচার করেছেন বলে তাঁর মন্তব্যগুলিও হ'য়েছে সুস্পষ্ট ও আন্তরিক।

যাঁরা শিশু-সাহিত্য বা শিশু-শিক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত তাঁরা এবং সাধারণভাবে সমস্ত অভিভাবকই বইটি প'ড়ে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

তলিয়ে যাবার আগের কদিন— (উপন্যাস)—সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য। দেশ প্রকাশনী, ১৪৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬। দাম তিন টাকা।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাঙলাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জমিদারী ব্যবস্থা বাঙলার সমাজজীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল। ভাল ও মন্দ মিশ্রিত এই ব্যবস্থা সাধারণ বাঙালী মাত্রেরই জীবন অসহনীয় করে তোলে। জমিদারদের থেকে তাদের কর্মচারীদের অকথ্য অত্যাচার আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেই জমিদারী ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস অবলম্বন করে লেখক তাঁর কাহিনী গড়ে তুলেছেন। বহু চরিত্রের ভিড়ে কাহিনীর বিরাটত্ব ফুটে উঠেছে। নানাবিধ টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে নিজের অভিজ্ঞতাকে যেন বলে গেছেন। কোথাও আড়ষ্টতা নেই। বর্ণনাভংগী সুন্দর। গ্রন্থটির সুপ্রচার কামনা করি।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

চলচ্চিত্র শিল্পের জাতীয়করণ ঃ

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগীয় ফিল্মস্ ডিভিশনও এই বোম্বাই শহরেই। এবং চলচ্চিত্র শিল্পের নানান সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তাও চালান এই বোম্বাইয়েরই চলচ্চিত্র-শিল্পপতিরা, প্রধানতঃ এ'দের সর্ব-ভারতীয় সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার মারফত। এই ফেডারেশনে মাদ্রাজ এবং বাঙলার প্রতিনিধিও আছেন। এমন কি, এই সংস্থার সভাপতি পদে আমাদেরই বাঙলা দেশের শ্রীঅজিত বসু মশায় আছেন। তবু ভারত সরকারের কর্তারা ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কারণে অকারণে যাঁদের সঙ্গে আলাপ, আলোচনা, পরামর্শাদি করেন, তাঁদের অধিকাংশই বোম্বাইয়ের বাসিন্দা বা ওখানকার শিল্পের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনপর্বে উত্তর-বোম্বাই এলাকায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ-মেননের সমর্থনে বোম্বাই চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের ধুরন্ধরেরা যে-বিরাট সক্রিয় সহযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন, তা কালক্রমে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। পত্রান্তরে প্রকাশ, মেননের সমর্থকদের মুখপাত্র শ্রীএ, এম্, তারিখ পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনছেন: এই প্রস্তাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করবার জন্যে পার্লামেন্টের সদস্য এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয়দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায়, এই কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে অনেকখানি সহায়ক হবে। এই ক্রমবিস্তারমান শিল্পটি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সরকারের সুষ্ঠু দৃষ্টি-ভঙ্গী গঠনে এবং এর সহায়তাকল্পে সক্রিয় গঠনমূলক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে এই কমিটি তার কর্মপন্থাকে বহুধা প্রসারিত করতে পারে। এই কারণে এই কমিটি গঠন সম্পর্কে শ্রীতারিখের প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে গৃহীত হ'লে চলচ্চিত্রামোদী মাত্রই আনন্দিত হবেন।

এই প্রসঙ্গে লোকসভা কর্তৃক গঠিত এস্টিমেট্স্ কমিটি প্রদত্ত চলচ্চিত্রসংক্রান্ত বিবরণীর কথা উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীসভা এবং চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা এবং নিবিড়তর পরামর্শ-সাধন সম্ভব করবার জন্যে বিবরণীতে চলচ্চিত্রের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আহ উইল্ডারনেস নাটকে জ্যাক আর্সেনল্ট ও মেরী জো ব্রুশ

এস্টিমেট্স্ কমিটির মতে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের আজ এমন বয়স হয়েছে যে, গঠনমূলকভাবে এর সাধারণ মানকে যথেষ্ট উন্নীত করা উচিত এবং এর জন্যে প্রয়োজন, যতশীঘ্র সম্ভব, একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠন।

২৪-এ মার্চ লোকসভায় প্রদত্ত ১৫৯তম বিবরণীতে এস্টিমেট্স্ কমিটি এক জায়গায় বলেছেন, বর্তমান চলচ্চিত্র-শিল্পে শিল্পগত নৈপুণ্য দেখানোর চেয়ে আর্থিক লাভের দিকে যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাকে দমন করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সরকার বিশেষভাবে মনোনীত সমিতি দ্বারা উৎকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত চলচ্চিত্রগুলিকে সর্বভারতীয় এবং রাজ্যভিত্তিতে পদক, মানপত্র এবং কিছু কিছু আর্থিক পুরস্কার পর্যন্ত দান করছেন। কিন্তু অপর দিকে সরকার কোন একটি ছবির আর্থিক লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই সেই ছবির টিকিটবিক্রয়লব্ধ অর্থের অন্যূন্য এক-তৃতীয়াংশের বখরা-দার। এর ওপর মুদ্রিতচিত্রের ওপর প্রদর্শনী-কর এবং ফিল্মস্ ডিভিসন নির্মিত সংবাদ ও দলিলচিত্রের আবশ্যিক প্রদর্শনের জন্যে দেয় ভাড়াও প্রযোজকের তহবিল থেকে কাটা যায়। ফলে, ভারত-বর্ষের অধিকাংশ প্রযোজকই একখানি মাত্র চিত্র প্রযোজনার পরেই অদৃশ্য হয়ে পড়েন। আমরা যতই চলচ্চিত্রকে অন্যতম জাতীয় শিল্প আখ্যায় ভূষিত ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিনা কেন, আসলে ভারতীয় চলচ্চিত্র অন্ততঃ প্রযোজনার ক্ষেত্রে—একটি নিছক জুয়াখেলা মাত্র।

তাই দেখি, ভারত ১৯৬০ সালে ৩২০খানি ছবি প্রস্তুত করলেও ১৯৬১তে মাত্র ২৯৭খানি ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। জনপ্রিয় শিল্পীদের যেন-তেন-প্রকারেণ ছবির মধ্যে অবতীর্ণ করাবার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে চলচ্চিত্র-নির্মাণের ব্যয় আজ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, খরচের ধাক্কা

সামলাতে না পেরে বহু ছবিই অর্ধপথে পরিত্যক্ত হচ্ছে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত হিসেব করলে প্রায় ২০০খানি ছবিকে অসম্পূর্ণ দেখতে পাওয়া যাবে এবং তারা কম ক'রে ২ কোটি টাকা মূলধন আটক করেছে। আজকাল সিনেমা-টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা হ'লেও প্রযোজকের ভাগে গিয়ে পড়ে মাত্র ১২ কোটি টাকা, যদিও তাঁরা ছবির নির্মাণকার্যে ব্যয় করে থাকেন অন্যূন ১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প বিদেশ থেকে মানযশ কুড়িয়ে আনলেও প্রযোজকরা বছরে ৩ কোটি টাকা লোকসান দিতে বাধ্য হচ্ছেন অর্থাৎ আর যার পক্ষেই হোক না কেন, চলচ্চিত্রশিল্প প্রযোজকদের পক্ষে আজও ব্যবসাবস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। আবার প্রযোজকদের অংশের এই যে ১২ কোটি টাকা, তার বেশীরভাগটাই অর্জিত হয় গোটা কুড়ি ভাগ্যবান ছবি দ্বারা; বাকী ২৪০খানি ছবির অদৃষ্টে 'অদ্যভক্ষধনুর্গুণঃ'। কাজেই ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে খালি বৎসরান্তে ঘটা ক'রে দুটো মেডেল বা গুটি চারপাঁচ প্রযোজককে হাজার কতক টাকা পুরস্কার দিলেই আমাদের জাতীয় সরকারের এই বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পের প্রতি কর্তব্য শেষ হবে না, তাঁদের আরও চোখ খুলে, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমগ্র চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণ যদি এখুনি সম্ভবপর নাই হয়, অন্ততঃ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীশিল্পের আশু জাতীয়করণ ঘটিয়ে শিল্পটিকে এমন একটি সুবিন্যস্ত এবং সমভাবে বন্টিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে চলচ্চিত্র-প্রযোজনা একটি যথার্থ ব্যবসায়ের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চিত্রের একটি দুর্লভ মুহূর্তকে অকৃত্রিম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিভাননী।

মেইন মাস্ক থিয়েটারের নাট্যানুষ্ঠান :

সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগ, মেইন মাস্ক থিয়েটার কলকাতার হিন্দী হাই স্কুলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের অভিনয়কলার পরিচয় দিয়ে গেলেন। এই দলের শিল্পীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে শুধু যে অভিনয়কলাই শিখেছেন, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—দৃশ্যপট নির্মাণ ও অঙ্কন, আলোকসম্পাত, সাজসজ্জা প্রস্তুতিকরণ ও নির্বাচন, প্রতি দৃশ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, মেক-আপ বিদ্যা, মঞ্চ-তত্ত্বাবধান, দৃশ্যাপসারণ, অভিনয় শিক্ষা ও পরিচালনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন। তাই এ'দের পরিচয়লিপিতে দেখি, সতেরোজন শিল্পীর মধ্যে মাত্র তিনজন শিশু শিল্পী ও একজন বয়স্ক শিল্পী ছাড়া প্রত্যেকেই অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটি কাজের ভার বহন করছেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়কে এ'দের বর্তমান পরিচালক হার্সেল, এল, ব্রিকার "শিক্ষামূলক অভিনয়" (educational theatre) নাম দিয়ে বলেছেন, এই রকম অভিনয় মারফত দলের শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষালব্ধ দক্ষতার প্রমাণ উপস্থিত করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

মেইন মাস্ক থিয়েটারের চারদিন-ব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানে যাঁদেরই উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, বহ্বাড়ম্বর না ক'রেও একটি অভিনয়ে কি ক'রে রসোত্তীর্ণ করতে হয়, সে-কৌশল এই গোষ্ঠীর প্রত্যেক শিল্পীই আয়ত্ত করেছেন। পশ্চাদপট হিসেবে প্রধানতঃ কালো পর্দা ও সময় সময় উজ্জ্বল ধূসর রঙের (Silver gray) পর্দা ব্যবহার ক'রে অত্যন্ত অল্প সাজসজ্জার সাহায্যে তাঁরা সুষ্ঠু আলোকসম্পাতের সহায়তায় যে-ভাবে নাটকগুলির দৃশ্যরচনা করেছিলেন, তা আমাদের যাত্রাভিনয়ের মতই দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিদেশে নাট্যপ্রযোজনার এই সহজ রীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও নাটকীয় রসসৃষ্টিতে এতটুকু বাধা জন্মায়নি, এ-কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। সামনে দু'টি, পেছনে দু'টি ক'রে চারখানি চেয়ারকে মঞ্চের ওপর বসিয়ে থর্নটন ওয়াইল্ডারের একাঙ্কিকা "হ্যাপি জার্নি"র অভিনয়ে যে-ভাবে চলন্ত মোটর গাড়ীর সংকেত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যেমনই কৌতুকপ্রদ, তেমনই শিক্ষণীয়।

তিনটি একাঙ্কিকা এবং দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছেন বর্তমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন নাট্যকার উইলিয়ম সারোয়ান রচিত "মাই হার্টস ইন দি হাইল্যান্ডস" নামে একাঙ্কিকাটি। এমন মানবতার আবেদনপূর্ণ নাটক এবং তার এমন অসামান্য সুন্দর অভিনয় আমরা কখনও দেখেছি ব'লে স্মরণ করতে পারছি না। পুত্র 'জনি'র ভূমিকায় বারো বৎসর বয়স্ক অভিনেতা মাইকেল এগার্ট যে সাবলীল আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয়-কলার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে পিতা

সেন আলেকজাণ্ডারের ভূমিকায় অ্যালবার্ট ডুক্‌লোজ এবং জ্যাস্পার ম্যাগ্রেগরের ভূমিকায় জন নিকলসের অভিনয় দর্শকমনে গভীরভাবে মুদ্রিত থাকবে। এর পরেই রুজভেল্টের মনোবল অবলম্বনে ডোর শ্যারি লিখিত "সানরাইজ অ্যাট ক্যাম্পোবেলো"'র অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রতিটি ভূমিকা এবং বিশেষ ক'রে ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্টের ভূমিকা যে-নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। মেইন মাস্ক থিয়েটারের শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকেই অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এই দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছেন রবার্ট, এস জয়েস এবং শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হচ্ছেন সারা লুই জনসন। এ'দের সঙ্গে অ্যালবার্ট ডুক্‌লোজ, জ্যাক আর্সেনল্ট, মেরী জো রুস, ডিয়ান, ই স্টিভেন্স, জন নিকলস, সিসিলিয়া, কে ব্রিকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জর্জিয়ান নৃত্যসংকলন :

৬০ জন সদস্যসমন্বিত জর্জিয়ান লোকনৃত্য সম্প্রদায় গেল ২৯শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের নাচের আসর বসিয়েছিলেন লোয়ার সার্কুলার রোডের "নিজাম প্যালেস" প্রাঙ্গণে। পাঁচদিনে অন্যূন ষোল সতেরো হাজার লোকের এই নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এবং এ'দের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একজনও নেই, যাঁর এই নাচ বার বার দেখবার ইচ্ছা হয়নি।

এ'দের পুরুষদের নাচের মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য উদ্দীপনা; এ-নাচে প্রচণ্ড দেহের কসরতের প্রয়োজন; অতিদ্রুত পদক্ষেপ, শূন্যে লম্ফন এবং নানা রকম দেহভঙ্গী নিয়ে পুরুষদের বিভিন্ন নাচ গঠিত। দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। আবার কোনো কোনো জায়গায় বিচিত্র ভঙ্গী হাসিরও উদ্রেক করে। আবার এই পুরুষরাই যখন মেয়েদের সঙ্গে নাচে, তখন তাদের পদক্ষেপের ভঙ্গী যায় বদলে, উদ্দামতা হয়ে যায় অন্তর্হিত; তখন তারা নারীর প্রতি স্বাভাবিক সম্ভ্রমসুলভ আচরণ বজায় রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাচের মধ্যে দিয়ে প্রেম নিবেদনকে প্রকট করে।

এই দলের প্রত্যেকটি মেয়েকেই সুন্দরী বলে মানতেই হবে। অবশ্য এ'দের সৌন্দর্য যেটুকু চোখে পড়ে, সেটুকু এ'দের মুখমণ্ডলে এবং করাঙ্গুলিতে সীমায়িত। মেয়েদের পোশাক এমনই যে, মাত্র মুখমণ্ডল ও করপল্লব অনাবৃত থাকে; দেহের অপরাপর অংশ; এমন কি পদপল্লব পর্যন্ত আবৃত। তা ছাড়া এ'দের দীর্ঘায়তনও সৌন্দর্যের প্রতীক—যাকে বলা যায়, stately figures। এ'দের নাচকে এক কথায় কমনীয় বা graceful আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ'রা দেহকে কোনো সময় ভাঙেন না বা বাঁকান না; মাত্র লঘু বা দ্রুত পদক্ষেপের দ্বারা স্থান থেকে স্থানান্তরে যান এবং কিছু হাতের ভঙ্গী করেন। এ'দের সুষম, লালিত্যপূর্ণ গতিভঙ্গী নয়নকে মুগ্ধ বিভ্রান্ত করে। একই দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ থেকে দুই বা চারভাগে বিভক্ত হয়ে আবার ঘূর্ণনের দ্বারা দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ হওয়া সুন্দর মণ্ডমায়ার সৃষ্টি করে।

জর্জিয়ান লোকনৃত্যের সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীত এবং সময় সময় কণ্ঠসঙ্গীত চলতে থাকে, তার সঙ্গে প্রাচ্য, এমন কি ভারতীয় লোকসঙ্গীতের প্রচুর মিল আছে। এ'দের যে-ড্রাম, সে ত' আমাদেরই ঢোলকে খানিকটা বেঁটে ক'রে নেওয়া; একজায়গায় ত' চমৎকার সানাই, এমন কি সঙ্গের 'পোঁ'টি পর্যন্ত শুনতে পাওয়া গেল। অবশ্য পিয়ানো-অ্যাকর্ডিয়ানটি প্রতীচীরই প্রতীক।

নৃত্যে মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী সুখিশভিলি (দলের পরিচালক ইলিকো সুখিশভিলির স্ত্রী) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠা। পুরুষদের মধ্যে নকল দুই মল্লবীরের কুস্তি প্রতিযোগিতার নর্তক গায়ুচাভা, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নৃত্যকলা প্রদর্শক নিমো র‍্যামিশভিলি, এল,

জর্জিয়ান লোকনৃত্য সংকলনের একটি দৃশ্য

ডাম্বাড়ুজে ও, মিথেইড়জে প্রভৃতি দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন। ড্রাম-বাদকদেরও প্রেক্ষাগৃহে হর্ষোৎফুল্ল করতালিধ্বনি তুলেছিলেন।

জর্জিয়ান নৃত্য-আসরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শিশু রংমহলের দ্বারা জর্জিয়ান নৃত্য সম্প্রদায়ের সংবর্ধনা ঃ

গেল বুধবার, ২৮শে মার্চ শিশু রংমহলের খুদে শিল্পীরা সোবিয়েত রাশিয়া থেকে আগত জর্জিয়ান নৃত্য-শিল্পীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁদের প্রীতিবিধানের জন্যে রবীন্দ্র-রচনা থেকে সংগৃহীত আলেখ্য "আনন্দ" নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেছিল। কবির চোখ দিয়ে বিভিন্ন ঋতুতে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখে নাচে-গানে সেই প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত হয়ে যাওয়ারই আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে এই "আনন্দ" নৃত্যনাটিকাতে। অল্প-বয়সী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে যে সহজ স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ করে, তার সুর এসে পৌঁছোয় প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শকের অন্তরে। এবং এর সঙ্গে আছে সুষ্ঠু মঞ্চপরিকল্পনা, আলোক-সম্পাত ও যন্ত্রসংগীত। জর্জিয়ান নৃত্য-শিল্পীরা শিশু শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখে প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে "নাইনথ সার্কল ঃ

যুগোশ্লাভ ফিল্ম চিত্র, ১৯৬০ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত "দি নাইনথ সার্কল" ছবিখানি গেল ১লা এপ্রিল, রবিবার স্থানীয় রক্সি সিনেমায় প্রদর্শিত হয়। ফ্রান্স স্টিগলিক পরিচালিত এই ছবিখানিতে নাৎসী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটি 'জু'-মেয়েকে একটি ছেলে মাত্র আনুষ্ঠানিক বিবাহ করবার পর ধীরে ধীরে দু'জন কিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষপর্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করে এবং নাৎসী কনসেনট্রেসন ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্যে ছেলেটি কি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ক'রেও ব্যর্থতাকে বরণ করে, তারই প্রাণস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রুথ এবং ইভোর ভূমিকায় ডুসিকা জেগারাক এবং বোরিশ ডার্ণিকের অভিনয় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। আইভ্যান ম্যারিনকেকের আলোকচিত্রের কাজ আলোছায়ার সংমিশ্রণে ভাবপ্রকাশক হয়েও বাস্তব-ধর্মী। সিঁড়িতে মেয়েটিকে অনুসরণকারী ছেলেকে যে-ভাবে ক্যামেরাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে, তা অত্যন্ত অভিনব এবং ভাবোদ্দীপক।

অগ্রগামীর "কান্না" ঃ

ডি-লুক্স ফিল্ম নিবেদিত এবং অগ্রগামী শিল্পগোষ্ঠী প্রযোজিত ও পরিচালিত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে গঠিত নবতম চিত্র "কান্না" আসছে ১২ই এপ্রিল থেকে উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলায় দেখানো হবে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, শ্যামল, শোভা সেন, সুলতা চৌধুরী ও নবাগতা নন্দিতা বসু। এতে সুরযোজনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

জালান প্রোডাকসন্স-এর "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" ঃ

শ্যামলাল জালান প্রযোজিত এবং তপন সিংহ পরিচালিত "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" খুব শিগ্গিরই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় এবং বলিষ্ঠ উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক তপন সিংহ নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, রঞ্জনা বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, লিলি চক্রবর্তী, নিভাননী প্রভৃতিকে। এতে সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ জন্মোৎসব ঃ
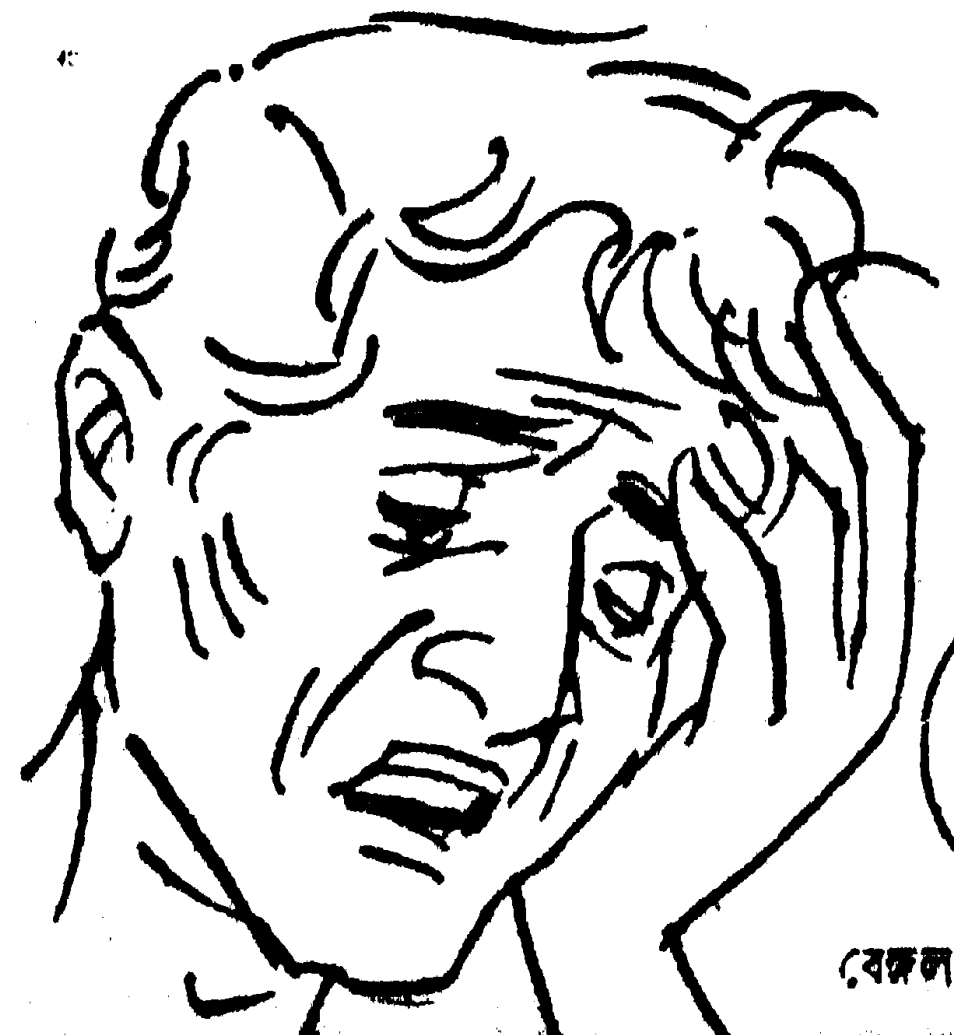
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী যাতে দেশের মানুষের নিকট সুলভ হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে গত ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায়—বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মরণসভায় একটি প্রস্তাব করা হয়। নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দজী পৌরোহিত্য করেন। এই সমাবেশে খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমা-লোচক ও নাট্যকার গিরিশ-প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে মহাকবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। এই সভায় প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী এবং প্রতিষ্ঠানও নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদনে যুক্ত করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের লোকোত্তর

প্রতিভার উল্লেখ করে বলেন যে, এই আশ্চর্য-শিল্পীর অনন্য প্রভাব শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত নয় আজ পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হচ্ছে। তিনি আশা ও বিশ্বাস করেন যে গিরিশচন্দ্রের আদর্শ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে দেশের সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণ আজকার হতাশা হতে দেশকে রক্ষা করে এক মহৎ আশায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ডাঃ অজিতকুমার ঘোষ এক মনোজ্ঞ আলোচনায় যে যুগে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব এবং যুগপটভূমিকায় গিরিশ-প্রতিভার স্ফুরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেন। নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তাঁর আদর্শ কার্যকর করার আবেদন জানান।

নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে গিরিশ-প্রতিভার যে বিশেষ দিকটির স্ফুরণ হয় তার উল্লেখ করেন।

নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরযূবালা, শ্রীতারক বাগচি ও বৃহস্পতির আসরের সভাগণ আলোচনা, গিরিশরচনা পাঠ ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয়ের দ্বারা মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সাজ ও আওয়াজের নবপ্রচেষ্টা ঃ

সাজ ও আওয়াজের পতাকাতলে রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির সাঙ্গীতিক রূপায়ণের অসামান্য সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরকার ভি বালসারা তাঁর পরবর্তী প্রয়াসরূপে "রামায়ণ"-এর সংগীত রূপায়ণের কাজে ব্রতী হয়েছেন। জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি আর একবার "দেবতার গ্রাস" ও তাঁর একক পিয়ানো সংগীত পরিবেশন করতে মনস্থ করেছেন।

* * *

পূর্বাঞ্চল চলচ্চিত্র কমিটির সুপারিশ ঃ

পূর্বাঞ্চল চলচ্চিত্র অ্যাওয়ার্ড কমিটি রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র সম্মান প্রতিযোগিতার জন্যে প্রেরিত বাংলা, ওড়িয়া ও অসমীয়া ছবিগুলি দেখে তাঁদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেল। এই কমিটির মতে পূর্বাঞ্চলে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান পাবার অধিকারী "সমাপ্তি" (সত্যজিৎ রায় পরিচালিত)। আর যে চারখানি বাংলা ছবি তাঁদের সুপারিশ পেয়েছে, তারা হচ্ছে—সপ্তপদী, ভগিনী নিবেদিতা, মেঘ এবং পুনশ্চ।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
তৃতীয় টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২৫৮ রান (পতৌদির নবাব ৪৮, দুরানী ৪৮ নট-আউট এবং জয়সীমা ৪১; হল ৬৪ রানে ৩, ওরেল ১২ রানে ২ এবং সোবার্স ৪৬ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৮৭ রান (সারদেশাই ৬০, মঞ্জরেকার ৫১ এবং সুর্তি ৩৬। গিবস ৩৮ রানে ৮ এবং স্টেয়ার্স ২৪ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৭৫ রান (জো সলোমন ৯৬, রোহন কানহাই ৮৯, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ৭৭, কনরাড হান্ট ৫৯, সোবার্স ৪২, এ্যালেন নট-আউট ৪০ এবং ম্যাকমরিস ৩৯। দুরানী ১২৩ রানে ২, নাদকার্ণী ৯২ রানে ২, বোরদে ৮৯ রানে ২ এবং উমরীগড় ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (২৩শে মার্চ) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

দ্বিতীয় দিন (২৪শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস : ২৬৩ রান (৪ উইকেটে)। সলোমন ২৩ রান এবং গিবস ১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

বিশ্রামের দিন : ২৫শে মার্চ

তৃতীয় দিন (২৬শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস : ৪২৭ রান (৮ উইকেটে)। ওরেল ৬৪ ও ডেভিড এ্যালান ৯ রান করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন (২৭শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৪৭৫ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—১০৪ রান (২ উইকেটে)। সারদেশাই ৪৭ এবং মঞ্জরেকার ১৪ রান করে নট আউট থাকেন।

পঞ্চম দিন (২৮শে মার্চ) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট পূর্বে ১৮৭ রানে সমাপ্ত।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

বার্বাদোজের রাজধানী ব্রিজটাউন সহরের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ে উভয় দলের পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট খেলার বিশেষ আকর্ষণ রইলো না। মোট পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর পর তিনটে টেস্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে টেস্ট সিরিজে ইতিমধ্যেই 'রাবার' পেয়ে গেছে। বাকি

ল্যান্স গিব্‌স

দুটো খেলার ফলাফল নিয়ে তাদের বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই, রেকর্ড করা ভিন্ন। ভারতবর্ষের পক্ষে এই দুটো খেলার গুরুত্ব এই কারণে আছে যে, তারা বিগত তিনটে টেস্ট খেলায় যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার কিছুটা লাঘব হবে যদি বাকি দুটো টেস্টে সাফল্য লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজ বাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩টে টেস্ট সিরিজ খেলেছে এবং পাঁচটা টেস্ট খেলার প্রতিটি সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পায়নি। সেই দিক থেকে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজের বাকি চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলার গুরুত্ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে কমেনি। তারা ইতিমধ্যে ৩টে খেলায় জয়লাভ ক'রে 'রাবার' পেয়ে গেছে। বাকি দুটো টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়লাভ করলে তাদের টেস্ট খেলার ইতিহাসে জাতীয় রেকর্ড হবে—টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলায় জয়লাভ ক'রে 'রাবার' লাভ।

ব্রিজটাউনের সদ্য সমাপ্ত কেনসিংটন ওভাল মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর খেলতে নামেননি। বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় তাঁর মাত্র দু' রানের মাথায় তিনি গ্রিফিথের বাম্পার বলে গুরুতররূপে আহত হয়ে ঐ খেলা থেকে বরাবরের মত অবসর গ্রহণ করেন। তৃতীয় টেস্ট খেলার সময়েও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। কন্ট্রাক্টরের অনুপস্থিতিতে দলের সহ-অধিনায়ক পতৌদির নবাব ভারতীয় দল পরিচালনা ক'রে বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন—সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই দেশের পক্ষে পিতা-পুত্রের অধিনায়কত্ব লাভ। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই দেশের পক্ষে পিতা-পুত্রের অধিনায়কত্ব লাভ বিরল। এ-ব্যাপারে প্রথম নজির স্থাপিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এফ জর্জ মান যখন ইংল্যাণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন। জর্জ ম্যানের পিতা ফ্র্যাঙ্ক ম্যান ইংল্যাণ্ড দল পরিচালনা করেন ১৯২২-২৩ সালে।

ওরেল যথেষ্ট কূটনীতির পরিচয় দিয়েছেন। টসে জয়ী হয়েও তিনি ভারতবর্ষকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়েছেন। গ্রিফিথের বলে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টরের আহত হওয়ার ঘটনাকে তিনি যে অনেকখানি সহানুভূতির চোখে দেখেছেন, তা এই সিদ্ধান্তে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় দলের পক্ষে যে সব অভিযোগ উঠেছিল ওরেল তার মুখ বন্ধ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী পরিমাণ বাম্পার এবং বাউন্সার বল খেলতে অভ্যস্ত নয় এবং ভারতবর্ষের ব্যাটিং বিপর্যয়ের প্রধান কারণও তাই বলা হয়েছিল। তৃতীয় টেস্ট খেলায় তাই দেখলাম গোণাগুণতি বাম্পার বা বাউন্সার বল দেওয়া হয়েছে। বল থ্রো করার অথবা আম্পায়ারিং সম্পর্কে কোন অভিযোগ ওঠেনি। এদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তাদের সুনাম অনুযায়ী ফিল্ডিং করতে পারে নি—চারটে 'ক্যাচ' পড়ে গেল। তবুও প্রথম দিনেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ২৫৮ রাণে শেষ হয়ে যায়। উইকেট রাণ তোলার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। অভিযোগ করার মুখ রইলো না। ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। এরপর ওরেল নিজ দলের ব্যাটিংয়ের স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে মন্থর গতিতে ব্যাট করার পন্থা অবলম্বন

করেন। উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার, পিটিয়ে না খেলে, ধীরস্থির ভাবে চতুর্থ দিন পর্যন্ত খেলাটা গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত উইকেটে ভারতীয় দলকে পুনরায় খেলতে দেওয়া আর ভারতবর্ষের থেকে ২৫০ রাণের মত বেশী রাণ ক'রে দলকে এগিয়ে রাখা। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে কম রাণ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে পরাজয় বরণ করে; সুতরাং ভারতবর্ষের ব্যাটিংয়ের দৌড় সম্পর্কে ওরেলের গণনা ভুল হয়নি। তবুও শেষের দু'দিনে উইকেট যতটা খারাপ হবে ধারণা করা হয়েছিল তা মোটেই হয়নি। ফাস্ট এবং স্পিন—দুই শ্রেণীর বোলারই এখন ভারতীয় খেলোয়াড়দের 'জুজু' হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব আক্ষেপ করেই জনৈক সমালোচক ভারতীয় খেলোয়াড়দের 'আণ্ডার হ্যাণ্ড' বলে 'কেঁচে গণ্ডূষ' করতে প্রস্তাব করেছেন। তৃতীয় টেস্ট খেলার শেষে ভারতীয় দলের অস্থায়ী অধিনায়ক পতৌদির নবাব মন্তব্য করেছেন, কন্ট্রাক্টরের আহত হওয়ার ঘটনা দলের মনোবল যথেষ্ট ভেঙে দিয়েছে এবং যা বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন বিপর্যয় ঘটে গেছে। অধিনায়কের এই মন্তব্য একদিক থেকে সত্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অন্য দিক থেকে ভারতীয় দলের খেলার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, খেলাটি সুনিশ্চিতভাবে অমীমাংসিত থেকে যাবে এই ধারণা নিয়ে খেলার দরুণই ভারতীয় দলকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা আত্মপ্রসাদে মোহাচ্ছন্ন হয়ে 'নরম' বল যেভাবে খেলে দলের পতন ঘটিয়েছেন সে রকম মার 'নরম' বলে দেওয়া উচিত হয়নি। ৪২ ওভার খেলার পর বল বেশ নরমই ছিল এবং অধিনায়ক ওরেল ভারতীয় দলের খেলার মতিগতি লক্ষ্য রেখে শেষ পর্যন্ত পুরনো বলেই কাজ হাসিল করেন।

টসে জয়ী হয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল রাণ করার উপযুক্ত উইকেটে ভারতীয় দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। নিজের দল সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা না থাকলে কোন অধিনায়কই এইভাবে বিপক্ষ দলকে দান ছাড়েন না। এ কাজ দলের পক্ষে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের সামিল। জুয়া খেলার সমানও বলতে পারেন। আবার বলতে পারেন, দুর্বল দলের প্রতি করুণা প্রকাশ।

লাঞ্চের সময় ভারতীয় দলের সমর্থকদের থাওয়া মাথায় উঠে গেল—৪টে উইকেট পড়ে মাত্র ৯০ রাণ, দু'ঘণ্টার খেলায়। উইকেটে তখন খেলছেন উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব, দুজনেরই রাণের ঘরে ১ রাণ। ৫ম উইকেট পড়ে যায় দলের ১১২ রাণের মাথায়—উমরীগড় ৩৬ মিনিট খেলে মাত্র ৮ রাণ ক'রে হলের বলে এ্যালানের হাতে ধরা পড়েন। ৬ষ্ঠ উইকেটে পতৌদির সঙ্গে খেলতে নামেন বোরদে। এই জুটি ৪৪ মিনিটের খেলায় ৪১ রাণ তুলে দিয়ে ভেঙ্গে যায়, বোরদে ১৯ রান করে আউট হ'ন। ৮ উইকেট পড়ে যখন দলের ১৮৮ রান তখন ৯ম উইকেটে নাদকার্ণীর সঙ্গে দুরাণী খেলতে নামেন। এই ৯ম উইকেটের জুটি নাদকার্ণী এবং দুরাণী ৫০ মিনিটের খেলায় দলের ৪২ রাণ তুলে দেন। দুরাণীকে হল বাউন্সার এবং স্টেয়ার্স বাম্পার ছাড়েন। দুরাণী স্টেয়ার্সের বাম্পার বলে 'হুক' ক'রে বাউণ্ডারী করেন। দলের ২৩০ রাণের মাথায় দলের ৯ম উইকেট (নাদকার্ণী) পড়ে যায়। শেষ খেলোয়াড় দেশাই খেলতে নামেন। শেষ উইকেটে দলের ২৮ রাণ যোগ হয়। ২৫৮ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মোট ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিটের খেলায়। দুরাণী ৪৮ রাণ ক'রে নট আউট থেকে যান। এই ৪৮ রাণ তুলতে তাঁর ৮০ মিনিট সময় লাগে, বাউণ্ডারী করেন ৮টা। পতৌদির নবাবও করেন ৪৮ এবং একই সময়ের খেলায়, তবে বাউণ্ডারী ৬টা। ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচ-জন ব্যাটসম্যান ৯৫ রাণ করেন এবং শেষের ৬ জনে ১৬১ রাণ। প্রতিবারের মত এবারও শেষের খেলোয়াড়রাই ভারতীয় দলের মুখ রক্ষা করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল কড়া ফিল্ডিং করলে ভারতীয় দলের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত। জয়সীমা, সারদেশাই, দুরাণী এবং দেশাইয়ের 'ক্যাচ' ফসকে যায়। উইকেট-কিপার এ্যালান ৪টে 'ক্যাচ' ধরেন।

এই দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র ১০ মিনিট খেলবার সময় পায় এবং কোন উইকেট নষ্ট না ক'রে ৫ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনের ৫½ ঘণ্টার খেলায় পূর্ব দিনের ৫ রাণের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২৫৮ রাণ যোগ করে, ৪টে উইকেট খুইয়ে। লাঞ্চের সময়ের স্কোর ৬৭ রাণ (১ উইকেট), চা-পানের সময়ের স্কোর ১৮২ রাণ (২ উইকেটে) এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর দাঁড়ায় ২৬৩ রাণ (৪ উইকেটে)।

ভারতীয় দলের নিখুঁত বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে রাণ তুলতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। ১২০ মিনিটের খেলার মাত্র ৬২ রাণ ওঠে। লাঞ্চের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে আর দেরী নেই, শেষ ওভার খেলা হচ্ছে। এই শেষ ওভারের সর্বশেষ বলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬৭ রাণের মাথায় প্রথম উইকেট পড়লো, ম্যাক্‌মরিস ৩৯ রাণ ক'রে দুরাণীর বলে উইকেট-কিপার ইঞ্জিনীয়ারের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। দ্বিতীয় উইকেটে হাণ্টের সঙ্গে খেলতে নামেন কানহাই। দলের ১৫২ রাণের মাথায় হাণ্ট নিজস্ব ৫৯ রাণ ক'রে খেলা থেকে বিদায় নেন। হাণ্ট ২১৫ মিনিট খেলে ৫৯ রাণ করেন, বাউণ্ডারী ৭টা। দ্বিতীয় উইকেটে হাণ্ট এবং কানহাই দলের ৮৫ রাণ তুলেন। তৃতীয় উইকেটে কানহাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধেন সোবার্স।

লাঞ্চের পর থেকেই কানহাই মাথা চাড়া দিয়ে খেলতে থাকেন। নাদকার্ণীর বলে দলের ১১৯ রাণের মাথায় কানহাই একটা 'ক্যাচ' তুলেন। উমরীগড় বলটা হাত থেকে ফেলে দেন; কানহাইয়ের রাণ তখন মাত্র ২৬। সেই কানহাই ৮৮ রাণের মাথায় আবার একটা 'ক্যাচ' তুললেন সুর্তির বলে, এবার 'ক্যাচ' ফেলে দেন দুরাণী। এর পরই মাত্র ১ রাণ ক'রে নিজস্ব ৮৯ রাণের এবং দলের ২২৬ রাণের মাথায় কানহাই রাণ আউট হন। দুরাণী কানহাইয়ের 'ক্যাচ' ফেলাতে বোলার সুর্তি হাত কামড়েছিলেন, এবার তিনিই নিখুঁতভাবে বল ছুঁড়ে কানহাইকে রাণ-আউট করেন।

কানহাই তাঁর ৮৯ রাণ তুলতে ১৩০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন, বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১২টা আর ওভার-বাউণ্ডারী ৩টে। কানহাই এবং সোবার্সের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৭৪ রাণ ওঠে। চতুর্থ উইকেট (সোবার্স) পড়ে যায় দলের ২৫৫ রাণের মাথায়। পঞ্চম উইকেটে সলোমনের সঙ্গে গিবস খেলতে নামেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাণ ২৬৩, ৪ উইকেটে (সলোমন ২৩ এবং গিবস ১ রাণে নট আউট)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ রাণে অগ্র-গামী, হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

তৃতীয় দিনের খেলাতেও ভারতীয় দলের বোলিং খুবই নিখুঁত হয়। রাণের গতি মন্থর—খুবই মন্থর। প্রথম দু'-ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৫৮ রাণ। সারাদিনের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ১৬৪ রাণ—উইকেট পড়ে আরও ৪টে। অর্থাৎ মোট রাণ দাঁড়ায় ৪২৭ রাণ, ৮ উইকেটে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৬৯ রাণে অগ্রগামী হয়। হাতে জমা থাকে ২টো উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২—০ খেলায় অগ্রগামী থেকেও অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করে। খেলার ধরণ দেখে দর্শক সাধারণ খুশী হতে পারেননি। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মন্থর গতিতে রান করার নীতি ক্রিকেট খেলার স্বার্থের পরি-পন্থী। এই মতবাদের বড় সমর্থক ফ্রাঙ্ক ওরেল নিজেও। কিন্তু এই দিনে ৬ষ্ঠ উইকেটে সলোমনের সঙ্গে খেলতে নেমে ওরেল নিজেই তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধতা করলেন—১০২ মিনিটে ৮ রাণ, ১৫০ মিনিটে ১৯ রাণ, ১৬০ মিনিটে ২৫ রাণ এবং ২৮০ মিনিটের খেলায় ওরেলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। এই দিনে তিনি তাঁর ৬৪ রাণ করেন ৩০০ মিনিট খেলে। সমস্ত মাঠ জুড়ে ওরেলের খেলায়

বিরক্ত ভাব। ওরেলের কথার সংগে তাঁর খেলার কোন মিল নেই—ওরেলের এই নীতি বেশীর ভাগ দর্শকই বরদাস্ত করেননি। ওরেলের প্রত্যেকটি বল খেলার আগে এবং পিছনে টিট্‌কারী, হাততালি আর জুতোর আওয়াজ ফেউয়ের মত সমানে লেগে ছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৩০০ রাণ পূর্ণ হ'তে ৪০৮ মিনিট সময় লাগে। উইকেটে তখন ছিলেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সলোমন এবং ওরেল। বেচারা সলোমন! মাত্র চার রাণের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। ৬ষ্ঠ উইকেটে (সলোমন ৯৬ রাণ) পড়ে যায় দলের ৩৭৮ রাণের মাথায়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে সলোমন এবং ওরেল ১৯৭ মিনিটের খেলায় ৯৬ রাণ তুলে দেন। সলোমন ২৮৫ মিনিট খেলেছিলেন, বাউন্ডারী বাড়ি মেরেছিলেন ১১টা। এর পর ৭ম উইকেট (স্টেয়ার্স' ৭ রাণ) দলের ৩৯৪ রাণে, ৮ম উইকেট (হল ৩ রাণ) দলের ৩৯৯ রাণের মাথায় পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে ওরেলের সংগে জুটি বাঁধেন এ্যালান। খেলা ভাঙ্গার সময়ে স্কোর বোর্ডে ঝুলে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪২৭ রাণ, ৮ উইকেটে—ওরেল ৬৪ এবং এ্যালান ৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনে দলের ৪৫৪ রাণের মাথায় ওরেল নিজস্ব ৭৭ রাণ করে উমরীগড়ের বলে বোল্ড আউট হন। ওরেল ৩৫১ মিনিট খেলেছিলেন, বাউন্ডারী মেরেছিলেন মাত্র ৭টা। ৯ম উইকেটের জুটিতে ওরেল এবং ডেভিড এ্যালান মূল্যবান ৫৫ রান তুলে দেন। শেষ উইকেটে খেলতে নামেন ভ্যালেনটাইন। ১০ম উইকেটের জুটিতে ২১ রাণ ওঠে, ভ্যালেনটাইন ৪ রান করে আউট হ'ন। ডেভিড এ্যালান ৪০ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। এই দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭২ মিনিট খেলে পূর্ব দিনের ৪২৭ রাণের (৮ উইকেটে) সংগে ৪৮ রাণ যোগ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৭৫ রাণে শেষ হয়, ১২ ঘন্টা ২২ মিনিটের খেলায়। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১৭ রাণে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ২৩৬ রাণে অগ্রগামী হয়ে এক ইনিংস এবং ১৮ রাণে জয়ী হয়েছিল।

লাঞ্চের ৪০ মিনিট আগে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। দলের তখনও কোন রাণ উঠেনি, জয়সীমা আউট হলেন স্টেয়ার্সে'র বলে এল-বি-ডবলিউ হয়ে। সারদেশাইয়ের সংগে খেলতে নামেন সুর্তি।

সুর্তি ১৩৫ মিনিট খেলে নিজস্ব ৩৬ রাণ ক'রে দলের ৬০ রাণের মাথায় স্টেয়ার্সে'র বলেই এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হ'ন। তৃতীয় উইকেটে সারদেশাইয়ের সংগে জুটি বাঁধলেন মঞ্জরেকার। এইদিন আর কিছু অঘটন ঘটেনি, রাণ দাঁড়ায় ১০৪, ২ উইকেটে। সারদেশাই ৪৭ এবং মঞ্জরেকার ১৪ রান করে নটআউট থাকেন। ভারতবর্ষের এই ১০৪ রাণ তুলতে ৪ ঘন্টার সামান্য বেশী সময় লাগে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ১৪৯ রাণ, ২ উইকেটে। সারদেশাই ৬০ এবং মঞ্জরেকার ৪১ রাণ করে নটআউট ছিলেন। এই তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গার জন্যে ওরেল উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। আটজন বোলারকে দিয়ে বল দিয়েও লাঞ্চের আগে তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গতে পারেননি।

খেলায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভের মধ্যে যথেষ্ট শিহরণ এবং আনন্দ আছে। ক্রিকেট খেলায় তার সম্ভাবনা অন্যান্য খেলার থেকে অনেক বেশী। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। সমস্ত কিছু শিহরণ এবং অনিশ্চয়তা যেন তোলা ছিল লাঞ্চের পরবর্তী খেলার জন্যে। লাঞ্চের পর তখন ২৫ মিনিট খেলা হয়েছে; অফ্-স্পিনার লান্স গিবস বল করতে এলেন। এর আগে গিবস ৩৮ ওভার বল ক'রে একটা উইকেটও পাননি, ২৩টা মেডেন পেয়ে ৩২ রান দেন। সুতরাং তাঁর বলে খুব ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি যে আজ খেলতে আসবার সময় তাঁর বাম দিকে শেয়াল যাত্রা করে এসেছেন এ কেউ জানতেন না। বল করতে এসে গিবস ভারতীয় দলের মাথা খারাপ ক'রে দিলেন। ১·৩ ওভার বলে মাত্র এক রান দিয়ে গিবস ভারতীয় দলের ১৫৮ রানের মাথায় সরদেশাইকে, ১৫৯ রানের মাথায় মঞ্জরেকার এবং পতৌদির নবাবকে খেলা থেকে বিদায় করলেন। সারদেশাই ৩০২ মিনিট খেলে তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। মঞ্জরেকার তাঁর ৫১ রান করতে ২৫৫ মিনিট সময় নেন। সারদেশাই এবং মঞ্জরেকারের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৯৮ রান উঠে ২৪৫ মিনিটের খেলায়। চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১৮৭ রানে শেষ হয়ে যায়। লাঞ্চের পর দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১ ঘন্টা ২০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস লাঞ্চের পর ৫৫ মিনিটের খেলায় শেষ হয়েছিল। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়লাভের প্রধান কারণই হ'ল গিবসের ব্যক্তিগত সাফল্য। গিবস ১৫·৩ ওভার বল দিয়ে ১৪টা মেডেন পান এবং মাত্র ৬ রান দিয়ে পর পর ৮টা উইকেট পান। গিবসের বলে ক্যাচ লুফেন সোবার্স ৩টে, ওরেল ২টো, হাণ্ট ১টা এবং উইকেট-কীপার এ্যালান ১টা ক্যাচ ধরেন এবং ইঞ্জিনীয়ারকে ষ্টাম্পড-আউট করেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের বাকি ২টো উইকেট পান স্টেয়ার্স। প্রথম ইনিংসের খেলায় গিবস মাত্র ১টা উইকেট পেয়েছিলেন ২৫ রানে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনটে টেস্ট খেলায় গিবস মোট উইকেট পেয়েছেন ১৭টা (১৫০·২ ওভার, ৬৬ মেডেন, রান ২২৬)। এ পর্যন্ত গিবস ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলে উইকেট পেয়েছেন ৬১টা, ১৫৫৪ রানে।

লান্স গিবস তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন স্বদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালে। ১৯৫৮-৫৯ সালের ভারত-পাকিস্তান সফরে গিবস পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩টে টেস্টে ৮টা উইকেট পান। ভারতবর্ষের বিপক্ষে গিবস মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, কিন্তু কোন উইকেট পাননি। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েই গিবস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে রাতারাতি নাম ক'রে ফেলেন। সিডনির তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলায় গিবস চারটে বলে ৩টে উইকেট পান এবং চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে হ্যাট-ট্রিক নিয়ে ৫টা উইকেট পান। এই সফরের টেস্ট খেলায় লান্স গিবস নিজ দলের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেন (ওভার ১৯২·২, মেডেন ৬৫, রান ৩৯৫, উইকেট ১৯, এভারেজ ২০·৭৮)। এত দিন ভারতীয় দলের কাছে ওয়েসলি হল ছিলেন 'জুজু' এখন আবার লান্স গিবস।

কোন একজন খেলোয়াড়ের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তারই নামে সমস্ত টেস্ট খেলাটি অভিহিত করার রীতি অনেক দিন থেকেই ক্রিকেট মহলে সুপ্রচলিত আছে। সেই দিক থেকে বলবো ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্ট খেলাটি 'ল্যান্স গিবসের খেলা।'

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের প্রকাশিত অমর কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

স্বামী	১·৭৫	পল্লীসমাজ	৩·০০	ছবি	১·৫০
পণ্ডিতমশাই	২·৫০	শুভদা	৩·৩০	বড়দিদি	২·০০
শেষ প্রশ্ন	৫·৫০	শ্রীকান্ত (২য়)	৩·৭৫	অরক্ষণীয়া	১·৭৫
নববিধান	২·০০	মেজদিদি	২·০০	চরিত্রহীন	৬·৫০
বৈকুণ্ঠের উইল	১·৭৫	নিষ্কৃতি	১·৭৫	গৃহদাহ	৬·০০
চন্দ্রনাথ	২·২৫	হরিলক্ষ্মী	১·৭৫	অনুরাধা, সতী	
দেবদাস	২·৫০	পরিণীতা	২·০০	ও পরেশ	১·২৫

নাটক

বিপ্রদাস	১·৫০	রাজলক্ষ্মী	২·০০	বিজয়া	২·৫০
গৃহদাহ	২·৫০	পথের দাবী	২·০০	ষোড়শী	২·৭৫
রমা	২·০০	নিষ্কৃতি	১·৫০	দেবদাস	২·০০

প্রবন্ধ গ্রন্থ

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী ৫·০০

অ্যাসোসিয়েটেড-এর
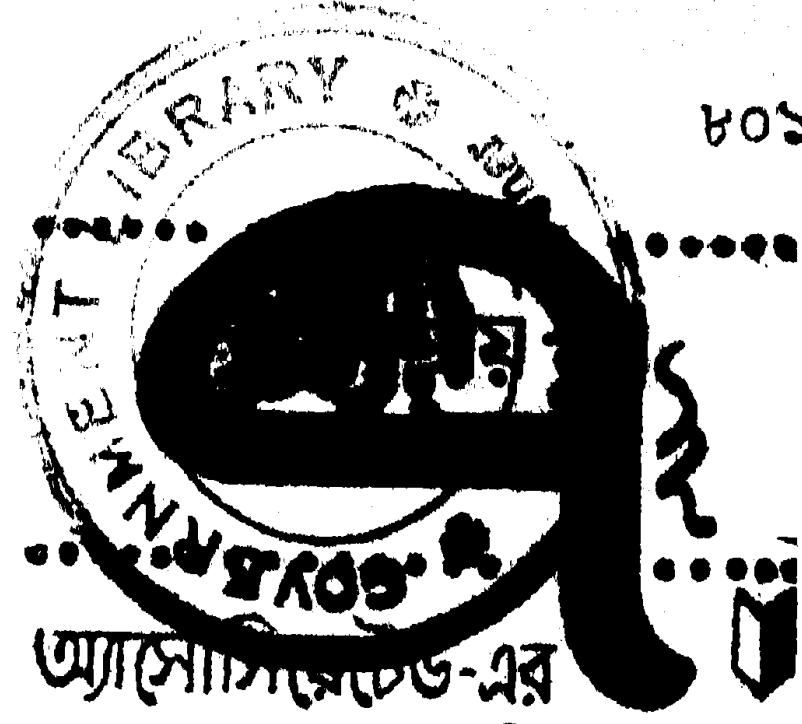
গ্রন্থতিথি

৭ই ফাল্গুনের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এমন দিনে ৩·৭৫

৭ই মাঘের বই

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক
অঘটন আজো ঘটে ২·২৫
[কাহিনী : শ্রীদিলীপকুমার রায়]

সম্প্রতি প্রকাশিত

'রবীন্দ্র-জীবনীকার'
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

শ্রীকানাই সামন্তের
রবীন্দ্র-প্রতিভা ১০·০০

আমাদের প্রকাশনার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ও উপহারযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পরাশর ২·৭৫

লীলা মজুমদারের
ঝাঁপতাল ২·৭৫

'বনফুল'-এর
জলতরঙ্গ ৪·৫০

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের
রিক্‌শার গান ৫·০০

চিত্রিতা দেবীর
দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ফুটলো কুসুম ২·০০

নবেন্দু ঘোষের
প্রথম বসন্ত ২·০০

গল্পগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সপ্তপদী ২·০০

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিলো ৩·২৫

দ্বারেশ শর্মাচার্যের
জ্যোতিষীর ডায়েরী ২·৫০

নবেন্দু ঘোষের
পাপুই দ্বীপের কাহিনী ৩·৩০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মালাচন্দন ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জাতিস্মর ২·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বাজীমাৎ ১·৭৫

সন্তোষকুমার ঘোষের
পারাবত ৩·৫০

কবিতা গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম গ্রন্থ
কখনো মেঘ ৪·০০
[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন পারিপাট্যে সমুজ্জ্বল]

মোহিতলাল মজুমদারের
সুনির্বাচিত কবিতা ৪·০০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫·০০

প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল)
সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা ৫·০০
[বিশেষ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সম্পাদিত]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচী পত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 13th April, 1962
40Naya Paise.

ইংরাজি অথবা বাংলা, শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সে বিষয়ে 'অমৃতে'র ৪৭ সংখ্যায় আমরা মন্তব্য করেছিলাম। আমরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছিলাম, বাংলাভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা এ সংশয়ও প্রকাশ করেছিলাম যে, হাওয়ার গতি বোধহয় অন্যদিকে।

হ'য়েছেও ঠিক তাই। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষার সপক্ষে ভাষণ দেওয়ার পর অন্যতমা অতিথি শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর সমাবর্তন ভাষণে ইংরাজির অনুকূলে মত-প্রকাশ করেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ীও তাঁর বক্তৃতায় সেই প্রস্তাবেই সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তারপর থেকে ইংরাজি বনাম বাংলা বিতর্কটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যিক মহলেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু প্রায় সকলেই এত উচ্চকণ্ঠে নিজ-নিজ বক্তব্য প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত যে, অন্যের বক্তব্য ধীরভাবে বিচার করে দেখা বোধহয় অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। সেইজন্যেই আমরা দ্বিতীয়বার এই একই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

সমস্যাটা এ নয় যে, ইংরাজি রাখব কি বাংলা রাখব। আলোচ্য হল এই যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজিকে বজায় রাখা হবে, অথবা মাতৃভাষার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা মেনে নেব। এর সঙ্গে ইংরাজিকে বিদায় করার কোনো সম্পর্ক নেই। ভাষা হিসাবে আমরা অবশ্যই ইংরাজি শিখব। কারণ বর্তমান জগতের ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় ইংরাজিই যে সব থেকে কার্যকর মাধ্যম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যাঁরা ইংরাজির সপক্ষে, তাঁরা নিছক ইংরাজি-শিক্ষায় খুশি না হ'য়ে সমস্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থাকেই ইংরাজির মুখাপেক্ষী ক'রে রাখতে চান, আপত্তি ওঠে সেইখানেই।

উপাচার্য শ্রীযুক্ত লাহিড়ী ইংরাজির সমর্থন করতে গিয়ে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন, যেটা ভারতের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর আশঙ্কা, প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যেই যদি সেই অঞ্চলের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তা'হলে জাতীয় সংহতি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাবে। এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিতে পারত, যদি ভাষা হিসাবেও ইংরাজির চর্চা বন্ধ হ'য়ে যেত। কিন্তু কেউই তো তেমন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। ইংরাজি যেমন শেখানো হচ্ছে সেই-ভাবেই শিখিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলির শিক্ষাদান মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হলে অসুবিধাটা ঠিক কোথায় হবে তা বোঝা মুস্কিল।

আসলে আমাদের চিন্তাসূত্রের মধ্যেই কোথায় যেন একটা জট পাকিয়ে উঠেছে। যাঁরা রক্ষণশীল এবং কোনো রকম পরিবর্তনের নামেই যাঁরা বিচলিত হ'য়ে ওঠেন, তাঁরা যতোই না কেন ইংরাজির মহিমা প্রচার করুন, অনেক উপকারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদেশী ভাষা যে আমাদের চিন্তাপঙ্গুতার প্রশ্রয় দিয়েছে তাও প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। মেকলের বিষবৃক্ষ সত্যিই তার বিষময় ফল উপহার দিতে শুরু করেছে। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হ'য়ে সমাজের এক স্তরের মানুষ এমন একটি নতুন কৌলীন্যের আস্বাদ পেয়েছেন যা তাঁরা দেশের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত নন। সম্ভবত সেইজন্যেই এত 'গেল গেল' রব; কিন্তু রাজ্য সরকার যখন মাতৃভাষাকে রাজ-সম্মান দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছেন, তখন শিক্ষার বাহন হিসাবেও মাতৃভাষার দাবি বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে 'অমৃতে'র বর্তমান সংখ্যার 'মতামত' বিভাগে যে চিঠিখানি প্রকাশিত হল, যুক্তিবত্তার দিক দিয়ে তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। পত্র-লেখক আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় সু-উন্নত দেশ জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়ে পর-ভাষা ইংরাজির শিক্ষা-মাধ্যম ছাড়াই কীভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হওয়া যায় তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। আমাদের দেশেও এককালে ইংরাজি শেখা, ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতেই স্বপ্ন-দেখার যে দুরূহ তপশ্চর্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অজস্র বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ইংরাজিতে কবিখ্যাতি লাভের প্রয়াসী শ্রীমধুসূদনের মর্মান্তিক বিলাপোক্তিই তাঁদের পরম ব্যর্থতার স্মারক হ'য়ে আছে। দুঃখের বিষয়, প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রামের পর যে স্বপ্নভঙ্গের ফলে উক্ত মহাকবি মাতৃভাষারূপ খনির সন্ধান পেয়ে প্রায় ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে উঠেছিলেন, সে সাধনার ফলশ্রুতিতে আমরা উত্তরাধিকারী হ'তে পারিনি। তাই, পোষমানা পাখির মতো বাহিরের বন্ধন ঘুচে গেলেও আমরা ঘুরে-ফিরে সেই পুরনো খাঁচাতেই ফিরে যেতে চাই। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়!

কবিতা
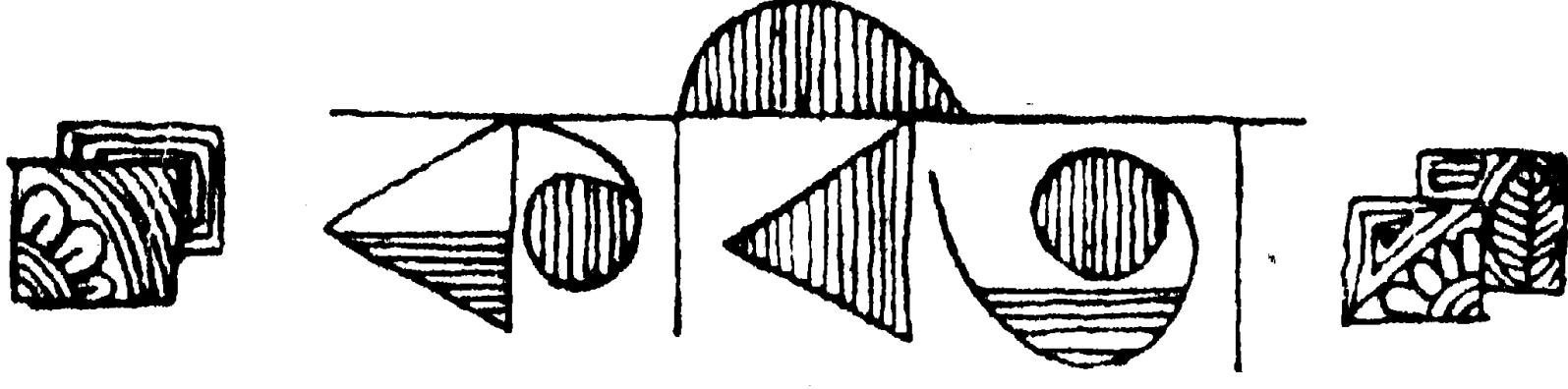
কানামাছি—আন্তর্জাতিক

হরপ্রসাদ মিত্র

হাওয়ায় সন্ধ্যার গন্ধ—এখানটা বৃহৎ বন্দর,
জাহাজে আলোর মালা নিচে জল। রাতের জেটিতে
আমাকে আসতেই হয়। দেখতে হয়। ধরি একে তাকে।
চলছে সোনার ব্যাবসা। এ খেলাটা আন্তর্জাতিক।
আমি এ বৃহৎ বৃত্তে—কানামাছি,—সামান্য চেতনা—
ভঙ্গুরে জীবিকা মাত্র,—তাই ঘুরি,—ঈশ্বর জানেন।
কেউ ধরা পড়ে, কেউ সৌম্য মুখে বিপদ এড়িয়ে
আবার সমুদ্রে ভেসে চলে যায় নতুন হাওয়াতে॥

সোনায় দেদীপ্যমান পৃথিবীর বিশাল বাজারে
দিন যায়, রাত্রি হয়,—রাত বাড়ে,—আমি সেই রাতে
একটি গভীর কী যে খুঁজে খুঁজে পেয়েছি রাত্রিকে—
তখনো চলছে খেলা সোনার গোলক ছোঁড়াছুঁড়ি
কোনো সূর্যকরোজ্জ্বল ভিন্ন দেশে, অন্যান্য বন্দরে।
এখানে বিরতি মাত্র,—
—রমণী,—বিস্মৃতি।
এ কানামাছির মনে এ-লক্ষ্যও আন্তর্জাতিক।

প্রতিবেশী

মঞ্জুলিকা দাশ

শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বুদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!
সারাদিনমান থাকুক, খাটুক
ওরা নাগরিক হয়ে, তার পরে বিশ্রামের শান্তি পাক
গ্রামে এসে ফিরে, রাত্রিতে ঘুমোক!
বসুক নদীর ধারে এক ছুটি রবিবারে শেষে!

শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বুদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!
পরিচয় হোক বিনিময়ে শহরে ও গ্রামে।
একটি জানালা যেন খোলা থাকে,
অনেক দুয়োর!
পথিকেরা পথ দিয়ে চলে যায়,
মানুষেরা দোর দিয়ে আসে!

ঘুম ভেঙে উঠে হাঁটাপথে ট্রেন ধরে
অফিসে পৌঁছলে পরে মনে হয় যেন,
শহরের লোকগুলো কৃত্রিম, কৃপণ বড়ো
এ শহর ভারী ব্যস্ত, অস্থির অস্থির!
আহা শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বুদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!

*
* *

হাল ধরে বসে আছি

করুণাসিন্ধু দে

হাল ধরে বসে আছি। দুই চক্ষু অপলক চাওয়া
ধোঁয়াটে বর্তুল রেখা দূরপথে, চেনা অচেনার
রঙ ঝরে; গোধূলির তন্ময়তা গাঢ় হিম-ছাওয়া,
সর্বাঙ্গ অবশ করা বধির শ্রবণে বিন্ধ কার
পদধ্বনি, শব্দময় বুকের ছলাৎ তাড়নায়
ছুটে আসে প্রতিশ্রুতিময় ঢেউয়ে, এ-পাড়, ও-পাড়
রোমাঞ্চিত ঝড় তুলে তোলপাড় কম্পিত নৌকায়
অনড় নোঙর খুলে, মজ্জা খুলে খেয়া-পারাপার।

কে আসে চপল ছন্দে এলোকেশী উদভ্রান্ত বাতাসে
অনাত্মীয় ছদ্মবেশে অলক্তক নয়নাভিরাম
চরণ, বাদামে রেখে, হিরন্ময় স্পর্শের নির্যাসে
ফোটায় আলোর ফুল কৌতূহলে। আমি তার নাম,
বংশ, পরিচয় ভুলে যাই নিতে পারানির কড়ি;
বাড়ি আসি শূন্য হাতে, শূন্য বুকে, শূন্য কিযে ধরি!

দূর দর্শন

জৈমিনি

সম্প্রতি কলকাতা করপোরেশনের এক সভায় বিরোধী দলের কয়েকজন পৌরপিতা শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার, পয়ঃপ্রণালী পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে করপোরেশনের কার্য-নির্বাহের ভার মিলিটারীর হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, এবং তা ভালোই হ'য়েছে। কিন্তু যে-মনোভাব থেকে মিলিটারী ডাকার ইচ্ছা জাগে, সেবড় সাধারণ নয়। জৈমিনিও তাই তার অনতি-সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখতে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে।

একথা অবশ্যই ঠিক, বছরের পর বছর ধরে করপোরেশনে যে অবস্থা চলছে তাকে কোনো বিচারেই আদর্শ বলা চলে না। অকর্মণ্যতার ফিরিস্তিটা এতোই সুপরিচিত যে সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এবং সত্যি বলতে কি, এমন একটা দুঃসহ অবস্থা বেশীদিন চললে শুধু মিলিটারী কেন, দমকল বা ভূতের রোজাও ডাকতে চাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সময়টা এখন বড়ই খারাপ. নিজেদের অসহায়তা প্রকাশের সময়ও এখন ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। নয়তো একটা 'হিতে বিপরীত' ঘটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

পৃথিবীর মানচিত্রটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। মিলিটারীর আজ কী দোর্দণ্ড প্রতাপ। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রতিদিনই খবরের কাগজের হেডলাইন অধিকার করে বসছে। দিকে দিকে আজ কেবল গোপন ষড়যন্ত্র, বেয়োনেটের ঝলকানি এবং দ্রুত পট-পরিবর্তন। প্রতিদিনই নতুন নতুন বিস্ময় —গোয়েন্দা সিরিজের গল্পের চেয়েও যা রোমাঞ্চকর এবং রোমহর্ষক।

বিশেষ ক'রে এশিয়ার যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত তার কথা ভাবুন। পাকিস্তানের মিলিটারী শাসন তো পুরনো ঘটনা, নেপালের সরকার-চ্যুতি এবং ব্রহ্মদেশের সামরিক অভ্যুত্থানও বাসি-খবর হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া উত্তরে রয়েছে চীনের সামরিক ছাউনি এবং দক্ষিণে লংকাকাণ্ডের গোপন প্রশ্রয়দাতা হিসাবে গভর্ণর জেনারেলের পদচ্যুতি। এরই মাঝখানে, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপের মতো ভারতবর্ষ। গণতন্ত্রের সাধনা চলছে এদেশে; ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্নিপরীক্ষা।

হঠাৎ এর মধ্যে মিলিটারীর নাম শুনলে চমকে উঠতে হয় তাতে সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতের মতো বিশাল দেশ, যেখানে দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য আছে, সেখানে প্রতিবেশী অনগ্রসর দেশগুলির মতো রাতারাতি মিলিটারী শাসন কায়েম হ'য়ে বসা সম্ভব নয়। কিন্তু মিলিটারী আসার যেটা প্রাথমিক শর্ত, অর্থাৎ নিজেদের চিন্তাপঙ্গুতা এবং অসহায়তা-বোধ, তা যে এখানে একেবারেই নেই তাই বা বলি কী করে! ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ঈশ্বর যাকে ধ্বংস করতে চান প্রথমে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটান। সেই বুদ্ধিভ্রংশতার ছাপই যেন দেখতে পেলাম পৌর-পিতাদের সেদিনকার প্রস্তাবে। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

এবং অবহিত হওয়া উচিত, মিলিটারী শাসনের প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে।

মনে করা যাক, একজন ভদ্রলোকের নাম হরিবাবু। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থী এক ছেলে এবং বছর তিনেকের একটি মেয়ে। হরিবাবু বেজায় মিলিটারী-ভক্ত এবং তাঁর এই ভক্তি ক্রমে বাড়ির অন্য সকলেও নির্বিচারে মেনে নিয়েছে। এখন দেখা যাক, ন্যায়শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এ'দের আচার-আচরণ কোনপথে পরি-চালিত হ'তে পারে।

হরিবাবু আপিসে চাকরি করেন। প্রত্যেক চাকরিজীবীর মতো তিনিও আপিসের নানা ঝঞ্ঝাটে মোটেই প্রসন্ন নন। এতদিন এসব চিত্তচাঞ্চল্য ঘটলে গিন্নির কাছে মনোবেদনা জ্ঞাপন করে, কিংবা তাঁর অসহযোগিতা থাকলে নানা ছুতোয় ঝগড়া ক'রে এবং গোপনে ইষ্টদেবতাকে 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন' ইত্যাদি আনন্দমঠ-পড়া ন্যায়-পরায়ণতার বিষয়ে সজাগ হ'তে অনুরোধ জানিয়েই তিনি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করতেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর মানস জগতে সহসা মিলিটারীর অভ্যুদয় ঘটায় সবকিছু ওলট-পালট হ'য়ে গেল। তিনি চোখ বুজলেই আজকাল মিলিটারী দেখতে পান এবং তাঁর আপিসে বড়কর্তার আসনে একজন খাকী কোর্তা-পরা সামরিক অফিসার বসে আছেন ভেবে উল্লসিত হন। তাঁর ধারণা, পুরাণে যে কল্কি অবতারের কথা আছে, তিনি আসলে একজন মিলিটারী অফিসার ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু মিলিটারী যদি সত্যিই আসে তবে যে-চাকরিটা তিনি করছেন তা করতে পারবেন কিনা এসব স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা তাঁর কাছে অবান্তর। নিজের নাকের যে দশাই ঘটুক, পরের যাত্রা-ভঙ্গ হবে এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা।

হরিবাবুর স্ত্রীও কম যান না। তিনিও তো স্বামীর আদর্শেই মানুষ! সংসারে নানারকম অশান্তি ক্রনিক ব্যামোর মতো আর দশজন মহিলার যেমন গা-সওয়া হ'য়ে যায়, তাঁরও এতোদিন তেমনিই ছিল। ইতিমধ্যে মিলিটারীর আবির্ভাব ঘটায় পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করল। আজকাল তিনি সুবেশা, সালংকারা প্রতিবেশিনী দেখলেই মনে মনে মিলিটারীর হস্তক্ষেপের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন। তাঁর ধারণা, মিলিটারীরা তাঁর এতোদিনের ত্যাগস্বীকারের মহিমা বুঝবে এবং ধর্মরাজ-নিযুক্ত ভলা-ন্টিয়ারের মতো কলকাতা শহরের যাবতীয় ঈর্ষাযোগ্য শাড়ী এবং নতুন প্যাটার্ণের গহনা সংগ্রহ করে তাঁর চরণে উৎসর্গ ক'রে দেবে।

হরিবাবুর ছেলে পরীক্ষার হলে ব'সে প্রশ্নকর্তার হৃদয়হীনতা, ইন-ভিজিলেটারদের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা এবং ভবিষ্যৎ পরীক্ষকদের অনুদার-চিত্ততার বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারটাই মিলিটারীর হাতে চলে যাওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানায়। তার বিশ্বাস, সে সময়ে খাতায়-কলমে এই স্বৈরথ সমরে তাকে নাজেহাল হ'তে হবে না, এবং স্রেফ কতকগুলি পার্কে-প্রচলিত রসিকতা এবং চলতি সিনেমার দু'চার কলি মনমাতানো গান শুনিয়েই সে মিলিটারীর হাতে সোনার মেডেল পাবে।

সবশেষে হরিবাবুর ছোট মেয়েটি কিন্তু খুকুমণির বয়স কম হলেও বুদ্ধি কম নয়। বিশেষ করে এমন একটি জিনিয়াসের পরিবারে তার জন্ম যে কিছু না শিখেই তার পক্ষে অনেক কিছু শিখে ফেলা সম্ভব। কাজেই একদিন দুপুরে তার মা যখন একখানি উপাদেয় উপন্যাস হাতে ক'রে দিবানিদ্রার সাধনায় মগ্ন, তখন খুকুমণিও তার খেলার পুতুলটি কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে শুরু করল। তারপর, যেহেতু খুকুমণি নিজে ঘুমোতে দেরী করে, অতএব পুতুলও ঘুমোতে চাইল না। তখন তিতি-বিরক্ত হ'য়ে খুকুমণি ডেকে উঠল—জুজু নয়, হালুম বুড়ো নয়, ডাকল—'মিলিতারী, ও মিলিতারী, একবার আয় তো!'

ঘটনাগুলি কাল্পনিক, কিন্তু সত্যের ছিঁটেফোঁটা এতে নেই এমন নয়। বিশেষ করে পৌরপিতাদের ঐ আবেগ-কম্পিত প্রার্থনার কথা মনে রাখলে ব্যাপারটাকে দুবার ক'রে ভাবতেই হয়। কিন্তু মিলিটারী যে সর্বরোগহর দাওয়াই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারের ওপারের অমানুষিক ঘটনাবলীই তো তার যথেষ্ট প্রমাণ! আরো তাজা প্রমাণ কি গায়ের চামড়া দিয়ে অনুভব করতে হবে?
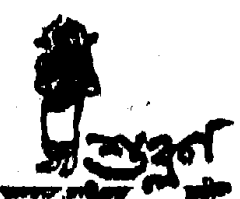
প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ধারা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

'সত্যি বলছি ভাই, আমার মনটা বড্ডো খারাপ লাগছে, অথচ আমি তো এর কোনো কারণই খ‍ুঁজে পাচ্ছিনে'।—বলেছিলেন আন্তনিও।

আন্তনিওর এই কথাগ‍ুলো দিয়েই সেক্সপীয়ারের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকটির আরম্ভ হয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, আন্তনিওর মনে ভাবী দ‍ুর্ঘটনার ছায়াপাত হয়েছিল। মনোবিদ বলবেন, তাঁর বিষাদের কারণ অনাগত ঘটনার ভেতরে নেই, এর কারণ ল‍ুকোনো রয়েছে তাঁর মনের গহনে, অচেতন স্তরে। আন্তনিওর মতো আমরাও অনেক সময়ে বলে থাকি, 'কিছ‍ুই ভালো লাগে না', অথচ তার কোনো স‍ুস্পষ্ট কারণ অনেক সময়ে নির্দেশ করতে পারিনে। তবে একথা ব‍ুঝি যে, এই ভালো-না-লাগাটা মনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এটাকে একটা সাময়িক রোগ বলতেও কারো আপত্তির কোনো কারণ নেই। শ‍ুধ‍ু বিষাদ নয়, আমাদের মনে যখন অবসাদ বা নৈরাশ্য জাগে, অথবা মনটা যখন রিপ‍ুর তাড়নায় চঞ্চল হয়, তখনও কিন্তু আমরা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন অপরিমিত বা লোভ যখন দ‍ুর্দমনীয় হয়, অপরের সৌভাগ্য দেখে যখন আমরা ঈর্ষায় জবলে মরি, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যখন আমাদের হিতাহিতব‍ুদ্ধি লোপ পায়, তখনও নিঃসংশয়ে আমাদের মনের স্বাস্থ্য ক্ষ‍ুণ্ণ হয়। অবশ্য, এই সব ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসকের আশ্রয় নিতে হয় না। যাঁরা একট‍ু আত্ম-বিশ্লেষণ করতে পারেন, তাঁরা নিজেদের দোষত্র‍ুটি সম্পর্কে কখনো উদাসীন থাকতে পারেন না। কাজেই এ সব স্থলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শ‍ুধরে নিতে পারেন। কিন্তু এমন অনেক স্নায়‍ুরোগও আছে, যেখানে রোগী নিজের ওপরে প্রভ‍ুত্ব হারিয়ে ফেলেন। কাজেই সেখানে চিকিৎসক না ডেকে উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু আমাদের লোভ, গর্ব, ঈর্ষা প্রভৃতির ম‍ূলে থাকে স‍ুশিক্ষার অভাব বা কুশিক্ষার প্রভাব। আমরা অনেকে সামান্য কারণে রেগে যাই, অল্প কারণে ধৈর্য হারাই, এক জায়গায় অপমান হজম করে আর এক জায়গায় তার প্রতিশোধ নিই, এ সবও নিশ্চয়ই স‍ুস্থ মনের লক্ষণ নয়। স‍ুক্ষ্মভাবে বিচার করলে এ-কথা বলতেই হয় যে আমরা সবাই কম বেশি মনের রোগে ভুগচি। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেছেন, 'The healthy man is virtually a neurotic' তবে যতক্ষণ আমরা পরি-বেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারি, ততক্ষণ সমাজের চোখে আমরা স‍ুস্থমনা বা নর্মাল। স‍ুতরাং মনের দিক দিয়ে স‍ুস্থ বা অস‍ুস্থের পার্থক্য শ‍ুধ‍ু মাত্রাগত বা পরিমাণগত, প্রকারগত নয়।

এ-কালে পাশ্চাত্য দেশে মনস্তত্ত্ব নানা শাখায় বিভক্ত হয়েছে, তার ভেতর একটি হচ্ছে অ-প্রকৃতিস্থ মান‍ুষের মনস্তত্ত্ব বা Abnormal Psychology। যারা উন্মাদ তারা তো সমাজের একটা সমস্যা বটেই, যারা নানা রকমের স্নায়‍ুরোগে ভুগচে অথবা একটা বিষাদের ছায়া যাদের মনকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তাদের অবস্থাটাও কম গ‍ুর‍ুতর নয়। আর সব চেয়ে ভাববার কথা হচ্ছে এই যে, মান‍ুষ যতই উন্নত হচ্ছে, তার সভ্যতা যতই বেড়ে চলেছে, মনের ব্যাধিও ততই প্রসার লাভ করেছে। পাশ্চাত্য দেশে মনের রোগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ভবিষ্যতেও এবিষয়ে অনেকে আলোকসম্পাত করবেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতেও যে মনের প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল, তার নজীর রয়েছে যোগশাস্ত্রে, আয়‍ুর্বেদে ও নানা তন্ত্র-শাস্ত্রে। বিষয়টিক প‍ুরাকালের পণ্ডিতেরা দ‍ুদিক থেকে আলোচনা করেছেন, প্রথমত, কেমন করে মনকে স‍ুস্থ রাখা যায়, তার নির্দেশ দেওয়া, দ্বিতীয়ত কেমন করে মান‍ুষকে মনের রোগ থেকে ম‍ুক্ত করা যায়, তার উপায় প্রদর্শন করা।

মহর্ষি চরকই বোধ হয় সর্বপ্রথম স‍ুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাটি ঘোষণা করেছিলেন যে রোগ শ‍ুধ‍ু দেহেরই নয়,

মনেরও রোগ হয়ে থাকে। সংসারে সুস্থ মানুষের সংখ্যা খুবেই কম, আমরা প্রায় সবাই ব্যাধিগ্রস্ত। মনের দিক দিয়েও এ কথা সত্যি। আমাদের লালসা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, মোহ, ভয়, অবসাদ, নৈরাশ্য এগুলো কি মনের ব্যাধি নয়? আবার কাম, ক্রোধ, গর্ব, ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এগুলোও তো মনেরই বিকার। এই সব বিকারের উৎস কোথায়? মহামতি চরক বলেন—রজোগুণ আর তমোগুণে। ধন, মান, যশ বা ক্ষমতালাভের জন্যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে রজোগুণ, আবার আলস্য, জড়তা, অবসাদ ও নৈরাশ্যের মূলে আছে তমোগুণ। মহামতি চরক অন্যত্র বলেছেন, 'মানুষ তার মনের ব্যাধির জন্যে নিজেই দায়ী। মনের ব্যাধির একটা কারণ হচ্ছে প্রজ্ঞাপরাধ বা জ্ঞানপূর্বক পাপকর্ম করা, পাপচিন্তা করা বা পাপবাক্য বলা।' আবার নিজেই অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়। সে চিকিৎসা কি? একালে অনেকেই হয়তো শুনলে চমকে উঠবেন। আধি বা মনের রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হচ্ছে পাঁচটি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধি। জ্ঞান মানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান মানে অধ্যাত্মজ্ঞান, স্মৃতি মানে নিজের স্বরূপ চিন্তন, সমাধি মানে চিত্তের একাগ্রতা।

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন, আমাদের যে সব বাসনা সমাজের চোখে নিন্দিত ব ঘৃণিত, আমরা সেগুলোকে দমন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সেগুলো মরে না, সেগুলো মনের অচেতন স্তরে গিয়ে আশ্রয় লয়। আবার স্বপ্নের ভেতর এই সব বাসনাই চরিতার্থ হয় কিন্তু প্রায়ই তারা ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, কাজেই আমরা তাদের চিনতে পারি না। এই দমিত বাসনাই হচ্ছে আমাদের স্নায়ুরোগের কারণ। হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের মূলেও থাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এ দেশের পাতঞ্জল দর্শনেও কিন্তু মনের এই অচেতন স্তরের কথা স্বীকৃত হয়েছে। পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অগণিত বাসনা সংস্কারে পরিণত হয়, আর এই সংস্কারই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যা কিছু মনের বাইরে চলে যায়, তাই যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এ কথা সত্যি নয়। আমাদের বাসনাগুলো সংস্কাররূপে মনের অচেতন স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। সুতরাং মনের অসংবিদ বা অচেতন স্তরের কথা মনস্বী ফ্রয়েডের বহু পূর্বে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন। অবশ্য, মানসিক রোগীদের মনঃসমীক্ষণ করতে গিয়েই ফ্রয়েড তাদের মনের নিজ্ঞান স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। আর পতঞ্জলি মনকে কেমন করে একটি লক্ষ্যের দিকে স্থির করা যায় তার উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে মানুষের প্রবৃত্তির উৎস সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, তবে মানুষ তাঁর চেষ্টার দ্বারা সংস্কারের বীজকে দগ্ধ করতে পারে।

মনের রোগীদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেও ফ্রয়েড তাঁদের অচেতন মনের গোপন বাসনার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'Dreams are the via regia to the unconscious' ফ্রয়েডের এই স্বপ্ন-তত্ত্ব যে ভারতে অজানা ছিল না, এ-কথা সহজেই প্রমাণ করা যায়। ভারতের ঋষি বলেছেন, আমরা যখন জেগে থাকি, তখন আমাদের জাগ্রদাবস্থা, যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বাসনার প্রভাবে কল্পিত দৃশ্যাদি দেখি, তখন আমাদের স্বপ্নাবস্থা, আর যখন আমরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সুষুপ্তির অবস্থা। যোগীদের অবশ্য এ ছাড়া আর একটা চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে সমাধির অবস্থা। স্বপ্ন হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার, আর এই সূক্ষ্ম শরীর হচ্ছে বাসনাময়। স্বপ্ন সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে আরও অনেক আলোচনা আছে উপনিষদ ও দর্শনসমূহে। কোন্ রোগের সঙ্গে কোন্ স্বপ্নের কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে আয়ুর্বেদে। সে আলোচনা কতটা বিজ্ঞানসম্মত, বলতে পারিনে।

শোনা যায়, কেউ কেউ স্বপ্নে ভাবী বা অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ব এর কোনো কারণই নির্দেশ করতে পারেনি। তাই আমাদের বলতে হয় 'There are more things in Heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your Philosophy'

অবশ্য, স্বপ্নে কেন সময়ে সময়ে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হয় অথবা দূরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার একটা ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শনে রয়েছে। স্বপ্নাবস্থায়ও কচিৎ কখনও মনের সত্ত্বগুণ প্রবল হতে পারে, আর সত্ত্বগুণের ধর্মই হচ্ছে বস্তুকে প্রকাশ করা। তাই স্বপ্নেও মানুষ কখনো কখনো দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। মানুষ তখন দূরের ঘটনা বা ভাবী কালের ব্যাপার দেখতে পায়। তবে স্বপ্ন দেখার সময় প্রায়ই রজোগুণ বা তমোগুণ প্রবল থাকে। তাই স্বপ্নদর্শনের কালে যে প্রত্যয় জন্মে, উহা প্রায়ই মনের ভ্রান্তি-মাত্র। (Illusion বা Hallucination) মানসিক উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যই অনেক সময়ে এরূপ ভ্রান্তির কারণ। আর এই উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য তো মনেরই বিকার। মনের স্বাস্থ্যের অধিকারী বলবো তাঁকে, যিনি কিছুতেই নিজের স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল বা উত্তেজিত হতে দেন না।

আমাদের চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ হচ্ছে দুটি,—রাগ (অনুরাগ) আর দ্বেষ। এই রাগ আর দ্বেষকে যিনি যে পরিমাণে জয় করতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ মনের দিক দিয়ে সেই পরিমাণে সুস্থ।

অবশ্য, কামরিপুকে জয় করাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ব্যাপক দৃষ্টিতে 'কাম' কথাটার অর্থ কামনা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কাম মানে ইন্দ্রিয়বিশেষের সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা। ফ্রয়েড বলেন—এই কামরিপুকে দমন করাই কল্যাণের পন্থা নয়, শ্রেয়ের পথ হচ্ছে কামকে ঊর্ধ্বমুখী করা, শিল্পসাধনা, সাহিত্য-চর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি খাতের ভেতর দিয়ে কামকে প্রবাহিত করা, একেই বলে কামের উদ্গতি বা Sublimation।

কিন্তু কেমন করে কামনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়, সে সম্পর্কে প্রাচীন মনীষীদের ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। যোগীরা অবশ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পথই অবলম্বন করে থাকেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় বা মনকে জয় করার প্রধান উপায় 'প্রতিপক্ষ-ভাবনা' বা অভ্যস্ত চিন্তার বিপরীত কোন চিন্তাকে আশ্রয় করা। তুমি যার দোষ দর্শন কর, তার গুণের কথা চিন্তা কর, যাকে তুমি ঈর্ষা কর, তাকে ভালোবাসতে শেখ, তার প্রতি মৈত্রীভাবনা অভ্যাস কর, আবার যে দেহটাকে নিত্য বলে মনে করছো, তার অনিত্যতার কথা চিন্তা কর, যে দেহটা পরম রমণীয় বলে মনে কর, তার বীভৎসতা ও কদর্যতার কথা স্মরণ কর; —এরই নাম প্রতিপক্ষ-ভাবনা। কিন্তু

এ পথ সবার জন্যে নয়। এ পথ অবলম্বন করলে হিতে বিপরীতও হতে পারে।

ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বিতীয় পথ হচ্ছে সংযম বা মিতাচারের পথ। সকল বিষয়ে আতিশয্য বর্জন করে চলাটাই কল্যাণের পথ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভেতর, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। এই সামঞ্জস্যের কথা আছে ধর্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে। শাক্যমুনিও 'মধ্যপন্থার' কথাই বলেছেন। আমাদের দেশে একটি চমৎকার প্রবচন আছে :

'অতি উঁচু হয়োনা, ঝড়ে ভেঙে নেবে,
অতি নীচু হয়োনা ছাগলে মুড়ে খাবে।'

মহামতি চরক বলেছেন, 'ব্যায়াম করা, হাস্য করা, কথা বলা, কামের সেবা করা, রাত্রি জাগরণ করা, এগুলো উচিত হলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সব বিষয়ে মাত্রা লঙ্ঘন করবেন না'।

মহর্ষি চরক সকল বিষয়েই মাত্রা রক্ষা করে চলার ও মনকে সকল বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন রাখার উপদেশ দিয়েছেন। মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই পরিমিতিবোধ। যিনি মিতাহারী, মিতাচারী, মিতভাষী, যিনি সহজে নিজের স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল বা উত্তেজিত হতে দেন না, তাঁকেই মনের দিক দিয়ে সুস্থ মানুষ বলা যায়।

আমরা মনকে ঊর্ধ্বমুখী করার কথা বলেছি। কিন্তু শুধু শিল্প-সাধনার ভেতর দিয়ে কামের সম্পূর্ণ উদ্গতি হতে পারে না। শিল্পী যতই শিল্প-সাধনার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করুন না কেন, তাঁর মন মাঝে মাঝে জৈব স্তরে নেমে আসবেই। কারণ কোন্ সাধনার বলে জীব শিবে পরিণত হতে পারেন, তাতো তাঁর জানা নেই। একমাত্র ধর্ম-সাধনার ভেতর দিয়েই মানুষ তার কামকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে কুণ্ডলিনী-জাগরণ বলা হয়, তারও মূল কথা কামের ঊর্ধ্বায়ন, sublimation of the libido। সাধকের জীবনে কেমন করে এই ঊর্ধ্বায়ন ঘটে, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নয়। সংক্ষেপে বলে রাখি, তান্ত্রিক সাধকের ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি সব কিছুর একই লক্ষ্য। তারপর পূজার সময়ে সাধককে চিন্তা করতে হয় যে, আমি আমার ইষ্টদেবতার সঙ্গে অভিন্ন' 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'। এই রকম চিন্তনের দ্বারাই সাধকের দেহ ও মনের রূপান্তর ঘটে। সাধক তখন নতুন জন্ম লাভ করেন। বৈষ্ণব সাধক বলেন, 'কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সকলি তাঁকে অর্পণ করতে হবে, তা হলে তন্ময়তা আসবে'। এই তন্ময়তা এলেই তো সাধকের দেহ হয় ভাগবতী তনু। তখন তাঁর কাম পরিণত হয় প্রেমে। জীবনে দেখা দেয় সামঞ্জস্য, মন পূর্ণ হয় শান্তি ও আনন্দে। তবে এর জন্যে চাই সাধনা। বিনা সাধনায় কোনো সিদ্ধিই তো লাভ করা যায় না।

এ কালের একটা প্রধান ব্যাধি হচ্ছে অবসাদ। এই অবসাদের মূলে কখনো থাকে বাস্তব কারণ, কখনো থাকে কল্পিত কারণ। কখনো এর মূলে থাকে ভগ্নস্বাস্থ্য, কখনো দুরাশা, কখনো মনস্তাপ, কখনো পারিবারিক জীবনে সঙ্গতির অভাব। এই অবসাদের ঔষধ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। গীতায় একটি কথা আছে—'নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ' অর্থাৎ আত্মাকে কখনো অবসন্ন হতে দেবে না। এই জন্যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ভাবনাকে অবলম্বন করে নিজের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই ভাবনাকে বলে auto-suggestion। একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে—'যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি'। বেদান্ত বলেছেন—'যে নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে, সে বদ্ধ হয়ে যায়, আর যে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে মুক্তই হয়ে যায়। এই জন্যে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'আমি ব্রহ্ম, আমি নিত্য-শুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্ত' অথবা 'আমার মনঃশক্তি অতি প্রচণ্ড, আমি এই শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারি' এম্নি কোনো মন্ত্র বা বাণী কয়েকবার জপ করতে হবে। ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক এমিল কুয়ে যে কথাগুলো প্রতি সন্ধ্যায় বিশবার জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে কথাগুলো এই—

'Every day, in every way, I am getting better and better'.

আমরা ভারতীয় মনীষীদের মতে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি উপায়ের নির্দেশ করলাম, কারণ 'Prevention is better than cure' কিন্তু যদি আধিগ্রস্ত রোগী নিজের চিকিৎসা নিজে করতে অক্ষম হয়, তা হলে উপায়? মনের রোগ কত রকমের, তার চিকিৎসার পদ্ধতিই বা কি, এ সম্পর্কেও প্রাচীন ভারতে একদিন বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ের দিগ্দর্শন করব।

মতামত
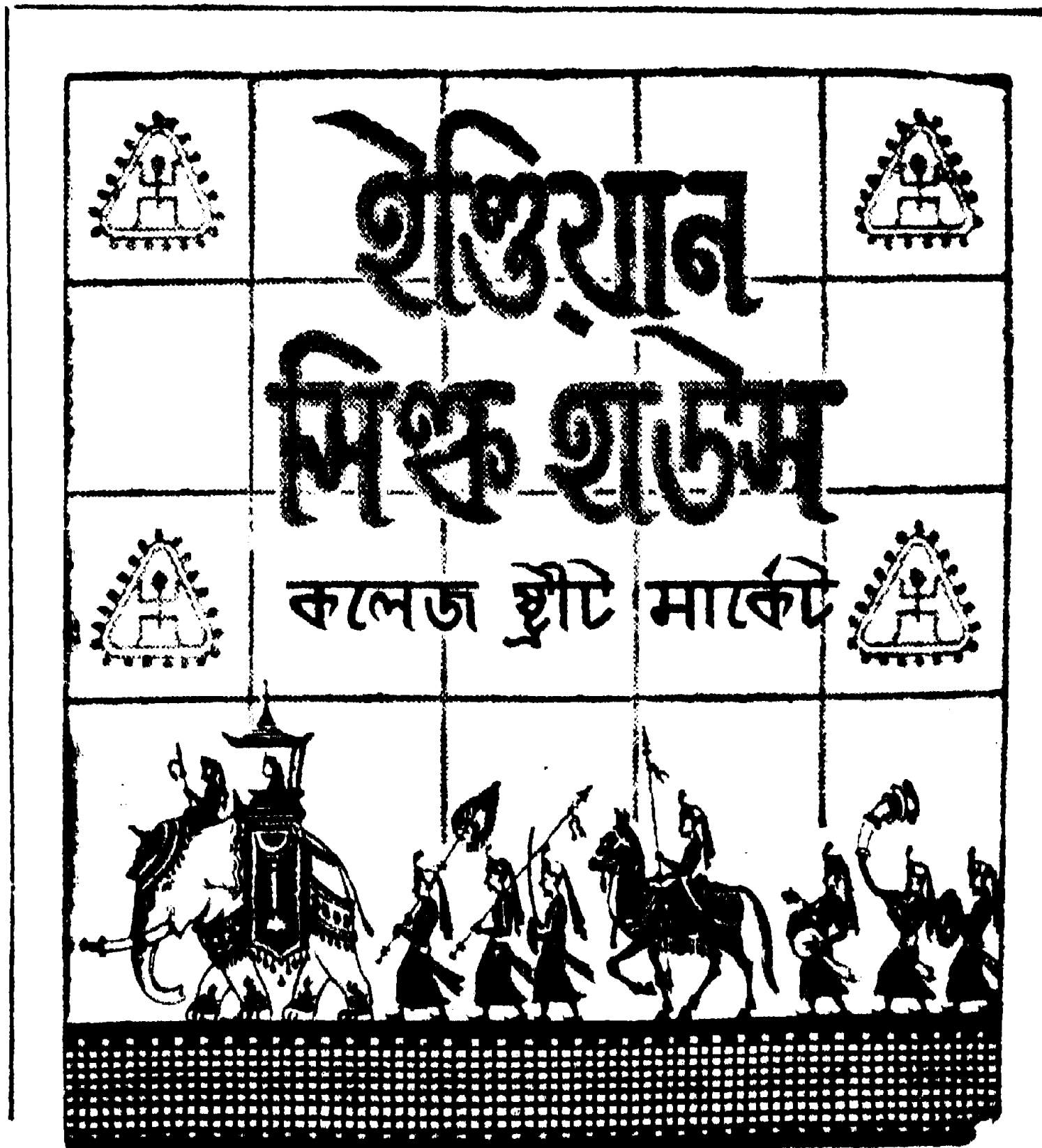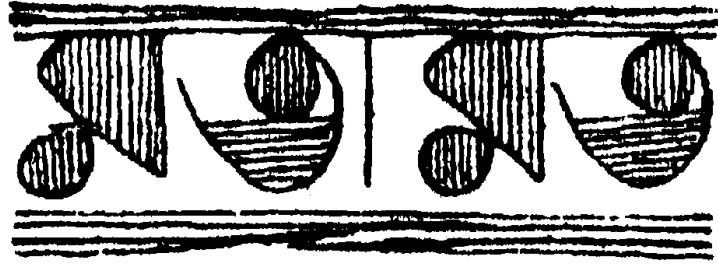
॥ মাতৃভাষার স্বপক্ষে ॥

মহাশয়,

গত শুক্রবারের অমৃতে পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পাঠ করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ইংরেজির অন্ধ অনুরাগীদের যুক্তিগুলির প্রতিধ্বনি করে আপনারাও যে আজ উচ্চ কণ্ঠে একথা প্রচার করতে শুরু করেননি যে, ইংরেজির দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব সেজন্য আপনারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি তার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেন এ প্রশ্নের উত্তরে এ যাবৎ একাধিক জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছেন ইংরেজির একনিষ্ঠ সেবকবৃন্দ। প্রথমতঃ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। বহির্ভারতীয় দেশগুলির সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে ইংরেজির শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই! দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজির সাহায্য ব্যতীত ভাবগত ঐক্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কাজেই ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এ-যুগে কোন দেশের পক্ষেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে একক-ভাবে উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই যে ভারতকেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তাই বলে ভারতের সকল মানুষের উপর ইংরেজি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে না দিলে যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এ যুক্তি অবিশ্বাস্য। ভাবগত ঐক্য গঠনে ইংরেজিই যে একমাত্র সহায়ক এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। আর শুধু 'বিজ্ঞানাচার্য' সত্যেন বসুই নন আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিও নির্দ্বিধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার পুস্তক রচনা করা সম্ভব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেও মাতৃভাষাতে বিজ্ঞান শেখানো দুঃসাধ্য নয়। কাজেই ইংরেজির সপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে সেগুলোকে নির্বিবাদে বাতিল করা চলে।

এই প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখ করা চলতে পারে। ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও জাপান ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং একমাত্র বাতুলের পক্ষেই এ কথা সম্ভব যে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন না করে জাপান ভুল করেছে। জাপানী জার্ণালের লেখক শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলেছেন, জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ করে নিয়েও কখনও পরভাষার দাসত্ব করবার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি। কিন্তু এদেশের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই আত্ম-ঘাতী ভুল করবার জন্যই আজ বদ্ধ-পরিকর। এদেরকে আজ বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, জাপানে যা সম্ভব হয়েছে ভারতেও তা সম্ভব হবে। ইতি—

পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়।
এ্যাসফিল্ড, দার্জিলিং।

॥ শিশু শিক্ষার তামাসা ॥

মহাশয়,

গত ২৩শে চৈত্রের অমৃতে 'মতামত' বিভাগে 'শিশু শিক্ষার তামাসা' শীর্ষক প্রকাশিত পত্রটির ওপর আমার কিছু বক্তব্য আছে। লিখে জানালাম। আপনা-দের পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

পত্রলেখিকা শ্রীমতী বসু কতকগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখে পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষকদের ধর্মঘটের পর থেকে দেখা যাচ্ছে অভি-ভাবকদের এক অংশ শিক্ষকদের হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন। প্রকাশিত পত্রটিতে এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়।

শ্রীমতী বসু তাঁর মেয়ের কথা লিখেছেন। স্কুলে সেলাইয়ের কোনো-রকম শিক্ষা না দিয়েও তাঁর মেয়েকে শিক্ষিকা বললেন যাহোক কিছু একটা করে আনতে, কারণ ইন্‌স্পেক্টার আসবে স্কুলে। যদি সত্যিই এইরকম ঘটে থাকে, সেই স্কুলের শিক্ষিকা বা কর্তৃপক্ষের দোষ সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রীমতী বসু কি তখনই এই ব্যাপারটার একটা প্রতি-বাদ বা ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারতেন না? কারুর নিন্দা করার পূর্বে দেখা উচিত আমাদের নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব আমরা যথাযথ পালন করেছি কিনা। কারণ, অন্যায়কারী এবং অন্যায়সহ্যকারী উভয়েই সমান দোষী।

আর তাঁর মেয়ের কথা লিখেছেন। অযোগ্যা শিক্ষিকা ভুল পড়িয়েছেন তাকে। এখানে প্রশ্ন করা যায়, তিনি কি শিক্ষিকার কাছ থেকে নিজে জেনেছেন কি যে তাঁর মেয়ের অভিযোগগুলি সত্য কি না? তাঁর পত্রপাঠে মনে হয় তিনি তা করেন নি। শিক্ষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি শিশু মনস্তত্ত্ব বড় জটিল। সময়ে সময়ে তাদের ব্যবহারের এবং কথাবার্তার কোন তাৎই খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীমতী বসু শুধুমাত্র তাঁর মেয়ের কথা শুনেই দেশের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রশ্ন করলে যদি ভুল উত্তর দেয় তাহলেই কি তার জন্যে শিক্ষক শিক্ষিকাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে? স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা কতটুকু সময় থাকে? তার চেয়ে অনেক বেশী সময় তারা বাড়ীতে অভিভাবক অভিভাবিকার কাছে থাকে না কি?

নমস্কারান্তে—
ভবদীয় দীপক মজুমদার
ভদ্রকালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
হুগলী।

ফল্গু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
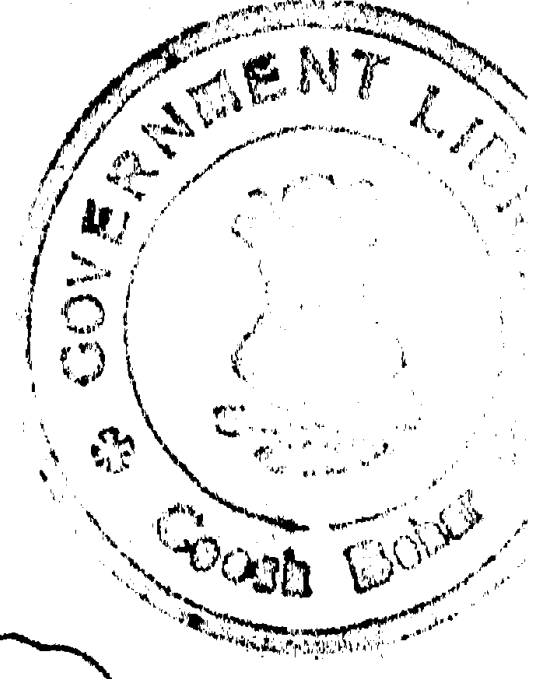
প্রাণপণ শক্তিতে রমা চোখদুটো ফিরিয়ে নিল। আশ্চর্য, এত চেষ্টা, এতদিনের তালিম, তবু কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না। কেবল দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে কাঠগড়ার দিকে গিয়ে পড়ে। যেখানে ক্লান্ত, অবসন্ন একটা মানুষের কাঠামো দুটো হাত জোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টি, মনে হয় এত বড় একটা নাটকে তার যেন কোন অংশ নেই, নেপথ্য ভূমিকাও নয়। সে শুধু একজন দর্শক মাত্র। কোর্ট ঘরে ভিড় করে বসে থাকা কৌতূহলী জনতারই একজন।

বলুন, থামলেন কেন? জানি এসব কথা বলতে আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তো আর উপায় নেই। পৃথিবী একটা নরক, কিংবা বুঝি তার চেয়েও ভয়ানক জায়গা।

সরকারি উকিলের কণ্ঠে দরদ আর সহানুভূতির প্রলেপ।

রমা ঢোঁক গিলল। একটা হাত দিয়ে নিজের শাড়ীর আঁচল চেপে ধরল। এছাড়া ধারে-কাছে আর বুঝি কোন অবলম্বন নেই।

ঠিক সরকারি উকিলের পাশে বসা বাপের দিকে চোখ পড়ল। দু' চোখ ভ্রূকুটি আর উষ্মা। কঠিন, ঋজু একটা অবয়ব। একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চেয়ে রয়েছেন। কোন ভুল নয়, কোন বিচ্যুতি নয়। রাজদ্বারে মেয়েকে টেনে এনেছেন বিচারের আশায়। বিচার চাই। তার জন্য যদি সত্যকে বিকৃত করতে হয়, প্রয়োজন হয় অনৃতভাষণের, তাতেও ক্ষোভ নেই।

মেয়েকে তাঁর বিশ্বাস নেই। এই বয়সের কোন মেয়েকেই নয়। এই বয়স আলো অন্ধকার চেনে না, নিজের ভবিষ্যত নয়। কল্পনার রং বুলিয়ে সহজকে, সাধারণকে রমণীয় করে তোলে।

বলুন, কোর্টের অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট করবেন না। ধর্মাবতারের কাছে সব কিছু বলুন।

সরকারি উকিল আবার অনুরোধ করলেন।

তারপর, তারপর অনুদা আমায় বলল, চল তোমাকে মাসীমার বাড়ী রেখে আসি।

জজের চশমার মোটা কাঁচটা ঝকঝকিয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠধ্বনিও হল কোর্টঘরের লোকদের সচকিত করে, অনুদা কে?

আসামী, ধর্মাবতার, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি উকিল বলে উঠলেন, ভাল নাম অনুতোষ। অনুতোষ রায়।

জজ চোখ ফেরালেন রমার দিকে। রমা ঘাড় নাড়ল। স্প্রিং দেওয়া কলের পুতুলের মতন।

আসামীর দিকে চোখ না ফিরিয়েও রমা বুঝতে পারল, একটা মানুষের কাঠামো তীব্র এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। নিস্পৃহ দুটি চোখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর বিরক্তির প্রতিচ্ছায়া। শপথ নিয়েছে রমা। সত্য কথা বলবার শপথ। কিন্তু এভাবে সত্যের অপলাপ করতে বিবেকেও একটু বাধছে না। বিবেক বিসর্জন দিয়েই বুঝি রমা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনুর সঙ্গে সম্পর্কের সামান্যতম জোরটুকুও মুছে ফেলার দুর্বার প্রতিজ্ঞা করেছে।

তারপর। সরকারি উকিল খেই ধরিয়ে দিলেন।

তারপর, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রমা ভাবতে শুরু করল, কি তারপর, মিথ্যার তরঙ্গের পর তরঙ্গ সাজিয়ে অন্তহীন সমুদ্রের সৃষ্টি করতে হবে। একটা মানুষ, একটা ভালবাসা যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই দুস্তর সাগরে।

রুদ্ধ কক্ষে বাপের তর্জন মনে পড়ে গেল।

এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি বেঁচে থাকতে বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থর ছেলের বিয়ে হতে দেব না। কখনই নয়। যে চুনকালি তুমি নিজে দু হাতে মুখে মেখেছ, সে কলঙ্ক মোছার ভার তোমারই ওপর। তোমার চেয়ে সমাজ অনেক বড়, হৃদয় নিয়ে প্রেমের খেলার চেয়ে শাস্ত্রের অনুশাসন অনেক মূল্যবান। তাছাড়া, সব চেয়ে বড় কথা, অন্যায়ের প্রতিকার চাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

একবারে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রমা এক মনে কথাগুলো

শুনেছে। গুরুর বচনের মতন তদ্গত চিত্তে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ! নিজের স্ত্রীকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারার কাহিনী অজানা নয় রমার। তারপরে বাপের লাম্পট্যের ইতিহাসও জানার সুযোগ হয়েছে। গভীর রাত্রে স্খলিত পায়ে বাড়ী ফেরার দৃশ্য চোখ না বুজেও রমা দেখতে পায়। এসব পাপ নয়। পাপ শুধু একটা মেয়ের ভালবাসার পাত্রের হাত ধরে বাড়ী ছাড়া। অপরাধ শুধু প্রিয়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

দিন পাঁচেক অসহ্য যন্ত্রণা। নরক যন্ত্রণাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। নিজেকে নিঃশেষ করার অনেক চেষ্টা রমা করেছে। উপায় খুঁজেছে। দড়ি, আগুন কিংবা জল, কিন্তু সুবিধা হয়নি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়া বাপ দুটি সজাগ দৃষ্টি সর্বদা জ্বালিয়ে রেখেছেন। কঠোর প্রহরা। মেয়েকে চোখের সামনে থেকে নড়তে দেননি।

কঠিন হাতে টানতে টানতে নিয়ে গেছেন পুলিশের কাছে। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এজাহার লিখিয়েছেন। আগের রিপোর্টের সঙ্গে তাল রেখে মেয়ের সর্বনাশের ফিরিস্তি দিয়েছেন।

ভুল রমা সত্যিই করেছিল। বাড়ী থেকে পালিয়ে নয়, শহর থেকে না পালিয়ে। অনু বারবার বলেছে, চল রমা, আমরা দূরে কোথাও চলে যাই। এ শহর নিরাপদ নয়, কোথায় কখন কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বিপদ।

কিন্তু রমা ঘাড় নেড়েছে। না, না, তা সম্ভব নয়। বাইরে কোথাও যাওয়া মানে অনুতোষকে চাকরি ছেড়ে যেতে হবে। দারিদ্র্যের জ্বালা হাড়ে হাড়ে জানে রমা। সেই অন্ধকার দিনগুলো এড়িয়ে যাবার জন্যই সাহস করে সমাজের বেড়া ভেঙে বাইরে এসেছে। আবার নতুন করে তমসা-ঘন জীবনের মধ্যে সে ফিরে যেতে চায় না। তা ছাড়া, এটুকু নিশ্চয়ই জানতো, তার খোঁজ কেউ করবে না। বাপ তো নয়ই। দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলেতে ইতিমধ্যেই ভেলাফুটো সংসারের পানসিটা টলমল করছিল। অভাবের লোনাজল ঢুকে বিপর্যস্ত করছিল মাঝিকে। অক্ষম হাতে দাঁড় বেয়ে বেয়ে সে পানসিকে নিরাপত্তার কূলে ভিড়ানো প্রায় অসম্ভবই ছিল। কাজেই একজন যাত্রী যদি স্বেচ্ছায় মরেই গিয়ে থাকে তবে সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। খুঁজে খুঁজে তাকে ফিরিয়ে আনার দুর্বুদ্ধি মাঝির হবে না।

কিন্তু রমা ভুল করেছিল। হিসাবের ভুল। বাপের ব্রাহ্মণ্যতেজের পরিমাপ বুঝি তার জানা ছিল না। পাড়ায় কানা-ঘুষো একটু গিয়েছিল বাপের কানে। রমা আর অনুতোষের হৃদ্যতার সংবাদ। রমার বাবা আর কালবিলম্ব না করে পুলিশের সাহায্য নিলেন। পুলিশ অনু-তোষের মেসে হানা দিল। বেড খালি কিন্তু আস্তানার পাত্তা মিলল। সম্পর্কে এক বোনের বাড়ী গিয়েছিল অনুতোষ। সেখানে পুলিশ যখন গিয়ে পৌঁছল তখন রমার অঙ্গে সস্তা বেনারসী, গলায় বাসি ফুলের মালা, কপালে, গালে চন্দনের ফোঁটা।

অনুতোষ একটি কথা বলেনি। ঘাড় হেঁট করে পুলিশের সঙ্গে চলে এসেছে। আপত্তি জানিয়েছিল রমা। চীৎকার করে বলেছিল, আমি সাবালিকা। স্বেচ্ছায় আমি ঘর ছেড়েছি। অনুতোষের কোন দোষ নেই। আমাদের গ্রেপ্তার করার আপনাদের কোন এক্তিয়ার নেই।

পুলিশ রমার বাপের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়েছে। রমার বাপ দাঁতে দাঁত ঘসেছেন। তারপর ইন্সপেক্টরকে আড়ালে ডেকে বলেছেন, শয়তানী বুদ্ধিটা একবার দেখুন স্যার। আমার চেয়ে যেন বয়স ওর বেশী জানা। সামনের আশ্বিনে সতেরোয় পড়বে। এসব ওই হতভাগার ট্রেনিং। শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে রেখেছে। উঃ, দিন কাল কি হ'ল। মুখুজ্জেবাড়ীর মেয়ে, যাদের চন্দ্র সূর্য কোন দিন দেখতে পায়নি, সেই বাড়ীর সম্ভ্রম—

কথাটা রমার বাবা আর শেষ করতে পারেননি। বুকভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গিয়েছিলেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর থামেনি। রমার দেহের খাঁজে খাঁজে কৌতূহলী চোখ বুলিয়ে বয়সের হিসাব নেবার চেষ্টা করেছে। ষোল বছর বয়সের পক্ষে বেশ বাড়ন্ত গড়ন। দেখে তো মনে হয় বয়স বিশের এপারে নয়। যাক, যার গরু নেই হিসাব করুক। এসব ব্যাপারে পুলিশের মাথা গলাবার দরকার নেই।

তারপর রমার বাপকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। নকল ঠিকুজী কোষ্ঠি তৈরী করা। দিনরাত থানায় গিয়ে বসে থাকা। সরকারি উকিলের বাড়ী দৌড়ানো। মকদ্দমার তদ্বির-তদারক।

এতে কষ্ট হয়নি, সব চেয়ে মুস্কিলে ফেলেছে নিজের মেয়ে। ফণা তুলে ছোবল দেবার চেষ্টা করেছে। কথার ছোবল। বেশ সময় নিয়েছে তার বিষদাঁত ভাঙতে। দিনের পর দিন খাওয়া বন্ধ। তার ওপর চড় চাপড় তো ছিলই।

যখন বাপের কথায় রমা সায় দিয়ে-ছিল তখন তার নিস্তেজ, অসহায় অবস্থা। ঘরের মেঝেয় চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। গাল বেয়ে অজস্র অশ্রুর ধারা। ভাল করে কথা বলার শক্তিও নেই।

তারপর তাসের পর তাস সাজিয়ে ঘর গড়ে তোলার মতন, মকদ্দমা গড়ে উঠল। সরকারি উকিল সাহায্য করলেন। রমার বাপের তো তৎপরতার অন্ত নেই। সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে অনুতোষের নামে অনেক কথা শোনান হ'ল রমাকে। এমন কথাও বলা হ'ল অনুতোষ বিবাহিত। দেশের বাড়ীতে তার বৌ আছে, ছোট একটা ছেলেও।

চোখ বন্ধ করে রমা সব শুনল। বিশ্বাস করল কিনা সেটা তার মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল না।

অনুতোষ হাজতে একটি কথাও বলল না। তিনকুলে তার কেউ ছিল না। বাপ যখন মারা যায় তখন অনুতোষের বয়স বছর এগারো। মা যাবার সময় বয়স কুড়ি। এক রকম চলে যাচ্ছিল অনু-তোষের। পিছন দিকে চাইবার যেমন কেউ ছিল না, সামনের দিকে নজর দেবার মতনও কিছু নয়।

হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। অনুতোষের নির্মেঘ পরিষ্কার আকাশে রামধনুর ঝিলিক। নিস্পৃহ জীবনে একটা মোহ।

কারখানা থেকে বেরোতেই একেবারে মুখোমুখি।

ভাইয়ের হাত ধরে রমা ফিরছিল। আধ ময়লা শাড়ী, এলো খোঁপা, প্রসাধনের বালাই নেই। কিন্তু অনু-তোষের ভাল লেগে গেল।

সুগৌর বর্ণ আর ডাগর দুটি চোখ। ঠোঁটের কোণে অল্প হাসির রেশ।

অনুতোষের পরণে নীল সার্ট আর প্যান্ট। তাও ধোপদুরস্ত নয়, জায়গায়

জায়গায় তেল আর কালির ছোপ। তবু রমা ফিরে ফিরে দেখল।

সেই দেখা শেষ নয়, বরং সেই দেখাই কাল হল।

তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই এক সময়ে অনুতোষকে সে পথে দেখা গেল। আগে সে নাইট ডিউটি করতেই চাইত না, কিন্তু আজকাল অদ্ভুত উৎসাহ দেখা গেল নিশাচরবৃত্তিতে। অন্য কর্মী-দের সংগে ডিউটি বদল করতে লাগল।

রমাও ভাইকে ভোরে স্কুলে পেৌঁছে দিতে ঠিক ওই রাস্তাই ধরল। যেতে যেতে বার বার চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কি অসভ্য লোক, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক একভাবে চেয়ে রয়েছে।

একদিন সুযোগ জুটে গেল।

কারখানার পাশেই এক ময়দান। কোথা থেকে এক সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলল। বাঘ, হাতি আর ভল্লুক। তাদের হাঁক ডাকে পাড়া সরগরম।

ভাইকে নিয়ে যেতে যেতে রমা থমকে দাঁড়াল। বাঘের খাঁচার পাশে দারুণ ভিড়।

রমার ভাই আবদার ধরল, দিদি একটু দেখব।

অত ভিড়ের মধ্যে যাবো কি করে মানু। অসহায় চোখে রমা এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়ে গেল। অনুতোষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে।

রমা কিছু বলবার আগেই অনুতোষ এগিয়ে এল। মানুর কথা বোধ হয় তার কানে গিয়েছিল।

এস ভাই, আমি তোমাকে বাঘ দেখিয়ে নিয়ে আসছি।

মানু নির্বিকারে, নির্দ্বিধায় অনু-তোষের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। এক পা এগিয়েই অনুতোষ রমার দিকে ফিরে বলল, আপনিও আসুন না।

রমা আরক্ত মুখে বলল, আমি আর কি দেখব!

অনুতোষ হাসল, কেন, বাঘ অনেক দেখেছেন বুঝি?

রমা আরও রাঙা হ'ল। কোন কথা না বলে অনুতোষের পিছন পিছন এগোতে লাগল।

কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল।

ভিড়টা ঠিক বাঘের জন্য নয়। বাঘের খাঁচার মধ্যে একটি মেয়ে। বয়স হয়তো রমার মতনই হবে। স্বাস্থ্যবতী, তন্বী। এত অল্প আবরণ জড়িয়ে কেউ লোক-চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে এ যেন রমার ধারণারও অতীত ছিল। পাতলা কাপড়ের পটি বুকে বাঁধা। কটিতে কৌপীন।

অনুতোষের পাশে দাঁড়িয়ে রমার অবস্থা কাহিল। বিশেষ করে আশপাশে দাঁড়ানো লোকের মন্তব্যের টুকরো কানে যেতে রমার আর চোখ তোলবার উপায় ছিল না।

অনুতোষ বেপরোয়া। মহা উৎসাহে মানুকে বাঘের আচার আচরণ শিকার ধরার পদ্ধতি বুঝিয়ে চলেছে।

একটু পরে রমাই মনে করিয়ে দিল, চলুন, মানুর স্কুলের দেরী হয়ে যাবে।

অনুতোষ অপ্রস্তুত হবার ভান করল, তাইতো, ওর স্কুলের কথাটা আর আমার খেয়াল ছিল না।

মানুর কিন্তু হুঁস নেই। এমন বাঘ ছেড়ে স্কুলের শিক্ষকদের কাছে যেতে সে রাজী নয়।

কিন্তু যেতে হ'ল। দিদি হাত টেনে ধরল। অনুতোষ রইল পাশে পাশে।

তারপর থেকে রোজ। মানুকে স্কুলে নিয়ে যাবার সময় নয়, ফেরার পথে।

ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়ল। দুজনেরই। হাঁটি হাঁটি পা পা করে রাস্তা থেকে সস্তা রেস্টরেন্টে গিয়ে ঢুকল। দু কাপ চা সামনে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে বসে রইল দুজনে। প্রথম প্রথম নিজেদের সংসারের কথা, আত্মীয়স্বজনের খবর। তারপর আবোল তাবোল কথা শুরু হ'ল। চিরন্তন আবেগ, হাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতি। পুরোনো সংসার ছেড়ে নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন।

অনুতোষের কেউ কোথাও ছিল না, কিন্তু রমার জাঁদরেল বাপ ছিল। অভিভাবক বলতে ওই একজন, কিন্তু একাই একশ। মেয়ে কুল ছাড়া, গোত্র ছাড়া কারো গলায় মালা দেবে আর তিনি নির্বিবাদে চোখ বুজে তাই মেনে নেবেন এমন মনে করার কোন হেতু ছিল না।

তাই অনুতোষ স্পষ্টই বলল, চল আমরা চলে যাই কোথাও।

উদাস দুটি চোখ তুলে রমা জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

অনেক দূরে কোথাও। যেখানে তোমার বাপের ছায়া পেৌঁছবে না।

না, না, রমা ঘাড় নেড়েছে, তোমার চাকরি? চাকরির কি হবে?

ঠিক হয়েছিল অনুতোষ চাকরি ছাড়বে না। শুধু বাসা বদলাবে। মেস

ছেড়ে শহরতলীর কোথাও আস্তানা পাতবে।

রমার বাপ যে মেয়ের বিয়ের একেবারেই চেষ্টা করেননি এমন নয়। তিনি আশা করছিলেন মেয়ের রূপ যখন রয়েছে তখন রূপোর ওপর পাত্রপক্ষ হয়তো বিশেষ জোর দেবে না।

কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে দেরী হ'ল না। মেয়েকে দেখে যাও বা দু' একজনের পছন্দ হল, বাপের দানের ফিরিস্তি শুনেই তাঁরা পিছু হাটলেন। বেশ তো, মেয়ে সুন্দরী, বেশী কিছু দিতে না চান, কিছু তো দেবেন। অন্ততঃ গাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁরা যে ছেলের বিয়ে দেবেন না, এটা তো ঠিক।

দু' একজন হয়তো খালি হাতেই মেয়ে নিতেন, কিন্তু তাঁরা থেমে গেলেন মেয়ের বাপের চরিত্র-মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে। তাঁরা খবর না দিয়ে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন অপ্রস্তুত অবস্থায় মেয়েকে দেখবেন, কিন্তু মেয়ের বাপের অবস্থা দেখে তারাই অপ্রস্তুত হলেন।

একদিন কথাটা রমার বাপের কানে উঠল। পাড়ায় পরোপকারী ছেলের অভাব ছিল না। অন্যায়, অসত্য দেখলেই যারা জ্বলে ওঠে। বিশেষ করে নিজেদের মুখের গ্রাস পরকবলিত হ'লে। যারা রমাকে পথে-ঘাটে দেখলে উৎসাহে শিস দিত, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করত, মাঝে মাঝে কথা বলার চেষ্টা, তারাই রমার সঙ্গে বেপাড়ার অনুতোষের অন্তরঙ্গতা দেখে সমাজ-হিতৈষী সাজল। রং ফলিয়ে রমার বাপের কাছে এই অবৈধ সম্পর্কের রসাল বর্ণনা দিল।

মেয়েকে বাপ সোজাসুজি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাড়ার ছেলেরা কি সব দেখেছে বলছে। কারখানার কোন মিস্ত্রির সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়িয়ে—

রমা সব কিছু অস্বীকার করল। বরং পাড়ার ছেলেরাই যে তার পিছনে লেগেছে, সে কথাই বলল।

রমার বাপ বিশ্বাস করলেন মেয়ের কথা। আর এই ব্যাপারের তিন দিন পরেই রমা নিখোঁজ।

রাত্রে নেশাটা বেশ জবর হয়েছিল। রমা যে নেই সেটা খেয়াল হল অনেক পরে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে রমার বাবা চুপচাপ বারান্দায় বসেছিলেন, ছেলে এসে কাছে দাঁড়াল।

দিদি এখনও আসেনি বাবা।

প্রথমে কথাটা তাঁর কানেই যায়নি। ছোট কথা কানে যাবার মতন অবস্থাও তাঁর ছিল না। মাঠে বেশ কিছু গেছে। ঘোড়ার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন এক গাদা টাকা। যা বাকি ছিল শোক ভুলতে খরচ করেছেন। অথচ এখনও প্রায় সারাটা মাস বাকি। তাই বসে বসে ভাবছিলেন। কালই কোন বন্ধুর কাছে হাত পাতা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

হুঁস হতে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, যাবে আর কোন চুলোয়। দেখ সুখীদের বাড়ী আছে। আসবে এখন।

সুখী মানে সুখদা। বিয়ে হয়েছিল বছর দুয়েক। এর মধ্যে হাতের লোহা ঘুচিয়ে, সিঁথের সিঁদুর মুছে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে। প্রায় রমারই সমবয়সী। সংসারের কাজ শেষ করে মাঝে মাঝে রমা যায় সুখীদের বাড়ী।

রাত বাড়তে রমার বাবার খেয়াল হ'ল। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিজে গিয়ে দাঁড়ালেন সুখীদের বাড়ী।

না, রমা নেই সুখীদের বাড়ী। আজ সকাল থেকে আসেনি। তবে, তবে মেয়ে গেল কোথায়!

উঠতি বয়সের মেয়ে! দুবেলা যথেষ্ট খোরাক না জুটলেও স্বাস্থ্য যথেষ্ট সংগ্রহ করেছে। ভয়ের কথা। শহরের অলিগলিতে লোভের ফাঁদ, বিপদের হাতছানি। একবার তলিয়ে গেলে আর খোঁজ পাওয়া দুষ্কর।

রাত্রে আর কিছু করলেন না কিন্তু সারাটা রাত রমার বাবা জেগে রইলেন। শুধু জাগা নয়, বসে বসে মেয়ের চোদ্দ-পুরুষ নরকস্থ।

ভোরে উঠেই ছুটলেন থানায়।

এবার পাড়ার ছেলেরা অগ্রণী হ'য়ে এল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর জোগাল। পুলিশকে অনুতোষের পাত্তা দিল। তারপর মেস থেকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে দুজনকে পাকড়াও করতে পুলিশের অসুবিধা হ'ল না।

সরকারি উকিলই কথাটা বললেন। বয়স কমিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না। নকল কোষ্ঠি তৈরী করেও নয়। ডাক্তাররা এসব মানতে চাইবে না। তাও বা দু'-এক বছরের এদিক-ওদিক হ'লেও কথা ছিল। শিং উঁচিয়ে একবার সরকারি উকিল লড়বার চেষ্ট করতেন। বাড়ন্ত গড়নের নজীর দেখিয়ে। কিন্তু মেয়ের বয়স অনেক। সেটা প্রমাণ হ'লেই সব জারিজুরি ফাঁক। সমস্ত কেসটা শুধু বয়সের ঝুড়িতে বোঝাই করাটা সমীচীন হবে না। যদি প্রমাণ হয় মেয়ে সাবালিকা, তা হ'লেই আসামী বেকসুর খালাস পাবে। কাজেই মেয়ে স্বেচ্ছায় যায়নি, সেটাই প্রমাণ করতে হবে।

সেই কথাই মেয়ের বাপকে বললেন। ধমক দিয়ে হোক, গাল দিয়ে হোক মেয়েকে শায়েস্তা করতেই হবে। বাপের

ইজ্জত, বংশের মর্যাদা নিশ্চয় ঠুনকো প্রেমের চেয়ে বড় নয়। অতএব।

অতএব মেয়ের ওপর নির্যাতন চলল। একটানা।

ফল হ'ল। রমা রাজী হ'ল বাপের শেখানো বুলি বলতে।

সরকারি উকিল আবার মনে করিয়ে দিলেন, আপনি গেলেন মাসীর বাড়ী?

মুখ নীচু করে রমা মাথা নাড়ল। না, মাসীমার বাড়ী যাওয়া হয়নি। চলন্ত এক ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে অনুদা আমায় উঠতে বলল। আমি উঠলাম।

এই পর্যন্ত সত্যি, কেবল মাসীমার বাড়ী যাবার ব্যাপারটা ছাড়া। সে রাতে ট্যাক্সির কোটরে রমা খুব ঘন হয়ে বসেছিল অনুতোষের বুকের কাছে। খুব মৃদু কণ্ঠে ড্রাইভারে কান বাঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি চিরদিন আমায় এমনি কাছে রাখবে তো। নেশা কাটলে দূরে সরিয়ে দেবে না?

জীবনটাকে পরিষ্কারভাবে রমা দেখেছে। কিছু নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, কিছু সমবয়সীদের মারফৎ। পুরুষ ভালবাসে, কাছে টানে তারপর সাময়িক উচ্ছ্বাস প্রশমিত হ'লে বাসি-মালার মতন পরিত্যাগ করে। পিছন ফিরে দেখে না। গায়ে কতটুকু কাদা লাগল তার খোঁজ রাখে না। এ পথ অনিশ্চিতের পথ। মোহের পাশাপাশি দাহও আছে। হিসাবে ভুল হ'লে একটা নারীত্ব ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একটা জীবনের পরিসমাপ্তি।

অনেকদিন ধরে অনুতোষকে রমা যাচাই করেছে। পাশাপাশি এসেছে দুজনে, খুব কাছাকাছি, তবু কোনদিন অনুতোষ এই সান্নিধ্যের অমর্যাদা করেনি। নিজেকে নিবেদন করেছে পরিচ্ছন্ন ভাষায়, রমাকে কাছে টেনেছে, সসম্ভ্রমে।

অনেক ভেবে-চিন্তে তবে রমা এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। যে আলোর মোহে ঘর ছেড়েছে, সে যে আলেয়া নয়, এটুকু বিশ্বাস তার ছিল।

সরকারি উকিল একটা পা তুললেন পাশের খালি চেয়ারে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমাটা মুছলেন। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। অনেকদিন ধরে শেখান হ'য়েছে। ঠুলি-পরা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মতন ঠিক চলবে সোজা শড়ক ধরে। এদিক ওদিক হবার ভয় কম।

এসব কেসে প্রথম প্রথম যা একটু অসুবিধা। তেজী ঘোড়ার মতন ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে আবেগ স্তিমিত হয়ে যায়, উদ্দীপনা, উত্তেজনা সব নিস্তেজ। তখন সব কিছু ঠিকভাবে দেখবার সুযোগ পায়। চোখের সবুজ চশমাটা খসে পড়ে।

তারপর। রমা থেমে আছে দেখে সরকারি উকিল কথার খোঁচা দিলেন।

অনেকক্ষণ ট্যাক্সি চলার পরে খেয়াল হ'ল যে মাসীমার বাড়ী যেতে তো এতক্ষণ লাগার কথা নয়। অনুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত দেরী হচ্ছে কেন? অনুদা বলল, সোজা রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছে, তাই গাড়ী ঘুর পথে যাচ্ছে।

রমার বাবা উল্লসিত হলেন। অবশ্য মনে মনে। অপহৃতা মেয়ের বাপের উল্লাস প্রকাশ করা অনুচিত। বিশেষ করে কোর্ট-ঘরে। ধর্মাবতারের সামনে। এতদিন ধরে তালিম দেওয়া সার্থক। ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছে মেয়েটা। কোথাও ভুলচুক করছে না।

একটা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামল। অনুদার নির্দেশে। নিজে নেমে দাঁড়িয়ে অনুদা বলল, আমার এক বোনের বাড়ী, এস একটু দেখা করে যাই। আমি নামলাম, আর বেরোতে পারলাম না। সে রাত্রেই বিয়ে হয়ে গেল। সব আয়োজন তৈরীই ছিল।

আপনি আপত্তি করেননি? সরকারি উকিল চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিল।

তুমি চিরদিন আমায় এমনি কাছে রাখবে তো?

আসামীর উকিল এতক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠল। আপত্তি জানানোর ভঙ্গীতে।

এভাবে ফরিয়াদীর মুখে উত্তর তুলে দেবার অধিকার বে-আইনী।

কিন্তু ততক্ষণে রমা শেখানো উত্তর বলতে শুরু করেছে।

—আমি অনেক আপত্তি করেছি, মিনতি করেছি, কান্নাকাটি করেছি, কিন্তু কেউ শোনেনি আমার কথা।

থেমে থেমে ঢোক গিলে আস্তে আস্তে রমা কথাগুলো বলল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সে রাত্রের দৃশ্য। রমারই আগ্রহ ছিল বেশী। সেই অনুতোষকে বলেছিল, গন্ধর্ব বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই, হিন্দুমতে বিয়ের আয়োজন কর।

কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ।

আমরা পুরুষ আর নারী। আমরা ধর্মে হিন্দু। তোমার শাস্ত্র আমার শাস্ত্র

এক। যদিদং হৃদয় মম, এই মন্ত্রে দুজনেই বিশ্বাসী। কাজেই কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কোন অসুবিধা কি হয়নি? নিজের হাতে রমা সিঁথের সিঁদুর মুছেছে, হাতের শাঁখা ভেঙেছে। বাপ সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু করিয়েছেন। কোন প্রতিবাদ শোনেনি। তবে কোথায় গেল সেই ধর্মের অনুষ্ঠান, লোকাচার, শাস্ত্রের বিধান! অনুতোষের কাছ থেকে যে বিচ্ছেদের ভয়ে রমা ধর্মের সাহায্য খুঁজেছিল, নিজের হাতে সেই ধর্মের বন্ধন সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে।

এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল! কোন পথ! এ যন্ত্রণা, এ লাঞ্ছনা আর রমা সহ্য করতে পারছিল না। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে এ এক জীবন্মৃত অবস্থা।

কাঠগড়ার দিকে চোখ ফেরাতে গিয়েও রমা সামলে নিল। হয়তো অনুতোষ বিস্ফারিত দুটি চোখে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে, যে মুখে আকাশের চাঁদের ছায়া দেখেছিল অনুতোষ, স্বর্গের প্রতিচ্ছবি, সে মুখে এত পঙ্কিলতা, এত ক্লেদ!

কি হবে অনুতোষের। যেভাবে সব দিক বেঁধে রমার বাবা কেস শুরু করেছেন, যেভাবে রমা একটা মিথ্যার পর একটা মিথ্যা বলে চলেছে, যেভাবে সরকারি উকিল তৎপর, সাজা অনুতোষের হবেই। কত বছর! এক, দুই, দীর্ঘ পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অনুতোষ থাকবে। আর এক কারার অন্তরালে থাকবে রমা। দুচোখে প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করবে। দীর্ঘ পাঁচ বছর, ততদিন হয়তো রমার বাবা থাকবেন না। কোন বাধা থাকবে না, কোন অন্তরাল নয়। অনুতোষের কাছে যেতে রমার কোন অসুবিধা নেই।

অনুতোষ উকিল দিতে চায়নি। উকিল দিয়েছে অনুতোষের জনদুয়েক বন্ধু। বন্ধুরা যে খুবই স্বল্পবিত্ত সেটা উকিলের চেহারা দেখেই মালুম হয়। অর্ধভুক্ত, শীর্ণ একটা মানুষ জরাজীর্ণ গাউনের আবরণে আত্মরক্ষা করছে। কেসের ব্যাপারে আসামীর চেয়েও নিস্পৃহ, আরো নিবীর্য।

কিন্তু এর পরেও অনুতোষ কি গ্রহণ করবে রমাকে? একটা ছলনা, একটা প্রবঞ্চনা, একটা শঠতাকে নিয়ে ঘর করবে!

একবার অনুতোষের কাছে যেতে পারলে রমা সব কিছু বোঝাতে পারবে। নিজের অসহায় অবস্থা, নিজের রিক্ততা। দুচোখের জল দিয়ে, হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে অনুতোষের মনের সব অবিশ্বাস মুছে দেবে।

অনুতোষ উকিল দেয়নি। ভেবেছিল প্রয়োজন হবে না। কোর্টে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে রমা মিথ্যা বলবে না। অন্তত এমন একটা জীবন-মরণের সমস্যার ব্যাপারে। কিন্তু অনুতোষের বুঝি ভুল ভেঙেছে। সাপিনীর মতন শুধু ফণাই প্রসারিত করেনি রমা, ছোবলে ছোবলে অন্তরের সবটুকু বিষ ঢেলে দিচ্ছে। কেবল কাছে আসাটাকেই যে অস্বীকার করছে এমন নয়, অনুতোষকে আততায়ী সাজিয়েছে। ছলে, বলে, কৌশলে সে

একটা নারীত্বের অবমাননা করেছে। অমর্যাদা করেছে পবিত্র এক চিত্তের।

কিন্তু উপায় নেই। কোন উপায় নেই। এ কথা কি করে অনুতোষকে রমা বোঝাবে। একটা মানুষ কত নৃশংস হতে পারে, কত হৃদয়হীন, রমার বাবা তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। দয়া, মায়া, মমতার কোমল তন্ত্রীগুলো নির্মম হাতে অপসারিত করেছেন। মানুষ নন, তীব্র একটা প্রতিহিংসা, একটা জ্বলন্ত ক্ষোভ সরকারি উকিলের পাশে বসে নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

এ বিবাহে আপনি যে আপত্তি করেছেন, তার প্রমাণ?

আসামীর উকিল আর একবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর চেয়েও জরাজীর্ণ একটা এভিডেন্স এ্যাক্টের পাতা খুলে বিড়-বিড় করে কি পড়ে গেলেন।

ধর্মাবতার মাথা নাড়লেন। নাকচ করলেন আপত্তি। রমার দিকে চোখ ফেরালেন প্রশ্নের উত্তরের আশায়।

রমা নিশ্চল। পাথরের মতন অনুভূতিহীন। কানের পাশে হাজার বোলতার গুঞ্জন ধ্বনি। কি এদের প্রশ্ন? কিসের উত্তর এরা চায়?

সরকারি উকিল আবার প্রশ্নটা বললেন। রমার দিকে চেয়ে।

সরকারি উকিলের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই রমার দুটি চোখ তার বাপের মুখের দিকে ন্যস্ত হ'ল। অগ্নি-বর্ষী দুটি চোখ ইঙ্গিতময়। দাঁত দিয়ে সবলে ঠোঁটটা চেপে ধরেছেন। দুটি বিছা-ভ্রূ কুঞ্চিত।

কি একটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন রমাকে। এত দিনের, এত কষ্টে তালিম দেওয়া সব কিছু, রমা বুঝি বিস্মৃত হ'ল।

মনে পড়ে গেল। একটু একটু করে সব কিছু। একজনের পীড়নের সব চিহ্ন আর একজনের বলে চালাতে হবে, সেই নির্দেশই ছিল। নীল নীল দাগ, বাহুমূলে, প্রকোষ্ঠে, দু গণ্ডে। বিয়েতে আপত্তি করেছিল, যেতে চায়নি বাসরঘরে, তাই নির্যাতন করেছে অনুতোষ।

দুটো হাত সামনের দিকে রমা প্রসারিত করল। দেখুন ধর্মাবতার, সারা কোর্ট ঘরে জমাট-বাঁধা লোকের দল চোখ ফেরাক এদিকে। একটা পুতশুভ্র দেবতার নির্মাল্যকে কিভাবে দানব ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, কালিমালিপ্ত, সারা পৃথিবী নিরীক্ষণ করুক।

এই যে, কথাটা বলেই রমা নিজের হাতের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর অনেকক্ষণ আর চোখ তুলতে পারল না।

প্রকোষ্ঠে, বাহুমূলে অনেকগুলো কালশিটে। রক্ত জমে নীল হয়ে রয়েছে। কিন্তু মণিবন্ধে লালচে একটা আঁচড়, রমার সুগৌর ত্বকে উষার রক্তিম আভা নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ চিহ্ন কিন্তু অন্য লোকের। কাঠগড়ায় নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে থাকা মানুষটা সে রাতে কতকটা সজীব ছিল, কতটা প্রাণবন্ত এ চিহ্ন তারই নিরিখ।

মনে আছে রমার। সবটুকু মনে আছে।

খাটের বাজু ধরে রমা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। একটু বুঝি অন্যমনা। বার কয়েক অনুতোষ ডেকেছে। রমা শুনতে পায়নি। এই এসো। রমার হাতটা চেপে ধরে অনুতোষ আকর্ষণ করেছে। আকর্ষণটা বুঝি একটু জোরই হয়ে গিয়েছিল। হাতের চুড়িগুলো লেগে অনেকটা কেটে গিয়েছিল। ক্ষতমুখে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ।

অনুতোষ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ছি ছি, তুমি যে লেদ মেশিন নও সেটা মনেই ছিল না। মিস্ত্রীর হাত তো। বড্ড লেগেছে না?

তারপর আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দিয়েছিল রমাকে।

কই দেখান ধর্মাবতারকে। হাতটা তুলে ধরুন। সরকারি উকিল গলা চড়াল।

হাতটা সন্তর্পণে তুলে ধরতে গিয়েই রমা কান্নায় ভেঙে পড়ল। মণিবন্ধের লাল আঁচড়ের মতনই আরক্ত দুটি চোখের দিকে তার নজর পড়েছে। আশ্চর্য, সে দুটি চোখে ঘৃণা নয়, বিতৃষ্ণা নয়, বিরাগ নয়, অপরিসীম ভালবাসা। অনেকদিন আগের রমার জীবনের সবচেয়ে মোহময় একটি রাতে খুব কাছে আসা মানুষের প্রেমাতুর দুটি দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া।

না, না, না, এ আমি পারবো না! নিজেকে ভেঙে এভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা সাজাতে আমি পারব না ধর্মাবতার! আমার মজ্জায় মজ্জায়, তন্তুতে তন্তুতে যে মানুষটা মিশিয়ে গেছে, তাকে অস্বীকার করতে আমি পারব না। আমি স্বেচ্ছায় গেছি ওর কাছে, আমি নিবেদন করেছি, তবে ও নিয়েছে আমাকে।

কাঠগড়ার কাঠামোটা বুঝি নড়ে উঠল। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত শিলা চূর্ণ হয়ে একটা স্রোতস্বতীর কলধারা শোনা গেল।
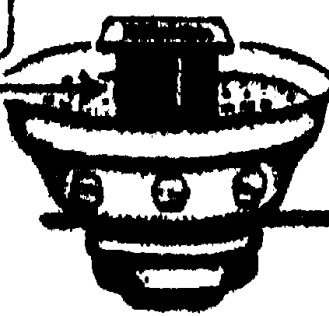
নিকো

বীজাণুনাশক সাবান

পার্ক-ডেভিসের তৈরী

আপনার ত্বককে পরিস্কার ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ফুস্কুড়ি, মেচেতা, ঘামাচি ও এধরনের অন্যান্য সংক্রামক চর্মরোগ থেকে মুক্ত রাখে। নিয়মিতভাবে শ্যাম্পু হিসাবে ব্যবহার করলে নিকো সাবানের জীবাণুনাশক ফেনা মরামাস বা মাথার খুস্কির একটি ভাল প্রতিষেধক। সুপরীক্ষিত জীবাণু-নাশক গুণসম্পন্ন সাবান নিকো একই সঙ্গে তিন রকমের উপকার দেয়— পরিস্কারক, বীজাণুনাশক ও চর্মরোগ প্রতিষেধক। প্রতিদিনই আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় যত্ন নিন— নিকো দিয়ে।

NEKO
Germicidal Soap

নিকো

দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আসল বীজাণুনাশক সাবান

NAS. PD 9007

মেঘের ওপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

| উপন্যাস |

॥১॥

"গাড়ীখানি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। একখানি গো-শকটের পাশ কাটাইতে গিয়া অকস্মাৎ একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং প্রায় পনেরো ফুট নীচে গিয়া উলটিয়া পড়ে। পাঁচজন আরোহীর তিনজন তৎক্ষণাৎ নিহত হন, বাকী দুইজন হাসপাতালে পৌঁছিবার পূর্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

বিহারের কোন্ দূর প্রান্ত থেকে সংবাদ। এতবড় খবরের কাগজটার খুব সামান্য অংশই জুড়ে আছে—তন্ন-তন্ন করে না খুঁজলে চোখেই পড়তে চায় না। প্রত্যেক দিনের অসংখ্য বড়ো বড়ো ঘটনার তরঙ্গের মধ্যে কয়েকটা কালো অক্ষরের বুদ্বুদ। যে হাজার হাজার মানুষ এই বাংলা খবরের কাগজটা পড়ে, তাদের কেউ ও নিয়ে এক মিনিটও মাথা ঘামাবে না। শুধু এই কাগজের পাঠকেরাই বা কেন, হাজারীবাগ জেলার যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, চার দিন আগেকার এই ব্যাপারটা এখন তাদের কাছেও পুরোনো হয়ে গেছে। ভাঙা মোটরটাকে হয়তো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, শুকিয়ে গেছে রক্তের দাগ—যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারাও আর এ নিয়ে এখন গল্প করে না।

খবরের কাগজে কয়েকটা অক্ষরের বুদ্বুদ হয়ে উঠে পাঁচজন মানুষ চিরকালের মতো অন্ধকারের সমুদ্রে মিশল। সুখ-দুঃখ মন্দ-ভালোর দায় মিটিয়ে বেঁচে গেল তারা। আর তাদের স্মৃতি যাদের বুকের ভেতর রেখে গেল—

এইখানে প্রভাত সরকারের ভাবনাটা থামল। পশ্চিমমুখো করে রাখা গাড়ীটার সামনের কাচে ধারালো রোদ এসে পড়েছে। বৃষ্টিহীন বৈশাখের রোদ। চোখ-মুখ-কপাল একসঙ্গে একটা হিংস্র দহনে জ্বালা করে উঠল তার। রোদটা হয়তো আসছিল অনেকক্ষণ থেকেই, কিন্তু প্রভাত সরকার এতক্ষণে তার অস্তিত্বটা অনুভব করল।

মোটর দুর্ঘটনা। সারা ভারতবর্ষে, এই কলকাতায়—প্রত্যেক দিন, প্রতি ঘণ্টায় ঘটে চলেছে হয়তো। মানুষ মরছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসছে, অক্ষম বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রভাত সরকারের তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। এই বৈশাখ মাসের বিকেল চারটের সময় গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে সকালের বাসী-হয়ে-যাওয়া কাগজটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে সে-ও আরো দশজনের মতো ওই ছোট খবরটুকুর ওপর কৌতূহলহীন দৃষ্টি মাত্র এক মিনিটের জন্যে বুলিয়ে নিতে পারত। কিন্তু প্রভাত সরকার ওটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না—কোনো মোটর অ্যাকসিডেণ্টের খবরই সে সহজে ভুলতে পারে না। কেবল বিকেলের রোদ নয়—আর একটা জ্বালা, আর একটা দুঃসহ দহন তার কপালের ওপর—কপাল ছাড়িয়ে তার মস্তিষ্কের ভেতরে জ্বলতে থাকে। প্রভাত সরকার ভাবে, নিজের হাতে শেষ অ্যাকসিডেণ্টটা না ঘটানো পর্যন্ত এই জ্বালার হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা আগে গিন্নী এবং দিদিমণি সামনের বড়ো দোকানটাতে ঢুকেছেন। কী সব কাপড়-জামা কিনবেন তারা! তার মানে আরো একটি ঘণ্টায় আগে তাঁরা বেরুবেন না। কর্তা সঙ্গে থাকলে তবু একটু তাড়াতাড়ি হয়—কিন্তু কোনো ভরসা নেই মা-মেয়ের বেলায়। রাত আটটায় দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পছন্দের পালা চলতে পারে।

কাগজটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে, প্রভাত সরকার মাথাটা গাড়ীর দরজার দিকে এলিয়ে দিলে। রোদটা এখন আর সোজাসুজি মুখে পড়ছে না। পকেট থেকে তেলের রং-ধরা রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছল একবার—তারপর আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। পীচ-গলা পথের ওপর টায়ারের দাগ ফেলে চলা বড়ো বড়ো ডবল-ডেকারের ' আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তার দৃষ্টি আটকে রইল রাস্তার ওধারে সার-বাঁধা গাছগুলোর দিকে—যেখানে দুপুরের গরম হাওয়ায় এখনো সমানে পাতা-ঝরানোর পালা চলছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল চার বছর আগে। না—একটু বেশি। চার বছর দু মাস। সেদিন আষাঢ়ের মেঘে আকাশ কালো হয়ে এসেছিল। তারপর নেমেছিল সেই বৃষ্টি—যে বৃষ্টিতে তিন-চার হাতের পরে আর হেড লাইটের আলো যেতে চায় না—উইন্ড-স্ক্রীনের ওপরে ওয়াইপার দুটো অসহায়ভাবে যেন ঝর্ণার জল রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে।

তার আগের দিন রাণীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আর সেই বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যায় প্রভাত সরকার গাড়ী নিয়ে তাদের পৌঁছে

দিতে যাচ্ছিল একুশ মাইল দূরের জংশন স্টেশনে।

কিন্তু সে গাড়ী আর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি।

প্রভাত সরকার আবার সেই রুমালটা দিয়ে কপাল-মুখ মুছে ফেলল। বিকেলের রোদে লালচে আভা পড়ছে, তবু সমস্ত চৌরঙ্গী যেন কামারশালার মতো গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে। প্রভাত সরকারের সেই পুরোনো বড়ো পুকুরটাকে মনে পড়ল। বৈশাখের আগুন-ঝরা দিনেও কী ঠাণ্ডা, কী গভীর তার জল।

সেই পুকুরে রাণী ডুবছিল।

সাঁতার জানত না তা নয়। অত বড় পুকুরটা এপার-ওপার করতে গিয়ে খুব সম্ভব পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। প্রভাত সরকার চলেছিল একটু দূরের মাঠের পথ দিয়ে সাইকেলে চেপে। হঠাৎ পাঁচ-সাতটি মেয়ের চিৎকার কানে এল তার ঃ ডুবে যাচ্ছে—ডুবে যাচ্ছে—সাইকেলটাকে মাঠের ভেতর আছড়ে ফেলেই প্রভাত ছুটে এসেছিল ঘাটে। তারপর গায়ের জামাটা খুলে সোজা ঝাঁপ দিয়েছিল পুকুরে।

রাণী তখন একবার উঠছে, একবার ডুবছে। সঙ্গের কিশোরীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে, সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার মতো সাহস কারো নেই। তীরের বেগে জল কেটে প্রভাত সরকার এগিয়ে গিয়েছিল, মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল খোলা চুলের রাশ, দু' মিনিটের মধ্যে টানতে টানতে ডাঙ্গায় এনে ফেলেছিল।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে এসে। প্রভাত কেবল বলেছিল, সামান্য জল খেয়েছে মাত্র, বিশেষ কিছু হয়নি। তবু একটু দেখুন মেয়েটিকে।—তারপর জামাটা তুলে নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল—সাইকেলটা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে তার।

পরের দিন সকালে ব্যাপারটা যখন তার মনেই নেই, চক্রবর্তী কোম্পানির আফিসে বসে যখন সে সপ্তাহের পেট্রোল আর মবিলের হিসেব করছিল, সেই সময় এলেন অমূল্য বাবু। এখানকার স্কুলের হেড্ মাষ্টার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, চওড়া কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে শান্ত-গম্ভীর চোখ, পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর, হাতে ছড়ি।

প্রভাত ভদ্রলোককে চিনত। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁকে বক্তৃতা দিতে শুনেছিল একবার। ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে কী যেন তিনি বলেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে—প্রচুর ইংরেজি আর সংস্কৃত আওড়েছিলেন সেই সঙ্গে।

প্রভাত তাঁর ছাত্র নয়, তবু তিনি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

অমূল্যবাবু মিনিটখানেক কালো ফ্রেমের চশমার আড়াল থেকে গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন তাকে। তারপর সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার নাম প্রভাত সরকার?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তোমার মতো ছেলে আমি দেখিনি।

প্রভাত কথাটা বুঝতে পারেনি। বোকার মতো তাকিয়ে থেকেছিল তাঁর দিকে।

হেড মাষ্টার বলেছিলেন, লোকে একটা ভালো কাজ করে তার পাঁচগুণ পাবলিসিটি চায়। তুমি তার উলটোটি করে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এলে? জানো, কাল সারাদিন খোঁজ-খবর করে মাত্র আজ সকালে আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি?

—মাপ করবেন, আমি ব্যাপারটা ঠিক—

আমি রাণীর বাবা। কাল তুমিই আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছ জল থেকে।

প্রভাত মাথা নীচু করল।

—আমি এখানে নতুন, মাসখানেক মাত্র এসেছি। কেউ আমাকে চেনেন না—আমার সঙ্গেও বিশেষ কারো—

অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছিলেন তার দিকে।

—দেশ বুঝি এদিকে নয়?

—না, পাকিস্তানে। ঢাকায়।

—সেইজন্যেই এত লাজুক। তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়েছ সেজন্যে তোমায় কী বলে যে আশীর্বাদ করব জানি না। কিন্তু আর একটু কষ্ট তোমায় করতে হবে।

—বলুন।

—আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়ীতে তুমি আসবে—রাত্রে যা হোক দুটো খাবে ওখানে। না বললে শুনব না। আমার বাসা চেনো তো?

প্রভাত মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, সে চেনে না।

—চিনতে অসুবিধা হবে না। হাই-স্কুলটা দেখেছ তো? তার ঠিক উলটো দিকেই হলদে রঙের একতলা বাড়ীটা। ঠিক সাতটায় তোমায় এক্সপেক্ট্ করব। মনে থাকবে তো?

যেতেই হয়েছিল প্রভাতকে।

ছোট সংসার। অমূল্যবাবু, তাঁর স্ত্রী, বি-এ ক্লাশে পড়া তাঁর ছেলে অলকেশ আর স্কুল-ফাইনালের ছাত্রী মেয়ে রাণী—যার ভালো নাম সুস্মিতা।

অভ্যর্থনা, আশীর্বাদ, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর গালগল্প। প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন অমূল্যবাবুর স্ত্রী।

—কে আছেন তোমার?

—কাকা আছেন। এলাহাবাদে থাকেন।

—বাপ মা ভাইবোন?

—কেউ নেই।

—সে কি কথা!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চমকে উঠেছিলেন।

তখন নিজের কথাগুলো সব খুলে বলতে হয়েছিল। বাপ-মার একমাত্র সন্তান সে। দেশ ভাগ হওয়ার পরেও তারা কয়েক বছর পাকিস্তানেই ছিল। তারপর বাবাকে একটা রাজনৈতিক মামলায় জড়িয়ে দশ বছরের জন্যে জেলে পাঠানো হয়—তিন বছরের মধ্যে জেলেই মারা যান তিনি। সেবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে। বাবার মৃত্যুর খবর আসবার কয়েক দিন পরেই মা আত্মহত্যা করেন। তারপর—

তারপর স্রোতের মুখে। কাকার ওখানে আর যায়নি—কারণ কাকা কুড়ি বছর দেশছাড়া। বাবা রাজনীতি করতেন আর জেল খাটতেন বলে সরকারী চাকুরে কাকা পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগেই সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রভাত সেখানে অনুগ্রহ চাইতে যেতে পারেনি। পাঁচ বছর এলোমেলো ভাবে ঘুরেছে এদিক ওদিক; দু-একটা ছোটখাটো চাকরি জুটেছে আবার ছেড়েও গেছে। শেষ পর্যন্ত এই চক্রবর্তী মোটর কোম্পানিতে—

আরো অনেকের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। তবু অমূল্যবাবুর স্ত্রীর চোখে জল এসেছিল। আর অমূল্যবাবু বলেছিলেন, দাঁড়াও—দাঁড়াও—নিজের পায়েই দাঁড়াও। বী সেল্‌ফমেড।

আর রাত এগারোটায় বিদায় নেবার সময় রাণী বলেছিল, আবার আসবেন কিন্তু।

—আসব।

সেই শুরু। তারপর থেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া। দিনের পর দিন—মাসের

পর মাস। আর সামনের ছোট গেটটির পাশে দাঁড়িয়ে রাণীর চুপি চুপি বলা : তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না—কাউকে নয়।

সেদিন তাদের টিনের ঘরের মেঝে, নড়বড়ে তক্তপোশে শুয়ে—সারাটা রাত প্রভাত আর ঘুমোতে পারেনি। মাথার পাশের খোলা জানলা দিয়ে শরতের ঠান্ডা আসছিল, তবু জানলাটাকে সে বন্ধ করতে পারেনি কিছুতেই। মনে হয়েছিল সারাটা আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যেন বিয়ে-বাড়ীর আসর বসেছে—যেন ওদের ভেতর থেকে রাণীর দুটো লজ্জা-জড়ানো কোমল চোখ একভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাইরে টপটপ করে শিশির ঝরছিল ধুলোয়—ভিজে মাটি থেকে যেন চন্দনের গন্ধ আসছিল; ঝিঁঝির ডাকে কে যেন গম্ভীর গলায় মন্ত্র পড়ছিল, বাইরে পাতায় পাতায় ভাঁজ-ভাঙা চেলির মতো খস খস করে আওয়াজ উঠছিল। ভিজে মাটির গন্ধের সঙ্গে ভোরের প্রথম শিউলি ফোটার গন্ধ না আসা পর্যন্ত একটা অসম্ভব স্বপ্নের ভেতর তার রাত-জাগা চোখ দুটো মগ্ন হয়ে ছিল।

সেই রাতে—সেই কল্প-কামনা ভরা প্রহরগুলোতে একথা প্রভাত সরকারের কখনো মনে হয়নি রাণী—যার ভালো নাম সুস্মিতা—সে হেড্ মাষ্টারের মেয়ে। টাকা হয়তো বেশি নেই, কিন্তু অন্য সম্মান তাঁর আছে। আর তিন কুলে যার কেউ নেই—নিতান্তই স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে যে এই ছোট শহরটাতে এসে ভিড়েছে, চক্রবর্তী কোম্পানিতে যে একশো টাকা মাইনেতে হিসেব-পত্র দেখে আর ড্রাইভার না থাকলে কখনো কখনো গাড়ীও চালায়—তার সঙ্গে অমূল্যে বিশ্বাসের আকাশ-মাটির তফাৎ। জানলা দিয়ে আকাশের যে তারাগুলোকে সে দেখেছিল, রাণী তার কাছে তাদের মতোই সুন্দর।

কিন্তু বয়েস তখন বাইশ বছর, আর বাইশ বছরের চোখে তখনো কৈশোরের রূপকথা। তখনো বিকেলের সোনালি আলোতে দূরে রাজপুরীর সোনার চূড়ো দেখা যায়, তখনো অনেক রাতে ঝড়ের হাওয়া দেখা দিলে মনে হয়, দরজার বাইরে কেশর-ফোলানো একটা মস্ত কালো ঘোড়া এসে পা ঠুকে ঠুকে গর্জন করে চলেছে; নদীর বুকের ওপর একখানা সাদা মেঘ হঠাৎ একটুখানি নীচু হয়ে এলে তখনো মনে হয়, ওই মেঘের ভেতর থেকে টুপ করে কে যেন জলের ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—চকিতের জন্যে দেখা গেল তার মুখখানা, তার গলায় দুলে উঠল মুক্তোর হারের ঝলক, ঝিকমিক করল দুটি হীরে-বসানো কাঁকন, তারপর নদীতে একটুখানি হাসির কল-ধ্বনি তুলে সে কোন্ অতলে মিলিয়ে গেল।

—ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চ্!

একটা কর্কশ তীব্র আওয়াজে চমকে চোখ তুলল প্রভাত সরকার। সে নদী নেই—মেঘ নেই—সেই হীরে-বসানো কাঁকনের বিদ্যুৎ নেই। বিকেলের রোদে জ্বলন্ত চৌরঙ্গী। পীচ্-গলা পথে টায়ারের ছাপ, গরম হাওয়ায় পোড়া পেট্রলের গন্ধ।

হঠাৎ ব্রেক কষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার সামনেই ঠেলাগাড়ী নিয়ে একটা কালো কুঁজো লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে। লোকটার মাথার পাকা চুল আর গায়ের ঘাম রোদে জ্বলছে।

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার গালাগাল দিচ্ছে অশ্রাব্য কটু ভাষায়।

—উল্লুক, গাদ্ধা, বুদ্ধু কাঁহাকা! এখনি যে জান চলে যেত।

প্রভাত সরকার সোজা হয়ে উঠে বসল। এখুনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট্ হতে যাচ্ছিল, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল এই মুহূর্তেই। ট্যাক্সির ধাক্কায় ঠেলা কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ত আর কালো, কুঁজো ওই ক্লান্ত বুড়ো মানুষটা সোজা চাপা পড়ত ট্যাক্সিটার তলায়। তৎক্ষণাৎ তার জীর্ণ পাঁজরগুলো মড়মড় করে গুঁড়িয়ে যেত, জ্বলন্ত পীচের রাস্তার গরমে খানিকটা গরম রক্ত ধোঁয়া হয়ে আকাশে উড়ে যেত, খানিকটা বীভৎস মাংসের তাল কিছুক্ষণ পথের ওপর ছড়িয়ে পড়ে থাকত আব সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কালকের কাগজে একটা দু লাইনের খবর হয়ে যেত। দয়া করে খবরটা যারা পড়ত, এক মিনিটের বেশি তাদের মন সেখানে আটকে থাকত না। কিন্তু কিছুই হল না। একজন ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে এল, ঠেলাওলার ঘাড়ে গোটা দুই ধাক্কা দিলে, বোধ হয় আরো কিছু গালাগাল করল। খানিকটা পোড়া গ্যাসের উত্তাপ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ড্রাইভার শেষবারের জন্যে গলা বাড়িয়ে বলে গেল, এইসেই মরতা হ্যায় শালা লোগ! ট্রাফিক কনস্টেব্‌ল নিজের জায়গায় ফিরে গেল আর তেমনি কুঁজো হয়ে গাড়ীটা ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল সেই বুড়ো ঠেলাওলা, গলা-পীচের সঙ্গে তার ঘামে-ভেজা পায়ের ছাপ পড়তে লাগল পথের ওপর। যেন শেষ অ্যাক্সিডেন্টটা না ঘটা পর্যন্ত লোকটা ওই ভাবেই এগিয়ে চলতে থাকবে—যেন এ-ই ওর নিয়তি!

লোকটা চাপা না পড়ায় যেন মনে মনে খানিকটা নিরাশ হল প্রভাত সরকার। আবার রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল, শ্রান্তভাবে তাকিয়ে দেখল সামনের দোকানটার দিকে। দেড় ঘণ্টা হতে চলল, মা-মেয়ের বেরিয়ে আসার লক্ষণ নেই এখনো। রাত আটটায় দোকানের চাকর ঝাঁট দিয়ে বাইরে না ফেলে-দেওয়া পর্যন্ত হয়তো বেরুবেন না ও'রা।

রোদের ধারটা একটু কমে এসেছে, একটা শিথিল অবসাদ এসে জড়িয়ে ধরছে শরীর। প্রভাত সরকার চোখ বুজল। ট্যাক্সির ব্রেক-কষার আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে ওই রকম আর একটা শব্দ। প্যাঁচা ডাকছিল।

প্যাঁচা ডাকছিল গুমোট অন্ধকারে। এক পশলা বৃষ্টির পর ভিজে মাটি আর পাতার গন্ধ উঠছিল। সেই গেটটার পাশেই দাঁড়িয়েছিল রাণী। প্রভাত সরকার অপেক্ষা করছিল হাত তিনেক দূরে।

প্রভাত শেষবার বলেছিল, চলো—পালিয়ে যাই দুজনে।

—তারপর?

—যেখানে হোক জীবন শুরু করব আমরা। পৃথিবী অনেক বড়ো জায়গা—আমি দেখেছি।

—সে হয় না। আমি পারব না।

—তোমার সাহস নেই?

—না। বাবা-মাকে কষ্ট দিতে পারব না আমি।

—তবে আমাকে কেন তুমি আশা দিয়েছিলে? কেন বলেছিলে—

রাণী তার জবাব দিতে পারেনি। চৌদ্দ বছরের স্কুলের মেয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সতেরো বছরের কলেজের মেয়ে তাকে নতুন করে ভেবে দেখেছে আবার। চোখে তখন আর নতুন রং নেই—এসেছে সতর্কতা, দেখা দিয়েছে বিচার। সেদিনের কৃতজ্ঞ আবেগকে ছাপিয়ে উঠেছে হেড মাষ্টারের শান্ত-শাসন। রাণী জেনেছে, জীবন জুয়ো-খেলবার জিনিস নয়।

প্রভাত সরকার না বুঝেছিল তা নয়। সে-ও জেনেছিল একটা মৃত্যু থেকে বাঁচানোই আর একটা মৃত্যুর ভেতরে টেনে নেবার অধিকার দেয় না। তবু অসম্ভব আশায় সে অপেক্ষা করেছিল।

—আমার জন্যে তোমার কষ্ট হবে না?

—হবে। কিন্তু—

'কিন্তু'টার কোনো জবাব নেই। রাণী কাঁদছিল। প্রভাত সরকার কাঁদতে পারেনি, কেবল মাথার ভেতরে ঝড়ো-হাওয়ার মাতামাতি শুনতে শুনতে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে—যেন দু-চোখ বুজে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। আজ সঙ্গে তার সাইকেলটা ছিল না—মনে হচ্ছিল একটা নিরালোক-নির্জন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সে চলেছে। কোনো লক্ষ্য তার সামনে নেই, তার পথ কোনোদিন কোথাও আর শেষ হবে না।

রেল-লাইনে গিয়ে চলন্ত গাড়ীর সামনে পেতে দেবে গলাটা? একটা কাপড়ের ফাঁস পরে ঝুলে পড়বে কোনো গাছের ডাল থেকে?

তবু আরো একটু বাকী ছিল। প্রভাত সরকারের জীবনে সব চাইতে বীভৎস কৌতুকটা অবশিষ্ট ছিল তখনো।

চক্রবর্তী বলেছিলেন, মথুরার কাল রাত থেকে ভয়ানক জ্বর হয়েছে। গাড়ীটা নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে।

"চলো—পালিয়ে যাই দুজনে"

শেষ ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মা-কে মনে পড়ে গিয়েছিল। চালের আড়াটার সঙ্গে বাঁধা শরীরটা ঝুলেছে। পিঠ বেয়ে নেমেছে ধুমাবতীর মতো রুক্ষ চুল। প্রভাত সরকার কতদিন সে আতঙ্কটা ভুলতে পারেনি কত রাত অসহ্য দুঃস্বপ্নে সে জেগে উঠেছে ঘুম থেকে, তারপর আলো জেলে বসে থেকেছে চুপ করে—দু-চোখের পাতা বন্ধ করতে সাহস হয়নি।

আত্মহত্যা করেনি প্রভাত সরকার—কিছুই করতে পারেনি। শুধু একটা আহত জন্তুর মতো লুকিয়ে থেকেছে নিজের ভেতর—নিজের ক্ষত লেহন করেছে। আর চক্রবর্তী কোম্পানির অফিসে বসে গাড়ীর তেলের হিসেব লিখতে লিখতে প্রত্যেকটা তারিখের সঙ্গে সঙ্গে রাণীর বিয়ের দিন গুণেছে।

প্রভাত সরকার চুপ করে থেকেছিল এক মিনিট। তারপরে বলেছিল, যাব।

না—আর কোথাও তার বাধা নেই। প্রভাত সরকার এখন সব পারে। কাল রাতে রাণীর বিয়েতে সে পরিবেশন করে এসেছে—এমন কি, আসবার সময় এক গ্লাস দই-মিষ্টি খেয়ে আসতেও তার বাধেনি। স্বপ্নের ঘোরে কিছুদিন রাজার সিংহাসনে বসেছিল, এখন আবার যথা-স্থানে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নিজের তুচ্ছতার ভেতরে, অভ্যস্ত দীনতায়।

একুশ মাইল দূরে জংশন স্টেশন। এখানকার ছোট লাইনের গাড়ী সেখানে যেতে প্রায় দুঘণ্টা সময় নেয়। বরযাত্রীরা অবশ্য এখান থেকেই ট্রেনে উঠবে, গাড়ী বদল করবে জংশনে গিয়ে। আর বর-কনে, বরের কাকা আর ছোটভাই সোজা মোটরে

জংশন-স্টেশনে চলে যাবে—গিয়ে উঠবে বড় ট্রেনের রিজার্ভ-করা কম্পার্টমেন্টে।

বাড়ীতে যখন উলু, শাঁখের শব্দ আর কান্নার পালা চলছিল, তখন প্রভাত সরকার চুপ করে বসে ছিল মোটরের স্টিয়ারিঙে মাথা গুঁজে। যা কিছু ঘটছে—তার সঙ্গে কোথাও তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই। বর-কনেকে নিরাপদে একুশ মাইল দূরের জংশন-স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে তার ছুটি। তারপরে যা খুশি করতে পারে সে। গাড়ীটা নিয়ে ছুটে যেতে পারে দিগ্‌-দিগন্তে, আছড়ে পড়তে পারে নদীর জলে, যা খুশি অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ ঘটাতে পারে। তখন আর কোনো দায়িত্ব তার নেই—নিজের কাছে নয়, পৃথিবীর কাছেও নয়।

এক সময় বিদায়ের পালা শেষ হল। বর-কনে আর বরের ছোট ভাই উঠল পেছনে, কাকা এসে বসলেন তার পাশে। প্রভাত সরকার পেছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না—ঘোমটার আড়াল থেকে রাণী তাকে চিনতে পারল কিনা তাও সে জানতে চাইল না।

কাকা তাকে বললেন, চলো হে ড্রাইভার, আর দেরী করলে—

ড্রাইভার! একবারের জন্যে মাথার আগুন জ্বলল, মনে হল চিৎকার করে ওঠে: আমি ড্রাইভার নই, ভদ্র ভাষায় কথা বলুন। কিন্তু প্রভাত সরকার জবাব দিল না। শাঁখের আওয়াজ, উলু আর মেয়েলি কান্নার ঘূর্ণির মধ্যে গাড়ীতে স্টার্ট দিলে সে। হেড্‌ মাস্টার অমূল্য বিশ্বাসের বাড়ীর সীমানা কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক পেছনে সরে গেল।

শহর পেরিয়ে শহরতলী। তারপরে মাঠ, বন, জলা, ছোট-বড়ো গ্রাম। কিন্তু মাইল পাঁচেক এগোতেই দেখতে দেখতে ধোঁয়াটে কালো মেঘে ছেয়ে গেল পশ্চিমের আকাশ।

কাকা বললেন, বৃষ্টি আসবে নাকি?

জবাব এল মাঠের বুক থেকে ছুটে-আসা এক ঝলক দুরন্ত হাওয়ায়। পশ্চিমের ধোঁয়াটে কালো মেঘ চক্ষের নিমেষে দক্ষিণে-পুবে-উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল। নারকেল গাছের সারি নুয়ে পড়ল হাওয়ার বেগে, ধুলোয় অন্ধকার হল চারদিক, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

সামনের উইন্ড-স্ক্রীনের ওপর দিয়ে যেন ঝর্ণার ধারা নামল। ওয়াইপার দুটো অসহায়ভাবে ক্লান্ত বাদুড়ের মতো এক-টানা ডানা নেড়ে চলল—কিন্তু চোখের দৃষ্টি কিছুতেই সামনে এগোতে চায় না। আকাশ-ভাঙা ঝর্ণার ধারা এই মুহূর্তে জলপ্রপাত হয়ে উঠেছে যেন।

কোথাও গাড়ীটা দাঁড় করানো দরকার—কিন্তু দুধারে দীর্ঘ গাছের সার ঝোড়ো হাওয়ায় পাগল হয়ে উঠেছে। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়—যে-কোনো সময় গাছ ভেঙে পড়তে পারে গাড়ীর ওপর। আর একটু এগিয়ে কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে—

কিন্তু সে সুযোগ আর সে পেলো না।

এক মিনিটের মধ্যেই ঘটল ব্যাপারটা। স্টিয়ারিঙের শাসন অস্বীকার করে পিছলে গেল গাড়ীর চাকা এবং তারপরে—একটা প্রকাণ্ড জামগাছ সেই বৃষ্টির ভেতর যেন দৈত্যের মতো গাড়ীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ীর জান্তব অন্তিম হাহাকার আর মানুষের আর্তনাদ ঘূর্ণির মতো জেগে উঠল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আর—

আর, পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হল।

শুধু দু-জন বেঁচেছিল সেই দুর্ঘটনায়। প্রভাত সরকার আর রাণী। যেন প্রভাতের মনের সমস্ত হিংসা সেই দুর্ঘটনার রূপ নিয়ে দু-জনের ভেতরকার সমস্ত বাধা মুছে দিয়েছিল। তারপর উদ্দাম মুক্তির আনন্দে রাণীর হাত ধরে সে ছুটে বেরিয়ে পড়তে পারত—বলতে পারত, এইবারে তুমি আমার—আর কেউ আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কিন্তু রাণীকে পায়নি প্রভাত সরকার—সেই অ্যাক্‌সিডেন্টের ভেতর দিয়েই সে তাকে হারিয়েছে চিরকালের মতো। রাণী আজ কোথায় আছে—কী ভাবে আছে সে জানে না। শুধু এ-কথা জানে, পৃথিবীতে রাণীই সব চাইতে ঘৃণা করে তাকে। রাণীর কাছে আজ সে খুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌টা আপনা থেকে ঘটেনি, সেই-ই ঘটিয়েছে। তার বিকৃত মনের অন্ধকার থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে ঘাতক, ইচ্ছে করেই গাড়ীটাকে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে গাছের গায়ে—বিয়ের পরদিনই রাণীকে বিধবা করে সে তার কুৎসিত বীভৎস প্রতিশোধ নিয়েছে।

আজ এতদিন পরে প্রভাত সরকার ভাবে—সত্যিই কি সেদিনের দুর্ঘটনার ওপরে তার কোনো হাত ছিল না? চেষ্টা করলে গাড়ীটা বাঁচানো কি একান্তই অসম্ভব ছিল? সে কি সত্যিই হত্যা-কারী? এমনি একটা কিছু ঘটানোর জন্যেই কি কালো আকাশটার মতো একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি চলছিল তার ভেতরে?

এই প্রশ্নটার উত্তর মেলে না। মাথার ভেতরে যেন কতগুলো বিষাক্ত পোকা এসে বাসা বেঁধেছে—তারা তাকে কখনো কখনো অসহ্য দংশনে পাগল করে দেয়। কল-কাতার পথে ট্রাফিকের শাসন মেনে নিরুত্তাপ স্তিমিত ভাবে গাড়ী চালাতে চালাতে একটা হিংস্র কামনা কখনো কখনো তাকে পেয়ে বসে—ইচ্ছে করে তার সর্বশেষ বীভৎস অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌টার মধ্য দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যায় সে।

নীচের ঠোঁটে দাঁতের একটা তীক্ষ্ণ চাপ পড়তে প্রভাত সরকার জেগে উঠল।

দোকানটা থেকে মা আর মেয়ে বেরিয়ে আসছেন এতক্ষণে। ছোট-বড়ো প্যাকেটের বোঝা নিয়ে দুটি ভারবাহী জন্তুর মতো এগিয়ে আসছেন গাড়ীর দিকে।

একবারের জন্যে প্রভাত সরকার বীভৎস মুখভঙ্গি করল একটা—তারপর নেমে পড়ল গাড়ী থেকে। ওঁদের একটু সাহায্য করা দরকার। (ক্রমশঃ)

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। কুড়ি ।।
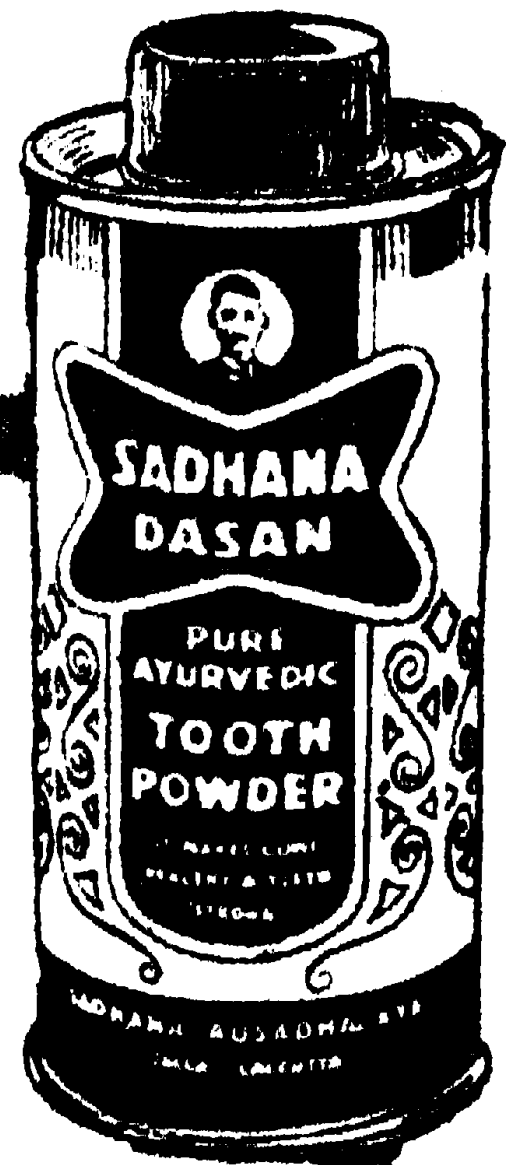
সাতটি পাহাড়ের ওপর মস্কো নগরী আজ প্রসার লাভ করেছে। এদের মধ্যে একটি হল ক্রেমলিন, আরেকটি লেনিন পাহাড়। এদের যদি পাহাড় বলি তবে আমাদের দেওঘরের সেই ক্ষুদ্র 'নন্দন পাহাড়' দোষ করল কোথায়? সুতরাং এসব পাহাড় ৪০।৫০ ফুট উঁচু হবে কিনা সেটি মেপে দেখতে হয়। উরল পর্বতশ্রেণীর এত নামডাক, কিন্তু তা'রা পর্বত নয়, কেননা আমাদের গয়া, হাজারিবাগ, কোডারমা বা রাঁচি অঞ্চলে যে পাহাড়গুলি দেখি, উরল পর্বত প্রায় তার কাছাকাছি। বিহার রাজ্য অতিক্রম করার কালে যাঁরা পরেশনাথ পাহাড়টিকে দেখেছেন, তাঁরাই বুঝবেন,—যদি আমি বলি, উরল পাহাড়ের শ্রেণী উচ্চতায় পরেশনাথের আধাআধি! সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রকৃত পর্বতশ্রেণী হল দক্ষিণে পামীর, তিয়েনৎসানের একটি অংশ, এবং ককেশাস পর্বতমালা। কিন্তু অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে বৃহৎ, ব্যাপক এবং আদি-অন্তহীন সমতল,—তার তুলনা পৃথিবীতে নেই!

ওই সাতটি পাহাড়ের একটি হল ক্রেমলিন। ষ্টালিন আমলে ক্রেমলিনের প্রাকার-তোরণ পেরিয়ে একটি মাছিও ভিতরে ঢোকেনি! আজ ক্রেমলিনের ভিতরকার বড় বড় বাগান এবং বৃহৎ প্রাচীন গির্জাগুলি জনসাধারণের অবারিত ক্ষেত্র। আমার নিজের নানাবিধ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য থাকার জন্য বার আষ্টেক আমাকে ক্রেমলিনের মধ্যে ঢুকতে হয়েছিল। ক্রেমলিনের বাগানে দাঁড়িয়ে এখন ছবি তোলা চলে, এবং সরকারি প্রাসাদগুলি ও মিউজিয়মের ভিতরে প্রবেশকালে হয় পাস, নয়ত 'অনুমতির' দরকার।

ক্রেমলিন শব্দটির বাংলা আমি জানিনে। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি এর নাম ছিল 'মস্কো দুর্গ'। মস্কো, মস্কোয়া, মাস্কোভি—এ নামগুলি রুশীয় নয়, এগুলি ফিনল্যাণ্ডের কাছে পাওয়া! 'মস্কো দুর্গ' বা ক্রেমলিন রুশ-সংস্কৃতিকে ৮০০ বছর ধরে বহন করে আসছে। পুরাকালে ক্রেমলিনের অনেকাংশ ছিল দারুময়। কিন্তু এই দুর্গে আগুন জ্বলেছে অনেকবার--যখন এর প্রাকার তৈরি হয়নি। তাতার, মোঙ্গল, হূন—এরা আগুন জ্বালিয়েছে বা'র বার, ছারখার করে গেছে ক্রেমলিন। এদের মধ্যে কেউ-কেউ সিংহাসনে বসে গায়ের জোরে রাজ্যপাটও চালিয়েছে! মুসলমানের আক্রমণও এককালে রোধ করা যায়নি,—আজও অগণিত সংখ্যক মুসলমান রয়েছে মস্কো-লেনিনগ্রাড এবং রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে। প্রতি শতাব্দীতে ক্রেমলিন ক্রমাগত নতুন-নতুন ক'রে তৈরি হয়েছে। একবার ভেঙেছে, আবার গড়েছে! এমনি করে চলে গেছে অনেক কাল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সেণ্ট ল্যাজারাস নামক যে গির্জা নির্মাণ করা হয়, সেটি আজও রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অপর একটি অতি বৃহৎ গির্জা নির্মাণ করেন জনৈক ইতালীয় স্থাপত্যবিদ্ 'আরিসটটল ফিয়োরাবান্তি'—এটি প্রাচীন রুশ স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, এবং এটির নাম 'উসপেনস্কি ক্যাথিড্রল্'। এই গির্জার মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত কলাবিদ্যার নানা উপকরণ সংরক্ষিত। শুধু চিত্রশালা নয়, ঐতিহাসিক সামগ্রীর সংরক্ষার দিক থেকে সম্রাট আইভান-দি-টেরিবল্ যে দারুনির্মিত সিংহাসনে বসতেন, সেটিও রয়েছে। পরবর্তীকালে প্রত্যেক জার-সম্রাটের অভিষেকস্থল হয়ে এসেছে এই 'উসপেনস্কি' ধর্মমন্দির। এই ধর্মমন্দিরের কঠোর এবং নির্মম শাসন রুশীয় সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে এতকাল। রুশ ধর্মসমাজের সঙ্গে মিলিয়ে এখানকারই 'হোলি সাইনদ' থেকে মহামতি টলষ্টয়কে 'ধর্মচ্যুত' ঘোষণা করা হয়! লেনিন সেদিন রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, "জনসাধারণের হাতে এর প্রতিকারের দায়িত্ব তোলা রইল! তারাই সেদিন এই অবমাননার বিচার করবে!"

বিচার তিনিই করেছিলেন। ক্রেমলিনের গির্জাগুলি এখন যাদুঘরে পরিণত!

দ্বিতীয় প্রধান গির্জাটি হল 'গ্রাণ্ড আর্কাঞ্জেল ক্যাথিড্রল'। এটিও আরেকজন ইতালীয়ন স্থাপত্যবিদ্ 'আলেভিস নোভি-র' পরিচালনায় নির্মাণ করা হয়। এটির অভ্যন্তরভাগ প্রাচীন ইতালীয় স্থাপত্যকলার পরিচয় দিচ্ছে। এই গির্জার মাটির নীচে আজও বহু সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, এবং রাজপুত্র-কন্যাগণের মৃতদেহ নিহিত রয়েছে। রাজপরিবারের নরনারীরা যে গির্জাটিতে প্রার্থনা করতেন, সেটির দাঁতভাঙা নাম—'ভ্যাগোভেশচেনস্কি'! এটি অন্যগুলির চেয়ে ঈষৎ ক্ষুদ্রকার। কিন্তু এই ধর্ম-

মন্দিরের ভিতরভাগ অমূল্য রত্নরাজির দ্বারা খচিত। চারিদিকে ধর্মচিত্রের মনোরম দৃশ্যাবলী। বহু মূল্যবান এবং বহু-বিচিত্রবর্ণ পাথরের কাজ সমস্ত মেঝের উপর আস্তীর্ণ। সম্পদের, প্রাচুর্যের এবং বর্ণাঢ্যতার এমন আশ্চর্য সমারোহ কচিৎ চোখে পড়ে।

এর পর ক্রেমলিনের বাগানে এসে দাঁড়িয়ে সর্বাপেক্ষা যে উচ্চ গম্বুজটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি আইভান-দি-গ্রেট আমলের ২৭০ ফুট উঁচু 'বেল্-টাওয়ার', অর্থাৎ ঘণ্টা-গম্বুজ। 'পেট্রক মালি' নামক এক স্থাপত্যবিদ্ ১০ বৎসর কাল ধ'রে এই বেল্-টাওয়ারটি নির্মাণ করেন। মাটির তলায় ১২৫ ফুট নীচের থেকে পাথরের ভিত গেঁথে এই টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলে। বিশালকায় যে লোহার ঘণ্টাটি বাগানের উপর আজ ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এটি ছিল ওই গম্বুজের উপর বসানো। এটি নাকি পৃথিবীর সাতটি 'আশ্চর্যের' অন্যতম।

প্রথম আমলে এই অতিকায় ঘণ্টা বুঝি ঝোলানো থাকত এক দানবাকার কাঠের ফ্রেমে। রুশেরা সাধারণতঃ একটু খর্বকায়, বোধ হয় সেইজন্যই বৃহৎ এবং বিশালতার প্রতি রুশপ্রকৃতির চিরকালের একটা ঝোঁক দেখা যায়,—এই ঘণ্টা তার সাক্ষ্য! এটির ওজন প্রায় ২০০ টন। এটি ২ ফুট পুরু এবং ১৯ ফুট উঁচু। যে ভাঙ্গা টুকরোটি এর পাশেই পড়ে রয়েছে, সেটির ওজন ৬ টন! অদূরবর্তী যে বেল্-টাওয়ারটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় চতুর্থ আইভানের আমলে, সেটির কাজ শেষ হয় 'বোরিস গডুনভের' রাজত্বকালে। এই বেল্-টাওয়ারের রয়েছে ২২টি বড় এবং ৩০টিরও বেশি লোহ-ঘণ্টা। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এটির নির্মাণ শেষ হয়। সে যাই হোক, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে দারুময় মস্কোতে যে সর্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তার ঝলকে পূর্বোক্ত অতিকায় ঘন্টার ফ্রেমটিতে আগুন লাগে। ফলে, এই ঘন্টা ছিটকে গিয়ে পড়ে নিকটবর্তী প্রকাণ্ড এক গহ্বরে, এবং এর বিপুল পরিমাণ ওজনের সংঘাতে একটি টুকরো ভেঙ্গে পড়ে! কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্যরক্ষাধর্মী রুশ জাতি তাদের এই পুরনো 'সপ্তমাশ্চর্য' বস্তুটির দুর্দশা সইতে না পেরে এই গহ্বরটিতে জল ঢেলে ঠাণ্ডা করতে থাকে। পরবর্তীযুগে নেপোলীয়নের সেনাদল যখন ক্রেমলিনে আগুন লাগায়, তখনও এই ঘণ্টাটি বেঁচে যায়! এটি যেন রুশ জাতির কঠিন প্রাণের সাক্ষ্যস্বরূপ। ওরা অত্যন্ত রক্ষণশীল, কোনও সামগ্রী ফেলতে চায় না!
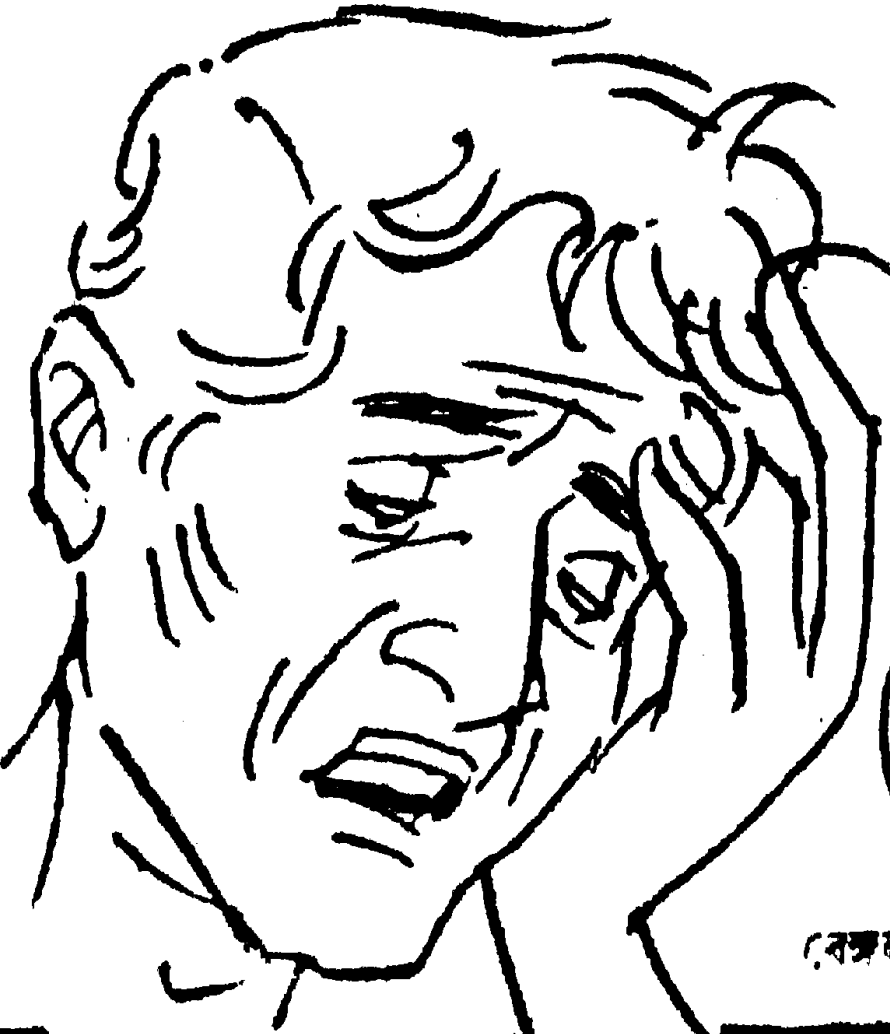
জার সম্রাটগণের আমলে ক্রেমলিনের প্রাসাদগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্প যাঁরা অধিকাংশে রচনা করেছেন তাঁরা বাইরের লোক। সাহিত্য ও চারুকলায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম ছিল, কিন্তু ইতালী ও ফ্রান্স হল রাশিয়ার ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের গুরু! ক্রেমলিন প্রাসাদগুলিতে ইতালীয় ভাস্করের কাজ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। সোভিয়েট আমলে ভাস্কর্যকলা ইউরোপীয় রীতির সঙ্গে নিজকে মেলাতে চেয়েছে। কিন্তু যেটুকু তার রসোত্তীর্ণ রূপ, সেটুকু এসেছে প্রাচীনের অনুকরণে। সোভিয়েট নির্মাণকার্যে বিশালতা এসেছে, প্রবলতা এসেছে, স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা এসেছে,—কিন্তু সূক্ষ্ম অঙ্গুলির সেই সৌন্দর্য-সংবেদনটি নেই, লাবণ্যের সেই ললিত প্রকাশটি যেন হারিয়েছে! একথাটি স্পষ্ট, ক্রেমলিন প্রাসাদগুলির নির্মাণকালে ইতালীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যটি না থাকলে এগুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারত না। 'গ্রানো-ভিটায়া প্লাটা, গোল্ডেন্ জারিৎসিন্ন

স্লাটা, এবং টেরেংনয় প্রাসাদ,'—এগুলিই বর্তমান 'গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্রাসাদের' অন্তর্গত ইতালীয় শিল্পসৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়! এই 'গ্রানোভিটায়া' এককালে জার-আমলে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনার প্রধান স্থান ছিল, এবং রুশসম্রাট-পরিবার যখন পিটার্সবার্গ থেকে মস্কোয় আসতেন, তখন এই প্রাসাদেই তাঁদের বসবাসের আয়োজন করা হত। বর্তমানে এই প্রাসাদের বিশাল এবং বিস্তৃত কক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের, পার্টি কংগ্রেসের এবং নিখিল সোভিয়েট লেখক-কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই সুবৃহৎ সোভিয়েট পার্লামেণ্ট ভবনের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে চারিদিকে যে ওক, ওয়ালনাট্, শেগুন প্রভৃতি কাঠের মনোরম কাজ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

সোভিয়েট আমল ক্রেমলিনের ঐতিহ্যের পক্ষে নতুন। সেই ঐতিহ্যে ছিল প্রাচীনের সুষম ধারাবাহিকতা। তা'রা একে একে পাশাপাশি জায়গা পেয়ে বসে গেছে, কারো সঙ্গে কারো'র বিরোধ ঘটেনি। কেউ সেখানে 'উট্‌কো' নয়। সোভিয়েট আমল সেখানে গায়ের জোরে এসে জায়গা জুড়ে বসেছে বটে, কিন্তু নিজকে মেলাবার জন্য সঙ্গতিরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে! 'গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেস'—যেখানে 'আফ্রো-এশিয়ান' ও ভারতীয় লেখকগণকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, সেখানে যেদিন একাকী এসে এদিক-ওদিক চেয়ে দাঁড়ালুম—সেদিন বিশ্বাস করেছিলুম, ক্রেমলিনের প্রাচীন এবং ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি সোভিয়েট আমলে অধিকতর শোভায় ঝলমল করে উঠেছে! যে-বৈপ্লবিক চেতনা ও চিন্তা বাইরে দেখে বেড়াচ্ছি, এখানে এসে সেই চেতনা সংযত, শোভন ও সুন্দর হয়েছে। জারের গোষ্ঠীর হয়ত কেউ আজ বেঁচে নেই, কিন্তু সেকালের অভিজাত এবং উচ্চ সংস্কৃতিবান ধনী-গোষ্ঠীর বংশ-পরম্পরা হাওয়ায় মিলিয়েও যায়নি! তারাই রয়েছে আজকের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, তারাই রয়েছে সকল প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকেন্দ্রের উচ্চ শীর্ষে—তাদের উচ্চশিক্ষা, বিদ্যা, মনীষা, সুরুচিবোধ,—নূতন ক্রেমলিনকে সৃষ্টি করেছে! কমিউনিস্ট পার্টির সকলেই ভুঁইফোঁড়, একথা মেনে নিতে বাধে।

সমগ্র ক্রেমলিন এবং প্রত্যেকটি ক্যাথিড্রল্ আজও বাইবেলের বহু চিত্রিত গল্পে পরিপূর্ণ। বাইবেল সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ, প্রত্যেক মহাপুরুষ বা সেইণ্ট্, যীশুখৃষ্ট ও মাতা মেরী, জ্যোতির্মণ্ডলীযুক্ত ধর্মপ্রচারক খৃষ্ট, দু' হাজার বছরের খৃষ্টধর্মের গতি-প্রকৃতি ও অনুশাসন, ধর্মসভা ও প্রচারের বহুবিধ ঘটনাবলী,—আগাগোড়া আজও ক্রেমলিনের প্রায় প্রত্যেক প্রাসাদে, দেওয়ালে, সীলিংয়ে, বিবিধ রত্নখচিত ঐতিহাসিক সামগ্রীতে হয় খোদিত, না হয় চিত্রিত! কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াবার কালে এটি প্রত্যেক দর্শকের মনে হতে পারে, মিঃ খ্রুশ্চভ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজকে নিরীশ্বর ও নাস্তিক্যবাদী ব'লে প্রায়শই ঘোষণা ক'রে থাকেন, ঠিক সেইখানে সেই ক্রেমলিনে তিনি চারিদিকের যীশুখৃষ্ট, মাতা মেরী, খৃষ্টধর্ম এবং বাইবেলের বিবিধ অনুশাসনের দ্বারা 'পরিবৃত'! ক্রেমলিনের ভিতরে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অর্থ, যীশুখৃষ্টের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমগ্র জীবন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, তাঁর পুনর্জন্ম, খৃষ্টধর্মের জয়যাত্রার কাজ প্রভৃতির মধ্যে বাস ক'রে আসার মতো! বিগত ৪৫ বৎসর কালের ভিতরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিজাদিগকে 'নাস্তিক' বলে ঘোষণা ক'রে অগণিত সংখ্যক ষড়যন্ত্রী ধর্মযাজককে ঠেঙিয়ে মেরেছেন এবং তার ফলে খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির এবং খৃষ্টান-সভ্যতা সমগ্র ফেডারেটেড রাশিয়া, উক্রাইন এবং অন্যান্য অঞ্চলে নতুন চেহারায় দাঁড়িয়ে উঠেছে! আমার ধারণা, নিরীশ্বর ও নাস্তিক্যবাদ হল সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি সাময়িক চিত্তবিকার, কেননা ভিতরে-ভিতরে সর্বসাধারণের মধ্যে যে ধর্মভীরুতা ও মানবতাবাদ লক্ষ্য

করেছি, সেটি আমার কাছে কৌতুকের বস্তু! কমিউনিস্ট নেতাদের দেখাদেখি অনেক সোভিয়েট মেয়ে চেঁচিয়ে বলে, তারাও non-believer নাস্তিক! কিন্তু কোন কোনও ভারতীয়কে প্লেনে চড়িয়ে দেবার সময় একাধিক রুশ মেয়েকে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে শুনেছি, "ভারতীয়রা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন! সেই ঈশ্বর যেন ও'দেরকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেন্!"

নন্সেন্স!—পাশ থেকে হেসে বলে ফেলেছি।—"সোভিয়েট ইউনিয়নে যে-সব ভারতীয় আসেন, তাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নন্!"

মুখ ফিরিয়ে শ্রীমতী বললেন, ছি, অমন কথা মুখেও আনতে নেই! ঈশ্বর আপনারা মানেন,—তিনি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন!

আমার দ্বিতীয়বার সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ উপলক্ষে 'এয়ার ইণ্ডিয়া সুপার কনস্টেলেশন' বিমানে মস্কোয় গিয়েছিলুম। প্লেনটি লেট ছিল প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল। মস্কো বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত একদল রুশ লেখকবন্ধু ও দুইজন দোভাষিণী এতে একটু ভয় পান্। যাই হোক, মস্কো টাইম রাত প্রায় ২টার সময় প্লেনটি নিরাপদে মস্কো বিমানঘাঁটিতে নেমে আসে। অতঃপর একজন দোভাষিণী আমাকে বলেন, আপনার বিমানের আলোটি প্রথম যখন দৃশ্যমান হল, তখন একদৃষ্টে সেইদিকে কিংবা আপনাদের ঈশ্বরের দিকে চেয়েছিলুম, আমার মনে নেই! সমস্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে একমনে প্রার্থনা করছিলুম, বিমানটি কতক্ষণে বিমানঘাঁটির ভূমি স্পর্শ করবে।

তিনি কা'র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, সেটি তিনি বলেননি!

ক্রেমলিনের অপর একটি অংশের নাম 'অরুজিনায়া প্লাটা', অর্থাৎ 'স্টেট-আর্মারি'। এটি মস্ত এক যাদুঘর। এই যাদুঘরের বাইরের দিকে যে কামানগুলিকে সযত্নে রাখা হয়েছে, সেগুলি নেপোলীয়ন মস্কোত্যাগের কালে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন! এই দিনে আমার সঙ্গে ছিলেন স্বামীসহ শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্যনায়কম্ এবং দোভাষিণী শ্রীমতী নিনা। ক্রেমলিনের এই অংশ নির্মাণ করেন, শ্রীমতী নিনার কথায়,—'পীটার-দি-গ্রেট'! এই যাদুঘরে প্রাচীন রুশ রাজগোষ্ঠীর বিবিধ সম্পদ্ বর্তমান। সেনাপতিগণের ব্যবহৃত ইস্পাত-নির্মিত অসংখ্য ডিজাইনের শিরস্ত্রাণ, বর্ম-তরবারি ও ঢাল সুসজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেকটি সুসজ্জিত সেনাপতিকে আপন-আপন দেহে অন্তত একমণ ওজনের পোষাক ও অস্ত্র বহন করতে হত! সেই চেহারা কি প্রকার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত, এই শিরস্ত্রাণ, বল্লম, বর্ম, ঢাল-তরোয়াল তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিচ্ছে! তাতার, হুন, মোঙ্গল, তুর্কী, স্লাভ, কসাক,—কারও পোষাক বাদ পড়েনি। সোনা, রূপো, হীরা এবং অন্যান্য জহরতখচিত বিভিন্ন কালের বিভিন্ন অস্ত্রাদি এই যাদুঘরকে আকণ্ঠ ঔৎসুক্যে ভরিয়ে রেখেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনিশ শতাব্দী,—প্রতি যুগের সামরিক সজ্জা এখানে সুরক্ষিত। মূল্যবান ধাতব, জড়োয়া, বিচিত্র অলঙ্কার, একটি সুসজ্জিত অশ্ববাহিনীনিযুক্ত রাজকীয় শকট, স্বর্ণমণ্ডিত বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ, যীশুখৃষ্টের বিভিন্ন মূর্তি ও তৈলপট, বহুবর্ণাঢ্য প্রস্তর, রত্নখচিত পেটিকা, হীরা-মুক্তা-মণিমাণিক্যময় দ্রব্যাধার, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মণিমুক্তাময় রাজসজ্জা, অলঙ্কার, আইভরি, আসবাব,—এবং মাণিক্য-স্বর্ণ-মুক্তা-প্রবালমণ্ডিত বিভিন্ন সেট্—যেগুলি দেশ-দেশান্তর থেকে রাষ্ট্রদূতেরা এনেছেন, অথবা যেগুলি সম্রাটদের উপহার-সামগ্রী,—যুগ থেকে যুগান্তরে যেগুলি সংগৃহীত,—আজ সেগুলি প্রদর্শনীর উপকরণ মাত্র! প্রত্যেকটি যেন জীবন্ত, কিন্তু তারা বহন করছে অতীতের মরা ইতিহাস!

পীটার-দি-গ্রেট এবং আইভান-দি-গ্রেট সম্বন্ধে একটি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সোভিয়েট ইউনিয়নে ছড়ানো আছে। এ'দের কীর্তি অবিনশ্বর—ওরা বলে। এর একটা প্রধান কারণ, ওরা বলে—পীটার শুধু সম্রাট ছিলেন না, মানুষ ছিলেন! তিনি কল্যাণব্রতী, দরদী, দেশসেবক এবং সর্বজনের বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে রান্না করতেন, বিলাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা ছিল, তাঁর রাজত্বকালে অনাচার ঘটেনি! পীটার ছিলেন অতিকায় পুরুষ, সাত ফুট লম্বা, অতিশয় বলবান। তিনি শিল্পী ছিলেন। সূচীশিল্পে তাঁর দক্ষতা ছিল। নিজের হাতে তিনি নিজের এবং অন্যের পোষাক তৈরি করে দিতেন। নিজের জুতো তিনি নিজে তৈরি করতেন, এবং তাঁরই হাতের একজোড়া জুতো এখানে শোভা পাচ্ছে। এই 'দানবীয়' বৃহৎ জুতো জোড়াটার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভাবতে হয়, পৃথিবীর কোন্ দেশে কে এমন অতিকায় ব্যক্তি আছে যার পায়ে এই জুতো লাগে! এই যাদুঘরে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিচিত্র 'ঘড়ি' আজও সচল অবস্থায় দণ্ডায়মান। ঘড়িটি ছোট, কিন্তু সেটিকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে একটি 'সান্-ডায়াল'। এই ঘড়িটিতে নিরন্তর একটি সঙ্গীতের সুর বেজে চলেছে, এবং প্রতি তিন মিনিট অন্তর একটি ঈগলপাখীর মুখ থেকে তার শাবকের মুখে খাদ্য-বিন্দু পাত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি মধুর ঘণ্টা বেজে উঠছে! ঘড়িটি দ্রষ্টব্য!

ক্রেমলিনের বাগানে দাঁড়ালে নীচের দিকে সমগ্র বিরাট মস্কো নগরী দৃশ্যমান হয়। এটি উপত্যকা, এবং প্রাকার বেষ্টিত। একদিকে মস্কোয়া নদী,—যেটির অপর নাম ভল্‌গা-মস্কো ক্যানাল্‌; অন্যদিকে আরেক নদী—যার নাম 'নেগ্‌লিন্নায়া'। ক্রেমলিনের চতুর্দিক উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত, যেটি দিল্লীর লালকেল্লার অনুরূপ। প্রাকারের উচ্চতা কোথাও ৩০ ফুট, এবং স্ফীতি ১৭ ফুট। এই ক্রেমলিন এককালে দুটি নদী এবং দুটি পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখন পরিখা নেই, তার স্থলে আছে ক্রেমলিন গার্ডেন একদিকে, এবং পূর্বপ্রকারের বাইরের দিকে এখন প্রসারিত 'রেড স্কোয়ার'! রেড স্কোয়ার চতুষ্কোণ নয়, বহু কোণ! এটি বাগান নয়,—পাথর-বাঁধানো ঢেউ-খেলানো নাতি-

---

বৃহৎ ময়দান। চতুর্থ দিকটিতে প্রাচীন পরিখার নাবাল অংশে বড় বড় গাছপালা, এবং ঝোপঝাড়। সেখানে রাজপথ এবং ক্রেমলিন প্রবেশপথের মাঝখানে সাঁকোর মতো আর একটি পথ প্রাকারের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। ক্রেমলিনের প্রাকারের কোণে কোণে কয়েকটি 'টাওয়ার' বা চূড়া বর্তমান, তারই একটির ডগায় রয়েছে মস্ত একটি ঘড়ি। এটিকে বলা হয়েছে 'ক্রেমলিন-ক্লক',—এবং এই নামে একটি নাটক অভিনীত হয় আর্ট থিয়েটারে। কিন্তু উক্ত প্রত্যেকটি টাওয়ারের এক একটি পৃথক নাম ও ইতিহাস আছে। যেমন একটির নাম 'সুইরভস্কায়া'—এটি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মাণ করা হয়। মস্কো নগরীতে যখন প্রথম পরিস্রুত জল সরবরাহের কথা উঠে,—সেটি বুঝি সপ্তদশ শতাব্দী,—তখন এই টাওয়ারটিকে জল-টেনে-তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। সেটি 'স্বদেশী কৌশল', কেননা সেটি পাতকুয়োর যুগ, তখন মোমবাতি-জ্বালা রাষ্ট্রশাসন,—মস্কো তখনও 'নগর' হয়ে ওঠেনি!

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্রেমলিনের চারদিক কাঠের বেড়া দিয়ে আড়াল করা ছিল। তারপর হল পাথরের পাঁচিল, এবং তার সঙ্গে একটি গম্বুজ, যার নাম 'তাইনিংস্কায়া'—যেটির ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মস্কোয়া নদীতে পৌঁছে জল আনা হত। এটি আজও তেমনি আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরেকটি টাওয়ার বানিয়ে অন্য একটি সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। কে যেন এর প্রথম নামকরণ করল, 'ফ্রলভস্কায়া', তারপর আবার কে যেন দেড়শ' বছর পরে এর নাম বদলে রাখল, 'স্পাসস্কায়া'। এটি তৎকালীন ক্রেমলিনের প্রধান তোরণ হয়ে উঠল। তারপর একে একে মাথা তুলে দাঁড়াল এক একটি টাওয়ার—যাদের নাম 'সবাকিনা, এলেনিনস্কায়া, বরভিৎস্কায়া, ট্রইৎস্কায়া' ইত্যাদি। বুঝতে পারা যায়, প্রত্যেক যুগে ওই প্রাকার রক্ষার জন্য প্রহরার পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকে যখন পাঁচিল রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, ভিতর দিকে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এক একটি গির্জা ও ধর্মমন্দির উঠে দাঁড়াচ্ছে। সেটি মধ্যযুগ। প্রতি রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক। তখন ধর্মের জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা,—অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটির যুগ! রাষ্ট্র তখন ধর্মকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ। যদি কারও গির্জা বা সিনাগগ, মসজিদ বা মঠ ভাঙ্গলো, তবে সেই রাষ্ট্রের জাত গেল! সে তখন অপমানিত, পরাজিত। রাশিয়ার বর্বরযুগ মানে ধর্মোন্মাদনার যুগ। ধর্মের জন্য নরহত্যা, রক্তপাত, অগ্নিযোগ,—এগুলি খৃষ্টের দর্শন নয়, কিন্তু খৃষ্টান সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

একদিন আমি আবদার ধরে বসলুম, এবার আর যাদুঘর নয়, ক্রেমলিনের যারা 'যাদুকর'—তাদের আপিস দেখব! আপিসের বারে যাব!

শ্রীমতী অকসানা হাসিমুখে বললেন, তথাস্তু। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব —এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রেমলিনের বাইরের চেহারা দৈত্যকায়, ভিতরের চেহারা যক্ষপুরী। আজ যখন ভিন্ন এক পথ দিয়ে ঢুকলুম, তখন পটপরিবর্তন ঘটেছে! এও এক বাগান, কিন্তু সে-বাগান নয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাছাকাছি একটিও ক্যাথিড্রল, একটিও জনপ্রাণী। নিস্তব্ধ, গম্ভীর,—চারিদিকের পৃথিবী যেন রুদ্ধশ্বাস! রৌদ্রদীপ্ত সকাল,—কিন্তু সে-রৌদ্র এবং সেই দিনমান আমার কাছে এত অপরিচিত এবং এমন বিদেশী যে, আমার যেন পা উঠছে না! বাগানের ধারে পূর্বমুখী একখানা হরিদ্রাভ বর্ণের অট্টালিকা। উপর তলাকার একটি কক্ষের বড় বড় দুটো জানলা খোলা। এই বাড়িটিতে স্টালিন ছিলেন প্রায় ৩০ বছর। ওই খোলা জানালার সামনে এসে তিনি দাঁড়াননি কোনদিন, কিন্তু ওই ঘরটিতেই তিনি থাকতেন! এখন ওখানে কেউ থাকে না। বিশেষ প্রহরীরা শুধু তালাচাবি খোলে, ঘরে আলো-বাতাস আনে, আবার বন্ধ করে দেয়। তাঁর মহল এখন শূন্য। অতঃপর 'গ্র্যান্ড প্যালেসের' দরজায় এসে পৌঁছলুম। সামনে কয়েকজন সামরিক মোটা গরম পোষাকপরা সশস্ত্র পাহারা। সেই তাদের পিতলের মতো ঠান্ডা ভাষাহীন মুখ! ঔৎসুক্য, প্রশ্ন, ভ্রুকুঞ্চন, প্রসন্নতা, বিরক্তি,—কোনটার চিহ্ন নেই সেই মুখে। শ্রীমতী অকসানার হাত থেকে একজন কাগজটি নিল, এবং শ্রীমতী তাঁর নিজের পরিচয়-পত্রের কার্ডটি বার করে দেখালেন। ওরই মধ্যে একজন আমার দিকে তাকাল, এবং তার ইস্পাতবর্ণ চক্ষুতারকার মধ্যে আমিও যেন দেখে নিলুম উত্তর মেরুলোকের শ্বেতভল্লুকের কঠিন তুহিন দৃষ্টি!

সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠে চললুম। সে-ব্যক্তি আসতে লাগল আমার পিছু পিছু। 'গোল্ড রাশ' নামক ছবিতে 'চার্লি চ্যাপলিনের' পিছু পিছু মানুষের গন্ধ পেয়ে শ্বেতভল্লুক যেমন মৃত্যুর মতো কিয়ৎক্ষণ অনুসরণ করেছিল!

দোতলা থেকে আবার যেন কোন্ পথ এবং করিডর পেরিয়ে ভিন্ন এক প্রাসাদের বারান্দার দিকে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অপর এক সশস্ত্র সৈন্য এগিয়ে এসে আমাদের দায়িত্ব নিল! পিছন ফিরে দেখি, সেই 'যমদূত' কখন অদৃশ্য হয়েছে! এক গেলাস খাবার জল পেলে ভাল হত!

শুষ্ককণ্ঠ এবং রুদ্ধশ্বাস আমি কেবল একা নই! ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস, বন—কে নয় রুদ্ধশ্বাস? অনিশ্চয়তা, সংশয়, আতঙ্ক, অবিশ্বাস, —এরা যেন ব্যগ্রব্যাকুল চক্ষে এই দানবাকার ক্রেমলিনের প্রতি পদধ্বনির দিকে কান পেতে রয়েছে পৃথিবীর চারিদিক থেকে! নিত্য গোপনতার কঠিন বর্মে ক্রেমলিন আগাগোড়া আচ্ছাদিত। ক্রেমলিনের প্রত্যেকটি কক্ষ এক একটি লোহার সিন্দুক। প্রতি কর্মচারীর প্রকৃতি অতল পাথার। এই ক্রেমলিন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রথম যুগে বহন করল পৃথিবীর বিজাতীয় ক্রোধ, স্টালিনযুগে বিজাতীয় ঘৃণা, খ্রুশ্চভের যুগে অবিশ্বাস এবং আতঙ্ক! আজ ক্রেমলিনকে ভয় দেখাবার আগে নিজেরই ভয় করবে, অস্ত্রের ঝনৎকার শোনাতে গেলে এই যুগান্তক দৈত্যের করাল চক্ষে অনুকম্পার বক্র হাসি ফুটবে,—এই ক্রেমলিন আজ পাশুপত অস্ত্রবলে বলীয়ান! আজ মস্কোতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, হাজার-হাজার আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, জাপানী পর্যটক! এরা জানতে এসেছে ক্রেমলিনের মূল প্রকৃতি, সন্ধান করতে এসেছে তার মানবিক সত্তা, তার লৌহবর্মের কাঠিন্যের অন্তরালে আবিষ্কার করতে এসেছে মাধুর্যের সঙ্কেত যদি কিছু থাকে। ক্রেমলিনের অন্তঃপুরে ঢুকলে গা ছমছম করে।

এই প্রাণহীন শব্দহীন ক্রেমলিনের এক মহল থেকে অন্য মহল পেরিয়ে চার তলার সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করার পর সহসা বেরিয়ে এল যেন যক্ষপুরীর এক রাজকন্যা। বছর তিরিশ বয়সের অতি সুশ্রী এক হাস্যমুখী মহিলা অভিবাদন জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। এক সময় ফিরে হঠাৎ দেখি, পিছনের সেই সশস্ত্র ব্যক্তি কোন্ বাঁকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে! এবার বোধহয় দেখব 'ভানুমতীর খেল্'!

থমথম করছে জনশূন্য জীবশূন্য, শব্দশূন্য অন্য এক প্রাসাদ! চকমিলানো অট্টালিকার মধ্যস্থলে প্রাচীন জমিদার-বাড়ির মতো উঠোন। প্রাসাদ-অলিন্দে তির্যকভাবে সূর্যালোক পড়েছে বিশাল বাঁকা তলোয়ারের মতো! করিডরের ডানদিকের দেওয়ালগুলিতে বৃহৎ এক একটি আলমারি বইঠাসা। এটি লাইব্রেরী, এগুলিতে মোট ৩০ হাজার বই তালা-চাবি বন্ধ,—এগুলি লেনিনের নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি এই লাইব্রেরী ক্রেমলিনকে দান ক'রে গেছেন। আমরা এসে পৌঁছলুম লেনিনের আপিসে, এবং তৎসংলগ্ন তাঁর ফ্ল্যাটে—যেখানে তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়া এবং তাঁর ভগ্নি মেরিয়া বাস করতেন। আপিস এবং বসবাসের ব্যবস্থা তাঁর একই ফ্ল্যাটে ছিল!

বিগত ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পীটার-দি-গ্রেট মস্কো থেকে তাঁর রাজধানী তুলে নিয়ে ৩০০ মাইল উত্তরে পিটার্সবার্গে গিয়ে স্থাপন করেন। মস্কো শুধু থেকে যায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কেন্দ্র। একালে অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট একটি বিশেষ ডিক্রির দ্বারা মস্কোকে পুনরায় রাজধানী ঘোষণা করেন, এবং ওই বৎসরেই ১০ই মার্চ তারিখে একখানি স্পেশাল ট্রেন পিটার্সবার্গ বা তদানীন্তন পেট্রোগ্রাড থেকে ছেড়ে মস্কোর দিকে রওনা হয়। এই গাড়িখানি ছিল সেদিনকার চলন্ত সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট,—এবং এটিতে লেনিন, ট্রটস্কি, জিনোবিভ, কামেনেভ, রোথারিন-সহ অন্যান্য 'কমিসার' বা মন্ত্রীরা যাত্রী ছিলেন। পরবর্তী প্রায় পাঁচ বৎসরকাল লেনিন এই তিনতলার ফ্ল্যাটটিতে বাস করেন। ক্রেমলিনের ভিতরকার এই বিরাট ও বৃহত্তম প্রাসাদটিই এখন সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং গভর্ণমেন্টের মূল কেন্দ্র। আমাদের পায়ের তলাকার সমস্ত পথ মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ঢাকা। মেঝে, দেওয়াল, সিঁড়ি, কড়িকাঠ, বারান্দা এবং সকলপ্রকার আসবাবপত্র নতুন পালিশে ঝলমল করছে। ঠাণ্ডার জন্য দেওয়ালের অনেক উঁচু পর্যন্ত পালিশকরা মোটা কাঠ দিয়ে ঢাকা।

আমরা লেনিনের আপিসে এসে ঢুকলুম। এই কক্ষে বসে তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর অবধি ৪ বৎসর ৯ মাসকাল দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন,—কেননা তিনিই ছিলেন প্রধান-মন্ত্রী। তিনি তাঁর মাসিক বেতনস্বরূপ ৫০০ রুবল নিতেন, এবং কেনও উপরোধেই তার বেশি তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হননি। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫০০০ টাকার বদলে মাত্র ৫০০ টাকা নিতেন, এবং বাকি টাকা তিনি যক্ষ্মা রোগীদের কল্যাণকল্পে দান করতেন! কেরলায় প্রাক্তন কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠাকালে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী লেনিনের আদর্শ অনুসরণের জন্য এইরূপ এক প্রস্তাব তুলেছিলেন! কিন্তু তারপরে আর কোনও খবর জানিনে। লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া ছিলেন শিক্ষা বিভাগের উপ-মন্ত্রী, স্বয়ং লেনিন ছিলেন প্রতিরক্ষা এবং শ্রম বিভাগের সর্বময় কর্তা। লেনিনের ভগিনও কি যেন কাজ ক'রে উপার্জন করতেন। রান্নাবান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাড়া, বিছানা করা, কাপড় চোপড় কাচা ইত্যাদি দুইজন মহিলাই করতেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে লেনিনের শরীরে প্রথম এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কবে যেন দ্বিতীয় পক্ষাঘাতের আক্রমণে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে ক্রেমলিন থেকে তিনি শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে যান। মস্কো থেকে মাইল তিরিশেক দূরে 'লেনিনস্কি-গোর্কি' নামক একটি বনময় বাগানবাড়িতে তিনি জীবনের শেষ ১৩ মাস অতিবাহিত করেন। অবশেষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে একপ্রকার অকালমৃত্যু ঘটে! তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার মৃত্যু ঘটে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। ক্রুপস্কায়ার চিরদিনের দুঃখ ছিল, তাঁর সন্তানাদি হয়নি! আমাদের বাঙ্গলা-দেশে রাজা রামমোহন ছাড়া আর বিশেষ কোনও মহাপুরুষ বা দিগ্বিজয়ী মনীষার 'পুরুষবংশ' থাকেনি! ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এবং একালের সুভাষচন্দ্র—কারও থাকেনি!

লেনিনের আপিসটি ঠিক যেমন তাঁর কালে ছিল, আজও অবিকল তেমনি

রয়েছে। সমগ্র ক্রেমলিনের একমাত্র এই ঘরটি—যেটি লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে দপ্তরের কাজে আর ব্যবহার করা হয়নি! সামনে বৃহৎ দুখানা মানচিত্র টাঙ্গানো। একখানা সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের, অন্যখানা ককেশিয়ান দেশগুলির। তাঁর সময়ে এই ককেশিয়ায় ছিল ৫০টি পৃথক জাতি এবং উপজাতি, এবং তাদের অনেকগুলি সামন্ত সর্দারদের দ্বারা শাসিত হত। লেনিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ককেশাস বিভিন্ন সমস্যায় এবং অন্তদ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল। সামনের দেওয়ালে কার্ল মার্কসের সেই পরিচিত গুম্ফ-শ্মশ্রুযুক্ত বৃহৎ একখানা ছবি ঝুলছে। ঘরের মধ্যে বড় বড় পাঁচটি আলমারিতে বই ঠাসা,—এইগুলি সকল সময়ে তাঁর কাজে লাগত। রুশ সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থ তাঁর প্রিয় ছিল। টলস্টয়, গোর্কি, তুর্গেনিভ, লারমন্টভ, চেকভ, গোগল,—এগুলি সাজানো রয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য অনেক। লেনিন পাঁচটি ইউ-রোপীয় ভাষায় অনর্গল লিখতে, পড়তে এবং বক্তৃতা করতে পারতেন। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেনিন কবিতা পাঠ করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কাব্যগ্রন্থ পেলে তিনি মহাখুশী। বোধ হয় এইজন্যই তৎকালে ইংরেজ সাহিত্য-মনীষী এইচ-জি ওয়েলস মস্কো ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এসে লেনিনের সঙ্গে আলাপ ক'রে লেনিনের কড়া সমালোচনা ক'রে লিখেছিলেন, "লেনিন রোমান্টিক"। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। মানব-ইতিহাসের কোনও যুগে এমন একটা অভিনব রাষ্ট্র-পরিকল্পনার ছক আর কেউ মনে-মনে আঁকেননি। সুতরাং তাঁকে 'রোমান্টিক' বলতে বাধবে কেন ?

লেনিনের নিজস্ব টেবলটি পুরনো, কোথাও কোথাও কালিপড়ার দাগ। সেই টেবলের উপর রয়েছে মোমবাতি, দোয়াত-দান, দুটি কলমের একটিতে নিব নেই, লোহার ছোট কাগজ-চাপা, কাঁচি ও ছুরি, আলপিন্ ও ক্লিপ কয়েকটি, এককোণে পুরনো আমলের টেলিফোন যন্ত্র। লেনিনের বেতের চেয়ারখানা অতিশয় দরিদ্র,—যেমন দরিদ্র ছিল মস্কো তৎকালে। অন্য দ্রষ্টব্য বস্তুটি হল, একটি আলমারির উপরের তাকে লাল মলাটে বাঁধানো মোটা একখানা বই; সেটিতে লেখা রয়েছে, "Indian National Congress" এই নামে কোনও ইংরেজি বই ভারতবর্ষে আছে কিনা অথবা লেনিনের আমলে ছিল কিনা আমার জানা নেই। ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া এককালে ইংরেজিতে একখানা গ্রন্থ রচনা ক'রে নাম দিয়েছিলেন "The History of the Indian National Congress"। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা, লেনিনের মৃত্যুর আগে সে-বই প্রকাশিত হয়নি! যাই হোক, আলমারিটি তালাচাবি বন্ধ না থাকলে বইটি দেখে নিতে পারতুম। বইটি ওখানে থাকার ব্যাপারে আমার মনে নানা প্রশ্ন থেকে গেছে।

লেনিনের টেবলটির মাথার দিকে মোটা মোটা চামড়ায় বাঁধানো গদির চেয়ারে বিশিষ্ট দর্শনপ্রার্থীর বসবার জায়গা। তারই সামনে একটি 'ডার-উইনীয়' 'বানর-মূর্তি' শোভা পাচ্ছে! মুণ্ডটি তার নর, দেহটি বানর,—লেনিনকে এটি কে যেন উপহার দিয়েছিল!

আপিসঘরের মাঝখানের দরজাটি পর্দা সরালেই বিরাট 'সেনেট হাউস'। অনেকটা যেন হেড মাস্টারের ঘরের সামনে ছাত্রদের হল্। এখানে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর দল বসতেন পরামর্শ সভায়। এই সেনেট হাউসের সভ্যরা তৎকালে শুধু যে বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচালনা কর্মে হিমসিম খেতেন তাই নয়, এইখানে বসে পৃথিবীকে ডাক দিয়ে বলা হত, "Workers of the world, unite"! এই সেনেট হাউসে বসেই লিয়ঁ ট্রটস্কি সোভিয়েট ইউনিয়নের 'লাল ফৌজ' এবং 'রেড গার্ড' বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীব্যাপী কমিউনিষ্ট বিপ্লব-সাধনের ছক কেটেছিলেন!

লেনিনের শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে প্রথম মনে হয়, লোকটা গরীব-গেরস্থ ছিল! সাধারণ স্বল্পবিত্ত কেরাণীর ঘর,—যেখানে মোটামুটি কাজ চলা গোছ সবই আছে কিন্তু বৈভবসজ্জার কোনও প্রাচুর্য নেই। ক্রেমলিনের মধ্যে এমন শাদা-মাটা ও ঝুপসি ছায়াছন্ন ঘর থাকতে পারে, এটি অভিনব। একগাছা ছড়ি, ছাতা, দু একটা কাঠের বাক্স, পুরনো টাইপ-রাইটার, দেওয়ালের পেরেকে দুচারখানা ছবি, জুতো রাখার ষ্ট্যাণ্ড, একটি আলমারি, সাধারণ শোবার খাট, ভাঙ্গা চিরুনি, তেলের শিশি, পাউডারের একটা কৌটো, ঝাপসা একখানা আয়না, একটি লোহার সিন্দুক,—এটা-ওটা আরও কত কি। ক্রুপস্কায়ার শোবার ঘরে লেনিনের লেখা বইয়ের দেরাজ। ভগ্নির ঘরে শেলাইয়ের সরঞ্জাম। রান্নাঘর ও খাবার জায়গাটায় ঢুকে দেখি,—আ কপাল, সেই তিনজনের মতন সামান্য চিনেমাটির বাসন। তিনটি ডিস, তিনটি পেয়ালা, কটি প্যান আর কেটলি,—ঘরটা আগা-গোড়া অতি সাধারণ। কিন্তু অপরিসীম শ্রদ্ধা ও যত্নে সবগুলি সুবিন্যস্ত করা। বাথরুমির ঘরটা একটু ভুতুড়ে। কোথাও চাকচিক্যের ছাপ নেই। লেনিনের এই গরীবানা চাল দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম! গান্ধীজীর জীবনযাত্রা মনে পড়েছিল।

ঘণ্টা দুই আগে ভেবেছিলুম এই বিশাল প্রাসাদ এক জনহীন প্রেতপুরী! এবার শ্রীমতী অকসানা আমার সেই ভুল ভেঙে দিলেন। আমরা যেখানে এতক্ষণ চলাফেরা করছি, শুনলুম তার ঠিক নীচে আনাস্তাস মিকোয়ান প্রমুখ প্রত্যেকটি মন্ত্রী এখন 'কাজ' করছেন, তবে মিঃ খ্রুশ্চভ এখন আমেরিকায়! পাশের মহলে অতিশয় কর্মব্যস্ত তদা-নীন্তন প্রেসিডেণ্ট ভরশিলভ। অদূরে ম্যালিনভস্কির দপ্তর। এই প্রাসাদে নাকি হাজার হাজার 'কর্মী' এখন ঠাসা, প্রতিটি দপ্তর জন-পরিপূর্ণ! অগণিত সংখ্যক পরিবার আছে ক্রেমলিনে,—অসংখ্য নরনারী। আহার-বাসস্থান সব এখানে। সংসার-যাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় রসদাদি নিয়ে ট্রাকের পর ট্রাক এসে ঢুকছে ক্রেমলিনে। এখানে আপিস ছুটির পর জনসমারোহ নেই, টিফিনের ছুটির নাম ক'রে কেউ বাজারহাট করতে বেরোয় না, এক চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে অন্য টেবলের ধারে বসে কেউ এ্যামেচার থিয়েটারের গল্প, কিংবা আপিস ইউনিয়নের মারফৎ মাইনে বাড়াবার কৌশল আঁটে না! আমি মনে মনে আমাদের রেলওয়ে আপিস, কাস্টমস্, ডাক বিভাগ, কর্পোরেশন এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কথা স্মরণ ক'রে একটু অবাক হয়েই অকসানার দিকে সেদিন তাকিয়ে ছিলুম। এখানকার বিরাট প্রশাসনযন্ত্র নিঃশব্দে চলে। পাছে, একপক্ষ অন্যপক্ষের আলাপ শুনতে পায়, এজন্য 'সাউণ্ড-প্রুফ টেলিফোন কিয়স্ক' বসানো আছে প্রতি কক্ষে। ক্রেম-লিনের প্রতি কক্ষের দরজা লোহার সিন্দুকের ডালার মতো। তার ভিতর ও বাহির মৃত্যুপুরীর মতো অসাড়। সেখানে বেয়ারা ছোটে না, ঘণ্টা বাজে না, টেলিফোন ডাকে না, ব্যক্তিগত আলাপ চলে না, চায়ের ফরমাস করে না, ফাইল

নিয়ে দৌড়াদৌড়ি হয় না, দর্শনপ্রার্থী আসে না, উমেদার এসে সামনে বসে না। সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়া ওঠে না! কঠিন উদাসীন নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য যেন চারিদিকের দিবালোকেও একপ্রকার ভয় ও দুর্ভাবনার ছায়া বিস্তার করে রয়েছে।

বারান্দা পেরিয়ে আসার সময় সেই সুন্দরী মহিলা হাস্যমুখে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এক বাঁকে যথারীতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগেকার পাহারাদারটি এগিয়ে এসে আমাদের 'দায়িত্ব' নিল। কয়েক পা এগিয়ে এসে দেখলুম, একটি টেবলের ওপর মোটা একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো খাতা। শ্রীমতী অকসানা প্রশ্ন করলেন, ভিজিটার্স বুকে লিখবেন কিছু?

খাতাখানার মধ্যে জগতের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ হাতে কিছু কিছু লেখা রয়েছে দেখলুম। ভারতীয়গণের মধ্যে রয়েছেন বেনারসীদাস চতুর্বেদীর স্বাক্ষর। পাতা ওলটাতে গিয়ে এক স্থলে দেখি, বাঙলা লেখা! তার তলায় পরিচিত নাম সই—'অনিলকুমার চন্দ'!

আগে আমি বাঙলায় লিখে নাম সই করলুম, অতঃপর অকসানার অনুরোধে তার ইংরেজি ব্যাখ্যা লিখলুম এবং আমার অনুরোধে তিনি সেটি রুশ ভাষায় তর্জমা ক'রে দিলেন। হঠাৎ ফিরে দেখি, সেই সোনালি, নীল এবং খাকি পোষাকপরা লৌহকঠিন মিলিটারি পাহারার পিতলের হাঁড়ির মতো মুখে সপ্রশংস হাসির আভা ফুটে উঠেছে! এতক্ষণ পরে মনে হল, সে মানুষ,—তার ভ্রূ-কুঞ্চন আছে, চক্ষুতারকার চাঞ্চল্য আছে, মানবিক প্রকৃতির দোলায়িত দ্বন্দ্বরূপ আছে!

উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পর করমর্দন করার কালে অনুভব করলুম, লোকটার হাতের তালুর মধ্যে তাতার কিংবা কসাকের কাঠিন্য বর্তমান।

জার, সীজার, কাইজার—এ শব্দগুলি পুরনো। কিন্তু এগুলির মূল অর্থ একই, এবং উৎপত্তিস্থলও বিশেষ পৃথক নয়। তাতার বংশ একদিন ক্রেমলিনের সিংহাসন দখল করেছিল। আইভান-দি-টেরিবল্ তাদের পরাস্ত করে' নিজেকে জার অর্থাৎ সম্রাট বলে প্রথম ঘোষণা করেন কিনা, এবং তিনিই তৃতীয় আইভান কিনা—এটি স্পষ্ট জানতে পারলুম না। কিন্তু তাঁরই আমল থেকে মস্কো বা ক্রেমলিন শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর একে একে চতুর্থ আইভান, তাঁর পুত্র ফিয়োডোর,—এঁরা রাজত্ব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মস্কো আক্রমণ করে পোল্যান্ড। তারা এসে রুশ রাজপুরুষগণের বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে ক্রেমলিন জয় করে এবং সিংহাসনে বসে। তদানীন্তন রুশ রাজকুমার 'দিমিত্রি পোজ্হারস্কি' এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী 'কুজমা মিনিন'—এঁরা দুজন বিদ্রোহের ধ্বজা তোলেন এবং পদানত রুশ জনসাধারণ বিপ্লবের আগুন জ্বালায়। সেই বিপ্লবে পোল্যান্ডের হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়ে। সেই বিপ্লবের নামও 'অক্টোবর বিপ্লব'। তবে সেটি সংঘটিত হয় ৩৫০ বছর আগে। আজও রেড স্কোয়ারে সর্বাপেক্ষা সুন্দর প্রতিমূর্তি হল, 'পোজহারস্কি ও মিনিন'।

এই বিপ্লবের ঠিক ১০০ বছর পরে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পীটার দি-গ্রেট তাঁর নবনির্মিত নগর পীটার্সবার্গে রাজধানী তুলে নিয়ে যান। আমার এখনও বিশ্বাস, সেন্ট পীটার নামক যে 'সাধুর' কথা বলা হচ্ছে, তিনিই পীটার-দি-গ্রেট। রুশ জাতি মহামতি লেনিনের মতো সম্রাট প্রথম পীটারকেও ভালবাসে। কিন্তু পীটারের নামটি তুলে দিয়ে লেনিনের নামটি বসাবার সময় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের চক্ষুলজ্জা বা আড়ষ্টতা এসেছিল কিনা, অথবা 'সাধুর' গল্পটা অলীক কিনা—এসব তথ্য আমার জানা সম্ভব ছিল না। সোভিয়েট আমলে, লক্ষ্য করবার বিষয় এই, পৃথিবীর এই বৃহত্তর ভূভাগের প্রাচীন ইতিহাসের নানা কথা ও কাহিনী নিয়ে গবেষণার সুযোগ কম। সোভিয়েট ইউনিয়ন আপন দেশের পুরনো ইতিহাসকে সম্ভবত গৌরবজনক মনে করে না বলেই ওটাকে যেন ভুলে থাকতে চায়।

এরপর ওই ক্রেমলিনের মধ্যেই রয়েছে একটি রূপকথার জগৎ এবং সেটি হল ১৬শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর রাজকীয় সম্পদের সমারোহ। এক একটি হলে চারদিক থেকে উজ্জ্বল স্বর্ণাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সোনালি ফ্রেস্কোর কাজ, মার্বেল পাথরের উপর মনোরম ভাস্কর্য কলা,—তার খিলান এবং গঠনের মধ্যে কারুশিল্প। মাঝে মাঝে ওরই মধ্যে বলা হচ্ছে বাইবেলের গল্প! প্রতি বৃহৎ কক্ষই যেন তার আপন কাহিনী বলে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা কক্ষ, সরকারি ডিক্রি ঘোষণা কক্ষ, পররাষ্ট্রীয় অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করার কক্ষ। ওরই মধ্যে বিরাট এক নাটমঞ্চ। প্রতি হলের মেঝে পালিশ করা কাঠের তৈরি। প্রতি কক্ষ যীশুখৃষ্ট, মাতা মেরী, যোসেফ এবং খৃষ্টশিষ্যবর্গের সকল অবস্থার চিত্র পরিপূর্ণ। একটি কক্ষে নগ্নকান্তি ইভ এবং এ্যাডামের আগাগোড়া কাহিনীটি চিত্রিত। সমগ্র ক্রেমলিনকে যদি কেউ বলে, খৃষ্টান ধর্মের অন্যতম তীর্থপ্রদর্শনী, তাহলে ভুল হবে না!

একটির পর একটি বিশাল স্বর্ণালি তোরণ পেরিয়ে যখন একাকী এসে জারসম্রাটের আবাসিক মহলে প্রবেশ করলুম, তখন পুরনো ইতিহাস যেন আমার দুই পায়ে কাঁপন আনছিল। শয়নকক্ষটিতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শয্যা আজও প্রস্তুত! দেরাজগুলির মধ্যে জ্যোতির্বিকীরণময় তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী; চেয়ারগুলির প্রত্যেকখানি যেন একেকটি রত্নমণিখচিত সিংহাসন! দেওয়ালগুলি স্বর্ণোজ্জ্বল, চতুর্দিকে বহুবর্ণাঢ্য মর্মরশোভা, প্রত্যেকটি প্রবেশপথ স্বর্ণময়, প্রতি কক্ষ একেকটি স্বপ্নপুরী! আমি পীটার-দি-গ্রেট এবং তাঁর পুত্রের শয়নকক্ষগুলি দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। এই কক্ষগুলিকে শীতের দিনে উষ্ণ ক'রে রাখার নানাবিধ কৌশলগুলি লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল।

শ্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে এলেন একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে, যেটির নাম, 'ইনস্টিটিউট অফ্ রাইটার্স'। এটি মস্ত আপিস, এবং এখানে লেখকরা 'জন্মগ্রহণ' করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব কাঁচ ও কাঁচা তরুণ-তরুণী প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, যারা কুঁড়ি—কিন্তু ফুল হয়ে ওঠেনি, এই মস্ত প্রতিষ্ঠানটি তাদেরই জন্য। আজ শনিবার,—লেখকলেখিকারা এখন অনুপস্থিত, সেইজন্য ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারীর সঙ্গেই আলাপ করতে বসলুম। তাঁরা অতি সজ্জন,—আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের বিষয় হাসিমুখে বোঝাতে লাগলেন।

এই বাড়িটিও যথারীতি জার আমলের। এখানে লেখকরা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হন, এবং তাঁদের সাহিত্যপ্রবেশপথে সর্বপ্রকার সহায়তা করা হয়। এখানে তাঁদের স্ব স্ব পাণ্ডুলিপি পাঠ, আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা হয়ে থাকে। কি কি গুণপনা নব্য লেখকলেখিকার পক্ষে থাকা প্রয়োজন, এর

জবাবে তাঁরা বললেন, সাহিত্য-বিষয়ে লেখকদের 'গ্রাজুয়েট' হওয়া প্রথম দরকার। রুশভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রি না থাকলে এখানে সভ্য হওয়া যায় না! সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ লেখক এখান থেকে পাস ক'রে বেরিয়েছেন। নবাগত লেখক-লেখিকাকে 'উপযুক্ত' বিবেচনা করলে এখান থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। কেননা তাদের অভাব ও দারিদ্র্য থাকলে 'কাজ' চলবে না! প্রত্যেক লেখক-লেখিকার পক্ষে অন্তত দু'বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—সে কাজ কারখানায়, আপিসে, বা ক্ষেতখামারে—যেখানেই হোক। তাদের পক্ষে জীবনকে এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে জানা একান্ত দরকার। নতুন লেখকদের বই ছেপে দিয়ে এখানে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মোট ৪৫ জন প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা নব্য লেখকদের পাণ্ডুলিপি একে একে বিচার করে দেন, এই সব ছাপা উচিত কিনা! আমার হাতের কাছে এক-খানি কবিতার বই দেখলুম, এখানি এক নব্য কবির রচনা। 'সামান্য' ৫,০০০ কপি মাত্র ছেপে নব্য কবিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শুনলাম কোনও লেখকের এক-খানি বই মাত্র প্রকাশিত হওয়ার অর্থই হল, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাওয়া! সেই লেখকের পথ সেদিন থেকে কুসুমাস্তীর্ণ!

এই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা 'মানুষ' হয়েছে তা'রা সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে রসিকসমাজে সমাদৃত হয়েছে কিনা, এইটি ভাবতে ভাবতে আমি যখন বিদায় নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলুম তখন ডাইরেক্টর সাহেব প্রশ্ন করলেন, এবম্প্রকার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে কিনা! হাসিমুখে বললুম, ভারতীয় লেখকরা কোনও শাসন-বন্ধন স্বীকার করেন না!

উভয়পক্ষেই হাসাহাসি। অকসানা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট লেখকদের পক্ষে যেন স্কুল-বোর্ডিংয়ের মতো! অর্থাৎ খেলার মাঠ আছে মস্ত। যত জোর পায়ে আছে, ফুটবল কিক্ ক'রো। যত খুশি ছোটো স্কুলের মাঠে! কিন্তু তুমি প্রাচীরবেষ্টিত! ভিতরে কড়া নিয়ম! ঠিক সময় স্নানাহার আর পড়াশুনা! ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ম-পালন। পরীক্ষায় পাস করো, প্রাইজ নাও, হাততালি পাও! মানুষ হও! কিন্তু অবাধ্য হয়ে পাঁচিল টপ্‌কে পালাতে চেয়ো না,—ওতে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। মনে রেখ, তুমি কমিউনিস্ট সমাজের লেখক!

কেউ পাঁচিল টপ্‌কায়নি! সেই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে সোভিয়েট সাহিত্য মেলেনি!

এর চেয়ে অকসানার সঙ্গে সেদিন মেঘলা ও টিপটিপি বৃষ্টির দিনে মস্কো চিড়িয়াখানা দেখে বেশি আমোদ পেলুম! আলীপুরে চিড়িয়াখানার মতো এটি সম্পদশালী নয়, জীব জানোয়ার বড় কম। বৈচিত্র্য তার চেয়েও কম। সেদিনকার ঠাণ্ডা ছিল অতি প্রবল। কিন্তু সেই অসহনীয় ঠাণ্ডার মধ্যে একমাত্র দ্রষ্টব্য জন্তু ছিল উত্তর মেরুলোকের তিনটি শ্বেতভল্লুক। ওদের পক্ষে মস্কো এখন 'গরম' দেশ। দুটি ভল্লুক আরামে ঘুমোচ্ছে, কারণ কৃত্রিম উপায়ে তাদের উপর 'ঠাণ্ডা' বৃষ্টিপাত করা হচ্ছিল। তৃতীয়টি এই 'অসহ্য গরমে' বরফজলের পর দিয়ে ছুটোছুটি করছে! ওরা বিশেষ হিংস্র। একটি প্রশস্ত পরিখা মাঝখানে রেখে ওদেরকে খোলা জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এদিকে একটি 'উষ্ণ' প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছে নেহরুর দেওয়া ভারতীয় হাতীটিকে! এইটি সকলের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অপর একটি অঙ্গনে একটি বৃহদাকার ও সুপুষ্ট সিংহের কোলের কাছে তার ঘনিষ্ঠ 'বন্ধু' একটি কুকুর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রয়েছে! শীতপ্রধান দেশের চিড়িয়াখানায় বর্ণবৈচিত্র্য কম!

ট্রপিকাল দেশের আকাশ যে ঘননীল, এটি রাশিয়ার অধিবাসী জানে না! সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে ভারতের আকাশে প্রত্যক্ষ ৭টি এবং মিশ্রিত ১৮টি বর্ণের সমারোহ দেখা যায়, এটি শুনলে ওরা অবাক হয়ে থাকে! ট্রপিকাল আকাশের সকল রং যে ভারতীয় পাখিরা আপন-আপন দেহে জড়িয়ে বনে-বনে কুজন-গুঞ্জন ক'রে বেড়ায়, এটি ওদের অজ্ঞাত। ময়ূর-ময়ূরী ওদের কাছে স্বপ্নবৎ।

গোর্কি স্ট্রীটে এক অট্টালিকায় এসে থামলুম। এটি শিশুসাহিত্য প্রকাশন-রাজ্য! প্রতিটি রিপাবলিকে এমনই একেকটি প্রকাশন-রাজ্য বর্তমান। মাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর কম বেশি ৬০০ খানা শিশুপাঠ্য সাহিত্যের বই ছাপা হয়, যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিশু-পাঠ্য গল্প ও রূপকথার বই এখান থেকে ছাপা হয়। বাঙলা বইও রয়েছে অনেক-গুলি। বয়সেরও ভাগ আছে। ৩ থেকে ৭, ৭ থেকে ১২, ১২ থেকে ১৬ ইত্যাদি। পাঠ্য তালিকার শ্রেণীবিচার আছে, সুস্থ মন, প্রকৃতি ও সদভ্যাসের উপর জোর দেওয়া। নৈতিক চেতনা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বোধ, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা, প্রত্যেক বিষয়টির প্রতি অনুরাগ, এবং জীবন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য—এইগুলি নিয়ে শিশুচিত্তগ্রাহী রসসাহিত্য! এখানে সব পাঠশালায় বই যায়, শিক্ষকদের কাছে বুলেটিন পাঠানো হয় গ্রন্থাদির বর্ণনা দিয়ে—যাতে তাঁরা নির্বাচন ক'রে নিতে পারেন। শিশুসাহিত্যের লেখকরা আসেন শিশু উৎসবে যোগদান করতে। বইয়ের অন্তর্গত 'হিরো এবং হিরোয়িনকে' যথাযথ পোষাকে মঞ্চের উপরে দেখানো হয়। শিশু-পত্রলেখকদের মন্তব্য ও অভিমতগুলি জমিয়ে রেখে অনুমান ক'রে নেওয়া হয়, তারা কি কি ধরণের বই ভালবাসে! তখন ডাকা হয় লেখকদের এবং অন্যান্য সভ্যদের। ১৯৪৯ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুসাহিত্যে ১,২০,০০০ খানা বই ছাপা হয়েছে। এই বিচিত্র গ্রন্থ প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ হল, বহু বইয়ের ভিতরে বর্ণিত রূপকথার এক একটি বর্ণনা এখানে জীবন্ত দৃশ্যে রূপান্তরিত করে দেখানো হয়ে থাকে, এবং শিশুরা এসে তাদের 'পরিচিত' দৃশ্যগুলি হুবহু দেখে আনন্দে মেতে ওঠে! এই প্রতিষ্ঠান 'রামায়ণ ও মহাভারতের' বহু কাহিনী নিয়ে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার প্রবীণ ডাইরেক্টর মিঃ আইভান ডেভিড আগাগোড়া আমাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

অতঃপর শ্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন মস্কোর একটি মুসলমান পল্লীতে। নূতন ও পুরাতন মস্কো মিলিয়ে রয়েছে একই সঙ্গে। এটি মস্কোর পুরনো পল্লী! আশপাশের চেহারাটি যথেষ্ট সুশ্রী নয়। এখানে ওখানে আবর্জনা; অপরিচ্ছন্ন নালীপথে নোংরা চোখে পড়ে। এই ঘিঞ্জি পল্লীর একস্থলে এসে আমাদের গাড়ি থামতেই একটি দরিদ্রা নারী এগিয়ে এল একটি পাত্র হাতে নিয়ে। সে চাইল মসজিদের দরুণ চাঁদা, আমি বুঝলুম এটি ভিক্ষা। পাশের একটি গলিতে ডেলা-ডুমুরি ডিঙিয়ে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল মস্কোর প্রধান মসজিদের

সামনে। আজ রুশীয় মুসলমানগণের একটি বিশেষ পার্বন উপলক্ষ্যে মসজিদের মধ্যে এখনই প্রার্থনা আরম্ভ হবে! অকসানা গাড়ির মধ্যে রইলেন, আমি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলুম। জুতো না ছাড়লেও চলত, কিন্তু আমি ছেড়েই ঢুকলুম। হলটি বৃহৎ, এবং ভিতরটি সম্পদশালী। দেওয়ালে ও থামগুলিতে নানাবিধ চিত্রন, মক্কাতীর্থের বড় বড় ছবি। পশ্চিমের দেওয়ালের দিকে উঁচু পাথরের বেদীতে ইমামের আসন। ভারতের শ্রেষ্ঠ মসজিদগুলির অভ্যন্তরভাগের তুলনায় এই কক্ষটি কম সম্পদশীল নয়। ভিতরে একটিও স্ত্রীলোক নেই। পক্কশ্মশ্রু-বিলম্বিত সৌম্যমূর্তি কয়েকজন পাগড়িপরা বৃদ্ধ মুসলমান উপস্থিত রয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি কোটপ্যান্ট ও চাঁদিটুপিপরা। যাঁদের টুপি নেই, তাঁরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিলেন। মেঝের উপর মোটা জাজিমপাতা, তারই উপর বসেছেন সবাই। ভিতরে জনতা পরিপূর্ণ, তিল-ধারণের ঠাঁই নেই। সকল বয়সের পুরুষেরাই উপস্থিত রয়েছেন। চেহারায় বা পোষাকে দারিদ্র্যদশা বা অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র নেই। আমি এতদিনে অনেকটা লোক চিনতে শিখেছি। এঁদের মধ্যে তাতার, মঙ্গোল, উজবেক, তুর্ক, কসাক, ককেসীয়, —প্রায় সকলেই আছেন। আমাকে ওঁদের অনেকে ভারতীয় মুসলমান ঠাউরে নিয়েছিলেন! কেননা আমিও এক ফাঁকে মাথায় রুমাল বেঁধে নিয়েছিলুম! অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে ইমামের আসনের কাছে গিয়ে আসন নিয়ে যথারীতি পিছন দিকে পা মুড়ে বসলুম, এবং বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ইমামের আরবীয় ভাষায় বক্তৃতা শুনতে লাগলুম! ভাষা বুঝিনে, কিন্তু তাঁর দীপ্তকণ্ঠে যে-ভাষণ উচ্চারিত হচ্ছিল, সেটি বিশেষ প্রেরণাদায়ক। এই ভাষণের ফাঁকে-ফাঁকে যখন নমাজ পড়া এবং বিশেষ ভঙ্গীতে পিছন দিক উঁচু করে মেঝের উপর মাথা নোওয়ানো, এবং একবার দাঁড়িয়ে একবার হাঁটু মুড়ে বসে আবার মাটিতে মাথা রেখে পিছন দিক উঁচিয়ে প্রার্থনা করা আরম্ভ হয়ে গেল,—আমিও তখন 'ভারতীয় মুসলমান' হয়ে উঠতে বাধ্য হলুম! 'হিন্দুশ্রেষ্ঠ' ব্রাহ্মণকুলে আনুষ্ঠানিক পরিবারে আমার জন্ম, এটি আরেকবার উপলব্ধি করার আগেই আমাকে বারম্বার সকলের দেখাদেখি উপুড় হতে হচ্ছিল এবং বিজবিজ ক'রে কিছু একটা বলতে-বলতেই আন্দাজ করার চেষ্টা পাচ্ছিলুম, অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমানতালে আমি নিজে সোজা হয়ে উঠতে, উঠে দাঁড়াতে ও আবার নিজের কান ধ'রে হাঁটু মুড়ে বসতে সমর্থ হচ্ছিলুম কিনা! এইভাবে কতক্ষণ অবধি 'নাকে-কানে-খৎ' দিয়েছিলুম আমার মনে নেই! কিন্তু জীবনের ওই প্রথম সুন্দর অভিজ্ঞতাটি নিয়ে যখন বেরিয়ে এলুম, তখন আমার মুখে-চোখে শ্রদ্ধানুরাগ লক্ষ্য ক'রে শ্রীমতী অকসানা বললেন, আপনি যে একজন ভারতীয় মুসলমান, আমি জানতুম না!

আমি হাসলুম। হিন্দু এবং মুসলমানের নামের মধ্যে যে পার্থক্যটি সর্বত্র বর্তমান, অথবা বিশেষ নামের সঙ্গে বিশেষ একটি 'ধর্ম' জড়ানো থাকে,—আধুনিক সোভিয়েট নাগরিকরা এ সম্বন্ধে তেমন অবহিত নন। এটি নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামান না!

সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়েকটি হাসপাতাল আমি নিজের গরজেই দেখেছিলুম। সেদিন মস্কোর একটি আধুনিক হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এটি মস্কোর একটি পুরনো কালের অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত, এবং এটির নাম "The First Clinical City Hospital". অকসানা সঙ্গে ছিলেন। এখানকার যিনি 'ভাইস-চীফ', তাঁর অনুরোধে আমরা ঔষধ-মাখানো সেই পরিচিত শ্বেতবর্ণের একটি পোষাক পরে নিলুম। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে মেয়ে-পুরুষ এবং বালক-বালিকা—সকলেই থাকে। অপরিপুষ্ট দেহ, বিকলাঙ্গ, বর্ণপাণ্ডুরতা, ভৌতিক চেহারা, অঙ্গাবিকার, অপ্রাকৃতিক ভঙ্গী, মুদ্রাদোষ, রুগ্ন অভ্যাস, অকাল বার্ধক্য—এইগুলির সুচিকিৎসা এখানে হয়ে থাকে। রোগীর পক্ষে কোনও প্রকার খরচপত্র এখানে নেই। রোগী দেখতে আসার সময় আত্মীয়রা কেউ তিন-গুণ দামে দাগী কমলালেবু বা আধ-পচা আঙ্গুর কিনে ঢোকে না, অথবা হাসপাতালের প্রেসক্রিপসন নিয়ে বাইরে থেকে কেউ ঔষধ কিনে আনে না! আমার প্রশ্নের উত্তরে জানলুম, রোগীদেরকে এখানে দুফালা বাসি রুটির গায়ে বনস্পতি-মাখন ছুঁইয়ে এবং ময়লা এক পেয়ালা চা সঙ্গে দিয়ে 'ব্রেকফাস্ট' ব'লে চালানো হয় না! এখানে প্রতিদিন মোট পাঁচ বার পূর্ণভোজ্য দেওয়া হয় প্রতি রোগীকে, এবং তার মধ্যে প্রতি দফায় তিন প্রকার ফল, খাঁটি দুধ, মাখন ও চীজ, মাংস, ডিম এবং ক্রীম-ঢালা সুপ! এই হাসপাতালের অট্টালিকা থেকে আন্দাজ ৩০০ গজ দূরে আর একটি বৃহৎ বাড়ি হ'ল এই হাসপাতালের রান্না-ভাঁড়ার এবং ঔষধ-পত্রাদির স্টোর, এবং উভয়ের মাঝখানে একটি ভূগভস্থ ক্ষুদ্র 'রেলপথ' ইলেক্ট্রিকের সাহায্যে দিবা-রাত্র আনা-গোনা করছে আহার্য ও ঔষধপত্র নিয়ে! আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলে। আমরা এই সুবৃহৎ চিকিৎসাকেন্দ্রের তিনতলা অট্টালিকার প্রায় প্রতি কক্ষেই ঢুকে একে একে পর্যবেক্ষণ করছিলুম।

কাঁচের একটি মস্ত ঘরে একখানা টেবলের ওপর বছর বারো বয়সের একটি ছেলেকে শুইয়ে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল। আপাদমস্তক আচ্ছাদিত জন-আষ্টেক ডাক্তার সেই কাজে ব্যস্ত। ওদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ চেনবার উপায় নেই। ছেলের বুকের একটি পাশে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ছুরি দিয়ে সম্পূর্ণ দুফালা করে চিরে ফেলার ফলে রক্তের ধারা নেমেছে। বুকের ভিতর থেকে রক্তিম তাল-শাঁসের মতো একটি মাংসপিণ্ড বার ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে, সেটি ধুক ধুক করছে কিনা! এটি নাকি 'হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার'!

এটি আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা বলেই আমি উৎসুক হয়ে উপরের কাঁচের ভিতর দিয়ে নিরীক্ষণ করছিলুম। ছেলেটির চোখ খোলা, এবং সে নিঃসাড়। বোধ হয় "কাজ" করতে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল, সেই কারণে আরেকবার ছুরি বসিয়ে পাকা পেঁপের মতো বুকের বিশেষ অংশটা আরেকটু চিরতে হল! এবার হঠাৎ আমার পাশ থেকে শ্রীমতী অকসানা মুখের একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে সরে গেলেন এবং সম্ভবত বাথ-রুমের দিকে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ অসুস্থ ছিলেন! তাঁর ভিতরের জননীর হৃৎপিণ্ডে বোধ হয় দোলা লেগেছিল।

ভাইস চীফ বললেন, এটি হার্ট অপারেশন! এখানে ফুসফুসটি খুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। জন্তুর ফুসফুস এনেও জোড়া দেওয়া হয়। ছেলেটির বাঁচবার আশা ছিল না।

সমস্ত টেবল এবং ডাক্তারদের

পোষাকে রক্তের ছড়াছড়ি দেখে প্রশ্ন করলুম, এবার বাঁচবে মনে হয়?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, দিন তিনেক পেরোলে বলা যাবে। আশা করি বাঁচবে!

প্রথমবার সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে জেনেছিলুম, ভারতের প্রাধনমন্ত্রী নেহরু অপেক্ষা সেখানে জনপ্রিয় অপর আরও দুইজন ভারতীয়! তাঁরা হলেন বোম্বাই সিনেমা চিত্রের অভিনেতা এবং অভিনেত্রী! তাঁদের সুখ্যাতি ঘরে ঘরে এবং মুখে মুখে শুনেছিলুম। তাঁরা ও-দেশে গিয়েছিলেন তাঁদেরই একখানা ছবি সঙ্গে নিয়ে। এই ছবির কাহিনীকার জনৈক ভারতীয় কমিউনিস্ট! ছবিটি বা কাহিনীটি কেমন আমার জানা নেই। কিন্তু সেই ছবির একটি অপদার্থ এবং 'চটুরঙ্গী' গান সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই কারণে যে, সেটি নাকি 'ভারতীয় সঙ্গীতের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ'! গানটি আমি শুনেছি। ভাষাটি অশ্রাব্য এবং ইতর। কিন্তু এটির মধ্যে নৃত্যরসভঙ্গীর একটি চাল থাকার জন্যই এর জনপ্রিয়তা বেশী। কলকাতার বিড়ির দোকানে, চায়ের হোটেলে, ইস্কুল-কলেজ পালানো ছেলে-মহলে, এবং বারোয়ারী সরস্বতী পুজোর লাউড-স্পীকারে—এই গানটি একদা আসর জমাতো! যাই হোক, এটি 'ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ—' এ আমার মনে হয়নি!

দ্বিতীয়বার যাত্রাকালে আমি সঙ্গে নিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের চব্বিশখানি গানের রেকর্ড। এগুলি দিয়েছিলেন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র কর্মী শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার মহাশয়। আমি সেগুলি উপহার দিয়েছিলুম মস্কোর "House of Friendship" বা মৈত্রীভবনে গিয়ে। তাঁরা বিশেষ সমাদর ও আনন্দের সঙ্গে রেকর্ডগুলি গ্রহণ করেছিলেন। মস্কো বেতারে এগুলি বাজানো হয়েছিল।

'মৈত্রীভবন'টি একটি অতি সুদৃশ্য অট্টালিকা। দূরের থেকে এই বৃহৎ অট্টালিকাটিকে অলংকার-বহুল স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে হয়। মস্কোর সর্বাপেক্ষা জনবহুল একটি রাজপথের সামনে এটি দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধিগণকে এখানে আনা হয়। 'রুশ-ভারত সংস্কৃতিক সম্পর্ক' সংস্থার পক্ষ থেকে আমার ওপর একদিন ডাক পড়ে এবং সেইদিন এই 'মৈত্রীভবনে' গিয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলুম। সেই আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বাঙলা জানেন। প্রথম হলেন বিদুষী শ্রীমতী বিকোভা,—আমার বিশেষ পরিচিত। দ্বিতীয়জন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংস্থার ভারতীয় বিভাগের কৃতী অধ্যাপক 'গ্নাচুক দানিল্‌চুক আলেকজান্দার',—এ'র সঙ্গে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রা সাহিত্য সম্মেলনে আমার আলাপ হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেখানে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয়জন হলেন মিঃ ই-এন-কমারভ। ইনি পররাষ্ট্র বিভাগের সাংস্কৃতিক উপভাগের তরুণ কর্মী,—এ'র নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত আছে! এ ছাড়া ইনি প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে গবেষণার কাজ করেন অধ্যাপকরূপে। এই সভায় 'প্রাবদা', 'ইজভেস্তিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্রের লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি স্বরূপ ছিলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ প্রবীণ অধ্যাপক মিঃ বালাবুশেভিচ। ইনি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একজন বিশেষ বন্ধু, এবং এ'র কাছে আমার সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার একখানি পত্র লিখেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ'র ভাষণ সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল!

প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে অপর একজন ভারততত্ত্ববিদ হলেন সুদর্শন অধ্যাপক মিঃ চেলিশেভ। ইনি সুন্দর হিন্দী ভাষায় কথা বলেন। ভারত এবং কলকাতার সঙ্গে ইনি বিশেষ পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবে ইনি ছিলেন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ।

চেলিশেভের বাড়িতে সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে গিয়েছিলুম।

পুরাতন মস্কোর একটি অঞ্চলে চেলিশেভ সপরিবারে বাস করেন। এ'র খ্যাতি, সমাদর এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায় বসবাস ব্যবস্থাটি যথেষ্ট উন্নত নয়। যে-বাড়ির নীচের-তলায় একটি স্বল্প-পরিসর ফ্লাটে উনি থাকেন, সে-বাড়িটি সাবেককালের হলেও বিশেষ মজবুত। কিন্তু সমস্ত বাড়িখানা বারোয়ারী। কে কোন্ তলায় রয়েছে, কার সঙ্গে কার যোগ, কে কখন কোন্ দিক থেকে আসছে যাচ্ছে, কে পরিষ্কার রাখছে এই ধূলিমলিন মস্ত বাড়িখানার পাঁচ-দুয়ারী ঘরদোর,—'কাকস্য পরিবেদনা!' এই কারণে লক্ষ্য করেছি, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট কর্মচারী, খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ নাগরিক,—যথা উপমন্ত্রী, ডাইরেক্টর, ইউনিয়ন সেক্রেটারী, কমিটির চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান, দোভাষী বা দোভাষিণী ইত্যাদি—এ'রা কেউ সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলে আপন আপন বাসস্থানে আমন্ত্রণ করে পরদেশীকে সহজে নিয়ে যেতে চান না! ও'দের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্বরক্ষার স্থান হল হোটেল, আপিস, একজিবিশন, লবী, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, পথঘাট ইত্যাদি। অর্থাৎ বাইরে-বাইরে! এর দুটি কারণ আমি বুঝতে পারতুম। প্রথম, পরদেশীর সম্বন্ধে সন্দেহ বা আড়ষ্টতা। দ্বিতীয়, পরদেশীর সামনে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে গৃহস্থালীর অভাব-অসুবিধাগুলি চেপে রাখা,—কেননা সেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। অনেক সময় আমি স্বল্পকালের পরিচিত কোন কোনও ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে যখন দেখতুম, চমৎকার সচ্ছল ফ্ল্যাটে তিনি বসবাস করছেন, তখন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ঘরদোর দেখতে পাচ্ছিনে কেন—এ প্রশ্ন আমার মনে আসত! সর্বাপেক্ষা আনন্দ পেয়েছিলুম শ্রীমতী অকসানার সরল স্বীকারোক্তিতে। তিনি বারম্বার বলতেন, আমার ওখানে আরেকটি ঘর থাকলে আপনাকে আমি কয়েকদিন রেখে দিতুম! কিন্তু বড্ড জায়গা কম। একটিতে থাকে আমার মেয়ে-জামাই, আরেকটিতে আমি! আমার অপর দোভাষিণী শ্রীমতী লিডিয়া তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা আলোচনাই করতে চান না! শুধু বলতেন, আমি একটি ঘরে থাকি, এবং আমার ছেলে যখন ছুটিতে আসে, আমার কাছেই থাকে!

সোভিয়েট রাষ্ট্রের একটি আইন আছে এই, প্রতি নাগরিককে অন্তত তিরিশ বর্গফুট পরিমাণ পাকা আশ্রয়-স্থল (living space) দেওয়া চাই! কিন্তু আরও বছর দশেকের আগে এই আইনটি যথাযথভাবে কার্যকরী করা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমাদের ভারতবর্ষে কুঁড়েঘরে এবং গাছতলাতেও আমরা ডেকে আনি 'অতিথি নারায়ণকে'! আমরা হৃদয়ের প্রাচুর্য প্রকাশ করি, জড়বস্তুর প্রাচুর্যের দ্বারা বহিরাগতকে অভিভূত করার চেষ্টা পাইনে। ভারতীয় চিত্তে দৈন্যবোধ নেই বলেই আমরা আমাদের অভাব ও দারিদ্র্যকে প্রকাশ করে থাকি এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করি! আমরা ঘরে 'উচ্ছে' ভেজে বাইরে 'পটোল' বলে চালাইনে! যারা বাইরে থেকে আসে তারা আমাদের অভাব-অভিযোগ দেখে যায়, কিন্তু স্বভাব-দৈন্য নিয়ে কেউ কথা তোলে না! বরং দরিদ্র ভারতকে সম্মানই দিয়ে যায়! আমেরিকান লেখক 'লুই ফিশার' গান্ধীজির পর্ণকুটিরে একদা সাত দিন বাস করেছিলেন। তিনি নিজে রান্না করতেন, বাসন মাজতেন, ঘর দোরে ঝাঁটা দিতেন, নিজের কাপড় নিজে কাচতেন! ইংরেজ মেয়ে 'কৃকাবেন গান্ধীজির পাল্লায় পড়ে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন! দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের কথা আজও কেউ ভোলেনি। আরও অনেক উদাহরণ আছে। ভারতবর্ষের তথাকথিত 'দারিদ্র্যে'

অবগাহন করে অনেকেই পুণ্যলাভ করেছেন! আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা বলতে কোথাও ভয় পাইনে, এবং আমাদের প্রকৃত ব্যাধি চেপে রাখিনে। ভিতরের 'ছুঁচোর কীর্তন' ঢেকে বাইরে 'কোঁচার পত্তন' করিনে। অন্দর-মহলের কলঙ্ক আড়াল করবার জন্য বাইরের জানলায় সিল্কের পর্দা ঝোলাইনে! আমাদের যারা ভাল করে চেনে তারা আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও চেনে, দুর্গত অবস্থা জেনেও সম্মান করে,—কারণ আমরা 'বিদুরের' বংশ!

অহঙ্কার করিনে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিকট ধনরাজ আমেরিকা দ্বাদশ বৎসর কাল ধরে যে-গঞ্জনা সহ্য করেছে, বিশেষ করে 'জন ফস্টার ডালেসের' আমলে,—তার পরেও আমেরিকার কাছে থেকে অগণ্য কোটি টাকার অকৃপণ সাহায্য পাওয়া—যে কোনও রাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি অভিনব ঘটনা! তার তুলনায় এখন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়! কিন্তু শুধু একটি 'ভিলাই ইস্পাত কারখানা' সৃষ্টির বাহাদুরি নিয়ে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যে বিপুল প্রচারকার্যের চেহারা দেখেছি তাতে রবীন্দ্রনাথের একটি 'কণিকা' আমার মনে পড়ত :

"শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

আমার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ ভারতকে আমেরিকার সাহায্যদানের প্রকৃত পরিমাণটি জানে না! তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের 'দানের' কথাটাই বড় বড় অক্ষরে পড়ে। এটি রাজনীতি কিনা আমি জানিনে।

সৌম্যদর্শন মিষ্টভাষী এবং বন্ধুবৎসল চেলিশেভের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে চলাফেরার জায়গা কম, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে তাঁর হৃদয় ছিল দিকচিহ্নহীন! ঘরে তাঁর স্ত্রী এবং বিধবা জননী। জননী তাঁর স্বাভাবিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে কিছুতেই সামনে আসতে পারলেন না। স্ত্রী রান্না করেছেন সকাল থেকে। যেমন লজ্জাশীলা, তেমনি মধুরভাষিণী। আমাদের সামনে বসে কিছুতেই তিনি খেতে পারলেন না! ঘরের সমস্ত কাজকর্ম শাশুড়ী ও পুত্রবধূই সম্পন্ন করেন। বাজারহাট সবই তাঁদের করতে হয়। চেলিশেভ জার্মান যুদ্ধে বোমারু বিমানের পাইলট ছিলেন।

আহারাদির পরে চেলিশেভের ঘরটির মধ্যে গড়াচ্ছিলুম। আমাকে রাগাবার জন্য চেলিশেভ আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে হিন্দী গান দিলেন। কিন্তু আমার চোখ পাকানো দেখে রবীন্দ্রনাথের "রোদন ভরা বসন্ত" চড়ালেন।

গানে, গল্পে, তামাশায় ও তন্দ্রায় চেলিশেভের সঙ্গে কেটে গেল প্রায় সারা দিন। বাইরে রৌদ্র দেখে উঠতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। চেলিশেভও নানা অছিলায় আটকে রাখার চেষ্টা পাচ্ছিলেন। এই মিষ্টস্বভাব ব্যক্তি আমার নিকট স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু ওই অতি-সাধারণ মধ্যবিত্ত "বাঙ্গালী" ঘরকন্নার মধ্যে বসে আমার একবারও মনে হয়নি, নিজের দেশ-গাঁ ছেড়ে আমি উত্তর মেরুবলয়ের সীমানাবর্তী মস্কো শহরের একটি যেমন-তেমন পল্লীর মধ্যে বসে অলস অপরাহ্ন অতিবাহিত করছি। আর কোনও দিন একটি রুশ পরিবারকে এমন একান্ত আপনজন মনে হয়নি! (ক্রমশঃ)

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত
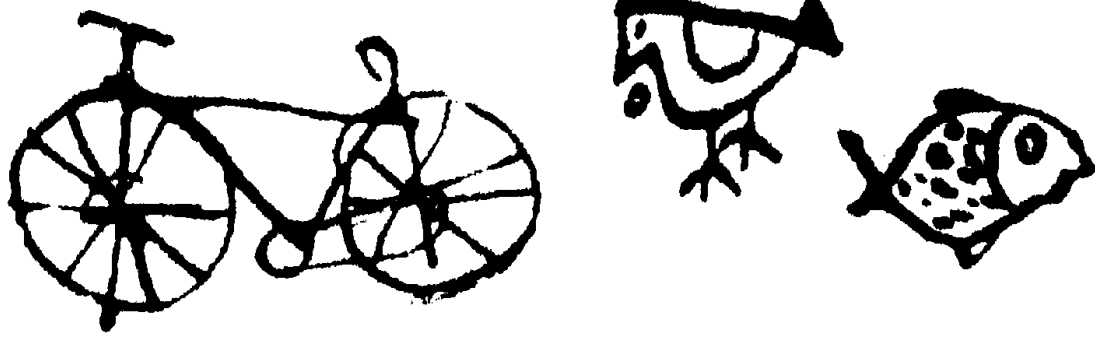
॥ হাট-বাজারের কয়েকজন মানুষ ॥

রান্নাঘরে না ঢুকলে কোনো একটি পরিবারের সত্যিকারের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা হয় না। তেমনি বাজারে না ঢুকলে স্থানীয় মানুষজন সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। রান্নাঘরে যেমন কোনো আব্রু থাকে না, তেমনি বাজারেও কোনো আড়াল নেই। আপনার পাশের ফ্ল্যাটের যে-মানুষটির সঙ্গে নিত্যি যাওয়া-আসার পথে রোজ দু-বেলা আপনার দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে বা যে-মানুষটির সঙ্গে আপনি গিয়ে বসছেন একই চায়ের দোকানে বা একই খেলার মাঠে বা একই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে বা একই ট্রামে-বাসে-আপিসে, তাকেও কোনোদিন বাজারের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে মানুষটির সঙ্গে আপনার পরিচয় অসম্পূর্ণ ছিল।

বাস-স্টপের মেয়েটির কথা দিয়েই শুরু করা যাক। আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রোজ ঠিক একই সময়ে এই মেয়েটি বাস-স্টপে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘাঙ্গী নিশ্চয়ই, কিন্তু তন্বী নয়। আর এই কারণেই মেয়েটিকে যেন আরো বেশি চোখে পড়ে। শরীরের পুষ্টি গায়ের গোলাপী রঙের সঙ্গে যেন ভারি চমৎকার মানিয়েছে। মেয়েটিকে অন্যমনস্কভাবে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনি নিশ্চয়ই অনেককিছু কল্পনা করেছেন। হয়তো একজন ভাগ্যবান নায়কের কথা ভেবে খানিকটা ঈর্ষাও অনুভব করেছেন মনে মনে। তাই আপনাকে বলছি, মেয়েটিকে অনুসরণ করে একদিন আপনিও বাজারের মধ্যে আসুন। দূর থেকে লক্ষ্য করুন, মেয়েটি কী কেনে আর কি-ভাবে কেনে। বাস-স্টপের রহস্যময়ী তখন নিতান্ত আটপৌরে সাজে আপনার বাড়ির মেয়ের মতোই আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। কারণ মেয়েটিকে বাজার করতে না দেখলে আপনি নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারতেন না যে মেয়েটির হাতের শৌখিন চামড়ার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে এক পোয়া আলু, দু-পয়সার কাঁচালঙ্কা, একটি পাতিলেবু ও আধপোয়া কাটা পোনা। নিত্যি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই একই বাজার। আসে খুব ভোরে যখন ঘুম-ভাঙা বাজার সবে হাই তুলছে। আর ছকবাঁধা রাস্তায় একটি মাত্র পাকে সমস্ত কেনাকাটি ঊর্ধ্বশ্বাসে শেষ করে। তারপরে এসে দাঁড়ায় বাস-স্টপে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালে এখন হয়তো আপনি ওর হাতের শৌখিন চামড়ার ব্যাগ থেকে আঁশটে গন্ধটুকুও পেতে পারেন।

এই মেয়েটি সম্পর্কে আপনার যদি আর কোনো কৌতূহল না থাকে তাহলে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভদ্রলোকের সাজ-পোশাক হয়তো খানিকটা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু মুখের সিগারেটের ব্র্যান্ডটি দেখতে পাচ্ছেন কি? যিনি এমন অবহেলার সঙ্গে এমন দামী সিগারেট টানতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই নিদেনপক্ষে কোনো সওদাগরী আপিসের ছোটখাটো অফিসার। হয়তো কোনো একদিন চাকরির উমেদার হয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে। কাজেই ভদ্রলোককে খুশি করবার হদিশ আপনার আগে থেকেই জানা দরকার।

লক্ষ্য করে দেখুন, আলুর দোকানে গিয়ে ভদ্রলোক হয়তো সবচেয়ে দামী আলুই কিনলেন একসের। কিন্তু সেই-সঙ্গে একটি কমদামী ছোট আলু ফাউ চাই। তেমনি এক ছটাক কাঁচালঙ্কার দাম যাই হোক না কেন তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু দুটি কাঁচালঙ্কা তাঁকে ফাউ হিসেবে পেতেই হবে। তেমনি মাছের দোকানে। তেমনি অন্য সর্বত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি বুঝতে পারবেন, ভদ্রলোকের কাছে ফাউটাই হচ্ছে আসল। যেখানে ফাউ নেই, সেখানে তিনি পারতপক্ষে যেতে চান না।

কিন্তু সকলেই যে এই ফাউয়ের দলে তা ভাববার কোনো কারণ নেই। থাক

হাফপ্যাণ্ট পরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারার ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। গোল মুখখানা যেন ভরাট হাসিতে আরো গোল হয়ে উঠেছে। কারো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন না, কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন না। মূর্তিমান বিনয় বা অমায়িকতা যেন আধা-মিলিটারি সাজপোশাক পরে বাজারের অলিগলিতে চলাফেরা করছে।

এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হবে তিনি বাজারে এসেছেন অনেককাল পরে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যে। কুশল প্রশ্ন করছেন, বাড়ির খোঁজখবর নিচ্ছেন, এমন কি চলতি দু-একটি গুজবের ওপরে রসালো মন্তব্যও করছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে, বাজারের থলেটা তিনি বোধহয় ভুলে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে। আর থলেটা যখন সঙ্গেই আছে তখন একপো বেগুন বা একপো পটল বা একপো মাছ কিনে নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি। হ্যাঁ, রীতিমতো পয়সা

দিয়েই তিনি কিনছেন, দরদস্তুরের ধার দিয়েও যাচ্ছেন না। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আপনি বুঝতে পারবেন, এই ভদ্রলোকের কাছে আনাজ বা মাছের দর ঠিক বাজার-দর নয়, তার চেয়ে কম। এই ভদ্রলোককেও আপনি ভালো করে চিনে রাখুন। আপনার যদি কোনোদিন কাউকে চাকরি দেবার ক্ষমতা হয় তাহলে হয়তো এই ভদ্রলোকই হবেন আপনার প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থী। না, কারও পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার জন্যে নয়, নিজের জন্যে তো নয়-ই, তিনি এসেছেন নিতান্তই আপনার হিতৈষী হিসেবে কিছু সৎ-পরামর্শ দেবার জন্যে।

লক্ষ্য করতে পারেন আরো অনেককেই। কিন্তু আপনি না চাইলেও যাঁকে লক্ষ্য করতেই হবে তিনি হচ্ছেন মূর্তিমান ঘোষণার মতো সেই ভদ্রলোকটি যিনি চাকরের মাথায় মস্ত ধামা চাপিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবির বুকপকেটে এক গোছা নোটের ঝিলিক তুলে বাজার উজাড় করার উল্লাসে মেতে উঠেছেন। আপনার যদি তাড়া থাকে তাহলে এই ভদ্রলোক যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সেখান থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে দূর থেকে লক্ষ্য করতে পারেন, ইনি কত সহজে বাজারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এঁকে সওদা গছাতে পারলে যে-কোনো বেসাতী নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

অন্যদিকে আপনার লক্ষ্যপথ থেকে সব সময়ে আড়ালে থাকতে চাইবেন এমন মানুষেরও অভাব নেই। এঁদের যাতায়াত একটু বেলার দিকে যখন সারা সকালের ব্যস্ত বেচাকেনার পরে বাজার একটু যেন ঝিমিয়ে পড়তে চাইছে। চাষীদের ডালাগুলো ততোক্ষণে প্রায় খালি, উঁচু জায়গার স্থায়ী পসারীরা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে শুকিয়ে-আসা আনাজের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে, জলে আর কাদায় থিকথিক করছে বাজারের সরু সরু রাস্তাগুলো, আর একটা ভ্যাপসা গুমোট অনেক মানুষের নিঃশ্বাসের সংগে তাল-গোল পাকিয়ে বন্ধ বাতাসে পাক খাচ্ছে।

ইনিও এসেছেন মাঝারি আকারের একটি থলে সংগে নিয়ে। নজর বিশেষ করে মাটির দিকে। সারা সকাল ধরে হাজার মানুষের নাড়াচাড়ায় বাজারের কিছু কিছু পণ্য ততোক্ষণে বাতিল হয়ে গিয়ে জলেকাদায় মিশে গিয়েছে, যাকে বলা চলে বাজারের উচ্ছিষ্ট। ইনি এসেছেন সেই উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে। পচা আলু, পোকায় খাওয়া বেগুন, হলদে হয়ে যাওয়া পটল—কোনো কিছুই ইনি বাতিল করেন না। অত্যন্ত মমতার সংগে প্রায় প্রত্নবিদের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু সংগ্রহ করে চলেন।

এই ভদ্রলোককে অবশ্যই পাল্লা দিতে হয় আদুড় গা একপাল বাচ্চার সংগে। এরা তাড়া দিলে পালায় না, ধমক দিলে ভয় পায় না, মার খেয়েও কাঁদে না। সারা বাজারে এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোথাও এক চিলতে পচা কুমড়োও এদের চোখের আড়ালে থাকবার উপায় নেই।

আর আছে এমন একদল মানুষ যাদের দিকে নজর দেবার অবসর কারও নেই। এরা আসে দলে দলে, মুখ বুজে সারা বাজারে ঘুরে বেড়ায় আর শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে শস্তা দামের শাকপাতায় বাজারের থলে ভর্তি করে বাড়ি ফিরে যায়। মাছের বাজারের ধারেকাছে যায় না। মাংস বা ডিমের দোকানের দিকে দূর থেকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর হয়তো ভাবে যে মাছের বা মাংসের খানিকটা গন্ধ যদি থলেতে পুরে বাড়ির হেঁসেলে হাজির করা যেত!

তাই আপনাকে বলছি, সময় পেলে একবার বাজারে আসবেন। আপনার প্রতিবেশীদের চিনবার জন্যে তো বটেই, নিজেকে চিনবার জন্যেও।

তাছাড়া বাজার করার প্রচণ্ড একটা নেশাও আছে। এমনিতে আপনি হয়তো বিরক্ত হবেন, কথায় কথায় হয়তো আক্ষেপ জানাবেন যে সকালে উঠে এই একটি ঝামেলা আপনাকে রোজ পোয়াতে হচ্ছে; কিন্তু একদিন বাজারে না গিয়ে দেখুন, মনে হবে শরীরের ভেতরটা হাঁসফাঁস করছে। যারা রোজ বাজার করে তাদের পক্ষে একদিন বাজার করতে না পারাটা রীতিমতো অস্বস্তির ব্যাপার।

আর বাজারে যদি আসেন-ই তবে একটু সময় নিয়ে আসবেন আর চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই আপনার ধারণা হবে যে বাজার এক অতি আশ্চর্য জায়গা। এখানে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য শোনা যায় না। সর্ববিষয়ে পারঙ্গম ব্যক্তিদের যদি সাক্ষাৎ পেতে চান তাহলেও এই সেই জায়গা। ঘোড়দৌড়ের মাঠে কোন্ ঘোড়া অবধারিত জয়মাল্য পাবে, খেলার মাঠে কোন্ খেলোয়াড় অবধারিত গোল করবে—ইত্যাদি খবর বাজারের মানুষের নখদর্পণে। এমন কি কোন্ সিনেমা মার খাবে বা কোন্ মন্ত্রী নির্বাচনে গণেশ ওল্টাবে, তাও এখানে কারও অজানা নয়।

আর যদি আপনার আরো একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকে তাহলে বাজারে এসে দেখতে পাবেন পৃথিবীর এক আশ্চর্য দৃশ্য। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর একদল বোবা মানুষ ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল ফেলে সেই আগুন নেবাতে চেষ্টা করছে।

আপনার প্রতিবেশী যে-ভদ্রলোককে চিরকাল নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে জেনে এসেছেন, যিনি কোনোদিন চড়া গলায় কথা বলেননি, নিজের ছেলেমেয়েকে যিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন—তিনি যদি হঠাৎ একদিন বাজার থেকে ফিরে এসে অতি তুচ্ছ একটা কারণে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেমেয়েদের মারধোর করতে শুরু করেন, তাহলে বুঝবেন যে বাজারের আগুন তাঁর চোখের জলের পুঁজিকেও নিঃশেষ করেছে।

তবুও আপনাক অনুরোধ করছি, খানিকটা সময় হাতে নিয়ে একদিন বাজারে আসুন। এই আগুন আর এই চোখের জল একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সময় থাকতে এই আগুন আর এই চোখের জলকে চিনে রাখুন। তাহলে আপনি নিজেকেও চিনতে পারবেন।

মসিরেখা

জরাসন্ধ
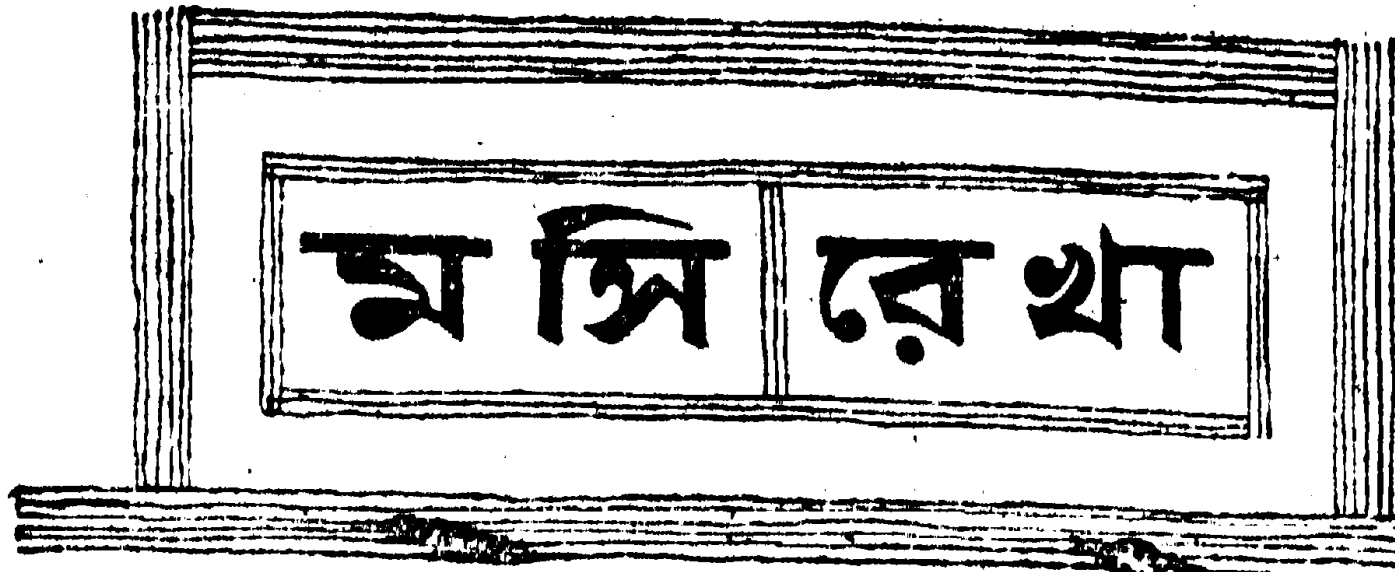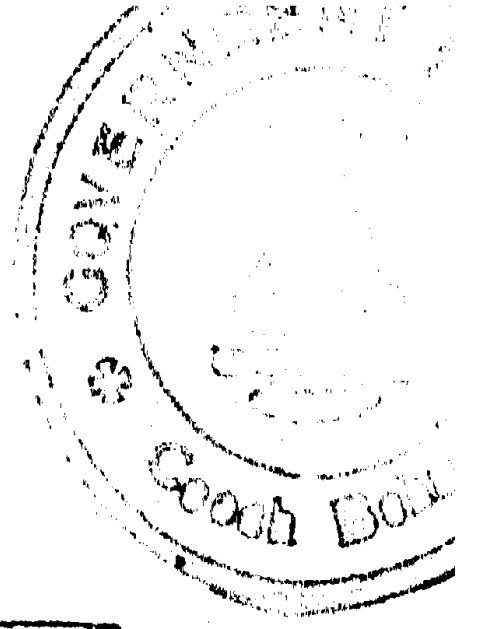
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে দেখাশুনোর পালা মিটিয়ে সন্ধ্যার পর আশুবাবু সাহেবের বাড়ি গেলেন শেষ বিদায় নিতে। কথা-বার্তা যেটুকু হল, বেশীর ভাগই নীরবে, দুজনের মনে মনে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, দেশের বাড়িতেই যাচ্ছেন তো?

—আজ্ঞে না। সেখানে কেউ নেই। ঘরদোরও না থাকার মধ্যে।

—তাহলে?

—আপাততঃ গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি। তারপর তিনি যা আদেশ করেন।

—সারা জীবনের সব কিছু রোজগার তো গুরুজীকেই দান করে বসে আছেন। বাকী জীবনটা—

আশুবাবু দাঁতে জিব কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, তাঁকে দান করতে পারি আমি! সে স্পর্ধা কোনোদিন মনেও আসেনি। বলতে পারেন, তাঁরই অনুগ্রহের দান তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি যে গ্রহণ করেছেন, তাতেই আমি ধন্য।

সাহেব অনেকটা নিজের মনে বললেন, তার মানে পেনসন আর প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা কটাও ঐভাবেই যাবে। যাক, ওসব কথা তুলে যাবার সময় আর আপনার মনে দুঃখ দিতে চাই না। যখনই ইচ্ছা হবে একবার ঘুরে যাবেন। আপনার বণ্টাল আপনারই রইল।

আশুবাবুর দুচোখ ছলছল করে উঠল। উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত কী একটা বলতে গেলেন, পারলেন না। সাহেব কিছুক্ষণ পরে বললেন, আপনি ছিলেন, একটা বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

আশুবাবু চোখ তুলতেই যোগ করলেন দিলীপের কথা বলছি। যাবার আগে পরীক্ষাটা দিয়ে যেতে পারবে কিনা, কে জানে?

—যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি, স্যর।

—না, না; এর বেশী আপনি আর কী করতে পারতেন? এত অল্প সময়ের মধ্যে যতখানি এগিয়ে দিয়ে গেলেন, সেটা আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হত না।

—বিশেষ করে ওর কথাটাই আমাকে সব সময়ে পীড়া দেবে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করবো।

—একশবার করবেন। আমিও যখন যা হয়, আপনাকে জানাবো।

আশুবাবুর গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মী মহলে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। কে তিনি, কী নাম, কী তাঁর কীর্তিকলাপ, কোথায় আশ্রম—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন প্রায়ই লেগে থাকত সকলের মুখে। আশুবাবু বিব্রত বোধ করতেন; তিনি জানতেন উত্তরটা তাদের খুশী করতে পারবে না। নাম একটা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অন্য দশজনের মত সাধারণ, সাদামাটা। আদিতে 'স্বামী' নেই, অন্তেও নেই 'আনন্দ'। 'আশ্রম' বলতে হুগলী জেলার কোন এক নগণ্য গ্রামের শেষপ্রান্ত গঙ্গাতীরে গাছপালার আড়ালে খানকয়েক টালিছাওয়া মাটির ঘর। কার্যকলাপও প্রচার করবার মত কিছু নয়। গ্রামের বেশীর ভাগ লোক জেলে। জমিজমা নেই; পাশের গ্রামের মুসলমানদের মত কল-কারখানায় খাটে না, গয়লাদের মত দুধ-ছানার কারবার করে না, তাদের একমাত্র আশ্রয় গঙ্গা। মৃত্যুর পর সকলেরই, ওদের জীবনে এবং মরণে। কিন্তু মাটি-মা যেমন সহজে বরদা নন, 'বহু খোঁড়াখুঁড়ি'র পর 'শস্যকণার' সন্ধান মেলে, গঙ্গা-মাও তাই। অনেক কাঠখড় দড়াদড়ি না হলে তাঁর 'শস্য'-ভাণ্ডারে পৌঁছানো যায় না। সে সব সরঞ্জাম জোটেনি বলে বছরের পর বছর ধরে গঙ্গা এদের কোলে ঠাঁই দেওয়া ছাড়া অপর কিছুই বড় একটা দিতে পারছেন না। তবু গঙ্গাকে এরা ছাড়েনি। বাপ পিতামহের ফেলে যাওয়া খানকয়েক ভাঙ্গা নৌকা আর গোটা-কয়েক ছেঁড়া জাল নিয়ে ভোর না হতেই ভাসতে শুরু করে এবং সন্ধ্যার পর প্রায় শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসে।

এমন সময় ওদের পাড়া থেকে কয়েক গজ দূরে এক সারি বহু পুরনো আম-কাঁঠালের জটলার ধারে কোত্থেকে এসে ডেরা বাঁধলেন এক 'সাধুবাবা'। অদ্ভুত সাধু। দাড়ি আছে, জটা নেই, গেরুয়া পরেন কিন্তু গাঁজা খান না, ধুনি জ্বালান না। সারাদিন ঘরে বসে কী সব পড়েন আর সন্ধ্যার ঠিক আগে চোখে চশমা এবং পায়ে স্যান্ডাল পরে গঙ্গার তীর ধরে অনেক দূর চলে যান। সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, রবিবারে কিংবা ছুটির-দিনে বিভিন্ন ট্রেণ ধরে একদল নানা বয়সী ভদ্রলোক আসেন ওঁর কাছে। সেদিন আর উনি পড়েন না, বেরোন না, প্রায় সারাদিন ধরে চলে শুধু কথাবার্তা।

'ভদ্রলোকের' পাড়াটা এখান থেকে কিছু দূরে। তাঁরা এদিকটায় বড় বেশী ঘেঁসেন না। দুএকজন কালেভদ্রে দেখা দেন, মাছ সংগ্রহ কিংবা আদায় তহশিলের প্রয়োজনে। প্রবীণ লোক। তাদের কেউ কেউ সাধুর সঙ্গ লাভ করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে

গেছেন। এ কেমনধারা 'সাধু!' ধর্মকথা নয়, আধ্যাত্মিক আলোচনা নয়, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ বা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ নয়, এ'র যত কিছু জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ কেবল বৈষয়িক বিষয়ে। গ্রামে এবং তার আশে-পাশে কত লোকের বাস, কী তাদের উপ-জীবিকা, কি রকম আয়, যুবকেরা কী করে, লেখাপড়ার হার কত ইত্যাদি। পাল্টা প্রশ্ন করে তাঁরা এই সাধুটির সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করলেন, তাও নৈরাশ্যজনক। এক সময়ে নাকি কোন সরকারী আফিসে চাকরি করতেন; অবসর নেবার পর সংসারের কোলাহল ভাল লাগল না, তাই নিরিবিলি দেখে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃটিশ দাপটের যুগ। 'সরকারী' নামটা শুনলেই মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরা ফিরে গিয়ে নানা কথা রটিয়ে দিলেন। কেউ বললেন, লোকটা পুলিশের স্পাই, কেউ বললেন, ফেরারী আসামী, যাঁরা আরো বুদ্ধিমান তাঁরা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন, স্পাই, তবে পুলিশের নয়, ওর আসল মতলব নতুন কোনো ট্যাকস বসাবার মাল-মসলা যোগাড় করা। অতএব শত হস্তেন— যে-কটি নিষ্কর্মা যুবক তাস পিটে আর থিয়েটারের রিহার্সাল দিয়ে দিন গুজরান করছিল এবং একদিন সদলবলে এসে সাধুটিকে বাজিয়ে দেখবার মতলব আঁটছিল, তাদেরও সাবধান করে দিলেন প্রবীণ অভিভাবকেরা—ভুলক্রমেও যেন এদিকটা কেউ না মাড়ায়, কোথাকার কোন স্বদেশী হাঙ্গামায় ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ!

'সাধু'ও 'ভদ্রপাড়া'য় না ঘে'সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন জেলেপাড়ার দিকে। তারা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সাধুবাবা' নিজে থেকে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাদের কু'ড়েঘরের আঙিনায়! কিন্তু তারপরেই রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল যখন উনি ঠাকুর-দেবতা, নামকীর্তন, পূজা-পাঠ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে সোজা-সুজি ঘর-সংসারের কথা পাড়লেন, জানতে চাইলেন সারা বছর মাছ ধরতে হলে কখানা নৌকা চাই, কটা জাল, তার মোটামুটি খরচ কত, কার কী পরি-মাণ দেনা আছে মহাজনের ঘরে। সকলের শেষে অকপটে স্বীকার করলেন তিনি 'সাধু' নন, সাধারণ সংসারী মানুষ, ওদের মধ্যে থেকে আপন জনের মত বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে চান। তার-পরেও আরো কিছুদিন গেল তাদের সন্দেহ ঘুচতে। কিন্তু বুদ্ধির দৌড় তো বেশী নয়। তাই শেষটায় আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এগিয়ে এল খোলা মনে একরাশ অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি নিয়ে। সাধুর নতুন নামকরণ হল 'বাবাঠাকুর'। ইতি-মধ্যে তারা টের পেয়েছিল, প্রতি মাসের প্রথম দিকে কতগুলো করে মণিঅর্ডার আসে আশ্রমের ঠিকানায়। সেই দিকেই পড়ল ওদের লোলুপ দৃষ্টি। দলবেঁধে এসে প্রার্থনা জানায় বাবাঠাকুর যদি দয়া করেন, তাহলেই তাদের সব কষ্ট দূরে হতে পারে। তিনি বললেন, 'ও টাকা' তোমাদের দেবার উপায় নেই। ওর অনেক ভাগীদার। (হেসে একগোছা মণিঅর্ডারের ফরম দেখিয়ে দিলেন) তোমাদের টাকা তোমরা যোগাড় করবে।

—আমরা কোথায় পাবো! একেবারে আকাশ থেকে পড়ল মাতব্বরের দল।

—পাবে ব্যাঙ্ক থেকে।

ব্যাঙ্কের নাম শুনেছে কেউ কেউ, শহরে গিয়ে চোখেও পড়েছে দু-একজনের, মস্ত বড় পাকা বাড়ি, গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান, সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোটর। যারা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে তারা সব বড় বড় বাবু। জাঁদরেল চেহারা, জমকালো পোষাক-আসাক। সেখানে পাত্তা পাবে তাদের মত গরীব মানুষ! বাবাঠাকুর কি ঠাট্টা করছেন তাদের সঙ্গে?

তিনি বললেন, সে ব্যাঙ্ক নয়, এ অন্য ব্যাঙ্ক। তোমরাই হবে তার মালিক, তোমাদেরই কারো ঘরে বসবে তার আফিস। ধারও নেবে তোমরা, তার সুদ থেকে যে লাভ হবে সেটাও তোমাদের।

একজন, যে ওদের মধ্যে সব চেয়ে চালাক, হেসে বলল, টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

—সহরের বড় ব্যাঙ্ক থেকে। ধারও বটে, মূলধনও বটে। তার জন্যে তোমাদের সবাইকে জোট বাঁধতে হবে। টাকা যেটা আসবে, তোমাদের সকলের টাকা, সমান অংশ, সমান অধিকার। ও দিয়ে যা কিছু কেনা হবে, নৌকো, জালের সুতো, বাঁশ দড়ি, আলকাৎরা— তারও মালিক ঐ জোট, যার নাম সমবায় সমিতি। মাছ যা উঠবে, একসঙ্গে নিয়ে যাবে সহরে, বিক্রী করে যে টাকা পাবে, তার থেকে ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ দিয়ে বাকীটা ভাগ হয়ে যাবে তোমাদের অর্থাৎ সমিতির মেম্বরদের মধ্যে।

মাতব্বরদের চোখে মুখে ঔৎসুক্যের আলো ফুটে উঠল, তার মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ম্লান ছায়া পড়ল তার উপর। এত বড় কাণ্ড করবার মত কে আছে তাদের মধ্যে? সবাই নিরক্ষর মুখ্যু। লেখাপড়া, তদ্বির-তালাস, হিসাব-পত্তর—ঝামেলা তো কম নয়। ঠাকুরমশাই বললেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো।

১৯২২-২৩ সালের কথা। গ্রামাঞ্চলে সমবায় ঋণ সমিতি গঠনের দিকে কিঞ্চিৎ নজর দিয়েছেন ইংরেজ সরকার। মহা-জনেরা যথাশক্তি বাধা দিচ্ছেন। লাল

ফিতার দৌরাত্ম্যও কম নয়। সরকারী মহলে একদা কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল মৈত্র মশায়ের—(ঐটাই তাঁর পৈতৃক পদবী)—সৌহার্দ্যও ছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। তারই বলে অনেক অনাবশ্যক জটিলতার হাত এড়িয়ে আবশ্যক মঞ্জুরিটা অল্পদিনেই এসে গেল। একটা অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র গ্রামের কতগুলো শ্রীহীন ভাঙা কুঁড়েঘরের এককোণে গড়ে উঠল এ তল্লাটের প্রথম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি।

ছোট-বড় সব রকম ব্যাংক-ব্যবসায়ের আসল মূলধন টাকা নয়, সততা; এই দুর্ভাগা দেশের জাতীয় চরিত্রে যার একান্ত অভাব। মৈত্র মহাশয়ের সে কথা জানা ছিল এবং সেই জন্যে গোড়া থেকেই ওদিকটায় নজর রেখেছিলেন। এই লোকগুলোর অপরিসীম অজ্ঞতাও তাঁকে কম বাধা দেয়নি। সেটা দূর করবার জন্য এদের কয়েকটি ছেলেকে কিছুটা লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল। বাপ-দাদার পেশা থেকে সরিয়ে না এনে কিংবা তার উপরে কোনো রকম অনিচ্ছা বা অশ্রদ্ধার উদ্রেক না করিয়ে যতটা শেখানো যায়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য; যাতে করে কালক্রমে তাদেরই কাউকে ব্যাঙ্কের কাগজপত্রের দিকটার ভার ছেড়ে দেওয়া যায়।

এই গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ায় একটি পরিবারের সঙ্গে আশুবাবুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ আর্থিক যোগাযোগও রাখতে হয়েছিল। তাদেরই কারো অসুখের খবর পেয়ে একটা 'রবিবার এখানে কাটাতে এসেছিলেন। সধ্যাবেলা গঙ্গাতীরে বেড়াতে গিয়ে একটি বৃদ্ধ জেলের সঙ্গে কথায়-বার্তায় 'বাবাঠাকুরের' যে বর্ণনা শুনেছিলেন, তাতেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আলাপ-সালাপের পর আকর্ষণ ক্রমশঃ গাঢ় হতে থাকে। পরের আর একটা রবিবার সকালের দিকে এসে দেখেন ঠাকুরের ঘর-ভর্তি বাইরের লোক। বেশীর ভাগই তার মত নীচু-স্তরের চাকরিজীবী। নানা কাজের ভার তাঁদের উপর। সেই সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশ নিতে এসেছেন গুরুর কাছে। মন্ত্রদাতা বা দীক্ষাদাতা গুরু নন, যে যে কাজে তাঁরা ব্রতী তারই প্রেরণা ও পরামর্শদাতা, সেই অর্থে গুরু। কেউ কোন্ এক বস্তিতে নাইট-স্কুল চালান, কেউ কোনো কোনো নিম্নবিত্ত ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু কাঁচামাল যুগিয়ে তৈরী মাল বাজারে দিয়ে কিঞ্চিৎ বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, কারো কারো গোপন কর্মস্থল মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী সমাজ। অল্প সুদে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনাসুদে কিছু কিছু ধার দিয়ে রাঘব-বোয়ালরূপী পশ্চিমী দারোয়ান এবং নেকড়েরূপী কাবুলিওয়ালার কবল থেকে ধীরে ধীরে সেই দেনায়ডোবা লোকগুলোকে বের করে আনার দুরূহ কাজের ভার নিয়েছেন তাঁরা। টাকাটার যোগান দেন মৈত্রমশাই। নিজের টাকা নয়, দশজনের কাছ থেকে যা আসে। এমনি একজন 'শিষ্য' বসেছিলেন পিছন দিকে; মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ। গুরু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাথায় ঐ আশীর্বাদী নির্মাল্যটি কার হাতের? পাঁড়েজী না খাঁসাহেব? দ্বারভাঙ্গা না আফগানিস্তান?

—আজ্ঞে, আফগানিস্তান হলে কি আর এত অল্পের ওপর দিয়ে যেত? এটা আমাদের বড় দারোয়ানজীর ভাড়াকরা লেঠেল। অবিশ্যি বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

—'ওদিকেও বুঝি অসুবিধে হচ্ছে?' ......বুড়ো আঙুলের উপর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করলেন।

—খুব। এ মাসে নতুন মক্কেল একটাও জোটেনি, পুরনোর মধ্যেও তিনজনকে ছাড়িয়ে এনেছি।

—আহা বেচারা! তুমি তার ভাতে

...বাবাঠাকুরের যে বর্ণনা শুনেছিলেন, তাতেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন।

ঘা মারবে, আর সে বুঝি হাত-পা কোলে করে চুপ করে বসে থাকবে?

ঘরের আরেক দিকে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবকের দিকে ফিরে বললেন, মহীনের কী খবর? ঘাড়ের ব্যথা সেরেছে?

ছেলেটি সলজ্জ ভাবে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কে একজন জিজ্ঞাসা করল, ঘাড়ে ব্যথা হল কেমন করে?

—ও, তা জান না বুঝি? মহীনবাবুর বিদ্যাসাগর হবার সখ চেপেছিল। হাওড়া ষ্টেশনে এক বাবু ছোট্ট একটা সুটকেসের জন্যে কুলী ডাকছিলেন। ওর সেটা সহ্য হল না। বলে বসল, আমাকে দিন, কুলী-ভাড়াটাও দিতে পারেন ইচ্ছা করলে। বাবুটির কেমন সন্দেহ হল, ছোকরার কোনো মতলব আছে নিশ্চয়ই। কোন কথা না বলে মালটা কুলীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। কুলী ব্যাপারটা অত সহজে ছেড়ে দিল না। মুখ ভেংচে কী একটা ঠাট্টা করতেই ও-ও তেড়ে জবাব দিল। তারপর যা হয়ে থাকে। ভিড়ের মধ্যে পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর কিঞ্চিৎ দাওয়াই। তবে বাঙালের ঘাড় তো, অত সহজে সোজা হবার নয়। এবারে নিয়ম করে কুলীগিরি চালাচ্ছে মহীনচন্দ্র। আফিস ছুটির পর পাঁচটা ছত্রিশের ট্রেণে বাড়ি ফিরত, এখন ছটা বিয়াল্লিশের গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এক ঘণ্টা মোটটানা চাকরি।

এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, মোট বইতেও তো লাইসেন্স্ লাগে। পুলিশে ধরছে না?

—ধরতে পারলে তো? মহীন যে সেখানে মোটওয়ালার নিজের লোক। কারো ভাই, কারো বড় কুটুম্ব। 'চলুন জামাইবাবু, আসুন দিদি, এইটুকু মাল, কুলী কী হবে?' বলে, বাঁ কাঁধের ওপর একটা পেল্লায় ট্রাঙ্ক্ তুলে আর ডান হাতে বিছানাটা জাপটে ধরে এগিয়ে চলল। এর পরে আর লাইসেন্স্ চাইবে কে?

মহীন বলল, রেলের বাবুরা কেউ কেউ জেনে গেছে? কিছু বলে না।

—বলবে কী? ওরাও ছা-পোষা মানুষ, গরিব ভদ্রলোকের ওপর তাদের কুলী-পল্টনের জুলুমবাজি চোখের ওপর দেখছে তো? সঙ্গে যদি একটু বেশী মোট-ঘাট থাকে, একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেয় ব্যাটারা।

—'সত্যি; মহীনবাবু একটা কাজের কাজ করছেন,' প্রশংসার সুরে কে এক-জন বলে উঠলেন, 'ও'র মত আর দু'চারটি ছেলে যদি এগিয়ে আসে, কুলীগুলো শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

মৈত্রমশায় বললেন, সে চেষ্টাও চলছে। মহীন বসে থাকার ছেলে নয়। কী হল? জোটাতে পারলে দু-একটি সাকরেদ?

—আজ্ঞে, আসছে হপ্তা থেকে দুজন বন্ধু জুটবে বলে মনে হচ্ছে। আসতে তো চায় অনেকেই। কিন্তু ভারী মোট বইবার মত গায়ের জোর থাকা চাই। সে রকম লোক পাওয়া শক্ত। তারপর কুলীগুলো ক্ষেপে আছে। তার জন্যও তৈরী থাকতে হচ্ছে।

মহীন উঠে এসে কতকগুলো রেজগি মৈত্রমশায়ের পায়ের কাছে রেখে বলল, পাঁচ টাকা দশ আনা আছে; গেল হপ্তার রোজগার।

মৈত্রমশায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মহীন যোগ করল, সাহায্য নেবার মত গরিব পার্টি বেশী ছিল না, দু'চারটি সৌখীন বড়লোক ধরলাম। কিছু বখ-সিস্ পাওয়া গেল। না দিয়ে ছাড়লেন না।

—বাঃ, তাহলে রোজগারও হচ্ছে কিছু? তা, এক কাজ কর। কালকের মত এ চাকরিটা বাদ দাও। এখানে কত আছে বললে? পাঁচ টাকা দশ আনা। আচ্ছা; তার সঙ্গে এই নাও চার টাকা ছ আনা। এই টাকাটা তোমাকে বৌবাজারে একটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। দাঁড়াও ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'...... বলে একটা খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন এবং তারই ভিতর থেকে একটা নাম-ঠিকানা খুঁজে একটুকরা কাগজে লিখে দিয়ে টাকা সমেত এগিয়ে ধরলেন মহীনের দিকে।

বললেন, গলিটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হবে। একটা অত্যন্ত পুরনো বাড়ির একতলার পেছন দিকে থাকেন ভদ্রলোক। ভেতরে চলে গিয়ে ও'র হাতে দিও টাকাটা, আর কাউকে দিও না।

বেলা বাড়তেই অনেকে উঠে পড়লেন। একটু পরে কলকাতার দিকে যাবার একটা ট্রেণ ছিল। তাতেই ফিরবেন বেশীর ভাগ। যাবার আগে প্রায় সকলেই কিছু কিছু টাকা 'গুরুদেবের' পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। তিনি কারো মাথায় হাত রেখে, কারো বা বাহু ধরে, পাত্র বিশেষে নানা রকম সরস মন্তব্য এবং সস্নেহ পরিহাসের ভিতর দিয়ে একে একে সবাইকে বিদায় দিলেন। দু'চারজন যাঁরা রয়ে গেলেন, উঠে গিয়ে বোধহয় রান্না-বান্নার তদারকে লাগলেন। মৈত্রমশায়ের একটি ভৃত্যজাতীয় লোক আছে। তার নাম মধু। রবিবারে তার বেশ কিছু কাজ বাড়ে।
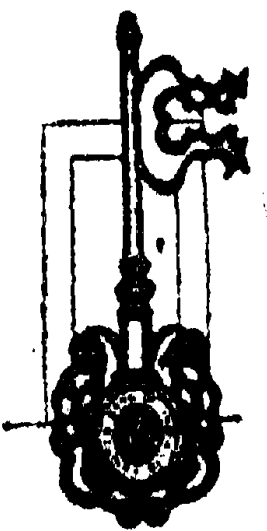
(ক্রমশঃ)

দুটি হাতের জাদুর প্রভাব

পলাশ মিত্র

মাত্র দুটি হাত। অথচ আশ্চর্য এর জাদুর প্রভাব! এর প্রভাবে (না ভালোবাসায়?) আপনি কি থেকে কি হয়ে উঠতে পারেন তা ভাবলেও হৃদ্‌পিণ্ডটি চঞ্চল হয়।

সারা দেশটাই চলেছে এই দুটি হাতের জাদুর প্রভাবে। যিনি যেখানে আছেন, যেমনভাবে আছেন, যেমন পেশায় আছেন, নেশায় আছেন, সকলেই ব্যাকুল এই হাতের জন্যে।

বুঝতে পারছেন অনুমান করি, হাততালির কথাই বলছি। লক্ষ্য করুন, দেখবেন দুনিয়াটাই চলছে এই হাততালিতে। সর্বভূতে নারায়ণের মতো হাততালিও সর্বঘটে বিরাজমান—এটা ধর্মশাস্ত্র না পড়েই বলা যায়!

হাততালি কোথায় বা নেই! এখানে-সেখানে আনাচে-কানাচে অলিতে-গলিতে-রাজপথে ক্লাবে-পার্টিতে সভায়-অনুষ্ঠানে, এমন কি শোকসভায়। রাম-শ্যাম যদু-মধু থেকে জজ-ব্যারিস্টার সাহিত্যিক শিল্পী-কেরানী মন্ত্রী নেতা সকলেই, আজ্ঞে হ্যাঁ, সকলেই লালায়িত এই হাততালির জন্যে। সে হাততালি লীলায়িত হাতের হোক কিংবা কঠিন শির-বের-করা হাতের হোক, সেদিকে দেখার দরকার নেই। আসল কথা, হাততালি আমাদের চাই। এটাই আমাদের অন্তরাত্মার একমাত্র শ্লোগান।

বয়েস যখন আপনার কাঁচা ছিল, অর্থাৎ আজ মাননীয় শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র অমুক হলেও যখন আপনি নাদু কিংবা পল্টু কিংবা মোনা নামে জনপ্রিয় ছিলেন সেই সময় হাততালি পাবার দিকে আপনার তেমন লোভ ছিল না। আপনি তখন ব্যস্ত থাকতেন হাততালি দিতে।

রাস্তায় সেই ঝাঁকড়া চুলের লোকটা দিনদুপুরে আপনার চোখের সম্মুখে ছোট্ট ছেলেটার আস্ত জিভটা যখন কেটে ফেলল তখন আপনার চোখ দুটিতে অন্তত বিস্ময়-মুগ্ধ জিজ্ঞাসা। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই ছেলেটার কাটা জিভ মন্ত্র দিয়ে লোকটা যখন জুড়ে দিলে সেই সময় আপনি কি করেছিলেন? কি আবার করবেন? হাততালি দিয়েছিলেন প্রাণভরে। সে-হাততালি থামতেই চায় না।

এবং সেই প্রথম আপনি হাততালির স্বাদ পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই 'লেড়কালোক এক দফে হাততালি বাজাও' শুনলেই কে যেন পাগলাঘণ্টা বাজাতে আপনার নির্ভেজাল রক্তে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনি যত জোরে পারতেন, যত ভালোভাবে পারতেন হাততালি দিতেন। সে কী আনন্দ! কী শিহরণ! হাততালিকে ভুলতে পারত না আপনার শিশুমন।

এবং আজ জীবনের আরেক সীমায়

এসেও হাততালিকে ভুলতে পারেননি আপনি।

তবে আগের তুলনায় কিছুটা পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে বৈকি। আগে আপনি শুধু হাততালি দিয়েই যেতেন। আজ কিন্তু আপনি দিয়ে ততো তৃপ্ত নন, যতটা পেয়ে।

এখন আপনার তাই লক্ষ্য, কিভাবে এবং কোন উপায়ে হাততালি আপনি পেতে পারেন। শুধু আপনি কেন, সব মানুষেরই নজর বা লোভ যাই বলুন না কেন ঐ হাততালির দিকে। চারদিক থেকে এ-জিনিস এমনভাবে আপনাকে বেঁধে রেখেছে যে, পালাবার ইচ্ছে থাকলেও পালাতে আপনি পারবেন না। তাই আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পরেও কোনো 'বিরাট জাতি-সদনের শোকসভায় আপনার নামে পড়বে হাততালি। ঘন ঘন হাততালি।

শুধু শোকসভায় কেন। হাততালি সর্বত্রগামী। সিনেমা-থিয়েটারে যান হাততালি। মনুমেন্টের সভাতেও হাততালি। এমনকি দুহাত-চওড়া কালী লেনের সাপ-খেলাতেও হাততালি। ক্রিকেট-ফুটবলের মাঠে হাততালি। ডিনার পার্টিতে হাততালি। অর্থাৎ হাততালি রয়েছে সর্বভূতে। সর্বরূপে। নানান ছন্দের নানান সুরে চলেছে এই হাততালি। কখনও আস্তে। কখনও জোরে। বিচ্ছেদহীন বিরামহীন এই হাততালি।

মেমও নয় সাহেবও নয়, অথচ মেম-সাহেব—এরকম মানুষের হদিস অবশ্যই পেয়ে থাকবেন। কিন্তু হাতও নয় তালিও নয়, অথচ হাততালি—এরকমটি আপনি পারেন না। অর্থাৎ হাততালি বললেই হাত এসে যাবে। সে-হাত হাজারো রকমের। হাজারো গড়নের।

অষ্টাদশী তরুণীর নরম সুডৌল হাত, খেটে-খাওয়া-মানুষের শক্ত কঠিন হাত, রোগা লোকের শির-বের-করা হাত, কথাকলি ভারতনাট্যম অজন্তা পোজের হাত—এই সব রকমের হাতই আপনি পাবেন।

হাত সবরকমের হোক। হাততালির সময় কিন্তু সব মিলেমিশে একাকার। সমস্ত হাতের এতো বড় মিলন এটা কিন্তু কম কথা নয়। কারও সঙ্গে কারও বিভেদ নেই। অতএব হাততালির মধ্যে মিলনের এই পথপ্রাপ্তিতে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন।

এ যেন সেই বাজারের হট্টমেলা। দূরে থেকে মনে হবে এক সুরের কাকলী। কাছে গেলেই শোনা যাবে কেউ দর করছে চিংড়িমাছ, কেউ ঝগড়া করছে পালংশাক-ওলার সঙ্গে।

আজ কিন্তু আপনি দিয়ে ততো তৃপ্ত নন, যতটা পেয়ে

হাততালিও ঠিক তাই। কাছ থেকে এক এক জনের হাততালি এক এক রকম মনে হলেও দূরে থেকে কিন্তু সমস্ত হাততালির এক সুর।

লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, হাততালি শুনলে স্থির থাকতে পারেন না অনেকেই। ও-পাশের কোণের ছারপোকা-ভর্তি-চেয়ার থেকে প্রথমে এক জোড়া হাত বেজে উঠল। তারপর আর কি! জোড়া হল নানান হাত।

ভয় এই পেছনের হাততালিকেই।

একেবারে অটোমেটিক। তারপর আস্তে, জোরে, আরো জোরে। তারপর আবার আস্তে, ক্রমে আরো আস্তে। এই হল হাততালির সাইকেল (ইকনমিক্সের বিজনেস সাইকেলের মতো আর কি)।

এইভাবে চলছে হাততালি। সেই সঙ্গে চলেছে একে নিয়ে গবেষণা।

অনেকে বলেন, হাততালি নাকি খুব উঁচুদরের উপদা (অর্থাৎ ঘুষ)। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। শোনা যায়, হাততালি নামক উপদার সাহায্যে অনেককেই নাকি কাহিল করা সম্ভব। অর্থের চেয়েও সময় বিশেষে হাততালি নাকি বেশি ফলপ্রদ।

অবশ্য যাঁরা সাধুপুরুষ, হাততালিকে তাঁরা আমল দেন না (এটি একটি আপ্ত বাক্য)। কিন্তু জনবল্লভ হতে যাঁদের সাধ তাঁদের প্রধানতম কর্তব্য হল হাততালির পালসটাকে বোঝা। এটা না বুঝলেই ধনে-প্রাণে মৃত্যু।

লক্ষ্য করেছেন কি, বক্তৃতা গান বা অভিনয় যখন মোটেই জমছে না, শ্রোতার দল তখন জোরসে হাততালি দিয়ে চলেছেন। বক্তা বা শিল্পী বোধহয় ভাবলেন তাঁদের অনুষ্ঠান শ্রোতৃবৃন্দের মনে খুশির আমেজ এনেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই?

না মশাই তা নয়। বক্তা বা শিল্পীর অত্যাচারে শ্রোতারা অগ্নিশর্মা হয়েছেন। এবং সেইজন্যেই এতো হাততালির ঘটা। এর অর্থও খুব পরিষ্কার। অর্থাৎ, বক্তা বা শিল্পীমশাই, দয়া করে থামুন এবার। আমরা আপনার কী সর্বনাশ করেছি যে এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছেন? পায়ে পড়ি আপনার। রেহাই দিন হে নরোত্তম!

রেহাই পাব বললেই কি পাওয়া যায়। হাততালির ঘটা শুনে বক্তা বা শিল্পী দম নিয়ে আবার শুরু করলেন তাঁদের অত্যাচার।

মজাটা দেখুন একবার। বক্তা বা শিল্পীর এটুকু বোঝবার ক্ষমতা হল না, যে-হাততালি তাঁদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে, সেটা সামনে হলেও আসলে সেটা কিন্তু পেছনের হাততালি।

ভয় এই পেছনের হাততালিকেই। এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় উন্মাদ হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব নয়। সুতরাং নিজের মঙ্গল চাইলে হাততালিতে উল্লসিত হবেন না মোটেই। যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন, আপনাকে কেন্দ্র করে হাততালি দিলেই আনন্দে অজ্ঞান হবার আগে দয়া করে হাততালির পালসটাকে বুঝতে চেষ্টা করুন প্রথমে। জেনে নিন, হাততালিটা বাস্তবিকই সামনের না পেছনের। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যদি হয় চল্লিশ কোটি, তার মধ্যে চারজনকেও পাবেন কিনা সন্দেহ যারা প্রকৃতপক্ষেই সামনে হাততালি দিতে অভ্যস্ত।

বিদেশী গল্প

হৃত অরণ্য

যোহানেস ভি য়েনসেন

এক যে ছিল চাষী, নাম ছিল তার কোর‍্যা। চাষবাস করে কিছু টাকা জমিয়েছিল কোর‍্যা। সেই টাকা নিয়ে কোর‍্যা গেল শহরে: ইচ্ছা তার ক্রীতদাস কিনবে।

ক্রীতদাসের বেচা-কেনা করত যে ব্যাপারী সে কোর‍্যাকে অনেকগুলি ক্রীতদাস দেখাল। কিন্তু একটাও পছন্দ হল না তার।

অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাপারী বললে, "আপনার জন্য ওদের সবাইকে ডেকে আনতে হবে এখানে দেখছি।" তখন বেলা দুপুর। ক্রীতদাসরা তখন সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে।

খুব সহজ গলায় কোর‍্যা বললে, "আমি অন্য ব্যাপারীদের কাছে যাই।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান।" ব্যাপারী চেন ধরে টান দিল আর সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল ক্রীতদাসরা। তাদের চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে আছে। কোর‍্যা সকলকে একে একে চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

একজন ক্রীতদাসকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, "দেখুন, দেখুন মশাই একে দেখুন। সুন্দর জোয়ান। কেমন? মনে ধরেছে? বুকের ছাতিটা দেখেছেন? শক্ত; না? ধাক্কা দিয়ে দেখুন। পরখ করে নিন। আর কব্জিগুলো দেখেছেন মশাই। আর কন্ডরাগুলো বেহালার তারের মত। এই, মুখ খোল্।"

ব্যাপারী ক্রীতদাসের মুখের ভিতরে আঙুল পুরে দিয়ে তার মুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল। "এবার এর দাঁতগুলো ভাল করে দেখুন।" ব্যাপারী তার এই ক্রীতদাসকে নিয়ে খুবই গর্বিত। ক্রীতদাসের দাঁতগুলোর ওপর ছুরির উল্টো পিঠ দিয়ে একবার টান দিল ব্যাপারী। "দেখেছেন তো! এই দাঁতগুলো লোহার মত। ইচ্ছে করলে পেরেক কামড়ে দুখানা করে দিতে পারে।"

এই অবসরে কোর‍্যা নিজেও ভেবে দেখেছে। বেশ তারিফ করার ভঙ্গিতে কোর‍্যা ক্রীতদাসের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে নিল। আঙুলের ডগা দিয়ে ক্রীতদাসের পেশীগুলো টিপে দেখল বেশ শক্ত কি না। শেষে এই ক্রীতদাসকেই কেনার জন্য মন স্থির করে ফেলল কোর‍্যা। মুখ গোমড়া করে দাম দিল। ব্যাপারী ক্রীতদাসের হাতকড়ি খুলে দিল। কোর‍্যা ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন ক্রীতদাস অসুখে পড়ল। দিনের পর দিন রোগা হয়ে যেতে থাকল সে। ক্রীতদাস এখন এক জায়গায় মোটামুটি স্থায়ী আশ্রয় পেয়েছে। তাকে আর বাজারে দাঁড়াতে হবে না। তাই তার মনটা এখন অরণ্যের জন্য হু হু করে উঠল। সেই অরণ্য, যেখান থেকে সে এসেছে। ক্রীতদাস সেই অরণ্যে ফিরে যেতে চায়। ক্রীতদাসের এই উদাস উতলা ভাব ভাল লাগলো কোর‍্যার। সে এই সব উপসর্গ চিনতো খুব ভাল করেই। একদিন কোর‍্যা দেখল যে ক্রীতদাস মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। জীবনে আর তার কোন আসক্তিই নেই। কোর‍্যা ক্রীতদাসের পাশে বসে ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই বলে গেল।

"ভয় পাচ্ছ কেন? ভয় পেয়ো না। তুমি তোমার অরণ্যে ফিরে যাবে: ঠিক যাবে। আমি তোমাকে কথা দিলাম। আমার কথার ওপর ভরসা করতে পার। তোমার এখন কাঁচা বয়স। তোমার ধারণা নেই তোমার এখন বয়স-কাল। তুমি যদি মনপ্রাণ দিয়ে আমার ক্ষেতে পাঁচটা বছর কাজ কর তা হলে আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে রেহাই দেবো। তুমি মুক্তি পাবে। যদিও আমি তোমাকে সারা জীবনের মত কিনে নিয়েছি, তবু আমি তোমায় মুক্তি দেবো। কিন্তু পাঁচটা বছর তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। ঠিক? এই কথা রইল।"

ক্রীতদাস কাজে লেগে গেল। দৈত্য-দানবের মত হাড়গোড় ভাঙা খাটুনি খাটে মাঠে। দরজার ওপর বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকে কোর‍্যা। খুব ভাল লাগে তার। বাদামী চামড়ার নিচে ক্রীতদাসের পেশীগুলো দলা পাকাচ্ছে, নাচছে, কাঁপছে। ক্রীতদাসকে এমনভাবে খাটতে দেখে খুব আনন্দ পায় কোর‍্যা। ঘন্টার পর ঘন্টা দরজার ওপর ঠায় বসে সে তাকিয়ে থাকে। আর অন্যদিকে মনও থাকে না তার। কোর‍্যা অনুভব করতে আরম্ভ করল যে শরীর অতি অপূর্ব বিস্ময়, শরীর বড় নয়নাভিরাম।

ক্রীতদাস গুণতে থাকে পাঁচটা বছর। পাঁচটা বছর—তার হাতে যতগুলো আঙুল আছে ততগুলো জয়নাক্ত পার হয়ে গেলে শেষ হবে পাঁচটা বছর। এই পাঁচটা বছরে সূর্য দশবার মুখ ঘোরাবে।

তাই প্রতিদিন বিকেল বেলা ক্রীতদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পাথর কিম্বা ঢিপি দিয়ে সে দিন গোনে। সূর্যের প্রথম অয়নান্ত যেদিন হল সেদিন ক্রীতদাসের ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুক্ত হল। আবার একটা অয়নান্ত। কত যুগ পরে যেন এই মুখ ঘোরাল সূর্য। এইবার মুক্ত হল তর্জনী। আরও কটি আঙুল মুক্ত হলে শেষ হবে তার দাসত্ব।

তাই দিনকাল গোনা হয়ে ওঠে ক্রীতদাসের ধর্ম। এই প্রতীক্ষা হল তার অন্তরের সম্পদ, তার আত্মার ঐশ্বর্য। কেউ এই সম্পদ কেড়ে নিতে পারে না। এই ঐশ্বর্য নিয়ে বিবাদ বাধবে না কারো সঙ্গে।

সময় যত পার হয়ে যায় গণনা হয়ে ওঠে বিরাটতর, প্রশস্ততর এবং গভীরতর। বছর পার হয়ে যায় অপরিমিত কল্পনার মত। ক্রীতদাস সময়ের এই ধারা কিছুতেই বুঝতে পারে না। কিন্তু অস্ত-মুখী সূর্যের রক্তিম আভার নিচে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাস প্রতিদিন তার আশাকে উজ্জীবিত করে নেয়, প্রতিদিন উৎসর্গ করে
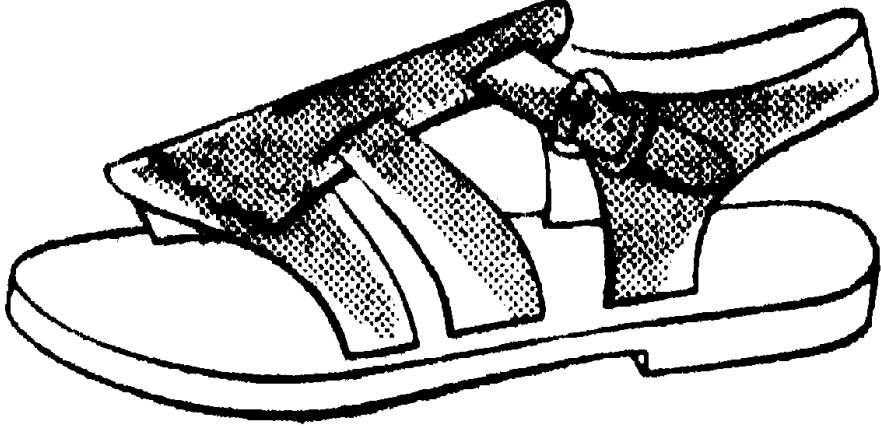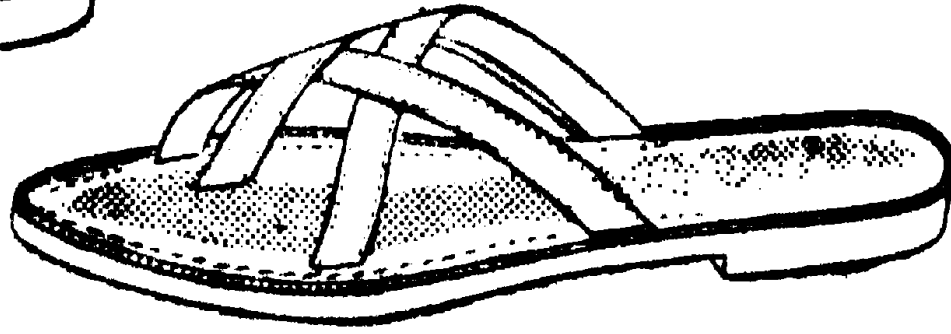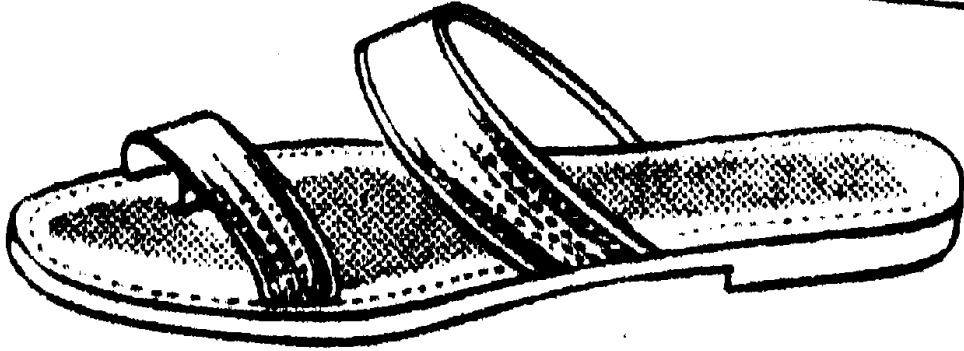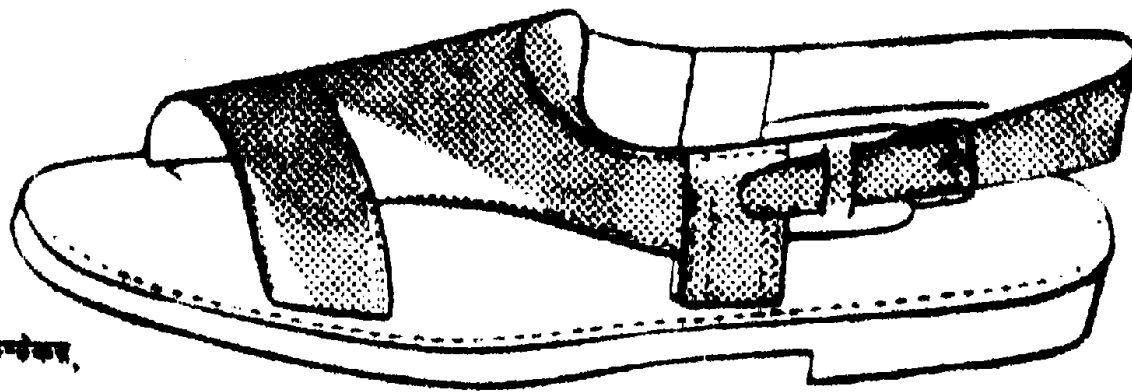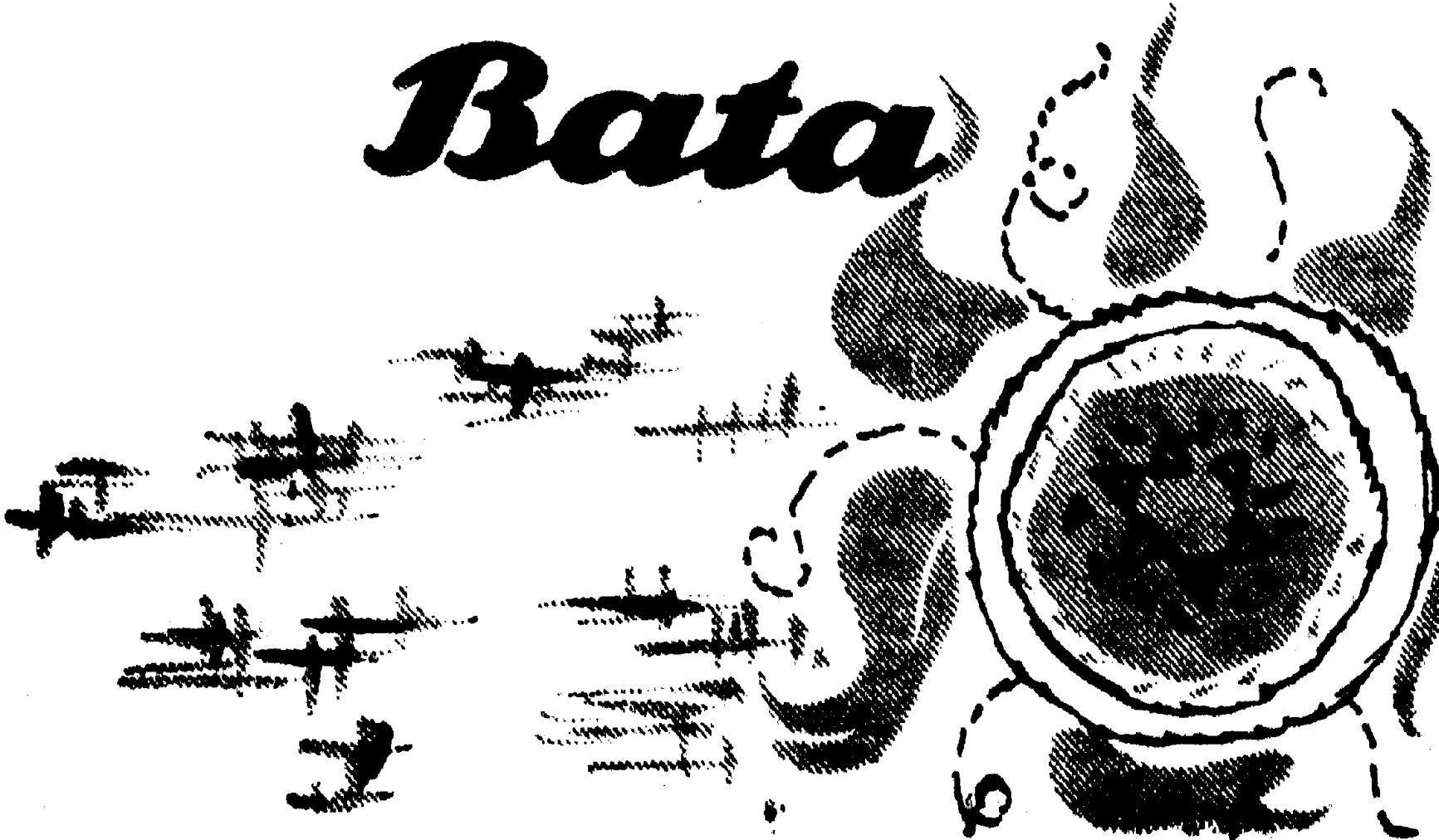
তার বিশ্বাস। সময়, যা নিত্যই বর্তমানে বিলুপ্ত, তা ক্রীতদাসের কাছে মনে হল অনন্ত, অসীম। সেই সময় হয়ত কিছু পার হয়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যত এখনও বহুদূরে, দূরান্তরে।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে ক্রীতদাসের মন অনেক গভীর হয়ে ওঠে। তার মুক্তির আকুলতা অসীমকে নিয়ে এসেছে সময়ের সীমায়। আর তাই তার বিশ্বও হয়ে উঠেছে সীমাহীন, চিন্তা হয়েছে অপরিমিত। প্রতি সন্ধ্যায় ক্রীতদাস তাকিয়ে থাকে পশ্চিম দিগন্তে, প্রতি সূর্যাস্ত তার অন্তরে দান করে গভীরতা।

শেষে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল। (কথাটা কত সহজেই না বলা যায়!) ক্রীতদাস মালিকের কাছে এসে মুক্তি চাইল। সে এবার যাবে অরণ্যে, তার বাড়িতে।

চিন্তা করতে করতে কোর‍্যা বললে, "তুমি সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছ। তোমার বাড়ি কোথায়, বল। তোমার বাড়ি কি পশ্চিমে? আমি বহুদিন তোমাকে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।"

ঠিক, তার বাড়ি ওই দূরে পশ্চিমের দিকে।

"তাহলে সে ত অনেক দূরে", কোর‍্যা বললে। ঘাড় নাড়ল ক্রীতদাস,—অনেক দূরে। "কি করে যাবে? তোমার কাছে টাকা-কড়ি আছে?"

বিমর্ষ হল ক্রীতদাস। চুপ করে থাকল। না, ঠিকই তো। তার কাছে টাকা-কড়ি নেই।

"কথা শোন। টাকা না থাকলে তুমি যে কোথাও যেতে পারবে না। তুমি যদি আমার কাছে আরও তিন বছর, না, না, দু বছর; তুমি যদি আমার কাছে আরও দু বছর কাজ কর আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে পারি। তোমার পথের খরচা সেই টাকায় চলে যাবে।"

মাথা নিচু করে ক্রীতদাস মেনে নিল এই প্রস্তাব। আবার মাঠের কাজে লেগে গেল। সে এবারও মনেপ্রাণে খাটে। কিন্তু এবার সে আর আগের মত সময়ের জন্য ব্যাকুল হয় না, গুণেও রাখে না। বরং দেখা যায় ক্রীতদাস এখন দিবা-স্বপ্নে মগ্ন। কোর‍্যা শোনে ক্রীতদাস ঘুমের ঘোরে ভুল বকছে, কাঁদছে। কিছুদিন পরে আবার অসুখে পড়ল সে।

কোর‍্যা ক্রীতদাসের পাশে বসে খুব ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে অনেক কথাই বলে গেল। তার কথাগুলো খুবই বিচক্ষণ বলে মনে হল। মনে হল তার প্রত্যেকটি কথার পিছনে আছে সৎ অভিজ্ঞতা, আছে জ্ঞান।

সে বললে, "আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি। একদিন আমারও যৌবন ছিল। সেদিনও আমার বুক ওই পশ্চিমের জন্য উথালি-পাথালি করত। ওই বিরাট অরণ্য আমাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকত। কিন্তু অত দূরে যাবার মত উপযুক্ত টাকা পয়সা আমার ছিল না। আজ আর আমি কখনও সেখানে যেতে পারব না। আমি মারা গেলে আমার আত্মা হয়ত সেখানে পৌঁছাবে, কিন্তু আমি সেখানে আর যেতে পারব না। তোমার এখন বয়স-কাল। শরীর ভাল, খেটে কাজও কর। কিন্তু আমার বয়স-কালে আমি যতটা শক্তিমান ছিলাম, যে ভাবে খাটতে পারতাম তুমি কি তা পার? এই সব কথা ভেবে দ্যাখো। বুড়ো মানুষের কথাগুলোকে একেবারে হেলা-ফেলা করো না। যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ, সে দিকেও একটু নজর দিও।"

খুব ধীরে ধীরে সবল হয় ক্রীতদাস। আবার ক্ষেত-খামারের কাজে মন দেয়। কিন্তু আগের মত উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই। কাজকর্মের দিকে আকর্ষণ আর নেই। আর তার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে সে আজকাল ঘুমিয়ে নেয়। একদিন কোর‍্যা ক্রীতদাসকে চাবুক মারল। চাবুক খাওয়ার পর হুঁস ফিরে এল ক্রীতদাসের। সে কাঁদল।

দু বছর এই ভাবে পার হয়ে গেল।

তারপর কোর‍্যা সত্যি সত্যি ক্রীতদাসকে মুক্তি দিল। সে পশ্চিমের দিকে রওনা হল। কিন্তু কয়েক মাস পরে অতি দরিদ্র অবস্থায় আবার ফিরে এল সে। সে তার অরণ্যকে খুঁজে পায়নি।

কোর‍্যা বললে, "দেখলে ত? আমি তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম। কিন্তু আমি এমন কোন কাজ করবো না যার জন্যে কেউ বলতে পারে যে আমি তোমার ওপর দুর্ব্যবহার করেছি। আর একবার দ্যাখো। এবার তুমি যাও পূবের দিকে। যে অরণ্য তুমি খুঁজছো তা হয়ত আছে ওই পূবের দিকেই।"

ক্রীতদাস আবার যাত্রা আরম্ভ করল। এবার সে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে গেল। অনেক ঘোরার পর সে নিজের অরণ্য এবার খুঁজে পেল। কিন্তু সে নিজের অরণ্যকে ঠিকমত চিনতে পারল না। ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে সে আবার মুখ ঘোরায় পশ্চিমের দিকে, ফিরে আসে মালিকের কাছে। বলে সে অনেক অরণ্য খুঁজে পেয়েছে ছোট-বড় অনেক অরণ্য। কিন্তু কোনটাই তার নিজের অরণ্য নয়।

কোর‍্যা কেশে বলল, "হুঁ"।

তারপর খুব খুশী হয়েই বলে উঠল, "এবার আমার কাছে থাক। আমি যতদিন বেঁচে আছি, এ মাটিতে বাস করার মত ঘর তুমি পাবে। আমি মারা গেলে আমি জানি আমার ছেলে তোমার দেখাশোনা করবে।" ক্রীতদাস কোর‍্যার কাছেই থাকে।

কোর‍্যা বুড়ো হয়ে গেল। কিন্তু ক্রীতদাসের অটুট যৌবন। কোর‍্যা তাকে আদর-যত্ন করে, ভাল করে খাওয়ায় পরায়। সে দীর্ঘায়ু হোক এই-ই কোর‍্যার বাসনা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে যেন তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। আর নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্রীতদাসকে চাবুক মারে যেন সে বিনয়ী হয়, মান্য করতে শেখে। তার বিশ্রামের দিকেও নজর রাখে কোর‍্যা। প্রতি রবিবার তার ছুটি। সে এই ছুটির দিন ঢিপির ওপর গিয়ে বসে আর পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোর‍্যার ক্ষেতে সোনার ফসল উপচে ওঠে। সে জঙ্গল কেনে। ক্রীতদাসের কাজের কামাই যেন না হয়। তাই সে জঙ্গল পরিষ্কার করে, সেখানে আবাদ করে। ক্রীতদাসও মনপ্রাণ দিয়ে গাছ কাটে। কোর‍্যার এখন অনেক টাকা। একদিন কোর‍্যা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এল এক ক্রীতদাসী।

দশ বছর কেটে গেল। কোর‍্যার ঘরে এখন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ছ'টি বড় বড় সন্তান। বাপের মত তারাও কঠোর পরিশ্রম করে। ওদের বাবা ওদের বলে, যখনই কাজ করবে দেখবে সময় পার হয়ে গেছে। আমাদের সময় পার হয়ে গেলে আমাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে চির-কালের অরণ্যে। প্রতি বিশ্রাম-বারে ক্রীত-দাস তার সন্তানদের নিয়ে ঢিপিটার ওপর দাঁড়ায় আর দেখে ডুবন্ত সূর্যকে। ক্রীতদাস তার সন্তানদের অন্তরে জাগায় অরণ্যের আশঙ্কা।

কোর‍্যা বুড়ো হয়ে গেছে, এখন সে জীর্ণ। কোর‍্যা চিরকালই বুড়ো। কিন্তু এখন সে শুধু মাত্র বয়স ছাড়া আর কিছু নয়। কোর‍্যার ছেলে-পিলে কোনদিনই স্বাস্থ্যবান নয়। কিন্তু তারা নির্ভয়। তাদের এক একটা ক্রীতদাস এক এক আঘাতে শত্রু নির্মূল করতে পারে। এদের শরীর খুব ভাল। লোহার মত পেশী শক্ত চামড়া দিয়ে মোড়া, দাঁতগুলো বাঘের মত। কিন্তু সময় এখন নিরাপদ। ক্রীতদাসরা কুড়ুল দোলায় আর গাছ কাটে।

অনুবাদ : রাম বসু

ডেনমার্কের কৃষক পরিবারে জন্ম হয় য়েনসেনের। কোপেনহেগেনে ডাক্তারি পড়বার জন্য তাকে পাঠান হয়। কিন্তু লেখাপড়া ভাল লাগলো না তার। ইনি ভবঘুরে হয়ে যান। এই সময় আরম্ভ হয় তার সাহিত্য-সাধনা। ১৯৪৪ সালে লং জার্নি উপন্যাসের জন্য একে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। উপন্যাসটি ছ' খণ্ডে বিভক্ত। এই উপন্যাসে আদিম মানুষ থেকে আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত মানুষের উন্নতি ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে এর মৃত্যু হয়।

—অনুবাদক

স্লাভ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই কম। ইভো আন্দ্রিকের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি সমগ্র যুগোশ্লাভীয় সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। সেইসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ওদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেও এখনও পর্যন্ত ফরাসী, ইংরিজি, রুশ, আমেরিকান সাহিত্যের তুলনায় এক আনাও জানতে পারেনি। সম্প্রতি ইভো আন্দ্রিকের কিছু রচনার বঙ্গানুবাদ দেখা গেছে ইতস্ততঃ।

স্লাভ সাহিত্যের অপর একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ সিরিল কসম্যাক। ১৯৫৩ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'এ ডে ইন স্প্রিং' প্রকাশিত হওয়ার কিছুকালের মধ্যে ইংরিজিসমেত আরও অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। উপন্যাসে এক বিপ্লবী বীরের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আশ্রয়হীন, কারাবাস, বিদেশে পলায়ন এভাবে কাটাবার ১৫ বৎসর পর সে নিজের দেশে আবার ফিরে এল স্বাভাবিকভাবে। বাড়ীর মধ্যে এসে প্রকৃতির শান্ত স্বচ্ছ মাধুরিমার মধ্যে শুনতে পেয়েছে শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম করেছিল তাদের মৃত্যুপণ সংগ্রামের কথা। এক কুমারী মাতার সন্তান. সমগ্র কাহিনীর মূলে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে—তার সামনে দিয়ে চলে গেছে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল।

উত্তমপুরুষে লেখা গ্রন্থখানি আত্মস্মৃতিমূলক, ছেলেবেলা আর অতীতের স্মৃতিবিজড়িত, হারিয়ে-যাওয়া মানুষের বেদনাময় জীবনের শোকোচ্ছ্বাস, যুদ্ধকালীন জীবনের ভয়াবহ আর মর্মন্তুদ পরিস্থিতি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে একটি মানুষ—যার প্রাণে আছে আনন্দ, মানুষের জন্য ভালবাসা।

তৎকালীন ইটালীর অন্তর্গত স্লাপে কসম্যাকের জন্ম ১৯১০ সালে। ছোটবেলা থেকে সুবিশাল সমুদ্রের সান্নিধ্যে মানুষ—যৌবনে সরকারী আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান ১৯৩১ সালে। ১৯৩৮-৪২ পর্যন্ত প্যারিসে বাস করে ১৯৪৩-এ লণ্ডনে চলে যান। দ্বিতীয় যুদ্ধকালে যুগোশ্লাভিয়ায় এসে মুক্তিফৌজে যোগ দেন।

এই সমাজ-সচেতন কথাশিল্পীর রচনায় পল্লী অঞ্চল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

* * *

'আধুনিক' কথাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বলেও একথা বলা যায় যে সিনক্লেয়ার লুইস একজন আধুনিক মার্কিন ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ বিশ শতকের মার্কিন লেখকদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় লুইসের 'মেইন স্ট্রীট' আর

সাহিত্য সমাচার

১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। লুইসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'এ্যারোস্মিথ' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্যাবিট'। ব্যাবিট একটি টাইপ চরিত্র।—এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে মার্কিন জীবনের আত্মপ্রবঞ্চনার এক আশ্চর্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'এ্যারোস্মিথে' বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-অভিশাপের কথা অপূর্ব ব্যঙ্গ ও সততার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে।

লুইস মূলত হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনায় দক্ষ। তাঁর এই শিল্পসুষমার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনের সত্য ও সুন্দর রূপের অন্তরালবর্তী ক্লেদাক্ততা, গ্লানি মালিন্য। লুইস ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্য।

* * *

ইংরিজি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই মিস মুরিয়েল স্মার্কের রচনার সঙ্গে পরিচিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর দি কম্ফর্টার্স, দি ব্যাচেলার্স, রবিন্স, দি ব্যালাড অব পেকাম রাই, দি প্রাইম অব মিস জীন রডি প্রভৃতি ছয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

অবজার্ভার পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করবার পর প্রকাশকদের আগ্রহে স্মার্কের প্রথম উপন্যাস 'দি কম্ফর্টার্স' রচিত হয়। এই উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে এক নির্জন বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হয়েছিল। স্মার্কের রচনায় লঘু রসিকতাকে যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসাও ফুটে উঠেছে। মোটামুটিভাবে ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন প্রকৃত পড়ুয়া। চোখের সামনে যখন যে বই পেয়েছেন একাগ্রতার সঙ্গেই পড়ে গেছেন। কবি হিসাবে স্মার্ক জন মেসফিল্ডের ভক্ত। তাঁর বিভিন্ন রচনায় উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখকের কথা বলা হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে স্মার্ক বলছেন এক জায়গায়, "নিজেকে ঔপন্যাসিক হিসাবে ভাবতে আমার এখনও একটু দ্বিধাবোধ হয়। আমাকে একজন ঔপন্যাসিক না বলে লেখিকা বলাই সমীচীন বলে আমি মনে করি।"

* * *

জার্মান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহিলা শিল্পী বারবারা কোয়নিং প্রথম জীবনে সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব যেন পূর্ব হতেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কারণ ১৯৫৮ সালে যখন তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দি চাইল্ড অ্যাণ্ড ইটস স্যাডোজ' প্রকাশিত হয় তখন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান জার্মান সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁরও স্থান স্বীকৃত।

* * *

পশ্চিম জার্মানীর বইয়ের দোকানে আজকাল বেশীর ভাগ মেয়ে-বিক্রেতা দেখা যায়। কারণ মেয়েরা নাকি ভাবী ক্রেতার মনের ভাবটি ঠিক ধরে ঠিক বইটি গছিয়ে দেয়।

পশ্চিম জার্মানীতে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পুরুষদের বহু কাজ মেয়েদের হাতে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার মত বইয়ের ব্যবসাতেও এখন মেয়েদের প্রাধান্য। একপুরুষ আগেও এই ব্যবসায়ে সব মেয়েরা কাজ করত, তাদের ব্যঙ্গ করে বলা হত 'উঁচু ঘরের মেয়ের দল' যারা 'কাজের কাজ না করে বুদ্ধিগত ও সাংস্কৃতিমূলক কাজে' নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এখন বইয়ের ব্যবসায়ে চারভাগের তিনভাগই মেয়ে কর্মচারী।

কেন যে মেয়েরা এই কাজে বেশী নামতে চায় বলা কঠিন। তবে হয়তো এই কাজটি তাদের বেশ খাপ খায়। লোকের মনের ভাব মেয়েরা বেশ ভাল বোঝে। মেয়েরা এখন সুধু আর বইয়ের দোকানে কাজ করে না, অনেকেই তারা রীতিমত বইয়ের ব্যবসাদার। প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগ প্রতিষ্ঠানের হয় তারা মালিক, নয় পরিচালক।

প্রকাশক হিসাবে মেয়েরা এখনও তত উঠতে পারেনি বটে, তবে কিছু কিছু মেয়ে-প্রকাশক পশ্চিম জার্মানীতে আছে। বহু প্রকাশক সংস্থা আজকাল মেয়েদের পাঠক হিসাবে কাজে লাগায়। এদের কাজ হচ্ছে মেয়ে-মহলে কি ধরণের বইয়ের চাহিদা তা ঠিক করা। অনুবাদক হিসাবেও বহু মেয়ে কাজ করে।

বইয়ের ব্যবসাতে মেয়েদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে খুব সমালোচনা হচ্ছে। একজন নামজাদা সাহিত্য-সমালোচক বলেছেন, 'বর্তমান যুগে আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও আত্মিক ক্রিয়াকলাপ মহিলাদের মুকুরে প্রতিফলিত হবে।' এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত মতামত এখনই প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও মনে হয় নিশ্চিত পরিবর্তন এক্ষেত্রে আসবেই। কেননা মেয়েরা বর্তমানে অধিক সংখ্যায় আধুনিক ব্যবসায় ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব সবাই মিলে গল্প করার প্রস্তাব বাতিল হয়। কোনো এক সময় রাত্রি শান্তও হয়। ভোরের বাতাসে শ্রান্ত ঘুমন্ত মানুষগুলোর মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস শুধু গুঞ্জরণ করে ফেরে—।

কিন্তু এখনো রাত্রির পরে আবার সকাল আছে।

এখনো শুধু রাত্রিতে গড়া দিন আসেনি।

সুচিন্তা কি কাজে দরজার সামনে দিয়ে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান, ঘরে ঢুকে পড়েন। বলেন, 'কী হচ্ছে এ?'

সারা ঘরে জামা কাপড় তোয়ালে এটা-সেটা জিনিসপত্র ছড়িয়ে আর দুটো ডালা-খোলা শূন্য সুটকেস হাঁ করে রেখে সুশোভন ঘেমে-টেমে হিমসিম খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সুচিন্তা এসে বললেন, 'এটা কী হচ্ছে?'

সুশোভন বীরদর্পে বললেন, 'গোছাচ্ছি।'

'গোছাচ্ছ? তা' ভালই করছ, সুচিন্তা হেসে উঠে বলেন, 'বেশ, অনেকক্ষণ তো গোছালে, এবার ছাড়ো আমি গুছিয়ে দিই।'

সুশোভন কিন্তু সে দিক দিয়ে গেলেন না, হঠাৎ খাটের ওপর বসে পড়ে বললেন, 'তুমি হাসছ যে?'

'হাসব না কেন?'

'আমি চলে যাচ্ছি, তুমি হাসবে? তোমার মন কেমন করছে না?'

সুচিন্তা স্থির হয়ে যান। দুই চোখে ফুটে ওঠে একটা গভীর ছায়া, বলেন, 'তুমি তো বলেছ আমরা বড় হয়েছি, আমাদের মন কেমন করতে নেই, করা নিয়ম নয়।'

সুশোভন আবার চঞ্চল ভাবে উঠে পড়ে বলেন, 'তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি সুচিন্তা! আমি বলেছি, মন কেমন করার কথা বলা নিয়ম নয়। তা' বলে তুমি হাসবে?'

'হাসলে তোমার ভাল লাগে না?'

সুশোভন অস্থির ভাবে একবার খুব কাছাকাছি সরে আসেন, তারপর আবার সরে গিয়ে চাপা ব্যস্ত স্বরে বলেন, 'লাগে লাগে, খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমি চলে যাবার দিন নয়।'

সুচিন্তা ওই অস্থির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে বলেন, 'তবে তুমি চলে যাচ্ছ কেন?'

'চলে যাচ্ছি কেন? সাধে আর তোমার ছেলেমানুষ বলি সুচিন্তা? চলে যেতে হবে বলেই চলে যাচ্ছি। আমার কী কষ্ট হচ্ছে না? কিন্তু কি করা যাবে? সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। তবু কষ্টও আছে। থাকবে।'

সুচিন্তা হঠাৎ সেই মেজেয় ছড়ানো কাপড় চোপড়ের স্তূপের ওপর বসে পড়েন। কী একটা হাতে তুলে নিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে বলেন, 'আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিছু না।'

সুশোভন আবার পায়চারী করতে থাকেন, পায়ের কাছের জিনিসগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যান বলে পা ফেলাটা কেমন এলোমেলো লাগে। কিন্তু কথা বলেন শান্ত। বলেন, 'ওকথা বলে তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না সুচিন্তা! আমি কি তোমাকে জানি না? জানি না আমি চলে গেলে তুমি কাঁদবে!'

'না না না। আমি কিছু করবো না।'

'বাবা, আমাদের যে একবার ডাক্তার পালিতের কাছে যেতে হবে।'

বাইরের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নীতা।

তারপর?

তারপর কয়েকটা ঘন্টা কেটে গেল শুধু ছুটোছুটি হুড়োহুড়িতে। ডাক্তারের বাড়ী থেকে ফিরে ওরা আবার গেল দোকানে, গেল আবার কোথায়। সুশোভনের লণ্ডভণ্ড করেফেলা জিনিস-গুলো গুছিয়ে তুলতে, খাওয়া-দাওয়া সারতে, কোথা দিয়ে চলে গেল সময়। এসে পড়ল ওবাড়ীর ছোট বৌ আর তার ছেলেরা।

একসঙ্গে যাবে সবাই।

এবাড়ীর বড় ছেলে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দুষ্ট ছেলে দুটো হৈ চৈ করে আগেই গিয়ে গাড়ীতে উঠেছে। নীতা বাবাকে নিয়ে নামছে। যাবার মুহূর্তে অশোকা বলে ওঠে, 'দিদি, আপনিও চলুন না ষ্টেশনে।'

'আমি ষ্টেশনে?' সুচিন্তা যেন ভয়ঙ্কর একটা হাসির কথা শুনে

আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'কী কান্ড! আমি এখন স্টেশনে যাবো? দেখ চারদিকে কত কাজ থই থই করছে!'

'কাজ! কাজের কথা ভাবছেন আপনি এখন? বিশ্বাস ক'রবো তাই? আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না দিদি!'

সুচিন্তা খুব জোরে হেসে উঠে বলেন, 'এক ফোঁট্টা মেয়ের সাহস দেখ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলাম, এখন উনি এলেন আমার ফাঁকি ধরতে। চল দরজা অবধি যাই। গাড়ীতে সাবধানে যেও, দুরন্ত ছেলেরা!'

আর কতক্ষণ? কতক্ষণ আর পারবেন সুচিন্তা?

এত রকমের প্রশ্নপত্র আসবে, একথা কি আগে বুঝতে পেরেছিলেন?

তবু চালিয়ে যাচ্ছেন সুচিন্তা।...... চালিয়ে যাবেন কথার দাঁড় বেয়ে বেয়ে।

এই তো শেষ ঢেউ।

তারপর তো ছুটি।

সারা জীবনে আর কোন কথা না কইলেও হয়তো চলে যাবে সুচিন্তার।

তাই সুচিন্তা এখন অকারণ কথা বলছেন। বলছেন, 'সিঁড়ির সামনে জুতো রাখল কে? ছি ছি! তাড়াতাড়ির সময়!'

বলছেন, 'মালপত্র সব গুণে গাড়ীতে উঠিয়েছ তো? নামাবার সময় আবার গুণে নামিও।'

বলছেন, 'তুমি যাচ্ছ ছোট বৌ, খুব স্বস্তি পাচ্ছি। নীতা একা, দু'দিকে দুটো রোগী—'

আরও কত কীই যেন বলছেন সুচিন্তা। যে সুচিন্তাকে একসঙ্গে এতকথা কইতে কেউ কখনো দেখেনি।

হ্যাঁ, কথার দাঁড় বেয়েই পার হয়ে যাচ্ছিলেন সুচিন্তা ভয়ঙ্কর এই ঘূর্ণি ঢেউটা, হয়তো পার হয়েই যেতেন, কিন্তু হাতের দাঁড় হাতেই রয়ে গেল তাঁর, অকস্মাৎ নৌকোখানা একটা পাক খেয়ে উল্টে গেল!

গাড়ীতে উঠে বসার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন সুশোভন; বললেন, আমি যাবো না, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না!'

'বাবা বাবা, ট্রেণের সময় হয়ে গেছে—' নীতা ব্যাকুল হয়ে বাপের পিঠে হাত রাখে, 'দেরী করলে ট্রেণ ফেল করবো।'

কিন্তু সুশোভন এ ব্যাকুলতায় বিচলিত হলেন না, বললেন, 'করুক ফেল! আমার মন কেমন করছে।'

'সুশোভন!'

সুচিন্তা কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'কী হচ্ছে? দেখছ না নীতার কষ্ট হচ্ছে।'

সুশোভন সহসা বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন, 'আর আমার? আমার কষ্ট হচ্ছে না? দেখতে পাচ্ছো না— তোমার জন্যে আমার মন কেমন করছে!'

ঘড়ির কাঁটা কাঁটা ফোটাচ্ছে! নীতা কাতর মিনতিতে ভেঙে পড়ে, 'আমি আবার তোমায় নিয়ে আসবো বাবা, এখন চল, আজ চল।'

কিন্তু পাগল কবে মিনতিতে ভোলে?

পাগল সেই এক বুনো জেদের ভঙ্গীতে বলে, 'না। ইচ্ছে হচ্ছে না বলছি যে!'

ড্রাইভারটা একটা বিরক্তিব্যঞ্জক

'না না না। আমি কিছু করবো না।'

মন্তব্য করে ওঠে, অশোকা ব্যগ্রভাবে বলে, 'উঠে আসুন মেজদা।'

'আঃ! তুমি আবার কথা বলছ কেন? তুমি কে?'

নিরুপম কথায় জোর দিয়ে বলে, 'রাস্তার মাঝখানে কী হচ্ছে? উঠুন গাড়ীতে। নইলে বাধ্য হয়েই জোর করে—'

সুশোভন যেন ভয় পান, দিশেহারা আর্তনাদে বলে ওঠেন, 'সুচিন্তা, এরা আমায় জোর করে নিয়ে যাবে। তুমি

পাড়ার লোকের আর পথের লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি কৌতুকে সজাগ হয়ে উঠেছে, নিরুপম একবার সেদিকে তাকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। চাপা তীব্র কণ্ঠে বলে, 'কী ছেলেমানুষী করছেন, নিজেই তো যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন।'

'হয়েছিলাম! এখন হচ্ছি না! বাস! চলো সুচিন্তা, চলো চলো, আমরা পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি।'

গাড়ীর দিকে পিঠ ফেরালেন সুশোভন।

আটকে রাখো! তুমি যে বলেছিলে আটকে রাখবে, যেতে দেবে না!'

না, এ যুগে পৃথিবীর দ্বিধা হবার দায় নেই।

সমস্ত দুঃসহ লজ্জার ভার মানুষকেই বহন করতে হয় তার রক্তমাংসে গড়া সাড়ে তিনহাত মাপের দেহটুকুর মধ্যে।

সেই দুঃসহকে সংহত করে এগিয়ে এলেন সুচিন্তা, কঠিন স্বরে বললেন, 'সুশোভন! গাড়ীতে ওঠো।'

'না উঠবো না—' সুশোভনের স্বর আর কাতর নয়, রুষ্ট, 'আমি যাবো না। আমি তোমার অবাধ্য হবো।'

নীতা হতাশ দৃষ্টি মেলে বলে 'তবে থাকুন।'

অশোকা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'তাই ভাল বোধ হয়।'

নিরুপম বলে, 'ঠিক আছে। যান আপনি বাড়ীর মধ্যে যান।'...আর অনেক-দিন পরে মায়ের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, 'কি করা যাবে, নিয়ে যাও। রাস্তার সামনে এভাবে—! যা ভাবা গিয়েছিল, তা' কিছুই হয়নি দেখা যাচ্ছে। যেমন ছিলেন থাকুন তেমনি।'

'তা' হয় না!' সুচিন্তা স্থির অকম্পিত গলায় বলেন, 'তা' হয় না।'

এ গলা কবে যেন একদিন শুনেছিল না নিরুপম? এই গলা এই কথা। কিন্তু এখন সেকথা ভাবার সময় নেই। নিরুপম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে বলে, 'নিয়ে যাওয়া যাবে কি করে?'

'যে করে হোক! ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ীতে চাপলেই ভুলে যাবে।'

'আর যদি বিপদে ফেলেন?'

'বিপদে!'

সুচিন্তা ছেলের দিকে—স্পষ্ট চোখে সোজাসুজি তাকাল, অনেক অনেকদিনের পর। হয়তো বা জীবনে এই প্রথম। তাকিয়ে কি হাসেন? বোঝা যায় না, শুধু কথাটাই বোঝা যায়, 'বিপদে পড়ার ভয় পাচ্ছ? তা দরকার হলে সেটুকু বিপদকে মেনে নিতেই হয়।'

আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলেন সুচিন্তা, সরে এলেন অনুপম কুটিরের দেয়ালের আড়ালে। বাইরের যে দরজাটা হয়তো জীবনেও কোনদিন নিজে হাতে বন্ধ করেননি, সেটা চেপে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর কি ঝড় উঠল?

মেঘ ডাকল?

বাজ পড়ল?

না বাজ নয়, ঝড় নয়, ভয়ানক রেগে ওঠা একটা ক্ষ্যাপা মানুষের গর্জনের স্বর।

আর সেই গর্জনকে তুলে নিয়ে গেল আরও রেগে ওঠা দুরন্ত একটা গাড়ী, তার চাকার শব্দে আরও প্রবল গর্জন তুলে!

কিন্তু তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারল কই সে? ভয়ঙ্কর ছুট দিয়েও তো পারল না। শুধু ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়ে গেল। মিশিয়ে দিয়ে গেল বাতাসের স্তরে স্তরে, উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে গেল আকাশের কিনারায় কিনারায়। তাই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বাজতে থাকল সে স্বর।

হয়তো চিরদিন বাজবে!

'সুচিন্তা আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।...সুচিন্তা, আমায় ধরে রাখো! সুচিন্তা আমি তোমায় দেখতে না পেলে মরে যাবো।'

দেখতে না পেলে মরে যাওয়া যায়?

ক্ষ্যাপার কথা ক্ষ্যাপাই জানে, সুস্থ মানুষেরা জানে তা' যায় না! তাই সুচিন্তা মরে যাবেন না। মরে গেলেন না। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময় বড্ডবেশী আস্তে হাঁটলেন। উঠে এসে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন একেবারে শূণ্য হয়ে যাওয়া বাড়ীটায়।

কেউ কোথাও নেই।

খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা।

নিথর হয়ে পড়ে আছে।

সুচিন্তা হাঁটা থামিয়ে বসলেন।

ওই নিথরতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিথর হয়ে বসে রইলেন ও'র সেই একদা অতিথিকে উৎসর্গ করে দেওয়া বড় ঘরখানায়।

ঘরটা কত বড়!

অনেকদিন ধরে ছোট্ট ঘরটায় থেকে-ছেন বলেই কি এই মাপজানা ঘরটাকেও এতবেশী বড় লাগছে সুচিন্তার? না কি ক্রমশঃই বড় হয়ে যাচ্ছে ঘরটা? তাই যাচ্ছে যেন, দেয়ালগুলো পিছিয়ে পিছিয়ে অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে প্রকান্ড একটা শূন্যতাকে জায়গা করে দিয়ে। যে শূন্যতা সুচিন্তাকে গ্রাস করে নেবে।

কিন্তু তাই কি?

নিজেই সুচিন্তা অবাক হয়ে দেখছেন, গ্রাস করতে তো আসছে না, শুধু দেয়ালের বাইরের জগৎটাকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর সুচিন্তার এই শূন্য জগৎটা? সেটা ভরে উঠছে, ভয়ানক যন্ত্রণাময় একটা সুখে। সুচিন্তা জানেন না, সুচিন্তা বুঝতে পারছেন না, সুচিন্তা অবাক হয়ে ভাবছেন, কী এই সুখ? যা দিয়ে অতখানি শূন্যতা ভরে ওঠে?

সে কি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ওই শব্দটা? যে শব্দ এখনও থামছে না! কোনদিনই থামবে না।

॥ সমাপ্ত ॥

চারু ও কারুশিল্পের দুইটি প্রদর্শনী

গত ২৯শে মার্চ থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে উদ্বোধিত শিল্পী লক্ষ্মণ পাইয়ের চিত্রকলার প্রদর্শনীটি আমরা দেখে এসেছি। আর সেইসঙ্গে দেখে এসেছি ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে গত ১লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উদ্বোধিত ভারতীয় হস্তশিল্পের পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন সংস্থার স্থায়ী প্রদর্শনীটি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই দুটি প্রদর্শনীই কলকাতার শিল্পরসিক ব্যক্তি-দের কাছে ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। আমরা প্রদর্শিত নিদর্শনগুলি দেখে আনন্দিত হয়েছি। উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

।। শিল্পী লক্ষ্মণ পাইয়ের প্রদর্শনী ।।

সাম্প্রতিক কালে যে কয়জন ভারতীয় চিত্রকলায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে দেশ-বিদেশে খ্যাত হয়েছেন, শিল্পী লক্ষ্মণ পাই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ সালে লক্ষ্মণ পাই গোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তিনি শিক্ষালাভ করেছেন বোম্বের জে, জে, স্কুল অফ আর্টসে। ১৯৫১ সালে প্যারিস এবং ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় থেকেই শিল্পী শ্রীপাই প্যারিস লণ্ডন, বোম্বাই, দিল্লী, নিউইয়র্ক, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি স্থানে অনেক-গুলি একক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলারসিকদের সপ্রশংস অভিনন্দনে ধন্য হয়েছেন। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। সেই দিক থেকে, ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পীর তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ছিল ২৭ খানি। এ-ছাড়া জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র এবং এচিং ও সিল্কের উপর অঙ্কিত কিছু চিত্রকলার নিদর্শন। সব কয়টির মাধ্যমেই শিল্পী শ্রীপাই তাঁর স্বকীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর তৈল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে ইউরোপীয় চিত্রকলার রীতি-নীতি আত্মস্থ করার প্রবণতা থাকলেও ভার-তীয় চিত্রকলার ছন্দিত রেখার সুষমায় তিনি সেই চিত্রগুলিকে এমন এক প্যাটার্ণে বাঁধতে পেরেছেন যে, সেগুলিকে আমাদের ভারতীয় মন অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারে। মূলতঃ নানা রঙের বর্ণাঢ্য জমিনের উপর এমন সূক্ষ্ম ছন্দিত রেখার সৌন্দর্য ইদানীংকালে

প্রদর্শনী
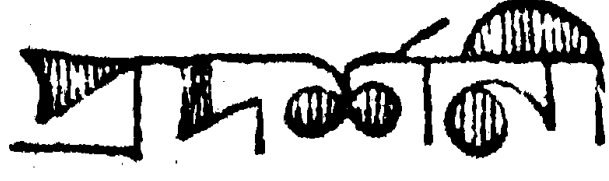
কলারসিক

আমরা অন্য কোনো শিল্পীর কাছ থেকেই পাইনি। এক কথায়, তাঁর চিত্র-সংস্থাপন, বর্ণাঢ্য জমিন এবং গতিময় ছন্দিত রেখায় বিধৃত চিত্র-বক্তব্য আমাদের মুগ্ধ করেছে।

উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'বালিকা' (৫), 'ন্যুড (৭), 'গাছ' (১০), ঘাস (১৩), প্যারিস (২৩), 'মিক' (২৪), প্রভৃতি চিত্রগুলিকে উপস্থিত করা যায়। এগুলিতে শিল্পী জমিনের উপর এমন সূক্ষ্ম রেখায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে, প্রতিটি দর্শক তা দেখে অভিভূত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। এ-যেন দক্ষ শিল্পীর সহজ সুন্দর সাবলীল ভঙ্গী ও বিন্যাসকলার এক প্রাণবন্ত-রূপ।

আবার এরি পাশাপাশি তিনি মোটা রেখার টানেও দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর 'ঘনিষ্ঠতা' (১৬) চিত্রে। এই একই শিল্পীর হাত দিয়ে যখন বুদ্ধজীবনের ঘটনা অবলম্বনে সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ রেখার চমৎকার এচিংগুলি সৃষ্টি হয় তখন স্পষ্ট অনুভব করা যায় শিল্পী পাই ইউরোপীয় চিত্রকলার রূপ-রসে মুগ্ধ হলেও, তাঁর মনের জমিনে ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব কতখানি। শুনেছি, ইতঃপূর্বে শ্রীপাইয়ের 'গীতগোবিন্দ', 'রামায়ণ' এবং গান্ধীজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রগুলি দেশ-বিদেশের কলারসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দনলাভে ধন্য হয়েছে। আমরা সেগুলি দেখিনি। কিন্তু, বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর এচিংগুলি দেখে এ-কথা সহজেই বলতে পারি—শিল্পী পাই ছন্দিত রেখা দিয়ে সত্যিই কথা বলাতে পারেন। এই একই কথা বলা যায় তাঁর সিল্কের উপর রচিত পটচিত্রগুলি দেখে। এখানে তিনি যেন রঙের যাদুকর। রঙের এমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য সমাবেশ খুব কম শিল্পীর কাছেই প্রত্যাশা করা যায়।

শিল্পী লক্ষ্মণ পাই আমাদের অনেক প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। অশোকা গ্যালারী তাঁর মত একজন বলিষ্ঠ শিল্পীকে আমাদের কাছে তুলে ধরে ধন্যবাদভাজন হলেন। আমরা শিল্পী ও উদ্যোক্তা উভয়ের উদ্দেশ্যেই আমাদের অভিনন্দন জানাই।

।। হস্তশিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী ।।

ভারতীয় হস্তশিল্প যুগ-যুগান্ত ধরে তার অনুপম কারুসৌন্দর্যে বিশ্ব-বাসীকে মুগ্ধ করেছে। স্বাধীন ভারতে সেই লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপক আয়োজন করেছেন নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা। সারা দেশব্যাপী এই সংস্থার কর্মকেন্দ্র এখন বিস্তৃত। সেখানে শিল্পীরা কাজ করছেন, উদ্ভাবন করছেন নতুন নক্সা, হস্তশিল্পের নতুন নিদর্শন। এ-ছাড়া অসংখ্য শহর-নগর-গ্রামে হস্ত-শিল্পীরা কর্মনিরত। এঁদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কারুশিল্পের যেসব সৌন্দর্যময় নিদর্শনগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তার জন্য বাজার চাই। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কারুশিল্পের সম্পদ পৌঁছে দেবার মত সংস্থা চাই। বিশেষ করে বিদেশের বাজারে ভারতীয় কারুশিল্প যাতে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য সম্প্রতি গড়ে উঠেছে ভারতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থা।

এই সংস্থার আঞ্চলিক কর্মকেন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা, ত্রিপুরা আর মণিপুরের জন্য এতদিন পর্যন্ত কোনো সংস্থা ছিল না। গত ১লা এপ্রিল এইসব রাজ্যের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় সেই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশ-বিদেশের মানুষ এলে এখন এখানেই তাঁরা দেখতে পারবেন পূর্বাঞ্চলীয় তথা সর্বভারতীয় কারু-শিল্পের নিদর্শন।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ কারু-শিল্পের পূর্বাঞ্চলীয় এই সংস্থার স্থায়ী প্রদর্শনী-কক্ষটি দেখে আমরা খুশি হয়েছি। অতি চমৎকারভাবে সমস্ত কক্ষটি সজ্জিত। প্রতিটি গ্যালারীতে আছে বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত অপূর্ব সব হস্তশিল্পের নিদর্শন। এর মধ্যে বাংলার পুতুল আর খেলনা, বালুচর শাড়ি, শিং-এ প্রস্তুত দ্রব্য, হাতীর দাঁতে প্রস্তুত শিল্পকর্ম, বাঁশের কাজ, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ, ঢোকরা কামারের ধাতুশিল্প, উড়িষ্যার মুখোস, আসামের টোকা, হায়দ্রাবাদের লাক্ষায় প্রস্তুত কারু-দ্রব্য, মুরাদাবাদের ধাতু দ্রব্য, কাশ্মীরের সাজ-সজ্জার অলংকার প্রভৃতি নিদর্শন-গুলি দেখে যে কোনো দর্শক শুধু মুগ্ধ হবেন না, সেগুলি নিজের প্রয়ো-জনে কিংবা গৃহসজ্জার জন্য ক্রয় করতেও ইচ্ছুক হবেন। এমনি ক্রেতা সাধারণ এবং বিদেশী ক্রেতাদের জন্য এই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, এ অত্যন্ত সময়োপ-যোগী হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী রঞ্জনা রায় এই নব-উদ্বোধিত কর্মকেন্দ্রের বর্তমান ভার-প্রাপ্তা কর্মকর্ত্রী। আশা করি তাঁর অনলস শ্রম আর সাধনায় এই কেন্দ্র সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। আমরা এই নবজাত কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

ভালবাসা

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট দীর্ঘ ঐ যে মানুষটি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বারে বারে হোঁচট খাচ্ছে এর ওর তার সাদর আহ্বানে—ওর নাম কাজল আচার্য। খেলার জগতে মানুষটি সুপরিচিত। সকলেই তাকে চেনে। শুধু চেনেই না, সদালাপী নিরহঙ্কার আর পরোপকারী এই লোকটিকে অনেকেই ভালবাসে। আর এই ভালবাসার প্রকাশ যত্র তত্র এমন ভাবে তারা প্রকাশ করে থাকে যে, কাজলের মাঝে মাঝে লজ্জা পায়। তবে বাধা দেয় না। শুনতে ভালই লাগে।

যারা ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে তারা ক্ষেত্র বিশেষে কাজলকে এড়িয়ে চলে। নইলে সময় রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। কাজলকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। ওর জনপ্রিয়তাই এর অন্যতম কারণ। কাউকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে উপেক্ষা করতে সে পারে না। তা সে যে কোন স্তরের লোকই হোক না কেন। এর জন্য ঘরে-বাইরে তাকে কথা শুনতে হয় বটে, কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

খেলার কথা যদি কেউ তুলতে পারে তা'হলে ত' কথাই নেই। স্থান, কাল আর পাত্রের হিসেব থাকে না। একেবারে বিভোর হ'য়ে আলোচনায় ডুব দেয়! চোখ বুজে মুখে মুখে আলোচ্য খেলার অতীত এবং বর্তমানের এক ধারাবাহিক ইতিহাসই হয়তো শুনিয়ে দেবে।

বহু গুণের অধিকারী কাজল আচার্য একটি বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল। নিজের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিরূপ সমালোচনা সে শুনতে পারে না। অসহ্য লাগে। অথচ কে কোথায় তার বিষয়ে আলোচনা করছে সেদিকে তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কান সজাগ। এক এক সময় প্রশ্ন করতেও দ্বিধা করে না।

যারা কাজলকে অষ্টপ্রহর ঘিরে আছে সত্যি আর মিথ্যায় মিলিয়ে তারা সব মনের মত করেই সব সময় জবাব দেয়। কাজল বাধা দিয়ে ওদের আরও উৎসাহিত করে তোলে। হৃষ্টচিত্তে লজ্জিত মুখে কান পেতে শোনে। এর একটানা স্তব-স্তুতি শুনতে শুনতে এর বিপরীত কিছু কানে এলেই ইদানিং সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

কাজল প্রশংসা পাবার যোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তাই ব'লে ওর এই কাঙ্গালপনা ওকে যে মোটেই মানায় না এ কথা একদিন কাজলের বাল্য-বন্ধু স্পষ্ট ক'রেই তাকে মুখের উপর শুনিয়ে দিল।

অনুপ বলল, প্রশংসা আর ভালবাসা সকলেই চায়। কিন্তু তার জন্যে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করা মোটেই শোভন নয় কাজল। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

এই সহজ কথাটা কাজল সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, তোমার এ কথার মানে কি অনুপ?

অনুপ একটু হেসে জবাব দেয়, না বোঝার মত করে ত' বলিনি ভাই।

কাজল রাগ ক'রে বলল, তোমার এই মনগড়া অভিযোগগুলি না করলেই ভাল করতে অনুপ।

অনুপ একটু হেসে বলল, তুমি যদি আমার কথাগুলিকে অভিযোগ মনে করো তা'হলে আমি নাচার কাজল। আমার সব কথা তুলে নিচ্ছি।

প্রসঙ্গটা অনুপ সাবধানে এড়িয়ে যেতে চাইলেও কাজল থামতে পারে না। বলে, তুলে নিলাম বললেই ত' কথাটা মুছে যেতে পারে না। এমনি একটা ধারণা আমার সম্বন্ধে তোমার হ'লো কেন তা আমাকে জানতেই হবে।

সহসা অনুপ গম্ভীর হ'য়ে উঠল।

বলল, তোমার কোন প্রশ্নেরই আর জবাব আমার কাছ থেকে পাবে না।

কাজল বলল, জবাব দেবার নেই ব'লেই দিতে পারছ না। তুমিও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছো। সময়ই মানুষকে মানুষ চিনবার সুযোগ দেয়। তুমিও দিয়েছো। তার জন্য ধন্যবাদ! তবে তোমাকে এত ছোট করে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

এবারে অনুপের বিস্মিত হবার পালা। বলল, অর্থাৎ......

কাজল গম্ভীরভাবে ব'লল, আমার জনপ্রিয়তা তোমাকে বিচলিত ক'রেছে তাই.........

অনুপ এতক্ষণে উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। বলল, এর পরে তোমাকে বলবার আমার কিছু থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমায় বলে যাই...........

বলতে গিয়েও অনুপ শেষ পর্যন্ত কথাটা অসমাপ্ত রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। চলে না গিয়ে তার উপায় ছিল না। যারা ইদানিং কাজলকে ঘিরে তার কাছে গুণ-গুণ করে স্তব-স্তুতি ক'রছে তাদের দলে অনুপ কোনদিন যোগ দিতে পারেনি—বরং তার দোষ-ত্রুটি যখনই চোখে পড়েছে, বিনা দ্বিধায় সেইদিকে কাজলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাকে ছোট করবার জন্য নয়—তুলে ধরবার জন্য। কাজলও তা জানে। সুতরাং সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন মধ্যপথ তার ছিল না।

কাজল অনুপের বাল্যবন্ধু। যে প্রতি-কূল অবস্থার ভিতর দিয়ে একটু একটু ক'রে পরম নিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নানা দুঃখ-কষ্ট আর বাধা-বিঘ্ন হাসি-মুখে অতিক্রম ক'রে নিছক নিজের চেষ্টায় কাজল ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে দেশের মধ্যে নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে তার জন্য অবশ্যই সে প্রশংসা পাবার যোগ্য। এ ছাড়া আরও অনেক উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। পাড়ায় কোথায় কোন বাড়ীতে কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—ডাক কাজলকে। কাকে হাস-পাতালে অবিলম্বে একটা ফ্রি-বেড ক'রে দিতে হবে সেখানেও কাজল। এ সব কথা একবারও অনুপ অস্বীকার করে না। বরং এই আদর্শ চরিত্রের লোকটিকে উদা-হরণ হিসেবে নিজেই সে বহু লোকের কাছে গল্প করেছে। সম্ভবতঃ সেইজনাই কাজল-চরিত্রের একটা দিকের এতবড় দুর্বলতা অনুপকে ব্যথিত ক'রে তুলে-ছিল। কণ্ঠে দেখা দিয়েছিল প্রতিবাদের সুর। কিন্তু কাজল বুঝল না। ভুল করল। তার প্রতিবাদকে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা মনে করে মর্মান্তিক বিদ্রুপ ক'রে বসল।

অনুপ দূরে সরে গেল। সে যে এভাবে চলে যাবে এ কথা কাজল ভাবতেও পারেনি। তবে তাকে ফিরেও ডাকেনি। সহস্র রকম কাজের মধ্যে তাকে বিব্রত থাকতে হয়। উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আনন্দের মধ্যে তার দিন চলে যাচ্ছে। অনুপের না আসার ফাঁকটা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে একেবারে বুজে গেল। অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হ'ল। কিন্তু এই বিরামহীন উদ্দীপনা আর চলার গতি সব সময় একই খাতে বয়ে যায় না। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। মনের তীব্র গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে। মনকে ফিরে দাঁড়িয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। তুলনামূলক চিন্তাটা কাজলের মধ্যেই আজ নতুন রূপে নিয়ে দেখা দিয়েছে।

অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে কাজল। পর পর বার দুই ইনফ্লুয়েঞ্জা হবার পর হঠাৎ ঠান্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে গিয়েছে জ্বর ছাড়তে চায় না। সপ্তাহখানে চিকিৎসার পর ডাক্তার সন্দেহ করলে প্লুরিসি ব'লে। এক্সরে প্লেট ডাক্তারে অনুমানকে সত্য বলে ঘোষণা করল চিকিৎসার ধারা পাল্টে গেল। নড়া-চড় এমন কি পাশ ফেরাও নিষেধ। শয্যাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। খাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য যাবতীয় কাজই তাকে এ ছোট গন্ডির মধ্যে বসে করতে হয় বিকেল হলেই কাজল ছট-ফট করে। মা তাকে আকর্ষণ করে। ডাক্তারের বিধি নিষেধের গন্ডি ডিঙিয়ে বাইরে বা হ'তে ইচ্ছে হয়। বহু বছরের এই অভ্যাস তাকে চঞ্চল করে তোলে। তার পরেই দেখা দেয় একটা অপরিসীম ক্লান্তি। অবসাদে দু'চোখ বুজে আসে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের চোখে মুখে একটা শঙ্কিত ভাব। যদিও প্রকাশ্যে কিছু না বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কাজল ম্লান মুখে হাসে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে। সে ছেলে মানুষ নয়। ডাক্তারের বিধি-নিষে রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে তুলেছে। কথা বলতে ভাল লাগে না কথা শুনতেও বিরক্তি বোধ করে ডাক্তারের নির্দেশও তাই। তবুও তাকে চুপ ক'রে থাকতে হয়। বাধ্য হ'য়েই চুপ করে থাকে। যারা তাকে ভালবাসে বলে দাবি করে, তা একান্ত অনুগত ভক্ত, তারাই আজ ওর জীবনসংশয় করে তুলেছে। অসুস্থ হ'য়ে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তে যতটুকু সময় লেগেছে—তারপরেই দলে দলে দর্শন-প্রার্থী আর মঙ্গল-প্রার্থীর আগমন শুরু হ'য়েছে। এদের বিমুখ করা সহজ নয়—সম্ভব নয়। হয়তো বা শোভনও নয়। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হ'য়েছে যে যারা দেখতে আর দেখা দিতে আসে তারা আসল উদ্দেশ্যই ভুলে যায়। যার ফলে রুগীর ঘর শেষ পর্যন্ত খেলার মাঠে রূপান্তরিত হয়।

সকলের মুখেই এক কথা। একই আশ্বাস-বাণী। কিছুই হয়নি তার। দুটো দিন চুপ ক'রে শুয়ে থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ মুখে যারা এ কথা বলে কাজে তারা ঠিক বিপরীত পথ ধরেই চলেছে। কাজল শুধু বিস্মিত হয় না, মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

প্রাদেশিক ক্রিকেট দল গঠন নিয়ে পরিচালক এলেন কাজলের উপদেশ
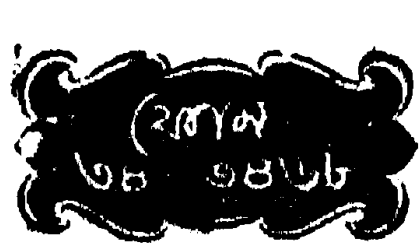
নিতে। সঙ্গে তার আরও জনকয়েক খেলোয়াড় এসেছে। আলোচনার নামে খানিক হল্লা ক'রে গেল। শুধুই কি এই—

বিমল বলছিল, একটু তাড়াতাড়ি সেরে উঠন, কাজলদা। খেলার মাঠ একেবারে অন্ধকার। গণেশ বাবুর সঙ্গে ছেলেদের মোটেই বনিবনা হ'চ্ছে না। ও'র কেতাবী ধরনের শিক্ষা হজম করা শক্ত। তার উপর বড্ড মুখ খারাপ করেন কথায় কথায়।

বিমলের কথার জের টেনে অমল বলে, সহজকে শক্ত করে দেখানই গণেশ-বাবুর বৈশিষ্ট্য।

বিমল বলল, ঠিক সেই জন্যই ও'র হাত দিয়ে আজও একটিও উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় বার হ'লো না। বুঝলেন কাজলদা, আপনার এই সামান্য কটা দিনের অনুপস্থিতিতে কথাটা আরও বেশী করে মনে পড়ছে।

ওদের আলোচনার ভিতর দিয়ে ওরা যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজলকে স্তুতি ক'রে চলেছে তা অতি সহজেই তার কাছে ধরা পড়ল। খুশী হওয়ার পরিবর্তে আজ কিন্তু তার মুখের উপর খানিকটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

নিজেদের আলোচনায় ওরা এমনই মগ্ন যে, কোনকিছুই তাদের চোখে ধরা পড়ল না। অমল পুনরায় বলল, মিথ্যেই আমরা আলোচনা ক'রছি। বর্তমান যুগে যত গোলযোগ, যত অনাচার আর অবিচার তার মূলে রয়েছে দল। সুতরাং মিথ্যে দুঃখ করে কি হবে।

রাজেন চুপ ক'রে শুনছিল। এতক্ষণে সেও মুখ খুলল, আজকের দিনে রাজনীতি কোথায় নেই ভাই? চায়ের দোকানে, হোটেলে, হাটে মাঠে ঘাটে, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, বাপের সঙ্গে ছেলের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এমনকি নাবালক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এ রোগের সংক্রামক জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

কাজল এতক্ষণ ধরে চোখ মেলে ওদের আলোচনা শুনছিল। হঠাৎ সে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুলো।

তবুও ওদের হুঁশ নেই। বিমল চোখ টিপে বলল, কাজলদার গতমাসের রেডিও-টকটা নিশ্চয় খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলি রাজেন?

রাজেন একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, শুনেছি বৈকি—

বিমল বলল, কাজলদাও এই কথাগুলিই সেদিন দুঃখ করে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি খেলোয়াড়দেরও বাদ দেননি। তাদের অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির কথাটাও বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ ক'রেছিলেন। তাদের দুর্বল মনোবৃত্তির জন্য কোথায় যে তারা দিনের পর দিন নেমে যাচ্ছে সে কথাও সাহসের সঙ্গে বলেছেন। অথচ এই একটা যায়গায় ইতিপূর্বে এই পাপ প্রবেশ করবার সুযোগ পেত না।

রাজেন বলল, কিন্তু যারা কানে তুলো গুঁজে ব'সে আছে তাদের কাছে চীৎকার ক'রে লাভ কি?

কাজল একখানা হাত তার কানের উপর চাপা দিল। ওরা নিজেদের কথায় এমনই মত্ত যে, সেদিকে কারুর চোখ পড়ল না।

বিমল বলল, লাভ একেবারে নেই এ কথা ঠিক নয় রাজেন। এই ধরনের চীৎকার ক'রবারও প্রয়োজন আছে। নইলে কাজলদার মত লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না রাজেন।

দেওয়াল ঘড়িতে এইমাত্র চারটা বাজল। একটায় ওরা এসেছে। এই তিন ঘন্টার মধ্যে যত ওরা আলোচনা ক'রেছে তার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও কাজল যোগ দেয়নি। যোগ দেবার মত মনের অবস্থাও তার নয়—দেহের অবস্থাও নয়। ডাক্তারের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতে চায়। এখনি দাদা দেখা দেবেন। ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে। এ কাজটি তিনি নিজের হাতে করেন। আর কারুর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। দাদার কথা ভাবতে গিয়ে আজ বহুদিন পরে কাজলের অনুপের কথা মনে পড়ল। মনে মনে হিসেব করে দেখল কতদিন সে এমুখো হয়নি। অথচ এমন একদিন ছিল যে, দিনান্তে দুবার তাদের দেখা না হ'লে—দিনটা অসম্পূর্ণ মনে হ'ত।

কাজলের দাদা দেখা দিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে বিরক্তি—মুখে লেগে আছে, অনুযোগের আভাস। কিন্তু ওষুধ খাইয়ে যেমন নিঃশব্দে তিনি এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেলেন।

দাদা চলে যেতেই এই সর্বপ্রথম কাজল মুখ খুলল, তোমাদের মাঠে যাবার সময় হ'য়ে গেল যে বিমল। যাবে না?

এই ছোট্ট প্রশ্নটির দ্বারা কাজল যে কথা ওদের ব'লতে চেয়েছিল তার ধার দিয়েও ওরা গেল না বরং মাঠে না গিয়ে বিকেলটা ওরা এখানেই কাটাবে সমবেত-

কণ্ঠে এই কথাটাই সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাঠ ত চিরদিনই আছে একদিনের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু অঘটন ঘটবে না।

কাজলের অন্তরাত্মা ভিতরে ভিতরে ককিয়ে উঠল—হায় ভগবান!...আর পাশের ঘরে বসে তার দাদা রুদ্ধ রোষে নিজের হাত কামড়াচ্ছিলেন। আর ভাবছিলেন এই সব ভদ্রসন্তানদের আর কি ক'রলে ভদ্রভাবে বিদায় করা যায়। নিচে গিয়ে একবার চাকরবাকরদের উপর হুমকি দিয়ে এলেন, যত সব অকর্মার দল—এদের বাড়ীতে ঢুকতে দিস কেন?

ওরা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই বলে, কাল থেকে সদর দরজাই খুলবো না। আপনি দেখে নেবেন বড়বাবু।

দাদা এটাও চান না। বল্লেন, ভদ্দরলোকের ছেলেরা এলে দরজা খুলবিনে কিরে। যতসব!

তাহ'লে বড়বাবু—ওরা একযোগে প্রশ্ন করে।

উত্তর খুঁজে পান না দাদা। তিনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হন। চলে যেতে গিয়েও তাঁকে থামতে হয় অনুপকে দেখে। বলেন, ঠিক হ'য়েছে, তুমিই পারবে অনুপ। তোমাকেই আমি মনে মনে চাইছিলাম।

অনুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

দাদা বলেন, ছেলেটাকে ওরা শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। আমার হ'য়েছে যত জ্বালা। না পারি সমর্থন ক'রতে, না বলতে পারি সোজাসুজি চলে যেতে।

অনুপ এতক্ষণে কথা বলে, আপনি কিসের কথা বলছেন দাদা! কাজল ভাল আছে তো?

দাদা হতাশ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তবে আর বলছি কি তোমায়। ভাল থাকতে কাজলকে তার ছাত্র আর বন্ধুরা দেবে না। অসহ্য। বুঝলে অনুপ, রুগীর ঘরকে ওরা মাঠ বানিয়ে ছেড়েছে।

অনুপ বলে, প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন বড়দা। তারা যখন বোঝে না তখন সোজাসুজি বুঝিয়ে দিন।

দাদা বলেন, আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও পারতে না ভাই। ওরা ত তোমারও পরিচিত তুমি একবার বুঝিয়ে বলে দেখনা।

অনুপ আপত্তি জানালে, বলতে হ'লো আপনাকেই ব'লতে হবে। এখানে অধিকারের প্রশ্ন আছে। আমার কথা যদি না শোনে। মিথ্যা অপমান হ'তে আমি চাই না।

দাদা বলেন, আমি ভেবেছিলাম কথাটা কাজলই ওদের ব'লবে। কিন্তু ও যখন চুপ ক'রে আছে তখন—

বাধা দিয়ে অনুপ বলে, ঠিক সেই কারণেই আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

দাদা বললেন, কথাটা আমিও স্বীকার করছি ভাই, কিন্তু কাজল হয়তো এটা পছন্দ না ক'রতে পারে।

অনুপ বলল, কাজলের মনে করার প্রশ্ন এখানে না তুলে তার অসুখের কথাটাই প্রথমে আমাদের ভাবা উচিত ছিল। তাছাড়া কাজল যদি পাগল হয় তাই ব'লে আর সকলে সেই সঙ্গে পাগল হ'তে পারে না। ব্যবস্থা একটা ক'রতে হবে বৈকি।

আগ্রহভরে দাদা বলেন, নিশ্চয় ক'রতে হবে ভাই। তবে আমি লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারতে চেয়েছিলাম।

অনুপ বিচিত্র ধরনের একটু হেসে বলল, কিন্তু একসঙ্গে সকলকে খুশী করা সম্ভব নয় বড়দা।

অনুপ মুহূর্তের জন্য থামল—একটু চিন্তা ক'রল, তারপর দ্রুত বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল। কিছু অনুমান না ক'রতে পেরে বিহ্বল দৃষ্টিতে দাদা চেয়ে রইলেন।

আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এল অনুপ। সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ দত্ত। তিনি খেলোয়াড় কাজলের একজন অকৃত্রিম ভক্ত। এবং বর্তমানে তাঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। অনুপ তাঁকে এখানকার পরিস্থিতি সবিস্তারে জানাতেই তিনি আর কালবিলম্ব না ক'রে ছুটে এসেছেন।

খেলার মাঠের রাজনীতির সমালোচনা তখনও পুরোদমে চলেছিল। ডাঃ দত্ত ঘরে প্রবেশ ক'রতেই মন্ত্রবলে ওরা থেমে গেল।

ডাঃ দত্ত চিকিৎসকের গাম্ভীর্য নিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, এ'রা সব?

অনুপ জবাব দিল, আপনার রুগীর ছাত্র আর বন্ধু এ'রা।

ডাঃ দত্তের কণ্ঠে বিস্ময় এবং বিরক্তি প্রকাশ পেল, তিনি কাজলের দাদার পানে মুখ ফিরিয়ে অনুযোগ দিয়ে বললেন, বাদলবাবু কি এ'দের জানিয়ে দেননি যে কাজলবাবুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটান মানেই তার কতবড় ক্ষতি করা? আমি বার বার করেই একথা আপনাকে জানিয়ে গেছি যে খুব বড় প্রয়োজনেও যেন কেউ তাঁর ঘরে এসে বিরক্ত না করে। কিন্তু দেখছি চিকিৎসকের নির্দেশ খুব ভাল ক'রেই আপনি পালন ক'রেছেন।

কাজলের দাদা অসহায়ভাবে একে একে সকলের মুখের পানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে অনুপকে ব'লতে থাকেন, দেখ দেখি অনুপ, কি বিপদে পড়লাম। মানে...বুঝতেই ত' পারছো তুমি...মানে এরা সব শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সব কথা কি এদের বলা চলে? আমার হ'য়েছে যত বিপদ—

ডাঃ দত্ত ততক্ষণে গিয়ে কাজলের শয্যার পাশে সাবধানে বসেছেন। তার বন্ধুর দল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তারা চলে গেল।

ডঃ দত্ত এতক্ষণে স্বাভাবিক হেসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালে যারা দেখে না তাদের পরিষ্কার ক'রেই ব'লতে হয় কাজলবাবু।

কৃতার্থের হাসি হাসলেন কাজলের দাদা। কাজলও মিটি-মিটি হাসছিল। ডাঃ দত্তের ব্যবস্থায় সেও যে কত খুশী হ'য়েছ তা ওর মুখ দেখেই অনুমান করা যায়।

অনুপ এতক্ষণে চুপ ক'রে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাঃ দত্ত প্রস্থান উদ্যত হ'তেই সেও তার পিছু নিল।

কাজল কাতরভাবে তাকে পিছু ডাকল। অনুপ ফিরে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ রেখে একটু হাসল—কথা বলল না। কাজলের মুখেও ঠিক একই ধরনের হাসি ফুটে উঠল। দ্বিতীয় বার আর পিছু ডাকল না।

॥ সিরিয়ায় ওলট-পালট ॥

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সিরিয়ার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে চলেছে। গত সপ্তাহের সংবাদ ছিল, সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান। মাত্র তিন মাস স্থায়ী সিরিয়ার অসামরিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সৈন্যদল সেখানে শাসন-যন্ত্র অধিকার করে। এই সৈন্যশাসন কায়েম হওয়ার পরেই প্রচারিত হয় যে, ক্ষমতাসীন সৈন্যবাহিনী নাসেরের সমর্থক এবং অবিলম্বে সিরিয়া মিশরের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত না হলেও তাদের বর্তমান বৈরী ভাবের অবসান হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু নাসের-সমর্থক সৈন্যদের শাসন সিরিয়ায় ভাল-ভাবে কায়েম হওয়ার আগেই আবার সেখানে এক অভ্যুত্থান হয় এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলে সিরিয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত অসামরিক শাসকরাই আবার সিরিয়ার শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে ফিরে আসেন। কিন্তু সে আসন বর্তমানে আর নিষ্কন্টক নয়। একারণে শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষ যে সিরিয়ার শাসনক্ষমতায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন তা আজ কারও পক্ষেই সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সৈন্যবাহিনীর সহায়তা উভয়পক্ষেই আছে। একারণে মনে হয়, সমগ্র সিরিয়াব্যাপী নাসের-পন্থী ও নাসের-বিরোধীদের মধ্যে একটা ভয়ংকর রকমের গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

॥ পূর্ব-পাকিস্থান ॥

পূর্ব-পাকিস্থান এখন সামরিক শাসনের দাপটে অতিষ্ঠ। পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আয়ুবশাহীর প্রচন্ড নির্যাতনেও তা থামেনি, ফলে নির্যাতনের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে সেখানে। স্বয়ং আয়ুব এখন উপস্থিত হয়েছেন ঢাকায়, আন্দোলনের কণ্ঠরোধের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। লাঠি, গুলী, জেলের ভয় চলে গেছে পূর্ব-পাকিস্থানের যে বেপরোয়া ছেলেদের, তাদের শায়েস্তা করা যায় আর কোন উপায়ে তাই এখন চিন্তা হয়েছে পাকিস্থানের জনসমর্থনহীন জঙ্গী নায়কদের। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে যে ধুনিয়াদী ধাপ্পা দিতে চেয়েছিলেন জনাব আয়ুব, পূর্ব-পাকিস্থানে তা অন্তত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্থানের সকল মানুষ যুগান্তরে প্রত্যাখ্যান করেছেন আয়ুবের তথাকথিত সংবিধানকে। যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক বিধানসভার, তার জন্যে একটি মনোনয়ন-পত্রও নাকি পড়েনি পূর্ব-পাকিস্থানের কোন কেন্দ্রে। এমন অসহযোগের উদাহরণ সারা পৃথিবীর কোন দেশের আন্দোলনেই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই জনাব আয়ুব নাকি ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের উপযুক্ত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি পাকিস্থানে। একারণে অন্তত পূর্ব-পাকিস্থানে আরও কিছুকাল সামরিক শাসন অপরিবর্তিতই রাখবেন তিনি। আর তার ফাঁকে চিন্তা করবেন, কেমন করে বেপরোয়া বাঙালীগুলোকে বশে আনবেন তাঁর সঙ্গীনের নীচে। বাঙলাভাষা ভুলিয়ে দিয়ে বাঙালীদের অবাঙালীতে পরিণত করার অদ্ভুত চিন্তাও এসেছে তাঁর মাথায়। কিন্তু এসবে যে কিছুই ফললাভ হয় না তা বুঝতে এতটুকুও অসুবিধা হত না জনাব আয়ুবের, যদি পেশী দিয়ে চিন্তা না করে মস্তিষ্কের বুদ্ধিতে নির্ভরশীল হতেন তিনি। যদি সঙ্গীনের ফলা থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতেন ইতিহাসের নির্দেশের দিকে।
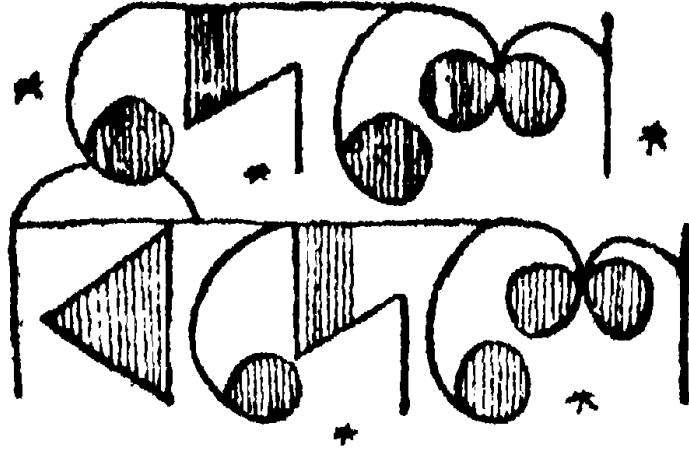
॥ ফ্রান্স ও আলজিরিয়া ॥

যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও আলজিরিয়ায় বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এখনও আসেনি। আর তা যে খুব সহজে আসবে না এ আশঙ্কা থেকেই ছিল। তবে আলজিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফ্রান্স যে সত্যই আগ্রহী তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। এখন প্রধানত ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গেই আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের সংগ্রাম চলেছে এবং জেনারেল দ্যগলের দৃঢ় ও কঠোর নীতির ফলে অবিলম্বেই আলজিরিয়ায় পূর্ণ শান্তি কায়েম হবে, এবিশ্বাস আজ ফ্রান্সের সকল দল ও মতাবলম্বী মানুষেরই সুনিশ্চিত হয়েছে। আলজিরিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্সে যে গণভোট হবে তাতে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট দলগুলি সম্পূর্ণভাবে জেনারেল দ্যগলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিউনিষ্টরা এইবারই প্রথম জেনারেল দ্যগলের সমর্থনে ভোট দেবেন।

তার কারণস্বরূপ তাঁরা বলেছেন, আলজিরিয়া সম্পর্কে জেনারেল দ্যগলের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন দ্যগল-নীতিরই পরাজয়ের সূচনা। আলজিরিয়াকে জোর করে সাম্রাজ্যিক নাগপাশে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদীরা দ্যগলকে ফ্রান্সের একনায়ক পদে অধিষ্ঠিত করিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে জেনারেল দ্যগল বুঝেছেন, ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরানোর সামর্থ্য তাঁর নেই।

কিন্তু দ্যগলের আজকের নীতি তাঁর পূর্বনীতির বিপরীত হলেও একথা সত্য যে, প্রকৃত অবস্থার বিচারে তাঁর কোন ভুল হয়নি। এবং তাঁর কাজের ফলে শুধু তাঁরই সম্মান বাড়েনি, ফ্রান্সেরও অশেষ উপকার হয়েছে। আলজিরিয়াকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত করে জেনারেল দ্যগল কিভাবে আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির কাছে সম্বর্ধনা ও সমর্থনলাভ করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হ'ল। সেনেগলের প্রেসিডেন্ট সেংহর এই উপলক্ষে বলেছেন, আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশমুক্তির পর্ব শেষ হ'ল। এবার ফ্রান্সকে আবার অতীতের মত সকল স্বাধীনতার জননী ও ধাত্রীর ভূমিকা নিতে হবে। আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট হাউফোনেট বইগুনি বলেছেন, ফ্রান্স আবার জগতের সম্মুখে তার প্রকৃত রূপ দেখানোর সুযোগ পেল। এঁদের প্রশংসা অবশ্য নতুন ঘটনা নয়, আফ্রিকার নরমপন্থী নেতাদের কাছে জেনারেল দ্যগল বরাবরই মুক্তিদাতারূপে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। কিন্তু সেনেগল, আইভরি কোস্ট ছাড়াও ফ্রান্সকে অভিনন্দন জানিয়েছে গিনি, মালি ও নাইজার রিপাব্লিক যারা আলজিরিয়ার মুক্তির দাবীতে বরাবরই ফ্রান্সের বিরোধিতা করেছে। নাইজার নতুন করে ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং গিনিও এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছে যে, এর পর ফ্রান্সের সঙ্গে তার পূর্ব বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাবে। এই সকল ঘটনা থেকে হয়ত ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পারবে যে, উপনিবেশগুলিকে মুক্তি দিয়ে ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। উন্নয়নকামী অনগ্রসর দেশগুলির মৈত্রী ও সহযোগিতা ফ্রান্সের বৈষয়িক উন্নতির বনিয়াদকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

॥ চীন-সোভিয়েট বিরোধ ॥

চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের ফলে চীনের অর্থনীতির উপর যে গুরুতর চাপ পড়েছে তার ফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। রাশিয়া এ-পর্যন্ত চীনকে যত টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে তার সবকিছুর দাম অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়া চীনের উপর নোটিশ জারী করেছে। অথচ পূর্বের ব্যবস্থানুসারে ও টাকা, বিশেষ করে কোরিয়া যুদ্ধে ব্যয়ের টাকা চীনের শোধ করার কথা ছিল না। শুধু টাকা ফেরৎ চেয়েই রাশিয়া চুপ করেনি, চীনে শিক্ষাদানরত প্রায় তিন হাজার রুশ কারিগর ও যন্ত্রবিদ বিশেষজ্ঞকেও রাশিয়া হঠাৎ চীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলে চীনের বহু জাতীয় প্রকল্প এখন উপযুক্ত পরিচালক ও দক্ষ কারিগরের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু অসমাপ্ত প্রকল্পের ব্লু-প্রিন্ট পর্যন্ত নাকি রুশ বিশেষজ্ঞরা যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। চীনের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সানমেন গর্জ, যার কাজ শেষ হলে দশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হ'ত, নয়জন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ হঠাৎ চলে যাওয়াতে তার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের বাণিজ্য বর্তমানে পঞ্চাশ শতাংশ কমে গিয়েছে, এবং চীনে গুরুতর খাদ্যসংকট ঘটা সত্ত্বেও রাশিয়া শুধু যে চীনকে গম সরবরাহ বন্ধ করেছে তাই নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে গম বয়ে আনার জন্যে জাহাজ চেয়েও চীন রাশিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই খাদ্যাভাবের ফলে বিভিন্ন কারখানাতে এখন কাজ চালানোও চীনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ চীনের একটি বিরাট ইস্পাতের কারখানাতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার থেকে কমে এখন তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে, এবং কয়লা-খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমেছে। বিভিন্ন অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত প্রকল্পের করুণ দৃশ্য এখন চীনের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ জোরের সঙ্গে একদিন যে সকল প্রকল্পের কথা প্রচার করত চীন, সেইজয়াং ট্রাক্টর কারখানা বা চ্যাঙ চুন মোটর কারখানার উৎপাদন সম্পর্কিত অগ্রগতির কথা আর শুনতে পাওয়া যায় না। চীনের খাদ্যসংকট আজ কল্পনাতীত। '৬১ সালে চীনকে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার কাছে থেকে গম আনতে হয়েছে ৪০ লক্ষ ৫ হাজার টন যা তার নিজস্ব উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। এছাড়া আর্জেন্টিনা, বর্মা, ফ্রান্স, পঃ জার্মানী, নিউজিল্যান্ড, বৃটেন প্রভৃতি দেশ থেকে বার্লি, ময়দা, ভুট্টা, চাল, চিনি, গুঁড়ো দুধ প্রভৃতি খাদ্যপণ্য আনতে হয়েছে ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টন। চীনের প্রয়োজনের তুলনায় এ আমদানী সামান্য, কিন্তু আরও আনতে হলে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও জাহাজ ইত্যাদির সুবিধা থাকার দরকার চীনের বর্তমানে তা নেই। ফলে মহাচীনের শতকরা আশীজন লোকই পুষ্টির অভাবে জীর্ণ। এ অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধের যদি কোন নিষ্পত্তি না হয় তবে চীনের বৈষয়িক অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ঘটনা-প্রবাহ
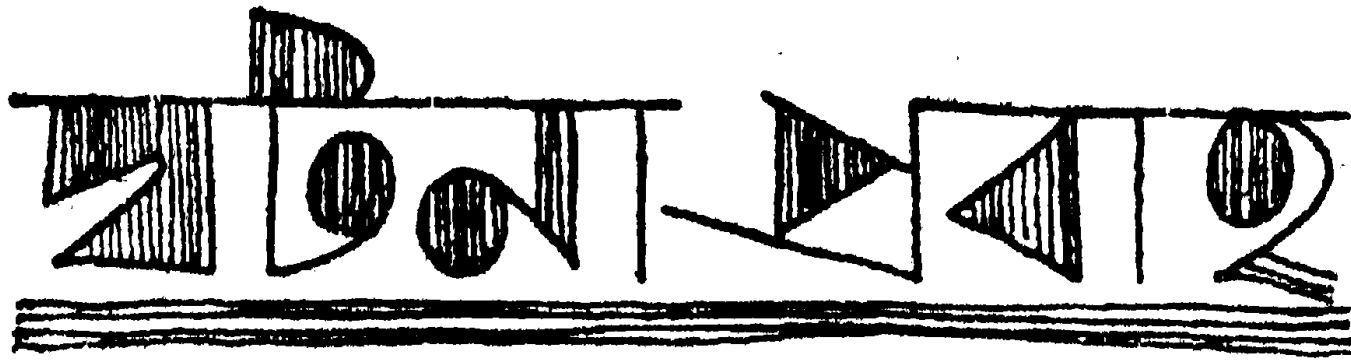
॥ ঘরে ॥

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : পুণার সন্নিহিত পিম্প্রিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত স্ট্রেপটোমাইসিন কারখানার উদ্বোধন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীনেহরুর দাবী : ব্যাধি নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাজ্যসভার দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে (বিধানসভার ভোটে) ৪ জন কংগ্রেস ও ২ জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী নির্বাচিত।

বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী পার্ল বাকের কলিকাতা উপস্থিতি ও সম্বর্ধনা লাভ।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : চা ও রবার বাগিচা শ্রমিকদের অন্তবর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি—ভারত সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বেতন পর্ষতের সুপারিশ গ্রহণ।

'সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার জন্য নিকট ভবিষ্যতে চীনা প্রধানমন্ত্রীর (চৌ এন্-লাই) সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : আগামী আর্থিক বর্ষে (১৯৬২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ পর্যন্ত) ৬৫ দফা পণ্যের আমদানী হ্রাস কিংবা নিষিদ্ধ—সরকার কর্তৃক বার্ষিক আমদানী নীতি ঘোষণা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে দ্বিতীয় লোকসভার অবসান।

দিল্লীতে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ১৩ জন শ্রেষ্ঠ লেখককে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক সাহিত্য আকাদেমীর জাতীয় পুরস্কার (১৯৬১) অর্পণ—বাংলা ভাষায় অনবদ্য সৃষ্টির জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত পুরস্কৃত।

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে নূতন মেট্রিক ওজন চালু—বাজারে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও বিহার—ভারতের এই ৪টি রাজ্যে নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি।

অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত পাক্-ভারত সমস্যার আংশিক স মা ধা ন—দিল্লীতে তিনদিনব্যাপী বৈঠকের শেষে যুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : শ্রীনেহরু পুনরায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত।

নেতাজী সম্পর্কে বোম্বাই-এর সাপ্তাহিক পত্রে ('উইমেন্স ওন উইকলি') আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জের—সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রী এন্ জি হ্যামিল্টনের কলিকাতার আদালতে বিনাসর্তে ক্ষমা প্রার্থনা।

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : পদত্যাগের পর শ্রীনেহরু পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত—দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবন হইতে ঘোষণা— কেন্দ্রে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তোড়জোড়।

সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (মধ্যপ্রদেশ) ডাঃ কাটজুর আবার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা— একটি উপনির্বাচনের জন্য যথারীতি মনোনয়নপত্র পেশ।

॥ বাইরে ॥

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্দিজি পদচ্যুত—বন্দী অবস্থায় প্রেসিডেন্টকে কারাদ্বীপ মার্টিন গারসিয়ায় প্রেরণ।

'রাশিয়ার সহিত অস্ত্র-পরীক্ষা (পারমাণবিক) বন্ধের আ লো চ না য় কার্যতঃ অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে'—ওয়াশিংটনে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির উক্তি।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ পাকিস্তান কর্তৃক অগ্রাহ্য—একতরফা কাজ হয় নাই বলিয়া পাক্ সরকারের সদম্ভ ঘোষণা।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট পদে সেনর গুইদোর শপথ গ্রহণ।

ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জুলিও হ্যারোসেমোনা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : 'শুক্রগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নাই : বহিস্তরের তাপমাত্রা ৫৭০ ডিগ্রী'— সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার।

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : পশ্চিম ইরিয়ানের সন্নিহিত ওয়েগিয়ো দ্বীপ ওলন্দাজ কবল হইতে মুক্ত—জাকার্তা বেতারের ঘোষণা।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে মধ্য সিরিয়ায় প্রবল বিক্ষোভের সংবাদ।

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : মিশরের সহিত পুনর্মিলনে সিরীয় সামরিক কমান্ডের সম্মতি—সিরিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গতি পরিবর্তন—নাসের (আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট) সমর্থক কমান্ড কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

'নিরাপত্তার আশ্বাস পাইলে আমেরিকা আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিতে প্রস্তুত'—জেনেভায় ৬৭-জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধির বিবৃতি।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : উত্তর সিরিয়ায় পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা—বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন।

আলজিয়ার্সে ফরাসী সৈন্যদের সহিত মুশ্লিম বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ।

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে জেনেভা সম্মেলনে (১৭-জাতি) রুশ-মার্কিণ বিতন্ডা।

বৃটিশ খৃষ্টমাস দ্বীপে (প্রশান্ত মহাসাগরীয়) আমেরিকার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালনার সিদ্ধান্ত।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ সাহিত্য পুরস্কার ১৩৬৮ ॥

সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে সরকারী পুরস্কার বাদ দিয়ে যে সমস্ত বে-সরকারী পুরস্কার প্রতি বৎসর দেওয়া হয়ে থাকে, অল্পকালের মধ্যে সেগুলি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। পুরস্কারগুলি সাহিত্যিক ও পাঠক উভয় মহলেই ক্রমশঃ একটি বিশেষ আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

১৩৬৮ সালের পুরস্কারসমূহ এ'রা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য লাভ করেছেন : শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুখলতা রাও, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পুরস্কারগুলির নাম—মতিলাল পুরস্কার, শিশিরকুমার পুরস্কার, প্রফুল্লকুমার পুরস্কার, সুরেশচন্দ্র পুরস্কার, মৌচাক পুরস্কার, উল্টোরথ পুরস্কার।

তাছাড়া এই বছরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ পুরস্কার দিচ্ছেন শ্রীঅশোককুমার সরকার। তাঁর মাতামহী স্বর্গতা সরলাবালা সরকারের নামে পুরস্কারটি ঘোষণা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-গবেষণার জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে।

॥ শিশির কুমার পুরস্কার ॥

'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রদত্ত এই পুরস্কারটি লাভ করেছেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পদাবলী সম্পর্কীয় গবেষণা অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ মতিলাল পুরস্কার ॥

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি এই বছর লাভ করেছেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র। বৃহ-

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নরেন্দ্র মিত্র

বিমল মিত্র

সুখলতা রাও

হরপ্রসাদ মিত্র

দায়তনের উপন্যাস রচনায় শুধু নয়, প্রকৃত শৈল্পিক গুণসমন্বিত কাহিনী সৃষ্টিতে তিনি একালের সার্থক কথাকারদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১২ সালে জন্ম, শ্রীযুক্ত মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ মৌচাক পুরস্কার ॥

উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসর এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে। এ বছর প্রখ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমতী সুখলতা রাও পুরস্কারটি লাভ করেছেন। শিশু-উপযোগী বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি ইতিমধ্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ ৫০০ পাঁচশত টাকা।

॥ প্রফুল্ল সরকার পুরস্কার ॥

প্রবীণতম কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। তাঁর রচিত 'শতদল', 'অজয়', 'উজানী' 'বনমল্লিকা', 'একতারা' 'নূপুর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত। বর্তমানে নিজের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামেই বাস করছেন। পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ সুরেশচন্দ্র পুরস্কার ॥

একালের অন্যতম কথাশিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে ঘোষিত এই পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা। দীর্ঘকাল যাবৎ নিরলসভাবে সাহিত্য-সেবা করে আসছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকুরী জীবনের জটিলতা তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে স্তিমিত করতে পারেনি। দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে।

॥ উল্টোরথ পুরস্কার ॥

উল্টোরথ পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি প্রতি বৎসর একজন কবিকে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্য থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ ৫০১ টাকা।

নতুন বই

চলন্তিকা—রাজশেখর বসু-সংকলিত। (সংশোধিত ও পরিবর্তিত নবম সংস্করণ)। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

কিছুকাল দুষ্প্রাপ্য থাকার পর 'চলন্তিকা' নব-কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে, এতে আমরা অত্যন্তই আনন্দিত। ছোট আকারের বাংলা অভিধান এবং সেই সঙ্গে সম্প্রসারণশীল বাংলা ভাষার চলতি শব্দগুলির সংকলন হিসাবে 'চলন্তিকার' উপযোগিতা প্রায় তিরিশ বছর আগেই সর্বজনস্বীকৃত হয়েছিল। সে উপযোগিতা এই দীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ আছে, এতে সংকলন-কর্তার গভীর বাস্তববোধ এবং অপরিসীম দূরদৃষ্টিই প্রমাণিত হয়। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে 'চলন্তিকা'র বিষয়ে যা জানিয়েছিলেন—'বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে যে ইচ্ছা করবে তোমার বই ছাড়া তার গতি নেই', সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।
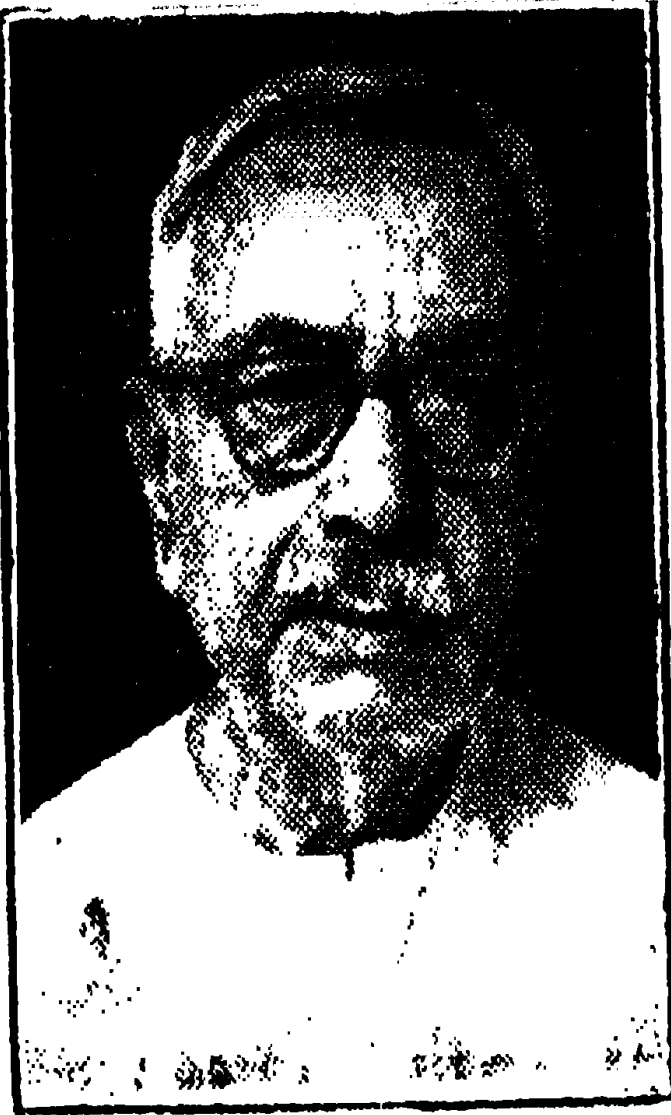
বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজশেখরবাবু ছিলেন একজন আশ্চর্য-কর্মা ব্যক্তি। পরশুরাম, এই ছদ্মনামের অন্তরালে তিনি যেমন তিক্ত-মধুর হাসির গল্পের রসধারায় বাঙালীকে আত্মসচেতন ক'রে তুলেছেন, তেমনি অভিধান-সংকলন, রামায়ণ ও মহাভারতের সারানুবাদ, পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়ন এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার অনুবাদ ক'রে আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যের বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন। তাঁর নিরভিমান সংস্কারমুক্ত মন এবং যুক্তিবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্যে তিনি পিতামহসদৃশ বয়সেও তরুণতম আধুনিক যুবকের সমকালীন হ'তে পেরেছিলেন। এই সমকালীনতার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বই মূর্ত হয়ে উঠেছে 'চলন্তিকার' মধ্যেও। এর শব্দ-সঞ্চয়ন, অর্থভেদ, পারিভাষিক শব্দার্থের তালিকা সবই আধুনিক পাঠকের পরম আশ্বাস ও আনন্দের বিষয়। অভিধান-গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে কখনোই মৃত শব্দের জাদুঘর বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন প্রবহমান জীবনেরই প্রদর্শনী। এর 'চলন্তিকা' নাম আজ আক্ষরিকভাবেই সত্য হ'য়ে উঠেছে।

রাজশেখরবাবুর পরলোকগমনের পর এই নবম সংস্করণই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশকবর্গ অভিধানখানিতে কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন দেখে মনে হল, 'চলন্তিকা' নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও চলমান জীবনের সহযাত্রী থাকবে।

অভিধানখানির ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

চার চোখ (কাব্য সংকলন)—কৃষ্ণ ধর। রাম বসু। গিরিশংকর। দিলীপ রায় ॥ ২২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ ॥ দাম : তিন টাকা ॥

রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক কাব্য-আন্দোলন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে আমাদের সম্মুখে এক মহৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কাব্যনাট্য সেই ধারারই অন্যতম ফসল। আলোচ্য সংকলনের কবি চতুষ্টয় তাঁদের কল্পনা-প্রতিভার দানে তাকে পরিপুষ্ট করায় আমরা আনন্দিত।

অবশ্য, আধুনিক যুগের কাব্য-নাট্য-স্রষ্টাদের সম্মুখে উদ্যত সমস্যাগুলি আমাদের অজানা নয়। কাব্যের মাধ্যমে নাটক রচনা সত্যি কঠিন কাজ। কারণ, ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অন্তঃসংঘাতের গভীরতায় চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়ে দর্শককে বাস্তবের সম্মুখীন করার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র বিমূর্ত কাব্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া কোনো কাব্য-নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব না। আর, যেহেতু কাব্যের মাধ্যমেই তাঁকে এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়, সেইহেতু বিষয়-নির্বাচনের সময় পাত্র-পাত্রীর এমন এক উত্তুঙ্গ আবেগময় মুহূর্তের সংঘাতে কাব্য-শরীর গঠন করা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে অভিনয়কালে আমরা জীবন-সত্যকেও সহজে উপলব্ধি করতে পারি। এবং বলাবাহুল্য, এ-যুগের হৃদয়-যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে যুগোত্তীর্ণ কাব্য-নাট্য রচনার প্রয়াস অসম্ভব ঘটনা।

'চার চোখ' কাব্য-নাট্য-সংকলনের বিভ্রান্তিকর মুখবন্ধ সত্ত্বেও কবি কৃষ্ণ ধরের 'দ্বিতীয় নায়িকা', রাম বসুর 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা' ও 'গিরিশংকরের 'চেরাগ বিবির হাট' কাব্য-নাটক সম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার প্রায় সীমান্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র কবি দিলীপ রায়ের 'সংলাপ' এর ব্যতিক্রম। শ্রীরায় নাটকের আঙ্গিককে কাব্য-সংলাপেই পরিবেশন করেছেন। একে নাট্যকাব্য বলা যায়, কাব্য-নাট্য বলা সত্যি কঠিন।

যা হোক, আলোচ্য সংকলনের কবি কৃষ্ণ ধর আমাদের কাছে 'রূপবতী পৃথিবীর' যন্ত্রণা-জর্জর 'বিস্মিত নায়ক' অমলকে উপহার দিয়েছেন। দ্বন্দ্ব-পীড়িত ভীরু অমল, রমা আর জয়ন্তীর আবেগ-মথিত নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে তিনি সুন্দরভাবে কাজেও লাগিয়েছেন। ফলে, কৃষ্ণবাবুর কাব্য-নাট্যে অনেক স্মরণীয় উক্তির সন্ধান পাবেন পাঠক-পাঠিকা।

কবি রাম বসুর 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা, তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্য-নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণবাবুর মত রাম বসুও নির্বাচন করেছেন এমন এক বিষয়বস্তু যা অন্তঃসংঘাতে কাব্যের বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণে নিয়ত উদ্যত। তাছাড়া তাঁর দৃশ্য-পরিকল্পনা, কাব্য-সংলাপ রচনা অভিনয়োপযোগী বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়েছে।

'চেরাগ বিবির হাট'-এ নাট্যকার গিরিশংকর সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। বিষয়কস্তু রবীন্দ্রানুরাগী হলেও গিরিশংকর তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল। তবে, তাঁর নাটকে অন্য দুজনের তুলনায় কাব্যগুণ কিঞ্চিৎ কম।

কবি দিলীপ রায়ের 'সংলাপ' এই সংকলনের দুর্বলতম সংযোজন। বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চরিত্র কাব্যিক সংলাপ আবৃত্তি করেছে মাত্র। কিছু অংশের কাব্যগুণ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাকে কাব্যনাট্য বলি কি করে?

আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে। এবং দিলীপ রায় আমাদের সুন্দর কাব্যনাট্য উপহার দেবেন। আমরা এই সংকলনের সমাদর কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-সজ্জা মনোরম।

চৈত্রে রচিত কবিতা— উৎপলকুমার বসু। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। দাম : দু'টাকা।

অনুভবের শুদ্ধতা, শিল্প-সচেতনতা ও পরিশীলিত মন্ময়তা উৎপল বসুর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। পঞ্চাশের তরুণ কবিদের মধ্যে উৎপল-কুমার বসু তাই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এবং একথা একান্তভাবে উল্লেখ্য যে, কোন

প্রকার চতুর চমক বা তথাকথিত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে আশ্রয় করে সহজ আপাত-সাফল্য লাভের চেষ্ট এই কবি কদাচ করেননি। শিল্প এবং সৌন্দর্যের অন্বিষ্ট বিন্দুর অভিমুখে অভিজ্ঞতার সৎ এবং গোপন সরণি ধরে ক্রমে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারেই তিনি নিরন্তর পরিশ্রমী। এই নিবিষ্ট যাত্রার অভিজ্ঞান তাঁর কবিকৃতিতে পরিব্যাপ্ত।

তাঁর কবিতা ইঙ্গিতময়—প্রতীকধর্মী। কবিতার বিষয়বস্তু এখানে সামাজিকতা নয়, কবির নিগূঢ় ব্যক্তিগত উপলব্ধি। নির্বাচিত শব্দের ব্যঞ্জনাময়, অন্তর্লীন ধ্বনি-সংগীত তাঁর কবিতাকে গুণান্বিত করেছে। ফলতঃ আলোচ্য বইয়ের কবিতাগুলি পাঠকের চেতনায় আবহ সৃষ্টিতে সক্ষম। এবং এইটিই তাঁর প্রথম কবিতার বই একথা মনে রাখলে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের আগ্রহশীল ক'রে তোলে।

অনেক সময় ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে কবি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে কবিতার ছন্দ-শরীর নির্মাণ করেছেন এবং প্রায়শই সার্থকও হয়েছেন। তবে ইঙ্গিতময় প্রতীক-মাধ্যম প্রকাশ তাঁর কবিতাকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট করে তুলেছে। অবশ্য 'ময়ূর'-এর মতো অনবদ্য সুন্দর রচনাও তাঁর রয়েছে। যে কবিতাগুলি বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, 'চৈত্রে রচিত কবিতা', 'আবিষ্কার', 'দুঃসময়' ও 'পরিলিখন'—তাদের কয়েকটি।

একটি প্রেমের কাহিনী—(উপন্যাস) **গুড়িপাতি ভেঙ্কটাচালম। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম দু'টাকা।**

বোম্মানা বিশ্বনাথম প্রতিবেশী সাহিত্যের অনুবাদক হিসাবে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন। ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যই তিনি কিছু কিছু বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন, 'অমৃত' পত্রিকার পাঠকদের কাছে তিনি সে হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও সুস্পষ্ট। 'একটি প্রেমের কাহিনী' তেলেগু ভাষায় লিখিত 'ময়দানম' নামক এক বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প। কাহিনীতে সেই চিরন্তন ত্রিভুজের সমস্যা। প্রেম যেন শাঁখের করাত, 'আসিতে যাইতে কাটে' ও এই প্রেমের রথ 'চলিতে চালাতে নাহি জানে'। রাজেশ্বরী যখন অসহায় অবস্থায় বিজড়িত, কামনার আগুনে পুড়ে সে অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, প্রেমিকপ্রবর তখন তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। অল্পবয়সী এক বালক রাজেশ্বরীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করে, তবু তাতে প্রাণ ভরে না। শেষ পর্যন্ত প্রেমিক আমির ফিরে আসে, এবং আত্মহত্যা করে। কাহিনীটি করুণ, স্থানে স্থানে শ্লীলতা-বর্জিত, তবু তা রসোত্তীর্ণ। কাহিনীটির মধ্যে এক চিরকালিক আবেদন আছে। প্রচ্ছদটি সুন্দর এঁকেছেন গণেশ বসু। ছাপা মনোজ্ঞ।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

রুশ ভারতী—সম্পাদক মহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হতে প্রকাশিত। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'রুশ ভারতী'র এইটি প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। অধ্যাপক অরুণ বসুর 'সোভিয়েত সাহিত্যের সত্য-মিথ্যা' ও শংকর চক্রবর্তীর 'মহাকাশজয়ী মানুষ' এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আলোচনা। আলেকজান্দার শিফমান রচিত 'তলস্তয় ও বিবেকানন্দ', 'আমার লেখা' প্রসঙ্গে গোর্কী, মিকোইয়ানের 'বিমান থেকে 'মহাব্যোমযান' রচনাগুলি মূল্যবান সংযোজন। নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পুশকিনের কবিতার অনুবাদ ও পুস্তক সমালোচনা, অরুণাচল বসু-কৃত 'জলামাঠ রেলস্টেশন : রাজলিঙ' কবিতাটি পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটি সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত।

শতভিষা—সম্পাদক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১এ, বিজয় মুখার্জি লেন, কলকাতা—২৫ হতে প্রকাশিত। দাম চল্লিশ নয়া পয়সা।

কবিতা সংকলন। বহু দিন ধরে কবিতার এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। আধুনিক বাঙলা কাব্যান্দোলনের ক্ষেত্রে 'শতভিষা'র অবদান কম নয়। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে যে সমস্ত তরুণ কবি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাদের অনেকেই এ পত্রিকায় লিখেছেন এবং লিখছেন। আলোচ্য ফাল্গুন (১৩৬৮) সংখ্যায় লিখেছেন—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, দিলীপ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি এবং রবার্ট বার্ণস ও হাইনরিখ হাইনের কবিতার অনুবাদ আছে। এ ছাড়া আরও দুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তরুণ মিত্র ও আলোক সরকার।

চিত্রপট—সম্পাদক মৃগাঙ্কশেখর রায়। বাংলা দেশে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে চিত্রপটের স্থান স্বতন্ত্র। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান রচনা তাঁরা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। মাত্র দুটি সংখ্যায় তাঁদের এ প্রয়াস প্রশংসনীয়। এ সংখ্যায় যাঁদের উল্লেখযোগ্য রচনা আছে তাঁরা হলেন—বেলা বালাজ, কিরণময় রাহা, জগমোহন, ধ্রুব গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, জি জোর্জিনিংসেব প্রভৃতি। তাছাড়া আরও অনেকের প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

বাংলা চলচ্চিত্রের এ-পিঠ ও-পিঠ :

অরোরা নিবেদিত "ভগিনী নিবেদিতা"র সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলুম, "অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মহৎ কিছু গড়বার চেষ্টা করলে উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিদ্ধি যে অনিবার্য, তার জ্বলন্ত প্রমাণ —অরোরার 'ভগিনী নিবেদিতা'।......... 'ভগিনী নিবেদিতা' বাংলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় নিবেদন বলেই পরিগণিত হবে।"

আমাদের এই মন্তব্যকে সার্থক করে 'ভগিনী নিবেদিতা' ১৯৬১ সনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প দীর্ঘজীবী হোক!

১৯৫৩ সাল থেকে শুরু করে গেল ন'বছরের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ বছর বাংলা ছবি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে। আর্থিক অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলা ছবি যে উন্নতমানের পরিচয় দিচ্ছে বার বার, এর জন্যে বাংলার লেখক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, কলাকুশলীগোষ্ঠী, অভিনেতা - অভিনেত্রী এবং সবশেষে উল্লেখিত হলেও সবচেয়ে মুখ্য প্রযোজক-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারেন। মাত্র সর্বভারতীয় সম্মান নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিও প্রথমে লাভ করেছে বাংলা ছবি-ই। আজ ভারতবর্ষ যে বিশ্বের চলচ্চিত্র-মানচিত্রে গৌরবের আসন অধিকার করেছে, সেও বাঙালী পরিচালক-প্রযোজক সত্যজিৎ রায়েরই দৌলতে।

কিন্তু এই মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তির পিছনে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আজ ঘোর দুর্দিনের সম্মুখীন। বাংলাদেশে স্থায়ী চিত্রগৃহ আছে আড়াইশোর কাছাকাছি এবং মাত্র কলকাতাতেই চিত্র-পরিবেশকের সংখ্যা প্রায় একশো। অথচ আগে যেখানে অন্ততঃ পঞ্চাশখানি বাংলা ছবি প্রতি বছর মুক্তিলাভ করত—১৯৫৫ সালে ৫৫ খানি মুক্তি পেয়েছিল,—সেখানে গেল দু'বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, ৩৪ থেকে ৩৬-র বেশী ছবিকে পর্দায় স্থান দেওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে, এ-বছর যেভাবে ছবি তৈরীর কাজ চলছে, তাতে বছরের শেষে খান পাঁচিশেকের বেশী ছবি তৈরী হবে কিনা সন্দেহ। অতএব নির্মাণ-ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ক্রমেই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। বাংলা দেশের চলচ্চিত্র-প্রযোজনা-শিল্পে কমবেশী সাড়ে তিন হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র শ'পাঁচেক কাজে নিযুক্ত আছেন, বাকী তিন হাজার আজ বেকার। এবং বাংলা দেশেই বাংলা ছবির চাহিদা যেভাবে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা অসঙ্গত হবে না, এমন দিন শিগ্‌গিরই আসবে, যখন জনকয়েক 'বাংলা ছবি-না-করে-পারি না' মনোবৃত্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী আদর্শবাদী চিত্রনির্মাতা এবং তাঁদের সঙ্গে কর্মরত শ'দুইতিন কলাকুশলী ও কর্মী বছরে দশ-পনেরোখানা বাংলা ছবি তৈরী করতে থাকবেন এবং বাকী কর্মীরা—যাঁদের সংখ্যা ৩২০০-৩৩০০ শ' হবে, তাঁরা ক্ষুধার অন্নসংগ্রহের জন্য অপর কোনো কর্মে ব্রতী হবেন এবং যাঁরা তা না পারবেন, তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তব্যবোধে দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য করেন এবং নানা প্রকারে নৃত্য, নাটক, সংগীত প্রভৃতি চারুকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে যে-সব শিল্পের মাধ্যমে বাঙালীর গৌরবময় আসন পাবার অধিকার আজও আছে, বাংলা ছবি যে তার অন্যতম, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' প্রভৃতি চিত্রের আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ এই 'অমৃত'-এরই পাতায় বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও 'বাংলার চলচ্চিত্র-প্রযোজনা-শিল্পকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের সরকার একেবারে নির্বিকার। সরকারের অজানা থাকবার কথা নয় যে, সমগ্র পশ্চিম বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী-লব্ধ অর্থের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ যায় তাঁদের প্রমোদকরের চাহিদা মেটাতে। বাকী টাকার অন্ততঃ শতকরা ষাট ভাগ নিয়ে নেন চিত্র-প্রদর্শকেরা এবং কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ নিয়ে নেন চিত্র-পরিবেশকেরা তাঁদের কমিশন বাবদ। অর্থাৎ একশো টাকার টিকিট বিক্রি হলে সরকার, প্রদর্শক এবং পরিবেশকের পাওনা মিটিয়ে প্রযোজকের ভাগ্যে জোটে গোটা আঠারো থেকে কুড়ি টাকা। অথচ প্রযোজককে যে খালি ছবি তৈরী করবার জন্যেই খরচ করতে হয়, তাই নয়; সেই ছবির মুক্তির জন্যে প্রতি রীলে ৪০ টাকা করে সেন্সার-ফি, মুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রিন্ট বাবদ প্রায় ৭০০ টাকা কেন্দ্রীয় এক্সাইজ ডিউটি, ছবির মুক্তির জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয়, যা অন্ততঃপক্ষে ৩০।৪০ হাজার টাকা, এমন কি শহরের যে-কটি প্রধান চিত্রগৃহে ছবিটি মুক্তি পাবে, সেগুলিকে সুসজ্জিত করারও ব্যয়ভার বহন করতে হয়। বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম, চিত্র-সমালোচকদের প্রীতিবিধানের জন্য ছবির মুক্তি উপলক্ষে প্রায়ই যে-জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়, এর খরচও আসে ঐ প্রযোজকের পকেট থেকে। অথচ মজা এমনই যে, যে-ভদ্রলোক ছবিটির জন্যে গোড়া থেকে শেষ অবধি সমূহ খরচ করলেন, তাঁরই পাওনাটা ছবির জগতে সবশেষে বিবেচ্য; এমন কি, ছবিটি যদি কোনো দিনই অন্ততঃ খরচের টাকাটাও তুলে আনতে না পারে, তা'হলেও অপর তিনপক্ষ—সরকার, প্রদর্শক ও পরিবেশক—তাঁদের প্রাপ্যের একটি নয়া পয়সাও ছাড়বেন না। এই ঘোরতর অবিচার সত্ত্বেও বাংলা ছবি আজও তৈরী হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বিকারচিত্তে বহুস্ফীত প্রমোদকর লব্ধ অর্থ পেয়ে আনন্দিত হচ্ছেন।

খালি সরকারই বা বলি কেন, বাংলা ছবির প্রতি মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি কজন বাঙালীর আছে? আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী বাঙালীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি,—এ'দের মধ্যে চিকিৎসক, আইনজীবী, রাজনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিত্রকর, ভাস্কর, পুরাতত্ত্ববিদ্যা-বিশারদ, স্থপতি, ব্যবসায়ী, পদস্থ সরকারী কর্মচারী সকলেই আছেন,—এ'দের কাউকে বলতে শুনলুম না যে, তিনি বাংলা ছবি দেখে থাকেন বা বাংলা ছবি সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন। ও'দের মধ্যে কেউ কেউ বেশ মুরুব্বি চালেই বলেছেন, 'হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়ের ঐ যে বইখানা—হ্যাঁ, পথের পাঁচালী—ওটা দেখেছিলুম বটে, মন্দ লাগেনি', কিন্তু বেশীর ভাগই জানিয়েছেন, তাঁদের কর্মব্যস্ত জীবনে বাংলা ছবি দেখে সময় নষ্ট করবার মত সময়ের অত্যন্ত অভাব। 'বাড়ীর মেয়েরা আর ঐ ছেলেপুলেগুলো কখনও-সখনও যায় বলে শুনি বটে, তবে ও-সব দেখে বাজে পয়সা নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না', এ-কথা যাঁরা গুরুগম্ভীরভাবে বলেন, তাঁদের অনেককেই কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তাসের আড্ডায়, প্রতি শনিবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে, প্রতি ছুটির দিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বা বাগানবাড়ীর হৈ-হল্লাতে সময় কাটাতে দেখা যায়। এবং শুনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এ'রাই বাংলা ছবির সবচেয়ে বেশী নিন্দে করে থাকেন।

কাজেই মুষ্টিমেয় আপনি-আমি চীৎকার করলে কি হবে, বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প থাক আর যাক, এর জন্যে সরকার বা পণ্ডিতম্মন্য শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক সামান্য মাত্রও আলোড়িত হবে না।

বাংলা দেশেই বাংলা ছবি ক্রমে ক্রমে কোণঠাসা হচ্ছে কেন, হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় তা বারে বারে আর্থিক ক্ষেত্রে হার স্বীকার করছে কেন, সারা বাংলার চিত্রগৃহগুলির প্রদর্শনী-সময় হিসেব করে সারা বছরে বাংলা ছবি তার যেটুকু ভগ্নাংশ সময় পায়, তাও ক্রমে কমে যাচ্ছে কেন, অ-বাংলা ছবির দর্শকদের মধ্যে বাঙালী দর্শকের সংখ্যা বছরের পর বছর কি অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে যেমন উচ্চ পর্যায়ের সরকারী তদন্ত হওয়া যতশীঘ্র সম্ভব দরকার, তেমনই বাংলা ছবির প্রযোজনার ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় জেনে এই শিল্পের চিরস্থায়ী সংকট-মোচনেও সরকারী হস্তক্ষেপের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করছি।

আমরা ১৯৬১ সালের ১৬ই জুনের এবং ১৯৬২ সালের ৫ই জানুয়ারীর 'অমৃত'-এ যে-কথা লিখেছিলুম, তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি : 'বহু অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ছবি আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অসামান্য মর্যাদার আসন পেয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমাদের এই গৌরবময় শিল্প সম্বন্ধে অবহিত হতে বলি এবং একটুও কালবিলম্ব না করে এই শিল্পটিকে কি উপায়ে সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করতে অনুরোধ করি। ......বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে যদি মাত্র কোনো ক্রমে টিকে না থেকে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে বাংলা ছবিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তার বিক্রীর বাজারকে বাড়াতে হবে, তার মুক্তির পথকে অধিকতর প্রশস্ত করতে হবে, মাত্র সারা ভারতে নয়, সারা বিশ্বে যাতে তার চাহিদা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হয়, সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের প্রযোজক ও স্টুডিও-মালিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট কলাকুশলী এবং শিল্পীবৃন্দ এক টেবিলে বসে একটি সুষ্ঠু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করতে আহ্বান করুন।' এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাতর প্রার্থনা জানাই "বাঙালী, বাংলা ছবি দেখুন—**বাংলা ছবি দেখুন—বাংলা ছবি দেখুন।"**

ভগিনী নিবেদিতার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ

'ভগিনী নিবেদিতা'র সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ একটি অসাধারণ ঘটনা। বিখ্যাত কোনো কাহিনীকারের রচনা অবলম্বনে গঠিত কাল্পনিক চিত্র নয়, এমন একজন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার জীবনীচিত্র, যিনি ১৮৯৮ সালের ২৮-এ জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়াবার পর থেকে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দার্জিলিংয়ে তাঁর জীবনপ্রদীপ না নেভা পর্যন্ত তাঁর এই দ্বিতীয় পিতৃভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে মনকে তন্ময় ও অভিভূত করা নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের শিল্পরীতি ও মননশীলতার পরিচায়ক।

ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত চিত্রনাট্যকে সম্বল ক'রে তরুণ পরিচালক বিজয় বসু—এই ছবির প্রস্তুতি সম্পর্কেই তাঁর নাম আমরা প্রথম জেনেছি—কোন্ মন্ত্রবলে এই অসাধ্য সাধন করলেন। যেভাবে তিনি প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাঁর গৃহীত চরিত্র সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন,

রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা" চিত্রের নাম-ভূমিকায় প্রতিভাময়ী শিল্পী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

একান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল, এমন দু-একজন লোকের হয়ত এখনও সন্ধান মিলতে পারে। তাই এই জীবনীচিত্র-রচনায় কল্পনা-বিলাসের অবকাশ খুবই সামান্য। অপর পক্ষে বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার কর্মজীবন-রচনায় এমন বহু চরিত্রকেই আনতে হয়েছে, যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের প্রচুর জানা আছে। কাজেই এ হেন জীবনীচিত্রের সুষ্ঠু চিত্রায়ণ রীতিমত দুষ্কর কর্ম এবং তারই মধ্যে দর্শক-

যাতে আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি, একটি মহৎ জীবনীচিত্রে অভিনয়ের গুরুদায়িত্বের কথা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন, তাতেই আমরা এই চিত্রনির্মাণে তাঁর নিজের অসাধারণ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, তাঁর এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই ছবির নাম-ভূমিকার অভিনয়; অভিনয় বললে ভুল

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত তারাশঙ্করের 'কান্না' চিত্রের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী।

হবে; তিনি জীবন্ত নিবেদিতারূপে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন। এবং অমরেশ দাস প্রমুখ প্রতিটি শিল্পী নিজের নিজের গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন, এ কথা 'ভগিনী নিবেদিতা'র সমালোচনা কালে আগেই বলেছি।

'ভগিনী নিবেদিতা'র রাষ্ট্রীয় সম্মান-লাভের যে গৌরব, সে গৌরব চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ পরিচালক বিজয় বসু, সঙ্গীত-পরিচালক অনিল বাগচী, চিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ, শব্দ-যন্ত্রী সমর বসু, শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী, সম্পাদক বিশ্বনাথ মিত্র প্রভৃতি সকল কলাকুশলী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়-চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা, মঞ্জুশ্রী, অমরেশ দাস, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শিশির মিত্র, ঠাকুরদাস মিত্র, দ্বিজু ভাওয়াল, মমতাজ আহমেদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি শিল্পী এবং ছবিখানির নির্মাণ যাঁদের অক্লান্ত সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব ছিল না, অরোরা ফিল্ম কর্পো-রেশন প্রতিষ্ঠানের সেই যুগ্মস্তম্ভ—অজিত বসু এবং অরুণ বসু এবং তাঁদের সঙ্গে এই চিত্র-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরই সমবেতভাবে প্রাপ্য।

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকলে যে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়, 'ভগিনী নিবেদিতা' রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করে সেই সত্যকেই উদ্ঘাটিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিবিধ সংবাদ

১৯৬১ সালের রাষ্ট্রীয় সম্মান:

ভারতে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলিকে সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুরস্কার-প্রদানের যে ব্যবস্থা ভারত সরকার গেল ১৯৫৪ সাল থেকে করে আসছেন, এ বছর সেই ব্যবস্থামত ১৯৬১ সালে নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে যে সব ছবি পুরস্কৃত হয়েছে তাদের নাম:

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে

কাহিনীচিত্র : (১) ভগিনী নিবেদিতা (বাংলা)— রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক
(২) পাবা মণিপ্পু (তামিল)
(৩) প্রপঞ্চ (মারাঠি)

শিশুচিত্র : (১) হট্টগোল বিজয় (হিন্দী) প্রধানমন্ত্রীর সুবর্ণ পদক
(২) সাবিত্রী (হিন্দী)
(৩) নানহে মুনহে সিতারে (হিন্দী)

তথ্যচিত্র : (১) রবীন্দ্রনাথ (ইংরাজী)— রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক
(২) আওয়ার ফেথার্ড ফ্রেন্ডস (ইংরাজী)
(৩) রোমান্স অব দি ইন্ডিয়ান কয়েন (ইংরাজী)

শিক্ষামূলক চিত্র : (১) সাইট্রাস কালটি-ভেশন (ইংরাজী)—রাষ্ট্রপতি সুবর্ণ পদক
(২) কয়ার ওয়ার্কার (ইংরাজী)
(৩) আহ্বান (হিন্দী)

আঞ্চলিক ভিত্তিতে

হিন্দী : (১) ধরমপুত্র
(২) গঙ্গা-যমুনা
(৩) প্যার-কি-পিয়াস

বাংলা : (১) সমাপ্তি
(২) সপ্তপদী
(৩) পুনশ্চ

মারাঠি : (১) মানিনী
(২) বজয়ন্ত
(৩) মানসাল্লা পংখ অস্তাত

তামিল : (১) কাপ্পালোট্টিয় টামিঝান
(২) পাসা মলর
(৩) কুমুদম

মালয়লম : (১) মুড়িয়ানয়া পুত্রন
(২) কান্ডুম বেচা কোট্টু
(৩) সাবরিমালা শ্রীআইয়াপ্পান

অসমীয়া : (১) শকুন্তলা

তেলেগু : (১) ভার্যা ভারতলু

গুজরাটী : (২) মান্ডনবন

ওড়িয়া : (২) নুয়া বৌ

কানাড়া : (২) কিট্টুর চেন্নাম্মা

আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রথম স্থানাধি-কারী ছবিগুলি রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করবে।

থিয়েতর লাইবারের নিয়মিত অভিনয়:

কলকাতার অন্যতম নাট্য-সংস্থা থিয়েতর লাইবার ২৭-এ মার্চ থেকে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণ কলকাতায় 'থিয়েটার সেন্টার'-এ তাঁদের নতুন নাটক 'ধূলিমাটির সুর'-এর অভিনয় করছেন।

'ঢেউ-এর পর ঢেউ' ছবিতে কিশোর শিল্পী শান্তনু ও গোপা

সমরেশ বসুর ছোটগল্প 'মদনের স্বপ্ন' অবলম্বনে অগ্নিমিত্রম কর্তৃক রচিত এই নাটকখানি ১৯৬১-৬২ সালে থিয়েটার সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির পরিচালক ও অজয় দাস হচ্ছেন সংগীত-পরিচালক।

এস টি প্রোডাকসন্সের 'রতনলাল বাঙ্গালী':

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এস টি প্রোডাকসন্স-এর, 'রতনলাল বাঙ্গালী' ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে বর্তমানে কমল গাঙ্গুলীর সম্পাদনা-কক্ষে রয়েছে। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, চন্দ্রাবতী, সন্ধ্যা রায়, তন্দ্রা বর্মণ, কমলা মুখোপাধ্যায়, গীতা সিং, আশিসকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ধীরাজ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এতে সুরারোপ করেছেন— অভিজিৎ।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের "পান্থশালা":

গেল রবিবার, ৮ই এপ্রিল সকালে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ রমেন লাহিড়ী রচিত "পান্থশালা" কৌতুক-নাটকটি নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। পাড়াগেঁয়ে জমিদার রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাউণ্ডুলে ছেলে লাটু তারই শহুরে হবু-ভগ্নিপতি প্রকাশ এবং তার বন্ধু অজয়ের কাছে নিজেই যে শুধু আত্মগোপন করে, তাই নয়, তারা যখন ঐ পল্লীগ্রামে কোনো হোটেল আছে কিনা জানতে চায়, তখন তাদের উৎকট শহুরে-পনার উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে নিজেদের বাড়ীটাকেই তাদের চাহিদামত হোটেল বলে সেইখানে পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধুকে সঙ্গে দিয়ে। এবং বলে দিল—হোটেলওয়ালা বুড়ো পুরোনো জমিদার-বাড়ীর নীচের তলায় হোটেল খুলেছে ব'লে নিজেকেই জমিদার ব'লে জাহির করে আনন্দ পায়। অতএব প্রকাশ এবং অজয় জমিদার রমণীমোহনকে মনে করে হোটেলওয়ালা এবং নিজেদের পরস্পরের নাম পালটিয়ে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে করে দুর্ব্যবহার। জমিদার-গৃহিণী বিরজা দেবী অজয়কে প্রকাশ মনে ক'রে তার সঙ্গে আত্মীয়তা বাড়াবার চেষ্টা করেন এবং বিপত্তি চরমে ওঠে, যখন তাদের কন্যা মীরা তার হবু-স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দেয়, তারই মাসতুতো বোন মায়া বলে এবং প্রকাশ তার কথা বিশ্বাস করে মায়াকেই মীরা ভেবে নিয়ে তার সাহায্যে লেগে নিজেকে ধন্য করবার চেষ্টা করে।—এই ভুল বোঝা-বুঝি এবং ভুল জানাজানিকে আশ্রয় ক'রে যে-সব কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার জন্যে প্রেক্ষাগৃহে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে যায়।

"পান্থশালা" নাটকটির গোড়ার দিকের কিছুটা অংশ এবং শেষের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয়। এটুকু বাদ দিলে নাটকটি আরও রসঘন হতে পারত। নাটকটি মোটের উপর অত্যন্ত সুঅভিনীত ও সুপ্রযোজিত হয়েছে। অজয়ের ভূমিকায় সোমেন নন্দী নিঃসন্দেহে এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, চলন, অঙ্গভঙ্গী এবং ভাবপ্রকাশক দৃষ্টি কৌতুকনাট্যটিকে উপভোগ্যতার চরমে নিয়ে যেতে বহুলাংশে সহায়তা করেছে। লাটুর ছোট্ট ভূমিকাটিকে

কৃষ্ণাণ পাণ্ডু পরিচালিত 'শাদী' চিত্রে সায়রাবানু ও মনোজ

জীবন্ত ক'রে তুলেছেন দিলীপ রুদ্র তাঁর অসামান্য নাটনিপুণতা দ্বারা। অদিত কুণ্ডু তাঁর বাস্তবধর্মী অভিনয়ে নিজেকে অনায়াসেই জমিদার রমণীমোহনে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। প্রকাশের ভূমিকায় নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর সাবলীল অভিনয় আরো কিছু সরস হ'লে আরো ভাল হ'ত। মীরা এবং মায়ার ভূমিকায় উমা দাশগুপ্ত ও মায়া নিয়োগীর অভিনয় চরিত্রোপযোগী। অঞ্জলি লাহিড়ীর বিরজা কিছু আড়ষ্ট। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

খণ্ড দৃশ্যের সাহায্যে দৃশ্য পরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাত—উভয় বিভাগেই অমর ঘোষ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আসছে ৩০এ এপ্রিল বঙ্গীয় নাট্য সংসদ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করবে। এরই মধ্যে অন্ততঃ দু'খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং বাইশটি একাঙ্কিকাকে মঞ্চস্থ করা যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্লাঘার কথা। বঙ্গীয় নাট্য সংসদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক!

আস্তিক ফিল্মস-এর "পলাশের রঙ" :

একটি গ্রাম্য কবিয়ালের ছেলের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত বাণী বিশীর কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক সুশীল ঘোষ যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তারই চিত্ররূপ হবে আস্তিক ফিল্মস-এর "পলাশের রঙ"। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন : [illegible]কুমার, বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ, [illegible] মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, অঞ্জনা নাগ, চিত্রিতা মণ্ডল এবং নবাগতা সুতপা মজুমদার। ছবিটির আলোকচিত্র, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা এবং সঙ্গীত-পরিচালনার ভার নিয়েছেন : যথাক্রমে গণেশ বসু, গৌর পোদ্দার, শিব ভট্টাচার্য ও ভি বালসারা। বি এন বাহেড়ী ছবিখানির প্রযোজক।

চেনা-অচেনার "ভীমপলশ্রী" :

আজ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬॥টায় রঙমহলে "চেনা-অচেনা"র সভ্যরা বনফুলের সুখ্যাত কাহিনী "ভীমপলশ্রী"র সুনীল ঘোষ প্রদত্ত নাট্যরূপটিকে মঞ্চস্থ করবেন। নির্দেশনায় আছেন জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় :

বাঙলা নববর্ষের প্রথম দিন, ১৪ই এপ্রিল সকাল ১০॥টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত একক আড়াই ঘণ্টাব্যাপী মূকাভিনয়

প্রদর্শন করবেন। বিখ্যাত ফরাসী মূকাভিনেতা মার্সেল মার্শোর পর ভারতে এই প্রথম পেশাদারী পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী।

"নটাম" সম্প্রদায়ের পথের ডাক":

গেল ২৮এ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে শৌখীন নাট্য সম্প্রদায় "নটাম" তারাশঙ্করের "পথের ডাক" অভিনয় করেন। অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এবং রথীন চন্দ, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী, অতীশ রায়চৌধুরী, মণি গাঙ্গুলী, গণেন বরাট, তারা ভাদুড়ী, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা দে, গীতা বসু, নমিতা সমাজদার প্রভৃতির অভিনয়গুণে নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

অগ্রগামীর "কান্না":

গেল বৃহস্পতিবার, ১২ই এপ্রিল থেকে উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলায় মুক্তি পেয়েছে অগ্রগামী পরিচালিত এবং ডিলুক্স নিবেদিত নতুন ছবি "কান্না"। ছবির প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন : উত্তমকুমার, রাধামোহন, শ্যামল, সুলতা চৌধুরী, শোভা সেন ও নবাগতা নন্দিতা বসু। ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন সুধীন দাসগুপ্ত।

জালান প্রোডাক্সন্স-এর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা":

তপন সিংহ পরিচালিত এবং জালান প্রোডাকসন্স প্রযোজিত নবতম চিত্র হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনে মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা প্রভৃতি অভিনীত ছবিখানিতে সুর-যোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তিন দেশী ছবি

মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়োনির নতুন ছবি

আন্তোনিয়োনির "L' Avventura (লা আভেনতুরা) চিত্রজগতে একটি সোরগোল তুলেছিল। সোরগোল ওঠার কারণ চিত্রটির প্রতীকী দুর্বোধ্যতা। আভেনতুরা ছবিটির আঙ্গিক একেবারে খাঁটি তথ্যচিত্রের। সমগ্র ছবিটিই তোলা হয়েছে লোকেশনে এবং ডিটেলের কাজে ছবির কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে আন্তোনিয়োনি অন্তর্মুখপন্থী। কাহিনী গ্রন্থনে তিনি বহির্লোকের গতিবিধির ওপর নির্ভর না করে অন্তর্লোকের মানুষকে খুঁজেছেন। ফলে ছবির গল্পে নাটক থেকেও নেই, সমস্ত কিছুই যেন কেমন ছাড়া ছাড়া। আভেনতুরা ছবির বিরুদ্ধে অসংলগ্নতার অভিযোগ ওঠার পর পরিচালক উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছে করেই কাহিনীর ফাঁকগুলো রেখেছেন যাতে দর্শকরা নিজেদের কল্পনায় ফাঁকটা ভরে নেয়।

কিন্তু আন্তোনিয়োনির নতুন ইটালীয় ছবি "La Notte" (দি নাইট) নাট্যগতিসম্পন্ন সহজতর ছবি। এই ছবির গল্পটি নিতান্তই আটপৌরে এবং চরিত্রদের জীবনসমস্যাও আমাদের অতিচেনা। দি নাইট ইটালীর অসুস্থ জীবনের মানচিত্র। মিলানবাসী জনৈক প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক এবং তাঁর স্ত্রীর একটি অবক্ষয়ী অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার গ্লানি বর্তমান চিত্রের উপাদান। একটি গ্রীষ্মের অপরাহ্নে, হাসপাতালে এক পারিবারিক বন্ধুকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে স্ত্রী হঠাৎ বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। স্বামীকে ছেড়ে একা একা মিলানের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন এক অদ্ভুত একাকীত্ববোধের তাড়নায়। স্বামী গেলেন তাঁর নতুন উপন্যাস প্রকাশ উপলক্ষে প্রদত্ত একটি ককটেল পার্টিতে। পরে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বামী একটি সান্ধ্যভোজে গেলেন, সেখান থেকে আবার আরেক জায়গায়, সারারাত্রির বনভোজন উৎসবে। চারদিকের হৈ চৈ, হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে নিজের নিঃসঙ্গতাকে দ্বিগুণ করে ফিরে পেলেন স্ত্রী। ক্রমশঃ যেন স্বামীর মুখ তাঁর কাছে অচেনা হয়ে এল এবং ভোরের ধূসরতায় তাঁর মনে হল পৃথিবীতে তিনিই বুঝি একমাত্র নিঃসঙ্গ জীবিত সত্তা। মোটামুটি এই হচ্ছে দি নাইট চিত্রের কাহিনী। কাহিনীর মন্থরতা অধিকাংশ দর্শকের অসহনীয় মনে হতে পারে কিন্তু এই চিত্রে আন্তোনিয়োনি অবক্ষয়ী যুগের হতাশাকে কঠোর নিষ্ঠায় রূপায়িত করেছেন। জিন মরু অভিনয় করেছেন স্ত্রীর ভূমিকায় এবং স্বামীর ভূমিকায় আছেন মারসেলো মাস্ত্রোয়ানি।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৪৪ রান (রোহন কানহাই ১৩৯, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ৭৩ নট আউট, ম্যাকমরিস ৫০, রডরিগস ৫০, হল ৫০ নট-আউট। উমরিগড় ১০৭ রানে ৫, নাদকার্নী ৬৯ রানে ২, জয়সীমা ৬১ রানে ১ এবং দুরাণী ৫৪ রানে ১ উইকেট)।

ও ১৭৬ রান (৩ উইকেটে। হান্ট ৩০, ম্যাকমরিস ৫৬, কানহাই ২০, নার্স ৪৬ নট-আউট এবং সোবার্স ১৬ নট-আউট। দুরানী ৬৪ রানে ৩টে উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৯৭ রান (উমরীগড় ৫৬, পতৌদির নবাব ৪৭ এবং বোরদে ৪২। হল ২০ রানে ৫, রডরিগস ৫৩ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

ও ৪২২ রান (উমরীগড় ১৭২ নট-আউট, দুরানী ১০৪, মেহেরা ৬২ এবং নাদকার্নী ২৩। গিবস ১১২ রানে ৪, সোবার্স ১১৬ রানে ৩, হল ৭৪ রানে ১ এবং স্টেয়ার্স ৫০ রানে ১ উইকেট)

প্রথম দিন (৪ঠা এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—২৬৮ (৬ উইকেটে)। রডরিগস (২৫) এবং গিবস (০) নট আউট থাকেন। লাঞ্চের স্কোর—১০১ রান (১ উইকেটে) এবং চা-পানের স্কোর ২০৪ রান (৩ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিন (৫ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ওরেল দলের ৪৪৪ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—৬১ রান (৫ উইকেটে); ৬ষ্ঠ উইকেটের জুড়ি উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (৬ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৯৭ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষ ২৪৭ রান পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৬ রান (২ উইকেটে)। দুরানী ৯১ এবং মঞ্জরেকার ৯ রান ক'রে এই দিন নট-আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন (৭ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৪২২ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৩ রান (কোন উইকেট না পড়ে)। হান্ট এবং ম্যাকমরিস যথাক্রমে ১১ ও ১০ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

বিশ্রামের দিন (৮ই এপ্রিল)

পঞ্চম দিন (৯ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস—১৭৬ রান (৩ উইকেটে)।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়লাভ করেছে—আলোচ্য টেস্ট সিরিজে এই নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের উপর্যুপরি চতুর্থ জয়। এখন পঞ্চম টেস্ট খেলা বাকি। এই শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করলে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করবে।

ক্রিকেট খেলার রীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে বার্বাদোজের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি 'ল্যান্স গিবসের খেলা' নামে অভিহিত করেছিলাম। চতুর্থ টেস্ট খেলায় সেই সম্মান পলি উমরিগড়ের প্রাপ্য। প্রধানতঃ গিবসের বোলিং সাফল্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছিল। পলি উমরিগড়ের বোলিং এবং ব্যাটিং সাফল্যে ভারতীয় দল পরাজয় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি সত্য, কিন্তু প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড় ভারতবর্ষের দারুণ সংকটের সময়ে দক্ষ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একজনের পক্ষে যতখানি সম্ভব ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করেছিলেন। তিনি এই ভূমিকা গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পরাজয়ের গ্লানি অনেক পরিমাণ হ্রাস করেছেন পলি উমরিগড়। তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে ১০৭ রাণে ৫টা উইকেট পান এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ১৭২ রাণ করে বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ৮টা উইকেট পড়ে দলের রাণ ছিল ২৮৫—ভারতবর্ষ মাত্র ৩৮ রাণে অগ্রগামী। উইকেটে তখন উমরিগড় ৬৩ রাণ এবং নাদকার্ণি ২ রাণ করে নট আউট। দলের এই সংকট অবস্থা থেকে সুদক্ষ অধিনায়কের মতই তিনি দলকে ৪২২ রাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে নিজে অপরাজিত থাকেন। লাঞ্চের পর দলের ১৩৭ রাণ ওঠে। এই ১৩৭ রাণের মধ্যে উমরিগড়ের ১০৯ রাণ, নাদকার্ণির ২১ রাণ, সারদেশাইয়ের ০ এবং কুন্দরামের ৪ রাণ। এই থেকেই উমরিগড়ের খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টসে জয়লাভ করেন, বর্তমান টেস্ট সিরিজে পর পর দুটো টেস্ট খেলায় তাঁর টসে জয় হ'ল। খেলায় জয় পর পর চারটে। এবার আর ওরেল ভারতবর্ষকে তৃতীয় টেস্ট খেলার মত প্রথম ব্যাট করতে দান ছাড়লেন না। প্রথম উইকেট দলের ৫০ রানে এবং দ্বিতীয় উইকেট দলের ১৬৯ রানে পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ম্যাকমরিস এবং কানহাই ১২২ মিনিটের খেলায় দলের ১১৯ রান তুলে দেন। লাঞ্চের সময় দলের রান ছিল ১০১ (১ উইকেটে)। ম্যাকমরিস ৩৫ এবং কানহাই ৩৮ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় রান দাঁড়ায় ২০৪ (৩ উইকেটে)। তখন উইকেটে খেলছিলেন কানহাই এবং সোবার্স। এর পর আরও তিনটে উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৬৮ রান তুলে ৬টা উইকেট খুইয়ে। রডরিগস ২৫ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। তাঁর সপ্তম উইকেটের জুটি গিবস তখনও কোন রান করেন নি। এই দিনের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিলো—ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—খেলার সর্ব বিভাগে। রোহন কানহাই ১৩৯ রান ক'রে উমরীগড়ের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। কিছু কম চার ঘণ্টা তিনি খেলেছিলেন। বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১৫টা এবং ওভার-বাউণ্ডারী ২টো। রোহন কানহাই এই নিয়ে সবশুদ্ধ ২৯টা টেস্ট ম্যাচ খেললেন; সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭টা, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩টে এবং বর্তমান টেস্ট সিরিজে ২টো।

প্রথম দিনের খেলায় উমরীগড় ৩৯ রানে ৩টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের স্কোর দাঁড়ায় ৩৪৬, ৯ উইকেটে। অর্থাৎ সকালের দু'ঘণ্টার খেলায় পূর্ব দিনের ২৬৮ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ৭৮ রান যোগ হয়েছে আরও ৩টে উইকেটের বিনিময়ে। লাঞ্চের সময় উইকেটে নট-আউট ছিলেন ওরেল (২৬ রান)। লাঞ্চের পরের খেলায় ১০ম উইকেটের জুটি ওরেল এবং হল ব্যাট করতে নামেন। দলের ৪৪৪ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) অধিনায়ক ওরেল প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ১০ম উইকেটের জুটি ওরেল এবং হল ৮০ মিনিটের খেলায় ৯৮ রান তুলে দিয়ে যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে দশম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান প্রতিষ্ঠা করেন। দশম উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড—৫৫ রান (ওরেল এবং রামাধীন), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, নটিং-হ্যাম, ১৯৫৭। ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার ফলে ওরেল এবং হল যথাক্রমে ৭৩ এবং ৫০ রান ক'রে নট-আউট থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনের খেলা হলেরই খেলা। এই দিন হল ৫০ রান ক'রে নট-আউট থেকে ব্যাটিংয়ে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তেমনি দেন বোলিংয়ে—মাত্র ১২ রানে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট নিয়ে। তবু একটাও বাম্পার বা বাউন্সার ছাড়েননি।

ভারতবর্ষের ৩০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায় এবং এই পাঁচজন খেলোয়াড়—সারদেশাই সুর্তি, মঞ্জরেকার, জয়সীমা এবং মেহেরা সকলেই হলের বলে আউট। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা হলের বল দিয়ে আরম্ভ। হল তাঁর প্রথম ওভারের পাঁচটা বলেই ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পেলেন। ভারতবর্ষের রানের ঘর শূন্য। মেহেরা ৭০ মিনিট এক দিকের উইকেট বাঁচিয়ে খেলে দলের ৩০ রানের মাথায় বিদায় নেন। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় ৩০ রানের মাথায় উমরীগড়ের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন পতৌদির নবাব। এই দিন আর কিছু অঘটন ঘটেনি। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৩ মিনিট আগেই আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব এই দিন দলের ৩১ রান যোগ করেন।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

খেলোয়াড়--সারদেশাই, সুর্তি, মঞ্জরেকার,

ভারতবর্ষ বিগত তিনটি টেস্ট খেলায় প্রথম দিনে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করেছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রে খুব অল্প রানের মধ্যেই দলের চারটে উইকেট পড়ে যায়। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ব্যাট করার প্রথম সুযোগ লাভ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। এবার দেখা গেল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং আরও খারাপ, ৩০ রানে ৫টা উইকেটের পতন

তৃতীয় দিনে দলের ১২৪ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (পতৌদির নবাব) পড়ে যায়। পতৌদির নবাব ৯৩ মিনিটের খেলায় নিজের ৪৭ রান করেন। বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ৫টা। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে পতৌদির নবাব এবং উমরীগড় দলের ৯৪ রান তুলে দেন। উমরীগড়ের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে খেলতে নামেন বোরদে। এর পর উমরীগড় মোট ১৩০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫৬ রানে সোবার্সের বলে মেন-ডোনকার হাতে স্টাম্পড আউট হন। উমরীগড় ৬টা বাউণ্ডারী মেরেছিলেন এবং তাঁর ৫৬ রানই প্রথম ইনিংসের খেলায় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান হয়েছিল। পতৌদির নবাব এবং উমরীগড়ের বিদায়ের পর দলের আবার ভাঙ্গন শুরু হয়। বোরদে একদিকের উইকেট বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে ছিলেন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৯৭ রানে শেষ হয়। বোরদে ৮০ মিনিট খেলে ৪২ রান করেন। লাঞ্চের সময় স্কোর
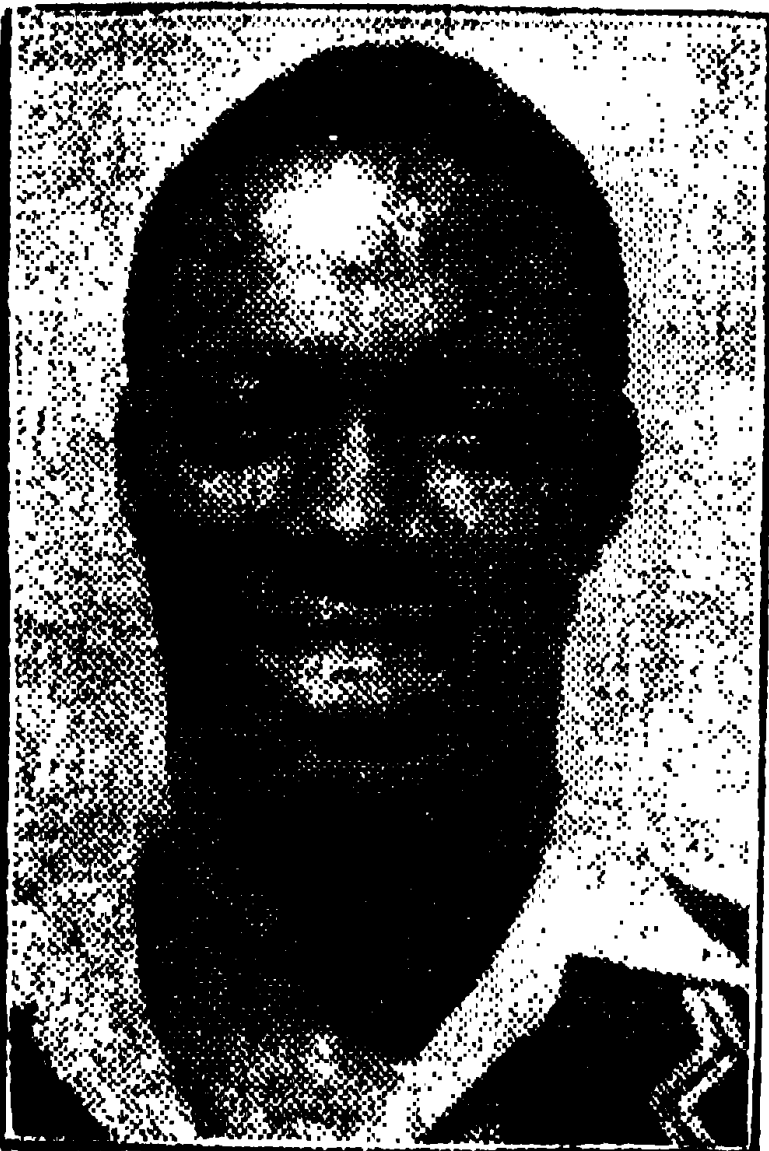
ওয়েসলে হল

পলি উমরীগড়

সেলিম দুরাণী

ছিল ১৭৯, ৯ উইকেটে। উইকেটে খেলছিলেন বোরদে এবং কুন্দরাম। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০ মিনিট টিকে ছিল এবং এই সময়ে ১৮ রান যোগ হয়েছিল। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েসলে হল বল করেননি। এই দিন রডরিগাস ৩টে এবং সোবার্স ২টো উইকেট পান।

ভারতবর্ষ ২৪৭ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ভারতবর্ষের এই প্রথম 'ফলো-অন' করার লাঞ্ছনা। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রথম আঘাত দিলেন স্টেয়ার্স দলের ১৯ রানের মাথায়; স্টেয়ার্সের বলে জয়সীমা ধরা পড়লেন মেনডোনকার হাতে। বিজয় মেহেরার সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন সেলিম দুরানী। এই জুটিই শেষ পর্যন্ত ভারতের মুখ রাখলেন। ১৩৬ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় উইকেটের জুটি মেহেরা এবং দুরানী ১৪৪ রান তুলে দেন; মেহেরা ১৫৫ মিনিটে ৬২ রান ক'রে খেলা থেকে বিদায় নেন্। বাউণ্ডারীর মার দেন ৭টা। মেহেরার খেলায় বিশেষ কোন চটক ছিল না, তিনি সোজা ব্যাট দিয়ে খেলে যান। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে তাঁর এই ৬২ রানই ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

মেহেরা এবং দুরানীর দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গতে ওরেল ৬ জন বোলার লাগিয়েছিলেন এবং ১৩৬ মিনিট খেলার পর তবে হলের বলে মেহেরা বোল্ড-আউট হন। নির্দিষ্ট সময়ে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৮৬, ২ উইকেটে, দুরানী ৯১ রান এবং মঞ্জরেকার ৯ রান ক'রে এই দিনে নট-আউট থেকে যান। তৃতীয় দিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষ ৩২২ রান করে—প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেটে ১৩৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেটে ১৮৬ রান। 'ফলো-অন' করা এবং ইনিংস পরাজয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় ৫½ ঘণ্টার খেলায় এত রান ওঠে।

চতুর্থ দিনের খেলার সূচনায় আবার ভারতীয় দলের ভাঙ্গন মাথা চাড়া দিয়ে দেখা দেয়। পূর্ব দিনের ১৮৬ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৬ রান যোগ এদিকে উইকেট পড়লো ২টো—মঞ্জরেকার (১৩ রান) এবং পতৌদির নবাব (১ রান) খেলা থেকে বিদায় নিলেন। পঞ্চম উইকেটে দুরানীর সঙ্গে খেলতে নামেন উমরীগড়। এই জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ২২১ রানের মাথায়—সেলিম দুরানী ১০৪ রান ক'রে সোবার্সের বলে রডরিগসের হাতে আটকে পড়েন। দুরানী ১৯৫ মিনিট খেলে তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। টেস্ট খেলায় এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রথম সেঞ্চুরী। দুরানী তাঁর ৯৯ রানের মাথায় সোবার্সের বলে মিড-অনে ওরেলের হাতে একটা 'ক্যাচ' দিয়েছিলেন; ওরেল 'ক্যাচটা' হাতে রাখতে পারেন নি, ফেলে দেন। উমরীগড়ের জুটি দুরানী, সুর্তি, বোরদে এবং সারদেশাই একে একে খেলা থেকে বিদায় নিলেন। দলের ২৭৮ রানের মাথায় ৮ম উইকেট (সারদেশাই) পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে উমরীগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন নাদকার্নী। লাঞ্চের সময়ের স্কোর খুবই মলিনমুখ—২৮৫ রান (৮ উইকেটে); উইকেটে ছিলেন উমরীগড় (৬৩ রান) এবং নাদকার্নী (২ রান)। চতুর্থ দিনের প্রথম দু' ঘণ্টার খেলায় দলের ৬টা উইকেট পড়েছে, পূর্ব দিনের ১৮৬ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৯৯ রান যোগ হয়েছে।

তরুণ চৌকস খেলোয়াড় সেলিম দুরাণীর খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। দলের ভাঙ্গনের মুখে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। তৃতীয় দিনে দলের ১৯ রানের মাথায় তিনি দ্বিতীয় উইকেটে মেহেরার সঙ্গে খেলতে নামেন এবং ১৩৬ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় উইকেটে দলের মূল্যবান ১৪৪ রান তুলে দেন। চতুর্থ দিনে দলের ২২১ রানের মাথায় তিনি সোবার্সের বলে রডরিগসের হাতে বল তুলে দিয়ে খুব আনাড়ীর মত আউট হয়েছিলেন। তাঁর ১০৪ রান তুলতে ২০০ মিনিট সময় লাগে, বাউণ্ডারী করেন ১৫টা। এই সময় ভারতবর্ষ মাত্র ২৬ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল।

লাঞ্চের পরের খেলা উমরীগড়েরই খেলা। যেমন তৃতীয় টেস্টে লান্স গিবস মাত্র ৬ রানে ভারতবর্ষের ৮টা উইকেট নিয়ে ভেল্কির খেলা দেখিয়েছিলেন, তেমনি মারের খেলা দেখান পলি উমরীগড় চতুর্থ দিনের লাঞ্চের পরের খেলায়। ভারতবর্ষের লাঞ্চের স্কোর (৮ উইকেটে ২৮৫ রান) দেখে ভারতবর্ষের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও বেশী কিছু আশা করেননি। উমরীগড় যে অন্য রকম আশা করেছিলেন, তা তাঁর খেলাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি তাঁর ১৭ এবং ২৬ রানের মাথায় 'চান্স' দিয়ে খুব জোর বেঁচে যান। এই দুটি ঘটনা এবং দলের সঙ্গীন অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাঁকে দুর্বার করে তুলে। হল এবং স্টেয়ার্সের বাম্পার এবং বাউন্সার বল তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। হলের এক ওভার বলে উমরীগড় ১৪ রান তুলে দেন—দুটো বলে 'হুক' করেন। দলের ৯ম উইকেট (নাদকার্ণী) পড়ে যায় ৩৭১ রানের মাথায়। ৯ম উইকেটের জুটিতে ৮৭ মিনিটের খেলায় নাদকার্ণী এবং উমরীগড় দলের অতি মূল্যবান ৯৩ রান তুলে দেন। ভারতবর্ষ ১২৪ রানে অগ্রগামী হয়। নাদকার্ণী দেড় ঘণ্টা খেলে ২৩ রান করে দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হন। শেষ উইকেটে খেলতে নামেন কুন্দরাম। কুন্দরাম এক ঘণ্টা খেলে মাত্র ৪ রান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই রানটাই বড় ছিল না—উইকেটে টিকে থাকাই বড় ছিল। কুন্দরাম এবং উমরীগড়ের ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের ৫১ রান ওঠে যায়। দলের ৪২২ রানের মাথায় কুন্দরাম গিবসের বলে ড্রাইভ মেরে রডরিকসের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। চতুর্থ দিনের খেলায় কোন ফাস্ট বোলারই উইকেট পাননি। এই দিনের ৮টা উইকেট পড়ে—গিবস পান ৪টে এবং সোবার্স ৩টে। নাদকার্ণী রান আউট হন। পলি উমরীগড় ১৭২ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। শেষদিকে উমরীগড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ায় কয়েকটা 'চান্স' দিয়েছিলেন। কিন্তু এইগুলি দিয়ে তাঁর খেলা ম্লান করা যায় না। দলের যখন ৪ উইকেট পড়ে ১৯২ রান, তখন ৫ম উইকেটে দুরাণীর সঙ্গে উমরীগড় খেলতে নামেন। তখনও ভারতবর্ষ ৫৫ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়েছিল। দলের ৪২২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ১৭৫ রানে অগ্রগামী হয়। কিন্তু উমরীগড় ১৭২ রান করে নট আউট থাকেন। ক্রিকেট খেলার যত রকমের দর্শনীয় মার আছে উমরীগড় তারই যেন প্রদর্শনী খুলে দিয়েছিলেন চতুর্থ দিনের খেলায়। মাঠের দর্শক-সাধারণ তাঁর খেলা দেখে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন—চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই

আলোচ্য টেস্ট সিরিজে স্থাপন করেছেন। উমরীগড় তাঁর এই ১৭২ রান তুলতে ২৯৮ মিনিট সময় নিয়েছিলেন, বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ২২টা। ২০৩ মিনিটে তাঁর ১৫০ রান পূর্ণ হয় এবং শেষের ৫০ রান তুলে দেন ৪৫ মিনিটে। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে উমরীগড়ের এই প্রথম সেঞ্চুরী এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় সেঞ্চুরী। পূর্বের সেঞ্চুরী ১১৭ রান, কিংসটন ১৯৫২--৫৩ এবং ১০০ রান, ত্রিনিদাদ (১ম টেস্ট), ১৯৫২--৫৩। উমরীগড়ের এই নট আউট ১৭২ রানই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড : ১৬৩ নট আউট—এম এল আপ্তে, কিংসটন, ১৯৫২-৫৩। এই নিয়ে উমরীগড়ের টেস্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২টা, ৫৮টা টেস্ট খেলায়। সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ টেস্ট খেলা ধরে উভয় দলের সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩২ (১৯৬২ সালের ৪টে সেঞ্চুরী) এবং ভারতবর্ষ ১৩ (১৯৬২ সালে ২টো সেঞ্চুরী)।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান তুলতে এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এক ঘণ্টার সময়ে কোন উইকেট নষ্ট না ক'রে ১৫ রান তুলে দেয়।

পঞ্চম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে তিনটে উইকেট হারাতে হয়। খেলার বিরতির নির্দিষ্ট সময় থেকে ৮ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ৯০, কোন উইকেট না পড়ে। ম্যাকমরিস ৫৪ এবং হাণ্ট ২৭ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন।

রোহন কানহাই

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

বোম্বাইয়ে কমনওয়েলথ একাদশ দল বনাম ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতির একাদশ দলের চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইন্ডিয়ার সভাপতির একাদশ দলের অধিনায়ক রামচাঁদ টসে জয়লাভ করেও কমনওয়েলথ দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। প্রথম দিনের খেলায় ৫ উইকেট পড়ে তাদের ৪৩৫ রান ওঠে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ক্রেগ (১০১ রান) এবং ববি সিম্পসন (১০৪ রান) সেঞ্চুরী করেন। এই দু'জন খেলোয়াড়ের প্রথম উইকেটের জুটিতে দলের ২০৮ রান ওঠে। ইংল্যাণ্ডের টম গ্রেভনী ৫ রানের জন্যে সেঞ্চুরীর সম্মান থেকে বঞ্চিত হন।

দ্বিতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ৫১৮ রানে শেষ হ'লে সভাপতির একাদশ দল বাকি সময়ে ৩ উইকেট খুইয়ে ২২০ রান তুলে দেয়। সুধাকর অধিকারী ১২৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে সভাপতির একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৪৭২ রানে শেষ হলে কমনওয়েলথ দল ৪৬ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। অধিকারী উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৫০ রান করেন। এইদিনের খেলায় কমনওয়েলথ দলের চারটে উইকেট পড়ে গিয়ে ১১৯ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থ দিনে কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৩ রানে শেষ হয়। বালু গুপ্তে ৯৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় সভাপতির একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২১৪ রান উঠেছে ৬টা উইকেট পড়ে। ফলে খেলাটি ড্র যায়।

কমনওয়েলথ দল : ৫১৮ রান (ববি সিম্পসন ১০৪, আয়ান ক্রেগ ১০১, টম গ্রেভনি ৯৫, এভার্টন উইকস ৫৫, রমণ সুব্বারাও ৫১, রিচি বেনো ৭০। সিভালকার ১২৯ রানে ৫ এবং বালু গুপ্তে ১৬১ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২৫৩ রান (বেনো ৬৪, সুব্বারাও ৪০। রাজিন্দর পাল ৪৪ রানে ১, বালু গুপ্তে ৯৪ রানে ৪, সিভালকর ৪৪ রানে ২ এবং দিওয়াদকার ৪৫ রানে ২ উইকেট)।

সি সি আই প্রেসিডেন্ট দল : ৪৭২ রান (সুধাকর অধিকারী ১৫০, আমরোলিওয়ালা ৯০, জি এস রামচাঁদ ৬১। সিম্পসন ১২১ রানে ৩, মোডক ২, রামাধীন ৯৪ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ২১৪ রান : (৬ উইকেটে। ভোঁসলে ৫২, আমরোলিওয়ালা ৪৭ এবং সূর্যবীর ৪২। বেনো ৫৭ রানে ২ উইকেট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।